# ইসলামী বিশ্বকোষ

Contents

## পঞ্চম খণ্ড

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

الـمـوسـوعـة الاسـلا مـيـة

بـالـلـغـة الـبـنـغـالـيـة

الـمـجـلـد الـخـامـس

# ইসলামী বিশ্বকোষ

## পঞ্চম খণ্ড

ইমাদ শাহী—ঈসাওয়া

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

**ইসলামী বিশ্বকোষ (৫ম খণ্ড) (পৃষ্ঠা ৮০০ )**
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের
আওতায় সংকলিত ও প্রকাশিত

ইবিবি প্রকাশনা ঃ ৫২
ইফাবা প্রকাশনা ঃ১৩২৫/২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.০৩
ISBN : 984-06-1102-0

**প্রথম প্রকাশ**
জুমাদা'ল-উলা ১৪০৬
মাঘ ১৩৯২
জানুয়ারী ১৯৮৬

**দ্বিতীয় মুদ্রণ**
সেপ্টেম্বর ২০০০
ভাদ্র ১৪০৭
জুমাদা আছ-ছানী ১৪২১

**দ্বিতীয় সংস্করণ**
আষাঢ় ১৪১৩
জুমাদা'ল-উলা ১৪২৭
জুন  ২০০৬

**প্রকাশক**
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

**মুদ্রণ**
**মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ**
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

**বাঁধাই**
আল-আমিন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৮৫, শরৎ গুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

**প্রচ্ছদ**
গ্রাফিক আর্টস (জু.)
২৫, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

**মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা মাত্র**

---

Islami Bishwakosh (5th Volume) 2nd ed. (The Encyclopaedia of Islàm in Bengali) Edited by the Board of Editors and published by A. S. M. Omar Ali on behalf of Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarrarm, Dhaka-1000. Phone : 9551902 June 2006

web site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 590.00 ; US $ 30

## সম্পাদনা পরিষদ ( ১ম সংস্করণ )



## সম্পাদনা পরিষদ ( ২য় সংস্করণ )

# আমাদের কথা

বিশ্বকোষ বিশ্বের সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার। সেই অর্থে ইসলামী বিশ্বকোষ হইল ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্নমুখী জ্ঞানের ভাণ্ডার। ইসলামের ব্যাপক বিষয়াবলী ইসলামী বিশ্বকোষের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নহে, বরং ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। একটি অনুপম জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলাম বিশ্বকে উপহার দিয়াছে একটি নৈতিক মানদণ্ড। ইসলামের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে আমরা পাইয়াছি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধনা উজ্জল অসংখ্য মহৎ ব্যক্তিত্ব।

সভ্যতার ইতিহাসে ইসলামের স্থান সকল কিছুর শীর্ষে। জীবন ও ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে এবং সৃষ্টির প্রতিটি বিষয়ে ইসলামের অখণ্ড মনোযোগ রহিয়াছে এবং সেই সঙ্গে রহিয়াছে উহার বিশেষ ভূমিকা ও অবদান। আর সেইজন্যই ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি এত ব্যাপক, বৈচিত্র্যময় ও বহুমাত্রিক।

ইসলামের এই ব্যাপক ও বহুমাত্রিক বিষয়সমূহ বাংলাভাষী পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৮০ সালে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে দুই খণ্ডে সমাপ্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়।

বাংলাভাষী পাঠক সমাজে ইহার ব্যাপক সাড়া ও চাহিদা লক্ষ্য করিয়া পরবর্তী কালে পঁচিশ খণ্ডে বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিষয়ের ব্যাপকতার কারণে ষোলতম খণ্ড দুই ভাগে এবং চব্বিশতম খণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া মোট ২৮ খণ্ডে তাহা সমাপ্ত হয়। মাত্র ১৫ বৎসর সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ এই প্রকাশনার কাজটি ২০০০ সালে সমাপ্ত হয়।

ইহা অনস্বীকার্য যে, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হওয়ার পর লেখক, সাহিত্যিক, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষক তথা প্রতিটি মহলে উহার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। ইসলামী বিশ্বকোষের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা তাহাদের জ্ঞানগবেষণা চালাইয়া যাইতে নিশ্চিন্ত বোধ করেন।

অত্যন্ত স্বল্প সময়ে এই বৃহত্তর প্রকাশনার কাজ আঞ্জাম দেওয়ার কারণে কোন কোন নিবন্ধ অপ্রতুল থাকিয়া যায়, আবার তথ্য ও উপাত্ত না পাওয়ার কারণে কোন কোন নিবন্ধ আশানুরূপ সমৃদ্ধশালী করা সম্ভবপর হয় নাই। তাই আরও সমৃদ্ধ আকারে ইসলামী বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভূত হয় যাহা প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি বিশ্বকোষেরই ধর্ম।

ইসলামী বিশ্বকোষের নিবন্ধগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করার মানসে বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা ইহার সমস্ত নিবন্ধ পুনঃ সম্পাদনা করানো হইয়াছে। অনেক নিবন্ধই নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজানো হইয়াছে। বেশ কিছু নিবন্ধ সম্পূর্ণ নূতনভাবে লেখা হইয়াছে।

এইরূপে আজ ইসলামী বিশ্বকোষ পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহার সহিত জড়িত লেখক, সম্পাদক, প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট প্রেসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এজন্য তাহাদের সকলকেই মুবারকবাদ জানাই। মহান আল্লাহ তা'আলা সকলকেই তাহাদের এই কষ্টের বিনিময়ে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন।

**মোঃ ফজলুর রহমান**
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

# প্রকাশকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ। ইসলামী বিশ্বকোষ-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এজন্য আমরা সর্বপ্রথম সকল কর্মের নিয়ামক পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে লাখো কোটি হ'াম্‌দ ও শোকর পেশ করিতেছি, পেশ করিতেছি অসংখ্য রুকূ ও সিজদা। কেবল তিনিই তওফীক দানকারী এবং তাঁহার বান্দাদেরকে মনযিলে মকসূদে পৌঁছাইতে একমাত্র তিনিই সাহায্যকারী। এতদসঙ্গে সালাত ও সালাম প্রিয়নবী সায়্যিদুল-মুরসালীন, খাতিমুন-নাবিয়্যীন, শাফী'উল-মুযনিবীন আহ'মাদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যাঁহার সীমাহীন ত্যাগ ও অপরিসীম কুরবানীর ওসীলায় আমরা হিদায়াতরূপ অমূল্য সম্পদ লাভে ধন্য হইয়াছি আর পৃথিবীর মানবমণ্ডলী লাভ করিয়াছে আলোকোজ্জ্বল এক অতুলনীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সুস্থ সঠিক জীবনবোধ।

ইসলাম প্রচলিত অর্থে কেবল একটি ধর্মই নয়, একটি জীবন দর্শন, সেই সঙ্গে একটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাও বটে। মানব সৃষ্টির সূচনা হইতেই ইসলাম মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করিতে বিপুল অবদান রাখিয়াছে। শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, দর্শন, অধ্যাত্ম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান ব্যাপক ও বহুমুখী। শতাব্দী পরিক্রমায় সৃষ্ট এই সব অবদান মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে মুদ্রিত পুঁথির পৃষ্ঠায়, পাণ্ডুলিপিতে, স্থাপত্য নিদর্শনে, নানা সংগঠন ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে। পৃথক পৃথকভাবে ইহার কোন একটি বিষয়ের অধ্যয়নে যে কোন জ্ঞানপিপাসু পাঠক তাহার সমগ্র জীবন কাটাইয়া দিতে পারেন। এই ধরনের বিপুল বিষয়সমূহের মূল কথা ও তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া বিশ্বকোষে সংকলন করা হয়। ইসলামী বিশ্বকোষও তদ্রূপ ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানের একটি অত্যাবশ্যকীয় সংকলন। বিশ্বের অগ্রসর সমাজ কর্তৃক ইংরাজী, আরবী, ফারসী ও উর্দূসহ কয়েকটি ভাষায় ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু উপমহাদেশের প্রায় একুশ কোটি বাঙলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য তাহাদের ধর্ম ও জীবনাদর্শ, তাহযীব-তমদ্দুন ও ইতিহাস সম্বন্ধে কোন ইসলামী বিশ্বকোষ ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। তাই তাহাদের, বিশেষ করিয়া বাংলাভাষী মুসলমানদের ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করিবার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা কর্মসূচী গ্রহণ করে। অতঃপর পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম পর্যায়ে দুই খণ্ডে বিভক্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশ করে এবং সেই সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ে আনুমানিক বিশ খণ্ডে বিভাজ্য বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনার কার্যক্রমও গ্রহণ করে যাহা পরবর্তী পর্যায়ে ২৮ খণ্ডে উন্নীত হয়।

১৯৮২ সালে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হইলে আগ্রহী পাঠক ইহাকে সাগ্রহে গ্রহণ করেন এবং স্বল্পতম সময়ে ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। অতঃপর পাঠকদের নিরন্তর তাকীদ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মতামতের আলোকে আরও ৬৯টি নিবন্ধ সহযোগে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। পরম আনন্দের বিষয়, প্রকাশের অত্যল্প কালের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণটিও নিঃশেষিত হইয়া যায়। ফলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগ হইতে ইহার তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করিতে হইয়াছে। বর্তমানে ইহাও সমাপ্তির পথে।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষের প্রতি পাঠক সমাজের এই বিপুল আগ্রহ যেমন আমাদিগকে বিস্ময়াভিভূত করে তেমনি বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশে উৎসাহিত করে, নিরন্তর পরিশ্রমে করে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। আর ইহারই ফলে ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে ইসলামী বিশ্বকোষ-এর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে ইহার সর্বশেষ খণ্ড হিসাবে ২৬ তম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে ১৬তম খণ্ডটি ১৬শ খণ্ড (১ম ভাগ) ও ১৬শ খণ্ড (২য় ভাগ) এবং ২৪তম খণ্ডটি ২৪তম খণ্ড (১ম ভাগ) ও ২৪তম খণ্ড (২য় ভাগ) নামে দুই অংশে প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার জগতে গতিশীলতার ক্ষেত্রে ইহাকে অনন্য নজীরই বলিতে হইবে। স্মর্তব্য, ২য় ও ৩য় খণ্ড প্রকাশের মাঝে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ-এর পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে আমাদিগকে অতিরিক্ত শ্রম দিতে হয়। অন্যথায় আরও সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ইহার প্রকাশ সম্ভব হইত। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ২৩ খণ্ডে সমাপ্ত উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ "দাইরা-ই মা'আরিফ-ই ইসলামিয়্যা" (দা.মা.ই.) সংকলন ও প্রকাশনায় ৪০ বৎসরের মত সময় লাগিয়াছে।

পরম আনন্দ ও সুখের বিষয় এই যে, শিক্ষিত ও সচেতন পাঠক সমাজ কর্তৃক আমাদের এই উদ্যোগ সাদরে গৃহীত ও প্রশংসিত হইয়াছে এবং ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রথম সংস্করণ হিসাবে প্রকাশিত ইহার সমুদয় কপি দ্রুত নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছে। ইতোমধ্যে ১ম ও ২য় খণ্ডটি নিঃশেষ হইবার ফলে পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে ২য় মুদ্রণ প্রকাশ করিতে হয়। আশার কথা, বর্তমানে ইহাও শেষ হইয়া গিয়াছে। ফলে ইসলামী বিশ্বকোষ-এর এধরনের সম্ভাব্য চাহিদার কথা মনে রাখিয়াই ২০০০-২০০৫ সালের ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমলে গৃহীত জীবনী বিশ্বকোষ প্রকল্পের আওতায় ২২ খণ্ডে সমাপ্য সীরাত বিশ্বকোষ-এর কাজ শুরু হয় এবং ইহার আওতায় ইসলামী বিশ্বকোষ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কাজ হাতে নেওয়া হয়। অতঃপর প্রাথমিকভাবে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি সম্পাদনা পরিষদের নিকট ইহার সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই পরিষদ কর্তৃক ১ম ও ২য় খণ্ড সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। অতঃপর এই সংকলিত বিশ্বকোষটি অধিকতর সমৃদ্ধ নির্ভুল করিবার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে ৫টি সম্পাদনা সাব-কমিটি এবং এ সমস্ত সাব-কমিটির সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনা সাব-কমিটি এবং এ সমস্ত সাব-কমিটির সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়। আর এই পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত পাণ্ডুলিপিটি পরিপূর্ণ অবস্থায় এক্ষণে আমাদের আগ্রহী পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে পারায় আমরা পুনরায় আল্লাহ রাব্বু'ল-'আলামীনের দরবারে অশেষ হ'াম্দ ও শোকর আদায় করিতেছি।

নব পর্যায়ে ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ)-এর পঞ্চম খণ্ড সংকলন ও প্রকাশের পেছনে যাহাদের অনস্বীকার্য অবদান রহিয়াছে আমরা তাহাদের নিকট আমাদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। বিশেষ করিয়া বিশ্বকোষের সম্মানিত লেখক ও অনুবাদক, শ্রদ্ধেয় সম্পাদকমণ্ডলী, বিশ্বকোষ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ইহার কম্পোজ, মুদ্রণ ও বাঁধাইকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট আমাদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা সীমাহীন। আমরা তাহাদের জন্য জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পাকের দরবারে ইহার উপযুক্ত বিনিময় কামনা করি এবং তিনি ইহা তাঁহার শান মুতাবিক দিবেন বলিয়া আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস।

ইসলামী বিশ্বকোষ-এর বর্তমান খণ্ড প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম মহাপরিচালক জনাব মোঃ ফজলুর রহমান-এর নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি যিনি নানাভাবে উৎসাহ দিয়া এবং ইহার প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করিয়া ইহার প্রকাশকে সহজ করিয়াছেন। এতদসঙ্গে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব জনাব বদরুদ্দোজা, অর্থ পরিচালক জনাব লুতফুল হক, প্রকাশনা পরিচালক জনাব আবদুর রব, লাইব্রেরিয়ান জনাব সিরাজ মান্নান, পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালক জনাব নূরুল আমীন-এর নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অধিকন্তু অত্র বিভাগে কর্মরত গবেষণা কর্মকর্তা ড. হাফেজ মাওলানা আবদুল জলীল, প্রকাশনা কর্মকর্তা মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, গবেষণা সহকারী মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুবসহ আমার সকল সহকর্মীর প্রতি তাহাদের নিরলস শ্রম ও আন্তরিক সহযোগিতার জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছি। ই.ফা.বা. প্রেস ব্যবস্থাপককে কম্পোজও মুদ্রণের জন্য এবং আল-আমিন প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্সকে বাঁধাই এবং প্রুফ রীডারবৃন্দকে ইহার নির্ভুল প্রকাশে সহযোগিতা দানের জন্য জানাইতেছি অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। আল্লাহ্ পাক সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা দিন, ইহাই আমাদের একান্ত মুনাজাত।

পরিশেষে ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের পক্ষ হইতে আমরা জানাইতে চাই, বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা একটি জটিল ও শ্রমসাধ্য কাজ। আল্লাহর অপার রহমত এবং সংশ্লিষ্ট সকলের দু'আ ও সহযোগিতা আমাদের সম্বল। ফলে সঙ্গত কারণেই ইহার নানা পর্যায়ে ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা সতর্ক ও সন্ধানী পাঠকের চোখে পড়িবে। তাই সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার নিকট আমাদের বিনীত আবেদন, মেহেরবানী করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান পরামর্শ দান করিবেন এবং পরবর্তী খণ্ডগুলি যাহাতে অধিকতর উন্নত, তথ্যসমৃদ্ধ ও নির্ভুল হয় সেজন্য আমাদের সাহায্য করিবেন।

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب

**আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী**
পরিচালক

বৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়

১। বিশ্বকোষে ব্যবহৃত অনুলিখন পদ্ধতি; ২। বর্ণানুক্রম; ৩। পাঠ সংকেত ঃ শব্দ সংক্ষেপ; ৪। নিবন্ধকার ও অনুবাদকবৃন্দের তালিকা; ৫। বহুল উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের/সাময়িকীসমূহের সংক্ষিপ্ত নাম।

বিশ্বকোষে ব্যবহৃত অনুলিখন পদ্ধতি

'আরবী, ফারসী ও ইংরাজী (রোমান) বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| أ = আ a | ج = জ dj, j | ز = য z | ع = ' | م = ম m |
| ا = ই i | چ = চ c | ژ = ঝ· zh | غ = গ· gh | ن = দ n |
| اُ = উ u | ح = হ. h | س = স s | ف = ফ f | ه = হ h |
| ب = ব b | خ = খ kh | ش = শ sh | ق = ক' k.q | و = ও w |
| پ = প p | د = দ d | ص = স· s | ك = ক k | ى = য় y |
| ت = ত r | ڈ = ড d́ | ض = দ·/য- d | گ = গ g | ے = ে ay |
| ث = ছ· th | ذ = য· dh | ط = ত· t | ل = ল l | ء = ' |
| | ر = র r | ظ = জ· z | | |
| | ڑ = ড় ŕ | | | |

'আরবী স্বরচিহ্নের অনুলিখন

যবর ( َ ) আ , া = احد = আহা·দ, بشر = বাশার,

যবর + আলিফ = া حلال = হ·লাল,

যবর + و = াও, يوم = য়াওম, قوم = ক·াওম,

যবর + ى = ায়, ليل = লায়ল, شيدا = শায়দা,

যের ( ِ ) = ই / ি ابل = ইবিল,

যের + ى = ঈ / ী عيسى = 'ঈসা, نسيم = নাসীম,

যের (ফারসী শব্দ) = এ / ে پيش = পেশ,

পেশ ( ُ ) উ / ু احد = উহু·দ, كتب = কুতুব, উল্টা পেশ ( ) = له = লাহূ

পেশ + و = ঊ / ূ قعود = কু·ঊদ, موسى = মূসা,

যবর ও তাশ্দীদযুক্ত ى = য়্যা بيّن = বায়্যানা, যের ও তাশ্দীদযুক্ত ى = য়্যি سيّد = সায়্যিদ, পেশ ও তাশ্দীদযুক্ত ى = য়্যু حى = হ·ায়্যু, যবর ও তাশ্দীদযুক্ত و = ওওয়া, صوّر = স·াওওয়ারা, যের ও তাশ্দীদযুক্ত وّ = ব্বি· مصوّر = মুসাব্বির / মুসাব্বির পেশ ও তাশ্দীদযুক্ত و = ওউ تصوف = তাস.াওউফ, যবরের পর أ = সাকিন رأس = রা'স, যেরের পর أ সাকিন بئس = বি'সা, পেশের পর أ সাকিন مؤمن মু'মিন, যবরযুক্ত و = ওয়া ولى = ওয়ালী, যেরযুক্ত و = বি وتر = বিত্‌র, পেশযুক্ত و = উ وضوء = উদূ (উযূ'-);

খাড়া যবর = া قتل = ক·াতালা, اوى = আাওয়া,

খাড়া যের = ী, ربه = রব্বিহী, يحيى = য়ুহ·য়ী,

অন্তে অনুচ্চারিত ة = ঃ (বিসর্গ) ঃ جنة = জান্নাঃ, জান্নাঃ, عائشة = 'আ'ইশাঃ,

শেষ বর্ণ ه সাকিন = হ্ الله = আল্লাহ্ نامه = নামাহ্।

ع = و এবং ی = যুক্ত শব্দের অনুলিখন প্রকরণ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ع = 'আ | عبد = 'আব্দ | وِ = বি· | وتر = বি·ত্র |
| ع = 'ই | علم = 'ইল্ম | و = ہ | وحى = 'ওয়াহ্·য়ি |
| ع = 'উ | عثمان = 'উছ·মান | وُ = উ | وضوء = উদূ'(উযূ') |
| عا = 'আ | عابد = 'আবিদ | و + الف = ওয়া | واجب = ওয়াজিব |
| عى = 'ঈ | عيد = 'ঈদ | وَ + عْ = ওয়া' | وعظ = ওয়া'জ· |
| عو = 'ঊ | عود = 'ঊদ | | |
| وَ = ওয়া | ولد = ওয়ালাদ | و + ى = ওয়ায় | ويل = ওয়ায়ল |

يَ = য়া يهود = য়াহূদ يُ + و = য়ূ يوسف = য়ূসুফ يَ + يْ = য়ায় ييئس = য়ায়'আস্

a এ = া, আা I= ী ঈ U = = উ

**অনুলিখনের বেলায় যেসব ব্যতিক্রম মানিয়া লওয়া হইয়াছে**

**ব্যতিক্রম**

(১) কোন ব্যক্তি নিজ নাম বাংলায় যে বানানে লিখিয়াছেন দেখা যায়, তাহার নামের সেই বানান রক্ষিত হইয়াছে।

(২) যে সকল 'আরবী, শব্দ বহু ব্যবহারের দরুন বাংলায় একটা প্রচলিত বানান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সেইগুলিকে সাধারণত প্রচলিত আকারেই রাখা হইয়াছে। যথা ঃ

আইন, আখিরাত, আদম, আদালত, আরবী, ইমাম, ইন্তিকাল, ইরান, ইরশাদ, ইসলাম, ঈমান, ওযু / উযু, কদর, কবর, কলম, কানুন, কাফির / কাফের, কাযী, কিতাব, কিয়ামত, কুরবানী, খলীফা, গযব, জিহাদ, তওবা, তওরাত, তরজমা, তশরীফ, তসবীহ, তারিখ, তারিফ, দওলত (দৌলত), দফতর / দপ্তর, দলীল, নফল, নবী, ফকীর, ফজর, ফরয, মাওলানা, মক্কা, মদীনা, মন্যিল, মসনদ, মসজিদ, মাফ, মিম্বর, মুকাবিলা / মোকাবিলা, মুতাবিক / মোতাবেক, মুনাফিক, মৌলবী, রওযা, রমযান, রহমত, যাকাত, শহীদ, সালাম, সিজদা, সুন্নত, হক, হজ্জ, হযরত, হরফ, হলফ, হুকুম ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, এই সকল শব্দ 'আরবী, ভাষার বাক্যাংশ কিম্বা উদ্ধৃতি অথবা ঐ সকল ভাষার গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের নাম হইলে সেইগুলি প্রতিবর্ণায়িত হইবে।

**বর্ণানুক্রম**

নিম্নলিখিত বর্ণানুক্রমে নিবন্ধাদি বিন্যস্ত হইয়াছে ঃ

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য য় র ল শ ষ স হ

**পাঠ-সংকেত ঃ শব্দ সংক্ষেপ**

অনু. ...................... অনুবাদ, অনূদিত
'আ ...................... 'আরবী
আনু. .................... আনুমানিক
আবি. .................... আবির্ভাব
('আ) .................... 'আলায়হিস্-সালাম
ই. ...................... ইত্যাদি
ইং. ...................... ইংরাজী
ঐ. ...................... ib. ibid, و هى كتاب
খৃ. খ্রী. .................. খৃস্টাব্দ, খ্রীস্টাব্দে, ع
খৃ. পূ. .................. খৃস্টপূর্ব

Contents



জ. ........................ জন্ম
ড. ডঃ. .................. ডক্টর (পি.এইচ.ডি. ইত্যাদি)
ডা. ডাঃ. ................. ডাক্তার (চিকিৎসক)
তা. বি. .................. তারিখবিহীন n.d.
তু. ...................... তুলনীয় cf. قب
দ্র. ...................... দ্রষ্টব্য, q.v., s. v. رك بان
নং. ..................... নম্বর, No.
প. ..................... পরবর্তী, sq. sqq. f. ff. ببعد
পরি. .................... পরিশিষ্ট, suppl.....supplement
পাণ্ডু. ................... পাণ্ডুলিপি, MS.
পূ. গ্র. .................. পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, op. cit. كتاب مذكور
পূ. স্থা. ................. পূর্বোল্লিখিত স্থানে, loc. cit. محل مذكور
ব.ব. .................... বহুবচন
বি. স্থা. ................. বিভিন্ন স্থানে
মু., মুদ্র. ................ মুদ্রণ
মূ. ধা. .................. মূল ধাতু
মৃ. ...................... মৃত, মৃত্যু = م
(র). .................... রাহ্‌মাতুল্লাহি 'আলায়হি
(রা). ................... রাদিয়াল্লাহু 'আন্‌হু
(স). .................. সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম
সং. ..................... সংস্করণ
সম্পা. .................. সম্পাদিত, ed.
স্থা. ..................... বিভিন্ন স্থানে, passim, بمواضع كثيره
হি. ..................... হিজরী, হিজরীতে,
প., দ্র. ................ পরবর্তীতে দ্রষ্টব্য, Infra
ঐ লেখক. ........... id. Idem, وهى مصنف
শা/ধা. ................ section mark, فصل
শিরো, ধাতু. .......... শিরোনামে, بذيل مادة s.v.
পত্র, পত্রক. ........... fols.
তথা. ................. Sc.
মূ. পা. ................. Sic. মূল পাঠ (উদ্ধৃতি মূলের অবিকল অনুরূপ)
লা. ছত্র. ............... Line. লাইন, س
ক. ..................... a
খ. ..................... b
১খ. ৪০ ............ প্রথম খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা (গ্রন্থের ক্ষেত্রে)
৩ ঃ ৭ ................ সূরাঃ ৩-এর আয়াত ৭ (কুরআন মাজীদের ক্ষেত্রে)

৪৫০/১০৫৮......... হি. ৪৫০ সন মুতাবিক খৃ. ১০৫৮ (সন উল্লেখের বেলায়) যেখানে জন্ম বা মৃত্যুসন অজ্ঞাত (বা অনিশ্চিত) সেখানে '?' (প্রশ্নবোধক চিহ্ন) দেওয়া হইয়াছে।

# নিবন্ধকার ও অনুবাদকবৃন্দের তালিকা

Contents





## বহুল উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত নাম

'আওফী, লুবাব=লুবাবুল আলবাব, সম্পা. E. G. Browne, লন্ডন-লাইডেন ১৯০৩-১৯০৬ খৃ.। আগ'নী[১] অথবা[২] অথবা[৩]= আবুল ফারাজ আল-ইস'ফাহানী, আল-আগ'নী, বূলাক ১২৮৫ হি.; [২] কায়রো ১৩২৩ হি.; [৩] কায়রো ১৩৪৫ হি.।

আগ'নী, Tables=Tables Alphabetiques du কিতাবুল আগানী, redigees par I. Guidi, Leiden ১৯০০ খৃ.।

আগ'নী, Brunnow=কিতাবুল-আগানী, ২১ খ., সম্পা. R. E. Brunnow, লাইডেন ১৮৮৩ খৃ.।

আবুল-ফিদা, তাক'বীম=তাক'বীমু'ল-বুলদান, সম্পা. J.-T. Reinaud এবং M. de Slane, প্যারিস ১৮৪০ খৃ.।

আবু'ল-ফিদা, তাক'বীম, অনু.=Geographie d'Aboulfeda, traduite de l'arabe en francais, ১খ., ২খ., I by Reinaud, প্যারিস ১৮৪৮; ২খ. by St. Guyard, ১৮৮৩ খৃ.।

আল-আন্‌বারী, নুযহা=নুযহাতু'ল-আলিব্বা ফী ত'াবাক'াতি'ল-উদাবা , কায়রো ১২৯৪ হি.।

'আলী জাওয়াদ, মামালিক-ই 'উছমানিয়্যীন তারীখ ওয়া জুগা'রাফিয়া লুগাতি, ইস্তাম্বুল ১৩১৩-১৭/১৮৯৫-৯।

ইদরীসী, মাগ'রিব=Description de l'Afrique et de l'Espagne, সম্পা. R. Dozy ও M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৬৬ খৃ.।

ইব্‌ন কু'তায়বা, আশ-শি'র=ইব্‌ন কু'তায়বা, কিতাবু'শ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, সম্পা. De Goeje, লাইডেন ১৯০০ খৃ.।

ইব্‌ন খালদূন, 'ইবার=কিতাবুল-'ইবার ওয়া দীওয়ানু'ল-মুবতাদা' ওয়া'ল-খাবার ইত্যাদি, বূলাক ১২৮৪ হি.।

ইব্‌ন খালদূন, মুক'াদ্দিমা=Prolegomenes d'Ebn Khaldoun, সম্পা. E. Quatremere, প্যারিস ১৮৫৮-৬৮ (Notices et Extraits xvi-xviii)।

ইব্‌ন খালদূন=The Muqaddimah, Trans. from the arabic by Franz Rosenthal, ৩ খণ্ডে, লন্ডন ১৯৫৮ খৃ.।

ইব্‌ন খালদূন-de Slane=Les Prolegomenes d'Ibn Khaldoun, traduits en francais et commentes par M. de slane, Paris 1863-68 (anastatic reprint 1934-38)।

ইব্‌ন খাল্লিকান=ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান ওয়া আন্‌বাউ আবনাই'য্‌-যামান, সম্পা. F. Wustenfeld, Gottingen 1835-50 (quoted after the numbers of Biographies).

ইব্‌ন খাল্লিকান, বূলাক=the same, সং. বূলাক ১২৭৫ হি.।

ইব্‌ন খাল্লিকান, de Slane=কিতাব ওয়াফায়াতিল-আ'য়ান, অনু. Baron MacGuckin de Slane, ৪ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৪২-১৮৭১ খৃ.।

ইব্‌ন খুররাদাযবিহ=আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৮৯ খৃ. (BGA VI)।

ইব্‌ন তাগ'রীবিরদী, কায়রো=আন-নুজূমুয-যাহিরা ফী মুলূক মিস'র ওয়াল-ক'াহিরা, সম্পা. W. Popper, Berkeley-Lieden 1908-1936.

ইব্‌ন তাগ'রীবিরদী, কায়রো=the Same, সং. কায়রো ১৩৪৮ হি. প.।

ইব্‌ন বাত্'তূ'ত'া=Voyages d'Ibn Batouta, Arabic text, সম্পা. এবং ফরাসী অনু. C. Defremery ও B. R. Sanguinetti, ৪ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৫৩-৫৮ খৃ.।

ইব্‌ন বাশকুওয়াল=কিতাবু'স'-সি'লা ফী আখবার আইম্মাতি'ল-আনদালুস, সম্পা. F. Codera, মাদ্রিদ ১৮৮৩ খৃ. (BHA II)।

ইব্‌ন রুসতা=আল-আ'লাকু'ন-নাফীসা, সম্পা. M.J. De Goeje, লাইডেন ১৮৯২ খৃ. (BGA VII)।

ইব্‌ন সা'দ=আত'-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, সম্পা. H. Sachau and others, লাইডেন ১৯০৫-৪০ খৃ.।

ইব্‌ন হ'াওক'াল=কিতাব সূ'রাতি'ল-আরদ', সম্পা. J. H. Kramers, লাইডেন ১৯৩৮-৩৯ খৃ. (BGA II, ২য় সং)।

ইব্‌ন হিশাম=আস-সীরা, সম্পা. F. Wustenfeld, Gottingen 1859-60.

ইব্‌নু'ল-আছ'ীর=কিতাবুল-কামিল ফি'ত-তারীখ, সম্পা. C. J. Tornberg, লাইডেন ১৮৫১-৭৬ খৃ.।

ইব্নুল-আছীর, trad. Fagnan=Annales du Maghred et de l'Espagne, অনু. E. Fagnan, Algiers 1901.
ইব্নুল-আব্বার=কিতাব তাকমিলাতি'স্‌-সি'লা, সম্পা. F. Codera, মাদ্রিদ ১৮৮৭-৮৯ খৃ. (BHA V-VI)।
ইব্নুল-'ইমাদ, শায'রাত=শায'রাতু'য-য'াহাব ফী আখবার মান য'াহাব, কায়রো ১৩৫০-৫১ হি. (quoted according to years of obituaries).
ইব্নুল-ফাক'ীহ=মুখতাস'ার কিতাব আল-বুলদান, সম্পা. De. Goeje, লাইডেন ১৮৮৬ খৃ. (BGA V)।
য়াকূ'ত, উদাবা=ইরশাদুল-আরীব ইলা মা'রিফাতিল-আদীব, সম্পা. D. S. Margoliouth, Leiden 1907-13 (GMS VI).
য়াকূ'ত=মু'জামুল-বুলদান, সম্পা. F. Wustenfeld, Leipzig 1866-73 (anastatic reprint 1924)
য়া'কূ'বী=তারীখ, সম্পা. M. Th. Houtsma, Leiden 1883.
য়া'কূ'বী, বুলদান=সম্পা. M. J. De Goeje, Leiden 1892 (BGA VII).
ইস্'ত'াখরী=আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৭০ খৃ. (BGA I) (এবং পুনর্মুদ্রণ ১৯২৭ খৃ.)।
কুতুবী, ফাওয়াত= ইব্ন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াতুল-ওয়াফায়াত, বূলাক ১২৯৯ হি.।
খাওয়ানদামীর=হ'াবীবুস-সিয়ার, তেহরান ১২৭১ হি.।
ছা'আলিবী, য়াতীম=য়াতীমাতু'দ-দাহ্‌র ফী মাহ'াসিনিল-'আস'র, দামিশক ১৩০৪ হি.।
জুওয়ায়নী=তারীখ-ই জিহান গুশা, সম্পা. মুহ'াম্মাদ ক'াযবীনী, লাইডেন ১৯০৬-৩৭ খৃ. (GMS XVI)
তা-'আ. (TA), তাজুল-'আরূস, মুহ'াম্মাদ মুরতাদ'া ইব্ন মুহ'াম্মাদ আয-যাবীদী প্রণীত।
ত'াবারী=তারীখুর-রুসুল ওয়াল-মুলূক, সম্পা. M. J. De Goeje and others, Leiden 1879-1901.
তারীখ-ই গুযীদা=হ'ামদুল্লাহ মুসতাওফী আল-ক'াযবীনী, তারীখ-ই গুযীদা, সম্পা. in Facsimile by E. G. Browne, Leiden-London 1910.
তারীখ দিমাশক'=ইব্ন 'আসাকির, তারীখ দিমাশক', ৭ খণ্ডে, দামিশক ১৩২৯-৫১/১৯১১-৩১।
তারীখ বাগদাদ=আল-খাত'ীব আল-বাগ'দাদী, তারীখ বাগদাদ, ১৪ খণ্ডে, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩১।
দাওলাত শাহ=তায'কিরাতুশ-শু'আরা, সম্পা. E. G. Browne, লন্ডন-লাইডেন ১৯০১ খৃ.।
দাব্বী=বুগ্য়াতুল-মুলতামিস ফী তারীখ রিজালি আহ্‌লিল-আনদালুস, সম্পা. F. Codera J. Ribera, মাদ্রিদ ১৮৮৫ খৃ. (BAH III).
দামীরী=হায়াতুল-হায়াওয়ান (quoted according to title of articles).
ফারহাংগ=র'াযমারা ও ন'াওতাশ, ফারহাং-ই জুগরাফিয়া-ই ঈরান, তেহরান ১৯৪৯-১৯৫৩ খৃ.।
ফিরিশ্‌তা=মুহাম্মদ ক'াসিম ফিরিশ্‌তা, গুলশান-ই ইব্রাহীমী, লিথো., বোম্বাই ১৮৩২ খৃ.।
বালাযু'রী, আনসাব=আনসাবুল-আশরাফ, ৪খ., ৫খ., সম্পা. M. Schlossinger এবং S.D.F. Goitein, জেরুসালেম ১৯৩৬-৩৮।
বালাযু'রী, ফুতূহ'=ফুতূহ'ল-বুলদান, সম্পা. M.J. de Goeje, লাইডেন ১৮৬৬ খৃ.।
মাককারী, Analects=নাফহ্‌'ত্‌-তীব ফী গুস্‌নিল-আনদালুসির-রাতীব (Analects sur l'histoire et la littereature des Arabes de l'Espagne), লাইডেন ১৮৫৫-৬১ খৃ.।
মাস'ঊদী, তানবীহ = কিতাবুত-তান্‌বীহ্ ওয়াল-ইশ্‌রাফ, সম্পা. M. J. De Goeje, Lieden 1894 (BGA VIII).
মাস্'ঊদী, মুরূজ = মুরূজুয'-য'াহাব, সম্পা. C. Barbier de Meynard et pavet de Courteille, প্যারিস ১৮৬১-৭৭ খৃ.।
মীর খাওয়ানদ=রাওদ'াতু'স'-স'াফা, বোম্বাই ১২৬৬/১৮৪৯।
মুক'াদ্দাসী=আহ'সানুত-তাক'াসীম ফী মা'রিফাতিল-আক'ালীম, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৭৭ খৃ. (BGA III).
মুনাজ্‌জিম বাশি=স'াহ'াইফুল-আখবার, ইস্‌তাম্বুল ১২৮৫ হি.।
যাহাবী, হু'ফ্‌ফাজ'=আয-য'াহাবী, তায'কিরাতুল-হু'ফ্‌ফাজ', ৪ খণ্ডে, হায়দরাবাদ ১৩১৫ হি.।
যুবায়রী, নাসাব=মুস'আব আয-যুবায়রী, নাসাব কু'রায়শ, সম্পা. E. Levi-Provencal, কায়রো ১৯৫৩ খৃ.।
লি. 'আ. (LA)=লিসানুল-'আরাব।
শাহরাসতানী=আল-মিলাল ওয়ান্-নিহ'াল, সম্পা. W. Cureton, লন্ডন ১৮৪৬ খৃ.।
সাম'আনী=আস-সাম'আনী, আল-আন্‌সাব, সম্পা. In facsimile by D.S. Margoliouth, Leiden 1912 (GMS XX).
সার্‌কীস=মু'জামুল মাত'বূ'আত আল-'আরাবিয়্যা, কায়রো ১৩৪৬/১৯২৮।
সিজিল্ল-ই'উছমানী =মেহমেদ ছুরায়্যা, সিজিল্ল-ই 'উছমানী, ইস্তাম্বুল ১৩০৮-১৩১৬ হি.।
সুয়ূত'ী, বুগ্'য়া=বুগ্‌য়াতুল-উ'আত, কায়রো ১৩২৬ হি.।
হ'াজ্জী খালীফা=কাশফুজ'-জু'নূন, সম্পা. S. Yaltkaya and Kilisli Rifat Bilge, ইস্তাম্বুল ১৯৪১-৪৩ খৃ.।
হ'াজ্জী খালীফা, জিহাননুমা=ইস্তাম্বুল ১১৪৫/১৭৩২।

হাজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel=কাশ্ফুজ জুনূন, Leipzig 1835-58.
হামদানী= সিফাতু জাযীরাতিল 'আরাব, সম্পা. D. H. Muller, Lciden 1884-91.
হামদুল্লাহ মুসতাওফী, নুযহা=নুযহাতুল কুলূব, সম্পা. G. Le Strange, Leiden 1913-19 (GMS XXIII)
হুদূদুল 'আলাম=The Regions of the World, অনু. V. Minorsky, London 1937 (Gms, N. S. Xi).

## Abbreviated Titles
## Of Some of The Most Often Quoted Works

Babinger=F. Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke, Ist, ed., Leiden 1927.

Barkan, Kanunlar=Omer Lutfi Barkan, XV vc XVI inci Asirlarda Osmanli Imparatorlugunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslari, I. Kanunlar, Istanbul 1943.

Barthold, Turkestan= W. Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion, London 1928 (GMS. N. S. V).

Barthold, Turkestan$^2$=the same, 1st edition, London 1958.

Blachere, Litt.=R. Blachere, Histoire de la Litterature arabe, i, Paris 1952.

Brockelmann, I, II=C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literatur, zweite den Supplementbanden Angepasste Auflage, Leiden 1943-49.

Brockelmann, S. I, II, III=G. d. a. L., Erster (Zweiter, Dritter) Supplementband, Leiden 1937-42.

Browne, i=E. G. Browne, A Literary History of Persia, from the earliest times until Firdawsi, London 1902.

Browne, ii=A Literary History of Persia, From Firdawsi to Sa'di, London 1908.

Browne, iii=A History of Persian Literature under Tartar Dominion, Cambridge 1920.

Browne, iv=A History of Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924.

Caetani, Annali=L. Caetani, Annali dell'Islam, Milan 1905-26.

Chauvin, Bibliographie=V. Chauvin, Bibliographie des ouvrages Arabes et relatifs aux Arabes, Lille 1892.

Dozy, Notices=R. Dozy, Notices sur quelques arabes, Leiden 1847-51.

Dozy, Recherches$^8$=Recherches sur I'lristoire et la litterature de I'Espagne pendant le moyenage, third edition, Paris and Leiden 1881.

Dozy, Suppl.=R. Dozy, Supplement aux dictionnaires arabes, Leiden 1881 (anastatic reprint, Leiden-paris 1927).

Fagnan, Extraits=E. Fagnan, Extraits inedits relatifs au Maghreb, Alger 1924.

Gesch. des Qor.=Th. Noldeke, Geschichte des Qorans, new edition by F. Schwally, G. Bergstrasser and O. Pretzl, 3 vols., Leipzig 1909-38.

Gibb, Ottoman Poetry=E. J. W. Gibb, A History of Ottoman Poetry, London 1900-09.

Gibb-Bowen=H. A. R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West, London 1950-1957.

Goldziher, Muh. St.=I. Goldziher, Muhammedanische Studien, 2 vols., Halle 1888-90

Goldziher, Vorlesungen =I. Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, Heidelberg 1910.

Goldziher, Vorlesungen$^2$=2nd ed., Heidelberg 1925.

Goldziher, Dogme=Le dogme et la loi de l'islam, tr. F. Arin, Paris 1920.

Hammer-Purgstall GOR=J. von Hammer (Purgstall), Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest 1828-35.

Hammer-Purgstall Gor[2]=the same, 2nd ed., Pest 1840.

Hammer-Purgstall, Histoire=the same, trans. by J. J. Hellert, 18 vols., Bellizard (etc.), Paris (etc.) 1835-43.

Hammer-Purgstall=, Staatsverfassung=J. von Hammer, Des Osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, 2 vols., Vienna 1815.

Hammer, Recueil=M. Th. Houtsma, Recueil des textes relatifs a l'histoire des Seldjoucides, Leiden 1886-1902.

Ibn Rusta-Wiet=Les Atours Precieus, Traduction de Gaston Wiet, Cairo 1955.

Idrisi-Jaubert=Geographie d'Edrisi, Trad. de l'arabe en francais par P. Amedee Jaubert, 2 vols., Paris 1836-40.

Juynboll, Handbuch=Th. W. Juynboll, Handbuch des Islamischen Gesetzes, Leiden 1910.

Lane=E. W. Lane, An Arabic-English Lexicon London, 1863-93 (reprint New York 1955-6).

Lane-Poole, Cat.=S. Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, 1877-90.

Lavoix, Cat.=H. Lavoix, Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliotheque Nationale, Paris 1887-96.

Le Strange=G. Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, 2nd ed., Cambridge 1930.

Le Strange, Baghdad.=G. Le strange, Baghdad during the Abbasid Caliphate, Oxford 1924.

Le Strange, Palestine=G. Le Strange, Palestine under the Moslems, London 1890.

Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus.=E. Levi-Provencal, Histoire de l'Espagne musulmane, new ed., Leiden-Paris 1950-53, 3 vols.

Levi-Provencal, Chorfa=E. Levi-Provencal, Les Historiens des Chorfa, Paris 1922.

Maspero-Wiet, Materiaux=J. Maspero et G. Wiet, Materiaux pour servir a la Geographie de l'Egypte, Le Caire 1914 (Mifao xxxvi).

Mayer, Architects=L. A. Mayer, Islamic Architects and their Works, Geneva 1956.

Mayer, Astrolabists=L. A. Mayer, Islamic Astrolabists and their works, Geneva 1998.

Mayer, Metalworkers=L. A. Mayer, Islamic Metalworkers and their Works, Geneva 1959.

Mayer, Woodcarvers=L. A. Mayer, Islamic Wookcarvers and their Works, Geneva 1958.

Mez, Renaissance=A. Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1922.

Mez, Renaissance, Eng. tr.=The Renaissance of Islam, translated into English by Salahuddin Khuda Bukhsh and D.S. Margoliouth, London 1937.

Mez, Renaissance, Spanish trans.=El Renacimiento del Islam, translated into Spanish by S. Vila, Madrid-Granada 1936.

Nallino, Scritti=C. A. Nallino, Raccolta di Scritti editi e inediti, Roma 1939-48.

Pakalin=Mehmet Zeki Pakalin, Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu, 3 vols., Istanbul 1946 ff.

Pauly-Wissowa=Realenzyklopaedie des Klassischen Altertums.

Pearson=J.D. Pearon, Index Islamicus, Cambridge 1958.

Pons Boigues=Ensayo bio-bibliografico sobre los historiadores y geografos, arabigo-espanoles, Madrid 1898.

Santillana, Istituzioni=D. Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malichita, Roma 1926-38.

Schwarz, Iran=P. Schwarz, Iran in Mittelalter nach den arabischen Geographen, Leipzig 1896.

Snouck Hukrgronje, Verspr. Geschr.=C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, Bonn-Leipzig-Leiden 1923-27.

Sources inedites=Comte Henry de Castries, Les Sources inedites de l'Histoire du Maroc, Premiere Serie, Paris (etc.) 1905-Deuxieme Serie, Paris 1922.

Spuler, Horde=B. Spuler, Die Goldene Horde, Leipzig 1943.

Spuler, Iran=B. Spuler. Iran in fruh-Islamischer Zeit, Wiesbaden 19052.

Spuler, Mongolen[2]=B. Spuler, Die Mongolen in Iran, 2nd ed., Berlin 1955.

Storey=C.A. Storey, Persian Literature : a Bio-bibliographical Survey, London 1927.

Survey of Persian Art=ed. by A.U. pope, Oxford 1938.

Suter=H. Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke Leipzig 1900.

Taeschner, Wegenetz=Franz Taeschner, die Verkehrslage und das Wegenetz Anatoliens im Wandel der Zeiten, Gotha 1926.

Tomaschek=W. Tomaschek, Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter, Vienna 1891.

Weil, Chalifen=G. Weil, Geschichte der Chalifen, Mannheim-Stuttgart 1846-82.

Wensinck, Handbook=A.J. Wensinck, A Handbook of Early Muhammdan Tradition, Leiden 1927.

Zambaur=E. de Zambaur, Manuel de Genealogie et de chronologie pour l'Histoire de l'Islam, Hanover 1927 (anastatic reprint Bad Pyrmont 1955).

Zinkeisen=J. Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1840-83.

## ABBREVIATIONS FOR PERIODICALS ETC

Abh. G.W. Gott.=Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen,

Abh.K.M.=Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes.

Abh. Pr, Ak. W.=Abhandlungen der preussischen AKademir der Wissenschaften.

Afr.Fr.-Bulletin de Comite de l'Afrique francaise.

AIEO Alger=Annales de l'Institut d'Etudes Orientale de l'Universite d'Alger N.S. from 1964.

AIUON=Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli.

Anz. Wien=Anzeiger der (Kaiserlichen) Akademie der Wissenschaften, Wien. Philosophisch- historische Klasse.

AO=Acta Orientalia.

ArO=Archiv Orientalni.

ARW=Archiv Fur Religionswissenschaft.

ASI=Archaeological Survey of India.

ASI, NIS=ditto, New Inperial Series.

ASI, AR-ditto, Annual reports.

AUDTCFD=Ankara Universitesi Dilve Tarih-Cografya Fakultesi Dergisi.
BAH=Bibliotheca Arabico Hispana.
BASOR=Bulletin of the American Schools of Oriental Research.
Belleten=Belleten (of Turk Tarih Kurumu).
BFac.Ar.=Bulletin of the Faculty of Arts of the Egyptian University.
BEt. Or.=Bulletin d'Etudes Orientales de l'Institut Francais de damas.
BGA=Bibliotheca Geographorum Arabicorum.
BIE=Bulletin de l'Institut d'Egypte.
BIFAO-Bulletin de l'Institut Francais d'Archeologie Orientale de Caire.
BRAH=Boletin de la Real Academia de la Historia de Espana.
BSE=Bol'shaya Sovetskaya Entsiklopediya (Large Soviet Encyclopaedia), Ist ed.
BSE²=the same, 2nd ed.
BSL(p)=Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris.
BSO (A)S=Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies.
BTLV=Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde (van Nederlandsch-Indie).
BZ=Byzantinische Zeitschrift.
COC=Cahiers de l› Orient Contemporain.
CT=Cahiers de Tunisie.
EI¹=Encyclopaedia of Islam, Ist edition.
EIM=Epigraghia Indo-Moslemica.
ERE=Encyclopaedia of Religions and Ethics.
GGA=Gottiger Gelehrte Anzeigen.
GMS=Gibb Memorial Series.
Gr. I. Ph.=Grundriss der Iranischen Philologie.
IA=Islam Ansiklopedisi.
IBLA=Revue de l' Institut des Belles Lettres, Arabes, Tunis.
IC=Islamic Culture.
IFD=Ilahiyat Fakultesi Dergisi.
IHQ=Indian Historical Qurateriy.
IQ=The Islamic Quarterly.
Isl.=Der Islam.
JA=Journal Asiatique.
JAfr. S=Journal of the African Coeiety.
JAOS=Journal of the American Oriental Society.
JAnthr.I=Journal of the Anthropological Institute.
JBBRAS=Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.
JE=Jewish Encyclopaedia.
JESHO=Journal of the Economic and Social Historyt of the Orient.
J(R)Num. S.=Journal of the (Royal) Numismatic Society.
JNES=Jouranal of Near Eastern Studies.
JPak. HS.=Journal of the Pakistan Historical Society.
JPHS=Journal of the Punjab Historical Society.

JQR=Jewish Quarterly Review.
JRAS=Journal of the Royal Asiatic Society.
J(R) ASB=Journal and Proceedings of the (Royal) Asiatic Society of Bengal.
JRGeog. S.=Journal of the Royal Geographical Society.
JSFO=Journal de la Societe Finno-Ougrienne.
JSS=Journal of Semitic Studies.
KCA=Korosi Csoma Archivum.
KS=Keleti Szemle (Oriental Review).
KSIE=Kratkie Soobshceniya Instituta Etnografiy (Short communications of the Institute of Ethnography).
LE=Literaturnaya Entsiklopediya(Literary Encyclopaedia).
MDOG=Mitteillungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.
MDPV=Mitteilungen und Nachrichten des Deutschen Palastina-Vereins.
MEA=Middle Eastern Affairs.
MEJ=Middle East Journal.
MFOB=Melanges de la Faculte Orientale de 1' Universite St. Joseph de Beyrouth.
MGMN=Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften.
MGWJ=Monatsschrift fur die Geschichte und Wissenschaft des Judentums.
MIDEO =Milanges de 1'Institut Dominicain d'Etudes Orientales du Caire.
MIE-Memoires de 1' Institut d'Egypte.
MIFAO=Memoires publics par les membres de 1' Institut Francais d' Archeologie Orientale du Caire.
MMAF=Memoires de la Mission Archeologique Francaise au Caire.
MMIA=Madjallat al-Madjma' al-Ilmi al-'Arabi, Damascus.
MO=Le monde Oriental.
MOG=Mitteilungen zur Osmanischen Geschichte.
MSE=Malaya Sovetskaya Entsiklopediya (Small Sovite Encyclopaedia).
MSFO=Memoires de la Societe Finno-Ougrienne.
MSL(P)=Memoires de la Societe Linguistique de Paris.
MSOS Afr.=Mitteilungen des Seminars fur Orientalische Sprachen, Afrikanische Studien.
MSOS As.=Mitteilungen des Seminars fur Orentalische Sprachen, Westasiatische Studien.
MTM=Milli Tetebbu'ler Medjmu'asi.
MW=The Muslim World.
NC=Numismatic Chronicle.
NGw Gott.=Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.
OC=Oriens Christianus
OLZ=Orientalistische Literaturzietung.
OM=Oriente Moderno.
PEFQS=Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement,
Pet. Mitt.=Petermanns Mitteilungen.
QDAP=Quarterly Statement of the Department of Antiquities of Palestine.
RAfr.=Revue Africaine.
RCEA=Repertoire Chronologique d'Epigraghie arabe.

REJ=Revue des Etudes Juives.
Rend. Lin.=Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche.
REI=Revue des Etudes Islamiques.
RHE=Revue de l'Histoire des Religions.
RIMA=Revue de l'Institut des Manuscrits Arabes.
RMM=Revue Monde Musulman.
RO=Rocznik Orientalistyczny.
ROC=Revue de l"Orient Chretien.
ROL=Revue de l'Orient Latin.
RSO=Rivista degli Studi Orientali.
RT=Revue Tunisienne.
SBAk. Heid.=Sitzungsberichte der Heidelberger Akadekemie der Wissenschaften.
SBAK. Wien=Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Wien.
SBBayr. Ak.=Sitzungsberichte der physixalisch-me Bayrischen Akademie der Wissenschaften.
SBPMS Erlg.- Sitzungsberichte der dizinischen Sozietat in Erlangen.
SBPr. Ak. W.=Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
SE=Sovetskaya Etnografiya (Soviet Ethnography).
SO=Sovetskoe Vostokovedenie (Soviet Orientalism).
Stud. Isl.-Studia Islamica.
S. Ya.=Sovetskoe Yazikoznanie(Soviet Linguistics).
TBG-Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
TD=Tarih Dergisi.
TIE=Trudi Instituta Etnografiy(Works of the Institute of Ethnograpgy).
TM=Turkiyat Mecmuasi.
TOEM/TTEM=Ta'rikh-i 'Othmani (Turk Ta'rikhi) Endjumeni medjmi'asi.
Verh. AK. Amst.=Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen to Amsterdam.
Versl. Med. AK.Amst.=Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.
VI=Voprosi Istoriy (Historical Problems).
WI=Die Welt des Islams.
WI'n. s.=The same, new series.
Wiss. Veroff. DOG=Wissenschaftliche Veroffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.
WZKM=Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes.
ZA=Zeitschrift fur Assyriologie.
ZATW=Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft.
ZDMG=Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft.
ZDPV=Zeitschrift des Deutschen Palastinavereins.
ZGErdk. Birl.=Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkunde in Berlin.
ZS=Zeitschrift fur Semitistik.

# সূচীপত্র

Contents

Contents



---

ইসলামী বিশ্বকোষ ০৯/ইবিপ্র/২য় সং/১/২০০৬ (উন্নয়ন)/৩২৫০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**'ইমাদ শাহী** (عماد شاهى) ঃ একটি শাসক বংশের উপাধি, ইসলামে দীক্ষিত জনৈক হিন্দু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। উহা ৮৯৬/১৪৯০ সন হইতে ৯৮২/১৫৭৪ সন পর্যন্ত বেরার (দ্র.) শাসন করে। বংশটির প্রতিষ্ঠাতা দারয়া খান, ইতিহাসে ফাতহুল্লাহ 'ইমাদু'ল-মুলক উপাধিতে অধিক পরিচিত, বিজয় নগর (দ্র.)-এর কানাড়ী ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত। তিনি ৮২৭/১৪২৩ সনে যুদ্ধবন্দীরূপে বেরারের বাহমানী (দ্র.) সেনাদলের প্রধান সেনাপতি খান-ই-জাহান-এর হাতে পড়েন। ইনি তাঁহাকে তাঁহার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী দলে নিয়োগ করেন। তাঁহার সামর্থ্য ও কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া খান-ই-জাহান তাঁহাকে গুরুত্বপূর্ণ পদে পদোন্নতি দান করেন। তাঁহার মনিবের মৃত্যুর পর ফাতহু'ল্লাহ বীদার (দ্র.)-এর রাজদরবারে যোগ দেন এবং উহার প্রধান মন্ত্রী খাওয়াজা মাহমূদ গাওয়ান (দ্র.)-এর মধ্যস্থতায় দ্বিতীয় মুহাম্মাদ শাহ বাহমানী (রাজত্বকাল ৮৬৭/১৪৬৩-৮৮৭/১৪৮২)-র নিকট হইতে 'ইমাদু'ল-মুলক উপাধি লাভ করেন। তিনি ৮৭৬/১৪৭১ সনে বেরারের শাসনকর্তা ও সেনাদলের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রাক্তন মনিব খান-ই-জাহান পদটি দখল করিয়াছিলেন। অবশ্য জীবনের শেষের দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারাধিপতির কাছে বশ্যতা স্বীকার করিলেও সম্ভবত তিনি বেরারের প্রকৃত শাসক বলিয়া মনে করিতেন। মুগল আমলের গোড়ার দিকে অযোধ্যার নাওয়াব-উযীররাও (দ্র.) ঐরূপ ভাবিতেন। ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা একজন নও-মুসলিম। তিনি সামরিক কৃতিত্ব বলেই শক্তিশালী হন। এই কারণ ছাড়াও সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি উহার শাসকবর্গের বিশেষ অনুরাগের অভাবে বংশটির ইতিবৃত্ত কখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই এবং কোন বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহাদের উত্থান-পতনের দিকে মনোযোগ দেন নাই। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির ইতিহাসে এই বংশের উল্লেখ না থাকিলে তাহাদের সম্পর্কে কিছুই জানা যাইত না (ফিরিশ্তা তাঁহার গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই বংশের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন)। তাঁহাদের শাসনকালে নির্মিত কোনও অট্টালিকা, শিল্পকর্ম বা জনকল্যাণমূলক কার্য আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে তাঁহারা তাঁহাদের প্রজাদের মঙ্গল ও রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির জন্যই তাঁহাদের সমস্ত সময় ব্যয় করিয়াছেন। বেশ কয়েকটি শী'আ রাজ্যের পার্শ্বে তাঁহাদের রাজ্যটি একমাত্র সুন্নী রাজ্য ছিল। ঐ সকল রাজ্যে ইরানের পণ্ডিতগণকে আকৃষ্ট করিয়া আনা হইতেছিল; উহাদের কেহ কেহ উপমহাদেশে বসতি স্থাপন করিয়া লেখকের পেশা অবলম্বন করেন। তাঁহাদের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ঐতিহাসিক না জোটার ইহাও অন্যতম কারণ। ফলে এমন কি রাজ্যটির সীমানা পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা যায় নাই। ইহা আনজাদ্রী পাহাড় এলাকা হইতে গোদাবরী নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আবার পশ্চিম দিকে উহা আহমাদ নগর (দ্র.) ও খানদেশ (দ্র.) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উহার পূর্ব সীমানা নির্ধারিত হয় নাই। আধুনিক নগরী নাগপুর এলাকা সমেত অঞ্চলটি অরণ্যে ঢাকা ছিল।

বেরারের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ দানের অল্পকাল পরে ফাতহু'ল্লাহ্কে বীরগড়-এর শাসক রায় বিজয় সিংহের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য প্রেরণ করা হয়। ছয় মাস অবরোধের পর তিনি দুর্গটি অধিকার করেন এবং সরকারী অর্থবিত্ত ও পূর্বপুরুষের ধনদৌলত ফেলিয়া রাখিয়া উহার শাসককে তাঁহার পৈতৃক বাসভবন ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করেন। ৮৭৭/১৪৭২ সনে প্রধান মন্ত্রী মাহ'মূদ গাওয়ান ও য়ূসুফ 'আদিল খান (যিনি ভাগ্যক্রমে পরবর্তীকালে বিজাপুরের 'আদিল শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা হন)-এর সঙ্গে তিনি বেলগাম-এর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। বেলগাম বিজিত হইলে প্রধান মন্ত্রীর জায়গীরের সঙ্গে উহা সংযুক্ত হয়। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে ৮৮৬/১৪৮১ সনে মাহমূদ গাওয়ান-এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হইলে 'ইমাদু'ল-মুলক তাঁহার নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হইয়া অসন্তোষের লক্ষণাদি প্রকাশ করিতে থাকেন। তাঁহার প্রকাশ্য বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া দ্বিতীয় মুহাম্মাদ শাহ বাহমানী তাঁহাকে বেরারের শাসকরূপে পাকাপাকিভাবে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে শান্ত করেন। ৮৮৭/১৪৮২ সনে মাত্র বার বৎসর বয়সে দ্বিতীয় মাহমূদ শাহ বাহমানী সিংহাসন প্রাপ্ত হইলে বিদেশিগণকে (গ'রীবান) ব্যাপকভাবে হত্যার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার চাকুরী মন্ত্রিত্বের পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। এই সকল বহিরাগত বিজাপুরের শাসনকর্তা য়ূসুফ 'আদিল খানের সমর্থক ও অনুগত ছিল। এইভাবে (সুলত'ান নাবালক হওয়াতে) যাহাতে নিজামু'ল-মুলক সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করিতে পারেন, তাহার পথ সুগম হয়। ইনি দাক্ষিণাত্যের জনৈক উচ্চ বংশজাত ব্যক্তি। আর সঙ্গে সঙ্গে 'ইমাদু'ল-মুলক-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র শায়খ (ফিরিশ্তা উদ্দেশ্যমূলকভাবে শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন— উপমহাদেশের সম্ভ্রান্ত বংশীয় কেহ ইসলামে দীক্ষিত হইলে তাঁহার অমুসলিম উদ্ভব বুঝাইতে তাঁহার নামের সম্মানসূচক উপাধিরূপে ইহা ব্যবহৃত হইত) 'আলাউদ্দীনকে বেরারে তাঁহার পিতার প্রতিনিধিরূপে নিয়োগ দান করা হয়। কালক্রমে 'ইমাদু'ল-মুল্ক এত প্রভাবশালী হইয়া উঠেন যে, সুলত'ান নাবালক থাকাকালে নিজামু'ল- মুল্কের সহযোগিতায় তিনি সরকারের সকল কাজকর্মই পরিচালনা করিতেন। এই বিষয়ে তিনি আগাগোড়া রাজমাতার সমর্থন লাভ করেন। দুইজন মন্ত্রীর উদ্ধত মনোভাবের দরুন ভীষণ রাগান্বিত এবং জনৈক হাব্শী সভাসদের অসতর্ক মন্তব্যে উত্তেজিত হইয়া মাহমূদ শাহ তাঁহাদেরকে হত্যার আদেশ দেন। তাঁহারা উভয়েই অভিজ্ঞ যোদ্ধা হওয়ায় প্রাণ বাঁচাইয়া সরিয়া পড়িতে সক্ষম হন। 'ইমাদু'ল-মুলক সুলতানের বিরুদ্ধে একটা আক্রোশের মনোভাব লইয়া এবং তাঁহার অধীনতাপাশ হইতে মুক্তি লাভের সুযোগের অপেক্ষায় তাঁহার বেরার সরকারে ফিরিয়া আসেন। ইহার কয়েক বৎসর পর

৮৯০/১৪৮৪ সনে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া স্বনামে মুদ্রা প্রবর্তন ও খুত্‌বা পাঠ করাইতে থাকেন। অবশ্য তিনি এক সময় সেই সুলতান পরিবারের অধীনে চাকুরী করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণেই হউক কিংবা রাজনৈতিক সুবিধাবাদের কারণেই (সেই সম্ভাবনাই সমধিক) হউক, তিনি শাহ খেতাব গ্রহণ করেন নাই। স্বাধীনতার সুফল ভোগ করার সৌভাগ্য তাঁহার বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। কেননা ঐ বৎসরই তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহার পুত্র 'আলাউদ্দীন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। দুর্বল বাহমানী শাসক তাহাদের অধিকার আদায়ের জন্য যে জিদ ধরিতে পারিবেন না, সেই বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস হওয়াতে ইনি ৮৯৬/১৪৯০ সনে শাহ খেতাব গ্রহণ করেন। বিজাপুরের য়ূসুফ 'আদিল খান ও মারহূ'ম নিজামু'ল-মুলকের পুত্র মালিক আহ্‌'মাদ বাহরীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিনি কাভিল-তাঁহার দরবার প্রতিষ্ঠিত করেন। শাসকদ্বয় ৮৯৫/১৪৮৯ সনে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং দ্বিতীয় জন আহ্‌'মাদ নগর (দ্র.) শহর স্থাপন করেন।

বীদার-এর শাসকের প্রতিনিধি ক'াসিম বারীদ-এর পুত্র আমীর 'আলী বারীদ মাহ্‌'মূদ শাহ বাহমানীকে তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করিতে সক্ষম হন। ইহার পর তিনি মালিক আহ্‌'মাদ বাহরীর সঙ্গে একযোগে শী'আ মতবাদ প্রচারের অভিযোগে য়ূসুফ 'আদিল শাহকে শাস্তি দানের উদ্দেশে ৯১০/১৫০৪ সনে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন (পার্শ্ববর্তী আর সকল রাজ্য ও দাক্ষিণাত্যের সমগ্র মুসলিম জনগণ সুন্নী মতাবলম্বী)। যুদ্ধ প্রচণ্ডভাবে প্রতিরোধ করিয়া য়ূসুফ 'আদিল শাহ দৃঢ় প্রতিরোধ করিয়া 'আদিল শাহ প্রতিআক্রমণ চালাইলে মাহ্‌'মূদ শাহ ও আমীর আলী বারীদ 'ইমাদু'ল-মুলকসমেত অন্যদের সাহায্যপ্রার্থী হইতে বাধ্য হন।

ফিরিশতার বর্ণনামতে এই প্রবীণ অভিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক পুরাপুরি নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কিন্তু যে আমীর 'আলী বারীদ য়ূসুফ 'আদিল শাহের সর্বনাশ সাধনের উদ্দেশে ধর্মের নামটিকে কাজে লাগাইতেছিলেন, যখন ইনি তাঁহার কুমতলব বুঝিতে পারিলেন, তখন সুলতানের কাছে য়ূসুফ 'আদিল শাহের পক্ষে ওকালতি করিলেন। বস্তুত আমীর বারীদ এক্ষণে নিঃসঙ্গ হইয়া পড়ায় সুলতানের সঙ্গে একযোগে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। তখন মিত্র শক্তি রাজকীয় তাঁবু লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়।

ইতোমধ্যে মাহ্‌'মূদ শাহের প্রতিপত্তি বেশ কিছুটা বিনষ্ট হইলে দশ বৎসর পর ৯২০/১৫১৪ সনে আমীর 'আলী বারীদের উদ্ধত ব্যবহারে ধৈর্যহারা হইয়া তিনি কাভিল-এ পলাইয়া যান এবং 'ইমাদু'ল-মুল্‌কের সেনাদল লইয়া বারীদ-এর রাজধানী গুলবার্গা (দ্র.) আক্রমণ করেন। বারীদ তখন যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সহসা সসৈন্যে রাজধানী-দুর্গ হইতে বাহির হন। ইতোমধ্যে বৃদ্ধ দশাগ্রস্ত মাহ্‌'মুদ শাহ দৈহিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হইয়া পড়ায় অকস্মাৎ যুদ্ধে পক্ষ পরিবর্তন করিয়া আমীর 'আলী বারীদের সেনাদলের সঙ্গে যোগ দেন। ইহাতে 'ইমাদু'ল-মুলক সংকটে পড়িয়া অবিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে অস্থিরচিত্ত সুলত'ানকে একাই অবস্থার মুকাবিলা করিতে হয়। এই দুর্ভাগ্য ঘটিয়া যাওয়ার পর মাহমূদ শাহ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন ও অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করিবার যোগ্যতা হারাইয়া ফেলেন এবং অসৎ আমোদ-প্রমোদ আর লাম্পট্যে নিমগ্ন হইয়া সত্বরই ইনতিকাল করেন।

৯৩৪/১৫২৭ সনে আমীর 'আলী বারীদ মাহমূদ ও রামগির দুর্গ দুইটি অধিকার করেন। এইগুলি গুজরাটাধিপতি বাহাদুর শাহের হাবশী মন্ত্রী খুদাওয়ান্দ খানের দখলভুক্ত ছিল। তিনি তখন 'ইমাদু'ল-মুল্‌কের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। এই সময় ইনি অবিলম্বে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া বিনা যুদ্ধেই দুর্গ দুইটি পুনরুদ্ধার করিয়া ঐগুলিকে স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে প্রয়াসী হইলেন। প্রথম বুরহান নিজাম শাহ (নিজাম শাহী দ্র.) সক্রিয়ভাবে এই জবর দখলের ঘটনার বিরোধিতা করেন। ফলে পরস্পর আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ এই দুই শাসক পরিবারের মধ্যে ঘন ঘন যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিতে থাকে পরিণামে আলাউদ্দীন 'ইমাদ শাহ পরাস্ত হন।

৯৩০-১/১৫২৪-৫ সনে শোলাপুর দুর্গ উদ্ধারের উদ্দেশে 'আলাউদ্দীন তাঁহার প্রাক্তন শত্রু প্রথম বুরহান নিজাম শাহের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁহার বোন মারয়াম যখন বুরহান নিজাম শাহের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন, তখন তাঁহাকে ইসমা'ঈল 'আদিল শাহ দুর্গটি যৌতুকের অংশ হিসাবে দান করিতে ওয়াদা করেন। ইসমা'ঈল 'আদিল শাহ কিছুতেই না হটিয়া প্রবলভাবে এই যৌথ অভিযানে বাধা দেন। ফলে 'ইমাদু'ল-মুলক পলায়ন করেন।

তিনি বুরহান নিজ'াম শাহের হস্তে পরাস্ত হইয়াছেন— এই অপমান তাঁহাকে ভীষণভাবে বেদনা দিতে লাগিল। ফলে গোলকুণ্ডা (দ্র.)-র শাসক সুলত'ান কু'লী কু'ত্'ব শাহ ও ইসমা'ঈল 'আদিল শাহের প্ররোচনায় তিনি বুরহান শাহের পাত্রী (patri) দুর্গটি ৯৩৩/১৫২৭ সনে অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু দুই মাস ধরিয়া অবরোধ পরিচালনার পর বুরহান নিজ'াম শাহ উহা পুনর্দখল করেন এবং পরে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া ফেলেন। এই বিজয়ের ফলে আবেগদীপ্ত বুরহান শাহ বেরারের আরও কয়েকটি স্থান দখল করিতে অগ্রসর হন। ইহাতে ঐ অঞ্চলে আতংকের সৃষ্টি হয়। 'ইমাদু'ল-মুলক নিজেকে আহ্‌'মাদ নগরের সেনাবাহিনীর আক্রমণ একাকী প্রতিহত করিতে সক্ষম বিবেচনা করিয়া বুরহানপুর (দ্র.)-এ পলায়ন করেন এবং তথাকার শাসক মীরান মুহ'াম্মাদ শাহ ফারূকীর সাহায্যপ্রার্থী হন। এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষ বুরহান নিজাম শাহের হস্তে তাঁহাদের কামান ও হস্তীগুলি হারাইয়া চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করেন। তখন প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় মীরান মুহাম্মাদ শাহ তাঁহার মামা গুজরাটের বাহাদুর শাহ (রাজত্বকাল ৯৩২/১৫২৫-৯৪৩/১৫৩৭)-এর কাছে তাহাদেরকে সহায়তা দানের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। বাহাদুর শাহ তৎক্ষণাৎ উহাতে সম্মত হন এবং এক বিশাল সেনাবাহিনী লইয়া ৯৩৪-৫/১৫২৭-৮ সনে দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি জালনাপুরে পৌঁছিলে তাঁহার মনোভাব পরিবর্তিত হয়। তিনি বেরার অবরোধ করিতে মনস্থ করেন। 'আলাউদ্দীন 'ইমাদ শাহ তাঁহার মতলব বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে তাঁহার আত্মশ্লাঘার পরিপূরণ সাধন করেন। তিনি তাঁহার নামে খুত'বা পাঠ করাইয়া তাঁহার অধীনতা মানিয়া লইলেন। উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে উপযোগী এই কার্য দ্বারা তিনি কেবল আপন রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করেন নাই, এতদ্বারা তিনি বাহাদুর শাহকে আহ্‌'মাদ নগর আক্রমণ করিতে ও উহার অধিপতিকে অবনমিত করিতে পরামর্শ দিয়া রাযী করান। বাহাদুর শাহের ন্যায় এত বড় শক্তিশালী বাদশাহ্‌র আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া বুরহান নিজ'াম শাহ আক্রমণকারীর অধীনতা মানিয়া লন। বাহাদুর শাহ বিনা বাধায় আহ্‌'মাদ নগরে প্রবেশ করিয়া প্রথম বুরহান নিজাম শাহের রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেখানে চল্লিশ দিন যাবত তিনি উত্তম খাদ্যসামগ্রী দ্বারা তাঁহার ভোজন বিলাস চরিতার্থ করিলেন। তবে প্রথম বুরহান নিজ'াম শাহ ঘন ঘন ছোটখাট সংঘর্ষ বাধাইয়া গুজরাটী সেনাদলকে হয়রান করিতে লাগিলেন। অবশ্য এইভাবে তিনি যে সকল দুর্গ ও হস্তী দখল করেন, শেষ পর্যন্ত সেগুলি ফেরত দিবার অঙ্গীকার করিয়া শান্তিচুক্তির জন্য তাঁহাকে আবেদন করিতে হইয়াছিল (যদিও পরে তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন)।

অভিযানের উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় 'ইমাদু'ল-মুলক ও মীরান মুহ'াম্মাদ শাহ উভয়েই সোল্লাসে তাঁহাদের স্ব স্ব রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইহার দুই বৎসর পর ৯৩৭/১৫৩২ সনে 'আলাউদ্দীন 'ইমাদু'ল মুলক ইনতিকাল করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারয়া 'ইমাদ শাহ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। বিজাপুরের ইসমা'ঈল 'আদিল শাহের ভগ্নী খাদীজার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন হয় (ভুলবশত গ্রন্থকার ফিরিশতা অন্যত্র যে কথা বলিয়াছেন, তাহা নহে অর্থাৎ তাঁহার কন্যার সঙ্গে বিবাহ হয় নাই, তু. Brigg- এর অনুবাদ, ৩খ, ৪৮৮)। য়ূসুফ 'আদিল শাহের বিবাহিতা জনৈকা হিন্দু রাজকুমারীর গর্ভে ইনি জন্মলাভ করেন। তিনি ছিলেন কূটনীতিতে সিদ্ধহস্ত একজন অতি উত্তম রাষ্ট্রনায়ক। বাহাদুর শাহ সেনাবাহিনী লইয়া আহ'মাদ নগরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করিলে যখন তিনি নিজেকে সংকটাপন্ন অবস্থায় দেখিলেন, তখন ইহা প্রমাণিত হইয়াছিল। তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও আহমাদ নগরের অধিপতি 'ইমাদ শাহের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হইতে তিনি ইতস্তত করেন নাই। ফলে তাঁহাকে গুজরাটাধিপতির কাছে আত্মসমর্পণ করার কারণে ভুলের খেসারত দিতে হইয়াছিল। সুলত'ান দারয়া 'ইমাদ শাহের রাজত্বের ইতিহাস ফিরিশতা রচিত গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে এমন ইতস্তত ছড়ানো রহিয়াছে যে, সেইগুলিকে একত্র করিতে চাহিলে ধৈর্য ধারণ করিয়া গবেষণা পরিচালনার প্রয়োজন হইবে। তৎকর্তৃক লিপিবদ্ধ বিবরণ অতি সামান্য হইলেও উল্লিখিত বিবরণের সঙ্গে বুরহান-ই-মাআছি'র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ বর্ণনা যোগ করিলে তাঁহার রাজত্ব সম্পর্কে একটা পাঠোপযোগী বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইবে। বিবরণটি জট পাকাইয়া এমন জটিলতায় বিজড়িত হইয়াছে যে, এমন কি ফিরিশতার ন্যায় একজন তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন অভিজ্ঞ ইতিবৃত্তকারও ৯৩৯/১৫৩২ সনের পরবর্তী ঘটনাদির বর্ণনায় দারয়া 'ইমাদ শাহ ও তাঁহার পিতা আলাউদ্দীন 'ইমাদ শাহের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে সক্ষম হন নাই (যদিও ফিরিশতা নিজেই দেখাইয়াছেন যে, 'আলাউদ্দীন 'ইমাদ শাহ সেই বৎসরই ইনতিকাল করেন)। তিনি স্বীকার করেন, তিনি 'ইমাদ শাহী বংশের কোন লিখিত বিবরণ না পাইয়া পুরুষানুক্রমিকভাবে মুখে মুখে হস্তান্তরিত কাহিনী ও জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াছেন (তু. Brigg-এর অনুবাদ, ৩খ, ৫০০)।

ইবরাহীম 'আদিল শাহ ও তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রী আসাদ খান লারীর মধ্যকার গুরুতর মতদ্বৈততার সুযোগে বুরহান নিজ'াম শাহ তাঁহার মিত্র আমীর বারীদ-এর সঙ্গে একযোগে ৯৪৯/১৫৪২ সনে বিজাপুর আক্রমণ ও অবরোধ করেন। তাঁহার অভিজ্ঞ মন্ত্রীর সৎ পরামর্শ হইতে বঞ্চিত ইবরাহীম 'আদিল শাহ এই পরিস্থিতিতে একাকী আক্রমণকারিগণকে বাধা দিতে সক্ষম হইবেন না ভাবিয়া তাঁহার স্বজন দারয়া 'ইমাদ শাহের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন (গ্রন্থকার ফিরিশতা এখানে তাঁহার ও তাহার পিতার মধ্যে পার্থক্য ধরিতে পারেন নাই; তু. Brigg- এর অনু., ৩খ, ৯২)। শাহ তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে রাযী হইয়া গেলেন। তখন বেরার ও বিজাপুরের যৌথ বাহিনী অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া আক্রমণকারিগণকে শান্তিচুক্তির আবেদন করিতে বাধ্য করে। এই সকল সামরিক অভিযান 'ইমাদ শাহী পরিবারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিল। তখন হইতে ক্ষমতাসীন সুলত'ান একজন শক্তিশালী নরপতি হিসাবে গণ্য হন এবং তাঁহার মতামত দাক্ষিণাত্যে গ্রাহ্য হইতে থাকে। তাঁহার প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'ইমাদ শাহ ৯৫০/১৫৪৩ সনে ইবরাহীম 'আদিল শাহের সঙ্গে তাঁহার ভগ্নী রাবি'আর বিবাহ দেন। ইহাতে স্বভাবতই এই পরিবারের পুরাতন শত্রু বুরহান নিজ'াম শাহ ঈর্ষান্বিত হন। অবশ্য সিংহাসন লাভের অব্যহিত পরেই দারয়া 'ইমাদ শাহ স্ত্রী আমীনার গর্ভজাত তাঁহার কন্যা বিবি দাওলাতের সহিত বুরহান শাহের পুত্র ও সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হুস'ায়ন নিজাম শাহের সঙ্গে শাদী সম্পাদন করিয়া তাঁহার সঙ্গে আপোসের চেষ্টা করেন। ইহার পরের বৎসরই (৯৫১/১৫৪৪সন) ইবরাহীম 'আদিল শাহ ও দারয়া 'ইমাদ শাহের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিলে তাহা বুরহান শাহের পক্ষে বিজাপুর আক্রমণের সুযোগ আনিয়া দেয়। তিনি বিজয়নগর (দ্র.)-এর হিন্দু নরপতি সদাশিব রায় (মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে রামরাজা) ও গোলকুণ্ডার শী'আ অধিপতির সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেন। অতঃপর সম্মিলিত মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে বিজয়নগরের যোদ্ধা দলের যে সকল লড়াই চলে, পরবর্তীকালে 'ইমাদ শাহীগণ তাহাতে কি ভূমিকা পালন করেন তাহা অজ্ঞাত। সম্মিলিত মুসলিম রাজন্যবর্গ যখন হিন্দুদের বিরুদ্ধে একটা ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত, তখন গোড়া ইসলামপন্থী বেরার রাষ্ট্র নির্লিপ্ত থাকিবে, এমন কথা বিশ্বাস করা শক্ত। ধর্মীয় লক্ষ্য নয়, বরং জাহাঙ্গীর খানের হত্যা প্রভৃতি ব্যক্তিগত ক্ষতির কারণই সম্ভবত আহ'মাদ নগর ও বেরারের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হওয়ার জন্য দায়ী। হুসায়ন নিজাম শাহের সিংহসনারোহণের স্বল্পকাল পরেই সহোদর ভাই 'আবদু'ল-কা'দির আহ'মাদ নগর হইতে পলায়ন করিয়া বেরারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে সায়ফ 'আয়নু'ল-মুলক-এর ন্যায় খ্যাতিমান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যিনি ১ম বুরহান নিজ'াম শাহের অধীনে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন, তিনিও হু'সায়ন নিজাম শাহের অত্যাচারে অনুরূপভাবে বেরারে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ইতিবৃত্তকার ফিরিশতা এই ঘটনা ৯৫৯/১৫৫১ সনে ঘটে বলিয়াছেন। একথা বিভ্রান্তিকর। কেননা প্রথম বুরহান নিজাম শাহ সে বৎসরও জীবিত ছিলেন। তিনি যে ৯৬১/১৫৫৪ সনে ইনতিকাল করেন, সে বিষয়ে ইতিহাস বিশেষজ্ঞরা একমত (যাওয়াল-ই-খুসরাওয়ান নামে অভিহিত খোদাই করা তালিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ)। গুজরাটের ৩য় মাহমূদ শাহ (দ্র.) ও ইসলাম শাহ সূর (দ্র.)-ইহারাও ঐ বৎসর ইনতিকাল করেন। যাহা হউক, আমরা তাঁহাকে তাঁহার ভগ্নীপতি ইবরাহীম 'আদিল শাহের সমর্থকরূপে দেখিতে পাই। ঐ সময় তিনি বুরহান নিজ'াম শাহের পুত্র ও তাঁহার ভাগিনেয় শাহ 'আলী ও বোন মারয়ামের সপক্ষে প্রচারের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ক্ষমতাসীন শাসক হুসায়ন নিজাম শাহের স্থলে আহ'মাদ নগরের সিংহাসনের একজন দাবীদার ছিলেন। সম্ভবত তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দারয়া 'ইমাদ শাহকে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টানিয়া আনা হয়। কেননা আমরা তাঁহাকে খুব সম্ভব তাঁহার ভাগিনেয়ের সঙ্গে সম্পর্কের খাতিরে একটা পরোক্ষ ভূমিকা পালন করিতে দেখি। এখানে ফিরিশতা লিখিত বিবরণ হতবুদ্ধিকর ও বিভ্রান্তিকর। তিনি ইবরাহীম 'আদিল শাহের রাজত্বকালের ঘটনাবলীর বিবরণ দান উপলক্ষে ৯৫৯/১৫৫১ সনে শাহযাদা 'আলীর বিদ্রোহের কথা অবতারণা করেন (তু. Brigg- অনু., ৩খ, ১০৬)। আবার তাঁহার পিতা বুরহান নিজ'াম শাহের ইতিহাস বর্ণনাকালে বলেন যে, ৯৬১/১৫৫৩ সনেও ইনি (শেষোক্ত নৃপতি) জীবিত ছিলেন (তু. Brigg- অনু., ৩খ, ২৩৫)। এই কারণে তারিখগুলিকে খাপ খাওয়ান কষ্টকর।

যাহা হউক, শোলাপুরে 'আদিল শাহী সেনাদলের সঙ্গে নিজ'াম শাহী সেনার যে সংঘর্ষ হয়, তাহাতে ইবরাহীম 'আদিল শাহ দারয়া 'ইমাদু'ল-মুলক-কে যোদ্ধৃদলের দক্ষিণ-পার্শ্ব দেশ (মায়মানা) রক্ষাব্যূহের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া মধ্যবর্তী অংশের পরিচালনার ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেন। তাঁহার মিত্র সায়ফ 'আয়নু'ল-মুলক তাহার প্রাক্তন মনিবের পুত্র ও উত্তরাধিকারী হু'সায়ন নিজাম শাহের পক্ষে যোগদান করিয়াছেন বলিয়া ভ্রান্ত

বিশ্বাস জন্মাইবার দরুন এক সংকটময় সন্ধিক্ষণে ইবরাহীম 'আলী শাহ ভগ্নোদ্যম হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলায়ন করেন। ইহার পর 'ইমাদু'ল-মুলক-এর ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে তাহা অজ্ঞাত। তবে তিনিও যে উৎপীড়িত হওয়ার আগে তাঁহার রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন এইরূপ ধারণা করা যাইতে পারে। অতঃপর তাঁহার সম্পর্কে আরও কিছু শোনা যায় না। ফিরিশতার ভাষায় অতঃপর ৯৬৯/১৫৬১ সনে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি পরম শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ সামাজিক পরিবেশে রাজত্ব পরিচালনা করেন (তু. 'আবদু'ল-গাফূর, তারীখ-ই-দাকান, ২খ, ৭৯)।

মাত্র তিন বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র বুরহান 'ইমাদু'ল-মুলক তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলে মন্ত্রী তুফাল খান দাখনী অন্তর্বর্তীকালের জন্য তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন আরম্ভ করেন। এই অকৃতজ্ঞ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সমস্ত ক্ষমতা নিজের কুক্ষিগত করিয়া ৯৭৬/১৫৬৮ সনে বালক সুলত'নকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। সিংহাসনের প্রকৃত মালিককে উচ্ছেদ করিয়া এইভাবে তাহার স্থান দখল করার ঘটনাটিতে বেরারের জনগণ নিতান্ত ক্ষুব্ধ হয় এবং তখন হইতে তাহারা তাঁহাকে সিংহাসনে পুনরাধিষ্ঠিত করিবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে।

সুলত'ান নাবালক হওয়ায় বিজাপুরের 'আলী 'আদিল শাহের সঙ্গে একত্রে মিলিত হইয়া ৯৭৩/১৫৬৫ সালে মুরতাদা নিজ'াম শাহ বেরার আক্রমণ করেন। আক্রমণ চলাকালে তাহারা দেশটিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া বর্ষাকাল আসিলে স্ব স্ব রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। ইহার অল্পকাল পরে খান্দেশ-এর সুলত'ান মীরান মুহ'াম্মাদ শাহ বেরার আক্রমণ করিলে বুরহান 'ইমাদ শাহ গোলকুণ্ডার শাসকের প্রতি আনুগত্যহীন মন্ত্রী জগদেব রাওকে বেরার সেনাদলের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। খান্দেশ বাহিনীর সহিত কয়েকবার তাহার সংঘর্ষ হইলে তিনি তাহাদেরকে হারাইয়া দেন। বেরার রাজ্যটিকে করতলগত করার জন্য কিছুদিন যাবত পরিকল্পনা করার পর মুরতাদা নিজাম শাহ ৯৮০/১৫৭২ সনে এক বিশাল সেনাবাহিনী লইয়া আক্রমণ পরিচালনা করেন। সিংহাসনের জবর দখলকারকে গদিচ্যুত করিয়া রাজ্যটিকে তাঁহার শাসিত এলাকার সঙ্গে সংযুক্ত করাই ঐ আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। তুফাল খান আহ'মাদ নগরের সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম না হওয়া শেষ পর্যন্ত নারনালার পাহাড়ী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুগল সম্রাট আকবরের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। এই অবস্থায় সম্রাট আকবর মুরতাদা নিজ'াম শাহকে হাত গুটাইয়া অভিযান প্রত্যাহার করিতে নির্দেশ দেন। তখন হইতে বেরারের দায়িত্বভার তিনিই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মুরতাদা নিজাম শাহ এই সতর্কবাণীতে কর্ণপাত না করিয়া নারনালা সমেত বেরারের প্রধান দুর্গগুলিকে জয় করিতে অগ্রসর হইলেন। অভিযান কালে তুফাল খান, তাঁহার কয়েদী বুরহান 'ইমাদু'ল-মুলক ও তাঁহার কিছু সংখ্যক অনুচরকে বন্দী করিয়া একটি বিজিত দুর্গে আটক রাখা হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই বন্দীদশায় থাকাকালে একদিন প্রাতঃকালে তাহাদের সকলকেই মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, তাহাদেরকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। কিন্তু অন্যেরা বলেন, তাহাদের সকলকে একত্রে রাখার পক্ষে কক্ষটি খুবই ক্ষুদ্র হওয়ায় শ্বাসরোধের ফলে তাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে। ৯৮২/১৫৭৪ সনে বুরহান 'ইমাদ শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় এক শতাব্দী যাবত বেরার শাসনের পর 'ইমাদ শাহী বংশের পরিসমাপ্তি সূচিত হয়। ইহার পর সিংহাসনের দাবীদার জনৈক ফীরূয দারয়া 'ইমাদু'ল-মুলক-এর দাসী পুত্র বলিয়া দাবী করে। সে এক বিপুল বাহিনী লইয়া বেরার আক্রমণ করিলে খান্দেশের সুলত'ান মুহ'াম্মাদ শাহ ফারূকী তাঁহাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন। যুদ্ধে নিজাম শাহী সেনাদল ফীরূযকে পরাজিত করিয়া তাহার অনুচরগণকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। এই সময় হইতে ছোটখাট একটি রাজ্যরূপে বেরারের স্বাধীন অস্তিত্ব আর রহিল না।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ফিরিশতা, গুলশান-ই-ইব্রাহীমী, বোম্বাই ১৮৩১ খৃ., (২য় মুহ'াম্মাদ শাহ বাহমানী, ২য় মাহ'মূদ শাহ বাহমানী, য়ূসুফ 'আদিল শাহ, ইসমা'ঈল 'আদিল শাহ, ১ম ইব্রাহীম 'আদিল শাহ, আলী 'আদিল শাহ, ১ম বুরহান নিজ'াম শাহ, ইব্রাহীম কুত্ব শাহ, ১ম হু'সায়ন নিজ'াম শাহ দ্র. ((Brigg- অনু., ২য়, ৪৮৮-৯, ৪৯২, ৫০২, ৫১৬-৭, ৫২৫-৮, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৪৮-৯; ৩খ, ১৫, ১৮, ২৬-৩১, ৪৬, ৫২, ৫৪, ৫৭-৬০, ৬৪-৮, ৯০-৩, ১০৫ প., ১৩২, ২১৬-২১, ২৩০, ২৩৭-৯, ৪০০-১, ৪০৫, ৪৮৫-৯৪, ৪৯৬-৭]; (২) 'আলী ইব্ন 'আযীযিল্লাহ তাবাতাবা, বুরহান-ই-মা'আছি'র, দিল্লী ১৩৩৫/১৯৩৬ (ফিরিশতার পর দ্বিতীয় প্রধান সূত্র, কিন্তু একজন গোঁড়া শী'আ ও 'ইমাদশাহী বংশ সম্পর্কিত তাঁহার বিবরণ নিতান্ত পক্ষপাতদুষ্ট), পৃ. ১৬, ২০, ১০৯, ১১৯, ১২৩,, ১৩৫, ১৫০, ১৫৪, ১৬০-১, ১৬৪, ২০৪, ২৩৬-৪০, ২৪৩-৫১, ২৭০-৩, ২৯৮-৩০২, ৩০৮, ৩১২, ৩১৭-২০, ৩২৬-৭, ৩৫৭, ৩৭৯, ৩৯৯-৪০২, ৪৩৪-৭, ৪৫৭-৭৪, ৭৮৩; (৩) সিকান্দার ইব্ন মানজহু, মির'আত-ই-সিকান্দারী (সম্পা. এস. সি. মিশ্র ও এম. এল, রাহমান) বরোদা ১৯৬১ খৃ., পৃ. ২৬৮-৭৫; (৪) গুলাম ইমাম খান, তারীখ-ই-রাশীদুদ্দীন খানী, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১২৮২/১৮৬৫, পৃ. ১৮৭-৯, ১৯২-৩, ২০৪, ২১৩-৪; (৫) 'আবদু'ল-গাফূর, তারীখ-ই-দাকান, আগ্রা ১৯০০ খৃ., ২খ; ৭৫-৮১; (৬) Cambridge History of India, ৩খ, ৩১৭, ৩২৪ প., ৩৩৩, ৩৪৬, ৩৬৬, ৩৯৮, ৪১৬, ৪১৯, ৪২৩-৫, ৪২৭, ৪২৯-৩১, ৪৩৪-৮, ৪৪০-৬, ৪৪৮, ৪৫০, ৪৫৩ প.; (৭) হারূন খান শেরওয়ানী, The Bahmanis of the Deccan, হায়দরাবাদ তা. বি. (১৯৫৩ খৃ.); (৮) ঐ লেখক, মাহ'মূদ গাওয়ান, The great Bahmani Wazir, এলাহাবাদ ১৯৪১ খৃ.; (৯) মীরযা ইব্রাহীম যুবায়রী, বাসাতীনু'স- সালাতীন, লিথো, হায়দরাবাদ (not seen); (১০) বাশীরুদ্দীন আহমাদ, ওয়াকী'আত-ই মামলাকাত-ই বীজাপুর, আগ্রা ১৯১৫ খৃ. ৩খ, ৬৪০ (সিংহাসনের জবরদখলকারী তুফাল খান কর্তৃক যেই তারিখে বুরহান 'ইমাদ শাহ সকল প্রকার শাসন ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হন, সেই তারিখটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ); (১১) Col. Wolseley Haig, The history of the Nizam Shahi Kings of Ahmadnagar, in indian Antiquary, ১৯২০-৩ খৃ.; (১২) গাবিলগড়. বেরার, নিজ'াম শাহী ও অন্যান্য প্রবন্ধ দ্র.।

A. S. Bazmee Ansari (E.I.[2])/ মুহম্মদ ইলাহি বখশ

**'ইমাদী** (عمادى) ঃ ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের ফারসী ভাষার একজন কবির ছদ্মনাম, প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। এই নামের সহিত কখনও আমীর উপাধি যুক্ত হয় সম্ভবত এই কারণে যে, কবি তাঁহার সময়ে সভাকবিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আরও একটি নিসবা শাহরিয়ারী প্রায়ই যুক্ত হয়। শেষোক্ত নিসবাটিকে চরিতকারগণ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। কোন কোন লেখকের মতে ইহা রায়-এর একটি জেলার নাম হইতে গৃহীত এই অর্থে যে, সেইখানে 'ইমাদীর জন্ম এবং ইহা সম্ভাব্য। অন্যান্য লেখক ইহাকে মাযান্দারানের বাওয়ান্দী (দ্র.) বংশের ইসলামী শাখার প্রতিষ্ঠাতার সহিত সম্পর্কযুক্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে, এই বংশের সায়ফুদ্দীন

'ইমাদুদ্দীন ফারামুরয পরিবারের প্রতি আনুগত্যের পরিচায়ক তাঁহার নিস্‌বা 'ইমাদী। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, 'ইমাদী এই পরিবারের আশ্রয়ে তাঁহার সাহিত্যিক জীবন শুরু করেন। অতঃপর তিনি সাল্‌জূক রাজসভায় যোগদান করেন এবং সুলত'ান রুক্‌নুদ্দীন ২য় তুগ্‌রিল (৫২৬-৯/১১৩২-৪)-এর জন্য কয়েকটি প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেন। আরও অনেক পৃষ্ঠপোষকের নাম 'ইমাদীর কাব্যে উল্লিখিত হইয়াছে। শেষে উল্লিখিত ব্যক্তিদের একজন ছিলেন Eldiguzid আতাবাক জিহান-পাহ্‌লাওয়ান মুহাম্মাদ (৫৭০-৮১/১১৭৫-৮৬)। কথিত আছে, তিনি সুলত'ান ৩য় তুগরিল (৫৭১-৯০/১১৭৬-৯৪)-এরও প্রশংসা করেন ('ইমাদীর পৃষ্ঠপোষকদের পূর্ণ তালিকার জন্য দ্র. S. Nafisi তা'লীকাত-ই-লুবাবি'ল-আল্‌বাব, ৭২৪ প.); কিন্তু এই বক্তব্য নির্ভরযোগ্য নহে। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ হিসাবে উল্লিখিত ৫৭৩/১১৭৭-৮ (তাকী কাশী) ও ৫৮২/১১৮৬-৭ (আতাশকাদা), এই দুই তারিখের প্রথমটিকে অধিকতর সম্ভাব্য মনে হয়।

'ইমাদীর কয়েকটি কবিতা আওফী 'ইমাদুদ্দীন গাযনাবীর প্রতি আরোপ করিয়াছেন। ইহা পূর্বাঞ্চলে 'ইমাদীর জন্ম—এইরূপ অনুমানের সহায়ক পরবর্তী জীবনীকারগণ গাঁযনাবী কবি মুখতারীকে তাঁহার পিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাকী কাশীর তথ্যানুসারে 'ইমাদী বাল্‌খ-এ সানাঈর নিকট তাস'াওউফের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। উক্ত লেখক অনুমান করেন যে, সম্ভবত একই নামের সমসাময়িক দুইজন কবি ছিলেন। এই অনুমান হাফ্‌ত ইক্‌লীম-এ স্পষ্টভাবে নাকচ করা হইয়াছে। তাঁহার নিজস্ব রচনাবলীতে গাযনার সহিত তাঁহার সম্পর্কের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রধানত সভাকবি হিসাবে খ্যাত 'ইমাদী ধর্ম বিষয়ক কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। বিখ্যাত প্রচারক ইব্‌ন 'আব্বাদী (রাহাতু'স-সুদূর, ২০৯) অনুষ্ঠিত অধিবেশনে তিনি এই ধরনের কবিতা আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার কবিতায় ব্যবহৃত রীতিগত রূপকল্পকে আধ্যাত্মিক (Transcendental) অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে— 'ইমাদী তাঁহার একটি গাযাল-এ পরিষ্কারভাবে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন (তু. উদাহরণস্বরূপ জাজারমী, মু'নিসু'ল-আহ্‌রার, তেহরান ১৩৫০/১৯৭১, ২খ., ১১০৮প.)।

'ইমাদীর জীবনকালে তাঁহার কবিতায় যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জন করার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে, এমন কি হাসান্‌ গাযনাবী আশরাফ, 'ইমাদীর রচনাকে শিক্ষানবীস কবিদের জন্য উত্তম অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে সুপারিশ করিতেন (রাহাতু'স -সুদূর, ৫৭)। 'ইমাদী রায়-এর অন্য একজন কবি কিওয়ামীর সহিত পরস্পর প্রশংসাসূচক কবিতা বিনিময় করেন। উভয় কবি বহু ক্ষেত্রে সানাঈর কাব্য রীতির অনুকারী ছিলেন। 'ইমাদী সানাঈর একটি কবিতা নিজের ব্যবহারের জন্য অভিযোজিত করিয়া লইতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই (শাম্‌স-ই-কায়স, ৪৬৪ প.)। আধুনিক একজন সমালোচক (ফুরূযানফার্‌) 'ইমাদীর কল্পনা শক্তির সূক্ষ্মতা ও ভাষার সবলতার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার ক্ষমতার প্রশংসা করিয়াছেন।

কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার কবিতাসমূহ পথিকবর্গের আকর্ষণ হারায় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহার দীওয়ান-এর কোন পূর্ণাঙ্গ প্রতিলিপি আছে বলিয়া জানা যায় নাই। অদ্যাপি বর্তমান সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সঙ্কলনটি বৃটিশ লাইব্রেরীর পাণ্ডু. Or. 298, যাহাতে ১৪০০ এর অধিক ছত্র রহিয়াছে; ইহাদের অধিকাংশই কাসীদা। আরও উপাদান বহু সূত্রে বিক্ষিপ্ত আছে; কিন্তু একটি ব্যাপক সঙ্কলনের এখনও অভাব।

**গ্রন্থপঞ্জী** : (১) রাওয়ান্দী, রাহাতু'স-সুদূর, সম্পা. মুহাম্মাদ ইকবাল, লন্ডন ১৯২১ খৃ.; (২) আওফী, সম্পা. Browne, ২খ, ২৫৭-৬৭; সম্পা. S. Nafisi, ৪৩০-৬; (৩) তু. তালীকাত, ৭২২-৮; (৪) শাম্‌স-ই কায়স, আল-মু'জাম ফী মাআয়ীর আশ 'আরি'ল-আ'জাম, তেহরান ১৩৩৮/১৯৫৯, স্থা.; (৫) তাকী কাশী, খুলাসাতু'ল-আশ্‌আর (তু. Blochet, Catalogue des manuscrits persans de la bibliotheque Nationale, ৩খ, প্যারিস ১৯২৮ খৃ., ৫০ ও নাফীসী, পূ. গ্র.); (৬) আমীন আহ্‌মাদ রাযী, হাফ্‌ত ইক্‌লীম, তেহরান ১৩৪০/১৯৬১, ৩খ, ২৩-৩১; (৭) লুত্‌ফ 'আলী বেগ আযার, আতাশকাদা, তেহরান ১৩৩৭/১৯৫৮ পৃ. ৩৩. ১১৭, ১০৭, ২২০; (৮) রিদা-কুলী খান হিদায়াত, মাজমাউল-ফুসাহা, তেহরান ১২৯৫/১৮৭৮, ১খ, ৩৫০-২; (৯) Ch. Rieu Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, লন্ডন, ১৮৮১ খৃ., ২খ, ৫৫৭-৮; (১০) বাদী'উ'য-যামান ফুরূযানফার্‌, Sukhan wa sukhan-warani, তেহরান ১৩১২/১৯৩৩, ২খ, ১৬৬-৭৭ তেহরান ১৩৫০/১৯৭১, ৫১৭-৩২; (১১) Dh. Safa. তারীখ-ই-আদাবিয়্যাত দার ইরান, ২খ, তেহরান ১৩৩৯/১৯৬০, ৭৪৩-৫০; (১২) A. Munzawi, ফিহরিস্ত-ই নুসখাহা-ই খাত্তীই ফারসী, ৩খ, তেহরান ১৩৫০/১৯৭১, পৃ. ২৪৫১।

J. T. P. de Bruijn (E.I.², suppl.)/মোঃ গোলাম মাওয়ার

**'ইমাদু'দ-দাওলা** (عماد الدولة) : 'আলী ইব্‌ন বুওয়ায়হ্‌ (অথবা বূয়েহ) বুওয়ায়হী বা বূয়ী (দ্র.) বংশ প্রতিষ্ঠাতা বা দায়লামী (দ্র.) ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে অনেক বৎসরের ব্যবধানে বয়োজ্যেষ্ঠ কিন্তু সর্বাপেক্ষা কম পরিচিত। প্রথমত তিনি তাঁহার একদল স্বদেশবাসীর সহিত সামানী নাস্‌র ইব্‌ন আহ্‌মাদ [৩২১-৯ হি. (দ্র.)]-এর এবং পরে ইরানে তাঁহার প্রতিনিধি মাকান ইব্‌ন কাকী (দ্র.)-র অধীনে চাকুরী করেন। শেষোক্ত জনের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করত তিনি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মারদাবী (দ্র.)-এর পক্ষাবলম্বন করেন। তাঁহার নিকট হইতে তিনি সন্দিগ্ধ অবস্থায় (ভাবী মন্ত্রী ইবনু'ল-'আমীদের পিতা ও রায়-এর গভর্নরের সচিবের সহিত তাহার সম্পর্কের খাতিরে) কারাজ ও মাহুল-বাসরা (দ্র.)-র গভর্নর পদ লাভ করেন। বিভিন্ন কোষাগার ও ভাণ্ডার হইতে, বিশেষত খুররামীদের কোষাগারসমূহ হইতে, যেইখানে তিনি প্রবেশাধিকার লাভের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন, আহরিত অর্থ দ্বারা পরিকল্পিত বদান্যতার সাহায্যে তিনি বহু দায়লামীকে নিজের চতুষ্পার্শ্বে একত্র করিয়াছিলেন যাহারা সর্বাধিক অর্থ প্রদানকারী নিয়োগকর্তার সেবা করিতে সদা প্রস্তুত ছিল। এই কার্য স্বভাবতই মারদাবীজকে উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে এবং তিনি তাঁহাকে আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তখন 'আলী উদ্যোগ গ্রহণ করত স্বল্প কালের জন্য ইসফাহান দখল করেন। তবে তিনি দখল বজায় রাখিতে অসমর্থ হন। অতঃপর তিনি চূড়ান্তরূপে আররাজান (দ্র.) দুর্গ অধিকার করত সেই স্থানে নিজেকে প্রকাশ্য বিদ্রোহী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন (৩২১/৯২৩)। বসরার স্বাধীন গর্ভনর আল-বারীদী (দ্র.)-র সমর্থন সত্ত্বেও পরবর্তী বৎসর তিনি ফারস হইতে খলীফার গভর্নর য়াকূতকে বিতাড়িত করেন। সমস্ত শত্রুর সমন্বিত আক্রমণের হুমকির মুকাবিলায় তিনি খলীফার মন্ত্রী ইব্‌ন মুকলা (দ্র.)-র নিকট হইতে ফারস-এর মুকতা হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেন। অতঃপর তিনি মারদাবীজ-এর সহিত আপোস করিতে চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত আপাতদৃষ্টিতে নিজেকে ঘটনার সহিত না জড়াইয়া ৩২৩/৯৩৫ সালের শুরুতে মারদাবীজের গুপ্তহত্যার ফলে রক্ষা পান। এইভাবে তিনি কেন্দ্রীয়

ইরানের তৎকালীন পরিস্থিতির হর্তাকর্তা হইয়া উঠেন এবং তিনি প্রতিবেশী রাজপুত্র গভর্নরদের উপর বলপ্রয়োগ ও কূটনীতির সমন্বিত নীতি প্রয়োগ করেন। তিনি তাঁহার এক ভাই আল-হ'াসান (পরবর্তীকালের রুকনুদ্দাওলা ৩২৯/৯৪০-১)-কে রায় দখল করিতে প্রেরণ করেন। অপর ভাই আহ'মাদ (ভবিষ্যতের মু'ইযযু'দ-দাওলা কিরমান ও খুযিস্তানের উপর ক্ষমতা সম্প্রসারিত করেন। তথা হইতে তিনি শেষ পর্যন্ত বাগ'দাদের খলীফাকে নিয়ন্ত্রণভুক্ত করেন। (৩৩৪/৯৪৫)। এই ভ্রাতৃদ্বয় ইতিহাসে যে সম্মানিত উপাধি দ্বারা পরিচিত তাহা এই সময়ই গ্রহণ করেন।

বৃদ্ধ ও দুর্বল 'ইমাদু'দ-দাওলা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সামানীদের সহিত অধিকতর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে এবং তাহার স্বনির্বাচিত ব্যক্তি শান্তিপূর্ণ উত্তরাধিকার নিশ্চিত করিতে ব্রতী হন। নিজের পুত্র না থাকায় তাঁহার ভ্রাতা রুকনু'দ-দাওলার পুত্র ফানাখুসরাও এবং পরবর্তীকালের 'আদু'দু'দ-দাওলা—ই ছিল তাঁহার নির্বাচিত উত্তরাধিকারী। এইভাবে আহওয়াযে তাঁহার ভাই মু'ইযু'দ-দাওলার সহিত সাক্ষাতকারের অল্প কিছুকাল পর তিনি ইনতিকাল করেন (৩৩৮/৯৪৯)। গভর্নর হিসাবে তাঁহার কার্যাবলীর শুধু এইটুকু জানা যায় যে, তিনি স্বীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে বিতরণের জন্য বিভিন্ন কোষাগারে রক্ষিত লুপ্ত ধনভাণ্ডার অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতেন। ঐ সময় ইসরা'ঈল ইব্ন মূসা নামক তাঁহার একজন খৃস্টান সচিব ছিল। সে তাহার মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। মু'ইযযু'দ-দাওলার বাগ'দাদে অবস্থানের ফলে অনেক মুসলমান তাহাকে সমীহ করিত। ইহা সত্ত্বেও 'ইমাদ নিজেকে তাঁহার ভ্রাতাগণ 'ইমাদকে পরিবারের প্রধানরূপে গণ্য করিতেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ বুওয়ায়হীগণ নিবন্ধ দেখুন। উহা প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে সাধারণভাবে বুওয়ায়হীগণের বিষয়ে বেশ কয়েকখানা গবেষণাকার্য প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য এইগুলিতে 'ইমাদুদ-দাওলাকে কেবল কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পুস্তকসমূহের নাম এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ (১) The Buwayhid dynasty of Baghdad, কলিকাতা ১৯৬৪ খৃ., নামক মফিজুল্লাহ কবীরের প্রকাশিত সন্দর্ভ; (২) J. C. Burgel, Die Hofkorres pondenz Adud al-Dawla, Wiesbaden, 1965 খৃ.; (৩) C. E. Bosworth, Military Organisation under the Buyids of Persia and Iraq, Oriens-এ ১৮-১৯ খ (১৯৬৭ খৃ.), ১৪৩-৬৭; (৪) H. Busse, Chalif und Grosskonig, Die Buyiden in Bagdad, 1968;

Cl. Cahen (E.I.[2]) পারসা বেগম

**'ইমাদুদ-দীন** (عماد الدين) ঃ মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-কাতিব আল-ইসফাহানী, সুবিখ্যাত লেখক ও ঐতিহাসিক, ৫১৯/১১২৫ সালে ইসফাহানে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম। বিখ্যাত কাতিব আল-'আযীযও এই পরিবারভুক্ত ছিলেন যাঁহার জীবনী নং ৭৭ Wustenfeld সংস্করণ, ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতে দেওয়া আছে (তু. এতদসংক্রান্ত, Houtsma, Recueil, ii, মুখবন্ধ, ১৯ প.)। তিনি নিজ শহর ও কাশানে তাঁহার যৌবনকাল অতিবাহিত করেন। কিন্তু তিনি বাগদাদে বিশেষভাবে ফিক্হশাস্ত্র শিক্ষা করেন। তিনি মাওসিল ও অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করেন। যখন সালজূকী সুলতান ২য় মুহ'াম্মাদ ৫৫১/১১৫৬ সালে বাগদাদ অবরোধ করিতে ব্যর্থ হন, 'ইমাদু'দ-দীন তখন সেই শহরে ছিলেন এবং এই ব্যর্থ অবরোধ উপলক্ষে রচিত একখানা ক'াসীদার মাধ্যমে খলীফাকে অভিনন্দিত করেন। ইহার ফলে তিনি মন্ত্রী ইব্ন হুবায়রা (দ্র.)-র আনুকূল্য লাভ করেন। এই মন্ত্রী তাঁহাকে ওয়াসিতে তাঁহার না'ইব নিযুক্ত করেন। কিন্তু মন্ত্রীর মৃত্যুর পর (জুমাদা'ল-উলা ৫৫৯/মার্চ-এপ্রিল ১১৬৪ সাল) তিনি তাঁহার পদ হারাইয়া ফেলেন এবং পরবর্তী দুই বৎসর দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত করেন। মন্ত্রী আশ-শাহ্রাযূরীর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি শেষ পর্যন্ত সিরিয়ার যাংগীগণের অনুগ্রহ লাভ করেন। ইঁহারা তাঁহার পরিবার, বিশেষত তাঁহার চাচা উল্লিখিত আল-'আযীযকে চিনিতেন। ফলে তিনি তাঁহাদের নিকট সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন। সুলতান নূরু'দ-দীন কর্তৃক তিনি কাতিব নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তাঁহার সম্মানে নির্মিত এক মাদরাসায় তিনি মুদাররিস নিযুক্ত হন। অধিকন্তু তিনি খলীফার এক কূটনৈতিক মিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং দীওয়ানের মুশ্রিক হিসাবে নিযুক্তির মাধ্যমে কর্মজীবন শেষ করেন। কিন্তু ৫৬৯/১১৭৩ সালে নূরু'দ-দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার শত্রুরা তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হয়। সেইখানে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। কিন্তু পরে সুস্থ হইয়া সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। সিরিয়ায় তিনি জানিতে পারেন যে, সালাহু'দ্-দীন সিরিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা করিতেছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি যখন হিম্স (৫৭২/১১৭৫) অধিকার করিলেন তখন 'ইমাদু'দ-দীন তাঁহাকে কবিতায় শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করেন। এইভাবে তিনি তাঁহার উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেন এবং তাঁহার সমস্ত অভিযানে তাঁহাকে সঙ্গ দান করেন। সালাহু'দ্-দীনের মৃত্যুর (৫৮৯/১১৯৩) পর তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে ফিরিয়া আসেন এবং নিজেকে আমৃত্যু (৫৯৭/১২০১) সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত রাখেন।

তিনি ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর 'আরব কবিদের উপর খারীদাতু'ল-ক'াস্'র ওয়া জারীদাত আহলি'ল-'আস্'র (ইহার অংশবিশেষ মিসর. কায়রো ১৯৫১ খৃ., ইরাক, বাগদাদ ১৯৫৫ খৃ., সিরিয়া, দামিশ্ক, মাগ'রিব, তিউনিস ১৯৬৬ খৃ.-এর উপর) নামক এক বিশাল সাহিত্য সংকলন প্রকাশ করেন। ইহা আছ্'-ছা'আলিবী (দ্র.)-র য়াতীমাতু'দ-দাহ্র-এর ধারাবাহিকতা। অন্যান্য রচনার মত কুত্তাব বা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ সচিব (পত্রলেখক)-দের (উল্লেখ্য হিলাল আস্'-সা'বী' ও আল-'উতবী) প্রথানুযায়ী পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বিশিষ্ট রীতিতে কিছু টীকাসহ 'ইমাদু'দ-দীন তাঁহার সাহিত্য সংকলন প্রকাশ করেন। একই রীতিতে কিন্তু আরও বিস্তৃত পরিসরে তিনি তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা আল-ফাত্হু'ল-কুস্সী ফি'ল-ফাত্হি'ল-কুদসী [জেরুসালেম জয়ের উপর কুসীয় বাগ্মিতা (কুস ইব্ন সা'ইদা দ্র.), সম্পা. Landberg, Leiden ১৮৮৬ খৃ.; অধিকন্তু কায়রো ১৩২২ হি. (H. Masse-কৃত ফরাসী অনু. যন্ত্রস্থ)] রচনা করেন। ইহার মুখবন্ধে উল্লিখিত তথ্যানুযায়ী ৫৮৩/১৩ মার্চ ১১৮৭ সালের প্রারম্ভে তিনি ইহা রচনা করিতে শুরু করেন। লেখকের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনারীতি প্রশংসনীয় হইলেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাচনরীতি, শব্দসম্ভারের জটিলতা (de slane, H. O. C., iv, v.-এর মতে) বিরোধালংকার, সমার্থক শব্দ, দ্ব্যর্থবোধক বাক্যরীতি, অহমিকাবোধক শব্দাবলী, প্রাচীন প্রকাশভঙ্গী ও পরোক্ষ ঘটনার বিবৃতি, বর্ণনামূলক ও প্রামাণিক গুণাগুণসম্পন্ন এই শ্রেষ্ঠ রচনাকার্যকে প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। ইহা একজন প্রত্যক্ষদর্শীর রচনাকর্ম যাহাতে যুদ্ধের মত কার্যাবলী, সুলতানের কর্তৃত্ব, কার্য ও গুণাগুণ ও কূটনৈতিক চিঠিপত্র (যেগুলির বেশ কয়েকখানা তিনি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন) লেখার মাধ্যমে 'ইমাদু'দ-দীন যে ভূমিকা পালন করেন তাহার উল্লেখ রহিয়াছে।

"তাঁহার বর্ণনা বিভিন্ন তথ্যাদির একটি সরাসরি উৎস যেন প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং যে নথিসংরক্ষক সর্বোচ্চ বিচারালয়ের দলীলাদির সুষ্ঠু ব্যবহার করে তাহার কার্যাবলীর সমমূল্য বহন করে" (G. Wiet)। আল-কুস্সী ছাড়াও 'ইমাদু'দ-দীনের ঐতিহাসিক রচনাসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) নুসরাতু'ল-ফাতরা ঃ মহান সালজূক'গণের প্রথম ইতিহাস। এই রচনার মূল ছিল আনূশারওয়ান ইব্ন খালিদ (মৃ. ৭৩৮/১১৩৭; তু. Browne, ২খ, ৩৬ ও সূচী)-এর অধুনালুপ্ত পারস্য স্মৃতি। ইহাকে 'ইমাদু'দ-দীন প্রচুর অতিরিক্ত তথ্য ও সুশোভন অলংকরণসহ 'আরবীতে রূপান্তরিত করেন। ইহা ৫৭৯/১১৮৩ সালে সমাপ্ত হয়। বর্তমানে ইহা ৬২৩/১২২৬ সাল আল-বুনদারী (দ্র.) লিখিত ও Recueil, ii-তে T. Houtsma কর্তৃক প্রকাশিত একখানা সংরক্ষিপ্তাকার পুস্তকে সন্নিবেশিত আছে।

(২) **আল-বারকু'শ-শামী** ঃ (৫৬২/১১৬৬-৫৮৯/১১৯৩) সালাহু'দ-দীনের যুদ্ধসমূহের আত্মজীবনীমূলক বর্ণনা। লেখক তাঁহার সচিব ছিলেন। যে দুই অংশ পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে সেইগুলির উভয়ই Bodleian-এ রহিয়াছে। সেইগুলি হইতেছে তৃতীয় খণ্ড যাহাতে ৫৭৩/১১৭৭-৫৭৫/১১৭৯ সালের এবং পঞ্চম খণ্ড যাহাতে ৫৭৮/১১৮২-৫৭৯/১১৮৩ সালের বর্ণনা রহিয়াছে। আল-বুনদারীকৃত ও সানা আল-বারক আশ-শামী শিরোনামযুক্ত প্রথম (?) অংশের একখানি সংক্ষিপ্ত রূপ একটি বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপি আকারে ইস্তাম্বুলে Esad Efendi সংগ্রহে রক্ষিত আছে। ইহা অতি শীঘ্রই ড. আর সেসেনকৃত একটি সংস্করণে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে ৫৬২/১১৬৬-৫৮৩/১১৮৭ সালের বর্ণনা রহিয়াছে। আবূ শামা (দ্র.)-র রাওদা'তায়ন-এ সংক্ষিপ্তাকারে বারক হইতে গৃহীত বিস্তৃত ও প্রচুর উদ্ধৃতি রহিয়াছে।

(৩) আল-'উতবা ওয়া'ল-'উক্'বা (আবূ শামা, ২খ, ২২৮-৩১), নিহ্লাতু'র-রিহ্'লা (ঐ ২খ, ২৩১-২), খাতফাতু'ল-বারিহ' ওয়া 'আত্ফাতু'শ-শারিহ' (ঐ, পৃ. ২৩৩-৪৫) শিরোনামযুক্ত পুস্তকে সালাহু'দ-দীনের মৃত্যুর পর হইতে (?) ৫৯৭ হি. পর্যন্ত ঘটনাবলীর ক্রমোল্লেখ রহিয়াছে। আল-বুনদারী সানার মুখবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে তিন বৎসরের ঘটনা তিনটি খণ্ডে উল্লেখ রহিয়াছে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) Brockelmann, ১খ, ৩১৪-৫, পরিশিষ্ট ১, পৃ. ৫৪৮-৯; (২) ইব্ন খাল্লিকান, নং ৭১৫; (৩) H. O. C., iv, PP. iii-v; (৪) Wustenfeld, Die Akademien der Araber, নং ৬২; (৫) H. A. R. Gibb, al-Barq al-Shami the history of Saladin by the Katib Imad al-Din at Isfahani, WZKM-এ lii (১৯৫৩ খৃ.), ৯৩-১১৫; (৬) J. Kraemer, Der Sturz des Konigreichs Jerusalem (৫৮৩/১১৮৭) in der Darstellung des Imad ad-Din al-Katib al-Isfahani, Wiesbaden ১৯৫২ খৃ.; (৭) Lewis ও Holt, Historians, সূচী।

H. Masse (E.I.²)/পারসা বেগম

**'ইমাদু'দ-দীন** (عماد الدين) ঃ 'আলী, ফাকীহ্-ই-কিরমানী, ৮ম/১৪শ শতাব্দীর ফারসী ভাষার মরমী কবি, ৬৯০/১২৯১-২ সালের কাছাকাছি সময়ে কিরমানে তাঁহার জন্ম।

'সাফা' নামাহ্' নামক গ্রন্থে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, ৭০৫/১৩০৫ সালে যখন তাঁহার পিতা ইনতিকাল করেন তখন তিনি ও তাঁহার এক ভ্রাতা কিরমানে তাঁহার পিতার শায়খ নিজ'ামু'দ-দীন মাহ্'মূদ কর্তৃক কু'ত'বু'ল-আক্'তাব যায়নু'দ-দীন 'আবদু'স-সালাম কামূয়ীর অনুগামীদের উপকারার্থে স্থাপিত খানকাহ্র পরিচালনায় দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মরমী ঐতিহ্যের এই পেশার মাধ্যমে 'ইমাদু'দ-দীন আবূ হাফস্' 'উমার আস্-সাহরাওয়ার্দী (দ্র.)-এর শিক্ষার সহিত পরিচিত হন। সংসারত্যাগী ধর্মাচারীদের খানকাহ্-র একজন শায়খ হিসাবে দায়িত্ব পালন ছাড়াও তাঁহার লাকাব অনুসারে জানা যায় যে, তিনি ইসলামী আইনশাস্ত্রের একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবেও খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে বারংবার একটি ক্ষুদ্র কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে। হাবীবু'স-সিয়ার গ্রন্থে সর্বপ্রথম উহা উল্লিখিত হয়। উহা অনুসারে 'ইমাদু'দ-দীনের বিড়াল তাঁহার সালাত আদায়ের অনুকরণ করিতে পারিত। মুজাফ্ফারী শাসনকর্তা শাহ শূজা' (তু. হুমায়ূন-ফার্‌রুখ, ভূমিকা, ৮১ প.)-র অনুগ্রহ লাভের জন্য দুইজন কবির প্রতিদ্বন্দ্বিতার উল্লেখ হিসাবে বিখ্যাত হাফিজের একটি কবিতার একটি পংক্তি এই গল্পের মূল উৎস। 'ইমাদু'দ-দীন-এর কাব্যে অনেক প্রশস্তিমূলক বিষয়বস্তুর উল্লেখ হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি তাঁহার সমসমায়িক শাসকদের ও তাঁহাদের কতিপয় মন্ত্রীর সহিত সুসম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মুজা'ফ্ফারী শাসনকর্তাগণ, বিশেষভাবে শাহ শুজা' তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করিলেও তিনি মুবারিযু'দ-দীন মুহ'াম্মাদকে উৎসর্গ করিয়া বহু কবিতা রচনা করেন। সময়ে সময়ে তিনি তাঁহাদের প্রতিপক্ষ শীরাযের আবূ ইসহ'াক ইনজূ-র প্রশংসা করিয়াও কবিতা রচনা করিতেন এবং ইহাও সম্ভবপর যে, তিনি নিজে শীরাযে কিছুকাল বসবাস করিয়াছিলেন। ঈলখান আবূ সা'ঈদের দরবারেও তাঁহার কবিতা প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল।

মনে হয়, 'ইমাদু'দ-দীনের জীবনের অধিকাংশ সময় কিরমানে অতিবাহিত হইয়াছিল। দাওলাত শাহের বর্ণনা অনুসারে ৭৭৩/১৩৭১-২ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। তাকী কাশী (তু. Sprenger, Oudh catalogue, কলিকাতা ১৮৫৪ খৃ., পৃ. ৪৩৬-৮) তাঁহার মৃত্যু সন ৭৯৩/১৩৯১ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সঠিক হওয়ার পক্ষে সম্ভাবনা কম। ৯ম/১৫শ শতাব্দীর শেষ দিকেও উক্ত খানক'াহ্-তে ও 'ইমাদু'দ-দীনের মাযারে ভক্তবৃন্দের আগমন ঘটিত।

'ইমাদু'দ-দীনের সাহিত্যকর্ম যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই কবিতা। কবিনাম হিসাবে তিনি 'ইমাদ ও খুব কম ক্ষেত্রে 'ইমাদ-ই ফাকীহ ব্যবহার করেন। তাঁহার দীওয়ানে মুখ্যত গ'াযাল অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সা'দী ও হাফিজের জীবনকালের মধ্যবর্তী সময়ে যে সমস্ত স্বনামধন্য কবি গাযালের উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে তিনি খুবই উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সা'দী শীরাযীকে 'ইমাদ একজন প্রশংসিত পূর্বগামী হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। কবি হ'াফিজ' ছিলেন তাঁহার সমসাময়িক তরুণ ব্যক্তি। তিনি 'ইমাদের সাহিত্যকর্মের সহিত পরিচিত ছিলেন। 'ইমাদ ও হ'াফিজ' শুধু যে উভয়ে একই সঙ্গে একই ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেন তাহা নয়, তাঁহাদের কবিতার বিষয়বস্তু ও উপাদান অনেক ক্ষেত্রেই ছিল সাদৃশ্যপূর্ণ। আধুনিককালের কয়েকজন গবেষক (উদাহরণ স্বরূপ ইব্ন য়ূসুফ শীরাযী, মুহাম্মাদ মু'ঈন ও হুমায়ূন ফার্‌রুখ) এই সকল সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়বস্তুর তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। অপর পক্ষে 'ইমাদের

গাযালসমূহের ভাষা অত্যধিক সরল এবং গঠন প্রণালী সুসমঞ্জস। হাফিজের রচনারীতি হইতে তাঁহার রচনারীতির পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা যায়। রচনাগুলির মূল সুর বা বিষয়বস্তু অতীন্দ্রিয় জগতের অধিবাসী এক প্রিয়তমের সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রেমিকের আকুল আকাঙ্ক্ষা। বিষয়বস্তুতে অ্যানাক্রেয়নী (Anacreontic) ও কালান্দারী উপাদানের অভাব না থাকিলেও সেগুলি অপ্রধান মাত্র। উপাদান ক্ষেত্রে তাঁহার কবিতা সংক্ষিপ্ত প্রশংসামূলক অভিভাষণের ভূমিকাস্বরূপ রচিত হইয়াছে। সেখানেও তাঁহার কবিতায় অন্তর্নিহিত অতীন্দ্রিয় লক্ষ্যবস্তুটি ভুল করিবার আশংকা নাই। জামী তাঁহার বাহারিস্তান গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, কবি তাঁহার স্বরচিত কবিতাগুলি তাঁহার খানকাহ-তে আবৃত্তিপূর্বক আলোচনা করিতেন। এই সূত্র হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনি তাঁহার মরমী শিক্ষার কাজে তাঁহার কবিতা ব্যবহার করিতেন। K. Stolz [Der Diwan des Imaduddin Faqih, WZKM-এর xlix (১৯৪২ খৃ.) খণ্ডের পৃ. ৩১-৭০] 'ইমাদের গাযালসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করিয়াছেন।

'ইমাদের সাহিত্যিক অবদানের দ্বিতীয় অংশ বেশ কয়েকটি মাছনাবী সমন্বয়ে রচিত। কতকগুলি ক্ষুদ্রাকার কবিতা ছাড়াও ইহাতে মধ্যম আকারের পাঁচটি কবিতা রহিয়াছে।

১। সাফা' নামাহ বা মু'নিসু'ল-আব্‌রার, নিজামীর মাখযানু'ল-আস্‌রার-এর অনুকরণে লিখিত একটি শিক্ষামূলক কবিতা। সাফা' নামাহ মাখ্‌যানু'ল-আসরার-এর অনুরূপ সাধারণ সারী' ছন্দে রচিত। কবিতাটির রচনা ৭৬৬/১৩৬৪-৫ সালে সমাপ্ত হয় এবং ইহা শাহ শুজা'-র নামে উৎসর্গ করা হয়। শীরাযের বর্ণনা কবিতাটির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি। মুহাম্মাদ ইকবাল, Oriental College Magazine, ৫-৮খ, (১৯২৯-৩২ খৃ.) সংখ্যায় মূল কবিতাটি সম্পাদনাপূর্বক প্রকাশ করেন।

২। সুহবাত নামাহ বা তারীকাত-ই সুহবাত নামাহ, সা'দীর বুসতাঁ-এর অনুরূপ ছন্দে রচিত। ৭৩১/১৩৩০-১ সালে ইহার রচনা সম্পূর্ণ হয়। কবিতাটি ঈল্‌খানের উযীর গিয়াছু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাশীদি'দ-দীন ফাদ্‌লুল্লাহ-এর নামে উৎসর্গীকৃত। ইহাতে দশটি অধ্যায়ে শাসনকর্তা, সাধু ব্যক্তি, ছাত্র, পণ্ডিত ব্যক্তি, গৃহত্যাগী, ভ্রমণকারী, আহলে-ই-ফুতুওয়াত, সুন্দর-সুন্দরী, প্রেমিক-প্রেমিকা ও গায়ক-বাদকদের স্বভাব বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রতিটি অধ্যায়ে এক বা একাধিক উদাহরণমূলক কাহিনী সংযুক্ত করা হইয়াছে। H. W. Duda কর্তৃক ARO, ৬খ. (১৯৩৪ খৃ.), ১১২-২৪-এ Imaduddin Faqih und die Futuwwa নিবন্ধে উক্ত কবিতার সপ্তম অধ্যায়টি সম্পাদিত, অনূদিত ও প্রকাশিত হয়।

৩. মুহাব্বাত নামাহ-ই সাহিবদিলান, ইহা একটি ক্ষুদ্রাকার মাছনাবী। ইহার প্রারম্ভে ঈলখানী উযীর খাওয়াজা তাকিয়্যু'দ-দীন 'ইরাকীর নামে উৎসর্গ লিপিসম্বলিত গদ্যে রচিত একটি অবতরণিকা আছে। দ্বিতীয়াংশে ব্যবহৃত ছন্দের নাম হাযাজ-ই-মুসাদ্দাস-ই মাহ্‌যুফ। বিশ্ব প্রকৃতির সর্বক্ষেত্রে প্রেমের যে সুরের অনুসন্ধান করা হইয়াছে, এই মাছনাবীতে তাহা আত্মা ও দেহের মধ্যে এবং অজৈব, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের অন্তর্ভুক্ত কিছু কাল্পনিক সত্তার মধ্যে দশটি বঙ্গানুবাদ একটি অনুক্রম আকারে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিখ্যাত প্রেমিক যুগলদের প্রেম-কাহিনী হইতে গৃহীত উদাহরণমূলক বর্ণনাসমূহ সংযোজিত হইয়াছে (তু. H. W. Duda, Ferhad und Schirin, Prague ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ৯৮-১০০, যে স্থানে পঞ্চম বাদানুবাদের বিষয়বস্তু আলোচিত হইয়াছে)। কবিতাটির শিরোনাম একটি সাংকেতিক সময় নির্দেশক। ইহা হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ৭৩২/১৩৩১-২ সালে ইহার রচনাকার্য সমাপ্ত হয়।

৪. তারীকাতনামাহ্‌, পূর্বোল্লিখিত কবিতার অনুরূপ ছন্দে রচিত। ইহার চরণসমূহের একটিতে গুপ্তভাবে লিখিত সময় নির্দেশিকা অনুসারে ইহার রচনা কার্যের সমাপ্তি ঘটে ৭৫০/১৩৪৯-৫০ সালে। কিন্তু হুমায়ুন ফাররুখ উক্ত চরণটিকে বিকৃত বলিয়া বিবেচনা করিয়া উহার রচনাকার্য সমাপ্ত হওয়ার তারিখ ৭৫৪-৯ হিজরীর মধ্যে অর্থাৎ যাঁহার নামে কবিতাটি উৎসর্গ করা হইয়াছিল সেই মুবারিযু'দ-দীন মুহাম্মাদ-এর শাসনকালের শেষ বৎসরগুলির কোন এক বৎসরে হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। উহার বিষয়বস্তু আবূ হাফ্‌স 'উমার আস-সুহরাওয়ার্দী (for a list of the ten chapter headings, দেখুন Munzawi, ৪খ, ২৯৪-৯৫) রচিত 'আওয়ারিফু'ল-মা'আরিফ গ্রন্থের, 'ইয্‌যু'দ-দীন মাহমূদ কাশানী (মৃ. ৭৩৫/১৩৩৪-৫)-কৃত ফারসী অনুবাদ মিসবাহু'ল-হিদায়া-র একটি অভিযোজনা।

৫. দাহ-নামাহ্‌ (পাণ্ডুলিপি, আয়া সোফিয়া, নং ৪১৩১, তারিখ ৮৪১ হি., রচনাটি নাসীহাত-নামাহ্‌ নামে অভিহিত)। আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে, রচনাটি পূর্ববর্তী কবিতাগুলির ছন্দে রচিত এক ধরনের মাছনাবীর অন্তর্ভুক্ত যাহাতে কল্পিত এক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বিনিময়কৃত ১০খানা প্রণয়লিপি বিষয়বস্তুরূপে স্থান লাভ করিয়াছে। 'ইমাদ প্রথাসিদ্ধ গঠন রীতিতে কয়েকটি ব্যতিক্রমধর্মী পরিবর্তন কার্যকর করেন। তিনি মাছনাবী ও কাসীদা এই উভয়ের জন্য কিছু ভিন্ন ধরনের ছন্দ ব্যবহার করেন। তিনি বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব প্রদর্শনের জন্য প্রণয়লিপির পরিবর্তে তাঁহার কিছু সংখ্যক পৃষ্ঠপোষকের উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী উহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া মূল বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। আরও দেখুন T. Ganjei, The genesis and definition of a literary composition, the Dahnama (Ten love-letters), in Isl., xlvii (1971), 59-66.

পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে 'ইমাদের রচনাবলী ক্রমশ গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে, যদিও তাঁহার সময়ে ও উহার অব্যবহিত কিছু পরেও সেইগুলির যথেষ্ট কদর ছিল। প্রথম দিকের কয়েক খণ্ড পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত হইয়াছে। ঐগুলির একটি (Madjlis নং ২০৩০) তাঁহার স্বহস্তে লিখিতও হইতে পারে। ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভ কালের লোকদের মধ্যে ইসহাক ও আযারী তাঁহার কাব্য প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** : (১) বিস্তারিত ভূমিকাসহ রুকনু'দ-দীন হুমায়ূন ফাররুখ সম্পাদিত দীওয়ান-ই 'ইমাদ-ই ফাকীহ-ই কিরমানী, তেহরান ১৩৪৮/১৯৬৯, পানজ গান্‌জ-এ পূর্বোক্ত লেখক কর্তৃক হুমায়ুন-নামাহ শিরোনাম বিশিষ্ট একটি ছোট কবিতাসহ সম্পাদিত পূর্বোল্লিখিত মাছনাবিয়্যাত, তেহরান ১৯৭৮ খৃ.; (২) খুব গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপিগুলির বিবরণের জন্য আরও দেখুন, Sir G. Ouseley, Biographical notices of Persian poets, লণ্ডন ১৮৪৬ খৃ., পৃ. ১৯৫-২০০; (৩) Sachau-Ethe, Catalogue of the Persian manuscripts in the Bodleian library, ১ম খণ্ড, অক্সফোর্ড ১৮৮৯ খৃ., cols. ৫৭২-৩; (৪) মাওলাবী 'আবদু'ল-মুক্‌তাদির, Catalogue..., Bankipore, Persian poets: Ferdausi to Hafiz,

পাটনা ১৯০৮ খৃ., পৃ. ২১৭-৯; (৫) Blochet, Catalogue des manuscrits persans de la Bibliotheque Nationale, প্যারিস ১৯২৮ খৃ., ৩খ, পৃ. ২১৭-১৮; (৬) H. W. Duda, Ferhad und Schirin, Prague ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ১৯১-২; (৭) ঐ লেখক, in ArO, ৬খ. (১৯৩৪ খৃ.), পৃ. ১১৩-৪; (৮) ইব্ন য়ুসুফ শীরাযী, ফিহ্রিস্ত-য়ি কিতাব খানা-য়ি মাদরাসা-য়ি 'আলী সিপাহসালার, ২খ, তেহরান ১৩১৮/১৯৩৯, ৬৪৩-৪; (৯) ঐ লেখক, ফিহ্রিস্ত-ই কিতাবখানা-ই মাজলিস-ই শুরা-ই মিল্লী, তিহরান ১৩২১/ ১৯৪২, ৩খ, ৩৫৯-৬৩; (১০) আহ্‌মেদ আতেশ, Istanbul kutuphanelerinde farsca manzum eserler, ইস্তাম্বুল ১৯৬৮ খৃ, ১খ, ২৭৩-৮; (১১) নুসখাহা-য়ি খাত্তী, তেহরান ১৩৪৮/১৯৬৯, ৬খ, ৬৮৩; (১২) A. Munzawi, ফিহ্রিস্ত-ই নুস্খাহা-য়ি খাত্তী-য়ি ফারসী, তেহরান ১৩৫০/১৯৭১, ৩খ, ১৮৮৬, ২৪৫০ প. ৪খ, তেহরান ১৩৫১/১৯৭২, পৃ. ২৮১৯, ২৯৮৫ প., ২৯৯০, ২৯৯৪ প., ৩১৭৪, ৩৩২৭; (১৩) প্রধান জীবনীমূলক সূত্রসমূহ, দাওলাত শাহ, পৃ. ২৫৪-৬; (১৪) জামী, বাহারিস্তান, ভিয়েনা ১৮৪৬ খৃ., পৃ. ১০১; (১৫) খাওয়ানদামীর, হাবীবু'স-সিয়ার, বোম্বাই ১৮৫৭ খৃ., ৩/২খ, ৩৭ [(আরও দেখুন (১৬) 'আবদু'ল-হু'সায়ন নাওয়া'ঈ, রিজাল-ই কিতাব হাবীব আস-সিয়ার, তেহরান ১৩২৪/১৯৪৫, পৃ. ৮৩)]; (১৭) আমীন আহ্‌মাদ রাযী, হাফ্ত ইক্‌লীম, তেহরান ১৩৪০/১৯৬১, ১খ, ২৭৫-৭; (১৮) লুত্‌ফ 'আলী বেগ আয্'র, আতাশকাদা, তেহরান ১৩৩৭/১৯৫৮, পৃ. ১২৪; (১৯) রিদাকু'লী খান হিদায়াত, রিয়াদু'ল-'আরিফীন, তেহরান ১৩০৫/ ১৮৮৭-৮, পৃ. ১০৯-১০; আরও দেখুন (২০) Browne, LHP, ৩খ, ২৫৮-৯ ও স্থা.; (২১) ঈরাজ আফশার, ফিহ্রিস্ত-ই মাকালাত-ই ফার্সী, তেহরান ১৩৩৯/১৯৬০, ১খ, ৪৬০, ৫৯১-৬।

(J.T.P. De Bruijn (E.I.[2] Suppl.)/মোঃ গোলাম সরওয়ার

**'ইমাদু'দ্-দীন আল-গূরী** (عماد الدين الغورى): আন-নারনূলী, আশ-শায়খ, মাওলানা, একজন বিজ্ঞ 'আলিম, ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ ও সাধক। তিনি নারনূল-এর এক সম্ভ্রান্ত 'আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষদের মধ্যে শায়খ 'ইমাদু'দ্-দীন নামক জনৈক ন্যায়নিষ্ঠ সৎ সাহসী 'আলিম দিল্লী সম্রাট মুহাম্মাদ শাহ তুগলাক (৭২৫-৫২/ ১৩২৫-৫১)-এর সমালোচনার অপরাধে নিহত হন। শায়খ 'ইমাদু'দ-দীন জীবনের প্রথমদিকে বংশীয় ঐতিহ্যগত জ্ঞান চর্চার পরিবর্তে খেলাধুলা ও কুশ্তী চর্চায় সময় অতিবাহিত করিতেন। এইজন্য তিনি স্বজন কর্তৃক নিন্দিতও হন। একদা একজন খ্যাতনামা কুশ্তীগীরকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করিয়া বিজয় গর্বে উল্লসিত হইয়া দম্ভভরে তিনি গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহার এইরূপ অহঙ্কার ও দম্ভের জন্য কঠোর ভাষায় তাঁহাকে ভর্ৎসনা করেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া কুশ্তী চর্চা পরিত্যাগ করেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। নারনূলের খ্যাতনামা সূফী সাধক শায়খ মুহাম্মাদ আয-যাকীর মাযারের এক হুজরায় শায়খ 'ইমাদ পবিত্র কু'রআন তিলাওয়াতে, নফল সালাত ও আল্লাহ্র যিক্রে নিমগ্ন থাকিয়া আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির প্রয়াসে কালাতিপাত করিতে থাকেন। উযূ-গোসলের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশে তিনি কখনও হুজরার বাহিরে আসিতেন না। এইভাবে দীর্ঘ বার বৎসর কঠোর সাধনার ফলে আল্লাহ্র অনুগ্রহে তাঁহার চরম আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধিত হয় এবং তিনি বহুবিধ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হন। অতঃপর তিনি বংশীয় ঐতিহ্যধারায় জনগণের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিস্তার ও জনকল্যাণে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার অনেক কারামাত ছিল বলিয়া জানা যায়। নারনূলেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

শায়খ আহ্‌মাদ ইব্ন মাজদু'দ্-দীন আশ্-শায়বানী বর্ণনা করেন যে, তিনি স্বীয় বাল্যকালে শায়খ 'ইমাদু'দ্-দীনের সাক্ষাত লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আচার-আচরণসমূহের অনুশীলন ও তাঁহার সুন্নাতসমূহ আন্তরিকভাবে পালনে অশেষ যত্নবান হইতে দেখিতে পাইয়াছেন। শায়খ 'ইমাদ ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের মোহমুক্ত সহজ সরল জীবন যাপন করিতেন এবং দীন-দুঃখীদের ভালবাসিতেন। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত।

**গ্রন্থপঞ্জী** : (১) শায়খ 'আবদু'ল-হাক্ক দিহ্লাবী, আখ্বারু'ল-আখ্য়ার, মীরাট ১২৭৭ হি.; (২) শারীফ 'আবদু'ল-হায়্যি আল-হাসানী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ৩খ, ১০৮-৯, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফি'ল-'উছমানিয়্যা, হায়দরাবাদ, হিন্দ, ১ম সং, ১৯৫১ খৃ.।

ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

**'ইমাদু'দ্-দীন চিশ্তী** (عماد الدين چشتى): আদ-দিহলাবী আশ-শায়খ সমসাময়িক যুগের দিল্লীর চিশ্তিয়া তারীকাপন্থী একজন খ্যাতনামা সাধক। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না। তবে যে সূত্রপরম্পরায় তিনি চিশ্তিয়া তারীকায় দীক্ষা লাভ করেন সেই শাজরানামার বর্ণনা পাওয়া যায়। উপমহাদেশে চিশ্তিয়া সূফী তারীকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শায়খ খাজা মু'ঈনু'দ্-দীন হাসান চিশ্তী সিজযী আজমীরী (মৃ. ৬৩৪/১২৩৬), তাঁহার অন্যতম মুরীদ শায়খু'ল-ইসলাম কুত্বু'দ-দীন বাখ্তিয়ার কা'কী (মৃ. ৬৩৩/১২৩৩)। দিল্লী সম্রাট সুলতান শামসু'দ-দীন ইলতুত্‌মিশ-এর রাজত্বকালের (৬০৭-৩৩/১২১০-৩৩) শেষভাগে দিল্লীতে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং তাঁহার প্রভাবে দিল্লী ও অন্যান্য অঞ্চলে চিশ্তিয়া তারীকা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। শায়খু'ল-ইসলামের ইনতিকালের পর তদীয় অন্যতম মুরীদ আশ-শায়খ আল-ফাকীহ বাদ্রু'দ-দীন গাযনাবী (মৃ. ৬৫৭/১২৫৮) দিল্লীতে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। শায়খ বাদ্রু'দ-দীনের ওফাতের পর তাঁহার সুযোগ্য শাগরিদ ও আবদালরূপে জনগণের মধ্যে পরিচিত, ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ শায়খ 'ইমামু'দ-দীন দিহ্লাবী (মৃ. ৭৮০/১৩৭৮) তাঁহার স্থানে গদীনশীন হন। শায়খ আবদাল-এর মৃত্যুর পর আল-'আশিক (আল্লাহ্-প্রেমিক) নামে অভিহিত শায়খ শিহাবু'দ-দীন দিহ্লাবী তাঁহার মুরশিদের স্থলাভিষিক্ত হন। এই শায়খ শিহাব-এর কাছেই শায়খ 'ইমাদু'দ-দীন চিশ্তিয়া তারীকায় দীক্ষিত হইয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। ন্যায়নিষ্ঠা ও চারিত্রিক মহত্ত্বের জন্য তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। দিল্লীতেই তিনি ইনতিকাল করেন এবং তথায় তাঁহাকে দাফন করা হয়। শায়খ তাজু'দ-দীন তাঁহার অন্যতম মুরীদ।

**গ্রন্থপঞ্জী** : (১) ইব্ন বাত্তূতা, তুহ্ফাতু'ন-নুজ্জার, শায়খ বাখ্তিয়ার কা'কীর কিছু প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ আছে; (২) গুলাম আহ্‌মাদ খান, উর্দূ অনু., ফাওয়া'ইদু'ল-ফুওয়াদ, রুহ্‌টাক ১৩১৩ হি.; (৩) 'আবদু'ল-হাক্ক দিহ্লাবী, আখ্বারু'ল-আখ্য়ার; (৪) মুফতী গুলাম সারওয়ার, খাযীনাতু'ল-আস্ফিয়া ওয়া হাদীকাতুল-আওলিয়া; (৫) শারীফ 'আবদু'ল-হায়্যি আল-হাসানী,

নুযহাতু'ল-খাওয়াতি'র, ৩খ, ১০৯-১০, প্রবন্ধে উল্লিখিত অন্যদের জন্য দ্র. ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডের নির্ঘণ্ট।

এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

**'ইমাদু'দ-দীন আল-বারোদাবী** (عماد الدين البر ودوى) ঃ আশ-শায়খ আল-কাদী ৯ম/১৫শ শতকের গুজরাটের ফাকীহ ও মুজাহিদ 'আলিম। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি বরোদা রাজ্যের শাসনকর্তা উলুগ খান (الغ خان) কর্তৃক বরোদার কাদী নিযুক্ত হন। এতদঞ্চলের মুসলিম-বিদ্বেষী শক্তিসমূহের কর্মতৎপরতা প্রতিরোধে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। গুজরাটের তৎকালীন শাসক সুলতান মাহ্মূদ শাহ (১৪৫৮-১৫১১ খৃ.) চাম্পানীর (چانپانیر)-এর অত্যাচারী রাজপুত রানার বিরুদ্ধে সমর অভিযানের উদ্যোগ গ্রহণ করিলে কাদী 'ইমাদ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই যুদ্ধ যেন শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে পরিচালিত হয়। চাম্পানীরের রানা পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু মুসলিমকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল শুধু এই অজুহাতে যে, তাঁহারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী। কাদী 'ইমাদ এই অভিযানে অংশগ্রহণের সঙ্কল্প করেন। তিনি বরোদার শাসক উলুগ খানের সমীপে আসিয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং কাদী পদে ইস্তি'ফা' দিয়া সরকারী কোষাগারের বেতন তালিকা হইতে নিজের নাম খারিজ করান। অতঃপর তিনি জিহাদের নিজস্ব পতাকা উত্তোলন করিলে দলে দলে জনগণ তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হয়।

মুজাহিদ বাহিনী চাম্পানীর অভিমুখে যাত্রা করিলে শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারা সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠেন। রানার বিরাট বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের তুমুল যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু লোক হতাহত হয়। এমতাবস্থায় চাম্পানীরের রানা ও কাদী 'ইমাদ মল্লযুদ্ধে পরস্পরের মুকাবিলা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সম্মুখ যুদ্ধের যেই পর্যায়ে কাদী 'ইমাদ রানাকে তলোয়ারের এক প্রচণ্ড আঘাত করেন, ঠিক সেই মুহূর্তে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির প্রস্তর আঘাতে রানা ধারাশায়ী হন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রানাকে বন্দী করা হয়। এইভাবে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করিলেও কাদী 'ইমাম শাহাদাতের পরম সৌভাগ্য (সা'আদাত) লাভের উদ্দেশে অবশিষ্ট শত্রু বাহিনীর সহিত অসিযুদ্ধ করিয়া অবশেষে শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। ৮৮৯/১৪৮৪ সালে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

দুর্ভেদ্য পার্বত্য এলাকার সুউচ্চ পর্বতশীর্ষে চাম্পানীরের সুদৃঢ় রাজপুত দুর্গ অধিকার মাহ্মূদ শাহ-এর রাজত্বকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কাদী 'ইমাদের নেতৃত্বে আত্মত্যাগী মুজাহিদগণ এই যুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। চাম্পানীরের বন্দী ও আহত রানার চিকিৎসার জন্য সুলতান যে সুব্যবস্থা করেন তাহাতে তাঁহার চারিত্রিক মহত্ত্ব ও ইসলামী মূল্যবোধের পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ইসলাম গ্রহণের শর্তে সুলতান রানাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু রানা ইহাতে অস্বীকৃতি জানান। ইত্যবসরে গুজরাটের রসূলাবাদ এলাকার মুসলিম অধিবাসিগণ তাঁহাদের অঞ্চলের বহুবার লুণ্ঠন ও বহু নিরাপরাধ মুসলিমকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার অভিযোগে সুলতানের কাছে বিচারপ্রার্থী হইলে যথারীতি রানার বিচার করা হয় এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। চাম্পানীর দুর্গ অধিকারের পর সুলতান মাহ্মূদ শাহ দুর্গের পাদদেশে মুহাম্মাদাবাদ নামে একটি শহর পত্তন করিয়া তথায় বহু অর্থ ব্যয়ে একটি বিশাল জামি' মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের সুরম্য মিহ্রাব ও মিম্বরের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। সুলতান স্বয়ং চাম্পানীরে অবস্থান করিয়া শহর ও মসজিদের নির্মাণকার্য পরিচালনা করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) মুহাম্মাদ কাসিম ফিরিশ্তা, তারীখ-ই-ফিরিশ্তা, সালাতীনে গুজরাট অধ্যায়, উর্দূ অনু., ২খ, ৩০৫-৭, চাম্পানীরের যুদ্ধ; (২) শারীফ 'আবদু'ল-হায়্যি আল-হাসানী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতি'র, ৩খ, পৃ. ১১০, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফি'ল-'উছমানিয়্যা, হায়দরাবাদ, হিন্দ, ১ম সং., ১৯৫১ খৃ.।

ড. এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

**'ইমাদু'দ-দীন যাংগী** (দ্র. যাংগী)

**'ইমাদু'ল-মুল্ক** (عماد الملك) ঃ গাযি'দ-দীন খান ফীরূয জাঙ্গ (৩য়), প্রপিতামহ গাযি'দ-দীন খান ফীরূয জাঙ্গ ১ম (দ্র. শিহাবু'দ-দীন মীর)-এর নামানুসারে তাঁহার নাম শিহাবু'দ-দীন রাখা হয়। তাঁহার মাতা ছিলেন উযীর কামারু'দ-দীন খান (মৃ. ১১৬১/১৭৪৬)-এর কন্যা। তাঁহার বয়স যখন আট বৎসর তখন তাঁহার পিতা মীর মুহাম্মাদ পানাহ্ (দ্র.) দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধির পদ দখলে ব্যর্থ প্রয়াসের সময় অকস্মাৎ আওরাঙ্গাবাদ-এ ১১৬৫/১৭৫২ সালে ইনতিকাল করেন। দাক্ষিণাত্যের উদ্দেশে তাঁহার পিতার দিল্লী ত্যাগের প্রাক্কালে শিহাবু'দ-দীনকে দিল্লীতেই মন্ত্রী আবু'ল-মানসূর সাফদার জাঙ্গ (দ্র.)-এর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যাওয়া হয়। বয়সের তুলনায় তাঁহাকে অকালপক্ব কিন্তু ধূর্ত বলিয়া মনে হইত। জীবনের প্রারম্ভেই স্বীয় চাতুর্য ও বুদ্ধি নৈপুণ্য এবং সাফদার জাঙ্গের সহায়তায় তিনি "মীর বাখশী" (Quartermaster general)-এর পদ অর্জন করিতে সমর্থ হন।

উচ্চাভিলাষের বশবর্তী হইয়া তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকেরই বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং ১১৬৭/১৭৫৪ সালে মারাঠাদের আমন্ত্রণ জানান। তাহারা আহ্মাদ শাহ্ (১১৬১-৭/১৭৪৮-৫৪)-কে সিংহাসনচ্যুত করে অন্ধ করিয়া দেয় এবং ২য় 'আলামগীরকে দিল্লীর সম্রাট হিসাবে অধিষ্ঠিত করে। জন্মগতভাবেই একজন কূটনীতিবিদ 'ইমাদু'ল-মুলক রাজনীতির কলাকৌশল সম্পর্কেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁহারা মাতুল মীর মু'ঈনু'ল-মুল্ক (মীর মুন্নু) গভর্নর ছিলেন, মৃত্যুর পর ১১৬৯/১৭৫৫ সালে তিনি লাহোর অধিকার করেন এবং মীর মুন্নুর বিধবা পত্নী মুগুলানী বেগমের প্রণয়ী আদীনাহ বেগ খানের হাতে ইহার শাসনভার অর্পণ করেন। আহ্মাদ শাহ আবদালী (দ্র.) এই ভুঁইফোঁড় ক্ষমতালোভীর উত্থানে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং অনতিবিলম্বে সসৈন্য লাহোর অভিমুখে যাত্রা করেন (১১৭০/১৭৫৬)। তিনি আদীনাহ বেগ খানকে বহিষ্কৃত করেন এবং 'ইমাদু'ল-মুল্ককে সঙ্গে লইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। এইবার 'ইমাদু'ল-মুল্ক দুররানী সর্দারের পক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং ভারতপুরের সুরজমল জাট (দ্র.) ও অযোধ্যার শুজা'উ'দ-দাওলা (দ্র.)-এর বিরুদ্ধে অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তাঁহার এই কৃতঘ্নতা আবদালীর দারুণ অসন্তোষের কারণ হয়। তিনি নাজীবু'দ-দাওলাকে হিন্দুস্তানের আমীরু'ল-উমারা' নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আহ্মাদ শাহের ভারত ত্যাগের পর প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য 'ইমাদু'ল-মুল্ক নাজীবু'দ-দাওলাকে দিল্লীর দুর্গে অবরুদ্ধ করেন এবং অক্ষম সম্রাট ২য় 'আলামগীরকে ১১৭৩/১৭৫৯ সালে হত্যা করান। এই ঘটনায় আবদালী অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং সসৈন্য ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। অতঃপর ১১৭৫/১৭৬১ সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে তিনি সাফল্যজনকভাবে 'ইমাদু'ল-মুলকের সহযোগী মারাঠাদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হন।

এইভাবে 'ইমাদু'ল-মুল্কের শক্তির রাজনীতির খেলা কার্যত শেষ হইল। প্রবল পরাক্রমশালী প্রতিপক্ষের ভয়ে ভীত হইয়া তিনি জাটদের আশ্রয় চাইলেন এবং কিছুকাল সুরজমলের সহিত অবস্থান করেন। তাঁহার মৃত্যু (১১৭৭/১৭৬৩) হইলে তিনি বসবাসের উদ্দেশে ফাররুখাবাদের নওয়াব আহ্'মাদ খান বাঙ্গাশের (মৃ. ১১৮৫/১৭৭১) নিকট গমন করেন। দুই বৎসর পর তিনি দাক্ষিণাত্যে যান এবং তাঁহার পূর্বেকার সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ মারাঠাদের নিকট হইতে কালপীতে কিছু জমি লাভ করেন। কিন্তু সেই স্থানেও নিরাপদ বোধ না করিয়া তিনি সুরাটে বৃটিশদের সহিত বসবাসের উদ্দেশে গমন করেন। Colonel Goddard হাজ্জযাত্রীর পোশাক পরিহিত অবস্থায় তাঁহার সহিত সাক্ষাত করেন। সেই স্থানে তিনি কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধও ছিলেন (তু. Mill, History of India, ২খ, ৪১৪)। কারামুক্তির পর তিনি হা'জ্জ পালনের উদ্দেশে মক্কা গমন করেন। অতঃপর ১১৯৫/১৭৮১ সালে তাঁহাকে সিন্ধুতে দেখা যায়। বসরা ও কান্দাহার হইয়া তিনি অবশেষে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তীকালে তিনি তায়মূর শাহ আবদালীর (রাজত্ব ১১৮৭-১২০৭/১৭৭৩-৯৩) অধীনে চাকুরী প্রার্থনা করেন। যামান শাহ (রাজত্ব ১২০৭-১৬/১৭৯৩-১৮০১) যখন ১২১১/১৭৯৭ সালে পাঞ্জাব আক্রমণ করেন তখন তিনি তাঁহার অধীনে চাকুরীরত ছিলেন। ইহার পর কিছুকাল তিনি অজ্ঞাতবাসে অখ্যাত জীবন যাপন করেন এবং কালপীতে ১০ রাবী'উ'ল-আখিরা, ১২১৫/১ সেপ্টেম্বর, ১৮০০ সালে ৫৪ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন।

তিনি ছিলেন একাধারে হাফিজ, সুপণ্ডিত ও সুলেখক। তিনি প্রথমে 'আসাফ' কবিনামে (تخلص) এবং পরবর্তী সময়ে উহা পরিত্যাগ করিয়া 'নিজাম' কবিনামে ফারসী, 'আরবী, উর্দূ ও তুর্কী ভাষায় কবিতা রচনা করেন। তাঁহার ফারসী দীওয়ান (বৃটিশ মিউজিয়াম ও লেনিনগ্রাদে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিসমূহ) ১৩০১/১৮৮৩-৪ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁহার অন্যান্য কাব্য রচনার মধ্যে 'আলী (রা) ইব্‌ন আবী তালিবের উদ্দেশে একটি প্রশস্তিমূলক কবিতা (মান্‌কাবাত-ই নিজাম দার মাদ্‌হ-ই 'আলী) একটি ক'াসীদা ও দরবেশ ফাখরু'দ-দীন চিশ্‌তী শাহ্‌জাহানাবাদীর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে কিছু মাছ'নাবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দরবেশের জীবনী সম্পর্কে তিনি মানাকিব-ই ফাখ্‌রিয়্যা (সম্পা. দিল্লী ১৩১৫/১৮৯৭) নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে হামীদু'দ-দাওলা দ্বিতীয় নিজামু'ল-মুল্ক আসাফ জাহের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত হন এবং 'পাঁচ হাযারী' মনসবদারের পদ অর্জন করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) 'আবদু'ল-কাদির খান জা'ইসী, তা'রীখ-ই 'ইমাদু'ল-মুল্ক (পাণ্ডু. ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ৪০০০); (২) সাম্‌সামু'দ-দাওলাঃ শাহ-নাওয়ায খান, মা'আছিরু'ল-উমারা' (Bibl. Ind), ২খ, ৮৪৭-৫৬, ইং. অনু. H. Beveridge, পৃ. ৬৭৪-৮; (৩) আযাদ বিলগিরামী, খিযানা-ই 'আমিরা, কানপুর ১৯০০ খৃ., পৃ. ৫০-৪; (৪) গুলাম হু'সায়ন খান, গুলযার-ই আসাফিয়্যা, বোম্বাই ১৩০৮/১৮৯১, পৃ. ৬৮-৭০; (৫) Cambridge Hsitory of India, ৪খ, ৪১৫-৬, ৪৩৫-৪০, ৪৪৪-৮; (৬) W. Irvine, Later Mughals, কলিকাতা ১৯২২ খৃ., ২খ, ১৪১, ২৯৫, ৩০০; (৭) Storey, ১/১খ, ৬২৩, ১/২খ, ১০২৮-৩০ (যেইখানে অন্যান্য আরও বহু সূত্রের নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে)।

এ. এস. বাযমী আনসারী (E.I.[2])/শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

**ইমাম** (إمام) ঃ আলিফ, মীম, মীম-এই তিন বর্ণবিশিষ্ট শব্দমূল হইতে গঠিত বিশেষ্য; ফি'আল (فعال) শব্দের সম-ওযনবিশিষ্ট। অর্থ-যাহাকে উদ্দেশ্য করা হয়, যাহার নিকট হইতে হিদায়াত লাভ করা হয় অথবা যাহাকে অনুসরণ করা হয়। শেষোক্ত অর্থে 'ইমাম' সেই মানুষকে বুঝায় যাহার বাণী ও কার্য অনুসৃত হয় অথবা 'ইমাম' সেই গ্রন্থ যাহাতে বর্ণিত আদেশ-নিষেধ পালন করা হয়। ইমাম শব্দটির অর্থের মধ্যে ব্যাপকতা রহিয়াছে। যে ব্যক্তির অনুসরণ করা হয়, তিনি সত্যানুসারী হইলে মূলত ও সাধারণত তাহাকেই 'ইমাম' বলা হয়, কিন্তু কখনও কখনও আলংকারিকভাবে অথবা শ্লেষাত্মকভাবে যে কোনও নেতাকে—সে সত্যানুসারী হউক বা না হউক—'ইমাম' নামে আখ্যায়িত করা হয়। "আর আমাদেরকে মুত্তাকীগণের ইমাম বানাও" (২৫ ঃ ৭৪)-কু'রআন মাজীদের এই আয়াতে মুত্তাকী ও সত্য সাধক ইমামের কথা বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে "আর আমি তাহাদেরকে নেতা করিয়াছিলাম, তাহারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করিত" (২৮ঃ ৪১)-এই আয়াতে বাতিলপন্থী ও কুফ্‌রের নেতৃত্ব দানকারী ইমামের কথা বলা হইয়াছে (মুফ্‌রাদাত, আলিফ-মীম-মীম এই শব্দসমূলের অধীনে দ্র.)। শিশু-কিশোরদের প্রাত্যহিক পাঠ বা সবককেও ইমাম বলা হইয়া থাকে। ইমাম শব্দটির আর এক অর্থ রাস্তা বা মহাসড়ক। যেমন কু'রআন মাজীদে বর্ণিত হইয়াছেঃ "ফলে আমি উহাদেরকে শাস্তি দিয়াছি, উহাদের উভয়ই তো প্রকাশ্য পথপার্শ্বে অবস্থিত" (১৫ঃ ৭৯)-আয়াতে যে সড়কের কথা বলা হইয়াছে, উহা য়ামান হইতে আরম্ভ হইয়া লোহিত সাগরের তীর ঘেষিয়া উত্তর দিকে হিজায ও মাদ্‌য়ান হইয়া 'আকাবাঃ উপসাগরের মোড় লইয়া তায়মা'-র মধ্য দিয়া গায়য়াঃ-য় পৌঁছিয়াছিল। উক্ত মহাসড়কের পার্শ্বেই আয়কা নামক জনপদ ও হযরত লূত ('আ)-এর সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। এই সড়কটি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষ, য়ামান. মিসর, সিরিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব য়ূরোপ ভ্রমণের পথ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ইমাম শব্দটি নিম্নোক্ত কয়েকটি অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকেঃ দালানের গাঁথুনির সরলতা মাপিবার কার্যে রাজমিস্ত্রী কর্তৃক ব্যবহৃত ওলন বা ওলন দড়ি, রেখা টানিবার দণ্ড; দৃষ্টান্ত–উট-চালক, কাফেলার চারণ গায়ক, জামা'আতে আদায়কৃত সালাতে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি (লিসান), তাস্‌বীহের গণনার দানাগুলি হইতে পৃথক করিয়া উহার প্রান্তে গ্রথিত লম্বা দানা (নূরু'ল-লুগাত), পথ প্রদর্শক, সেনাপতি (তাজ)। ইমাম আবূ দাউদ-এর সুনান গ্রন্থে বর্ণিত আছে, "ইমামের আদেশ ভ্রান্ত হউক অথবা অভ্রান্ত, জিহাদের ময়দানে তাঁহাকে মান্য করা ওয়াজিব" (কিতাবু'ল-জিহাদ, বাব ৩৩)। এই হ'াদীছে উল্লিখিত 'ইমাম' শব্দটিকে 'সেনাপতি' অর্থে গ্রহণ করা যায়। তাফসীর, হ'াদীছ', ফিক্'হ, তাসাওউফ, ইসলামী দর্শন, অভিধান ইত্যাদি বিষয়ের যে কোনও একটির বিশেষজ্ঞকেও 'ইমাম' নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। যেমন তাফসীর-এর ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) (মৃ. ৩১০ হি.), হ'াদীছ'-এর ইমাম মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (র) (মৃ. ২৫৬ হি.) ফিক্'হশাস্ত্রের ইমাম আবূ হানীফাঃ (র) (মৃ. ১৫০ হি.), আসরার-ই-দীন-এর ইমাম আল-গ'ায্‌যালী (মৃ. ৫০৫ হি.), 'ইল্‌ম-ই-কালাম-এর ইমাম আল-আশ'আরী (মৃ. ৩২৪ হি.), অভিধানের ইমাম রাগি'ব (মৃ. ৫০২ হি.), প্রমুখ। কু'রআন মাজীদকেও ইমাম নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে (তাজ)। হযরত 'উছ'মান (রা) কুরআন মাজীদের যে অনুলিপি প্রস্তুত করাইয়া ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইমাম শব্দটি বিশেষত সেই সকল অনুলিপির প্রতিই প্রযোজ্য

হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বরকতময় সত্তাকেও ইমাম নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। এইরূপে খলীফাকেও ইমাম বলা হইয়াছে। য়ামান দেশীয় বাদশাহদেরকেও ইমাম বলা হইত (তাজ)। আমীরকেও ইমাম নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। আর আমীর হইতেছেন তিনিই যাঁহার নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করা হয় (মাজ্মা'উ বিহারি'ল-আনওয়ার, আলিফ-মীম-রা শব্দমূল দ্র.)।

শী'আ দলের ইছ্না 'আশারিয়্যা উপদল ইমাম উপাধিটিকে হযরত 'আলী (রা) ও তাঁহার বংশধরগণের মধ্য হইতে প্রথম এগার জনের জন্য নির্দিষ্ট বলিয়া মনে করে (ইছ্না 'আশারিয়্যা নিবন্ধ দ্র.)। কিন্তু উক্ত দলের সাব'ইয়্যা উপদলের মতে শুধু প্রথম সাতজন ইমাম-ই 'ইমাম' উপাধি পাইবার যোগ্য। শী'আদের মতে 'ইমাম' নিষ্পাপ ও যাবতীয় বিষয়ে ওয়াকিফহাল হইয়া থাকেন। তাহাদের মতে ইমামাত বা ইমামের পদ শুধু হাদীছ দ্বারাই প্রমাণিত হইতে পারে। আর এইরূপ প্রমাণেই হযরত 'আলী (রা) প্রথম ইমাম নিযুক্ত হন। এতদসম্পর্কিত হাদীছটি রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক গাদীরু খুম নামক স্থানে উক্ত হইয়াছিল। অনেক মুহ'াদ্দিছের মতে হ'াদীছ'টি নির্ভরযোগ্য নয় (Dr. Serajul Haque, Imam Ibn Taimiya and his projects of Reform, Dacca 1982, pp. 100-01)। শী'আ ইমামকে হাশিমী গোত্রের ব্যক্তি হইতে হইবে বলিয়া তাহারা মনে করে। শী'আ দলের ইমামিয়্যা উপদলের মতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর প্রথম ইমাম ছিলেন হযরত 'আলী (রা)। উক্ত উপদলের মতে উক্ত অভিমতের সপক্ষে সুস্পষ্ট হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত উপদলের মতে মতভেদ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ইমাম নিযুক্ত করিয়া যাওয়া পূর্ববর্তী ইমামের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু চারিজন ইমামের ইমামাতের যুগ শেষ হইবার পর উক্ত উপদলের মধ্যে এই বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়।

আশ'আরিয়্যা, জুব্বা'ইয়্যা ও কোনও কোনও দলের মতে ইমামকে কুরায়শ গোত্রীয় হইতে হইবে। ইহার সপক্ষে "ইমামগণ কুরায়শ গোত্র হইতে হইবেন" (আত-তায়ালিসী, মুসনাদ, ৯২৬ ও ২১৩৩ ক্রমিক সংখ্যক হাদীছ)-এই হাদীছকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয় (তা'রীখু'ল-খুলাফা', পৃ. ৭, লাহোর ১৮৭০ খৃ.)। কিন্তু খারিজীগণ ও কতক মু'তাযিলা উক্ত মতের বিরোধী (এই সম্পর্কে জুব্বা'ইয়্যা মতবাদের জন্য দেখুনঃ আশ-শাহ্রাস্তানী, আল-মিলাল, পৃ. ১০৭)। আহ্লু'স-সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত-এর মতে ইমামাত নির্ধারিত হইবে রাসূলুল্লাহ (স')-এর হ'াদীছ' দ্বারা, মুসলিম উম্মাহ্-এর ইজমা' বা ঐকমত্য দ্বারা অথবা মুসলিম উম্মাহ্-র জ্ঞানতাপস বিশেষজ্ঞদের (আহ্লু'ল-হাল্লি ওয়া'ল-'আক্দ) সম্মতিতে। ইমামাতের জন্য মুফ্তী মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ্ 'আল-বিলায়াতু'ল-'আম্মা' পরিভাষাটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং তিনি লিখিয়াছেন যে, উহার জন্য নির্বাচন প্রয়োজন (তাফ্সীর, ৮খ, ১০৩)। মুসলিম দার্শনিকগণ ইমামের জন্য ন্যূনাধিক আটটি শর্ত বর্তমান থাকা প্রয়োজন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (আল-বুস্তানী, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৪খ, ৩৫২)। ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ জানিবার জন্য দেখুনঃ আল-বুখারী, কিতাবু'ল-আহ'কাম, বাব ১; আবূ দাউদ, কিতাবু'ল-খারাজ ওয়া'ল-ইমারা, বাব ১২; আত-তিরমিযী, কিতাবু'ল-আয়াত, বাব ৬; আহ'মাদ, মুস্নাদ, ৩খ, ২৮, ৯২, ৬খ, ২৪; শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ, হুজ্জাতু'ল্লাহি'ল-বালিগা, কায়রো ১২৮৬ হি. ২খ, ১৬০ প.)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ মূল নিবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী দেখুন; (১) আল-মাওয়ারদী, আল-আহ'কামু'স-সুলতানিয়্যা, পৃ. ৩-৩৩; (২) আশ-শাহ্রাস্তানী, আল-মিলাল, পৃ. ১২২; (৩) আল-মাস'ঊদী, মুরূজ, প্যারিসে মুদ্রিত, ১খ, ৭০প., ৬খ, ২৪ প.; (৪) আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফ্রাদাত, امرؤ لقيس-এই শব্দমূল দ্র.; (৫) আবূ 'উবায়দা, মাজাযু'ল-কু'রআন, কায়রো ১৩৭৪ হি., ৩৫৪, ৩৮৬; (৬) ইব্ন কুতায়বা, তাফ্সীর গারীবি'ল-কু'রআন, পৃ. ২৩৯, ২৫৭; (৭) আস-সারাখ্সী, আল-মাব্সূত, কায়রো ১৩২৪-১৩৩১ হি., স্থা.; (৮) ইব্ন রুশ্দ, বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ, ২খ, ৪৪৯ পৃ.; (৯) ইব্ন খাল্দূন, আল-মুকাদ্দিমা, ১খ, ৩৪২; (১০) আত-তাহানাবী, কাশ্শাফু ইসতিলাহাতি'ল- ফুনূন, কলিকাতা ১৮৬২ খৃ., পৃ. ৯২, ৪৪১; (১১) মুহ'াম্মাদ সিদ্দীক হ'াসান খান, ইক্লীল, ভূপাল ১২৯৪ হি.; (১২) D. Herbelot, Biblio-Orientale, প্যারিস ১৭৭৭ খৃ., ২খ, ৩২৩-২৬; (১৩) Goldziher, Vorlesungen, পৃ. ৮২ প., ২৮০ প.; (১৪) Macdonald, Development of Muslim Theology, দ্র. শিরো.; (১৫) E.I.[2], ২খ, ৪৭৩-৪৭৪।

ইহ্সান ইলাহী রানা ও সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/মু. মাজহারুল হক

**ইমাম আ'জাম** (দ্র. খালীফা)

**ইমাম বাড়া** (امام بارؤلقيزا (باره): শব্দার্থে "ইমামগণের জন্য নির্দিষ্ট স্থান"। শব্দটি ভারতে মুহাররাম মাসে শী'আগণের সবাবেশ স্থান হিসাবে নির্মিত অট্টালিকা বুঝায়। এই স্থানে তা'যিয়া (দ্র.) সংরক্ষণ করা হয় এবং সমবেত জনতা হাসান ও হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাত উপলক্ষে শোকগাথা আবৃত্তি করে। ইমাম বাড়া একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার উৎপত্তি সূচিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন শী'আদের আচার-আচরণ ও প্রথাসমূহের অনেকাংশ বর্তমান আনুষ্ঠানিক রূপ গ্রহণ করে। সাফদার জাংগ (১৭০৮-৫৪ খৃ.) দিল্লীতে মুহ'াররাম উৎসব পালনের জন্য একটি অট্টালিকা নির্মাণ করেন। ইহাকে ইমাম বাড়া বলা হইত না তবে ইহাকে এই ধরনের আদি সৌধ বলা যাইতে পারে। প্রায় একইরূপ একটি অট্টালিকা নির্মাণ করেন তাহার পৌত্র আসাফু'দ-দাওলা। লক্ষ্ণৌতে নির্মিত এই অট্টালিকাটি কিন্তু 'ইমাম বাড়া-ই-আসাফী' নামে পরিচিতি লাভ করে। ইহার পর হইতে অযোধ্যার নাওয়াবগণের মধ্যে 'ইমাম বাড়া' নির্মাণের প্রবণতা দেখা দেয় এবং এইগুলি একই সংগে নির্মাতা পরিবারের প্রধানগণের অন্তিম বিশ্রাম স্থলরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। মুহ'াম্মাদ 'আলী শাহ (১৮৩৭-৪৭ খৃ.) নির্মিত হু'সায়নাবাদ-এর ইমাম বাড়া য়ুরোপীয় স্থাপত্যের প্রভাব বহন করে। জা'ফার শারীফ-এর মতে দক্ষিণ ভারতের 'আশুর-খানা'-এর উত্তর ভারতীয় বিকল্প হইতেছে 'ইমাম বাড়া'। ঢাকার 'ইমাম বাড়া' হোসেনী দালান নামে পরিচিত।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) W. Knighton, The private life of an Eastern King together with Elihu's story, অক্সফোর্ড ১৯২১ খৃ., পৃ. ৯০ প.; (২) G. A. Herklots, Islam in India, জা'ফার শরীফ-এর কানূন-ই ইসলাম-এর ইংরেজী অনুবাদ, অক্সফোর্ড ১৯২১ খৃ., পৃ. ১৪৬; (৩) J. Fergusson, History of Indian and eastern architecture, লণ্ডন ১৮৯১ খৃ., পৃ. ৬০৫; (৪) বেগম মীর হ'াসান 'আলী, Observations on the Mussulmauns of India, লণ্ডন ১৮৩২ খৃ., ১খ, ৩২-৯; (৫) H. G. Keene, Handbook of Lucknow, কলিকাতা ১৮৭৫

খৃ., পৃ. ১০২-৩; (৬) J. H. T. Walsh, History of the Murshidabad District, লণ্ডন ১৯০২ খৃ., পৃ. ৭৬-৭।

K. A. Nizami (E.I.[2])/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

**ইমাম যাদাহ** (امام زاده) ঃ বলিতে কোন শী'আ ইমামের বংশধর ও তাঁহার দরগাহ উভয়ই বুঝায় (এই নিবন্ধে মুখ্যত ইমামদের বংশধরগণের দরগাহের বিষয় বিবৃত হইয়াছে)। অতএব, ইমামযাদাগান বা ইমামগণের বংশধরবৃন্দ সকলেই সায়্যিদ (দ্র.), কিন্তু সকল সায়্যিদ বংশীয় ব্যক্তিকে 'ইমামযাদাহ্' উপাধি প্রদান করা হয় না। সাধারণত ইমামগণের পুত্র ও পৌত্রগণ ইমামযাদাহ্ উপাধি লাভ করেন, কিন্তু যাঁহারা নিজেরা ইমাম পদে অধিষ্ঠিত হন তাঁহারা নহেন। ইমাম বংশের যাঁহারা বিশেষ ধর্মানুরাগিতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন বা শাহাদত প্রাপ্ত হন তাঁহাদেরকেও ইমামযাদাহ্ উপাধি দেওয়া হয়। ইমাম বংশের স্ত্রীলোকদেরকে সাধারণত এই উপাধি দেওয়া হয় না। 'ইমামযাদাগান' (ইমামগণের বংশধরগণ)-এর অনেকেরই জীবন-বৃত্তান্ত সাধারণ জীবন-চরিত ও পীর-দরবেশগণের জীবনী গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। অন্য অনেকের জীবনের বিশদ বিবরণ অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে, আবার যে সমস্ত ইমাম বংশধরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা হয় এবং হাজ্জযাত্রিগণ যাহাদের মাযার যিয়ারাত করে তাঁহাদের কাহারও কাহারও প্রকৃত বংশ পরিচয় সন্দেহজনক।

ইমামগণের বংশধরদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ইরানে প্রথম প্রবেশ ঘটে সম্ভবত কুম্ম শহরে। হাসান মুহাম্মাদ আল-কুম্মী রচিত তারীখ-ই কুম্ম গ্রন্থে ইমাম হাসান, ইমাম হুসায়ন, ইমাম মূসা ইব্ন জা'ফার ও অন্যদের বংশধরদের কুম্ম-এ আগমনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আল-কুম্মী আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবা ও কাশান নামক স্থান দুইটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন (উক্ত গ্রন্থ, সম্পা. সায়্যিদ জালালু'দ-দীন তিহরানী, তেহরান ১৯৩৪ খৃ., ১৯১ প.)। মা'মূন কর্তৃক ইমাম রিদা-কে তাঁহার 'ওয়ালী 'আহ্দ' বা একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা দানের পর ইমামগণের বংশধরদের মধ্যে অনেকেই ইরানে চলিয়া আসেন। ইমাম রিদা'-র ইনতিকালের পর তাঁহারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়েন। ইঁহাদের অনেককেই ইমামদের দরগাহ সংলগ্ন এলাকার সীমানার মধ্যে, বিশেষত মাশ্হাদ ও নাজাফ-এ অবস্থিত ইমামদের দরগাহ সংলগ্ন এলাকা দুইটিতে দাফন করা হয়। কিন্তু অন্যদের ও তাঁহাদের বংশধরদের কবর বা যেগুলি তাঁহাদের কবর বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস উহা ইরানের সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। ইহাদের অনেক কয়টিই তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতেই শী'আ ও সুন্নী উভয় ফিরকার লোকেরা ইমামদের বংশধরদের মাযারসহ সকল পীর-দরবেশদের মাযার যিয়ারাত করিতেন। মুহাম্মাদ বাকির মাজলিসী বলেন, মুসলিম 'আলিমগণ মাযার যিয়ারাত প্রথা অনুমোদন করেন তবে ইমামদের সন্তান-সন্ততিদের মাযার যিয়ারাত অনুমোদনের সপক্ষে ইমামগণের নিজেদের আমলের কোন নজীর উল্লেখ করা যাইবে কিনা সন্দেহ (দ্র. তুহফাতু'য-যা'ইরীন, লিথো, তেহরান ১৮৫৭ খৃ., ৪২০, D. M. Donaldson কর্তৃক The Shiite Religion, London 1933, 258-এ উদ্ধৃত)। তবে তিনি এই তীর্থযাত্রার সপক্ষেই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, সব শহরেই ইমামদের বংশধর ও তাঁহাদের আত্মীয়-পরিজনদের বলিয়া কথিত বহু কবর আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। যেই সকল মাযার সনাক্ত করা হইয়াছে সেইগুলির যিয়ারাত করা হইয়া থাকে এই ধারণায় যে, ইঁহাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন ইমামগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই শামিল। এই যিয়ারাতের কোন পৃথক বিধি-বিধান দেওয়া হয় নাই; তবে অন্যান্য মুসলিমের মাযার যিয়ারাতের মত একই নিয়মে এই সকল মাযারও যিয়ারাত করা হয়।

ইমামযাদাদের দরগাসমূহের মধ্যে অনেককয়টিই কেবল স্থানীয়ভাবে পরিচিত; কতকগুলিকে আবার লোকে ইমাম যাদাহ্ দরগাহ বলিয়া মনে করিলেও আসলে ঐগুলি কোন পীর-দরবেশের মাযার; যেমন কাযবীনে অবস্থিত শায়খ আহমাদ গাযালীর মাযার, যাহা 'ইমামযাদাহ আহমাদ' (ইমাম যাদাহ্ আহমাদের দরগাহ) নামে পরিচিত (সায়্যিদ মুহাম্মাদ 'আলী গুলরীয, মিনূদার য়া-বাব-আল-জিন্নাত-ই-কাযবীন, তেহরান ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ৬৭২; তু. ইব্ন কারবালা'ঈ, রাওদাতু'ল-জিনান ওয়া জান্নাতু'ল-জিনান, সম্পা. জা'ফার সুলতান আল-কারা'ঈ, তেহরান ১৯৬৫ খৃ. পৃ. ১৭৬); তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাবরীযের একটি মাযার ভুলক্রমে ইমাম যাদাহ্ দরগাহ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও তুলনীয় তেহরানে শাহ নাসিরু'দ-দীনের একটি প্রাসাদের অভ্যন্তরে জনৈক ইমাম যাদার কথিত কবর আবিষ্কারের কাহিনী যাহা দুস্ত 'আলী মু'আয়্যির আল-মামালিক বর্ণনা করিয়াছেন (দ্র. য়াদ-দাশতহা'ঈ আয-যিন্দাগী-ই-নাসিরু'দ-দীন শাহ, তেহরান, তা. বি, পৃ. ৪৩)।

অনেক ইমাম যাদার দরগাহ যিয়ারাতের জন্য বিশেষ যিয়ারাতনামাহ্ আছে। যে স্থান হইতে খাস মাযারটি সর্বপ্রথম তীর্থযাত্রীদের দৃষ্টিগোচর হয়, উহাকে বলা হয় সালামগাহ্। পল্লী-অঞ্চলের কোন কোন স্থানে, বিশেষত দক্ষিণ ইরানের উপজাতীয় এলাকায় বৎসরের পর বৎসর তীর্থযাত্রিগণ কর্তৃক স্থাপিত পাথরের স্তূপ জমিয়া এই স্থানগুলি (সালামগাহ্) চিহ্নিত হইয়া আছে। কোন কোন ইমাম যাদার দরগাহে বৎসরের একটি নির্দিষ্ট মওসুমে যিয়ারাত অনুষ্ঠিত হয়। যেমন ইমাম মুহাম্মাদ আল-বাকিরের বংশধর ইমাম যাদা সুলতান 'আলীর দরগাহের বার্ষিক 'উরস; তিনি কাশান-এর নিকট আরদাহাল-এর অদূরে অবস্থিত মাশ্হাদ-ই কালী গ্রামে নিহত হন। জনশ্রুতি আছে, একখানি কার্পেটে করিয়া তাঁহার লাশ বর্তমান দরগাহ্স্থলে আনীত হয়। প্রতি বৎসর শরৎকালে মাসের ১৭ তারিখে এই দরগাহে একটি বার্ষিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় উক্ত কার্পেটখানি শোভাযাত্রা সহকারে মাযার হইতে নিকটবর্তী নদীতীরে লইয়া যাওয়া হয়; সেখানে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সহকারে কার্পেটখানি ধৌত করিয়া পুনরায় মাযারে ফেরত আনা হয় (দ্র. 'আবদু'র-রাহীম দাররাবী, তা'রীখ-ই কাশান, তেহরাণ ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৩৩০ প. এবং A. Houtum Schindler, Eastern Persian Irak, London 1898, 88, note)। এই প্রথা এখনও চালু আছে। অন্য অনেক দরগাহে ইমাম বংশীয়দের কবর ছাড়াও তাঁহাদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সংরক্ষিত আছে বলিয়া দাবী করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য; আরূন ও নাযমাকান-এর নিকটে অবস্থিত ইমাম মূসা ইব্ন জা'ফারের বংশধর বলিয়া খ্যাত সায়্যিদ জামালু'দ-দীনের দরগাহে তাঁহার বলিয়া কথিত একখানা তরবারি দরগাহের মুতাওয়াল্লীর নিকট রক্ষিত আছে।

বহু ইমামযাদার দরগাহের অলৌকিক শক্তি ও বিশেষ গুণাবলী আছে বলিয়া দাবী করা হয়। মসজিদের ন্যায় এই সব দরগাহও প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বিপন্ন মানুষের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। অপরাধী ও ফেরারী আসামীরা প্রায়ই এই সমস্ত দরগাহে আশ্রয় লইত। নাসিরু'দ-দীন শাহ (দ্র.) এই প্রথা সীমিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তেহরানের নিকটে অবস্থিত শাহ

'আবদু'ল-'আজীমের দরগাহ ইরানের অন্যতম প্রধান সুবিদিত ইমামযাদাহ-দরগাহ (দ্র. Donaldson, পূ. গ্র, পৃ. ২৬০)। কাজার রাজধানীর নিকটেই দরগাহটি অবস্থিত বলিয়া ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যাঁহারা তৎকালীন সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপের প্রতিবাদ করিতেন, তাঁহারা প্রায়ই এখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। ১৮৯১ খৃ. বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা জামালু'দ-দীন আফগানী (দ্র.) এখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন, কিন্তু মাস সাতেক পরে এই আশ্রয়স্থলের পবিত্রতা লঙ্ঘন করিয়া সরকারী সৈন্যগণ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। সংগ্রাম চলাকালে যাহার ফলশ্রুতিতে শাসনতন্ত্র মঞ্জুর হয়, আন্দোলনের সমর্থকরা ১৯০৫ খৃ. বসন্ত কালে এবং স্বেচ্ছাচারী শাসকের সমর্থক কতিপয় মুল্লা ১৯০৭ খৃ. গ্রীষ্ম কালে শাহ 'আবদু'ল-'আজীম ইমাম যাদার দরগাহে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সর্বশেষ প্রসিদ্ধ ইমামযাদা দরগাহগুলির অনেকটিরই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজস্ব ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি আছে; অন্য কতকগুলিরও ছোটখাটো ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি আছে। তবে যে সকল ইমামযাদার দরগাহ খুবই স্বল্প পরিচিত উহাদের মধ্যে অনেক যিয়ারাতকারিগণের দেয়া নজরানা ছাড়া প্রায়শই ব্যয় নির্বাহের জন্য আয়ের আর কোন উৎস নাই। দরগাহগুলির মুতাওয়াল্লীগণ প্রায়ই বংশানুক্রমে তাঁহাদের পদে নিযুক্ত হন (আরদাবীল ও শাহ 'আবদু'ল-'আজীম দরগাহের মুতাওয় াল্লী পদের বিশদ বিবরণের জন্য দ্র. মীরযা রাফী'আ, দাস্‌তূরু'ল-মুলূক, সম্পা. মুহ'াম্মাদ তাকী দানিশ-পাযহূ, প্রকাশিতঃ Revue de la Faculte des Lettres, University of Tehran, xvi, no. 1-2, 68-9; আরও দ্র. H. Busse, Untersuchungen zum islamischen kanzleiwesen, Cairo 1959, 157-75)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) 'আলাওবী শিরোনামের নিবন্ধ দ্র.; (২) 'আলী তাশাককুরী, সিতারাগান-ই ফুরূযান, তেহরান ১৯৬৯ খৃ.; (৩) তা'রীখ-ই কুম্ম, পূ. গ্র., পৃ. ১৯১ প.; (৪) তা'রীখ-ই কাশান, পূ. গ্র., পৃ. ২৯৮ প.; (৫) মিনূদার য়া বাব আল-জান্নাত-ই কাযবীন, পূ. গ্র., পৃ. ৬২৭ প.; (৬) রাওদ'াতু'ল-জিনান ওয়া জান্নাতু'ল-জিনান, পূ. গ্র., পৃ. ৪৪৯ প.; (৭) মুহ'াম্মাদ মুফীদ, জামি'ই মুফীদী, সম্পা. ঈরাজ আফশার, তেহরান ১৯৬১ খৃ., ৩খ, ৫২০ প.; (৮) জা'ফার মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হ'াসান জা'ফারী, তা'রীখ-ই য়ায্‌দ, সম্পা. ঈরাজ আফশার, তেহরান ১৯৬০ খৃ., ১০৬ প.; (৯) সায়্যিদ 'আবদু'ল-হু'জ্জাত বালাগী, তা'রীখ-ই না'ঈন পৃ. ২১ প.; (১০) রাফী', তা'রীখ-ই সিমনান, তেহরান ১৯৬২ খৃ., পৃ. ১১৬ প.; (১১) ফাসা'ঈ, ফার্সনামা-ই নাসিরী, লিথো., তেহরান ১৮৯৪-৬ খৃ., পৃ. ১৫৪ প.; (১২) মুহ'াম্মাদ জাওয়াদ বিহরূযী, শাহ্‌র-ই সাব্‌য য়া শাহরিস্তান-ই কাযিরূন, শীরায ১৯৬৭-৮ খৃ., পৃ. ২৮৯ প.; (১৩) ইরানের প্রধান প্রধান নগরে অবস্থিত ইমাম যাদাগণের দরগাহের তালিকার জন্য দ্র. 'আলী আকবার সালমাসীযাদা, তা'রীখ চা-ই ওয়াক্‌ফ দার ইসলাম, তেহরান ১৯৬৪ খৃ.। বহু আঞ্চলিক ইতিহাসে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ইমামযাদাগণের দরগাহের বিবরণী পাওয়া যায়।

A.K.S.Lambton (E.I.²)/শায়খ ফজলুর রহমান

**ইমাম শাহ** (امام شاه) ঃ ইমামু'দ-দীন 'আবদু'র-রাহ'ীম ইব্‌ন হ'াসান ইমাম শাহী নামে অভিহিত গুজরাটের (ভারত) ইসমা'ঈলী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও একজন ওয়ালী (পীর)। তিনি সৎপন্থী নামেই অধিকতর পরিচিতি। 'সৎ পন্থা' (সঠিক পথ) শব্দটি মূলত ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় ইসমা'ঈলীবাদ নির্দেশ করিতে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীকালে 'সৎপন্থিগণ' খোজাগণের সহিত সকল সম্পর্ক অস্বীকার করে যদিও উভয় মতবাদের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য বিদ্যমান। তাঁহার জন্ম উচ্‌ নামক স্থানে আনুমানিক ৮৫৬/১৪৫২ সনে এবং মৃত্যু আহ'মাদাবাদের সন্নিকটে ৯১৯/১৫১৩ সনে (ভিন্ন মতে ৯২৬/১৫২০, দা. মা. ই., ৩খ, ২২৬)। পিরানাতে তিনি বসবাস করিতেন এবং সেখানেই শিক্ষা দানে রত ছিলেন। একই স্থানে তাঁহার মাযার সৌধ বর্তমান। এই মাযারকে তাঁহার অনুসারিগণ গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলেও তাঁহার অনুসারিগণের বিস্তৃতি রহিয়াছে এবং বুরহানপুরের সন্নিকটে ইহাদের একটি বড় বসতি বর্তমান।

তাঁহার জীবন-চরিত সম্পর্কে প্রচুর পরিমাণ গল্প ও কাহিনী বিরাজমান। তাঁহার সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্রসুলভ অনেক কারামাত উল্লিখিত হয়। সংক্ষেপে ইহা বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁহাকে পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে পীর স্বীকার করা হইল না তখন তিনি পাঞ্জাব ত্যাগ করিয়া গুজরাটে চলিয়া আসেন এবং তথায় শাহ মাহ'মূদ বিগড়ার আমলে (৮৬৩/১৪৫৮-৯১৭/১৫১১) তিনি কৃষিজীবিগণের মধ্যে স্বীয় মতবাদ প্রচারকার্যে সবিশেষ সফলতা অর্জন করেন। তিনি একটি তা'রীক'ার প্রবর্তন করেন; কিন্তু উহা শীঘ্রই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ফলে তাঁহার সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের দাবীদারগণ সর্বদা পরস্পরের সহিত অথবা নূতন মুসলিম ধর্মাবলম্বিগণের প্রতিনিধি ও ধর্মীয় আওক'াফ পরিচালকগণের সহিত সংঘাতে লিপ্ত থাকিত। ইমাম শাহকে 'সৎ পন্থা' সম্পর্কীয় কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতারূপে চিহ্নিত করা হয়। বইগুলি হিন্দু রীতিতে গুজরাটী ভাষায় লিখিত। কিন্তু ইহা একটি বিরাট প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায় যে, এই সকল পুস্তকের মধ্যে কোনটি প্রামাণ্য। 'সৎপন্থীদের' মতবাদ ও আচার-আচরণ প্রধানত হিন্দুগণের অনুরূপ। ইহারা হিন্দু মতাদর্শ 'কর্ম' (পুনর্জন্ম)-তে বিশ্বাসী এবং ইহারা কু'রআন-এ বিশ্বাসী বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহাদের ইমামকে হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর দশম আবির্ভাব বলিয়া বিবেচনা করে। 'আলী (রা) ছিলেন তাহাদের ইমামগণের সর্বপ্রথম এবং "ঐশী আলোকের অধিকারী"। তাহাদের মতে কুরআন মূলত ৪০ পারায় (অংশ) বিভক্ত ছিল যাহার মাত্র ৩০টি বর্তমানে সংরক্ষিত আছে। এই ধর্ম বিশ্বাসের সঠিক ব্যাখ্যাকে বলা হয় 'আলানকার'। ইমাম শাহীগণ সাধারণভাবে নিরামিষভোজী। 'Gnans' নামে পরিচিত ইহাদের ভক্তিমূলক কাব্য কয়েকটি সংগ্রহে বিদ্যমান। এই সব অত্যন্ত সুন্দর ও মর্মস্পর্শী এবং অধ্যয়ন ও প্রকাশনার বিশেষ দাবী রাখে। সম্প্রদায়ের সদস্যগণ এই গ্রন্থটিকে অত্যন্ত সম্মানিত বস্তু বলিয়া মনে করে, এমন কি তাহারা ইহার প্রতি কু'রআন অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধাশীল।

পরবর্তীকালে তাঁহার পুত্র নূর মুহ'াম্মাদ শাহ [যাহাকে ইসলামী রীতিতে কোন কোন সময় নূর (نور) মুহা'ম্মাদও বলা হইত] তাঁহার উত্তররাধিকারী হন। তিনি ইমাম হিসাবে প্রকাশ্য সমর্থন লাভ করেন। তিনি ৯৪০/১৫৩৩ সনে মৃত্যুবরণ করেন। ক্রমাগত হিন্দু রীতিনীতির প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া 'সৎপন্থিগণ' ইরানের নিযারী ইমামগণের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। শুরুতে ইমাম শাহ যে ইসলামী মূলনীতিসমূহে বিশ্বাসী ছিলেন তাহার বেশীর ভাগ শেষ পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে টিকিয়া থাকে নাই (দ্র. Gazetteer of the Bombay Presidency, ৪খ, ২৮৭ হইতে ২৯০ ও ২/৯)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) S. C. Misra, Muslim Communities in Gujarat, বোম্বাই ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ৫৪ এবং নির্ঘণ্ট; (২)

Gazetteer of the Bombay Presidency, ৪খ, ২৮৭-২৯০; ৯খ (২য় ভাগ), ৭৬-৭; (৩) R. E. Enthoven, Tribes and castes of Bombay, ৩ খণ্ডে, ১৯২০ খৃ.।

A.A.A. Fayzee (E.I.[2]),
W. Ivanow (E.I.[2])/আবদুল বাসেত

**ইমামা** (দ্র. লিবাস)

**ইমামাত** (امامت) ঃ মুসলিম মিল্লাতের 'সর্বোচ্চ নেতৃত্ব'; তাৎপর্যে মহানবী (স)-এর ইনতিকালের পর ইমামাত। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে ইমামাতের ধর্মতাত্ত্বিক ও বিচারশাস্ত্রীয় দিক আলোচিত হইবে। ইমামাতের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ সম্পর্কে জানার জন্য দ্র. খিলাফা।

**প্রাথমিক বিকাশ ঃ** মহানবী মুহ'াম্মাদ (স')-এর ইনতিকালের পর আবূ বাক্র (রা)-কে আল্লাহ্র রাসূলের প্রতিনিধি বা খালীফাতু রাসূলুল্লাহ হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। আর ইহার মধ্য দিয়া একজন একক নেতার নেতৃত্বে মুসলিম সমাজের ঐক্যের ধারাবাহিকতাও সুনিশ্চিত হয়। এই খিলাফা ব্যবস্থায় ইমামাতের অধিকারের ব্যাপারে প্রথম দিকের মক্কী সাহাবী ও সেই সঙ্গে কুরায়শী সাহাবীদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় মহানবী (স)-এর সহিত রক্তের সম্পর্কের কারণে ঐ ইমামাতে কোনও অধিকার অস্বীকৃত। এই নীতির বিরুদ্ধে যদিও একেবারে গোড়া হইতেই চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে, তবু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, 'উছ'মান (রা)-র বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনায় খিলাফাত ব্যবস্থায় যে সংকট দেখা দেয় তখন হইতেই ইমামাত প্রশ্নে ব্যাপক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। ঐ গৃহযুদ্ধ শেষে দেখা যায়, মু'আবি'য়া (রা) কার্যত শাসক হইয়া বসিয়াছেন। তবে গোটা মুসলিম সমাজ ইমামাতের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রশ্নে গভীরভাবে দ্বিধাবিভক্ত থাকিয়া যায়। যাঁহারা 'উছ'মান (রা)-কে ন্যায়সঙ্গত খলীফা হিসাবে দাবী করিতে থাকেন তাঁহারা সাধারণভাবে 'উছ'মানিয়্যা নামে পরিচিত হন। তাঁহারা 'উছমান (রা)-র বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে অনুমোদন দেন নাই আর একই কারণে ইহার পরিণতিতে 'আলী (রা) খিলাফায় অধিষ্ঠিত হইলেও তাহাতেও তাঁহাদের অনুমোদন ছিল না। উল্লিখিত 'উছ'মানিয়্যাদের মধ্যে মু'আবি'য়া (রা)-র পক্ষের লোকেরা ছাড়াও গোড়ার দিকের বা আদি খিলাফাতের নীতির অনুসারী কিছু লোকও ছিলেন যাঁহারা মনে করিতেন, বিশেষত গোড়ার দিকে মহানবী (স')-এর অ-হাশিম বংশীয় স'াহ'াবীদেরও খিলাফাতে অধিকার আছে যাঁহারা প্রায় সকলেই তখন মদীনায় বাস করিতেছিলেন। এই শেষোক্ত মতের লোকেরা যদিও 'উছ'মান (র)-র খিলাফাতের শেষের দিকে তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনায় সোচ্চার হইয়াছিলেন, তাঁহারা কিন্তু খলীফার পদে 'আলী (রা)-র অধিষ্ঠানকে ভাল চোখে দেখেন নাই এবং সিফ্ফীনে নিয়োজিত সালিস বা বিচারকমণ্ডলী 'উছমান (রা)-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হইয়াছে রায় দিলে তাঁহারা ঐ রায় গ্রহণ করেন। মু'আবি'য়া (রা) যেহেতু মহানবী (স')-এর আদি সাহাবীদের কেহ ছিলেন–না খলীফা পদে তাঁহাকেও তাই তাঁহারা পসন্দ করেন নাই, কিন্তু ঐক্যের খাতিরেই শেষ পর্যন্ত আমীরু'ল-মু'মিনীন হিসাবে তাঁহাকে মানিয়া নেন। 'আলী (রা)-র পক্ষের লোকেরা সাধারণত শী'আ বলিয়া পরিচিত। এই 'আলী (রা)-র সমর্থকদের মতে 'উছ'মান (রা)-র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল ন্যায়সঙ্গত। তাঁহারা আরও মনে করিতেন, 'উছ'মান (রা) অন্যায় কার্যাবলীর মাধ্যমে খিলাফাতে নিজ অধিকার হারাইয়াছেন। খিলাফাতের জন্য মু'আবি'য়ার দাবী ছিল 'উছমান (রা) হত্যার বদলা গ্রহণকারী হিসাবে। এই দাবীর পাল্টা হিসাবে শী'আগণ হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর বংশের কাহারও নেতৃত্বে, বিশেষত 'আলী (রা)-র পুত্রগণের কাহারও নেতৃত্ব কামনা করিতেছিলেন। তাহাদের মতে ন্যায়সঙ্গত ইমামাত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ইমামাতে নবী পরিবারের (আহ্লু'ল-বায়ত দ্র.) দাবীর প্রতি তাঁহাদের সমর্থনের অর্থ অবশ্য এই ছিল না যে, আবূ বাক্র (রা) ও 'উমার (রা)-র খিলাফাত অস্বীকার করিতে হইবে। 'আলী (রা) আল্লাহ্র তরফ হইতে মহানবী (স')-এর উত্তরাধিকারী হিসাবে নিযুক্ত এবং এইজন্য তাঁহাকে অপার্থিব ক্ষমতায় ক্ষমতাবান করা হইয়াছে বলিয়া যে বিশ্বাস প্রচলিত আছে তাহার সূত্র হিসাবে 'আবদুল্লাহ ইব্ন সাবা' নামের উল্লেখ করা হয়। আর এই বিশ্বাস তাই তাৎপর্যের দাবীদার। খারিজীরা ঐ উল্লিখিত ব্যক্তির 'উছ'মান (রা) ও তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান সম্পর্কিত ধারণার সহিত অভিন্ন মত পোষণ করে এবং প্রথমদিকে তাঁহারা 'আলী (রা)-র খিলাফাতের প্রতি সমর্থন জানায়। পরে এই খারিজীরা 'আলী (রা)-র পক্ষ ত্যাগ করে। মু'আবি'য়া (রা)-র সহিত 'আলী (রা)-র যে সংঘাত ও বিরোধ চলিতেছিল উহার নিষ্পত্তির জন্য 'আলী (রা) যখন সালিসীর প্রস্তাবে রাযী হন ঠিক তখন হইতে এই খারিজীরা 'আলী (রা)-র নিন্দা শুরু করে এবং একই সঙ্গে সমানভাবে মু'আবি'য়াকে (তাঁহাদের মতে) সূচনাপর্বে ন্যায়সঙ্গত 'আলী (রা)-র খিলাফাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইবার জন্য ধিক্কার জানাইতে থাকে।

মু'আবি'য়া (রা)-র ইনতিকালে পর দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় এবং উহার পরিণতিতে বংশগত ভিত্তিতে উমায়্যা শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উল্লিখিত দুই পক্ষের মধ্যে সংঘাত আরও তীব্র হইয়া উঠে। আদি খিলাফাত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য 'আবদুল্লাহ ইবনু'য-যুবায়র (রা)-এর প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবার পর যাঁহারা আদি খিলাফাতের ঐতিহ্য ও ধারার সমর্থক ছিলেন তাঁহাদের সকল আশা ধূলিসাৎ হইয়া যায়। অতঃপর তাঁহাদের নিকট ইসলামের প্রথম তিন খলীফার খিলাফাত আদর্শ হইয়া উঠে। তাঁহারা যদিও উমায়্যা পক্ষকে সমর্থন করেন এবং বিদ্রোহ-অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করেন, উমায়্যাদের সিরীয় সমর্থকদের মত উমায়্যাদের এই শাসনকে সত্যিকার খিলাফাতের অঙ্গ হিসাবে কখনও তাঁহারা মনে করেন নাই। আগেই বলা হইয়াছে, তাঁহাদের মতে খাঁটি খিলাফাতের অবসান ঘটিয়াছে 'আলী (রা)-র খিলাফাতের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে। উমায়্যাগোষ্ঠীর সমর্থকদের হাতে মহানবী (স')-এর দৌহিত্র আল-হু'সায়ন (রা)-র নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পর 'আলী (রা)-র পক্ষের সমর্থকদের মাঝে উগ্র প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। আল-মুখতার পরিচালিত আন্দোলনে 'আলীপন্থীদের মাঝে এই উগ্রতাবাদীরা নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং শী'আ রক্ষণবাদীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে। এই ক্ষেত্রে উগ্রপন্থী দল যুক্তি প্রদর্শন করে যে, 'আলী সমর্থকদের এই অংশের পুরাটাই মহানবী (স')-এর স্থানে 'আলী (রা)-র ঐশী অধিকার স্বীকার না করিয়া এবং আবূ বাক্র (রা) ও উমার (রা)-এর খিলাফাত মানিয়া লইয়া বিপথগামী হইয়াছে। ইহারা এই আশা প্রকাশ করে যে, তাহাদের ইমাম মুহ'াম্মাদ ইব্নু'ল-হ'নাফিয়্যার জয় অভিযানের মধ্য দিয়া দুনিয়ায় ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহারা এই ইমামের মাঝে মাহ্দীর মাসীহী ভূমিকার কল্পনা করে। শী'আদের মাঝে এই উগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে আল-হ'াসান ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্নি'ল-হ'নাফিয়্যা মুরজি'আ আন্দোলনের সূচনা করিয়া মধ্যপন্থী বা নরমপন্থী শী'আ ও 'উছ'মানিয়্যাদের মধ্যকার ব্যবধান ঘুচাইবার প্রয়াস পান। গোড়ার দিকের মুরজি'আ মতবাদ অনুযায়ী পরবর্তী খলীফাদের

উপর আবূ বাক্র (রা) ও 'উমার (রা)-র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়। 'উছ'মান (রা) ও 'আলী (রা)-র প্রসঙ্গ এবং গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের বিষয়টি আল্লাহ্র বিচারের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাঁহারা উমায়্যা শাসনকে আল্লাহ্র বিধান হিসাবে গ্রহণ করেন; কিন্তু সেই সঙ্গে তাহাদের আচরণের বিষয়ে মন্তব্য হইতে বিরত থাকেন। তাঁহারা সমাজে কোনও রকম শান্তি ভঙ্গের পক্ষপাতী ছিলেন না। খারিজীরা 'আবদুল্লাহ ইব্নু'য-যুবায়র (রা)-কে তাঁহাদের মতে টানিতে না পারিয়া প্রায় গোটা মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং নিজেরা নিজেদের ইমাম নির্বাচন করিতে শুরু করে। তবে অ-খারিজী মুসলমানদের প্রতি কী আচরণ করা হইবে সেই সঙ্গে অন্যান্য বিষয় লইয়া এই খারিজীদের নিজেদের মধ্যে ক্রমেই মতভেদ বাড়িতে থাকে এবং শেষাবধি তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

**মূল মতবাদগুলির বিস্তারিত আলোচনা**

**সুন্নী মতবাদ ঃ** ইমামাত সম্পর্কিত সুন্নী মতবাদ অনেকটা 'উছ'মানিয়্যা ও মুরজি'আ মতবাদের অনুরূপ। ইহার মূল লক্ষ্য ঐতিহাসিক খিলাফাতের আওতায় মুসলিম সমাজের ঐক্য ও অভ্যন্তরীণ শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা; বিরুদ্ধবাদী যেসব আন্দোলন নানা দাবী ঐ সময় উত্থাপন করে এবং উহা হইতে যে হুমকি দেখা দেয় তাহা হইতে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করা। অবশ্য ইহা দ্বারা সুন্নী মতবাদ ইহা বুঝাইতে চায় নাই যে, এই মতবাদের লোকেরা ঐতিহাসিক খিলাফাতকে ঢালাও সমর্থন দেয়। সাধারণত সুন্নী মতবাদে 'সঠিক পথে চালিত গোড়ার দিকের (রাশিদূন) খালীফা' নুবূওয়াতের প্রতিনিধি (খিলাফাতু'ন-নুবূওয়াঃ) এবং পরবর্তীকালের ইমামাত সম্পর্কে পার্থক্য অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও শাণিতভাবে চিহ্নিত। ইমামাতে পার্থিব রাজত্বের (মুল্ক) বৈশিষ্ট্য আছে। আর এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইমামাতের মধ্যে অনেক অন্যায়কারী ও অত্যাচারী ইমামেরও সন্ধান পাওয়া যায়। কেবল রাশিদূনই ইমামাতের শর্তাবলী পরিপূর্ণরূপে পূরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কাজ ও রায় বাধ্যতামূলক 'সুন্নাহ'। বিরোধী পক্ষগুলির সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে এই রাশিদূন খলীফাদের শাসনের ও কাজের ন্যায্যতার সপক্ষে বরাবর যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে।

সুন্নী হাদীছ'বেত্তাগণের মতবাদে এই বৈশিষ্ট্যটি অত্যন্ত পরিষ্কার। ইহা আইনমূলক হ'াদীছে'র ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয় এবং হ'াম্বালী ও আল-আশ'আরী মতবাদে ইহাকে বিশদ করিয়া তোলা হয়। 'আব্বাসী যুগের গোড়ার দিকে মদীনা, বসরা, বাগদাদ ও সিরিয়ার রক্ষণবাদী মহল সাধারণত 'উছ'মানিয়্যা মতবাদকেই অনুমোদন দেয়। আর এই মত অনুযায়ী ইসলামের প্রথম তিন খলীফাকে রাশিদূন হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং 'আলী (রা)-র খিলাফাতকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। তবে কূফার রক্ষণবাদী মহল দৃঢ়তার সঙ্গে 'আলী (রা)-র খিলাফাতকেও রাশিদূন-এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যে বক্তব্য পেশ করে তাহার পক্ষে সমর্থন দ্রুত বিস্তার লাভ করে। পরিশেষে আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র)-ও ইহার অনুকূলে রায় দেন। ইব্ন হাম্বাল প্রথম দিকে 'উছ'মানিয়্যা মতবাদের সমর্থক ছিলেন। ৪র্থ/১০ম শতাব্দী নাগাদ চার রাশিদূনের খিলাফাত সুন্নী মতবাদের বিতর্কাতীত বিশ্বাসে দাঁড়াইয়া যায়। হাম্বালী ও আশ'আরী মতবাদে জোরালোভাবে এই বক্তব্য দেওয়া হয় যে, রাশিদূনের অন্তর্ভুক্ত চার খলীফার মর্যাদা ও উৎকর্ষগত অবস্থান খিলাফাতে তাঁহাদের অনুক্রম বিন্যাস দ্বারা নির্ধারিত। বিষয়টি হ'াম্বালী মতবাদে প্রচ্ছন্ন এবং আশ'আরী মতবাদে প্রকাশ্যে গৃহীত। উল্লিখিত মতবাদগুলির বক্তব্য এই যে, মুসলিম সমাজে যিনি সর্বোৎকৃষ্ট ও উত্তম (আল-আফদ'াল) তিনিই কেবল ন্যায়সঙ্গতভাবে খলীফা হইবার অধিকারী। আর ইমামাত হইতেছে অপেক্ষাকৃত কম উৎকর্ষসম্পন্ন ব্যক্তিদের (আল-মাফদূল) যাহা আল-আশ'আরীর মতে পার্থিব বাদশাহী। রক্ষণাবাদীর মতে যদিও রাশিদূন খলীফাদের পরবর্তী কোনও খলীফা খিলাফাতের আদর্শগত শর্তাবলী পূরণের প্রায় কাছাকাছি আসিতে পারেন (যেমন ধার্মিক উমায়্যা খলীফা 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীযের ক্ষেত্রে দাবী করা হইয়া থাকে), তবু ঐ মতবাদে এই প্রত্যাশা করা হয় নাই যে, ৩০ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পরও নুবূওয়াতের প্রতিনিধিত্ব কখনও আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। একটি বিখ্যাত হ'াদীছে' উল্লেখ আছে যে, খিলাফাত ৩০ বৎসরকাল স্থায়ী হইবে। পরবর্তীকালের ইমামাতের জন্য কেবল ন্যূনতম শর্তাবলী ছিল যে, ঐ ইমামকে মুসলিম ও একজন কুরায়শ বংশীয় হইতে হইবে। মুসলিম সমাজের কোনও স্বীকৃতি ছাড়াও ইমামাত তাহাদের উপর বাধ্যতামূলক হইতে পারে। আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র) সুনির্দিষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, আত্মসাৎ বা দখলের (গ'লাবাঃ) মাধ্যমে অর্জিত ইমামাতও বৈধ হইতে পারে। ইমাম না থাকিলে মুসলিমগণ কোনক্রমেই কোনও গৃহযুদ্ধে জড়িত হইতে পারে না (?) এবং সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ইমামের প্রতি তাহাদের পরিপূর্ণ আনুগত্য ও সক্রিয় সমর্থন থাকিতে হইবে, এমন কি ঐ ইমাম যদি ন্যায়বিচারক ও ধার্মিক না হইয়া অত্যাচারী ও অধার্মিকও হন তাহা হইলেও তাহার অনুগত হইতে হইবে। ঐ ইমাম যদি শারী'আ লঙ্ঘন করেন কেবল তখন এই নিয়মের ব্যত্যয় হইবে। ইমাম যদি ধর্মের পরিপন্থী আচরণ করেন এবং জামা'আতে সালাতের ইমামের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন (যে দায়িত্বের কথা একটি হ'াদীছে'ও সমর্থিত) কেবল সেই ক্ষেত্রে ইমামাত খতম করা যাইবে।

হ'ানাফী ও গোড়ার দিকে মাতুরীদী মতবাদ এই ব্যাপারে রক্ষণবাদী মতের অনেকটা কাছাকাছি ছিল। আবূ হ'ানীফা (র) যিনি মুরজি'আ মতবাদের সমর্থক বলিয়া কথিত, তিনি 'উছ'মান (রা) ও 'আলী (রা)-র মধ্যে কাহাকে অগ্রাধিকার দেন সে কথা না বলিয়া তাঁহাদের দুইজনকেই আবূ বাক্র ও 'উমার এর নীচে স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। হ'ানাফী মতের অনুসারী কোনও কোনও সম্প্রদায়ে এই মতকে সঙ্গত বলিয়া অনুমোদন দিলেও হানাফী মতাবলম্বীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ উত্তরাধিকারের ক্রমবিন্যাস অনুসারেই খলীফাদের মর্যাদাগত অবস্থানে অস্থাবান। একটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সূত্রমতে আবূ হ'ানীফা (র) সর্বোত্তমের ইমামাতের পক্ষেও একবার মত প্রকাশ করিয়াছেন। কোনও কোনও হাম্বালী রিওয়ায়াতে খিলাফাত ৩০ বৎসরে সীমিত বলিয়া হাদীছে বর্ণিত বিবরণের প্রতি যে সমর্থন রহিয়াছে ইহার সহিত তাহা সামঞ্জস্যপূর্ণ। হ'ানাফী বিশ্বাসে রাশিদূনের পর ইমামাত সম্পর্কিত বিষয়ে উল্লেখ অতি সামান্য যাহা হ'াম্বালী মতবাদের পরিস্থিতির বিপরীত। স্বধর্মী মুসলমানের বিরুদ্ধে অসি ব্যবহারের উপর যে নিষেধাজ্ঞা আছে বস্তুত তাহাতে শাসকের প্রতি আনুগত্য রক্ষার প্রচ্ছন্ন আভাস রহিয়াছে। শাফি'ঈ মতবাদ ও ইহার সহিত সম্পর্কিত কুলাবিয়্যাদের কালাম-চিন্তাধারার মাঝে এই ব্যাপারে ভিন্ন একটি মতবাদ গড়িয়া উঠে এবং আল-বাকি'ল্লানী (মৃ. ৪০৩/১০১৩)-র পর উহা ক্রমবর্ধমান হারে আশ'আরী মতবাদকেও প্রভাবিত করে। শাফি'ঈ মতবাদে ন্যায্য ইমামাত সমাজের সর্বোত্তমের মধ্যে সীমিত নয়। এই মতবাদে অপেক্ষাকৃত কম উত্তমের ইমামাত স্বীকৃত, বিশেষ করিয়া যদি ঐ ইমাম নির্বাচনে বিরোধ

এড়াইতে পারা যায়। আশ-শাফি'ঈ ও শাফি'ঈ মতবাদী কিছু গোড়ার দিকের বিশারদ ব্যক্তি নাকি উৎকর্ষের দিক হইতে 'আলী (রা)-কে 'উছ'মান (রা)-র উর্ধ্বে [যদিও আবূ বাক্র (রা) ও 'উমার (রা)-র নীচে] স্থান দেন। আর তাই 'উছ'মান (রা)-র ইমামাত ছিল অপেক্ষাকৃত কম উত্তম। এই অপেক্ষাকৃত কম অনমনীয় চিন্তাধারা শাফি'ঈদেরকে রাশিদূন পরবর্তী খলীফাগণকে মূলত সুষ্ঠু ইমামাতের দৃষ্টিতে বিচারের সুযোগ করিয়া দেয় যাঁহাদের আদর্শগত মান বিচারের ভিত্তি হয় আদি খিলাফাতের আদর্শ। ইমামের যোগ্যতা, অভিষেক ও কার্যাবলী সম্পর্কে এক ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীণ আইনগত পদ্ধতি গড়িয়া উঠে যাহাতে মু'তাযিলী তত্ত্বের প্রভাব প্রবল। বিষয়টি আল-মাওয়ারদী (মৃ. ৪৫০/১০৫৮) রচিত গ্রন্থ 'আল-আহ'কামু'স- সুলত'ানিয়্যা'-তে চরম বিকাশ লাভ করে এবং গ্রন্থটি ইমামাত সম্পর্কে সুন্নী মতবাদের এক প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য দলীল হিসাবে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। 'আব্বাসী খলীফাদের পুনরাবির্ভাবকালে বুওয়ায়হী আমলের শেষের দিকে লিখিত গ্রন্থটির লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্র বিধানে সমসাময়িক কালের খিলাফাতের বুনিয়াদকে মযবুত করা। এই সময় প্রথমবারের মত ওয়াযীরাত (মন্ত্রিত্ব) ও আমীরাতের বিষয় লইয়াও আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। এই ওয়াযীর (উযীর) আমীর পদে পরবর্তীকালে আসীন ব্যক্তিরা খলীফার বেশীর ভাগ ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। মাওয়ারদীর মতবাদ এই সব নূতন পদের উপর খলীফার পূর্ণ সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখিয়াও উল্লিখিত নূতন পদগুলির ন্যায্যতা ও বৈধতা নিশ্চিত করে। হ'াম্বালী মতবাদী জনৈক আবূ য়া'লা আল-ফাররা' (মৃ. ৪৫৮/১০৬৬) অনতিবিলম্বে আল-মাওয়ারদীর রচনার অনুসরণে আর একখানি রচনা খাড়া করিয়া ফেলেন। এই ক্ষেত্রে তিনি মাওয়ারদীর বেশীর ভাগ বক্তব্যই গ্রহণ করেন। কেবল কয়েকটি বিষয়কে তিনি হ'াম্বালী ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দেন। আল-মাওয়ারদীর মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি দখল বা আত্মসাতের মাধ্যমে অর্জিত ইমামাতকে বৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, অনৈতিকতা, অবিচার বা রক্ষণবাদী মতবাদের বিরুদ্ধাচারণে ইমামাতের বাজেয়াপ্তি ঘটে না। মাতুরীদী হ'ানাফীদের মধ্যে আবু'ল-য়ুস্র আল-বায়দ'াবী (মৃ. ৪৯৩/১০৯৯) অনেক শাফি'ঈ মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া হ'ানাফী ঐতিহ্যের দৃষ্টিভঙ্গীর ধারায় সেগুলির সংশোধন করিয়াছেন। চার রাশিদূনসহ মু'আবি'য়া (রা)-র ইমামাত বৈধ ছিল ইহা দেখাইবার জন্য হ'াম্বালী মতাবলম্বী আবূ য়া'লা ও আশ'আরী মতালম্বী আবূ বাক্র আল-ফূরাকী (মৃ. ৪৭৮/১০৮৫-৬) যে কাজ করেন তাহাতে রাশিদূন পরবর্তী খলীফাদের সুন্নী মতে মূল্যায়নের প্রয়াস প্রতিফলিত।

পূর্ণ বিকশিত সুন্নীতত্ত্বের প্রধান বিষয়গুলি ছিল নিম্নরূপঃ একজন ইমামের পাকাপোক্ত কায়েমী প্রতিষ্ঠা সমাজের জন্য চিরন্তন বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব)। যৌক্তিক কারণের ভিত্তিতে নয়, বরং ঐশী আইনে ইমামের কার্যাবলীর ভিত্তিতে সাধারণ তত্ত্বের আওতায় ঐ বাধ্যবাধকতা দেখা দেয়। যে কোনও সময়ে কেবল একজন ইমাম থাকিতে পারে। মাঝে সাগর দ্বারা বিভক্ত থাকার কারণে দুইয়ের মধ্যে পারস্পরিক সামরিক সাহায্য-সহযোগিতা সম্ভব না হওয়ায় ঐ দুই দেশের দুইজন ইমাম থাকিতে পারে বলিয়া যে মত প্রচলিত আছে তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কাররামিয়্যা মতবাদে 'আলী ও মু'আবিয়া (রা) উভয়েই ইমাম ছিলেন বলিয়া যে দাবী করা হয় তাহা প্রত্যাখ্যাত হয়। ইমামাতের যোগ্যতাসমূহ হইতেছে তাঁহাকে কুরায়শ বংশোদ্ভূত হইতে হইবে; বিচার কার্যের জন্য আইন সম্পর্কে যে জ্ঞান থাকা দরকার তাহা থাকিতে হইবে; আইনগত সাক্ষ্য দান, পরিণত প্রজ্ঞা, শারীরিক সামর্থ্য এবং ইমামাতের রাজনৈতিক ও সামরিক দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা থাকিতে হইবে। ইমাম তাঁহার পূর্বসূরীর নিয়োগের ('আহ্দ) মাধ্যমে অথবা নির্বাচনের মাধ্যমে (ইখ্তিয়ার) নিয়োজিত হইতে পারেন। এই ব্যাপারে সচরাচর ধারণাটি হইতেছে, আবূ বাক্র (রা) খলীফা পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। আর উহার বিপরীত ধারণা বা বিশ্বাস হইল মহানবী (স) তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন। এই ধারণাগুলি আল-হ'াসান আল-বাস'রী, ইব্ন-হ'াযম ও ইব্ন তায়মিয়্যার মত বিশিষ্ট সুন্নী বিশারদগণ সমর্থন করিয়াছেন। কোনও মুসলমান যিনি সৎ, ইমামাতের প্রকৃতি সম্পর্কে যাঁহার জ্ঞান আছে এবং যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে যিনি যথার্থ বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োগ করিতে পারেন তিনি নির্বাচক হিসাবে যোগ্য বলিয়া গণ্য। নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা কিংবা বাধ্যবাধকতা আরোপকারী বা নিয়ন্ত্রণ শিথিলকারী (আহ্লু'ল-হ'াল্লি ওয়া'ল-'আক্দ দ্র.) বা নিয়ন্ত্রণ শিথিলকারী (আহ্লু'ল-হ'াল্লি ওয়া'ল-'আক্দ দ্র.) জনমণ্ডলীর রায় নির্বাচনের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত (যাহার ফলে ঐ নির্বাচন গোটা সমাজের জন্য বাধ্যতামূলক হইতে পারে) লইয়া নানা মত প্রচলিত। এইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত একক মত হইতেছে আশ'আরী মতবাদ। আর একটি হইতেছে আবূ য়া'লা প্রণীত নির্বাচকদের 'সার্বজনীনতা' (জুমহূর) মতবাদ। এই নির্বাচনের তাৎপর্যগত অর্থ বিভিন্ন প্রার্থীর মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বাছিয়া নেওয়া নয়, বরং সেই নির্বাচন হইতে হইবে সর্বোত্তমের। তবে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ব্যক্তি যদি আর সব দিক হইতে যোগ্য হন তাহা হইলে তাহার নির্বাচন বাধ্যতামূলক গণ্য হইবে। এই ব্যতিক্রম অবশ্য তখনই অনুমোদনযোগ্য হইবে যদি তাহার নেপথ্যে যথার্থ কারণ থাকে। মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্য কিংবা স্বাধীনতা হারাইলে প্রতিষ্ঠিত ইমামাত তাঁহার বৈধতা হারাইবে। অনেক শাফি'ঈ বিশারদের মতে অনৈতিকতা, অবিচার বা অধর্মাচরণের মাধ্যমে সততা বিনষ্ট হওয়ার কারণে ইমামাত বৈধতা হারায় যদিও হ'াম্বালী, হ'ানাফী ও অন্যদের মতে ইহাতে ইমামাত ক্ষুণ্ন হয় না। ইমামের কর্তব্যগুলি এইভাবে নির্ধারিতঃ অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিশ্বাসকে হেফাজত করা, বিবদমান দুই পক্ষের মাঝে আইন ও সুবিচার প্রয়োগ এবং আইনানুগ দণ্ডবিধান (হু'দূদ), ইসলামের ভূখণ্ড এলাকার শান্তি রক্ষা এবং বাহিরের দুশমন হইতে ঐ ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষা বিধান, যাহারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা, আইনগত দান, কর ও গ'ানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ, আইন অনুযায়ী রাজস্ব আয় বণ্টন এবং দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে নিয়োগ দান।

**মু'তাযিলী মতবাদ** : উমায়্যা শাসনের শেষভাগে মু'তাযিলা আন্দোলনের আবির্ভাব। ধর্মীয়-রাজনৈতিক দল-উপদলগুলির বিরোধের একটি আপোষমূলক সমাধানের বুনিয়াদে গোটা মুসলিম সমাজকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করাই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। ইমামাতের প্রশ্নে মু'তাযিলী মতবাদ খারিজী মতবাদের অনুরূপ। ইহাতে ইমামের ন্যায়সঙ্গত হওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মু'তাযিলী মতে একজন অন্যায্য ইমামকে অপসারণের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করিয়া বলা হইয়াছে, প্রয়োজনে ঐ ইমাম অপসারণের জন্য বল প্রয়োগ করিতে হইবে। এই মত অনুযায়ী ইমামের মাঝে ন্যায়ের অস্তিত্ব বলিতে মু'তাযিলী মতবাদ অনুযায়ী ইমামের সঠিক ও অভ্রান্ত বিশ্বাস, ব্যক্তিগত জীবনে ঐশী জীবন

বিধান ও সরকার পদ্ধতি অনুসরণকে বুঝানো হইয়াছে। খারিজীগণ 'উছমান, 'আলী ত'লহ'া, আয-যুবায়র (রা) ও তাঁহাদের সমর্থকদের বিধর্মী বা অবিশ্বাসী বলিয়া যে নিন্দা করিয়া থাকে, মু'তাযিলীগণ অবশ্য উহার বিরোধী। গোড়ার দিকের খারিজীগণ 'উছমান (রা) ও তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের মধ্যকার বিরোধ এবং সেই সঙ্গে 'আলী (রা) ও উষ্ট্রের যুদ্ধে তাঁহার বিরোধী পক্ষের বিরোধের ব্যাপারে কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করিত। সাধারণভাবে একথা স্বীকার করা হইত যে, বিরোধে জড়িত কোনও না কোনও পক্ষ অবশ্যই ভ্রান্ত। তবে সুনির্দিষ্টভাবে কোন্ পক্ষ সেই দোষে দোষী সে ব্যাপারে মু'তাযিলী রায় সাধারণত স্থগিত রাখিয়া দেওয়া হয়, এমন কি কোনও পক্ষকে সুনির্দিষ্টভাবে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সেই পক্ষের কাজকে পাপাচরণ বলিয়া (ফাসিক) নিন্দা করার ব্যাপারেও কুণ্ঠা ছিল। পরে অবশ্য মু'তাযিলী মতবাদে দোষত্রুটি হইতে 'উছ'মান ও 'আলী (রা) উভয়কে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং 'উছ'মান (রা)-র বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের নিন্দা করা হয়। স্থির করা হয় যে, 'আ'ইশা, ত'লহ'া ও আয-যুবায়র (রা) ন্যায়সঙ্গত ইমামের বিরুদ্ধে তাঁহাদের মৃত্যুর পূর্বে বিদ্রোহ করার জন্য অনুশোচনা করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের অনুসারী যাহারা এই ব্যাপারে অনুশোচনা করেন নাই তাঁহাদের নিন্দা করা হয়। এই উমায়্যা খিলাফাতকে সাধারণত ঘৃণার চোখে দেখা হইলেও নীতিগতভাবে ঐ খিলাফাতকে কিন্তু প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। উমায়্যা খলীফা 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয ও য়াযীদ ইব্নু'ল-ওয়ালীদকে ন্যায়সঙ্গত ইমাম হিসাবেই সাধারণত ধরা হয়। গোড়ার দিকে 'আব্বাসী খলীফাদের ব্যাপারে এই মনোভাব ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। কেহ কেহ তাঁহাদের প্রতি অনুকূল মনোভাব দেখাইয়াছেন। আবার অনেকে 'আলীপন্থীদের বিদ্রোহকে সমর্থন করিয়াছেন। আবূ 'আলী আল-জুব্বা'ঈ-এর পরবর্তীকালে 'আলী (রা)-র পুত্র আল-হ'াসান (রা)-এর ইমামাতের বিষয়টি সাধারণ মতবাদ হইয়া দাঁড়ায়। কাযী 'আবদু'ল-জাব্বার (মৃ. ৪১৫/১০২৫) তাঁহার কিতাবু'ল-মুগ'নী গ্রন্থে এই মর্মে 'আলী বংশীয় আল-হ'াসান, আল-হু'সায়ন, যায়দ ইব্ন 'আলী, মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ (আন-নাফসু'য-যাকিয়্যা) ও তাঁহার ভাই ইব্রাহীমের ইমামাতের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম দিকের বসরার মু'তাযিলীগণ আবূ বাক্র (রা)-কে মহানবী (স')-এর পরই উৎকর্ষ ও গুণের দিক হইতে সর্বোচ্চ স্থানে সমাসীন করেন এবং সাধারণভাবে এই বক্তব্য প্রদান করেন যে, যথার্থ ইমামাত সমাজের সর্বোত্তম ব্যক্তিরই কেবল প্রাপ্য। বসরার এই মু'তাযিলী মতবাদের প্রায় অর্ধ শত বৎসর পর বাগদাদে মু'তাযিলীদের দ্বিতীয় মতবাদের বিকাশ ঘটে। এই মতবাদের আওতায় মর্যাদার প্রশ্নে 'আলী (রা)-কে আবূ বাক্র (রা)-র ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয় এবং সেই অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত কম উত্তমদের ক্ষেত্রেও সঙ্গত বলিয়া স্থির করা হয়। বসরার আবূ 'আলী আল-জুব্বা'ঈ ও তাঁহার পুত্র আবূ হাশিম ছিলেন এই বাগদাদী মু'তাযিলীদের নেতা। তাঁহারা আবূ বাক্র (রা) বা 'আলী (রা)-র শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নটি অমীমাংসিত রাখিয়া দিয়া রায় দেন যে, যথার্থ কারণে অপেক্ষাকৃত কম উত্তম ব্যক্তির ইমামাত বৈধ হইতে পারিবে। আবূ 'আবদিল্লাহ আল-বাস'রী (৩৬৭/৯৭৭) ও 'আবদু'ল-জাব্বার তাঁহার পরবর্তী মতবাদে 'আলী (রা)-র শ্রেষ্ঠত্ব বহাল রাখেন।

গোড়ার দিকে মু'তাযিলী মতবাদ খারিজী তত্ত্বের মতই সাধারণত ইমামাত কেবল কুরায়শ বংশের লোকদের জন্য সীমিত করিয়া দেয় নাই। মু'তাযিলী দি'রার ইব্ন 'আম্র ছিলেন রগচটা প্রকৃতির লোক। তিনি রায় দেন, ইমামাতের জন্য যদি যুগপৎ দুইজনই সমান যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী থাকেন তাহা হইলে অ-কুরায়শ প্রার্থী কুরায়শ প্রার্থীর উপর অগ্রাধিকার পাইবে, যদিও সার্বজনীন মতানুযায়ী কুরায়শ প্রার্থীর প্রতিই পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে মু'তাযিলী মতবাদে বলা হয়, যদি যোগ্য কোনও কুরায়শ প্রার্থী পাওয়া যায় তাহা হইলে সেক্ষেত্রে কোনও অ-কুরায়শ ইমাম হইতে পারিবে না। গোড়ায় দিকের এক দল মুষ্টিমেয় মু'তাযিলী ছাড়া গোটা মু'তাযিলী মতবাদ অনুসারে একজন ইমামের প্রতিষ্ঠা মুসলিম সমাজের জন্য বাধ্যতামূলক। আগে যে ব্যতিক্রমধর্মী মু'তাযিলীদের কথা উল্লেখ করা হইল তাঁহারা ছিলেন কঠোর সংযমী স্বভাবের। তাঁহাদের মত হইল, জিহাদের জন্য নেতা এবং অন্যান্য দায়িত্ব-কর্তব্যের জন্য সাময়িক ভিত্তিতেই মুসলিম সমাজের কর্মকর্তা নির্বাচন করা উচিত হইবে যাহাতে দুনিয়াদারির ক্ষমতা কুক্ষিগত করার যে কোনও অভিলাষ ব্যর্থ হয়। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মু'তাযিলী যুক্তির কারণে একজন ইমামের প্রতিষ্ঠা বাধ্যতামূলক—এই অভিমত প্রত্যাখ্যান করেন। এই বিষয়টি আল-জাহি'জ, আবু'ল-ক'াসিম আল-বালখী ও আবু'ল-হু'সায়ন আল-বাস'রী স্বীকার করিয়াছেন। সার্বজনীন পর্যায়ের মতবাদ অনুযায়ী যে কোনও সময়ে কেবল একজন মাত্র ইমাম থাকিতে পারেন। কেবল আবূ বাক্র আল-আসা'ম্ম রায় দেন যে, যেহেতু ইসলাম বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে সেহেতু প্রতিটি শহরের জন্য একজন করিয়া ইমাম নির্বাচিত করা উত্তম। আর অন্য সকল ক্ষেত্রে মু'তাযিলী মতবাদ বহুলাংশেই সুন্নী মতবাদের অনুরূপ।

**শী'আ মতবাদ ঃ** (ক) যায়দিয়্যা অনুসারীরা ১২২/৭৪০ সনে যায়দ ইব্ন 'আলী যে বিদ্রোহ করেন তাহার সমর্থক। তাহারা ইমামিয়্যাদের মত ইমামদের বংশগত উত্তরাধিকারের ধারাকে স্বীকার করেন না। তবে তাহারা আহ্লু'ল-বায়ত-এর যে কোনও সদস্য অবৈধ ইমামাতের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া ইমামাতে দাবী জানাইলে তাহাকে সমর্থন জানাইতে প্রস্তুত। ৪র্থ/১০ম শতাব্দী অবধি কোনও কোনও যায়দী সম্প্রদায় 'আলী (রা)-র পিতা আবূ ত'ালিবের সকল বংশধরকে ইমামাতের যোগ্য বিবেচনা করিতেন। কিন্তু যে তত্ত্বটি বহুল প্রচলন লাভ করে তাহা হইল ইমামাত কেবল আল-হ'াসান ও আল-হু'সায়ন (রা)-র বংশধরগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ২য়/৮ম শতাব্দীতে যায়দী মতবাদ তাত্ত্বিক দিক হইতে দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়; একটি বাত্রিয়্যা ও অপরটি জারূদিয়্যা। বাত্রিয়্যা শাখা কূফার শী'আদের নরমপন্থী প্রশাখার ঐতিহ্যের অনুসারী। তাঁহারা আবূ বাক্র ও 'উমার (রা)-র ইমামাতকে সমুন্নত রাখেন, 'উছমান (রা)-র খিলাফাতের প্রথম ছয় বৎসরও তাঁহাদের দৃষ্টিতে বৈধ। এক্ষেত্রে তাঁহাদের যুক্তি ছিল, 'আলী (রা) এই ইমামদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা 'উছ'মান (রা)-র শেষের ছয় বৎসরের ইমামাতকে স্বীকার করেন না, যেমন স্বীকার করেন না 'আলী (রা)-র সকল বিরোধী পক্ষকে। 'আলী (রা)—কে তাঁহার মহানবী (স')-এর পর সর্বোত্তম ব্যক্তি বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত কম উত্তম ইমামাতকে অনুমোদন দেন। জারূদিয়্যা মতবাদীরা ইমামিয়্যাদের অধিকতর উগ্র মত গ্রহণপূর্বক ইসলামের প্রথম তিন খলীফার ইমামাত প্রত্যাখ্যান করে এবং এই অভিমত প্রদান করে যে, মহানবী (স') 'আলী (রা)-কে স্পষ্ট নির্দেশ (নাস্'স') দ্বারা তাঁহার ওয়াসী বা কার্যনির্বাহক নিয়োগ করিয়াছেন। ইঁহারা আরও রায় দেন যে, মহানবী (স')-এর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবী আবূ বাক্র ও 'উমার (রা)-র প্রতি অনুগত থাকিয়া

পথভ্রান্ত হইয়াছে। ঐ দুই খলীফা আইনের যে ঐতিহ্য রাখিয়া যান সেগুলিও জারূদিয়্যা মতবাদীরা প্রত্যাখ্যান করে। বস্তুত এইখানেই তাহাদের সহিত বাতরিয়্যাদের পার্থক্য। প্রথমোক্ত দল ধর্মীয় জ্ঞানের জন্য সামগ্রিকভাবে আল-হাসান ও আল-হুসায়নের বংশধরগণের উপর পরিপূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন, তাঁহাদেরকে শুধু ইমাম হিসাবেই স্বীকার করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। ৩য়/৯ম শতাব্দী হইতে জারূদিয়্যা মতবাদ যায়দী চিন্তাধারায় আধিপত্য বিস্তার করে।

৪র্থ/১০ম শতাব্দী মু'তাযিলী ও ইমামীদের প্রতিনিধিদের সহিত মত বিনিময়ের মধ্য দিয়া যায়দী তত্ত্ব পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে। এই তত্ত্বের প্রধান বিষয়গুলি হইতেছে ঃ একজন ইমামের প্রতিষ্ঠা মুসলিম সমাজের জন্য বাধ্যতামূলক। সাধারণ ধারণায় ইহা আবশ্যক। কেননা একজন ইমাম কাজ করেন ঐশী আইনের আওতায়, কোনও যৌক্তিকতার ভিত্তিতে নয়। প্রথম তিন ইমামঃ 'আলী, আল-হাসান ও আল-হুসায়ন (রা) মহানবী (স) কর্তৃক চিহ্নিত হইবার মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহাদের এই চিহ্নিত হইবার বিষয়টি অস্পষ্ট (খাফী, গায়র জালী) থাকিয়া যাওয়ায় বলা হয় ঐ চিহ্নিতকরণের অভীষ্ট লক্ষ্য কেবল অনুসন্ধান অন্বেষণের মধ্য দিয়াই উদ্ধার করা সম্ভব। এই মতবাদ দ্বারা যায়দিয়্যাগণ দৃশ্যত মহানবী (স)-এর নির্দেশের অমান্যকারী আদি ইসলামী সমাজের লোকদের পাপ নিরসনের প্রয়াস পায় যাহা ইমামিয়্যা মতবাদে অনুপস্থিত। আল-হুসায়নের পর আল-হাসান বা আল-হুসায়নের যে কোনও যোগ্য বংশধর যিনি সকলকে তাঁহার আনুগত্যে আহ্বান করেন কিংবা অবৈধ শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়ান তিনিই ইমামাতের অধিকারী। এই ইমামাত আইনগতভাবে বৈধ হয় আনুগত্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আহ্বান (দা'ওয়া)-এর ও উত্থান (খুরূজ)-এর মাধ্যমে, নির্বাচন (ইখতিয়ার) ও চুক্তির ('আক্দ) মাধ্যমে নয়। একমাত্র নবীর বংশধর হওয়ার শর্ত ব্যতিরেকে ইমামাতের আর সকল শর্ত মূলত সুন্নী ও মু'তাযিলী মতবাদের অনুরূপ। অবশ্য সেই সঙ্গে যায়দী মতবাদে ইমামের ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান, আইনের স্বাধীন বিচার-বিবেচনা, অনুশীলনের সামর্থ্য (ইজতিহাদ), পুণ্যানুশীলন, নৈতিক দৃঢ়তা ও সাহসিকতা গুণের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। উল্লিখিত গুণাবলীর কোনটির অভাব থাকিলেও, বিশেষত ইমাম যদি নৈতিক অপরাধ করেন তাহা হইলে ইমামাত বাজেয়াপ্ত হইবে। কেবল যিনি সর্বোত্তম তিনিই ন্যায়সঙ্গত ইমাম হইতে সমর্থ এবং যদি কোনও প্রার্থী আসীন ইমামের তুলনায় উৎকর্ষে ছাড়াইয়া যান এবং উত্থিত হইয়া ইমামাতের দাবী জানান তাহা হইলে আসীন নিকৃষ্ট ইমামকে অবশ্যই ইমামাত শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদারের নিকট ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইমামের এইসব গুণ পরবর্তীকালে কোনও কোনও যায়দী মতবাদবিশারদ প্রত্যাখ্যান করেন। বর্তমানে যায়দী মতবাদ বলিয়া যাহা প্রচলিত উহাতে যে কোনও কালে কেবল একজন ইমামের অস্তিত্ব স্বীকৃত। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে উপকূল অঞ্চলগুলিতে ও য়ামানে দুইটি পৃথক যায়দী দলের অস্তিত্ব রহিয়াছে। পরবর্তীকালে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইমাম হিসাবে দুইজন সমসাময়িক দাবীদারকে স্বীকার করার নজীর আছে। তবে সমসাময়িককালে দুই ইমামের বৈধতার আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের এই নজীর ব্যতিক্রমমূলক। কেননা যে কোনও সময়ে ইমামাতের জন্য অবশ্য কাহাকে না কাহাকেও একমাত্র যোগ্য হইতেই হইবে। আনুগত্যের আহ্বান জানাইবার পর ইমাম সম্পর্কে জানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক।

স্বীকৃত যায়দী ইমামদের তালিকা কোনও কালেও একান্তভাবে নির্ধারিত নয় যদিও সর্বসম্মতভাবে স্বীকার করা হয় যে, অনেক ইমাম আছেন। ইমামাতের জন্য বড় রকমের শর্তাবলী, বিশেষত ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান সম্পর্কিত শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে 'আলী বংশীয় অনেক ইমামাতের দাবীদার ও শাসককে ইমাম গণ্য করা হয় নাই। এইসব ইমামকে সীমিত ইমাম (মুহ্তাসিবূন বা মুক্তাসি'দা) কিংবা আহ্বানকারী (দু'আত) হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যাইতে পারে; পরিপূর্ণ ইমাম হিসাবে (সাবিকূন) নয়। শুধু অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে য়ামানী যায়দী মতবাদ ইহ্তিসাব ইমামাত সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে। মুহ্তাসিব ইমামের কার্যাবলীর সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে, তাঁহার কাজ হইবে যাহা যথার্থ তাহার বিকাশ সাধন এবং যাহা অযথার্থ তাহার নিষিদ্ধকরণ; বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে জনসমষ্টিকে রক্ষা করা এবং দুর্বলের অধিকার সংরক্ষণ করা। এই ইমামের সালাতের জামা'আতে নেতৃত্ব দানের অধিকার দেওয়া হয় নাই; দান ও কর তিনি আদায় করিতে পারিবেন না; আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালাইতে পারিবেন না; বৈধ দণ্ডবিধানও কার্যকর করিতে পারিবেন না।

**(খ) ইমামিয়্যা (১২ ইমামী শী'আ)** ঃ ইমামাত সম্পর্কিত ইমামী তত্ত্বগুলির মৌলিক ধারণায়ন সম্পন্ন হয় ইমাম জা'ফার আস্-সাদিক-এর সময়ে (১৪৮/৭৬৫)। মানব জাতির জন্য ঐশী নির্দেশনাপ্রাপ্ত, বিচ্যুতির সম্ভাবনাবিহীন নেতা ও ধর্ম সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজন চিরকালের, আর এই প্রয়োজনের বুনিয়াদেই ইমামী তত্ত্ব ইমামাতকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এইভাবে ইমামাতকে নুবূওয়াতের স্তরে উন্নীত করা হয়। রাসূল বা আল্লাহ্র বার্তাবাহক নবী ও ইমামের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হইতেছে ইমাম কোনও ঐশী গ্রন্থের বিষয় মানব জাতিকে পৌঁছাইয়া দেওয়ার কাজটি করেন না। ঐশীভাবে নিয়োজিত ইমামকে অবহেলা বা তাঁহাকে অমান্য করা নবীকে অবহেলা বা অমান্য করা মতই অবিশ্বাসীর কাজ। ইমামকে অবশ্যই পাপ ও প্রমাদ হইতে পুরাপুরি মুক্ত (মা'সূম) হইতে হইবে—এই ধারণাটি ইমামী তত্ত্বের একান্ত মৌলিক বিষয়। ইমাম অবশ্য তাঁহার নিজ অনুসারীদের নিরাপত্তার আশঙ্কা থাকিলে তেমন ক্ষেত্রে ছদ্মবেশে বা আত্মগোপন (তাকিয়্যা) করিয়া থাকিতে পারেন। ইমাম ধর্মীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্ব লাভের অধিকারী হইলেও তাঁহার ইমামাত বাস্তবে তাঁহার শাসন বা উহা অর্জনের জন্য কোনও প্রয়াস সাপেক্ষ নয়। প্রথমদিকের শী'আদের উগ্র বা চরমপন্থী শাখার ধারানুসরণে ইমামিয়্যাগণ আবূ বাক্র, 'উমার ও 'উছমান (রা)-র খিলাফাত অস্বীকার করে। তাহাদের বক্তব্য ঃ মহানবী (স) 'আলী (রা)-কে চিহ্নিত করিয়া তাঁহার ওয়াসী নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। আর এই চিহ্নিত নিয়োগকে অগ্রাহ্য করিয়া মহানবী (স)-এর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবী বিধর্মাচারণ করিয়াছেন। আল-হাসান ও আল-হুসায়নের পর ইমামাত হুসায়নের বংশধরদের হাতে অর্থাৎ পিতা হইতে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে পুত্রে এবং এইভাবে মাহদী পর্যন্ত হস্তান্তরিত হওয়া উচিত ছিল। ২০৩/৮১৮ সনে সাত বছরের বালক মুহাম্মাদ আল-জাওয়াদ ইমামের উত্তরাধিকার পাইলে প্রশ্ন দেখা দেয়ঃ নাবালকত্বের কারণে ইমামাত রহিত বা সীমিত হয় কিনা এবং ঐ ইমাম কিভাবে নিখুঁত জ্ঞান লাভ করে? সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামী এই অভিমত দেন যে, নাবালক ইমামাতের সকল দায়িত্ব পূরণে সক্ষম। আল্লাহ্ তাঁহাকে ধর্মীয় বিষয়ে সর্বাঙ্গীণ জ্ঞানে বিভূষিত করেন। একাদশ ইমাম যখন ইনতিকাল করেন তখন তাঁহার দৃশ্যত কোনও সন্তান না থাকায় যে সঙ্কট

দেখা দেয় তাহার সমাধান করা হয় এই মর্মে প্রত্যয় ঘোষণা করিয়া যে, মা'রূম ইমামের একজন পুত্র সন্তানের অস্তিত্ব আছে। আর এই প্রত্যয়কে ভিত্তি দানের জন্য অনুপস্থিতি বা 'গা'য়বাঃ' (দ্র.) তত্ত্বের অবতারণা করা হয়। বলা হয়, দ্বাদশ ইমাম যদিও আত্মগোপন করিয়া আছেন, তবু তিনি এই দুনিয়াতেই কোথাও আছেন এবং তিনি ইমামাতের মৌলিক কাজগুলি করিতে সক্ষম। এই গায়বী ইমাম আর মাহ্দী অভিন্ন ইমাম বলিয়া বক্তব্য দেওয়া হইয়া থাকে। মাহদী তথা এই গা'য়বী ইমাম আখিরী যামানায় পুনরাবির্ভূত হইবেন বলিয়া প্রত্যাশা করা হয়।

নির্ভরযোগ্য ইমামী হাদীছে ইমামদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিশ্বাসের কথা বর্ণিত আছেঃ এই পৃথিবী আল্লাহ্র একজন হু'জ্জা (প্রমাণ, নিশ্চয়তা বিধায়ক-ইমাম) ছাড়া একটি পলের জন্যও অস্তিত্ব রক্ষায় অক্ষম। যে কোনও এক সময়ে কেবল একজন ইমামই থাকিতে পারেন যদিও তিনি ছাড়াও সমসাময়িককালে একজন নীরব (সা'মিত) ইমাম (তাঁহার উত্তরসুরি) থাকিতে পারেন। কু'রআনের বহু আয়াতে 'আল্লাহ্র নূর', মানুষের কাছে তাঁহার 'সাক্ষ্য' (শুহাদা'), তাঁহার 'চিহ্নসমূহ' ('আলামাত), ঐ সকল 'দৃঢ়' জ্ঞানের অধিকারীসমূহ (আর-রাসিখূন) ইত্যাদি আকারে এই ইমামদের উল্লেখ আছে। তাঁহারা এই দুনিয়ার আল্লাহ্র 'প্রতিনিধি' (খুলাফা'), আল্লাহ্র 'দ্বার' যাহার মধ্য দিয়া আল্লাহ্র নিকট পৌঁছান যায়। মহানবী (স')-এর জ্ঞানের উত্তরাধিকারী ইমামগণ আল্লাহ্ প্রেরিত সকল গ্রন্থের অধিকারী। কেবল তাঁহারাই কু'রআনের প্রকাশ্য (জা'হির) ও গুপ্ত (বাতি'ন) অর্থ সম্পর্কে জ্ঞাত। তাঁহাদেরকে আল্লাহ্র সর্বাপেক্ষা মহান নাম (ইসমুল্লাহ আল-আ'জা'ম) দেওয়া হয়। তাঁহারা উত্তরাধিকারী হিসাবে মহানবী (স')-এর হাতিয়ার ও গুপ্ত জ্ঞানসম্বলিত ফাতি'মার গ্রন্থাবলী, সে সাহীফা, জামি'আ ও মাস'হা'ফ পাইয়াছেন। প্রত্যেক ইমামের জ্ঞান মহানবী (স')-এর জ্ঞানের সহিত অভিন্ন। ইমামদেরকে যদিও অদৃশ্য বা গা'য়ব সম্পর্কে কোনও স্থানীয় জ্ঞানের অধিকারী করা হয় নাই তাঁহারা অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখেন। তাঁহারা সকল কুশলী কাজকর্ম ও ভাষা সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞানের অধিকারী। তাঁহারা যে বিষয়ে জানিতে চান আল্লাহ্ তাঁহাদেরকে সেই বিষয়েই জ্ঞান দান করেন। পূর্ববর্তী ইমামের জীবনের শেষ মুহূর্ত সম্পর্কে পরবর্তী ইমাম নিখুঁত জ্ঞান লাভ করেন। প্রতি বৎসর আল-ক'াদ্‌রের রাতে ইমাম পরবর্তী বৎসরের প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ্র রায় পান। একজন ফিরিশ্তা ইমামের সহিত কথা বলেন (মুহ'াদ্দাছ') এবং তাঁহাকে অবহিত করেন (মুফাহ্হাম)। কিন্তু এক্ষেত্রে রাসূলের সহিত ইমামের যে পার্থক্য তাহা হইতেছে ইমাম ফিরিশ্তাকে প্রত্যক্ষ করেন না। ইমাম পবিত্র রূহ' (রূহ'ল-কুদুস)-এর অধিকারী।

কালাম-এ ইমামাত সম্পর্কিত আলোচনায় ইমামী ধর্মবেত্তাগণ ইমামাত সম্পর্কে নিম্নলিখিত বক্তব্য প্রদান করিয়াছেনঃ ইমামাত যৌক্তিক কারণের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজের জন্য বাধ্যতামূলক। আল্লাহ্ অপার করুণার (লুত্'ফ) কারণে একজন ইমামের প্রতিষ্ঠা হইতেই হয়, মানব জাতির কারণে নহে। নবী বা একজন ইমামের মাধ্যমে আল্লাহ্ দ্বারা অবশ্যই একজন ইমামকে অভিষিক্ত হইতে হইবে। মহানবী (স') সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে (নাস্'স' জালী) 'আলী (রা)-কে ইমাম করিয়াছেন। ইমাম অবশ্যই পাপ ও প্রমাদমুক্ত। ইমামকে অবশ্যই তাঁহার সমসাময়িক কালের সকলের শ্রেষ্ঠ হইতে হইবে। ইমাম অতীন্দ্রিয় কার্যকলাপ সম্পাদনে সক্ষম। তিনি তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে পাপী থাকিলে আল্লাহ্র নিকট তাঁহার জন্য আবেদন জানাইতে পারেন।

(গ) **ইসমা'ঈলিয়্যা** ঃ ইমাম জা'ফারের ইনতিকালের পর ইসলমা'ঈলিয়্যা শাখা ইমামিয়্যাদের ধারা হইতে আলাদা হইয়া যায়। তবে মানব জাতির জন্য এক নিষ্পাপ ও ভ্রান্তিমুক্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা হিসাবে একজন ইমামের স্থায়ী প্রয়োজন সম্পর্কে ইমামী মতবাদের মৌলিক ধারণাগুলি ইসমা'ঈলিয়্যা মতবাদেও গৃহীত হয়। ইমামিয়্যা মতবাদের এই ধারণাগুলির উপর আদি ইসমা'ঈলিয়্যারা ইতিহাসের এক চক্রায়িত মতবাদ (দ্র. ইসমা'ঈলিয়্যা) বসাইয়া দেয়। এই মতবাদ অনুসারে প্রত্যেক নবীর যুগে বক্তা-নবীর ও তাঁহার ওয়াসী বা আসাসগণের পর সাতজন ইমামের আগমন ঘটে। এই সাত ইমামের সপ্তম ইমাম পরবর্তী যুগের বক্তা-নবীর স্থানে উন্নীত হন। এই রকম ষষ্ঠ যুগে এ যুগের সূচনা করেন মুহ'াম্মাদ (স) বক্তা-নবী হিসাবেও 'আলী (রা) ছিলেন তাঁহার আসাস; আর সপ্তম ইমাম ছিলেন মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন জা'ফার। প্রাক-ফাতিমীয় ইসমা'ঈলিয়্যা মতবাদে মনে করা হইত, অন্তর্হিত হওয়ার পর মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল ৭ম বক্তা-নবী হিসাবে পুনরায় ফিরিয়া আসিবেন। তাঁহাকে কা'ইম বা মাহ্দী সহিত অভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এই ক'াইম বা মাহ্দী আখিরী যামানার সূচনা করিবেন। ফাতি'মী তত্ত্বে এই বিশ্বাসের সংশোধন করা হয় এইভাবে যে, ফাতি'মীগণ ষষ্ঠ যুগের ইমাম, এই স্বীকৃতি দিয়া আখিরী যমানার প্রত্যাশিত সময়কে আরও দূর সুদূর ভবিষ্যতের দিকে আগাইয়া দেওয়া হয়। মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইস্‌মা'ঈলের অন্তর্ধান ও ফাতি'মীদের উত্থানের সময়টিকে 'অন্তর্ধান' (সাত্‌র) তথা ৭ম ইমামের পরকাল তাত্ত্বিক তাৎপর্য হিসাবে সাধারণত উল্লেখ করা হইয়া থাকে। উল্লিখিত দুই সময়ের মধ্যবর্তীকালে ইমামাতের নিরবচ্ছিন্নতা ব্যাখ্যার প্রয়াসের স্বার্থে এবং ফাতি'মী খলীফার উত্তরাধিকারে ধারাবহিকতা ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণে ইসমা'ঈলিয়্যা মতবাদে নিরন্তর পরিবর্তন-সামঞ্জস্য বিধান করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তাহা করাও হয়। তবে এখানে তাহার বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই। ইমামাতে উত্তরাধিকারের বেলায় একান্তভাবে নিরবচ্ছিন্ন রৈখিক বংশানুক্রমিকতা হইতে যে বিচ্যুতি ঘটে সেই বিষয়টির ব্যাখ্যায় অনেক ক্ষেত্রেই 'আমানাত' (মুসতাওদা') ইমাম এই পরিভাষাটিকে কাজে লাগানো হইয়াছে। এই আমানাত ইমামাত'কে অবশ্যই এক সময় স্থায়ী ইমামদের (মুস্‌তাক'ার্‌র) ধারায় ফিরাইয়া দিতে হইবে। এইভাবেই আল-হাসানকে কোনও কোনও সময়ে 'আমানাত ইমাম' হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা ইমামাতের ধারাবাহিকতা বহন করিয়াছেন আল-হু'সায়নের বংশধরগণ যাহারা স্থায়ী ইমাম। অবশ্য এই তত্ত্বটি বরং অতীতের ইমামদের উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতায় নিরবচ্ছিন্নতা ভঙ্গের ব্যাখ্যা হিসাবেই দাঁড়াইয়াছে, ভবিষ্যতের ইমামাতের কোনও প্যাটার্নের আভাস ইহাতে কমই মিলে।

গুপ্ত ইসমা'ঈলী মতবাদে ইমাম ধর্মীয় মর্যাদা সোপানের একটা অবক্রমের (হ'াদ্দ) প্রতিনিধিত্ব করেন যাহা নাতি'ক' ও আসাস-এর নীচে, অথচ হু'জ্জা-এর উপরে সমাসীন। ইমাম তাঁহার আমলে প্রকাশ্য ঐশী আইনের বাহ্যিক (জা'হির) অর্থ প্রচার ও উহার সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। অন্যদিকে তাঁহার হু'জ্জা আসাসের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হইয়া উহার গুপ্ত বা অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ (তা'বীল) প্রকাশ করেন। ইমাম তাঁহার আমলের ইমামাতের পদ সোপানে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে মু'মিন ও আধ্যাত্মিক দুনিয়ার নীতিমালার মধ্যে মধ্যস্থ হিসাবেও কাজ করেন।

**খারিজী মতবাদ ঃ** খারিজী মতবাদে ইমামাতের বৈধতা অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে ইমামাতের ন্যায়পরায়ণতার (‘আদ্‌ল) উপর একান্ত নির্ভরশীল। ঐশী আইনের যে কোনও রকমের লংঘন হইলে ইমাম তাঁহার বৈধতা হারাইবেন এবং তাঁহাকে অবশ্যই অপসারণ করিতে হইবে। এজন্য প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। অন্যায্য ইমাম ও তাঁহার সমর্থকগণ অনুশোচনা না করা পর্যন্ত অবিশ্বাসী হিসাবে গণ্য হইবেন। এইভাবেই ‘উছমান ও ‘আলী (রা) উভয়েই অবিশ্বাসী হইয়া যান যদিও গোড়ার দিকে তাঁহাদের ইমামাত বৈধ ছিল। যদি কোনও মুসলিম তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন না করে (তাবাররা’), তাহা হইলে তাহারাও তাহাদের অবিশ্বাসী হওয়ার অংশীদার হইবে। একইভাবে যদি কোন মুসলিম বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত ইমাম যেমন আবূ বাক্র ও ‘উমার (রা)-র সঙ্গে নিজেদের একাত্মতা বা সংহতি (তাওয়াল্লা) ঘোষণা না করে তাহা হইলে সে অবিশ্বাসী হইবে। প্রচলিত খারিজী মতবাদ অনুসারে একজন ইমামের প্রতিষ্ঠা বাধ্যতামূলক। কেবল নাজাদাত নাকি এই অভিমত দেন যে, মুসলিমগণ যদি নিজেরা নিজেদের মাঝে বৈধ ও ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করিতে পারে তাহা হইলে তাহাদের জন্য একজন ইমামকে প্রতিষ্ঠা করা বাধ্যতামূলক হইবে না। ইমাম নির্বাচিত হইবেন। দুইজন ন্যায়পরায়ণ মুসলমানের আনুগত্যের অঙ্গীকারের মাধ্যমে ইমামাত আইনত চুক্তিবদ্ধ হয়। আর সমাজের সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তিই কেবল ইমামাতের অধিকারী। মাঝে মাঝে খারিজীগণ তাহাদের ইমামদের উপর শর্তারোপ করেন যে, যদি আরও প্রার্থী পাওয়া যায় তাহা হইলে বর্তমান ইমামকে ইমামাত ছাড়িয়া দিতে হইবে। অবশ্য ইমামের উপর এই শর্তারোপের বিষয়টি অন্যদের মতে অবৈধ বিবেচিত হয়। খারিজী মতবাদে ইমামাতে কুরায়শ বংশের লোকদের বিশেষ সুবিধা বা অধিকারের বিষয়টি প্রত্যাখ্যাত হয়। উহাতে বলা হয়, কোনও যোগ্য মুসলিম তিনি যদি দাস বংশোদ্ভূতও হইয়া থাকেন, ইমামাতের যোগ্য হইবেন। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী অভিমত দিয়াছেন শাবীব ইব্‌ন য়াযীদ-এর অনুসারিগণ। তাহাদের মতে স্ত্রীলোকও ইমামাতের জন্য যোগ্য হইতে পারে। প্রচলিত খারিজী মত অনুযায়ী যে কোন সময়ে কেবল একজন মাত্র ইমাম থাকিতে পারেন। তবে কিছু দলত্যাগী খারিজীগোষ্ঠী এই রায়ও দেয় যে, যে কোনও এক সময়ে একাধিক ইমামের অস্তিত্বও বৈধ হইতে পারে। খারিজী মতে ইমামের অন্যান্য যোগ্যতা সুন্নী মতবাদেরই অনুরূপ। খারিজী মতবাদে ইমামের নৈতিক কৃচ্ছ্র ও সেই সঙ্গে সঠিক বিষয়ের নির্দেশনা ও অযথার্থ বিষয় নির্ধারণে তাঁহার দায়িত্ব এবং অ-খারিজী মুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদে তাঁহার নেতৃত্ব দানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বহু খারিজী সম্প্রদায়ের মধ্যে ইবাদিয়্যা (দ্র.) দলই হইতেছে একমাত্র দল যাহাদের মতবাদের লিখিত বিবরণ আছে। এই বিষয়ে পদ্ধতিমাফিক পড়াশুনা তথা অনুসন্ধান কাজ এখনও হাতে নেওয়া হয় নাই। ইবাদিয়্যাগণ সাধারণ খারিজী মতবাদের সহিত একমত হইলেও চারিটি অবস্থা বা পন্থার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের ইমামের অস্তিত্ব স্বীকার করে। উল্লিখিত চারিটি অবস্থা বা পন্থার (মাসালিক) সাহায্যে মু'মিনগণ দুশমনের মুকাবিলা করিতে পারেঃ (১) প্রকাশিত অবস্থা (জু‘হূর), যখন মুসলিম সমাজ দুশমনকে পরাভূত করার মত শক্তিশালী; (২) প্রতিরক্ষা অবস্থা (দিফা‘), যখন মুসলিম সমাজে একটি শক্তিশালী দুশমনকে কেবল প্রতিহত করিতে পারে; (৩) আত্মোৎসর্গের অবস্থা (শিরা’), যখন ক্ষুদ্র একদল মুসলমান শহীদ হইবার প্রস্তুতি লইয়া দুশমনের বিরুদ্ধে উত্থিত হয় এবং (৪) আত্মগোপনের অবস্থা, যখন মুসলমানগণ দুশমনের শাসনের আওতায় বাস করিতে বাধ্য হয় এবং ছদ্মবেশ ধারণ করে। কেবল সুপ্রকাশিত অবস্থায় ইমাম তাহার সকল দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করিতে পারেন। যেমন তিনি আইনগত দণ্ডসমূহ কার্যকর করিতে পারেন, অ-মুসলিমদের নিকট হইতে কর ও জিয্‌য়া আদায় করিতে ও গ'নীমাতের দ্রব্যাদি বণ্টন করিতে পারেন। খারিজীদের খালাফিয়্যা নামে একটি দলত্যাগী উপদল আছে। সাধারণ খারিজী মতবাদে নিশ্চিত করিয়া বলা হয়, কোনও এক সময়ে একই পন্থা অবলম্বনকারী একাধিক ইমাম থাকিতে পারে না। উক্ত খালাফিয়্যারা ইহা মানে না।

**ইমামাত সম্পর্কিত পরবর্তীকালীন চিন্তাধারা ঃ** ইমামাত সম্পর্কিত সুন্নী চিন্তাধারা আল-মাওয়ারদীর সময়কার ‘আব্বাসী খিলাফাতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সুন্নী মতবাদীদের ভাগ্য বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খোদ ঐ মতবাদেও তাহার প্রতিক্রিয়ার প্রভাব দেখা দিতে থাকে। আল-গ'াযালী (র) (মৃ. ৫০৫/১১১১) শক্তিশালী সাল্‌জূক সুলত'ানদের প্রভাবে খলীফাকে ইসলামের কেবল প্রতীকী প্রধান হিসাবে দেখিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার এই ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী একজন কার্যকর শাসকের আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে খিলাফাত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঐ শাসকের শাসন আবার বৈধতা পায় খলীফার পক্ষ হইতে তাঁহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে। আল-গ'াযালী (র) উল্লেখ করিয়াছেন, গোটা সাম্রাজ্যে প্রাদেশিক শাসক ও বিচারকদের বৈধতা রক্ষার একান্ত প্রয়োজন খলীফার পক্ষ হইতে প্রকৃত রাজনৈতিক অনুষ্ঠানগুলি আইনসম্মত বলিয়া অনুমোদন দানের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাগ'দাদের খিলাফাতের পতনের পর শারী'আঃ বলবৎ করার ক্ষেত্রে এই বৈধতা রক্ষার বিষয়টি মৌলিক ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। ইসলামী সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল কয়েক দশকের জন্য অমুসলিম শাসকের অধীনে চলিয়া গেলে আত-তাফতাযানী (মৃ. ৭৯১/১৩৮৯) রায় দেন যে, যেহেতু ভ্রান্তি ও নিপীড়নমূলক শাসনের প্রাবল্যে ঐ সময়ে একজন যোগ্য কুরায়শ বংশীয় ইমামের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, সেহেতু বিচারের কার্যাবলীর বৈধতাও ঐ ধরনের ইমামের উপর নির্ভরশীল থাকিতে পারে না। মামলূক সুলত'ান কায়রোয় যে ছায়া ‘আব্বাসী খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করেন মামলূক শাসনামলে মলের ইব্‌ন তায়মিয়্যা (মৃ. ৭২৮/১৩২৮) ও ইব্‌ন জামা‘আর মত সুন্নী আইন বিশারদগণও কার্যত সেই খিলাফাতকে উপেক্ষা করিয়াছেন। ইমামাতের জন্য ক্ষমতার সত্যিকার প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক বিবেচনায় এই সুন্নী আইন বিশারদগণ বাহ্যত ইমামাতের কার্যাবলী প্রকৃত শাসকের হাতে ন্যস্ত করেন। আল-গ'াযালী (র)-র বিপরীতক্রমে তাঁহারা ঐ শাসকের প্রতি খলীফার নামেমাত্র স্বীকৃতির সঙ্গে ঐ শাসকের বৈধতার বিষয়টি আর সম্পর্কিত করেন নাই। হ'াদীছে' খিলাফাতের মোট মেয়াদ ৩০ বৎসরে সীমিত। এই মেয়াদের পর পার্থিব বাদশাহী উহার স্থলাভিষিক্ত হইবে-এই হ'াদীছ'টি সচরাচর উদ্ধৃত করা হয় এবং সুন্নী চিন্তাধারায় ইহার প্রাধান্য লক্ষণীয়। যেহেতু যোগ্যতা থাকুক বা নাই থাকুক বাদশাহী ক্ষমতাধারীর করায়ত্ত সেহেতু ইমামাতের যে ক্লাসিকাল তত্ত্ব রহিয়াছে তাহা উপেক্ষা করা যাইতে পারে কিংবা প্রকাশ্যভাবে ঐ শর্তাবলী তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে প্রয়োজন তত্ত্বের (দারূরা) প্রয়োগের মাধ্যমে। ক্লাসিক্যাল মতবাদটি অবশ্য কোথাও সংশোধিত করা হয় নাই বরং উহা স্থগিত— ইহাই বিবেচনা করা হইয়াছে। আল-জুওয়ায়নী ও আল-গ'াযালী (র)-এর অনুসরণে পরবর্তী কালের সুন্নী মতবাদ বিশারদগণ বহু ক্ষেত্রেই গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করিয়াছেন

যে, ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলি (উসূ'লুদ্দীন) নয় বরং উদ্ভাবিত আইনের বিষয়াবলীই (ফুরূ') ইমামাত নির্ধারক-যদিও ঐতিহ্যগতভাবে আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নয় বরং উসূ'ল রচনাবলীতেই ইমামাতের বিষয় বেশী আলোচিত হইয়াছে। শী'আ মতে ইমামাতকে ধর্মের একেবারে মর্মমূলে স্থাপন করা হইয়াছে। উল্লিখিত বক্তব্য শী'আদের উল্লিখিত প্রবণতার বিরুদ্ধে দেওয়া হইলেও বর্তমানে ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে, বস্তুত ইমামাতের আর অস্তিত্বই নাই-এই উপলব্ধির প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার উপশম। শেষের দিকে সুন্নী মতবাদমূলক লেখায় বা বক্তব্যে ইমামাতের কথা আদৌ উল্লেখই করা হইত না কিংবা কেবল খিলাফাতে রাশিদূন-এর কথা উল্লেখ করা হইত।

ইমামাতের প্রশ্নে আধুনিকতাবাদী সুন্নী মতবাদে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ধর্মে একজন ইমামের যে প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সুন্নী মতবাদে কোনও কোনও সময় ব্যাপারটি পুরাপুরি এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে। এক্ষেত্রে ১৯২২ খৃ. 'উছ'মানী সালত'নাতের বিলোপ প্রশ্নে তুরস্কের মহাজাতীয় পরিষদ খিলাফাত সম্পর্কে যে বক্তব্য দেয় এবং মিসরের 'আলী 'আবদু'র-রাযিক' তাঁহার আল-ইসালাম ওয়া উসূলু'ল-হু'কম (১৯২৫ খৃ.) শীর্ষক গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন তাহা নজীরস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। অন্য সুন্নী বিশারদগণ রাশিদূন-এর আদর্শকে খিলাফাতের মডেল হিসাবে এক বিশ্বজনীন ইমামাতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে বক্তব্য পেশ করিয়াছেন। এই সব প্রস্তাবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও বিশদ প্রস্তাব দিয়াছেন সিরীয় 'আল্লামা রাশীদ রিদা' (দ্র.) তাঁহার আল-খিলাফা ওয়া'ল-ইমামু'ল-'উজ'মা (১৯২৩ খৃ.) শীর্ষক গ্রন্থে। ইমামাত ও ইসলামী সরকার সম্পর্কিত আধুনিকতাবাদী চিন্তাধারায় যে মূল বিষয়গুলি রহিয়াছে সেগুলিতে পরামর্শ গ্রহণভিত্তিক (শুরা দ্র.) ও নির্বাচনভিত্তিক সরকারকেই ইমাম প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই যে নীতিগুলি বা বক্তব্য এখানে এভাবে আসিয়াছে সেগুলি যথার্থ পথের পন্থী রাশিদুন খিলাফাতের আদর্শকেই বরং পরবর্তীকালের স্বেচ্ছাচারী খিলাফাতের তুলনায় বিশিষ্ট ও মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে।

ইমামী মতবাদ অবশ্য পরবর্তীকালেও উহার ক্লাসিক্যাল ধারণাগুলি পুরাপুরি অপরিবর্তিত রাখিয়াছে। ৭ম/১৩শ শতাব্দীর সূচনাপর্বে ইমামী গুপ্ত মতবাদ আংশিকভাবে সূফী ও ইসমা'ঈলী প্রভাবে জটিল ও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইমামাতের চিরন্তন সত্যতা যাহাকে অধুনা সাধারণত ওয়ালায়া হিসাবে উল্লেখ করা হয় উহাকে নুবূওয়াতের গুপ্ত দিক হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এইভাবে ইমামকে মনে করা হইতে থাকে যে, তিনি তাঁহার মৌল প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁহার ঐশী বৈশিষ্ট্যের কারণে ও ইমামগণের বাণী হইতে তাঁহার শিক্ষা গ্রহণের সুবাদে মরমী জ্ঞানে দীক্ষা দিয়া থাকেন।

ইসমা'ঈলী মতবাদ ফাতি'মী খিলাফাতের পর প্রধানত দুইটি শাখায় অস্তিত্ব রক্ষা করে। এই দুইটি শাখা আবার বেশ ভিন্নভাবেই নিজ নিজ গুপ্ত মতবাদ বা চিন্তাধারা গড়িয়া তোলে। ত'য়্যিবী ইসমা'ঈলীগণ ফাতি'মী আল-আমির (মৃ. ৫২৪/১১৩০)-এর শিশুপুত্র আত'-ত'য়্যিবকে ইমাম বলিয়া মানে এবং এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। ত'য়্যিবী মতবাদে বলা হয় যে, ইমাম আত'-ত'য়্যিব যদিও অন্তর্হিত (সাত্র) হইয়া আছেন তবুও তিনি তাহার অনুসারীদের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। এই মতবাদে ইমামী তত্ত্বে যে, গ'য়বা' মতবাদ রহিয়াছে তাহা সুনির্দিষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। তাহাদের গুপ্ত ইমাম আর আখিরী যামানার ক'াইম অভিন্ন নয়। ত'য়্যিবী ইসমা'ঈলী গুপ্ত মতবাদ অনুযায়ী ইমামের প্রকৃতি বিশেষভাবে মহাজাগতিক এবং তাঁহার ভূমিকাও মহাজাগতিক। ইমামের ঐশী প্রকৃতি (লাহূত) তাঁহার মানবীয় প্রকৃতি (নাসূত) হইতে ভিন্ন। তাঁহার এই ঐশী প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যকে 'জ্যোতি আগার (হায়কাল নূরানী) বলিয়া মনে করা হয়। ইমাম গত হইবার (নাকলা) পর তাঁহার অনুসারীদের রূহ ঐ জ্যোতি আগারে একত্র হয় এবং জ্ঞানের দশম দিগন্তে উথিত হইয়া স্বতঃসৃষ্টিমূলকভাবে এই ইমামের স্থান গ্রহণ করে।

নিযারী ইসমা'ঈলী মতবাদ ফাতি'মী ইসমা'ঈলী মতবাদের একটি শাখা। ফাতি'মী আল-মুসতানসি'র (মৃ. ৪৮৭/১০৯৪)-এর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নিযারকে ইমাম স্বীকার করা হয় এবং তাঁহার বংশানুক্রমে এই যাবত নিযারী ইমামদের ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিয়ামত তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যাক্রমে এই মতবাদে ইমামকে ৫৫৯/১১৬৪ সনে গুপ্ত সত্যের প্রকাশক হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং তখন হইতে তিনি আইন প্রণেতা ব্যাখ্যাকার নাতি'কের মর্যাদার উর্ধ্বে সমাসীন হন। চিরন্তন মৌলিক বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় ইমামকে আল্লাহ্‌র কথা (কালিমা) বা আদেশের (আমর) প্রকাশ (মাজ'হার) হিসাবে আধ্যাত্মিক বিশ্বের কারণ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইমামের এই মৌলিক সত্তাকে স্বীকৃতি জানাইবার মধ্য দিয়া বিশ্বাসিগণ তাহাদের আত্মিক জন্ম বা পুনরুত্থান লাভ করিয়া থাকে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) আবু'ল-'আব্বাস আন্-নাশী আল-আক্বার, 'উসূলু'ন-নিহ'াল, পাণ্ডু. বুরসা Haraccioglu 1309, পত্রক ১-৫১; (২) আন-নাওবাখতী, ফিরাকু'শ-শী'আ, সম্পা. H. Ritter, ইস্তাম্বুল ১৯৩১ খৃ.; (৩) আল-আশ'আরী, মাক'ালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন, সম্পা. H. Ritter, ইস্তাম্বুল ১৯২৯-৩৩ খৃ., ব্যাখ্যা। H. Brentjes, Die Imamatslehren im Islam nach der Darstellung des Aschari, Berlin 1964; (৫) W. Madelung Der Imam al-Qasim b. Ibrahim und die Glaubenslehre der Zaiditen Berlin 1965.

সুন্নী মতবাদঃ ইমামাত সংক্রান্ত সুন্নী হা'দীছ'সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন (৬) A J. Wensinck, Handbook, imam (s)।

**হাম্বালী মতবাদ** ঃ (৭) ইব্ন আবী য়া'লা, ত'াবাক'াতু'ল-হ'ানাবিলা, সম্পা. এম. হা'মিদ আল-ফিকী, কায়রো ১৯৫২ খৃ.।

**হ'ানাফী মতবাদ** ঃ (৮) A. J. Wensinck, The Muslim Creed, Cambridge 1932. আল-গ'াযালী (র) পর্যন্ত সুন্নী মতবাদের নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগ্রাহক; (৯) য়ূসুফ ঈবিশ, নুসূসু'ল-ফিক্র আস-সিয়াসী আল-ইসলামী, আল-ইমামা 'ইন্দা'স-সুন্না, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ.।

মু'তাযিলী মতবাদ ঃ (১০) আল-খায়্যাত', আল-ইনতিস'ার, সম্পা. H.S. Nyberg, কায়রো ১৯২৫ খৃ., বিশেষত পৃ. ৯৭-১০২; (১১) 'আবদু'ল-জাব্বার আল-আসাদাবাদী, আল-মুগ'নী, ২০ খৃ., সম্পা. 'আবদু'ল-হ'ালীম মাহ'মূদ ও সুলায়মান দুনয়া, কায়রো তা. বি.।

**যায়দিয়্যা মতবাদ** ঃ (১২) আবু ত'ালিব আন-নাতি'ক, আদ-দিআমা ফী তাছ'বীতি'ল-ইমামা, পাণ্ডু. সানআ জামি মাসজিদ; (১৩) R. Strothmann, Das Staatsrecht der Zaiditen Strassburg 1912.

ইমামিয়া মতবাদ (১৪) আল-কুলায়নী, আল-উসূ'ল মিনা'ল-কাফী, সম্পা. 'আলী আকবার আল-গ'াফফারী, তেহরান ১৩৮১ হি., ১খ,

কিতাবু'ল-হুজ্জা; (১৫) আশ-শারীফু'ল- মুরতাদা', আশ-শাফী ফি'ল-ইমামা, তেহরান ১৩০১হি; (১৬) নাসীরুদ্দীন আত-তূসী, রিসালাই ইমামাত (রিসালা ফি'ল-ইমামা), সম্পা. এম. টি. দানিশপাযহুহ, তেহরান ১৩৩৫ হি.; (১৭) W. M. Miller (অনু.), আল-বাবু'ল-হাদী 'আশার... by.... ইব্নু'ল-মুতাহহার আল-হিল্লী, মিক্দাদ-ই ফাদি'ল-আল-হিল্লীর ভাষ্যসহ, লণ্ডন ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৬২-৮১।

**ইসমা'ঈলিয়্যা মতবাদ ফাতিমী মতবাদের প্রতিনিধিত্বশীল ভাষ্যসমূহ ঃ** (১৮) আন্-নু'মান ইব্ন হায়্যন, কিতাব আসাসি'ত-তা'বীল, সম্পা. আ. তামির, বৈরূত ১৯৬০ খৃ.; (১৯) মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী আস-সূরী, আল-কাসীদাতু'স-সূরিয়া, সম্পা. আ. তামির, দামিশ্ক ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৪১-৭১; (২০) W. Madelung. Das Imamat in der fruhen ismailitischen Lehre in Isl., xxxvii (1961)।

**খারিজী মতবাদ ঃ** (২১) E. A. Salem, Political theory and institutions of the Khawarij, Baltimore 1956, বিশেষত ৪র্থ অধ্যায় (যাহাতে অনেক ভুল-ভ্রান্তি রহিয়াছে); (২২) A. de C. Motylinski, L Aqida des Abadhites, in Recueil de Memoires et de Textes publie en l'honneur du XIV$^{e}$ Congres des Orientalistes, Alger 1905.

**পরবর্তীকালের সুন্নীবাদ ও আধুনিক চিন্তাধারা ঃ** (২৩) H. A. R. Gibb, Some considerations in the Sunni theory of the Caliphate, in Archives d'Histoire du Droit oriental, iii (1939), 401-10; (২৪) M. H. Kerr, Islamic reform, the political and legal theories of Muhammad Abduh and Rashid Rida, Berkeley 1966, বিশেষত ৫ম অধ্যায়।

(২৫) ইমামী গুপ্ত তত্ত্ব ঃ (২৬) H. Corbin, Histoire de la Philosophie islamique, Paris 1964, i 53-109.

তায়্যিবী ইসমা'ঈলী মতবাদ ঃ (২৭) 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নিল-ওয়ালীদ, কিতাব তাজি'ল-'আকাইদ ওয়া মাদিনি'ল-ফাওয়াইদ, সম্পা. আ. তামির, বৈরূত ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ৬০-৭৯। গুপ্ত তত্ত্বঃ (২৮) আল-হুসায়ন ইব্ন 'আলী ইব্নিল-ওয়ালীদ, কিতাবু'ল-মাবদা ওয়াল-মা'আদ, সম্পা. ও অনু. H. Corbin in Trilogie Ismaelienne, তেহরান ১৯৬১ খৃ., ৪র্থ, অধ্যায়; (২৯) কিয়ামার পর নিযারী গুপ্ত তত্ত্ব; (৩০) M. G. S. Hodgson, The Order of Assassins, The Hague 1955, 160-75.

W. Madelung (E.I.$^{2}$)/আফতাব হোসেন

**ইমামীয়া** (امامية) ঃ শী'আ সম্প্রদায়ের উপদল বিশেষ। এই উপদলের মতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের অব্যবহিত পর হযরত 'আলী (রা) [মৃ. ৪০/৬০০] হাদীছের সুস্পষ্ট নির্দেশ মুতাবিক ইমাম নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে রাসূল (স) ইঙ্গিতে ও সুস্পষ্ট ভাষায় উভয়বিধ উপায়ে হযরত 'আলী (রা)-এর উক্ত ইমামাতকে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই বিষয়ে গাদীরু খুম (غدير خم) নামক স্থানে বিবৃত হাদীছটিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। উক্ত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে 'আলীকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। হে আল্লাহ্! যে ব্যক্তি 'আলীকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তুমি তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও; আর যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তুমি তাঁহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করিও।" হাদীছটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিছীন-এর মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম ইব্ন তায়মিয়া (র)-এর মতে হাদীছটি সহীহ নয়।

হযরত 'আলী (রা)-এর পর যথাক্রমে ইমাম হাসান (মৃ. ৫০/৬৭০), ইমাম হুসায়ন (মৃ. ৬১/৬৮০) ও ইমাম যায়নু'ল-'আবিদীন আল-আসগার আস-সাজ্জাদ ইব্ন হুসায়ন (মৃ. ৯৪/৭১২)-এর জন্য ইমামাত নির্ধারিত হইবার বিষয়ে শী'আ সম্প্রদায়ের ইমামিয়্যা উপদল একমত ছিল। অতঃপর কে কে ইমাম ছিলেন সেই বিষয়ে উক্ত উপদলের বিভিন্ন শাখার মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ইমামিয়া উপদলের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ইছ্না 'আশারিয়া (দ্র.) দলই হইতেছে অধিক খ্যাত। এই দলটি পর্যায়ক্রমে বারজন ইমামকে ইমাম বলিয়া স্বীকার করে। খ্যাতির দিক হইতে পরবর্তী পর্যায়ের ফেরকা হইল সাব'ইয়্যা (দ্র.)। এই ফেরকাটি হযরত 'আলী (রা) হইতে হযরত মূসা আল-কাজিম (মৃ. ১৮৩/৭৯৯) পর্যন্ত মোট সাতজনকে ইমাম বলিয়া স্বীকার করে। এই ফেরকা হযরত মূসা আল-কাজিমকে আল-কাইমু'ল-মাহ্দী বা স্থায়ী মাহ্দী মনে করে। ইহারা ওয়াকিফিয়্যা (واقفية) নামেও পরিচিত। কারণ ইহাদের মতে ইমামাত হযরত মূসা আল-কাজিম পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। এই ফেরকা হযরত মূসা আল-কাজিম-এর পর সর্বশেষ ইমামের আগমনের অপেক্ষায় রহিয়াছে। কেহ কেহ আবার ইমাম মূসা আল-কাজিম-এর পর তাহার পুত্র আহমাদকে ইমাম বলিয়া স্বীকার করে। তাহারা ইমাম 'আলী রিদা (মৃ. ২০৩/৮১৮)-কে শী'আ বলিয়া স্বীকার করে না। ইমাম 'আলী রিদার ইনতিকালের পর হযরত আল-হাসান আল-'আসকারী এবংও দিয়াছিল। ইমাম আল-হাসান আল-আসকারীর ইনতিকালের পর কেহ কেহ হযরত জা'ফারকে ইমাম বলিয়া স্বীকার করে। ঐতিহাসিক আল-বাগদাদী ইমামিয়া উপদলের নিম্নোক্ত চৌদ্দটি ফেরকার নাম উল্লেখ করিয়াছেনঃ (১) কামিলিয়্যা; (২) মুহাম্মাদিয়্যা; (৩) বাকিরিয়্যা; (৪) নাওসিয়্যা; (৫) শুমায়তিয়্যা; (৬) 'উমারিয়্যা; (৭) ইসমা'ঈলিয়্যা; (৮) মুবারাকিয়্যা; (৯) মূসাবিয়া; (১০) কাতী'ইয়্যা; (১১) ইছ্না 'আশারিয়্যা; (১২) হিশামিয়্যা; ৯১৩) যারারিয়া ও (১৪) যুনুসিয়া।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) ইব্ন বাবাওয়ায়হ আল-কুম্মী, কামালুদ্দীন, অধ্যায় ১১৪; (২) আবু যায়দ আল-বালখী, কিতাবু'ল-বাদই ওয়া'ত-তারীখ, প্যারিস ১৮৯৯ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৩) 'আবদু'ল-কাহির আল-বাগদাদী, আল-ফার্ক, কায়রো ১৩২৮ হি., ১৭খ., ৩৮-৫৪; (৪) আশ-শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, কায়রো ১৩১৭ হি., ১খ, ২১৮; (৫) আল-জুরজানী, 'আত-তা'রীফাত, কায়রো ১৩২১ হি.; (৬) ইব্ন হাযম, আল-ফিসাল, মিসর ১৩২১ হি., ৪খ, ১৭৯; (৭) আদ-দিয়ার বাক্রী, আল-খামীস, ২খ, ২৬৮ প.; (৮) আন-নাওবাখ্তী, ফিরাকু'শ-শী'আ, মুহাম্মাদ সাদিক কর্তৃক মুদ্রিত, নাজাফ; (৯) ইব্ন তায়মিয়া, মিনহাজুস-সুন্না, বূলাক ১৩২২ হি.।

সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/মু. মাজহারুল হক

**'ইমামুদ্দীন দিহ্লাবী** (امام الدين دهلوى) ঃ আশ-শায়খু'ল-'আলিম (الشيخ العالم), ফাকীহ ও আবদাল (ابدال) উপাধিতে প্রসিদ্ধ। তিনি গাযনীর শায়খ বাদরুদ্দীনের শিষ্যত্বে তারীকাত- এর জ্ঞান

লাভ করেন এবং কিছুকাল অবধি নিজ শায়খ কু'ত'বুদ্দীন বাখতিয়ার-এর সাহচর্য লাভ করেন। শিহাবুদ্দীন আল-'আশিক' তাঁহার নিকট ত'রীক'াতের দীক্ষা গ্রহণ করেন। মাহ্র-জাহানতাব (مهر جهانتاب) গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে যে, তিনি ৭৮০ হি. ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) 'আবদু'ল-হ'ায়্যি আল-লাখনাবী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতি'র, ২য় সং, হায়দরাবাদ ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ, ১৩।

মুহাম্মদ মূসা

**ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী** (امام الدين بنغالى) ঃ (১৭৮৮-১৮৫৯), মাওলানা, উনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত 'আলিমে দীন, দরবেশ ও সূফী সাধক। বালাকোটের মুজাহিদ সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরেলবী (র)-এর অন্যতম খলীফা। জীবনের এক উল্লেখযোগ্য সময় তিনি সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরেলবীর সহকর্মী হিসাবে বিভিন্ন অঞ্চল সফর, হজ্জব্রত পালন ও বালাকোটের যুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ খিদমত, সেবা কর্ম ও অর্পিত দায়-দায়িত্ব প্রতিপালন করেন। বালাকোটের যুদ্ধের পর মাওলানা ইমামুদ-দীন বাঙ্গালী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরায় ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন।

তিনি ১৭৮৮ সালে নোয়াখালী জেলার রৌশনাবাদের অধীন আম্বরাবাদ পরগনার হাজীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র তিন বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহারা হইলে তাঁহার মাতা দ্বিতীয় বিবাহ করেন এবং শিশু ইমামুদ-দীনও মাতার সহিত তাঁহার সৎ পিতার বাড়িতে বড় হইতে থাকেন। বাল্যকাল হইতে লেখাপড়ার প্রতি ইমামুদ-দীনের প্রবল ঝোঁক ছিল, কিন্তু সৎ পিতা ছিলেন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ও অমনোযোগী। তাই বাধ্য হইয়া ইমামুদ-দীনকে ছোটবেলায় লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিতে হয়। প্রথমে তিনি ঢাকায় এবং পরে কলিকাতায় পড়ালেখা সম্পন্ন করেন। কোন মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন তার নাম জানা যায় নাই। লেখাপড়া শেষে মাওলানা ইমামুদ-দীন বাঙ্গালী মৌলভী ইসরাঈল খানের সহিত দিল্লী যান এবং তথাকার প্রসিদ্ধ পীর শাহ গোলাম 'আলী (র)-র মাদরাসায় শিক্ষকতার পেশায় যোগ দেন। তাঁহার 'ইলম-আমল ও তাকওয়ায় মুগ্ধ হইয়া নোয়াখালীর রামগতি দায়েরা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত সূফী সাধক হযরত চাঁদ শাহ ফকির (র) নিজের মেয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। জনৈক অজ্ঞাত লেখক কর্তৃক রচিত পীরতত্ত্ব নামক কাব্যগ্রন্থে এই বিবাহের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

পরবর্তীতে তিনি দিল্লীতে উপমহাদেশের প্রখ্যাত 'আলিম শাহ 'আবদু'ল-'আযীয দেহলভীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে রায়বেরেলীর সায়্যিদ আহমাদ শহীদের নাম ও খ্যাতি দিল্লীর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। মাওলানা ইমামুদ-দীন তাঁহার দরবারে গমনের ইচ্ছা পোষণ করেন এবং একদিন তিনি আত্মিক সাধনার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে সায়্যিদ সাহেবের এক মাহফিলে যোগদান করেন। কিন্তু সায়্যিদ সাহেবের প্রতি তিনি আকর্ষণ বোধ করেন নাই। তাই তিনি কিছু না বলিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করেন। ইহার কিছুদিন পর ১৮২০ সালে সায়্যিদ আহমাদ শহীদ লক্ষ্ণৌ গমন করেন এবং সেখানে নয় সপ্তাহের মত অবস্থান করেন। শত শত মুসলমান এই সময়ে তাঁহার হাতে বায়'আত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ঘটনাক্রমে এই সময়ে ইমামুদ্দীন বাঙ্গালীও লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত ছিলেন। একদিন তিনি সায়্যিদ সাহেবের যিকিরের মাহফিলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার যিকিরের তালিমে অভিভূত হন এবং এখানেই তিনি সায়্যিদ সাহেবের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর তাহার জীবনের মোড় পরিবর্তিত হয়। তিনি সব সময়ই সায়্যিদ সাহেবের সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার নিকট হইতে অধ্যাত্মিক জ্ঞান ('ইলমে মা'রফিত) লাভ করেন।

লক্ষ্ণৌ হইতে মাওলানা ইমামুদ-দীন সায়্যিদ সাহেবের সফর সঙ্গী হইয়া যান। সায়্যিদ সাহেব রায়বেরেলীতে কিছুদিন অবস্থানের পর পবিত্র হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে ১৮২১ সালের ৩০ জুলাই ৪৩০ জন মহিলা ও পুরুষের যে কাফেলা লইয়া রায়বেরেলী হইতে রওয়ানা হন, তাঁহাদের মধ্যে ইমামুদ্দীন বাঙ্গালীও ছিলেন। ১৮২১ সালের ৩ আগস্ট সায়্যিদ সাহেব তাঁহার হজ্জের কাফেলা লইয়া উত্তর প্রদেশের দালমু হইতে নৌকাযোগে গঙ্গা নদী দিয়া নভেম্বর মাসে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছান। এইখানে তিনি তিন মাস অবস্থান করেন এবং দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

সায়্যিদ সাহেবের কলিকাতায় অবস্থানকালে মাওলানা ইমামুদ্দীন তাঁহার মায়ের সহিত দেখা করিবার জন্য সায়্যিদ সাহেবের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া নিজ জন্মভূমি নোয়াখালী প্রত্যাবর্তন করেন। সায়্যিদ সাহেব বলিলেন, তাঁহার মাতা যদি হজ্জব্রত পালন করিতে আগ্রহী হন তবে যেন তাঁহাকে লইয়া আসেন। বিশেষ অসুবিধাবশত মাওলানার মাতা যাইতে পারেন নাই, তবে তাঁহার সহিত ত্রিশ চল্লিশ জন লোক সায়্যিদ আহমাদ শহীদের সহিত দেখা করিতে কলিকাতা যান এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইসব লোক সায়্যিদ সাহেবকে তাঁহাদের এলাকায় আসিবার জন্য অনুরোধ জানান, কিন্তু হজ্জের জাহাজ প্রস্তুত থাকায় এবং হাতে পর্যাপ্ত সময় না থাকায় সায়্যিদ সাহেব দুঃখের সহিত তাঁহার অপরাগতা প্রকাশ করেন। তিনি মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী ও সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীকে এইসব এলাকায় মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য খিলাফত দান করেন।

১৮২২ সালের প্রথমভাগে সায়্যিদ সাহেব তাঁহার ৭৫০ জন সঙ্গী লইয়া হজ্জের উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে রওয়ানা হন। পুরা কাফেলাকে দশটি দলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলের জন্য একটি করিয়া জাহাজ ও একজন আমীর নিযুক্ত করা হয়। সায়্যিদ সাহেব নিজের জন্য সবচাইতে পুরাতন এবং ধীর গতিসম্পন্ন জাহাজ দরিয়া-ই-বাকা পছন্দ করেন এবং সবার শেষে কলিকাতা ত্যাগ করেন। সায়্যিদ সাহেবের জাহাজের যাত্রী সংখ্যা ছিল ১৫০ জন যাহার অধিকাংশই ছিল তাঁহার নিকট-আত্মীয়। মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী সায়্যিদ সাহেবের সহিত তাঁহার সফর সঙ্গী হইবার দুর্লভ গৌরব অর্জন করেন। পবিত্র হজ্জব্রত পালনশেষে ১৮২৩ সালের অক্টোবর মাসে সায়্যিদ সাহেব কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৮২৪ সালের ২৪ এপ্রিল তিনি মুঙ্গের, আযীমাবাদ ও এলাহাবাদ হইয়া রায়বেরেলী পৌঁছেন। সায়্যিদ সাহেব কলিকাতা পৌঁছিবার পর মাওলানা ইমামুদ্দীন তাঁহার নির্দেশক্রমে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে তরিকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের মুসলমানদেরকে এই আন্দোলনের পথে উদ্বুদ্ধ করেন।

হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর সায়্যিদ সাহেব জিহাদের প্রস্তুতির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এইজন্য তিনি শহর, নগর, গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহ পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার শিষ্যরাও উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকা হইতে লোক সংগ্রহ করিতে থাকেন। অতঃপর সায়্যিদ সাহেব শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার উদ্দেশ্যে সীমান্ত প্রদেশ রওয়ানা হইয়া যান। ব্যাপক প্রচারণার ফলে বিভিন্ন এলাকার লোকজন সায়্যিদ সাহেবের

নিকট সমবেত হইতে এবং অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে থাকেন। ১৮২৬ সালের ১৭ জানুয়ারী সায়্যিদ সাহেব হিজরতের পথে পা রাখেন এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বালাকোটকে জিহাদের কেন্দ্রস্থল হিসাবে নির্বাচন করেন। বাংলাদেশে এই জিহাদী আন্দোলনের পটভূমি সৃষ্টি করিয়া মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী তাঁহার পীরের সহিত জিহাদে যোগদান করিবার জন্য সীমান্ত প্রদেশে চলিয়া যান। সেখানে তিনি সায়্যিদ সাহেবের বিশিষ্ট দলের অন্তর্ভুক্ত হন এবং বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইমামুদ্দীনের সীমান্তে চলিয়া যাইবার পরও বাংলাদেশ হইতে সীমান্তে মুজাহিদদের গমনাগমন অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশে মাওলানা ইমামুদ্দীন-এর ব্যাপক প্রচারণার ফলে ইহা সম্ভব হইয়াছিল। শেষের দিকের কাফেলাসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ হইতে মাওলানা ইমামুদ্দীন-এর ভাই মৌলভী 'আলীম উদ্দীন-এর নেতৃত্বে একটি দলও সীমান্ত প্রদেশে গিয়াছিল। এই দল সীমান্তের কালাবাগে সায়্যিদ জা'ফার 'আলী নকভীর দলের সহিত মিলিত হয়। মৌলভী আলীম উদ্দীন বালাকোটের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

সায়্যিদ সাহেব সীমান্তের সোয়াত জেলা ভ্রমণের পর এই জেলার অন্তর্গত পানজতার নামক স্থানে মুজাহিদদের জন্য সম্পূর্ণ বিরাণ জায়গায় একটি বসতি আবাদ করেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই জায়গাটি মরদান জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত পাহাড়ঘেরা একটি নিরাপদ স্থান। এইখানে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেন যাহার চারিদিকের প্রাচীরগুলি ছিল পাথরের। দুর্গের চার কোণে চারটি বুরুজ ছিল এবং প্রধান প্রবেশ পথ ছিল পূর্ব দিকে। উত্তর-পূর্ব কোণের বুরুজে সায়্যিদ সাহেব অবস্থান করিতেন। ইহার নিকটেই তাঁহার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থাকিতেন। সায়্যিদ সাহেবের কামরার সহিত লাগানো ঠিক পশ্চিম পার্শ্বের দুইটি কামরায় থাকিতেন যথাক্রমে মৌলভী ওয়ারেছ আলী বাঙ্গালী এবং মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী।

বাংলাদেশের মুজাহিদদের সায়্যিদ সাহেবের এত নিকটে অবস্থান নিঃসন্দেহে বালাকোটের যুদ্ধে বাংলাদেশের মুজাহিতদের অনুপম নিষ্ঠা ও বলিষ্ঠ ভূমিকাই নির্দেশ করে। বলা হইয়া থাকে, হাজারা জেলার অন্তর্গত তানুলির শাসনকর্তা পায়েন্দা খান সায়্যিদ সাহেবের প্রতি মুখে আনুগত্য প্রদর্শন করিলেও গোপনে বিরোধিতা করিতেন। তাই তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে সম্মত করাইবার জন্য সায়্যিদ সাহেবের সহিত যে বারজন লোক মনোনয়ন লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী অন্যতম।

১৮৩১ সালের প্রথম দিকে সায়্যিদ সাহেব পেশোয়ার দখল করিয়া বিজয়ীর বেশে কাবুলী দরওয়াজা দিয়া শহরে প্রবেশ করেন। বিশাল জনতা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানায়। তিনি সুবিস্তৃত অঞ্চলে শরীয়তী শাসন প্রবর্তন করিবার পূর্ণ সুযোগ পান। আম্ব হইতে মরদান পর্যন্ত তাঁহার অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। পেশোয়ারে সায়্যিদ সাহেবের থাকিবার ব্যবস্থা প্রথমে গুরপাথরী সরাইখানায় করা হয়। ইহা অনেকটা দুর্গের মত সুরক্ষিত ছিল। পর্যায়ক্রমে আট ব্যক্তি সায়্যিদ সাহেবের পাহারায় নিযুক্ত থাকিতেন। ইহাদের মধ্যে দুইজন রায়বেরেলীর সায়্যিদ ঈসমাঈলের দলের, দুইজন মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙ্গালীর, দুইজন মৌলভী সালাহ উদ্দীন ফলতির দলের এবং দুইজন মৌলভী আব্দুল হাকিম ফলতির দলের ছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে এই ব্যবস্থায়ন কর্মপদ্ধতি (Arrangement structure) হইতে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে, সায়্যিদ সাহেবের বিশিষ্ট দল চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল, যাহার একটির নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী।

১৮৩১ সালের ৬ মে বালাকোটের ময়দানে সায়্যিদ সাহেব শহীদ হইবার পর তাঁহার আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার মুরীদদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। পাটনার সাদিকপুরী দলের নেতা মাওলানা বিলায়েত 'আলী সায়্যিদ সাহেবের অদৃশ্য হইয়া যাওয়ায় বিশ্বাস করিতেন। অপর দিকে মাওলানা ইসহাকের নেতৃত্বে দিল্লী দলের সদস্যরা সায়্যিদ সাহেবের শাহাদাতে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা জিহাদী আন্দোলন হইতে সরিয়া মুসলমানদের ঈমান-আমল বাঁচাইবার জন্য আপাতত লেখাপড়া শিক্ষার প্রতি বিশেষ জোর দেন। দিল্লী দলের মাওলানা মামলূক 'আলী ও বিশিষ্ট আলিমগণ দিল্লীর গাযী উদ্দীন কলেজে (দিল্লী কলেজ) শিক্ষকতা শুরু করেন। মাওলানার এইসব ছাত্ররাই উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলিম চিন্তাধারা প্রবাহ ও সংস্কৃতিতে আধুনিকতাবাদ প্রচলন করেন। এক ছাত্র মাওলানা কাসিম নানূতুবী (র) ১৮৬৭ সালে দেওবন্দে দারুল উলূম নামে মাদরাসা স্থাপন করিয়া মুসলমানদের দীনি শিক্ষার পথ সুগম করেন এবং অপর শিষ্য স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন আলীগড় কলেজ, যাহা পরবর্তীতে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

অপরদিকে বালাকোটের যুদ্ধের পর মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী দেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি জিহাদের পরিবর্তে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের প্রতি বিশেষ জোর দেন এবং জীবনের বাকী অংশ নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা) জেলার মুসলমানদের হেদায়াতের কাজে অতিবাহিত করেন। তৎকালীন বাংলাদেশের এতদঞ্চলের ধর্মীয় ও নৈতিক অবক্ষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়া চট্টগ্রামের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ হামিদুল্লাহ খান লিখেন, "সেই সময় কতিপয় ভবঘুরে ও পর্যটক ফকির মুসলমান (চট্টগ্রামে) আগমন করে এবং হিন্দু ও মগদের মন্দিরের ন্যায় বিখ্যাত সুলতানুল আরেফীন বায়াযীদ বিস্তামী ও হজরত শায়খ আবদুর কাদের জিলানী প্রমুখের নামে কয়েকটি মিথ্যা কবর ও যিয়ারতকেন্দ্র গড়িয়া তোলে। অথচ এ বুযুর্গ ব্যক্তিগণ কখনও ভারতে (চট্টগ্রামে) আগমন করেননি। এই সমস্ত কবরের সাহায্যে তাহারা লোকজন সমবেত করিবার আর নিজেদের জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে একটি ফন্দি বাহির করিয়া লয়। ইহা পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে তীর্থকেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়।"।

সমকালীন সমাজের আলোচনা করিতে গিয়া একই ঐতিহাসিক লিখেন, মূর্খতা, অহংকার এবং হীনমন্যতার প্রাদুর্ভাব সর্বত্র স্থানীয় মুসলমান সমাজকে দীর্ঘকাল নানা অনৈসলামী আচার-ব্যবহার, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে পরিবেষ্টিত রাখিবার পর একজন স্বনামখ্যাত আলেম এবং অপরজন ধর্মপ্রাণ সূফীর দীর্ঘ সাধনার ফলে মুসলিম সমাজ এই অন্ধকার হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়া আবার সত্যিকার ইসলামের সন্ধান লাভে সমর্থ হইয়াছিল। হামিদুল্লাহ খান এই দুই জনকে যথাক্রমে হাজী,গাজী, আলেম, ফাযেল ও মুজাহিদ মাওলানা ইমাম উদ্দীন (বাঙ্গালী) এবং হাজী, গাজী, পীর ও মোর্শেদ সুফী নূর মোহাম্মদ (নিযামপুরী)-রূপে উল্লেখ করেন।

মাওলানা ইমামুদ্দীন সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি গ্রামের পথে-প্রান্তরে হাঁটিয়া বেড়াইতেন এবং জনগণকে হেদায়াত বাণী শুনাইতেন। তাঁহার কথায় এমন প্রভাব ছিল যে, সাধারণ মানুষ হৃষ্টচিত্তে তাঁহার কথা মানিয়া চলিত। ভ্রমণকালে দুইজন ছাত্র তাঁহার সঙ্গে থাকিত, যেখানে যখনই সুযোগ পাইতেন সাধারণ জনগণকে শিক্ষা দিতে তিনি কার্পণ্য করিতেন না। তিনিই এতদঞ্চলে প্রচলিত বিদ'আতসমূহ দূর করিয়া খাঁটি ইসলামের ভিত্তি

Contents



স্থাপন করেন। এই মহান সাধক ১৮৫৮ সালে দ্বিতীয় বার হজ্জ পালনের জন্য মক্কা গমন করেন এবং প্রত্যাবর্তনের পথে ১৮৫৯ সালে এডেনের নিকট 'আরব সাগরে জাহাজের মধ্যে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার লাশ মুবারক জানাযা নামাযশেষে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সাগরে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। এইভাবে ৭১ বৎসরের সংগ্রাম মুখর ও বর্ণাঢ্য জীবনের সলিল সমাধি ঘটে। তাঁহার বংশধরগণ বর্তমানে নোয়াখালীর সাদুল্লাহীপুর গ্রামে বসবাস করিতেছেন। উপরে উল্লিখিত তথ্যাবলীর নিরিখে ইহা প্রমাণিত হয় যে, মাওলানা ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী কেবল একজন সাধারণ মুজাহিদ ছিলেন না, বরং তরিকা-ই মুহাম্মাদিয়া আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অন্যতম ছিলেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) Hafiz Malik, Moslem Nationalism in India and Pakistan, Washington D.C.1963; (২) আব্দুল মওদুদ, ওহাবী আন্দোলন, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৮৫, পৃ. ৯৮, ১১০-১৭; (৩) এম. ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, ২য় সংস্করণ, ফেনী ১৯৮১ খৃ., পৃ. ১৭৪-৭৫; (৪) Herbert Risley, N. S. Meyer and J.S. Cotton, The Imperial Gazetteer of India, vol. x, Oxford 1908, p. 124; (৫) হুমায়ুন আব্দুল হাই, মুসলিম সংস্কারক সাধক, ঢাকা ১৯৭৬, পৃ. ৯৮; (৬) লেখক অজ্ঞাত, পীরতত্ত্ব, পৃ. ২; (৭) গোলাম রাসূল মেহের, সায়্যিদ আহমাদ শহীদ, লাহোর ১৯৬৮, পৃ. ১৬৭;৬৮; ২১৯, ২৯০-৯৪, ২২০; (৮) মুহাম্মদ মতিউর রহমান, আইনা-ই ওয়ায়সী, পাটনা ১৯৭৬, পৃ. ৯৫, ৯৭; (৯) হামিদুল্লাহ খান, আহাদীছুল খাওয়ানীন, কলিকাতা ১৮৭১, পৃ. ১৬-১৭, উদ্ধৃত মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোছলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস, ঢাকা ১৯৬৫, পৃ. ১৬৫।

ড. শাহ মোহাম্মদ শফিক উল্লাহ

**আল-ইমামু'ল আ'জাম** (দ্র. আবূ হানীফা)

**ইমামু'ল-হ'ারামায়ন** (দ্র. আল-জুওয়ায়নী)

**ইমামু'ল-হুদা** (দ্র. আবু'ল-লায়ছ আস-সামারকান্দী)

**ইমারা** (দ্র. আমীর)

**আল-ইমারাতু'ল-আরাবিয়্যাতু'ল-মুত্তাহি'দা** (الامارات العربية المتحدة) ঃ সংযুক্ত 'আরব আমীরাত, ইতোপূর্বে শান্তি চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র বলিয়া পরিচিত আল-ইমারাতু'ল-'আরাবিয়্যাতি'ল-মুত্তাহি'দা নিম্ন উপসাগরের সাতটি শায়খ-শাসিত রাজ্যের সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ। ইহা ১৪ শাওয়াল, ১৩৯১/২ ডিসেম্বর ১৯৭১ সনে প্রতিষ্ঠিত। সদস্য রাষ্ট্রগুলি আবূ জাবী (আবূ জাবী), দুবায়্যি (দুবাই), আশ-শারিকা (মারজা), আজমান, উম্মুল-কায়ওয়ায়ন, রাসূ'ল-খায়মা ও ফুজায়রা। এই যুক্তরাষ্ট্রের মোট আয়তন প্রায় ৩২,০০০ বর্গমাইল (৮২,৮৮০ বর্গ কি. মি.) এবং জনসংখ্যা (১৯৮৫ খৃস্টাব্দের আদমশুমারী অনুসারে) ১২, ৮৩,০০০ আনু. (The World Almanac, 1987, p. 624)।

১৯৭১ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সাতটি শায়খ-শাসিত রাজ্য গ্রেট বৃটেনের সহিত কতগুলি চুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত ছিল। প্রাচীনতম চুক্তিটির তারিখ ছিল ১২৩৬/১৮২০, যদ্দারা বৃটেন শায়খশাসিত রাজ্যগুলির বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা, দীর্ঘকাল ধরিয়া বিদ্যমান সামুদ্রিক বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি পালন এবং 'আরব রাজ্য কর্তৃক জলদস্যুতা ও দাস ব্যবসা হইতে বিরত থাকার চুক্তিবদ্ধ দায়িত্ব পালন সুনিশ্চিত করে। সাধারণত স্বীকৃত ছিল যে, চুক্তিবদ্ধ শায়খশাসিত রাজ্যগুলিকে বিদেশী আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব বৃটেনের উপর অর্পিত। ১৩৭১-২/১৯৫২ সনে শায়খ-শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টির উদ্দেশে সাতটি রাজ্যের শাসক সমন্বিত একটি রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ লওয়া হয়। পরবর্তী পদক্ষেপগুলি ছিল চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির উন্নয়ন পরিষদ গঠন, যাহার উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক, বিশেষত কৃষিকাজের উন্নতি সাধন এবং চুক্তিবদ্ধ ওমান স্কাউট সংগঠন (জর্দানী 'আরব Legion- এর আদর্শে ১৯৫০ সনে প্রথম Trucial Oman Levies হিসাবে গঠিত) যাহার উদ্দেশ্য শায়খশাসিত রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ ও সীমান্ত শান্তি সংরক্ষণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৩৭৪-৫/১৯৫৫ ও ১৩৮০-১/১৯৬১ সনগুলির মধ্যে এই রাজ্যগুলির সীমান্ত চিহ্নিত করা হইয়াছিল।

শাওয়াল ১৩৮৭/জানুয়ারী ১৯৬৮ সনে বৃটিশ সরকার ঘোষণা দেন যে, তাহারা ১৯৭১ সনের (যু'ল-কা'দা, ১৩৯০) শেষ নাগাদ উপসাগরে তাহাদের বিশেষ অবস্থান হইতে সরিয়া দাঁড়াইবে এবং একই সময়ে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলি এবং বাহ'রায়ন ও কা'তারের সহিত তাহাদের চুক্তি সম্পর্ক বিলুপ্ত করিতে ইচ্ছুক। এই ঘোষণার এক মাস পর আবূ যাবী ও দুবায়্যির শাসকগণ ঘোষণা করেন (১৯ যু'ল কা'দা, ১৩৮৭/১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮) যে, তাঁহাদের বৈদেশিক ও প্রতিরক্ষা নীতিসমূহের সমন্বয় সাধন ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও অভিবাসন (imigration) বিষয়ে সহযোগিতার অভিপ্রায়ে তাঁহারা দুইটি শায়খ-শাসিত রাজ্যের একটি সংঘ গঠন করিবেন। তাঁহাদের প্ররোচনায় চুক্তিভুক্ত শায়খগণ এবং বাহ্‌রায়ন ও কাতারের শাসকদের একটি সম্মেলন পরবর্তী সপ্তাহে দুবায়্যি-এ অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৮ যুল-কাদা/২৭ ফেব্রুয়ারী তারিখে নয়টি শায়খ-শাসিত রাষ্ট্রের একটি ফেডারেশন গঠনের লক্ষ্যে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নয়জন শাসক সমন্বয়ে গঠিত সর্বোচ্চ পরিষদকে ফেডারেশনের সর্বময় ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। পক্ষান্তরে নির্বাহী ক্ষমতা একটি ফেডারেল-কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত হয়। 'আরব আমীরাত ফেডারেশন (ইত্তিহ'াদু'ল-ইমারাতি'ল 'আরাবিয়্যা) গঠনের চুক্তি যু'ল-কা'দার শেষ দিন ১৩৮৭/৩০ মার্চ, ১৯৬৮ সনে কার্যকরী হইবে।

পরবর্তী দুই বৎসরে ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন অগ্রগতি সাধিত হয় নাই। একটি অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা, একটি সংযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা, সমন্বিত চিকিৎসা, সামাজিক সেবা প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রারম্ভিক কাজের দায়িত্ব কতকগুলি কমিটির উপর অর্পিত হয়, কিন্তু তাহাদের কর্তৃত্বের অভাবে এবং দীর্ঘসূত্রিতার দরুন উহার কার্যকারিতা ব্যাহত হয়। যাহা হউক, প্রধান বাধাগুলি ছিল মূলত রাজনৈতিক। প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী শায়খ-শাসিত রাজ্যগুলি আঞ্চলিক কলহ, বংশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও গোত্রীয় বিরোধের প্রশ্নে পারস্পরিক বিবাদ ও প্রকাশ্য সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। ফেডারেশন গঠনের আলাপ-আলোচনা চলাকালে অস্থায়ী ফেডারেল রাজধানীর স্থান নির্বাচন, ফেডারেশন প্রেসিডেন্টের কার্যকাল ও নির্বাচন (Selection) এবং সর্বোপরি সর্বোচ্চ ও ফেডারেল কাউন্সিলসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন ও প্রস্তাবিত পরামর্শ পরিষদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নের তিক্ত বিরোধ আত্মপ্রকাশ করে।

বাহ'রায়ন ও কা'তার দাবী করে যে, সর্বোচ্চ পরিষদে তাহাদের, আবূ জাবী ও দুবাই প্রতিটির একটি করিয়া ভোট থাকিবে, অপরপক্ষে বাকী পাঁচটি রাজ্যের (Truical state) যৌথভাবে একটি মাত্র ভোট

থাকিবে। তাঁহারা আরও দাবী করেন যে, পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সকল সিদ্ধান্তই সর্বসম্মত হইতে হইবে। সর্বসম্মত অথবা অধিকাংশ সিদ্ধান্তের প্রশ্নে মতবিরোধ থাকিলেও চুক্তিবদ্ধ রাজ্যগুলি ভোটাধিকার ক্ষেত্রে সম অধিকার দাবী করে। আবূ জা'বী সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের নীতিতে সর্বাধিক জোর দেয়। সম্ভবত প্রস্তাবিত পরামর্শ পরিষদে আসন বণ্টন প্রশ্নে সর্বাধিক মতভেদ ছিল। বাহ'রায়ন জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের দাবী করে যাহাতে সে অপর আটটি রাজ্যের সম্মিলিত আসন সংখ্যার দ্বিগুণ আসন লাভ করিত। এই একমাত্র কারণেই অন্যান্য রাজ্য সমান আসন সংখ্যা দাবী করে। ফেডারেশনে বাহ'রায়নের ৩২১ আধিপত্যের ভীতি শুধু ইহার সংখ্যাসংক্রান্ত শক্তির জন্যই ছিল না, বরং ইহার জনগণের উচ্চতর দক্ষতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণেও ছিল। সম্ভবত একমাত্র এই সর্বাধিক শক্তিশালী কারণেই নয়টি শায়খ-শাসিত রাজ্যের ফেডারেশনের ধারণা দুর্বল হইয়া পরিণামে ভাঙ্গিয়া যায়।

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল দুইটি শায়খ-শাসিত রাজ্যের উপর উদ্যত খড়্গের ন্যায় আঞ্চলিক দাবী, বাহ'রায়নের উপর পারস্যের সার্বভৌমত্ব এবং অপরটি উমানের সীমান্ত বরাবর বুরায়মী মরূদ্যানসহ শায়খ-শাসিত আবূজাবী রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের উপর সাঊদী 'আরবের দাবী। পারস্যের দাবীর বিরুদ্ধে সমর্থন লাভের ইচ্ছা ফেডারেশনে যোগদানের ক্ষেত্রে বাহ'রায়নের সিদ্ধান্তকে বহুলাংশে প্রভাবিত করিয়াছিল। যাহা হউক, অন্যান্য রাষ্ট্র বাহ'রায়নের কাঙ্ক্ষিত সমর্থন দানের মাধ্যমে পারস্যকে অসন্তুষ্ট করিতে অনিচ্ছুক ছিল। উদাহরণস্বরূপ, নিবিড় ব্যবসায়িক সম্পর্কের কারণে দুবাই পারস্যের সহিত কোনরূপ বিবাদে জড়িত হইতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিল। একইভাবে অধিকাংশ শায়খশাসিত সাঊদী আরবের সহিত আবূজা'বীর সীমান্ত বিরোধে জড়িত হইতে ইচ্ছুক ছিল না। কা'তারের সহিত সাঊদী সম্পর্ক অনেক বৎসর ধরিয়াই অন্তরঙ্গ ছিল; পক্ষান্তরে আবূজা'বীর সহিত সম্পর্ক ছিল সুদূর এবং কখনও কখনও বংশপরম্পরায় শত্রুতাপূর্ণ। বাহ'রায়ন পারস্যের বিরুদ্ধে সাঊদী কূটনৈতিক সাহায্যের উপর ভরসা করিত; পক্ষান্তরে দুবাই চুক্তিবদ্ধ উমানের রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য আবূজা'বীর সহিত দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ছিল। পার্স্যো-বাহরায়ন সমস্যা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে ১ রাবী'উল-আওয়াল, ১৩৯০/মে, ১৯৭০ সনে নয়টি শায়খশাসিত রাজ্যের ফেডারেশন সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। উভয় দলের ও সংরক্ষক শক্তি বৃটেনের অনুরোধে শায়খশাসিত রাজ্যের ভবিষ্যত রাজনৈতিক মর্যাদা ও পারস্যের সহিত ইহার সম্পর্কের ব্যাপারে বাহ'রায়নের জনগণের ইচ্ছা নির্ধারণের উদ্দেশে মুহ'াররাম ১৩৯০/মার্চ ১৯৭০ সনে জাতিসংঘের মহাসচিব একজন ব্যক্তিগত প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। উক্ত প্রতিনিধি মে মাসের প্রারম্ভে রিপোর্ট পেশ করেন যে, বাহ্'রায়নের জনগণ একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবীতে প্রায় ঐক্যবদ্ধ এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ একটি 'আরব রাষ্ট্র স্থাপনে ইচ্ছুক। নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে ১১ মে তারিখে রিপোর্টটি অনুমোদন করে এবং ঐ মাস (রাবী'উল-আওয়াল, ১৩৯০)-এর শেষ দিকে পারস্য সরকার উহা গ্রহণ করে। বাহ'রায়নের উপর পারস্যের দাবী পরিত্যক্ত হইলেও ফেডারেশনের আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি অন্যান্য হুমকির উপর ইহার কোন প্রভাব পড়ে নাই, যদিও ঐ সময় হইতে ইহা 'আরব আমীরাত ফেডারেশনের প্রতি বাহ'রায়নের দৃষ্টিভঙ্গী নির্ধারণ করে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সাঊদী 'আরব আবূজা'বীর পশ্চিমে ও দক্ষিণ অঞ্চল এবং বুরায়মী মরূদ্যানের উপর পুনরায় দৃঢ়রূপে তাহাদের দাবী উত্থাপন করে। এক পক্ষকাল পরে পারস্য আবূ মূসা দ্বীপপুঞ্জ ও হুরমুয প্রণালীর পশ্চিমে উপসাগরের কয়েক মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর তুনব (তুন্‌ব-ই-বুযুরক ও নাহিয়্যি তুন্‌ব)-এর উপর দাবী উত্থাপন করে। আবূ মূসা এই সময় অবধি চুক্তিবদ্ধ শায়খ শাসিত রাজ্য আশ-শারিকার একটি অধিকৃত রাজ্যে ও তুন্‌বস রাসূল-খায়মার মালিকানাধীন বলিয়া বিবেচিত হইত।

পারস্যের দাবী নিশ্চিতরূপে প্রত্যাহৃত হইবার পর আবূ মূসা ও তুনবস বিরোধে আশ-শারিকা ও রা'সূল- খায়মার পক্ষাবলম্বন করিয়া পারস্যের সহিত সংঘর্ষের নূতন উৎস সৃষ্টি করিতে বাহরায়নীগণ ইচ্ছুক ছিল না। এই সতর্কতা, প্রস্তাবিত ফেডারেশনে বাহ'রায়নের স্বার্থ ও মর্যাদার প্রতি প্রদত্ত গুরুত্ব অপর্যাপ্ত বিবেচিত হইবার কারণে অসন্তোষ এবং সাঊদী 'আরবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে আবূজা'বীর পক্ষাবলম্বন অনীহার সহিত যুক্ত হইয়া বাহ'রায়নকে ১৯৭০ সালের মে মাসের পরে এসব রাজনৈতিক কর্মপন্থা অনুসরণে অনুপ্রাণিত করে যাহা ক্রমান্বয়ে ইহাকে ফেডারেশনের বিপরীত স্বাধীনতার দিকে আকর্ষণ করে। কিছুটা অভিমান ও কিছুটা রাজনৈতিক সুবিধা অর্জন ও পরিণাম দর্শিতার কারণে কা'তারকে বাহ'রায়নের অভিপ্রায় অনুসারে চলিতে হইত (এক শতাব্দী ধরিয়া ইহার শাসক পরিবার বাহ'রায়নের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল)। বৃটেনে ১৯৭০ সালের জুন নির্বাচনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত রক্ষণশীল সরকার ইহার পূর্বতন সরকারের ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুসরণে ১৯৭১ সালের শেষে উপসাগরীয় এলাকা হইতে সরিয়া আসিবে এই ঘোষণা চূড়ান্ত উদ্দীপনা যোগায় (সিদ্ধান্তটি ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ঘোষিত হইলেও ইহা কিছু দিন আগেই গ্রহণ করা হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ রহিয়াছে)। বাহ'রায়ন, ২২ জুমাদা'ছ-ছানী, ১৩৯৯/১৪ আগস্ট, ১৯৭১ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং কা'তার ১১ রাজাব, ১৩৯১/১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সনে কা'তার বাহ'রায়নের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে চুক্তিবদ্ধ (Trucial States) সাতটি রাজ্যের ছয়টি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, নয়টি শায়খশাসিত রাজ্যের ফেডারেশন গঠন অসম্ভব বিধায় তাহারা নিজেরাই একটি ফেডারেশন গঠন করিবে। তদনুসারে ২৫ জুমাদাল-আওয়া'ল, ১৩৯১/১৮ জুলাই, ১৯৭১ সনে দুবাইতে সংযুক্ত আরব আমীরাতে (আল-ইমারাতু'ল-'আরাবিয়্যাতু'ল মুত্তাহি'দা) নামে একটি চুক্তিবদ্ধ ফেডারেশনের গঠন ঘোষণা করা হয়। রা'সূ'ল-খায়মার শাসক শায়খ সাক্‌র ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-কা'সিমী কিছুটা তুনবস-এর প্রতি পারস্যের দাবীর বিরোধিতার ব্যাপারে ইহার সদস্যগণ তাঁহাকে সক্রিয় সহযোগিতা না দেওয়ায় এবং অংশত আবূজা'বী ও দুবাই-এর শাসকগণ ফেডারেশনে যে মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী ছিল তাহার প্রতি ঈর্ষাবশত ফেডারেশনে যোগদান করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তাঁহার সহযোগী কা'সিমী শাসক, আশ-শারিকা'র শায়খ খালিদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আবূ মূসা দ্বীপে পারস্যের কর্তৃত্ব সম্প্রসারণের প্রশ্নে অধিকতর নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেন। নভেম্বরের শেষের দিকে বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ভর্তুকি ও আবূ মূসার অদূরবর্তী সামুদ্রিক তৈল ক্ষেত্র হইতে আহরিত তৈলের সমান অংশ প্রাপ্তির বিনিময়ে পারস্যের অধিকারের প্রতি তাঁহার সম্মতি পাওয়া গিয়াছিল। ১২ শাওয়াল, ১৩৯১/৩০ নভেম্বর, ১৯৭১, চুক্তিবদ্ধ রাজ্যগুলির সহিত বৃটেনের বিশেষ সন্ধি সম্পর্ক সরকারীভাবে

UNITED ARAB EMIRATES

International boundary
National capital
Pipeline
Railroad
Route of travel

0 50 100 Kilometers
0 50 100 Miles

IRAN
PERSIAN GULF
Al Jubayl
Ras Tanura
MANAMA
BAHRAIN
QATAR
DOHA
SAUDI ARABIA
Bandar-e Lengeh
STRAIT OF HORMUZ
To OMAN
Administrative line
Ra's al Khaymah
Umm al Qaywayn
'Ajmān
Ash Shāriqah
Dubayy
Hisn Dibā
Al Fujayrah
DUBAI
ABU DHABI
Al Buraymī
GULF OF OMAN
ABU DHABI
OMAN
Undefined boundary

# সংযুক্ত আরব আমীরাত

মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার নির্ধারিত দিনের পূর্ব দিন বৃহত্তর তূনব, রা'সু'ল-খায়মার শাসনকর্তার সৈনিকদের সশস্ত্র প্রতিরোধ সত্ত্বেও পারস্য বাহিনী আবূ মূসা ও তূনবস অধিকার করে। পারস্য কর্তৃক দ্বীপটি অধিকৃত হওয়ায় কয়েকটি প্রতিক্রিয়ামূলক ঘটনা ঘটে। এই সব ঘটনার মধ্যে একটি, ইরাক হইতে কয়েক সহস্র পারস্যবাসীকে বহিষ্কারকরণ, অপরটি লিবিয়া সরকার কর্তৃক বৃটিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর লিবিয়াস্থ সম্পত্তি জাতীয়করণ। সর্বাপেক্ষা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী একক প্রতিহিংসামূলক ঘটনাটি ঘটে ১৩৯১-এর যু'ল-হি'জ্জা ১৯৭২ সালের জানুয়ারীর শেষ দিকে। তখন বাহ্যত পারস্যের হাতে আবূ মূসা সমর্পণের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশে আশ-শারিক'ার শাসনকর্তা শায়খ খালিদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-কা'সিমীকে তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা ভূতপূর্ব শাসনকর্তা শায়খ সাক্‌র ইব্‌ন সুলত'ান আল-কা'সিমী হত্যা করেন। রা'সূল-খায়মার শায়খ সাক্‌র ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ এই হত্যায় এত ভীত হইয়া পড়েন যে, যু'ল-হি'জ্জা ১৩৯১/মধ্যফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ সনে তিনি ফেডারেশনে যোগদান করেন। বৃটেনের সহিত চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির সন্ধিসমূহ ১৩ শাওয়াল, ১৩৯১/১ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বাতিল হয় এবং পরের দিন সংযুক্ত 'আরব আমীরাতের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী সম্পন্ন হয়। ইহার প্রেসিডেন্ট ছিলেন আবূজাবীর শাসক শায়খ যায়দ ইব্‌ন সুলত'ান আন-নিহায়্যান ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট দুবাই-এর শাসনকর্তা শায়খ রাশিদ ইব্‌ন সা'ঈদ আল-মাকতূম। মিসরীয় আইনবিশেষজ্ঞ ড. ওয়াহীদ আর-রিফা'আতের সহিত পূর্ববর্তী দুই বৎসর যাবত আলোচনায় প্রণীত খসড়া শাসনতন্ত্র অনুসারে তাঁহারা পাঁচ বৎসর উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন এবং মেয়াদ শেষে পুনঃনিয়োগের যোগ্য বিবেচিত হইবেন। আবূজা'বী ও দুবাই-এর সীমান্ত সংলগ্ন একটি স্থানে স্থায়ী রাজধানী নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত আবূজা'বীতে সংযুক্ত 'আরব আমীরাতের (UAA) অস্থায়ী রাজধানী স্থাপন করা হয়।

ফেডারেশনের নির্বাহী ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার উৎস ও মূল সাতটি শায়খশাসিত অথবা আমীরাতের শাসকবর্গ দ্বারা গঠিত সুপ্রিম ফেডারেল কাউন্সিলে নিহিত ছিল। অধিকাংশের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং আবূজাবী ও দুবাই উভয়েই ভেটো ক্ষমতার অধিকারী। প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও অন্যান্য (প্রায় দুই ডজন) মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। সম্মিলিতভাবে তাঁহারাই ফেডারেল কাউন্সিল বা মন্ত্রীসভা। মন্ত্রীসভার মুখ্য কাজ সুপ্রীম কাউন্সিলের সিদ্ধান্তসমূহ ও প্রেসিডেন্টের নির্দেশাবলী কার্যে পরিণত করা। ধারাবিশিষ্ট খসড়া শাসনতন্ত্র পরামর্শদাতা পরিষদরূপে কাজ করিবার জন্য একটি ফেডারেল ন্যাশনাল কাউন্সিলও প্রতিষ্ঠিত করে। আমীরাতের শাসকগণ কর্তৃক দুই বৎসর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত চল্লিশ জন প্রতিনিধি দ্বারা ইহা গঠিত। ইহাতে আবূজাবী ও দুবাই প্রতিটি রাজ্যের আট জন, আশ-শারিকা ও রা'সূল-খায়মার ৬ জন এবং অন্য তিনটি রাজ্যের চারিজন করিয়া প্রতিনিধি আছে। শাসনতন্ত্র জাতীয় কাউন্সিলকে আইন সূত্রপাত করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে বলিয়া মনে হইলেও ইহার প্রধান কাজ সুস্পষ্টত মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক পেশকৃত বাজেট ও খসড়া আইন আলোচনা ও অনুমোদন করা। সংবিধানে ফেডারেশনের জন্য একটি সর্বোচ্চ বিচারালয় ও কিছু সংখ্যক প্রাথমিক আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ফেডারেশনের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে ভাইসপ্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রী, প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ বিভাগের মন্ত্রীবর্গ ও চুক্তিবদ্ধ উমান স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে (Trucial Omman Scouts) কেন্দ্র করিয়া গঠিত সম্মিলিত প্রতিরক্ষা বাহিনীর (Union Defence Force) অধিনায়ক সমন্বয়ে গঠিত একটি উচ্চতর প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত।

সংযুক্ত 'আরব আমীরাতের সংবিধান ইহার ধারাগুলি ও কার্যকলাপ এই দুইয়ের মধ্যে যে ফেডারেশনে দুইটি সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী ও জনবহুল আমীরাত আবূজাবী ও দুবাইর প্রধান্য প্রতিফলিত করিয়াছে। প্রেসিডেন্ট ও ভাইসপ্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁহাদের মেয়াদ ১৩৯৬/১৯৭৬ অন্তে আবূজা'বীর শায়খ যায়দ ও দুবাইর শায়খ রাশিদ তাঁহাদের পূর্ব পদে আরও পাঁচ বৎসরের জন্য পুনঃনির্বাচিত হন। তাঁহাদের পরিবারের সুদস্যবৃন্দ ও পার্শ্বচরগণকে মন্ত্রী পরিষদের প্রধান দফতরসমূহের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। আবূজা'বী ইহার তৈল হইতে প্রাপ্ত বিরাট অঙ্কের রাজস্ব হইতে স্বতন্ত্রভাবে ফেডারেল বাজেটের প্রায় সম্পূর্ণ অর্থই যোগান দেয়। দুবাই ইহার তৈল ও বাণিজ্য হইতে মোটা রকম অর্থ অর্জন করিলেও সে প্রতীকস্বরূপ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী অর্থ দান করিতে অস্বীকৃতি জানায়)। এতদ্ব্যতীত আবূজা'বী যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী অপেক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃহত্তর ও উন্নততর অস্ত্রসজ্জিত একটি প্রতিরক্ষা বাহিনীরও অধিকর্তা। স্বাভাবিকভাবে পূর্বোল্লিখিত দুইটি শায়খশাসিত রাষ্ট্রের সামর্থ্য ও রাজনৈতিক প্রাধান্য ফেডারেশনের অন্যান্য তুলনামূলকভাবে কম ভাগ্যবান সদস্যদের মধ্যে ঈর্ষা ও কিছু পরিমাণ অসন্তোষের সঞ্চার করিয়াছিল। সম্ভবত তৈল হইতে অর্জিত মধ্যম পর্যায়ে প্রাচুর্য ভোগকারী আশ-শারিকাকে ব্যতিক্রম হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে। ভাগ্যগুণে আবূজা'বী ও দুবাই অধিকতর সম্পদশালী হওয়ায় শায়খ রাষ্ট্রগুলি আরো সুস্পষ্টভাবে উত্তরাঞ্চলীয় কাসিমী ও দাক্ষিণাঞ্চলের বানীয়াস গোষ্ঠী সমবায়ের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতার ভাবকে চিরস্থায়ী ও প্রবলতর করিয়াছে। ফেডারেশনভুক্ত রাষ্ট্রগুলির সম্পদের সামঞ্জস্যহীনতা এবং অতীতের গোত্রীয় ও বংশগত গৃহবিবাদ-জনিত হিংসা ছাড়াও অসন্তোষের আরও কারণ রহিয়াছে। সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলি প্রবল অস্থিতিকর। সর্বপ্রকার অধিবাসীদের বহুল আগমন ঐতিহ্যবাহী সমাজ কাঠামো ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। অনর্জিত অপরিমেয় প্রাচুর্য রীতিগত নৈতিক চরিত্র, মূল্যবোধ ও সংযমে অবক্ষয় সূচিত করিয়াছে। বিদেশী ভাবাদর্শভিত্তিক ধ্যান-ধারণা ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক নিশ্চয়তার ধ্বংস সাধন করিয়াছে। এই অবস্থার চরম পরিণতি কি হইতে পারে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। সংযুক্ত 'আরব আমীরাতের (UAA) মূল ভিত্তি ছিল এবং এখনও আছে, সদস্য রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের ঐক্য, বিশেষত উপসাগরীয় বৃহত্তর শক্তিগুলির বিরুদ্ধে পারস্পরিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা। এইভাবে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটি অভ্যন্তরীণ ঐক্যনাশক চাপ সহ্য করিবার মত যথেষ্ট শক্তিশালী কিনা তাহা ভবিষ্যতই বলিতে পারে।

**গ্রন্থপঞ্জী** : (১) ওয়াহ'ীদ আর-রিফা'আত, The Union of Arabian Gulf Amirates, in Revue egyptienne de droit international, ২৬খ., (১৯৭০ খৃ.), (২) Constitution of the UAA, in Middle East Journal, ২৭খ (১৯৭২খৃ.), ৩০৭-২৫; (৩) J. D. Anthony, Arab states of the Lower Gulf, Washington, D. C. ১৯৭৫ খৃ., ৯৭-১২২; (৪) Middle East Record, ৪খ (১৯৬৮ খৃ.), জেরুসালেম ১৯৭৩ খৃ., ৬৬৭ প. ও ৫খ (১৯৬৯-৭০), জেরুসালেম ১৯৭৭ খৃ., ৯৯২-১০০৪।

J. B. Kelly (E.I.[2] Suppl.)/মুহাঃ আবু তাহের

**ইমালা** (إمالة) ঃ ঝুকান, নোয়ান। বাব ইফ'আল-এর মাস্দার। মূল ধাতু م-ي-ل একটি ধ্বনিগত বিষয় যাহা ফাতহা-কে কাস্রা ও আলিফকে য়াতে পরিবর্তিত করিবার ফলে উৎপন্ন হয়। আলিফের অব্যবহিত পরে কাস্রা অথবা য়া 'ي' হইবার ফলে এইরূপ ধ্বনিগত পরিবর্তন হয় (ইব্নু'স-সাররাজ, মূযাজ, পৃ. ১৩৯) অথবা ইহা এমন কোন হারাকাতযুক্ত হরফের পরিবর্তনের ফলে হয় (যাহা কাস্রাযুক্ত অথবা উক্ত হরফের পূর্ববর্তী হরফ য়া হয়) অথবা আলিফ হরফটি বিশেষ স্থানে ব্যবহৃত হইবার ফলে য়াতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। আধুনিক ধ্বনিবিদ্যা ইহাকে তালব্যকরণ হিসাবে মনে করে, যাহা তালুর অগ্রবর্তী অঞ্চলে, হিজ্বার ঊর্ধ্ব দিকে আন্দোলিত হইবার ফলে উৎপন্ন হয়। এই আন্দোলনের ব্যাপ্তির উপর নির্ভর করিয়া স্বরবর্ণ 'আ' ইহার উচ্চারিত হইবার স্থান হইতে 'ই'-এর এলাকায় স্থানান্তরিত হয়। আরব ব্যাকরণবিদগণ ইমালাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইমালা শাদীদা কঠিন (সম্ভবত আ-ই) ও ইমালা মুতাওয়াসতিয়া মধ্যম (সম্ভবত আ-আ)। তাঁহারা (বৈয়াকরণ) ইমালা বলিতে বুঝান আলিফের নিকটবর্তী য়া অথবা কাস্রা-এর উপস্থিতিতে সৃষ্ট অবস্থা, যাহা আলিফকে উহাদের আরও অনুরূপ করিবার জন্য নিজেদের দিকে টানে। সীবাওয়ায়হি তাঁহার পুস্তকের ৪৭৭ অনুচ্ছেদে আলিফ সংক্রান্ত ইমালা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ যখন একই শব্দাংশে (syllable) আলিফের একেবারেই পূর্ববর্তী বা পরবর্তীতে কাস্রা হয়, যেমন 'আলিম (عالم), মাসাজিদ (مساجد) ইত্যাদি। নিম্নলিখিতগুলি অবশ্য ইমালাবিহীন (২খ, ২৮০, লাইন ২, ৪-৬) আজুরর (ইট), তাবাল (গুঁড়া মশলা), জামাদ (খনিজ দ্রব্য) ইত্যাদি।

**ইমালা** ঃ এক ধরনের ধ্বনিগত পরিবর্তন যাহার বর্ণনা প্রাচীন 'আরবের নাহ্ওশাস্ত্রবিদ ও তাফসীরকারগণও করিয়াছেন। কখনও কখনও ফাত্হা-এর কাস্রা-এর প্রতি ঝুঁকিবার ব্যাপারও বর্ণিত হইয়াছে; যেমন যামাখশারী-এর সংজ্ঞায় প্রকাশ। এমনও হইতে পারে যে, কাস্রা-এর উচ্চারণ, যাহা হইতে ইমালা উৎপন্ন হয় প্রকৃতপক্ষে প্রকাশিতই নয়, বরং শুধু মূলেই (مادة) নিহিত রহিয়াছে। এই প্রকারের শব্দসমূহের মধ্যে افعال-এর রূপগুলি বিদ্যমান, যেমন মূল ر-م-ى হইতে رمى-এর উপর ধারণা (কি'য়াস) করিয়া غزى (প্রকৃতপক্ষে এখানে মূলে و ছিল অর্থাৎ غ-ز-و এবং অনুরূপভাবে নামবাচক শব্দ (اسماء), যেমন মূল ف-ت-ى হইতে فتى তদ্রূপ যে সমস্ত ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী কালিমা (বর্ণ) য়া অথবা ওয়াও' হয় সে ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন خوف হইতে خاف এবং طيب হইতে طاب (অনুরূপভাবে নামবাচক শব্দ, যেমন نيب হইতে ناب ও نوب হইতে ابا ب। কিছু কিছু ব্যতিক্রমী অবস্থাও দৃষ্ট হয়, উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় যাহার ব্যাখ্যা করা যায় না। অত্যধিক ব্যবহারের ফলে অনেক সময়ে ইমালা হইয়া যায়।

সীবাওয়ায়হি তাহার পুস্তকের ৪৮০ অনুচ্ছেদে ইমালা প্রতিরোধকারী হরফসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন ৭টি সাহীহ হরফ ص ض ط ظ ع غ ও ق-এর ক্ষেত্রে ইমালা হয় না। অবশ্য শর্ত এই যে, ইহাদের কোন একটি পূর্ববর্তী বা পরবর্তী হরফ হিসাবে যদি ইহার সহিত মিলিত হয়, আর যদি ইহা আলিফ মামদূদা হইতে দূরে অবস্থিত হয় তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ম রহিয়াছে। উল্লেখ্য যে, এই সা'হীহ হরফসমূহ ঐ সকল ক্ষেত্রে ইমালা-এর প্রতিরোধকারী নয় যেখানে য়া-এর মূল ধ্বনি বিদ্যমান থাকে না। যেমন طاب-এর উদাহরণে প্রকাশ। 'রা' (ر)-এর ব্যাপারটি সম্পূর্ণ পৃথক। 'রা' অথবা 'রু' ইলামা-এর প্রতিরোধকারী হয়, যেমন অন্যান্য হরফে খাসসা বা মুসতা'লিয়া; অন্যপক্ষে (ر) রি' সাধারণভাবে ইমালা উৎপন্ন করে, অথচ হুরূফে খাস্‌সা হইলে ইমালা হয় না।

ইমালা প্রাচীন আরবী ভাষার কী পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য তাহা নিরূপণ করা কঠিন। প্রাচীন বর্ণনার পরস্পরবিরোধী মতামত হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, ইহা কিছু কিছু গোত্রের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ছিল। সম্প্রতি Chr. Sarauw সীবাওয়ায়হি-এর উদ্ধৃতি দ্বারা ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইমালা-এর যে প্রকারটি কাস্রা হইতে উৎপন্ন হয় উহা পূর্ব-'আরবে খুবই সাধারণ ছিল এবং ইহা তুলনামূলকভাবে বর্তমানকালের ব্যাপার। দ্বিতীয় প্রকারটি হি'জায-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং মূল শামী-এর 'ঈ' (اى) ধ্বনির প্রতিনিধিত্বকারী। প্রাচীন যুগে ইলামা কতদূর বিস্তৃতি লাভ করে? এই প্রশ্নের জওয়াবের জন্য সেই সকল 'আরবী নাম ও শব্দাবলী খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাহা বাহিরের দেশসমূহের রচনায় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বর্তমানের কথ্য ভাষায়ও এক ধরনের ইমালা পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাকে পুস্তকে বর্ণিত (লেখ্য) ইমালা হইতে পৃথক হিসাবেই বিবেচনা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ বৈরূতের প্রবচনে (محاورة) ইমালা-এর নিকটবর্তী হু'রূফ সা'হীহা-এর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং কাস্রা-এর ধ্বনি খুব কমই প্রভাব বিস্তার করে, (যেমন ر-এর সঙ্গে)। সুতরাং ইহা ফাতহা' হইতে আলিফ-এর দিকে সরাসরি অতিক্রান্ত হয়। সকল ধ্বনি ইমালা-এর প্রতিবন্ধক শুধু তীব্র ও হালকাই হয় না, বরং হানজারী (حنجرى) কণ্ঠ)-ও হয়।

ফার্সী ও উর্দূ ভাষায়ও ইমালা হয়। ফার্সীতে কখনও কখনও গদ্যে উহার প্রয়োজন হয় এবং আলিফ য়ায়ে, মাজহুলে পরিবর্তিত হইয়া যায়, যেমন ركاب হইতে ركيب উর্দূতে ইমালা খুবই সাধারণ, যেখানে আলিফ মাক'সূ'রাই শুধু নয়, 'হা'-এর হাওওয়ায (ه) ও য়ায়ে মাজহূলে পরিবর্তিত হইয়া যায়, যেমন بنده হইতে بندے এবং گدها হইতে گدهے। ইহার বিভিন্ন নিয়মের জন্য দেখুন নূরু'ল-লুগাত।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত সূত্রাবলী ছাড়াও দ্রষ্টব্য (১) সীবাওয়ায়হি-এর অনুচ্ছেদ ৪৭৭-৮২ (প্যারিস ২খ, ২৭৯-৯৪, কায়রো, ২খ, ২৫৯-৮১); ر সম্পর্কিত বর্ণনার জন্য ৪৮১-২ অনুচ্ছেদ দ্র.; (২) 'আরব বৈয়াকরণগণ কর্তৃক পুনর্লিখিত তথ্য, দেখুন ইব্নু'স-সাররাজ-এর "ছয়টি কারণ", মূযাজ, বৈরূত ১৩৮৫/১৯৬৫, পৃ. ১৩৯-৪০; (৩) যামাখশারী, মুফাস্সাল (২য় সং J.P. Broch); (৪) 'আবদু'র-রাহীম, গা'য়াতু'ল-বায়ান ফী 'ইলমি'ল-লিসান, কলিকাতা ১২৪৪ হি., পৃ. ১০৫; (৫) মুহাম্মাদ হুসায়ন আযাদ, জামি'উ'ল-কাওয়া'ইদ, প্রকাশক সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড, লাহোর ১৯৫৭ খৃ., ১২; (৬) E.H. Palmer, A Grammar of the Arabic Language, লন্ডন ১৮৭৪ খৃ., পৃ. ৯; (৭) W. Wright, Grammar of the Arabic Language, কেম্ব্রিজ, ১৯৫১ খৃ., ১খ, পৃ. ১০ ; (৮) Max Th. Grunert, Die Imala, der Umlaut im Arabischen, ভিয়েনা ১৮৭৬ খৃ., (Sitzungsber d. Wien Akad. phil-hist. Cl., ৮১খ, ৪৪৭-৫৪২) যেখানে বিশেষত প্রাচীন উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে; (৯) J Karabacek, Zur kenntins des umlautes im Arabischen, Mitt. a. d. Samml. d. Pap. Erzh. Rainer- এ ৫খ, ৫৯-৬২; (১০) J. Barth A.

Fischer, Ursemit, e, etc., Zeitschr. der Deutsch. Morg. Gesellsch-এ পৃ. ৫৯, ৬৩৩ হইতে ৬৭১; (১১) Chr. Sarauw. Die altarabische Dia lektspaltung, Zeitschr. f. Assyr- এ ২১খ, ৩১-৪৯; (১২) A. Schaade, Sibawaihi's Lautlehre, লন্ডন ১৯১১ খৃ., বিশেষত পৃ. ৩৮-৪৫।

Emanel Mattsson and Ed. (H. Fleisch)
(E.I.[2] ও দা. মা. ই.)/মোঃ রেজাউল করিম

**ইযনীক** (إزنيق) ঃ প্রাচীন ও বায়যানটাইন নীসিয়া (Nicaea) (ইব্ন খুররাদাযবিহ ও আল-ইদ্রীসীর গ্রন্থে নীক'য়া (نيقية)। ইযনীক শহর ৯৯/৭১৭ ও ১০৭/৭২৫ সনে বায়যানটিয়ামের বিরুদ্ধে 'আরবদের প্রথম অভিযানকালে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু এই অবরোধ তেমন কার্যকর হয় নাই (Theophanes, সম্পা. de Boor, ১খ, ৩৯৭ ও ৪০৫ প.) এবং ইহা ১০৮১ খৃস্টাব্দের শুরুতে ৪৭৩ হিজরীর মধ্যভাগে) কুতলুমুশ-এর পুত্র সালজূক সুলায়মানের করতলগত হইয়াছিল। তিনি সেইখানে তাঁহার বাসভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন। ৪৮৯/১০৯৬ সনে Walter Sans Avoir-এর নেতৃত্বে প্রথম ক্রুসেড যোদ্ধাগণ সুলত'ান সুলায়মানের পুত্র ও উত্তরাধিকারী আল্প আরস্লান কর্তৃক নীসিয়ার সন্নিকটে ভীষণভাবে পরাজিত হইয়াছিল। যাহা হউক, পরবর্তী বৎসর Godfrey de Bouillon-এর পরিচালনাধীনে ক্রুসেড যোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণকে প্রতিহত করিতে না পারিয়া ৫-৬ রাজাব ৪৯০/১৯-২০ জুন, ১০৯৭ সনে ক্রুসেড যোদ্ধাদের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ বায়যানটীয়দের নিকট শহরটি আত্মসমর্পণ করিয়াছিল এবং তুর্কীদের আক্রমণ পর্যন্ত হইয়া তাহাদের অধিকারেই রহিয়াছিল। কথিত আছে, সুলত'ান ১ম 'উছ'মান নীসিয়া শহরটির উপর একটি ব্যর্থ আক্রমণ চালাইয়াছিলেন, কিন্তু ৭৩১/১৩৩১ সনে এই শহরটি তুর্কীদের শাসনাধীনে আসে সুলত'ান ওরখান-এর রাজত্বকালে দীর্ঘ অবরোধের পর। অতঃপর তিনি কিছুকালের জন্য সেইখানে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন ('আশিক' পাশাযাদে ও Leunclavius, Hist., পৃ. ১৯৫; তু. Nicephorus Gregoras, ৩খ, ৫০৮ প.)। ৮০৪/১৪০২ সনে এই শহরটি তৈমুর লং-এর সৈন্যদের একটি দাঙ্গাকারী দল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল (Ducas, পৃ. ৭২; শারফুদ্দীন, জা'ফারনামা, ২খ, ৪৫৪), কিন্তু অচিরেই শহরটি এই দুরবস্থা কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছিল; রাজপুত্র ক'ারা মুস্ত'াফার বিদ্রোহের সময় উন্নত সমৃদ্ধিশালী শহর হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিল (Leunclavius, Hist., পৃ. ৫২৫, ছত্র ৪৬)। কথিত আছে, ২য় বায়াযীদ তাঁহার পিতা ২য় মুহ'াম্মাদের ইনতিকালের পরে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া নীসিয়াতে অবসর গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

১১শ/১৭শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে এই শহরটির পতন আরম্ভ হইয়াছিল এবং তৎকালীন নিরূপিত দশ হাজার (Grelot) জনসংখ্যা ১৯শ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রায় ১৫ শতে হ্রাস পাইয়াছিল, আবার ইহার সংখ্যা ১৯৬০ খৃ., ৬২৯০ জনে দাঁড়াইয়াছিল। প্রশাসনিক দিক দিয়া ইযনীক বর্তমানে ব্রুসা (Brussa) প্রদেশের (বিলায়াত) অন্তর্গত একটি জেলার প্রধান কেন্দ্র। তুলনামূলকভাবে বর্তমান শহরটি প্রাচীন শহর-প্রাচীরের মধ্যে পরিবেষ্টিত অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। যেই সব পুরাকীর্তি সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে সংরক্ষিত রহিয়াছে সেইগুলি হইতেছে রোমান ও বায়যানটাইন কর্তৃক নির্মিত দুর্ভেদ্য প্রাচীরসমূহ (যেইগুলির সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন Prokesch ও Texier, এই বিষয়ে Korte, Mitt, des Deutsch. Arch. Instituts, গ্রন্থে ২৪ খ. ৩৯৮-৪০৯); এইগুলিতে রহিয়াছে বহু সংখ্যক বিশাল তোরণ ও ২৩৮ টি আত্মরক্ষার স্থান Texier। এই সমস্ত প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বায়যানটাইনের ভূমিকা Leo III the Insaurian-এর রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং তিনি এইগুলি ৭২৬ খৃ. 'আরবদের আক্রমণের পরে নির্মাণ করিয়াছিলেন (Corp. Inscr. Graec., নং ৮৮৬৪)। অতঃপর ৮৫৮ খৃ. Michael III ও ইহার কিছুকাল পরে Theodore Lascaris (Corp. Inscr. graec., নং ৮৭৪৫-৮৭৪৭) সেইগুলিকে উন্নত ও সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

ইসলামী স্মৃতিস্তম্ভের এই শহরটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই স্মৃতিস্তম্ভসমূহের কতকগুলির কাজ প্রাথমিক তুর্কী ('উছ'মানী) শাসনামলে আরম্ভ হইয়াছিল। সুলত'ান ওরখান ইযনীক বিজয়ের অব্যবহিত পরে আয়া সোফিয়া (Aya Sofya) গির্জাটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। ১১শ/১৭শ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইহাকে পুনরায় সুসজ্জিত করা হয় এবং ইহার কি'বলামুখী দেওয়ালটি উজ্জ্বল চীনা মাটির টালি দ্বারা আবৃত করা হয় (Katharina Otto-Dorn, Das islamiche Iznik, বার্লিন ১৯৪১ খৃ., পৃ. ৯-১৩, সংক্ষিপ্ত পৃ. ১-৩, সারণী ২-৩)। সুলত'ান ওরখান এই মসজিদটির পার্শ্বে একটি মাদরাসাও নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা ছিল তুর্কী (Ottoman) সাম্রাজ্যের প্রথম মাদরাসা (Dorn, পূ. গ্র., পৃ. ১০)। তিনি শহর প্রাচীরের বাহিরে ইয়েনিসেহির ফটক (Yenisehir Gate) হইতে ৪০০ মিটার দূরে আর একটি ছোট মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই মসজিদটির নামকরণ তাঁহার নামে হইয়াছিল। পূর্বে বিশ্বাস করা হইত যে, শহরটি অধিকার করিবার পূর্বে ইহার পত্তন হইয়াছিল, কিন্তু ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ খৃ. তথায় ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে ৭৩৫/১৩৩৪ সনে উল্লিখিত তারিখ প্রদত্ত একটি উৎকীর্ণ ফলক পাওয়া গিয়াছে (Oktay Aslanapa, Iznikte Sultan Orhan Imaret Camii Kazisi, পৃ. ১৬-৩১; অধিকন্তু আবদুল্লাহ কুরান, The Mosque in early Ottoman architecture, পৃ. ৭৮-৯, চিত্র ৭৭-৭৮)। সুলত'ান ওরখান-এর রাজত্বকালের আর একটি মসজিদ হইল হ'াজ্জী ওযবেগ জামি'ই (চারসী মাসজিদি নামেও পরিচিত)। ইহাই সর্বপ্রথম তুর্কী মসজিদ যথায় ৭৩৪/১৩৩৩ সনে ভিত্তি স্থাপনের তারিখবিশিষ্ট উৎকীর্ণ ফলক সংরক্ষিত হইয়াছে (Otto-Dorn, পৃ. ১৫-১৮, সংক্ষিপ্ত পৃ. ৫-৬, সারণী ৪-৫; কুরান, পৃ. ৩৪-৫, চিত্র ৬-৮)। হ'াজ্জী হ'ামযা বেগ নির্মিত মসজিদ ও গোরস্থানটি যথাক্রমে ৭৪৬/১৩৪৫ ও ৭৫০/১৩৪৯ সনে স্থাপিত হইয়াছিল (Otto-Dorn, পৃ. ১৮-২০, সংক্ষিপ্ত পৃ. ৬, সারণী ৫/৩, ৬/১-২)। ইহা আশ্চর্যরূপে লক্ষণীয় যে, এই সমস্ত প্রাথমিক মসজিদের কোনটিরই মীনার ছিল না। তবে ইহার পরবর্তী মসজিদসমূহ, যথাঃ য়াশিল জামি'ই (৭৮০/১৩৭৮-৭৯৪/১৩৯১) কুত'বুদ্দীন জামি'ই (আনু. ৮২১/১৪১৮), মাহ'মূদ চেলেবি জামি'ই (৮৪৬/১৪৪২) ও ইশরিফযাদে-ই রূমী জামি'ই (৮৭৪/১৪৬৯)-এর সালজূক পদ্ধতিতে নির্মিত মীনার আছে। এই সমস্ত মসজিদের মধ্যে সম্ভবত য়াশিল জামি'ই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, যাহার ভিতরভাগ ও মীনার উজ্জ্বল চীনা মাটির টালি দ্বারা সুসজ্জিত। ইহার মিহ'রাবটি সুসংগঠিতভাবে

মার্বেল পাথর দ্বারা নির্মিত মনোরম চিত্র খোদিত ছিল। তুর্কী মসজিদ স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে ইহাই সর্বপ্রথম নিদর্শন (Otto-Dorn পৃ. ২০-৩৩, সংক্ষিপ্ত, পৃ. ৭-১১, সারণী ৬/৩-১৭; কুরান, পৃ. ৬১-৩, চিত্র ৫২-৭)। ইহা খায়রুদ্দীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (দ্র. Djandarli)। তারিখ ফলকে উৎকীর্ণ লিপির মাধ্যমে স্থপতি হিসাবে জনৈক হ'াজ্জী মূসার নাম জানা যায়। উল্লিখিত মসজিদ কু'ত'বুদ্দীন জামি'ইর প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে কোন তারিখ পাওয়া যায় না, কিন্তু Otto-Dorn প্রমাণ সহকারে ৮২১/১৪১৮ সন ইহার প্রতিষ্ঠা বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই বৎসরই কু'ত'বুদ্দীন-এর মৃত্যু হয় Otto-Dorn, পৃ. ৩৩-৫, সংক্ষিপ্ত, পৃ. ১২, সারণী ১৯-২০)। মাহ'মূদ চেলেবি জামি'ই সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রহিয়াছে এবং ইহার মীনার উজ্জ্বল চীনা মাটির সবুজ ও নীল রঙ্গের টালি দ্বারা সুসজ্জিত, Otto-Dorn, পৃ. ৩৫-৯, সংক্ষিপ্ত, পৃ. ১৩-১৫, সারণী ২১-২)। এই মীনারবিশিষ্ট মসজিদসমূহের মধ্যে আশরাফযাদেই রূমী জামি'ই মূলত সমন্বিত সৌধমালার একটি (Complex) যাহা একটি গোরস্থান ও একটি তাকি'য়া (খানকাহ) লইয়া গঠিত। ইহা ধর্মপ্রাণ আশরাফযাদের জন্য স্থাপন করা হইয়াছিল যিনি ১২০ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন (৭৭৯/১৩৭৭- ৮৯৯/১৪৯৩)। কিন্তু ইহার একমাত্র মীনারটি, দেওয়ালসমূহের অংশ বিশেষ ও মিহ'রাবযুক্ত কি'বলা দেওয়ালটি ব্যতীত প্রায়ই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে (Otto-Dorn পৃ. ৩৯-৪৮, সংক্ষিপ্ত, পৃ. ১৬-১৮, সারণী ২৩)। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর শেষদিকে অথবা ৯ম/১৫শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইযনীক'-এ প্রতিষ্ঠিত যেই সমস্ত বৈষয়িক স্থাপত্যশিল্প অপেক্ষাকৃত অধিককাল টিকিয়া রহিয়াছে, তন্মধ্যে হ'াজ্জী হ'াম্যা হ'াম্মাম উল্লেখযোগ্য (Otto-Dorn পৃ. ৮৯-৯৫, সংক্ষিপ্ত, পৃ. ৩৯-৪০, সারণী ৩৪-৫)।

ইযনীক' এককালে মৃৎশিল্পের একটি সমৃদ্ধিশালী কেন্দ্র ছিল। ১৯৬৩ ও ১৯৬৬ খৃ. মধ্যভাগে তথায় ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তথাকথিত "মিলেটাস পণ্যদ্রব্য' (Miletus ware) ইযনীক'-এ প্রস্তুত হইত। এই পণ্যদ্রব্য লাল এঁটেল মাটি দ্বারা গঠিত হইত এবং ইহাতে নীল-হরিৎ ও বেগুনী রঙ্গের বিভিন্ন কারুকার্য করা হইত (Oktay Aslanapa, Turkische Fliesen und keramik in Anatolien, পৃ. ২৯-৩২, সংক্ষিপ্ত, পৃ. ৪-৫৮, সারণী ১২৩১, রঙ্গিন)। সম্পূর্ণ বাহিরের প্রভাবে চীনা মাটি বাসনপত্রের ন্যায় ঈষাৎ সাদা ও উজ্জ্বল কারুকার্যমণ্ডিত পাত্রগুলি এই লাল রঙ্গের পণ্যদ্রব্যসমূহের স্থান আকস্মিকভাবে দখল করিয়া নেয়। ইযনীক'-এর এই মসৃণ ও ঝকঝকে মৃৎপাত্রসমূহকে Arthur Lane প্রথমত তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন (Later Islamic Pottery, লন্ডন ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ৪০-৬০; ঐ লেখক, The Ottoman Pottery of Iznik, Ars Orientalis- এ, ২খ, ১৯৫৭, ২৫৪-৮১)। সর্বপ্রথম ভাগে চীনা প্রভাব পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হয়, যাহা সম্ভবত ৯ম/১৫শ শতাব্দীর শেষদিকে এবং ১০ম/১৬শ শতাব্দীর প্রথমদিকে আরম্ভ হইয়াছিল। পরবর্তীকালে বেগুনী ও সবুজ রং সংযুক্ত হইয়াছিল (Lane-এর দ্বিতীয় ভাগ) ও ১০ম/১৬শ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময় এইগুলির উপর ঈষৎ উজ্জ্বল এক ধরনের লাল রং দেখা যায় (তৃতীয় ভাগ)। ইযনীক'-এ ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে খোলামকুচি, চুল্লীর ধ্বংসাবশেষ ও মৃন্ময় পাত্রের চুল্লী উদ্ঘাটিত হওয়ার ফলে প্রতীয়মান হয় যে, এই সমস্ত সকল ধরনের মৃন্ময় পাত্র এই দেশেই প্রস্তুত করা হইত (Oktay Aslanapa, Pottery and kilns from the Iznik excavations পৃ. ১৪০-৬)। ১৭৩৬ খৃ. ও ইযনীক'-এ টালি ও মাটির পাত্রসমূহ প্রস্তুত হইত (Otter, Voyage en Turquie, ১খ, ৪৪), কিন্তু ইহা অচিরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহাতে মনে হয় যে, কুম্ভকাররা ইযনীক' ত্যাগ করিয়া kutahya-তে চলিয়া গিয়াছিল। সেইখানে তাহারা মৃৎপাত্র নির্মাণে ইযনীক'-এর ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্‌ন খুররাদাযবিহ্, পৃ. ১৭; (২) ইব্‌ন বাত্‌তা, প্যারিস সং, ২খ, ৩২৩-৫; (৩) ইং. অনু. ২খ, ৩২৩-৫; (৩) ইং. অনু. ২খ, ৪৫২-৪; (৪) Busbecq, Epistolae, ed. Plantin ১৫৮৫ খৃ. পত্রক ৩১; (৫) Grelot, Relation nouvelle d'un Voyage a Constantinople, পৃ. ৪৫-৭; (৬) আওলিয়া চেলেবী, সিয়াহ'তনামে, ৩খ, ৭-১০; (৭) কাতিব চেলেবী, জাহান্নুমা, পৃ. ৬৬২ প.; (৮) Paul Lucas, Voyage dans la Grece, l'Asie Mineure etc., আমস্টারডাম ১৭১৪ খৃ., ১খ, ৬৫-৭২; (৯) Pococke, Description of the East, ২খ, ২, ১২১-৩; (১০) Sestini, Voyage dans la Grece asiatique, প্যারিস ১৭৮৯ খৃ., পৃ. ২১৩-২০; (১১) v. Hammer, Umblick auf einer Reise von Constantinopel nach Brussa, পেস্ট ১৮১৮ খৃ., পৃ. ৯৯-১২৫; (১২) ঐ লেখক, Gesch d. Osm. Reiches, ১খ, ১০১-৮; (১৩) Kinneir, Journey through Asia Minor, পৃ. ২৩-৩১; (১৪) মুহ'াম্মাদ আদীব, মানাসিকু'ল-হাজ্জ, ইস্তাম্বুল ১২৩২ হি., পৃ. ২৬-৭; (১৫) Prokesch von Osten Denkwurdigkeiten und Erinnerugen aus dem Orien, ৩খ, ১০৫-২৩; (১৬) Leon de Laborde, Voyage de l'Asie Mineure, পৃ. ৩৬-৪৪; (১৭) Texier, Descr. de l'asie Mineure, ১খ, ৩০-৫৮; (১৮) Ausland 1855, পৃ. ৬৮৬ প.; (১৯) সালনামা-ই খুদাওয়ানদিগার, ১২খ, ৪১৪-৬; (২০) v. d. Goltz. Anatolische Ausfluge, পৃ. ৪০৬-৪৫; (২১) ওক্‌তায় আসলানাপা, Iznikte Sultan Orhan Imaret Camii Kazisi, in Sanat Tarihi Yilligi, ইস্তাম্বুল ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ১৬-৩১; (২২) ঐ লেখক, Turkische Fliesen und Keramik in Anatolien, ইস্তাম্বুল ১৯৬৫ খৃ. ; (২৩) ঐ লেখক, Pottery and kilns from the Iznik excavations, in Forechungen zur Kunst Asiens in Memorian Kurt Erdmann, ইস্তাম্বুল ১৯৭০ খৃ., পৃ. ৪০-১৪৬; (২৪) 'আবদুল্লাহ কুরান, The Mosque in Early Ottoman Architecture, শিকাগো ও লন্ডন ১৯৬৮ খৃ., (২৫) Kathrina Otto-Dorn, Das islamische Iznik, বার্লিন ১৯৪১ খৃ.; (২৬) Views and plaus in Pococke, de laborde and Texier। গ্রীক গির্জা বিষয়ে; (২৭) Oskar Wulff, Die Koimesiskirche in Nicaea und ihre Mosaiken, স্ট্রাসবুর্গ ১৯০৩ খৃ.।

J. H. Mordtmann [G. Fehervari] (E.I.[2])/
এ. বি. এম. আবদুর রব

**ইযযাত পাশা** (عزت پاشا) ঃ আহ্‌মাদ ‘ইযযাত ফুরগাচ, (احمد عزت فرگچ) [১৮৬৪-১৯৩৭] একজন ‘উছ্‌মানী সৈনিক ও কূটনীতিক। আহ্‌মাদ ইযযাত মানাস্তীর (বর্তমানে বিতোলা, দক্ষিণ যুগোশ্লাভিয়া) প্রদেশের গরীযী (Goriaje) [বর্তমান কোরসে (Korce) দক্ষিণ আলবেনিয়া]-র নিকটবর্তী মেসিডোনীয় ক্ষুদ্র পল্লী নাসলীক (Naslic)-এ জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারটি এলাকার বিখ্যাত ‘উছমানী তুর্কী বংশীয়। তবে তাহারা মূলত তুর্কী বংশোদ্ভূত অথবা আলবেনীয় বংশীয় ইহা বিতর্কমূলক (দ্র. Inal. p. 2020, quoting General Ali Fuad [Erdem] and Klinghardt, p. 12)। তিনি ১৯৩৪ সনের তুরস্ক দেশীয় পারিবারিক নাম সম্পর্কিত আইনানুসারে ফুরগাচ নাম গ্রহণ করেন।

‘ইযযাত পাশার পিতা হ'য়দার ‘উছ্‌মানী সিভিল সার্ভিসে যোগদান করিয়া মুতাস'াররিফ (নির্বাহী কর্মকর্তা) পদে উন্নীত হন। ‘ইযযাত প্রথমত স্বীয় পিতামহ তিমুত-এর তত্ত্বাবধানে নাসলীক-এ প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। অতঃপর পিতার চাকুরীস্থলে তিনি মেসিডোনিয়া, আনাতোলিয়া ও ইস্তাম্বুলে বসবাস করেন। তিনি তের বৎসর বয়সে ইস্তাম্বুলের মাধ্যমিক সামরিক স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৮৮১-৮৭ খৃ. পর্যন্ত সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এইখানে তিনি নিয়মিত উচ্চ সামরিক কলেজ হইতে ১৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে নবম স্থান অধিকার করিয়া গ্রাজুয়েট হন। তিনি সামরিক চাকুরীতে দ্রুত উন্নতি লাভ করেন; ক্যাপ্টেন (১৮৮৭), কোলআগাসী (১৮৮৯), মেজর (১৮৯৪), লেফটেন্যান্ট কর্নেল (১৮৯৮), কর্নেল (১৯০১), ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (১৯০৫), লেফটেন্যান্ট জেনারেল (ফারীক, ১৯০৭), জেনারেল বিরিঞ্জী ফারীক (১৯০৮), মার্শাল (১৯১৮)। ১৯১৩ খৃ. হইতে তিনি তদানীন্তন সুলত'ানের আজীবন Aide-de-Camp নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯১২ সনে সিনেটের সদস্য মনোনীত হন।

সামরিক কলেজ (হ'ারবিয়া) হইতে গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করিবার পর ‘ইযযাত সামরিক ভূগোলের অধ্যাপক এবং ‘উছ্‌মানী সামরিক স্কুলসমূহের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল-এর সহকারী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। জার্মানীতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ (১৮৯১-৯৪) লাভের পর সিরিয়ার আল-লাযি'কিয়্যায় সংক্ষিপ্ত সময় কালের জন্য নিয়োগ পত্র প্রাপ্ত হন। পরে তিনি সোফিয়ার ‘উছমানী হাই কমিশনে সামরিক এ্যাটাচী নিযুক্ত হইয়াছিলেন (১৮৯৫-৯৬)। কেন্দ্রীয় সরকারের জনৈক প্রিয়পাত্র পরবর্তী হাই কমিশনার নিযুক্ত হইলে তিনি বদলির জন্য আবেদন করেন। গ্রীক-তুরস্ক যুদ্ধ শুরু হইলে ইযযাত পাশাকে থেসালিয়া (Thessalian) ফ্রন্টে সম্মিলিত তুর্কী সামরিক বাহিনীর জেনারেল ও যুদ্ধ পরিচালনা অফিসে নিয়োগ করা হয়। তিনি দুর্নীতি ও অযোগ্যতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য কৈফিয়তের সম্মুখীন হইলেন। অবশেষে তাঁহাকে দামিশ্‌কে রিজার্ভ বাহিনীতে শাস্তিমূলকভাবে বদলি করা হয় (১৮৯৭)। সেইখানে তিনি সামরিক ও কূটনৈতিক প্রতিভা দ্বারা বিদ্রোহী জাবাল দ্রূযকে পরাভূত করেন (১৯০২) এবং আকাবার নিকটবর্তী হিজায রেলওয়ের কাজ তদারকে তাঁহার প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক দক্ষতা প্রদর্শন করেন। ১৯০৮ খৃ. পর্যন্ত তিনি পরবর্তী প্রধান মন্ত্রী ‘আলী রিদ'া পাশার প্রথমত স্টাফ প্রধান হিসাবে য়ামানে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং ইমাম য়াহ'য়ার নেতৃত্বে যায়দী দলের বিদ্রোহ দমনের জন্য তাঁহার সেনাদলকে দ্রুত প্রেরণ করা হয়। তৎপর তিনি হুদায়দা ডিভিশনে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন (১৯০৭)। নব্য-তুর্কী বিপ্লবের দরুন লেবাননে তাঁহার গ্রীষ্মাবকাশ বিঘ্নিত হয় এবং ‘ইযযাত পাশা ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তন করেন।

von der Goltz-এর একজন উল্লেখযোগ্য শিষ্য হিসাবে ‘ইয্‌যাতের সুনাম, য়ামানের যুদ্ধে দক্ষতা প্রদর্শন ও সুলতান ‘আবদু'ল-হ'ামীদের রাজত্বকালের দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার অদম্য সাহস প্রদর্শনের জন্য পরবর্তীকালে ১৯০৮ সনের বিদ্রোহের পরে তাঁহাকে ‘উছ্‌মানী সাম্রাজ্যের প্রধান জেনারেল স্টাফ হিসাবে নিয়োগ করা হয়। আড়াই বৎসর পর্যন্ত তিনি ভন ড্যার গোল্‌য ও মাহ'মূদ শাওকাত পাশার সহিত একযোগে কাজ করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি অফিসার ও নন-কমিশণ্ড অফিসারদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতির সংস্কার ছাড়াও রিজার্ভ অফিসার বাহিনী সংগঠন করেন এবং সুদক্ষ সৈন্যদল গঠন ও রাজ্যের য়ূরোপীয় অংশের নিরাপত্তা বিধানের জন্য সৈন্য বাহিনীর পরিবহন ও যাতায়াতের আধুনিক কৌশল প্রবর্তন করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলের প্রতিবিপ্লবের সময় হারকাতে ওরদূসো (حركت اردوس) ইস্তাম্বুলের সন্নিকটবর্তী হইলে ‘ইযযাত পাশা রাজধানীতে শান্তি স্থাপন করিতে সহায়তা করেন। যুদ্ধমন্ত্রী মাহ'মুদ পাশা ও তাঁহার বৃদ্ধ শিক্ষক ভন ড্যার গোল্‌যের মধ্যে বিরোধ ‘ইযযাতের পুনঃনিয়োগের পথ প্রশস্ত হয়। আলবেনিয়ার বিদ্রোহ দমনে শাওকাতের কার্য-পদ্ধতি ইয্‌যাত সমর্থন করিতেন না এবং বিভাগীয় প্রশাসনিক অভিযান সংক্রান্ত ব্যাপারে যুদ্ধমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপের দরুন তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ইত্যবসরে ইমাম য়াহ'য়া পুনরায় সান'আ অবরোধ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে য়ামানের তুর্কী প্রধান সেনাপতি ‘আবদুল্লাহ পাশার মৃত্যুর পর ইযযাত পাশাকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া তথায় প্রেরণ করা হইল (ফেব্রুয়ারী ১৯১১-ডিসেম্বর ১৯১২)। এই সময় তিনি স্টাফ প্রধানের পদে ছুটিতে ছিলেন। তিনি য়ামানের অবরুদ্ধ রাজধানী স'ান'আ উদ্ধার করেন এবং দাআন-এ একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদনে কৃতকার্য হন। এই চুক্তি অনুযায়ী ইমাম য়াহ'য়াকে যায়দী শী'আদের পার্থিব ও পারলৌকিক নেতা হিসাবে স্বীকার করা হয় এবং সুলতানের পক্ষে স্থানীয় কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। ইহার বিনিময়ে ইমাম য়াহ'য়া তুরস্কের সুলতানের সার্বভৌম ক্ষমতা মানিয়া লইলেন এবং উত্তরাঞ্চলের বিদ্রোহী সায়্যিদ ইদ্‌রীসের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনায় ‘উছমানী সেনাবাহিনীর সহিত সহযোগিতার একটি চুক্তি করিলেন।

তাঁহার য়ামান অবস্থানকালে প্রথম বলকান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তিনি ইহা শুনিয়া আতঙ্কিত হইলেন যে, নূতন যুদ্ধমন্ত্রী নাজি'ম পাশা তাঁহার সাবধানতামূলক যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া এবং পূর্ণ প্রস্তুতির পূর্বেই আক্রমণ পরিচালনা করেন। যানবাহনের অসুবিধার দরুন ‘ইযযাত পাশা এমন সময় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিলেন যখন তুর্কী সৈন্য-বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিয়া নগর প্রাকারের বাহিরে চাতালজায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ১৯১৩ সনের ২৩ আনুয়ারী আংশিক অভ্যুত্থানে ঐক্য ও প্রগতি ইউনিয়নের সদস্যবর্গ ক্ষমতা দখল করিলে মাহ'মূদ শাওকাতের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা ‘ইযযাতকে সেনাবাহিনীর প্রধান পদ গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু ইউনিয়নপন্থীদের চক্রান্তের বিরোধিতা করিয়া এবং অভ্যুত্থানে নাজি'ম পাশার হত্যার দরুন হৃদয়ে দারুণভাবে আঘাত পাইয়া তিনি উক্ত প্রস্তাব প্রথমত প্রত্যাখান করেন। পুনরায় বলকান যুদ্ধ শুরু হইবার বিপদ অনুধাবন করিয়া এবং ‘ইযযাতের ধারণায় অনভিজ্ঞ আনওয়ার পাশা এই পদ প্রাপ্ত হইতে পারে ভাবিয়া তিনি পরবর্তীতে এই প্রস্তাব

পুনর্বিবেচনা করিলেন। ফলে ১৯১৩ সনের ৩০ জানুয়ারী 'ইযযাত ডেপুটি কমান্ডার-ইন-চীফ পদে (বাশকুমানদান ওকীলী) নিয়োজিত হইলেন। সুলতান স্বয়ং নামে মাত্র বাশ কুমানদান (باش كماندان) ছিলেন। সা'ঈদ হ'ালীম পাশার মন্ত্রীসভার যুদ্ধমন্ত্রী মাহ'মূদ শাওকাত ইউনিয়নবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে জুন মাসে নিহত হইবার পর 'ইযযাত পাশা সম্মিলিত স্থল ও নৌ-বাহিনীর প্রধান হিসাবে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে ইদিরনে পুনর্দখলকারী সৈন্যবাহিনী পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন (জুলাই, ১৯১৩)। তাঁহার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের আমলে নৌ-মন্ত্রী চুরুকসুলো মাহ'মূদ পাশা অন্তর্বর্তীকালীন যুদ্ধমন্ত্রী হিসাবে প্রায়ই কার্য পরিচালনা করিতেন। ১৯১৩ সনের শরৎকালে তিনি একটি চুক্তি সম্পাদন করেন এবং এই চুক্তি অনুযায়ী General Otto Liman von Sanders-এর নেতৃত্বে একটি জার্মান সামরিক মিশন তুরস্কে আনয়ন করা হয়।

এই মিশনের সুদূরপ্রসারী ক্ষমতা 'উছ'মানী সামরিক পরিকল্পনার ভিত্তিমূলে আঘাত হানিতে পারে ভাবিয়া 'ইযযাত পাশা খোলা মনে এই মিশন গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পরবর্তীতে বলকান যুদ্ধসমূহের অদক্ষ সামরিক অফিসারদের শুদ্ধি অভিযান প্রমাণ করে যে, ইহা এক দিকে ছিল বিবেচনাহীন এবং অন্য দিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ফলে ইউনিয়নপন্থীদের সহিত তাঁহার মতবিরোধ ঘটে এবং ১৯১৩ সনের শেষ ভাগে তিনি যুদ্ধমন্ত্রী পদ ও ডেপুটি কমান্ডার-ইন-চীফ পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আনওয়ার পাশা এই উভয় পদেই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

'ইযযাত পাশার স্বীয় বর্ণনা অনুসারে (Inal, 1979, klinghardt, 231f.) এই সময় 'উছ'মানী সরকার সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলবেনিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যদিও প্রস্তাবটি ইস্তাম্বুলে ও আলবেনিয়ায় আলবেনীয় নেতৃবৃন্দের সমর্থন লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি ইহা এই ভাবিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন যে, এই নিযুক্তির কারণে আলবেনিয়ার ক্ষতি হইতে পারে।

'ইযযাত পাশা দুই বৎসর যাবত অবসর জীবন অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু ১৯১৬ সনের প্রথম দিকে দিয়ারবাক্র-এ হেড কোয়ার্টার স্থাপন করিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী বৎসর আনওয়ারের ব্যক্তিগত অভিযানে সরিকামিশ-এ মারাত্মক পরাজয়ে পূর্ব ফ্রন্টের প্রায় সব কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 'ইযযাতের পক্ষে তাঁহার ক্ষুদ্র ও অপ্রতুলভাবে সজ্জিত সৈন্যবাহিনী দ্বারা আর্মেনিয়া ও কুর্দি পার্বত্য অঞ্চলের রুশ অগ্রগতি বিলম্বিত করা ব্যতীত অন্য কোন পথ ছিল না। ১৯১৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে পরিচালিত বিপ্লবে রুশ সৈন্য দলের বিপর্যয়ে সমর ক্ষেত্রে বাস্তব নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল না বলিয়া 'ইযযাত পাশা উক্ত পদ হইতে অব্যাহতির অনুরোধ করেন। অতঃপর তিনি Brest Litovsk-এ রাশিয়ার সহিত এবং বুখারেস্ট-এ রুমানিয়ার সহিত অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে 'উছ'মানী সরকারের সামরিক প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন (ডিসেম্বর ১৯১৭, মে ১৯১৮)।

ফিলিস্তীন-সিরীয় ফ্রন্টের পতনের পর ত'াল'আত-আনওয়ার মন্ত্রীসভার পদত্যাগ এবং আহ'মাদ তাওফীক পাশার সরকার গঠনের ব্যর্থ চেষ্টার পর নূতন সরকার গঠনের দায়িত্ব 'ইযযাত পাশার উপর অর্পিত হয়। ১৯১৮ সনের ১৪ অক্টোবর হইতে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত তিনি প্রধান মন্ত্রী (স'াদ্রে 'আজাম) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এই নব গঠিত সরকারের কিছু সংখ্যক মধ্যমপন্থী ইউনিয়নিস্ট, যেমন অর্থ মন্ত্রণালয়ে জাবীদ (দ্র.) ও ১৯১৮ সনের প্রথমভাগে গঠিত যুদ্ধবিরোধী ইউনিয়নপন্থী সংসদীয় দলের 'আলী ফাত্হী (Okyar)-ও ছিলেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যেমন নৌ বাহিনীর সেনাপতি হু'সায়ন রাউফ (Orbay) ও রাজকীয় ইতিহাসবেত্তা 'আবদু'র-রাহ'মান শারীফকেও মন্ত্রীসভার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যুদ্ধ বিরতির চুক্তি সম্পাদনই ছিল সেই সময়ের অত্যন্ত জরুরী বিষয়। 'ইযযাত পাশা বিভিন্ন সূত্রে মিত্র শক্তির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত লওয়া হয় যে, ১৯১৬ সনে কূতু'ল-'উমারা (كوت العمارة)-এ বৃটিশ জেনারেল Charles Townshend-কে ভাইসএডমিরাল স্যার সমারসেট আর্থার গুহ্ কেলথ্রোপ (Somerset Arthur Gough-Calthorpe)-এর সদর দফতর ইজিয়ান সাগরের লিমনোস (Lemnos) দ্বীপের মুদরোস (Mudros) পোতাশ্রয়ে প্রেরণই একটি বড় সফল যোগাযোগ সূত্র। 'উছ'মানী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দান করেন হু'সায়ন রাউফ এবং বৈদেশিক বিষয়ের আন্ডার সেক্রেটারী রিশাদ হি'কমাত। প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী শান্তি আলোচনায় তুরস্কে অবস্থানরত জার্মান ও অস্ট্রিয়ান সামরিক বাহিনীর লোকদেরকে নিরাপদে চলাচলের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু তুর্কী প্রতিনিধিগণ মৈত্রী চুক্তির এই শর্তও মানিয়া লয় যে, 'উছ'মানী রাজ্যের অধিকারভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর, পোতাশ্রয় ও রেলওয়ে জংশনসমূহে মিত্রশক্তির অধিকার থাকিবে। 'ইযযাত পাশা মিত্রশক্তির সহিত সম্পর্ক উন্নয়নের প্রত্যাশায় চুক্তির ব্যাখ্যায় বিবাদে লিপ্ত না হইয়া এই আদেশ দিলেন যে, বৃটিশ সেন্যবাহিনী ৩১ অক্টোবর চুক্তি সম্পাদনের পর নির্ধারিত সীমার মধ্যে চলাচল করিলে তাহাদেরকে বাধা দেওয়া হইবে না। কিন্তু বৃটিশ সেনাবাহিনী মাওসিল ও ইসকান্দারূন অধিকার করিয়া লয়। তৎকালীন সিরীয় ফ্রন্টের সেনাপতি মুস'ত'াফা কামাল পাশা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। এই সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে জোরালো টেলিগ্রামের বিনিময় চলে (কামাল পাশা ১৯২৬ সনে ইহা প্রকাশ করেন)।

যখন ইহা প্রকাশ পাইল যে, আনওয়ার, ত'াল'আত, জামাল ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ইউনিয়নপন্থী ১৯১৮ সনের ২ নভেম্বর ইস্তাম্বুল হইতে পলায়ন করিয়াছেন যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের যুদ্ধনীতি সম্পর্কিত অপরাধের দায়িত্ব এড়াইতে পারেন, ইহাতে 'ইযযাত পাশার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। কিন্তু তাঁহাদের পলায়নের কোন পূর্ব ধারণাও তাঁহার ছিল না বরং তিনি জার্মান ও অস্ট্রিয়ান সরকারের সহিত তুর্কী দেশত্যাগীদেরকে ওডেসা হইতে ফেরত আনিবার জন্য চেষ্টা চালাইতেছিলেন। কিন্তু তিনি রাজনৈতিক চাপ অনুধাবন করিয়া ৮ নভেম্বর পদত্যাগ করেন। তিনদিন পর সুলত'ান 'ইযযাত পাশার মধ্যমপন্থী সরকারের স্থলে একজন ইউনিয়নিস্ট-বিরোধী ব্যক্তি আহ'মাদ তাওফীকে'র নেতৃত্বে নূতন সরকার গঠনের আহ্বান জানান।

১৯১৯ সনের মে মাসে 'ইযযাত গ্রীকদের ইযমীরে সম্ভাব্য আক্রমণের আশংকা করিয়া জাতীয় ঐক্য রক্ষায় অংশগ্রহণস্বরূপ দ্বিতীয় দামাদ ফারীদ সরকারে দফতরবিহীন মন্ত্রী হিসাবে যোগদান করেন। পরবর্তী জুলাই মাসে 'ইযযাত পাশা দামাদ ফারীদের দ্বিতীয় মন্ত্রী সভায় যোগদান করিতে অস্বীকার করেন। উহা কামালপন্থী বিপ্লবীদের সামরিক অভিযান নস্যাৎ করিবার জন্য গঠিত হয়। ১৯২০ সনের অক্টোবরে আহ'মাদ তাওফীকে'র আপোসমূলক

মন্ত্রী সভায় অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী হিসাবে যোগদান করেন। ১৯২০-এর ডিসেম্বর মাসে 'ইযযাত পাশা ও সালিহ খুলুসী পাশাকে মুস্'তাফা কামাল ও তাঁহার জাতীয় মহাপরিষদের সহিত আলাপ-আলোচনার উদ্দেশে আংকারার মধ্যপথে অবস্থিত বেলিজীকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কামাল ইস্তাম্বুলে গঠিত কোন সরকারের প্রতিনিধিকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন এবং তাঁহার মেহমানদেরকে রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতেও বাধা প্রদান করেন, বরং কামাল তাহাদেরকে আংকারায় আটক করেন এই আশায় যে, কামালপন্থীদের চারকাস আদহাম-এর নেতৃত্বাধীন অনিয়মিত সৈন্যের বিরুদ্ধে এবং গ্রীক বাহিনীর বিরুদ্ধেও বিজয় লাভে প্রভাবান্বিত হইয়া 'ইযযাতকে তাঁহার দলে আনয়ন করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু প্রতিনিধিদল সরাসরি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় অবশেষে ১৯২১ সনের মার্চ মাসে 'ইযযাত পাশা ও তাঁহার সহকর্মীদেরকে এই প্রতিশ্রুতিতে ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হয় যে, তাঁহারা ইস্তাম্বুল কেবিনেটে পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে যোগদান করেন, তিনি কামাল পাশার নিন্দাপূর্ণ টেলিগ্রাম পাইয়া পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতির কথা অস্বীকার করেন নাই বরং তিনি কোন জোরযবরদস্তির অজুহাত পেশ না করিয়া প্রত্যুত্তরে বলেন যে, স্বদেশের স্বার্থ রক্ষার খাতিরে মন্ত্রী সভায় যোগদান করিয়াছেন। 'ইযযাত পাশা ১৯২২ সনের নভেম্বর মাসে সুলত'নের সরকার পতনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল ছিলেন।

'ইযযাত একজন অসামান্য দক্ষ ও উচ্চমনা দেশপ্রেমিক সৈনিক ছিলেন। 'উছ'মানী সামরিক ও রাজনৈতিক মঞ্চের নির্ভরযোগ্য পর্যবেক্ষকদের অন্যতম এবং তুরস্কে অস্ট্রিয়ার সামরিক এ্যাটাচী Pomiankowski (p.38) ১৯১৪ সনের প্রথম ভাগে 'ইযযাত পাশার পদত্যাগের প্রাক্কালে তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য করেন ঃ তাঁহার বাবার শাসন ক্ষমতার সর্বোৎকৃষ্ট বৎসরসমূহ প্রমাণ করে যে, তিনি একজন জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ সৈনিক এবং উক্ত সময়ের একমাত্র যোগ্য কর্মচঞ্চল তুর্কী সামরিক সেনাপতি হিসাবে সম্মানের পাত্র ছিলেন (damals der einzige tuchtige turkische Heeresfuhrer angeschen)। বিভিন্ন সঙ্কটময় মুহূর্তে তাঁহার প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক গুণাবলীর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি আজীবন দলাদলি ও রাজনৈতিক কৌশল ঘৃণা করিতেন। তাঁহার দুর্ভাগ্য যে, তিনি এমন সময় এত উচ্চ সামরিক পদে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন যখন রাজনৈতিক ও সামরিক সমস্যাদি ওঁতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। দেশের সরকারের স্থায়িত্বহীনতা, ক্রমাবনতি ও বৈদেশিক শক্তির চাপের কারণে সাম্রাজ্য ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছিল। কর্তব্য পালনে তাঁহার গভীর অনুরক্তির কারণে তিনি কোন দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিতে অনীহা প্রকাশ করেন নাই এবং স্বীয় সততা ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে উক্ত পদ দীর্ঘ দিন আকড়াইয়া রাখিতেন না। ফলে বহুবার তিনি তাঁহার শ্রমের অর্জিত সুফল অন্যদের অপচয় করিতে দেখেন এবং পরবর্তীতে শুধু তাহাদের ভুল সংশোধনের জন্য তাঁহাকেই আহ্বান করা হইত। তাঁহার রাজনৈতিক নরম পন্থা ও নিজস্ব দল গঠন করিবার মানসিকতার অভাব তাঁহাকে ইউনিয়নপন্থী ও ইউনিয়নবিরোধীদের মধ্যে আদর্শ ব্যক্তিত্বে পরিণত করিয়াছিল এবং তিনি কামালপন্থী ও কামালবিরোধীদের মধ্যস্থ ভারসাম্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 'উছ'মানী সাম্রাজ্যের একজন নিষ্ঠাবান অনুগত কর্মকর্তা হিসাবে 'ইযযাত পাশা তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের অধীন ইস্তাম্বুলে স্বীয় গৃহে অবসর জীবন যাপন করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) Denkwurdigkeiten des Marschalls Izzet Pascha, অনু. ও সম্পা. Karl Klinghardt, Leipazig 1927; (২) Ibnulemin, M. K. Inal, Osmanli devrinde son sadrazamlar, Istanbul 1940-1953, fasc. 13, 1973-2028, consisting largely (to p. 2001) of Izzets, autobiographical sketch undertaken a Inals request; (৩) Mushir Ahmed Izzet Pashanin Khatirati, in Aksham (Istanbul) এপ্রিল ১৯২৮-জুন ১৯২৮; (৪) 'ইযযাত পাশার পুত্র প্রফেসর হ'ায়দার ফারগাচ-এর সহিত সাক্ষাতকার, ইস্তাম্বুল, এপ্রিল ১৯৬৫।

(৫)Ferox Ahmad, The Young Turks...1908-1914, Oxford 1969; (৬) W.E.D. Allen and P. Muratoff, Caucasian Battlefields, Cambridge 1953; (৭) (Mustafa Kemal Ataturk), Buyuk Ghazinin khatiralarindan sahifeler, first Published in the Newspapers Hakimiyet-i Milliye (Ankara) and Milliyet (Istanbul), 13 March-12 April 1926, also French tr. by Jean Deny (Revue des Etudes Islamiques, 1927) and various Turkish editions by Falih Rifki Atay; (৮) ঐ লেখক Nutuk, 1927 (1934 ed., ii, 53-124 passim); (৯) Tevfik Biyiklioglu et al., Turk istiklal harbi I Mondros mutarekesi ve tatbikati, Ankara 1962 (an official history published by Genelkurmay Baskanligi Harb Tarihi Dairesi); (১০) ঐ লেখক Ataturk Anadoluda 1919-1921, i, Ankara 1959; (১১) R. H. Davison, Turkish diplomacy from Mudros to Lausanne, in G. Craig and F. Gilbert (ed.) The Diplomats 1919-1939, Princeton 1953, 172-209; (১২) Colmar Freiherr von der Goltz, Denkwurdigkeiten, Berlin 1929, 170.312 f; (13) J. C. Hurewitz. Diplomacy in the Near and Middle East, Princeton 1956, ii, 36 f. (for text of the Mudros armistice); (১৪) Ismet Inonu, Inonunun Hatiralari, ed, Sabahattin Selek, Istanbul 1969, I, 87 ff.; (১৫) Muharrem Mazlum (Iskora), Erkamharbiye mektebi (harp akademisi) tarihi, Istanbul 1930, 209; (১৬) G. Jaschke Beitrage zur Geschichte des kampfes der Turkei umihre Unabhangigkeit, in WI, ns., v. (1957), 1-64; (১৭) ঐ লেখক Turk Kurtulus savasi ile ilgili Ingiliz belgeleri, Ankara 1971; (১৮) M. Larcher, La guerre turque dans la guerre mondial, Paris 1926; (১৯) Josef Pomiankowsi, Der Zusamme-

nbruch des ottomanischen Reiches, Leipzig 1928; (২০) D. A. Rustow, The Army and the founding of the Turkish Republic, in World Politics, xi (1959), 513-52; (২১) Glen W. Swanson, Mahmud Shewket Pasha and the German Military Mission to Turkey, in War, Technology and Society in the Middle East, ed. M. Yapp (London 1973); (২২) Charles V.F. Townshed, My campaign in Mesopotamia, London 1920, ch. xx; (২৩) Ali Turkgeldi, Mondros ve Mudanya mutarkeleri, Ankara 1948; (২৪) Ulrich Trumpener, Germany and the Ottoman, Empire, 1914-1918, Princeton 1968; (২৫) Ali Fuad Turkgeldi, Gorup isittiklerim[2], Ankara 1951; (২৬) Manfred W. Wenner, Modern Yemen, 1918-1966, Baltimore 1967, 47ff.

D.A. Rustow and G.W.Swanson (E.I.[2])/হাফিজ সৈয়দ নূরুদ্দীন

**'ইযযাত মুল্লা** (عزت ملا) ঃ কেচেজী যাদাহ (যাদে) (১২০০/১৭৮৫-১২৪৫/১৮২৯) একজন তুর্কী কবি, ইস্তাম্বুলে জন্ম, কা'দী 'আসকার মুহ'াম্মাদ সা'লিহ'-এর পুত্র। কোনিয়া (Konya) হইতে তাঁহার বংশের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তোপরাক সোকাক (Toprak Sokak) মসজিদের ইমাম সুলায়মান আফেন্দী হইতে তাঁহাদের গোত্র নাম গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি জীবিকা নির্বাহ করিতেন পশমী বস্ত্র বয়নকারী (Kecedji) হিসাবে। তাঁহার পুত্র মুস'তাফা (মৃ. ১১৮১/১৭৬৭) ইস্তাম্বুলে শিক্ষা লাভ করিয়া কা'দী হইয়াছিলেন এবং একই পেশার জন্য উপযোগী করিয়া তাঁহার পুত্র মুহ'াম্মাদ সা'লিহ' (কবির পিতা)-কে প্রশিক্ষণ দিয়াছিলেন। 'ইযযাত-এর চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় তাহার পিতা সা'লিহ' আফেন্দী ইনতিকাল করেন। অতঃপর তাহার দুই ভগ্নীপতি কা'দী 'আসকার হা'মিদ ও কবি আস'আদ 'ইযযাতের লালন-পালন করিবার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং 'আলিম-এর পেশা গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রশিক্ষণ দান করেন। কিন্তু কবি আস'আদের অতি অবাধ ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের প্রভাবে 'ইযযাত সুরা পানে আসক্ত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার পিতা সামান্য যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা উড়াইয়া দেন। এই কারণে 'আলিমদের তালিকা হইতে তাহার নাম বাদ যায়। এই কলংক তাহার দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনের সহিত একীভূত হইয়া তাহাকে নৈরাশ্যের শেষ প্রান্তে লইয়া যায় এবং তিনি আত্মহত্যা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই নির্মম পরিস্থিতিতে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হইতে যাইতেছিল এবং ইহা হইতে তাহাকে কেমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করা হইয়াছিল এবং পরিণামে কিভাবে দ্বিতীয় মাহ'মূদ-এর ক্ষমতাশালী অন্তরঙ্গ বন্ধু হ'ালাত আফেন্দী (দ্র.)-এর সহিত পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন এই সম্পর্কে তাহার একজন প্রপৌত্র রেশাদ ফুআদ কর্তৃক একটি জীবনীমূলক নিবন্ধ এবং পরবর্তীকালে ইবনু লামিন মাহ'মূদ কামাল (ইনাল) [গ্রন্থপঞ্জী দ্র.] কর্তৃক কতকটা ভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

হ'ালাত আফেন্দী তাঁহাকে একটি গৃহ উপহার দিয়াছিলেন, জীবিকা নির্বাহের উপায় নিশ্চিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং সুলত'ানের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন (এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য দ্র. A. H. Tanpinar, xix, Asir Turk Edebiyati Tarihi, ইস্তাম্বুল ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৫৬, টীকা ১)। পুনরায় হ'ালাতের সহায়তায় তিনি ১২৩৬/১৮২০ সালে গালাতার কাযী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যখন হ'ালাতের মর্যাদাহানি ঘটে আর তিনি কোনিয়ায় নির্বাসিত হন এবং পরে তথায় তাহার প্রাণবধ করা হয় (১২৩৬/১৮২০), তখন তাঁহার স্বজনদের মধ্যে একমাত্র তাঁহার বিশ্বস্ত প্রিয়পাত্র 'ইযযাতই অভিযোগমুক্ত ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত কথাবার্তায় তিনি তাঁহার হিতৈষীর প্রশংসা এবং তদীয় শত্রুদের প্রতি দোষারোপ করার প্রলোভন রোধ করিতে পারেন নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার রচিত একটি অশোভন শ্লোকই (জেওদেত, তারীখ, ১২খ, ৬৭-এ উদ্ধৃত) সম্ভবত কর্তৃপক্ষের ধৈর্যের শেষ সীমায় লইয়া যায়। শীঘ্রই তিনি স্বয়ং থ্রেসস্থ তাকিরদাগের (Rodosto) নিকটবর্তী কাশান-এ নির্বাসিত হইলেন। সেইখানে তিনি প্রায় এক বৎসর (১২৩৮-৯/১৮২৩-৪) অবস্থান করিয়াছিলেন এবং এইখানে থাকিয়াই তিনি তাহার শ্রেষ্ঠ অবদান মিহনাত কাশান (Mihnet Kashan) রচনা করিয়াছিলেন। নূতন প্রধান উযীর গা'লিব পাশা যদিও তিনি পূর্বে হ'ালাতের একজন প্রধান শত্রু ছিলেন, তথাপি ইযযাত যখন বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাহার নিকট একটি কাসীদা পাঠান তখন তিনি সুলতানের নিকট তাঁহাকে ক্ষমা প্রদর্শন করিবার জন্য মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মাহ'মূদ-এর আনুকূল্য পুনঃপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইযযাত-এর তেমন কোন অসুবিধাই হয় নাই। তিনি পর্যায়ক্রমে মক্কা (১২৪১/১৮২৫) এবং পরে ইস্তাম্বুল (১২৪২/১৯২৬)-এর কাযী এবং হ'ারামায়ন (মক্কা ও মদীনা)-এর পরিদর্শক (inspector) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সৌভাগ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল না। ১২৪৩/১৮২৮ সালের বসন্তকালে শায়খু'ল-ইসলাম-এর দফতরে অনুষ্ঠিত এক যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণাসভা (War Council) রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইবে কিনা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মিলিত হয়; কেননা কয়েক মাস পূর্বে নাভারিনো (Navarino)-তে তুর্কী রণতরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পরে রাশিয়া তুরস্ক আক্রমণ করিয়াছিল, 'ইযযাত সেখানে অত্যন্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধ সমর্থনকারী সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে যোগদান করেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরে 'উমার রাসিম আফেন্দীর সহিত মিলিত হইয়া দফতরদার-এর কোষাধ্যক্ষ (Treasurer of the Defterdar) নামে একটি স্মারক পত্র (Layiha) রচনা করেন এবং তিনি তাহা সিলাহদার আগা-এর মাধ্যমে সুলতানের নিকট পেশ করেন। প্রকাশ্যভাবে 'ইযযাত যাহা বলিতে সাহস করিতেন না, ইহাতে তাহাই তিনি সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। যুদ্ধ পরিচালনা করা কেন সমীচীন নহে তাহার বহুবিধ কারণ তিনি ইহাতে দর্শাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় মাহ'মূদ ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একটি প্রতিস্মারক (countermemorial) [reddiyye] দ্বারা তাহার স্মারক প্রত্যাখ্যান করিয়া নেন এবং সেই সঙ্গে 'ইযযাতকে সাইপ্রাস ও রাসিমকে Rhodes-এ নির্বাসিত করিবার জন্য একটি আদেশ জারী করেন। পরে অবশ্য 'ইযযাত-এর নির্বাসনে স্থান পরিবর্তন করিয়া সাইপ্রাসের পরিবর্তে সিভাস (Sivas) নির্ধারণ করা হয়। নয় মাস পরে ১২৪৩/১৮২৮ সালে পরিচালিত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের করুণ পরিণতির ফলে 'ইযযাতের মত সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং তাহাকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু সুলতানের ফরমান (ferman) সিভাস-এ পৌঁছিবার কয়েক ঘন্টা পূর্বেই অসুস্থ কবি ইনতিকাল করেন।

ফরমানের মর্মবাণী তাঁহার কবরের বক্ষে সন্নিহিত রহিয়াছে (স'ফার ১২৪৫/আগস্ট, ১৮২৯)। ঐ সময়ে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৪৪ বৎসর। তাঁহার দেহাবশেষ ইস্তাম্বুলে আনীত হয় এবং তাঁহাদের পারিবারিক গোরস্থানে কবর দেওয়া হয়।

ইসমা'ঈল মাক্কী বেগ (তুর্কী ভাষার ইসলামী বিশ্বকোষের প্রবন্ধে ফাওযিয়া 'আবদুল্লাহ ভুলবশত লিখিয়াছেন কারা মুস'তাফা পাশা)-র কন্যা হিবাতুল্লাহ খানমকে 'ইযযাত মুল্লা বিবাহ করেন। ইসমা'ঈল মাক্কী বেগ ছিলেন কারা মুস'তাফা পাশা (১০৯৫/১৬৮৩ সালে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত)-এর বংশধর। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ফুআদ পাশা (দ্র.) উনবিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন।

'ইযযাত মুল্লা দীওয়ান কবিতার সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি ছিলেন প্রাচীনপন্থী ব্যক্তিগণের শেষ সময়ে যখন তাহার সমসাময়িক অনেকেই দীর্ঘ ও একঘেঁয়েমী অতি প্রচলিত সস্তা পদসমষ্টি (cliches) ও গতানুগতিক উপমার পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি কৌতুক রসবোধের জোরালো চেতনা, বিদ্রূপাত্মক সাহিত্য ও তাৎক্ষণিক সরল জবাব দানের প্রবণতা দ্বারা স্বীয় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সঙ্গে তাঁহার ছিল অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। অনেক গতানুগতিক কবির মত তিনি কখনও কল্পনা অথবা রূপকথার রাজ্যে নিজেকে একান্তে লুকাইয়া রাখিতেন না, বরঞ্চ নির্দ্বিধায় প্রকাশ করিয়াছিলেন চারিপার্শ্বের নানা বাস্তব ঘটনা তাঁহার অধিকাংশ রচনায়।

তাঁহার পিতার সংক্ষিপ্ত জীবনীখানি ব্যতীত তিনি অতি উন্নত অলংকারপূর্ণ রচনাশৈলীর (ইনশা) দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গদ্য, বিশেষত লাইহ'া বা সংস্কারের উপর তাঁহার স্মারক গ্রন্থখানি খুবই সহজ, সাবলীল ও যথাযথ। 'ইযযাত মুল্লা নিম্নে বর্ণিত রচনাসম্ভার প্রণয়ন করেনঃ (১) দীওয়ান-১ বাহার-ই আপকার শিরোনামে ১২৪১/১৮২৫ সনে সংকলিত হয়। তাঁহার মাছ'নাবী (বূলাক' হি.)-র বাহিরের অধিকাংশ কবিতাই উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁহার অনেক সন নির্ধারক (chronograms) পংক্তির অসাধারণ প্রামাণিক মান রহিয়াছে। (২) দীওয়ান-২ খাযান-ই আছার শিরোনামে সংকলিত হইয়াছে, ইহাতে তাহার পরবর্তী সময়ের কিছু কবিতা সন্নিবেশিত হয় (ইস্তাম্বুল ১২৫৭ হি.); (৩) গুলশান-ই আশক হিজরী ১২২৭ সনে সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহা গ'ালিব দাদা (Ghalib Dede)-এর হু'সনু আশক-এর সদৃশ অলৌকিক প্রেমের একটি সংক্ষিপ্ত রূপক জাতীয় মাছনাবী এবং একইভাবে জালালুদ্দীন রূমীর সূ'ফী মতবাদসমূহ দ্বারা অনুপ্রাণিত। 'ইযযাত একজন মাওলাবী ত'ারীক'াভুক্ত সূফী ছিলেন এবং সেই ত'ারীক'ার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিজেকে পেশ করিয়াছিলেন। একটি মোটামুটি বিবরণের জন্য দ্র. Gibb, HOP, iv, পৃ. ৩০৬-৩০৮ (লিথোগ্রাফস সং. ইস্তাম্বুল ১২৬৫ হি.); (৪) মিহ'নাত-কাশান (ভুক্তভোগী, The sufferers কাশান শব্দটির বিভিন্ন অর্থের কৌতুক ব্যঞ্জনায় বিন্যাসিত এই শিরোনাম মিহ'নাত কাশান (শাস্তিপ্রাপ্তগণ) অথবা মিহ'নাত-ই কাশান (কাশান শহরে শাস্তি ভোগ করা যাইতে পারে)। ইহা ছিল তাঁহার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রচনা। ইহা অবিলম্বে তাঁহার সুখ্যাতি নিশ্চিত করে এবং সমসাময়িক অনেক দীওয়ান প্রণেতা কবি হইতে তাঁহাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করিতে সহায়তা করে। ইহা মুতাক'ারিব ও মাছ'নাবী আকারে প্রায় সাত হাযার শ্লোক সমন্বয়ে গঠিত। ইহাতে অনেক কাসীদা, গাযাল, মুরাব্বা চতুর্পদী ও সন নির্ধারক পংক্তি ছড়াইয়া আছে যাহাতে সবিস্তারে এবং তীব্র কৌতুক রস ও জীবন্ত বাস্তবতার সংমিশ্রণ বর্ণনা করা হইয়াছে যে পরিস্থিতিতে সরকারী গোসলখানায় তাহাকে গ্রেফতার করা হইয়াছিল, কাশান অভিমুখে যেই দুঃসাহসিক ভ্রমণ ছোট প্রাদেশিক শহরের রঙ্গীন জীবন, অনেক স্থানীয় চরিত্র যাহাদের সহিত তিনি সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন এবং তথায় তাঁহার যাবতীয় অভিজ্ঞতা ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার গোড়ার দিকের জীবনের অনেক স্মৃতিচারণ ও ইস্তাম্বুলের যে সকল ব্যক্তিকে তিনি চিনিতেন তাহাদের জীবন্ত এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক বর্ণনায় একই রকম আনন্দদায়ক ব্যঙ্গরসের সংমিশ্রণ করিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থটি উনবিংশ শতাব্দীর মহান সংস্কারের পূর্বে 'উছ'মানী সাম্রাজ্যের শেষ যুগের জন্য একটি অন্য প্রামাণিক রচনায় পরিণত হইয়াছে। কাশানে থাকাকালে তিনি মিহ'নাত কাশান-এর অধিকাংশই রচনা করিয়াছিলেন এবং ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া আসিয়া জুমাদাল-উখরা ১২৩৯/ফেব্রুয়ারী ১৮২৪ সালে সমাপ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু রচনাটি ছিল ছড়াইয়া ছিটাইয়া থাকা পৃষ্ঠার উপর তাড়াহুড়া করিয়া লেখা। পরবর্তীকালে তাঁহার দুইজন বন্ধু কর্তৃক উহা সুবিন্যস্ত ও অনুলিপিকৃত হইয়াছিল (লিথোগ্রাফিক সংস্করণ, ইস্তাম্বুল ১২৬৯ হি.); (৫) তাঁহার পিতা মুহ'াম্মাদ স'ালিহ' আফেন্দী সম্বন্ধে লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনীমূলক গ্রন্থখানি হইল দাওহ'াতু'ল-মাহ'ামিদ ফী তারজামাতি'ল-ওয়ালিদ, ইহা অতি প্রচলিত উত্তম ইন্শা-এর নমুনায় অলংকারপূর্ণ রচনাশৈলীতে লিখিত হইয়াছিল। ইহা ১৯১৬ খৃ. প্রকাশিত হয় (TOEM, No. 41, ডিসেম্বর ১৮৩২); (৬) লাইহ'া সুলত'ান তৃতীয় সালীম-এর নিকট পেশকৃত। অনেক লাইহ'া-র সহিত সদৃশভাবে রচিত একটি সংস্কার স্মৃতিচারণ। ইহা দ্বিতীয় মাহ'মূদ-এর আদেশক্রমে ১২৪৩/১৮২৭ সালে লিখিত হয়। ইহা সম্পদিত হয় নাই (Turkish Historical Society ও the University of Istanbul-এর গ্রন্থাগারে ইবনু লামিন সংগ্রহে দুইখানি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রহিয়াছে)। তাঁহার অপর লাইহ'া গ্রন্থখানি সুবিখ্যাত যুদ্ধবিরোধী স্মরণিকা যাহা 'উমার রাসিম আফেন্দীর সহিত যৌথভাবে লিখিত।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) তায'কিরা গ্রন্থে ফাতীন প্রণীত প্রবন্ধ দ্র.; (২) বুরসালী মুহ'াম্মাদ ত'াহির, 'উছ'মানলি মুআললিফ লারি, ২খ, ৩২০; (৩) Gibb, History of Ottoman Poetry, ৪খ, ৩০৪-৩২২; (৪) আ. শারাফ, তারীখ মুসাহাবালারি, ইস্তাম্বুল ১৩৩৯ হি., ৩৯ প.; (৫) ইবনু লামিন মাহ'মূদ কামাল ঈনাল, Son Asir Turk Sairleri, ১৯৩৭ খৃ., দ্র. শিরো.; (৬) ফাওযিয়া 'আবদুল্লাহ প্রণীত প্রবন্ধ IA-তে দ্র.; (৭) A. H. Tan pinar, XIX, Asir Turk Edebiyati Tarihi[2] ইস্তাম্বুল ১৯৫৬ খৃ., ৫৪ প.; (৮) Hammer-Purgstal, Gesch. der Osman. Dichtkvnst, ৪খ, ৫০৬-২৫; (৯) Schlechta Wssehrd, Izzet Mollah, Fuad Paschas, Vater und dessen Tristia, Leipzig 1863.

Fahir Iz (E.I.[2]) মুহম্মদ আবদুস সাত্তার

**'ইযযী সুলায়মান আফেন্দী** (عزى سليمان أفندى) ঃ মৃ. ১১৬৮/১৭৫৫, তুরস্কের একজন সরকারী ইতিহাস-লেখক (ওয়াক'আ নাবীস দ্র.) তিনি সুলত'ান চতুর্থ মুহ'াম্মাদ-এর বালতাজী প্রহরীর কেত্খুদা জনৈক খালীল আগার পুত্র। তিনি পিতা ও গৃহশিক্ষকগণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি লিপিবিদ্যা (calligraphy)-ও অর্জন করেন (মুস্তাক'ীম যাদা তুহ্ফা-ই খাত্ত'াতীন, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ., পৃ. ২১২)। রাজদরবারের

সহিত তাঁহার পিতার সম্পর্কের কল্যাণে তিনি ক্রমাগতভাবে একাধিক সচিবের পদ লাভ করেন। ফলে ১১৫২/১৭৩৯ সনে তিনি মাকতূবীই কেতকুদাই 'আলী পদে উন্নীত হন। এই পদের অধিকারীরূপে তিনি বেলগ্রেডের চতুর্দিকে সামরিক অভিযানগুলির সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। নগরীর পুনরাধিকারে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি কারাচেলেবি যাদাহ (দ্র.)-এর সুলায়মানন্যামা-এর একটি অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত এই দ্বিতীয় বিজয়ের একটি স্বরচিত কাহিনী সংযোজিত করেন (স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডু. ইস্তাম্বুল, Topkapi Sarayi, Emanet Hazinesi, 1395-কারাতায় নং ৬৮৪)। রাঈসু'ল-কুত্তাব-এর সুপারিশক্রমে ১ রাজাব, ১১৫৮/৩০ জুলাই, ১৭৪৫ সনে তিনি সুব্হী (দ্র.)-এর স্থলে ওয়াক'আ নাবীস নিযুক্ত হন। এই পদ পরিত্যাগ না করিয়াই ১১৬০/১৭৪৭ সনে তিনি Master of ceremonies (তাশরীফাতচী)-রূপে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। জুমাদা-২, ১১৬৮/মার্চ-এপ্রিল ১৭৫৫ সনে তিনি ইনতিকাল করেন এবং Edirne Kapici-এর নিকট নাক্শ্বান্দী তারীকায় তাঁহার মুরশিদ শায়খ মুরাদ যাদাহর পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

সরকারের নির্দেশে লিখিত তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে ১১৫৭-৬৫/১৭৪৪-৫২ সনের ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহা ১১৯৯/১৭৮৫ সনে ইস্তাম্বুলে মুদ্রিত হয়। ইহার অনেক পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান [দ্র. (১) Babinger, পৃ. ২৮৮; (২) Ist. kut, turkce tarih ve cog, yazmalari Kat., ১/২, নং ৮২; (৩) কারাতায়, নং ৯৩০-৯, নং ৯৩৭ যাহা ছিল সুলত'নকে প্রদত্ত সৌজন্যমূলক কপি ইত্যাদি]। একটি মুখবন্ধে তিনি চরিত্র গঠন ও নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে ইতিহাসের গুরুত্ব বর্ণনা করেন। সুতরাং ঐতিহাসিকগণের কর্তব্য হইল সততা ও সরলতা সহকারে ইতিহাস রচনা করা। তিনি দীওয়ান-ই হুমায়ূন-এ পরিবর্তনের বিস্তারিত ও পূর্ণ বর্ণনা দান করেন যাহার ফলে গ্রন্থখানি রাজনীতিবিদগণের জীবন-চরিতের একটি মূল্যবান উৎস হইয়াছে। স্থানে স্থানে তিনি তৎকর্তৃক ভারপ্রাপ্ত প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইন্শা-এর মত বিস্তারিত ও অলংকারপূর্ণ বাকভঙ্গীতে গ্রন্থখানি রচিত এবং সন-তারিখ নিরূপণে সহায়ক লিপিতে পরিপূর্ণ। তিনি একখানা দীওয়ান (কবিতা-গ্রন্থ) রচনা করেন; কিন্তু কবি হিসাবে তাঁহার খ্যাতি নগণ্য। সূ'ফীবাদের ক্ষেত্রে তিনি স'লাহু'দ্দীন ইব্ন মুবারাক আল-বুখারীর ফারসী ভাষায় লিখিত আনীসু'ত-ত'লিবীন গ্রন্থখানি তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) সালিম, তায'কিরা, পৃ. ৪৭৪ প.; (২) Hammer-Purgstall নির্ঘণ্ট, শিরো. Isi; (৩) ঐ লেখক, GOD, ৪খ, ১৭৩, ২৮৪ ;(৪) সিজিল্ল-ই 'উছ'মানী ৩খ, ৪৬৭; (৫) জামালুদ্দীন 'উছমানলী, তারীখ ওয়া মুওয়াররিখলেরি, ইস্তাম্বুল ১৩১৪ হি., পৃ. ৪৯প; (৬) বুরসালী মুহাম্মাদ ত'াহির, 'উছ'মানলী মুআল্লিফলেরী, ৩খ, ১০১ প.; (৭) Babinger, পৃ. ২৮৭ প.; (৮) Necib Suyolcuzade, Devhatul Kuttab (sic), ইস্তাম্বুল ১৯৪২ খৃ., পৃ. ৯৫।

Ismet Parmaksizoglu (E.I.[2])/আবদুল খালেক

**'ইযযু'দ-দাওলা** (عز الدولة) ঃ একটি সম্মানজনক উপাধি (লাকাব দ্র.) যে ধরনের উপাধি ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে খলীফাগণ কর্তৃক ও পরবর্তীকালে অন্যান্য নৃপতি কর্তৃক প্রচলিত হয়। দাওলা শব্দযুক্ত সম্মানসূচক উপাধি সর্বপ্রথম পাইয়াছিলেন খলীফা আল-মুকতাফী (৯০২-৪)-এর উযীর আল-ক'াসিম; ২৮০/৯০২ খৃ. তাঁহাকে ওয়ালিয়্যুদ-দাওলা (রাজবংশের বন্ধু) উপাধি দেওয়া হয়। প্রথমত দাওলা (দ্র.) শব্দটি দ্বারা বুঝা যাইত ঘুরিয়া দাঁড়ান, উল্টাইয়া যাওয়া (বিশেষত যুদ্ধের ক্ষেত্রে); অতঃপর ইহা পুরাতন মাহদী মতবাদ প্রচারের পদবী হইয়া দাঁড়াইল। ৩য়/১০ম শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে ইহার বর্তমানে প্রচলিত অর্থ চালু হইলঃ রাজবংশ বা রাষ্ট্র। এই অর্থের ভিত্তিতেই দাওলা শব্দটি সেই সকল সম্মানসূচক উপাধির উপাদান হইয়া গেল যেগুলি ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর মধ্য ভাগের সামান্য পূর্বে দেওয়া শুরু হয়। বুওয়ায়হী (দ্র.)-গণের আমলে ইহা একটি প্রথায় পরিণত হয়। বস্তুত ইহাই ছিল ঐ আমলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

অর্থ অনুসারে দাওলা শব্দটির সহিত সংযুক্ত (মুদ'াফাত) শব্দসমূহকে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) ক্রিয়াগত আকার, যাহাতে বর্ণিত হয় উপাধিধারীর রাজবংশ সম্পৃক্ত কার্যাবলী, যথাঃ মু'ঈন (সাহায্যকারী) আদ-দাওলা, নাসি'র, মু'ইযয, মুশাররিফ প্রভৃতি (২) উপমা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্ত্র অথবা শরীরের অংশ বিশেষ; যথা; সায়ফ, হু'সাম, 'আদুদ (এবং এইগুলি হইতে উদ্ভূত য়ামীন, আয়ন) ইত্যাদি; (৩) বিশ্ব প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত ধারণা, যথাঃ নূর, দিয়া, বাহা ও শামসু'দ-দাওলা, সামাউদ-দাওলা (পিতা ও পুত্র কর্তৃক এই উপাধিদ্বয় উল্লিখিত ক্রমানুসারেই গৃহীত হইত, যাহাতে ক্রমোন্নয়ন ও ক্রমবর্ধমান তীব্র ধারণা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়); (৪) স্থাপত্যবিদ্যা হইতে উদ্ভূত ধারণা, যথাঃ 'আমীদ, 'ইমাদ, রুক্ন, সানাদ, 'উমদা, ক'াওয়াম ইত্যাদি; (৫) শাসকগণের পরিচয় সূচক চিহ্ন ও উপাধি; যথা তাজ (রাজমুকুট) ও সুলত'ান (একটি উপাধি যাহা তৎকালে একমাত্র খলীফার অধিকারভুক্ত ছিল) এবং যা'ঈমও; (৬) যশ, গৌরব ও সম্মানের ধারণা ফাখ্র, জালাল, মাজ্দ, শারাফ, 'আলা', 'ইযয।

৩৪৮/৯৫৯-৬০ সালে বুওয়ায়হী সর্দার বাখতিয়ার যখন যুবরাজ ছিলেন তখনই তাঁহাকে 'ইযযু'-দাওলা উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ইহা স্পষ্টতই তাঁহার পিতা আমীর মু'ইয্যু'দ-দাওলার উপাধির সামান্য পরিবর্তন। এই ঐতিহ্য বজায় রাখিয়াই যখন বাখতিয়ার তাঁহার পুত্র বসরার শাসনকর্তা আল-মারযুবানকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন তখন খলীফাও তাঁহাকে সম্মানসূচক ই'যাযু'দ-দাওলা উপাধি দান করেন। যখন 'আদু'দু'দ-দাওলা বাগ'দাদে আবির্ভূত হইয়া ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে বুওয়ায়হীগণকে সমূলে উৎখাত করেন তখন বাখতিয়ারের ঘটিল চরম অপমানজনক পরিণতি। ঐ সময়েই 'ইযয ও অন্যান্য শব্দ সহযোগে দাওলা উপাধি গ্রহণের প্রথারও পরিসমাপ্তি ঘটে অন্তত বুওয়ায়হীগণের মধ্যে। শীরায ও বাগ'দাদের অধিবাসী পরবর্তী বুওয়ায়হীগণের সকলেই ছিলেন 'আদু'দু'দ-দাওলার বংশধর। তাঁহারা উপরে উল্লিখিত ছয়টি উপাধির মধ্যে অন্যগুলি বাছিয়া লন।

বুওয়ায়হীগণ ব্যতীত সমকালীন সকল শাসক যাঁহারা 'আব্বাসী খিলাফাত মানিয়া লন তাঁহারা উল্লিখিত বিভিন্ন উপাধি লাভ করেন। ইঁহারা ছিলেন মারওয়ানী, মাযয়াদী, মিরদাসী, গাযনাবী শাসকগোষ্ঠী প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত সামানীগণ যাঁহারা কিছুকাল বুওয়ায়হীগণ কর্তৃক নিয়োজিত বাগদাদের খলীফাকে স্বীকার করেন নাই, তাঁহারাও এই সকল উপাধি দানের রীতি গ্রহণ করেন। তাঁহারা এইগুলি দান করিতেন নিজেদেরই কর্তৃত্ববলে। তাঁহারা খুরাসানের শাসনকর্তাগণকে নিজেদের সহিত ঘনিষ্ঠতর করিবার উদ্দেশে তাঁহাদেরকে এই সকল উপাধি দান করিতেন। অপরপক্ষে মিসরে ফাতি'মী আমলে এই ধরনের বিভিন্ন উপাধি এক ভিন্নতর নীতিতে নির্বাচিত হইত। উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে 'দাওলা' উপাধিটি শুধু মাঝে মধ্যে পরিলক্ষিত হইত। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবেই এই 'আব্বাসী রীতি কদাচিৎ অনুসৃত হইত।

সম্মানজনক 'ইযযু'দ-দা'ওলা উপাধিটি স্পষ্টতই বুওয়ায়হী বাখতিয়ারের অখ্যাতির স্মৃতি দ্বারা এত প্রভাবিত হইয়াছিল যে, ইহার পুনরাবির্ভাব ঘটে অনেক পরে, আর তাহা ঘটে প্রধানত পারস্যে, বিশেষত পরবর্তী কালে এই উপাধিধারিগণকে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে (১) গায্নাবী 'আবদু'র-রাশীদ (১০৫০-৩); (২) বাদুসপানী হাযারাস্ব ইব্ন নামওয়ার (৪৭০/১০৭৭-৫১০/১১১৭, মাযান্দারানে) ও কু'বাদ ইব্ন শাহ্ গাযী (৭৮০/১৩৭৮-৮০১/১৩৯৯), (৩) আরতুকীগণের উসতাযদার আবূ নাস্'র ইব্নু'ল-হা'সান, (দিয়ার বাক্র-এ ৫৫১/১১৫৬-৫৬৫/১১৭০)।

পরবর্তী কালেও অবশ্য 'দাওলা'-সম্বলিত উপাধি পরিলক্ষিত হয়, তবে শুধু কোন কোন সময়। সালজূক' আমল হইতে এই সকল উপাধির স্থান গ্রহণ করে 'দীন' শব্দটিকে উপাদান হিসাবে গ্রহণ করিয়া রচিত বিভিন্ন উপাধি। সাফাবী আমলে পারস্যে 'দাওলা'-সম্বলিত উপাধির আংশিক পুনরাবির্ভাব ঘটে। প্রধান উযীর পদাধিকারবলে ই'তিমাদু'দ-দাওলা' (দ্র.) উপাধি গ্রহণ করিতেন। কাজারদের আমলে তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই বুওয়ায়হীগণের (ও সাফাবীগণের) ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া চলিতেন এবং অতঃপর বারংবার এই প্রবন্ধে উল্লিখিত উপাধিগুলো ব্যবহার করিতেন। উল্লিখিত (১) হইতে (৬) পর্যন্ত সব মিশ্রণই ইহাদের মধ্যে পাওয়া যাইত; সেই সঙ্গে আবার নূতন কতিপয় উপাধিও সংযোজিত হইয়াছিল; তথাপি এই 'ইযযু'দ-দাওলা উপাধিটি সচরাচর দেখা যাইত না। কাজার নৃপতিগণের অধীনে কেবল মুহ'াম্মাদ শাহ্-এর এক পুত্র 'আবদু'স-স'ামাদ মীরযা (১২৫০/১৮৩৪-১২৬৪/১৮৪৮) এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রতীতি হয় যে, এই উচ্চ প্রশংসাসূচক 'আয্যা ওয়া জাল্লা' কথাটি একমাত্র আল্লাহ্র নামের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় বলিয়াই আংশিকভাবে অনুরূপ শব্দসম্বলিত 'ইযযু'দ-দাওলা উপাধিটির ব্যবহার বাধাপ্রাপ্ত হয়। উপাধির ব্যবহারও খুব বিরল ছিল। তাঁহারা বরং আমীন, ই'তিমাদ, মু'আয়্যিদ, মু'তামাদ ও নিজ'াম শব্দনিচয় সহযোগে রচিত উপাধি বেশী পছন্দ করিতেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ 'ইযযু'দ-দীন প্রবন্ধের বরাত দ্রষ্টব্য।

H. Busse (E.I.[2])/ছালেমা খাতুন

**'ইয্যুদ-দাওলা** (দ্র. বাখতিয়ার)

**'ইয্যুদ-দীন** (عز الدين) ঃ এই উপাধি (লাক'াব)-টির উদ্ভব হইয়াছিল 'দাওলা' শব্দসম্বলিত অন্যান্য উপাধির সহিত অভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। 'ইযযু'দ-দাওলা' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত যে সকল সম্বন্ধসূচক (মুদ'াফাত) সংযোগে উপাধি রচিত হইত, এ স্থলেও প্রায়শ সেগুলিই ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং অর্থ অনুসারে তাহাদেরকে অনুরূপ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইত, অন্ততপক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে। এই নামকরণ পদ্ধতির (nomenclature) আলোকে ইহা খুবই সন্দেহজনক যে, ২৫৬/৮৬৯-৭০ সালে ওয়াসিত'-এ মুদ্রিত একটি মুদ্রায় উৎকীর্ণ লাকাবটিকে আসলে 'আলিয়্যু'দ-দীন পড়িতে হইবে কিনা। বর্ণনা সূত্রাদি অনুসারে সন্দেহাতীত 'দীন' শব্দে গঠিত উপাধিটি ৩৮৮/৯৯৮ সালে সর্বপ্রথম দেওয়া হয় কুর্দী বর্যিকানী আমীর বাদ্র ইব্ন হা'সানওয়ায়হ-কে, 'দাওলা' শব্দযোগে গঠিত সর্বপ্রথম উপাধির উদ্ভবের প্রায় এক শত বৎসর পরে। 'দাওলা' শব্দযুক্ত উপাধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে যৌগিক উপাধি নাসি'রু'দ-দীন ওয়া'দ-দাওলা-তে দৃষ্ট হয়। কুর্দী আমীর (বাদ্র ইব্ন হা'সানওয়ায়হ্) এই প্রকার একটি উপাধির জন্য গোঁ ধরিয়াছিলেন 'দীন'-এর ব্যাপারে তাঁহার অনেক প্রশংসনীয় কর্মের সুবাদে (বিশেষত হা'জ্জের উৎসাহ দানে)। বুওয়ায়হী (بويهى) শাসকগণের আমলে উচ্চাভিলাষ, বিশেষত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার প্রেক্ষাপটে, খোদ বুওয়ায়হীগণকে ও অন্যান্য আঞ্চলিক শাসকগণকে 'দীন' লাক'াব-এর অনুরোধ জ্ঞাপনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, এমনকি খলীফা কর্তৃক প্রদত্ত 'দাওলা' লাক'াবের সংযোজন হিসাবেও 'দাওলা'-র সহিত প্রচলিত রীতি অনুসারে সম্বন্ধসূচক শব্দ প্রয়োগের পাশাপাশি 'মুহ'য়ি'দ-দীন' (দীনের পুনরুজ্জীবনকারী) উপাধিটি দেওয়া হইয়াছিল আবূ কালিজার (৪১৫/১০২০-৪৪০/১০৪৮)-কে; একজন শী'আ বুওয়ায়হী শাসকের পক্ষে ইহা ছিল বিস্ময়কর। 'দীন' শব্দ সংযুক্ত উপাধি কুর্দী শাসক বাদ্র-কে যেমন দেওয়া হইয়াছিল, তদ্রূপ সাধারণত নিষ্ঠাবানদের পক্ষে সেবাকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপও প্রদত্ত হইত। যখন ৪০৩/১০১২-১৩ সালে গায্নাবী সুলত'ান মাহ্'মূদ (৩৮৯/৯৯৮-৪২১/১০৩০) ফাতি'মী খলীফা কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানজনক পোশাক (খিল'আত) প্রত্যাখ্যান করেন, তখন 'আব্বাসী খলীফা তাঁহাকে নিজ'ামু'দ-দীন ওয়া নাসি'রু'ল-হা'ক্ক (দীনের নিয়ামক ও সত্যের সহায়ক) উপাধি দান করেন। 'ইযযু'দ-দীন উপাধিটি বুওয়ায়হী আমলে দৃষ্টিগোচর হয় না এবং 'ইযযু'দ-দাওলা প্রবন্ধের শেষভাগে উল্লিখিত কারণে পরবর্তী সময়েও ইহা অপেক্ষাকৃত কম দৃষ্ট হয়।

সাল্জূক'দের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে 'দীন' উপাধিগুলি 'দাওলা' উপাধিগুলিকে উৎখাত করে। বুওয়ায়হী শাসকগণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে খিলাফাতের সহিত ব্যক্তিগত সংযোগ প্রকাশের উপর জোর দিতেন। বিপরীতে সাল্জূক'গণ 'দীন' (ধর্ম)-এর মত একটি বিমূর্ত ধারণার সহিত তাঁহাদের গুরুত্ব আরোপ শ্রেয় মনে করিয়া তাঁহারা যে ধর্মনিষ্ঠার পুনরুজ্জীবন ও রক্ষণকার্যে রত বলিয়া নিজদেরকে মনে করিতেন, সেই ধারণার প্রকাশ করিতে প্রয়াসী ছিলেন। যদিও তু'গ'রিল বেগ 'রুক্নু'দ-দুন্য়া ওয়া'দ-দীন' ('দাওলা' স্থলে 'দুন্য়া') এই যৌগিক উপাধিটি তখনও বজায় রাখিয়াছিলেন, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ কেবল 'দীন'যুক্ত উপাধিই ধারণ করিতেন। রূম (এশিয়া মাইনর)-এর সাল্জূকগণের ক্ষেত্রে যেমন, তদ্রূপ সাফ্ফারীগণ ৪৯৬/১১০৩ হইতে, আর্তুকীগণ ৫৩৮/১১৪৪ হইতে, আলেপ্পোয় যাংগীগণ, আনাতোলিয়ায় দানিশমান্দীগণ, ফার্সে সাল্গুরীগণ, পূর্ব ইরান ও ভারতবর্ষে গূরীগণ, খাওয়ারিয্মের শাহ্গণ ও পারস্যের ইস্মা'ঈলীগণের বেলায়ও (৫৬৪/১১৬৬ হইতে) একই কথা প্রযোজ্য।

অন্যান্য উপাধির ন্যায় আলেপ্পো-র যাংগীগণ ও কোনিয়া-র রূম সাল্জূক'গণের আমলে 'ইযযু'দ-দীন উপাধিটির ব্যবহার বহু ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, ৭ম/১৩শ শতাব্দীর মধ্যে এই উপাধিটি বা স্থানীয় রাজন্যবর্গ কর্তৃক প্রদত্ত সম্মান হিসাবে মর্যাদা হারায়। তখন ইহা পর্যবসিত হইল শুধু একটি নাম বা উপনামে, যাহা কোনও ব্যক্তি নিজেই গ্রহণ করিত অথবা সমকালীন কতিপয় ব্যক্তি কোনও উপযুক্ত লোককে সরকারী নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়াই প্রদান করিত। ইব্নু'ল-ফু'ওয়াতী (মৃ. ৭২৩/১৩২৩-২৪) তাঁহার রচিত 'মাজ্মা'উ'ল-আদাব ফী মু'জামি'ল-আল্কা'াব (সম্পা. মুস্'ত'াফা জাওয়াদ, দামিশ্ক' ১৯৬২ খৃ.) গ্রন্থে 'ইযযু'দ-দীন উপাধিধারী পাঁচ শতাধিক ব্যক্তির তালিকা দিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সকল শ্রেণীর মানুষ ছিলেন ঃ সুলতান ও সভাসদগণ, রাজধানীতে, প্রদেশসমূহে ও প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ, ধর্মীয় দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ (বিচারক, মাদরাসার অধ্যাপক), সরকারী পদমর্যাদাহীন

ও 'আলিম ও ফাকীহগণ, বিভিন্ন লোকায়ত (secular) পেশাধারী ব্যক্তিগণ (কবি, ঔষধ বিক্রেতা, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী) প্রভৃতি। সময়-নির্ণীতভাবে সর্বপ্রথম যাঁহারা এই উপাধিধারী ছিলেন তাঁহারা (যথা এক ফাকীহ, নং ২৩১) ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর প্রথম দিক্‌কার লোক ছিলেন। সাল্‌জূক আমলের শেষের দিকে, সর্বশেষ সময় মোঙ্গলদের (যাহারা গাযান খানের সহিত প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন, ৬৯৪/১২৯৫-৭০৩/১৩০৪) আগমণের পর উপাধিটি নিশ্চিতভাবে সরকারপ্রদত্ত সম্মানের মর্যাদা হারায়। কালকাশান্দী (মৃ. ৮২১/১৪১৮) সুব্‌হু'ল-আ'শা' (৬খ, ৩৮প.) গ্রন্থে, "উপাধির তালিকা"-তে 'ইযয্ শিরোনামের নিম্নে একমাত্র 'ইযযু'ল-ইসলাম-এর উল্লেখ করিয়াছেন 'কতিপয় নৃপতি'র উপাধি হিসাবে।

**'দাওলা'** শব্দযুক্ত উপাধিগুলির ন্যায় 'দীন' শব্দযুক্ত উপাধিগুলির ব্যবহারও সীমাবদ্ধ ছিল মুসলিম জগতের পূর্বাংশে। মুসলিম প্রাচ্যে আল-বীরূনী ইতিপূর্বে আলকাব-এর সমালোচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজনৈতিক ও বাস্তব সমস্যার প্রেক্ষিতে তাঁহার মতে সকল উপাধি খিলাফাতের অবক্ষয়ের নিদর্শন অসার দম্ভের প্রকাশ, অধিকন্তু বাস্তব ব্যবহারের পক্ষে অত্যধিক শব্দবহুল। মিসরীয় ইব্‌ন তাগরীবিরদী পারস্যবাসিগণকে উপহাসচ্ছলে বলিতেন, "তাহাদের মধ্যে সব কিছুই 'দীন'-এর সহিত সম্পৃক্ত।" মাগ্‌রিবী 'আলিম 'আলী ইব্‌ন মায়মূন (আনু. ৯০০/১৪১৫) উপাধিগুলিকে শুধু 'শয়তানী বিদ্'আত' (বিদ্'আতু'শ শায়তানিয়্যা) বলিয়া অভিহিত করিতেন।

ইব্‌নু'ল-ফুওয়াতী ও কালকাশান্দীর পরে সর্বশেষে ১০ম/১৬শ শতাব্দীর শুরু হইতে 'দীন' উপাধি সত্যিকার অর্থে উপাধি বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; ইহা মানুষের নামে পরিণত হইয়াছিল। 'উছমানী সুলতানদের সময় 'দীন' শব্দসম্বলিত একটি উপাধি ও একটি প্রকৃত নাম-এইরূপ ডবল নাম গ্রহণের প্রবণতার বিকাশ ঘটে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন F. Babinger। 'উমারু'দ-দীন' নামের মত অদ্ভুত শব্দ সমন্বয়ের কথা বাদ দিলে (দ্র. J. H. Kramers) আধুনিক কালে 'দীন' সহযোগে নামকরণ প্রবণতা হ্রাসের লক্ষণ দেখা যায়। চরিতাভিধান Turk Meshurlari 'ইযযু'দ-দীন' কদাচিত দেখা যায়। মিসরে মূলত যে সকল নামের শেষে 'দীন' শব্দটি থাকে তাহার সহিত 'কামাল', 'জামাল' ইত্যাদি সম্বন্ধবাচক শব্দ যোগ করিয়া রীতিগতভাবে নামগুলিকে সংক্ষিপ্ত করা হয়। তুর্কী নাম 'ইযযেত'-এর উদ্ভবও সম্ভবত একইভাবে (কিন্তু তু. হিক্‌মত, ফিক্‌রেত ইত্যাদি; আরও দ্র. ISM=ইস্‌ম্)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্‌নু'ল-ফুওয়াতী ও আল-কাল্‌কাশান্দী (প্রবন্ধের অভ্যন্তরে উল্লিখিত); (২) G. Flugel, Husam ed-Din, in Ersch and Gruber, Allgemeine Encyclopaedie der Wissenschaften, und Kunste, অধ্যায় ২, অংশ ১২ দ্র.; (৩) F. Babinger, Schejch Bedr ed-Din, der Sohn des Richters von Simaw, in Isl., xi (1921), 20, n. 3; (৪) J. H. Kramers, Les noms musulmans composes avec Din, in AO, v (১৯২৬/২৭ খৃ.), ৫৩-৬৭; (৫) হাসান আল-বাশা, আল-আল্‌কাবু'ল-ইসলামিয়্যা ফি'ত-তা'রীখ ওয়া'ল-ওয়াছা'ইক ওয়া'ল-আছার (الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والاثار), কায়রো ১৯৫৭ খৃ.; (৬) A. Dietrich, Diemit ad-din zusammengesetzten Personennamen, in ZDMG, cx (1961), 43-54 (Flugel and Kramers কর্তৃক প্রস্তুত তালিকার সহিত মূল্যবান সংযোজনসহ); (৭) H. Busse, Chalif und Grosskonig, Beirut 1969 (Beiruter Texte und Studien, Vol. 6), (কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত 'দাওলা' ও 'দীন' উপাধিসমূহ, আনু. ৪৪৬/১০৫৫ পর্যন্ত, পৃ. ১৬৭-৭৩)।

H. Busse (E.I.[2])/ছালেমা খাতুন

**'ইযযু'দ-দীন ইব্‌ন 'আবদু'স-সালাম** (عزالدين بن عبد السلام) ঃ হিজরী সপ্তম শতাব্দীর মুহাদ্দিছ, সত্যের পথের আপোষহীন সংগ্রামী ও ইসলামী ফিক্‌হ বিশারদ, ৫৭৮/১১৮৩ সনে সিরিয়ার রাজধানী দামিশকে জন্ম গ্রহণ করেন। কুরআন, হাদীছ ও ফিকহে সুগভীর পাণ্ডিত্য, অনুপম তাকওয়া, স্বৈরাচারের সামনে সত্য কথনে দৃঢ়চিত্ততার কারণে সমসাময়িক 'উলামায়ে কিরাম সুলতানুল উলামা নামে তাঁহাকে অভিহিত করেন। শায়খ জামালুদ-দীন ইব্‌ন হাজিবের মতে ইসলামী ফিকহে 'আল্লামা 'ইযযু'দ-দীন-এর সুগভীর মনীষা ও বিশ্লেষণধর্মী পাণ্ডিত্য ইমাম গাযালীকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাঁহার সৌভাগ্য যে, তিনি শায়খ ফাখরুদ্দীন ইবন 'আসাকির, সায়ফু'দ-দীন আমিদী, হাফিজ আবূ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আসাকির ও শায়খ আবু'ল-হাসান শামলীর মত বিশ্ববরেণ্য 'আলিমদের নিকট শিক্ষালাভ করেন। দীর্ঘদিন যাবত তিনি গাযালিয়া ইসলামী শিক্ষা নিকেতনে শিক্ষকতার গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করেন এবং একই সময়ে দামিশকের ঐতিহাসিক উমায়্যা মসজিদের খতীব ছিলেন। তাঁহার ওয়াজ-নসীহতের ফলে দামিশকে প্রচলিত বহু বিদ'আত ও ধর্মীয় কুসংস্কারের অবসান ঘটে। সিরিয়ার সুলতান আল-মালিকু'ল-কামিলের আমলে তিনি দামিশকের আদালতে বিচারক নিযুক্ত হন এবং একবার রাষ্ট্রদূত হিসাবে বাগদাদে খলীফার দরবারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তরীকতের অন্যতম ইমাম শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর নিকট তিনি আধ্যাত্ম সাধনার দীক্ষা ও খিলাফাত লাভ করেন।

শিক্ষক, মুফতী ও বিচারপতি হওয়ার পাশাপাশি গ্রন্থকার হিসাবেও তাঁহার সবিশেষ খ্যাতি রহিয়াছে। মুসলিম বিশ্বে তাঁহার লিখিত গ্রন্থাবীলর মধ্যে মাজমূ'আ ফাতাওয়া, আল-কাও'য়াইদুল-কুবরা, মাজাযুল কুরআন, শাজারাতুল-মা'আরিফ ও আদ-দালাইলু'ল-মুতা'আল্লাকা বিদগ্ধ পণ্ডিতদের নিকট অতি মূল্যবান গবেষণাকর্ম হিসাবে স্বীকৃত। আস-সুবকী শেষোক্ত গ্রন্থ দুইটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, উক্ত কিতাবদ্বয় ইমামাত ও 'উলূমে শারী'আতে লেখকের উচ্চতর মর্যাদার সাক্ষ্য বহন করে। শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দিহ্‌লবী তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হু'জ্জাতুল্লাহ আল-বালিগাহ-এর ভূমিকায় বিশেষ যে তিন জন বড় 'আলিমের নাম উল্লেখ করেন, তাঁহাদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম 'ইযযু'দ-দীন ইব্‌ন 'আবদু'স-সালাম অন্যতম। অপর দুইজন হইতেছেন ইমাম গাযালী ও আবূ সুলায়মান খাতাবী।

'ইলম, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার পাশাপাশি 'আল্লামা 'ইযযু'দ-দীন-এর চরিত্রে পরোপকার, বদান্যতা ও সহৃদয়তার মত মহৎ গুণাবলী ছিল অনেকের নিকট শ্লাঘার বিষয়। দামিশকে একবার ভীষণ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে বিভিন্ন ফলের বাগান সস্তা দামে বিক্রয় হইতে থাকে। শায়খের সহধর্মিনী নিজের একটি দামী অলঙ্কার তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, ইহা দিয়া একটি বাগান কিনিয়া লও। খরা ও গ্রীষ্মের মৌসুমে আমাদের কাজে আসিবে। শায়খ স্বর্ণালঙ্কারটি বিক্রয় করিয়া পুরা অর্থ গরীব-মিসকীনদের

মধ্যে বিলাইয়া দেন। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, বাগান কেনা হইয়াছে কি? শায়খ জবাব দিলেন, হাঁ কিনিয়াছি, তবে জান্নাতে। আমি দেখিলাম দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে আমি সব টাকা দান করিয়া দিয়াছি। পূণ্যবতী স্ত্রী জবাব শুনিয়া বলেন, আল্লাহ্ পাক আপনাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ (আমর বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার), গোমরাহী ও বিদ'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা 'আলিমদের জন্য ফরয বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে, এই দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া সমূহ বিপদ ও দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতে হইবে। 'ইলম ও ভাষাজ্ঞান হইতেছে 'উলামার হাতিয়ার। দীনের মর্যাদা বৃদ্ধি ও দীনকে বিজয়ী করিবার জন্য প্রয়োজনে জীবনকে বাজি রাখিয়া মুশরিকদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। যে ব্যক্তি নিজের প্রাণের চাইতে আল্লাহকে প্রাধান্য দিবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে অন্যদের তুলনায় অধিকতর প্রাধান্য দিবেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকিবে তাহার পক্ষে। জনগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যে ব্যক্তি ব্যস্ত হইয়া পড়ে, আল্লাহর রোষ পতিত হইবে তাহার উপর এবং আল্লাহ্ তা'আলা জনগণকে তাহার প্রতি বিদ্রোহী করিয়া দিবেন।

তৎকালীন সিরিয়ার বাদশাহ সালিহ ইসমা'ঈল আশংকা করেন, যেই কোন মুহূর্তে মিসরের বাদশাহ নাজমু'দ-দীন আয়্যুব তাঁহার দেশে হামলা চালাইতে পারেন। মিসরীয় হামলা প্রতিরোধে তিনি খৃস্টান সৈন্যদের সাহায্য কামনা করিয়া এক চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তিবলে খৃস্টান সৈন্যরা দলে দলে সিরিয়ার বাজার হইতে অস্ত্র কিনিতে লাগিল। সেই সময় সিরিয়া ছিল আধুনিক অস্ত্র ও গোলাবারুদ উৎপাদন ও বিপণনের আন্তর্জাতিক বাজার। অস্ত্র ব্যবসায়িগণ শায়খ 'ইযযু'দ-দীন-এর নিকট ফতওয়া তলব করেন। তিনি ফতওয়া জারি করিয়া বলিলেন, খৃস্টানগণ এইসব অস্ত্রশস্ত্র কিনিয়া মুসলমানদের বুকে চালাইবে। তাই মুসলমানদের জন্য খৃস্টানদের নিকট অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিক্রয় করা হারাম। দামিশকের উমায়্যা মসজিদের মিম্বরে দাড়াইয়া তিনি অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তাঁহার প্রদত্ত ফতওয়ার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেন। খুতবায় বাদশাহের জন্য দো'আ করা বন্ধ করিয়া দেন। তিনি অত্যন্ত জোশের সহিত মুসল্লীদের লইয়া দো'আ করেনঃ

"হে আল্লাহ্! ইসলাম ও ইসলামের অনুগামীদের তুমি সাহায্য কর, ইসলামের দুশমনদের তুমি ধ্বংস করিয়া দাও।" ইহা ছিল সিরিয়ার বাদশাহর প্রতি প্রচণ্ড ধরনের আঘাত। 'আল্লামা 'ইযযু'দ-দীন ইব্ন 'আবদু'স-সালাম-এর ঈমানদীপ্ত ঘোষণার কারণে রুষ্ট হইয়া বাদশাহ তাঁহাকে গ্রেফতারের হুকুম জারি করেন। শায়খ গ্রেফতার হইয়া কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে চলিয়া যান। এইদিকে অস্ত্র উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা শায়খের ফতোয়ার কারণে খৃস্টানদের নিকট অস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেয়। বহুদিন তিনি কারাগারে বন্দী ছিলেন। সিরিয়ার সাধারণ জনগণের ভক্তি দিন দিন শায়খের প্রতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং বাদশাহর জনপ্রিয়তা দ্রুত নিম্নগামী হইয়া পড়িল। অবনতিশীল পরিস্থিতি অনুধাবন করিয়া বাদশাহ শায়খের সহিত আপোষ- রফার এক ফর্মূলা বাহির করেন। ইতোমধ্যে বাদশাহ সালিহ ইসমা'ঈল হিম্স প্রদেশের গভর্ণর আল-মানসূর সমভিব্যবহারে জেরুসালেম নগরীতে আসেন। একদিন বাদশাহ জনৈক মন্ত্রীকে নিজের একটি রুমাল দিয়া নির্দেশ দেন যে, তিনি রাত্রিবেলা কারাগারে গিয়া উক্ত রুমালটি শায়খকে হাদিয়া হিসাবে পেশ করিবেন এবং তোষামোদ করিয়া তাহাকে বলিবেন, তিনি যেন বাদশাহর সহিত একটি সম্মানজনক আপোষ-রফায় উপনীত হন। তিনি যদি প্রস্তাবে সম্মত হন তাহা হইলে তাঁহার হারানো চাকুরী ও পদ ফিরাইয়া দেওয়া হইবে আর তিনি যদি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তাহা হইলে কারাগার হইতে আনিয়া প্রাসাদ সংলগ্ন অপর একটি কক্ষে তাঁহাকে যেন বন্দী করিয়া রাখা হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গভীর রাত্রিতে মন্ত্রী জেরুসালেম কারাগারে অন্তরীণ শায়খের প্রকোষ্ঠে হাযির হন এবং অত্যন্ত বিনয় ও তোষামোদের সহিত তাঁহার সহিত আলাপ করেন। মন্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন। কারাগারের নিকটবর্তী রাজকীয় প্রাসাদে বাদশাহ অবস্থান করিতেছেন, আপনি যদি বাদশাহর দরবারে গিয়া তাহার হাতে চুমা দেন তাহা হইলে সকল ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিবে এবং আপনি পুরাতন চাকুরী ও অপরাপর সুযোগ-সুবিধা বর্ধিত আকারে পাইবেন। আপোষের এই হীন প্রস্তাব শুনিয়া শায়খ 'ইযযু'দ-দীন জেলখানার ভিতরে চিৎকার দিয়া বলেন ঃ

والله يا مسكين ما ارضاه ان يقبل يدى فضلا عن اقبل يده يا قوم انتم فى واد وانا فى واد والحمد لله الذى عافانى مما ابتلاكم به.

"আল্লাহর কসম! আরে বেওকুফ! বাদশাহর হাতে চুমা দিয়া ক্ষমা চাহিব ইহাত দূরের কথা, বাদশাহ যদি স্বয়ং আমার কক্ষে আসিয়া আমার হাতে চুমা দিতে চান আমি তাহাতেও রাজী হইব না। তোমরা এক জগতের বাসিন্দা, আমি আরেক জগতের। আল্লাহর শুকরিয়া, তোমরা যেই ভাবে মানব বন্দনায় ব্যস্ত আমি তাহা হইতে মুক্ত।"

বাদশাহর নির্দেশমত মন্ত্রী শায়খকে বন্দী করিয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া আসেন। শায়খের কক্ষ আর বাদশাহর কক্ষ পাশাপাশি। প্রায় সময় তিনি পবিত্র কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতে মশগুল থাকিতেন। একদা খৃস্টান প্রতিনিধি ও সৈন্যদের সম্বোধন করিয়া বাদশাহ বলেন, তোমরা কি কুরআন তিলাওয়াতের আওয়ায শুনিতে পাইতেছ? তাহারা জবাব দিলেন, হাঁ। বাদশাহ বলেন, তিলাওয়াতকারী কে তাহা কি তোমরা জান? তিনি সেই ব্যক্তি যিনি ফতওয়া দিয়া তোমাদের কাছে অস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করিয়াছেন। তিনি মুসলমানদের বড় ইমাম। আমি তাঁহাকে বিচারক ও মসজিদের খতীবের পদ হইতে বহিষ্কার করিয়া কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছি। তোমাদের স্বার্থে তাঁহাকে দামিশক নগরী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছি। খৃস্টানগণ এই জবাব শুনিয়া বলিলেন, 'এই রকম দৃঢ়চেতা মানুষ যদি আমাদের পাদ্রীদের মধ্যে থাকিত তাহা হইলে তাঁহার পা ধুইয়া আমরা পানি পান করিতাম।'

ইত্যবসরে মিসরীয় সৈন্যরা দামিশকে অভিযান চালাইয়া সালিহ ইসমা'ঈলকে পরাজিত করে। খৃস্টান সৈন্যদের আগ্রাসী থাবা স্তব্ধ হইয়া যায়। শায়খ কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া সহীহ সালামতে মিসরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মিসরের বাদশাহ নাজমু'দ-দীন শায়খের হাতে বায়'আত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে 'আমর ইবনু'ল-আস মসজিদের খতীব, মিসরের আদালতের বিচারক এবং জরাজীর্ণ মসজিদগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার বিভাগের প্রধান হিসাবে নিয়োগ দান করেন। পরবর্তীতে বাদশাহ যখন সালিহিয়্যা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন, তখন শাফিঈ মাযহাবের শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব শায়খের উপর অর্পণ করেন।

ফাখরু'দ-দীন 'উছমান নামক জনৈক ব্যক্তি যিনি রাজপ্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, একবার বাদ্যযন্ত্র অনুশীলনের জন্য মিসরের একটি

মসজিদের ছাদের উপর তবলাখানা নির্মাণ করেন। শায়খের কানে যখন এই সংবাদ পৌছিল তখন তদন্তের মাধ্যমে মসজিদের উপরে নির্মিত তবলাখানা ভাঙিয়া ফেলিবার নির্দেশ দেন। মসজিদে তবলাখানা নির্মাণের অভিযোগে ফাখরুদ্দীন 'উছমানের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করিয়া এক নির্দেশ জারি করেন এবং তিনি বিচারকের পদ হইতে ইস্তিফা দেন। অসত্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত শায়খের এই সংগ্রামী ভূমিকায় রাজদরবারে ও দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে শায়খের ইযযত ও মর্যাদা বহু গুণে বৃদ্ধি পায়।

একদা ঈদের দিন রাজকীয় দুর্গের অভ্যন্তরে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ চলিতেছিল। বাদশাহ স্বয়ং রেশমের চাদরে আবৃত আসনে সমাসীন। আমীর-উমারা, সেনা কর্মকর্তাগণ বাদশাহকে সালাম জানাইতেছেন। কেহ কেহ সিজদা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। এ দৃশ্য দেখিয়া শায়খ 'ইযযু'দ-দীন স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি এই পূর্ণ দরবারে ডাক দিয়া বলিলেনঃ

আয়্যুব! আল্লাহকে কী জবাব দিবেন? কিয়ামতের দিন আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমি তোমাদেরকে এই জন্য মিসরের রাজত্ব দিয়াছিলাম যে, স্বাধীনভাবে সবাই মদপান করিতে পারিবে? বাদশাহ জানিতে চাহিলেন, ঘটনা কী? শায়খ বলেন, অমুক শরাবখানায় বেপরোয়াভাবে মদপানের আসর বসে এবং আরো কত অসামাজিক কার্যকলাপ চলে তাহার খবরাখবর কি আপনার থাকিবার কথা নহে? আপনি তো আরাম-আয়েশের সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন। বাদশাহ জবাবে বলিলেনঃ

জনাব! এতে আমার কিছু করিবার নাই। আমার পিতার শাসনকাল হইতে এসব চলিয়া আসিতেছে। শায়খ বলিলেন, আপনিও তাহাদের মত বলিতেছেন যাহাদের সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে, 'ইন্না ওয়াজাদনা আবাআনা 'আলা উম্মাতিন' (এইসব আমাদের বাপ-দাদাদের যুগ ধরিয়া অব্যাহত রহিয়াছে)। বাদশাহ তাৎক্ষণিকভাবে শরাবখানা বন্ধের নির্দেশ জারি করেন।

শাহী দরবার হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে এক শিষ্য শায়খের নিকট জানিতে চাহিলেন, ঘটনা কী? তিনি বলিলেন, বাদশাহ যেইভাবে শান-শওকতের সহিত দরবারে আসীন ছিলেন, মানুষ যেভাবে কুর্ণিশ করিতেছিল, তাহাতে আমার আশংকা হইল, হয়তো ইহাতে তাহার মধ্যে অহংবোধের সৃষ্টি হইতে পারে এবং প্রবৃত্তির তাড়না জাগ্রত হইতে পারে। আমি তাঁহাকে সংশোধন করিবার জন্য এইসব কথা বলিয়াছি। শিষ্য জানিতে চাহিলেন, এইসব কথা বলিবার সময় আপনার মনে কোনরূপ ভীতির উদ্রেক হয় নাই? শায়খ বলিলেন, মহান আল্লাহর শান-শওকত ও মর্যাদা আমার অন্তরে এমনভাবে জাগ্রত ছিল যে, ইহার সামনে বাদশাহকে মনে হইয়াছে অসহায় বিড়াল।

তৎকালে খৃস্টানদের ষড়যন্ত্র ছিল একেবারে প্রকাশ্য। তাহারা একবার অভিযান চালাইয়া মানসূরা পর্যন্ত দখল করিয়া লয়। শায়খ মুসলমানদের সাথে লইয়া খৃস্টান আগ্রাসী শক্তির মুকাবিলায় জিহাদে ঝাপাইয়া পড়েন। মুনাজাত কবুল হইবার এক ঐশী শক্তির অধিকারী ছিলেন শায়খ 'ইযযু'দ-দীন। তাবাকাতু'শ-শাফিঈয়া-এর ভাষ্য অনুযায়ী শায়খের দো'আয় আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের বিজয় নসীব করেন এবং খৃস্টানদের জাহাজ প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়িয়া বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ইহাতে অধিকাংশ সৈন্যের সলিল সমাধি ঘটে।

হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে মোঙ্গলদের যুলুম, আক্রমণ ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতা মুসলমানদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। মোঙ্গলদের হাতে বাগদাদ ধ্বংসের স্মৃতি মুসলমানদের হৃদয়ে দগদগে ঘায়ের মত ছিল বেদনাদায়ক। ইতোমধ্যে খবর পাওয়া গেল যে, মোঙ্গল শক্তি মিসর অভিমুখে অভিযান চালাইবার পরিকল্পনা করিয়াছে। মিসরের বাদশাহ ও জনগণ মোঙ্গল আগ্রাসনের মুকাবিলা করিবার সাহস হারাইয়া ফেলেন। শায়খুল ইসলাম শায়খ 'ইযযু'দ-দীন মুসলমানদের অভয় দিয়া ঘোষণা করেন, আল্লাহর নাম লইয়া বাহির হও! আমি বিজয়ের গ্যারান্টি দিতেছি। বাদশাহ বলেন, যুদ্ধ পরিচালনার মত অর্থ আমার কোষাগারে নাই, আমি ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ঋণ লইতে চাই। শায়খ বলেন, রাজকীয় মহলের অভ্যন্তরে শাহী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ঘরে যে সমস্ত বৈধ-অবৈধ অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার রহিয়াছে সেইগুলি প্রথমে একত্র করা হউক। ইহার পর যদি অর্থ সংকট থাকে তাহা হইলে কর্জ লইবার কথা চিন্তা করা যাইতে পারে। শায়খের অপ্রতিহত প্রভাবে আমীর-উমারাহ বিনাবাক্যে নিজ নিজ স্ত্রীদের স্বর্ণালঙ্কার শায়খের সামনে হাযির করিলেন। এইগুলি দিয়া যুদ্ধের ব্যয়ভার মিটিয়া যায়। আল্লাহর দয়ায় মুসলমানরা বিজয়ী হয়।

৬৬০/১২৬৩ সালে এই বীর মুজাহিদ মিসরে ইন্তেকাল করেন। জানাযায় বাদশাহ, আমীর-উমারাসহ বিপুল সংখ্যক লোক অংশ গ্রহণ করেন। শায়খের লাশ যখন দুর্গের নীচ দিয়া কবরস্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন বিপুল জনসমাগম দেখিয়া মিসরের সম্রাট বায়বার্স মন্তব্য করেন, আজ আমার রাজত্ব সুদৃঢ় হইল। জনগণের উপর শায়খের যে অপ্রতিহত প্রভাব তাহাতে তিনি ইশারা করিলে জনগণ আমাকে ক্ষমতা থেকে টানিয়া নামাইয়া ফেলিত। বায়বার্স শায়খকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখিতেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** : (১) তাবাকাতু'স-শাফিঈয়াতি'ল-কুবরা, ৫খ., পৃ. ৮৪-১১১; (২) শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহ আল-বালিগাহ, পৃ. ৮৪; (৩) জালালুদ-দীন সুয়ূতী, হুসনু'ল-মুহাদারা, ২খ., পৃ. ৪৯-১৪১; (৪) সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, তারীখে দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমাত, মাজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, লক্ষ্ণৌ ১৯৮২, ১খ., পৃ. ৩৭৬-৩৯৪।

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

**'ইয্যুদ-দীন কায়কাউস** (২) (দ্র. কায়কা'উস)

**'ইয্যুদ-দীন ইবনুস-সুলাম** (দ্র. আস-সুলামী)

**'ইযরাঈল** (দ্র. 'আযরাঈল)

**'ইযা'আ** (اذاعة) ঃ আধুনিক আরবী শব্দ, ইহার অর্থ সম্প্রচারণ' (مذيع সম্প্রচারক, مذياع মাইক্রোফন)।

ইসলামী জগতে ১৯২৫ খৃ. তুরস্কে সম্প্রচারণ প্রবর্তন করা হয় লন্ডন হইতে নিয়মিত ট্রান্সমিশন প্রতিষ্ঠা করিবার তিন বৎসর পর। অধিকাংশ ইসলামী দেশে স্বীয় রাজনৈতিক পরাধীনতা ও অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে ইহার উন্নয়ন বিলম্বিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মিসরে ১৯৩৪ খৃ. সম্প্রচারণ শুরু হয় এবং ১৯৫২ খৃ. বিপ্লবের সময় সর্বমোট ৭৩ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটারের দৈনিক কার্যকাল ছিল মাত্র ১৫ ঘণ্টা। পরবর্তীতে জাতীয় অনুভূতির বিকাশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে ১৯৬৬ সালে প্রায় ৬,০০০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটারের দৈনিক কার্যকাল ১৩০ ঘণ্টায় উন্নীত হয় (এই বিবৃতি নির্দেশনা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপ-প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক আল-ইযা'আ ওয়া'ত-তালাফিস্যূন, ২৪ মার্চ, ১৯৬৬ খৃ. প্রদত্ত)।

তুরস্ক ১৯৬৪ খৃ. স্বতন্ত্র সম্প্রচার সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইসলামী বিশ্বে পুনরায় নব প্রবর্তকরূপে পরিগণিত হয়। ইহা সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না। এই সংস্থা অনুজ্ঞাপত্র ও বিজ্ঞাপন দ্বারা অর্থ যোগাড় করিত, কিন্তু ঘাটতি সরকার কর্তৃক পূরণ করা হইত। ইসলামী জগতের অন্যত্র সম্প্রচার কার্য সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। অধিকাংশ সময় সরকারী নীতি, অফিস সংক্রান্ত বিবৃতি ও নেতা কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের আক্ষরিক বিবরণ প্রচারে ব্যাপৃত হইত। ১৯৫৪-৫ খৃষ্টাব্দের মিসরের ইখওয়ানু'ল-মুসলিমূন নেতৃবৃন্দের বিচারের দীর্ঘ বিবরণী এবং ১৯৫৮-৯ খৃষ্টাব্দে ইরাকের ভূতপূর্ব মন্ত্রীবর্গের বিচারকার্য সম্প্রচার করা হইয়াছিল। ১৯৫৮ সালের নভেম্বরে দণ্ড নির্ধারণের অধিবেশন 'সরাসরি' (Live) প্রচার করা হয়। অনুরূপভাবে ১৯৬৬ খৃ. ইন্দোনেশিয়ার সুবান্দরিও বিচারের প্রারম্ভ ও শেষ অধিবেশনও। বেতারযোগে বিজ্ঞাপন প্রদান অনেক দেশে অনুমোদিত থাকিলেও য়ুরোপ কিংবা আমেরিকার তুলনায় অনুন্নত হওয়ার কারণে ইহা আয়ের উৎস হিসাবে অতি নগণ্য। সম্প্রচারণের শ্রেণীবিভাগ অপরাপর দেশের অনুরূপ। ধর্মীয় সম্প্রচারে কু'রআন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্মিলিত 'আরব প্রজাতন্ত্রে (UAR) ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ৪টা হইতে ৯টা এবং ১২টা হইতে ২১টা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে কু'রআন তিলাওয়াতের প্রচারকার্য শুরু হয়। শুক্রবারের অনুষ্ঠানাদিও সম্প্রচার করা হয়, বিশেষ করিয়া রামাদ'ান উপলক্ষে ধর্মীয় কথিকাসমূহ ও তিলাওয়াত। সৌদী 'আরবে সম্প্রচার কেবল খবর পরিবেশন, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক কথিকায় সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ ছিল। অধিক সংখ্যক খৃস্টান সংখ্যালঘু রাষ্ট্রে কোন উপলক্ষকে কেন্দ্র করিয়া খৃষ্ট ধর্ম সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচার করা হয়। সম্মিলিত 'আরব প্রজাতন্ত্র, তুরস্ক ও অন্য কতগুলি দেশে বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধিজীবীদের উপযোগী সাংস্কৃতিক কর্মসূচী রহিয়াছে। প্রচারকৃত খবরের মান স্থানীয় সংবাদপত্র, সংবাদ (সরবরাহ) প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যমান সিনেমা শিল্পের লঘু আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। ঢাকায় ১৯৩৯ খৃ.-এর ১৬ ডিসেম্বর রেডিও স্টেশন স্থাপন করা হয়।

বহু সংখ্যক মুসলিম দেশ বিস্তৃত এলাকা লইয়া গঠিত। জনবসতি সীমাবদ্ধ জায়গায় কেন্দ্রীভূত, মরু অঞ্চল দ্বারা ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্ন, তবে ইন্দোনেশিয়া সমুদ্র দ্বারা। নিরক্ষরতা সাধারণত খুব বেশী এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীন জাতীয় সত্তা সবেমাত্র অর্জিত হইয়াছে। সুতরাং তথ্য ও ভাবের প্রসার, সাধারণ জাতীয় মনোভাব গঠন ও শিক্ষামূলক বক্তৃতা বিস্তারে সম্প্রচারণ অত্যধিক মূল্যবান মাধ্যম। কিন্তু স্পষ্ট বার্তা গ্রহণে নিশ্চয়তার জন্য যাহা কার্যকর সম্প্রচারণে অত্যন্ত প্রয়োজন, যুগপৎ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রচুর মূলধন খরচ অপরিহার্য করিয়া তোলে। ইন্দোনেশিয়ায় আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ নিজস্ব অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কিন্তু সাধারণত সংস্থা খুবই কেন্দ্রীভূত। ট্রাঞ্জিস্টার সেট প্রচলনের ফলে ১৯৫৫ হইতে ১৯৬৫ দশকে শ্রোতা সেটের ঘনতা অত্যধিক বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। সর্বাধিক সংখ্যায় মুসলিম অধ্যুষিত মধ্যপ্রাচ্যে বিবিসির (Hand book, 1967) মোটামুটি হিসাবে সেটের সংখ্যা এই সময়ে দুই হইতে বার মিলিয়নে উন্নীত হয়, মোটামুটিভাবে জনসংখ্যার প্রতি দশজনের জন্য একটি। দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম দেশটিতে ইহার সংখ্যা অতি নিম্নতর ছিল।

অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু জাতির জন্য তাহাদের সংশ্লিষ্ট ভাষায় প্রচারকার্য পরিবেশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ ইরাকে কুর্দীদের জন্য, ইরানে তুর্কমান, আসীরীয়, আর্মেনীয়, কুর্দী, আযারবায়জানী সম্প্রদায়ের জন্য এবং আহ্ওয়াযে 'আরবদের জন্য, মরক্কো ও আলজিরিয়ায় বার্বার জাতির জন্য। মালী ফারসী ভাষা, বামবারা, সোনাঈর, পিউল, সারাকোলে, উলোফ, তামাসেক (তুরেগ বার্বার) ও হ'াস্সানী 'আরবীতে সম্প্রচার করে। অধিকাংশ দেশ আবার আবাসিক বিদেশী সংখ্যালঘুদের জন্য প্রচারকার্য পরিবেশন করে, যেমন সম্মিলিত 'আরব প্রজাতন্ত্র ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় ও গ্রীকদের জন্য। কোন কোন দেশ বিদেশে অবস্থানরত নিজ জাতির জন্য স্বদেশী ভাষায় সম্প্রচার করে, যেমন লেবানন, দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম আফ্রিকার জন্য, জর্দান দক্ষিণ আমেরিকার জন্য এবং তুরস্ক জার্মানীতে বসবাসকারী স্বদেশত্যাগী শ্রমিকদের জন্য।

যে দেশে ভাষা আধুনিকীকরণ করা হইতেছে কিংবা ইহাতে জাতীয়তার ছাপ দেওয়া হইতেছে, যেমন তুর্কী ও উর্দু, সেইখানে সম্প্রচারণের একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে; আর 'আরব জগতে ইহার গুরুত্ব সর্বসম্মতভাবে ব্যবহৃত 'আরবী ভাষার নমুনা বিস্তারের জন্য।

অধিকাংশ মুসলিম দেশ জনগণের কথিত ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে—এক কিংবা একাধিক বৃহৎ শক্তিবর্গের জন্য যাহারা সেই অঞ্চলের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের জন্য। এইরূপ সম্প্রচারণ সার্থক হওয়ার উদ্দেশে উপযুক্ত, সম্ভবত বিদেশী কর্মচারী নিয়োগ এবং শক্তিশালী ট্রান্সমিটার কার্যকর হইলে প্রচারের মাধ্যম কেন্দ্রসমূহের (Medium relay stations) জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হয়। ভাষার মান ও বিষয়বস্তু গ্রহণকারী দেশের তুল্য মানের হইতে হইবে এবং রাজনৈতিকভাবে কার্যকর হওয়ার জন্য প্রচারকৃত ভাবধারা লোকসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশের অন্তরে অনুভূতি জাগাইতে সক্ষম হইতে হইবে। এই সকল শর্ত পূর্ণ হইলে কেবল তখনই সম্প্রচার অভিযান সুপ্ত অনুভূতিকে কার্যকরভাবে উদ্দীপ্ত করে কিংবা জনসাধারণ্যে বিদ্যমান অনুভূতির আকস্মিক বৃদ্ধি চিহ্নিত করিতে সতর্ককারী হিসাবে কাজ করে। বেতার যুদ্ধ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মধ্যে এবং সম্মিলিত 'আরব প্রজাতন্ত্র ও ইরানের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে। 'আরব জগতে ইহা পুনঃপুনঃ সংঘটিত হইয়াছে, যেখানে ইহা সাধারণ ভাষা দ্বারা সম্ভবপর হইয়াছে। মরক্কো ও আলজিরিয়ার মধ্যে ইহা সংঘটিত হয় ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে যুদ্ধের সময়। তবে ইহাদের মধ্যে সম্মিলিত 'আরব প্রজাতন্ত্র ইহার শক্তিশালী ট্রান্সমিটার, উন্নত খবর পরিবেশন, তুলনামূলকভাবে উন্নত সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল 'আরব রাষ্ট্রের এক উল্লেখযোগ্য অংশের নিকট প্যান 'আরব ও সমাজতান্ত্রিক কৌশলের অনুভূতি জাগানোর দরুন প্রায়ই প্রধান অভিনেতারূপে পরিগণিত হইত। সম্মিলিত 'আরব প্রজাতন্ত্র প্রায় ৩০টি ভাষায়, ১৩টি আফ্রিকান ভাষাসহ, সপ্তাহে ৫৮৯ ঘণ্টা অনুষ্ঠান করিয়া বহির্দেশীয় সম্প্রচারকদের তালিকায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ইহা সোভিয়েত রাশিয়ার ১৩৮১ ঘণ্টা; ভয়েস অব আমেরিকার ৯০৯ ঘন্টা এবং বিবিসির প্রায় ৪০টি ভাষায় ৬৬৩ ঘন্টা বহিঃপ্রচারের সহিত তুলনীয়। ইরান স্থানীয় ভাষা ছাড়া রাশিয়ান, ফরাসী, ইংরেজী, উর্দু, তুর্কী ও 'আরবী ভাষায় সম্প্রচার করিয়া থাকে। পাকিস্তান ও তুরস্ক প্রতিটি দেশই বার কিংবা আরও অধিক ভাষায় সম্প্রচার করে। বাংলাদেশ ৬টি ভাষায় সম্প্রচার করিয়া থাকে। ক্ষুদ্রতর শক্তিগুলির মধ্যে সোমালিয়া স্বাধীনতা লাভের তিন বৎসর পর ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েত রাশিয়া হইতে দুইটি ৫০ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার সংগ্রহ করিবার পর 'বিশ্বে সংবাদ প্রেরণ' শুরু করে— সোমালী ভাষায়

প্রচারকার্য দৈনিক ছয় ঘন্টা; 'আরবীতে ১ ত(১,২) ; ইংরেজীতে ত(৩,৪) এবং ইতালী, আমহারিক ও সাওয়াহিলী প্রতিটি ভাষায় ত(১,২) ঘন্টা, গালায় ১০ মিনিট এবং কোন উপলক্ষকে কেন্দ্র করিয়া ডানকালী ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

বিদেশ হইতে ইসলামী দেশে সম্প্রচার করিবার দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ও যুদ্ধ চলাকালীন বৃহৎ শক্তিবর্গ দ্বারা স্থাপন করা হয়। ইতালীর ফ্যাসিবাদী শাসক ১৯৩৫ সালে 'আরবীতে সম্প্রচার শুরু করে। গ্রেট বৃটেন অনুরূপ কাজের সূচনা করে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে এবং নাৎসী জার্মানী ১৯৩৮ সালের মধ্যভাগে; শেষোক্ত দেশ অমার্জিত ও হিংসাত্মক প্রচারণায় পারদর্শিতা অর্জন করে। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৪৩ খৃ. হইতে তাহাদের সম্প্রচারযুক্ত করে। প্যারিস হইতে 'আরবীতে সম্প্রচারণ ১৯৩৯ সালের পূর্বে শুরু হয়; ইহাতে রহিয়াছে ফ্রান্সে বসবাসকারী আলজিরীয়দের জন্য আঞ্চলিক ভাষায় ট্রান্সমিশন। উত্তর আফ্রিকার অপরাপর 'আরবী ভাষাভাষী দেশের স্থানীয় সম্প্রচার ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া গেলে বহির্বিশ্বের জন্য তাহাদের সম্প্রচার আলজিরীয় যুদ্ধ চলাকালে সর্বাধিক মাত্রায় পৌঁছে। পরবর্তী কালে এইগুলি অনেক হ্রাসকৃত হয়। ১৯৬৬ খৃস্টাব্দে ৪৫টি মুসলিম ও অমুসলিম রাষ্ট্র দেশসমূহের জন্য 'আরবী ভাষায়, ২০টি দেশ ইরানের জন্য পারসী ভাষায়, ১৭টি দেশ ইন্দোনেশিয়ার জন্য ইন্দোনেশীয় ভাষায় সম্প্রচারণ করিতেছিল। একমাত্র বিবিসি দৈনিক ১২ ঘন্টা 'আরবী ভাষায় সম্প্রচার করে (১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১০ ঘন্টা) এবং সেই বৎসরে প্রায় ৮০,০০০ পত্র শ্রোতাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়। সিরিয়াই সর্বপ্রথম 'আরব রাষ্ট্র যাহা শিশালীর শাসনামলে (১৯৫০-৪) সত্যিকারভাবে বহির্বিশ্বের জন্য সম্প্রচার সংগঠিত করে। সিরিয়া ও সম্মিলিত 'আরব প্রজাতন্ত্র ইসরা'ঈলের জন্য হিব্রু ভাষায় সম্প্রচারণের সূত্রপাত করে, ইহার পরিবর্তে ইসরা'ঈল তাহার সংখ্যালঘু 'আরব ও প্রতিবেশীদের জন্য 'আরবী ভাষায় সম্প্রচারণ করে।

দৃশ্যত গুপ্ত দেশীয় কেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হয় আর বিলীন হয়, বিশেষ করিয়া সংকটময় কালগুলিতে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি অকৃত্রিম পাওয়া যায়; কিন্তু সাধারণত এইগুলি পাশ্চাত্য কিংবা মুসলিম রাষ্ট্রের বাহিরের বিদেশী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি দ্বারা পরিচালিত হয়।

টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপন, উৎপাদন ও প্রয়োজন ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে মুসলিম জগতে ইহার প্রচলন খুবই সীমিত। তৎসত্ত্বেও এশিয়ার ও সাহারার উত্তরাঞ্চলের আফ্রিকায় এবং অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে ১৯৬৬ খৃ. নাগাদ কিছু কিছু সার্ভিস প্রচলিত ছিল এবং অনেক রাষ্ট্র শুল্ক রহিত করিয়া কিংবা অন্য উপায়ে টেলিভিশন সেট ক্রয় করিতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিল। সম্মিলিত 'আরব প্রজাতন্ত্র ব্যতীত সার্ভিস কেবল রাজধানী কিংবা কতিপয় বড় শহরে কার্যকরভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। ইরানে বেসরকারী কোম্পানী বিজ্ঞাপন হইতে প্রাপ্ত আয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় তেহ্রান ও আবাদানে সার্ভিস চালু রাখে। কোন কোন অঞ্চলে (সৌদী 'আরব ও লিবিয়া) জাতীয় টেলিভিশন প্রবর্তনের পূর্বে আমেরিকা সেনাবহিনী কিংবা তৈল কোম্পানীর ট্রান্সমিশন স্থানীয়ভাবে চালু করা হয়। শেষোক্তটি তৈলের আয় দ্বারা এবং প্রথমোক্তটি ধর্মীয় আপত্তিসমূহ দুর্বল করার মাধ্যমে সম্ভব হইয়াছে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) World Radio and TV Handbook (annually from 1947); (২) Statistical Yearbook (UNESCO); (৩) Internationales Handbuch fur Rundfunk und Fernsehen, Hamburg 1964; (৪) G. A. Coddling jr., Broadcasting without barriers, UNESCO 1959; (৫) BBC Yearbook (now Handbook), London (annually from 1928); (৬) BBC Monitoring Service daily digest of World broadcasts 1939-1947 and Summary of world broadcasts 1947 (এই সকল গ্রন্থ ইসলামী দেশসমূহ হইতে ও ইহাদের সম্বন্ধে সম্প্রচার হইতে নির্বাচন সম্বলিত এবং ১৯৪৯ খৃস্টাব্দ হইতে ইহাতে এইসব দেশে সম্প্রচারণের বিকাশ হইতে নির্বাচন অন্তর্ভুক্ত আছে); (৭) N. Barbour, Broadcasting to the Arab World, in MEJ, v (1951), 57-69. কোন প্রকাশনা ইসলামী দেশ হিসাবে ইহার পূর্ণ তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে না। তথ্যের জন্য প্রতি দেশের সম্প্রচার প্রকাশনাসমূহ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

N. Barbour (E.I.²)/মু. মাহবুবুর রহমান

**ইয়াদ** (إياد) ঃ একটি প্রাচীন 'আরব গোত্র। কুলজিবিদগণের মতে তাহাদের পূর্বপুরুষ ইয়াদ ছিল নিযার ইব্ন মা'আদ্দ-এর পুত্র এবং রাবী'আ, আন্মার ও মুদ'ার-এর ভ্রাতা। প্রথমত তাহারা তিহামা-তে বসবাস করিত। প্রচলিত মক্কী কাহিনীমতে (দ্র. Wustenfeld, Chroniken, ২খ, ১৩৭ প.) তাহারা মক্কা হইতে জুরহুম গোত্রকে বিতাড়িত করিয়া নিজেদেরকে কা'বার অধিকর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করে, কিন্তু পরবর্তী কালে খুযা'আ গোত্রের সহিত বিবাদ সৃষ্টি হইলে তাহারা বিতাড়িত হয়। অতঃপর তাহারা বাহ্রায়ন গমন করে এবং অন্যান্য গোত্রের সহায়তায় আত-তানূখ (দ্র.) কনফেডারেশন গঠন করে। ইহার পর তাহারা ইরাক গমন করে এবং সেই স্থানে ইউফ্রেটিস (দিজলা) নদী ও মরুভূমির মধ্যবর্তী উর্বর সাওয়াদ অঞ্চলে পশু পালন উপযোগী চারণক্ষেত্র পায় এবং 'আয়ন উবাগ'-এ বর্ষব্যাপী পানি সংগ্রহের সুযোগ পায়। আল-হীরার শাসনকর্তা জাযীমা ইব্ন মালিক আল-আয্দীর সহিত তাহাদের কথিত সংঘর্ষের ব্যাপারটি যদিও সত্য হয়, তবে সম্ভবত উপরিউক্ত ঘটনা ঘটে খৃস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে। জাযীমা ছিলেন পালমায়রা-র জেনোবিয়ার সমসাময়িক। কতিপয় ইয়াদভুক্ত জনগোষ্ঠী আল-হীরাতে বসতি স্থাপন করে এবং ইতঃপূর্বে ধর্মান্তরিত না হইয়া থাকিলে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়া নাগরিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। কিছু কিছু লোক সাসানীদের অধীনে চাকুরী প্রাপ্ত হয়ঃ লাকীত ইব্ন য়া'মুর [শিরো.], (তাহার পিতার নামের জন্য দ্র. আশ-শাম্মাখ, দীওয়ান, ১৩০২ হি., পৃ. ২৯, ২) ছিলেন 'আরব বিষয়াবলী সম্পর্কিত বিভাগের সচিব; কবি আবূ দুওয়াদ (দ্র.) ছিলেন ৩য় আল-মুনযি'র ইব্ন মা'উ'স-সামা' (রাজত্বকাল ৫০৫-৫৪ খৃ.)-এর অশ্বশালার ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা। অন্যরা বেদুঈন জীবন যাপন করিতে থাকে এবং মরুভূমিতে ইতস্তত ভ্রমণকালে প্রায়শ কৃষকগণের উপর উপদ্রব করিত। ১ম খসরু-এর রাজত্বকালে (৫৩৯-৭৯ খৃ.) তাহারা, এমনকি পারস্য দেশীয় জনৈক অভিজাত মহিলাকে অপহরণ করে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত পারস্যদেশীয় অশ্বারোহী বাহিনীকে দায়রু'ল-জামাজিম (দ্র.)-এ পরাভূত করে; কিন্তু লাকীত কর্তৃক তাঁহার প্রখ্যাত কবিতাগুলির মাধ্যমে প্রদত্ত সতর্কবাণীর প্রতি তাহারা কর্ণপাত না করিলে শেষ পর্যন্ত পারসিকগণ তাহাদেরকে বিধ্বস্ত করে। যাহারা টিকিয়া থাকে তাহাদের কেহ কেহ মরুভূমিতে পলায়ন করে, একদল সিরিয়া, এমনকি বায়যানটিয় এলাকাধীন একটি স্থান আঙ্কারায় (আল-আসওয়াদ ইব্ন

য়া'ফুর আন-নাহ্শালী কর্তৃক উল্লিখিত, মুফাদ্দা'লিয়্যাত নং ৪৪=আ'শা নাহ্শাল, নং, ৭, Geyer) গমন করে। এই স্থানটি ছিল পার্বত্য অঞ্চল হইতে দিজ্‌লা নদীর উৎপত্তি স্থলে অবস্থিত। আর তৃতীয় একটি দল কূফা, জাযীরা ও তিকরিত-এ গমন করে। তিকরিত হইতে এই দলটি পুনরায় পারসিকগণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়, কিন্তু পরে তাহারা তিকরিতে প্রত্যাবর্তন করে এবং ১৬/৬৩৭ সালে ইয়াদগণ গোপনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তিকরিত-এর সেনা ছাউনিকে সহায়তা প্রদান করে। ইরাকে থাকিয়া যাওয়া অবশিষ্টগণ পারসিক সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য হয় এবং তাহাদেরকে আনু. ৬০৪ খৃ. যূক'ার (দ্র.)-এর যুদ্ধে বাক্‌র ইব্ন ওয়া'ইল-এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তাহারা পক্ষ পরিবর্তন করিয়া বাক্‌র-এর সহিত মিলিত হয় এবং এইভাবে প্রথমবারের মত বেদুঈনদের হস্তে পারসিকদের পরাজয় হয়।

ইসলামের উত্থান ইয়াদ গোত্রের উপর কোনরূপ সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে নাই। ৮/৬২৯ সালে মক্কায় তাহাদের প্রেরিত প্রতিনিধিগণ সম্পর্কিত কাহিনীটি (আগ'ানী², ১৪খ, ৪১ প.; ইব্ন সা'দ, ১/২খ, ৫৫) বস্তুতপক্ষে কু'স্‌স ইব্ন সা'ইদা (দ্র.) সম্পর্কিত কিংবদন্তীর অন্তর্ভুক্ত। কিছু সংখ্যক ইয়াদ তামীম গোত্রীয় সাজাহ' (দ্র.) নাম্নী ভণ্ড নারী পয়গাম্বরের সহিত যোগদান করে। কূফায় কিছু সংখ্যক ইয়াদী ছিল নিঃসন্দেহে মুসলিম (ত'াবারী, ১খ, ২৪৮২, ২৪৯৫), কিছু সংখ্যক ছিল দাসত্ব হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত স্বাধীন ব্যক্তি (ইব্ন সা'দ, ৬খ, ২৭০, ২৭৭) এবং কিছু সংখ্যক ভূম্যধিকারী (বালাযু'রী, পৃ. ২৮৩, ৫) ১২/৬৩৩ সালে যখন খালিদ ইব্নু'ল-ওয়ালীদ (রা) ইরাক' জয় করেন তখন ইয়াদ অন্যান্য গোত্রের সমবায়ে পারসিক সেনাবাহিনীর সহিত তাঁহাকে পর্যায়ক্রমে 'আয়নু'ত-তামর (ত'াবারী, ১খ, ২০৬২) ও সানদাওদা' (বালাযু'রী, পৃ. ৩১০; য়াকূত, ২খ, ৪২০) নামক স্থানে প্রতিরোধ করে। একটি বর্ণনামতে (ত'াবারী, ১খ, ২০৭৪) ইয়াদ তাগ'লিব এবং নামির ও তাহাদের সহযোগী বায়যানটীয় ও পারসিকগণকে খালিদ (রা) ১২/৬৩৪ সালে দিজ্‌লা নদীর বাঁধে (الفراد) পরাভূত করেন। তবে বর্ণনাটি সন্দেহজনক। প্রায় একই সময়ে ১৩/৬৩৪ সালে মুসলমানদের ফিলিস্তীন বিজয় শুরু হয়। একই বৎসরের শেষের দিকে হি'ম্‌স' তাহাদের আয়ত্তে আসে। সিরিয়ার এই উত্তরাঞ্চলে বেদুঈনগণ বসবাস করিত এবং তাহাদের মধ্যে বহু শতাব্দী যাবত প্রায়শ বিভিন্ন বসতিতে (حاضر) পৃথকীকৃত অবস্থায় তানূখ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৭/৬৩৮ সালে ইয়াদীগণ ও ইরাকের অন্য বেদুঈনগণ বায়যানটীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করে এবং সিরিয়া পুনর্দখলের চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলিমগণ মেসোপটেমিয়া জয় করিলে তাহারা স্বপক্ষ ত্যাগ করে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, বায়যানটীয়গণ পরাজিত হয় এবং সাইলিসিয়াতে পলায়ন করে। 'উমার ইব্নু'ল-খাত্তাব (রা) হেরাক্লিয়াসের নিকট তাহাদের প্রত্যর্পণ দাবি করেন এবং সম্রাট তাহাদেরকে ফেরত পাঠাইতে বাধ্য হন (বাকরী, পৃ. ৪৯)। তাহারা সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়াতে বসতি স্থাপন করে। ইহার পরবর্তী সময়ে ইয়াদীগণের সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হইতেছেন আল-মা'মূন-এর ক'াদী আহ'মাদ ইব্ন আবী দুওয়াদ (দ্র.)। অবশ্য তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার এই বংশ ঐতিহ্যের দাবি স্বীকার করেন না। অন্য ইয়াদীগণের মধ্যে ছিলেন মিসরের ক'াদী ইব্ন আবি'ল-লায়ছ, মৃ. ২৫০/৮৬৪ (খাতী'ব, তা'রীখ বাগ'দাদ, ২খ, ২৯২) এবং সিজিস্তানের কাযী যাফির ইব্ন সুলায়মান (ঐ, ৮খ, ৪৯৪; আরও দ্র. ঐ, ৩খ, ৬৫, নং ১০২০; ৩খ, ১০৬, নং ১১০৪; ৪খ, ৩২৫ নং ২১৩৫; ১২খ, ৯৭, নং ৬৫২৫)। স্পেনেও কিছু সংখ্যক ইয়াদী ছিল (মাক্কারী, ১খ, ১৮৬, ১৫), তাহাদের অন্যতম হইতেছে সেভিলের প্রখ্যাত ইব্ন যুহ্‌র (দ্র.) পরিবার। বানূ ইয়াদ ইব্ন সূদ ছিল আযদ গোত্রের একটি অংশ।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ প্রবন্ধের গর্ভে বরাত দ্র.। আরও দ্র. (১) আল-বাক্‌রী, মু'জাম (Wustenfeld), পৃ. ৪৪-৫১ ও স্থা.; (২) ইব্ন কু'তায়বা, শি'র, পৃ. ৯৭; (৩) ইব্ন দুরায়দ, ইশ্‌তিক'াক (Wustendeld), ১০৪ প.; (৪) হামদানী (তাঁহার ১৭৮[২১]-১৭৯[১৫] পৃষ্ঠায় তাহাদের বসতি স্থান-সমূহের তালিকা প্রদান করিয়াছেন); (৫) নিম্নোক্ত গ্রন্থকারগণের নির্ঘণ্টসমূহ দ্র.ঃ ত'াবারী, য়া'কূ'বী, মুবাররাদ-এর কামিল, ইব্ন 'আবদ' রাব্বিহি, আল-'ইক্‌'দ (মুহা'ম্মাদ শাফী'প্রদত্ত নির্ঘণ্ট), মাস'ঊদী, আগ'ানী, ফিহ্‌রিস্ত, ইব্নু'ল-আছীর, য়াকূ'ত', মু'জাম ও W. Caskel, Gamharat alnasab des ibn al-Kalbi, ১খ, ১৭৪; ২খ, ২৫৯ প.।

J. W. Fuck (E.I.²)/আবদুল বাসেত

**'ইয়াদ ইব্ন মূসা** (عياض بن موسى) ঃ ইব্ন 'ইয়াদ' ইব্ন 'আম্‌রূন আল্-য়াহ'সু'বী আস-সাব্‌তী আল-ক'াদী (৪৭৬/১০৮৮-৫৪৪/১১৪৯) ছিলেন মুসলিম প্রতীচ্যে মালিকী মায'হাবের অতি প্রসিদ্ধ প্রবক্তাগণের অন্যতম। তাঁহার অস্তিত্ব প্রায় সম্পূর্ণভাবে আল-মুরাবিত বংশের শাসনামলের সমকালীন এবং জীবনব্যাপী তিনি ছিলেন মুরাবিত শাসকদের সহিত সুদৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত।

য়াহ'সু'ব-এর মাধ্যমে য়ামানী উৎসসম্ভূত তাঁহার পরিবার বহু পূর্বেই প্রতীচ্যে দেশান্তরী হয় এবং Basta (দ্র.), মুসলিম স্পেন, Fez ও এক অনির্ধারিত কালে কায়রাওয়ানে বাস করার পর অবশেষে সিউটা (ceuta)-তে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার প্রপিতামহ 'আম্‌রূন ছিলেন পরিবারের প্রথম প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তাঁহার খ্যাতির মূলে ছিল কু'রআনের পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং সর্বোপরি সুবিখ্যাত আল্-মান্‌সূ'র ইব্ন আবী 'আমির (দ্র.)-এর অধীনে চাকুরীতে তাঁহার কৃতিত্ব। একমাত্র তিনিই ধনরত্নসহ, যাহা তিনি সম্ভবত আল্-মান্‌সূ'রের অধীনে চাকুরীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হন, সিউটাতে বসতি স্থাপন করেন এবং তথায় ৩৯৭/১০০৭ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার বংশধরগণ এই স্থানে নগরীর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্ত হন।

তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত ছিলেন 'ইয়াদ'। নিজ শহরে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি ৫০৭/১১১৩ সালে জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য প্রাচ্যের পরিবর্তে স্পেনে গমন করেন [তিনি কখনও, এমনকি হ'জ্জের জন্যও প্রাচ্য গমন করেন নাই; ইব্ন বাশ্‌কুওয়াল তাঁহার সি'লা-তে (১খ., ৪৪৬, নং ৯৭২; আন্-নাওয়াকি'রী কর্তৃক পুনঃপ্রকাশিত, Simtl Ms. B.N. Tunis, নং ১১, ৩৯৬, পৃ. ১০) আবূ 'আলী আস'-সা'দাফীর তত্ত্বাবধানে 'ইয়াদ-এর গবেষণা সংক্রান্ত যে 'বি'ল-মাশ্‌রিক' (অর্থাৎ প্রাচ্যে) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা পূর্ব স্পেন নির্দেশ করে, প্রাচ্য (Orient) নহে; ইহা আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে শেষোক্ত শিক্ষকের ছাত্রগণের প্রতি উৎসর্গীকৃত ইব্নু'ল-আব্বার-এর মু'জাম-এ]। শিক্ষা লাভের জন্য ঐতিহ্যগত এই ভ্রমণ (রিহ্'লা) প্রায় এক বৎসর স্থায়ী হয়। 'ইয়াদ' সর্বমোট প্রায় এক শত শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার গুন্‌য়া (غنية) গ্রন্থটি (পাণ্ডুলিপি পর্যায়ে) যেই শিক্ষকগণের নামে উৎসর্গ করেন তাঁহাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ইব্ন হাম্‌দীন (৪৩৯/১০৪৭-৫০৮/১১১৫), যিনি ছিলেন আল্-গ'াযালী (র)-র ইহ্'য়া' গ্রন্থের তীব্রতম বিরোধী; আবূ বাক্‌র ইব্নু'ল-'আরাবী

(৪৬৮/১০৭৫-৫৪৩/১১৪৯), যিনি প্রাচ্যে আল্‌-গাযালী (র)-র সাক্ষাত লাভ করেন এবং ৪৯৩/১১০০ সালে মরক্কো ও স্পেনে তাঁহার ইহ্‌য়া' গ্রন্থটি সম্ভবত পরিচিত করেন; আরও ছিলেন প্রখ্যাত হ'াদীছ'বিদ আবূ 'আলী আস্‌-সাদাফী (মৃ. ৫১৪/১১২০-১)।

সিউটাতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহাকে 'শূরা' (দ্র.)-এর মর্যাদায় ও পরে ৫১৫/১১২১-২ সালে তাঁহার পূর্বপুরুষগণের নগরীর কাদী পদে উন্নীত করা হয়। ১ সাফার, ৫৩১/২৯ অক্টোবর, ১১৩৬ সালে তাঁহাকে গ্রানাডার কাদীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে তিনি একজন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বে পরিণত হন এবং নূতন বসতি স্থানের বাসিন্দাগণ তাঁহাকে একজন বীরের মত সানন্দ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। তাহার এই মর্যাদা ছিল ক্ষণস্থায়ী। কঠোর দোষদর্শী বিবেচিত হওয়ায় নগরীর তৎকালীন গভর্নর তাশ্‌ফীন-এর অনুরোধক্রমে কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়। তাশ্‌ফীনের মৃত্যুর (২৬ রামাদান, ৫৩৯/২৩ মার্চ, ১১৪৫) পর তিনি পুনরায় দোদুল্যমান আল-মুরাবিত শাসকগণের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হন। ৫৩৯/১১৪৫ সালের শেষদিকে তিনি পুনরায় স্বল্পস্থায়ী ইব্‌রাহীম ইব্‌ন তাশ্‌ফীন কর্তৃক সিউটার কাযী মনোনীত হন। এই পদে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন তাঁহার জন্য অবধারিত ছিল। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণ নহেন, বরং তাঁহার জীবনীকারগণ নীরব থাকা শ্রেয় মনে করিয়াছেন।

একজন জংগী ও নিবেদিতপ্রাণ মালিকী হিসাবে 'ইয়াদ' সিউটাতে বস্তুত আল-মুওয়াহ্‌হিদ শাসনের বিরোধিতার কেন্দ্রে পরিণত হন। আল-মুওয়াহ্‌হিদগণের চূড়ান্ত জয়ের পর তিনি প্রথমত তাদ্‌লা (Tadla)-তে যাযাবরদের মধ্যে নির্বাসিত হন। পরে সন্দিগ্ধ সিউটা নগরীর অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তির সহিত তাঁহাকে যবরদস্তী মাররাকুশ-এ বসবাসের জন্য প্রেরণ করা হয়। এই স্থানে তিনি শ্রান্ত ও ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় ৭ জুমাদা-২, ৫৪৪/১৩ অক্টোবর, ১১৪৯ সালে ইনতিকাল করেন। আল-মুওয়াহ্‌হিদগণের আমলে তিনি যে শত্রু ভাবের শিকার হইয়াছিলেন ইহার প্রতিধ্বনিমূলক কিংবদন্তী স্নানাগার (হাম্মাম) তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুকে আল-গাযালী (র)-র প্রতি তাঁহার আসক্তির সহিত বিজড়িত করিয়াছে অথবা অন্য কিংবদন্তীমতে গোপনে য়াহূদীবাদ আচরণের অভিযোগে মাহ্‌দী ইব্‌ন তূমারত তাঁহাকে হত্যা করিয়াছেন।

'ইয়াদ সাহিত্যে প্রতিভাহীন ছিলেন না; কিন্তু তিনি প্রধানত একজন হ'াদীছ'বিদ ও ফাকীহরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন আল-মুরাবিত যুগের যথার্থ প্রতীকরূপী ফাকীহ, ইমাম, কঠোর নিষ্ঠাবান এবং তাঁহার মতে কেবল ইমাম মালিক (র) ও তাঁহার মাযহাবের শিক্ষাই ছিল প্রকৃত অনন্য সত্য। তিনি ২০টির অধিক গ্রন্থ রচনা করেন; অনেককয়টি লুপ্ত। তাঁহার সুপরিচিত প্রকাশিত রচনাবলী তিনটিঃ (১) আশ্‌-শিফা' বি-তা'রীফি হুকূকি'ল--মুস্‌তাফা' (الشفاء بتعريف حقوق المصطفى); গ্রন্থখানি বিরাট সাফল্য অর্জন করে এবং বর্তমানকালেও জনপ্রিয় ভক্তিমূলক কার্যক্রমের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; (২) মাশারিকু'ল্‌-আন্‌ওয়ার 'আলা সিহাহি'ল্‌-আছার (مشارق الانوار على صحاح الاثار); (৩) তার্‌তীবু'ল-মাদারিক ওয়া তাক্‌রীবু'ল-মাসালিক বি-মা'রিফাতি আ'লামি মাযহাবি মালিক (ترتيب المدارك وتقريب المسالك بمعرفة اعلام مذهب مالك); এই গ্রন্থটি মালিকী মাযহাবের প্রধান প্রবক্তা ও সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) বরাতের জন্য দ্র. (১) Brocklemann, I, ৪৫৫-৬ ও S I, ৬৩০-২; (২) M. Talbi, Biographies aghlabides extraites des Madarik du Cadi Iyad, তিউনিস ১৯৬৮ খৃ., ৫১-৮; (৩) মুর্‌তাদা, ইতহাফু'স-সাদাতি'ল্‌-মুত্তাকীন বি-শার্‌হি ইহ্‌য়া' 'উলূমি'দ-দীন (اتحاف السادات المتقين بشرح احياء علوم الدين), সম্পা. বূলাক, তা. বি., ১খ, ২৭; (৪) মুহাম্মাদ কুওয়ায়সিম ইব্‌ন 'আলী আন-নাওয়াবিরী, সিম্‌তু'ল্‌-লা'আলী, পাণ্ডু. B. N. Tuins, নং ১১৩৯৬, ১খ. ১০-১৪; (৫) M. A. Enan, 'আস্‌রু'ল্‌-মুরাবিতীন ওয়া'ল-মুওয়াহ্‌হিদীন, কায়রো ১৯৬৪ খৃ., ১খ, ৪১-৪; (৬) A. Merad, Abd al-Mu'min a la conquete de l'Afrique du Nord (১১৩০-১১৬৩), in AIEO (Alger), ১৫ খ. (১৯৫৭ খৃ.), ১২৬-৮; (৭) আল্‌-ই'লাম বি-হুদূদি কাওয়া'ইদি'ল-ইস্‌লাম, সম্পা. আত-তান্‌জী, রাবাত ১৯৬৪ খৃ.; (৮) আল্‌-ইল্‌মা' ইলা মা'রিফাতি উস্‌লি'র-রিওয়ায়া ওয়া তাক্‌য়ীদি'স্‌-সামা' (الالماع الى معرفة اصول الرواية وتقييد السماع), A. Safar, কায়রো-তিউনিস ১৯৭০ খৃ.; আরও দ্র. 'আল্‌-মাক্কারী' প্রবন্ধ।

M. Talbi (E.I.[2])/আবদুল বাসেত

**'ইয়াদ ইব্‌ন যুহায়র আল-ফিহ্‌রী** (عياض بن زهير الفهرى) ঃ (রা) একজন মুহাজির সাহাবী, জন্ম মক্কার সম্মানিত কুরায়শ গোত্রে, জন্ম তারিখ অজ্ঞাত, উপনাম আবূ সা'ঈদ, মাতার নাম সাল্‌মা বিন্‌ত 'আমির ইব্‌ন রাবী'আ। তাঁহার বংশতালিকা এইরূপঃ 'ইয়াদ' ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন আবী শাদ্দাদ ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন উহায়ব ইব্‌ন দাব্বা ইব্‌নি'ল-হারিছ ইব্‌ন ফিহ্‌র।

ইব্‌ন ইস্‌হাক, মূসা ইব্‌ন 'উকবা, ওয়াকিদী প্রমুখের বর্ণনামতে 'ইয়াদ' ইব্‌ন যুহায়র (রা) নবূওয়াতের ৬ষ্ঠ বর্ষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে হাবশা (ইথিওপিয়া)-য় হিজ্‌রতকারী দ্বিতীয় দলে শরীক ছিলেন। মক্কায় প্রতাবর্তনের পর তিনি মদীনায় হিজরত করেন। অন্যান্য মুহাজির-এর সহিত তিনি কুল্‌ছূম ইব্‌নু'ল-হিদ্‌ম-এর আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বদ্‌র, উহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন।

খলীফা ইব্‌ন খায়্যাত প্রমুখ ঐতিহাসিক হাবশায় হিজরতকারী ও বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীর নাম 'ইয়াদ' ইব্‌ন গানম ইব্‌ন যুহায়র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আসলে তিনি হাবশায় হিজরতকারী ও বদ্‌রী সাহাবী 'ইয়াদ' ইব্‌ন যুহায়র (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র (উস্‌দু'ল-গাবা, ৪খ, ১৬৩)।

'ইয়াদ' ইব্‌ন যুহায়র (রা) 'উছমান (রা)-এর খিলাফাতকালে ৩০ হি. মদীনায় মতান্তরে সিরিয়ায় ইনতিকাল করেন। তাঁহার কোন বংশধর ছিল না।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৪১৭-১৮, ৬২৩; (২) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ৪৮, নং ৬১৩১; (৩) ইব্‌নু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ১৬৩-৬৪; (৪) আয-যাহাবী, তাজ্‌রীদ আস্‌মা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৪৩০, নং ৪৬৫৯; (৫) ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব (ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ১২৭); (৬) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতু'ন-নাবাবিয়্যা, মিসর তা. বি., ১খ, ৩২২, ২খ, ২৪৭; (৭) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া,

বেরূত ১৯৭৮ খৃ., ৩খ, ৬৯, ৩২২; (৮) ইদ্রীস কান্ধলাবী, সীরাতু'ল-মুস্তাফা, দিল্লী ১৯৮১ খৃ., ১খ, ২৪৭, ৬১০; (৯) ইবন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ ১৯৭৭/১৩৯৭, ৩খ, ৩১০।

ডঃ আবদুল জলীল

**'ইয়াফা** (عيافة) ঃ ফা'ল (দ্র. فأل)-এর বিপরীতার্থক শব্দ, 'ইয়াফা মানবকেন্দ্রিক শুভাশুভ নির্ধারণ পদ্ধতি (cledonism)-সূচক, সাধারণ অর্থে ইহা জন্তকেন্দ্রিক শুভাশুভ নির্ধারণ পদ্ধতি (Zoomancy) সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে শব্দটির প্রয়োগ হয় পক্ষীকেন্দ্রিক শুভাশুভ নির্ধারণ (ornithomancy) সম্পর্কে অর্থাৎ পাখীদের নাম, ইহাদের ডাক, উড্ডয়ন ও অঙ্গবিন্যাস (posture) হইতে শুভাশুভ নির্ধারণের কৌশলকে عيافة ('ইয়াফা) বলা হয় (T A, ৬খ, ২০৭, লাইন ২৪ প.)। যদিও সর্বক্ষেত্রে ইহার হেতু নিরূপণ সম্ভব হয় না, সাধারণভাবে কতিপয় পাখীর নামের সহিত মারাত্মক ক্ষতি সম্পৃক্ত। সাধারণভাবে কাল ও ঈষৎ সবুজ রংয়ের নরম পালক ইহার একমাত্র যুক্তিরূপে উপস্থাপিত হয়। উদাহরণস্বরূপ কাক (Roller, Joy) ও সাদা ছোপসহ গাঢ় রংয়ের পালক ও চামড়াবিশিষ্ট যে কোন জন্তু বা পাখী, যেমন মাদী উট, মাদী নেকড়ে, ঘুঘু পাখী সম্বন্ধেও একই কথা (তু. Divination, 498-519, কোন্ কোন্ জন্তুকে 'আরবগণ শুভাশুভ ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের মাধ্যম জ্ঞান করিত, সে সম্বন্ধে)।

পক্ষীসমূহের প্রকৃতি (অর্থাৎ কোন শুভ বা অশুভ লক্ষণসূচকবিশিষ্ট দেবত্বের সহিত তাহাদের সংস্রব) এবং তাহাদের শ্রেণীবিভাগ (অর্থাৎ যাহাদের উড্ডয়ন ও কূজন এইরূপ শুভাশুভ নির্ণয়ের ভিত্তি) সম্পর্কিত বিষয় অপেক্ষাও প্রাচীন 'আরবী সাহিত্য হইতে সংগৃহীত তথ্যসমৃদ্ধ পক্ষী বিষয়ক (ornithomantic) ও প্রাণী বিষয়ক (Zoomantic) দলীলাদির মাধ্যমে কতিপয় চতুষ্পদ জন্তুর চলাফেরা, পক্ষীসমূহের উড্ডয়ন ও কূজন মাধ্যমে শুভাশুভ নির্ধারণমূলক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রদানের নীতি ও নিয়মাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বর্ণনা প্রদান করা সম্ভব।

পক্ষীসমূহের উড্ডয়ন সম্পর্কে মূলত দুইটি পদ্ধতি বর্তমান ছিল, তীরা ও যাজ্র (الطيرة والزجر)। পাখীর স্বতঃস্ফূর্ত উড্ডয়নের পর্যবেক্ষণ ও শুভাশুভমূলক ব্যাখ্যা প্রদানকে বলা হয় তীরা। শব্দটির প্রয়োগ ক্রমাগত বিস্তৃতি লাভ করে, বিশেষত উপবেশন অবস্থাকেও শুভাশুভ নির্ধারণের ভিত্তিতে পরিণত করা (sedentarization) হয়। ক্রমে ক্রমে সকল সজীব ও নির্জীব বস্তুর সকল প্রকার অভিব্যক্তি, বিশেষত পারিবারিক পরিমণ্ডলে শুভাশুভ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির তৈজসপত্রের অবস্থান, তাহার স্ত্রীর অঙ্গ সঞ্চালন ও বাক্য স্ফুরণ, গৃহের বাসিন্দা ও তাহার কর্মে নিয়োজিত পশুসমূহের আচরণ ও আওয়াজ তীরা-র উপকরণের শামিল হইয়া যায়। মূলত ইহা যুগপৎভাবে শুভ ও অশুভ উভয়ের নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ইসলাম এই পৌত্তলিক প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করে, মংগলসূচক লক্ষণ নির্ণয়কে ফা'ল (فأل)-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহার অনুমতি দান করে এবং নানা অন্ধ শক্তি ও উহাদের প্রতীক দেবদেবীদের উপর আস্থাসূচক তীরা নিষিদ্ধ করা হয়।

তীরা-র ন্যায় অর্থ সম্প্রসারণের দরুন যাজ্রও ক্রমশ ইহার প্রাচীন অর্থ হারাইয়া ফেলে। ভ্রমাত্মকভাবে সাধারণত যাজ্র-এর স্থলে তীরা শব্দের ব্যবহার হয়। যাজ্র-এর আদি অর্থ কোন পাখির উড্ডয়ন পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা করার উদ্দেশে প্রস্তর নিক্ষেপে উহাকে উড়িতে বাধ্য করা; পাখীটি উড়িয়া যদি যাজির (প্রস্তর নিক্ষেপকারী)-এর ডান দিকে যায় তবে উহা শুভ লক্ষণ, বাম দিকে গেলে কুলক্ষণরূপে বিবেচিত (তু. Divination, ৪৩৮)। কিন্তু ইবন খাল্দূন (মুকাদ্দিমা, ১খ, ১৯৫) ইহার এমন সংজ্ঞা দান করিয়াছেন যাহাতে মনে হয় প্রশ্নটি তীরা সংক্রান্ত। ইহাও যাযাবর অবস্থান হইতে স্থির বসতির অবস্থানে পরিবর্তনের পরিণাম।

'ইয়াফা-র দুইটি পদ্ধতি, তীরা ও যাজ্র মূলত পাখীর উড্ডয়ন ও কূজনের ব্যাখ্যার সহিত সম্পর্কিত। এই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দাবলী শিকার কৌশল হইতে উদ্ভূত এবং সকল প্রকার পশুকেন্দ্রিক শুভাশুভ নির্ণয় (Zoomantic divination,)-এর সম্পর্কে প্রযোজ্য। এই প্রবন্ধে ইহাদের বিস্তৃত আলোচনা (যাহা Divination, 440-6-এ করা হইয়াছে) সম্ভব নহে, কেবল বহু ব্যবহৃত দুইটি শব্দের উল্লেখ যথেষ্ট হইবে। যথা "আস্-সানিহ অর্থাৎ ডান দিক হইতে উড়িয়া বাম দিকে অগ্রসর হয় এবং ইহার বিপরীতার্থক 'আল্-বারিহ, শব্দদ্বয় বর্তমানে এই অর্থে, কিন্তু মাঝে মাঝে উল্টা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তবে অর্থ নির্ভর করে ইহাদের ব্যবহার প্রাণীভিত্তিক শুভাশুভ নির্ধারণ সম্পর্কিত না শিকার সম্পর্কিত তাহার উপর (বিবরণের জন্য তু. Divination, 440 ff.)। সাধারণভাবে আস্-সানিহ অনুকূল আল্-বারিহ প্রতিকূল লক্ষণ জ্ঞাপক; কিন্তু এই ক্ষেত্রেও অনেক বৈসাদৃশ্য বর্তমান। ইবন বাররী-র মতে (T. A.-এ উদ্ধৃত, ২খ, ১৭০, ২৪প.) ইহা আঞ্চলিক রীতিনির্ভর। তাঁহার বক্তব্য 'নাজ্দ অধিবাসিগণ আস্-সানিহকে 'অনুকূল -রূপে বিবেচনা করে, কিন্তু কোন নাজ্দবাসী হিজায-এর শব্দাবলী ব্যবহার করিতেও ত পারে।' বিপরীত পক্ষে আমরা বিশ্বাস করি, এই সকল বৈসাদৃশ্য অত্যন্ত প্রাচীন অবস্থার পরিচায়ক যখন ডান দিক নিশ্চিতভাবেই মংগলসূচক ও বাম দিক অমংগলসূচকরূপে বিবেচিত হইত না; যেমন দেখা যায় আসিরীয়-বাবিলীয় আমলে শুভাশুভ নির্ণয়ের বেলায়।

পাখীর ডাকের ব্যাখ্যা কাকের ক্ষেত্রে বহুলভাবে প্রচলিত [তু. Arabica-তে প্রকাশিত অনুবাদ ও মূল পাঠ, ৮খ. (১৯৬১ খৃ.), ৩৪ প. ও ৪৯ প.]; কিন্তু 'আরবগণ এতদ্ব্যতীত কবুতরের কূজন, যে কোন পাখীর ডাক, মোরগের উচ্চকিত ডাক, গাধার চীৎকার, মেষপালের ধ্বনি, উটের ডাক, কুকুরের ঘেউ ঘেউ ইত্যাদি হইতেও শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণয় করিত (তু. Divination,-এর বিবরণ, ১৪৬-৯)।

'আরবগণের জন্য পাখীর অঙ্গভঙ্গী ও ব্যবহার শুভাশুভ নির্ণয়ের উপকরণ সরবরাহ করিত। যদি কোন কাক একটি শুষ্ক অথবা পাতাযুক্ত গাছে অথবা নবনির্মিত দেওয়ালে বসিয়া ডাকে, তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে ডাকের ব্যাখ্যা হইবে ভিন্নতর। যদি পাখীটি ঝাঁকুনি দেয়, ডানা ঝাপটায়, মাটি ঠোকরায়, মাটি খুঁটিয়া খাদ্যান্বেষণ করে, ঠোঁট মুছে, শুভাশুভ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সমুদয় অবস্থা বিবেচিত হইবে (তু. Divination, ৪৪৯ প., এবং Arabica, পূ. স্থা.)।

ফা'ল, তীরা ও যাজ্র-এর মধ্যে সম্পর্কের জন্য দ্র. 'ফা'ল' নিবন্ধ।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) T. Fahd, La divination Arabe, Leiden ১৯৬৬ খৃ., ৪৩১-৫০ ও ৪৯৮-৫১৯; ইহাতে মূল পাঠ ও বিশ্লেষণ রহিয়াছে; (২) ঐ লেখক, Les presages par le corbeau. Etude dun texte attribue a Gahiz, in Arabica, ৮খ. (১৯৬১ খৃ.), ৩০-৫৮, ইহাতে 'আরবদের শুভাশুভ নির্ণয় রীতি সম্পর্কিত মূল পাঠের তুলনা করা হইয়াছে আসিরীয়, বাবেলীয় ও ইরানী রীতির মূল পাঠের সহিত।

T. Fahd (E.I.²)/আবদুল বাসেত

**'ইয়ার** (দ্র. সিক্কাঃ)

**ইয়ার উদ্দিন খলীফা** (يار الدين خليفة) ঃ পূর্ণ নাম শাহ ইয়ার উদ্দীন খাঁ হইলেও ইয়ার উদ্দীন খলীফা নামে সমাধিক পরিচিত। আনু, ১২২০ বঙ্গাব্দে ফরিদপুর জেলার পালং থানাধীন ধূমসী গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতার নাম সরাই খাঁ। তিনি একজন দীনদার আবেদ লোক ছিলেন। অল্প বয়সেই ইয়ার উদ্দীনের পিতামাতা ইনতিকাল করেন। ইয়াতীম ইয়ার উদ্দীন গ্রাম্য পরিবেশ ও আর্থিক অনটনের কারণে তেমন লেখাপড়া করিবার সুযোগ পান নাই। তিনি সামান্য আরবী শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। যুবক বয়সে তিনি দেওভোগ গ্রামে বিবাহ করেন কিন্তু মহামারীতে তাঁহার স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তিনি ভীষণভাবে শোকাহত হন এবং সংসারত্যাগী হইয়া আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়েন। জীবনের প্রথম পর্ব তিনি ফরিদপুরে কাটান এবং পরবর্তী জীবন বর্তমান পটুয়াখালী জিলার মির্জাগঞ্জ উপজিলায় অতিবাহিত করেন। ইয়ার উদ্দীন খাঁ সম্ভবত ফরিদপুরের ব্যবসায়ীদের সহিত মির্জাগঞ্জ আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার এইখানে আগমনের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল দীন ইসলামের প্রচার। তিনি টুপী সেলাই করিয়া বিক্রয় করিতেন। কথিত আছে যে, তিনি দর্জির কাজ করিতেন। স্থানীয় পরিভাষায় দর্জিদের "খলীফা" বলা হয়। ইহা হইতেই পরবর্তী কালে তিনি ইয়ার উদ্দীন খলীফা নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি দিনের বেলা ব্যবসা করিতেন এবং রাত্রিবেলা ইবাদত ও রিয়াযতে মগ্ন থাকিতেন। পরবর্তী কালে তিনি একজন উচ্চ স্তরের ওলীআল্লাহ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি সাধারণত লুঙ্গি, লাম্বা জামা আর মাথায় টুপী পরিতেন। তিনি খুবই সাদাসিধা জীবন যাপন করিতেন। তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত স্বভাবের লোক ছিলেন। হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। অর্থের প্রতি তাঁহার মোহ ছিল না। গরীব-মিসকীনদের প্রতি তাঁহার ছিল অপরিসীম দরদ।

তাঁহার বেশকিছু কারামাত প্রকাশিত হয়। খলীফা সাহেবের বয়স যখন এক শত বৎসরের ঊর্ধ্বে তখন তাঁহার ভাতিজা সুলতান খাঁ তাঁহাকে দেশের বাড়ীতে নেওয়ার জন্য মির্জাগঞ্জ আসে কিন্তু সে জ্বরাক্রান্ত হইয়া মারা যায়। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে খলীফা সাহেব ২৪ ফাল্গুন জ্বরাক্রান্ত হন এবং পরের দিন ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২৫ ফাল্গুন রাত এগারটায় ইনতিকাল করেন। মির্জাগঞ্জ বন্দরেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের ২৪ ও ২৫ তারিখ দুই দিনব্যাপী এইখানে ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

তাঁহার দরবারকে কেন্দ্র করিয়া মির্জাগঞ্জ বন্দরে একটি ফাযিল মাদরাসা, মসজিদ, হাফিযিয়া মাদরাসা, ফোরকানিয়া মাদরাসা, হাই স্কুল, লিল্লাহ বোর্ডিং, ইয়াতীমখানা, মেহমানখানা, সমাজকল্যাণ কেন্দ্র, হাসপাতাল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক মসজিদ পাঠাগারসহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) আ. জ. ম. সিকান্দার মোমতাজী, যাঁদের ভুলিনি, প্রকাশনায়-শিক্ষার্থী পাঠাগার, পটুয়াখালী, প্রকাশকাল ৫ জুন, ১৯৮৭ খৃ.; (২) আজিজুল হক বান্না, বরিশালে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল জুন ১৯৯৫ খৃ.; (৩) বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, পটুয়াখালী, সাধারণ সম্পাদক মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এম. এ. লতিফ।

মোঃ আবদুর রব মিয়া

**ইয়াস ইব্‌ন আবী যু'বাব আদ-দাওসী** (اياس بن ابى ذباب الدوسى) ঃ (রা) রাসূলুল্লাহ (স')-এর একজন সাহাবী। মক্কায় তাঁহার নিবাস ছিল। পরবর্তী কালে তিনি মদীনায় বসবাস করেন। তিনি বানূ দাওস গোত্রীয় ছিলেন। কাহারও মতে তিনি মুযায়না গোত্রের ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম লইয়া মতভেদ আছে। ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী আল-ইস'াবায় তাঁহার পিতার নাম লিখিয়াছেন আবূ যু'বাব। য'াহাবী তাঁহাকে 'আবদুল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়াছেন। তাঁহারা আবূ যু'বাবকে ইয়াস (রা)-এর পিতামহ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের মতে তিনি রাসূলুল্লাহ (স')-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। ইব্‌ন হি'ব্বান তাঁহাকে তাবি'ঈদের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, কথিত আছে, ইয়াস রাসূলুল্লাহ (স')-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে ইহা সঠিক নহে। ইমাম বুখারী বলেন, ইয়াস রাসূলুল্লাহ (স')-এর সাহচর্য পাইয়াছেন কিনা তাহা আমি অবগত নহি। আবূ দাঊদ, নাসাঈ প্রমুখ মুহ'াদ্দিছ' একটি বিশুদ্ধ সনদে ইয়াস (রা) হইতে একটি হ'াদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইবনু'স-সাকান বলেন, ইহাতে এ কথা উল্লেখ নাই যে, তিনি স্বয়ং হ'াদীছটি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। ইমাম যুহ্‌রী 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা) হইতে এবং তিনি ইয়াস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স') ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহ্‌র দাসীদেরকে মারিও না। অতঃপর একদিন 'উমার (রা) রাসূলুল্লাহ (স')-এর সমীপে আসিয়া অভিযোগ করিলেন যে, স্বামীদের উপর মহিলাদের স্পর্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি তখন তাহাদেরকে মারিবার অবকাশ দিলেন। কিছুদিন পর নবী পরিবারে নারীদের আনাগোনা শুরু হইল। তাহারা নিজ নিজ স্বামী সম্পর্কে অভিযোগ করিতে লাগিল। একদিন রাসূলুল্লাহ (স') বলিলেন, মুহ'াম্মাদের পরিজনের কাছে অধিক সংখ্যায় নারীরা আগমন করিতেছে। তাহারা তাহাদের পুরুষদের সম্পর্কে অভিযোগ করে। মনে রাখিবে, ঐ সব পুরুষ তোমাদের মধ্যে ভাল মানুষ নহে (আদ-দারিমী, বৈরূত তা. বি., ২খ, ১৪৭)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্‌ন হি'ব্বান, কিতাবু'ছ'-ছি'কাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৩খ, ১২; (২) য'াহাবী, তাজরীদু আসমা'ই'স-স'াহ'াবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৩৯; (৩) ইবনু'ল-আছ'ীর আল-জাযারী, উসদু'ল-গাবা, বৈরূত ১৩৭৭ হি., ১খ, ১৫০; (৪) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব, মিসর তা. বি., ১খ, ১২৭; (৫) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ৯০; (৬) ঐ লেখক, তাক'রীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ১খ, ৮৭।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

**ইয়াস ইব্‌ন মু'আবি'য়া** (اياس بن معاوية) ঃ (ইব্‌ন কুর্‌রা আল-মুযানী, আবূ ওয়াছিলা, বসরার বিচারপতি, যাঁহার সম্বন্ধে জীবনীকারগণ লিখিয়াছেন, احد اعاجيب الدهر فى الفطنة والذكاء অর্থাৎ 'সূক্ষ্মদর্শন ও বুদ্ধিতে কালের বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বদের অন্যতম' (আল-আ'লাম, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১খ, ৩৭৬)। 'উমার ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-'আযীয (র)-ও ইয়াস ইব্‌ন মু'আবিয়াকে ৯৯/৭১৮ সালে বসরার বিচারপতি নিয়োগ করিয়াছিলেন (ওয়াকী'প্রদত্ত সন ৯৫/৭১৪ শুদ্ধ নহে; কারণ ৯৯ হি. পূর্বে 'উমার খালীফা হন নাই এবং ৯৯-১০১ হি. পর্যন্ত 'আদী ইব্‌ন আরত'াত বস্‌রার গভর্নর ছিলেন, যিনি খলীফার আদেশে ইয়াসকে বিচারপতির পদের জন্য মনোনয়ন দান করিয়াছিলেন)। তিনি এই পদ বিশেষ আগ্রহ সহকারে

গ্রহণ করেন নাই এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে ১০১ বা ১০২ হি. ইস্তফা দেন। তিনি ছিয়াত্তর (৭৬) বৎসর বয়সে ওয়াসিত-এ ইনতিকাল করেন (১২১/৭৩৯ অথবা ১২২/৭৪০)। মেধা ও বিচক্ষণতার বিবেচনায় তিনি 'আরবী সাহিত্যে উপমাস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা ও উপস্থিত বুদ্ধির বহু উদাহরণ সাহিত্য গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। 'আয়কানু মিন ইয়াস' (ইয়াস অপেক্ষা অধিক বিচক্ষণ) একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ (Freytag, Prov. Arab., ১খ, ৫৯৩)। আল-মায়দানী-র ন্যায় প্রবীণ গ্রন্থকার 'যাকানু ইয়াস' নামে একটি গ্রন্থে তাঁহার মেধা ও বাগ্মিতার কাহিনীসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই হিসাবে তিনি সাহিত্যে প্রসিদ্ধ এবং বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন (দ্র. আবূ তাম্মাম, ফী হি'লমি আহ্নাফ ওয়া ফী যাকা'ই ইয়াস; R. Basset, Reveue des Traditions Populaires, 6, 67)। যাহা হউক, গল্পপ্রবণতা, অহংকার ও সন্দেহজনক হ'াদীছে প্রত্যয়ের জন্য তাঁহার বিরূপ সমালোচনা করা হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১২৯৯ হি., ১খ, ১৪৩ প.; (২) ইব্ন নুবাতা, শারহু'ল-'উয়ূন 'আলা রিসালাতি ইব্ন যায়দূন, ইসকান্দারিয়া ১২৯০ হি., ৭৩ প., হ'াশিয়া-তে আস-সা'ফাদী রচিত শারহু'ল-লামিয়াতি'ল-'আজাম, ১খ, ১৪২ প.; (৩) আশ-শুরায়শী, শারহু' মাক'ামাতি'ল-হ'ারীরী, ৭খ.; (৪) আল-বায়ান ওয়া'ত-তাব্য়ীন, ১খ, ৫৬; (৫) মীযানু'ল-ই'তিদাল, ১খ, ১৩১; (৬) হি'ল্য়াতু'ল-আওলিয়া', ৩খ, ১২৩; (৭) জাহি'জ, বায়ান, ১খ, ৯৮-১০১ ও নির্ঘণ্ট; (৮) ঐ লেখক, হ'য়াওয়ান, ১খ, ১৪৯-৫১ ও নির্ঘণ্ট; (৯) ওয়াকী', আখ্বারু'ল-কু'দা'ত, কায়রো ১৯৪৭ খৃ., ১খ, ৩১২ প.।

Ch. Pellat (দা. মা. ই. ও E.I.[2])/মোঃ আবদুল আউয়াল

**ইয়াস ইব্ন সালামা** (اياس بن سلمة) ঃ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী। পিতা সালামা ইব্নু'ল-আকওয়া' (রা)-ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী (সালামা শিরো. দ্র.)। ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র তাঁহাকে সাহাবীদের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইয়াস ইব্ন সালামা রাসূল (স')-এর গুণ-কীর্তনে কবিতা রচনা করিয়াছেন। ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী বলেন, আবু'ল-'আমীম যাঁহার সূত্রে হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, ইনি যদি সেই ইয়াস হইয়া থাকেন তাহা হইলে বলিব, ইনি রাসূলুল্লাহ (স')-এর সাহচর্য লাভ করেন নাই। কেননা তাঁহার জন্ম হইয়াছে 'উছমান (রা)-এর শাসনকালে। পক্ষান্তরে যদি ইয়াস নামের স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তি সালামা-র পুত্র সন্তান হইয়া থাকেন তবে তাঁহার সাহাবী হওয়ার অবকাশ রহিয়াছে। ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র-এর পূর্বে আল-মারযুবানী তাঁহার মু'জাম গ্রন্থে ইয়াস (রা) সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তবে তিনি পরিষ্কারভাবে একথা ব্যক্ত করেন নাই যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স')-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন, বরং তিনি শুধু বলিয়াছেন, ইয়াস ইব্ন সালামা রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স') সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

سمح الخليقة ماجد وكلامه – حق وضية رحمة ونكال

"তিনি উদার চরিত্রের অধিকারী। তিনি মহান; তাঁহার বাণী সত্য। মমতা ও কঠোরতার সমাবেশ তাঁহার চরিত্রে"।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ৮৯; (২) ঐ লেখক, তাক'রীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৯৭৫/১৩৯৫ হি., ১খ, ৮৭; (৩) য'াহাবী, তাজরীদু আসমা'ই'স-সা'হ'াবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৩৯।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

**ইয়াস ইব্ন সাহ্ল আল-জুহানী** (اياس بن سهل الجهني) ঃ (রা) রাসূলুল্লাহ (স')-এর সাহাবী। তিনি জুহায়না গোত্রীয় ছিলেন। এই গোত্রটি আনসারদের সহিত চুক্তিবদ্ধ ছিল। ইতিহাসে ইয়াস (রা)-এর বংশ-পরিক্রমা পাওয়া যায় না। তিনি রাসূলুল্লাহ (স')-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছেন কিনা তাহাতে লইয়া ঐতিহাসিকদের মতভেদ রহিয়াছে। ইব্ন মানদা ও আবূ নু'আয়ম তাঁহাকে তাবি'ঈ বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। ইব্ন মান্দা কর্তৃক বর্ণিত দুইটি হ'াদীছ দ্বারা তাঁহার সাহাবী হওয়ার কথা প্রমাণিত হয়। তিনি মূসা ইব্ন জুবায়র হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "আমি এক ব্যক্তিকে ইয়াস আল-জুহানী হইতে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, 'মু'আয' ইব্ন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ (স')-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ঈমান শ্রেষ্ঠতর? তিনি বলিলেন, তুমি আল্লাহ্র উদ্দেশে ভালবাসিবে এবং তাঁহারই উদ্দেশে শত্রুতা পোষণ করিবে। আর তোমার রসনাকে আল্লাহ্র যিকিরে লিপ্ত রাখিবে।" ইব্ন মানদা আরও বর্ণনা করেন যে, মুস'আব ইব্নু'ল-মিক'দাম, মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-মাদানী হইতে এবং তিনি আবূ হ'াযিম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বানূ সা'ঈদা-র মসজিদে ইয়াস ইব্ন সাহ্ল (রা)-এর সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। ইয়াস (রা) তাঁহাকে বলিলেন, "আবূ হ'াযিম! সম্মুখে আস, তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর হ'াদীছ বর্ণনা করিব।"

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) ইব্নু'ল-আছীর আল-জাযারী, উসদু'ল-গ'াবা, বৈরূত ১৩৭৭ হি., ১খ, ১৫৫; (২) যাহাবী, তাজরীদু আসমা'ই'স-সাহ'াবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৩৯; (৩) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ৮৯।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

**ইয়াস ইব্নুল-বুকায়র** (اياس ابن البكير) ঃ ইব্ন 'আব্দ য়ালীল (রা) আল-লায়ছী, একজন মুহাজির সাহাবী, জন্ম মক্কার আল-[illegible] শাখাগোত্রে, তারিখ অজ্ঞাত। মূসা ইব্ন 'উক্বা, মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইস্হ'াক, ইব্ন হিশাম প্রমুখের বর্ণনামতে তাঁহার পিতার নাম বুকায়র, আবূ মা'শার ও মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'উমার-এর বর্ণনামতে আবু'ল-বুকায়র। তাঁহার বংশতালিকা এইরূপঃ ইয়াস ইব্নু'ল-বুকায়র ইব্ন 'আব্দ য়ালীল ইব্ন নাশিব ইব্ন গি'য়ারা ইব্ন সা'দ ইব্ন লায়ছ ইব্ন বাক্র ইব্ন 'আব্দ-মানা ইব্ন কিনানা ইব্ন খুযায়মা ইব্ন মুদরিকা ইব্ন ইল্য়াস আল-কিনানী। তিনি ছিলেন বানূ 'আদিয়্যি ইব্ন কা'ব-এর চুক্তিবদ্ধ মিত্র (উস্দু'ল-গ'াবা, ১খ, ১৫৩)। তিনি অপর তিন ভ্রাতাসহ ('আকি'ল, 'আমির ও খালিদ)-সহ আরক'াম (রা)-এর গৃহে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহারাই এই গৃহে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন (ত'াবাক'াত, ৩খ, ৩৮৮)। ইয়াস (রা) মদীনায় প্রথম হিজরতকারীদের অন্যতম। চারি ভ্রাতা ও পরিবারের নারী-পুরুষ সকলেই এক সঙ্গে শূন্য গৃহে তালা লাগাইয়া হিজরতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। মদীনায় তাঁহারা রিফা'আ ইব্ন 'আবদি'ল-মুন্যি'র-এর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন (ইস'াবা, ১খ, ৮৯)। রাসূলুল্লাহ (স') তাঁহাকে হ'ারিছ ইব্ন খাযামা (রা)-র সহিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেন। বদ্র, উহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধে (বাদ্র-এ অপর তিন ভ্রাতাসহ) তিনি অংশগ্রহণ করেন। ইব্ন ইস্হ'াক বলেন, এমন আর কোন ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়কে

একত্রে বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে দেখা যায় না। ইয়াস (রা)-এর ভ্রাতা 'আকিল (রা) বদ্‌র যুদ্ধে, খালিদ (রা) রাজী'-এর যুদ্ধে এবং 'আমির (রা) য়ামামার যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। ইব্‌ন য়ূনুস-এর বর্ণনামতে ইয়াস (রা) মিসর বিজয়ে অংশগ্রহণ এবং ৩৪ হি. 'উছ'মান (রা)-এর খিলাফাতকালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার পুত্র মুহ'াম্মাদ ছিলেন হ'াদীছের একজন রাবী, যিনি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন (উসদু'ল-গ'াবা, ১খ, ১৫৩)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) বুখারী, স'াহীহ', দিল্লী তা. বি., ২খ, ৫৭৪; (২) বাদ্‌রু'দ-দীন আল-'আয়নী, 'উমদাতু'ল-ক'ারী, বৈরূত তা. বি., ১৭খ, ১২২; (৩) ইব্‌ন সা'দ, আত'-তাবাক'াতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৩৮৮, ৩৮৯; (৪) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি, ১খ, নং ৩৭৩; (৫) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, উস্‌দু'ল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ১খ, ১৫৩; (৬) আয্‌-য'াহাবী, তাজ্‌রীদু আস্‌মা'ই'স-সাহ'াবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৩৯, নং ৩৪৯; (৭) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব (ইস'াবার হ'াশিয়া, ১খ, ১০১-১০২); (৮) ইব্‌ন কাছ'ীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ২য় সং, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ৩খ, ৩১৫; (৯) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতু'ন-নাবাবি'য়া, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ., ২খ, ২৩৬; (১০) ওয়ালিয়্যু'দ-দীন আবূ 'আবদিল্লাহ, আল-ইক্‌মাল ফী আসমা'ই'র-রিজাল (মিশকাতু'ল-মাস'াবীহ' গ্রন্থের শেষে সন্নিবেশিত), কলিকাতা, তা. বি., পৃ. ৫৮৫।

ড. আবদুল জলীল

**ইয়াসীন** (ياسين) ঃ মাওলানা, কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানাধীন নলুয়া চাঁদপুর গ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী 'আলিম পরিবারে আনুমানিক ১৮৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দানিশ মুহাম্মদ মিয়াজী। তিনিও ছিলেন একজন বড় 'আলিম। মাওলানা ইয়াসীন স্বীয় পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পর তৎকালীন বঙ্গদেশের বিখ্যাত দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নোয়াখালীর সোনাপুরস্থ ইসলামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি কিশোর বয়সেই স্নেহময়ী মাতাকে হারান। অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান হওয়ার কারণে অতি সহজেই তিনি শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন। তিনি এইখানে জামাআতে চাহারম কিংবা ছসুয়াম পর্যন্ত লেখাপড়া করেন।

ইহার পর উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। মিশকাত শরীফ পড়ার বৎসর বাড়ী হইতে সংবাদ যায় যে, তাঁহার পিতা চিরবিদায় নিয়াছেন। পিতার বড় সন্তান হওয়ায় পারিবারিক প্রয়োজনে তাঁহাকে পড়াশুনা অসমাপ্ত রাখিয়া বাড়ি চলিয়া আসিতে হয়।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ১৯২৭ মুতাবিক ১৩৩৪ বাংলা সনে বরুড়া মাদরাসার শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪৪ মুতাবিক ১৩৫১ বাংলা সনে তৎকালীন মুহতামিম মাওলানা সাইয়েদ খান সাহেবের ওফাত হইলে সর্বসম্মতিক্রমে মাওলানা ইয়াসীনের উপর মুহতামিমের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। তিনি আমৃত্যু প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবত এই দায়িত্বে বহাল থাকেন। তিনি ছিলেন দারুল 'উলূম বরুড়ার চতুর্থ মুহতামিম।

ফারসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত মাওলানা ইয়াসীন মিশকাত শরীফ, হিদায়া, সিকান্দার নামা ও মহব্বত নামার দরসেই বেশী দিয়াছেন। তাঁহার দরস প্রদান ছিল আকর্ষণীয় ও অভিনব পদ্ধতির। তাঁহার পরিচালনার আমলে বরুড়া মাদরাসায় বিভিন্নমুখী উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হয়। তিনিই মাদরাসায় হিফজ বিভাগের সংযোজন করেন। তাঁহার আমলে ১৯৫১ মুতাবিক ১৩৫৭ বাংলা সনে বরুড়া মাদ্‌রাসায় দাওরায়ে হাদীছের ক্লাস চালু হয়।

তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। মাদরাসা পরিচালনার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এলাকার জটিল সালিসী মামলার নিষ্পত্তিও তিনি করিতেন। বৃটিশ ভারতে যখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পরস্পরবিরোধী রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয় তখন মাওলানা ইয়াসীন অখণ্ড ভারতের দাবীর সহিত একাত্ম হইয়া কংগ্রেসকে সমর্থন দেন।

তিনি হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহমাদ মাদানীর হাতে বায়'আত হন। তাঁহার ওফাতের পর চট্টগ্রামের মাওলানা সুলতান আহমদ নানুপুরীর নিকট পুনরায় বায়আত হন। হযরত নানুপুরী তাঁহাকে খিলাফত প্রদান করেন।

দীর্ঘ শিক্ষকতার কালে তিনি শত শত যোগ্য আলিম তৈরী করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন মাওলানা আশরাফ উদ্দীন, মাওলানা ইউসুফ, মাওলানা হিফায উদ্দীন, মাওলানা আলী আকবর ও মাওলানা তোরাব আলী প্রমুখ।

মাওলানা ইয়াসীন ১৯৬৮ সালে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে তাঁহার নিজগ্রাম নলুয়া চাঁদপুরে ইনতিকাল করেন। শিক্ষকগণ তাঁহাকে মাদরাসার পার্শ্বে দাফন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাইগণ ইহাতে সম্মত না হওয়ায় তাঁহাকে পারিবারিক কবরস্থানেই দাফন করা হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) মাওলানা হিফযুর রহমান, মাশায়েখে কুমিল্লা, ১ ও ২ খ, ১৯৯৯ খৃ., দারুল উলুম, বরুড়া, কুমিল্লা; (২) জুবাইর আহমদ আশরাফ সম্পাদিত মাওলানা আশরাফউদ্দীন আহমদ স্মারক গ্রন্থ, ২০০৩ খৃ., চৌধুরী পাড়া মাদরাসা, ঢাকা ১২১৯; (৩) মাওলানা হিফযুর রহমান সম্পাদিত বরুড়া মাদরাসার স্মরণিকা আফতাব, ১৪১৫ হি.।

জুবাইর আহমদ আশরাফ

**'ইর্ক** (عرق) ঃ আসল বুৎপত্তিগত অর্থ 'মূল'। কিন্তু মূল অর্থের সহিত প্রচলিত অন্য অর্থাদির সংমিশ্রণের পরিণতিতে ইহার অর্থ 'জাত বা কুল' (race)-এর প্রায় কাছাকাছি উপনীত হয়। যাহা সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে এইরূপ দুষ্প্রাপ্য (rare) দলীল-প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, এই অর্থের ধারণা কোথাও সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয় নাই, বরং আরও সঠিকভাবে বলা যায় যে, ইহা 'বংশ' (Stock) অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। কবি ইম্‌রু'উ'ল-ক'ায়স বলেন, "আমি আমার মূলের (عروق) সন্ধান ভূমির মূলে (عرق) খুঁজি" (L.A., দ্র. عرق)। 'বংশ' বলিতে উত্তরাধিকারের অন্যতম ভিত্তি (Factor) 'রক্ত'-কেও নির্দেশ করা হয়, কিন্তু এই বাস্তব (Sufstaktive) অর্থ 'বংশ'-এর পশ্চাতে পরিলেখ (Outline)-রূপে 'জাত' (race)-এর ধারণাটি বিদ্যমান মনে হয়। কু'রআনে 'ইর্ক' শব্দটি কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। হ'াদীছে ইহার ব্যবহার দেখা যায় মাঝে মাঝে, বিক্ষিপ্তভাবে। প্রথমত, মূল (root) অর্থে হাদীছে 'ইর্ক' শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। যে ব্যক্তি মৃত ভূমিতে প্রাণ সঞ্চার করে সে উহার মালিক হয়; কিন্তু যে মূল (عرق) অন্যায়ভাবে জন্মে তাহা জমির মালিকানা প্রদান করে না (বুখারী, কিতাবু'ল-ওয়াকালা, কায়রো ১৩৭৬ হি.; ৩খ, ৯৩)। নির্বিচারে ধমনী ও 'শিরা' অর্থে 'ইর্ক শব্দের ব্যবহার হ'াদীছে' পাওয়া যায়, 'যখন সে তাহাদের হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত করিল তখন তাহার ধমনী (عرق) ফাটিয়া গেল এবং সে মরিল' (দ্র. Wensinck, Concordance)। ইহার অর্থ 'রক্ত'-ও হয় যাহাতে তরল সত্তা (النفس السائلة)-র ইঙ্গিত

থাকে। বলা হইয়াছে, 'তাহার প্রাণ রক্ত ক্ষরণের (عرق) সহিত বিদায় হইল (দ্র. Wensinck) মহিলার অনিয়মিত দীর্ঘ ঋতুস্রাব সম্পর্কে বলা হইল, "ইহা ঋতুস্রাবের নহে, বরং রক্তক্ষরণের ব্যাপার" (বুখারী, ৭খ, ৪৬)। পরিশেষে যে 'ইর্‌ক'-এর ক্রিয়া সুনির্দিষ্ট নহে, বরং মানুষের জন্মগত দোষ-ত্রুটির প্রতি মূলত ইঙ্গিত করে, সেই অর্থই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স')-কে বলিল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার একটি কাল শিশু জন্মিয়াছে।' রাসূল (স') বলিলেন, "তোমার কি কোন উট আছে?" উত্তর, "হাঁ, আছে।" রাসূলুল্লাহ (স') বলিলেন, "কি কি রংয়ের?" উত্তর, "লাল।" রাসূলুল্লাহ (স') বলিলেন, "উহাদের মধ্যে কি ধূসর বর্ণের উটও আছে?" উত্তর, "হাঁ আছে।" নবী (স') বলিলেন, "ইহা কিরূপে ঘটিল?" উত্তর, "সম্ভবত কোনরূপ 'ইরক' ইহার মধ্যে (কাল রং) আকর্ষণ করিয়াছে।" রাসূলুল্লাহ (স') বলিলেন, "সম্ভবত তোমার (কাল) শিশুর ব্যাপারও তদ্রূপ, কোন 'ইরক' তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে (সুতরাং তাহাকে জারজ মনে করিও না) (বুখারী, ৭খ, ৪৬)। এইভাবেই 'ইরক'-এর সহিত বংশ ও জন্মের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। উল্লিখিত হা'দীছ' আমাদেরকে আরও গভীরে লইয়া যায়। কেননা জন্ম সম্পর্কে একটি ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা দানের ব্যাপারে ইহা বংশগতির (heredity) মত একটি এমন উপাদান বা হেতু (factor)-এর আশ্রয় গ্রহণ করে যাহার নিয়ন্ত্রণ অসাধ্য। এই কল্পিত সত্য (hypothesis) অনুযায়ী এই ক্ষেত্রেও 'ইর্‌ক' (عرق) রক্তের সমার্থক। আধুনিক বেদুঈনগণ ঠিক এই ধারণাই প্রকাশ করে যখন তাহারা বলে, عرق الخال لا ينام [মাতুল বংশের রক্ত (عرق) সুপ্ত থাকে না]। প্রাচীন 'আরবী ভাষাও এই ব্যাখ্যা সমর্থন করে। বলা হয়, فى فلان عرق من العبودية (অমুকের মধ্যে কিছু দাসত্বের রক্ত বিদ্যমান)। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আমরা 'ইর্‌ক সম্পর্কে এমন একটি ধারণার সম্মুখীন হই যাহা দ্ব্যর্থবোধক হওয়া সত্ত্বেও জাতি (race)-র ধারণার সহিত সম্পৃক্ত, যেহেতু ইহা রক্তের বিশুদ্ধতাসূচক।

ইহা সুবিদিত যে, প্রাচীন 'আরবগণ তাহাদের বংশবৃত্তান্ত (কুলজি, দ্র. নাসাব)-র বিশুদ্ধতার প্রতি এতই গুরুত্ব আরোপ করিত যে, দাসীর ঔরসজাত শিশুকে অসন্তোষভরেই স্বীকৃতি দান করিত। রক্তের বিশুদ্ধতা যাহাদের যত অধিক সমাজে তাহারা তত বেশী সম্মানিত ছিল। যাহারা সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মলাভের গর্ব করিতে পারে না, যাহারা না সা'রীহ' (صريح নির্মল), না মাহ'দ' (محض অবিমিশ্র) তাহাদের সামাজিক অমর্যাদা তাহাদের জন্ম সম্বন্ধে সন্দিগ্ধতা ও অস্পষ্টতার অনুপাতেই হইত। অতীব সফলতা সহকারে কু'রআন ইসলামী সম্পর্ককে গোত্রীয় সম্পর্কের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছে এবং প্রতিটি ব্যাপারে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করিয়া হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তাঁহার উম্মাতকে আযাদ পৌত্তলিক নারীকে বিবাহ না করিয়া বরং দাসী মু'মিনাকে বিবাহ করিতে আদেশ প্রদান করিয়া প্রাচীন গোত্রীয় মর্যাদার আবিষ্টতার উপর আঘাত হানিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও এই আবিষ্টতা কিয়ৎ পরিমাণ থাকিয়াই যায়। 'শারীফ' ও 'সায়্যিদ'গণের মধ্যে তাঁহাদের খান্দানী শারাফাত ও তাঁহাদের মহান পূর্বপুরুষ মুহ'াম্মাদ (স')-এর সূত্রে প্রাপ্ত বারাকাত (بركة) এতদুভয় কারণে বংশের বিশুদ্ধতা সম্পর্কীয় চিন্তা পরিলক্ষিত হয়। বাংলায় عرق শব্দটি 'আরক'রূপে নির্যাস বা সারবস্তু অর্থে ব্যবহৃত হয়।

গ্রন্থপঞ্জীঃ ইসলামে গোত্রীয় পরিদৃষ্টি সম্বন্ধে দ্র. (১) G. Rotter, Die Stellung der Negers in des islamisch-arabischen Gesellschaft bis zum XVI. Jahrhundert, Bon 1967; (২) B. Lewis, Race and color in Islam, New York 1971.

J. Chelhod (E.I.²)/হাফিজ সৈয়দ নূরুদ্দীন

**'ইর্‌ক'** (দ্র. সাহ্‌রা')

**'ইরক'া** (عرقة) ঃ বা 'আরকা', 'আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত একটি ছোট শহর ও জেলা, হাদরামাওত (দ্র.)-এর সীমানার সামান্য ভিতরে আহওয়ার (দ্র.) ও হাওরা (দ্র.)-র প্রায় মাঝপথে অবস্থিত। জনসংখ্যা প্রায় ৫০০, প্রধানত মাছ ধরিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। দক্ষিণ য়ামান গণপ্রজাতন্ত্র সৃষ্টির পূর্বে 'ইর্‌ক'া ছিল ওয়াহি'দী সালতানাত-এর অন্তর্ভুক্ত একটি আলাদা শায়খশাসিত এলাকা। ১৮৮৮ খৃ. সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ইহা 'আদান (এডেন) কর্তৃপক্ষের আশ্রিত হয়। Landberg-এর বর্ণনা অনুযায়ী এই শহরটি ছিল বাদাসগণের শায়খ-এর বাসস্থান। উহারা ছিল যি'আব (দ্র.) গোষ্ঠীর একটি শাখা, পূর্বাঞ্চলের হি'ময়ার জাতির মধ্যে ঐ যি'আবগোষ্ঠী ছিল সর্বাপেক্ষা বড় গোত্র, যদিও হামদানীর আমলে শহরটি কিন্দার বানূ 'আমির-এর এলাকাভুক্ত ছিল। 'ইরক'ার ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কোন প্রস্তরলিপিতেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে যি'আবগণ সম্ভবত R. E. S. 3945/4 প্রস্তরলিপিতে অন্যতম উল্লিখিত বিষয়। ইহাতে বর্ণিত আছে যে, HBN [Habbab (দ্র.) হ'াব্বাব] ও DYB-এর শহরগুলিও পানিসেচ নিয়ন্ত্রিত সমস্ত জমি আসওয়ান রাজ্যের অধিকার হইতে সাবা'র কারাব'ইল ওয়াতার-এর দখলে চলিয়া গেল। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে 'ইরক'াতে একই নামের জনৈকা মাহিলা দরবেশের আস্তানা ছিল। স্থানীয় মাশা'ইখ ও চলাচলকারী নাবিকগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) A. Grohmann, in N. Rhodokanakis, Altsabaische Texte I, Sitzungsb. Akad. Wiss, Wien, 106/2, Vienna 1927, 123-4; (২) Hamdani, Sifa, 96; (৩) Admiralty, Naval Intelligence Division, Western Arabia and the Red Sea (London), 1946; (৪) C. Landberg, Arabica IV, V, Leiden 1897-98; (৫) ঐ লেখক, Etudes sur les dialectes de l'Arabie meridionale II: Datinah, Leiden 1905-13।

A. K. Irvine (E.I.²)/হুমায়ুন খান

**আল-ইর্‌জানী** (الارجانى) ঃ আবূ য়াহ'য়া যাকারিয়্যা', নাফূসার বার্‌বার উপজাতির প্রধান ও উত্তর আফ্রিকার সর্বশেষ ইবাদী ওয়াহ্‌হাবী ইমাম। সম্ভবত তিনি R. Basset কর্তৃক ভ্রমবশত তাঁহার পুত্র, জাবাল নাফূসার প্রধান (হা'কিম) আবূ যাকারিয়্যা' ইব্‌ন আবী য়াহ'য়া আল-ইর্‌জানীর সঙ্গে তালগোল পাকাইয়া আবূ যাকারিয়া' য়াহ'য়া আল-ইর্‌জানী নামে আখ্যায়িত হইয়াছেন। তাসমিয়াত শুয়ূখ জাবাল নাফ্‌সা ওয়া-কুরআহুম (৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দী) নামে পরিচিত ইবাদী দলীলপত্র অনুযায়ী ইরকান (ইরজান)-এর আবূ যাকারিয়্যা' (ভ্রমবশত আবূ য়াহ'য়া যাকারিয়্যা'), আবূ হা'তিম (অর্থাৎ আবূ হা'তিম য়ূসুফ ইব্‌ন আবি'ল-য়াক'জান মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ'মান ইব্‌ন রুসতাম)-এর পরেই ইমাম নির্বাচিত হন। শেষোক্ত ব্যক্তি ২৯৪/৯০৬-৭ সাল পর্যন্ত কার্যরত

থাকায় উক্ত তারিখের পূর্বে আবূ যাকারিয়্যা' য়াহ্‌'য়া আল-ইরজানীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই, এমনকি ইহা সম্ভবত ২৯৬/৯০৯ সালে তাহেরত (Tahert)-এর রুসতামী ইমামাতের অবসান না হওয়া পর্যন্তও অনুষ্ঠিত হয় নাই। তাঁহার কিতাবু'স-সিয়ার (অপর শিরো কিতাব সিয়ার মাশায়িখ নাফূসা)-এ আশ-শাম্মাখী কর্তৃক একটি উদ্ধৃত অংশে, মাকরীন ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-বুগ'তূরী, আবূ য়াহ'য়া যাকারিয়্যা' আল-ইরজানীকে হ'াকিম অথবা ইমাম মুদাফি' (প্রতিরোধের ইমাম) হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আশ-শাম্মাখীর গ্রন্থের অপর একটি অংশে আবূ য়াহ'য়া যাকারিয়্যা'-কে আল-ক'াদী আল-'আদিল আল-'আলিম আল-কামিল আল-ইমাম আল-ফাদি'ল উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। এইভাবে তিনি একই সঙ্গে ইমাম ও বিচারক ছিলেন। তিনি জাবাল নাফূসার পূর্বাঞ্চলের একটি গ্রাম [ফোস্‌সাতো (Fossato) অঞ্চলের অন্তর্গত মেয্‌যু (Mezzu)-এর নিকটে খিরবাট আরজান-এর ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান] ইর্‌জান বা আরজানে বসবাস করিতেন। তথা হইতে তিনি প্রতিদিনই জাদূ শহরে যাতায়াত করিতেন। উক্ত সময়ে শহরটি এই অঞ্চলের সম্ভবত সমগ্র জাবাল নাফূসার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল।

আবূ য়াহ'য়া যাকারিয়্যা' আল-ইর্‌জানীর প্রায় পনর বৎসরব্যাপী শাসনকাল সমগ্র জাবাল নাফূসার উপর সম্প্রসারিত ছিল। অঞ্চলটির ইবাদী-ওয়াহ্‌হাবী দুইটি দল–বানূ যাম্মূর ও তেরমীসার জনগণের মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধসমূহ তাঁহার শাসনামলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। এই গৃহযুদ্ধগুলির মধ্যে ৩১০/৯২২-৩ সালে ফাতিমী সেনাদল কর্তৃক জাবাল নাফূসা আক্রান্ত হয়; ইহা জাবাল নাফূসার সম্পূর্ণ পূর্বাঞ্চলটি ধ্বংস করে। আবূ য়াহ'য়া যাকারিয়্যা' আল-ইর্‌জানীর পরিবার ইহাতে জড়িত হওয়া এড়াইতে পারে নাই। ইব্‌ন 'ইযারীর মতে এই সেনাদলটি সেনাপতি 'আলী ইব্‌ন সালমান আদ-দা'ঈর অধিনায়কত্বে এবং ইবাদী কাহিনীকারদের মতে কুতামা দক্ষ সৈনিক, নির্ভীকতম ও ফাতি'মী বংশের অনুগত সমর্থকদের দ্বারা গঠিত ছিল। ফাতি'মী সেনাবাহিনী জাবাল নাফূসার প্রধান দুর্গ আল-জাযীরা আক্রমণ করে; কিন্তু তাহারা ইবাদীদের দ্বারা পরাভূত হয়। নাফূসা ও 'আলী ইব্‌ন সালমানের সেনাদলে মধ্যে তিরাক্‌ট (জাবাল নাফূসার পূর্ব দিকের অঞ্চলে যাহা বর্তমানের আর-রুজাবান অঞ্চল বলিয়া প্রতীয়মান হয়)-এর নিকটে সংঘটিত দ্বিতীয় যুদ্ধ চলাকালে জনৈক ইবাদী সৈনিক কর্তৃক কোন একটি অবিচারের প্রতিশোধ হিসাবে আবূ য়াহ'য়া নিহত হন।

ইব্‌ন 'ইযারীতে 'আলী ইব্‌ন সালমান আদ-দা'ঈর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নাফূসা প্রধানকে আবূ বাত্তা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা ছিল আবূ য়াহ'য়া যাকারিয়্যা' আল-ইর্‌জানীর অন্যতম ডাকনাম— এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) R. Basset, Les sanctuaires du Djebel Nefousa, in JA, মে-জুন ১৮৮৯ খৃ., পৃ. ৪৩৩, ৪৫৪; (২) Fournel, Berbers, ২খ, ১৪৪; (৩) ইব্‌ন 'ইযারী, বায়ান, ১খ, ১৮৭; (৪) T. Lewicki, Etudes ibadites nord-africaines, ১ম অংশ, Tasmiya suyuh Gabal Nafusa Wa-qurahum, Warsaw ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৯৭-৮; (৫) ঐ লেখক, Ibaditica, 2: Les Hakims du Gabal Nafusa, in RO, ২৬/২খ. (১৯৬২ খৃ.), ৯৯-১০১; (৬) শাম্মাখী, কিতাবু'স-সিয়ার, কায়রো ১৩০১ হি.।

T. Lewicki (E.I.²)/মুহঃ আবূ তাহের

**ইর্‌তিজা'** (দ্র. রাজ'ইয়্যা)

**ইর্‌তিজাল** (إرتجال) ঃ কোন কাব্য অথবা বক্তৃতার উপস্থিতী মত গ্রন্থনা ও উন্নয়ন। ইব্‌ন রাশীক ('উম্‌দা, ১খ, ১৩১) ও তাঁহার অনুসরণে আয্‌দী (বাদা'ই', বূলাক সংস্করণ, পৃ. ৫) শব্দটিকে 'সহজ হওয়া' অর্থে, শা'র রাজিল অভিব্যক্তিতে অর্থ প্রকাশক, 'নিম্নে প্রবাহিত হওয়া', 'দীর্ঘ বিরল কেশ' অথবা ইরতিজালু'ল-বি'র, 'নিজ পায়ে কূপে অবরোহণ' অর্থাৎ রজ্জুর সাহায্য ব্যতীত অবরোহণ-এর সহিত এবং ইর্‌তিজাল-এর সমার্থক বাদীহা-এর মূল শব্দ বাদা'আ 'শুরু করা' (হামযার পরিবর্তে হা' প্রতিস্থাপিত করিয়া)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন। উল্লিখিত এই দুইজন গ্রন্থকারের মতে ইর্‌তিজাল ও বাদীহা-এর মধ্যে পার্থক্য হইতেছে, যদিও ইর্‌তিজালের ক্ষেত্রে কবি তাঁহার কাব্য সম্পর্কে কোন পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করেন না, বাদীহা-এর ক্ষেত্রে তিনি কয়েক মুহূর্তের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বিভিন্ন অভিধানে প্রদত্ত ইর্‌তিজালের অপরাপর সমার্থক শব্দসমূহের মধ্যে কেবল ইকতিদার শব্দটি মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয়। শেষোক্ত শব্দটির শব্দতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার জন্য (দ্র. আবূ হিলাল আল্-'আসকারী, কিতাবু'স-সি'না'আতায়ন, পৃ. ৩৯-৪০ তু. কবি বা'ঈছ-এর ব্যবহৃত রীতি অনুযায়ী এবং জাহি'জ-এ প্রাপ্তব্য খারিজী নেতা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব আর-রাসিবীর একটি বিখ্যাত উক্তিতে ব্যবহৃত অভিব্যক্তি-কালাম ক'াদীব 'অপ্রস্তুত, অমার্জিত ভাষণ', বায়ান, সম্পা. 'আবদু'স-সালাম মুহ. হারূন, কায়রো ১৩৬৭/১৯৪৮, ১খ, ২০৪-৫)।

R. Blachere (Litt., ৮৭-৮, ৩৬৪, ৩৬৯-৭৩)-এর মতে ইসলামের পূর্ব ও ইসলামের প্রাথমিক যুগে উপস্থিতমতে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহার্য ছন্দটি ছিল সর্বক্ষেত্রে না হইলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রাজায। অধিকন্তু উষ্ট্র চালকগণের গীত (হিদা), ঘুম পাড়ানী গান ইত্যাদি স্বভাবজ উপস্থিত রচিত গীতাবলী ব্যতীত বিভিন্ন গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিস্থিতিতে ও উপস্থিতমতে রচনার ব্যবহার দেখা যায়। শত্রুর প্রতি নির্দেশিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অথবা অভিশাপ, যুদ্ধ সঙ্গীত ও শোক সঙ্গীত ইহাদের প্রধান (অতিরিক্ত দ্র. M. Ullmann, Untersuchungen zur Ragazpoesie, Wiesbaden, ১৯৬৬ খৃ., ১৮-২৪-এ রাজায বিষয়ক ক্যাটালগ)। সুতরাং ইহা হইতে উদ্ভূত ক্রিয়া পদ রূপ রাজাযা এবং ইরতাজাযা প্রায়শই 'রাজায পদ্ধতিতে উপস্থিত রচনসা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় (প্রায়শ ইহার গৌণ অর্থে 'ভর্ৎসনা করা' অথবা 'নাক সিটকানো' অর্থে ব্যবহারসহ, (দ্র. I. Goldziher, Abhand. Zur Arabischen Philologie, লাইডেন ১৮৯৬ খৃ., ১খ, ৭৯-৮১; 'আব্বাসী খলীফা মুতাওয়াক্কিল কর্তৃক একটি জয় লাভের প্রসঙ্গে উপস্থিতমতে রচিত একটি রাজায-এর জন্য দ্র. 'আগ'ানী¹, ৯খ, ১১৯-আগ'ানী³, ১০খ, ২৩১-২)।

অপরপক্ষে ইর্‌তিজাল ও বাদীহা শব্দদ্বয় (তৎসহ বাদীহ আন, 'উপস্থিতভাবে') মনে হয় রাজায্ ভিন্ন অন্যান্য ছন্দে গ্রন্থিত উপস্থিতমতে রচিত কাব্য সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে (ইহার ব্যতিক্রমসমূহের জন্য দ্র. উল্লিখিত আগ'ানীর পরিচ্ছেদসমূহ ও ইব্‌ন কু'তায়বা, শি'র, ১৭৮)। এই সকল শব্দ সাধারণভাবে ৩য়/৯ম শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতে প্রাপ্ত বিভিন্ন পাঠে পাওয়া যায়, তবে প্রচুর সংখ্যক ঘটনার বর্ণনায় মনে হয় ইহারা আরও পূর্ব হইতে বর্তমান। ইব্‌ন রাশীকের প্রণীত অধ্যায়টি ব্যতীত অলংকারশাস্ত্রের বিভিন্ন নির্দেশক পুস্তকে এই দুইটি শব্দ সম্পর্কে অতি সামান্য বর্ণনা আছে। 'আলী ইব্‌ন জ'াফির আল-আয্‌দী (মৃ. ৬১৩/১২১৬) সম্ভবত তাই

সঠিকভাবেই দাবি করিয়াছেন যে, তাঁহার কিতাব বাদা'ই' আল-বাদা'ইহ্ (বূলাক ১২৭৮/১৮৬২ ও 'আব্বাসী প্রান্তিকে মা'আহিদু'দ-তানস'ীস, কায়রো ১৩১৬/১৮৯৮) এই বিষয় সম্পর্কিত একমাত্র গ্রন্থ। বাদা'ই'তে প্রচুর পরিমাণ কাহিনী সংক্রান্ত বিষয়াদি ছাড়াও স্থূলভাবে কালানুক্রমিক সজ্জিত বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে কখনো হাল্কা রসাত্মক ও কখনো গুরুগম্ভীর বিষয়ের এক প্রায় সীমাহীন প্রকারের ভাণ্ডার রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও ইহাতে বিভিন্ন প্রকার ইজাযা [দ্র.] সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে। এই প্রকারের উপস্থিত কাব্যে যেহেতু ছন্দ ও পদ উভয়ই অপর ব্যক্তি দ্বারা নির্বাচিত ও প্রস্তাবিত হয়, তাই কাব্যের কোন অংশ কবির পক্ষে অগ্রিম গ্রন্থনা করা সম্ভব হয় না। এই সকল কাহিনীর কোন কোনটি হয়ত বা সত্য (উদাহরণস্বরূপ বূলাক সংস্করণের ৯০-২ পৃষ্ঠার কাহিনী)। ইহার নির্দেশনা পাওয়া যায় এই সাক্ষ্যে যে, আজও 'আরব দেশসমূহে এমন ব্যক্তিবিশেষের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁহারা উপস্থিতভাবে উল্লেখযোগ্য দৈর্ঘ্যের কাব্য রচনায় পারদর্শী।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্ন কু'তায়বা, কিতাবু'শ-শি'র, সম্পা. M. J. de Goeje, লাইডেন ১৯০২ খৃ., ২৬-২৮; (২) আবূ হিলাল আল-'আসকারী, কিতাবু'স-সি'না'আতায়ন, কায়রো ১৩৭১/১৩৫২, ৩৯-৪১; (৩) ছা'আলিবী, য়াতীমা, দামিশ্ক ১৩০২/১৮৮৫, ৪খ, ১৬৭; (৪) ইব্ন রাশীক', কিতাবু'ল-'উম্দা, কায়রো ১৩৫২/১৯০৭, ১খ, ১২৬-৩১; (৫) রাগি'ব আল-ইস'ফাহানী, মুহ'াদারাতু'ল-উদাবা', কায়রো ১৩২৬/১৯০৮, ১খ, ৩৮-৯; (৬) নিজ'ামী-ই 'আরূদী, চাহার মাক'ালা, সম্পা. মীরযা মুহ'াম্মাদ, লন্ডন ১৯১০ খৃ., পৃ. ৩১, ৩৫-৬, ৪২, ৪৩, ৪৭, ৫৩ (=idem, অনু. E. G. Browne, লন্ডন ১৯২১ খৃ., পৃ. ৩২, ৩৮, ৪৭, ৫৩, ৬০); (৭) আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ আর-রু'আয়না, বারনামাজ, দামিশক ১৩৮১/১৯৬২, পৃ. ১০১-২, ১৯৫; (৮) A. H. Layard, Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon, লন্ডন ১৮৫৩ খৃ., পৃ. ৩১৯-২০; (৯) G. Jacob, Altarabisches Beduinenleben, বার্লিন ১৮৯৭ খৃ., ১৭৭; (১০) J. Lecerf, Litterature dialectale et renaissance arabe moderne, in B. Et. Or., ২খ (১৯৩২ খৃ.), ২১৮-২০, ২৩৪ (উদ্ধৃতি মাশরিক, ২৮খ, ১৯৩০ খৃ., ৫০১-৩)। ফার্সী ও তুর্কীতে উপস্থিত রচনার জন্য দ্র. Supplement.

S. A. Bonebakker (E.I.²)/আবদুল বাসেত

**ইরাতিফা'** (দ্র. ফালাক, 'ইলমু'ল-হায়'আ)

**ইরতিশ** (ارتش) ঃ অব (Ob) নদীর অববাহিকার সাইবেরিয়ার একটি বড় নদী, উহার দুইটি উৎস 'আর্‌তুশু'ল-আয্‌রাক' (নীল ارتش الازرق) ও 'ইর্‌তিশু'ল-আব্‌য়াদ' (শ্বেত ارتش الابيض) আল-তা'ঈ আল-কুবরা (the Great Altai)-র পার্বত্য ভূমি হইতে বহির্গত হইয়াছে এবং উভয় স্রোতধারা মিলিত হওয়ার পর এই নদী যায়সান (Zaisan) হ্রদ পর্যন্ত 'ইর্‌তিশু'ল-আস্‌ওয়াদ' (কৃষ্ণ ارتش الاسود) নামে অভিহিত হইয়াছে। হ্রদ হইতে বহির্গত হওয়ার পর উহা প্রায় ১৮০ মাইল পর্যন্ত তৃণভূমির মধ্য দিয়া 'আরতুশু'ল-আব্‌য়াদ' অথবা 'আর্‌তুশু'ল-হাদী' (الهادى ক্ষীণস্রোতা) নামে প্রবাহিত হয়। অতঃপর ৬০ মাইল পর্যন্ত অত্যন্ত দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হইয়া পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্য দিয়া 'আরতুশু'স-সারী' বা 'দ্রুত প্রবহমান' নদ নামে অগ্রসর হইয়াছে। Ustkamenogorsk শহরের সন্নিকটে ইহা সাইবেরিয়ার সেই বিশাল প্রান্তরে প্রবেশ করিয়াছে যাহার উচ্চতা উত্তর মহাসাগরের (Arctic Sea) দিকে ক্রমশ ঢালু হইয়া গিয়াছে এবং কয়েকটি ছোট উপনদী ছাড়াও ডান পার্শ্ব হইতে ওম (Om) ও তারা (Tara), আর বাম পার্শ্ব হইতে ইশিম (Ishim) ও তুবুল (Tobol) উপনদীসমূহ ইহার সহিত মিশিয়াছে। অতঃপর ইহা Samarowsk গ্রামের নিম্নভাগে অব নদীতে পতিত হইয়াছে। নদীটির মোট দৈর্ঘ্য ২,২৩০ মাইল (৩,৬০০ কিলোমিটার, নীল নদের দৈর্ঘ্যের সমান); তন্মধ্যে মাত্র ২৫৩ মাইল চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত; Omsk নামক স্থানে ঐ নদীর রেলসেতু ৭৬৫ গজ দীর্ঘ। এই নদীর নিম্নভাগের স্রোতধারার সর্বাধিক প্রস্থ ৮৭৬ গজ।

এই নদীর নামের উল্লেখ খৃ. ৮ম শতাব্দীর Orkhon লিপিতেও পাওয়া যায় (W. Radloff, Die alturkischen Inschriften der Mongolie, দ্বিতীয় পর্যায়, পৃ. ১৯, স্বরচিহ্নবিহীন লিপিতে)। মাস'ঊদী কিতাবু'ত-তান্‌বীহ (সম্পা. De Goeje, ৬২)-এ আর্‌তুশু'ল-আস্‌ওয়াদ ও ইর্‌তিশু'ল-আব্‌য়াদ'—এই দুই নদীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে, উক্ত নদীদ্বয় বুহ'ায়রা-ই খি'দি'র-এ মিলিত হইয়াছে। হু'দূদু'ল-'আলাম (পৃ. ১০)-এর লেখক ইর্‌তিশকে ভলগার উপনদী বলিয়া মনে করেন। তাঁহার পাণ্ডুলিপিতে উহার বানান আর্‌তুশ অথবা আরতূশ লিখিত হইয়াছে এবং একটি কিংবদন্তীর সহিত এই উচ্চারণের মিল রহিয়াছে যাহা শব্দটির জনপ্রিয় বুৎপত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত (আর্‌তুশ='ওহে ব্যক্তি! নিচে অবতরণ কর') যাহার বর্ণনা Barthold-এর যাবানী গার্‌দিযী দিয়াছেন। গার্‌দিযীর বর্ণনামতে যদিও এই বাণিজ্যিক নৌপথ ফারাব (দ্র.) হইতে আরতুশ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, তবু ঐ অঞ্চলে মধ্যযুগের ইসলামী কৃষ্টির প্রভাব অল্পই পড়ে। নদীর নামের উল্লেখও অতি বিরল, যথাঃ তৈমূরের অভিযানসমূহের ইতিহাস, জ'াফারনামা (ظفرنامة) ভারতীয় মুদ্রণ, ১খ, ৪৭৫ ও ৪৯৫ (ইর্‌তিশ)-এর মধ্যে। যে ইসলামী শহর রুশ বিজয়িগণ নদীর ভাটিতে দেখিতে পাইয়াছিল (যাহার বড় দুর্গ টুবুল [Tobol]-এর মোহনার নিকট অবস্থিত), সম্ভবত উহা মোঙ্গলদের শাসনামলে ভলগা (Volga) অঞ্চল হইতে আগমনকারীরা গড়িয়া তুলিয়াছিল। বুখারা হইতে ইসলাম প্রচারকবৃন্দের প্রেরণ সম্পর্কে যে সমস্ত কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া র‍্যাডলফ (Radloff, Aus Siberien, ১খ, ১৪৬) উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের সত্যতা সন্দেহাতীত নহে। যাহা হউক, আর্‌তুশ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের ব্যাপকতা উত্তর অঞ্চল হইতে রুশদের শাসনামলেই আরম্ভ হইয়াছিল (দ্র. শব্দমূল برية)। আর্‌তুশের তীরে ও উহার অববাহিকায় সমস্ত শহর ও বস্তী এলাকা কেবল রুশদের শাসনামলে গড়িয়া উঠিয়াছিল। দক্ষিণ দিকে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত 'তারা'-এর পর অন্য কোন শহর ছিল না। ওম্‌স্‌ক (Omsk) ও উহার দক্ষিণ দিকের শহরগুলির ভিত্তি সম্রাট মহামতি পিটার (Peter the Great)-এর শাসনামলে স্থাপিত হইয়াছিল।

আর্‌তুশ-এর উপনদীগুলির সঙ্গমস্থল পর্যন্ত উহা নাব্য। Tobolsk ও Ustkamenogorsk-এর মধ্যে বাষ্পীয় পোতসমূহ নিয়মিত চলাচল করে, কোন কোন সময় বাষ্পীয় জাহাজসমূহ Zaisan পর্যন্ত চলিয়া যায় এবং আর্‌তুশু'ল-আস্‌ওয়াদ হইতে উজানে চীন সীমান্ত পর্যন্ত, এমনকি উহারও অগ্রে চলিয়া যায়। সাইবেরিয়া রেলপথ চালু হওয়ার পর যাতায়াতের মহানৌপথ হিসাবে আর্‌তুশের গুরুত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আর্‌তুশের বর্তমান গুরুত্ব কেবল একটি মহানৌপথ হিসাবে নহে, সোভিয়েত

শাসনামলে উহার উপকূলে কয়েকটি পানিবিদ্যুৎ (Hydro- electric) কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার ফলে সাইবেরিয়ার বিরাট পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে, অনেক শুষ্ক অঞ্চল সেচের মাধ্যমে উর্বর ও শস্যশ্যামল হইয়া উঠিয়াছে। কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আলতাই পর্বতমালার মূল্যবান খনিজ সম্পদ কাজে লাগাইবার জন্য বহু কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গতি দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে (দ্র. Bolsaya sov. entisclop., মস্কো ১৯৩৫ খৃ., ২৯, ২৭৫ হইতে ২৭৯; Sibirskaya sov. entisklopediya, মস্কো ১৯৩১ খৃ., ২খ, ৩৩৬ হইতে ৩৪৫ এবং অন্য যে সমস্ত উৎসের উল্লেখ আছে, যেমন তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, শিরো.)।

W. Barthold (দা. মা. ই.)/মুহাম্মদ আবদুল আজিজ

**'ইর্‌দ** (عرض) ঃ 'আরবী শব্দ (ব. ব. আ'রাদ'), সম্মান শব্দের প্রায় অনুরূপ অর্থবোধক। কিন্তু কিছুটা দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট যাহা আভিধানিকগণের দ্বিধা দ্বারা অসমর্থন প্রতীয়মান হয়। পবিত্র কু'রআনে শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই এবং যেসব প্রসঙ্গে ইহা হ'াদীছে স্থান লাভ করিয়াছে তাহাতে ইহার যথার্থ অর্থ পরিস্ফুট হয় না। জাহি'জ' 'ইর্‌দ-এর ধারণা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে ইব্‌ন কু'তায়বা মনে করেন যে, ইহা কখনও আত্মা বা কখনও শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁহার এই ব্যাখ্যাটি আল-কালী কর্তৃক বিরূপ সমালোচিত হইয়াছে (আমালী, কায়রো ১৩২৩ হি., ১খ, ১১৮)। প্রকৃতপক্ষে 'শক্তিশালী সেনাদল', 'খর্জুর বৃক্ষে আচ্ছাদিত উপত্যকা' (দ্র. TA, শিরো. La, শিরো) ইত্যাদির মত জড় অর্থ ছাড়াও 'ইর্‌দ' হ'াদীছে' ও কাব্যে জীবজন্তুর, এমনকি মানবদেহ, শরীরের স্বেদ নিঃস্রাবী অঙ্গ-প্রতঙ্গ এবং পুরুষ ও নারীদেহের গন্ধ অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কোন ব্যক্তিবিশেষের পূর্বপুরুষদের খ্যাতি অথবা ব্যক্তিগত আভিজাত্য (হ'াসাব দ্র.), সচ্চরিত্র (খালীক'া মাহ্'মূদা) অথবা আত্মা (নাফ্স) সমস্ত গুণবাচক অর্থেও আভিধানিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। 'ইর্‌দ'-এর সংরক্ষণ (صان ও ইহার সমার্থক) অথবা অমর্যাদা (شتم ও ইহার সমার্থক) যাহার ব্যবহার বর্তমানে 'আরবীতে বহুল প্রচলিত তাহা অধিবিদ্যার সত্তারূপে বিবেচিত 'আত্মা' অথবা শুধু প্রশংসার দাবিদার সচ্চরিত্রের ক্ষেত্রে স্পষ্টত প্রয়োগ করা যায় না। অতএব, যখন 'ইর্‌দ'-এর সহিত 'হ'াসাব' (আভিজাত্য) নির্ভুলভাবে একার্থবোধক; এ ক্ষেত্রে প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা বেশী অর্থবোধক। 'হ'াসাব' 'ইর্‌দ'-এর শুধু একটি অভিব্যক্তি।

শব্দার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে 'ইর্‌দ'-এর মূল বর্ণগুলি কার্যকরী পথ নির্দেশ দিতে পারে। এই মূল হইতে ব্যুৎপন্ন কতগুলি শব্দ কোন কিছু 'আড়াআড়িভাবে স্থাপিত' অর্থ প্রকাশ করে (تعرض اعترض) এবং 'ইরদ' (عرض) একখণ্ড মেঘ যাহা দিগন্তকে দৃষ্টির আড়াল করে। যেহেতু 'আরবগণ হাতাক্'ল-'ইর্‌দ' (هتك العرض) দ্বারা 'ইর্‌দ' ছিন্নকরণ' বাকধারাটি ব্যবহার করিত যখন কেহ পর্দা ফাড়ে এবং যেহেতু একই মূল হইতে উৎপন্ন হাতীকা (هتيكة)-এর অর্থ 'অসম্মান', সেইহেতু ইহা যুক্তিসঙ্গত 'ইর্‌দ-কে এক রকমের বিভাজক বা পর্দা অর্থে ব্যবহার করা যাহা কোন ব্যক্তিবিশেষকে অবশিষ্ট মানবগোষ্ঠী হইতে পৃথক করিয়া রাখে। এই পর্দার অন্তরালে গুপ্ত রাখা হইত ব্যক্তিগত অথবা পূর্বপুরুষদের বৈশিষ্ট্যগুলি। প্রাচীন 'আরবগণ এই সব বৈশিষ্ট্যকে অপমানের হাত হইতে রক্ষার জন্য কৃতসংকল্প ছিল। এই পর্দা উন্মোচনের মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তির কলঙ্কজনক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ করাই ছিল হিজা' (দ্র.)-এর অন্যতম লক্ষ্য।

'ইর্‌দ-এর অপরিহার্য অংশগুলিকে তিনটি শিরোনামে বিন্যস্ত করা যাইতে পারে ঃ গোত্রীয় দল, পরিবার ও ব্যক্তিবিশেষ। গোত্রের আওতায় আসে ইহার অধীন সদস্য সংখ্যা, কবি ও বাগ্মীদের গুণাবলী, বিজয়সমূহ ও স্বাধীনতা; পরিবারের আওতায় ইহার সন্তান-সন্ততি ও ব্যক্তিবিশেষের আওতায় দল। অন্যান্য উপাদান, যেমন বিদ্রোহ, বীরত্ব, স্বাধীনতা, বংশগত বিরোধ, স্ত্রীর সতীত্ব, বদান্যতা, প্রতিজ্ঞা পালন, হ'াসাব (ব্যক্তিগত উন্নত চরিত্র), দুর্বলকে আশ্রয়দান, মেহমানদারী, বাসস্থানের অভেদ্যতা, কখনও দল ও ব্যক্তিবিশেষের, কখনও পরিবার ও ব্যক্তিবিশেষের, আবার কখনও দল, পরিবার ও ব্যক্তিবিশেষের আওতাভুক্ত।

প্রাচীন 'আরবদের সামরিক জীবনে 'ইর্‌দ'-এর বিভিন্ন উপাদানের বিশ্লেষণ আমরা দেখিতে পাই। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধে ব্যর্থতার লক্ষণ অথবা স্বাধীনতা হারানোর লক্ষণ 'আরবদের জন্য ছিল একটা অবমাননাকর ও অপমানজনক ব্যাপার। সুতরাং অবমাননা (ذلة) হইল শক্তি (عزة)-এর বিপরীত। যেহেতু ইহা দুর্বলতার ইঙ্গিত বহন করে, অতএব দুর্বলতা হইতেছে অবমাননাকর অবস্থা, আর শক্তি হইল সম্মান বা 'ইর্‌দ-এর ভিত্তিস্বরূপ। অন্য কথায় শক্তির ব্যাপারে যাহা কিছু অবদান রাখে তাহাই সম্মানের উপাদান। পক্ষান্তরে দুর্বলতা উদ্রেককারী সব কিছুই অসম্মানের অপরিহার্য অংশ। এখন ইহা সুস্পষ্ট যে, 'ইর্‌দ' ব্যুৎপত্তিগতভাবে যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল।

'ইর্‌দ-এর আরও এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ছিল। একমাত্র য়ামান ব্যতীত সকল 'আরববাসীরই কাজকর্ম ইহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। সুতরাং সম্মান অর্জনের জন্য অনুষ্ঠিত মুফাখারা (مفاخرة) ও মুনাফারা (منافرة) দ্র. নামক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে ইহা ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং পবিত্র বৈশিষ্ট্যের দরুন 'ইর্‌দ'-এর ধর্মের স্থলাভিষিক্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গতই ছিল। কারণ 'আরবগণ ইহাকে উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল এবং হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া রক্ষা করিত।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে নিম্নরূপ উপসংহার টানা যাইতে পারে, 'আরবগণ তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের নৈতিক মূল নিয়ম, যথাঃ সম্মান ('ইর্‌দ')-এর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার ফলে যেমন নৈরাজ্যবাদী ছিল না, তেমন খাঁটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী আদিকালীন আচরণপন্থী বা মনেপ্রাণে বস্তুবাদীও ছিল না। পক্ষান্তরে নৈতিক মূল নিয়ম হিসাবে 'ইর্‌দ' নৈতিক জীবন, রীতিনীতি, এমন কি সামাজিক বিধি-বিধানের বিভিন্ন দিকের মূলে অবস্থিত ছিল। ইহা সামাজিক শ্রেণীবিভাগ অথবা অসমতাবাদী সামাজিক কাঠামোর মূলেও ছিল; কবি, বাগ্মী ও একদিক দিয়া সায়্যিদগণ বিশেষ সম্মান ভোগ করিতেন। সেখানে পুত্র কন্যা অপেক্ষা, উচ্চ বংশীয় (شريف শারীফ) নিম্নবংশীয় (وضيع ওয়াদী') অপেক্ষা, আযাদ (حر হুররূ) গোলাম (عبد 'আব্‌দ) অপেক্ষা, সবল গোত্র দুর্বল গোত্র অপেক্ষা ইত্যাদি উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী ছিল।

আমাদের বিশ্লেষিত 'ইর্‌দ'' এখানে জাহিলিয়্যা যুগের সহিত সম্পর্কিত। তবুও হযরত মুহাম্মাদ (স') 'ইর্‌দ'কে পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করিতেন এমন কি ইহার মর্যাদা ধর্মের সমপর্যায়ের ছিল। ইসলাম ইহার অনেক উপাদান রক্ষা করিয়াছে এবং এইগুলি ইহাতে পালনীয় কর্তব্যরূপে স্থান লাভ

করিয়াছে। নিরাপত্তা দান, অকাতরে অর্থদান, বীরত্ব ইত্যাদি মুসলিম (ধর্মীয়) কার্যের অংশ হিসাবে পরিগণিত। অবশ্য এই উপাদানগুলি ইহাদের আদি বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। এইগুলি এখন আর দাম্ভিকতার কারণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না (ইসলামে তাক্'ওয়া হা'মিয়্যা-র বিপরীত বিধায়); এইগুলি বরং ধর্মের সহিত অথবা ধর্ম হইতে উদ্ভূত নৈতিক মূল নিয়মের সহিত সম্পর্কিত। অন্য উপাদানগুলি (যেমন হা'সাব ও শারাফ) ইহার মর্মের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার কারণে ইসলাম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। অন্যদিকে ইহাদের কতগুলি এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান আছে এবং কখনও কখনও ইহাদের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। আধুনিক বেদুঈনদের মধ্যে 'ইর্দ' এখনও প্রায় ইহার সকল প্রাক-ইসলামী উদ্দীপনার সহযোগে পরিলক্ষিত হয় (ট্রান্স-জর্দানিয়া ও মোয়াব-এর 'আরবদের হু'কূক')।

পরবর্তী সময়ে এই সমস্ত উপাদান একাধিকবার রূপান্তরিত হইয়াছে অথবা বিলুপ্তও হইয়াছে, বিশেষ করিয়া শহরগুলিতে। তথাপি অপেক্ষাকৃত কম সমৃদ্ধ অর্থে হইলেও উমায়্যা শাসনামল পর্যন্ত 'ইর্দ' শব্দটি ইহার পবিত্র বৈশিষ্ট্য ও অসম্মানের সহিত সম্পর্কসহ চিরাচরিত অর্থে ব্যবহৃত হইত (তু. ইব্ন দুরায়দ, জামহারা, বূলাক' সং., ১৬৬; আগ'নী, ১১খ, ৪৯; ইব্ন কু'তায়বা, 'উয়ূনু'ল-আখবার, ১খ, ২৯৩; আছ-ছা'আলিবী, মির'আতু'ল-মুরুওওয়াত, কায়রো ১৮৯৮ খৃ., পৃ. ২২, ৩১; আবূ তাম্মাম, দীওয়ান, কায়রো ১৮৭৫ খৃ., পৃ. ৯৩; আল-বুহ্'তুরী, দীওয়ান, বৈরূত ১৯১১ খৃ., পৃ. ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৯, ৬৫২; আল-মুতানাব্বী, দীওয়ান, সম্পা. Dieterici, ৪১৬; মিহ্য়ার আদ-দায়লামী, দীওয়ান, ১৯২৯ খৃ., ২খ, ৪)। জাহিলিয়্যা যুগের বিচিত্র রং-বিবর্জিত অবস্থায় আংশিকভাবে শারাফ (شرف) ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে যাহার সাধারণ অর্থ সম্মান (য়া'কূবী, Historiae, ২খ, ৩১৪; ইব্ন কু'তায়বা, উয়ূনু'ল-আখবার, ১খ, ২৪৬; আল-মুতানাব্বী, দীওয়ান, পৃ. ৩৪২; ইব্ন খাল্দূন, মুকা'দ্দিমা, বৈরূত সং., ১৯০০ খৃ., পৃ. ৩৯৬; তু. আল-হু'স'রী, যাহ্র, সম্পা. যাকী মুবারাক, ১খ, ১৩৫ ও অভিধানসমূহ)।

বর্তমান কালে 'ইর্দ'-এর অর্থ সীমিত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া নারীদের ক্ষেত্রে ট্রান্স-জর্দানে ইহা নারীদের গুণের সহিত, এমনকি তাহাদের রূপের সহিতও সম্পর্কিত। মিসরে একজন পুরুষের 'ইর্দ' সাধারণত তাহার স্ত্রী ও অন্য সকল মহিলা আত্মীয়ার সুখ্যাতির উপর নির্ভর করে। সিরিয়ায় গোত্রের সকল সদস্যের খ্যাতির মাধ্যমে একজন লোকের 'ইর্দ' প্রতিফলিত হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) B Fares, L'honneur chez les Arabes avant l'Islam, প্যারিস ১৯৩২ খৃ., যেইখানে বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা আছে; (২) আরও দ্র. শারাফ।

B. Fares (E.I.2)/আবু তাহের

**'ইরফান** (দ্র. মা'রিফা)।

**আল-'ইরবাদ' ইব্ন সারিয়া** (العرباض بن سارية) ঃ (রা), বিশিষ্ট সাহাবী, উপনাম আবূ নাজীহ', সুলায়ম গোত্রের লোক। তিনি শুরুতে যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মদীনায় হিজরতের পর তিনি আহলু'স-সু'ফফা (দ্র.)-এর অন্তর্ভুক্ত হন। ৯ম হিজরীতে (৬৩১ খৃ.) তাবূক যুদ্ধের সময় যেই সাতজন সাহাবী যান-বাহনের অভাবের কারণে যুদ্ধে যাইতে না পারিয়া রাসূলুল্লাহ (স')-এর দরবার হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া যান তাঁহারা হইতেছেনঃ সালিম ইব্ন 'উমায়র (سالم بن عمير), হারামী ইব্ন 'আম্র (هرمى بن عمر), উল্বা ইব্ন যায়দ (علبة بن زيد), আবূ লায়লা আল-মাযিনী (ابو ليلى المازنى), 'আম্র ইব্ন 'আনামা (عمرو ابن عنمة), সালামা ইব্ন সাখ্র (سلمة بن صخر) ও আল-'ইরবাদ ইব্ন সারিয়া (রা)। তাঁহাদের সম্পর্কেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইয়াছে, "যাহারা নিজেরা আসিয়া তোমার নিকট যান-বাহনের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য আবেদন করিয়াছিল, আর তুমি বলিয়াছিলে, আমি তোমাদের জন্য যান-বাহনের ব্যবস্থা করিতে অক্ষম, ফলে তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া যায়" (৯ ঃ ৯২)।

তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসার সময় পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (স') তাঁহাদের সম্পর্কে তাঁহার সঙ্গী-সাথীদের বলিয়াছিলেন, "মদীনায় এমন কিছু লোক রহিয়াছে, তোমরা এমন কোন প্রান্তর অতিক্রম কর নাই, কোথাও যাত্রা কর নাই যাহাতে তাহারা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে নাই।" সাহাবীগণ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মদীনায় থাকিয়াই কি তাহারা এইরূপ করে?" তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, মদীনায় থাকিয়াই তাহারা এইরূপ করে। কেননা অক্ষমতা তাহাদেরকে ঘরে আটক করিয়া রাখিয়াছে। অন্যথায় তাহারা কিছুতেই ঘরে আটক থাকিবার লোক নহে।" আল-'ইর্বাদ' (রা) রাসূলুল্লাহ (স') ও আবূ 'উবায়দা ইব্নু'ল-জার্রাহ' (রা)-এর নিকট হইতে হা'দীছ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা), 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন 'আ'ইয, আবূ রুহ্ম, আস-সামা'ঈ, হা'বীব ইব্ন 'উসায়্দ, জুবায়র ইব্ন নুফায়র, 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন 'আম্র ইব্ন আস-সুলামী, হা'জার ইব্ন হা'জার আল-কালা'ঈ, সা'ঈদ ইব্ন হানী' আল-খাওলানী, শুরায়হ' ইব্ন 'উবায়দ, 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী বিলাল, সুওয়ায়দ ইব্ন জাবালা, 'আবদু'ল-আ'লা ইব্ন হিলাল প্রমুখ রাবী হা'দীছ' বর্ণনা করিয়াছেন। প্রধানত সুনান আরবা'আ (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসা'ঈ, ইব্ন মাজা) গ্রন্থে তাঁহার হা'দীছ' নিম্নরূপ, আল-ইর্বাদ' (রা) বলেন, "একদিন রাসূলুল্লাহ (স') আমাদের সালাত পড়াইলেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া আমাদের উদ্দেশে এমন মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন যে, আমাদের চক্ষু দিয়া পানি ঝরিতে লাগিল এবং আমাদের অন্তর বিগলিত হইয়া গেল। এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহা যেন বিদায় গ্রহণকারীর শেষ উপদেশ। আমাদেরকে আরও কিছু উপদেশ দিন। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্কে ভয় করিবার উপদেশ দিতেছি এবং (নেতার) কথা শুনিতে ও তাহার অনুগত থাকিতে আদেশ করিতেছি, যদিও সে হা'বশী গোলাম হয়। আমার পরে তোমাদের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখিবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নাতকে আঁকড়াইয়া ধরিবে, উহাকে দাঁত দিয়া শক্ত করিয়া কামড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। সাবধান! তোমরা নূতন কথা (বিদ্'আত) হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কেননা প্রতিটি নূতন কথাই বিদ'আত এবং প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, মুসনাদ আহ্'মাদ)। আল-'ইর্বাদ' (রা) ছিলেন বয়ঃবৃদ্ধ সাহাবী। তিনি ৭৫ হিজরীতে 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন মারওয়ানের রাজত্বের প্রথমদিকে হি'ম্স' শহরে ইনতিকাল করেন। মতান্তরে ইব্ন যুবায়র (রা)-এর সময়কার গৃহযুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। অপর মত অনুযায়ী তিনি ৭৫ হিজরীর পরে ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্ন হা'জার আল-'আসকা'লানী, আল-ইসা'বা, ১ম সং. বাগ'দাদ ১৩২৮ হি., ২খ, ৪৭৩; (২) ইব্ন সা'দ, আত্'-তাবাকা'তু'ল-

কুব্‌রা, বৈরূত সং., ২খ, ১৬৫, ৪খ, ২৭১; (৩) 'আবদু'র-রাহ্‌মান আর-রাযী, কিতাবু'ল-জারহ্‌ ওয়া'ত-তা'দীল, ১ম সং., বৈরূত ১৩৭২/ ১৯৫২, ৭খ, ৩৯; (৪) ইব্‌ন হ্‌াজার, তাক্‌রীবু'ত-তাহযীব, ২য় সং., দারু'ল-মা'আরিফ, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ, ১৭।

মুহাম্মদ মূসা

**ইর্‌বিদ** (اربد) ঃ দুইটি পৃথক স্থানের নাম। (১) (ইর্‌বিদ/আর্‌বাদ), ট্রান্স-জর্ডানের 'আজ্‌লূন (দ্র.) কা'দা'-র (৩২°-৩৩' উত্তর অক্ষাংশ ও ৩৫° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) কেন্দ্র। ত'াবারীর মতে উমায়্যা খলীফা দ্বিতীয় য়াযীদ ইর্‌বিদে ইনতিকাল করেন। ঘটনাপঞ্জী লেখকগণের মতে সেই সময় ইহা বালকা' (দ্র.) অঞ্চলের একটি অংশ ছিল। অপর কয়েকটি কিংবদন্তী মতে দ্বিতীয় য়াযীদের বাসস্থান ছিল বায়ত রাস (দ্র.)-এ। এই স্থানটি ইর্‌বিদ হইতে তিন কিলোমিটার উত্তর দিকে। মাম্‌লূক" আমলে ইর্‌বিদ ছিল বারীদ [দ্র.] (ডাক বিভাগ)-এর একটি বিশ্রামস্থল। বর্তমানে ইহা ব্যাসাল্ট (কোল আগ্নেয়গিরিজাত শিলা) গৃহবিশিষ্ট ৩০০০ অধিবাসির একটি ক্ষুদ্র শহর।

(২) (খিরবাত ইর্‌বিদ, আরবাদ, এরবেদ) টাইবেরিয়াস হ্রদের পশ্চিমে ওয়াদি'ল-হ'ামাম-এর সৃষ্ট সংকীর্ণ খাদে (ravine) অবস্থিত প্রাচীন আরবেলা-র অবশিষ্ট নিদর্শন। ধ্বংসাবশেষের উল্লেখযোগ্য অংশ একটি য়াহূদী মন্দির (সিনাগগ) যাহা খাদটিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। খাদের পার্শ্বেই শিলাতে কাটা সিঁড়ি দ্বারা সংযুক্ত কয়েকটি গুহা আছে। কিংবদন্তী মতে এই সকল গুহার কোন একটিতে মূসা ('আ) [মূসা ইব্‌ন 'ইমরান]-এর মাতা ও জ্যাকব (য়া'কূ'ব)-এর চার পুত্র দান, ইসাখার, যাবূলূন ও গাদ-এর সমাধি অবস্থিত।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) তাবারী, ২খ, ১৪৬৩; (২) J. Sauvaget, Poste aux chevaux, প্যারিস ১৯৪১ খৃ., ৭২-৬; II: (৩) য়াকূত, শিরো.; (৪) হারাব'ী, যিয়ারাত, সম্পা. J. Sourdel-Thomine, দামিশ্‌ক' ১৯৫৩ খৃ., ১৯-২০; (৫) Le Strange, Palestine, ৪৫৭; (৬) Marmardji, Textes geographiques, প্যারিস ১৯৫১ খৃ., ৪; (৭) F. M. Abel, Geographie de la Palestine, প্যারিস ১৯৩৩-৮ খৃ., ১খ, ৪১০, ২খ, ২৪৯; (৮) Clermont-Ganneau, in RAO, ১খ, ৩২৪; (৯) ZDPV, xix (১৮৯৬ খৃ.), ২২২-৩, ২৮খ. (১৯০৫ খৃ.), ২২-৪।

S. Ory (E.I.²)/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

**ইর্‌বিল** (اربل) ঃ উত্তর মেসোপটেমিয়ার একটি শহর, ইহা আল-মাওসিল (৩৬°-১৫' উত্তর, ৪২°-২' পূর্ব)-এর প্রায় ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। ইহা এডিয়াবেন নামে পরিচিত একটি অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। উহার উত্তর সীমান্ত বড় যাব নদীর গতিপথ এবং দক্ষিণ সীমান্ত ছোট যাব নদীর গতিপথ দ্বারা পরিবেষ্টিত। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইর্‌বিল শহরটির অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। একটি কীলকাকার উৎকীর্ণ লিপিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 'আরবাঈলু' ছিল আসিরীয় রাজ্যের ধর্মীয় কেন্দ্র যেখানে আসিরীয় ইশ্‌তার দেবীর নামে একটি উপাসনালয়ও ছিল। ইহা একদিকে ছিল একটি যোগাযোগ কেন্দ্র এবং অন্যদিকে কাফেলা পথসমূহের কেন্দ্রস্থান। ইহা ছিল পরবর্তী কালের 'আরবেলেস' নামে প্রসিদ্ধ স্থানটির সন্নিকটবর্তী যেখানে খৃষ্টপূর্ব ৩৩১ অব্দে পারস্য সম্রাট ৩য় দারা আলেকজান্ডারের নিকট পরাজয় বরণ করিয়াছিলেন। পার্থিয়ান ও রোমানদের সংঘর্ষকালে শহরটি 'আরবীরা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহার অনতিকাল পরেই ইহা খৃস্টান রাজ্যে পরিণত হয়। অবশ্য উক্ত অঞ্চলে খৃস্টানদের অনুপ্রবেশ কি পরিমাণ ঘটিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। সাসানীদের শাসনামলে গভর্নরের রাজধানী ইর্‌বিলে খৃস্টানদের প্রতি নির্যাতন পরিলক্ষিত হয়। ৩৪০ খৃ. একটি অনুশাসন দ্বারা তিনি খৃস্টানদের প্রতি মাথাপিছু কর ধার্য করেন এবং তাহারা নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট ভোগের শিকার হয়। ইহাতে কতিপয় খৃস্টানের বাধা প্রদানের দরুন তাহাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে ৩৫৮ খৃ. প্রাদেশিক শাসনকর্তা 'কারদাগ' খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হইলে তাহাকেও মৃত্যুদণ্ডে প্রাণ হারাইতে হয়।

আপাতদৃষ্টিতে প্রায় বিনা বাধায়ই মুসলিম শক্তি ইর্‌বিল জয় করে, তবে তাহারা খৃস্টান বিশপের এলাকার একটি সক্রিয় কেন্দ্র হিসাবে উহাকে খর্ব করে নাই। মুসলিম বিজয়ের পরেও বহু সুবিখ্যাত বিশপ স্বাধীনভাবে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিলেন। যাহা হউক, অতি দ্রুততার সঙ্গে মাওসিল শহর দ্বারা ইরবিল নিষ্প্রভ হইয়া পড়ায় তথা হইতে ৩য়/৯ম শতাব্দীতে প্রধান বিশপ মাওসিলে স্থানান্তরিত হন। 'আরব ভৌগোলিকগণ সেই সময়ের ইরবিল হু'লওয়ান অঞ্চলের কেবল একটি প্রধান শহর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ৫৬৩/১১৬৭ সালে ইর্‌বিল একটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হয়। ৬৫৩/১১৬৭ সালে আমীর যায়নু'দ-দীন 'আলী কুচুক বেগ্‌তেগীন, যিনি ছিলেন সিন্‌জার, হাররান ও তিকরিতের প্রাক্তন শাসক, ইর্‌বিলকে রাজধানীতে পরিণত করেন। অবশ্য কিছুকালের মধ্যেই তিনি তাঁহার পুত্র কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন। এই বংশের খ্যাতিমান মুজ'াফ্‌ফারু'দ-দীন কোক্‌বূরী (দ্র. বেগ্‌তেগীনিদস) সুলত'ান স'লাহু'দ-দীন আয়্যুবীর ভগ্নিপতি ছিলেন। তিনি ৫৮৬/১১৯০ হইতে ৬৩০/১২৩২ পর্যন্ত শাসন করেন এবং এই সুদীর্ঘকাল ইর্‌বিলই ছিল তাঁহার রাজধানী। তিনি তাঁহার রাজধানী শহরটিকে নানাদিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তোলেন, বিশেষ করিয়া তিনি শহরটির উচ্চ অঞ্চলের পাদদেশকে কতিপয় অঞ্চলে রূপান্তরিত করেন। বিভিন্ন ধরনের সরকারী প্রাসাদ, দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি মাদ্‌রাসা যাহা মুজ'াফফারিয়্যা নামে খ্যাত এবং সূফী দরবেশদের জন্য একটি 'রিবাত'' প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি শহরটির নিম্নাঞ্চল সুশোভিত করেন। মহানবী হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর জন্মদিবস উপলক্ষে সুলত'ান কোকবূরী প্রতি বৎসর অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে পবিত্র মীলাদু'ন-নাবী উৎসব পালন করিতেন। কোকবূরীর মৃত্যুর পর ইর্‌বিল রাজ্যটি বাগ'দাদের 'আব্বাসী খলীফা আল-মুস্‌তানসি'র-এর শাসনাধীনে চলিয়া যায়। কোকবূরী স্বেচ্ছায় বাগদাদের খলীফা আল-মুসতান্‌সি'রকে উহা দান করিয়া গিয়াছিলেন। তথাপি উহার শাসনক্ষমতা হস্তগত করিবার জন্য খলীফা শহরটি অবরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

৬৩৩/১২৩৫ সালে মোঙ্গলদের দ্বারা শহরটি আক্রান্ত হয় এবং উহাদের লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবশ্য 'আব্বাসী খিলাফাতের অবসান ঘটিলে ৬৫৬/১২৫৮ সালে মঙ্গোলরা কেবল নগর-দুর্গটি অধিকার করিয়া লয়। কোকবূরীর পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী বাদরু'দ-দীন লু'লু'র সাহায্যে তাহারা দুর্গটি অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, যাঁহাকে শহরটি প্রদান করা হয়। ৬৫৯/১২৬১ সালে লু'লু'র বিদ্রোহী পুত্র আল-মালিকু'স'-সালিহ ইস্‌মা'ঈলের কয়েক বৎসর ব্যাপী ব্যর্থ অভ্যুত্থানে একটি ধ্বংসলীলা সত্ত্বেও ইর্‌বিলের খৃস্টান সম্প্রদায় নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের তুলনামূলক সুযোগ লাভ

করে এবং নূতন উপাদানসমূহের আগমনে তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। শহরটিতে তাজু'দ-দীন মুখ্‌তাস্‌স নামে একজন খৃস্টান গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। তাজু'দ-দীন মুখতাস্‌স গ্রামাঞ্চলের জ্যাকোবীয় লোকদেরকে ইর্‌বিলে আগমনের জন্য উৎসাহ প্রদান করে এবং নেস্টরীয় ধর্মযাজক ডেন্‌হা-র সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী তাহাদেরকে তথায় একটি গির্জা নির্মাণেরও অনুমতি প্রদান করে। ইহার কয়েক বৎসর পরে নূতন জ্যাকোবীয় লোকেরা ডেন্‌হা-কে তাহাদের নিজস্ব বিশপ হিসাবে নিয়োগের সরকারী অনুমোদন লাভ করিতে সক্ষম হয়। ডেন্‌হা-কে ৬৬৩/১২৬৫ সালে বাগ্‌দাদে আরমেনীয় প্রধান বিশপ (catholicos) হিসাবে নিয়োগ করা হয়, কিন্তু ৬৬৬/১২৬৮ সনে বাগ্‌দাদ ত্যাগ করিয়া ইর্‌বিলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ৬৬৯/১২৭১ সালে তিনি তথা হইতেও পলায়ন করেন এবং গভর্নরের সহিত মতবিরোধের কারণে শেষ পর্যন্ত ইর্‌বিল ত্যাগপূর্বক আযারবায়জানে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। ৬৮৭/১২৮৯ সালে তাজু'দ-দীনের অপসারণ ও উৎপীড়ন দ্বারা ইর্‌বিলের খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রতি নিপীড়ন ও হয়রানী করার ঘটনা সূচিত হয়। ৬৯৩/১২৯৫ সালে মোঙ্গলদের আদেশে তিনটি গির্জা ধ্বংস করা হয় এবং ৭০৮/১৩১০ সালে কতিপয় বিদেশী বেতনভুক্ত খৃস্টান সৈন্যের অমানবিক কার্যকলাপের জের হিসাবে শহরের নিম্নাঞ্চলের সম্পূর্ণ এবং পরে উচ্চাঞ্চলেরও আংশিক খৃস্টান অধিবাসীদের উচ্ছেদ করা হয়। কতিপয় গির্জা ধ্বংস করা হয়। তখন হইতেই ইর্‌বিলের খৃস্টান সম্প্রদায় নিজেদের গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে। অবশিষ্ট স্বল্প সংখ্যক খৃস্টান ধীরে ধীরে ইর্‌বিল ত্যাগ করে। উছ্‌মানী শাসনামলে ইহা বাগ্‌দাদের পাশার এলাকাধীনে থাকিলেও ১১৫৬/১৭৪৩ সালের ইর্‌বিলকে নাদির শাহের অভিযান সামলাইতে হয়। ১৮৯২ খৃস্টাব্দে ইহার লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৩,২০০। তন্মধ্যে ৪৫৭ জন ছিল য়াহূদী, তবে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সকল পরিব্রাজক ইরবিল ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই গণনাটি প্রকৃত জনসংখ্যা অপেক্ষা স্বল্প বলিয়া মনে করেন। বর্তমানে ইর্‌বিল প্রায় এক লক্ষ অধিবাসীর একটি শহর। ইহা একটি বাণিজ্যকেন্দ্র যাহা অদ্যাবধি শহরের উচ্চাঞ্চল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শহরের নিম্নাঞ্চলে এখনও একটি মীনার বিদ্যমান, যাহার সুড়ঙ্গের ন্যায় একটি প্রবেশপথ রহিয়াছে এবং উহা অষ্টভুজ আকারে নির্মিত। সম্ভবত উহা ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর শেষভাগে নির্মাণ করা হইয়াছিল, আর উহাই ছিল মুজাফফারিয়্যা মাদরাসার প্রবেশ পথ।

**গ্রন্থপঞ্জী** : (১) L. Dilleman, Haute-Mesopotamie,, প্যারিস ১৯৬২ খৃ., পৃ. ১১২; (২) J. M. Fiey, Assyrie chretienne, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৩১-৯৭; (৩) Le Strange, পৃ. ৯২; (৪) BGA, ৬খ, পৃ. ৬, ২৩৫; (৫) ইব্‌ন খাল্লিকান, ৫৫৮; (৬) ইবনু'ল-আছীর, নির্ঘন্ট; (৭) য়াকূত, ১খ, ১৮৬-৯; (৮) Bar Hebraeus, তা'রীখ মুখতাসারি'দ-দুওয়াল, বৈরূত ১৮৯০ খৃ., পৃ. ৪৩৬-৭২; (৯) ঐ লেখক, Chronography, অনু. Budge, লণ্ডন ১৯৩২ খৃ., নির্ঘন্ট; (১০) ঐ লেখক, Chronicon syriacum, সম্পা. Bedjan, প্যারিস ১৮৯০ খৃ., বিশেষত পৃ. ৪৬৬, ৫০৬, ৫২৫, ৫২৮-৯, ৫৫৭; (১১) ঐ লেখক, Chronicon ecclesia-sticum, সম্পা. Abbeloos ও Lamy, প্যারিস ১৮৭২-৭ খৃ., স্থা.; (১২) La Chronique des Ayyoubides d'al-Makin b. al-`Amid, সম্পা. CL. Canen, in B. Et. Or., ১৫খ. (১৯৫৫-৭খৃ.), পৃ. ১১৯, ১৪০-১; (১৩) ইব্‌ন ওয়াসিল, মুফাররিজু'ল-কুরূব, ৩খ, কায়রো তা, বি., নির্ঘন্ট; (১৪) সিব্‌ত ইবনু'ল- জাওযী, মির'আতু'য-যামান, ৮খ, স্থা., বিশেষত এস. এ. ৫৮৬। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং আধুনিক বিবরণাদি হইতে নিম্নে বর্ণিত গ্রন্থপঞ্জী আলোচনা করা যাইতে পারেঃ (১৫) C. Niebuhr, Reiseberichte nach Arabien, ২খ, কোপেনহেগেন ১৭৭৮ খৃ., পৃ. ৩৪২-৫; (১৬) C. Ritter, Erdkande, ৬খ, ৬৯১-৪; (১৭) V. Cuinet, La Turquie d'Asie, প্যারিস ১৮৯২ খৃ., ২খ, ৮৪৭-৮, ৮৫৬-৮। প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষের জন্য দ্র.ঃ (১৮) F. Sarre এবং E. Herzfeld, Archaologische Reise im Euphratund Tigris-Gebiet, বার্লিন ১৯২০ খৃ., ২খ, পৃ. ৩১৩-৮।

D. Sourdol (E.I.[2])/আবদুল ওয়াদুদ

**ইরমিয়া** (إرميا) ঃ নামটি মাদ্দ্‌ সহকারে অথবা মাদ্দ্‌ ব্যতীত আরমিয়া ও উরমিয়া-রূপেও লিখিত হয়, বাইবেলের নবী জেরেমিয়াহ (য়িরমেয়াহ)। তাঁহার সম্পর্কে কুরআন শারীফে কোন উল্লেখ না থাকিলেও তাফসীর সম্পর্কিত হাদীছে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া কিছু কাহিনী রহিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়।

ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌ ও কা'ব আল-আহবার-এর বরাতে প্রাপ্ত মুসলিম কাহিনীর দুইটি সংস্করণে জেরেমিয়াহ্‌ সম্পর্কে বাইবেলীয় বিবরণের ব্যাপক তথ্য অবাধ ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সংস্করণটির মুখ্য বিষয় হইল ইর্‌মিয়া এবং বুখতনাসসার (দ্র.) (Nebuchadnezzar)-এর মধ্যকার সম্পর্ক। ইহা মোটামুটিভাবে জেরেমিয়াহ ৩৯ঃ৪৩ শীর্ষক বাইবেলীয় বিবরণের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। আলেকজান্দ্রিয়ায় ইর্‌মিয়ার সমাধিস্থান প্রদর্শিত আল-হারাবী, Guide des lieux de pelerinage, সম্পা. J. Sourdel Thomine, দামিশক ১৯৫৭ খৃ., ৪৭, অনুবাদ ৩।

পরিশেষে জেরমিয়াহ্‌-ই সেই ব্যক্তিত্ব যাঁহাকে আত-তাবারী কর্তৃক সংগৃহীত এবং পরবর্তী লেখকের লেখায় বহুবার পুনরুল্লিখিত একটি কাহিনীতে "আল্লাহ্‌র লোক" (Man of God) নামক উপাখ্যানের নায়ক হিসাবে দেখা যায়। অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ছিলেন 'উযায়র (দ্র.) যিনি এক শতাব্দী যাবত ঘুমন্ত ছিলেন এবং আল্লাহ্‌ যে মৃতুকে জীবিত করিতে সক্ষম তাহার প্রমাণস্বরূপ যাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করা হইয়াছিল। কথিত আছে যে, এই নবজীবন লাভের পর নশ্বর মানবকুলে ইর্‌মিয়া এক অসাধারণ দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হন। এই কারণে তাঁহাকে আল-খাদির (খিদ্‌র দ্র.) বলিয়া ভুল করার প্রবণতা রহিয়াছে। আল-জাহিজ (তার্‌বী', সম্পা. Pellat, 40)-এর একটি নিবন্ধে ইহার নির্দেশ পাওয়া যায়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ উপরে সংক্ষেপে বর্ণিত কাহিনীসমূহ বিস্তারিত-ভাবে আলোচিত হইয়াছে নিম্নলিখিত নিবন্ধেঃ Irmiya, by A.J. Wensinck, Handworterbuch des Islam, 214 ff.= Shorter Encyclopaedia of Islam, ১৭২ প.। নিবন্ধটিতে উল্লিখিত গ্রন্থাদি ব্যতীত অতিরিক্ত দ্রষ্টব্যঃ (১) তাবারী, তাফ্‌সীর, নূতন সংস্করণ, ৫খ, ৪৩৮-৮৪; (২) Chronique de Tabari (বাল'আমী), ১খ, ৪৯২, ৪৯৪ প.; (৩) মাস'উদী, মুরূজ, ১খ, ১১৭ প., অনু. Pellat, ১খ, ১১৩ প.; (৪) আল-বাদ' ওয়া'ত-তা'রীখ, ৩খ, ১১৪, ১১৭ প.;(৫) ছা'লাবী, 'আরা'ইসু'ল-মাজালিস, ১৯৫-৮ (পুরাতন সংস্কারণ, ১৯২ প.); (৬) ইব্‌ন কাছীর, বিদায়া, ২খ, ৩৩-৮; (৭) মুজীরু'দ্‌-দীন

আল-হাম্বালী, আল-উনসু'ল-জালীল, কায়রো ১২৮৩/১৮৬৬, ১খ, ১৩৮ প.; (৮) I. Friedlaender, Die Chadhirle- gende und der Alexanderroman, পৃ. ২৬৯ প.; (৯) H. Speyer, Die bibischen Erzahlungen im Qoran, 425।

G. Vajda (E.I.2)/আবু মুহাম্মদ আসাদ

**ইর্য়াক আল-হাজিব** (اریاق الحاجب) ঃ আল-গাযনাবী, আল-আমীরু'ল-কাবীর, গাযনার শাসক সুলতান মাহমূদ গাযনাবী (৯৯৭-১০৩০ খৃ.)-এর মুক্ত দাস ও বিশ্বস্ত দেহরক্ষী। দীর্ঘকাল সুলতানের সেবক হিসাবে বহু সঞ্চয় ও সম্মানের সুযোগ লাভ করেন। সুলতানের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলে তাঁহাকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অভিযানে প্রেরণ করা হয়। লাহোরে সৈন্যবাহিনীর কর্তৃত্বভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হয় এবং সুলতানের প্রতিনিধিরূপে দীর্ঘকাল পাঞ্জাবের শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করিতে থাকেন। অবশেষে ইর্য়াক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সকল কর্তৃত্ব পরিচালনা করিতে থাকেন। সুলতান মাহমূদ এমতাবস্থায় তাঁহাকে গাযনাতে ডাকিয়া পাঠান; কিন্তু ইর্য়াক বিভিন্ন ওযর আপত্তি করিয়া সময় কাটাইতে থাকেন। ইত্যবসরে সুলতান মাহমূদ ইনতিকাল করিলে ইর্য়াকের অবাধ্যতা চরমে উঠে। গাযনার পরবর্তী শাসক সুলতান মুহাম্মাদও ইর্য়াক-কে গাযানাতে তলব করেন; কিন্তু তিনি এই নির্দেশও পালন করেন নাই। সুলতান মাহমূদের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিহাবু'দ-দীন মাস'ঊদ গাযনার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া (১০৩১-৪১ খৃ.) সুকৌশলে ইরয়াকের কর্তৃত্ব হইতে ভারতবর্ষের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন। তিনি ইর্য়াক-কে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য বাল্খ-এর সেনানিবাসে আগমন করিবার দা'ওয়াত করেন। মাস'ঊদের প্রধান মন্ত্রী আহমাদ ইব্নু'ল-হাসান আল-মাহমান্দী ইর্য়াক-কে নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। আমীর ইর্য়াক' তাঁহার বহু তুর্কী ও হিন্দী সহচর ও সৈন্যসহ বাল্খ উপস্থিত হইলে সুলতান মাস'ঊদ তাঁহাকে সাড়ম্বরে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার বিলাসবহুল জীবন যাপনের সুব্যবস্থা করেন। ইর্য়াক আমোদ-প্রমোদ ও মদ্যপানে দিন অতিবাহিত করিতে থাকিলে ১৯ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ৪২২ তারিখে সুলতান মাস'ঊদ তাঁহাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বন্দী করিয়া প্রথমে কাহান্দায, পরে গাযনা এবং অবশেষে ঘোরে প্রেরণ করেন। ইর্য়াকের পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আর কিছু অবগত হওয়া যায় না। আমীর নায়ালতাকীন (نيالتكين)-কে অতঃপর ভারতের অধিকৃত এলাকার শাসনকর্তা করিয়া পাঠান হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্নু'ল-আছীর, আল-কামিল, নির্ঘন্ট; (২) আবু'ল-ফিদা, তা'রীখ; (৩) শারীফ 'আবদু'ল-হায়্যি আল-হাসানী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ১খ, ৭৯-৮০, ৯৬-৯৭; (৪) দাইরাতু'ল-মা'আরিফ আল-'উছমানিয়্যা, ২য় সং, হায়দরাবাদ ১৯৪৭ খৃ.।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

**ইর্সালিয়্যা** (ارسالية) ঃ অথবা মাল-ই ইরসালিয়্যা ইহা 'উছমানী অর্থ ব্যবস্থা বিষয়ক একটি শব্দ এবং ইহা ইস্তাম্বুলে অবস্থিত সুলতানের ব্যক্তিগত কোষাগারে (জায়ব-ই হুমায়ূন অথবা হারেম-ই হুমায়ূন খাযীনেসী) জায়গীর-বহির্ভূত সান্জাকগুলির মালিকগণ এবং জায়গীর-বহির্ভূত 'আরব প্রদেশগুলির শাসনকর্তাগণ কর্তৃক নগদ এবং দ্রব্যে প্রেরিত বার্ষিক 'প্রেষিতক' (প্রেরিত অর্থসম্ভার) বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। প্রথমোক্তটি সাধারণত নাওরোয ইর্সালিয়্যাসী (নববর্ষের প্রেষিতক) অথবা আগস্টোস্ ইর্সালিয়্যাসী (আগস্ট প্রেষিতক) নামে প্রেরিত হইত। শেষোক্তটিকে ইর্সালিয়্যা খাযীনেসি (প্রেষিতক কোষাগার), কখনো কখনো সংক্ষেপে খাযীনা নামে অভিহিত করা হইত এবং প্রাদেশিক ব্যয়ভার ও গভর্নরের বেতন (সালিয়ানা) পরিশোধ করার পর প্রতিটি প্রাদেশিক কোষাগারে (খাযীনা-ই 'আমিরে) যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইত।

এইরূপ প্রেষিতক সুলতানের নিকট দামিশ্ক, য়ামান, বস্রা এবং বাগদাদ হইতে নিয়মিতভাবে আসিত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে 'উছমানী মিসরের গভর্নরগণ প্রেরিত প্রেষিতক সর্ববৃহৎ এবং সর্বাধিক পরিচিত ছিল। মিসর বিজয়ের অল্পকাল পরেই ১৩শ/১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত মিসরীয় ইর্সালিয়্যা ষোল মিলিয়ন পারাস (Paras) ধার্য করা হইয়াছিল। ইহা ১০০৫/১৫৯৬ সালে বার্ষিক ২০ মিলিয়ন 'পারাস'-এ এবং ১০০৯/১৬০১ সালে ২৪ মিলিয়নে বার্ধিত হয়। ১১শ/১৭শ শতাব্দীর অবশিষ্ট কালে এবং ১২শ/১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত ইহা বিশ হইতে ত্রিশ মিলিয়ন পারাসের মধ্যে থাকে। এই প্রেষিতক পাঠাইবার সময় সিরিয়ার মধ্য দিয়া স্থলপথে যাত্রীদের মাধ্যমেই হউক অথবা নদীপথেই হউক সর্বদা অত্যন্ত ব্যয়বহুল উৎসব পালন করা হইত এবং ইরসালিয়্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ প্রকৃতপক্ষে ইস্তাম্বুলে পাঠান হইত। অবশিষ্টাংশ মিসরেই রাখা হইত এবং স্থায়ী জামানত হিসাবে ব্যবহার, যথা সুল্তানগণের বিশেষ দায়দায়িত্ব নির্বাহ, আলেকজান্দ্রিয়া, দামিয়েত্তা (Damietta) এবং লোহিত সাগরে 'উছমানী নৌবহরগুলির রসদপত্র সরবরাহ, 'উছমানী হজ্জগমনকারিগণের এবং মিসরের মধ্য দিয়া দক্ষিণ 'আরবে গমনকারী সৈন্যগণের জন্য সরবরাহ, ইস্তাম্বুলে সুলতানী বাবুর্চিখানায় এবং পবিত্র মক্কা ও মদীনায় ব্যবহারের জন্য মিসরীয় দ্রব্য-সম্ভার ক্রয় এবং সরবরাহের জন্য অর্থদানে ব্যবহার করা হইত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিক হইতে শুরু হয় মিসরের মামলূকগণ কর্তৃক দেশের 'উছমানী শাসন ব্যবস্থার, এমনকি কোষাগারেরও নিয়ন্ত্রণ নিজেদের অধিকারে আনয়ন। তাঁহারা ইরসালিয়্যার অংশ হইতে ক্রমবর্ধমান হারে নিজেদের স্বার্থে অর্থ ব্যবহার করিতে থাকে। উপরন্তু রাজস্বের একটি প্রধান অংশ তাঁহারা আদায় করিয়া লইত, যাহাতে ইর্সালিয়্যা বাবদ প্রেরিত অর্থের পরিমাণ আরও কমিয়া যায়। এই অবস্থার সংশোধন এবং ইরসালিয়্যা পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত প্রশাসনিক সংস্কার প্রবর্তনের মাধ্যমে কয়েকবার প্রচেষ্টা চালানো হইয়াছিল এবং ১২০০/১৭৮৬ সনের সংস্কারই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অবিচ্ছিন্ন মামলূক প্রতিপত্তির কারণে এই সকল প্রচেষ্টার ফল স্বল্পস্থায়ী হইয়াছিল। ১২শ/১৮শ শতাব্দীর অনেকাংশে 'উছমানী গভর্নরগণ মামলূকদের মধ্যে বিরাজমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া হৃত ইরসালিয়্যা তহবিল পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সম্পত্তি বাজেয়াফ্ত করিয়া বিক্রয় করিতে পারিবে এবং লব্ধ অর্থ, যাহা মাল-ই হুলওয়ান নামে পরিচিত, ইরসালিয়্যা হইতে পূর্বে যে খরচ যোগান হইত তাহার জন্য ব্যবহার করিতে পারিবে, যাহারা এই শর্তে সম্মত হইত তাহাদেরকেই উহারা সমর্থন দান করিত।

বিদ্রোহী মামলূক 'আলী বে আল-কাবীর (দ্র.)-এর আমলে কয়েকবার এবং মিসরে ফরাসী আক্রমণের (১৭৯৮-১৮০১) সময়ে ইর্সালিয়্যা প্রেরণ সম্পূর্ণভাবে স্থগিত ছিল। 'উছমানী ক্ষমতা পুনঃস্থাপিত হইলে হ্রাসকৃত হারে ইহা পুনঃপ্রচলিত হয় এবং মুহাম্মাদ 'আলী, সুলতানের সহিত তাঁহার দুই যুদ্ধের সময় ব্যতীত, শুধু মিসরের জন্যই নহে, তাঁহার অধিকৃত সিরীয় অঞ্চলের জন্যও ইর্সালিয়্যা বহাল রাখেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) মিসরীয় ইরসালিয়্যা সম্বন্ধে উৎসের এবং অপ্রধান গ্রন্থাবলীর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে ঃ (১) S.J. Shaw, The financial and administrative organization and development of Ottoman Egypt, 1517-1798, Princeton- New Jersey 1962, 283-315; (২) ঐ লেখক, Ottoman Egypt in the age of the French Revolution, Cambridge- Massachusetts 1964,152-3; (৩) ঐ লেখক, The Budget of Ottoman Egypt, 1005-1006/1596-1597, The Hague and Paris 1968, 13-14, 202-5; (৪) আরও দ্র. H.A.R. Gibb and Harold Bowen, Islamic society and the West, I vol. in 2, লণ্ডন এবং নিউইয়র্ক ১৯৫০-৫৭, ১খ., প্রথম অংশ, ১৪৮-৯, দ্বিতীয় অংশ, ১৭, ১৮; (৫) ইস্‌মা'ইল হাক্কী Uzuncarsili, Osmanli devletinin saray teskilati, আংকারা ১৯৪৫ খৃ., ৩৯১; (৬) ঐ লেখক, Osmanli devletinin merkez ve bahriye teskilati, আংকারা ১৯৪৮ খৃ., ৩৬৩, ৩৭১; (৭) Mehmet Zeki Pakalin Osmanli terih deyimleri ve terimleri sozlugu, ৩ খণ্ডে, আংকারা ১৯৪৬-৫৬ খৃ, ২খ, ৮১-২; (৮) L. Fekete, Die Siyaqat-Schrift in der Turkischen Finanzverwaltung, ২খ, বুদাপেস্ট ১৯৫৫ খৃ., ১খ., ৭৪ প.; (৯) Uriel Heyd, Ottoman documents on Palestine, 1552-1615, অক্সফোর্ড ১৯৬০ খৃ., 114n., 118n., ১২৩-৪; (১০) Omer Lutfi Barkan, ১০৮৯-১০৮০ (১৬৬৯-১৬৭০) Mali yilina ait bir butcesi ve ek'leri, in Istanbul Universitesi Iktisat Fakultesi Mecmuasi, xvii (Ekim 1955-Temmuz 1956), ২২৫-৩০৩; (১১) ঐ লেখক, ১০৭০-১০৭১ (১৬৬০-১৬৬১), Tarihli Osmanli butcesi ve bir mukayese, in Istanbul Universitesi, Iktisat Fakultesi Mecmuasi xvii, ৩০৪-৩৮, বিশেষত ৩২৪, ৩৩৪-৩৮ (যেখানে মিসরীয় ইরসালিয়্যার অর্থ দ্বারা ক্রীত রসদপত্রের ফর্দ দেওয়া আছে)।

S.J. Shaw(E.I.2)/ আ. র. মামুন

**ইরাক** (عراق) ঃ স্বাধীন, সার্বভৌম (মুসলিম) প্রজাতন্ত্র, সরকারী নাম "আল-জামহূরিয়্যা আল-'ইরাকিয়্যা," আয়তন ৪,৩৮,৩১৭ বর্গ কিলোমিটার (১,৬৯,২৩৫ বর্গমাইল), জনসংখ্যা (১৯৮৫ খৃ.) ১,৫৬,৭৬,০০০, মধ্যপ্রাচ্য বা দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার উর্বর অর্ধচন্দ্রাকৃতির ভূভাগের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত (পূর্বে ইরান, পশ্চিমে জর্দান ও সিরিয়া, দক্ষিণে কুয়েত, সৌদী 'আরব ও পারস্য উপসাগর এবং উত্তরে তুরস্ক। দিজলা ও ফুরাত এবং উহাদের মিলিত স্রোত শাত্তু'ল-'আরাব নদী বিধৌত। রাজধানী বাগদাদ (জনসংখ্যা ১৪,৯০,০০০); প্রধান প্রধান শহর বসরা (বন্দর), মাওসিল, কিরকুক, তিকরিত, নাজাফ ও হিল্লা। অধিবাসিগণের ৯৫% মুসলিম, তন্মধ্যে ৫০% শী'আ অধিবাসিগণের ৮০% 'আরবীতে কথা বলে (রাষ্ট্রীয় ভাষা 'আরবী), ১৫% কুর্দী ভাষাভাষী, অন্যান্যদের ভাষা তুর্কোমান। 'আব্বাসী খলীফাগণের কীর্তি মুখরিত 'আরবভূমি, বর্তমান ইরাক মোটামুটিভাবে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া রাজ্য নিয়াই গঠিত।

(১) **ভূপ্রকৃতি** ঃ ইরাকের গঠন বৈচিত্র্যের মৌলিকতা স্বতঃ বিরোধিতামূলকভাবে এইখানে যে, ইহাতে নিহিত ভৌগোলিকভাবে এক বিশাল এলাকার অংশ। এই দেশের সাধারণ ভূপ্রকৃতি এবং আবহাওয়া 'আরব-সিরীয় সমতল মরুভূমি দ্বারা প্রভাবিত, যাহা এই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তসীমা বরাবর অবস্থিত। অপরদিকে উত্তর-পূর্ব দিকের সমগ্র সীমান্তব্যাপী ইহা পশ্চিম এশিয়ার স্তূপ পর্বতমালার প্রভাবিত ভূপ্রকৃতি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, এই পর্বতমালা হইতে উৎপন্ন দুইটি নদীই ইরাকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। কিন্তু এই দুই নদী এবং নদী বিধৌত বিস্তীর্ণ সমভূমি সুপ্রাচীন কাল হইতে মেসোপটেমিয়া নামে পরিচিত এই দেশটিকে যে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য।

দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী এবং উত্তর-পূর্বমুখী অঞ্চলে দেশটির যে প্রধান বিভাগ উহাই আবার মোটামুটিভাবে 'ইরাক 'আরাবী ও 'ইরাক 'আজামী নামে পরিচিত বিভাগ দুইটিকেও চিহ্নিত করিয়াছে। কিন্তু এইগুলি ছাড়াও ভূভাগের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ রহিয়াছেঃ একদিকে উচ্চ মেসোপটেমিয়া অর্থাৎ আকূর বা জাযীরা নামে পরিচিত দিজলা ও ফুরাত নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশ এবং অপরদিকে মূল ইরাক বা মেসোপটেমিয়া, যেখানে নদীদ্বয় অনির্ধারিত গতিপথ রচনা করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই দুই অঞ্চলগত তফাতের প্রভাব আবহাওয়াতেও প্রতিফলিত হইয়াছে। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত দক্ষিণাংশে যেখানে মাত্র ৫০ মিলিমিটার, উত্তরাংশে সেখানে ৩০০ মিলিমিটার। এই দুই অঞ্চল বাগদাদ এলাকায় একসঙ্গে মিশিয়াছে, এইখানেই দিজলা ও ফুরাত নদীদ্বয় তাহাদের প্রবাহের প্রথম বারের মত পরস্পরের অতি নিকটবর্তী হইয়াছে, যাহার ফলে নৌ-পরিবহনোপযোগী সামগ্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় নৌ-পারাপার ও সংযোগ স্থাপনও সম্ভব হইয়াছে। একদিকে বৃক্ষহীন তৃণভূমি ও পার্বত্য অঞ্চল এবং অপরদিকে উচ্চ মেসোপটেমিয়া ও নিম্ন মেসোপটেমিয়া এই মধ্যবর্তী ভূভাগ দ্বারা চিহ্নিত হইবার ফলে দেশটির অবস্থা বাস্তবিকই হইয়াছে ইহা যেন ক্রসরোডের ভূগোল বিশ্ব-ইতিহাসকে জাগরূক করে দুই মহাঅক্ষের মিলনস্থলে-এক অক্ষ ভূমধ্যসাগর হইতে উচ্চ এশিয়া পর্যন্ত এবং অপরটি পশ্চিম য়ুরোপ হইতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত।

**উত্তর ইরাক** ঃ জাযীরাতেই দক্ষিণ-পশ্চিমের স্তেপ (Steppe) ভূমি এবং উত্তর-পূর্বের পার্বত্যভূমির মধ্যকার ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সর্বাপেক্ষা পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান হয়। সেখানে স্তেপভূমি কমবেশী নিয়মিত রূপান্তরিত হইয়াছে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে, ক্রমেই নিম্নমুখে এবং অপেক্ষাকৃত কম খাড়াই-ঢালু অঞ্চলে। আবহাওয়া এবং গাছপালা, জীবজন্তু ও জনবসতির দিক হইতে ইহা চিরন্তন বেদুঈন অঞ্চল এবং তদুপরি অবস্থা বদল ও বৈপরীত্যের অঞ্চল। ফুরাত নদী যতদূর পর্যন্ত ইরাকের মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে তাহার মধ্যে যথার্থভাবে বলিতে গেলে আর কোন উপনদী তাহার সঙ্গে মিলিত হয় নাই। সর্বোপরি উহা এমন একটি নদী যাহা হইতে পানিসেচ করা যায়। ইহার উপত্যকা অগভীর বালুকা ও মৃত্তিকার স্তর ক্ষয় হইয়া গঠিত, তাহার নিম্নে 'আরব-সিরীয় প্রস্তর স্তরের চুনা পাথর ও চুনা মিশ্রিত কাদা; এই অঞ্চল ঐতিহ্যগতভাবে স্থায়ী এবং কমবেশী চিরব্যবহৃত কৃষিকার্যের স্থান। কৃষিকার্যের জন্য চাকার সঙ্গে পাত্র বাঁধিয়া তাহার সাহায্যে

বা রশি বা অন্য কোন উপায়ে পশু দ্বারা টানিয়া নদী হইতে পানি তোলা হয়। এই সকল সুপ্রাচীন আমলের কৃষি ব্যবস্থা। তাহা অপেক্ষা দেশের ভবিষ্যৎ কৃষি সম্ভাবনা অনেক বেশী, কারণ সেই মধ্যযুগ হইতে, যখন নাকি 'আরব ভূগোলবেত্তাগণ দেশটির উর্বরতার কথা বলিয়া গিয়াছেন (তু. ইব্ন হাওকাল, অনু. Wiet, পৃ. ২১৪ প.), বর্তমানে অবস্থার বরং অবনতিই হইয়াছে। কেননা বেদুঈনরা অধিকতর সংখ্যায় এখানে আসিয়াছে (দ্র. ইব্ন হাওকাল, পৃ. ২২১, ২২৩) শেষ পর্যন্ত খৃস্টীয় ১৮শ শতকে, যাহার ফলাফল স্বীকার করিতে হইয়াছে। বর্তমানে ইরাক রাষ্ট্র বিশাল বাঁধ ও পানি প্রকল্প নির্মাণের বিষয়ে (আর-রামাদি'ল-হাব্বানিয়্যা প্রকল্প) চিন্তা করিতেছে, যাহাতে পানি প্রবাহের বিভিন্নমুখী প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন সম্ভব হইতে পারে (স্বাভাবিক পানি প্রবাহের পরিমাণ প্রতি সেকেণ্ডে ৮৩৮ ঘন মিটার, কিন্তু নদীতে বন্যার সময়ে ৫,২০০ ঘন মিটার)।

উত্তর-পূর্বে সর্বোচ্চ পর্বতমালা (আস-সুলায়মানিয়্যার নিকটে ২,৫৮৮ মিটার ইরানের যাগরোস তৃতীয় স্তরের স্তূপের সঙ্গে যুক্ত, আর জাবাল সিন্জার, যাহা মাওসিলের পশ্চিমে পালমায়রা অঞ্চলের স্তর-ভঙ্গ (Faulted) এলাকার পরিবর্ধিত অংশ, পূর্ব সিরিয়ার ভূতাত্ত্বিক গঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত। এই পর্বতমালা প্রশস্ত সম্মুখভাগের দিকে দিজলা অববাহিকার প্রতি অগ্রসরমান, যাহা আল-ফাতহা নামক সরু জলরেখাতে জাবাল হামরিনের বেলেপাথরের স্তূপ কাটিয়া অগ্রসর হইয়াছে। ভূমি যেখানে উচ্চ সেখানে স্বাভাবিক পানি সরবরাহ প্রচুর বলিয়া বৃষ্টিপাত দ্বারা আর কোন বিশেষ উপকার হয় না; কৃষিকার্য হয় এবং জনবসতিও কেন্দ্রীভূত শুধু সেই সকল স্থানের আর্দ্র প্রান্তবর্তী এলাকাসমূহেই, সে সকল স্থানে ঝরনাও রহিয়াছে, আসীরিয়ার স্তেপসদৃশ সমভূমি হইতে শুরু করিয়া মাওসিলের চতুষ্পার্শ্ববর্তী পর্বতবেষ্টিত অঞ্চল, পশ্চিমে সিনজার, পূর্ব-উত্তর-পূর্বে মাকলুব, দক্ষিণে মাকহূল এবং অতঃপর আরবী, কিরকূক ও খানিকীনের অব-আলপাইন অঞ্চল পর্যন্ত; এই সমস্ত অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে দিজলার তিনটি উপনদী— বড় যাব, ছোট যাব ও দিয়ালা। চিরদিনের কৃষিপ্রধান এই অঞ্চলই তৈল সমৃদ্ধ (মাওসিল ও কিরকূকের তৈল ক্ষেত্রসমূহ), আর তদুপরি এই অঞ্চলেই রহিয়াছে সর্বাধিক উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। দিজলা নদী আসিরীয় সমভূমি এবং বাগদাদের মধ্যে ২১০ মাইল প্রবাহিত হইয়াছে। অতঃপর ৪ কিলোমিটার প্রশস্ত উপত্যকা ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে কয়েক স্তরের ভূমি অতিক্রম করিয়াছে। অবশেষে ঢালুতে নদীর প্রবাহের পতন যথেষ্ট কম এবং স্রোতের প্রবলতাও বেশী (গড়ে প্রতি সেকেণ্ডে ১,৪০০ ঘন মিটার); ফলে নৌ-চলাচলের বেশ উপযোগী। এখনও এখানে প্রায়ই ছাগলের চামড়ার তৈরী ভেলা জাতীয় নৌযান ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে আবার পরিবর্ধিত কৃষি অঞ্চলে পানিসেচের প্রয়োজনে নদীর ও উপনদীসমূহের যে সংস্কার সাধন করিতে হইয়াছে তাহার জন্য বিভিন্ন বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনাও সম্পন্ন করিবার প্রয়োজন হইয়াছে— দিজলায় সামারা, ওয়াদী ছারছার ও বালাদ প্রকল্প, ছোট যাবে দুকান প্রকল্প এবং দিয়ালাতে দারবেন্দী-খান প্রকল্প।

**দক্ষিণ ইরাক** ঃ দক্ষিণ ইরাকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যময় যে ভূ-প্রকৃতি তাহা সম্পূর্ণই বিশাল নদীগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানেই ইরানের লুরিস্তান হইতে প্রবাহিত প্রবল নদীদ্বয় কারূন ও কারখা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং যেখানে আসিয়া উহারা সমভূমিতে নির্গত হইয়াছে সেখানে বদ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছে যাহা দিজলার উত্তরেও অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরেও বেশ কিছুদূর পর্যন্ত এবং তারপর সমভূমি অঞ্চলে আঁকাবাঁকা গতিতে প্রবাহিত হইয়া শক্তি হারাইয়া ফেলায় দিজলার পানি জলাবদ্ধ অঞ্চলে আটকা পড়িয়া থাকে এবং ফুরাতের স্রোতধারার সঙ্গেও অংশত মিশিয়া গিয়াছে। ফুরাতও এই অঞ্চলে আসিয়া নিঃসন্দেহে মেসোপটেমিয়ার দুর্বলতম নদীতে পরিণত হইয়াছে। বাগদাদের নীচে 'আরবীয় স্তেপভূমিতে জলাবদ্ধতায় বাধা পাইয়া এবং পুনরায় দিজলার নানা শাখা-প্রশাখার সঙ্গে যুক্ত হইয়া ইহা গতি পরিবর্তন করিয়াছে এবং জলাভূমিতে ইহার গতি নিঃশোষিত হয় (নাজাফ, আশ-শামিয়্যাম, আল-শিনাফিয়্যা ও আস-সামাওয়া অঞ্চল), সেখান হইতে বহির্গত হইয়া ইহা পুনরায় অন্যান্য জলাভূমিতে, যথাঃ হোর (খাওর) আল-হাম্মারে পতিত হইয়াছে, এবং সেইগুলির মধ্য দিয়া দিজলায় পতিত হইয়াছে। নিম্ন মেসোপটেমিয়ার ভূমি-গঠন বিভিন্ন নদীপ্রবাহের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত, বিশেষত নদীতে বসন্তকালীন যে বন্যা হয় তাহার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে ফুরাত নীল-নদীর সমপরিমাণ পলি বহন করিয়া আনে, দিজলা বহন করে উহার চার গুণ এবং কারূন তদপেক্ষা বেশী। কাজেই প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের পরিষ্কার আভাস ইহাতে পাওয়া যায়, প্রথমত পর্বতসমূহের ক্রিয়া, তারপরে উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হইতে হইতে স্রোতের বেগ ক্রমেই কমিয়া আসে দিজলা এবং বিশেষ করিয়া ফুরাতের ক্ষয়িত বেগের বৈপরিত্যস্বরূপ কারূন নদী বহন করে বিপুল পরিমাণ পলিমাটি, যাহার পরিমাণ বৎসরে প্রায় পাঁচ লক্ষ টন, কেবল ইহা দ্বারাই সৃষ্টি হয় শাত্তুল-'আরাবের চর।

মাটির গঠন ও পানির সঙ্গে উহার যে সম্পর্ক তাহা সরাসরি পানি প্রবাহ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত, যাহা শক্তি ও বিশৃঙ্খলা এই উভয়েরই সমার্থক। দিজলা ও ফুরাত নদীদ্বয়ের সঞ্চিত পলি, বিশেষ করিয়া নিম্নে গতিপথে, যেখানে উহারা কারূনের চাপের সম্মুখীন, বর্তমানে অতি মিহি কাদার সমন্বয় বিশেষ। অধিকতর ভারী তলানী সঞ্চয়, যাহা আরও উজানে ছাড়া সম্ভব নহে, ঘটিয়া থাকে জলা অঞ্চলে; ইহা ভূ-দৃশ্যের বড় একটি বৈশিষ্ট্য ঃ তাহাদের মাথার দিকে রহিয়াছে বিশাল জলরাশি ও খাগড়া শ্রেণীর উদ্ভিদ, প্রায় ৮০ কিলোমিটার জুড়িয়া বিস্তৃত এবং আল-হাম্মার, আল-কুরনা ও কালআত সালিহ-এর মধ্যে অবস্থিত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অন্য যে কোন স্থান অপেক্ষা এখানে পানির গতি-বিজ্ঞান (Hydraulics)-এর গুরুত্ব অনেক বেশি। নদীসমূহকে স্বাভাবিক গতিপথে প্রবাহিত রাখার এবং প্রবাহ চলমান রাখার প্রয়োজন ছাড়াও যথেষ্ট পরিমাণ পানি সঞ্চিত রাখা প্রয়োজন হয়। কারণ এই অঞ্চলে মে মাস হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী কয়েক মাস পর্যন্ত নদীর পানির উচ্চতা যেমন খুবই কমিয়া যায় তেমনি আবার শুষ্ক এবং উষ্ণ মওসুমও চলিতে থাকে। দক্ষিণ ইরাকের সমগ্র ইতিহাস জুড়িয়া ব্যাপ্ত রহিয়াছে নদীসমহের গতিপথ পরিবর্তনের অথবা ধ্বংসের স্মৃতি, যেসবের মুকাবিলা করিবার জন্য মানুষ নদীসমূহের নিয়ন্ত্রণকল্পে বিভিন্ন প্রচেষ্টায় রত রহিয়াছে, যেমন কৃত-এ দিজলা নদীতে এবং আল-হিন্দিআতে ফুরাত নদীতে বাঁধ নির্মাণ এবং জলাভূমিসমূহ উন্নয়নের প্রকল্প তৈরী।

তদুপরি এই নদীগুলি দ্বারাই নিম্ন মেসোপটেমিয়ার দুইটি অঞ্চলকে চিহ্নিত করা যায়। উত্তরের বিশাল সমভূমির যে হলুদ কাদা, তাহার সঙ্গে বন্যার পানিবাহিত লবণ মিশ্রিত হইয়া উটের চারণভূমি সৃষ্টি করিয়াছে, এখানকার ঘাস-জমি বৃক্ষহীন তৃণভূমির বৈশিষ্ট্যযুক্ত। কিন্তু দুই নদীর বাহুর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে বা খালের তীরবর্তী এলাকায় আবার স্থায়ী কৃষি ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠে। কোথাও কোথাও আছে অস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থা, যেমন বৃষ্টিপাত হইলে স্তেপভূমি হইতে সময়বিশেষের জন্য কোনক্রমে উদ্ধারকৃত
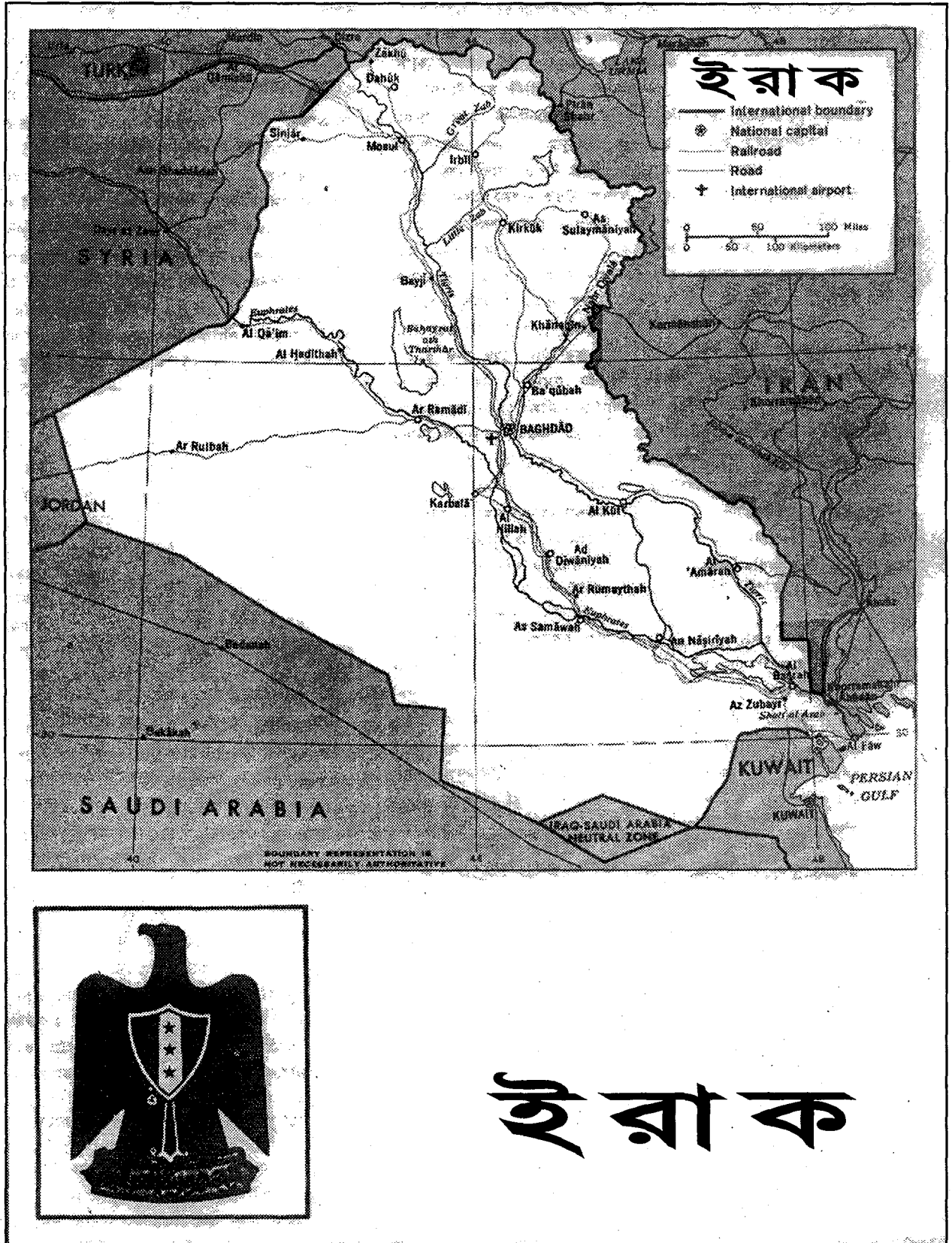
আবাদী জমিতেও চাষবাস হয়। অপরপক্ষে আরও দক্ষিণ দিকে নদীস্রোত যেখানে মন্থর এবং তাহার পরেই জলাভূমি বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করিয়া থাকে, সেখানে এক প্রকার আর্দ্র অঞ্চলে, স্বল্প পানিতে নিয়মিত কৃষিকাজ করা সম্ভব হয়; বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চলসমূহে শুধু খেজুর গাছেরই প্রাধান্য দেখা যায়। তাহার পরে জলা জমির নল-খাগড়া, আর মহিষই প্রধানত চোখে পড়ে, সমস্ত জলা অঞ্চলেই বসবাস এবং জীবন যাপন অতি বিপদসংকুল।

**শাত্তু'ল-'আরাব ও পারস্য উপসাগর :** এখানে সাগর ও স্থলভাগ এক হইয়া অভিন্ন অঞ্চল গঠন করিয়াছে। সমুদ্রের জোয়ার বিশাল নদীসমূহের পানিরাশি ঠেলিয়া অভ্যন্তর ভাগের দিকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার নিয়া আসে, আর পলি সঞ্চিত হইয়া স্থলভাগ ক্রমেই উপসাগরের দিকে সম্প্রসারিত হয় (বাৎসরিক গড় বৃদ্ধি ২৫ মিটার)। উপসাগর খুবই অগভীর, গড় গভীরতা ২৫ মিটার। সামগ্রিকভাবে উপসাগরের প্রাকৃতিক অবস্থা দুর্যোগপূর্ণ, ইরান ও মেসোপটেমিয়া হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা অত্যন্ত প্রবল, আবহাওয়া অত্যন্ত উষ্ণ, পোতাশ্রয় নিরাপদ নহে, ভরাট হইয়া যাইবার আশংকা সকল সময়েই রহিয়াছে, জাহাজের প্রবেশ পথ খুবই কম এবং বিপজ্জনক। তথাপি সামগ্রিকভাবে অবস্থা নৈরাশ্যব্যঞ্জক নহে। সাগরে মাছ, প্রবাল, মুক্তা (পানি খুব বেশী নহে বলিয়া আহরণ করাও সুবিধাজনক) এবং সর্বোপরি তৈলের খনি; ইরাকী এলাকা কুয়েত এবং খুজিস্তানের তৈলখনি দ্বারা বেষ্টিত। পরিশেষে মনে রাখা প্রয়োজন যে, আধুনিক ভূগোলের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উপসাগরের অবস্থান উহার অসুবিধাসমূহ অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান। উপসাগরটি আসলে মেসোপটেমিয়ারই বর্ধিত অংশ, ইহা দূরপ্রাচ্য ও ভারত উপমহাদেশের সঙ্গে সুদীর্ঘ নৌ-বাণিজ্য পথের একটি প্রধান পথ, বসরাতে এখান হইতে বাগদাদমুখী বাণিজ্যের যোগাযোগ সংস্থাপিত রহিয়াছে, ফুরাতের তীর বরাবর রেলপথও বাণিজ্য সম্ভার বহন করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া দিজলা নদীপথেও বাণিজ্য সম্পদ বাহিত হইয়া থাকে।

**'আরব ভূগোলবিদগণের রচনায় ইরাক :** মুসলিম মধ্যযুগে ইরাকের নৌ-পথ ও নদীর সাধারণ বিবরণ সম্বন্ধে বাতীহা, দিজলা, দিয়ালা এবং ফুরাত শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে শুধুমাত্র ইরাক দেশটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। আল-মুকাদ্দাসীর মতে ইরাক 'আরব এলাকারই অংশবিশেষ, ইহা চতুর্থ এলাকা, ব্যাবিলনের কেন্দ্ররূপে পরিচিত এবং নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, অধিবাসিগণের নৈতিক ও উন্নত মানসিকতার জন্য বিখ্যাত। তাঁহার বর্ণনা দুইটি প্রধান বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া লিখিত, পানি (নদীসমূহ ও খাল) এবং রাজধানীর প্রশংসা, অবশ্য রাজধানীর পতনের কথাও তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাই সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইরাকী উপজীব্য প্রশংসা ও শোক-এই দুই স্তরে বিকাশ লাভ করে।

ইরাক কথাটি দ্বারা 'আরব ভূগোলবিদগণ বাস্তবে নিম্ন মেসোপটেমিয়াকে বুঝাইতেন। বর্তমান ইরাকের উত্তরাংশ এবং সিরীয়া ও তুরস্কের কিছু কিছু অংশ জাযীরা (দ্র.)-র অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভাবে সীমাবদ্ধ ইরাকের উত্তর সীমা ছিল দিজলা তীরবর্তী তিকরিত অঞ্চল এবং ফুরাত তীরবর্তী হীত-এর সামান্য উপরের এলাকা। সেখান হইতে দক্ষিণ-পূর্বমুখে সীমান্তরেখা স্তেপভূমির সন্নিহিত এলাকা ধরিয়া 'আয়নুত-তাম্‌র, আল-কাদিসিয়্যা, আল-হীরা এবং বসরার দক্ষিণের অঞ্চল ধরিয়া অগ্রসর হয়। পর্বতময় অঞ্চলে ইহা প্রধানত ইরাক ও ইরানের মধ্যবর্তী বর্তমান সীমান্ত রেখা অনুযায়ীই ছিল, তবে দক্ষিণে শাত্তুল-'আরাবের বাম তীর ধরিয়া আরও সামনে বিস্তৃত ছিল।

দেশটির সাধারণ রূপ বেশ পরিষ্কারভাবেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। আবহাওয়া উত্তর-পূর্বের পার্বত্য সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নাতিশীতোষ্ণ এবং দেশের অন্যান্য অংশে উষ্ণ, কিন্তু পরিবর্তনশীল, বিশেষ করিয়া বসরাতে একদিকে পারস্য উপসাগরের দিক হইতে অতি উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। আবার উত্তর হইতে প্রবাহিত শীতল বায়ু উহাকে প্রশমিত করে। তবে সামগ্রিকভাবে জলা অঞ্চলের বাতাস আর্দ্র এবং আবহাওয়া গরম (বাতাইহ্), আর সেখানে মশার উপদ্রবও খুব বেশী।

স্থানের দূরত্ব মোটামুটি সঠিকভাবেই দেয়া হইয়াছে। আল-মুকাদ্দাসী (পৃ.১৩৪) উপসাগর হইতে তিকরিত উত্তরস্থ আস-সিন্ন-এর দূরত্ব দেখাইয়াছেন ১২৫ পারাসাঙ বা ৭৫০ কিলোমিটারের কিছু কম, ইহা শাত্তুল 'আরাব নদীর মোহনা হইতে দিজলা এবং ছোট যাব নদীর সঙ্গমস্থলের মধ্যকার সরাসরি টানা দূরত্ব অপেক্ষা কিঞ্চিৎমাত্র কম। সামাররার পূর্বে অবস্থিত হুলওয়ান হইতে স্তেপভূমি পর্যন্ত দেশের সর্বাধিক প্রশস্ততা আল-মুকাদ্দাসী দেখাইয়াছেন ৮০ পারাসাঙ বা প্রায় ৪৬০ কিলোমিটার। এই দূরত্ব সঠিকভাবে একদিকে আস-সুলায়মানিয়া অঞ্চলে ইরানের সীমান্ত এবং অপরদিকে আস-সুলায়মানিয়া হইতে সমকোণ করিয়া দিজলা ও ফুরাত-এর অববাহিকাতে ফুরাতের ডান তীরস্থ সিরিয়ার স্তেপভূমির ৬০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি স্থানের যা দূরত্ব, উহার ঠিক সমান।

পানি সংক্রান্ত সমস্যাবলীর উপরে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। বসরাতে যেখানে পানির অভাব ছিল, কিছুকাল পর্যন্ত নিকটবর্তী শহর আল-উবুল্লাহ হইতে নৌকায় করিয়া পানি আনা হইত। অন্যান্য স্থানে, পানি পাওয়া যাইত দুই বড় নদী এবং উহাদের উপনদীসমূহ হইতে, আর খাল হইতে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খাল ছিল নাহরুল-ইসহাকী, দুজায়ল, নাহরাওয়ান, খালিস, নাহর 'ঈসা, নাহর সারসার, নাহরুল-মালিক, নাহর কূছা এবং নীল (Nil)।

দেশটি যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত ছিল তাহার অতি যথাযথ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন আল-মুকাদ্দাসী (পৃ. ১১৪-৫)। তাঁহার ভৌগোলিক পদ্ধতি অনুযায়ী ইরাকের একটি ভৌগোলিক সত্তা ছিল, উহা ছিল একটি প্রদেশ (ইকলীম), রাজধানী ছিল বাগদাদে। সমগ্র দেশটি ছয়টি অঞ্চলে (কুওয়ার, এ. ব. কুরা) বিভক্ত ছিল, সেইগুলির প্রধান প্রধান শহর (মুদুন, এ. ব. মাদীনা) ছিল আল-কূফা, আল-বাসরা, ওয়াসিত, বাগদাদ, হুলওয়ান ও সামাররা। দেশের এই যে বিভাগ দেখান হইয়াছে তাহা অপর একটি বিভাগের সীমারেখাকেও সম্পূর্ণ নিশ্চহ্ন করে না। সেই রেখা এই তথ্যনির্ভর যে, দেশটি, অন্তত দেশের মধ্যের অঞ্চলটি অবিচ্ছিন্ন কৃষিকার্যের জন্য অতি সমৃদ্ধ ছিল এবং সেইজন্য উহার নাম হয় সাওয়াদ বা কালো জমি। জমির খাজনা (খারাজ) প্রবর্তনের ফলে করারোপের জন্য বিভক্ত জমি (তাসাসীজ, এ. ব. তাস্‌সূজ) সাধারণত ইরানী নাম দ্বারা চিহ্নিত হয় এবং বলাবাহুল্য সেইগুলি ইসলাম-পূর্ববর্তী নাম। আল-মুকাদ্দাসী সে সকল নাম এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন : হুলওয়ান, শাযকুবায, বারমাসিয়ান, বিহকুবায, আল-আওসাত; আরদাশীর-বাবকান, শাযশাবুর, শাযবাহমান, আসতান, শাযহুরমুয ও আন-নাহরাওয়ানাত। বহুল সমালোচিত নানাবিধ অপ্রত্যক্ষ কর হইতেই তৎকালে আদায়কৃত পরিমাণের একটি আন্দাজ করা যায়— জনপ্রতি কর, পশুপালের উপর আরোপিত খাজনা ও কর, বিক্রয় কর এবং হজ্জ কর।

কোন কোন লেখকের লেখা হইতে ধর্মীয় ভূগোলের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন যে, য়াহূদী বা খৃষ্টানগণ বিপুল সংখ্যায়

বাস করিত, অগ্নি উপসাকরাও ছিল। ইরাকে শী'আবাদ যে প্রবল ছিল সে বিষয়টি তাঁহারা জোর দিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু লেখা ভাল করিয়া পাঠ করিলে বুঝা যায় (দ্র. আল-মুকাদ্দাসী, পৃ. ১২৬), সুন্নীগণও সতর্ক-সচেতন ছিল এবং তাহাদেরও শক্তি ছিল। আরও সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলা যায়, দলগত স্পৃহা এবং রাজনৈতিক পশ্চাদপট ইরাকের প্রতি শহরেই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল।

কিছু সংখ্যক অত্যাশ্চর্য বস্তুর ('আজা'ইব) এবং হারাম বা পবিত্র স্থানের রেকর্ড বিদ্যমান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য টেসিফন-এর তোরণ (ঈওয়ান কিসরা), ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ (বাবিল), হযরত 'আলী (রা) এবং ইমাম হুসায়ন (রা)-র মাযার, আল-হীরার ধ্বংসাবশেষ, সাসানী দস্তাজিরদের এবং সামাররার ধ্বংসাবশেষ, কূফাতে ইবরাহীম (আ)-এর অগ্নিকুণ্ডের 'ছাই' এবং সবশেষে কূফা, বসরা ও বাগদাদের বিশিষ্ট মুসলিম ওয়ালী-দরবেশ ও চিন্তাবিদগণের মাযার।

আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির অন্তর্গত যে বিষয়টির কথা অবধারিতভাবে মনে উদিত হয় তাহা সংস্কৃতি বা তমদ্দুন, জনসাধারণের নাগরিক জীবন ও আকর্ষণ এবং জনগণের বৃহত্তর অংশের অনস্বীকার্য মমত্ববোধের কথা। তবে প্রধান আলোচ্য বিষয় সকল সময়েই ব্যবসা-বণিজ্য, যাহা শহরগুলির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির, কৃষি কেন্দ্রীভূত ছিল তিনটি মৌলিক উৎপাদনের মধ্যে ঃ খাদ্যশস্য, খেজুর ও ফলমূল, বিশেষ করিয়া আঙ্গুর। পশুখাদ্য, ধান ও ভোজ্য তৈলের উদ্ভিদ (Sesame)-এর উল্লেখ অপেক্ষাকৃত কম পাওয়া যায়। কারু শিল্পজাত দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বসরা হইতে মিহি বস্ত্র, বিলাস সামগ্রী (মণিমুক্তা), এন্টিমনি ও সীসকভস্ম (litharge) রফতানী হইত। এতদ্ব্যতীত আরও রফতানী হইত গোলাপ পানি, ভায়োলেট ও হেনার নির্যাস। তবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যদ্রব্য অবশ্যই ছিল খেজুর। বাগদাদেও বিলাস সামগ্রী এবং বস্ত্রের ব্যবসাকেন্দ্র ছিল, অপর একটি দ্রব্য ছিল রঙ। জলা অঞ্চলে মাদুর বুননের জন্য নল খাগড়া জাতীয় উদ্ভিজ্জ উপাদান প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। তিক্‌রিত পশমের জন্য বিখ্যাত ছিল, ওয়াসিত (এখানকার মাছের উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ ছিল) ঝোলান যায় এমন সাজসজ্জার দ্রব্যাদির জন্য, কূফা ভায়োলেট ফুলের নির্যাস এবং পাগড়ীর জন্য এবং আল-উবুল্লা বস্ত্র ও ইট প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত ছিল।

সামগ্রিকভাবে বলিতে গেলে, মধ্যযুগের মুসলিম লেখকগণ ইরাককে বাস্তব অবস্থা অপেক্ষা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই বেশী দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশটির ভৌগোলিক পরিবেশ, দেশবাসীর জীবন ও পরিণতিকে পানি প্রবাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, পানি ছিল দেশের সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল উৎস। আর এই পানির গুরুত্বের বিষয়টিকে সর্বাধিক তাৎপর্য প্রদান করিয়া সাফল্যের সঙ্গে দেখিয়াছিলেন আল-মুকাদ্দাসী, যিনি ৪র্থ/১০ম শতকে এই ধরনের রচনায় অত্যন্ত কুশলতা অর্জন করিয়াছিলেন। দিজলা নদী সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "ইহা লাভের উৎস, নদীর উজানে ও ভাটিতে অনবরত দ্রব্যসম্ভার বোঝাই নৌকা চলাচল করিতেছে। এই সকল নৌযানে করিয়া লোকে বাগদাদে আসে, বাগদাদ হইতে রওয়ানা হইয়া যায় বা নদী পারাপার হয়। এই সকল কর্মব্যস্ততার ফলে যে গোলযোগ হয় তাহাতে কানে তালা লাগিয়া যায়। বাগদাদের সকল আকর্ষণের তিন ভাগের দুই ভাগই দেখা যায় নদীর কিনারে।" ইত্যকার নানা কারণে বাগদাদকে অহোরাত্র জীবন্ত নগরী বলিয়া আখ্যায়িত করা হইত। পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকালয়ে ইহাকে স্বপ্নপুরী'র উপাখ্যানে অভিহিত করা হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) R. Blanchard, Asie occidentale, in Geographie Universelle (viii), under the direction of P. Vidal de la Blache and L. Gallois, Paris 1929; (২) জ.ম. আল-খালাফ, মুহাদারাত ফী জুগরাফিয়্যাতিল-ইরাকিত-তাবীইয়্যা ওয়াল-ইক্‌তিসাদিয়্যা ওয়াল- বাশারিয়্যা, ২য় সং. Ligue des Etats arabes 1961; (৩) S. H. Longrigg, Iraq, লণ্ডন ১৯৫৮ খৃ.; (৪) y. Sarkis, মাবাহিছ ইরাকিয়্যা, ১খ, বাগদাদ ১৯৪৮ খৃ.; (৫) বাতীহা, দিজলা, দিয়ালা ও ফুরাত শীর্ষক প্রবন্ধসমূহের গ্রন্থপঞ্জী; (৬) Iraq and the Persian Gulf, September 1944, Geographical Handbook Series of the Naval Intelligence Division, Oxford 1944.

ইরাকের সুপ্রাচীন কালের ইতিহাসের জন্য দ্র. (৭) M. Besneri, Lexique de geographie ancienne, Paris 1914; মুসলিম মধ্যযুগের জন্য পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধসমূহের প্রন্থপঞ্জী দ্র. এবং (৮) G. Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, 2nd ed., Cambridge 1930; (৯) এ. সূসা, আল-ইরাক ফি'ল-খারাইতিল-কাদীমা, বাগদাদ ১৯৫৯ খৃ.। 'আরব বৌগোলিকগণের রচনাবলীর প্রধান প্রধান উৎস নিম্নরূপ (১০) খাওয়ারিযমী, কিতাব সূরাতি'ল-আর্‌দ, সম্পা. von Mzik, Leipzig 1926 (রঙীন চিত্রসম্বলিত, ১৯৬৩ খৃ.), পৃ. ১২২ প.; (১১) ইব্‌ন খুররাদাযবিহ্, পৃ. ৫-১৫; (১২) Yakubi-Wiet, 4ff., 449 ff., 132 ff., 16ff.; (১৩) ইব্‌নুল-ফাকীহ্, পৃ. ৬, ১৬১ প.; (১৪) Ibn Rusta-Wiet, 104-8, 120-1, 189-91, 202, 208, 210, 212-6; (১৫) কুদামা, কিতাবুল-খারাজ ওয়া সিনাআতুল-কিতাবা, সম্পা. De Goeje, লাইডেন ১৮৮৯ খৃ., পৃ. ১৮৫, ২১৬-৭, ২২৫, ২২৭, ২৩৫ প.; (১৬) সুহ্‌রাব, কিতাব 'আজাইবিল-আকালীমিস-সাব'আ, সম্পা. von Mzik, লাইপযিগ ১৯৩০ খৃ., পৃ. ২৮, ৩০, ৯৬-১১৮ প.; (১৭) মাসঊদী, অনু. Pellat, পৃ. ১৮৯,২২৮-৯, ২৩৫,২৩৯-৪০, ২৭০, ৯৭৮, ৯৮৬; (১৮) ইসতাখ্‌রী, সম্পা. এম. জি. 'আবদুল 'আল-আলহীনী, কায়রো ১৯৬১ খৃ., পৃ. ৫৬-৬১; (১৯) ইব্‌ন হাওকাল, Kramers-Wiet, 225-40; (২০) মুকাদ্দাসী, পৃ. ৩২, ১১৩-৩৫; (২১) আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ-এর ভূমিকা, সম্পা. Salmon, প্যারিস ১৯০৪ খৃ., স্থা.; (২২) ইদ্রীসী-Jaubert, ২খ., ১৪২-৮, ১৫৫-৬২; (২৩) যুহরী (ফাযারী হইতে), কিতাবুল জা'রাফিয়্যা, সম্পা. M. Hadj-Sadok, B. Et. Or., xxi, দামিশ্‌ক ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ১৬৮-৯, ২৪৯, ২৫৪-৫, ২৯৭; (২৪) য়াকূত, মু'জামু'ল বুলদান, বৈরূত সং. ১৩৭৬/১৯৫৭, ৪খ, ৯৩-৫; (২৫) ইব্‌ন জুবায়র, অনু. M. Gaudefroy-Demombynes, প্যারিস ১৯৪৯-৬৫ খৃ., পৃ. ২৪০-৬৮; (২৬) কাযবীনী, আছারু'ল-বিলাদ (সম্পা. Wustenfeld, Kosmographie, ii), Gottingen 1848, পৃ. ১৮৮-৯১, ২০২-৩, ২০৫-২০, ২৩৫-৪১, ২৪৫-৬, ২৫৭-৬১ ২৬৮-৭০, ২৭৯-৮৫, ২৮৯, ২৯৮-৯, ৩০১, ৩০৩-৫, ৩০৮-৯, ৩১০-১১, ৩১৪-৫, ৩১৬, ৩২০-২; (২৭) আবুল-ফিদা, তাকবীম, পৃ. ২৯১-৩০৯; (২৮) ইব্‌ন বাত্তূতা, সম্পা. Defremery-Sanguintti Monteil, প্যারিস ১৯৬৮ খৃ., ২খ., ৮ প., ৯৩-৬, ১০০-৩২ ও স্থা.।

A. Miquel (E.I.²)/হুমায়ুন খান

২। **জনসংখ্যা ও অধিবাসিগণের বিবরণ ঃ** দিজলা ও ফুরাত নদীর পলল সমভূমি নীল নদের সমভূমির ন্যায়ই, নব্য প্রস্তর যুগের শেষভাগে ব্যাপক চাষাবাদ ও জনবসতির উপযোগী হয়- যখন খাল খনন ও পানিসেচ পদ্ধতির যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়। ইহাই সর্বপ্রথম চাষাবাদকৃত ভূমিসমূহের মধ্যে অন্যতম বলিয়া ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। ইহার পর হইতে ইরাকের জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে মিসরের ইতিহাস অপেক্ষা অনেক জটিল ও গোলযোগপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল হইয়াছে অংশত এই কারণে যে, মিসরের নীল নদ অপেক্ষা ইরাকের নদীসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা সহজতর এবং অংশত এই কারণেও যে, মিসরের নিম্নভূমির উভয় পার্শ্বে মরুময় বিরাণ অঞ্চল থাকাহেতু আক্রমণকারিগণের পক্ষে উহাতে অভিযান পরিচালনা যেইরূপ দুরূহ, ইরাকের নিম্ন সমভূমি অঞ্চল সেইরূপ নহে। বরং বিপরীতটিই সত্য যে, একদিকে নিম্ন-ইরাকের পানিসেচ বিধৌত অঞ্চল এবং হামাদের স্তেপ অঞ্চল এবং অপরদিকে জাগরোস পর্বতমালার পাদদেশ, এই দুইয়ের মধ্যে কোন প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক নাই। গ্রীষ্মকালে হামাদ ও জাযীরার বিরাণ ও শুষ্ক তৃণময় অঞ্চলের বেদুঈনরা প্রথম গ্রীষ্মের বারিস্রোত দ্বারা বিধৌত উপত্যকা-চারণভূমির প্রতি আকৃষ্ট হয়, আবার শীতকালে জাগরোসের উপজাতীয় লোকেরা তাহাদের উঁচু বাসভূমি ত্যাগ করিয়া নদীবিধৌত উপত্যাকার অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর সমভূমি অঞ্চলে নামিয়া আসে।

ইরাকের নিম্ন অঞ্চলের অধিবাসিগণের দুইটি প্রধান মানবগোষ্ঠীগত দলের সন্ধান করা যায় উপরিউল্লিখিত দুই সন্নিহিত অঞ্চলে। স্তেপ অঞ্চল হইতে আসিয়াছে লম্বাটে মাথার, সাধারণভাবে হাল্কা গড়নের 'ভূমধ্যসাগরীয়' জাতি; আর পাহাড়ী অঞ্চল হইতে আসিয়াছে চ্যাপ্টা মাথার, লম্বা গড়নের 'আলপাইন' উত্তরাধিকারের অধিবাসিগণ যেমন ছিল আদি সুমেরীগণ। তৃতীয় শ্রেণীর জনগণ হইতেছে 'ভূমধ্যসাগরীয়' গোষ্ঠীরই য়ূরো-আফ্রিকীয় শ্রেণীর লম্বাটে গড়নের কতকটা বক্র চেহারার অধিবাসিগণ, আর চতুর্থ শ্রেণীয়গণ হইতেছে নিগ্রো বা Veddoid-গণ; Keith তাঁহার অত্যন্ত চমৎকার সন্দর্ভে ইহাদের সঠিক শ্রেণী নির্ধারণ করিয়াছেন, Keith-এর সেই গবেষণা Field-এর ১৯৩৫ খৃ. ইরাকী সেনা নিয়োগের যে নৃতত্ত্বগত চিরায়ত গ্রন্থ তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। Buxton, Field and Penniman-কৃত কিশ এবং অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহ হইতে প্রাপ্ত প্রাচীনতম নরকঙ্কালসমূহের পরিমাপ অনুযায়ী উপত্যকার অধিবাসিগণের নৃতাত্ত্বিক শ্রেণী সুপ্রাচীনকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত অল্পই পরিবর্তিত হইয়াছে, শুধু পার্বত্য অঞ্চল হইতে আগত জনগণের সংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বর্তমান ইরাকের উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী কুর্দী এবং তাহাদের সমশ্রেণীর উপজাতীয়গণ দুইটি ধারার মিশ্রণ, উভয় শ্রেণীভুক্তগণই দীর্ঘদেহী ঃ লম্বাটে মাথার ফর্সা 'নভিকগণ' যাহারা নিঃসন্দেহে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে এই অঞ্চলে আগমন করিয়াছিল এবং এখানকার ভাষা ও সংস্কৃতির প্রধান ধারাটি আনয়ন করিয়াছিল এবং খুবই চ্যাপ্টা মাথার অতি-আলপাইন (hyper-Alpine) বা 'আর্মেনীয়গণ' যাহাদের চুল কালো, চোখ কটা এবং বড় ও অনেক সময়ে বাঁকা নাক, যাহা এই পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসিগণের লক্ষণ। Von Luschan দেখাইয়াছেন যে, এই আর্মেনীয় গোষ্ঠীর লোকেরা অত্যন্ত একরোখা প্রকৃতির এবং অবস্থানগত ও সামাজিক একাকীত্বের পরিবেশগত ধরন দ্বারা চিহ্নিত; উহা লক্ষ্য করা যায় উত্তর ইরাকের সিনজার পর্বতের য়াযীদীগণ (দ্র.)-এর মধ্যে বা যাকো জিলার আসিরীয় খৃস্টান সম্প্রদায়ের অধিবাসিগণের মধ্যে।

হইতে পারে যে, 'য়ূরো-আফ্রিকীয় ভূমধ্যসাগরীয়' মরুভূমির অধিবাসিগণের সাফল্যজনক বিস্তৃতির জন্য একটি ভৌগোলিক সীমারেখা রহিয়াছে। কেননা একটি লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে এই যে, 'আরবী ভাষা, বেদুঈন উপজাতীয় রীতিনীতি, এমন কি স্তেপভূমির বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্থাপত্য এই সবই উত্তর ইরাকের কুর্দী খাড়া উঁচু পাহাড় দ্বারা চিহ্নিত উচ্চ অঞ্চলে এবং পূর্বের যাগরোস পর্বতের পাদদেশে আসিয়া হঠাৎ শেষ হইয়া গিয়াছে। Myres এই সমস্যার একটি প্রত্যক্ষ সমাধান দিতে চেষ্টা করিয়াছেন এইভাবে যে, 'য়ূরো-আফ্রিকীয় ভূমধ্যসাগরীয়' গোষ্ঠীর যে মরুবাসী লোক- উহারা উচ্চ অঞ্চলে বসবাস করিতে গেলে হয়ত বক্ষ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, অথচ প্রাকৃতিক নির্বাচনহেতু পর্বতবাসী স্থানীয় অধিবাসীদের সম্ভবত তাহা সহিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মিয়া গিয়াছে।

ইরাকের ইতিহাসে পরিষ্কারভাবেই লিখিত রহিয়াছে যে, ইরাকের নদীগুলি ইরাকের সমৃদ্ধির উৎস। সেইগুলি নিয়ন্ত্রণ করা হইলে ও সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হইলে ইরাকের জনসংখ্যা বাড়ে ও ইরাক সমৃদ্ধশালী হয়। আর নদীগুলির নিয়ন্ত্রণ ও সেচব্যবস্থা অবহেলিত হইলে কৃষিজমি জলাভূমিতে পরিণত হইয়া যায় তখন সেই সকল জমি মওসুমী চারণভূমিতে পরিণত হইলেও জনসংখ্যা হ্রাস পায়। ৭ম/১৩শ শতকের মঙ্গোল আক্রমণসমূহের ফলেও দীর্ঘকালব্যাপী জনসংখ্যা হ্রাস পায়। সেই সময়ে সমভূমিগুলির মালিকানা প্রধানত ছিল হামাদ ও জাযীরার বড় বড় বেদুঈন গোত্রসমূহের হাতে, বিশেষ করিয়া 'আনাযা ও শাম্মার (দ্র.) গোত্রীয়দের হাতে। বর্তমানের স্থায়ী অধিবাসিগণ এখন পর্যন্তও উপজাতীয় আইন-কানুন মানিয়া চলে এবং বেদুঈন সমাজের সঙ্গেই তাহাদের রক্তসম্পর্ক ও আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলে। আর সরকারের পক্ষ হইতে বারবার চেষ্টা করিয়াও স্থায়ী কৃষিকার্যের প্রতি জনসাধারণের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী অংশের যে অনীহার ভাব রহিয়াছে তাহা দূর করা যায় নাই।

যাহা হউক, জনসংখ্যাগত পরিসংখ্যান হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বর্তমান শতাব্দীতে, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে ইরাক দৃঢ়ভাবে সমৃদ্ধির এক নূতন যুগে প্রবেশ করিয়াছে, উহার ভিত্তি হইল নূতন উন্নততর সেচ ব্যবস্থা এবং ক্রমবর্ধমান শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি। ১৯৩০ খৃ. দেশের জনসংখ্যা ছিল ২৮ লক্ষ; ১৯৩৪ খৃ. জনসংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষে পৌঁছায়; ১৯৫০ খৃ. উহা হয় ৪৮ লক্ষ; ১৯৫৭ খৃ. ৬৩ লক্ষ; আর ১৯৬৫ খৃ. আদমশুমারীতে উন্নততর পদ্ধতি গ্রহণ করার পরেই দেখা গিয়াছে যে, জনসংখ্যা স্পষ্টই যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, আর এই বৃদ্ধিকে একমাত্র স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

শেষ আদমশুমারীর উল্লেখযোগ্য দিক হইতেছে এই যে, শহর অঞ্চলের জনসংখ্যা প্রায় গ্রাম অঞ্চলের জনসংখ্যার সমান হইয়া উঠিয়াছে; নিঃসন্দেহে তাহা তৈল ব্যবসার গুরুত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের এবং সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্প-কারখানা বৃদ্ধির ফল। সাম্প্রতিককালে রাজধানী শহর এলাকার সম্প্রসারণ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

দীর্ঘকাল যাবত দেশটিতে যেখানে আদমশুমারীর ফলাফল মুতাবিক সামগ্রিকভাবে মহিলা জনসংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশী, ১৯৬৫ খৃ. গৃহীত আদমশুমারীতে সেই অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়াছে। বর্তমানে

রাজধানী শহরের চতুপার্শ্ববর্তী সমৃদ্ধ নদীবহুল জিলাগুলিতে জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য ঘনত্ব এবং বসরা ও মাওসিলে অপেক্ষাকৃত কম ঘনবসতি লক্ষ্য করা যায়। নদীগুলি সাধারণত নূতন জনবসতি গড়ার আকর্ষণ হইয়া থাকে, যদিও নদীর তীর এখন আর সুষমভাবে চাষাবাদের উপযোগী নাই। উদাহরণস্বরূপ, সামাওয়া জিলার নিম্ন ফুরাতের যে জলাভূমি, সেখানে শুধু জলা অঞ্চলের 'আরবদের (Marsh Arabo) হাল্কা বসতি রহিয়াছে, উহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যময় রীতিনীতি ও অর্থনীতি রহিয়াছে। দেশের উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলের যথেষ্ট সংখ্যক ঘন জনবসতি, বিশেষ করিয়া সুলায়মানিয়্যার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বসতি লক্ষ্য করিবার মত। ইরাকের একমাত্র এই এলাকাতেই বৃষ্টিপাত যথেষ্ট পরিমাণে হয় এবং কোনরকম কৃত্রিম পানিসেচ ব্যতীতই কৃষিকাজ করা সম্ভব হয়। এই অঞ্চলেই কুর্দী উপজাতির প্রধান অংশ বাস করে, উহাদের সংখ্যা (১৯৬৫ খৃ.) আনুমানিক প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ। অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যায় বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের মধ্যে রহিয়াছে সিনজারের য়াযীদীগণ, সংখ্যায় প্রায় ৫৬,০০০ এবং শাত্তুল-'আরাবের তীরবর্তী কয়েকটি গ্রামে বসবাসকারী মানদাইন (Mandaean) বা সেন্ট জন খৃষ্টানগণ।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) F. von Luschan's Huxley Lecture in J. Anth. I. xli (1911), 241 প., ইহা আরমেনীয় সমস্যার উপরে লিখিত একখানি চিরায়িত অবদান। (২) J. L. Myres, Who were the Greeks? Berkeley 1939, chap. 11, esp. pp. 60-65, এখানে উক্ত বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে; (৩) L. H. Dudley Buxton's The Peoples of Asia, 1925, chap. 4-এ মূল্যবান মৌলিক তথ্য রহিয়াছে; (৪) Henry Field এই বিষয়ের উপরে অনেক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ Arabs of Central Iraq... (Field Mus. Nat. Hist., Anthrop. Mem. 4, Chicago 1935(; (৫) The Arabs of Iraq, in Am. Journ. Phys. Anthro., xxi (1936), 49-56; (৬) Mountain peoples of Iraq and Iran, N. S. ix (1951), 472-5; (৭) The Anthropology of Iraq, Pt. I, Chicago; (৮) Pt. II, Camb. (Mass), 1951-2; and (৯) Ancient and Modern Man in Southwestern Asia, Miami 1956; (১০) Sir Arthur Keith-এর সুগভীর দৃষ্টিভঙ্গীজাত রচনাবলী, Field's study of 1935 of Arabs of Central Iraq.....এর অন্তর্ভুক্ত (উপরে দ্র.) এবং Bertram Thomas-এর Arabia Felix, New York 1932, App. I, pp. 301-33-এর অন্তর্ভুক্ত; (১১) W. C. Brice-এর South West Asia, লণ্ডন ১৯৬৬ খৃ., গ্রন্থখানিতে মানব গোষ্ঠীর ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে; (১২) জনসংখ্যার পরিসংখ্যান সরকারের বার্ষিক পরিসংখ্যান তথ্য গ্রন্থে দেওয়া আছে।

W. C. Brice (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

৩। **ইতিহাস ঃ** (ক) প্রাচীন ইতিহাস (দ্র. বাক্র ইব্ন ওয়া'ইল, আল-হীরা, ঈওয়ান, লাখমীগণ, আল-মাদাইন, নাবাত, আল-উবুল্লা, ইত্যাদি প্রবন্ধ)

(খ) 'আরব বিজয় হইতে ১২৫৮ খৃ.।

অতি আদিকাল হইতেই ইরাক উর্বরা, সমৃদ্ধ অঞ্চল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই এই দেশের প্রতি কিছু সংখ্যক 'আরব দলের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। খৃষ্টান লাখমীগণ (দ্র.) ৩য় শতকেই আল-হীরা (দ্র.)-র পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে বসতি স্থাপন করে এবং সাসানী শাসকগণ তাহাদিগকে দায়িত্ব দেয় যে, বায়যানটীয় বা তাহাদের মিত্রশক্তির যে কোন সাম্ভাব্য আক্রমণ হইতে তাহারা মেসোপটেমিয়া এলাকা রক্ষা করিবে। ৬ষ্ঠ শতকে মধ্য 'আরবের কিছু সংখ্যক গোত্র, তাগলিবগণ ও বাক্র ইব্ন ওয়াইলগণ (দ্র.) অজ্ঞাত কোন অর্থনৈতিক সংকটহেতু তাহাদের আদি বাসভূমি ত্যাগ করিয়া নিম্ন ফুরাতের স্তেপভূমিতে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। পরে তামীম (দ্র.) গোত্রেরও কিছু কিছু লোক তাহাদের অনুসরণ করে। তাহারা ক্রমে নদীর উজানের দিকে যাত্রা শুরু করে এবং মেসোপটেমিয়ার লাখমীদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল এবং উত্তর 'আরবের কিনদীগণের শাসিত অঞ্চলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে গিয়া বসতি স্থাপন করে। এই সময়ে উহাদের কিছু সংখ্যক লোক খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

'আরবদের ইরাক বিজয় শুরু হয় হযরত 'উমার (রা)-এর খিলাফাতকালে। হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর প্রচেষ্টায় সমগ্র 'আরব ভূখণ্ডে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইলে খালিদ ইবনুল-ওয়ালীদ (রা) (দ্র.) রিদ্দার যুদ্ধ (দ্র.) শেষ করেন, অর্থাৎ মিথ্যা নুবূওয়াতের দাবীদারগণ এবং যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী গোত্রসমূহকে দমন করেন। তখন বাক্র গোত্রীয়গণের জনৈক নেতা, নও-মুসলিম আল-মুছ'ান্না ইব্ন হ'ারিছ' (খালিদ (রা)-কে আহ্বান জানান যেন তিনি তাঁহার সহিত যোগদান করেন, যাহাতে উভয়ে সম্মিলিতভাবে উর্বর দেশ ইরাক জয় করিতে পারেন। ১২/৬৩৩ সালের বসন্ত বা গ্রীষ্মকালে খালিদ (রা) ছোট একটি সেনাদল লইয়া আল-হীরার বহির্ভাগে উপস্থিত হন, অনতিবিলম্বে আল-হীরার পতন ঘটে। কিন্তু ১৩/৬৩৪ সনে মুসলিম বাহিনীকে আল-মুছ'ান্নার অধীনে রাখিয়া খালিদ যখন সিরিয়া বিজয়ে চলিয়া যান তখন যুদ্ধের গতি শ্লথ হয়। মুসলিম ও পারস্য বাহিনীর মধ্যে কয়েক মাস যাবত বিভিন্ন ঘটনাসহ কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। মুছান্না প্রথমে 'সেতুর যুদ্ধে' পরাজিত হন, পরের বৎসর তিনি বাওয়ায়হ-এর যুদ্ধে জয়লাভ করেন, কিন্তু বিজয়ের অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত পরবর্তী মুসলিম সেনাপতি, প্রথম স্তরের সাহাবা সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) (দ্র.)-কে ১৬/৬৩৭ সালের বসন্তকালে সাসানী সেনাপতি রুস্তম-এর আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হয়। এই যুদ্ধে পারসিক বাহিনী মুসলমানদের প্রায় তিন গুণ ছিল। আল-হীরার ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত আল-কাদিসিয়্যা (দ্র.)-তে সংঘটিত হয় তিন দিন তিন রাত্রি ব্যাপী এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়, আর এই বিজয়ের ফলে ইরাক তাহাদের নিকটে উন্মুক্ত হইয়া যায়। প্রথমে টেসিফন অধিকৃত হয়, অতঃপর সমগ্র দেশটি তাহারা অধিকার করিয়া নেয়; অধিবাসিগণ ছিল আরামাই বা প্রাচীন সিরীয় জাতির এবং বিজেতা মুসলিমগণের ন্যায়ই সেমিটিক ভাষাভাষী, তাহারা 'আরব মুসলিমগণকে বরং আনন্দের সঙ্গেই বিজয় অভিনন্দন জানায়। ১৭/৬৩৮ সনে শাত্তুল-আরাবের তীরে সুরক্ষিত সেনা ছাউনি আল-বাসরা (দ্র.) স্থাপিত হয়, পরবর্তী কালে ক্রমে ক্রমে উহার উন্নয়ন সাধন করা হয় এবং উহাকে শক্তিশালী করা হয়। আধুনিক বাগদাদের দক্ষিণে এবং ফুরাত নদীরও দক্ষিণ তীরে অবস্থিত আল-কূফা (দ্র.) সেনা ছাউনি স্থাপিত হয় ১৭ বা ১৮/৬৩৯

সনে। ইহাই হয় ইরাকের নূতন রাজধানী। পুরাতন রাজধানী টেসিফন পরিত্যক্ত হয়। ক্রমে সেখানকার সকল অধিবাসীও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ জয় দ্বারা (২১/৬৪২) ইরাক বিজয় সুনিশ্চিত হয়; অতঃপর ইরানভূমি মুসলিম বাহিনীর সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া যায়। বসরা ও কূফাতে পৃথক পৃথক শাসক (গভর্নর) নিযুক্ত হন, ফলে এইগুলি সত্যিকারের শহরের মর্যাদা লাভ করে। এই বসরারই নিকটবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে ৩৬/৬৫৬ সনে হযরত 'আলী (রা) তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষীয়গণের মুকাবিলা করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন, উহা জামাল বা উটের যুদ্ধ নামে বিখ্যাত (দ্র. হারবুল-জামাল)। পরবর্তীকালে একদিকে মু'আবিয়া (রা) এবং অপরদিকে খারিজীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকাকালে হযরত 'আলী (রা) কূফাতেই তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। খারিজীগণকে তিনি ৩৮/৬৫৮ সনে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে পর্যুদস্ত করেন। ৪০/৬৬১ সনে হযরত আলী (রা) কূফাতে ইব্ন মুলজাম (দ্র.) নামক আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

মুসলিমদের গৃহযুদ্ধে সিরিয়ার শাসক (গভর্নর) মু'আবিয়া (রা)-এর বিজয় এবং 'উমায়্যা রাজবংশের অভ্যুত্থান, যুগপৎ এই উভয় ঘটনার ফলে ইরাকের উপরে সিরিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও সেই সময়ে ইরাক জনসংখ্যা এবং সম্পদের দিক হইতে অনেক বেশী সমৃদ্ধ ছিল এবং ইরাকের অধিবাসিগণও একটি বিশাল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক সমস্যা এবং সরকার পরিচালনার বিষয়ে সিরিয়াবাসিগণ অপেক্ষা অনেক বেশী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিল।

মু'আবিয়া (রা)-এর আমলে ইরাকে একজনমাত্র গভর্নর নিযুক্ত ছিলেন যিয়াদ (দ্র.) যিনি প্রথমে বসরার গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন (৪৫/৬৬৫), পরে ৫০/৬৭০ হইতে শুরু করিয়া ৫৩/৬৭৩ সনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র প্রদেশটি শাসন করেন। ৫৫/৬৭৫ সনে তাঁহার পুত্র 'উবায়দুল্লাহ ইবনুল যিয়াদ (দ্র.) পিতার দায়িত্ব পালন করিতে থাকে। এই যিয়াদই ৬১/৬৩০ য়াযীদ (দ্র.)-এর রাজত্বকালে কারবালা (দ্র.) প্রান্তরে ইমাম আল-হু'সায়ন (রা) (দ্র.)-এর হত্যার জন্য অংশত দায়ী ছিল।

পরবর্তী বৎসরগুলির গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র (দ্র.)-এর খলীফা (য়াযীদ) বিরোধী বিদ্রোহ; তাঁহার স্বপক্ষে কূফা ও বসরার অধিকাংশ অধিবাসীর, বিশেষ করিয়া তামীম গোত্রীয়গণের সমর্থন ছিল। তখন ইরাকের গভর্নর ছিলেন মুস'আব ইবনুয-যুবায়র (দ্র.)। তাঁহার প্রধান কাজ ছিল আল-মুখতার (দ্র.)-এর বিদ্রোহ দমন করা। ৬৬/৬৮৬ সনে এই বিদ্রোহের সূচনা হয় এবং কয়েক মাস পরে ৬৭/৬৮৭ সনে তাহা দমন করা হয় (দ্র. হারূরা) এবং উহার অল্পদিন পরেই 'আবদুল-মালিক (দ্র.)-এর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে আল-মুখতার নিহত হন। ৭২/৬৯১ সনে উমায়্যাগণ ইরাকে তাঁহাদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। যাহা হউক, খারিজীগণের শত্রুতা দমন করিবার উদ্দেশ্যে খলীফা ৭৫/৬৯৪ সনে আল-হা'জ্জাজ (দ্র.)-কে কূফার গভর্নর নিযুক্ত করিয়া পাঠান। খারিজীগণ তখনও অস্ত্রত্যাগ করে নাই। এই সময়েই আল-হ'াজ্জাজ, আল-মুহাল্লাব (দ্র.)-এর নেতৃত্বে ইরাকী বাহিনীতে শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়া এবং বসরা ও কূফা অধিকারকারী বিদ্রোহী ইবনুল আশ'আছ (দ্র.)-কে দমন করিয়া ৮৩/৭০২ সনে নূতন শহর ওয়াসিত (দ্র.)-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়েই খলীফা 'আবদুল-মালিকের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধিত হয়, যাহার ফলে ওয়াসিতে টাকশাল স্থাপিত হয় এবং সেখান হইতে মুদ্রা তৈরী হইতে থাকে। এই সময়ে আর এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়; নও-মুসলিম কৃষিজীবিগণ দলে দলে জমি ত্যাগ করিতে থাকে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাহারা যে খাজনা দিত তখন মুসলিম হইবার পরে তাহারা আর সেই খাজনা দিতে অস্বীকার করে (দ্র. খারাজ)। সিরিয়ার মত ইরাকেও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বৈরিতা চলিতেই থাকে; আল-হাজ্জাজ যেখানে কায়স (দ্র.) গোত্রীয়দেরকে সমর্থন করেন, তাঁহার অন্যতম উত্তরাধিকারী য়াযীদ ইবনুল মুহাল্লাব (দ্র.) আবার উহাদের উপর নির্যাতন করিতে থাকেন। পরে খলীফা 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল 'আযীয (দ্র.)-এর আদেশে তাঁহাকে বন্দী করা হয়। য়াযীদ কারাগার হইতে পলায়ন করেন এবং এক বিদ্রোহের সূচনা করেন। উমায়্যা বংশীয় শাহযাদা মাসলামা (দ্র.) ১০২/৭২১ সনে সেই বিদ্রোহ দমন করেন। ঘটনাক্রমে এই শাহযাদাই শাত্তুল-'আরাবের নিকটবর্তী নূতন জলা অঞ্চলের জমি উদ্ধার করিয়া চাষাবাদের উপযোগী করেন (দ্র. আল-বাতীহা)। খলীফা হিশাম (দ্র.)-এর রাজত্বকালে খালিদ ইব্ন আবদিল্লাহ আল-কাস্রী (দ্র.) যখন ইরাকের গভর্নর তখন সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে খলীফা ২য় আল-ওয়ালীদ (দ্র.)-এর রাজত্বকালে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হয়। ক্রমবর্ধমান গোলযোগ উমায়্যা আমল জুড়িয়া লাগিয়াই ছিল, একদিকে ছিল 'আব্বাসী সমর্থকদের সৃষ্ট গোলযোগ আর অপরদিকে খারিজীদের উৎপাত, যাহারা কিছুকালের জন্য কূফা অধিকার করে। গভর্নর ইব্ন হুবায়রা (দ্র.) 'আব্বাসী বাহিনীকে প্রতিহত করিতে ব্যর্থ হন, ওয়াসিতে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলা হয়, শেষ পর্যন্ত উমায়্যা বাহিনী পরাস্ত হইলে তিনি আত্মসমর্পন করেন। তাঁহাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয় নাই।

'আব্বাসী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে সাম্রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় ইরাকে, প্রথমে কূফাতে, পরে নূতন শহর বাগদাদ (দ্র.)-এ। ফলে এই প্রদেশের এবং ইহার অধিবাসিগণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, শহরগুলির চেহারায়ও পরিবর্তন সাধিত হয়। ক্রমে কূফার অধিবাসিগণ বাগদাদে চলিয়া আসে ২২১/৮৩৬ সালে খলীফার দরবার সামাররা-তে স্থাপিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত বাগদাদের আয়তন বাড়িতেই থাকে।

'আব্বসীয় খিলাফাতের প্রথম ভাগে ইরাকের নানাবিধ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। ইহা সমগ্র প্রাচ্যের বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয় (দ্র. তিজারা), সেই সঙ্গে ইহা জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্পকলারও কেন্দ্রস্থল হয়। এখানে কবি, বিদ্বান, আইনজ্ঞ, হাদীছবেত্তা, ধর্মতত্ত্ববিদ এবং পণ্ডিতগণের সমাবেশ ঘটিতে থাকে (দ্র. 'আরাবিয়্যা সাহিত্য, ফিক্হ, হাদীছ, কালাম এবং বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ)। তবে এলাকাটি বিভিন্ন ধরনের গোলযোগ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১৪৫/৭৬২ সালে বসরাতে 'আলীপন্থীগণের বিদ্রোহ হয়, এই একই দল ১৯৯-২০০/৮১৫-৬ সালে আল-কূফাতেও বিদ্রোহ করেন (দ্র. ইব্ন তাবাতাবা), আল-আমীন (দ্র.) এবং আল-মামূন (দ্র.)-এর মধ্যকার গৃহযুদ্ধ এবং ১৯৬-৮/৮১২-৩ সনে বাগদাদ অবরোধ, সামাররা-তে তুর্কী কর্মকর্তাগণের বিদ্রোহ যাহার ফলে ২৫১/৮৬৫-৫ সনে দ্বিতীয়বার বাগদাদ অবরোধ (দ্র. আল-মুসতা'ঈন), নিম্ন ইরাকের বাগিচাক্ষেত্রের গোলামদের বিদ্রোহ, যাহা যান্জ বিদ্রোহ নামে পরিচিত (২৫৫-৭০/৮৬৯-৮৩), তথাকথিত কারমাতী (দ্র.) দস্যুদল কর্তৃক কিছুদিন পর পর লুণ্ঠন; এই সকল ঘটনা রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক অস্থিরতারই পরিচয় বহন করে, যাহা সরকারের শান্তি বিঘ্নিত করে। এই সকল গোলযোগ খলীফা ও খিলাফাতের জন্য সংকটজনক ছিল। কেননা ইরাক তখন ছিল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী অঞ্চলের অন্যতম;

সাওয়াদগণের দেশ (ইরাককে প্রদত্ত সাম্প্রতিক নাম) হইতে যে রাজস্ব আদায় হইত তাহা রাজকোষের আয়ের একটি উৎস ছিল, আর এই পরিস্থিতি হেতুই ৪র্থ/১০ম শতকের গোড়ার দিকে প্রায় সর্বদাই উযীর নিযুক্ত করা হইত এমন সব ব্যক্তিকে, যাঁহারা অর্থনৈতিক বিষয়াদিতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং উযীর হইবার পূর্বে যাঁহারা এই অঞ্চলের করের হিসাব সংক্রান্ত জটিল সমস্যাদির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আল-মাহ্দীর খিলাফাত কাল হইতে ঘটনাক্রমে নিয়ম করা হয় যে, এই সকল কর একটি আনুপাতিক হারে নগদ অর্থের বদলে দ্রব্য দ্বারা অগ্রিম প্রদান করিতে হইবে।

খলীফা আর-রাদী (দ্র.) কর্তৃক আমীরুল-উমারা পদ সৃষ্টি এবং সেই পদে ইব্ন রা'ঈক (দ্র.)-কে নিয়োগের ফলে খিলাফাতের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। সেই সময়কাল ৩৩৬/৯৪৫ হইতে ৪৪৭/১০৫৫ পর্যন্ত এক শত বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হয়। এই সময়ে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সামরিক অভিযানসমূহের ফলে ইরাকের কৃষিজ সমৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সাম্রাজ্যের মধ্যে ইরাকের যে কেন্দ্রীয় অবস্থান ছিল তাহা আর রহিল না, বুওয়ায়হী আমীরগণ (দ্র.)-এর দ্বারা শাসিত ইরাক সাম্রাজ্যের মধ্যে সাধারণ একটি অঞ্চলে পরিণত হয়। এই আমীরগণের শী'আ (সম্ভবত ইমামী) মতবাদে বিশ্বাস থাকাহেতু তাঁহারা প্রদেশে শী'আ অনুষ্ঠানসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে থাকেন (দ্র. মুহাররাম); ইরাকে ইমামগণের যে সব মাযার ছিল সেখানে তাঁহারা সৌধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করেন (দ্র. মাশ্হাদ)। কিন্তু সুন্নী জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই নীতির বিরোধিতা হইতে থাকে, কিছুদিনের মধ্যে স্বয়ং খলীফাও ইহার বিরোধিতা করেন (দ্র. আল-ক'াদির)। তদুপরি খারাজ (দ্র.) জমির জন্য আমীরগণকে যে হ্রাসকৃত খাজনা প্রদানের সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল তাহা দ্বারা কৃষি শ্রমিকদের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, অথচ তাহাদের উপরেই, অন্তত অংশত, সেই অঞ্চলের সম্পদ নির্ভরশীল ছিল।

ইরাক কিছুকালের জন্য আল-বাসাসীরী (দ্র.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ফাতিমী সমর্থক বিদ্রোহের কারণে অশান্তি ভোগ করে, সালজূক (দ্র.)দের আগমনের ফলে সেখানে একটি নূতন শাসক বংশের সৃষ্টি হয় এবং তাহা মঙ্গোল অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই নূতন বংশের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তাঁহারা সেখানে সুন্নী মতবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই চেষ্টার ফলে মতদ্বৈততার সৃষ্টি হয়, একদিকে খলীফা এবং সুলতানগণের মধ্যে, যাহারা ঘটনাক্রমে ইসফাহানে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন বা অপর দিকে আশ'আরী মতবাদে রূপান্তরিত শাফিঈগণ ও হাম্বালীগণের মধ্যে (দ্র. আশ-শাফিঈ, আল-আশ'আরিয়্যা, আল-হানাবিলা)। এই আশ'আরীতে পরিনত শাফিঈগণ নব প্রতিষ্ঠিত নিজামিয়্যা মাদরাসার (৪৫৯/১০৬৭ সনে প্রতিষ্ঠিত, দ্র. মাদ্রাসা) শিক্ষকগণের মাধ্যমে সরকারীভাবে সালজূক সুলতানগণের অনুগ্রহ লাভ করিতে থাকে। সালজূকগণ ৬ষ্ঠ/১২শ শতকেও ইরাকে তাহাদের প্রাধান্য বজায় রাখেন, কিন্তু তখন তাহাদের সাম্রাজ্য দ্রুত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল। সালজূকদের যে শাখা ইরাকে গিয়া স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সানজার-এর ভ্রাতুষ্পুত্র মাহমূদ ইব্ন মুহাম্মাদ, তিনি ৫১১/১১১৮ সনে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। এই শাখা খওয়ারাযম শাহগণ (দ্র.)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত (৫৯০/১১৯৪) সেখানে শাসন ক্ষমতায় ছিল; কিন্তু ইতোমধ্যেই ইরাকের সালজূক আমীরগণের কর্তৃত্ব স্বয়ং আব্বাসী খলীফাগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়, খলীফাগণ উহাদের প্রভাবমুক্ত হইতে সচেষ্ট হন। ইহার পরিণামে প্রতিপত্তি নিয়া দ্বন্দ্ব বাধে, যাহা সুলতান মাসঊদ (দ্র.)-এর শাসনামলে মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং তাঁহাদেরই কারসাজিতে ৫২৯/১১৩৫ সনে খলীফা আল-মুসতারশিদ (দ্র.) এবং ৫৩০/১১৩৬ সনে খলীফা আর-রাশীদ নিহত হন। অতপর সুলতানের পসন্দ অনুযায়ী আল-মুকতাফী খলীফা হন। তবে সুলতানের ক্ষমতা ক্রমেই লোপ পাইতে থাকে এবং খলীফা আন-নাসির (দ্র.) তাঁহার ৫৭৫/১১৮০ হইতে ৫২২/১২২৫ সাল পর্যন্ত শাসনকালে সাম্রাজ্যের প্রাচ্য অংশের প্রধান প্রধান রাজ্যসমূহে ফুতুওয়া (দ্র.) সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, তাঁহার নিজস্ব পরিচালনাধীনে উহা অতীতের 'আব্বাসী সাম্রাজ্যের নৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ উপায়। খলীফার এই প্রচেষ্টায় আশানুরূপ সুফল হয় নাই এবং ৬৫৬/১২৫৮ সনে মঙ্গোল বাহিনী যখন ইরাক জয় করে তখন 'আব্বাসী খলীফাগণের শাসনের অবসান ঘটে (দ্র. আল-মুস্‌ত'াসিম)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ উল্লিখিত কালের জন্য ইরাকের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। প্রবন্ধে নির্দেশিত রচনাসমূহ, বিশেষ করিয়া রাজবংশ খলীফা, সুলতান, গভর্নরগণ এবং শহরসমূহ বিষয়ক প্রবন্ধগুলি দ্র.। বিভিন্ন যুদ্ধজয়ের ঘটনাবলীর জন্য দ্র. (১) F. Gabrieli, Muhammad and the conquests of Islam, লণ্ডন ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ১১৮-২৬ এবং গ্রন্থপ ী, ২৪৫।

'আব্বাসীগণের ইতিহাসের জন্য দ্র. (২) D. Sourdel, Le vizirat 'abbaside, দামিশ্ক ১৯৫৯-৬০ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, La politique religieuse du calife abbaside al-Ma'mun, in REI, 1962, 27-48; (৪) ঐ লেখক Le politique religieuse des successeurs d al-Mutawakkil, in S I, xiii, (1960), 5-21.

বুওয়ায়হী ইরাকের জন্য দ্র. (৫) M. Kabir, The Buwayhid dynasty in Baghdad, কলিকাতা ১৯৬৪ খৃ., এবং (৬) H. Busse, Chalif und Grosskonig, Wiesbaden 1969. বাগদাদ-এর জন্য দ্র. (৭) G. Makdisi, The Topography of eleventh century Bagdad, in Arabica, vi (1969), 178-97; 281-309; (৮) J. Lassner, The topography of Baghdad in the Middle Ages, Detroit 1970. ৪র্থ/১০ম শতকে ইরাকের সভ্যতার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ নির্দেশ করা যায় ঃ (৯) আ. 'আ. দূরী, তা'রীখুল-'ইরাক আল-ইক্তিসাদী ফি'ল-কার্নির-রাবি', বাগদাদ ১৯৪৫ খৃ.; (১০) Cl. Cahen Quelques problemes economiques et fiscaux de I' Iran buyide d'apres un traite de mathematiques, in AIEO Algiers, x (1952), 326-63. সালজূক আমলের ইরাকের জন্য দ্র. ঃ (১১) Cl. Cahen, apud History of the Crusades, সম্পা. K. M. Setton, i, philadelphia 1955, 168-72; (১২) H. Laoust, La politique de Gazali, প্যারিস ১৯৭০ খৃ.।

D. Sourdel (E. I.[2])/হুমায়ুন খান

(গ) **১২৫৮-১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ** ঃ মঙ্গোল বিজয় হইতে উছমানী বিজয় পর্যন্ত কালের মধ্যে কোন রাজনৈতিক ঐক্যতান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, শুধু রাজবংশের দ্রুত উত্থান-পতনের মধ্যে দেখা যায় যে, খিলাফাত শেষ হইয়া

যাইবার পরে ইরাকের রাজনৈতিক পতনের যুগ শুরু হইয়াছে সেই পতন ১৬শতকের পরবর্তীকাল পর্যন্ত চলিতে থাকে। তখন ছিল অর্থনৈতিক অধঃপতনের আমল, ১৫শ শতকের দিকে তাহা সর্বনিম্ন পর্যায়ে গিয়া পৌঁছায় অথচ অবস্থার ক্রমাবনাত জনগণ তখনও যথাযথভাবে বুঝিতে পারে নাই। প্রায় তিন শতাব্দী কালের মঙ্গোল (ঈলখানী, জালায়িরী, তৈমূরী) এবং তুর্কোমান (কারা-কো য়েনলু, আক-কোয়ূনলু, সাফাবী) বংশীয়গণের শাসনকাল সম্বন্ধে সামগ্রিক অধ্যয়ন হয় নাই; ঐতিহাসিক, ভূগোল, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সামান্যই জানা যায়, শুধু রাজনৈতিক ইতিহাসই তুলনামূলকভাবে সঠিকভাবে পুনর্লিখিত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস-গ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ 'আব্বাস আল-আযযাবী রচিত তারীখুল-ইরাক বায়না ইহতিলালায়ন, ১-৩ (এবং ৪), বাগদাদ ১৯৩৫ খৃ., বইয়ে কালানুক্রমিকভাবে দেওয়া আছে। প্রধান প্রধান তথ্য-সূত্র হইল, ঈলখানী আমলের জন্য ইব্‌নু'ল ফুওয়াতী (দ্র.)-এর গ্রন্থাবলী, কারা এবং আক-কোয়ূনলু আমলের জন্য তারীখুল-গিয়াছ (অপ্রকাশিত) এবং আবূ বাক্‌র তিহরানী, তারীখ-ই দিয়ারবাকরিয়্যা, সম্পা. ফারূক সুমের, ২খ, আন্‌কারা ১৯৬২-৪ খৃ.।

ঈলখানীদের (দ্র.) আমলে কেবল মাত্র একটি প্রাদেশিক রাজধানীতে পরিণত হইলেও তখন পর্যন্ত বাগদাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও ধর্মীয় দ্যুতির কিছু পরিচয় বর্তমান ছিল। প্রাদেশিক সরকার, যাহা এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা, নিম্ন মেসোপটেমিয়া শাসন করিত, উপরাংশের মেসোপটেমিয়া শাসিত হইত আল-মাওসিল হইতে। ইরাকের এই যে দুই বড়, সুস্পষ্ট এবং প্রায়শ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রশাসনিক বিভাগ ইহা 'উছমানী অধিকার পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ঈলখানী সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের ন্যায় ইরাকী প্রদেশদ্বয়েরও প্রধান শাসক ছিলেন একজন মঙ্গোল গভর্নর (তাঁহাদের অসম এবং অসম্পূর্ণ তালিকার জন্য দ্র. Die Mongolen in Iran, 348-52)। তাঁহাকে সহায়তা করিতেন একজন অ-মঙ্গোল নাইব, যিনি হইতেন কোন একজন প্রবীণ মুসলিম, খৃস্টান বা য়াহূদী কর্মকর্তা-সাধারণত উযীরগণের মধ্যকারই কোন একজন যিনি নাকি Ordo-তে প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। বাগদাদ এবং দক্ষিণ ইরাক এইভাবে বিশ বৎসর যাবত শাসন করেন খুরাসানী শাসক, যাঁহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতেন জুওয়ায়নীগণ। তাঁহাদের পতনের পরে ঈলখানী রাজ্যের সর্বত্র যে সামাজিক চাপ সৃষ্টি হইয়াছিল, ইরাকে সেই অবস্থা আরও বেশী জটিল হয়। কেননা সেখানে অগণিত খৃস্টান ও য়াহূদী ছিল এবং মঙ্গোল শাসকগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া শী'আ মুসলিমগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নিজেদের ধর্মীয় মতামত গর্বভরে প্রকাশ করিতে থাকেন।

ঈলখান আবূ সাঈদ-এর মৃত্যুর পরে (৭৩৫/১৩৩৫) রাজ্য ভাঙ্গিয়া যাইবার কালে ইরাক প্রথমে মঙ্গোল প্রভাবাধীনে ছিল, কিন্তু হাসান জালায়িরি মৃত্যু (১৩৫৬ খৃ.) পর্যন্ত চেঙ্গিসখানী বংশের উত্তরাধিকারিগণের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিলেও তিনিই একটি নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া খ্যাত। জালায়িরীগণ (দ্র.) বাগদাদে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী চুবানীদের বিতাড়িত করেন এবং মেসোপটেমিয়ার উপরাংশে তাঁহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে বাগদাদ এবং তাবরীয-এই উভয় স্থানে রাজধানী থাকাহেতু তাঁহাদের রাজ্য যতটা 'আরব ছিল তাহার তুলনায় বেশী ছিল ইরানী। ৭৯৫/১৩৯৩ সনে ইরাকে তৈমূরের প্রথম অভিযানের পরে বিভিন্ন শহরে প্রবেশকালে নগরবাসিগণের প্রতিবন্ধকতাহেতু তাঁহার অগ্রযাত্রা স্থানে স্থানে ব্যাহত হয়। অতঃপর তৈমূরীয় শাসনের সংক্ষিপ্ত কাল (৭৯৬/১৩৯৩-৪, ৮০৪/১৪০১-২, ৮০৬-৭/১৪০৩-৫) এবং জালায়িরীগণের ক্ষমতা পুনর্দখলের কাল, যখন কারা কোয়ূনলু তুর্কোমানগণের সর্বাত্মক সমর্থন প্রদান ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ; সে কারণে ১৫শ শতকে তাঁহাদের আধিপত্যই গৌণ হইয়া পড়ে। তৈমূর কর্তৃক বাগদাদ লুণ্ঠনের ফলে (৮০৩/১৪০১) তু. Arabica, ix/2, 1962) ইতিমধ্যেই ক্ষীয়মান রাজধানীতে মারাত্মক আঘাত পড়ে, যে আঘাতের ক্ষতি এই শহরে আর কোনদিন কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে উপজাতীয় উত্থান (দক্ষিণে বেদুঈনগণ, উত্তরে তুর্কোমান ও কুর্দীগণ) তখন হইতে শুরু করিয়া দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলে এবং পারস্য উপসাগর, কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যকার যে বাণিজ্যিক পণ্যসামগ্রির কাফেলা চলাচল করিত সেইগুলিকে পারস্য ও আনাতোলিয়ার বাণিজ্য পথের দিকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। ইরাক এমন এক প্রাণহীন অঞ্চলে পরিণত হয় যে, জালায়িরীয় বংশের ক্ষমতাচ্যুতির পরে (১৪১০-১১ খৃ.), কারা-কোয়ূনলুগণকে দুই দশক (১৪১১-৩১) খৃ.) পর্যন্ত তৎকর্তৃক প্রথমে দক্ষিণের জিলাসমূহে (খুযিস্তান, বসরা, আল-হিল্লা) বিতাড়িত ও পরে তাহাদেরই উত্তরাধিকারিগণের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত থাকিতে হয়। রাজনৈতিক বিভেদ ক্রমে আরও বেশী প্রকট আকার ধারণ করে এবং তাহা কেবলমাত্র তুর্কোমান জাতিসমূহের বিভিন্ন দলের মধ্যকার বৈরিতার কারণেই নহে বরং এই বাস্তব ঘটনার ফলশ্রুতি স্বরূপ (উল্লেখযোগ্য যে, দেশটি ঐতিহ্যগতভাবে বিভিন্ন জিলা এলাকায় বিভক্ত ছিল এবং সেইগুলির মধ্যে কোন ঐতিহাসিক ঐক্য ছিল না), বাগদাদের শাসকগণ এবং আল-মাওসিল-এর শাসকগণের মধ্যে সশস্ত্র প্রতিযোগিতা লাগিয়াই থাকিত এবং মুশা'শা'গণ (দ্র.)-এর রাজনৈতিক-ধর্মীয় আন্দোলন নিম্ন ইরাকের সর্বশেষ জালায়িরীগণের কাছ হইতে ক্ষমতা দখল করিয়া নেয়; সেইখানে উহারা একদিকে ফারস-এর তৈমূরীয়দের রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টাকে রোধ করিয়া রাখে, আর একই সঙ্গে তুর্কোমান আধিপত্যবাদ হইতেও দেশকে রক্ষা করে। তুর্কোমানদের কর্তৃত্বকে মুকাবিলা করিবার মত যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন একমাত্র দেশীয় আন্দোলন মুশা'শা' বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও মুশা'শা' বাগদাদ অধিকার করিতে সক্ষম হয় নাই। এমন কি তাহারা মাত্র স্বল্পকালের জন্য আল-হিল্লা দখলে রাখিতে পারিয়াছিল (১৪৬৬-৮)। কারা-কোয়ূনলুগণের স্থানাধিকারী (১৪৬৮-৯) আক-কোয়ূনলুগণের অধীনে থাকাকালীন ইরাকে যুদ্ধ ও বিদ্রোহ অপেক্ষাকৃত কম হয়। ইরান হইতে সাফাবী কীযীলবাসিগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইবার পরে তাঁহারা কিছু সময়ের জন্য ইরাকে ক্ষমতা দখল করিয়াছিল।

ইরাকে সাফাবী আধিপত্যের কাল (১৫০৮-৩৪) অন্যান্য স্থানের মতই ছিল অর্থনৈতিক অচলাবস্থা এবং দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা চিহ্নিত। উচ্চ মেসোপটেমিয়া মাওসিল আমীরগণের প্রভাবাধীন ছিল, তাঁহারা ইতোমধ্যে আক-কোয়ুনলুদের আমলে সেখানে ক্ষমতাবান হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং বাগদাদ শাসন করিবার কর্তৃত্ব লাভ করিয়া বাস্তবে তাঁহারা সমগ্র ইরাকের উপরেই নিয়ন্ত্রণ লাভ করিয়াছিলেন। ১ম শাহ তাহমাস্‌প-এর আমলে তাঁহাদের মধ্যে একজন যুল-ফিকার, এমন কি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন (১৫২৮-৯ খৃ.)।।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে।

J. Aubin (E.I.²)/হুমায়ুন খান

(ঘ) 'উছমানী আমল ঃ ১০ম/১৬শ শতক হইতে শুরু করিয়া খৃস্টীয় ১৯শ শতক পর্যন্ত ইরাকী ভূভাগ মূলত 'উছমানী তুর্কী সাম্রাজ্যের ক্ষমতার দুর্গস্বরূপ ছিল। এখান হইতে পারস্যের শাসকগণের এবং উত্তর-পূর্বের একগুঁয়ে, অবাধ্য কুর্দীদের এবং দক্ষিণপশ্চিমের দিজলা-ফুরাত সমভূমির 'আরব গোত্রীয়দের মুকাবিলা করা হইত। পশ্চিমের উর্বর অর্ধচন্দ্রাকার ভূভাগ যেমন ৯২২/১৫১৬ সনে একটিমাত্র অভিযান দ্বারা বিজিত হইয়াছিল এবং অতঃপর খৃস্টীয় ১৮শ শতকের শেষভাগের পূর্বে আর কখনও বহিঃশক্তির আক্রমণ দ্বারা গুরুতররূপে বিঘ্নিত হয় নাই। কিন্তু ইরাকের ক্ষেত্রে অবস্থাটা ভিন্নরূপ ছিল, ইরাক অধিকৃত হইয়াছিল খণ্ড খণ্ডভাবে ও ক্রমান্বয়ে বার বার জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়া এবং দীর্ঘস্থায়ী শাসন যে কায়েম করা সম্ভব হইয়াছিল তাহাও বাগদাদের গভর্নরদিগকে যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন প্রদানের বিনিময়ে। ১৯শ শতকে 'উছমানী সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের ন্যায় এখানেও প্রশাসনিক পুনর্গঠন সম্পন্ন করা হয়। তুর্কীরা প্রথমে দখল করে মাওসিল, দিয়ার বাক্র (দ্র.) এবং দিজলা নদীর পূর্বদিকের কুর্দী অঞ্চলসমূহ, এইসবই ৯২১-৩/১৫১৫-১৭ সালে চালদিরান (দ্র.) অভিযানকালে বিজিত হয়। সুলতান সুলায়মান এবং শাহ্‌তাহমাস্প-এর মধ্যে পুনরায় বিরোধ দেখা দিলে ৯৪১/১৫৩৪ সনে বাগদাদ (দ্র.) বিজিত হয়। বসরার 'আরব শাসক রাশিদ ইব্‌ন মুগামিস (দ্র.) তুরস্কের সুলতানের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। পরে তাঁহার রাজ্য (৯৫৩/১৫৪৬ সনের পরে) পুরাপুরিভাবে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। তিনটি কেন্দ্রীয় 'ইয়ালেত' মাওসিল, বাগদাদ ও বসরা লইয়া ইরাক গঠিত হয়, ইহার পূর্বে অবস্থিত ছিল কুর্দী ইয়ালেত শাহরিযুর আর পারস্য উপসাগরের পশ্চিম উপকূলে (দ্র. বাহ্‌র ফারিস) অবস্থিত ছিল ইয়ালেত আল-হাসা (দ্র.)। দিয়ার বাক্র ইয়ালেত আধুনিক ইরাকের বাহিরে অবস্থিত হইলেও 'উছমানী আমলে উহার ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল।

১১শ/১৭শ ও ১২শ/১৮শ শতকে তুরস্কের কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িলে সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানের মত ইরাকেও তাহার প্রতিফলন দেখা যায় এবং স্বৈরাচারী স্থানীয় শাসকগণ মাথাচাড়া দিয়া উঠে, আর শহরগুলিতে রক্ষিত সৈন্যগণ আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। বসরার গভর্নর পদটি আফরাসিয়াব (দ্র.) নামক জনৈক ব্যক্তি বিপুল অর্থের বিনিময়ে বাগাইয়া লইয়াছিল। (আনু. ১০২১/১৬১২), সেই পদ তাঁহার বংশধরগণের একচেটিয়া হইয়া যায়। আল-হাসাতেও অনুরূপ একটি গভর্নর পরিবার ১০ম/১৬শ শতক হইতে ১০৭৪/১৬৭৩-৪ সাল পর্যন্ত শাসন করিতে থাকে। বাগদাদের ছাউনীর সৈন্যদলও ইতোমধ্যে বিশেষ সুবিধাভোগী এবং নগর এলাকায় সামাজিকভাবে ক্ষমতাবান হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে একজন নেতার উদ্ভব হয়, নাম বাক্র সু বাশী (দ্র.)। নিজ ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি শাহ্ আব্বাসী (দ্র.)-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এইভাবে বাগদাদ এবং কেন্দ্রীয় ইরাক পারস্যের শাসনাধীনে চলিয়া যায় (১০৩৩/১৬২৩), কিন্তু সাফাবীগণ মাওসিল এবং শাহ্‌রিযূর অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। অবশেষে তুরস্কের সুলতান ৪র্থ মুরাদ কর্তৃক ১০৪৮/১৬৩৮ সনে পারস্য শক্তি ইরাক হইতে উৎখাত হয়। অতঃপর যে 'উছমানী-সাফাবী মীমাংসা হয় (যুহাব-এর চুক্তি দ্বারা উভয় শক্তির মধ্যে করা সীমানা নির্ধারিত হয় ১৪ মুহাররাম, ১০৪৯/১৭ মে, ১৬৩৯)। কিন্তু সেই সীমারেখা চূড়ান্ত করণ লইয়া খৃস্টীয় ১৯শ শতক পর্যন্ত উভয় শক্তির মধ্যে বৈরিতা লাগিয়াই থাকে।

'উছমানী পুনর্বিজয় ইরাকে কোন স্থায়ী স্থিতাবস্থা আনয়ন করিতে পারে নাই। বাগদাদের শিবিরস্থ সৈন্যগণ পূর্বের মতই বিক্ষুব্ধ এবং আনুগত্যহীন ছিল। বসরার আফরাসিয়াব বংশের স্বায়ত্তশাসন শেষ পর্যন্ত ১০৭৮/১৬৬৮ সনে দমন করা হইলেও জলাভূমি অঞ্চলের মুনতাফিক শক্তিসংঘের এবং দক্ষিণের মরুভূমির 'আরবদের উত্থানের ফলে উছমানী নিয়ন্ত্রণ ভীতিজনক বাধার সম্মুখীন হয়। বাগদাদের দুইজন গভর্নর সেই পরিস্থিতি আয়ত্তে আনেন, একজন হাসান পাশা (দ্র.), যিনি ১১১৬/১৭০৪ হইতে ১১৩৬/১৭২৪ সাল পর্যন্ত এবং অপরজন তাঁহারই পুত্র এবং উত্তরাধিকারী আহমাদ পাশা (দ্র.) (যিনি মধ্যবর্তী কিছু সময় ব্যতীত) ১১৬০/১৭৪৭ সনে ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত শাসন করেন। তৎকালীন অন্য 'উছমানী গভর্নরগণের মত তাঁহাদেরও কর্তৃত্বের ভিত্তিস্বরূপ ছিল এক নূতন সামরিক ও প্রশাসনিক পদ্ধতি। হাসান ও আহমাদ ছিলেন জর্জীয় বংশোদ্ভূত। তাঁহারা বাগদাদে জর্জীয় মামলূক পরিবার প্রতিষ্ঠা করেন, উহাদের মাধ্যমে তাঁহারা প্রদেশ শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করিতেন। মুনতাফিকগণের আক্রমণের ভয়হেতু বসরা বাস্তবে বাগদাদের উপরে নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। ১১৩৫/১৭২২ সালের পর হইতে উহা অপেক্ষা মারাত্মক আর এক ভীতির আবির্ভাব হয়; প্রথমে আফগানগণ ও পরে নাদির শাহ পারস্যের সাফাবীগণের স্থলাভিষিক্ত হন এবং 'উছমানী শক্তির সঙ্গে তাঁহাদের বৈরিতা নূতন করিয়া দেখা দেয়। পরবর্তীকালের অভিযানসমূহে বাগদাদের কেন্দ্রীয় গুরুত্ব থাকাহেতুই সম্ভবত সালতানাতের নীরব সম্মতিক্রমে আহমাদ পাশা দীর্ঘকাল ক্ষমতায় ছিলেন এবং তিনি স্বায়ত্তশাসন ভোগ করেন। এই একই সময়ে জালীলী (দ্র.) পরিবারের সদস্যগণ নিজেদেরকে মাওসিলের প্রায় বংশানুক্রমিক গভর্নররূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। নাদির শাহ ১১৪৬-৭/১৭৩৩ সনে বাগদাদ অবরোধ করেন এবং ১১৫৬/১৭৪৩ সনে মাওসিল অবরোধ করেন। কিন্তু সুদীর্ঘ সংগ্রাম সামগ্রিকভাবে অমীমাংসিতই থাকে, পরে ১১৫৯/১৭৪৬ সনে যে মীমাংসা হয় তদ্দারা বাস্তবে যুহাব চুক্তিই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

নাদির শাহ্-এর মৃত্যুর (১১৬০/১৭৪৭) অল্পদিন পরেই আহমাদ পাশার মৃত্যু হয়। অতঃপর তাঁহার মামলূক পরিবারের সদস্যগণ দৃঢ়ভাবে ক্ষমতা দখল করিয়া থাকেন। সেই ক্ষমতা স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা সামরিক ও প্রশাসনিক উচ্চ পদসমূহ অধিকার করেন। মামলূকগণ সুলতানের সরকার কর্তৃক তাঁহাদিগকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিবার মত ক্ষমতা অর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু গভর্নর পদে উত্তরাধিকার লাভের জন্য একটি স্থায়ী পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। মামলূকগণের পাশা (Pashalic) আমলে (১১৬০-১২৪৭/ ১৭৪৭/ ১৭৪৭-১৮৩১) পারস্যের শাসক কারীম খান্-ই যান্দ-এর সঙ্গে সংগ্রাম বাধে, তখন মামলূকগণ সাময়িকভাবে বসরা হারায় (১১৯০-৩/ ১৭৭৬-৯), কিন্তু কারীম খানের মৃত্যুর পরে সে বিপদ কাটিয়া যায়। বুযুক সুলায়মান পাশার দীর্ঘ শাসনামলে মামলূক পাশার সর্বোচ্চ গৌরব সূচিত হয়, তিনি বাগদাদ, বসরা ও শাহরিযোর একযোগে শাসন করেন। কিন্তু শাসনের শেষভাগে ওয়াহ্হাবীগণ যখন আল-হাসাতে এবং ইরাকের প্রান্তবর্তী এলাকায় সম্প্রসারিত হইতে থাকে তখন তাহাদিগকে দমন করিতে গিয়া তিনি ব্যর্থ হন। পরে মুনতাফিক শক্তিজোট এক সঙ্গে বাধা দান করিয়া তাহাদিগকে প্রতিহত করে। ১২১৬/১৮০২ সালে বিশাল ওয়াহ্হাবী আক্রমণ এবং কারবালা শহর লুণ্ঠন দ্বারা মামলূক পাশা শাহীর শক্তিহীনতা প্রমাণিত হয়। উক্ত ঘটনার পরে আরও অল্প কিছুকাল তাঁহারা ক্ষমতায় ছিলেন,

অতঃপর সুলতান ২য় মাহমূদ শক্তিবলে এই বংশের শেষ প্রতিনিধি দাউদ পাশা (দ্র.)-কে বিতাড়িত করিয়া স্বায়ত্তশাসিত গভর্নর পদের অবসান ঘটান (১৮৩১ খৃ.)।

১৮৩১ খৃ. হইতে ১৯১৮ খৃ. পর্যন্ত ইরাকের ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু হইতেছে 'উছমানী প্রশাসনিক সংস্কার এবং ক্রমবর্ধমান য়ুরোপীয় অনুপ্রবেশ। দাঊদ-এর ঠিক পরবর্তী উত্তরাধিকারিগণ উপজাতীয় অধিবাসীদের উপরে তাঁহাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার বিষয়ে মামলূক পাশাগণ অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ কিছু করিতে পারেন নাই। এই বিষয়ে সত্যিকারের পরিবর্তন সূচিত হয় মিদহাত পাশার গভর্নর থাকাকালীন (১৮৬৯-৭২ খৃ.), যখন বাগদাদের উপর বিলায়েত আইন (১৮৬৪) এবং 'উছমানী ভূমি আইন (১৮৫৮ খৃ.) বলবৎ করা হয়। এই উভয় আইনই ছিল পাশ্চাত্যমুখী সংস্কার, একটি দ্বারা য়ুরোপীয় পদ্ধতির প্রাদেশিক প্রশাসনের কাঠামো সৃষ্টি করা হয়, অপরটি দ্বারা উপজাতীয় এলাকার ভূমির উপরে ব্যক্তির স্বাধীন স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুলতান ২য় 'আবদুল-হ'ামীদ ইরাকের বিস্তৃত এলাকার জমি তাঁহার ব্যক্তিগত সেনিয়্য (Seniyye) প্রশাসনের অধীনে আনয়ন করেন। যুব তুর্কী আন্দোলনের সময়ে যে 'আরব জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয় তাহা সিরিয়ার প্রদেশসমূহের ন্যায় ইরাকে ততটা অনুভূত হয় নাই, যদিও কিছু কিছু জাতীয়তাবাদী নেতা (প্রধানত সামরিক অফিসার) এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।

খৃস্টীয় ১৯শ শতকের পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল ব্যতীত ইরাকী অঞ্চল খুব কমই য়ুরোপীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খৃস্টীয় ১৮শ শতকের শেষভাগের মধ্যে উপসাগরীয় অঞ্চলের প্রভাবশালী শক্তিরূপে ইংরেজগণ ওলন্দাজদের স্থান অধিকার করে (তৎপূর্বে ওলন্দাজগণ যেইরূপ পর্তুগীজদের স্থান দখল করিয়াছিল)। ১৭৬৩ খৃ. হইতে বসরা ব্রিটিশ বাণিজ্যের কেন্দ্র এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটি এজেন্সীর ব্যবসাস্থল হয়। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কর্তৃক মিসর অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত খোদ বাগদাদের গুরুত্ব ছিল ইংরেজদের কাছে দ্বিতীয় পর্যায়ের। ১৭৯৮ খৃ. সেখানে একজন স্থায়ী ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের স্বার্থে ১৮৩০ খৃস্টাব্দের পরে ফুরাত জলপথ জরীপ করা হয় এবং উহার ফলে ইরাকে আধুনিক নদীপথের সূচনা হয়। ১৮৬১ খৃস্টাব্দের পরে টেলিগ্রাফ যোগাযোগ স্থাপন করা হয়- যখন ইস্তাম্বুলের সহিত বাগদাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। আনাতোলিয়া হইতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত জার্মান উদ্যোগে রেলপথ স্থাপনের প্রকল্প ব্রিটিশ সরকার বন্ধ করিয়া দেন এবং শুধুমাত্র বাগদাদ হইতে সামার্‌রা পর্যন্ত অংশটুকুর রেলপথ 'উছমানী শাসনামলে নির্মিত হয়।

যখন প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয় তখনও ইরাকে য়ুরোপীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ খুব সামান্য মাত্র ঘটে। ১৯১৪ খৃ. নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষের একটি সেনাদল উপসাগরের মুখ এবং বসরা দখল করে। ইংরেজদের বাগদাদ দখলের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাহারা বৃটিশ শক্তির নিকট কূত আল-আমারাতে আত্মসমর্পন করে, দ্বিতীয়বারের প্রচেষ্টায় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তাহারা বাগদাদ দখল করিতে সক্ষম হয়। তবে মুদরস-এর যুদ্ধ বিরতির দ্বারা যুদ্ধে তুরস্কের অংশ গ্রহণ সমাপ্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত মাওসিল তুরস্কের অধিকারে থাকে। ইতোমধ্যে ইরাকে প্রধানত ব্রিটিশ এবং ভারতবর্ষীয় কর্মকর্তাগণের সমবায়ে গঠিত একটি প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯২০ খৃ. অছি প্রথা অনুযায়ী ব্রিটিশগণ কর্তৃক ইরাক শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন পরিচালনা করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জীর জন্য উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধসমূহ এবং বিশেষ করিয়া বাগদাদ প্রবন্ধটি দ্র.। ইহা ছাড়া প্রধান প্রধান আধুনিক গ্রন্থ দ্র. (১) 'আব্বাস আল-'আয্যাবী, তারীখুল ইরাক বায়না ইহ্তিলালায়ন, ৪-৮ খ., বাগদাদ ১৯৪৯-৫৮ খৃ.; (২) S. H. Longrigg. Four centuries of modern Iraq. অক্সফোর্ড ১৯২৫ খৃ., পুনর্মুদ্রণ লণ্ডন ১৯৬৯ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, Iraq 1900 to 1950, লণ্ডন ১৯৫৩ খৃ.; (৪) A. T. Wilson, The Persian Gulf, লণ্ডন ১৯২৮ খৃ.।

P. M. Holt (E.I.$^2$)/ হুমায়ুন খান

**(ঙ) ১৯১৮ খৃস্টাব্দের পর হইতে** ঃ ১৯১৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক বর্তমান ইরাক অধিকার সম্পন্ন হয় যখন তুরস্ক এবং মিত্রপক্ষের মধ্যে মুদরসের যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার সাত দিন পরে নভেম্বর মাসে ইংরেজ সৈন্যগণ মাওসিল প্রবেশ করে। তবে বিজিত এলাকার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারী মতামতের পরস্পর বিরোধিতার ফলে প্রশাসনিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ফলে দেশে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, যাহার উদ্দেশ্য ছিল দেশে একটি মুসলিম 'আরব রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। ১৯২০ খৃ. যখন ইরাকের উপরে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব ঘোষণা করা হয় তখন সঙ্গে সঙ্গেই মধ্য ফুরাতের উপজাতীয় শায়খগণের বিদ্রোহ সূচিত হয়, আর তাহাতে সমর্থন যোগায় নাজাফ ও কারবালার শী'আ মুজ্তাহিদগণ। এই বিদ্রোহ দমন করিতে যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্যের প্রয়োজন হয় এবং অবশেষে ১৯২১ খৃস্টাব্দের শুরুতে পরিস্থিতি শান্ত হয়। বিদ্রোহ দমনের পূর্বে স্যার পারসি কক্স-কে ব্রিটিশ হাই কমিশনার নিযুক্ত করা হয়, তিনি সরকার পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি 'আরব রাজ্যসভা (Council of state) গঠন করেন, ফলে অক্‌টোবর, ১৯২০ সালে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। ১৯২১ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে উইনস্টন চার্চিল (Winston Charchill)-এর সভাপতিত্বে (তিনি তখন উপনিবেশ সচিব ছিলেন) কায়রো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইরাকের পরিস্থিতি বিষয়ে সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ১৯২০ সালের জুলাই মাসে ফরাসীগণ কর্তৃক সিরিয়া হইতে বিতাড়িত মক্কার শারীফ হুসায়ন-এর দ্বিতীয় পুত্র ফায়সালকে শাসন ক্ষমতা প্রদান করা হইবে। ইরাকের বাদশাহরূপে ফায়সাল-এর এই নির্বাচন রাষ্ট্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক সমর্থিত হয়, এক গণভোটে উহা সর্বসাধারণের সম্মতিও লাভ করে এবং ১৯২১-এর আগস্ট মাসে শাসনতান্ত্রিক বাদশাহরূপে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার একজন প্রতিনিধি রাখিবার ব্যবস্থা হয় এবং দেশের সরকার হয় গণতান্ত্রিক (দ্র. দুসতূর, ৬৫৯)। ম্যাণ্ডেটে ক্ষমতাবান দেশের সঙ্গে ইরাকের সম্পর্ক কয়েক দফা চুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহাদের মধ্যে সর্বশেষ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৩০ খৃ.। উহা দ্বারা ইরাককে যথাযথভাবে স্বাধীনতা প্রদান করা হয় এবং ২৫ বৎসর মেয়াদী একটি ঘনিষ্ঠ অ্যাংলো-ইরাকী মৈত্রীর ব্যবস্থা রাখা হয়। এইভাবে ১৯৩২ খৃ. একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে ইরাককে জাতিপুঞ্জ (League of Nations)-এর সদস্যভুক্ত করা হয়।

ইরাক যখন স্বাধীন হয় তখন একটি আধুনিক জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিবার জন্য দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং গোষ্ঠীর সামাজিক সংহতির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাস্তবে তাহা ছিল না। দেশের ভিতরে নানা

রকম পরস্পর বিরোধী স্বার্থান্বেষী ধ্বংসাত্মক স্থানীয় শক্তি ছিল। এই সকল স্বার্থান্বেষীকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া রাষ্ট্রের স্বার্থে কাজে লাগাইবার জন্য প্রয়োজন ছিল বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্বের এবং একদিকে, ব্রিটিশ ও জাতীয়তাবাদিগণের মধ্যে এবং অপর দিকে, বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। ফায়সাল যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৩৩ খৃ. তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়। ইরাকের আধুনিক ইতিহাসের এক জটিল সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়, যখন আসীরীয় গণহত্যা, উপজাতীয় উত্থান এবং উগ্র বিটিশ বিরোধী আন্দোলন নূতন রাষ্ট্রের ভিত্তিকেই কাঁপাইয়া তোলে। গাযী ফায়সাল এর উত্তরাধিকারী ছিলেন একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং দেশে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখিবার জন্য পিতার ন্যায় কর্তৃত্বও তাঁহার ছিল না। ইরাকের বিক্ষুব্ধ এবং বহু বিভক্ত রাজনীতিতে তাঁহাকে পক্ষপাতিত্বের জন্য টানিয়া আনা হয়। কোন কোন দল চেষ্টা করিতেছিল উপজাতীয় বিদ্রোহ ঘটাইয়া নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্ষমতা হইতে অপসারিত করিতে, অন্যেরা আবার সচেষ্ট ছিল সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ক্ষমতা দখল করিতে। এইভাবে ১৯৩৬ খৃ. জেনারেল বাক্র সিদ্কী হিক্মাত সুলায়মান-এর সহযোগিতায় এবং আল-আহালী নামে পরিচিত সংস্কারবাদী রাজনৈতিক দলের সমর্থনে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান। এই আন্দোলন শুরু হইবার মাত্র দশ মাসের মধ্যেই আবার আর এক অভ্যুত্থানের ফলে উহা শেষ হইয়া যায়। রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ এক মারাত্মক উদাহরণের সৃষ্টি করে। কেননা ১৯৩৬-৪১ খৃ. সময়ের মধ্যে দেশে কমপক্ষে সাতবার অভ্যুত্থান ঘটে। এই সময়ে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী মনোভাব অক্ষশক্তির উস্কানী ও সহায়তায় এবং ফিলিস্তীনে ব্রিটিশ নীতি দ্বারা প্রভাবিত হইবার ফলে দেশে রাশীদ 'আলী আল-গায়লানীর নাৎসীপন্থী সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকার ১৯৪১-এর এপ্রিল মাসে ক্ষমতায় আসে এবং ১৯৩০ খৃ. সম্পাদিত অ্যাংলো-ইরাকী চুক্তি লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হয়। ইহার পরিণতিতে ১৯৪১-এর মে মাসে ব্রিটিশ পরিচালনাধীন জর্দানের 'আরব বাহিনী বাগদাদ দখল করে। গায়লানী শাসন দমন এবং গঠনতান্ত্রিক একক শাসন পুনঃপ্রবর্তনের পরে ইরাকী রাজনৈতিক নেতা নূরী আস-সা'ঈদ পরবর্তী মন্ত্রীসভাসমূহের লৌহ মানবরূপে আবির্ভূত হন। ১৯৪৩ খৃ. ইরাক অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং তদ্বারা জাতিসংঘ সংস্থার অন্যতম Charter সদস্য হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্যতা অর্জন করে এবং ১৯৪৫ খৃ. ২১ ডিসেম্বর ইরাক জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যপদ লাভ করে। একই বৎসরে ইহা 'আরব লীগ রাষ্ট্রীয় সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও হয়। ১৯৪৮ খৃ. ফিলিস্তীনের মুসলিমগণকে বিতাড়িত করিয়া য়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈল সৃষ্টি করা হইলে উহার প্রতিবাদে অন্যান্য 'আরব লীগের সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ইরাকও একযোগে ইসরাঈলের উপরে আক্রমণ করে, কিন্তু তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়। বিশ্বযুদ্ধের অবসানে দেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পুনরুজ্জীবন হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে স্বাধীনভাবে রাজনীতি করিবার অনুমতি দেওয়া হয় কয়েকটি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। সকল দলেই রাজনৈতিকভাবে উচ্চকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিজীবী দলের সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। সকল রাজনৈতিক দলই অ্যাংলো-ইরাকী চুক্তি বাতিল করিবার দাবী জানায় এবং তাহারা শ্রমিক ও ছাত্রগণকে তাহাদের দাবীর প্রতি সমর্থন দানের আহ্বান জানায়। ফলে দেশে ছাত্র আন্দোলন ও শ্রমিক গোলযোগ প্রবল হইয়া উঠে এবং তখন সকল রাজনৈতিক দল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ইরাকী তেলের আয় বৃদ্ধি পায়, উহা পানি সেচের জন্য বাঁধ নির্মাণ ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় করা হয়। কিন্তু এই সকল প্রকল্প দ্বারা দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন ব্যর্থ হওয়ায় দেশে ব্যাপক গণ-অসন্তোষের সৃষ্টি হয় যাহার ফলে বিরোধী দলের শক্তি পুনরায় বৃদ্ধি পায়। মিসরে প্রগতিবাদী নূতন নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটিলে ইরাকের বিরোধী দলীয় রাজনীতিকগণ উহার সুযোগ গ্রহণ করেন। তাঁহারা বৃটেনের সঙ্গে চুক্তির বিরুদ্ধে প্রবল প্রচারকার্য চালাইতে থাকেন এবং উহার পরিবর্তে নিরপেক্ষতা ও মিসরের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের দাবী জানান। যাহা হউক ইরাক নিজ গৃহে এবং সমগ্র 'আরব দুনিয়াতে প্রবল প্রতিবাদের মুখে পাশ্চাত্যের অনুপ্রাণিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করে (১৯৫৫ খৃ.) এবং পরের বৎসর ১৯৫৬ খৃ. সুয়েজ সংকটের কালে মিসরকে মৃদু সমর্থন দান করে। মিসরের কূটনৈতিক বিজয় এবং 'আরব জাতীয় ব্যক্তিত্বরূপে জামাল 'আবদুন-নাসির-এর আবির্ভাব রাজতন্ত্রপন্থী ইরাকের ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন করে। ১৯৫৮ খৃ. সিরিয়া ও মিসর যখন সংযুক্ত 'আরব প্রজাতন্ত্র গঠন করে, তখন ইরাক এবং জর্দানও হাশিমী রাজতন্ত্রাধীনে একত্রে ফেডারেশন গঠন করে। সেই বৎসরই জুলাই মাসে ব্রিগেডিয়ার 'আবদুল-কারীম কাসিম-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একদল অফিসার অভ্যুত্থান ঘটাইয়া রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে এবং ইরাককে প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করে। উত্থানের ফলে বাদশাহ ২য় ফায়সাল, প্রধান মন্ত্রী নূরী আস-সাঈদ এবং রাজপরিবারের সকল সদস্য নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। ব্রিগেডিয়ার (পরে জেনারেল) কাসিম দেশের রাজনৈতিক দলের এবং ইরাকের সমাজ-কাঠামোর বিচ্ছিন্ন অংশের সকলের যুক্ত শক্তির ব্যাপক সমর্থন লাভ করেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই সম্মিলিত দলে যথেষ্ট দৃঢ় সংহতি ছিল না। ফলে কয়েক মাস পরেই উহা ভাঙ্গিয়া যায়। প্রায় পাঁচ বৎসর যাবত কাসিম প্রতিযোগী সামরিক এবং বেসামরিক দলগুলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিতে সচেষ্ট থাকেন। তাঁহার শাসনামলে ইরাক বাগদাদ চুক্তি হইতে বাহির হইয়া আসে এবং সকল কম্যুনিস্ট দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ১৯৬৩-এর ফেব্রুয়ারী মাসে সেনাবাহিনীর প্যান-'আরব মতাবলম্বী দলের এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে কাসিম ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। তাঁহার সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে ইরাকের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নকরণ, ইরাককে 'আরব দুনিয়ার সঙ্গে একত্রিতকরণ এবং কুর্দী বিদ্রোহ। তাঁহার পরে ক্ষমতা দখল করেন উল্লিখিত প্যান-'আরব বা'ছ' (Bath) পার্টির প্রতিনিধিত্বকারী একটি সরকার। কিন্তু মাত্র সাত মাস পরেই কর্নেল 'আবদুস সালাম আরিফ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কর্নেল (পরে ফীল্ড মার্শাল) 'আরিফ ১৯৬৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে দেশ হইতে সামরিক আইন তুলিয়া নেন এবং বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। 'আরিফ সরকার মিসরকে সমর্থন প্রদান করেন, কুয়েত এর স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া নেন এবং সংযুক্ত 'আরব প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে ইরাকের যুগ্ম রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্থাপন করিতে সচেষ্ট হন। 'আরিফ সরকার কম্যুনিস্ট-বিরোধী ছিলেন। প্রথম দিকে তাঁহার নূতন সরকারের উপরে বা'ছ' পার্টির প্রভাব বেশী ছিল, কিন্তু পরে তিনি মন্ত্রীপদ হইতে সেই পার্টির সকল সদস্যকে বাদ দেন। ১৯৬৬-এর মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট আরিফ এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন এবং তাঁহার ভাই, একই নামধারী মেজর জেনারেল 'আবদুর-রাহমান মুহাম্মাদ 'আরিফ প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৬৮-এর জুলাই মাসে বা'ছ' পার্টির সদস্যগণ দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট 'আরিফকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

অতঃপর সাবেক প্রধানমন্ত্রী মেজর জেনারেল (পরে ফীল্ড মার্শাল) আহমাদ হাসান আল-বাক্র প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মন্ত্রী হন। দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্পিত হয় একটি বিপ্লবী কমাণ্ড কাউন্সিলের উপর। আল-বাক্রের শাসনামলে সিরিয়ার সঙ্গে ইরাকের সম্পর্কের উন্নতি হয়। ১৯৭৯-এর ১৬ জুলাই বিপ্লবী পরিষদের ভাইস-প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসায়ন আল-বাক্রকে অপসারিত করিয়া বিপ্লবী পরিষদের (Revolutionary Command Council) চেয়ারম্যান এবং দেশের প্রেসিডেন্ট হন। সেই বৎসরই তিনি বাছ' ও কমুনিস্টদের যৌথ দল ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ ফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া দেন। পর বৎসর ১৯৮০ খৃ. তিনি জাতীয় সনদ (National Charter) ঘোষণা করেন এবং ইরাকের জোটনিরপেক্ষতাও ঘোষণা করেন। ১৯৮০-এর জুন মাসে দেশের ২৫০ সদস্যের জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে দেশের অন্যতম বড় সমস্যা কুর্দী স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের ৫০ সদস্যের আইন পরিষদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার প্রচেষ্টায় দেশে বিবিধ নির্মাণ কর্ম, রেলপথ সম্প্রসারণ, সড়ক যোগাযোগ, কৃষি এবং শিক্ষার অগ্রগতি সাধিত হয়।

**ইরাক-ইরান যুদ্ধ** ঃ ইরাক ১৯৮০ সনের ১৬ সেপ্টেম্বর ইরাক-ইরান সীমান্ত চুক্তি (১৯৭৫ খৃ.) বাতিল বলিয়া ঘোষণা করে, ২২ সেপ্টেম্বর ইরাকী সেনাবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে। পূর্ণ চার বৎসর ব্যাপী প্রতিদিন যুদ্ধ চলিবার পরেও কোন পক্ষই ভূভাগ দখলের দিক হইতে তেমন কোন বড় সুবিধা অর্জন করিতে পারে নাই। কিন্তু উভয় পক্ষই বিপুল লোকক্ষয় এবং অপরিমিত অর্থনৈতিক ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ১৯৮২ খৃ. শুধু ইরাকের যুদ্ধব্যয় হইয়াছে প্রতি মাসে গড়ে এক হাযার মিলিয়ন ডলার। যুদ্ধের কারণে ইরাকের তৈল উৎপাদন এবং রফতানী মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ১৯৭৯ খৃ. যেখানে দৈনিক উৎপাদন ছিল ৩৪,৫০,০০০ ব্যারেল, ১৯৮০ খৃ. যুদ্ধ শুরুর বৎসরে উৎপাদন হ্রাস পাইয়া তাহা দাঁড়ায় ২৬,৪৫,০০০ ব্যারেলে। আর ১৯৮১ খৃ. উৎপাদন ছিল মাত্র ৯,০০,০০০ ব্যারেল। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা অবশ্য অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করা হয়। ১৯৮২ খৃ. জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের শীর্ষ সম্মেলন বাগদাদে অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু এই যুদ্ধের কারণে সম্মেলন সেখানে অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই; পরে তাহা নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়।

ইরাকের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্বে সংক্ষেপে আধুনিক ইরাকের একটি সামগ্রিক পরিচিতি প্রদান করা যাইতে পারে। ইরাক ১৫টি প্রদেশে বিভক্ত, তাহা ছাড়া রহিয়াছে ৩টি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, তন্মধ্যে একটি কুর্দীদের অঞ্চল। দেশের অধিবাসিগণের ৯৫% মুসলিম, তন্মধ্যে প্রায় ৫০% শী'আ মতাবলম্বী, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতগণের অধিকাংশই সুন্নী মতাবলম্বী। ১৯৭৮ খৃ. দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা ছিল ১০০% দেশে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে, ১৯৮০ খৃ. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নির্মাণ ব্যয় ধরা হইয়াছিল নয় শত মিলিয়ন ডলার। দেশের প্রধান উৎপাদিত পণ্য গম, ধান, যব, ভুট্টা, গোল আলু, তরমুজ, আঙ্গুর খেজুর ও তূলা; প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য খেজুর ও তূলা। ইরাক বিশ্বে সর্বাধিক খেজুর উৎপাদনকারী দেশ; ১৯৮১ খৃ. মোট উৎপাদন ছিল (FRO হিসাবে) ৪,০৫,০০০ মেট্রিক টন। ইরাক মধ্যপ্রাচ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈল উৎপাদনকারী দেশ, ১৯৭৯ খৃ. দৈনিক উৎপাদন ছিল ৩.৪৫ মিলিয়ন ব্যারেল। দেশের বিশাল অর্থনৈতিক আয়ের মূল উৎস এবং বিশাল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূলে রহিয়াছে তৈল আয়। ১৯৭৪ খৃ. তৈল আয় ছিল ৬,০০০ মিলিয়ন ডলার, ১৯৭৮ খৃ. ৮,০০০ মিলিয়ন ডলার, ১৯৮০ খৃ. ২৬,৫০০ মিলিয়ন ডলার এবং ১৯৮১ খৃ. ১০, ৪০০ মিলিয়ন ডলার। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া মাওসিল ও কিরকুক এলাকায় অধিকাংশ তৈল উত্তোলিত হয়। তৈল উত্তোলনে নিয়োজিত রহিয়াছে ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী নামক আন্তর্জাতিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। দেশের প্রধান বন্দর বসরা। সমগ্র দেশে ২,০০০ কিলোমিটার রেলপথ রহিয়াছে। বর্তমানে রেল ও সড়ক যোগযোগের ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করা হইতেছে। পর্যটন দেশের আয়ের একটি বড় উৎস। সুপ্রাচীন সভ্যতার দেশ বলিয়া প্রতি বৎসর বহু বিদেশী ইরাক সফর করিতে আসে। ১৯৭৮ খৃ. আগত পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৭,১৯,৮২৩। ইরাকের উর, ব্যাবিলন, নিনেভ ইত্যাদি স্থান সুমেরীয়, ব্যাবিলোনীয় ও আসিরীয় সভ্যতার স্থান, সেইগুলি ব্যতীত আল-কূফা, কারবালা, বাগদাদ, মাওসিল (মসুল), বসরা ইত্যাদি স্থান ইসলামের ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত, বহু মুসলিম প্রতি বৎসর এই সকল স্থান সফর করিয়া থাকেন। ইরাকের প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে রহিয়াছে বিপ্লবী কমাণ্ড কাউন্সিল (RCC)। এই কাউন্সিল ৯ সদস্য বিশিষ্ট। কাউন্সিলের সভাপতি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসায়ন। দেশে ১৮ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক তরুণের জন্য সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) P. W. Ireland, Iraq, a study in Political development, লণ্ডন ১৯৩৭ খৃ.; (২) 'আবদুর রায্যাক আল-হাসানী, তারীখুল-ওয়াযারাতি'ল-'ইরাকিয়্যা ১০ খণ্ডে, সিডন ১৯৩৪-৫৮ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, তারীখুল ইরাক আস-সিয়াসী আল-হাদীছ, ৩ খন্ডে, বাগদাদ ১৯৪৯ খৃ.; (৪) S. H. Longrigg, Iraq 1900 1950 লণ্ডন ১৯৫৬ খৃ.; (৫) মাজীদ খাদ্দূরী, Independent Iraq, লণ্ডন ১৯৬০ খৃ.; (৬) ঐ লেখক, Republican Iraq, লণ্ডন ১৯৬৯ খৃ.; (৭) U. Dann, Iraq under Qassem, লণ্ডন ১৯৬৯ খৃ.; (৮) ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস, বাংলা বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, প্রবন্ধ, ইরাক' এবং 'আরব লীগ', ঢাকা নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭২ খৃ.; (৯) Europa year Book, 1983, vol. II, Art. Iraq, Europa Publications Ltd, London 1984; (১০) Descriptive Map of the United Nations, U. N. Publication, 1983.

A. Kelidar (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

৪। **ভাষা** ঃ ইরাকের রাষ্ট্রীয় ভাষা 'আরবী (দ্র. 'আরাবিয়্যা)। কিন্তু 'আরবী ভাষাভাষী অঞ্চল একই প্রকৃতির নহে, বরং কিছু ইরানী আঞ্চলিক ভাষা এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে কুর্দী ভাষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি কুর্দিস্তান অঞ্চলে এই ভাষাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

**(ক) 'আরবী আঞ্চলিক ভাষাসমূহ** ঃ দুইটি বৈশিষ্ট্যময় উপভাষা রূপ, প্যান-'আরবীয় বিভাগেরই একটি আলাদা রূপ, 'কাল' উপভাষা ও 'গাল' উপভাষা, মেসোপটেমীয় অঞ্চলে একযোগে ব্যবহৃত হয়। কাওল (অর্থ বলা) ক্রিয়া পদের রূপের উত্তম পুরুষে এক বচনে উহাদের বলা যায় কিল্তু উপভাষা এবং গিলিত উপভাষা; উহাদের তিনটি গঠন-বৈশিষ্ট্য, যথাঃ প্রাচীন 'আরবী কাফ (ق) (reflexes), অনুসর্গের রূপ বা আকার এবং স্বরধ্বনি ব্যবহারের মাত্রা। এই বিভাগ অংশত অঞ্চলভিত্তিক অংশত সামাজিক কিল্তু ভাষা বলে সামাররাফালুজা রেখার উত্তরে বসবাসকারী স্থায়ী

অধিবাসিগণ এবং উক্ত রেখার দক্ষিণে বসবাসকারী যাযাবর অমুসলিমগণও; গিলিত ভাষা বলে সকল অঞ্চলেরই যাযাবর বেদুঈন, অর্ধ যাযাবর ও বেদুঈনে পরিণত অধিবাসিগণ এবং উল্লিখিত রেখার দক্ষিণে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মুসলিমগণ। কিলতু উপভাষার সঙ্গে পূর্ব আনাতোলিয়াতে (মারদিন, দিয়ার বাক্‌র, সির্ত এবং উরফা প্রদেশ) ব্যবহৃত 'আরবী ভাষারূপের ঘনিষ্ঠ মিল রহিয়াছে, আর গিলিত উপভাষা কুয়েত পারস্য উপসাগর এবং খুযিস্তান পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। নাজ্‌দ ও উযবেকিস্তানের উপভাষাসমূহের সংগেও উহাদের মিল রহিয়াছে। নাজ্‌দ হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে আগত লোকগণ, যথা শাম্মার ও 'আনাযা উপজাতিগণের ব্যবহৃত সমগোত্রীয় বিষয় এখানে আর আলোচনা করা হইল না।

বাগদাদের মুসলমানদের (এখন হইতে মুবা. দ্বারা নির্দেশ করা হইবে) উপভাষা বিষয়ক নির্ভরযোগ্য তথ্যাবলী গত দশকে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু অপর উপভাষা গিলিত বিষয়ে শুধুমাত্র আল-হিল্লা প্রদেশের কোবীরীসে (এখন হইতে কোবী' দ্বারা নির্দেশ করা হইবে) ব্যবহৃত রূপ নিয়া আলোচনা করা হইয়াছে (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.) যদিও আল-হিল্লা, আল-'আফাচ এবং বসরার তথ্যাদিও সাম্প্রতিককালে পাওয়া গিয়াছে। কিলতু উপভাষার মধ্যে য়াহূদী বাগদাদী ('য়. বা.') এবং খৃস্টান বাগদাদী ('খৃ. বা.') সম্বন্ধে বেশ বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করা হইয়াছে, মাওসিলের উপভাষা ('মাও') স্বল্প জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে আর 'আনা, তিকরীত ও হীত সম্বন্ধে কিছু বিচ্ছিন্ন টীকা পাওয়া যায়।

**ধ্বনিতত্ত্ব** ঃ কিলতু উপভাষার বৈশিষ্ট্য হইতেছে ক'াফ ( ق ) প্রাচীন 'আরবীর ক'াফ ( ق )-এর ন্যায় উচ্চারিত হয় (যেমন, ক'াল 'তিনি বলিলেন, ক'াম তিনি উঠিলেন, বাক' 'সে চুরি করিল') এবং কাফ ( ك ) প্রাচীন 'আরবীর কাফ ( ك )-এর ন্যায় উচ্চারিত হয় (যেমন, কান 'তিনি ছিলেন, কাল্‌ব' একটি কুকুর, 'হ'াকা' তিনি বলিলেন') যদিও এই সকল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে 'আনা-তে চ ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। গিলিত উপভাষাসমূহে প্রাচীন 'আরবী ক' ( ق )-এর স্থানে গ ( گ ) ব্যবহৃত হয় (গাল, গাম, বাগ) যদিও বা. মু. তে অনেক ক্ষেত্রে ق-ই ব্যবহৃত হয় (কি'রা 'তিনি পাঠ করিলেন', বুক'া তিনি রহিলেন', কি'বাল তিনি গ্রহণ করিলেন') এবং সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে গ ব্যবহৃত হয় (রিফিগ 'সঙ্গী', সারগি সারকি'' পূর্বাঞ্চলীয়); এবং প্রাচীন 'আরবী ক ( ك )-এর স্থলে অনেক ক্ষেত্রেই 'চ' ব্যবহৃত হয় (চিবির 'বড়', কিন্তু কিবার 'বড়, বহুবচনে', চান "তিনি ছিলেন", কিন্তু য়াকূন তিনি হইবেন', চালবাক 'তোমার (পুং., এক বচনে) কুকুর', চালবিচ তোমার (স্ত্রী. এক বচনে) কুকুর; ব্যঞ্জন ধ্বনির ঘর্ষরূপের পরিমাণ বা মাত্রার মু. বা. উপভাষার সঙ্গে গ্রাম অঞ্চলের গিলিত উপভাষার প্রভেদ রহিয়াছে ঃ মু. বা. আকিল 'খাদ্য' গাইদ 'বসিয়া আছে'-এর স্থলে কো. বী, আচিল, গাইদ। সর্বদক্ষিণাঞ্চলের গিলিত উপভাষায় প্রাচীন 'আরবী গ ( گ ) ধ্বনির স্থলে য় ( ی ) উচ্চারিত হয়। অধিকাংশ কিলতু উপভাষায় (মাও., খৃ. বা., য়. বা., তিক্‌রিত) প্রাচীন আরবীর ( ر ) ধ্বনির স্থলে গ ( گ ) ধ্বনি ব্যবহৃত হইয়াছে; এইরূপ বহু উদাহরণ পাওয়া যায় (যথাঃ গাস, 'মাথা')। একমাত্র 'আনা বাদে তাহাদের উচ্চারণে সজোর ইমালা রহিয়াছে (মাও ও খৃ. বা. বেগিদ 'ঠাণ্ডা', য়. বা. বিযিদ), অথচ গিলিত উপভাষায়, বিশেষ করিয়া মু. বা. সকল অবস্থানে নিম্ন, মধ্য এবং এমন কি পশ্চাৎ মুখী আ ধ্বনি হয়। উভয় শ্রেণীরই কয়েকটি উপভাষাতে প্রাচীন আয় এবং আও ধ্বনি রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু সেইগুলি সাধারণত এ এবং ও দ্বারা লিখিত হয়, উচ্চারিত ২য় সাধারণত মধ্যম ধ্বনিতে।

প্রাচীন ই (i) এবং (u), হ্রস্ব ই ধ্বনির সাহায্যে উচ্চারিত হয়, কিলতু উপভাষায়, কিন্তু উহা শুনিতে সাধারণত মধ্য মূর্ধাজাত ধ্বনির ন্যায় শোনায় (যথাঃ কিল্ল, 'সকল', কিননা' আমরা ছিলাম, কেতিব লিখিতেছে, বে কি'ফ 'দাঁড়াইয়া আছে'), অথচ মু. বা.-এ ই এবং উ- এই উভয় ধ্বনিই রহিয়াছে যদিও উহাদের পুনঃবিস্তৃতি ঘটিয়াছে (যথাঃ কুল্ল, চিন্না, কাতিব, ওয়াগুফ)। হ্রস্ব আ ধ্বনির ব্যবহার অত্যন্ত জটিল, ইহা সামগ্রিকভাবে কিলতু-গিলিত বিচ্ছিন্ন রীতির অনুসারী নহে, তবে একটি ব্যতিক্রম আছে যাহা মু. বা.-এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেমন গিমাল 'উট', গুমার 'চাদ' বনাম মাও. গামাল, কামাগ। গিলিত উপভাষায় প্রকৃতপক্ষে সার্বজনীনভাবে স্বরধ্বনির প্রথমে দীর্ঘ ও পরে হ্রস্ব উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়, এখানে অতিরিক্ত সংযোজিত স্বরধ্বনি প্রয়োগ ও পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের হয়; চালিব 'কুকু', দারুব 'পথ', বা'আদ 'এখনও'; কিলতু উপভাষা স্বরধ্বনির দীর্ঘ উচ্চরণের মাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ লাভ করে, উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রক্ষণশীল, যেমন য়. বা.-এর প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ ভেদ নাই। যেমন কালব, দাগব, বা'দ। একমাত্র খৃ. বা.-এর ব্যতিক্রম বাদে আর সকল উপভাষারই সাধারণ নিয়ম এই যে, সেখানে দন্ত্য ধ্বনি রক্ষিত হয়, (বিশেষ করিয়া গিলিত গোষ্ঠীর উপভাষাতে), নূতন ধ্বনিচিহ্ন চ ( چ ) ও গ ( گ ) ব্যবহৃত হয় এবং তাহা কিল্‌তু গোষ্ঠীর ভাষাতেও, উভয় ধরনেরই অন্তত শহরের ভাষায় একটি নূতন ধ্বনিচিহ্ন প ( پ ) ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

**শব্দরূপ বা গঠনরীতি** ঃ বিশেষণীয় অনুসর্গের রূপে নিম্নে দেখান হইল। কিলতু উপভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ মাওসিল শব্দরূপে এবং গিলিত উপভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ মু. বা. শব্দরূপে দেখান হইয়াছে। 'ভাই' এবং 'ঘর' শব্দের রূপ ঃ

| | মাওসিল | | মু. বা. (মুসলিম বাগদাদ) | |
|---|---|---|---|---|
| উত্তম এ. ব. | আহূ'য়ি | বেতি | আহূ'য়া | বেতি |
| মধ্যম পুং এ. ব. | আহূ'ক | বেতাক | আহূ'ক | বেতাক |
| মধ্যম স্ত্রী এ. ব. | আহূ'ক | বেতকি | আহূ'চ | বেতিচ |
| নাম পুং এ. ব. | আহূ'নু | বেতু | আহূ' | বেতা |
| নাম স্ত্রী এ. ব. | আহূ'হা | বেতা | আহূ'হা | বেত্‌হা |
| উত্তম ব. ব. | আহূ'না | বেত্‌না | আহূ'না | বেতন |
| মধ্যম ব. ব. | আহূ'কিম | বেত্‌কিম | আহূ'কুম | বেতকুম |
| নাম ব. ব. | আহূ'হিম | বেতিম | আহূ'হুম | বেতহুম |

কিলতু উপভাষাতে স্ত্রীলিঙ্গের অনুসর্গ রূপই এবং আ-এর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়, গিলিত উপভাষাতে বরাবর আ থাকে। মাও-এ কালবি 'কুকুরী' (কেহ কেহ উচ্চারণ করে কালবে), বেদ' 'ডিম্ব; (য়. 'কুফরী' বা. কালবা, বেদি), মু. বা. চালবা, বেদা। সংযোগের ক্ষেত্রে এবং অনুসর্গ সমেত, দুই উপভাষার ক্ষেত্রে এই অনুসর্গের ভিন্ন ভিন্ন শব্দ রূপ হয়; মাও. কাল্‌বিত, আহূ'য়ি, কাল্‌বিতি, কাল্‌বিত্‌না, তুলনায় মু. বা. চাল্‌বাত, আহূ'য়া, চালিবতি, চাল্‌বাত্‌না। সমগ্র অঞ্চলে কাত-তাল বিশেষ্যের বহুবচনের সাধারণ রূপগুলি এইরূপ; কসালা (মু. বা.), কাসালি (মাও) 'অলস' বিশেষণের ক্ষেত্রে-আন, এবং হায়ায়ীত (মু. বা.), হায়ীয়ীত (মাও.), দরজী রং এবং দৈহিক খুঁত বুঝাইবার বিশেষণের স্ত্রীলিঙ্গের রূপে কিলতু উপভাষার ক্ষেত্রে স্বরধ্বনির দীর্ঘায়িত সজোর উচ্চারণ হয়, আর গিলিত উপভাষার ক্ষেত্রে স্বরধ্বনির সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ হয়। মাও সোদা কালো, 'আময়া 'অন্ধ'-এর তুলনায় মু. বা. সোদা, 'আম্‌য়া। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে সাধারণ

শ্রেণীরূপই হইয়া থাকে, ৪র্থ শ্রেণীরূপ কম ব্যবহৃত হয়। ১ম শ্রেণীরূপে মাত্র একটিই, কিতাল কুতাল (কোনটির পরে কোনটি তাহা অবস্থার উপরে নির্ভর করে) রূপ গিলিত উপভাষায় ব্যবহৃত হয়, যথা, কিতাব সে লিখিয়াছিল' এর বিপরীতরূপে তুবাখ সে রান্না করিয়াছিল, কোন কোন কিলতু উপভাষায় একটি মাত্র কাতাল শব্দরূপ, অন্যান্য উপভাষায় দ্বিবিধ কাতাল বনাম কিতিল রূপ রহিয়াছে, যথা, মাও কাতাব 'সে লিখিয়াছিল'-এর বিপরীত রূপ সিগিব 'সে পান করিয়াছিল। মাও এবং মু. বা. কথ্য ভাষায় শুধু কাতাল শব্দের উদাহরণ দেখান হইল ঃ

| | মাওসিল | | (মসুন) | (মুসলিম বাগদাদ) |
|---|---|---|---|---|
| উত্তম এ. ব. | কাতব্তু | আক্তিব | কিতাবিত | আক্তিব |
| মধ্যম পুং এ. ব. | কাতাবিত | তিক্তিব | কিতাবিত | তিক্তিব |
| মধ্যম স্ত্রী এ. ব. | কাতাব্তি | তুকিত্বিন | কিতাব্তি | তুকিত্বিন |
| নাম পুং এ. ব. | কাতাব | য়িক্তিব | কিতাব | য়িক্তিব |
| নাম স্ত্রী এ. ব. | কাতাবিত | তিক্বিত | কিত্বাত | তিক্তিব |
| উত্তম ব. ব. | কাতাব্না | নিক্তিব | কিতাবনা | নিক্তিব |
| মধ্যম ব. ব. | কাতাব্তিম | তুকিত্বুন | কাতাব্তু | তকিত্বুন |
| নাম ব. ব. | কাতাবু | য়কিতবুন | কিত্বাও | য়িকত্বুন |

Imperfect এয়ুন রূপ সমগ্র অঞ্চলেরই বৈশিষ্ট্য, উহা ব্যতীত পূর্ব আনাতোলিয়া 'উত্তর এবং উযবেকিস্তানেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রাম অঞ্চলের গিলিত উপভাষাসমূহের ক্ষেত্রে (এবং মু. বা.-এর কোন বক্তা) ক্রিয়ার এবং কর্ম (Pron suff)-এর মধ্যম ও নাম পুরুষের বহুবচনের রূপে লিঙ্গভেদে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। কিলতু উপভাষার ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য নাই। বর্তমান indicative-এর চিহ্নসূচক রূপ (যথা, মাও. কা- বা. মু. দা-) অধিকাংশ উপভাষাতেই লক্ষ্য করা যায়।

**বাক্য বিন্যাস** ঃ অধিকাংশ অঞ্চলেই অনির্দেশিত বিশেষ্য সাধারণত প্রাচীন 'আরবী হইতে গৃহীত ধ্বনিরূপ দ্বারা চিহ্নিত, ফারদ (মু. বা. ফাদ, ফারিদ) নির্দেশিত কর্ণের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাতে বিভিন্ন নিয়মানুবর্তিতায় একটি সর্বনাম অনুসর্গ ও তৎসঙ্গে ল (ل) যুক্ত হয়, যথা, মু. বা. সিফতা লাহুক 'আমি তোমার ভাইকে দেখিয়াছিলাম। এই অঞ্চলে প্রায়শ ব্যবহৃত গঠনরীতির মধ্যে রহিয়াছে এই শ্রেণীর বাক্য, যেমন, ওয়ালাদ ইয়যেন 'ভাল ছেলে' অর্থাৎ এক ধরনের তৈরী বাক্যাংশ যাহা নির্ধারিত বিশেষ্যের স্থলে বসে এবং তৎসঙ্গে বিশেষণীয় বাক্যাংশ যুক্ত হয়। খৃ. বা. (খৃস্টান বাগদাদ)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য-যদিও পূর্ব আনাতোলিয়ার ভাষাতেও ইহা লক্ষ্য করা যায়— হইতেছে তবে ব্যবহার্য বাক্যাংশ যুক্তকারী (Postposed copula)-এর ব্যবহার, যথা, হাদা সিগলাক ইয়ানু 'উহা তোমার ব্যাপার। না-বাচক শব্দ অন্তে ব্যবহার্য (Postposed) স-বিহীন 'ম' চিহ্ন দ্বারা বুঝান হয়, আর না-বাচক imperative-এর ক্ষেত্রে লা ব্যবহৃত হয়।

**শব্দ-সম্ভার** ঃ সামগ্রিকভাবে অনেকগুলি বিষয়ই এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য; সেইগুলির মধ্যে রহিয়াছে তুর্কী ও ফার্সী ভাষা হইতে ধার করা বিপুল সংখ্যক শব্দ। নিম্নলিখিত শব্দসমূহ মু. বা. উপভাষাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যদি অবশ্য অন্যরূপ নির্দেশিত না হয়, আদামি 'ব্যক্তি, ব্যক্তিবিশেষ'; বাযুযুন (আ) 'বিড়াল', বাগ 'চুরি করা'; বীবি, 'দাদী বা. নানী'; তুফ্‌গা 'রাইফেল'; তিম্মান 'চাউল'; গ্রেদি 'ইদুর'; চারাক 'এক-চতুর্থাংশ', চাতাল কাঁটা'; হালিগ 'মুখ'; হুনতা 'গম'; হাসিম 'নাক' হাসূগা 'চামচ'; হিতাল 'লুকানো'; (intransitive)। খোশ 'ভাল'; দায্ 'পাঠানো', (transitive) 'আগরুগ্‌গা 'ভেক', কাসমার 'ছলনা করা' গুব্বা 'কক্ষ'; গাদ্দা 'ভিক্ষা করা', লাহ, লুহ 'অপর' (মাররত ইল্লহ 'পুনরায়'); মেষ 'টেবিল'; মেওয়া 'ফল'; নিতা (মাও তা'আ) 'দেওয়া'; হদূম (মাও হূওয়াস) 'কাপড়-চোপড়' হায়স'গরু'। অব্যয়ের মধ্যে লক্ষণীয় আকু 'আছে', ইহার নঞার্থক মাকু; সম্বন্ধসূচক চিহ্ন মাল এবং বিশেষণীয় বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণ হাম 'ও'; হাওআয়া 'অনেক (পরিমাণ বা সংখ্যা)' দক্ষিণাঞ্চলে (ওয়াজিদ); হনা (য়া) 'এখানে' (মাও হোনি); হূনাকা 'সেখানে' (মাও হোনিক, হূনুকা); হিচি 'এইভাবে' (মাও হাকিও), লুবারহা 'গতকাল' (মাও. মূবেহা), বাচির 'আগামীকাল' (মাও. গাদা); জিজ্ঞাসাবাচক মিনু 'কে'; সিনু 'কি'; (মাও. আশ); শ্লোন 'কিভাবে' (মাও. আস. লোন); ওয়েন 'কোথায়' (মাও. এসাব), বিস্ময়, ভয়, হর্ষ বিষয়ক অব্যয়ের ক্ষেত্রে ঈ, বালি 'হ্যাঁ', আস্ (কোনস প্রতিষ্ঠিত ঘটনা পর্যবেক্ষণ আস্গেত 'এই যে তুমি'), xo (আশা বা ভাবনার বিষয় বুঝাইতে হো মা তাওয়েত, আঘাত লাগে নাই, অশো করি ? ইয়েযি "যথেষ্ট হইয়াছে।"

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ ১৯৬২ খৃ. পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকার জন্য দ্র. (১) H. Blanc, Iraqi Arabic, in H. Sobelman, ed., Arabic dialect studies, Washington 1962, and some addenda in JAOS, Ixxxlv (1964), পৃ. ৩০৪। বাগদাদ সম্বন্ধে ঃ (২) W. M. Erwin, A short reference grammer of Iraqi Arabic, Washington 1963; (৩) N. Malaika, Grundzuge der grammatik des Arabischen Dialektes von Bagdad, Wiesbaden 1963; (৪) R. J. McCarthy and F. Raffouli, Spoken Arabic of Baghdad, pt. I, Grammar and exercises, Beirut 1964, pt. IIa, Anthology of texts, Birut 1965; (৫) H. Xlanc, Communal dialects in Baghdad, Cambridge Mass. 1964; (৬) S. J. Altoma, The problem of diglossia in Arabic-A comparative study of classical and Iraqi Arabic, Cambrige Mass., 1969; এবং নিম্ন লিখিত অভিধানসমূহ ঃ (৭) জালাল আল-হানাফী, মু'জামুল-লুগাতিল-'আম্মিয়্যা আল-বাগদাদিয়্যা, ১ম অংশ, হারফ আল-আলিফ, বাগদাদ ১৯৬৩ খৃ., ২য় অংশ হারফ আল-বা, বাগদাদ ১৯৬৬ খৃ.; (৮) B. E. Clarity, K. Stowasser and R. Wolfe, A dictionary of Iraqi Arabic (English-Arabic), Washington 1964.; (৯) D. R. Woodhead and W. Beene, A dictionary of Iraqi Arabic (Arabic-English), Washington 1967; মূল পাঠের জন্য আরও দ্র. ঃ (১০) J. Lecerf, Poesie dialectale iraqienne dans les milieux baghdadiens, in Arabica, ix (1962), 435-6; (১১) ঐ লেখক, Ani ummak ya Saker je suis ta mere, o Saker-Piece de Yusuf al-ani in Arabica, xii (1965), 225-43. কওয়েরিস ও অন্যান্য উপভাষার জন্য দ্র. ঃ (১২) B. Meissner, Neuarabische Geschichten aus dem

Iraq, Leipzig 1903 এবং (১৩) F. H. Weissbach কর্তৃক উহার সমালোচনা ZDMG-তে, lviii (1904), 931-48; (১৪) F. H. Weissbach, Beitrage zur Kenntniss des Irak-Arabischen, i, Leipzig 1908, ii, Leipzig 1930; (১৫) A. Denz and D. O. Edzard, Iraq-Arabische Texte nach Tonbandaufnahmen aus al-Hilla, al-`Afac und al-Basra in ZDMG, cvi (1966), 60-96. অন্যান্য ইরাকী উপভাষার জন্য দ্র. ঃ (১৬) H. Blanc, পূ. গ্র., এবং সেখানে নির্দেশিত গ্রন্থসমূহ।

H. Blance (E. I.²)/হুমায়ুন খান

**(খ) ইরানী উপভাষাসমূহ ঃ** শী'আগণের নিকট পবিত্র শহর কারবালা। কাজিমায়ন ও নাজাফের অধিবাসিগণের বিরাট অংশ ফার্সী ভাষায় কথা বলিলেও ইরাকে প্রচলিত প্রধান ইরানী ভাষা হইল কুর্দী ভাষা। সুলায়মানিয়্যার এবং 'আরবীলের লিওয়ার অধিবাসীগণের প্রায় সকলেই এবং কিরকূকের অর্ধেক অধিবাসী কুর্দী, উহারা কেন্দ্রীয় কুর্দী উপভাষায় কথা বলে। মাওসিল (মসুল) লিওয়াতে, উক্তর কুর্দীয় বাহদীনানী উপভাষা বলে 'আকরা, 'আমার্দিয়্যা, দুহোক এবং যাখু, নাহিয়াগুলিতে, আর সিনজারের য়াযীদীগণ উহারই সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ভাষা বলে। খানাকিনে এবং দিয়ালা-র মানদালী অঞ্চলে দক্ষিণী কুর্দী ভাষা প্রচলিত (দ্র. কুর্দীগণ ভাষা)।

অপর দুইটি ইরানী ভাষাকেও প্রায়ই ভুলক্রমে কুর্দী ভাষায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে, সেইগুলি হইল গুরানী ও লুরি ভাষা। প্রথমোক্তটি ইরাকে বাজালানী ভাষা নামে পরিচিত (দ্র. বাজালান) এবং হাওরামী ভাষা সীরওয়ান নদীর উত্তরে পারস্য সীমান্তের নিকটস্থ অল্প কয়েকটি গ্রামের অধিবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত (দ্র. হাওরামান, গুরান, ভাষা)। সকল ইরানী ভাষার মধ্যে যেইটি আধুনিক ইরানী ভাষার সর্বাধিক নিকটবর্তী উহা লুরি, বাগদাদের কুলিরূপে সুপরিচিত ফায়লিয়্যাগণ এই ভাষায় কথা বলে।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধসমূহ দ্র. ঃ তাহা ছাড়া (১) D. N. Mackenzie, Kurdish Dialect Studies, ২ খণ্ডে, লণ্ডন ১৯৬১-৬২ খৃ.; (২) ঐ লেখক, The Dialect of Awromean, Copenhagen 1966.

D. N. Mackenzie (E.I.²)/হুমায়ুন খান

**'আরবী সাহিত্য ঃ** ইরাকের সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের ইতিহাস খিলাফাতের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এই অর্থে যে, 'আরবী সাহিত্য, যাহা উমায়্যাগণের আমলে (যদিও তাঁহাদের রাজধানী ছিল দামিশ্কে) এবং 'আব্বাসীগণেরও আমলে যখন তাঁহারা সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক ছিলেন, প্রায় একান্তভাবেই ইরাকী সাহিত্য ছিল; এই সাহিত্য বিভিন্ন প্রদেশে স্বাধীন রাজবংশসমূহ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। সাহিত্য সৃষ্টি, একেবারে কড়াকড়ি অর্থে, একদিকে-কাব্যের ক্ষেত্রে-পৃষ্ঠপোষকতার উপরে নির্ভরশীল ছিল এবং অপর দিকে-গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে-প্রশাসনিক দফতরের উপরে নির্ভরশীল ছিল, যেখানে কুত্তাব (এ. ব. কাতিব-সচিব, করণিক) পদে নিযুক্তি লাভের সুযোগ ছিল। প্রতিভাবান কবিগণ যখন পৃষ্ঠপোষকের সন্ধানে প্রাদেশিক দরবারসমূহে চলিয়া যাইতে শুরু করেন এবং অত্যন্ত সুদক্ষ লিপিকারগণও স্থানীয় শাসকগণের চাকুরীতে চলিয়া যাইতে থাকেন, তখন ইরাকের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইতে শুরু করে। আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, যখনই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিপজ্জনক বলিয়া মনে হইয়াছে তখনই সকল শ্রেণীর লেখক ও পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্যের দিকে, বিশেষ করিয়া মুসলিম স্পেনে চলিয়া গিয়াছে। অতএব বলা যাইতে পারে যে, ৪র্থ/১০ম শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া ইরাককে সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে ক্রমেই বেশী করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইয়াছিল— যদিও ইরাক তখন পর্যন্ত সর্বাগ্রেই ছিল। যে ক্রমাবনতি ইতিমধ্যেই শুরু হইয়া গিয়াছিল তাহা সালজূকীদের আমলে আরও বেশী দ্রুততর হয় এবং মঙ্গোলদের হাতে বাগদাদ পতনের ফলে ইরাকে 'আরব সংস্কৃতির উপরে তাহা মরণ-আঘাতস্বরূপ হয়। সেখানে তখন 'আরব ইসলামী সভ্যতা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ম্রিয়মান দেখা যায়, ফলে একেবারে খৃ. ১৯শ শতক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ঘটনাক্রমে ইরাক কতকটা শ্লথগতিতেই পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় তীরবর্তী দেশসমূহের নাহদা (সংস্কার) অনুসরণ করিতে থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বিপ্লবী পথে অগ্রসর হয়।

ইসলাম পূর্বকাল হইতেই ইরাকে 'আরবী কবিতা রচিত ও আলোচিত হইত, বিশেষ করিয়া আল-হীরাতে (দ্র.) লাখমী নামক একটি 'আরব রাজবংশ 'আরবের অধিবাসী কবিগণকে সমাদর করিতেন, যেমন, আন-নাবিগা আয-যুবায়ানী কিংবা স্থানীয়, বিশেষ করিয়া খৃস্টানদের মধ্য হইতে প্রতিভাবানদের কাব্য প্রতিভা স্ফুরণে সহায়তা করিতেন, উহাদের মধ্যে 'আদী ইব্‌ন যায়দ আল-'ইবাদী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। নির্ভরযোগ্য বলিয়া গৃহীত কিছু খণ্ড কবিতা, যাহা এখনও বিদ্যমান, সেইগুলি বিচার করিলে দেখা যায় যে, আল-হীরাতে যে কবিতা বিকাশ লাভ করিয়াছিল সেইগুলি ছিল নগর জীবনের কবিতা, সেইগুলিতে প্রশস্তি অবশ্যই থাকিত, কিন্তু ভোগ লালসাও ইহাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। লাখমী রাজবংশের পতনের (৬০২ খৃ.) স্বল্পকাল পরেই ইসলাম প্রচার শুরু হয়, তখন এই কবিতার গতি গুরুতররূপে বাধাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু বসরা (দ্র.) ও কূফা (দ্র.) প্রতিষ্ঠিত হইলে নিম্ন মেসোপটেমিয়াতে 'আরব আবাসভূমি স্থাপিত হয় এবং প্রধানত 'আরবের কেন্দ্রীয় অঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল হইতে উপজাতীয় লোকেরা আসিয়া সেখানে বসবাস করিতে শুরু করে। সেই অঞ্চল দ্রুত 'আরবীকৃত হইতে থাকে এবং পারস্যের বন্দীগণ সেই সময়ে কোন কাব্য রচনা না করিলেও অন্তত নূতন বসবাস স্থাপনকারী 'আরবগণ যুদ্ধক্ষেত্রে বা গুরুত্বপূর্ণ কোন উপলক্ষে কবিতা আবৃত্তি করিয়া ইসলাম-পূর্ব যুগের ঐতিহ্যকে চালু রাখিয়াছিল এবং নূতন প্রতিষ্ঠিত শহরগুলিতে প্রাণ সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল, বক্তাগণও তাঁহাদের বাগ্মিতা দ্বারা নূতন দেশের রক্ষাকার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মসজিদে মসজিদে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বাগ্মিতা প্রদর্শিত হইত এবং একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, ১ম/৭ম শতকের যে বাগ্মিতা প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহা সবই ইরাক ও মিসর হইতে উক্ত হইয়াছিল (দ্র. আল-হাজ্জাজ, যিয়াদ)। প্রধানত পরবর্তী সংগ্রহ গ্রন্থসমূহে কবিতা ও বক্তৃতার যে খণ্ডাংশসমূহ রক্ষিত হইয়াছে সেইগুলি খুবই সন্দেহজনক। তথাপি সেইগুলি বাস্তবতার সহিত অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সেইগুলি হইতে প্রতিভাত হয় যে, 'আরবদের দক্ষতাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যে, বাগ্মিতাশক্তি তাহা ইরাকে নূতন বসতি স্থাপনকারী অধিবাসিগণের মধ্যে সর্বদাই আচরণ ও অনুশীলনের বিষয় ছিল; এবং যদিও তাঁহাদের সৃষ্টিতে অর্থাৎ কবিতা ও বক্তৃতাতে 'আরব ঐতিহ্য রক্ষিত হইয়াছিল, তথাপি সহজ বোধগম্য কোন কোন বিষয়ে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যও যুক্ত হইয়াছিল যাহা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বর্তমান ছিল।

১ম/৭ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বসরা ও কূফাতে যে কাব্য রচিত হয় সেইগুলি ঐতিহ্যগত ভাবধারা ও পরিবেশেই বিরচিত হয়, কিন্তু নানা রকম ভিন্ন রীতি দ্বারাও ইহা প্রভাবিত হয়। বেশ কিছু সংখ্যক কবি দামিশ্কের দরবারের প্রতি আকৃষ্ট হইলেও ইরাকের উমায়্যা গভর্নরগণ এবং কয়েকটি সুবিখ্যাত সম্ভ্রান্ত পরিবার কে নূতন ধরনের পৃষ্ঠপোষকতার রীতি অনুসরণ করিয়া মরুভূমিতে প্রতিপালিত বেদুঈনগণ কর্তৃক তখন পর্যন্ত রচিত প্রশস্তিমূলক কবিতায় উৎসাহ প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহারা বড় বড় শহরের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দ্বারা প্রলুব্ধ হইলেন। এই শ্রেণীর মধ্যে যে নবম শতকের বিখ্যাত কবিগণ- যথা, আল-ফারায্দাক, জারীর, আল-আখ্তাল এবং আর-রা'ঈ য়ুর-রুম্মা এবং অন্য আরও অনেক স্বল্পখ্যাত কবি থাকিবেন, তাহা সম্ভবত নিতান্ত ঘটনাক্রম ছিল না। বসরার মিরবাদ ছিল কারাভা-এর মিলন স্থল, শ্রেষ্ঠ কবিগণ এখানে আসিয়া জনগণের প্রশংসা অর্জনের জন্য স্বরচিত কবিতা পাঠ করিতেন। জনসাধারণের মধ্যে কবিতার ঐতিহ্য যাঁহারা তুলিয়া ধরিতেন সেই কবিগণ তখন পর্যন্ত নিজেদের বেদুঈন-পূর্ব ঐতিহ্যেরই নৈকট্যে ছিলেন, তাঁহারা কাব্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতেন, গর্বের সংগে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইতেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহারা গোত্রীয় পরিবেশের উর্ধ্বে উঠিতে এবং আরও বিস্তৃততর রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করিতে সক্ষম হন।

আরও বেশী বৈশিষ্ট্যময় ছিল একদল কবির ভূমিকা, তাঁহারা হিজা' এবং মাদীহ (দ্র.)-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া কোন গোত্র বা গোত্রীয় প্রধানকে নহে, বরং বিশেষ ধর্মীয় রাজনৈতিক দলকে সমর্থন অথবা আক্রমণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। বাস্তবিক যে বিভিন্নতা, বিশেষ করিয়া সিফ্ফীন (দ্র.)-এর যুদ্ধের পরবর্তীকালীন বিচ্ছিন্নতার ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে দুইটি বিভাগের সৃষ্টি হয় এবং রক্তাক্ত সংঘর্ষের সূচনা হয় তাহা 'আলী পন্থী লেখকগণের (যথা, আল-আ'শা হামাদানী, আল-কুমায়ত, কুছ'ায়্যির 'আযযা, প্রমুখ) বা খারিজীগণের (যথা, 'ইমরান ইব্ন হিত্তান, আত-তিরিম্মাহ প্রমুখ) লেখায় প্রতিফলিত হয়। ইহারই স্বাভাবিক ফলশ্রুতি স্বারূপ উমায়্যাদের প্রতি তাঁহাদের সকলের সাধারণ শত্রুতার মনোভাব প্রকটিত হইয়াছিল সর্দারের প্রশস্তিতে এবং তারপরে ইহাদের প্রশস্তিতে, আর সেই প্রশস্তির মাধ্যমে কবিতার যা দুশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে যে সব কবিতা বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকিয়া আছে সেইগুলিতে প্রায়শই মহাকাব্যোচিত গুণ লক্ষ্য করা যায়, যে কারণে কবিতাসমূহের অধিকাংশই হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের দুঃখবোধ জাগে। কেননা এক সময়ে সেইগুলি সৎ অনুভূতি হইতেই উৎসারিত হইয়াছিল। এই সময় পর্যন্ত প্রতিভাবান কবিগণের মধ্যে অনারব ছিল না বলিলেই চলে এবং সম্ভবত ইব্ন মুফার্রিগ অনারব ছিলেন- যদিও তাঁহার প্রকৃত পরিচয় আজ পর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। যিয়াদ-এর পুত্রগণের অন্তরের শত্রু এই কবি মাওয়ালী দলের সদস্য ছিলেন, এই দলীয়রা শীঘ্রই সাফল্যের সঙ্গে 'আরবদিগকে এমন এক ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ করে যেখানে 'আরবরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

বিশেষ করিয়া হ'ারিছ'া ইব্ন বাদ্র আল-গু'দানী আল-হীরার ভোগ-লালসার ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন, যদিও কাম বাসনার বিষয়সমূহ কোনভাবেই অবহেলিত হয় নাই, তথাপি ঠিক একই সময়ে হিজাযের শহরসমূহে এই ধরনের যে প্রেমের কবিতা বিকশিত হইয়াছিল সেই সমস্তের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে ইরাকের তেমন কিছুই ছিল না এবং শুধুমাত্র আল-'আব্বাস ইবনুল আহ'নাফ (মৃ. আনু. ১৯০/৮০৫)-এর দ্বারাই হিজায-এর ঐতিহ্য ইরাকে প্রবেশ করিয়াছিল। অপরপক্ষে কূফার আল-আগ'লাব আল-'ইজলীকে উর্জূযা (দ্র.) ছন্দ আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেওয়া হইয়া থাকে, ইহা তাঁহার বন্ধু আবুন-নাজ্ম কর্তৃক এবং বসরাবাসী আল-'আজ্জাজ ও তাঁহার পুত্র রু'বা কর্তৃক কতকটা সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত হয়। ইরাকের শহরবাসী কবিগণ কর্তৃক উরজূযা ছন্দ নীতিমূলক কবিতার জন্য জনপ্রিয় রূপ বলিয়া গৃহীত হইবার পূর্বে শুধু রাজায ছন্দের মাধ্যমেই প্রমাণের উপায় ছিল যে, তাঁহারা মরুবাসী বেদুঈনদের জীবনযাত্রা ও ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

জাহিলী কাব্যের ঐতিহ্যের সহিত তুলনামূলকভাবে (অন্তত সেই ঐতিহ্য যেরূপ ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়) পরিবর্তন খুব একটা দর্শনীয় নহে। যাহা হউক, প্রশস্তিমূলক কবিতা তখন হইতে এমন সব ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত হইতে থাকে যাঁহারা একমাত্র উপজাতীয় অথবা গোত্রের সর্দারই ছিলেন না। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভাব-যদিও বা গোঁড়ামীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না- নূতন গুরুত্ব লাভ করে। হিজা সংক্ষিপ্ত চাতুর্যময় প্রবাদ বাক্যের রূপ লাভ করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐতিহ্যময় গতানুগতিক ধরনকে সম্মান করা হইলেও কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে কবিতার যে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে তাহা চিরায়ত কাসীদার সহিত খুব বেশী ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত নহে।

আরও সাধারণভাবে বলিতে গেলে, ইরাকের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রথম দিককার এই সময়টি ছিল ইরাকে নবাগত বসতি স্থাপনকারী 'আরবগণের নূতন জীবনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার কাল এবং ইসলামী সংস্কৃতিতে বিদেশী উপাদানসমূহের অভিযোজনের কাল। এই যুগের শেষভাগে বিখ্যাত উমায়্যা কবিগণের মৃত্যু হয় এবং আভিধানিকগণের সংজ্ঞা অনুযায়ী খাঁটি 'আরাবিয়্যারও সমাপ্তি ঘটে। প্রকৃতপক্ষে এই সময়েই বসরা ও কূফাতে 'আরব-ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ শুরু হয়, যে সংস্কৃতি পরবর্তীকালে সমগ্র মুসলিম দুনিয়াতে ছড়াইয়া পড়ে; তখন শিক্ষা সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে ইরাকের প্রভাব অনুভূত হইতে থাকে-যদিও বা সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক কেন্দ্র তখনও ছিল সিরিয়াতে।

ধর্মীয় বিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে ইরাকের ভূমিকা কি ছিল এবং কতদূর ছিল এখানে তাহার বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নহে; তবে অনুরূপ ক্ষেত্রের উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে, ব্যাকরণ ইরাকী পঠন-পাঠনেরই বিষয় ছিল, আর সেই ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন সম্ভবত 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী ইসহাক (মৃ. ১১৭/৭৩৫)। তদুপরি ইরাকেই অভিধান সংকলন এবং ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার প্রধান কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছিল। সেই গবেষণা ও পঠন-পাঠন এবং তৎসহ প্রাচীন কবিতা, প্রবাদসমূহ ও কমবেশী ঐতিহাসিক ঐতিহ্যসমূহের রীতিসিদ্ধ সংগ্রহ বহু সংখ্যক পণ্ডিতকে বা রুওয়াতকে (দ্র. রাবী) অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে আবূ 'আম্র ইবনুল 'আলা' (মৃ. আনু. ১৫৪/৭৭১), আল-আস'মা'ঈ (মৃ. ২১৩/৮২৮) এবং আবূ 'উবায়দা (মৃ. ২০৯/৮২৪) স্বল্পকাল পরে সুবিখ্যাত হন, আরও অনেকেই সেইরূপ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এইভাবে একত্রে সংগৃহীত তথ্য প্রমাণাদি সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা আদাব (দ্র.-এর ভিত্তি রচনা করে, কাজেই উহার উৎপত্তিস্থল ইরাকেই নির্ধারিত হওয়া উচিত।

'আব্বাসীগণ ক্ষমতায় আসিবার ফলে ইরাক ইতোমধ্যেই জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা চর্চার ক্ষেত্রে যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল তাহাতে জ্ঞান

পিপাসুদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। ইরাকের এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের কবি ও বিদ্বানগণ বিদ্যোৎসাহী উৎসাহদাতাগণের সম্মুখে নিজেদের প্রতিভার পরিচয় উপস্থাপিত করিবার সুযোগ লাভ করেন। বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠার পরে অপর দুইটি রাজধানী শহর বসরা ও কূফা-যেখানকার সাহিত্য সৃষ্টির কর্মকাণ্ড হিজায, সিরিয়া বা মিসরের সাহিত্যকর্ম অপেক্ষা অধিক পরিমিত ও বিভিন্নমুখী ছিল বেশ কিছুকাল পর্যন্ত পূর্ব মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই উহাদের ভূমিকা গৌণ হইয়া পড়ে এবং সেই উভয় শহর হইতে নূতন রাজধানীতে জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিগণ জমায়েত হইতে থাকে, যেখানে তাঁহাদের জন্য সম্পদ ও সুখ্যাতির নিশ্চয়তা ছিল। ২য়/৮ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বাস্তবিক খুব কম কূফাবাসী বা বসরাবাসীই ছিলেন, যাঁহারা দারিদ্র্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভীতি বা অভাবজনিত কারণে একবার বাগদাদে গিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করেন নাই। এইভাবে এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়, যাহার ফলে সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে অতি সুফল ফলিয়াছিল।

খিলাফতের কেন্দ্র ইরাকে স্থানান্তরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বিষয় তাহার সহযোগী হইয়াছিল- মাওয়ালী (দ্র.)-এর প্রাদুর্ভাব এবং তাহা শুধু 'আরবীয় সংস্কৃতিতেই নহে, রম্য রচনাতেও। অনারব বংশীয় বেশ কিছু সংখ্যক ইরাকী মুসলিম বাস্তবিক ইতিমধ্যে প্রশাসনিক দফতরসমূহে গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করিয়াছিল, সেই পদগুলি একেবারে প্রথম হইতেই বিদ্বান ব্যক্তিগণের জন্য নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষেত্রস্বরূপ ছিল। কিন্তু এক ধরনের সাংস্কৃতিক গণতন্ত্রায়ন, সেই সঙ্গে 'আরবদের উপরে স্থান দখল করিবার খোলাখুলি প্রচেষ্টা হেতু এই মাওয়ালীদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ইহারা 'আরবী ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন এবং ভাব প্রকাশের অন্য কোন মাধ্যম না থাকাহেতু ইহারা বিজেতাগণের বাকরীতিই গ্রহণ করেন এবং সচ্ছন্দে কবিতা ও গদ্যসাহিত্য রচনা করিতে থাকেন।

এই মাওয়ালীগণ 'আরব কবিতার ঐতিহ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া স্বেচ্ছাকৃতভাবে রীতিনীতির প্রতি আত্মবিসর্জন দিতেন এবং যখনই প্রয়োজন হইত, তখনই প্রশস্তিসূচক কবিতা রচনা করিতেন- যে কবিতা হয়ত বেদুঈন কবিগণ বাতিল করিয়া দিতেন না। কিন্তু তাঁহারা 'আধুনিক ধরনের কবিতা জোর করিয়া পাঠকদের উপরে চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন, সেইগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল চিরায়ত কাব্যরূপ পরিত্যাগ করা এবং এমন ভাবধারা গ্রহণ করা যাহা মুসলমানদের নূতন জীবন যাপন পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। কিতাবু'ল-আগানীর একটি বড় অংশ ইরাকী লেখা বিষয়ক, উহাতে বসরা বা কূফার কবিগণের প্রতি— যে সকল কবি সাহিত্য সমালোচনার দৃষ্টিতে অপ্রধান বলিয়া বিবেচিত ছিলেন- জারীকৃত নির্দেশনামা রহিয়াছে, সম্ভবত এই কারণে যে, তাঁহারা প্রচলিত রীতিপদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না, অথচ তাঁহারা পাঠকগণের স্থায়ী মনোযোগ আকর্ষণেরই দাবীদার, যেমন তাঁহারা প্রকৃত ভাব-ভাবনাকেই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের ভাষা প্রাঞ্জল। কখনও কখনও তীক্ষ্ম বিদ্রূপ বা গালি নিক্ষেপেও তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের অশ্লীলতা প্রায়শই তাঁহাদের মৌলিকতাকে বড় বেশী অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এই সকল গ্রন্থই খাঁটি কবিতা বিধায় গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সাধারণভাবে সেইগুলি অবহেলিত হইয়াছে। কারণ 'আরবী সাহিত্যের বিশেষজ্ঞগণ 'আরব সমালোচকগণ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত আধুনিকতাবাদিগণের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিয়াছেন, যাঁহারা নাকি গতানুগতিক কাব্যরূপকে অবহেলা না করিয়াও নিজেদের প্রতিশ্রুতিশীল মৌলিকতার কারণে পূর্ববর্তিগণ হইতে বৈশিষ্ট্যময় ছিলেন। এই কবিগণের মধ্যে সাধারণত বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় বসরাবাসী বাশ্শার ইব্ন বুর্দ (মৃ. ১৬৭/৭৮৩-৪)-এর নাম, যিনি ব্যঙ্গ কবিতা ও কাম লালসার কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং আবূ নুওয়াস (মৃ. আনু. ২০০/৮১৬)-এর নাম, যিনি ভোগ-লালসা ও কামোদ্দীপক কবিতা রচনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, অথচ কামোদ্দীপক ভাবকে সুকৌশলে ব্যবহার করিয়া তিনি উচ্চ মর্যাদায় আসীন হইয়াছিলেন। তদুপরি তথাকথিত দেহাতীত ও অতিন্দ্রীয়বাদী কবিতাতে (যুহ্দিয়্যাত) মৃত্যুর মুখোমুখি অজানাকে প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষের মনে যে যাতনা হয় তিনি তাহারও কাব্যময় প্রকাশ করেন। এই একই ধরনের কবিতাতে তাঁহার সমসাময়িক আবুল 'আতাহিয়া (মৃ. আনু. ২১৩/৮২৩)-ও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। শেষোক্ত কবির অনুরূপ যেই সকল কবিতা অদ্যাবধি টিকিয়া আছে সেইগুলিতে দেখা যায় যে, তিনি সাদামাটা সত্য মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছেন, কোনরূপ বড় ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশ করেন নাই। আরও লক্ষণীয় যে, সেই শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মীয় বিষয়বস্তু কম সংখ্যক কবিকেই অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিল, বাশ্শার বা আবূ নুওয়াস ইসলাম বিষয়ে সন্দেহবাদী হইতেও কুণ্ঠিত হন নাই- এমন কি কখনও অশ্রদ্ধাসূচক মনোভাবও প্রকাশ করিয়াছেন এসবই অবশ্য তাহাদের প্রথম জীবনের কথা; শেষ জীবনে এই জন্য তাহারা অনুশোচনা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে নিজেদের পূর্বপুরুষের ও তাঁহাদের ধর্মের মহিমা কীর্তনও করিয়াছেন। এই মনোভাবের ফলে তাঁহারা যিনদীক (দ্র.) বা শুউবিয়্যা (দ্র.) শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন এবং কখনও কখনও বিপদেও জড়াইয়া পড়িয়াছেন, অথচ তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদের সুনাম ক্ষুণ্ন হয় নাই।

অপরদিকে শী'আগণের কবিতা ছিল রাজনৈতিক ধর্মীয় শ্রেণীর, আহ্লুল-বায়ত (দ্র.)-এর প্রশংসায়, বিশেষভাবে হযরত 'আলী (রা) এবং তাঁহার পুত্র আল-হুসায়ন (রা)-এর প্রশংসা ও শোকগাথায় পূর্ণ, তাঁহাদের শাহাদাতের মূলভাব অবলম্বনে প্রায়শ কবিতা রচিত হইত। বিখ্যাত শী'আ কবিগণের মধ্যে সাহিত্য সমালোচকগণ বিশেষভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন আস-সায়্যিদ আল-হি'ময়ারী (মৃ. ১৭১/৭৮৭-৮)-কে এবং দি'বিল (মৃ. ২৪৬/৮৬০)-কে; কিন্তু এখন পর্যন্ত গবেষণা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। এই সকল রাজনৈতিক কবিতার অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া যাইবার ফলে এবং পরবর্তীকালের অসংখ্য অপসংযোজনের ফলে গবেষণাকার্যের নানা অসুবিধা দেখা দিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গবেষণার কাজ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

উল্লিখিত কালে কবিতার বিকাশের গুরুত্বকে যদিও অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তথাপি যে সত্যটিকে সমান গুরুত্ব প্রদান করা উচিত তাহা হইল 'আরব-ইসলামী সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা এবং তৎসঙ্গে 'আরবী গদ্যের বিকাশ বলিলে অতিরঞ্জিত হইবে না যে, এতকাল যে 'আরবী সাহিত্য বলিতে শুধুমাত্র কবিতাই বুঝাইত তাহা এক নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ করে যখন এই উপলব্ধিটি জন্মে যে, ভাবের বাহন হিসাবে পদ্য অপেক্ষা গদ্যই অধিক সুবিধাজনক; পদ্য বা কবিতা আদি সাহিত্যরূপ হইলেও এই নূতন বাহনটি সম্বন্ধে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। তখন হইতে মনে হয় যেন একটি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং পাল্লা যেন গদ্যের প্রতিই কিছুটা বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল।

এই ক্ষেত্রেও পারস্যের প্রভাব সুনিশ্চিত ছিল এবং উমায়্যা শাসনামলের শেষে যে পত্র-সাহিত্যের নূতন ধারা সূচিত হইয়াছিল তাহার স্রষ্টা বলিয়া যদি 'আব্দুল হ'মীদ ইব্ন য়াহ'য়াকে ধরিয়া লওয়া হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই ইরাকে সেই ধারাটির আরও পরিপূর্ণতা লাভ করিবার কথা। কেননা 'আব্বাসীগণ যতকাল বাগদাদে ক্ষমতা ধারণ করিয়াছিলেন ততদিন তাঁহারা ইহার পরিপোষণ করিয়াছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় পত্রাদি রচনার জন্য কুত্তাব নিযুক্ত করিয়াছিলেন (ঘটনাক্রমে কাতিবগণ প্রধানত অনারব হইতেন); রিসালা (দ্র.) সাহিত্য সেইসব সরকারী চিঠি অবলম্বনে রচিত। সেই রীতি পরে গদ্য সাহিত্যেরও অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

খলীফার দরবারেরই একজন কাতিব ইব্নুল মুক'াফ্ফা' (মৃ. আনু. ১৩৯/৭৫৭), যিনি কালীলা ওয়া দিমনা অনুবাদ এবং তৎসহ নিজের রচনার মাধ্যমে বস্তুত 'আরবী গদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সাহিত্যে তিনি সাসানী ধরনের আদাব ব্যবহার করিয়া রচনাকে নীতিমূলক ও আনন্দদায়ক করিয়া তোলেন। তাঁহার লেখার উদ্দেশ্য ছিল নীতি প্রচার করা এবং শাসকগণ ও জনগণকে 'পেশাগত' উপদেশ প্রদান করা। কালীলা ওয়া দিমনার নীতিমূলক গল্পগুলি আর মাত্র একজন পারস্যবাসী কাতিবকেই অনুকরণের জন্য অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তিনি সাহ্ল ইব্ন হারূন (মৃ. ২৪৪/৮৫৮)। কিন্তু ইব্নুল মুক'াফ্ফা'-এর আদাব (সাহিত্য) যাহা পারস্য-উদ্ভূত বিষয়বস্তু দ্বারা পরিপূরণকৃত হইয়াছিল এবং ইরাকীগণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল পাহ্লাবী ভাষা হইতে অনুবাদের মাধ্যমে, উহা দীর্ঘকাল যাবত নৈতিক শিক্ষামূলক সাহিত্য পুস্তক এবং জনপ্রিয় বিশ্বকোষসমূহে ব্যবহৃত হয়। প্রথমে ব্যবহৃত হয় ইরাকে এবং অতঃপর 'আরব বিশ্বের অন্যান্য দেশে। ইব্নুল মুক'াফ্ফা'-এর অল্পকাল পরেই গ্রীক সাহিত্যের অনুবাদ বাগদাদে পৌঁছায়, এমন কি রাজধানীর বায়তুল-হিক্মাতেও অনুবাদের কাজ হইতে থাকে। সেইগুলি দ্বারা মুতাকাল্লিমূন (দ্র.) এবং পরবর্তীকালে ফালাসিফা (দ্র.) অনুপ্রেরণা লাভ করে, আবার আদাব (সাহিত্য) পুস্তকেও কিছু কিছু নূতন নীতিকথা সংযোজিত হয়।

অপর একটি কাজকে যদিও খুব বেশী জোর দিয়া উল্লেখ করা যায় না, তথাপি তাহা ছিল রাবীগণের ভূমিকা। প্রথমে এক পুরুষ যাবত কিছু সংখ্যক নিষ্ঠাবান পণ্ডিত 'আরব মানবিক বিষয়সমূহের সংগ্রহের কাজ করেন, ইহার পরে আসেন এই রাবীগণ। তাঁহারা একের পর এক গবেষণাকার্য দ্বারা সেই বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সুবিন্যস্ত করেন। তাঁহাদের সেই বিরাট কাজের একটি বিস্ময়কর পরিচিতি প্রদান করা হইয়াছে 'আল-ফিহ্রিস্ত' গ্রন্থে। আল-আস্'মা'ঈ, আবূ 'উবায়দা ও তাঁহাদের সহকর্মিগণের পরে আবুল হাসান আল-মাদা'ইনী (মৃ. ২১৫/৮৩০-এর পরে ইহার সত্যিকারের প্রভাব যে কতটুকু ছিল তাহা নির্ণয় করা চিত্তাকর্ষক হইবে) পরবর্তী প্রজন্মের জন্য 'আরর সংগৃহীত মাল-মসলা হইতে বিপুল পরিমাণ তথ্যাদি, জনশ্রুতি, প্রবাদ, কবিতা ইত্যাদি আহরণ করিয়া গিয়াছেন (সেইগুলি তাঁহার সযত্ন শ্রেণীবিন্যাস করণ সত্ত্বেও অবশ্য কিছুটা দুর্বোধ্য রহিয়া গিয়াছে)।

আল-জাহি'জ (মৃ. ২৫৫/৮৬৮) এই প্রামাণ্য তথ্যাদির আলোচনামূলক টীকা রচনা করিয়া উহা হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়া ব্যাপক স্বচ্ছ-সাহিত্যিক- সংস্কৃতি গঠন করেন। তিনি কিংবদন্তী অংশ বাদ দেন এবং নির্দেশ প্রদান করেন যে, কোন পদ্ধতিতে ভাবনা-চিন্তা, গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিলে উহার আরও উন্নয়ন সাধন করা যায়। আল-জাহি'জ নিজেকে একজন রাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহা অপেক্ষা আরও বড় ছিলেন। কেননা 'বায়ান' বা 'হ'ায়াওয়ান' গ্রন্থে যদিও তিনি লোকশ্রুতিসমূহ উদ্ধৃতির মাঝেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি নৈতিক আদাব (সাহিত্য)-কে তিনি অধিকতর নীতি নিষ্ঠভাবে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ সেখানে চরিত্রগুলির গুণগত বিশ্লেষণে মনোবিজ্ঞানের ব্যবহার হয় এবং সমাজচিত্রও ধরা পড়ে। তাঁহার গ্রন্থখানিকে একটি বিশেষ স্তর বা যুগসন্ধি সৃষ্টিকারী বলিয়া গণ্য করা উচিত ছিল, অথচ তাঁহার প্রশংসাকারিগণই সেই গ্রন্থখানিকে চূড়ান্ত বলিয়া মনে করেন। অপরদিকে তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষীয়গণ আবার সেই একই গন্থে মুসলিম আদর্শের প্রতি এক প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া মনে করিতেন। কারণ উহারা সংস্কৃতি ও গদ্য সাহিত্যকে আরও বেশী প্রয়োজনোপযোগিতার দিকে এবং গড়পড়তা মুসলমানদের প্রয়োজনের প্রতি অধিকতর সংগতিপূর্ণ করিবার দিকে নিয়া যাইবার পক্ষপাতী ছিলেন। আল-জাহি'জ-এর একজন সুদূর উত্তরাধিকারী ছিলেন আবূ হ'ায়্যান আত-তাওহ'ীদী (মৃ. ৪১৪/১০২৩)। কিন্তু মু'তাযিলা আন্দোলন শেষ হইয়া যাইবার অল্পকাল পরে তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন জনৈক ফাক'ীহ, নাম ইব্ন কু'তায়বা (মৃ. ২৭৬/৮৮৯)। তিনি অধিকতর এবং কম বিপজ্জনক সংস্কৃতি সেবায় পদ্ধতিগত ও সুশৃঙ্খল বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্তন করেন, তাহাতে 'আরবদের ধর্মবোধ এবং উত্তরাধিকার মিলিয়া এক সুসংগত সামগ্রিকতা গঠন করিয়াছিল। সেই সংস্কৃতি সর্বাধিক সংখ্যক লোকের জন্য উন্মুক্ত থাকিলেও সেখানে বাহিরের দুনিয়ায় প্রবেশের সকল পথই রুদ্ধ ছিল। ইব্ন কু'ত'ায়বার আদাব (সাহিত্য)-এর প্রতিনিধিত্বকারী গ্রন্থাবলী হইতেছে 'উয়ূনুল-আখবার, কিতাবুল-মা'আরিফ এবং কিতাবুশ শি'র ওয়াশ শু'আরা। এইগুলি প্রধানত প্রবাদ বা উদ্ধৃতি বাক্য এবং ঐতিহ্যগত বস্তু যাহার বেশীর ভাগই পরবর্তীকালের সাহিত্যে প্রবেশ করে এবং জনপ্রিয় বিশ্বকোষ গ্রন্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়। যে সাহিত্যিক আদাবকে আল-জাহি'জ চলিত রীতিতে পরিণত করিয়াছিলেন এবং ইব্ন কু'তায়বা পদ্ধতিবদ্ধ করিয়াছিলেন উহার প্রতিনিধিত্ব লক্ষ্য করা যায় পরবর্তীকালের কিছু কিছু গ্রন্থে, যেমন আল-মুবাররাদ (মৃ. ২৮৫/৮৯৮)-এর 'কামিল'-এ তাহারও পরে উহার ক্রমাবনতি শুরু হয় এবং গদ্য ও কবিতার সংকলনে রূপ লাভ করে। এই শেষোক্ত রূপের বৈশিষ্ট্যময় এবং তুলনামূলকভাবে মৌলিক উদাহরণ হইতেছে আল-ওয়াশশা'-এর মুওয়াশশা'। সেই গ্রন্থখানিতে বাগদাদের সৌখিন ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে প্রচলিত ঐতিহ্য ও প্রবাদসমূহকেই প্রধানত বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ অদ্যাবধি টিকিয়া আছে, কারণ সেইগুলি পাঠক-পাঠিকাগণের চাহিদা মিটাইয়াছে। তাহারাও ছোট ছোট প্রাচীন ঐতিহ্যের কাহিনী উপভোগ করিত, কেননা সেইগুলি মুখস্থ করা সহজ ছিল, আবার প্রতিদিনের কথোপকথনেও ব্যবহার করা যাইত। আরও প্রাচীন, একেবারে নিসন্দেহে মূল সাহিত্যের অংশ ছিল এই রকম রচনারও যৎসামান্য খণ্ডাংশমাত্র বর্তমানে পাওয়া যায়, সেইগুলি এখন রিওয়ায়া বা পাণ্ডিত্যের শাখারূপেই গণ্য হইয়া থাকে। ফিহ্রিস্ত অনুযায়ী বিচার করিয়া দেখিতে গেলে (ফিহ্রিস্তে যথেষ্ট সংখ্যক পুস্তকের নাম ও আলোচনা রহিয়াছে), উহাদের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে বিশুদ্ধ প্রেমকাহিনী ও রোমাঞ্চকর অভিযান, হাস্যোদ্দীপক প্রহসন (অধিকাংশই অশ্লীল) এবং চিত্তাকর্ষক কিংবদন্তী সংগ্রহ; সংক্ষেপে, একেবারে বিশুদ্ধ আনন্দদায়ক সাহিত্য, সেই সঙ্গে কল্পনাশক্তিরও কিছু যোগাযোগ। যাহা হউক, নিঃসন্দেহে নিষ্ঠাবাদী মহলের প্রতিক্রিয়ার কারণেই হইবে যে, এইগুলির আর কপি করা হয় নাই,

শুধুমাত্র উদ্ধৃতিরূপে খণ্ডাংশ আকারে প্রচলিত থাকে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন কাব্যসংগ্রহে স্থান লাভ করে। কিন্তু যথাযথ নির্দেশিকার অভাবহেতু সেইগুলির পরিচয় এখন চিহ্নিত করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আদাব'এর যে দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্য, পাঠের অবকাশ সৃষ্টি এবং নীতিশিক্ষা, তাহা স্বেচ্ছাকৃতভাবেই গম্ভীর ভাবধারায় রচিত কিছু সংখ্যক গ্রন্থের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, যথা, আত-তানূখী (মৃ. ৩৮৪/৯৯৪)-এর আল-ফারাজ বা'দাশ-শিদ্দা। ইহাতে প্রবাদ, কিংবদন্তী, ভাবনার চাপ হইতে অবকাশ লাভের মূল ভাবভিত্তিক, প্রধানত কাযীগণের বর্ণিত, বর্ণনামূলক কাহিনী, এই সবই একত্রে স্থান লাভ করিয়াছে। সম্ভবত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে এই যে, এক হাজার এক রাত্রি বা আরব্য রজনীর (দ্র. আল্‌ফ লায়লা ওয়া লায়লা) প্রথম কাহিনীগুলি একত্রে সংগ্রহ করা হইয়াছিল ইরাকেই।

আল-ফিহ্‌রিস্ত (রচনাকাল ৩৭৭/৯৮৭-৮) গ্রন্থখানি হইতে ৪র্থ/১০ম শতকের শেষভাগে বাগদাদে 'আরবী সাহিত্যের ঐশ্বর্যের পরিচয় লাভ করা যায়। এমন কি ইহাও জানা যায় যে, তৎকালীন বাগদাদের বই ব্যবসায়িগণ অন্যান্য দেশে লিখিত বইও বিক্রয় করিতেন। মোট বইয়ের সংখ্যা আন্দাজ করিবার জন্য এই অমূল্য গ্রন্থতালিকাখানির সারসংক্ষেপ তুলিয়া ধরা প্রয়োজনীয় হইবে। সেইখানি পাঠ করিলে ইরাকের পণ্ডিত, লেখক ও কবিগণের রচিত গ্রন্থের প্রতি পাঠক-পাঠিকাগণের অশেষ শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়। আল-ফিহ্‌রিস্ত হইতে আরও জানা যায় যে, যদিও ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ এবং রাবীগণ প্রাথমিক শতাব্দীগুলির 'আরব ঐতিহ্যের যতটুকু আমরা বর্তমানে জানি তাহার অধিকাংশই সংগ্রহ ও পরবর্তী বংশধরদের জন্য সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, তথাপি ইরাকীগণই প্রাচীন, চিরায়ত এবং সমসাময়িক কালের আধুনিক ধারার কবিগণের দীওয়ানসমূহ পুনর্গঠন বা পুনঃগ্রন্থনার কাজে নিয়োজিত থাকেন এবং ইহাও নিশ্চিত যে, এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থখানি ইরাকে এবং অন্যত্র 'আরবী কাজের বিকাশে সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করিয়াছিল। সম্ভবত কাব্যে আধুনিকতার পরে যে নব্য-ক্লাসিসিজমের ধারার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা তাৎক্ষণিকভাবে সেই ধারা পরিবর্তনেও সহায়ক হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে আধুনিকতাবাদী আন্দোলন খুবই স্বল্পস্থায়ী হইয়াছিল আর পারস্য সাহিত্যের বিজয়ী প্রভাবও কোন চূড়ান্ত রূপ লাভ করিতে পরে নাই। কেননা ২য়/৮ম শতকের শেষভাগের দিকেই উহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সেই প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ছিল ক্লাসিক্যাল বা চিরায়ত রীতি-পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন এবং তৎকালীন আধুনিকতাবাদিগণের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচিত ভাষার ব্যবহার, আর প্রকাশ ভঙ্গীর জটিলতর কাব্যময় রূপ মাওয়ালীগণ নিজেরাও নব্য-ক্লাসিসিজমের আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দ্বিধাবোধ করেন নাই কেননা দেখা যাইতেছে, এই আন্দোলনের একেবারে প্রাথমিক আমলের প্রতিনিধি মুসলিম ইব্‌নুল-ওয়ালীদ (মৃ. ১৮৭/৮০৩) একজন মাওলা ছিলেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ, আবূ তাম্মাম (মৃ. ২৩১/৮৪৫), ইবনুর-রূমী (মৃ. ২৮৩/৮৯৬), আল-বুহ্‌তুরী (মৃ. ২৮৪/৮৯৭ এবং ইব্‌নুল-মু'তায্য (মৃ. ২৯৪/৯০৭) তাঁহারা সকলেই খাঁটি 'আরব ছিলেন না। এই কবিগণ শেষ পর্যন্ত ঐতিহ্যগত কাব্যরীতিতে আধুনিকতার ভাবগীত অবদান সংযোজন করিয়াছিলেন।

ইরাকে যে নব্য-ক্লাসিসিজমের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা শীঘ্রই অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং মুসলিম দুনিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে বরং আরও অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে উহার চর্চা হইতে থাকে। এই ব্যাপ্তি বিশেষ করিয়া তখন হইতেই শুরু হয় যখন বাগদাদ আর কাব্য সাহিত্যের অবিসম্বাদিত এবং একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু ছিল না, যখন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরগণও প্রাদেশিক দরবারসমূহের প্রতি অধিকতরভাবে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। এই শ্রেণীর কবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি আল-মুতানাব্বী (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫) প্রধানত আলেপ্পোতে খ্যাতি লাভ করেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য আরও অনেকে মাত্র স্বল্পকালের জন্য বাগদাদে অবস্থান করিয়াছিলেন। খিলাফাতের ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইরাকী কবিতার ক্ষেত্রেও সেই ক্ষীয়মানতার প্রভাব পড়ে। তাহা ছাড়া ইরাকের কবিগণের মধ্যে তখন আর বড় ব্যক্তিত্ব কেহ ছিলেন না। তাঁহারা সকলে আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং পূর্বাপেক্ষা অধিক ব্যক্তিসচেতন, অধিক গীতিকবিতাধর্মী ছিলেন এবং সম্ভবত অধিক সততার সহিত কাব্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্যতম ইব্‌নুল হা'জ্জাজ (মৃ. ৩৯১/১০০১)-এর কবিতায় এই প্রবণতাসমূহের পরিষ্কার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তাঁহার কাব্য অসহনীয় অশ্লীলতায় পূর্ণ।

গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সম্ভবত ৪র্থ/১০ম শতকের শেষভাগে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আবুল-মুতাহ্‌হার আল-আযদী, আল-জাহি'জ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহার হি'কায়া নামক গ্রন্থে বাগদাদের জীবন ও রীতিনীতি সম্বন্ধে ব্যঙ্গাত্মক চিত্র অংকন করিয়া একটি নূতন ধারার সৃষ্টি করেন। কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টা যদিও খুবই সফল হইয়াছিল তথাপি বড় একটি প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে নাই এবং অনুসৃতও হয় নাই। সেই একই আমলে বুওয়ায়হী দরবারের এবং উচ্চ বিচারালয়ের লিপিকারগণ তাঁহাদের পত্রাদি রচনায় রীতি অনুযায়ী ছন্দোময় গদ্য ব্যবহার করেন যাহা মাকামা সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু মাকামা রচয়িতা আল-হামাযানী ইরাকী ছিলেন না এবং তাঁহার গৌরবময় উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে অন্যতম আল-হারীরী (মৃ. ৫১৬/১১২২)-ও ছিলেন একজন বসরাবাসী। তৎরচিত 'মাকাম'সমূহ ব্যাকরণগত পাণ্ডিত্যের দরুন এমন একটি যুগের পরিচয় চিহ্নত করিয়াছে যখন বিদ্বানগণের অন্যতম প্রধান চর্চার বিষয়ই ছিল ভাষাতত্ত্ব।

ইতোমধ্যে সালজূকী তুর্কীগণ বাগদাদ অবরোধ করেন (৪৪৭/১০৫৫) এবং গোঁড়াপন্থী মতবাদে প্রত্যাবর্তনের জন্য আগ্রহী হইয়া তাঁহারা মাদরাসা (দ্র.) প্রতিষ্ঠিত করেন, যাহার উদ্দেশ্য ছিল 'আরবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সম্মানজনক আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাবেক গোঁড়াপন্থী শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করা। অতএব মাদরাসাটিতে অতি সীমাবদ্ধ ধরনের সংস্কৃতির পরিচর্যা হইতে থাকে এবং সেখানে ব্যাকরণ, কাব্যতত্ত্ব এবং প্রাচীন লেখকগণের যে সকল গ্রন্থ ব্যাখ্যা ব্যতীত আর বুঝিবার উপায় ছিল না, সেইগুলি মুখস্থ করাইবার দিকেই বেশী জোর দেওয়া হইতে থাকে। সালজূকীগণের আমলের ইরাকী কাব্য আলোচনা করিতে গেলে বেশ কয়েকজন অপ্রধান কবির নাম উদ্‌ঘাটিত হয়, তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন ইব্‌নু'ল-হাব্বারিয়্যা (মৃ. আনু. ৫০৯/১১১৫), যিনি নিজামু'ল-মুল্‌ক-এর সফর সঙ্গিগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি কিছু সংখ্যক প্রশস্তি এবং ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেন যেইগুলি ইব্‌নু'ল-হাজ্জাজের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং তাহা ছাড়াও আস্'-সাদিহ' ওয়া'ল-বাগিম নামক কব্যে কতগুলি নীতিসূচক গল্প রচনা করেন। আর একজন ছিলেন আত-তুগ'রা'ঈ (মৃ. আনু. ৫১৫/১১২১) তিনি লামিয়্যাতু'ল-'আজাম (জাহিলী কবি শান্‌ফারার লামিয়্যাতু'ল-'আরাব-এর প্রতি ইঙ্গিতবহ) নামের একটি কাব্যের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

ক্রমাবনতি পরিষ্কারভাবে লক্ষণীয় হয় ৪র্থ/১০ম শতক হইতে, উহা মঙ্গোলদের বাগদাদ অবরোধ ও ধ্বংসকাণ্ডের (৬৫৬/১২৫৮) পরে অধিকতর সুস্পষ্ট হয়। তদুপরি 'আরবী সাহিত্য যখন সর্বত্রই ক্ষীয়মান অবস্থায় ছিল তখন ইরাকেও তাহা সুদীর্ঘকালব্যাপী অস্তমিত অবস্থায় থাকে। পারস্য দেশীয় ও তুর্কী সংস্কৃতির বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় 'আরবী সংস্কৃতি আরও পশ্চিমে অপসারিত হয় এবং গদ্য রচনা ও কবিতার ক্ষেত্রে কিছু ইরাকীর নাম পাওয়া গেলেও তাঁহারা প্রধানত নিজ দেশের বাহিরেই সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। গদ্যের ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পাওয়া যায় না, কবিতায় চিরায়ত 'আরবী ও 'আরবী উপভাষার মধ্যকার ক্রমবর্ধমান বিভেদের ফলে ভাব প্রকাশের জন্য ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহৃত পুরাতন বাচনভঙ্গী ও কাব্যিক রূপকল্পসমূহই বারবার ব্যবহৃত হইতে থাকে, অথচ সেইগুলি তখন ছিল একেবারেই প্রেরণাহীন। সম্ভবত চিরায়ত কাব্যের এই অচলায়তনকে চ্যালেঞ্জ করিবার উদ্দেশ্যেই ইরাকীগণ— যাহারা মুসলিম স্পেনের জন্য যথেষ্ট অবদান রাখিয়াছিল— সেই দেশের অর্থাৎ মুসলিম স্পেনের আদর্শ অনুসরণ করে এবং কতিপয় জনপ্রিয় কাব্য রচনার রূপ সৃষ্টি করে বা গ্রহণ করে (যাজাল, মাওয়ালিয়া, দূবায়ত, কানওয়া-কান, কূমা, মুওয়াশ্শাহ ), এই বিষয়ের উপরে সাফিয়্যু'দ্-দীন আল-হিল্লী (মৃ. আনু. ৭৫০/১৩৪৯) আল-'আতিল আল-হালী ওয়া'ল-মুরাখ্খাস আল-গালী (সম্পা. Hoenerbach, Wiesbaden 1956) গ্রন্থে কিছু আলোকপাত করিয়াছেন। এই একই কবি, যিনি সম্ভবত এই সমগ্র দীর্ঘকাল ব্যাপী সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন (ঘটনাক্রমে তাঁহার সম্বন্ধে অতি সামান্যই জ্ঞাত হওয়া যায়)— তিনি নিজেকে নব্য-ক্লাসিক্যাল লেখকগণের অন্যতম বলিয়া প্রকাশ করেন এবং অন্যান্য স্থানের কবিগণের ন্যায় তিনিও রাসূল (স)-এর সম্মানে কাব্য রচনা করেন (যাহা হইতে বুঝা যায় যে, সমসাময়িক বিষয়াদির কদর আদৌ ছিল না)। কিন্তু তাঁহার কবিতায় আবার জনপ্রিয় বিষয়বস্তুর অবলম্বন এবং অশ্লীল শব্দ প্রয়োগেরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; উহা সম্ভবত ইরাকেরই বৈশিষ্ট্য ছিল।

'উছমানী আমলে (৯৪১/১৫৪৩-১৩৩৭/১৯১৮) সাহিত্য সৃষ্টির পরিমাণ ছিল খুবই নগণ্য এবং ১৯ শতকের শেষভাগেই মাত্র প্রাচীন রাজধানী পুনরায় যতটুকু সম্ভব হইয়াছে আধুনিক রেনেসাঁতে অংশ গ্রহণ করিয়াছে, আর সেইজন্য বড় কৃতিত্ব আয্-যাহাবী (১৮৬৩-১৯৩৬ খৃ.) এবং মা'রূফ আর-রুসাফী (১৮৭৫-১৯৪৫ খৃ.)-এর ন্যায় কবিগণের। যাহা হউক, ইরাক অবশেষে বোধগম্য বিলম্বের পরে সাহিত্যিক ও নাট্য আন্দোলনে যোগদান করা সত্ত্বেও সেখানে কথ্য 'আরবীতে জনপ্রিয় কবিতা রচনা বর্তমান যুগের অন্যতম বিস্ময়কর লক্ষণরূপে বর্তমান রহিয়াছে।

বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে ইরাকে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মূল্যায়নের সময় এখনও আসে নাই, কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত যে, অন্যান্য 'আরবী ভাষাভাষী দেশ সমূহের তুলনায় ইরাক এখনও কিছুটা পশ্চাদপদ।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ 'আরবী সাহিত্যের আলোচনা বিষয়ক যে কোন বই, তাহাছাড়া দ্র. 'আরাবিয়্যা প্রবন্ধ এবং এই প্রবন্ধে উল্লিখিত লেখকগণের বিষয়ে প্রবন্ধ। আরও দ্র. বিশেষ করিয়া (১) R. Blachere, La poesie arabe au `Iraq et a Bagdad jusqu'a, Ma`ruf al-Rusafi, in Arabica, ix/3 (1962), 419-34; (২) G. Troupeau, La grammaire a Bagdad du IXe au XIII$^{e}$ siecle, ঐ, ৩৯৭-৪০৫; (৩) J. Lecerf, Poesie dialectal$^{e}$ `iraqienne dans les milieux bagadiens, ঐ, ৪৩৫-৪৬, এবং সেখানে প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী ও নির্দেশিকা; (৪) Ch. Pellat, La prose arabe a Bagdad, ঐ, ৪০৭-১৮; (৫) ঐ লেখক, Milieu, স্থা.; (৬) এ. জে. তাহির, আশ-শি'রু'ল-'আরাবী ফি'ল-'ইরাক ওয়া বিলাদি'ল-'আজাম ফি'ল-'আস্রি'স সালজূকী বাগদাদ ১৯৬১ খৃ.; (৭) তাহা হুসায়ন, হাদীছু'ল-আরবি'আ", স্থা.; (৮) 'আবদু'ল-কাদির আল-খাতীবী আশ-শাহ্রাবানী, তাযকিরাতু'শ-শু'আরা', বাগদাদ ১৯৩৬ খৃ.; (৯) এম. এম. আল-বাসীর, নাহ্দাতু'ল-'ইরাক আল-আদাবিয়্যা ফি'ল-কার্নি'ত-তাসি' 'আশার, বাগদাদ ১৯৪৬ খৃ.; (১০) 'আলী আয-যুবায়দী, আল-মাসরাহিয়্যা আল-'আরাবিয়্যা ফি'ল-'ইরাক, কায়রো ১৯৬৭ খৃ.।

Ch. Pellat (E.I.$^{2}$)/হুমায়ুন খান

৬ **দল-উপদল** ঃ খলীফা আবূ বাক্র (রা)-এর আমলে (১১/৬৩২-১৩/৬৩৪) ইরাক বিজয় আরম্ভ হয় এবং খলীফা 'উমার (রা)-এর আমলে (১৩/৬৩৪-২৩/৬৪৪) বিজয় সম্পূর্ণ হয়। দেশটি বিজয়ের পর পরই, সেই প্রাথমিক যুগে ইরাকে বিভিন্ন দলের মধ্যে ক্ষমতার জন্য ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। খলীফা 'উছমান (রা) (২৩/৬৪৪-৩৩/৬৫৫)-এর শাসনামল হইতেই খলীফার বিরোধী এবং 'উমায়্যাগণেরও বিরোধী একটি দল ইরাক, বিশেষ করিয়া কূফাতে দানা বাঁধিয়া উঠে। তাহাদের অন্যতম কর্মঠ সামরিক নেতা ছিল মালিক আল-আশ্তার (দ্র.)। মদীনাতে যে বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি হয় এবং যাহার ফলেই খলীফা 'উছমান (রা) ঘাতকের হস্তে শাহাদত বরণ করেন, কোন কোন বর্ণনা মতে সেই বিদ্রোহের জন্য আল-আশ্তার কূফা হইতে দুই শত সৈন্য নিয়া আসিয়াছিল, উহারা মিসর হইতে আগত বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল; সে নিজে খলীফার গৃহ ঘেরাওকারিগণের (মুহ্ফার) সঙ্গে ছিল এবং কেহ কেহ তাহাকে খলীফার অন্যতম হত্যাকারীও বলিয়া থাকেন।

'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-এর খিলাফাতকালে (৩৫/৬৫৬-৪০/৬৬১) ইরাকে কিছুকাল যাবত নূতন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সূচনা হইয়াছিল। একদিকে ছিল হিজাযবাসিগণ, যাহারা প্রায় সকলেই খলীফা 'আলী (রা)-এর সমর্থক ছিল এবং অপরদিকে ছিল সিরিয়াবাসিগণ যাহাদের সমর্থন আমীর মু'আবিয়া (রা) আদায় করিয়া নেন। হযরত 'আ'ইশা (রা), তালহা (রা) এবং আয-যুবায়র (রা) বসরাবাসিগণের সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাহিনী সেই শহরের নিকটেই খলীফা 'আলী (রা)-এর বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই যুদ্ধ উটের যুদ্ধ (আল-হারবু'ল-জামাল দ্র.) নামে খ্যাত এবং ইহা সংঘটিত হয় ১৫ জুমাদা-২, ৩৬/৯ ডিসেম্বর, ৬৫৬ সনে। এই বিভ্রান্তিকর যুদ্ধে তাল্হা ও আয্-যুবায়র (রা) শহীদ হন এবং রাসূল-পত্নী হযরত 'আ'ইশা (রা)-কে কড়া সেনা প্রহরাধীনে মদীনায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সিফ্ফীন (দ্র.)-এর অমীমাংসিত যুদ্ধের পরে হযরত 'আলী (রা) যখন মু'আবিয়া (রা) প্রস্তাবিত সালিশী মানিয়া নেন (৩৭/৬৫৭) তখনই খাওয়ারিজ (দ্র.) নামক নূতন এক মুসলিম দলের সৃষ্টি হয়। এই দলের ইতিহাস যেমন, উৎপত্তিও তেমনই দুর্জ্ঞেয়। দলত্যাগের ঘটনা হারূরা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়; হযরত 'আলী (রা) আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া কূফাতে যে বক্তৃতা

করেন উহার ফলে তাঁহার আরও অনেক সমর্থক দলত্যাগ করে। খাওয়ারিজী দল অল্প সময়ের মধ্যেই একটি অঞ্চল দখল করিয়া লয়, তাহাদের মধ্যে নেতৃবৃন্দেরও সৃষ্টি হয় এবং একটি রাজনৈতিক সংস্থারও উদ্ভব ঘটে। হযরত 'আলী (রা) তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে পুনরায় স্বপক্ষে আনিতে সক্ষম হইলেও অধিকাংশই 'দলত্যাগী' রহিয়া যায়, ফলে সংঘর্ষ অবধারিত হইয়া উঠে। ৯ সাফার' ৩৮/১৭ জুলাই, ৬৫৮ আন-নাহরাওয়ানের যুদ্ধ (দ্র.) সংঘটিত হয়, কিন্তু তথাপি ধর্মীয় রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে খারিজীবাদ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় নাই।

৪০/৬৬১ সনে কূফার মসজিদে হযরত 'আলী (রা) খারিজী গুপ্তঘাতক ইব্ন মুল্জাম (দ্র.)-এর হস্তে শাহাদাত লাভের ফলে শী'আবাদ দুর্বল ও বিভক্ত হইয়া পড়ে। প্রচলিত মুসলিম ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদিগণের মধ্যে চরমপন্থী (গুলাত) শী'আ মতবাদ সাব'ইয়্যার সৃষ্টি প্রায় এই সময়েই হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা 'আবদুল্লাহ ইব্নু'স্-সাবা' (দ্র.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সম্ভবত কূফাবাসী একজন য়াহূদী ছিলেন (দ্র. H. Laoust, Schismes, 15-6)।

মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনামলে (৪০/৬৬১-৬০/৬৮০) ইরাক প্রদেশটিকে নূতন খিলাফাতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, রাজধানী স্থাপিত হয় দামিশ্‌কে, কিন্তু ইহা দুই বিরোধী শক্তি, শী'আ এবং খারিজীগণের বিরোধিতার কেন্দ্র থাকিয়া যায়।

কূফাতে শী'আ প্রতিরোধের নেতৃত্ব করেন হু'জ্‌র ইব্ন 'আদী (দ্র.)। তিনি প্রথমে শহরের গভর্নর আল-মুগীরা ইব্ন শু'বা (দ্র.)-এর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই যিয়াদ ইব্ন আবীহি (দ্র.)-এর সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষে আসেন। হু'জ্‌র-এর বিদ্রোহের অভিযোগ আনা হয় এবং তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া দামিশ্‌কের নিকটে মার্‌জ 'আয্‌রা'তে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

খারিজী উত্তেজনা তাহার পরেও চলিতে থাকে। কয়েকটি বিদ্রোহ উমায়্যা খিলাফাতের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়। তন্মধ্যে একটির নেতৃত্ব করেন ফারওয়া ইব্ন নাওফাল ৪১/৬৬১ সালে, পরের বৎসর আর একটির নেতৃত্ব করেন আল-মুস্‌তাওরিদ এবং অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন নাহ্‌রাওয়ানের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী দুই ব্যক্তি; এই শেষোক্ত বিদ্রোহ হয় মু'আবিয়া (রা)-র রাজত্বের শেষদিকে।

৬০/৬৮০ সনে মু'আবিয়া (রা)-র মৃত্যু, তাঁহার পুত্র য়াযীদ-এর বিতর্কিত সিংহাসন লাভ এবং 'আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (দ্র.)-এর স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা শী'আ এবং খারিজী বিরুদ্ধ দলসমূহের পুনর্জাগরণের সহায়ক হয়। ১০ মুহার্‌রাম, ৬১/১০ অক্টোবর, ৬৮০ কারবালা (দ্র.) প্রান্তরে ইমাম আল-হুসায়ন (রা)-এর শোকাবহ শাহাদাতের ঘটনা উমায়্যা সমর্থকগণ এবং রাসূল (স)-এর পরিবারের সদস্যগণের মধ্যকার বিভেদ চূড়ান্তভাবে স্থায়ী করিয়া দেয়, যদিও বা ইমাম হুসায়ন (রা) কূফাবাসিগণের পক্ষ হইতে যে সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন তাহা ছিল অনিশ্চিত এবং কতকটা সন্দেহজনক।

অনুতপ্তগণের (তাওওয়াবূন) বিদ্রোহ ছিল নেতৃত্ববিহীন এবং কোন রকমে দাঁড় করানো সংগঠন, ২২ জুমাদা-১, ৬৫/৪ জানুয়ারী, ৬৮৫ তারিখে 'আয়ন ওয়ার্‌দা-এর যুদ্ধে সেই বিদ্রোহ ধ্বংস হইয়া যায়, কিন্তু উহার ফলে ইরাকে উমায়্যা পুনর্বিজয় বিলম্বিত হয়।

মুখ্‌তার ইব্ন আবী 'উবায়দ (দ্র.)-এর বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ছিল এক চরমপন্থী ভাবধারা, সুন্নী সমালোচকগণ সেই ধর্মদ্রোহিতাবাদী ভাবধারার তীব্র সমালোচনা করেন। এই বিদ্রোহীরা প্রথমে কূফা অঞ্চলের কতিপয় বিশিষ্ট 'আরব পরিবারের সমর্থন লাভ করে পরে তাহারা সেই অঞ্চলের মাওয়ালীদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। বসরার গভর্নর মুস'আব ইব্নুত যুবায়র শেষ পর্যন্ত রামাদান ৬৭/এপ্রিল ৬৮৭-তে কূফাতে সংঘটিত যুদ্ধে এই বিদ্রোহীদের পর্যুদস্ত করেন।

কায়সানিয়্যাঃ (দ্র.) দল মোটামুটিভাবে এই সময়েই জনগণের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে বলিয়া মুসলিম ধর্মদ্রোহিতাবাদের ইতিহাস হইতে জানা যায়। এই ধর্মীয় দলের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, হযরত 'আলী (রা)-র মৃত্যুর পরে ইহারা তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ ইব্নু'ল-হানাফিয়্যা (দ্র.)-কে ন্যায়সঙ্গত ইমাম বলিয়া স্বীকার করিত। কালক্রমে এই দল বহু উপদলে বিভক্ত হইয়া যায়, যেগুলির মধ্যে অনেকেই গুলাত-এর পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল। ইহাদের ধর্মীয় মতাদর্শ সঠিক কি ছিল বা ইহাদের অনুসারিগণের (কুরায়বিয়্যা, হারবিয়্যা, বায়ানিয়্যা) সংখ্যা কত ছিল তাহা নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায় না। ৫৭/৭১৬ সনে ইব্নু'ল-হানাফিয়্যার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আবূ হাশিম ইমামাতে আপন দাবী 'আব্বাসী দাবীদার মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলীর বরাবরে পরিত্যাগ করেন। মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী জর্দানে 'আব্বাসীগনের বাসস্থান হুমায়মা-তে গমন করেন তখন এই ঘটনা ঘটে। 'আব্বাসীগণের বাসস্থান হুমায়মা-তে গমন করেন তখন এই ঘটনা ঘটে। 'আব্বাসীগণ এই ঘটনাকে তাঁহাদের উমায়্যা বিরোধী প্রচারকাজে লাগান এবং ৮ম/১৪শ শতক পর্যন্ত ইব্ন কাছীর-এর ন্যায় ঐতিহাসিকও ইহার সত্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু খিলাফাতের সুবিখ্যাত তথ্যবিশারদ, যথাঃ আল-মাওয়ার্‌দী বা আবু'ল-মা'আলী আল-জুওয়ায়নী, বিষয়টির পুনরুত্থাপন করেন নাই।

উমায়্যা শাসনের অবসানে যায়দ ইব্ন 'আলী (দ্র.)-র বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে শী'আ উত্তেজনা পুনরায় দেখা দেয়। যায়দ ১২২/৭৪০ সনে কূফাতে বিদ্রোহ করেন, পরে সর্বশেষ সমর্থকগণকে লইয়া শহরের মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করিলে সেখানে দুঃখজনকভাবে তাহাদের সকলেরই মৃত্যু হয়। এই বিদ্রোহ ইরাকে দমন করা হইলেও কিছুকাল পরে পুনরায় খুরাসানে দেখা দেয়। খলীফা ২য় আল-ওয়ালীদের শাসনামলে সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন য়াহ্'য়া ইব্ন যায়দ; জূযাজান-এ তাঁহার মাযার শীঘ্রই পবিত্র স্থানে পরিণত হয়। যায়দ ইব্ন 'আলীর সঙ্গে সঙ্গে শী'আপন্থিগণের মধ্যে যুদ্ধবাদী মনোভাব গড়িয়া উঠে, উহা যায়দীবাদ (দ্র.) নামে পরিচিত হয়। ইহাদের মতবাদ অনুযায়ী হযরত ফাতিমা (রা)-র যে কোন সুযোগ্য বংশধরই বিদ্রোহ বা সশস্ত্র আন্দোলনের (দা'ওয়া এবং জিহাদ) আহ্বান জানাইলে কর্তৃত্ব আইনানুগভাবে তাঁহার উপরে বর্তাইবে।

ইহার সামান্য কাল পরে সেই কূফাতেই আরও একটি বিদ্রোহ দেখা দেয়, উহার নেতৃত্ব করেন 'আবদুল্লাহ ইব্ন মু'আবিয়া (দ্র.), যিনি হযরত 'আলী (রা) বা হযরত ফাতিমা (রা)-কাহারও বংশধর ছিলেন না, বরং 'আলী (রা)-এরই এক ভাই হযরত জা'ফার আত-তায়্যার (রা) (দ্র.)-এর বংশধর ছিলেন। এই জা'ফার (রা) ৮/৬২৯ সনে মু'তা (مؤتة) অভিযানকালে শহীদ হইয়াছিলেন। মার্‌ওয়ান আল-হিমার (দ্র.)-এর সিংহাসন লাভের স্বল্পকাল পরে ১২৭/৭৪৪ সনে কূফাতে এই বিদ্রোহের সূচনা হয়। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করা হয়, কিন্তু কি পরিস্থিতিতে ইহা সমাপ্ত হইয়াছিল

তাহা পুরাপুরিভাবে জানা যায় না। এই দলের কয়েকজন অনুসারীকে গুলাত বলিয়া গণ্য করা হয় (জানাহিয়্যা, হারিছিয়্যা)।

'আব্বাসীগণ ক্ষমতায় আসার ফলে ইরাকে শান্তি বা ধর্মীয় ঐক্য কোনটিই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ধীরে ধীরে ইহা মু'তাযিলা (দ্র.) আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। উমায়্যাগণের ক্ষমতার অবসানে উহারা পুনরায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল এবং খলীফা আল-মা'মূন ও তাঁহার পরবর্তী দুইজন উত্তরাধিকারীর শাসনামলে বসরা ও বাগদাদের এই আন্দোলন বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। বসরায় ইহাদের শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে সচরাচর যাঁহাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে তাঁহাদের মধ্যে আবুল-হুযায়ল আল-'আল্লাফ (মৃ. ২২৭/৮৪১ বা ২৩৫/৮৫০ দ্র.), আন-নাজ্জাম ও হিশাম আল-ফুওয়াতী (মৃ. আনু. ২০০/৮১৬) বিখ্যাত। বাগদাদ শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলিয়া বলা হয় বিশ্‌র ইব্‌নুল-মু'তামিরকে। এখানকার বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিলেন আবূ মূসা আল-মুরদার এবং ছুমামা ইব্‌ন আশ্‌রাস।

দুই জা'ফারকে- জা'ফার ইব্‌ন মুবাশ্‌শির ও জা'ফার ইব্‌ন হার্‌ব-কোন কোন ধর্মদ্রোহিতা বিষয়ক পণ্ডিত, যথা, আল-মালাতী (দ্র.) মুতাযিলা মনে না করিয়া বরং বাগদাদের যায়দিয়্যাগণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন।

মু'তাযিলী দলকে হাদীছবেত্তাগণের সঙ্গে মারাত্মক বিরোধের মুকাবিলা করিতে হয়, বিভিন্ন দ্বন্দ্বের মধ্যে মিহ্‌না (দ্র.) ছিল নিঃসন্দেহে সর্বাধিক নাটকীয় অধ্যায়। হাদীছবেত্তাগণের মধ্যে যাঁহারা যোদ্ধাবেশে এই আন্দোলন প্রতিরোধের জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (দ্র.) এবং তাঁহার প্রথম দিককার শাগরিদগণ (দ্র. হানাবিলা)।

মধ্যযুগীয় ইরাকের ইতহাসের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যময় অধ্যায় ইমামী শী'আগণের উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব অর্জন। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের মৃত্যুর পরবর্তী খিলাফাতের দীর্ঘ অরাজকতার কালে এই আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়া উঠে। তখন একেবারে প্রথম সারির ধর্মতত্ত্ববিদগণের পক্ষ হইতে ইহাকে প্রতিরোধ করা হয়। প্রতিরোধকারিগণের মধ্যে ছিলেন বানূ নাওবাখ্‌ত বা আল-কুলায়নী (মৃ. ৩২৯/৯৪০) যিনি কিতাবু'ল-কাফী গ্রন্থের রচয়িতা, গ্রন্থখানিতে উসূল ও ফুরূ'-উভয়ই আলোচিত হইয়াছে। বুওয়ায়হী আমলে বাগদাদের বিভিন্ন বিখ্যাত পণ্ডিতগণের মধ্যে নিম্নোক্তগণের নাম উল্লেখযোগ্য ইব্‌ন বাবূয়াহ (মৃ. ৩৮১/৯৯১) যিনি আশ-শায়খ আস-সাদূক নামে অভিহিত ছিলেন, আল-মুফীদ (মৃ. ৪১৩/১০২৩) এবং দুই খ্যাতিবান ভাই আর-রাদী (মৃ. ৪০৬/১০১৬) ও আল-মুরতাদা (মৃ. ৪৩৬/১০৪৫), বিদ্যাবত্তা এবং ইমামীবাদের বিশেষজ্ঞরূপে যাঁহাদের খ্যাতি ছিল। এই চিন্তাধারার সর্বশেষ প্রতিনিধি ছিলেন শায়খুত-তাই'ফা আবূ জা'ফার আত-তূসী (মৃ. ৪৬০/১০৬৮)।

৪৪৭/১০৫৫ সনে বাগদাদ সালজূকগণের অধিকারে আসিলে তখন সুন্নী মতবাদের পুনর্জাগরণ হয়, তবে মাঝে মাঝে মারাত্মক রকমের সংকট, যেমন আল-বাসাসীরীর সংকট বা শী'আ উত্তেজনা দ্বারা সুন্নী জাগরণ ব্যাহত হয়। এমন কি সুন্নী মতবাদিগণের মধ্যেও আশ'আরী এবং হাম্বালীগণের মধ্যকার বিভেদ মাঝে মাঝে সংঘর্ষে পরিণত হইত। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক সংঘর্ষটি ঘটে ৪৬৯/১০৭৭ সনে এবং উহা ইব্‌নুল-কুশায়রীর ফিতনা নামে পরিচিত। খিলাফাতের শেষ দুই শতাব্দী কালে মু'তাযিলাবাদ ধ্বংসোন্মুখ হইলেও তখন পর্যন্ত উহার কিছু কিছু অনুসারী ছিল, আর ইরাকে ইমামীগণের অবস্থাও সুদৃঢ়ই ছিল। ৬৫৬/১২৫৮ সনে মঙ্গোল আক্রমণের ফলে যে খিলাফাতের অবসান হয় তাহার পশ্চাতে ইমামীগণের ভূমিকা কতটুকু ছিল তাহা নির্ণয় করা সত্যই দুষ্কর। পক্ষান্তরে তাহাদের ভূমিকা যে ছিল না তাহাও বলা যায় না। যাহা হউক, মঙ্গোল আক্রমণ ও বিজয় এবং সুন্নী খিলাফাতের পতনের ফলে রাজধানী শহর হিসাবে বাগদাদ নগরীর দীর্ঘকালের যে গৌরব ও মহিমা ছিল তাহা আর রহিল না। বলা বাহুল্য প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই বাগদাদ ছিল মুসলিম ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ প্রবন্ধের এই অংশে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত দ্র. (১) H. Laoust, Les Schismes dans I' Islam, Paris 1965 (index appeared in 1969)।

H. Laoust (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

৭। **শিল্পকলা এবং পুরাকীর্তি** ঃ ইসলামী শিল্পকলার বিকাশে ইরাকের ভূমিকার যে গুরুত্ব তাহা আব্বাসী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় প্রদেশরূপে ইরাক যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে তাহার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। সেই ভূমিকা ২য়/৮ম শতকের শেষভাগ হইতে শুরু করিয়া সাম্রাজ্যের পতনের কাল— যাহা ৪র্থ/১০ম শতকে শুরু হয় বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয়- পর্যন্ত ব্যাপৃত ছিল। সেই ভূমিকার রীতিসিদ্ধ বিবরণ প্রদান করিতে গেলে স্থাপত্যকীর্তিসমূহ, অন্যান্য অপ্রধান শিল্পকলা এবং 'আব্বাসী বাদশাহী শিল্পকলার বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় অনুসন্ধান করিতে হইবে। বাদশাহী শিল্পকলা বিভিন্ন রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কারণ ও প্রভাবের ফলে রাজধানী শহরগুলিতে সূচিত হয় এবং ক্রমে সাম্রাজ্যের বাহিরের অঞ্চলসমূহে বিস্তৃত হয়— যে অঞ্চলসমূহ হইতে শিল্পকলার কোন কোন বৈশিষ্ট্য আহরিতও হইয়াছিল। এই শিল্পকলার অগ্রগতিই ছিল উল্লিখিত সময়ে ইরাকের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে কার্যে নিরত চারু ও কারু শিল্পিগণের সুখ্যাতির মূল। একই সঙ্গে তাঁহারা আবার অন্য ইসলামী দেশ-সমূহের পূর্বেকার ও সমসাময়িক শিল্প প্রচেষ্টাসমূহকেও নিজেদের মধ্যে একীভূত করিয়া লইয়াছিলেন।

ইরাকের শিল্পকলার যে 'সাম্রাজ্যিক' বৈশিষ্ট্য সুদীর্ঘকাল যাবত রক্ষিত ছিল, যাহা প্রকৃতপক্ষে উমায়্যা আমলের শেষভাগে সূচিত হয়, সেই বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ সম্বন্ধে মন্তব্য করা সত্যই কঠিন। মনে হয় যেন মূলে উহা স্থানীয় শিল্পকলাই ছিল, পরে যাহা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বিকশিত হয় একটা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হইয়া, যাহা দেশের ভূপ্রকৃতিগত চরিত্রের প্রভাবিত চিরন্তন সৌন্দর্যবোধ বা শিল্পবোধ হইতে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তবে একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, ইরাকের বৈশিষ্ট্য— যাহা ছিল অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে চলাচলের প্রধান পথ, দেশটি পানিসেচযোগ্য পলিবাহিত সমভূমি দ্বারা গঠিত, ইহা কৃষিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, বিশাল নদীসমূহ ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত, কিন্তু এই উর্বর ও সমৃদ্ধ দেশটি পুনঃপুনঃ বন্যা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে আর বিভিন্ন বিজেতা দ্বারা বারবার বিজিতও হইয়াছে-এই সবই বিশেষ ধরনের ইমারত নির্মাণ বা স্থাপত্যগত সৌন্দর্য ও অন্যান্য শিল্পের জন্য উপযোগী ছিল। প্রায় সকল নির্মাণ কার্যেরই প্রধান উপকরণ ছিল কাদা বা মাটি, সহজলভ্য, সস্তা এবং অপরিমিত, কিন্তু খুব বেশী টেকসই নহে। এই কাদা দ্বারা তৈরী রৌদ্রে বা আগুনে পোড়ানো ইট দ্বারা ইমারত নির্মাণ ও

ইমারতের সম্মুখভাগের সৌন্দর্য সৃষ্টি (যাহা হয়ত প্লাস্টার বা চুনবালি দ্বারাও করা সম্ভব ছিল) করা হইত, এই মাটি দিয়াই বিভিন্ন সাদামাটা তৈজসপত্র বা অত্যন্ত মূল্যবান এনামেল করা দ্রব্যাদি বিশেষ মেসোপটেমীয় পদ্ধতিতে দ্রুত নির্মাণ করা সম্ভব ছিল, যাহা দ্বারা গ্রাম অঞ্চলের জনসাধারণের বিপুল চাহিদা পূরণ, আবার ভোগ ঐশ্বর্যবিলাসী শাসকগণের মনোরঞ্জন — এই দুই-ই সম্ভব হইত। কিন্তু একই সঙ্গে আবার কাদা বা ইটের তৈরী বলিয়াই সেইসব ইমারত বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকিয়া থাকার মত মযবুত হয় নাই, ফলে এখন আমরা সেইগুলিকে বস্তুত আকারবিহীন ধ্বংসস্তূপে মাত্র পাই। কাজেই ইরাকের বৈশিষ্ট্যরূপে বলিতে পারি যে, এখানকার স্থাপত্য কীর্তিসমূহ যেমন বিশাল আকারের ও মহিমাময় ছিল তেমনি আবার অ-মযবুত ছিল। এই বৈশিষ্ট্য 'আব্বাসী আমলের সকল নির্মাণেই লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের নির্মাণকার্যসমূহেও এই রীতি অনুকরণকৃত হয়, এমন কি সেই সকল প্রদেশে সুদক্ষ কারিগর এবং অধিকতর মযবুত নির্মাণ-সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও ইহা কার্যকরী থাকে।

ইরাকের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থা (কিন্তু দেশের বর্তমান সীমানার ভিতরে বিভিন্ন জলবায়ূ অঞ্চলে এবং লোকের বসবাসেরও অবস্থা অনুসারে এই ভৌগোলিক অবস্থার বিভিন্নতা রহিয়াছে) ইতিহাসের যুগ যুগ ধরিয়া দেশের স্থানীয় শিল্পকলার বিভিন্ন ধারাতে অবদান রাখিয়াছে; সেই সব ঐতিহ্য ধারা-প্রবাহের একদিকে ছিল বাগদাদ-অঞ্চলের শিল্প-স্কুলসমূহ, এবং অপর দিকে ছিল নিম্ন বদ্বীপ অঞ্চলের শিল্প-স্কুলসমূহ যেইগুলির সঙ্গে একযোগে ছিল মাওসিল (দ্র) বা উচ্চ মেসোপটেমিয়ার স্কুলসমূহ, সেইগুলি পার্শ্ববর্তী আনাতোলিয়া এবং আযারবায়জানের শিল্পকলা দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। কিন্তু এই ধরনের বৈশিষ্ট্য দ্বারা শিল্পকলা বিকাশের ক্ষেত্রকে খুব কড়াকড়িভাবে ভৌগোলিক আঞ্চলিকতার সীমারেখার মধ্যে চিহ্নিত করা যাইবে না; মুসলিম দেশসমূহের ক্ষেত্রে সর্বত্র যেমন ঘটিয়াছে তেমনি এখানেও শিল্পকলা রাজনৈতিক ঘটনাবলী দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, যেক্ষেত্রে ছোটখাট রাজবংশেরও সাময়িক বিজয় সূচিত হইয়াছে। ইরাকের ইসলামী শিল্পকলা–স্থাপত্য ও শিল্পগত কারুকলা-দুই-ই তাই কালানুক্রমিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনা করা উচিত। আর সেই বিবেচনাকালে একটি বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন থাকিতে হইবে যে, আর কোন মুসলিম দেশেই সম্ভবত মধ্যযুগ এবং বর্তমান কালের মধ্যে ভূ-দৃশ্যের এমন সার্বিক পরিবর্তন হয় নাই।

ইরাকের পুরাকীর্তিসমূহ সময়ের ব্যবধানে বারে বারে মরুভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেইগুলি হইতে যা সামান্য স্থাপত্য বিষয়ক তথ্য লাভ করা যায় সেই সব অঞ্চলে যুগে যুগে বসবাসকারী মানুষের বিভিন্ন অধ্যায় সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার জন্য যথেষ্ট নহে। 'আব্বাসী স্বর্ণযুগের পানিসেচ ব্যবস্থাসমূহের ক্রমবর্ধমান ক্ষয়ের ফলে অধিবাসিগণ ছোট ছোট শহর ও গ্রাম ত্যাগ করিতে থাকে। সেইগুলির সঠিক অবস্থান ও আকৃতি বা পরিসর নির্ধারণ করা বর্তমানে এক দুরূহ কাজ (এই বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট সীমাদ্ধ এলাকায় ব্যাপক গবেষণা চালানো হইয়াছিল, অনুরূপ গবেষণা দিজলা ও ফুরাত নদীর সমগ্র অববাহিকা ব্যাপী যে সুপ্রাচীন আবাদী এলাকা ছিল সেই সমগ্র অঞ্চলেই প্রসারিত করা যাইতে পারে; এই বিষয়ে দ্র. R.Mc.C. Adams Land Behind Baghdad, শিকাগো-লণ্ডন ১৯৬৫ খৃ.)। অনুরূপভাবে ইরাকী মুসলিম শহরগুলির যথার্থ ইতিহাস রচনা করাও দুরূহ কাজ, সেই শহরগুলির অধিবাসী এবং তাহাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড— এই উভয় কারণেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু সেইগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল ক্ষয়িষ্ণু জমিনের উপরে যেখানে স্বাভাবিকভাবেই বর্তমানে আর ইমারতের এমন কোন ভগ্নাবশেষ পাওয়া যাইবে না, যাহার উপরে ভিত্তি করিয়া আমরা বিভিন্ন আমলের ভৌগোলিক ইতিহাস পুনঃনির্মাণ করিতে পারি (বর্তমান সময়ে সেই ধরনের যে গবেষণা করা হইতেছে তাহা সকলই, প্রায়শ সাহিত্য কর্মের উপরে ভিত্তি করিয়া; দ্র. বাগদাদ, বসরা, কূফা, ইত্যাদি প্রবন্ধ)।

তবে ইরাকের প্রাথমিক ইসলামী যুগের স্থাপত্য সম্বন্ধে সাম্প্রতিক কালে কিছু অগ্রগতি হইয়াছে, তাহাতে ইতোপূর্বে অবহেলিত বিষয়সমূহকে গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করা হইয়াছে। সেই অগ্রগতি আমাদের 'স্থাপত্য' শীর্ষক প্রবন্ধের সহিত ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলিতে সাধিত স্থাপত্যশিল্পের বিকাশের যে তালিকা-চিত্র বা table দেওয়া হইয়াছে (উদ্দেশ্য ছিল বিষয়টিকে কোন কোন দিক হইতে পূর্ণাঙ্গ করা) তাহার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ; উল্লিখিত সময়ে ইরাকের স্থাপত্য শিল্পের যে উন্নয়ন তাহা সমগ্র ইসলামী শিল্পকলার সঙ্গে অভিন্ন ছিল।

সর্বাধিক দর্শনীয় না হইলেও সর্বাধিক বাস্তব ও যথার্থ অবদান ছিল সম্ভবত জনকল্যাণকর বেসামরিক স্থাপত্যসমূহে, যাহা শিল্পকলার ঐতিহাসিকের নিকটে গুরুত্বপূর্ণ না হইলেও মানব সভ্যতার ঐতিহাসিকের নিকট যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। সে আমলের খাল খনন পদ্ধতি এবং সেচ ব্যবস্থা দ্বারা পানি বিভাজনের পদ্ধতি, যাহা দ্বারা উমায়্যা এবং 'আব্বাসী আমলে অধিকতর পরিমাণে জমি চাষাবাদের আওতাধীনে আনা সম্ভব হইয়াছিল, সেইগুলি এই বিষয়ে তথ্য— প্রমাণরূপে কাজে আসিয়াছে, এই বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে আকাশ হইতে ছবি তুলিয়া এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শব্দতরঙ্গের দ্বারা জমিনের স্তর পরীক্ষা করিয়া। এই অনুসন্ধান কার্য চালাইবার কালে, একদিকে, এক বিশেষ নির্মাণ পদ্ধতির একটি বিশাল মসজিদ এবং অপর দিকে বিশেষ নির্মান পদ্ধতির আর এক রাজপ্রাসাদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। এইগুলি ইরাকে প্রাথমিক ইসলামী শাসনামলের নিদর্শন এবং সেই একই সময়কার সিরীয় নিদর্শনসমূহ হইতে ভিন্নতর নির্মাণরীতির। অথচ এতকাল পর্যন্ত সেই সিরীয় নিদর্শনসমূহকেই সেই সময়কার একমাত্র নমুনা বলিয়া মনে করা হইয়া আসিতেছিল। নাহ্রাওয়ান খালের পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত উস্কাফ বানী জুনায়দ-এ অবস্থিত সুপ্রাচীন মসজিদ এবং ওয়াসিতে অবস্থিত মসজিদ, যেইগুলি খলীফা 'আবদু'ল-মালিক কর্তৃক নিযুক্ত ইরাকের গভর্নর আল-হাজ্জাজ (দ্র.) কর্তৃক ৮৩/৭০৩ এবং ৮৬/৭০৬ সময়কালের মধ্যে একবারের প্রচেষ্টায় নির্মিত নূতন রাজধানীতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে বসরা এবং কূফাতে অবস্থিত বিখ্যাত ও বিশাল জামি' মসজিদভিত্তিক বিতর্কিত তথ্যাবলী অপেক্ষা অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য পরিকল্পনা প্রাপ্ত হইয়াছে। তদুপরি এই একই এলাকা ওয়াসিত এবং উসকাফ বানী জুনায়দ এবং তাহা ছাড়াও কূফার বড় মসজিদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে সকল আকর্ষণীয় স্থানসমূহ চিহ্নিত করা হইয়াছে— খনন-কার্য এখনও সমাপ্ত হয় নাই এবং ফলাফলও সম্পূর্ণ প্রকাশ করা হয় নাই— তাহা হইতে যে পরিমাণ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি দারু'ল-'ইমারা বা কাস্রু'ল-'ইমারা হইতে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের সমপরিমাণ; শেষোক্তগুলিও সেই একই কালে নূতন ইসলামী শহরে নির্মাণ করা হইয়াছিল। এই ইমারতগুলি পূর্ব হইতেই বৈশিষ্ট্যময় ছিল,

যেমন তাহাদের ভিতরের কক্ষের বৈশিষ্ট্য (এইগুলি পরবর্তী কালের 'আব্বাসী আমলের বাড়ী ও রাজপ্রাসাদের কক্ষের অনুরূপ), সিরিয়া এলাকাতে প্রচলিত কাস্‌র-এর নমুনা হইতে ভিন্নতর ছিল। এই সকল তথ্য হইতে যে সিদ্ধান্ত আহরণ করা যায় তাহা এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র ইঙ্গিত পর্যায়েই রহিয়াছে, কিন্তু এইগুলি হইতে প্রাথমিক যুগের ইসলামী সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে এই মেসোপটেমীয় প্রদেশের ভূমিকা কতটুকু ছিল সেই সম্পর্কে অধিকতর তথ্য পাওয়া যাইবে। 'আব্বাসী বিপ্লব তাহাতে বহুপূর্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠত্বকে সমন্বিতমাত্র করিয়াছিল।

'আব্বাসী আমলে ইরাকে স্থাপত্য শিল্পের যে বিকাশ সাধিত হইয়াছিল এখানে শুধু তাহার বৈশিষ্ট্যসমূহের পুনরুল্লেখ করিলেই চলিবে। এই বিষয়ে খুঁটিনাটি চিরায়ত বিষয়সমূহ, যেইগুলি প্রধানত খলীফাগণের ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজধানী সামাররা (দ্র.)-র বিশেষ বিশেষ খননকেন্দ্র হইতে লাভ করা গিয়াছে, সেইগুলি ঐতিহ্যগত ইসলামী শিল্পকলার যে কোন বিশ্লেষণ-গ্রন্থেই পাওয়া যাইবে (দ্র.স্থাপত্য, ফান্ন)। প্রধান দালানের গঠন রীতি এবং অলংকৃত সম্মুখ ভাগের বিভিন্ন স্টাইল, যাহা চিত্রিত বা চুনাবালি দ্বারা নির্মিত সূক্ষ্ম কারুকার্যময় পুষ্পিত ও লতাপাতাময় 'আরবী নকশা দ্বারা শোভিত, সেইগুলির মধ্যেই আবার জ্যমিতিক প্যাটার্নের ছড়াছড়ি এবং এমন কি বিভিন্ন পশুপাখির আকৃতিরও সমাবেশ; এইগুলি প্রাথমিক বাদশাহী শিল্পকলার শেষ দিককার পরিবর্তিত রূপেও সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। কূফার পশ্চিমে মরুময় স্তেপভূমিতে উখায়দির (দ্র.) নামক স্থানে একাকী দণ্ডায়মান অজানা তারিখের একটি প্রাসাদ বর্তমানে সংস্কারাধীন রহিয়াছে এবং সেইটির বিভিন্ন নির্মান কৌশল ও নক্‌শা-অলংকরণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা চলিতেছে, সেই গবেষণা হইতে সম্ভবত স্থাপত্য শিল্পগত প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া যাইতে পারে। সামাররার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া অগণিত নিদর্শন রহিয়াছে; বর্তমানে উহাদের মধ্যে কয়েকটি স্থানে মাত্র অনুসন্ধান কার্য চলিতেছে। এই অনুসন্ধান যদি সেখানকার অন্যান্য এলাকায়ও বিস্তৃত করা হয় তবে আরও অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাইবে। তাহা দ্বারা অবশ্য বর্তমান ধারণার কোন বড় পরিবর্তন ঘটিবে না বা সেই আমলের ধর্মীয় এবং বেসামরিক নির্মাণ–স্থাপত্যের যে সকল বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য ছিল, সে সকলেরও কোন ধারণাগত পরিবর্তন ঘটাইবে না। গৌরবময় আমলের যে ইরাকী মুসলিম শিল্পকলা নৈপুণ্যের শীর্ষে স্থান লাভ করিয়াছিল তন্মধ্যে বিশেষ স্থানাধিকারী ছিল কাচ নির্মাণ ও কাচ সামগ্রীতে নানাবিধ কারুকার্য, চীনা মাটির দ্রব্যাদি (যাহা চীনা দ্রব্যাদির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম ছিল, খলীফাগণের ব্যবহারের জন্য চীনামাটির তৈজসাদি চীনদেশ হইতে আমদানী করা হইত) বা মূল্যবান কাঠের উপরে খোদাই-এর কাজ যেইগুলির কিছু কিছু দুর্লভ নিদর্শন বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকিয়া আছে। চীনামাটির সৌন্দর্যমণ্ডিত দ্রব্যাদি নির্মাণের জন্য সাধারণত মেসোপটেমিয়ার আদি 'আব্বাসী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতি নির্দেশ করা হইয়া থাকে, সেইটি ৩য়/৯ম এবং ৪র্থ/১০ম শতকে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। এখানকার উৎপাদিত চীনামাটির দ্রব্যাদির মূলে ছিল ক্রিম রঙ্গের দ্রব্যাদি, তাহার উপরে কোবাল্ট নীলের কারুকাজ বা দ্যুতি। এই প্রতিষ্ঠানের কারুশিল্পীগণ পরে সম্ভবত ফাতিমীদের আমলে মিসরে চলিয়া যায়।

বুওয়ায়হী আমলের এবং সালজূক আমলের ইরাকের শিল্পকলার প্রতি এখানে আর ভিন্নভাবে আলোচনা করা সম্ভব নহে; তাঁহাদের স্থাপত্যগত নিদর্শনসমূহ সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং তাঁহাদের কারুশিল্পিগণের কাজও বিভিন্ন স্থানীয় ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের ফল হেতু সমসাময়িক ইরানী প্রদেশসমূহের কাজ হইতে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল না। যাহা হউক পরবর্তীকালে ইরাকে ইসলামী শিল্পকলার অগ্রগতিতে নূতনত্ব আসিয়াছিল। উহা প্রাদেশিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল এবং দেশের বাহিরে উহার প্রভাব অতি সামান্যই ছিল। কিন্তু উহাতে এমন গুণ ও শক্তির সমন্বয় ছিল যাহা প্রতিবেশী অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনীয় ছিল। সেই ৬ষ্ঠ/১২শ এবং ৭ম/১৩শ শতকে বিস্তৃত সালজূকোত্তর আমল হইতেই বাগদাদ এবং আল মাওসিলের বর্তমান স্থাপত্য নিদর্শনসমূহের ঐতিহ্যবাহী অধিকাংশ প্রাসাদের নির্মাণকাল ধরা হইয়া থাকে। বাগদাদের স্থাপত্যসমূহ খলীফা আন-নাসি'র (দ্র.) এবং আল-মুসতানসি'র (দ্র.) কর্তৃক সীমিত পার্থিব ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টারই ফল, কিন্তু সেই প্রচেষ্টার ভিত্তি ছিল রাজ্যের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং গৌরবময় দিনের খিলাফাতের যে মহিমা ছিল তাহার অন্তত আংশিক পুনরুদ্ধার আল-মাওসিল অঞ্চলের সেই নিদর্শনাবলী যেইগুলি যাঙ্গী এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী আতাবেগণের [(দ্র.)(বিখ্যাত আতাবেগ লু'লু' (দ্র.) তাঁহাদের অন্যতম)] ছোট দরবারের শিল্পসৌকর্যময় কেন্দ্রের পরিচয়বাহী, যাহা তেমন কোন অবহেলার যোগ্যও নহে বা মৌলিকতাহীনও নহে— যদিও বা সেইগুলির নির্মাণে বিভিন্ন প্রভাবের পরিচয় রহিয়াছে।

এখানে আমরা বাগাদাদের উল্লিখিত সময়ের স্থাপত্য শিল্প বিকাশের প্রধান প্রধান দিক নিয়া আলোচনা করিব। দ্রুত সম্পাদিত জরীপ দ্বারা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে সকল দুর্গের অংশবিশেষ (যেমন প্রাসাদোপম তোরণ, আল-বাবু'ল-ওয়াসতানী এবং বাবু'ত' ত'ালিস্‌ম, যেইগুলি এই শতাব্দীর শুরুর দিকে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বা বেসামরিক ভবনসমূহের ভগ্নাবশেষ, যেমন হারবা সেতু, খলীফগণের পূর্বেকার প্রাসাদের ধ্বংসাবশের (যাহা পরবর্তীকালে 'উছমানী নগর রক্ষাকেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল) বা ধ্বংসের বিভিন্ন স্তরে বর্তমান ধর্মীয় ভবন সমূহ, যেমন মুসতানসি'রিয়্যা মাদরাসা, সূকু'ল-গায্‌ল-এর (যেটির মীনারটি মাত্র বর্তমানে টিকিয়া আছে), বা আয-যুবায়দার মাযার-সৌধ এবং সেইগুলি ব্যতীতও মূল বাগদাদ শহরের সীমানার বাহিরে অবস্থিত কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যেমন সামাররার বাবু'ল-গ'ায়বার পবিত্র আশ্রয়স্থল বা বসরাতে অবস্থিত আল-হাসান আল-বাসরী (র)-এর মাযার। এই সকল ভবনে তৎকালে সালজূকী আমল হইতেই প্রচলিত ঐতিহ্য অনুযায়ী নিখুঁত ও চূড়ান্ত সৌন্দর্যময় পোড়া ইটের ব্যবহার হইয়াছে, কিন্তু তাহা ছাড়াও (বাহিরের অংশে) মুক্ত, স্বাধীন আকারের পরিবর্তে জটিল নকশার রূপ সৃষ্টি দ্বারা অত্যন্ত সুদৃশ্য এবং অতি ব্যয়সাধ্য আর নয়নাভিরাম সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। এইসব অলংকরণ গঠন রীতিতে (মৌচাক আকৃতির যাহা এমন কি বিশেষ বৈশিষ্ট্যময় থামের মধ্যেও ব্যবহৃত হইয়াছে) বা বাহিরের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে ('আরবের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত লতাপাতাময় পুষ্পিত নকশার পোড়া ইটের বহুকোণ ডিজাইনসমূহের জটিল ব্যবহারের এবং বর্তমানে আর সমমাত্রায় না থাকাহেতু সেইগুলির কৌশলগত রূপ নির্ণয়ও সম্ভব নহে) লক্ষ্য করা যায়।

বাগদাদের সমরীতি-প্রকৃতির স্থাপত্য কীর্তিসমূহের সহিত উচ্চ মেসোপটেমিয়ার একই সময়কালীন ইমারতসমূহের গঠনগত বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়, যেমন আল-মাওসিলে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এখন পর্যন্তও সম্পূর্ণ যথাযথভাবে অপরীক্ষিত ইমারতসমূহ (দিজলা তীরবর্তী লু'লু'-এর প্রাসাদ বা কারা সারায়, ছোট ছোট অনেক পবিত্র আশ্রয়স্থল বা সূফী দরবেশ ও ইসলামী শাস্ত্রজ্ঞগণের মাযার এবং একটি বিশাল বড় মসজিদ ও উহার সংলগ্ন অতি সুদৃশ্য, উঁচু, গোলাকার ইটের তৈরী একটি মীনার) বা সিনজার (দ্র.), ইরবিল (দ্র.) বা তিকরিতের নিকটবর্তী এলাকাসমূহের পুরাকীর্তিসমূহ যেখানে সম্প্রতি আরবা'ঈনগণের মাযার সৌধ পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে। এইগুলির প্রতিটির ক্ষেত্রে ইট আর চুনা-বালির নির্মাণ রীতির প্রভাব তো রহিয়াছেই, সেই সঙ্গে পাথরের যথেষ্ট ব্যবহার হইয়াছে— নিম্ন মানের পাথর, কিন্তু এখানে প্রচুর পাওয়া যায়— ফলে স্থাপত্যের প্রকৃতি হইয়াছে কতকটা সামঞ্জস্যহীন এবং বহুমিশ্র প্রকৃতির। তবে কোন কোন স্থাপত্যগতরূপে (যেমন সংযোজিত অংশের (Copula) স্থলে ঢেউ খেলানো মোচাকৃতির বা পিরামিড আকৃতির ছাদ ব্যবহৃত হইয়াছে), আকারে মিশ্রিত, আকারে এবং দরজা ও জানালার অলংকরণে (যেখানে সরল ও বাঁকান রেখার কাজ করা হইয়াছে) প্রকৃতপক্ষে 'আরবীয় লতাপাতার কাজেরই নূতনতর ব্যবহার হইয়াছে এবং সামঞ্জস্যহীন পুষ্পিত অংলকরণ একটি ঘেরান শাখা-প্রশাখার মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

৬ষ্ঠ/১২শ এবং ৭ম/১৩শ শতকে ইরাকে স্থাপত্য শিল্পের যে প্রসার ঘটে তাহার সঙ্গে অনুরূপ একটি ক্ষুদ্রতর শিল্পেরও বিকাশ এবং সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্পকলা প্রতিষ্ঠান শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতেও সক্ষম হয়। প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় চীনামাটির দ্রব্যাদির, কিন্তু সম্ভবত উজ্জ্বল চাকচিক্যময় চীনামাটির কাজ নহে (সেইগুলি উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র তখনও ছিল বর্তমান ইরাকের সীমানার বাহিরে আর-রাক্কা-তে), কিন্তু অনুজ্জ্বল, কারুকার্যময় তৈজষ পত্রাদি,যেইগুলির মধ্যে সর্বোত্তমগুলিকে এখন আল-মাওসিলে তৈরী বলিয়া মনে করা হয়। আল-মাওসিলেই পিতল ও তামা-কাসার অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্যদি তৈরীর একটি অতি চমৎকার প্রতিষ্ঠান ছিল, যেখানকার তারিখ-যুক্ত এবং স্বাক্ষরিত কিছু কিছু জিনিস পাওয়া গিয়াছে। সেইগুলি সোনা ও রূপার আশ্চর্য সুন্দর কারুকার্জের জন্য যেমন অত্যন্ত আকর্ষণীয়, তেমনই তথ্যপূর্ণও যে, যে কারখানায় সেইগুলি উৎপাদিত হইয়াছিল উহার মান কতটুকু ছিল আর যে কারিগর পরিবার সেইগুলি তৈরী করিয়াছিল তাঁহারা ক্রমান্বয়ে কতটুকু দক্ষতাই বা অর্জন করিয়াছিলেন। সর্বোপরি এই আমলের ইরাকের যে চিত্রকলা (ইহাকে বলা হয় 'আরব চিত্রকলা', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা ছিল এক মিশ্র সমাজের অবদান, আব্বাসী স্বর্ণযুগের যে চিত্রকলা উহা হইতে ইতোমধ্যে অনেক ভিন্নতর হইয়া পড়িয়াছিল) তাহার প্রতিনিধিত্বকারী গুরুত্বপূর্ণ কিছু চিত্র রহিয়াছে, ব্যাপকতর অর্থে মেসোপটেমীয় ধারার পাণ্ডুলিপি-চিত্রসমূহ (অনেকে আবার এই চিত্রশিল্পের ধারাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন, উচ্চ মেসোপটেমিয়ার ধারা এবং বিশেষভাবে 'বাগদাদী' ধারা; কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে কোন সঠিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয় নাই)। সেই সময়কার মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিফলন পাওয়া যায় বহু ছোট ছোট কিন্তু অত্যন্ত প্রকাশভংগীময় চিত্রের মধ্যে। এইগুলির মধ্যে দিয়াই বিখ্যাত ক্ষুদ্র চিত্রকলা (Miniature Paintings) জন্মলাভ করে, যাহা পরবর্তী যুগের ইসলামী শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিবার জন্য যেন পূর্ব নির্ধারিত ছিল; কিন্তু সামগ্রিক ইসলামী চিত্রকলার মধ্যেও প্রাথমিক যুগের এই নিদর্শনগুলি নকশা এবং রংগের ব্যবহারের দিক হইতে পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

৬৫৬/১২৫৮ সনে মঙ্গোল বাহিনী কর্তৃক বাগদাদ অবরোধ ও লুণ্ঠনের ফলে ইরাক মুসলিম বিজয়ের পর হইতে যে শিল্পকলাগত শ্রেষ্ঠত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিল তাহার অবসান ঘটে বলিয়া মনে হয়। সেই তারিখের পর হইতে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পতন শুরু হয় (সেই ভয়াবহ ধ্বংসকাণ্ডের তাৎক্ষণিক ফলাফলকে সম্ভবত অতিরঞ্জিত করা উচিত হইবে না)। তাহাতে এই শিল্পের আর টিকিয়া থাকা সম্ভব ছিল না। ইরাক তখন ছিল একটি অধস্তন প্রদেশমাত্র, বিজয়ী ক্ষমতা নহে। তবে সত্য যে, সেই বাধাবদ্ধ জীবনের মধ্যেও স্থাপত্যশিল্প ও কারুশিল্পের কাজকর্ম চলিয়া আসিতেছিল। কয়েক শতাব্দী যাবত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ভবন নির্মিত হয়, বিশেষ করিয়া শী'আ মাযারসমূহের উপরে ও চতুষ্পার্শ্বেই বেশী হয়, সেইগুলির সঙ্গে ক্রমাগতই অন্য নির্মাণাদি শোভা বৃদ্ধি করিতে থাকে। বাগদাদ, সামাররা, নাজাফ ও কারবালা'তে সেই সব ভবনের উপরে উজ্জ্বল রংগের চারকোণাকৃতির যে চীনামাটির টালির কাজ ছিল সেইগুলি এখনও রহিয়াছে। কিন্তু যে সমস্ত সৌন্দর্য ও সৌকর্যময় বিভিন্ন সৌধ, যেগুলি হয় পারস্যের ঈলখানী শিল্পকলা হইতে (যেমন মিরজানিয়া মাদরাসা বা বাগদাদের খান মিরজান) বা পারস্যের স'ফাবী রীতি হইতে বা 'উছমানী শিল্পকলা হইতে (প্রধানত মসজিদ এবং জনহিতকর ভবনসমূহ, যেমন বাজার বা হাম্মাম) উদ্ভূত হইয়াছে, প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অদ্যাবধি এইগুলি যথাযথভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই, এইগুলি ইরাকের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, কাজেই যথার্থ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা শিল্পের ধারায় উহাদের সঠিক স্থান নির্ধারিত হওয়া উচিত; এইগুলি স্থানীয় ধারায় উৎসারিত, কিন্তু তন্মধ্যে অনেক বিদেশী প্রভাবও রহিয়াছে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ ইসলামী স্থাপত্যশিল্প ও অন্যান্য অপ্রধান শিল্পকলা বিষয়ক সাধারণ গ্রন্থে ইরাকের 'আব্বাসী যুগ এবং সালজূকোত্তর যুগের বিভিন্ন ধারার বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। সেই সকল গ্রন্থে বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থপঞ্জী সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তৎসঙ্গে আমরা আর অল্প কয়েকটি মাত্র সংযোজিত করিবঃ (১) O. Grabar -কৃত দুইট অতি আকর্ষণীয় প্রবন্ধ Umayyad "palace" এবং The 'Abbasid "Revolution", in Stud. 1sl., xviii (1963), 5-18; (২) Al-Mushatta, Baghdad and Wasit, in The World of Islam, Studies in Honour of Ph. K. Hitti, London-New York 1959, 99-108; (৩) ইহা ছাড়া ইরাক সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ হইতে বিভিন্ন খননকার্য ও গবেষণা সম্বন্ধে প্রকাশিত রিপোর্ট ও বিবরণীসমূহ, সেইগুলি এফ, সাফার, ওয়াসিত সংকলিত খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, ৬ষ্ঠ মওসুমের খননকার্য কায়রো ১৯৪৫ খৃ. হইতে Sumer-এ প্রকাশিত সর্বশেষ পর্যালোচনা রিপোর্ট পর্যন্ত; (৪) J. Sourdel-Thomine, L'art de Bagdad, in Arabica, ix (1962), 449-465; (৫) Peinture arabe et societe musulmane a props d'un liver recent, in R. E. I., xxxi (1963), 115-21.

J. Sourdel-Thomine =(E.I.²)/হুমায়ুন খান

**সংযোজন**

**ইরাক** (عراق) ঃ

পটভূমি ঃ ভূতপূর্ব 'উছমানী খিলাফাতের অংশ, ইরাক প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে (১৯১৪-১৮ খৃ.) বৃটেনের দখলে চলিয়া যায়। ১৯২০ খৃ. বৃটেনের শাসনাধীনে ইহাকে লীগ অব নেশন্স্-এর ম্যানডেটভুক্ত করা হয়। পরবর্তী দ্বাদশ বছরে ধাপে ধাপে অর্জিত অগ্রগতির ধারাবাহিকতায়, ১৯৩২ খৃ. ইরাক স্বাধীনতা অর্জন করে। তখন ইহা একটি বাদশাহ শাসিত রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫৮ খৃ. ইরাককে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কতিপয় শক্তিশালী সামরিক জান্তা দেশটিকে শাসন করে। যাহার সর্বশেষ ছিলেন সাদ্দাম হোসেন (সাদ্দাম হুসায়ন)। সীমানাগত বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া দেশটি ইরানের সহিত আট বৎসর ব্যাপী একটি অমীমাংসিত ও ব্যয়বহুল যুদ্ধে (১৯৮০-৮৮ খৃ.) জড়াইয়া পড়ে। ১৯৯০ খৃ. ইরাক একটি ঝটিকা অভিযানে কুয়েত দখল করিয়া লয়। কিন্তু জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ খৃ. যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতিসংঘের সম্মিলিত বাহিনী কুয়েতকে ইরাকের দখলমুক্ত করে। অতঃপর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইরাককে উহার সকল গণবিধ্বংসী অস্ত্র এবং দূরপাল্লার মিসাইলের ধ্বংস সাধন করিতে বলে। নিরাপত্তা পরিষদ এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দল কর্তৃক ইরাকে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থাও করে। ১২ বৎসর ব্যাপী অব্যাহতভাবে নিরাপত্তা পরিষদের আদেশ লংঘনের দায়ে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে মার্চ ২০০৩ খৃ. ইরাক আক্রমণ করত সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করা হয়। অতঃপর অনেক অনুসন্ধান সত্ত্বেও সেখানে গোয়েন্দাদের কথিত গণবিধ্বংসী পারমানবিক রাসায়নিক বা জীবানু অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যুক্তরাষ্ট্র ও উহার মিত্রদের যুদ্ধ-পূর্ব গোয়েন্দা তথ্যের ফলে অহেতুকভাবে ইরাকের জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার পরবর্তীতে তাহাদের এই বিভ্রান্ত হওয়ার কথা স্বীকারও করে। অত্যন্ত ব্যয়বহুল যুদ্ধে অসংখ্য সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে এবং ইরাক ধ্বংস ও অরাজকতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়।

যাহা হউক, সম্মিলিত বাহিনী ইরাকে অবস্থান করত উহার ভৌত অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত রহিয়াছে। সম্মিলিত সামরিক কর্তৃপক্ষ জুন ২০০৪ খৃ. ইরাকী অন্তর্বর্তীকালীন কর্তৃপক্ষের হাতে সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা হস্তান্তর করে। ইরাকীরা ৩০ জানুয়ারি, ২০০৫ খৃ. ২৭৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৫ খৃ. ২৭৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি গণপরিষদ নির্বাচিত করে। যাহারা একটি চূড়ান্ত সংবিধান প্রণয়ন করিবেন (CIA, The World Fact book-Iraq, 2006. p. 2-15)।

**ভূগোল** ঃ দেশটির অবস্থান মধ্যপ্রাচ্যে, ইহার সীমানায় আছে ইরান ও কুয়েতের মধ্যবর্তী পারস্য উপসাগরীয় উত্তর প্রান্তে ১৯ কিলোমিটার (১২ মাইল) উপকূল, যাহা দেশটিকে ৩৫৭ বর্গমাইল আঞ্চলিক সমুদ্র সীমার অধিকার দান করিয়াছে, যাহা সমগ্র ভূ-ভাগের শতকরা ০.২ ভাগের সমান।

ইরাকের ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক ৩৩০০ উত্তর, ৪৪০০ দক্ষিণ। ইহার আয়তন ৪,৩৭,০৭২ বর্গ কিলোমিটার, যাহার মধ্যে ভূ-ভাগ ৪,৩২,১৬২ বর্গ কিলোমিটার এবং জলভাগ ৪,৯১০ বর্গ কিলোমিটার। স্থল সীমানায় অবস্থিত ছয়টি দেশের সহিত ইরাকের ৩,৬৫০ কিলোমিটার সীমান্ত রহিয়াছে। তন্মধ্যে উত্তরে অবস্থিত তুরস্কের সহিত ৩৫২ কিলোমিটার, পূর্বে অবস্থিত ইরানের সহিত ১,৪৫৮ কিলোমিটার, পশ্চিমে সিরিয়া ও জর্দানের সহিত যথাক্রমে ৬০৫ ও ১৮১ কিলোমিটার এবং দক্ষিণে সৌদি 'আরব ও কুয়েতের সহিত যথাক্রমে ৮১৪ ও ২৪০ কিলোমিটার স্থল সীমান্ত রহিয়াছে। ইরাকের উপকূল রেখার পরিমাণ ৫৮ কিলোমিটার; এবং সমুদ্রসীমা ১২ নটিকেল মাইল।

ইরাকের আবহাওয়া অধিকাংশ মরু-ভাবাপন্ন, এখানে মধ্যম হইতে ঠাণ্ডা শীতকাল এবং শুষ্ক, গরম ও মেঘমুক্ত গ্রীষ্মকাল পরিলক্ষিত হয়। ইরান এবং তুরস্ক সীমান্তবর্তী পর্বত সঙ্কুল উত্তরাঞ্চলে মাঝে মাঝে ভারী তুষারপাত ঘটে, যাহা বসন্তকালের শুরুতে গলিয়া গিয়া কেন্দ্রীয় এবং দক্ষিণ ইরাকের বিস্তৃর্ণ এলাকা প্লাবিত করে।

ভূ-প্রকৃতিগত বৈচিত্রের দেশ ইরাকে বিস্তীর্ণ সমভূমি, ইরান বা সীমান্তবর্তী দক্ষিণে নল-খাগড়াযুক্ত প্লাবিত জলাভূমি এবং ইরান ও তুরস্কের সহিত সীমান্ত অঞ্চলে পর্বতমালা পরিলক্ষিত হয়। দেশটির সর্বনিম্ন বিন্দু পারস্য উপসাগর ০ মিটার। সর্বোচ্চ বিন্দু নামবিহীন চূড়া ৩,৬১১ মিটার। অন্যান্য পর্বত চূড়ার মধ্যে গুনদাহ যহুর (৩,৬০৭ মিটার) ও কুহ-হাজ্জী ইবরাহীম (৩,৫৯৫ মিটার) উল্লেখযোগ্য।

ইরাকের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, ফসফেট ও সালফার উল্লেখযোগ্য। ব্যবহারিক দিক হইতে ইরাকের ভূ-সম্পদকে তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে ঃ আবাদযোগ্য ভূমি ১৩.১৫%, স্থায়ী শস্য ০.৭৮% এবং অন্যান্য ৮৬.০৭% (২০০১ খৃ.)। এখানে ৩৫,২৫০ বর্গ কিলোমিটার ভূমিতে চাষাবাদ করা হয় (১৯৯৮ খৃ.)। ইরাকের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে আছে ধূলিঝড়, বালুঝড় এবং বন্যা (CIA-The world Factbook-Iraq 2006, পৃ. ১১-১৫)।

দেশটির চলমান পরিবেশগত ইস্যুসমূহের মধ্যে রহিয়াছে সরকারের পানি নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পসমূহের আওতায় আন-নাসিরিয়া-এর পূর্বাঞ্চলীয় ঘনবসতি জলাভূমিগুলি হইতে পানি নিষ্কাশন বা সেগুলির সহিত সংযোগ সাধনকারী নদী-নালাসমূহের গতিপথ পরিবর্তন। এইভাবে হাজার হাজার বৎসর যাবত জলাভূমিতে বসবাসকারী 'আরবগণ গৃহহারা হন। অধিকন্তু, প্রাকৃতিক চারণভূমির ধ্বংসসাধনের ফলে বন্য প্রাণীসমূহ হুমকির সম্মুখীন হয়। অন্যান্য পরিবেশগত বিপর্যয়ের মধ্যে আছে সুপেয় পানির অভাব; টাইগ্রিস নদীর উজানে অবস্থিত তুরস্কের সহিত চুক্তিমতে নদী-শাসন, বায়ু ও পানি-দূষণ ভূমির উৎকর্ষতা হ্রাস (লবণাক্ততা) ও ভূমিক্ষয় এবং মরুকরণ। দেশটি আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনে স্বাক্ষরকারী অংশীদার।

শাতিল 'আরাব নৌপথ এবং পারস্য উপসাগরের উত্তর প্রান্তে কৌশলগত অবস্থানের কারণে ইরাক মধ্যপ্রাচ্য তথা আরব বিশ্বের সামরিক, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে (পূ. গ্র., পৃ. ২-১০)।

**জনগোষ্ঠী** ঃ জুলাই ২০০৫ খৃ. হিসাবমতে ইরাকের জনসংখ্যা ২,৬০,৭৪,৯০৬ জন। ইরাকের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৭% (২০০৫ খৃ.)। জন্মহার হাজারে ৩২.৫টি, মৃত্যুর হার ৫.৪৯টি। ২০০৫ খৃ. ইরাকে শিশু মৃত্যুর হার ছিল মোট হাজারে ৫০.২৫টি। ২০০৫ খৃ. ইরাকের মানুষের গড় আয়ুষ্কাল ছিল ৬৮.৭ বছর। তন্মধ্যে পুরুষের গড় আয়ু ছিল ৬৮.৪৯ বৎসর এবং মহিলাদের ৬৯.৬৭ বৎসর।

দেশটির অধিবাসীদের জাতীয়তা ইরাকী। এখানে বসবাসরত নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীদের মধ্যে আছেন ঃ 'আরব ৭৫%-৮০%, কুর্দী ১৫%-২০%, এবং তুর্কস্থান, আসিরীয় ও অন্যান্য ৫%। ইরাকের দাপ্তরিক ভাষাগুলির মধ্যে আছে 'আরবী, কুর্দী (কুর্দী অঞ্চলসমূহের দাপ্তরিক ভাষা), আসিরিয়, ও আর্মেনীয়। ইরাকে স্বাক্ষরতার হার ৪০.৪%; তন্মধ্যে পুরুষ ৫৫.৯% এবং মহিলা ২৪.৪% (২০০৩ খৃ.)।

**সরকার ঃ** দেশটির নাম ইরাক প্রজাতন্ত্র। 'আরবীতে আল-জামহূরিয়্যা আল-ইরাকিয়্যা। ইরাকে ১৮টি প্রশাসনিক বিভাগ (মুহাফাজাত, একবচন-মুহাফাজাহ) রহিয়াছে, যথা আল-আনবার, আল-বাসরাহ, আল-মুছান্না, আল-কাদিসিয়াহ, আন-নাজাফ, ইরবিল, আস-সুলায়মানিয়্যা, আত-তামীম, বাবিল, বাগদাদ, দাহুক, যীকার, দিয়ালা, কারবালা, মায়সান, নিনাওয়া, সালাহুদ্দীন এবং ওয়াসিত। ইরাকের রাজধানী প্রশস্ত ট্রাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী বিখ্যাত শহর বাগদাদে।

সাদ্দাম হোসেনের শাসনামলে বিপ্লব দিবস ১৭ জুলাই (১৯৬৮ খৃ.) জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে পালিত হইত। ইরাকের অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান ৮ মার্চ, ২০০৪ খৃ. স্বাক্ষরিত হয়। ঐ দিনই অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক আইন কার্যকর হয়। একটি নির্বাচিত ইরাকী সরকার কর্তৃক ২০০৬ খৃ. একটি নূতন সংবিধান প্রণিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত আইন বলবৎ থাকিবে।

দেশটির আইন ব্যবস্থা ইরাকী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক আইনের নিয়ন্ত্রণাধীনে বেসামরিক এবং ইসলামী আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমে ইরাকীরা বিশ্বজনীন ভোটাধিকার প্রাপ্ত হন।

প্রেসিডেন্ট জালাল তালাবানী ৬ এপ্রিল, ২০০৫ খৃ. হইতে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তাঁহার সহযোগিতায় আছেন দুইজন উপ-রাষ্ট্রপতি ঃ 'আদিল 'আবদুল মাহদী এবং গাযী আল-উজ্জায়ল আল-য়াওয়ার (৬ এপ্রিল, ২০০৫ খৃ. হইতে)। উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি সমন্বয়ে প্রেসিডেন্সি পরিষদ গঠিত হয় (পূ. গ্র., পৃ. ৭-১০)।

ইরাকের সরকার প্রধান হিসাবে ইরাকী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী ইবরাহীম আল-জাফারী (এপ্রিল ২০০৫ খৃ. হইতে এপ্রিলের ৩য় সপ্তাহ পর্যন্ত)।

প্রেসিডেন্সি কাউন্সিল কর্তৃক নিয়োজিত মন্ত্রীসভার সদস্য সংখ্যা ৩২ জন। অধিকন্তু তাহাদের সহিত উপ-প্রধান মন্ত্রীত্রয়ও আছেন। প্রাথমিকভাবে বাগদাদ এবং রাজধানীর পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চল কেন্দ্রিক একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী ইরাকী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও সম্মিলিত বহুজাতিক বাহিনীর অবস্থানকে বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের অতর্কিত হামলায় জান-মালের অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতি হয়। বিদ্রোহী গোষ্ঠীসমূহের নেতৃত্বে আছেন বিশেষত সুন্নী 'আরবগণ। তাহাদের সকলের লক্ষ্য হইতেছে ইরাককে সম্মিলিত বহুজাতিক বাহিনী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব হইতে মুক্ত করা। বহুজাতিক বাহিনীর ইরাক আক্রমণ ও দখলের পর হইতে এই পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার মার্কিন সৈন্য ইরাকের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হইয়াছে। ইরাক অনেকগুলি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য ও তাহাদের কার্যক্রমের অংশীদার। এই সমস্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে আছে ঃ ABEDA, AFESD, AMF, CAFU, G-77, FAO, IAFA, IBRD, ICAD, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, INTERPOL, IOC, ISO, ITU, LAS, NAM, OAPEC, OIC, OPEC, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WT.O, WTO (পর্যবেক্ষক), (পূ. গ্র., পৃ. ৮)।

ইরাকের পতাকার সহিত সিরিয়া, ইয়েমেন এবং মিসরের পতাকার স্বাদৃশ্য রহিয়াছে। এই সকল ইসলামী দেশের পতাকায় তিনটি আনুভূমিক ফিতা বা স্ট্রাইপ রহিয়াছে। উপরের স্ট্রাইপটি লাল, মাঝেরটি সাদা এবং নীচেরটি কালো। ইরাকের পতাকার মাঝের সাদা স্ট্রাইপটিতে তিনটি সবুজ তারকা রহিয়াছে। তারকাগুলি আনুভৌমিকভাবে সজ্জিত। পতাকাটি 'আল্লাহু আকবার' খচিত। ১৯৯১ খৃ. পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় এই শব্দ দুইটিকে ইরাকের পতাকায় সংযুক্ত করা হয়।

**ইরাকের রাজনৈতিক দলসমূহ**

আল-সাদর মুভমেন্ট; আসিরিয়া ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট; কনফারেন্স অব ইরাকী পিপল; সাংবিধানিক রাজতন্ত্র মুভমেন্ট বা সি.এম.এম.; দা'ওয়া পার্টি; স্বাধীন ইরাকী মৈত্রী বা আই আই এ; ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টি; ইরাকী হিযবুল্লাহ; ইরাকী স্বাধীন ডেমোক্রাটস বা IID; ইরাকী ইসলামিক পার্টি বা IIP; ইরাকী জাতীয় জোট বা INA; ইরাকী জাতীয় কংগ্রেস বা INC; ইরাকী জাতীয় সংলাপ পরিষদ বা INCD; ইরাকী জাতীয় একতা আন্দোলন; ইসলামিক কার্য সংস্থা; জামা'আত আল-ফাদিলাহ; কুর্দিস্তান গণতান্ত্রিক পার্টি বা KDP; মুসলিম 'উলামা কাউন্সিল; জাতীয় ইরাকী ফ্রন্ট; জাতীয় পুনর্মিলন ও মুক্তি পার্টি; কুর্দিস্তানের দেশাত্মবোধ ইউনিয়ন এবং ইরাকে ইসলামী বিপ্লবের চূড়ান্ত পরিষদ (বরাত ঃ পূ. গ্র.)।

**ইরাকের অর্থনীতি**

ইরাকের অর্থনীতি তৈল নির্ভর। দেশটির অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ৯৫ ভাগ এই খাত হইতে আসে। আগস্ট ১৯৯০ খৃ. ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল, তৎপরবর্তী আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবরোধ এবং জানুয়ারি ১৯৯১ খৃ. হইতে আন্তর্জাতিক সম্মিলিত বাহিনীকৃত সামরিক ব্যবস্থা ইরাকের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। বৃহৎ সামরিক ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যয়ভার বহন করায় সরকারী নীতি এবং শাসকগোষ্ঠীর অনুকূলে সম্পদ বরাদ্দ সত্ত্বেও ডিসেম্বর ১৯৯৬ খৃ. সাধারণ ইরাকীদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। খাদ্য, ঔষধ এবং ভৌত অবকাঠামোসমূহের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশের বিনিময়ে ইরাককে সীমিত পরিমাণ তৈল রপ্তানীর অনুমতি প্রদান করা হয়। ১৯৯৯ খৃ. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইরাককে তাহার মানবিক চাহিদা মিটাইবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তৈলসম্পদ রপ্তানির অনুমতি প্রদান করে। ফলে মাথাপিছু খাদ্য আমদানী উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ঔষধপত্রের সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য সেবার ক্রমোন্নতি ঘটে। মাথাপিছু উৎপাদন এবং জীবনযাত্রার মান তখনও ১৯৯১ খৃষ্টাব্দের পূর্বের তুলনায় কম ছিল। অবশ্য এই ক্ষেত্রে যে কোন অনুমানে বিস্তর ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়। মার্চ-এপ্রিল ২০০৩ খৃ. যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত সম্মিলিত বাহিনীর সামরিক বিজয়ের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক প্রশাসন অবকাঠামোর বিলুপ্তি ঘটে। যদিও যুদ্ধকালে কল-কারখানার তুলনামূলকভাবে স্বল্পই ক্ষতিসাধিত হইয়াছিল, তথাপি লুটতরাজ, বিদ্রোহী হামলা ও আত্মঘাতী আক্রমণে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে

ব্যাহত হয়। গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক স্থাপনাসমূহে বিশেষত তেল-পাইপলাইন এবং ভৌত অবকাঠামোসমূহে বিদ্রোহী হামলার ফলে ইরাক উহার রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছিতে পারে নাই। কিন্তু তৈলের উচ্চ মূল্যের কারণে মোট সরকারী রাজস্ব আয় প্রত্যাশিত মাত্রাকে অতিক্রম করিয়াছে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও ইরাক উহার অর্থনৈতিক নীতিমালার বাস্তবায়নকল্পে পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করিয়াছে। তিনটি ধাপে উহার ঋণভার হ্রাসের লক্ষ্যে প্যারিস ক্লাবের সহিত সাফল্যজনকভাবে একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। যথাসময়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল হইতে ঋণ প্রাপ্তি ও পরিশোধের লক্ষ্যেও ইরাক তৎপর রহিয়াছে। ইহার ফলে ইরাক ক্রমান্বয়ে প্যারিস ক্লাবের ঋণভার হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

২০০৫ খৃ. ইরাকের জিডিপি (ক্রয় ক্ষমতার তুল্যমান) ছিল ৯৪.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই সময়ে জিডিপি (দাপ্তরিক বিনিময় হার) ছিল ৪৬.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জিডিপি প্রকৃত বৃদ্ধি হার ছিল ২.৪%। ক্রয় ক্ষমতার তুল্যমানে মাথাপিছু জিডিপি ছিল ৩,৪০০ মার্কিন ডলার।

২০০৪ খৃ. জিডিপি-এর খাত ভিত্তিক পরিমাণ ছিল ঃ কৃষি ৭.৩%, শিল্প ৬৬.৬% এবং সেবা ২৬.১%। এই বৎসর দেশটির শ্রমশক্তি ছিল ৭.৪ মিলিয়ন (পূ. গ্র., পৃ. ৯)।

২০০৫ খৃ. ইরাকের বেকারত্ব হার ছিল ২৫% হইতে ৩০%। মুদ্রাস্ফীতির হার (ভোগ্যপণ্য সামগ্রীর মূল্যমানে) ছিল ৪০%। ২০০৫ খৃ. ইরাকের বাজেটে রাজস্ব ১৯.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ধরা হয়। অপর পক্ষে এই বাজেটের ব্যয় ধরা হয় ২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যাহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ৫ বিলিয়ন ডলারের মূলধন ব্যয়।

ইরাকের কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে গম, বার্লি, ধান, শাকসব্জি, খেজুর, তুলা, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী উল্লেখযোগ্য। দেশটির শিল্প-দ্রব্যের মধ্যে পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, বস্ত্র, নির্মাণ সামগ্রী, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সার ও ধাতব দ্রব্যাদির খাত উল্লেখযোগ্য।

২০০৫ খৃ. ইরাকে ৩১.৭ বিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। তখন বিদ্যুতের ব্যবহার ছিল ৩৩.৩ বিলিয়ন কিলোওয়াট; আর বিদ্যুৎ আমদানীর পরিমাণ ছিল ২.০২ বিলিয়ন কিলোওয়াট।

২০০৪ খৃ. ইরাকে প্রতিদিন ২.০৯৩ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উৎপাদিত হয়। ইহার পূর্বে ২০০২ খৃ. সেখানে প্রতিদিন ২.০৩ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উৎপাদিত হইত। ২০০৫ খৃ. দেশটি প্রতিদিন ১.৪৩ মিলিয়ন ব্যারেল তেল রপ্তানী করে। সেদেশে তেলের প্রমাণিত মজুদ ১১২.৫ বিলিয়ন ব্যারেল (২০০৫ খৃ.) (পূ. গ্র., পৃ. ১১)।

২০০২ খৃ. ইরাকের গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২.৩৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার। দেশটির প্রমাণিত গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৩.১৪৯ ট্রিলিয়ন কিউবিক মিটার।

২০০৪ খৃ. ইরাকের চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত ছিল ৯.৪৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৭.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইরাকের রপ্তানী সহযোগীদের মধ্যে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৫১.৯%, স্পেন ৭.৩%, জাপান ৬.৬%, ইতালী ৫.৭% ও কানাডা ৫.২%। ২০০৪ খৃ. ইরাকের আমদানীর পরিমাণ ছিল ১৯.৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যে সমস্ত দেশ হইতে ইরাক পণ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে আছে ঃ সিরিয়া ২২.৯%, তুরস্ক ১৯.৫%, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৯.২%, জর্দান ৬.৭% ও জার্মানী ৪.৯%। ২০০৫ খৃ. ইরাকের বৈদেশিক বিনিময় ও স্বর্ণের রিজার্ভ ছিল ৮.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২০০৫ খৃ. বহির্বিশ্বের সহিত ইরাকের ঋণের পরিমাণ ছিল ৮২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৪-২০০৭ খৃ. সময়ে ইরাক বহির্বিশ্ব হইতে ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক সাহায্যের আশ্বাস পাইয়াছে। ২২ জানুয়ারি, ২০০৪ খৃ. হইতে নূতন ইরাকী দীনার মুদ্রা হিসাবে চালু রহিয়াছে। বিনিময় হার ঃ ১ মার্কিন ডলার = ১,৪৭৫ ইরাকী দীনার (পূ. গ্র., পৃ. ১২)।

**ইরাকের বেতার, টিভি ও টেলিফোন যোগাযোগ**

২০০৩ খৃ. হিসাবমতে ইরাকে ৬৭৫,০০০টি প্রধান টেলিফোন লাইন কার্যকর ছিল। অবশ্য মার্চ-এপ্রিল ২০০৩ খৃ. যুদ্ধকালে অজ্ঞাত সংখ্যক টেলিফোন লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০০৪ খৃ. হিসাবমতে ১৭ মাস ব্যাপী অনিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যম বিকাশের পরে, ইরাকের অভ্যন্তরে আনুমানিক ৮০টি বেতার কেন্দ্র কার্যকর ছিল।

ইরাকে প্রতি হাজার মানুষের জন্য ৮২টি টেলিভিশন, ২২৯টি রেডিও এবং ১৯টি দৈনিক সংবাদপত্র রয়েছে।

**পরিবহন**

২০০৪ খৃ. ইরাকে ১১১টি বিমানবন্দর ছিল। উল্লেখ যে, মার্চ-এপ্রিল ২০০৩ খৃ. যুদ্ধে ইরাকের অনেকগুলি বিমানবন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০০৫ খৃ. ইরাকে ৮টি হেলিপোর্ট ছিল।

ইরাকের পাইপ লাইনগুলির মধ্যে আছে ঃ গ্যাস ১,৭৩৯ কিলোমিটার; তেল ৫,৪১৮ কিলোমিটার; এবং পরিশোধিত পণ্যদ্রব্য ১,৩৪৩ কিলোমিটার (২০০৪ খৃ.)।

২০০৪ খৃ. ইরাকের মোট রেলপথ ছিল ২,২০০ কিলোমিটার। ১৯৯৯ খৃ. ইরাকে ৪৫,৫৫০ কিলোমিটার সড়ক পথ ছিল। ২০০৪ খৃ. ইরাকের মোট নৌপথ ছিল ৫,২৭৫ কিলোমিটার। তন্মধ্যে ইউফ্রেটিস নদীর ২,৮১৫ কিলোমিটার, টাইগ্রিস নদীর ১,৮৯৫ কিলোমিটার এবং থার্ড নদীর ৫৬৫ কিলোমিটার ছিল প্রধান নৌপথ। ২০০৫ খৃ. ইরাকের বাণিজ্যিক নৌ-বহরে ১১টি কার্গো ও ৩টি পেট্রোলিয়াম ট্যাংকারসহ মোট ১৪টি জাহাজ ছিল। ইরাকের বন্দর ও টার্মিনালগুলির মধ্যে আল-বাসরাহ, খাওর, আয-যুবায়র ও উম্ম কাস্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

**সামরিক শক্তি**

২০০৫ খৃ. হিসাবমতে ইরাকের সামরিক বাহিনীসমূহের মধ্যে আছে ইরাকী নিয়মিত সেনাবাহিনী (ইরাকী স্পেশাল অপারেশন ফোর্স এবং ইরাকী প্রতিরোধ বাহিনীসহ); ইরাকী নৌ-বাহিনী এবং ইরাকী বিমান বাহিনী।

১৮ বৎসর বয়সী সকল ইরাকীর সেনাবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক। ইরাকী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশকে বহিঃশত্রু ও বর্তমান বিদ্রোহের কবল হইতে রক্ষার জন্য ১৮-৪০ বৎসর বয়সী নাগরিকদের সমন্বয়ে একটি নূতন পেশাগত সামরিক বাহিনী বিনির্মাণের কাজে নিয়োজিত আছে (২০০৪ খৃ.)। ২০০৫ খৃ. সামরিক বাহিনীতে কাজের জন্য ১৮-৪৯ বৎসর বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা ছিল ৫৮,৭০,৬৪০। উহাদের মধ্যে যাচাই-বাছাইয়ের পর ৪৯,৩০,০৭৪ জন প্রার্থী যোগ্য বিবেচিত হয়। প্রতি বৎসর ২,৯৮,৫১৮ জন ইরাকী সামরিক বাহিনীতে কাজের বয়সে উপনীত হয়। ২০০০ খৃ. ইরাকর সামরিক ব্যয় ছিল ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

**আন্তর্জাতিক বিরোধসমূহ**

সম্মিলিত বাহিনী ইরাকের সীমানা নিরাপত্তা পরিদর্শনে সহযোগিতা করিয়া থাকে। ইরানের সহিত সমুদ্র-সীমানা চিহ্নিত না থাকায় পারস্য

উপসাগরে অবস্থিত শাতিল 'আরবের বাহিরে সমুদ্রে কর্তৃত্বের এখতিয়ার লইয়া বিরোধ দেখা দেয়। ইরাকের কুর্দিদের অবস্থান বিষয়ে তুরস্ক সরকারের মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছে।

**শরণার্থী সমস্যা**

২০০৪ খৃ. হিসাবমতে তুরস্কে ১৫০,০০০ জন প্যালেস্টাইনী শরণার্থী বসবাস করিতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে চলমান যুদ্ধের প্রেক্ষিতে ১৩,৪০,২৮০ জন কুর্দী ইরাকে প্রত্যাগমন করিয়াছে।

**শিক্ষা ব্যবস্থা**

ইরাকে লেখাপড়া সম্পূর্ণ অবৈতনিক। নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। উহা ছয় বৎসর বয়সে শুরু হইয়া ছয় বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ১৯৭০ খৃ. এই বয়ঃসীমার মধ্যে বিদ্যালয় গঠনের হার ১০০% ভাগে উন্নীত হয়; কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে ১৯৯৫ খৃ. উহা ৭৬% ভাগে নামিয়া আসে (পুরুষ ৮১% মহিলা ৭১%)। মাধ্যমিক শিক্ষা বার বৎসর বয়সে শুরু হয়, যাহা ছয় বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার এই ছয়টি বৎসর, তিন বৎসর মেয়াদী দুইটি ধাপে বিভক্ত। ১৯৯৫ খৃ. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সংশ্লিষ্ট বয়ঃসীমার মোট কিশোরদের ৪২% ছিল (কিশোর ৫১%, কিশোরী ৩২%)। ইরাকে ৪৭টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ১৯টি প্রযুক্তি শিক্ষায়তন এবং ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। ১৯৯১/৯২ খৃ. শিক্ষাবর্ষে ৪৬,২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষার কোর্সসমূহে ভর্তি হয়। এপ্রিল ২০০৩ খৃ. বাগদাদে সরকার পরিবর্তনের পটভূমিতে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হয় (The Europa world yearbook 2003, P. 141)।

**সংবাদ মাধ্যম**

ইরাকের উল্লেখযোগ্য দৈনিক সংবাদপত্রগুলির মধ্যে বাগদাদ অবজার্ভার (প্রচার সংখ্যা ২২,০০০); আল-ইরাক (কুর্দী ভাষায় প্রচার সংখ্যা ৩০,০০০); আল-জুমহূরিয়া ('আরবী ভাষায় প্রচার সংখ্যা ১৫০,০০০); আল-কাদিসিয়্যা (সেনাবাহিনীর একটি প্রকাশনা); আর-রিয়াদী (যুব মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'আরবী প্রচার সংখ্যা ৩০,০০০); তারীক আশ-শা'আব বা জনগণের পথ (ইরাকী সমাজতান্ত্রিক দলের একটি 'আরবী প্রকাশনা); এবং আছ-ছাওরা (বিপ্লব) (অধুনালুপ্ত বাথ পার্টির মুখপত্র, 'আরবীতে যাহার প্রচার সংখ্যা ছিল ২৫০,০০০) ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। সাদ্দাম হোসেনের পুত্র ইরাক যুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর হাতে নিহত, উদায় সাদ্দাম হোসেন। বাগদাদ হইতে প্রকাশিত আল-বা'স আর-রিয়াদী এবং বাবিল (ব্যাবিলন) নামক দুইটি দৈনিক সংবাদপত্রে স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন।

ইরাকের উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির মধ্যে আছে ঃ 'আলিফ (আরবী ও ইংরেজী প্রচার সংখ্যা ৩৩০০০); আল-ইযা'আ ও আল-টেলিবিশুন (রেডিও ও টেলিভিশন) ('আরবীতে, প্রচার সংখ্যা ৪০,০০০) শিশুতোষ পত্রিকা মাজাল্লা ('আরবীতে, প্রচার সংখ্যা ৩৫০০০); আর রাসিদ (পর্যবেক্ষক) (বাগদাদ হইতে প্রকাশিত একটি সাধারণ পত্রিকা); 'আরবীতে প্রকাশিত ইরাকী যুব-সম্প্রদায়ের একটি পত্রিকা; সাওত আল-ফাললাহ্ (কৃষক কণ্ঠ) ('আরবীতে, প্রচার সংখ্যা ৪০,০০০); এবং ওয়াঈবুয়্যুল উম্মাল (শ্রমিক সমাজের চেতনা) (ইরাকী ট্রেড ইউনিয়নের একটি পত্রিকা, যাহার প্রচার সংখ্যা ২৫,০০০)। (বরাত পূ. গ্র.)।

ইরাকের বাগদাদ হইত 'আরবীতে প্রকাশিত ২৩টি উল্লেখযোগ্য সাময়িকীর মধ্যে আছে ঃ আল-আরাবিয়্যা; আল-আকলাম (লেখনী) (প্রচার সংখ্যা ৭,০০০); বাগদাদ (ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত একটি পাক্ষিক); L'Iraq Aujourd'hui (ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত একটি দ্বি-মাসিক পত্রিকা, প্রচার সংখ্যা ১২,০০০); ইংরেজিতে প্রকাশিত তৈল মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনা Iraq Oil News; 'আরবী ও ইংরেজিতে বাগদাদ বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা The Journal of the Faculty of Medicine; 'আরবী ইসলামিক সংস্কৃতি চতুর্মাসিক পত্রিকা মাজাল্লাত আল-মাজমা' আল-'ইলমি আল-'ইরাকী; ১৯৩৫ খৃ. প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা, সামাজিক ও সাধারণ পত্রিকা আল-মু'আল্লিম আল-জাদীদ (প্রচার সংখ্যা ১৯০,০০০); সাওতু তালাবা অর্থাৎ ছাত্রকণ্ঠ, 'ইরাকী ছাত্রদের জাতীয় সংগঠনের মুখপত্র (প্রচার সংখ্যা ২৫,০০০); শিল্প মন্ত্রণালয়ের মুখপত্র আস-সিনা'আ (শিল্প), প্রচার সংখ্যা ১৬,০০০; আত-তুরাছ আশ শা'আব (গণ ঐতিহ্য), ইরাকী এবং 'আরবী লোক সাহিত্য বিষয়ক এই মাসিক পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ১৫,০০০; এবং আল-ওয়ায়্যল 'ইরাকীয়া (ইরাক প্রজাতন্ত্রের দাপ্তরিক গেজেট) প্রচার সংখ্যা 'আরবীতে ৪,০০০ ও ইংরেজিতে ৪০০ (পূ. গ্র., পৃ. ২১৫-৫১)।

**ইরাকের সাম্প্রতিক ইতিহাস**

অতীতে ইরাক তুরস্কের উছমানীয় খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে (১৯১৪-১৯১৮ খৃ.) যখন তুরস্ক জার্মানীর মিত্ররাষ্ট্র ছিল, তখন ১১ মার্চ, ১৯১৭ খৃ. বৃটিশ সেনাবাহিনী বাগদাদ দখল করিয়া লয়। ১৯২০ খৃ. যুক্তরাজ্যের শাসনাধীনে ইরাককে লীগ অব নেশনস-এর ম্যানডেটভুক্ত করা হয়। ১৯২১ খৃ. আমীর ফায়সাল ইব্ন হুসায়নকে ইরাকের বাদশাহ নিযুক্ত করা হয়। তিনি ছিলেন 'আরবের হাশিমীয় গোত্রের লোক। তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লাহকে প্রতিবেশী ট্রান্সজর্ডান (যাহা পরবর্তীতে জর্ডান নামে পরিচিত হয়) রাষ্ট্রের বাদশাহ বানান হয়। উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যের শাসনাধীনে জর্ডানও তৎকালে লীগ অব নেশনস-এর ম্যানডেটভুক্ত ছিল। উক্ত রাজন্যদ্বয় ছিলেন মক্কার শারীফ হুসায়ন ইবন 'আমীর পুত্র। শেষোক্ত শারীফ ১৯১৬ খৃ. নিজেকে হিজায-এর বাদশাহ হিসাবে ঘোষণা দেন। তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন প্রচারণায় হুসায়নের সহযোগিতার ইহা ছিল পুরস্কার স্বরূপ। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ১৯৩০ খৃ. ইরাক ও বৃটেনের মধ্যে ২৫ বৎসর মেয়াদী একটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৩ অক্টোবর, ১৯৩২ খৃ. বৃটিশ ম্যান্ডেটের সমাপ্তি ঘটে এবং ইরাক একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। (The Europa World Yearbook 2006, P. 21-29)।

নূতন রাজতন্ত্রটি উহার প্রাথমিক বৎসরসমূহে কুর্দী বিদ্রোহ (১৯২২-১৯৩২ খৃ.) এবং দক্ষিণাংশে সীমানা বিরোধের সম্মুখীন হয়। এই রাজতন্ত্রের শাসনাধীনে ইরাকের রাজনৈতিক জীবনে জেনারেল নূর আস-সাঈদ ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯৩০ খৃ. প্রধান মন্ত্রী হন এবং ২৮ বৎসর ব্যাপী ৭টি মেয়াদে এই দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যুক্তরাজ্য এবং সাধারণভাবে পশ্চিমা বিশ্বের সহিত ইরাকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ খৃ. বাদশাহ ১ম ফায়সালের ইনতেকালের পর ইরাকী রাজতন্ত্র বৃটিশঘেঁষা থাকিয়া যায়। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫ খৃ. বৃটিশ অনুপ্রেরণায় ইরাক আঞ্চলিক নিরাপত্তা ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য বাগদাদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতার জন্য তুরস্ক, পাকিস্তান, এবং ইরানও চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করে। প্রযুক্তিগতভাবে চুক্তিটিকে কেন্দ্রীয় চুক্তি সংস্থা বা Central Treaty Organization-CENTO নামেও অভিহিত করা হয়। চুক্তিটি মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। কারণ অনেকে মনে করেন যে, চুক্তিটির প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। প্রকৃতপক্ষে চীন ও রাশিয়া হইতে আগত সমাজতন্ত্রের বিস্তার রোধের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে উত্তর আটলান্টিক সহযোগিতা চুক্তি (NATO)-এর অদলে ইহা প্রণীত হয়। পাশ্চাত্যপন্থী বাগদাদ চুক্তির প্রতিকার হিসাবে ১২ মার্চ, ১৯৫৬ খৃ. সৌদি আরব, সিরিয়া ও মিসর একটি চুক্তিতে উপনীত হয়, যাহার উদ্দেশ্য ছিল ইসরাঈলী আগ্রাসন হইতে একে অপরকে রক্ষা করা।

১৪ জুলাই, ১৯৫৮ খৃ. কর্নেল আবদুস সালাম মুহাম্মাদ আরিফ এবং জেনারেল আবদুল কারীম কাসিমের নেতৃত্বে পরিচালিত এক বামপন্থী সামরিক অভ্যুত্থানে ইরাকের রাজতন্ত্র উৎখাত করা হয়। ইরাককে একটি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয় এবং কাসিম উহার প্রধানমন্ত্রী হন। এই অভ্যুত্থানে বাদশাহ ২য় ফায়সাল, নূরী আস-সাঈদ এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রাজপুত্রকে হত্যা করা হয়। মার্চ ১৯৫৯ খৃ. ইরাক বাগদাদ চুক্তি পরিত্যাগ করে। ৭ অক্টোবর, ১৯৫৯ খৃ. বাথপন্থী বিদ্রোহীরা কাসিমের বিরুদ্ধে একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থান পরিচালনা করে। তিনি আহত হন। পরবর্তীতে ৭৮ জন বামপন্থীর বিচার করা হইলে তাহাদের একজন সাদ্দাম হুসায়ন (জন্ম ২৮ এপ্রিল, ১৯৩৭ খৃ.) সিরিয়াতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। ১৯ জুন, ১৯৬১ খৃ. কুয়েত স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এলাকাটি ১৮৯৯ খৃ. হইতে বৃটিশের প্রতিরক্ষাধীনে ছিল। এই ঘটনায় ইরাকী নেতৃবৃন্দ মর্মাহত হন কারণ তাহাদের দীর্ঘদিনের আশা ছিল যে, কুয়েত ইরাকের সহিত একীভূত হইবে। ২৫ জুন, ১৯৬১ খৃ. ইরাকী নেতা জেনারেল 'আবদুল করীম কাসিম কুয়েতকে "ইরাকী মাতৃভূমিতে" প্রত্যাবর্তনের আহবান জানান। ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩ 'আরব সোসালিস্ট বাথ পার্টি (ASBP)-এর নেতা 'আবদুস সালাম মুহাম্মাদ আরিফ একটি সফল অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নিজেকে ইরাকের রাষ্ট্রপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩ খৃ. বাথ পার্টি ইরাকী প্রধান মন্ত্রী আবদুল করীম কাসিমকে হত্যা করে। আরিফ সরকার 'আরব জাতীয়তাবাদী ভাবাপন্ন ছিল। তাহারা মিসরের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়িয়া তোলারও প্রয়াস পান। জার্মানীর ইসরাঈলের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিবাদে ১৩ মে, ১৯৬৫ খৃ. ইরাক, লেবানন, জর্দান, সিরিয়া, মিসর, সৌদি 'আরব লীগের অন্যান্য দেশ জার্মানীর সহিত কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ করে। ১৬ এপ্রিল, ১৯৬৬ খৃ. ইরাকের রাষ্ট্রপতি আবদুস সালাম মুহাম্মদ আরিফ এক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হইলে তাঁহার অগ্রজ মেজর জেনারেল আবদুর রহমান মুহাম্মদ আরিফ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৭ জুলাই, ১৯৬৮ খৃ. আরব পুনর্জাগরণ (বাথ) সমাজতান্ত্রিক পার্টির সদস্যরা এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাঁহাকে উৎখাত করে। জেনারেল আহমাদ হাসান আল-বাক্র রাষ্ট্রপতি এবং সাদ্দাম হুসায়ন উপ-রাষ্ট্রপতি হন।

৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০ খৃ. ইরাক, জর্দান, সিরিয়া, সুদান ও মিসরের প্রতিনিধিবর্গ তিন দিনের এক সম্মেলন শেষে এক যৌথ ঘোষণায় ৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাঈলের জবরদখলকৃত 'আরবভূমি উদ্ধারে তাঁহাদের সঙ্কল্প পুনর্ব্যক্ত করেন।

১৬ জুলাই, ১৯৭৯ খৃ. বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল (RCC)-এর ভাইস চেয়ারম্যান সাদ্দাম হুসায়ন প্রেসিডেন্ট হিসাবে আহমাদ হাসান আল বাকরের স্থলাভিষিক্ত হন। বলা হয় যে, স্বাস্থ্যগত কারণে বাকর পদত্যাগ করেন এবং তাহাকে গৃহবন্দী করা হয়। কথিত আছে যে, ১৯৮২ খৃ. বিষপ্রয়োগে তাহাকে হত্যা করা হয়।

সাদ্দামের ক্ষমতা গ্রহণের অল্পকাল পরেই একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের দায়ে কতিপয় বিপ্লবী কমান্ড সদস্যকে হত্যা করা হয়। অভ্যুত্থানে সিরিয়ার জড়িত থাকার সন্দেহে সেই দেশের সহিত রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ইউনিয়ন গঠনের লক্ষ্যে পরিচালিত আলোচনা ব্যাহত হয়। এই সময় ইরাকী সমাজতান্ত্রিক দল, জাতীয় প্রগতি ফ্রন্ট (NPF) হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। NPF ছিল বামপন্থী, কুর্দী ও সমাজতান্ত্রিক দলসমূহের একটি জোট। বলা হয় যে, বামপন্থীরা দেশে একটি "সন্ত্রাসের রাজত্ব" কায়েম করে।

ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ খৃ. সাদ্দাম হুসায়ন একটি জাতীয় সনদপত্র ঘোষণা করেন, যেখানে জোটনিরপেক্ষ নীতির প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করা হয়। জুন মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছিল ১৯৫৮-র বিপ্লবের পর প্রথম নির্বাচন। নির্বাচনে জাতীয় সংসদের ২৫০ জন সদস্য নির্বাচিত হন। সেপ্টেম্বর মাসে কুর্দী আইন পরিষদের ৫০ জন সদস্য নির্বাচিত হন।

২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ খৃ. ইরান এবং ইরাকের মধ্যে পরবর্তী প্রায় এক দশক ব্যাপী যুদ্ধের সূচনা হয়। সীমানা বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া উভয় দেশ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ৭ জুন, ১৯৮১ খৃ. ইসরাঈলী জেট বিমান ইরাকের ওসিরাক পরমাণু চুল্লী ধ্বংস করে। তাহার অভিযোগ ছিল যে, স্থাপনাটি পরমাণু অস্ত্র উদ্ভাবনে ব্যবহৃত হইতে পারে।

সাদ্দাম হুসায়ন প্রশাসনে তাঁহার অবস্থানকে ক্রমে ক্রমে আরও সুদৃঢ় করেন। উত্তর ইরাকে কুর্দী বিদ্রোহীরা সক্রিয় হইয়া উঠে। কখনও কখনও তাহারা যুদ্ধে ইরানকে সহযোগিতাও করিতে থাকে। ইহার ধারাবাহিকতায় নভেম্বর ১৯৮২ খৃ. নির্বাসিত শী'আ নেতা মুহাম্মদ বাকির আল-হাকিম তেহরানে প্রবাসী অবস্থায় ইরাকের ইসলামী বিপ্লবের সুপ্রীম কাউন্সিল (SCIRI) গঠন করেন। তথাপি ইরাকের সংখ্যাগরিষ্ঠ শী'আ সম্প্রদায় ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমেনীর মৌলবাদী কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে নাই। তাহারা ইরাক ও ইহার সুন্নী রাষ্ট্রপতির প্রতি আনুগত্য পোষণ করে। অপরপক্ষে ইরান সমর্থিত জঙ্গী গোষ্ঠীগুলি অকার্যকর রহিয়া যায়। শেষোক্ত জঙ্গীদের মধ্যে শী'আ মৌলবাদী আদ-দাওয়া আল-ইসলামিয়্যা সাদ্দাম হোসেনকে হত্যার অসংখ্য ব্যর্থ চেষ্টা চালায়।

২৬ নভেম্বর, ১৯৮৩ খৃ. যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান ইরানের সহিত যুদ্ধে ইরাকের পরাজয় রোদকল্পে "আইনগতভাবে প্রয়োজনীয় যে কোন উদ্যোগ" গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশনামূলক একটি গোপন দলীলে স্বাক্ষর করেন। এই সময় রিগ্যান প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিল যে 'ইরাকের নিকট "গণবিধ্বংসী অস্ত্র" আছে এবং তাহারা প্রায় প্রতিদিন ইরানের উপর রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করে। রিগ্যান, রামসফেল্ডকে ইরাকে প্রেরণ করিয়া সাদ্দাম হোসায়নকে এই মর্মে আশ্বস্ত করেন যে, তাঁহাকে সকল প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হইবে।

১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪ খৃ. ইরান ও ইরাকের মধ্য ৪০ মাসব্যাপী চলমান যুদ্ধে আরও গতি সঞ্চার হয়; ঐ সময় ইরান একটি বড় ধরনের আক্রমণ পরিচালনা করে; ইরানের ৫০০,০০০ সৈন্য তাহাতে অংশগ্রহণ করে।

১৯৮০ খৃ. দশকের দ্বিতীয়ার্ধে সাদ্দাম হোসেন দেশব্যাপী তাঁহার নিয়ন্ত্রণকে আরও সুসংহত করেন এবং ইরাকের শী'আ সম্প্রদায়ের আনুগত্য অর্জনে সক্ষম হন। ২০ জুলাই, ১৯৮৮ খৃ. ইরানী আধ্যাত্মিক নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনী ইরাকী নেতা সাদ্দাম হুসায়নের সহিত সন্ধি স্থাপনে সম্মত হন। এইভাবে আট বৎসরব্যাপী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধে ইরাকের এক লক্ষ ও ইরানের দশ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে। ইরানের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসায়ন অতঃপর রাজনৈতিক সংস্কার এবং বহু দলীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনের ঘোষণা দেন।

১৯৮০-র দশকে ইরাকে ২.৫-৩ মিলিয়ন কুর্দী অধিকতর স্বায়ত্তশাসন দাবি করে। অভিযোগ করা হয় যে, দেশের উত্তর-পূর্বে কুর্দী বিদ্রোহ দমনে অনেক অস্ত্র ব্যবহৃত হয়। সাদ্দাম হুসায়ন কুর্দীদের সহিত আপোষ রফার চেষ্টা করেন। ডিসেম্বর ১৯৮৩ খৃ. কুর্দীস্তানের দেশপ্রেমী ইউনিয়ন (PUK)-এর নেতা জামাল তালাবানীর সহিত একটি অস্ত্র সম্বরণ চুক্তিতে উপনীত হওয়ার পর অনেকগুলি আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনাতে কুর্দী গ্রুপের অন্য একজন প্রধান নেতা কুর্দিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (KDP) মাসুদ বারযানিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। ফলে মে ১৯৮৪ খৃ. আলোচনা ভাঙ্গিয়া যায় এবং KUK গেরিলা ও সরকারী বাহিনীর মধ্যে সশস্ত্র লড়াই বাঁধিয়া যায় (জানুয়ারি ১৯৮৫ খৃ.)। তখন কুর্দী এবং ইরানী বাহিনী যৌথভাবে ইরাকী সেনাবাহিনী ও শিল্প স্থাপনার উপর প্রায়শই হামলা পরিচালনা করিতে থাকে।

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ খৃ. KDP ও PUK গেরিলারা সরাকার নিয়ন্ত্রিত ইরাকী কুর্দিস্তানে প্রবেশ করে। এই ঘটনার প্রতিশোধ হিসাবে মার্চ মাসে ইরাকী বাহিনী কুর্দি শহর হালাবজাতে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে। মে মাসে KDP ও PUK দুটি দলের সমন্বয়ে একটি জোট গঠন করত ইরানের সামরিক সহায়তায় কুর্দীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার প্রেক্ষিতে আগস্ট মাসে ইরাক, তুরস্ক ও ইরানের সহিত উহার সীমান্তে অবস্থিত কুর্দি গেরিলা ঘাঁটিগুলিতে নব উদ্যমে হামলা চালায় এবং সেখানে বারবার রাসয়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে বলিয়া অভিযোগ করা হয়। কুর্দী বেসামরিক লোক ও যোদ্ধারা সীমান্ত পথে পলায়ন করে এবং মধ্য-সেপ্টেম্বর নাগাদ ইরান ও তুরস্কে ২০০,০০০-র বেশি কুর্দী শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করে। ঐ মাসে তুরস্ক সীমান্তে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হইলে ইরাকী সরকার শুধুমাত্র জামাল তালাবানী ব্যতীত দেশের ভিতরে বাহিরে অবস্থানরত সকল ইরাকী কুর্দীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। ইরান ও তুরস্ক সীমান্তব্যাপী ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি বসতিবিহীন 'নিরাপত্তা এলাকা' সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কুর্দী স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের নাগরিকদিগকে দেশের অভ্যন্তরভাগে সরাইয়া নেওয়ার কাজও শুরু করা হয়। অক্টোবর ১৯৮৯ খৃ. নাগাদ বসতি সরাইয়া নেওয়ার উপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও 'নিরাপত্তা এলাকা' স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার খবর পাওয়া যায়। ইহার প্রেক্ষিতে PUK দেশব্যাপী শহর কেন্দ্রিক গেরিলা যুদ্ধের ঘোষণা দেয়।

ইরাক ১৯৭৫ খৃ. প্রণীত আলজিয়ার্স চুক্তির কারণে ক্রমাগতভাবে ইরানের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছিল। শেষোক্ত চুক্তিতে ইরান ও ইরাকের দক্ষিণ সীমান্ত হিসাবে শাতিল 'আরব নৌপথের মধ্যবিন্দুকে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৭১ খৃ. ইরান কর্তৃক দখলকৃত আবু মূসা ও তুনব দ্বীপদ্বয় হইতেও ইরানের প্রত্যাহার দাবি করিয়া আসিতেছিল। ১৯৭৯ খৃ. ইরানী বিপ্লব এই সকল ক্ষোভকে আরও বাড়াইয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত, ইরানের খুজিস্তান (আরাবিস্তান) অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে আরবদের দাবিকে ইরাক উৎসাহিত করে।

১৯৮৮ খৃ. শুরু হইতে ইরাকী বাহিনী ইরান কর্তৃক দখলীকৃত ভূখণ্ড পুনর্দখল করিতে থাকে এবং জুলাই মাসে তাহারা ১৯৮৬ খৃ. হইতে প্রথমবারের মত ইরান সীমান্তে ঢুকিয়া পড়ে। ঐ মাসে ইরান শর্তহীনভাবে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ৫৯৮ নং সিদ্ধান্ত মানিয়া নেয় এবং আগস্ট মাসের মধ্যে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অস্ত্র বিরতি কার্যকর হয়।

উক্ত অস্ত্র-বিরতি চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আলাপ-আলোচনায় সামান্য অগ্রগতি সাধিত হইতে না হইতেই ২ আগস্ট, ১৯৯০ খৃ. ইরাক এক ঝটিকা অভিযানে কুয়েত দখল করিয়া লয়। এই সময় সাদ্দাম হুসায়ন অত্যন্ত ক্ষীপ্র গতিতে ইরানের সহিত একটি আনুষ্ঠানিক শান্তি চুক্তিতে উপনীত হন। তিনি অস্ত্র বিরতি পাশ হইতে ইরানের উত্থাপিত সকল দাবি মানিয়া নেন (বরাত পূ. গ্র.)।

মধ্য ১৯৯০ খৃ. পেট্রোলিয়াম রপ্তানীকারক দেশসমূহের সংস্থা - ওপেক (opec) কর্তৃক নির্ধারিত মাত্রায় চাইতে অব্যাহতভাবে অধিক মাত্রায় তৈল উৎপাদনের জন্য ইরাকী সরকার কুয়েত এবং সংযুক্ত 'আরব আমীরাত (UAE)-এর সমালোচনা করে। ইরাক আরও অভিযোগ করে যে, কুয়েত সীমানা লঙ্ঘন করিয়া ইরাকী তৈল সম্পদ আহরণ করিতেছে। ইরাক কুয়েতের নিকট তাহার ঋণ পরিশোধ হইতেও অব্যাহতি চায়। জুলাই মাসে সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে ওপেক মিটিংয়ের প্রাক্কালে ইরাক তাহার সহিত কুয়েতের সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে। ইরাক ও কুয়েতের মধ্যে সীমানা বিরোধ এবং ঋণ পরিশোধ বিষয়ক সরাসরি আলোচনা-অমীমাংসিতভাবে ভাঙিয়া যায়। ২ আগস্ট ইরাকী সেনাবাহিনী দেশটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতঃ সেখানে একটি "মুক্ত সরকার" গঠন করে। অতঃপর ৬৬২ নং সিদ্ধান্তক্রমে জাতিসংঘ ইরাকের সহিত কুয়েতের সংযুক্তিকে বেআইনী ও অকার্যকর ঘোষণা করে। ৭ আগস্ট সৌদি 'আরবের বাদশাহ ফাহদের অনুরোধে কুয়েতের সহিত দেশটির সীমান্তের সুরক্ষা ও সম্ভাব্য ইরাকী আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সৌদি 'আরবে সেনা ও বিমান বহর প্রেরণ করে।

ইতিমধ্যে কুয়েত দখলের একদিন পরে অনুষ্ঠিত 'আরব লীগের এক বৈঠকে ২১ জন সদস্যের মধ্যে ১৪ জন সদস্য কুয়েত হইতে ইরাকের নিঃশর্ত প্রত্যাহার দাবি করেন। এক সপ্তাহ পরে ১২টি সদস্য রাষ্ট্র পারস্য ('আরব) উপসাগরীয় অঞ্চলে একটি মধ্যস্থতাকারী বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশ্য জর্দানের প্যালেস্টাইনী জনগোষ্ঠী ও মাগরিব রাষ্ট্রসমূহে ইরাকের অনুকূলে ব্যাপক জনসমর্থন ও শোভাযাত্রা হয়। বাংলাদেশেও ইহার ধারাবাহিকতায় ইরাকী জনগণ ও সাদ্দাম হুসায়নের অনুকূলে ব্যাপক জনসমর্থন পরিলক্ষিত হয়।

ইরাক কুয়েত হইতে তাহার বাহিনী প্রত্যাহারে অসম্মত হওয়ায় উপসাগরীয় সঙ্কটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের সকল কূটনৈতিক উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নভেম্বর ১৯৯০ খৃ. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ১৫ জানুয়ারি, ১৯৯১ খৃ. মধ্যে ইরাক কুয়েত হইতে সৈন্য প্রত্যাহারে ব্যর্থ হইলে সদস্য রাষ্ট্রগণ উহা কার্যকর করিবে। জানুয়ারি ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যৌথ বাহিনী কর্তৃক বাগদাদে বোমা বর্ষণের মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু হয়।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ খৃ. ইরাক আনুষ্ঠানিকভাবে মিসর, ফ্রান্স, ইতালী, সৌদি 'আরব, সিরিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। একই মাসে ইরাক সোভিয়েত রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রণীত দুইটি শান্তি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু উহা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তে বর্ণিত কুয়েত হইতে নিঃশর্ত প্রত্যাহারের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এই যুক্তিতে প্রত্যাখ্যাত হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ খৃ. ইরাক কুয়েত হইতে সৈন্য প্রত্যাহার করিবার শর্তসাপেক্ষে প্রস্তাব দিলে; শর্ত সংযোজিত থাকায় সম্মিলিত বাহিনী তাহা প্রত্যাখ্যান করে।

সংঘর্ষ এড়ানোর কতিপয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এবং ইরাক কুয়েত হইতে সৈন্য প্রত্যাহার না করায় ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ খৃ. রাত্রিতে যৌথবাহিনী স্থল, সমুদ্র এবং আকাশপথে তাহাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত আক্রমণ শুরু করে। ইরাকী বাহিনী খুব দ্রুত পরাজয় বরণ করে এবং তাহাদের বিপুল সংখ্যক সেনা আত্মসমর্পণ করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ খৃ. যুক্তরাষ্ট্র সরকার অস্ত্র বিরতি ঘোষণা করে। ইরাক কুয়েতের উপর হইতে তাহার দাবি প্রত্যাহার করে, যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদানে সম্মত হয় এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত মানিয়া নেয়।

সম্মিলিত বাহিনী কর্তৃক কুয়েত হইতে বহিষ্কারের পর ইরাক দাপ্তরিকভাবে অস্ত্র বিরতি চুক্তিগ্রহণ করে। ৩ এপ্রিল, ১৯১১ খৃ. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত ৬৮৭ নং সিদ্ধান্তে ইরাক ও কুয়েতের সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়। এই সিদ্ধান্তে ইরাকের উপর কতকগুলি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। যেমন ইরাক কুয়েতের সার্বভৌমত্বকে শ্রদ্ধা করিবে, ১৫০ কিলোমিটারের অধিক পাল্লার সকল ব্যালিস্টিক মিসাইলের ধ্বংসসাধন করিবে, সকল কুয়েতী নাগরিকদের পুনর্বাসন করিবে এবং ইরাকের পেট্রোলিয়াম মজুত হইতে আহরিত অর্থ দ্বারা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ করিবে।

যুদ্ধের পরে ইরাকের অভ্যন্তরে অস্থিরতা দেখা দেয়। ১৯৭০ খৃ. কুর্দী নেতৃবৃন্দ এবং ইরাক সরকারের মধ্যে সম্পাদিত ১৫ দফা শান্তি চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উত্তরাঞ্চলীয় বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। কিন্তু কুর্দীদের পক্ষে ইরাকী সশস্ত্র বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হয় নাই। এই সময় প্রায় ১ মিলিয়ন কুর্দী উত্তরাঞ্চলীয় পর্বতমালা পাড়ি দিয়া তুরস্ক ও ইরানে পলায়ন করে। ইহার প্রেক্ষিতে এপ্রিল ১৯৯১ খৃ. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ উহার ৬৮৮ নং সিদ্ধান্তে বেসামরিক জনগণ, বিশেষত কুর্দী জনগোষ্ঠীর হয়রানির নিন্দা করে এবং আর্তমানবতার সেবায় আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাসমূহের অবিলম্বে ইরাক প্রবেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ইহার প্রেক্ষিতে ১৬ এপ্রিল, ১৯৯১ খৃ. মার্কিন, ফরাসী ও বৃটিশ সেনাবাহিনী প্রদত্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থায় উত্তর ইরাকের কুর্দীদের জন্য একটি 'নিরাপত্তা এলাকা' স্থাপিত হয়। ২৫ জুন, ১৯৯১ খৃ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ইরাকের কুর্দীদের সুরক্ষার জন্য একটি তদারকী বাহিনী গঠন করে। ৯ অক্টোবর, ১৯৯১ খৃ. ইরাকী এবং কুর্দী বাহিনী অস্ত্র বিরতিতে সম্মত হয়।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ৭১৫ নং সিদ্ধান্ত মুতাবিক সেখানে আন্তর্জাতিক পরিদর্শক দল কর্তৃক ইরাকী নিরস্ত্রীকরণ এবং পরমাণু স্থাপনাদি পরিদর্শনে সহযোগিতা বাধ্যতামূলক করা হয়।

২৬ আগস্ট, ১৯৯২ খৃ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স দক্ষিণ ইরাকের রাষ্ট্রীয় বিমান আক্রমণের কবল হইতে রক্ষার জন্য একটি "উড্ডয়নমুক্ত এলাকা" গঠন করে। ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৯২ খৃ. একটি মার্কিন যুদ্ধবিমান উক্ত "উড্ডয়নমুক্ত এলাকা" লঙ্ঘনের দায়ে একটি ইরাকী বিমানকে ভূপাতিত করে। অতঃপর উক্ত এলাকায় আরও ইরাকী সামরিক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য বাহিনী ইরাকের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের লক্ষবস্তুতে হামলা চালায়। এপ্রিল মাসে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে কুয়েতে হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগে ২৭ জুন, ১৯৯৩ খৃ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের গোয়েন্দা ঘাঁটিসমূহে বিমান হামলা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে। জুলাই ১৯৯৩ খৃ. ইরাক উহার দক্ষিণাঞ্চলে জলাভূমিতে বসবাসকারী নাগরিকদের উপর নূতন করিয়া হামলা শুরু করে। মে ১৯৯৬ খৃ. ইরাক সরকার বসরা গভর্নরেটে অবস্থানরত শী'আ মুসলমান ও উপজাতীয়গণের উপর ব্যাপক হামলা চালায়। একই বৎসরের শেষ নাগাদ ইরাকের সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনী এবং শী'আদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ছড়াইয়া পড়ে। এপ্রিল ১৯৯৮ মাসে ইরান কেন্দ্রিক ইরাকে ইসমালী বিপ্লবের সুপ্রীম কাউন্সিল SCRI বলে যে, মার্চ ১৯৯৮ খৃ. দক্ষিণ ইরাকে শী'আ বিদ্রোহীদের দমন প্রক্রিয়ায় ইরাকী বাহিনীর হাতে আনুমানিক ৬০ জন শী'আ মুসলমান নিহত হয়।

ইতিমধ্যে এপ্রিল ১৯৯১ খৃ. কুর্দী সংগঠন PUK নেতা জালাল তালাবানী ঘোষণা করেন যে, প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসায়ন ১৯৭০ খৃ. প্রণীত কুর্দী শান্তি পরিকল্পনা মানিয়া নিতে নীতিগতভাবে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু কিরকুক শহরকে কুর্দী স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি না মানায় আলোচনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। অক্টোবর ১৯৯১ খৃ. একটি "স্বায়ত্তশাসিত কুর্দিস্তান"-এর বিষয়ে কোন গৃহীত চুক্তির অবর্তমানে ইরাক সরকার এলাকাটি হইতে সকল সেবা প্রত্যাহার করে, যাহার ফলে এলাকাটি কার্যতর একটি অর্থনৈতিক অবরোধের শিকার হয়। মে ১৯৯২ খৃ. ১০৫ সদস্যবিশিষ্ট কুর্দিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে দুই কুর্দী সংগঠন KDP এবং PUK প্রায় সমান সংখ্যক আসন প্রাপ্ত হইলে একজন সর্বময় তুর্কী নেতা নির্বাচনের বিষয়টি অমীমাংসিত রহিয়া যায়।

ডিসেম্বর ১৯৯৩ খৃ. কুর্দিস্তানের দেশপ্রেমিক ইউনিয়ন PUK এবং কুর্দিস্তানের ইসলামী লীগ (বা ইরাকী কুর্দিস্তানের ইসলামী আন্দোলন IMIK)-এর সশস্ত্র যোদ্ধাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিয়া যায়। ইরাকী জাতীয় কংগ্রেস INC (বিরোধী দলসমূহের একটি বৃহত্তর সংগঠন)-এর মধ্যস্থতায় ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ খৃ. একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মে ১৯৯৪ খৃ. KDP এবং PUK-এর মধ্যে আরও ব্যাপক সংঘর্ষের সূত্র ধরিয়া উত্তরাঞ্চলীয় কুর্দী নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ১৯৯৪ খৃ. জুন, নভেম্বর ও ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সকল শান্তি-চুক্তিগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জানুয়ারি ১৯৯৫ খৃ. সাদ্দাম হুসায়ন এই বিরোধের মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব দেন।

জানুয়ারি ১৯৯৭ খৃ. "অপারেশন আরাম দাও"-এর সমাপনান্তে "উত্তরাঞ্চলীয় পর্যবেক্ষণ" শীর্ষক এক নূতন সামরিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্ক ভিত্তিক এই নূতন অপারেশনে বৃটিশ, তুর্কী এবং মার্কিন বাহিনী অংশগ্রহণ করে (পৃ. গ্র.)।

মে ১৯৯৭ খৃ. ৫০,০০০ তুর্কী সেনা উত্তর ইরাকে প্রবেশ করে। তাহারা কুর্দিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির সহযোগিতায় কুর্দিস্তান শ্রমিক পার্টির ঘাটিসমূহে প্রবল হামলা চালায়। ইরাক, ইরান, সিরিয়া এই

অনুপ্রবেশের নিন্দা করে। সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ খৃ. যুক্তরাষ্ট্র কুর্দিস্তানের বিবদমান উভয় পার্টির মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক শান্তি চুক্তির মধ্যস্থা করে। কুর্দিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির পক্ষে মাসঊদ বারযানী এবং প্যাট্রিয়টিক ইউনিয়ন অব কুর্দিস্তানের পক্ষে জালাল তালাবানির উপস্থিতিতে ওয়াশিংটন ডিসি-তে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটিতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংস্থান রাখা হয় সেগুলির মধ্যে ছিল ঃ ১৯৯৯ খৃ. কুর্দি আইনসভার নির্বাচন (যাহা আদৌ অনুষ্ঠিত হয় নাই);একটি সংযুক্ত আঞ্চলিক প্রশাসন; স্থানীয় রাজস্ব ভাগাভাগি বৈরীতার অবসান এবং কুর্দী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে "খাদ্যের জন্য তেল" কর্মসূচীর বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা (পূ.গ্র., পৃ ২১/৩১-৩২)।

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত যৌথ বাহিনীর নিকট ইরাকের পরাজয়ের পর সাদ্দাম হুসায়ন তাঁহার পরিবারের সদস্যবর্গ ও ঘনিষ্ঠ সমর্থকদিগকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদসমূহে নিয়োগদান করত দেশটিতে তাঁহার নিয়ন্ত্রণ জোরদার করেন। জুলাই ১৯৯৫ খৃ. একজন নূতন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং একজন নূতন সেনাপ্রধান সাদ্দাম সরকারের প্রতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আস্থা দৃঢ়তরকরণের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ খৃ. বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের এক সভা আহবান করা হয়। সেখানে সংবিধানের অন্তর্বর্তীকালীন সংস্কার করা হয়। সেমতে বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের নির্বাচিত সভাপতি অবধারিতভাবে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হইবেন এইরূপ বিধান রাখা হয়। অবশ্য ইহাতে জাতীয় সংসদের অনুমোদন ও গণভোটে সম্মতির সংস্থান রাখা হয়। সংসদ সাদ্দাম হুসায়নের প্রার্থিতা যথারীতি অনুমোদন করে। ১৫ অক্টোবর, ১৯৯৫ খৃ. অনুষ্ঠিত গণভোটে ৯৯.৪৭% ভোটার তাহাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। উহার ৯৯.৯৬% ভোটার সাদ্দাম হুসায়নের রাষ্ট্রপতি হিসেবে বহাল থাকার পক্ষে ভোট দেয়। নয়টি ইরাকী বিরোধী দল তাহাদের এক বিবৃতিতে গণভোটের ফলাফলকে অকার্যকর ও বাতিল ঘোষণা করে (পূ. গ্র., পৃ. ২১৩২)।

১৯৯৭ খৃ. ইরাকের বিরোধী দল সূত্রে জানা যায় যে, সাদ্দাম হুসায়ন তাঁহার পুত্রের উপর আক্রমণের প্রতিশোধ হিসাবে ১৯৭ জন বন্দীকে হত্যার নির্দেশ দেন। এই ঘটনার পূর্ববর্তী মাসে তাঁহার ছেলে কুসায় দুইবার আততায়ীদের আক্রমণ হইতে অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পান।

১৯৯৭ খৃ. শেষদিকে কতিপয় উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, বাথ পার্টির সদস্য এবং বিরোধী দলের সন্দেহভাজন ৮০০ বন্দীকে হত্যা করা হয়। দুইজন উর্ধ্বতন শী'আ ধর্মীয় নেতাকে এপ্রিল ও জুন ১৯৯৮ খৃ. হত্যা করা হয়। তাহারা ছিলেন যথাক্রমে আয়াতুল্লাহ মুরতাদা আল-বুরুজিরদি ও আয়াতুল্লাহ সিরযী 'আলী আল-গারাতাই। পর্যবেক্ষক মহল আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ইরাকের শী'আ মুসলমানগণের স্বাধীনতার প্রতিভূ নেতৃবৃন্দকে পর্যায়ক্রমে হত্যা প্রচেষ্টার ইহা ছিল এক খণ্ডাংশ মাত্র। এই হত্যাকাণ্ডের সহিত ইরাক সরকার তাহার সম্পৃক্ততার অভিযোগ অস্বীকার করে এবং ইহার দায় বিদেশে অবস্থিত দূরভিসন্ধিমূলক চক্রের উপর চাপায়।

২০০০ খৃ. মে মাসের প্রথম দিকে ইরাকে ইসলামী বিপ্লবের সুপ্রিম কাউন্সিল বাগদাদের রাষ্ট্রপতি ভবনে একটি রকেট হামলা করিলে তথায় বেশ কিছু হতাহতের ঘটনা ঘটে। উল্লেখ্য যে, ঐ সময় সাদ্দাম হুসায়ন তাহার পুত্রদের সহিত সেখানে সাক্ষাত করিবেন, পূর্ব নির্ধারিত এইরূপ এক সময়সূচীর ভিত্তিতে রকেট হামলা পরিচালিত হয়। মধ্য-জুলাই ২০০১ খৃ. সংস্থাটি বাগদাদের দাপ্তরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর পুনরায় কতিপয় রকেট হামলা করে। শী'আ ধর্মীয় নেতাদের উপর আক্রমণের প্রেক্ষিতে, বিশেষত নাজাফে সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে শী'আ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ সায়্যিদ হুসায়ন বাহরুল-'উলূমের ইন্তিকালের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে হামলাগুলি পরিচালিত হয়।

ইতিমধ্যে ২০০২ খৃ. জাতীয় সংসদ সর্বসম্মতভাবে রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হুসায়নের আরও সাত বৎসরের একটি টার্ম রাষ্ট্রপতি থাকার বিষয়ে গণভোটের জন্য সর্বসম্মতভাবে মনোনয়ন দান করে। ১৫ অক্টোবর, ২০০২ খৃ. যথারীতি গণভোট অনুষ্ঠিত হয় যেখানে দাপ্তরিকভাবে উল্লেখ করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি ১০০% ভোট প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উপসাগরীয় যুদ্ধের পরবর্তী দশকের ঘটনাবলী জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বহাল ও নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক নির্দেশাবলী ইরাক কর্তৃক না মানার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মে ১৯৯১ খৃ. গৃহীত নিরাপত্তা পরিষদের ৬৯২ নং সিদ্ধান্তমতে জাতিসংঘ ক্ষতিপূরণ কমিশন গঠিত হয়। ইহার মাধ্যমে ইরাকী আগ্রাসনে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্থদের ইরাকী পেট্রোলিয়ামের আয় হইতে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়। আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৯১ খৃ. গৃহীত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ৭০৬ ও ৭১২ নং সিদ্ধান্তমতে ৬ মাসের মধ্যে ইরাককে ১,৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পেট্রোলিয়াম বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়। এরূপে তৈল হইতে বিক্রয়লব্ধ আয় জাতিসংঘের একটি হিসাবের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করিতে বলা হয়। উক্ত অর্থের একাংশ দ্বারা ইরাকের জন্য খাদ্য, ঔষধ ও জরুরী বেসামরিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের সংস্থান রাখা হয়। ইরাক পুনরায় তৈল রপ্তানীর জন্য জাতিসংঘের আরোপিত শর্ত মানিয়া নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ খৃ. পরবর্তী আলোচনায় অংশগ্রহণ হইতে বিরত থাকে। অক্টোবর ১৯৯২ খৃ. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ৭৭৮ নং সিদ্ধান্তক্রমে ইরাকের তৈল সংশ্লিষ্ট ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সম্পদ জব্দ করা হয় (পূ. গ্র., পৃ. ২১-৩৩)।

১৯৯৬ খৃ. চুক্তিমতে, ইরাকের তৈল বিক্রয়লব্ধ প্রতি ১,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে, ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার জাতিসংঘের প্রত্যাবাসন তহবিলে, ৩০-৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ইরাকে জাতিসংঘ কর্মকাণ্ডের ব্যয় নির্বাহে এবং ১৩০-১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ইরাকের কুর্দী শাসিত এলাকাগুলিতে জাতিসংঘ পরিচালিত মানবিক কর্মকাণ্ডের ব্যয় নির্বাহে ব্যবহারের এবং অবশিষ্ট অর্থ দ্বারা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ইরাকের জন্য মানবিক দ্রব্যাদি ক্রয় ও বিতরণের সংস্থান রাখা হয়। সমঝোতা চুক্তিটিকে ইরাক নিষেধাজ্ঞা উত্তোলনের সূচনা হিসাবে চিহ্নিত করে। অপরপক্ষে জাতিসংঘ জোরালোভাবে উল্লেখ করে যে, দেশটির গণবিধ্বংসী সকল অস্ত্রের বিবরণ প্রকাশ ও ধ্বংস সাধন না করা পর্যন্ত ইরাকী পেট্রোলিয়াম বিক্রয়ের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা পূর্ণাঙ্গরূপে প্রত্যাহার করা হইবে না। ১৯৯৭ খৃ. আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতভাবে ইরাকী কর্মকর্তাদের উপর ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। মার্কিন নাগরিকদের ইরাক হইতে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করার জন্যও জাতিসংঘ ইরাকের উপর চাপ সৃষ্টি করে। জাতিসংঘ আরও বলে যে, অস্ত্র পরিদর্শনে অসহযোগিতা অব্যাহত থাকিলে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বৃদ্ধি করা ছাড়াও সামরিক ব্যবস্থা নেওয়া হইতে পারে।

ইরাক তাহার দাবি পরিত্যাগে অস্বীকৃতি জানায় এবং মার্কিন অস্ত্র পরিদর্শকদের ইরাক ত্যাগে বাধ্য করে। ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ঐ এলাকায় তাহাদের সমরশক্তি বৃদ্ধির নির্দেশ

দেয়। নভেম্বর ১৯৯৭-র মাঝামাঝি সময় নাগাদ রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মধ্যস্থতায় উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হয়।

জানুয়ারি ১৯৯৮ খৃ. স্কট রিটার নামক একজন প্রাক্তন মার্কিন মেরিন অফিসারের নেতৃত্বে জাতিসংঘ কমিশন অস্ত্র পরিদর্শনে আসিলে ইরাক অভিযোগ করে যে, স্কট মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা পরিদপ্তর সিআইএ-এর একজন কর্মকর্তা। কাজেই ইরাক তাহাদের দ্বারা অস্ত্র পরিদর্শন করানোতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, যাহার প্রেক্ষিতে দলটি ইরাক ত্যাগ করে। ইহাতে অস্ত্র পরিদর্শন বিষয়ক বিরোধ আরো ঘনীভূত হয়। ১৯৯৮ খৃ. জানুয়ারির শেষদিকে এবং ফেব্রুয়ারির প্রথমদিকে ইরাকের বিরুদ্ধে আসন্ন বিমান হামলার প্রাক্কালে রাশিয়ার পররাষ্ট্র উপমন্ত্রী বাগদাদে ইরাকী কর্মকর্তাদের সহিত বিস্তারিত আলোচনা করেন। রুশ প্রেসিডেন্ট বোরিস ইয়েলৎসিন বলেন, ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের যে কোন প্রস্তাবে রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করিবে। তিনি আরও বলেন, ইরাকে মার্কিন সামরিক শক্তি প্রয়োগের কারণে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে (পূ. গ্র., পৃ. ২১৩৩-৩৫)।

অধিকন্তু ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি আঞ্চলিক সমর্থন অতি সামান্য। শুধুমাত্র কুয়েত কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ব্যর্থতায় শক্তি প্রয়োগকে অনুমোদন করা হয়। সৌদি আরব ও বাহরায়ন তাহাদের ভূখণ্ড হইতে সামরিক আক্রমণ পরিচালনার অনুমোদন দেয় নাই। অধিকন্তু সিরিয়া ও মিসর ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে তাহাদের অনুমতি নাই, একথা সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেয়। মে ১৯৯৮ খৃ. অস্ত্র পরিদর্শক দলের প্রধান বাটলার নিরাপত্তা পরিষদে প্রেরিত তাহার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, ইরাক উপসাগরীয় যুদ্ধের পূর্বেই তাহার মিসাইলসমূহকে রাসায়নিক অস্ত্র-সজ্জিত করিয়াছিল। পরিদর্শন কর্মসূচির অংশ হিসাবে ধ্বংসকৃত মিসাইলগুলিতে মার্কিন সামরিক পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। পরবর্তীতে ফরাসী ও সুইস বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত টেস্টেও প্রমাণিত হয় যে, ইরাক উহার জীবানু অস্ত্র ধ্বংস করিয়াছে। জুলাই ১৯৯৮ খৃ. আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি কমিশন পুনরায় বলে যে, ইরাকের পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র গোপন রাখার কোন প্রমাণ মিলে নাই।

নভেম্বর ১৯৯৮ খৃ. প্রথমদিকে বৃটেনের উদ্যোগে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাশকৃত একটি প্রস্তাবে জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দলের জন্য অবিলম্বে নিঃশর্ত সহযোগিতা দাবি করা হয়। কিন্তু ইরাক উহাতে অস্বীকৃতি জানানোতে সম্ভাব্য ইরাকী লক্ষ্যবস্তুসমূহে হামলার জন্য উপসাগরীয় অঞ্চলে পুনরায় আরও সেনা মোতায়েন করা হয়। মিসর, সৌদি আরব ও সিরিয়া শক্তি প্রয়োগের বিরোধিতা করে।

১৯৯৮ খৃ. ডিসেম্বর মাসের প্রথমদিকে অস্ত্র পরিদর্শক দল বাগদাদে অবস্থিত বাথ পার্টির সদর দপ্তরে অতর্কিত পরিদর্শনে গেলে জাতিসংঘের সহিত ইরাকের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কারণ সেখানে অস্ত্র পরিদর্শক দলের প্রবেশে অস্বীকৃতি জানানো হয়। ডিসেম্বর ১৯৯৮ খৃ. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পেশকৃত এক প্রতিবেদনে বাটলার উল্লেখ করেন যে, ইরাক পূর্ববর্তী মাসে প্রদত্ত তাহার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দলকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা প্রদানে ব্যর্থ হইয়াছে। ইহার প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দল ও আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থার লোকজনকে ইরাক হইতে প্রত্যাহার করত ১৬-১৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ খৃ. রাত্রিতে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ইরাকে বিমান হামলা চালায়। অপারেশন "মরু খেকশিয়াল" নামে পরিচালিত এই বিমান আক্রমণ ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ খৃ. শেষ হয়। উহাতে ইরাকের সামরিক স্থাপনার উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধন করা হয় বলিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য দাবি করে। ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন বলে যে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিনানুমতিতে উক্ত সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

জানুয়ারি ১৯৯৯ খৃ. মার্কিন ও ইরাকী যুদ্ধ বিমানগুলি উড্ডয়নমুক্ত এলাকায় সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। উক্ত এলাকার নজরদারীতে নিয়োজিত মার্কিন যুদ্ধ বিমানগুলির প্রতি ইরাক ভূমি হইতে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করে। এইভাবে ইরাকের লড়াকু মনোবৃত্তি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, দেশটি উড্ডয়নমুক্ত এলাকার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ১৯৯৯ খৃ. ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিকে এবং মার্চ মাসের প্রথমদিকে উড্ডয়নমুক্ত এলাকা লঙ্ঘনের দায়ে এবং ভূমি হইতে নিক্ষিপ্ত অস্ত্র দ্বারা হামলার জবাবে মার্কিন ও বৃটিশ সামরিক বাহিনী ইরাকের সামরিক স্থাপনাসমূহে আরও বিমান হামলা পরিচালনা করে। ইরাকী কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে, বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর হামলা করা হইয়াছে। উড্ডয়নমুক্ত এলাকা প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের অনুমোদন না থাকায় রাশিয়ার মত গণচীনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যকে ইরাকের বিরুদ্ধে বিমান হামলা বন্ধের আহবান জানায়। ডিসেম্বর ১৯৯৮ খৃ. হইতে মধ্য ১৯৯৯ খৃ. পর্যন্ত সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের যুদ্ধ বিমানগুলি ইরাকের বিরুদ্ধে ২০০ বারেরও বেশি বহুমুখী ক্ষেপনাস্ত্র হামলা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের যুদ্ধ বিমানগুলি ১৯৯৯ খৃ., ২০০০ খৃ. ও ২০০১ খৃ. ইরাকের বিরুদ্ধে তাহাদের বিমান হামলা অব্যাহত রাখে (পূ. গ্র., পৃ. ২১৩৪)

জানুয়ারি ২০০১ খৃ. জর্জ ডাবলিউ বুশের নূতন মার্কিন সরকার ক্ষমতায় আসিয়া ইরাকের বিষয়ে এক আপোষহীন নীতি গ্রহণ করে। ২০০১ খৃ. মধ্য ফেব্রুয়ারি মার্কিন ও বৃটিশ যুদ্ধ বিমানগুলি ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দের অপারেশন 'মরু খেকশিয়ালের' পর প্রথমবারের মত বাগদাদের সন্নিকটে বিমান প্রতিরক্ষা লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপরে হামলা চালায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট উত্তর ও দক্ষিণ ইরাকের বিমান উড্ডয়নমুক্ত এলাকাসমূহের রক্ষার্থে ইহাকে একটি 'রুটিন মিশন' নামে অভিহিত করেন। এই আক্রমণের সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য উড্ডয়নমুক্ত এলাকায় টহলরত তাহাদের যুদ্ধ বিমান বহরকে লক্ষ্য করিয়া ক্রমবর্ধমান হারে ইরাকী বিমান ও মিসাইল আক্রমণের কথা উল্লেখ করে। ইরাক উহার প্রতিবাদে বলে যে, তাহার বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর হামলা করা হইয়াছে। পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমসমূহেও ইরাকের বেসামরিক হতাহতের খবর উল্লেখ করা হয়।

ডিসেম্বর ১৯৯৮ খৃ. ইরাকী লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর বিমান হামলা অভিযানের মাধ্যমে জাতিসংঘের বিশেষ কমিশনের যবনিকাপাত ঘটে। জানুয়ারি ১৯৯৯ খৃ. ইরাক বিষয়ে একটি নূতন নীতি নির্ধারণের জন্য জাতিসংঘ তিনটি প্যানেল গঠন করে। উহাদের বিবেচ্য বিষয় ছিল ইরাকের নিরস্ত্রীকরণ, কুয়েতী যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে বিবেচনা এবং মানবিক পরিস্থিতির বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করা।

জাতিসংঘের বিশেষ কমিশনের প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্যের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপনে ১৯৯৯ খৃ. প্রথম দিকে যুক্তরাজ্য ও হল্যান্ডের কূটনৈতিক উদ্যোগ ফলপ্রসু

হয়। এজন্য নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ১২৮৪ নং প্রস্তাবমতে ইরাকী অস্ত্র পরিদর্শনের একটি নূতন কৌশল অবলম্বন করা হয়। গৃহীত নূতন প্রস্তাব মতে জাতিসংঘের বিশেষ কমিশন (UNSCOM)-কে জাতিসংঘের একটি পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও পুনর্মূল্যায়ন কমিশন (UNMOVIC) দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়।

তুরস্কের ভাষ্যমতে, ১৯৯৬ খৃ. গৃহীত জাতিসংঘের ৯৮৬ নং সিদ্ধান্ত মতে কিরকুক- য়ুমুরতালিক পাইপলাইনের মাধ্যমে ইরাক প্রতিদিন ৩৫০,০০০ ব্যারেল অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম রপ্তানী করিতে থাকে। এই তেল রপ্তানীর অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত খাদ্যসামগ্রীর প্রথম সরবরাহ মার্চ ১৯৯৭ খৃ. ইরাকে পৌঁছে। জুন ১৯৯৭ খৃ. তেলের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির মেয়াদ আরো ছয় মাস বৃদ্ধি করা হয়, কিন্তু জাতিসংঘের নিকট হইতে পর্যাপ্ত মানবিক সাহায না পাওয়ার অভিযোগে ইরাক পেট্রোলিয়াম রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেয়। জানুয়ারি ১৯৯৮ খৃ. ইরাক কর্তৃক দাখিলকৃত একটি নূতন বিতরণ কর্মসূচি জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে তৈল রপ্তানী পুনরায় শুরু করা হয়। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ খৃ. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ তৈল রপ্তানী হইতে আয়ের উর্ধ্বসীমা ৫,২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করে। জুলাই ১৯৯৮ খৃ. অবধি এইরূপে আহরিত আয় হইতে মানবিক পণ্যসামগ্রী ক্রয়ার্থ ইরাককে ৩,৫৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ের অনুমতি প্রদান করা হয়। বাকী অর্থ দ্বারা ক্ষতিপূরণ এবং দেশটিতে জাতিসংঘ কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। যাহা হউক, ইরাক বলে যে, তাহার তেল খাতের পুনর্বাসন ব্যতীত সে প্রতি ৬ মাসে ৪,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি তৈল রপ্তানীতে সক্ষম নয়। মার্চ ১৯৯৮ খৃ. জাতিসংঘের টেকনিশিয়ানরা তাহাদের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে বলেন যে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ইরাক প্রতি ছয় মাসে ৩,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈল রপ্তানীতে সক্ষম। অবশ্য সেক্ষেত্রে দেশটিতে প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানীর অনুমতি প্রদান করা আবশ্যক। সে মতে, জাতিসংঘের মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ করিলে তৈল রপ্তানীর আয় হইতে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দ্বারা তৈল উৎপাদন স্থাপনাসমূহের মেরামত ব্যয় নির্বাহের জন্য ইরাককে অনুমতি দেওয়া হয় (পূ. গ্র., পৃ. ২১৩৬-৭)।

ফেব্রুয়ারি ২০০০ খৃ. অব্যাহত অবরোধের প্রেক্ষিতে ইরাকী জনগণের দুর্ভোগ বৃদ্ধির প্রতিবাদে ইরাকে জাতিসংঘ মানবিক কার্যক্রম সমন্বয়ক হ্যান্স ডন স্পোনেক এবং দেশটিতে নিযুক্ত বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রধান জুটটা বার্গহারডট পদত্যাগ করেন। পূর্ববর্তী তেলের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির সমন্বয়ক ডেনিস হ্যালিডে ১৯৯৮ খৃ. একইভাবে অবরোধকারীদের ব্যর্থতার নিন্দা জ্ঞাপন করিয়া পদত্যাগ করেন। তুন মায়াত, যিনি ২০০০ খৃ. এপ্রিল মাসে বাগদাদে মানবিক কর্মসূচি সমন্বয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তিনি তেলের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির সমালোচনা না করিয়া উহার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন (পূ. গ্র, পৃ. ২১৩৬)।

ইরাকে নিষেধাজ্ঞার এক দশকে সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইহার ক্রমবর্ধমান নিন্দায় সোচ্চার হইয়া উঠে। মার্চ ২০০০ খৃ. জাতিসংঘ নিষেধাজ্ঞা কমিটির আপত্তি সত্ত্বেও একজন বৃটিশ সংসদ সদস্য জর্দানের রাজধানী আম্মান হইতে সড়কপথে বাগদাদ অভিমুখী একটি সাহায্য কর্মসূচি দলের নেতৃত্ব দেন এবং বাগদাদে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সদর দপ্তরে ঔষধপত্র সরবরাহ করেন। অতঃপর এপ্রিল ২০০০ খৃ. ইরাকে বিমান ভ্রমণের উপর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করিয়া ইতালী এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্টের একজন সদস্য আম্মান হইতে একটি চার্টার্ড বিমানযোগে বাগদাদে আগমন করেন। আগস্ট ২০০০ খৃ. ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রপতি হুগো স্যাভেয ফ্রিয়াস উপসাগরীয় সঙ্কট শুরুর পর হইতে বাগদাদ ভ্রমণকারী কোন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ইরাক ভ্রমণ করেন।

আগস্ট ২০০০ খৃ. বাগদাদ ও সিরিয়ার অলেপ্পোর মধ্যে রেল যোগাযোগ ২০ বৎসর পর পুনঃস্থাপিত হয়। অধিকন্তু নভেম্বর ২০০০ খৃ. ইরাক ১৯৮০ খৃ. হইতে অব্যবহৃত একটি তেল পাইপ লাইনের মাধ্যমে সিরিয়াতে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম সরবরাহ করিতে থাকে। উল্লেখ্য যে, তেলের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় ইরাককে শুধুমাত্র দুইটি সুনির্দিষ্ট পথে তৈল রপ্তানীর অনুমোদন দেওয়া হয়। নূতন পথটির মাধ্যমে ইরাকের তৈল রপ্তানীর সামর্থ্য বিদ্যমান প্রতিদিন ১৫০,০০০ ব্যারেল হইতে দ্বিগুণেরও অধিক পরিমাণে উন্নীত করে।

সাদ্দাম হুসায়ন বলিতে থাকেন যে, নিষেধাজ্ঞা চক্রের অবসান ঘটিতে চলিয়াছে। নিষেধাজ্ঞার দশ বৎসরে ইরাকী জনগণের দুর্ভোগ চরমে উঠায় তিনি আন্তর্জাতিক সহানুভূতি অর্জনের চেষ্টা করিতে থাকেন। প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাবলিউ বুশের নূতন মার্কিন প্রশাসন জানুয়ারি ২০০০ খৃ. ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া ইরাকে নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রাখার বিষয়ে জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেন। নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে তৈল রপ্তানী খাতে ইরাকের আয় ডিসেম্বর ২০০১ খৃ. প্রতিদিন ২.২ মিলিয়ন ব্যারেল হইতে জানুয়ারি ২০০২ খৃ. প্রতিদিন ১.৫ মিলিয়ন ব্যারেলে নামিয়া আসে। ইতিমধ্যে ইরাক কর্মসূচির নির্বাহী পরিচালক বেনন সেভান জানুয়ারি ২০০২ খৃ. জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা কমিটির এক সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ইরাক বিষয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বের কারণে এ যাবৎ দেশটির ৫,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হইয়াছে।

২০০২ খৃ. জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে প্রেসিডেন্ট বুশ তাহার স্টেট অব দি ইউনিয়ন ভাষণে ইরাককে ইরান ও উত্তর কোরিয়ার সহযোগে "শয়তানের অক্ষশক্তি" গঠনের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। তিনি এই দেশগুলিকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণের জন্য দোষারোপ করেন। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, ইরাক এ্যানথ্যাক্স, স্নায়ু গ্যাস ও পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে নিয়োজিত রহিয়াছে। প্রেসিডেন্ট বুশের এই মন্তব্যে উত্তেজনা ছড়াইয়া পড়ে (পূ. গ্র., পৃ. ২১৩৭)।

আগস্ট ২০০২ খৃ. বাগদাদে সরকার পতনের লক্ষ্যে হস্তক্ষেপ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র উহার অভিপ্রায় পুনর্ব্যক্ত করে। সে লক্ষ্যে মার্কিন সরকার ইরাকে সামরিক হস্তক্ষেপের বৈধতাসূচক একটি প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে পাশ করাইবার উদ্যোগ গ্রহণ করে। অন্যথায় যুক্তরাষ্ট্র একক ব্যবস্থা গ্রহণেরও ইঙ্গিত দেয়।

২০০২ খৃ. সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে বৃটিশ সরকার সাদ্দাম হুসায়ন সরকারের বিরুদ্ধে উহার অবস্থান ব্যাখ্যা করিয়া একটি বিবরণী প্রকাশ করে। উহাতে ইরাকের অবৈধ অস্ত্র কর্মসূচি কিভাবে পশ্চিমা বিশ্ব ও মধ্যপ্রাচ্যের জন্য হুমকীস্বরূপ তাহা ব্যাখ্যা করা হয়। ইহার স্বল্পকাল পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামসফেল্ড যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ পুনর্ব্যক্ত করিয়া বলেন যে, ইরাক আল-কায়েদা সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষণে সহায়তা দান করিতেছে।

২০০২ খৃ. অক্টোবরে মার্কিন কংগ্রেস সাদ্দাম সরকারের নিরস্ত্রীকরণে, প্রয়োজনে এককভাবে, শক্তি প্রয়োগের প্রস্তাব পাশ করে এবং প্রেসিডেন্ট বুশ উহাতে সম্মতি সূচক স্বাক্ষর করেন। ৮ নভেম্বর, ২০০২ খৃ. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্যের সম্মতির প্রেক্ষিতে ১৪৪১ নম্বর প্রস্তাব পাশ করা হয়। সেখানে যে সকল বিষয়ের সংস্থান রাখা হয় সেগুলির মধ্যে ছিল ঃ ইরাক জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দল ও আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি এজেন্সিকে সন্দেহযুক্ত বেআইনী অস্ত্র সম্বলিত স্থানসমূহে অবাধ প্রবেশাধিকার প্রদান করিবে; রাষ্ট্রপতি ভবনগুলিও পরিদর্শনের আওতায় আসিবে; এবং ইরাক উহার রাসায়নিক, জীবানু, পরমানু ও ব্যালাসটিক অস্ত্রসহ তৎসংশ্লিষ্ট বেসামরিক শিল্পকারখানার বিবরণ ৩০ দিনের মধ্যে জাতিসংঘ সমীপে পেশ করিবে (পূ. গ্র., পৃ. ২১৩৭)।

শেষোক্ত প্রস্তাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলা হয় যে, জাতিসংঘের পূর্ববর্তী প্রস্তাবসমূহের ধারাবাহিকতায় বাধ্যতামূলক নিরস্ত্রীকরণ অবলম্বনে বাগদাদের জন্য ইহা 'শেষ সুযোগ'। ইহা প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে বা অস্ত্র ভাণ্ডারের 'মিথ্যা ও ত্রুটিপূর্ণ' বিবরণ দাখিল করিলে 'মারাত্মক পরিণতির' সম্মুখীন হইতে হইবে। ১২ নভেম্বর, ২০০২ খৃ. ইরাকী গণপরিষদ কর্তৃক ১৪৪১ নং প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে প্রত্যাখ্যাত হইলেও পরবর্তী দিবসে বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল প্রস্তাবটিতে আনুষ্ঠানিক ও নিঃশর্ত অনুমোদন প্রদান করে। অবশ্য ইরাকী কর্মকর্তাগণ বারংবার বলিতে থাকেন যে, তাহাদের কাছে কোন গণবিধ্বংসী অস্ত্রসম্ভার নাই।

৭ ডিসেম্বর, ২০০২ খৃ. ইরাক তাহার অস্ত্র কর্মসূচির ১২,০০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি বিবরণ জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দলের নিকট উপস্থাপন করে। ডিসেম্বর ২০০২ খৃ. যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করে যে, ইরাক জাতিসংঘের ১৪৪১ নং প্রস্তাবের উল্লেখযোগ্য শর্তাবলী ভঙ্গ করিয়াছে; দেশটি উহার অস্ত্রভাণ্ডারের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হইয়াছে; বিশেষত অ্যানথ্যাক্সের মত জীবাণু অস্ত্রভাণ্ডারের মজুদ বিষয়ক তথ্য প্রকাশ করে নাই। তথ্যে উহার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। ইতিমধ্যে হ্যান্স ব্লিক্স এবং আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি এজেন্সি প্রধান মুহাম্মাদ এল-বারাদেই জাতিসংঘে উপস্থাপিত তাহাদের প্রতিবেদনে ইরাকী কর্মকর্তাদের নিকট হইতে আরও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

জানুয়ারি ২০০৩ খৃ. সাদ্দাম হুসায়ন জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকগণকে গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে অভিযুক্ত করেন। মধ্য জানুয়ারি ২০০৩ খৃ. অস্ত্র পরিদর্শকগণ বাগদাদের দক্ষিণে কতিপয় শূন্য রাসায়নিক অস্ত্রের আধার আবিষ্কার করেন। সেগুলির বিবরণ ইরাকের ডিসেম্বরে দাখিলকৃত ঘোষণাপত্রে ছিল না। অবশ্য ইহা কোন উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিৎ হওয়া যায় নাই। ইতিমধ্যে সৌদি আরব ও মিসরসহ কতিপয় আরব রাষ্ট্র সাদ্দাম হুসায়নের পদত্যাগ বা দেশান্তর গ্রহণে তাহাকে রাজী করাইবার চেষ্টা করে। অবশ্য ইরাকী কর্মকর্তাগণ ইহার সত্যতা অস্বীকার করেন। মার্চ ২০০৩ খৃ. শুরুতে মিসরের কায়রোতে অনুষ্ঠিত আরব লীগের এক জরুরী শীর্ষ সম্মেলনে সাদ্দাম হুসায়নের পদত্যাগ বিষয়ক আমীরাতের একটি প্রস্তাব আলোচিত হয় এবং এ মাসের শেষে বাহরাইনের আমীর সাদ্দাম হুসায়নকে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু আসন্ন যুদ্ধ এড়ানোর লক্ষ্যে গৃহীত এ সকল প্রচেষ্টার সবগুলিই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

জানুয়ারী ২০০৩ খৃ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রচুর সেনা সমাবেশ করে। নিরস্ত্রীকরণে বাগদাদের আগ্রহের প্রতি সন্দেহের ধারাবাহিকতায় পররাষ্ট্র এবং কমনওয়েলথ বিষয়ক বৃটিশ সেক্রেটারী অব স্টেট জ্যাক স্ট্র ঘোষণা করেন যে, ইরাক জাতিসংঘের গৃহীত ১৪৪১ নং প্রস্তাব গুরুতরভাবে লংঘন করিয়াছে। ক্রমবর্ধমান সংকটের প্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের সম্ভাবনা ঘনীভূত হয়। তখন ২০০৩ খৃ. জানুয়ারি মাসের শেষদিকে যুক্তরাজ্য, ইতালী ও স্পেনসহ আটটি ইউরোপীয় দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক নীতির সমর্থনে এক যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে।

মার্চ ২০০৩ খৃ. তুরস্কের সংসদে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিমান বহর তুরস্কের আকাশ সীমা ব্যবহারের লক্ষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবশ্য পার্লামেন্টে তুরস্কের সামরিক ঘাটিসমূহের মার্কিন ব্যবহার, এমনকি জ্বালানী পুনর্ভরণের জন্যও, অনুমোদিত হয় নাই (বরাত ঃ পূ. গ্র.)।

১৫ মার্চ, ২০০৩ খৃ. যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আসন্ন হামলার আশঙ্কায়, সাদ্দাম হুসায়নের সার্বিক নেতৃত্বে ইরাককে চারটি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়। উহার পরের দিন পর্তুগালের আজোরস (Azores)-এ জর্জ ডাবলিউ বুশ, টনি ব্লেয়ার ও স্পেনের প্রধান মন্ত্রী জোসে মারিয়া আসসোর (Jose Maria Azuar)-এর মধ্যে এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কতিপয় পর্যবেক্ষকের মতে, আযোরস সম্মেলনকে একটি 'যুদ্ধ পরিষদ' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

১৭ মার্চ, ২০০৩ খৃ. প্রেসিডেন্ট বুশ সাদ্দাম হুসায়ন ও তাহার দুই পুত্রকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ইরাক ত্যাগের চরম পত্র দেন। অন্যথায় তাহাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দেওয়া হয়। ইহার ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দল, মানবিক সহায়তা কর্মীবৃন্দ এবং কুয়েত-ইরাক সীমান্তে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণকে প্রত্যাহার করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ইরাকের জাতীয় সংসদ প্রেসিডেন্ট বুশের চরম পত্র প্রত্যাখান করে। ১৯ মার্চ, ২০০৩ খৃ. উক্ত চরম পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার অল্পকাল পরেই মার্কিন এবং বৃটিশ সেনাবাহিনী সাদ্দাম সরকারে উৎখাতের লক্ষ্যে 'অপারেশন ইরাকী ফ্রিডম' নামে এক 'সর্বাত্মক' সামরিক অভিযান শুরু করে। প্রাথমিক বিমান হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল বাগদাদের উপকণ্ঠে অবস্থানরত সাদ্দাম হুসায়ন ও তাহার সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, যাহা দৃশ্যতর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনী কুয়েত হইতে ইরাকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত রাজধানী অভিমুখে তাহাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। ইতিমধ্যে বাগদাদ ও উহার আশপাশের অঞ্চলসমূহে অবস্থিত ইরাক সরকারের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, সেনা ছাউনি, সরকারী ভবনাদি এবং বেতার সম্প্রচার কেন্দ্রসমূহে বিমানপথে ব্যাপক গোলাবর্ষণ করা হয়। পরবর্তী দিবসসমূহে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ইরাকী শহরসমূহের সরকারী ও সামরিক স্থাপনাসমূহ যৌথ বাহিনীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। মার্কিন ও বৃটিশ বাহিনী যৌথ প্রচারপত্র বিলির মাধ্যমে ইরাকী জনগণকে বাথ পার্টির উপর হইতে তাহাদের সমর্থন প্রত্যাহারের আহবান জানায়। এই মর্মে তাহারা বেতার সম্প্রচারও করে। এভাবে যৌথ বাহিনী পরিচালিত 'অপারেশন ইরাকী ফ্রিডমে'র মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরভাগ হইতে ইরাক সরকারকে অকার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বৃটিশ সেনাবাহিনী ইরাকের দ্বিতীয় নগরী বসরাসহ ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহরগুলি আয়ত্তে আনার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। ইতিমধ্যে মার্কিন নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনী দক্ষিণাঞ্চলীয় গুরুত্বপূর্ণ বন্দর

নগরী উমম কাসর (Umm Qasr) এবং আল-ফাও উপদ্বীপ (Al-Faw Peninsula)-এর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের অভিপ্রায় ছিল, বসরায় শী'আ মুসলমান সম্প্রদায় অচিরেই সাদ্দাম হুসায়নের সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবে যেমনটি তাহারা ১৯৯১ খৃ. উপসাগরীয় যুদ্ধের পরে করিয়াছিল। যদিও মার্কিন নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনী ও ইরাকী সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে অনুষ্ঠিত সংঘর্ষগুলির অধিকাংশ ছিল তীব্র, তথাপি ইরাকী সেনাবাহিনী, কতিপয় ফেদাঈন (শহীদগণ) ও অন্যান্য 'আরব দেশসমূহ হইতে আগত স্বেচ্ছাসেবকগণ যে প্রতিবন্ধকতার ব্যূহ রচনা করে, তাহা ছিল যৌথ বাহিনীর ধারণাকৃত আশঙ্কার চেয়ে অনেক কম। এতদ্ব্যতীত মার্কিন নেতৃত্বাধীন অগ্রসরমান যৌথ বাহিনীর নিকট ইরাকী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের ব্যাপক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। অপারেশন ইরাকী ফ্রিডম শুরুর অল্পকাল পরে মার্চ ২০০৩ খৃ. মার্কিন বাহিনী উত্তর ইরাকে কুর্দীনিয়ন্ত্রিত এলাকায় একটি দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিয়া আনসার আল-ইসলাম (Ansar Al-Islam)-এ অবস্থিত ঘাটিসমূহে আক্রমণ পরিচালনা করিতে থাকে। এখানে মার্কিন বাহিনী কুর্দী বাহিনীর সহযোগিতা লাভ করে।

৭ এপ্রিল, ২০০৩ খৃ. মার্কিন বাহিনী রাষ্ট্রপতি ভবনসহ বাগদাদের কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করে। সাদ্দাম হুসায়নের অভিজাত রিপাবলিকান গার্ড বাহিনী প্রতিস্ফীত কঠোর প্রতিবন্ধকতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়। ৯ এপ্রিল ২০০৩ খৃ. ইরাকীরা সাদ্দাম হুসায়নের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করিয়া বাগদাদের রাস্তায় মিছিল বাহির করে এবং প্রেসিডেন্টের প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্যের ধ্বংস সাধন করে। এভাবে সাদ্দাম সরকারের পতন সূচিত হয়। ১০ এপ্রিল, ২০০৩ খৃ. কুর্দী জঙ্গীরা উত্তরাঞ্চলীয় শহর কিরকুক (kirkuk)-এর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। ইহার পরের দিন কুর্দী ও মার্কিন বাহিনী Mosul নগরী অবরোধ করে। মার্কিন বাহিনী কর্তৃক সাদ্দাম হুসায়নের জন্মভূমি ও শক্তির কেন্দ্রবিন্দু বাগদাদের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত তিকরিত (Tikrit) ১৪ এপ্রিল, ২০০৩ খৃ. অধিকৃত হইলে সাদ্দাম সরকারের অপসারণে ইহাকে চূড়ান্ত কৌশলগত মার্কিন বিজয় হিসাবে অভিহিত করা হয় (পূ. গ্র., পৃ. ২১৩৯-৪০)।

কতিপয় নেতৃস্থানীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী দেশে প্রত্যাবর্তন করায় ১৫ এপ্রিল, ২০০৩ খৃ. মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ ইরাকের আন-নাসিরিয়া (Nasiriya)-তে বিরোধী দলগুলির একটি সম্মেলন আহবান করা হয়। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করায় ইরাকে ইসলামী বিপ্লবের সুপ্রীম কাউন্সিল উহা বয়কট করে।

১১ এপ্রিল, ২০০৩ খৃ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষমতাচ্যুত ইরাক সরকারের নেতৃস্থানীয় ৫৫ ব্যক্তির একটি 'আশু আবশ্যক' তালিকা প্রস্তুত করত তাহাদেরকে গ্রেফতারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। ২৫ এপ্রিল, ২০০৩ খৃ. ইরাকের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী তারিক 'আযীয মার্কিন বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। পরবর্তী সপ্তাহসমূহে প্রাক্তন সরকারের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যৌথ বাহিনীর হাতে বন্দী হন। ১ মে, ২০০৩ খৃ-প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাকে 'গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ কর্মকাণ্ডের' সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ইহার কয়েক দিন পর পল ব্রেমার নামক একজন মার্কিন কূটনীতিককে 'বেসামরিক প্রশাসক' হিসাবে তাহার পূর্বসূরী জায়গারনারের স্থলভিষিক্ত করা হয় (History of Iraq Time Line events 6750 BCE— 2004 CE, P. 3811)।

৫ মে, ২০০৩ খৃ. জায়গারনার জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ইহার ফলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির আমদানী বাধাগ্রস্ত হওয়ায় ইরাকের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হইতেছে। মার্কিন কর্মকর্তারা নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কলিন পাওয়েল বলেন যে, ইহাতে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত যুক্তরাষ্ট্রের উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

৬ মে, ২০০৩ খৃ. মার্কিন কর্মকর্তারা আবিষ্কার করেন যে, ১৮ মার্চ, ২০০৩ খৃ. কুসায় হোসেন তাহার পিতা সাদ্দাম হোসেন স্বাক্ষরিত এক ক্ষমতায়ন পত্রানুসারে ইরাকের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অপসারণ করেন। মুকতাদা সাদর ইরাকের উদীয়মান শী'আ নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকেন। ইহার ধারাবাহিকতায় 'সাদ্দাম সিটি'-কে 'সাদর সিটি' নামকরণ করা হয়।

১২ মে, ২০০৩ খৃ. ইরাকী জীবাণু কর্মসূচির প্রধান রিহাব রাশিদ তাহা আল-আযযাবী আত-তিকরিতী যৌথ বাহিনীর হাতে বন্দী হন। সংঘর্ষ পরবর্তী ইরাকে ব্রিটেনের ভূমিকায় অসন্তুষ্টির কারণে বৃটিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সচিব পদত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে; এবং ইরাকের সবচেয়ে সিনিয়র শী'আ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আল-হাকিম ২৩ বৎসর ইরানে নির্বাসনে থাকার পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

১৬ মে, ২০০৩ খৃ. ইরাকী সমাজকে বাথ পার্টির প্রভাবমুক্ত করার এক মার্কিন ফরমান জারী করা হয়। সেমতে ব্রেমার সাদ্দাম সরকারের ৩০,০০০ ইরাকী কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পূর্বপদে যোগদান বা ইরাকী প্রশাসনের নূতন পদে নিয়োগের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন।

সাদ্দাম হুসায়ন ইরাকী জনগণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এক পত্রে দেশকে শত্রুসেনার কবল হইতে মুক্ত করার আহবান জানান। ২ জুন, ২০০৩ খৃ. ইরাকে প্রধান জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শক হ্যান্স ব্লিক্স তাহার শেষ প্রতিবেদনে নিরাপত্তা পরিষদকে বলেন যে, তিনি কোন গণবিধ্বংসী, রাসায়নিক, জীবাণু বা পারমানবিক অস্ত্রের সন্ধান লাভে সক্ষম হন নাই।

১৩ জুলাই, ২০০৩ খৃ. ইরাকের ২৫ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ উহার প্রথম অধিবেশনে মিলিত হয়। এই পরিষদের সদস্যবৃন্দের মধ্যে ছিলেন ১৩ জন কুর্দী শী'আ, ৫ জন কুর্দী, ৫ জন সুন্নী 'আরব, ১ জন খৃষ্টান এবং ১ জন তুর্কী (Rusi, Iraq Chronology, P. 12-34)।

২২ জুলাই, ২০০৩ খৃ. সাদ্দাম হুসায়নের দুই পুত্র উদয় (৩৯) ও কুসায় (৩৬) এক বন্দুক যুদ্ধে নিহত হন। (পূ. গ্র., পৃ. ১২-৩৪)

১৯ আগস্ট, ২০০৩ খৃ. বাগদাদে অবস্থিত জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এক আত্মঘাতী বোমা হামলায় জাতিসংঘের বিশেষ দূত সারজিও ভিয়েরা ডি মেললোসহ ২২ ব্যক্তি নিহত ও ১০০ ব্যক্তি আহত হন। ২১ আগস্ট, ২০০৩ খৃ. যৌথ বাহিনীর হাতে 'কেমিকেল আলী' নামে পরিচিত সাদ্দাম হুসায়নের সবচেয়ে সিনিয়র জেনারেল আলী আহাসন আল-মাজীদ গ্রেফতার হন। তিনি ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'আশু আবশ্যক' তালিকায় বর্ণিত ৫৫ ব্যক্তির মধ্যে নবম। ১৯৮৭ খৃ. উত্তরাঞ্চলীয় কুর্দীদের বিরুদ্ধে আক্রমণে বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগে তাহার ভূমিকার কারণে তিনি নিন্দিত হন।

২৯ আগস্ট, ২০০৩ খৃ. শীর্ষস্থানীয় শী'আ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ বাকের আল-হাকীম ৯৫ ব্যক্তিসহ নাজাফে এক গাড়ী বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন। তিনি ছিলেন ইরাকী ইসলামী বিপ্লবের সুপ্রীম

কাউন্সিলের নেতা। ইরানে কয়েক দশকের নির্বাসিত জীবন যাপনের পর তিনি যে ২০০৩ খৃ. ইরাকে প্রত্যাবর্তন করেন।

১০ ডিসেম্বর, ২০০৩ পেন্টাগণ ঘোষণা করে যে, শুধুমাত্র যৌথ বাহিনীর সদস্যরাই ১৮.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ইরাক পুনর্গঠন কর্মে ঠিকাদার হিসাবে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

১৩ ডিসেম্বর, ২০০৩ খৃ. সাদ্দাম হুসায়ন মার্কিন বাহিনীর হাতে বন্দী হন। তিনি ইরাকে তাহার পৈতৃক শহর তিকরিতের নিকটস্থ একটি দুর্গম খামার বাড়ীর ভূগর্ভস্থ একটি প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহার গ্রেফতার সংবাদে তেলের মূল্য ৪% ভাগ হ্রাস পায় (Rusi Iraq Chronology. P. 10-34)।

১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ খৃ. দুইটি রাজনৈতিক দলের অফিসে ঈদুল আযহার প্রাক্কালে বিস্ফোরিত বোমার আঘাতে ইরবিলের গভর্নর আকরাম মিনতিক ও উপ-প্রধান মন্ত্রী সামি আবদুর রাহমান উভয়ে নিহত হন। এই আক্রমণের জন্য ইসলামী জঙ্গী গোষ্ঠীকে দোষারোপ করা হয়।

৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ খৃ. মার্কিন কর্মকর্তাগণ আল-কায়দার একটি চিঠি জব্দ করেন। চিঠিখানা আল-কায়দা জঙ্গী আবূ মূসা আল জারকাবী কর্তৃক ইরাকের মুজাহিদীন নেতৃবৃন্দকে লেখা হয়। জর্দানী নাগরিক জারকাবী আফগানিস্তানে লড়াই করেন। কাসাব্লাঙ্কা ও ইস্তাম্বুলে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণের জন্য তাঁহাকে দায়ী করা হয়। তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার জন্য মার্কিন সরকার ঘোষিত পুরস্কার ৫ মিলিয়ন হইতে বাড়াইয়া ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার করা হয়। মার্কিন কর্মকর্তাগণের ধারণায় সমগ্র ইরাকে বোমা আক্রমণের তিনিই মূল পরিকল্পনাকারী (পূ. গ্র., পৃ. ১০-৩৪)।

২ মার্চ, ২০০৪ খৃ. ছিল ইরাক যুদ্ধের পর সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী দিবস। ঐ দিন বাগদাদ ও কারবালাতে আশূরা পালনরত শী'আ মুসলমানদের উপর উন্নত প্রযুক্তি সমন্বিত এক আত্মঘাতী বোমা ও মর্টার আক্রমণে ২৭১ ব্যক্তি প্রাণ হারায়। যৌথ বাহিনী আল-কায়দা সংশ্লিষ্ট ইসলামী জঙ্গী আল-জারকাবীকে এই হামলার জন্য দায়ী করে। প্রধান শী'আ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ সিসতানী তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষায় ব্যর্থতার জন্য যৌথবাহিনীর প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করেন। ১ মার্চ, ২০০৪ খৃ. গেরিলারা ইরাকের ফালুজাতে (Fallujah) চারজন মার্কিন ঠিকাদারকে তাহাদের গাড়ীতে বোমা বিস্ফোরণে নিহত করে। উত্তেজিত মার্কিন বিদ্বেষী জনতা সেখানে আগমন করিয়া অগ্নিদগ্ধ দেহগুলি টনা-হেচড়া করিয়া বিকৃত করার চেষ্টা করে। অতঃপর দুই ব্যক্তিকে ইউফ্রেতিস নদীর উপরস্থ একটি সেতু হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া হয় (History of Iraq : Timeline of Events, 6750 BCE - 2004 CE)।

১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ খৃ. ইরাকী বিদ্রোহী দল জায়শ আল-মুজাহিদীন দুইজন ইন্দোনেশীয় সাংবাদিককে অপহরণ করত ইন্দোনেশীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ খৃ. দক্ষিণ বাগদাদে একটি গাড়ী বোমা বিস্ফোরণে ১২৫ ব্যক্তি নিহত হয়। ২০০৩ খৃ. সাদ্দাম সরকারের পতনের পর ইহাকে অন্যতম ধ্বংসাত্মক একটি বিদ্রোহী হামলা হিসেবে পরিগণিত করা হয়।

২ মার্চ, ২০০৫ খৃ. উত্তরাঞ্চলীয় শহর সুলায়মানিয়াতে একটি সংবাদ সম্মেলনে কুর্দী নেতা তালাবানী এবং শী'আ নেতা ইবরাহীম আল-জাফারী সাময়িকভাবে তাহাদের নীতিগত পার্থক্য পরিত্যাগ করত যৌথভাবে দেশ গঠনে তাহাদের ঐকমত্য প্রকাশ করেন। এইভাবে তাহারা ইরাকের প্রথম কুর্দী রাষ্ট্রপতি ও একজন শী'আ প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের পথ সুগম করেন।

৩ মার্চ, ২০০৫ খৃ. সাদ্দাম হুসায়নের বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইবুনালের সদস্য, ইরাকী বিচারক বারওয়েয মাহমূদ মারওয়ানী এবং তাহার পুত্র আরয়ান মারওয়ান তাহাদের বাড়ীর বাহিরে বোমা বিস্ফোরনের শিকার হন। বিচারক নিহত হন। উল্লেখ্য যে, ট্রাইবুনালটি ডিসেম্বর ২০০৩ খৃ. গঠিত হয়। নিরাপত্তা জনিত কারণে উহার কার্য বিলম্বিত হয়। বিদ্রোহীরা মার্কিন বাহিনীর নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে তাহাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে বিবেচনা করে।

৫ এপ্রিল, ২০০৫ খৃ. ইরাকী জেনারেল এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মাদ জালালকে বাগদাদে অপহরণ করা হয়। ৭ এপ্রিল, ২০০৫ খৃ. ইরাকী জাতীয় সংসদ ইবরাহীম আল-জাফারীকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করে। ইতিপূর্বে প্যাট্রিয়টিক ইউনিয়ন অব কুর্দিস্তানের নেতা, জালাল তালাবানীকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা হয়। তিনিই প্রথম কুর্দী যিনি ইরাকের রাষ্ট্রপতি হন (Rusi Iraq Chronology P. 4-34)।

২৮ এপ্রিল, ২০০৫ খৃ. প্রধান মন্ত্রী ইবরাহীম আল-জাফারী তাঁহার ৩৩ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রী সভার নাম ঘোষণা করেন। তিনি আহমাদ চালাবীকে একজন উপ-প্রধান মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দান করেন। ১৩ মে, ২০০৫ খৃ. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইরাকের আনবার প্রদেশে বিদ্রোহী দমনে মার্কিন সেনা অপারেশনের প্রেক্ষিতে সেখানকার ১,০০০ ইরাকী পরিবার প্রাণভয়ে ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পলায়ন করে। বিদ্রোহীরা সেখানকার গভর্নরকে অপহরণ করে।

৩ জুন, ২০০৫ খৃ. ইরাকী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয় যে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ইরাকী নিরাপত্তা বাহিনী পরিচালিত 'ঝটিকা অভিযান' উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিয়াছে। তাহারা বিদ্রোহীদের ৭০০ জনকে বন্দী এবং ২৮ জনকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া দাবি করে। এই অপারেশনের মাধ্যমে তাহারা বিদ্রোহীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে বাগদাদকে কয়েকটি নিরাপত্তা এলাকায় ভাগ করে।

১৮ জুন, ২০০৫ খৃ. মার্কিন সেনাবাহিনী পশ্চিম ইরাকে 'বল্লম যুদ্ধ' পরিচালনা করে। সেখানে কিছু বিদেশী বিদ্রোহী দমনার্থে মার্কিনীরা এই অভিযানে নামে। বিশেষত সিরীয় সীমান্তবর্তী আনবার প্রদেশে এই অভিযান কেন্দ্রীভূত ছিল। মার্কিন সরকার অভিযোগ করে যে, সিরীয় সীমান্ত পথে বিদেশী যোদ্ধারা ইরাকে অনুপ্রেবেশ করে ; কিন্তু সিরিয়া উহা অস্বীকার করে। অভিযানে ১০০ জন বিদ্রোহীকে বন্দী এবং ৫০ জনকে হত্যা করা হয়। 'তরবারি যুদ্ধ' নামে আর একটি যৌথ অভিযান ইরাকের বাগদাদের আশেপাশে পরিচালিত হয়। সেখানে বিদ্রোহীদের একটি ঘাটি করায়ত্ত করিতে ১০০০ মার্কিন সৈন্যের একটি বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়, (পূ. গ্র., পৃ. ১-৩৪)।

ইতিমধ্যে তেলবাহী জাহাজ Nord Millennium হামলার শিকার হয়। বিদ্রোহীরা ইরাকের তৈল ও গ্যাস স্থাপনা ও পাইপ লাইনসমূহেও ব্যাপক হামলা করে। ফলে তেলসমৃদ্ধ ইরাকে তীব্র জ্বালানী সংকট দেখা দেয়। ২৫ অক্টোবর, ২০০৫ খৃ. ইরাকী ভোটাররা দেশের নূতন খসড়া সংবিধান অনুমোদন করে (Iraq Energy Chronology : 1980-November 2005, p. 34)।

১৪ ডিসেম্বর, ২০০৫ খৃ. কুখ্যাত মার্কিন সৈন্য লিন্ডি ইংল্যান্ড মার্কিন সান ডিয়াগোর নিকটবর্তী মিরামার মেরিন ঘাঁটিতে অগ্নিদগ্ধ হয়। ইরাকের

আবু গারীব কারাগারে ইরাকী বন্দীদের উলঙ্গ করিয়া ছবি তোলা ও সেইগুলি বিশ্বব্যাপী প্রচারের পর লিন্ডি প্রচণ্ডভাবে নিন্দিত হয়। ইতিপূর্বে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ খৃ. সামরিক কারাগারে বিচারের পর তাহাকে তিন বৎসরের কারাদণ্ড এবং অসম্মানজনকভাবে সেনাবাহিনী হইতে বরখাস্ত করা হয় (রয়টার্স, ১ জানুয়ারি, ২০০৬)।

মার্কিন সামরিক বাহিনীর এক বিবৃতিতে ২০০৫ খৃ. ইরাকে ৮৮২ দখলদার সেনা নিহত হওয়ার কথা বলা হয়। ২০০৪ খৃ. এই সংখ্যা ৮৪৬ ছিল বলিয়া বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। ইহাতে আরও বলা হয়, ২০০৩ খৃ. মার্চে ইরাক আক্রমণের পর হইতে ২০০৫ খৃ. সেখানে সর্বাধিক সংখ্যক মার্কিন সৈন্য নিহত হয়। ২০০৩ খৃ. মার্চ মাস হইতে ২০০৫ খৃ. ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে ইরাকে প্রায় আড়াই হাজার মার্কিন সৈন্য নিহত হয়। (এপি ২ জানুয়ারি ২০০৬)।

ইতিমধ্যে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীতে প্রেসিডেন্ট বুশের ইরাক নীতির প্রতি সমর্থন হ্রাস পায়। ২ জানুয়ারি, ২০০৬ খৃ. প্রকাশিত মিলিটারী টাইমসের এক জনমত জরিপে দেখা যায় যে, এই সমর্থন ৫৪ শতাংশে নামিয়া আসিয়াছে। এক বৎসর পূর্বে এই সমর্থন ছিল ৬৩ শতাংশ (এএফপি, ৪ জানুয়ারি, ২০০৬)।

সমসাময়িক কালে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশকে সবচেয়ে পরিকল্পিত খুনী রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে অভিহিত করিয়া বলেন, ইরাক যুদ্ধ হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন দেশের বহু সংকটের জন্য আমেরিকা দায়ী (ইনকিলাব ডেস্ক, ৬ জানুয়ারি, ২০০৬),

৫ জানুয়ারী, ২০০৬ খৃ. নিউইয়র্ক হইতে এনা জানায় যে, ইরাকে ৮০% নাগরিকই সেখানে মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতিকে আর মানিয়া লইতে পারে না।

আল-কায়দা নেতা আরমান আল-জাওয়াহবি ৬ জানুয়ারি, ২০০৬ মধ্যপ্রাচ্যের আল-জাযীরা টেলিভিশনকে জানান যে, ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয় হইয়াছে, এখন শুধু সেনা প্রত্যাহার বাকী। তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের পরাজিত করার জন্য ইরাকবাসীকে অভিনন্দন জানাইয়া বলেন, ইহা শুধু ইরাকীদের নয়, বিশ্বের সকল মুসলমানের বিজয় (আল-জাযীরা, মক্কা টাইম)। এই পটভূমিতে মার্কিন সমরবিদগণ ইরাকের প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কৌশল গ্রহণ করেন। এই অপকৌশলের আওতায় ইরাকী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের একাংশকে প্রলুব্ধ করত তাহাদিগকে বহিরাগত আল-কায়দার গেরিলা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার চেষ্টা করা হয়।

ইরাক নীতির পটভূমিতে যুক্তরাষ্ট্রকে অনেকেই সুনজরে দেখে। ভাষাগত পার্থক্যের কারণে 'আরব টেলিভিশন যুক্তরাষ্ট্র বিষয়ে মিথ্যা ধারণা দেয়, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ অন্যান্য ভাষার সহিত মার্কিনীদের 'আরবী ও ফার্সি ভাষাও শিক্ষার আহবান জানান। এজন্য ২০০৭ খৃ. বাজেটে তিনি ১১ কোটি ৪০ লক্ষ মার্কিন ডলার বরাদ্দের সংস্থান রাখেন।

একটি তুচ্ছ ও যুক্তিহীন পটভূমিতে ইরাক যুদ্ধে ভূমিকার জন্য বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে অনাস্থার দাবি উত্থাপন করা হয়। এই অনাস্থা প্রস্তাবের উদ্যোক্তা ছিলেন বসনিয়ায় জাতিসংঘের সাবেক কমান্ডার জেনারেল মাইকেল রোজ। ইরাকে মার্কিন হামলা একটি মারাত্মক ভুল, এই অভিযোগে ইতিপূর্বে ২০০৪ খৃ. নভেম্বরে ২৩ জন এমপি ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করেন। রোজের এই উদ্যোগে উহার পুনরাবৃত্তি ঘটে (মেইল অব সানডে, লন্ডন, ৮ জানুয়ারি, ২০০৬ খৃ.)।

২০০৩ খৃ. জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রতিভাত হয় যে, বিধ্বস্ত ইরাকের পুনর্নির্মাণের কাজ ক্রমান্বয়ে পরিত্যক্ত হইতেছে। পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন যে, সিআইএ সাদ্দাম হুসায়নের সেনাপতিদের আগেই ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিল। ইরাকী বাহিনী অনেক ক্ষেত্রে কোন বাধাই দেয় নাই। এতদসত্ত্বেও বর্বরোচিত হিংস্রতাসহ মার্কিনীরা বোমা নিক্ষেপ করে। ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়াম এবং ফসফরাস বোমাও তাহারা ব্যবহার করে। শুধু তেল মন্ত্রণালয় ছাড়া বাগদাদে আর কোন মন্ত্রণালয় অক্ষত ছিল না। ইরাকের পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহসহ সকল অবকাঠামো চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়।

ইরাক পুনর্গঠনে কোন রকম টেন্ডার না ডাকিয়া, কোন ইরাকী প্রতিষ্ঠানকে জিজ্ঞাসা না করিয়া হ্যালিবার্টন এবং আরও দুই একটি ছোট-খাটো মার্কিন কোম্পানীকে একাধিক বিলিয়ন ডলারের ঠিকাদারী দেওয়া হয়। হয়ত হ্যালিবার্টনকে পুনর্গঠন ঠিকাদারী দেয়াও ইরাক আক্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কেননা ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি ইরাক আক্রমণের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং তাহার ও তাহার পরিবারের বহু শেয়ার আছে হ্যালিবার্টন কর্পোরেশনে। ইহার ফলে 'কয়েক বিলিয়ন ডলার ব্যয় দেখানো হইলেও ইরাকের পুনর্গঠনে তেমন অগ্রগতি হয় নাই।

মার্কিন কংগ্রেস ইরাকের পুনর্গঠন বাবদ যে বরাদ্দ করে, তাহার প্রায় অর্ধেক সরাইয়া নেওয়া হয় প্রতিরোধ বিরোধী যুদ্ধের এবং সাদ্দামের বিচারের আয়োজনের জন্য।

ইরাক যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে (মার্চ ২০০৩ খৃ.) প্রেসিডেন্ট বুশের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ল্যারি লিন্ডসে বলেন, শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত ইরাক যুদ্ধে সর্বোচ্চ ২০০ বিলিয়ন (২০,০০০ কোটি) ডলার ব্যয় হইতে পারে। এই ব্যায় বরাদ্দ ইতিমধ্যে অতিক্রম করিয়াছে। প্রকৃত ব্যয় অনেক বেশি।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যোশেফ স্টিগলিংস এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট বিশেষজ্ঞও লিন্ডা বিলমস তাহাদের যৌথ গবেষণায় দেখান যে, ইরাক যুদ্ধের প্রকৃত মার্কিন ব্যয় দুই ট্রিলিয়ন (২ লক্ষ কোটি) ডলার পর্যন্ত হইতে পারে।

১৫ জানুয়ারি, ২০০৬ খৃ. পর্যন্ত ইরাক যুদ্ধে ২২০০ মার্কিন সৈন্য নিহত হয়। গুরুতর আহত (মস্তিষ্কে ও মেরুদণ্ডে জখম, অঙ্গচ্ছেদ) সৈন্যদের সংখ্যা ১৬,০০০ বলিয়া পেন্টাগন সূত্রে জানা যায় (দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ জানুয়ারি, ২০০৬)।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক এক সময় বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্রের সন্ধান না পাইলে তাহারা সেখানে তাহা আবিষ্কার করিবে। অফিস অব স্পেশাল প্ল্যানস-এর লারিষা আকেক্সান্দ্রাভনার এক রিপোর্টে জানা যায়, হোয়াইট হাউসের প্রি-ওয়ার 'ইনটেলিজেন্স' ২০০৩ খৃ. ইরাকে হামলা চালানোর পর যুক্তরাষ্ট্র সেখানে লোক পাঠায় এবং তাহারা যখন জানিতে পারে যে, যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ ইরাকে কোন গণবিধ্বংসী অস্ত্র নাই, তখন তাহারা যুক্তরাষ্ট্রকে বিব্রতকর অবস্থা হইতে রক্ষার জন্য সেখানে গোপনে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র পুতিয়া রাখার চিন্তাভাবনা করে (আল-জাযীরা অন লাইন, ১৫ জানুয়ারি, ২০০৬)।

এই পর্যায়ে 'আরবী ভাষায় টেলিভিশন নেটওয়ার্কে আল কায়দা নেতা বিন লাদেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবার হামলার প্রস্তুতি চলিতেছে এই মর্মে হুঁসিয়ারী উচ্চারণ করিয়া বলেন, তবে যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার মিত্ররা যদি ইরাক-আফগানিস্তানসহ দখলীকৃত সকল মুসলিম দেশ হইতে সৈন্য প্রত্যাহার করিয়া নেয়, সেই ক্ষেত্রে এই হামলা স্থগিত করা হইবে এবং তিনি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করিবেন।

ইরাকে ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৫ খৃ. অনুষ্ঠিত নির্বাচনের বিলম্বিত ফলাফলে দেখা যায়, ২৭৫ আসনের পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ শী'আ জোটের প্রার্থী দক্ষিণ ইরাকের ১২৮টি আসন লাভ করে। সুন্নী প্রার্থীগণ উত্তর ও পশ্চিম ইরাকের ৫৫টি আসন লাভ করে। কুর্দী প্রার্থীগণ তাহাদের বসবাসের এলাকা উত্তর ইরাকের ৫৩টি আসন লাভ করে। এই নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষ প্রার্থীদের ভরাডুবি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রিয়পাত্র ও এক সময়কার ইরাক হামলার নেপথ্য ইন্ধনদাতা এবং ইরাকের সাবেক প্রধান মন্ত্রী আইয়াদ আলাবির নেতৃত্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ জোট সান ২৫টি আসন লাভ করে। ইহাতে দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বপ্নভঙ্গ হয় এবং পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন যে, গৃহযুদ্ধের আশংকা লইয়াই নূতন ইরাক সরকারের যাত্রা শুরু হইতে পারে। কারণ কোন রাজনৈতিক দলই এই নির্বাচনে এককভাবে সরকার গঠনের মত দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সমর্থ হয় নাই (ইনকিলাব ডেস্ক, ২২ জানুয়ারি, ২০০৬ খৃ.)।

শী'আ-সুন্নী দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ ইরাকে মার্কিন হামলার পর হইতেই ইরাকের সর্বত্র দুর্ভিক্ষ ছড়াইয়া পড়ে। অথচ সাদ্দাম আমলের ইরাকী 'ফুড চেইন' বা খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা বিশ্বনন্দিত ছিল। জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল পরিচালিত সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যায়, জনসংখ্যার বিশ শতাংশ আন্তর্জাতিক দরিদ্রসীমার (দৈনিক জনপ্রতি এক মার্কিন ডলার পরিমাণ) নীচে অবস্থান করিতেছে। এজন্য বেকারত্ব ও সহিংসতাকে দায়ী করা হয় (এএফপি, ২৮ জানুয়ারি, ২০০৬ খৃ.)।

ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধের জের ধরিয়া মার্কিন সামরিক শক্তির পক্ষে একক পরাশক্তি হিসাবে টিকিয়া থাকা সম্ভব হইবে না, এই মর্মে মার্কিন সামরিক শক্তির উপর প্রকাশিত এক গবেষণা রিপোর্ট ২৯ জানুয়ারি, ২০০৬ বিবিসি অনলাইনে প্রকাশিত হয়। ইরাক যুদ্ধে সকল ধরনের যুদ্ধাস্ত্রের নির্বিচার ব্যাপক ব্যবহারে মার্কিন অস্ত্রভাণ্ডারে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত ইরাকসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে মার্কিন সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা এত আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পায় যে, তাহা পূরণ করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ খৃ. মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, এখন সেনা প্রত্যাহার করিলে ওসামা বিন লাদেন এবং আবূ মুসাব আল-জারকাবীর অনুসারীরা ইরাক দখল করিয়া লইবে। কৌশলগত উপসাগরীয় দেশটির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যেন ইসলামপন্থীদের হাতে না যায় সেজন্য ইরাকী বাহিনী দেশটির নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে পূর্ণ সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত মার্কিন বাহিনীর সেখানে অবস্থানের পক্ষে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

৩ দিনের অনশন ধর্মঘটরত অবস্থায় ইরাকী নেতা সাদ্দাম হুসায়ন প্রহসনের ট্রাইবুনালে হাজির হইয়া ইরাকী মুজাহিদদের পক্ষে স্লোগান দেন। ট্রাইবুনালের বিচারক আবদুর রাঊফ রাহমান হাতুড়ি পিটাইয়া আদালতের কার্যক্রম শুরু করিলে তিনি প্রথা মাফিক উঠিয়া না দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেন এবং বিদ্রূপ করিয়া বিচারককে লক্ষ্য করিয়া বলেন, হাতুড়ি দ্বারা তোমার নিজের মাথায় আঘাত কর (এএফপি, বাগদাদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬)।

ফেব্রুয়ারি ২০০৬ খৃ. মাঝামাঝি সময়ে অস্ট্রেলিয়ার স্পেশাল ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের ডেট লাইন প্রোগ্রামে আবূ গারীব কারাগারে ইরাকী বন্দীদের উপর মার্কিন সৈন্যদের নৃশংস ও নগ্ন নির্যাতনের নূতন ছবি প্রদর্শন ইরাকী জনগণকে আরও বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। ছবিগুলির মধ্যে কতিপয় লাশও ছিল। ছবিগুলি প্রচারের ফলে বিশ্বব্যাপী সহিংসতা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া পেন্টাগন আশঙ্কা প্রকাশ করে। এদিকে ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ খৃ. জানা যায় যে, ইরাকে বৃটিশ সেনাবাহিনীর ১ হাজার ৩ শত নারী ও পুরুষ সদস্য সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া যায়। ইরাক হইতে ফেরত আসা এই সকল সেনাসদস্য মানসিক রোগাক্রান্ত ছিল। ইরাকে দিনের পর দিন ধ্বংস, মৃত্যু ও অমানবিক কাজে জড়িত থাকায় তাহাদের এই দশা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র দখলীকৃত ইরাকে দীর্ঘদিনের আশংকিত গৃহযুদ্ধের ভয়াবহতা ২০০৬ খৃ. ফেব্রুয়ারি মাসের ২২ তারিখে কার্যকরভাবে শুরু হয়। উত্তর ইরাকের সামারায় অবস্থিত ১২০০ বৎসর পূর্বে নির্মিত ইমাম আলী আল-হাদীর মাযারে পরিচালিত রহস্যজনক বোমা হামলা শী'আ মাযারটির স্বর্ণ নির্মিত গম্বুজ উড়াইয়া দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ইরাকব্যাপী এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ছড়াইয়া পড়ে। ইরাকের শী'আ ও সুন্নী নেতাদের শান্ত থাকার উদাত্ত আহবান সত্ত্বেও ঐ দিনের এই শী'আ-সুন্নী দাঙ্গায় ইরাকের বিভিন্ন স্থানে ১৫৪ ব্যক্তি নিহত হয়। এই হতভাগ্যদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সুন্নী নেতা এবং দুবাই ভিত্তিক আল-আরাবিয়া টিভি নেটওয়ার্কের সাংবাদিকসহ ৩ জন সাংবাদিকও ছিলেন। অতঃপর এই দাঙ্গা অব্যাহত থাকে এবং ৯০টি সুন্নী মসজিদে হামলা পরিচালিত হয়। শী'আরা দাঙ্গা উসকাইয়া দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করে। সুন্নীরা ঘোষণা করে যে, তাহারা শী'আদের নেতৃত্বে কোন ঐকমত্যের সরকার গঠনের সংলাপে অংশগ্রহণ করিবে না (দৈনিক ইনকিলাব, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ খৃ.)।

২০০৩ খৃ. ইরাক আক্রমণের পর কত মানুষ সেখানে মারা গিয়াছে তাহার সঠিক হিসাব আজও পাওয়া যায় নাই। কাহারও মতে ২০ হইতে ৩০ হাজার, আবার কাহারও মতে ৭৫ হইতে ৯০ হাজার। ২০০৪ খৃ. চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িকী লালচিটে বলা হয়, যুদ্ধের কারণে ইরাকে ৯৮ হাজার ইরাকী নিহত হয়। ১৪ মার্চ, ২০০৬ খৃ. কোর্ট মার্শালের মুখে সার্জেন্ট মাইকেল জে. স্মিথ (২৪) নামক একজন মার্কিন সৈন্য বাগদাদের আবূ গারীব কারাগারে ইরাকী বন্দীদের উপর নির্যাতন চালাইতে কুকুর লেলাইয়া দেওয়ার অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে। মেজর জেনারেল জিওফ্রে ডি. মিলার ২০০৩ খৃ. বন্দীদের আটক ও নিয়ন্ত্রণে কুকুর ব্যবহারের অনুমতি দেন। তাহারা ইরাকী বন্দীদেরকে যৌন হয়রানি ও অন্যান্য উপায়েও নির্যাতন করে।

অব্যাহত শী'আ-সুন্নী দাঙ্গায় ১৪ মার্চ, ২০০৬ খৃ. বাগদাদের উপশহর সদর সিটিসহ অন্যান্য জায়গায় ৮৭টি লাশ উদ্ধার করা হয়। অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ইরাক ট্র্যাজেডি গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে গ্রাস করিবে। ১৬ মার্চ, ২০০৬ বৃহস্পতিবার রাজধানী বাগদাদের উত্তরে সুন্নী প্রধান সামারা শহর ও তাহার আশপাশের অঞ্চলে মার্কিনী ও তাহাদের তল্পিবাহক স্থানীয় সৈন্যরা ইরাকী যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক অভিযান পরিচালনা

করে। মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ ঝাঁকে ঝাঁকে জঙ্গী হেলিকপ্টার দ্বারা পরিচালিত এই অপারেশনকে তিন বৎসরের মধ্যে বৃহত্তম বিমানবাহী অভিযান হিসাবে আখ্যায়িত করে। 'অপারেশন সোয়ার্মার' বা অপারেশন পঙ্গপাল ছদ্মনামে পরিচিত এই অপারেশনে প্রায় ৫০টি জঙ্গী হেলিকপ্টার অংশগ্রহণ করে। এইসব হেলিকপ্টারের মধ্যে ছিল ব্ল্যাক হক, এ্যাপাচি ও চিনুক।

ইরাকে মার্কিন বৃটিশ হামলার তিন বছর পূর্তিকে সম্মুখে রাখিয়া ইরাকের সাবেক অন্তবর্তী সরকারের প্রধান মন্ত্রী আইয়াদ আশাবি বলেন, ইরাক এক 'দুর্ভাগ্যজনক গৃহযুদ্ধের কবলে পড়িয়াছে। দেশব্যাপী প্রতিদিন অর্ধ-শতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটিতেছে।

মার্কিন নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনী মার্চ ২০০৩ খৃ. ইরাকে হামলা চালাইবার পর হইতে এ পর্যন্ত সেখানে প্রায় ২ হাজার ৫০০ জন মার্কিন সেনা নিহত হইয়াছে। ইরাকে বহুজাতিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে বৃটেনের ১০৩ জন, ইতালির ২৭ জন, ইউক্রেনের ১৮ জন, বুলগেরিয়ার ১৩ জন এবং স্পেনের ১১ জন সেনাসহ আরও বেশ কয়েকজন বিদেশী সেনা নিহত হইয়াছে (এপি, ২০ মার্চ, ২০০৬ খৃ.)। উল্লেখ্য যে, উক্ত দেশসমূহের সাধারণ নাগরিকগণ ইরাক হইতে সৈন্য প্রত্যাহারের পক্ষপাতী।

২৩ মার্চ, ২০০৬ খৃ. আবূ গারীব কারাগারে ইরাকী বন্দীদের উপর দখলদার মার্কিন সেনাদের অমানুষিক নির্যাতনের আর একটি লোমহর্ষক ঘটনার কথা জানা যায়। একটি মার্কিন সামরিক আদালতে অভিযুক্ত এক মেরিন সেনার বিচারকালে এই ঘটনাটি প্রকাশ পায়। মেরিন সার্জেন্ট মাইকেল জে. স্মিথ তাহার একজন সহকর্মীকে লইয়া আবূ গারীবে কয়েকজন ইরাকী বন্দীকে প্রথমে কিল-ঘুষি মারে এবং অতঃপর নির্দয়ভাবে বুট দ্বারা লাথি মারে। ইহার পর স্মিথ কালো রঙের দুইটি হিংস্র ও শিকারী বেলজীয় শেফার্ড কুকুর বন্দীদের সম্মুখে ছাড়িয়া দেয়। কুকুর দুইটি যখন ঘেউ ঘেউ করিয়া পিছনের দিকে হাত বাঁধা অসহায় বন্দীদের দিকে ছুটিয়া যায় তখন স্মিথ ও তাহার সহকর্মী সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে উচ্চৈস্বরে হাসিতে থাকে। এদিকে বন্দীরা কুকুরগুলির হামলায় অসহায়ের মত মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া তীব্র আর্তনাদ করিতে থাকে। মেরিন সেনাদের এই জঘন্য আচরণ মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। এজন্য ফোর্ট মিয়েডের আদালতে বিচারে তাহার মাত্র ৬ মাসের কারাদণ্ড হয়।

রবার্ট ফ্রিস্ক মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে সর্বাধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পরামর্শকদের একজন। দি গ্রেট ওয়ার ফর সিভিলাইজেশন — দি কনকোয়েস্ট অব মিডল ইস্ট' — তাহার সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার ত্রিশ বৎসরের সাংবাদিকতা জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন, যাহা বর্তমান অবস্থার সৃষ্টিকারী দখলদার বাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। সম্প্রতি তিনি বলেন, কেহ একজন ইরাকে একটি গৃহযুদ্ধ চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন।

কতকগুলি মিথ্যাকে সুপরিকল্পিতভাবে সত্য বলিয়া জাহির করিয়া, আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের সনদ লংঘন করিয়া সার্বভৌম দেশ ইরাক আক্রমণ করা হইয়াছিল। ইহার পরিকল্পনা অনেক আগেই, এমনকি জর্জ বুশ প্রেসিডেন্ট হওয়ার অনেক আগেই গ্রহণ করা হইয়াছিল। যে মহলটি সুপরিকল্পিতভাবে এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের ভিত্তিতে টেক্সাসের গভর্নর জর্জ বুশকে প্রথমে প্রার্থী দাঁড় করায় এবং পরে বিজয়ী করে, সে মহলের নাম 'নিও-কনজারভেটিভ' বা নিওকন গোষ্ঠী। ইরাক আক্রমণের পরিকল্পনাও তাহাদেরই সৃষ্টি। মূলত ত্রিমুখী স্বার্থ নিওকনদের জন্ম দিয়াছিল, সমরাস্ত্র নির্মাতাগোষ্ঠী, মার্কিন বহুজাতিক তৈল কোম্পানীগুলি এবং ইসরাঈলী ও যায়োনিস্ট লবি। ইরাক যুদ্ধজয়ে তাহাদের সকলের আশাপূর্ণ হয়। তবে সম্প্রতি ইরাককে লইয়া মার্কিন নিওকনদের প্রত্যাশা অনুশোচনায় মোড় নিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়া ওয়াশিংটন পোস্টের ২৩ মার্চ, ২০০৬ খৃ. এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ইরাকের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসায়নের শেষ অর্থমন্ত্রী নাজি সাবরি দ্বৈত এজেন্ট হিসাবে কাজ করিতেন। তিনি ১ লক্ষ মার্কিন ডলারের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএর কাছে ইরাকের গোপন অস্ত্র কর্মসূচির তথ্য বিক্রয় করেন। (ওয়াশিংটন পোস্ট, ২৩ মার্চ, ২০০৬ খৃ.)।

কেহ বলেন, সাদ্দামের কমান্ডাররা বিশ্বাসঘাতকতা করায় তিনি পরাজিত হন। আবার কেহ বলেন, তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ শী'আ বিদ্রোহের আশংকা করায় তাহার সৈন্যদের মনোবল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তিনি পরাজিত হন। সর্বশেষ ২৪ মার্চ, ২০০৬ খৃ. 'ইরাকী পারসপেক্টিভস' শিরোনামে ওয়াশিংটনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ইরাক হামলার সময় রুশরা সাদ্দামকে মার্কিন গতিবিধি সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য প্রদান করিত, সেখানে রুশদের বিভ্রান্তিকর গোয়েন্দা তথ্যের জন্য সাদ্দামের পরাজয় ঘটে।

২০০৩ খৃ. আমেরিকার ইরাকযুদ্ধের কৌশলপত্র বাস্তবতাবিবর্জিত ছিল। আধুনিক অস্ত্রবিদ্যা সংক্রান্ত খ্যাতিমান ঐতিহাসিক গ্যাব্রিয়েল কলকো তাঁহার নূতন গ্রন্থ 'দি এজ অব ওয়ার, দি ইউএস কনফ্রান্টস দ্য ওয়ার্ল্ড'-এ উল্লেখ করেন যে, ইরাক যুদ্ধের তত্ত্ব ও প্রত্যাশার চেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মুখে বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। যুদ্ধের সূচনালগ্নের চেয়ে ইরাকের বর্তমান পরিস্থিতি এখন আরও খারাপ। যুদ্ধের ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। আমেরিকার বাজেট ঘাটতির সীমাবদ্ধতা প্রকট। এমনকি ডলার ধরিয়া রাখার ক্ষেত্রে বিদেশীদের আগ্রহে ভাটা পড়িয়াছে। মিত্ররা হতবিহ্বল এবং বৃটেন ছাড়া বেশির ভাগ শক্তিশালী রাষ্ট্র শুরু হইতেই এই যুদ্ধ প্রত্যাখ্যান করে (The Age of War, the United States Confronts the world by Gabriel Kolko)।

২৯ মার্চ, ২০০৬ খৃ. ইন্দোনেশিয়া যাত্রাকালে নিউজিল্যান্ডে স্বল্প যাত্রা বিরতিকালে অকল্যান্ড রেডিওকে প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বলেন, ইরাক হইতে এখন সৈন্য প্রত্যাহার করিলে তেলসমৃদ্ধ উপসাগরীয় দেশটি তাঁহার ভাষায় সংঘাত সৃষ্টিকারী অর্থাৎ স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের দখলে চলিয়া যাইবে। ব্লেয়ারের ইন্দোনেশিয়া সফরের প্রতিবাদে জাকার্তাসহ দেশের ছোট-বড় অনেক শহরে প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভকারীরা প্রতিবাদ ধ্বনি তুলেন ঃ 'ব্লেয়ার জাহান্নামে যাও'।

অবশেষে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইস স্বীকার করেন যে, ইরাকে যুক্তরাষ্ট্র বহু কৌশলগত ভুল করিয়াছে। তবে ইতিহাসই বলিয়া দিবে সাদ্দাম হুসায়নকে ক্ষমতাচ্যুত করার কৌশলগত লক্ষ্যটি কত যথার্থ ছিল। ৩১ মার্চ, ২০০৬ খৃ. বৃটেন সফরকালে তিনি একথা বলেন। যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের ইরাক নীতির সমালোচক শত শত মানুষ সারা দিন রাইসের সফরের বিরোধিতায় রাস্তায় অবস্থান নেন। বিক্ষোভকারীরা 'কন্ডোলিসা রাইস, বাড়ি যাও', 'হেই হেই কান্ড রাইস, অদ্য তুমি কতজন

শিশুকে হত্যা করিয়াছ ?' প্রভৃতি বলিয়া স্লোগান দেয়। প্ল্যাকার্ডও তাহারা বহন করে। বিক্ষোভের কারণে রাইস ব্লাকবার্ণে একটি মসজিদ পরিদর্শনের কর্মসূচি বাতিল করিতে বাধ্য হন।

মানবতার বিরুদ্ধে বিচার শেষ হওয়ার পূর্বেই ইরাকের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে কুর্দী গণহত্যার অভিযোগ আনা হয়। আশির দশকে ইরাকের কুর্দিস্তানে কুর্দি বিদ্রোহ দমনে হালাবজায় আনফাল অভিযানে ১ লক্ষ ৮০ হাজার কুর্দি হত্যার অভিযোগে বাগদাদের আদালতে সাদ্দাম ও তাহার সহযোগীদের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে আদালতে ক্ষুব্ধ সাদ্দাম অভিযোগ করেন, কথিত প্রত্যক্ষদর্শীদের সকলকে সাক্ষ্যদানের জন্য ঘুষ প্রদান করা হইয়াছে। আদালতে কী বলিতে হইবে, তাহাও তাহাদের শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৭ এপ্রিল, ২০০৬ খৃ. ইরাকের রাজধানী বাগদাদে একটি শী'আ মসজিদে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ৭৯ ব্যক্তি নিহত ও ১৬৪ ব্যক্তি আহত হন। এইভাবে প্রতিদিনই শী'আ-সুন্নী দাঙ্গায় বহু ইরাকীর হতাহত হওয়ার ঘটনা অব্যাহত রহিয়াছে। হামলাটি সাম্প্রতিক কালের দ্বিতীয় বড় হামলা। ৮ এপ্রিল, ২০০৬ খৃ. মার্কিন সামরিক বাহিনী অভিযোগ করে যে, এক ইরাকী সৈন্য একজন মার্কিন সৈন্যকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে (এপি ও এএফপি, বাগদাদ, ৯ এপ্রিল, ২০০৬ খৃ.)।

উল্লেখ্য, ইরাকের গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব শিকড় গাড়িয়াছে একেবারে সাম্প্রতিক কালে। ইরাক ছিল জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ একটি দেশ। সুন্নী ও শী'আর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও ছিল খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা। ২ এপ্রিল, ২০০৬ খৃ. আল-জাযীরা সূত্রে জানা যায় যে, ইরাক যুদ্ধের সময় ইরাকীদের হত্যা করত তাহাদের ছিন্ন মস্তক লইয়া মার্কিন সৈন্যরা ফুটবল খেলে। জোসুয়া কী নামক স্বপক্ষত্যাগী এক মার্কিন মেরিন সেনা আরও জানায়, ২০০৩ খৃ. মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্র ইরাক দখলের প্রথমদিকে মেরিন কমান্ডাররা সৈন্যদের নির্দেশ দেন, কোন ইরাকীকে দেখামাত্র গুলি করিবে। যুক্তরাষ্ট্রে গেলে কোর্ট মার্শালের ভয়ে জোসুয়া কী উদ্বাস্তু হিসাবে কানাডাতে আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

সম্মুখ সমরে মুজাহিদদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া মার্কিন আগ্রাসীরা সুন্নী ও কুর্দি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্যে দাঙ্গা লাগাইয়া দিয়া ইরাককে বিভক্ত করিয়া শাসন করার চক্রান্ত করে। এই চক্রান্তের অংশ হিসাবে তাহারা মসজিদ এবং রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিসে হত্যাকাণ্ড চালাইয়া ইহার দায়-দায়িত্ব মুজাহিদদের ঘাড়ে চাপাইয়া তাহাকে সাম্প্রদায়িক উগ্রতার ফল বলিয়া বর্ণনা করার অপপ্রয়াস চালায়। কিন্তু এই প্রয়াসের ফলও আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে চলিয়া গিয়াছে। এই সব হত্যাকাণ্ডে সুন্নীদের পাশাপাশি এখন শী'আরাও অনুধাবন করিতে পারিয়াছে যে, মার্কিনীরা তাহাদের উভয় পক্ষেরই শত্রু। তাহারা ইরাকীদের শত্রু, মুসলমানদের শত্রু। শুধু তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশটির মহামূল্যবান সম্পদ লুট করার উদ্দেশ্যেই তাহারা ইরাক দখল করে। আর অনির্দিষ্ট কাল ধরিয়া দেশটি দখলে রাখার জন্য তাহারা বৈধ সরকারকে উৎখাত করিয়া সেখানে একের পর এক গণহত্যা চালাইয়া যাইতেছে। পর্যবেক্ষক মহলের মতে, ইরাকীদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যতই চক্রান্ত করুক না কেন, তাহা তাহাদের জন্যই বুমেরাং হইবে এবং ১৯৭৫ খৃ. তাহারা ভিয়েতনামে যেভাবে হারিয়াছে ইরাকেও নির্ঘাত পরাজিত হইবে (দৈনিক আল-আহরাম, কায়রো, ২ এপ্রিল, ২০০৬ খৃ.)।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের মানবাধিকার বিষয়ক দূত অ্যান ক্লাউড বলেন, মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনীর হাতে গ্রেফতারকৃত ইরাকীরা একটি 'কালো গহ্বরে' অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে এবং তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করা খুবই কঠিন। শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র সমস্যাটিকে গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করিলে তাহা ইরাকে বন্দী নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধে সহায়ক হইত (নিউ ইয়র্ক টাইমসের ওয়েব সাইট, ৮ এপ্রিল, ২০০৬ খৃ.)।

১০ এপ্রিল, ২০০৬ খৃ. মার্কিন সামরিক বাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয় যে, ইরাকের ডেথ স্কোয়াডে মার্চ ২০০৬ খৃ. পর্যন্ত ১,৩০০ সুন্নীকে হত্যা বা অপহরণ করা হয়। তাঁবেদার সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বায়ান জাবের সুন্নীদের অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলেন, হত্যাকারী ও অপহরণকারীরা পুলিশের পোশাক পরিয়া এসব অপকর্ম করে। তাই ইরাকী পুলিশ ও সেনারা এসব কাজ করে বলিয়া সকলের ধারণা (বিবিসি অনলাইন, ১৩ এপ্রিল, ২০০৬ খৃ.)।

এদিকে ন্যাটোর সাবেক সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওয়েসলি ক্লার্ক ৬ জন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলের সহিত যোগদান করিয়া মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ডের প্রতি পদত্যাগের আহবান জানান। রামসফেল্ড ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি যুক্তরাষ্ট্রকে ইরাক যুদ্ধে ঠেলিয়া দিয়েছেন এই অভিযোগ করিয়া বিশ্বব্যাপী পরিচিত জনপ্রিয় জেনারেল ক্লার্ক বলেন, এই যুদ্ধের সহিত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াইয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না। উক্ত দুইজন যুদ্ধের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছেন। কূটনৈতিক প্রচেষ্টা শেষ হওয়ার পূর্বেই তাহারা প্রকাশ্য যুদ্ধের জন্য চাপ প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি ইরাক অভিযানকে মারাত্মক ভুল এবং গুরুতর কৌশলগত বিপর্যয় বলিয়া অভিহিত করেন।

সর্বশেষ ২০মে, ২০০৬ খৃ. ইরাকের ২৭৫ সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেন্ট নবগঠিত জাতীয় ঐকমত্যের সরকারের মন্ত্রীসভাকে অনুমোদন করে। বহু প্রতীক্ষার পর এই সংসদ অধিবেশনের উদ্বোধন করা হয়। দেশটির শী'আ প্রধান মন্ত্রী নূরী আল-মালিকী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে এবং সুন্নী উপ-প্রধান মন্ত্রী সালাম আল-জওবাই সাময়িকভাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন (বিবিসি ও এএফপি, বাগদাদ ২০ মে, ২০০৬)।

**ইরাক যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি**

২০০৩ খৃ. ইরাক যুদ্ধের প্রেক্ষিতে দেশটিতে ব্যাপক লুটতরাজ হয়। লুণ্ঠিত স্থানসমূহের মধ্যে ইরাকের জাতীয় জাদুঘর ছিল অন্যতম। মার্কিন সামরিক বাহিনী জাদুঘর পাহারা দেয় নাই, কারণ তাহারা তৈল মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যস্ত ছিল। মার্কিন কর্মকর্তাগণের মতে, হাসপাতাল, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সমূহের নিরাপত্তা বাস্তবতার নিরিখে অগ্রাধিকার পায়। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নিরাপত্তা বিধানের জন্য মার্কিন সৈন্যসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল বলিয়া কিছু অপ্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় বলিয়া মার্কিন কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করে। বহু ট্রাকভর্তি লুণ্ঠিত ইরাকী স্বর্ণ ও ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নগদ টাকার তোড়া মার্কিন বাহিনী জব্দ করে।

হৃত সামগ্রী পুনরুদ্ধারে মার্কিন ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (FBI)-কে তলব করা হয়। দেখা যায় যে, ১৫,০০০টির মত প্রাচীন নিদর্শন খোয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে অদ্যাবধি ৫,০০০টি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। তথাপি প্রাচীন সুমেরিয়া হইতে নিদর্শনাদি খোয়া যাওয়াতে অপূরণীয় সাংস্কৃতিক ক্ষতিসাধিত হইয়াছে।

যুদ্ধে ইরাক হইতে খোয়া যাওয়া দ্রব্যাদির তালিকার মধ্যে আছে হাজার হাজার টন ভারী সমরাস্ত্র, আর্টিলারী সেল, বিমান বোমা, মর্টার ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত ইরাকী পারমাণবিক স্থাপনা, তুওআইথা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র হইতে মার্কিন সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে ১০০ টন ইউরেনিয়াম লুট হইয়া যায় (বরাত ঃ Invasion of Iraq - Wikipedia, the free Encyclopedia)।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন নিকট-প্রাচ্যের শিল্পকলার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক জয়নাব বাহরানি বলেন যে, প্রাচীন ব্যবিলন শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি হেলিকপ্টার অবতরণস্থল নির্মাণ করা হয়। ইহাতে সেখানকার মাটির উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক স্তর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হেলিকপ্টারের দৈনিক যাতায়াতে প্রাচীন দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়ে। হেলিকপ্টারের ঘূর্ণায়মান পাখার বাতাসে নিক্ষিপ্ত বালুর আঘাতে প্রাচীন আমলের ভঙ্গুর ইটগুলি আরও ভাঙিয়া পড়ে। সেখানে কর্তব্যরত মার্কিন সেনাধ্যক্ষগণ বলেন যে, তাহাদের নিরাপত্তার জন্য স্থানটি খোলা রাখা আবশ্যক।

বুরহানী আরও বলেন যে, ২০০৪ খৃ. কতিপয় ৬ষ্ঠ খৃ. পূ. সনের নিদর্শন, যেমন নাবুর মন্দির ও নিনমাহ-এর মন্দিরের ছাদ হেলিকপ্টার উঠানামার ফলে ধ্বসিয়া পড়ে। যুদ্ধোত্তর ইরাকে বিদ্যুৎ সরবরাহ দুর্লভ হওয়ায় 'উছমানী সাম্রাজ্যের আর্কাইভসহ কিছু ভঙ্গুর নিদর্শনাদি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অবর্তমানে বিনষ্ট হয় (পূ. গ্র. বরাত)।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) The world of Learning 2005, 54th edition, volume I, London and New York 2004, 864, 868, নিবন্ধ ইরাক; (২) Article Iraq in the Europa world yearbook, London 2006; (৩) Article Iraq in the Encyclopedia Americana, International Edition, Connecticut 2006; (৪) Iraq in Britanica Book of the Year, Chicago 2006; (৫) Iraq in the World Almanac and Book of Facts, New York 2006; (৬) Article Iraq, in the New Encyclopedia Britannica, Chicago 2006; (৭) Axelgard, F.W. ed., Iraq in Transition (west view 1986); (৮) Helms, C.M., Iraq : Eastern Flank of the Arab World (Brookings Inst. 1984); (৯) Stephen H. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq (Gregg Intl. 1968); (১০) Marr. phebe, The Modern History of Iraq (Westview 1985); (১১) Helen Chapin Metz (ed.), Iraq; A Country Study, 4th ed. (1990); (১২) Stephen Hemsley Longrigg and Frank Stoakes, Iraq (1988); (১৩) Essay on Iraq in the Middle East and North Africa (annual); (১৪) Peter Beaumout, Gerald H. Blake and Malcolm wagstaff, The Middle East : A Geographical Study, 2nd ed. (1988); (১৫) Nissim Rejwan, The Jews of Iraq : 3000 Years of History and culture (1985); (১৬) Abbas Shiblak, The Lura of Zion : The Case of the Iraqi Jews (1986); (১৭) Committee Against repression and for Democratic Rights in Iraq, Saddam's Iraq : Revolution or Reaction ?, new ed., rev. and updated (1989); (১৮) Samir al-Khalil, Republic of Fear (1989); (১৯) Majid Khadduri, The Gulf War The Origins and Implications of the Iraq-Iran Conflict (1988); (২০) Shahran Chubin and Charles Tripp, Iran and Iraq at War (1988); (২১) Kaiyan Homi Kaikobad, The Shatt-al-Arab Boundary Question : A Legal Appraisal (1988); (২২) Edgar O'Ballance, The Gulf War (1988); (২৩) Hanns W. Maull and Otto pick (eds.), The Gulf War : Regional and International Dimensions (1989); (২৪) Efraim Karsh (ed.), The Iran-Iraq War : Impact and Implications (1989); (২৫) Iraq, in Thomas Brinkhoff, City Population (internet www. citypopulation. de), 19 April, 2006; (২৬) Iraq in UN. world Urbanization Prospects : The 2006 Revision; (২৭) Iraq, in the UN, World population Prospects : The 2006 Revision; (২৮) Iraq, in the WHO, World Health Report (2006); (২৯) Iraq, in the ILO, Yearbook of Labour Statistics (2006); (৩০) Iraq, in the UN Industrial Commodity Statistics Yearbook (2006); (৩১) Iraq, in the IMF International Financial Statistics (2006); (৩২) Iraq, in the UN Economic and Social Commission for Western Asia, National Accounts Studies of the ESCWA Region (2006); (৩৩) Iraq, in the UN, International Trade Statistics Yearbook (2006); (৩৪) Iraq, in the IRF World Road Statistics (2206); (৩৫) Iraq, in the Liod's Register Fairplay, World Fleet Statistics (2006); (৩৬) Iraq, in the World Tourism Organization, Yearbook of Tourism Statistics (2006); (৩৭) Iraq, in the UN Statistical Yearbook, World Telecommunication Union (2006); (৩৮) Iraq, in the UNESCO, Statistical Yearbook (2206); (৩৯) Iraq, in the UNDP Human Development Report (2006); (৪০) Paul Sarobin, Shattering Iraq, in the National Journal, vol. 37. No. So. pp. 3784-3791, USA 10 December 2005; (৪১) Dan Thompson, American Interrupted : 14 Months in Iraq, USA 2006; (৪২) M. Ismail Marcinkowski, Religion and Politics in Iraq. Shiite Clerics between Quietism and Resistance, Singapore 2004; (৪৩) Iraq-wikipedia, the free

encyclopedia, in the internet "http : //en. winkipedia.org/wiki/Iraq", 19 April, 2006; (৪৪) Professor Juan Cole, Informed Comment, Thoughts on the Middle East, History and Religion, University of Michigan 2006; (৪৫) Mark Levine, Why Don't Hate US : Globalization in a post-9/11 World, California 2004; (৪৬) CIA- The World Factbook- Iraq, in the internet google search, 2006; (৪৭) Islamic History of Iraq, in the internet google search, 2006; (৪৮) The country and people of Iraq, in the internet "http://www. hejleh.com/countries/iraq.html", 2006; (৪৯) Art Journal : Iraq's cultural heritage : monuments, history and loss, in the internet google search, 2004; (৫০) James Caroll, Voices Against the war, in the Boston Globe, Boston 7 September, 2004; (৫১) Eric Black, A history of Iraq, the cradle of western civilization, in the Star Tribune, Minneapolis 2 February, 2003; (৫২) Iraq, in the USA Today 2006; (৫৩) Electra Draper, Traveling Memorial Brings Home Iraq war's Human Cost,- in the Denver Post, Denver 21 October, 2004; (৫৪) VAIW : Veterars Against the Iraq war, in the internet "www. vaiw. org", 2006; (৫৫) Dr. Alan Godlas, Muslims, Islam and Iraq, University of Georgia, internet godlas @uga. edu, 2006; (৫৬)Yitzhak Nakash/ Evan Langenhahn, The Si'is and The Future of Iraq, Washington Institute's special policy Forum, 21 February, 2003; (৫৭) Dr. Nakash, Iraqi Shi'ites, The shi'is of Iraq, Princeton University Press 2006; (৫৮) Frank Smith, Iraq's Forgotten Majority, in the New York Times, 3 October, 2002; (৫৯) T. M. Aziz, The Role of Muhammad Baqir Al-Sadr in Shi'a Political Activism in Iraq from 1958 to 1980, an online book in the internet google search, 2006; (৬০) Mehrad Izady, The Kurds : A Coincise Handbook (1992) (Sufism Section), Harvard 1992; (৬১) Anssi Kristian Kullberg (University of Tartu), Strategic Game on (sic) Iraq's Kurds, in the The Eurasian Politician, Issue 2 October, 2001; (৬২) Faleh Abdul Jabar (ed.), Ayatollah; Sufis and Ideologys: State, Religion and Social Movements in Iraq, Saki Books, London 2002; (৬৩) The Kurds and Islam, Working Paper No. 13, Islamic Area Studies Project, Tokyo, Japan 1999; (৬৪) Professor Carole A. O'Leary, The Kurds of Iraq : Recent History, Future prospect, American University Centre for Global Peace (MERIA, vol. 6, no. 4, Dec. 2002); (৬৫) Professor Richard Falk and David Krieger, Iraq and the Faileeres of Democracy, Princeton 24 February, 2003; (৬৬) Nadeem Ilyas, The Inpending Slaughter of Muslims in Iraq, at the online Islamic Journal, Khilafah, com, 2 February, 2003; (৬৭) Dr. Imran Waheed, Colonialism, Iraq and Islam, St. Annes College, University of Oxford, 29 October, 2002; (৬৮) Ansar Al-Islam : Iraq's Al-Qaeda Connection, by Jonathan Schanzer of the Washington Institute of Near East Policy, published online in frontpage Magazine. com, 17 January, 2003; (৬৯) Graham E. Fuller, The Arab Shi'a : The Forgotten Mulims, Palgrave-Macmillan, 2001; (৭০) Keiko Sakai, Modernity and tradition in the Islamic Movements in Iraq : continuity and discontinuity, in Arab Studies Quarterly, vol. 23, no. 1, winter issue, 2001; (৭২) Mark Danner, Torture and Truth : America, Abu Gharib, and the war on Terror, USA 2006; (৭৩) সাদ্দাম হোসেন, ড্যান্স অব এ ডেভিল, জাপানী সাংবাদিক ইতসুকু হিরাতা কর্তৃক জাপানী অনু. (আকুমা নো ড্যান্স), টৌকিও ২০০৬ খৃ.।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

**'ইরাক 'আজামী** (দ্র. আল-জিবাল)

**'ইরাকী** (عراقی) ঃ হিজরী সপ্তম শতাব্দীর খ্যাতনামা কবি, শায়খ ফাখরু'দ-দীন ইবরাহীম ইব্ন 'আব্দি'ল-গাফফার জাওয়ালিকী হামাদানী, কবিনাম 'ইরাকী' হামাদান-এর বহিরস্থ কুমজান (কামীজান) গ্রামে ৬১০/১২১৩-১৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ সেই যুগের অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি সারফ, নাহ্ব, 'আরবী সাহিত্য, তাফসীর ও হিকমাত বিষয়ে হামাদান-এ শিক্ষা লাভ করিয়া তথায় ১৭ বৎসর বয়সে শিক্ষা দানে আত্মনিয়োগ করেন। ৬২৭/১২৩০ সনে তাঁহার মনে এক আধ্যাত্মিক প্রেরণার উদয় হয়। তিনি বুযুর্গদের সান্নিধ্য লাভের মানসে স্বীয় জন্মভূমি হামাদান ত্যাগ করিয়া সিজাস নামক স্থানে রুক্নু'দ-দীন সিজাসীর সমীপে উপস্থিত হন। অতঃপর বাবা কামাল খুজান্দী ও শামসু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মালিকদাদ তাবরীযীর সমীপে, যিনি তৎকালের প্রসিদ্ধ সূফীদের মধ্যে গণ্য হইতেন, উপস্থিত হন (শাওয়াল ৬৩২/ জুন-জুলাই ১২৩৫)। অতঃপর তিনি ইসফাহান গমন করেন এবং তথা হইতে হিন্দুস্তানে পৌঁছেন। ৬৩১/১২৩৪ সনে 'ইরাকী মুলতানের শায়খ বাহা'উ'দ-দীন যাকারিয়্যা (৫৬৫/১১৭০ হইতে ৭ সাফার ৬৬৬/২৮ অক্টোবর, ১২৬৭ বৃহস্পতিবার তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত)-র হস্তে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল তথায় আধ্যাত্মিক সাধনায় রত থাকেন। এই সময়ে তিনি একবার দিল্লী এবং দ্বিতীয়বার সোমনাথ গমন

করেন। তিনি মুলতানে ১৫ বৎসর শিক্ষা দানে ব্যাপৃত ছিলেন এবং তথায় শায়খ বাহা'উ'দ-দীন যাকারিয়্যা-র কন্যাকে বিবাহ করেন যাঁহার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করেন। তাঁহার নাম কাবীরু'দ-দীন। শায়খ বাহা'উ'দ-দীন যাকারিয়্যা তাঁহাকে স্বীয় গদ্দীনশীন (স্থলাভিষিক্ত) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু শায়খ-এর ইনতিকালের পর তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। এই কারণেই 'ইরাকী ঐ বৎসর (৬৬৬/১২৬৮) মুলতান হইতে হিজরত করিয়া 'উমান হইয়া হাজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন। মদীনায় রাওযা মুবারাকের যিয়ারাতের পর তিনি বাগদাদ পৌঁছেন। অতঃপর রূম দেশে (বর্তমান তুরস্ক) গমন করেন এবং সেইখানকার কয়েকটি শহরে–যথা কো'নিয়া তাওক'াদ (তাওক'াত বা তাওক'াত) যেইগুলি কোনিয়া ও সীওয়াস-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং কাস্ত'ামূনী অঞ্চলে সানুব (বা সীনূপ)-এ, কিছুকাল অবস্থানের পর কৃষ্ণসাগর উপকূলে বসবাস করিতে থাকেন। তথায় অবস্থানকালে তিনি তৎকালীন দুইজন খ্যাতিমান শায়খ-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। প্রথমে তিনি মাওলানা জালালু'দ-দীন রূমীর (৬ রাবী'উ'ল-আওয়াল, ৬০৩–৫ জুমাদা'ল-আখিরা ৬৭২/২১ অক্টোবর, ১২০৬–১৭ ডিসেম্বর ১২৭৩) খিদমতে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি তাঁহার সহিত কয়েকবার সাক্ষাত করেন এবং তাঁহার জানাযায় অংশ গ্রহণের জন্য কোনিয়াতে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন শায়খ স'াদরু'দ-দীন আবু'ল-মা'আলী মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহ'াক ইব্ন মুহাম্মদ কোনাবী (মৃ. ৬৭৩/১২৭৪-৫); এক যুগ পর্যন্ত তাঁহার সহচরদের মধ্যে তাঁহাকে গণ্য করা হইত। খ্যাতনামা সূফী ইব্নু'ল-'আরাবী (আবূ বাক্র মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী হাতিমী তা'ঈ আন্দালুসী [(৭ রামাদান, ৫৬০-রাবী'উ'ল-আখিরা ৬৩৮/১৮ জুলাই, ১১৬৪-অক্টোবর ১২৪০)]-এর আল-ফুতূহাতু'ল- মাক্কিয়্যা ফী আসরারি'ল-মালিকিয়্যা ওয়া'ল-মিলকিয়্যা গ্রন্থখানি (যাহার রচনা-কার্য তিনি স'াফার ৬২৯/নভেম্বর ১২৩১ সালে সম্পন্ন করিয়াছিলেন) তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন। তিনি মু'ঈনু'দ-দীন আবূ নাস্র সুলায়মান ইব্ন মুহাম্মাদ সুলায়মান ইব্ন মুহাযযাবু'দ-দীন 'আলী দায়লামী (নিহত ৬৭৫/১২৭৬-৭) যিনি পারওয়ানা নামে পরিচিত, তাঁহার সহিতও সাক্ষাত করেন এবং ৬৫৮/১২৬০ হইতে ৬৭৫/১২৭৭ পর্যন্ত সালজূকী রুক্নু'দীন ৪র্থ ক'ায়লাজ আরসলান-এর উযীরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তৎকালীন আধ্যাত্মিক বুযুর্গদের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি 'ইরাকীর জন্য তাওক'াদ-এ একটি খানকাহ নির্মাণ করাইয়া দেন। উক্ত সফরকালে 'ইরাকী স্বীয় কিতাব 'লুম'আত' কো'নিয়া অবস্থানকালে প্রণয়ন করেন। বাহ্যত মু'ঈনু'দী-দীন পারওয়ানা-র হত্যা এবং এশিয়া মাইনরের পরিস্থিতির অবনিতির পর ৬৭৫/১২৭৬-৭ হইতে ৬৭৬/১২৭৭-৮ পর্যন্ত তিনি মিসর সফর করেন এবং ইহার গভর্নর রুক্নু'দ-দীন বায়বারস বুন্দুক্দারী (৬৫৮ হইতে ৬৭৬/১২৫৯-৬০ হইতে ১২৭৭-৭৮) তাঁহাকে শায়খু'শ-শুয়ূখ-এর পদ অর্পণ করেন। ৬৭৬/১২৭৭-৭৮ সনে বায়বারস-এর ইনতিকালের পর 'ইরাকী এশিয়া মানইরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কিছুকালের জন্য তাওকাদ-এ অবস্থান করেন। ৬৮০/১২৮১-৮২ সনে যখন তুলাগূ খান-এর নবম পুত্র কানকূরবায় (মৃ. ৬৮০/১২৮১-২) এবং উযীর শামসু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন বাহা'উ'দ-দীন মুহাম্মাদ আল-জুওয়ায়নীর সহিত (যিনি ৪ শা'বান, ৬৮৩/১৬ অক্টোবর, ১২৮৪ সোমবার নিহত হন) এশিয়া মাইনরে আগমন করেন। তিনি শামসু'দ-দীন আল জুওয়ায়নীর সহিত সাক্ষাত করেন এবং স্বীয় মাছ'নাবী 'উশ্শাক' নামা বা 'দাহ্নামা' তাঁহার উদ্দেশ্যে রচনা করেন। অতঃপর তিনি দামিশ্ক-এ গমন করেন। এইখানে তাঁহার পুত্র কাবীরু'দ-দীন ছয় মাস পর মুলতান হইতে তাঁহার নিকট চলিয়া আসেন। তিনি তথায় পাঁচ দিন পীড়িত থাকিবার পর ৮ যু'ল-কা'দাঃ, ৬৮৬/১৫ ডিসেম্বর, ১২৭৭ সালে ইনতিকাল করেন। দামিশ্কের স'ালিহি'য়্যা গোরস্থানে মুহয়ি'দ-দীন ইব্নু'ল-'আরাবীর মাযারের পশ্চাতে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার মাযার হিজরী দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল, কিন্তু বর্তমানে ইহার কোন চিহ্ন নাই। 'ইরাকীর দীওয়ান-এর মুখবন্ধে যাহা বাহ্যত অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহার কোন বন্ধু কিংবা অন্য কেহ লিখেন এবং 'উশশাক' নামা-র শুরুতে যাহা প্রফেসর আরবেবী প্রকাশ করিয়াছেন এবং এইভাবে এই নিবন্ধকার প্রকাশিত এই 'কুল্লিয়্যাত'-এ যাহা তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

ফাখরু'দ-দীন 'ইরাকী হিজরী সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ সূফী কবিদের অন্তর্ভুক্ত; তিনি এই শ্রেণীর উচ্চ পর্যায়ের কবিদের মধ্যে পরিগণিত। মা'রিফাত বিষয়ক কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। তাঁহার আধ্যাত্মিক কবিতা ছিল প্রসিদ্ধ। তিনি ক'াস'ীদা (দীর্ঘ কবিতা), গ'াযাল (প্রণয় তারজী' বান্দ, গীতি), কি'ত'আত (খণ্ড কবিতা) এবং রুবা'ইয়্যাত (চতুষ্পদী)-রূপে ৪,৮০০টি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মাছ'নাবী 'দাহ্ নামাহ' বা 'উশশাক' নামাহ' তাঁহার স্মৃতিস্বরূপ বিদ্যমান আছে। যাহা তিনি ৬৮০/১২৮১-২ সনে তাওকাদ-এ শামসু'দ-দীন আল-জুওয়ায়নীর উদ্দেশ্যে রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে ১০৬৪টি শ্লোক রহিয়াছে। তাস'াওউফ বিষয়ক তাঁহার অন্য একটি উত্তম রচনা হইতেছে 'লুম'আত'। উক্ত গ্রন্থখানি তিনি ইমাম গাযালী (র)-র ভ্রাতা আবু'ল-ফাত্হ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-গাযালীর (মৃ. ৫১০/১২২৬) 'কিতাবু'স্-সাওয়ানিহ' ফী মা'আনি'ল-'ইশ্ক'-এর অনুসরণে ৬৭৩/১২৭৪ সনের পূর্বে কো'নিয়ায় রচনা করেন। ইহা তাস'াওউফের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহার কয়েকখানি ভাষ্য লিখা হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ভাষ্যগুলি ইহাদের অন্তর্গত স'াইনু'দ-দীন 'আলী তারিকাঃ ইসফাহানী (৮৩৫/১৪৩১-২)-কৃত আদ'-দাও; শায়খ য়ার 'আলী শীরাযী-কৃত আল-লামহ'াত ফী শার্হি'ল-লুম'আত (৮২৬/১৪২২-৩) এবং খাওরী ও বুরহানুদ-দীন খাত্লানী (৮৯৩/১৪৮৭) খাত্লানী (৮৯৩/১৪২২-৩)-কৃত শার্হ বা ভাষ্যদ্বয় এতদ্ব্যতীত যুব্দাতু'ত-ত'ারীক'-এর প্রণেতা দারবীশ 'আলী ইব্ন য়ুসুফ কোক্হারীর ভাষ্য ৮০৫/১৪০২ সনে, আশি'আতু'ল-লুম'আত নামে নূরু'দ-দীন আব্দু'র-রাহমান জামীর ভাষ্য যাহা তিনি ৮৮৯/১৪৮৪ সনে সমাপ্ত করিয়াছেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** : (১) হ'ামদুল্লাহ আল-মুসতাওফী, তারীখ-ই গুযীদাহ্ (Gibb Memorial Series); (২) জামী, নাফাহাতু'ল-উন্স, কলিকাতা ১২৭৬/১৮৫৯;(৩) দাওলাত শাহ্, তায'কিরাতু'ল-শু'আরা', লাইডেন; (৪) খান্দামীর, হ'াবীবু'স-সিয়ার; (৫) মাজালিসু'ল-'উশ্শাক'', কানপুর ১৩১৪/১৮৯৬; (৬) মুল্লা 'আব্দু'ন-নাবী, ফাখ্র-ই যামানী, মায়খানাহ, লাহোর ১৩৪৫/১৯২৬; (৭) দারা শুকোহ্, সাফীনাতু'ল-আওলিয়া', সং লক্ষ্ণৌ ১২৮৯/১৮৭২; (৮) শের খান লোদী, মির'আতু'ল-খিয়াল, বোম্বাই ১৩২৪/১৯০৬; (৯) মুহ'াম্মাদ কু'দরাত খান গোপামু'ঈ, নাতাই'জু'ল-আফকার, মাদ্রাজ ১২৫৯/১৮৪৩; (১০) লুত্ফ 'আলী বেগ আয'ার, আতাশ কাদাহ, বোম্বাই ১২৯৯/১৮৮১; (১১) সায়্যিদ মুহাম্মাদ

সিদ্দীক হাসান খান, শামা'-ই আন্‌জুমান, ভূপাল ১২৯৩/১৮৭৬; (১২) রিদা কুলী খান হিদায়াত, রিয়াদু'ল-'আরিফীন, তেহ্‌রান ১৩০৫/ ১৮৮৭; (১৩) গু'লাম সারওয়ার লাহোরী, খাযীনাতু'ল-আস'ফিয়া', কানপুর ১৩৩৩/১৯১৪; (১৪) রিদা কু'লী খান হিদায়াত, মাজমা'উ'ল-ফুস'াহা', তেহ্‌রান ১২৯৫/ ১৮৭৮; (১৫) না'ইবু'স-সু'দূর মা'সূম 'আলী শাহ্‌শীরাযী, ত'ারা'ইকু'ল-হ'াকা'ইক', তেহ্‌রান তা. বি.; (১৬) ইসমাঈল পাশা বাগদাদী, হাদিয়াতু'ল-'আরিফীন, ইস্তাম্বুল ১৩৭১/১৯৫১; (১৭) মুহাম্মাদ সা'দিক' নাজি'ম তাবরীযী, মুনাজ্জা'ম গারব'ীদা, পাণ্ডুলিপি লেখকের নিজস্ব স্বত্ব; (১৮) আমীন আহ'মাদ রাযী, হাফ্‌ত ইক্‌লীম পাণ্ডুলিপি, লেখকের নিজস্ব স্বত্ব; (১৯) শায়খ আবু'ল-কা'সিম ইব্‌ন আবি হ'ামিদ নাস্'র বিল্‌য়ানী আনসারী, সুল্লামু'স- সামাওয়াত, পাণ্ডুলিপি, লেখকের নিজস্ব স্বত্ব; (২০) মুহাম্মাদ 'আরিফ বাক'া'ঈ, মাজমা'উ'ল-ফুদ'ালা', পাণ্ডুলিপি, লেখকের অধিকারে; (২১) আহ'মাদ 'আলী খায়র আবাদী, কাস্'র-ই 'আরিফান (ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন, লাহোর), ১৯৬৫ খৃ.; (২২) তারীখ-ই ফিরিশ্‌তা (২৩) আশি'আতু'ল-লুম'আত, তেহ্‌রান, তা. বি.; (২৪) Dr. Arberry লিখিত প্রবন্ধ রোযগার-ই নাও-এ, ১খ, ১ম সংখ্যা; (২৫) প্র. 'আবদু'ল-হু'সায়ন নাওয়া'ঈ লিখিত প্রবন্ধ য়াদগার-এ, ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সখ্যা; (২৬) ক'াসিম-গ'ানী, তারীখ-ই তাস'াওউফ্ দার ইসলাম (ইসলামের শুরু হইতে হাফিজ-এর যুগ পর্যন্ত). তেহ্‌রান ১৩২২ হি., শাম্‌সী; (২৭) কুল্লিয়্যাত-ই 'ইরাকী, লাহোর তা. বি.; (২৮) ফাখরু'দ-দীন 'ইরাকী, 'উশ্‌শাক' নামাহ্‌, লেখকের জীবনীসহ, Arberry কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামিক রিসার্চ এসোসিয়েশান সিরিজ, ৮ম সংখ্যা, ১৩৫৭/১৯৩৯; (২৯) বিশেষত ফাখরু'দ-দীন ইব্‌রাহীম হামাদানী কবি নাম 'ইরাকী, কুল্লিয়্যাত (যাহা ভূমিক'া, দীওয়ান, কাসা'ইদ, কি'ত'আত, তার্‌কীবাত, তারজী'আত, গ'াযলিয়্যাত, রুবা'ইয়্যাত, 'উশ্‌শাক' নামাহ্‌ বা দাহ্‌ নামাহ্‌ লুম'আত এবং তাসাউফ্-এর পরিভাষাসহ,এই 'কুল্লিয়্যাত' আঠারখানি অনুলিপির সহিত তুলনা করিয়া দেখার পর সা'ঈদ নাফীসীর প্রচেষ্টায় ও তাঁহার ভূমিকাসহ ১৩৩৫ হি. তেহ্‌রান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

সা'ঈদ নাফীসী (দা. মা. ই.)/যোবায়ের আহমদ

**আল-'ইরাকী, সায়্যিদ শামসু'দ-দীন** (سيد شمس الدين العراقى) ঃ কাশ্মীরে ধর্ম প্রচার কার্যে সক্রিয় একজন ধর্মীয় নেতা। তিনি ছিলেন জনৈক মূসাবী সায়্যিদ ইব্‌রাহীমের পুত্র। কায্‌বীনের রাস্তায় তেহ্‌রানের নিকট অবস্থিত কুন্‌দ-সূল্‌ক'ান নামক একটি ছোট শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুশিক্ষা লাভ করেন এবং অল্প বয়সেই নূর-বাখ্‌শিয়্যা তারীকার প্রতিষ্ঠাতা সায়্যিদ মুহাম্মাদ নূর বাখ্‌শ (৭৯৫-৮৬৯/ ১৩৯৩-১৪৬৪)-এর প্রভাব ভুক্ত হন (দ্র. কুব্‌রা, নাজ্‌মু'দ-দীন)। তাঁহার বাগ্মিতা ও জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া সুলতান হু'সায়ন মীরযা'বায়ক'ারা (৮৭৩-৯১১/১৪৬৯-১৫০৬) তাঁহাকে নিজের অধীনে রাজকার্যে নিয়োজিত করেন এবং তাঁহার নিজ দূত হিসাবে কাশ্মীরের সুলতান হ'াসান শাহ (৮৭৭-৮৯/১৪৭২-৮৪)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি কাশ্মীর উপত্যকায় পৌঁছিয়া আট বৎসরকাল সেইখানে অবস্থান করেন এবং কুব্‌রা ত'ারীক'র সাধক বাবা ইসমা'ঈল-এর শাগরিদ হন। অতঃপর তিনি গোপনে তাঁহার অন্যতম নিবেদিত মুরীদ বাবা 'আলী নাজ্জারকে বুঝাইয়া নূর বাখশিয়্যা তারীক'ায় দীক্ষিত করেন। এই মতবাদটি ছিল সূফী সর্বেশ্বরবাদ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত শী'আ ও সুন্নী মতবাদের একটি সংমিশ্রিত রূপ। দূত হওয়ার কারণে তিনি প্রকাশ্যে ধর্মপ্রচার করিতে পারিতেন না, অতএব তাঁহার সফলতা ছিল সীমাবদ্ধ। তাহা ছাড়া সুন্নী 'আলিমগণ তাঁহার ধর্ম বিশ্বাস জানিতে পরিয়া তাঁহাকে কাশ্মীর ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। ফলে তিনি হারাত-এ প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার নিষ্ঠাবিহীন ধর্মমতের কারণে তিনি সুলতান হুসায়ন মীরযার অনুগ্রহও হারান। সুতরাং তিনি সায়্যিদ মুহাম্মদ নূর বাখ্‌শ-এর পুত্র শাহ ক'াসিম-এর সহিত বসবাস করিবার জন্য রায় অভিমুখে রওয়ানা হন।

রায়-এ অবস্থানকালে শামসু'দ-দীন শুনিতে পান যে, তিনি যাঁহাদিগকে স্বমতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা পুনরায় তাঁহাদের নৈষ্ঠিক ধর্মমতে ফিরিয়া গিয়াছেন। অতএব তিনি শাহ ক'াসিম-এর উপদেশে কাশ্মীর উপত্যকার দিকে রওয়ানা হইতে মনস্থ করিলেন। রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৯০৭/সেপ্টেম্বর ১৫০১ সালে তিনি রায় ত্যাগ করেন। তিনি মাশ্‌হাদ-কান্‌দাহার-মুলতান হইয়া পুঞ্চবারামূলার পথ দিয়া ১৫০২ খৃ. বসন্তকালে কাশ্মীরে প্রবেশ করেন। তিনি শ্রীনগরে আগমন করিয়া পুনরায় বাবা 'আলী নাজ্জারকে স্বমতে আনয়ন করেন। কিন্তু তাঁহার তারীকায় দীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন প্রভাবশালী ও সম্ভ্রান্ত মূসা রায়না, যিনি তাঁহার কাজকর্মে তাঁহাকে সমর্থন করেন এবং শ্রীনগরের জাদ্দিবাল-এ খানকাহ (দ্র.) নির্মাণ করিতে অর্থ প্রদান করেন। কিন্তু নিষ্ঠাবান 'আলিমগণের এবং সুলতান মুহাম্মাদ শাহ-এর উযীর সায়্যিদ মুহাম্মাদ বায়হাকীর বিরোধিতার কারণে তিনি কাশ্মীর ত্যাগ করেন। তিনি উত্তর-পূর্ব কাশ্মীরের বাল্‌তিস্তানে গমন করেন এবং বেশ সফলতার সহিত ইহার বৌদ্ধ অধিবাসীদের মধ্যে ধর্ম প্রচারের কাজ চালান। ৯১১/১৫০৫ সালে সায়্যিদ মুহাম্মাদ বায়হাকীর (দ্র. বায়হাক'ী সায়্যিদ, উপরে) পরাজয় ও নিহত হওয়া পর্যন্ত তথায় তিনি দুই মাসের অধিককাল অবস্থান করেন। ইতোমধ্যে মূসা রায়না পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহার আমন্ত্রণে শামসু'দ-দীন শ্রীনগরে প্রত্যাবর্তন করেন। মূসা রায়নার উযীর থাকাকালীন নয় বৎসরকাল সময়ে শামসু'দ-দীন বিনা বাধায় তাঁহার কার্যকলাপ চালাইয়া যান। তাজীচক ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত চকদের তাঁহার তারীকায় দীক্ষিত হওয়ার দরুন তিনি তাঁহার কাজ সংহত করিতে অধিকতর সক্ষম হইয়াছিলেন।

ইতোমধ্যে নূর বাখ্‌শিয়্যা তারীকায় এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। সাফাবী ইরানের প্রভাবে এই তারীকা ক্রমশ শী'ঈ মতবাদ গ্রহণ করে এবং সূফীবাদ ও সুন্নী ইসলাম হইতে গৃহীত নীতিমালা বর্জন করে। শামসু'দ-দীন নিজেও এই প্রভাব অনুভব করেন এবং স্বভাবত ইছনা 'আশারিয়্যা মতবাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। তিনি তখন হইতে প্রকাশ্যভাবে এই মতবাদ প্রচারের কাজ আরম্ভ করেন এবং ৯৩২/১৫২৬ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কাশ্মীরে শী'আ মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। যাহা হউক দূরবর্তী বাল্‌তিস্তানে নূর বাখশিয়্যা তারীকা বিদ্যমান রহিয়াছে।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** শামসু'দ-দীন-এর একমাত্র জ্ঞাত বিদ্যমান জীবনী গ্রন্থ ঃ (১) তুহ'ফাতু'ল-আহ'বাব, তাঁহার একজন অজ্ঞাতনামা সমসাময়িক লেখক কর্তৃক প্রণীত, ইহার পাণ্ডুলিপি শামসু'দ-দীনের জনৈক বংশধর ও কাশ্মীরের শী'আ মুজ্‌তাহিদ মুহাম্মাদ য়ূসুফ-এর নিকট সংরক্ষিত আছে। অন্যান্য গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ঃ (২) পীর হাসান শাহ, তা'রীখ-ই হাসান, ২খ, শ্রীনগর ১৯৫৪ খৃ.; (৩) মীরযা হ'ায়দার দুগ'লাত, তা'রীখ-ই রাশীদী, অনু. E. D. Ross, এবং N. Elias, লণ্ডন ১৮৯৫ খৃ.; (৪) নূরুল্লাহ শুশ্‌তারী, মাজালিসু'ল-মু'মিনীন, তেহ্‌রান ১২৯৯/১৮৮২; (৫) মুহি'ব্বুল-হ'াসান,

Kashmir under the Sultans, শ্রীনগর ১৯৭৪ খৃ.; (৬) Oriental College Magazine, লাহোর (ফেব্রুয়ারী ও মে ১৯২৫; এবং আগস্ট ১৯২৯)।

মুহি‘ব্বুল-হাসান (E.I.²)/মু. আবুল কালাম আযাদ

**ইরাতেন** (IRATEN) (আয়ত>আছ' য়িরাতেন; 'আ. بنورتن) ঃ বৃহৎ কাবিলিয়া এলাকার একটি বার্বার গোত্র-সমষ্টি যাহাদের রাজ্যের সীমা উত্তর দিকে সেবাও পর্বত এবং পশ্চিম দিকে ওয়াদী আইসী (ওয়াদী আয়সী). এই আইসী উপত্যকাই ইহাদিগকে আয়ত য়েন্‌নি হইতে পৃথক করিয়াছে, দক্ষিণ দিকে য়াহ্‌য়া এবং পূর্বদিকে আইত ফ্রাউসেন। ইহা একটি পাহাড়ী এলাকা যাহার উচ্চতা ৩০০০ হইতে ৩৫০০ ফুট পর্যন্ত। এই স্থানে উৎপন্ন হয় জলপাই, ডুমুর ও কিছু খাদ্যশস্য। এই এলাকার অধিবাসিগণ বিভিন্ন গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছে, এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য আদনি (Adni). তাওরিরত (Tawrirt), আমেক্করান (Amekkran), উসাম্মের (Usammer) ও আগেম্মুন (Agemmun)। ফরাসী শাসনকালে ইরাতেনগণ সংখ্যায় ছিল দশ হাজারের মত; ইহারা তখন ফোর্থ ন্যাশনাল (Forth National)-এর 'কম্যুন মিক্সট" (Commune mixte)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আমরা ইরাতেনদের ইতিহাস কিছুই জানি না। ইব্‌ন খালদূন (Berberes, অনু. de slane, ১খ., পৃ. ২৫৬) তাহাদের সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহার 'বিজায়া (Bidjaya বা Bougie) এবং তেদেল্লীস (Tedellys বা Dellys) এই দুই পর্বতের মধ্যবর্তী এলকার অধিবাসী। তাহারা নামে মাত্র Bougie-এর শাসনকর্তার অধীনে ছিল এবং খারাজ দাতাদের তালিকাভুক্ত ছিল। তবে প্রকৃতপক্ষে তাহারা স্বাধীনই ছিল। ইফ্‌রীকিয়াতে মারীনী বংশীয় আল-হাসানের সামরিক অভিযানের সময় তাহারা 'শাম্‌সী' নাম্নী এক মহিলার শাসনাধীন ছিল। এই মহিলা ছিলেন 'আবদুস-সামাদ পরিবারের। তাহাদের দলপ্রধানগণও ছিলেন এই পরিবার হইতে আগত।

তুর্কী আমলের সম্পূর্ণকাল ব্যাপিয়া ইরাতেনগণ পর্বতান্তরালবর্তী নিরাপত্তায় তাহাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিল। তাহারা কাবিলিয়ায় একটি অতি শক্তিশালী ফেডারেশন গঠন করে; ইহার অংগীভূত ছিল পাঁচটি 'আর্শ ঃ (১) আয়ত ইর্‌জেন; (২) আকের্‌মা; (৩) উছাম্মের; (৪) আওগ্‌গাশা ও (৫) উমালু। ফেডারেশন গঠনের পর তাহারা ২৮০০ লোকের একটি সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণে সমর্থ হয়। ফরাসীগণ মার্শাল রাঁদ (Randon)-এর নেতৃত্বে ১৮৫৪ খৃ. কাবিলীয় পার্বত্যাঞ্চলে প্রবেশ করিবার পূর্ব পর্যন্ত তাহারা স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখে। ইরাতেনগণ তাহাদের রাজ্য আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য প্রতিভূ ও কর প্রদানে সম্মত হয়। তথাপি তাহাদের এলাকাটি ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের লীলাভূমি থাকিয়া যায়। ফলে ১৮৫৭ সালে রাঁদ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দমন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফরাসী সৈন্যদল ২৪ মে তিযি-ওউযোউ (Tizi-Ouzou) হইতে অভিযান আরম্ভ করিয়া পরপর সবগুলি কাবিল গ্রাম জয় করে। তাহারা ২৯ মে তারিখে সূকুল-আর্‌বা'আ (سوق الاربعاء) মালভূমিতে ইরাতেনের প্রতিরক্ষা বাহিনী ও উহার মিত্রবর্গকে পরাজিত করে। অতঃপর তাহাদিগকে আয়ত্তে রাখিবার উদ্দেশ্যে রাঁদ অবিলম্বে ইরাতেন এলাকার কেন্দ্রস্থলে নেপোলিয়ন দুর্গ' (পরবর্তীতে ফোর্ট ন্যাশনাল) নির্মাণ আরম্ভ করে, ইহাই হইল কাবিলিয়ার চোখের কাঁটা। অতঃপর ১৪ বৎসরকাল ইরাতেনগণ শান্ত ছিল, কিন্তু ১৮৭১ সালে তাহারা আবার অস্ত্র হাতে তুলিয়া লয় এবং ফোর্ট ন্যাশনাল অবরোধে অংশ গ্রহণ করে, তবে বিদ্রোহিগণ ইহা দখল করিতে কৃতকার্য হয় নাই (পরবর্তী ঘটনার জন্য দ্র. 'আলজিরিয়া' প্রবন্ধ)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) 'কাবিলিয়া' প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ; এতদ্ব্যতীত ইরাতেন সম্বন্ধে বিশেষভাবে দ্র.; (২) S. Boulifa, Le K'anoun d'Ad'ni, in Recueil de memoires et de textes publie en l'honneur du XIVᵉ Congres international des Orientalistes, আলজিয়ার্স ১৯০৫ খৃ.; (৩) Carette, Etudes sur la Kabylie (Exploration scientifique de I'Algerie, Sciences historiques et geographiques), প্যারিস ১৮৪৮ খৃ., ২খ., পৃ. ২৮৭; (৪) E. Carrey, Recits de Kabylie, Campagne de 1857, Algiers 1858; (৫) Clerc, Campagne de Kabylie, Paris 1857; (৬) Devaux. Les Kabailes du Djerdjera, মারসাই ১৮৫৯ খৃ.; (৭) (Marechal) Randon, Operations militaires en Kabylie. Rapport au ministre de la guerre, প্যারিস ১৮৫৪ খৃ.; (৮) Hanoteau এবং Letourneux, La Kabylie et les coutumes kabyles, প্যারিস ১৮৯৩ খৃ., ৩ খণ্ড, ১খ., পৃ. ২৩৮-৪১। আছ. ইরাতেনদের আঞ্চলিক ভাষা সম্বন্ধে দ্র. (৯) Hanoteau, Poesies populaires de la Kabylie du Jurjura, প্যারিস ১৮৬৭ খৃ., পৃ. ১২৩-৪৭; (১০) S. Boulifa, Recueil de poesies kabyles, আলজিয়ার্স ১৯০৪ খৃ.; (১১) ঐ লেখক, Methode de langue kabyle 2e annee, আলজিয়ার্স ১৯১৩ খৃ.,; (১২) ঐ লেখক, Recueil de compositions, আলজিয়ার্স ১৯১৩ খৃ.,; (১৩) A. Basset এবং A. Picard, Elements de grammaire berbere আলজিয়ার্স ১৯৪৮ খৃ.; (১৪) ঐ লেখক, Sur berbere yir 'mauvais' chez les Irjen, in Rafr., ৯৩ খ. (১৯৪৯ খৃ.), ২৯১-৩১৩; (১৫) A. Picard, Textes berberes dans le parler des Irjen,আলজিয়ার্স ১৯৫৮ খৃ.; (১৬) ঐ লেখক, De quelqucs faits de stylistique dans le parler berbere des Irjen, আলজিয়ার্স ১৯৬০ খৃ.।

G. Yver (E. I.²)/ছালেমা খাতুন

**ইরাদ** (তুর্কী, Irade = ارادہ) ঃ শাব্দিক অর্থ ইচ্ছা বা আদেশ। শব্দটি ১৮৩২ সাল হইতে 'উছমানী সরকারের দফতরে সুলতানের নামে জারীকৃত ফরমান ও নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হইত। আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি ছিল এই যে, মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারিগণ আদেশনামার খসড়া রচনা করিয়া মুখ্য সচিবের (সেরকাতিব-ই শাহরিয়ারী) নিকট পাঠাইতেন যিনি সুলতানকে উহা পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং তাঁহার মতামত লিপিবদ্ধ করিতেন। তিনি অনুমোদন করিলে মুখ্য সচিব প্রধান মন্ত্রীর নিকট সুলতানের আদেশনামারূপে উহা প্রেরণ করিতেন। সংবিধান অনুযায়ী সরকারী সিদ্ধান্তে সুলতানের দায়িত্ব সীমিত ছিল অনুমোদন দানে। ইরাদ শব্দটি সুলতানের ঐ সম্মতি জ্ঞাপনের জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/শামসুর রহমান

**ইরান** (ایران। ঈরান) ঃ

(১) নাম ঃ ইরানের সাবেক একটি নাম ছিল 'পারসিস' (Persis) অথবা 'পারসিয়া' (Persia)। প্রখ্যাত রোমান সাহিত্যিক প্লাউটাস (Ploutus)-ও এক স্থলে 'পারসিয়া' লিখিয়াছেন। পারসিয়া শব্দটি যূনানী রোমান উপাধি পারসী (Parsae) হইতে উদ্ভূত, যাহা এ্কিমোনিয়ানদের জন্য ব্যবহৃত হইত। ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল পারসেস নামক একটি রাষ্ট্র, একটি গোত্রের নামানুসারেই উহার উক্ত নামকরণ করা হয়। পারসেস সম্ভবত সেই 'পারসুয়া' (Persua)-রই রূপান্তর যাহাদের সম্পর্কে আশূরী (এসিরিয়ান) শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, অতীতে উহারা মাদ [(Media) (=আল-জিবাল) যাহার সম্পর্কে আলোচনা সর্বপ্রথম ৮৪৪ খৃ. পূ. সালে পাওয়া যায়)]-এর একটি অংশে বসবাস করিত। বৃটানিকা বিশ্বকোষের (Encyclopaedia Britannica, ১৭ খ., Persia প্রবন্ধে) প্রবন্ধকার ইহার ব্যাখ্যা এইভাবে দিয়াছেন যে, 'প্রকৃত অর্থে পারসিয়া (Persia)-এর দ্বারা বুঝান হয় সেই সমস্ত এলাকাকে যেখানকার বাসিন্দাগণকে 'পারসিয়ান' (Persians) বলা হইত, অর্থাৎ প্রাচীন যুগের 'পারসেস' আর বর্তমান যুগের 'ফারিস' একই। মুসলমানদের যুগে 'ফারিস' শব্দের ব্যবহার 'পারসেস'-এর সেই সমস্ত অংশের ক্ষেত্রেই হইত। কিন্তু ফারসী শব্দটি প্রাচীনকাল হইতেই ইরানী প্রদেশগুলিতে প্রচলিত ভাষাসমূহের একটি ভাষার জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে (তু. আল-ফিহ্‌রিস্ত, Flugel সং. পৃ. ১৩)। এই ভাষা, যাহাকে আমরা 'পারসিয়ান' (অথবা ফারসী) বলিয়া থাকি, খৃস্টীয় ৯ম শতক হইতে উহা গ্রন্থের ভাষা বা লেখ্য ভাষায় পরিণত হয়। এমনিভাবে আল-ফুরস শব্দটি, যাহা প্রাচীন 'আরবী সাহিত্যে পাওয়া যায়, ইরানের সকল অঞ্চলের জন্যই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ব্যাপকভাবে ইহার ব্যবহার ইসলাম-পূর্ব যুগের ইরানীদের ক্ষেত্রে, উপরন্তু সেই সমস্ত লোকের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হইত যাহারা তাহাদের প্রাচীন মতবাদ ও ধর্মীয় চিন্তাধারায় অটল ছিল। এই হিসাবে শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'আরবী পরিভাষা 'আল-'আজাম'-এর প্রতিশব্দ। আসাদী لغت فرس (ফুরস ভাষা) দ্বারা বাল্‌খ, মা ওয়ারাউন-নাহ্‌র ও খুরাসানবাসী প্রভৃতির ভাষা বুঝাইয়াছেন।

ইরান শব্দটি 'আরিয়ানাঃ' (Aryana, পরবর্তীকালে আভেস্তায় ঈরিয়ানা') হইতে উদ্ভূত, যাহার অর্থ আরিয়াদের আবাস ভূমি, ইরান ছিল সাসানীদিগের রাজত্বের রাজধানী তথা কেন্দ্রীয় অংশের নাম যাহারা নিজদিগকে 'শাহানে ঈরান ওয়া আনীরান' উপাধিতে ভূষিত করিত। 'আরবের প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক গ্রন্থসমূহে ইহা ঈরান শাহ্‌র' রূপে বর্ণিত হইয়াছে, যাহার অর্থ ইরান দেশ (তু. য়াকূ'ত, সম্পা. Wustenfeld, ১খ., পৃ. ৪১৭)।

কিংবদন্তীর বর্ণনা মতে হোশাঙ্গ ইব্‌ন কিউমারছ তাঁহার রাষ্ট্রের নাম রাখে ইরান। আর তদীয় পুত্র পারেস যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ইহাকে মুলক-ই পারেস বলা হইতে থাকে। এই রাষ্ট্র বেলুচিস্তান, কচ, মাকরান, গোর, বামিয়্যান, হিন্দুকুশ, সীস্তান, যাবিলিস্তান, খুরাসান, মা ওয়ারাউন-নাহ্‌র, রাশত, ইসফাহান, মাযিন্দরান, আস্তার আবাদ, গুরগান, ফারিস, লারিস্তান, খুযিস্তান, আফগানিস্তান, কাবিলিস্তান, পাঞ্জাব, কুর্দিস্তান, শীরওয়ান, বাবিল, মাওসিল ও দিয়ার বাক্‌র-এর সমন্বয়ে গঠিত ছিল। অপর এক বর্ণনা মতে 'ফারদূন'-এর পুত্রদিগের মধ্যে ইরাজ ও তূর-এর পারস্পরিক কলহে ইরাজ মারা যান; কিন্তু ইরান ও তুরানের বিবাদ বরাবর চলিয়া আসিতেছিল। মহাকবি ফিরদাওসীর ভাষায় ঃ

توگهے نبیره کشی گاه پور-بهانه تراجنك ایران و تور

"তুমি কখনও পুত্রকে কখনও পৌত্রকে টানিয়া আন, ইহাতে তোমার মতলব হইতেছে কেবল ঈরান ও তুরান-এর মধ্যে যুদ্ধ চালু রাখা" (বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন ফিরদাওসী ঃ শাহনামা ফারহাঙ্গ-ই আনন্দরাজ, 'ঈরান' ঈরাজ ও 'তূর' শিরোনামে দ্র.)। ইসলামী যুগে শাহ্‌নামার মাধ্যমে যখন প্রাচীন ঘটনাবলী আবার নূতনভাবে প্রাণ ফিরিয়া পায় তখন 'ঈরান' নামটি আবারও সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠে।

হিন্দুস্তানে, বিশেষত মুগল আমলের ফারসী সাহিত্যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'ঈরান' 'কিশওয়ার 'ঈরান' (ইরান দেশ)-এর নাম পাওয়া যায়, (যথাঃ ইনশা-ই আবু'ল-ফাদ'ল, দফতর-ই আওওয়াল-এ ঃ হযরত শাহিনশাহী কর্তৃক শাহ্‌ 'আব্বাসকে কিশওয়ার-ই ঈরান-এর শাহী খিতাব)। সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদিতে (ইংরেজী) Iranian ও Iranistic শব্দের ব্যবহার উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে পাওয়া যায় না (Spiegel, Eranische Altertumskunde, ১৮৭১ খৃ.,; Darme-steter, Etudes Iraniennes, ১৮৮৩ খৃ.)। ব্যস্থত উনবিংশ শতাব্দীতেই ইরানবাসিগণ নিজদিগকে ইরানী বলিয়া আখ্যায়িত করিবার জন্য জোর প্রচেষ্টা শুরু করে; অতঃপর ১৮৯০ খৃ.-এর দিকে 'ঈরান' নামে তথায় একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫ খৃ. সরকারীভাবে সে দেশের নাম ইরান বলিয়া স্বীকৃত হয়। এখন ইহা ইরান নামেই পরিচিত (দ্র. Encyclopaedia Britannica., Iran নিবন্ধ)।

(২) **ভৌগোলিক পর্যালোচনা** ঃ বর্তমান ইরানের আয়তন ৬,২৮,০০০ বর্গমাইল। আর ইহা উত্তর দিকে ২৫. ৪০' অক্ষাংশ এবং পূর্বদিকে ৪৪. ৩০', ৬৩', দ্রাঘিমাংশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই দেশের বিরাট একটি অংশ মরুভূমি। সারা দেশে বসতি এমনভাবে ছড়ান যে, প্রতি বর্গমাইলের জনসংখ্যা বিশ পঁচিশ জনের বেশী নহে (বসতি সম্পর্কীয় সদ্য হিসাব ও সংখ্যা পরে দ্রষ্টব্য)। দেশটির বেশীর ভাগ অঞ্চলই শুষ্ক, উঁচু ভূমি বিদ্যমান এবং পূর্ব সীমান্ত ছাড়া বাকী সবদিকই পাহাড় পর্বতে ঘেরা। উত্তর দিকের পাহাড় আঠার হাজার সাত শত ফুট পর্যন্ত উঁচু। মধ্যাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে আছে মরুভূমি।

মধ্যযুগে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সংগে সংগে ইরানের সীমানাও বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তীত হইতে থাকে। সুতরাং ইসলামী যুগের ইরান সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময় কোন নির্ধারিত সীমানার উপর অটল থাকা মুশকিল্‌ হইয়া পড়িবে। অধিক কিছু বর্ণনা করিতে চাহিলে বলা যাইতে পারে যে, উহার বিস্তৃতি ছিল বর্তমান ইরান, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান এবং ইরানের দক্ষিণ সীমান্তের মারভ অঞ্চল পর্যন্ত। সম্ভবত ইরাক, আল-জাযীরা ও আরমেনিয়া অঞ্চল এ্কিমোনিয়া এবং তৎপরবর্তী সাসানী রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাহা পরবর্তীকালে আলাদা হইয়া গিয়াছে। সাসানীযুগে বাবিল (ব্যাবিলন)-কে 'দিল-ই ঈরান শাহ্‌র' বলা হইত (BGA, ৬খ., ৫; তু. য়াকূ'ত, ১খ, ৪১৭ যাহাতে এই পরিভাষা ইরাক-এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে)।

ইরানে একদিকে প্রশস্ত উঁচু ভূমি, যাহার কিছু অংশ পাহাড়ী অঞ্চল, আর অন্যদিকে কাস্পিয়ান সাগর এবং পারস্য উপসাগরীয় উপকূলবর্তী এলাকা। এই উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহ ব্যতীত ইরানের অবশিষ্ট অংশের নদী-নালার

পানি সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছে না; একমাত্র হিলমান্দ- যাহা ক্ষুদ্র উপনদীগুলির ন্যায় সীমান্তের নিম্ন জলাশয়ে আসিয়া পতিত হইয়াছে অথবা হারীরূদ যাহা উত্তরাঞ্চলের মরুভূমিতে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে - এই দুইটি নদী ব্যতীত নদীরূপে আখ্যায়িত করিবার মত কোন নদীর তথায় অস্তিত্ব নাই। উপত্যকাসমূহ এবং পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ভূখণ্ডে ছোট ছোট নদীর পানির সাহায্যে অতি সামান্যই চাষাবাদ করা যায়। উঁচু অঞ্চলের আবাদযোগ্য জমিরও এই একই অবস্থা। যেই সকল স্থানে সেচ ব্যবস্থা (যাহা সাধারণত ভূগর্ভস্থ খননকৃত পাকা নর্দমার মাধ্যমেই হইয়া থাকে) বেশী সম্প্রসারণ করা সম্ভব হইয়াছে- সেখানে সবুজ শ্যামল ভূখণ্ডও অধিকতর বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হইয়াছে। যেই সকল অঞ্চলের ভূমি সাধারণত লবণাক্ত, সেই সকল অঞ্চলের শহর ও গ্রামগুলির মধ্যবর্তী এলাকাগুলি বিজন প্রান্তর ও মরুভূমিমাত্র, এই রূপ পানি ও বৃক্ষ-লতাশূন্য পাহাড়ী অঞ্চল কেবলমাত্র যাযাবরদিগের বসবাসের উপযুক্ত। এতদঞ্চলের তাপমাত্রার অত্যধিক হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে বৎসরের কয়েকমাস মাত্র মানুষ এখানে বসবাস করিতে পারে।

ইরানের উঁচু অঞ্চলে স্থায়ী বসবাসকারীদের পাশাপাশি যাযাবর এবং আধা যাযাবরদের সন্ধানও পাওয়া যায়। যাযাবরদের উপর্যুপরি আক্রমণে এই ধরনের বসতি এলাকার জনসংখ্যার হার পরিবর্তিত হইতে থাকে। ইরানের বহু এলাকা একটি অন্যটি হইতে সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এইজন্যই ইতিহাসের দীর্ঘ পরিসরে বেশীর ভাগ সময়েই সেখানে একক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। উহার প্রতিটি অঞ্চলেই বিভিন্ন সময়ে স্বতন্ত্রভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। সেইহেতু মুসলিম ভূগোলবিদগণের বর্ণনায়, ইরানের প্রতিটি অঞ্চলের স্বতন্ত্র চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের বিবরণে ভৌগোলিক বিভক্তি স্থান পাইলেও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রীয় সীমানা পরিবর্তনের বিবরণই অধিকাংশ স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সমস্ত অঞ্চলকে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল এই দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, মধ্য ইরানের দাশ্‌ত-ই কাবীর এই দুইটিকে পৃথক করিয়াছে। এই মরুভূমি কাস্পিয়ান সাগর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকের মাক্‌রান অঞ্চলে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আরব ভূগোলবিদগণ কোন কোন অংশ বিশেষভাবে সামনে রাখিয়া উহাকে মাফাযাতু খুরাসান (খুরাসান মরুভূমি), অথবা মাফাযাতু সীস্তান (সীস্তান মরুভূমি) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই কারণে (বিভিন্ন বর্ণনায়) সেই মরুভূমির আয়তন এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। সামগ্রিকভাবে ইহার উচ্চতা ইরানের পূর্ব ও পশ্চিমাংশের উঁচু অঞ্চলের তুলনায় ঢালু। উত্তরাংশে এক বিশাল লবণাক্ত ভূমি, তথায় বৃক্ষলতাদি জন্মিতে পারে না। দক্ষিণ দিকে ফার্‌স-এর পূর্বে বর্তমান মানচিত্রে কথিত দাশ্‌ত-ই লূত-এর অংশ শুরু হইয়াছে (=লূত; তু. জুগ্‌রাফিয়া-ই মুফাস্‌সাল-ই ঈরান)। এই স্থানে এবং ইহা হইতে আরও সন্মুখে দক্ষিণ পূর্বদিকে, প্রচুর পরিমাণে খেজুর বাগান রহিয়াছে। ইহা কাফেলা যাত্রীদের সেই সকল রাস্তার বড় বড় মান্‌যিলস্বরূপ, যাহার বদৌলতে প্রাচীন যুগ হইতেই খুরাসান ও সীস্তানের সহিত ফারস ও কির্‌মানের সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, দক্ষিণে তূরান ও মাক্‌রান এলাকা হইতে যাহা দাশ্‌ত-ই ঈরান হিলমান্দ উপত্যকার দক্ষিণাংশে গিয়া মিশিয়াছে। এখানে সাধারণত বিজন প্রান্তর অথবা মরুভূমি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মরুভূমির এই বিস্তৃতি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে না পারিলেও অধিকাংশ সময়ে রাষ্ট্রীয় সীমানা সেই অনুযায়ী নির্ধারিত হইয়াছে। শুধুমাত্র উত্তরদিকে কূমিস এলাকা ও রায় (পরে তেহ্‌রান)-এর পূর্বাঞ্চল এবং কাস্পিয়ান উপসাগরের উপকূলবর্তী এলাকা চাষাবাদযোগ্য, যাহা মাদ (মিডিয়া) হইতে খুরাসান পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যবর্তী অংশকে (প্রাচীন যুগের মাদ-মিডিয়া), ইসলামী যুগে আল-জিবাল এবং পরবর্তীকালে উহাকে ইরাক-ই 'আজাম বলা হইতে থাকে। এই উঁচু ভূমি পর্বতরাজিতে পরিপূর্ণ যাহার বেশীর ভাগই উত্তর পশ্চিম দিক হইতে দক্ষিণ পূর্ব দিকে চলিয়া গিয়াছে। আর উহার সীমারেখা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যাগ্‌রূস (Zagros) পার্বত্যাঞ্চলের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এখানকার প্রসিদ্ধ শহর হইতেছে হামাদান ও ইসফাহান। ইসফাহানের উত্তর-পশ্চিম দিকে আল-জিবাল-এরই কাছাকাছি আযারবায়জান; কিন্তু আরদলান-এর মরুভূমি উভয় অঞ্চলকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আযারবায়জান আরও বেশী পার্বত্যাঞ্চল, কারণ এই অঞ্চল আরও সন্মুখ ভাগে অগ্রসর হইয়া আরমেনিয়া ও (ককেসাস কাফকায) পর্বতমালার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলে নদী-নালা খুব বেশী। আরাস (Araxes) দরিয়াকে ইহার উত্তর সীমান্ত বলিয়া চিহ্নিত করা যাইতে পারে। আরমিয়ার লবণাক্ত পানির হ্রদ হইতেছে ইহার ভৌগোলিক সীমারেখার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, ইসলামের প্রথম যুগে আরদাবীল ছিল এখানকার একটি বিশেষ স্থান; কিন্তু বর্তমান যুগের বিশেষ স্থান হইতেছে 'তাবরীয'। আযারবায়জানের পূর্ব সীমান্ত হইতে আরও সন্মুখে কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলবর্তী এলাকা। ইসলামী ভূগোলে ইহাকে 'আল-জীল', আদ্-দায়লাম এবং পূর্বাঞ্চলকে তাবারিস্তান বলা হয়। বর্তমানে ইহাকে গীলান এবং মাযিন্দারান বলা হয়। এই অঞ্চল একটি সংকীর্ণ উপকূলবর্তী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত, যাহা পূর্ব দিকে কিছুটা প্রশস্ত। উহার আর্দ্র আবহাওয়া এবং প্রচুর উদ্ভিদের কারণে উহা ইরানের অন্যান্য অঞ্চল হইতে আলাদা বৈশিষ্টের অধিকারী। দক্ষিণদিকে এই অঞ্চল আলবুরূয'-এর উচ্চ পর্বতমালা পর্যন্ত সুউচ্চ স্তম্ভ আকারে অগ্রসর হইয়াছে যাহা মধ্য উঁচু অঞ্চলের সীমারেখা সৃষ্টি করে, দক্ষিণের পাহাড়ী নিম্নাঞ্চলে বিস্তৃত বসতি ও শস্যক্ষেত্রের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল 'রায়'। উহার মধ্য দিয়াই চলিয়া গিয়াছে খুরাসানের রাজপথ। 'রায়' ব্যতীত এই রাজপথে সামনান, দামগান ও বিস্‌তাম শহরগুলিও অবস্থিত ছিল। কাস্পিয়ান উপসাগরের দক্ষিণ পূর্ব কোণ হইতে এই রাস্তা জুরজানের পার্বত্যাঞ্চলের দক্ষিণ দিক অতিক্রম করিত। যেহেতু উহার জুরজান ও আতরাক নদী দুইটি কাস্পিয়ান উপ-সাগরের দিকে প্রবাহিত, সেইজন্যই ভৌগোলিক দৃষ্টিতে জুরজান খুরাসানের অন্তর্ভুক্ত নহে।

'আল-জিবাল'-এর দক্ষিণে লুরিস্তানের পাহাড় খুযিস্তানের ঢালু ও নিম্নাঞ্চলের সোপানস্বরূপ। খুযিস্তানের প্রাক্তন নাম ঈলাম (Elam) অথবা 'ঈলাম এবং বর্তমান নাম হইতেছে 'আরাবিস্তান (Le Stranges, পৃ. ২৩২)। এই এলাকা ইরাকের সহিত বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ; কিন্তু উভয়ের মাঝখানেই মরুভূমি অন্তরায় হইয়া আছে। আহ্‌ওয়ায দরিয়াকে বর্তমানে কারূন নদী বলা হয়। মধ্যযুগে ইহা উপনদী কের্‌খা হইতে পানি সংগ্রহ করিয়া সরাসরি পারস্য উপসাগরে গিয়া পতিত হইত। পরবর্তী যুগে উহা শাত্তুল-'আরাবে পতিত হইতে থাকে। খুযিস্তান হইতে পূর্বে এবং আল-জিবাল হইতে দক্ষিণপূর্বে পার্বত্যাঞ্চল শুরু হইয়াছে। সেখানে পাহাড়ী
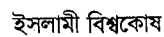
হ্রদ এবং উর্বর উপত্যকা রহিয়াছে। কিরমানের পার্বত্যাঞ্চল পর্যন্ত এই একই ধারা অব্যাহত রহিয়াছে। এই উভয় অঞ্চলই একই ধরনের; কিন্তু কিরমানে বালুকাময় স্থান বেশী। মধ্যযুগে এবং বর্তমান যুগে পারস্যের সর্বাধিক বড় শহর হইতেছে 'শীরায'। গুরুত্বের দিক দিয়া উহা পুরাতন শহর 'জুর' ও 'ইস্তাখর'-এর স্থান দখল করিয়াছে; কিন্তু কিরমানের পুরাতন শহর সীরজান ও জীরুফ্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং বর্তমানের কিরমান তুলনামূলকভাবে নূতন শহর। পারস্য এবং কিরমানের উপকূলীয় অঞ্চল হইতেছে অনুর্বর। এখানকার 'তাওওয়াজ', সীরাফ ও 'হুরমুয' অত্যন্ত প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। বর্তমানে বূশীর (Bushire) এবং বন্দর 'আব্বাস উহার স্থান দখল করিয়াছে। ভূগোলবিদগণ পারস্য ও কিরমানের আলাদা আলাদা একটি দক্ষিণাঞ্চলীয় উষ্ণ এলাকা এবং একটি উত্তরাঞ্চলীয় শীতল এলাকা বর্ণনা করেন। প্রকাশ থাকে যে, কিরমানের উত্তর ও পূর্বাংশে উষ্ণ অঞ্চল রহিয়াছে। সেখানে ভূমি ধ্বসিয়া মরুভূমির সমান হইয়া গিয়াছে। য়াযদ এবং উহার পার্শ্ববর্তী এলাকার খেজুর বাগিচাগুলি সাধারণত পারস্যেরই একটি অংশ বলিয়া গণ্য করা হয়। কিরমান হইতে পূর্বদিকের এলাকাসমূহে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের পাহাড়ী অঞ্চল রহিয়াছে। এই অঞ্চলে চাষাবাদযোগ্য ভূমি অত্যন্ত অল্প। ইহাতে সিন্ধু উপত্যকায় যাওয়ার একটি রাস্তা আছে এই রাস্তাটি ছাড়া ইহার আর অধিক কোন গুরুত্ব নাই। বর্তমান বেলুচিস্তান এই ধরনেরই একটি অঞ্চল। মাকরান-এর উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং মাকরান-এর সংলগ্ন তুরানের এলাকাসমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

ইরানের উত্তরপূর্বস্থিত উঁচু অঞ্চলে তিনটি বিরাট অংশ রহিয়াছে। উহার মধ্যে সীস্তান (আর্-রুখ্খাজ Arachosia-সহ) হিলমান্দ নদীর জলধারার পলি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। এই এলাকার নদীনালা সীস্তান-এর হ্রদে গিয়া পতিত হইয়াছে। কালের প্রবাহে ইহার আকৃতি অনেকখানি পাল্টাইয়া গিয়াছে। মধ্যযুগে এখানকার বড় শহর 'যারাঞ্জ' ও 'বুস্ত' ছিল জনবহুল, এই এলাকার পাহাড় উত্তর দিকে বেশী উঁচু এবং উত্তর-দক্ষিণ দিকে বেশীর ভাগ বিস্তৃত। পূর্ব সীমান্তে সিন্ধু উপত্যকার বারিধারা আসিয়া পড়ে। সীস্তান-এর উত্তরে খুরাসানের বিশাল এলকা বিস্তৃত রহিয়াছে। উহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে, সেখানে পূর্ব ও পশ্চিম পর্যন্ত শুধু পার্বত্যাঞ্চল। হিন্দুকুশ পর্বত পূর্ব দিকের সীমানা নির্ধারণ করে। এই সকল পাহাড়ের মধ্যে বহু নদী রহিয়াছে— যাহার অধিকাংশই দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্যাঞ্চল হইতে উত্তরে অথবা উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয় এবং জায়হূন (আমূ দরিয়া)-এর দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্যাঞ্চল হইতে উত্তরে অথবা উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয় এবং জায়হূন (আমূ দরিয়া)-এর দক্ষিণ তীরে যে মরুভূমি রহিয়াছে উহাতে মিশিয়া গিয়াছে অথবা পশ্চিম দিকে মোড় লইয়া কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

খুরাসানের সর্ববৃহৎ নদী হইতেছে হারীরূদ। হিরাত উহার তীরে অবস্থিত। উহার পর মুরগাব নদী (সেখানে মারওয়ারূরূয, মার ওয়ারূরূদ, অথবা মাররূদ; তু. Le Strange ও মার্ভ রহিয়াছে), এবং বালখ নদীর নাম উল্লেখযোগ্য। খুরাসানের দূরবর্তী পশ্চিমাঞ্চল-তথা ইস্ফারাঈন (তু. য়াকূত) নীশাপুর এবং তূস প্রভৃতি খুরাসান এবং জুরজান-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত পশ্চিমী পাহাড়সমূহের পানি দ্বারা আর্দ্রতা ও উর্বরতা লাভ করিয়া থকে। ভৌগোলিক দিক হইতে খুরাসানকে একক একটি দেশ মনে হইলেও উহা এমন বিশাল ও বিস্তৃত এলাকা যে, উহাকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা যায়। যেমন, বাদগীস, জুযাজান, তুখারিস্তান প্রভৃতি। ইরান ও আফগানিস্তানের বর্তমান সীমানা উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত খুরাসান ও সীস্তানকে একেবারে মধ্যস্থল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। শেষে সিন্ধু নদ এবং উহার উপনদীগুলি নিজস্ব ভূখণ্ডের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। হিন্দুকুশের দক্ষিণে অবস্থিত সেই অংশকে (কাবুল যাহার অন্তর্ভুক্ত), উপরন্ত গাযনাকেও (গযনী) অধিকাংশ মুসলিম ভূগোলবিদ খুরাসানের মধ্যে গণ্য করিতেন। সিন্ধু উপত্যকার সে এলাকা আরও দক্ষিণে অবস্থিত। উহাকে সুলায়মান পার্বত্যাঞ্চল এবং ওয়াযীরিস্তান-এর মরু অঞ্চল হিলমান্দ-এর উপত্যকা হইতে পৃথক করিয়া দেয়। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে এই অংশে চাষাবাদযোগ্য ভূমি অত্যন্ত কম।

গোটা ইরানী উঁচু অঞ্চলের উপর দিয়া বহুকাল হইতে কাফেলাদের যাতায়াত পথ রহিয়াছে। এই কারণেই অধিকাংশ চাষাবাদযোগ্য ভূমির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ বিদ্যমান। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহে যাতায়াতের বড় বড় রাস্তা ছিলঃ (১) পূর্ব ককেসাস (আর্‌রান, তু. য়াকূত)-এর দিকে আরাস নদীর অতিক্রম স্থল; (২) উরমিয়া-এর পশ্চিম গিরিপথ হইতে আরমেনিয়া পর্যন্ত; (৩) শাহ্‌র যূর এবং হুলওয়ান-এর গিরিপথ আল-জাযীরা এবং ইরাক পর্যন্ত; ইহা ছাড়া (৪) বসরা হইতে আহওয়ায পর্যন্ত একটি রাজপথ চলিয়া গিয়াছিল। পারস্য উপসাগরের বন্দরসমূহ হইতেও 'আরব, ভারতবর্ষ এবং পূর্ব আফ্রিকার উপকূলবর্তী শহরগুলির সহিত যোগাযোগের সুব্যবস্থা ছিল। আমূ দরিয়ার অপর পাড়ে মা ওয়ারা'উ'ন-নাহ্‌র (Transoxiana) গমনের বড় রাজপথ তিরমিয শহরের নিকট দিয়া অতিক্রম করিত। অন্যদিকে কাবুল ও গাযনা হইতে সুলতান সড়ক উঁচু অঞ্চল ও মুসলিম ভারতের মধ্যে যোগাযোগের প্রধান সূত্র ছিল। কাস্পিয়ান উপসাগরের বন্দরসমূহের মাধ্যমে ভল্গার উৎপত্তিস্থল পর্যন্ত চলাচল করা যাইত।

**(৩) বংশানুক্রমিক পর্যালোচনা ঃ** ইরানের বর্তমান বংশ ও জাতিগত অবস্থা 'আরবদের বিজয়ের পূর্বের অবস্থা হইতে অনেক ভিন্ন ধরনের। কারণ ইসলামী যুগের তের শত বৎসর যাবত এখানে বারবার বাহিরের আক্রমণ হইতে থাকে। ইহা ছাড়া ভৌগোলিক অবস্থা অনুকূল হইবার ফলে এখানে একটি স্থায়ী জনবসতি এবং উহার পাশাপাশি যাযাবর ও আধা যাযাবরদের বসতি আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। যাযাবরদের মধ্যে কোন এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিবার প্রবণতা সর্বযুগেই সমানভাবে রহিয়াছে। কিন্তু যাযাবরদেরই নিত্য নতুন আক্রমণে, বিশেষত উত্তর-পূর্বদিক হইতে সর্বদা যে আক্রমণ পরিচালিত হইত উহার ফলে তাহাদের সে আগ্রহ ও প্রবণতা স্তিমিত হইয়া পড়ে। (১৯২৯ খৃ.) যাযাবরদের বসতি ছিল স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের আনুমানিক শতকরা ২০ ভাগ। শহরাঞ্চলের বসতির উন্নতি ইসলামী যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জনবসতি যখন স্থাপিত হইতে লাগিল (তু. আল-বালাযুরী, পৃ. ৩২৪) তখন শহরও সম্প্রসারিত হইতে লাগিল। এই সময়েই ছোট শহরের জন্য 'শহর' শব্দটি ব্যবহৃত হইতে থাকে। ইহার পূর্বে একটি বড় শহর অথবা একটি দেশের জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদিও সল্প পরিসর স্থানে তাহাদের ছাউনী নির্মাণ করিয়াছিল তথাপি পরবর্তীকালে এইগুলি এতই সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠে যে, বড় বড় প্রাচীন শহরও উহাদের তুলনায় ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়। কালের প্রভাবে যে সমস্ত শহর নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল সেইগুলিকে আবার উহার ধ্বংসাবশেষের উপর অথবা উহার আশপাশে আবাদ করা হয়। এমনিভাবে মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে কোন কোন বৃহৎ ইসলামী শহর বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উহাদের স্থলে পূর্ববর্তী যুগের অনুল্লেখ্য শহরগুলি পরে গুরুত্ব

লাভ করে। ইহার উদাহরণ হইতেছে তেহরান, তাবরীয ও মাশহাদ। বর্তমানে এইগুলি ইরানের সর্ববৃহৎ শহর বলিয়া গণ্য হয়।

ইরানের বড় বড় শহরগুলি হইতেছেঃ (১৯৮২ খৃ.) তেহরান জনসংখ্যা ৫৭,৩৪,২০০), আবাদান (২,৪৬,৬৩৬), আহওয়ায (১,৩১,০১৬), ইসফাহান (৯,২৬,০০০), মাশ্হাদ (১১,১৯,০০০), রাশ্ত (২,০০,০০০), শীরায (৪,১৪,৫০০), হামাদান (১,৫৬,০০০)। শহরের বসতি বেশীর ভাগই সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে, অতীতে যাহারা এখানে আক্রমণ পরিচালিত করিত। ইহারা বর্তমানে ইরানের অধিবাসিগণের মধ্যে সক্রিয়তা ও স্বাতন্ত্র্যে প্রবল পক্ষ। ইহারা আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণে নূতন এক ফারসী ভাষায় কথা বলে, যাহা লেখা ফারসী ভাষার সহিত চালু আছে। কেবলমাত্র আযারবায়জান-এ শহরতলী ও গ্রাম্য লোকদের ভাষা আযারী তুর্কী।

শহরের বাহিরের গ্রাম্য জনপদগুলিই বেশীর ভাগ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে। তাহাদের ভাষায় অন্য বহু ইরানী সম্প্রদায়ের প্রাচীন শব্দও প্রচলিত রহিয়াছে। প্রাচীন মুসলিম ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক উৎসসমূহেও এই বিষয়ে উল্লেখ রহিয়াছে। উত্তর ও পূর্ব ইরানে এই গ্রামবাসীদের বিভিন্ন ভাষাগত সম্প্রদায়কে 'তাত' (দ্র.) বলা হয়। উত্তর এবং পূর্ব ইরানে উহাদিগকে সাধারণত 'তাজীক' বলা হয়।

এতদ্ব্যতীত গ্রামের বাসিন্দা এবং স্বল্প সংখ্যক শহরতলীর বাসিন্দাদের মধ্যে বহু লোক এখনও পর্যন্ত গোত্রীয় সম্প্রদায়ের সহিত আপন সম্পর্কের অনুভূতি রাখে। এই অবস্থা বেশীর ভাগ সেই সকল এলাকায় বিদ্যমান যেখানে প্রতিবেশীদের জনপদে এখন পর্যন্ত গোত্রীয় শৃঙ্খলা বজায় রহিয়াছে। এই সমস্ত গোত্রীয় লোক যাহারা লোকালয়ে বসতি স্থাপন করিয়াছে, উহাদিগকে অধিকাংশই শহরের বাসিন্দা, গ্রামের বাসিন্দা ও মরুভূমির বাসিন্দা বলা হয়।

ইরানে যে গোত্রকে 'ঈলিয়াত' বলা হয়, উহারা বর্তমানে বেশীর ভাগই কোন না কোন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। বাকী যে সকল গোত্র রহিয়াছে উহারা আধা যাযাবর। গ্রীষ্মের মৌসুমে ইহারা আপন গবাদি পশুর পাল লইয়া উঁচু পাহাড়ী এলাকায় চলিয়া যায়, তবুও যাযাবরী এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তাই সময়ে সময়ে ইরানের তৃণভূমির সর্বত্রই যাযাবরদের কাল তাঁবু দৃষ্টিগোচর হয়।

গোত্রসমূহের মূল বংশীয় পরিচয়ের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই উহা 'ইরানী-পূর্ব' (Pre-Iranians), ইরানী, 'আরবী এবং তুর্কী তাতারীর সংমিশ্রণের ফসল। উত্তর ইরানে নিঃসন্দেহে তুর্কী উপাদানের প্রাধান্য রহিয়াছে, যাহা সেখানে প্রচলিত ভাষা হইতে অনুমান করা যায়। এখানে দায়লাম ও 'জীল'-এর দুর্ধর্ষ পাহাড়ী অধিবাসিগণ বহুকাল ধরিয়া ইসলামী প্রভাব ও ভাব-ধারার বিরোধিতায় অটল ছিল। মধ্যযুগ পর্যন্ত তাহাদের নিজস্ব এক বিশেষ ভাষা তাহারা চালু রাখে। ইহারা বেশীর ভাগই তুর্কী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ। ইরানের শহুরে ভাবধারা তাহাদিগকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। আযারবায়জান হইতে পারস্য এবং কিরমান পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্যাঞ্চলে ইরানী বংশ ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া ছিটাইয়া রহিয়াছে, কিন্তু এই অনুমানও ভাষাভিত্তিক করা হইয়াছে। সেই গোত্রগুলির মধ্যে প্রচলিত অথবা পার্শ্ববর্তী লোকালয়ে তাহাদের সম্পর্কে প্রসিদ্ধ লোকগাঁথা দ্বারা কয়েকবার তাহাদের ব্যাপক হারে স্থান পরিবর্তনের ঘটনা নূতন করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা তাহাদের আংশিক তুর্কী অথবা 'আরব বংশীয় হওয়ার প্রমাণ বহণ করে। কোন কোন গোত্র তুর্কী বলিয়াও প্রসিদ্ধ, যদিও উহারা ইরানী ভাষায় কথা বলে। 'আরব বংশীয় গোত্রগুলি এখনও তাহাদের বংশ পরিচয় সম্পর্কে অবহিত, কিন্তু কয়েক শতাব্দী পূর্বেই তাহারা নিঃসন্দেহে পুরাপুরিভাবে ইরানী হইয়া গিয়াছে। শুধুমাত্র কয়েকটি গোত্র কোহিস্তান এবং খুরাসানে 'আরবী ভাষা সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল। নিকট ঐতিহাসিক সময়ে (অতীতে) ইরানী গোত্রসমূহের গুরুত্বপূর্ণ হিজরত সম্পন্ন হয়। বেলুচীদের দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে কিরমানের দিকে এবং পরে বর্তমানে বেলুচিস্তানের দিকে স্থানান্তর করিবার প্রবণতা মধ্যযুগের প্রথমদিকে শুরু হইয়া গিয়াছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহরে অধিক সুবিধার্থে ১৮শ ও ১৯শ শতকের কোন কোন বাদশাহ কিছু কিছু কুর্দী গোত্রকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে স্থানান্তর করিয়া দেন। ইহার প্রসিদ্ধ উদাহরণ হইতেছে, নাদির শাহ্ কুর্দী গোত্রকে খুরাসানের সীমান্ত কূচান (খুশান, তু. Le Strange, কূজান, তু. য়াকূ‘ত)-এর আশেপাশে এবং মাযিন্দারান-এ পুনর্বাসিত করেন। সেখানে এখন পর্যন্ত তাহাদের বিশেষ গঠন ও আকৃতি এবং তাহাদের ভাষা প্রচলিত রহিয়াছে। মোটকথা, ইরানে গোত্রীয় অবস্থার যে বর্ণনা হইতে পারে উহা কেবল তাহাদের ভৌগোলিক বিভক্তিকরণের ভিত্তিতেই।

মধ্যযুগের 'আরব ভূগোলবিদগণ আল-জিবাল ও পারস্যের সকল গোত্রকে 'আকরাদ' (কুর্দ-এর ব. ব.) অর্থাৎ কুর্দীদের অধীনে উল্লেখ করেন। কিন্তু বংশ বিজ্ঞানে (বর্তমানে) এই পরিভাষার কোনই মূল্য নাই। আজকাল কুর্দীদের নাম সাধারণত সেই সকল গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ- যাহারা কিরমান শাহ্-এর আশেপাশে এবং আরও উত্তরে পশ্চিম আযারবায়জানে বসবাস করে। কিরমান শাহ্-এর দক্ষিণ হইতে 'লুর' গোত্র শুরু হইয়াছে। এখান হইতে পশ্চিমদিকে পাহাড়ে 'ইরাক'-ই 'আজাম এবং 'আরাবিস্তান-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাখ্তিয়ারীগণের অবস্থান। উত্তর দিকের পাহাড়ে বসবাস করে পারস্যের কূহ গিলূ' এবং মামাসেনী গোত্র। ইহার দক্ষিণে শীরায-এর আশপাশে থাকে 'কাশকায়' সম্প্রদায়, যাহারা এখনও এক ধরনের তুর্কী ভাষায় কথা বলে। 'আরাবিস্তান- যেখানে মধ্য যুগ পর্যন্তও স্থানীয় খুযী ভাষা বিলুপ্ত হয় নাই সেখানে শহরের অধিবাসিগণের মধ্যে 'আরব্য গোত্রের প্রাধান্য রহিয়াছে। এখানকার 'আরব্য গোত্রগুলি বানূ কা'ব হইতে উদ্ভূত এবং বেশীর ভাগই সেই সকল 'আরবের অন্তর্ভুক্ত যাহাদিগকে ১ম 'আব্বাসের যুগে নাজ্দ হইতে আনিয়া এখান পুনর্বাসিত করা হইয়াছিল। ইরানী বেলুচিস্তান, সীস্তান এবং পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী এলাকার গোত্রসমূহ বেলুচী। তাহারা এইখানে বসতি স্থাপনের পর স্থানীয় ছোট ছোট গোত্রকেও নিজেদের সহিত মিলাইয়া লইয়াছে। যথা ঃ কুফ্স, মধ্য যুগীয় উৎসসমূহ হইতেও ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে কোহিস্তান, বিশেষত কাইন-এর আশেপাশে 'আরবগণের নিবাস। এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে বেশ কিছু অংশ নিজদিগকে নবী কারীম (সা)-এর বংশধর বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। এই সায়্যিদগণের মধ্যে বেশীর ভাগের বসতি ঃ মাযিন্দারানে-প্রাচীন যুগে যেখানকার শাসকগণ ছিলেন 'আলী (রা)-র বংশধর। ইরানী খুরাসানেও 'আরবগণ ব্যতীত স্বল্প সংখ্যক আফগানী এবং সীমান্ত এলাকায় কুর্দীরা রহিয়াছে। খুরাসানের উত্তর সীমান্তে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সেই সকল তুর্কীয় নিবাস যাহাদের কিছু সংখ্যক মধ্যযুগের শেষ ভাগে এইখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। যেমন, আফশার এবং কাচার (আস্তারাবাদের পার্শ্বে), তবে ইহাদের মধ্যে নূতনতর বসতি হইতেছে তুর্কমানদের।

ইরানী লোকালয়ে অন্যান্য বংশের যে সমস্ত লোক রহিয়াছে উহাদের মধ্যে এক শ্রেণী হইতেছে 'আরমান', যাহারা ইরানের আরমেনিয়া, আযারবায়জান এবং জুলফা-এর বৃহৎ আরমানী লোকালয়ে বসবাসরত। জুলফা ইসফাহানের উপকণ্ঠে অবস্থিত। ১ম শাহ্ আব্বাস আরমানিদিগকে এখানে পুনর্বাসিত করিয়াছিলেন। নিস্তূরী খৃষ্টানগণ 'উরমিয়া' হ্রদের পূর্ব দিকে বসবাস করিত। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাহারা প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 'আরাবিস্তানে এখনও অবশিষ্ট কিছু কিছু মানদী (Mandaeans) রহিয়াছে। অবশেষে চল্লিশ হাজারের মত য়াহূদীর উল্লেখ করাও জরুরী, যাহাদের অধিকাংশ ইসলামী যুগের পূর্ব হইতেই বসবাসরত য়াহূদীগণের বংশধর, ইসফাহানের 'আল-য়াহূদিয়্যা' নামে ইহাদের প্রসিদ্ধ লোকালয় ছিল। (১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারী অনুযায়ী ইরানে পঞ্চাশ হাজার আরমান, বিশ হাজার নিস্তূরী এবং ছিয়াত্তর হাজার প্রোটেস্ট্যান্ট এর বাস ছিল)।

ইরানের বাসিন্দাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাগই ইমামিয়া শী'আ মাযহাবের সহিত সম্পৃক্ত এবং জা'ফারী ফিক্হ-এর অনুসারী। ইহাদের মধ্যে শহরের শিক্ষিত নাগরিকের সংখ্যা অধিক। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন মূল তূর্কী গোত্রের বেশীর ভাগ লোকই ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের সংখ্যা প্রায় সত্তর লক্ষের কিছু কম (এই সংখ্যা এবং পরবর্তী সংখ্যা ১৯২৯ খৃ. হিসাব অনুযায়ী), উহার মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ 'আখবারী হামাদান, আহ্ওয়ায এবং উহার উপকণ্ঠে বসবাস করে। তাহারা কেবল রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ এবং ইমামদিগের বাণীকে গ্রহণযোগ্য দলীল হিসাবে মান্য করে। অন্যান্য শী'আ ফিরকা হইতেছে শায়খিয়্যা (প্রায় আড়াই লক্ষ) এবং নুকত'াবিয়্যা (তু. নাজমুল-গ'ানী, তা'রীখ মাযাহিব-ই 'আলাম নাকিতিয়্যা; প্রায় এক লক্ষ, গীলানে; বংশের দিক হইতে যায়দী)। কোন কোন শহরে বাবী এবং তদপেক্ষা কিছু বেশী বাহা'ঈও বসবাসরত আছে। চরমপন্থী শী'আ যাহাদিগকে 'আলী আল্লাহী অথবা আহ্ল-ই হাক্ক (দ্র.) বলা হইয়া থাকে- কুর্দী ও লুরীদের মধ্যে এবং আর কিছু মাযিনদারান ও খুরাসানে বসবাসরত। তাহাদের সংখ্যা তিন লক্ষ। ইহার অর্ধ সংখ্যা হারূফী ফিরকার অনুসারী বলিয়া বর্ণনা করা হয়। মাকূ-এর নিকটে কিছু য়াযীদীও রহিয়াছে (শী'আ মতাবলম্বীদের সর্বাপেক্ষা বড় ধর্মীয় নেতাকে আয়াতুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শেষ আয়াতুল্লাহ ছিলেন বুরূজিরদী (১৯৬১ খৃ. তিনি ইনতিকাল করেন)। সুন্নী (শাফি'ঈ) মুসলমান কেবল কুর্দ ও 'আরবে এবং (হানাফী) তুর্কমান ও আফগান-এ রহিয়াছে (প্রায় পঁচাশি হাজার)। অবশেষে অগ্নিপূজকদের পরিসংখ্যান। এই ধর্মের মোট জনসংখ্যা (আনুমানিক দশ হাজার) এখনও পর্যন্ত য়ায্দ, কিরমান, তেহরান, শীরায ও কাশান-এ রহিয়াছে (এই সকল সংখ্যা Annuaire dumonde Musulman, ৩য় সং, ১৯২৯ খৃ., হইতে গৃহীত)।

১৯৬০ খৃ. ইরানের মোট জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৮ লক্ষ ৪৯ হাজার। ইহার মধ্যে সাড়ে আট লক্ষ ছিল সুন্নী। জাতিসংঘের পক্ষ হইতে ১৯৬৩ খৃ. যে জরীপ চালানো হয় তদনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ২ কোটি ২৫ লক্ষ ১ হাজার (মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৯৮.৮ ভাগ)। বর্তমান (১৯৮৭ খৃ.) জনসংখ্যা ৫,৭০,০০,০০০।

J. H. Kramers ও সম্পাদনা পরিষদ
(দা. মা. ই.)/ড. আবদুল জলীল

(৪) **ঐতিহাসিক পর্যালোচনা** ঃ (ক) প্রাচীন ইরান ঃ ঐতিহাসিকগণ এই ব্যাপারে একমত যে, খৃষ্টপূর্ব ৯ম শতকে আরিয়াঈ বংশের একটি শাখা দক্ষিণ রাশিয়া হইতে পশ্চিম ইরানের যাগরূস পর্বতের মধ্য এলাকা মিডিয়ায় আসিয়া বসতি স্থাপন করে। আর এই ভৌগোলিক সম্পর্কের কারণে এই সমস্ত লোককে মাদ্দ বলা হয়। এই বংশেরই অন্য একটি শাখা পূর্ব ইরানে আগমন করে। ইহারা কিরমান প্রদেশ হইয়া ফারিস (পারস্য) আগমন করে। ইহাদিগকে পারসী বলা হয়।

**মাদ্দীয় যুগ** ঃ দীর্ঘকাল পর্যন্ত মাদ্দগণ স্বস্তিতে বসবাস করিতে পারে নাই। কারণ তাহাদের এলাকার সীমান্ত ছিল আশূরদের এলাকার সহিত মিলিত। আশূরীয়গণ প্রায়ই তাঁহাদের উপর হামলা করিত। তাই নিরাপত্তার জন্য সর্বদাই তাহাদিগকে কর প্রদান করিতে হইত। অবশেষে খৃষ্টপূর্ব ৭ম শতকে ডিওকিস (Deioces) আপন জাতিকে সংঘবদ্ধ করিয়া আশূরীয়গণকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করিয়া হামাদানকে রাজধানী বানাইয়া মিডিয়ায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করে। খৃষ্টপূর্ব ৬১২ শতাব্দীতে কিয়াক সারা (Cyaxaras) অথবা হাখিশ্তার (খৃষ্টপূর্ব ৬৩৩-৫৮৫) আশূরীয়দের শক্তিশালী শহর নিনেভা জয় করে এবং দিজলা নদীর আশেপাশের অঞ্চল স্বীয় রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়। খৃ. পূ. ৫৫০ সালে কোরোশ-ই আ'জ'াম মাদ্দ জাতির শেষ বাদশাহ্ আসতিয়াগাস (Astyages)-কে পরাস্ত করে। তখন হইতেই মাদ্দ রাজত্বের পতন ঘটে।

**জাতীয় শৌর্যবীর্য** ঃ প্রাচীন ইতিহাসের সংগে সংগে ইরানী কিংবদন্তীও সমানভাবে প্রচলিত রহিয়াছে যাহা সর্বদাই ইরানবাসীদের গর্বের বিষয় হইয়া রহিয়াছে (দ্র. খুদা'ঈ নামাক, য়াদগার যুরী ঈরান, শাহ্নামাহ্-ই ফিরদাওসী)। প্রথম বংশ হইতেছে পেশদাদী। উহার বাদশাহ্গণের নাম নিম্নরূপ ঃ কিউমারছ, হুশাঙ, তাহ্মূরছ, জামশীদ (যাহ্'হ'াকের হাতে যাহার রাজত্বের বিলুপ্তি ঘটে) এবং ফারীদূন (যাহ্'হ'াকের বন্দী হওয়ার ও মৃত্যুর পর তিনি রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন)। ফারীদূন তদীয় তিন পুত্র সালাম, তূর ও ইরাজের মধ্যে ইরান রাষ্ট্র বিভক্ত করিয়া দেন। ইরাজকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় প্রতারণা করিয়া হত্যা করে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহাদের বংশধরগণের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতে থাকে। পেশাদীদের পরে কিয়ানী বংশের সূচনা হয়। তাহাদের প্রসিদ্ধ বাদশাহ কায়কোবাদ, কায়কাউস (রুস্তাম-এর কারণে তাঁহার রাষ্ট্রের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল) ও কায়খুসরূ। লহ্রাসাপ, গুশতাসাপ এবং ইস্ফানদিয়ারও এই যুগেরই। এই বংশের শেষ বাদশাহ বাহমান ছিলেন দীর্ঘ হস্ত। ইতিহাসে 'আরদশীর, দারায দাস্ত (A rtaxerxes Longimanus) নামে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

**একিমোনীয় যুগ** ঃ মাদ্দীয়দের পরে দ্বিতীয় ঐতিহাসিক বংশধারা হইতেছে একিমোনিয়ীদের। ইহাদের ঐতিহ্য ও মর্যাদার প্রতি ইরানবাসীগণ আজও গর্ব বোধ করে। ইহাদের প্রথম বাদশাহ্ ছিল কোরোশ-ই আ'জ'াম (Cyrus the Great, খৃ. পূর্ব ৫৫০-৫২৯)। তিনি আস্তিয়াগাসকে পরাজিত করিয়া তাঁহার বংশের মুরব্বী হাখ্যামান্শ-এর নামানুসারে হাখামানশী (একিমোনীয়) যুগের গোড়াপত্তন করেন। তিনি রুশদের এলাকা জয় করত পুরা এশিয়া মাইনরের উপর তাঁহার নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেন। এই বংশের অন্যান্য বাদশাহ্-এর তালিকা নিম্নরূপ ঃ

**কামবুজিয়া** ঃ (Cambyses) (৫২৯-৫২১ খৃ. পূ.), ১ম দারিয়ূশ (Darius) (৫২১-৪৮৫ খৃ. পূ.), তিনি বাবিল, মিসর, পাঞ্জাব ও সিন্ধু জয়

করেন। দানিয়ুব পার হইয়া তিনি তারাকিয়া (Thrace) জয় করেন। ইহার পর মাকদুনিয়া (মেসিডোনিয়া) অধিকার করেন এবং পশ্চিমে আফ্রিকা ও পূর্বে চীন পর্যন্ত স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহার এই উপর্যুপরি ও বিশাল বিজয়ের কারণে ইতিহাসে তাঁহাকে দারিয়ূশ-ই-আ'জ'ম (মহান দারিয়ূশ) উপাধি দান করা হইয়াছে। খাশিয়ারশা জারেকস্ (Xerxes) (৪৮৫-৪৬৬ খৃ. পূ.), আরদশীর (Artaxerxes) দারায় দাস্ত (৪৬৫-৪২৫ খৃ. পূ.), ২য় দারিয়ূশ (৪২৪-৪০৪ খৃ. পূ.), ২য় আরদশীর (৪০৪-৩৮৫ খৃ. পূ..), ৩য় আরদশীর (৩৫৮-৩৩৮ খৃ. পূ.) এবং ৩য় দারিয়ূশ (৩৩৬-৩৩০. খৃ. পূ.), তাঁহাকে সিকান্দার-ই আ'জ'ম (Alexander the Great) পরাস্ত করত একিমোনিয়া রাজ্যের পতন ঘটায়। একিমোনীয়দের ভাষা ছিল প্রাচীন ফারসী। কোরোশ-ই আ'জ'ম এবং দারিয়ূশ-ই আ'জ'ম-এর শিলালিপিতে ইহার নমুনা পাওয়া যায়।

**য়ূনানী (সেলয়ূকী) রাজত্ব ঃ** সিকানদার-ই আ'জাম-এর মৃত্যুর (৩২৩ খৃ. পূ.) পর সিকান্দার-এর রাজত্ব তাঁহার সেনাপতিদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। ইরান সেলুকাস (Seloucus)-এর ভাগে আসে এবং সেখানে ১৮৫ খৃ. পূ. পর্যন্ত সেলয়ূকী রাজত্ব কায়েম থাকে।

**আশকানী যুগ ঃ** পারত অথবা পারথিয়া (খুরাসান)-এর আশকানী গোত্রের ঊর্ধ্বতন পুরুষ ১ম আরশাক (Arsaces) (২৪৯-২৪৭ খৃ. পূ.)-এর হাতে সেলয়ূকী রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়। তিনি আশ্কানী যুগের গোড়াপত্তন করেন। ২২০ খৃষ্টাব্দে আরদশীর বাবাক (Artaxerxes) শেষ আরদশীর বাদশাহ ৫ম আরদ ওয়ান (Artabanus)-কে পরাস্ত করত আপন পিতৃপুরুষ সাসান-এর নামানুসারে সাসানী যুগের সূচনা করেন।

**সাসানী যুগ ঃ** (২২৬-৬৫২ খৃ.) এই গোত্রের উল্লেখযোগ্য বাদশাহগণের নাম হইতেছে ১ম শাপুর (২৪০-২৭২ খৃ.)। তিনি ২৫৮ খৃ. এশিয়া মাইনরের উপর আক্রমণ করত ইনতাকিয়া জয় করেন এবং কায়স'ার ওয়ালীরীনকে হাজার হাজার য়ূনানীসহ গ্রেফতার করেন। শাপুর আ'জাম (৩০৯-৩৭৯ খৃ.); বাহরাম গুর (৪২০-৪৪০ খৃ.); কু'বাদ (৪৮৭-৫৩১ খৃ.), তিনি মায্দাক-এর মতবাদের প্রভাবিত হন; খাসরূ পারভেয (৫৯০-৬২৮ খৃ.), তাঁহাকে রাসূল কারীম (স) পত্র প্রেরণ করত ইসলামের দাওয়াত দেন; ৩য় য়ায্দগির্দ (৬৩৪-৬৫২ খৃ.), 'আরবগণ তাঁহাকে উপর্যুপরি কয়েকবার পরাস্ত করিয়া সাসানী যুগের বিলোপ সাধন করেন।

(মীরযা মাক'বূল বেগ বাদাখশানী)

**(খ) ইসলামী যুগ ঃ** ইসলামের আর্বিভাবের বহু পূর্বেই 'আরব ও ইরানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। দক্ষিণ ইরানে ১ম শাপুরের (২৪১-২৭২ খৃ.) যুগ হইতেই 'আরবরা আসিয়া আস্তানা গাড়ে এবং রাসূলুল্লাহ (স) (১১/৬৩৩)-এর সময় পর্যন্ত দক্ষিণ 'আরব সাসানী বাদশাহদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। হযরত 'উমার (রা)-এর খিলাফাত কালে (১৩/৬৩৪-২৩/৬৪৪) ইরানের ইতিহাসে ইসলামী যুগের সূচনা হয়। এই সময়ে 'আরবগণ ইরান জয় করিতে আরম্ভ করে। কাদিসিয়ার যুদ্ধে (১৪/৬৩৫) 'আরবগণ ইরানী সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিবার পর সাসানী রাজ্যের রাজধানী 'আল-মাদাইন জয় করিয়া লয় (১৬/৬৩৭)। হযরত 'উছমান (রা)-এর শাহাদাতের পূর্বে তাহারা মাকরান ও কাবুল ব্যতীত খুরাসানে বাল্খ-এর কাছাকাছি এবং সিজিস্তানে যারাঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। প্রথমত মদীনা মুনাওয়ারা হইতে যে সকল সৈন্য আগমন করিয়াছিল এবং দ্বিতীয়ত কূফা ও বসরা হইতে সেখানকার গভর্নরগণ যে সকল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাদের যুদ্ধাভিযানের প্রকৃতিতে যে পার্থক্য ছিল এখানে উহার প্রতি কিছুটা আলোকপাত করা সমীচীন হইবে। হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্ক'াস (রা)-এর মাদাইন অবরোধের তাৎক্ষণিক পরিণতি ইহাই দাঁড়াইয়াছিল যে, আল-জিবাল-এর বিরাট অংশ এবং দক্ষিণ ও পূর্ব আযারবায়জান প্রথম আক্রমণেই মুসলমানদের অধীনে আসিয়া যায়। ১৬/৬৩৭ সালে জালূলা-এর যুদ্ধ এবং হুল্ওয়ান বিজয়ের পর কির্মিসীন (কিরমান শাহ্) তাহাদের আয়ত্তে চলিয়া আসে। কূফা হইতে সাহায্যকারী সৈন্য আসিবার পর নিহাওয়ান্দ-এর প্রসিদ্ধ যুদ্ধের (২১/৬৪১) মাধ্যমে ইহার পূর্ণতা লাভ হয়। এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইরানের শাহ্ য়ায্দগিরদ পলায়নের রাস্তা অবলম্বন করেন। ইস্ফাহান, ইস্তাখর, কিরমান ও সিজিস্তান-এর রাস্তা ধরিয়া তিনি মার্বে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে সর্দার মাহওয়ায়হ্-এর হস্তে তিনি নিহত হন (৩১/৬৫২)। নিহাওয়ান্দ জয়ের পরপরই আরদাবীল বিজিত হয় (২১/৬৪১) এবং গীলান-এর দূর-দূরান্ত অঞ্চল পর্যন্ত আক্রমণ পরিচালিত হয়। আযারবায়জান-এর দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ বিজয়ের সূচনা হয় মাওসিল হইতে। ২০-২১/৬৪১ সালে 'উত্বা ইব্ন ফারক'াদ উহা জয় করেন। তিনি তাঁহার যুদ্ধাভিযান কালে শাহ্রযূর (শাহরযুর, দ্র. Le Strange : Eastern Caliphate, পৃ. ৯০), উরমিয়া এবং আযারবায়জান-এর বিভিন্ন অঞ্চল করায়ত্ত করেন। নিহাওয়ান্দ এতদাঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনার সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছিল। এইখান হইতেই প্রথম প্রথম কূফার গভর্নরদের দ্বারা 'রায়' এবং কূমিস প্রদেশের শহরগুলি (২১/৬৪১ সনের পর) এবং প্রায় একই সময়ে হামাযান, কাযবীন এবং যানজান বিজিত হয়। পরবর্তী বৎসরগুলিতে এই দিকে দায়লামী এবং পার্বত্যাঞ্চলের বিদ্রোহী গোত্রগুলির বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধ পরিচালনাও করিতে হয়। কূফা হইতেই সেখানকার গভর্নর মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) খুযিস্তানের উপর আক্রমণের সূচনা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (১৭/৬৩৮) বসরার প্রসিদ্ধ গভর্নর হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)-র নেতৃত্বে উক্ত অঞ্চল বিজিত হইতে থাকে এবং ইহাতে অধিক কালক্ষেপণ হয় নাই। তুসতার (শুসতার)-এ সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। ইহার পর খুযিস্তানই আবূ মূসা (রা)-র যুদ্ধকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। সেখান হইতেই তিনি আল-জিবাল-এর অন্যান্য শহর সীরওয়ান, সায়মারা, কু'ম্ম এবং কাশান জয় করেন। (২৪/৬৪৪ সালে তাঁহার প্রতিনিধি 'আবদুল্লাহ ইব্ন হুয'ায়ল-এর মাধ্যমে ইসফাহান বিজিত হয়। ইব্ন হুযায়লই আত'-তা'বাসানবাসীকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন এবং খুরাসান অভিমুখে আক্রমণ পরিচালনা করেন (তা'বাস খুরাসানের মাশহাদ হইতে ৩৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত)। এই শহরের যেহেতু দুইটি অংশ ছিল (= তাবাস গীলগী এবং তাবাস মাসীনান; তু. য়াকূত), এইজন্যই 'আরবগণ উহার জন্য দ্বিবচন (আত'-তা'বাস-এর দ্বি. ব.) ব্যবহার করিয়াছেন এবং উহাকে বাব-ই খুরাসান (খুরাসানের দ্বার) ও বলা হইয়াছে। প্রায় এই সময়েই (২৩/৬৪) পারস্যের উপর প্রথম আক্রমণ পরিচালিত হয়, কিন্তু খুযিস্তানের পরিবর্তে উহার বিপরীত দিকে অবস্থিত 'আরব অঞ্চল আল-বাহ'রায়ন হইতে এই আক্রমণ পরিচালিত হয়। উহার গভর্নর 'উছমান ইব্ন আবি'ল-'আস' (রা)-এর সহিত আবার কাওয়ান দ্বীপে (= আবার কাফান, আবার কুমান, ইব্ন কাওয়ান, তু. Le Strange, পৃ.

২৬১; কায়তানী, ৪খ, ১৪৯) ইরানী নেতার সংঘর্ষ হয়। পরে তাঁহারা 'তাওওয়াজ' শহরটি অধিকার করিয়া নেন এবং পারস্যের অন্যান্য শহরের উপর আক্রমণ শুরু করেন। তাঁহার ভ্রাতা আল-হ'াকাম ১৯/৬৪০ রাশিহর (= রীশাহর, তু. Le Strange)-এর নিকটে উপকূলবর্তী এলাকায় এক তুমুল লড়াইয়ে পারস্য সেনাপতিকে পরাস্ত করেন। আল-বালাযূ'রীর মতে এই যুদ্ধ ছিল ঐতিহাসিক ক'াদিসিয়া যুদ্ধের সমপর্যায়ের গুরুত্বসম্পন্ন যুদ্ধ। ইহার পর আবূ মূসা (রা)-কে সৈন্য-সামন্ত লইয়া 'উছমান ইব্ন আবি'ল-'আস (রা)-এর সহিত মিলিত হইবার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁহারা উভয়েই একত্র হইয়া ২৪/৬৪৪ এবং ২৭/৬৪৭ সনের মধ্যবর্তী সময়ে বহু শহর যথা ঃ আর্‌রাজান, শাপুর, শীরায, সীনীয, দারাব জিরদ এবং ফাসা জয় করেন। আবূ মূসা (রা) কিরমান-এর বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গেলেন। এখানে শীরায শহরটি মুসলমানদের সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হইল। এইখান হইতেই হযরত 'উছ'মান (রা)-এর খিলাফাতকালে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমির (রা) বসরার গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই বড় বড় যুদ্ধ পরিচালনা আরম্ভ করেন। ২৮/৬৫০ সালে তিনি ইসতাখার এবং জূর জয় করেন যাহা তখনও মুসলমানদের করায়ত্ত হইতে পারে নাই। ২৯/৬৪৯ সালে তিনি খুরাসান জয়ের জন্য অগ্রসর হন। ইহার কারণ হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তূস-এর শাসনকর্তা একখানি দাওয়াতনামা যোগে হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমির (রা)-কে এবং কূফার গভর্নর হযরত সা'ঈদ ইবনু'ল-'আস (রা)-কে আক্রমণের আহ্বান জানাইয়াছিল, কিন্তু তাবারিস্তান ও জুরজান-এর শাসকদ্বয় খারাজ দিতে স্বীকৃত হওয়ায় হযরত সা'ঈদ (রা) সেখান হইতে আর সম্মুখে অগ্রসর হন নাই। অতএব খুরাসান বিজয়ের ভার আসিয়া পড়িল 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমির (রা)-এর উপর। তিনি তাঁহার প্রতিনিধি মুজাশি' ইব্ন মাস'উদকে ইতোপূর্বেই য়াযদগিরদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মুজাশি'কে পুনরায় ২৯/৬৫০ সালে কিরমান প্রেরণ করা হয়। সেখানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ শহর-আস-সীরজান, বাম্ম ও জীরুফ্‌ত জয় করেন। হুরমুয-এর নিকটে এবং কুফ্‌স-এর পার্বত্যাঞ্চলে একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমির (রা)-এর পক্ষ হইতে আরও একটি ক্ষুদ্র সেনাদল সীস্তানে প্রেরণ করা হয়। উহার নেতা আর-রাবী' ইব্ন যিয়াদ ফাহ্‌রাজ হইতে বহু কষ্টের মধ্য দিয়া মরুভূমি অতিক্রম করত সীস্তান-এর রাজধানী যারান্‌জ জয় করিয়া লইতে সমর্থ হন এবং কয়েক বৎসর তিনি এইখানে অতিবাহিত করেন। ইহার পর তাঁহার প্রতিনিধিকে যারান্‌জ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে তিনি 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন সামুরাকে প্রেরণ করেন- যিনি দাওয়ার বুস্‌ত এবং যাবুল পর্যন্ত সমস্ত এলাকা পুনরায় জয় করিয়া নেন। এইদিকে ৬৫০ খৃ. 'আবদুল্লাহ স্বয়ং আত'-ত'াবাসানের দিকে অগ্রসর হন, যাহা পূর্বেই বিজিত হইয়াছিল। সেখান হইতে আল-আহ'নাফ ইব্ন ক'ায়সকে কূহিস্তান বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং নীশাপুর অভিমুখে অগ্রসর হন। নীশাপুর অবরোধ করা হইলে সেখানকার অধিবাসিগণ আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয়। এখান হইতেই 'আবদুল্লাহ (রা) ও তাঁহার প্রতিনিধিগণ আরও কয়েকটি শহর জয় করেন এবং তূস-এর নেতার সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করেন। মারববাসিগণ বিনাযুদ্ধেই আত্মসমর্পণ করে। আওস ইব্ন ছা'লাবা-এর নেতৃত্বে অন্য একটি সৈন্যদল হিরাত-এ প্রেরণ করা হইলে তথাকার শাসক আনুগত্য স্বীকার করিয়া লন। অবশেষে আহ'নাফ ইব্ন কায়স পূর্ব খুরাসানের উপর আক্রমণ করেন। মারুর-রূযের নিকটে প্রচণ্ড লড়াই হয়, জুরজান-এর এলাকা এবং বাল্‌খ শহর জয় করিয়া লওয়া হয়। এইখান হইতে খাওয়ারিয্‌ম পর্যন্ত তাঁহাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমির (রা) প্রত্যাবর্তন করিবার পর ক'ায়স ইব্‌নু'ল-হায়ছ'ামকে খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।

হযরত 'উছমান (রা)-এর শাহাদাতের সময় (৩৫/৬৫৬) সামরিক অবস্থা এই পর্যায়ে ছিল যে, সীস্তান ও খুরাসানের সদ্য বিজিত এলাকাসমূহে মুসলমানদের অবস্থান তখনও দৃঢ় হয় নাই, কিন্তু নিহাওয়ান্দ, আহওয়ায এবং শীরায-এ সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হইয়াছিল, ইহারই ফলে গৃহযুদ্ধ খতম হইবার পর মুসলিমগণ তাঁহাদের বিজয় অভিযানকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইরানে যাহাদের সহিত মুসলমানদের মুকাবিলা হয় তাহারা বিভিন্ন প্রকৃতি ও চরিত্রের অধিকারী ছিল। ক'াদিসিয়া ও নিহাওয়ান্দ-এর যুদ্ধে যখন রাজকীয় মূল সেনাবাহিনী নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় তখন অধিকাংশ আঞ্চলিক সর্‌দার তাহাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী দ্বারা মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে এবং নিজেদের পৃথক পৃথক চুক্তি সম্পাদন করিতে থাকে। সেই সমস্ত চুক্তির মধ্যে খারাজ আদায়ের বিনিময়ে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন সহায়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের স্বীকৃতি প্রদান করা হইত। পুরা জনপদের ইসলাম গ্রহণের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল, যেমন ক'াযবীন সম্পর্কে এই ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। অগ্নিপূজকগণ, বিশেষ করিয়া পারস্য ও আযারবায়জানে সব সময়ই আপন ধর্মের উপর অটল ছিল। কিন্তু পারস্য হইতে বহু লোক সীস্তান ও মাকরানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং প্রায় ৮১/৭০০ সনে তাহারা প্রথমে কাসিওয়াড় (হিন্দুস্তান)-এ চলিয়া আসে। দারাব জার্‌দ শহরের স্থানীয় নেতা ছিল হুরবুয। তিনি মুসলমানদের সহিত সন্ধি করেন। এই সময়ে বহু ইরানীকে বন্দী করিয়া ইরান ও 'আরবে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তাহারা ক্রীতদাসে পরিণত হয়। কোন কোন গোত্রের সকলেই মুসলিম সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছিল। যথা য়াযদগিরদ্-এর সৈন্যদলের বহু অভিজ্ঞ সৈনিক এবং দক্ষিণ ইরানের জনপদের বিভিন্ন গোত্র (যুত্ত, সায়াবিজা প্রভৃতি)। পারস্য এবং আল-জিবাল, বিশেষ করিয়া জীলান এবং দায়লাম-এর পাহাড়ী গোত্রগুলি বহুদিন পর্যন্ত অপরাজিত ছিল। স্থানীয় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দারের হাতেই ছিল তাহাদের শাসন ব্যবস্থা। কোহিস্তানে হায়াতিলা (Hephtalites)-দের অবশিষ্ট বংশধরদের সহিত আরও পূর্বদিকে মূর্তিপূজকদের (মুশরিকূন) সহিত এবং খুরাসানে উহার তুর্কী মিত্রদের সহিত মুসলিম বিজয়িগণের সাক্ষাত ঘটে। অপর দিকে বিজয়ের ফলে ইরানী শহরগুলিতে মুসলিম সেনাদল বসবাস করিতে শুরু করিলে সেখানে সর্বপ্রথম তাহারা একটি মসজিদ নির্মাণ করিত, তারপর বসবাস শুরু করিত। বানূ উমায়্যার যুগে চাষাবাদের কারণে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাহাদের মধ্যে বহু হ'াদীছ' বর্ণনাকারী এবং দীনী বিশেষজ্ঞও ছিলেন। এমনিভাবে ইরানী জনবসতি ও লোকালয়ে ধীরে ধীরে ইসলামের প্রসার ঘটে।

'আরবদের গৃহযুদ্ধে ইরানীরাও ইরাকে কম ভূমিকা পালন করে নাই। ইহার ফলে 'আরবদের অগ্রযাত্রা কিছু দিনের জন্য স্তিমিত হইয়া পড়ে; কূফা এবং বসরায় হযরত 'আলী (রা) (৩৫/৬৫৬-৪০/৬৬১)-এর গভর্নরদের বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। খুরাসান আনুগত্য করিতে অস্বীকার করে (যদিও বলা হইয়া থাকে যে, মারব নেতা হযরত 'আলী (রা)-এর সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়াছিল)। বাল্‌খের উপরও কিছু সময়ের জন্য চীনাগণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বানূ উমায়্যার যুগে তাহাদের ইরাকস্থ সুচতুর গভর্নর

যিয়াদ ও হ'াজ্জাজের সময় নব উদ্দীপনার সহিত রাজ্য শাসন শুরু হয়। মু'আবি'য়া (রা)-এর যুগে (৪১/৬৬১-৬০/৬৮০) 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমির (রা)-কে পুনরায় বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় (৪১/৬৫১), যিনি 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন সামুরা (রা)-কে পুনরায় সীস্তান প্রেরণ করেন। সেই সময়ে মুসলমানগণ কাবুলে পৌঁছিতে সমর্থ হয়। কাবুল শাহ্ এবং যাবুলিস্তান-এর বিভিন্ন প্রশাসনের সহিত যাহাদিগকে যাম্বীল' বলা হইত (Marquart : Eransahr, পৃ. ২৪৮), সকল ঝামেলা মিটাইতে 'আবদু'র-রাহ'মান ও তৎপরবর্তী গভর্নরদিগেকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। এই অসুবিধা বানূ উমায়্যার পুরা শাসনামলেই (৪১/৬৬১-১৩২/৭৫০) দেখা দিতে থাকে। যখন শৃঙ্খলা বিধানের জন্য সীস্তানকে খুরাসানের সহিত একীভূত করিয়া দেওয়া হয় এবং শেষোক্ত এলাকায় 'আরবদের নিয়ন্ত্রণ মযবুত করা হয়, কেবল তখনই এই অসুবিধা কিছুটা লাঘব হয়। ইব্ন আমিরই সর্বপ্রথম তদীয় প্রতিনিধি আল-কায়স ইব্নু'ল-হায়ছ'ামের মাধ্যমে নূতনভাবে খুরাসান জয় করিতে শুরু করেন [হিরাত বিজয় ৪১/৬৬১ এবং বুখারা ৫৪/৬৭৬ সনে]। যিয়াদ ইব্ন আবী সুফ্য়ান (৪৬/৬৬৬ হইতে) এই গতি অব্যাহত রাখেন এবং তাঁহারই সময়ে মারব 'আরব সেনাবাহিনীর একটি শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয় এবং অত্যল্পকালের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাযার 'আরব মুসলিম খুরাসানে আপন গোত্রের সহিত স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে শুরু করে। আল-হ'াজ্জাজ খুরাসানে তাঁহার সুযোগ্য সেনাপতিবৃন্দ আল-মুহাল্লাব ইব্ন আবী সু'ফরা, য়াযীদ ইব্নু'ল-মুহাল্লাব এবং শেষে কু'তায়বা ইব্ন মুসলিম-এর মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার পরবর্তী সময়েও খুরাসানের রাজপথ যাহা রায়, কূ'মিস এবং ত'াবারিস্তান-এর মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছিল, উহার সংরক্ষণ করা এবং নিরাপদ রাখাই ছিল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই উদ্দেশ্যেই এতদঞ্চলের পাহাড়ী লোকদের সহিত বহুবার যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। এই দিকে 'আরবে যে গোত্রীয় দ্বন্দ্ব শুরু হইয়াছিল উহার কারণে বহু 'আরব সৈন্যকে খুরাসানে যিয়াদের নিকট বদলী করা হইয়াছিল। এই সমস্ত নবাগত সৈনিক এখানকার ছাউনীতেও 'আরব সৈন্যদের চিন্তাধারা বদলাইয়া দেয়। এই সময়েই রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় মতপার্থক্য, যাহা গৃহযুদ্ধ ও বিভিন্ন দল ও মতে বিভক্ত হইবার কারণ হইয়া দাঁড়ায়- প্রথমত 'আরব এবং কিছুদিন পর তাহাদের ইরানী অনুসারিগণ ইহাতে যোগ দেয়। এই সকল গোত্রের মধ্যে খাওয়ারিজ ছিল শীর্ষস্থানীয়। তাহারা তাহাদের নেতা ক'াত'ারী ইব্নু'ল-ফুজা'আ (নিহত আনু. ৭৮/৬৯৭)-এর নেতৃত্বে কিরমানকে নিরাপদ ঘাঁটিস্বরূপ বানাইয়া লইয়াছিল এবং সেখান হইতেই উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনা করিত। বানূ উমায়্যার খিলাফাতের প্রায় শেষভাগে ইস্ফাহান, খুযিস্তান ও পারস্যের কিছু অংশ সাময়িকভাবে 'আবদুল্লাহ ইব্ন মু'আবি'য়া (৭৪৪-৭৪৬ খৃ.), আয়ত্তাধীনে আসিয়াছিল। হ'াজ্জাজের সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সকল রেকর্ডপত্র সাসানীদের রীতি অনুযায়ী ফারসী ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইত। হাজ্জাজের সময় রাষ্ট্রীয় ভাষা 'আরবী করিয়া দেওয়া হয় এবং ইরাকে 'আরবী লিখন পদ্ধতি চালু হয়। নিঃসন্দেহে ইরানী অঞ্চল গুলিতেও সরকারী কাজকর্ম ধীরে ধীরে 'আরবী ভাষায়ই সম্পাদিত হইয়া থাকিবে। তবুও প্রথম প্রথম শাসকগণ এবং ক'াত'ারী যে মুদ্রা প্রস্তুত করে তাহাতে 'আরবীর সংগে সংগে পাহলাবী শব্দও অংকিত ছিল। ইরানকে ইসলামী রঙ্গে রঙ্গীন করিতে 'উমার ইব্ন 'আব্দিল-'আযীয, (র) (৯৯/৭১৭/১০১/৭২০) ও হিশাম (১০৫/৭২৪-১২৫/৭৪৩) কর্তৃক প্রবর্তিত বাস্তবভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবদান উল্লেখযোগ্য। সাম্য প্রতিষ্ঠা করা এবং উদার ও সহিষ্ণু মনোভাবের ব্যাপারে হযরত 'উমার (রা)-এর ফরমান বহু ইরানীকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। ইহার পর হিশাম মুসলিম অমুসলিম সকলের উপর একই হারে শুল্ক নির্ধারণ করেন। ইহাতে জাতীয় বৈষম্যের অবসান ঘটে এবং সেখানে তখন নব্য মুসলিম ইরানী অফিসারদের নির্ভরযোগ্য একটি শ্রেণী আত্মপ্রকাশ করে। কেবল পাহাড়ী অঞ্চলের লোক তাহাদের আঞ্চলিক নেতার অধীনে বিদ্রোহ করিতে থাকে। খুরাসানের ন্যায় দূরবর্তী অঞ্চলে কিছু বিদ্রোহ দেখা দিলেও উহা পূর্ণভাবে সরকারের আয়ত্তে ছিল। মারব-এ এক বিরাট সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ ও তথায় গভর্নরদের অবস্থান সরকারের শক্তিশালী হইবার কারণে পরিণত হয়। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল যে, কু'তায়বার নেতৃত্বে মা-ওয়ারাউ'ন-নাহ্‌র-এ মুসলিম বাহিনীর বিজয় অভিযান অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে, যাহার ফলে কেহ বিদ্রোহ ঘোষণার দুঃসাহস করিতে পারে নাই।

উপরিউক্ত ঘটনাবলীর দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বানূ 'উমায়্যার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারিগণ (সিরিয়ায় বানূ 'আব্বাস যাহাদের নেতৃত্ব দান করিতেছিল) খুরাসানকে কেন তাহাদের গুপ্তচর বৃত্তি এবং সংবাদ সংগ্রহের কেন্দ্ররূপে বাছিয়া লইয়াছিল। তাহারা 'আরব গোত্রসমূহের পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ এবং সমসাময়িক সরকারের বিরুদ্ধে অস্থিরতা ও অসন্তোষকে কাজে লাগাইয়াছিল। তাহাদের এই প্রচেষ্টার শেষ ফল দাঁড়াইয়াছিল ১২৯/৭৪৭ সনে আবূ মুসলিম খুরাসানী কর্তৃক বিদ্রোহ ঘোষণা। প্রথমে তিনি মারব অধিকার করিয়া অতিশীঘ্রই নীশাপুরও দখল করিয়া নেন। অতঃপর ইরানে অবস্থানকারী 'আরব সৈন্য এবং তাঁহাদের ইরানী মিত্রদের বদৌলতে বানূ 'আব্বাস চূড়ান্ত বিজয় (১৩২/৭৫০) লাভ করে। ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, খিলাফাতে নব্য অধিষ্ঠিত বংশের শাসনামলে ইরানের অবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। উহার বড় কারণ ছিল, 'আব্বাসীগণ ইরাকে তাহাদের বাসস্থান স্থানান্তরিত করিয়া লইয়াছিল, ইরানী শেষ শাসক বংশের ঘাটি ছিল সেখানেই। বাগদাদে নবনির্মিত (১৪৫/৭৬২) রাজধানীতে যাহা 'আরবদের রাষ্ট্রীয় শক্তির এবং শীঘ্রই ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, ইরানী জীবন-যাপন পদ্ধতি এবং ইরানী সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই ইরানী সভ্যতার প্রভাবের একটি নমুনা হইতেছে ইব্নুল-মুকা'ফ্ফা' (দ্র.)-এর ন্যায় লেখকগণের পাহলাবী সাহিত্যের 'আরবী অনুবাদকর্ম। অধিকন্তু ইরানী বংশোদ্ভূত কিছু শক্তিধর গোত্র- যথা ঃ বারামাকা এবং পরবর্তীতে 'বানূ নাও বাখ্ত-এর লোকজন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে মন্ত্রী হিসাবে প্রভূত প্রভাব সৃষ্টি করে। এই সময়েই শু'উবিয়া আন্দোলনরূপে ইরানীদের বংশপ্রীতি মাথা চাড়া দিয়া উঠে এবং ইরানী যিন্দীকদের (ধর্মদ্রোহী) আত্মপ্রকাশের ফলে ধর্মীয় মহলে সন্দেহ ও সংশয়ের ঢেউ উছলিয়া উঠে। উমায়্যাগণের তুলনায় খোদ আব্বাসী খলীফাগণের মধ্যে তাহাদের ইরানী অঞ্চলসমূহের প্রতি বেশী আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল। তাহারা ইহা করিতে বাধ্য ছিল, কারণ একজন শক্তিশালী সৈন্যাধ্যক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কি করিতে পারে-ঘটনা প্রবাহের দ্বারা তাহা সকলের নিকটই স্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ আল-জিবাল, খুযিস্তান ও পারস্যে অবশ্য এই ধরনের বিদ্রোহের কোন ভয় ছিল না, কিন্তু দূরবর্তী এলাকা এবং পার্বত্যাঞ্চলে বারংবার সৈন্য প্রেরণ করিয়াই কেবল রাজত্ব রক্ষা করা সম্ভব ছিল। তাই খুরাসানের গভর্নরের পক্ষ হইতে যখন বিদ্রোহের আভাস পাওয়া গেল তখন

খলীফা আল-মানসূ'র (১৩৬/৭৫৪-১৫৮/৭৭৫) সৈন্যাধ্যক্ষ খাযিম ইব্ন খুযায়মার সহিত আপন পুত্র আল-মাহ্দীকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রেরণ করেন। ইহার পর তাঁহাকে ত'াবারিস্তানে জনৈক রাজত্বের দাবীদারকে দমন করিতে হয়। ইহার পর সিংহাসনে আরোহণের সময় পর্যন্ত আল-মাহদী রায়-এ অবস্থান করেন, হারূনু'র-রাশীদ (১৭০/৭৮৬-১৯৩/৮০৯) খুরাসান ও মা-ওয়ারাউ'ন-নাহ্রের বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে শেষ বয়সে সেনাবাহিনী লইয়া স্বয়ং আভিযান পরিচালনা করেন। পথিমধ্যে তূসে তাঁহার ইন্তিকাল হয় (১৯৩/৮০৯)। পিতার সহিত অভিযানের শরীক পুত্র আল-মা'মূন (১৯৮/৮১৩-২১'৮/৮৩৩)-কেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খলীফা হইবার পরও ২০২/৮১৭ সন পর্যন্ত কিছুকাল খুরাসানে অবস্থান করিতে হয়। এই সময়েই হযরত ইমাম 'আলী রিদ'া (র) (দ্র.)-এর ঘটনা সংঘটিত হয়। 'আব্বাসী যুগের সূচনা হইতেই ইরানীদের চালচলন ও রীতিনীতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে ইসলামের প্রভাব পড়িতে থাকে। অতঃপর আবূ মুসলিম-এর বিদ্রোহের পর উঁচু স্তরের বহু ইরানী (গ্রাম্য সর্দার) ইসলাম গ্রহণ করে। অপরদিকে খুরাসানে কয়েকজন ভণ্ড নবীরও আবির্ভাব হয়, যথা ঃ অগ্নিপূজক সিম্বায (১৩৭/৭৫৪-৫৫), উসতাদি সীস (১৪৯/৭৬৬-১৫১/ ৭৬৮), য়ূসুফ আল বারম আল-মুক'ান্না' (১৬১/৭৭৭-১৬৪/৭৮০)। বাবাক (২০১/৮১৬-২২৪/৮৩৮)-এর নেতৃত্বে আযারবায়জানে সংঘটিত খুররামিয়াদের দীর্ঘ বিদ্রোহ এই ধরনেরই ধর্মীয় আন্দোলনের সহিত সম্পৃক্ত ছিল। খলীফাগণ এই ধরনের আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করিতে সঠিক ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ ইহাতে সাধারণত রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের উচ্চকাঙ্ক্ষাই নিহিত থাকিত। দায়লামে য়াহ্'য়া ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-'আলাবী-এর বিদ্রোহ (১৭৭/৭৯৩) হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ইরানে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের শ্লোগান দিয়া বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা ঘটান সহজ। এইজন্যই তাঁহাকে দমন করিতে আল-হারূনকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

আল-মা'মূনের সময় 'আব্বাসী খিলাফাতের সহিত খুরাসান এবং প্রতিবেশী প্রদেশসমূহের রাজনৈতিক সম্পর্ক দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। ইরানী নেতৃবৃন্দ অথবা আমীরদের প্রচেষ্টা, উপর্যুপরি গণআন্দোলনসমূহ এবং খারিজী অথবা 'আলাবী প্রচার-প্রচারণা কোনটিই ইহার কারণ ছিল না, বরং ইরানী বংশোদ্ভূত মুসলমান কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের দ্বারাই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহারা প্রাচীন আমীর-উমারার গোত্রের না হইলেও তাহাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার আবেগ ছিল, তাহাদের প্রচেষ্টায় ইরানে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের পথ পরিষ্কার হয়। আল-মা'মূনের সেনাপতি ত'াহির ইব্নু'ল-হু'সায়ন (যু'ল-য়ামীনায়ন নামে পরিচিত) ২০৫/৮২০ সালে খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত হন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত অর্থাৎ ত'াহিরিয়্যাগণ (২০৫/৮২০-২৫৯/৮৭২) নামে মাত্র খলীফাদের অধীনস্থ ছিলেন বরং স্বয়ং খলীফাগণই প্রায় তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহারা খুরাসান, পূর্বে সিন্ধু নদ এবং পশ্চিমে রায় পর্যন্ত সকল রাষ্ট্রে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে পারেন। এই সকল এলাকা আর কখনও পুরাপুরিভাবে খলীফার আয়ত্তে আসে নাই। কারণ (২৫৯/৮৭২) স'াফ্ফারিয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ত'াহিরিয়্যাগণ নিজেদের শক্তি ও কর্তৃত্ব হারাইয়া বসিয়াছিল। স'াফ্ফারিয়াগণ ছিল অন্য একটি গোত্র যাহারা ২৫৪/৮৬৭ সনে য়া'কূ'ব ইব্নু'ল-লায়ছ (২৫৪/৮৬৭-২৬৫/৮৭৮)-এর তদীয় ভ্রাতা 'আম্র ইব্নু'ল-লায়ছ (২৬৫/৮৭৮-২৮৭/৯০০)-এর নেতৃত্বে সীস্তান অধিকার করিতে শুরু করে। কিছুকাল পর্যন্ত খুরাসান, কাবুল ও রুখ্খাজ-এর এলাকায় তাহাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল যেখানে 'আব্বাসী রাজত্ব কখনও ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। উপরন্তু কিরমান এবং পারস্য পর্যন্তও সাফ্ফারিয়াদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহারা বাগদাদের দিকে অগ্রসর হইলে খলীফার ভ্রাতা আল-মুওয়াফ্ফাক'-এর হস্তে পরাজিত হয় (২৬৫/৮৭৮) এবং অতি শীঘ্রই ইরান হইতে স'াফ্ফারিয়াদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। স'াফ্ফারিয়াদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রকৃতি ভালরূপে নির্ধারিত হয় নাই। কিন্তু তাহারা ইরান হইতে বিলীন হইয়া যাওয়ার পরও দীর্ঘ দিন যাবত তাহাদের কীর্তি প্রসিদ্ধ ছিল। এই সময়েই খলীফাগণকে বেশ কিছু সংখ্যক স্বাধীন সরকারের অস্তিত্ব বরদাশত করিয়া লইতে হইয়াছে। যথা ঃ আল-জিবাল-এর দক্ষিণাংশ আল-কারাজ-এ দুলাফিয়া (২১০/৮২৫-২৮৫/৮৯৮) এবং আযারবায়জানে রাওদীনী শাসকগোষ্ঠী; কিন্তু খুরাসান ও মা-ওয়ারাউ'ন-নাহ্র-এ সামানী গোত্রের শাসকদের অভ্যুদয়ের বিষয়টিই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই শাহী খান্দানের গোড়াপত্তন হয় খুরাসানে (২৬১/৮৭৪)। তাহারা ছিল প্রথমত ত'াহিরিয়্যাদের অনুগত চাকুরীজীবী এবং প্রথম হইতেই মা-ওয়ারাউন-নাহর- এ তাহারা ছিল শক্তিশালী। ত'াহিরিয়্যাদের পতনের কারণে খুরাসানে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাহাতে তাহাদের সুযোগ মিলিয়া যায়। ২৭৯/৮৯২ সালে বাগদাদ প্রশাসনের নামমাত্র অধীনে থাকিয়া তাহারা খুরাসানে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া লয়। সীস্তান, কিরমান, জুরজান, রায় এবং তাবারিস্তানের এলাকাও নাস্'র ইব্ন আহ'মাদ (৩০১/৯১৩-৩৩১/৯৪২)- এর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহার সময়ে দেশে সুখশান্তি ফিরিয়া আসে এবং আমীর-উমারার মধ্যে এমন এক শ্রেণীর জন্ম হয় যাঁহারা সাহিত্য ও বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করিতে পারিতেন। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, খুরাসানে ফারসী সাহিত্যের সংগে সংগে 'আরবী সাহিত্যও উন্নতি লাভ করিতে থাকে (আল-বালখী এবং অন্যান্য লেখক)।

'আব্বাসী যুগের সূচনা হইতেই পশ্চিম ইরানে 'আলাবী আন্দোলন শুরু হয়। তাহারা খিলাফাতের সহিত জনসাধারণের বিরোধকে একটি ধর্মীয় রূপ দিয়া দেন। দায়লাম-এ খৃস্টীয় দশম শতকের সূচনা পর্যন্ত ছোট ছোট কিছু স্থানীয় গোত্র বাস করিত। এইখান হইতেই লুট-তরাজ ও দাঙ্গাকারীদের দৌরাত্ম্য শুরু হয় যাহার প্রথম লক্ষ্যস্থল ছিল রায়। এই দস্যুদের নেতা বড় বড় সৈন্যদলের সেনাধ্যক্ষ হইয়া যাইত। তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আবার ঐ সকল রাজ্যের শাসনকর্তা হইয়া যায় যাহার সীমানা সর্বদাই পরিবর্তিত হইতে থাকে। কারণ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অথবা সামানী সুলতানদের সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ লাগিয়াই থাকিত। সেই সময়ে যে সকল গোত্র স্বীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় তন্মধ্যে যিয়ারিয়া গোত্রের রাজত্ব অধিক সময় স্থায়িত্ব লাভ করে (৩১৬/৯২৮-৪৩৭/১০৪২); যাহারা কিছুকাল পর্যন্ত রায়, ইসফাহান এবং আহওয়াযে রাজত্ব করে। কিন্তু অবশেষে তাহাদের রাজ্য সংকুচিত হইতে হইতে কেবল তাবারিস্তান ও জুরজান অঞ্চলে সীমিত হইয়া পড়ে। আল-জিবাল, পারস্য ও খুযিস্তানে অতি শীঘ্রই দায়লামের বুওয়ায়হ-এর বংশধরগণ তাহাদের স্থান দখল করে যাহারা ইতোপূর্বে তাহাদের মিত্র ছিল। পরবর্তীকালে ইহারা যিয়ারিয়াদের অপেক্ষা বেশী সফলতা লাভ করে। বুওয়ায়হ্-এর পুত্রগণ অর্থাৎ 'আলী, হ'াসান এবং আহ'মাদ নামক তিন ভ্রাতার স্বাধীনতা লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ৩২০/৯৩২ সনের কাছাকাছি শুরু হয় এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে প্রায়

সমগ্র পশ্চিম ইরান বাগদাদের সরকারকে শুল্ক এবং খারাজ (ফসলের কর) দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। এদিকে বাগদাদেও সেনানায়কগণের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। এই পরিস্থিতিতে আহ্‌মাদ ইব্‌ন বুওয়ায়হ-এর যিনি পূর্ব হইতেই খুযিস্তানের অধিকারী ছিলেন, ৩৩৪/৯৪৫ সনে বাগদাদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করত রাজধানীকে নিজের করতলগত করার সুযোগ মিলিয়া যায়। এই পরিবারের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধীনে খিলাফাত নামে মাত্র টিকিয়া থাকে। আহ্‌মাদ ইব্‌ন বুওয়ায়হ-এর আর এক ভ্রাতা রায় এবং শীরাযে বসতি স্থাপন করেন। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক দীপ্তিমান শাসনের যুগ ছিল শীরাযের গভর্নর 'আলী (৩২০/৯৩২-৩৩৮/৯৪৯)-এর পুত্র 'আদু'দু'দ-দাওলা (৩৩৮/৯৪৯-৩৭২/৯৮২)-এর। তিনি ৩৬৭/৯৭৭ সনে বাগদাদ অধিকার করেন। ৯৮২ খৃ. পর্যন্ত তিনি রাজত্ব পরিচালনা করেন। তদীয় পুত্র বাহাউ'দ-দাওলা (৩৭৯/৯৮৯-৪০৩/১০১২) ইরাক, পারস্য ও কিরমান-এ রাষ্ট্র পরিচালনা করিতে থাকেন। সেই সময়েই ইরানের উত্তর ও পশ্চিমাংশ হস্তচ্যুত হইয়া যায়। আযারবায়জানে সাজিদিয়া গোত্রের (২৬৬/৮৭৯-৩১৮/৯৩০) অর্ধস্বাধীন গভর্নরদের পরে কুর্দী গোত্রসমূহ, যথা ঃ মুসাফিরিয়্যা, শাদ্দাদিয়্যা, রাওওয়াদিয়্যা প্রভৃতি গোত্রের রাজত্ব কায়েম হয়।

খৃস্টীয় দশম শতকে ইরানে তুর্কীদের অভ্যুদয় ঘটে। তুর্কী সৈনিকদের বিরাট বিরাট দল পূর্ব হইতেই সেই সকল গভর্নর ও আমীর-উমারার দলে শামিল ছিল যাহারা ইরানের বিভিন্ন ভূ-খণ্ডে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কোহিস্তানীরাও (পার্বত্যাঞ্চলের লোক) তুর্কীদের সাহায্য-সহযোগিতা হইতে পরাঙ্মুখ ছিল না। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের পদাতিক সৈন্যের সহিত তুর্কী অশ্বারোহী সৈনিকের প্রয়োজন ছিল। ইহা ঠিক যে, পূর্ব হইতেই সামানীদের যুগে কিছু সংখ্যক তুর্কী গোত্র জায়হূন নদীর দক্ষিণ দিকে তাবারিস্তানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল; কিন্তু ইরানে তাহারা স্থানীয় সরকার ও সুলতানের অধীনে সৈনিক ও সেনানায়কের দায়িত্ব পালনে বিশেষ তৎপর থাকিত। সামানী শাসনামলে কিছু সংখ্যক তুর্কী উচ্চ সামরিক ও প্রশাসনিক পদ দখল করিতে সক্ষম হয়। যেহেতু সামানীদের সামরিক শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল, সেইহেতু এই সকল তুর্কী সেনানায়কদের মধ্যে আপন তুর্কী সৈন্যগণের উপর আস্থার এবং সামরিক ব্যবস্থাপনায় স্বীয় স্বভাবগত যোগ্যতার কারণে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুঃসাহস দেখা দিতে থাকে। [ইহারই ফলে আলপ্তগীন গায্‌নায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন (৩৫১/৯৬২) এবং তাঁহার ক্রীতদাস ও জামাতা সাবুক্‌তগীন ইহাকে আরও বিশাল এলাকায় বিস্তৃত করেন এবং ঐ সকল অঞ্চলও আপন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন যাহা তখনও পর্যন্ত স্থানীয় হিন্দু শাসনকর্তাদের অধীনে ছিল]। অতি শীঘ্রই সাবুক্‌তগীনের (৩৬৬/৯৭৬-৩৮৭/৯৯৭) শক্তি খোদ সামানীদের জন্য বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা মাওয়ারাউ'ন-নাহর-এ ঈলখানী তুর্কীদের হাতে বারংবার পরাস্ত হইতেছিল। সাবুক্তগীন খুরাসানে সামানীদের গভর্নর ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মাহ্‌মূদ গায্‌নাবী (৩৮৮/৯৯৮-৪২১/১০৩০) খুরাসানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করেন। তিনি প্রথমে বাল্‌খ-কে তাঁহার রাজধানী করেন; ইহার পর ইরানে সীস্তান এবং পূর্ব আল-জিবাল পর্যন্ত তাঁহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মাওয়ারাউ'ন-নাহ্‌র এবং ভারতবর্ষে তিনি যে সমস্ত বিজয় লাভ করেন উহার ফলে ইরানে তাহার শক্তি অধিক মযবুত হইয়া যায়। মাহ্‌মূদ বাগদাদের খলীফার নিকট রাষ্ট্রীয় ফরমান প্রার্থনা করেন (যিনি তাঁহাকে আমীনু'ল-মিল্লাত এবং য়ামীনু'দ-দাওলা উপাধিও প্রদান করেন)। তাঁহাকে আহ্‌লু'স-সুন্না ওয়াল জামা'আতের একজন মহান পৃষ্ঠপোষক বলিয়া গণ্য করা হইত। তাঁহার রাজত্বকালে সামানীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি কায়েম ছিল। মাহ্‌মূদের দরবার ছিল ইরানী কবিদের কেন্দ্রস্থল (তাঁহাদের মধ্যে ফিরদাওসী (দ্র.) অন্যতম, যাঁহার শাহ্‌নামাহ্‌কে ইরানের হ'আমাসা-ই মিল্লী অর্থাৎ জাতীয় বীরত্বগাথা বলা হয়)। মাহ্‌মূদের শাসনামলে ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা যে অতি উত্তম ও উঁচু পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল, উহা প্রমাণ করার জন্য এক আল-বীরূনী (দ্র.)-র নাম পেশ করাই যথেষ্ট। ইহা ছিল তাঁহার বিপুল জনপ্রিয়তার ফলস্বরূপ যাহার কারণে পরবর্তী সূফী কাব্যে এই তুর্কী শাসককে ইরানী সভ্যতা ও সংস্কৃতির একজন বীর পুরুষরূপে উপস্থাপন করা হইয়াছে। কাবুল রাজ্যে পুরাপুরিভাবে ইসলামের প্রসারও ছিল গাযনাবীদেরই অবদান। এই সময় বুওয়ায়হ বংশের শেষ শাসনকর্তা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিলেও তাঁহার শান-শওকত খতম হইয়া গিয়াছিল। গায্‌নাবীদের ছাড়াও পারস্যে কুর্দীগণ ১১শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বুওয়ায়হ বংশধরকে অত্যন্ত দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। এতদসত্ত্বেও এই সকল অবস্থা ইরানী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে নাই (ইব্‌ন সীনা)।

ইহা বলা যাইতে পারে যে, গায্‌নাবীদের উত্থান ঐ তুর্কী আক্রমণেরই ফল যাহা সালজূকী বংশীয়গণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল এবং যাহার ফলে ইরান এবং ইরানের বহিরাঞ্চলও তাহাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। ঐ সময়ে তুর্কীগণ, যাহাদের অধিকাংশকে গায্য বলা হইত, ৪২০/১০২৯ সাল হইতে পূর্ব এবং উত্তর ইরানে আসিয়া বসবাস করিতে শুরু করে। তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার প্রচেষ্টা চালান হয়; কিন্তু তাহাদের আগমন বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। তাহাদের নেতা তু'গ'রিল বে খুরাসানে তাঁহার বিজয় অভিযান শুরু (১০৩৭ খৃ.) করার পর সতের বৎসরের মধ্যেই সমগ্র উত্তর ইরান দখল করিয়া নেন (এবং ৪৪৭/১০৫৫ সালে তিনি বাগদাদ গমন করিয়া খলীফার সনদ এবং নিজ নামে খুতবা পঠিত হওয়ার অনুমতি লাভ করেন)। তাঁহারই শাসনামলে যিয়ারিয়া এবং বুওয়ায়হ বংশের অবশিষ্ট বিভিন্ন গোত্রের শক্তি একেবারেই ধ্বংস হইয় যায়। ইরানের অতি অল্প স্থানই গায্‌নাবীদের অধিকারে অবশিষ্ট থাকে। এমনিভাবে প্রায় সমগ্র ইরান সালজূকী তুর্কীদের অধীনে পুনরায় বিভিন্ন প্রদেশ অর্থাৎ খুরাসান, সীস্তান ও হিরাত, কিরমান, ফার্‌স ও আযারবায়জান এই গোত্রের শাসকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। তুগ'রিল বে (৪২৯/১০৩৭-৪৫৫/১০৬৩) রায়-কে তাঁহার রাজধানী করেন। তাঁহাকে এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণকে গোত্রীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সালজূক শাসনকর্তা হইতে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করিবার উদ্দেশ্যে সালজূক-ই আ'জাম (৪২৯/১০৩৭-৫৫২/১১৫৭) বলা হইত। শেষ সালজূক-ই আ'জাম সানজার (৫১১/১১১৭-৫৫২/১১৫৭) একজন উপযুক্ত শাসনকর্তা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজ্য কেবল খুরাসানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার জীবদ্দশায়ই তাঁহাকে ইরানে নব শক্তির সম্মুখীন হইতে হয় যাহা তাঁহার মৃত্যুর পর এমন এক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণ হইয়া দাঁড়ায় যে, কেবল তাতারীদের বিজয়ের ফলেই উহা নিশ্চিহ্ন হয়।

তুর্কী হামলার কারণে তুর্কী যাযাবরগণ ইরানের প্রায় এমন সকল অংশে পৌঁছিয়া গিয়াছিল যেখানকার অবস্থা ও জলবায়ু তাহাদের জীবন যাপনের বেশ অনুকূল ছিল। এই হামলাকে কয়েক দিক হইতে 'আরবদের হামলার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, অতঃপর ইহার ফলে মা-ওয়ারাউ'ন-নাহ্‌র এবং এশিয়া মাইনরের বিপরীত ইরান একটি তুর্কী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে

পারে নাই। অবশ্য এই ব্যাপারে কেবল আযারবায়জানকে স্বতন্ত্ররূপে গণ্য করা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ইরানের নব্য সাংস্কৃতিক জাগরণে এমন এক প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল যে, উহা তুর্কী বংশোদ্ভূত শাসকগণকেও মোহাবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল এবং ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত তুর্কী সালজূকগণ এশিয়া মাইনরে ইরানী সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার করিতে থাকে। গায্য যাযাবরগণ অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় ইরানে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায় নাই। তাহারা ছিল একটি দুস্কৃতিকারী জাতির ন্যায়, যাহাদের কারণে (খৃ.) ত্রয়োদশ শতকে খোদ সালজূকগণও বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল। সালজূকগণ আহ্‌লু'স্-সুন্না ওয়া'ল-জামা'আতের সমর্থক হইয়া সামানী ও গাযনাবীদের ন্যায় আহ্‌ল-ই সুন্নাতের মাযহাব বহাল রাখেন। তৎকালীন রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ও সাহিত্যের জগতে যাঁহারা স্তম্ভস্বরূপে গণ্য হইয়াছিলেন উযীর নিজা'মু'ল-মুলক ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। ইমাম গা'যালী (র) তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতার জ্ঞানচর্চা করেন। শেষ পর্যায়ে ইমাম গাযালী (র)-এর কর্মতৎপরতায় কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল খুরাসানের নীশাপুর। তখনকার ইরান ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং ইরাক ও মুসলিম জাহানের অন্যান্য কেন্দ্রের ন্যায় ইরানও খ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ হয়।

এই ব্যাপারে ইরানে ইসমা'ঈলী দাওয়াতের উল্লেখ করাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পশ্চিম ইরানে এই দলের আবির্ভাব ঘটে। ৪৮৪/১০৯১ সালে হ'াসান স'াব্বাহ' ক'াযবীনের নিকটবর্তী 'আলামুত কিল্লা জয় করেন। ইসমাঈলী আন্দোলনের উৎস পূর্ব ও পশ্চিমে একই রকম বিদ্যমান ছিল, কিন্তু ইরানের রাজনৈতিক প্রভাব আল-জিবাল, ফার্‌স ও খুযিস্তানে প্রবলভাবে এবং পূর্বদিকের কোহিস্তানে (পার্বত্যাঞ্চলে) স্বল্প পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। প্রায় এই সময়েই কোহিস্তানের কয়েকটি দুর্গ ইসমা'ঈলীদের হস্তগত হয়। মোটকথা, হ'াসান সাব্বাহ' এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী পশ্চিম ইরানে, বিশেষ করিয়া আল-জিবাল-এ এমন এক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হইয়া পড়িয়াছিল সালজূকী শাসনকর্তাগণ তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণে আনিতে ক্রমেই অক্ষম হইয়া পড়িতেছিল। অবশেষে তাতারী আক্রমণের ফলেই তাহাদের মূলোৎপাটন সম্ভবপর হইয়াছিল।

সালজূকীগণ তাহাদের অধিকৃত এলাকায় উত্তরাধিকার সূত্রে সামরিক জায়গীর (ইক্'তা')-এর এক ব্যবস্থার প্রচলন ঘটায় যাহার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বস্ত নেতৃবৃন্দের অধীনে সৈন্য পরিচালনার কোন উত্তম পন্থা বাহির করা। এই ব্যবস্থার ফলে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ধীরে ধীরে স্বাধীন সামরিক শাসনকর্তাগণ উহার স্থান দখল করিয়া নেন; ইহারাই ইতিহাসে আতাবেক নামে প্রসিদ্ধ। ইরানের বড় বড় আতাবেক বংশ আযারবায়জানে (৫৩১/১১৩৬ হইতে), লুরিস্তানে (৫৪৩/১১৪৮ হইতে) এবং য়াযদ-এ (৫৬৬/১১৭০ হইতে) উত্তরাধিকারী শাসক হইয়া পড়েন। সিলগ্'রীদের আতাবেক বংশ ফারসে (৫৪৩/১১৪৮) রাজত্ব করিতে থাকে। এই বংশ কিরমানের সালজূকী শাসকগণের পতনের পর এই রাষ্ট্রও নিজদের কুক্ষিগত করিয়া লয়। পারস্য এবং কিরমানের দক্ষিণাঞ্চলে শাবান কারাহ্‌দের অনিয়মতান্ত্রিক শাসনকার্যও চলিতে থাকে। সুলতান সানজারের মৃত্যুর (৫৫২/১১৫৭) পর খুরাসানে সালজূকী বাদশাহ খাওয়ারিয্‌ম শাহগণের মুকাবিলায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়েন। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে গূ'রীদের উত্থান হয়। 'আল-গূ'র' এবং আদ্-দাওয়ার পর্বত হইতেই ইহাদের যাত্রা শুরু হয়। এই গূ'রীগণই (৫৪৩/১১৪৮) গাযনা জয় করিয়া ইরান হইতে গাযনাবী শাসনের বিলোপ সাধন করে। এমনিভাবে সীস্তান ও বুস্‌ত-এর চারিদিকের মফস্বল ও গ্রাম পর্যন্ত উত্তরে বামিয়ান-এর পূর্বে খুরাসান পর্যন্ত গূ'রীগণ তাহাদের রাজ্য বিস্তার করে; কিন্তু পরবর্তীকালে তাহাদিগকেও তাহাদের অধিকৃত অঞ্চলের বিরাট এক অংশ খাওয়ারিয্‌ম শাহদিগকে ছাড়িয়া দিতে হয়। গূ'রীগণ কোনও কোনও সময় যাযাবর গুয্যদের মিত্র এবং কোনও কোনেও সময় শত্রু ছিল। সামষ্টিকভাবে গূ'রীগণ এবং তাহাদের সাময়িক মিত্রগণ যে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালায় তাহা উত্তর-পূর্ব ইরানে সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক পতনের সূচনা সংকেত বিবেচিত হইয়া থাকে।

তাতারীদের আক্রমণ এই পতনকে আরও ত্বরান্বিত করে। চেঙ্গিস খান (৬০৩/১২০৬-৬২৪/১২২৭)-এর সহিত মুহ'াম্মাদ খাওয়ারিয্‌ম শাহ-এর সংঘর্ষের (৬১৫/১২১৮) পর তাতারীগণ প্রথমে মা-ওয়ারাউ'ন-নাহ্‌র-এর খাওয়ারিযম শাহ-এর রাজত্ব অধিকার করে। ইহার অবশ্যম্ভাবী রাষ্ট্রীয় ও সামরিক পরিণতি ছিল খুরাসানে তাহাদের অভ্যুত্থান। ৬১৭/১২২০ সালের যুদ্ধে তাতারীদের দুইজন সেনাধ্যক্ষ জাবা ও সাবূতাঈ খুরাসানসহ ইরানের উত্তরাঞ্চল আযারবায়জান পর্যন্ত দখল করিয়া লয় এবং মুহ'াম্মাদ খাওয়ারিয্‌ম শাহকে কাস্পিয়ান সাগরের উপকূল আবাসকূন পর্যন্ত তাড়াইয়া দেয়। সেইখানেই তিনি ইনতিকাল করেন। তদীয় পুত্র জালালুদ্দীনকেও তাতারীগণ সিন্ধু নদ অতিক্রম করিতে বাধ্য করে। খুরাসানের বড় বড় শহর এমনভাবে ধ্বংস করা হয় যে, তাহাতে অতীতের জাঁকজমক ও জৌলুস ফিরাইয়া আনা আর সম্ভবপর ছিল না। বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক গণহত্যার ফলে চাষাবাদ অনেক হ্রাস পায়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির অতি উত্তম নিদর্শনসমূহ বিনষ্ট করিয়া ফেলা হয়। বিজিত শহর সঙ্গে সঙ্গেই তাতারী শাসনকর্তাদের নিকট সোপর্দ করিয়া দেওয়া হইত। যেখানেই জনগণ একটু বিদ্রোহ করিত-যেমন হামাদানে হইয়াছিল সেইখানেই অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সহিত ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালান হইত। এই সকল বিজিত অঞ্চল, মঙ্গোলিয়া সাম্রাজ্যের যে অংশ চুগ্‌তাঈদের অধীনস্থ ছিল উহার সহিত শামিল করিয়া দেওয়া হয়। দক্ষিণ ইরান কিছু দিনের জন্য ধ্বংসের হাত হইতে রেহাই পায়। কিরমানে তাতারী দূত বাররাক হ'াজিব (৬১৯/১২২২) একটি অর্ধস্বাধীন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহার মাত্র কয়েকদিন পরই জালালুদ্দীনও ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং যুদ্ধ করিতে আযারবায়জান ও আরমেনিয়া পর্যন্ত পৌঁছেন; কিন্তু তাতারীদের বহিষ্কারে সফলকাম হইতে পারেন নাই। ৬৫৪/১২৫৬ সালে তাতারী সৈন্যগণ পুনরায় আক্রমণ করে; ইহাদের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন তখনকার বাদশাহ খানমান্‌গো (=মান্‌গো কাআন)-এর ভ্রাতা হুলাগু (হালাকু) (৬৫৪/১২৫৬-৬৬৩/১২৬৫)। প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত এই যুদ্ধ ইরানের ইসমাঈলী গোত্র এবং বাগদাদের খিলাফাতের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। অতঃপর ৬৫৬/১২৫৮ সালে বাগদাদের খিলাফাত খতম করিয়া দেওয়া হয়। এই যুদ্ধের পিছনে খৃস্টানদের বন্ধু হুলাগুর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের কোন উদ্দেশ্য থাকিলেও থাকিতে পারে, তবে ইহার পরিণামে সামগ্রিকভাবে ইসলামী বিশ্বের পূর্বাঞ্চলে সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়। সমগ্র ইরান তাতারীদের করায়ত্ত হয় এবং অমুসলিম ঈলখানী শাসকদের রাজত্বের এক বিরাট অংশে পরিণত হয়। এই সকল বাদশাহ-এর বেশীর ভাগই আযারবায়জান-এ (এবং ৭০৫/১৩০৬ সালের পর সুলতানিয়ায়) অবস্থান করিতেন। খৃ. ত্রয়োদশ শতকের শেষ অবধি অবশিষ্ট ছোট ছোট রাজপরিবার, যথা ঃ ফারসের সিলগুরী আতাবেক এবং কিরমানের কু'তলুগ খানও বিলুপ্ত হইয়া যায়।

খুরাসানে ভয়ানক ধ্বংসলীলার কারণে এতদঞ্চল আর ইরানের ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন আশ্রয়স্থল অবশিষ্ট থাকে না। উল্লেখ্য যে, এইসব রাজনৈতিক ঘটনা পশ্চিমাঞ্চলের ইসলামী কেন্দ্রসমূহের সহিত (মিসর ও সিরিয়া প্রভৃতি) ইরানের সম্পর্ক দুর্বল করিয়া দেয়। কারণ ঐ দেশগুলি তখন সর্বক্ষণ ক্রুসেড যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত ইসমা'ঈলী শক্তি মূলোৎপাটিত হইয়াছিল বটে, তবুও তখন পর্যন্ত ঈলখানীদের মনোভাব ইসলাম এবং ইসলামী শিক্ষার প্রতি সন্দেহজনক পর্যায়ে ছিল। মোটকথা তখন ইরানী মুসলিমগণ দারুণ উৎকণ্ঠা ও দুঃসহ অবস্থার মধ্যে কাল কাটাইতেছিলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে বহু বিপরীতমুখী চিন্তাধারার আগমন ঘটিয়াছিল। সেই যুগেই স'াফাবি'য়া গোত্রের প্রধান শায়খ স'াফিয়্যুদ্দীন (৬৫০/১২৫২-৭৩৪/১৩২৫) 'আরদাবীল-এ অবস্থান করিতেছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও ইরানের জাতীয় চালচলন ও রীতিনীতি আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল ছিল এবং নূতন নূতন বহিরাগত (বেশীর ভাগ তুর্কী)-কে আকৃষ্ট করিতে থাকে- যাহাদের মধ্যে সভ্যতার শীর্ষস্থানীয় মাপকাঠি পর্যন্ত পৌঁছিবার যোগ্যতা বিদ্যমান ছিল। সেই সময়ে ইরানের বড় বড় কবির (যেমন সা'দী) আবির্ভাব ঘটে এবং ঈলখানী শাসনকর্তাগণ (৬৫৪/১২৫৬-৭৫০/১৩৪৯) ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির (নাস'ীরুদ্দীন) প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকেন।

আবূ সা'ঈদ-এর ইনতিকালের (৭৩৬/১৩৩৫) পর ঈলখানী গোত্রের জালা'ইরী ও চূপানী গোত্রের বিবাদের অবসান ঘটে। স্বয়ং আবূ সা'ঈদকে তাঁহার রাজ্যের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখিতে অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। এই ব্যাপারে চূপান গোত্রের প্রভাবশালী আমীরের সহিত তাঁহার বিরোধ ও সংঘাত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপরন্তু পরবর্তী ঈলখানীগণও একের পর এক অর্ধ স্বাধীন শাসকের ভূমিকা বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ হিরাত-এর কুরত গোত্রের (৬৪৩/১২৪৫-৭৯১/১৩৮৯) নাম উল্লেখ করা যায়। খুরাসানে কেবল এই বড় শহরটিই তাতারীদের লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা পায়। এতদ্ব্যতীত ঈলখানীদের অধীনে চাকুরীরত শক্তিশালী সেনাপতিগণ আবূ সা'ঈদ-এর ইনতিকালের পর গৃহযুদ্ধের সময়ে স্বাধিকার অর্জনের সুযোগ লাভ করে। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী সফলকাম হইয়াছিল ফারস ও কিরমানের মুজ'াফ্ফারী গোত্র। তাহাদের শাসনকার্য আনুমানিক ৭১৩/১৩১৩ সন হইতে শুরু হয় এবং ৭৮৯/১৩৮৭ সনে উত্থানের সময় দক্ষিণ ইরান এবং কিছু দিনের জন্য 'ইরাক-ই আ'জাম (আল-জিবাল) এবং আযারবায়জান পর্যন্ত দূর-দূরান্ত অঞ্চলের উপর তাহারা শাসনকার্য চালাইতে থাকে। ইহার আরও পরে আযারবায়জান কখনও 'আলতূন উরদূ'-এর খাওয়ানীদের (৬২১/ ১২২৪-৯০৭/১৫০২), আবার কখনও বাগদাদের জালা'ইরী সুলতানদের হস্তগত হইতে থাকে। পূর্ব ইরানের বেশীর ভাগই উল্লিখিত কুরত গোত্র এবং সারবাদারদের মধ্যে, যাহাদের কেন্দ্র ছিল সাবযাওয়ার, বিভক্ত ছিল। এই বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগপূর্ণ সময়ে সরকার যখন দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল তখন ইরানে জনগণের স্বাধিকার সম্পর্কে সচেতন হইবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়। বিভিন্ন শহরের বাসিন্দাগণ প্রতিদ্বন্দ্বী শাসকগণের সহিত স্বাধীন রীতিনীতি অবলম্বন করে। এশিয়া মাইনরের জনসাধারণকেও স্বাধিকারের এই দাবী উত্থাপন করিতে দেখা যায়; কিন্তু পশ্চিম ইরানের উর্বর ভূমিতে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহারা এমনভাবে আত্মনিয়োগ করে যে, ১৪শ ও ১৫শ শতকে সেখানকার সাহিত্য এক দীপ্তিমান আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইহা একটি জোর প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আশ্চর্যজনক বলিয়াই বোধ হয়। সাহিত্যের এই উৎকর্ষের সংগে সংগে মানুষের ধর্মীয় চিন্তাধারাও প্রভাবিত হয়। উদাহরণত তাহারা দরবেশগণের প্রচারিত তাস'াওউফ-এর সীমাহীন প্রভাবে প্রভাবিত হয়। খুরাসানে সারবাদারদের ব্যাপারে দরবেশদের ভূমিকায় রাজনৈতিক ভাবধারাও আসিয়া পড়ে। এই ক্ষেত্রেও এশিয়া মাইনরের সহিত এক অদ্ভুত সাদৃশ্য হয় ঃ উচ্চাঙ্গের তাস'াওউফ কেবল উঁচু দরের লোকের মধ্যে সীমিত ছিল। আর উহার চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটিত সাহিত্যের মাধ্যমে, উহা হইতে আমরা বিভিন্ন ধরনের চিন্তাধারার সন্ধান পাইতে পারি।

১৪শ শতকের (খৃ.) শেষে তায়মূর-এর ইরান বিজয়ের কারণে এক ভয়ানক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। ইহা ছিল আরও একটি বহিরাক্রমণ, যাহার ফলে শেষবারের মত ইরানের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পথে বাধার সৃষ্টি হয়। বিজয়ের মাধ্যমে মধ্য এশিয়ায় একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার পর তায়মূর (৭৭১/১৩৬৯-৮০৭/১৪০৪) চেঙ্গীস খান-এর বংশধর হওয়ার দাবীতে সমগ্র ইরানের শাসনভার দাবী করেন। ৭৮২/১৩৭০ সালেই তিনি বাল্খ জয় করিয়াছিলেন; ৭৮২/১৩৮০ সালে তিনি খুরাসান, সীস্তান ও মাযিনদারান অধিকার করেন, ৭৮৫-৭৮৬/১৩৮৩-১৩৮৪ সনে আযারবায়জান ও ইরাক 'আ'জ'াম জয় করেন এবং পরে মুজ'াফ্ফারিয়া গোত্রের পতন ঘটাইয়া ফার্‌স অধিকার করিয়া লন (৭৯৫/১৩৯৩)। এমনিভাবে তাঁহার ইরান বিজয় পরিপূর্ণতা লাভ করে। সারাবদারগণ (৭৮৩/১৩৮১)-তো পূর্বেই সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিল; ৭৯১/১৩৮৯ সনে হিরাত এর কুর্‌ত গোত্রেরও পতন ঘটে। এই সকল বিজয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ঘটনা ছিল ৭৮৯/১৩৮৭ সনে ইসফাহান-এর শোচনীয় পতন। তায়মূর বেশী দিন ইরানে অবস্থান করেন নাই। সেখানকার সাম্রাজ্য তিনি পুত্রদের হাতে ছাড়িয়া দেন, বিশেষ করিয়া শাহরুখকে ৮০০/১৩৯৭ সন হইতেই খুরাসান ও সীস্তান-এ বাদশাহ বলা হইতে থাকে। আযারবায়জান-এ রাজত্ব করিতে থাকেন মীরান শাহ্; কিন্তু তায়মূর তাঁহার এই পুত্রের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তায়মূর-এর ইনতিকাল (৮০৭/১৪০৪)-এর পর শাহরুখ-এর সময়ে (৮০৭/১৪০৪-৮৫০/১৪৪৭) দেশে সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ঐক্য বিদ্যমান ছিল। তাঁহার পিতার সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের দরুন যে, ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হইয়াছিল, তিনি তাহার সংস্কার সাধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁহার ইনতিকালের পর তায়মূর বংশীয় শাসকগণ ইরানের বিভিন্ন অংশে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়। অপরদিকে ৮৫৪/১৪৫০ সনের পর পশ্চিম দিক হইতে কারাকূয়ুনলু (৭৮০/১৩৭৮-৮৭৪/১৪৬৯) ইরানের বৃহদাংশ অধিকারের জন্য আক্রমণ করে। ইরানের খ্যাতনামা তায়মূরী সুলতান হুসায়ন বীকরা (বায়করা) যাঁহার রাজধানী ছিল হিরাত, খুরাসান, সীসতান ও জুরজান-এ ৮৬৪/১৪৬০ সাল হইতে ৯১২/১৫০৬ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

এই সময়ে বহু নূতন ধর্ম ও মতবাদের সৃষ্টি হয়। উহার মধ্যে একটি হইতেছে হ'ারূফী ফিরকা। এই ফিরকার এক অনুসারী ৮২৯/১৪২৬ সালে হিরাতে শাহরুখকে হত্যার চেষ্টা করে। সরকারের পক্ষ হইতে এই ধর্মীয় আন্দোলন প্রতিহত করা হয়; কিন্তু অন্যান্য আন্দোলনের ন্যায় ইহার প্রভাবও পশ্চিমে প্রসার লাভ করে। অর্থাৎ উহা আযারবায়জান হইয়া এশিয়া মাইনরে পৌঁছে। সেখানে 'উছমান বংশীয় তুর্কীগণ পুনরায় রাজত্ব কায়েম করার পর ইরান হইতে আগত ধর্মীয় প্রভাবসমূহ প্রতিহত করিবার জন্য নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছিল। এই সময়েই পশ্চিম ইরানের উচ্চমানের সাহিত্যে

ইরানী সাংস্কৃতিক জীবনের প্রকাশ ঘটিতে থাকে। অপর দিকে ককেশাস এবং ইসলামী হিন্দুস্তানেও ইরানের সাহিত্য ও সংস্কৃতি পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে। খুরাসানে হিরাতের জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রস্থলে পূর্ব তুর্কী চুগতাঈ সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। 'আলী শের নাওয়া'ঈ হিরাতে হুসায়ন বায়কারা-এর দরবারে এই সাহিত্য-সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন করেন। ইসলামী ইরানের রীতিনীতি এই সমস্ত এলাকায় সর্বদা প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিলেও পূর্ব-ইরান স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রভাবে সাংস্কৃতিক দিক হইতে পশ্চিম ইরান হইতে পৃথক হইয়া যাইতে থাকে। এই অবস্থা, ঐ যুগে এশিয়া মাইনর, আল-জাযীরা (মেসোপটেমিয়া) ও ইরাকের 'আরবী ভাষাভাষীদের এলাকায় যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তাহারই সদৃশ ছিল।

সাফাবী রাজবংশের উত্থানের পূর্বে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয় আযারবায়জান ছিল উহার বিশেষ উৎপত্তি স্থল। এই অঞ্চলেই কারা কূয়ূনলু পরিবারের কারা য়ূসুফ ৮০৯/১৪০৬ সনে তাবরীয জয় করিয়া আপন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। আর তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণ এই শহরকে তাঁহাদের রাজধানীতে পরিণত করেন। জাহান শাহ (৮৪১/১৪৩৭-৮৭২/১৪৬৭)-এর যুগে এই রাজত্ব প্রায় সমগ্র পশ্চিম ইরান এবং পূর্বে হিরাত পর্যন্ত বহুদূর সম্প্রসারিত হয়। আযারবায়জানেরই পথে উযুন হ'াসান (৮৭১/১৪৬৬-৮৮৩/১৪৭৮), যিনি আক কূ'য়ূনলু গোত্রের নেতা ছিলেন, জাহান শাহকে পরাস্ত করিয়া (৮৭৪/১৪৬৯) ইরানে প্রবেশ করেন। ইহার পর তিনি তৈমূরী শেষ বাদশাহ সুলতান আবূ সা'ঈদকে পরাস্ত করেন এবং পশ্চিম ইরানে একচ্ছত্র শাসন কায়েম করেন। এই সময়েই তিনি উছমানী তুর্কীদের বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটান যাহা পরবর্তী তিন শত বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। ইহার পূর্বেই শায়খ হায়দার প্রভৃতি সাফাবী নেতৃবৃন্দের সহিত উযুন হাসান-এর স্থলাভিষিক্তগণের সংঘর্ষ হইয়াছিল। শেষোক্তরা তখনই আযারবায়জান ও এশিয়া মাইনরে অস্বাভাবিক প্রভাব বিস্তার এবং প্রবেশ লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে সাফাবীদের উত্থানে তাঁহাদের রাজত্ব প্রাক্তন রাজ-পরিবারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত গণতান্ত্রিক পন্থায় শুরু হয়। ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল তুর্কী বংশোদ্ভূত ৭টি গোত্র। সূফীদের তাবলীগী পন্থায় তাহাদের মধ্যে শী'আ মতবাদ প্রচার করা হয়। এই ক্রমবর্ধমান জনসমাগমকে লোকে তখনকার দিনে "কিযিল বাশ" (লাল মস্তকসম্পন্ন) বলিয়া অভিহিত করিতে থাকে। পরবর্তী কালে ইহা একটি প্রসিদ্ধ পরিভাষা হইয়া দাঁড়ায়। মোটকথা, শাহ ইসমা'ঈল সাফাবীর নেতৃত্বে তাঁহাদের রাজনৈতিক উত্থানে আহ্‌ল-ই সুন্নাতের মতবাদের বিরোধিতার দিকটিও বিদ্যমান ছিল। ইহা এমন ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া ছিল, যাহাতে নিজের সাহায্যার্থে পশ্চিম ইরানের নাগরিকগণকে শামিল করিয়া লওয়া কোনরূপ কঠিন কার্য ছিল না। কারণ এই জনগণ বহুদিন ধরিয়া বেসরকারী ধর্ম এমনকি অন্য ধর্মের আকীদা ও বিশ্বাসকেও গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহী ছিল এবং ইহার অন্তরালে বিদেশী সরকারের প্রতি নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া আসিতেছিল। বিভিন্ন ধরনের এইসব জনগোষ্ঠীর সাফাবী গোত্রকে একটি স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত করে। অথচ তাহাদের নেতা ছিল তুর্কী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত আযারবায়জানী তুর্কী। শাহ ইসমা'ঈল, যিনি ইতঃপূর্বে জীলানে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, আত্মপ্রকাশ করিবার পর শাহ শির্‌ওয়ান-এর বিরুদ্ধে ককেশাস-এ প্রথম সফলতা লাভ করেন। ইহাতে তিনি এতই শক্তিশালী হইয়া উঠেন যে, আক কূয়ূনলু-এর শেষ শাসনকর্তার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং শুরূর-এর যুদ্ধে (৯০৭/১৫০২) তাঁহাকে পরাস্ত করেন। ৯১৬/১৫১০ সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিম ইরান, আরমেনিয়া, আল-জাযীরা এবং ইরাক অধিকার করিয়া লন (বাগদাদ ৯১৪/১৫০৮ সনে অধিকার করেন) যেখানে নাজাফ এবং কারবালায় বহু ইমামের পবিত্র মাযার বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার পর তিনি পূর্ব ইরানের প্রতি মনোনিবেশ করেন, কারণ মা ওয়ারাউন-নাহ্‌র হইতে তখন একটি নূতন আক্রমণের আশংকা দেখা দিয়াছিল। অর্থাৎ হিরাতের সুলতান হুসায়ন বায়কারা-এর মৃত্যুর (৯১২/১৫০৬) পর শায়বানী খান (৯০৬/১৫০০-৯১৬/১৫১০)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় উযবেক শক্তির উত্থান ঘটে। শায়বানী খান খুরাসান আক্রমণ করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি মার্‌ব-এর যুদ্ধে (৯১৬/১৫১০) শাহ ইসমা'ঈলের হাতে নিহত না হইলে ইরানকে মধ্য এশিয়া হইতে উত্থিত আর এক বিজয় সয়লাবের সম্মুখীন হইতে হইত। ইহার পর ৯২০/১৫১৪ সালে চালদিরান-এর প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হয়, ইহাতে শাহ ইসমা'ঈল ১ম সালীম (৯১৮/১৫১২-৯২৬/১৫২০)-এর সৈন্যবাহিনীর নিকট শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। ফলে ভবিষ্যতে সাফাবী রাষ্ট্রের সীমানা কতদূর পর্যন্ত থাকিবে, তাহা পরিষ্কার হইয়া যায়। পশ্চিমে আযারবায়জান হইতে সাফাবীদের প্রতি আনুগত্যের ঢেউ উঠে এবং সুদূর এশিয়া মাইনর পর্যন্ত উহা ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু উছমানী শাসকগণ অত্যন্ত কঠোরভাবে উহা অবদমিত করিয়া রাখেন। আর চালদিরান-এর যুদ্ধই প্রমাণ করে যে, এইদিকে ইরানের রাজ্য বিস্তার সম্ভবপর নহে। সাফাবী বংশ ১১৪৮/১৭৩৬ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা করিলেও ইসমা'ঈলের জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইতেই তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত হইয়া যায়। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি এবং ভৌগোলিক প্রয়োজন এই রাজবংশকে একটি জাতীয় বংশের মর্যাদা দান করে। এই বংশের দীর্ঘকাল যাবত রাজ্য পরিচালনা এবং ধর্মীয় দিক হইতে নিজ রাজ্যকে (অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্র হইতে) পৃথক রাখার কৌশলটিও সত্যিকার অর্থে একটি ইরানী জাতীয়তাবাদ গড়িয়া উঠিবার ব্যাপারে কম সহায়ক হয় নাই। এই জাতিই অষ্টাদশ শতকের বিশৃঙখলা ও গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে এবং উনবিংশ শতকে আরও দ্বিগুণ শক্তিতে আপন অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিতে সমর্থ হয়। এতদসত্ত্বেও ঐ সময়ে রাষ্ট্রীয় অবস্থা দ্রুত উন্নতি লাভের অনুকূল হয় নাই। বহু সংখ্যক ইরানী তুর্কী ও 'আরব বংশীয় যাযাবর দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাহাদের আপন সংস্কার-জালে জড়াইয়া থাকে এবং বিভিন্ন জনবহুল এলাকার মধ্যে আমদানী-রফতানীর সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকার কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি ও কর্তৃত্ব স্বভাবতই কিছুটা দুর্বল হইয়া পড়ে। সাফাবীদের পূর্ণ রাজত্বকালে বাদশাহকে অর্ধ-স্বাধীন গভর্নর এবং গোত্রের সরদারদিগকে দমনে ব্যস্ত থাকিতে হয়। প্রথম শাহ তাহ্‌মাস্‌প-এর সময়ে কিছু সংখ্যক গুর্‌জিস্তানী আমীর ও বাদশাহ-এর হিতাকাঙক্ষীদের প্রাধান্য ঘটিলেও সামগ্রিকভাবে কিযিলবাশ গোষ্ঠীই বিভিন্ন সময়ে শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাষ্ট্রের জন্য হুমকি ও বিপদের কারণ হইতে থাকে। এই কারণেই রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য বাদশাহ্ তাহাদের মুখাপেক্ষী হইতেন। শুধুমাত্র প্রথম 'আব্বাস (৯৮৫/১৫৮৭-১০৩৮/১৬২৯)-এর যুগে এক ধরনের শাহী সৈন্য (শাহ সিওয়ান=মুহিব্বান শাহ) গঠন করা হয় এবং য়ূরোপীয় গোলাবারুদের দ্বারা তাহাদিগকে সুসজ্জিত করা হয়। এতদসত্ত্বেও 'উছমানী শাসনামলে দেওয়ানী ও সামরিক নিয়মনীতিতে যে আইন-শৃঙখলা ও ঐক্য পরিলক্ষিত হইত, তাহা কখনও সৃষ্টি হইতে পারে নাই। উদাহরণস্বরূপ হুর্‌মুয (-এর বন্দর)-এ সাফাবীদিগকে পর্তুগীজদের এবং পরবর্তী কালে ইংরেজদের অবস্থান বরদাশত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু এই

বিষয়টি তখনকার রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থার সহিত মোটেই সংঘাতময় ছিল না। দেশের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও কর্তৃত্ব অত্যন্ত কঠোরভাবেই চালু রাখা যাইত— যাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রথম 'আব্বাসের যুগে পরিলক্ষিত হয়। এই কারণেই সাফাবী রাষ্ট্রের সীমানা পূর্ব ও পশ্চিমে কখনও এক রকম ছিল না যদিও ধীরে ধীরে একটি সীমানার পত্তন হয়। খুরাসানের পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল বহুদিন যাবত সাংস্কৃতিক দিক দিয়া পশ্চিম ইরান হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছিল। তাই তাহারা কখনও সাফাবী সরকারকে গ্রহণ করে নাই। বাল্খ ও মার্ব প্রায় একাধারে উযবেকদের একচ্ছত্র শাসনাধীন ছিল (প্রথম 'আব্বাস ১০০৬/১৫৯৮ শুধুমাত্র সাময়িকভাবে বাল্খ অধিকার করেন)। কাবুল ও কান্দাহার শুরু হইতেই ভারতবর্ষের মুগল শাসনাধীন ছিল। কান্দাহারে সাফাবীগণ অতি অল্প সময়ই টিকিয়া থাকে। হিরাত অধিক সময় পর্যন্ত তাহাদের হস্তগত থাকে। এমন কি উনবিংশ শতকেও বিশেষ এক সময় পর্যন্ত ইরান এই শহরের উপর তাহার দাবি পরিত্যাগ করে নাই। এই কারণেই উযবেক এবং মুগলদের শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও ইরানের পূর্বাঞ্চল পুনরায় সাফাবী রাজত্বের সহিত একীভূত হয় নাই; বরং সেখানে শেষ পর্যন্ত আফগান শাসনকর্তাদের অধীনে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধুমাত্র পশ্চিম খুরাসান, মাশ্হাদ এবং সীসতান সাফাবী রাষ্ট্রের এবং পরবর্তী কালে নূতন ইরানের অবিচ্ছেদ্য অংগরূপে টিকিয়া থাকে। পশ্চিমে ইরানী এবং তুর্কী 'উছমানীগণ ককেশাস পর্বত হইতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল অংশের জন্য সর্বদাই পরস্পর যুদ্ধে রত থাকে। এই উপর্যুপরি যুদ্ধের মধ্যে কখনও সন্ধি করিয়া সাময়িকভাবে লওয়া হইত। ষোড়শ শতকে তুর্কীগণ আযারবায়জান, আল-জাযারী ও ইরাক ছিনাইয়া লয়। প্রথম 'আব্বাসের যুগে উহা পুনরুদ্ধার করা হয়; কিন্তু ১০৪৫/১৬৩৮ সনে ৪র্থ মুরাদ (১০৩২/১৬২৩-১০৪৯/১৬৪০) দিজ্লা উপত্যকায় ইরানী আধিপত্যের অবসান ঘটান। অবশ্য আযারবায়জান ও আরমেনিয়ার কিছু অংশ ইরানীদের অধীনেই থাকিয়া যায়। মাযিনদারানের উপর কাসকূ (কাযকূ)-এর আক্রমণের কারণে ১০৭৮/১৬৬৮ সনে রাশিয়ার সহিত প্রথম যুদ্ধ হয়।

সূচনা হইতে প্রথম শাহ ইসমা'ঈল শী'আ মতবাদকে ইরানের রাষ্ট্রীয় ধর্মের সম্মান দান করেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ব্রাউন (Browne) সাফাবী যুগে সাহিত্যের অবনতি ও অধোগতির জন্য এই ধর্মীয় পরিবর্তনকেই দায়ী করেন। এমতাবস্থায় ইরান প্রতিবেশী ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। অন্যদিকে য়ুরোপে 'উছমানী সাম্রাজ্যের দুশমনগণ আশা করিয়াছিল যে, 'উছমানী সাম্রাজ্যের পতন ঘটাইবার ব্যাপারে ইরান একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিবে। য়ুরোপীয় শক্তিসমূহের, যেমন ভেনিস ও স্পেনের সহিত ইরানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধির কারণ ইহাই ছিল। ইহারা ইরানের সহিত বাণিজ্যিক দিক হইতে লাভবান হইবার আশা করিত। তাহাদের দেখাদেখি এবং ভারতবর্ষ ও উহার দূরবর্তী স্বীয় অধিকৃত অঞ্চলের হিফাজতের রাজনৈতিক প্রয়োজনে অন্যান্য য়ুরোপীয় শক্তিবর্গ ও সাফাবী সরকারের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী হইয়া উঠে। ইংরেজ, ওলন্দাজ এবং ফরাসীগণ পারস্য উপসাগরীয় এলাকা হইতে পর্তুগীজদের বহিষ্কারের পর সাফাবীদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে শুরু করে। য়ুরোপীয় রাষ্ট্রদূতগণ যাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শারলে (Sherley) ভ্রাতৃবৃন্দ ১ম 'আব্বাসের যুগে সবিশেষ খ্যাতি ও সমাদর লাভ করেন। তাঁহাদের মাধ্যমেই পাশ্চাত্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত সর্বপ্রথম ইরানের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সম্পর্কই য়ুরোপে কিছু সংখ্যক ইরানী রাষ্ট্রদূত প্রেরণে উৎসাহিত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যে রাজনৈতিক কারণে য়ুরোপের নৌশক্তি পারস্য উপসাগর পর্যন্ত উপনীত হইতে সমর্থ হয়, উহারই ফলে ইরান কখনও একটি নৌ-শক্তিতে পরিণত হইতে পারে নাই। নবনির্মিত বন্দর 'আব্বাসকে একটি বৃহৎ নৌশক্তি কেন্দ্র ও বাণিজ্যিক শহর বানাইবার জন্য ১ম 'আব্বাস আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই।

সাফাবী বাদশাহদের মধ্যে অধিকাংশই দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার প্রধান কারণ ছিল রাজ-পরিবারের মধ্য হইতে যাহাদের রাষ্ট্রের দাবিদার হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহাদিগকে ইঁহারা প্রথম সুযোগেই হত্যা করিয়া ফেলিত। ইহাদের মধ্যে ১ম 'আব্বাসের শাসনকাল (৯৮৫/১৫৮৭-১০৩৮/১৬২৯) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার আবাসস্থল কাযবীন হইতে ইসফাহানে স্থানান্তরিত করেন এবং তথায় এমন সব সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করান যাহা একটি জাঁকজমকপূর্ণ রাজধানীতে পরিণত হয়। শাহ 'আব্বাসের উত্তরাধিকারিগণ তাঁহার গৃহীত ব্যবস্থায় লাভবান হন। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের দুর্বলতার ফলে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে ইরান এক শান্তিপূর্ণ যুগের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে থাকে। কয়েকখানি য়ুরোপীয় ভ্রমণ কাহিনী হইতে তখনকার সঠিক অবস্থা আমরা ভালভাবে জানিতে পারি। এই শান্তিপূর্ণ অবস্থার সুযোগে কান্দাহারে ১১২১/১৭০৯ সনে এক বিপরীতমুখী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, যাহা সাফাবী বাদশাহ সুলতান হুসায়ন (১১০৫/১৬৯৪-১১৩৫/১৭২২) বাধা দিয়াও প্রতিহত করিতে পারেন নাই। এই আন্দোলনের ফলেই স্বাধীন আফগান রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। ১১৩৫/১৭২২ সালে মীর মাহমূদের আফগান সৈনিকগণ ইসফাহান জয় করে। প্রায় আট বৎসর পর্যন্ত আফগানগণ ইরানের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখে। অবশেষে হু'সায়নের সাফাবী উত্তরাধিকারী শাসক স্বীয় সেনাধ্যক্ষ নাদির কুলীর সাহায্যে স্বদেশকে মুক্ত করিতে সমর্থ হন। এই ব্যক্তি আফশার গোত্রের লোক ছিলেন। ১১৪৮/১৭৩৬ সনে তিনি নাদির শাহ নাম ধারণ করিয়া স্বয়ং ইরানের বাদশাহ হইয়া বসেন। নাদির প্রথমেই আযারবায়জান ও গুরজিস্তানের যে সকল শহর তুর্কীদের অধীনে চলিয়া গিয়াছিল তাহা পুনরুদ্ধার করেন। এমনিভাবে তিনি রাশ্ত এবং বাকূও পুনরুদ্ধার করেন, যাহা রাশিয়ার অধিকারে ছিল। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর তিনি হিন্দুস্তান ও আফগানিস্তানের এলাকাসমূহ আক্রমণ করিতে উদ্যত হন। এতদসত্ত্বেও তিনি স্বদেশে এমন শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করিয়া যাইতে সমর্থ হন নাই, যাহা তাঁহার পরেও সফলতার সহিত টিকিয়া থাকিতে পারিত। তাই ১১৬০/১৭৪৭ সনে তাঁহার নিহত হইবার পর ইরানে এক ব্যাপক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার যুগ শুরু হইয়া যায়। আফগানদের শক্তি ম্লান হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহারা নাদির শাহের পৌত্র শাহরুখকে, যাহাকে অন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, খুরাসানের রাজত্ব সঁপিয়া দেয় (১১৬১/১৭৪৮- ১২১০/১৭৯৬)। একটি শক্তিশালী রাজবংশ প্রতিষ্ঠায় নাদির শাহ-এর ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ইহাও ছিল যে, তিনি শী'আ রীতিনীতির বিলোপ সাধনের প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু ইহাতে তিনি প্রজা সাধারণ এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন। নাদির শাহ নিহত হইবার পর সাফবী কোন ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার প্রশ্ন উঠাই সম্ভব ছিল না। আসল শক্তি কারীম খান যান্দ-এর হাতে আসিয়া যায়। তিনি বেশীর ভাগ সময়ই শীরায-এ অবস্থান করিতেন। তিনি তাঁহার উদারতাপূর্ণ

রাজত্বকালে (১১৬৩/১৭৫০-১১৯৩/১৭৭৯) ইরানকে একত্র করিতে সফল হন। তাঁহার সময় ইরাকী সীমান্তে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার কারণে বসরা জয় করিবার পথও পরিষ্কার হইয়া যায়। কারীম খানের ইন্তিকালের পর সিংহাসনের জন্য তাঁহার সন্তানদিগের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মকলহের সুযোগেই আস্তারআবাদ-পার্শ্ববর্তী কাচার গোত্রের আগা মুহাম্মাদ খান কৌশলে পুরা রাজ্যটিই অধিকার করিয়া লন। অবশেষে তিনি তেহরানের সিংহাসনে আরোহণ করেন (১২১০/১৭৯৬) এবং ১২১১/১৭৯৭ সালে ইনতিকাল করেন। এই সময় হইতেই কাচার রাজবংশের সূত্রপাত হয়, যাঁহারা ১৯২৫ খৃ. পর্যন্ত রাজ্য পরিচালনা করেন। আফগান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূচনাতেই রাশিয়া দারবান্দ ও রাশ্ত অধিকার করিয়া লইয়াছিল। আর অন্যদিকে তুর্কীগণ দেশের অভ্যন্তরে হামাদান পর্যন্ত ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আফগানিস্তানের শাসনকর্তা আশরাফ এবং তাঁহার পর নাদির শাহ এই বিজিত অঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধার করেন। এমনিভাবে ১১৫৩/১৭৪০ সনে নাদির শাহ তুর্কীদের ২য় আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেন। ১৮শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়া ও তুরস্ক পারস্পরিক দ্বন্দ্বে এইভাবে মত্ত ছিল যে, ইরানের প্রতি লক্ষ্য করিবার অবকাশ তাহাদের ছিল না। উত্তর-পূর্ব দিকের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে উযবেক সাম্রাজ্যের পক্ষ হইতে প্রত্যক্ষভাবে বিপদাশংকা তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু খুরাসানের উত্তরে দুর্ধর্ষ তুর্কমানগণ কর্তৃক পুনঃপুনঃ অতর্কিত হামলা ইরানী জনগণের জন্য এক অনিশ্চিত ও আশংকার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আগা মুহাম্মদ খান তাহাদের উপর কয়েকবার প্রচণ্ড আক্রমণ চালান বটে কিন্তু কাচারদের শাসনের প্রাথমিক যুগেই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। কারণ ইরান বিশ্বজোড়া রাজনৈতিক কোন্দলে জড়িত হইয়া পড়ে। ১২২৯/১৮১৪ সন পর্যন্ত ইরানের সহিত মৈত্রী স্থাপনের বিষয়টি ইংল্যান্ড ও নেপোলিয়নের সময়ের ফ্রান্সের মধ্যে একটি বিতর্কিত বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। বৃটেন ভারতবর্ষে যেভাবে তাহাদের অবস্থান সুদৃঢ় করিয়া লয়, উহার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজগণ ইরানের সহিত মৈত্রী স্থাপনের বিষয়টি গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করে। অপরদিকে নেপোলিয়ান রাশিয়ান সৈন্যদের সহায়তায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার অভিসন্ধি করিতেছিলেন। ১৮১৪ খৃ. ফ্রান্সের আশংকা দুরীভূত হয় এবং বৃটেন ইরানের সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করে। কিন্তু ১২২৭/১৮১২ সাল হইতেই গুরজিসতান অধিকারের ব্যাপারে রাশিয়ার সহিত বৃটেনের সংঘাত শুরু হওয়ার ফলে তাহাদিগকে বিরাট সামরিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হয়। অবশেষে তুর্কমান চায়-এর সন্ধি (১২৪৪/১৮২৮) অনুসারে ইরানকে আর্‌স দারয়ার উত্তরের সমগ্র অঞ্চলই হাতছাড়া করিতে হয়। ইহার পর হইতেই রাশিয়া ও বৃটেনের মধ্যে শত্রুতা শুরু হয় এবং বৃটেন সর্বদা এই প্রচেষ্টাই চালাইয়া যায় যাহাতে ইরান শক্তিশালী হইতে না পারে। কারণ রাজনৈতিক দিক হইতে ইরান রাশিয়ার প্রভাব বলয়ে আসিয়া গিয়াছিল। এই কারণেই বৃটেন আফগানিস্তানে ইরানের সর্বপ্রকার প্রভাব বিস্তারের বিরোধিতা করে। বহুদিন ধরিয়া ইরানীদের হিরাত জয়ের আন্তরিক আকাঙ্খা ছিল। ১৮৩৮ খৃ. বৃটেন ইরানীদেরকে উহা হইতে বিরত রাখে। ১৮৫৬ খৃ. ইরানীগণ সত্যসত্যই যখন হিরাত অধিকার করিয়া লয় তখন বৃটেন ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং পারস্য উপসাগরে তাহার সৈন্য মোতায়েন করে। ১৮৫৭ খৃ. প্যারিসে যে সন্ধি হয় তাহা সম্পাদনের সময় ইরানকে তাহার দাবি পরিত্যাগ করিতে হয়। এই সময়ে রাশিয়ার শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আসতারআবাদ উপসাগরে রাশিয়ানদের একটি নৌ-ঘাটি স্থাপিত হয়। ১৮৮১ খৃ. তিক্কা ও তুর্কমানগণকে পরাস্ত করিবার মাধ্যমে রাশিয়ানদের খীওয়া ও বুখারা বিজয় পরিপূর্ণ হয়। মারব-এর খেজুর বাগানও রাশিয়ানদের হস্তগত হয়। এমনিভাবে সামরিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে রাশিয়া ইরানের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। উত্তর আফগানিস্তান ও তুরস্কের আরমেনিয়ায় রুশীয়দের অনুপ্রবেশে ইহা আরও শক্তিশালী হয়। ইরান তাহার পূর্ণ স্বাধীনতার স্বীকৃতি পাওয়ার উপযুক্ত ছিল না। অবশ্য প্রথমবারের মত তাহাদের সীমানা ভালভাবে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। ইরাকে তুর্কীদের সহিত যে মনোমালিন্য হয় তাহারই ফলে ১৮৪৩ খৃ. তুর্কী- ইরানী সীমান্ত নির্ধারিত হয় (১৯১৩ খৃ. এই সীমান্ত সংশোধন করা হয়)। অপর দিকে ১৮৭২ খৃ. বৃটেন, ইরান ও আফগানিস্তানের সীমানা নির্ধারণকারী প্রতিনিধি দল আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের সহিত পূর্ব সীমান্ত নির্ধারণ করিয়া দেয়। ইরানের মধ্য দিয়া হিন্দুস্তানে তার (Telegramme) লাইন লইয়া যাওয়ার প্রয়োজনেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। নাসি'রু'দ-দীন শাহ (ক'াযার)-এর দীর্ঘ শাসনামলে (১৮৪৮-১৮৯৬ খৃ.) আন্তর্জাতিক অবস্থা পূর্ববতই অক্ষুণ্ণ থাকে। কারণ সামগ্রিক দিক হইতে ইরানের অভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন পূর্ণ শান্ত ছিল। কিন্তু নাসিরু'দ-দীনের প্রতিনিধি (মুজ'াফ্ফারু'দ-দীন শাহ কাযার)-এর সময়ে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনার কারণে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তখন দুই বৃহৎ শক্তির (রুশ ও বৃটেন) অনুপ্রবেশ অত্যধিক ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি করে। এই অনুপ্রবেশের ফলেই ১৯০৭ খৃ. রাশিয়া ও বৃটেনের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাহার ফলে ইরান দুইটি রাজনৈতিক প্রভাব বলয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। একটি উত্তর দিকের, অন্যটি দক্ষিণ দিকের।

উনবিংশ শতকে প্রকৃতপক্ষে কাযার বংশ প্রাচীন ঐতিহ্য ও শান-শওকতের সহিত ইরান শাসন করিতে সফল হয়। কারণ তাহারা বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী বিরোধী গোত্র এবং উহার নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের সুযোগে তাহাদিগের সর্বপ্রকার তৎপরতা স্তব্ধ করিয়া দিতে সর্মথ হন। জনসাধারণের মধ্যে শী'আ নেতৃবৃন্দের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। তাঁহারা বেশীর ভাগই কারবালা ও নাজাফের ধর্মীয় কেন্দ্রস্থলে বাস করিতেন। সাধারণ 'আকীদা ছাড়াও কিছু কিছু ধর্মীয় মতবিরোধ ঊনবিংশ শতকের শুরু হইতেই জন্ম লইতে থাকে। যেমন শায়খিয়া সম্প্রদায়, ইহাদের মধ্যে ছিল রূহ্ বা আত্মার প্রাধান্য। আর ইহা হইতেই অবশেষে 'বাব'-এর আত্মপ্রকাশের পথ সুগম হইয়া যায়। 'বাবী' আন্দোলনে কয়েক বৎসর পর্যন্ত একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক বিদ্রোহ নিহিত ছিল। তাই ব্যাপক রক্তপাতের মাধ্যমে সরকারকে উহা দমন করিতে হয়। তখন হইতেই 'বাবী' মতবাদ এবং পরে উহারই সৃষ্টি 'বাহাঈ' আন্দোলন, উভয়টি ইরান হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু ইরানীদের জাতীয় ও ধর্মীয় জীবনে ইহার কিছু প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। উহা দ্বারা শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয় এবং তাহারা এক প্রকার স্বাধীন জীবন যাপন করিতে থাকে। তাহারা যখন সরকারের ক্রিয়াকলাপের তীব্র সমালোচনা শুরু করে তখন মুজতাহিদগণের (ইসলামী শাস্ত্র গবেষক) অধিকাংশই তাহাদের পক্ষ সর্মথন করেন। জামালুদ-দীন আফগানী (দ্র.)-র তাহরীক-ই ইত্তিহাদ-ই ইসলামী (ইসলামী ঐক্য আন্দোলন)-ও গণঅনুভূতি জাগ্রত করিয়া তুলিবার মত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে। অতঃপর মুজ'াফ্ফারু'দ-দীন শাহ-এর আমলে যখন অভ্যন্তরীণ অবস্থা নাযুক হইয়া পড়িতেছিল এবং পূর্ববর্তী শাসকগণ

কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিপত্রের মাধ্যমে গৃহীত বৈদেশিক ঋণের অশুভ পরিণতি দেখা দিতে লাগিল, জনগণ তখন ইহার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়া উঠে। এই কারণে শাহ সাংবিধানিক সরকার দিতে এবং ১৯০৬ সনের ১ অক্টোবর প্রথম জাতীয় পরিষদের উদ্বোধন করিতে বাধ্য হন। ১৯০৯ খৃ. মুজা'ফ্ফারু'দ-দীনের উত্তরাধিকারী মুহাম্মদ 'আলী শাহ-এর বরখাস্তের মধ্য দিয়া তাঁহার হঠকারিতা ও চতুরতার অবসান ঘটে। কিন্তু বৈপ্লবিক আন্দোলনের ফলে যে হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় উহা রুশ্দিগকে তাব্রীয ও কাযবীন অধিকারের সুযোগ করিয়া দেয়। অপরদিকে ইরান সরকার তখন তাহার রাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন বিভাগে (অর্থাৎ সামরিক পুলিশ, অর্থনীতি, আমদানী কর) বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সরকারীভাবে ইরান নিরপেক্ষ ছিল। কিন্তু ১৯১৫ খৃ. বৃটিশ ভারতের উপর জার্মানী আক্রমণের পরিকল্পনা করিলে জার্মানীর প্রচার প্রোপাগাণ্ডার অভিযান প্রথমবারের মত ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে সফলকাম হয়। অপরদিকে রুশ সৈন্যগণ এনযোলীতে অবস্থান গ্রহণ করে এবং ১৯১৬ খৃ.-এ কিরমান শাহ বিজয়ের মধ্য দিয়া যে তুর্কী আগ্রাসনের সূচনা হয় রুশীয় বাহিনী তাহা প্রতিহত করে। এই বৎসরই ইংরেজগণ পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে দক্ষিণ ইরানে একটি বিশেষ সৈন্যবাহিনী (South persian Rifles) গঠন করে। ১৯১৭ খৃ.-এর বিপ্লবের কারণে রুশ বাহিনী যখন দুর্বল হইয়া পড়ে বৃটিশ সৈন্য তখন পারস্য উপসাগরে অবতরণ করে এবং পশ্চিম সীমান্তে তুর্কী আগ্রাসন বন্ধ করিতে ও গীলানে জংগলীদের স্থানীয় বিদ্রোহ দমন করিতে রুশীয় বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালায়। এই প্রচেষ্টায় তাহারা সফলকামও হয়। পরে ১৯১৮ খৃ. শীরাযে কাশ্কাঈ গোত্রের নেতৃত্বে সংঘটিত এমনি ধরনের একটি জাতীয় বিদ্রোহও দমন করিতে ইংরেজ-গণকে হিমশিম খাইতে হয়।

যুদ্ধ শেষ হইবার পরই ইরান হইতে সৈন্য প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয় এবং ইরান জাতিপুঞ্জ (League of Nations)-এর সদস্যপদ লাভ করে। ১৯১৯ খৃ. বৃটেনের সহিত যে চুক্তি সম্পাদিত হয় উহার ফলে পুনরায় বৃটেনের প্রভুত্ব কায়েম হয়। কিন্তু এই বৎসরই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় হঠাৎ যে বিপ্লব শুরু হয় উহার ফলে ইরানের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি পরিবর্তিত হইয়া যায়। সায়্যিদ যিয়াউদ-দীন ও রিযা খান (رضا خان) অস্ত্রের মুখে ক্ষমতা দখল করিয়া লন। রিযা খান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত হন। দেশে তখন এই ধরনেরই লৌহ মানবের প্রয়োজন ছিল। পরবর্তী কয়েক বৎসর তিনি বিশৃঙ্খলা ও কলহপ্রিয় গোত্রগুলিকে সম্পূর্ণরূপে স্বীয় কর্তৃত্বে আনয়ন এবং ৪০ হাযার যুবকের একটি বিশ্বস্ত সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। ১৯২৩ খৃ. তিনি প্রধান মন্ত্রী হন। আহমাদ শাহ কাযার প্যারিসে চলিয়া যান। ১৯২৫ খৃ.-এর অক্টোবরে জাতীয় সংসদ তাঁহাকে বরখাস্ত করিয়া কাযার গোত্রের অবসান ঘটায়। ১৯২৫ খৃ.- এর ১৩ ডিসেম্বর সংসদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রিযা খান পাহ্লাবী উপাধি ধারণ করিয়া ইরানের শাহানশাহ হইবার ঘোষণা প্রদান করেন। তখন হইতেই ইরানের এক নূতন যুগের সূচনা হয় (বিস্তারিত পরে দ্র.)।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ হইতে উল্লিখিত নিবন্ধগুলির বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জীর জন্য সাধারণত ইরানের ইতিহাস, ভূগোল এবং বংশ সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থাবলী দ্র. এবং ইরান সম্পর্ক সাধারণ রচনাবলীর উদ্ধৃতিই যথেষ্ট, যথাঃ (১) M.Schwab, Bibliographie de la perse, প্যারিস ১৮৭৫ খৃ. এবং (২) A. T. Wilson, A Bibliography of persia, অক্সফোর্ড ১৯৩০ খৃ.; [আরও দ্র. (৩) Encyclopaedia Britannica, ১২খ. (ইরান প্রবন্ধ) এবং ১৭খ. (পারশিয়া প্রবন্ধ); (৪) The Statesman's year Book 1966-1967; (৫) World Muslim Gazetteer, করাচী ১৯৬৪ খৃ.]।

J. H. Kramers ও স. প. (দা. মা. ই.)/ ড. আবদুল জলীল

(গ) পাহ্লবী ইরান ঃ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্ত মুতাবিক রিযা খান পাহ্লাবী ইরানের শাহনশাহ ঘোষিত হন এবং ১৯২৬ খৃ.-এর ১৫ এপ্রিল তাঁহার অভিষেক অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

ক্ষমতা গ্রহণ করিবার পর রিযা শাহ পাহ্লাবী সর্বপ্রথম সারাদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ বহাল ও পাকাপোক্ত করেন। ইহার পর তিনি সকল সাবেক চুক্তিপত্র বাতিল করিয়া (১৯২৮ খৃ.) সমতার ভিত্তিতে বহির্বিশ্বের সহিত ইরানের সম্পর্ক জোরদার করিতে আরম্ভ করেন। রাজস্বের উৎসসমূহকে জাতীয় মালিকানাভুক্ত করা হয় এবং উন্নত মানের একটি জাতীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন সাধন করা হয়। ট্রান্স-ইরানিয়ান রেলওয়ে তাঁহার শাসনামলের একটি গৌরবময় ও অক্ষয় কীর্তি। ১৯৩৪ খৃ. তিনি তেহ্রান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৩৭ খৃ.-এর ৮ জুলাই সাদ 'আবাদ চুক্তির অধীনে ইরাক, তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্তান ঐক্যবদ্ধ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে ইরান নিরপেক্ষ নীতি ঘোষণা করে; কিন্তু ১৯৪১ খৃ.-এ মিত্র শক্তি (রাশিয়া ও বৃটেন) ইরানকে তাহার দেশ হইতে জার্মানদিগকে বহিষ্কার করিতে বলিলে ইরান উহাতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ২৬ আগস্ট বৃটিশ ও সোভিয়েত বাহিনী ইরানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ১৬ সেপ্টেম্বর রিযা শাহ তাঁহার পুত্র মুহ'াম্মদ রিযার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। বৃটেন ও রাশিয়ার সহিত এক ত্রিদলীয় মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের ফলে ইরান পূর্ণ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব লাভ করে। বিনিময়ে ইরানকে মিত্র শক্তির যুদ্ধের প্রয়োজনে দেশের সকল ঘাঁটি ব্যবহারের নিঃশর্ত অনুমতি প্রদান করিতে হয়। চুক্তিতে ইহাও উল্লেখ করা হয় যে, যুদ্ধ শেষ হইবার পর মিত্র বাহিনী ৬ মাসের বেশী ইরানে অবস্থান করিবে না। মার্কিন ও বৃটিশ বাহিনী ১৯৪৬ খৃ.-এর মার্চ মাসেই শর্ত মুতাবিক ইরান হইতে চলিয়া যায়, কিন্তু সোভিয়েত বাহিনী আরও জাঁকিয়া বসে। অবশেষে নিরাপত্তা পরিষদের শরণাপন্ন হইলে ১৯৪৬ খৃ.-এর মে মাসে তাহারা বিদায় নেয়। শুরু হইতেই ইরান জাতিসংঘের সদস্য। ১৯৫১ খৃ.-এর এপ্রিলে ডঃ মুসা'দ্দিকে'র প্রচেষ্টায় জাতীয় সংসদ তৈল শিল্প জাতীয়করণের নীতি মঞ্জুর করে এবং মে মাসে ডঃ মুসাদ্দিক প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। বৃটিশ সরকার এবং এ্যাংলো- ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানী আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা রুজূ করে, কিন্তু ইরানের দাবি ছিল, এই বিষয়টি আদালতের এখ্তিয়ার বহির্ভূত। ১৯৫২ খৃ.-এর জুলাই মাসে আদালত এই দাবি সঠিক বলিয়া মানিয়া লয়। ২৩ অক্টোবর বৃটেনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। এই সময়ই শাহানশাহ ও ডঃ মুসাদ্দিকের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। অতি শীঘ্রই উহা এত চরম আকার ধারণ করে যে, ১৯৫৩ খৃ.-এর ফেব্রুয়ারীতে বাদশাহ পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জাতীয় পরিষদের কিছু সংখ্যক সদস্য মুসাদ্দিকের নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়া উঠে এবং তাঁহার পদত্যাগ দাবি করে। মুসাদ্দিক তদুত্তরে জনমত যাচাইয়ের ভিত্তিতে দাবি করেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তাঁহার পক্ষে এবং তিনি সংসদ ভাঙ্গিয়া

দেন। রক্তক্ষয় ও গৃহযুদ্ধ হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য শাহানশাহকে দেশ ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু তিনদিন পরই জেনারেল যাহিদী এক ফরমান বলে প্রধান মন্ত্রিত্ব দখল করেন। মুসাদ্দিক ও তাঁহার সরকারের সদস্যবর্গকে গ্রেফতার করা হয় এবং শাহানশাহকে দেশে ফিরাইয়া আনা হয়। ১৯৫৩ খৃ.-এর ডিসেম্বরে বৃটেনের সহিত সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয় এবং তৈলের ব্যাপারে একটি মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্য আলোচনা শুরু হয়। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, ইরান সরকার এবং তৈল কোম্পানীগুলি লভ্যাংশের সমান অংশীদার হইবে এবং দেশের চাহিদা মিটাইবার জন্য ইরানের জাতীয় কোম্পানী নাফাতশাহ-এর প্রস্রবণ ও কিরমান শাহ-এর কারখানার সাহায্য গ্রহণ করিবে। এই সকল বাদ-বিসম্বাদের একটি দুঃখজনক পরিণাম ইহাই দাঁড়াইল যে, সংস্কারের গতি অত্যন্ত মন্থর হইয়া পড়িল। ফলে রাষ্ট্রে আবার বিশৃংখলা ও গোলযোগ দেখা দিল। ১৯৫৫ খৃ.-এর এপ্রিলে যাহিদী মন্ত্রী পরিষদ ক্ষমতাচ্যুক্ত হয় এবং শাহানশাহ রাজনীতিতে কার্যকরভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে শুরু করেন।

শাহানশাহ-এর নেতৃত্বে দেশ অতি শীঘ্রই ডঃ মুসাদ্দিকের সরকারের আমলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দৈন্য কাটাইয়া উঠে এবং বিভিন্ন ধরনের সংস্কারমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা চাঙ্গা হইয়া উঠিতে থাকে। ১৯৫৫ খৃ.-এর অক্টোবরে ইরান বাগদাদ চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করে, যাহা পরবর্তী কালে CENTO নামে প্রসিদ্ধ হয়। মৌলিকভাবে ইহা ছিল একটি প্রতিরক্ষামূলক চুক্তি। তুরস্ক, ইরাক, ইরান, পাকিস্তান ও বৃটেন ইহার নিয়মিত সদস্য ছিল। ১৯৬৪ খৃ. ইরান, তুরস্ক ও পাকিস্তানের মধ্যে ইস্তাম্বুল চুক্তি সম্পাদিত হয়, যাহার ভিত্তিতে এই সকল রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার (R.C.D) সুখময় পদক্ষেপ সূচিত হয়।

সায়্যিদ আমজাদ আলতাফ (দা. মা. ই.)/ড. আবদুল জলীল

(ঘ) **শ্বেত বিপ্লব ঃ** ১৯৬২ খৃ. ইরানে এক বিপ্লব সংঘটিত হয়, যাহা মেহনতী মানুষের জীবনযাত্রা একেবারে পাল্টাইয়া দেয়। এই বিপ্লবের মূল হোতা যেহেতু স্বয়ং শাহানশাহ ছিলেন সেইজন্য ইহাকে শ্বেত বিপ্লব নামে আখ্যায়িত করা হয়। ইহার পূর্বে বহুবার শাহানশাহ তাঁহার বক্তৃতায় এই কথার উপরে জোর দিয়াছিলেন যে, ইরানের এই মান্ধাতার আমলের অর্থ ব্যবস্থা পাল্টাইবার জন্য এমন এক মৌলিক বিপ্লবের প্রয়োজন যাহা কৃষক-শ্রমিক ও কারিগরের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবে। এই মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য শাহানশাহ স্বয়ং পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং ব্যক্তি ও সরকারী মালিকানাধীন ভূমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে শুরু করেন। উপরন্তু ভূমি সংস্কার নীতির মুসাবিদা পেশ করা হয়, যাহার আলোকে কোন বড় জমিদার অথবা জায়গীরদার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক ভূমির মালিক থাকিতে পারিত না। এই সংস্কার গুটি কয়েক জমিদারের স্বার্থের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায় যাহারা কৃষক-শ্রমিকের রক্ত শোষণ করিয়া নিজেদের সম্পদের পাহাড় গড়িয়া তুলিতেছিল। সুতরাং তাহারা কোমর বাঁধিয়া এই মুসাবিদা নীতির বিরোধিতা করে। দেশে কৃষকদের অবর্ণনীয় দুর্দশা না শাহানশাহ সহ্য করিতে পারিতেন, না ইরানী জাতি। ১৯৬৩ খৃ.-এর ৯ জানুয়ারী তেহরানে কৃষকদের প্রথম জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়, যাহাতে ৪ হাযারেরও অধিক কৃষক প্রতিনিধি ছাড়াও বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, শিল্প ও অর্থনৈতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণও অংশগ্রহণ করে। উহাতে শাহানশাহ শ্বেত-বিপ্লবের মৌলনীতিসমূহ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া কিছু কিছু সংস্কারও ঘোষণা করেন এবং এই ব্যাপারে জনমত যাচাই করেন। সংস্কারসমূহের সারসংক্ষেপ হইতেছেঃ (১) জায়গীরদারী প্রথার বিলোপ সাধন করা এবং ভূমি সংস্কারের প্রচলন করার উদ্দেশ্যে চাষীদের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টন; (২) সমস্ত বনাঞ্চল জাতীয়করণ; (৩) ভূমি সংস্কারের জন্য সরকারী কারখানাগুলি বিক্রয় করা; (৪) কারখানার লাভে শ্রমিকদের হিস্যা অনুমোদন; (৫) নির্বাচন আইন সংশোধন করা; (৬) বাধ্যতামূলক শিক্ষা সুলভ করার লক্ষ্যে স্বাক্ষর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা।

প্রকৃতপক্ষে বুনিয়াদী কানূন প্রচলনের পর হইতেই ইরানের শিক্ষিত সমাজ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহাদের লক্ষ্য ছিল জমিদার ও জায়গীরদারদের ক্ষমতার অবসান ঘটাইয়া মালিক শ্রমিকের অভিশপ্ত নীতির বিলোপ সাধন করা। বিগত অর্ধ শতাব্দীতে বিভিন্ন উন্নয়নকামী সংগঠন জোর প্রচেষ্টা চালাইয়া যায়। ভূমি সংস্কার নীতি প্রচলনের প্রাথমিক পর্যায় শুরু হয় ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে যখন শাহানশাহ সরকারী জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া উক্ত কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। ১৯৬০ খৃ. ভূমি সংস্কারের বিল পরিষদে পেশ করা হয়। কিন্তু জায়গীরদারদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির কারণে উহার এত অধিক সংশোধন ও রদবদল করা হয় যে, আসল নীতিই বিকৃত হইয়া যায় এবং মঞ্জুরীপ্রাপ্ত নীতি কেবল জমিদার ও জায়গীরদারদের স্বার্থই সংরক্ষণ করে। ১৯৬১ খৃ.-এর ৯ জানুয়ারী সংশোধিত বিল মন্ত্রী পরিষদে পেশ করা হয়। ১৯৬২খৃ.-এর ২৬ জানুয়ারী শাহানশাহ-এর পেশকৃত আসল বিল মতামত যাচাইয়ের জন্য ইরানের জনগণের নিকট পেশ করা হয়, যাহাতে ৫৫,৯৮,৭১১ জন সংস্কারের সপক্ষে এবং ৪,১১৫ জন বিপক্ষে রায় প্রদান করে। এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতাই সংস্কার নীতিকে জোরদার করিয়া তোলে।

ভূমি সংস্কার নীতি দুইটি পর্যায়ে চালু করা হয়। প্রাথমিক পর্যায় ছিল সেই সকল বড় বড় জমিদারের সম্পর্কে যাহারা বিশাল ভূমির মালিক ছিল। এই পর্যায়ে প্রত্যেক জমিদার তাহার পূর্ণ সম্পত্তির এক-দশমাংশ নিজের নিকট রাখিত, আর বাকী সম্পত্তি উপযুক্ত মূল্যে সরকার ক্রয় করিয়া লইত। ১০ বৎসরে উহার মূল্য পরিশোধ করা হইত, কৃষি মন্ত্রণালয় ইহার জামিন হইত। ক্রীত ভূমি কৃষকদের নিকট বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয় এবং উহার মূল্য ১৫ বৎসরের ১৫ কিস্তীতে সমানভাবে কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে উসূল করা হয়। এইভাবে জমিদারের নির্ধারিত পরিমাণের অধিক ভূমি তাহাদের নিকট হইতে লইয়া কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ভূমি সংস্কারের দ্বিতীয় পর্যায়টি ছোট জমিদারের সহিত সম্পৃক্ত। ইহাদের ভূমি ছিল প্রথম পর্যায়ের নির্ধারিত পরিমাণের কম। সেই ভূমিতে বহু কৃষক কার্য করিত। এইজন্য কৃষক ও মালিকের অংশ নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। যেমন জমির পূর্ণ বখরা দেওয়া, জমি বিক্রয় করিয়া দেওয়া অথবা ভূমি বণ্টন করিয়া দেওয়া, যাহাতে কৃষক ও ভূস্বামী তাহাদের নিজেদের লাভজনক পন্থা বাছিয়া লইতে পারে।

বনাঞ্চলকে জাতীয়করণ করিবার উদ্দেশ্য ছিল, যে সকল বনাঞ্চল ব্যক্তি মালিকানায় রহিয়াছে উহা জাতীয় মালিকানাধীন আনয়ন এবং এমনিভাবে জায়গীরদারদের দৌরাত্ম্য হইতে রেহাই প্রাপ্তি। এই সকল বনাঞ্চল ও চারণভূমি গবাদি পশু পালনকারী পেশার ব্যক্তিবর্গকে সহজ শর্তের উপর দেওয়া হয়। ইহাতে এই লাভ হয় যে, গবাদি পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়াও উহার জাত ভাল হয় এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

সরকারী কারখানা বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ছিল পুঁজি সঞ্চয় করা। ৫৭টি কারখানার অংশ বিক্রয় করা হয়। ভূমি সংস্কার নীতির আওতায় যে সকল জমিদারের সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল, তাহারা তাহাদের মূলধন দ্বারা এই অংশ ক্রয় করিয়া লয়। এমনিভাবে এই পুঁজি অনুৎপাদনশীল খাতে পড়িয়া না থাকিয়া উৎপাদনমুখী কাজে ব্যয় হয়। এই কারখানার অংশীদারদের একটি সংগঠন গড়িয়া উঠে আর এমনিভাবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জনসাধারণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কারখানার লভ্যাংশে শ্রমিকদের অংশীদারিত্বের আইন প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। ইহাতে কেবল শ্রমিকদের আয়ই বৃদ্ধি পায় নাই; বরং শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্কেরও উন্নতি হয় এবং শিল্পকারখানায় সঠিক আইন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পদক্ষেপের ফলে দেশের শিল্প উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে থাকে।

নির্বাচনী আইন প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া, পূর্বে প্রভাবশালী লোক, যথা জমিদার ও জায়গীরদারগণ তাহাদের সম্পদ ও অর্থের জোরে নির্বাচনে জয়ী হইয়া যাইত। এই আইনের ফলে কৃষক, শ্রমিক এবং নারীদের জন্য জাতীয় পরিষদের সদস্য হইবার রাস্তা খুলিয়া গেল। এই আইনের ভিত্তিতেই শাহানশাহ ১৯৬২ খৃ.-এর ২৭ ফেব্রুয়ারী ইরানের নারী সমাজকে রাজনৈতিক সমান অধিকার প্রদান করেন। ইহার ফলে ইরানের আইনের ইতিহাসে নারী সমাজ প্রথমবারের মত 'মাজলিস' (Parliament) এবং 'সিনেট' (Senate)-এর সদস্য নির্বাচিত হয়।

ভূমি সংস্কারের পাশাপাশি আরও একটি সংস্কার সূচিত হয় অর্থাৎ একটি 'জ্ঞান-ফৌজ' (শিক্ষানবীশ সৈনিক) প্রতিষ্ঠা করা, যাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ ঃ (১) শিক্ষাগতঃ মূর্খতা ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান। এই সৈনিকের কাজ হইতেছে গ্রাম-গঞ্জের নিরক্ষর লোক এবং শ্রমিকদেরকে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করা, যাহাতে তাহারা সুষ্ঠু জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। গ্রাম্য বালক-বালিকাদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক, (২) অর্থনৈতিকঃ গ্রাম ও গ্রামবাসীদের উন্নতি ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতামূলক সংগঠন, কৃষি বিষয়ক নূতন পদ্ধতি সম্পর্কে অবগতকরণ এবং গবাদি পশু পালনের সুষ্ঠু পন্থা সম্পর্কে শিক্ষা দান; (৩) সামাজিকতা ঃ গ্রাম-গঞ্জে সামাজিকতাকে ফলপ্রসূ করিয়া তোলা এবং উহার সম্প্রসারণের জন্য কৃষকদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার স্পৃহা ও মন-মানসিকতা সৃষ্টি করা, শিক্ষাগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গ্রামের লোকজনকে শরীক করা, তাহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা এবং তাহাদের হীনমন্যতবোধ দূর করা। শিক্ষক-ফৌজে সেই সকল যুবক অংশগ্রহণ করিত, যাহারা হাই স্কুলের শিক্ষা সমাপন করিয়াছে এবং যাহাদিগকে বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে যোগদান করিতে হইত। সেনাবাহিনীর দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও এই সকল যুবককে ৪ মাসের একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়া দূর-দূরান্ত অঞ্চলে প্রেরণ করা হইত। সেখানে তাহারা জনগণকে শিক্ষা প্রদান করিত। তাহারা স্বতঃস্ফূর্ত ও একনিষ্ঠভাবে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিত। শিক্ষার অগ্রগতি যদি এইরূপ অব্যাহত থাকিত তবে ১৮/২০ বৎসরের মধ্যেই ইরান হইতে নিরক্ষরতা একেবারেই বিলীন হইয়া যাইত।

এই ৬ ধরনের সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার পর শাহানশাহ আরও একটি ফরমান জারী করেন, সেই ফরমানবলে 'স্বাস্থ্যফৌজ ও কৃষি ফৌজ' গঠিত হয়। দূর-দূরান্ত অঞ্চলের স্বাস্থ্য ও কৃষি সংক্রান্ত কাজ তাহাদের উপর সোপর্দ করা হয়। স্বাস্থ্যফৌজের কর্মিগণ ছিল তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ছাত্র। তাহাদিগকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ৪ মাসের একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়া গ্রামে প্রেরণ করা হইত। সেখানে তাহারা স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম-কানুন বর্ণনা করিত এবং জনগণকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে উদ্বুদ্ধ করিত। তাহারা আপন আপন ঘর-বাড়ী, মহল্লা ও গ্রাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উপকারিতা বুঝাইত। তাহাদের সাহায্যর্থে কৃষি ফৌজ তাহাদের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া নিজদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তৎপর থাকিত।

শ্বেত-বিপ্লবের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক 'বিচারালয়'। সমগ্র দেশের গ্রামে-গঞ্জে এবং শহরে ছোট বড় আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল আদালতের বিস্তারিত বিবরণ 'আদালিয়্যা' শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করা হইবে।

এইভাবে শাহানশাহ-এর নেতৃত্বে দেশে এক বিরাট সংস্কারধর্মী বিপ্লবের সূচনা হয়, যাহাতে সকল শ্রেণীর লোক অংশগ্রহণ করে। জনগণের মধ্যে এক রাজনৈতিক জাগরণ সৃষ্টি হয়, যাহার ফলে ইরানী জাতি ধাপে ধাপে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

এস. নি'মাতী (দা.মা. ই.)/ ড. আবদুল জলীল

**(ঙ) রাষ্ট্রনীতি** ঃ ইরান ১৩ টি প্রদেশে (উস্তান) (বর্তমানে ২৪টি) বিভক্ত। প্রতি প্রদেশের গভর্নরকে 'উস্‌তানদার' বলা হয়। তেহরান বা তেহরানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের আলাদা একজন গভর্নর রহিয়াছেন যাঁহার রাজধানী তেহরান, প্রতিটি প্রদেশ আবার কয়েকটি শহরে বিভক্ত, যাহার গর্ভনরকে'ফারমানদার' বলা হয়। প্রতিটি শহর কয়েকটি জেলায় এবং প্রতি জেলা কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। জেলা প্রসাশককে'বাখশদার' এবং অঞ্চল প্রশাসককে দিহ্‌দার বলা হয়। প্রতি গ্রামে একজন গ্রাম প্রধান থাকে। এই গ্রাম প্রধান ব্যতীত আর সকল প্রশাসকই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে নির্বাচিত হন।

প্রদেশগুলির নাম হইতেছেঃ (১) গীলানঃ যানজান, ক'াযবীন ও আরাক লইয়া ইহা গঠিত, লোকসংখ্যা ১৫,০০,০০০, রাজধানী রাশ্‌ত; (২) মাযান্দারান ঃ গুরগান, দামগ'ান ও শাহরূদ ইহার অন্তর্গত, লোকসংখ্যা ১৬,০০,০০০; রাজধানী সারী; (৩) পূর্ব আযারবায়জান ঃ লোকসংখ্যা ২৭,০০,০০০; রাজধানী তাবরীয; (৪) পশ্চিম আযারবায়জানঃ লোকসংখ্যা ৮,০০,০০০; রাজধানী রিদাইয়াঃ; (৫) কিরমান শাহঃ হামার্দান ইহার অন্তর্গত; লোকসংখ্যা ১৭,০০,০০০; রাজধানী কিরমান শাহ; (৬) খুযিস্তান ঃ লুরিস্তান ইহার অন্তর্গত; লোকসংখ্যা ২৪,০০,০০০; রাজধানী আহ্‌ওয়ায; (৭) ফার্‌স ঃ লোকসংখ্যা ১৬,০০,০০০; রাজধানী শীরায; (৮) কিরমান ঃ লোকসংখ্যা ৯,০০,০০০; রাজধানী কিরমান; (৯) খুরাসান ঃ লোকসংখ্যা ১৮,০০,০০০; রাজধানী মাশ্‌হাদ; (১০) ইস্‌ফাহান ঃ লোকসংখ্যা ১৮,০০,০০০; রাজধানী ইস্‌ফাহান; (১১) কুরদিস্তান ঃ লোকসংখ্যা ৫,০০,০০০; রাজধানী সানানদাজ ; (১২) সীস্তান ও বেলুচিস্তান, লোকসংখ্যা ২,৫০,০০০; রাজধানী যাহিদান; (১৩) মধ্যপ্রদেশ ঃ তেহরান ও সিমনান ইহার অন্তর্গত, লোকসংখ্যা ৪৮,০০,০০০; রাজধানী তেহরান।

**আইন** ঃ আরিয়া মেহের শাহানশাহ মুহ'াম্মদ রিদ'া পাহলাবী ছিলেন দেশের রাষ্ট্র প্রধান। উচ্চ পর্যায়ের আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান ছিল জাতীয় পরিষদ (Parliament), যাহা ১৯০৬ খৃ.-এর ৩০ ডিসেম্বর গঠিত হয়। সংবিধানে 'সিনা' (Senate) গঠনেরও অবকাশ ছিল; কিন্তু ১৯৫০ খৃ.-এর

ফেব্রুয়ারীতে ইহা প্রথম গঠিত হয়। উহার সদস্য সংখ্যা ছিল ৬০জন, যাঁহাদের মধ্যে ৩০ জনকে শাহান্‌শাহ নির্বাচন করিতেন। ১৯৪৯ খৃ. ও ১৯৫৭ খৃ. সংধিানের সংশোধন অনুযায়ী জাতীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৩৬ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২০০ এবং উহার মেয়াদ ২ বৎসরের পরিবর্তে ৪ বৎসর করিয়া দেওয়া হয়। শাহানশাহ-এর উভয় পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে পাসকৃত আইন পুনর্বিবেচনার জন্য আবার পরিষদে প্রেরণ করার অধিকার ছিল। অবশ্য ইহা ছাড়া আর যত আইন পরিষদ পাস করিত উহা অনুমোদন করা এবং জারী করা ছিল শাহানশাহ-এর অবশ্য কর্তব্য।

জাতীয় পতাকা সবুজ, সাদা ও লাল রঙ-এর তিনটি লম্বা লম্বা পট্টি দ্বারা গঠিত। সাদা পট্টির উপর সোনালী আভার কিছুটা প্রাধান্য ছিল এবং সূর্যের গোলক ছিল।

**জাতীয় সংগীতের প্রথম চরণ ঃ** شاهنشاه ما زنده باد (আমাদের শাহানশাহ যিন্দাবাদ) (রচনায় ঃ শাহযাদাহ আফ্‌সার; সুরকারঃ দাঊদ নাজমী)। রাষ্ট্রভাষা ফার্‌সী এবং প্রধান মুদ্রা রিয়াল। এক রিয়াল-এ ১০০ দীনার। বিনিময় পদ্ধতিঃ ১ পাউণ্ড- ২১০-২১৪'২ রিয়াল;১ডলার=৭৫/৭৬ রিয়াল।

**আইন-আদালত ঃ** গ্রামে ও ছোট ছোট শহরে জজকোর্ট এবং বড় বড় শহরে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল। তেহরান, তাবরীয, শীরায, কির্‌মান শাহ, ইস্‌ফাহান, মাশ্‌হাদ, কির্‌মান ও আহ্‌ওয়ায-এ ছিল হাইকোর্ট, আর সুপ্রীম কোর্ট ছিল তেহরানে। এই সকল আদালত আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। ১৯৩০ খৃ. ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের আইন- কানুনের অনুকরণে নূতন দেওয়ানী ও ফৌজদারী করা হইয়াছিল।

**অর্থনীতি ঃ** ১৯৬৫-১৯৬৬ খৃ.-এর পরিসংখ্যানে ইরানের আয় সাড়ে সতের হাযার কোটি রিয়াল (আনু. তিরাশি কোটি পাউণ্ড) এবং ব্যয় সতের হাযার চার শত কোটি রিয়াল (= আনু. বিরাশি কোটি পাউণ্ড) দেখান হইয়াছিল। ১৯৬০ খৃ. পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইরান ঋণ ও সাহায্য হিসাবে যে অর্থ গ্রহণ করে উহার পরিসংখ্যান হইতেছে (১) উন্নয়ন ব্যাংক হইতে দুই কোটি বাষট্টি লক্ষ ডলার, (২) সাধারণ ব্যাংক হইতে পনের লক্ষ ডলার, (৩) সরকারের নিকট হইতে সাহায্য হিসাবে বাইশ লক্ষ ডলার। বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সোভিয়েত রাশিয়া হইতে পঁয়ত্রিশ লক্ষ রুবল ঋণ গ্রহণ করা হয়।

তৃতীয় সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৬২-১৯৬৮খৃ.) আনুমানিক দুই শত কোটি রিয়াল ব্যয় হয়। এই অর্থের শতকরা ২২.৫ ভাগ কৃষি ও সেচ ব্যবস্থায়, শতকরা ২৫ ভাগ পরিবহন সামগ্রী, শতকরা ১৩.৫ ভাগ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, শতকরা ১৮.৭ ভাগ সামাজিক উন্নয়ন এবং শতকরা ১১ ভাগ শিল্প ও খনিজ পদার্থ উত্তোলনে ব্যয় করা হয়।

**প্রতিরক্ষা ঃ** স্থল বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ছিল ১৭.০০.০০০। উহার মধ্যে ৮ ডিভিশন পদাতিক। প্রত্যেকের জন্য দুই বৎসর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা ছিল বাধ্যতামূলক। নৌ-সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে ছিল একটি যুদ্ধ জাহাজ, চারটি যুদ্ধ নৌকা, চারটি মাইন পরিষ্কারক জাহাজ, চারটি চলাচলের জাহাজ, একটি তেলবাহী জাহাজ, নয়টি মোটর লঞ্চ ও একটি মেরামতকারী জাহাজ প্রভৃতি।

বিমান বাহিনীতে কর্মরত ছিল দশ হাযার সৈনিক। ছয় স্কোয়াড্রন জংগী বিমান, ৭৫টি জেট বিমান এবং ৬৫ টি ছিল অন্যান্য বিমান।

**কৃষি ঃ** ইরানবাসীদের সর্বাপেক্ষা বড় পেশা হইতেছে কৃষি। প্রধান ফসল গম, যাহা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যথেষ্ট (১৯৬০ খৃ. ছয় লক্ষ চুরাশি হাযার টন)। ধানের ফলনও খুব ভাল হয়, বিশেষ করিয়া খাযার উপসাগরের পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপাদিত হয় (১৯৬০ খৃ. ছয় লক্ষ একান্ন হাযার টন)। এতদ্ব্যতীত ইক্ষু (পাঁচ লক্ষ অষ্টাশি হাজার টন), তূলা (নব্বই হাজার টন), ডাল (তেষট্টি হাজার টন) তামাক (বার হাজার টন), তৈল বীজ (সাত হাজার টন), এবং চা (নয় হাজার টন)- এর চাষাবাদও করা হইয়া থাকে। ফল-ফলাদিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, বিশেষত আংগুর, বাদাম ও পেস্তা। খাযার উপসাগরীয় অঞ্চলে যে রেশম উৎপন্ন হয় তাহা ইতিহাস বিখ্যাত। আর একটি উল্লেখযোগ্য উৎপাদিত দ্রব্য হইতেছে আফিম। বিগত ৪০ বৎসর ধরিয়া সেই সকল ফসল উৎপাদনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হইতেছে যাহা দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা যায়। গ্রামে সড়ক নির্মাণ করা হইতেছে এবং চাষাবাদে উন্নতির জন্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সংরক্ষণের পরিকল্পনা বিবেচনাধীন রহিয়াছে। ১৯৬৩ খৃ. দিযরূদ- এর উপর একটি বাঁধ উদ্বোধন করা হয়, যাহার ফলে তিন লক্ষ ষাট হাজার একর মরুভূমি অঞ্চল চাষাবাদের আওতায় চলিয়া আসে। রাশ্‌ত-এর নিকটবর্তী সাফীদ রূদ-এর উপরও একটি বাঁধ নির্মাণাধীন রহিয়াছে, যাহা সমাপ্ত হইলে সাড়ে চার লক্ষ একর জমি চাষাবাদের আওতায় আসিবার কথা। এতদ্ব্যতীত আরও ছোট ছোট বাঁধ নির্মাণ করা হইতেছে।

**গবাদি পশু ঃ** গবাদি পশু ইরানের একটি মূল্যবান সম্পদ। ইহা হইতে গোশ্‌ত, দুধ, কাঁচা চামড়া ও পশম পাওয়া যায় (১৯৬৪ খৃ. ভেড়া দুই কোটি ষাট লক্ষ; বকরী এক কোটি চল্লিশ লক্ষ, গরু পঞ্চান্ন লক্ষ; ঘোড়া ছয় লক্ষ, ১৯৬০ খৃ. উট চার লক্ষ চল্লিশ হাজার, মহিষ এক লক্ষ বিরাশি হাজার, টাট্টু ঘোড়া দুই লক্ষ, হাঁস মুরগী দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ)। সরকার উন্নত জাতের গবাদি পশু উৎপাদন করার, ছোঁয়াচে রোগ উৎখাত করার এবং যাযারবদেরকে একটি জায়গায় পৃথকভাবে পুনর্বাসিত করিবার মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে।

**বনাঞ্চল ঃ** বনাঞ্চল প্রায় পাঁচ কোটি একর, ইহার অধিকাংশই সরকারী মালিকাধীন। ইহা হইতে যে কাষ্ঠ উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা ইমারত, আসবাবপত্র এবং রেলের পাটি তৈরি করা ছাড়াও জ্বালানী কাষ্ঠেরও কাজ হয়।

**মৎস্য শিকার ঃ** খাযার ও পারস্য উপসাগরে মৎস্য শিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান পেশা। মৎস্য শুকাইয়া উহা সংরক্ষণ করিবার জন্য রাশিয়া ও জাপানের সহযোগিতায় কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। খাযার উপসাগর হইতে প্রতি বৎসর আটচল্লিশ হাজার টন মৎস্য উৎপন্ন হয়।

**খনিজ সম্পদ ঃ** খনিজ সম্পদের মধ্যে তৈল সম্পদ জাতীয়করণ করিবার পর বিদেশী কোম্পানীগুলির সহিত যে আলাপ-আলোচনা হয় উহারই ভিত্তিতে একটি 'কনসোর্টিয়াম' (Consortium) গঠিত হইয়াছিল। ইহা হইতে ১৯৬০ সালে ইরান পূর্ণ লভ্যাংশের যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লাভ করে উহা ছিল এক কোটি চার লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৬৩ খৃ. ইরান তৈল ব্যবসায়ে সর্বমোট সাড়ে তের কোটি পাউণ্ড আয় করে। তৈল উৎপাদনের দিক হইতে ইরানের অবস্থান মধ্যপ্রাচ্যে ৩য় এবং সমগ্র বিশ্বে ৬ষ্ঠ। অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের মধ্যে পারা, সংখিয়া (সাম্মু'ল-ফারর),বক্সাইট (Bauxite), ক্রোমাইট, কয়লা, কোবাল্ট, তামা, সীসা, ম্যাগনিশিয়াম, রাঙতা, দস্তা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

**শিল্প** ঃ ইরানে সর্ববৃহৎ শিল্পই হইতেছে তৈলের। প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহারও দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আবাদান-এর কারখানা আজকাল ইহার সাহায্যে চালিত হয়। তৈলের পরই সূতী বস্ত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কেন্দ্র ইসফাহান। ইসফাহান ও তাবরীযে পশমী কাপড়ের বড় বড় কারখানা রহিয়াছে। মাযানদারান পাট ও রেশম উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। গালিচা তৈরি করা একটি বিশেষ হস্তশিল্প বলিয়া পরিগণিত হয়। রিযা শাহ পাহ্লাবীর শাসনামল হইতে শিল্প উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে থাকে। রেশমী কাপড়, পাটের থলি এবং রশি প্রস্তুত করিবার কারখানা ছাড়াও সিমেন্টের দুইটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, যেখানে বৎসরে সাত লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টন সিমেন্ট তৈরী হয়। ইহা ছাড়া হাইড্রোক্লোরিক এসিড, বনস্পতি ঘি, সাবান এবং তামার জিনিস তৈরীর কারখানাও চালু হইয়া গিয়াছে। তেহরান সর্বাপেক্ষা বড় শিল্প কেন্দ্র। ১৯৬০ খৃ. দেশে ছোট বড় মোট চার হাজার চার শত ত্রিশটি কারখানা ছিল।

**যোগাযোগ ব্যবস্থা** ঃ ইরানে পনের হাজার মাইল লম্বা সড়ক রহিয়াছে এবং লক্ষাধিক মোটর গাড়ী চলাচল করে। দেশে ব্যাপকভাবে রেল সড়ক নির্মাণ করা হয়। ট্রান্স-ইরানিয়ান রেলওয়ে নয় শত মাইল লম্বা, যাহা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর গৌরবজনক কীর্তি, 'সেন্টো' ও ইস্তাম্বুল চুক্তি অনুযায়ী ইরানের রেলওয়ে সড়কের মাধ্যমে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত বিশেষত পাকিস্তান, তুরস্ক ও ইরাকের সহিত সংযুক্ত করা হইতেছে। রিযা ইয়্যা হ্রদে জাহাজ চলাচলও করে। বিভিন্ন স্থানে বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে এবং তেহরান হইতে য়ূরোপের সহিত বেতারের মাধ্যমে এবং বাগদাদ, লণ্ডন, ব্রুনেই ও নিউইয়র্কের সহিত রেডিও ফোনের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক প্রায় সকল কোম্পানীর বিমান পথই ইরানের উপর দিয়া গিয়াছে। তেহরান ও আবাদান আন্তর্জাতিক সংযোগের কেন্দ্রস্থল। দেশের অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল ব্যবস্থা ইরানিয়ান এয়ার ওয়েজ-এর নিয়ন্ত্রণে। ইহার বিমান পাকিস্তান, ভারত, আফগানিস্তান ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য রাজধানীতে, উপরন্তু য়ূরোপেও যাতায়াত করে।

**বিদ্যুৎ** ঃ দেশে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। দীয্ রূদ বাঁধ হইতে পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার কিলোওয়াট এবং কুরজ বাঁধ হইতে এক লক্ষ বিশ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সাফীদ রূদ বাঁধ নির্মিত হইবার পর আরও চেষট্টি হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ বেশী উৎপন্ন হইবার কথা।

**বাণিজ্য** ঃ ১৯৬০-১৯৬১ খৃ. বিদেশে মাল রফতানী করিয়া সাত শত সাতাশ কোটি বিশ লক্ষ রিয়াল উপার্জন করা হয়। উল্লেখযোগ্য রফতানী দ্রব্য হইল তৈল, পেট্রোল গালিচা, আফিম, আটা, ফল, তুলা, কাঠের আসবাবপত্র ও চাউল। বিশেষ বিশেষ আমদানী দ্রব্য হইল সূতী বস্ত্র, চা, চিনি, মোটর গাড়ী, রেলওয়ের আসবাবপত্র, মেশিনারী দ্রব্য, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম,লৌহের পাত্র, চীনা বরতন ও সিমেন্ট। ইউ. কে., সোভিয়েত রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, ভারত ও সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সহিত ইরানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বর্তমান।

ইরানের বাণিজ্যিক কেন্দ্র হইল তাবরীয, তেহ্রান, হামাদান, মাশহাদ ও ইসফাহান। বৃহৎ বন্দর' আব্বাস, খুর্রাম শাহর, বুশাহর ও বন্দর শাপুর ফারস উপসাগরে অবস্থিত। আর আস্তারা পাহ্লাবী, বাবিল, বন্দর গায ও বন্দর শাহ খাযার উপসাগরের তীরে অবস্থিত।

শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে আসিতেছে। প্রসিদ্ধ শহর ও পুরাকীর্তিসমূহের জন্য সেই সম্পর্কীয় নিবন্ধ দ্র.

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) Elwell-Sutten, Modern Iran, লণ্ডন ১৯৪১ খৃ.; (২) ঐ লেখক, Persian Oil, A Study in Power Politics, লণ্ডন ১৯৫৫ খৃ.; (৩') Haas, Iran, নিউইয়র্ক ও লণ্ডন ১৯৪৬ খৃ.; (৪) M. Ahmad, Pakistan and the Middle East, করাচী ১৯৪৮ খৃ.; (৫) Lanczowsky, Russia and the West in Iran, কর্নেল ইউনিভার্সিটি ১৯৪৮ খৃ.; (৬) মাহমূদ বারীলাবী, The Muslim Neighours of Pakistan, লাহোর ১৯৫০ খৃ., পৃ. ৩৭-৫৮; (৭) Ann Lambton, Landlord and Peasant in Persia, লণ্ডন ও নিউইয়র্ক ১৯৫৭ খৃ.; (৮) Vreeland, Iran, নিউইয়র্ক ১৯৫৭ খৃ.; (৯) Wilber, Iran, Past and Present, প্রিন্সটন ১৯৪৮ খৃ.; (১০) ঐ লেখক, Contemporary Iran, নিউইয়র্ক-লণ্ডন ১৯৬৩ খৃ.; (১১) Lockhart, Persian Cities, লণ্ডন ১৯৬০ খৃ.; (১২) আমীন বানানী, The Modernization of Iran, স্টেনফোর্ড (ক্যালিফোর্নিয়া) ১৯৬১ খৃ.; (১৩) Hardley Taylor, Bibliogrphy of Iran, লণ্ডন ১৯৬৪ খৃ.; (১৪) Benedick, Industrial finance in Iran, হারবার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস সং., ১৯৬৪ খৃ.; (১৫) Peter Avery, Modern Iran, লণ্ডন ১৯৬৫ খৃ. (গ্রন্থপঞ্জীর এক পূর্ণ সূচী এবং ইরানের মানচিত্র, দ্র. পৃ. ৫০৭ প.)। আরও দ্র. (১৬) W. Theimer, Penguine Political Dictio- nary, লণ্ডন ১৯৩৯ খৃ.; (১৭) Hyamxson, A Dictionary of International Affairs, লণ্ডন ১৯৪৬খৃ.; (১৮) Encyclopaedia Britannica, ১৯৬০ খৃ.; ১২খ, ৫৫৮ প. ও ১৭খ, ৫৪৮ প.; (১৯) World Muslim Gazetteer, করাচী ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ১৩৯ প.; (২০)The Statesmn's year Book, 1966-1967, লণ্ডন ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ১১৩৬ প.; (২১) 'আলী আসগার শামীম, Iran In the Reign of His Majesty Mohammad Reza Shah Pahlavi, ইংরেজী হইতে অনু. Aladin Pazargadi, কায়হান প্রেস সং., তা. বি.; (২২) শাহানশাহ মুহাম্মদ রিযা শাহ পাহ্লবী, রিযা শাহ কাবীর, ইরান সং., তা. বি.; (২৩) ইসফানদিয়ারী, রুস্তখীয ঈরান, তেহ্রান তা. বি.; (২৪) হুসায়ন মাক্কী, তারীখ বাস্ত সালা-ই ঈরান, তেহ্রান ১৯৪৫-১৯৪৬ খৃ.; (২৫) তামান্না'ঈ, ঈরান এক তা'আরুফ), করাচী ১৯৬০ খৃ.; (২৬) মুহাম্মাদ 'আলী যুরনিগার, আপনে ওয়াতান কে লিয়ে (শাহানশাহ ইরানের আত্মজীবনীর উর্দু অনু.), করাচী ১৯৬৩ খৃ.।

সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/ ড. আবদুল জলীল

**(চ) শিক্ষা ব্যবস্থা (রাজতন্ত্রের আমলে)** ঃ ইরানের ভৌগোলিক অবস্থা উহার শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। একদিকে ভারতবর্ষ ও চীন, অন্যদিকে এশিয়া মাইনর, ভূমধ্যসাগর ও য়ূরোপের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানের কারণে দেশটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তাহযীব ও তামাদ্দুন দ্বারা সর্বদাই উপকৃত হইয়াছে এবং ইরানী জনগণকে ইরানী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করত প্রাচ্যের তাহযীব ও তামাদ্দুন পাশ্চাত্যে এবং পাশ্চাত্যের তাহযীব- তামাদ্দুন প্রাচ্যে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। ইরানের উত্তর সীমান্তে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক না থাকায় অন্যান্য জাতি ও গোত্রগুলি (যথা তুরানী, গুয, মুগল, তাতারী, তুর্কী ও উযবেক) সাইবেরিয়ার

দক্ষিণ মরুভূমি, মঙ্গোলিয়া ও তুর্কিস্তান হইতে বারবার ইরানের উপর আক্রমণ পরিচালনা করিয়াছে এবং তাহাদের আক্রমণে দেশটি বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু আক্রমণকারী গোত্র ইরানের পথে হিন্দুস্তান ও এশিয়া মাইনরের উপরও আক্রমণ করিত এবং সংগে সংগে ইরানী তাহযীব- তামাদ্দুনের কিছু প্রভাব প্রতিবেশী রাষ্ট্রেও পৌঁছাইয়া দিত। ইরানের আবহাওয়া এবং মালভূমি মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতি ও শিক্ষা-দীক্ষার উপর কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এখানে আর একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা প্রয়োজন, তাহা হইতেছে যরাথুষ্ট্রীয় ধর্মের প্রভাব। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে প্রায় ১৭ শত বৎসর যাবত ইরানীগণ যরাথুষ্ট্রীয় ধর্মের শিক্ষানুযায়ী জীবন যাপন করিত এবং এই সময় পর্যন্ত যরাথুষ্ট্রীয় চারিত্রিক শিক্ষা অর্থাৎ সত্য কথা বলা, সৎ কাজ করা, সত্যপরায়ণ হওয়া, ন্যায়পরায়ণতা, কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং ধৈর্য ও সহনশীলতা মানুষের অন্তরে রেখাপাত করিয়াছিল। (ইসলামের আবির্ভাবের পর নূতন ধর্মীয় অনুশাসন ইরানীদের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য ও রীতিনীতির সহিত মিলিত হইয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত কিছু নূতন প্রবণতার জন্ম দেয়— যাহাদের প্রভাব সমগ্র ইসলামী বিশ্বের উপরই পড়ে)।

জাহিলী যুগে একেমেনীয়, আশকানীয় ও সাসানীদের শাহানশাহীর সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ উচ্চ শ্রেণীর লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সিলেবাসে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিলঃ আইন, ধর্মশাস্ত্র, লিখন-পঠন, অংক, ওযন ও পরিমাপ, ইতিহাস, সাহিত্য, অশ্ব চালনা, পোলো খেলা এবং বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রের ব্যবহার। উচ্চ স্তরের জ্ঞান-বিজ্ঞান, যথা ব্যবস্থাপনা, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিদ্যার জন্য বিশেষ সিলেবাস প্রচলিত ছিল। সাসানীদের রাজত্বকালে খুযিস্তানের জুনদীশাপুর বিশ্ববিদ্যালয় শত শত বৎসর পর্যন্ত বিশ্বের একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিগণিত ছিল। হিজরী তৃতীয় শতক পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম ছিল।

প্রথমে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলঃ (১) ইসলামী ও (২) যরাথুষ্ট্রীয়। ইহার পর ধীরে ধীরে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাই দেশে প্রচলিত হইয়া যায়। হিজরী প্রথম শতক হইতেই বড় বড় শহরে মসজিদ নির্মিত হইতে থাকে এবং উহা জনসাধারণের ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।

উমায়্যা যুগে আরব ও ইরানীদের মিশ্র জীবনযাত্রা শুরু হয়। ১৩২/৭৪৯-৭৫০ খৃ. শাসন ক্ষমতা আব্বাসীদের হাতে আসিয়া যায়। সাসানী শাহানশাহদের রাজধানী মাদাইনের নিকটবর্তী শহর বাগদাদের পত্তন করা হয়। পাহলাবী, সুরয়ানী, গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলী 'আরবী ভাষায় অনূদিত হইতে শুরু হয় এবং ইরানীগণ ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুনের উন্নতি সাধনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। 'আরবী, যাহা উমায়্যা যুগ পর্যন্ত কেবল সরকারী, ধর্মীয় ও কাব্য চর্চার ভাষা ছিল, তাহা সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষায় পরিণত হইল। ধীরে ধীরে দীনী ইল্‌মের বিন্যাস ও সম্পাদনা করত উহা শিক্ষাদানের জন্য বহু মসজিদে মকতব প্রতিষ্ঠা করা হয়। হিজরী তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে যখন সাসানী, যায়ারী এবং বুওয়ায়হী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উচ্চ শিক্ষার জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান কায়েম করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, হিজরী চতুর্থ শতকের শুরুতে ইরানের পূর্বাঞ্চলের বড় বড় শহর, যথা নীশাপুর, সাবয্ওয়ার, আমাল, বুখারা, বালখ, গাযনা প্রভৃতি স্থানে পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। নিজ'ামু'ল- মুলক তূসী, যিনি ৪৫৫/১০৬৩ সনে মন্ত্রিত্ব লাভ করেন, ইরানের বহু শহরে নিজ'ামিয়া নামে অনেকগুলি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাদের প্রতিটির জন্য বিস্তীর্ণ ভূমি ওয়াক্‌ফ করা হয় এবং প্রতিটি মাদরাসার একটি সুষ্ঠু পাঠ্যক্রম ও সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি ছিল। নিজ'ামু'ল-মুল্‌কই ৪৫৭/১০৬৪-১০৬৫ সনে মাদরাসা-ই নিজ'ামিয়া-ই বাগদাদ প্রতিষ্ঠা করেন, যাহা বহুকাল পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 'ইল্‌মী মারকায বা কেন্দ্র ছিল। এমনিভাবে যে সকল মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় সেইগুলি ছিল গুরুত্বপূর্ণ পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার এই ধারা এখনও মুসলিম বিশ্বে চালু রহিয়াছে। ক্রমে ক্রমে ফারসী সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হয় এবং শিক্ষা পদ্ধতিও পরিবর্তিত হয়। শিক্ষার সাধারণত দুইটি শাখা ছিলঃ (১) শার'ইয়্যাত ও (২) ফাদ'লিয়্যাত। শার'ইয়্যাতের আওতাভুক্ত ছিল দীনী 'ইলম এবং উহার পরিপূরক অন্যান্য 'ইল্‌ম অর্থাৎ মানতি'ক (যুক্তিবিদ্যা) প্রভৃতি। আর ফাদ'লিয়্যাতের আওতাভুক্ত ছিল সাহিত্য। ইহার কিছু ছিল 'আরবী আর বেশীর ভাগই ছিল ফারসী। নিজ'ামী আরূদী সামারক'ান্দী তাঁহার চাহার মাক'ালা গ্রন্থে শিক্ষার চারটি প্রধান শাখার উপর গুরুত্ব দিয়াছেন ঃ (১) ব্যবস্থাপনা ও সাচিবিক শিক্ষা; (২) কাব্যচর্চা; (৩) চিকিৎসা; (৪) জ্যোতির্বিজ্ঞান। সম্ভবত তাঁহার সময় পর্যন্ত (রচনাকাল চাহার মাক'ালা ১৯৫৬ খৃ.) এই চারটি শাখাই বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। এই সকল শিক্ষা বাস্তব প্রয়োজনে কাজে আসিত। অবশ্য শার'ঈ শিক্ষার প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরবর্তী গ্রন্থাবলী (যথা হ'াবীবু'স- সিয়ার, রাওদ'াতুস-সাফা, তারীখ-ই গুযীদা, মাজালিসু'ন-নাফাইস ও তায'কিরা-ই দাওলাত শাহ্) হইতে পরবর্তী শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া যায়। আরও বিশদ বিবরণের জন্য দ্র. শিব্‌লী, হামারী গুযাশতা তা'লীম; আবুল-হাসানাত নাদাবী, ইসলামী মাদারিস; Totah, Arab Education, মানাজি'র আহ'সান গীলানী, হিন্দুস্তান মেঁ ইসলামী নিজাম-ই তালীম ওয়া তারবিয়াত; ইব্‌ন খালদূন, মুক'াদ্দিমা, আল-গ'াযালী, ইহ্‌য়া')।

ইরানে বারবার ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞ ও বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে (যথা হিজরী ৭ম শতাব্দীতে মোংগল এবং ৮ম শতাব্দীতে তাতারীদের আক্রমণ, ১০ম শতাব্দীতে সাফাবীদের ক্ষমতা গ্রহণ এবং শী'আ মতবাদের সরকারী পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ, এমনিভাবে ১২শ শতাব্দীতে দুর্ধর্ষ নাদির শাহের ক্ষমতা দখল); কিন্তু ইহাতে উল্লেখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মৌলিক কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। অবশ্য পাঠ্যক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র সংখ্যা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতেই সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুরোধা গুণীজন সৃষ্টি হইয়াছে। যথা ফিরদাওসী, বূ'আলী সীনা, আল-বীরূনী, 'উমার খ্যায়াম, আল-গ'াযালী, সা'দী, জালালু'দ-দীন রূমী, নাস'ীরুদ্-দীন তূসী এবং হাফিজের ন্যায় শত শত প্রখ্যাত মনীষী, যাঁহাদের অমর কীর্তি ও অবদান সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধ। নূতন করিয়া উহা বর্ণনার অবকাশ রাখে না। উল্লেখ্য, মনীষীরা বলেন, ইসলামের প্রথম শতাব্দীকাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য মৌলিক অবদানের জন্য যাঁহারা চিরস্মরণীয় তাহাদের মধ্যে পারস্যবাসীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে সর্বাধিক।

হিজরী ১৩শ শতকের শুরু হইতে ইরান যখন রাশিয়ার প্রকাশ্য হুমকির সম্মুখীন হয় তখন অবস্থানুযায়ী কখনও ১ম নেপোলিয়ানের সহিত মিত্রতা স্থাপন করে— আবার কখনও বৃটিশ সরকারের সহিত। তখন উভয়

সরকারের লোলুপ দৃষ্টি ভারতবর্ষের উপর নিবদ্ধ হয়। গ্রেট বৃটেন ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য বহাল রাখিবার এবং নেপোলিয়ন সেই আধিপত্য নস্যাৎ করিবার জন্য ইরানের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রত্যাশী ছিলেন। এমনিভাবে ইরানের তাহযীব-তামাদ্দুনের উপর আধুনিক যুরোপ, বিশেষত ফ্রান্সের প্রভাব পড়িতে শুরু করে। অবশেষে ১২৬৮/১৮৫২ সনে তেহ্‌রানে দারুল-ফুনূন (উচ্চতর বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহাতে স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীও ছিল এবং কলেজের বিভিন্ন শাখাও ছিল। কারণ এখানে স্কুলে পাঠ্যক্রম পর্যন্ত দর্শন, অংক, ইতিহাস, ভূগোল এবং বিদেশী ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হইত, আবার চিকিৎসা, ভেষজ বিজ্ঞান, প্রকৌশলী এবং সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল।

দারুল-ফুনূন এবং অন্যান্য নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, উচ্চ শিক্ষার্থে যুরোপ গমন, পাশ্চাত্য দেশসমূহের সহিত ইরানের সম্পর্ক বৃদ্ধি প্রভৃতির মাধ্যমে ইরানবাসী আধুনিক চিন্তাধারার সহিত এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ধ্যান-ধারণার সহিত পরিচিত হয় এবং ধীরে ধীরে ১৩২৪/১৯০৬-১৯০৭ সনের বিপ্লবের পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। এই বিপ্লবের ফলে ইরানের নিয়মতান্ত্রিক সরকার এবং পার্লামেন্ট (জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ) প্রতিষ্ঠা এবং সংবিধান প্রণয়নের জন্য শাহী ফরমান জারী হয়। ইহার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ফ্রান্সের শিক্ষা ব্যবস্থানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। ১৩৪০/১৯২১-১৯২২ সনে রিযা শাহ পাহ্‌লাবীর নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থানের পর দেশে শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, উচ্চ শিক্ষার্থে ছাত্রদের যুরোপ গমন এবং জনসাধারণের দোরগোড়ায় শিক্ষার আলো পৌঁছাইয়া দেওয়ার কাজ অতি দ্রুত গতিতে চলিতে থাকে।

দেশের অন্য সকল বিভাগের ন্যায় শিক্ষা বিভাগও কেন্দ্রের অধীনে ছিল এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ছিল সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে। দেশের সকল ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিও ইহারই তত্ত্বাবধানে ছিল এবং উহার আয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঐতিহাসিক ভবন এবং পবিত্র স্থানের দেখাশোনার কাজে ব্যয় করা হইত। দেশে ৩৮টি শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়, উহার মধ্যে কোনও কোনটি অনেক বড়, যথা খুরাসান ও ফার্‌স বোর্ডদ্বয়। প্রতিটি বোর্ডের মহাপরিচালক (শিক্ষা ব্যবস্থাপক) কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে নিয়োগ করা হইত। সিলেবাস, শিক্ষা পদ্ধতি, নিয়ম নীতি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাপারে শিক্ষা বিষয়ক উচ্চতর পরিষদের অনুমোদনক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইত। ১৩২০ (সৌর)/ ১৯৪০ সন হইতে বিভিন্ন শহরে ইহার আরও শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়, যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজন মত শিক্ষা নীতি ও পাঠ্যক্রম সংশোধনের ব্যাপারে স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা। সরকারী মাদরাসার ব্যয় সরকারই নির্বাহ করিত। ১৩৩১/১৯৫১ সনে রাষ্ট্রীয় বাজেটের প্রায় ১২% (শতাংশ) শিক্ষা খাতে ব্যয় হয়।

ইরানে প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা, মাকতাবখানাহ্ এবং দীনী শিক্ষার মাদ্‌রাসা-গুলিতে প্রচলিত রহিয়াছে। মাকতাবখানাহ্ সাধারণত মসজিদ ও দীনী মাদরাসার সহিত সংযুক্ত অথবা ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাদাতার গৃহে অবস্থিত। ইহার পাঠ্যক্রম সাধারণত কুরআন (নাজি'রা), ফারসী লিখন ও পঠন, প্রাথমিক পর্যায়ের দীনী মাসআলা ও অঙ্ক। কোন কোন মাকতাবে আরবী নাহ্ও-সার্‌ফ (ব্যাকরণ)-ও শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাতে এইখানকার শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্ররা প্রাপ্ত বয়সে পদার্পণ করিয়া দীনী মাদরাসায় ভর্তি হইতে পারে, যেখানে সাধারণত 'আরবী গ্রন্থ পড়ান হইয়া থাকে। ১৩১২/১৯৩২ সন হইতে সরকারী প্রাইমারী মাদরাসায় অবৈতনিক শিক্ষা শুরু হয়, যাহার ফলে মকতবের সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতেছে। ১৩৩১/১৫৫১ সনে এখানে ৬১১টি মকতব ছিল এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল সতের হাজারের কিছু বেশী।

দীনী মাদরাসা প্রাচীন যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং অধিকাংশ শহরেই উহার নিজস্ব ভবন রহিয়াছে। ১৯৫১ খৃ. উহার মোট সংখ্যা ছিল ২১০ এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮ হাজার। দীনী শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই ছিল মাশহাদ ও কুম্ম-এ শিক্ষারত। ওয়াক্‌ফ ও দান তহবিল হইতে তাহাদিগকে ভাতা দেওয়া হইত। পাঠ্যক্রমে কোন নির্ধারিত সময়সীমা ছিল না; বরং ইহা নির্ভর করিত ছাত্রের যোগ্যতা, পারদর্শিতা ও প্রয়োজনের উপর। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ ছিল দীনী মাদরাসাসমূহের পাঠ্যক্রমভুক্তঃ ' আরবী, নাহ্‌-সারফ (ব্যাকরণ), মানতিক (যুক্তিবিদ্যা), কালাম, হাদীছ, ফিক্‌হ, উসূলুল ফিক্‌হ, কুরআনের তাফসীর। আর কোন কোন মাদরাসায় অংক শাস্ত্র, দর্শন, জাতি ও ধর্মের ইতিহাস, আধুনিক বিজ্ঞান এবং বিদেশী ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হইত। যে সকল ছাত্র সফলতা লাভ করিত তাহাদিগকে মুজতাহিদগণের পক্ষ হইতে সার্টিফিকেট দেওয়া হইত। তাহারা সাধারণত দীনী মাদরাসার শিক্ষক অথবা ওয়ায়েজ ও সালাতের ইমাম নিযুক্ত হয়।

নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে ১৩২৯/১৯১১ সন হইতে চারি ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু রহিয়াছে। (১) গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয়;(২) শহর-বন্দরের প্রাথমিক বিদ্যালয়; (৩) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং (৪) উচ্চ বিদ্যালয় (ইন্টারমিডিয়েট কলেজ)। এতদ্ব্যতীত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় (তেহ্‌রান, শীরায, তাবরীয, ইসফাহান, মাশহাদ, আহওয়ায) এবং কিছু সংখ্যক মেডিকেল ও টেকনিক্যাল কলেজ ছিল। বিগত ২০ বৎসরে উচ্চ শিক্ষা পরিষদের অনুমোদনক্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা প্রচলিত থাকে।

গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সময়সীমা ৪ বৎসর এবং শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ বৎসর। ইহার পর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সময়সীমা ও ৬ বৎসর। আর ইহা ৩ টি টার্ম-এ বিভক্ত। প্রথম টার্ম ৩ বৎসর; দ্বিতীয় টার্ম ২ বৎসর এবং তৃতীয় টার্ম এক বৎসরের বিশেষ পাঠ্যক্রম (Specialized Course) যাহা অংক, ফারসী সাহিত্য এবং বাণিজ্যিক শিক্ষার মধ্য হইতে যে কোন একটি বিষয়ে হইয়া থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষা ৭ বৎসর বয়স্ক সকল ইরানী শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক। বিদ্যালয়ে কেবল নামমাত্র ফিস থাকে। এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ সাধারণত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৯৬৩ খৃ. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১২,৪৫১ এবং উহার ছাত্র সংখ্যা ১৭,১৯,৪২৬।

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আসল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদিগকে উচ্চ শিক্ষা এবং বিশেষ বিষয়ের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা। যে সকল ছাত্র উচ্চ মাধ্যমিকের ৩য় শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্ত করত আর্ট স্কুল অথবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইতে ইচ্ছা করে তাহাদিগকে ৩য় বৎসরের পরীক্ষা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে দিতে হয়। পাঁচসালা পাঠ্যক্রম পূর্ণ করিবার পর মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হইতে পুনরায় পরীক্ষা লওয়া হয়। লিখিত পরীক্ষা হয় ৯ পত্রের ঃ ফারসী, 'আরবী, বিদেশী ভাষা, চিকিৎসা, রসায়ন,

ইতিহাস, ভূগোল, এ্যালজেব্রা, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি, ড্রয়িং এবং পেইনটিং। এতদ্ব্যতীত ফারসী ও 'আরবী বিদেশী ভাষা, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং দীনিয়াত ও আখলাকিয়্যাত ৪টি বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষা হয়। ৬ষ্ঠ বর্ষ শিক্ষা সমাপ্তির পর উচ্চ মাধ্যমিকের শেষ পরীক্ষা হয় এবং সকল ছাত্রকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হইতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সনদ দেওয়া হয়।

উচ্চ মাধ্যমিকের পাঁচসালা পাঠ্যক্রমের সনদপ্রাপ্ত ছাত্রগণ দুই বৎসরের পরিবর্তে কেবল এক বৎসর বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করে অর্থাৎ ছয় মাস অফিসারদের কলেজে এবং ছয় মাস সামরিক বিভাগে অফিসার পদে। ছয় বৎসরের শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার সার্টিফিকেটধারী ছাত্রগণ এই সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুক ছাত্রিগণ এই সকল নিয়ম নীতির অধীনে উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। ছয়সালা পাঠ্যক্রমে পরীক্ষা দিয়া তাহারা মহিলা বিভাগে ভর্তি হইতে পারে। তাহাদের পাঠ্যক্রম ২ বৎসরের এবং নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উহার অন্তর্ভুক্ত ঃ ফারসী, বিদেশী ভাষা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং শিশু পরিচর্যা, নার্সিং, মনস্তত্ত্ব ও আখলাকিয়্যাত, পাক প্রণালী (রন্ধন কার্য), সেলাই বিজ্ঞান, সঙ্গীতবিদ্যা, অংকন ও চিত্রকলা। পুঁথিগত পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করিবার পর তাহারা নার্সিং, কম্পাউণ্ডারী এবং পাক-প্রণালী বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

১৯৬৩ খৃ. উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৩৮০ এবং উহার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩,৪১,৯০৫। উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষকগণ তেহরান টিচার্স ট্রেনিং কলেজ হইতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

টেকনিক্যাল শিক্ষার জন্য তিন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে ঃ (১) গ্রাম শিক্ষা কেন্দ্রঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর পর এখানে ভর্তি হওয়া যায়। ইহার পাঠ্যক্রম ৩ বৎসরের। পাঠ্য তালিকায় রহিয়াছে ফারসী, দীনিয়াত, পৌরনীতি, অংক, চিকিৎসাবিদ্যা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল, কৃষিবিদ্যা, পশু পালন, মুরগী, মৌমাছি ও রেশমী পোকা পালনবিদ্যা। আর ব্যবহারিক তালিকায় রহিয়াছেঃ কৃষিকাজ, ছুতারের কাজ এবং কৃষি শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ; (২) কারিগরী শিক্ষা কেন্দ্র ঃ তিনসালা পাঠ্যক্রমধারী কেন্দ্রসমূহকে"আমূযিশগাহ-ই হিরফা আয়" এবং ৬ সালাগুলিকে'হুনুরিস্তান' বলা হয়। আমূযিশগাহ মাত্র ৪টি। সেখানে ছেলেদিগকে মেকানিক, মোটর ড্রাইভিং এবং মোটর মেরামতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং মেয়েদিগকে খাবার তৈরীকরণ, সেলাই ও গৃহস্থালীর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। হুনুরিস্তান মোট পাঁচটি, যাহা তেহরান, তাবরীয, মাশহাদ, ইসফাহান ও শীরাযে অবস্থিত। ইহার কোন কোনটিতে ৩টি বিভাগ আছে (বৈদ্যুতিক কাজ, ধাতু শিল্প ও কাঠ শিল্প, আর কোন কোনটিতে দুইটি (ধাতু শিল্প ও কাঠ শিল্প)। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ এই সকল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারে। (৩) ৩য় প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম পর্ব উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে ভর্তি করা হয় এবং উহার পাঠ্যক্রম ২ অথবা ৩ বৎসরের হইয়া থাকে। উহার মধ্যে কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র"দানিশ শারায় মুক'াদ্দামাতী (ট্রেনিং স্কুল) হুনুরিস্তান-ই রাংরিযী (রংকরণ শিক্ষার জন্য) হুনুরিস্তান-ই বারূওয়া" (সেলাই শিক্ষার জন্য), হুনুরিস্তান-ই হুনুর পেশগী' (অভিনয়ের প্রশিক্ষণের জন্য), ডাক ও তার প্রশিক্ষণের কেন্দ্র এবং আবাদানের টেকনিক্যাল স্কুল উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিম্নেরগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

**(১) তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় ঃ** ১৩১৩ সৌর/১৯৩৩ সনে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে নিম্নলিখিত বিভাগসমূহ রহিয়াছে ঃ সাহিত্য, অংক চিকিৎসা ও ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী, আইন, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি, কারিগরী বিদ্যা, কৃষি বিজ্ঞান, পশু চিকিৎসা, ললিত ও চারু কলা প্রভৃতি। অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীন এবং শিক্ষা মন্ত্রী ইহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

**(২) দানিশ সারায় 'আলী তেহরান ঃ** এই শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের-ই একটি শাখা। ১৩০৭ সৌর/ ১৯২৭ সনে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে ভর্তি হইবার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক অথবা দানিশ সারায় মুক'াদ্দামাত (শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুল)-এর ডিগ্রীধারী হইতে হয়। ইহার পাঠ্যক্রম তিন বৎসরের। ছাত্রগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যে কোন একটিতে লীসান্স ডিগ্রী লাভ করিয়া থাকে ঃ ফারসী ভাষা ও সাহিত্য, দর্শন, শিক্ষা বিষয়ক দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, বিদেশী ভাষা, প্রাচীন ঐতিহ্য, অংকশাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক ছাত্রই শিক্ষাকালে কিছু সময় বিদ্যালয়ে গিয়া অধ্যাপনা করত শিক্ষকতার বাস্তব প্রশিক্ষণও লাভ করে।

(৩) দানিশগাহ-ই তাবরীয (তাবরীয বিশ্ববিদ্যালয়); ১৩২৬ সৌর/১৯৪৭ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ইহাতে সাহিত্য ও চিকিৎসা-এই দুইটি অনুষদ রহিয়াছে।

(৪) মেডিকেল কলেজ ঃ মাশহাদ, শীরায ও ইসফাহানে রহিয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান ইরান বিশ্ববিদ্যালয়ের বুনিয়াদী নিয়ম-নীতি অনুসরণ করিয়া থাকে।

(৫) আমূযিশগাহ হায় বাহদাশ্ত (গণস্বাস্থ্য বিদ্যালয়) ঃ শীরায ও ইসফাহানে রহিয়াছে। ইহার পাঠ্যক্রম চার বৎসরের।

(৬) হুনুর সারায় আলী (আর্ট কলেজ) ঃ তেহরানে।

(৭) দানিশগাহ-ই জাংগ (মিলিটারী একাডেমী)ঃ সামরিক অফিসারেদের উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

(৮) অফিসার ও বৈমানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ মিলিটারী একাডেমীর ন্যায় এখানে পদাতিক ও বিমান বাহিনীর অফিসারগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই উভয় প্রতিষ্ঠানই জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। এখানে ভর্তি হওয়ার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সার্টিফিকেট প্রয়োজন। প্রতিটি কলেজের পাঠ্যক্রম তিন বৎসরের।

(৯) আমূযিশগাহ-ই 'আলী শাহর বানী ঃ এখানে পুলিশ অফিসার ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ইহা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে।

(১০) আমূযিশগাহ-ই 'আলী পুস্ত ওয়াতলিগ্রাফ ওয়া তিলিফূন ঃ ডাক তার ও টেলিফোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানে দুই বৎসর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

(১১) হুনুর সারায় 'আলী তেহরান ঃ কারিগরী কলেজ, এখানে হইতে ছাত্ররা তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকালটির ন্যায় ইঞ্জিনিয়ার হইয়া বাহির হয়।

(১২) আমূযিশগাহ-ই 'আলী নিফ্‌ত আবাদান; তৈল সংক্রান্ত বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

ইরানের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই স্বাস্থ্য সংরক্ষণের সুব্যবস্থা রহিয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইহার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত, চিকিৎসার জন্য কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে, 'আঞ্জুমান-ই তারবিয়াত-ই বাদানী-এর ব্যবস্থাপনাধীনে শরীর চর্চা হইয়া থাকে। ইহার সভাপতি ছিলেন স্বয়ং শাহানশাহ।

ফারসী ভাষা সংরক্ষণ, ইহার প্রসার ও উন্নতির জন্য ১৩১৪ সৌর/১৯৩৪ সনে ফারহাঙ্গিস্তান-ই ঈরান নামে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইহার প্রচেষ্টায় শিক্ষা, সাহিত্য ও বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিভাষার ভাণ্ডার সংকলন করা হয়। ফলে সকল বিদ্যা ফারসী ভাষায় রূপান্তরিত করা সম্ভবপর হইয়া যায়। ১৯৫১ খৃ. সারা দেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৪০০; উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৪১১; প্রশিক্ষণ স্কুল ২১; কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৫; কারিগরি স্কুল ৪৭; দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২১; উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৯; বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ১০২৭। ১৯৬৩ খৃ. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২৪৫১ (ছাত্র সংখ্যা ঃ ১৭,১৯,৪২৬) এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩৮০ (ছাত্র সংখ্যা ৩,৪১,৯০৫)। এতদ্ব্যতীত বাণিজ্যিক শিক্ষার ১১৪টি (ছাত্র সংখ্যা ১২,১৯৮) এবং উচ্চতর শিক্ষার ৪১টি (ছাত্র সংখ্যা ২৪,৪৫৬) প্রতিষ্ঠান চালু ছিল। ১৯৬১ খৃ. তেহরানে সেনটো (Cento)-র ব্যবস্থাপনাধীনে পারমাণবিক গবেষণার একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। ১৯৬১ খৃ. কারাজ এ কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। ১৯৬০ খৃ. তেহরানে বিভিন্ন পেশার প্রশিক্ষণ দানের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

'ঈসা সি'দ্দীক (সম্পা. ও সংযোজন, সম্পাদনা পরিষদ)
(দা.মা.ই.)/ ড. আবদুল জলীল

**ইরানের ভাষাসমূহ**

**আধুনিক ফারসী ভাষা ঃ** পশ্চিমে ফুরাত নদী হইতে পূর্বে হিন্দুকুশ পর্বতমালার পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ডে যে ভাষা গোষ্ঠী প্রচলিত আধুনিক ফারসী ভাষা উহারই অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ব্যতীত ককেশাস অঞ্চলের অন্তর্গত 'আম্মান এলাকার উপদ্বীপ মাসান্দাম নামীয় ভূখণ্ডেও উক্ত ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষার বৃহত্তর গোষ্ঠীগত শ্রেণীবিভাগের দিক দিয়া উক্ত ভাষাসমূহ ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। উক্ত ভাষাসমূহ ইরানী ভাষা নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। কারণ উহারা ইরানে ব্যাপকভাবে কথিত হইত। বর্ণমালার দিক দিয়া উহাদের নাম সাসানী শাসনামলে ছিল আর্য়ান ও এরান, হাখামানশী শাসনামলে ছিল আরিয়া এবং আসী ভাষায় উহাদের নাম ছিল ইর, ইরো ও ইরোন। প্রাচীন যুগে ইরানী ভাষাসমূহ আধুনিক যুগের তুলনায় অধিকতর বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ পশ্চিমে ফুরাত নদী হইতে পূর্বে মাযানদারান এলাকার উত্তর প্রান্ত পযর্ন্ত একং দক্ষিণে খাওয়ারিয্‌ম হইতে উত্তরে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে উক্ত ভাষাসমূহ কথিত হইত। এইরূপে উত্তর মঙ্গোলিয়ায় সাগাদী নামীয় নূতন জনপদ পর্যন্ত অঞ্চলেও এই ভাষা কথিত হইত।

ইরানী ভাষাসমূহের তিনটি ঐতিহাসিক যুগ রহিয়াছে ঃ প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ। ইরানী ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শাখা ফারসী ভাষার উক্ত তিনটি যুগ ইরানের ইতিহাসের নিম্নোক্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ যুগের সহিত সংশ্লিষ্ট ঃ (১) প্রাচীন হাখামানশী যুগের অবসান (৩৩০ খৃ. পূ.) পর্যন্ত; (২) আশ্‌কানী রাজবংশের শাসনামলের প্রারম্ভ (২৭৯ খৃ. পূ.) হইতে সাসানী রাজবংশের শাসনামলের অবসান (৬৫২ খৃ.) পর্যন্ত। উক্ত পর্যায়কে ইসলাম-পূর্ব যুগ নামেও অভিহিত করা যায়। (৩) আধুনিক যুগ ঃ ইসলামের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই যুগ আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য ইরানী ভাষাকেও অনুরূপ তিনটি ঐতিহাসিক যুগ বা স্তর অতিক্রম করিতে হইয়াছে।

**প্রাচীন ইরানী ভাষাসমূহ ঃ** ইরানের প্রাচীন ভাষাসমূহের মধ্য হইতে মাদী (Media অঞ্চলে কথিত) ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়। উহার একটি শব্দ কিত্‌য়া (كتيا)-র সাহায্যে (যাহা ঐতিহাসিক হিরোডোটাস রচিত গ্রন্থে এখনও বিদ্যমান) এবং কয়েকটি বিশেষ নামের সাহায্যে। উক্ত শব্দগুলির আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মাদী ভাষাকে ইরানী (আরও বিশেষ করিয়া উত্তর ইরানী) ভাষাসমূহের মধ্যে স্থান দিতে পারি। প্রকৃত অর্থে ইরানের প্রাচীনতম যে সকল ভাষার পরিচয় আমরা পাই, উহারা হইতেছে আবি'সতী (أوستى) ভাষা ও ফারসী পাস্‌তান ভাষা।

আবি'স্তী ভাষা ছিল ইরানের যরাথুষ্ট্রীয়দের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ আবি'সতার ভাষা। কোনও কোনও প্রাচীন য়ুরোপীয় পণ্ডিত ভুলক্রমে উক্ত ধর্মগ্রন্থের নাম ঝান্দ (زند) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ঝানদ হইতেছে আবি'সতা গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ (উক্ত ব্যখ্যাগ্রন্থ মধ্যযুগীয় ফারসী ভাষায় রচিত)। আবি'সতার সঠিক রচনাকাল নির্ণয় করা সুকঠিন। অবশ্য উহার দুইটি খণ্ডের ভাষার প্রকৃতি সুস্পষ্টরূপে পরস্পর পৃথক। গাথা (گاتها) নামে বিখ্যাত উহার প্রথম খণ্ডের ভাষা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম বৈদিক মন্ত্রসমূহের ভাষার সহিত সদৃশ বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। নূতন আবি'স্তা বা পরবর্তী আবি'সতা নামে খ্যাত উহার দ্বিতীয় ও বৃহত্তর খণ্ডের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন যুগে রচিত ও বিন্যস্ত হইয়াছে। আনুমানিক ৩৭৯ খৃ. উহার সংকলন ও বিন্যাসকার্য সম্পন্ন হয়। ইতিমধ্যে আস্‌তী ভাষা মৃত ভাষার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। উহার চর্চা তখন শুধু যরাথুষ্ট্রীয় ধর্মের পুরোহিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কোনও কোনও গবেষক পণ্ডিত উহার দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষাকে বাখতারী (باخترى) ভাষা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু স্বীয় দাবির সমর্থনে তাঁহারা কোনও অভ্যন্তরীণ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। প্রাচ্যবিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডার্মস্টেটর ও টটেস্কো উহার ভাষার উৎপত্তি স্থান উত্তর-পশ্চিম ইরান অর্থাৎ মাদ (ماد) অঞ্চল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহাদের ন্যায় আবিসতার দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষাকে মাদী ভাষা বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি না। আবিসতার ভাষার বর্ণমালাকেও প্রাচীন মনে করা যায় না। কারণ আমরা উহাকে একটি সংস্কারকৃত পাহ্‌লাবী (پهلوى) বর্ণমলায় লিখিত দেখি।

ফারসী পাসতান ভাষা হাখামানশী রাজবংশের সম্রাটদের উৎকীর্ণ লিপিসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত লিপিসমূহ মীখী ( Cureiform) বর্ণমালায় লিখিত।

**মধ্য যুগের অর্থাৎ ইসলাম-পূর্ব যুগের ইরানী ভাষাসমূহ ঃ** চীনা তুর্কিস্তানে ভাষা সম্পর্কিত নূতন তথ্যাবলী আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে আমরা ইরানের মাত্র দুইটি ভাষা সম্বন্ধে অবগত ছিলাম ঃ(১) সাসানী পাহ্‌লাবী ভাষা। উক্ত ভাষা ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে (ফার্‌স-এ) কথিত হইত এবং সাসানী সম্রাটদের রাষ্ট্রভাষারূপে ব্যবহৃত হইত। (২) যে ভাষা সাসানী রাজবংশের প্রথম যুগের সম্রাটদের কোনও কোনও উৎকীর্ণ লিপিতে পাওয়া যায় এবং ভাষাতত্ত্ববিদগণ প্রথমদিকে অসঙ্গতভাবে যাহাকে কালদানী (كلدانى) পাহ্‌লাবী নামে আখ্যায়িত করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ইভিরিয়াস উহাকে আশকানী পাহ্‌লাবী অর্থাৎ পাথিয়াঈ বা আশ্‌কানী রাজবংশের শাসনামলের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

উক্ত ভাষা দুইটি আরামী (آرامى) ভাষার রূপান্তরিত বর্ণমালায় লিখিত হইয়াছে। তবে উভয়ের বর্ণমালার আকৃতি পরস্পর বিভিন্ন। উল্লেখ্য যে, পাহ্‌লাবী ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণমালা বা কোনও কোনও বর্ণের রূপ অবয়ব এই

রকম অনিশ্চিত যে, উহাদের এককেটি বর্ণকে একাধিক বর্ণরূপে পাঠ করিবার সুযোগ থাকে। ফলে অনুমানের ভিত্তিতে পাঠ করিতে হয় বলিয়া উহাতে অনেক সময়ে ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে।

চীনা তুর্কীস্তানের অন্তর্গত তুরফান নামক অঞ্চলে মানবী (مانوی) ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহের বিপুল সংখ্যক খণ্ডাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহারা Estranghelo নামে অভিহিত এক প্রকারের সুরয়ানী বর্ণমালায় লিখিত। আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহের আরামী ভাষার শব্দসম্ভার স্থান পায় নাই; বরং সকল শব্দই নির্ভেজাল ইরানী ভাষার শব্দসম্ভার হইতে গৃহীত হইয়াছে।

আধুনিক গবেষণা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, আশকানী রাজবংশের শাসনামলে ইরানে প্রচলিত ভাষা মধ্য ইরানে প্রচলিত ভাষা গোষ্ঠীর সহিত সম্পর্কিত ছিল। আধুনিক যুগে কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে সামনানী ভাষা এবং কাশান ও ইসফাহান অঞ্চলে গোরানী ভাষা, উক্ত ভাষা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করিতেছে।

আশকানী পাহ্লাবী ভাষা ও সাসানী পাহ্লাবী ভাষা অনেক সময়ে যথাক্রমে উত্তরাঞ্চলীয় ও দক্ষিণাঞ্চলীয় পাহ্লাবী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাসানী পাহ্লাবী ভাষা আশকানী পাহ্লাবী ভাষা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। কারণ আশ্কানী রাজবংশের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে সাসানী রাজবংশের সম্রাটগণ তাহাদের সরকারী ভাষার বিরাট একটি অংশ উত্তরাঞ্চলীয় পাহ্লাবী ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রাক-ইসলামী যুগে উপরিউক্ত ভাষাগুলি ভিন্ন আরও কয়েকটি ভাষা ইরানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহে প্রচলিত ছিল। তুরফান অঞ্চলে অন্য এক ভাষায় লিখিত কতগুলি গ্রন্থাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ উক্ত ভাষার নাম সাগ'দী ভাষা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আবিষ্কৃত গ্রন্থাংশসমূহে বাইবেলের নূতন নিয়মের কিয়দংশের অনুবাদ এবং বৌদ্ধ ধর্মের গ্রন্থাবলীর কোনও কোনও অংশের অনুবাদ রহিয়াছে। এতদ্বারা উক্ত ভাষার গুরুত্ব অনুমান করা যায়। এককালে উক্ত ভাষা পূর্বে চীনের প্রাচীর হইতে পশ্চিমে সামারকান্দ, এমন কি উহারও পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে কথিত হইত। ইহা শত শত বৎসর ধরিয়া সমগ্র মধ্য এশিয়ার আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। আধুনিক যুগের য়াগ্নূবী (يغنوبى) ভাষা, উহার সর্বশেষ স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। য়াগনূবী ভাষা পামীর মালভূমির অন্তর্গত য়াগনূব উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে।

চীনা তুর্কিস্তানে দুইটি অপরিচিত ভাষায় অনূদিত বৌদ্ধ ধর্মের গ্রন্থাবলীর উক্ত ভাষাদ্বয় বর্তমানে সাকাঈ (سا كائى) ও তাখারী (طخارى) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সাকাঈ বা হিন্দু সাকাঈ ভাষা পূর্ব ইরানী ভাষাগোষ্ঠীর সহিত সম্পর্কিত। উল্লেখ্য যে, আধুনিক যুগে আফগানিস্তানের ভাষা পুশ্তু ও পামীর মালভূমির কোনও কোনও ভাষা, যেমন সারাকূলী (سرى قولى), শুগনী (شغنى), ওয়াখী (وخى) ইত্যাদি পূর্ব ইরানী ভাষাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করিতেছে।

তাখারী ভাষা সম্বন্ধে একটি বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা এই যে, তাখারী ভাষা ইন্দো-য়ূরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও উহা প্রাচ্যের আর্য ভাষা নহে; বরং উহা গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান ইত্যাদি পাশ্চাত্য ভাষাগোষ্ঠীর সহিত সম্পৃক্ত।

সামী (سامى) ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম শাখা আরামী ভাষা, প্রাচীন কাল হইতেই পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল । উক্ত ভাষা হাখামানশী রাজবংশীয় সম্রাটদের সরকারী ভাষারূপে ব্যবহৃত হইত। মীখী বর্ণমালা শুধু উৎকীর্ণ শিলালিপি ইত্যাদিতে সহজে ব্যবহৃত হইতে পারিত। সুতরাং সাধারণ লিখনকার্যে আরামী ভাষার বর্ণমালাই ব্যবহৃত হইত। এমন কি ফারসী ভাষার রচনাবলীও আরামী ভাষার বর্ণমালায় লিখিত হইতে থাকে। এই পথেই পাহ্লাবী ভাষার বর্ণমালার উদ্ভব ঘটে এবং কোনও রচনাকে আরামী ভাষার শব্দ দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়া উহাকে ফারসী ভাষায় পাঠ করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। যেমন লিখিত হইত مالكان ملكا (মালেকান মালেকা) এবং উহা পঠিত হইত شاهنشاه (শাহানশাহ্)-রূপে (উল্লেখ্য যে, প্রথমোক্ত শব্দগুলি আরামী ভাষার এবং শেষোক্ত শব্দগুলি ফারসী ভাষার)। সাসানী রাজবংশের শাসনামলে ইরানের সামী বংশোদ্ভূত খৃস্টান অধিবাসীদের ভাষা ছিল সুরয়ানী।

মহাবীর আলেকজাণ্ডার ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত শাসকগণ ইরানে যে সকল গ্রীক বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তথায় দীর্ঘকাল ধরিয়া গ্রীক ভাষার আধিপত্য বিদ্যমান ছিল। খৃস্টীয় প্রথম শতকে ইরানে ইরানী তাহযীব তামাদ্দুন ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটিবার পর ইরানী মুদ্রায় গ্রীক ভাষার সহিত পাহ্লাবী ভাষাও লিখিত হইতে থাকে। অতঃপর গ্রীক ভাষা কোনও কোনও অঞ্চলে কথিত হইতে থাকিলেও সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত মুদ্রা হইতে উহা ক্রমশ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

**আধুনিক যুগের ফারসী ভাষাসমূহ** ঃ ইরানের আধুনিক ভাষাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক ভাষা হইতেছে ফারসী ভাষা। ইহাই বর্তমানে ইরানের রাষ্ট্রভাষা। এই ভাষাতেই ইরানের বিপুল ও ব্যাপক সাহিত্য সম্পদ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই ভাষাই ইরানের অধিকাংশ অধিবাসীর ব্যবহার্য ভাষারূপে প্রচলিত রহিয়াছে। আধুনিক ফারসী ভাষা, ইরানী ভাষাসমূহে পূর্বোক্ত তিনটি যুগের মধ্য হইতে মধ্যযুগের দক্ষিণাঞ্চলীয় ফার্সী ভাষার প্রত্যক্ষ স্থলাভিষিক্ত ভাষা। অবশ্য বর্তমানে উহাতে বিপুল সংখ্যক 'আরবী ও তুর্কী শব্দ প্রবিষ্ট হইয়া উহার অপরিহার্য অংশে পরিণত হইয়াছে। কিছু পরিমাণ আঞ্চলিক পরিবর্তন ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও ইরান, আফগানিস্তান, রুশীয় তুর্কিস্তান ও পাকিস্তানের কোনও কোনও এলাকায় প্রচলিত ফারসী ভাষার রূপ ও প্রকৃতি একই দেখা যায়। আধুনিক ফারসী ভাষা 'আরবী বর্ণমালায় লিখিত হইয়া থাকে।

উপরোল্লিখিত দেশসমূহের অধিকাংশ অঞ্চলে, বিশেষত উহাদের পল্লী অঞ্চলে ফারসী ভাষার পাশাপাশি কতগুলি আঞ্চলিক ভাষাও প্রচলিত রহিয়াছে। সাহিত্যিক ভাষা ফারসী দক্ষিণাঞ্চলীয় বা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় যে ভাষাগোষ্ঠীর সহিত সম্পৃক্ত রহিয়াছে, ইরানের ফার্স, লুরিস্তান, খুরাসান ও কিরমান প্রদেশের অধিকাংশ এলাকায় প্রচলিত কতগুলি আঞ্চলিক ভাষাও ঠিক সেই ভাষাগোষ্ঠীরই অন্তর্গত। পক্ষান্তরে ইরানে এইরূপ কতগুলি ভাষাও প্রচলিত রহিয়াছে, যেইগুলি অধুনালুপ্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় ভাষার প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের ভাষাসমূহ, কুর্দী ভাষা (উল্লেখ্য যে, উত্তর সিরিয়া, এমনকি মধ্য এশিয়ার আঙ্কারা অঞ্চল পর্যন্ত উহার প্রভাব-বলয় বিস্তৃত রহিয়াছে), বালুচ ভাষা এবং এতদসহ দেশের অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষাসমূহ (উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কাশান ও সিমনান অঞ্চলদ্বয়ে এইরূপ জনগোষ্ঠীর বসবাস রহিয়াছে)। পূর্বাঞ্চলীয় ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ইরানী আঞ্চলিক ভাষাসমূহের মধ্য হইতে নিম্নোক্ত ভাষাগুলির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ (১)

আফগান ভাষা পুশতূ; (২) ওড়মুড়ী (ارڑ مــڑی) ভাষা; (৩) পামীর মালভূমিতে কথিত বিভিন্ন ভাষা [ যেমন শাগানী, ওয়াখী মানজানী (منجنی) ইত্যাদি ];(৪) য়াগনূবী ভাষা (উহা ইরানী ভাষাসমূহের ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের তিনটি যুগের মধ্য হইতে মধ্যযুগের ভাষা সাগাদীর বর্তমান স্থলাভিষিক্ত ভাষা); (৫) আসী ভাষা (উহা মধ্য ককেশাস অঞ্চলের অধুনালুপ্ত সারামীশিয়াঈ (سار میشیانی) ভাষার বর্তমান স্থলাভিষিক্ত ভাষা। মারমেশি'য়াঈ ভাষা এক কালে দক্ষিণ রাশিয়াতে কথিত হইত। ১৯২৭ খৃ. ইরানে খাওয়ারিযমী ভাষায় লিখিত কতগুলি প্রাচীন রচনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত ভাষাও পূর্বোক্ত মধ্য যুগের সাগাদী ভাষার সদৃশ কোনও ভাষার স্মৃতি বহন করিতেছে।

যাহা হউক, উল্লিখিত ভাষাসমূহ বতমানে আধুনিক ফারসী ভাষার ক্রমবর্ধমান প্রসার ও বিস্তৃতির মুখে টিকিয়া থাকিতে না পারিয়া উহাকে স্থান করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ইরানের বিভিন্ন সার্বজনীন ও আঞ্চলিক ভাষাসমূহ সম্বন্ধে ব্যাপক অধ্যয়ন। উদ্ধৃতিসমূহের জন্য দেখুন ঃ (১) H. W. Bailey, Persia, E.I.I, লাইডেন, ৩খ, ১০৫০-৫৮; (২) Encyclopaedia Britannica, ১৯৫০ খৃ., ১২খ, ৫৮৬-৮৭; (৩) A. Christensen, L'ঈran sous les Sassanides, Copenhagen 1944, অনু. ডঃ মু. ইকবাল, ইরান বা'আহদ-ই সাসানিয়ান।

সায়্যিদ আমজাদ আলতাফ (দা.মা.ই.)/মু. মাজহারুল হক

**ফারসী সাহিত্য** ঃ ফারসী সাহিত্য বলিতে আমরা মুসলিম বিজয়ের যুগ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত যুগে ফারসী ভাষায় রচিত সাহিত্যকে বুঝাইতে চাই। এই নিবন্ধে প্রাক-ইসলামী যুগে ফারসী সাহিত্যের-যাহাকে ইরানী সাহিত্য নামে আখ্যায়িত করা অধিকতর সমীচীন মনে হয়—আলোচনা শুধু ভূমিকা হিসাবেই করা হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা হাখামানশি যুগের (৫৫০-৩৩০ গ. পূ.) প্রাচীন ফার্সী সাহিত্যের ও সাসানী যুগের (২২৪-৬৫১ খৃ.) পাহ্‌লাবী সাহিত্যের ভাসাভাসা সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং ইসলামী যুগের ('আব্বাসী যুগ হইতে) বর্তমান কাল পর্যন্ত বিস্তৃত যুগের ফারসী সাহিত্যের বিশদ আলোচনা করিব। ফারসী সাহিত্য যে দেশেই রচিত হইয়া থাকুক না কেন, উহা সামগ্রিকভাবে একক ও অবিচ্ছেদ্য ফারসী সাহিত্য। উক্ত অবিচ্ছেদ্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই শুধু ইরানে রচিত ফারসী সাহিত্যের প্রতি নহে, বরং এতদসহ ইরানের বাহিরে মা ওয়ারাউন নাহ্‌র (ট্রান্স অক্সানিয়া), তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান ও ভারতীয় উপমহাদেশে রচিত ফারসী সাহিত্যের প্রতিও এই নিবন্ধে আলোকপাত করা হইবে।

হাখামানশী রাজবংশের সম্রাটদের যুগে উৎকীর্ণ শিলালিপিসমূহ যেইগুলি মহাবীর দারয়ূস (৫২১-৪৮৫ খৃ. পূ.) ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত সম্রাটদের আদেশে কোহবিসাতুন ও পার্‌সীপোলস (সম্রাট জামশেদের সিংহাসন)-এ উৎকীর্ণ হইয়াছিল এইসব হইল প্রাচীন ফারসীর নমুনা। উক্ত শিলালিপিগুলিতে আহুরা মাযদা (বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা)-র প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে। সম্রাট উহাতে স্বীয় বিজয়সমূহকে তাঁহারই (অর্থাৎ আহুরা মাযদা) কৃপার ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য একমাত্র তাঁহারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। উহাতে অন্যায় হইতে বিরত থাকিতে এবং সত্য পথে চলিতে মানুষকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কোনও কোনও শিলালিপিতে যে সকল বিজিত রাজ্যে ইরান সরকারের আইন-কানূন ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে অথবা যে সকল রাজ্য হইতে ইরান সরকারের কর আসিত, উহাদের উল্লেখ রহিয়াছে। কোনও কোনও শিলালিপিতে রাজকীয় ইমারতাদির পরিচয় এবং বিভিন্ন দেশ হইতে নির্মাণ সামগ্রী আনীত হইবার ও নির্মাণের ব্যাপারে শিল্পীদের যথাযথ সেবা ও পরিশ্রমের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উক্ত শিলালিপিগুলিকে প্রকৃতপক্ষে ফারসী সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে গণ্য করা যায় না কিন্তু প্রাচ্যবিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ব্রাউন (A Literary History of Persia, ১খ, ৯৩)-এর বর্ণনামতে সহজ ও সাবলীল ভাষা, রসোত্তীর্ণ বর্ণনাভঙ্গি ও সূক্ষ্ম সাহিত্যিক উন্নত মান সাহিত্যের মানদণ্ডে সহজেই টিকিয়া যায়।

ইরানে হাখামানশী রাজবংশের শাসনের অবসানে তথায় গ্রীকদের শাসন কায়েম হইবার ফলে ফারসী সাহিত্যের একচ্ছত্র প্রভাব ও স্বাধীন বিকাশের পথে ঘোর বিপদ নামিয়া আসে। এতদ্ব্যতীত উহার ফলে ইরানীদের চিন্তাধারাও গ্রীক চিন্তাধারায় রূপান্তরিত হয়। আশকানী রাজবংশের শাসনামলে (খৃ. পূ. ২৫০-২২৫ খৃ.) পারতাও অঞ্চলের (বর্তমান খুরাসান প্রদেশ; এই প্রদেশেই আশকানী রাজবংশের শাসন কায়েম হইয়াছিল) ভাষা পাহ্‌লাবী অর্থাৎ মধ্য যুগীয় ফারসী ভাষা সমগ্র দেশে প্রচলিত হয়। উক্ত রাজবংশের দীর্ঘ শাসনামলে যরাথুষ্ট্রের গ্রন্থ আবি'স্‌তা ভিন্ন ইরানে অন্য কোন গ্রন্থের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। মূল আবি'স্‌তা গ্রন্থ হাখামানশী রাজবংশের শাসনামলের শেষ দিকে ইরানে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে (খৃ. পূ. ৩৩০) ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। আশকানী রাজবংশের শাসনামলে যরাথুষ্ট্রীয় ধর্মের পুরোহিতগণ তাহাদের স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া উহাকে পুনরায় রচনা ও পুনর্বিন্যস্ত করেন। এইরূপে রচিত আবি'স্‌তা গ্রন্থ নিম্নোক্ত পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত ছিল ঃ (১) য়াস্‌না; (২) বি'স্‌পেরেদ; (৩) বি'ন্‌দী দাদ; (৪) য়াশ্‌ত ও (৫) খোরদা আবি'সতা। সাসানী রাজবংশের শাসনামলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়। নিম্নে উহাদের মধ্য হইতে দুইটি গ্রন্থের পরিচয় প্রদত্ত হইল ঃ (১) দীন কার্‌ত دین کرت ধর্মীয় কার্যাবলী) ঃ উহাতে যরাথুষ্ট্রীয় ধর্মের আকীদা-বিশ্বাস, বিধি-বিধান, আদব-কায়দা, অনুষ্ঠানাদি ও যরাথুষ্ট্রের সহিত সম্পর্কিত কিস্‌সা-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। (২) বুন্দা হেশ্‌ন (آفرينش সৃষ্টি ক্রিয়া) উহাতে বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি, নিজ সৃষ্টির প্রতি আহরামান (অমঙ্গলের স্রষ্টা)-এর ঔদাসীন্য ও সৃষ্টি বস্তসমূহের পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে। ধর্মগ্রন্থ ভিন্ন অন্যান্য গ্রন্থের মধ্য হইতে নিম্নোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ (১) কারা নামাক আর্‌তাখ্‌শাতর-ই পাপাকান (کار نامك ارتخشتر پاپکان) ও (২) য়াতকার যারীরাঁ (یاتکار زریران) উহা শাহনামাহ-ই গুশ্‌তাস্‌প (شاهنامه گشتاسپ) নামেও পরিচিত। ঐতিহাসিক মালিকুশ-শু'আরা' বাহার স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে পাহ্‌লাবী ভাষায় রচিত তিরানব্বইটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। উহাদের মধ্য হইতে বিরাশিটি গ্রন্থে ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়াবলী এবং এগারটি গ্রন্থে ধর্ম ভিন্ন অন্যান্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে (সুবুকশেনাসী, ১খ, ৪৪-৪৯)। মহামতি সম্রাট নাওশেরওয়াঁ (৫৩১-৫৭৯ খৃ.)-র রাজত্বকালে গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষা হইতে বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থ পাহ্‌লাবী ভাষায় অনূদিত হয়। উহা দেশের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করত দেশবাসীর মধ্যে জ্ঞান প্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করে। অনূদিত গ্রন্থসমূহের মধ্য হইতে কালীলা ওয়া দিম্‌না নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিত বার্‌যাবি'য়াহ উহাকে সংস্কৃত ভাষা

হইতে পাহ্‌লাবী ভাষায় অনুবাদ করেন। ঐতিহাসিক বাহার তৎকালে ইরানে চব্বিশটি গল্প গ্রন্থ, সাতটি জ্ঞান ও নীতিমূলক উপদেশ গ্রন্থ এবং বিশটি বিভিন্ন প্রকার বিদ্যা ও শিল্প সম্পর্কিত গ্রন্থ পাহলাবী ভাষা হইতে 'আরবী ভাষায় অনূদিত হইবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন (সুবুকশেনাসী, ১খ, ১৫৪-১৫৮)। উহাদের মধ্য হইতে হাজার আফসানাহ (উহার 'আরবী অনুবাদ গ্রন্থের নাম হইতেছে আলফু লায়লা ওয়া লায়লা), কালীলা ওয়া দিমনা, খুদায়নামাক ওয়া আ'ঈন নামাক ('আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুক'াফ্‌ফা' কর্তৃক 'আরবীতে অনূদিত) এবং ওয়াসায়া-ই আর্দশীর বা শাপুর-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের অভ্যুদয়ের যুগেও পাহ্‌লাবী ভাষায় রচিত বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থ ইরানের সাহিত্য ভাণ্ডারে বিদ্যমান ছিল এবং সাহিত্যক্ষেত্রে উহাদের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম পণ্ডিতবর্গ উহাদিগকে 'আরবীতে ভাষান্তরিত করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

প্রাচীন ইরানে কবিতা চর্চা হইত এইরূপ প্রমাণও ইতিহাসে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক রিযা যাদাহ-র বর্ণনামতে প্রাচীন ইরানে পাহলাবী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কাব্যগ্রন্থও ছিল (তা'রীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, পৃ. ২৪)। ইহা ছাড়া সাসানী শাসনামলে উৎকীর্ণ লিপিসমূহে, বিশেষত হা'জ্জী আবাদ নামক স্থানে অবস্থিত লিপিসমূহে ছন্দোবদ্ধ বাণী পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, সম্রাটদের শাসনামলে ইরানে কবিতা চর্চাও হইত। উক্ত তথ্য এই ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারাও সমর্থিত হয় যে, সম্রাট খুসরাও পারভেযের রাজত্বকালে (৫৯০-৬২৭ খৃ.) বারবাদ ও অন্যান্য বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী শাহী দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাহারা শাহী দরবারে বীণা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র সহকারে সঙ্গীত শুনাইতেন। ঐতিহাসিক জালালুদ দীনের বর্ণনামতে (তা'রীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, পৃ. ২২৪) সঙ্গীতশিল্পী বারবাদ নিজেই কয়েকটি সুর উদ্ভাবন করেন। উহাদের একটির নাম হইতেছে নাওয়া-ই খুসরাওয়ানী। সম্রাট নাওশেরওয়াঁ যখন বারযাহি'য়া কর্তৃক সংস্কৃত ভাষা হইতে পাহ্‌লাবী ভাষায় অনূদিত কালীলা ওয়া দিমনা নামক গ্রন্থ তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠান করিতে চাহিলেন তখন তিনি দেশের বিশিষ্ট কবি ও বক্তাগণকে উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিবার আমন্ত্রণ জানাইয়া প্রত্যেককে অনুষ্ঠান উপযোগী কবিতা ও বাণী উপস্থিত করিতে অনুরোধ করেন। ঐতিহাসিক আবূ তা'হির খাতূনী-র বরাতে ঐতিহাসিক দাওলাত শাহ্ সামারকান্দী লিখিয়াছেন (তায'কিরাতুশ শু'আরা',ব্রাউন কর্তৃক মুদ্রিত, পৃ. ২৯) যে, সম্রাট 'আদু'দুদ-দাওলা-এর রাজত্বকালেও (৩৩৮/ ৯৪৯-৩৭২/৯৮২) ইরানের বিখ্যাত ক'াস্'র-ই শীরীন প্রাসাদ অক্ষুণ্ন অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। উহার শিলালিপিতে একটি শ্লোকও উৎকীর্ণ ছিল।

সম্রাট বাহ্‌রাম গোর (৪২০-৪৩৮ খৃ.)-এর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মুহ'াম্মাদ 'আওফী (লুবাবুল-আলবাব, সম্পা. ব্রাউন, ১খ, ২১) লিখিয়াছেন যে, একদা মানসিক প্রশান্তিপূর্ণ আনন্দঘন মুহূর্তে তাঁহার মুখে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উচ্চারিত হইয়াছিল ঃ

منم آں شیر گله منم آں پیل یله
نام من بهرام وگور کنیتم بوجبله

'আমি হইতেছি সেই ব্যাঘ্রদলের ব্যাঘ্র, আমি হইতেছি সেই মুক্ত হস্তী। আমার নাম বাহ্‌রাম গোর এবং আমার উপনাম বূ জাবালা ।'

ঐতিহাসিক দাওলাত শাহ্ (তায'কিরা, পৃ. ২৯) লিখিয়াছেন, একদা বাহ্‌রাম শাহ শিকার করিতে গিয়া একটি ব্যাঘ্রকে কাবু করিবার পর গর্বভরে বলিয়াছিলেন ঃ

منم آں پیل دمان ومنم آں شیریله

'আমি হইতেছি সেই শক্তিধর হস্তী ও আমি হইতেছি সেই মুক্ত ব্যাঘ্র।' উক্ত চরণটি শুনিয়া তাঁহার প্রেমাস্পদ দীলারাম তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেনঃ

نام بهرام ترا وپدرث بوجبله

'তোমার নাম বাহ্‌রাম, তোমার পিতা ছিল আবূ জাবালা (বীর পুরুষ)।'

অভিধানকার শাম্‌সও স্বীয় গ্রন্থ 'আল-মু'জাম-এ উক্ত চরণদ্বয় উপরিউক্তরূপেই উদ্ধৃত করিয়াছেন। যদিও অন্যান্য জীবনী গ্রন্থে উহা ভিন্নরূপেও উদ্ধৃত হইয়াছে (হুমাঈ, তারীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, পৃ. ২৫)। অবশ্য সকল ঐতিহাসিক উহাকে বাহ্‌রাম গোর-এর রচনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক আকা'য় তাকী যাদাহ (দেখুন জালাল হুমা'ঈ তা'রীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, পৃ. ১৭৯) ইবনুস-সায়্যিদ আল- বাত'লীমূসী রচিত শারহ' আদাবি'ল-কাতিব (ইব্‌ন কু'তায়বা) গ্রন্থ হইতে একটি ঘটনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'আরবের অভিজাত শ্রেণীর কবি ও গায়ক তু'লায়হ'া আসাদী ইরানের নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠানে একদা কিসরা পারভেযের রাজদরবারে প্রবেশের সুযোগ লাভ করেন। গায়ক কবি দুই দুইবার 'আরবী গান রচনা করিয়া দরবারে গাহিয়া শুনাইলেন। সম্রাটকে উহার ফারসী অনুবাদ শুনান হইল, কিন্তু উহা তাঁহার মনঃপূত হইল না । অতঃপর গায়ক কবি ফারসী ভাষায় গান রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন। এইবার উহা তাঁহার মনঃপূত হইল। ঐতিহাসিক শাফাক' নমুনাস্বরূপ তু'লায়হ'া রচিত কতগুলি পাহ্‌লাবী কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন (তা'রীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, পৃ. ২৫)। উহাদের ওজন ও মাত্রা ছন্দোবিদ্যার নিয়মের অনুসারী নহে, তবে উহাকে হিজা'ঈ ওযন নামে আখ্যায়িত করা যায়।

'আরবগণ নিহাওয়ান্দ নামক স্থানে পারস্য সম্রাট ৩য় য়াযদ গির্দ (یزد گرد)-কে শেষবারের মত পরাজিত করিয়া (২১/৬৪২) সাসানী রাজবংশের শাসনকালের পরিসমাপ্তি ঘটাইবার পর দুই শত বৎসরের মধ্যে তথায় বিদেশী আরবী ভাষা এইরূপ প্রসার ও প্রচার লাভ করে যে, উহার নজীর বিশ্বের ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যায়। সকল ইরানী 'আলিম 'আরবীতে কথা বলিতেন এবং 'আরবী ভাষার প্রসার ও প্রচারে সচেষ্ট থাকিতেন । অধিকাংশ ইরানী 'আলিম 'আরবী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন, এইরূপে আরবী ভাষা ইরানে জ্ঞান চর্চার ভাষার মর্যাদা লাভ করে। 'আব্বাসী খিলাফাতের (১৩২/৭৪৯-৭৫০/১২৫৮) যুগে যখন ইরানীদের মধ্যে ইরানী ভৌগোলিক জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয় তখন তাহারা স্বদেশী ভাষা ফারসীর চর্চা ও উৎকর্ষ সাধনের প্রতি মনোযোগী হয়। ফলে ইরানে ফারসীর চর্চা আরম্ভ হয় এবং পাহলাভী ভাষা 'আরবী বর্ণমালায় লিখিত হইতে থাকে। ক্রমে 'আরবী শব্দসমূহ উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে থাকে। এই সময়ে স্বাধীন তাহিরী রাজবংশ (২০৫/৮২০-২৫৯/৮৭২), লায়ছী' রাজবংশ (২৫৪/৮৬৭-২৯০/৯০৩) ও সামানী রাজবংশ (২৬১/৮৭৪-৩৮৯/৯৯৯) -এর শাসন ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল রাজবংশ সম্পূর্ণভাবে ইরানী ছিল। ইঁহারা স্বদেশী ভাষার পুনরুজ্জীবন দানে মনোযোগী হন। এইরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, 'আরবদের ইরান জয়ের দুই শত বৎসর পর ফারসী

ভাষা উহার বর্তমান রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে এবং জ্ঞানচর্চাকারিগণ ফারসী ভাষাকে গদ্য ও পদ্য রচনার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন। বর্তমানে ফারসী ভাষার উদ্ভব কবিতা দ্বারা সূচিত হয়। এইজন্য প্রথম ফারসী কবির কবিতা পাঠকদের নিকট পেশ করা ঐতিহাসিকদের দায়িত্ব। ঐতিহাসিক রিয়া.কু'লী হিদায়াতের বর্ণনানুসারে ইরানের ইসলামী যুগের প্রথম কবি ছিলেন হা'কীম আবূ হা'ফস' সা'গাদী (মাজমা'উ'ল- ফুস'াহা, ১খ, ৬১)। তিনি হি. প্রথম শতকের কবি ছিলেন। তৎকর্তৃক রচিত একটি শ্লোক এই ঃ

آهـوی کـوهـی در دشـت چـگـونـه رودا
یـار نـدارد بـی یـار چـگـونـه رودا

'পার্বত্য অঞ্চলে লালিত হরিণ সমভূমিতে কীরূপে দৌড়াইবে ? তথায় তাহার তো কোনও সঙ্গী নাই। সঙ্গীহীন অবস্থায় সে কীরূপে পথ চলিবে ?'

কবি আবূ হা'ফ্সে'র প্রথম শতকের কবি হইবার বিষয়টি নিশ্চিত নহে। কারণ ঐতিহাসিক শামস কায়স রাযী লিখিয়াছেন, আবূ হা'ফ্স' তৃতীয়/নবম শতকের কবি ছিলেন (আল-মু'জাম ফী মা'আয়ীরি আশ'আরি'ল-'আজাম, সিলসিলা-ই য়াদগার-ই গিব, পৃ. ১৭১)। উক্ত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কবি রূদকীর (মৃ. ৩২৯/৯৪০) সমসাময়িক কবি ছিলেন। ঐতিহাসিক নিজা'মী আরূযী সামারকান্দীর বর্ণনানুসারে (চাহার মাকা'লা, মুহ'াম্মদ কাযবীনী কর্তৃক মুদ্রিত, পৃ. ১৪২), কবি হান্‌জালা বাদগায্‌সী (মৃ. ২১৯ বা ২২০/৮৩৪- ৮৩৫) কবি আবূ হা'ফ্সে'র পূর্ববর্তী যুগের কবি ছিলেন। উল্লেখ্য, আহ'মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ খুযিস্তানী (মৃ. ২৬৮/৮৮১) উক্ত কবি হানজালা রচিত কাব্যগ্রন্থ (দীওয়ান) দ্বারা প্রভাবিত হইয়া গাধার ব্যবসায় ত্যাগ করত পর্যায়ক্রমে এক সময়ে খুরাসান প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব লাভে কৃতকার্য হন। তা'হিরী ও সাফফারী রাজবংশের শাসনামলের আরও একাধিক কবি কবি আবূ হা'ফসে'র পূববর্তী যুগে জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক 'আওফী স্বীয় গ্রন্থে (লুবাবুল-আলবাব, ১খ, ২১) ইরানের অন্যতম প্রাচীন কবি 'আব্বাস মার্ওয়াযীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কবি 'আব্বাস খলীফা মামূনু'র- রাশীদের (১৯৮/৮১৩-২১৮/৮৩৩) সমসাময়িক ছিলেন। ১৯৩/৮০৮-৮০৯ সনে খলীফা মামূনের প্রথমবার মারব আগমন উপলক্ষে তিনি তাঁহার প্রশংসায় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, উহার প্রথম চরণদ্বয় হইতেছে এই ঃ

ای رسـانـیده بـدولت فرق خـود تـا فـرقـدین
گـسـترانـیده بـجـود وفـضـل در عـالم یـدین

"হে মহামান্য সম্রাট! ধনদৌলত দান করিয়া আপনি স্বীয় মুকুটকে লঘু সপ্তর্ষির উজ্জ্বল নক্ষত্রদ্বয়ে পৌঁছাইয়াছেন। দয়া-দাক্ষিণ্যসহ স্বীয় হস্তদ্বয়কে আপনি জগতে বিস্তারিত করিয়া দিয়াছেন।"

প্রাচ্যবিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ব্রাউন চরণদ্বয় কবি 'আব্বাস কর্তৃক রচিত হইবার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন (A. Lit. Hist, of Persia, 2খ, 13)। মির্যা মুহাম্মাদ ক'াযবীনী ফার্সী ভাষায় প্রাচীনতম কবিতা শীর্ষক নিবন্ধে (বিস্ত মাকা'লা-ই ক'াযবীনী গ্রন্থ দ্র.) প্রমাণ করিয়াছেন যে, কবি 'আব্বাস কর্তৃক রচিত বলিয়া কথিত উক্ত চরণদ্বয় প্রকৃতপক্ষে তাঁহার রচনা নহে, বরং পরবর্তী কালের কেহ উহা রচনা করিয়া কবি 'আব্বাস কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কাযবীনী কর্তৃক বর্ণিত এতদ্‌সম্পর্কিত প্রমাণাদি নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে ঃ (১) উক্ত চরণদ্বয় যে কাসীদার অংশ উহার চরণসমূহ বিন্যাস পদ্ধতি ও রচনা কৌশল প্রাচীন নহে, বরং আধুনিক; (২) ইরানী কবিগণ একমাত্র তখনই বর্তমান ছন্দসমূহ মুতাবিক কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন যখন 'আরবী ছন্দশাস্ত্রের উদ্ভাবক খালীল ইব্‌ন আহ'মাদ (মৃ.১৭৫/৭৯১ সনের দিকে)-এর মাধ্যমে ছন্দবিদ্যার প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথম দিকে ইরানী কবিগণ ফার্সী কবিতা রচনায় 'আরবদের সকল প্রকারের ছন্দের অনুকরণ করেন। পরবর্তী কালে তাঁহারা তাঁহাদের মনঃপূত নয় এমন সব ছন্দ পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা কোনও কোনও ছন্দে প্রয়োজনীয় মাত্রার সংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া নূতন ছন্দ উদ্ভাবন করেন। এইরূপ নব উদ্ভাবিত ছন্দগুলি ইরানী কবিদের নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়। যেমন হাযাজ ও রামাল নামীয় ছন্দদ্বয়ের মাত্রার সংখ্যা 'আরবী ছন্দবিদ্যা অনুসারে ছয়টি। ইরানী কবিগণ ইহাদের প্রতিটি ছন্দে অতিরিক্ত দুইটি মাত্রা সংযোজিত করিয়া উহাদিগকে আট মাত্রাবিশিষ্ট ছন্দে পরিণত করেন। কবি 'আব্বাস কর্তৃক রচিত বলিয়া কথিত অষ্ট মাত্রাবিশিষ্ট রামাল নামীয় ছন্দশ্রেণীর অন্তর্গত (উহার কোন কোন মাত্রা কখনও সংক্ষেপিত এবং কখনও উহ্যও থাকে)। বলা অনাবশ্যক যে, আরবী ছন্দবিদ্যা উহার উদ্ভাবনের বহু পরে ইরানে প্রচার ও প্রসার লাভ করে। অতএব উহার উদ্ভাবক খালীল ইব্‌ন আহমাদের ইনতিকালের মাত্র আঠার বৎসর পর ১৯৩/৮০৮ সনে উহার নিয়মাবলী ইরানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়া অসম্ভব ও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। ইহাও যুক্তিগ্রাহ্য নহে যে, খুরাসানের ন্যায় ইরানের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন কবি ('আব্বাস) রামাল নামীয় ছন্দের ন্যায় একটি নূতন প্রকারের ছন্দে— যাহা তাঁহার মৃত্যুর পর উদ্ভাবিত হওয়াই নিশ্চিত— কবিতা রচনা করিয়াছেন; (৩) ঐতিহাসিক 'আওফীই সর্বপ্রথম কবি 'আব্বাসের প্রথম ইরানী কবি হইবার কথা বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক কোনও ঐতিহাসিক উহা সমর্থন করেন নাই। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ইরানের প্রথম কবি 'আব্বাস মারওয়াযী হইতে পারেন না। ঐতিহাসিক মির্যা মুহ'াম্মাদ কাযবীনী— ইব্‌ন কু'তায়বা (তা'বাকাতুশ-শু'আরা), তা'বারী (তারীখ, লাইডেন, ২খ, ১৯২-১৯৩) ও আবুল-ফারাজ আল-ইসফাহানী (কিতাবুল-আগানী, ১৭খ, ৫৬) এই ঐতিহাসিকত্রয়ের বরাতে লিখিয়াছেন যে, য়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার খিলাফাতের যুগে (৬০/৬৮০-৬৪/৬৮৩) 'আব্বাদ ইব্‌ন যিয়াদ ইরানের সীস্তান অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া আসিবার কালে কবি য়াযীদ ইব্‌ন মুফাররিগ' তাঁহার সহিত তথায় পরিচয় উদ্ধার করিয়া আগমন করেন। এক সময়ে কবি য়াযীদ 'আব্বাদ ইব্‌ন যিয়াদের কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইলে তিনি তাঁহার নিন্দায় কবিতা রচনা করেন। তৎকর্তৃক রচিত উক্ত নিন্দামূলক কবিতার তিনটি চরণ এই ঃ

اَبست نـبـیـذ اسـت . عـصـارات زبـیـب اسـت. سـمـیـه
رو سـپـیـز اسـت–

"এখানে পানি আছে। এখানে খোর্মা ভিজানো পানি আছে। এখানে আঙ্গুরের রস আছে। ('আব্বাদ ইব্‌ন যিয়াদের পিতামহী) সুমায়্যা-র মুখমণ্ডল হইতেছে শ্বেত।"

তাবারী তাঁহার তা'রীখ গ্রন্থে ১০৮/৭২৬ সনের ঘটনাবলীর বর্ণনায় লিখিয়াছেন, আবূ মুনযির আসাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-ক'াস্‌রী যখন তুর্কী সম্রাটের (খাকান) নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া খুরাসানে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন খুরাসানবাসীগণ তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন ঃ

از ختلان آمذى    برو تباه آمذى

از ختلان آمذى    برو تباه آمذى

بيدل فراز آمذى

از ختلان آمذى    برو تباه آمذى

آبار باز امدى    خشك نزار آمذى

"তুমি খুত্তালান অঞ্চল হইতে আসিয়াছ। তুমি বিপর্যস্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছ। তুমি দূর হও। তুমি খুত্তলান এলাকা হইতে আসিয়াছ। তুমি বিপর্যস্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছ, তুমি দূর হও। তুমি নিরাশ হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়াছ। তুমি খুত্তালান এলাকা হইতে আসিয়াছ। তুমি বিপর্যস্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছ, তুমি দূর হও। তুমি নিরাশ অন্তকরণে প্রত্যাবর্তন করিয়াছ। তুমি শুষ্ক দেহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছ"।

কাব্যরস বিচারের মানদণ্ডে যদিও উক্ত চরণগুলি কবিতা নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে, তথাপি নিশ্চয় উহা প্রাথমিক ফারসী কবিতা রচনার নমুনা।

ইরানে কবিদের অব্যাহত আবির্ভাব ও তাঁহাদের অব্যাহত কবিতা রচনা আরম্ভ হয় তাহিরী রাজবংশের রাজত্বকালে। এই যুগের কবি হ'ানজ'লা বাদগায়সী (মৃ. ২১৯-২২০/৮৩৪-৮৩৫) ছিলেন কাব্যগ্রন্থ (দীওয়ান) রচয়িতা প্রথম কবি। তাহিরী রাজবংশ অপেক্ষা স'াফ্ফারীগণ (২৫৪/৮৬৭-২৯০/৯০৩) ফারসী সাহিত্যের উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনে অধিকতর মনোযোগী ও উৎসাহদাতা ছিলেন। উক্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা য়া'কূ'ব ইব্ন লায়ছ 'আরবী ভাষায় কাসীদা রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইলে তিনি উহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিতেন, যে কবিতার অর্থ আমি বুঝি না, তাহা আমাকে শুনাইলে কী লাভ হইবে? (শাফাক তারীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, পৃ. ৩৭; তা'রীখ-ই সীস্তান -এর উদ্ধৃতিতে)। ইরানে কবি ও সাহিত্যিকগণ ফারসী ভাষায় কবিতা ও নিবন্ধ রচনায় সচেষ্ট ও যত্নবান হন। য়াকূব ইব্ন লায়ছের সচিব মুহাম্মাদ ইব্ন ওয়াস'ীফ নিজে কবি ছিলেন। তিনি বাদশাহ্র প্রশংসায় একাধিক কাসীদা রচনা করিয়াছিলেন। সাফ্ফারী দরবারের কবি ফীরোয মাশরিকী (মৃ. ২৮১/৮৯৫) 'আম্র ইব্ন লায়ছ (২৬৫/৮৭৮-২৮৭/৯০০)-এর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ফারসী কাসীদায় ন্যূনতম সংখ্যক আরবী শব্দ ব্যবহারের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কবি আবূ সালীক গূরগানীও 'আম্র ইব্ন লায়ছের সমসাময়িক ছিলেন। সামানী রাজবংশের শাসন (২৬১/৮৭৪-৩৮৯/৯৯৯) সমগ্র ইরানভিত্তিক ছিল না, বরং উহা ছিল অঞ্চল ভিত্তিক। এই হেতু উক্ত রাজবংশের শাসনামলে ফার্সী ভাষাবিদ 'আলিম ও কবিদিগকে বিপুলভাবে সমাদৃত ও উৎসাহিত করা হইত। উহার ফলে এই যুগে ফারসী ভাষা বেশ উৎকর্ষ লাভ করে। তবে প্রাচ্যবিদ ব্রাউনের বর্ণনামতে এরূপ মনে করা সমীচীন নহে যে, সামানী রাজবংশের সম্রাটগণ ফারসী ভাষায় 'আরবী শব্দের অনুপ্রবেশ অথবা ইরানে 'আরবী ভাষার প্রসার ও প্রচার রোধ করিতে কোনরূপ চেষ্টা করিতেন (A Lit. Hist. of Persia, ১খ, ৩৬৫)। কবি আবূ শাকূর বালখী বাদশাহ নূহ ইব্ন নাস্'র (৩৩১/৯৪২-৩৪৩/৯৫৪)-এর দরবারের সভাকবি ছিলেন। ঐতিহাসিক শাফাকের বর্ণনানুসারে (তারীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, পৃ. ৩৮) সর্বপ্রথম তিনিই ফারসী ভাষায় মাছ'নাবী শ্রেণীর কাব্য (যে কাব্যের কবিতার প্রতি দুই চরণের শেষে মিল রহিয়াছে) রচনা করেন (উহার রচনাকাল ৩৩৬/৯৪৭ সন)। স্বীয় মাছনাবীতে তিনি সহজ, সাবলীল ও নিরলংকার ভাষা ব্যবহার করেন। উহাতে ব্যবহৃত উপমাসমূহ প্রাকৃতিক ও সহজবোধ্য। কবি আবুল মু'আয়্যিদ বাল্খী উক্ত দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবার কালেই তাঁহার মাছনাবী 'য়ূসুফ যুলায়খা' রচনা করেন। কবি হাকীম কিসাঈ মারওয়াযী (জন্ম ২৯১/৯০৩ সনের দিকে) ধর্মীয় বিষয়াবলী এবং উপদেশ ও নীতিকথাকে স্বীয় কাব্য রচনার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেন। কবি আবুল-হাসান শাহীদ বালখী এবং কবি 'আম্মারা মারওয়াযীও সামানী দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রূদকী উক্ত রাজবংশের দরবারের সহিতই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বাদশাহদের প্রশংসায় কাসীদা রচনা করিতেন এবং তাঁহাদিগকে বাদ্যযন্ত্র সহকারে সঙ্গীত শুনাইতেন। তিনি সঙ্গীত রচনার গুরু ছিলেন। তাঁহার রচনায় সাবলীলতা ও গতিশীলতা রহিয়াছে। উহা কষ্টকল্পনার দোষ হইতে মুক্ত। উহাতে ব্যবহৃত উপমাসমূহ প্রাকৃতিক বিষয়বলী হইতে গৃহীত। তাঁহার রচিত কাসীদার প্রারম্ভিক অংশে গাযাল বা গানের রস বিদ্যমান রহিয়াছে। বক্তব্য বিষয়সমূহে শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতা রহিয়াছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং সৃষ্টিতে বিধৃত রহস্যাবলী তাঁহার রচনার বিশেষ বিষয়বস্তু হইয়া রহিয়াছে। খুরাসানের অন্য সভাকবিগণও তাঁহাদের রচনায় উক্ত রচনা পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত রচনা নীতি সাবুক-ই খুরাসানী বা খুরাসানী বিশেষ রচনা রীতি নামে অভিহিত হইয়াছে। ফারসী কাব্য রচনায় প্রথমবারের মত পরিদৃষ্ট কাব্য রচনার একটি বিশেষ বিষয়বস্তু হইতেছে বিগত যৌবনের জন্য শোক ও বিলাপ প্রকাশ করা। এইরূপ শোক ও বিলাপ প্রকাশকে কাব্য রচনার বিষয়বস্তু করিয়া কবি রূদকী তাঁহার কবিতায় অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি কালীলা ওয়া দিমনা গ্রন্থকেও ফার্সী কাব্যরূপ দান করিয়াছিলেন কিন্তু কালের করাল গ্রাসে উহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কবি রূদকীর পরে যে কবি সামানী দরবারে সর্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতি লাভ করেন তিনি হইতেছেন কবি দাকীকী বালখী। তিনি সামানী বাদশাহ নূহ ইব্ন মানসূরের আদেশে শাহনামাহ রচনা আরম্ভ করেন; কিন্তু মাত্র এক হাযার শ্লোক রচনাকার্য সম্পন্ন হইবার পর তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে স্বীয় দাসের হস্তে নিহত হন। কবি দাকীকী নব নব রচনারীতির উদ্ভাবক কবি ছিলেন। তিনিই ইরানে মহাকাব্য রচনার প্রবর্তক ছিলেন। তৎকর্তৃক রচিত কতগুলি খণ্ড কবিতা ও কাসীদা তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

সামানী রাজবংশের শাসনামলে ইরানে কাব্য রচনার পাশাপাশি ফার্সী গদ্য রচনাও উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকে। তৎকালে রচিত গদ্য গ্রন্থাবলীর কোনও কোনও গ্রন্থ অবশ্য এখন আর পাওয়া যায় না (শাফাক, তা'রীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, পৃ. ৫৩)। ৩৪৬/৯৫৭ সনে তূস নগরের শাসনকর্তার আদেশে আবূ মানসূ'র ইব্ন 'আবদির'-রায্যাক' কর্তৃক রচিত মুক'াদ্দিমা-ই শাহনামাহ নামীয় গদ্য গ্রন্থটি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত গ্রন্থ ফারসী-ই দারী' নামীয় নির্ভেজাল ফার্সীতে রচিত। 'আরবী নামসমূহ ভিন্ন একটি 'আরবী শব্দও উহাতে স্থান পায় নাই। উহাতে সমার্থবোধক শব্দাবলী ব্যবহৃত হইয়াছে— তবে উহাতে অলংকারিক বর্ণনার প্রাচুর্য নাই। আবূ 'আলী বাল'আমী, যিনি 'আবদু'ল মালিক ইব্ন নূহ (৩৪৩/৯৫৪-৩৫০/৯৬১) ও মানসূ'র ইব্ন নূহ' (৩৫০/৯৬১-৩৬৬/৯৭৬)-এর মন্ত্রী ছিলেন, ফারসী ভাষায় তা'বারীর তা'রীখ গ্রন্থের অনুবাদ করেন। উক্ত অনুবাদ গ্রন্থের ভাষা সরল ও গতিশীল। প্রথম যুগের ফারসী গদ্য রচনার উক্ত রীতি 'সাবুক কাদীম বা 'প্রাচীন রচনা রীতি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উক্ত রীতিতেই

মা ওয়ারা'উন'-নাহর (ট্রান্স-অক্সিয়ানা) অঞ্চলের জনৈক আলিমও ফারসী ভাষায় তা'বারীর তাফসীরের অনুবাদ করেন।

সুলতান মাহমূদ গা'যনাবী (৩৮৮/৯৯৮-৪২১/১০৩০)-র হস্তে সামানী রাজবংশের শাসন কালের পরিসমাপ্তি ঘটিবার পর গাযনাবী শাসনামলে রাজধানী গাযনী নগরী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই যুগে পূর্বোক্ত সাবুক-ই খুরাসানী বা খুরাসানী রচনা রীতি চরম উৎকর্ষ লাভ করে।

কবি 'উনসু'রী (৩৫০/৯৬১-৪৩১'/১০৩৯) গাযানাবী রাজদরবারের মালিকুশ-শু'আরা' অর্থাৎ কবি সম্রাট ছিলেন। সুলতান মাহমূদের সহচর হইবার সৌভাগ্য লাভ করিবার কারণে তিনি তাঁহার কাসীদাসমূহে জৌলুসময় ভাষায় উক্ত বিজয়াভিযানসমূহের বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি সুলতান মাহমূদের স্থলাভিষিক্ত শাসনকর্তাদের প্রশংসায়ও কিছু কাসীদা রচনা করেন। অধিকাংশ কাসীদায় এইরূপ বিষয়াবলীকেও রচনার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, যদ্বারা তাঁহারা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। তৎকর্তৃক রচিত দীওয়ান-ই আশ'আর (কাব্যগ্রন্থ) তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। তিনি কিছু সংখ্যক মাছনাবী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; কিন্তু ওয়ামিক ওয়া আযরা (وامق وعذراء) নামীয় মাছনাবী গ্রন্থ ছাড়া উহাদের সবগুলিই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কবি ফারুরূখী গায্নীর রাজদরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি বিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদের ভক্ত ছিলেন। তাঁহার কবিতায় পার্থিব ভোগবিলাস ও আরাম-আয়েশের প্রতি তাঁহার আকর্ষণের প্রকাশ ঘটিয়াছে। গীতি কবিতার উপযোগী শব্দ প্রয়োগে তাঁহার বিশেষ যোগ্যতা ছিল। তাঁহার কবিতায় সহজ সরল বক্তব্য বিষয় লিপিবদ্ধ। উহাতে চিন্তার গভীরতা অনুপস্থিত।

আলোচ্য যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন মহাকবি ফিরদাওসী (জন্ম ৩২৯/৯৪০ সনের দিকে)। তিনি ইরানের জাতীয় কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁহার গভীর প্রভাবের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। শাহ্নামা মহাকাব্য তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত রচনা (৩৬৫/৯৭৫ সনে উহার রচনা কার্য আরম্ভ হইয়া ৪০০/১০০৯ সনে উহা সমাপ্ত হয়)। উক্ত কাব্য গ্রন্থে তিনি ইরানের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তিনি ইরানের প্রাচীন ইতিহাস পুনরুজ্জীবিত করিয়া ইরানীদের মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিয়াছেন। মহাকবি ফিরদাওসী শাহনামা রচনায় 'আরবী শব্দ যথাসম্ভব ব্যবহার না করার নীতি কঠোরভাবে মানিয়া চলেন। ফলত 'আরবী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে , যে ক্ষেত্রে উহা ব্যবহার ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। শাহ্নামা উহার উচ্চাঙ্গ রচনাসৌকর্য ও পরিশীলিত কাব্যরস দ্বারা সভ্য জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছে। একাধিক এশীয় ও য়ূরোপীয় ভাষায় উহা অনূদিত হইয়াছে। শাহনামা মহাকাব্য ও উহার রচয়িতা মহাকবি ফিরদাওসী বিশ্বের সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবেন। শাহনামা রচিত হইবার প্রথম শতকে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হইবার সংখ্যাগত হার যে কোন বিখ্যাত মহাকাব্যকে হার মানাইয়াছে বলিয়া কথিত। বাংলা একাডেমী কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ শাহনামা বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

এই যুগে কবি আসাদী (বড়) ছন্দোবদ্ধ বিতর্কমূলক কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র আবূ নাস্'র ইবন আহমাদেরও কবি নাম ছিল আসাদী (ছোট)। তিনি শাহনামার অনুকরণে গুর্শাস্পনামাহ্ রচনা করেন। পিতা-পুত্র উভয়ের কবি নাম একই হইবার কারণে কোনও কোনও আধুনিক গবেষক ধারণা করিয়াছেন যে, গুরশাস্পনামাহ কাব্য গ্রন্থটি কবি আসাদী (বড়) কর্তৃক রচিত (শিব্লী নু'মানী, শি'রু'ল-'আজাম, ১খ, ১২১; শাফাক, তা'রীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, পৃ. ১৪১)। সর্বপ্রথম প্রাচ্যবিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইথে (Ethe), অতঃপর ব্রাউন (A Lit. Hist. of Persia, ২খ, ২৭২) উক্ত ভ্রান্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন, গুরশাস্পনামাহ্ কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা হইতেছেন কবি আসাদী (ছোট)। তিনি কবি আসাদী (বড়) হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন। শেষোক্ত কবি (আসাদী বড়) বিতর্কমূলক কবিতার রচয়িতা ছিলেন। সমালোচক হাফিজ শীরানী ঐতিহাসিক পর্যালোচনা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, গুর্শাস্পনামাহ্-র রচয়িতা কবি আসাদী (বড়) নহেন, বরং উহার রচয়িতা হইতেছেন কবি আসাদী ছোট (তান্কী'দুশ-শি'রিল' 'আজাম, পৃ. ১৫৩)।

কবি মানূরচহ্রী দামিগা'নী (মৃ. ৪৩২/১০৪০) 'আরব কবিদের রচনা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তাঁহার রচিত কাসীদাসমূহে বহুল পরিমাণে 'আরবী শব্দের ব্যবহার এবং 'আরবী শব্দ বিন্যাস প্রণালীর অনুসরণ দেখা যায়। পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা, কাফেলার কথা, মরুভূমির বর্ণনা, বাব্লা গাছের কাঁটার সাহচর্য, বিশ্রামের পর কাফেলার স্থান ত্যাগের সময়ে উটের পিঠে অবস্থিত আসনের শব্দ এবং সুহায়ল ও সিমাক নক্ষত্রদ্বয়ের উল্লেখ তাঁহার কবিতায় বহুল পরিমাণে দেখা যায় (উল্লেখ্য, 'আরবী কবিতায় উক্ত বিষয়সমূহের উল্লেখ স্বভাবতই বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়)। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কবি মানূচেহ্রী দামিগানী তাঁহার রচনায় ''আরবী রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আরও কয়েকজন কবি গাযনীর রাজদরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যেমন 'আস্জাদী, বাহ্রামী সারাখসী, লাবীবী খুরাসানী, গাদা'ইরী রাযী, 'উতারিদী প্রমুখ কবি।

সুলতান মাহমূদের মৃত্যুর পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত শাসনকর্তাদের মধ্যে বিশাল সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণে রাখিবার যোগ্যতা না থাকিলেও তাঁহারা কবিতা ও কাব্য রচনা পসন্দ করিতেন। তাঁহাদের দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট কবি আবুল-ফারাজ রূনী ও মাসঊদ সা'দ সালমান (৪৪০/১০৪৮-৫১৫/১১২১) কাসীদা রচনায় বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। শেষোক্ত কবি এই দিক দিয়া হতভাগ্য ছিলেন যে, শত্রুদের চক্রান্তে তিনি প্রথমে দশ বৎসর এবং পরে আরও আট বৎসর বিভিন্ন দুর্গে কারারুদ্ধ ছিলেন। কারাগারে আবদ্ধ থাকাকালীন নির্মম অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া তিনি কারাগার ও উহার দুর্ভোগ বিষয়ে বহু সংখ্যক কবিতা রচনা করেন। এই শ্রেণীর কবিতাবলী (حبسية কারগার সম্পর্কিত কবিতা) তাঁহার কবি প্রতিভার উত্তম নিদর্শন। কবিতা রচনার আর একটি রীতি হইতেছে شهر آشوب রীতি। সম্ভবত তিনি উক্ত রীতির উদ্ভাবক ছিলেন। এই শ্রেণীর কবিতায় সমাজ চিত্রের বিভিন্ন দিকের পরিচয় বিবৃত হইয়া থাকে।

গাযনাবী যুগে ইতিহাস রচনাও উৎকর্ষ লাভ করে। মহান ঐতিহাসিক আবুল-ফাদ্'ল বায়হাকী' ( ৩৮৫/৯৯৫-৪৭০/১০৭৭) এই যুগে তা'রীখ-ই বায়হাক (রচনাকাল ৪৫১/১০৫৯) নামক ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। জীবনীকারগণ এই বিষয়ে একমত যে, উক্ত ইতিহাস গ্রন্থ একজন বিশ্বস্ত দায়িত্ব সচেতন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া রচিত। তাঁহারা এই বিষয়েও একমত যে, উক্ত গ্রন্থ ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নের একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি বর্তমানে রক্ষিত নাই। ইহার শুধু একটি খণ্ডই রক্ষিত আছে। উহাতে সুলতান মাহমূদের পুত্র সুলতান মাস'উদের শাসনামলের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উক্ত খণ্ডই তা'রীখ-ই বায়হাক বা তা'রীখ-ই মাস'ঊদী নামে

পরিচিত। উক্ত গ্রন্থে বহুল পরিমাণে 'আরবী শব্দের ব্যবহার ও 'আরবী শব্দ বিন্যাস প্রণালীর অনুসরণ পরিলক্ষিত হয়। উহার কোথাও কোথাও শব্দ প্রয়োগের নৈপুণ্য দেখা যায়। এই যুগে ঐতিহাসিক আবূ সা'ঈদ (সা'দ) 'আবদু'ল-হ'ায়্যি ইব্ন দাহ'হ'াক গারদিযী, 'যায়নু'ল-আখবার' (রচনা ৪৪০/১০৫১ সনের মধ্যে সম্পন্ন) নামক ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। উহাতে জগত সৃষ্টির সূচনা হইতে শুরু করিয়া সুলতান মাওদূদ ইব্ন সুলতান মাস'উদ গায্নাবী (৪৩২/১০৪১-৪৪১/১০৪৯-–র রাজত্বকালের ঘটনাবলী পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

এই যুগে ছন্দশাস্ত্রবিদ ফার্রুখী তার্জুমানুল-বালাগাত নামক একখানা ছন্দশাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় না। গাযনাবী সুলতানদের সমসাময়িক অন্যান্য অঞ্চলের কোনও কোনও রাজবংশও যোগ্য কবিদিগকে নিজেদের দরবারে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। বুওয়ায়হী রাজবংশের (৩২০/৯৩২-৪৪৮/১০৫৬) বাদশাহদের দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট কবিদের অন্যতম কবি কামালু'দ্-দীন বুন্দার স্বীয় কাসীদাসমূহে সাহিত্যিক ফারসী ব্যতীত রায় অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষাও ব্যবহার করিয়াছেন। কবি ক'াত'রান তাবরীযী (মৃ. ৪৬৫/১০৭২) বুওয়ায়হী বাদশাহদের প্রশংসায় কাসীদা রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইতেন। তৎকর্তৃক রচিত কাসীদাসমূহে অলংকারের প্রাচুর্য দেখা যায়। তবে তাঁহার যালযালা-ই তাব্রীয নামক কাসীদা তীব্র আবেগানুভূতি প্রকাশের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তুর্কিস্তান আয়লাক খানী রাজবংশের শাসনামলে (আনু. ৩২০/৯৩২-৫৬০/১১৬৫) ও মা ওয়ারাউন-নাহর (ট্রান্সঅক্সিয়ানা) অঞ্চলে ফারসী কাব্য রচনা উৎকর্ষ লাভ করে। কবি 'আম'আক বুখারা'ঈ (মৃ. ৫৪৩/১১৪৮-১১৪৯) মা ওয়ারা'উন-নাহ্র অঞ্চলের শাসনকর্তা খিদি'র খানের দরবারের কবি সম্রাট ছিলেন। তাঁহার কাসীদাসমূহ আনন্দরসে পরিপূর্ণ এবং পাঠককে উহা আনন্দ দান করে। আনন্দবর্ধক 'প্রারম্ভিক অংশে'র জন্য উহারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে।

সাল্জূক রাজবংশের (৪২৯/১০৩৭-৫৯০/১১৯৪) ইরানকে গাযনাবীদের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিবার পর খুরাসানের বিখ্যাত শহর নীশাপুর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই যুগের সুলতান মালিক শাহ (৪৬৫/১০৭২-৪৮৫/১০৯২) ও সুলতান সান্জার (৫১৩/১১১৯-৫৫২/১১৫৭) জ্ঞান-বিজ্ঞানের অত্যন্ত অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারা 'আমীদু'ল মালিক কুন্দুরী ও নিজ'ামুল-মুল্ক তূসীর ন্যায় বিচক্ষণ মন্ত্রী পাওয়ায় জ্ঞানী ও জ্ঞান চর্চাকারী ব্যক্তিদের সম্মান ও মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। সালজূক বাদশাহদের শাসনামলে দরবারী কাব্য রচনা চরম উৎকর্ষ লাভ করিলেও সামানী শাসনামলে রচিত দরবারী কবিতায় যে সরলতা, সাবলীলতা, আবেগানুভূতির প্রাবল্য, প্রাণচাঞ্চল্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য হিসাবে বর্তমান ছিল, সাকলজূক শাসানামলে রচিত দরবারী কবিতা হইতে তাহা ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়া জ্ঞানপূর্ণ বক্তব্য ও শব্দ প্রয়োগ-নৈপুণ্য উহাদের স্থান অধিকার করে। এই যুগের কবিদের কবিতায় শব্দালংকার ও অর্থালংকার, অতিরঞ্জন, অপ্রাকৃতিক উপমা ব্যবহার বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। কাহারও কাহারও কবিতায় রূপক ব্যবহারের ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হয়। যাহা হউক, উহা দ্বারাও ফারসী সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়াছে।

হি. চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীদ্বয় তাস'াওউফ চর্চার ইতিহাসেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাল ছিল। এই সময়ে তাস'াওউফ শিক্ষা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। কবিগণ উহা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া খণ্ড কবিতা ও রুবা'ইয়াতের মাধ্যমে তাসাওউফের বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করেন। তাঁহারা তাঁহাদের কবিতায় সৃষ্টি-প্রেমের আড়ালে স্রষ্টা প্রেমের বর্ণনা করেন। এইরূপে ব্যাপকার্থক সূফীতত্ত্বের কথা সর্বসাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। সূফী সাধক বাবা তাহির 'উরয়ান হামাদানী লুরী ভাষার সদৃশ আঞ্চলিক ভাষায় এক শ্রেণীর রুবা'ইয়াত কবিতা রচনা করেন। উহাদের ওযন রুবা'ইয়াত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে পৃথক। এইদিক দিয়া উহারা ফাহ্লাবিয়্যাত (فهلويات) নামে আখ্যায়িত হইয়াছে (শাফাক, তারীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, পৃ. ১০৯)। তাঁহার ভাষা অত্যন্ত সরল ও নিরলংকার। বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর ঐক্য, স্রষ্টা হইতে মানুষের বিচ্ছেদ ও তজ্জন্য কবির মানসিক অস্থিরতা, কবির নিঃসঙ্গ ও অকিঞ্চিৎকর অবস্থা ইত্যাদি হইতেছে তাঁহার কবিতার বিষয়বস্তু। কবি আবূ সা'ঈদ আবু'ল-খায়র (৩৫৭/৯৬৮-৪৪০/১০৪৮) বিখ্যাত সূফী সাধক ছিলেন। তিনি রুবা'ইয়াত শ্রেণীর কবিতাকে তাসাওউফ প্রচারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন। কোনও কোনও ফরাসী প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতের মতে কবি আবূ সা'ঈদ আবুল-খায়র কর্তৃক রচিত বলিয়া কথিত রুবা'ইয়াত প্রকৃতই তৎকর্তৃক রচিত হইবার বিষয়টি নিশ্চিত নহে। প্রেথলেস নামক জনৈক ফরাসী পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই যে, তিনি (কবি বূ সা'ঈদ আবু'ল-খায়র) তাঁহার জীবনে মাত্র একবার তাৎক্ষণিকভাবে একটি রুবা'ঈ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তৎকর্তৃক রচিত বলিয়া কথিত অন্যান্য রুবা'ঈ কবিতা তাঁহার নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আর না হয় তিনি তাঁহার ওয়াজসমূহে অপর কর্তৃক রচিত উক্ত রুবা'ইয়াত শ্রোতাদিগকে পড়িয়া শুনাইবার ফলে লোকেরা ভুল বশত উহাদিগকে তাঁহারই রচনা বলিয়া মনে করিয়াছে।" পণ্ডিত প্রবর প্রেথলেস তাঁহার উক্ত অভিমতের পক্ষে কোনও প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই। পক্ষান্তরে ইরানের আধুনিক গবেষক আক'া যাবীহু'ল্লাহ স'াফা লিখিয়াছেন, 'সূফী সাধকদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই (কবি আবূ সা'ঈদ আবু'ল-খায়র) কবিতার মাধ্যমে সূফীতত্ত্বের বিষয়সমূহ প্রকাশ ও প্রচার করেন। অবশ্য তৎকর্তৃক রচিত রুবা'ইয়াতের বিপুলাংশই প্রক্ষিপ্ত রচনা (তারীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, ১খ, ৬০৭)।

কবি সানা'ঈ (মৃ. ৫৪৫/১১৫০)-র কবিতা, কবিতার মাধ্যমে তাসাওউফের বিষয়াবলীকে প্রকাশ ও প্রচার করিবার আরেকটি পদক্ষেপ ছিল। তিনি মাছ'নাবী-ই হ'াদীক'াতু'ল-হ'াকীক'াত (রচনাকাল ৫২৫/১১৩০) কাব্য গ্রন্থে তাসাওউফের বিষয়সমূহকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে রূপক ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়াছেন। সূফী সাধক ফারীদু'দ-দীন 'আত্তার (মৃ. ৬২৭/১২২৯) তাঁহার মানতিকু'ত'-তা'য়র নামক মাছনাবী শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থে উক্ত পন্থাকে অধিকতর সফলতার সহিত প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি একাধিক মাছন্নাবী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (তৎকর্তৃক রচিত কাব্য গ্রন্থাবলীর একটি বৃহৎ সংকলন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে)। মাওলানা জালালু'দ-দীন রূমী কর্তৃক রচিত মাছ'নাবী-ই মা'নাবী (তাসাওউফ তত্ত্ব বিষয়ক মাছনাবী) অত্যন্ত বিখ্যাত তাসাওউফ বিষয়ক কাব্য গ্রন্থ। উক্ত কাব্য গ্রন্থ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য ঃ

هست قرآن در زبان پهلوى

(রূমী রচিত 'মাছ্নাবী' গ্রন্থ) হইতেছে ফারসী ভাষায় রচিত 'কুরআন মাজীদ।'

আলোচ্য যুগে মহাকাব্য রচনার দিকে কবিদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কবি আসাদী (ছোট) কর্তৃক রচিত ইতিপূর্বে আলোচিত গুর্শাপনামাহ নামক মহাকাব্য এই যুগেরই রচনা।

কবি খাকানী (৫২০/১১২৬-৫৯৫/১১৯৮) মানূচেহিরী খাকান শেরওয়ানীর প্রশংসায় কাসীদা রচনা করিয়া অনেক খ্যাতি অর্জন করেন। 'আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত হইবার কল্যাণে তিনি 'আরবী শব্দসমূহ ও 'আরবী শব্দবিন্যাস প্রণালীর ব্যবহারকে স্বীয় কাসীদাসমূহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করেন। স্বীয় কাসীদাসমূহে তিনি যে সকল উপমা ও দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন, উহারা প্রায়শ অপ্রাকৃতিক ও দুর্বোধ্য। রূপকের অত্যধিক ব্যবহার তাঁহার কাসীদাসমূহকে পাঠকের উপলব্ধি ক্ষমতার পক্ষে দুর্বহ বোঝায় পরিণত করিয়াছে। পবিত্র হজ্জ পালন (৫৫১/১১৫১) করিয়া তিনি তুহ্‌ফাতু'ল-'ইরাকায়ন নামক মাছনাবী শ্রেণীর কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত কাব্য গ্রন্থখানা তুলনামূলকভাবে সাবলীল ও সহজবোধ্য। হজ্জের সফরকালে তিনি সাসানী সম্রাটদের এক কালের রাজধানী মাদাইন-এ গমন করেন। তথায় রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবস্থা দর্শনে শোকাভিভূত হইয়া তিনি আয়ওয়ান-ই মাদা'ইন নামক বিখ্যাত কাসীদা রচনা করেন। উক্ত কাসীদা তাঁহার দেশপ্রেমমূলক গভীর আবেগানুভূতির নিদর্শন হইয়া রহিয়াছে। এই গ্রন্থে তিনি প্রকৃত কবির স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সফর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর শত্রুদের চক্রান্তে খাকান তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। হাবসিয়াত নামক কাব্যগ্রন্থে তিনি কারারুদ্ধ থাকাকালীন স্বীয় দুর্বিসহ অবস্থার বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তবে উহাতে অতিরঞ্জন ও কষ্ট কল্পনার ছাপ পরিদৃষ্ট হয়।

কবি আমীর মু'ইয্‌যী(মৃ. ৫২০/১১২৬) সান্‌জারের সর্বশ্রেষ্ঠ সভাকবি ছিলেন। কাসীদা রচনার কল্যাণে তিনি অত্যন্ত সুখ সম্ভোগের মধ্যে জীবন যাপন করেন। বাদশাহ একদা তাঁহাকে রাজ-প্রতিনিধি করিয়া রোমক সম্রাটের দরবারেও প্রেরণ করিয়াছিলেন (শাফাক, তা'রীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, পৃ. ১৬৮)। কাসীদা রচনায় তিনি পূর্ববর্তী কবিদের রচনা-রীতিকে অনুসরণ করেন।

কবি আদীব সাবির (মৃ. ৫৪০/১১৪৫) কাসীদা রচনায় যদিও কবি 'উনসুরী ও কবি ফাররুখীর রচনা-রীতিকে অনুসরণ করিয়াছেন, তাথাপি চিন্তাধারার সজীবতার কল্যাণে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। কবি ফাখরু'দ-দীন গুরগানী (জুরজানী) এবং কবি আযরাকীও আলোচ্য যুগের বিখ্যাত কাসীদা রচয়িতা। তবে কাসীদা রচনা করিয়া যিনি সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন, তিনি হইতেছেন কবি আনওয়ারী (মৃ.৫৮৭/১১৯১ ও ৫৯২/১১৯৬ সনের মধ্যবর্তী কোনও সনে)। তিনি সুলতান সানজারের অত্যন্ত প্রিয় কবি ছিলেন। কাসীদা রচনায় তিনি যে উচ্চ আসন ও মর্যাদা লাভ করিয়াছেন, কবি খাকানীর পর অন্য কোনও কবির পক্ষে উহা লাভ করা সম্ভব হয় নাই। শক্তিশালী প্রকাশ-ক্ষমতা, জৌলুসময় শব্দ প্রয়োগ ও উন্নত কল্পনা-শক্তির বদৌলতে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কাসীদা রচয়িতা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। তাঁহার কাসীদাসমূহে অতিরিক্ত অতিশয়োক্তি এবং অপ্রাকৃতিক ও দুর্বোধ্য উপমাসমূহ পরিদৃষ্ট হয়। অবশ্য গুযি বংশীয় আক্রমণকারীদের হস্তে খুরাসানের ধ্বংসের (১১৫৪ খৃ.) বর্ণনায় তিনি আশ্‌কহায়-খুরাসান (খুরাসানের অশ্রুরাজি) নামে যে শোক কবিতা রচনা করেন, উহা করুণ রস ও মর্মবেদনার এক বেদনা-বিধুর শোকগাথা। রাশীদু'দ-দীন ওয়াতওয়াত (৪৮০/১০৮৭-৫৬৮/১১৭২) খাওয়ারিয্‌ম অঞ্চলের শাসনকর্তা আতসিয (৫২১/১১২৭-৫৫১/১১৫৬)-এর শাসনামলে কবিতা রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। আতসিয চাহিলেন, আনওয়ারীর কাব্য প্রতিভা রাশীদু'দ-দীন ওয়াতওয়াতের কাব্য প্রতিভার নিকট ম্লান হইয়া যাক। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, রাশীদু'দ-দীন ওয়াতওয়াত আনওয়ারীর সমকক্ষ হইবার যোগ্যতা রাখিতেন না। ওয়াতওয়াত সমালোচনামূলক গদ্য গ্রন্থ হাদাইকু'স-সিহ্‌র রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এই যুগে আরও অনেক কবি কাসীদা রচনা করেন। তবে শেষ দিকে যাঁহারা কবিতা রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁহারা হইতেছেন জাহীরুদ-দীন ফারয়াবী ও কামাল ইসমা'ঈল। শেষোক্ত ব্যক্তি নূতন চিন্তাধারাসমূহের ধারক হইবার কারণে খাল্লাকু'ল-মা'আনী (خلاق المعانى নব নব রহস্য কথার স্রষ্টা) উপাধিতে ভূষিত হন। শেষ জীবনে তিনি কাসীদা রচনা ত্যাগ করেন এবং দরবারী জীবনের সাফল্যের উপর সূফী তত্ত্বের সাধনাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন। অবশ্য ইতপূর্বে রচিত তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতাবলী তাসাওউফ বিষয়ক বর্ণনায় পরিপূর্ণ ছিল। শেষ জীবনে তিনি তাসাওউফপন্থী হওয়ায় তাঁহার তখনকার রচনায় উহা আরও অধিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে। কবি সূযানী (মৃ. ৫৬৯/১১৭৪) সালজূক শাসনকর্তাদের যুগে তাহাদের প্রশংসায় কাসীদাসমূহ রচনা করেন। তবে তিনি শ্লেষাত্মক ও হাস্য-পরিহাসমূলক কবিতা রচনা করিয়াই অধিকতর খ্যাতি অর্জন করেন।

আলোচ্য (সালজূক) যুগে রোমান্টিক মাছনাবী শ্রেণীর কাব্য রচিত হয়। কবি ফাখরু'দ-দীন গুরগানী (জুরজানী) কর্তৃক রচিত বিখ্যাত মাছনাবী কাব্য 'বীস ওয়া রামীন' (ویس و رامین) (রচনাকাল আনু. ৪৪০/১০৪৮ সন) এই যুগে রচিত রোমান্টিক কাব্য গ্রন্থসমূহের অন্যতম। কবি নিজামী গানজাবী (৫৩৫/১১৪০-১১৪১-৫৯৯/১২০২-১২০৩) এই যুগের সর্বশেষ প্রথম সারির শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তিনি নিম্নোক্ত খামসা বা পাঞ্জগাঞ্জ অর্থাৎ পাঁচটি মাছনাবী শ্রেণীর কাব্য রচনা করিয়া বিখ্যাত হন ঃ (১) মাখযানু'ল-আসরার (রচনাকাল সাফা-এর মতে ৫৭০/১১৭৪; ব্রাউনের মতে ৫৬১/১১৬৫; শাফাকে'র মতে ৫৭৫/১১৭৯); (২) খুসরাও শীরীন; (রচনাকালঃ ব্রাউনের মতে ৫৭১/১১৭৫-১১৭৬; সাফা ও শাফাকে'র মতে ৫৭৬/১১৮০);(৩) লায়লী মাজনূন (রচনাকাল ঃ৫৮৪/১১৮৮-১১৮৯); (৪) হাপ্ত পায়কার বা বাহরামনামাহ (রচনাকাল ঃ সাফা ও শাফাকের মতে ৫৯৩/১১৯৬; ব্রাউনের মতে ৫৯৫/১১৯৮-১১৯৯); (৫) সিকান্দারনামাহ-(রচনাকাল ঃ শাফাকের মতে ৫৯৩/১১৯৬ অওর পরে সাফা-এর মতে ৫৯৯/১২০২-১২০৩-এর দিকে; ব্রাউনের মতে ৫৮৭/১১৯১)। উক্ত পাঁচটি মাছনাবীতে গীতি কবিতা ও প্রেমের কবিতার ভাষা ও রচনা-রীতি প্রবল। উহাদের প্রকাশভঙ্গী হৃদয়গ্রাহী এবং বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত গভীর। সিকান্দার নামাহ্ কাব্যে মহাকাব্যিক রচনা-রীতি চরম উৎকর্ষে পৌঁছিয়াছে। প্রতিটি নূতন বক্তব্য বিষয়, সাকীনামাহ দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে। পরবর্তী কালে কাব্য রচনায় সাকী নামাহ নামীয় নূতন এক রচনা-রীতি প্রবর্তিত হয়। কবি নিজামী দরবারী জীবন যাপন হইতে দূরে থাকিতেন।

সালজূক যুগের রুবা'ইয়াত শ্রেণীর কবিতা রচনাকারী কবিদের মধ্যে কবি 'উমার খায়্যাম সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। তিনি একাধারে দার্শনিক ও পদার্থবিদ্যা বিশারদ কবি ছিলেন। বিশ্বসৃষ্টির রহস্য, মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতা ও সীমাবদ্ধতা, কালের প্রবাহ ও বিশ্বপ্রকৃতির আবর্তন-বিবর্তন, পৃথিবী তথা বিশ্বের নশ্বরতা ইত্যাদি বিষয়ের রহস্যের তিনি সন্ধান করিতেন। কোন সমস্যার সমাধান না মিলিলে তিনি কাব্য রচনা দ্বারা মনের ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। উক্ত বিষয়সমূহ ও অনুরূপ সমস্যাবলীই ছিল তাঁহার কবিতার বিষয়বস্তু। স্বীয় কবিতায় তিনি পার্থিব জীবনের সুখ-সম্ভোগকে গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তৎকর্তৃক রচিত রুবা'ইয়াতের দুইটি বিখ্যাত চরণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ঃ

این نقد بگیر ودست ازاں نسیئه بدار
کاوازو هل شنیدن از دور خوش است

নগদ যা পাও হাত পেতে নাও
বাকীর খাতায় শূন্য থাক।
দূরের বাদ্য লাভ কী শুনে
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।।

কবি কর্তৃক রচিত রুবা'ইয়াত তাঁহাকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও সম্মানের অধিকারী করিয়াছে।

সালজূক যুগে রচিত কবিতা ও সাহিত্য তৎকালে পরিচালিত শী'আ ইসমা'ঈলী আন্দোলন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় (ইসমা'ঈলিয়্যা নিবন্ধ দ্র.)। এই যুগের কবি নাসি'র খুস্রাও (৩৯৪/১০০৩-৪৮১/১০৮৮) কর্তৃক রচিত কাব্যে ইসমা'ঈলী মতবাদের প্রতি কবির সমর্থনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। স্বীয় জীবন-দর্শন ও বিশেষ ধর্মীয় 'আকীদা-বিশ্বাসের প্রকাশ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি রাওশনাঈ নামাহ ও সা'আদাত নামাহ নামীয় দুইটি মাছনাবী শ্রেণীর কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন।

সালজূক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থ 'আরবী ভাষায় রচিত হইলেও বহু সংখ্যক মনীষী ফারসী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। খাজা 'আবদুল্লাহ আন্সারী (৩৯৬/১০০৫-৪৮১/১০৮৮) হৃদয়স্পর্শী ফারসী ভাষায় একটি গীতি কবিতাসদৃশ সমিল মুনাজাতমূলক গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থ সেই যুগের গদ্য কবিতার একটি নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হয়। [খাজা 'আবদুল্লাহ আনসারীর মুনাজাত গ্রন্থটির বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা এত ব্যাপক হয়, সুপণ্ডিত সরদার স্যার যুগেন্দ্র সিং ইংরেজী ভাষায় ইহার কাব্যানুবাদ সম্পন্ন করত The Persian Mystics Ansari শিরোনামে ১৯৫১ সালে লণ্ডন হইতে প্রকাশ করেন। পাঠক গোষ্ঠীর নিকট ইহার গ্রহণযোগ্যতা বাংলাদেশেও বিস্তৃতি লাভ করে। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি অধ্যক্ষ এ. এ. রেজাউল করিম চৌধুরীর হাতে ইহার চমৎকার ও সাবলীল বাংলায় কাব্যানুবাদ হইয়া 'খাজা 'আবদুল্লাহ আনসারীর মুনাজাত ও নসীহত' নামে ২০০৪ সালে কোর নলেজ ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, গ্রন্থখানি প্রার্থনামূলক হইলেও ইহার আবেদন ও বিষয়বস্তু ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের নিকট অত্যন্ত সুগভীর।

বিশিষ্ট দার্শনিক বূ'আলী সীনা (৩৭০/৯৮০-৪২৯/১০৩৭) দার্শনিক তত্ত্বকথার মহাসমুদ্র 'দানিশ নামাহ-ই 'আলাঈ' ফারসী ভাষায় রচনা করেন। ইমাম গাযালী (র) তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত 'আরবী গ্রন্থ ইহ্য়া' 'উলূমিদ'দ-দীন-এর সংক্ষিপ্তসার 'কীমিয়া-ই সা'আদাত' নিজেই ফারসী ভাষায় রচনা করেন। 'আলী হু'জ্বীরী (দাতাগাঞ্জ বাখ্শ) (র)-এর অমূল্য গ্রন্থ 'কাশ্ফুল-মাহ্'জূব' হি. পঞ্চম শতকে রচিত হয়। উহাতে তাঁহার আত্মচরিত, জ্ঞানপূর্ণ বাণীসমূহ এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ ভারতীয় উপমহাদেশে রচিত সূফীতত্ত্ব বিষয়ক উচ্চ শ্রেণীর প্রথম গ্রন্থ। উহা ফারসী ভাষায় রচিত হয়। ৫৬০/১১৬৫ সনে মুহাম্মাদ আমীন মুনাওওয়ার ফারসী ভাষায় শায়খ আবূ সা'ঈদ আবু'ল-খায়র-এর জীবন বৃত্তান্ত এবং তাঁহার বাণী ও কারামাতসমূহ বর্ণনায় আস্রারু'ত-তাওহীদ গ্রন্থ রচনা করেন। শায়খ ফারীদু'দ-দীন 'আত্তার-এর বিখ্যাত গ্রন্থ তায্কিরাতু'ল-আওলিয়া' হি. সপ্তম শতকের প্রথম দিকে রচিত হয়। উহাতে আওলিয়া-ই কিরামের জীবন-বৃত্তান্ত ছাড়াও অতি প্রয়োজনীয় উপদেশাবলী, চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলী ও উপদেশমূলক কাহিনীসমূহ সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থও ফারসী ভাষায় লিখিত হি. ষষ্ঠ শতকের মধ্য দিকে আবুল-হাসান 'আলী ইবন যায়দ বায়হাকী তা'রীখ-ই বায়হাক নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হি. ষষ্ঠ শতকের শেষদিকে আবূ বাক্র মুহাম্মাদ রাওয়ান্দী সালজূক সুলতানদের শাসনামলে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ রাহ'াতুস্'-সু'দূর প্রণয়ন করেন। উহাতে কবি ও মনীষীদের কবিতাবলী এবং জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে উহা একটি সাহিত্য গ্রন্থ হইবার মর্যাদারও অধিকারী। উভয় গ্রন্থই ফারসী ভাষায় প্রণীত হয়।

৪৮৪/১০৯১ সনের দিকে নিজামু'ল-মুল্ক কর্তৃক রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'সিয়াসাত-নামাহ্' ইহা সামাজিক কর্তব্য, আচরণসমূহ, নৈতিক কর্তব্যসমূহ, রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা, মন্ত্রীসভার কার্যাবলী এবং বিচারক ও বক্তাদের করণীয়সমূহ সম্পর্কিত একটি মৌলিক গ্রন্থ। উহাতে বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের 'আকীদা-বিশ্বাস এবং পরিচয় সরল ও সাবলীল ফারসী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ক'াবূস নামাহ্ নামক ফারসী গ্রন্থটি (রচনাকাল ৪৭৫/১০৮২) সামাজিক কর্তব্যসমূহ, সদগুণাবলী অর্জন ও চরিত্র গঠন সম্পর্কিত একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ। গ্রন্থটি যিয়ারী বংশীয় আমীর কায়কা'উস ইব্ন সিকান্দার ইব্ন কা'বূস ওয়াশ্মগীর কর্তৃক স্বীয় পুত্র গীলান শাহকে উপদেশ প্রদান ও তাঁহার চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে ফারসী ভাষায় রচিত হয়। বাহরাম শাহ গাযনাবীর শাসনামলে (৫১২/১১১৮-৫৭৪/১১৫২) আবু'ল-মা'আলী নাসরুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-মাজীদ 'কালীলা ওয়া দিমনা' নামক বিখ্যাত 'আরবী গ্রন্থকে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। উল্লেখ্য, উক্ত গ্রন্থও একটি উপদেশমূলক গল্পগ্রন্থ। তিনি উহাকে বাহ্রাম শাহের নামের সহিতই সম্পৃক্ত করেন। উক্ত গ্রন্থ যদিও একটি উপদেশ গ্রন্থ, তথাপি রচনা সৌকর্য ও ভাষার সাহিত্যিক গুণের কারণে উহা একটি সাহিত্য পুস্তকও বটে। হি. চতুর্থ শতকে মারযুবান ইব্ন রুস্তাম প্রাচীন তাবারিস্তানী ভাষায় মারযুবান নামাহ্ নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তী কালে সা'দু'দ-দীন ওয়ারাবীনী (৬০৭/১২১০ ও ৬২২/১২২৫ সনের মধ্যবর্তী কোনও সময়ে) উহাকে বিশুদ্ধ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। মারযুবানের মূল গ্রন্থখানা বর্তমানে পাওয়া যায় না। আলোচ্য যুগে ফারসী ভাষায় রচিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হইতেছে সাফ়ারনামাহ্-ই নাসি'র খুসরাও। উক্ত গ্রন্থে ইরান, সিরিয়া, ফিলিস্তীন, 'আরব ও মিসরের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য যুগে ফারসী ভাষায় জীবনী গ্রন্থ রচনার প্রতিও মনোযোগ দেওয়া হয়। এতদসম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হইতেছে নিজ'ামী 'আরূদী সামারক'ান্দী রচিত চাহার মাক'ালা গ্রন্থ (রচনাকাল ৫৫০/১১৫৫ সনের দিকে)। বর্ণনার সরলতা ও সাবলীলতা এবং রচনারীতির নৈপুণ্য ও সৌকর্যের কল্যাণে গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট ফারসী গদ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। গ্রন্থটিতে অবশ্য কতগুলি ঐতিহাসিক তথ্যগত ভ্রান্তি রহিয়াছে; এতদসত্ত্বেও উহা 'উলামা' ও কবিদের জীবন বৃত্তান্তমূলক একখানা প্রাচীন মৌলিক গ্রন্থ।

আলোচ্য যুগে ফারসী ভাষায় মাক'ামাত রচনার বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। ফারসী ভাষায় সর্বপ্রথম হ'ামীদু'দ দীন আবূ বাক্র ইব্ন মাহমূদ (মৃ.৫৫৯/১১৬৩) মাকামাত-ই হামীদী নামক গল্পগ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের ভাষা গীতি কবিতার ভাষার ন্যায় সমিল ও ছন্দোবদ্ধ। এই যুগে

ইরান
0 Kilometres 300
0 Miles 200
ARMENIA
Yerevan
AZERBAIJAN
Baku
Turkmenbashi
UZBEKISTAN
TURKMENISTAN
Turkmenabat
Khvoy
TURKEY
Marand
Ahar
Tabriz
Ardabil
Astara
Caspian Sea
Ashkhabad
Orumiye
Maraghe
Rasht
Tedzhen
Mary
Bojnurd
Gonbad-e Kavus
Quchan
Babolsar
Gorgan
Saqqez
Zanjan
Ghazvin
Babol
Damavand 5671m
Abhar
Emamrud
Sabzevar
Meshad
Karaj
TEHRAN
Neishabur
Karkuk
Sanandaj
Varamin
Kashmar
Taybad
Hamadan
Qom
Malayer
Kermashah
Herat
Baghdad
Zagros
Ilam
Kashan
Khorramabad
AFGHANISTAN
Shahr-e Kord
Esfahan
Birjand
Desful
Mountains
Farah
Qomisheh
Bafq
N
Nasiriya
Euphrates
Ahvaz
Yazd
IRAQ
Basra
Abadan
Del Bid
Kerman
Rafsanjan
Khorramshahr
Kazerun
Shiraz
Zahedan
Kuwait
Sirjan
KUWAIT
Bushehr
PAKISTAN
Fasa
SAUDI ARABIA
Persian Gulf
Principle Roads
Wadi
Perennial river
Salt Pan/Sabkha
Desert/Sand sea
Historic site
Bandar-e Abbas
Minab
Iranshahr
BAHRAIN
QATAR
Doha
Dubai
Chah Bahar
Gulf of Oman
UAE
OMAN
© 2005 www.unimaps.com

যায়নু'দ-দীন আবূ ইব্‌রাহীম ইসমা'ঈল ইব্‌ন হাসান জুরজানী (মৃ. ৫৩১/১১৩৬) বিভিন্ন রোগ ও উহাদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার্য ঔষধাবলী বিষয়ে যাখীরা-ই খাওয়ারিয্‌ম শাহী নামক একখানা ফারসী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৫৫০/১১৫৫ সনে হুসায়ন আল-মু'আয়্যাদী 'আল-ফারজু বা'দাশ' শিদ্দা নামক 'আরবী গ্রন্থকে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন।

খৃ. দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বিভিন্ন দেশীয় রোমান্টিক গল্পসমূহ এবং জাহিলী যুগের জ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাবলী ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়। সামাক-ই 'আয়ার গ্রন্থটি (রচনাকাল ৫৮৫/১১৮৯) আলোচ্য যুগে রচিত রোমান্টিক গল্পগ্রন্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। উহার রচয়িতা হইতেছেন ফারামুর্‌য ইব্‌ন খুদাদাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-কাতিব আল-আররাজানী। গ্রন্থকার উহার স'াদাক'া-ই আবুল-কাসিম নামক জনৈক গল্পকার হইতে শুনিয়া গ্রন্থাকারে সংকলন করেন (য'াবীহু'ল্লাহ 'সাফা, তারীখ-ই আদাবিয়্যাত দার ঈরান, ১খ, ৯৮৮)। রুমূয-ই হ'ামযা (যাহা দাস্‌তান-ই আমীর হামযা নামে উর্দু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে) বাখতিয়ার নামাহ্‌ এবং কিস্‌সা-ই হাতিম তাঈ নামক ফারসী গ্রন্থসমূহও আলোচ্য যুগে রচিত হয়।

সপ্তম/ ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে মোঙ্গলগণ কর্তৃক ইরান আক্রান্ত হয়। তাহাদের আক্রমণে হাজার হাজার গ্রাম ও জনপদ ধ্বংস হইয়া যায়, বহু স্থানে গণহত্যা ঘটে। বিপুল সংখ্যক 'উলামা ও পণ্ডিত-মনীষী নিহত হন এবং বহু মূল্যবান জ্ঞানভাণ্ডার বিধ্বস্ত হয়। পরবর্তী মোঙ্গল সম্রাটগণ দেশকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট ছিলেন। অবশ্য দেশের পূর্বাবস্থা দুই এক দিনে ফিরাইয়া আনা সম্ভবপর ছিল না। 'উলামা' ও মনীষিগণ মোঙ্গলদের ধ্বংসযজ্ঞের পর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ও উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করেন। ইরানের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থসমূহ এই যুগেই রচিত হয়। কবিগণ মোঙ্গলদের বর্বরতার তিক্ত অভিজ্ঞতা বিস্মৃত হইবার উদ্দেশ্যে তাসাওউফকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করেন। দরবারী কাব্য রচনা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহ (যাহা মোঙ্গলদের ধ্বংসযজ্ঞ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল) অবশিষ্ট রহিয়া গেল, তবে উহার মান উন্নত হইতে পারিল না। যে সকল যোগ্য কবি কাব্যের মান উন্নত রাখিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাঁহারা দেশ ত্যাগ করিয়া উত্তর ভারতের রাজদরবারসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেন। দেশত্যাগীদের মধ্যে বিখ্যাত কাসীদা রচয়িতা বাদ্‌র চাচ (بدر چاچ)-ও ছিলেন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের সম্রাট মুহাম্মাদ তুগলাক (৭২৫/১৩২৪-৭৫২/১৩৫১)-এর দরবারে চাকুরী গ্রহণ করেন।

মোঙ্গল আক্রমণের অব্যবহিত পরবর্তী যুগের দুইজন মহান কবি হইতেছেন মাওলানা জালালু'দ-দীন রূমী ও কবি শায়খ সা'দী। মাওলানা রূমী (৬০৪/১২০৭-৬৭২/১২৭৩) প্রথমে সূফীসুলভ রচনা রীতিতে দীওয়ান রচনা করেন। তাঁহার পীর ও শায়খ শাম্‌স তাবরীযীর নামে উক্ত কাব্যের নামকরণ হয়। পরবর্তী কালে তিনি তাঁহার জগদ্বিখ্যাত মাছ'নাবী-ই মা'নাবী কাব্য রচনা করেন। উক্ত কাব্যে তিনি অধ্যাত্মবাদ ও সূফীতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী বর্ণনা করিয়া সূফীতাত্ত্বিক ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক কাব্য রচনার রীতিকে সমৃদ্ধ ও গৌরবময় করেন। ফাখ্‌রু'দ-দীন 'ইরাকী (মৃ. ৬৮৮/১২৮৯) সূফীতত্ত্বের একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন। তৎকর্তৃক রচিত গাযালসমূহে সূফীসুলভ বক্তব্য রহিয়াছে। তাঁহার গদ্য রচনা লামা'আত তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। ৮৮৬/১৪৮১ সনে মাওলানা জামী আশি'আতু'ল-লামা'আত (اشعة اللمعات) নাম দিয়া উহার একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন। গুলশান-ই রায গ্রন্থটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ সূফীতাত্ত্বিক মাছনাবী গ্রন্থ। আমীর সায়্যিদ হু'সায়নী হারাবী'র কতগুলি প্রশ্নের উত্তর দানের উদ্দেশ্যে মা'হমূদ শাবিসতারী ৭১৭/১৩১৭ সনে উক্ত মাছনাবী গ্রন্থ রচনা করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, মাহমূদ শাবিস্‌তারী ইতিপূর্বে কখনও কবিতা রচনা করেন নাই। কিন্তু যেহেতু আমীরের প্রশ্নগুলি ছিল কবিতায় লিখিত, তাই তিনি কবিতায়-ই উহার উত্তর প্রদান করেন। কবি শায়খ সা'দী (মৃ.৬৯১/১২৯১ ও ৬৯৪/১২৯৪ সনের মধ্যবর্তী কোনও সনে) সময়ের দাবি মুতাবিক লোকদিগকে বিনয়, সন্তুষ্টি, ধৈর্য ও প্রশান্তির গুণাবলী অর্জন করিতে উপদেশ দেন, যাহাতে মোঙ্গলদের বর্বরতার তিক্ত স্মৃতি হ্রাস পায়। তাঁহার বিখ্যাত কাব্য 'বূসতাঁ (بوستان) উক্ত উপদেশ ও শিক্ষার ধারক হইয়া রহিয়াছে। গাযালকে তিনি যে উহার প্রকৃতি মুতাবিক গীতি কবিতাসুলভ নরম ও মোলায়েম ভাষা প্রদান করিয়াছেন শুধু তাহাই নহে, তিনি এতদসহ স্রষ্টা-প্রেমকে সৃষ্টি-প্রেমের আবরণে উপস্থাপন করিয়া কাব্য রচনার এই ধারাকে অধিকতর আকর্ষণীয় ও অর্থবহ করিয়া তুলিয়াছেন। মোঙ্গলদের ইরান আক্রমণের কালে মাওলানা রূমী ও শায়খ সা'দী— এই দুই মহান কবিই দেশের বাহিরে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের কবি-কীর্তির কথা বাদ দিলে বলা যায়, মোঙ্গলীয় ধ্বংসযজ্ঞের পর ইরানের কাব্য ও সাহিত্য রচনা ক্ষেত্রে স্থবিরতা নামিয়া আসে।

গায্‌নাবীদের শাসনামলে ফারসী ভাষা ভারতীয় উপমহাদেশে যথানিয়মে প্রসার লাভ করিতে থাকে। ঈলখানী রাজবংশের শাসনামলে (৬৫৪/১২৫৬-৭৫০/১৩৪৯) কিছু সংখ্যক ইরানী 'উলামা' ও কবি ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করিবার পর এই দেশে ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা অধিকতর ব্যাপকতা লাভ করে। যে যুগে শায়খ সা'দী শীরাযে গাযাল রচনা করিয়া তথাকার মানুষের হৃদয়কে বিমোহিত করিয়াছিলেন— ঠিক সেই যুগেই কবি আমীর খসরূ (৬৫১/১২৫৩-৭২৫/১৩২৪) দিল্লীর আকাশে বাতাসে ফারসী গীতির মোহনীয় সৌরভ ছড়াইয়া দিতেছিলেন। গাযাল রচনায় তিনি যদিও কবি শায়খ সা'দীর রচনারীতিকে অনুসরণ করিয়াছেন, তথাপি হৃদয়ের আবেগানুভূতির প্রকাশ, নব নব উপমার প্রয়োগ, প্রযুক্ত শব্দাবলীর সুসমঞ্জস ও গীতি কবিতাসুলভ সুরেলা শব্দ বিন্যাস দ্বারা তিনি তাঁহার গাযালের মধ্যে এক অভিনব উপভোগ্য স্বাদ সৃষ্টি করেন। তিনি বিভিন্ন বয়সে রচিত তাঁহার গাযালসমূহকে নিম্নোক্ত পাঁচটি পৃথক কাব্যে বিন্যস্ত করিয়াছেন ঃ (১) তুহ্‌'ফাতুস-সিগ'ার (বাল্যকালে রচিত); (২) ওয়াসাতু'ল হ'ায়াত (যৌবনে রচিত); (৩) গুর্‌রাতু'ল-কামাল (প্রৌঢ়ত্বের প্রথমাংশে রচিত); (৪) বাকি'য়্যা নাকি'য়্যা (প্রৌঢ়ত্বের শেষাংশে রচিত); (৫) নিহায়াতুল-কামাল (বার্ধক্যে রচিত)। উক্ত কাব্য গ্রন্থসমূহে তিনি কবি নিজ'ামীর সমকক্ষ হইবার দাবি করিয়াছেন। কবি আমীর খসরূ কাসীদা এবং মাছনাবী শ্রেণীর কবিতাও রচনা করিয়াছেন। তৎকর্তৃক রচিত মোট দশটি মাছনাবী শ্রেণীর কাব্য গ্রন্থের মধ্য হইতে পাঁচটি হইতেছে ইতিহাসমূলক এবং পাঁচটি হইতেছে রোমান্টিক শ্রেণীর। তাঁহারই যুগে কবি হাসান সাজযীও আবেগানুভূতিমূলক সুখপাঠ্য ও শ্রুতিমধুর গাযাল রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

ইরানে তায়মূর ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত বাদশাহদের রাজত্বকালে (৭৭১/১৩৬৯-৯০৬/১৫০০) সাহিত্য ও কবিতা রচনার ধারা পুনর্জীবন লাভ করে। উহার কারণ এই যে, ইরানে ঈলখানী রাজবংশের শাসন

অবসানোন্মুখ হইতেই স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ স্বাধীন রাজ্যসমূহ স্থাপন করিয়া কবি ও 'আলিমদিগকে তাঁহাদের দরবারে স্থান দেন। উক্ত কারণে এই যুগটি ইরানে ফারসী সাহিত্যের নব বসন্ত আনয়নে সহায়ক হয়। এই যুগের কবিদের মধ্যে স্বাধীন রচনারীতি ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই হেতু এই যুগের কোনও কোনও কবি কাব্য রচনা প্রতিভায় পূর্ববর্তী কবিদিগকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। কবি ইব্ন য়ামীন (৬৮৫/১২৮৬-৭৬৯/১৩৬৭) প্রথম দিকে সিরবাদার রাজবংশীয়দের (৭৩৭/১৩৩৭-৭৮৩/১৩৮১) প্রশংসায় কাসীদা রচনা করিতেন। পরবর্তী কালে দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা পরিবর্তিত হইবার পর তিনি উপদেশ ও নীতিকথাকে কবিতা রচনার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি নীতিকথা বর্ণনায় যে খণ্ড কবিতা রচনা করেন, উহার নজীর ফারসী কাব্য সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তৎকর্তৃক রচিত খণ্ড-কাব্য গ্রন্থ দীওয়ান তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। কবি খাজূ কিরমানী (৬৭৯/১২৮০-৭৫৩/১৩৫২)-এর কাব্য রচনা কাসীদা রচনা দিয়া আরম্ভ হয়। অতঃপর তিনি কবি শায়খ সা'দীর অনুসরণে গাযাল রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার চিন্তাধারা দার্শনিক সুলভ ছিল। ফলে দার্শনিক চিন্তা ও কবিসুলভ অনুভূতি প্রবণতার সংমিশ্রণে তিনি চমৎকার গাযাল রচনা করিতে সমর্থ হন। কবি হাফিজ শীরাযী কবিতা রচনার উক্ত ধারকেই স্বীয় গাযাল রচনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। কবি আওহাদী মারাগী (৬৭০/১২৭১-৭৩৮/১৩৩৭)-এর কবিতাগুলিতে সূফীতত্ত্বের বর্ণনা রহিয়াছে। তৎকর্তৃক রচিত 'দীওয়ান ও 'মাছ্নাবী-ই জাম-ই জাম' কাব্য গ্রন্থদ্বয় তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। কবি সালমান সাওয়াজী (মৃ.৭৭৮/১৩৭৬) আল-ই জালা'ইর রাজবংশ (৭৩৬/১৩৩৬-৮১৪/১৪১১) এবং আল-ই মুজা'ফ্ফার রাজবংশ (৭১৩/ ১৩১৩-৭৯৫/ ১৩৯৩)-এর শাসনকর্তাদের প্রশংসায় কাসীদা রচনা করেন। তাঁহার রচিত কাসীদাসমূহের উপক্রমণিকা শক্তিশালী ও আবেদনময় হইবার কারণে তিনি প্রথম শ্রেণীর কাসীদা রচয়িতাদের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন। তিনি গাযাল শ্রেণীর কবিতাও রচনা করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে অতিরিক্ত কল্পনা প্রবণতার ছাপ থাকায় উহা তেমন জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। জামশীদ ওয়া খুরশীদ (রচনাকাল ঃ ৭৬৩/১৩৬১) ও ফিরাক'নামাহ্ (রচনাকাল ৭৭০/১৩৬৮) নামক মাছ্নাবী শ্রেণীর কাব্যদ্বয় তাঁহার বিখ্যাত রচনা।

ইরানের সুবিখ্যাত মহান কবি হাফিজ শীরাযী (আনু. আয়ুষ্কাল ৭২৬/১৩২৫-৭৯১/১৩৮৮) আবূ ইসহাক ঈনজূ (৭৪২/১৩৪১-৭৫৮/ ১৩৫৬) এবং শাহ শুজা'(৭৫৯/১৩৫৭-৭৮৬/১৩৮৪) এই দুই শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। কবি হাফিজ তায়মূরী বর্বরতার দৃশ্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। এই হেতু তাঁহার কবিতায় ইরানের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন দেখা যায়। দার্শনিক চিন্তা এবং হৃদয়ের আবেগানুভূতির সংমিশ্রণে তিনি তাঁহার গাযালকে এইরূপ উন্নত ও সূক্ষ্ম কাব্যরস সমৃদ্ধ করিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোনও গাযাল রচয়িতাই কাব্য রচনার চরম সৌকর্য ও নৈপুণ্যে তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

নূরু'দ-দীন 'আবদুর-রাহ'মান জাম (৮১৭/১৪১৪-৮৯৮/১৪৯২) একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি, নির্ভরযোগ্য 'আলিম ও উচ্চ মর্যাদার সূফী সাধক ছিলেন। তিনি কখনও কোন রাজদরবারের প্রাঙ্গণ মাড়ান নাই। তিনি সূফীতত্ত্বের গাযাল রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। তুহ'ফা-ই সামী (ইরানে মুদ্রিত, পৃ.৭৬) নামক গ্রন্থে তাঁহার রচিত গদ্য ও পদ্য গ্রন্থাবলীর সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে সাতটি মাছ্নাবী শ্রেণীর কাব্য গ্রন্থও রহিয়াছে। উহারা হাফ্ত আওরাঙ্গ বা সাব্'আ নামে পরিচিত।

সূফীতাত্ত্বিক কবিতা রচনা করিয়া শাহ নি'মাতুল্লাহ কির্মানী (মৃ. ৮৩৫/১৪৩১)-ও উচ্চ মর্যাদার আসন লাভ করিয়াছেন। সূফীতাত্ত্বিক গাযাল গ্রন্থ তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। কবি ক'াসিম আল-আনওয়ার (৭৫৭/১৩৫৬-৮৩৭/১৪৩৩-১৪৩৪) তাঁহার সূফীতাত্ত্বিক গাযালসমূহে শুধু ফারসী ভাষা নহে, বরং গীলানের প্রাচীন ভাষাও ব্যবহার করিয়াছেন। কবি কাতিবী নীশাপুরী (মৃ. ৮৩৮/১৪৩৪-১৪৩৫) নিজ'ামী গাঞ্জাবী'র অনুকরণে খামসা নামীয় মাছ্নাবী শ্রেণীর কাব্য গ্রন্থসমূহ রচনা করেন। উক্ত কাব্যসমূহে সূফীতাত্ত্বিক রহস্যাবলীর প্রতি প্রচুর ইঙ্গিত রহিয়াছে। উহাতে অন্ধ অনুকরণের দোষকে বর্ণনাভঙ্গীর সৌকর্য ও নৈপুণ্য এবং আলঙ্কারিক রচনারীতির আড়ালে সুকৌশলে লুক্কায়িত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কবি 'আরিফী হারাবী (আনু. আয়ুষ্কাল ৭৯১/১৩৮৯-৮৩৫/১৪৩১), বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হ'ালনামাহ্, যাহা 'গোয় চাওগান' নামে অধিক পরিচিত, রচনা করিয়া খ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন। কবি 'ইসমাত বুখারায় (মৃ. ৮২৯/১৪২৫-২৬) আদ্হামনামাহ্ নামক কাব্যগ্রন্থে একটি প্রাচীন গল্পকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় রচনাশৈলীতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ঈলখানী রাজবংশীয় ও তায়মূরী রাজবংশীয় বাদশাহ্গণ যদিও কাব্য ও সাহিত্য রচনায় উৎসাহ প্রদান করেন নাই, তথাপি তাঁহারা নিজেদের রাজত্বকালের ঘটনাবলীর বিবরণ ইতিহাস আকারে সংরক্ষিত রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন। এইহেতু তাঁহাদের শাসনামলে ইতিহাস লেখকদিগকে অত্যন্ত উৎসাহিত করা হয়। ফলত ইরানের বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থসমূহ এই যুগেই লিখিত হয়। 'আতা মালিক জুওয়ায়নী (মৃ. ৬৮১/১২৮২), যিনি হুলাগূ খান (৬৫৪/১২৫৬-৬৬৩/১২৬৪) ও তাঁহার পুত্র আবাক'া খান (৬৬৩/১২৬৪-৬৮০/১২৮১)-এর পক্ষ হইতে ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিন খণ্ডে জাহান গুশাহ্-ই জুওয়ায়নী নামক একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রথম খণ্ডে চেঙ্গীয খান, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ও চুগতাঈ খান পর্যন্ত তাঁহার বংশধরদের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে খাওয়ারিয-এর বাদশাহদের, বিশেষত কু'ত'বু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ ও জালালু'দ-দীনের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে শী'আ দলের উপদল ইসমা'ঈলীদের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ, বিশেষত হ'াসান ইব্ন সা'ব্বাহ' ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের অর্থাৎ আলামুত-এর হ'াশ্শাশীনদের পরিচয় ও জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ইতিহাস গ্রন্থ এই কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, গ্রন্থকার নিজে হুলাগূ খান ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত সমসাময়িক ছিলেন এবং দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণেও তাঁহার বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাঁহার গ্রন্থের ভাষা গদ্য হইলেও উহা প্রাচীন সরল ও সাবলীল গদ্য ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ও পৃথক। উহাতে বিভিন্নরূপ শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার এবং সমার্থক শব্দসমূহের প্রয়োগের ছড়াছড়ি রহিয়াছে। উহার বাক্যসমূহ দীর্ঘ ও শব্দবহুল। গদ্য রচনার উক্ত ধারা শৈল্পিক রচনারীতির মানদণ্ডে উত্তীর্ণ রচনাধারার আদর্শ হইতে পারে।

শারাফু'দ-দীন 'আবদুল্লাহ ইব্ন ফাদলিল্লাহ শীরাযী (জ. ৬৩৩/১২৩৪) কর্তৃক রচিত তারীখ-ই বি'স'াফ (যাহার অন্য নাম হইতেছে তাজযিয়াতুল-আমস'ার ওয়া তাযজিয়াতু'ল-'আস'ার) নামক ইতিহাস গ্রন্থে হুলাগূ খানের বাগদাদ জয়ের সময় (৬৫৬/১২৫৮) হইতে আবূ সা'ঈদ-এর

শাসনামল (৭১৬/১৩১৬-৭৩৬/১৩৩৫) পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের ভাষায় অতিরিক্ত কষ্ট-কল্পনা ও দুর্বোধ্যতা পরিলক্ষিত হয়। উহাতে বিভিন্নরূপ শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের ছড়াছড়ি রহিয়াছে। উহার বাক্যসমূহ দীর্ঘ, শব্দবহুল ও জটিল। উক্ত গ্রন্থের রচনাধারাও শৈল্পিক রচনাধারার একটি আদর্শ। জামি'উ'ত-তাওয়ারীখ (রচনাকাল ৭১০/১৩১০) নামক ইতিহাস গ্রন্থটি রাশীদু'দ-দীন ফাদ্‌লুল্লাহ (৬৪৫/১২৪৭-৭১৮/১৩১৮) কর্তৃক রচিত। উক্ত গ্রন্থকার গাযান-এর শাসনামলে (৬৯৪/১২৯৪-৭০৩/১৩০৩) তাঁহার মন্ত্রীর পদে সমাসীন ছিলেন। উক্ত গ্রন্থে প্রাচীনকালের রাজা-বাদশাহ্‌দের এবং নবীগণের সময় হইতে গাযানের যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত কালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থের শেষ খণ্ড, যাহাতে মোঙ্গলদের আক্রমণ, ধ্বংসযজ্ঞ ও তাহাদের শাসনপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি ঈলখানী রাজবংশের শাসনামলে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে একটি উচ্চ স্তরের ইতিহাস গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। উহার ভাষা সরল ও সাবলীল। হ'ামদুল্লাহ মুস্‌তাওফী ক'াযবীনী (মৃ. ৭৫০/১৩৪৯) কর্তৃক রচিত তারীখ-ই গুযীদাহ (রচনাকাল ৭৩০/১৩২৯) নামক ইতিহাস গ্রন্থকে জামি'উ'ত-তাওয়ারীখ গ্রন্থের সারসংক্ষেপ মনে করা যাইতে পারে। উহার ভাষা সহজ ও সাবলীল। উক্ত গ্রন্থকারই শাহ নামাহ্-র অনুকরণে জাফারনামাহ্ নামে একটি ইতিহাসমূলক কাব্য রচনা করেন (রচনাকাল ৭৩৫/১৩৩৪)। উক্ত গ্রন্থে ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভিক যুগ হইতে মোঙ্গল যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। ব্রাউনের বর্ণনানুসারে (৩খ, ৯৫) উহাতে পচাত্তর হাযার কবিতা রহিয়াছে। উক্ত গ্রন্থকার হ'ামদুল্লাহ মুসতাওফী নুযহাতু'ল-কু'লূব নামক ভূগোলশাস্ত্রের একখানা গ্রন্থও রচনা করেন (রচনাকাল ৭৪০/১৩৩৯)। ইহা এই বিষয়ে একটি মূল্যবান মৌলিক গ্রন্থ। ক'াদী আবু'ল-খায়র নাসি'রুদ-দীন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার আল-বায়দ'াবী (মৃ ৬৮৫/১২৮৬) কর্তৃক রচিত নিজ'ামুত-তাওয়ারীখ নামক ইতিহাস গ্রন্থে খৃ. ১২৮৪ সন পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে। আবূ সুলায়মান দাঊদ বানাকিতী, কর্তৃক ৭১৭/১৩১৭ সনে রচিত তারীখ-ই বানাকিতী, যাহা রাওদ'াতু উলি'ল-আলবাব ফী তাওয়ারীখি'ল- আকাবির ওয়া'ল-আনসাব নামেও পরিচিত। এই ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে প্রাচীন যুগের নবীগণ, ইরানের সম্রাটগণ, রাসূল কারীম (স), উমায়্যা ও 'আব্বাসী খলীফাগণ, য়াহূদী ও খৃস্টানগণ, ফিরিঙ্গীগণ, ভারতীয়গণ, চীনাগণ এবং মোঙ্গলগণের ইতিহাস। যুবদাতু'ত-তাওয়ারীখ একটি সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণসম্বলিত গ্রন্থ (ঐতিহাসিক ফাস'ীহী খাওয়াফীর বর্ণনানুসারে উহার নাম মাজমা'উত-তারীখিস-সুলত'ানী)। উক্ত গ্রন্থ চারিটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল; কিন্তু উহার শেষ দুই খণ্ড যাহাতে ইসলাম-পরবর্তী যুগের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ ছিল— বর্তমানে আর পাওয়া যায় না। উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা হইতেছেন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন লুত'ফিল্লাহ ইব্‌ন 'আবদি'র-রাশীদ। ইনি হ'াফিজ' আব্‌রূ নাম পরিচিত (তু. খাজাহ্ নূরু'দ-দীন লুত্'ফুল্লাহ, মাত'লা'উ'স-সা'দায়ন)। ৮৩০/১৪২৬ সনে উহার রচনাকার্য সমাপ্ত হয়। ফাসীহী খাওয়াফী কর্তৃক রচিত মাজ্‌মা'উ'ল-ফাসীহী গ্রন্থে ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভকাল হইতে হি. ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ের বিস্তৃত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। মাত্'লা'উস-সা'দায়ন 'আবদুর-রাযযাক সামারকান্দী রচিত একটি ইতিহাস গ্রন্থ। উহাতে সুলতান আবূ সা'ঈদ ঈলখানীর জন্মকাল হইতে আবূ সা'ঈদ তায়মূরীর জন্মকাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের (৭০৪/১৩০৪-৯৭২/১৫৬৪= মোট ২৬০ বৎসর) ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মারহুম মুহ'াম্মাদ শাফী উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। নিজ'ামু'দ-দীন শামী কর্তৃক রচিত জ'াফারনামাহ্ নামক গ্রন্থটি তায়মূরের যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীসম্বলিত একটি ইতিহাস পুস্তক। ৮০৪/১৪০১ সনে সম্রাট তায়মূর নিজেই গ্রন্থকারের উপর উক্ত গ্রন্থ রচনার দায়িত্ব অর্পণ করেন (গ্রন্থের ভূমিকা দ্র.)। উহাতে তায়মূরের জন্মকাল ৭৩৬/১৩৩৫ হইতে ৮০৭/১৪০৪ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের (মোট ৬৯ বৎসরের) ইতিতহাস বর্ণিত হইয়াছে। উহার ভাষা সহজ ও সাবলীল হইলেও চিন্তাধারার দিক দিয়া উহা পণ্ডিতসুলভ রচনা। এই যুগের রচিত আর একটি ইতিহাস গ্রন্থও জাফারনামাহ নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক শারাফু'দ-দীন য়াযদী (মৃ. ৮৫৮/১৪৫৪) উহার রচয়িতা (রচনা কাল ৮২৮/১৪২৪-১৪২৫)। উহাতে তায়মূরের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে সমাপ্ত। গ্রন্থের ভাষায় শব্দালংকার, অর্থালংকার ও সমার্থক শব্দ প্রয়োগের বাহুল্য রহিয়াছে। উহাতে 'আরবী শব্দ ও 'আরবী শব্দ বিন্যাস প্রণালী প্রয়োগের প্রাচুর্যও দেখা যায়। ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইব্‌ন খাওয়ান্দ শাহ (৮৩৮/১৪৩৪-৯০৩-১৪৯৮) যিনি মীর খাওয়ান্দ নামেও পরিচিত, রাওদাতু'স-সাফা নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন, উহা সাত খন্ডে সমাপ্ত। উহাতে নবীগণের ইতিহাস, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইরানী সম্রাটগণ হইতে তায়মূর ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত শাসনকর্তাগণ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের পৌত্র গিয়াছু'দ-দীন খাওয়ান্দ আমীর, মীর 'আলী শেরনাওয়া'ঈর আদেশে সুলতান হুসায়ন বায়ক'ারা (৮৭৫/১৪৭০-৯১১/১৫০৫)- এর শাসনামলে ইতিহাস বর্ণনায় উক্ত গ্রন্থের সপ্তম খণ্ড রচনা করেন। গিয়াছু'দ-দীন আমীর খাওয়ান্দ, খুলাস'াতু'ল- আখবার নাম দিয়া রাওদ'াতু'স-সাফা গ্রন্থের সার সংক্ষেপও রচনা করেন (রচনা কাল ৯০৫/১৪৯১)।

আলোচ্য যুগ সাহিত্য ও কাব্য চর্চার ইতিহাস রচনার জন্যও বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এই যুগে সাদীদু'দ-দীন মুহাম্মাদ 'আওফীও কাব্যচর্চা সম্পর্কে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস রচনা করেন (ইনি দেশ ত্যাগ করিয়া ৬২৫/১২২৭ সনে সুলতান ইলতুতমিশের দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট হন) উক্ত গ্রন্থে তিনি সর্বপ্রথম ফারসী কবি হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সমসাময়িক ফারসী কবিগণ পর্যন্ত সকল ফারসী কবির কাব্য চর্চার ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে বিভক্ত ঃ প্রথম খণ্ডে কাব্য রচনাকারী ও কাব্য চর্চাকারী বাদশাহ, শাসনকর্তা ও মন্ত্রীদের জীবনী ও কাব্যচর্চার ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডে সাধারণ কবি-সাহিত্যিকদের কাব্য ও সাহিত্য চর্চার ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের কোনও কোনও স্থানে কোনও কোনও কবিতা ও সাহিত্য-কর্মের সমালোচনাও করিয়াছেন। উহার ফলে ভবিষ্যতের সাহিত্যিকদের জন্য সমালোচনা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। উক্ত গ্রন্থকার জাওয়ামি'উ'ল- হি'কায়াত নামক চার খণ্ডে সমাপ্ত একটি গ্রন্থও রচনা করেন (রচনা কাল ৬৩০/১২৩২)। ডক্টর মুহাম্মাদ মু'ঈন সম্পাদনা করিয়া উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই যুগে শাম্‌স কায়স রাযী, আল-মু'জামফী মা'আয়ীরি আশ'আরি'ল-'আজাম নামক ছন্দ ও কাব্য রচনাশাস্ত্র সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থকার খাওয়ারিয্‌ম প্রদেশের শাসনকর্তাদের দরবারের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন। মোঙ্গলদের ধ্বংসযজ্ঞ শেষ হইবার পর তিনি শীরাযে ৬২৩/১২২৬ সনে আগমন করত আতাবিক সা'দ

ইব্ন যাঙ্গী (৫৯১/১১৯৫-৬২৩/১২২৬)-এর দরবারে চাকুরী গ্রহণ করেন। উক্ত গ্রন্থের (পূর্বে যাহা 'আরবী ভাষায় প্রণীত হইয়াছিল, দেখুন মির্যা মুহাম্মাদ খান কাযবীনী কর্তৃক লিখিত ভূমিকা, উক্ত গ্রন্থ) প্রণয়ন-কার্য ৬১৭/১৯২০ সনে সমাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে আতাবিক সা'দ ইব্ন যাঙ্গীর দরবারের বিদ্বজ্জনদের আদেশে গ্রন্থকার নিজেই ৬৩০/১২৩২ সনে উহাকে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। উক্ত গ্রন্থ ছন্দবিদ্যা ও কাব্য রচনাশাস্ত্র সম্পর্কিত একটি নির্ভরযোগ্য পুস্তক। উহার ভাষা সরল ও সাবলীল। ১৯০৯ খৃ. অধ্যাপক ব্রাউন ইহাকে মির্যা মুহাম্মাদ খান ক'যবীনী কর্তৃক লিখিত ভূমিকা ও টীকাসহ প্রকাশ করেন। দাওলাত শাহ সামারকান্দী কর্তৃক ৮৯২/১৪৮৬ সনে রচিত তায'কিরাতু'শ-শু'আরা' হইতেছে ঐ শ্রেণীর আর একটি গ্রন্থ। অধ্যাপক ব্রাউন উহাকে সম্পাদনা করেন এবং উহা প্রকাশিত হয়। তাঁহার মতে উক্ত গ্রন্থ "একটি বিদগ্ধজন চিত্ত-আকর্ষক গ্রন্থ" হইলেও উহাতে কতগুলি ঐতিহাসিক তথ্যগত ভ্রান্তি রহিয়াছে। উহার ফলে Rieu- এর ন্যায় সতর্ক ও নির্ভরযোগ্য গবেষকও কোথাও কোথাও ভুল করিয়া বসিয়াছেন (ব্রাউন, ৩খ, ৪৩৬)। উক্ত গ্রন্থের ভাষা সরল ও সাবলীল। উহার বর্ণনা ভঙ্গি কোথাও কোথাও নাটকীয়। নূরু'দ-দীন 'আবদু'র-রাহমান জামী (৮১৭/১৪১৪-৮৯৮/১৪৯২) কর্তৃক রচিত 'নাফাহ'াতু'ল উন্স' গ্রন্থে সূফীদের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। বাহারিস্তান গ্রন্থটিও তৎকর্তৃক রচিত। উহা শায়খ সাদীর গুলিসতাঁর রচনা রীতির অনুকরণে লিখিত হইলেও গুলিসতাঁর রচনা শৈলী ও বর্ণনা সৌকর্য উহাতে অনুপস্থিত।

আলোচ্য যুগে চরিত্র গঠনমূলক উত্তম গ্রন্থাবলীও প্রণীত হয়। এই যুগে নাসীরু'দ-দীন তূসী (৫৯৭/১২০০-৬৭২/১২৭৩) কর্তৃক আখলাক'-ই নাসি'রী নামে শিক্ষামূলক গ্রন্থ রচিত হয় (রচনাকাল ৬৩৩/১২৩৫)। উক্ত গ্রন্থ ইব্ন নমসকাওয়ায়হ্ কর্তৃক রচিত তাহ্যীবু'ল-আখলাক' ওয়া তাত্হীরু'ল-আ'রাক' নামক গ্রন্থের অনুবাদ ও সারসংক্ষেপ। অবশ্য উহার কোথাও কোথাও অনুবাদক নিজের কথা যোগ করিয়া দিয়াছেন। এই যুগে জালালু'দ-দীন দাওওয়ানী (মৃ. ৯০৮/১৫০২-১৫০৩) আখলাক-ই জালালী গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থকার উহাতে মানবীয় কার্যাবলীর গঠন ও বিন্যাসের বৈজ্ঞানিক মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন এবং কোথাও কোথাও উহার সমর্থনে কুরআন মাজীদের আয়াত, রাসূল (সাঃ)-এর হাদীছ ও খুলাফা-ই রাশিদা-র উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন। গ্রন্থের বিষয়াবলীর বর্ণনা রীতি পাণ্ডিত্যময়। উহাতে বিপুল পরিমাণে 'আরবী শব্দ ও 'আরবী শব্দবিন্যাস প্রণালী ব্যবহৃত হইয়াছে। দর্শনের সংমিশ্রণ গ্রন্থটিকে অধিকতর পাণ্ডিত্যময় করিয়াছে। আখলাক'-ই নাসি'রী দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ইহা রচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার ইহা স্বীকারও করিয়াছেন। ৯০০/১৪৯৪ সনে হুসায়ন ওয়া'ইজ' কাশিফী আখলাক-ই মুহ্সিনী রচনা করেন। উহার নামের বর্ণমালায় উহার রচনা সালের ইঙ্গিত রহিয়াছে। উহাতে সহজ, সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় নীতিকথাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের কোথাও কোথাও বক্তব্য বিষয়ের উপযোগী কবিতার উল্লেখ করিয়া উহার আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আনওয়ার-ই সুহায়লীও উক্ত হুসায়ন ওয়া'ইজ' কাশিফী কর্তৃক রচিত হয়। উক্ত গ্রন্থ কালীলা ওয়া দিম্না গ্রন্থেরই একটি ভিন্ন রূপ। গ্রন্থকার উহার রচনা দ্বারা কালীলা ওয়া দিমনা গ্রন্থের ভাষাকে সহজ ও সাবলীল করিতে চাহিলেও উহাতে তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাঁহার রচনায় কষ্টকল্পনা ও কৃত্রিমতা পরিলক্ষিত হয়। এই যুগে ভারতীয় উপমহাদেশেও ফারসী ভাষায় কতগুলি নীতিমূলক গ্রন্থ রচিত হয় (যেমন আখলাক-ই হুমায়ূনী; আখলাক-ই জ'াহীরী; আখলাক-ই জাহাঙ্গীরী ইত্যাদি; তু. হস্তলিখিত গ্রন্থাবলী তালিকা, ইণ্ডিয়া অফিস, লণ্ডন, সাংকেতিক বিবরণের সাহায্যে দ্র.)।

ইরানে সাফাবী রাজবংশের শাসনামলে (৯০৭/১৫০২-১১৪৮/১৭৩৬) চিত্র শিল্প ও হস্তলিপি শিল্প উন্নতির চরম স্তরে পৌঁছিলেও বিখ্যাত ও প্রতিভাবান কবি এবং সাহিতিকের আবির্ভাব ঘটে নাই। অধ্যাপক ব্রাউন কাযবীনীর ভাষায় উহার কারণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ সাফাবী সুলতান তাঁহাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে এবং তুর্কী সরকারের সহিত তাঁহাদের ঘোর শত্রুতার কারণে নিজেদের অধিকাংশ শক্তি শী'আ ধর্ম মতের প্রসারে ও শী'আ 'আলিমদের উৎসাহ বৃদ্ধিতে ব্যয় করিতেন। 'আলিম সমাজ যদিও জনগণের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্য সৃষ্টির জন্য চরম প্রচেষ্টা চালান (এবং যাহার ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয়) এবং যদিও তাঁহারা আধুনিক ইরানের গোড়াপত্তনে প্রধান ভূমিকা পালন করেন (যে আধুনিক ইরানে জনগণ একইরূপ ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাস পোষণ করে, একই ভাষায় কথা বলে এবং একই মানব গোষ্ঠীর সহিত সম্পর্ক রাখে), তথাপি সুলতানদের উক্ত নীতির কারণে কাব্য, সাহিত্য ও তাসাওউফ চর্চা বিরাট প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। অপরদিকে ভারত উপমহাদেশের মোগল সম্রাটদের দরবার হইতে অধিকতর আর্থিক আনুকূল্য লাভের প্রত্যাশা থাকায় ইরানী কবিগণ কারবালার শাহী দরবারে গমনের পরিবর্তে মোগল সম্রাটদের দিল্লীর দরবারে আগমন করিতেন (A. Lit. Hist. of Persia, ৩খ, ২৭)। সম্রাট আকবর (৯৬৩/১৫৫৬-১০১৪/১৬০৫), সম্রাট জাহাঙ্গীর (১০১৪/১৬০৫- ১০৩৭/১৬২৮) এবং তাঁহাদের অমাত্যগণ, বিশেষত সেনাপতি বৈরাম খান ও খান ইখানান-এর বদান্যতায় উৎসাহিত হইয়া ইরানে কবি ও 'আলিমগণ ভারত উপমহাদেশে আগমন করিতে থাকেন। 'আল্লামা শিব্লী নু'মানীর বর্ণনানুসারে শুধু সম্রাট আকবারের দরবারে আগমনকারী ইরানী কবিদের সংখ্যাই ছিল পঞ্চাশ (শি'রু'ল-'আজাম, ৩খ, ৫)।

এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য যুগে তুর্কী কাব্য রচনারীতির প্রভাবে ইরানী কাব্য রচনায় কল্পনা-প্রবণতা ও কাল্পনিক কাহিনী রচনার ধারা প্রবিষ্ট হইতে থাকে। ভারতীয় ফারসী কবিগণ এই বিশেষ রচনারীতিকে অনুশীলন করিয়া উহাকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাইয়া দেন। এই কারণে ঐতিহাসিক বাহার উহাকে সুবুক-ই হিন্দী অর্থাৎ ভারতীয় রচনারীতি নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

আলোচ্য যুগে ফারসী কবিতা রচনায় বাবা ফাগানী (মৃ. ৯২৫/১৫১৮) একটি নূতন রীতি প্রবর্তন করেন। উক্ত রচনারীতি তাযাহ্ গুই অর্থাৎ 'জীবন্ত বিষয় বর্ণনার রীতি' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই বিশেষ রচনারীতি সম্রাট আকবার ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ভারত উপমহাদেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। মা'আছি'র-ই রাহ'ীমী গ্রন্থের লেখক লিখিয়াছেন ঃ 'উক্ত রচনারীতি আবুল-ফাত্হ' গীলানীর হাতে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। 'বাবা ফাগানী সৃষ্টি প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন। তিনি হৃদয়ের গভীর ভালবাসা ও ইহার তরঙ্গময় কল্পনারাজিকে অশান্ত ও উদ্ভ্রান্ত ভাষায় প্রকাশ করেন। কবি হাতিফী (মৃ. ৯২৭/১৫২০) কবি জামীর ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি কবি নিজামীর অনুকরণে খামসা রচনা করেন। উহা নিম্নোক্ত পাঁচটি কাব্যের সমষ্টি ঃ (১) লায়লা ওয়া মাজনূন; (২) খুসরূ ওয়া শীরীন; (৩) হাফ্ত নাজ'র; (৪) তায়মূরনামাহ্ ও (৫) শাহনামাহ্। কবি আহলী শীরাযী (মৃ.

৯৪২/১৫৩৫) কর্তৃক রচিত সিহ্'র-ই হালাল এবং শামা' ওয়া পরওয়ানাহ নামক মাছ্নাবী শ্রেণীর কাব্যদ্বয় এবং একটি 'দীওয়ান' তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। কবি ওয়াহ্'শী বাফাকী (মৃ. ৯৯১/১৫৮৩) খণ্ড কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি ফারহাদ ওয়া শীরীন নামক একখানা মাছ্নাবী শ্রেণীর কাব্য রচনার কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐতিহাসিক শাফাক-এর বর্ণনানুসারে তিনি উহার রচনাকার্য সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই (তা'রীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, প্র. ৩৭৩)। অবশেষে কবি বিস'াল শীরাযী (মৃ. ১২৬২/১৮৪৫) উহার রচনাকার্য সমাপ্ত করেন। কবি যুলালী খাওয়ান্সারী (মৃ. ১০২৪/১৬১৫) মহামতি 'আব্বাস-এর দরবারের প্রধান কবি ছিলেন। ঐতিহাসিক শাফাক' এর বর্ণনানুসারে তিনি সাতখানা মাছ্নাবী কাব্য রচনা করেন। উক্ত কাব্য সপ্তক তাঁহাকে খ্যাতির আসনে সমাসীন করে (তারীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, পৃ. ৩৭৩)। কবি মুহ'তাশিম কাশী (মৃ. ৯৯৬/১৫৮৭) প্রথম বয়সে কাসীদা ও গাযাল রচনা করিতেন। কিন্তু সাফাবী রাজবংশের প্রবণতা দেখিয়া তিনি কবিতা রচনায় স্বীয় চিন্তাধারার পরিবর্তন করিয়া ইমাম হাসান ও হুসায়ন (রাঃ) এর মার্ছিয়া রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং মার্ছিয়া রচনার ধারাকে উৎকর্ষে পৌঁছাইয়া দেন। তৎকর্তৃক রচিত হাফ্ত বান্দ-ই কাশী নামক মার্ছিয়া কাব্য হৃদয়ের শোক ও বেদনার এক জ্বলন্ত শোকগাথা হইয়া রহিয়াছে। কবি হাতিফ ইস্ফাহানী (মৃ. ১১৯৮/১৭৮৩) কর্তৃক অর্জিত বিপুল সুখ্যাতির মূলে রহিয়াছে তাঁহার সূফীতাত্ত্বিক তারজী 'বান্দ কবিতা। কবি হিলালী চুগ্তাঈ (মৃ. ৯৩৯—১৫৩২) কর্তৃক রচিত 'শাহ ওয়া দারবেশ' একটি প্রসিদ্ধ মাছনাবী কাব্য।

ঐতিহাসিক সাম মির্যা তাঁহার তুহ'ফা-ই সামী গ্রন্থে সাফাবী যুগের বিশ জনের অধিক কবির নাম উল্লেখ করিলেও তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র কবি জামী ব্যতীত অন্য কেহই প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন না। সাফাবী বাদশাহ্দের বিশেষ ধর্মীয় প্রবণতার দরুন তাঁহাদের যুগে কাসীদা ও গাযালের তেমন কোনও কদর ছিল না পক্ষান্তরে ভারতীয় উপমহাদেশে তখন মোগল সম্রাটদের দরবার কাব্য ও সাহিত্য চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহারা ফারসী সাহিত্যের বিকাশ ও প্রসারে ব্যক্তি গতভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। স্বয়ং সম্রাটদের কেহ কেহ গ্রন্থ রচয়িতা ছিলেন। 'আল্লামা ফায়দী (৯৫৪/১৫৪৭-১০০৪/১৫৯৪) সম্রাট আকবারের সভার নবরত্নের অন্যতম এবং প্রধান সভাকবি ছিলেন। উচ্চ স্তরের কাব্য প্রতিভার অধিকারী হওয়া ছাড়াও তিনি 'আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা জানিতেন। দার্শনিক চিন্তাধারা ও মনমানসিকতার অধিকারী হইবার কারণে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন। আড়ম্বরপূর্ণ শব্দ প্রয়োগ, উদ্দীপনাময়ী বর্ণনা ও উন্নত প্রকাশ-ভঙ্গিমা তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য।

কবি ফায়দীর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে যে সকল বিখ্যাত কবি উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন তাঁহাদের মধ্যে কবি 'উরফী শীরাযী (৯৬৩/১৫৫৫-৯৯৯/১৫৯০), শাহ যাদাহ্ সালীম, 'আবদুর-রাহ'ীম খান খানান ও আবু'ল-ফাত্হ' গীলানীর প্রশংসায় শক্তিশালী কাসীদা রচনা করেন। তাঁহার কবিতা রচনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি অতি সাধারণ বিষয়কে বর্ণনাশক্তি দ্বারা ব্যাপকতা দান করিয়া উহাকে বাস্তব জগতের ঊর্ধ্বে কল্পনার উচ্চ লোকে পৌঁছাইয়া দেন। তিনি তাঁহার কবিতায় দার্শনিকসুলভ বর্ণনা পদ্ধতিও প্রয়োগ করিয়াছেন এবং অভিনব শব্দ বিন্যাস ও উপমা প্রয়োগ দ্বারা উহাকে রসোত্তীর্ণ করিয়াছেন। স্বীয় কাসীদাসমূহের বহু স্থানে তিনি নিজ গৌরবের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। অহম ও আত্মোপলব্ধি এবং উন্নত মানসিকতা ও সাহসিকতা তাঁহার রচনার বিশেষ বিষয় ছিল। তিনি গাযালও রচনা করিয়াছেন; কিন্তু কাসীদা রচনার কারণেই তিনি স্থায়ী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

কবি নাজীরী নীশাপূরী (মৃ. ১০২১/১৬১২) সম্রাট আকবার, শাহযাদাহ সালীম ও শাহযাদাহ্ মুরাদের প্রশংসায় কাসীদা রচনা করেন। কিন্তু যে গতিময় বর্ণনাশক্তি কবি 'উরফী রচিত কাসীদা-য় বিদ্যমান দেখা যায়, কবি নাজ'ীরী রচিত কাসীদা-য় তাহা অনুপস্থিত। গাযাল রচনা তাঁহার প্রিয় রচনা প্রকরণ ছিল। জীবন্ত কল্পনা ও চিন্তাধারা এবং বলিষ্ঠ বর্ণনা ভঙ্গী দ্বারা উহাকে তিনি উৎকর্ষের চরম শিখরে পৌঁছাইয়াছেন। তাঁহার রচনায় তাসাওউফের ছাপও দেখা যায়।

সম্রাট আকবারের দরবারে আরও বহু ইরানী কবি ছিলেন। আবু'ল-ফাদ্'লের ভাষায় সম্রাটের দরবারের সহিত ইরানী কবিদের একটি বিরাট দল সংশ্লিষ্ট ছিল (আ'ঈন-ই আকবারী, ১খ, ১৮২)। তিনি এইরূপ প্রায় পঞ্চাশজন কবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আনীসী শামলু, উকৃ'ঈ নীশাপূরী, সান্জার কাশী, আশকী কু'মী, শাকীবী ইস'ফাহানী প্রমুখ কবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কবি ত'ালিব আমিলী (মৃ. ১০৩৬/১৬২৬) সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারের প্রধান কবি ছিলেন। স্বীয় কবিতায় অভিনব উপমা ও রূপকসমূহ ব্যবহার করিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করেন। লাহোর শহরের প্রতি তাঁহার ভালবাসার কারণে একটি কবিতায় তিনি উহার প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য যুগে হায়দরাবাদ-দাক্ষিণাত্যের 'আদিল শাহী রাজবংশীয় ও কুত্'ব শাহী রাজবংশীয় বাদশাহ্গণ সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চায় পৃষ্ঠাপোষকতা দান করেন। কবি মালিক কুমী দাক্ষিণাত্যের বাদশাহ্দের কাব্যচর্চায় উৎসাহ প্রদানের খ্যাতি শুনিয়া তথায় আগমন করেন এবং বীজাপুরের রাজদরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। মোল্লা জ'াহূরী তারশীযী (মৃ. ১০২৪/১৬১৫) আহমাদ নগর ও বীজাপুরের রাজদরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সম্রাট শাহজাহান (১০৩৭/১৬২৮-১০৬৮/১৬৫৮) বিশ জনের অধিক কবিকে কবিতা রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। তাঁহাদের অধিকাংশই ইরান হইতে আগমন করিয়াছিলেন। কবি কু'দসী মাশহাদী (জ. ৯৯১/১৫৮৩ সনের দিকে) সম্রাট শাহজাহানের দরবারে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেন। নীতিকথা ও ধর্মীয় বিষয়াবলী তাঁহার রচনার বিষেশ বিষয়বস্তু ছিল। কুল্লিয়্যাত কাব্য ছাড়াও জাফারনামাহ-ই শাহজাহানী এবং মাছ'নাবী-ই কাশমীরী নামক মাছনাবী শ্রেণীর দুইটি কাব্য গ্রন্থ তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

সম্রাট শাহজাহানের দরবারের দ্বিতীয় বিখ্যাত কবি ছিলেন স'া'ইব তাবরীযী (১০১০/১৬০১-১০৬১/১৬৫০)। কবিতা রচনা করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতির অধিকারী হন। মিছ'ালিয়্যা কবিতা রচনা তাঁহার স্থান অনন্য। মিছ'ালিয়্যা কবিতা রচনার নিয়ম এই যে, কবিতার প্রথম চরণে কোন বিষয়কে বর্ণনা করিয়া দ্বিতীয় চরণে বাস্তব প্রমাণাদি যোগে উহাকে প্রমাণিত করিতে হয়। চমৎকার উপমা এবং উৎকৃষ্ট বাগধারা ও প্রবাদসমূহ ব্যবহার করিয়া তিনি স্বীয় কবিতাকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন। সম্রাট শাহজাহানের দরবারের আর একজন কবি হইতেছেন আবূ ত'ালিব কালীম হামাদানী (মৃ. ১০৬১/১৬৫০)। তিনি গাযাল কবিতা রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। কল্পনা প্রবণতা এবং নব নব বিষয়বস্তুর উদ্ভাবন তাঁহার গাযাল

রচনার বৈশিষ্ট্য। তিনি কাসীদাও রচনা করিয়াছেন। উহাতে বর্ণনা শক্তির প্রবলতা এবং শব্দ প্রয়োগের আড়ম্বর উভয়ই অনুপস্থিত। কবি স'া'ইব-এর ন্যায় তিনিও মিছ'ালিয়্যা শ্রেণীর কবিতা রচনা করিয়াছেন। দীওয়ান কাব্য ছাড়াও মাছনাবী শ্রেণীর একাধিক কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে বাদশাহনামাহ কাব্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সম্রাট আওরঙ্গযেব-এর শাসনামলে (১০৬৯/১৬৫৯-১১১৮/১৭০৭)ও দিল্লীর রাজদরবারে ফারসী কাব্য চর্চা হইতে থাকে। তবে কবি 'আবদুল-ক'াদির বেদিল ব্যতীত অন্য কোনও প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব এই যুগে ঘটে নাই। কবি নাসি'র 'আলী সারহিন্দী গভীর অর্থপূর্ণ রচনা এবং নব নব বিষয়বস্তু উদ্ভাবনে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করেন। উচ্চ পদস্থ রাজ-কর্মচারীদের মধ্যে আরও কিছু সংখ্যক কবি-সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন হইতেছেন মির্যা মুহাম্মাদ শীরাযী 'আলী (মৃ. ১১২১/১৭০৯)। রন্ধনশালার প্রধান কর্মকর্তা হওয়ায় তিনি নিমাত ('আলী) উপাধিতে বিখ্যাত হন। কবি গানী কাশ্মীরী (মৃ ১০৭৯/১৬৬৮) সম্রাট শাহজাহান ও সম্রাট আওরঙ্গযেব উভয়ের রাজত্বকালের কবি ছিলেন। স্বীয় কবিতায় সুক্ষ্ম তত্ত্ব সৃষ্টি এবং জীবন্ত কল্পনা ও চিন্তাধারা প্রকাশ করিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। পূর্বোক্ত কবি বেদিল (মৃ. ১১৩৩/১৭২০) সম্রাট আওরঙ্গযেব এবং তাঁহার স্থলাবিষিক্ত সম্রাটদের যুগ প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল তাসাওউফ ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী। রচনার জীবন্ত কল্পনা ও চিন্তধারার প্রাকাশ এবং উৎকৃষ্ট প্রকাশ ভঙ্গীর কারণে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। একমাত্র কবি বেদিল বক্তব্য বিষয়কে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্মরূপে বর্ণনা করিবার পদ্ধতিকে উন্নতির চরম স্তরে পৌছাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কবি গানীমাত (মৃ. ১১৫৮/১৭৪৫), নায়বাঙ্গ-ই 'ইশ্‌ক বা শাহিদ ওয়া 'আযীয নামক মাছনাবী শ্রেণীর কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। কবি হ'াযীন (মৃ. ১১৯৩/১৭৭৯) সম্রাট মুহ'াম্মাদ শাহ এর রাজত্বকালে দিল্লীতে আগমন করেন এবং তথাকার সাহিত্যে প্রভাব রাখেন। কবি মাজ্‌হার-ই জান-ই জানাঁ (মৃ. ১১৯৫/১৭৮০) এর কবিতা সূফীতত্ত্বমূলক। কবি মির্যা কাতীল (মৃ. ১২৪০/১৮২৪) ও কবি ওয়াকিফ (মৃ. ১২০০/১৭৮৫) উভয়েই সম্রাট মুহাম্মাদ শাহ-এর স্থলাভিষিক্ত সম্রাটদের শাসনামলের কবি ছিলেন। সর্বশেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ (মৃ. ১২৭৯/১৮৬২)-এর শাসনামল (১২৫৩/১৮৩৭-১২৭৫/১৮৫৭)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি গালিব (মৃ. ১২৮৬/১৮৬৯) যদিও উর্দূ কবিতা রচনা করিয়া সবিশেষ খ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন তথাপি তাঁহার ফারসী কবিতাও বর্ণনাভঙ্গির চমৎকারিত্ব এবং বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব ও ভাব গভীরতার দিক দিয়া উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁহার রচনার বিষয়বস্তুসমূহ দর্শন সমৃদ্ধ, বর্ণনা ভঙ্গি উদ্দীপনাময়ী, উপমাসমূহ অভিনব এবং চিন্তাধারা উন্নত।

ইরানের সম্রাট ফাত্‌হ' শাহ ক'াযার (১২১১/১৭৯৭-১২৫০/১৮৩৪) কাব্যমোদী ও সাহিত্য-রসিক ছিলেন। তিনি ইরানের আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। উল্লেখ্য, উক্ত সাহিত্য আন্দোলন ভারতীয় উপমহাদেশীয় রচনা-রীতি এবং হিরাতীয় রচনারীতির বিরুদ্ধে ফারসী সাহিত্যের সুবক-ই ক'াদীম অর্থাৎ প্রাচীন রচনারীতির পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে আরম্ভ হয়। প্রাচীন রচনারীতি ও উহার বিপরীত রচনারীতির মাধ্যকার প্রধান পার্থক্য এই যে , প্রাচীন রচনারীতি হইতেছে সহজ, সরল ও আড়ম্বরহীন রচনারীতি; পক্ষান্তরে উহার বিপরীত রচনারীতি হইতেছে কষ্ট কল্পনাপূর্ণ, আড়ম্বরময় ও কৃত্রিমতাপূর্ণ। সম্রাট নিজে দীওয়ান-ই খাকান নামক একটি কবিতা সংকলন সংকলিত করেন। উহার ভূমিকা মির্যা 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব নিশাত ইসফাহানী কর্তৃক লিখিত হয় (সুবক-শিনাসী, ৩খ, ৩৩৩)। উক্ত কবিতা সংকলনে আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সম্রাট মুহাম্মাদ শাহ (১২৫০/১৮৩৪- ১২৬৪/১৮৪৮) এবং সম্রাট নাসিরু'দ-দীন শাহ (১২৬৪/১৮৪৮- ১৩১৩/১৮৯৫)-ও সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় সাহিত্য রচনার পদ্ধতিকে উৎসাহিত করিয়াছেন। এই যুগে শাসনকর্তাদের প্রচেষ্টার কারণে ফারসী সাহিত্য ঈলখানী ও সাফাবী যুগের কৃত্রিমতাপূর্ণ রচনারীতি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বাভাবিক রচনারীতিতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। সাহিত্যকে কৃত্রিমতামুক্ত করিবার উক্ত আন্দোলন ইসফাহানে আরম্ভ হইয়া উহা সমগ্র ইরানে ছড়াইয়া পড়ে।

কবি মুজমার ইসফাহানী (মৃ. ১২২৫/১৮১০) সম্রাট ফাত্‌হ' 'আলী শাহ ও তাঁহার পুত্রদের প্রশংসায় কাসীদা রচনা করেন। তিনি কিছু কিছু গাযাল এবং তারকীব বান্‌দও (সম আকৃতির একাধিক শ্লোকবিশিষ্ট কবিতা) রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত কবি খাকানীর অনুসরণে তুহ'ফাতু'ল-'ইরাকায়ন কাব্য রচনা করেন। মির্যা 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব নিশাত' ইসফাহানী (১২৪৪/১৮২৮)- সম্রাট ফাত্‌হ 'আলী শাহ যাঁহাকে তাঁহার প্রশাসনের পত্রালাপ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন-ফারসী সাহিত্যের আধুনিকীকরণ আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। তাঁহার গদ্য ও পদ্য রচনাবলীর সমষ্টি গাঞ্জীনাহ্‌ নামে পরিচিত। উক্ত রচনা-সম্ভারের গদ্যাংশে তৎকর্তৃক লিখিত কতগুলি পত্র, রাজকীয় ফরমান ও প্রবন্ধ রহিয়াছে। ঐতিহাসিক ইব্‌রাহীম সাফা'ঈ-র বর্ণনানুসারে (নাহ্‌দাত-ই আদাব-ই ঈরান, পৃ. ২০) সম্রাট ফাত্‌হ 'আলী শাহ ফরাসী বীর নেপোলিয়নের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, উহা নিশাত কর্তৃকই রচিত হইয়াছিল। ফারসী সাহিত্যের আধুনিকীকরণের আন্দোলকে অধিকতর পরিব্যাপ্ত ও শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে তিনি মুশ্‌তাক নামক একটি সাহিত্য মজলিস কায়েম করেন। উক্ত সাহিত্য মজলিসের সম্মেলনে কবিগণ সমবেত হইয়া স্ব স্ব কবিতা আবৃতি করিয়া শুনাইতেন এবং পরস্পরের কবিতার সমালোচনা করিয়া ভাষণ দিতেন। কবি ফাত্‌হ 'আলী খান সাবা (মৃ. ১২৩৮/১৮২২) সম্রাট ফাত্‌হ 'আলী শাহের দরবারের প্রধান কবি ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত কাসীদা রচয়িতা ছিলেন। আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনে তিনি উৎসাহী ভূমিকা পালন করেন। তৎকর্তৃক রচিত মাছনাবী শ্রেণীর তিনটি কাব্য শাহনামাহ্‌, 'ইব্‌রাতনামাহ্‌ ও গুলশান-ই সাবা তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। কবি মির্যা শাফী বিসাল; শীরাযী (১১৯৩/১৭৭৯-১২৬২/১৮৪৫) শুধু মাত্র আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনকে অনুসরণ করেন নাই, বরং তিনি শীরায নগরের নবীন সাহিত্যিকদিগকেও উক্ত আন্দোলনের অনুসরণে সহজ সরল ও কষ্ট-কল্পনা মুক্ত সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেন। তিনি বায্‌-ম-ই বি'স'াল নামক মাছনাবী শ্রেণীর একখানা কাব্য রচনা করেন এবং কবি ওয়াহ্‌শী য়ায্‌দীর অসমাপ্ত মাছ'নাবী শ্রেণীর কাব্য ফারহাদ ওয়া শীরীন-এর রচনা সমাপ্ত করেন। কবি ক'াইম মাক'াম ফারাহানী ছ'ানা'ঈ (১১৯৩/১৭৭৯- ১২৫১/১৮৩৫) একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক, কবি ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি তাঁহার সময়কার যুবরাজের উযীর নিযুক্ত হন; কাইম মাকাম খেতাবে ভূষিত হন। কিন্তু হিংসুকদের চক্রান্তে তিনি এক সময়ে পদচ্যুত হন। ধৈর্য পরীক্ষার এই কঠিন যুগে তিনি যে সব ক'াসীদা ও গাযাল কবিতা রচনা করেন, উহা করুন রস ও শোক-বেদনার মর্মগাথা হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার রচিত পত্রাবলী গদ্য সাহিত্যের উৎকৃষ্ট আদর্শ উহাদের অধিকাংশ আবার

ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়াও অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। ১২৮০/১৮৬৩ সনে সাহিত্যিক ফারহাদ মীর্যা উক্ত পত্রাবলীকে মুনশা'আত-ই ক'া'ইম মাক'াম নাম দিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। মাহ'মূদ খান উহার ভূমিকা লিখিয়া দিন। সাহিত্যিক ওয়াহীদ দাস্তগারদী দীওয়ান-ই ক'াসা'ইদ নাম দিয়া তাঁহার রচিত কাসীদাসমূহের একটি সংকলন সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। কবি ফারাহানী ছানা'ঈ রচিত মাছনাবী-ই জালা'ইরনামাহ্ তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

আলোচ্য যুগে ইরানে যে কবি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, তিনি হইতেছেন কবি ক'া'আনী (১২২২/১৮০৭-১২৭২/১৮৫৫; অধ্যাপক ব্রাউনের বর্ণনানুসারে তাঁহার মৃত্যু সন ১২৭০/১৮৫৩)। কাসীদা রচনায় তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি প্রতিভার ছাপ তাঁহার রচনায় সুস্পষ্ট। কাব্যে ব্যবহৃত তাঁহার উপমাসমূহ স্বাভাবিক। তাঁহার প্রকাশভঙ্গি স্বাভাবিক ও কষ্ট-কল্পনাবর্জিত। প্রায় সমোচ্চারিত শব্দাবলী ব্যবহার করিবার মাধ্যমে শ্রোতার হৃদয়ে শব্দ-প্রভাবজাত সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা সৃষ্টিতে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ও দক্ষতা রহিয়াছে। কাসীদা রচনায় তিনি ঘটনা বর্ণনার পদ্ধতিও গ্রহণ করিয়াছেন। কবি ফুরূগী বিসাতামী (১২১৩/১৭৯৮-১২৭৪/১৮৫৭) কাসীদা রচনা করিলেও গাযাল কাব্য তাঁহার স্বভাবজাত প্রতিভার ফসল ছিল। গাযাল রচনা করিয়াই তিনি খ্যাতি লাভ করেন। কবি সারূশ ইসফাহানী (১২২৯/১৮১৩-১২৮৫/১৮৬৮) আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের একজন উৎসাহিত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার রচিত কাসীদাসমূহে প্রেম ও কল্পনাপ্রিয়তার উপাদান বিদ্যমান। সাকী নামাহ্ ও ইলাহী নামাহ্ নামক দুইটি মাছনাবী শ্রেণীর কাব্য তাঁহার সৃষ্টি। কবি মির্যা আবু'ল-হাসান য়াগ'মা কবি 'উবায়দ যাকানীর ন্যায় কৌতুক কবিতার রচয়িতা ছিলেন। মার্ছিয়া কাব্যে তিনি এক বিশেষ রচনারীতির উদ্ভাবক। উক্ত রচনা রীতিকে তিনি বুক চাপড়ানির করুন কান্না নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কৌতুক কাব্য সার্দারিয়্যা (তেহরন ১৮৬৬ খৃ.) নামে পরিচিত।

সম্রাট মুহাম্মাদ শাহ কাযার-এর রাজত্বকালে রাজ-দরবারের শ্রেষ্ঠ কবি মাহ'মূদ খান (মৃ. ১৩১১/১৮৯৩) কাব্য রচনায় সাবক-ই খুরাসানী অর্থাৎ খুরাসানী রচনারীতির পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনে আধুনিক পন্থীদিগকে সমর্থন ও সহযোগিতা দান করেন। তিনি কবি ফাররূখী ও কবি আমীর মু'ইয্যীর অনুকরণে কাসীদা রচনা করেন। তাঁহার রচনায় দৃশ্য বর্ণনার নিদর্শনও পরিলক্ষিত হয়। তিনিই সেই কবি—যিনি সর্বপ্রথম নিজের জন্য কোনও কবি নাম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। তাঁহার রচিত 'দীওয়ান'কে সাহিত্যিক আক'া'ঈ ওয়াহীদ যাদ সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সায়্যিদ মুহাম্মাদ শু'লা, মীর সায়্যিদ মুশ্তাক; মির্যা নাস'ীর ইসফাহানী, 'আশিক' ইসফাহানী, লুত্'ফ 'আলী বেগ আয'ার, সায়্যিদ আহমাদ হাতিফ, সুলায়মান বেদ্গালী, য়াগ'মা'ঈ শিহাব তারশীযী, রিদা কুলী হিদায়াত, স'াবুরী মাশহাদী এবং ফাত্হু'ল্লাহ্ খান শায়বানীও আলোচ্য যুগের ফারসী কবি ছিলেন।

সম্রাট মুহাম্মাদ শাহ কাযার-এর রাজত্বকালে (১২৫০/১৮৩৪-১২৬৪/১৮৪৮) সায়্যিদ 'আলী মুহাম্মাদ বাব ( ১২৩৫/১৮১৯/১২৬৬/১৮৫০)-এর নেতৃত্বে ইরানে একটি শক্তিশালী ধর্মীয় আন্দোলন সূচিত হয়। উক্ত আন্দোলন তাহ'রীক-ই বাবী অর্থাৎ বাব কর্তৃক প্রবর্তিত আন্দোলন নামে পরিচিত। ইরানের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাহিত্যও উক্ত আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়। কু'ররাতু'ল-'আয়ন তাহিরা নাম্নী জনৈকা প্রতিভাময়ী কবি (মৃ. ১২৬৮/১৮৫২) উক্ত আন্দোলনের একজন অতি উৎসাহী প্রচারিকা ছিলেন। কতগুলি গাযাল কবিতা ব্যতীত তাঁহার কোনও (উল্লেখযোগ্য) রচনা এখন আর পাওয়া যায় না। উক্ত গাযালগুলিতে হৃদয়ের আবেগানুভূতির প্রাবল্য ছাড়াও সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার অন্তঃপ্রবেশের ধারনার প্রকাশ রহিয়াছে। উহাতে অদ্বৈতবাদ এবং স্রষ্টার মধ্যে সৃষ্টির লয় প্রাপ্তির সূফী তাত্ত্বিক চিন্তাধারারও প্রচার দেখা যায়।

ইরানে সাফাবী আফশারী যান্দী ও কাযারী রাজবংশসমূহের রাজত্বকালে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থাবলী রচিত হয়। ইব্ন বাযায কর্তৃক হি. ৮ম শতাব্দীতে রচিত স'াফওয়াতু'স'-সাফা গ্রন্থে সাফাবী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা স'াফিয়্যুদ-দীন-এর জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। রাওদ'াতুস'-সাফা গ্রন্থের রচয়িতা মীর খাওয়ান্দ-এর পৌত্র গিয়াছু'দ-দীন খাওয়ান্দ আমীর কর্তৃক রচিত হাবীবু'স-সিয়ার গ্রন্থে সাফাবীর রাজত্বকালের প্রারম্ভ হইতে শাহ ইসমা'ঈল সাফাবীর রাজত্বকাল পর্যন্ত যুগের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের বর্ণনা পদ্ধতি সরল ও সাবলীল। উক্ত গ্রন্থকারের আর একটি গ্রন্থের নাম হইতেছে মুতাম্মিম-ই রাওদ'াতুস্'-সাফা (রাওদু'স-স'াফা গ্রন্থের পরিশিষ্ট)। প্রকৃতপক্ষে ইহা রাওদাতসি-সাফা গ্রন্থেরই পরিচ্ছেদ। মূল গ্রন্থের সহিত উহাকে যুক্ত করিয়া গ্রন্থকার মূল গ্রন্থে বর্ণিত ইতিহাসের পরিধিকে নিজ যুগের ঘটনাবলী পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন। হাসান বেগ রোমলো কর্তৃক রচিত আহ্'সানু'ত-তাওয়ারীখ গ্রন্থে ৯০০/১৪৯৪ হইতে ৯৭৫/১৫৬৭ পর্যন্ত বিস্তৃত যুগের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ শাহ ত'াহমাস্প স'াফাব'ীর বিস্তারিত জীবনী জানিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। মুহাম্মাদ বাখ্শ ইব্ন 'আবদি'ল-কারীম রচিত যুবদাতু'ত-তাওয়ারীখ গ্রন্থে সাফাবী ও আফগানী সম্রাটদের যুগের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। তারীখ-ই 'আলাম আরা-ই 'আব্বাসী গ্রন্থের রচয়িতা সিকান্দার মুন্শী সাফাবী দরবারের একজন বিখ্যাত রচনা-কুশলী ছিলেন। উক্ত গ্রন্থে শাহ প্রথম 'আব্বাস (৯৮৫/১৫৭৭-১০৩৮/১৬২৯) ও তাঁহার সন্তানদের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। উহার বর্ণনা রীতি সহজ, সরল ও সাবলীল। নিগারিস্তান ও জাহান আরা গ্রন্থদ্বয় ক'াদী আহ'মাদ গিফারী কর্তৃক রচিত হইয়াছে। শাহ য়াহ্'য়া 'আবদু'ল-লাত'ীফ কাযবীনী কর্তৃক রচিত লুব্বুত-তাওয়ারীখ বা তারীখ-ই এলচী নিজ'াম গ্রন্থখানা শাহ ত'াহমাস্প-এর জীবনী সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। 'আলী রিদা ইব্ন 'আবদি'ল-কারীম রচিত তারীখ-ই যান্দিয়্যা গ্রন্থে সম্রাট কারীম খান যান্দ (১১৬৩/১৭৫০-১১৯৩/১৭৭৯) ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। মির্যা মুহাম্মাদ নামী রচিত তারীখ-ই গীতীকুশা গ্রন্থটিতেও কারীম খান যান্দের যুগের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। যান্দী শাসনামল (১১৬৩/১৭৫০-১২০৯/১৭৯৬) ও আফশারী শাসনামল (১১৪৮/১৭৩৬-১২১০/১৭৯৬)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ মুজমালু'ত তাওয়ারীখ আবু'ল-হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ আমীন গুলিস্তানা কর্তৃক প্রণীত। তারীখ-ই জাহানগুশা-ই নাদি'রী-র রচয়িতা আবুল-হাসান মির্যা মাহদী কাওকাবী আসতার আবাদী একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন। তিনি সম্রাট নাদির শাহ (১১৪৮/১৭৩৬-১১৬০/১৭৪৭)-এর একজন অমাত্যও ছিলেন। তিনি নাদির শাহের যুদ্ধাভিযানসমূহে তাঁহার সহচর হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। এই কারণে উক্ত গ্রন্থটি নাদির শাহের শাসনামলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ। ইহার বর্ণনা-রীতি অলংকারময় ও কষ্টকল্পনাপূর্ণ।

আলোচ্য গ্রন্থকারের আর একটি গ্রন্থের নাম হইতেছে দুররাহ্-ই নাদিরা। উক্ত গ্রন্থে অলংকার ও জটিল বাক্যের ব্যবহারের ছড়াছড়ি রহিয়াছে। নাসিখু'ত-তাওয়ারীখ গ্রন্থটি মীর্যা তাকী সিপিহ্র কর্তৃক রচিত। গ্রন্থকার সম্রাট নাসি'রু'দ-দীন শাহ কাযার-এর দরবারের প্রধান হিসাব রক্ষক ছিলেন। উক্ত গ্রন্থ এগার খণ্ডে সমাপ্ত। উহাতে ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভিক যুগ হইতে গ্রন্থকারের যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ কালের ইরানের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে 'আব্বাস 'আলী সিপিহ্র অতিরিক্ত চার খণ্ডে ইমামদের জীবনী লিপিবদ্ধ করত উহার সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থের বর্ণনা রীতি সহজ ও সরল। উহার ভাষার গাঁথুনি অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ। জামা-ই-জাম গ্রন্থটি ফারহাদ মির্যা কর্তৃক প্রণীত, ইতিহাস ও ভূগোল উহার আলোচনার বিষয়বস্তু। আকা খান কিরমানী কর্তৃক প্রণীত আ'ঈনা-ই সিকান্দারী গ্রন্থে প্রাচীন ইরানের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার পূর্বোক্ত বাক কর্তৃক প্রবর্তিত আন্দোলনের সহিত সম্পৃক্ত থাকিবার কারণে দেশ ত্যাগ করিয়া ইস্তাম্বুল চলিয়া যান। মুহাম্মাদ হাসান খান স'নী'উদ-দাওলা কর্তৃক প্রণীত তারীখ-ই মুনতাজি'ম-ই নাসি'রী গন্থে ইসলামের অভ্যুদয়ের যুগ হইতে গ্রন্থকারের যুগ পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত গ্রন্থকার মির'আতুল-বুলদান, তারীখ-ই আশকানিয়া,মাতলা'উশ-শাম্স আল-মা'আছির ওয়া'ল-আছা'র এবং তারীখ-ই ফারালাহ্ নামক ইতিহাস গ্রন্থ চুষ্টয়ও প্রনয়ন করেন। মা'আছির-ই খাকানী এবং হাদা'ইক-ই জিনান নামক গ্রন্থদ্বয় 'আবদু'র-রায্যাক বেগ দুমবুলী কর্তৃক প্রণীত। প্রথমোক্তে গ্রন্থে কাযারী রাজবংশের শাসনামলের (১২৪৩/১৮২৭ সন পর্যন্ত) ইতিহাস এবং শোষাক্ত গ্রন্থে গ্রন্থকারের সমকালীন 'আলিমদের এবং স্বয়ং গ্রন্থকারের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। নাদির মির্যা কর্তৃক ১৩০২/১৮৮৪ সনে প্রণীত তারীখ ওয়া জুগ-রাফিয়্যা-ই তাবরীয গ্রন্থটি ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ক জ্ঞানবর্ধক একটি গ্রন্থ। গাঞ্জ-ই দানিশ গ্রন্থে (রচনাকাল ১৩০৫/১৮৮৭) গ্রন্থকার মুহাম্মাদ তাকী খান ইরানের শহরসমূহ ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের পরিচয় এবং কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য যুগে কাযার রাজবংশীয় এককভাবে কোনও কোনও নির্দিষ্ট সুলতানের জীবনী অবলম্বনেও গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। যেমন 'আবদু'র-রাযযাক ইব্ন নাজাফ 'আলী কর্তৃক প্রণীত মা'আছি'র-ই সুলতানিয়্যা; মাহমূদ মির্যা কর্তৃক প্রণীত তারীখ-ই স'াহি'ব কি'রানী এবং ফাদলুল্লাহ মুনশী কর্তৃক প্রণীত তারীখ-ই যুল-কা'র্নায়ন। উক্ত গ্রন্থত্রয়ে ফাত্হ 'আলী শাহ কাযার-এর জীবনী বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য যুগে ফারসী ভাষায় জীবনী গ্রন্থ রচনাও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। শাহ ইসমা'ঈল সাফাবীর পুত্র যাম মির্যা (মৃ. ৯৮৩/১৫৭৫) কর্তৃক ৯৫৭/১৫৫০ সনে রচিত তুহফা-ই সামী গ্রন্থে হি. ৯ম শতাব্দী হইতে ১০ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত যুগের ইরানী কবিদের জীবনী লিখিত হইয়াছে। তায়মূর বংশীয় সম্রাট আবুল-গাযী সুলতান হুসায়ন বায়কারা-এর মন্ত্রী আমীর 'আলী শের নাওয়া'ঈ কর্তৃক তুর্কী ভাষায় মাজালিসু'ন-নাফা'ইস নামক একটি গ্রন্থ রচিত হয়। গ্রন্থকার উহাতে তাঁহার সমকালীন কবিদের জবিনী বর্ণনা করেন। ফাখরী ইব্ন আমীর লাতা'ইফ নামাহ্ নাম দিয়া উহাকে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসী ভাষায় আমীন আহমাদ রাযী বিখ্যাত ভূগোল গ্রন্থ হাফ্ত ইক্'লীম রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে সাতটি দেশের ভৌগোলিক পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার উহাতে এলাকাওয়ারী ভাবে কবিদের জীবনীও বর্ণনা করিয়াছেন। দীর্ঘ ছয় বৎসরের সাধনায় ১০০২/৯৫৯৩ সনে উহার রচনাকার্য সমাপ্ত হয়। ১০১০/১৬০১ সনে কা'দী নূরুল্লাহ শুস্তারী কর্তৃক ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসী ভাষায় রচিত মাজালিসু'ল-মু'মিনীন গ্রন্থে শী'আ সম্প্রদায়ের 'উলামা' ও কবিদের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। লুত্ফ 'আলী বেগ আযার (জ. ১১২৩/১৭১১) কর্তৃক রচিত (রচনাকাল অধ্যাপক ব্রাউনের বর্ণনানুসারে ১১৯৫/১৭৮১) আতিশ কাদাহ্-ই আযার গ্রন্থটি কাযার রাজবংশীয় শাসনামলে রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে অতি বিখ্যাত একটি গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থে এলাকাওয়ারীভাবে কবিদের জীবনী বর্ণিত এবং তাঁহাদের রচনার উদ্ধৃতিসমূহ উপস্থাপিত হইয়াছে। মাজমা'উ'ল-ফুস'াহা গ্রন্থটি বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক হিদায়াত (মৃ. ১২৮৮/১৮৭১) কর্তৃক রচিত হয়। উহাতে সাত শতাধিক কবির জীবনী বর্ণিত এবং তাঁহাদের রচনার উদ্ধৃতিসমূহ উপস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ ইরানী সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ আলোচ্য গ্রন্থকার রিয়াদু'ল-'আরিফীন নামক সূফী কবিদের জীবনীমূলক একটি গ্রন্থও রচনা করেন। তৎকর্তৃক প্রণীত আনজুমান আরা নামক একটি অভিধান গ্রন্থও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। নামাহ্-ই দানিশওয়ারাঁ গ্রন্থটিকে ফারসী ভাষায় রচিত একটি বিশ্বকোষ বলা যায়। গ্রন্থটি নাসি'রু'দ-দীন শাহ-এর যুগের 'উলামা' শামসু'ল-'উলামা' 'আবদুর-রব্ব আবাদী, মির্যা আবু'ল-ফাদ্ল সাওয়াহা'ঈ, মির্যা হাসান খান তালিক'নী, শায়খ 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব কায্বীনী এবং মোল্লা আকা-ইঁহাদের সম্মিলিত সাধনা ও প্রচেষ্টার ফসল। তাযকিরা-ই তাকী'য়্যু'দ-দীন কাশানী গ্রন্থটি সাফাবী রাজবংশীয় যুগের কবিদের জীবনী বর্ণনায় রচিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। ভারতীয় উপমহাদেশের সম্রাট ও 'আলিমগণ গোড়া হইতেই ফার্সী ভাষায় ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ রচনার দিকে মনোযোগ দেন। উপমহাদেশে ফার্সী ভাষায় সর্বপ্রথম রচিত ইতিহাস গ্রন্থ হইতেছে চাচ নামাহ্। উক্ত গ্রন্থ প্রথম 'আরবী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। সম্রাট নাসি'রু'দ-দীন কুবাচাহ্-এর রাজত্বকালে ৬১৩/১২১৬ সনে মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী কূফী উহাকে ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। উহাতে চাচ-পুত্র সীলা'ইজ এবং মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। উহা পাঠে তৎকালীন সিন্ধুর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করা যায়। শামসু'ল-উলামা' 'উমার ইব্ন দাঊদ পোতা উহা সম্পাদনা করিয়াছেন। ফাখ্‌র-ই মুদাব্বির রচিত বিখ্যাত আদাবু'ল-হারবি ওয়া'শ-শুজা'আ গ্রন্থে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপরে আলোকপাত করা হইয়াছে। তারীখ-ই মুবারাক শাহী গ্রন্থও উক্ত গ্রন্থকার কর্তৃক রচিত হয়। দি'য়া'উ'দ-দীন বারানী কর্তৃক রচিত বিখ্যাত তারীখ-ই ফীরোয শাহী গ্রন্থে সম্রাট বলবান-এর রাজত্বকাল (৬৬৪/১২৬৫ সন হইতে আরম্ভ) হইতে সম্রাট ফীরোয তুগলাকের সিংহাসন আরোহণের ষষ্ঠ বৎসর (৭৫৭/১৩৫৬) পর্যন্ত বিস্তৃত যুগের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রতি আলোকপাত করা হয়। উক্ত নামেরই অন্য একটি ইতিহাস গ্রন্থ শাম্সিরাজ 'আফীফ কর্তৃক রচিত হয়। উহাতে ফীরোয শাহ তুগলোকের রাজত্বকাল (৭৫২/১৩৫১-৭৯০/১৩৮৮)-এর ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। উহার ভাষা সরল ও সাবলীল। মোগল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবুর (৯৩২/১৫২৬-৯৩৭/১৫৩০) তুযুক-ই বাবুরী নাম দিয়া তুর্কী ভাষায় একটি 'আত্মজীবনী' রচনা করেন। সম্রাট আকবারের রাজত্বকালে 'আবদুর-রাহ'ীম খান খানান উহাকে ওয়াকি'আত-ই বাবারী নাম দিয়া ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থকার উহাতে ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় এবং সামাজিক অবস্থাও বর্ণনা করিয়াছেন। উহার বর্ণনা-রীতি সহজ, সরল ও সাবলীল। কোথাও

কোথাও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় দৃশ্য বর্ণনাও পরিলক্ষিত হয়। হুমায়ূন নামাহ্ গ্রন্থে গুল্‌বাদান বেগম সহজ, সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সম্রাট বাবুর ও সম্রাট হুমায়ূনের জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে রাজদরবারের করণীয় আচরণ ও প্রথাসমূহ এবং তৎকালীন সামজিক অবস্থার প্রতিও আলোকপাত করা হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা সহজ ও সাবলীল হইলেও স্থানে স্থানে তুর্কী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মুনতাখাবু'ত-তাওয়ারীখ মোল্লা 'আবদু'ল-কাদির বাদায়ূনী (মৃ.১০২৪/১৬১৫) কর্তৃক রচিত একটি বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ। উহাতে গাযনাবী যুগ হইতে সম্রাট আকবারের সিংহাসনারোহণের পঞ্চদশতম বৎসর (৯৯৭/১৫৭১) পর্যন্ত বিস্তৃত যুগের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার উহাতে সম্রাট আকবার কর্তৃক প্রবর্তিত দীন-ই ইলাহীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। উহাতে তৎকালীন সূফী দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ এবং কবিগণ সম্পর্কিত আলোচনাও স্থান পাইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ সম্রাট আকবারের যুগের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ। উক্ত নামেরই একটি ইতিহাস গ্রন্থ মুহাম্মাদ-যূসুফ আতাকী কর্তৃক রচিত হয়। উহা একটি সামগ্রিক ইতিহাস গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থে নবীগণ হইতে খলীফা 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন মারওয়ান-এর জীবনী পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। 'আব্বাস খান শেরওয়ানী কর্তৃক রচিত তারীখ-ই শেরশাহী ৯৮৭/১৫৭৯ সনে লিখিত হয়। ১০০২/১৫৯৩ সনে খাজাহ্ নিজ়া'মু'দ-দীন বাখ্‌শী কর্তৃক রচিত ত'াবাক'াত-ই আক্‌বারী গ্রন্থে সম্রাট সুবুক্তগীন (৩৬৬/৯৭৬-৩৮৭/৯৯৭)-এর যুগ হইতে গ্রন্থকারের নিজের যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ সময়ের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে প্রসঙ্গক্রমে হায়দরবাদ দাক্ষিণাত্য, সিন্ধু এবং বৃহত্তর বাংলার সরকারসমূহের আলোচনাও আসিয়া গিয়াছে। তারীখ-ই আলফী গ্রন্থটি সম্রাট আকবারের যুগের একাধিক ইতিহাসবিদ সম্মিলিতভাবে রচনা করেন। উহাতে ইসলামের অভ্যুদয়কাল হইতে ১০০০/১৫৯১ সন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত সুদীর্ঘ যুগের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। এক হাযার বৎসরের ইতিহাস উহাতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই উহার নাম তারীখ-ই আলফী (এক হাযার বৎসরের ইতিহাস) রাখা হইয়াছে। গ্রন্থটি চার খণ্ডে সমাপ্ত। লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীতে উহা রক্ষিত আছে। আক্‌বার নামাহ্ গ্রন্থটি সম্রাট আকবারের নবরত্নের সদস্য সুবিখ্যাত 'আলিম আবু'ল-ফাদ্'ল (মৃ. ১০১১/১৬০১) কর্তৃক রচিত। এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, উহাকে তিন খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছে। প্রথম খণ্ডে সম্রাট আকবারের জন্মগ্রহণ হইতে তাঁহার সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত ঘটনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহার সিংহাসনারোহণের পর হইতে রাজকুমার দানিয়ালের জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলী এবং তৃতীয় রাজকুমার দানিয়ালের জন্মগ্রহণের পর হইতে আকবারের সিংহাসনারোহণের ৪৬ তম বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের ঘটনাবলী স্বয়ং আবু'ল-ফাদ্'ল কর্তৃক লিখিত হয়। পরবর্তীকালে মুহি'ব্ব 'আলী খান আকবরের রাজত্বকালের শেষ চারি বৎসরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থটির রচনাকার্য সমাপ্ত করেন। গ্রন্থটি সম্রাট আকবারের রাজত্বকালের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপুর্ণ মৌলিক রচনা। আ'ঈন-ই আকবারী উক্ত গ্রন্থেরাই একটি অংশ। উহাতে আকবারের রাজত্বকালে প্রচলিত ও প্রবর্তিত আইন-কানুন এবং এতদসম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইন্‌শা-ই আবুল-ফাদ্'ল গ্রন্থটি রাজকীয় ফরমানসমূহ, পত্রসমূহ এবকং অন্য বিবিধি রচনার সমষ্টি। উহার প্রথম অধ্যায়ে সম্রাট আকবারের পক্ষ হইতে বিভিন্ন শাসনকর্তা, উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট প্রেরিত পত্রাবলী, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আবুল-ফাদ্'ল কর্তৃক বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট লিখিত ব্যক্তিগত পত্রাবলী এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বিবিধ বিষয়ক রচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত রচনাসমূহের মধ্যে কতকগুলি সমালোচনামূলক রচনাও রহিয়াছে। গ্রন্থে লিপিবদ্ধ পত্রাদিসহ বিভিন্ন রচনার ভাষা জৌলুসময় এবং উহার বর্ণনাভঙ্গি পাণ্ডিত্যসুলভ। সম্রাট আকবারের দরবারের প্রধান কবি ফায়দী কর্তৃক লিখিত পত্রাবলীর সমষ্টি লাত'ীফা-ই ফায়্যাদী নামে পরিচিত। মা'আছি'র-ই রাহ'ীমী গ্রন্থটি মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-বাকী নিহাওয়ানদী (মৃ. ১০২২/১৬১৩) কর্তৃক রচিত হয়। উক্ত গ্রন্থে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে 'আবদু'র-রাহীম খান খানান, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ, ভারতীয় উপমহাদেশের সাবেক সুলতানগণ, তাঁহাদের সহিত সম্পৃক্ত উচ্চ পদস্থ রাজ কর্মচারী (আমীরগণ), কবিগণ এবং গ্রন্থকারগণ। শায়খ 'আবদু'ল-হাক্‌কা মুহাদ্দিছ ইব্ন সায়ফি'দ-দীন কর্তৃক রচিত তারীখ-ই হাক্কী গ্রন্থে দাস বংশের শাসনামল (৬০২/১২০৬-৬৮৬/১২৮৭) হইতে সম্রাট আকবারের রাজত্বকাল পর্যন্ত বিস্তৃত যুগের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। যুবদাতু'ত তাওয়ারীখ গ্রন্থটি শায়খ 'আবুদু'ল-হাক্কা মুহাদ্দিক-এর পুত্র নূরুল-হাক্'কাকর্তৃক প্রণীত হয়। উহাতে সম্রাট কুত্‌বু'দ-দীন আয়বেক এর রাজত্ব কাল হইতে সম্রাট আকবারের রাজত্বকাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত যুগের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। মুহ'াম্মাদ আমীন ইব্ন দাওলাত মুহ'াম্মাদ আল-হু'সায়নী কর্তৃক প্রণীত আন্‌ফা'উল-আখ্‌বার গ্রন্থে পয়গম্বরগণ ও ইরানের প্রাচীন সম্রাটগণ হইতে তায়মূর রাজবংশীয় সম্রাটগণের জীবনী ও ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে, মুহ'াম্মাদ ক'াসিম হিন্দুশাহ ফিরিশতাহ কর্তৃক প্রণীত তারীখ-ই ফিরিশতাহ বা গুলশান-ই ইব্‌রাহীমী গ্রন্থে ভারতীয় উপমহাদেশের সম্রাটদের ১০১৫/১৬০৬ সন পর্যন্ত সময়ের বৃহত্তর বাংলা, কাশ্মীর, হায়দরাবাদ দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, খান্দেশ, মালব ও সিন্ধুর ইতিহাস এবং ভৌগোলিক পরিচয়ের প্রতিও আলোকপাত করা হইয়াছে। গ্রন্থকার সম্রাট ইব্‌রাহীম 'আদিল শাহ-এর যুগের (৯৮৭/১৫৭৯-১০৩৫/১৬২৬) ইতিহাসবিদ ছিলেন।

তুযুক-ই জাহাঙ্গীরী গ্রন্থটি সম্রাট জাহাঙ্গীর (১০১৪/১৬০৫-১০৩৭/১৬২৭) কর্তৃক প্রণীত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। উহাতে তৎকালীন তাহযীব-তামাদ্দুন ও কৃষ্টি সংস্কৃতির বিশদ বর্ণনা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রাজকীয় কর্তব্যসমূহ এবং যুদ্ধভিযানসমূহের বিবরণও উহাতে স্থান পাইয়াছে। বর্ণনাভঙ্গি হৃদয়গ্রাহী, সাবলীল ও লৌকিকতাবর্জিত। মু'তমিদ খান কর্তৃক প্রণীত ইক'বাল নামাহ-ই জাহাঙ্গীরী গ্রন্থটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত। উহার প্রথম খণ্ডে সম্রাট বাবুর ও সম্রাট হুমায়ূনের রাজত্বকালের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডে সম্রাট আকবারের রাজত্বকালের ইতিহাস এবং তৃতীয় খণ্ডে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। বাদশাহ নামাহ গ্রন্থটি 'আবদু'ল-হ'ামীদ লাহোরী (মৃ ১০৬৪/১৬৫৩) কর্তক প্রণীত হয়। উহাতে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রথম বিশ বৎসরের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে রাজকুমারগণ, তৎকালীন উচ্চ পদস্থ রাজ-কর্মচারীগণ (আমীর), সাহিত্যিকগণ, কবিগণ, 'উলামা' এবং চিকিৎসাবিদগণ সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে। ওয়ারিছ' খান এবং আমীর কাযবীনী উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট রচনা করেন। মুহাম্মাদ স'ালিহ' কামবূহ কর্তৃক প্রণীত 'আমাল-ই স'ালিহ' গ্রন্থে সম্রাট শাহাজাহানের রাজত্বকালের বিস্তারিত ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। মুহাম্মাদ কাজি'ম কর্তৃক ১১০০/১৬৮৮ সনে প্রণীত 'আলামগীর নামাহ-এ আওরঙ্গযেবের রাজত্বকালের প্রথম দশ বৎসরের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। মুহাম্মাদ সাকী কর্তৃক ১১২২/১৭১০ সনে প্রণীত মা'আছি'র-ই 'আলামগীরী গ্রন্থটি সম্রাট আওরঙ্গযেব-এর রাজত্বকালের ইতিহাসের একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। সম্রাট আওরঙ্গযেব নিজেও একজন উচ্চস্তরের রচনা কুশলী ছিলেন। তৎকর্তৃক লিখিত পত্রাবলী রাক'া'ইম-ই কারা'ইম এবং রুকাআত-ই আলামগীরী নামে গ্রন্থাকারে সংকলিত হইয়াছে। ওয়াকাই-ই নি'মাত খান 'আলী গ্রন্থটি মির্যা মুহাম্মাদ শীরাযী নি'মাত খান কর্তৃক প্রণীত। উহার ভাষায় কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা

রহিয়াছে। মুহাম্মাদ হাশিম খাওয়াফী খান কর্তৃক প্রণীত মুনতাখাবুল-লুবাব গ্রন্থে সম্রাট বাবুরের রাজত্বকাল হইতে সম্রাট মুহাম্মাদ শাহ-এর সিংহাসনারোহণের চতুর্দশতম বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত যুগের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। মুহাম্মাদ কাসিম কর্তৃক প্রণীত 'ইব্রাত নামাহ গ্রন্থে আওরঙ্গযেব-এর ইনতিকালের বৎসর (১১১৮/১৭০৭) হইতে মুহাম্মাদ শাহ-এর রাজত্বকাল ১১৩১/১৭১৯১১৬১/১৭৪৮) পর্যন্ত বিস্তৃত যুগের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। মা'আছি'রুল-উমারা' গ্রন্থটি শাহ্ নাওয়ায খান কর্তৃক প্রণীত। উক্ত গ্রন্থটি সম্রাট আকবারের রাজত্বকাল হইতে ১১৯৪/১৭৮০ সন পর্যন্ত বিস্তৃত যুগের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জীবনীসম্বলিত একটি বৃহৎ কলেবর পুস্তক। খাজাহ 'অবদু'ল-কারীম খান কর্তৃক প্রণীত বায়ান-ই ওয়াকি' গ্রন্থে মুহাম্মাদ শাহ এবং আহমাদ শাহ এর যুগের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। গু'লাম হু'সায়ন ত'াবাত'াবা'ঈ কর্তৃক প্রণীত সিয়ারু'ল-মুতা'আখ্খিরীন গ্রন্থে ভারতীয় উপমহাদেশের তাহযীব- তামাদ্দুন ও সামাজিক জীবনের প্রতি আলোকপাত এবং মোগল সম্রাটদের রাজত্বকালের বিশদ ইতিহাস বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাতে উপমহাদেশে ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও প্রতিপত্তির ধারাও বর্ণিত হইয়াছে। গু'লাম 'আলী খান কর্তৃক প্রণীত শাহ 'আলামনামাহ গ্রন্থে সম্রাট শাহ 'আলমের রাজত্বকালের বিস্তারিত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। আজ'ফারী গুরগানী কর্তৃক প্রণীত ওয়াকি' 'আত-ই আজ'ফারী গ্রন্থে ১২০২/১৭৮৭ হইতে ১২২১/১৮০৬ সন পর্যন্ত বিস্তৃত যুগের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার উহাতে দুর্গে বসবাসকারীদের জীবনের উপরও আলোকপাত করিয়াছেন।

উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ ফারসী ভাষায় রচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় ইতিহাস বর্ণনায়ও বহু সংখ্যক ইতিহাসগ্রন্থ ফারসী ভাষায় রচিত হইয়াছে।

কাব্য ও সাহিত্য রচনার ইতিহাস বর্ণনায়ও ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসী ভাষায় বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। নিম্নে বর্ষওয়ারীভাবে উহাদের কতগুলি গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তরূপে আলোচনা করা হইতেছে ঃ

৬৬০/১২৬১ সনে সাদীদু'দ-দীন মুহাম্মাদ 'আওফী রচিত লুবাবু'ল-আলবাব গ্রন্থটি দুই খণ্ডে সমাপ্ত একটি জীবনী ও পর্যালোচনামূলক গ্রন্থ। উহার প্রথম খণ্ডে কাব্য শিল্প ও কাব্য রচনা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম পর্যায়ে 'উলামা' ও পণ্ডিতদের জীবনী এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে গাযনী ও লাহোরের কবিদের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। 'আবদু'ন-নাবী কর্তৃক রচিত মায়খানাহ্ গ্রন্থে নব্বইজন কবির বিস্তারিত জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। তেপ্পান্নটি সাকী নামাহ শ্রেণীর রচনাও উক্ত গ্রন্থের অন্তভুর্ক্ত রহিয়াছে। মাওলাবী মুহাম্মাদ শাফী' লাহোরী গ্রন্থটি সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মুহাম্মাদ আফ্দ'াল সার্খোশ (মৃ. ১০৫০/১৬৪০) কর্তৃক রচিত কালিমাতুশ-শু'আরা' গ্রন্থে সম্রাট জাহাঙ্গীর, সম্রাট শাহজাহান এবং সম্রাট আওরঙ্গযেবের যুগের কবিদের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। শেরখান লূধী কর্তৃক রচিত মির'আতু'ল-খিয়াল (রচনাকাল ১১০২/১৬৯০) গ্রন্থের ভূমিকায় কবিতা ও গদ্য রচনা সম্বন্ধে পর্যালোচনামূলক নিবন্ধ এবং মূল গ্রন্থে একশত বিশজন কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়াছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের বেশ কিছু সংখ্যক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন তাসাওউফপন্থী শায়খ ফারসী ভাষায় তাসাওউফ ও চরিত্র গঠন সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া উহার সম্পদ ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই শ্রেণীর সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইতেছে কাশফু'ল-মাহ'জূব। ইতঃপূর্বে উক্ত গ্রন্থের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। হযরত দাতা গাঞ্জ বাখশ 'আলী হু'জবীরী (মৃ. ৪৬৫/১০৭২) উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। উহাতে ধর্মীয়, চারিত্রিক ও তাসাওউফ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা করা হইয়াছে। উক্ত আলোচনায় একদিকে যেমন তাসাওউফপন্থী শিক্ষার্থীগণ তাসাওউফের পথের সন্ধান পান, অন্যদিকে তেমনই উহা দ্বারা দুনিয়াতে মানসভ্রমের সহিত অবস্থান করিবার পন্থারও সন্ধান পাওয়া যায়। ফাওয়া'ইদু'স-সালিকীন গ্রন্থটি হযরত বাখ্তিয়ার কাকী (র) (মৃ. ৬৩৩/১২৩৫) কর্তৃক প্রদত্ত বয়ানসমূহের সমষ্টি। উহা হযরত বাবা ফারীদ গাঞ্জশাকার (র) (মৃ. ৬৬৪/১২৬৫) কর্তৃক সংকলিত হয়। তাসাওউফপন্থী শিক্ষার্থীগণ উক্ত গ্রন্থ দ্বারা আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভে সহায়তা পাইয়া থাকেন। ফাওয়া'ইদু'ল-ফুওয়াদ গ্রন্থটি হযরত নিজামু'দ-দীন আওলিয়া (র) (৬৩৬/১২৩৮-৭২৫/১৩২৫)-এর বয়ান ও বক্তৃতাসমূহের সমষ্টি। উহা হাসান সিজযী কর্তৃক সংকলিত। আমীর খুসরূ (৬৫১/১২৫৩-৭২৫/১৩২৪) আফদালু'ল-ফাওয়া'ইদ নাম দিয়া হযরত নিজামুদ-দীন আওলিয়া (র)-র বাণীসমূহে আর একটি সংগ্রহ সংকলন করেন। তাসাওউফ-এর গুপ্ত কথা ও রহস্যাবলীর বর্ণনায় উক্ত সংকলনদ্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। হযরত শারাফু'দ-দীন য়াহয়া মুনায়রী নামে পরিচিত-মুকাশাফা (আধ্যাত্মিক বিষয়ের উন্মোচন) ও মুশাহাদাত (আধ্যাত্মিক বস্তুর অন্তর্দর্শন)-এর প্রতি সূফীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোকপাত করা হইয়াছে। মালফূজুল-মাখ্দূম গ্রন্থটি হযরত সায়্যিদ জালালুদ-দীন মাখদুম-ই জাহানিয়া জাহাঁগাশ্ত (র) (মৃ. ৭৮৫/১৩৮৩) কর্তৃক রচিত হয়। উহাতে তাসাওউফের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী এবং তাসাওউফপন্থী শিক্ষার্থীর পথ চলিবার বিভিন্ন পর্যায়ের পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে। মাকতূবাত-ই ইমাম রাব্বানী গ্রন্থটি হযরত শায়খ আহ্মাদ সারহিন্দী (র) (৯৭১/১৫৬৪-১০৩৪/১৬২৪) কর্তৃক লিখিত পত্রাবলীর সমষ্টি। উক্ত পত্রাবলী তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বিষয়কে, বিশেষত তাসাওউফের সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহকে 'উলামা, মুরীদ ও অন্যান্য লোকের নিকট তুলিয়া ধরিবার উদ্দেশ্যে রচনা করেন। সম্রাট আকবারের রাজত্বকালে ধর্মের মধ্যে যে সকল বিদ'আত প্রবেশ করিতে থাকে, তিনি তাঁহার উক্ত পত্রাবলীতে উহাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেন। পত্রে যদিও তিনি নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তিকে সম্বোধন করিতেন, কিন্তু বক্তব্য বিষয়ের স্রোত ও গতিধারা সকল মুসলমানের দিকে থাকিত। উক্ত গ্রন্থ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। আনওয়ার-ই মাজালিস গ্রন্থটি হযরত খাজা গীসু দারায (মৃ. ১০৫৮/১৬৪৮)-এর বাণীসমূহের সমষ্টি। উহাতে তাসাওউফের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর প্রতি আলোকপাত করা হইয়াছে। গুলাম 'আলী আযাদ কর্তৃক রচিত য়াদ-ই বায়দা (১১৪৫/১৭৩২-১১৪৮/১৭৩৫) গ্রন্থে ৫৩২ জন কবির জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। মাজ্মা'উ'ন-নাফা'ইস গ্রন্থটি ১১৬৩/১৭৪৯ সনে সিরাজু'দ-দীন 'আলী খান আরযু কর্তৃক রচিত। উহাতে কবিদের জীবনীসহ তাঁহাদের রচনার উদ্ধৃতিসমূহও উপস্থাপিত হইয়াছে। ১১৬৫/১৭৫১ সনেমুহাম্মাদ 'আলী হাযীন কর্তৃক রচিত তাযকিরাতু'ল-মু'আসিরীন গ্রন্থে ইসফাহানের কবিদের ও 'আলিমদের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। সার্ব-ই আযাদ গ্রন্থটি ১১৬৬/১৭৫২ সনে গুলাম 'আলী আযাদ (মৃ. ১২০০/১৭৮৫) কর্তৃক রচিত। উহাতে দুইটি পর্ব রহিয়াছে ঃ প্রথম পর্বে ফারসী ভাষার কবিদের জীবনী এবং দ্বিতীয় পর্বে উর্দু ভাষার কবিদের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। মীর 'আলী শেরকানি' কর্তৃক রচিত মাকালাতু'শ শু'আরা' (রচনাকাল ১১৬৯/১৭৫৫-১১৭৩/১৭৫৯) গ্রন্থে ৭১৯ জন কবির জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। ১১৭৫/১৭৬১ সনেস মোল্লা 'আবদু'ল হাকীম লাহোরী কর্তৃক রচিত মারদুম-ই দীদাহ্ গ্রন্থে গ্রন্থকারের ঘনিষ্ঠ পরিচিত কবিদের জবিনী বর্ণিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে সায়্যিদ 'আবদুল্লাহ উহা সম্পাদনা করেন এবং 'পাঞ্জাবী একাডেমী, লাহোর উহা প্রকাশ করে। গুলাম 'আলী আযাদ বিলগিরামী (মৃ.১২০১/১৭৮২) কর্তৃক রচিত খাযানা-ই 'আমিরা গ্রন্থে

এক শত পঁচিশজন কবির জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিসমূহের দিক দিয়া উহা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ১২১৮/১৮০৩ সনে শায়খ আহমাদ 'আলী হাশিমী সিনদীলাবী কর্তৃক রচিত মাখযানু'ল-গারা'ইব গ্রন্থে কবিদের জীবনী বিশদভাবে বর্ণিত ইহয়াছে। উহাতে কবিদের জীবনীসহ তাঁহাদের রচনার সংকলনসমূহও প্রদত্ত হইয়াছে। ১২১৮/১৮০৩ সনে মুহাম্মাদ কুদরাতুল্লাহ খান গোপামাবী কর্তৃক নাত'ইজু'ল-আফকার গ্রন্থটি রচিত হয়। ১২৯৮/১৮৮০ সনে নাওয়াব সিদ্দীক হাসান ভূপালী কর্তৃক রচিত শাম'-ই আঞ্জুমান গ্রন্থে বেশ কিছু সংখ্যক কবির জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহাদের নিকট হইতে জানিয়া লইয়া উহাতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ফারসী ভাষায় সূফী সাধকদেরও বহু জীবনী গ্রন্থ রচিত হইয়া উহার সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই শ্রেণীর কতগুলি বিখ্যাত গ্রন্থের পরিচয় প্রদত্ত হইল। শায়খ জামালী দিহলাবী (মৃ. ৯৪২/১৫৩৫) কর্তৃক রচিত সিয়ারু'ল-আরিফীন গ্রন্থে হযরত খাজাহ্ মু'ঈনু'দ-দীন চিশতী (র) হইতে মাওলানা শাহ ইসমা'ঈল শহীদ (র) পর্যন্ত চৌদ্দজন সূফী সাধকের জবিনী বর্ণিত হইয়াছে। শায়খ 'আবদু'ল-হাক্ক মুহাদ্দিছ দিহ্লাবী (মৃ. ১০৫২/১৬৪২) কর্তৃক রচিত আখাবারু'ল-আখয়ার গ্রন্থে ভারতীয় উপমহাদেশের আওলিয়া-ই কিরামের বিশদ জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। ১০৩৩/১৬২৩ সনে 'আলী আসগার চিশতী কর্তৃক রচিত জাওয়াহির ফারীদী গ্রন্থে চিশতী সূফী সাধকদের বিস্তারিত জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। ১০৪৩-১০৪৪/১৬৩৩-১'৬৩৪ সনে 'আলী আকবার হুসায়নী কর্তৃক রচিত মাজমা'উ'ল-আওলিয়া' গ্রন্থে পনের শত সূফী সাধকের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। ১০৪৯/১৬৩৯ সনে সম্রাট শাহজাহানের পুত্র দারা শুকোহ সাফীনাতু'ল- আওলিয়া' গ্রন্থ রচনা করেন। উহাতে সকল তারীকার সূফী সাধকদের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। সাকীনাতু'ল-আওলিয়া গ্রন্থটিও তিনি রচনা করেন (রচনাকাল ১০৫২/১৬৪২)। উহাতে হযরত মিয়াঁ মীর (র) ও মোল্লা শাহ বাদাখ্শী (র) এবং তাঁহাদের খলীফাগণের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। সম্রাট শাহজাহানের কন্যা জাহাঁনআরা বেগম, ১০৫০-১৬৪০ সনে মুনিসু'ল-আরওয়াহ নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থকার উহাতে হযরত খাজা মু'ঈনু'দ-দীন চিশতী (র) এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং তাঁহার জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন। ১০৬৫/১৬৫৪ সনে 'আবদু'র-রাহ্মান চিশতী (মৃ. ১০৯৫/১৬৮৩) কর্তৃক রচিত মির'আতুল-আস্রার গ্রন্থে ইসলামের অভ্যুদয়ের যুগ হইতে হুসামু'দ-দীন মানিকপুরীর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ কালের সূফী সাধকদের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। ১১৮১/১৭৬৭ সনে মীর 'আলী শেরকানি' (মৃ. ১২০৩/১৭৮৮) কর্তৃক রচিত তুহফাতুল-কিরাম গ্রন্থে সিন্ধু প্রদেশের সূফী সাধক ও 'আলিমগণের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। খৃ. সপ্তদশ শতকে মুহাম্মাদ গাওছী রচিত গুলযার-ই আব্রার গ্রন্থটি সূফী সাধকদের জীবনীমূলক একটি বৃহৎ কলেবর গ্রন্থ। ১১৬৭/১৭৫২ সনে গুলাম 'আলী আযাদ বিলগিরামী (মৃ. ১২০১/১৭৮৬) কর্তৃক রচিত মা'আছিরু'ল-কিরামও আলোচ্য শ্রেণীভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ১২০৩/১৭৮৮ সনে ওয়াজীহু'দ-দীন কর্তৃক রচিত বিহার-ই যাখ্খার গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশধরগণ, সাহাবা-ই কিরাম, খুলাফা-ই রাশিদীন এবং হযরত হাসান (রা) ও হযরত হুসায়ন (রা)-এর জীবনী বর্ণিত হইবার পর নাসীরু'দ-দীন চেরাগ দিহলাবী (র), 'আলী সাবির কালীরী (র), বড় পীর 'আবদু'ল-কাদির জীলানী (র) এবং কয়েকজন কালান্দারের (দুনিয়া-বিরাগী দরবেশ) জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। খাযীনাতু'ল-আসফিয়া' (রচনাকাল ১২৮১/১৮৬৪) মুফতী গুলাম সারওয়ার লাহোরী কর্তৃক রচিত একটি বিখ্যাত জীবনী গ্রন্থ। উহাতে চিশতিয়া, কাদিরিয়া নাক্শ্বান্দিয়া, সুহারাওয়াদিয়া এবং অন্যান্য কয়েকটি তারীকার শায়খদের জীবনীসহ তাঁহাদের রূহানী প্রভাব ও ক্রিয়াকলাপের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

যে কোনও ভাষায় উন্নতি ও বিকাশে অভিধান প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। ফারসী ভাষা অভিধানের উন্নয়নেও ভারতীয় ভাষাবিদ পণ্ডিতগণ বিরাট অবদান রাখিয়াছেন। নিম্নে ভারতে প্রণীত কতগুলি ফারসী অভিধানের পরিচয় প্রদত্ত হইল ঃ (১) ফারহাঙ্গ-ই ফাখ্র-ই কাওয়াস, সম্রাট 'আলা'উ'দ-দীন খালজীর রাজত্বকালে প্রণীত। (২) মু'আয়্যিদু'ল-ফুদালা' ১৫১৯ খৃ. শায়খ মুহাম্মাদ ইব্ন লাদ দিহ্লাবী প্রণয়ন করেন। (৩) মাদারু'ল-আফাদিল, ১০০২/১৫৯৩ সনে শায়খ আল্লাহ্ দাদ ফায়দী প্রণয়ন করেন। (৪) ফারহাঙ্গ-ই জাহাঙ্গীরী, ১০১৭/১৬০৮ সনে মীর জামালু'দ-দীন হাসান আনজু প্রণয়ন করেন। বুরহান-ই কাতি' ১০৬৩/১৬৫২ সনে মুহাম্মাদ হুসায়ন তাবরীযী প্রণয়ন করেন। উক্ত অভিধান গ্রন্থ কয়েক বৎসর পূর্বে ইরানে অত্যন্ত গুরুত্ব ও সুব্যবস্থা সহকারে প্রকাশিত হইয়াছে। (৫) কাতি' বুরহান, কবি আসাদুল্লাহ খান গালিব বুরহান-ই কাতি-র উত্তরে উহা প্রণনয় করেন। উহাতে বুরহান-ই কাতি' গ্রন্থের কোনও কোনও ভ্রান্তির প্রতি নির্দেশ করা হইয়াছে। (৬) ফারহাঙ্গ-ই রাশীদী, ১০৬০/১৬৫৩ সনে মোল্লা রাশীদ তাতাবী প্রণয়ন করেন। (৭) সিরাজু'ল-লুগাত; (৮) চিরাগ-ই হিদায়াত; (৯) নাওয়াদিরু'ল-আলফাজ; সিরাজুদ-দীন 'আলী খান আরযু (মৃ. ১১৭০/১৭৫৬) উক্ত অভিধান গ্রন্থত্রয় প্রণয়ন করেন। (১০) বাহার-ই 'আজাম, টেকচান্দ বাহার কর্তৃক প্রণীত। (১১) সিয়ালকোটী মাল-এর মুস্তালাহাত-ই ওয়ারিস্তাহ। (১২) মির'আতু'ল-ইসতিলাহ; আনন্দরাম মুখলিস উহার সংকলক। (১৩) গিয়াছু'ল-লুগাত, মুহাম্মাদ গিয়াছু'দ-দীন রামপুরীর সংকলন। (১৪) ফারহাঙ্গ-ই আনন্দরাজ, মুহাম্মাদ বাদশাহ শাদ্দ উহার প্রণেতা (শেষোক্ত অভিধান গ্রন্থটি ১৩৩৫ সৌর বৎসরে মুহাম্মাদ দাবীর সিয়াকী তেহরান হইতে প্রকাশ করেন)। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক অনেক ফারসী অভিধান গ্রন্থ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রণীত হয়।

গত এক শত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরে ইরানে চিন্তা ক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, উহার নজীর ইরানের ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। কাযার বংশীয় সম্রাটদের শাসনামলে য়ুরোপীয় দেশসমূহের সহিত ইরানের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। সম্রাটগণ এবং শাসন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ মাঝে মাঝে য়ুরোপ ভ্রমণ করিতেন। ইহার ফলে ব্যবসায়ীদের ও পর্যটকদের য়ুরোপে ভ্রমণের সুযোগ ঘটে। এইরূপে য়ুরোপের সাহিত্য ইরানে প্রবেশ করে। ফলে দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে এবং লেখক শ্রেণীর মন-মানসিকতা প্রভাবিত হয়। উনবিংশ শতাব্দী ফারসী সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনার সূচনার যুগ। ১৮১৬-১৮১৭ খৃ. তাবরীযে মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাই ইরানের সর্বপ্রথম মুদ্রণালয়। উক্ত মুদ্রণালয়ের প্রতিষ্ঠা ইরানে সংবাদপত্র প্রকাশের কার্যকে সম্ভব করিয়া দিলেও প্রথম দিকে প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহ শুধু সরকারী মহলের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ১৮৫১ খৃ. পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কলেবরের কোনও সংবাদপত্র ইরানে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। সম্রাট নাসিরু'দ-দীন শাহ-এর শাসনামলে (১২৬৪/১৮৪৭-১৩১৩/ ১৮৯৫) 'দারু'ল-ফুনূন' নামক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় জ্ঞান-সাধক মহলে এই আগ্রহ সৃষ্টি হয় যে, ইরানের জনগণকে য়ুরোপের বর্তমান জ্ঞান-চর্চা ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে মির্যা 'আবদু'র-রাহমান নাজ্জার যাদাহ্-র ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি 'তালিব উফ' নাম দিয়া জনপ্রিয়

গ্রন্থাবলীর সিরিজ প্রকাশ করেন। উহাদের মধ্য হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হইতেছে 'মাসালিকু'ল-মুহসিনীন' ও 'কিতাব-ই আহমাদ'। বিংশ শতাব্দীতে ইরানে শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনে অত্যন্ত জোরদার হইয়া উঠে। উক্ত আন্দোলন কবি, সাহিত্যিক, বক্তা এবং সাংবাদিকগণ অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই যুগটি ছিল ইরানবাসীদের জন্য অত্যন্ত পরিবর্তনশীলতা ও কর্মতৎপরতার যুগ। 'আলী আকবার দেহ্খুদা নামক জনৈক সাংবাদিক সংবাদ কৌতুক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি সংবাদপত্রের চারান্দ-পারান্দ নাম দিয়া তীব্র ভাষায় কৌতুক প্রবন্ধসমূহ লিখেন। উহাতে বিপ্লবপন্থী পত্রিকা 'সুর-ই ইস্রাফীল' আলোকিত ও উদ্ভাসিত হইয়া অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তী কালের লেখকগণও উক্ত রচনা-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৌতুক ও ব্যঙ্গ রচনা আরম্ভ হইবার পর উহা সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ে। হাজ্জী যায়নু'ল-'আবিদীন মারাগী (মৃ. ১৯১০ খৃ.) সিয়াহাত নামাহ্-ই ইব্রাহীম বেগ নাম দিয়া প্রথম কৌতুক-উপন্যাস রচনা করেন। তিন খণ্ডে সমাপ্ত উক্ত উপন্যাসের কাহিনীর কাঠামো তারবিয়া'ই খুদাওয়ান্দী নামক গ্রন্থের অনুকরণে গঠিত হয়। উপন্যাসখানা বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা লাভ করে। চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্যের কারণে উক্ত গ্রন্থের মূল্য এখনও পূর্ববৎ কায়েম রহিয়াছে। গ্রন্থের ভাষায় অতিরঞ্জন দোষ দৃশ্যমান হইয়া থাকিলেও উহা পাঠে অতীত ইরানের ত্রুটি-বিচ্যুতি পাঠকের মানস-চক্ষুতে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। ১৩২৪/১৯০৬ সনে সম্রাট মুজাফফারু'দ-দীন শাহ (১৩১৩/১৮৯৫-১৩২৪/১৯০৬) মত প্রকাশের স্বাধীনতাকামিগণের নাগরিক অধিকার আইন প্রবর্তিত করিবার দাবি মানিয়া লইয়া উহা প্রবর্তন করেন। উহার ফলে ইরানীদের জীবনের সকল বিভাগে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। মানুষের চিন্তাধারা ও ধ্যানধারণা পরিবর্তিত হইয়া যায়, জীবনে নূতন মর্যাদা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়, দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ বিকাশ লাভ করে, জাতীয় স্বার্থচিন্তা ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তার স্থান অধিকার করে এবং দেশের কবিগণ দেশের সম্রাটদের গুণকীর্তনের পেশা পরিত্যাগ করত ইরানী সমাজ ও উহার সমস্যাবলীকে তাহাদের কাব্য চর্চার বিষয়বস্তুতে পরিণত করেন। এইরূপে উক্ত ঘটনা রাজনীতি-দর্শন এবং সাহিত্য ও কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে অনুকূল বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়।

বহুবিদ বিষয়ে বিস্তৃত আধুনিক ইরানী সাহিত্য সম্বন্ধে এস্থলে ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনা করা অত্যন্ত কঠিন। এই হেতু এখানে আমরা ইরানের মাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট আধুনিক সাহিত্যিক ও তাঁহাদের সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব।

ইরানে আধুনিক সাহিত্য রচনায় সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করেন আদীব পেশাওয়ারী (১২৬০/১৮৪৪-১৩৪৯/১৯৩০)। তাঁহার কবিতা রচনা রীতি প্রাচীন হইলেও চিন্তাধারা আধুনিক। তাঁহার কবিতাবলী ইংরেজ-বিদ্বেষ এবং বিশ্বযুদ্ধের প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ। তিনি অনাগত কালের কবিদের জন্য কবিতার নব নব বিষয়বস্তু উদ্ভাবনের পথ রচনা করিয়া যান। কবি আদীবু'ল মামালিক আমীরী (১২৭৭/১৮৬০-১৩৩৬/১৯১৭) কর্তৃক রচিত 'দীওয়ান' কাব্যের অধিকাংশ কবিতা দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ মূলক। বিখ্যাত কবি বাহার (জ. ১৩০৪/১৮৮৬)-এর অধিকাংশ কাসীদা রাজনৈতিক প্রকৃতির। ইরানী জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টিতে এবং তাহাদেরকে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে তাঁহার রচিত কাসীদাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। তিনি তাঁহার গাযাল, কাসীদা ও মাছ্নাবীসমূহে মর্মস্পর্শী ভাষায় ইরানের জাতীয় বিপদ ও বিপর্যয়সমূহের চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। কবি ঈরাজ মীর্যা (জ. ১২৯১/১৮৭৪)-র যুগে ইরানে কাব্যের রচনা-রীতি ও বিষয়বস্তু লইয়া নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছিল। কবি নিজেও উহা দ্বারা প্রভাবিত হন এবং 'জাতীয় কাব্য রচনা ও দেশাত্মবোধ' বিষয়ে কবিতাবলী তাঁহার কাব্যের একটি বিশেষ বিষয়বস্তু। পারবীন ই'তিসামী একজন সূক্ষ্মদর্শী মহিলা কবি ছিলেন। চরিত্র গঠন ও দুনিয়ার অস্থায়িত্ব তাঁহার কবিতার বিশেষ বিষয়বস্তু। কবি 'আরিফ কাযবীনী (জ. ১৩০০/১৮৮২) ১৯০৬ খৃ. হইতে ১৯২২ খৃ. পর্যন্ত বিস্তৃত অশান্তিপূর্ণ যুগ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তিনি তাঁহার বেদনাবিধুর কবিতাবলীতে ইরানের জাতীয় বিপদ ও বিপর্যয়ের চিত্র তুলিয়া ধরেন। সঙ্গীত রচনা করিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। কবি ফাররুখী য়াযদী (জ. ১৩০৬/১৮৮৮) প্রাচীন রচনারীতির অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও নিজ জন্মভূমি ইরানের স্বাধীনতার পক্ষে নির্ভীক কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই শ্রেণীর কবিতায় প্রবল বিদ্রোহাত্মক অনুভূতির সাক্ষাত পাওয়া যায়। কবি ইশ্কী (জ. ১৩১২/১৮৯৩) বিপ্লববাদী কবি ছিলেন। যে গণতন্ত্রে জনগণ পূর্ণ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বাদ না পায়, তিনি সেই গণতন্ত্রকে পসন্দ করিতেন না। কবিতা রচনারীতির ক্ষেত্রে তিনি নূতন নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়াছেন। তাঁহার প্রথম গীতিনাট্য 'রাস্তাখীয', যাহা ইরানে মঞ্চস্থ হইয়াছিল, উক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষাসমূহেরই অংশ। উক্ত গীতিনাট্যের কাহিনীর পটভূমি হইতেছে প্রাচীন ইরানের ঐতিহাসিক গৌরব ও মর্যাদা। কবি 'ইশ্কী আরও কতগুলি নাট্যকাব্য রচনা করিয়াছেন। উহাদের মধ্য হইতে يك ال آيد نفر پير مود دهقان এই প্রথম চরণবিশিষ্ট নাট্য কাব্যটি রচনা করিয়া তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। কবি রাশীদ য়াসমী (জ. ১৮৯৭ খৃ.)-র লঘু ও হাল্কা ছন্দের গীতি কবিতাবলী, য়ূরোপীয় কাব্য রচনারীতির দ্বারা তাঁহার প্রভাবিত হইবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। কবি সাদিক সার্মাদ (জ. ১৩৩৫/১৯১৬) কবিতা রচনায় যদিও প্রাচীন রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তথাপি রচনারীতি ও বিষয়বস্তু নির্বাচনে তিনি কোথাও কোথাও নূতন পথও অবলম্বন করেন। জাতীয় উন্নয়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং ব্যক্তি মর্যাদা, তাঁহার রচনার বিশেষ বিষয়বস্তু। তাৎক্ষণিকভাবে কবিতা রচনায় তাঁহার বিশেষ প্রতিভা ছিল। কবি শাহ্রিয়ার-এর কবিতায় অত্যধিক শোক ও মর্মবেদনার প্রকাশ দেখা যায়। মানব প্রেম এবং মানব জাতির কল্যাণকে তিনি তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কবি নীমা য়ূশীজ (জ. ১৩৩৩৫/১৯১৬) তাঁহার কাব্যে কতগুলি নূতন রচনারীতির উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'মাহ্বাস' কবিতায় জনৈক ইরানী কৃষকের দুঃখময় জীবনের হৃদয়স্পর্শী চিত্র উপস্থাপিত হইয়াছে। কবি নিজাম ওয়াফা কতগুলি আবেগানুভূতিমূলক মাছ্নাবী শ্রেণীর কবিতা রচনা করিয়াছেন।

আলোচ্য যুগে ইরান কাযার রাজবংশের সাম্রাজ্যবাদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে; কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশ তখনও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশে আবদ্ধ। পরাধীনতার সেই যুগের ভারতীয় উপমহাদেশে 'আল্লামা ডঃ মুহাম্মাদ ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮ খৃ., দ্র. 'ইকবাল) স্বীয় প্রাণসঞ্চারিণী কবিতার মাধ্যমে স্বদেশবাসীকে স্বাধীনতা, আত্মোপলব্ধি, সংগ্রাম ও সাধনা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী শুনাইতেছিলেন। তাঁহার কবি প্রতিভার খ্যাতি ভারতীয় উপমহাদেশের সীমানা ছাড়াইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে। আসরার-ই খুদী, রুমূয-ই বে-খুদী, পায়াম-ই মাশরিক, যাবুর-ই আজাম, জাবীদ নামাহ্, পাস-চে বায়াদ কার্দ এবং আরমুগান-ই হিজায (উহার অধিকাংশ ফার্সী ভাষায় রচিত) গ্রন্থগুলি কবি ইকবালের অমর রচনা। 'আল্লামা শিবলী নু'মানী (১৮৫৭-১৯১৪ খৃ.) একজন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক, কবি ও সমালোচনা বিশারদ ছিলেন। তিনি ফারসী কাব্য বিষয়ে

শি'রু'ল-'আজাম নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থ ফারসী ভাষায়ও অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত ফার্সী কবিতাবলী কুল্লিয়াত-ই শিব্‌লী নামে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত কবিতাবলীতে তাঁহার কল্পনারাজি ও হৃদয়ানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য যুগের প্রাচীন রচনারীতি অনুসারী বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে ছিলেন কবি গুলাম কাদির গিরামী (মৃ. ১৯২৭ খৃ.) ও কবি 'ইজামী (মৃ. ১৯৫৬ খৃ.)। কবি গিরামীর 'দীওয়ান' এবং 'রুবা'ইয়াত' প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্তমান যুগে ইরানী কাব্যসাধনা শুধু পরীক্ষামূলকভাবে নূতন পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তবে ইরানী গদ্য সাহিত্যে বেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন রীতির বিপরীত রীতিতে নাটক রচনায় বেশ সাফল্য অর্জিত হইয়াছে। মীর্যা জাফার কারাজাহ্‌দাগী আযারবায়জানের বিখ্যাত লেখক ফাত্‌হ 'আলী আখুন্দ-যাদাহ্ কর্তৃক রচিত বিখ্যাত নাটকসমূহের ফারসী অনুবাদ করিয়াছেন। অবশ্যই উক্ত নাটকসমূহ, বিখ্যাত রাজনীতিবিদ মির্যা মীলকাম খান কর্তৃক রচিত স্বাভাবিক ও লৌকিকতা বর্জিত নাটকসমূহের জন্য আদর্শস্বরূপ ছিল। পাশ্চত্য নাট্যকার Molier কর্তৃক রচিত নাটকসমূহও ফার্সী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। উহাদের মধ্য হইতে "Le Medecin malgre Lui Le Misanthsrope" এবং "Tartufe"-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিয়মিত রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত না থাকায় প্রথমদিকে ইরানে নাট্যশিল্পের উন্নতি কিছু কালের জন্য বিঘ্নিত হইলেও সাম্প্রতিক কয়েক যুগ পূর্বে এই বিঘ্ন দূরীভূত হওয়ায় তথায় অনেক নাটক মঞ্চস্থ হইয়াছে। সায়্যিদ 'আবদু'র-রাহীম খালখালী রচিত দাসাতান-ই খুনীন (রচনাকাল ১৯২৬ খৃ.), সা'ঈদ নাফীসী রচিত আখিরীন য়াদগার-ই নাদির শাহ (রচনাকাল ১৯২৭ খৃ.) এবং 'আলী জালাল কাফী রচিত 'শাহ 'আব্বাস-ই কাবীর; 'দারয়ূশ-ই কাবীর ও 'ইনকিলাব-ই মাশরূতিয়্যাত-ই ঈরান' মঞ্চস্থ ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে বিখ্যাত। উক্ত নাটকগুলি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। উপন্যাস রচনা 'সিয়াহাত নামাহ-ই ইব্‌রাহীম বেগ' উপন্যাস গ্রন্থ রচনা দ্বারা সূচিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর কয়েক বৎসরের মধ্যে শায়খ মূসা হামাদানী কর্তৃক (১৩৩৭/১৯১৯ সনে) 'ইশ্‌ক ওয়া সালতানাত নামক একটি উপন্যাস গ্রন্থ রচিত হয়। উহাতে মহামতি সাইরাসের কীর্তির প্রতিও আলোকপাত করা হয়। এই যুগের আগা মির্যা হাসান খান বাদী শাহনামাহ কাব্যের অন্যতম কাহিনী ঝবীওয়া মানীবা অবলম্বনে উক্ত নামের একখানা উপন্যাস রচনা করেন। ১৩৩৯/১৯২১ সনে সানআতী যাদাহ কিরমানী 'ইনতিকাম খাহান-ই মাযদাক নামক একখানা উপন্যাস রচনা করেন। উক্ত উপন্যাসে তিনি মাযদাকের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি 'মানী'র জীবনী অবলম্বনেও ১৯২৭ খৃ. একখানা উপন্যাস রচনা করেন। ১৯০৯ খৃ. মুহাম্মাদ বাকির মির্যা খুসরাও রচিত 'শাম্‌স ওয়া তুগরা' নামক উপন্যাসে মোঙ্গলীয় শাসনের ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে। ১৯৭১ খৃ. কামালী রচিত 'লাযীকা' উপন্যাসের বিষয়বস্তু হইতেছে দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ। 'আব্বাস খালীলী রচিত 'রোযগার-ই সিয়াহ; 'ইনতিকাম' ও 'ইনসান' উপন্যাসত্রয়ও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। ১৩৪৭/১৯২৮ সনে মুহাম্মাদ হিজাযী (জ. ১৯০০ খৃ.) রচিত 'হুমা' উপন্যাসে নারীর অধিকার সমর্থিত হইয়াছে। মাসঊদ দিহাতী রচিত 'দর তালাশ-ই মা'আশ' উপন্যাসে প্রচলিত সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করা হইয়াছে। মুশ্‌ফিক কাজিম রচিত তিহরান-ই মুখাওয়াফ উপন্যাসে অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভাষায় ইরানের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে। জাওয়াদ ফাদিল রচিত উপন্যাসসমূহও এই বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্বের অধিকারী। মুহাম্মাদ 'আলী জামাল যাদাহ ১৩৩৯/১৯২০ সনে 'য়াকে বুদ য়াকে নাবুদ' শিরোনামে তাঁহার রচিত উপন্যাসসমূহের সমষ্টি বার্লিন হইতে প্রকাশ করেন। তিনিই ইরানের বাহিরে নিজ উপন্যাস সমগ্রের প্রথম প্রকাশক ইরানী গ্রন্থকার। এই উপন্যাসসমূহের গ্রন্থকার সমাজের নৈতিক ও চারিত্রিক সংশোধনের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ ও কৌতুকের পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। সাদিক হিদায়াত (জ. ১৯০৩ খৃ.) তাঁহার উপন্যাসসমূহে সমাজের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীদ্বয়ের লোকদের জীবন-চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। গ্রন্থকার উহাতে মানব-আচরণের মধ্যে উন্নত আদর্শ ও মূল্যবোধের সাক্ষাত পাইয়াছেন। বুযুর্গ 'আলাবী (জ. ১৯০৭ খৃ.) একজন স্বাধীনতাপ্রিয় ঔপন্যাসিক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। হুসায়ন কুলী মুসতা'আনের উপন্যাসসমূহের একাধিক সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে সমাজের আরামপ্রিয় বিত্তবান শ্রেণীর ক্ষতিকর আচরণসমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

ইরানের নবীন উপন্যাস রচয়িতাদের মধ্যে ই'তিমাদ যাদাহ, সাদিক চুবাক এবং জালাল আল-ই আহমাদের উপন্যাসসমূহ নিপুণ চরিত্র চিত্রণের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সমালোচনা সাহিত্য রচয়িতাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কাযবীনী, মুহাম্মাদ তাকী বাহার, রাশীদ য়াসমী, সা'ঈদ নাফীসী, 'আব্বাস ইকবাল, পুর দাঊদ, রিদা যাদাহ শাফাক, জালাল হুমা'ঈ ও যাবীহুল্লাহ সাফা বিশেষ গৌরবের অধিকারী। তাঁহারা তাঁহাদের বিপুল সংখ্যক সমালোচনা গ্রন্থ দ্বারা ফারসী সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারকে সমধিক সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** : (১) 'আওফী, লুবাবু'ল-আলবাব, ব্রাউন কর্তৃক প্রকাশিত, লাইডেন, ১খ, ১৯০৬ খৃ, ২খ., ১৯০৩ খৃ.; (২) শাম্‌স কায়স রাযী, আল-মু'জাম ফী মা'আয়ীরি আশ'আরিল-আজাম, লাইডেন ১৯০৯ খৃ.; (৪) রিদা কুলী খান, মাজমা'উল ফুসাহা, তেহরান ১২৯৫ হি.; (৫) ঐ লেখক, রিয়াদু'ল-আরিফীন, তেরান ১৩০৫ হি.; (৬) হাসান পেরীনা, ঈরান, তেহরান ১৩১১ সৌর সন; (৭) জালালু'দ-দীন হুমাঈ, তারীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, তেহরান ১৩৪০ হি.; (৮) রিদা যাদাহ শাফাক; তারীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান; (৯) যাবীহুল্লাহ সাফা, তারীখ-ই আদাবিয়্যাত দর ঈরান, তেহরান (১৯৫৪ খৃ. হইতে); (১০) বাহার, সুবক শিনাসী, তেহরান ১৩৩৭ সৌর সন; (১১) বাদী'উয-যামান ফুরূযানফার, সাখুন ওয়া সাখুনওয়ারাঁ, তেহরান ১৩১২ সৌর সন; (১২) ঐ লেখক, তারীখ-ই আদাবিয়্যাত-ই ঈরান, তেহরান ১৩১৭ সৌর সন; (১৩) মুহাম্মাদ ইসহাক, সাখুনওয়ারান-ই ঈরান, দিল্লী ১৩৫১ হি.; (১৪) সা'ঈদ নাফীসী, নাছর-ই ফারসী-ই মুআসরি, তেহরান ১৩৩০ সৌর সন; (১৫) 'আবদু'ল হামীদ খালখালী, তাযকিরা-ই শু'আরা-ই মু'আসির-ই ঈরান, তেহরান ১৩৩৩ হি.; (১৬) সায়্যিদ মুহাম্মাদ বাকির বারকাঈ, সাখুনওয়ারান-ই নামী-ই মু'আসির, তেহরান; (১৭) শিবলী নুমানী, শি'রু'ল-'আজাম, পাঁচ খণ্ড, লাহোর ১৯২৪ খৃ.; (১৮) ক্রিস্টেন সেন, তারীখ-ই ঈরান বা'আহদ-ই সাসানিয়াঁ, অনু. ডঃ মু. ইকবাল, দিল্লী ১৯৪১ খৃ.; (১৯) Rieu, বৃটিশ মিউজিয়ামে ফারসী পাণ্ডুলিপির তালিকা, ৪ খণ্ডে, ১৮৭৯-১৮৯৫ খৃ.; (২০) E.G. Browne, A Literary History of Persia, চার খণ্ড, প্রথম খণ্ড ১৯০২ খৃ. লণ্ডনে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯০৬ খৃ. লণ্ডনে, তৃতীয় খণ্ড ১৯২০ খৃ. ক্যাম্ব্রিজে এবং চতুর্থ খণ্ড ১৯২৪ খৃ. ক্যাম্ব্রিজে প্রকাশিত; (২১) ঐ লেখক, Press and Poetry of Modern Persia, ক্যাম্ব্রিজ ১৯১৪ খৃ.; (২২) ঐ লেখক, Persian Revolution; (২৩) জ্যাকসন, Early Persian Poetry, নিউইয়র্ক ১৯২০ খৃ.; (২৪) R. Levy, Persian Literature, an Introduction, লণ্ডন ১৯২৩ খৃ.; (২৫)C. A. Storey, Persian Literature, a bibligraphical survey, ১৯২৭ খৃ.।

মির্যা মাক্‌বুল বেগ বাদাখশানী (দা. মা. ই.)/ মু. মাজহারুল হক

সংযোজন

**ইরান (ایران)** ঃ ১৯৩৫ খৃ. পর্যন্ত ইরান পারস্য নামে পরিচিত ছিল। ১৯৭৯ খৃ. ক্ষমতাসীন রাজতন্ত্রের উৎখাত ও শাহকে নির্বাসন গমনে বাধ্য করার পর দেশটি একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসাবে পরিগণিত হয়। রক্ষণশীল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ দেশে একটি ইসলামপন্থী সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। দেশের চূড়ান্ত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব একজন বিজ্ঞ ধর্মীয় 'আলিম ব্যক্তিত্বের উপর ন্যস্ত করা হয়। ৪ নভেম্বর, ১৯৭৯ খৃ. হইতে একদল ইরানী ছাত্র তেহরানে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস দখল করিয়া ২০ জানুয়ারী, ১৯৮১ খৃ. পর্যন্ত উহা অবরুদ্ধ করিয়া রাখার সময় হইতে ইরান-মার্কিন সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ১৯৮০ খৃ. - ১৯৮৮ খৃ. ইরান ইরাকের সহিত এক অমীমাংসিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধটি পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিলে উহার এক পর্যায়ে ১৯৮৭-১৯৮৮ খৃ. মার্কিন নৌ-বাহিনী ও ইরানী সামরিক বাহিনী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। লেবানন ও বিশ্বের অন্যান্য স্থানে ইরানের কর্মকাণ্ডের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে সন্ত্রাসের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষক হিসাব অভিহিত করে। অভিযুক্ত ভূমিকায় ইরানের অব্যাহত সংশ্লিষ্টতার প্রেক্ষিতে দেশটি সম্ভাব্য মার্কিন অর্থনৈতিক অবরোধ ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ জনিত চাপের মধ্যে রহিয়াছে (CIA— The world Factbook — Iran, 2006, p. 2-15)।

১৯৯০ খৃ. দশকের শেষদিকে একজন সংস্কারবাদী প্রেসিডেন্ট ও মজলিস নির্বাচিত হওয়ার পর গণ-অসন্তোষের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করিলে রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দের চাপের মুখে তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সংস্কারপন্থীদিগকে অবদমনের মাধ্যমে তাহাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনী সুবিধা অর্জন করা হয়। ২০০৪ খৃ. অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচন এবং আগস্ট ২০০৫ খৃ. একজন শক্তিশালী রক্ষণবাদী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে ইরানের সরকার ব্যবস্থায় রক্ষণশীল ক্ষমতার অধিকতর দৃঢ়করণ প্রক্রিয়াকে সুসম্পন্ন করা হয়।

**ভূগোল** ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান (জামহূরী-য়ে ইসলামী-য়ে ঈরান)-এর আয়তন ৬,৩৬০০০ বর্গমাইল (১৬,৪৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার )। ইহার উত্তরে রাশিয়া ও কাস্পিয়ান সাগর, পূর্বে পাকিস্থান ও আফগানিস্তান, দক্ষিণে পারস্য উপসাগর ও উমান উপসাগর, এবং পশ্চিমে তুরস্ক ও ইরাক অবস্থিত। পারস্য উপসাগরে অবস্থিত ডজনখানেক দ্বীপও ইরান নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ইরানের মোট আয়তনের মধ্যে স্থলভাগ ১৬,৩৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং জলভাগ ১২,০০০ বর্গ কিলোমিটার (Encyclopedia Britannica, Iran নিবন্ধ, শিকাগো ২০০৬ খৃ.)।

**আন্তর্জাতিক সীমানা দৈর্ঘ্য** ঃ ইরানের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ইহার সীমানার শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশি সমুদ্র উপকূল বেষ্টিত। ইরানের মোট স্থল সীমানা ৫,৪৪০ কিলোমিটার; ইহার সমুদ্র সীমানার দৈর্ঘ্য ২,৪৪০ কিলোমিটার। উল্লেখ্য, কাস্পিয়ান সাগরের সহিত ইরানের সীমান্ত রেখার দৈর্ঘ্য ৭৪০ কিলোমিটার।

**সামুদ্রিক পানিসীমা** ঃ স্থলভাগ সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় ইরানের কার্যকর পানিসীমা ১২ নটিকেল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।

**আবহাওয়া** ঃ ইরানের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক অথবা অর্ধশুষ্ক। সর্বোচ্চ গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ৫৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালীন তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে ১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কাস্পিয়ান সমুদ্র উপকূলে বরাবর উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়া পরিদৃষ্ট হয়।

**ভূ-প্রকৃতি** ঃ ইরানের ভূ-প্রকৃতি অসমান এবং পর্বতসঙ্কুল। ইহার অধিকাংশ স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১,৫০০ ফুট (৪৬০ মিটার) উচ্চতায় অবস্থিত। ইহার এক-ষষ্ঠাংশ ৬,৫০০ ফুটের অধিক উচ্চতায় অবস্থিত। সেখানে মরুভূমি, মরূদ্যান এবং সমুদ্রোপকূলে বিচ্ছিন্ন সমতলভূমিও পরিদৃষ্ট হয়। দেশটির সর্বনিম্ন বিন্দু কাস্পিয়ান সাগর ২৮ মিটার, এবং সর্বোচ্চ বিন্দু কুহ-ই দামাভান্দ ৫,৬৭১ মিটার।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে কৌশলগত অবস্থানে অবস্থিত ইরান মধ্যপ্রাচ্যের প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসাবে বিবেচিত হয়। ইহার প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের মধ্যে পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, ক্রোমিয়াম, তামা, আকরিক লৌহ, সীসা, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা ও সালফার উল্লেখযোগ্য।

**ভূমি ব্যবহার** ঃ ভূমি ব্যবহারের দিক হইতে ইরানের আবাদযোগ্য ভূমি ৯.৭৮%, স্থায়ী শস্য ১.২৯%, এবং অন্যান্য ৮৮.৯৩% হিসাবে বিবেচিত হয় (২০০৫ খৃ.)। ১৯৯৮ খৃ. ইরানে ৭৫,৬২০ বর্গকিলোমিটার জমিতে চাষাবাদ করা হয়।

**প্রাকৃতিক দুর্যোগ** ঃ ইরানের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে সময়ে সময়ে খরা, বন্যা, ধূলিঝড়, বালুঝড় ও ভূমিকম্প উল্লেখযোগ্য।

**পরিবেশ** ঃ দেশটির পরিবেশগত সাম্প্রতিক সমস্যাসমূহের মধ্যে আছে ঃ বিশেষত শহর এলাকাগুলিতে যানবাহনের চলাচল, তেল শোধনাগার, শিল্প স্থাপনা হইতে বায়ু-দূষণ, বনভূমি উজাড়, মাত্রাতিরিক্ত গো-চারণ, মরুকরণ, পারস্য উপসাগরে তৈল-দূষণ, খরার কারণে আর্দ্রতাযুক্ত ভূমির ক্রমশ বিলুপ্তি, মৃত্তিকার অবনতি (লবণাক্ততা), পর্যাপ্ত সুপেয় পানির অভাব, শিল্প-বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাষণ হইতে পানি-দূষণ এবং নগরায়ন। ইরান আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের এক অন্যতম অংশীদার। এতদ্ব্যতীত পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ, সামুদ্রিক আইন এবং সামুদ্রিক জীব সংরক্ষণ বিষয়ে প্রণীত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলিতে ইরান স্বাক্ষর করিয়াছে, কিন্তু সেই দেশের পার্লামেন্ট কর্তৃক এখনও সেইগুলি অনুমোদিত হয় নাই (দ্র. CIA, The world Factbook — Iran 2006)।

**ইরানের জনগোষ্ঠী** ঃ ইরানের বর্তমান জনসংখ্যা ৬,৮৬,৮৮,৪৩৩ (২০০৬ খৃ.)। বয়স কাঠামো অনুসারে ০-১৪ বৎসর বয়সী লোকসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২৬.১%। মোট জনসংখ্যার ৬৯% জনের বয়স ১৫-৬৪ বৎসরের মধ্যে ৬৫ বৎসর এবং তদুর্ধ বয়সী লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪.৯% ভাগ (২০০৬ খৃ.)। ইরানের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার ১.১%। দেশটিতে বর্তমান জন্মহার ১৭টি জন্ম প্রতি ১,০০০ জনে; মৃত্যুহার ৫.৫৫টি মৃত্যু প্রতি ১,০০০ জনে।

ইরানের জাতিগত গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে রহিয়াছে ঃ পার্সিয়ান ৫১%, আযিরী ২৪%, গিলাকী ও মাযানদারানী ৮%, কুর্দী ৭%, আরব ৩%, লুব ২%, বালুচ ২%, তুর্কমেন ২% এবং অন্যান্য ১% (পূ. গ্র.)।

ইরানের জনসংখ্যা ৮৯% জন শী'আ; ৯% জন সুন্নী মুসলমান; জোরোয়াস্টার ধর্মী, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, এবং বাহাই ২% জন।

ইরানের ভাষাগুলির মধ্যে আছে ফারসী ৫৮%, তুর্কীচ ২৬%, কুর্দী ৯%, লুরী ২%, বালুচী ১%, আরবী ১%, তুর্কী ১%, ও অন্যান্য ২% ভাগ। তাহাদের স্বাক্ষরতার হার ৭৯.৪% (২০০৩ খৃ., পূ. গ্র.)।

**ইরানের সরকার ব্যবস্থা** ঃ ইরান ৩০টি উস্তান বা প্রদেশে বিভক্ত। নিম্নে প্রদেশগুলির নাম উল্লেখ করা হইল। বন্ধনীর ভিতরের নামগুলি

সংশ্লিষ্ট প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানীর নাম নির্দেশ করে। লোকসংখ্যাসহ ইরানের প্রদেশসমূহ (প্রাদেশিক রাজধানীসহ) : পূর্ব আযারবায়জান ৩৩,৭৮,২৪২ (তাবারীয); পশ্চিম আযারবায়যান ২৭,৭৪,৮০৪ (উরুমিয়েহ); আরদাবিল ১২,০৪,৪১০ (আরদাবিল); ইসপাহান ৪৩,১৬,৭৬৭ (ইসপাহান); ইলাম ৫,৫০,৯৭১ (ইলাম); বুশেহর ৭,৯৬,৬৩৯ (বুশেহর); তেহরান ১,১৬,৮৯,৩০১ (তেহরান, ইহা ইরানের রাজধানীও বটে); চাহারমহল ও বখতিয়ারী ৭,৯৪,০৭৭ (শাহর-এ কো); খুযিস্তান ৪৫,০৬,৮১৬ (আহওয়ায); যান্যান ৯,৩৬,৯৮৫ (যান্যান); সিমনান ৫,৬৩,৯৫৯ (সিমনান); সিস্তান ও বেলুচিস্তান ২০,৮৬,১৭০ (যাহেদান); ফার্স ৪১,৩৫,২৫১ (শীরায); কাযবীন ১০,৬৬,৩১৭ (কাযবীন); কোম ৯,৭১,২৮০ (কোম); কুর্দিস্তান ১৪,৯২,০০৭ (সানান্দাজ); কিরমান ২২,১৫,৩৭৬ (কিরমান); কিরমানশাহ ১৯,৬২,১৭৬ (কিরমানশাহ); কোহগিলুয়েহ ও বয়্যের আহমাদ ৬,২৭,৫১৭ (ইয়াজুজ); গোলিস্তান ১৫,৫৫,০৫৮ (গুরপান); গিলান ২৩,১০,০৩৩ (রাশ্ত); লুরিস্তান ১৬,৭১,৭০৬ (খুর্রমাবাদ); মাযিন্দারান ২৭,৪২,৮৮৫ (সারি); মারকাযী ১৩,০০,৭৭৮ (আরাক); হুরমুযগান ১২,৩৫,৮১৬ (বান্দার আব্বাস); হামাদান ১৭,১৮,৬২৭ (হামাদান); ইয়াযদ ৮,৪১,৩৭০ (ইয়াযদ); খোরাসান-ই যানুবি, খোরাসান-ই রাযালী এবং খোরাসান-ই শিমালী ৬০,৯৪,৮৮৮। (নিউজ লেটার, ঢাকা, অক্টোবর ২০০২ খৃ., The Europe world Yearbook, London 2006)।

১ এপ্রিল, ১৯৭৯ খৃ. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয় বিধায় দিনটিকে ইরানের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে বিবেচনা করা হয়। প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে ১ এপ্রিল সরকারী ছুটি থাকে। ইরানে প্রতিপালিত অন্যান্য ছুটিগুলির মধ্যে আছে : বিপ্লব দিবস, ১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৯ খৃ.), নওরোজ (নববর্ষ), ২১ মার্চ; সাংবিধানিক রাজতন্ত্র দিবস, ৫ আগস্ট (১৯২৫ খৃ.); এবং হিজরী বর্ষমতে চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন ইসলামী পর্ব দিবস।

২-৩ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ খৃ. ইরানের সংবিধান প্রবর্তিত হয়। ১৯৮৯ খৃ. রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সম্প্রসারণ ও প্রধান মন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত করণার্থে সংবিধানটিকে সংশোধন করা হয়। ইরানের সংবিধানে দেশে ইসলামী সরকার এবং আইন ও বিচার ব্যবস্থার সংস্থানকে সংবিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। দেশের ১৫ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত সকল নাগরিকের বিশ্বজনীন ভোটাধিকার রহিয়াছে।

৪ জুন, ১৯৮৯ খৃ. হইতে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হিসাবে সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ 'আলী হুসায়নী খামেনেয়ী কর্মরত আছেন। সরকার প্রধান হিসাবে আছেন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদি নেজাদ (৩ আগস্ট ২০০৫ খৃ. হইতে); প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট পারভেয দাঊদী (১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ খৃ. হইতে)।

আইন সভার অনুমোদনক্রমে প্রেসিডেন্ট তাহার মন্ত্রীসভা গঠন করেন। অধিকতর সংবেদনশীল মন্ত্রীবর্গের নিয়োগে সর্বোচ্চ নেতা তাঁহার সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

ইরানের নির্বাচনী বিধিমতে বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী ইসলামী বিপ্লবের একজন আজীবন নেতার নিয়োগদান করিয়া থাকেন। জনপ্রিয় ভোটের মাধ্যমে চার বৎসর মেয়াদের জন্য একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৭-২৪ জুন, ২০০৫ খৃ. সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী নির্বাচন ২০০৯ খৃ. অনুষ্ঠিত হইবে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধান অনুযায়ী মসলিসে শূরায়ে ইসলামী (পার্লামেন্ট)-এর প্রত্যেক মেয়াদের নির্বাচন পরবর্তী মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই অনুষ্ঠিত হইতে হইবে। যাহাতে দেশ কখনো পার্লামেন্টবিহীন না থাকে। মজলিসের আসন সংখ্যা অপরিবর্তনশীল নয়। ইতিপূর্বে ইহার আসন সংখ্যা ২৭০ ছিল, তবে ১৯৮৯ খৃ. সংবিধান সংশোধনীর সময় এই বিধান রাখা হয় যে, প্রতি দশ বৎসর অন্তর অন্তর মানবিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক প্রতি বিষয়ের আলোকে আসন সংখ্যা সর্বোচ্চ ২০টি পর্যন্ত বাড়ানো যাইবে। উহার আলোকে বর্তমানে মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর আসনসংখ্যা ২৯০। ইহার মধ্যে ২৮৫টি আসন মুসলিম জনগণের জন্য এবং বাকী ৫টি আসন বিভিন্ন ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত। সংখ্যালঘুদের মধ্যে যরথুষ্ট্রীদের জন্য একটি, কালিমীদের (ইয়াহূদী) জন্য একটি, আশুরী ও কালদানী খৃষ্টানদের জন্য একটি, উত্তরের আর্মেনীয় খৃষ্টানদের জন্য একটি আসন বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সংবিধানের অভিভাবক পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১২ জন। তাহারা ছয় বৎসর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন। তাহাদের মধ্যে অর্ধেক অর্থাৎ ছয়জন থাকেন মুজতাহিদ (ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ)। তাহারা দেশের সর্বোচ্চ নেতা রাহবারের পক্ষ হইতে মনোনীত হন। বাকী ছয়জন থাকেন আইনের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী আইনজ্ঞ। তাহাদের তালিকা সর্বোচ্চ বিচার পরিষদের পক্ষ হইতে মজলিসে প্রেরণ করা হয়। মজলিস তাহাদিগকে অভিভাবক পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করে। এই পরিষদের সদস্যদের পরবর্তী মেয়াদসমূহে পুনঃনিযুক্তি বা পুনঃনির্বাচনে আইনগত কোন বাধা নাই।

মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর সপ্তম মেয়াদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় গত ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ খৃ.। এই নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ। ইহাদের মধ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ ভোটার জীবনে এই প্রথমবার মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর নির্বাচনে ভোট প্রদানের সুযোগ পান। নির্বাচনে মোট ৭,৯০০ প্রার্থীর মধ্যে ৬০০০ জন যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন বিবেচিত হওয়ায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন (নিউজ লেটার, ঢাকা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৪ খৃ., পৃ. ৩৯-৪১)।

উক্ত নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, রক্ষণশীল ইসলামপন্থীরা ১৯০, সংস্কারবাদীরা ৫০টি, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৪৩টি, ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ৫টি এবং অন্যান্যরা ২টি আসন লাভ করেন। পার্লামেন্টের পরবর্তী নির্বাচন ফেব্রুয়ারি ২০০৮ খৃ. অনুষ্ঠিত হইবে।

অপরপক্ষে ১৭-২৪ জুন, ২০০৫ খৃ. অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মাহমুদ আহমাদি নেযাদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ইরানের বিচার ব্যবস্থার মধ্যে আছে একটি বিশেষ ধর্মীয় আদালত, একটি বিপ্লবী আদালত এবং একটি বিশেষ প্রশাসনিক আদালত। এইগুলির উপরে সর্বোচ্চ আদালত হিসাবে আছে সুপ্রীম কোর্ট।

আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক দলের ধারণা ইরানে অপেক্ষাকৃত নূতন। অধিকাংশ রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দ অদ্যাবধি রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারকারী গোষ্ঠীর মাধ্যমে কাজ করিতে অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। ২০০০ খৃ. মজলিস (পার্লামেন্ট)-এর নির্বাচনকালে ২য় খোর্দাদ ফ্রন্ট নামে একটি ঢিলেঢালা সংস্কারপন্থী জোট উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। তাহাদের জোটের মধ্যে কতকগুলি রাজনৈতিক দল স্বল্প মাত্রায় আনুষ্ঠানিক প্রভাব বিস্তারকারী গোষ্ঠী এবং সংস্থাও ছিল। শেষোক্ত জোটের শরীক

দলগুলির মধ্যে ছিল ঃ ইসলামিক ইরান পার্টিসিপেশন ফ্রন্ট (IIPF), বিনির্মাণ দলের নির্বাহীবৃন্দ (কারগোযারান), সংহতি পার্টি, ইসলামী শ্রমিক দল, মারদাম সালারি, ইসলামী বিপ্লবী সংস্থার মুজাহিদীন (MIRO) এবং জঙ্গী ধর্মীয় গোষ্ঠী (রূহানিয়ূন)। এই জোট ২০০৪ খৃ. সপ্তম মজলিস নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। একটি নূতন দৃশ্যতর রক্ষণশীল গোষ্ঠী, ইসলামী ইরানের প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ (Builders of Islamic Iran), ফেব্রুয়ারি ২০০৪ খৃ. সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করিয়া পার্লামেন্টের নেতৃত্বস্থানীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়।

রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারকারী গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে ইরানের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সিংহভাগ সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সমর্থক দলগুলির মধ্যে আছে ঃ আনসারে হিযবুল্লাহ; ইমামের ধারাবাহিকতাবাদী মুসলিম ছাত্রদল, তেহরানস্থ প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ধর্মীয় এসোসিয়েশন (রূহানিয়াত), ইসলামী যৌথ পার্টি এবং ইসলামী প্রকৌশলী সমিতি। সংস্কারপন্থী সক্রিয় ছাত্রদলগুলির মধ্যে ঐক্য-সংহতি সংস্থার নাম উল্লেখযোগ্য। ইরানের বিরোধী দলগুলির মধ্যে ইরানের মুক্তি আন্দোলন, জাতীয় ফ্রন্ট, মারযে পোর গোহার এবং বিভিন্ন উপজাতীয় ও রাজতন্ত্রবাদী সংগঠনসমূহের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করা যায়। সরকার কর্তৃক প্রায় সম্পূর্ণভাবে অবদমিত সশস্ত্র রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের মধ্যে মুজাহিদীনে খালক সংগঠন (MFK), জনগণের ফেদাঈন, ইরানী কুর্দিস্তানের গণতান্ত্রিক পার্টি এবং কোমালার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা হয়।

ইরান যে সমস্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সদস্যপদ অর্জন করিয়াছে তাহার মধ্য আছে ঃ বিশ্বশান্তি স্থাপনের ধর্মীয় সংস্থা (CP); ইংলিস চেম্বার অর্কেস্ট্রা (ECO); জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO); আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি, উন্নয়ন ও সহযোগিতার জন্য প্রতিষ্ঠিত ১৫ জাতি, ২৪ জাতি ও ৭৭ জাতিসমূহের সংস্থা (G-15, G-24, G-77); আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAFA); পুনর্নির্মাণ ও উন্নয়নকল্পে স্থাপিত আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD), বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO); আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC); আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA); আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংক (IDB); কৃষি উন্নয়নের আন্তর্জাতিক তহবিল (IFAD); রেডক্রস সোসাইটি সমূহের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন (IFRCS); আন্তর্জাতিক অর্থ কর্পোরেশন (IFC); আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO); আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF); আন্তর্জাতিক পুলিশ (Interpol); আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (IOC); আন্তর্জাতিক ডাক চলাচল ইউনিয়ন (IPU); আন্তর্জাতিক স্টান্ডার্স ইউনিয়ন (ISU); আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (ITU); জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM); ইসলামী দেশসমূহের সংস্থা (OIC); তেল রপ্তানীকারক দেশসমূহের সংস্থা (opec); জাতিসংঘ (UN); জাতিসংঘের ব্যবস্থায় ও উন্নয়ন কনফারেন্স (UNCTAD); জাতিসংঘের শিক্ষা,বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO); জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক দূত বা দূতাবাস (UNHCR); জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO); বিশ্ব ডাক সমিতি (UPU) বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO); বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) এবং ওয়ারসা চুক্তিসংস্থা (WTO) (CIA, The world Factbook - Iran 2006, p. 8-15)।

নিম্নবর্ণিত দেশগুলির সহিত ইরানের কূটনৈতিক সম্পর্ক রহিয়াছে ঃ আফগানিস্তান, আলবানিয়া, আলজেরিয়া, এঙ্গোলা, আর্জেন্টিনা, আর্মেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আস্ট্রিয়া, আজারবায়জান, বাইরাইন, বাংলাদেশ, বেলারুস, বেলজিয়াম, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ব্রাজিল, ব্রুনাই, বুলগেরিয়া, বুরকিনা ফাস্টো, চাঁদ, কানাডা, চিলি, গণচীন, কলম্বিয়া, গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো, আইভরি কোস্ট, ক্রোয়েশিয়া, কিউবা, সাইপ্রাস, চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, ইথিওপিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, গাম্বিয়া, জর্জিয়া, জার্মানী, ঘানা, গ্রীস, গিনি, হলি সিটি (ভ্যাটিকান), হাঙ্গেরী, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, আয়ারল্যান্ড, ইতালী, জাপান, জর্দান, কাজাখস্তান, কেনিয়া, গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, কুয়েত, কিরগিজস্তান, লাওস, লেবানন, সিরিয়া, মেসিডোনিয়া (প্রাক্তন যুগোস্লভ প্রজাতন্ত্র), মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, মঙ্গোলিয়া, মরক্কো, মোজাম্বিক, মায়ানমার, নামিবিয়া, নেপাল, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, নাইজার, নাইজেরিয়া, নরওয়ে, ওমান, পাকিস্তান, পেরু, ফিলিপাইনস, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, কাতার, রোমানিয়া, রাশিয়া, সৌদি 'আরব, সেনেগাল, সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রো, সিয়েরা লিওন, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, সোমালিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, শ্রীলংকা, সুদান, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, সিরিয়া, তাজিকিস্তান, তাঞ্জানিয়া, থাইল্যান্ড, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, তুর্কমেনিস্তান, ইউক্রেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য, উরুগুয়ে, উজবেকিস্তান, ভেনিজুয়েলা, ভিয়েতনাম ও ইয়েমেন।

উল্লেখ্য যে, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইরানের কূটনৈতিক সম্পর্ক নাই। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিতি পাকিস্তান দূতাবাসের মাধ্যমে ইরান সেখানে তাহার স্বার্থ রক্ষা করিয়া থাকে। অনুরূপভাবে যুক্তরাষ্ট্র সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে ইরানে তাহার স্বার্থ রক্ষা করিয়া থাকে।

**ইরানের পতাকা ঃ** ইরানের পতাকায় তিনটি সমান অনুভূমিক ব্যান্ড রহিয়াছে, উপরেরটি সবুজ, মাঝেরটি সাদা এবং নীচেরটি লাল। সাদা ব্যান্ডটির মাঝখানে লাল কালিতে আছে ইরানের জাতীয় প্রতীক (শহীদের প্রতীক, টিউলিপ ফুলের আকৃতিতে বিশেষ ভঙ্গিমায় লিখিত শব্দ আল্লাহ)। সবুজ ব্যান্ডের নীচের প্রান্তে এবং লাল ব্যান্ডের উপর প্রান্তে সাদা আরবী হরফে আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান) কথাটি এগারবার করিয়া মুদ্রিত আছে (পৃ. গ্র.)।

**ইরানের অর্থনৈতিক পর্যালোচনা ঃ** ইরানের অর্থনীতি তৈল-নির্ভর। অদক্ষ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ফলে মুদ্রাস্ফীতি লক্ষ্য করা যায়। পরিসংখ্যান সর্বস্ব নীতির ফলে অর্থনীতির স্বাভাবিক চিত্র প্রতিফলিত হইতে পারে নাই। ব্যক্তিখাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ওয়ার্কশপ, কৃষি এবং সেবাখাতে কর্মকাণ্ড অত্যন্ত ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আহমাদিনেযাদ প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রাফসানজানির বাজার সংস্কার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয় নাই। কারণ ইরানের অধিকাংশ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত। তাই মুক্ত বাজার অর্থনীতির সুফল অর্জন করা সম্ভব হয় নাই। সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে তৈলের উচ্চমূল্যের কারণে ইরানের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হইলেও উহাতে বেকারত্বের উচ্চহার বা মুদ্রাস্ফীতি জনিত অর্থনৈতিক দুরবস্থার লাঘব ঘটে নাই। গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিকাশ সাধনে অর্থনীতির যে উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয়িত হয়, তাহা পশ্চিমা বিশ্বের উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

**জিডিপি ঃ** ক্রয় ক্ষমতার তুল্যতা বিচারে দেশটির জিডিপি ৫৫২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৫ খৃ.)। দাপ্তরিক বিনিময় হারে জিডিপি

১৭৮.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৫ খৃ.)। প্রকৃত প্রবৃদ্ধির বিচারে জিডিপি ৪.৮% (২০০৫ খৃ.)। ইরানী জনগণের মাথাপিছু আয় ৮,১০০ মার্কিন ডলার। খাতভিত্তিক জিডিপি-র সমাহার ঃ কৃষি ১১.৮%, শিল্প ৪৩.৩% এবং সেবা ৪৪.৯% (২০০৫ খৃ.)। একই সময়ে দেশটির সর্বমোট নির্ধারিত বিনিয়োগ ছিল জিডিপি-র ৩০.৫%। আর জনগণের ঋণ ছিল জিডিপি-র ২৭.৫% (২০০৫ খৃ.)।

**শ্রমশক্তি ও মুদ্রাস্ফীতি** ঃ ২০০৫ খৃ. ইরানের শ্রমশক্তি ছিল ২৩.৬৮ মিলিয়ন। দেশটিতে দক্ষ শ্রমশক্তির ঘাটতি আছে। ২০০৪ খৃ. ইরানে বেকারত্বের হার ছিল ১১.২%। ২০০২ খৃ. দেশটিতে ৪০% লোক দারিদ্র্যসীমার নিম্নে বসবাস করিতেছিল। ২০০৫ খৃ. ইরানের মুদ্রাস্ফীতি ছিল ১৬%।

**বাজেট, কৃষি ও শিল্প** ঃ ২০০৫ খৃ. ইরানের বাজেটে রাজস্ব ছিল ৪৮.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অপরপক্ষে বাজেটে ব্যয় ছিল ৬০.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; মূলধন ব্যয় ৭.৬ বিলিয়ন ডলারসহ। কৃষি খাতে ইরানের উৎপাদিত সামগ্রীর মধ্যে গম, ধান, অন্যান্য দানা শস্য, বীট, ফলমূল, বাদাম, তুলা, ডেইরী পণ্যাদি, পশম ও কেভিয়ার উল্লেখযোগ্য। ইরানের শিল্প দ্রব্যের মধ্যে পেট্রোলিয়াম, পেট্রো রসায়ন সামগ্রী, বস্ত্র, সিমেন্ট ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ (বিশেষত চিনি পরিশোধন ও বনস্পতি তৈলোৎপাদন), ধাতব কারুকাজ এবং সামরিক সরঞ্জাম উল্লেখযোগ্য। ২০০৫ খৃ. ইরানের শিল্প উৎপাদন প্রবৃত্তির হার ছিল তৈল ব্যতীত ৩%।

**বিদ্যুৎ ও জ্বালানী** ঃ ২০০৩ খৃ. ইরানের বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৪২.৩ বিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা। ঐ বৎসর বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ১৩২.১ বিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা। ২০০৩ খৃ. ইরান ৮৪০ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ রপ্তানী এবং ৬০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ আমদানী করে (পূ. গ্র., পৃ. ১০-১৫)। ২০০৫ খৃ. ইরান প্রতিদিন ৩.৯৭৯ মিলিয়ন ব্যারেল তৈল উৎপাদন করে। ২০০৩ খৃ. ইরান প্রতিদিন ১.৪২৫ মিলিয়ন ব্যারেল তৈল ব্যবহার করে। ২০০৪ খৃ. দেশটি প্রতিদিন ২.৫ মিলিয়ন ব্যারেল তৈল রপ্তানী করে। ২০০৫ খৃ. ইরানে তৈলের প্রমাণিত মজুদ ছিল ১৩৩.৩ বিলিয়ন ব্যারেল।

২০০৩ খৃ. ইরান ৭৯ বিলিয়ন কিউবিক মিটার প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন এবং ব্যবহার করে। একই বৎসর ইরান ৪.৯২ বিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস আমদানী ও ৩.৪ বিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস রপ্তানী করে। ২০০৫ খৃ. ইরানে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রমাণিত মজুদ ২৬.৬২ ট্রিলিয়ন কিউবিক মিটার বলিয়া অনুমিত হয় (পূ. গ্র., পৃ. ১০-১৫)।

**ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা** ঃ ২০০৫ খৃ. ইরানের চলতি হিসাবে ব্যালান্স ছিল ৮.১৭৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই বৎসর দেশটি ৫৫.৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানী করে। দেশটির রপ্তানীজাত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে আছে পেট্রোলিয়াম ৮০%, রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিকেল পণ্য, ফলমূল, বাদাম বা দানাশস্য, কার্পেট ইত্যাদি। ২০০৫ খৃ. ইরান ৪২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য আমদানী করে। ইহার আমদানী দ্রব্যাদির মধ্যে আছে শিল্পদ্রব্যের কাঁচামাল, মূলধন দ্রব্যাদি, খাদ্য ও ভোজ্যসামগ্রী, প্রযুক্তি সেবা, সামরিক সরঞ্জাম ইত্যাদি।

ইরানের রপ্তানী অংশীদারদের মধ্যে আছে ঃ জাপান ১৮.৪%, গণচীন ৯.৭%, ইতালী ৬%, দক্ষিণ আফ্রিকা ৫.৮%, দক্ষিণ কোরিয়া ৫.৪%, তাইওয়ান ৪.৬%, তুরস্ক ৪.৪% এবং নেদারল্যান্ডস ৪% (২০০৪ খৃ.)। অপরপক্ষে ইরানের আমদানী অংশীদারদের মধ্যে আছে ঃ জার্মানী ১২.৮%, ফ্রান্স ৮.৩%, ইতালী ৭.৭%, গণচীন ৭.২%, সংযুক্ত 'আরব আমীরাত ৭.২%, দক্ষিণ কোরিয়া ৬.১% এবং রাশিয়া ৫.৪% (২০০৪ খৃ.)।

২০০৫ খৃ. ইরানে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণের রিজার্ভ ছিল ৪০.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই বৎসর দেশটির বহিঃস্থ ঋণের পরিমাণ ছিল ১৬.৯৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০২ খৃ. দেশটি দাতাগোষ্ঠীর নিকট হইতে ৪০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থনৈতিক সহযোগিতা লাভ করে। ইরানের মুদ্রার নাম ইরানী রিয়াল (IRR)। মার্কিন ডলার প্রতি ইরানী রিয়ালের বিনিময় হার ৮,৯৬৪ (২০০৫ খৃ.), ৮,৬১৪ (২০০৪ খৃ.), ৮,১৯৩.৯ (২০০৩ খৃ.), ৬,৯০৭ (২০০২ খৃ.), ১,৭৫৩.৬ (২০০১ খৃ.)। ইরানের অর্থ বৎসর ২১ মার্চ হইতে ২০ মার্চ পর্যন্ত বিস্তৃত (পূ. গ্র., পৃ. ১১, ১২ ও ১৫)।

**ইরানের পরিবহন ব্যবস্থা** ঃ ২০০৫ খৃ. ইরানে ৩১০টি বিমান বন্দর ছিল। তন্মধ্যে পাকা রানওয়ে বিশিষ্ট ১২৯টি এবং কাঁচা রানওয়েবিশিষ্ট ১৮১টি বিমান বন্দর ছিল। ঐ বৎসর ইরানে ১৫টি হেলিপ্যাড ছিল। ২০০৪ খৃ. ইরানের উল্লেখযোগ্য পাইপলাইনগুলির মধ্যে ছিল ঃ কনডেনসেট গ্যাস ২১২ কিলোমিটার, গ্যাস ১৬,৯৯৮ কিলোমিটার, তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস ৫৭০ কিলোমিটার, তেল ৮,২৫৬ কিলোমিটার, পরিশোধিত সামগ্রী ৭,৮০৮ কিলোমিটার। ২০০৪ খৃ. ইরানে রেললাইনের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৭,২০৩ কিলোমিটার। তন্মধ্যে ব্রড গেজ ৯৪ কিলোমিটার ১.৬৭৬ মিটার গেজ এবং স্টান্ডার্ড গেজ ৭,১০৯ কিলোমিটার ১.৪৩৫ মিটার গেজ (১৮৯ কিলোমিটার বিদ্যুতায়িত) ছিল।

২০০২ খৃ. ইরানে সড়ক পথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ১,৭৮,১৫২ কিলোমিটার। তন্মধ্যে ১,১৮,১১৫ কিলোমিটার (৭৫১ কিলোমিটার এক্সপ্রেস সড়কসহ) পাকা সড়ক এবং ৬০,০৩৭ কিলোমিটার কাচা রাস্তা ছিল। ২০০৬ খৃ. ইরানের কারুন নদীতে নৌপথের দৈর্ঘ্য ৮৫০ কিলোমিটার (উরমিয়া হ্রদে অতিরিক্ত সেবাসহ) পরিলক্ষিত হয়। আসসালুয়েহ ও বুশেহর ইরানের বিখ্যাত বন্দর ও টার্মিনাল হিসাবে পরিচিত।

২০০৫ খৃ. ইরানের বাণিজ্য বহরে ১৪৩টি জাহাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। তন্মধ্যে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বহরে ছিল বিপুল পরিমাণে পণ্যবাহী জাহাজ ৩৮টি, কার্গো ৪৮টি, রাসায়নিক ট্যাংকার ৪টি, কনটেইনার ১৪টি, তরলীকৃত গ্যাস ১টি, যাত্রীবাহী ১টি (কার্গো ৪টি, পেট্রোলিয়াম ট্যাংকার ৩০টি এবং রোল অন রোল অফ জাহাজ ৩টি। উক্ত জাহাজগুলির মধ্যে একটি ছিল সংযুক্ত 'আরব আমীরাতের মালিকানাধীন। আরও উল্লেখ্য যে, উক্ত জাহাজগুলির মধ্যে ১৯টি জাহাজ ছিল অন্যান্য দেশে রেজিস্ট্রিকৃত (CIA- The world Factbook — Iran 2006, 13-15)।

**ইরানের সামরিক বাহিনী** ঃ ইরানের সামরিক বাহিনীর কতকগুলি শাখা রহিয়াছে, যেমন নিয়মিত বাহিনী, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী (বিমান প্রতিরক্ষাসহ); ইসলামী বিপ্লবী গার্ড সেনাদল (সেপাহে পাসদারানে ইনকিলাবে ইসলামী) ঃ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, কুদ্স বাহিনী বাসিজ (Basij) বাহিনী (জনপ্রিয় সংগঠিত সেনাদল) এবং আইন প্রয়োগকারী বাহিনী (২০০৪ খৃ.)।

১৮ বৎসর বয়সের সকল ইরানী নাগরিকের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগদান করা বাধ্যতামূলক। ১৬ বৎসর বয়সে উপনীত হইলে তাহারা

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করিতে পারে। ইরান-ইরাক যুদ্ধ চলাকালে ৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত কিশোরদিগকেও ব্যাপকভাবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করানো হয়। সামরিক বাহিনীতে কমপক্ষে ১৮ মাস চাকরী করা সকল ইরানী নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক। ২০০৫ খৃ. ১৮-৪৯ বৎসর বয়সী ১,৫৬,৬৫,৭২৫ জন ইরানী নাগরিক সামরিক বাহিনীতে চাকুরীর জন্য উপযুক্ত ছিলেন। প্রতি বৎসর সেই দেশে ৮,৬২,০৫৬ জন ইরানী সামরিক বাহিনীতে চাকুরীর বয়সে উপনীত হন। ২০০৩ খৃ. ইরান সামরিক খাতে ৪.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করে, যাহা দেশটির জিডিপি-র ৩.৩% বলিয়া বিবেচিত হয় (পূ. গ্র., পৃ. ১৪-১৫)।

**আন্তর্জাতিক বিরোধসমূহ** ঃ আফগানিস্তান হেলমানদ নদীর উপনদীসমূহে বাঁধ নির্মাণ করিয়া শুষ্ক মৌসুমে পানিপ্রবাহ হ্রাস করায় ইরান উহার প্রতিবাদ করে। পারস্য উপসাগরে শাতিল 'আরবের মোহনার বাহিরে ইরাক ও ইরানের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট পানিসীমা না থাকায় উহার কর্তৃত্ব লইয়া দুই দেশের মধ্যে প্রায়ই বিরোধ দেখা দেয়। ইরান কর্তৃক অধিকৃত আবূ মূসা দ্বীপ ও তুন্‌ব দ্বীপপুঞ্জ লইয়া ইরান ও সংযুক্ত আরব আমীরাতের মধ্যে বিবাদ রহিয়াছে। কাস্পিয়ান উপসাগরকে পাঁচটি সমান ভাগে ভাগ করার দাবিতে উপকূলবর্তী দেশসমূহের মধ্যে ইরান একক দাবিদার হিসাবে উহার ভূমিকায় অটল রহিয়াছে।

**উদ্বাস্তু সমস্যা** ঃ ২০০৫ খৃ. হিসাবমতে ইরানে আফগানিস্তান হইতে আগত ৯,৫২,৮০২ জন এবং ইরাক হইতে আগত ৯৩,১৭৩ জন উদ্বাস্তু ছিল।

**ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিষ্ঠা** ঃ ১৯৬৫ খৃ. এবং ১৯৭৭ খৃ.-এর মধ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রেক্ষিতে ইরানের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। পেট্রোলিয়াম হইতে আহরিত আয়ই ছিল এই উন্নয়নের চালিকাশক্তি। এই সময় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয় ও অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়। ১৯৭৭ খৃ. হইতে প্রধানত অবনতিশীল অর্থনীতি এবং শাহের নিপীড়নমূলক শাসনের প্রতিবাদে সরকার বিরোধী আন্দোলন নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৮ খৃ.-এর শেষ নাগাদ সরকার বিরোধী বিক্ষোভ ব্যাপক আকার ধারণ করে। ইহাতে শাহের বিপক্ষে বামপন্থী, উদারপন্থী এবং ইসলামপন্থী সকলেই সমভাবে সক্রিয় ছিল। সরকার বিরোধী আন্দোলনে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর সমর্থকগণ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রাখেন। উল্লেখ্য যে, এই সময় ইমাম খোমেনী ফ্রান্সে অবস্থান করিতেছিলেন। ক্রমবর্ধমান আন্দোলন ও অস্থিরতায় শাহ জানুয়ারী ১৯৭৯ খৃ. ইরান ত্যাগে বাধ্য হন। ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯ খৃ. ইমাম খোমেনী তেহরানে উপনীত হন এবং ১০ দিন পর কার্যকরভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সহযোগিতায় দেশ শাসনের জন্য ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ গঠন করা হয়। অতঃপর ১ এপ্রিল, ১৯৭৯ খৃ. ইরানকে একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। শী'আ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক নিয়োজিত ওয়ালী ফকীহ বা একজন ধর্মীয় নেতা (প্রাথমিকভাবে খোমেনী)-এর উপর রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হয়। নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করার সংস্থান রাখা হয়। জানুয়ারি ১৯৮০ খৃ. আবু'ল হাসান বনীসাদর প্রাপ্ত ভোটের ৭৫% ভাগ লাভ করিয়া এই পদে নির্বাচিত হন। ইরানের মজলিসে শূরায়ে ইসলামী (পার্লামেন্ট)-এর প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় মার্চ-মে ১৯৮০ খৃ.। এই নির্বাচনে খোমেনী এবং প্রথাগত মুসলমান সম্প্রদায় সমর্থিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রী দল (IRP) পার্লামেন্টের ২৭০টি আসনের মধ্যে ৬০টি আসনে জয়লাভ করে এবং ক্রমান্বয়ে তাহাদের সমর্থনের ভিত্তিকে আরও মজবুত করিয়া গড়িয়া তোলে (The Emofic world year book 2003, p. 2102)।

**মার্কিন দূতাবাস অবরোধ** ঃ নভেম্বর ১৯৭৯ খৃ. ইরানী ছাত্ররা তেহরানে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের ৬৩ জন কর্মীকে যিম্মী করে। দূতাবাস অবরোধের মূল উদ্দেশ্য ছিল তৎকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত শাহকে বিচারের জন্য ইরানে প্রত্যাগমনের দাবির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা। জুলাই ১৯৮০ খৃ. শাহ মিসরে ইন্তিকাল করিলে ইরান আরও শর্তারোপ করে। তখন ইরান যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দাবি করে যে, ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিষয়ে আর হস্তক্ষেপ করিবে না। জোরালো কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে জানুয়ারি ১৯৮১ খৃ. অবশিষ্ট ৫২ জন যিম্মী মুক্তিলাভ করে।

যিম্মী সমস্যার প্রেক্ষিতে মধ্যমপন্থী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয়। ১৯৮০ খৃ. ইরানের বিভিন্ন দল ও উপদলগুলি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে। উহার একদিকে ছিল প্রেসিডেন্ট বানী সদর ও তাঁহার আধুনিকতাবাদী মিত্রবর্গ এবং অপরদিকে ছিল ইরানী প্রজাতন্ত্রী দল ও রক্ষণশীল সম্প্রদায়। জুন ১৯৮১ খৃ. মুজাহিদীনেখালক (বানীসাদরকে সমর্থন দানকারী একটি ইসলামপন্থী গেরিলা দল) এবং বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর মধ্যেকার ক্রমবর্ধমান বৈরিতা অব্যাহত সংঘর্ষের রূপ লাভ করে। ইহাতে মজলিস প্রেসিডেন্টের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে। অতঃপর খোমেনী তাহাকে বরখাস্ত করেন। বানীসাদর এবং মুজাহিদীনের নেতা মাসউদ রাযায়ী ফ্রান্সে পলায়ন করেন। জুলাই ১৯৮১ খৃ. অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রধান মন্ত্রী মুহাম্মাদ আলী রাযায়ী জয়লাভ করেন। মুহাম্মাদ জাভার বাহুনারকে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। ইতিমধ্যে মুজাহিদীনে খালক এবং সরকারী বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ তীব্রতর আকার ধারণ করে। আগস্ট ১৯৮১ খৃ. এক বোমা বিস্ফোরণে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মন্ত্রী উভয়ে নিহত হন। এই বোমা হামলার জন্য মুজাহিদীনকে অভিযুক্ত করা হয়। অক্টোবর ১৯৮১ খৃ. পুনরায় অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে হুজ্জাতুল ইসলাম 'আলী খামেনী জয়লাভ করেন। মীর হুসায়ন মুসাবী প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন।

**ইরান-ইরাক যুদ্ধ**

১৯৮০ খৃ.-এর দশকের অধিকাংশ সময় ইরানের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি ইরাকের সহিত যুদ্ধের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। সেপ্টেম্বর ১৯৮০ খৃ. বিতর্কিত শাতিল আরব নৌপথের উপর সার্বভৌমত্বের দাবিকে কেন্দ্র করিয়া সীমান্তের ৫০০ কিলোমিটার এলাকা পথে ইরাক ইরানের উপর এক যুদ্ধ অভিযানে নামে। ইরাক অতি দ্রুত সামরিক বিজয়ের প্রত্যাশা করিলেও যুদ্ধক্ষেত্রে ইরানী বাহিনীর তরফ হইতে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। ১৯৮২ খৃ. ইরান ইরাকে পাল্টা আক্রমণ পরিচালনা করে। জুন ১৯৮২ খৃ. ইরাক ইরানী ভূখণ্ড হইতে সৈন্য প্রত্যাহারে বাধ্য হয়। অতঃপর ইরানের সেনাবাহিনী ইরাকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এভাবে ইরান ও ইরাকের মধ্যে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চলিতে থাকে। পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ, স্থাপনা এবং পরিবহন ব্যবস্থা তাহাদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ১৯৮৪ খৃ. হইতে ইরাক ইরানের খারগ দ্বীপস্থ তেল টার্মিনালের মাধ্যমে ট্যাংকারসমূহে আক্রমণ পরিচালনা করে। পারস্য

উপসাগরে অবস্থিত উক্ত তেল টার্মিনাল হইতে ইরাকী আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে ইরান উপসাগরে অবস্থিত সৌদী 'আরব ও কুয়েতী ট্যাংকারগুলিকে উহার সামরিক লক্ষ্যবস্তু হিসাবে বিবেচনা করে। শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে জাতিসংঘের একাধিক উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ ইরান দাবি করে যে, শুধুমাত্র ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বহিষ্কার এবং তৎসহ ইরাক কর্তৃক ইরানকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রদানের শর্ত বৈরিতার অবসান ঘটাইতে পারে।

যুদ্ধের প্রেক্ষিতে ইরান কূটনৈতিকভাবে নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িলেও ১৯৮৬ খৃ. ইহা প্রতীয়মান হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৮৫ খৃ. ইরানের সহিত গোপন আলোচনার মাধ্যমে লেবাননে শী'আ গোষ্ঠী কর্তৃক আটক মার্কিন যিম্মীদের মুক্তির বিনিময়ে ইরানকে অস্ত্র সরবরাহ করে। অথচ প্রকাশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সকল দেশকে ইরানে অস্ত্র সরবরাহ হইতে বিরত থাকার আহ্বান জানায়। ইতিমধ্যে কুয়েত ইরাককে সমর্থন করাতে ইরান কুয়েত ও তৎসংশ্লিষ্ট নিরপেক্ষ ট্যাংকারগুলিতে আক্রমণ পরিচালনা করে। ১৯৮৭ খৃ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১১টি কুয়েতী ট্যাংকারকে পুনঃরেজিস্ট্রেশন দানের মাধ্যমে সেইগুলিকে মার্কিন পতাকাবাহী হিসাবে নৌ-সুরক্ষার আয়ত্তাধীনে আনয়ন করে। অতঃপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও ইতালী উপসাগরীয় অঞ্চলকে মাইন বিমুক্তকরণে আত্মনিয়োগ করে (পূ. গ্র., পৃ. ২১০২-৩)

এপ্রিল ১৯৮৮ খৃ. ইরাক ফাও উপদ্বীপ পুনর্দখল করে (যাহা ইরান দুই বৎসর পূর্বে দখল করিয়াছিল)। ইহাতে ইরান শাতিল 'আরব হইতে সেনা প্রত্যাহারে বাধ্য হয়। জুন ১৯৮৮ খৃ. ইরাক মাজনৌউন দ্বীপ ও তৎসন্নিহিত এলাকা পুনর্দখল করে (যাহা ইরান ১৯৮৪ খৃ. দখল করিয়াছিল)। জুলাই ১৯৮৮ খৃ. হুরমুয প্রণালীতে অবস্থানরত মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ হইতে নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে একটি ইরানী বেসামরিক বিমানকে ভূপাতিত করা হইলে উহার ২৯০ জন যাত্রী ও ক্রু সকলেই নিহত হন। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে যে, ভুলক্রমে একটি জঙ্গী জেট বিমান ভাবিয়া যাত্রীবাহী বিমানটিতে গোলাবর্ষণ করা হয়। এই সময় ইরাকী সেনাবাহিনী ১৯৮৬ খৃ. হইতে প্রথমবারের মত ইরানী ভূখণ্ডে ঢুকিয়া পড়ে এবং ইরাকী ভূখণ্ড হইতে সকল ইরানী সৈন্য বিতাড়িত করা হয়। ১৮ জুলাই, ১৯৮৮ খৃ. ইরান অপ্রত্যাশিতভাবে দুই বৎসর পূর্বে গৃহীত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ৫৯৮ নম্বর প্রস্তাব নিঃশর্তভাবে মানিয়া লইবার ঘোষণা প্রদান করে। জাতিসংঘের এই প্রস্তাবে অবিলম্বে অস্ত্রবিরতি, আন্তর্জাতিক সীমানার অভ্যন্তরে সেনা প্রত্যাহার এবং শান্তি স্থাপনে ইরান ও ইরাকের সহযোগিতার সংস্থান রাখা হয়। আট বৎসর স্থায়ী এই সংঘর্ষে ১০ লক্ষেরও অধিক লোকের প্রাণহানী ঘটে বলিয়া অনুমান করা হয়। ২০ আগস্ট, ১৯৮৮ খৃ. অস্ত্রবিরতি কার্যকর হয় এবং ইহার অল্পকাল পরেই সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় শান্তি আলোচনা শুরু হয়। এই সময় জাতিসংঘের ইরান-ইরাক সামরিক পর্যবেক্ষক গ্রুপ বা UNIMOG গঠন করা হয়। যাহা হউক, শাতিল 'আরবের সার্বভৌমত্ব, যুদ্ধবন্দী বিনিময় এবং সশস্ত্র বাহিনীকে আন্তর্জাতিক সীমারেখার অভ্যন্তরে ফিরাইয়া নেওয়া ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া আলোচনায় অচলাবস্থা দেখা দেয়। জুলাই ১৯৯০ খৃ. জেনেভাতে ইরান ও ইরাকের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি সভার প্রেক্ষিতে একটি ব্যাপক ভিত্তিক শান্তিচুক্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়, কিন্তু আগস্ট ১৯৯০ খৃ. ইরাকের কুয়েত আক্রমণের ফলে উহার দ্রুত অন্তর্ধান ঘটে। সাদ্দাম হোসেন ইরানের সহিত অবিলম্বে একটি আনুষ্ঠানিক শান্তি চুক্তিতে উপনীত হইবার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। অস্ত্র সংবরণের পর হইতে ইরানের উত্থাপিত সকল দাবি তিনি মানিয়া নেন। তৎসহ তিনি ১৯৭৫ খৃ সম্পাদিত আলজিয়ার্স চুক্তিরও পুনর্বহাল করেন। শেষোক্ত চুক্তিতে শাতিল 'আরব নৌপথকে বিভক্ত করার ব্যবস্থা ছিল। ইরাক দ্রুততার সহিত তাহার সেনাবাহিনীকে ইরাক সীমান্ত হইতে প্রত্যাহার করিয়া কুয়েত সীমান্তে নিয়োজিত করে। অতঃপর ইরান ও ইরাক বন্দী বিনিময় করে এবং সেপ্টেম্বর ১৯৯০ খৃ. তাহাদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনস্থাপিত হয়। ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ খৃ. জাতিসংঘের ইরান-ইরাক সামরিক পর্যবেক্ষক গ্রুপ এই মর্মে পরিসমর্থন করে যে, দেশ দুইটি তাহাদের সশস্ত্র বাহিনীদ্বয়কে স্ব স্ব সীমান্তের অভ্যন্তরে প্রত্যাহার করিয়াছে। অতঃপর UNIIMOG-এর ম্যানডেটের পরিসমাপ্তি ঘটে (পূ. গ্র., পৃ. ২১০৩)।

**যুদ্ধে ইরানের ক্ষয়ক্ষতি ও মনোবল ঃ** ইরানী সূত্রমতে আমেরিকার নির্দেশে ইরাক কর্তৃক চাপাইয়া দেওয়া যুদ্ধের ৯ বৎসরে ইরানের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। আমেরিকা ইরাককে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও উন্নত মিসাইল সরবরাহ করে। ইরাক এগুলি ব্যবহার করিয়া সামান্য অজুহাতে ইরানী সীমান্তের শহরগুলি আক্রমণ করে। ইরাকের বোমা ও মিসাইল হামলায় ইরানের অনেক শহর ও গ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যুদ্ধের তাণ্ডব হইতে আল্লাহর ঘর মসজিদও রেহাই পায় নাই। ধ্বংস হইয়া যায় অনেক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও হাসপাতাল। দাউ দাউ আগুনে পুড়িয়া যায় ফসলের মাঠ, বনবনানী, লোকালয়। নিহত হয় লক্ষ লক্ষ নর-নারী-শিশু-কিশোর। সাম্রাজ্যবাদী কুফরী শক্তির এ ধ্বংসযজ্ঞেও ইরানী জনগণ ভয় পায় নাই, এই দুর্দিনেও তাহাদের নেতা ইমাম খোমেনী (র)-এর নির্দেশাবলী মানিয়া চলিয়াছে। আল্লাহর উপর ভরসা রাখিয়াছে, ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছে, আমিন আল- আসাদ, ইমাম খোমেনী (র) ও ইসলামী বিপ্লব, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৯৭ খৃ., পৃ. ৫১-৫২)।

ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের ফলে পরাশক্তি যে ইরানে তাহাদের প্রভাব হারাইয়া ফেলে শুধু তাহাই নহে, বরং তাহারা অন্যান্য মুসলিম দেশে বিপ্লবের বিস্তার লাভের আশঙ্কায় খুবই শংকিত হইয়া পড়ে। এই কারণে তাহারা ইসলামী বিপ্লবের উপর আঘাত হানিবার জন্য যে কোন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণে দ্বিধা করে নাই। কিন্তু তাহাদের কাছে যখন স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্ট কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য এবং ক্ষুদ্র রাজনৈতিক ও গেরিলা গোষ্ঠীগুলির নাশকতামূলক পদক্ষেপসমূহ বিপ্লবের পথ রুদ্ধ করিতে সক্ষম নহে, তখন পরাশক্তিবর্গ ইরানের প্রতিবেশী ইরাককে ইরানের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক যুদ্ধ শুরু করার জন্য উস্কানি ও উৎসাহ প্রদান করে।

সে সময় ইরানে সবেমাত্র সশস্ত্র বাহিনী পুনর্গঠন প্রক্রিয়া চলিতেছিল। সেপাহ পাসদার বাহিনীও ছিল একটি নবগঠিত বাহিনী। তাই ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসায়ন ধারণা করেন যে, ইসলামী বিপ্লবের পতন ঘটাইবার লক্ষ্যে তিনি মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার বাহিনীকে তেহরান পৌঁছাইতে সক্ষম হইবেন অথবা কমপক্ষে খুযিস্তান প্রদেশ দখল করিয়া ইরানকে তাহার তেল বিক্রয়ের আয় হইতে বঞ্চিত করিয়া অচল করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার সে মহাপরিকল্পনা সফল হয় নাই।

যুদ্ধের প্রথমদিকে ইরাকের স্থলবাহিনী ইরানের সীমান্তবর্তী এলাকার কয়েকটি ছোট ছোট শহর দখল করিয়া লয় এবং খুযিস্তানের বিরাট জনসংখ্যা বিশিষ্ট দুইটি বড় শহর আবাদান ও খুররমশাহর অবরোধ করে। ইহাতে উক্ত দুইটি শহরে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ইরাকী বাহিনী ইরানী "বাসিজ" বাহিনীর পক্ষ হইতে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের হামলা তীব্রতর করে। ইরাকী বিমান রণাঙ্গন ও সেনানিবাসসমূহে ইরানী বাহিনীর উপর হামলা পরিচালনা ছাড়াও ইরানের কল-কারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, তেল কূপ, তেল শোধনাগার, সেতু, মহাসড়ক ও আবাসিক এলাকার উপর পর্যন্ত বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। ইহা ছাড়া তাহারা ইরানের সীমান্তবর্তী শহরসমূহের হাজার হাজার নিরীহ সাধারণ মানুষকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ইরানের সশস্ত্র বাহিনী, সেপাহ পাস্দার বাহিনী ও বাসিজ (গণবাহিনী) পারস্পরিক সমন্বয় সাধন করে এবং আত্মোৎসর্গের মনোভাব লইয়া শত্রুর উপর ব্যাপক হামলা পরিচালনা করে। তাহারা আবাদান ও খুররমশাহর পুনর্দখল করে। তাহারা হাজার হাজার শত্রুসেনাকে হত্যা ও বন্দী করে। ২০ এপ্রিল, ১৯৮২ খৃ. ইরানী বাহিনী শুধু একটি অভিযান চালাইয়া খুযিস্তান প্রদেশের দেড় হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গা শত্রুর হাত হইতে পুনরুদ্ধার করিতে এবং ১৮ হাজার শত্রু সৈন্যকে বন্দী করিতে সক্ষম হয়। এই অভিযানের নাম ছিল "ফাতহুম্ মুবীন'।

ইরাক কর্তৃক তেহরানে অব্যাহত ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের জবাবে ইরানী বাহিনী ইরাকী ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে অভিযান চালাইয়া হালাবজাহ্ শহরসহ উত্তর ইরাকের বিরাট এলাকা দখল করিয়া লয়। কুর্দী অধ্যুসিত হালাবজাহর জনগণ ইরানী বাহিনীকে স্বাগত জানায়। ইহার প্রেক্ষিতে ইরাকী বাহিনী হালাবজাহ্বাসীদের উপর রাসায়নিক বোমা বর্ষণ করে। ফলে সেখানে এক নারকীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়। নারী, শিশু ও বৃদ্ধসহ পাঁচ হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয় (ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন দফতরের ইতিহাস বিভাগ, ইরানের সমকালীন ইতিহাস, বাংলায় অনু. নূর হোসেন মজিদী, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৯৬ খৃ., পৃ. ২৯৪-২৯৭, ৩০৫-৩০৭)।

**ইরানের কুয়েত নীতি ঃ** ইরান ইরাকের কুয়েত দখলের নিন্দা করে এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ইরাকের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা মানিয়া চলে। তথাপি দেশটি উপসাগরীয় অঞ্চলে জাতিসংঘের নেতৃত্বে নিয়োজিত বহুজাতিক বাহিনী নিয়োজিত করার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে। ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ খৃ. কুয়েত মুক্ত হওয়ার পর ইরান ও ইরাকের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। দক্ষিণ ও কেন্দ্রীয় ইরাকের বিদ্রোহ দমন ও তৎসহ উক্ত অঞ্চলের শী'আ তীর্থক্ষেত্রগুলির ধ্বংসসাধন করা হইলে ইরান উহার প্রতিবাদ করে এবং পুনরায় সাদ্দাম হুসায়নের পদত্যাগ দাবি করে। ইহার প্রেক্ষিতে ইরাক বিদ্রোহীদের সমর্থনের জন্য ইরানকে দায়ী করে। এইভাবে জাতিসংঘের ৫৯৮ নম্বর শান্তি প্রস্তাবের শর্তাবলীর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ণ বাধাগ্রস্ত হয়। অক্টোবর ১৯৯৩ খৃ. অবশিষ্ট যুদ্ধবন্দী বিনিময় বিষয়ে ইরান ও ইরাকের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের এক পুনরালোচনা অনুষ্ঠিত হয় (The Europe world Yearbook, London 2006)।

**সংস্কারবাদ ও সংরক্ষণবাদ ঃ** এপ্রিল ও মে ১৯৮৮ খৃ. অনুষ্ঠিত মজলিসের নির্বাচনে 'সংস্কারপন্থীরা' জয়লাভ করেন। তাহাদের নেতৃত্বে ছিলেন স্পীকার হাশিমী রাফ্সানজানি এবং প্রধান মন্ত্রী মূসাবী। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ খৃ. আয়াতুল্লাহ খোমেনী ইরানের রাজনীতিতে 'সংস্কারপন্থী' ও 'রক্ষণশীল' এই দুইটি বিদ্যমান ধারা বিষয়ে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করেন। সংস্কারপন্থীরা যুদ্ধোত্তর ইরানের পুনর্নির্মাণে পরিমিত মাত্রায় পাশ্চাত্য অংশগ্রহণের প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীলগণ ইহার বিরোধিতা করেন। আয়াতুল্লাহ খোমেনী ঘোষণা করেন যে, তিনি কখনই সংস্কারপন্থীদিগকে মানিয়া লই না। ইহার প্রেক্ষিতে কতিপয় বিখ্যাত সংস্কারবাদী রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

স্বল্পকালীন রোগভোগের পর ১৩৬৮ ফার্সী সালের ১৩ খোরদাদ (১৯৮৯ খৃ. ৩ জুন) শনিবার ইরানী সময় রাত ১০টা ২২ মিনিটে ইমাম খোমেনী ৮৭ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইমামের ইন্তেকালের পরপরই নেতা নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ পরিষদ অধিবেশনে বসে এবং এক দিনেরও কম সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তারা সঠিক বিবেচনায় সাইয়েদ আলী খামেনিয়াকে দেশের নেতা হিসাবে নির্বাচিত করেন। এইভাবে খামেনেয়ী ইরানের আধ্যাত্মিক নেতা বা ওয়ালী ফকীহ্ হিসাবে অভিষিক্ত হন।

**স্যাটানিক ভার্সেস ঃ** ১৯৮৮ খৃ. ইমাম খোমেনী একটি ঐতিহাসিক ফতোয়া জারী করেন। তিনি নিন্দিত "স্যাটানিক ভার্সেস" বইয়ের কুখ্যাত লেখক সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে মুরতাদ হওয়ার ও তাহাকে হত্যার অপরিহার্যতার ফতোয়া জারী করেন। সালমান রুশদী মহানবী (স) সম্পর্কে কুৎসা রটনা করিয়া বইটি লিখিয়া বিশ্বের দেড় শত কোটি মুসলমানের বুকে ছুরিকাঘাত করে। সারা বিশ্বের মানুষ বইটির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। শয়তান রুশদীর ফাঁসির দাবিতে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের মুসলমানগণ নজিরবিহীন বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। বৃটিশ লেখক সালমান রুশদী মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও আসলে সে একজন নাস্তিক। বৃটেনে বইটির প্রকাশক ছিল ইয়াহুদীবাদী প্রকাশনা 'ভাইকিং পেংগুইন'। পশ্চিমা দেশসমূহ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করে। ইরানের মজলিসে শূরায়ে ইসলামী বৃটেনকে এক চরমপত্র প্রদান করে এবং উহার ভিত্তিতে ইরান ও বৃটেনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায় (ইরানের সমকালীন ইতিহাস, পৃ. ৩০০)।

**প্রেসিডেন্ট রাফ্সান্জানির শাসনামল ঃ** ২৮ জুলাই, ১৯৮৯ খৃ. অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 'সংরক্ষণবাদী' 'সংস্কারবাদী'গণের যৌথ সমর্থনক্রমে রাফ্সান্জানি নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেন। একই দিনে যুগপৎ অনুষ্ঠিত এক গণভোটে সংবিধানের সংশোধনী অনুমোদন করা হয়। সংশোধনীর উল্লেখযোগ্য দিক ছিল প্রধান মন্ত্রী পদের বিলোপ সাধন করত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

১৯৯০ খৃ. দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং খাদ্য ঘাটতির ফলে ব্যাপক প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক সংস্কারের আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এপ্রিল ও মে ১৯৯২ খৃ. চতুর্থ মজলিসের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অভিভাবক পরিষদ রাফসানজানির বিপক্ষের অধিকাংশ প্রতিযোগী প্রার্থীকে অযোগ্য ঘোষণা করিলে তাঁহার সমর্থক ডেপুটিগণ নির্বাচনে পার্লামেন্টের প্রায় ৭০% ভাগ আসন লাভ করেন।

জুন ১৯৯৩ খৃ. রাষ্ট্রপতি পুনর্নির্বাচনে দেখা যায়, রাফ্সান্জানির জনসমর্থন অপেক্ষাকৃত হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ খৃ. তেহরানে এক জনসভায় তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। বিপ্লবী রক্ষীদের মুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ এই হামলার দায়দায়িত্ব স্বীকার করে।

আগস্ট ১৯৯৫ খৃ. রাজনৈতিক দলসমূহ পরিদর্শনের জন্য বিশেষ কমিশন সূত্রে বলা হয় যে, রাজনৈতিক দল, সমিতি ও গোষ্ঠীসমূহ দেশের সংবিধানকে সমর্থন করার শর্তে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

মার্চ ও এপ্রিল ১৯৯৬ খৃ. ৫ম মজলিসের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ইরানের রাজনীতিতে, 'সংস্কারবাদী' বা 'উদারপন্থী' এবং 'রক্ষণশীল'দের মধ্যে ক্ষমতার পটপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

রাফ্‌সান্‌জানি সমর্থিত ইরানের বিনির্মাণ দল, আয়াতুল্লাহ খোমেনী সমর্থিত 'রক্ষণশীল' সংগ্রামী ধর্মীয় নেতৃগোষ্ঠী (Society of Compotant Clergy)-এর চেয়ে সংসদে কিছু সংখ্যক কম আসনে বিজয়ী হয়।

মার্চ ১৯৯৭ খৃ. রাফসান্‌জানি কাম্যতা নির্ধারণ পরিষদের সভাপতি হিসাবে নিয়োজিত হন। কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যদি মজলিসে শূরায়ে ইসলামী ও সংবিধানের অভিভাবক পরিষদের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটে, সেক্ষেত্রে এই পরিষদ বিতর্কিত বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মার্চ ২০০২ খৃ. তিনি পুনরায় কাম্যতা নির্ধারণ পরিষদের প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হন। এইভাবে রাষ্ট্রপতি পদে তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও ইরানের রাজনীতিতে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত থাকে।

**প্রেসিডেন্ট খাতামীর শাসনামল ঃ** ইরানের বিনির্মাণ দল (Servants of Iran's Construction), পেশাজীবী, নারী সমাজ ও যুবদলসমূহের সমর্থনপুষ্ট হইয়া আগস্ট ১৯৯৭ খৃ. খাতামী ইরানের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। 'উদারপন্থী' খাতামী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ইরানের অব্যাহত অগ্রগতির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি পাশ্চাত্যের প্রতি সহনশীল ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সম্পন্ন বৈদেশিক নীতি অবলম্বন করেন। অবশ্য তিনি পাশ্চাত্য তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাঈলের সামরিক ও সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন অব্যাহত রাখেন।

১৯৯৮ খৃ. তেহরানের 'উদারপন্থী' মেয়র গোলাম হোসেন কারবাসচিকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেপ্তারের ঘটনায় 'উদারপন্থী'দের সহিত 'রক্ষণশীল'দের বৈরিতার আভাস পাওয়া যায়। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ খৃ. কতিপয় বুদ্ধিজীবি এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী লেখককে তথ্যমন্ত্রণালয়ের লোকেরা তথ্যমন্ত্রী কোরবান আলী নাজাফাবাদীর অজ্ঞাতসারে হত্যার ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িলে মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। এই সময় ইসলামী বিপ্লবের পর ইরানের প্রথম স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ২,০০,০০০ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে 'সংস্কারবাদীরা' তেহরান, সিরাজ ও ইস্পাহানে এবং 'রক্ষণশীলরা' তাহাদের চিরায়ত শক্ত ঘাটি কোম্ম ও মাশহাদের কাউন্সিলসমূহে জয়লাভ করে। এপ্রিল ১৯৯৯ খৃ. তেহরানে মুজাহিদীনে খালক সশস্ত্র বাহিনীর উপ-প্রধান লে. জে. আলী সায়্যাদ শিরাযীকে হত্যা করে। জুলাই ১৯৯৯ খৃ. 'উদারপন্থী' প্রকাশনাসমূহের কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণের জন্য পার্লামেন্টে একটি আইন পাশ করা হয়। ইহার প্রেক্ষিতে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য শহরে সংঘটিত পাঁচ দিনের দাঙ্গায় ৮ ব্যক্তি নিহত হয় ও ১,৪০০ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। জাগ্রত জঙ্গীগোষ্ঠী আনসারে হিযবুল্লাহর সহযোগিতায় নিরাপত্তা বাহিনী ক্যাম্পাসে হামলার অভিযোগে পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ ১০০ পুলিশ কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করে।

অতঃপর প্রেসিডেন্ট খাতামী সমর্থিত 'উদারপন্থী' পত্রিকা 'সালাম'-এর নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আরও ৫ বৎসর বৃদ্ধি করা হয়। ইহার ধারাবাহিকতায় 'উদারপন্থী' খোরদাদ নামক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক 'আবদুল্লাহ নূরীকে অক্টোবর ১৯৯৯ খৃ. বিশেষ ধর্মীয় আদালতের সামনে বিচারের সম্মুখীন হইতে হয়। তাহার বিরুদ্ধে ইসলাম অবমাননা ও আয়াতুল্লাহ খোমেনীকে অবমূল্যায়নের অভিযোগ আনা হয়।

ফেব্রুয়ারি ২০০০ খৃ. ইরানের ৬ষ্ঠ পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে 'উদারপন্থী' ডেপুটিগণ ২০০ টি আসন এবং বাকী ৯০ টি আসন 'রক্ষণশীল' ডেপুটিগণ লাভ করেন। প্রেসিডেন্ট খাতামী তাঁহার শাসনামলে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করেন। তিনি কতিপয় রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও মন্ত্রণালয়কে একীভূত ও পুনর্গঠিত করেন। ডিসেম্বর ২০০০ খৃ. খাতামী সংস্কৃতি ও ইসলামী নির্দেশনা বিষয়ক 'উদারপন্থী' মন্ত্রী আতাউল্লাহ মুহাজিরী-এর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন।

নভেম্বর ২০০০ খৃ. তেহরানে একদল খ্যাতনামা 'সংস্কারবাদী'র বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। ইরানের রাজনৈতিক সংস্কার বিষয়ে এপ্রিল ২০০০ খৃ. জার্মানীর বার্লিনে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে তাহারা অংশগ্রহণ করিলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ আনয়ন করা হয় যে, তাঁহারা 'জাতীয় নিরাপত্তা পরিপন্থী সরকার বিরোধী আচরণ করিয়াছেন। এইজন্য বিচারে অভিযুক্তদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

জানুয়ারি ২০০১ খৃ. স্বরাষ্ট্র বিভাগের 'সংস্কারবাদী' উপমন্ত্রী মুস্তাফা তাজাদেহ-এর বিচার শুরু হয়। তাহার বিরুদ্ধে ২০০০ খৃ. অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোট কারচুপি ও ঐ বৎসরের আগস্ট মাসে খুররামাবাদে বিক্ষোভ ও উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগ আনয়ন করা হয়। এপ্রিল ২০০১ খৃ. ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মেহদী বাজারগানের সহযোগীবৃন্দসহ অনেক মধ্যমপন্থীকে গ্রেফতার করা হয় (The Europe world yearbook, London 2006, p. 2105-6)।

জুন ২০০১ খৃ. অনুষ্ঠিত অষ্টম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে খাতামী পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ইহাতে তাঁহার সংস্কার কর্মসূচির প্রতি জনসমর্থন প্রমাণিত হয়। পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় খাতামী ইরানে অধিকতর গণতান্ত্রিক চর্চা, সরকারের জবাবদিহিতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন। প্রেসিডেন্ট হিসাবে খাতামীর এই দ্বিতীয় মেয়াদেও 'সংস্কারবাদী' ও 'রক্ষণশীল'দের মধ্যে মতদ্বৈধতা অব্যাহত থাকে। তাঁহার গঠিত নূতন সরকারকে 'রক্ষণশীল'রা এই বলিয়া সমালোচনা করে যে, উহা অত্যন্ত উদারনৈতিক।

খাতামীর পুনর্নির্বাচনের পরে 'সংস্কারপন্থী' কর্মীদিগকে বিচার বিভাগ কর্তৃক গ্রেপ্তার অভিযান জোরদার হয়। গণগ্রেফতার, প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত এবং এমনকি গণসমক্ষে মৃত্যুদণ্ড প্রদান, দৃশ্যত অপরাধ দমন ও নৈতিকতা উন্নয়নে উৎসাহ প্রদানার্থ করা হইলেও, অনেকে উহাকে রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবিত সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার ঠেকানোর ইচ্ছাকৃত প্রয়াস বলিয়া অভিহিত করেন। সংস্কারবাদী সাংসদদিগকে সংসদে সরকার বিরোধী বক্তব্যের জন্য কারাদণ্ড প্রদান করিলে উদারপন্থী সাংসদগণ উহার প্রতিবাদে স্পীকার মাহদী কাররুবির নেতৃত্বে জানুয়ারি ২০০২ খৃ. সংসদ ত্যাগ করেন। ইহার ধারাবাহিকতায় ইরানের সংস্কারবাদী লেখক, শিক্ষাবিদ, সাংসদ ও মন্ত্রীদিগকে ব্যাপক হারে জেল-জরিমানা, আদালতে তলব ও বরখাস্ত

করিলে খাতামীর অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। ইরান ও মার্কিন প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে আলোচনাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র-পত্রিকায় কোন নিবন্ধ প্রকাশকে বিচার বিভাগ দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে পরিগণিত করে। এইভাবে ইরানের প্রধান সংস্কারপন্থী পত্রিকা নওরোজের প্রকাশককে জেল-জরিমানা করা হয়। অনুরূপভাবে অনেক সংস্কারপন্থী প্রতিষ্ঠানও সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তাহাদের বিরুদ্ধে ইরানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রতি বিরুদ্ধাচরণের অভিযোগও ছিল।

ফেব্রুয়ারি ২০০৩ খৃ. অনুষ্ঠিত ইরানের দ্বিতীয় স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রক্ষণশীলদের নিকট প্রেসিডেন্ট খাতামীর ইসলামিক ইরান পার্টিসিপেশন ফ্রন্টের বিপুল পরাজয় ঘটে। ইসলামী বিপ্লবের পর দ্বিতীয় বারের মত অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে মাত্র ৩৯% ভোটার তাহাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। মৌলিক রাজনৈতিক সংস্কারে খাতামীর ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে মধ্যপন্থী ভোটাররা নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেন। তেহরান কাউন্সিল নির্বাচনে রক্ষণশীলরা ১৫টি মধ্যে ১৪টি আসন লাভ করেন। সেখানে মাত্র ১৫% ভোটার তাহাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। (পৃ. গ্র. পৃ. ২১০৮)

২০০০ খৃ.- ২০০৪ খৃ. পর্যন্ত কার্যকর ইরানের ষষ্ঠ মজলিস 'সংস্কারপন্থী পার্লামেন্ট' নামেও পরিচিত। এই সময় খাতামীর নেতৃত্বে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহিত ইরানের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু অভিভাবক পরিষদের সহিত মতদ্বৈধতার কারণে খাতামী তথা ষষ্ঠ পার্লামেন্ট এক প্রতিকূল সময় অতিবাহিত করেন।

২৭ মে, ২০০৪ খৃ. ইরানের সপ্তম মজলিস বা পার্লামেন্টের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। অভিভাবক পরিষদ খাতামীর অধিকাংশ সংস্কারপন্থী ডেপুটিগণকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ হইতে বিরত রাখেন। নির্বাচনে ৫১.২১% ভোটার তাহাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। ভূমিকম্প বিধ্বংস শহর বাম-এর আসনটিতে নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। রক্ষণশীল অধ্যুসিত এই পার্লামেন্টে ১২ জন নারী সদস্যও আসন লাভ করেন (Iran Media Guide by Foreign Media Department, Ministry of Culture and Islamic Guidance, Fourth Edition, Tehran 2005)।

**প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদি নেযাদের শাসনামল ঃ** আগস্ট ২০০৫ খৃ. ইরানের নবম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শক্তিশালী রক্ষণবাদী প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদি নেযাদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এইভাবে বর্তমানে (জুন ২০০৬ খৃ.) ইরানে রক্ষণবাদী পার্লামেন্ট ও রাষ্ট্রপতি প্রবল প্রতাপের সহিত ইরানের শাসনভার নির্বাহ করিয়া চলিয়াছেন। অবশ্য ইরানের সাম্প্রতিক পরমাণু কর্মসূচী লইয়া যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য বিশ্ব ইরানের উপর চাপ সৃষ্টি করিতেছে। ইরান গণচীন ও রাশিয়ার সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরমাণু শক্তির ব্যবহারে আগ্রহী। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার পাশ্চাত্য মিত্ররা সন্দেহ করে যে, ইরান পরমাণু অস্ত্রে সজ্জিত হইবার উদ্দেশ্যে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচী হাতে নিয়াছে।

**ইরানের শিক্ষা ব্যবস্থা ২০০৫ খৃ. ঃ** ইরানে প্রাথমিক শিক্ষা দাপ্তরিকভাবে বাধ্যতামূলক। বিনামূল্যে প্রদত্ত পাঁচ বৎসর মেয়াদী এই শিক্ষা ব্যবস্থা ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বলবৎ থাকে। অবশ্য গ্রামাঞ্চলে ইহা এখনও পরিপূর্ণভাবে চালু হয় নাই। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ৭ বৎসর মেয়াদী। ইহা ১১ বৎসর বয়সে শুরু হয়। দুইটি ধাপে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়; প্রথম ধাপে ৩ বৎসর ও দ্বিতীয় ধাপে ৪ বৎসর। ১৯৯৬ খৃ. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় বয়সী মোট ছাত্র-ছাত্রীদের ৮৬% ভাগ বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছিল। ইরানে সরকারী বিদ্যালয়গুলির পাশাপাশি কিছু বেসরকারী বিদ্যালয়ও আছে, যেখানে ৮% ভাগেরও বেশি শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। ১৯৮৭-৮৮ খৃ. হইতে ১৯৯৯-২০০০ খৃ. পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ইরানের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতঃপর ২০০০-২০০১ খৃ. হইতে ছাত্রসংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইরানের ৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১৬টি তেহরানে অবস্থিত। দাপ্তরিক হিসাবমতে ২০০১-২০০২ খৃ. ইরানের পাবলিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ৭,৫৯,৮৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছিল। বৎসরটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট হইতে শিক্ষাখাতে ২,৪০,৩১,০০০ মিলিয়ন ইরানী রিয়াল ব্যয় করা হয়, যাহা মোট খরচের ১৮.৮% ভাগ (The Europe world yearbook, London 2006, আরও দ্র. Iran Media Guide, Foreign Media Department, Tehran 2005, পৃ. ৩৩)।

**ইরানের বিদ্বান সমাজ ও গবেষণা কেন্দ্র ঃ** সুপ্রাচীন কাল হইতে ইরানের বিদ্বান-সমাজ বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি সমসাময়িক প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হইল (২০০৬ খৃ.)। ইউনেস্কো অফিস তেহরান। ইহা ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জাতিসংঘের পক্ষ হইতে সহযোগিতা করিয়া থাকে। ইরান ব্যবস্থাপনা সমিতি, তেহরান, ১৯৬০ খৃ. সদস্য সংখ্যা ১,৩০০, গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ৮,০০০। সাময়িকী প্রকাশনা ২টি। প্রাচীন ইরান সংস্কৃতি সমিতি, তেহরান (স্থাপিত ১৯৬১ খৃ.)। বৃটিশ ইনস্টিটিউট অব পার্সিয়ান স্টাডিজ, (স্থাপিত ১৯৬১ খৃ.), লণ্ডন তেহরানে ইহার অফিস রহিয়াছে। সদস্য সংখ্যা ৪০০, গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি ও পুস্তকসংখ্যা ১০,০০০। বার্ষিক ইরান সাময়িকী প্রকাশক।

বৃটিশ কাউন্সিল, তেহরান শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিয়া থাকে। তেহরানস্থ নাট্যকার, নিবন্ধকার ও ঔপন্যাসিকদের ক্লাব সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের উন্নয়নে সমন্বয় ও সহযোগিতা করিয়া থাকে। তেহরানস্থ কলা ও সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন ইনস্টিটিউট (IHCS), ১৯৮১; দশটি অনুষদে গবেষণার মাধ্যমে 'আরবী ও ইংরেজি, গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ১,২০,০০০; পত্রিকা প্রকাশনা ৪টি (The world of Learning 2005, London 2004, পৃ. ৮৫২-৮৬৩)।

১৯৪০ খৃ. প্রতিষ্ঠিত ইরানী অনুজীববিজ্ঞান সমিতি তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে কার্যনির্বাহ করিয়া থাকে। তেহরানস্থ ইরানী গণিত সমিতি ১৯৭১ খৃ. স্থাপিত হয়। সমিতি ৩টি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকে। তেহরানস্থ পশুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ১৯৩৩ খৃ. স্থাপিত হয়। এখানে ৫টি বিষয়ে গবেষণা করা হয়; ইহার গ্রন্থাগারে ৬,৪২৫টি পুস্তক ও ১৭৬টি পত্রিকা আছে। গবেষণা প্রকাশনা ১টি। বৃক্ষের পোকামাকড় ও রোগ-বালাই গবেষণা কেন্দ্রটি ১৯৪৩ খৃ. তেহরানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ৬টি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। কেন্দ্রটির গ্রন্থাগারে ইংরেজি ও ফার্সী ভাষার ৫৫,০০০ পুস্তক ও ৪৮০টি পত্রিকা রহিয়াছে। এখান হইতে ৪টি গবেষণা সাময়িকী প্রকাশিত হইয়া থাকে।

রাজি ভ্যাকসিন ও সিরাম গবেষণা কেন্দ্র ১৯৩০ খৃ. হেসারাক-এ প্রতিষ্ঠিত ইহার গ্রন্থাগারে ১৩,০০০ পুস্তক ও ৮০০ সাময়িকী আছে। কেন্দ্রটি ২টি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকে। বীজ ও বৃক্ষ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কারাজে অবস্থিত। রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক স্টাডি ইনস্টিটিউট ১৯৮৩ খৃ. তেহরানে স্থাপিত। এখানে অন্যান্য বিষয়ের সহিত মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য উপসাগর ও সেন্ট্রাল এশিয়ার ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে গবেষণা করা হয়। ইনস্টিটিউট আরবী, ইংরেজি ও ফার্সী ভাষায় ৬টি জার্নাল প্রকাশ করিয়া থাকে (পৃ. গ্র.)।

১৯৮০ খৃ. তেহরানে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় অধ্যয়ন ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে ৭০,০০০ পুস্তক আছে। ১৮৯৭ খৃ. তেহরানে প্রতিষ্ঠিত Institut Francais de Recherche en Iran-এর গ্রন্থাগারে ৩৫,০০০ পুস্তক আছে। এখানে ৩টি জার্নাল প্রকাশ করা হয়। তেহরানের জাতীয় মানচিত্র কেন্দ্র ১৯৫৩ খৃ. প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহার গ্রন্থাগারে ৪,০০০ পুস্তক ও ২,৫০০ প্রতিবেদন আছে; কেন্দ্রটি একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকে। ১৯২১ খৃ. প্রতিষ্ঠিত তেহরানের পাস্তুর ইনস্টিটিউটে ৮টি বিষয়ে গবেষণা শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইয়া থাকে। ইহার প্রকাশনার মধ্যে আছে ১টি বায়োমেডিকেল জার্নাল। তেহরানের নৃতত্ত্ব গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৩৭ খৃ. স্থাপিত হয়।

ইসলামিক গবেষণা ফাউন্ডেশন, ১৯৮৪ খৃ. মাশহাদে স্থাপিত হয়। এখানে ইসলামী বিষয়সমূহ, আল-কুরআন, হাদীছ, বিচারশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, ইসলামী টেক্সট সম্পাদনা এবং ইসলামী শিল্পকলার উপর গবেষণা করা হয়। ইহার গ্রন্থাগারে ৪৬,০০০ পুস্তক আছে; মিশকাত নামে একটি জার্নাল তাহাদের প্রকাশনার অন্তর্ভুক্ত।

**ইরানের গ্রন্থাগার ও আর্কাইভ** ঃ ইরানের ইস্পাহানে দুইটি গ্রন্থাগার রহিয়াছে। সেখানে ১৯৯১ খৃ. স্থাপিত পৌরসভা গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সংখ্যা ৬০,০০০। ইস্পাহান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ১,১২,১৫০। মাশ্হাদে ২টি গ্রন্থাগার রহিয়াছে। সেখানে ফেরদৌসী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তক সংখ্যা ২,৮০,০০০। আস্তানে কুদ্সে রাজায়ির ডকুমেন্টেন কেন্দ্র, গ্রন্থাগার ও যাদুঘর প্রতিষ্ঠানের (স্থাপিত ১৫শ শতাব্দী) ও ইহার ৩৩টি শাখা গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ২০,০০,০০০; পাণ্ডুলিপি ৬৫,০০০ এবং ৬০,০০,০০০ অন্যান্য দলীল-দস্তাবেজ। এখানে ৬৪ ভাষায় ৭৮,২০০ বিদেশী পুস্তক রহিয়াছে। তাবরীযের গ্রন্থাগার ৩টি ঃ তাবরীয গণ গ্রন্থাগার, তারবিয়াত গ্রন্থাগার, (স্থাপিত ১৯২১ খৃ.), পুস্তক সংখ্যা ২৯,৭৫০; এবং তাবরীয বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (স্থাপিত ১৯৬৭ খৃ.), পুস্তক সংগ্রহ ৯৫,৮৭১। তেহরানে ১৪টি লাইব্রেরী রহিয়াছে। শহীদ বেহেশতী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (স্থাপিত ১৯৬০ খৃ.) পুস্তক সংখ্যা ৩,১৫,৫২৯ জার্নাল প্রকাশনা ২টি। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (স্থাপিত ১৯৪৯ খৃ.), পুস্তকসংখ্যা ৮,৫০,০০০। আর্থ-সামাজিক ডকুমেন্টেশন ও প্রকাশনা কেন্দ্র (স্থাপিত ১৯৬২ খৃ.) চারটি সাময়িকী, তৎসহ ক্যাটালগ ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া থাকে। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের জাতীয় গ্রন্থাগার (স্থাপিত ১৯৩৭ খৃ.) পুস্তক সংখ্যা ৬,৮৪,৪৬৫, চারটি সাময়িকী প্রকাশ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ১৯২৩ খৃ. প্রতিষ্ঠিত ইরানের পার্লামেন্ট লাইব্রেরীতে ২,৭২,০০০ পুস্তক, ১,২০,০০,০০০ জাতীয় ও ঐতিহাসিক দলীল, মাইক্রোফিল্মে ১৩,৫০০ পাণ্ডুলিপি, ইত্যাদি আছে (পৃ. গ্র.)।

**ইরানের যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারী** ঃ ইস্পাহানে ২টি যাদুঘর রহিয়াছে। Armenian Museum of All Saviour's Cathedral (স্থাপিত ১৯৩০ খৃ.) প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ৭৫০টি, চিত্রকর্ম ৫৭০টি, পুস্তকসংখ্যা ২৫,০০০। অন্যটি চেহেল সাতুন যাদুঘর। মাশহাদের আস্তান কুদ্স যাদুঘর ১৯৪৫ খৃ. স্থাপিত হয়। ইহার ১০টি বিভাগের মধ্যে পবিত্র কুরআন যাদুঘর এবং আয়াতুল্লাহ খোমেনী প্রদত্ত নিদর্শনাদি উল্লেখযোগ্য। কোম্ম শহরের যাদুঘরটি ১৯৩৬ খৃ. স্থাপিত হয়, ইহা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে ন্যস্ত। শীরাযের যাদুঘরটি পার্স যাদুঘর নামে খ্যাত (স্থাপিত ১৯৩৮ খৃ.)। তেহরানে ৬টি যাদুঘর অবস্থিত। গুলিস্তান রাজপ্রাসাদ যাদুঘর (স্থাপিত ১৮৯৪ খৃ.), ইরান বোস্তান যাদুঘর (স্থাপিত ১৯৪৬ খৃ.), মালেক যাদুঘর (স্থাপিত ১৯৩৭ খৃ.), নৃতত্ত্ব যাদুঘর (স্থাপিত ১৮৮৮ খৃ.), পার্লামেন্ট যাদুঘর (স্থা. ১৯৯৯ খৃ.) এবং তেহরান সমকালীন শিল্পকলার যাদুঘর (স্থা. ১৯৭৭ খৃ.) (প্রাগুক্ত)।

**ইরানের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে** শিক্ষার মাধ্যম ঃ ফার্সী ও ইংরেজি। এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

১. আহওয়ায জন্দিশাহপুর চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ১৯৮৮ খৃ. ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ২. আল-যাহ্রা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ১৯৬৫ খৃ. ইহা তেহরানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮১ খৃ. এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম পরিবর্তন করা হয়। ৩. আল্লামা তাবাতাবাঈ বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ১৯৮৪ খৃ. ইহা তেহরানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪. আমীর কাবীর প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ঃ (স্থাপিত ১৯৫৮ খৃ.) ইহা তেহরানে অবস্থিত। ৫. শিল্পকলা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ১৯৮০ খৃ. ইহা তেহরানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬. বু-আলি সিনা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ১৯৭৩ খৃ. ইহা হামাদানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭. ফেরদৌসী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ১৯৫৬ খৃ. ইহা মাশহাদে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮. গীলান বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ১৯৭৭ খৃ. ইহা রাশতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯. চিকিৎসা বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক ইরান বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৭৪ খৃ. ইহা তেহরানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০. ইরান প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৮ খৃ. ইহা তেহরানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১১. ইস্পাহান বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপিত ১৯৫০ খৃ.। ১২. ইস্পাহান চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপিত ১৯৫০ খৃ.। ১৩. ইস্পাহান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপিত ১৯৭৭ খৃ। ১৪. ইসলামিক আযাদ (উন্মুক্ত) বিশ্ববিদ্যালয়, তেহরানে, স্থাপিত ১৯৮২ খৃ.। ১৫. কে. এন. তূসী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপিত তেহরানে, ১৯২৮ খৃ.। ১৬. কেরমানশাহ চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপিত ১৯৮৬ খৃ.। ১৭. মাশহাদ চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপিত ১৯৪৫ খৃ.। ১৮. মাযানদারান বিশ্ববিদ্যালয়, স্থা. বাবলসার ১৯৮০ খৃ.। ১৯. পায়ামে নূর বিশ্ববিদ্যালয়, তেহরান, স্থাপিত ১৯৮৭ খৃ.। ২০. পেট্রোলিয়াম প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, তেহরান, স্থাপিত ১৯৩৯ খৃ.। ২১. রাযী বিশ্ববিদ্যালয়, কেরমানশাহ, স্থাপিত ১৯৭৪ খৃ.। ২২. সিমনান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপিত ১৯৮৯ খৃ., এখানে ৪টি অনুষদে পাঠদান করা হয়। ২৩. শাহেদ বিশ্ববিদ্যালয়, তেহরান, স্থা. ১৯৮৯ খৃ.। ২৪. কিরমানের শাহিদ বাহানোর বিশ্ববিদ্যালয়, স্থা. ১৯৭৪ খৃ.। ২৫. শহীদ বেহেশতী বিশ্ববিদ্যালয়, তেহরান, স্থাপিত ১৯৫৯ খৃ.। ২৬. শহীদ বেহেশতী মেডিকেল ও স্বাস্থ্য সেবা বিশ্ববিদ্যালয়, তেহরান, স্থা. ১৯৮৬ খৃ.। ২৭. শহীদ সাদৌঘি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, য়াযদ, স্থা. ১৯৮৩ খৃ.। ২৮. শহীদ কামরান বিশ্ববিদ্যালয়, খুজিস্তান, স্থা. ১৯৫৫ খৃ; ২৯. শাহরেকোরদ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, স্থা. ১৯৮৬ খৃ.। ৩০. শারীফ

প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, তেহরান, স্থা. ১৯৬৫ খৃ.। ৩১. শীরায বিশ্ববিদ্যালয়, স্থা. ১৯৪৬ খৃ.। ৩২. তাবরীয মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, স্থা. ১৯৮৫ খৃ.। ৩৩. তাবরীয বিশ্ববিদ্যালয়, স্থা. ১৯৪৬ খৃ.। ৩৪. তারবিয়্যত মুদাররিস বিশ্ববিদ্যালয়, তেহরান, স্থা. ১৯৮২ খৃ.। ৩৫. তেহরান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, তেহরান, স্থা. ১৯৮৬ খৃ.। ৩৬. তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়, স্থা. ১৯৩৪ খৃ.। ৩৭. উরমিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, স্থা. ১৯৬৫ খৃ.। ৩৮. য়াযদ বিশ্ববিদ্যালয়, স্থা. ১৯৮৮ খৃ.।

**ইরানের মহাবিদ্যালয় সমূহ ২০০৫ খৃ. ঃ** ইরানে ৫০টি উচ্চশিক্ষা কলেজ ও ৪০টি প্রযুক্তি বিষয়ক ইনস্টিটিউট রহিয়াছে।

**ইরানের দৈনিক সংবাদপত্রসমূহ ২০০৫ খৃ. ঃ** ইরানের অধিকাংশ দৈনিক সংবাদপত্র তেহরান হইতে প্রকাশিত হয়। ঐগুলির ভাষা ফার্সী। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৈনিক সংবাদপত্রের বিবরণ দেওয়া হলো ঃ ১. রায়হান, স্থা. ১৯৪১ খৃ., প্রচার সংখ্যা ৩,৫০,০০০। ২. ইত্তেলা'আত (তথ্য), স্থা. ১৯২৫ খৃ, প্রচার সংখ্যা ৫,০০,০০০। ৩. আফতাবে য়াযদ, স্থা. ২০০০ খৃ., প্রচার সংখ্যা ১,০০,০০০। রিসালাত, স্থা. ১৯৮৫ খৃ., প্রচার সংখ্যা ১,০০,০০০। অন্যান্য দৈনিকগুলির মধ্যে আছে ঃ আবরার, আলিক, বাহার, ফাতহ (বিজয়), গুলিস্তানে ইরান, হায়াতে নাও, ইংরেজি দৈনিক Iran News, স্থা. ১৯৯৪ খৃ., প্রচার সংখ্যা ৩৫,০০০, খোরাসান, খোরদাদ, নিশাত, রাহে নাজাত, সালাম, সুবহে ইমরুয এবং ইংরেজি দৈনিক Tehran Times. (The Europa world yearbook, London 2006. পৃ. ২১২৪)।

**ইরানের সাময়িকীসমূহ ঃ** ইরানের উল্লেখযোগ্য সাময়িকীসমূহের মধ্যে আছে ঃ দোনায়ে ভারযেশ, প্রচার সংখ্যা ২,০০,০০০; ইত্তেলা'আত-জাবালা, স্থা. ১৯৬৬ খৃ. প্রচার সংখ্যা ১,২০,০০০; কায়হান বাচ্চা (শিশু জগত) স্থা. ১৯৫৬ খৃ. প্রচার সংখ্যা ১,৫০,০০০; ইসলামী পত্রিকা মাহজুবা এবং ইত্তেলা'আত-ইসলামী স্থা. ১৯৮৫ খৃ., প্রচার সংখ্যা ৭৫,০০০। অন্যান্য সাময়িকী পত্রিকাসমূহের মধ্যে আছেঃ আশূর, Auditor, Bulletin of the National Film Archive of Iran, দানিশমান্দ, The Eco of Iran, Echo of Islam, Iran Tribune, Iranian Cinema, Music Iran, যানে রূয (আজকের নারী), ফারহাঙ্গে ইরান যামিন ইত্যাদি (পৃ. গ্র.)।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) The world of Learning 2005, 54th edition, volume I, London and New york 2004, 852-863, (২) Article Iran in the Europa world yearbook, London 2006, (৩) Article Iran in the Encyclopedia Americana, International Edition, Connecticut 2006, (৪) Article Iran in Britannica Book of the Year, Chicago 2006; (৫) Article Iran in The world Almac and Book of Facts, New York 2006, (৬) Article Iran in the New Encyclopaedia Britannica, Chicago 2006, (৭) Abrahamian, Ervand, Iran Between Two Revolutions, Priceton chiv. Press 1982; (৮) Akhavi, Shahrough, Religion, and politics in contemporary Iran, State view of New York Press 1980; (৯) Shaul Bahhash, The Reign of the Ayatollahs, Iran and the Islamic Revolution (1984; repriat Basic BKS. 1986); (১০) Beeman, william o., Language, status and Power in Iran, Ind. Univ, Press 1986; (১১) Beham, M. Reza, Cultural Foundations of Iranian Politics, Univ of Utah Press 1986; (১২) Fischer, Michael M., Iran : From Religious Dispute to Revolution, Harvard Uuiv. Press 1982, (১৩) Frye, Richard v., The Golden Age of Persia, weidenfeld & Nicholson London 1975; (১৪) Hoogluad, Eric J., Land and Revolution in Iran, 1960-1980, Uuiv. of Texas Press 1982, (১৫) Isuaed, Tareq Y., Iraq and Iran : Roots of Conflict, Syracuse Univ. Press 1982; (১৬) Keddie, Nikki R., and Richard, Yann, Roots of Revolution, Yale chiv. Press 1981; (১৭) Khomeini, Ruhullah, Islam and Revolution, Mitau Press, Berkeyley, 1981, (১৮) Limbert, John W., Iran, Westview Press 1985; (১৯) Savory, Roger M., Iran Uuder the Safavids, Cambridge 1980; (২০) Yarshater, Ehsan ed., The Cambridge History of Iran, 2 vols., Cambridge 1983; (২১) Principal Towus of Iran, in the UN Demographic Yearbook 2006; (২২) Birth and Deaths of Iran, in the UN, world population Prospects 2006; (২৩) Fishing in Iran, in the FAO yearbook of Fishery Statistics, 2006; (২৪) Mining, in the IMF, Islamic Republic of Iran : Statistical Appendix 2006; (২৫) Industry of Iran, in the UN, Industrial Commodity Statistics yearbook 2006; (২৬) Finance of Iran, in the IMF, International Financial Statestics 2006; (২৭) Railways and Road Traffic of Iran, in the International Road Federation, world Road Statistics 2006; (২৮) Merchant Fleet of Iran, in Lloyd's Register-Fairplay, World Fleet statistics 2006; (২৯) Civil Aviation of Iran, in the UN Statistical yearbook 2006; (৩০) Foreign Tourist Arrivals in Iran, in the world tourism organization, Yearbook of Tourism statistics 2006; (৩১) Education in Iran in the UNDP Human development report 2006; (৩২) M. Ismail Marcinkowski, Persian Historiography and Geography : Bertold Spuler on Major works produced in Iran, caucasus, central Asia, India and Early ottoman Turkey, ISBN 9971774887,

2003; (৩৩) Isabella Bird, Journeys in Persia and Kurdistan, Vol. I, Reprint, Viagra Press, London 1988; (৩৪) Stephen Kinzer, All the shah's Men : An American coup and th roots of Middle East Terror, ISBN 0471265179, 2003; (৩৫) Zarin Behravesh Pakigezi, History of the Christians in Iran, Sooner printing Ine., Oklahoma city 2006; (৩৬) History of Iran, From wikipedia, the free encyclopedia, in the internet google search 2006; (৩৭) The History of Iran in the internet at iranologity. com 2006; (৩৮) T.R. Robinson Alexander and the Ganges : The Text of Didorus XVIII 6.2, in the Ancient History Bulletin, 7.4 (1997) 84-89' (৩৯) Guity Nashat, ed., women in Iran from the Rise of Islam to 1800, University of Illinois at Chicago 2006; (৪০) Janet Afary, The Iranian Coustitutional Revolution of 1906-11 : Grassroots Democracy, Social Democracy and the Origins of Feminism, USA 2006; (৪১) Lois Beck, Nomad : A year in the life of a Quasqa'i Tribesman in Iran, Wasington University Press, New Haven 1986; (৪৩) Terror and Tehran : Chronology U.S. Iran Relations 1906-2002, in the internet google search 2006; (৪৪) পারভীয নাতেল খান্‌লারী, তারীখে যাবানে ফার্সী, ১ম খণ্ড, তেহরান ১৯৮০ খৃ.; (৪৫) হাসান আবিদীন, ইরানে গল্প সাহিত্যের শতবর্ষ, ১ম ও ২য় খণ্ড, তুন্দর প্রকাশনা, ইরান ১৯৯০ খৃ.; (৪৬) ইরান ও বিশ্বযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস পর্যালোচনা বিষয়ক সেমিনারের প্রবন্ধ সংকলন, ইসলামী বিপ্লবের পঙ্গু বিষয়ক ফাউন্ডেশন, তেহরান ১৯৯৩ খৃ.; (৪৭) ড. মুহসিন আবু'ল কাসিমী, তারীখে যাবানে ফার্সী, ৩য় প্রকাশ, সেমাত পাবলিকেশন্স, তেহরান ২০০১ খৃ.; (৪৮) ঐ লেখক, তারীখে মুখতাসার যাবানে ফার্সী, তাহুরী লাইব্রেরী, তেহরান ১৯৯৮ খৃ.; (৪৯) মুহাম্মাদ তাকী বাহার, সাবাক শিনাসী, আমীর কাবীর পাবলিকেশন্স, তেহরান ১৯৯৪ খৃ.; (৫০) আবদুস সাত্তার, ফারসী সাহিত্যের কালক্রম, দ্বিতীয় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৭ খৃ.; (৫১) নূর হোসেন মজিদী, অনু. ইরানের সমকালীন ইতিহাস, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৯৬ খৃ.; (৫২) এ. এম. আরানাক্‌সকী, মুকাদ্দামে মে ফিকহুল লুগাতে ইরানী, অনু. কারীম কেশাভারসী, তেহরান ১৯৫৬ খৃ.; (৫৩) আলী যামী, তামাদ্দুনে সাসানী, ১ম খণ্ড, শীরায ১৯৬৩ খৃ.; (৫৪) Shaked S. Specimens of Middle Persian Verse, in W.B. Henning Memorial Volume, London 1970; (৫৫) মুহাম্মাদ কারীম পীরনিয়া, ইরানের ইসলামী স্থাপত্য কলা পরিচিতি, ইরানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, তেহরান ১৩৭২ ফাঃ সাল; (৫৬) Achievements of the Islamic Revolution of Iran, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৮৬ খৃ.; (৫৭) ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মজলিসে শুরা, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৮৬ খৃ.; (৫৮) আহমদ ইয়াহিয়া খালেদ, ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সাফল্য, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৮৫ খৃ.; (৫৯) Tehran Times, Tehran Jan-Dec 2005; (৬০) The Financial Express, Dhaka January 2005, April 2006; (৬১) Iranian Studies : The Persian Literature Masterpieces, Centre of Iranian Research in the University of Beijing, China 200; (৬২) Alexander, Yonah and Allan Nanes (eds)., The United States and Iran : A Documentary History, Maryland 1980; (৬৩) Algar, Hamid, Religion and state in Iran in 1785-1906 : The Role of the Ulama in the Qaijar Period, Berkeley and Los Angels 1969; (৬৪) Hossain Amirsadeghi, Twentieth century Iran, London 1977; (৬৫) Amnesty International, Iran : Documents Sent by Amnesty International to the Government of the Islamic Republic of Iran, London 1987; (৬৬) A.J. Arberry, The Legacy of Persia, Oxford 1953; (৬৭) Hassan Arfa, Under Five Shahs, London 1964. (৬৮) Said Amir Arjomand (ed.), From Nationalism to Revolutinary Islam : Essays on Social Movement in the contemporary Near and Middle East, Albany 1984; (৬৯) ঐ লেখক, The Shadow of God and the Hidden Imam, Chicago 1984; (৭০) Shaul Bakhash, Iran : Monarchy, Bureaucracy and Reform under the Qajars 1858-1896, London 1978, (৭১) Badr ol-Muluk Bamdad, From Darkness into Light : women's Emancipation in Iran, (সম্পা. এবং অনু. F.R.C. Bagley), New york 1977; (৭২) Hossein Bashiriyeh, The state and Revolution in Iran, 1962-1982., New York 1984; (৭৩) Mangol Bayat, Misticism and Dissent : Sociorcligious thought in Qajar Iran, Syracuse 1982, (৭৪) E.A. Bayne, Persian Kingship in Transition, New york 1968; (৭৫) Julian Bharier, Economic Development in Iran, 1900-1970, New york 1971; (৭৬) James a Bill, "Iran : Is the Shah Pushing It too Fast ?" Christian Science Monitor, 9 November, 1977, 16-17; (৭৭) ঐ লেখক, Iran : The Politics of Groups, classes and Modernization, Ohio 1972; (৭৮) Leonard Binder, Iran : Political Development in a changing society, Berkeley and Los Angeles 1962; 994-1040, Edinburgh 1963;

(৭৯) C.E. Bosworth, The Medival History of Iran, Afghanistan and Central Asia, London 1977; (৮০) ঐ লেখক, (সম্পা.), Iran and Islam, Edinburgh 1971; (৮১) R. M. Burrell, "Iranian Foreign Policy During the Last Decade," Asian Affairs, London February 1974, 7-15; (৮২) Warren Christopher (ed.), American Hostages in Iran, New Haven 1985; (৮৩) Shahram chubin, and sepehr, The Foreign Relations of Iran : A Developing state in a Zone of Great power confict, Berkeley and Los Angels, 1974; (৮৪) R.I. Jan Cole, and Nikki R. Keddie (eds.), Shi'ism and Social Protest, New Haven 1986; (৮৫) Richard w. cottan, Nationalism in Iran, Pittsburgh 1964; (৮৬) George Curzon, Persia and the Persian Question, London 1966; (৮৭) Fereidun, Development of Iranian Oil Industry : International and Domestic Aspects, New York 1976; (৮৮) R. Ghirshman, Iran : From the Earliest Times to the Islamic Conquest, London 1954; (৮৯) Robert Graham, Iran : The Illusion of Power, London 1978; (৯০) Abdul Hadi Hairi, Shi'ism and constitutioanalism in Iran, Leiden 1977; (৯১) Fred Halliday, Iran : Dictatorship and Development, New York 1979; (৯২) Mohamed Haikel, The Retern of the Ayatollah, London 1981; (৯৩) Ferdoun Hoveyda, The Fall of the Shah, London 1979; (৯৪) J. Jacqz (ed.), Iran, Past, present and Future, New York, 1976; (৯৫) Homa Katouzian, The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseduo Modernism, 1926-1979, New York 1981; (৯৬) Farhad Kazemi, Poverty and Revolution in Iran : the Migrant Poor, Urban Marginality and Politics, New York 1980; (৯৭) R. Niki Keddie, Iran : Religion, Politics and Society, London 1980; (৯৮) Elie Kedouri and Sylvia Haim (eds.), Towards a Modern Iran : Studies in Thought, Politics and Society, London 1980; (৯৯) Bruee R. Kunnildum, The Origins of cold war in the Middle East : Great Power conflict and Diplomacy in Iran, Turkey and Greece, Princetou 1980; (১০০) Habib Ladjevardi, Labor Unions and Autocracy in Iran, Syracuse 1985; (১০১) Michael Ledeen, and william Lewis, Debacte : The American Failure in Iran, New York 1981; (১০২) George Lènczowski, Russia and the west in Iran, 1918-1948, Ithaca 1949; (১০৩) Roy P. Mottechediws The Moutle of the Prophet : Religion and Politics in Iran, New York 1985; (১০৪) Authony Persons, The Pride and the Fall : Iran, 1974-1979, London 1984; (১০৫) Ruhollah K. Ramazani, The Persian Gulf : Iran's Role, Charlottes ville 1972; (১০৬) ঐ লেখক, Revolutionary Iran : Challenge and Response in the Middle East, Bltimore 1986; (১০৭) Barry Rubin, Paved with Good Intensions : the American Experience and Iran, Oxford 1982; (১০৮) Amin Saikal, The Rise and Fall of the Shah, Princeton 1980; (১০৯) Gary Sick, All Fall Down : America's Tragic Ecounter with Iran, New York 1985; (১১০) John D. Stempel, Inside the Iranian Revolution, Bloomington 1981; (১১১) Joseph M. Upton, The History of Modern Iran, Harvard University Press 1960; (১১২) Mervin Zonis, The Political Elite of Iran, Princeton 1971; (১১৩) Iran-Bibliography, in the U.S. Library of Congress, Washington D.C. 2006; (১১৪) Dr. Kiyanoosh Kiyani Haftlang, The Book of Iran, A Survey of the Geography of Iran, Tehran 2003; (১১৫) শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মুতাহ্হারী, অনু. এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর, ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান, ঢাকা ২০০৪ খৃ.।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

**ইরানী** (দ্র. মুগলগণ)

**'ইরাফা** (দ্র. 'আরীফ, কিহানা)

**ই'রাব** (اعراب) ঃ 'আরবী ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ, যাহাকে কখনও ইংরেজীতে inflexion বলা হয় (G. Flugel, Diegram, Schukn, 15)। 'আরবী শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহার শেষ হরফে স্বরের পরিবর্তন ঘটে। যেমন زَيْدٌ جَاءَ زَيْدًا رَأَيْتُ بِزَيْدٍ مَرَرْتُ এখানে زيد শব্দটির শেষ হরফ দাল (د)-এর স্বরের বিভিন্ন পরিবর্তন হইয়াছে। সাধারণত কর্তৃকারকে পেশ, কর্মকারকে যবর এবং বিভক্তি (হুরূফ জারর যেমন من ، ل ، ب ইত্যাদি) ব্যবহারের সময় যের দ্বারা স্বর প্রকাশিত হইয়া থাকে। শেষ হরফের পরিবর্তন সূচক হারাকাত-কে ই'রাব বলা হয়। যে শব্দটি এই ধরনের পরিবর্তন গ্রহণ করে সেইটিকে বলা হয় মু'রাব (معرب)। তবে 'আরবী ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দ আছে যেগুলি কোন পরিবর্তন গ্রহণ করে না। এইগুলির শেষ হরফ সর্বাবস্থায় একইরূপ থাকে। এইগুলিকে বলা হয় মাবনী (مبنى), যেমন هؤلاء।

অনেক সময় ই'রাব (পেশ [ ], যবর [ ], যের [ ]) ا–و–ى হরফ-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হইয়া থাকে আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় সাধারণত পেশ ও و -এর মাধ্যমে ই'রাব প্রকাশকে রাফ' (رفع) এবং পরিবর্তিত শব্দটিকে মারফূ' (مرفوع), যবর ও الف -এর মাধ্যমে

ই'রাব প্রকাশ করাকে নাসাব (نصب) এবং পরিবর্তিত শব্দটিকে মানসূব (منصوب), যের ও ى-এর মাধ্যমে ই'রাব প্রকাশকে জার্র (جر) এবং পরিবর্তিত শব্দটিকে মাজরূর (مجرور) বলা হইয়া থাকে। তবে কিছু ক্ষেত্রে (দ্বিবচনে) الف-এর মাধ্যমে (جَاءَ مُسْلِمَانِ) রাফ' এবং ي-এর মাধ্যমে নাসাব ও

জারর (رأيت مسلمين مررت بمسلمين)-এর প্রকাশ হইয়া থাকে।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) সীবাওয়ায়হ, ১খ, পরিচ্ছেদ ২ (প্যারিস সংস্করণ); (২) ইবনু'ল-আনবারী, আসবারু'ল-'আরাবিয়্যা, সম্পা. C.F.Seybold, পরিচ্ছেদ ২-৬ পৃ. ৪০-১, এই বিষয়ের একটি উৎস পরিচিতি এবং বাসরী ও কূফীদের মধ্যকার মতবিরোধ আলোচিত হইয়াছে; (৩) যাজ্জাজ, আল-ঈদাহ ফী 'ইলালি'ন-নাহ্ব, কায়রো ১৩৭৮/১৯৫৮, এবং ইবনু'ল- আনবারী, কিতাবু'ল-ইনসাফ, সম্পা. G. Weil, প্রশ্ন ৩, দ্বিবচন ও বহুবচন; (৪) আবু'ল-বাকা' আল-'উকবারী, আল-মাসা'ইলু'ল-খিলাফিয়্যা ফি'ন- নাহ্ব (পাণ্ডু. কায়রো, ২খ., ১৫৮), সম্পা. ও সংকলন C. Petraitis, সংক্ষিপ্ত ব্যাকারণগত প্রবন্ধ; (৫) ইবনু'স-সার্রাজ, আল-মূযাজ ফি'ন-নাহ্ব, বৈরূত ১৩৮৫/১৯৬৫, পৃ. ২৮; (৬) যাজ্জাজী, জুমাল, প্যারিস ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ১৮-২১। বিস্তৃত আলোচনা ঃ (৭) ইব্ন মালিক, আলফিয়্যা, চরণ ১৫-৫১ এবং ইব্ন 'আকীল-কৃত শারহ (ব্যাখ্যা), ১খ., ২৬-৭৬ (২৬-৭৬, সম্পা. মুহয়িদ-দীন 'আবদু'ল-হামীদ, কায়রো ১৩৭০/১৯৫১); (৮) যামাখশারী, মুফাসসাল, শা. ১৫-৮, ১৫৯ (২য় সংস্কৃরণ, J.P Broch) এবং ইব্ন য়া'ঈশ-কৃত শারহ, পৃ. ৫৭-৮৮, ৪০০-৫ (সম্পা. G. Jahn); (৯) রাদিয়্যু'দ-দীন আল-আসতারাবাদী, শারহু'ল-কাফিয়া, ১খ, ১৪-৩০, ২খ, ২-৩, ২০৯-১৫ (ইস্তাম্বুল ১২৭৫ হি.)।

H.Fleisch ও সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/ মোঃ রেজাউল করিম

**ইরাম** (ارم) ঃ একটি গোত্র বা স্থানের নাম।

(১) ইরাম নামক একটি গোত্র প্রাচীন কবিতায় কয়েকবার উল্লিখিত হইয়াছে (J. Horovitz, Koranische Untersuchugen, বার্লিন ১৯২৬ খৃ., পৃ. ৮৯ পৃ. বারটির অধিক হাওয়ালা দিয়াছেন)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহাকে 'আদ-এর সহিত সংশ্লিষ্ট করা হইলেও মাঝে মাঝে ইহাকে ছামূদ, হিম্‌য়ার ইত্যাদির সহিত সম্পর্কিত করা হয় এবং কথিত আছে যে, কুদার আল-আহ্‌মার (উহায়মির) নামক জনৈক ব্যক্তি ইহার ধ্বংস সাধন করে। এই অর্থে ইরাম একটি প্রাচীন 'আরবী গোত্র। আল-হারিছ ইব্‌ন হিল্লিযা তাঁহার মু'আল্লাকা-তে (৬৮ লাইন) বিশেষণরূপে "প্রাচীন কোন বংশের লোক" অর্থে ইরামী শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন (তু. আত-তিব্‌রীযী, যথাস্থানে)। যখন মুসলিম বিদ্বানগণ প্রাচীন 'আরব বংশ-তালিকার সহিত বাইবেলীয় বংশ-তালিকার যোগসূত্র স্থাপন করিতে শুরু করেন, তখন ইরামকে তাহারা শেম-এর পুত্র আরাম (Genesis, ১০,২২ f.; I. Chronicles, i, 17) বলিয়া চিহ্নিত করেন এবং 'আরবের বিভিন্ন প্রাচীন জনগোষ্ঠীকে ইরাম-এর বংশধররূপে সনাক্ত করেন। এইভাবে 'আদ (দ্র.) 'আও স ইব্‌ন ইরাম-এর পুত্র (তু. বাইবেলের Uz) এবং ছামূদ (দ্র.) 'আবির ইব্‌ন ইরাম-এর পুত্র। 'আমালিক (দ্র.) বা Amalekites-কে 'আম্‌লীক (বা 'ইমলাক) ইব্‌ন লাওধ (তু. Lud) ইরাম-এর বংশোদ্ভুত। কথিত আছে যে, লাওধ এর অপর এক পুত্র Uwaym পারস্য দেশে গমন করেন এবং সময় সময় তাঁহাকে Gayomart বলিয়া সনাক্ত করা হয় (ইব্‌ন হিশাম, ৫; মাস্'উদী, মুরূজ, ১খ, ৭৭ পৃ.; ইত্যাদি)।

(২) ভৌগোলিক পরিভাষায় ইরাম-এর সঠিক অর্থ পথ নির্দেশকরূপে স্থাপিত একটি প্রস্তর স্তূপ। য়াকূত (মু'জাম, ১খ., ২১২-৬) 'আরবের একটি পাহাড় ও এই নামের একটি স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন (তু. Th. Noldeke, Funf Moallaqat, ১খ, ৭৮)। মুসলিম 'আলিমগণ যখন 'ইরামা যাতিল-'ইমাদ'-কে একটি শহররূপে গণ্য করেন তখন তাঁহারা বেশীর ভাগ ইহাকে দামিশকরূপে সনাক্ত করেন। ইহার কারণরূপে অনুমান করা হয় যে, সিরিয়ার উক্ত অঞ্চল হিব্রুতে আরাম নামে অভিহিত। তবে কিছু সংখ্যক পণ্ডিতের মতে ইহা আলেকজান্দ্রিয়া অথবা য়ামানের কোন একটি স্থান (য়াকূত, পৃ. স্থা.)।

(৩) শব্দটি কুরআন মাজীদে একবার উল্লিখিত হইয়াছে (৮৯ ঃ ৬)। এই অনুচ্ছেদটির শব্দগত অর্থ এবং কয়েকটি শব্দের ব্যাকরণগত গঠন উভয়ই মুফাস্‌সিরগণের জন্য খুবই অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে। কেহ কেহ পাঠ করেন عاد ارم, তাঁহারা ইরাম-কে مضاف اليه-রূপে গণ্য করেন এবং বলেন, ইরাম 'আদ-এর রাজধানী। সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য মত 'ইরাম' একটি গোত্রের নাম, ইহা 'আদ-এর بدل (in apposition)-এর 'ইমাদ অর্থ তাঁবুর খুঁটি অথবা দৈর্ঘ্য। তাবারীর মতে ইরাম 'আদ-এর একটি উপগোত্র। পরবর্তীতে মুসলিম 'আলিমগণ ইরামকে একটি শহর অর্থে গ্রহণ করা শ্রেয় মনে করেন এবং যাতি'ল-'ইমাদ অর্থ "স্তম্ভযুক্ত"করা হয়। এইগুলি দামিশ্‌কের মর্মর-স্তম্ভ বলিয়া কথিত। "ইরামা যাতি'ল 'ইমাদ"-এর যে বিশদ এবং ক্রম সম্প্রসারণশীল বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। একটি প্রচলিত কাহিনীতে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিভাবে ইহা এডেনের সন্নিকটে শাদ্দাদ ইব্‌ন 'আদ কর্তৃক নকল বেহেশতরূপে নির্মিত হয় এবং স্পর্ধার শাস্তিস্বরূপ প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে কিরূপে ইহা ধ্বংস হয় এবং শহরটি বালিকাস্তূপে সমাহিত হয় (য়াকূত, পৃ. স্থা.)। অপর একটি কাহিনীতে পাওয়া যায়, আলেকজান্ডার দি গ্রেট আলেক- জান্দ্রিয়াতে একটি মর্মর স্তম্ভশোভিত প্রকাণ্ড সৌধের ধ্বংসাশেষের সন্ধান পান এবং ইহাতে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি অনুসারে তিনি অবগত হন, ইহা প্রথম "ইরামা যাতি'ল-'ইমাদ"-এর একটি প্রতিরূপ হিসাবে নির্মিত হয়। অপর একটি কাহিনীতে আছে, মু'আবিয়া (রা)-এর আমলে এক বেদুঈন কিভাবে বালুকা স্তরে আশ্চর্যজনক ধ্বংসাবশেষসমূহের সন্ধান পাইয়াছিল।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) কুরান, ৮৯ ঃ৬-এর ভাষ্য; (২) মাস্'উদী, মুরূজ, ২খ., ২৪১; (৩) ঐ লেখক, ৩খ., ৮০ প.; (৪) ঐ লেখক, ৪খ., ৮৭ প.; (৫) তাবারী, Annals, ১খ., ২১৪, ২২০, ২৩১, ৭৪৮।

W. Montgomery Watt. (E.I.²)/মুহাম্মদ ইমাদু'দ্দীন

**ইলগায** (দ্র. মু'আম্মা)

**ইলগাযী** ঃ মৃ. ১১২২ খৃ., প্রথম ক্রুসেডোত্তর যুগের প্রধান মুসলিম নেতা (আমীর)। আর্তুকের পুত্র ও আতাবেগ সুকমানের ভ্রাতা। বাগদাদের

Contents



কোতোয়াল। মারদীন-এ জায়গীর পান (১১০৮)। এডেসার প্রথম অবরোধে (১১১০) যোগ দেন, কিন্তু মাওসিল বা মসুলের আমীর আল-বুরাস্কির প্রতি ঈর্ষাবশত দ্বিতীয় অবরোধে (১১১৪) সরিয়া থাকেন। আলেপ্পোর মালিকানা লইয়া (১১১৮) পূর্ণোদ্যমে জিহাদে অবতীর্ণ হন। আলেপ্পোর চাবি আসারিব ও জারিদনাসহ বহু দুর্গ হস্তগত করেন; বালাতের যুদ্ধে অ্যানটিয়ক-এর রাজা পরাজিত ও নিহত হন। দানিমে (১১১৯) জয়-পরাজয় অনিশ্চিত থাকিলেও আলেপ্পো নিরাপদ হওয়ায় এই অভিযান সফল হয়। প্রথম ক্রুসেডে কেবল দুই-একটি জয়লাভই ইহার সহিত তুলনীয়। ইহার পরেও ক্রুসেডারদের সহিত তাঁহার অনেক যুদ্ধ হয়। শেষে তিনি রাজ্যাংশ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করেন (১১২১)। দেড় মাস (রোগ) শয্যাগত থাকিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। যুগপৎ আলেপ্পো ও মারদীন-এর মালিক হওয়ায় তাঁহার আমলে সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার সম্পর্ক পূর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর হয়। ক্রুসেডারগণ তাঁহারই নিকট সর্বপ্রথম প্রচণ্ড বাধা পায়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত (১১২২-২৪) হন বালাক (BalaK) যিনি ১১২৩-এ জেরুসালেমের ২য় বলডুইনকে বন্দী করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) W. B. Stevenson, Cruasders in the East, বাংলা বিশ্বকোষ।

**ইল্জা' অথবা তাল্জি'আ** (إلجاء أو تلجئة) ঃ উপরওয়ালা কর্তৃক অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রতিরক্ষার একটি পদ্ধতি। এই সম্পর্কে দ্র. দায়'আ (ضيعة) এবং হিমায়া (حماية) নিবন্ধ দুইটি এবং ইহাদের গ্রন্থপঞ্জীর সহিত যোগ করিতে হইবে Y. Linant de Bellefonds, Volonte interne et volonte declaree en droit musulman in Revue lntern. de Droit Compare, ১০খ (১৯৫৮খৃ.), ৫১৩ (করারোপ, বাজেয়াপ্তি ইত্যাদির আশংকা হইতে প্রতিরক্ষা লাভের লক্ষ্যে আইন গ্রন্থে যেই ভুয়া বিক্রয় চুক্তির উল্লেখ আছে উহাই তাল্জি'আ); কিন্তু সংকট অতিক্রান্ত হইলে সম্পত্তিটি কিভাবে পুনরুদ্ধার করা যাইবে তৎসম্পর্কে প্রশ্ন রহিয়া যায়।

CL. Cahen (E.I.2)/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

**ইলতিযাম** (দ্র. লুযূম মালা য়ালযান)

**ইল্তিযাম** (التزام) ঃ এক শ্রেণীর করভিত্তিক কৃষি জোত বা খামার, যাহা 'উছমানী সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল। সার্বিকভাবে উছমানী 'ইলতিযাম সম্পর্কে দ্র. মুলতাযিম।

ইল্তিযাম একটি কৃষি জোত ব্যবস্থা যাহা মিসরে মুহাম্মাদ 'আলী কর্তৃক এককেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী ছিল। তাঁহার শাসনামলের আগে ইল্তিযামগুলির মঞ্জুরী এক বৎসর বা বড়জোর কয়েক বৎসর মেয়াদের জন্য নহে, বরং আজীবনের জন্য দেওয়া হইত। এই ইলতিযাম উত্তরাধিকারযোগ্য কিংবা হস্তান্তরযোগ্য হইতে পারিত। ফলে রাষ্ট্র কৃষি রাজস্বের একটি অংশ হইতে বঞ্চিত হইত। এই ইলতিযাম ক্ষমতার নূতন সব উৎসের অভ্যুদয়ের বুনিয়াদ হিসাবেও কাজ করিত। ঐ সময়ের যাহারা মুলতাযিম বা ইল্তিযাম মালিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হিসাবে গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিলেন তাহারা ছিলেন গোত্রপতি শায়খ ও 'উলামা শ্রেণীর লোক। তাহারা ইল্তিযামের মালিক হিসাবে প্রচুর ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত করেন এবং বিরাট রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হন (জাবারতী, ৪খ, ৬৮)।

মিসরে ফ্রান্সের দখলদারীর সময় এই ইল্তিযাম ব্যবস্থা (তু. El Mouelhy, in BIE xxx (1949), 197-228) উচ্ছেদের একবার উদ্যোগ নেওয়া হয়, কিন্তু পরে আবার ইহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। মুহাম্মাদ 'আলী পাশা তাঁহার শাসনামলের প্রথমদিকের বৎসরগুলিতে চাষীদের উপর ক্রমবর্ধমান হারে করারোপ (ইল্তিযাম মালিকদের মাধ্যমে নয়) করেন এবং মুলতাযিমদের ফাইজ বা লাভের অংশটি বাজেয়াফ্ত করেন। খৃষ্টীয় ১৮০৮-১০ সনের দিকে যেসব মুলতাযিম তাহাদের সরকারকে দেয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয় তাহাদের সমুদয় ইল্তিযাম বাজেয়াফ্ত করা হয়। ১৮১১ সালের মার্চে মুহাম্মাদ 'আলী মামলূকদের পাইকারী হারে এক ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালান এবং ঐ বৎসরের শেষের দিকে ফেল্লাহ বা চাষীদের অভাব-অভিযোগের শুনানী গ্রহণ এবং জোতজমি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার পর এক বিশেষ দীওয়ান চালু করার মাধ্যমে দেশে মুলতাযিম দের প্রভাব-প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব হ্রাস করেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসে উজান মিসরে মামলূকদের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর কোনও প্রকার ক্ষতিপূরণ না দিয়াই তথাকার সকল ইল্তিযাম বাজেয়াফত করা হয়। ইল্তিযামগুলি অন্য মুলতাযিমের নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর না করিয়া আল-মাদ্বৃত নামে সরকারের হাতেই রাখিয়া দেওয়া হয়। ১৮১৪ সনের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে ভাটি মিসরের ইলতিযামগুলিও বাজেয়াফত করিয়া জমি সরকারের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মুলতাযিমগণকে আজীবন একটি ভাতা মঞ্জুরীদানের (পরে যাহা বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার প্রথায় দাঁড়ায়) ব্যবস্থা করা হয়। ঐ ভাতার পরিমাণ ছিল ইলতিযাম হইতে প্রাপ্ত লাভ বা ফাইজের সমপরিমাণ। ১৯১৫-৬ খৃ. সেনাবাহিনী ও 'উলামা' সম্প্রদায়ের তরফ হইতে এই ব্যাপারে প্রবল চাপ সত্ত্বেও মুহাম্মাদ 'আলী দাবিদার ও বিদ্রোহীদিগকে কিছু ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহার ঐ সংস্কারমূলক ভূমি ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখিতে সক্ষম হন।

মুলতাযিমের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য 'উস্য়া' নামে যে জমি দেওয়া হইত উজান মিসরে ইল্তিযামগুলি বাজেয়াফত করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই উস্য়া নামের ভূমিগুলিও বাজয়াফত করা হয়। ভাটি মিসরে অবশ্য মুলতাযিমদের বিক্ষোভ-প্রতিবাদে আন্দোলনের মুখে ঐ উস্য়া জমির উপর তাহাদের উপস্বত্ব অধিকার (হস্তান্তর করার অধিকার ব্যতীত) বজায় রাখা হয়। মূলত যে ব্যবস্থা ছিল তাহাতে মুলতাযিমের মৃত্যুর পর ইল্তিযামের উস্য়া জমির সরকারের মালিকানায় ফিরিয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু এই ভাটি মিসরের মুলতাযিমগণ তাহাদের উস্য়া ভূমি ওয়াক্ফ্ আহলী করিয়া দিতে শুরু করে। ইহা বন্ধ করিবার জন্য ১৮৫৫ খৃ. সা'ঈদ এই মর্মে ফরমান জারী করেন যে, উস্য়ার মালিকগণ ঐ ধরনের বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারিবেন, তবে মুলতাযিমের বংশধারার যদি অবসান ঘটে তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে ঐ উস্য়া জমি সরকারের মালিকানায় চলিয়া যাইবে।

ভাটি মিসরের মুলতাযিমগণের যে বার্ষিক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল তাহার পরিমাণ ছিল সামান্য। কারণ এই মুলতাযিমেরা প্রকৃত পক্ষে তাহাদের ইল্তিযাম হইতে যে আয় পাইতেন তাহা অপেক্ষা অনেক কম

আয় হইয়াছে দেখাইয়া সাধারণত সরকারকে অনেক কম অর্থ প্রদান করিত। অধিকন্তু সরকারকে দেয় অর্থ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কম দেওয়া হইত এবং একত্রে না দিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইত। ১৮৩১ হইতে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহা ৬,০০০ কীস হইতে ২,৫০০ 'কীস'-এ হ্রাস পায়। ১৮৮৯ ও ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে উল্লিখিত ব্যবস্থার পরিবর্তে এককালীন অর্থ সামগ্রিকভাবে সরকারকে প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

এই যাবত যে আলোচনা হইল উহার সব কিছুই ভূমি-করমূলক ইলতিযাম সম্পর্কিত; যাহার পৌরকর দেওয়া হয় এমন খামার (চাষাবাদ) (ইল্‌তিযাম বা মুকাতা'আ, য়ুরোপীয় সূত্র অনুযায়ী Appalto) সুনির্দিষ্ট সামগ্রীসমূহের বিক্রয় বা উৎপাদন এবং কতকগুলি কার্যনির্বাহ সংক্রান্ত ব্যবস্থা; এই জাতীয় যে ইলতিযাম ছিল তাহা ১৮৭০ খৃ. পর্যন্ত বহাল ছিল। এই ধরনের ইলতিযামগুলি নীলাম ডাকে বিলিবন্টন করা হইত। এই ব্যবস্থার আওতায় বিভিন্ন সময়ে আমদানী শুল্ক ও নগর শুল্ক, স্ট্যাম্প ডিউটি, লবণ, মদ, ভেষজ, বিভিন্ন ফসল ও উদ্ভিদের বীজ ও তালের পাতা বিক্রয়, বিভিন্ন ধরনের হাট-বাজার পরিচালনা (যেমন ১৯০০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিক অবধি গরুর হাট), পশু ও মৎস্য শিকার (মাতারিয়্যা, মৎস্য শিকার ব্যবস্থা যাহা ১৮৯৩ খৃ. পর্যন্ত প্রচলিত ছিল), তাঁতের কারখানা ও অন্যান্য ধরনের কল-কারখানা যেগুলি মুহাম্মাদ 'আলী ঐ সকল শিল্প-কারখানার পতন দশার যুগে স্থাপন করিয়াছিলেন (খৃষ্টীয় ১৮৫০ ও ১৮৬০ খৃ.-এর দশকে), সরকারী গেজেট প্রকাশ (১৮৬৩ খৃ.), নীলনদে নৌ-পরিবহন, কসাইখানা, বিভিন্ন শহরের ওজন-পরিমাপ ব্যবস্থা, নিলাম ও উত্তরাধিকার অর্জন জনিত ফি ইত্যাদি ছিল। ১৮৪৩ ও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের আইনসমূহে ঐ সকল নিলাম ডাকে মুলতাযিকমদের অংশগ্রহণের নিয়মাবলী নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়। তাহাদের মধ্যে অন্যায় যোগসাজস নিষিদ্ধ করা হয় এবং চড়া দামে পণ্য বিক্রয়, অত্যধিক খাজনা বা প্রাপ্য আদায় ও অন্যান্য ধরনের অপরাধের জন্য দণ্ড এবং জরিমানাও নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়। সরকারের তরফ হইতে কাজ করার জন্য উপযুক্ত কর্মকর্তা ও কেরানী পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়ার পর এই সকল কাজে তথা সরাসরি করারোপের জন্য অচিরেই মুলতাযিম ব্যবস্থার উচ্ছেদ করা হয়। এই মুলতাযিমদের উচ্ছেদের ফলে সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) 'আবদু'র-রাহমান আল-জাবরতী, 'আজাইবু'ল- আছার ফি'ত-তারাজিম ওয়া'ল-আখবার, বুলাক ১২৯৭/১৮৭৯-৮০; (২) ফীলীব জাল্লাদ, কামূসুল-ইদারা ওয়া'ল কাদা, আলেকজান্দ্রিয়া ১৮৯০ খৃ.; (৩) আমীন সামী, তাকবীমু'ন-নীল, কায়রো ১৯১৬-৩৬ খৃ.; (৪) H.A.B. Rivlin, The Agricultural Policy of Muhammad Ali in Egypt, Cambridge Mass. 1961; (৫) G. Baer, A History of Landownership in modern Egypt 800-1950, London 1962; (৬) ঐ লেখক, The Evolution of private landownership in Egypt and the Fertile Cresent, in C. Issawi (ed.) The economic history of the Middle East, Chicago 1966, 80-90।

G. Baer (E.I.2)/ আফতাব হোসেন

**ইলতুত্‌মিশ** (التتمش) ঃ বিভিন্ন উপাধিসহ পূর্ণ নাম হইতেছেঃ শামসু'দ-দুন্‌য়া ওয়া'দ-দীন জিল্লুল্লাহ ফিল-'আলামীন আবুল- মুজাফ্‌ফার ইলতুত্‌মিশ আস-সুলতান য়ামীন খালীফাতুল্লাহ নাসির আমীরুল-মুমিনীন (তাবাকাত-ই নাসিরী, পৃ. ৪৪০)। ইনি ভারতীয় উপমহাদেশের কেন্দ্রস্থলে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন।

'ইলতুমিশ' নামের কয়েকটি বানান রহিয়াছে। যেমন ইলতুত্‌মিশ (التتمش); ঈল্‌তুত্‌মিশ (ايلتتمش); ইলতুমিশ (التمش); ঈলতুমিশ (ايلتمش); ইল্‌তীমিশ (التيمش) (এতদ্ব্যতীত দ্র. তাবাকাত-ই নাসিরী, টীকা, পৃ ৮৩০)।

ঐতিহাসিক বাদায়ূনী (১খ, পৃ. ৬২) এই নামের বানান 'ইল্‌তুমিশ' লিখিয়াছেন। তিনি এইরূপ নামকরণের এই কারণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোনও তুর্কী সন্তান চন্দ্রগ্রহণের সময়ে জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে 'ইল্‌তুমিশ' নামে আখ্যায়িত করা হয় (এতদ্ব্যতীত দ্র. মিফতাহু'ত-তাওয়ারীখ, পৃ. ৫৬)। ফারসী অভিধান গ্রন্থসমূহে লিখিত রহিয়াছে যে, তুর্কী ভাষায় সৈন্যদলের অগ্রভাগকে অথবা উহার অগ্রভাগ ও সেনাপতির মাঝখানে অবস্থিত সৈন্যদলকে 'আলতামিশ' বলা হয়। ষষ্ঠ ক্রমিক সংখ্যকেও তুর্কী ভাষায় 'ইলতুতমিশ' বলা হয় (আনন্দ রাজ, গিয়াছ, ইত্যাদি গ্রন্থবলী)। খুলাসাতু'ত-তাওয়ারীখ গ্রন্থের টীকায় লিখিত রহিয়াছে যে, শব্দটি শুদ্ধ বানান হইতেছে ঈলতুত্‌মিশ (ايلتتمش)। তুর্কী ভাষায় উহার অর্থ 'রাজ্য রক্ষক' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৯০)। কিন্তু বর্তমানে বিশেষজ্ঞগণ প্রায় সকলে এই বিষয়ে একমত যে, সম্রাট শামসু'দ-দীনের উপাধি ছিল 'ইলতুতমিশ'। তাবাকাত-ই নাসিরী গ্রন্থের লেখক মিনহাজ-ই সিরাজ কর্তৃক নাসিরু'দ-দীন মাহমূদ ইব্‌ন ইলতুত্‌মিশ-এর প্রশংসায় রচিত একটি কাসীদার নিম্নোক্ত প্রথম চরণদ্বয় দ্বারা উক্ত কথাটি সমর্থিত হয় ঃ "যে রাজাধিরাজ দানশীলতায় হাতিম তাঈ এবং বীরত্বে রুস্তাম সমতুল্য, তিনি হইতেছেন দীন-দুনিয়ার সহায় মাহমূদ ইব্‌ন ইলতুত্‌মিশ" (তাবাকাত-ই নাসিরী, পৃ. ৪৭২)।

উক্ত চাক্ষুষ বিবরণ যিনি প্রদান করিয়াছেন, তিনি প্রথমে সুলতান ইলতুত্‌মিশ-এর সংস্পর্শে এবং পরে তাঁহার বংশধরদের সংস্পর্শে ছিলেন। মাওলানা 'ইসামী রচিত ফুতূহুস-সালাতীন গ্রন্থের একাধিক কবিতায় সুলতান শামসুদ-দীনকে শামসুদ-দীন অথবা শাম্‌স-ই দীন ওয়া দুন্‌য়া' অথবা 'ইলতুতমিশ' নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের তৎকালীন দাবীরু'ল-মুল্‌ক শামসু'দ-দীন তাজ রেজাহও তাঁহার কবিতায় সুলতানের 'ইলতুত্‌মিশ' নামই ব্যবহার করিয়াছেন (তাবাকাত-ই নাসিরী গ্রন্থের হাবীবী রচিত টীকা, পৃ. ৮৩১)।

আকা হাবীবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'সুলতান শামসু'দ-দীন কর্তৃক প্রবর্তিত মুদ্রাসমূহে উৎকীর্ণ নাম 'ইলতুত্‌মিশ' অথবা 'ঈলতুমিশ' গঠিত হইয়াছে' (তাবাকাত-ই নাসিরী গ্রন্থের টীকা, পৃ. ৮৩১)। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন সহকারী প্রধান জাফার হাসান বলেন, সুলতান শামসু'দ-দীন কর্তৃক লিখিত লিপিফলকসমূহ এবং তৎকর্তৃক প্রবর্তিত মুদ্রাসমূহে 'ঈলতুতমিশ' নামই রহিয়াছে (খুলাসতু'ত-তাওয়ারীখ, পৃ. ১৯০)। স্যার সায়্যিদ আহমাদ (দ্র. আহমাদ খান) তাঁহার আছারু'স-সানাদীদ

গ্রন্থে কুত্‌ব মীনার-এর যেই চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, উহার চতুর্থ ধাপ হইতে তিনি উহাতে নিম্নোক্ত লিপিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

امر بهذه العمارة في ايام الدولة السلطان الاعظم وشهنشاه المعظم مالك رقاب الامام مولى ملوك الترك والعرب والعجم شمس الدنيا والدين معز الاسلام والمسلمين ودار الامن والامان وارث ملك سليمان ابو المظفر ايلتمش السلطان ناصر امير المؤمنين.

(আছারু'স-সনাদীদ, দিল্লী ১২৭০/১৮৫৩, পৃ. ২৫; এতদ্ব্যতীত তু. উক্ত গ্রন্থ, নওল কিশোর প্রেস অক্টোবর ১৮৯৫ খৃ., ৫৪ পৃষ্ঠার বিপরীতে প্রদত্ত চিত্র)।

মনে করা হয় যে, সুলতান শামসু'দ-দীনের জীবদ্দশায়ই বিভিন্ন সময়ে তাঁহার উপাধিটি বিভিন্ন বানানে লিখিত হইয়াছে। তবে বর্তমানে সর্বসম্মতভাবে উহার বানান 'ইলতুত্‌মিশ' লিখিত হইয়া থাকে (যেমন ঈশ্বরী প্রসাদ, The History of Mediaeval India, পৃ. ১৫০)

সুলতান শামসু'দ-দীন ইলতুত্‌মিশ তুর্কীস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ঈলখান (মতান্তরে ঈলাম খান, খাযীনাতু'ল আসফিয়া, ১খ, ২৭১; তারীখ-ই হিন্দুস্তান ১খ, ৩৬৬)। তাঁহার পিতা ইলবারী নামক গোত্রের নেতা ছিলেন (তাবাকাত-ই নাসিরী, পৃ. ৪৪১)। 'আলাবরী' শব্দটি 'আলাপ (ব্যাঘ্র) ও 'ওযার' (তুল্য) এই শব্দদয়ের সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছে বলিয়া কথিত আছে। তারীখ-ই হিন্দুস্তান গ্রন্থে ইলতুত্‌মিশকে 'কারাহ খাতা'ঈ' নামক তুর্কী জনগোষ্ঠীর সদস্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (পৃ. ৩৬৬)। তাঁহার জন্মের সন-তারিখ জানা যায় না। বিভিন্ন আভাষসূত্র দ্বারাও এই সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন। শুধু এতটুকু জানা যায় যে, অতি অল্প বয়সেই তিনি অসাধারণ প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার চেহারাও অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতাগণ শত্রুতাবশত অপ্রত্যাশিত- ভাবে একদা তাঁহাকে ধরিয়ে গোপনে জনৈক দাস ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়। উক্ত ব্যবসায়ীর পরিবারেই তিনি লালিত-পালিত হন।

তাবাকাত-ই নাসিরী গ্রন্থে স্বয়ং ইলতুত্‌মিশ হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ "কৈশোরের প্রথমদিকে একদা কিছু পয়সা হাতে দিয়া আঙ্গুর ক্রয়ের উদ্দেশ্যে আমাকে বাজারে পাঠান হয়। দুর্ভাগ্যবশত পয়সাগুলি আমার হাত হইতে পড়িরা গিয়া হারাইয়া গেলে আমি ভয়ে কাঁদিতে থাকি। এই অবস্থায় আমার প্রতি জনৈক দরবেশের দৃষ্টি পতিত হয়। তিনি আমার বিপদের কথা শুনিয়া আমাকে আঙ্গুর কিনিয়া দিয়া আমার নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেন, "যদি আমি কোনও দিন রাজ্যের অধিকারী হই তবে যেন দরবেশ-'আলিমদের প্রতি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখি।" ইলতুতমিশ দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেন যে, ঐ দরবেশের দু'আর বদৌলতেই তিনি রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন (পূ. গ্র., পৃ. ৪৪১-৪৪২)।

কালের পরিক্রমায় এক সময় সাদ্‌র-ই জাহান-এর পরিবার আর্থিক দুর্দশায় পতিত হইলে ইল্‌তুত্‌মিশকে বুখারার জামালু'দ-দীন ওরফে চোস্‌ত কাবা নামক জনৈক হাজ্জী সাহেবের নিকট বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। তিনি আরেকজন তুর্কী দাসসহ তাঁহাকে গাযনীতে লইয়া যান। সেইখানে সুলতান মু'ইয্‌যু'দ-দীনের দরবারে তাঁহার জন্য তাঁহাদের দুইজনের মূল্য এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা ধার্য হয়। কিন্তু চোস্‌ত কাবা এই মূল্যে তাহাদেরকে বিক্রয় করিতে সম্মত না হইলে সুলতান আদেশ প্রদান করেন যে, গাযনীতে যেন কেহ তাঁহাদেরকে ক্রয় না করে। ফলে চোস্‌ত কাবা তাঁহাদেরকে বুখারায় ফিরাইয়া লইয়া যান।

কোনও কোনও ঐতিহাসিক বিবরণে জানা যায় যে, চোস্‌ত কাবা একবার ইলতুত্‌মিশ ও অন্য দাসটিকে বাগদাদেও লইয়া গিয়াছিলেন (তারীখ-ই ফিরিশ্‌তাহ্‌, পৃ. ৬৬; তারীখ-ই হিন্দুস্তান, ১খ, পৃ. ৩৪১)। সেই সময়ে সুলতান কুত্‌বু'দ-দীন আয়বাক নাহরাওয়ালা (গুজরাট) জয় করিবার (রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৫৯৩/ জানুয়ারী ১১৯৭) পর গাযনীতে গিয়াছিলেন। তিনিও দাস ক্রয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ইল্‌তুত্‌মিশ ও তাঁহার সঙ্গী দাসের পরিচয় জানিবার পর তিনি তাহাদেরকে ক্রয় করিবার জন্য সুলতান মু'ইয্‌যু'দ-দীনের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলে সুলতান তাঁহাকে গাযনীতে তাঁহাদিগকে ক্রয় করা নিষিদ্ধ হইবার কথা জানাইয়া প্রয়োজনে তাঁহাদিহকে দিল্লীতে লইয়া গিয়া ক্রয় করিতে বলেন। ইহাতে কুত্‌বু'দ-দীনসহ তাহাদিগকে চোস্‌ত কাবাকে দিল্লীতে লইয়া আসিবার দায়িত্ব দিয়া নিজের জনৈক কর্মচারীকে গাযনীত রাখিয়া যান। মোটকথা সুলতান আয়বাক এক লক্ষ জীতাল-এর বিনিময়ে ইলতুত্‌মিশকে ক্রয় করেন (তাবাকাত, পৃ. ৪৪৩)। বর্তমানে প্রচলিত টাকায় উক্ত এক লক্ষ জীতাল-এর মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন, সুলতান আয়বাক-এর রাজত্বকালে জীতালের সঠিক মূল্য কত ছিল তাহা নির্ধারণ করিবার কোনও উপায় নাই।

কুত্‌বু'দ-দীন আয়বাক ইল্‌তুত্‌মিশকে প্রথমে তাঁহার দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান এবং পরে তাঁহার মৃগয়া বিভাগের প্রধান (امير شيكار) নিযুক্ত করেন। পরবর্তী কালে গোয়ালিয়র অধিকৃত হইবার পর তিনি তাঁহাকে উহার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং বার্ন (বুলন্দ শহর) ও তৎসন্নিহিত চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল তাঁহার জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন। অল্প দিনেই তিনি ইলতুত্‌মিশের বীরত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বাদায়ূ'ন-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন (তাবাকাত, পৃ. ৪৪২-৩)। উল্লেখ্য যে, সেই সময়ে ঐ পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহের অন্যতম ছিল। ইল্‌তুত্‌মিশের অসাধারণ যোগ্যতা ও প্রতিভা দর্শনে সুলতান আয়বাক স্থির নিশ্চিত হইয়া গেলেন যে, রাজ্য শাসনের ন্যায় গুরুদায়িত্ব পালন করিবার যোগ্যতা একমাত্র ইল্‌তুত্‌মিশের মধ্যেই রহিয়াছে। সুতরাং তিনি তাঁহাকে স্বীয় পালক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করিলেন (তাবাকাত, পৃ. ৪১৮)।

সাধারণত বর্ণিত হইয়া থাকে যে, সুলতান কুতবুদ-দীন আয়বাক স্বীয় জীবদ্দশায়ই নিজ কন্যাকে ইলততিমিশের সহিত বিবাহ দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাবাকাত-ই নাসিরীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ইলতুত্‌মিশ স্বীয় সিংহাসনারোহণের পর সুলতান কুত্‌বুদ-দীন আয়বাকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন (পূ. গ্র., পৃ. ৪১৮)। তাবাকাত-এর লেখক যেহেতু সুলতান আয়বাকের পরিবারের সদস্যের মর্যাদা প্রাপ্ত ছিলেন, সেইজন্য এতদসম্পর্কিত তাঁহার বর্ণনাকেই অধিক নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করা সমীচীন হইবে।

৬০১/১২০৪ সনে সুলতান মু'ইয্‌যু'দ-দীন খাওয়ারিয্‌ম আক্রমণ করেন। খাওয়ারিয্‌মের শাহ পূর্বেই তুর্কিস্তানের গোত্রপতিদিগকে এবং কাযাহ্‌ খাতা'ঈ লোকদিগকে স্বীয় দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় সুলতান মু'ইয্‌যুদ-দীনের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে অল্প, কিন্তু তিনি এইরূপ অবস্থায়ই খাওয়ারিযমের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া গায্‌নীতে প্রত্যাবর্তন করেন। গাযনীতে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পূর্বে গুজব ছড়াইইয়া পড়ে যে, সুলতান মু'ইয্‌যু'দ-দীন যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। সুযোগ বুঝিয়া তাজু'দ-দীন য়ালদুয গায্‌নী অধিকার করিয়া লইবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকেন। অপর এক ব্যক্তি মুলতান অধিকার করেন। খোখারীয়গণও এই সুযোগকে হাতছাড়া না করিয়া বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়া দেয়। এই নাযুক পরিস্থিতিতে সুলতান মু'ইয্‌যু'দ-দীন গাযনীতে পৌঁছিয়া একদিকে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, পরবর্তী তিন বৎসরের প্রস্তুতির পর তিনি পুনরায় তুর্কিস্তান আক্রমণ করিবেন। অতঃপর তিনি খোখারীয়দিগকে ও অন্যান্য বিদ্রোহী দলকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে পৌঁছিলেন। কুত্‌বু'দ-দীন আয়বাকও সসৈন্যে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং ইল্‌তুত্‌মিশকেও বাদায়ুন হইতে নিজের কাছে ডাকাইয়া আনিলেন। ঝিলাম নদীর তীরে খোকারীয়দের সহিত সুলতান মু'ইয্‌যু'দ-দীনের বহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইল্‌তুত্‌মিশ অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনি খোখারীয়দের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে অশ্ব লইয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং বিদ্রোহীদিগকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল না করা পর্যন্ত যুদ্ধে চালাইয়া গেলেন। তাঁহার বীরত্ব দর্শনে সুলতান মু'ইয্‌যু'দ-দীন যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁহাকে বিশেষ রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করিলেন। তিনি সুলতান কুত্‌বু'দ-দীন আয়বাককে এই অমূল্য প্রতিভার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে জোর তাকীদ দিলেন। তৎসহ তিনি তাঁহাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিবার সনদপত্র প্রদান করিতেও আয়বাককে নির্দেশ দিলেন (তাবাকাত, পৃ. ৪৪৩-৪)।

যুদ্ধশেষে সুলতান মু'ইয্‌যু'দ-দীন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে লাহোর হইয়া গাযনীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পথে ৩ শা'বান, ৬০২/১৫ মার্চ, ১২০৬ সালে খোখারীয়দের হাতে নিহত হন। তাঁহার শাহাদাত লাভের পর কুত্‌বু'দ-দীন আয়বাক ভারতবর্ষের স্বাধীন সুলতান পদে অভিষিক্ত হন। ইল্‌তুতমিশ পূর্ববৎ বাদায়ূনের শাসকর্তার পদে বহাল থাকেন। ৬০৭/১২১০ সালে কুত্‌বু'দ-দীন আয়বাক ইনতিকাল করিলে তাঁহার পুত্র আরাম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেও তৎকালে রাজ্য রক্ষা ও উহার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সুলতানের যেই সকল গুণাবলীর অধিকারী হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল, সেইগুলি তাঁহার ছিল না। ফলে অচিরেই সাম্রাজ্যের মধ্যে চরম অশান্তি ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। সিন্ধুর শাসনকর্তা নাসিরু'দ-দীন কুবাচাহ উচ ও মুলতান অধিকার করিয়া লন এবং লাহোরের নিরাপত্তাকে চরমভাবে বিঘ্নিত করিয়া দেন। বঙ্গদেশের রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে 'আলী মারদান খাল্‌জী দিল্লীকে রাজস্ব প্রদান করা বন্ধ করিয়া দিয়া কার্যত স্বাধীন শাসনকর্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এইদিকে তাজু'দ-দীন য়ালদুয গাযনীর শাসন ক্ষমতা দখল করত সুলতান মু'ইয্‌যু'দ-দীন-এর শাসনামলের ন্যায় সকল অধিকৃত অঞ্চলের একেকটি অঞ্চলকে গাযনীর শাসনাধীন একেকটি প্রদেশ বলিয়া বিবেচনা করিতে থাকেন। এইরূপ বিশৃংখল ও অশান্ত পরিস্থিতিতে দিল্লীর শাহী দরবারের অমাত্যবর্গের দৃষ্টি ইলতুত্‌মিশের প্রতি পতিত হয়। তাহারা পত্র যোগে তাঁহাকে বাদায়ূন হইতে দিল্লীতে ডাকিয়া আনিয়া শাসনভার গ্রহণের অনুরোধ জানান এবং তিনি ইহাতে সম্মত হন (৬০৮/১২১১)। আরাম শাহ তখন লাহোরে ছিলেন। সংবাদ পাইয়া তিনি সসৈন্যে দিল্লীতে পৌঁছিলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে আরাম শাহ পরাজিত হন এবং এই অবস্থায় কিছুকাল পর ইনতিকাল করেন (তাবাকাত, পৃ. ৪১৮)।

ইলতুত্‌মিশের সিংহাসনারোহণের পর তুর্কী নেতৃবৃন্দ এবং সুলতান মু'ইযযু'দ-দীনের দরবারের অমাত্যগণ ও সুলতান কুত্‌বু'দ-দীনের দরবারের অমাত্যগণ দিল্লীতে সমবেত হন। তাঁহাদের একদল নূতন ব্যবস্থাকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিলেও আরেক দল উহার বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হইয়া শহরের বাহিরে গমন করত বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জলিত করে। ইল্‌তুতমিশ বিশেষ সামরিক বাহিনী লইয়া আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এইরূপে তিনি দিল্লী ও তৎসন্নিহিত চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা দূর করিতে সক্ষম হইলেও অধিকৃত অঞ্চলগুলির বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলিকে সুসংবদ্ধ করত স্বীয় সাম্রাজ্যকে মযবূত ও নিরাপদ করিবার কঠিনতর কার্য তখনও তাঁহার সম্মুখে অসমাপ্ত ছিল। ইলতুত্‌মিশ সেই দুরূহ কার্য সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করেন।

তাজু'দ-দীন য়াল্‌দুয নিজেকে অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করিতেন। তিনি ভারতবর্ষে ইলতুত্‌মিশের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিকট একটি 'রাজছত্র' প্রেরণ করেন। ইলতুত্‌মিশ নিজে অতি সত্বর অযোধ্যা, বেনারস ও সাওয়ালিক-এর বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তি-শৃংখলা ফিরাইয়া আনিলেন।

ইতোমধ্যে খাওয়ারিযম-এর শাহ গায্‌নী অধিকার করিয়া লইলেন। ফলে তাজু'দ-দীন য়ালদুয ভারতবর্ষে আগমন করিতে বাধ্য হন। তিনি ৬১২/১২১৫ সনে কুবাচাহকে পরাজিত করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করত দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ইলতুত্‌মিশ তারাইন (তারাওড়ী) নামক স্থানে তাঁহাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করত বন্দী করিয়া বাদায়ূনের দুর্গে পাঠাইয়া দেন। তিনি আটকাবস্থায় সেইখানেই ইনতিকাল করেন। অতঃপর ইলতুত্‌মিশ নাসিরুদ-দীন কুবাচাহ-এর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু শীঘ্রই উভয়ের মধ্যে (৬১৪/১২১৭) সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়।

ভারতবর্ষে অভ্যন্তরীণ অশান্তি ও বিশৃংখলা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবার পূর্বেই ইতিমধ্যে খাওয়ারিয্‌মের শাহ সুলতন জালালু'দ-দীন মানাক্‌বার্‌নী তাতারীদের চাপে বাধ্য হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এই বিষয়ে ইলতুত্‌মিশের আসল আশংকা ছিল এই যে, যদি খাওয়ারিয্‌মের শাহের পশ্চাদ্ধাবনে তাতার বাহিনী ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তবে তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান এবং ইরানের ন্যায় ভারতবর্ষও হত্যা ও লুটতরাজের শিকার হইবে। ইলতুত্‌মিশ এই বিপর্যয়ের পথ রুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং লাহোরে পৌঁছিলেন। ইত্যবসরে খাওয়ারিযমের শাহ্‌ সিন্ধু অভিমুখে গতি পরিবর্তন করিলেন। সেইখান হইতে তিনি মাক্‌রান হইয়া ইরানে চলিয়া

গেলেন। এইরূপে ভারতবর্ষে তাতারী আক্রমণের আশংকা অন্তত সাময়িকভাবে দূর হইল।

এইদিকে বঙ্গদেশের রাজধানী লক্ষণাবতীতে পূর্বেই মালিক 'ইয্‌যু'দ-দীন খাল্‌জী মুহাম্মাদ বাখ্‌তিয়ার খালজীর অসুস্থ অবস্থায় তাঁহাকে হত্যা করিয়া নিজেই শাসনকর্তা বনিয়া গিয়াছিলেন। আট মাস পর 'আলী মার্দান খাল্‌জী তাঁহাকে হত্যা করিয়া সুলতান 'আলা'উ'দ-দীন উপাধি ধারণপূর্বক নিজের নামে খুতবা ও মুদ্রা প্রর্বতন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার দুই বৎসর পর দিল্লী হইতে বঙ্গদেশে সেনাদল প্রেরিত হয়। তাহাদের আগমনে সকল খাল্‌জী অমাত্যগণ দিল্লী বাহিনীর পক্ষ অবলম্বন করেন এবং 'আলী মার্দান নিহত হন। অতঃপর তদস্থলে গিয়াছু'দ্‌-দীন আওয খালজী বঙ্গদেশের শাসনকর্তা হন। ৬০৭/১২১০ সনে সুলতান কুত্‌বু'দ-দীন আয়বাকের ইনতিকালের পর তাঁহার পুত্র আরাম শাহ্ সম্রাট হইলে তাঁহার আমলে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হইয়া পড়িলে গিয়াছু'দ-দীন আওযও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইলতুত্‌মিশ অন্যান্য অভিযান সাফল্যের সহিত সমাপ্ত করিবার পর ৬২২/১২২৫ সনে লক্ষণাবতীতে পৌঁছেন। গিয়াছু'দ-দীন আওয তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহসী হইলেন না। তিনি আটত্রিশটি হস্তী, আশি হাযার টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী সুলতান ইলতুত্‌মিশের খেদমতে উপঢৌকন পেশ করত তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন (রিয়াদু'স সালাতীন, পৃ. ৬৯-৭০)। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ লিখিয়াছেন, কর হিসাবে পেশকৃত উক্ত দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে আটত্রিশটি হস্তী ও আশি লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা ছিল (The History of Medieval India, পৃ. ১৫৬)। তাবাকাত গ্রন্থে উহার স্থলে "ত্রিশটি হস্তী ও আশি লক্ষ মাল" কথাটি লিখিত রহিয়াছে (পৃ. ৪৪৫)।

সুলতান ইল্‌তুত্‌মিশ স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরু'দ-দীনকে, যিনি ইতঃপূর্বে অযোধ্যার শাসনকর্তা ছিলেন, বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। গিয়াছু'দ-দীন আওয আসামের কামরূপে চলিয়া যান এবং পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। শাহযাদা নাসিরু'দ-দীন তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন (রিয়াদু'স- সালাতীন, পৃ. ৭১)। অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে গিয়াছু'দ-দীন আওয সুলতানস ইলতুত্‌মিশের দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পর বিদ্রোহ করিলে তিনি তাঁহাকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র নাসিরু'দ -দীনকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। গিয়াছু'দ-দীন আওয নিহত হন এবং শাহযাদা নাসিরু'দ-দীন বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন । তিন বৎসর কয়েক মাস শাসনকার্য পরিচালনা করিবার পর জুমাদা'ল-উলা ৬২৬/এপ্রিল ১২২৯ সনে শাহযাদা নাসিরু'দ-দীন ইনতিকাল করেন। তাঁহার ইনতিকালের পর গিয়াছু'দ-দীন আওয-এর পুত্র হিশামু'দ -দীন খাল্‌জী বঙ্গদেশের শাসনকর্তা হইয়া বসেন। ইল্‌তুত্‌মিশ পুনরায় একবার বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং বিদ্রোহ দমনপূর্বক 'ইয্‌যু'ল-মুল্‌ক মালিক 'আলা'উ'দ-দীন জানীকে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করত রাজাব ৬২৭/মে ১২৩০ সনে দিল্লী ফিরিয়া যান। সুলতান ইলতুত্‌মিশের জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

(১) ভূতপূর্ব জয়পুর রাজ্যের রাজধানী হইতে আশি মাইল দূরে অবস্থিত রনথম্বর দুর্গ বিজয় (৬২৩/১২২৬), উল্লেখ্য, দুর্গটি ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের অজেয় দুর্গগুলির মধ্যে গণ্য হইত; (২) যোধপুর হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত মন্দুর বিজয় (৬২৪/১২২৭); (৩) নাসিরু'দ-দীন কাবাচাহ-কে দমন করার উদ্দেশ্যে উচ দুর্গ বিজয় (৬২৫/১২২৮)। কাবাচাহ কোনক্রমে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়া ভাক্কার-এর দিকে পালাইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় পুত্র 'আলা'উদ-দীন মাসঊদ বাহ্‌রাম শাহ্‌কে প্রতিনিধি করিয়া ইলতুত্‌মিশের দরবারে প্রেরণ করিলেন। ইল্‌তুত্‌মিশ তরুণ বাহরাম-এর সহিত সদয় ব্যবহার করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে পিতার নিকট ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন না। অতঃপর ভাক্কার-এ কাবাচাহকে অবরোধ করা হইল। তিনি নদী পার হইয়া নিরাপদ স্থানে গমনের উদ্দেশ্যে স্বীয় পরিবারের সদস্যগণ এবং কিছু ধনসম্পদ সঙ্গে লইয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অতি ব্যস্ততার ফলে নৌকা উল্টাইয়া যাওয়ায় সকল সঙ্গীসহ তিনি নদীতে ডুবিয়া মারা যান।

অতঃপর ইলতুত্‌মিশ ৬ সাফার, ৬৩০/২২ নভেম্বর, ১২৩২ সনে গোয়ালিয়র, ৬৩১/১২৩৪ সনে বেলসা এবং পরবর্তী বৎসর উজ্জয়িনী জয় করেন। ৬৩৩/১২৩৬ সনের প্রথম দিকে তিনি বিন্‌য়ান (বর্তমান নাম বান্নূ) আক্রমণ করেন। উক্ত অভিযানে তিনি শারীরিক দিক দিয়া এইরূপ দুর্বল হইয়া পড়েন যে, এই সময়ে তাঁহার জীবন-সংশয় দেখা দেয়। ১ শা'বান, ৬৩৩/১০ এপ্রিল, ১২৩৬ সনে ইলতুত্‌মিশের সওয়ারী যুদ্ধশেষে দিল্লীতে পৌঁছে এবং ২০ শা'বান, ৬৩৩/২৯ এপ্রিল, ১২৩৬ সনে এই মহান মুসলিম শাসনকর্তা ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে মসজিদ-ই কুওয়াতুল-ইসলাম-এর পার্শ্বে দাফন করা হয়।

**ইলতুতমিশের কবর ঃ** দিল্লীতে আনু. ১২৩৫ খৃ. সুলতান নিজের জীবদ্দশায় নিজের কবর নিমার্ণ করেন। কুওয়াতুল-ইসলাম মসজিদের উত্তর-পশ্চিম দিকে ৪২' বর্গ পরিমাপের, পশ্চিম প্রাচীরে ৩টি মিহরাব, বাকী তিনদিকে একটি করিয়া দরওয়াজা। গুম্বজ নির্মাণে স্কুইন্চ (Squinch) খিলান ব্যবহারের প্রাথমিক চেষ্টা পাক-ভারতে এই কবর-ইমারত নির্মাণে লক্ষিত হয়। স্যার সায়্যিদ আহমাদ ইল্‌তুতমিশের কবরের নিম্নরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, "ইলতুত্‌মিশের কবরের ইমারতের বহিরাংশ গ্রানাইট শিলা (granite stone) দ্বারা এবং অভ্যন্তর ভাগ প্রধানত লোহিত প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। উহার কোথাও কোথাও মর্মর প্রস্তরও ব্যবহৃত হইয়াছে। কবরের প্রাচীর গাত্রের সর্বত্র কারুকার্যের আতিশয্য, সর্বত্র কূফী, তুগ্রা ও নাসতালীক শিল্পে কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ খোদিত রহিয়াছে। উহার মূল সৌধ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। শুধু প্রাচীর চতুষ্টয় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তবে উহাদের কোনও কোনও অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে" (আছারু'স-সানাদীদ, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৬৬)।

উত্তর ভারতকে জয় করিবার এবং তথায় ইসলামী শাসনের ভিত্তি স্থাপন করিবার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে সুলতান মাহমূদ গাযনাবী, মু'ইয্‌যু'দ-দীন সাম, কুত্‌বু'দ-দীন আয়বাক এবং মুহাম্মাদ বাখতিয়ার খালজীর প্রাপ্য। কিন্তু এই শাসনকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করিবার কৃতিত্ব নিসন্দেহে ইল্‌তুত্‌মিশেরই প্রাপ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি ভূমির আবাদী, রাজ্যের শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জন-জীবনের মান উন্নয়ন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা, ইমারাতাদি নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রভূত সাফল্য অর্জন

করিয়াছিলেন এবং উত্তর ভারতকে একটি গৌরবময় সমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

ইল্‌তুত্‌মিশের রাজত্বকালেই এশিয়া মহাদেশের বহু ইসলামী রাজ্য তাতারীদের হাতে বিধ্বস্ত হইলে বিপুল সংখ্যক 'আলিম, বিজ্ঞানী, শিল্পী ও সমাজনেতা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ইলতুত্‌মিশের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদেরকে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলায়, এমনকি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও ভারত বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

ইলতুত্‌মিশ একজন অতি ন্যায়পরায়ণ, ধর্মনিষ্ঠ ও উদারচিত্ত শাসক ছিলেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতায়ও অনুরাগী ছিলেন। অব্যাহত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

তাবাকাত-ই নাসিরীর মতে সুলতান শামসু'দ-দীন ইল্‌তুত্‌মিশ কোটি মুদ্রাদাতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন, অথচ কুত্‌বু'দ-দীনকে আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল লক্ষ মুদ্রাদাতা হিসাবে। তাঁহার শাসনামলে চতুর্দিক হইতে লোকেরা ভারতবর্ষের রাজধানী এবং ইসলাম ও শারী'আতী বিধিবিধানের কেন্দ্রভূমি দিল্লীতে আগমন করিত।

পরে বাগদাদের খলীফার পক্ষ হইতে সম্রাটের জন্য, শাহ্‌যাদাদের জন্য, অমাত্যবর্গের জন্য এবং দেশের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের জন্য বিভিন্নরূপ উপহার-উপঢৌকন প্রেরিত হয়। সোমবার ২২ রাবী'উল- আওওয়াল, ৬২৬/১৯ ফেব্রুয়ারী, ১২২৯ সনে খালীফাতু'ল-মুসলিমীন কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি দিল্লী পৌঁছেন। এতদুপলক্ষে দিল্লী শহরকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয় এবং এক জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব পালিত হয়। খিলাফাতের কেন্দ্রের সহিত উক্তরূপ সুসম্পর্ক রাখা তৎকাল পর্যন্তও মুসলিম জনগণের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইত। গায্‌নাবী ও ঘোরী সুলতনগণও উহাকে নিজেদের জন্য গৌরব ও সম্মানের বিষয় মনে করিতেন। তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সম্পদ খিলাফাতের কেন্দ্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সম্পদ অপেক্ষা অধিকতর হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা ঐরূপ মনে করিতেন।

ইলতুতমিশ দিল্লী ও আজমীরে সুদৃশ্য কারুকার্যমণ্ডিত বিশাল ইমারতাদি নির্মাণ করেন। উহাদের মধ্যে কুত্‌ব মীনারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুওয়াতুল-ইসলাম নামীয় মসজিদের তৃতীয় তলাও তিনিই ৬২৭/১২৩০ সনে নির্মাণ করাইয়াছিলেন (আছারু'স-সানাদীদ, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৬৬)।

ইলতুত্‌মিশ আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। তিনি হযরত বাখ্‌তিয়ার কাকী (র)-এর মুরীদ এবং হযরত খাজা মু'ঈনু'দ-দীন চিশ্‌তী (র)-এর প্রিয়পাত্র ছিলেন। খাযীনাতু'ল আসফিয়া' গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে, সুলতান ইলতুত্‌মিশ বাহ্যত যদিও রাজত্ব ও রাজ্য শাসনের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন, কিন্তু অন্তরে তিনি সূফী ও দরবেশদের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তিনি অল্প আহার করিতেন, অল্প ঘুমাইতেন এবং সাধারণত রাত্রিতে জাগিয়া 'ইবাদত (দ্র.) করিতেন। তিনি রাত্রিকালে দাস-দাসীদিগকে কাজে খাটাইয়া কষ্ট দিতেন না। প্রজাবর্গের অবস্থা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সাধারণ মানুষের পোশাক পরিধান করিয়া রাত্রির অন্ধকারে শহরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। 'আলিম, সজ্জন ও সূফীদের খিদমত করাকে নিজের জন্য গৌরবের বিষয় মনে করিতেন এবং গোপনে দান করাই শ্রেয় মনে করিতেন।

ইল্‌তুত্‌মিশের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরু'দ-দীন মাহ্‌মূদ বঙ্গদেশের লক্ষ্মণাবতীতে ইন্‌তিকাল করেন। পুত্রদের মধ্যে একমাত্র তিনিই রাজ্য-শাসন ও রাজ্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মহৎ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। অন্যান্য পুত্রের কাহারও মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনও গুণ ছিল না। পুত্র নাসিরু'দ-দীন মাহ্‌মূদের ইন্‌তিকালে ইল্‌তুত্‌মিশ অত্যন্ত শোকাহত হন। তিনি এই নামেই স্বীয় কনিষ্ঠতম পুত্রের নামকরণ করেন। তাঁহার ঐ পুত্রই তদীয় বংশের সর্বশেষ সুলতান ছিলেন।

ইল্‌তুত্‌মিশ ছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীন মুসলিম সুলতানদের মধ্যে দ্বিতীয়। চরিত্রগুণ, যোগ্যতা ও কৃতিত্বের কারণে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শাসকগণের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত।

**গ্রন্থপঞ্জী** : (১) মিন্‌হাজ সিরাজ জুয্‌জানী, তাবাকাত-ই নাসিরী, সম্পা. 'আবদু'ল-হায়্যি হাবীবী কান্দাহারী, ১খ, কাবুল ১৩৪২ সৌর হি., ২খ, টীকাসহ, লাহোর ১৯৫৪ খৃ. (পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা); (২) বাদায়ুনী, মুনতাখাবু'ত-তাওয়ারীখ, বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৬২ খৃ., ১খ; (৩) তারীখ-ই ফিরিশ্‌তাহ, নওলকিশোর কর্তৃক মুদ্রিত, ১২৮১/১৮৬৫; (৪) সায়্যিদ গুলাম হুসায়ন তাবাতাবা'ঈ, সিয়ারু'ল-মুতা'আখ্‌খিরীন, নওলকিশোর কর্তৃক মুদ্রিত, শাওওয়াল ১৩১৪/মার্চ ১৮৯৭; (৫) নিজামু'দ-দীন আহ্‌মাদ, তাবাকাত-ই আক্‌বারী, বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯১১ খৃ.; (৬) য়াহ্‌য়া ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আস্‌-সাহ্‌রান্দী, তারীখ-ই মুবারাক শাহী, বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯১৩ খৃ.; (৭) সুজন রায় ভাণ্ডারী, খুলাসাতু'ত তাওয়ারীখ, জে. অ্যাণ্ড সন্স, দিল্লী ১৯১৮ খৃ.; (৮) ফাখরু'ল-মুল্‌ক 'ইসামী, ফুতূহু'স্‌- সালাতীন,মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা ১৯৪৮ খৃ.; (৯) স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান, আছারু'স-সানাদীদ, নওলকিশোর, রাবী'উ'ল-আখিরা ১৩১৩/ অক্টোবর ১৮৯৫; (১০) গুলাম সারওয়ার, গুলযার-ই. শাহী কোহ্‌-ই নূর, লাহোর কর্তৃক মুদ্রিত; (১১) টমাস উইলিয়াম বেল, মিফ্‌তাহু'ত-তাওয়ারীখ, মাতলা'উ'ল-আখ্‌বার ওয়া আস'আদু'ল-আখ্‌বার আগ্রা ১৮৪৯ খৃ. কর্তৃক মুদ্রিত'; (১২) গুলাম হুসায়ন সালীম, রিয়াদু'স-সালাতীন (বঙ্গদেশের ইতিহাস), বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৮৯০ খৃ.; (১৩) মুহাম্মাদ যাকাউল্লাহ্‌ দিহ্‌লাবী, তারীখ-ই হিন্দুস্তান (ইসলামী সালতানসাতের বিবরণ), ১খ, মাতবা'-ই ইন্‌স্টিটিউট, আলীগড় ১৯১৫ খৃ.; (১৪) গুলাম সারওয়ার, খাযীনাতু'ল-আসফিয়া', ১খ, মাতবা'-ই ছামার-ই হিন্দু, লাখনৌ, যু'ল-কা'দা ১২৯০ হি.; (১৫) ঈশ্বরী প্রসাদ, The History of Medieval India, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ ১৯৪০ খৃ.; (১৬) E. Thomas, Cronicles of the Kings of Dehli; (১৭) The Encyclopaedia of Isiam, ১ম সংস্করণ, ২খ; (১৮) বাংলা বিশ্বকোষ, পৃ. ৩৪৭।

গুলাম রাসূল মিহ্‌র (দা.মা.ই.)/ মু. মাজহারুল হক

**ইল্‌দেনিয, শামসু'দ্‌-দীন** (إلدنز، شمس الدين) ঃ (মৃ. ৫৭১/১১৭৫-৭৬?), আযারবায়জানের আতাবেগ এবং স্বল্পায়ু ইলদেনিযী বংশের প্রতিষ্ঠাতা (দ্র. ইল্‌দেনিযী)।

জন্মগতভাবে তিনি একজন কিপ্‌চাক তুর্কী ছিলেন। তিনি সালজূক সুলতান মাহ্‌মূদের উযীর কামালু'দ-দীন আস-সিমীরূমী (নিহত ৫১৫ বা ৫১৬/১১২১ বা ১১২২)-র একজন ক্রীতদাসরূপে জীবন আরম্ভ করেন। অতঃপর তিনি সুলতান মাস্'উদ (৫২৯/১১৩৪-৫৪৭/২১৫২)-এর চাকুরীতে যোগদান করেন। তিনি তাঁহাকে আর্‌রানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। জর্জীয় আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য এই দূরবর্তী প্রদেশে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী পোষণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ায় ইল্‌দেনিয সালজূকদের অন্যতম শক্তিশালী আমীরে পরিণত হন এবং ৫৪০/১১৪৬ সালের দিকে নিজেকে আয়ারবায়জানের প্রকৃত স্বাধীন শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। সুলতান মাস্'উদ তাঁহার ভ্রাতা ও পূর্ববর্তী শাসক তুগ্‌রিলের বিধবা স্ত্রী মু'মিনা খাতূনকে তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দেন। মাস্'উদের মৃত্যুর (৫৪৭/১১৫২) পর এই পরিণয় তাঁহাকে উত্তরাধিকার নির্ধারণের বিবাদে তাঁহার সৎপুত্র আর্‌সলান ইব্‌ন তুগ্‌রিলের পক্ষে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্বুদ্ধ করে। ৫৫৬/১১৬১ সালে তিনি হামাদান হইতে অভিযান পরিচালনা করেন এবং সুলায়মান শাহকে পরাজিত করিয়া আর্‌স্‌লানকে সুলতানরূপে ক্ষমতা অধিষ্ঠিত করেন। কৃতজ্ঞ আর্‌স্‌লান ইল্‌দেনিযকে আতাবেক-ই আ'জাম-এর মর্যাদা দান করেন। এই সময়ে ইল্‌দেনিয তাঁহার অভিভাবকত্বাধীন (Protege) সুলতানের মর্যাদার নিরাপত্তা বিধানের দিকে মনোনিবেশ করেন। ইল্‌দেনিযের পুত্র (ও উত্তরাধিকারী) পাহ্‌লাওয়ানের সহিত রায়-এর আমীর ইনান্‌চ (Inance)-এর কন্যার বিবাহের ফলে তাঁহাকে (ইনান্‌চ্‌কে) সাময়িকভাবে বশীভূত করা হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি ফার্‌স ও কায্‌বীনের আমীরদের সহযোগিতায় আর্‌স্‌লানকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা মুহাম্মাদকে ক্ষমতাসীন করার চেষ্টা করেন। বিরোধী পক্ষ ইল্‌দেনিয কর্তৃক পরাজিত হন; কিন্তু ইনান্‌চ রায়-এর দিকে পলায়ন করেন। সেইখানে তিনি খাওয়ারিয্‌ম শাহ ইল-আর্‌স্‌লানের সমর্থন লাভ করেন, কিন্তু ৫৬৪/১১৬৯ সালে ইল্‌দেনিযের আগমনে তিনি পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ইল্‌দেনিয ইনানচ্‌-এর উযীর সা'দু'দ-দীন আল-আশাল্ল-এর সহযোগিতায় তাঁহার হত্যার ব্যবস্থা করেন। অতঃপর ইল্‌দেনিয সুলতানের সহিত ইস্‌ফাহান গমন করেন এবং ফার্‌স-এর আতাবেগ যান্‌গীর আনুগত্য লাভ করেন। জর্জিয়ানদের দুইন (দ্র. Dwin) লুণ্ঠনের (৫৫৭/১১৬২) সংবাদে তিনি আযারবায়জানে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। অতঃপর ইল্‌দেনিযের নেতৃত্বে মুসলিম শাসকদের একটি সম্মিলিত দল জর্জিয়া আক্রমণ করে এবং রাজাকে পরাজিত করে (দ্র. কুরজ)। হামাদানে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি শুনিতে পান যে, খাওয়ারায্‌ম শাহ খুরাসান আক্রমণের পরিকল্পনা করিতেছেন। এই রাজ্যগুলি সালজূক সুলতানের অধীন— এই মর্মে ইল্‌দেনিযের এক সতর্কবাণী সত্ত্বেও ইল্‌-আর্‌সলান নীশাপুর আক্রমণ করেন। ইল্‌দেনিয তাঁহাকে বিস্‌তামে বাধা প্রদান করেন, কিন্তু কোন সম্মুখ সমর সংঘটিত হয় নাই এবং ইল্‌-আর্‌স্‌লান ফিরিয়া যান। ৫৬৮/১১৭২ সালে ইল্‌-আর্‌স্‌লানের মৃত্যুর ফলে ঐদিক হইতে হুমকি দূরীভূত হয়। ইহার ফলে সম্ভবত ৫৭১/১১৭৫-৭৬ সালে তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে ইল্‌দেনিয সালজূক সাম্রাজ্যের ইরাকী অঞ্চলগুলির প্রকৃত শাসকরূপে পরিগণিত হন। তাঁহাকে হামাদানে স্বপ্রতিষ্ঠিত একটি মাদ্‌রাসার পার্শ্বে দাফন করা হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) বুনদারী, যুব্‌দাতু'ন্‌-নুস্‌রা ... (Houtsma, Recueil, ii), নির্ঘন্ট; (২) সাদ্‌রু'দ-দীন আল-হু'সায়নী, আখ্‌বারু'দ-দাওলা আস্‌-সালজূকিয়্যা, সম্পা. এম. ইক্‌বাল, লাহোর ১৯৩৩ খৃ., নির্ঘন্ট; (৩) ইব্‌নু'ল-আছীর, ১১খ. (নির্ঘন্ট); (৪) হাম্‌দুল্লাহ কায্‌বীনী, তারীখ-ই গুযীদা (GMS, ১৪/১-২), ৪৭২-৭৩; (৫) মীর খাওয়ান্দ, রাওদাতুস- সাফা, লখনৌ ১৮৯১ খৃ., ২ খ, ২০১ প.; (৬) C. E. Bosworth, in Cambridge History of Iran, ৫খ, ১ম অধ্যায়, বিশেষত পৃ. ১৬৯-৭০, ১৭৬-৯ (পূর্ণ সূত্রনির্দেশসহ)। ইল্‌দেনিযী প্রবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী দেখুন। এই প্রবন্ধটি ইল্‌দেনিয প্রবন্দের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ যাহা I A, fasc. ৫০, ৯৬১-৬৪-তে প্রকাশিত হইয়াছে।

Mirza Bala (E. I.[2])/ডঃ এ. কিউ. এম. শামসুল আলম

**ইল্‌দেনিযী বা এলদিগুযী** ঃ আতাবেগ বা তুর্কী দাস সেনানায়ক-গণের একটি শাখা, যাঁহারা ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত আর্‌রান, আযারবায়জানের অধিকাংশ এবং জিবালসহ উত্তর-পশ্চিম পারস্যের অধিকাংশ এলাকা শাসন করিতেন। ৫৯০/১১৯৩-এর যুদ্ধে তুগ্‌রিল ইব্‌ন আর্‌স্‌লান-এর মৃত্যুকাল হইতে ইরাক ও পারস্যের মহান সালজূক সুলতানগণের অধীনে থাকিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সালজূক শাসনের প্রায় শেষ অবধি তাঁহার নিজেদের মুদ্রায় এই অধীনতা স্বীকার করেন। পরবর্তীকালে মোঙ্গলদের পশ্চিমমুখী অগ্রাভিযান এবং খাওয়ারায্‌ম শাহগণ দুর্বল হইয়া এই বংশের পতন না হওয়া পর্যন্ত কার্যত তাহারা একটি স্বাধীন রাজবংশরূপে বিরাজ করেন। সকল ইল্‌দেনিযী আতাবেগগণ নিজ নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন।

**ইলদেনিযী বংশ-তালিকা**

১. শামসু'দ-দীন ইলদেনিয
- ২। নুস্‌রাতু'দ-দীন জাহান-পাহ্‌লাওয়ান মুহাম্মাদ
  - ৪। কুত্‌লুগ্‌ ইনানচ
  - ৫। নুস্‌রাতুদ-দীন আবূ বাক্‌র
    - পীশ্‌কীন
  - ৬। মুজাফ্‌ফারু'দ দীন উযবেগ
    - কীযীল আর্‌স্‌-লান খামুশ
  - ৭। আমীর-ই আমীরান 'উমার
- ৩। মুজাফ্‌ফারু'দ-দীন কীযীল আর্‌স্‌লান 'উছমান
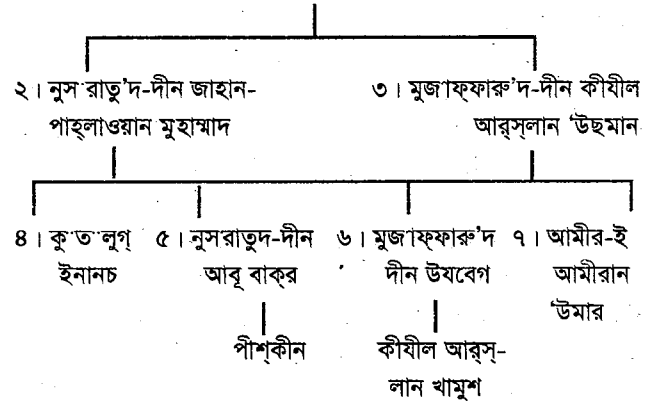
১। **রাজনৈতিক ইতিহাস** ঃ শামসু'দ-দীন ইল্‌দেনিযের সমগ্র জীবনেতিহাস ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে (ইল্‌দেনিয দ্র.)। তাঁহার নামের বানান অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল 'yldkz' হইতে 'ইল্‌দেগিয' বা 'ইল্‌দেনিয' লিখিত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু V. Minorsky (Studies in Caucasian History, 92, নং ২) তুর্কী হইতে উহা উদ্ভূত মনে করেন এবং আর্মেনীয় ও জর্জীয় ভাষায় নামটির প্রতিবর্ণায়নের ভিত্তিতে ইহার রূপ 'এলদিগুয' বলিয়া ধারণা করেন। সুলতান তুগ্‌রিল ইব্‌ন মালিক শাহের বিধবা স্ত্রী মু'মিনা খাতূনকে বিবাহ করায় এবং আর্‌স্‌লান ইব্‌ন তুগ্‌রিলকে ক্ষমতারোহণে সহায়তা করায় সালজূক রাজ-পরিবারের সহিত তাঁহার সম্পর্কের উন্নতি হয়। ফলস্বরূপ তাঁহার সন্তানগণ উত্তর-পশ্চিম পারস্যের উপর একচ্ছত্র প্রভুত্ব অর্জন করেন;

তাঁহারা বেশ কিছুকাল তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলির মুকাবিলায় এই প্রভুত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হন।

ইল্‌দেনিযের জ্যেষ্ঠ পুত্র আতাবেগ নুসরাতু'দ-দীন জাহান-পাহ্‌লাওয়ান মুহাম্মাদ (৫৭১-৮২/১১৭৫-৮৭) ছিলেন সুলতান আর্‌সলানের বৈপিত্রেয় ভাই। তিনি শুধুমাত্র তাঁহার পিতৃরাজ্য আর্‌রান এবং মারাগার আহমাদালিস কর্তৃক অনধিকৃত আযারবায়জানের অংশবিশেষেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন নাই; বরং জিবাল, হামাদান, ইসফাহান এবং রায়কেও তাঁহার রাজ্যভুক্ত করেন। তাঁহার ভ্রাতা কীযীল আর্‌সলান 'উছমান তাবরীযে অধীনস্থ শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। পাহ্‌লাওয়ান মুহাম্মাদ তাঁহার পিতার নীতির অনুকরণে সুলতানকে নিজের অভিভাবকত্বে রাখিবার নীতি অব্যাহত রাখেন। ইমাদু'দ-দীন সুচতুর বাক-চাতুর্যের সহিত দাবি করেন যে, আতাবেগের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইবার আশায় পাহলাওয়ান মুহাম্মাদ ৫৭১/১১৭৬ সালে আর্‌সলানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন এবং পরে আর্‌সলানের তরুণ পুত্র তুগ্‌রিলকে ক্ষমতায় বসান। পাহলাওয়ান মুহাম্মাদের আতাবেগীয় তৎপরতার বিবরণ রাওয়ান্দী ও ইব্‌ন ইস্‌ফানদিয়ার বিশেষভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। কথিত আছে যে, ব্যক্তিগত দাসবাহিনী, ইবনু'ল আছীরের ভাষায়, পাহ্‌লাওয়ানিয়্যাগণের সাহায্যে তিনি রাজ্যে নিজেকে অতিশয় ক্ষমতাশীলরূপে আসীন করিয়াছিলেন। বাহ্যত মনে হইয়াছিল, তাহারা পাহ্‌লাওয়ান মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর তাঁহার সন্তানগণের সমর্থক হইবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল যে, তাহারা সংহতি সৃষ্টি অপেক্ষা অনৈক্যের উপাদানরূপেই কাজ করিয়াছে বেশী। বস্তুত সুলতান তুগ্‌রিলের শাসনামল এবং তৎপরবর্তী কালে পশ্চিম পারস্যের গোলযোগকে তাহারা আরও বাড়াইয়া দেয় (দ্র. Luther, Rawandi's report on the administrative change of Muhammad Jahan Pahlavan)। ৫৮২/১১৮৭ সনে পাহ্‌লাওয়ান মুহাম্মাদ ইনতিকাল করিলে তুর্কীদের প্রচলিত জ্যেষ্ঠক্রম অনুসারে তাঁহার সন্তানহীন ভ্রাতা মুজাফ্‌ফারু'দ-দীন কীযীল আর্‌সলান 'উছমান (৫৮২-৭/১১৮৭-৯১) আতাবেগীয় উত্তরাধিকার লাভ করেন। যাহা হউক, পাহ্‌লাওয়ান মুহাম্মাদ তাঁহার অধিকারভুক্ত রাজ্যকে চারি পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন ; ইহারা কীযীল আর্‌সলানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অধীনস্থ শাসকরূপে কাজ করিতেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা অত্যন্ত অশুভ প্রমাণিত হয়। যে দাসগণকে পাহ্‌লাওয়ান মুহাম্মাদ প্রতিপত্তিশালীর মর্যাদায় আসীন করিয়াছিলেন তাহারা এক্ষেত্রে অনেকটা অনিবার্যরূপে সেই ক্ষমতা ত্যাগে অনীহা প্রকাশ করে। রায়-এর গভর্নর ঈনানচ সোনকুরের কন্যা পাহ্‌লাওয়ান মুহাম্মাদের বিধবা স্ত্রী ঈনানচ খাতুন ছিলেন অনুরূপ উচ্চাভিলাষী। তিনি স্বীয় দুই পুত্র কুতলুগ ঈনানচ ও আমীর-ই আমীরান 'উমারের দাবির সমর্থনে পাহ্‌লাওয়ান মুহাম্মাদের দাসী স্ত্রীর গর্ভজাত অপর দুই পুত্রের বিরোধিতা করেন। সুচতুর রাষ্ট্রনায়কোচিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী পাহ্‌লাওয়ান মুহাম্মাদের সহিত সুলতান তুগরিলের আচরণ ছিল যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু কীযীল আর্‌সলানের মনোভাব ছিল অপেক্ষাকৃত কম সহানুভূতিশীল। তিনি সুলতানের সহিত অবজ্ঞাসূচক আচরণ শুরু করেন। ইলদেনিযী ও 'আব্বাসী খিলাফাতের পুনরুজ্জীবিত শক্তি এই দুইয়ের চাপের মধ্যে (কীযীল আর্‌সলান আন-নাসিরের উযীর 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন য়ুনুস বাহিনীকে তাঁর সাহায্যার্থে আহ্বান করিয়াছিলেন) তুগ্‌রিল তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে কীযীল আর্‌সলান প্রথমত সানজার ইব্‌ন সুলায়মান শাহ নামে একজন সালজূক বংশীয় রাজপুত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বী সুলতানরূপে ক্ষমতায় বসান। পরে খলীফার অনুমোদন লইয়া তিনি নিজেকে ইরাক ও পারস্যের সুলতানরূপে ঘোষণা করেন। এই সময় হইতে তাঁহার মুদ্রায় সুলতানকে স্বীকৃতি না দিয়া শুধুমাত্র খলীফাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হইতে থাকে (দ্র. E. von Bergmann, Zur Muhammedanische Munzkunde, in ZDMG, xxiii, ১৮৬৯ খৃ., পৃ. ২৫১-৬)। যাহা হউক, ইহার এক বৎসর পর তিনি সম্ভবত ঈনানচ্‌ খাতূনের হস্তে নিহত হন— যাঁহাকে তিনি প্রচলিত বিবাহ প্রথা অনুযায়ী বিধবা ভ্রাতৃবধূরূপে বিবাহ করিয়াছিলেন (দ্র. Houtsma, Some remarks on the history of the Saljuks, পৃ. ১৪২-৪)।

ঈনানচ খাতূনের পুত্র কুত্‌লুগ ঈনান্‌চ (৫৮৭-৯১/১১৯১-৫) দক্ষিণাঞ্চলীয় আর্‌রান হইতে আক্রমণকারী তাঁহার বৈপিত্রেয় ভাই আবূ বাক্‌র এবং বন্দীশালা হইতে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ও প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর সুলতান তুগ্‌রিলের বিরুদ্ধে আপন বংশীয়গণের উপর নির্ভরশীল হন। খাওয়ারায্‌ম শাহ টেকিশের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কুত্‌লুগ ঈনান্‌চ উত্তর-পশ্চিম পারস্যে এক নূতন ভয়াবহ শক্তির সূচনা করেন যাহা শেষ পর্যন্ত তাঁহার নিজ পরিবারের জন্যও বিপর্যয় ডাকিয়া আনিয়াছিল (নিম্নে দেখুন)। টেকিশ ৫৯০/১১৯৪ সনে সালজূক সালতানাতের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের পর কুত্‌লুগ ঈনান্‌চকে জিবালের গভর্নর নিযুক্ত করেন। কুত্‌লুগ ঈনান্‌চের আতাবেগীয় আমলে নুসরাতু'দ-দীন আবূ বাক্‌র ইব্‌ন পাহলাওয়ান মুহাম্মাদ (৫৯১-৬০৭-১১৯৫/১২১০) ইলদেনিযীদের কেন্দ্রভূমি আযারবায়জানে তাঁহার অবস্থানকে সংহত করেন এবং সেখানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে শাসন করিতে থাকেন। অন্যদিকে জিবালে তাঁহার কর্তৃত্ব নামমাত্র, প্রকৃত ক্ষমতা ছিল পাহলাওয়ানিয়্যা দাস সেনাপতিদের হাতে। আবার ইসফাহান, কায্‌বীন এবং হামাদানের মত শহরগুলি নিয়ন্ত্রণ করিতেন খলীফা আন-নাসির। আবূ বাক্‌রের বেশীর ভাগ শক্তি তাঁহার পরিবারের পুরাতন শত্রু মারাগার আহমাদীলীদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত থাকে। কবি নিজামীর পৃষ্ঠপোষক 'আলা'উ'দ-দীন কারা সোনকুর ৬০২/১২০৫-৬ সনে আবূ বাক্‌রকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু আবূ বাক্‌র আহমাদীলী আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হন এবং তাহাদের রাজধানী দখল করিয়া নেন; বস্তুত ইহার তিন বৎসর পর আহমাদীলীদের বেশীর ভাগ এলাকা ইলদিগুযী নিয়ন্ত্রণে চলিয়া আসে।

মুজাফ্‌ফারু'দ-দীন উজবেগ ইব্‌ন পাহলাওয়ান মুহাম্মাদ (৬০৭-২২/১২১০-২৫) উত্তর জিবালকে মাঝেমধ্যে ৬০০/১২০৩-৪ সালের পর হইতে শাসন করিতে থাকেন, যদিও বেশীর ভাগ ইল্‌দেনিয দাসগণ সেখানে ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং ৬১৪/১২১৭ সনে ইসফাহান চূড়ান্তভাবে উজবেকের হস্তচ্যুত হয়। ৬০৭/১২১০ সনে আবূ বাক্‌রের মৃত্যুর পর মোঙ্গলরা তাবরীযে উপস্থিত হইলে উযবেক তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দান করেন। জর্জীয়াবাসী ও খিলাতের আয়্যুবী শাসকগণের সহিত মিত্রতার প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয় এবং পরবর্তী বৎসরে মোঙ্গলদিগকে পুনরায় ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। উযবেককে তাঁহার শাসনকালের শেষ বৎসরগুলিতে জর্জীয় আগ্রাসন, খাওয়ারাযমীদের বিদ্রোহের হুমকি এবং মোঙ্গলগণ কর্তৃক পুনরাক্রমণের আশংকা ইত্যাদির মুকাবিলা করিতে

হয়। সর্বশেষ ইল্‌দেগুযী বংশের উপর চূড়ান্ত আঘাত আসে খাওয়ারাযম শাহ জালালু'দ-দীন মিংবুরনুর নিকট হইতে। ৬২২/১২২৫ সনে তাবরীয হাতছাড়া হয় এবং উযবেক সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী হন। ইলদেগুযী বংশের সর্বশেষ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হইলেন উযবেকের বধির পুত্র কীযীল আরস্‌লান খামূশ (the silent), যিনি একজন আহ্‌মাদীলী শাহযাদীকে বিবাহ করেন এবং পরবর্তী কালে জালালু'দ-দীনের পক্ষাবলম্বন করেন।

২। **সংস্কৃতি** ঃ তুর্কী ইল্‌দেনিযীগণ তাঁহাদের সময়ে ইরানী ইসলামী সভ্যতায় পুরাপুরি শরীক ছিলেন। এই সময়ে শার্‌ওয়ান, আব্‌রান, আযারবায়জানসহ উত্তর ইরানের রাজ-দরবারসমূহের প্রতি কবি ও সাহিত্যিকগণের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ইল্‌দেনিয তাঁহার ধার্মিকতা ও পণ্ডিতগণের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি হামাযানের বৃহৎ মাদ্‌রাসা নির্মাণ ও ইহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দান হিসাবে আওকাফের ব্যবস্থা করিয়া যান এবং সেইখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। এমন কি কুখ্যাত মদ্যপায়ী আবূ বাক্‌রও 'আলিমগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং মসজিদ-মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। ঐতিহাসিক দাওলাতা শাহ ইল্‌দেনিয রাজ-দরবারের বেশ কয়েকজন কবির নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইলেন আছ্‌ীরু'দ-দীন আখসিকাতী, মুজীরু'দ-দীন বায়লাকানী, জাহীরু'দ-দীন ফারায়াবী, নিজামী, কি'ওয়ামী, মুতার্‌রিযী এবং য়ূসুফ ফুদূলী। ইহা ছাড়া 'আওফী ইঁহাদের সহিত 'ইমাদু'দ-দীন গায্‌নাবী এবং পাহ্‌লাওয়ান মুহাম্মাদের স্তুতিলেখক শাফ্‌রূহ ইস্‌ফাহানীর নামও উল্লেখ করিয়াছেন। এই কবিগণের মধ্যে কীযীল আর্‌স্‌লান ও আবূ বাক্‌রের রাজ-দরবারে জাহীরু'দ-দীনের ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য। কীযীল আর্‌স্‌লানের সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য নিজামী তাঁহার জন্মভূমি গাঞ্জা-র বাহিরে অন্যতম দুর্লভ সফর সম্পন্ন করেন। কমপক্ষে তাঁহার চারিটি খাম্‌সা ইলদেনিযীদের সম্পর্কে রচিত মাখ্‌যানু'ল-আস্‌রার গ্রন্থটি ইল্‌দেনিযের উদ্দেশ্যে এবং "খুসরাও উ শীরীন' সুলতান তু'গ'রিল ইব্‌ন আর্‌স্‌লান, পাহ্‌লাওয়ান মুহাম্মাদ ও কীযীল আর্‌স্‌লানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত (শেষোক্তজনের নিকট হইতে কবি চারিটি গ্রাম উপহার হিসাবে লাভ করেন)। ইসকান্দার নামাহ ও হাপ্ত পায়কারের প্রথম সংস্করণ আবূ বাক্‌রের নামে উৎসর্গ করা হয়। (ইসকান্দার নামাহ দুই খণ্ড উৎসর্গীকরণ সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য দেখুন Minorsky, Caucasica II, ৮৭২-৩)।

৩। **উপসংহার** ঃ এই বংশের ঐতিহাসিক তাৎপর্য দুই পর্বে বিভক্ত। প্রথমত, সালজূক'দের দুর্বলতার ফলে ইলদেনিযীগণ উত্তর পারস্যের গভর্নর পদ রূপান্তরিত করিয়া উহাকে সালজূক রাজপুত্রের উপর আতাবেগীয় শক্তির বংশানুক্রমিক শাসনে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইলদেনিয ও পাহ্‌লাওয়ান মুহাম্মাদের মত শক্তিশালী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের বংশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁহারা সালজূক রাজ-পরিবারে আতাবেগীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিয়া কার্যত স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের দুর্বল উত্তরাধিকারিগণ উত্তর ও পশ্চিম পারস্যের ক্ষমতা লাভের জন্য দ্বন্দ্বরত অন্য অনেক শক্তির মধ্যে নিজদিগকে মাত্র একটি উপাদানরূপে দেখিতে পাইলেন। এই শক্তিগুলি হইল— প্রতিদ্বন্দ্বী তুর্কী আমীরগণ, 'আব্বাসী খলীফা, খাওয়ারাযম শাহ এবং পশ্চিম প্রান্তে আয়্যূবী শাসকগণ, যাহাদের সহিত খিলাতের আরমানীদের উত্তরাধিকারের বিষয়ে পাহ্‌লাওয়ান মুহাম্মাদের কিছুটা কূটনৈতিক বিরোধ ছিল (আর্মেনিয়া ও আযারবায়জানের সীমান্তে আয়্যূবী নীতি সম্পর্কে দ্র. V. Minorsky, Studies in Caucasian History, 150 ff., এবং F. Sumer, IA, art. Pehlivan) এবং আযারবায়জানের বাহিরে তাহাদের কর্তৃত্ব প্রায়শ বিরোধের সম্মুখীন হইত। দ্বিতীয়ত ইলদেনিযী শক্তির সুসংহতি এবং জর্জিয়ার খৃস্টান সামরিক সম্প্রসারণবাদের অভ্যুদয় একই সময়ে সংঘটিত হয়। জর্জীয়ানদের এলাকা, মুসলিম শারওয়ান ও আর্‌রান পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। ককেশীয় সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা ইল্‌দেনিযীগণের বিশেষ উদ্বেগের কারণ। আতাবেগ এবং শারওয়ান শাহ ও শাহ আরমানীদের মত স্থানীয় শাসকদের প্রচেষ্টার ফলে বাগরাতী রাজা তৃতীয় জর্জি (giorgi)-এর (১১৫৬-৮৪ খৃ.) গতি স্তিমিত হইয়া পড়ে, কিন্তু রাণী তামারার (১১৮৪-১২১২ খৃ.) শাসনামলে জর্জীয়ানগণ পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠে। এই সময়ে পাহ্‌লাওয়ান মুহাম্মাদের মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ইল্‌দেনিযী রাজপুত্রদের সহায়তা করিয়া প্রায়ই ইল্‌দেনিযী এবং শারওয়ান শাহগণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন। আবূ বাক্‌র তাঁহার পদের নিরাপত্তার জন্য ৬২০/১২০৫-৬ সনে একজন জর্জীয়ান রাজকুমারীকে বিবাহ না করা পর্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকে। ইলদেনিযীগণ কোন রকমে জর্জীয়ানদের ঠেকাইয়া রাখিতে সমর্থ হন এবং ককেশাসে মোঙ্গলদের আবির্ভাবের পরই কেবল জর্জীয়ানদের শক্তি দমিত হয়।

**গ্রন্থপঞ্জি** ঃ ঐতিহাসিক তথ্যের প্রাথমিক উৎস ঃ (১) রাওয়ান্দী, রাহাতু'স-সুদূর; (২) জাহীরু'দ-দীন নীশাপূরী, সালজূক-নামাহ; (৩) আবূ হামিদ, যায়ল-ই সালজূক-নামাহ; (৪) মুহাম্মাদ আল-য়াযদী, আল-'উরাদা ফি'ল-হিকায়াতি'স্‌-সাল-জূকিয়্যা (৫) 'ইমাদু'দ-দীন, বুনদারীতে, যুবদাতু'ন-নুসরা; (৬) সাদরু'দ-দীন আল-হুসায়নী, আখবারু'দ-দাওলাতি'স সালজূকিয়্যা; (৭) ইব্‌ন ইস্‌ফানদিয়ার, তা'রীখই তাবারিস্তান; (৮) সিবত ইব্‌নু'ল-জাওযী, মির'আতু'য-যামান; (৯) ইব্‌নু'ল-আছীর, আল-কামিল; (১০) নাসাবী, সীরাত সুলতান জালালি'দ-দীন; (১১) হামদুল্লাহ মুসতাওফী, তা'রীখ-ই গুযীদা। জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া সংক্রান্ত তথ্যের জন্য দেখুন ঃ (১২) Brosset, Histoire de la Georgie; (১৩) ঐ লেখক, Collection d'historiens armeniens, আর্মেনীয় ঐতিহাসিক গাঞ্জাক-এর অধিবাসী কিরাকস্ এবং ভারদান এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য উৎস ঃ (১৪) M.T. Houtsma, Some remarks on the history of the Saljuks, in AO, iii (১৯২৪ খৃ.), পৃ. ১৩৬-৫২ ; (১৫) V. Minorsky, Studies in Caucasian history, London 1993; (১৬) ঐ লেখক, Caucasiac II, in BSOAS, xiii (১৯৫১ খৃ.), পৃ. ৮৬৮-৭৭; (১৭) C. E. Bosworth, অধ্যায়-১, on the history of Iran 1000-1217, Cambridge history of Iran, ৫খ., ক্যামব্রিজ ১৯৬৮ খৃ.; (১৮) K. A. Luther, The political transformation of the Seljuq Sultanate of Iraq and western Iran 1152-1187, প্রিন্‌সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. থিসিস (অপ্রকাশিত); (১৯) ঐ লেখক, Ravandi's reporet on the administrative change of Muhammad Jahan Pahlavan, in Minorsky memorial volume; (২০) R. A. Huseinov, Institut Atabekov, in Palestinskii Sbornik, xv

(1966), পৃ. ১৮১-৯৬; (২১) Minorsky, E. I.[1], সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ দ্র; (২২) Faruk Sumer, IA, দ্র. পাহলাওয়ান এবং কীযীল আর্‌সলান; (২৩) Zambaur, Manuel, E. পৃ. ২৩১; (২৪) Bosworth, The Islamic dynasties, 125-6।

এই বংশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার জন্য দ্র. (২৫) দাওলাত শাহ্‌, তাযকিরাতু'শ-শু'আরা'; (২৬) 'আওফী, লুবাবু'ল-আলবাব; (২৭) J. Rypka, Iranische Literaturgeschichte, ২০০ পৃ.; (২৮) Browne, ২খ., ৪০১-২, ৪১২-১৭।

C. E. Bosworth (E. I.[2])/নুরুল আমিন

**'ইল্‌বা' ইব্‌ন আস্‌মা' আল-'আব্‌সী** (علباء بن أصمع العبسى) ঃ (রা), সাহাবী। ইব্‌ন মান্‌দা নিজস্ব সনদ পরম্পরায় 'ইলবা' (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ তিনি বলেন, আমি প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলাম। তাঁহার সান্নিধ্যে পৌঁছিয়া তাঁহাকে বলিতে শুনিলাম, "লোকেরা যখন পার্থিব স্বার্থের দিকে ধাবিত হয় তাহাদের আখিরাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেই জাতি নিজেদের কামনা-বাসনা লইয়া তৃপ্ত এবং দীন পরিত্যাগ করিয়া বসে আল্লাহ তাহাদের উপর ব্যাপক আকারে গযব নাযিল করেন। অতঃপর তাহারা তাঁহার নিকট দু'আ' করিলে তাহা তিনি কবুল করেন না।"

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৪৯৯; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৪৬ হি., ৪খ., ১০।

মুহাম্মদ মূসা

**'ইল্‌বা' ইব্‌ন মুররা** (علباء بن مرة) ঃ (রা), আবূ মুহাম্মাদ ইব্‌ন হায্‌ম তাঁহাকে সাহাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মু'তা যুদ্ধে শহীদ হন। অষ্টম হিজরীতে রোমীয় সামন্ত-রাজ শুরাহ্‌বীল-এর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ পরিচালিত হয়। এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পালক পুত্র সেনাপতি যায়দ (রা)-ও শহীদ হন। খালিদ ইব্‌নু'ল-ওয়ালীদ (রা) এই যুদ্ধে যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন তাহাতে মুগ্ধ হইয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে সায়ফুল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র তরবারি) খেতাবে ভূষিত করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৪৯৯; (২) মোঃ হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, বগুড়া ১৯৭২ খৃ., পৃ. ৮৬-৭; (৩) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, বৈরুত ও রিয়াদ ১৯৭৮ খৃ., ৪খ., ২৪১।

মুহাম্মদ মূসা

**'ইলবা' আস-সুলামী** (علباء السلمى) ঃ (রা), তিনি মদীনার অধিবাসী ছিলেন। আবূ হাতিম তাঁহাকে সাহাবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি মাত্র হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম বুখারী ইমাম আহমাদের সূত্রপরম্পরায় বর্ণনা করিয়াছেন, 'ইলবা' আস-সুলামী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছিঃ "সৃষ্টির নিকৃষ্টদের উপরই কিয়ামত আপতিত হইবে।" ইমাম হাকিম, বাগাবী এবং ইব্‌ন আবী 'আসিম নিজ নিজ সনদ সূত্রে স্ব স্ব গ্রন্থে হাদীছটির উল্লেখ করিয়াছেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৪৯৯; (২) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বারর, আল-ইস্‌তী'আব (ইসাবার হাশিয়া), ৩খ, ১৭৩-৪।

মুহাম্মদ মূসা

**ইল্‌বীরা** ঃ (স্পেনীয় Elvira) একটি শহর এবং গ্রানাডার সহিত অথবা উহার নিকটবর্তী সংশ্লিষ্ট প্রদেশ। Ilberri/Ilbira/Granada প্রশ্নটি ইতিপূর্বে বহুল আলোচিত। ঐসব বিবরণের সারসংক্ষেপ এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে ঃ রোমক আমলের Illberri নামের এই শহরটি বর্তমান গ্রানাডার অংশবিশেষে অবস্থিত ছিল। ঐ অঞ্চলের 'আরব গভর্নরগণ গোড়ার দিকে সেইখানেই বাস করিতেন। তাঁহারা ঐ জনপদের 'আরবীয় নাম দেন ইলবীরা। তবে ১৩০/৭৪৭ সাল নাগাদ তাঁহারা শহরটি বর্তমান গ্রানাডা হইতে ১২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে স্থাপন করেন এক নূতন রাজধানী হিসাবে। উহার কাসতাল্লা, কাসতীলা বা কাসতীলিয়া নাম দেওয়া হয়। তবে শহরটি অচিরেই উহার আগের শহর Elvira নামেই পরিচয় লাভ করে। মূল শহরে জনবসতি অক্ষুণ্ন থাকে। এই শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী ছিল য়াহূদী ও খৃস্টান। এই Elvira শহরের নাম পরে বদলাইয়া Granata/Gharanata (গারনাতা) হয়। ৪০১/১০১০ সনে বারবার অভ্যুত্থানকালে নূতন Elvira শহরে যাবী ইব্‌ন যীরীর সানহাজা বাহিনী ও গ্রানাডায় হিজরতকারী অধিবাসীদের দ্বারা বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত হয়। ৪০৩/১০১২ সনে যাবী স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া গ্রানাডাকে তাঁহার রাজধানী করেন। ইহার পর হইতে Elvira-এর অবক্ষয় শুরু হয় যদিও ঐ শহরে ৮৯১/১৪৮৬ সন পর্যন্ত একটি দুর্গের অস্তিত্ব ছিল। ঐ দুর্গটির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া ঐ শহরের নামটি আজও Sierra de Elvira এবং গ্রানাডায় Puerta de Elvira এই নামের মাঝে বাঁচিয়া আছে।

Elbira শহরের পতন দশার পরেও বহুকাল রাজধানী গ্রানাডার সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের নাম হিসাবে ইল্‌বীরা নামটি টিকিয়া ছিল। আরও দ্র. গারনাতা (Gharanata)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকের সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলীর স্থানে স্থানে ; তবে বিশেষত দ্র. (১) য়াকূত, ১ খ, ৩৪৮, ৪খ., ৯৭; (২) Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., i, 343; (৩) Dozy, Recherches, i, 328-33।

J. F. P. Hopkins (E.I.[2])/আফতাব হোসেন

**আল-ইল্‌বীরী** (দ্র. আবূ ইসহাক আল-ইলবীরী)।

**'ইল্‌ম** (علم) ঃ 'আরবী, অর্থ 'জ্ঞান', ইহা জাহ্‌ল বা 'অজ্ঞতা'-এর বিপরীতার্থক শব্দ। 'ইল্‌ম একদিকে হিল্‌ম (দ্র.)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অপর দিকে আরও কয়েকটি শব্দের সঙ্গেও সম্পর্কিত, সেগুলির যথাযথ সংজ্ঞা পাওয়া যাইবে সেই নামীয় প্রবন্ধসমূহের মধ্যে; যথা মা'রিফা, ফিকহ্‌, হিক্‌মা, শু'উর, তবে 'ইল্‌ম-এর সঙ্গে সচরাচর মা'রিফা শব্দটিকেই সম্পর্কিত করা হইয়া থাকে। কুরআন শারীফে 'আলিমা ক্রিয়া পদটি সমাপিকা ও অসমাপিকা— এই উভয় রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং অনুজ্ঞা বা আদেশবাচকরূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থ 'জানা, কিন্তু অনুজ্ঞারূপে ও সমাপিকারূপে যে ব্যবহার তাহাতে প্রায়শ যেন মূলত "শিক্ষা লাভ করা— to learn"— এই অর্থই বুঝাইয়াছে (অর্থাৎ বিনা চেষ্টায় শিক্ষা লাভ করা, আবার তা'আল্লামা রূপটি তখনই ব্যবহৃত হয় যখন পরিশ্রমসাধ্য পড়াশুনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়; 'ইল্‌ম হইতেছে ইহার লব্ধ ফল। 'আরাফা অর্থও 'জানা'; কিন্তু এই অর্থ আসিয়াছে সম্ভবত কিছু কিছু প্রাথমিক প্রত্যয়ান্ত (মুশ্‌তাক) শব্দ হইতে, যথা 'আরিফ বা 'আররাফ-এর বিশেষ অর্থ (দ্র. T. Fahd, Divination, নির্ঘণ্ট; আল-জাহিজ,

তারবী', নির্ঘণ্ট)। প্রাথমিক আমলেই মুসলিম চিন্তাবিদগণের মধ্যে মা'রিফা ও 'ইল্ম শব্দ দুইটির তাৎপর্য সম্পর্কে মতভেদ দেখা দেয়, প্রথমটি দ্বারা চেতনা বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে বুঝাইত, তাহা দ্বারা জ্ঞান অর্জনের পূর্বে একটি অজ্ঞতার অবস্থা যে ছিল সেরূপ ধরিয়া লওয়া হইত। আর দ্বিতীয় শব্দটি দ্বারা সেই জ্ঞানকে বুঝাইত যাহাকে স্বতঃস্ফূর্ত বলিয়া বর্ণনা করা যায়। অন্য কথায়, মা'রিফা দ্বারা বুঝায় সাধারণ জ্ঞান আর 'ইল্ম দ্বারা বুঝায় আল্লাহ্‌কে জানিবার জ্ঞান এবং সেই অর্থে ধর্ম বিষয়ক যে কোন জ্ঞান। বস্তুত এই পার্থক্যগুলি সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও সন্দেহযুক্ত, এমনকি উভয় শব্দেরই যথেষ্ট উদাহরণ সমেত অর্থগত আলোচনা করিলেও এই সমস্যাটির কোন সমাধান হইবে না। বিভিন্ন লেখক নিজ নিজ পসন্দ অনুযায়ী এইগুলির ব্যবহার করিয়াছেন এবং প্রায়োগিক দিক হইতে অর্থের বিভিন্নতাও ব্যাপকতর হইয়া গিয়াছে। সূফীতত্ত্ব বা অধ্যাত্মবাদের ক্ষেত্রে 'ইল্ম ও মা'রিফা' শব্দ দুইটির মধ্যকার যে সম্পর্ক সে বিষয়ে মা'রিফা ও তাসাওউফ শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটিতে আলোচনা করা হইয়াছে; দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হইতে জ্ঞানের যে ধারণা সে বিষয়ে মা'রিফা শীর্ষক প্রবন্ধ দ্র.। আমরা এখানে শুধু বলিব যে, 'ইল্ম কথাটি দ্বারা মুতাকাল্লিমূন-এর পদ্ধতিগত ধারণার সকল প্রয়োজনই মিটাইতে হইত। তাঁহারা ইহাকে এরিস্টোটলীয়গণের চিন্তা পদ্ধতি বা জ্ঞানের সারবস্তুর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। 'ইল্ম হইতেছে এক অপ্রধান গুণ বা আপতন ('আরাদ); ইহার বৈশিষ্ট্য হইতেছে জীবন (মুখতাস্‌স বি'ল-হায়াত) ও গঠন যাহা ইচ্ছা, শক্তি ইত্যাদির সমন্বয়ে নিম্নতর আকাঙ্ক্ষাহীন মনের অবস্থাসমূহের (কায়ফিয়্যাত) অন্যতম শ্রেণী (দ্র. আল-ঈজী, মাওয়াকিফ, উহাতে আল-জুরজানী কর্তৃক লিখিত ভাষ্য, বূলাক ১২৬৬ হি., পৃ. ২৭২ প.; আত-তাহানাবী, Dict. of techn. terms, 1055-66)। 'ইল্ম হয় চিরন্তন (কা'দীম) অথবা ইহা সময় বা কালের ভিতরে উৎপন্ন হয় (হাদিছ, মুহ্‌দাছ); তাহা নির্ণীত হয় এইরূপে যে, 'ইল্ম কি আল্লাহ্‌র মধ্যে বর্তমান, না সৃষ্ট কোন সত্তাতে বর্তমান, আর এই দুই ধরনের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই। মুতাকাল্লিমূন 'ইল্ম ও মা'রিফা-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহারা প্রথম শব্দটি দ্বারা যৌগিক ও বিশ্বজনীন কিছুকে বুঝাইয়া থাকেন এবং মা'রিফা দ্বারা সহজ সরল বস্তুকে (বাসীত) [দ্র. আল-জুরজানী, তা'রীফাত] ও বিশেষভাবে কোন কিছুকে বুঝাইয়া থাকেন (দ্র. আত-তাফতাযানী, নাসাফীর ভাষ্য, পৃ. ৪৩)।

ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক দৃষ্টিকোণ হইতে 'ইল্ম ও 'আমাল (কাজ বা আচরণ)-এর সম্পর্কের মধ্যে আরও একটি তফাৎ রহিয়াছে। বস্তুত একটি রহিয়াছে 'ইল্ম নাজারী, যেমন কোন বস্তু বিষয়ে জ্ঞান এবং কোন ব্যক্তির এই জ্ঞান থাকিলে তিনি সেইখানে বিরত হইতে পারেন। আর একটি রহিয়াছে 'ইল্ম 'আমালী, যেমন ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ বিষয়ে জ্ঞান ('ইবাদাত), ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করা হইলে তবেই ইহা পরিপূর্ণ হইল (দ্র. আর-রাগিব, মুফরাদাত, পৃ. ৩৪৮)। আল-কারাফী তাঁহার তানকীহ গ্রন্থে (কায়রো ১৩০৬ হি., পৃ. ১৯৩) যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা কতকটা ভিন্ন রকমের যাহার বস্তুর জ্ঞান রহিয়াছে এবং সেই জ্ঞানের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করে না সে অর্ধ-অনুগত আর যাহার এই জ্ঞান রহিয়াছে এবং তদনুযায়ী কাজ করে তাহার কৃতিত্ব দ্বিগুণ।

আরও সাধারণ দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে 'ইল্মকে যদি ধর্মীয়রূপে প্রয়োগ করা হয় তখন তাহা মা'রিফার বিপরীত অর্থ দেয়। যেমন মা'রিফা হইতে পবিত্র নহে সেরূপ জ্ঞানেরও অংশ আবার আদাব (দ্র.)-এর সঙ্গেও বৈপরীত্য প্রকাশ পায় এইভাবে যে, উহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা কঠিন। তবে উহা (আদাব) দ্বারা, বিশেষ করিয়া সাহিত্যে বিষয়ক ও পেশাগত প্রশিক্ষণকেই অধিক বুঝাইয়া থাকে যাহা অনেকটা মা'রিফার অনুরূপ। 'আলিম এই কর্তৃক বিশেষ্য (ইস্‌ম ফা'ইল) পদটি দ্বারা ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিকে (দ্র. প্রবন্ধ 'উলামা) বুঝাইত। পরবর্তী কালে ইহা দ্বারা শুধু বিদ্বান বা পণ্ডিত ব্যক্তিকে বুঝান হইতে থাকে, অথচ এই অর্থ বুঝাইবার জন্য আগে অন্যান্য শব্দ (বিশেষ করিয়া হাকীম) ব্যবহৃত হইত। আর 'ইল্ম দ্বারা যে সাধারণভাবে সকল জ্ঞানকে বুঝান হইতে থাকে তাহা আরও অনেক পরের বিষয়।

এই কথা সত্য যে, 'তালাবু'ল-'ইল্ম' কথাটির মধ্যে শেষ শব্দটি দ্বারা অধিকাংশ 'আলিম হাদীছশাস্ত্রকেই বুঝিতেন, যাহার জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিবার প্রয়োজন হইত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) অসংখ্য হাদীছে মুসলিমগণকে যে 'ইল্ম বা জ্ঞান অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়াছেন সেখানে তিনি শুধু এই ধর্মীয় জ্ঞানকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন কিনা তাহাতে সন্দেহ রহিয়াছে। কাজেই যে সকল হাদীছে এই শব্দটি রহিয়াছে সেখানে 'জ্ঞান' অর্থই বুঝিতে হইবে, যেমন ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলির বিভিন্ন পাঠে ইহাকে 'শিক্ষালাভ' অর্থ করণই সঙ্গত। তাহা ব্যতীত জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রথমে চর্চা করেন দার্শনিকগণ, অতঃপর বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও লেখকগণ। এইগুলিকে অনেক তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় (ইহ্‌যা-'উলূম)। ৩য়/৯ম শতক হইতে শুরু করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত এইগুলির যে বিবর্তন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। L. Gardet S M. M. Anawati তাঁহাদের Introduction a la theologic Musulmane গ্রন্থে (প্যারিস ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ১০১-২৪) সেইগুলির খুবই শিক্ষণীয় তালিকা দিয়েছেন। সেখানে জ্ঞানের গঠনরীতিতে কালামের স্থান বিবেচনা করিয়া তাঁহারা আল-ফারাবী, ইখওয়ানু'স-সাফা', আলখাওয়ারিযমী, ইবনু'ন-নাদীম, আল-গাযালী ও ইব্‌ন খালদূনের পরিকল্পিত শ্রেণীবিভাগসমূহ দেখাইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে ইব্‌ন সীনার (পৃ. ১০২, টীকা ২) যুরজী যায়দানের তালিকারও উল্লেখ করিয়াছেন। এই তালিকা প্রণেতাদের নামের সঙ্গে যোগ করা যাইতে পারে ইব্‌ন কুতায়বা (দ্র. G. Lecomte, Ibn Qutayba, Damascus 1965, 443-9), আবূ হায়্যান আত-তাওহীদী (দ্র. M. Berge, in BEO, xviii, 1963-4, 241-99), ইব্‌ন হায্‌ম (মারাতিবু'ল-'উলূম, সম্পা. এস. আল-আফগানী), মিস্‌কাওয়ায়হ (কিতাবু'স্-সা'আদা, কায়রো ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৪৮-৬০) এবং সম্ভবত আরও অন্য লেখকগণের নাম।

এই সকল তালিকা পরীক্ষা করিলে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে, 'আরব-ইসলামী বিজ্ঞান ও বিদেশী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, তারিখ যতই পিছাইয়াছে ততই ক্রমাগতভাবে শেষোক্ত বিষয় কম স্থান লাভ করিয়াছে। আল-গাযালী (র) [মৃ. ৫০৫/১১১২] এই ক্ষেত্রে একটি সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি প্রশংসনীয় (মাহমূদা) ও নিন্দনীয় (মাযমূমা) বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করিয়াছেন। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় সেইরূপ সকল শাখাকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; শুধু অপ্রয়োজনীয় নহে, দুনিয়াতে জীবনের জন্য ক্ষতিকর

এবং আখিরাতে আত্মার কল্যাণের পক্ষে ক্ষতিকর বিষয়সমূহও (দ্র. ইহ্'য়া, ১খ., অধ্যায় ১-৪)। এই বিষয়ে অপর একটি ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে একটি হাদীছে'র বিতর্কিত ব্যাখ্যার কারণ (তার্কু মালায়া'নীহ 'অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে মনোযোগ না দেওয়া'; দ্র. I. Goldziher, Muh. St., ii, 157)।

তবে সাধারণ যে মনোভাব তাহা কিছু সংখ্যক মুসলিমকে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে গ্রহণ ও পরিবেশন করা হইতে বিরত রাখিতে পারে নাই, সেই বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁহারা নিজেদের অবদানও রাখিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন শাখার বিস্তারিত বিষয় জানা যাইবে নিম্নলিখিত প্রবন্ধসমূহেঃ গণিতশাস্ত্র (আল-জাব্র ওয়া'ল-মুকাবালা; 'ইলমু'ল-হি'সাব), কারিগরি বিষয় (হিয়াল), জ্যোতির্বিদ্যা (আসতুরলাব; ফালাক; 'ইলমু'ল-হায়'আ), চিকিৎসাশাস্ত্র (তি'ব্ব); উদ্ভিদবিদ্যা (নাবাতাত); রসায়ন বা আলকেমী (কীমিয়া'), প্রাণিবিদ্যা (হায়াওয়ান) ইত্যাদি। আর মুসলিম দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সাধারণ জরীপ ও ধারণার জন্য পাঠ করা যাইতে পার ঃ (১) G. Sarton, Introduction to the History of Science, Baltimore 1927-31, 2 vols.; (২) A. Mieli, La science arabe, Leiden 1938; (৩) P. Kraus, Gabir ibn Hayyan, Contribution a l'histoire des idees scientifiques en Islam, Cairo 1942-3 vols.; (৪) L. Massignon and R. Arnaldez, La science arabe, vol. ii of the Histoire generale des science, Paris 1957, 2nd. ed., 1966; (৫) আহ'মাদ আল-হা'সান ও Donald R. Hill, Islamic Technology, London, Cambridge Univ. Press, 1986.

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ বরাত নিবন্ধ গর্ভে উল্লিখিত রহিয়াছে।

সম্পাদকমণ্ডলী (E. I.²) হুমায়ুন খান

**'ইলমিয়্যে** (علمى) ঃ 'উছমানী সাম্রাজ্যে উচ্চতর মুসলিম ধর্মীয় সংস্থা ('উলামা' দ্র.), বিশেষ করিয়া উচ্চতর মাদ্রাসার শিক্ষকগণকে (দ্র. প্রবন্ধ মাদ্রাসা) ও বিচার বিভাগের কাদীগণকে এই সংস্থাভুক্ত সদস্য বলিয়া বিবেচনা করা হইত। তাঁহাদের যে সুবিন্যস্ত শ্রেণী তাহা ইসলামের ইতিহাসে আর কখনও কোথাও ছিল না। ১০ম/ ১৬শ শতক হইতে ইহার সূচনা যাহার প্রধান ছিলেন ইস্তাম্বুলের মুফতী যাঁহাকে বলা হইত শায়খু'ল-ইসলাম (দ্র.)।

কাদীগণের সংস্থাই ছিল 'উছ'মানী 'আলিমগণের মধ্যে সর্বোচ্চ; শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া 'উছ'মানী সাম্রাজ্য বিস্তার ও সংকোচনের ফলে, কতকগুলি পদের তুলনামূলক গুরুত্ব কম-বেশী হইবার কারণে সময়ে সময়ে উহার মর্যাদার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাঁহারা যে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন ক্রমে সেগুলি বিবর্তিত হয়। পরে ১২শ/ ১৮শ শতকে ইহা মোটামুটি একটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। প্রধান প্রধান পদ ছিল কাদী 'আস্কার (দ্র.) বা সুলতা'ন ২য় মুহ'াম্মাদ (মৃ. ৮৮৬/ ১৪৮১)-এর রাজত্বের শেষদিকে সেই পদটিকে যখন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়, যথাঃ রুমেলীর কাদী 'আসকার (সা'দ্র-ই রুম) ও আনাতোলিয়ার কা'দী) 'আসকার (সাদ্র-ই আনাতোলী)। উভয়ই ছিলেন পদাধিকার বলে রাষ্ট্রীয় দীওয়ানের (দ্র. প্রবন্ধ দীওয়ান-ই হুমায়ূন) সদস্য, আর শায়খু'ল-ইসলাম উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উহার সদস্য ছিলেন না। তাঁহারা প্রাদেশিক কাদীগণকে মনোনয়ন প্রদান করিতেন; তবে উচ্চতর পদসমূহের (মোল্লা) মুদাররিসগণের ও ইস্তাম্বুলের মস্জিদসমূহের ওয়া'ইজ'গণের (নিম্নে দ্র.) মনোনয়ন তাঁহারা দিতেন না, শেষদিকের শতাব্দীগুলি ব্যাপিয়া তাঁহাদের নিয়োগ প্রদান করা হইত শায়খু'ল-ইসলামের সহিত পরামর্শক্রমে।

কাদী 'আসকা'রগণের নীচে ছিলেন বড় মোল্লাগণ, তাঁহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানীয়গণ সাম্রাজ্যের বড় বড় শহরের বিচারক নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাদের বেতন হইত দৈনিক ৫০০ আকচে। পরবর্তী কালে তাঁহাদেরকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ পদধারী ছিলেন রাষ্ট্রীয় রাজধানীর বিচারক (ইস্তাম্বুল কাদীসি বা এফেন্দিসি), বিভিন্ন সংস্থার উপরে কর্তৃত্ব প্রদান করিয়া এবং রাজধানী শহরের দ্রব্যাদি সরবরাহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দিয়া তাঁহার কর্তৃত্ব বৃদ্ধি ও সম্প্রসারিত করা হয়। তাহা ছাড়া তিনি ও শহরতলী এলাকার বিচারকগণ (নিম্নে দ্র.) উযীরে আ'জাম-এর দীওয়ানেও বিচারকের দায়িত্ব পালন করিতেন।

পদমর্যাদার নিম্নতর স্তরগুলিতে ছিলেন দুই পবিত্র নগরী (হা'রামায়ন) মক্কা ও মদীনার কাদীগণ। মদীনার কাদী পদটিকে ১১৩৫/১৭২২ সালে মক্কার কাদীর সমমর্যাদায় উন্নীত করা হয় (দ্র. কুচুক চেলিবি-যাদে 'আসিম, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১২৮২ হি., পৃ. ১৬ প.)।

সেই দুইটির পরেই ছিল (খৃ. অষ্টাদশ শতকের পর হইতে) চারিটি প্রধান শহরের (বিলাদ-ই আরবা'আ) কাদীগণের স্থান ঃ দুই সাবেক রাজধানী এদীরনে ও বুরসা এবং খিলাফাতের দুই পুরাতন কেন্দ্রস্থল, কায়রো ও দামিশ্ক। কিছু কালের জন্য ফিলিবিকেও (Plovdiv) পঞ্চম শহররূপে (বিলাদ-ই খাম্সা) বিবেচনা করিয়া সেখানকার কাদীকেও একই মর্যাদা প্রদান করা হয়।

পরবর্তী নিম্ন পর্যায়ে বিভিন্ন মর্যাদায় ছিলেন এই সকল স্থানের কাদীগণ ইস্তাম্বুলের শহরতলী অঞ্চল (গালাতা, কখনও কখনও এয়্যুব ও উসকুদার), জেরুসালেম, আলেপ্পো, ইযমীর, সালোনিকা, ওয়েনিশেহির (Larissa) এবং তাহা ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে ট্রাবযোন, সোফিয়া ও ক্রীট। এখানকার বিচারকগণের পদমর্যাদা ছিল মাখরেজ মোল্লালারী, কারণ উচ্চ মাদ্রাসা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইবার পরেই মুদাররিসগণকে প্রথমে এই পদে নিযুক্ত করা হইত। সঠিকভাবে বলিতে গেলে, এই পর্যন্ত উল্লিখিত বিচারকগণই শুধু মোল্লা (বা মোন্লা বা মেন্লা, সকলই 'আরবী মাওলা (দ্র.) শব্দজাত) উপাধি ব্যবহার করিতে পারিতেন। কিন্তু বাস্তবে তাহাদের ঠিক নীচের পদে নিযুক্ত বিচারকগণকেও এই উপাধি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইত, তাঁহারা তথাকথিত দেউরিয়্যে পদসমূহের প্রধান ছিলেন। ইঁহারা ছিলেন (খৃ. ১৮শ শতক হইতে) ১০-১৩টি গুরুত্বপূর্ণ শহরের বিচারক—বেলগ্রেড, বোসনা-সারায় (সারাজেভো), বাগদাদ, 'আয়নতাব, মার'আশ, দিয়ার বাক্র ইত্যাদি।

মোল্লা উপাধিধারী সর্বোচ্চ শ্রেণীয়গণের মধ্যে অধিকাংশ সময় ব্যাপিয়াই অন্তর্ভুক্ত থাকিতেন সুলতানের উস্তাদগণ (মু'আল্লিম বা খওয়াজা), তাঁহার দুইজন ব্যক্তিগত ইমাম, প্রাসাদের প্রধান চিকিৎসক (হেকীম-বাশী [দ্র.] বা রা'ঈসু'ল-আতিব্বা') ও জ্যোতিষ (মুনেজ্জিম বাশী [দ্র.]। ১১শ/১৭শ শতকের শেষভাগ হইতে শুরু করিয়া অতঃপর আওলাদে রাসূল অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশধরগণের যে নাকীব (নাকীবু'ল-আশরাফ দ্র.) তাঁহাকেও এই মর্যাদার মোল্লার পদ প্রদান করা হইত।

এই সকল প্রধান মোল্লা অপেক্ষা নিম্নতর পদে আরও পাঁচজন বিশেষ বিচারক (মুফাতিশগণ) থাকিতেন; তাঁহারা ওয়াক্ফ বিষয়াদির দায়িত্বে নিযুক্ত থাকিতেন— তিনজন ইস্তাম্বুলে (যথাক্রমে শায়খু'ল-ইসলাম-এর, উযীরে আ'জাম-এর ও প্রধান খাজা গোলাম-এর তত্ত্বাবধানে) ওয়াক্ফ বিষয়াদির দায়িত্ব পালন করিতেন, একজন থাকিতেন এদীরনেতে এবং একজন বুরসাতে। অন্যান্য বিশেষ বিচারক ছিলেন মাহ্‌মিল কাদীসি, তিনি হজ্জযাত্রিগণের কাফেলার সঙ্গে মক্কা শরীফে গমন করিতেন। ওরদু কাদিসি, তিনি স্বয়ং সুলতান (ও কাদী 'আসকারগণ) যখন যুদ্ধাভিযানে গমন করিতেন না, তখন সৈন্যদলের সঙ্গে যাইতেন এবং দোনান্মা কাদিসী, তিনি সুলতানের নৌবহর যখন বাৎসরিক সমুদ্র যাত্রায় যাইত তখন সঙ্গে যাইতেন।

শারী'আ অনুযায়ী বিচার পরিচালনাকারিগণের মধ্যে সর্বনিম্ন পদে ছিলেন না'ইবগণ (দ্র.)। তাঁহারা হয় বিচারপতিগণের প্রতিনিধি হিসাবে ছোটখাট মামলার বিষয়গুলি (বাব না'ইবী) মীমাংসা করিতেন, বিচারকের আওতাধীন জেলার অন্তর্ভুক্ত উপজেলার দায়িত্বে থাকিতেন (কাদা না'ইবী) অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে বিকল্প (ওয়াকীল) হিসাবে কাজ করিতেন, সেক্ষেত্রে সেই বিশেষ আইন এলাকার যে নির্ধারিত আয় তাহা আরপালিক (দ্র.) হিসাবে তাঁহাকে দেওয়া হইত। না'ইব প্রায় ক্ষেত্রে হইতেন স্থানীয় 'আলিমগণ, তাঁহারা সমমর্যাদাই লাভ করিতেন। কাদী 'আসকার-এর অনুমোদনক্রমে স্বয়ং বিচারকগণই এই না'ইবগণকে নিযুক্ত করিতেন। সেইজন্য তাঁহারা নিজেদের আয়ের একটা অংশ অথবা একটি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ বিচারককে দিতেন। 'উছমানী শক্তির পতনের যুগে না'ইব পদ বস্তুত সর্বোচ্চ অর্থ প্রদানকারীকে প্রদান করা হইত, অযোগ্য ব্যক্তিগণকে সেই পদ দিতে থাকার কারণে বিচার প্রশাসন তখন গুরুতরভাবে কলুষিত হইয়া পড়ে।

প্রাথমিক যুগে নিম্নপদের মোল্লাগণ উপরে পদোন্নতি পাইতেন না, নিজেদের শ্রেণীর মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া (দেউরিয়্যে) দায়িত্ব পালন করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর মোল্লাগণ সেইরূপ ছিলেন না, তাঁহারা প্রথাসিদ্ধভাবে পদোন্নতি লাভ করিতেন। মাখরেজ পদে কর্মজীবন শুরু করিয়া পদোন্নতি লাভ করিয়া তিনি প্রধান চার অথবা পাঁচ শহরের কাদী এবং অতঃপর মক্কা বা মদীনা শরীফের বিচারপতি, অতঃপর ইস্তাম্বুলের বিচারপতি, তাহারও পরে আনাতোলিয়ার অথবা রূমেলির কাদী হইয়া সর্বশেষ তিনি একেবারে সর্বোচ্চ পদ শায়খু'ল-ইসলাম পদ অলংকৃত করিতেন।

বিচার বিভাগের পদক্রমে উচ্চতর পদগুলি তুলনামূলকভাবে খুবই অল্প সংখ্যক হইবার কারণে অগণিত আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির চাপের ফলে পরবর্তী কালে মধ্যবর্তী কিছু সংখ্যক পদ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন হইতে এইরূপে রীতি হইয়া যায় যে, কোন মোল্লা বা সাবেক মোল্লাকে উচ্চতর পদ দিতে হইলে আগে তাঁহাকে সেই পদের বিচারক হইবার সম্মানজনক পদবী (পায়ে) প্রদান করিতে হইত। খৃ. ১১শ শতকে অনেক সরকারী বা বিশিষ্ট 'উলামা'কে নামেমাত্র সম্মানজনক পদবী (পায়ে-ই মুজেররেদে) প্রদান করা হইত, কিন্তু তাঁহাদেরকে কখনও বিচারকের দায়িত্ব পালন করিতে হইত না।

এই বড় মোল্লা ও ছোট মোল্লাদের হইতে সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন সাধারণ কাদীগণ, তাঁহারা ছোট ছোট শহরে বিচারকের (কুদাাত-ই কাসাবাত) দায়িত্ব পালন করিতেন এবং বেতনও অনেক কম পাইতেন, দৈনিক ২০-১৫০ আক্চে। ১১শ/ ১৭শ শতকে তাঁহাদের সংখ্যা এক হাযারের উপরে ছিল, কিন্তু ক্রমে তাহাদের সংখ্যা কমিতে থাকে। ১১শ/১৮শ শতকের শেষভাগে এইরূপ কাদীগণের সংখ্যা ৪৫৬-এর বেশী ছিল না, তাঁহারা তিন দলে বিভক্ত ছিলেন— রূমেলী, আনাতোলিয়া ও মিসর— তন্মধ্যে প্রতি দল আবার কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এক শ্রেণী হইতে অপর উচ্চতর শ্রেণীতে পদোন্নতি লাভ সম্ভব ছিল, কিন্তু কেহই সাধারণত অপর কোন ভৌগোলিক শ্রেণীকে ডিঙাইয়া উপরে যাইতে পারিতেন না। প্রতিটি দলের (আশরাফ-ই কুদাত) সর্বোচ্চ শ্রেণীর (সিত্তে) দুইজন করিয়া জ্যেষ্ঠ সদস্য— ছয়জন আখ্তাবাশী ইস্তাম্বুলে তাঁহাদের কাদী 'আসকারগণের উপদেষ্টারূপে কাজ করিতেন।

প্রথম দিকে 'উছমানী বিচারকগণ বহু বৎসর যাবত চাকুরীতে বহাল থাকিতেন। পরে ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য এবং ক্রমবর্ধমান প্রার্থীদেরকে চাকুরী প্রদানের জন্য চাকুরীর মেয়াদ ক্রমেই কমাইয়া মোল্লাগণের কার্যকাল এক বৎসর এবং সাধারণ কার্যকাল প্রথমে ২৪ মাস, পরে আস্তে আস্তে কমাইয়া ২০ মাস, ১৮ মাস এবং ১২ মাস করা হয়। একেবারের চাকুরীর মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে (মাযুল হইলে) তখন তাঁহারা নূতন দায়িত্ব লাভের জন্য ইস্তাম্বুলে অপেক্ষমাণ থাকিতেন, প্রতি বুধবার নিজেরা দীওয়ানে গিয়া তাঁহাদের কাদী 'আসকার-এর সঙ্গে সাক্ষাত করিতেন। চাকুরীকাল শেষ হইলে বা অবসর গ্রহণ করিলে তখন অনেক মোল্লাই মাদ্রাসাতে শিক্ষকতা করিতেন।

উপরের স্তরের বিচারপতিগণের প্রায় সকলকেই মাদ্রাসার মুদাররিসগণের মধ্য হইতে নিয়োগ করা হইত, সেই অধ্যাপকগণকে নিয়া 'উছমানী 'আলিমগণের অপর প্রধান শাখা গঠিত হইয়াছিল। প্রাথমিক কালে মুদার্‌রিসগণের পদোন্নতির ও বিচার বিভাগীয় পদে নিয়োগের জন্য কোন কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না। তবে পরবর্তী কালে বড় মোল্লাগণের পদে নিয়োগের জন্য শুধু কিবার-ই মুদাররিসীন অর্থাৎ ইস্তাম্বুলের মাদ্রাসাসমূহের অধ্যাপকগণকেই মনোনীত করা হইত, সেই মাদ্রাসাগুলি ছিল বারোটি শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে চারটি সর্বোচ্চ শ্রেণীর, যথা মুস্লে-ই সুলেয়মানিয়্যি, খওয়ামিস-ই (খামিসে-ই) সুলেয়মানিয়্যি, সুলেয়মানিয়্যি ও সকলের উপরে দারু'ল-হাদীছ।

প্রতি বৎসর যেহেতু মাত্র আটজন (পরবর্তী কালে এগারজন) পাস করিয়া এই শ্রেণীর বিচারক পদ লাভ করিতেন সেইজন্য উপরের মুদাররিস পদে উন্নতি লাভ স্বাভাবিকভাবেই সীমিত ছিল। প্রধান বাধা ছিল মাদ্রাসার গুরুত্বপূর্ণ ৬ষ্ঠ মানে, সাহ্ন-ই ছেমান বা অষ্টমের বারান্দাতে (ফাতিহ মস্জিদের মাদ্রাসাতে)। এই আটটি মুদার্‌রিস পদের জন্য আকাঙ্ক্ষী অসংখ্য প্রতিযোগী ঠিক নিম্নের মুসিলে-ই সাহ্ন মানে গিয়া আটকাইতেন, সেইজন্যই তাহাদেরকে বলা হইত 'আটক' (বাতাক)। পদোন্নতির জন্য অপেক্ষমাণদের দাবি মিটাইবার জন্য উচ্চ মাদ্রাসার পদসমূহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হয় এবং ইতিমধ্যে উঠিয়া গিয়াছে সেরূপ মাদ্রাসাতেও অনেককে নামমাত্র নিয়োগ প্রদান করা হইত।

ইস্তাম্বুলের প্রাদেশিক মাদ্রাসাসমূহে, সেই সঙ্গে বুরসা ও এদীরনের পুরাতন কলেজ বা উচ্চ মাদ্রাসার নিম্ন পদের মুদার্‌রিসগণ পরবর্তী কালে শুধু দেউরিয়্যে পদের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিতেন অথবা সাধারণ কাদী হইতে পারিতেন। প্রদেশসমূহে অনেক মুদার্‌রিস একই

সঙ্গে মুফতীর দায়িত্বও পালন করিতেন। যেই সকল ছাত্র (সোফতা, দানিশমেন্দ) ইস্তাম্বুলের উচ্চতর মানের মাদ্‌রাসা (তুর্কী মেদ্রেসে) হইতে স্নাতক ডিগ্রী পাইতে ব্যর্থ হইতেন তাহাদেরকে না'ইব বা মুফতী নিযুক্ত করা হইত। ইস্তাম্বুলের ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য শহরের প্রধান প্রধান মস্‌জিদের ওয়া'ইজ বা প্রচারকগণ ছিলেন এক বিশেষ শ্রেণীর 'উলামা'। তাঁহাদেরকে একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় দলে সংগঠিত করা হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদধারী ছিলেন আয়া সোফিয়ার শায়খ।

'উছমানী সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রশাসন প্রতিষ্ঠানের ন্যায় 'ইলমিয়্যেগণও ১০ম/১৬শ শতকের শেষের দিকে ক্রমেই লোপ পাইতে থাকে। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, অযোগ্যতা ইত্যাদি ক্রমেই বেশি করিয়া উচ্চ পদস্থ 'আলিমগণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, অথচ তাঁহারাই ছিলেন রাজধানী ও প্রদেশসমূহে বিচার প্রশাসনের দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তা (দ্র. প্রবন্ধ 'উলামা')। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে মাদ্‌রাসাসমূহের শিক্ষাও ব্যাহত হইতে থাকে। সুলতান ২য় মুহাম্মাদ ও সুলায়মানের শাসনাধীনে 'উছমানী মাদ্‌রাসাসমূহে যে সৃষ্টিশীল বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটিয়াছিল উহার স্থলে গোঁড়ামি দেখা দিতে থাকে। মাদ্‌রাসাসমূহে শিক্ষাপ্রাপ্ত 'উলামা' শ্রেণীর গোঁড়ামির কুফল 'উছমানী সাম্রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে থাকে, এমন কি ১২শ/১৮শ শতক পর্যন্ত, যখন 'ইলমিয়্যের দুর্নীতির মান একেবারে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছিল তখনও 'উলামা' শ্রেণী দেশের জনসাধারণের যথেষ্ট শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। উহার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, নীচের দিকের 'আলিমগণের ব্যবহার মধুর ছিল, আর তাহাদের সঙ্গেই জনসাধারণের সরাসরি সম্পর্ক ছিল। এই সময়ের মধ্যে 'ইলমিয়্যেগণ একটি রক্ষণশীল শ্রেণীতে পরিণত হন এবং তাঁহাদের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন অভিজাত মোল্লা পরিবারের সদস্যগণ। তাঁহারা জানিসারীগণের সঙ্গে সহযোগিতাক্রমে নিজেদের সুযোগ-সুবিধাগুলি রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। কিন্তু ১২শ/ ১৮শ শতকের শুরুর দিকে যে আধুনিকতার আন্দোলন শুরু হয় উহার ফলে 'উছমানী 'আলিমগণের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়। ১৮২৬ খৃ. জানিসারী ওজাকগণকে দমন করা হইলে তখন 'ইলমিয়্যেগণ বেশ কিছুকাল যাবত যে সামরিক সমর্থন লাভ করিয়া রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বঞ্চিত হন এবং তখন সুলতান ২য় মাহ্‌মূদ (১৮০৮-৩৯ খৃ.) এওকাফ (আওকাফ) মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত করেন (১৮৩৪ খৃ.)। উহার ফলে যে ওয়াক্‌ফ জমি এতকাল পর্যন্ত তাঁহাদের সম্পদের প্রধান উৎস ছিল সেই নিয়ন্ত্রণও আর থাকে না। তদুপরি তান্‌জীমাত আমলে নিজামিয়্যা 'আদালতসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে অতঃপর শার'ঈ 'আদালতসমূহের কার্যকারিতার সীমা শুধু পারিবারিক বা ব্যক্তিগত আইনের মধ্যে সীমিত হইয়া পড়ে। অনুরূপভাবে ধর্মনিরপেক্ষ স্কুলসমূহ প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে মাদ্‌রাসাসমূহের দায়িত্ব সেই সকল স্কুলের কর্তৃত্বে চলিয়া যায়।

'ইলমিয়্যের সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা খৃ. ১৮শ শতকের প্রথম দিক হইতে শুরু হয়। সুলতান ৩য় সেলীম (১৭৮৯-১৮০৭ খৃ.) ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের দিকে যে সকল কানুন জারী করেন সেগুলির ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্ষেতে কিছুটা সুফল পরিলক্ষিত হয়। আরও বেশী কার্যকর ব্যবস্থা হয় যখন ১৮৫৪ খৃ. ইস্তাম্বুলে মু'আল্লিমখানে-ই নুওওয়াব খুলিয়া সেইখান হইতে কাদীগণকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়া শার'ঈ 'আদালতসমূহে প্রেরণ করা হইতে থাকে। তরুণ তুর্কী শাসনামলে তুরস্কের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংস্কার সাধনের জন্য এক বিশাল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বাস্তবিক ১৯১৪ খৃ. মু'আল্লিম খানে-ই নুওয়াবকে করা হয় মাদ্‌রাসাতু'ল-কুদাত এবং সেই একই বৎসরে ইস্তাম্বুলে দারু'ল-খিলাফে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মাদ্‌রাসাসমূহের জন্য উপযুক্ত মুদাররিস তৈরি করা হইতে থাকে। এই সকল নূতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঐতিহ্যগত বিষয়াদির সঙ্গে আধুনিক বিষয়সমূহ, যথা সমাজ বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ—বিষয়সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

'উছমানী 'ইলমিয়্যের আধুনিকীকরণের ফলে কোন স্থায়ী সুফল দেখা দেয় নাই। নূতন প্রতিষ্ঠিত তুর্কী প্রজাতন্ত্র ৩ মার্চ, ১৯২৪ তারিখে খিলাফাত বিলুপ্ত করিয়া দেয়, অতঃপর 'আলিমগণকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দিয়া রাষ্ট্রকে ক্রমেই ধর্মীয় ব্যক্তিগণের প্রভাবমুক্ত করা হইতে থাকে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) M. D'ohsson, Tableau general de l'Empire Ottoman, Paris 1787-1791, iv, 482-616; (2) জাওদাত, তা'রীখ², ইস্তাম্বুল ১৩০৯ হি., ১খ, ১০৯-১৭; (৩) মুস্‌তাফা নূরী, নাতা'ইজু'ল-উকূ'আত, ৪খ, ইস্তাম্বুল ১৩২৭ হি., স্থা.; (৪) 'ইলমিয়্যে সালনামেসি, ইস্তাম্বুলে ১৩৩৪ হি., পৃ. ৩০৮-২০, ৬৪২-৫২; (৫) Pakalin, দ্র. শিরো.; (৬) Gibb-Bowen, i/2, chapters 9-12; (৭) Niyazi Berkes, The development of secularism in Turkey, Montreal 1964, নির্ঘণ্ট; (৮) ইসমা'ঈল হাক্কী উযুনকারসিল, 'উছমানলি দেভলেতিনিন 'ইলমিয়্যে তেসকিলাতি, আঙ্কারা ১৯৬৫ খৃ.; (৯) Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey², London 1968, নির্ঘণ্ট, দ্র. Islam, Seriat, Ulema; (১০) R. Mantran, Istanbul dans La seconde moitie du XVIII², Paris 1962, 130-43; (১১) Urief Heyd, The Ottoman ulema and westernization in the time of Selim III and Mahmud II, in Scripta Hierosolymitana, ix, 1961, 63-96; (১২) বাব-ই মাশীখাত, মূল পাঠে যেই সকল সরকারী কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ আছে সেইগুলি সম্পর্কিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থপঞ্জী। [এই প্রবন্ধটির অসম্পূর্ণ খসড়া পরলোকগত অধ্যাপক হেইড (মৃ. ১৩ মে, ১৯৬৮)-এর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। অধ্যাপক কুরান সেই অসম্পূর্ণ প্রবন্ধটি পূর্ণাঙ্গ করিয়া গ্রন্থপঞ্জী সংযোজন করিয়া দেন। সেইজন্য সম্পাদকমণ্ডলী অধ্যাপক কুরান-এর নিকটে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ]।

U. Heyd and E. Kuran (E. I.²)/ হুমায়ুন খান

**'ইলমুদ্-দীন ইব্ন আয়নিদ-দীন** (علم الدين بن عين الدين) ঃ ইব্ন নাজমি'দ-দীন আস-সিদ্দীকী, আশ-শাতিবী, আল-গুজরাতী, আশ-শায়খ, আল-কাদী।। ৯ম/১৫শ শতকের মুসলিম শাসিত গুজরাট অঞ্চলের 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ফিক্‌'হ, তাজ্‌বীদ ও 'ইল্‌মু'ল-কিরাআত (কুরআন পঠনবিদ্যা)-এর একজন প্রখ্যাত 'আলিম। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশদ কিছু জানা যায় না। তবে আশ-শাতিবী নিস্‌বা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, তাঁহার পূর্বপুরুষ মুসলিম স্পেনের প্রসিদ্ধ শহর জাতিবা (شاطبة)-এর অধিবাসী ছিলেন। উল্লেখ্য, স্পেনের পূর্বাঞ্চলের জাতিবা শহরে মুসলিম শাসন আমলে হ'াদীছ, তাফ্‌সীর,

ফিক্হ ও 'ইল্মু'ল-কিরাআতের যে বহু খ্যাতনামা 'আলিম জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে 'ইল্মু'ল-কিরাআতের ইমামরূপে পরিচিত আল-কাসিম আশ-শাতিবী (মৃ. ৫৯০/১১৯৪) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কদী 'ইল্মু'দ-দীন শাতিবীও অন্যান্য বিষয় ব্যতীত কিরাআতশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। ইমাম শাতিবীর সঙ্গে তাঁহার বংশগত সংযোগ ছিল কিনা তাহা অজ্ঞাত।

'আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ফিক্হ ও কিরাআতশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিবার পর 'ইল্মু'দ-দীন বুখারার সুপ্রসিদ্ধ 'আবিদ শায়খ সাদ্রু'দ্-দীন মুহাম্মাদ আল-হুসায়নী আল-বুখারীর দীর্ঘ সাহচর্যে 'ইল্মে মা'রিফাতের উচ্চতম মাকামে পৌঁছিতে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে গুজরাটে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। গুজরাটে তিনি শারী'আত ও তারীকাতের শিক্ষাদানে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার অসংখ্য ছাত্র ও মুরীদের মধ্যে বহু খ্যাতনামা 'আলিম ছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার পুত্র শায়খ মাওদূদ ও শায়খ কাদী খান আন্নাহারওয়ালী প্রধান।

'ইল্মু'দ-দীন ৮৮ বৎসর বয়সে রামাদান ৮৬০/১৪৫৫ সালে ইনতিকাল করেন। এই হিসাবে তিনি ৭৭২/১৩৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) শারীফ 'আবদু'ল-হায়্যি আল-হাসানী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ৩খ, ১০৮; (২) দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, হায়দরাবাদ, ১খ, ১৯৫১ খৃ.।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

**'ইল্মুদ্-দীন ইব্ন সিরাজিদ-দীন** (علم الدين بن سراج الدين) ঃ ইব্ন কামালি'দ-দীন আল-'উমারী, আদ-দিহ্লাবী, আল-গুজারাটী, আশ্-শায়খ, আল-'আল্লামা। ৯ম/১৫শ শতকের বর্তমান ভারত ইউনিয়নের অন্তর্গত গুজরাট প্রদেশের একজন সুবিজ্ঞ 'আলিম এবং চিশ্তিয়া সূফী তরীকার প্রখ্যাত শায়খ। তাঁহার পূর্বপুরুষ কাবুলের ফারুক্খ শাহ আল-'উমারী আল-আদ্হামীর বংশধর এবং আফগানিস্তান হইতে উপমহাদেশে আগমন করিয়া অযোধ্যায় (اودھ) স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার পিতামহ 'আল্লামা কামালুদ-দীন ইব্ন 'আবদি'র-রাহমান আল-হানাফী ছিলেন অযোধ্যার খ্যাতনামা সূফী সাধক ও শিক্ষাবিদ মাওলানা নাসীরু'দ-দীন মাহমূদ দিহ্লাবীর ভাগ্নেয়। 'আল্লামা কামালু'দ-দীন অযোধ্যায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বীয় মাতুল মাওলানা নাসীরু'দ-দীনের নিকট শারী'আত ও তরীকতের শিক্ষা লাভ করিয়া অযোধ্যায় অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। ইহার পর দিল্লীতে কিছুকাল অধ্যাপনায় অতিবাহিত করিয়া গুজরাটে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। জনপ্রিয় শিক্ষক হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি ৭৫৬/১৩৫৫ সালে দিল্লীতে ইনতিকাল করেন।

'আল্লামা 'ইলমু'দ-দীনের পিতা শায়খ সিরাজু'দ-দীন স্বীয় পিতার নিকট প্রচলিত ইসলামী শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁহার নিকট চিশতিয়া তারীকার সবক লাভ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি গুজরাটের নাহারওয়ালা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়া জনগণকে শারী'আত ও মা'রিফাতের শিক্ষাদানের মহান ব্রতে জীবন অতিবাহিত করেন। ৮১৭/১৪১৪ সালে নাহারওয়ালায় তিনি ইনতিকাল করেন এবং এইখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

শায়খ 'ইল্মু'দ-দীন গুজরাটে জন্মগ্রহণ করেন এবং এইখানেই লালিত-পালিত হন। স্বীয় পিতাও গুজরাটের তৎকালীন খ্যাতনামা 'আলিমদের নিকট বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। বংশীয় ঐতিহ্য ধারায় তিনি চিশ্তিয়া তরীকার শিক্ষা পিতার নিকট লাভ করেন। ঐতিহ্যগতভাবে তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। একজন বিজ্ঞ 'আলিম ও কামিল মুরশিদ হিসাবে তাঁহার বিপুল খ্যাতি ছিল। পিতার ইনতিকালের পর তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং জনগণকে চিশ্তিয়া তরীকা অনুযায়ী 'ইলমে মা'রিফাত শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি গুজরাটের প্রখ্যাত 'আলিম, সাধক ও মুগনিয়ু'ল-লাবীব গ্রন্থের ভাষ্যকার শায়খ বাদ্রু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ আল-মালিকী আদ-দামামীনী-এর খানকায় (যাবিয়ায়) অবস্থান করিয়া দীর্ঘকাল তাঁহার সাহচর্যে অতিবাহিত করেন।

মাহবূবে যি'ল-মানান নামক গ্রন্থে শায়খ 'ইল্মু'দ-দীনের মৃত্যুকাল ৮০৯/১৪০৬ উল্লিখিত হইয়াছে। নুয্হাতু'ল-খাওয়াতির গ্রন্থের লেখক নির্দ্বিধায় এই তারিখ উদ্ধৃত করিয়াছেন, অথচ শেষোক্ত লেখক মাজমা'উল-আব্রার গ্রন্থের বরাতে শায়খ 'ইল্মু'দ-দীনের পিতার মৃত্যুকাল ৮১৭/১৪১৪ সাল উল্লেখ করিয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পরও যে শায়খ 'ইল্মু'দ-দীন বেশ কিছুকাল জীবিত ছিলেন তাহা উপরের বর্ণনা হইতেই প্রতিপন্ন হয়। এই প্রেক্ষিতে শায়খ 'ইল্মু'দ-দীনের মৃত্যুকাল সম্ভবত ৮২৯/১৪২৫ (?) সাল হইবে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) শারীফ 'আবদু'ল-হায়্যি আল-হাসানী, নুয্হাতু'ল-খাওয়াতির, ২খ, ১১৬, ৩খ, ৭৭, ১০৪-৫ ; (২) দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, হায়দরাবাদ, হিন্দ, ২খ, ১৩৫০ হি., ৩খ, ১৯৫১ খৃ.; (৩) মুফতী গুলাম সারওয়ার, খাযীনাতু'ল-আসফিয়া', 'নওল কিশোর, লখনৌ।

ড. এ. কে. এম. আইয়ূব-আলী

**'ইল্মু'র-রিজাল** (علم الرجال) ঃ (দ্র. اسماء الرجال)-এর সাধারণ পারিভাষিক অর্থ ইস্নাদে বিদ্যমান ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে একান্ত তথ্য বিজ্ঞান। ইহার উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নৈতিক গুণাবলীর সমীক্ষা যাহাতে তাঁহাদের প্রজ্ঞা, সততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়, গ্রন্থপঞ্জী ভিত্তিক তথ্যাবলী যাহাতে আসল ইস্নাদের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব হয় এবং পরিশেষে তাঁহাদের নামের হুবহু সনাক্তকরণ হয় যাহাতে একই নামের ব্যক্তিবর্গের পরিচয়ে কোনরূপ বিভ্রান্তি দেখা না দেয়। ইছনা 'আশারিয়্যা শী'আগণের মধ্যে এই বিজ্ঞান শীঘ্রই আদর্শগত মতপার্থক্যের উৎসে পরিণত হয় [অতি প্রারম্ভিক তালিকাতেও প্রতীয়মান হয় যে, ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে হযরত 'আলী (রা)-র অথবা প্রথম যুগের ইমামগণের কোন একজনের পক্ষভুক্ত সুপরিচিত ব্যক্তিবর্গ]। ক্রমশ ইহা 'ইল্মু'ত-তারাজিম-এর সমার্থক হইয়া পড়ে। কিন্তু শেষোক্তটি কার্যত ইসলামী ঐতিহাসিক গবেষণার একটি শাখামাত্র এবং এইরূপে তত্ত্বগতভাবে 'ইল্মু'র-রিজাল হইতে পৃথক (যাহা কালাম-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ), যদিও উভয়ই সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে কুরআনী অনুশাসনের সহিত সামঞ্জস্যের দাবি করে। সুতরাং কিছু সংখ্যক গ্রন্থকার কর্তৃক প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যমূলক পার্থক্যের বিশেষ কোন মূল্য তাহাদের মতে নাই; রিজালের ইছনা 'আশারিয়্যা শী'আ গ্রন্থকারের পূর্বপুরুষ রাফিদী (অথবা সম্ভবত ওয়াকিফী) কূফাবাসী আবূ মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ ইব্ন জাবালা ইব্ন হায়্যান (অথবা হান্নান) আব্হার (অথবা ইবনু'ল-হু'র্র) আল-কিনানী (মৃ.

২১৯/৮৩৪) এবং তা'সী-সুসশী'আতে তাঁহাকে মৃত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (পৃ. ২৩২, আন্‌-নাজাশী হইতে গৃহীত প্রচুর হাদীছসহ, পৃ. ১৬০, যাহাতে নামটির অন্যান্য রূপ দেওয়া হইয়াছে)। অপরদিকে তারাজিম (তা'সীস, পূ. গ্র.)-এর প্রথম গ্রন্থকাররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে 'আলী ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ ইব্‌ন আবী রাফি'-এর মুন্‌শীকে, অন্যদের সঙ্গে ইঁহার নামও আন-নাজাশীতে প্রদত্ত হইয়াছে (পৃ. ৪-৫)। ইনি রিজাল ও যারী'আ (১০খ., নং ৮৪) সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে এই বিষয়ের প্রাথমিক গ্রন্থকারগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম যোগ্য ও দক্ষ লেখক। সুতরাং ইহা মোটেই আশ্চর্যজনক নহে যে, রিজাল-এর অর্থ প্রাথমিকভাবে 'আলীপন্থী কর্মতৎপরতার ছাপবিশিষ্ট হাদীছের সংগ্রাহক হইতে পরিবর্তিত হইয়া সাধারণভাবে বিদ্বান ব্যক্তি বুঝাইতে থাকে (ইহা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই শী'ঈ 'আলিমগণের প্রতি প্রযোজ্য; কারণ রিজালের ইছ্‌না 'আশারিয়্যা শী'আ ইমামগণের উদ্দেশ্যপূর্ণ সংকলনের মধ্যে প্রায়শই সন্দেহাতীতভাবে সুন্নী মতবাদিগণ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন)। এই প্রসঙ্গে হ'াসান আমীনের Islamic Shi'ite Encyclopaedia প্রথম খণ্ডের প্রতি লক্ষ্য করা চলে যিনি Biography শিরোনামে বিভিন্ন বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত ১১১ জন গ্রন্থকারের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যদিও কে কোন্‌ বিজ্ঞানের চর্চা করিতেন তাহা নির্ণয় করা হয় নাই।

শব্দটির কঠোর সীমাবদ্ধতা আমাদেরকে মাজালিসু'ল-মু'মিনীন অথবা কিসাসু ল-'উলামা'-এর মত গ্রন্থকেও 'ইল্‌মু'র-রিজাল হইতে বাদ দিতে বাধ্য করে। ...

বিখ্যাত নামসমূহের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় ইবনু'ন-নাদীম-এর ফিহ্‌রিস্‌ত ও আত্‌-তূসীর ফিহ্‌রিস্‌ত। দ্বিতীয়টি সরাসরিভাবে প্রথমটির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত (তু. 'আব্বাস ইকবাল, দ্বিতীয়টি সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব সংস্করণের মুখবন্ধ, পৃ. ২-৩, নং ৬) এবং উভয়ই মূলত গ্রন্থপঞ্জী চরিত্রের। জীবনী রচনার মৌলিক ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত গ্রন্থসমূহের তালিকার মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণভাবে গ্রন্থপঞ্জীমূলক সংকলন অন্তর্ভুক্তির কারণ ইহাই। প্রারম্ভিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় গ্রন্থের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল : (১) মা'রিফাতু আখবারি'র-রিজাল, আল-কাশ্‌শী (দ্র.)।

(২) আনুমানিক ৩৭৭/৯৮৭ সালে সংকলিত শায়খ আবু'ল-ফারাজ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন আবী য়া'কূ ব আন্‌-নাদীম-এর ফিহ্‌রিস্‌ত। আমাদের বিবেচ্য বিষয়টি ইহার দুই স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে; আল-ফান্নু'ছ-ছানী মিনা'ল-মাকালাতি'ল্‌-খামিসা-তে শী'ঈ রিজাল, মুতাকাল্লিম, ইছনা 'আশারিয়্যা ইমাম সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে, বিশেষভাবে আল-ফান্নু'ল-খামিস ও আল-ফান্নু'স-সাদিস মিনা'ল-মাকালাতি'স্‌-সাদিসাতে যাহা যথাক্রমে ফুকাহা', ব্যাকরণবিদ ও হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

(৩) শায়খু'ত্‌ -তা'ইফা আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন 'আলী আত্‌-তূসী (মৃ. ৪৫৯/১০৬৭)-এর ফিহ্‌রিস্‌ত্‌ কুতবি'শ-শী'আ (নাজাফ ১৯৩৭ খৃ.), বিশেষভাবে এই বিষয়ের পুস্তকসমূহের মধ্যে ইহাই প্রথম এবং সুন্নীগণ ইহাকে খুব মর্যাদার সহিত বিবেচনা করিয়া ইহার বহুল ব্যবহার করিয়াছেন। যদিও ইহা ইবনু'ন-নাদীমের ফিহ্‌রিস্‌ত-এর তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত, তথাপি তাঁহার তথ্যের পূর্ণতা সাধন করিয়াছে এবং উসূল সম্পর্কিত শী'ঈ রচনা ও গ্রন্থকার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিস্তৃত তথ্য সংযোজন করিয়াছে। রিজাল সম্পর্কে আত্‌-তূসীর শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবূ 'আম্‌র আল-কাশ্‌শী, (আন-নাজামীর মতে) তাঁহার বহু ভুল-ভ্রান্তি তিনি সংশোধন করেন; এবং আবু'ল-হাসান ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ ইব্‌ন আল্‌-গাদাইরী, যিনি একজন সুবিখ্যাত গ্রন্থকার ছিলেন এবং তাঁহার রচনাবলী পরবর্তী কালে অন্যান্য অনেকের সহিত ইব্‌ন তা'উসও অবলম্বন করেন।

(৪) উল্লিখিত আত্‌-তূসীর কিতাবু'র-রিজাল (নাজাফ ১৯৬১ খৃ.); ইহা প্রধানত রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখ হইতে ও প্রথম ইমামগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হাদীছ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছে। ইহাতে নামসমূহ বর্ণানুক্রমিকভাবে প্রতি অক্ষরের সংখ্যাসহ তালিকাভুক্ত হইয়াছে।

(৫) শায়খ আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আলী আন-নাজাশী (মৃ. ৪৫৫/১০৬৩)-এর আসমাউর-রিজাল। মাঝে মাঝে কিতাবু'র-রিজাল শিরোনামে উল্লিখিত এই গ্রন্থটিই সর্বাধিক উদ্ধৃত ও ব্যবহৃত। ইহা প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে প্রথম শী'ঈগণের বর্ণনা করিয়া বর্ণানুক্রমিকভাবে রিজালের বর্ণনা প্রদান করিয়াছে। প্রতি ইস্‌ম (اسم)-কে একটি বাব-এ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং চূড়ান্ত একটি বাবে উপনাম (কুন্‌য়া)-সমূহ বিধৃত রহিয়াছে। মুস তাফাবীর তেহরান (তা.বি.) সংস্করণের নির্ঘণ্ট হইতে মনে হয়, ইহাতে ১২২৬ জন সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হইয়াছে।

(৬) মুন্‌তাজাবু'দ-দীন আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্‌ন আবি'ল-হাসান ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ ইব্‌ন আল-হাসান...ইব্‌ন আল-হুসায়ন ... ইব্‌ন বাবূয়া আল-কুম্মী রচিত আসমা'উ মাশা'ইখি'শ-শী'আ ওয়া মুসান্নাফাতিহিম। এই গ্রন্থটি কুম্ম, রায় ও আবহা-এর নাকীব, 'ইয়্যু'দ-দীন য়াহ্‌য়া ইব্‌ন আবি'ল-ফাদ্‌ল মুহাম্মাদ আশ-শারীফু'ল-মুরতাদা-এর উদ্যোগে রচিত হয় এবং উদ্যোক্তা এই দায়িত্ব অর্পণের সময় গ্রন্থকারকে অবহিত করেন যে, আত্‌-তূসীর পর এই বিষয়ে কোন কাজ হয় নাই (ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, মুনতাজাবু'দ-দীন তাঁহার সমসাময়িক ইব্‌ন শাহ্‌রাশূব-এর গ্রন্থ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না)। এই সংকলনটি প্রণয়নের তারিখ নিশ্চিতভাবেই ৫৯২/১১৯৬-এর পরে নহে। কারণ এই সময় নাকীব মৃত্যুবরণ করেন এবং তাহা ৫৭৩/১১৭৮-এর পূর্বে নয়। কেননা এই সনটি কুত্‌ব রাওয়ান্দীর মৃত্যু বৎসর এবং গ্রন্থে তাঁহাকে মারহূমরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে আত-তূসীর সমসাময়িক বা পরবর্তী গ্রন্থকার ও শায়খগণ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যাঁহারা ফিহ্‌রিস্‌ত-এ অন্তর্ভুক্ত হন নাই।

(৭) আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ রাশীদুদ-দীন ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন শাহ্‌রাশূব আল-মাযানদারানী আস-সারাবী [দ্র. ইব্‌ন শাহ্‌রাশূব] (মৃ. ৫৮৮/১১৯২)-এর মা'আলিমু'ল্‌-'উলামা' (সম্পা. আব্বাস ইকবাল, তেহরান ১৯৩৪ খৃ.)। উল্লিখিত অপরাপর গ্রন্থের ন্যায় ইহাও 'আরবী ভাষায় রচিত এবং আত্‌-তূসীর ফিহ্‌রিস্‌ত-এর সম্পূরক গ্রন্থরূপে পরিকল্পিত। ইহাতে সংকলনের সমসাময়িক অপর ৩০০ জন শায়খ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজিত হইয়াছে। ইহার সংকলনের তারিখ ৫৮২/১১৮৬-এর পূর্বে যেই বৎসর একটি ইজাযাতে গ্রন্থকার মা'আলিমের উল্লেখ করিয়াছেন। তালিকাভুক্ত শিক্ষকগণের মধ্যে রহিয়াছেন আবূ মানসূর আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আলী আত-তাবারসী ও আবূ 'আলী ফাদ্‌ল ইব্‌ন হাসান তাবারসী, কুত্‌ব রাওয়ানদী ও আবু'ল-ফুতূহ রাযী (গ্রন্থকারের পিতা), যায়দ ও আবু'ল-হাসান বায়হাকী; এই নামগুলি গ্রন্থকারের শী'ঈ লক্ষ্যের প্রমাণ। ব্যবহৃত সংস্করণে বর্ধিত ব্যক্তিত্বের সংখ্যা ৯৯০; প্রথম ৮৭৪

জন বর্ণানুক্রমিকভাবে সজ্জিত, ফাস্‌ল-এর উপরিভাগসহ বর্ণমালার এক বা একাধিক অক্ষরের বাব-এ বিভক্ত। ৮৭৫ হইতে ৯৬২ পর্যন্ত তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে তাঁহাদের উপনাম (কুন্‌য়া) অনুযায়ী এবং ৯৬৩-৯৯০ তাঁহাদের উপাধি (লাক াব) অথবা নিস্‌বা অনুযায়ী। গ্রন্থটির সমাপ্তি হইয়াছে বাবুল-জামি'-তে অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রন্থপঞ্জীমূলক ফাস্ ল-এ; ইহার পরেই আছে আহ্‌লুল-বায়ত-এর কবিগণ সম্পর্কে একটি অতি সংক্ষিপ্ত বাব, যাহা তাঁহাদের রচনার রীতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত।

অতঃপর কিছুকাল কেবল সংকলনে অতিবাহিত হয়; তাহার পর আসে আল-মুহাক্কিকুল-হিল্লীর শাগরিদ তাকিয়্যু'দ-দীন হাসান ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন দাঊদ আল-হিল্লী (জ. ৬৪৭/১২৪৯-৫০)-র রিজাল (তেহরান ১৯৬৩-৪ খৃ.) এবং ইহার পর আসে আবূ মানসূর জামালু'দ-দীন হাসান ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুতাহ্‌হারু'ল-হিল্লী (মৃ. ৭২৫/১৩২৫)-র গ্রন্থ যিনি বিশেষভাবে বিখ্যাত একটি নূতন কিতাবু'র-রিজাল (তেহ্‌রান ১৯৩২-৩ খৃ.)-এর প্রণেতা। ইঁহারা অন্তত তাঁহাদের পরবর্তিগণের জন্য ঐ যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সাফাবী আমলের বৈশিষ্ট্যময় গ্রন্থাদি প্রণয়ণের আদর্শ স্থাপন করেন। সেই সময়ে জীবনীমূলক রচনাবলীর মূল কাঠামোর মধ্যে যে বিশ্বকোষ জাতীয় রচনা প্রচলিত হইতে থাকে (উদাহরণস্বরূপ ফারসী ভাষায় ৯৯০/১৫৮২ সালে লিখিত সায়্যিদ নূরুল্লাহ্ ইব্‌ন শারীফি'ল-মার'আশী আশ-শুস্‌তারীর মাজালিসু'ল-মুমিনীন, তেহরান ১২৬৮/১৮৫২ এবং ১২৯৯/১৮৮২) তাহা ইরানে শী'আ মতবাদের বিজয় ঘোষণাকারী স্থানীয় পণ্ডিতগণের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকে। 'আমালু'ল-'আমিল ফী 'উলামা'-ই জাবাল 'আমিল (তেহরান ১৩২০/১৯০২-৩), মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন 'আলী আল-হুররু'ল-'আমিলী (মৃ. ১০৯৭/১৬৮৬) অথবা য়ূসুফ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম আল-বাহ্‌রানী (মৃ. ১১৮৭/১৭৭৩-৪)-এর লু'লু'আতায়ি'ল-বাহ্‌রায়ন (তেহরান ১২৬৯/১৮৯৩)। ইহার পরেই সরাসরিভাবে আবির্ভাব ঘটে আধুনিক জীবনীমূলক অভিধানসমূহের যাহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নাম গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রাচীন মুসলিমগণের সম্পর্কে ইসলামের প্রারম্ভিক শতাব্দীগুলিতে সংগৃহীত তথ্যাবলীর পুনর্বিন্যাস সূত্রে, বিশেষজ্ঞদের লিখিত মৌলিক রচনা নহে।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** মূল পাঠে প্রদত্ত রচনাবলীর অতিরিক্ত দ্র. (১) EI[1], s.v. ShJ'A; (২) Rieu, Brit. Mus. Supp. cat. Ar. Mss, 422-7; (৩) মুহাম্মাদ বাকির আল্‌-খাওয়ান্‌সারী, রাওদাতুল-জান্নাত ফী আহ্‌ওয়ালি'ল-'উলামা' ওয়া'স-সাদাত, তেহরান ১৩০৬/১৮৮৯; (৪) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাদিক ইব্‌ন মাহ্‌দী, নুজূমু'স-সামা, লখনৌ ১৩০৩/১৮৮৫-৬; (৫) সায়্যিদ ই'জায হুসায়ন আল-কানতূরী, কাশ্‌ফু'ল-হুজুব ওয়া'ল-আস্তার, সম্পা. হিদায়াত হুসায়ন, কলিকাতা ১৯৩৫ খৃ.; (৬) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলয়মান তুনিকাবুনী, কিসাসু'ল-উলামা', তেহরান ১৩১৩/১৮৯৫-৬; (৭) আগা বুযুর্গ তেহ্‌রানী, তাবাকাতু আ'লামি'শ-শী'আ, নাজাফ ১৩৭৩/১৯৫৩ হইতে; (৮) ঐ লেখক, আয্‌-যারী'আ ইলা তাসানীফি'শ-শী'আ, তিন খণ্ড, নাজাফ ১৩৫৫-৭/১৯৩৬-৮; পরে তেহরান ১৯৪১ হইতে ; (৯) ঐ লেখক, মুসাফ্‌ফা'উ'ল- মাকাল ফী মুসান্নিফি 'ইল্‌মি'র-রিজাল, তেহরান ১৯৫৯ খৃ.; (১০) সায়্যিদ মুহ্‌সিনু'ল-আমীন আল-'আমিলী, আ'য়ানু'শ-শী'আ, দামিশ্‌ক ১৯৪৬ খৃ.; (১১) নামা-ই দানিশওয়ারান-ই নাসিরী, আট খণ্ড, কুম্ম ১৩৭৯/১৯৬০; (১২) হাজ্জ শায়খ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ হাসানু'ল-মামাকানী, তান্‌কীহু'ল-মাকাল ফী আহ্‌ওয়ালি'র-রিজাল, তিন খণ্ড, নাজাফ ১৩৪৯/১৯৩০; (১৩) মুহাম্মাদ 'আলী তাব্‌রীযী, রায়হানাতু'ল-আদাব ফী তারাজিমি'ল-মা'রূফীন বি'ল-কুন্‌য়া ওয়া'ল-লাকাব, পাঁচ খণ্ড, তেহরান ১৩৬৪-৭৩/১৯৪৫-৫৪, ৬খ., তাব্‌রীয ১৩৩৩/১৯৫৪; (১৪) 'আব্বাস কুম্মী, আল-কুনা ওয়া'ল-আলকাব, তিন খণ্ড, নাজাফ ১৯৫৬ খৃ.; (১৫) হাসান আস-সাদ্‌র, তা'সীসু'শ-শী'আ লি-'উলূমি'ল-ইস্‌লাম, বাগদাদ ১৯৫১ খৃ.; (১৬) হাসানু'ল-আমীন, Islamic Shiite Encyclopaedia, এক খণ্ড, অপ্রকাশিত, তা. বি., আরও দ্র. "যায়দিয়্যা" প্রবন্ধ।

B. Scarcia Amoretti (E.I.$^2$)/ আবদুল বাসেত

**'ইল্‌মুল-কালাম** (علم الكلام) ঃ ইসলাম বিষয়ক অন্যতম দীনী 'ইল্‌ম, যাহার বিষয়বস্তু দীনের 'আকীদাসমূহ যুক্তি ও দলীল-প্রমাণ দ্বারা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত করা এবং 'আকীদা সংক্রান্ত বিরোধী মতবাদের প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যান (আল-ঈজী, আল-মাওয়াকিফ)। অধুনা ইহাকে 'ইলমুল আকীদাও বলা হয়। ইহ্‌সা'উ'ল-'উলূম গ্রন্থে আল-ফারাবী 'ইল্‌মু'ল- কালামকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা বলিয়া গণ্য করেন যাহা মানুষকে এমন যোগ্যতা প্রদান করে যাহাতে সে শারী'আতে বর্ণিত 'আকীদাসমূহকে সত্য বলিয়া প্রমাণ এবং উহার বিরোধী মতাদর্শকে খণ্ডন করিতে পারে।

মনে হয় যেন 'ইল্‌মু'ল-কালাম দীনের 'আকীদাসমূহের জন্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং এইভাবে ঈমানের ভিত্তির হেফাজত করিয়া থাকে। অনুরূপভাবে উহা সর্বপ্রথম দীনী 'আকীদা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী এবং উহার অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, আল-কালাম এমন এক 'ইল্‌ম যাহাতে মাবদা' (প্রারম্ভ) ও মা'আদ (পরকাল) সম্পর্কে ইসলামী বিধানের আলোকে আলোচনা করা হয় ('আবদু'ন-নাবী, দাসতূরু'ল-'উলামা')। শারহুল-'আকা'ইদি'ন-নাসাফিয়্যা গ্রন্থে আত্‌-তাফতাযানীর বক্তব্য হইতে বুঝা যায়, 'ইল্‌মু'ল-কালাম এমন এক 'ইল্‌ম যাহা দলীল-প্রমাণ দ্বারা আকা'ইদ-এর পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। ইব্‌ন খালদূন মুকাদ্দিমা ('ইল্‌মু'ল-কালামের আলোচনা)-তে লিখিয়াছেন যে, ইল্‌মু'ল-কালামে ঈমান সংক্রান্ত 'আকাইদ সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা পূর্ববর্তী মনীষীদের মাযহাব পরিত্যাগ করিয়া যে সকল বিদ'আতপন্থী লোক ঈমান সংক্রান্ত 'আকীদাসমূহে সন্দেহ পোষণ করে তাহাদের সন্দেহের নিরসন উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। উক্ত 'আকীদাসমূহের মধ্যে প্রধান হইল তাওহীদের 'আকদী। মুল্লা 'আলী আল-কারী 'ইল্‌মু'ল-কালামকে দীনের মৌলিক বিষয় (উসূলু'দ-দীন) গণ্য করিয়া লিখেন যে, ইহা সেই 'ইল্‌ম যাহাতে এমন সব বিষয়ের আলোচনা করা হয় যেইগুলির প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক (শারহুল-ফিকহি'ল-আকবার, পৃ. ১১৩)।

'ইল্‌মু'ল-কালাম প্রকৃত অর্থে একটি ইসলামী 'ইল্‌ম। উহার আলোচনা মুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং খৃস্ট ও য়াহূদী ধর্মশাস্ত্র হইতে উহা সম্পূর্ণ পৃথক, যদিও উহা উক্ত

ধর্মদ্বয়ের অনুরূপ এক সাংস্কৃতিক পটভূমিতে বিকাশ লাভ করিয়াছে। এই কারণে Scholasticism-এর অনুবাদ 'ইল্মু'ল-কালাম করা যথাযথ মনে হয় না। 'ইল্মু'ল-কালামকে ফালসাফা কিংবা হিক্মাত বলাও ঠিক নহে; কেননা ইহা হইল খাঁটি দীনী (ইসলামী) 'ইল্ম। অন্যদিকে হিক্মাত বিষয়ে মুসলিমগণ ছাড়া য়াহূদী ও খৃস্টানগণও অংশগ্রহণ করিয়াছে। 'ইল্মু'ল-কালাম কেবল মুসলিমগণই সৃষ্টি করিয়াছে। কার্যত কালামে সেই সকল উপকরণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত হইতে থাকে যাহা দীনী ই'তিকাদ (বিশ্বাস)-সমূহ প্রমাণের জন্য আবশ্যক ছিল। যেমন সৃষ্টির শুরু ও বিশ্বজগতের সৃষ্টি সংক্রান্ত ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় যুক্তিনির্ভর প্রমাণসমূহকে যথারীতি একটি পদ্ধতিতে এই শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয় এবং পরবর্তী 'আলিমগণ দর্শন ও তাসাওউফের সহিত 'ইল্মু'ল-কালামের আলোচ্য বিষয়গুলির সমন্বয় সাধন করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু উহার স্বকীয়তা বজায় থাকে এবং মৌলিক অর্থাৎ দীনী দৃষ্টিভঙ্গির উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে। উহা ওহী ও ইল্হাম (কুর'আন ও সুন্নাহ)-এর নির্দেশিত বিষয়াদির অনুগত থাকে এবং এই বিশ্বাস করে যে, ওহী ও ইল্হামের নির্দেশাবলী সত্যের নির্দেশাবলীর অনুরূপ। উপমহাদেশের পরবর্তী চিন্তাবিদগণ, যেমন মুল্লা 'আবদু'ল-হাকীম সিয়ালকোটী, মুজাদ্দিদ আল্ফ ছানী [শায়খ আহ্মাদ সিরহিন্দী (দ্র.)], শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র) এবং আধুনিক কালে মিসরের মুহাম্মাদ 'আবদুহ্ ও পাকিস্তানের ডক্টর মুহম্মাদ ইক্বালের চিন্তাধারাকে এই ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যাইতে পারে।

'ইল্মু'ল-কালাম সম্পর্কে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, ইহা ইসলামী জ্ঞানের এমন এক শাখা যাহা দীনিয়াত ও দর্শনের মাঝামাঝি অবস্থান করে এবং যাহা জ্ঞান ও চিন্তার এই পরস্পর বিরোধী পদ্ধতিদ্বয় (ধর্ম ও দর্শন)-এর মধ্যে সেতুবন্ধনস্বরূপ। ইসলামী জ্ঞানের এই শাখাকে ন্যায়সংগতভাবে দর্শন ভিত্তিক দীনিয়াত অথবা ধর্মীয় দর্শন নামে অভিহিত করা যায় (দ্র. যুবায়দ আহ্মাদ, The Contribution of India to Arabic Literature, উর্দূ, অনু. 'আরবী আদাবিয়াত মেঁ পাক ওয়া হিন্দ কা হিস্সা)।

আহ্মাদ আমীন (দুহা'ল-ইসলাম, ৩খ.) এই বিষয়কে এমনভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে 'ইল্মু'ল-কালামের ভিত্তি দীন ইসলাম এবং উহাই ইহার কেন্দ্রবিন্দু। 'আলিমগণ যদিও গ্রীক দর্শন কাজে লাগাইয়াছেন, কিন্তু কুরআনের আয়াতসমূহ হইতে প্রমাণ গ্রহণ এবং উহাদের উপর তাঁহাদের নির্ভরতা ছিল অনেক বেশী।

**নামকরণের কারণ ঃ** ইল্মু'ল-কালামকে কালাম নামকরণের অনেক কারণ বর্ণনা করা হয় (বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. আত্-তাফ্তাযানী, শারহুল-আকা'ইদি'ন-নাসাফিয়্যা)। আশ-শাহরাসতানী (আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, পৃ. ১৮) লিখিয়াছেন, এই 'ইল্মকে কালাম বলিবার উদ্দেশ্য হয়ত ইহা ছিল যে, 'আকীদার বিষয়সমূহের মধ্যে যে বিষয়ের উপর অধিক আলোচনা ও বাকবিতণ্ডা হইতে থাকে তাহা ছিল আল্লাহ্র কালাম অথবা এই কারণে যে, এই 'ইল্ম দর্শনের মুকাবিলায় সৃষ্টি হইয়াছিল; সুতরাং দর্শনের একটি শাখা মানতিক (যুক্তিবিদ্যা)-এর যে নাম ছিল ইহারও সেই নাম রাখা হইয়াছে (মানতিক ও কালাম হইল সমার্থক শব্দ)।

ইব্ন খাল্লিকান মুহাম্মাদ আবু'ল-হুসায়ন মু'তাযিলীর উদ্ধৃতি দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, যেহেতু সর্বপ্রথম 'আকা'ইদ সম্পর্কিত মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছিল আল্লাহ্র কালামকে লইয়া, সেই হেতু 'ইল্ম 'আকা'ইদের নাম আল-কালাম হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অন্য একমতে এই 'ইল্ম শারী'আত সম্পর্কে আলোচনা (কালাম) করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকে বলিয়াই ইহা আল-কালাম অথবা প্রথম প্রথম এই 'ইল্মের রচনাবলীতে অধ্যায়সমূহের শিরোনাম "আল-কালাম ফী কাযা ওয়া কাযা" লিখিত হইত বলিয়া পরবর্তী কালে গোটা 'ইল্মকে 'ইল্মু'ল-কালাম নামে অভিহিত করা হয় (কাশ্শাফ ইস্তিলাহাতি'ল-ফুনূন, ১খ)।

ইব্ন খালদূনের মতে এই 'ইল্ম-এর নাম আল-কালাম এইজন্য রাখা হইয়াছে যে, ইহাতে বিদ'আতপন্থীদের সহিত 'আকাইদ বিষয়ে মুনাজারা (তর্ক-বিতর্ক) স্থান পাইয়াছে।

শায়খ মুহাম্মাদ 'আবদুহু (রিসালাতু'ত-তাওহীদ) এই নামকরণের কারণ ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'ইল্ম কালামের ভিত্তি হইল যুক্তিনির্ভর প্রমাণ। ফলে মুতাকাল্লিম (বক্তা)-এর কথা বলার সময় উহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং তাঁহার বক্তব্যে উহার প্রকাশ ঘটে। বক্তব্যের পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ হইতে দলীল পেশ করার সুযোগ তেমন মিলে না, বরং যুক্তিনির্ভর প্রমাণাদির মাধ্যমে দীনের মৌলিক বিষয়গুলি 'ইল্মু'ল-কালামে বর্ণিত হয় বলিয়া যুক্তিবিদ্যা ('ইল্মু'ল-মানতিক)-র সহিত ইহার সাদৃশ্য বিদ্যমান। সুতরাং এইখানেই মানতিক-এর পরিবর্তে কালাম শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে যেন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বজায় থাকে।

'ইল্মু'ল-কালামের আর একটি ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, 'ইল্মু'ল-কালাম হইল আল্লাহ্র কালাম সংক্রান্ত 'ইল্ম। বাহ্যত এমন মনে হয় যে, 'ইল্মু'ল-কালামের প্রয়োগ সর্বপ্রথম প্রমাণ সংক্রান্ত আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয় এবং এই হিসাবে বলিতে পারা যায় যে, মুতাকাল্লিমূন প্রথম 'যুক্তিবাদী' গোষ্ঠী ছিলেন।

'ইল্মু'ল-কালামের প্রায় সমার্থক আর একটি পরিভাষা হইল 'ইল্মু'ত-তাওহীদ, যাহার বিষয়বস্তু হইল আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থিত করা, কিন্তু উহার সম্পর্ক সকল ইসলামী 'আকাইদ, বিশেষত নবুওয়াত-এ বিশ্বাসের সহিত খুবই গভীর (দ্র. আল-জুরজানী, শাহুরহু'ল মাওয়াকিফ)। মুহাম্মাদ 'আবদুহু 'ইল্মু'ল-কালাম বিষয়ে লিখিত তাঁহার গ্রন্থের নাম রিসালাতু'ত তাওহীদ রাখিয়াছেন। তিনি বলেন, তাওহীদ এমন 'ইল্ম যাহাতে আলোচনা হয় ঃ আল্লাহ্র সত্তার (যাত), তাঁহার অপরিহার্য গুণাবলীর (সিফাত), তাঁহার জন্য অপরিহার্য নয় এমন সকল সিফাতের এবং সেই সকল বিষয়ের যাহা তাঁহার যাত হইতে বিদূরিত করা ওয়াজিব। ইহা ছাড়া আম্বিয়া ও রাসূলগণের নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রমাণ সংক্রান্ত বর্ণনাও উক্ত 'ইল্মের অন্তর্ভুক্ত।

**'ইল্মুল-কালামের বিভিন্ন নাম ঃ** (১) 'ইল্মু উসূলিদ-দীন, এই নামকরণের কারণ এই যে, ইহা হইল 'উলূমি শার'ইয়্যার মূল ও ভিত্তি ; (২) 'ইল্মু'ন-নাজর ওয়া'ল-ইস্তিদ্লাল ; (৩) 'ইল্মুত্-তাওহীদ ওয়া'স-সিফাত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর 'আকা'ইদ বিষয়ে রচিত গ্রন্থের নাম আল-ফিক্হু'ল-আক্বার (উহা দ্বারা হয়ত বা ইহাই বুঝান হইয়াছে যে, 'ইল্ম কালামের এক নাম আল-ফিক্হু'ল-আক্বার)।

আত্-তাফতাযানীর (শারহু'ল-'আকা'ইদ) মতে আহ্কামে শার'ইয়্যা দুই প্রকারের ঃ (১) যাহার সম্পর্ক 'আমলের সহিত। উহাকে

শার'ইয়্যা ও 'আমালিয়্যা বলা হয় এবং উহার 'ইল্মকে 'ইল্মু'শ্-শারা'ই' ওয়া'ল-আহ্কাম বলা হয়। (২) যাহার সম্পর্ক 'আকা'ইদের সহিত, উহাকে আস্লিয়্যা ও ই'তিকাদিয়্যা বলা হয় এবং উহার 'ইল্মকে 'ইল্মু'ত্-তাওহীদ ওয়া'স্-সিফাত বলা হয়। অতঃপর বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ আহকামি 'আমালিয়্যার আলোচনা যাহাতে আছে তাহা ফিক্হ এবং বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ 'আকা'ইদ-এর আলোচনা যাহাতে আছে তাহা কালাম।

এই বিষয়টি এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে যে, 'ইল্ম কালাম ই'তিকাদ সম্পর্কিত বিষয়সমূহের সংরক্ষণের জন্য প্রণয়ন করা হইয়াছে, অন্যদিকে 'ইল্ম ফিক্হ 'আমাল সংক্রান্ত বিষয়সমূহ ও বাহ্যিক আহ্কামের জন্য রচিত হইয়াছে ('আবদুন-নাবী, দাসতূরু'ল-'উলামা')।

**'ইল্ম কালামের উদ্দেশ্য ও উহার গুরুত্ব ঃ** যদিও সাল্ফ সালিহীন (অতীতের জ্ঞানী পুণ্যবান ব্যক্তিগণ) ও বিশেষ করিয়া ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ' ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, কাদী আবূ য়ুসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম সুফয়ান ছাওরী (র) প্রমুখ হইতে 'ইল্মু'ল-কালামের সমালোচনামূলক উক্তিও পাওয়া যায় (দ্র. দাস্তূরু'ল-'উলামা'; মুল্লা আলী আল-কারীও শারহুল-ফিকহি'ল-আকবার গ্রন্থে এই সম্পর্কে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন)। কিন্তু চিন্তাবিদগণ বলেন যে, 'ইল্মু'ল-কালামের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল অস্বীকারকারীকে দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে নিরুত্তর করা এবং বিরুদ্ধবাদীদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা। বাস্তব সত্য ইহাই যে, মুতাকাল্লিমদের 'আকা'ইদ ও চিন্তার উৎস হইল নবূওয়াত অর্থাৎ নবী কারীম (স) হইতে প্রাপ্ত 'ইল্ম, অন্য কিছু নহে (দাস্তূরু'ল-'উলামা')। 'ইল্মু'ল-কালামের উদ্দেশ্য হইল বিদ'আতপন্থীদের বিদ'আতের বিরুদ্ধে আহ্লু'স-সুন্নাতের 'আকীদার অকৃত্রিমতা রক্ষা করা।

মুল্লা আলী 'আল-কারী 'ইল্মুল-কালামের গুরুত্ব এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ জানা দরকার যে, 'ইল্মু'ত-তাওহীদ হইল সর্বশ্রেষ্ঠ 'ইল্ম এই শর্তে যে, উহা কিতাব, সুন্নাত ও ইজ্মা'বহির্ভূত হইবে না এবং উহাতে কেবল যুক্তিনির্ভর দলীলসমূহের সমাবেশ ঘটিবে না, যেমন বিদ'আতপন্থিগণ করিয়া থাকে এবং তাহারা সেই পথ পরিহার করিয়াছে যাহার উপর আহ্লু'স-সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আত প্রতিষ্ঠিত। 'ইল্মু'ল-কালামের ব্যাপারে মানুষ অতিরঞ্জিত ও বাড়াবাড়ি করিয়াছে। কেহ ইহাকে হারাম ও বিদ'আত বলিয়াছেন, আবার কেহ ইহাকে ফার্দ কিফায়া অথবা ফার্দ 'আয়ন ও সর্বোত্তম 'ইবাদত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কেননা ইহা হইল তাওহীদের প্রমাণ এবং আল্লাহ্র দীনকে রক্ষা করার নাম। যাহা হউক, ইমাম গাযালীর মত হইল, এই 'ইল্মে ক্ষতির দিকও রহিয়াছে এবং উপকারের দিকও রহিয়াছে ('ইল্মু'ল কালাম-এর সমর্থনকারী ও বিরোধিতাকারীদের দলীলসমূহের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. শার্হু'ল-ফিক্হি'ল-আক্বার)।

আত-তাফতাযানী কালাম নামে অভিহিত 'ইল্মু'ত-তাওহীদ ওয়া'স-সিফাতকে 'ইলমু'শ-শারা'ই' ওয়া'ল-আহ্কাম ও কাওয়া'ইদু 'আকা'ইদি'ল-ইসলাম-এর ভিত্তি বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া তিনি বলেন যে, 'ইল্মু'ল-কালাম হইল সন্দেহ ও সংশয় এবং বাতিল 'আকীদাসমূহের তমসা হইতে পরিত্রাণ দানকারী। মোটকথা কালাম হইল যাবতীয় 'ইল্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও দীনী 'ইল্মসমূহের প্রধান এবং উহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সৌভাগ্য লাভে সফলতা অর্জন করা।

এইখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, যদি প্রকৃতপক্ষে 'ইল্মু'ল-কালাম এতই উচ্চ স্তরের 'ইল্ম হইবে তাহা হইলে পূর্ববর্তী 'আলিমগণের মধ্যে কোন কোন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ইহার বিরোধিতা কেন করিয়াছেন ?

এই স্থানে ইমাম ইব্ন তায়মিয়া (র) [মৃ. ৭২৮ হি.]-এর উল্লেখ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যাঁহাকে 'ইল্মু'ল-কালামের বিরোধী ও উহার প্রবক্তা— এই উভয় দলের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। তিনি ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (র)-এর অনুসারীদের ও আহ্লু'স্-সুন্নাতের মহান সংরক্ষণকারীদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি যেমন দীনের শত্রুদের ও বিদ'আতপন্থীদের সমালোচনায় মুখর ছিলেন, তদ্রূপ আহ্লু'স্-সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আত, বাতিনী দল, দার্শনিক, এমনকি সূফী ও মুতাকাল্লিমদেরও সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করিতেন না এবং ইঁহাদের সকলেরই তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ইব্ন তায়মিয়া (র)-এর যুগে আশ্'আরীদের খুব প্রভাব ছিল, মু'তাযিলীদের প্রায় সমাপ্তি ঘটিয়াছিল এবং প্রকাশ্যভাবে আশ'আরীদের বিরুদ্ধে কিছু লেখা খুবই কঠিন কাজ ছিল। যাহা হউক, ইমাম গাযালী (র)-র রচনাবলীর ফল এই দাঁড়ায় যে, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন যাহা মুহাদ্দিছ ও ফাকীহদের দরবারে স্থান লাভ করে নাই, এখন তাঁহাদের মজ্লিসেও স্থান পাইতে থাকে। সপ্তম ও অষ্টম হিজরী শতকে ইব্ন তায়মিয়া (র) উক্ত 'ইল্মদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি দেন। তিনি একজন উচ্চ মানের মুহাদ্দিছ ছিলেন; যুগপৎ বিজ্ঞ দার্শনিক ও যুক্তিবিদও ছিলেন। তিনি 'ইল্মু'ল-কালামের প্রতিও পূর্ণ মনোযোগ দেন এবং উক্ত 'ইল্মের যাবতীয় প্রচলিত চিন্তামূলক রচনা সম্পর্কে গবেষণা করেন। তিনি আশ্'আরীদের সেই সকল দর্শনেরও সমালোচনা করেন যাহাতে তাঁহার (ইব্ন তায়মিয়ার দৃষ্টিতে) পূর্ববর্তী মুসলিম 'আলিমগণের পদ্ধতি হইতে তাঁহারা মুখ ফিরাইয়াছিলেন এবং এই ব্যাপারে দর্শন ভিত্তিক বাক-বিতণ্ডার আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইব্ন তায়মিয়া (র) কালাম-এর কিছু বিষয় ভ্রান্ত বলিয়া অভিমত দেন এবং সেইগুলি প্রত্যাখ্যান করেন ও তাঁহার মতে সেইগুলি দীনের জন্য ক্ষতিকর 'ইল্ম কালাম সম্পর্কে ইব্ন তায়মিয়ার লিখিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে দ্র. শিরো. ইব্ন তায়মিয়া। হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীতে আরব উপত্যকায় মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাবের আন্দোলনও ছিল প্রকৃতপক্ষে ইব্ন তায়মিয়া (র)-র চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি। ইহা ছিল এক সংস্কারমূলক আন্দোলন, যাহা পরবর্তী কালে সা'উদী রাজবংশের রাজনৈতিক মূলনীতিরূপে কার্যকর দেখা যায়। ইসলামী 'আকাইদ ও আদর্শের উপর এই আন্দোলনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহার প্রভাব উপমহাদেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

শিব্লী নু'মানী স্বীয় গ্রন্থ 'ইল্মু'ল-কালাম (পৃ. ৩৬ প.)-এ কালাম সম্পর্কে উপরিউক্ত মতামতের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। প্রথম শতাব্দীর দিকে 'আলিমগণ এক এক বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতেন। ব্যাকরণ বিষয়ের ইমামগণ ফিক্হশাস্ত্র সম্পর্কে জানিতেন না। ফাকীহগণের হাদীছের সম্পর্ক ছিল কম। মুহাদ্দিছগণ যুক্তি বিষয়ক 'ইল্ম-এর সহিত পরিচিত ছিলেন না। 'ইল্ম কালামের উদ্ভব হইলে উহাতে দর্শনের অসংখ্য পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। মুহাদ্দিছগণ উক্ত পরিভাষাসমূহ শ্রবণ করিয়া দর্শন ও কালামের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারেন নাই এবং যেহেতু তাঁহারা গ্রীক দর্শনকে প্রথম হইতেই খারাপ জানিতেন, তাই 'ইল্ম কালামকেও উহার অনুরূপ মনে করেন। মুহাদ্দিছুন হইতে সাধারণভাবে বর্ণিত আছেঃ যখন তোমরা কাহাকেও জাওহার, 'আরাদ, মাদ্দা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার

করিতে শুনিবে তখন তাহাকে পথভ্রষ্ট জ্ঞান করিবে। 'ইল্‌ম কালামের জন্য দর্শন তাবী'ইয়্যাত (প্রকৃতি বিজ্ঞান) ইত্যাদি বিষয়ে যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজন ছিল, অথচ মুহাদ্দিছগণ দর্শন অধ্যয়নের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন।

আস্-সুব্‌কী তাবাকাতু'শ-শাফি'ইয়্যাতি'ল-কুব্‌রা (২খ, ১৯৮, তায্‌কিরাতু আহমাদ ইব্‌ন সালিহ)-এ লিখিয়াছেন ঃ وفى كـتـب المتقدمين جرح جماعة بالفلسفة ظنامنهم ان علم الكلام فَلْسَفَةٌ "পূর্ববর্তী 'আলিমগণ যাহারা দর্শনের পঠন-পাঠনের চর্চা করিতেন তাঁহাদের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের ধারণায় 'ইল্‌মু'ল-কালামই হইল দর্শন"।

**'ইল্‌ম কালাম-এর বিষয়বস্তু** ঃ ইব্‌ন খাল্‌দূন লিখিয়াছেন যে, 'ইল্‌ম কালামের বিষয়বস্তু হইল সেই সকল স্বীকৃত ঈমানী 'আকীদা যেইগুলির প্রমাণ মযবুত যুক্তিপূর্ণ দলীলসমূহ দ্বারা উপস্থিত করা হইবে, যাহাতে বিদ'আত মূলোৎপাটিত হয়, সন্দেহের অবসান ঘটে এবং 'আকা'ইদ-এর ক্ষেত্রে সংশয়ের অমূলক ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল প্রমাণিত হয়। শার্‌হু'ল-মাওয়াকিফ গ্রন্থে 'ইল্‌মু'ল-কালামের বিষয়বস্তুর বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, দীনী 'আকীদাসমূহের প্রমাণ উহার সহিত সম্পৃক্ত। কাদী আরমাবী (أرموى) বলেন যে, 'ইল্‌মু'ল-কালামের বিষয়বস্তু হইল আল্লাহ্ তা'আলার যাত (সত্তা), তাঁহার যাত সংক্রান্ত বিষয়সমূহ অর্থাৎ তাঁহার গুণাবলী (সিফাত) এবং তাঁহার কার্যাবলী যাহার সম্পর্ক এই জগতের সহিত হউক (যেমন বিশ্বজগতের ঘটনাবলী) কিম্বা আখিরাতের সহিত হউক (যেমন পুনরুত্থান ইত্যাদি), ইহা ছাড়া ইহকাল ও পরকালে তাঁহার আহকামের সহিত (যেমন রাসূল প্রেরণ এবং পরকালের পুরস্কার ও শাস্তি)। ইহাও বলা হইয়াছে যে, উহার বিষয়বস্তু হইল الموجـود من حيث هو موجود (আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের বিদ্যমান) (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. শার্‌হুল-মাওয়াকিফ; দাস্‌তূরু'ল-'উলামা', ৩খ; কাশ্‌শাফু ইসতিলাহাতি'ল-ফুনূন, ১খ, ২১, ২২; কাশফু'জ-জুনূন, ২খ, ৩২৬)। 'আলিমগণ উহার এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, 'ইল্‌ম কালামের আলোচনাধীন আকাইদ দ্বারা সেই 'আকাইদকে বুঝান হইয়াছে যাহার সম্পর্ক রহিয়াছে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর দীনের সহিত। উহাতে দীন সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাও আলোচিত হয়। সুতরাং বিদ'আতপন্থীদের 'আকাইদ সংক্রান্ত আলোচনাও এই 'ইল্‌মের বহির্ভূত হইবে না (কাশ্‌শাফ)। অর্থাৎ যেইখানে সঠিক 'আকীদাসমূহ প্রমাণ করা হইবে, সঙ্গে সঙ্গে বাতিলসমূহও খণ্ডন করা হইবে। দাস্‌তূরু'ল-'উলামা' গ্রন্থে আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, এই 'ইল্‌ম-এর বিষয়সমূহ হয়ত দীনী 'আকীদাসমূহ হইবে, যেমন সৃষ্টির অনিত্যতার প্রমাণ, পুনরুত্থানের সত্যতা, স্রষ্টার একত্ববাদ অথবা এমন সব বিষয় যাঁহার উপর 'আকাইদ নির্ভরশীল, যেমন জাওয়াহিরু'ল-মুফরাদা (মৌলিক পদার্থসমূহ) দ্বারা দেহের গঠন, মহাশূন্যের (খালা) বিদ্যমানতা ইত্যাদি।

এইখানে সংক্ষেপে 'ইল্‌মু'ল-কালাম ও 'ইল্‌মু'ল-ইলাহীর (ইলাহিয়াত—স্রষ্টা সম্পর্কিত জ্ঞান) পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা প্রয়োজন। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া ইলাহিয়্যাত ও কালামের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। যেমন কেবল আল-মাওজূদ সম্পর্কে আলোচনা, কিন্তু 'ইল্‌মু'ল-ইলাহী হইতে অনেকাংশে 'ইল্‌মু'ল-কালাম পৃথক ও ভিন্ন এইভাবে যে, 'ইল্‌মু'ল-কালামে মাসা'ইল ও 'আকাইদ সম্পর্কে ইসলামী পদ্ধতিতে অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে বুদ্ধিগত জ্ঞান আলোচনা করা হয় এবং কেবল উপায় অথবা মাধ্যম হিসাবে উহাতে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে ইলাহিয়্যাত-এর ক্ষেত্রে আলোচনা মূলত বুদ্ধিগত ও জ্ঞানলব্ধ নিয়ম পদ্ধতির উপর নির্ভর করে, উহা ইসলাম সম্মত কিম্বা ইসলাম বিরোধী হইতে পারে (শার্‌হুল-মাওয়াকিফ)। এই মত সাধারণ ইলাহিয়াত-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইসলামী ইলাহিয়াত-এর ক্ষেত্রে কালামের ন্যায় ইহার প্রতিও লক্ষ্য করা হয় যেন কোন সিদ্ধান্ত ইসলামের চূড়ান্ত 'আকীদার (যাহা কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত) পরিপন্থী না হয়, অবশ্য তা'বীল (ব্যাখ্যা)-এর অবকাশ থাকিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ইলাহিয়াতের ক্ষেত্র কালামের আলোচনা হইতে অধিক প্রশস্ত। কালাম হইল ঈমানী 'আকীদাসমূহ প্রমাণের নাম এবং ইলাহিয়াত সাধারণ রহস্যাবলী অনুধাবনের নাম। ইহাও এক পার্থক্য যে, কালামের প্রাথমিক ভিত্তি হইল কুরআন-হাদীছ ও ইলাহিয়াত-এর জ্ঞান-বুদ্ধি)।

'ইল্‌ম কালামকে মাসা'ইল ও 'আকাইদের বর্ণনা হিসাবে দুইটি স্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ঃ (১) সেই 'ইল্‌ম কালাম যাহা বিশেষভাবে ইসলামী দলসমূহের পারস্পরিক রাজনৈতিক অথবা ই'তিকাদগত বিবাদের দরুন সৃষ্টি হইয়াছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই মতপার্থক্যের কারণেই পারস্পরিক ঝগড়ার সূত্রপাত এবং বিরাট বিরাট বিপর্যয় সংঘটিত হয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন কোন এক দলের পক্ষ অবলম্বন করায় অন্য দলের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন পর্যন্ত বৈধ রাখা হইয়াছে। (যেমন মা'মূনু'র-রাশীদের আমলে মু'তাযিলীদের ক্ষেত্রে পক্ষপাত)। (২) সেই 'ইল্‌ম কালাম যাহা দর্শনের মুকাবিলায় সৃষ্টি হইয়াছে।

মুতাকাদ্দিমূন (প্রাচীন 'আলিমগণ)-এর নিকট ইহা ছিল দুইটি পৃথক 'ইল্‌ম। কিন্তু ইমাম গাযালী (র) ফালসাফা ও কালামের মধ্যে পারস্পরিক মিশ্রণ ও মিলনের ভিত্তি রচনা করেন। ইমাম রাযী (র) উহার উন্নতি সাধন করেন এবং পরবর্তী কালের 'আলিমগণ (মুতা'আখ্‌খিরূন) উহাকে এত দূর মিশ্রিতরূপে আলোচনা করেন যে, শিবলী নু'মানীর ভাষায় ফালসাফা, কালাম, উসূ'ল-ই 'আকা'ইদ— সব কিছু একাকার হইয়া একটি মিশ্রিত রূপ পরিগ্রহ করে ('ইল্‌মু'ল-কালাম, পৃ. ২০)। এই সম্পর্কে ইব্‌ন খালদূন বর্ণনা করেন যে, প্রথম প্রথম উহাকে দার্শনিক রূপ প্রদান করা হয় নাই। কেননা একদিকে মানুষের মধ্যে ফালসাফার চর্চা খুই কম ছিল এবং যতটুকু চর্চা বিরাজমান ছিল উহা হইতেও মুতাকাল্লিমূন (কালামশাস্ত্রবিদগণ) এইজন্য দূরে থাকিতেন যে, তাঁহারা উহাকে শারী'আতের 'আকীদার পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেন। অতঃপর যুক্তিনির্ভর প্রমাণ প্রয়োগ করা হইতে থাকে এবং নূতন নূতন পদ্ধতি যাহাকে মুতা'আখ্‌খিরীন-এর পদ্ধতি বলা হইত এবং যাহাতে নব নব পদ্ধতি ও প্রমাণের অবতারণা করা হইয়াছে। যদিও উহাতে স্থানবিশেষে ফালাসিফার চিন্তাধারার প্রত্যাখ্যান বিদ্যমান ছিল, তথাপি মুতা'আখ্‌খিরীন 'ইল্‌ম কালামকে এমন রূপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, কালাম ও ফালসাফার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে এবং উহা পরস্পর মিলিত হইয়া যেন এক জিনিসে পরিণত হয় (ইব্‌ন খালদূন, মুকাদ্দামা, পৃ. ৪৬৬)।

আহমাদ আমীন (জুহ্‌রু'ল-ইসলাম, ৪খ, ২-৩) 'ইল্‌মুল-কালামের ব্যাপকতার দরুন উহাকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন

যে, এই 'ইল্‌ম কেবল দীনী 'আকীদাসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করে না, বরং উহাতে আরও অনেক জিনিস ক্রমশ অন্তর্ভুক্ত হইতে থাকেঃ (১) 'ইল্‌মু'ল-কালামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ইলাহিয়াত সংক্রান্ত বিষয়সমূহ লইয়া আলোচনা করে। যেমন আল্লাহ, তাঁহার সত্তা (যাত), গুণাবলী (সিফাত) ও কার্যাবলী (আফ'আল), আম্বিয়া' ও রুসুল ইত্যাদি। এই বিভাগকে আমরা সঠিক অর্থে 'ইল্‌মু'ল-কালাম বলিতে পারি; (২) 'ইল্‌মু'ল-কালামের হিক্‌মিয়া বিভাগ, যাহার সম্পর্ক অধিকতর তাবী'ঈয়াত (পদার্থ বিজ্ঞান) ও কীমিয়্যা (রসায়ন)-এর সহিত, যেমন জাওহার (মূল), 'আরাদ (আপাতন), অবিভাজ্য অণু, চলন ও স্থির, বর্ণ, ঘ্রাণ, স্বাদ ইত্যাদি; (৩) 'ইল্‌মু'ল-কালামের রাজনৈতিক বিভাগ, যাহাকে দীনী রূপ প্রদান করা হইয়াছে, যেমন ইমাম কে হইতে পারেন, ইমামাতের শর্তাবলী কি, 'আব্বাসী ও উমাবীরা ইমাম হিসেবে কেমন ছিলেন এবং এই ধরনের নানা প্রশ্ন; (৪) 'ইল্‌মু'ল কালামের 'আক্‌লী (যুক্তিগত) বিভাগ, ভাল ও মন্দ সম্পর্কে আলোচনা, মানবিক ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়, জ্ঞানগত উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা, ই'জাযু'ল-কুরআন, ইজমা ও কিয়াস ইত্যাদি। অতএব আমরা দেখি যে, আল-মাওয়াকিফ, আল-ফারক বায়না'ল-ফিরাক অথবা আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিবার সময় এই ধরনের বিভিন্ন অভিব্যক্তির উদয় হয়।

**'ইল্‌ম কালামের সূচনা কিভাবে হয় ঃ** 'ইল্‌ম কালামের সূচনা সম্পর্কে আল-আশ'আরী (মাকালাত) হইতে শুরু করিয়া আত-তাফতাযানী (শারহুল-'আকা'ইদি'ন-নাসাফিয়্যা) পর্যন্ত সকলে ইহাই বলিয়াছেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) ও সাহাবীগণের যুগ পর্যন্ত লোকেরা 'আকাইদ সংক্রান্ত ব্যাপারে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে জানিয়া লইবার কিংবা প্রত্যক্ষভাবে সাহাবীদের সহিত পরামর্শ করিবার সুযোগ পাওয়ার দরুন নিশ্চিন্ত হইতেন এবং খুব কমই মতানৈক্য প্রকাশ পাইত, কিন্তু পরবর্তী কালে ফিত্‌না ও অরাজকতা দেখা দিলে সন্দেহ ও আপত্তির সৃষ্টি হয়। ইহার কিছু রাজনৈতিক কারণ ছিল, কিন্তু অধিকাংশ মতানৈক্য ও মতভেদ এমন ছিল যাহা ভিন্ন ধর্মের লোক কিংবা উহাদের মধ্য হইতে ইসলাম গ্রহণকারী লোক অথবা গ্রীক জ্ঞানসমূহের প্রচার ও উহার প্রভাবাধীন যুক্তিগত পদ্ধতির প্রাধান্যের কারণে সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইহা মনে করা ঠিক নহে যে, মতানৈক্যের সৃষ্টি কোন অসাধারণ বা অস্বাভাবিক অবস্থা ছিল অথবা ইহা কেবল মুসলমানদের ব্যাপারেই ঘটিয়াছিল। প্রথমত, ইহা এক স্বভাবজাত ব্যাপার যে, মানুষ সময়ে সময়ে তাহার ব্যক্তিগত চিন্তা প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং প্রতিটি বস্তুর ব্যাপারে তাহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীও ধার্য করিয়া থাকে। সে এক চিন্তার উপর বিদ্যমান থাকিতে পারে না। রাজনৈতিক অবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থান ও বিভিন্ন জাতির আদর্শের দ্বন্দ্বের শিকার হওয়ার পর চিন্তাধারায় আলোড়নের সৃষ্টি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয়ত, ইসলাম হইল সমগ্র মানব জাতির দীন, উহা পৃথিবীর সকল মত ও পথের মুকাবিলায় নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও কর্মপদ্ধতি পেশ করে যাহার দরুন একটি সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায়, তখন সকল মাযহাব ও দীনের অনুসারীরা উহার মুকাবিলায় সংঘবদ্ধ হয় এবং নিজেদের চিন্তাধারার অনুকূলে ও উহার প্রতিরোধকল্পে সব রকমের অস্ত্র প্রয়োগ করে, যাহার ফলে অনেক সময় ইসলাম গ্রহণকারিগণও প্রভাবিত হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় বিবেচ্য বিষয় হইল যে, এই চ্যালেঞ্জকে মুসলিম 'আলিমগণ কিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং উম্মাতের এক বিরাট অংশ উক্ত দ্বন্দ্ব-কলহ হইতে কিভাবে রক্ষা পাইয়াছিল। ইসলামের মত এক বিশ্বজনীন দীন অন্যের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইবে না তাহা অবিশ্বাস্য। ইসলামকে প্রথম তিন শতাব্দীতে খুবই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করিতে হয় এবং নির্দ্বিধায় বলা হয়, সফলতার সহিত প্রতিটি পরীক্ষায় ইসলাম উত্তীর্ণ হয়। ইহা ছিল ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, মতপার্থক্যের জন্য বিভিন্ন দলের উৎপত্তি এক স্বাভাবিক ব্যাপার। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে জাতিসমূহের মধ্যে মানসিক অস্থিরতার সৃষ্টি হওয়া কোন নূতন ব্যাপার নহে। অতএব এই ধারণা পোষণ করা যথার্থ নহে যে, মুসলমানদের মধ্যেই কেবল দলের সৃষ্টি হইয়াছে। মতবিরোধ প্রতিটি ধর্মে এবং প্রতিটি দর্শনে বিদ্যমান। তদ্রূপ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে মুসলমানদের মধ্যেও মতপার্থক্য দেখা যায়।

ইসলামী দলসমূহের মতবিরোধের উপর অধিক যাহারা জোর দিয়া থাকেন তাহারা ইহা বিবেচনা করেন না যে, ইসলামী চিন্তাবিদগণ এই ধরনের মতবিরোধ ও বিতর্কের মুকাবিলা কিভাবে করিয়াছেন এবং এত দ্বন্দ্ব ও কলহের মধ্যেও কুরআন ও সুন্নাতের ভিত্তির উপর উম্মাতের ঐক্য কিরূপে সুদৃঢ় রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। 'আলিমগণ প্রকৃতপক্ষে মৌলিক বিষয়গুলিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া মূল লক্ষ্য স্থির রহিয়াছেন এবং উম্মতকে সঠিক নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছেন।

বিভিন্ন মতবাদ ও বিভিন্ন দলের সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান অপ্রয়োজনীয়, কারণ ইহা এক স্বাভাবিক ব্যাপার, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইল যে, এত অধিক মতবাদ সত্ত্বেও সত্য দীনের সঠিক রাস্তা কিভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিল এবং অধিকাংশ মুসলমানকে কিভাবে জামা'আতবদ্ধ করা সম্ভব হইল। বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হইয়াছিল নিঃসন্দেহে, তবে সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট দলের বিলুপ্তি ঘটিতে থাকে এবং সত্য দীনের জামা'আত সর্বদা বিজয়ী থাকে। সত্য দীনের উপর অধিকাংশ দলের ঐক্যবদ্ধ থাকাটা হইল অস্বাভাবিক ব্যাপার আর বিভিন্ন দলের উদ্ভব হওয়াটা হইল সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। উম্মাতকে অন্তত উহার বৃহদংশকে একতাবদ্ধ রাখার কাজ 'ইল্‌ম কালাম সম্পন্ন করিয়াছে। যেমন বর্ণিত হইয়াছে, এই মুকাবিলায় তিনটি ক্ষেত্র ছিল ঃ (১) অভ্যন্তরীণ, যাহাতে মুসলমানদের ভিতরে উদ্ভূত সন্দেহের অবসান করা হইয়াছে, ইহা ছিল বিভিন্ন মতবাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার; (২) ভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের অনুপ্রবেশের ফলে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে মুকাবিলা করা হইয়াছে, ইহা ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্র; (৩) গ্রীক (প্রাচীন) দর্শন ও পাশ্চাত্য (আধুনিক) দর্শন হইতে উদ্ভূত চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের মুকাবিলা। ইহাকে যুক্তিগত ক্ষেত্র বলা যাইতে পারে।

যদিও অনেক ক্ষেত্রে 'ইল্‌ম কালাম নূতন বিপর্যয়ের কারণ হইয়াছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে 'ইল্‌ম কালাম সত্য দীনের বাস্তবতা প্রমাণ করিবার এবং উহার বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রাখিয়াছে।

ইব্‌ন খালদূনও 'ইল্‌ম কালামের সূচনা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ঈমান সম্পর্কিত 'আকাইদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তিনি লিখেন, "মোটকথা ইহা ঈমান সম্পর্কিত সেই সকল মৌলিক 'আকীদা যাহার সমর্থনে যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণসমূহ উপস্থিত করা হইয়াছে। কিতাব ও সুন্নাতে উহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। পূর্ববর্তী মনীষী, 'আলিম ও গভীর

জ্ঞানসম্পন্ন ইমামগণ উক্ত দলীলসমূহ ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু পরবর্তী কালে 'আকীদাসমূহের ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। মতানৈক্যের পশ্চাতে প্রধান কারণ ছিল আল-কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ। এই মতানৈক্যই 'আলিমদেরকে বিতর্ক ও বাকযুদ্ধের দিকে টানিয়া আনে। তাঁহাদের প্রত্যেকেই যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নাক্ল (কিতাব ও সুন্নাত) দ্বারাও দলীল পেশ করেন। আর এইখান হইতেই 'ইল্ম কালামের ভিত্তি রচিত হয়" (মুকাদ্দিমা, পৃ. ৪৬৩)।

কি কি কারণে 'ইল্ম কালামের ক্রমবিকাশ ও উন্নতি সাধিত হয় সে সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা হইয়াছে। আহমাদ আমীনের মতে (দুহা'ল-ইসলাম, ৩খ, ১-৪) উক্ত কারণসমূহের মধ্যে কিছু ছিল অভ্যন্তরীণ ও কিছু ছিল বাহ্যিক (খারিজী)। অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ বলিতে ঐ সকল বস্তু বুঝায় যেইগুলি স্বয়ং ইসলাম ও মুসলমানগণ কামনা করিত। যেমন (১) কুরআন হাকীমের এই পদ্ধতি যে, উহা কেবল তাওহীদ ও নবূওয়াতের প্রতিই আহ্বান করে নাই, বরং পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ দীন ও জাতিসমূহের 'আকা'ইদ ও আদর্শ সম্পর্কেও আলোচনা করিয়াছে এবং তাহাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; (২) যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে অব্যাহতির পর মুসলিমগণ দীনী আলোচনা ও বিতর্কের প্রতি মনোযোগ দেন এবং দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে দীনী ব্যাপারে মতানৈক্যের উদ্ভব হয়; (৩) রাজনৈতিক সমস্যাবলী।

বাহিরের (খারিজী) কারণসমূহ বিদেশী সংস্কৃতি, অনৈসলামী 'আকাইদ ও আদর্শের দরুন সৃষ্টি হয়, উহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই ছিল যে, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদেরকে দর্শনভিত্তিক প্রমাণাদি দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা যায়। প্রকৃত ব্যাপার হইল, ইসলাম যতদিন 'আরব ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন 'আকীদা সম্পর্কে তেমন কোন সূক্ষ্ম অনুসন্ধান ও বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় নাই। ইহার কারণ এই ছিল যে, 'আরবগণ কল্পনাবিলাসী নহে, বরং বাস্তববাদী। এই কারণেই বাস্তব কার্যাবলীর (সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত) ব্যাপারে প্রথম হইতেই মাসআলাসমূহের অনুসন্ধানের সূচনা হইয়াছিল, এমনকি স্বয়ং সাহাবীদের (রা) যুগেও ফিক্হ ও তাফসীর গ্রন্থাদি রচনার সূত্রপাত হয়। কিন্তু যে সকল জিনিস কেবল ঈমানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল সেই সম্পর্কে অধিক বাক-বিতণ্ডা ও সমালোচনা হয় নাই, বরং সংক্ষিপ্তভাবে 'আকীদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে। সূক্ষ্ম অনুসন্ধানকর্ম (যেমন উপরে বর্ণিত হইয়াছে) পরবর্তী কালে বিভিন্ন উপায়ে সম্পন্ন করা হয়।

শিব্লী নু'মানীও "ইখতিলাফে 'আকা'ইদ কী ইব্তিদা' শিরোনামের অধীনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করিয়াছেন এবং (আশ-শাহ্রাস্তানীর উদ্ধৃতিসহ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইসলামী দলসমূহের মধ্যে মৌলিক বিষয় এই চারটি ছিল ঃ (১) আল্লাহ্র সিফাত প্রমাণ করা, (২) জাব্র ও কাদ্র-এর মূল কথা, (৩) 'আকা'ইদ ও 'আমাল-এর পরস্পর সম্পর্ক; (৪) 'আক্ল' ও 'নাক্ল'-এর বিবাদ ('ইল্মু'ল-কালাম, পৃ. ২০-৩০; বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্র. ফির্কা)।

"ইল্মু'ল-কালাম" পরিভাষাটি সর্বপ্রথম ও কখন ব্যবহার করিয়াছেন? আহমাদ আমীন (দুহা'ল-ইসলাম, ৩খ, ৯)-এর মতে এই থেকে ব্যবহৃত হইতেছে। সর্বপ্রথম 'আব্বাসী যুগে, সম্ভবত আল-মা'মূনের শাসনামলে প্রবর্তিত হয় এবং এই নাম মু'তাযিলীদের সৃষ্ট, ইহার পূর্বে ই'তিকাদ সংক্রান্ত বিষয়সমূহের জন্য "আল-ফিক্হ ফি'দ্-দীন" শব্দ ব্যবহার করা হইত, যেমন কানূনের জন্য "আল-ফিক্হ ফি'ল-'ইল্ম" প্রচলিত ছিল। আশ্ শাহ্রাস্তানী (আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, পৃ. ১৮) অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। শিব্লী নু'মানী লিখেন, "অবশ্য তখন পর্যন্ত ('আব্বাসী খলীফা মাহদীর যুগ) ইহা 'ইল্মু'ল-কালাম নামে অভিহিত হয় নাই। মা'মূন'র-রাশীদের যুগে যখন মু'তাযিলীগণ দর্শনে দক্ষতা লাভ করেন এবং দার্শনিক মনোবৃত্তি লইয়া এই শাস্ত্রের গ্রন্থাদি রচনা শুরু করেন তখন তাহারা ইহার নাম 'ইল্মু'ল-কালাম রাখেন" ('ইল্মু'ল-কালাম, পৃ. ৩৫)।

যাহা হউক, ইহা স্পষ্ট যে, কালাম ও দর্শন অনেক স্থানে একই প্রকারের বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মুতাকাল্লিমদের (কালামশাস্ত্রবিদ) ন্যায় মুসলিম দার্শনিকগণও ইসলামী 'আকা'ইদ ও অধিবিদ্যা সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ও ইসলামী জ্ঞানের ইতিহাসে আমরা এমন অনেক নাম পাই যাঁহাদেরকে আমরা যুগপৎ মুতাকাল্লিম ও দার্শনিক উভয় দলে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি। উক্ত মনীষীদের রচনাবলী আজ পর্যন্ত এই কথার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এখন প্রশ্ন হইল, মুতাকাল্লিম ও দার্শনিক (যাঁহারা ধর্মতত্ত্ব ও অধিবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন) উভয়ের কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির মাঝে পার্থক্য কি ? এই বিষয়ের উপর আমরা কয়েক পদ্ধতিতে আলোচনা করিতে পারি। মুতাকাল্লিমগণ ঈমান ও ইহার আনুষঙ্গিক বিষয়াদির উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন, উহার যথার্থতাকে স্বীকার করেন, উহার প্রতি ঈমান আনিয়া উহাকে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন এবং উহার সপক্ষে দলীল-প্রমাণ পেশ করেন। উহার বিপরীতে দার্শনিকগণ উক্ত বিষয়সমূহের উপর পক্ষপাতহীনভাবে আলোচনা করেন এবং তাহা এইভাবে যে, তাঁহাদের মন ও মগজ উক্ত বিশ্বাসসমূহ ও উহার প্রভাব হইতে মুক্ত। অতঃপর যখন তাঁহারা উহার চিন্তাভাবনা করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন তখন উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বসেন। উভয়ের কর্মপদ্ধতির মাঝে পার্থক্য যেন এইরূপ, মুতাকাল্লিমগণ ইসলামের মূল পদ্ধতিসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া উহার পক্ষে দলীল-প্রমাণ সংগ্রহ করেন। অপরদিকে দার্শনিকগণ উক্ত বিষয়সমূহের উপর দলীল-প্রমাণের চাহিদা অনুযায়ী চিন্তাভাবনা করেন (দ্র. ইব্ন খালদূন, মুকাদ্দিমা, পৃ. ৪৬৬; আল-গাযালী, আল-ইক্তিসাদ ফি'ল-ই'তিকাদ)।

অনুরূপভাবে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ মুসলিম দার্শনিকগণ 'ইল্মু'ল-কালাম ও মুতাকাল্লিমূন দ্বারা প্রভাবিত হন এবং 'ইল্মু'ল-কালামের কোন কোন পরিভাষাকে দর্শনের ক্ষেত্রে ব্যবহারও করেন, বরং আরও অগ্রসর হইয়া তাঁহারা দীনের এমন সব শ্রুত বিষয় গ্রহণ করেন যাহার ছাবিত কিম্বা বাতিলের উপর কোন যুক্তিনির্ভর দলীল পেশ করা যায় না। সুতরাং ইব্ন সীনা বলেন, "আখিরাতে পুনরুজ্জীবন বা পুনরুত্থান ও উহার অবস্থাসমূহের জ্ঞান লাভ দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে সম্ভব নহে, কিন্তু শারী'আতে মুহাম্মাদী উহা আমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছে, এইজন্য এই সকল ব্যাপার আমাদেরকে শারী'আতের মাধ্যমে জানিতে হইবে" (ইব্ন খালদূন, মুকাদ্দিমা, পৃ. ৯; কিতাবু'ল-মাবদা' ওয়া'ল-মা'আদ লিইব্ন সীনা-র উদ্ধৃতি সহকারে)।

**'ইল্মুল-কালামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু ঃ** 'ইল্মু'ল-কালামের প্রধান বিষয় হইল ঃ (১) আল্লাহ্র যাত (সত্তা), সিফাত (গুণাবলী), 'আদ্ল

(ন্যায়বিচার) ও তাওহীদ (একত্ববাদ)-এর বিষয়; (২) আল্লাহ্‌র দর্শন, (৩) কুরআন মাখ্‌লূক (সৃষ্ট) কিংবা গায়র মাখ্‌লূক (অসৃষ্ট) হওয়া, (৪) জাব্‌র (অদৃষ্টবাদ) ও ইখ্‌তিয়ার (ইচ্ছার স্বাধীনতা), (৫) কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির অবস্থা এবং কুফ্‌র-এর সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ (এবং মানযিলাতুন বায়না'ল-মানযিলাতায়ন), (৬) আম্‌র বি'ল-মা'রূফ (ভাল কাজে নির্দেশ) ও নাহী 'আনি'ল-মুন্‌কার (মন্দ কাজে নিষেধ), (৭) নবূওয়াতের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব, (৮) ইমামাত ও খিলাফাত প্রসঙ্গ।

সাধারণত মনে করা হয় যে, মুতাকাল্লিমগণের সকলেই 'আক্‌ল (বুদ্ধি)-এর প্রাধান্যের প্রবক্তা ছিলেন— ইহা ঠিক নহে। তাঁহাদের মধ্য হইতে কতক ব্যক্তি নিঃসন্দেহে এইরূপ ছিলেন, যেমন মু'তাযিরীদের কোন কোন দল, কিন্তু সামগ্রিকভাবে কালাম সংক্রান্ত 'আলিমগণ কুরআন ও সুন্নাতের প্রথম স্থান প্রদান করিয়া 'আকা'ইদকে যুক্তিনির্ভর দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণ করিতেন।

কালামের এই বিষয়সমূহের কিছু তো রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের দরুন সৃষ্টি হইয়াছিল এবং কিছু কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ (আয়াত মুতাশাবিহাত) হইতে এবং কিছু গ্রীক দর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া। সাধারণ পাঠকদের নিকট এই সকল আলোচনা গৌণ ও গুরুত্বহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার অনেক কুফল অবশেষে দীনের বিধানের উপর আপতিত হয়। এই কারণে মুহাদ্দিছূন, ফুকাহা' এবং পরবর্তী কালে আশ'আরীদেরকে উহার প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। অন্যথায় আশঙ্কা ছিল যে, দীনের 'আকীদাসমূহ, আল্লাহ্‌র যাত, নবূওয়াত ও রিসালাত, কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম হওয়া এবং 'আমাল ও প্রতিদানের বিষয় ও অনুরূপ মৌলিক বিষয়সমূহে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। উহার প্রভাবে সামাজিক ও নৈতিক নিয়ম-কানূন এবং 'ইবাদত ও ই'তিকাদ ব্যবস্থাপনায়ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিত। উহা ছাড়া উক্ত আলোচনাসমূহের মধ্য হইতে এমন অনেক বিষয়ও বাহির হইয়া পড়ে যাহা ইসলামী চিন্তার অন্তর্ভুক্ত। যেমন আশ'আরীদের মাসআলা-ই জাওয়াহির, যাহার গুরুত্ব বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশ পায়। সূচনাতে ইহা একটি সাধারণ প্রশ্ন ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে উহার শাখা-প্রশাখার উদ্ভব হয়, যাহার ফলে নিয়মতান্ত্রিক দল ও মতের সৃষ্টি হইতে থাকে। অতঃপর প্রতিটি দল ও মত হইতে অসংখ্য শাখা-প্রশাখার উদ্ভব হইতে থাকে।

আল-আশ'আরী 'মাকালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন' গ্রন্থে উক্ত দল ও মত ও শাখাসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। আল-বাগদাদী 'আল-ফারকু বায়না'ল-ফিরাক' গ্রন্থে ঐ সকল লোকদেরও চিহ্নিত করিয়াছেন যাঁহারা সত্য পথে আছেন এবং তিনি বাতিলপন্থীদের 'আকীদাসমূহও বর্ণনা করিয়াছেন (আরও দ্র. আশ-শাহ্‌রাস্তানী, কিতাবু'ল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল; ইব্‌ন হায্‌ম, কিতাবু'ল-ফসা'ল)।

এই স্থানে উক্ত মতবাদসমূহের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। এখানে শুধু কিছু মৌলিক দল ও তাহাদের উল্লেখযোগ্য প্রবক্তাদের আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত হইবে।

**'ইল্‌মুল-কালামের প্রসিদ্ধ দলসমূহ ঃ** খিলাফাতে রাশিদা যুগের পর যখন মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করে (বিশেষ করিয়া খাওয়ারিজ, বানূ উমায়্যা ও শী'আদের দ্বন্দ্ব), তখন স্বভাবত চিন্তা ও বিশ্বাসগত বাক-বিতণ্ডাও চরমে উঠে। যেই সকল বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া উক্ত বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা নিম্নরূপ ঃ (১) জাব্‌র ওয়া ইখ্‌তিয়ার সংক্রান্ত মাস'আলা। (২) কবীরা গুনাহকারী ও শারী'আতে তাহার স্থান; (৩) খাল্‌ক কুরআনের মাস'আলা।

**জাবরিয়া ও কাদরিয়্যাঃ** কেহ কেহ বলেন যে, 'জাব্‌র' মাস'আলার উদ্ভাবক ছিলেন জা'দ ইব্‌ন দিরহাম এবং তিনি এই মত য়াহূদীদের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। পারস্যবাসীদের নিকটও এই ধরনের মতের সন্ধান পাওয়া যায়। জা'দ ইব্‌ন দিরহাম হইতে এই 'আকীদা জাহ্‌ম ইব্‌ন সাফ্‌ওয়ান গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকেই জাব্‌রিয়্যা মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। তাঁহার মতে মানুষ সম্পূর্ণ অসহায়। তাহার না স্বাধীন কোন ইচ্ছা আছে এবং না তাহার কাজের উপর সে কোন ক্ষমতা রাখে। সে একটি খড়ের ন্যায় মাত্র, যাহা তীব্র বাতাসে উড়িয়া যায় অথবা একটি কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় যাহার চলন ঢেউয়ের আঘাতের উপর নির্ভরশীল। ইহা ছিল জাব্‌রিয়্যাদের মৌলিক 'আকীদা। জাহ্‌ম ইব্‌ন সাফ্‌ওয়ান আরও কিছু 'আকীদা পোষণ করিতেন, যেমন কোন বস্তু চিরস্থায়ী নহে এবং জান্নাত ও জাহান্নামও শেষ পর্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে; ঈমান আল্লাহ সম্পর্কে অবগত হওয়ার নাম এবং কুফর হইল আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতার নাম (এই কারণে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে জানিল, অতঃপর মুখে অবজ্ঞা করিল, সে কাফির নহে)। তিনি এই মতও পোষণ করিতেন যে, আল্লাহ্‌র জ্ঞান অস্থায়ী এবং তিনি কোন জিনিস সৃষ্টির পূর্বে উহা জানেন না, আল্লাহ্‌র দর্শন সম্ভব নহে; তিনি আল্লাহ্‌র সিফাত অস্বীকারকারী এবং খাল্‌ক কুরআনের পক্ষে ছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র কালামকে কাদীম (চিরন্তন) না বলিয়া হাদিছ (নশ্বর) মনে করিতেন (এই ব্যাপারে মু'তাযিলীগণ তাঁহার মত অবলম্বন করে)। জাহ্‌ম ইব্‌ন সাফ্‌ওয়ান ১২৮ হিজরীতে নাস্‌র ইব্‌ন সায়্যার-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন এবং নিহত হন। তাঁহার আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল খুরাসান। পরবর্তী কালে তাঁহার অনুসারিগণ নিহাওয়ানদে আশ্রয় গ্রহণ করে। সাল্‌ফ সালিহীন (প্রাথমিক যুগের পুণ্যবান ব্যক্তিগণ), অধিকাংশ মুতাকাল্লিম, মুহাদ্দিছ ও ফাকীহ জাব্‌র 'আকীদাবিরোধী ছিলেন এবং উক্ত মতবাদ খণ্ডন করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন (জাহ্‌ম ইব্‌ন সাফ্‌ওয়ান-এর মতসমূহের জন্য দ্র. আল-বাগদাদী, পৃ. ১৯৯; আশ্‌-শাহ্‌রাস্তানী, পৃ. ৬০১ প.)। অদৃষ্টবাদের ঠিক বিপরীতে কাদারিয়্যার অস্তিত্ব বিদ্যমান। এই মতবাদেও বাড়াবাড়ি রহিয়াছে এবং এই মতবাদ অনুসারে মানুষ সব কিছু নিজ ইচ্ছায় করিয়া থাকে, উহার সহিত আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক নাই। তাহারা স্পষ্টভাবে আল্লাহ্‌র তাক্‌দীরকে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, ঘটনাবলীর জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা কেবল তখনই লাভ করেন যখন উহা সংঘটিত হয়। তাহারা যেন এই কথাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, মানুষের কার্যাবলী সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতাসীমার বাহিরে। ইহারা বানূ উমায়্যার ঘোরতর বিরোধী এবং তাহাদের জীবন পদ্ধতির তীব্র সমালোচক ছিলেন।

'কাদারিয়্যা'দের এই নামে আখ্যায়িত করিবার ব্যাপারে অনেকে বিস্মিত হইয়াছেন যে, তাক্‌দীর অস্বীকার করা সত্ত্বেও তাহাদেরকে কাদারিয়্যা বলা হইয়াছে। অনেকের মতে তাহাদেরকে কাদারিয়্যা নামে অভিহিত করিবার কারণ হইল, তাহারা তাক্‌দীরকে আল্লাহ তা'আলা হইতে নির্বাসিত করিলেও মানুষের জন্য উহা বহাল রাখেন। প্রকৃতপক্ষে এই নাম তাহাদের জন্যই ব্যবহার করা হইয়াছে যাহারা এই কথা বলিতেন যে, মানুষ তাহার কার্যাবলীর উপর এতদূর শক্তি রাখে যে, 'কাদ্‌র' (শক্তি) যেন স্বয়ং তাহারই সহিত সংশ্লিষ্ট এবং প্রতিটি বস্তু তাহার ইচ্ছা

ও শক্তির অনুগত। কাদারিয়্যা সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন ইরাকে মা'বাদ আল-জুহানী এবং সিরিয়াতে গায়লান আদ-দিমাশকী। পরবর্তী কালে মু'তাযিলীদেরও কাদারিয়্যা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কেননা তাহারাও এই মত পোষণ করেন যে, মানুষের কার্যাবলী তাহাদের স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পাদিত হয়। মা'বাদকে হাজ্জাজ ইব্‌ন য়ূসুফ ৮০ হিজরীতে বিদ্রোহের আহ্বায়ক চিহ্নিত করিয়া হত্যা করেন এবং গায়লান নিহত (১০৫ হি.) হন হিশাম ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-মালিকের হাতে। তাহার সহিত ইমাম আওযা'ঈর তর্কযুদ্ধের ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। কাদারিয়্যাদের 'আকীদা দীর্ঘদিন ধরিয়া বসরা এবং উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইহার প্রচার ও প্রসার হইতে থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, কাদারিয়্যাদের 'আকা'ইদ পরবর্তী কালে দ্বিতীয় 'আকা'ইদের রূপ পরিগ্রহ করে এবং অনেকের মতে উহা মু'তাযিলীদের মধ্যে বিলীন হইয়া যায় অর্থাৎ মু'তাযিলীরাই কাদারিয়্যাদের ভূমিকা গ্রহণ করে।

**মুরজিআ** ঃ এই পারিভাষিক নামটি তাহাদের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে যাহারা গুনাহ্‌গার ব্যক্তি সম্পর্কে ফায়সালা প্রদানের ব্যাপারে ইরজা' (তা'জীল, বিলম্ব)-এর পক্ষে ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে কাবীরা গুনাহ্‌কারীর ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হইলে কয়েকটি মতের উদ্ভব হয়। শী'আদের মতে সে ব্যক্তি মু'মিন, তবে তাহার উপর হদ্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। খারিজীদের মত ছিল যে, সে কাফির এবং তাহাকে হত্যা করা ওয়াজিব। মু'তাযিলাগণ বলিতেন যে, সে মু'মিন নহে, কাফিরও নহে। তবে মুসলিম বলা যেতে পারে। মুরজিআ এই 'আকীদা পোষণ করিতেন যে, কবীরা গুনাহ্‌কারী ব্যক্তির ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র উপর (কিয়ামতের দিন পর্যন্ত) ছাড়িয়া দিতে হইবে, যিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বদ্রষ্টা এবং গোপন তথ্যাবলী সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তিনিই তাহাদের হিসাব লইবেন। মানুষের কাজ ইহা নহে যে, তাহারা অপরের কার্যাবলীর উপর হুকুম (ফায়সালা) প্রদান করিতে থাকিবে।

কেহ আবার বলেন যে, মুরজি'আগণ বানূ উমায়্যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য এই দর্শন গ্রহণ করে (দ্র. 'উমার ফার্‌রূখ, তা'রীখুল-ফিক্‌রি'ল-'আরাবী)। মুরজি'আগণ শী'আ ও খারিজীদের ন্যায় এই কথা স্বীকার করিতেন যে, য়াযীদ ও অন্য কয়েকজন উমাবী হইলেন ফাসিক ও ফাজির তবে তাহারা উহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও হত্যাযজ্ঞের পক্ষে ছিলেন না। মু'তাযিলীগণ সেই ব্যক্তিকেই মুরজি'আদের মধ্যে গণ্য করিতেন, যে কাবীরা গুনাহকারীকে চিরজাহান্নামী মনে না করে। এই কারণেই ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে অনেক প্রসিদ্ধ ও প্রখ্যাত ফিক্‌হ ও হাদীছের ইমামের নাম পাওয়া যায় যাহাদেরকে মুরজি'আ বলা হইয়াছে। নিকৃষ্ট লোকেরা খারাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য এই 'আকীদার আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছে (দ্র. ইব্‌ন হায্‌ম, আল-ফিসাল ফি'ল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, পৃ. ১১১ প.; মুরজি'আদের বিভিন্ন দল ও মতসমূহের জন্য দ্র. আশ্‌-শাহারাস্তানী, আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল)। কোন কোন 'আলিম মুরজি'আকে অন্যভাবেও বিভক্ত করিয়াছেন অর্থাৎ মুরজি'আ আস্‌-সুন্নাহ ও মুরজি'আ আল-বিদ'আ। (১) মুরজি'আ আস-সুন্নার দর্শন হইল যে, কবীরা গুনাহকারীকে তাহার পাপ অনুযায়ী অবশেষে শাস্তি প্রদান করা হইবে, তবে সে চিরজাহান্নামী নহে। সম্ভাবনা আছে যে, আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং শাস্তি হইতেও সে বাঁচিয়া যাইবে। ফাকীহ ও মুহাদ্দিছদের এক বিরাট দল এই মত পোষণ করেন (২) মুরজি'আ আল-বিদ'আর বক্তব্য হইল যে, ঈমানের সহিত পাপ ক্ষতিকর নহে, যেমনিভাবে কুফর-এর সহিত 'ইবাদত ও বন্দেগী ফলদায়ক নহে এবং প্রকৃতপক্ষে ইহারাই হইলেন সেই সকল লোক যাহাদেরকে মুরজি'আ বলা হয়।

**মু'তাযিলা** ঃ বস্তুত মু'তাযিলীদের আবির্ভাব উমায়্যা যুগেই ঘটিয়াছিল, তবে 'আব্বাসী যুগই তাহাদের উত্থানের কাল বলিতে হইবে। সাধারণত বলা হইয়া থাকে যে, এই মতের উদ্ভাবক হইলেন ওয়াসিল ইব্‌ন 'আতা' (মৃ. ১৩১ হি.)। তিনি ইমাম হাসান বাস্‌রী (র) আবূ সা'ঈদ আল-হাসান ইব্‌ন য়াসার, মৃ. ১১০ হি.)-র শিষ্য ছিলেন। কবীরা গুনাহ্‌কারীদের সম্পর্কে তাঁহার ধারণা স্বীয় উস্তাদের মত হইতে পৃথক ছিল। তিনি বলেন যে, কবীরা গুনাহ্‌কারী সম্পূর্ণ মু'মিনও নহে এবং সম্পূর্ণ কাফিরও নহে অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে সে মু'মিনও নহে এবং কাফিরও নহে, বরং তাহার স্থান হইল ঈমান ও কুফ্‌র-এর মধ্যবর্তী স্থলে। এই কথা বলিয়া তিনি হাসান বাস্‌রীর মাহ্‌ফিল হইতে— যাহা বসরার মসজিদে অনুষ্ঠিত হইত— উঠিয়া যান এবং নূতন এক পৃথক শিক্ষা শিবির প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে হাসান বাস্‌রী বলেন, "ই'তাযালা 'আন্না ওয়াসিলু" (ওয়াসিল আমাদের হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে) এবং তখন হইতে তাঁহার অনুসারীদের নাম মু'তাযিলা হিসাবে প্রসিদ্ধ হইয়া যায়। অনেকে আবার বলেন যে, এই দলের উদ্ভব ওয়াসিল ইব্‌ন 'আতা'র অনেক পূর্বেই ঘটিয়াছিল, বরং কিছু আহ্‌ল বায়ত (যেমন যায়দ ইব্‌ন 'আলী)-ও মু'তাযিলাপন্থী ছিলেন। অন্য এক দলের ধারণা হইল যে, উহার সূচনা ইমাম হাসান ইব্‌ন 'আলীর আমীর মু'আবিয়ার পক্ষে খিলাফাত পরিত্যাগ করিবার সময় হইতে হয় যখন শী'আন-ই 'আলীর মধ্য হইতে এক দল রাজনীতি হইতে সরিয়া গিয়া ইমাম হাসান (রা) ও আমীর মু'আবিয়া (রা) উভয় হইতে পৃথক হইয়া যায়। তাহারা কেবল 'ইল্‌ম ও 'ইবাদতের সহিত সম্পর্ক রাখেন এবং 'আকা'ইদ সংক্রান্ত বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণা করিতে থাকেন। কোন কোন প্রাচ্যবিদের মত হইল যে, ইহাদের এইজন্য মু'তাযিলা বলা হইত যে, তাঁহারা খুবই মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিলেন এবং পার্থিব জগত হইতে বিমুখ থাকিতেন। আহ্‌মাদ আমীন (ফাজ্‌রু'ল-ইসলাম, আল-খিতাত লি'ল-মাক-রীযী-এর উদ্ধৃতিসহ) লিখিয়াছেন যে, য়াহূদীদের মধ্যে ফারূশীম নামে এক গোত্র ছিল যাহার অর্থ হইল মু'তাযিলা। তাহাদের 'আকা'ইদ মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের 'আকা'ইদের সহিত মিল রাখে। সম্ভবত য়াহূদীদের মধ্য হইতে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা 'আকা'ইদের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের দরুন মু'তাযিলাকে এই নাম দিয়া থাকিবেন। মুহাম্মাদ আবূ যুহরা মনে করেন যে, ইসলামের মু'তাযিলা ও য়াহূদীবাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। য়াহূদীদের মু'তাযিলারা যুক্তি ও দর্শনের (মানতিক এবং ফালসাফা) আলোকে 'তাওরাত'-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিতেন। মুসলিম মু'তাযিলাগণও কুরআন ও আল্লাহ্‌র সিফাতের তাফসীর ও ব্যাখ্যা দর্শনের (ফালসাফা) আলোকে করিয়াছেন (দ্র. আল-মায়াহিবু'ল-ইসলামিয়্যা)।

**ই'তিযাল-এর পঞ্চনীতি (উসূল)** ঃ যদিও মু'তাযিলীদের বড় বড় নেতার কিছু নির্দিষ্ট মতামত ও চিন্তাধারাও রহিয়াছে এবং ঐগুলির ভিত্তিতে মু'তাযিলীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে (যেমন আল-ওয়াসিলিয়্যা, আল-হুযায়লিয়্যা, আন্‌-নাজ্‌জামিয়্যা, আল-জাহিজিয়্যা, আল-

খায়্যাতিয়্যা, আল-কা'বিয়্যা, আল-জুবা'ইয়্যা ইত্যাদি), কিন্তু পঞ্চনীতি (ওয়াসিল ইব্‌ন 'আতা' যাহার নাম আল-কাওয়া'ইদ দিয়াছিলেন) এমন যাহা উল্লিখিত সকল দলের মধ্যে সম্মিলিত মূলনীতি হিসাবে মর্যাদা রাখিত এবং যাহা স্বীকার করা ব্যতীত কেহ মু'তাযিলী বলিবার অধিকার রাখিত না। নীতিগুলি এই ঃ (১) আত্‌-তাওহীদ; (২) আল-'আদ্‌ল (মু'তাযিলীগণ নিজদের ন্যায়পরায়ণ তাওহীদবাদী বলিয়া দাবি করিতেন); (৩) আল-ওয়া'দ ওয়া'ল-ওয়া'ঈদ; (৪) আল-মানযিলাতু বায়না'ল-মানযিলাতায়ন; (৫) আল-আম্‌র বি'ল-মা'রূফ ওয়া'ন্‌-নাহী 'আনি'ল্‌-মুন্‌কার। মু'তাযিলীদের উল্লিখিত পঞ্চনীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(১) তাওহীদ ঃ আল্লাহ্‌র একত্ববাদের মাস্'আলা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক 'আকীদা এবং সকল মুসলমান আল্লাহ্‌র তাওহীদের 'আকীদায় বিশ্বাসী। সুতরাং ইহা সর্বজনবিদিত একটি বিষয়, কিন্তু মু'তাযিলীগণ নিজেদের দৃষ্টিকোণ হইতে এই 'আকীদার বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং উহার বিশ্লেষণ ও দার্শনিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, যাহার ফলে উহা হইতে অধিক বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। এই কারণেই বলা হয়, 'তাওহীদ' 'আকীদা হিসাবে তাহাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। কুরআন মাজীদে এমন অনেক আয়াত আছে যাহা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা প্রমাণ করে, যেমন ليس كمثله شيء; কিন্তু কিছু এমন আয়াতও আছে যাহা স্পষ্টত দৈহিক গঠনের প্রতি ইঙ্গিত করে, যেমন يد الله فوق ايديهم; অতঃপর এমন আয়াতও পাওয়া যায় যাহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌র জন্য কোন নির্দিষ্ট দিক নাই, যেমন و لله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله; আবার কিছু আয়াতে স্পষ্ট দিকের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন ثم استوى على العرش এবং أمنتم من في السماء; মুসলিম 'আলিমদের অনেকেই সেই যুগেও আল্লাহ্‌র পবিত্র যাতের বিস্তারিত আলোচনা ব্যতীত উহার প্রতি ঈমান রাখিতেন এবং যেই সকল আয়াত দ্বারা সাদৃশ্যের (তাশ্‌বীহ, তামছীল) প্রকাশ ঘটিয়া থাকে উহার আলোচনা ও পর্যালোচনা হইতে বিরত থাকিতেন। তাঁহাদের বক্তব্য হইল, "আমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার একত্ববাদের প্রতি ঈমান রাখি এবং যাহা কিছু কুরআনে আছে উহার অতিরিক্ত কিছু বলি না। কেননা উহার অতিরিক্ত জানা আমাদের উপর ওয়াজিব নহে। আমাদের জন্য যাহা কুরআনে নাযিল হইয়াছে তাহা গ্রহণ করাই যথেষ্ট। যদি আমরা উহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিতে যাই তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য হইয়া যাইবে, আল্লাহ্‌র উক্তি হইবে না।" এই সূক্ষ্ম বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গেলে ভুলের আশংকা দেখা দিবে, এই কারণে ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকাই উত্তম। এই ব্যাপারে মু'তাযিলীগণ বিকল্প পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তাহাদের বক্তব্য হইল, "আমরা পবিত্রতা সংক্রান্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়া থাকি, কিন্তু সেই সকল আয়াত যাহাতে 'আরশের উপর অবস্থান করা এবং চেহারা, হাত প্রভৃতির উল্লেখ আছে, উহার এমন তা'বীল করিয়া থাকি যাহাতে উহা আল্লাহ্‌র পবিত্রতার বিপরীত না হয়, বরং উহার সমর্থক হয়। যেহেতু আল্লাহ্ খাঁটি তাওহীদ এবং তাঁহার যাতের পবিত্রতার প্রবক্তা ইসলাম— সেইহেতু উহাতে আল্লাহ্‌র যাতের প্রতি নরত্বারোপের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। এই কারণে যেই সকল আয়াতের বাহ্যত নরত্বারোপ এবং তৎসদৃশ কোন বিবরণ পাওয়া যায় উহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যাহা খুবই স্পষ্ট ও সর্বসম্মত মত।

শিব্‌লী নু'মানী উক্ত মতবিরোধকে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, "আল্লাহ্ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে এই প্রকারের যে সমস্ত শব্দের উল্লেখ আছে যাহাতে আল্লাহ্‌র দৈহিক গঠন সম্পর্কে উক্তি রহিয়াছে, যেমন 'আরশের উপর তাঁহার অবস্থান করা, কিয়ামতের দিন ফেরেশ্‌তাদের সমভিব্যাহারে তাঁহার আগমন ইত্যাদি, এই ধরনের আয়াতের প্রকৃত অর্থ বা রূপক অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহা লইয়া দুইটি ভিন্ন দলের জন্ম হইয়াছে। প্রকৃত অর্থ গ্রহণকারিগণ হইলে মুহাদ্দিছূন ও আশ'আরীগণ, যাহাদের মধ্য হইতে ক্রমে ক্রমে মুজাস্‌সিমা (নরত্বারোপবাদী) ও মুশাব্বিহার উৎপত্তি হয়, যাহারা আল্লাহ্‌র হাত-পা আছে বলিয়া স্বীকার করিত। অপর সম্ভাবনার প্রবক্তা হইল মু'তাযিলা যাহাদের অপর নাম হইল মুন্‌কিরূন-ই সিফাত— আল্লাহ্‌র গুণাবলী অস্বীকারকারী ('ইল্‌মু'ল-কালাম, পৃ. ২৮)।

ইমাম আশ'আরী "মাকালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন" (১খ, ১৫৫)-এ মু'তাযিলাদের তাওহীদ ও পবিত্রতার 'আকীদাকে এই ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, "আল্লাহ্ এক। তাঁহার ন্যায় কোন বস্তু নাই। তাঁহার দেহ-শরীর, অবয়ব-আকৃতি, রক্ত-মাংস কিছু নাই। তিনি ব্যক্তি, জাওহার কিম্বা 'আরাদ নহেন। তাঁর কোন রং, স্বাদ কিংবা খোশবু নাই। তাঁহাকে স্পর্শ করা যায় না। তাঁহার না উষ্ণতা আছে এবং না শীতলতা, এমনিভাবে না আর্দ্রতা আছে এবং না শুষ্কতা। তাঁহার দৈর্ঘ্য বা গভীরতা নাই। তাঁহার মধ্যে মিলন বা বিচ্ছিন্নতা নাই। তিনি চলমানও নহেন এবং স্থিরও নহেন। তাঁহার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই। তাঁহার কোন দিকও নাই। তাঁহার না ডান আছে না বাম, না সম্মুখ না পশ্চাৎ, না ঊর্ধ্ব বা নিম্ন। কোন স্থান তাঁহাকে পরিবেষ্টন করে না, সময় ও কাল তাঁহার উপর প্রযোজ্য নহে। তিনি কোন স্থানে প্রবেশ করেন না। তাঁহাকে এমন কোন বিশেষণে ভূষিত করা যায় না যাহা সৃষ্টিসমূহের মধ্যে পাওয়া যায় এবং উহার অস্থায়িত্বের পরিচয় বহন করে। তাঁহার এই সিফাতেরও বর্ণনা করা যায় না যে, তিনি শেষ সীমায় পদার্পণকারী কিংবা তাঁহাকে পরিমাপ করা যাইতে পারে অথবা তিনি সর্বাধিক ব্যাপৃত। তিনি সীমাবদ্ধও নহেন। তিনি কাহারও পিতা বা সন্তান নহেন। শক্তি তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিতে এবং পর্দা তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিতে পারে না। অনুভূতি তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারে না এবং মানুষের সঙ্গে তাঁহাকে তুলনা করা যায় না। সৃষ্টিসমূহের সহিত তাঁহার কোনরূপ সাদৃশ্য নাই। দুর্যোগ ও বিপদ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিতে পারে না। তিনি অন্তরে উদিত চিন্তা এবং কল্পনায় আগত ধারণার সাদৃশ্য হইতেও মুক্ত। তিনি সর্বদা আছেন। তিনি অগ্র, পশ্চাত ও সকল দুর্বিপাকের ঊর্ধ্বে। তিনি সকল সৃষ্টির পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সর্বদা সর্বজ্ঞ, মহাপরাক্রমশালী ও চিরঞ্জীব এবং সর্বদা এইরূপেই থাকিবেন। চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পারে না এবং দৃষ্টিশক্তি তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না। চিন্তা ও কল্পনা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিতে পারে না এবং কর্ণ দ্বারা তাঁহার কথা শ্রবণ করা যায় না। তিনি বস্তু, তবে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় নহেন। তিনি 'আলিম ও পরাক্রমশালী, তবে জীবিত ও শক্তিমান 'আলিমদের ন্যায় নহেন। তিনিই কেবল অবিনশ্বর। তিনি ব্যতীত কিছুই চিরস্থায়ী নহে এবং তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তাঁহার রাজ্যে তাঁহার কোন শরীক নাই এবং উযীরও নাই। তিনি যাহা কিছু তৈরি বা সৃষ্টি করেন উহাতে তাঁহার কোন সাহায্যকারী নাই। তিনি সৃষ্টিকুলকে কোন পূর্ব-নমুনা মুতাবিক সৃষ্টি করেন নাই।

তাঁহার জন্য কোন বস্তুকে অপর বস্তুর মুকাবিলায় সৃষ্টি করা, না উহা হইতে অধিক সহজ এবং না উহা হইতে অধিক জটিল। তিনি না কোন প্রকার লাভবান হন এবং না তিনি কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হন। তিনি সুখ ও আনন্দ এবং কষ্ট ও দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁহার কোন সীমা বা শেষ নাই....।"

এই দীর্ঘ বর্ণনা আমরা এইজন্য পেশ করিলাম যেন মু'তাযিলাদের তাওহীদ এবং আল্লাহ্র যাতের পবিত্রতা সংক্রান্ত 'আকীদা স্পষ্ট হইয়া যায়। ইহা সুস্পষ্ট যে, মু'তাযিলীগণ পবিত্রতার যেমন দর্শনগত সমাধান দেন নাই, অনুরূপ তাওহীদের ব্যাখ্যাও জ্ঞানের আলোকে প্রদান করেন নাই, বরং এই কথা বলিয়াছেন যে, কুরআনের শব্দাবলী য়াদুন (يد) ইসতাওয়া 'আলা'ল-'আর্শ (اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ), ওয়াজ্হুন (وَجْهٌ) ইত্যাদির রূপক অর্থ করিতে হইবে।

যাতের পবিত্রতার ব্যাপারে তাঁহাদের এই গবেষণার ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, যুক্তিশাস্ত্রের নিরিখে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কালাম সংক্রান্ত মাস'আলার উদ্ভব হয় অর্থাৎ আল্লাহ্র দর্শন (রু'য়াত) সংক্রান্ত মাস্'আলা ও আল্লাহ্র সি'ফাত সংক্রান্ত মাস'আলা। অতঃপর এই দ্বিতীয় মাস'আলা হইতে খাল্ক কুরআনের বিবাদ সৃষ্টি হয়, যাহা দীর্ঘ দিন ধরিয়া ইসলামী সমাজে প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা ও ঝগড়া-কলহের কারণ হইয়া থাকে (খাল্ক কু'রআন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হইবে)। কিয়ামতের দিন মু'মিনদের আল্লাহ্র দর্শন লাভ সংক্রান্ত যে বর্ণনা আছে, মু'তাযিলাগণ উহাকে অসম্ভব মনে করেন। কেননা ইহাতে তাঁহাদের নিকট আল্লাহ্র শারীরিক অবয়ব ও দিকবিশিষ্ট হওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহারা স্বীকার করেন না যে, মানুষ আল্লাহ্কে দেখিতে পারে। এই কারণে তাহারা অসংখ্য হাদীছ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন যাহা আল্লাহ্র দর্শন লাভের সাক্ষ্য বহন করে। তাঁহারা বলেন, আল্লাহ্ তা'আলাকে চক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভব নহে; তবে মুমিনগণ তাঁহাকে অন্তর দ্বারা অবলোকন করিবেন এবং চিনিতে পারিবেন (D. Oleary, উর্দূ অনু., ফাল্সাফা-ই ইসলাম, পৃ. ১১৪)।

(২) **'আদ্ল** ঃ মু'তাযিলীদের মৌলিক 'আকীদাসমূহের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা এবং উল্লিখিত দুইটি মাস'আলার ভিত্তিতে তাহারা নিজদেরকে আহ্লু'ল-'আদ্ল ওয়া'ত্-তাওহীদ বলিতেন। যদিও সকল মুসলমান আল্লাহ্ তা'আলাকে 'আদিল বলিয়া জানেন, কিন্তু মু'তাযিলা এই ব্যাপারেও নিজেদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেঃ যেহেতু আল্লাহ্ 'আদিল' সুতরাং ইহা জা'ইয নহে যে, আল্লাহ অন্যায়ের নির্দেশ দিবেন এবং অতঃপর বান্দগণকে উক্ত অন্যায়ের দরুন শাস্তি দিবেন। মোটকথা মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং সে ভালমন্দ যাহা কিছু করে তাহা স্বেচ্ছায়ই করিয়া থাকে। উহাতে কেবল তাহার ইচ্ছার সম্পর্ক থাকে। এই কারণেই সে নেক কাজের দরুন ছাওয়াবের অধিকারী হয় এবং অন্যায় কাজের দরুন শাস্তি ভোগ করে। তাই মু'তাযিলীদের দর্শন এই দাঁড়ায় যে, মানুষ স্বয়ং তাহার কার্যাবলীর স্রষ্টা, আল্লাহ তা'আলা নহেন। ইহা ছাড়া মানুষ স্বীয় কার্যাবলীর ব্যাপারে স্বাধীন, বাধ্য নহে। আল্লাহ্ না খারাপ কাজের ইচ্ছা করেন এবং না উহার নির্দেশ দেন, বরং আলাহ্র উপরে ওয়াজিব এই যে, তিনি যাহা কিছু করিবেন তাহা বান্দার কল্যাণের জন্য করিবেন। উহার উপর ভিত্তি করিয়া প্রখ্যাত মু'তাযিলী আন-নাজ্জাম (ইবরাহীম ইব্ন সায়্যার, মৃ. ২৩১ হি.) এই দাবি করেন যে, আল্লাহ তাঁহার সৃষ্টির প্রতি কেবল সেই নির্দেশ প্রদান করিয়া থাকেন যাহা তাহার জন্য কল্যাণকর—আর ইহাই অবশ্য ইনসাফ ও 'আদ্ল।

মু'তাযিলীদের 'আদ্ল নীতি হইতে কল্যাণের দর্শন (সালাহ্ ওয়া আস্লাহ্) এবং হু'স্ন (ভাল) ও কু'ব্হ্ (মন্দ)-এর জ্ঞানবুদ্ধিলব্ধ (হু'স্ন ওয়া কু'ব্হ্ 'আক্'লী) এই দর্শনের উদ্ভব হয়। সা'লাহ্ ও আস্'লাহ্-এর অর্থ ইহাই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সকল কার্যে বান্দার কল্যাণই উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ এতদূর বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্র উপর কল্যাণ (আস্'লাহ্)-এর বিবেচনা করা অপরিহার্য।

এইভাবে মু'তাযিলীগণ যখন আল্লাহ্কে এই বলিয়া স্বীকার করিলেন যে, তিনি 'আদিল ও হাকীম এবং তাঁহার সকল কাজের কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে তখন 'আমালসমূহের মধ্যে ভাল (হু'স্ন) ও মন্দ (কু'ব্হ্)-এর মাস'আলা জন্ম নেয়। মু'তাযিলীদের বক্তব্যঃ 'আমালসমূহে হু'স্ন ও কুব্হ্-মৌলিকভাবে বিদ্যমান এবং সত্যবাদিতার (সি'দ্ক্) মধ্যে হুসন মৌলিকভাবে বিদ্যমান। সুতরাং শারী'আত যে সকল কাজের নির্দেশ প্রদান করিয়াছে তাহা মূলত ভাল (হু'স্ন) ছিল এবং এই কারণেই বলিয়াছে যে, এই কাজ কর। তদ্রূপ যেই সকল কাজ নিষেধ করা হইয়াছে তাহা মৌলিকভাবে মন্দ (কুব্হ্) এবং তাই শারী'আত বলিয়াছে যে, ইহা করিও না। ফল এই দাঁড়াইল যে, শারী'আতের হুকুম জানা না থাকিলেও বা শারী'আত তাহার নিকট না পৌঁছাইলেও মানুষ মুকাল্লাফ অর্থাৎ ভাল-মন্দ বিবেচনা করিয়া কর্তব্য পালনে বাধ্য। কেননা ভাল-মন্দ যাচাই করার মত বিবেক-বুদ্ধি তাহার আছে।

(৩) **ওয়া'দ ওয়া ওয়া'ঈদ** ঃ মু'তাযিলীদের 'আকীদা অনুযায়ী ঈমান এই যে, মানুষ যে 'আকীদা পোষণ করিবে সেই মুতাবিক 'আমলও করিবে। যে ব্যক্তি কাবীরা গুনাহ্র শিকার হওয়ার পর তওবা করিবে না 'সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। সুতরাং তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা ভাল কাজের জন্য ছাওয়াবের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন উহা অবশ্যই কার্যকর হইবে; পুণ্যবান লোক নিঃসন্দেহে প্রতিদান পাইবেন এবং পাপী ব্যক্তি অবশ্যই শাস্তি ভোগ করিবে। তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ অধিক বাড়াবাড়ি করিয়াছে এবং বলিয়াছে যে, আল্লাহ্র উপর ইহা অপরিহার্য যে, তিনি তাঁহার অনুগত বান্দাদেরকে ছাওয়াব (প্রতিদান) এবং কাবীরা গুনাহকারীদেরকে শাস্তি প্রদান করিবেন। ভাল কাজের জন্য ছাওয়াব এবং পাপ কাজের জন্য শাস্তি প্রদান যেন এক প্রকার কা'নূন যাহা পালন করা আল্লাহ্র জন্য অপরিহার্য।

(৪) **মানযিলাতুন বায়নাল-মানযিলাতায়ন** ঃ ইহার অর্থ কুফর ও ইসলামের মাঝখানে একটি শ্রেণী নির্দিষ্টকরণ। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের এই দর্শন 'ফাসিক'দের সম্পর্কে। এমন ব্যক্তি যে মুখে ঈমান আনিয়া থাকে কিন্তু সেই সংগে গুনাহ করিয়া থাকে তাহার অবস্থা কি হইবে? মু'তাযিলীদের মতে সে ব্যক্তি না সঠিক মু'মিন এবং না প্রকৃত অর্থে কাফির। কেননা তাহার কার্যে ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে নাই; কিন্তু আল্লাহ্র প্রতি ঈমান পোষণ তাহাকে উম্মাত হইতে বাহির হইতেও দেয় নাই। মু'তাযিলীদের মতে কিছু কবীরা গুনাহ এমন আছে যাহা মানুষকে কুফর-এর সীমা পর্যন্ত লইয়া যায়, আবার কবীরা গুনাহ উহা হইতে নিম্ন মানেরও আছে। এই শেষোক্ত কবীরা গুনাহের লিপ্ত ব্যক্তিকে ফাসিক বলা হয়। ফিস্ক

প্রকৃতপক্ষে ঈমান ও কুফর-এর মধ্যবর্তী একটি স্থান। ইহা না কুফর—না ঈমান; এইজন্য ফাসিক না মু'মিন—না কাফির, বরং তাহার স্থান উল্লিখিত স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী। 'মধ্যবর্তী স্থান'-এর দাবি করা সত্ত্বেও মু'তাযিলীগণ বলে যে, কবীরা গুনাহ্কারীর জন্য মুসলিম শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, কিন্তু এই ব্যবহার সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে নহে, বরং কেবল কাফির ও যিম্মীগণ হইতে পার্থক্য করিবার জন্য বলা হইবে।

**(৫) আম্র বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুন্কার ঃ** "ভাল কাজের নির্দেশ প্রদান এবং অন্যায় কাজ হইতে বিরত রাখা" ইহা সকল মুসলমানের জীবনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু এই বিষয়েও মু'তাযিলীগণ এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন, ভাল কাজের প্রসার এবং অন্যায় রোধের ক্ষেত্রে মু'তাযিলীগণ সরাসরি হস্তক্ষেপকে অপরিহার্য বরং প্রয়োজনে তরবারির ব্যবহারও বৈধ রাখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ভুল পথ প্রদর্শনকারীদেরকে বাধা প্রদানের জন্য ও সত্য বিরোধীদের সত্য গ্রহণে বাধ্য করিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ আবশ্যক। তাহারা এই নীতিকে 'আব্বাসী শাসক আল-মা'মূন, আল-মু'তাসিম ও আল-ওয়াছিক-এর শাসনামলে যথারীতি বাস্তবায়িত করিয়াছিল। খাল্ক কু'রআন বিষয়ে তাহারা রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় যেভাবে মুহাদ্দিছ ও ফাকীহদেরকে জোরপূর্বক তাহাদের মতানুসারী বানাইতে চাহিয়াছিল উহা তাহাদের আম্র বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুন্কার-এর এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

**(৬) সিফাতের অস্বীকৃতি ও খাল্ক কুরআনের মাসআলা**—মু'তাযিলীদের তাওহীদ সংক্রান্ত 'আকীদার উপর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আল্লাহ্র সিফাত বিষয়ে ও উহার অধীন খালক কু'রআনের বিতর্কের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। মু'তাযিলীগণ আল্লাহ্র সিফাত অস্বীকার করে। যে সকল সিফাতের উল্লেখ কু'রআনে আসিয়াছে তাহারা উহার তা'বীল করিয়া বলিয়াছে যে, ইহা আল্লাহ্র যাতের নামসমূহ—সিফাত নহে। মূলত কুরআন মাজীদে 'সিফাতুল্লাহ্'-র কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না এবং ইহার পূর্বে এই বিষয়ে আলোচনাও হয় নাই। এই বিষয়টি স্বয়ং মু'তাযিলীগণই উত্থাপন করেন এবং ইহাতে তাহারা এতদূর অগ্রসর হন যে, ইহা 'ইল্ম কালামের বিষয়সমূহের মধ্যে প্রথম সারির বিষয়ের রূপ নেয় (দ্র. আহ্মাদ আমীন, দু'হাল-ইসলাম, ৩খ, ২৯)। ইহা সত্য যে, কুরআন মাজীদে সিফাতুল্লাহ্র হুকুম নাই; তবে আল্লাহ্র গুণাবলীর (আওসাফ-ই ইলাহিয়্যা) উল্লেখ কু'রআন ও হাদীছের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। এই সকল সিফাত এমন যাহার সীমা নাই, কিন্তু কালাম সংক্রান্ত মাসা'ইল যাহার উপর আলোচনা করা হইয়া থাকে তাহা নিম্নরূপঃ 'ইল্ম, হায়াত, ইরাদা, সাম', বাসার, কালাম। মুজাস্সিমা ও মুশাব্বিহা আল্লাহ্র সিফাতকে হুবহু মাখলূকের সিফাত-এর অনুরূপ গণ্য করে, অন্যদিকে মু'আত্তিলা আল্লাহ্র সিফাতকে একেবারে অস্বীকার করে এবং বলে যে, আল্লাহ্ দেখেন না, শুনেনও না এবং তিনি কালাম করেন বলিয়াও প্রমাণ নাই ইত্যাদি। মু'তাযিলীগণ প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, এই সিফাত অথবা আওসাফ কী হুবহু আল্লাহ্র যাত না আল্লাহ্র যাতের অতিরিক্ত কিছু ? মু'তাযিলীগণ তাঁহাদের বিশেষ ভঙ্গীতে আল্লাহ্র একত্বের এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছে যে, তাঁহার পবিত্র সত্তা অসংখ্য বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত নহে। কেননা যদি উহা বস্তুসমূহের সমন্বয়ে গঠিত হয়, তাহা হইলে সেই সকল বস্তুর প্রতিটির পৃথক পৃথক অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন, ফলে প্রতিটি হইবে আলাদা বা ভিন্ন বস্তু। এমতাবস্থায় সেইগুলিকে যুক্ত করিবার প্রয়োজন। আর প্রয়োজনের অর্থই হইল উহা অপরের মুখাপেক্ষী হওয়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অপরের মুখাপেক্ষী হওয়া হইতে পবিত্র ও উর্ধ্বে। সুতরাং আল্লাহ্র সত্তায় কোন প্রকারেরই বহুত্ব পাওয়া যাইতে পারে না, উহা পরিমাণগত হউক কিংবা অভ্যন্তরীণ বিষয় সংক্রান্ত হউক।

মু'তাযিলীগণ নিজেরাই এই সূক্ষ্ম দর্শনগত মাস'আলার সূচনা করিয়াছিল, যাহার ফলে আল্লাহ্র সিফাতসমূহ হুবহু তাঁহার যাত না যাতবহির্ভূত কিছু এইরূপ জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। এখন মুতাযিলীগণ এই দর্শন স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, আল্লাহ্র যাত ও আল্লাহ্র সিফাত একই বস্তু অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার যাত হিসাবে হায়্যু, 'আলিম ও কাদির, এমন কোন সিফাতের ভিত্তিতে নহে যাহাকে ইল্ম অথবা হায়াত অথবা কুদরাত বলা যায় এবং যাহা আল্লাহ্র যাতের অতিরিক্ত হইবে। কেননা যদি তিনি 'আলিম এই হিসাবে যে, ইল্ম তাঁহার যাত-এর বহির্ভূত একটি গুণ; তবে ইহা অপরিহার্য যে, বিশেষ্য ও বিশেষণ অর্থাৎ ধারক ও যাহা ধারণ করা হইয়াছে— এই দুইটি বস্তু স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই অবস্থা কেবল দেহসমূহে পাওয়া যায় এবং আল্লাহ্ দেহগত কোন ব্যাপার হইতে মুক্ত ও পবিত্র। যদি আমরা বলি যে, প্রতিটি সিফাত সত্তাগতভাবে বিদ্যমান অর্থাৎ বিশেষত সত্তা হইতে পৃথকীকৃত একটি সত্তা, তাহা হইলে অনেক অনন্ত (কাদীম) বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে এবং এইভাবে একাধিক আল্লাহ্র মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

সিফাত অস্বীকার করার পরিণতিতে খাল্ক কুরআন মতবাদের জন্ম এবং এই মতবাদ এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, 'আকীদা সংক্রান্ত মতবাদসমূহের ইতিহাসে মু'তাযিলীগণ এই মাস'আলার ভিত্তিতেই সর্বাধিক পরিচিত। যখন তাহারা সিফাত অস্বীকার করিল এবং কালামও আল্লাহ্র সিফাতের অন্তর্ভুক্ত, সিফাতের অস্বীকৃতির কারণে আল্লাহ্র মুতাকাল্লিম (বক্তা) হওয়ার অস্বীকৃতি অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তাহাদের বক্তব্য হইল, কালাম আল্লাহ্র সৃষ্টিকৃত এবং কু'রআন মাজীদ আল্লাহ্র (সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে একটি) সৃষ্ট। উহা অনন্ত (কাদীম) নহে, বরং অনিত্য ও ধ্বংসশীল (হাদিছ)। তাহারা কু'রআনকে কাদীম বলা কুফর মনে করিত। আল-মা'মূনের যুগে মু'তাযিলীগণ বিশেষ উন্নতি লাভ করে। আল-মা'মূন সরকারীভাবে তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং সাধারণত মু'তাযিলী 'আলিমগণই তাঁহার প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। ফলে তিনি ২১২ হি. সনে খাল্ক কুরআনের 'আকীদার প্রকাশ্য ঘোষণা দেন এবং মু'তাযিলীগণ তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করেন যাহাতে তিনি সর্বসাধারণকে এই আকীদা গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। আল-মা'মূন প্রশাসকগণকে এই মর্মে পত্র লিখেন যে, তাঁহারা যেন মুহাদ্দিছ, 'আলিম, ফাকীহ ও কাদীদেরকে ডাকিয়া আমীরু'ল-মু'মিনীনের নির্দেশ জানাইয়া দেন যে, যে কোন ব্যক্তি খাল্ক কু'আনকে স্বীকার করিবে না আগামীতে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে না। ইহা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, আল-মা'মূন খাল্ক কু'রআনের মাস'আলার ক্ষেত্রে অহেতুক বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, এমন কি ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বালসহ কয়েকজন প্রখ্যাত 'আলিমকে বন্দী করিয়া জেলখানায় নিক্ষেপ করা হয়। ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বালকে বেত্রাঘাত করা হয়। আল-মা'মূনের পর আল-মু'তাসিম এবং ওয়াছিক বিল্লাহও এই পদ্ধতি অব্যাহত রাখেন। আল-ওয়াছিক-এর

যুগে ইমাম শাফি'ঈর শাগরিদ য়ূসুফ ইব্ন য়াহ্য়া বুওয়ায়তীকেও অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হইতে হয় এবং আহমাদ ইব্ন নাস্র খুযা'ঈকে শূলে চড়াইয়া হত্যা করা হয়। মোটকথা সত্যনিষ্ঠ 'আলিমগণ নিজেদের 'আকীদায় দৃঢ় থাকেন। সুতরাং ওয়াছিক বিল্লাহ অবশেষে তাঁহার অত্যাচারমূলক কর্মতৎপরতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং আল-মুতাওয়াক্কিল এই বিবাদ ও বিতর্কের পরিসমাপ্তি ঘটান (খাল্ক কু'রআনের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. আহমাদ আমীন, দুহা'ল-ইসলাম, ৩খ, ৩৪-৪৪, ১৬১-২০২; মুহাম্মাদ আবূ যুহরা, আল-মাযাহিবুল' ইসলামিয়্যা, খাল্ক কুরআন অধ্যায়; শিবলী, 'ইল্মুল-কালাম, পৃ. ২৮, ৩০-৩১)। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মু'তাযিলীদের পতনও আরম্ভ হয়। শেষ যুগে তাহাদের দুইটি পৃথক মতের সৃষ্টি হয় যাহা বসরা ও বাগদাদের সহিত সম্পর্কিত। বসরা মতাবলম্বিগণ আল্লাহ্র সিফাতের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিত। উহার প্রখ্যাত লেখক ছিলেন আবূ 'আলী আল-জুব্বা'ঈ ও তদীয় পুত্র আবূ হাশিম। আল-জুব্বা'ঈর ধারণামতে আল্লাহ্র সিফাত অস্থায়ী এবং উহা কেবল নাম; উহা হইতে কোন স্পষ্ট ধারণা লাভ সম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে যে সকল সিফাতের দাবি করা হইয়া থাকে তাহা আওসাফও (গুণাবলী) নহে এবং হালাতও (অবস্থাদি) নহে। ইহা যাতের সহিত এমনভাবে সংযুক্ত যে, উহা হইতে পৃথক হইতে পারে না। বাগদাদ মতাবলম্বিগণ বেশীর ভাগ এই খাঁটি দর্শনগত বিষয়ে লিপ্ত থাকেন যে, বস্তু (شئ) কি? ইহা স্বীকার করা হইয়াছিল যে, বস্তু (شئ) এমন এক কল্পনার উদ্ভব ঘটায় যাহার জ্ঞান লাভ হইতে পারে এবং যাহা কোন এক বিষয়ের অবলম্বন হিসাবে কাজে আসিতে পারে। উহার অস্তিত্ব অপরিহার্য নহে। কেননা অস্তিত্ব হইল এমন সিফাত যাহা যাতের উপর অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। এই অতিরিক্তের সহিত যাত বিদ্যমান থাকে এবং উহা ব্যতিরেকে যাত অনুপস্থিত থাকে। ইহা ছাড়া উহাতে রহিয়াছে মূল বস্তু (জাওহার) ও আপতন ('আরাদ), এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা অস্তিত্বের একটি সিফাত বৃদ্ধি করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন (D. Oleary, ফালসাফা-ই ইসলাম, পৃ. ১১৬-১১৭)।

আবু'ল-হুযায়ল আল-'আল্লাফ (মৃ. ২২৭ হি.)-কে বসরা মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মনে করা হয়। তথাকার অন্য প্রখ্যাত মু'তাযিলী হইলেন মু'আম্মার ইব্ন 'আব্বাস, ইব্রাহীম ইব্ন সায়্যার আন-নাজ্জাম (মৃ. ২৩১ হি.) ও আল-জাহিজ (মৃ. ২৫৫ হি.)। বাগদাদ মতবাদের প্রসিদ্ধ মু'তাযিলী 'আলিমদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন বিশ্র ইব্নু'ল-মু'তামির (মৃ. ২১০ হি.), আবূ মূসা আল-মুরদার, ছুমামা ইব্নু'ল-আশরাস, 'আবু'ল-হুসায়ন আল-খায়্যাত (কিতাবু'ল-ইনতিসার-এর প্রণেতা), আল-কা'বী (মৃ. ৩১৯ হি.) ও আহমাদ ইব্ন আবী দাউদ (দ্র. ২৪০ হি.)। উভয় মতবাদের মধ্যে পার্থক্য হইল, বসরার মু'তাযিলী মতবাদ তত্ত্বনির্ভর একটি মতবাদ, আর বাগদাদ মতবাদ অধিকতর বাস্তববাদী। শেষোক্তটি গ্রীক দর্শন দ্বারা অধিক প্রভাবিত। এই মতবাদ খাল্ক কুরআনের মাস'আলা অধিক প্রচার ও প্রসার ঘটায়।

**মু'তাযিলীদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী ঃ** ওয়াসিল ইব্ন 'আতা'র গ্রন্থসমূহের মধ্য হইতে কিতাবু আস্নাফি'ল-মুরজি'আ, কিতাবু'ত্-তাওবা, কিতাবু'ল-মানযিলাত বায়না'ল-মানযিলাতায়ন, কিতাবু মা'আনি'ল-কু'রআন, কিতাবু'ল-খুতাব ফি'ত্-তাওহীদ ওয়া'ল-'আদ্ল, কিতাবু'স্-সাবীল ইলা মা'রিফাতি'ল-হাক্ক-এর নামসমূহ পাওয়া যায়। আন-নাজ্জাম কিতাবু'ন-নুকাত ও কিতাবু'ল-জুয্' এবং আল-জাহিজ আল-ই'তিয়াল ওয়া ফাদলুহু 'আলা'ল- ফাদলা, আল-ইসতিতা'আ ওয়া খালকু'ল-আ'আল, খালকু'ল-কু'রআন এবং ফাদীলাতু'ল-মু'তাযিলা রচনা করেন। মু'তাযিলী লেখকদের গ্রন্থাবলী সাধারণত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতি সম্প্রতি যামানে ই'তিযাল সংক্রান্ত কিছু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যেমন কাদী 'আবদু'ল-জাব্বার-এর রচনাবলী আল-মুগ্নী ফী আব্ওয়াবি'ত-তাওহীদ ওয়া'ল-'আদ্ল, কিতাবু'ল-মাজমূ' ফি'ল-মুহীত বি'ত্-তাক্লীফ ; উম্মু'ল-মানদাকুম (?)-এর রচনা শারহু'ল-উসূলি'ল-খামসা।

**মু'তাযিলাদের অন্যান্য কিছু 'আকীদা ঃ** তাহারা সাধারণত মু'জিযা বিশ্বাস করিত না, ওয়ালীগণের কারামাত অস্বীকার করিত, তাহ্সীন ও তাকবীহ 'আকলী-এর মাসআলা (অর্থাৎ ভাল ও মন্দের ধারণা কেবল বিবেক-বুদ্ধি দ্বারাই সম্ভব) ; নবী (স)-এর হাদীছ গ্রন্থের ক্ষেত্রেও মু'তাযিলীরা 'আক্লকে বিচারক মানিত।

শী'আ মু'তাযিলাদের সম্পর্কে বর্ণনা শেষ করিবার পূর্বে আমরা শী'আ সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু লেখা প্রয়োজন মনে করি। যদিও শী'আ সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে একটি রাজনৈতিক দল, হযরত 'উছ্মান (রা) ও হযরত 'আলী (রা)-র যুগের রাজনৈতিক গোলযোগের দরুন তাহাদের প্রকাশ ঘটিয়াছিল এবং এই কারণে শী'আদেরকে 'ইল্মু'ল-কালামের আলোচনায় আনা হয় না। কিন্তু কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শী'আদের বিভিন্ন দল ইতিকাদ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিতর্কের সূচনা করে। আহ্লু'স-সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আতের সহিত তাহাদের সর্বাপেক্ষা বড় মতানৈক্য খিলাফাত বা ইমামাত সংক্রান্ত ব্যাপারে দেখা দেয়। তাহাদের বক্তব্য এই যে, খিলাফাতের প্রকৃত হকদার ছিলেন 'আলী (রা) এবং তাঁহার পর তাঁহার সন্তানগণ। এই কারণেই তাঁহারা 'আলী (রা)-র পূর্ববর্তী খলীফাগণ ও সাহাবীগণকে তিরস্কার করে। তাহাদের মতে ইমামগণও নবীদের ন্যায় নিষ্পাপ, কিন্তু আহ্লু'স-সুন্নাত কেবল নবীগণকে নিষ্পাপ বলিয়া থাকেন। তাহাদের মধ্য হইতে কেহ আবার ইমামগণ হইতে মু'জিযা প্রকাশ ও তাঁহাদেরকে যাবতীয় জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া মনে করিত।

**শী'আ** ই'তিকাদসমূহের মধ্যে 'তাকি য়্যা' হইল এক গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা, যাহাকে তাহাদের নিকট দীনের এক গুরুত্বপূর্ণ রুক্ন মনে করা হইত। ইহার অর্থঃ মানুষ তাহার মান-মর্যাদা ও জান-মাল শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশে যাহা কিছু অন্তরে আছে তাহার বিপরীত প্রকাশ করিবে। কু'রআনের ব্যাখ্যার ব্যাপারেও আহ্লু'স-সুন্নাতের সহিত শী'আদের মতপার্থক্য রহিয়াছে। কোন কোন আয়াতের তা'বীলের ক্ষেত্রে তাহাদের বিশেষ পদ্ধতি আছে।

কালামশাস্ত্রের অধিকাংশ বিষয়ে শী'আগণ মু'তাযিলীদের মত পোষণ করে। যেমন আল্লাহ্র সিফাত হইল তাঁহার সত্তাই, কু'রআন সৃষ্ট, কালাম-ই নাফ্স (অন্তর্নিহিত ভাব)-এর অস্বীকৃতি; দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্কে দেখিতে পাওয়ার অস্বীকৃতি; অনুরূপভাবে ভাল-মন্দের পরিচিতি লাভ জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব, অদৃষ্টবাদ ও ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্য আল্লাহ্ তা'আলার কার্যাবলী উদ্দেশ্য ও ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (মু'আল্লাল বি-আগ্রাদ ওয়া 'আদ্ল) বলিয়া গণ্য করিবার ব্যাপারেও শী'আ ও মু'তাযিলীদের মধ্যে মিল রহিয়াছে। আহ্মাদ আমীন (দুহা'ল-ইসলাম, ৩খ, ২৬৭) লিখিয়াছেন, আমি শী'আ ইমামিয়্যার এক কালামবিশারদ আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন নাওবাখ্ত-এর গ্রন্থ কিতাবু'ল-য়াকূত অধ্যয়নকালে অনুভব

করিয়াছি যে, আমি যেন মু'তাযিলীদের কালামশাস্ত্র সম্বন্ধে লিখিত কোন গ্রন্থ পড়িতেছি। প্রশ্ন হইল, উক্ত মাস'আলাসমূহ কে কাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে ? শী'আগণ মু'তাযিলীদের নিকট হইতে না মু'তাযিলীগণ শী'আদের নিকট হইতে? কোন কোন শী'আর দাবি হইল, মু'তাযিলীগণ তাহাদের নিকট হইতে এই সকল মতবাদ গ্রহণ করিয়াছে। আহ্‌মাদ আমীনের মতে সঠিক হইল, শী'আগণ মু'তাযিলীরে নিকট হইতে এই মতবাদ গ্রহণ করিয়াছে। শী'আ-ই যায়দিয়্যার প্রতিষ্ঠাতা যাযদ ইব্‌ন 'আলী (ইমাম জা'ফারের চাচা) ওয়াসি ল ইব্‌ন 'আতা'র শিষ্য ছিলেন এবং ইমাম জা'ফারের তাঁহার চাচার সহিত যে সম্পর্ক ছিল তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেক মু'তাযিলী শী'আদের তাশায়্যু' (তাহাদের মূল 'আকীদা) মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন (আশ্-শাহ্‌রাস্তানীর বক্তব্য ঃ যায়দ ইব্‌ন 'আলীর সকল সহচর মু'তাযিলী ছিলেন)। শী'ঈ সাহিত্যের ক্ষেত্রে বানূ বুওয়ায়হ-এর যুগের সাহিত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং বুওয়ায়হী যুগের গোটা সাহিত্যই শী'ঈ-মু'তাযিলী সাহিত্য (জুহ্‌রু'ল-ইসলাম, ৪খ, ১৪৫)।

প্রখ্যাত শী'আ কালামবিদদের মধ্যে হিশাম ইব্‌নু'ল-হাকাম, শায়তানু'ত-তাক, নাসীরু'দ-দীন তূসী এবং পরবর্তী কালের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হইলেন আল-হিল্লী, মুল্লা সাদরা ও মুল্লা বাকির দামাদ।

**খাওয়ারিজ ঃ** শী'আদের আলোচনা করিতে গেলে খারিজীদের আলোচনা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। খারিজীগণ এক চরম প্রকৃতির আরব বেদুঈন, যাহারা চিন্তা ও মতাদর্শের প্রতি নহে, বরং আইন-কানূন ও হুকুম-আহ্‌কামের প্রতি অধিক উৎসাহী ছিল। সিফ্‌ফীন যুদ্ধের পর ও 'আলী (রা)-র তাহ্‌কীম (সালিশ) মানিয়া লওয়ার ফলশ্রুতিতে এই দলের উদ্ভব হয়। এই দল স্বয়ং 'আলী (রা)-র অনুসারীদের মধ্য হইতে জন্ম নেয়। খারিজীদের সম্পর্ক অধিকতর রাজনীতির সহিত ছিল এবং তাহাদের চিন্তা ও আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদেরকে খুবই সাদাসিধা মনে হয়। ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে অনেক দলের সৃষ্টি হয়, যাহাদের সকলেরই সর্বসম্মত 'আকীদা এই ছিল যে, কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি কাফির। খারিজীদের মধ্য হইতে আযারিকার (নাফি' ইব্‌ন আয্‌রাকের অনুসারিগণ, নিহত ৫৫ হি.) আলোচনা সর্বাধিক হয়। এখানে তাহাদের কিছু 'আকীদার উল্লেখ করা যাইতেছেঃ কবীরা গুনাহ্‌তে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির এবং সে মিল্লাত-ই ইসলামিয়া বহির্ভূত, সে চিরদিন জাহান্নামে থাকিবে; যাহারা জামাল অথবা সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহারা সকলেই কাফির; সেই সকল খারিজীও কাফির যাহারা বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবিলা করিবার পরিবর্তে গৃহে অবস্থান করে; বিরোধীদের (তাহারা মুসলিম হইলেও) শিশু ও স্ত্রীদের হত্যা করা বৈধ; তাকিয়্যা জা'ইয নহে, না কথায়, না কাজে। নিজেদের আদর্শ রক্ষার জন্য যুদ্ধবিগ্রহ বৈধ এবং এই কারণেই তাহারা 'আলী (রা) ও বানূ উমায়্যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে।

**(৩) আশা'ইরা (আশ'আরিয়্যা) ঃ** 'আব্বাসী খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের যুগ হইতে আহ্‌লু'স-সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আত আবার একবার পুনর্জাগরণের সুযোগ লাভ করে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মু'তাযিলীদের অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিক্রিয়া ছিল এক স্বাভাবিক ব্যাপার। আল-মুতাওয়াক্কিল 'আলিম ও ফাকীহদেরকে তাঁহার নিকটবর্তী করেন এবং এক নূতন যুগের সূচনা হয়, যাহার দায়িত্ব আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-আশ'আরী (২৬০-৩৩০ হি.)-এর উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহার মতবাদ যাহা আশ'আরিয়্যা নামে আখ্যায়িত, ৪র্থ হিজরী শতাব্দী হইতে আজ পর্যন্ত 'ইল্‌মু'ল-কালামের সর্ববৃহৎ ও প্রসিদ্ধতম মতবাদ হিসাবে চলিয়া আসিতেছে। ইমাম আশ'আরীর কয়েকটি গ্রন্থ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে এবং তাঁহার মাকালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন আজও 'ইল্‌মু'ল-কালামের প্রাচীন ও প্রথম দিককার মতবাদসমূহের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উৎস বলিয়া মনে করা হয়। আবু'ল-হাসান আল-আশ'আরী প্রখ্যাত মু'তাযিলী 'আব্‌দু'ল-ওয়াহ্‌হাব আবূ 'আলী আল-জুব্বা'ঈর (মৃ. ৩০৩ হি.) শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ তাঁহার তত্ত্বাবধানে হইয়াছিল। তিনি 'ইল্‌মু'ল-কালাম ও ই'তিযাল মতবাদের শিক্ষা আল-জুব্বাঈ হইতে গ্রহণ করেন, কিন্তু হিজরী ২৯৫ সনে অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন বসরার জামি' মসজিদের মিম্বারে দণ্ডায়মান হইয়া ই'তিযাল হইতে পৃথক হওয়ার ঘোষণা করিয়া নিজের পূর্ববর্তী বক্তব্যসমূহ হইতে তওবা করেন এবং মু'তাযিলীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল আহ্‌লু'স-সুন্নাহ ওয়া'ল-জামা'আতের এক নব দিগন্ত, যাহা দ্রুত ইসলামী দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করে। এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা তাহার প্রতিপক্ষ মু'তাযিলীদের মতাদর্শকে তাহাদেরই দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে। যদিও সেই যুগে আহ্‌লু'স-সুন্নাতের দুইজন আরও প্রখ্যাত ফাকীহ—আত-তাহাবী ও আল-মাতুরীদীও 'আকীদা ও চিন্তার জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছিলেন (এই দুই মনীষীর আলোচনা পরে আসিতেছে), কিন্তু এই ক্ষেত্রে আবু'ল-হাসান আল-আশ'আরী মুখ্য ভূমিকা পালন করেন এবং তাঁহার প্রভাব অধিক ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। ইমাম আশ'আরীর জীবনে ই'তিযাল হইতে সুন্নীবাদের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং আদর্শের ক্ষেত্রে এই আকস্মিক বিপ্লব কিভাবে ও কোন্ কারণে সাধিত হয় সেই ব্যাপারে ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে কিছু বলা কঠিন। বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বাগদাদে যাতায়াত করিতেন এবং তথায় জামি'উ'ল-মানসূরের প্রসিদ্ধ শাফি'ই ফাকীহ আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল-মারওয়াযীর মজলিসে উপবেশন করিতেন। সম্ভবত এই শিক্ষাবৈঠকে তাঁহার অন্তরে ই'তিযাল-এর প্রতি ঘৃণা ও মুহাদ্দিছ ও ফাকীহদের তরীকার প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হয় এবং তিনি ধীরে ধীরে ই'তিযাল হইতে দূরে ও সুন্নীবাদের নিকটবর্তী হইতে থাকেন, অথচ তিনি ইতোপূর্বে কখনও ফিক্‌হ ও হাদীছের যথারীতি শিক্ষালাভ করেন নাই এবং মুহাদ্দিছদের পদ্ধতি অনুযায়ী দীনি 'আকা'ইদের অধ্যয়নও করেন নাই। ই'তিযাল পরিত্যাগ করিবার পর ইমাম আশ'আরী বসরা হইতে বাগদাদ চলিয়া যান এবং তথায় ৩৩০/৯৪২ সনে ইনতিকাল করেন। বাগদাদে থাকিয়া তিনি হাদীছ ও ফিক্‌হ বিষয়েও জ্ঞান লাভ করেন।

ইমাম আশ'আরী একজন উচ্চ পর্যায়ের লেখক ছিলেন (কোন কোন বর্ণনা মুতাবিক তাঁহার রচনাবলীর সংখ্যা হাযার পর্যন্ত পৌঁছে)। মাকালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন ছাড়া তাঁহার অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইল তাফসীরু'ল-কুরআনি'ল-কারীম, তিরিশ খণ্ডে; কিতাবু'ল-লুমা'; কিতাবু'ল-কিয়াস, কিতাবু'ল-ইজ্‌তিহাদ; আল-ইবানা 'আন উসূলি'দ-দিয়ানা, রিসালা ফী ইস্‌তিহ্‌সানি'ল-খাওদি ফী 'ইলমি'ল-কালাম এবং ইহা ছাড়া ভিন্ন দীন ও মাযহাবসমূহের প্রত্যাখ্যানে লিখিত অসংখ্য পুস্তিকা। যদিও ইমাম আশ'আরী নিজকে ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-এর পথের অনুসারী বলিয়া ঘোষণা করেন [কিতাবু'ল-ইবানার

মুকাদ্দামা দ্র., যাহাতে তিনি স্বীয় পদ্ধতির (মাস্লাক) ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন], কিন্তু তাঁহার চিন্তাধারা হাম্বালী মাযহাবে তেমন একটা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই, বরং হাম্বালী মাযহাবে তাঁহার বিরোধীর সংখ্যা প্রচুর। অবশ্য শাফি'ঈ মাযহাবে তাঁহারা চিন্তাধারা ব্যাপক মর্যাদা লাভ করে এবং হানাফী মাযহাবেও তাঁহার অনুসারী পাওয়া যায় (যেমন সায়্যিদ শারীফ আল্-জুরজানী, মৃ. ৮১৬ হি.)। শাফি'ঈ মাযহাবের প্রসিদ্ধ আশ'আরী 'উলামার নাম নিম্নে বর্ণিত হইল: আবূ সাহ্ল আস-সালূকী, আবূ বাক্র কাফ্ফাল, আবূ যায়দ আল-মারওয়াযী, হাফিজ আবূ বাক্র আল-জুরজানী, আবূ মুহাম্মাদ আত-তাবারী, আবূ 'আবদিল্লাহ আত-তা'ঈ, আবু'ল-হাসান আল-বাহিলী, আবূ বাক্র আল-বাকিল্লানী, আবূ ইসহাক আল-ইস্ফারা'ঈনী, আবূ বাক্র ইব্ন ফুরাক, ইমাম গাযালী (র)-র শিক্ষক ইমামু'ল হারামায়ন ও 'আল্লামা বায়দাবী। ইহা ছাড়া ইমাম বায়হাকী, আশ্-শাহরাস্তানী, আল-ঈজী, আদ-দাওওয়ানী, ইমাম ফাখ্রু'দ-দীন রাযী এবং পরবর্তী 'আলিমদের মধ্যে আস্-সানূসী, আত-তিলিমসানী, আল-বাজূরী সকলেই প্রসিদ্ধ আশ'আরী ছিলেন। প্রথমদিকে যদিও ইমাম গাযালী (র) আশ'আরী মতবাদের সমর্থন করেন, কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি বিশেষ কোন মতবাদের অনুসরণ করেন নাই, বরং আশা'ইরা পদ্ধতি হইতে পৃথক বিশ্বাস ও চিন্তার ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তথাপি তাঁহার ও আশা'ইরা মতবাদের মধ্যে তেমন একটি পার্থক্য পাওয়া যায় না। বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত মাদ্রাসা নিজামিয়াতে 'ইলমু'ল-কালামের শিক্ষা আশা'ইরারই পদ্ধতিতে প্রদান করা হইত। চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর শুরুতে যখন মু'তাযিলীদের প্রতাপ কমিয়া যায়, ইমাম আশ'আরী সম্মুখে অগ্রসর হন এবং সেই যুগে তাঁহাকে আহ্লু'স-সুন্নাতের 'আকাইদের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ও শক্তিধর ইমাম মনে করা হয়। তিনি মু'তাযিলীদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্রতার সহিত কলম ধরেন এবং খাঁটি সুন্নী দৃষ্টিকোণ হইতে দীনী 'আকাইদের সমর্থন ও প্রচারের সূচনা করেন। এই কারণেই 'ইল্মু'ল-কালামের ইতিহাসেও তাঁহার বিরাট মর্যাদা ও স্থান রহিয়াছে। তাঁহার অনুসারীদের সংখ্যা ছিল অগণিত। রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী ও গুণগ্রাহীর অভাব ছিল না এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুসারিগণ ইসলামী বিশ্বের দূর-দূরান্তে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার এই বিরাট খিদমতের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁহাকে "ইমামু আহ্লি'স-সুন্নাহ ওয়া'ল- জামা'আত" বলা হয়।

আবূ বাক্র আল-বাকিল্লানী (মৃ. ৪০৩ হি.) এই মতবাদের একজন প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকারী বলিয়া স্বীকৃত। তিনি কেবল ইমাম আশ'আরীর মতামতের প্রবল সমর্থনই করেন নাই, বরং এতদূর বলিয়াছেন যে, আল-আশ'আরী তাঁহার নির্ধারিত চিন্তাধারা পর্যন্ত পৌঁছার ক্ষেত্রে যেই সকল ভূমিকার আশ্রয় লইয়াছেন, 'আলিমদের জন্য সেই পর্যন্ত পৌছা ব্যতিরেকে নিস্তার নাই এবং উহার জ্ঞান অর্জন ছাড়া কেবল আশ'আরীর সিদ্ধান্তের দ্বারা দলীল গ্রহণ করা ঠিক হইবে না। যাহা হউক, ইসলামী 'আকাইদ ও চিন্তার ক্ষেত্রে আল-আশ'আরী যে খ্যাতি লাভ করেন উহা অন্যের ভাগ্যে খুব কমই জুটিয়াছে। যদিও তাঁহার বিরোধীদের (যেমন ইব্ন হায্ম যিনি বান্দার কার্যাবলী ও কাবীরা গুনাহকারীর ক্ষেত্রে আল-আশ্'আরীকে জাবারিয়্যা ও মুরজিআর অনুসারী বলিয়াছেন) সন্ধান ইতিহাসে পাওয়া যায় এবং কেহ কেহ তাঁহার কয়েকটি সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদও করিয়াছেন, তথাপি আশ'আরী মতবাদে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ও স্বনামধন্য 'উলামার সৃষ্টি হয়, যাঁহারা 'আক্লী ও নাক্লী জ্ঞানে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং যাঁহাদের আলোচনায় ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ পরিপূর্ণ। সাল্লাহু'দ-দীন আয়্যূবীও এই পদ্ধতির প্রচারে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁহার সন্তান ও তাঁহার তুর্কী ভৃত্যদের যুগে আশ'আরীদের বিপুল উন্নতি সাধিত হয়। আল-মাগরিবে ইব্ন তুমার্তও এই পদ্ধতি ইমাম গাযালী (র) হইতে গ্রহণ করেন।

'ইল্মু'ল-কালামের ইতিহাসে আমরা একদিকে মু'তাযিলী দল এবং অন্যদিকে হাশ্বিয়া, মুজাস্সিমা ও মুশাব্বিহা দলের উল্লেখ পাই। মু'তাযিলীগণ আল্লাহ্র সিফাত অস্বীকার করিত এবং হাশবিয়া ও মুজাস্সিমা আল্লাহ্র সিফাতকে সৃষ্টির সিফাতের অনুরূপ গণ্য করিত। ইমাম আশ'আরীর পদ্ধতি উল্লিখিত চরম পন্থাদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। তাঁহারা আল্লাহ্র সিফাতের 'আকীদা গ্রহণপূর্বক বলিয়াছেন যে, উক্ত সিফাত হাওয়াদিছ (ক্ষণস্থায়ী) সদৃশ নহে, বরং আল্লাহ্র যাতের উপযোগী, যেমন তাঁহার মর্যাদা দাবি করে। ইমাম আশ'আরী মুহাদ্দিছ, ফাকীহ ও মু'তাযিলীদের মতবিরোধগত বিষয়সমূহে মুহাদ্দীছদের মত পোষণ করেন এবং বিদ'আতপন্থীদের হইতে দূরে থাকেন। এই ক্ষেত্রে আমরা বলিতে পারি যে, আশ'আরীগণ সিফাত সংক্রান্ত মাসআলায় প্রত্যাখ্যান ও সমর্থনের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া এক মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং কম ও বেশী হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা 'আকীদাসমূহের ক্ষেত্রে 'আক্ল (বুদ্ধি-বিবেক) ও নাক্ল (কিতাব-সুন্নাহ) উভয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি 'আক্লকে চিন্তা ও দর্শনের জগতে শাসক ও বিচারকের স্থান প্রদান করেন নাই, বরং উহাকে শার'ঈ নস্সমূহের জন্য খাদিমরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। আশ'আরী 'ইল্মু'ল-কালাম-এর নির্ভরযোগ্য অংশ গ্রীক দর্শন প্রত্যাখ্যানের উপরও রহিয়াছে, মুতাযিলাদের নিকট যাহার সমাদর ছিল। শিবলী নু'মানী বলেন, "ইমাম আশ'আরীর নিজস্ব বিশেষ 'আকীদাসমূহ অথবা যাহাকে তিনি ই'তিযাল ও সুন্নাতের মধ্যে সীমা নির্ধারণকারী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, তাহা এক বিশেষ দিক দিয়া পর্যালোচনার দাবি রাখে এই কারণে যে, উহা দ্বারা 'ইল্মু'ল-কালামের এক নূতন ইতিহাসের সূচনা হয়। ইমাম আশ'আরীর পূর্বে দুইটি দল ছিল ঃ আরবাব-ই 'নাক্ল ও আরবাব-ই 'আক্ল, ইমাম আশ'আরী মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিবার প্রয়াস পান এবং এই কারণে এমন 'আকীদাসমূহ গ্রহণ করেন যাহা তাঁহার জ্ঞান 'আক্ল ও নাক্ল উভয়ের সহিত সম্পর্কিত ('ইল্মু'ল-কালাম, পৃ. ৫৭)।

শিবলী নু'মানী বলেন যে, আশ'আরীদের 'ইল্মু'ল-কালামে তিন প্রকারের মাস'আলা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে ঃ (১) খাঁটি ফালসাফা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ ; (২) ফালসাফার সেই সকল বিষয় যাহাকে মুতাকাল্লিমূন বিরোধী মতবাদ বলিয়া গণ্য করেন এবং (৩) খাঁটি ইসলামী মাস'আলাসমূহ। আল-ইবানা ও অন্যান্য উৎস (যেমন আশ্-শাহ্রাস্তানী, আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, পৃ. ৬৫ প.) হইতে ইমাম আশ'আরীর নিম্নবর্ণিত ই'তিকাদসমূহ বিস্তারিত জানা যাইতে পারে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা 'আলিম বি-'ইল্ম, হায়্যি বি-হায়াত, মুরীদ বি-ইরাদা, মুতাকাল্লিম বি-কালাম, সামী' বি-সাম্', বাসীর বি-বাস্র অর্থাৎ জ্ঞান, অস্তিত্ব, ইচ্ছা, বাকশক্তি, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি আল্লাহ্র সত্তাগত গুণাবলী; তাঁহার এই সিফাত অবিনশ্বর। আল্লাহ্র 'ইল্ম যাবতীয় জ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট; সকল বস্তু সম্পর্কে যথার্থভাবে বলা যায় যে, উহা দৃশ্যযোগ্য আর সেহেতু আল্লাহ্ বিদ্যমান, অতএব ইহাকে আখিরাতে স্বাভাবিকভাবে দেখা যাইবে।

ঈমান হইল অন্তরের বিশ্বাসের (তাস্‌দীক বি'ল্‌-কাল্‌ব) নাম, অবশ্য মুখের স্বীকারোক্তি ও 'আমাল বি'ল-আরকান হইল ঈমানের শাখাসমূহ ; কবীরা গুনাহকারী সর্বদা জাহান্নামে অবস্থান করিবে না; সকল বান্দাকে জান্নাত অথবা জাহান্নামে প্রবেশ করান আল্লাহ্‌র জন্য জুলুম নহে ; সকল অদৃশ্য বস্তু, যেমন জান্নাত, জাহান্নাম, সিরাত ইত্যাদি সত্য (হাক্ক) ; ভাল ও মন্দ সব কিছু আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সহিত সংশ্লিষ্ট ; কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম ও গায়র মাখ্‌লূক (অসৃষ্ট) ; সকল ওয়াজিবাত, মা'আরিফ (পুণ্যকর্ম) ও আখলাক সাম'ইয়্যাত [কুরআন-হাদীছে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) হইতে শ্রুত বিষয়াদি]-এর অন্তর্ভুক্ত, 'আক্‌ল উক্ত বিষয়গুলিকে ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য) বলিয়া গণ্য করিতে পারে না ; ইমামাত (খিলাফাত) ইখ্‌তিয়ার ও নির্বাচনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হইয়া থাকে।

আশ'আরী 'আকীদা ও দর্শনসমূহের আরও বিস্তারিত বর্ণনা চক্ষু দ্বারা আল্লাহ্‌র দর্শন, নবীর শাফা'আত, কবর 'আযাব হইল ইজমা' (দ্র.) ও রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন বস্তু অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না। আমরা কুরআন ও সুন্নাতের অনুসরণ করিয়া থাকি এবং ঐ সকল বক্তব্য ও বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করি যাহা সাহাবা-ই কিরাম, তাবি'ঊন ও আ'ইম্মা-ই হাদীছ হইতে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র চেহারা, চক্ষু ও হাত আছে, তবে উহার অবস্থা জানা নাই। আমরা আল্লাহ্‌র সিফাতকে অস্বীকার করি না। তাঁহার বাণী গায়র মাখলূক (অসৃষ্ট)। আমরা আল্লাহ্‌র তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করি—উহা ভাল হউক কিংবা মন্দ। আল্লাহ তা'আলাকে কিয়ামতের দিন পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দেখা যাইবে। আমরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে কিবলাপন্থী (মুসলিম)-কে কাফির বলি না, কিন্তু যে ব্যক্তি হারামকে হালাল মনে করে সে কাফির। খুলাফা-ই রাশিদীন ছিলেন দীনের পথিকৃৎ এবং তাঁহাদের খিলাফাত ছিল নবূওয়াতের প্রতিনিধিত্ব। 'আশারা-ই মুবাশ্‌শারা হইলেন জান্নাতী, আমরা সকল সাহাবীকে ভালবাসি এবং শ্রদ্ধা করি। আমরা ফিতনা ও বিশৃংখলার যুগে হত্যাযজ্ঞ পরিহারকে শ্রেয় মনে করি। দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ, কবর 'আযাব, মুনকার-নাকীর, নবী (স)-এর মি'রাজ ও ওয়ালীগণের কারামাতের উপর আমাদের ঈমান আছে।

আল্লাহ্‌র কুদরাত ও বান্দাদের কার্যাবলী সম্পর্কে আশ'আরীদের বক্তব্য হইল, বান্দা কোন কার্য সম্পাদনের শক্তি রাখে না। তবে 'কাস্‌ব'-এর ক্ষমতা তাহাকে প্রদান করা হইয়াছে, এই 'কাস্‌ব' আল্লাহ তাহার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। আশ'আরীদের কাস্‌ব ও ইক্‌তিসাব দর্শনকে আমরা এইভাবে বর্ণনা করিতে পারি যে, আল্লাহ্‌ মানুষকে শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাহাকে পসন্দ ও নির্বাচনের ক্ষমতাও দান করিয়া থাকেন। অতঃপর উক্ত শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে সে কার্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। এইভাবে কার্য মাখলূক-এর জন্য ইকতিসাবী হয় (ফালসাফা-ই ইসলাম, পৃ. ১৮২)। আশ'আরীদের বক্তব্য এই যে, মানুষের কার্যাবলীর মধ্যে তাহার ক্ষমতার কোন প্রভাব নাই; কার্যাবলীর সৃষ্টিকর্তা হইলেন আল্লাহ্‌ এবং মানুষ উহার মুকতাসিব (অর্জনকারী)।

মু'তাযিলীগণ আল্লাহ্‌র দর্শন (দীদার)-কে অস্বীকার করিয়াছে এবং কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়াছে। অপরদিকে মুশাব্বিহাদের বক্তব্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আল্লাকে নির্দিষ্ট ও বিশেষ অবস্থায় দেখা যাইতে পারে। আল-আশ'আরী আখিরাতে আল্লাহ্‌র দীদারের 'আকীদা সমর্থন করেন, তবে ইহা অস্বীকার করেন যে, তাঁহাকে নির্দিষ্ট ও বিশেষ অবস্থায় দেখা যাইবে, মু'তাযিলীদের 'আকীদাসমূহ (সিফাত-ই বারী, 'আদ্‌ল, ওয়া'দ ওয়া ওয়া'ঈদ, রুয়াতুল্লাহ ফি'ল-আখিরা, খাল্‌কুল-আফ'আল) এবং উহাদের সম্পর্কে আশ'আরীদের মতপার্থক্য ও প্রত্যেকের দলীলসমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. আহমাদ আমীন, জুহরু'ল-ইসলাম, ৪খ, ৭৪-৮৩।

ইমাম আশ'আরীর পর (আল-বাকিল্লানী ব্যতীত) তাঁহার মতবাদের বিস্তার ও তাঁহার দর্শনের প্রচারের ক্ষেত্রে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে অর্থাৎ আবূ হামিদ আল-গাযালী ও ফাখ্‌রু'দ-দীন আর্‌-রাযী। আহ্‌লু'স-সুন্নাতের নিকট এই দুই ব্যক্তি খুবই মর্যাদার অধিকারী এবং তাঁহাদের রচনাবলীও সকল যুগে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ইমাম গাযালী (র) আশ'আরী পদ্ধতি অনুযায়ী কয়েকটি গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। অতএব আশ'আরী মতবাদের প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর-রাযীও একজন প্রখ্যাত মুতাকাল্লিম ছিলেন। তিনি মু'তাযিলীদের সহিত কয়েকটি প্রবল বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং স্বীয় প্রসিদ্ধ তাফসীর কুরআন ব্যতীত কালামশাস্ত্রে উচ্চ স্তরের রচনাবলী রাখিয়া গিয়াছেন। তিনিও আল-গাযালীর ন্যায় আশা'ইরা মতবাদের বিস্তারের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেন, উহার বিরুদ্ধ মতের জোর প্রতিবাদ করেন এবং নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন।

(৪) মাতুরীদিয়া ঃ ই'তিকাদসমূহের জগতে আহ্‌লু'স-সুন্নাতের অন্য এক বৃহৎ চিন্তাগোষ্ঠী হইল মাতুরীদিয়্যাগণ, যাহা ইমাম আবূ মানসূর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ আল-মাতুরীদী আস-সামারকান্দী (মৃ. ৩৩৩ হি.)-এর সহিত সম্পর্কিত করা হয় (দ্র. আল-মাতুরীদী)। ইমাম আবূ মানসূর আল-মাতুরীদী একজন প্রখ্যাত হানাফী ফাকীহ, আহ্‌লু'স-সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আতের একজন প্রসিদ্ধ মুতাকাল্লিম এবং মু'তাযিলীদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইমাম মাতুরীদীর জীবন বৃত্তান্ত তেমন একটা জানা যায় না, তবে তাঁহার মতবাদের স্পষ্ট ধারণা তাঁহার নিজের প্রণীত গ্রন্থাবলী ও তাঁহার পরবর্তী কালের ভাষ্যকার ও লেখকদের পুস্তকসমূহ হইতে পাওয়া যায়। তাঁহার অনুসারীদের অধিকাংশ হইলেন হানাফী মতাবলম্বী। অপরপক্ষে ইমাম আশ'আরীর অনুসারীদের অধিকাংশ ছিলেন শাফি'ঈ মতাবলম্বী। সম্ভবত এই কারণে আহমাদ আমীন (জুহ্‌রু'ল-ইসলাম, ৪খ.)-এর মত হইল, আল-আশ'আরী ও আল-মাতুরীদীর মধ্যে যে সামান্য মতপার্থক্য দেখা যায়—উহা প্রকৃতপক্ষে ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আবূ হানীফা (র)-র নীতির ফল। যাহা হউক, আশ'আরীর মতবাদ হইল আহ্‌লু'স-সুন্নাতের 'ইল্‌মু'ল-কালামের ব্যাপকতর মতবাদ, উহার তুলনায় মাতুরীদীয়ার প্রসিদ্ধি কম হইয়াছে। ইহার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, হানাফী 'উলামা' 'ইল্‌ম কালাম বিষয়ে খুব কম গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে যে সকল প্রসিদ্ধ ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থসমূহ আছে তাহা শাফি'ঈদের প্রণীত যাঁহারা অধিকাংশ ছিলেন আশ'আরীপন্থী (শিবলী নু'মানী, 'ইল্‌মু'ল-কালাম, পৃ. ৭৫)। মাতুরীদী মতবাদের যথেষ্ট প্রচার ও প্রসার না হওয়ার ফলে পরবর্তী কালে ও বর্তমানে অধিকাংশ হানাফী 'আলিম আশ'আরীদের 'আকীদা পোষণ করেন, অথচ তৎকালে কোন হানাফীর আশ'আরী মতাবলম্বী হওয়াকে খুবই বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখা হইত (পৃ. গ্র.)। এতদসত্ত্বেও বলা যায় যে, আহ্‌লু'ল-'ইল্‌ম-এর উপর আল-মাতুরীদীর প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। আল-'আকা'ইদু'ন-নাসাফিয়া, যাহাকে আল-মাতুরীদীর কিতাবু'ত-তাওহীদের নির্যাস মনে

করা দরকার, আজও দীনী প্রতিষ্ঠান ও মাদ্‌রাসাসমূহে ইসলামী 'আকা'ইদের প্রসিদ্ধতম উৎসসমূহের মধ্যে গণ্য হয়। বর্তমান যুগে মাতুরীদী দর্শনের ছাপ মিসরীর শায়খ 'আবদুহ্-র রিসালাতু'ত-তাওহীদ ও শারহু'ল-'আকা'ইদ আল-'আদূদিয়া-তে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

ইমাম মাতুরীদী ফিক্‌হ, 'উসূলু'ল-ফিক্‌হ ও 'উসূলু'দ-দীনের সর্বস্বীকৃত 'আলিম ছিলেন। তিনি তাঁহার যুগের বড় বড় 'আলিমের নিকট হইতে 'ইল্ম হাসিল করেন। তন্মধ্যে আবূ নাস্‌র আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আব্বাস আল-'ইয়াদী, আবূ বাক্‌র আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইস্‌হাক আল-জূয্‌জানী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুকাতিল আর-রাযী ও নাস্‌র ইব্‌ন য়াহ্‌য়া আল-বালখী হইলেন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। ইমাম মুহাম্মাদের বরাতে উল্লিখিত মনীষীদের নিকট হইতে ইমাম মাতুরীদী (র) ইমাম আবূ হানীফার গ্রন্থসমূহের রিওয়ায়াত করিয়াছেন। আল-মাতুরীদী বহু সংখ্যক গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন এবং তিনি বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য মূল্যবান গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, যাহাদের মধ্যে ইমাম আ'জামের গ্রন্থ আল-ফিক্‌হু'ল-আকবার-এর ভাষ্যও রহিয়াছে। তাঁহার অন্যান্য রচনা হইল: কিতাব তা'বীলাতি'ল-কুরআন ; কিতাবু'ল-মাকালাত ফি'ল-কালাম (আরা' আস্‌হাবি'ল-মায়াহিব ওয়া'ল-ফিরাক)। কিতাবু ওয়াহমি'ল-মু'তাযিলা ; কিতাবু মা'আখিযি'শ-শারা'ই'; কিতাবু'ল-জাদাল ; কিতাবু'ল-উসূল ফী উসূলি'দ-দীন; কিতাবু'ত-তাওহীদ ; কিতাবু রাদ্দি আওয়া'ইলি'ল-আদিল্লা লি'ল-কা'বী; কিতাবু রাদ্দি ওয়া'ঈদি'ল-ফুস্‌সাক লি'ল খাম্‌সা লি-আবী মুহাম্মাদ আল-বাহিলী; কিতাবু রাদ্দি কিতাবি'ল-ইমামা লি-বা'দি'র-রাওয়াফিদ; আর-রাদ্দু 'আলা'ল-কারামিতা।

ইমাম মাতুরীদীর মতবাদ বেশীর ভাগ মা ওয়ারা'উ'ন্-নাহ্‌র-এর এলাকাসমূহে, হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের দেশসমূহে ও তুর্কিস্তানী এলাকায় বিস্তার লাভ করে। তাঁহার চিন্তা, মতবাদ ও ই'তিকাদ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে ফাখ্‌রু'ল-ইসলাম আল-বাযদাবী, আত-তাফ্‌তাযানী, আন-নাসাফী ও ইব্‌নু'ল-হুমাম-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ হানাফী 'আলিমদের যথেষ্ট অবদান আছে।

আল-আশ'আরী ও আল-মাতুরীদী উভয়ই সুন্নী ছিলেন এবং সম্মিলিত প্রতিদ্বন্দ্বী (ই'তিযাল)-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামী করিয়াছিলেন। অতএব ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, কিছু কিছু ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধও পাওয়া যায়, তবে অধিকাংশ মৌলিক বিষয়সমূহে তাঁহারা ঐকমত্য কিংবা কাছাকাছি মত পোষণ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল তাহার সংখ্যা প্রায় চল্লিশ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। তন্মধ্যে আমরা কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করিব। এখানে এই বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, আল-মাতুরীদীর চিন্তা ও মতবাদ পর্যালোচনাকালে ইহা গভীরভাবে অনুসৃত হয় যে, তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-র চিন্তাধারা ও মতবাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং উহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কেননা উভয়ের চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য সম্পর্ক পাওয়া যায় (ইমাম আ'জামের প্রতি আরোপিত অনেক পুস্তিকা ও গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, তন্মধ্যে আল-ফিক্‌হু'ল-আকবার, আল-ফিক্‌হু'ল-আবসাত, মাকতূব আবী হানীফা ইলা আবী 'উছমান বাত্তী, ওয়াসিয়্যাতু আবী হানীফা ইলায়ূসুফ ইব্‌ন খালিদ ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ খুবই প্রসিদ্ধ। অনুমিত হয় যে, আল-মাতুরীদী ইমাম আ'জামের এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন)। ইমাম মাতুরীদী 'নাক্‌ল' (কুরআন ও হাদীছ)-এর সংগে সংগে "আক্‌ল" (যুক্তি)-এর উপরও নির্ভর করিতেন এই শর্তে যে, উহা শারী'আতের অনুকূলে হইবে এবং তাঁহার নিকট কেবল সেই সকল 'আক্‌লী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বৈধ যাহা শারী'আত বিরোধী হইবে না। কুরআনের তাফ্‌সীর করিবার ক্ষেত্রেও তিনি এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন যে, মুতাশাবিহাত (রূপক)-কে মুহ্‌কামাত (স্পষ্টবাদিতা)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে এবং মুতাশাবিহাতের তা'বীল ও বিশ্লেষণ মুহ্‌কামাতে আলোকে করিতে হইবে। যাহা হউক, এই কথা বলিতে হয় যে, আল-আশ'আরী ও আল-মাতুরীদী উভয়ের 'আকা'ইদ সংক্রান্ত ব্যাপারে মৌলিক উৎস (কুরআন ও সুন্নাত)-এর সীমা অতিক্রম করিবার অভিপ্রায় ছিল না। উভয়ই ইসলামের মৌলিক নীতি ও 'আকা'ইদকে যুক্তি ও দলীল-এর আলোকে প্রমাণ করিতে চাহিতেন এবং 'আক্‌ল-কে নাক্‌ল-এর অনুগত বলিয়া মনে করিতেন।

শিবলী নু'মানী 'ইল্মু'ল-কালামে নিম্নবর্ণিত নয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন যেইগুলিতে আল-মাতুরীদী ও আল-আশ'আরীর দৃষ্টিভঙ্গী পরস্পর বিরোধী : (১) বস্তুসমূহের হুস্‌ন (ভাল) কুব্‌হ (মন্দ) হইল জ্ঞানগত ('আক্‌লী); (২) আল্লাহ্ কাহাকেও শক্তির বাহিরে কষ্ট দেন না; (৩) আল্লাহ্ অত্যাচার (জুল্‌ম) করেন না এবং তাঁহার অত্যাচারী হওয়া জ্ঞানত অসম্ভব ; (৪) আল্লাহ্‌র সকল কাজ কল্যাণের উপর ভিত্তিশীল; (৫) মানুষের স্বীয় কার্যাবলীর উপর ক্ষমতা ও এখতিয়ার রহিয়াছে এবং এই ক্ষমতা উক্ত কার্যাবলীর অস্তিত্বের উপর প্রভাব রাখে ; (৬) ঈমান হ্রাস পায় না এবং বৃদ্ধিও হয় না ; (৭) জীবন সম্পর্কে হতাশ হওয়া অবস্থায়ও তওবা কবূল হয় ; (৮) পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন বস্তু অনুভব করা 'ইল্ম নহে, বরং 'ইল্ম-এর মাধ্যম; (৯) আরাদ (আপতন-যাহার অস্তিত্ব নাই)-এর প্রত্যাবর্তন ঘটে না (আশা'ইরা উল্লিখিত 'আকীদা-সমূহের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করে)। এইখানে আমরা কোন কোন মতবাদের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করিব।

**(১) জ্ঞানের ('আক্‌ল) মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ :** এই বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে ঈমানের মূল বিষয়াদির সহিত সম্পর্কিত। মু'তাযিলাদের মতে জ্ঞানের সাহায্যে আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ অপরিহার্য। আশ'আরীদের মতে নবী প্রেরণের পূর্বে ঈমান ওয়াজিব নহে (অর্থাৎ তাঁহার পরিচয় লাভ করা শারী'আতের মাধ্যমে ওয়াজিব, জ্ঞানের মাধ্যমে নহে)। মাতুরীদীদের মতে 'আক্‌ল আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের পরিচয় লাভ করিতে পারে, কিন্তু উহা দ্বারা স্থায়ীভাবে শারী'আতের আহ্‌কামের পরিচয় লাভ সম্ভব নহে।

**(২) বস্তুসমূহের ভাল ও মন্দ :** আশ'আরীদের মতে বস্তুসমূহের মধ্যে মূলত কোন ভাল কিংবা মন্দ নিহিত নাই, বরং উক্ত ভাল ও মন্দ শারী'আতের উপর নির্ভরশীল। কোন কাজ বা কোন বস্তু এইজন্য উৎকৃষ্ট যে, শারী'আত উহার নির্দেশ দিয়াছে এবং নিকৃষ্ট এইজন্য যে, শারী'আত উহা করিতে নিষেধ করিয়াছে। মাতুরীদীর মতে বস্তুসমূহ মূলত হয় উৎকৃষ্ট—না হয় নিকৃষ্ট এবং উহার উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হওয়ার বিষয় জ্ঞানের সাহায্যে অনুভব করা যাইতে পারে। মু'তাযিলীগণও জ্ঞানগত ভাল ও মন্দের কথা বলেন, তবে তাহাদের ও আল-মাতুরীদীর চিন্তা ও মতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মু'তাযিলীদের মতে যে জিনিস জ্ঞাগতভাবে উৎকৃষ্ট তাহা ওয়াজিব এবং যে জিনিস নিকৃষ্ট উহা হারাম। মাতুরীদীগণ যদিও ইহা স্বীকার করেন যে, বস্তুসমূহের উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হওয়ার অনুভব জ্ঞান দ্বারা সম্ভব, তবে তাহাদের মতে মানুষ কেবল এই কারণে

মুকাল্লাফ ও আদিষ্ট হয় না, বরং মুকাল্লাফ ও আদিষ্ট হওয়ার (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কাজ সম্পাদন ও নিকৃষ্ট কাজ পরিহার) জন্য শারী'আতের নির্দেশ অপরিহার্য এবং আদেশ-নিষেধ (আম্র ওয়া নাহী) উহারই উপর নির্ভরশীল।

**(৩) আল্লাহ্র সকল কাজ কল্যাণের উপর ভিত্তিশীল ঃ** বিষয়টি এইভাবেও পেশ করা যায় যে, আল্লাহ্র কার্যাবলী কি মু'আল্লাল (হেতুর সঙ্গে সম্পর্কিত)? মু'তাযিলাদের মতে আল্লাহ্র সকল কাজ মু'আল্লাল। কল্যাণ উহার ভিত্তিমূল এবং উহার কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। অতএব তাঁহাদের মতে আল্লাহ কোন অকল্যাণকর কাজের নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন না, বরং কল্যাণকর কাজের আদেশ করা তাঁহার জন্য ওয়াজিব। আশ'আরীদের মতে আল্লাহ্র কার্যাবলী গায়র মু'আল্লাল (হেতুনির্ভর নহে)। তিনি তাঁহার বান্দাদের সহিত যাহা খুশী করিতে পারেন। এই কারণে বান্দার কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা তাঁহার উপর অপরিহার্য নহে। কেননা তাঁহাকে কাহারও সম্মুখে জওয়াবদিহি করিতে হইবে না। মাতুরীদীদের বক্তব্য হইল, আল্লাহ্র সকল কাজ হিকমাত ও কল্যাণের উপর ভিত্তি করিয়াই সংঘটিত হয়। কেননা তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ; তবে তিনি হিকমাত ও কল্যাণের ইচ্ছা ও কামনা করিতে বাধ্য নহেন। অতএব ইহা বলা ভুল যে, কল্যাণ সাধন করা তাঁহার জন্য অপরিহার্য। কেননা ইহাতে তাঁহার সীমাহীন ইচ্ছা ও পূর্ণ স্বাধীনতা রহিত হয়। তাঁহার জন্য কোন কাজ অপরিহার্য করা বৈধ নহে।

**(৪) বান্দাকে তাহার ক্ষমতার বাহিরে কষ্ট দেওয়া প্রসঙ্গে ঃ** আশ'আরীদের মতে আল্লাহ্র জন্য ইহা বৈধ যে, তিনি বান্দাদের জন্য এমন সকল কাজ নির্ধারণ করিয়া দিবেন যাহা সম্পাদন তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে। মাতুরীদীদের মতে আল্লাহ ক্ষমতার বাহিরে কোন কাজ করিতে কাহাকেও বাধ্য করেন না। প্রকৃতপক্ষে এই মাস'আলাটি আল্লাহ্র কার্যাবলী মু'আল্লাল অথবা গায়র মু'আল্লাল হওয়ার মাস'আল হইতে উদ্ভূত। আশ'আরীদের মতে ইহা যুক্তিগ্রাহ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার অনুগত বান্দাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন এবং পাপীকে পুরস্কৃত করিতে পারেন। কেননা ভাল কাজের প্রতিদান কেবল আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ এবং পাপের শাস্তি প্রদান আল্লাহ্র ইচ্ছায় হয়। আশ'আরীদের মতে আল্লাহ্ তাঁহার ওয়াদার খেলাফও করিতে পারেন, কিন্তু মাতুরীদীদের মতে আল্লাহ তাঁহার হিকমাত পরিবর্তন করেন না এবং তাঁহার ওয়াদায় কোনরূপ পরিবর্তন সম্ভব নহে।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

অর্থাৎ নিসন্দেহে আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না (৩ ঃ ৯)

**(৫) আল্লাহ তা'আলার সিফাত ঃ** মু'তাযিলা স্পষ্টভাবে আল্লাহ্র সিফাত অস্বীকার করিতেন। তাঁহাদের মতে আল্লাহ্র যাত (সত্তা) ও তাঁহার সিফাত (গুণাবলী) এক জিনিস। যেমন আল্লাহ স্বয়ং 'আলিম ও স্বয়ং কাদির, এমন কোন 'ইল্ম বা কুদরাতের ভিত্তিতে নহে যাহা তাঁহার যাতের অতিরিক্ত, কুরআন মাজীদে যে সকল সিফাত (যেমন কুদরাত, 'ইল্ম, সাম', বাসার)-এর উল্লেখ আছে মু'তাযিলীদের মতে উহার সমস্তই আল্লাহ্র যাতের নাম, তাঁহার সিফাত নহে। আশ'আরীগণ সিফাত প্রমাণের যুক্তি পেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, কুরআন মাজীদে উল্লিখিত সিফাতসমূহ অবিনশ্বর এবং আল্লাহ্র যাতের সহিত সম্পৃক্ত (দ্র. মাওলাবী মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-আহাদ, শারহ 'আকা'ইদি'ন-নাসাফী, টীকাসহ, লখনৌ ১২৯৪ হি.)। মাতুরীদীগণ সিফাত প্রমাণিত করিয়াছেন এবং এই মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তাঁহার সকল গুণাবলী (সিফাত) দ্বারা গুণান্বিত, যাহা অবিনশ্বর, উক্ত সিফাত যাতী হউক কিংবা ফি'লী, তাঁহার এই সিফাত হইল লা 'আয়ন ও লা গায়র (লা হুওয়া ওয়া লা গায়রুহু = তিনি নিজে নহেন এবং তাঁহার ব্যতিরেকেও নহে)। তাঁহাদের নিকট আল্লাহ্র সকল সিফাত (সিফাতু'ল-আফ'আলসহ, যেমন তাখলীক, তারযীক, ইহ্য়া', 'আমানাত তাকবীন) হইল স্থায়ী এবং লা হুওয়া ওয়ালা গায়রুহু। সিফাতু'য-যাত, মেযন 'ইল্ম, সাম', বাসার ও কালাম সম্পর্কে তাঁহাদের মতবাদ একই। কুরআন মাজীদ সম্পর্কে তাঁহাদের বক্তব্য হইল, উহা আল্লাহ্র কালাম এবং গায়র মাখলূক (অসৃষ্ট)। আল্লাহ্র সিফাত, কালাম হইল অবিনশ্বর; তবে উহা হুরূফ ও উচ্চারণের দিক দিয়া নহে, কুরআন মুসহাফে লিখিত, অন্তরে রক্ষিত, মুখে পাঠ করা হয় এবং কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করা হয়। উহা অর্থের দিক দিয়া স্থায়ী এবং আল্লাহ্র যাতের সহিত প্রতিষ্ঠিত।

**(৬) আল্লাহ্র দীদার (দর্শন) লাভ ঃ** মাতুরীদীগণও আশ'আরীদের ন্যায় আখিরাতে আল্লাহ্র দর্শনে বিশ্বাসী, অপরদিকে মু'তাযিলীগণ উহা অস্বীকার করেন। ইমাম মাতুরীদী আল্লাহ্র দর্শন সম্পর্কে বলেন যে, ইহা কিয়ামতের এমন সকল অবস্থার এক অবস্থা যাহার সঠিক জ্ঞান কেবল আল্লাহ্রই আছে এবং আমরা সেই অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নাই।

**(৭) কাবীরা** গুনাহগার ঃ খাওয়ারিজ ও মু'তাযিলীদের মতের বিপরীত আশা'ইরা ও মাতুরীদীয়া 'আমলকে ঈমানের অঙ্গ বলেন না। মোটকথা, আল-মাতুরীদীর নিকট কাবীরা গুনাহ্য় লিপ্ত কোন মুসলিম ব্যক্তি ঈমানের গণ্ডিবহির্ভূত নহে এবং সর্বদা জাহান্নামে অবস্থান করিবে না, যদিও সে তওবার পূর্বেই ইনতিকাল করে। যেহেতু ইমাম মাতুরীদীর মতবাদ অনুযায়ী আল্লাহ মানুষের উপর জুলুম করেন না এবং নিজ ওয়া'দার খেলাফ করেন না—এই কারণে ইহা হিকমাত এবং আল্লাহ্র ন্যায় বিচারের নীতি মুতাবিক হইবে না যে, তিনি একজন কাফির এবং একজন গুনাহগার মু'মিনকে একইরূপ শাস্তি দিবেন। আল-মাতুরীদী বলেন যে, গুনাহগার মু'মিনের ফায়সালা আল্লাহ্র উপর ঃ ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাকে নিজ দয়ায় ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং ইচ্ছা করিলে তাহার পাপ অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করিবেন। তবে তাহার চিরদিনের জন্য জাহান্নামী হওয়ার ধারণা ঠিক নহে। ঈমানদারগণ হইলেন ভীতি এবং আশার মধ্যবর্তী স্থলে।

**(৮) জাব্র (অদৃষ্টবাদ) ও ইখতিয়ার (ইচ্ছার স্বাধীনতা) ঃ** ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে জাব্র ও ইখতিয়ারের মাস'আলা-এর মুসলমানদের মধ্যে খিলাফাতে রাশিদার শেষে এবং বানূ উমায়্যার প্রথম যুগে সূত্রপাত। জাবারিয়্যাঃ বলে যে, মানুষের মাঝে কার্য সম্পাদনের জন্য ইচ্ছা শক্তিরই অস্তিত্ব নাই এবং সে কার্য সম্পাদনের জন্য কেবল বাধ্য (মাজবূর মাহাদ)। কাদারিয়্যা মতবাদ হইল যে, মানুষ সকল কাজ নিজ ইচ্ছায় সম্পাদন করিয়া থাকে এবং তাহার কার্যের সহিত আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক নাই। এই কারণে তাহারা আল্লাহ্র তাকদীর অস্বীকার করিতেন। মু'তাযিলীরাও এই 'আকীদা পোষণ করিতেন যে, মানুষ স্বয়ং তাহার কার্যের সৃষ্টিকর্তা এবং আল্লাহ্ কার্যাবলীর সৃষ্টিকর্তা নহেন। আশা'ইরা এই 'আকীদায় বিশ্বাসী যে, আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। অতএব, তিনি মানুষের সকল কার্যেরও সৃষ্টিকর্তা এবং মানুষ কার্যাবলীর সৃষ্টিকর্তা নহে, বরং উহা অর্জনকারী (মুকতাসিব)। মাতুরীদিয়ার

নিকট মানুষের কার্য সম্পাদন সেই শক্তির বলেই হইয়া থাকে যাহা আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে গচ্ছিত রাখিয়াছেন। অতএব, মানুষ উক্ত সৃষ্টি শক্তির কারণেই কার্য সম্পাদন অথবা অসম্পাদন—উভয়ের উপর শক্তি রাখে অর্থাৎ সে কোন কাজ করিবে অথবা করিবে না—সে ব্যাপারে তাহার ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। মানুষের ভাল কাজের পুরস্কার এবং অন্যায় কাজের শাস্তি উক্ত শক্তি ও প্রভাবেরই ফল। হানাফীদের মতে কার্য লাভের জন্য উক্ত সৃষ্ট-শক্তির নাম হইল ইসতিতা'আত (কর্মশক্তি) এবং ইহা মানুষের মধ্যে কার্যসম্পাদনের সময় সৃষ্টি হইয়া থাকে। আশা'ইরা ও মাতুরীদিয়া-র মতবাদের মধ্যে পার্থক্য হইল, আশা'ইরা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানুষকে স্বয়ং ক্ষমতাবান মনে করে না [এবং এই কারণে 'উলামা' আশ'আরীদের এই ধারণাকে মু'আদ্দী ইলা'ল-জাব্র (অদৃষ্টবাদের দিকে আকৃষ্ট) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন]। অপর দিকে মাতুরীদিয়া কার্য লাভের ক্ষেত্রে মানুষকে ক্ষমতাবান মনে করে। তাহাদের নিকট মানুষের সকল কার্যাবলী আল্লাহ্র ইচ্ছায় ও নির্দেশে সম্পাদিত হয়, অবশ্য মানুষের স্বীয় কার্য সম্পর্কে স্বাধীনতা আছে। কেননা তাহাকে কার্য-ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

(৯) **আয়াত মুতাশাবিহাতের তা'বীল (ব্যাখ্যা)ঃ** মাতুরীদিয়া কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্র সিফাত ও অবস্থাবলী স্বীকার করেন। তাহাদের বক্তব্য এই যে, কুরআনের আয়াতে যে হস্ত, চেহারা, দৃষ্টি ইত্যাদির উল্লেখ আল্লাহ্র যাতের জন্য করা হইয়াছে তাহা সত্য, তবে উহার সঠিক অবস্থা একমাত্র আল্লাহ্রই জানা আছে। ইমাম মাতুরীদীর মতে মুতাশাবিহাতের সঠিক অর্থ আল্লাহ্র 'ইল্ম-এর উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে।

**আত-তাবিয়্যা ঃ** ইমাম আবূ জা'ফার আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা আল-আযদী আত-তাহাবী (মৃ. ৩২২ হি.)-ও 'ইল্ম কালাম বিষয়ে সুন্নী 'আকীদার মতবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। 'আকা'ইদ বিষয়ে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বায়ানু'স-সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত (আল-'আকীদাতু'ত-তাহাবিয়া)। এই গ্রন্থের কয়েকখানা শারহ বা ভাষ্য লেখা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইমাম তাহাবী কোন নূতন মতবাদের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র) আহ্লু'স-সুন্নাতের প্রথম ইমাম, যিনি 'আকা'ইদ বিষয়ে কলম ধারণ করেন) এবং তাঁহার ছাত্রদ্বয় ইমাম আবূ য়ূসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শায়বানীর চিন্তাধারার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন (দ্র. মুকাদ্দামা-ই বায়ানি'স-সুন্না ওয়া'ল-জামা'আ)। ইসলামী 'আকা'ইদের ইতিহাসে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এক বিশেষ মর্যাদা ও স্থান রহিয়াছে (মাতুরীদিয়ার বর্ণনায় তাঁহার কিছু গ্রন্থাবলীর নাম লেখা হইয়াছে) এবং কথিত আছে, তাঁহার ছাত্রগণও উসূলু'দ-দীন সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, যদিও তাঁহাদের প্রসিদ্ধির বাস্তব ক্ষেত্র কেবল ফিক্হ-ই ইসলামী ছিল। আত-তাহাবীর চিন্তাধারা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য ইমাম আবূ হানীফা (র)-র গ্রন্থবলী আল-ফিক্হুল-আক্বার, আল-ওয়াসিয়্যা, আল-'আলিম ওয়া'ল-মুতা'আল্লিম ইত্যাদি অধ্যয়ন করিতে হইবে। আল-মাতুরীদীও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর চিন্তা ও মতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ও আত-তাহাবীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, যেখানে আল-মাতুরীদী 'আকা'ইদ প্রমাণের ক্ষেত্রে দর্শন ও জ্ঞানগত দলীলসমূহকেও ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহাকে চমৎকারভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, সেখানে আত-তাহাবী কেবল রিওয়ায়াত ও তাকলীদের পদ্ধতি অবলম্বন করেন এবং দর্শন অথবা শুধু যুক্তিনির্ভর আলোচনাকে তেমন গুরুত্ব দেন নাই। অতএব, আমরা বলিতে পারি, আল-মাতুরীদীর পদ্ধতি ছিল তানকীদী (সমালোচনামূলক), অন্যদিকে আত-তাহাবী রিওয়ায়াতকেই প্রধাত প্রণিধানযোগ্য মনে করেন (দ্র. আয়্যূব 'আলী, Tahawism শীর্ষক প্রবন্ধ, M. M. Sharif সম্পাদিত A. History of Muslim Philosophy, ১খ)।

**স্পেনে 'ইল্মু'ল-কালাম ঃ** প্রাচ্যের ইসলামী দেশসমূহে 'ইল্মু'ল-কালামের ব্যাপক চর্চা হয়, কিন্তু আল-মাগরিব, বিশেষ করিয়া স্পেনে দুইজন এমন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের জন্ম হয় যাঁহাদের আলোচনা ব্যতিরেকে 'ইল্মু'ল-কালামের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই প্রখ্যাত ব্যক্তিদ্বয় ছিলেন ইব্ন হায্ম (দ্র.; মৃ. ৪৫৬ হি.) ও ইব্ন রুশ্দ (দ্র.)। স্পেনে ইল্মু'ল-কালাম বিলম্বে পৌঁছিবার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, এই দেশে ই'তিকাদ সংক্রান্ত বিষয়সমূহের উপর অধিক আলোচনা-পর্যালোচনা হইত না এবং বিভিন্ন দলের অস্তিত্বও কম ছিল। সুতরাং তথায় মুসলিম বিশ্বের পূর্বাঞ্চলের ন্যায় 'ইল্মু'ল-কালামের তেমন উন্নতি সাধিত হয় নাই। আল-মায্হাজী হইতে ইব্ন হায্ম মুহাম্মাদ ইব্ন হাসা 'উলূম 'আক্লিয়া অর্জন করেন এবং উহাতে এতদূর পারদর্শিতা লাভ করেন যে, মান্তিক (যুক্তিবিদ্যা) বিষয়ে একখানা গ্রন্থ এমন পদ্ধতিতে লিখেন যাহাতে প্রচলিত সকল পরিভাষা পরিবর্তন করেন এবং আলোচ্য প্রতিটি বিষয়ের উদাহরণ ফিক্হী মাসা'ইল হিসাবে প্রদান করেন। উক্ত গ্রন্থের নাম আত-তাকরীব (দ্র. ইব্ন হায্ম-এর জীবনী, ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফিয়্যাত)। 'ইল্মু'ল-কালাম বিষয়ে ইব্ন হায্ম-এর প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ হইল কিতাবু'ল-ফাস্ল ফি'ল-মিলাল ওয়া'ল-আহ্ওয়া' ওয়া'ন-নিহাল। এই গ্রন্থে বিভিন্ন দীন ও মাযহাবের (মাজূসী, নাসারা, য়াহূদ, ফালাসিফা ও দাহ্রিয়া) 'আকা'ইদের নীতিমালা বর্ণনার পর ইহা প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া উহাতে কেবল প্রায় সকল প্রসিদ্ধ ইসলামী দলের 'আকীদা ও মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা এবং তাহাদের 'আকীদাসমূহের বিস্তারিত বর্ণনাই করা হয় নাই, বরং উহাদের সম্পর্কে প্রচুর সমালোচনাও ঐ গ্রন্থে বিদ্যমান। এই গ্রন্থ ইব্ন হায্ম-এর গোটা দর্শনকে শামিল করে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য শিব্লী নু'মানীর উক্তিঃ "পঞ্চম শতাব্দীতে 'ইল্মু'ল-কালামের ইতিহাসের নব যুগ শুরু হয়। এই সময় পর্যন্ত ফাকীহ ও মুহাদ্দিছগণ 'ইল্মু'ল-কালামের সহিত সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ছিলেন · · ·। স্পেন এই গৌরব লাভ করে যে, (ইব্ন হায্ম-এর বদৌলতে) হাদীছ ও কালাম একই সভায় স্থান লাভ করে" ('ইল্মু'ল-কালাম, পৃ. ৪৯)।

ইব্ন হায্ম-এর পর স্পেনে 'ইল্মু'ল-কালামের সর্বশ্রেষ্ঠ 'আলিম ছিলেন ইব্ন রুশ্দ। যদিও সেই যুগে কিছু মু'তাযিলী 'আলিম, যেমন খালীল ইব্ন ইসহাক, য়াহ্য়া ইব্নু'স-সামনিয়্যা, মূসা ইব্ন হাদী প্রমুখের নামও পাওয়া যায়, কিন্তু ইব্ন রুশ্দ-এর সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। আবু'ল-ওয়ালীদ মুহাম্মাদ আহমাদ ইব্ন রুশ্দ আল-কুরতুবী (মৃ. ৫৯৫ হি.)-কে অ্যারিস্টোটলীয় দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার বলিয়া গণ্য করা হয়। তাঁহাকে নানাবিধ কারণে 'ইল্মু'ল-কালামের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয় এবং তিনি ফালাসিফার বিপক্ষে ইমাম গাযালী (র)-র আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ তাহাফুতু'ল-ফালাসিফা-র তীব্র জওয়াব তাহাফুতু'ত-তাহাফুত গ্রন্থের মাধ্যমে প্রদান করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ফাকীহ ও কাযী ছিলেন এবং সেই সংগে ফালাসিফার একজন 'আলিমও ছিলেন। তাঁহার দর্শন ছিল এই যে, হিকমাত ও শারী'আত একই ইমারতের দুইটি স্তম্ভ। তিনি এক দিকে যেমন মাযহাবী ও দীনী দুর্বলতাকে বরদাশত করিতে পারিতেন

না, সুতরাং তিনি মা'কূল এবং মাকূলের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, তাঁহার নিকট হিকমাত ও শারী'আত পরস্পরবিরোধী নহে। 'ইল্‌মু'ল-কালামে মাস'আলাসমূহ প্রমাণিত করার সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি এই ছিল যে, যে সকল দলীল পেশ করা হইত তাহা 'আলিমদের নিজস্ব গবেষণালব্ধ হইত এবং দর্শনমূলক আলোচনা হইতেও সাহায্য লওয়া হইত। ইব্‌ন রুশ্‌দ আলোচনা মাস'আলাসমূহের উপর যে সকল দলীল-প্রমাণ পেশ করিয়াছেন উহা কুরআন মাজীদ হইতে গৃহীত (শিবলী নু'মানী, 'ইল্‌মু'ল-কালাম, পৃ. ৮০)। তাঁহার দাবী এই যে, কুরআন মাজীদের দলীলসমূহ যেমন সম্বোধনমূলক সান্ত্বনাদায়ক, (অর্থাৎ সাধারণ ব্যক্তি উহা দ্বারা সান্তনা লাভ করে) তেমনি যুক্তিনির্ভর ও প্রমাণভিত্তিকও বটে (অর্থাৎ মানতিক-এর নীতিমালা ও মানদণ্ডের সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল)।

'ইল্‌মু'ল-কালাম বিষয়ে ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর দুইটি গ্রন্থ আছে ঃ

(১) فصل المقال و تقريرما بين الشريعة و الحكمة من الاتصال

(২) الكشف عن مناهج الادلة فى عقائد الملة–

ফাস্‌লু'ল-মাকালে ইব্‌ন রুশ্‌দ ফাল্‌সাফা ও মান্‌তিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ, যুক্তিগ্রাহ্য দলীল, কুরআনের আয়াতের তা'বীল ইত্যাদি অনুরূপ বিষয়সমূহের উপর আলোচনা করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, তা'বীলের অনুমতি কেবল সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের; সাধারণ লোকদের নাই। এই গ্রন্থে ইব্‌ন রুশ্‌দ আশা'ইরার 'ইল্‌মু'ল-কালাম সম্পর্কেও আলোচনা করিয়াছেন এবং উক্ত বিষয়ে তীব্র সমালোচনা করিতে গিয়া প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন যে, আশা'ইরার পদক্ষেপ না 'আক্‌লী এবং না নাক্‌লী। নাক্‌লী এইজন্য নহে যে, উহা শার'ঈ নুসূসের ক্ষেত্রে তা'বীলের পক্ষপাতী এবং মুহাদ্দিছদের ন্যায় শব্দাবলী বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেন না ও 'আকলী এইজন্য নহে যে, তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে যে পরিমাণ 'আকলী দলীলসমূহের উল্লেখ আছে তাহা মানতিক এবং ফালসাফার মানদণ্ডের সহিত সর্বতো সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে।

আল-কাশ্‌ফ 'আন মানাহিজি'ল-আদিল্লা যদিও বিস্তারিত গ্রন্থ নহে, কিন্তু উহাতে ইব্‌ন রুশ্‌দ তাঁহার নিজস্ব প্রমাণপদ্ধতি প্রয়োগ করেন। উক্ত রিসালায় আশা'ইরা, মু'তাযিলা ও বাতিনিয়্যা ইত্যাদি মতবাদ ও বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের প্রমাণ পদ্ধতিকে ভুল প্রমাণিত করিবার পর তিনি তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ, তাওহীদ, হুদূছ 'আলাম, নবী-রাসূলদের প্রেরণ, তাকদীর সংক্রান্ত মাস'আলা, জুলুম, 'আদ্‌ল, আত্মিক, দৈহিক পুনরুত্থানের বিষয়াদি সম্পর্কে আকলী ও নাকলী দলীলসমূহ পেশ করত বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন।

**উপমহাদেশে (পাক-ভারত-বাংলা) 'ইল্‌মু'ল-কালাম ঃ** দীনী 'ইল্‌মসমূহের উপর কলম ধারণ করা উপমহাদেশের 'আলিমদের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। এই কারণে তাফসীর, হাদীছ, ফিক্‌হ ও তাসাওউফ ছাড়াও 'ইল্‌মু'ল-কালামের উপর লিখিত এই দেশের 'আলিমদের প্রচুর গ্রন্থ দেখা যায়, যেইগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই গ্রন্থসমূহ এই উপমহাদেশের সক্রিয় ইসলামী দীনী জীবনধারা উপলব্ধির ক্ষেত্রে এক অত্যাবশ্যকীয় পটভূমিকার কাজই কেবল করে নাই, বরং উহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যান্য ইসলামী দেশেও অনুভূত হইয়াছে। সুতরাং উহার প্রণেতাদের নাম আজও ইসলামী দেশসমূহে অত্যন্ত মর্যাদার সহিত লওয়া হইয়া থাকে। যদিও ইসলামী শিক্ষাসমূহের বিভিন্ন দিকের উপর শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দিহ্‌লাবী (র) (মৃ. ১১৭৬ হি.)-এর গ্রন্থসমূহ খুবই গুরুত্বের অধিকারী, কিন্তু 'ইল্‌মু'ল-কালাম ও ইসলামী চিন্তা ও দর্শনের ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমাদেরকে তাঁহার পূর্বের যুগেও যাইতে হইবে। ডক্টর যুবায়দ আহ্‌মাদ ('আরবী আদাবিয়্যাত মেঁ পাক ওয়া হিন্দ কা হিস্‌সা, পৃ. ১০) খালজী সুলতানদের যুগের একজন 'আলিম শায়খ সাফিয়্যু'দ-দীন (মৃ. ৭১৫ হি.)-এর উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, তিনি ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিবার পর উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশে মিসরে গমন করিয়াছিলেন, যেখানে তিনি 'ইল্‌মু'ল-কালাম ও ফিক্‌হশাস্ত্রের একজন প্রখ্যাত 'আলিম হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন এবং বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। উপমহাদেশে 'ইল্‌মু'ল-কালাম, মান্‌তিক ও ফালসাফা প্রাচীন যুগ হইতে 'আলিমদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এইভাবেই তুগলাক বংশের অন্যতম সুলতান মুহাম্মাদ তুগ্‌লাক তাঁহার যুগের একজন প্রসিদ্ধ 'আলিম মু'ঈনু'দ-দীন 'ইমরানী দিহ্‌লাবীকে—যিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতাও ছিলেন—শীরাযে প্রেরণ করিয়াছিলেন যেন তিনি 'ইল্‌মু'ল-কালামের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-মাওয়াকিফ-এর খ্যাতনামা 'আলিম কাদী 'আদু্দু'দ-দীনকে ভারত আগমনে উৎসাহিত করেন। অতঃপর মুগল সম্রাট আকবরের যুগে ভারতে বিদ'আত ও অ-ইসলামী চিন্তা ও মতবাদের প্রচলন যেভাবে সরকারী পর্যায়ে অব্যাহত ছিল, উহার মুকাবিলার জন্য কোন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের আগমনের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং এই কাজের দায়িত্বভার মুজাদ্দিদ-ই আলফ ছানী শায়খ আহ্‌মাদ সারহিন্দী (র) [মৃ. ১০৩৪ হি.] গ্রহণ করেন। তিনি অ-ইসলামী বিশ্বাস ও 'আকীদা এবং দেশে বিরাজমান বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী আন্দোলনের সূচনা করেন। ফলে অ-ইসলামী চিন্তাধারা ও কার্যক্রম স্তব্ধ হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে তাঁহার মাকতূবাত (৩ খণ্ডে), আল-মাবদা' ওয়া'ল-মা'আদ, রিসালাতু ফী ইছবাতি'ন-নুবূওয়া ও রাদ্দু রাওয়াফিদ-এর উল্লেখ বিশেষভাবে করা যাইতে পারে।

মুজাদ্দিদ-ই আল্‌ফ ছানী (র)-র শী'আ ও সুন্নী 'আকা'ইদ সম্পর্কে লিখিত ফার্সী গ্রন্থের আরবী অনুবাদ করেন শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দিহ্‌লাবী এই নামে "আল-মুকাদ্দামাতু'স্‌-সুন্নিয়া ফী ইন্‌তিসারি'ল-ফির্‌কাতি'স-সুন্নিয়া" এবং স্থান বিশেষে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও সমালোচনামূলক টীকা সন্নিবেশিত করেন। শাহ সাহেবের পুত্র শাহ 'আবদু'ল-'আযীয উক্ত 'আরবী অনুবাদের আরও ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ডক্টর যুবায়দ আহ্‌মাদ তাঁহার একটি হাশিয়া 'আলা শারহি'ল-'আকা'ইদি'ল-জালালীর উল্লেখও করিয়াছেন। উপমহাদেশের 'আলিমদের মধ্যে মুল্লা 'আবদু'ল-হাকীম সিয়ালকোটী ইসলামী 'আকা'ইদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দেন। আত্‌-তাফ্‌তাযানীর 'শারহু'ল-'আকা'ইদি'ন-নাসাফিয়্যা' ও আদ্‌-দাওয়ানীর 'শারহু'ল-আকা'ইদি'ল-'আদুদিয়্যা-র উপর লিখিত তাঁহার টীকাসমূহ 'ইল্‌মু'ল-কালামের ছাত্রদের নিকট খুবই জনপ্রিয়। এই বিষয়ে মুল্লা 'আবদু'ল-হাকীম সিয়ালকোটীর পৃথক গ্রন্থ আদ্‌-দুররাতু'ছ-ছামীনা অথবা আর্‌-রিসালাতু'ল-খাকানিয়্যা ফী 'ইল্‌মি'ল-বারী তা'আলা রহিয়াছে। ইহা মুগল সম্রাট শাহ জাহান-এর নির্দেশক্রমে লেখা হয় এবং ইরানের সাফাবী বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় 'আব্বাসের দরবারে প্রেরণ করা হয়। এই সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে লেখক আল্লাহ্‌ তা'আলার ব্যাপক জ্ঞানের সমষ্টি ও ব্যষ্টি সম্পর্কে আলোনচা করিয়াছেন এবং ফালসাফা ও 'ইল্‌মু'ল-কালামের

অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদন করিয়াছেন। গ্রন্থের অন্য অধ্যায়ে আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ 'আকীদা অর্থাৎ হাশ্র ও দেহের পুনর্জীবন লাভ এবং পৃথিবীর নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতা সম্পর্কেও আলোচনা করা হইয়াছে; এই সকল বিষয়ে সঠিক ইসলামী দৃষ্টিকোণের ব্যাখ্যাও এই পুস্তকে করা হইয়াছে। 'আবদু'ল-হাকীম সিয়ালকোটীর আল-হাশিয়া 'আলা শারহি'ল-মাওয়াকিফও খুব প্রসিদ্ধ। উপমহাদেশের কালাম বিষয়ে শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের মধ্যে শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দিহলাবীরও উচ্চ মর্যাদা রহিয়াছে। যদিও তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা-কে হাদীছ তত্ত্ব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু এই গ্রন্থ হাদীছ অপেক্ষা 'ইল্মু'ল-কালামের সহিত অধিকতর সম্পৃক্ত। শিব্লী নু'মানী লিখিয়াছেন যে, শাহ সাহেব 'ইল্মু'ল-কালাম শিরোনামে কিছু রচনা করেন নাই, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লহি'ল-বালিগা, যাহাতে তিনি শারী'আঁতের রহস্যাবলীর বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে 'ইল্মু'ল-কালাম-এরই নির্যাস ('ইল্মু'ল-কালাম, পৃ. ১৮৮)। শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র) তাঁহার এই গ্রন্থে ইসলামবিরোধীদের দাবীসমূহ প্রত্যাখ্যান, ইসলামী 'আকীদাসমূহ প্রমাণ ও উহার বাস্তবতাকে অকাট্য দলীল দ্বারা সঠিক প্রমাণিত করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, শারী'আতের সকল বক্তব্য জ্ঞানসম্মত। হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা-র মুখ্য উদ্দেশ্য হইল দীন ইসলামের বিভিন্ন বিস্ময়কর দিকের উদ্ঘাটন এবং ইসলামী আহকাম ও 'আকাইদের বাস্তবতাকে প্রমাণ করা। শাহ সাহেব ইসলামী আহকাম ও হিদায়াতের খুবই চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কালাম সংক্রান্ত মাস'আলা এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ ঃ মানুষকে মুকাল্লাফ সৃষ্টি করিবার কারণ, আল্লাহ্র প্রকৃতি ও 'আদত, রূহ, শাস্তি ও পুরস্কার, মৃত্যুর পরের জীবন ও নুবুওয়াতের রহস্য, সকল মাযহাবের উৎস, মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা, এই পার্থিব জগত ছাড়াও অন্য এক জগত, যাহাকে তাহারা 'আলামু'ল-মিছাল নামে অভিহিত করেন, ই'জাযু'ল-কুরআন (কুরআনের অলৌকিকতা), নবীদের মু'জিযা। শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্র 'আল-'আকীদাতু'ল-হাসা' ও 'শারহু'র-রিসালা ফী মাসা'ইলি 'ইলমি'ল-ওয়াজিবি তা'আলা'ও রহিয়াছে।

উপমহাদেশের 'আলিমগণ 'ইল্ম কালাম বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন উহাদের মধ্য হইতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হইল ঃ

(১) সাফিয়্যু'দ-দীন মুহাম্মাদ রাহীম আল-হিন্দী (মৃ. ৭১৫ হি.), আয-যুবদাতু ফী 'ইল্মি'ল-কালাম; (২) আবূ হাফ্স 'উমার ইব্ন ইস্হাক (মৃ. ৭৭২ হি.), শারহু'ল-'আকা'ইদি'ত-তাহাবিয়্যা; (৩) 'আলী ইব্ন আহমাদ আল-মাহা'ইমী (মৃ. ৮৩৫ হি.); আদ্-দাও'উ'ল-আজ্হার ফী কাশ্ফি'ল-কাদা' ওয়া'ল-কাদ্র; (৪) কাদী শিহাবু'দ-দীন দাওলাত আবাদী (মৃ. ৮৪৯ হি.), আল-'আকা'ইদু'ল-ইসলামিয়্যা; (৫) আবু'ল-ফাদ্ল গাযরূনী (মৃ. ৮৫৯ হি.), আল-হাশিয়াতু 'আলা শারহি'ল-মাওয়াকিফ; (৬) মুল্লা 'আলা'উ'দ-দীন লাহোরী (মৃ. ৯৪৯ হি.), আল-হাশিয়াতু 'আলা শারহি'ল-'আকা'ইদ; (৭) মাখদূমু'ল-মালিক 'আবদুল্লাহ সুলতানপুরী (মৃ. ৯৯০ হি.), 'ইস্মাতু'ল-আম্বিয়া'; (৮) কাদী নিজাম বাদাখশী (মৃ. ৯৯২ হি.), আল-হাশিয়া 'আলা শারহি'ল-'আকা'ইদ; (৯) ঐ লেখক, আর-রিসালাতু ফী 'ইলমি'ল-কালাম; (১০) ওয়াজীহু'দ-দীন গুজ্রাতী (মৃ. ৯৯৮ হি.), আল-হাশিয়াতু 'আলা শারহি'ল-'আকা'ইদ লি'ত্- তাফ্তাযানী; (১১) কাদী নূরুল্লাহ শূলতারী (মৃ. ১০১১ হি.), ইহ্কাকু'ল-হাক্ক ওয়া ইব্তালু'ল-বাতিল; (১২) আল-হাশিয়াতু 'আলা শারহি'ল-মাওয়াকিফ; (১৩) ঐ লেখক, আর্-রিসালাতু ফরিদ্দি রিসালাতি'দ-দাওয়ানী ফী ঈমা ফির-'আওন; (১৪) 'আবদু'ন-নাবী আশ-শাত্তারী (মৃ. ১২২০ হি.), সাওয়াতি'উ'ল-ইলহাম শারহ তাহ্যীবি'ল-কালাম; (১৫) ঐ লেখক, নাসিখু'ত্-তানাসুখ; (১৬) আবূ বাক্র আল-'ঈদরূস (মৃ. ১০৩৮ হি.), আদ-দুর্রু'ছ-ছামীন ফী বায়ানি'ল-মুহিম মিন 'উলূমি'দ-দীন; (১৭) মুল্লা মুহাম্মাদ হাসান (মৃ. ১০৮১ হি.), হাশিয়া 'আলা শারহি'ল-'আকা'ইদ; (১৮) মীর মুহাম্মাদ যাহিদ (মৃ. ১১০১ হি.), হাশিয়া 'আলা শারহি'ল-মাওয়াকিফ; (১৯) মুল্লা কুত্বু'দ-দীন সিহালাবী (মৃ. ১১০৩ হি.), আল-হাশিয়া 'আলা শারহি'ল-'আকা'ইদ লি'দ-দাওয়ানী; (২০) ঐ লেখক, আল-হাশিয়া 'আলা শারহি'ল-'আকা'ইদি'ন-নাসাফিয়্যা; (২১) মুহিব্বুল্লাহ বিহারী (মৃ. ১১১৯ হি.), আল-ফিত্রাতু'ল-ইলাহিয়া শারহি'ল-হিকমাতি'ল-জামি'আ; (২২) 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব কনৌজী (মৃ. ১১২৬ হি.), বাহ্রু'ল-মাযাহিব (আল-মাওয়াকিফ-এর অনুকরণে লিখিত, লেখক 'ইল্মু'ল-কালাম-এর পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন, বর্ণনা পদ্ধতি সহজ ও সাবলীল); (২৩) হাফিজ আমানুল্লাহ বানারাসী (মৃ. ১১৩৩ হি.), আল-হাশিয়া 'আলা শারহি'ল-মাওয়াকিফ; (২৪) ঐ লেখক, আল-হাশিয়া 'আলা শারহি'ল-আকা'ইদ লি'দ-দাওয়ানী; (২৫) ঐ লেখক, আল-হাশিয়া 'আলা'ল-'আকা'ইদি'ল-'আদুদিয়্যা; (২৬) নূরু'দ্-দীন আহমাদ আবাদী (মৃ. ১১৫৫ হি.), আল-হাশিয়া 'আলা শারহি'ল-মাওয়াকিফ; (২৭) ঐ লেখক, হাল্লু'ল-মা'আকিদ লি-হাশিয়াতি শারহি'ল-মাকাসিদ; (২৮) নিজামুদ-দীন সালালাবী (মৃ. ১১৬১ হি.), শারহু'র-রিসালাতি'ল-মুবারিয়া ফি'ল-'আকা'ইদি'ল-ইসলামিয়্যা; (২৯) ঐ লেখক, আল-হাশিয়া 'আলা শারহি'ল-'আকা'ইদ লি;দ-দাওয়ানী; (৩০) মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী (মৃ. ১১৬৩ হি.), আর-রিসালা ফী বিদ'আতি'ত্-তা'যিয়া; (৩১) মুহাম্মাদ হাশিম সিন্ধী (মৃ. ১১৭৪ হি.), তামীমু হাশিয়াতি'ল-খিয়ালী; (৩২) ঐ লেখক, ফারা'ইদু'ল-ইসলাম; (৩৩) কামা'লুদ-দীন সিহালাবী (মৃ. ১১৭৫ হি.), আল-হাশিয়া 'আলা শারহি'ল-'আকা'ইদি'ল-জালালী; (৩৪) মুহাম্মাদ সিদ্দীক লাহোরী (মৃ. ১১৯২ হি.), শারহু'-'আকা'ইদি'ন-নাসাফিয়্যা; (৩৫) 'আবদু'র-রাহমা রাহ্মানী ও মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয (দ্বাদশ শতাব্দী), হাওয়াশী শারহ 'আকা'ইদ জালালী; (৩৬) কাদী ছানা-উল্লাহ পনীপাতী (মৃ. ১২২৫ হি.), হুকূকু'ল-ইসলাম; (৩৭) ঐ লেখক, আস্-সায়ফু'ল-মাস্লূল; (৩৮) মুল্লা মুহাম্মাদ মুবীন লাখনাবী (মৃ. ১২২৫ হি.), আল-হাশিয়া 'আলা হাশিয়াতি'য্-যাহিরিয়া; (৩৯) সায়্যিদ দিলদার 'আলী (মৃ. ১২৩৫ হি.), 'ইমাদু'ল-ইসলাম; (৪০) ঐ লেখক, কাশ্ফু'ল-কাব 'আ্ 'আকা-'ইদি ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহহাব; (৪১) ঐ লেখক, আর-রিসালা ফী গায়বাতি সাহিবি'য-যামান; (৪২) বাহ্রু'ল-'উলূম 'আবদু'ল-'আলী লাখাবী (মৃ. ১২৩৫ হি.), আল-হাশিয়া 'আমা'ল-হাশিয়াতি'য-যাহিরিয়া; (৪৩) ঐ লেখক, আল-হাশিয়া 'আলা শারহি'ল-'আকা'ইদ লি'দ্-দাওয়ানী; (৪৪) ঐ লেখক, আল-হাশিয়া 'আলা শারহি'ল-মাওয়াকিফ; (৪৫) মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ফায়দ আবাদী (মৃ. ১২৩৫ হি.), আল-আসিন্নাতু'ল-হাদিয়্যা লি'য-যানাদিকা ওয়া'ন-

নাসরানিয়্যা ওয়া'ল-য়াহূদিয়্যা; (৪৬) 'আলী মুহাম্মাদ (মৃ. ১২৩৬ হি.), মিনহাজু'ল-ইসলাম; (৪৭) ঐ লেখক, তাহযীবু'ল-ইসলাম ; (৪৮) শাহ 'আবদু'ল-'আযীয ইব্ন শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দিহলাবী (মৃ. ১২৩৯ হি.), মীযানু'ল-'আকা'ইদ; ইহা ছাড়া তিনি তাঁহার পিতার রচিত; (৪৯) "আল-মুকাদ্দামাতু'স-সুন্নিয়া-র টীকা লিখিয়াছেন ; (৫০) ঐ লেখক, তুহফাতু ইছনা 'আশারিয়্যা ('আরবী অনুবাদ, হাফিজ গুলাম মুহাম্মাদ, আত-তারজামাতু'ল-'আবকারিয়্যা ওয়া'স-সাওলাতু'ল-হায়দারিয়্যা; (৫১) 'আবদু'ল-'আযীয মুলতানী, আন-নিবরাস শারহু'ল-'আকা'ইদি'ন-নাসাফিয়্যা ; (৫২) শাহ মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল দিহলাবী (মৃ. ১২৪৬), ইরশাদু'ল-'ইবাদ ইলা সাবীলি'র-রাশাদ ; (৫৩) কাদী ইরতিদা 'আলী গোপমাবী (মৃ. ১২৫১ হি.), আল-আওহাম 'আল মাস'আলাতি'ল-কালাম ; (৫৪) ওয়ালিয়্যুল্লাহ ফারাংগী মাহাল্লী (মৃ. ১২৭০ হি.), 'আল-হাশিয়া 'আল্লা শারহি'ল-'আকা'ইদি'ল-আদুদিয়্যা; (৫৫) সায়্যিদ হুসায়ন আবাদী (মৃ. ১২৭৩ হি.), মানাহিজু'ত-তাদ্কীক ওয়া মা'আরিজু'ত-তাহ্কীক ; (৫৬) আবূ সা'ঈদ জাহূরু'ল-হাক্ক (মৃ. ১২৭৯ হি.), তাসবীলাতু'ল-ফালাসিফা ; (৫৭) হাজ্জী রাহ্মাতুল্লাহ দিহলাবী, ইজহারু'ল-হাক্ক ফী রাদ্দি'ন-নাসারা; (৫৮) মুল্লা আহমাদ পেশাওয়ারী, তুহফাতু'ল-ইখওয়া ফি'ত-তাফ্রিকাতি বায়না'ল-কুফ্রি ওয়া'ল-ঈমান ; (৫৯) নি'মাতুল্লাহ, আর-রিসালাতু ফী খালকি'ল-আ'মাল ; (৬০) ইব্ন সিরাজ, তাযকিরাতু'ল-মাযাহিব ; (৬১) ফাত্হ মুহাম্মাদ, আর-রিসালাতু ফী তাহ্কী'ল-উজূদ; (৬২) য়ূসুফ আহমাদ আবাদী, 'আকা'ইদ।

উপমহাদেশের লেখকদের আলোচনার ক্ষেত্রে আলীগড় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান (মৃ. ১৮৯৮ খৃ.)-এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আবশ্যক। কেননা কাহারও কাহারও মতে তিনি হিন্দুস্থানে আধুনিক 'ইল্ম কালামের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তাঁহার কোন কোন সঙ্গীও দীনী মাসা'ইল ও মতবাদের ক্ষেত্রে তাঁহার অনুকরণ করিয়াছেন (দ্র. শায়খ আহ্মাদ আকরাম, মাওজ-ই কাওছার, সং. লাহোর)। এই সময় ইংরেজ শাসনের প্রভাব ও খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচারের ফলে য়ূরোপীয় ভাবধারা এই দেশে দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছিল। এই কারণে স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান মনে করিতেন যে, এই যুগে এমন এক আধুনিক 'ইল্ম কালামের প্রয়োজন যাহার মাধ্যমে য়ূরোপীয় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধর্মবিরোধী মাসা'ইলকে বাতিল প্রমাণিত অথবা ইহাকে সংশয়যুক্ত করা যাইতে পারে অথবা ইসলামী 'আকা'ইদ ও চিন্তাধারাকে উহার অনুরূপ যুক্তি প্রমাণসহ পেশ করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে স্যার সায়্যিদ এই 'আকীদা পোষণ করিতেন যে, মাযহাব আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূলের সহিত সামঞ্জস্যশীল হইবে এবং এই দিক দিয়া তাঁহার দৃষ্টিকোণ উপমহাদেশের সেই সকল মনীষীর চিন্তাধারা হইতে পৃথক ছিল যাঁহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। স্যার সায়্যিদ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে মাযহাবের পর্যালোচনা করেন এবং তাঁহার এই সমীক্ষায় আধুনিক কালের অনেক অনৈসলামিক প্রভাব কাজ করে। দীনী চিন্তাধারা ও 'আকা'ইদের ব্যাপারে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যেমন রিসালাহ তা'আম আহ্লি কিতাব, তাব্য়ীনু'ল-কালাম (বাইবেলের ব্যাখ্যা), রিসালা-ই ইবতাল গুলামী, খুত্বাত-ই আহমাদিয়া এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল তাফসীরু'ল-কুরআন যাহাতে রিওয়ায়াতের বিরোধিতা উহার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে (সায়্যিদ 'আবদুল্লাহ, স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান আওর উনকে রুফাকা', পৃ. ৩১)। এই তাফসীরে স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান কুরআন মাজীদের সকল বর্ণনাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন এবং যেইখানেই আধুনিক বিজ্ঞান ও কুরআন মাজীদের মাঝে (বাহ্যত) পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়াছে সেইখানেই মু'তাযিলীদের নীতি অনুযায়ী আয়াতের নূতন তা'বীল ও ব্যাখ্যা করিয়া উক্ত পার্থক্য দূরীকরণের চেষ্টা করিয়াছেন। এই কারণে স্যার সায়্যিদকে 'নব্য মু'তাযিলী'ও বলা হইয়াছে। তিনি মুজিযাত, মি'রাজ নাবাবী, জিহাদ, সুদ, গুলামী (দাসত্ব), বিবাহের সংখ্যা, আাদাম ('আ) ও ইব্লীসের ঘটনা, মাসীহ ('আ)-এর জীবন-মৃত্যু, আল্লাহ্র দীদার, ফিরিশতা ও জান্নাত—সকল বিষয়ে জামহূর 'উলামা' হইতে পৃথক মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং হিসাব-নিকাশ, পরকালীন জীবন, মীযান, জান্নাত ও জাহান্নাম সংক্রান্ত সকল কুরআনী ঘোষণাকে উদাহরণ ও রূপক বলিয়াছেন। যেমন তাঁহার নিকট জিন্ন অর্থ হইল পাহাড় এবং জংগলে লোকচক্ষুর অন্তরালে বসবাসকারী মানুষ।

আধুনিক 'ইল্ম কালামের ক্ষেত্রে সায়্যিদ আমীর 'আলী (দ্র.)-র নামও লওয়া যাইতে পারে।

দীনী চিন্তা ও মতবাদ সম্পর্কে উপমহাদেশের যে সকল 'আলিম কলম ধরিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মুহাম্মাদ শিবলী নু'মানী (মৃ. ১৯১৪ খৃ.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'আলীগড় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যুগে তাঁহার অন্তরে যুক্তিনির্ভর জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং তিনি অনুধাবন করেন যে, প্রাচীন 'উলূমকে নূতনভাবে পেশ করা খুবই প্রয়োজন। 'আক্লী 'উলূম সম্পর্কে তাঁহার উৎসাহ শিক্ষার প্রাথমিক কাল হইতে বর্তমান ছিল। সুতরাং তিনি, 'ইল্মু'ল-কালামের প্রতি দৃষ্টি দেন ও এই বিষয়ে উর্দূ ভাষায় তিনি দুইটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইল্মু'ল-কালাম' এবং 'আল-কালাম' প্রণয়ন করেন। স্যার সায়্যিদ আহমাদ খানের অতিরঞ্জনের সহিত তাঁহার মতবিরোধ ছিল। যাহা হউক, তাঁহার অধিকাংশ লেখায় এই বিষয়ের উপর জোর দেন যে, ইসলামকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সহিত সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং আধুনিক ফালসাফার সেই সকল চিন্তাধারা ও মাস'আলাসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে হইবে যাহা বাহ্যত মাযহাবপরিপন্থী বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়। শিব্লীর দৃষ্টি প্রাচীন নীতিপদ্ধতির প্রতি ছিল না এবং তিনি আধুনিক ধ্যান-ধারণার তা'বীল এই পদ্ধতিতে করেন যাহাতে প্রাচীন 'আকীদাসমূহের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি 'ইল্মু'ল-কালাম ও আল-কালাম ব্যতীত 'আকা'ইদ-এর উপর প্রচুর প্রবন্ধও রচনা করেন। 'ইলমু'ল-কালাম মুসলমানদের দীনী ফালসাফার ইতিহাস আর আল-কালাম শিবলীর চিন্তা ও দর্শনের সমষ্টি। তিনি লিখিয়াছেন, "আমার দীর্ঘ দিনের কামনা ছিল যে, 'ইল্ম কালামকে প্রাচীন পদ্ধতি ও আধুনিক ভাবধারা অনুযায়ী সাজাইতে হইবে . . . কাঙ্ক্ষিত 'ইল্ম কালামের বর্ণনা পদ্ধতি যাহাই হউক না কেন, পূর্ববর্তী মনীষীদের নির্ধারিত নিয়মনীতি অবশ্যই যেন হস্তচ্যুত না হয়" ('ইল্মু'ল-কালাম, পৃ. ১৬)। এই দিক দিয়া লক্ষ করিলে দেখা যাইবে যে, শিবলী আধুনিক 'ইল্ম কালামের ক্ষেত্রে স্যার সায়্যিদ আহমাদ হইতে ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন। তিনি মায্হাব ও 'আক্লের পুরাতন সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রকৃতিগতভাবে আক্লের ব্যবহারকে আবশ্যক মনে করেন। আবশ্য রহস্য উদ্ঘাটনের এমন এক সীমানারও উদ্ভব হয় যেইখানে 'আক্ল নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে (স্যার সায়্যিদ আওর উনকে নামওয়ার রুফাকা, পৃ.৭৯)। আল-কালাম বিষয়ে য়ূরোপের আধুনিক চিন্তাধারার প্রেক্ষিতে

উদ্ভূত সমস্যাবলীর মুকাবিলার উদ্দেশে শিব্লী ইসলামী 'আকীদাসমূহের প্রতি দৃষ্টি দেন। এই গ্রন্থে তিনি ইসলামের নীতিমালাকে 'আক্ল অনুযায়ী প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং স্বীয় দলীল-প্রমাণকে য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ অপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ করেন। আল-কালামের বিশেষ বিষয়াবলী নিম্নরূপ ঃ আধুনিক 'উলূম ও মাযহাব, 'আক্ল ও মাযহাব, নাস্তিকদের অভিযোগসমূহ ও উহার উত্তর, তাওহীদ, নুবূওয়াত, অলৌকিকতা, নবী ('আ)-দের শিক্ষা ও হিদায়াতের পদ্ধতি, মুহাম্মাদ (স)-এর নুবূওয়াত, আল্লাহ্র যাত ও সিফাত সংক্রান্ত 'আকা'ইদ, 'ইবাদাত, শাস্তি ও পুরস্কার, মানুষের অধিকারসমূহ, ইসলামে নারীর অধিকারসমূহ, উত্তরাধিকারের পদ্ধতি, তা'বীলের রহস্য, আধ্যাত্মিকতা ও অতীন্দ্রিয় বিষয়াদি, 'আলামু'ল-মিছাল, ওয়াহ্য়ি ও ইলহাম, ইসলাম সংস্কৃতি ও প্রগতিবিরোধী নহে, বরং উহার সমর্থক, দীন ও দুনিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক।

শিব্লী ইহা স্বীকার করেন নাই যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান মাযহাবের ভিত্তিকে টলাইতে পারে ; কেননা মানুষ মাযহাব হইতে মুক্ত হইতেই পারে না। ইহা তাহার জন্য এক জন্মগত বস্তু। তিনি ইহাও প্রত্যাখ্যান করেন যে, মুসলমানদের ফাল্সাফা গ্রীক ফাল্সাফা হইতে গৃহীত। শিবলীর বক্তব্য এই যে, মুসলমানগণ গ্রীক ফাল্সাফা হইতে অবশ্যই ফায়দা হাসিল করিয়াছেন, তবে তাঁহারা ইহাতে প্রচুর সংযোজনও করিয়াছেন। 'ইল্ম কালামের এই অবদান সর্বদা স্মরণযোগ্য যে, ইহার কারণে গ্রীকগণ দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করে, ফালসাফা দূরের কথা, মুসলমানগণ গ্রীক মানতিকের ভুলও প্রমাণিত করেন ('ইলমু'ল-কালাম, পৃ. ১১৮)।

সাম্প্রতিককালে মিসর ও উপমহাদেশের কয়েকজন 'আলিম ইসলামী 'আকীদা ও মতবাদের উপর কলম ধরেন। উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় তাহযীব-তামাদ্দুনের আক্রমণ খুবই তীব্র ছিল, মুসলিম দেশসমূহ পতনোন্মুখ ছিল এবং মুসলমানদের নব্য বংশধরের শক্তি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুফানের মুকাবিলায় ক্ষীণ মনে হইতেছিল। য়ুরোপীয় জাতিসমূহ মাযহাব ও রাজনীতিকে দুইটি পৃথক ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল। সর্বত্র বিজ্ঞান ও আধুনিক ফালসাফার জয় জয়াকার ছিল এবং বস্তু পূজারীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাইতেছিল। এই অবস্থা যখন বিরাজ করিতেছিল মিসর হইতে তখন সায়্যিদ জামালু'দ-দীন আফগানী (মৃ. ১৮৯৭ খৃ.) সোচ্চার হন। 'আকা'ইদ বিষয়ে সায়্যিদ জামালু'দ-দীনের দুইটি সংক্ষিপ্ত অথচ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রহিয়াছে ঃ আর্-রাদ্দু 'আলা'দ-দাহ্রিয়্যীন (বৈরূত ১৮৮৬ খৃ.) ও আল-কাদা ওয়া'ল-কাদ্‌র (কায়রো ১৯২৩ খৃ.)। মুসলমানদের মাঝেও বস্তু পূজারীর প্রচারণা চলিতেছিল। আফগানী উহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। বস্তু পূজারীদের (প্রকৃতির ধর্মে বিশ্বাসিগণ) বাতিল 'আকীদাসমূহের প্রত্যাখ্যানে তিনি পূর্ণ লেখনী শক্তি ব্যয় করেন এবং সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যে, মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য ই'তিকাদ (বিশ্বাস) খুবই প্রয়োজন। তিনি লিখিয়াছেন, নিঃসন্দেহে দীন সামাজিক কাঠামোর শৃংখলধারা। উহার অবর্তমানে সমাজ ও সংস্কৃতির ভিত্তি স্থির থাকিতে পারে না এবং এই বাতিল গোষ্ঠী এই শিক্ষাই দেয় যে, সকল দীনী 'আকীদার ধ্বংস সাধন করিতে হইবে। আর্-রাদ্দু 'আলা'দ-দাহ্রিয়্যীন গ্রন্থটি বস্তু পূজারীদের ভ্রান্ত ধারণার প্রত্যাখ্যান ও ইসলামী 'আকীদাসমূহের সমর্থনের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মুহাম্মাদ 'আব্দুহ্ এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, ভারতে অবস্থানকালে ইংরেজ সরকারের জুলুম ও গোমরাহী যাহা আফ্গানী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহার ফলে তাঁহার মনে এক দীনী অনুভূতির সৃষ্টি হয়। তাহারই ফলশ্রুতি তাঁহার এই গ্রন্থ। আফ্গানীর মতে সঠিক সংস্কৃতি হইল উহাই যাহার ভিত্তি 'ইল্ম, আখ্লাক ও মাযহাব, কেবল বস্তুগত উৎকর্ষ নহে। কেবল বড় বড় শহরের নির্মাণ, ধরা প্রাচুর্য অথবা ধ্বংস সাধনকারী যন্ত্রপাতির আবিষ্কার সভ্যতা নহে।

আফগানী জাব্র 'আকীদার বিরোধী ছিলেন। তিনি কা'দা', কা'দ্র ও জাব্র-এর মধ্যের পার্থক্য বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট কাদা' ও কাদ্র-এর 'আকীদা মানুষের মধ্যে দৃঢ়তা ও সাহসিকতার গুণকে শক্তিশালী করে এবং চারিত্রিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে, যেখানে জাব্র-এর মতবাদ কেবল বিদ'আত সায়্যি'আ (খারাপ নূতন কাজ), যাহাকে মুসলিম সমাজে কেহ কেহ নিজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ঢুকাইয়াছে। আফগানী মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির সুর প্রয়োগেরও সমর্থক ছিলেন এবং এই দিক দিয়া আমরা তাঁহাকে যুক্তিবাদীও বলিতে পারি। তাঁহার নিকট ইসলামই হইল একমাত্র মাযহাব যাহা মানুষকে বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগাইবার শিক্ষা দেয় এবং মানসিক সুখ ও সমৃদ্ধি বুদ্ধির সঠিক ব্যবহারের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

আফ্গানীর শাগরিদ মুহাম্মাদ 'আবদুহ্ (মৃ. ১৯০৫ খৃ.)-ও দীনী 'আকা'ইদ ও মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমান কালের সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য তিনি ইজতিহাদের দরজা মুক্ত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার নিকট ইসলাম নিঃসন্দেহে চিন্তা ও গবেষণার মাযহাব। প্রাচীন ধর্মসমূহ মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রতি আবেদন জানাইয়াছে, অন্যদিকে ইসলাম মানুষের বুদ্ধি ও বিবেককে সম্বোধন করিয়াছে। মুহাম্মাদ 'আবদুহ্ জাব্র-এর মুকাবিলায় মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার প্রবক্তা ছিলেন ঃ যদি মানুষের কর্ম স্বাধীনতা না থাকে, তবে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ সংক্রান্ত আহ্কাম নিরর্থক প্রতিপন্ন হইবে। মানুষ নিজের কাজের নিজেই অর্জনকারী (কাসিব), অবশ্য আল্লাহ্র ক্ষমতা মানুষের ক্ষমতাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। মানুষের ক্ষমতা সীমিত, আল্লাহ্র ক্ষমতা অসীম ও পূর্ণ। ইসলাম জাব্র-এর ধর্ম নয়, মুহাম্মাদ 'আবদুহ্-এর মতে ভাল-মন্দ বুদ্ধি দ্বারা নির্ণেয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক নবী ও রাসূলের প্রয়োজন। কেননা কোন্ কোন্ কাজে কি উপকার বা ক্ষতি সকল মানুষের পক্ষে শুধু বুদ্ধির সাহায্যে তাহা জানা সম্ভব নহে এবং এমন অনেক কাজ আছে যাহার উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া শুধু নিজ বুদ্ধিতে মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে ; এই কারণে নুবূওয়াতের প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট।

মুহাম্মাদ 'আব্দুহ মিসরে সংস্কারক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। চরিত্রের পরিশুদ্ধি ছিল তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহার মতে মক্সূদ হাসিলের ব্যাপারে একমাত্র মাযহাবই প্রধান ভূমিকা পালন করিতে পারে। তিনি তাঁহার রচিত কু'রআন মাজীদের তাফসীরে আল-কু'রআনের শুধু শাব্দিক অর্থ গ্রহণ এবং নরত্বারোপবাদ মতবাদের বিরোধিতা করিয়াছেন। তিনি কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ ব্যতীত কেবল শাব্দিক অর্থের উপর ভিত্তি করিয়া সম্পন্ন করিবার সমর্থক ছিলেন না। তাঁহার তাফসীরে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মুহাম্মাদ 'আবদুহ্ ইসলামকে আধুনিক যুগের অবস্থাবলীর সহিত সামঞ্জস্য বিধানের সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার মুক্ত চিন্তাধারার দরুন তাঁহার বিরুদ্ধে মিসরীয়

সমাজে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। তাঁহার দুইটি ফাত্ওয়া বিশেষ করিয়া সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় ঃ (১) য়াহূদী ও খৃস্টানদের যবেহকৃত পশুর গোশ্ত মুসলমানদের জন্য খাওয়া বৈধ; (২) ডাক ঘরের সঞ্চয়ী হিসাবে টাকা জমা রাখা এবং ঐ জমার টাকার সুদ গ্রহণ বৈধ।

**'আকীদা সম্পর্কে মুহাম্মাদ 'আব্দুহুর লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীঃ** (১) হাশিয়া 'আলা শার্হি'ল-'আকাইদি'ল-'আদুদিয়্যা, কায়রো ১৮৭৬ খৃ. ; (২) রিসালাতু'ত-তাওহীদ, কায়রো ১৮৭৯ খৃ. (এই গ্রন্থটি একাধিকবার মুদ্রিত হইয়াছে এবং 'ইল্মু'ল-কালাম বিষয়ে নূতন পদ্ধতির প্রসিদ্ধ গ্রন্থ) ; (৩) আল-ইসলাম ওয়া'ন-নাসরানিয়্যাঃ মা'আ'ল-'ইল্ম ওয়া'ল-মাদীনা, কায়রো ১৯০২ খৃ.।

আধুনিক কালে যে সকল মুসলিম চিন্তাবিদ ইসলামী 'আকাইদ ও চিন্তাধারাকে আলোচ্য বিষয় বানাইয়াছেন, তন্মধ্যে 'আল্লামা ইকবালের নাম সর্বপ্রথম আসে। তিনি আধুনিক জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আলোকে ইসলামী কালামশাস্ত্রকে নূতনভাবে সাজাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং কার্যকর পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। তিনি আধুনিক ফালসাফা ও বিজ্ঞান এবং ইসলামী 'আকাইদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে, ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক নহে, বরং প্রাচীন। তিনি ধর্মীয় চিন্তাধারার বিনাশ সাধন করিয়া আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি আধুনিক বিজ্ঞান ও মাযহাব কর্তৃক স্বীকৃত বস্তুসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা অবশ্যই করিয়াছেন, তবে তাঁহার নিকট ফালসাফা এক গতিশীল বস্তু যাহার কোন দলীলই অকাট্য বা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা যায় না। তাঁহার মত, হইল, প্রথমত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মুসলমান করিতে হইবে, অতঃপর মুসলমানদের মধ্যে উহার প্রচলন করিতে হইবে। তাঁহার মতে জ্ঞানের মাধ্যমে, যাহার ভিত্তি হইল অনুভূতি, এক স্বাভাবিক শক্তি হস্তগত হয় যাহাকে দীনের অধীন রাখিতে হইবে কেননা এই শক্তি যদি দীনের অধীন না থাকে তাহা হইলে উহা হইবে। শয়তানী শক্তি। ইকবালের রচনা Reconstruction of Religious Thought in Islam 'ইল্মু'ল-কালামে তাঁহার এক বিশেষ অবদান। ইহাতে তিনি অনেক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। উহার ভূমিকায় তিনি লিখেন, "আমি মুসলিম দার্শনিক ঐতিহ্যের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখিয়া এবং বর্তমান পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখার অগ্রগতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মুসলিম ধর্মীয় দর্শনকে পুনর্গঠনের প্রয়াস পাইয়াছি . . . সেই দিন অধিক দূর নহে, যখন ধর্ম ও বিজ্ঞানের অনেক অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্রে নবতর মিলনভূমি আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে, দার্শনিক চিন্তাজগতে চূড়ান্ত বলিতে কিছু নাই। জ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন আবিষ্কারের পথ যখন খুলিয়া যাইবে তখন এই সকল বক্তৃতায় যে মতামত উল্লিখিত হইয়াছে উহার তুলায় অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য মতামত উদ্ভাবিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। আমাদের কর্তব্য হইল আমরা যেন মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রতি দৃষ্টি রাখি এবং উহার সম্পর্কে মুক্ত ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করি।"

এই মুক্ত ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর অর্থ হইল, যখনই কোন নূতন জ্ঞানের আবিষ্কার হয় তখন উহা হইতে এমন দৃষ্টিভঙ্গী যেন গ্রহণ না করা হয় যাহা ধর্মীয় মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী হইবে। মুক্ত ও স্বাধীনতার অর্থ কখনও ইহা নহে যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফলাফল ও চিন্তাধারা হইতে এমন কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে যাহা ধর্মীয় 'আকাইদ অস্বীকার এবং প্রত্যাখ্যানের কারণ হইতে পারে। (ইকবাল কা' ইল্ম কালাম, পৃ. ১৭)। ডক্টর 'ইশরাত হুসায়ন Metaphysics of Iqbal-এ লিখিয়াছেন, "বিংশ শতাব্দীতে ইকবাল সম্ভবত ইসলাম ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সর্বাধিক নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা চালান। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হইল, তিনি কালামশাস্ত্রে নবরূপ প্রদান করেন। তিনি সেই কাজই করিয়াছেন যাহা কয়েক শতাব্দী পূর্বে ইসলামের প্রখ্যাত কালামবিদ নাজ্জাম ও আল -আশ্'আরী সম্পাদন করিয়াছিলেন যখন গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার হইয়াছিল।"

ইকবাল চিন্তা ও দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করেন, যেমন দর্শন ও তাসাওউফ, তাওহীদ ও রিসালাত, অধিবিদ্যা (metaphysics), ভাল ও মন্দ নির্ণয় সংক্রান্ত আলোচনা, অগ্রগতি (ইর্তিকা'), অদৃষ্টবাদ ও ইচ্ছার স্বাধীনতা (জাব্র ও ইখ্তিয়ার)-এর মাস'আলা, জীবন নির্বাহ ও সমাজ (মা'ঈশাত ওয়া মু'আশারাত), খুদী মতবাদ (নাজ রিয়া-ই) খূদী), মর্দ-ই মু'মিন, ইন্সান-ই কামিল, বি'ছাত, নবীর আবির্ভাব, মু'জিযাত, ধর্ম ও রাজনীতি (দীন ওয়া সিয়াসাত), গুলামী, দেশপ্রেম এবং ইসলামী ঐক্য (ওয়াতানিয়াত ওয়া ইত্তিহাদ-ই ইসলাম), ইত্যাদি। ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তু নিম্নরূপ ঃ জ্ঞান ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, দর্শনের চোখে প্রত্যাদেশমূলক ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, আল্লাহ্ সম্বন্ধে ধারণা এবং 'ইবাদতের মর্ম, মানুষের খূদী ও মাস'আলা-ই জাব্র ওয়া কাদ্র, ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা, ইজ্তিহাদের মাস'আলা ও ধর্ম কি সম্ভব।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইমাম আবূ হানীফা, আল-ফিক্হু'ল-আক্বার (মুল্লা আলী আল-কারীর ব্যাখ্যাসহ), কায়রো ১৩৭৫ হি.; (২) আল-মাতুরীদী, শারহু'ল-ফিক্হি'ল-আক্বার, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২১ হি. ; (৩) আল-আশ'আরী, মাকালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন, ইস্তাম্বুল ১৯৩০ খৃ. (উর্দূ অনু., মুহাম্মাদ হানীফা দাবী, লাহোর) ; (৪) ঐ লেখক, আল-ইবানা 'আন্ উসূলি'দ্-দিয়ানা, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৯ হি. ; (৫) ঐ লেখক, رسالة فى استحسان لخوض فى علم الكلام, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৩ হি.; (৬) ঐ লেখক, كتاب اللمع فى الرد على اهل الزيغ والبدع, বৈরূত ১৯৫২ খৃ. (ইংরাজী অনূ.সহ) ; (৭) আশ-শাহ্রাস্তানী, আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, কায়রো ১৩৬৮ হি. ; (৮) ঐ লেখক, নিহায়াতু'ল-আকদাম ফী 'ইলমি'ল-কালাম (ইংরেজী অনু. সহ, A. Guillaume), লন্ডন ১৯৩৪ খৃ. ; (৯) ইব্ন খালদূন, মুকাদ্দামা, মুস্তাফা মুহাম্মাদ প্রেস, কায়রো (উর্দূ অনু. সা'দ হাসান য়ূসুফী, করাচী সং.) ; (১০) ইবনু'ন-নাদীম, আল-ফিহরিস্ত (আল-মাকালাতু'ল-খামিসা), কায়রো ১৩৪৮ হি. ; (১১) আল-ফারাবী, ইহ্সা'উ'ল-'উলূম, কায়রো ১৯৪৮ খৃ. ; (১২) আল-গাযালী, ইহ্য়া' 'উলূমি'দ-দীন, কায়রো ১৩৪৮ হি. ; (১৩) ঐ লেখক, ফায়সালু'ত-তাফরিকা বায়না'ল-ইসলাম ওয়া'য-যানদাকা, কায়রো ১৯৬১ খৃ. ; (১৪) ঐ লেখক, কিতাবু'ল-ইকতিসাদ ফি'ল-ই'তিকাদ, কায়রো সং. ; (১৫) ঐ লেখক, আল-মুন্কিয মিনা'দ্-দালাল, আল-জামি'আতু'স-সূরিয়া প্রেস, ১৩৭৬ হি. ; (১৬) ঐ লেখক, তাহাফাতু'ল-ফালাসিফা, সম্পা. সুলায়মান দুনয়া, কায়রো ১৩৬৬ হি. ; (১৭) ফাখরু'দ-দীন আর-রাযী, কিতাবু'ল-আরবা'ঈন ফী উসূলি'দ-দীন, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৫৫

হি.; (১৮) ঐ লেখক, কিতাবু'ল-মুহাস্সাল, কায়রো ১৩২৩ হি. ; (১৯) ঐ লেখক, আল-মাবাহিছু'ল-মাশরিকিয়্যা, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৪৩ হি.; (২০) 'আবদু'ল-কাদির আল-বাগদাদী, আল-ফারকু বায়না'ল-ফিরাক, কায়রো ১৩৪৮ হি. ; (২১) ঐ লেখক, উসূলু'দ-দীন, ইস্তাম্বুল ১৩৪৬ হি. ; (২২) আবু'ল-বারাকাত আল-বাগদাদী, কিতাবু'ল-মু'তাবার, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৬৫ হি. ; (২৩) ইব্ন হায্ম, আল-ফাস্ল ফি'ল-মিলাল ওয়া'ল-আহওয়া' ওয়া'ন-নিহাল, কায়রো ১৩১৭ হি.; (২৪) ইব্ন রুশ্দ, তাহাফুতু'ত-তাহাফুত, সম্পা. সুলায়মান দুনয়া, কায়রো ১৯৬৪ খৃ. ; (২৫) ঐ লেখক, ফাসলু'ল-মাকাল, লাইডেন ১৯৫৯ খৃ. ; (২৬) ঐ লেখক, আল-আশফু'আ মাহিজি'ল-আদিল্লা, তা. বি. ; (২৭) ইব্ন তায়মিয়্যা, আল-'আকীদাতু'ল-ওয়াসিতিয়া, কায়রো ১৩৪৬ হি. ; (২৮) ঐ লেখক, আল-ঈমান, বৈরূত ১৩৯১ হি. ; (২৯) ঐ লেখক, মিনহাজু'স-সুন্নতি'ন-নাবাবিয়্যা, কায়রো ১৩২১ হি. ; (৩০) আল-জুওয়ায়নী, আল-ইরশাদ, তা. বি. ; (৩১) আল-বায়দাবী, তাওয়ালি'উ'ল-আওয়ার, তা. বি. ; (৩২) আল-জুরজানী, শারহু'ল-'আকা'ইদি'ন-নাসাফিয়্যা, লখনৌ ১৩০৫ হি. ; (৩৩) ঐ লেখক, শারহু'ল-মাকাসিদ, ইস্তাম্বুল ১৩০৫ হি. ; (৩৪) আত-তাহাবী, কাশ্শাফু ইসতিলাহাতি'ল-ফুনূন, ১খ, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ. ; (৩৫) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনূন, ইস্তাম্বুল, ১৩১১ হি. ; (৩৬) 'আবদু'ন-নাবী আহমাদ নগরী, দাসতূরু'ল 'উলামা', হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৯-১৩৩১ হি.; (৩৭) 'উমার ফাররূখ, তা'রীখু'ল-ফিকরি'ল-'আরাবী, বৈরূত ১৩৮২ হি. ; (৩৮) আল-হাসান ইব্ন 'আবদি'ল-মুহসিন আবূ 'উযবা, والروضة البهية فيما بين الاشاعرة والماتريدية, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২২ হি. ; (৩৯) মীর 'আলী হাসান খান, আল-কা'ইদ ইলা'ল-'আকা'ইদ, ভূপাল ১২৯৯ হি. ; (৪০) Goldziher, আল-'আকীদাতু ওয়া'শ-শারী'আতু ফি'ল-ইসলাম (টীকা অনু.) 'আলী হাসান 'আবদু'ল-কাদির ও অন্যান্য) মুদ্রণ, কায়রো; (৪১) আহমাদ আমীন, দুহা'ল-ইসলাম, ৩খ, মিসর ১৯৬২ খৃ.; (৪২) ঐ লেখক, জুহ্রু'ল-ইসলাম, ৪খ, কায়রো ১৯৬৪ খৃ. ; (৪৩) মুহাম্মাদ আবূ যুহরা, আল-মাযাহিবু'ল-ইসলামিয়্যা (উর্দূ অনু. গুলাম আহমাদ হারীরী, ১৯৭০ খৃ. ; (৪৪) আহমাদ ফারীদ আর-রিফা'ঈ, 'আসরুল-মা'মূন, ১খ, কায়রো ১৩৪৬ হি. ; (৪৫) لويس غردية فلسفة الفكر الديني بين الاسلام والمسيحية ، وفنو اتى (অনু.) সুব্হী 'আস-সালিহ' প্রমুখ), বৈরূত ১৯৬৭ খৃ. ; (৪৬) সিদ্দীক হাসান খান, আবজাদু'ল-'উলূম, ভূপাল ১২৯৫ হি. ; (৪৭) হাসানু'ল-বান্না', আল-'আকা'ইদ, কায়রো ১৩৭১ হি. ; (৪৮) মুহাম্মাদ 'আবদুহ, রিসালাতু'ত-তাওহীদ, কায়রো ১৩৬৫ হি. ; (৪৯) 'আবদু'ল-হায়্যি আল-হাসানী, আছ-ছাকাফাতু'ল-ইসলামিয়্যা ফি'লহিন্দ, দামিশ্ক ১৩৭৭ হি. ; (৫০) আল-বায়হাকী, কিতাবু'ল-আসমা' ওয়া'স-সিফাত, ইলাহাবাদ ১৩১৩ হি. ; (৫১) জামালু'দ-দীন আদ-দাওয়ানী, শারহু'ল-'আকা'ইদি'ল-'আদুদিয়্যা (পাণ্ডু. কিতাব খানা-ই দানিশগাহ, পাঞ্জাব, লাহোর) ; (৫২) হুসায়ন ইব্ন ইস্কান্দার, الجوهرة المنيفة فى شرح وصية الامام ابى حنيفة। হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২১ হি. ; (৫৩) শিব্লী নু'মানী, 'ইল্মু'ল-কালাম, করাচী ১৯৬৪ খৃ. ; (৫৪) মুহাম্মাদ ইদ্রীস কান্দেহ্লাবী, 'ইল্মু'ল-কালাম, মুলতান ১৩৭০ হি. ; (৫৫) যুবায়দ আহমাদ, Contribution of India to Arabic Literature (উর্দূ অনু. عربى ادبيات مين پاك و هند كا حصة শাহিদ রায্যাকী, লাহোর ১৯৭৩ খৃ.) ; (৫৬) জামালু'দ-দীন আফগানী, রাদ্দ নেচারিয়াত, লাহোর ; (৫৭) সায়্যিদ 'আবদুল্লাহ, سر سيد احمد خان اور انكى نامور رفقاء লাহোর ১৯৬০ খৃ. ; (৫৮) 'আলী 'আব্বাস জালালপুরী, ইক্বাল কা 'ইল্ম কালাম, লাহোর ১৯৭২ খৃ. ; (৫৯) আবু'ল-হাসান 'আলী নাদাবী, নুকূশ ইক্বাল, করাচী ১৩৯৩ হি. ; (৬০) শায়খ মুহাম্মাদ ইক্রাম, মওজ-ই কাওছার, লাহোর ১৯৫৮ খৃ. ; (৬১) মুহাম্মাদ ইক্বাল, The Development of Metaphysics in Persia, লন্ডন ১৯০৮ খৃ. ; (৬২) ঐ লেখক, Reconstruction of Religious Thought in Islam, লাহোর ১৯৬০. ; (৬৩) M. M. Sharif, A History of Muslim Philosophy, দুই খণ্ডে, ১৯৬৩ খৃ. ; (৬৪) W. Montgomery Watt, Islamic Philosophy and Theology, Islamic Surveys, Edinburgh ১৯৬২ খৃ.; (৬৫) History of Philosophy-Eastern and Western ; (৬৬) A. J. Arberry, Revelation and Reason in Islam, লন্ডন ১৯৫৭ খৃ.; (৬৭) E.E. Elder, A Commentary on the Creed of Islam, নিইয়র্ক ১৯৫০ খৃ. ; (৬৮) D. B. Macdonald, Development of Muslim Theology, লাহোর ১৯৬০ খৃ. ; (৬৯) K. C. Seely, Muslim Schism and sects, Columbia University Press ১৯৩০ খৃ. ; (৭০) A. S. Tritton, Muslim Theology, Bristol ১৯৪৭ খৃ, ; (৭১) D. Oleary, ফালসাফা-ই ইসলাম, উর্দূ অনু. ইহ্সান আহমাদ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৪৬ খৃ. ; (৭২) The New Ency. Brit. 15th Ed., ৯খ, ১০১২ প. ; (৭৩) E.I.$^2$, আল-কালাম প্রবন্ধ।

আমীনুল্লাহ ওয়াছীর (দা.মা.ই.)/মুহম্মদ ইসলাম গণী

**'ইল্মু'ল-কালাম (علم الكلام)** ঃ (শী'আ মতানুযায়ী) ইসলাম যেহেতু বিশেষ ও নির্দিষ্ট কিছু 'আকীদা ও 'আমলের আহ্বান জানাইয়া থাকে—এই কারণে রাসূলুল্লাহ (স) লোকদের বাতিল 'আকীদা প্রত্যাখ্যান করেন, পূর্ববর্তী আম্বিয়া' কিরাম ('আ)-এর শিক্ষার প্রচলন করেন এবং সকল বিশ্বাসীকে ইসলামী 'আকীদাসমূহ গ্রহণের আহ্বান জানান। ইহার প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন মাযহাবের কর্ণধারগণ সমালোচনা ও প্রত্যাখ্যানের নীতি অবলম্বন করেন। সন্দেহ পোষণকারীগণ আপত্তি করেন এবং বিশেষজ্ঞগণ প্রমাণ দাবী করেন। কুরআন ও হাদীছসমূহে এই অবস্থার চিত্রসমূহ পরিলক্ষিত হয় ঃ

তাওহীদ ও তাওহীদের মাসা'ইল, তাওহীদের প্রমাণ, আল্লাহ্র গুণাবলী, রিসালাত ও নবীগণের গুণাবলী, ইমামাত, কিয়ামত ও উহার বিভিন্ন প্রকারের মাস'আলাসমূহের উপর কুরআন মাজীদে ইব্লাগ (পৌঁছা), ইফ্হাম (বুঝা), ইস্তিদলাল, (প্রমাণ), জওয়াব ও জওয়াবের আলোচনা সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত পাওয়া যায়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ (স), সাহাবা (রা) ও দীনের ইমামদের নিকট লোকেরা 'আকা'ইদ সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্ন করিয়াছেন এবং তাঁহারা উহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এই সকল আলোচনা হাদীছের গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত আছে। ইসলামী দা'ওয়াত মক্কায় সাধারণ

সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছিল। মদীনায় য়াহূদ ও খৃষ্টানদের ন্যায় শিক্ষিত লোকদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। অতঃপর ইহাকে সাবী ও দাহ্রীয়াদের মুকাবিলারও সম্মুখীন হইতে হয়। সিরিয়া এবং ইরাকে দর্শন ও বিভিন্ন মতবাদের বড় বড় প্রতিষ্ঠান ছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানগণ ও তাঁহাদের সমর্থকগণ নূতন নূতন মাস'আলা উত্থাপন করেন। বাগদাদে বিশ্বের বিভিন্ন মাযহাবের প্রতিনিধিদের যাতায়াত হইতে থাকিলে বিরোধী মাযহাব ও 'আকীদার প্রধানগণ ইসলামী 'আকীদাসমূহে সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি করিত এবং নিজেদের 'আকীদাসমূহের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পায়। এইভাবে স্থান, কাল ও মনমানসিকতার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আলোচনা ও পর্যালোচনার ক্ষেত্র ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে এই বিষয়ে মৌখিক ও লিখিত উপকরণের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের আলোচনার সাধারণ ও মৌলিক বিষয়গুলির সংকলন আরম্ভ হয় এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর সমাপ্তি ঘটিতে ঘটিতে এই বিষয়টি পৃথক অস্তিত্ব লাভ করে। সুতরাং তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত জাদাল ওয়া নাজ্'র ও কালাম এই ধরনের নাম মানুষের মুখে উচ্চারিত হইতে থাকে। এই নাম উক্ত বিষয়ের বিভিন্ন দিকের সন্ধান দেয়।

মুহাম্মাদ আসিফ আল-হুসায়নী 'উলূমু'ল-কু'রআনের সংজ্ঞায় লিখিয়াছেন ঃ انه مسائل مشتملة على العقائد الدينية الحاصلة من ادلتها اليقينية। অর্থাৎ উক্ত 'ইল্ম দ্বারা সঠিক দলীল-প্রমাণের সাহায্যে অর্জিত দীনী 'আকা'ইদ ও তদসংক্রান্ত মাস'আলাসমূহকে বুঝায়। উহার মুকাবিলায় মাবদা' এই মা'আদ-এর অবস্থাবলী সম্পর্কে গবেষণা ও আলোচনা এই নামটি পূর্ববর্তীদের (মুতাকাদ্দিমূন) মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল (সিরাতু'ল-হাক্ক, ১খ, ৭)।

আবূ মানসূর আহমাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন আবী তালিব আততাব্রাসী আল-ইহ্তিজাজ গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (স) ও আ'ইম্মা-ই মা'সূমীন (বেগুনাহ)-এর সেই সকল বর্ণনা ও হাদীছ একত্র করিয়াছেন যাহাতে ইসলাম বিরোধীদের সহিত ইসলামী 'আকীদাসমূহের উপর আলোচনা হইয়াছে। এই গ্রন্থ দ্বারা 'ইল্ম কালামের বিষয়বস্তু ও আলোচনাসমূহের প্রাথমিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং বার (১২) ইমামের মৌলিক অবদানসমূহও জানা যায়।

তাওহীদ অস্বীকারকারিগণ, জাব্র ওয়া ইখতিয়ার, কাদা ওয়া কাদ্র, নুবূওয়াত ও ইমামাত সম্পর্কে আল-কাফী, ইব্ন বায়িওয়াহ (ابن بابويه)-এর গ্রন্থ কিতাবু'ত-তাওহীদ ও সায়্যিদ রাদীর সংকলিত নাহ্জু'ল-বালাগা-তে বর্ণিত বিভিন্ন আলোচনা অধ্যয়ন করিবার পর কোন সন্দেহ থাকে না যে, 'ইল্ম কালাম লেখার সূচনা মদীনাতেই হয় এবং আহ্ল-ই বায়তের ইমামগণ 'উসূল-ই 'আকা'ইদ ('আকীদার মৌল বিষয়সমূহ) ও ব্যাখ্যায় অপেক্ষা রাখে এমন মাস'আলাসমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। তাঁহাদের নিকট দলে দলে ছাত্রদের আগমন ঘটিত এবং তাঁহারা বহু দূর এলাকায় গমন করিয়া উক্ত শিক্ষার প্রচার করিতেন এবং স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পুস্তক রচনা করিতেন। উক্ত লেখকদের মধ্যে প্রাথমিক যুগের কয়েকজন 'আলিমের নাম উল্লেখ করা হইল ঃ (১) 'ঈসা ইব্ন রাওদা, কিতাবু'ল-ইমামার প্রণেতা, যিনি মানসূর 'আব্বাসী (মৃ. ১৫৮ হি.)-র একজন কর্মচারী ছিলেন এবং মানসূ'র হীরাতে ইমামাত বিষয়ে তাঁহার আলোচনা শ্রবণ করিয়া খুবই মুগ্ধ হইয়াছিলেন (আন্-নাজাশী, আর-রিজাল, পৃ. ২০৮)। সায়্যিদ হাসানু'স-সাদার (আশ্-শী'আ ওয়া ফুনূনু'ল-ইসলাম, পৃ. ৮৩) ও মুহ্সিনু'ল-আমীন আল-'আমিলী (আ'য়ানু'শ্-শী'আ, ১/২খ, ৮), 'ঈসা ইব্ন রাওদাকে প্রথম শী'আ মুতাকাল্লিম ও লেখক বলিয়া আখ্যায়িত করেন ; (২) 'আবদু'র্-রাহ্মান ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন জাব্রাওয়ায়হ, আল-কামিল ফি'ল-ইমামার লেখক (আন্-নাজাশী, পৃ. ১৬৪, আ'য়ান আশ্-শী'আ ওয়া ফুনূনু'ল-ইসলাম); (৩) কায়সু'ল-মু'আসি'র, যিনি ইমাম যায়নু'ল-'আবিদীন-এর অন্যতম ছাত্র ছিলেন (আশ্-শী'আ ওয়া ফুনূনু'ল-ইসলাম, পৃ. ৮৫)। সেই সময়ে মুরজি'আ, কাদারিয়্যা ও ইমামিয়্যার ন্যায় চিন্তাশীল গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। পারস্পরিক বিতর্ক ছাড়া অন্যান্য জাতির 'আকা'ইদের মধ্যে তাশ্বীহ, তাজসীম ও সিফাতের নূতন দিক ছিল, ইমামগণ উক্ত দিকসমূহের উপর আলোচনা ও বিতর্কের দ্বার উন্মুক্ত করেন এবং দার্শনিক পদ্ধতি ও যুক্তির ভিত্তিতে কু'রআন মাজীদ এবং হাদীছের আলোকে প্রমাণ পেশ করেন। বর্ণনা শক্তি আলোচনার উপকরণের দিক দিয়া দ্বিতীয় শতাব্দীর যুগ খুবই উর্বর ছিল; (৪) হিশাম ইব্নু'ল-হাকাম (মৃ. আনুমানিক ২০০ হি.), যিনি প্রথম দিকে আবূ শাকির আদ-দীসানীর দলভুক্ত ছিলেন, যাহাকে নাস্তিকতামূলক চিন্তাধারার উৎস বলা যাইতে পারে ; অতঃপর জাবরিয়া গোত্রের প্রধান জাহ্ম ইব্ন সাফওয়ান-এর শিক্ষা লাভ করেন এবং তর্ক-বিতর্কের পদ্ধতি আয়ত্ত করেন। অতঃপর তিনি শী'আ মতবাদ অবলম্বন করিয়া ইমাম জা'ফার আস-সাদিকে'র শিক্ষাচক্রে যোগদান করেন। রাওয়াকীদের ন্যায় হিশাম প্রতিটি বস্তুর শরীর নির্ধারণ এবং প্রতি অংশের বিভক্তির পক্ষপাতী ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি আল্লাহ্র সিফাতের মধ্যে তাখ্লীক (সৃষ্টি)-এর পূর্বে কোন অবস্থা ও ধারণার পক্ষপাতী ছিলেন না। এই দুইটি অভিব্যক্তি আদ-দাসানী ও ইব্ন জাহ্ম-এর প্রতিষ্ঠান হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল ইমাম জা'ফার আস-সাদিক (র)-এর সহিত সম্পর্ক স্থাপনের পর তাঁহার চিন্তা উৎকর্ষ লাভ করে। তিনি ইমাম জা'ফার 'আস-সাদিক (র) ও ইমাম মূসা কাজি'ম (র) হইতে সূক্ষ্ম মাস'আলাসমূহ সম্পর্কে অবগত হন। এই সম্পর্কিত রিওয়ায়াতসমূহ আল-কুলায়নী আল-কাফীর তাওহীদ অধ্যায়ে এবং আস-সাদূক কিতাবু'ত্-তাওহীদ গ্রন্থে সংরক্ষিত করিয়াছেন। 'আবদুল্লাহ্ নামা স্বীয় গবেষণা গ্রন্থ হিশাম ইব্নু'ল-হাকাম ও ফালাসিফাতু'শ-শী'আ-তে হিশামের কালাম সম্পর্কিত শেষ মতামতের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন। হিশাম ইব্ন হাকাম, 'আম্র ইব্ন 'উবায়দা, আবূ ইসহাক আন্-নাজ্জাম, আবু'ল-হুযায়ল আল-'আল্লাফ প্রমুখ মু'তাযিলীদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে অবতীর্ণ হন (ফালাসিফাতু'শ-শী'আ, পৃ. ৫৬৬ ; হিশাম ইব্নু'ল-হাকাম, মুদ্রণ তেহ্রান) এবং 'ইল্ম কালাম বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থসমূহ রচনা করেন। যেমন কিতাবু'ত-তাওহীদ, আর্-রাদ্দু 'আলা আস্হাবি'ল-ইছায়ন, কিতাবু'ল-জাব্র ওয়া'ল-কাদার, কিতাবু'ল-ইসতিতা'আ, কিতাবু'ল-মা'রিফা, কিতাবু'ল-ইমামা, আর্-রাদ্দু 'আলা'য-যানাদিকা ও আর্-রাদ্দু 'আলা'ল-মু'তাযিলা (হিশাম ইব্নু'ল-হাকাম, পৃ. ১০৯-১১০; হায়াতু'ল-ইমাম মূসা, ২খ, ৩০৭) ; (৫) হিশাম ইব্ন সালিম আল-জাওয়ালিকী ; (৬) মুহাম্মাদ ইব্ন নু'মান ; (৭) মু'মিন আত-তাক; (৮) 'আলী ইব্ন ইস্মা'ঈল ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন মুছায়ন আত-তামার (মৃ. ১৭৯ হি.) ; (৯) আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্ন মান্সূর; (১০) আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ

ইব্ন খালীল আল-বাগদাদী আশ্-শাক্কাল অথবা আস্-সাক্কাক ; (১১) আবূ 'আবদিল্লাহ মালিক আল-ইসফাহানী; (১২) আবূ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী আল-'আব্দ, কিতাবু'র-রাদ্দি 'আলা'ল-ইস্মা'ঈলিয়্যার প্রণেতা ; (১৩) কিতাবু'দ-দীন ফি'ল-উসূল-এর প্রণেতা আবূ মানসূর আস্-সারুরাম নীশাপূরী ; (১৪) আবূ সা'ঈদ 'আবদু'ল-জালীল ইব্ন আবি'ল-ফাত্হ মাস'উদ ইব্ন 'ঈসা আল-মুতাকাল্লিম আর্-রাযী।

তৃতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ 'আলিমদের তালিকা ও তাঁহাদের রচনাবলীর উপর আলোচনা খুবই দীর্ঘ (বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. ইব্নু'ন-নাদীম, আল-ফিহ্রিস্ত, পৃ. ২৪৯; আন-নাজাশী, আর-রিজাল; আত-তূসী, আল-ফিহ্রিস্ত; 'আবদুল্লাহ না'মা, ফালাসিফাতু'শ্- শী'আ; মুহ্সিনু'ল-আমীন, আ'য়ানু'শ-শী'আ)। সংক্ষেপে বলা যায়, হারূনু'র-রাশীদের কাল পর্যন্ত মদীনা হইতে বাগদাদ এবং কূফা হইতে কুম্ম পর্যন্ত শী'আ 'ইল্ম কালাম বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। ইল্হাদ, যান্দাকা, ছানাবিয়া, ফালাসিফা, মুজাস্সিমা, জাব্রিয়্যা, খারিজিয়্যা, ইস্মা'ঈলিয়া, না'উবিসিয়্যা, খিতাবিয়্যা, কারামিতা ও গুলাত অনুরূপ অসংখ্য মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল, তন্মধ্যে মু'তাযিলা, আশা'ইরা ও ইমামিয়ার স্থান শীর্ষে ছিল। আর যেহেতু আহ্ল বায়তের ইমামগণ মদীনাতে ছিলেন, সেই কারণে শী'আগণ তাঁহাদের সহানুভূতি লাভ করিয়া আসিতেছিল। বাগদাদে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের প্রসার তখন ঘটে যখন তথায় অনুবাদ প্রতিষ্ঠা (দারু'ত-তারজামা)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার আরম্ভ হয়। সেই যুগের ইমাম মূসা কাজিম (র) মদীনাতেই বাস করিতে থাকেন। আহ্ল বায়তের ইমামগণ পরিবর্তিত অবস্থা ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার মুকাবিলায় বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার করত 'ইল্ম কালামের সম্প্রসারণে অবদান রাখেন।

এদিকে আ'য়ুন ও নাওবাখ্ত-এর বংশধরগণ বাগদাদে নূতন চিন্তাধারার নূতন পদ্ধতিতে জাওয়াব দেন। আ'য়ুন-এর বংশধরের মধ্যে যুরারা ইব্ন 'আয়ন (মৃ. ১৫৯ হি.)-এর নাম ও কর্মতৎপরতা বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার এবং অনুরূপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইলেন নাওবাখ্ত-এর বংশে হাসান ইব্ন মূসা (কিতাবু'র-রাদ্দি 'আলা আসহাবি'ত-তানাসুখ [ইব্ন নাদীম, ২৫১]-এর প্রণেতা এবং আবূ ইসহাক. ইসমা'ঈল ইব্ন ইসহাক ইব্ন আবী সাহ্ল, কিতাবু'ল-য়াকূত [আশ-শী'আ ওয়া ফুনূনু'ল-ইসলাম পৃ. ৮৭]-এর প্রণেতা (কিতাবু'ল-য়াকূত-এর ভাষ্য 'আল্লামা হিল্লী লিখেন)। উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয় ছাড়া উক্ত বংশের বিদ্বান ব্যক্তিগণ ফালসাফা, অধিবিদ্যা ও শী'আ 'ইল্ম কালামের ক্ষেত্রে যুক্তিনির্ভর বিশেষ মতবাদ কায়েম করেন ('আব্বাস ইকবাল, নাওবাখ্তী বংশ) আল-কাফী, আত্-তাওহীদ ও তাওহীদু'ল-মুফাদ্দাল। ইহা ছাড়া সালীম ইব্ন কায়সের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে তৎকালীন শী'আদের বুদ্ধিগত প্রবণতা সম্পর্কে কিছুটা জানা যায়। এই তথ্যের ভিত্তিতে শী'আদেরকে প্রথম হইতেই যুক্তিবাদী বলা হইয়া থাকে। ইহাতে আরব কিংবা 'আজাম সংক্রান্ত বিতর্ক নাই, কোন আহ্ল বায়তের ইমামগণ বংশগতভাবে খাঁটি আরব ও বাসিন্দা হিসাবে মাক্কী অথবা মাদানী ছিলেন। আটজন ইমাম স্থায়ীভাবে মদীনাতেই ছিলেন। তাঁহাদের ছাত্রগণ যেখানকারই হউক না কেন, তাঁহারা মদীনাতেই থাকিয়া জ্ঞান অর্জন করিতেন। অতঃপর খাঁটি আরব কালামবিদও কম ছিল না, যেমন বানূ গাফ্ফার-এর আবূ যার, বানূ নাখা'-এর কুমায়ল ইব্ন যিয়াদ, বানূ 'আব্বাস-এর 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস, খুযা'আ-র হিশাম ইব্নু'ল-হাকাম, ফাযারা-র ইব্রাহীম ইব্ন হাবীব, বুজায়লা-র মু'মিন আত্-তাক মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন নু'মান, আয্দ-এর ফাদ্ল ইব্ন শাযান, বানূ শায়বান-এর আল-আ'য়ূন, বানূ হারিছ-এর শায়খ মুফীদ ও বানূ ফাতিমা-র সায়্যিদ মুর্তাদা। এই খ্যাতনামা কিছু ব্যক্তির নাম এই উদ্দেশে উল্লেখ করা হইল যাহাতে এই ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন হয় যে, বুদ্ধি ও যুক্তিনির্ভর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুধু আরবগণ করিয়াছেন।

'ইল্ম কালামের প্রথম আলোচনা হইল আল্লাহ্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি। ইহা হইল সম্পূর্ণ বুদ্ধিগত আলোচনা। ইহারই ভিত্তিতে কুরআন 'আক্ল (বুদ্ধি) ও ফিক্র (চিন্তা)-এর ব্যবহারের আহ্বান জানায়। আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও গুণাবলীর রহস্য, নুবূওয়াত ও নবীর কর্তব্য ও দায়িত্ব, অতঃপর খিলাফাতের পর্যালোচনা, কুরআনের সামগ্রিকতা, ই'জাযের বিষয় ইত্যাদি মুসলিম ইতিহাসের শুরুতেই আমাদের সম্মুখে আসে। এই বিষয়াবলীই ইরাকে প্রসার লাভ করিতে থাকে। ইমাম যায়নু'ল-'আবিদীন (র), ইমাম মূসা কাজিম (র) ও ইমাম 'আলী (র)-র যুগ পর্যন্ত কালাম এক স্বতন্ত্র বিষয়ে পরিণত হয়। ইমাম মূসা কাজিম (র) হারূনু'র-রাশীদের যুগে বাগদাদে নীত হন। তৎকালে বাগদাদ চিন্তার ক্ষেত্রে শীর্ষে ছিল। ইমাম মূসা কাজিম (র) নাস্তিকদের মুকাবিলা করেন, নরত্বারোপের (তাজ্সীম) বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি পেশ করেন, খাঁটি তাওহীদের অর্থ প্রকাশ করেন, জাব্র ও কাদার-এর ক্ষেত্রে 'আদলকে দীনের প্রধান মৌল নীতি বলিয়া মত দেন এবং নিজ পূর্বপুরুষের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাখ্যা প্রদান করেন (আল-কাফী, কিতাবু'ত-তাওহীদ; বিহারু'ল-আনওয়ার, কিতাবু'ত-তাওহীদ), আল্লাহ্র ইচ্ছা সংক্রান্ত বিষয় আলোচা করেন (হায়াতু ইমাম মূসা, পৃ. ১২৩), ইসলামে বিভিন্ন দল ও মাযহাবের উদ্ভব রোধ করার চেষ্টা করেন, তাহাদেরকে সত্যের পথ দেখান এবং তাহাদের চিন্তা ও 'আকীদার সংশোধন করেন। কিন্তু সরকার তাহাদের রাজনৈতিক মতলব হাসিলের জন্য জনসাধারণের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, দলাদলি ও অনৈক্যে উৎসাহ দিতে থাকে। ফলে বিতর্ক-বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা-ফাসাদ আরও বিস্তৃতি লাভ করে। খাল্ক কুরআনের মাস'আলার উদ্ভব হয়। আশা'ইরা কুরআনের অবিনশ্বরতার কথা বলেন এবং শী'আ ও মু'তাযিলা কুরআনকে নশ্বর বলেন (আবু'ল-কাসিম আল-খু'ঈ, আল-বায়ান ফী তাফসীরি'ল-কুরআন, পৃ. ৪০৫)।

মা'মূনু'র-রাশীদের যুগে ইমাম 'আলী রিদা (র)-কে ১৯৫ হিজরীর পর মদীনা হইতে খুরাসানে আহ্বান করা হয়। এই কারণে তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর দিকে শী'আদের চিন্তার কেন্দ্র খুরাসানে স্থানান্তরিত হয়—যেখানে কুম্ম শহর দীর্ঘ দিন হইতে আবূ মূসা আল-আশ'আরীর বংশধর ও 'আরব গোত্রসমূহ কর্তৃক আবাদ ছিল। এখানকার 'আরব গোত্রসমূহের আহ্ল বায়তের ইমামদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এইভাবে খুরাসা ও রায়-এর সম্পর্ক বাগদাদের সহিত স্থাপিত হয় এবং ধীরে ধীরে শী'আ 'আকা'ইদের বিষয়বস্তুতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। ইমাম মুহাম্মাদ তাকী (র), ইমাম 'আলী নাকী (র) ও হাসান 'আসকারী (র) বাগদাদে ও সামাররাতে ছিলেন। সুতরাং শী'আ মতবাদের তৃতীয় যুগ বাগদাদের সহিতই সম্পৃক্ত থাকে। এইখানে ফিক্হ, তাফসীর ও কালামের উপর গবেষণাকারী বিশেষ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মনীষী ছিলেন ঃ (১) য়ূনুস ইব্ন 'আবদি'র-রাহ্মান কুম্মী (মৃ. ২০৮ হি.) যিনি গুলাত-এর

প্রত্যাখ্যানে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন (খানদান-ই নাওবাখ্ত, পৃ. ৮২) ; (২) আবূ সাহল ইসমা'ঈল ইবন নাওবাখ্তী (মৃ. ৩১১ হি.) ; (৩) আবূ জা'ফার ইবন কুব্বা (মৃ. ৩১৯ হি.), কিতাবু'ল-আনসাফ প্রণেতা (দ্র. ইবন আবি'ল-হাদীদ); (৪) ফাদল ইবন শাযান আযদী নীশাপূরী (মৃ. আনুমানিক ২৫৫ হি.), কালামের বহু গ্রন্থের রচয়িতা (দ্র. ইবন নাদীম ; কাশী ; আন-নাজাশী); (৫) মুহাম্মাদ ইবন য়া'কূব আল-কুলায়নী (মৃ. ৩২৯ হি.), যিনি 'ইল্ম কালাম বিষয়ে পৃথক গ্রন্থ আর-রাদ্দু 'আলা'ল-কারামিতা ছাড়া আল-কাফীর প্রথম খণ্ডে (৯ 'আল-উসূল') 'ইল্ম কালামের যাবতীয় মাস'আলা সন্নিবেশিত করেন। উহাতে 'কিতাবু'ত-তাওহীদ' ও 'কিতাবু'ল-হুজ্জা' শীর্ষক অধ্যায়ে আহ্ল বায়তের ইমামদের হাদীছসমূহ সংকলন করিয়া প্রথম যুগের মাস'আলাসমূহের উপর শী'আ মতবাদকে ব্যক্ত করিয়াছেন ; (৬) 'আলী ইবন হুসায়ন আল-মাস'উদী আল-মু'আররিখ (মৃ. ৩৪৬ হি.) যিনি 'ইল্ম কালামের 'আলিম ও লেখকও ছিলেন—তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের মধ্যে আল-ইবানা 'আল উসূ লি'দ-দিয়ানা; আল-মাসা'ইল ওয়া'ল-'ইলাল ফি'ল-মাযাহিব ওয়া'ল-মিলাল ; আল-বায়ানা ফী আস্মা-'ইল্লাহি তা'আলা ; আল-ঈসতিবসার ফি'ল-ইমামা ও ইছ্বাতু'ল-ওয়াসিয়্যা ফি'ল-ইমামা (নাজাফ সং.) গ্রন্থসমূহ প্রসিদ্ধ ; (৭) আবু'ল-কাসিম 'আলী ইবন আহমাদ আল-কূফী (মৃ. ৩৫২ হি.) ; (৮) আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইবন জারীর ইবন রুস্তাম আমিলী, আল-মুসতারশিদ ফি'ল-ইমামা (নাজাফ সং) ; (৯) মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ জুনায়দ ইসকাফী, তাবসি-রাতু'ল-'আরিফ, নূরু'ল-য়াকীন ওয়া ইযালাতু'ল-বায়ন-এর লেখক ; (১০) জা'ফার ইবন মুহাম্মাদ ইবন কাওয়ালাবিয়া (মৃ. ৩৬৮ হি.) ; (১১) আবূ 'আলী মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-জুনায়দ আস্-সাকাফী (মৃ. ৩৮১ হি.) ; (১২) আশ-শায়খু'ল-মুফীদ মুহাম্মাদ ইবন নু'মান হারিছী 'আকবারী বাগদাদী (মৃ. ৪১৩ হি.,) ; যিনি ছিলেন চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে শী'আ 'ইল্ম কালামের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ও নূতন চিন্তার উদ্ভাবক। সূফীদের পূর্বে কালাম সংক্রান্ত মাস'আলাসমূহে দিরায়াত-এর সংমিশ্রণ এতদূর ছিল যে, বর্তমান কালের পাঠক সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জটিলতা বোধ করে। আল-কুলায়নীর উসূলু'ল-কাফী ও আস-সাদূক (মৃ ৩৮১/৯৯১)-এর আত-তাওহীদ হইতে যুগের চিন্তাধারা, রিওয়ায়াত ও প্রবণতার ধারণা পাওয়া যায়।

শায়খু'ল-মুফীদ উদার মনোভাব লইয়া সকল বিরোধমূলক চিন্তাধারা বিশেষ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন, সকল দলের সহিত মিলিত হন, যাবতীয় চিন্তাধারার প্রমাণ সংগ্রহ করেন এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে এই সকল বিষয় প্রকাশ করেন। বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার সম্পর্কিত আলোচনা, বিতর্কের আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়কে সরল রূপ দান করেন এবং জ্ঞান ও শাস্ত্র সম্পর্কিত এই সব আলোচনায় ও বর্ণনায় দুর্বোধ্যতা কমাইয়া আনেন। তাঁহার প্রতিপক্ষ এমন কি শত্রুরাও তাঁহার যোগ্যতার প্রশংসা করিতেন। ইবনু'ন-নাদীম (আল-ফিহ্রিস্ত, ২৫২ ও ২৭৯), ইবন কাছীর (আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া), আয-যাহাবী (দুওয়ালু'ল-ইসলাম), ইবন হাজার আল-'আসকালানী (লিসানু'ল-মীযান), আবূ হায়্যান (আল-ইনতাজ ওয়াল-মুওয়ানীসা) ও আল-খাতীব আল-বাগদাদী (তা'রীখ বাগদাদ) শায়খ সূফীদের পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি শী'আ 'ইল্ম কালামের সংকলন ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রাখিয়াছেন। শায়খ মুফীদ 'ইল্ম কালাম বিষয়ে প্রায় চল্লিশটি গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন (আ'য়ানু'শ-শী'আ, ফালাসিফাতু'শ-শী'আ), যাহাতে ফালাসিফার বক্তব্যসমূহ ও মতবাদের উপরও আলোকপাত করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আওয়া'ইলু'ল-মাকালাত ফি'ল-মাযাহিব ওয়া'ল-মুখ্তারাত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য (পৃ. ১১৯, বাহ্‌ছ জাওয়াহির ওয়া আ'রাদ)। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইল ঃ الفرق بين الشيعة فيما نسب به الى التشيوع المعتزلة فيما استحقت به اسم الاعتزال অর্থাৎ প্রথমে আলোচনার বিষয়বস্তু স্পষ্টকরণ, এ বিষয়ে বিরাজমান সন্দেহসমূহ দূরীকরণ ; দ্বিতীয় পর্যায়ে ইমামিয়া ও গায়র ইমামিয়া, শী'আ ইছনা 'আশারিয়া ও অন্যান্য দলের পারস্পরিক মতভেদ ও পার্থক্যসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা; তৃতীয় আলোচনায় মু'তাযিলা ও ইমামিয়ার সেই সকল মতভেদ সম্বলিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত যাহাতে রহিয়াছে নবূওয়াত এবং ইমামাত সংক্রান্ত মাস'আলাসমূহ। চতুর্থ আলোচনার মূল বক্তব্য হইল শায়খের মতামত এই অধ্যায়ে তিনি তাঁহার মতামতের সপক্ষে আহ্ল বায়ত-এর বক্তব্যসমূহ ও তাঁহার মতের অনুসারী শাস্ত্রবিদদের ও প্রবন্ধকারদের মন্তব্য বর্ণনা করিয়াছে। উক্ত গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা প্রমাণাদিসহ স্থান পাইয়াছে ঃ তাওহীদ, তাওহীদের পর্যালোচনা , সিফাত, 'আদ্ল, লুত্ফ, সালাহ, আসলাহ, নুবূওয়াত ও নুবূওয়াত সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী, ইমামাত ও ইমামাতের পর্যালোচনা, কুরআন, ই'জায কুরআন, কুরআনের বিন্যাস (তারতীব), মা'আদ, ওয়া'দ, ওয়া'ঈদ, আস্মা', আহকামের পরিচয় ও মাসলাক (পথ, পন্থা)-এর বর্ণনা। 'আল-লাতীফ মিনা'ল-কালাম' শীর্ষক অধ্যায়ে সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে যাহা তখনও প্রকৃতপক্ষে 'ইল্ম কালামের অন্তর্ভুক্ত ছিল না; তবে মূল বিষয়ের সহিত উহার সম্পর্ক ছিল, যেমন ফালাসিফা ও উহার বিষয়বস্তুর বর্ণনা।

শায়খ মুফীদ তাঁহার সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী শী'আ মুতাকাল্লিমদের আলোচ্য বিষয় ও 'আকীদাসমূহের পর্যালোচনা করেন এবং উহার উপর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সহজ ভাষায় উপস্থাপন করেন ; যেমন 'আল্লাহ্র দর্শন লাভ' বিষয় সম্পর্কে আলোচনা, "আমার বক্তব্য হইল, চক্ষু দ্বারা আল্লাহ্র দর্শন লাভ সম্ভব নহে। 'আক্ল, কুরআন ও আহ্ল বায়তের ইমামদের (নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত) বক্তব্য দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয়। ইমামিয়ার অধিকাংশ 'আলিম ও সাধারণভাবে মুতাকাল্লিমদের মতও ইহাই, কেবল সেই সকল ব্যক্তি ব্যতীত যাঁহারা হাদীছসমূহের অর্থ অনুধাবন করিতে যাইয়া সন্দেহের সম্মুখীন হইয়াছেন। মু'তাযিলীদের সকলেই ইমামিয়াদের মতের অনুসারী। মুরজি'আ, বহু সংখ্যক খারিজী, যায়দিয়া ও আহ্ল হাদীছের একটি দলও এই একই মত পোষণ করেন। মুশাব্বিহা ও তাঁহাদের সঙ্গী আসহাব সিফাত এই মতের বিরোধী" (আওয়া'ইলু'ল-মাকালাত, পৃ. ৫৯)।

বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত শায়খ সূফীদের মাদ্রাসা সুদূরপ্রসারী কল্যাণকর ফলাফলের উৎসে পরিণত হয়। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে তাঁহার জামাতা ও উত্তরাধিকারী আবূ য়া'লা মুহাম্মাদ ইবন হাসান ইবন হামযা জা'ফার আত-তূসীর নাম প্রসিদ্ধ। সায়্যিদ মুরতাদা 'ইলমু'ল-হুদা (মৃ. ৪৩৬ হি.) স্বীয় শিক্ষকদের কালাম সংক্রান্ত চিন্তা ও মতবাদের উপর আলোচনা করেন, কালামশাস্ত্রকে প্রামাণ্য করিতে প্রয়াস পান, মু'তাযিলীদের সমালোচনা করেন এবং সাহিত্য ও তাফসীর বিষয়ে প্রতিপক্ষের বক্তব্য

ও মতামতের প্রতিবাদ করেন। তিনি
الردعلى يحى (২) ; انقاذ البشر من القضاء والقدر (১)
بن عدى فى اعتراض دليل الم حد فى حدوث الا جسام
جواب الملحدة فى قدم العالم من اقوال المنجمين (৩)
الحدودو الحقائق (৪) ;
(আয-যিকরা আল-আলফিয়া, পৃ. ১৪৯ ও ৭২১) ব্যতীত কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ও চিঠি লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ব্যাপক ও বিস্তারিত গ্রন্থ আশ-শাফী ফি'ল-ইমামা ; ইহা কাদী 'আবদু'ল-জাব্বার ইব্ন আইমাদের প্রশ্নের উত্তরে লিপিবদ্ধ করা হয়। ইহা আরবী সাহিত্য ও শী'আ 'ইল্ম কালামের বিশিষ্ট গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং প্রথম হইতেই মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। সায়্যিদ মুরতাদার শিষ্য ও স্থলাভিষিক্ত শায়খ আবূ জা'ফার আত-তূসী উহার সারমর্ম লিখেন যাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এমনিভাবে তিনি তান্যীহু'ল-আম্বিয়া'-তে (যাহার উর্দু অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে) নবীদের নিষ্পাপ হওয়া ও নুবূওয়াত সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কালামভিত্তিক আলোচনাসমূহ একত্র করিয়াছেন। আল-আমালী গুরারু'ল-ফাওয়া'ইদ ওয়া দুরারু'ল-কালাই'ইদ (দুই খণ্ডে) গ্রন্থটি কয়েকটি আসরের বিবরণ আকারে রচিত। তন্মধ্যে কোন কোন মাজলিস কেবল কালাম ও মুতাকাল্লিমদের ইতিহাস, 'আকা'ইদ সংক্রান্ত মাস'আলা ও বিতর্কের জন্য নির্ধারিত। মু'তাযিলী মতবাদের প্রত্যাখ্যান, যিনদীকদের সহিত বিতর্ক এবং আশ'আরীদের বক্তব্য ও মতামত আল-আমালীতে এত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান যে, উহা দ্বারা ধর্মতত্ত্ববিদদের মতামত ও 'আকা'ইদসম্বলিত কালামশাস্ত্রের একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। সায়্যিদ মুরতাদা শায়খ সূফীদের বক্তব্যসমূহের সহিত অনেক ক্ষেত্রেই একমত হন নাই, যাহার দরুন কোন কোন বিষয়ে পরবর্তী ইমামিয়াগণ তাঁহাকে তীব্রভাবে আক্রমণও করিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার গ্রন্থ আল-আমালী আজও কালাম-এর বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা ও পর্যালোচনার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে সকল দলের মতামত মোটামুটিভাবে স্থান পাইয়াছে।

সায়্যিদ মুরতাদা মু'তাযিলী ও আশ'আরীদের বিপক্ষে যে বিস্তারিত আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন তাঁহার শিষ্য শায়খু'ত-তা'ইফা আবূ জা'ফার আত-তূসী (মৃ. ৪৬০ হি.) উহার সংক্ষিপ্তসার লিখেন এবং আরও অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে বিষয়টির উন্নতি সাধন করেন। মরক্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 'আলাল আল-ফাসী তাঁহার রচিত "আল-মাদ্রাসাতু'ল-কালামিয়্যা, আছারু'শ-শায়খ আত-তূসী ওয়া আরা'উহু'ল-খাস্সা বি-হাযা'ল-'ইল্ম" (আয-যিকরা আল-আলফিয়া লি'শ-শায়খ আত-তূসী, ২খ, ২৫৬) শীর্ষক প্রবন্ধে শায়খ আবূ জা'ফার আত-তূসীর চিন্তাধারার বিস্তারিত পর্যালোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাল্খীসু'শ-শাফী (মুদ্রণ ১৩৮৩ হি.) বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে যাহতে শায়খ আত-তূসী সায়্যিদ মুরতাদার চিন্তাধারাসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে নিজের চিন্তাধারাও প্রকাশ করেন। কিতাবু'ল-গায়বা হইল অন্য একটি গ্রন্থ (তাবরীয ১৩২৪ হি.) যাহাতে ইমাম মাহদীর আলোচনা আছে। মুহাম্মাদ ওয়া'ইজ যাদা-ই খুরাসানী কিতাবু'ল-জুমাল ওয়া'ল-'উকূদ-এর ভূমিকায় শায়খ-এর ষোলটি কালাম সংক্রান্ত গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কিতাবু'ল-মুকাদ্দামা ফি'ল-কালাম গ্রন্থটি মুহাম্মাদ তাকী দানিশ পাঝওয়াহ্ চাহার ফারহাঙ্গ নামা-ই কালামী-র অধীনে অতি সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যাহা শায়খ আত-তূসীর তাফসীর আত-তিব্য়ান ও কালাম সংক্রান্ত আলোচনাসমূহের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য উৎস গ্রন্থ। আছীরু'দ-দীন ইব্ন হায়্যা স্বীয় তাফসীর আল-বাহরু'ল মুহীত (মিসর ১৩৩৮ হি., পৃ. ২১১) গ্রন্থে 'আল্লাহ্র দর্শন লাভ' সংক্রান্ত বিষয়ের উপর আলোচনা করিতে গিয়া লিখেন, وقدرأيت لابى جعفر الطوسى من فضلاء الامامية فيها مجلدة كبيرة ইহার তাৎপর্য হইল, শায়খের চিন্তা ও মতবাদ দূরদূরান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং লোকেরা উহা অধ্যয়ন করিত। শায়খ তূসী বাগদাদ হইতে নাজাফ চলিয়া আসিলে তাঁহার সহিত শী'আ 'ইল্ম কালামের কেন্দ্রও নাজাফ-এ স্থানান্তরিত হয়। এই খানকাহ্র পরিবেশ বাগদাদের ন্যায় ছিল না, যেখানে আশা'ইরা, মু'তাযিলা এবং অন্যান্য 'আকীদার শিক্ষকদের সহিত মুকাবিলা করিতে হইত ও ইমামিয়া 'আলিমদের অধিকাংশ সময় উত্তর প্রদান ও প্রতিরোধে ব্যয় হইত) শায়খ আত-তূসীর পর তাঁহার পুত্র আবূ 'আলী হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। সেই যুগে বাগদাদ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার শিকার হইয়াছিল এবং সিরিয়া, খুরাসা ও মিসরে পৃথক পৃথক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শায়খের ছাত্রগণও ছড়াইয়া পড়ে। তন্মধ্যে আমীনু'ল-ইসলাম আবূ 'আলী ফাদ্ল ইব্ন হাসান তাবরাসী খুরাসানে 'আকা'ইদ ও 'ইল্ম কালামের যথেষ্ট খিদমত করেন। তাঁহার বিখ্যাত তাফ্সীর মাজমা'উ'ল-বায়ান শী'আদের কালাম বিষয়ক চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ। একই যুগে মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন 'আলী আল-ফাত্তাল নীশাপূরী "রাওদাতু'ল-ওয়া'ইজীন"-এর প্রণেতা ও প্রখ্যাত মুতাকাল্লিম ছিলেন।

তখন পর্যন্ত 'ইল্ম কালাম এমন একটি বিষয় ছিল যাহাতে কুরআন ও হাদীছ, মুতাকাল্লিম ও সাহিত্যিকদের বক্তব্য ও 'আলিমদের চিন্তাধারার আলোচনা হইত। তবে হাকীম ও দার্শনিক হুসায়ন ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন সীনা (মৃ. ৪২৮ হি.)-এর চিন্তাধারা ইসলামী বিশ্বে বিস্তার লাভ করে এবং তাঁহার গ্রন্থসমূহ পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়া মন-মস্তিষ্কের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকে। ফলে নব বংশধরের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটে এবং ফালসাফা দুর্নামের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সম্মানের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বূ 'আলী, ইব্ন সীনা, আবূ রায়হান আল-বীরূনী ও 'উমার খায়্যামের শাহী দরবারে ও জনগণের নিকট জনপ্রিয় হওয়ার দরুন তাঁহাদের জ্ঞান ও চিন্তা সংক্রান্ত আলোচনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। 'আলিম সম্প্রদায় তাঁহার বিরুদ্ধে কলম ধারণ করেন, আবার তাঁহার চিন্তাধারাকে সমর্থনও করেন। এই প্রত্যাখ্যান ও সমালোচনার ফলে দুইটি বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হয় ঃ একটি ইমাম গাযালী (র) (মৃ. ৭০৫ হি.)-এর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ ইহ্য়া' উলূমি'দ-দীন এবং দ্বিতীয়টি খাজা নাসীরু'দ-দীন আত-তূসী (মৃ. ৬৭২ হি.)-র গ্রন্থ তাজরীদু'ল-ই'তিকাদ। দ্বিতীয় গ্রন্থটি মূলত শী'ঈ 'ইল্মু'ল-কালাম বিষয়ক গ্রন্থ, কিন্তু অতি সত্বর উহা কালাম-এর পরিবর্তে ফালসাফার উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে (নাযার 'আরশী, পৃ. ৩৪৫)। তাজরীদু'ল-ই'তিকাদ গ্রন্থে প্রথমবারের মত সাধারণ বিষয়সমূহের নামে খাঁটি ফালস'ফাকে আলোচ্য বিষয়ভুক্ত করা হয়।

মনীষী গবেষক তূসীর শিষ্য 'আল্লামা হিল্লী 'ইল্ম কালাম ও ইসলামী ফালসাফা বিষয়ে ন্যূনপক্ষে চল্লিশটি গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে একটি

পুস্তিকা আল-বাবু'ল-হাদী 'আশার (মাতন কালাম) এবং অপরটি বিস্তারিত গ্রন্থ কাশ্‌ফু'ল-মুরাদ ফী শার্‌হি তাজরীদি'ল-ই'তিকাদ। এই দুইটি শী'আ 'ইল্‌ম কালামের প্রসিদ্ধ রচনা এবং দীর্ঘকাল হইতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠ্য তালিকার অপরিহার্য অংশ। যেমনিভাবে তাজরীদু'ল-ই'তিকাদের ব্যাখ্যা কাশ্‌ফু'ল-মুরাদ জনপ্রিয়, তেমনি আল-বাবু'ল-হাদী 'আশার-এর ব্যাখ্যা আন-নাফি' লি-য়াওমি'ল-হাশ্‌র-এর প্রসিদ্ধিও সার্বজনীন। এই ভাষ্যটি মিক্‌দাদু'স-সুয়ূরী আল-হি'ল্লী আল-আসাদী কর্তৃক রচিত। 'আল্লামা হিল্লীর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে নাহ্‌জু'ল-হাক্ক আল-আল্‌ফায়ন, ইসতিক'সা'উ'নাজ্‌র ফি'ল-কাদা' ওয়া'ল-কাদ্‌র, নাহ্‌জু'ল-কারামা ফি'ল-ইমামা, মাকসাদুল-ওয়াসিলীন ও তাসলীকু'ন-নুফূস ইলা হাজীরাতি'ল-কুদু'স গ্রন্থসমূহ হইল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার রচনাশৈলী সাহিত্যধর্মী এবং প্রমাণসমূহ যুক্তিভিত্তিক। তাঁহার বর্ণনা পদ্ধতি 'ইল্‌ম কালামের সহিত ফালসাফার উত্তমরূপে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে অষ্টম শতাব্দী 'ইল্‌ম কালামের পরিপক্বতার ও পরিপূর্ণতার শতাব্দী।

'আল্লামা হিল্লীর পুত্র ফাখ্‌রু'ল-মুহাক্কিকীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান (মৃ. ৭৭১ হি.) আল-কাফিয়াতু'ল-ওয়াফিয়া লিখেন এবং ফাদি'ল মিকদাদ হিল্লী (মৃ. ৮২১ হি.) আন-নাফি' লি-য়াওমি'ল-হাশ্‌র ছাড়াও আল-লাওয়ামি'উ'ল-ইলাহিয়া ফী মাবাহিছি'ল-কালামিয়া ও ইর্‌শাদু'ত-তালিবীন ফী শার্‌হি নাহ্‌জি'ল-মুসতারশিদীন রচনা করেন। এই গ্রন্থসমূহ 'ইল্‌ম কালাম বিষয়ে সুন্দর ও প্রমাণসিদ্ধ বর্ণনার উত্তম নিদর্শন।

ইমামিয়া ও মু'তাযিলা— উভয়ই 'আকা'ইদ-এর ক্ষেত্রে 'আক্‌লকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন এবং কুরআন-হাদীছের সহিত যুক্তিবিদ্যাকেও প্রমাণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই কারণেই উক্ত মতবাদদ্বয়ের কালাম সম্পর্কিত আলোচনা হইল যুক্তিনির্ভর। ইহা ছাড়া শী'আদের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাঁহাদের মুতাকাল্লিমগণ সাধারণত ভাষাবিদ ও কবিতা ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন। এই কারণে তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে সাহিত্যরসও পরিদৃষ্ট হয়। কুমায়ত, সায়্যিদ হিময়ারী, সায়্যিদ রিদা এবং সায়্যিদ মুর্‌তাদা'র দীওয়ানসমূহে বিভিন্ন কালাম সংক্রান্ত মাসা'ইল ছড়াইয়া আছে (দ্র. 'আবদু'ল-হুসায়ন আল-আমীনী, আল-গাদীর)। ইঁহারা ব্যতীত ইরাক, হালাব ও জাবাল 'আমিল-এ এক একজন বড় বড় সাহিত্যিকের আগমন ঘটে এবং তাঁহারা 'ইল্‌ম কালাম বিষয়ে কিছু না কিছু লিখিয়াছেন, বিশেষ করিয়া জামালু'দ-দীন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ হুসায়নী হালাবী (মৃ. ৭৭৬ হি.) ও যায়নু'দ-দীন 'আলী ইব্‌ন য়ূনুস নাবাতী বায়্যাদী (মৃ. ৮৭৭ হি.)। শেষোক্ত ব্যক্তির একটি কবিতা উরজুযা ফি'ল-কালাম ও উহার ব্যাখ্যা ফাতিহুল-কুনূযি মাহ্‌রূযাঃ উল্লেখযোগ্য। এমনিভাবে যাখীরাতু'ল-ঈমান, আস-সিরাতু'ল-মুসতাকীম ইলা মুসতাহাক্কি'ত-তাক্‌দীম ফি'ল-ইমামা الصراط المستقيم الى مستحقى التقديم فى الامامة এবং 'আস্‌রাতু'ল-মানজুদও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

দশম শতাব্দী হিজরীতে ইরান সাফাবী শাসকদের অধীন হইয়া গেলে শী'আ 'উলামা' তুর্কী শাসনের অধীন 'আরব অঞ্চল হইতে হিজরত করিয়া এখানে আগমন করেন। ইহা স্মরণযোগ্য যে, সাফাবী শাসন যেহেতু তায়মূরদের পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এই কারণে 'ইল্‌ম কালামের উপর তাসাওউফের প্রভাবও পড়ে। ধীরে ধীরে শী'আ মুহাদ্দিছ ও মুতাকাল্লিমগণ উহার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং ফালসাফাকে শক্তিশালী করেন। গিয়াছু'দ-দীন মানসূর শীরাযী (মৃ. ৯৪৮ হি.) হুজ্জাতু'ল-কালাম ও রিসালাতু'ল-মাশারিক গ্রন্থে ইহ্‌য়া' উলূমি'দ-দীন-এর বর্ণনাসমূহ প্রত্যাখ্যান করেন। গিয়াছু'দ-দীন শীরাযী ইরান ও উপমহাদেশের মানতিক ও ফালসাফা বিষয়ের শিক্ষকদের প্রধান ছিলেন। তাঁহার ছাত্র ও সন্তানদের মধ্য হইতে কয়েকজন দক্ষিণ হায়দরাবাদ, লাহোর ও আগ্রাতে আগমন করেন এবং এখানকার শিক্ষক হন। গিয়াছু'দ-দীনের পর ইরানে বড় বড় ফাল্‌সাফাবিদ ও মুতাকাল্লিম জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে মীর বাকির দামাদ (মৃ. ১০৪১ হি.); মুল্লা সাদরা (মৃ. ১০৫০ হি.), তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ও শাগরিদ মুল্লা 'আবদু'র-রায্‌যাক লাহিজী (মৃ. ১০৫১ হি.), যিনি মাশারিকু'ল-ইল্‌হাম ফী শারহি তাজরীদি'ল-কালাম ও গাওহার মুরাদ-এর প্রণেতা; মুল্লাা মুহসিন ফায়দ (মৃ. ১০৯২ হি.), যিনি একদিকে الوافى جامع بين الكتب الاربعة প্রণয়ন করেন এবং অন্যদিকে ইহ্‌য়া' উলূমি'দ-দীন ও ফুতূহাত মাক্কিয়ার সারমর্ম লিখেন (তিনি 'ইল্‌ম-কালাম সম্পর্কেও কিছু গ্রন্থ রচনা করেন, যেমন আল-মা'আরিফ, উসূল-ই ই'তিকাদ বার আসাস কিতাব ওয়া সুন্নাত, 'আয়নু'ল-য়াকীন, হাক্কু'ল-য়াকীন, 'ইল্মু'ল-য়াকীন, আল-লুবব্‌, আল-লুবাব ইত্যাদি); ফায়দ-এর সমসাময়িক হইলেন মুল্লা মুহাম্মাদ নাকী ও তাঁহার পুত্র মুল্লা মুহাম্মাদ বাকির মাজালিসী (মৃ. ১১১১ হি.)। শেষোক্ত ব্যক্তি বিহারু'ল-আন্‌ওয়ার গ্রন্থে 'ইল্‌ম কালাম সংক্রান্ত মাসা'ইল-এর উপর আহ্‌ল বায়তের হাদীছসমূহ ও হাক্কু'ল-য়াকীন গ্রন্থে এই বিষয়ের নাকলী ও 'আক্‌লী মাস'আলাসমূহের বর্ণনা সন্নিবেশিত করেন। 'ইল্‌ম কালামের এই যুগ হইল ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের যুগ এবং গাওহার মুরাদ ও হাক্কু'ল-য়াকীন হইল সাধারণ ফারসী ভাষায় 'ইল্‌ম কালামের উত্তম গ্রন্থ। এই যুগে শী'ঈ মুতাকাল্লিমদের মধ্যে এক নূতন চিন্তাধারার প্রবেশ ঘটে এবং তাহা হইল পরিচিতি ('ইরফানী)-মূলক প্রবণতা, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং অত্যন্ত কঠোরতার সহিত 'ইরফানকে তাসাওউফ নাম দিয়া প্রত্যাখ্যান করা হয়।

উপমহাদেশের শী'আ 'ইল্‌ম কালামের নিদর্শন শাসকদের মাযহাবগত বিরোধের দরুন সংরক্ষিত হয় নাই। দশম হিজরী শতাব্দীর প্রথম দিকে সিন্ধু ও দাক্ষিণাত্যের শী'আ শাসন ও দিল্লীতে শী'আদের ক্ষমতার দরুন কিছু লোকের নাম ও অবদান সংরক্ষিত আছে। তন্মধ্যে বাদশাহ হুমায়ুন ও তৎপূর্ব কালের একজন শী'আ 'আলিম সায়্যিদ মুহাম্মাদ রাজান শাহ ইব্‌ন সায়্যিদ (পাঞ্জাবে দাফনকৃত) ও দাক্ষিণাত্যের সায়্যিদ হুসায়নী সায়্যিদ (মুহাম্মাদ তাহির শাহ দাকানী (মৃ. ৯৫২ হি.)-র নাম পাওয়া যায়। তাহির শাহ বুরহান নিজাম শাহ-এর দরবারে সম্মানিত ছিলেন। তিনি বাবু'ল-হাদী 'আশার-এর ভাষ্য লিখেন। তাঁহার পর দাক্ষিণাত্যে বাহ্‌রায়ন, লেবানন ও ইরানের বড় বড় 'আলিমের আগমন ঘটে, যেমন গিয়াছু'দ-দীন মানসূর শীরাযীর বংশধর হইতে নিজামু'দ-দীন (মৃ. ১০৮৬ হি.) ও তাঁহার পুত্র সায়্যিদ 'আলী খান মদীনা হইতে হায়দরাবাদ আগমন করেন। আগ্রা ও লাহোরে গিয়াছু'দ-দীন শীরাযীর ছাত্রদের মধ্য হইতে ফাতহুল্লাহ শীরাযী, আবু'ল-ফাত্‌হ গায়লানী ও তাঁহার সমসাময়িক সায়্যিদ নূরুল্লাহ আশ্‌-শুসতারী ইহ্‌কাকু'ল-হাক্ক-এর প্রণেতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুসতারী কমপক্ষে এক শত পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে তিরিশটি গ্রন্থ কালাম সম্পর্কিত। যেমন (১)

হাশিয়াতু'ল-আনমুযাজ 'আলা মাবহাছি হুদূছি'ল-'আলাম; (২) শারহু ইছবাতি ওয়াজিব; (৩) ইহ্কাকু'ল-হাক্ক ফী রাদ্দি ইব্তালি'ল-বাতিল; (৪) মাসা'ইবু'ন-নাওয়াসিব; (৫) সাওয়ারিমু মুহ্‌রিকা ফী রাদ্দি সাওয়া'ইকি মুহ্‌রিকাঃ; (৬) রিসালাঃ আল-বায়ান হাকীকাত 'ইসমাত; (৭) রিসালাতু ফী রাদ্দি মা কাতাবা বা'দুহুম ফী নাফিয়্যি 'ইস্‌মাতি'ল-আম্বিয়া'; (৮) রিসালাতু ফি'ল-কাদা ওয়া'ল-কাদ্‌র; (৯) গাওহার শাহওয়ার; (১০) আল-লাতা'ইফ ফী বায়ানি উজূবি'ল-লুত্ফ। এই গ্রন্থসমূহে আশা'ইরা ও ইমামিয়াদের কালাম সংক্রান্ত আলোচনার উপর বিস্তারিত বর্ণনা আছে ও উহার অধ্যয়ন দ্বারা তাঁহার উদার দৃষ্টি ও কালাম সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের উপর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। নূরুল্লাহ্‌র ধারণামতে আক্রমণ যেইরূপ প্রচণ্ড হইবে, অনুরূপ উহার দাঁতভাঙ্গা জওয়াবও দিতে হইবে। তাঁহার বংশধরগণও উপমহাদেশে 'ইল্ম কালামের খিদমত করিতে থাকেন। পারস্পরিক দ্বন্দ্বের দরুন উপমহাদেশের 'ইল্ম কালাম দুই শত বৎসর পর্যন্ত ছিল আত্মরক্ষামূলক। যদিও লেখক ও বিশেষজ্ঞগণ সরাসরি কালাম বিষয়ের উপর গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন, কিন্তু প্রতিপক্ষের উত্তরে লিখিত গ্রন্থগুলিই সমাদৃত হয়। সায়্যিদ নূরুল্লাহ লাহোরের কাদী ছিলেন। তিনি লাহোরে শিক্ষা প্রদানও করেন এবং পুস্তক প্রণয়নও করেন। তিনি ছাড়া শায়খ 'আলী হাযীন ইসফাহানী বানারাসী (মৃ. ১১৮১ হি.) ও মুল্লা কামরু'দ-দীন আওরাঙ্গ আবাদী (মৃ. ১১৯৫ হি.)-ও 'ইল্ম কালামের উপর কাজ করেন, কিন্তু ইহকাকু'ল-হাক্ক-এর পর সরাসরি 'ইল্ম কালামের উপর সম্ভবত সর্ববৃহৎ গ্রন্থ হইল গুফরান মা'আব সায়্যিদ দিলদার 'আলী (মৃ. ১২৪৫ হি.)-র 'ইমাদু'ল-ইসলাম (আরবী), যাহাকে সকল কালাম সংক্রান্ত আলোচনার উপর পূর্ববর্তীদের বক্তব্য ও মতামত, প্রমাণ ও আলোচনাসমূহ বিস্তারিতভাবে একত্র করা হইয়াছে। ইহা পাঁচটি বৃহৎ খণ্ডে সন্নিবেশিত ঃ (১) তাওহীদ; (২) কিতাবু'ল-'আদ্‌ল; (৩) কিতাবু'ন-নুবূওয়াত; (৪) আল-ইমামাত; (৫) আল-মা'আদ, প্রথম তিন খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে এবং দুই খণ্ড হস্তলিপি আকারে রহিয়াছে। কিতাবু'ত-তাওহীদের 'আরবী সংক্ষিপ্তসার মাওলানা নাকী প্রস্তুত করেন। 'ইমাদু'ল-ইসলাম ছাড়া তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ ঃ শিহাবুন ছাকিব রাদ্দি ওয়াহ্‌দাতি'ল-ওয়াজূদ; কিতাবু সাওয়ারিম (তুহ্‌ফা-ই ইছনা 'আশারিয়ার ইলাহিয়্যাত অধ্যায়ের উত্তর); ইহ্‌য়া'উ'স-সুন্নাত (মাব্‌হাছ মা'আদ ওয়া রুজআত); খাতিমা-ই সাওয়ারিম (মাবহাছ ইমামাত)। তাঁহার 'ইল্ম কালাম বিষয়ক প্রতিষ্ঠান আজও উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁহার পুত্র সায়্যিদ মুহাম্মাদ (মৃ. ১৩৮৪ হি.) মুনাজিরাঃ ওয়া জাদাল ছাড়াও 'উজালা-ই নাফি'আঃ নামে,আরবীতে 'ইল্ম কালামের উপর একটি পুস্তিকা রচনা করেন। সায়্যিদ দিলদার 'আলীর অন্য পুত্র সায়্যিদ হুসায়ন ও তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে মুফতী মুহাম্মাদ কালী (১৪৬০ হি.), মুফতী মুহাম্মাদ 'আব্বাস (মৃ. ১৩০৬ হি.) ও সায়্যিদ 'আলী ইব্‌ন সায়্যিদ মুহাম্মাদ (মৃ. ১৩১২ হি.) 'ইল্ম কালামের উন্নতি সাধন করেন। তাঁহারা য়াহূদীবাদ, খৃষ্টবাদ ও আর্যবাদের প্রত্যাখ্যানে পুস্তকসমূহ প্রণয়ন করেন এবং তাওহীদ ও নুবুওয়াত সম্পর্কে কিছু নূতন তথ্য পরিবেশন করেন। মুফতী মুহাম্মাদ কালীর পুত্র সায়্যিদ হামিদ হুসায়ন (মৃ. ১৩০৬ হি.) ও পৌত্র সায়্যিদ নাসির হুসায়ন (মৃ. ১৩৬১ হি.) ইসতিকসা'উ'ল-ইফহাম ও 'আবকাতু'ল-আনওয়ার নামীয় বিরাট গ্রন্থদ্বয়ে কালাম ওয়া জাদাল ও রিজাল-ই হাদীছ সম্পর্কিত বহু তথ্য ও তত্ত্ব একত্র করেন। লাহোরে এই পদ্ধতিতে সায়্যিদ আবু'ল-কাসিম হা'ইরী (মৃ. ১৩২৪ হি.) তদীয় পুত্র সায়্যিদ 'আল হা'ইরী (মৃ. ১৩৬৩ হি.) কালাম বিষয়ে কয়েকটি ফারসী ও উর্দূ গ্রন্থ লিখেন। তাঁহার তাফসীর লাওয়ামি'উ'ত-তানযীল গ্রন্থটিতেও কালাম ও জাদাল-এর বহু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন পদ্ধতিতে সায়্যিদ জাহূর হুসায়ন (মৃ. ১৩৫৭ হি.)-এর জামি' হামিদী (দুই খণ্ডে ('আত-তাওহীদ' ও আল-'আদ্‌ল') উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে।

উপমহাদেশের কালামশাস্ত্র প্রথম দিকে শী'আ-সুন্নী বিবাদের আকারে অস্তিত্বে আসে এবং প্রসার লাভ করে, কিন্তু পরবর্তীকালে যখন খৃষ্টবাদ ও নাস্তিক্যবাদের প্রচার ও প্রসার হইতে থাকে তখন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একদল পণ্ডিত 'ইল্ম কালামের প্রতি আকৃষ্ট হন। উহার সূচনা প্রাচীন পদ্ধতিতে হয় অর্থাৎ লোকেরা আর্য, খৃষ্টান ও য়াহূদী লেখকদের মূল গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করে; হিব্রু, ইংরেজি ও আধুনিক ফালসাফা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয় এবং নূতন চিন্তাধারা অধ্যয়নের পর 'ইল্ম কালাম বিষয়ে নূতন অধ্যায় সংযোজন করে। এই সংক্রান্ত শী'আ লেখকদের মধ্যে গুলাম হাস্‌নায়ন কানতুরী (মৃ. ১৩৩৭ হি.) উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁহার গ্রন্থ ইনতিসারু'ল-ইসলাম (তিন খণ্ডে) লাহোর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ছাড়া মুহাম্মাদ হারূন যাংগীপুরী (মৃ. ১৩৩৯ হি.)-র রচনাবলীর মধ্যে রাদ্দি তানাসুখ, ই'জায-ই কুরআন, আল-মু'জিযা, তাওহীদু'ল-কুরআন, তাওহীদু'ল-আ'ইম্মা ও ইমামাতু'ল-কুরআন সমধিক প্রসিদ্ধ। দর্শনশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ মুহাম্মাদ হাদী রুস্‌ওয়া (মৃ. ১৩৫০ হি.)-র 'ইল্ম কালামের উপর লিখিত গ্রন্থসমূহের খসড়া লখনৌর মাদ্‌রাসাতু'ল-ওয়া'ইজীন-এ রক্ষিত আছে।

ইরাক, লেবানন ও ইরানে 'ইল্ম কালামের আধুনিক পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। শায়খ জাওয়াদ বালাগী নাজাফী প্রকৃতিবাদ, য়াহূদীবাদ, খৃষ্টবাদ ও কাদিয়ানীদের ভ্রান্তি ও অসারতার উপর কালাম সংক্রান্ত আলোচনাকে বিস্তৃতি প্রদান করেন। তাঁহার 'আরবী গ্রন্থসমূহ নাজাফ, বৈরূত ও দামিশ্‌ক হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার সমসাময়িক সায়্যিদ মুহসিনু'ল-আমীন আল'আমিলও 'ইল্ম কালাম সম্পর্কে লিখেন। জাবাল 'আমিল-এর প্রখ্যাত মুতাকাল্লিম, আল-মুরাজি'আত হাওলু'র-রাবিয়্যা-এর প্রণেতা সায়্যিদ 'আবদু'ল-হুসায়ন 'ইল্ম কালামের নূতন রূপ প্রদান করেন। আল-মুরাজি'আতের বিংশতিতম সংস্করণ এবং ইংরেজী, ফারসী ও উর্দূ অনুবাদ এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা প্রমাণিত করে। অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও গ্রন্থপ্রণেতা হইলেন ঃ শায়খ মুহাম্মাদ হুসায়ন, আলু কাশিফি'ল-গাতাঃ আসলু'শ-শী'আ ওয়া উস্‌লুহা; শায়খ 'আবদু'ল-হুসায়ন আল-আমীনী, আল-গাদীর; শায়খ মুজাফ্‌ফার, দালা'ইলুস-সিদ্‌ক; মুহাম্মাদ আসিফ আল-হুসায়নী, সিরাতু'ল-হাক্ক; সায়্যিদ মুহাম্মাদ হুসায়ন আত্-তাবাতাবা'ঈ, আল-মীযান ফী তাফ্‌সীরি'ল-কুরআন; শায়খ জাওয়াদ মুগ্‌নিয়া, কালাম সংক্রান্ত কিছু রচনা, 'আবদু'ল-ওয়াহিদ আনসারী 'ইরাকী, হাযিহি 'আকীদাতুনা; সায়্যিদ বাকির আস-সাদ্‌র নাজাফী, ফালসাফাতুনা; মুরতাদা মাতৃহারী তিহ্‌রানী, 'আদ্‌ল-ই ইলাহ। এই সকল লেখক আধুনিক চিন্তাধারা মুতাবিক 'ইল্ম কালামকে সাধারণের বোধগম্য করিয়া সম্পূর্ণ নূতন বিজ্ঞান ও মনস্তাত্ত্বিক ধারায় পেশ করেন। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানেও বিশেষজ্ঞদের গ্রন্থসমূহ মুদ্রিত হইতেছে। এই যুগ আশা'ইরা, মু'তাযিলা ও ইমামিয়াদের মতভেদ অতিক্রম করিয়া নূতন ধ্যান-ধারণা ও আধুনিক চাহিদার প্রেক্ষিতে

আলোচনার যুগ। প্রচার ও পরিচিতির মাধ্যমসমূহের আধিক্যের ফলে কালাম এক নূতন রূপ ধারণ করিতে শুরু করিয়াছে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) আশ-শায়খু'স-সাদূক আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ, আত্-তাওহীদ, সং, তেহরান; (২) আশ-শায়খু'ল-মুফীদ মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ, আওয়া'ইলু'ল-মাকালাত ফি'ল-মাযাহিব ওয়া'ল-মুখ্তারাত, মা'আ শারহি 'আকা'ইদি'স-সাদূক আও তাসহীহি'ল-ই'তিকাদ, মুদ্রণ 'আব্বাস কালী, তাবরীয ১৩৫৮ হি.; (৩) ঐ লেখক, আল-ফুসূলু'ল-মুখতারা মিনা'ল-'উয়ূন ওয়া'ল-মাহাসিন; (৪) ইবনু'ন-নাদীম, আল-ফিহ্‌রিস্ত, মিসর ১৩৪৮ হি.; (৫) আবু'ল-'আব্বাস আহমাদ আন-নাজাশী, কিতাবু'র্-রিজাল, বোম্বাই ১৩১৭ হি.; (৬) আবূ মুহাম্মাদ হাসান ইব্ন 'আলী আল-হার্‌রানী, তুহফু'ল-উকূল 'আন আলি'র-রাসূল, তেহরান ১৩৭৬ হি.; (৭) আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন য়া'কূব আল-কুলায়নী, আল-উসূল মিনা'ল-কাফী, সং, তেহরান; (৮) কামালু'দ-দীন মায়ছাম ইব্ন 'আলী ইব্ন মায়ছাম আল-বাহরায়নী, শারহু'নাহ্‌জি'ল-বালাগা, তেহরান ১৩৭৮ হি.; (৯) সায়্যিদ কাজিম রাওয়ান্ বাখ্‌শ, যিন্দিগানী ওয়া শাখসিয়াত-ই খাওয়াজা নাসীরু'দ-দীন তূসী, চাপ খানা-ই শাফাক, ১৩২৯ সৌর অব্দ; (১০) মুরতাদা হুসায়ন ফাদিল, আহওয়াল ওয়া শারহ রুবা'ইয়াত-ই খায়্যাম; সং, লাহোর; (১১) এ লেখক, তা'রীখ-ই তাদবীন-ই হাদীছ ওয়া শী'আ মুহাদ্দিছীন; (১২) ঐ লেখক, ইসলামী বিশ্বকোষ, উর্দূ (দ্র. 'ইল্‌ম, 'ইল্‌ম ফিক্‌হ, ওয়া 'ইল্মু'ল-ই'তিকাদ-এর অধীন); (১৩) 'আল্লামা হিল্লী জামালু'দ-দীন, কাশফু'ল-মুরাদ শারহ তাজরীদি'ল-ই'তিকাদ, সং. কুম্ম; (১৪) আবু'ল-হাসান আশ-শা'রানী, তারজামা-ই কাশ্‌ফি'ল-মুরাদ (ফারসী), তেহরান ১৩৫১ হি.; (১৫) শাব্বীর আহমাদ খানগুরী, তাজরীদ মুহাক্কাক তূসী দার নাযার-ই 'আর্‌শী, দিল্লী ১৯৬৫ খৃ.; (১৬) সায়্যিদ ইসমা'ঈল তাবরাসী, কিফায়াতু'ল-মুওয়াহহিদীন, সং, তেহরান; (১৭) সায়্যিদ মুহসিনু'ল-আমীন আল-'আমিলী, আ'য়ানু'শ-শী'আঃ ১/২খ, বৈরূত ১৯৫১ খৃ.; (১৮) মুরতাদা মুতহারী, 'আদ্‌ল ইলাহী, তেহরান ১৩৯৪ হি.; (১৯) 'আবদুল্লাহ নামা, ফালাসিফাতু'শ-শী'আ হায়াতুহুম ওয়া আরা'উহুম, সং. বৈরূত; (২০) 'আবদু'র-রায্‌যাক লাহিজী, গাওহার মুরাদ, বোম্বাই ১৩০১ হি.; (২১) 'ইমাদ যাদা'ই, জাহান-ই ইসলাম, সং. তেহরান; (২২) জাহূর হুসায়ন, জামি' হামিদী, সং. রামপুর; (২৩) সায়্যিদ হাসান আস-সাদ্‌র, তা'সীসু'শ-শী'আ লি-'উলূমি'ল-ইসলাম, সং. সায়দা; (২৪) ঐ লেখক, আশ-শী'আঃ ওয়া ফুনূ-নু'ল-ইসলাম, সায়দা ১৩৩১ হি.; (২৫) সায়্যিদ মুরতাদা 'ইলমু'ল-হুদা, আশ-শাফী, ইরান ১৩০১ হি.; (২৬) ঐ লেখক, আমালি'ল-মুরতাদা, সম্পা. মুহাম্মাদ আবু'ল-ফাদল ইব্‌রাহীম, মিসর; (২৭) ঐ লেখক, তানযীহু'ল-আম্বিয়া', কুম্ম ১৩৯২ হি.; (২৮) আস-সায়্যিদ 'আলী আল-ফানী, আল-মুখতার ফি'ল-জাব্‌র ওয়া'ল-ইখতিয়ার, নাজাফ ১৯৬৫ খৃ.; (২৯) 'আব্বাস ইকবাল, খানদান নাওবাখ্‌তী, তেহরান ১৩১১ সৌর অব্দ; (৩০) আবূ মানসূর আহমাদ ইব্ন 'আলী আত্-তাব্‌রাসী, কুতুবু'ল-ইহ্‌তিজাজ, নাজাফ ১৯৬৬ খৃ.; (৩১) আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর ইব্ন রুস্‌তাম আত-তাবারী, দালা'ইলু'ল-ইমামা, নাজাফ ১৯৪৯ খৃ.; (৩২) ইব্ন আবী জুমহূর (মুহাম্মাদ ইব্ন যায়নি'দ-দীন), মুজাল্লা' ইরান ১৩২৯ হি.; (৩৩) দিলদার 'আলী গুফরান মাআব, مرأة العقول فى علم الاصول المعروف عماد الاسلام في علم الكلام, লখনৌ ১৩২০ হি.; (৩৪) সায়্যিদ হামিদ হুসায়ন, استقعماء الافهام رد منتهى الكلام, লখনৌ ১৩১৫ হি.; (৩৫) হামিদ হুসায়ন এবং নাসির হুসায়ন, 'আবাকাতু'ল-আনওয়ার, কয়েক খণ্ড, সং. লখনৌ; (৩৬) বাকির মাজ্‌লিসী, হাক্কু'ল-য়াকীন, লখনৌ ১৩০০ হি.; (৩৭) মুহাম্মাদ আসিফ আল-হুসায়নী, সিরাতু'ল-হাক্ক, নাজাফ ১৩৮৫ হি.; (৩৮) আশ-শায়খ 'আলী ইব্ন য়ূসুফ ওয়া নাসীরু'দ-দীন তূসী, منتهى السئول فى شرح المفصول সং. লখনৌ; (৩৯) সায়্যিদ 'আলী আল-হা'ইরী, منهاج السلامة لاهل الكرامة در كلام مفصل লাহোর ১৩১৬ হি.; (৪০) সায়্যিদ আবু'ল-কাসিম হা'ইরী, নাফিউ'ল-ইজবার 'আনি'ল-ফা'ইলি'ল-মুখ্‌তার, লাহোর; (৪১) ফাদিল মিকদাদ, النافع ليوم الحشر فى شرح باب حادى عشر লখনৌ (ইংরেজী ও উর্দূ ভাষায় অনুবাদ মুদ্রিতও হইয়াছে); (৪২) 'আল্লামা হিল্লী, ইসতিকসা'উন্-নাজ্‌র ফি'ল-কাদা' ওয়া'ল-ওয়া'ল-কাদ্‌র; (৪৩) ঐ লেখক, নাহ্‌জু'ল-মুস্‌তারশিদীন ফী 'উসূলি'দ-দীন; (৪৪) ঐ লেখক, الانساف فى الانتصاف لاهل الحق من اهل الاعتراب (এই তিনটি গ্রন্থে ফটোস্ট্যাট কপি প্রবন্ধ লেখকের গ্রন্থাগারে আছে); (৪৫) মুহাম্মাদ রিদা আত-তাবরাসী, আশ-শী'আতু ওয়া'র-রাজ'আঃ, নাজাফ ১৯৬৬ খৃ.; (৪৬) L. Garet, Ilm-al-kalam. in E.I.[2], Vol. iii, Leiden 1979।

আমীনুল্লাহ ওয়াছীর ও সায়্যিদ মুরতাদা হুসায়ন ফাদিল (দা. মা. ই.)/ মুহাম্মদ ইসলাম গণী

**'ইল্মু'ল-জামাল** (علم الجمال) ঃ 'সৌন্দর্য জ্ঞান'। 'ইল্মু'ল-জামাল বলিতে যাহা বুঝায় তাহার সাধারণ ধারণা এবং এই বিশেষ ব্যবহৃত শব্দসমূহের যথার্থ সংজ্ঞা 'আরব সভ্যতার ইতিহাসে পাওয়া যায় না; তবে সৌন্দর্যতত্ত্ব বিষয়ক ভাবের এবং সেই ভাবের যে সাধারণ আবেগময় প্রকাশ সেইগুলির কোন কোন বিশেষ দিকের আলোচনা করা সম্ভব। 'আরবী সাহিত্যে ও শিল্পকলার সর্বাধিক গৌরবময় ধারা যে কবিতা, ভাব ও গঠনের দিক দিয়া সৌন্দর্যতত্ত্বের ধারণার সংগে তাহার কিছু কিছু সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। জাহিলী যুগের কবিতার ক্ষেত্রে একমাত্র গাযালই লক্ষ্য করা যায় যে, রচয়িতা কবি 'আদর্শ সৌন্দর্য' সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় যে, একই রূপের বর্ণনা সকল নারীর প্রতিই প্রয়োগ করা হইয়াছে আর সে বর্ণনা এমনই যে, সন্দেহ হয় যে, সেই নারী কোন সত্যিকারের মানুষ, না কি অবাস্তব কাল্পনিক নারীসত্তা (ইমরু'উ'ল-কায়স, দীওয়ান, কায়রো ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ১৫, ১৬, ১৭, ২৯, ৩০; তারাফা, দীওয়ান, বৈরূত, ১৯৬১ খৃ., পৃ. ২০, ২১; আন-নাবিগা, দীওয়ান, বৈরূত ১৯৬০ খৃ., ৩৯-৪২; আল-আ'শা, দীওয়ান, বৈরূত ১৯৬০ খৃ., ১১৪, ১৪৫; 'আবদুল্লাহ ইব্নু'ল-'আজলান, শার্‌হ দীওয়ানি'ল-হামাসা-তে, কায়রো ১৯৫২ খৃ., ২, নং ৪৭৬)। এই সকল কাব্যগ্রন্থে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা সৌন্দর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কচিৎ কখনও আধ্যাত্মিক বা নৈতিক গুণাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে (আশ্-শান্‌ফারা, আগানীতে, বৈরূত ১৯৬১ খৃ., ২০৯, কবিতা নং ৭-১০; 'আনতারা, শু'আরা' আন-নাসরানিয়্যা কাব্‌লা'ল্-ইসলাম-এ, বৈরূত ১৯৬৭ খৃ., ৮০৯, আল-আ'শা. পূ. গ্র.; ১৪৪, কবিতা নং-৭; আন-নাবিগা, ৬, ৪১, কবিতা নং ৬; কায়স ইব্নু'ল-খাতীম, আগানী-তে ৩খ, ২৩, কবিতা নং ৩, ৯, ১০)। এই সমস্ত কবিতার পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ হইতে

সৌন্দর্য সম্পর্কে জাহিলী ধারণার কতক বৈশিষ্ট্য পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, যেমন, ক্ষীণ কাঁকালধারিণী নারীদেহের দুই অর্ধেকের মধ্যেকার সামঞ্জস্য, গঠন ও রংগের বৈপরীত্য, কেশ ও সুশ্রী মুখমণ্ডল, ওষ্ঠ, অধর ও দন্তরাজি, সাদা চোখের মাঝখানে ভ্রমর কালো মণি, অংগুলি ও নখ। সৌন্দর্যের যে আদর্শ ধারণা তাহা বহিরাবরণকেন্দ্রিক নহে, বরং তাহা যেন 'আরব কবিগণের হৃদয়াবেগেরই বিকাশ, যাহা মু'আল্লাকাসমূহের গঠন রীতিতেও এই একইভাবে বিকশিত হইয়াছে। নারীদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে সাগ্রহ বর্ণনা তাহারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় সামগ্রিক একটি কবিতার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বায়ত বা শ্লোকের গঠনের প্রতি প্রদত্ত যত্নের মধ্যে। মু'আল্লাকা কবিতায় যে সকল সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপের বর্ণনা রহিয়াছে তাহা পরস্পর স্বাধীনভাবে বর্তমান ও সদা-সচল, কিন্তু একটি সাধারণ অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত। এই গঠন— গত কাব্য-রচনারীতি ইসলামী কাব্যশিল্পে লক্ষ্য করা যায় এবং ইহা এক অর্থে 'আরব সৌন্দর্যবোধের মৌলিক প্রতিবিম্ব।

ইসলাম উহার অনুসারিগণকে বিশ্বজনীন সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার আহ্বান দ্বারা সৌন্দর্যের ধারণাকে পরিবর্ধিত করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জাহিলী 'আরব কবিগণের প্রিয় ও অনুসৃত যে সৌন্দর্যের প্রথাগত ধারণা তাহাও রহিয়া গিয়াছিল। অপর পক্ষে সামাজিক বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট নৈতিক ও প্রজ্ঞাগত দিকসমূহ এই যুগে রচিত গাযাল কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু হয় (R. Blachere, Les principaux themes de la poesie erotique au siecle des Umayyades de damas, in AIEO Alger, v (1939-41, 82-128)। শিল্পকলার ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব ছিল অতি নগণ্য। কারণ আর্ট আর নৈতিকতার ক্ষেত্র ছিল আলাদা আলাদা। সেই কারণেই ইব্ন আবী রাবী'আ-এর কবিতা কামোদ্দীপক হওয়া সত্ত্বেও (আগানী, ১খ, ১১৩) প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। একটি বিষয় চিত্তাকর্ষক যে, ঐক্য ও চলমানতার যে রীতি-পদ্ধতি তাহা মসজিদের অগণিত স্তম্ভের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল এবং সেই সুসামঞ্জস্য কুব্বাতু'স-সাখ্রা, কাস্‌রু'ত্-তুবা ও মশাত্তার পরিকল্পনার মধ্যে এবং উহার সম্মুখভাগের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে রূপ লাভ করিয়াছিল। কাসরু'ল-হায়র আল-গারবীর দেওয়ালের কারুকার্যের মধ্যে যে আলো ও ছায়াময় রংগের বৈচিত্র্য রহিয়াছে তাহাও লক্ষণীয় [দ্র. (১) Creswell, A short account of Early Muslim Architecture, 1958, 124 প. ; (২) D. T. Rice, L'art de l'Islam, Paris 1966, 21 পৃ.]।

'আব্বাসী যুগে সৌন্দর্যবোধের ধারণার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হয়। তন্মধ্যে এই যুগে সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যময় ছিল সমতা রক্ষার প্রবণতা, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যবোধের প্রতি আগ্রহ এবং দেহের সুসামঞ্জস্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ (দ্র. স আল-মুনাজ্জিদ, জামালু'ল-মার'আ 'ইন্দা'ল-'আরাব, বৈরূত ১১৫৮ খৃ., পৃ. ৩৫-৪০)। সাহিত্যের একটি প্রিয় বিষয়বস্তু ছিল সৌন্দর্য। যদিও উহা 'ইল্‌ম-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তথাপি সৌন্দর্য (জামাল) কিছুটা গভীর জ্ঞানের ব্যাপার ছিল যাহা হইতে আল-বাসার বি'ল-জাওয়ারী (বালিকার চক্ষু) এই 'আরব প্রবচন আসিয়াছে। মানব-দেহের সৌন্দর্য বর্ণনার বিষয় পঠন-পাঠন হইতে সাহিত্য সমালোচনা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। উহা এতদূর পর্যন্ত ছিল যে, ইব্ন রাশীক যিহাফের অবনিম্ন আকার (مـخـفـف)-কে জারিয়াত (বালিকা)-এর তেমন কোন ত্রুটির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন যাহা প্রশংসিত হয় (দ্র. আল-'উম্‌দা' কায়রো ১৯৩৪ খৃ., ১খ, ১১৭)। আর্ট বা চারুকলার সমালোচনা ব্যতিরেকে যে সাহিত্য সমালোচনা তাহাতে যে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে সেই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় গাযালের মধ্যে এবং সাধারণভাবে শিল্পকলার মধ্যে। বস্তুময় ভাষায় প্রকাশিত যে রীতিসিদ্ধ সমালোচনা উহাকে প্রায়শ কোন ব্যক্তি বা প্রকাশভংগীর প্রতি প্রয়োগ করা যায় [ দ্র. (১) আল-'আসকারী, সিনা'আতায়ন, ইস্তাম্বুল ১৩২০ হি., পৃ. ১৩১; (২) ইব্ন রাশীক, ঐ, ১খ, ১০৬]। সমালোচকগণ (আল-'আসকারী, ঐ, ২০২; ইব্ন রাশীক, ঐ, ২খ, ৫) সুসামঞ্জস্য এবং বৈপরীত্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁহাদের যে বিশ্লেষণ উহা একতরফা বা পক্ষপাতিত্বময়। কেননা তাঁহারা সামগ্রিক কবিতা বিষয়ে আলোচনা করেন নাই, বরং শব্দ ব্যবহার, ছন্দ বা প্রকাশ ভঙ্গির উপর আলোচনা করিয়াছেন [দ্র. (১) ইব্‌নু'ল-আছীর, আল-মাছালু'স-সা'ইর, কায়রো ১৩১২ হি., ১খ, ৩৮৪, ৩৮৬; (২) আল-জুরজানী, দালা'ইলু'ল-ই'জায, কায়রো ১৩২১ হি., পৃ. ৩১]। উমায়্যাঃ আমল হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী সময় পর্যন্ত শিল্পকে (আর্ট) ধর্ম হইতে পৃথক করিবার যে রীতি চালু হয় তাহা 'আব্বাসী আমলের সমালোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় [দ্র. (১) কুদামাঃ, নাক্‌দু'শ-শি'র, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ১৪; (২)
আল-জুরজানী, আল-বিসাতা, সিডন ১৩৩১ হি. পৃ. ৫৭, ৫৮]। এই একই বৈশিষ্ট্যসমূহ স্থাপত্যের আরবীয় লতা-পুষ্পময় কারুকাজের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। সেখানে একই কারুকার্যের বার বার ব্যবহারের সঙ্গে কবিতার পুনঃপুনঃ ছন্দমিল ও মসজিদের সারি সারি থামের মিল রহিয়াছে। এইগুলিতে শিল্পের যে বিমূর্ততা তাহা 'আরব আদর্শায়িত রূপেরই একটি আকারমাত্র, এইগুলিতে স্বীয় সত্তার বাহিরে আর্টের আর কোন শেষ লক্ষ্য নাই, সেইখানে আর্ট আর্টের জন্যই— এই মনোভাব কার্যকর। ইহার ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচকের চিন্তাগত মনোভাবে মিল রহিয়াছে [দ্র. (১) ইব্‌নু'ল-আছীর, আল-মাছালু'স-সা'ইর, কায়রো ১৩১২ হি., পৃ. ১৬৮; (২) ইব্ন তাবাতাবা, 'ইয়ারু'শ-শি'র, কায়রো ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ১৭, ১১১]।

এই সকল শিল্পগত বাস্তবতা এবং এই সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় তাত্ত্বিকগণের লেখায়। ইব্ন সীনা সুন্দরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছেন এবং মঙ্গলের শিল্পকলা আর মানুষের উপকারের যে শিল্পকলা—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন (তু. আই. ইসমা'ঈল, আল-উসূলু'ল-জামালিয়্যাঃ ফি'ন-নাকদি'ল-আদাবী, কায়রো ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ১৪০)। আত-তাওহীদী সৌন্দর্য তত্ত্বগত বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন এবং সুন্দর কুৎসিতের পাঁচটি বিভিন্ন মাপকাঠির উল্লেখ করিয়াছেন ঃ (মানব) প্রকৃতি, রীতিনীতি, (ধর্মীয়) আইন, বিবেচনা ও কামনা (আল-ইমতা' ওয়া'ল-মু'আনাসাঃ, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., ১খ,, ১৫০)। আল-গাযালী (র) সুন্দরের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, উহা দর্শনে আনন্দ ও সুখ পাওয়া যায় এবং কুৎসিত হইল যাহা ব্যথা ও বিতৃষ্ণাবোধ সৃষ্টি করে। আল-গাযালী (র) সৌন্দর্যবোধের মূল ভিত্তিরূপের স্থিতি মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে নির্ধারণ করিলেও স্বীয় চিন্তার ধর্মীয় ও দার্শনিক দিকও পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ "যুক্তি দ্বারা যে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের উপলব্ধি হয় তা দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতিচ্ছবির সৌন্দর্য অপেক্ষা মহত্তর।" তিনি এই সমস্যার মূল কেন্দ্রে পৌঁছান যখন তিনি বস্তুগত সৌন্দর্যের আপেক্ষিকতার কথা

এবং বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেই সৌন্দর্যবোধের বিভিন্নতার কথা বলেন এবং যখন সৌন্দর্য সহানুভূতি হইতে উৎসারিত বলিয়া যে ধারণা ছিল তিনি তাহা বাতি'ল করিয়া দেন (ইহ্‌য়া', কায়রো তা. বি., ৪খ., ২৯৬ পৃ.)।

পরবর্তীকালে জামাল কিছুটা 'ইল্‌মভুক্ত হয়, কিন্তু তাহা শুধু মানুষের দৈহিক সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে। ইব্‌ন আবী হ়াজালা আল-মাগ'রিবী এই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দগুলির সংজ্ঞা প্রদান করিতে চেষ্টা করেন, যেমন জামীল, হাসান, মালীহ় ইত্যাদি ও তদ্দ্বারা তিনি প্রতিটি চারিটি করিয়া আটটি গ্রুপ দ্বারা গঠিত আদর্শ সৌন্দর্যের একটি নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হন। উক্ত আটটি গ্রুপের একটি হইতেছে নীতি বিষয়ক [দ্র. (১) দীওয়ানু'স্‌-সাবাবা, কায়রো ১২৭৯ হি., পৃ. ৩১, ৩২; (২) Bibl. Nat. প্যারিস, পাণ্ডু নং ৩৩৪৮, পত্রক ৭০]। প্রাচ্যে আল-গ'যালী (র) প্রতিটির চারিটি করিয়া মোট বিশটি গ্রুপের একটি নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন (মাতালি'উ'ল-বুদূর, ১২৯৯ হি., ১খ, ২৬৮)। এই উভয় নীতিমালার মধ্যে যে সাতটি শ্রেণী সাধারণ তাহাদের মধ্যে সামান্য মাত্র বিভিন্নতা রহিয়াছে এবং তাহাতে সাধারণ ধারণার কোন পরিবর্তন ঘটে না। তবুও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই পরবর্তীকালীন নীতিমালা, যেইগুলির একটি প্রাচ্যের এবং অপরটি পাশ্চাত্যের— এই উভয়ই সাধারণ ধারণাগত দিক হইতে একই রকমের, উভয়টিতে দশ শতাব্দী পূর্বেকার আদি আরব কবিগণের প্রশংসিত ধারণাই রূপায়িত হইয়াছে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, আরও দ্র. ফান্ন প্রবন্ধ।

S. Kahwaji (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

**'ইল্‌মু'ল-হান্দাসা** (علم الهندسة) ঃ ('আরবী), জ্যামিতি। ৩য়/৯ম শতাব্দীর পরবর্তী সময় হইতে শুরু হইয়া 'আরবগণ গ্রীক রচনাবলী বিশেষত ইউক্লিড-এর মূল সূত্রসমূহ (Euclid's Elements)-এর অনুবাদের মাধ্যমে জ্যামিতিশাস্ত্রের সহিত পরিচিতি লাভ করে। ইহার পর তাহারা বিজ্ঞানের এই শাখাটির জন্য ইহার গ্রীক নামের একটি রূপ জুমাত'রিয়্যা (جومطرية)গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে তাহারা আর্কিমিডিস (Archimedes)-এর ও আলেকজান্দ্রিয়ার হিরো (Hero)-এর ফলিত জ্যামিতি ও ভারতীয় 'সিদ্ধান্ত'শাস্ত্রের (আরবীতে, سند هند) সংস্পর্শে আসে এবং চূড়ান্তভাবে 'হান্দাসা' শব্দটি গ্রহণ করে (আল-খালীলের মতে ফার্‌সী আন্দাযাহ হইতে গৃহীত—পরিমাপ, আকার)।

'আরবদের মধ্যে জ্যামিতির বিকাশ ধারার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কালক্রম চিহ্নিত করা যায় ঃ (১) প্রাথমিক পরিচিতি ও অনুবাদের যুগ (৩য়/৯ম শতক)। (ক) প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে ইউক্লিডের জ্যামিতির মূলসূত্রসমূহ (Elements of Geometry) (كتاب الاصول অথবা كتاب الاركان) যাহা বহুবার অনূদিত ও টীকাসহ ব্যাখ্যাকৃত হইয়াছে। (১) হাজ্জাজ ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন মাত'র-এর দুইটি অনুবাদ উল্লেখযোগ্য, ইহাদের একটির শিরোনাম হারূনী, অন্যটি অধিকতর শব্দবাহুল্যবর্জিত, ইহা মা'মূনী নামে পরিচিত। (২) ইসহাক ইব্‌ন হুনায়ন কর্তৃক অনূদিত এবং হাররান-এর ছাবিত ইব্‌ন কু'ররা (২১৯-৮৮/৮৩৪-৯০১) কর্তৃক সংশোধিত ও পর্যালোচিত একটি সংস্করণ। (৩) আল-'আব্বাস ইব্‌ন সা'ঈদ আল-জাওহারী (২১৪/৮২৯) ইহার একটি ভাষ্য রচনা করেন। ইহাতে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয়ের সহিত রহিয়াছে কতিপয় চিত্র এবং এই সমস্ত সূত্রের প্রথম প্রতিজ্ঞার সহিত সংযোজিত কতিপয় বিশেষ ব্যাপার। (৪) পঞ্চম প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে আবূ 'আলী মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন 'ঈসা আল-মাহানীর (২৩৯ ও ২৭০/৮৫৩-৮৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে) একটি ভাষ্য। ইহাতে ২৬টি চিত্রসম্বলিত হইয়াছে এবং প্রধানত এইরূপ প্রমাণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট যাহা অসঙ্গতির মাধ্যমে বুদ্ধির ব্যবহার করে না। (৫) আবু'ল-'আব্বাস আল-ফাদ্‌ল ইব্‌ন হ়াতিম আন-নায়রীযী (মৃ. ৩১০/৯২২-তে)-এর রচিত একখানা ভাষ্য। (৬) খুরাসানের অধিবাসী আবূ জা'ফার আল-খাযিন (মৃ. ৩১০/৯২২-৩)-এর রচিত একখানা ভাষ্য। (৭) একই প্রসঙ্গে আবু'ল-ওয়াফা' আল-বুযজানী (মৃ. ৩২৩-৮/৯৩৪-১৮)-এর অসমাপ্ত ভাষ্য। (৮) আল-কিন্দী (১৮৪-২৫৯/৮০০-৭৩) ইউক্লিডের রচনার উদ্দেশ্যসমূহ (أغراض كتاب أقليدس) সম্পর্কে একটি রিসালা উৎসর্গ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, বস্তুতপক্ষে এই গ্রন্থটি ইউক্লিডের দ্বারা সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত এবং টীকা দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত প্রাচীন জ্ঞানের সংক্ষিপ্তসার মাত্র এবং তাহার অনুসারিগণের একজন Hypsicles ইহার সহিত চতুর্দশ পঞ্চদশ প্রতিজ্ঞা সংযোজিত করেন।

(খ) ইসহাক অনূদিত ও ছাবিত সংশোধিত ইউক্লিডের Data (معطيات)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় এবং প্রসঙ্গটি ইহার পরও উত্থাপিত হইবে যে, নিম্নোক্ত গ্রন্থকারগণ ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধসমূহের সমালোচনা রচনা করিয়াছিলেন ঃ আন-নায়রীযী তাঁহার "রিসালা ফি'ল-মুসাদারা আল-মাসহূরা লি-উক্‌লীদিস" (رسالة فى المصادرة المشهورة لاقليدس) "ইউক্লিডের বিখ্যাত স্বতঃসিদ্ধসমূহ সংক্রান্ত পত্র" গ্রন্থে; আল-হাসান ইবনু'ল-হায়ছ়াম (৩৫৪-৪৩০/৯৬৫-১০৩৮); 'উমার আল-খায়্যাম (৪৬৭-৫১৭/১০৭৪-১১২৩) তাঁহার "রিসালা ফী শারহ মা আশ্‌কালা মিন মুসাদারাত উক'লীদিস" (رسالة شرح ما أشكل من مصادرت أقليدس) "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধসমূহ দ্বারা উত্থাপিত কতিপয় সমস্যার ব্যাখ্যা সংক্রান্ত পত্র" গ্রন্থে এবং নাসীরু'দ-দীন আত'-তূ'সী (৫৯৭-৬৭২/১২০১-৭৪) তাঁহার "তাহ্‌রীর উসূল উক'লীদিস" (تحرير أصول أقليدس) "ইউক্লিডের সূত্রাবলীর পুনর্বাচনঃ ও "তাহরীর মুসাদারাত উকলীদিসঃ (تحرير مصادرات إقليدس) "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধসমূহ সম্বন্ধে মন্তব্য" গ্রন্থদ্বয়ে।

(গ) Apollonius-এর The Conic Sections (القطوع المخروطية) রচনাটি সম্ভবত ৮টি প্রতিজ্ঞার সমন্বয়ে রচিত হইয়াছিল; ইহার প্রথম চারটি আহমাদ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন শাকির-এর তত্ত্বাবধানে অনুবাদ সম্পাদন করেন হাল ইব্‌ন আবী হিলাল আল-হিম্‌সী (মৃ. ২১৮/৮৩৩) এবং শেষ তিনটি অনুবাদ করেন ছাবিত ইব্‌ন কুররা।

(ঘ) Menelaus-এর The Elements of Geometry, ছাবিত ইহার তিনটি প্রতিজ্ঞা অনুবাদ করেন। জনৈক অজ্ঞাত অনুবাদক ত্রিভুজ সম্পর্কিত অধ্যায়সমূহ পুনঃপরীক্ষাপূর্বক সংশোধন করেন। ছেদক সংক্রান্ত সমস্যাবলী ও কনিক গঠনে ইহার ব্যবহার ছাবিত-কে তাঁহার গ্রন্থ আল-কাওল ফি'শ-শাকলি'ল-কা'ত্তা' ওয়া'ন-নিসবাতি'ল-মু'আল্লাফা (القول فى الشكل القطاع والنسبة المؤلفة) "Survey of the transversal and harmonic division" রচনায় অনুপ্রাণিত করে। গ্রন্থটি পরবর্তীতে Cremona-বাসী Cerard কর্তৃক

ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় (Liber Thabit de figura alchata)। নাসীরু'দ-দীন আত্‌'-তূসীও এই পুস্তকটিকে তাঁহার গ্রন্থ কিতাবু'শ-শাক্‌কি'ল-কাত্তা'-এর ভিত্তিরূপে ব্যবহার করেন। শেষোক্ত পুস্তকে তিনি গোলক সম্বন্ধীয় ত্রিকোণমিতির মৌলিক নীতিমালাসমূহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

(ঙ) Pappus-এর রচনা (The Collection of Mathematics) বিশেষত ছা'বিত কর্তৃক অনূদিত গোলকের আয়তন সম্পর্কিত টলেমীর পুস্তকের উপর তাঁহার একটি ভাষ্য এবং ইউক্লিডের দশম প্রতিজ্ঞা বিষয়ে তাঁহার ভাষ্য।

(চ) জ্যামিতি বিষয়ে আর্কিমিডিসের রচনাবলী ঃ (১) বানূ মূসা এবং পরবর্তীতে ছাবিত ও ইসহাক ইব্‌ন হুনায়ন কর্তৃক অনূদিত তাঁহার রচনা On the sphere and the cylinder (গোলক ও সিলিন্ডার বিষয়ে)। কুসতা ইব্‌ন লূকা (২৯৯/৯১২) কর্তৃক অপর একটি অনুবাদ কালোনিমোস ইব্‌ন কালোনিমোস (৭২৮/১৩২৮)-এর হিব্রু অনুবাদের ভিত্তিস্বরূপ ব্যবহার করা হয়। (২) On the squaring of the circle (فى تكسير الدائرة، تربيع الدائرة، مساحة الدائرة) বৃত্তের বর্গকরণ বিষয়ে একখানা গ্রন্থ, ছাবিত ও হুনায়ন ইব্‌ন ইস্‌হাক' কর্তৃক অনূদিত; নাসীরু'দ্‌-দীন আত্‌-তূসী কর্তৃক সংশোধিত ইহার অপর একটি অনুবাদ (সং হায়দরাবাদ ১৩৫৯/১৯৪০)। (৩) The Lemmata (আল-মা'খূযাত) ছাবিত কর্তৃত অনূদিত এবং আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্‌ন আহ'মাদ আন্‌-নাসাবী কর্তৃক টীকা সংযোজিত (৩৭০-৪৩১/৯৮০-১০৪০); তূসী ১৯৪০ খৃ. হায়দরাবাদে প্রকাশিত তাঁহার গবেষণায় ইহার ব্যবহার করিয়াছেন। (৪) Measuring the side of a regular hetagon inscribed in a circle বৃত্তের অন্তঃস্থ কোন সুষম সপ্তভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় (تسبيع الدائرة), বিশেষত আবূ সাহ্‌ল আল-কূহীকে অনুপ্রাণিতকারী একটি গ্রন্থ।

(ছ) আলেকজান্দ্রিয়ার Hero প্রণীত গ্রন্থাবলী, বিশেষত তাঁহার কিতাব হাল্ল শুকূক উক্‌লীদিস (كتاب حل شكوك أقليدس) "ইউক্লিড সংক্রান্ত বিভ্রান্তির সমাধান" ও কিতাবু'ল-হিয়াল্‌ আর-রূহানিয়্যাঃ (كتاب الحيل الروحانية) বায়ু বিজ্ঞান (Pneumatics) বিষয়ে।

পরিশেষে ইহাও লক্ষণীয় যে, 'সিদ্ধান্ত'-এর অনুবাদের মাধ্যমে আরবগণ জরিপ সংক্রান্ত এবং আয়তন ও ক্ষেত্রফল পরিমাপের সমস্যাসমূহের সহিত পরিচিতি লাভ করে এবং সার্বিকভাবে জ্যামিতির বহুবিধ ফলিত প্রয়োগের সহিত পরিচিত হয়।

২। সৃজনশীলতার যুগ (৪র্থ-৯ম/১০-১৫শ শতক)। ইতোমধ্যে লক্ষ্য করা গিয়াছে, অনূদিত পাঠ্যসমূহ ক্রমবর্ধমানভাবে টীকাকৃত, আলোচিত ও সংশোধিত হইয়াছিল।

৩য়/৯ম শতাব্দী হইতে, বিশেষভাবে ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর পর হইতে 'আরবগণের সুনির্দিষ্ট অবদান ক্রমশ গুরুত্ব লাভ করিতে থাকে। 'আরবগণ বিজ্ঞানের কয়েকটি শাখার (জ্যোতির্বিজ্ঞান, আলোকবিদ্যা, বীজগণিত) প্রাচীন তথ্যসমূহকে নূতন প্রমাণ ও জ্যামিতিক প্রশ্নসমূহের সমাধান দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন; নূতন নূতন ফলিত বিদ্যার আবির্ভাব হয়, বিশেষত ভাস্কর্য ও স্থাপত্যবিদ্যার; ত্রিকোণমিতি আবিষ্কৃত ও সুসংগঠিত হয়; গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্থাপন ঘটে; প্রাচীন পণ্ডিতগণের প্রাথমিক প্রামাণিক রচনা প্রতিবাদের সম্মুখীন হয় এবং এতদিন যাবত অজ্ঞাত বিভিন্ন দিকে জ্যামিতির উন্নয়ন ও বিকাশের পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়ে।

জ্যামিতিশাস্ত্রে আরবগণের সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত অবদানসমূহ পর্যালোচনার পূর্বে প্রতি শতাব্দীর প্রখ্যাত গ্রন্থকার ও তাঁহাদের রচনাবলীর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

**৩য়/ ৯ম শতাব্দী ঃ** আল-খাওয়ারিযমী (মৃ. আনু. ২৩২/ ৮৪৬), বাবু'ল-মিসাহা আল-জাওহারী (২১৪-১৫/৮৩৯-৪০); কিতাব তাফ্‌সীর কিতাব উক্‌লীদিস (كتاب تفسير كتاب أقليدس) "ইউক্লিডের গ্রন্থের ভাষ্য"; কিতাবু'ল-আশ্‌কাল আল্লাতী যাদাহা ফি'ল-মাকালাতি'ল-উলা মিন উক্‌লীদিস (كتاب الاشكال التى زادها فى المقالة الاولى أقليدس) "ইউক্লিডের প্রথম প্রতিজ্ঞার সহিত তাঁহার যোগকৃত চিত্রাবলী প্রসঙ্গে", যিয়াদা ফি'ল-মাকালাতি'ল-খমিসা মিন কিতাবি উক্‌লীদিস (زيادة فى المقالة الخامسة من كتاب أقليدس) "ইউক্লিডের পঞ্চম প্রতিজ্ঞার পরিপূরক", তু. ফিহরিস্ত, কায়রো ১৩৪৮/১৯৩০, পৃ. ৩৭৯ ও Suter ২১। বানূ মূসা ইব্‌ন শাকির (মুহাম্মাদ, মৃ. ২৫৯/৮৭৩), মা'রিফাতু মিসাহ'াতি'ল-আশকাল আর-বাসীতা ওয়া'ল-কুরিয়্যা (معرفة مساحة الاشكال البسيطة والكرية) "সমতল ও গোলকীয় চিত্রসমূহের তল সম্পর্কে তথ্য" (পাণ্ডু. জারুল্লাহ ১৪৭৫, ৩; ১৫০২, ৯; Koprulu, ৯৩০, ১৪; ৯৩১, ১৪; রামপুর ৩১১; Bodl. ১খ. ৯৬০); মুক'াদ্দিমাতু'ল-মাখরূতাত (مقدمة المخروطات) "কনিক সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য" (পাণ্ডু. Bodl. ১খ, ৯৪৩, ৫ : লাইডেন ৯৭৯; Sarton ১৯৩); কিসমাতু'য-যাওয়া বি-ছালাছা আকসাম মুসতাবিয়া قسمة الزوايا بثلاثة أقسام مستوية "কোণের ত্রিখণ্ডন" (তু. ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ৩৭৯)। আল-মাহানী, রিসালা ফি'ন-নিসবা (رسالة فى النسبة) "অনুপাত সম্পর্কে পুস্তিকা" (ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ৩৭৯, পাণ্ডু. Bold. ৬০০৯; প্যারিস ৩৪৬৭, ১ম); রিসালা ফি'ল্‌-মুশকিল্‌ মিনা'ন-নিসবা رسالة فى المشكل من النسبة "জটিল অনুপাত বিষয়ক পুস্তিকা" (পাণ্ডু. প্যারিস ২৪৫৭, ৩৯); রিসালা ফী ২৬ শাকলান মিনা'ল-মাকালা আল-উলা মিন্‌ উক্‌লীদিস (رسالة فى ٢٦ شكلا من المقالة الاولى من أقليدس) (ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ৩৭৯, ছাবিত ইব্‌ন কুর্‌রা, দ্র. 'ঘ' উপরে); কিতাবু'শ-শাকলি'ল-কাত্তা' (كتاب الشكل القطاع) [ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ৩৮০; পাণ্ডু, প্যারিস ২৪৫৭, ৩৭; ২৪৬৭, ১৩, Esc. ৯৭১, ২; আলজিয়ার্স ১৪৪৬, ৫]; কিতাব ফী মিসাহাত কাত' আল-মাখরাত' আল্লাযী য়ুসাম্মা'ল-মুকাফি' كتاب فى مساحة قطع المخروط الذى يسمى المكافىء "অধিবৃত্ত নামক কনিকের উপরিতল" [পাণ্ডু. প্যারিস ২৪৩৭, ২৫; কায়রো ৬খ, ১৯৭]।

আল-বাত্তানী (২৪৪-৩১৭/৮৫৮-৯২৯) বিশেষভাবে স্মরণীয়, ত্রিকোণমিতিতে তাঁহার অবদান এবং গোলক সম্বন্ধীয় ত্রিকোণমিতির সমস্যাবলী সম্পর্কে লম্ব অভিক্ষেপের মাধ্যমে তাঁহার প্রদত্ত সুরুচিসম্পন্ন সমাধানসমূহ। এই সকল সমাধান Regiomontanus (১৪৩৬-৭৬ খৃ.) জ্ঞাত ছিলেন এবং আংশিকভাবে অনুকরণ করেন।

৪র্থ/ ১০ শতাব্দী ঃ আন-নায়রীযী, শারহ' উকলীদিস (شـرح أقليدس) (ফিহরিস্ত ৩৮৯; S. ৩৬৩); রিসালাঃ ফি'ল-মুসা-দারাতি'ল-মাশহূরা লি-উকলীদিস (رسالة فى المصادرة المشهورة لاقليدس)। আল-বুযজানী, কিতাব ফীমা য়াহ'তাজু ইলায়হি'ল-'উম্মাল ওয়া'ল-কুত্তাব মিন সিনা'আতি'ল-হিসাব كتاب فيما يحتاج اليه العمال، الكتاب من صناعة الحساب "হিসাবরক্ষক ও প্রশাসকের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালকুলাসের সূত্রাবলী"; ৩য় ভাগ, ফী আ'মালি'ল-মিসাহাঃ (فى أعمال المساحة) "উপরিতল সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহ" — আস-সিজ্যী (৩৫৮-৮৯/৯৬৯-৯৯) মুসলিম প্রখ্যাত জ্যামিতিবেত্তাগণের ও অন্যতম, রিসালাঃ ফী ইখরাজি'ল-খুতূত' ফি'দ-দাওয়া'ইরি'ল-মাওদূ'আঃ মিনান-নুক'আতি'ল-মু'তাঃ" (رسالة فى إخراج الخطوط فى الدوائر الموضوعة من النقط المعطاة) "কোন প্রদত্ত বৃত্তে নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়া কতিপয় সরল রেখা অংকন (পাণ্ডু. প্যারিস ২৪৫৮, ১; Sedillot Notices et Extraits, ১৩খ, ১৪৩); রিসালাতু ফি'ল-জাওয়াবি 'আনি'ল- মাসা'ইলিল্লাতী সু'ইলা 'আনহা ফী বা'দি'ল-আশকালি'ল-মাখূযাঃ মিন কিতাবি'ল-মা'খূযাত লি-আরশামিদিস (পাণ্ডু. প্যারিস ২৪৫৮,৮; sedillot ১১৬); তাহ'সীলু'ল-কা'ওয়ানীন আল-হানদাসিয়্যা আল-মাহ'দূদাঃ (تحسيل القوانين الهندسية المحمودة) (পাণ্ডু. প্যারিস ২৪৫৮, ২ ; Sedillot, ১৩৯); আস-সিজযী বিশেষভাবে বৃত্ত ও মোচাকার ক্ষেত্রাংশের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

৫ম/ ১১শ শতাব্দী ঃ ইবনু'ল-হায়ছাম আলোকতত্ত্ব সম্পর্কে (আল-হাযেনের সমস্যা) তাঁহার গবেষণার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার জ্যামিতি সম্পর্কিত রচনাবলীর মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য (তু. 'উয়ুনু'ল-আনবা' (عيون الانباء), সম্পা. বৈরূত ১৩৭৭/১৯৫৭, ৩খ, ১৫৪ প.) ঃ শারহ' উসূল উকলীদিস ফি'ল-হানদাসা ওয়া'ল-'আদাদ ওয়া তালখীসুহু (شرح اصول اقليدس فى الهندسة و العدد و تلخيصه) ইউক্লিডের মূলসূত্রসমূহের ভাষ্য ও সংক্ষিপ্তসার"; কিতাবু'ত-তাহলীল ওয়া'ত-তারকীব আল-হানদাসিয়্যীন (كتاب التحليل والتركيب الهندسيين) "Analysis and synthesis in Geometry"; মাকালা ফী হ'ল্ল শাক্ক, রাদ্দান 'আলা উকলীদিস ফি'ল-মাকালাতি'ল-খামিসা কিতাবিহ ফি'ল-উসূলি'র-রিয়াদিয়্যা" (مقالة فى حل شك رداً على أقليدس فى المقالة الخامسة كتابه فى الاصول الرياضية) Analysis of a doubt, in response to Euclid in the 5th proposition of his work "Elements of Mathematics"; মাকালাঃ ফী মিসাহ'াতি'ল-মুজাসসাম আল-মুকাফি' (مقالة فى مساحة المجسم المكافىء) "On the surface of the parabolid"; মাকালাঃ ফী খাওয়াসসি'ল-কাত'ই'ল-মাকাফি' (مقالة فى خواص القطع المكافىء) অধিবৃত্তের ধর্ম সম্পর্কে; মাকালা ফী খাওয়াসসি'ল-কাত' আ-যা'ইদ (مقالة فى خواص القطع الزائد) "পরাবৃত্তের ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনা"; মাকালাঃ ফী হ'ল্ল শুকূকি'ল-মাকালাতি'ল-উলা মিন কিতাব উকলীদিস (مقالة فى حل شكوك مقالة الاولى

من كتاب أقليدس) "ইউক্লিডের পুস্তকের প্রথম প্রতিজ্ঞা সম্পর্কিত সন্দেহাবলীর বিশ্লেষণ"। ইহার সহিত যোগ করা যায় যে, ইবনু'ল-হায়ছাম তাঁহার তাত্ত্বিক গবেষণা ছাড়াও তাহার ফলাফলের ফলিত ব্যবহারিক দিকেরও সন্ধান করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে এই ঘটনাটি স্মরণ করাই যথেষ্ট যে, নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্যে আল-কিফতী (৩খ, ১৪৯, ১৫০) আসওয়ানের নিকটে নীল নদের পানি প্রবাহের উপর একটি বাঁধ নির্মাণের চেষ্টা করেন।

৬ষ্ঠ/ ১২শ শতাব্দী ঃ 'উমার আল-খায়্যাম, রিসালা ফী শারহ' মা আশকালা মিন মুসাদারাত কিতাব উকলীদিস رسالة فى شرح ما أشكل من مصادرات كتاب أقليدس Explanation of difficulties raised by the postulates of the Book of Euclid" (পাণ্ডু. লাইডেন ৯৬৭; প্যারিস ৪৯৪৬); মাকালা ফি'ল-জাবর ওয়া'ল-মুকাবালা (পাণ্ডু. লাইডেন ১০২০; প্যারিস ২৪৫৮, ৭, ২৪৬১), বিশেষত দ্বি-মাত্রিক সমীকরণের জ্যামিতিক সমাধান।

৭ম/ ১৩শ শতাব্দী ঃ নাসীরু'দ-দীন আত'-তূসী, রিসালা আশ-শাকলি'ল-কাত্তা' (رسالة الشكل القطاع); এইখানে তিনি ভেদকের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তাহা হইতে মৌলিক সংযোগ উদ্ভাবনের মাধ্যমে তিনি গোলকীয় ত্রিকোণমিতির ভিত্তি স্থাপনে সমর্থ হন; তাহ'রীর উসূল উকলীদিস (تحرير أصول أقليدس) "Examination of the Elements of Euclid". পাণ্ডু. তিউনিস ৫৬ R, ৫৮, R, ল্যাটিন অনু. রোম ১৫৯৪); তাহ'রীর মুসাদারাত উকলীদিস تحرير مصادرات أقليدس (পাণ্ডু. তিউনিস ৪৭৬১), এই সকল গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি পরবর্তীকালে ইউক্লিড-এর ভাষ্যকারদের অনেকেই গ্রহণ করেন, যেইগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শামসু'দ-দীন আস-সামারকানদী-কৃত আশকালু'ত-তা'সীস (أشكال التأسيس) ও মূসা ইব্ন মুহাম্মাদ কাদী যাদাহ আর-রূমী (৮১৫/১৪১২) কর্তৃক প্রণীত ভাষ্য (পাণ্ডু. তিউনিস ২৭০৫, ২২৩ R, ২৭৪৬; Fsc. ৯৫২, প্যারিস ৬৮৫৩); হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ নাজ্জাম আন-নীসাবূরী (৮১১/১৪০৮) কর্তৃক প্রণীত এবং তূসীর তাযকিরা সম্পর্কে তাঁহার তাওহীদ-এ অন্তর্ভুক্ত ভাষ্য (পাণ্ডু. তিউনিস ২৩৬, পাণ্ডুলিপিটি ৮৬০/১৩৯৮ সালের)।

৯ম/ ১৫শ শতাব্দী ঃ আল-কাশী (মৃ. ৮৩২/১৪২৯), আর-রিসালাতু'ল-মুহীতিয়্যা ফী ইসতিখরাজ মুহীতি'দ-দা'ইরা "Determination of the perimeter of the circle"।

জ্যামিতির উন্নয়ন ও বিকাশে মুসলিম অবদানের একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ঃ (ক) বিশ্লেষণ— (১) প্রথমত লক্ষ্য করা যায় যে, বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত পুস্তকের ভূমিকার ছদ্মবেশে এমন কতিপয় জ্যামিতিক প্রশ্নমালার আলোচনা করা হইয়াছে যেইগুলির সমাধান উক্ত পুস্তকের পরবর্তী অংশে আলোচিত বক্তব্যের ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনীয়। এইরূপ একটি উদাহরণ জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত প্রবন্ধসমূহের মুখবন্ধ অধ্যায়সমূহ। এইখানে গোলকের অন্তঃস্থ বৃত্তসমূহের ধর্ম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং দূরত্ব, ঘন পদার্থের আয়তন, সমতল অথবা গোলকীয় ত্রিকোণমিতির সমস্যাসমূহের সমাধান অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

অপরদিকে জ্যামিতি ও পাটীগণিত অথবা বীজগণিতের উৎপত্তিগতভাবে দ্বৈততা থাকা সত্ত্বেও শেষোক্ত দুইটি যেহেতু প্রাথমিকভাবে স্বতন্ত্র বিজ্ঞান এবং প্রথমটি প্রায়োগিক দিক হইতে অবিরাম সম্ভাবনাপূর্ণ।

আল-খাওয়ারাযমীর পর হইতেই মুসলিমগণ জ্যামিতিক সমস্যা সমাধানে বীজগণিত ব্যবহার করিয়াছেন। একই সঙ্গে তাঁহারা নূতন বীজগণিতীয় সমস্যা সমাধানে জ্যামিতি ব্যবহার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহাই স্মরণ করা যথেষ্ট যে, আল-খায়্যাম বৃত্ত, অধিবৃত্ত ও পরাবৃত্তের সংযোগ ছেদকের মাধ্যমে ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান অর্জন করিয়াছেন। ইহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আল-মাহানী কোন গোলকের সমতলীয় ছেদ-তলের সম্পর্কিত সমস্যাবলী হইতে তিন মাত্রিক ঃ $x^3+b^2-bx^2$-এ উপনীত হন।

(২) অপরদিকে জ্যামিতির সহযোগী বিজ্ঞানরূপে মুসলিমগণ উদ্ভাবন ও বিকশিত করেন এক নূতন বিজ্ঞান-ত্রিকোণমিতি। ইহার ফলে পদার্থবিদ্যা বা বিশেষভাবে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক পরগণনায় যেই বিপ্লব সাধিত হয় তাহার গুরুত্ব পরিমাপ করা অসম্ভব। এই নূতন বিজ্ঞানের কল্যাণে সকল প্রকার সমস্যা সম্পূর্ণভাবে সমাধান লাভ করে এবং ইহার সূক্ষ্মতার মাত্রা নির্ভর করে কেবল কতিপয় তালিকার (table, زيج) উপর যাহা প্রারম্ভিক অবস্থাতেই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল।

৩য়/৯ম শতাব্দীতে আল-বাত্তানী Sin x-a cos. x সমীকরণটি সমাধান করেন এবং নিম্নোক্ত সূত্রটি আবিষ্কার করেন ঃ

$$\text{Sin } x = \frac{a}{\sqrt{1+a^2}}$$

(প্রথম চতুর্থাংশের অন্তর্গত বৃত্তচাপের জন্য হাবাশ স্পর্শক-এর তালিকা প্রণয়ন করেন। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে আবু'ল-ওয়াফা' ত্রিকোণমিতিতে বাস্তব উন্নতি সাধন করেন। তিনি নিম্নোক্ত সম্পর্কসমূহ প্রমাণিত করেন ঃ

$$\text{Sin }(a+b) = \text{Sin } a \text{ Cos } b + \text{Sin } B \cos a$$

$$2 \text{ Sin } a = 1 - \cos 2a$$

$$\text{Sin } 2a = 2 \text{ Sin } a \cos a$$

$$\sec a = \frac{1}{\text{Cos } a} = \sqrt{1-tg^2 a}$$

তিনি ত্রিমাত্রিক ত্রিভুজের সাইন (Sines) সংক্রান্ত সূত্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেন ঃ

$$\frac{\text{Sin } a}{\text{Sin } A} = \frac{\text{Sin } b}{\text{Sin } B} = \frac{\text{Sin } c}{\text{Sin } C}$$

ইব্‌ন য়ূনুস (৮৫৮/১০০৯), হাকিমী তালিকার গ্রন্থকার, নিম্নের সূত্রটি প্রমাণ করেন ঃ

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos (a+b) + \cos (a-b)]$$

ইহার ফলে যোগ হইতে গুণনে গমন সম্ভব হয়। এই পদ্ধতির পরবর্তীতে আবিষ্কৃত পরিগণনায় ব্যবহৃত লগ পদ্ধতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হয়।

৬ষ্ঠ/ ১২শ শতাব্দীতে জাবির ইব্‌ন আফলাহ cos b = cos B Sine এই সমীকরণটি সম্পর্কে পরিজ্ঞাত ছিলেন। সংক্ষেপে বলা চলে, আনু. ১২২০ খৃ. Fibonacci উপরিতল পরিমাপে ইহা ব্যবহার এবং আনু. ১৪৬৪ খৃ. আত-তূসীর রচনাবলীর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে Regiomontanus কর্তৃক ১৪৮৫ খৃ. য়ূরোপে সর্বপ্রথম প্রকাশিত ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধীয় প্রথম প্রবন্ধ রচনার বহু পূর্ব হইতেই আরবীয় ত্রিকোণমিতি একটি বহুকালব্যাপী প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ছিল।

(৫) ইহা ব্যতীত 'আরবগণ জ্যামিতি ব্যবহার দ্বারা ভূমিতিক (Geodesie) পরিমাপনের মাধ্যমে প্রাচীন অনুপাতসমূহ মিলাইয়া দেখা এবং টলেমীর আলমাজেস্ট-এর সিদ্ধান্তসমূহের যথার্থতা জরীপ করেন (বানূ শাকির আনু. ২১২/৮২৭ সালে পৃথিবীর হেলন নির্ণয় করার উদ্দেশে এক বৈজ্ঞানিক অভিযানে পালমিরা ও রাক্কাঃ পরে সিনজার, ল্যাটিন ভাষায় নিসগারা-এর উপকণ্ঠে গমন করেন)। আল-বাত্তানী পাশ্চাত্যের ৩০টিসহ ৩১০টি স্থানের ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক নির্ণয় করেন; আল-হাসানু'ল-মাররাকুশী ১৩৫ স্থানাঙ্ক প্রদান করেন যেইগুলির ৭১টি পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত। আল-বীরূনী মানচিত্র অঙ্কনের সমস্যা এবং সমতল ক্ষেত্রে জ্যোতির্মণ্ডল ও ভূমণ্ডল অঙ্কনের প্রশ্নসমূহের সমাধান করেন। তিনি বিভিন্ন প্রকারের পদ্ধতিতে অভিযোগের বিষয়টি পর্যালোচনা করেন। ইহাদের মধ্যে ছিল মোচাকৃতি, গোলাকৃতি, লম্বাকৃতি বা স্টেরিওগ্রাফী অভিক্ষেপ যাহাতে গোলকের রেখাসমূহ উপবৃত্ত, অধিবৃত্ত বা পরাবৃত্ত দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

(৪) ইখওয়ানু'স-সাফা'র লেখনী মতে "জ্যামিতির প্রধান প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহ হইতেছে ভূমির পরিমাপন, এই সকল পরিমাপন জরীপকারী, হিসাবরক্ষক, কর গ্রহীতা, জমিদারগণের বিভিন্ন প্রকার কার্য— যথাঃ সম্পত্তির কর আদায়, পানি নিষ্কাশন, ডাক ব্যবস্থা ইত্যাদি"।

(৫) জ্যামিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ ক্ষেত্র স্থাপত্য ও ভাস্কর্য; জ্যামিতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মুসলিম শিল্পকলা বর্ধিত খিলান, সুষম বহুভুজের উপর অবস্থিত চাঁদোয়া, Corbeling, Stalatites চুন-সুরকি মিলিত বহুমাত্রিক অংকন ও আলোক বিন্যাসের আবিষ্কার অথবা বিকাশ সাধন করে। প্রস্তর অথবা চুন-সুরকির উপর ভাস্করের কার্য গণিতজ্ঞের দ্বারা পূর্ব পরিকল্পিত হইত।

(খ) **রচনাবলী ঃ** মুসলিম গ্রন্থকারগণ রচিত তাত্ত্বিক জ্যামিতি সম্পর্কিত রচনাবলীর মধ্যে Suter কেবল দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন। ৩য়/ ৯ম শতাব্দীতে বানূ শাকির রচিত গ্রন্থ মা'রিফাতু'ল-আশ্‌কাল আল-বাসীতাঃ ওয়া'ল-কুরিয়্যাঃ (معرفة الاشكال البسيطة و الكرية) এবং ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে আবু'ল-ওয়াফা' রচিত জ্যামিতি যাহা তাঁহার জনৈক ছাত্রের মারফত একটি ফারসী সংস্করণে বর্তমান কাল পর্যন্ত আসিয়াছে (তু. F. Woepcke, JA-তে [১৮৫৫ খৃ.], পৃ. ২১৮-৫৬ ও ৩০৯-৫৯)।

অবশ্য একই সংগে আমাদের দৃষ্টিতে অন্য যেই সকল রচনা গুরুত্বপূর্ণ সেইগুলি সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা করা সম্ভব।

উল্লিখিত ছাবিত ইব্‌ন কুররাঃ-র পাণ্ডুলিপি ফী মিসাহা কাত্'ই'ল-মাখরূত আল্লাযী য়ুসাম্মা'ল-মুকাফি' (فى مساحة قطع المخروط الذى يسمى المكافى), ইহাতে আর্কিমিডিসের উদাহরণ অনুসরণে তিনি ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের একটি পদ্ধতি ব্যবহারের মধ্যে অক্ষ বা ফোকাসের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত কোন রেখার চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান কোন অধিবৃত্তের অংশের ক্ষেত্রফল অথবা অধিবৃত্তিক আকৃতির আয়তন নির্ণয় "Integeal sums"-এর সমতুল্য লিমিট অন্বেষণ করিয়াছেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্মরণযোগ্য; তাহা হইতেছে ইউক্লিডের নাম অতি প্রাচীনকাল হইতে যে অত্যধিক সম্মান পাইত তাহা অতিসাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রবল মাত্রায় অব্যাহত ছিল এবং বিভিন্ন নীতিমালা সম্পর্কে তাহার প্রামাণিকতার মূলনীতির প্রতি কতিপয় মুসলিম পণ্ডিতের মনোভাব। ইতোমধ্যে উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ৩য় / ৯ম শতাব্দী হইতেই পণ্ডিতগণ ইউক্লিডের স্বীকার্য সত্যসমূহের (postulates)

কতিপয়, বিশেষত সমান্তরাল রেখা সম্বন্ধীয় তাঁহার বিখ্যাত ৫ম স্বীকার্য সত্য সম্পর্কে গুরুতর মতদ্বৈততা প্রকাশে কুণ্ঠিত হন নাই।

অত্যন্ত সূক্ষ্ম যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে তাঁহারা প্রথমত দাবী করেন যে, স্বয়ং ইউক্লিড তাঁহার এই প্রতিজ্ঞাটি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে স্থির নিশ্চিত ছিলেন না। ইহাকে তিনি একটি 'মৌল সত্য' অথবা স্বতঃসিদ্ধরূপে বিবেচনা করেন নাই, বরং ইহা একটি স্বীকার্য সত্যমাত্র যাহা তিনি তাঁহার পাঠককে গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। ইহার পর তাঁহারা সরাসরি অগ্রসর হইয়া ইউডক্স ও আর্কিমিডিসের পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে এবং অন্য স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য সত্যসমূহ ব্যবহার করিয়া সমান্তরাল রেখার তত্ত্ব স্থির করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর গ্রন্থকারগণের মধ্যে প্রখ্যাত ছিলেন জাওহারী (৩য়/৯ম শতাব্দী), আব্হারী, নায়রীযী (৪র্থ/১০ম শতাব্দী), ইব্নু'ল-হায়ছাম, খায়্যাম (৫ম/১১শ শতাব্দী) ও তূসী (৭ম/ ১৩শ শতাব্দী)। এই সকল রচনা ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল; ইহাদের প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয় লেভি বেন গারসন (১৪শ শতাব্দী)-এর Commentaries to the introduction of Euclid's elements, আলফনসো (১৪শ-১৫শ শতাব্দী) রচিত Rectifier of wrong এবং ইউক্লিডের Elements সম্পর্কে ক্লাভিয়াস-এর ভাষ্যসমূহে।

তূসী কর্তৃক ৫ম স্বীকার্য সত্যের বিশ্লেষণটি (১৫৯৪ খৃ. রোম ও ১৬৫৭ খৃ. লন্ডনে প্রকাশিত) John Wallis (১৬১৬-১৭০৩ খৃ.) ও Saccheri (১৬৬৭-১৭৩৩ খৃ.) জ্ঞাত ছিলেন। খায়্যাম ও তূসীর বিশ্লেষণের সারবিন্দু ছিল এমন একটি চতুর্ভুজ ABCD গঠনের সম্ভাবনার প্রসঙ্গে (পরবর্তীকালে Saccheri-র রচনাবলীর মাধ্যমে খ্যাতিপ্রাপ্ত) যাহাতে AB-CD, ABC-ID, BCD-ID; সুতরাং BAD-ADC হইতে হইবে। তাত্ত্বিকভাবে এই কোণসমূহের জন্য তিনটি অবস্থা সম্ভবত ইহারা সমকোণ, স্থূল কোণ অথবা সূক্ষ্ম কোণ। খায়্যাম ও তূসী সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন যে, কেবল প্রথম অবস্থাটি বাস্তবভাবে সম্ভব। ইহা সর্বজনবিদিত যে, পরবর্তীতে Lobacheoski ও Bolyai-র non-Euclidian জ্যামিতির মৌল উপপাদ্যসমূহ মূলত সূক্ষ্ম কোণের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থূল কোণটির ধারণা একইভাবে রিমান (Riemann)-এর জ্যামিতির ভিত্তি।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলিমগণের গবেষণা ও অধ্যয়ন জ্যামিতিশাস্ত্রের ক্রমাগত উন্নতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে কতিপয় অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। জ্যামিতিকে অবিরাম মাত্রায় সীমাবদ্ধ না রাখিবার চমৎকার ধারণাটি তাঁহারাই দান করিয়াছিলেন। তাত্ত্বিক বিমূর্ত চিন্তা ও ব্যবহারিক শিল্পকলা অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রয়োগের মধ্যে একটি সুষম ভারসাম্য বজায় রাখিবার ক্ষেত্রে তাঁহারা অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন। যদিও তাঁহারা ইউক্লিড ও অন্যান্য গ্রীক জ্যামিতিশাস্ত্রের পণ্ডিতগণকে বহুলাংশে শিক্ষকরূপে গণ্য করিয়াছিলেন, তথাপি ঐ সকল প্রাচীন পণ্ডিতের রচনাবলীর সমালোচনা করা এবং ইহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিতে তাঁহারা দ্বিধাবোধ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদের তাত্ত্বিক সততা ছিল অত্যন্ত উচ্চ মানের এবং ইহার মাধ্যমে তাঁহারা জ্যামিতির পরবর্তী সময়কালে বিপুল উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) Alfonso, Meyasheriqub, বৃটিশ মিউজিয়াম, Add ২৬৮৯৪, রুশ অনুবাদ (প্রস্তুতি পর্বে) G. M. Gluskina; (২) Chr. Clavius, Euclidis, Elementorum libri XV, কোলন ১৫৯৬ খৃ.; (৩) Euclidis Elementorum geometricorum libri tredecim ex traditione doctissimi Nassiriddini Tusini nunc primum arabice impressi, রোম, ১৫৯৪ খৃ.; (৪) J. Wallis, De postulato quinto et definitione quinta lib. 6 Euclidis, in Opera mathematica, ২খ, অক্সফোর্ড ১৬৯৩ খৃ., ৬৬৯-৭৩; (৫) G. Sccheri, Euclides ab Omne naevo vindicatus, মিলান ১৭৩৩ খৃ.; (৬) F. Woepoke, L'Algebra d'Omar Alkhayyami, প্যারিস ১৮৫১ খৃ.; (৭) Sarton, Introduction; (৮) D. E. Smith, Euclid, Khayyam S Saccheri, in Scripta mathematice, ২/১খ, (জানুয়ারী ১৯৩৫ খৃ.), ৫-১০; (৯) A. Mieli, La science arabe, লাইডেন ১৯৩৮ খৃ.; (১০) E. B. Plooij, Euclid's conception of ratio and his definition of proportional magnitudes as criticized by Arabian commentators, রটারডাম ১৯৫০ খৃ.; (১১) B. A. Rosenfeld ও A. P. Yusckevie, Omar al-Khayyam, মস্কো ১৯৬২ খৃ.; (১২) Rosenfeld, The theory of parallel lines in the Medieval East, in Actes du XIe congree international d'histoire des sciences; (১৩) Yushckevic, Geschichte der Mahematik im Mittelalter, Basle ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ২৮৮-৯৫; (১৪) ঐ লেখক, Les mathematiques arabes, অনু. M. Cazenove ও K. Jaouiche, প্যারিস ১৯৭৬ খৃ.; (১৫) R. Taton, Histoire generale des sciences, ১খ, প্যারিস ১৯৬৬ খৃ., ৪৪০-৫২৫; (১৬) Kh. Jaoiche, De la fecondite mathematique : d' Omar Khayyam a G. Saccheri, in Diogene, ৫৭খ, (১৯৬৭ খৃ.) ৯৭-১১৩; (১৭) S. H. Nasr, Islamic Science, an illustrated survey, লন্ডন ১৯৭৬ খৃ.।

M. Souissi (E.I.[2], Suppl.)/ আবদুল বাসেত

**'ইলমু'ল-হায়'আ** (علم الهيئة) ঃ আকাশের গঠনবিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিদ্যা ('আরবীতে ইহা আরও কয়েকটি নামে পরিচিত)। ইহা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেই নক্ষত্রাদি সম্পর্কিত শাখা যাহার বিষয়বস্তু বিশ্ব সৃষ্টির জ্যামিতিক গঠন, গাগনিক বস্তু সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্রাদির পর্যায় বৃত্ত গতি নির্ণয়, সেই সকল গতি বর্ণনা করিবার জন্য গতিমান মডেল তৈরি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলকে ছকের আকারে আনয়ন ও সাজান যাহাতে একটি গণনাযন্ত্রের (কম্পিউটার) সাহায্যে খুব সহজে ও সঠিকভাবে পৃথিবীর যে কোন বিশেষ একটি স্থান হইতে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয় এবং যাহা নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণের নিশ্চয়তার জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরি ও ব্যবহারের বিষয়ে নিয়োজিত।

বিশ্বের জ্যামিতিক গঠন সম্বন্ধে মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ ৮০০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে যেই ধারণা করেন তাহা টলেমী কর্তৃক তাঁহার আলমাজেস্ট

(Almagest) গ্রন্থে বর্ণিত ধারণার সঙ্গে মোটামুটি মিলিয়া যায়। পৃথিবী বেষ্টনকারী আটটি গোলকের কেন্দ্রের নিকটে স্থির নিশ্চল রহিয়াছে। অষ্টম গোলকটি স্থির নক্ষত্ররাজি (আসসূফী, মৃ. ৩৭৬/৯৮৬ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যাহার তালিকা তৈরি করিয়াছিল) দ্বারা শোভিত, প্রতিদিন পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে আবর্তিত হয়; ইহা যথাযথ অগ্রচলন বলে; আবার বিপরীত দিকেও আবর্তিত হয় বা একটি গতিতে ক্রমাগত দোল খায়, যাহাকে কম্পন (trepidateon) বলা হয়। ছাবিত ইব্ন কুররাঃ ও অন্যান্য স্পেনীয় জ্যোতির্বিদের মাধ্যমে এই তত্ত্ব প্রচলিত হয়। পৃথিবীর কেন্দ্রের অকেন্দ্রিক পাঁচটি "নক্ষত্র-গ্রহে"র (star planets) গোলক এমনভাবে আবর্তিত হয় যে, উহাদের সুষম গতিময় কেন্দ্র (equants) ও জ্যামিতিক কেন্দ্র অভিন্ন থাকে না; বুধ গ্রহের ছাঁচ (model)-এ বিশেষ ব্যবস্থা অনুসারে একটি হস্তচালিত যন্ত্র (crank mechanism) আছে, তাহাতে ইহার কক্ষপথে দুই অনুভূ (perigees) সৃষ্টি হয়। এইসব গোলকের পৃষ্ঠে গ্রহগুলির উপচক্রের (epicycle) কেন্দ্র অবস্থিত। সূর্যের ছাঁচ মাত্র একটি উৎকেন্দ্রিক বৃত্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, অন্যদিকে চন্দ্রের ছাঁচে হস্তচালিত ক্র্যাংক যন্ত্র ও উপচক্র দুইই ব্যবহার করা হইয়াছে। ক্র্যাংক যন্ত্রে ইহার বহির্মুখী কেন্দ্রকে পৃথিবীর কেন্দ্রের চতুর্দিকে আবর্তিত করান হয় এবং উপচক্রের অনিয়মিত গতিবিধি উহার (উপচক্রের) অনুভূ হইতে গণনা না করিয়া উহার ক্র্যাংক যান্ত্রিক বৃত্তের বিপরীত বিন্দুতে অবস্থিত উহার কেন্দ্রের মধ্য দিয়া প্রসারিত রেখার একটি বিন্দু হইতে গণনা করা হয়। মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞান এই পদ্ধতির জটিলতা ব্যাখ্যা এবং যেই প্যারামিটার (Parameters) দ্বারা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধির ছাঁচকে গুণগত হইতে সংখ্যাগত ছাঁচে পরিণত করে তাহার সংস্কারকার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যীজ-এর মূল হইল ছাঁচের বিভিন্ন অংশের গতি এবং সেই গতির নির্ধারিত স্থিতিমাপ হইতে প্রস্তুত তালিকা। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতীয় ও সাসানীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাবলীর অনুবাদের ফলে (সেগুলির নাম একটু পরেই উল্লেখ করা হইবে) মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিগণনা স্থিতিমাপ ও তালিকা তৈরির পদ্ধতি নির্ণীত হয়, গ্রহাদির গোলকের জ্যামিতিক ছাঁচের মাধ্যমে নহে, (য়া'কূব ইব্ন তা'রিক রচিত তারকীবু'ল-আফলাক এই নিয়মের ব্যতিক্রম); সেইজন্যই তাঁহারা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর বিষয়ের উপরে বর্ণিত টলেমীয় মতবাদের কোন সংশোধন করেন নাই।

আলমাজেস্ট (Almagest-المجسطى) গ্রন্থের রচয়িতাকে অনুসরণ করিয়া মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ সমগ্র নিয়মটাকেই কোন রকম অবয়ব সম্পর্কবিহীন বিশুদ্ধ গাণিতিক গঠন বলিয়া ধারণা করিতেন। কিন্তু ইবনু'ল-হায়ছাম [দ্র.] (মৃ. ৪৩০/১০৩৯) টলেমীর নিজের (Hypotheses) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সূচিত চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, আলমাজেস্ট গ্রন্থে যেই সকল ছাঁচের কথা বলা হইয়াছে সেইগুলির বাস্তব অস্তিত্ব রহিয়াছে। এই মত সমর্থনকারিগণকে যেই সমস্যাটির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহা ছিল এই নমুনাগুলিকে অ্যারিস্টোটলীয় পদার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার। অ্যারিস্টোটলীয় পদার্থবিজ্ঞানে সমগ্র জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর শুধু পৃথিবীর কেন্দ্রের সঙ্গে সমকেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকিয়া অপরিবর্তনীয় বৃত্তাকার গতি থাকাই সম্ভব। ইব্ন বাজ্জা (মৃ. ৫৩৩/১১৩৮-৩৯) হইতে শুরু করিয়া ইব্ন তুফায়ল (দ্র.), ইব্ন রুশ্দ (দ্র.), আল-বিতরুজী (দ্র.) পর্যন্ত স্পেনের দার্শনিকগণ সকলেই সমস্যাটির হয় আংশিক মীমাংসা করিতে চাহিয়াছিলেন উপচক্র বাদ দিয়া, অথবা সম্পূর্ণ মীমাংসা করিতে চাহিয়াছিলেন বিশ্বজগতের ইথারময় অংশ (ethereal) হইতে উপচক্র উৎকেন্দ্র বাদ দিয়া। তাঁহাদের প্রচেষ্টার ফলাফল জোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু ৭ম/১৩শ শতকের শেষভাগে ৮ম/১৪শ শতকের প্রথম ভাগে সারাগা, তাবরীয দামিশ্কে আরও অধিকতর বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমস্যাটির সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয়। সেই সকল স্থানে লক্ষ্য ছিল শুধু টলেমীয় পদ্ধতি হইতে খুব বেশী অ-অ্যারিস্টোটলীয় বিষয়সমূহ বাদ দেওয়া— equants চন্দ্রের "বিপরীত বিন্দু"— যাহাতে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি শুধু একইরূপ বৃত্তাকার গতির সংমিশ্রণরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। মারাগা গোষ্ঠীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সাফল্য তাঁহাদের সমাধানের পরবর্তী প্রভাব সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

যাহা হউক, 'আরবগণ সব সময়ে টলেমীর জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। ইসলাম-পূর্ব যুগে ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে তাঁহাদের মধ্যে 'ইলমু'ল-হায়'আ-র যেই প্রতিফলন লক্ষ্য করা করা যায় তাহা হইল চন্দ্রের আটাশটি কক্ষগতির (منازل القمر) সাহায্যে রাত্রিকালের সময় নির্ণয় করার একটি খুবই স্থূল পদ্ধতি ও সূর্যের উদয় (heliacal risings) এবং মহাজাগতিক রশ্মির অপসারণ (cosmic settings (أنواء)-এর সাহায্যে ঋতুসমূহের একটি মোটামুটি হিসাব। কিন্তু হিজরী ২য় ও ৩য় শতাব্দীতে অর্থাৎ উমায়্যা বংশের শাসনের শেষভাগে ও 'আব্বাসী খিলাফাতের প্রথম দেড় শত বৎসরে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে (এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞানসম্বলিত জ্যোতিষীবিদ্যা সম্বন্ধে) বহু সংখ্যক গ্রন্থ সংস্কৃত, পাহ্লাবী, গ্রীক ও সিরীয় ভাষা হইতে 'আরবীতে অনূদিত হয়। অনুবাদ যুগের প্রথমার্ধ বা উহার নিকটবর্তী কালব্যাপী 'আরব জ্যোতির্বিজ্ঞানিগণ অত্যন্ত সারগ্রাহী ছিলেন এবং কোন কোন এলাকায়, যেমন স্পেনে সেই সারগ্রাহিতা অতি দীর্ঘকালব্যাপী প্রবল ছিল। কিন্তু ৩য়/৯ম শতকের শুরুতে টলেমীর কঠোর নিয়ম পদ্ধতিসমূহ জ্যামিতিক প্রমাণসমূহ প্রবর্তনের ফলে খুব দ্রুত পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রসার ঘটিতে থাকে, যেইগুলির উদ্দেশ্য ছিল অংশত গ্রীসীয়, ইরানী ও ভারতীয় পদ্ধতির অসামঞ্জস্যসমূহ অনুসন্ধান করিয়া দেখা এবং অংশত টলেমীয় প্যারামিটারের (parameters) উন্নয়ন সাধন করা। টলেমীয় পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বের ক্রমান্বয়ে স্বীকৃতির সঙ্গে অন্তত ইসলামে বিকশিত উগ্র গ্রীসীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পরিমণ্ডলীর স্বীকৃতি অধিকাংশ মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে আলমাজেস্ট এক অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করে। আনুমানিক ৯০০ খৃস্টাব্দে আল-বাত্তানীর যীজু'স-সাবি' (زيج الصابىء) প্রকাশকালের মধ্যে এই রীতি-পদ্ধতি সম্পূর্ণ হয় এবং আন্দালুসীয়গণের ভারতীয়করণের প্রবণতা, অ্যারিস্টোটলপন্থিগণের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও মারাগার জ্যোতির্বিজ্ঞানাগারের সাফল্য সত্ত্বেও একেবারে আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত টলেমীর আধিপত্য অক্ষুণ্ন ছিল।

### সংস্কৃত হইতে অনুবাদ

সংস্কৃত জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 'আরবীতে সর্বপ্রথম অনুবাদ সম্ভবত যীজ আল-আরকান্দ (زيج الاركند) [আরকান্দ শব্দটি সংস্কৃত অহর্গন শব্দের অপভ্রংশ]। গ্রন্থখানি ১১৭/৭৩৫ সালের সামান্য পরে

সিন্ধুতে অনূদিত হয়। ইহার উপরে ভিত্তি করিয়া আরও দুইখানি যীজ রচিত হয়, যীজ আল-হাযূর ও যীজ আল-জামি', সেই দুইখানিই ২য়/৮ম শতকে কান্দাহারে রচিত হয়। যীজ আল-কারকান্দ-এর বিষয়বস্তু দৃশ্যতই প্রধানত গৃহীত হইয়াছিল ৬৬৫ খৃ. ভিল্লমালার রমাগুপ্ত রচিত খণ্ডখাদ্যক গ্রন্থ হইতে; অবশ্য অনুবাদ গ্রন্থখানি ৩য় ইয়ায্দিগিরদ্ (৬৩২-৬৫২ খৃ.) রচিত যীজ আল-শাহ (زيج الشاه) দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছিল, সেইখানিও খণ্ডখাদ্যক গ্রন্থেরই ন্যায় আর্যভট্ট (জ. ৪৭৬) রচিত মধ্যরাত্রি গোষ্ঠী (অর্ধরাত্রিকা) গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

৭৪২ খৃ. আরও একখানি সংস্কৃত যীজ-গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়। উহা মূল সংস্কৃতের ন্যায় কাব্যাকারে রচিত হয়, নাম দেওয়া হয় যীজ আল-হারকান, (زيج الهرقن) এই হারকান শব্দটিও সংস্কৃত অহর্গন শব্দেরই অপভ্রংশ। এই যীজ আর্যভট্টের সূর্যোদয়গোষ্ঠী (আউদায়িকা) গ্রন্থাবলী অবলম্বনে অর্থাৎ ৪৯৯ খৃ. রচিত আর্যভট্টীয় গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যেই গ্রন্থখানি সংস্কৃত হইতে 'আরবীতে অনূদিত হয় সেইখানির নাম মহাসিদ্ধান্ত, উহা ব্রহ্মগোষ্ঠী (ব্রহ্মপক্ষ) গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত; মহাসিদ্ধান্ত প্রধানত বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরানের পিতামহ সিদ্ধান্তের (৫ম শতকের প্রথমার্ধ) উপর এবং ব্রহ্মগুপ্ত কর্তৃক ৬২৮ খৃ. রচিত ব্রহ্মস্পুট সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত, যদিও গ্রন্থখানির কিছু কিছু অংশ যে আর্যভট্টীয় হইতে আহৃত তাহা ইহার অবশিষ্ট ভগ্নাংশ হইতেই বুঝা যায়। ১৫৪/৭৭১ বা ১৫৬/৭৭৩ সালে সিন্ধুর দূতাবাস হইতে একটি দল বাগদাদে খলীফা আল-মানসূরের দরবারে গেলে তখন এই সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ 'আরবীতে অনুবাদের উপলক্ষ সৃষ্টি হয়। কথিত আছে, অনুবাদক নিযুক্ত হন আল-ফাযারী তিনি তাঁহার যীজু'স-সিন্দ হিন্দ আল-কাবীর (زيج السند هند الكبير) গ্রন্থে ভারতীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে ইরানী বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ ঘটান। আল-ফাযারী তাঁহার পূর্বের গ্রন্থের উপরে ভিত্তি করিয়া যীজ 'আলা সিনি'ল-'আরাব (زيج على سنى العرب) নামক অপর একখানি গ্রন্থেরও রচয়িতা, সেইখানি সম্ভবত 'আরবী বর্ষপঞ্জী ব্যবহারকারী প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞান তালিকাপঞ্জী; এই গ্রন্থ রচনার তারিখ আনু. ৭৯০ খৃ.। অপর একজন পণ্ডিত য়া'কূব ইব্ন তারিক, যিনি স্পষ্টতই স্বাধীনভাবে মহাসিদ্ধান্ত গ্রন্থখানি আয়ত্ত করেন, ৭৭৭ বা ৭৭৮ খৃ. একখানি তারকীবু'ল-আফ্লাক (تركيب الافلاك) প্রণয়ন করেন। অধিকন্তু তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে একখানি যীজ এবং একখানি কিতাবু'ল-'ইলাল (كتاب العلل)। এই সবেই ভারতীয় ও ইরানী বিষয়বস্তুর মিশ্রণ প্রতিফলিত হইয়াছে। আল-ফাযারী ও য়া'কূবের গ্রন্থাবলী সমবায়ে সিন্দ-হিন্দু ঐতিহ্য বা রীতির ভিত্তি রচিত হইয়াছে। নিম্নে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে ঃ

৮০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে যীজুল-আরজাবহার (زيج الارجبهر) নামে আর্যভট্টীয় গ্রন্থের আরও একখানি 'আরবী অনুবাদ মুসলিম জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে প্রচলিত হয়। সম্ভবত একমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানী যিনি সেইখানি অনুসরণ করিয়াছিলেন তিনি হইলেন জনৈক আবু'ল-হাসান আল-আহ্ওয়াযী, যদিও গ্রন্থখানির কথা আবূ মা'শার [দ্র.] (মৃ. ২৭২/৮৮৬)-ও অবশ্যই জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন। স্মরণ রাখা উচিত যে, এই অনুচ্ছেদ বা পরবর্তী অনুচ্ছেদে যেই সকল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলির কোনটিই আর বর্তমানে পাওয়া যায় না। কাজেই এইখানে যেই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, সেইগুলির কিছুটা সংশোধনের প্রয়োজন হইতে পারে এবং অবশ্যই তাহা মতদ্বৈততার ঊর্ধ্বে হইবে না।

**পাহ্লাবী ভাষা হইতে অনুবাদ**

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক সাসানীয় সাহিত্য, জ্যোতিষশাস্ত্রের ন্যায় (এই উভয়ই প্রধানত 'আরবী অনুবাদ ও অভিযোজনের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করে) ছিল গ্রীক ও ভারতীয় বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ। টলেমীর আলমাজেস্ট পাহলাবী অনুবাদের মাধ্যমে ৩য় শতকেই বর্তমান ছিল এবং আর্যভট্টের অর্ধরাত্রিকা গোষ্ঠীর একখানি গ্রন্থ ৫৫৬ খৃ. প্রচলিত ছিল; ব্রহ্ম পক্ষের একটি গ্রন্থ সম্ভবত ৪৫০ খৃ. পরিচিত ছিল। আনূশিরওয়ান-এর জন্য ৫৫৬ খৃ. সংশোধিত "শাহী জ্যোতির্বিদ্যা গণনা" বা যীজ-ই শাহ্রিয়ারান গ্রন্থখানি আনু. ৭৮০-৮১০ খৃ. মাশাশাআল্লাহ ব্যবহার করেন, কিন্তু সম্ভবত গ্রন্থখানি কোন সময়েই 'আরবীতে অনূদিত হয় নাই। ৩য় য়ায্দিগিরদ-এর সময়ে প্রকাশিত পরবর্তী সংস্করণ জনৈক আল-তামীমী কর্তৃক যীজু'শ-শাহ নামে আরবীতে অনূদিত হয়। আল-ফাযারী (বিশেষ করিয়া গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ক সমীকরণের জন্য) ও আবূ মা'শার গ্রন্থখানি ব্যবহার করেন; আল-বীরূনীর (দ্র.) আমল পর্যন্ত ইহার পাণ্ডুলিপি প্রচলিত ছিল।

**গ্রীক ও সিরীয় ভাষা হইতে অনুবাদ**

জ্যোতির্বিজ্ঞানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যেই গ্রন্থখানা 'আরবীতে অনূদিত হয় তাহা ছিল অবশ্যই টলেমীর আলমাজেস্ট। মূল গ্রীক ও সিরীয় অনুবাদ হইতেই ইহার অনুবাদ হইয়াছিল। আল-হাজ্জাজ-এর প্রচেষ্টায় অনূদিত এই গ্রন্থখানা ৩য়/৯ম শতকের প্রথমদিকে আল-মা'মূনের দরবারে সমবেত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের উপরে খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য অনুবাদ করিয়াছিলেন ইসহাক ইব্ন হুনায়ন (দ্র) এবং সংশোধন করিয়াছিলেন ছাবিত ইব্ন কুররা (দ্র.)। ৩য়/৯ম শতক কালের মধ্যে টলেমীর হাইপথেসিস (Hypothesis), থিওন-এর Handy Tables বা সংক্ষিপ্ত তালিকা ও অপ্রধান গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ "ক্ষুদ্র জ্যোতির্বিজ্ঞান" (Little Astronomy) [অথবা পরে, যখন নাকি ইউক্লিডের Elements "মাধ্যমিক জ্যোতির্বিদ্যা" (Middle Astronomy) হিসাবে খুব ভালভাবে শিক্ষা করিয়া অতঃপর জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যয়ন করা রীতিতে পরিণত হয়] ও 'আরবীতে অনূদিত হয় এবং গ্রীক ও সিরীয় গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া বা আস্তুরলাব (Astrolabe) বিষয়ে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত ও পাহলাবী ভাষা হইতে কৃত অনুবাদসমূহ দ্বারা কম বা বেশী প্রভাবিত জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই জ্ঞানভাণ্ডার [সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায় মুসলিমদের উদ্ভাবিত একটি ত্রিকোণমিতিতে; ভারতীয় পদ্ধতি যাহাতে শুধু সাইন (sine), কোসাইন (cosine) ও ভারসাইন (versine) অপেক্ষকসমূহের ব্যবহার করা হইত তাহা হইতে উদ্ভূত টলেমীর ত্রিকোণমিতি অপেক্ষা ইহা অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য] ৯ম খৃ. পরে ইসলামী জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হিসাবে গড়িয়া উঠে।

**টলেমীয় ঐতিহ্য**

উল্লিখিত জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে তত্ত্ব ও মহাবিশ্বের গঠন সম্বন্ধে 'আরবী গ্রন্থসমূহে সাধারণভাবে টলেমীয় পদ্ধতির প্রতিফলন রহিয়াছে। কিন্তু বিস্তারিত বিশ্লেষণের অভাবে যে কোন বিশেষ জ্যোতির্বিজ্ঞান বা যীজ ভারতীয়, ইরানী বা গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরে কতটুকু নির্ভর করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহা বর্তমানে নির্ণয় করা কঠিন। তবে

ইহা পরিষ্কার যে, এমন কি অধিকাংশ টলেমীয় যীজেও প্যারামিটার, গণনা পদ্ধতি বা অন্যান্য বিষয়াদি রহিয়াছে যেগুলি সিন্দ-হিন্দ বা জীযু'শ-শাহ হইতে গৃহীত হইয়াছে। য়াহ্'য়া ইব্ন আবী মানসূর (আনু. ২১৪/৮২৯)-কৃত যীজু'ল-মুমতাহান (زيج الممتحن)-এর ক্ষেত্রে এবং হাবাস (আনু. ২৩৫/৮৫০)-কৃত কয়েকটি যীজের ক্ষেত্রে ইহা সত্য। আবূ মা'শার তাঁহার যীজু'ল-হাযারাত গ্রন্থে তিনটি পদ্ধতিকেই একত্রীভূত করিতে সচেতনভাবে চেষ্টা করেন, যাহাতে সেইগুলি যে সবই অতুলনীয় মহাপ্লাবন বা নূহ ('আ) পূর্বেকার ওয়াহ্'য়িহ'ীলব্ধ জ্ঞান হইতে আহ্'রিত তিনি তাঁহার সেই দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন।

তবে আল-বাত্তানী (আনু. ২৮৭/৯০০)-র যীজু'স-সাবি' প্রায় সম্পূর্ণই টলেমীয়; ইহাতে সিরীয়, বিশেষ করিয়া হাররানী জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্র গোষ্ঠীতে যেই বিরাট গ্রীক প্রভাব ছিল খুব সম্ভব তাহাই প্রতিফলিত হয়। কুশ্'য়ার ইব্ন লাব্বান (আনু. ৪০০/১০১০) আল-বাত্তানীর প্যারামিটার গ্রহণ করিয়াছিলেন যদিও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থে তিনি সাধারণভাবে আবূ মা'শার-এর অনুসারী ছিলেন এবং সন্দেহ হয় যে, সেই প্রভাব তাঁহার যীজসমূহেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। ইব্ন য়ুনিস (আনু. ৩৮০/৯৯০) কর্তৃক কায়রোতে রচিত যীজু'ল-কাবীর আল-হাকিমী গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ হইবার কারণে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আল-বীরূনী (৪২১/১০৩০)-র গ্রন্থাবলীও ঐতিহাসিক তথ্যাদির জন্য অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার আল-কানূনু'ল-মাস'ঊদী গ্রন্থখানিতে স্থানে স্থানে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। যীজু'স-সানজারী রচনা করিয়াছিলেন আল-খাযিনী (আনু. ৫১৪/১১২০) ইরানে। উহার একখানি সংক্ষিপ্তসার গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন গ্রেগরী সিওনিয়াডেস (Gregory Chioniades)। তিনি আনু. ৭০০/১৩০০ সালে পাণ্ডুলিপিখানি তাব্রীযে পাইয়াছিলেন। আল-খাযিনী, আবূ মা'শার-এর ভারতীয় চক্র (cycles) নিয়মের প্রতি আগ্রহান্বিত থাকা সত্ত্বেও টলেমীর ঐতিহ্য অনুযায়ীই গণনা করিতে থাকেন এবং আল-ফাহ্'হাদ (আনু. ৫৪৫/১১৫০)-এর যীজু'ল-'আলা'ঈ (যাহা মূল আকারে পাওয়া যায় নাই) ছিল অন্যতম গ্রন্থ যেইগুলি সিওনিয়াডেস গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেন এবং ইহার বিষয়বস্তু আল-ফারিসী (আনু. ৬৫৮/১২৬০) তাঁহার যীজু'ল-মুমতাহান আল-মুজাফ্ফারী গ্রন্থে ব্যবহার করেন।

**সিন্দ-হিন্দ ঐতিহ্য**

এই ধারার ভিত্তি নিহিত আল-ফাযারী ও য়া'কূব ইব্ন তারিক-এর গ্রন্থাবলীতে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি সেইগুলি ব্রহ্ম পক্ষ ও আর্যভট্টীয় বিষয়াদির সঙ্গে কিছু কিছু সাসানী ও গ্রীক বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই ধারার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী প্রতিনিধিত্বশীল গ্রন্থ ছিল আল-খাওয়ারিযমীর [দ্র.] (আনু. ২১৫/৮৩০)-র যীজু'স-সিন্দ-হিন্দ। মূল গ্রন্থের কিছু কিছু খণ্ডাংশ মাত্র বর্তমানে পাওয়া যায়, কিন্তু আল-মাজরীতী (আনু. ৩৯০/১০০০) কর্ডোভাতে গ্রন্থখানির যেই একখানি সংশোধিত সংস্করণ করিয়াছিলেন, সেইখানির ল্যাটিন অনুবাদ বর্তমান রহিয়াছে; অনুবাদক ছিলেন বাথ-এর এডেলার্ড (Adelard of Bath, ১১২৬ খৃ.)। আল-খাওয়ারিযমী-র যীজের আল-মাসরূর (আনু. ২৬১/৮৭৫)-কৃত ও ইবনু'ল-মুছান্না (৪র্থ/১০ম শতক; শেষোক্ত ভাষ্যটি শুধু স্পেনে প্রণীত ল্যাটিন হিব্রু অনুবাদের মাধ্যমে বিদ্যমান)-কৃত ভাষ্য এবং আল-ফারগানী (দ্র.)-কৃত ভাষ্যের (আনু. ২৩৫/৮৫০) কিছু কিছু অংশও পাওয়া যায়। উল্লিখিত আল-খাওয়ারিযমীর রচনাবলীর সংরক্ষণ হইতে সিন্দ-হিন্দের প্রতি আন্দালুসীয়গণের তীব্র অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধারণার আরও সমর্থন পাওয়া যায় সিন্দ-হিন্দ ঐতিহ্যের অন্যতম প্রধান প্রাচ্য দেশীয় প্রতিনিধি স্থানীয় ইবনু'ল-আদামী-কৃত নাজমুল-'ইক্'দ (نظم العقد)-এর বিষয়ে জানা যায় প্রধানত সা'ইদ আল-আন্দালুসীর একটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে ৯০০ খৃ. পরে যেই দুইটি প্রাচ্যদেশীয় যীজ সিন্দ-হিন্দ ধারায় রচিত হয়, যথাঃ আন-নায়রীযী (আনু. ২৮৭/৯০০)-র যীজ (زيج النيريزى) ও বানূ আমাজুর (আনু. ২৯৭/৯১০)-এর যীজ, সেই দুইটির কথা জানা যায় প্রধানত ইব্ন য়ুনিস-এর ও আল-বীরূনীর উদ্ধৃতি হইতে।

স্পেনে এই ঐতিহ্য বহন করেন আল-মাজরীতীর ছাত্র ইব্ন সাম্হ (৪১৬/১০২৫), তাঁহার যীজ খণ্ডাংশ আকারে পাওয়া যায়; ইবনু'স-সাফ্ফার-এর যীজও সম্ভবত বর্তমানে হারাইয়া গিয়াছে। তবে প্যারিসের একটি পাণ্ডুলিপিতে হয়ত তাহা থাকিতেও পারে। কিন্তু মুসলিম স্পেনের প্রধান যীজ ছিল আল-যারকাল্লা (আনু. ৪৭৩/১০৮০)-এর 'টলেডীয় তালিকা' (Toledan Tables)। এই গ্রন্থখানি ছিল আল-খাওয়ারিযমী ও আল-বাত্তানীর বিষয়বস্তুর সমন্বয়। ১৫শ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত পশ্চিম য়ূরোপের মুসলিম (ইব্ন কাম্মাদ, ইবনু'ল-বান্না প্রমুখ), য়াহূদী (আব্রাহাম বেন এযরা, প্রফেটিয়াস প্রমুখ) ও খৃস্টান (the Alfansine Tables উহার উত্তরাধিকারিগণ) জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের উপরে এই গ্রন্থখানির বিরাট প্রভাব ছিল।

**মারাগাগোষ্ঠী**

আমরা দেখিয়াছি, স্পেন শুধু সিন্দ-হিন্দ ধারারই ধারক-বাহক ছিল না, এইখানেই টলেমীর উপরে অ্যারিস্টোটলীয় প্রতিবাদও পরিচালিত হইয়াছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে আরও দৃষ্টান্তমূলক প্রচেষ্টা মারাগার মানমন্দিরে (নাসীরু'দ-দীন আত-তূসী ৬৫৭/১২৫৯ সালে ইহা স্থাপন করেন) টলেমীর সূত্রসমূহকে সংশোধন করার উদ্দেশে এবং পরবর্তীকালে দামিশ্ক ও তাবরীযের মানমন্দিরেও এই প্রচেষ্টা চালান হয়। মারাগাতে, যেইখানে চীনা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাহাদের মুসলিম সহকর্মিগণকে সহায়তা করিত, টলেমীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের সংশোধন করা বলিতে ধরা হইয়াছিল যে, প্রতিটি গ্রহের ইকোয়ান্ট (equant)-কে এমনভাবে পরিস্থাপন করা যাহাতে মহাশূন্যের সকল জ্যোতিষ্কের গতি সুষম বৃত্তাকারের হয়। নাসীরু'দ-দীন কর্তৃক আবিষ্কৃত ও তাঁহার তায্'কিরাতে বিশ্লেষিত 'তূসী শক্তিযুগল' (Tusi couple-زوج طوسى) সমস্যাসমূহ দ্বারা সমাধানের প্রাথমিক গবেষণার পথ সুগম হয়; সমাধানের প্রশ্ন পরবর্তী সময়ে উত্থাপন করেন তাঁহারই ছাত্র কুত্'বু'দ-দীন আশ-শীরাযী ৬৮০/১২৮১ এবং ৬৮৩/১২৮৪ সালে এবং দামিশ্কের ইবনু'শ-শাতির, আনু. ৭৫০/১৩৫০ সালে যদিও তাঁহাদের উভয়েই উপচক্রগুলির (epicycles) ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা, মাত্রা ও স্থাপন পদ্ধতির (arrangements) কথা বলিয়াছেন। পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার পরে অবশেষে ইবনু'শ-শাতির সর্বাপেক্ষা দুরূহ দুইটি গ্রহ ও উপগ্রহ, বুধ ও চন্দ্র সম্বন্ধে সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছান। কিন্তু ৮ম/১৪শ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ জ্যোতিষ্কসমূহের যেই মডেল তৈরি করেন তাহাতে বৃত্তাকার গতিসমূহ একত্রীকৃত রীতির উপরেই নির্ভরশীল ছিল, তবে পাঁচ "নক্ষত্র-গ্রহে"র মডেলসমূহে ইকোয়ান্ট

(equant) ও চন্দ্রের মডেলে হস্তচালিত যন্ত্র (crank mechanism) ও বিপরীত বিন্দু (opposite point) থাকিবে না।

ইব্নু'শ-শাতির-এর অবদানের অনেক কিছুর সঙ্গেই দুই শতাব্দী পরে কোপার্নিকাস প্রস্তাবিত মডেলের মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়, বিশেষ করিয়া চন্দ্র ও বুধ গ্রহের মডেল হুবহু এক, উভয়েই "তূসী শক্তিযুগল" (Tusi couple) ব্যবহার করেন এবং উভয়ে বস্তুত একইভাবে ইকোয়ান্ট (equants) বাতিল করিয়া দেন। সন্দেহ নাই যে, কোপার্নিকাস ইব্নু'শ-শাতির-এর কার্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন; তবে সেই জ্ঞান কিভাবে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ অজ্ঞাত রহিয়াছে। ইহা সত্য যে, গ্রেগরী সিওনিয়াডেস (Gregory Chioniades) তাব্রীযের মানমন্দিরে অধ্যয়ন শেষ করিয়া আনু. ১৩০০ খৃ. কনস্টান্টিনোপলে প্রত্যাবর্তনের পরে বিভিন্ন 'আরবী যীজের যেই গ্রীক অনুবাদ করিয়াছিলেন, সেইগুলির পাণ্ডুলিপি পনের শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ইটালিতে পৌঁছিয়াছিল এবং যেইসব নক্‌শা আঁকা রহিয়াছে, সেইগুলিতে স্পষ্টত তূসী শক্তিযুগল (Tusi couple)-এর প্রয়োগ রহিয়াছে। কিন্তু সেই সকল পাণ্ডুলিপিতে কুত্‌বু'দ-দীনের রচনাবলী বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না, অবশ্য ইব্নু'শ-শাতির দ্বারা প্রভাবিত হইবার মত যথেষ্ট সময়ও তখন হয় নাই। কোপার্নিকাস পর্যন্ত এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের মাধ্যমে নিশ্চয়ই অন্য কেহ ছিলেন।

**পরবর্তীকালীন মানমন্দিরসমূহ**

মারাগার মানমন্দির ও সেইখানে উদ্ভাবিত যীজ— যীজ-ই ঈল্‌খানী— পরবর্তীকালের মুসলিমদের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার মডেলরূপে ব্যবহৃত হয়, যদিও আমরা এইমাত্র যেই বর্ণনা করিলাম সেই টলেমীয় তত্ত্বসমূহের সংশোধিত রূপ ৮ম/১৪শ শতকের পরে ইসলামে আর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। ইহার অনুকরণে সর্বাধিক বিখ্যাত যেই মানমন্দির স্থাপিত হয়, উহা ছিল সামারকান্দের উলুগ বেগ কর্তৃক ৮২৩/১৪২০ সালে স্থাপিত মানমন্দির। সেইখানে বৈজ্ঞানিক আল-কাশী ও কাদী-যাদার নেতৃত্বে জ্যোতির্বিজ্ঞানিগণ আনু. ৮৪৪/১৪৪০ সালে যীজ-ই সুলতানী প্রস্তুত করেন। আল-কাশী যীজ-ই খাকানী নামে নিজেরও একখানি যীজ প্রকাশ করেন। এই তিনখানি যীজের প্রতিটিই মূলত টলেমীয়, তাহার উপরে পরিমাপসমূহের (Parameters) ও কোন কোন তালিকার (tables) গঠনগত পরিবর্তন সাধন করা হয় এবং সকল জ্যোতির্বিজ্ঞানী তালিকাতে সাধারণ বর্ষপঞ্জী বিষয়ক তথ্যের সঙ্গে চীনা-উইগুর বর্ষপঞ্জীর বিষয়বস্তু সংযোজন করিয়া দেওয়া হয়।

সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম মানমন্দির তাকিয়্যু'দ-দীনের জন্য নির্মাণ করা হয় ইস্তাম্বুলে ৯৮৩/১৫৭৫ ও ৯৮৫/১৫৭৭ সালের মধ্যবর্তীকালে। কিন্তু সামারকান্দের সেই বিখ্যাত মানমন্দিরের অনুকরণের অম্বরের মহারাজা জয়সিংহ ১৬৯৩ খৃ. হইতে ১৭৪৩ খৃ. পর্যন্ত জয়পুর, উজ্জয়িনী, দিল্লী, মথুরা ও বারানসীতে যেই পাঁচটি মানমন্দির নির্মাণ করেন সেগুলিরও নাম উল্লেখ করিতে হয়। কেননা নিষ্ফল হইলেও সেইগুলিতে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্কার সাধন করিয়া উহাকে মুসলিম-টলেমীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করিবার প্রয়াস ছিল। পরবর্তীকালীন মুসলিম মানমন্দিরগুলির প্রতিবেশী দেশসমূহের উপরে অধিকতর ফলপ্রসূ প্রভাব হইয়াছিল। সুতরাং মারাগা, সামারকান্দ ও ইস্তাম্বুলের মানমন্দিরগুলি দ্বারা য়ূরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানসমূহের অনেক যন্ত্রপাতি ও কিছু কিছু ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ও টাইকোব্রাহে-র উরানিবোর্গ (Tycho Brahe's Uraniborg) (১৫৭৬ খৃ.) ও স্টিজারনেবোর্গ (Stigerneborg) [১৫৮৪ খৃ.] মানমন্দিরে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইসলামী জ্যোতির্বিজ্ঞানে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অবদান হইতেছে জ্যোতির্বিজ্ঞান মানমন্দিরসমূহের উন্নতি, মারাগাগোষ্ঠীর অবদান, ত্রিকোণমিতি ও তালিকাসমূহ (tables) প্রণয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন এবং পরিমাপকসমূহের (parameters) উন্নয়ন সাধনের জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এমন বিশাল যে, উহার সংশ্লিষ্ট সাহিত্য তালিকাভুক্ত করা এক দুরূহ কাজ। নিম্নের তালিকাতে শুধু উল্লেখযোগ্য নমুনা গ্রন্থাবলী ও বিষয়টির বিশেষ বিশেষ দিক সম্বন্ধে আলোকপাত করা হইয়াছে এইরূপ সর্বাধুনিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করা হইল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জীবনী ও তাঁহাদের অবদান বিষয়ে জানিতে হইলে দ্র. এখন পর্যন্ত সেই পুরাতন প্রামাণিক উৎস গ্রন্থ ঃ (১) H. Suter, Die Mathematiker Und Astronomen der Araber und ihre werke, Abhandlungen zur Geschichte der Mathematischen Wissenschaften, ১০খ, লাইপজিগ ১৯০০ খৃ. (পুনর্মুদ্রণ Ann Arbor ১৯৬৩ খৃ.); ইহার এক সহযোগে পাঠ করা যায়; (২) H. P. J. Renaud-এর প্রবন্ধ, Isis-এ, ১৮খ, (১৯৩২ খৃ.), পৃ. ১৬৬-৮[illegible]; (৩) C. Brookelmann, GAL, Pearson সং. ও (৪) Encyclopedia of Islam-এ এই বিষয়ক প্রবন্ধ; (৫) অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য Dictionary of Scientific Biography; যীজ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ও আলোচনার জন্য দ্র. (৬) E. S. Kennedy, A survey of Islamic Astronomical Tables, Transactions of the American Philosophical Society-তে নূতন সিরিজ, ৪৬/২খ, ফিলাডেলফিয়া ১৯৫৬ খৃ.; ইসলামী জ্যোতির্বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচিতি লিখিয়াছেন; (৭) C. A. Nallino 'ইল্‌মু'ল-ফালাক, রোম ১৯১১-১২, ; (৮) M. Nallino কর্তৃক উহার একখানি ইটালীয় অনুবাদ রহিয়াছে C. A. Nallino-ßf,'Raccolta di scritti editi e indediti, ৫খ, রোম ১৯৪৪ খৃ., ৮৮-৩২৯।

বিভিন্ন অনুবাদের সময়কালের সাহিত্যের জন্য পাঠক-পাঠিকাগণ (৯) D. Pingree, The Fragments of the works of al-Fazari, JNES-এ ২৮খ (১৯৫৯ খৃ.)-এর গ্রন্থপঞ্জী ও গ্রন্থ নির্দেশসমূহ দেখিতে পারেন; (১০) স্পেনে ইসলামী জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা এবং ল্যাটিন ও হিব্রু জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপরে উহার প্রভাব বিষয়ে O. Neugebauer, J. M. Millas Vallicrosa, B. Goldstein, P. Kunitzsch, G. Toomer প্রমুখ পণ্ডিতের কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে; (১১) বায়যানটিয়ামের উপরে মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রভাব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন O. Neugebauer, D. Pingree ও P. Kunitzsch; মুসলিম মানমন্দিরসমূহের পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে দ্র. ; (১২) A. Sayili, The

Observatory in Islam, তুর্কী ইতিহাস পরিষদের একটি প্রকাশনা, সিরিজ ৭, নং ৩৮, আঙ্কারা ১৯৬০ খৃ., আর মারাগাগোষ্ঠী বিষয়ে সাম্প্রতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং তৎসহ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্র.; (১৩) E. S. Kennedy, Late medieval planetary theory, Isis-এ ৫৭খ (১৯৬৬ খৃ.), ৩৬৫-৭৮। উল্লিখিত প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে বর্তমানে গভীরভাবে গবেষণা করা হইতেছে; এই প্রবন্ধের ভবিষ্যত পাঠক-পাঠিকাগণ হয়ত দেখিবেন যে, বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমাদের যেই জ্ঞান তাহার বিপুল অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে।

D. Pingree (E. I.[2])/ হুমায়ুন খান

**'ইল্‌মুল-হিসাব (দ্র. হিসাব)**

**'ইল্‌মুল-হুরূফ (দ্র. হুরূফ)**

**ইলয়াযা বা ইলিয়াড** (إليـاذة, Iliad) ঃ ইলিয়াড-এর 'আরবী প্রতিশব্দ। 'আরবী ভাষায় ইলয়াযাহ বা আলয়াযাহ উভয়টিই ব্যবহৃত হয়। গ্রীক কবি হোমার (Homer বা Homeros) [খৃ. পূ. ৯ম শতাব্দী] গ্রীক বীর-কেশরীদের দুঃসাহসিক ঘটনাবলী অবলম্বনে শৌর্যমণ্ডিত 'ইলিয়াড' (الإليـاذة و الأليـاذة বা The Iliad) নামক একটি মহাকাব্য (Epic) রচনা করেন। এখানে অভিন্ন ছন্দে ২৪টি কবিতায় ১৬ হাজার চরণ আছে (আল-মুনজিদ ফি'ল আ'লাম, পৃ. ৬২, ৭৩৪)। এই মহাকাব্যটি বর্ণনামূলক ও সমুন্নত বাচনভঙ্গিতে রচিত। ইহার বিষয়বস্তু হল বীরত্বপূর্ণ উপকথা, জাতীয় বা ঐতিহাসিক অভিযান। ইহা প্রাক-ডোরিয়ান সময় হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন সময়ে রচিত অসংখ্য বীরগাথা, ট্রয়ের যুদ্ধ ও উহার ফলাফলের স্মৃতিকে সংরক্ষিত করিয়াছে। এই গ্রন্থটি কাব্য আকারে বেশ দীর্ঘ। প্রাচীন মহাকাব্য সাধারণত হেক্সামিটার ছন্দে লিখিত। মহাকাব্য গ্রীক সাহিত্যের সর্বপ্রথম উত্তরজীবী সাহিত্য নমুনা। নাটক, ইতিহাস ও দর্শনের আগে মহাকাব্য রচিত হয়। সম্ভবত দেবতাদের বন্দনা হইতেই মহাকাব্যের উৎপত্তি হয়। হোমার প্রায় ৮১০ খৃষ্টপূর্ব সালে এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে রচনা করেন এই মহাকাব্য ইলিয়াড। তিনি তাহার গবেষণা ও সমালোচনার বিচার- বিশ্লেষণের জন্য ইহাকে উপযুক্ত মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেন। এই মহাকাব্যটি সমালোচনার উৎস হিসাবে সার্বজনীনভাবে গৃহীত। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া সমালোচনা সাহিত্যের সূচনা হয়। (মোঃ আবূ বকর সিদ্দীক, 'আরবী সাহিত্য সমালোচনা, পৃ. ৩৭, ৩৮; আহমদ আশ-শাইব, উসূলুন-নাকদিল আদাবি, কায়রো, আন-নাহদা আল-আরাবিয়া প্রেস, ১৯৭৩ সাল, পৃ. ১০৬)। পরবর্তীতে আধুনিক আরবী কবি সুলায়মান আল-বুসতানী (১৮৫৬-১৯২৫) ১৮৮৭ খৃ. মিসরে এই মহাকাব্যটি 'আরবী ভাষায় কাব্যাকারে অনুবাদ কবিরার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ১৯০৩ সালে কায়রো হইতে তাহা 'আরবী ভাষায় প্রকাশ করেন (হান্না আল-ফাখূরী, আল-মুজায ফি'ল আদাবিল 'আরাবী ওয়া তারীখিহি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৪)। মিসরের 'দারুল হিলাল' গ্রন্থাগারে ১৯০৪ সালে তাহা প্রকাশিত হয় (আল-মুনজিদ ফি'ল আলাম, পৃ. ৬২)।

গ্রীক কবি হোমার খৃ. পূ. ৯ম শতাব্দীতে এশিয়া মাইনরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার সম্পর্কে বিস্তারিত কোন তথ্য জানা যায় নাই। তবে ধারণা করা হয় যে, তিনি অন্ধ ছিলেন। তাহার তিনটি গ্রন্থ যথাক্রমে الأليـاذة، الأغـانـي الهـومـيـريـة পরবর্তী গ্রীক কাব্য সাহিত্যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে (আল-মুনজিদ ফি'ল আ'লাম, পৃ. ৭৩৪)। স্মার্না, রোডোস, কলোফোন, সালামিস, কিয়স, আর্গস ও এ্যাথনী- এই সাতটি শহরকে তাহার জন্মভূমি হিসাবে দাবি করা হয় (মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, 'আরবী সাহিত্য সমালোচনা, পৃ. ৩৮)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ ১. হান্না আল-ফাখূরী, আল-মুজায ফি'ল-আদাবিল 'আরাবী ওয়া তারীখিহি, বৈরুত, দারুল জীল, আদাবুন নাহদাতি'ল হ াদীছ া, ৫র্থ খণ্ড, ২য় সং, ১৪১১ হি./১৯৯১ খৃ., পৃ. ১৯৪; (২) আল-মুজিদ ফি'ল-আ'লাম, পৃ. ৬২, ৭৩৪; (৩) হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি' ফী তারীখিল আদাবিল আরাবী, আল-আদাবুল হাদীছ, বৈরুত, দারুল জীল, ১ম সং, ১৯৮৬ খৃ., পৃ. ১৬৮-৬৯; (৪) আহমাদ মুহাররাম, দেওয়ান মাজদুল ইসলাম, কুয়েতঃ মাকতাবাহ আল- ফালাহ, ১৪০২ হি./১৯৮২ ইং, ১ম সং, পৃ. ৯; (৫) আহমদ আশ-শাইব, উসূল আল-নাকদ আল-আদাবি, কায়রো, আল নাহদা আল আরাবিয়্যাহ প্রেস. ১৯৭৩ সাল, পৃ. ১০৬-১৪; (৬) মাজদী ওয়াহাবাহ ও কামিলুল মুহান্দিস, মু'জামুল মুসতালাহাতি'ল আরাবিয়্যা ফিল লুগাতি ওয়া'ল আদাবি, মাকতাবাতু লুব্নান, বৈরূত, ১৯৭৯ ইংরেজী, পৃ. ৩৬, ২১০; (৭) মোঃ আবূ বকর সিদ্দীক, 'আরবী সাহিত্য সমালোচনা, সুলতানা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৯, ২৭, ৩৭, ৩৮; (৮) এবার ক্রন্থি, সাহিত্য সমালোচনা, আবূ তাহের মজুমদার অনূদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী ১৯৮৭ খৃ. পৃ. ১৩৪, টীকা ৮।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মালেক

**আল-ইলয়াযাতুল-ইসলামিয়্যা ঃ ইসলামী ইলিয়াড** 'আরব কবিগণ الشـعـر القـصـصـي (আশ-শি'রুল কাসাসী) বা মহকাব্য বা কাহিনীমূলক কাব্য সম্পর্কে পরিচিত ছিলেন না। তাঁহারা শুধু কয়েক প্রকার ইতিহাস রচনার ব্যাপারে অবহিত ছিলেন, যাহা শ্রবণ ও সংরক্ষণ করিবার উপযোগী। সর্বপ্রথম প্রাচীন গ্রীক কবিগণই এই জাতীয় কাব্যধারা সৃষ্টি করেন। তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম গ্রীক কবি হোমার (Homer বা Homeros) [খৃ. পৃ.৯ম শতাব্দী] গ্রীক বীর-কেশরীদের শৌর্যপূর্ণ দুঃসাহসিক ঘটনাবলী অবলম্বনে 'ইলিয়াড' (الأليـاذة، الإليـاذة বা the Iliad) ও 'ওডেসি' (الأوذيـسـة বা The Odyssey) নামে দুইটি মহাকাব্য রচনা করেন (আল-মুনজিদ ফি'ল আ'লাম, পৃ. ৭৩৪)। 'আরব কবিগণ গ্রীক কবি-সাহিত্যিক ও তাহাদের সাহিত্যের সাহিত্য সংমিশ্রণের ফলে মহাকাব্য সম্পর্কে অবহিত হন। তাহারা গ্রীকদের মহাকাব্য অনুবাদ করিবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আধুনিক 'আরবী কবি সুলায়মান আল-বুসতানী (১৮৫৬-১৯২৫) গ্রীক কবি হোমারের ইলয়াযাহ বা ইলিয়াড ১৮৮৭ সালে মিসরে 'আরবী ভাষায় কাব্যাকারে অনুবাদ করিবার গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং ১৯০৩ সালে কায়রো হইতে তাহা আরবী ভাষায় প্রকাশ করেন (হান্না আল-ফাখূরী, আল-মুজায ফি'ল আদাবি'ল 'আরাবী ওয়া তারীখিহি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৪)।

পরবর্তীতে আধুনিক যুগে আরব কবিগণ প্রাচীন কিংবা নূতন ইতিহাস অবলম্বনে মহাকাব্য রচনার চেষ্টা করেন। তন্মধ্যে মিসরীয় বিখ্যাত কবি ইসলামের সুপণ্ডিত আহমদ মুহাররম (১৮৭৭-১৯৪৫) الإليـــــاذة الإسـلامـيـة (ইসলামী ইলিয়াড) বা ديوان مـجـد الإسـلام নামক মহাকাব্যটি রচনা করেন। ইহা তাহার সর্ববৃহৎ সাহিত্য সৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ

(স)-এর সম্পূর্ণ নবূওয়াতী জীবনকে কাব্যাকারে প্রকাশ করেন। মিসরের 'দারুল কুতুব' গ্রন্থাগারে ইহার একটি কপি সংরক্ষণ করা হইয়াছে। তিনি গ্রীক কবি হোমার রচিত ইলিয়াডের আদলেই ইহা রচনা করেন। এখানে কয়েক হাজার 'আরবী কবিতার শ্লোক আছে (আহমাদ কাব্বিশ, তারীখুশ শি'রিল-আরাবীল হাদীছ, পৃ. ৯৮) কোন কোন কবি-সাহিত্যিক ইহাকে الملحمة الشعرية (আল-মালহামাতুশ শি'রিয়্যাহ বা মহাকাব্য) বা شعر تاريخي (শি'রুন তারিখিয়্যুন, Historical poetry, ইতিহাস সম্বন্ধীয় কাব্য) বা شعر تعليمي (শি'রুন তা'লীমিয়্যুন, Didactic poetry, শিক্ষামূলক কাব্য) হিসাবে আখ্যায়িত করেন। কেননা এই গ্রন্থে কবি নূতন কিছু তৈরি করেন নাই, কাহারও কোন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেন নাই, কোন অবস্থার কল্পনাও করেন নাই, বরং প্রসিদ্ধ ইতিহাসই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন (ড. নি'মাত আহমাদ ফুয়াদ, খাসায়িসুশ শি'রুল হাদীছ, দারুল ফিকরিল 'আরাবী, পৃ. ৬৭)। তাঁহার এই গ্রন্থটি ديوان مجد الاسلام নামে প্রকাশিত হইয়াছে। কবি তাহার মৃত্যুর ১২ বৎসর পূর্বে ১৩৫৩ হি. সালে উস্তাদ মরহুম মুহিব্বুদ্দীন আল-খাতীবের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা রচনা করেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসের গৌরব, বিশেষত রাজনীতি, সমরনীতি, সামাজিক শৃঙ্খলা ও চারিত্রিক পরিশোধন ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপন করিবার পরামর্শ দেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ২০ বৎসর পর ১৩৮৩ হি. সালে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (আহমাদ আবদুল লতিফ আল-জাদা' ও হুসনি আদহাম জারার, পৃ. ৭০-৭১)। কবির জীবদ্দশায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় নাই। পরবর্তীতে দুইবার ইহা ছাপানো হইয়াছে, প্রথমত ১৩৮৩ হি./ ১৯৬৩ সালে, দ্বিতীয়ত ১৪০১ হি./ ১৯৮১ সালে। তিনি তাঁহার এই গ্রন্থকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসাসহ ইসলামের শুভ-উদয়ের গৌরবময় ইতিহাস, বিশেষত রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কী জীবন, হিজরত, মদীনায় অবস্থান, মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন, য়াহূদী ও মুনাফিকদের সহ-অবস্থান, গাযওয়া, সারিয়া, অন্যান্য ঘটনা ইত্যাদি বর্ণনায় সহজ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ইসলামের অন্যান্য চরিত্র, ঘটনাবলী, রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে প্রতিনিধিদের আগমন, অন্যান্য রাজা-বাদশাহদের নিকট পত্রসহ প্রতিনিধি প্রেরণ, বিভিন্ন দেশে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমতিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ, সাহাবায়ে কিরাম ও মুজাহিদীনের জীবন চরিত উপস্থাপন করিয়াছেন (আহমাদ মুহাররাম, দীওয়ান মাজদুল ইসলাম, পৃ. ৩৬)। তাঁহার দীওয়ানের অন্তর্ভুক্ত প্রথম কাসীদার নাম مطلع النور الأول। কবি রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় বলেন (মুহাম্মদ ইবন সা'দ, ১খ, পৃ. ২০৩; আহমাদ মুহাররাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫) ঃ

املإ الارض يامحمد نورا + واغمر الناس حكمة والدهورا

"হে মুহাম্মাদ ! তুমি নূর দ্বারা এই পৃথিবীকে পূর্ণ করিয়াছ, যুগ ও যুগের মানুষকে হিকমাত দ্বারা আবৃত করিয়াছ।"

১৪০২/১৯৮২ সালে মিসরের রাজধানী কায়রোর মাকতাবাতু'ল-ফালাহ গ্রন্থাগার হইতে প্রকাশিত ৫৭৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত দীওয়ান মাজদুল ইসলাম নামক গ্রন্থটিতে ১৬৮ (এক শত আটষট্টি)টি কাসীদা উল্লেখ আছে।

কোন কোন কবি-সাহিত্যিক 'আল-ইলয়াযা আল-ইসলামিয়্যা' বা ইসলামী ইলিয়াড ও হোমারের ইলিয়াড-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। উভয়ের মাঝে ভিত্তিগত মূল পার্থক্য ছাড়াও আরও কিছু পার্থক্য আছে। যথা ঃ ১. কবি আহমাদ মুহাররাম গ্রীক সাহিত্যিক হোমারের মত ইলিয়াড লিখেন নাই। তিনি গ্রীকদের আদলে শৈল্পিক গুণাবলী সম্বলিত তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। আর কবি মুহাররাম 'আরবদের মর্যাদা, ঐতিহ্য ও ইসলামের গৌরবের দিকগুলি খুবই সুন্দর ও চমৎকারভাবে উল্লেখ করেন যাহা যুবক তথা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ হিসাবে থাকিবে। তিনি আরববাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পিতা ও পিতামহ তথা পূর্বপুরুষের মর্যাদা ও সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করেন।

২. গ্রীক কবি হোমারের মহাকাব্য ইলিয়াড উপাখ্যান, রূপকথা, গল্প ও বীরত্বের ঘটনা নিয়াই রচিত হয়। লেখক তাহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নায়ক ও বীরের ব্যক্তিত্বের উপর আলোকপাত করিয়াছেন। খেয়াল- খুশিমত দেবতাদের মান-মর্যাদায় তাহাদের গুণাবলী উল্লেখ করেন। এখানে প্রকৃত অবস্থা ও বাস্তবতার প্রতি কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। অপরদিকে কবি আহমাদ মুহাররাম যদিও তাঁহার গ্রন্থে সাহসিকতা ও বীরত্বের ঘটনা উল্লেখ করেন, কিন্তু ইতিহাসের সত্যতা ও বাস্তবতার বাহিরে নয়, এই দুইটি বৈশিষ্ট্যর আবশ্যকতা রক্ষা করেন। শুধু তাহাই নয়, তিনি পরিপূর্ণভাবে ইতিহাসের সত্যতা ও ঘটনার বাস্তবতার নিরিখেই বীরত্বের ঘটনাগুলি উপস্থাপন করেন। তিনি সর্বদা শ্রদ্ধা ও পবিত্রতাসহ মানুষের অন্তর ও বিবেকের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

৩. উভয়ের মাঝে আরেকটি পার্থক্য এই যে, কবি আহমাদ মুহাররাম প্রতিটি কাসীদার প্রথমেই তাঁহার চিন্তা-চেতনার রূপরেখা গদ্যের আকারে মুকাদ্দিমা বা মুখবন্ধ হিসাবে উল্লেখ করেন। আর হোমার ইলিয়াড মহাকাব্যে তাহা উল্লেখ করেন নাই।

সর্বোপরি কবি তাঁহার ديوان مجد الإسلام বা ইসলামী ইলিয়াড গ্রন্থটিতে ৩০ (ত্রিশ) বৎসর যাবৎ বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করেন। তাই গ্রন্থটি সমগ্র 'আরব জাহান ও মুসলিম বিশ্বে গবেষক ও সাহিত্যিকদের নিকট শিল্পমণ্ডিত একটি দীওয়ান হিসাবে স্থান পাইবে (আহমাদ মুহাররম, দীওয়ান মাজদুল ইসলাম, পৃ. ৯)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) হান্না আল-ফাখূরী, আল-মুজায ফি'ল আদাবি'ল 'আরাবী ওয়া তারীখিহি, বৈরুত, দারুল জীল, আদাবুন নাহদাতিল হাদীছাহ, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সং, ১৪১১ হি./১৯৯১; (২) আল-মুনজিদ ফিল-আ'লাম, পৃ. ৬২; (৩) হান্না আল-ফাখূরী, আল-জামি' ফী তারীখিল আদাবি'ল 'আরাবী, আল-আদাবুল হাদীছ, বৈরূত, দারুল জীল, ১ম সং, ১৯৮৬ খৃ., পৃ. ১৬৮-৬৯; (৪) ড. নে'মাত আহমাদ ফুয়াদ, খাসায়িসুশ শি'রিল হাদীছ, দারুল ফিকরিল 'আরাবী, পৃ. ৬৭; (৫) মুহাম্মাদ ইবন সা'দ, আল-আদাবুল হাদীছ, রিয়াদ, দার আবদু'ল আযীয আল-হোসাইন ১৪১৮হি./১৯৯৮ খৃ., ১খ, ৭ম সং, পৃ. ২০০-২০৯; (৬) মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন হুসায়ন, আল-আদাবু'ল 'আরাবী ওয়া তারীখুহূ, আল-আসরুল হাদীছ, লিস সানাতিছ ছালিছাতিছ ছানাবিয়্যাতি, আল-মামলাকাতুল আরাবিয়্যাতুস সু'উদিয়্যা, জামি'য়াতুল ইমাম মুহাম্মদ, ৬২-৬৬; (৭) আহমাদ মুহাররাম, দীওয়ান মাজদুল ইসলাম, কায়রো, মাকতাবা আল-ফালাহ ১৪০২/১৯৮২, ১ম সংস্করণ; (৮) খায়রুদ্দীন আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, বৈরূত, দারুল ইলমি লি'ল-মুল্লাঈন ১৯৯৭ খৃ., ১খ, পৃ. ২০২; (৯) আহমাদ কাব্বিশ, তারীখুশ শি'রিল-আরাবীল হাদীছ, বৈরূত, দারুল জীল ১৩৯১ হি./১৯৭১ খৃ., পৃ. ৯৮-১০০; (১০) আহমাদ আবদুল

লাতীফ আল-জাদা' ও হুসনি আদহাম জারার, শু'আরাউদ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়্যা ফি'ল আসরিল হাদীছ, বৈরূত, মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০১ হি/১৯৮১ খৃ., ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৪; (১১) ড. শাওকী দায়ফ, দিরাসাতুন ফি'স্-শি'রিল আরাবি'ল মু'আসির, কায়রো, দারুল মা'আরিফ, ৮ম সং, পৃ. ৪৪-৫৭; (১২) মুহাম্মাদ য়ূসুফ কোকেন, আ'লামুন নাছরি ওয়াশ-শি'রি ফি'ল আসরিল আরাবিয়্যিল হাদীছ, মাদ্রাজ, দারু হাফিযা লিত-তাবা'আ ওয়ান-নাশরি, ১৪০৪/১৯৮৪ খৃ., ৩খ, পৃ. ৯৫-৯৯; (১৩) আবদুর রহমান আর-রাফি'ঈ, শু'আরাউল ওয়াতানিয়্যা; (১৪) হাসান কামিল আস-সায়রাফী, আহমাদ মুহাররাম ওয়া মাকানাতুহু বাইনা শু'আরা-ই জীলিহী, প্রবন্ধ, আল-মাজাল্লাতুল মিসরিয়্যা, ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯৫৭ খৃ.; (১৫) মুহাম্মাদ আবদুল মুন্'ইম খাফাজী, মাযাহিবুল আদাব; (১৬) 'উমার রিদা কাহ্হালা, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬; (১৭) মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ, আহমাদ মুহাররাম : আশ-শা'ইরু ওয়াতানিয়্যুল ইসলামী ওয়া ইসলাহাতুহুল ইজতিমা'ইয়্যা (প্রবন্ধ), আল-মাজাল্লাতুল আরাবিয়্যা, 'আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪র্থ খণ্ড, জুন ১৯৯৮-৯৯ খৃ., পৃ. ৪৩-৬০; (১৮) মোহাম্মদ আবদুল মালেক, আরবী কাব্যে রাসূল (স.) প্রশস্তি ঃ স্বরূপ ও শিল্প বিশ্লেষণ (পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ ২০০১ খৃ., পৃ. ২৩৫-৩৮, ৩৯১-৯৬, (অপ্রকাশিত)।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মালেক

**ইসহাক কানাইমাদারী ঃ মাওলানা** তিনি ছিলেন বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ও বিজ্ঞ আলিমে দীন। ১৯২০ সালে চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানার কানাইমাদারী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শিশু বয়সে তিনি তাঁহার পিতা ওয়াহেব উল্লাহ মিয়াজীকে হারাইয়া অসহায় হইয়া পড়েন। মাওলানা তুরাব উদ্দীনের সহায়তায় তিনি আনোয়ারা বোয়ালিয়া ইসলামিয়া (পুরাতন) মাদ্রাসায় মাধ্যমিক স্তরের পড়ালেখা শেষ করিয়া ১৯৩৮ সালে হাটহাজারী দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখানে মিশকাত-জালালাইন পর্যন্ত তিনি পড়াশুনা করেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশে হিন্দুস্তান যান। আর্থিক অসঙ্গতি ও পিতৃহীনতা তাঁহার জ্ঞানার্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কঠিন পরিশ্রম, গভীর অনুসন্ধিৎসা ও নিরন্তর জ্ঞান সাধনা তাঁহাকে সফলতার শীর্ষে লইয়া যায়। ১৯৪২ সালে তিনি কৃতিত্বের সহিত দারুল উলূম দেওবন্দ হইতে 'দাওরায়ে হাদীছ-এর সনদ প্রাপ্ত হন।

দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি আনোয়ারা থানার বোয়ালিয়া ইসলামিয়া (পুরাতন) মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। অতঃপর ধারাবাহিকভাবে ফটিকছড়ি থানার নাসিরুল 'উলূম মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম মুজাহেরুল উলূম মাদ্রাসা, পটিয়া থানার কৈয়গ্রাম হেমায়েতুল ইসলাম মাদ্রাসা, জামেয়া আরবিয়া জিরি, সাতকানিয়া আলিয়া মাহমূদুল 'উলূম মাদ্রাসা ও পটিয়া জামেয়া ইসলামিয়ায় মুহাদ্দিস হিসাবে কর্মরত ছিলেন। পটিয়া জামেয়া ইসলামিয়ায় তিনি 'শায়খুল হাদীছ' হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তিন বৎসর সাতকানিয়া আলিয়া মাহমূদুল 'উলূম মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন। হাদীছশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য সর্বজনস্বীকৃত। হৃদয়গ্রাহী ও যৌক্তিক ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপনা ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য। যে কোন জটিল বিষয়ে তাৎক্ষণিক সমাধান দেওয়ার দক্ষতা ছিল তাঁহার সহজাত। স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ও জ্ঞানগর্ভ পাঠদানের কারণে ছাত্রদের নিকট তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। প্রখর মেধা ও আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী এই মনীষী ছিলেন অনাড়ম্বর, নির্মোহ, প্রচারবিমুখ ও বন্ধুবৎসল। তৎকর্তৃক উর্দূ ভাষায় লিখিত 'তালাবায়ে মাদারিসে আরাবিয়া কে আসবাবে ইনহিতাত' নামক পুস্তিকা তাঁহার জ্ঞানের গভীরতার স্বাক্ষর বহন করে। প্রত্যক্ষ রাজনীতি না করিলেও তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম (হাযারভী)-এর সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৯৭ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ নিবন্ধকার কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত।

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

**ইল্য়াস** (الياس) ঃ (আ) একজন নবীর নাম। কুরআন মাজীদে নবীদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার নাম দুই স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে (৬ঃ ৮৫ ও ৩৭ ঃ ১২৩-১৩০) ; শেষোক্ত আয়াতে (১৩০) সম্ভবত ছন্দের খাতিরে তাঁহাকে ইল্য়াসীন বলা হইয়াছে অথবা উহা الياس -এর বহুবচন বা বিকল্পরূপ (য়ূসুফ আলী, Quran, tr. & Com.)। বাইবেলে উল্লিখিত ইলিজাহ (Elijah) ও কুরআনে বর্ণিত ইল্য়াস ('আ) সম্ভবত একই ব্যক্তি।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে ইল্য়াস ('আ)-এর রসূল হওয়ার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। তাঁহাকে বানূ ইসরাঈলের সেই আম্বিয়া' ('আ)-এর মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে, যাঁহারা আজীবন ধন-দৌলত ও শান-শওকত হইতে নির্লিপ্ত ছিলেন। তাহার গোত্র আল্লাহকে ভুলিয়া বা'আল দেবতার পূজায় লিপ্ত হইয়া পড়ে। তিনি মূর্তিপূজায় বাধা দেন এবং সত্য ধর্মের প্রতি তাহাদেরকে আহ্বান করেন। সূরা আল-আন'আম-এ ইল্য়াস ('আ)-কে নূহ ('আ)-এর বংশধর বলা হইয়াছে।

সাহীহ বুখারীতে ইব্ন 'আব্বাস ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, ইল্য়াস হইল ইদরীস ('আ)-এর নাম (কিতাবু'ল-আম্বিয়া', বাব ৪; আরও দ্র. আল-কাসতাল্লানী, মিসর ১৩২৪ হি., ৫খ., ৩৩; এই হাদীছে'র সনদকে 'হাসান' বলা হইয়াছে)। আদাম ('আ)-এর পর ইদরীস ('আ)-কে প্রথম নবী হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ১/১খ, ১৬)। এইভাবে ইদরীস ('আ)-এর কাল নির্ধারিত হয় হূদ ('আ)-এর যুগের পূর্বে। আল-হাকিম আল-মুসতাদরাক (হায়দরাবাদ ১৩৪০ হি., ২খ., ৫৪৮) গ্রন্থে লিখিয়াছেন, নূহ ('আ) ও ইদরীস ('আ)-এর মধ্যে এক হাযার বৎসরের ব্যবধান ছিল। আবূ বাকর ইব্ন 'আরাবী লিখিয়াছেন, ইদরীস ('আ) নূহ ('আ)-এর ঊর্ধ্বতন পুরুষের অন্তর্ভুক্ত নহেন, বরং ইসরা'ঈলী নবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মি'রাজ সম্পর্কিত বিখ্যাত হাদীছটি পেশ করিয়াছেন যাহাতে ইদরীস ('আ) মুহাম্মাদ (স)-কে "হে সালিহ নবী ও সালিহ ভ্রাতা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে যদি ইদরীস ('আ) নূহ ('আ)-এর পরবর্তী নবী হইতেন, তবে আদাম ('আ) ও ইবরাহীম ('আ)-এর ন্যায় তাঁহাকে যোগ্য সন্তান (ابن صالح) বলিয়া সম্বোধন করিতেন (আল-'আয়নী, কায়রো, ৭খ, ২৭)। কিন্তু হাফিজ ইব্ন কাছীর ইব্নুল আরাবীর সহিত একমত হন নাই (আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, কায়রো ১৩৪৮ হি., ১খ, ১০০)। লক্ষণীয় যে, কুরআন মাজীদে ইল্য়াস ('আ) ও ইদ্রীস ('আ)-এর আলোচনা ভিন্ন ভিন্ন নামে ও পৃথকভাবে করা হইয়াছে। আত-তাবারী (১খ, ৪১৫, De Goeje সংস্করণ) লিখিয়াছেন, ইল্য়াস ('আ) ইসরাঈলী নবী হিযকীল (আ)-এর পরে প্রেরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই।

ইল্য়াস শব্দটির ২য় রূপ ইলয়াসীন। Wensink (দ্র. Encylo. of Islam, Leiden) যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে কতিপয় প্রাচ্যবিদের এই ধারণা প্রতিফলিত হইয়াছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) কুরআনের রচয়িতা (না'উযু বিল্লাহ্) এবং অন্ত্যমিলের খাতিরে ইল্য়াসীন নামটি ব্যবহার করিয়াছেন। ইব্ন কাছীর (র) তাঁহার তাফসীরে ইল্য়াস-এর দ্বিতীয় রূপ ইল্য়াসীন বলিয়াছেন, যেমন 'ইসমা'ঈল শব্দের অপর রূপ ইসমা'ঈন যাহা আসাদ গোত্রে অদ্যাবধি ব্যবহৃত হয়। তামীম গোত্রের জনৈক কবির কবিতায় ইসমা'ঈল শব্দের বদলে "ইসমা'ঈন" ব্যবহৃত হইয়াছে। মীকাঈল-কে মীকাল ও মীকা'ঈনও বলা হইয়াছে। ইব্রাহীমকে Abraham, ইসরা'ঈলকে ইসরা'ঈন, "তূ্র-ই সায়না"-কে "তূর-ই সীনীন" বলা হইয়াছে। 'আরবীতে শব্দের এই প্রকার রূপান্তর প্রচলিত আছে। Old Testament-এর Kings (রাজাবলী) অধ্যায় উভয় খণ্ডে 'ইল্য়াস' ('আ)-এর উল্লেখ আছে।

আল-জাওয়ালীকীর মতে ইল্য়াস একটি অনারব (عجمى) শব্দ। কিন্তু কেহ কেহ ইহাতে দ্বিমত পোষণ করিয়াছেন। কেননা 'আরবগণ সাধারণত অনারব শব্দগুলিকে 'আরাবায়াত (مـعـرب) করিয়া লইত [ইসলামী বিশ্বকোষ, ('আরবী) শিরোনাম]। যাহা হউক, ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ইল্য়াস শব্দটি হিব্রু ভাষায় 'ঈল্য়া' অথবা ইলিজাহ (Elijah)-রূপে ব্যবহৃত হয় যাহার অর্থ Yhwa (য়াহওয়া) "আমার প্রভু; য়াহুদীগণ এই শব্দ আল্লাহ-এর অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে। jewish Encyclopaedia-তে এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, আলোচ্য নামের মধ্যে এই স্বীকারোক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যে, এই নামধারী ব্যক্তি (Elijah) 'বা'আল' পূজারীদের বিরুদ্ধে Yhwa-এর নামে (তাঁহার পক্ষে) জিহাদ করিয়াছেন এবং ইহাও প্রতিভাত হয় যে, ঈলীজাহ নিজেই এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাওরাতে "ইল্য়া"-কে "তিশ্বী" বলা হইয়াছে যাহাতে অনুমিত হয় যে, তিনি "তিশ্বাহ্" নামক কোন গোত্র অথবা স্থানের সহিত সম্পর্কযুক্ত। তিনি "জিল 'আদ" নামক স্থানে বসবাস করিতেন। Wellhausen (History of Israel, পৃ. ৪৬২) তাঁহার সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "তিনি এককভাবেই স্বীয় যুগে প্রবল প্রতাপ-প্রতিপত্তিসহ বিরাজমান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের পরিবর্তে কাহিনী ও রূপকথার বর্ণনায় স্থান পাইয়াছে।"

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) কু'রআন, ৬ ঃ ৮৪-৮৬, ৩৭ ঃ ১২৩-১৩০; (২) তাফ্সীর ইব্ন কাছীর, উপরিউক্ত আয়াতের আলোচনা; (৩) তাফ্সীর ফাতহু'ল-মান্নান (হা'ক্কানী), একাদশ সংস্করণ, লাহোর ১৯৫১ খৃ., ৬খ., পৃ. ১৫৬; (৪) তাফসীর ইব্ন জারীর, উপরিউক্ত আয়াতের আলোচনা; (৫) সাহীহ মুসলিম, কিতাবু'ল-ঈমান; (৬) ইমাম আহ্মাদ, মুস্নাদ, ৩খ, ২৬; (৭) Old Testament, Kings, I & II; (৮) আল্-জাওয়ালীকী, আল-মু'আর্রাব, Leipzig ১৮৬৭ খৃ., পৃ. ৮; (৯) আত্-তাবারী, De Goeje সংস্করণ, ১খ., পৃ. ৪১৫ ও ৫৪০; (১০) দিয়ার বাকরী, তা'রীখু'ল- খামীস, ১খ, ১০৭; (১১) ছা'লাবী, কা'সাসুল-আম্বিয়া', কায়রা ১২৯০ হি., ২৩১; (১২) মুহাম্মাদ 'আরাফাহ, তা'লীকাত, ইল্য়াস শিরোনামে, দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ ('আরবী), ২খ., পৃ. ৬০৫ ; (১৩) The Jewish Encyclopaedia, ৫খ., ১২১ প., ইল্য়াস শিরোনামে; (১৪) Encyclopaedia Britannica, ১৯৫০ খৃ. সংস্করণ, ৮খ., ৩৫৭ প., আরও দ্র. ইল্য়াস শিরোনামে; (১৫) মুহাম্মাদ জামীল আহ্মাদ, আম্বিয়া-ই কু'রআন, লাহোর সংস্করণ, ২খ., ১৫২ প.; (১৬) মুহাম্মাদ হি'ফজু'র-রহ্মান সিয়ুহারুবী. কা'সাসু'ল-কু'রআন, দিল্লী ১৯৪৩ খৃ., ২খ., ১২৪ প.; (১৭) A. Geiger, his book tr. into English, styba Judaism and Islam, Madras 1898, ১৫১ প.; (১৮) L. Ginzberg, The Legends of the Je[illegible]. ৪খ, ১৯১৩ খৃ., ১৯৫-২৩৫, ৬খ., ১৯২৮ খৃ., ৩১৬-৪২; (১৯) E. Margulies, Eliyahu ha-nabi, Jerusalem 1960.

(H. J. Wensinck [G. Vajda (E.I.[2]) সাইয়্যিদ আমজাদ আলতাফ ও দা. মা. ই. সংকলন বোর্ড। (দা. মা. ই.)/মাজেদুর রহমান

**ইল্য়াস কুদ্দূস** (الـيـاس قـدوس)ঃ (র) শাহ সায়্যিদ কুত্বু'ল-আওলিয়া' নামে খ্যাত শাহ জালাল (র)-এর কথিত ৩৬০ আওলিয়া'র অন্যতম সায়্যিদ নাসিরু'দ-দীন (র)-এর বংশধর। সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া তিনি এক জঙ্গলে গিয়া কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হন। অধ্যাত্ম সাধনার সুবাদে ইল্য়াস (র) কুত্বু'ল আওলিয়া' নামে খ্যাত হন, তাঁহার পিতা সায়্যিদ ইসরা'ঈল (দ্র.)। ঘড়গাঁও-এ ইল্য়াস (র)-এর জন্ম, মুড়ারবন্দ-এ তাঁহার মাযার অবস্থিত। তাঁহার লেখা বলিয়া কথিত আরবী, ফারসী, বাংলা ও হিন্দীমিশ্রিত একটি গান রামশ্রীবাসী সায়্যিদ সাজিদুর-রহমান সংগ্রহ করেন। গানটির সূচনায় আছে, "মুই তোর কি দোষ-এ কৈলুরে জানম" (جـانـم -† বা আমার প্রাণ বলিতে তিনি তাঁহার প্রেমাস্পদ আল্লাহ্কে সম্বোধন করিয়াছেন)। ইহাতে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারও দেখা যায়, যেমন "আব্তক তুই ঘরে না আইলেরে জানম," অন্যত্র "রাইত কেনে আইলায়রে জানম" ও "ভুলিয়াছি তুমিরে জানম" ইত্যাদি। কবিতার শেষভাগে عـالـم الـغـيـب: الـسـت بـربـكـم قـالـو ابـلـى – "ان الـلّـه يـغـفـر الـذنـوب جـمـيـعـا" لا تـقـنـطـوا مـن رحـمـة الـلّـه ইত্যাদি কুরআন মাজীদের কথা তাঁহার একাধিক ভাষামিশ্রিত কবিতার বুনটে অপূর্ব কাব্য কৌশলে সমন্বিত রহিয়াছে। সৈয়দ মুর্তজা আলী কুত্বু'ল- আওলিয়া-র কবিতার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন (দ্র. হযরত শাহ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস)। কবিতাটি পাণ্ডুয়া-র কুত্বু'ল-'আলাম-এর অনুরূপ একটি কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত (দ্র. ইসলাম প্রসঙ্গ)

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, জালালাবাদের কথা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩ খৃ., ২৯৮-৩০০; (২) সৈয়দ মুর্তজা আলী, হযরত শাহ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস, ঢাকা ১৯৭০ খৃ., ৩৮-৪১; (৩) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ, ঢাকা ১৯৭০ খৃ., ১৬৫-৬৭; (৪) মুহম্মদ আবূ তালিব, উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সাধনা, রাজশাহী ১৯৮৫ খৃ., ১৭২-৭৪; (৫) সৈয়দ হাসান ইমাম হোছেনী চিশতী, তরফ-এর ইতিকথা, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৭ খৃ., ৬৬-৭০।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

**ইল্য়াস ইব্ন ইবরাহীম** (الـيـاس بـن ابـراهـيـم)ঃ আস-সায়নূবী, আল-মাওলা, তুরস্কের ৯ম/১৫শ শতকের একজন খ্যাতনামা 'আলিম, শিক্ষাবিদ, হানাফী মাযহাবের অনুসারী, যুক্তিবাদী ফাকীহ ও কালামশাস্ত্রবিদ। তিনি এশিয়া-তুরস্কের উত্তরে কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী সায়নূব নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা

বলে তিনি বহুবিধ বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন। ফিক্হ, কালাম, ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনের একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি সুখ্যাত ছিলেন। তুরস্কের সুলতান মুরাদ খান-এর শাসনামলে 'উছমানী খিলাফাতের তৎকালীন রাজধানী বুরূসা (Brousse)-এর সরকারী মাদরাসার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং অধ্যাপনায় সারা জীবন অতিবাহিত করেন।

মাওলা ইলয়াসের বিশেষ খ্যাতি ছিল যে, তিনি স্বল্প সময়ে যে কোন বিষয়ে কৃতিত্বের সহিত পুস্তক রচনা করিতে পারিতেন। কথিত আছে, তিনি মুখতাসারু'ল-কুদূরী নামক পুস্তকটি একদিনে এবং শারহু'শ-শামসিয়্যা পুস্তকের টীকা এক রাত্রে রচনা করেন। তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর আল-ফিকহু'ল-আকবার পুস্তকের ভাষ্য 'শারহু'ল-ফিকহি'ল-আকবার গ্রন্থটি। মাওলা ইলয়াস সদালাপী, খোশমেযাজী ও কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। ৮৯১/১৮৮৬ সালে তিনি বুরূসায় ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনূন, শারহু'ল-ফিকহি'ল-আকবার শিরোনাম, ইস্তাম্বুল সং, ২/১১৫৭; (২) 'আল্লামা 'আবদু'ল-হায়্যি লাখনাবী, আল-ফাওয়াইদু'ল-বাহিয়্যা, মিসর ১৩২৪ হি., পৃ. ৪৯।

ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

**ইল্য়াস শাহী বংশ** (الیاس شاہی خاندان) ঃ ইল্য়াস শাহী খান্দান, বাংলার একটি রাজবংশ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শাম্সুদ্দীন ইল্য়াস শাহ। হাজ্জী ইল্য়াস নামে পরিচিত এই ব্যক্তি ৭৪৩ হি./ ১৩৪২ সালে লাখনাওতীর সুলতান 'আলাউদ্দীন 'আলী শাহকে পরাজিত করিয়া নিজে সুলতান শামসুদ্দীন ইল্য়াস শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া লাখনাওতীর সিংহাসন দখল করেন, (আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, জানু. ১৯৯৯, পৃ. ১৮৩; সুখোময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর ঃ স্বাধীন সুল্তানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খৃ., জাতীয় বুক স্টল, কলকাতা ১৯৯৮, পৃ. ২০)। ইতিপূর্বে যদিও ফাখরুদ্দীন মুবারাক শাহ সোনারগাঁও-এ এবং 'আলাউদ্দীন 'আলী শাহ লাখনৌতিতে স্বাধীন সুলতান হিসাবে ছিলেন; কিন্তু ইলয়াস শাহই প্রথম সমগ্র বাংলাদেশকে একত্র করিয়া স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং সেখানে স্বীয় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হন। শুধু তাহাই নহে, তিনি এমন এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন যে বংশ দীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলাদেশে যশ ও খ্যাতির সঙ্গে রাজত্ব করে (আবদুল করিম, ঐ গ্র., পৃ. ১৮২)। এই বংশের সুলতানগণ দেশীয় জনসাধারণের সঙ্গে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেন। ফলে দিল্লীর সুলতানের আক্রমণ প্রতিহত করার মত শক্তিও এখানে সঞ্চারিত হয়। এই যুগে বাংলায় এক উদার শাসন চালু হয়। এই সময় হইতেই বাংলার মুসলিম রাজ্য এই দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া এই দেশীয় রাজ্যে পরিণত হয়। এক কথায় ইল্য়াস শাহের সিংহাসনারোহণের ফলে বাংলার ইতিহাসে একটি নব অধ্যায়ের সূচনা হয় (যদুনাথ সরকার, সম্পা., হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৮ খৃ., ২ খ., পৃ. ১০৩)।

সুলতান শামসুদ্দীন ইল্য়াস শাহ (৭৪৩ হি./ ১৩৪২ — ৭৫৮ হি./ ১৩৫৮ খৃ.) পূর্ব পারস্যের কিজিস্তানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম সুলতান। প্রাথমিক জীবনে তিনি দিল্লীর মালিক ফীরূযের অধীনে চাকুরি করিতেন। অতঃপর তিনি বাংলায় আসিয়া সাতগাঁও-এর তুঘলক শাসনকর্তা 'ইয্যু'দ-দীন ইয়াহ্য়ার অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। 'ইয্যুদ-দীনের মৃত্যুর পর তিনি সাতগাঁও-এর নৃপতি হন। অতঃপর তিনি লাখনাওতীর সুলতান 'সালাহুদ্দীনকে যুদ্ধে পরাজিত করেন (বাংলাপিডিয়া, ১খ, পৃ. ৪২৩; সুখোময় মুখোপাধ্যায়, পূ. গ্র., পৃ. ১০)।

ইল্য়াস শাহের সিংহাসনারোহণের তারিখ লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ ছিল। বর্তমানে এ বিষয়ে আর কোন মতানৈক্যের সুযোগ নাই। তাঁহার মুদ্রা ৭৪৩ হিজরী হইতে উৎকীর্ণ হয় (আবদুল করিম, করপাস, পৃ. ৪২)। তাঁহার আবিষ্কৃত একমাত্র শিলালিপির তারিখ ৭৪৩ হিজরীর ২ শাবান (১৩৪২ খৃস্টাব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর)।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সুলতান শামসুদ্দীন ইল্য়াস শাহ রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। ৭৪৭ হি./ ১৩৪৬ সালের সাতগাঁও টাঁকশাল হইতে উৎকীর্ণ ইল্য়াস শাহের মুদ্রা প্রমাণ করে যে, তিনি ১৩৪৬ খৃস্টাব্দে কিংবা তাহার পূর্বে সাতগাঁও অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর ইল্য়াস শাহ পূর্ব বাংলার দিকে রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য চেষ্টা না করিয়া অন্যদিকে রাজ্য সম্প্রসারণে মনোনিবেশ করেন। তিনি ১৩৫২ খৃস্টাব্দে নেপাল আক্রমণ করেন। তাঁহার এ অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে নেপাল আক্রমণের ফলে ইল্য়াস শাহের রাজ্য সীমানা বৃদ্ধি না পাইলেও তিনি নেপাল হইতে প্রচুর ধন-সম্পদ হস্তগত করেন। ইল্য়াস শাহ ত্রিহুতের (উত্তর বিহার) বেশ কিছু অংশও ইতিপূর্বে জয় করিয়াছিলেন।

১৩৫২ ইল্য়াস শাহ পূর্ব বাংলা জয় করেন। তিনি ফাখরুদ্দীন মুবারক শাহের পুত্র ইখ্তিয়ারুদ্দীন গাজী শাহের নিকট হইতে সোনারগাঁও অধিকার করেন। ইহার ফলে তিনি সমগ্র বাংলাদেশের অধিপতি হন। ইল্য়াস শাহের পূর্বে বাংলার আর কোন মুসলিম সুলতান সমগ্র বাংলার সুলতান হওয়ার গৌরব অর্জন করিতে পারেন নাই। এইজন্যই ঐতিহাসিক শাম্স-ই-সিরাজ 'আফীফ ইল্য়াস শাহকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ', 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান' 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা' উপাধিতে ভূষিত করেন (আবদুল করিম, পূ. গ্র., পৃ. ১৮৪)।

ক্রমশ ইল্য়াস শাহের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি বাংলার বাহিরে সৈন্য পরিচালনা করিয়া জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমণ করেন এবং চিল্কা হ্রদের সীমা পর্যন্ত অভিযান করিয়া প্রায় ৪৪টি হাতিসহ অনেক ধন-সম্পদ হস্তগত করেন। এই সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া ইল্য়াস শাহ তাঁহার পশ্চিম সীমান্তবর্তী প্রদেশ বিহার ১৩৫৩ খৃ. আক্রমণ করেন (পূ. গ্র. পৃ. ১৮৫)। এ সময় বিহার দিল্লীর অধীনে ছিল এবং ইহার শাসনকর্তা ছিলেন মালিক ইব্রাহীম বায়ু। সুলতান মুহাম্মদ ইব্ন তুগলক ও তাঁহার পরবর্তী সুলতান ফীরূয শাহ বিদ্রোহ দমন ও নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত থাকায় তখন বিহারের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। বুকাননের বর্ণনায় উল্লেখিত হইয়াছে যে, বিহারের শাসনকর্তা মালিক ইব্রাহীম বায়ুর সহিত ইল্য়াস শাহের যুদ্ধ হয় (মার্টিন, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ২খ.)। যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে জানা যায় না। তবে মালিক ইব্রাহীম বায়ু আগলিনের মধ্যেই ইনতিকাল করেন। ইল্য়াস শাহের আক্রমণই বায়ুর মৃত্যুর কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ৭৫৩ হিজরীর ১৩ যুলাহজ্জা। তদুপরি ইল্য়াস শাহ বিহারের পরে চম্পারন, গোরক্ষপুর ও কাশী জয় করিয়া এক বিশাল ভূখণ্ড তাঁহার রাজ্যভুক্ত করেন।

ইল্য়াস শাহের এই সামরিক সাফল্য বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। কারণ ফীরূয শাহ তুগলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সাম্রাজ্যে

শৃঙ্খলা স্থাপনের পরেই বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। গিয়াসউদ্দীন বারানী ফীরূয শাহ্ তুগলক কর্তৃক বাংলাদেশ আক্রমণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন, ফীরূয শাহ্ সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, ইল্য়াস অনেক যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ত্রিহুত আক্রমণ করিয়াছে এবং সেখানে মুসলমান ও যিম্মীদের উপর অত্যাচার করিয়াছে। ইল্য়াস সেখানে লুটতরাজ করিয়া শহরগুলি ছারখার করিয়া দিয়াছে। সুতরাং ইল্য়াস শাহকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশে ফীরূয শাহ্ সসৈন্য বাংলাদেশ অভিযান পরিচালনা করেন। শামস-ই-সিরাজের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ইল্য়াস শাহের নৌবাহিনী গঙ্গা-গোগরা এবং গঙ্গা-গন্দকের সঙ্গমস্থলে দিল্লী বাহিনীকে বাধা প্রদানের চেষ্টা করে। কিন্তু ফীরূয শাহ্ অন্য পথে অগ্রসর হইয়া কুশী নদী অতিক্রম করেন। এই খবর পাইয়া ইল্য়াস শাহ্ রাজধানী পাণ্ডুয়ায় ফিরিয়া আসেন। অতঃপর তিনি দিল্লীর সুলতানের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার সেনাবাহিনীতে ছিল দশ হাজার অশ্বারোহী পঞ্চাশটি হাতি ও দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্য (ইলিয়ট, হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ৩খ, পৃ. ২৯৪-৯৫)। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এ দুর্গটি যেমন ছিল দুর্ভেদ্য, তেমনি ছিল দুর্গম। ইহার তিন দিক ছিল বালিয়া, চিরামতি ও মহানন্দার পানি এবং অন্যদিকে ছিল ঘন জঙ্গল। তাই ইহাতে ইলয়াস শাহ্ মনে করিয়াছিলেন যে, দিল্লী বাহিনীর পক্ষে একডালা দুর্গ জয় করা সম্ভব হইবে না। তাঁহার আরও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বর্ষাকালে প্রবল বর্ষণ ও মশার দংশন দিল্লী বাহিনীর সহ্য হইবে না এবং শেষ পর্যন্ত তাহারা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইবে (যদুনাথ সরকার, সম্পা. হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ঢা. বি. ১৯৪৮ খৃ. ২খ, পৃ. ১০৭)। অতঃপর দিল্লীর সুলতান একডালা দুর্গ আক্রমণ করেন। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও সুলতান একডালা দুর্গটি অধিকার করিতে পারেন নাই। অবশেষে সুলতান ফীরূয শাহ্ তুগলক ইল্য়াস শাহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ৭৫৫ হি./ ১৩৫৪ সালে দিল্লী ফিরিয়া যান। সন্ধির শর্তানুসারে উভয় পক্ষের মধ্যে পরবর্তীকালে প্রতি বৎসর দূত ও উপহার বিনিময় হইত (আবদুল করিম, পূ. গ্র. পৃ. ১৯৫)। ইহার ফলে ইল্য়াস শাহের রাজনৈতিক গৌরব বৃদ্ধি পায়। ফীরূয শাহ্ কর্তৃক বাংলা আক্রমণের ফলে বাংলাদেশে ও ইহার পূর্ব দিকের এলাকায় ইল্য়াস শাহের অধিকার কিছুমাত্র খর্ব হয় নাই। তবে লাখনৌতীর পশ্চিমে তিনি যে সকল অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যায়।

ফীরূয শাহের প্রত্যাবর্তনের পর ইল্য়াস শাহ্ তাঁহার রাজ্য পূর্ব দিকে সম্প্রসারণে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হন। ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালা হইতে জানা যায় যে, ত্রিপুরার রাজা ডাঙ্গর-ফা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রত্ম-ফাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু রাজার মৃত্যুর পর রাজার অন্যান্য পুত্র রত্ম-ফাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। রত্ম-ফা বাংলার সুলতানের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। সুলতান তাঁহাকে আশ্রয় দেন এবং পুনরায় সিংহাসন অধিকারে সহযোগিতা করেন। বিনিময়ে রত্ম-ফা বাংলার সুলতানকে একটি মাণিক্য ও কয়েকটি হাতি উপহার দেন এবং বাংলার সুলতান রত্ম-ফাকে 'মাণিক্য' উপাধি দেন (কালী প্রসন্ন সেন কর্তৃক সম্পাদিত শ্রীরাজমালা। কৈলাস চন্দ্র সিংহের রাজমালা ২খ)। এই সময় হইতেই ত্রিপুরার রাজারা 'মাণিক্য' উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ইল্য়াস শাহ্ তাঁহার রাজত্বের শেষ দিকে কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিয়া ইহার কিছু অংশ জয় করেন। বরেন্দ্রীর উত্তর-পূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অবস্থিত কামরূপ প্রাচীন কাল হইতেই একটি শক্তিশালী রাজ্য ও হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সম্ভবত ৭৫৮ হি./ ১৩৫৭ সালে ইলয়াস শাহ্ কামরূপের বিরুদ্ধে অভিযান করেন (যদুনাথ, সম্পা. হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ঢা. বি. ১৯৪৮ খৃ., ২খ, পৃ. ১১০)। কামরূপের সামাজিক ইতিহাসে যে বংশপঞ্জী উল্লিখিত আছে তাহা হইতে জানা যায় যে, উক্ত সময়ে ইন্দ্রনারায়ণ ছিলেন কামরূপের অধিপতি। কিন্তু মুসলিম বাহিনীকে প্রতিহত করার মত সামর্থ্য বা যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। পূর্বেই আসাম ও ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে কাছাড় অভিযানে তাঁহার শক্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে মুসলিম বাহিনী সহজেই কামরূপ অধিকার করে। ইলয়াস শাহ্ কর্তৃক কামরূপ অধিকার সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। কিন্তু সিকান্দার শাহের প্রচলিত মুদ্রা হইতে প্রমাণিত হয়, ৭৫৯ হি./ ১৩৫৮ সালের পূর্বেই কামরূপ বিজিত হইয়াছিল এবং কামরূপে একটি টাকশালও নির্মিত হইয়াছিল। সিকান্দার শাহের মুদ্রায় কামরূপ টাকশালের উল্লেখ আছে (যদুনাথ সরকার, পূ. গ্র. পৃ. ১১০)।

কখন ও কিভাবে ইল্য়াস শাহের রাজত্বের অবসান হইয়াছিল সে সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। রিয়াজুস সালাতীন অনুসারে ৭৫৯ হি./ ১৩৫৮ সালে তাঁহার ইনতিকাল হইয়াছিল এবং তাঁহার ইনতিকালের পরপরই দিল্লীর সুলতান ফীরূয শাহ্ তুগলক বাংলার বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান করেন (রিয়াজুস-সালাতীন বঙ্গানুবাদ, বাংলার ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪ খৃ., পৃ. ৭৯), তারীখ-ই মুবারক শাহীতেও ইল্য়াস শাহের মৃত্যুর তারিখ ঐ, ১২৯)।

স্বাধীন সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা ইল্য়াস শাহ্ বাংলার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি ছিলেন সমগ্র বাংলার একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁহার রাজত্বকালে বাংলার অন্তর্বিদ্রোহ কিংবা আত্মকলহ হয় নাই। তিনি দেশে সুশাসন কায়েম করেন এবং নূতন রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। দিল্লীর সঙ্গে তিনি যে মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা আমরণ রক্ষা করিয়াছিলেন। দিল্লীর সঙ্গে বার্ষিক দূত ও উপহার বিনিময় বাংলার রাজনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ১২০ বৎসরব্যাপী যশ ও খ্যাতির সহিত বাংলায় রাজত্ব করে। ইল্য়াস শাহ্ মুসলিম সূফীদের অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার সমসাময়িক তিনজন বিখ্যাত সূফীর নাম পাওয়া যায়, শায়খ আঁখি সিরাজু'দ্দীন 'উছ'মান, তাঁহার শিষ্য শায়খ 'আলাউল হক ও শায়খ রাজা বিয়াবানী। ইল্য়াস শাহ্ শায়খ 'আলা'উল হাকের সম্মানার্থে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন (আবদুল করিম, পূ. গ্র. পৃ. ১৯৯)। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে তিনি ছিলেন হাজীপুর শহরের প্রতিষ্ঠাতা (বাংলা পিডিয়া, ১খ., পৃ. ১২৪)।

সুলতান শামসুদ্'দীন ইল্য়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র সিকান্দার শাহ (৭৫৯/১৩৫৮— ৭৯৩/১৩৯০) পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বকালে বাংলাদেশে মুসলিম শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সিকান্দার শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গিয়াছুদ্দীন আজাম শাহ (৭৯৩/১৩৯০-৯১— ৮১৩/১৪১০-১১) বাংলার সিংহাসনে বসেন। ইল্য়াস শাহী বংশের প্রথম তিনজন সুলতানই অত্যন্ত যোগ্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। তন্মধ্যে ইল্য়াস শাহ্ ও সিকান্দার শাহ

যুদ্ধ বিগ্রহ ও স্বাধীনতা রক্ষার মধ্যে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সিকান্দার শাহের পুত্র গিয়াছুদ্দীন আজাম শাহ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাঁহার লোকরঞ্জন ব্যক্তিত্বের জন্য। তাঁহার মত বিদ্বান, রুচিবান, রসিক ও ন্যায়পরায়ন রাজা খুব কমই আবির্ভূত হইয়াছেন (সুখোময় মুখো. ঃ ঐ গ্র., পৃ. ৫৮)। তাঁহার চরিত্রে নানা রকম বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দ্র. ই.বি. ১০খ, ৪৫৫-৫৭।

মুদ্রা প্রমাণে প্রতীয়মান হয় যে, গিয়াছুদ্দীন আজাম শাহ ৮১৩/১৪১০-১১ সালে ইনতিকাল করেন। গোলাম হুসায়ন সেলীমের মতে রাজা গণেশ (রাজা কানস) নামে একজন জমিদারের চক্রান্তে সুলতানকে হত্যা করা হইয়াছিল (রিয়াদ, পৃ. ৮৫)।

সুলতান গিয়াছুদ্দীন আজাম শাহের রাজত্বকাল হইতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাজা গণেশ নামে এক হিন্দু জমিদারের আবির্ভাব হয়। রাজা গণেশ পরবর্তী পর্যায়ে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। আজাম শাহের হত্যা হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী সুলতানদের শাসনকালেও তাঁহার ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকে। অবশেষে ইল্য়াস শাহী বংশের শাসনের অবসান ঘটাইয়া গণেশ ক্রমে ক্রমে ক্ষমতা দখল করেন।

গিয়াছুদ্দীন আজাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সায়ফুদ্দীন হামযা শাহ (৮১৩/১৪১০-১১—৮১৪/১৪১১-১২) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সুলতানু-স-সালাতীন (রাজাধিরাজ) উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালেও চীন দেশের সহিত সদ্ভাব অক্ষুণ্ন ছিল এবং দূত বিনিময় হইয়াছিল। তিনি চীন সম্রাট য়ুঙলোর নিকট দূত পাঠাইয়া গিয়াছুদ্দীনের মৃত্যু ও নিজের সিংহাসনারোহণের সংবাদ জানাইয়াছিলেন। চীন সম্রাট বাংলার সুলতানের মৃত্যুতে শোকানুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য এবং নূতন সুলতানকে স্বাগত জানাইবার জন্য তাঁহার প্রতিনিধিদের পাঠান। সায়ফু'দ্দীন মাত্র দুই বৎসর রাজত্ব করেন। ফিরিশতার মতে হামযা শাহ সাহসী, উদার ও ধৈর্যশীল নরপতি ছিলেন। রাজা গণেশের চক্রান্তে সুলতানের ক্রীতদাস শিহাবু'দদীন তাঁহাকে হত্যা করেন এবং নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করে।

মুদ্রা প্রমাণে উল্লিখিত হয় যে, শিহাবুদ্দীন সুলতান হইয়া শিহাবুদ্দীন বায়েযীদ শাহ নামে ৮১৪/১৪১১-১২ হইতে ৮১৭/১৪১৪-১৫ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পূর্বে অজানা ছিল। বায়েযীদ শাহ মুদ্রায় নিজেকে কোন সুলতানের পুত্র বলিয়া দাবী করেন নাই। শিহাবুদ্দীনের রাজত্বকাল সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা যায় না। খুব সম্ভব রাজা গণেশের চক্রান্তে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল।

শিহাবুদ্দীন বায়েযীদ শাহের মৃত্যুর পর আলাউদ্দীন ফীরূজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুদ্রায় তিনি নিজেকে বায়েযীদ শাহের পুত্র হিসাবে দাবী করেন। তাঁহার রাজত্বকাল ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। রাজা গণেশ তাঁহাকে অপসারিত করিয়া ক্ষমতা দখল করেন।

ইল্য়াস শাহী রাজবংশের উচ্ছেদের পর রাজা গণেশ (১৪১৪-১৪১৮ খৃ.) বাংলার শাসনদণ্ড করায়ত্ত করেন। বাংলাদেশে মুসলমানদের আধিপত্যের যুগে সমগ্র বাংলা অধিকার করিয়া হিন্দুশাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল তাহার মূল লক্ষ্য। তিনি মুসলমান প্রজাদের অত্যাচার ও সমসাময়িক মুসলমান দরবেশদেরও নির্যাতন করেন। গনেশ অনেক মসজিদ ও ইসলামী প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেন। বিখ্যাত সূফী নূর কুতুবু-ল-'আলাম (দ্র.)-এর অনুরোধে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শাহী বাংলাকে আক্রমণ করেন। বাধ্য হইয়া রাজা গণেশ নতি স্বীকার করেন এবং নূর কুতুবু-ল-'আলামের সাথে আপোস করেন। আপোসের শর্তানুযায়ী রাজা গণেশের পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয় এবং যদুই 'জালালু'দদীন মুহাম্মদ শাহ' (দ্র.) নাম ধারণ করিয়া বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি দুই দফায় রাজত্ব করেন। প্রথমবার ৮১৮/১৪১৫ —৮১৯/১৪১৬ ও দ্বিতীয়বার ৮২১/১৪১৮—৮৩৬/১৪৩৩ সাল পর্যন্ত। তাঁহার রাজত্বকালে প্রজারা আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়া দিনাতিপাত করিত। ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে একজন সুশাসক হিসাবে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন (আবদুল করিম, পূ. গ্র., পৃ. ২৪৯)। ফিরিশতা বলেন, "তিনি ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে শাসন করিয়া সে যুগের নাওশেরঁয়া হইয়াছিলেন। অপূর্ব দৃঢ়তা ও শক্তির সঙ্গে ১৭ বৎসর ধরিয়া বাংলা ও লাখনৌতী শাসন করার পরে তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি রাজা গণেশ কর্তৃক নির্বাসিত নূর কুতবুল-'আলামের পৌত্র শায়খ জাহিদকে সেখান হইতে রাজধানীতে ফিরাইয়া আনেন। (রিয়াস-বাংলা অনুবাদ, পৃ. ৯২)। তিনি ইসলামের উন্নতি সাধন করেন, তাঁহার পিতা কর্তৃক ধ্বংস করা মসজিদগুলির সংস্কার করেন, মুদ্রায় কালেমা খোদাই করার প্রথাও চালু করেন (সুখোময় মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৫৯, আঃ করিম করপাস, পৃ. ১৬৮-১৬৯)। নিষ্ঠাবান মুসলমান হইলেও জালালুদ্দীন হিন্দুদের প্রতি উদার ব্যবহার করিতেন। তিনি চীনের সম্রাট ও মিসরের খলীফার সহিত দূত বিনিময় করেন। তিনি মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য এবং মক্কার জনগণের জন্য মক্কায় অর্থ ও উপহার পাঠান।

জালালুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শামসুদ্দীন আহমদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তিন বৎসরকাল রাজত্ব করেন (আঃ করিম, পূ., পৃ. ২৬১)। তাঁহার রাজত্বকাল নানাবিধ অপরাধ ও ষড়যন্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল। এইরূপ অবস্থা অসহনীয় মাত্রায় উপনীত হইলে অমাত্যবর্গের ষড়যন্ত্রে সাদী খান ও নাসির খান নামক সুলতানের দুইজন ক্রীতদাস ১৪১২ খৃ. তাঁহাকে হত্যা করেন (যদুনাথ সরকার, পূ. গ্র., পৃ. ১২৯)। তাঁহার হত্যার সঙ্গে সঙ্গে রাজা গণেশের বংশের অবসান ঘটে।

আহমদ শাহ নিহত হইলে বাংলাদেশে পুনরায় অরাজকতা শুরু হয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে ইল্য়াস শাহী বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ঐকমত্যে পৌছেন এবং তদনুসারে সিংহাসনের জন্য ইল্য়াস শাহের প্রপৌত্র নাসিরুদ্দীন মাহমূদকে মনোনীত করেন। তিনি নাসিরুদ'দীন (আবুল-মুজাফ্ফার) মাহমূদ শাহ নাম ধারণ করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান নাসিরু'দ্দীন মাহমূদ শাহ ইল্য়াস শাহের বংশধর ছিলেন বলিয়া নাসিরুদ্দীন মাহমূদ শাহের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে "পরবর্তী ইল্য়াস শাহী বংশরূপে আখ্যায়িত করা হয় (আ. করিম, পূ. গ্র., পৃ. ২৬৬)।

নাসিরুদ্দীন মাহমূদ শাহ (১৪৪১-৫৯ খৃ.), রুক্নুদ্দীন বারবাক শাহ (১৪৫৯-৭৪ খৃ.), শামসুদ্দীন য়ূসুফ শাহ নামে এই বংশের মোট ৪ জন সুলতান একাদিক্রমে ৪৬ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সুলতানগণ জ্ঞান-বিদ্যা চর্চায় উৎসাহ দিতেন। তাঁহাদের সময়ে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজিত ছিল। রুক্নুদ্দীনের আমলে কবি মালাধর বসু বিখ্যাত শ্রীকান্ত বিজয় কাব্য রচনা করেন এবং য়ূসুফ শাহের সভাকবি জৈনুদ্দীন কর্তৃক 'রসুল বিজয়' কাব্য রচিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত তাঁহারা হাবশী ক্রীতদাসদেরকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করিয়া নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনেন। ফাতেহ শাহ হাবশীর হস্তে নিহত হইলে ইল্য়াস শাহী বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে (১৪৮৭ খৃ.)।

ইলয়াস শাহী বংশের শাসকগণ বাংলাদেশে প্রায় ১২০ বৎসরকাল শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ইলয়াস শাহী বংশের শাসন বাংলাদেশের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছে। এই বংশের শাসনামলের মধ্যভাগে রাজা গণেশের বংশ প্রায় ২৫ বৎসরকাল শাসন ক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন; তবে তাহাদের শাসনাবসানের পর বাংলাদেশের সিংহাসনে ইলয়াস শাহী বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা তাঁহাদের জনপ্রিয়তা ও কৃতিত্বের পরিচায়ক।

বাংলার ইতিহাসে ইলয়াস শাহী একটি উজ্জ্বল যুগ। তাঁহারাই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম স্বাধীন সুলতানী যুগকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ফীরূয শাহ তুগলকের বাংলাদেশ পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা দুই দুইবার ব্যাহত করিয়া ইলয়াস শাহী সুলতানগণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা দীর্ঘস্থায়ী করিতে তাঁহাদের এই সাফল্য নিশ্চয়ই সাহায্য করিয়াছিল। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী মুসলিম শাসন অক্ষুণ্ন রাখিয়া ইলয়াস শাহী সুলতানগণ সীমান্তের চতুষ্পার্শ্বে তাঁহাদের সামরিক প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দিল্লীর সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া ইলয়াস শাহী শাসকগণ দেশীয় জনগণের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। ইলয়াস শাহী বংশের মাধ্যমে মুসলিম শাসন বাংলাদেশের জনগণের নৈকট্য লাভ করে। উচ্চ রাজকর্মে হিন্দুদের নিয়োগ, দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের সমাদর এবং দেশীয় পণ্ডিত ও কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা ইলয়াস শাহী শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহারা বাংলাদেশে মুসলিম সামরিক বিজয়কে সাংস্কৃতিক বিজয় দ্বারা পরিপূর্ণ করেন। এই যুগেই বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে এক নূতন ধারার সূচনা হয়।

স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের ক্ষেত্রেও শাহী বংশের বিশেষ অবদান রহিয়াছে। এই যুগে বাংলাদেশের মুসলিম স্থাপত্যশিল্প স্থানীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হইয়া এক নূতন রূপ ধারণ করিয়াছিল। দীর্ঘকালীন শান্তিপূর্ণ শাসনে এই বংশের শাসকগণ অনেক মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ্ ও সমাধিসৌধ এই যুগে নির্মাণ করেন। ইসলাম ও সংস্কৃতি বিস্তার ও প্রসারের ক্ষেত্রেও ইলয়াস শাহী সুলতানগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছেন। তাঁহারা সূফী ও 'আলিমদেরকে বিশেষভাবে সাহায্য দান করিয়াছেন। তাহাদের প্রচেষ্টায় ইসলাম ধর্ম বাংলায় প্রসার লাভ করিয়াছিল। তাঁহারা বাংলাদেশকে বহির্বিশ্বের সহিত পরিচয় ঘটাইতেও প্রশংসনীয় অবদান রাখিয়াছেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) গোলাম হোসায়ন সলীম রচিত রিয়াদুস-সালাতীনের বঙ্গানুবাদ, আকবর উদ্দীন অনূদিত বাংলার ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৪ খৃ.; (২) মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশতা বিরচিত ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস, অনুবাদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর, ১৯৭৭ খৃ.; (৩) মিনহাজ-ই-সিরাজে বিরচিত তাবাকাত-ই-নাসিরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৮৩; (৪) নিযামুদ্দীন আহমদ বাখশী; তাবাকাত-ই-আকবারী, কলকাতা, ১৯২৭-৩৫ খৃ.; (৫) যিয়াউদ-দীন বারানী; তারীখ-ই-ফীরূয শাহী, কলকাতা, ১৮৬২ খৃ.; (৬) রিহ্‌লা-ই-ইবনে বতুতা, প্যারিস, ফ্রান্স, ১৮৫৩-৫৯ খৃ.; (৭) আহোম বুরঞ্জী, কে. এল. বড়ুয়া কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত, শিলং, ১৮৩৩ খৃ.; (৮) আমানতুল্লাহ আহমাদ সংকলিত ঃ কোচবিহারের ইতিহাস, কোচবিহার, ১৯৩৬ খৃ.; (৯) রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ২খ, কলিকাতা, ১৩২১-১৩২৪ বঙ্গাব্দ; (১০) রজনীকান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ের ইতিহাস, ২খ, মালদহ, ১৯৩৯ খৃ.; সতীশ চন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩২৯-১৩৩৫ বঙ্গাব্দ; (১১) শ্রী সুখোময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর; স্বাধীন সুলতানদের আমল, কলকাতা, ১৯৯৮ খৃ.; (১২) আবদুল করিম, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩ খৃ.; (১৩) মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৯৯ খৃ.; (১৪) Ahmad M. A; Early Turkish Empire of Delhi, Lahore, 1949; (১৫) Ahmads; A Supliment to vol II of the catalague of coins in the Indian Museum, Calcutta, Delhi, 1937; (১৬) BhaHasali, N.K., Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, Cambridge, 1922; (১৭) Karim A, Social History of the Muslim in Bengal, Dhaka 1959; (১৮) ঐ লেখক, Campus of the Muslim coins of Bengal, Dhaka, 1960; (১৯) Majumdar R.C., History of Bengal, Vol I, Dhaka University 1943; (২০) Rahim M. A., Social Culture History of Bengal, Karachi, 1962; (২১) Sarkar J. N., A History of Bengal, Vol II, Dhaka University 1948; (২২) Bengal : Past and Present, Calcutta;

মুহাম্মদ আবু তাহের

**ইলয়াসিয়্যা** (الياسية) ঃ কিরমানের এক ক্ষুদ্র শাসকগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা আবূ 'আলী মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইল্‌য়াসকে ইল্‌য়াসিয়াহ্ বলা হয়। তিনি সোগদিয়ানা (Soghdiana)-এর অধিবাসী। অতঃপর তিনি বানূ বুওয়ায়হ্-এর কর্মচারী নিয়োজিত হন। ক্রমান্বয়ে উন্নতি করিয়া তিনি প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। কালক্রমে তিনি কিরমানের গভর্নরের পদ লাভ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (৩১৫/৯২৮)। কিরমাতেন তিনি প্রায় ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। ৯৩৫ খৃ. মুইয্‌যু'দ-দাওলা আল-বুওয়ায়হী কিরমান আক্রমণ করিয়া "শীরজান" দখল করিয়া লইলে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইলয়াস বারদাসীর (বর্তমান কিরমানশাহর)-কে স্বীয় রাজধানীতে পরিণত করেন এবং আল-বুওয়ায়হকে কর প্রদানে স্বীকৃত হন। ৩৪৮/৯৫৯ সনে তিনি 'আব্বাসী খলীফা আল-মুতী'-র তরফ হইতে সম্মানসূচক পতাকা (اعزازى علم) লাভ করিয়া কিরমানের স্বাধীন নরপতি হিসাবে অধিষ্ঠিত হন। পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া যখন তাঁহার জীবন-সংশয় দেখা দেয় তখন তিনি হুকূমাতের বাগডোর জ্যেষ্ঠ পুত্র আল-য়াসি'-এর হস্তে সমর্পণ করেন। কিন্তু কিছু দিন পর তিনি আপন পুত্র সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া পড়িলে আল-য়াসি'কে একটি দুর্গে নজরবন্দী রাখেন।

যুবরাজ আল-য়াসি' দুর্গ হইতে পলায়ন করেন। অতঃপর তিনি বিপুল সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসেন এবং রাজধানী অবরোধ করিয়া পিতাকে বন্দী করেন। এই অবস্থায় পিতা আবূ 'আলী বার বার সংজ্ঞা হারান। অবশেষে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বুখারায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। বুখারায় সামানী শাসক ১ম মানসূর ইব্‌ন নূহ তাঁহাকে বিশেষ সমাদরে গ্রহণ করেন। আবূ 'আলী আমৃত্যু ৮০ বৎসর বয়স কাল পর্যন্ত (৩৫৬/৯৬৭) মানসূরের নিকটেই অবস্থান করেন। পরবর্তী বৎসর

'আদুদু'দ-দাওলা আল-বুওয়ায়হী কিরমান দখল করিয়া কিরমান-রাজকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** : (১) ইব্‌নু'ল-আছীর (সং Tornberg), ৭ খ, ৩৯৩; ৪২৬ প., ৪৩২ প.; (২) মীর খাওয়ান্দ ও হামদুল্লাহ্‌ মুস্‌তাওফী (সং. Defremery, Hist. des Samanides), পৃ. ১৫৪, ২৬১; (৩) ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম সং, ৩খ, ১০৩০, দ্র. কিরমান; (৪) মিসকাওয়ায়হ; (৫) 'উত্‌বী য়ামীনী; (৬) আফদালু'দ-দীন আহ্‌মাদ, 'ইক্‌দু'ল-'উলা; (৭) Zambaur, Manuel, 216; (৮) C. F. Bosworth, The Banu Ilyas of Kirman (in the Minorsky Memorial Volume) ও বিশ্বকোষ বোর্ড।

Cl. Huart ও সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/ মাজেদুর রহমান

**ইল্‌শ** (দ্র. আল্‌শ)

**ইলহাদ** (দ্র. মুলহিদ)

**ইল্‌হাম** (الهام) : শব্দটির আভিধানিক অর্থ গলাধঃকরণ, গলাধঃ করান, কোনও বস্তুকে অন্য কোনও বস্তুর মধ্যে বিশেষিতকরণ। এই কারণেই বিরাট সৈন্যদলকে জায়শুন লুহাম (جيش لهام) বলা হয়, যেন উহা স্বীয় বিরাটত্বের কারণে সকল বস্তুকে গিলিয়া খাইবে। এইরূপ ভয়াবহ দুর্যোগকে আল-লুহায়ম ও মৃত্যুকে 'উম্মুল-লুহায়ম' বলা হয়।

'ইল্‌হাম' শব্দের শব্দমূল হইতে গঠিত শব্দ কুরআন মাজীদে মাত্র একবার ব্যবহৃত হইয়াছে : فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا

"অতঃপর যিনি উহাকে উহার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্ম সম্পর্কে প্রেরণা দান করিয়াছেন" (৯১ : ৮)।

আত-তাবারী (৩০খ. ১৫প.) উক্ত আয়াতের তাফসীরে মুজাহিদ-এর নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন : "আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের আত্মাতে পাপ ও পুণ্যের জ্ঞান নিহিত রাখিয়াছেন। এইরূপে ভাষাবিদ ফাররা উহাকে "আর আমি তাহাকে দুইটি পথ দেখাইয়া দিয়াছি" (৯১ : ১০) এই আয়াত অনুরূপ অর্থবহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-ও উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা আত্মাকে সৎ পথ ও অসৎ পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। ইব্‌ন কাছীর বলেন, 'মুজাহিদ, কাতাদা, আদ-দাহ্‌হাক ও সুফয়ান ছাওরীও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ইব্‌ন কুতায়বাঃ উহার ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষের আত্মার মধ্যে ভাল ও মন্দকে বুঝিবার যোগ্যতা নিহিত রাখিয়াছেন। যামাখশারী (২খ, পৃ. ১৬১) ও বায়দাবী (২খ, পৃ. ৪০৫) উহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষের আত্মাকে পাপ ও পুণ্যের পথদ্বয় চিনিবার ক্ষমতা দিয়াছেন।

আল-হাকিম তাঁহার আল-মুস্‌তাদ্‌রাক গ্রন্থে 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাবির (রা) হইতে নিম্নোক্ত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, "আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমা'ঈল ('আ)-এর অন্তরে এই 'আরবী ভাষার উদ্রেক করিয়াছেন" (الهم اسماعيل هذا اللسان العربى إلهاما)। ইবনু'ল-আছীর (আন-নিহায়া, ৪খ, ৭২) ও মুহাম্মাদ তাহির আল-ফাত্তানী (মাজমা' বিহারি'ল-আন্‌ওয়ার, ৩খ, ২৭১) নিম্নোক্ত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন : اسألك رحمة من عندك تلهمنى بها رشدى "হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার নিকট হইতে আগতব্য রহ্‌মাত তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যদ্দারা তুমি আমার মনে আমার জন্য প্রয়োজনীয় হিদায়াতের উদ্রেক করিবে।" শারহু'ল-'আকা'ইদি'ন-নাসাফিয়্যা (পৃ. ৪১)-তে নিম্নোক্ত হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে, "আমার প্রতিপালক আমার নিকট 'ইলহাম করিয়াছেন।" কিন্তু আল-জুন্‌দী, যিনি শারহু'ল-'আকাইদ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছসমূহের উৎস বর্ণনা করিয়াছেন, উক্ত হাদীছটির উৎস উল্লেখ করেন নাই।

ইব্‌ন খালদূন ইল্‌হামকে স্বজ্ঞা (intuition)-এর একটি রূপ বলিয়া মনে করেন (মুকাদ্দিমা, ২খ, ৩৩১)। ইব্‌ন হায্‌ম-এর মতে ইল্‌হাম তাবী'আত বা স্বভাব (nature)-এর সমার্থক (আল-ফিসাল, পৃ. ১৭৫)। আধুনিক যুগের মুসলিম চিন্তাবিদগণও 'ইল্‌হাম'-এর অনুরূপ ব্যাখ্যাই দিয়া থাকেন।

ইমাম রাগিব লিখিয়াছেন, ইল্‌হাম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কাহারও অন্তরে কোনও কথা প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া, কিন্তু পারিভাষিক অর্থে এই শব্দটি আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক 'কাহারও অন্তরে কোনও কথা প্রবিষ্ট করা' বুঝাইয়া থাকে। শব্দটি লাম্মাতু'ল-মালাক (لمة الملك ফেরেশতার স্পর্শ), নাফাছুন ফির-রূ' (نفث فى الروع) (অন্তরের মধ্যে ফুৎকার) অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন : কোনও কোনও লাম্মা ফেরেশতার, আবার কোনও কোনও লাম্মা শয়তানের। অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন : রূহু'ল-কুদুস আমার অন্তরে ফুৎকার (نفث) দান করিয়াছে . . . অর্থাৎ আমার অন্তরে বাণী প্রবেশ করাইয়াছে (মুফরাদাত, দ্র. লাম-হা-মীম শব্দমূল)। লিসানু'ল-'আরাব অভিধান গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে, "যেই কথা বা ধারণা মানুষের অন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় তাহাই ইল্‌হাম। হাদীছে রহিয়াছে, "হে আল্লাহ্‌ : আমি তোমার নিকট হইতে এরূপ রহ্‌মাত প্রার্থনা করি যাহা আমার অন্তরে হিদায়াতের উদ্রেক (ইল্‌হাম) করিবে।"

ইল্‌হাম এক প্রকারের ওহী এবং ইহা আল্লাহ্‌ বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা দিয়া থাকেন (দ্র. লাম-হা'-মীম শব্দমূল)। উক্ত বিশ্লেষণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইল্‌হামের অর্থ আল্লাহ কর্তৃক কাহারও অন্তরে কোনও কথা প্রবিষ্টকরণ। ইমাম সুয়ূতীর বর্ণনামতে ইল্‌হাম-এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক কাহাকেও কোনও কার্যে উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশে তাহার অন্তরে কোনও কথা উদ্রেককরণ। ইব্‌নু'ল-আছীর ও ইমাম সুয়ূতী লিখিয়াছেনঃ ইল্‌হাম এক প্রকারের ওয়াহ্‌য়ি। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন, তাহাকে উহা দ্বারা সম্মানিত করিয়া থাকেন (ইবনু'ল-আছীর, আন-নিহায়া, আস-সুয়ূতী, আদ-দুররু'ল-মানছূর, দ্র. লাম-হা-মীম শব্দমূল, আসগার 'আলী রূহী, মা ফি'ল-ইসলাম, ১খ, ১৯৩, লাহোর ১৩৫০ হি., লিস্যান, দ্র. 'লাম-হামীম শব্দমূল)। তাজু'ল-'আরাস অভিধানগ্রন্থে ইল্‌হাম-এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক কাহারও অন্তরে অনুগ্রহ (فيض) হিসাবে কোনও ধারণা বা উপলব্ধি প্রবিষ্টকরণ।' আক্‌রাবু'ল-মাওয়ারিদ অভিধান গ্রন্থে 'আল্‌হামা' শব্দটির অর্থ আওহা (أوحى) "ওহী প্রেরণ করিয়াছেন" দেওয়া হইয়াছে।

কুরআন মাজীদের ৯১ : ৮ সংখ্যক আয়াত : "অতঃপর তিনি তাহার নিকট পাপের বিষয় ও তাহার তাকওয়ার বিষয় 'ইল্‌হাম করিয়াছেন"-এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌ মানুষের আত্মাকে হিদায়াতের পথ ও গোমরাহীর পথ—উভয়ই শিখাইয়াছেন, জানাইয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন (ইব্‌ন জারীর, ৩০খ, ১১৬, কায়রো ১৩২১ হি.)। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় যামাখশারী বলেন, এই স্থলে 'ইল্‌হাম'-এর অর্থ জ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধি দান করা (আল-কাশ্‌শাফ, টীকাসহ, ৪খ, ৭৫৮,

কায়রো ১৯৪৬ খৃ.)। ইব্‌ন কুতায়বা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা আত্মার স্বভাব ও প্রবৃত্তির মধ্যে হিদায়াতের পথ ও গোমরহীর পথ—উভয়কে বুঝিবার যোগ্যতা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। বলা যায়, উক্ত আয়াতে দুইটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ঃ প্রথম বিষয়টি এই, আল্লাহ্‌ তা'আলা মানব প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন রূপ শক্তি ও যোগ্যতা নিহিত রাখিবার মাধ্যমে উহাকে এইরূপ একটি বিধানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং মানব প্রকৃতির মধ্যে এইরূপ কতগুলি বৈশিষ্ট্য নিহিত রাখিয়াছেন— যেইগুলির সাহায্যে মানুষ তাহার কার্যাবলীর বিষয়ে চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিলে সে এতদসম্পর্কে গ্রহণীয় সঠিক ও ন্যায়ানুগ পন্থা নির্ণয় করিতে পারে। নেককার লোকেরা নেক পথে চিন্তা করিয়া নেক কাজ বাছিয়া নেন। নিম্ন দিকে প্রবাহিত হওয়া যেরূপ পানির স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য এবং জীবন নাশ করা যেরূপ বিষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, নেক পথে চিন্তা করিয়া নেক কাজ বাছিয়া লওয়াও সেইরূপ মানবের চিন্তাশক্তির স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। উক্ত আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ইল্‌হামের মাধ্যমে মানুষকে কোন্‌টি হিদায়াতের পথ ও কোন্‌টি গোমরাহীর পথ তাহা জানাইয়া দিয়াছেন। কথাটি এইরূপেও বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা একদিকে যেমন মানুষের আত্মার মধ্যে নানারূপ চিন্তাশক্তি নিহিত রাখিয়াছেন, অন্যদিকে সেইরূপে উহার মধ্যে সত্য ও মিথ্যা এবং হিদায়াত ও গোমরাহীর পথ দুইটি চিনিবার ও উহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিবার জন্য প্রয়োজনীয় নূর ও জ্যোতিও সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। উক্ত বিষয়টি এইরূপ যে, সূর্যের আলো আকাশ হইতে আমাদের চোখের উপর পতিত হইয়া উহার দৃষ্টিশক্তির সহযোগিতায় আমাদেরকে পথ দেখায়। মোটকথা এই যে, ইল্‌হাম আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট হইতে আগত নূর ও জ্যোতি। উক্ত নূর ও জ্যোতিকে একমাত্র সেই সকল অন্তরই লাভ করিতে পারে, যাহাদের স্বভাব ও প্রকৃতি নেক ও পবিত্র। মানুষের অন্তরে শয়তানের তরফ হইতেও এক প্রকারের প্রেরণা উদিত হইয়া থাকে। উক্ত প্রেরণা ওয়াস্‌ওয়াসা নামে অভিহিত। ইল্‌হাম ও ওয়াস্‌ওয়াসা পরস্পর বিরোধী বিষয়। কারণ ইল্‌হাম আসিয়া থাকে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হইতে; পক্ষান্তরে ওয়াস্‌ওয়াসা আসিয়া থাকে শয়তানের পক্ষ হইতে। আমরা ওয়াস্‌ওয়াসাকে ইল্‌হাম বা ইল্‌হামকে ওয়াস্‌ওয়াসা নামে আখ্যায়িত করিতে পারি না। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে ইল্‌হাম ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে আসিয়া থাকে। পক্ষান্তরে ওয়াস্‌ওয়াসাকে শয়তানের কোনও মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি নিজেই অন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া থাকে (ইহ্‌য়া', ৩খ, ১৯)।

ইল্‌হাম—জ্ঞান লাভ ও উপলব্ধি অর্জনের উৎসও বটে। অধ্যবসায়, চর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ('ইল্‌ম ইল্‌হামী) এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনায় ইমাম গাযালী (র) বলেন, আমরা প্রথমোক্ত শ্রেণীর জ্ঞান লাভ করি নিজেরা বিভিন্নরূপে সূত্র স্থাপন ও বিন্যাস করত উহাদের সাহায্যে গবেষণা করিবার মাধ্যমে। পক্ষান্তরে শেষোক্ত শ্রেণীর জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে আমাদের অন্তর ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে আড়াল সৃষ্টিকারী পর্দা আপনা হইতেই উঠিয়া যায়। ইমাম গাযালী (র) উভয় শ্রেণীর জ্ঞানের এইরূপ উপমা প্রদান করিয়াছেন, মনে করুন, বাহির হইতে ভূপৃষ্ঠ গড়াইয়া একটি গর্তে পানি প্রবেশ করে। এইরূপ পানির সহিত স্বভাবতই আবর্জনা মিশ্রিত থাকে। আরেকটি গর্তে পানি প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ স্রোত হইতে। এইরূপ পানি স্বভাবতই নির্মল ও পরিষ্কার হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর জ্ঞান প্রথমোক্ত শ্রেণীর পানির সহিত তুলনীয় এবং শেষোক্ত শ্রেণীর জ্ঞান শেষোক্ত শ্রেণীর পানির সহিত তুলনীয়। ইমাম গাযালী (র) প্রথমোক্ত শ্রেণীর জ্ঞানকে 'ইস্‌তিব্‌সার' নামে অভিহিত করিয়াছেন (ইহ্‌য়া', ৩খ.)।

মুহ্‌য়ি'দ-দীন ইব্‌নু'ল-'আরাবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে "আর যখন আমার রাসূলগণ (প্রেরিত ফেরেশ্‌তাগণ) সুসংবাদ সহকারে ইব্‌রাহীমের নিকট আগমন করিল . . . " (২৯ ঃ ৩১) আয়াতটির ব্যাখ্যা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "মানুষের আত্মা, স্বভাব-প্রকৃতির দিক হইতে যাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে—যখন কঠোর সাধনা ও প্রচেষ্টা দ্বারা পবিত্রতা ও নির্মলতা লাভ করে, তখন উহা ফেরেশ্‌তাদের সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। অতঃপর উক্ত সাযুজ্য যেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতে বা হ্রাস পাইতে থাকে, সেই অনুপাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা উহার সম্মুখে এইরূপ আধ্যাত্মিক জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতে থাকেন, যাহা অন্যদের নাগালের বাহিরে থাকে। উক্ত অবস্থায় কখনও কখনও সূক্ষ্ম আত্মা দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া জড় জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া পড়ে। কারণ এইরূপ অবস্থায় উহা শুদ্ধ আধ্যাত্মিক বস্তুতে পরিণত হয় এবং জড়ের সহিত উহার সম্পর্ক, যাহা আত্মা ও আধ্যাত্মিক জগতের বিষয়াবলীর মধ্যে আড়াল সৃষ্টিকারী পর্দা হিসাবে বিরাজ করে, তিরোহিত হইয়া যায়। অতঃপর ইব্‌ন 'আরাবী 'গায়্‌বী 'ইল্‌ম' লাভ করিবার পাঁচটি উপায়ের প্রতি আলোকপাত করিয়াছেন। উহাদের প্রথমটি হইতেছে ইল্‌হাম। ইল্‌হামের মাধ্যমে মানবাত্মা প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক জগতের সহিত সম্পৃক্ত হয়। ফলে উহা আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী ও রহস্যাবলী সম্পর্কে অবগত হয়, যাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের ব্যাপারে সাধারণ জ্ঞানেন্দ্রিয় কোনও কাজে আসে না। উক্ত তত্ত্বের ভিত্তিতেই ইব্‌ন খালদূন লিখিয়াছেন যে, আম্বিয়া'-ই কিরাম ('আ) প্রকৃতিগতভাবেই মানব-চরিত্র হইতে ফেরেশ্‌তা চরিত্রে উত্তরণের বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহারা মুহূর্তে রূহানিয়্যাতের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিয়া ফেরেশ্‌তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী লাভ করত প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। উক্ত অবস্থার-ই নাম ওহী প্রাপ্তির অবস্থা। ওহী প্রাপ্তির অবস্থা অর্জিত নহে অর্থাৎ উহা সাধনা ও পরিশ্রম দ্বারা লাভ করিবার মত বিষয় নহে (আল-মুকাদ্দিমাতু'স-সাদিসা, ১খ, ৩৪৫, 'আবদুল-ওয়াহি'দ ওয়াফী কর্তৃক মুদ্রিত, ১৯৫৭ খৃ.)।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) আল-কু'রআন (৯১ ঃ ৮), বিভিন্ন তাফ্‌সীর গ্রন্থসহ, বিশেষত নিম্নোক্ত তাফ্‌সীর গ্রন্থসমূহ দেখুন ; (২) আত্‌-তাবারী, ৩০খ, ১১৫ প.; (৩) আয-যামাখশারী, আল-কাশ্‌শাফ, Less সং., পৃ. ১৬১২; (৪) আর-রাযী, মাফাতীহ, কায়রো ১৩০৮ হি., ৮খ, ৪৩৮; (৫) আল-বায়দাবী, ফ্লাইশার সং, ২খ, ৪০৫; (৬) 'আরবী ভাষায় প্রচলিত অভিধান গ্রন্থাবলী; (৭) 'আলী আল-হুজ্‌বীরী, কাশ্‌ফু'ল-মাহ্‌জূব, পৃ. ২৭১ ; (৮) আর-রাগিব, আল-মুফ্‌রাদাত, পৃ. ৪৭১; (৯) ইব্‌ন হাযম আল-আন্দালুসী, আল-ফিসাল, ৫খ, পৃ. ১৭ ; (১০) আল-গাযালী, ইহ্‌য়া', ৩খ, ১৬ প.; (১১) আল-'আকা'ইদু'ন-নাসাফিয়্যা, ভাষ্যসহ, কায়রো ১৩২১ হি., পৃ. ৪০ প. ; (১২) ইব্‌নু'ল-আছীর আল-জাযারী, আন-নিহায়া, কায়রো ১৩১১ হি., ৪খ, পৃ. ৭২; (১৩) আল-জুরজানী, আত-তা'রীফাত, কায়রো ১৩২১ হি., পৃ. ২২; (১৪) ইব্‌ন খালদূন, আল-মুকাদ্দিমা, কাত্‌রমিয়ার সং, ২খ, ২৩১; (১৫) আস-সুয়ূতী,

আল-জামি'উ'স-সাগীর, কায়রো ১৩২১ হি., ১খ, পৃ. ৫২; (১৬) মুহাম্মাদ তাহিত আল-ফাত্তানী, মাজমা' বিহারি'ল-আনওয়ার, নওল কিশোর সং, ১২৮৩ হি., ৩খ; পৃ. ২৭১; (১৭) 'আবদু'ল-আ'লা আত্-তাহানাবী, কাশ্শাফ ইস্তিলাহাতি'ল-ফুনূন, ১৩০৮ হি. সং; (১৮) Gesenius, Hebrew Lexicon, স্থা. ; (১৯) Dissoulavy. Gate of the East, স্থা. ; (২০) Encyclopaedia of Islam, ১ম সং, ২খ, পৃ. ৪৬৭-৬৮।

রানা ইহ্সান ইলাহী ও সম্পা. পরিষদ (দা. মা. ই.)/ মু. মাজহারুল হক

**ইলাহ্ (إله)** ঃ ('আ.) ব. ব. আলিহাঃ (آلهة), ক্রিয়াপদ আলাহা। শব্দটি জাহিলী যুগে আল্লাহ্ ছাড়াও ঐ সমস্ত কাল্পনিক দেবদেবীর জন্য ব্যবহৃত হইত, যাহাদেরকে কাফির ও মুশ্রিকরা নিজেদের উপাস্য বলিয়া গণ্য করিত। অবশ্য এই অর্থ বর্তমানেও প্রচলিত আছে। শব্দটির অগ্রে নির্দিষ্টসূচক 'আল' (ال) যুক্ত হইলে তখন খৃস্টান ও একত্ববাদী কবিদের নিকট একমাত্র ও অদ্বিতীয় উপাস্য আল্লাহ বলিয়াই নির্দিষ্ট হইত। পক্ষান্তরে অন্যান্য মুশ্রিক কবি এই শব্দটিকে "উপাসনার যোগ্য বস্তু" বলিয়াই ব্যবহার করিয়াছে। আবার একই কবিতার মধ্যে প্রথমে নির্দিষ্টসূচক 'আল' ব্যতীত ব্যবহৃত হইয়া পরবর্তীতে 'আল' যোগে ব্যবহৃত হইলে তখন শেষোক্ত আল-ইলাহ বলিতে সর্বদাই প্রথমোক্ত ইলাহকে বুঝান হইয়াছে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বাহ্নে কোন উল্লেখ ছাড়াই 'আল' যুক্তভাবে ব্যবহৃত হইয়া কবির কল্পনাজগতে বিদ্যমান কোন বিশেষ দেবদেবীর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই দুই প্রকার ব্যবহারের প্রথমোক্তকে বলা হয় عهد خرجى এবং শেষোক্তকে বলা হয় عهد ذهنى; ইসলামী যুগে ইলাহ্ নির্দিষ্টসূচক 'আল'-বিহীনভাবে ব্যবহৃত হইলে তখন অর্থ দাঁড়ায় কোন বিশেষ দেবতা, আর যখন 'আল' যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (আল-ইলাহ্ الاله) তখন অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ্। অধিক ব্যবহারের দরুন আল-ইলাহ শব্দটি আল্লাহ্ শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা। কোন কোন ভাষাবিদের মতে আরবী আল-ইলাহ ও হিব্রু 'ইলুহ' অভিন্ন এবং একই মূল ধাতু হইতে নিঃসৃত। যাহাই হউক, ইহা উল্লেখ্য যে, ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের ন্যায় সামী (سامى) ভাষাসমূহেরও একটি ভাষাগোষ্ঠী রহিয়াছে। এইজন্য কোন কোন শব্দ যেইগুলি দৃশ্যত স্বর ও বর্ণের দিক দিয়া সামঞ্জস্যশীল এবং অর্থের দিক দিয়া সমার্থক তাহা দেখিয়া এই মন্তব্য করা ঠিক নহে যে, একটি শব্দ অপরটি হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যদিও অবশেষে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, উভয়ই একটি মৌল সামী শব্দ হইতে গৃহীত যাহা বিভিন্ন সামী ভাষায় কাছাকাছি রূপ লাভ করিয়াছে।

'আল্লাহ্' শব্দটি সমন্বিতভাবে জাহিলী কাব্যেও ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু কখনও এই শব্দটি 'আল্লাহ্' ছাড়া অন্য কোন উপাস্যের জন্য ব্যবহৃত হয় না। এইভাবে শব্দটি একটি নামবাচক বিশেষ্য (اسم علم) রূপ ধারণ করিয়াছে। অনেকেই এই মত খণ্ডন করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ শব্দটি আল-ইলাহ-এর সমন্বিত রূপ (দ্র. দা.মা.ই., নিবন্ধ إله)। তাহাদের যুক্তি এই যে, জাহিলী যুগ হইতে আল্লাহ্ ও ইলাহ্ শব্দদ্বয় পাশাপাশি ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। আল্লাহ্ হইল একটি নামবাচক বিশেষ্য, পক্ষান্তরে ইলাহ্ হইল একটি অর্থবোধক অনির্দিষ্ট বিশেষ্য। আরবদের নিকট ইলাহ্ কোন একক সত্তার নাম ছিল না, বরং তাহারা যে সমস্ত দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করিত ইহাদের প্রত্যেকের জন্য এই শব্দ প্রয়োগ করিত। 'আল্লাহ্' শব্দটি যে 'আল-ইলাহ্' হইতে ভিন্ন অর্থজ্ঞাপক শব্দ ইহাও তাহার আর একটি প্রমাণ। কেননা আল-ইলাহ্ দ্বারা তাহাদের বহু দেবদেবী হইতে বিশেষ কোন একটিকেই বুঝান হইত (কারণ 'ইলাহ্'-এর পূর্বে সংযুক্ত 'আল' নির্দিষ্টকারক অব্যয় (حرف التعريف)। কুরআনের কোথাও "আল-ইলাহ্" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। শুধু 'ইলাহ্' 'আল্লাহ্' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (لا إله إلا الله) হুওয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হু (هو الله الذى لا اله الا هو) ইত্যাদি আয়াতে 'ইলাহ্' শব্দ দ্বারা ঐ সমস্ত দেবতার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, মানুষ যাহাদের পূজা, অর্চনা, উপাসনা ও আনুগত্য প্রকাশ করিয়া থাকে। উক্ত আয়াতসমূহে ও ইত্যাকার বহু আয়াতে কুরআন দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে যে, ইলাহ্ আখ্যায়িত হওয়ার একমাত্র অধিকার আল্লাহ্রই জন্য সংরক্ষিত। তিনি এক, অদ্বিতীয় ও সমস্ত 'ইবাদতের হকদার। তিনি ব্যতীত আর কোনও ইলাহ্ নাই। কুরআনের এই ঘোষণাটি শুধু 'আরব অঞ্চলের অবিশ্বাসীদের জন্য সীমিত নহে, ইহা সমগ্র দুনিয়াবাসীদের প্রতিও প্রযোজ্য যেইখানে প্রতিমা পূজার বিশ্বাস (paganism) ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল এবং যেইখানে আল্লাহ্র প্রকৃত সত্তা, তাঁহার গুণাবলী ও অবস্থান সম্পর্কে মানব অন্তর বহুবিধ গোম্রাহীর মধ্যে নিমজ্জিত ছিল।

إله শব্দের উৎপত্তি কোথা হইতে সেই সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। (১) অনেকের মতে ইহার মূল 'إله' (আলিহা) অর্থাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতভম্ব হইয়া পড়িল। কেননা মানুষ তাহাদের মা'বূদের সত্তা, শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে বাস্তব বা কল্পনা জগতে চিন্তা করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে। এই অর্থে 'إله' হইলেন ঐ সত্তা যাঁহার প্রকৃত সত্তা সম্পর্কিত ধারণা মানুষকে হতভম্ব করিয়া তোলে। (২) আর এক দলের মতে ইহার উৎপত্তি মূল أله অর্থাৎ আশ্রয় প্রার্থনা করিল, এই অর্থে إله হইতেছেন ঐ সত্তা যাঁহার নিকট মানুষ তাহাদের সমস্ত প্রয়োজন ও সমস্যার ব্যাপারে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া থাকে। (৩) অনেকের মতে এই শব্দটি لاه (লাহা) অর্থাৎ "প্রচ্ছন্ন হইল ও ঊর্ধ্বে অবস্থান করিল" হইতে উৎপন্ন। এই অর্থে إله হইলেন ঐ সত্তা যিনি তাঁহার অসাধারণ মর্যাদার কারণে লোকচক্ষু হইতে প্রচ্ছন্ন অথবা যাঁহার ব্যাপারে সম্যক্ উপলব্ধি ও প্রকৃত জ্ঞান লাভ বুদ্ধিসীমার ঊর্ধ্বে। (৪) কাহারও কাহারও মতে এই শব্দটির উৎপত্তি মূল وله অর্থাৎ ভীত-সন্ত্রস্ত হইল। এই অর্থে إله হইলেন ঐ সত্তা যাঁহার শক্তি দেখিয়া বান্দাগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে (দ্র. আল-ওয়াসীত, ১খ, ১০৫৭)। এই সমস্ত কারণেই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বারংবার ঘোষণা করা হইয়াছে যে, প্রকৃত ইলাহ্ একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহ নহে। 'আল্লামা যামাখ্শারী উপরিউক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় মতকে অধিকতর পসন্দ করিয়াছেন। তবে وله অধিকতর মৌলিক (দ্র. আল-মুফাস্সাল, সম্পা. Broch. পৃ. ১৭; ব্যাখ্যার জন্য আরও দ্র. শিরো. আল্লাহ্)।

জাহিলী যুগের মক্কাবাসীরা আল্লাহ্ (الله) শব্দটিকে নামবাচক বিশেষ্য (اسم علم) বলিয়া গণ্য করিত। ইসলামে এই মত প্রকৃতপক্ষে সার্বজনীন। আরব ভাষাবিদগণ ইলাহ্ ও আল্লাহ্ শব্দদ্বয়ের উৎপত্তি লইয়াও অনেক আলোচনা করিয়াছেন। উভয় শব্দ কি এক ও অভিন্ন না ভিন্ন ? তাঁহাদের

কেহ কেহ ইহাকে গুণবাচক বিশেষ্য (صفة) বলিয়াছেন (দ্র. আর-রাযী, মাফাতীহু'ল-গায়ব, কায়রো ১৩০৭ হি., ১খ, ৮৩)। বসরার বৈয়াকরণগোষ্ঠীর অনেকেই (খালীল, সীবাওয়ায়হ প্রমুখ) ইলাহ্ ও আল্লাহ্ এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে ভাষাগত কোন সরাসরি মিল নাই বলিয়া দাবী করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আল্লাহ্ শব্দটি স্বতঃস্ফূর্ত (مرتجل), ইহার কোন উৎপত্তিমূল নাই। কাহারও কাহারও মতে এই স্বপ্রতিষ্ঠিত শব্দটি ৮ل শব্দমূল (ليه)-এর পূর্বে নির্দিষ্টসূচক অব্যয় যোগে 'আল্লাহ্' রূপ ধারণ করিয়াছে। আবার আর এক মতে আল্লাহ্ শব্দটি সিরীয় বা হিব্রু হইতে গৃহীত। কিন্তু অধিকাংশের মতে আল্লাহ্ শব্দটি অন্য একটি ক্রিয়ামূল (مصدر) হইতে গঠিত (مشتق) বা গৃহীত (منقول) হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, শব্দটি لوه মূল ধাতু হইতে গৃহীত অর্থাৎ সৃষ্টি করা (ক্রিয়া পদ (لا يلوه)। আবার أول বা ايل ধাতু হইতে এই শব্দের উৎপত্তির সম্ভাবনাও কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ "অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হওয়া"। আবার إله শব্দটি একটি গুণবাচক বিশেষ্য হওয়ার কারণেই কু'রআনের বিভিন্ন স্থানে বারংবার ঘোষিত হইয়াছে যে, প্রকৃত ইলাহ্ (উপাস্য) হওয়ার যোগ্য হইলেন একমাত্র আল্লাহ্। আভিধানিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, কোন কোন দক্ষিণাঞ্চলীয় 'আরবী ভাষায় إيل শব্দটি দেবতার নামবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্র. G. Ryckmans, Les noms propres sud-semitiques, Louvain ১৯৩৮-৫, স্থা. এবং দক্ষিণ 'আরবের শিলালিপিতে إيل সম্পর্কে দ্র. A. Jamme, Le Pantheon sud-arabe preislamique d'apres les sources epigrapiques, Le Museon-এ, ৯খ (১৯৪৭ খৃ.), ৫৭-১৪৭।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাত ব্যতীত (১) কু'রআন মাজীদ ; (২) আরবী অভিধান ও বিভিন্ন তাফ্সীর গ্রন্থ ; (৩) E.I.[1], লাইডেন, প্রবন্ধ 'Ilah' ; (৪) রাগি'ব, মুফ্রাদাত গা'রীবি'ল-কু'রআন, শব্দ–ل–ا ه; (৫) দা.মা.ই.।

D. B. Macdonald (E.I.[2])/ ডঃ আবু বকর রফীক আহমদ

**ইলাহাবাদ** (দ্র. আল্লাহাবাদ)

**ইলাহী** (الهى) ঃ তুরস্কে প্রচলিত ধর্মীয় অনুপ্রেরণামূলক এক শ্রেণীর জনপ্রিয় কবিতা, কোন কোন অনুষ্ঠানে বাদ্যসঙ্গীত ব্যতীত এই কবিতা গানরূপে একক কণ্ঠে বা সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গীত হইবার দরুন ও সুর বৈশিষ্ট্যের জন্য ইলাহী অন্য সকল প্রকার জনপ্রিয় ধর্মসম্পৃক্ত কবিতা হইতে ভিন্ন। এইগুলির অনেক কবিতাই আদিতে হয়ত ইলাহীরূপে রচিত হয় নাই, পরে সেইগুলিতে যথাযথ সুর আরোপিত হইয়া অনুষ্ঠানাদিতে প্রচলিত হইয়াছে, যেইসব অনুষ্ঠানে ইলাহী গাওয়া অত্যাবশ্যকীয়।

সূ'ফীগণের খানকায় (তেক্কে, তাকিয়্যা) যখন যিকর করা হয় ইলাহী প্রধানত তখনই গাওয়া হয়। গানের কথা ও সুরের তাল দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অংশগ্রহণকারিগণ উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হয়। কিন্তু কমবেশী ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশে ও বিভিন্ন জনপ্রিয় অনুষ্ঠানাদিতে এই ইলাহীর কাব্যিক বা সঙ্গীতময় ব্যবহার হইয়া থাকে। নিম্নোক্ত অনুষ্ঠানসমূহ উপলক্ষে ইলাহী গাওয়া হয় ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর জন্মকাহিনী বা মাওলিদ (দ্র.) বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে; কোন স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষে, যেমন কু'রআনিয়্যা মাদরাসাতে কোন নূতন ছাত্র ভর্তি হইলে অন্য সকল ছাত্র ইলাহী গাহিতে গাহিতে তাহাকে প্রথম কু'রআন শিক্ষার শ্রেণীকক্ষে লইয়া যায়; বরযাত্রীদের শোভাযাত্রার সময়ে তাহারা ইলাহী গায়, ইহা বিবাহ অনুষ্ঠানের শেষ সন্ধ্যায় মসজিদ হইতে বাসর ঘরের উদ্দেশে যাওয়ার কালে গাওয়া হয়; হজ্জযাত্রিগণ মক্কার পথে রওয়ানা হইবার কালে এবং পুনরায় হজ্জ শেষে প্রত্যাবর্তনের পরে—তাঁহাদের সম্মানে যে অনুষ্ঠান হয় সেখানেও ইলাহী গাওয়া হয়।

ইলাহী কবিতার কিছু কিছু অংশ শিশুদের লোকসংগীতেও প্রবেশ করিয়াছে। কোন কোন সামাজিক উৎসবের সময়ে চাঁদা সংগ্রহের জন্য যে গান গাওয়া হয় তখন সকলে সমবেতভাবে সেইগুলি গায়। চানকিরি অঞ্চলে ইলাহীর সেই সকল শিশুসুলভ প্যারডি মেনেসিম (মুনাজাত) নামে পরিচিত; মুদুরনু (বোলু প্রদেশে)-তে এইসব শিশু-ইলাহীতে বর্তমানে আর কোন গাম্ভীর্যপূর্ণ অর্থ অবশিষ্ট নাই, এইগুলি এখন বরং হাস্যরসাত্মক ও কৌতুকময়। শুধু এইসব বহু-বিকৃত আকারের ইলাহীগুলিই নহে, মূলরূপে অদ্যাবধি অবিকৃত রহিয়াছে সেরূপ ইলাহীগুলিও "লোকগীতিতে রূপান্তরে"র অনবরত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছে। উহার কারণ, সেইগুলি মুখে মুখে প্রচলিত, তাহা ছাড়া লিখিত রূপগুলির (versions) মধ্যেও ব্যাপক সংযোজন করা হইয়াছে। প্রাথমিক অবস্থায় পরিচিত কবিগণের রচিত অনেক ইলাহীও কালক্রমে অজ্ঞাতনামা কবিগণের রচনা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে ক্রমশ অবক্ষয় সাধিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন কবির রচিত মূল পাঠসমূহ কালক্রমে একটির সঙ্গে আরেকটি মিশিয়া গিয়াছে। ফলে ইহাদের নূতন লোকগীতি সংস্করণের সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্তমান সময় পর্যন্ত বিদ্যমান সর্বপ্রাচীন ইলাহী কবিতাসমূহের রচয়িতা য়ূনুস এমরি [দ্র.] (মৃ. আনু. ৭২০/১৩২০)। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন বহু জনপ্রিয় কবির রচনা দ্বারা ইলাহীর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। তাঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান হইলেন য়ূনুস নামক একজন কবি (বা একই নামধারী একাধিক কবি?) [৯ম/১৫শ বা ১০ম/১৬শ শতকে]—যাঁহার ইলাহীসমূহ প্রায়শই য়ূনুস এমরি কর্তৃক রচিত ইলাহীর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া ভুল করা হয়; হাজ্জী বায়রাম (মৃ.৮৩৩/১৪২৯-৩০), এশরেফোগলু রূমী (মৃ. ৮৭৪/১৪৬৯-৭০), ইব্রাহীম গুল্শেনী (মৃ. ৯৪০/১৫৩৩-৪), উফ্তাদে (মৃ. ৯৮৮/১৫৮০-১), সায়ফুল্লাহ্ নিযামোগ্লু (মৃ. ১০১০/১৬০১-২), মুহ্য়ী (মৃ.১০২০/১৬১১), হুদায়ী (মৃ. ১০৩৪/১৬২৪-৫), হিম্মেত (মৃ. ১০৯৫/১৬৮৩-৪), নিয়াযী-ই মিসরী (মৃ. ১১০৫/১৬৯৪)। এই কবিগণের সকলেই বিভিন্ন সূফী তরীকার দরবেশ বা শায়খ ছিলেন। ইলাহী কবিতাসমূহ তুরস্কের সুন্নী মুসলমানগণের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অংশ পরিণত হইয়াছে। মাওলানা রূমী প্রবর্তিত মাওলাবীয়্যা সূ'ফী তরীকার এবং 'আলাবীশী'আগণের অনুষ্ঠানাদিতে ইলাহীর অনুরূপ যেই গান গাওয়া হয় সেইগুলি ভিন্নতর এবং সেইগুলির নামও ভিন্ন।

ইলাহী কবিতাসমূহের সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি— যেইগুলি অদ্যাপি বর্তমান আছে সেইগুলি শুধু সঙ্গীতের সুর এবং মাত্রার ইঙ্গিত বহন করে। অনুরূপভাবে বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে এই সকল সংগ্রহের লিথোগ্রাফ করা অনুলিপি স্কুলের ছেলেমেয়েদের পাঠ্যরূপে ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাইত। প্রাচীনতম ইলাহী কবিতাগুলিতে সুর সংযোজন কবে করা হইয়াছিল

তাহা এখন আর বলা সম্ভব নহে। শুধু জানা যায় যে, লোকায়ত বিষয়ে রচিত জনপ্রিয় কবিতার ন্যায় এই জনপ্রিয় ধর্মীয় কবিতাগুলিতেও রচনার সঙ্গে সঙ্গেই সুরারোপও করা হইয়াছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রচলিত কিছু সংখ্যক সুর হয়তো মূল কবিতা রচনার একই সময়কাল হইবে এবং সম্ভবত রচয়িতা স্বয়ং সেই সুর সংযোজন করিয়াছিলেন। ১৮শ শতাব্দীর শুরু হইতে কিছু সংখ্যক ইলাহীর সুরকারের—শুধু সুর, কবিতাটির রচনা নহে—নাম জানা যায় ঃ সোলাকযাদে (মৃ. ১১৩০/১৭১৮), তোসুনযাদে (মৃ. ১১২৭/১৭১৫), হামামীযাদে ইসমা'ঈল দেদে (মৃ. ১২৬২/১৮৪৬)। ইলাহীর সুরের স্বরলিপির ব্যবহার শুরু হয় বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে; বেশ কিছু সংখ্যক ইলাহীর সুরের স্বরলিপি করিয়াছেন সায়্যিদ 'আবদু'ল-কাদির ও রা'উফ য়াক্তা (মৃ. ১৯৩৫ খৃ.)।

জনৈক আধুনিক তুর্কী সুরকার 'আদনান সায়গুন ইলাহী দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া একখানি ধর্মীয় সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (য়ূনুস এম্রি, oratorio cn trios parties, রচনা ২৬; কবিতাগুলির ফরাসী অনুবাদ প্যারিস হইতে ১৯৪৭ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে)। উহাতে ১৩টি কবিতার মধ্যে—সেইগুলির মধ্যে কয়েকটি খুবই জনপ্রিয় ইলাহী—৫টির রচয়িতা য়ূনুস এম্রি (অতএব ৭ম/১৩শ শতকের রচনা) এবং আরও ৮টির রচনা তাঁহার উপর আরোপ করা হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ এই ধারার জনপ্রিয় কবিতা সম্বন্ধে কোনও গবেষণা গ্রন্থ নাই। সাধারণ তথ্যের জন্য দ্র. ঃ (১) আহমাদ তা'ল'আত, খাল্ক শি'রলেরিনিন শেকিল ভে নেউ'ই, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৯৫-৬ ; (২) কোপরুলুযাদে মুহাম্মাদ ফু'আদ, তুর্ক এদেবিয়্যাতিন্দা ইল্ক মুতাসাওবিফ্লার, ইস্তাম্বুল ১৯১৯ খৃ.; (৩) 'আবদু'ল-বাকী গোল্পিনারলি, য়ূনুস এম্রি ভে তাসাওউফ, ইস্তাম্বুল ১৯৬১ খৃ., (৪) প্রবন্ধ 'ইলাহী' পাকালিন-এ প্রকাশিত। স্কুলের অনুষ্ঠানাদিতে ইলাহী-এর ব্যবহারের জন্যঃ (৫) রিফ'আত ওদামান, এস্কি মাহাল্লে মেক্টেপ্লেরী ফাযিল ইয়েনিসে-তে, বুর্সা ফোক্লোরু, বুরসা ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ১১৭; (৬) মে. হালিত বায়রি, ইসতান্-বুল'দা মেক্তেবে বাশলমা, HBH (= হাল্ক বিলগিসি হাবের-লেরি)-এ, ১১খ (১৯৪২ খৃ.), ৫০-৪ ; (৭) P. N. Boratav, প্রবন্ধ 'আমীন আলায়ি', Turk Ansiklopedisi-তে; (৮) ঐ লেখক, 'আমীন আলায়ি', in Istanbul Ansikloedisi-তে। বিবাহ অনুষ্ঠানে ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দ্র. ঃ (৯) নাজিম ইউজেল্ত, Gecmiste Bursa'da dugun adetleri, F. Yenisey-তে পৃ. গ্র., পৃ. ৬৭; (১০) M. Enver Bese, Safranbolu'da bir koylunun, hayati, HBH-এ, ৮খ (১৯৩৯ খৃ.), ১০৬; (১১) Hamit Z. Kosay, Turkiye dugunleir, আঙ্কারা ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ১৫৪, ২৫৩, ৩০২; (১২) Fikret Memisoglu, Harput'ta kina geceleri, TFA (-Turk Folklor Arastirmalari)-তে, নং ৩৮ (১৯৫২ খৃ.) ও নং ৭৮ (১৯৫৬ খৃ.) ; (১৩) মুহাম্মাদ কালকানোগলু, Sarkisla dugunleri, TFA-তে , নং ৬৬ (১৯৫৫ খৃ.) ; (১৪) P. N. Boratav ও A. Golpinarli, পীর সুলতান আবদাল, আঙ্কারা ১৯৪৩ খৃ., পৃ.৫৩-৫। মক্কা শরীফে হজ্জযাত্রাকালীন অনুষ্ঠানে গীত ইলাহী বিষয়ে দ্র. ঃ (১৫) Enver Bese, পৃ. গ্র. ; এই সকল অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য মূল পাঠ জনপ্রিয় কবিতার পাণ্ডুলিপি আকারে লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে। ইলাহী কবিতাসমূহের সুর সম্বন্ধে ঃ (১৬) A. Golpinarli, পৃ. গ্র., পৃ. ২৪৭-৫১; (১৭) ঐ লেখক, য়ূনুস এম্রি, ইস্তাম্বুল ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ৩৩২-৫; (১৮) কোপরুলুযাদে, পৃ. গ্র., বইয়ের শেষে, মূল পাঠের পরে সংযুক্ত ফলকসমূহ; (১৯) Salahattin Gurer, Asik Yunus Emrenin bestelenmis siirleri, ইস্তাম্বুল ১৯৬১ খৃ.; (২০) Cahit Oztelli, Yunus Emrenin bestelenmis ilahileri, TFA-তে, নং ২২৩ (১৯৬৮ খৃ.)।

P. N. Boratav (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

**ইলাহী সন (অব্দ)** ঃ তারীখ-ই ইলাহী (الهی تاریخ) নামেও খ্যাত ; ৯৯২/১৫৮৪ সালে মুগল সম্রাট আকবার ইহার প্রবর্তন করেন। এই অব্দের প্রথম বৎসরটি ছিল আকবারের সিংহাসনারোহণের বৎসর, ৯৬৩/১৫৫৫-৬, ইহা ছিল একটি সৌর অব্দ এবং ইহার সূচনা ছিল মহাবিষুব (Vernal equinox)-এর দিনটি, ২০ মার্চের কাছাকাছি নওরোয দিবস। প্রাচীন পারস্যের পঞ্জিকায় মাসগুলির নাম যাহা ছিল, এই অব্দের মাসগুলিও তদ্রূপ। মাসগুলির দিনের সংখ্যা ২৯ হইতে ৩২ পর্যন্ত হইত। ফাত্হুল্লাহ্ শীরাযী এই অব্দ প্রবর্তনের প্রয়োজনীয় অংক কষেন এবং গণনার নিয়মাবলী রচনা করেন। এই অব্দের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের ব্যাপারে আবু'ল-ফাদ্'ল বলেন, ইসলামী চান্দ্র অব্দ প্রাচীন, সুতরাং নবযুগ সৃষ্টিকারী কোন সাম্প্রতিক ঘটনা হইতে শুরু করিয়া ভিন্ন একটি অব্দ প্রবর্তন করা উচিত। আকবারের সিংহাসনারোহণ এইরূপ একটি ঘটনা বলিয়া ঐ তারিখ হইতেই ইলাহী অব্দের সূচনা করা হয়। কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতাদির নিয়মিত হিসাব রক্ষণ, আয়-ব্যয়ের খাতাপত্র সংরক্ষণ (book-keeping) ও হিসাব নিরীক্ষণ (auditing)-এর ব্যাপারে এই অব্দ ছিল সুবিধাজনক। ১০৬৯/১৬২৮-৯ সালে আওরঙ্গযীব (দ্র.) নওরোয উদ্যাপন নিষিদ্ধ করেন, কিন্তু সরকারী নথি-পত্রাদিতে ইলাহী মাসের ব্যবহার বিলোপ করেন নাই। তিনি প্রথমে হিজরী সন-তারিখ লিখিয়া পরে ইলাহী অব্দের তারিখ লিখনের নির্দেশ প্রদান করেন। ১০৭৯/১৬৬৮-৯ সালে তিনি পঞ্জিকা প্রকাশনা নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু পঞ্জিকা ব্যতীত ইলাহী বর্ষপঞ্জী যথাযথভাবে অনুসরণ করা সম্ভব নয় বলিয়া কর্মকর্তাগণ আপত্তি করেন। কালক্রমে প্রকৃত মহাবিষুব ও সরকারী সৌর বৎসরের প্রারম্ভিক দিনটির মধ্যে কিছু গরমিল প্রকাশ পায়। বহুলাংশে ইলাহী বর্ষপঞ্জীর ভিত্তিতে পরবর্তী শতাব্দীতে রচিত মীরযা রাজা জা'ঈ সিংহ-এর যীজ-ই মুহাম্মাদ শাহী ছিল সরকারী কাজের জন্য একটি নূতন বর্ষপঞ্জী প্রকাশের উদ্যোগবিশেষ।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) আবু'ল-ফাদ্'ল, আক্বারনামা, ৩খ, Bibl. Ind., কলিকাতা ১৮৭৩-৮৭ খৃ.; (২) ঐ লেখক, আঈন-ই আক্বারী, ১খ, Bibl. Ind., কলিকাতা ১৮৬৭-৭৭ খৃ. ; (৩) মুহাম্মাদ হাশিম খাওয়াফী খান, মুন্তাখাবু'ল-লুবাব, Bibl. Ind. কলিকাতা ১৮৬০-৭৪ খৃ. ; (৪) S. H. Hodivala, Historical Studies in Mughal numismatics, The Numismatic Society of India, কলিকাতা ১৯২৩ খৃ.; (৫) দ্র. 'TA'RIKH' প্রবন্ধ।

M. Athar Ali (E. I.[2], Suppl.)/মুহঃ আবূ তাহের

**ইলাহী বাখ্শ্ মা'রূফ** (الهی بخش معروف) ঃ উর্দূ কবি, মরযা 'আরিফু'দ-দীনের পুত্র, য়ু'ল-ফাক'রু'দ-দাওল নাজাফ খানের উযারাত কালের এক সম্মানিত সভাসদ শারাফু'দ্-দাওলা ক্বাসিত জানের

কনিষ্ঠ ভ্রাতা, জ. ১১৫৬/১৭৪৩ সালে। পুরাতন দিল্লীর একটি সড়ক "গলী কাসিম জান" অদ্যাবধি শারাফু'দ্-দাওলা কা'সিম জানের নামানুসারে অভিহিত। একদা এইখানে বাস করিতেন অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, যেমন উর্দূ-ফারসী কবি গালিব (দ্র.), শেষ মুগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফার (দ্র.)-এর আধ্যাত্মিক উস্তাদ শায়্খ ফাখ্রু'দ-দীন ও শিফা'উ'ল-মুল্‌ক হাকীম আজ্‌মাল খান (মৃ. ১৯২৭ খৃ.)-এর প্রপিতামহ চিকিৎসক রা'ঈসু'ল-আতিব্বা' মুহা'ম্মাদ শারীফ খান। ইলাহী বাখ্শ আহ্‌মাদ য়াসাবী (দ্র.)-এর বংশধর বলিয়া দাবি করেন। তাঁহার পিতামহ খাজা 'আব্দু'র-রাহ্‌মান আল-য়াসাবী বুখারা হইতে বাল্খ-এ হিজরত করেন। নানা দুঃসাহসিক কর্ম-প্রচেষ্টার পক্ষে বাল্খ অত্যন্ত ক্ষুদ্র স্থান বিধায় মুগল সম্রাট মুহাম্মাদ শাহ-এর রাজত্বকালে তাঁহার পুত্রগণ ভাগ্যান্বেষণে ভারতে আগমন করেন। তাঁহারা পাঞ্জাবে শাসনকর্তা মীর মুন্নূ-র অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। মুন্নূ-র মৃত্যুর পর তাঁহারা দিল্লীর রাজদরবারে গমন করেন এবং সেইখানে শীঘ্রই যোগ্যতার পরিচয় দেন। সামরিক কর্মকুশলতা প্রদর্শনের জন্য, প্রথমে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ 'আলাম (দ্র.)-এর অধীনে অবাধ্য শিখদের দমনের ফলে এবং পরে ইংরেজ গভর্নর জেনারেল Lord Lake-এর অধীনে এই পরিবার দিল্লীর নিকটস্থ স্থান ফীরূযপুর ঝিরকা (Djhirka), জায়গীর (দ্র.) হিসাবে লাভ করে ইহার একাংশ পরবর্তীতে ইলাহী বাখ্শের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাওয়াব আহ্‌মাদ বাখ্শ খানের কর্তৃত্বে লোহারু রাষ্ট্র নামে পরিচিত হয়। পেশায় সৈনিক কিন্তু সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ইলাহী বাখ্শ খান প্রথম জীবনেই কবিতার প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়েন। কবিতার ব্যাপারে যাওক (দ্র.)-এর কবিগুরু শাহ নাসীর ও সায়্যিদ 'আলী গাম্গীন (দ্র. গুল্শান-ই বীখার) তাঁহার পথ প্রদর্শক ছিলেন। বয়সে যদিও যাওক ও হু'সায়ন আযাদ তাঁহার রচিত আব-ই হায়াত" (দ্র.)-এর মধ্যে বেশ ভাল যুক্তিসহ উপর্যুক্ত মন্তব্য করিলেও ইলাহী বাখ্শের বংশধরগণ ইহার সত্যতা স্বীকার করেন না। কারণ এই উচ্চ সম্মান লাভের পক্ষে ইলাহী বাখ্শের বয়স ছিল অতি অল্প (তু. দীওয়ান-ই মা'রূফ, পৃ. ২২১-৪০ ও গুল্ই রা'না, পৃ. ২৮৫)। যাহা হউক, যেহেতু যাওক ১২০৪/১৭৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং মা'রূফ ১২৪২/১৮২৬ সালে ইনতিকাল করেন, মা'রূফের মৃত্যুকালে যাওক্-এর বয়স ছিল ৩৮ বৎসর। সুতরাং ১২২৪/১৮০৯ সালের পর যখন যাওকের বয়স ২০ বৎসর এবং তিনি একজন পরিপক্ক কবি তখন মা'রূফ তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া থাকিতেও পারেন (তু. "উম্দা-ই মুনতাখাবা" গ্রন্থে যাওক প্রবন্ধ)। যখন লখনৌতে কবি মুস্হা'ফী (দ্র.) গৌরবের শীর্ষে ছিলেন তখন ১২০৫-৯/১৭৯০-০৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে যাওক লখনৌ ভ্রমণ করেন এবং তথায় দুই মাস অবস্থান করেন। যাহা হউক, সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ 'আলাম-এর পুত্র তখন লক্ষ্ণৌতে বসবারত শাহ্যাদা সুলায়মান শুকোহ্-এর দরবার যাঁহারা অলংকৃত করিয়াছিলেন সেই বিখ্যাত উর্দূ কবিদের কাহারও নিকট হইতে তিনি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে উপকৃত হইয়াছেন বলিয়া কোন ইংগিত পাওয়া যায় না। প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করা সত্ত্বেও মা'রূফ পার্থিব প্রলোভনে মোহিত হন নাই। যেই দরবেশগণ প্রায় তাঁহার সংস্রবে আসিতেন তাঁহাদের প্রভাবে তিনি বৃদ্ধ বয়সে সংসারবিরাগী হইয়া নির্জন জীবন যাপন করেন। পরিশেষে তিনি জয়পুর (দ্র.)-এর খাজা দিয়া'উ'দ-দীন চিশ্তী কাখরী (র)-র খলীফা হইয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই জয়পুরে গমন করিতেন। যৌবনে একজন সুদর্শন, অতি পরিমার্জিত ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বের অধিকারীরূপে তিনি "গোলাপী রাজকুমার" নামে সাধারণ্যে সুপরিচিত ছিলেন। অনেক বিখ্যাত কবি যেমন জুর'আত, সাওদা ও মীর তাকী প্রমুখকে তিনি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষের দিকে তিনি মীর দার্দ (দ্র.)-এর রচনাশৈলী অবলম্বন করেন। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে তাঁহার দীওয়ান (কাব্যসমষ্টি) প্রকাশিত হয় (ইহাতে রহিয়াছে যাওকের একটি Chronogrammatical (সংখ্যাজ্ঞাপক বর্ণসম্বলিত) কবিতা যাহা ইলাহী বাখ্শের সহিত যাওকের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের আর একটি প্রমাণ। তাঁহার রচনাবলী ফ্যাশন দুরস্ত নহে এবং তাহাতে মৌলিকত্বের ছাপ বা ভাবের গভীরতাও ছিল না। ১১১ চরণবিশিষ্ট "তাস্বীহ্-ই যুমুর্রুদ" শিরোনামের একটি সুদীর্ঘ কবিতার রচয়িতা তিনি। ইহার প্রতিটি চরণে 'সবুজ' শব্দটি, ইহা হইতে নিষ্পন্ন শব্দসমূহ এবং ইহার বাকধারাগত বা রূপক ব্যবহার রহিয়াছে। তিনি ১২৪২/১৮২৬ সালে বেশ পরিণত বয়সে ইনতিকাল করেন (তু. গুল-ই রা'না, পৃ. স্থা.), যদিও কু'দরাতু'ল্লাহ্ কা'সিম তাঁহার ১২২১/১৮০৬ সালের লেখায় মা'রূফকে একজন শান্ত প্রকৃতির বিশিষ্ট 'যুবক' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন (তু. মাজ্মূ'আ-ই নাগ্য্, ২খ, ২০২)।

**গ্রন্থপঞ্জী** : (১) কারীমু'দ্-দীন ও Fallon, তা'বাকা'ত-ই শু'আরা-ই হিন্দ, দিল্লী ১৮৪৮ খৃ., ৩৮৬-৭; (২) মুস্তা'ফা খান "শীফ্তা", গুল্শান-ই বিখার, লক্ষ্ণৌ ১৮৭৪ খৃ., ১২১; (৩) মুস্হা'ফী, তায্কিরা-ই হিন্দী, দিল্লী ১৯৩৩ খৃ., ২৪৫; (৪) মুহ'সিন 'আলী "মুহ'সিন", সারাপা সুখান, লক্ষ্ণৌ ১৮৬১ খৃ., ২৬, ১৪২, ২০৯, ৩৪০; (৫) 'আবদু'ল-গা'ফূর খান "নাস্সাখ", সুখান-ই শু'আরা', লক্ষ্ণৌ ১২৯১ হি., ৪৪৯; (৬) কাদির বাখ্শ "সাবির", গুলিস্তান-ই সুখান, লাহোর ১৯৬৬ খৃ., ৩৭০-৩; (৭) গু'লাম কু'ত্'বু'দ-দীন "বাতি'ন", গুলিস্তান-ই বীখিযান, লক্ষ্ণৌ ১৮৭৫ খৃ., ২২০; (৮) কু'দরাতুল্লাহ্ "কাসিম", মাজমূ'আ-ই নাগ্য, লাহোর ১৯৩৩ খৃ., ২খ, ২০১; (৯) 'আব্দু'ল-হায়্যি লাখনাবী, গুল-ই রা'না, আজমগড় ১৩৪৩/১৯২৪ খৃ., ২৮৪-৫; (১০) দীওয়ান-ই মা'রূফ, সম্পা. 'আব্দু'ল হামিদ কাদিরী বাদা'য়ূনী, বাদায়ূন ১৯৩৫ খৃ., সম্পাদকের ভূমিকা, ২১১-৪০ (কাব্য ক্ষেত্রে "মা'রূফ" "যাওক"-এর শাগরিদ ছিলেন কিনা প্রধানত এই আলোচনা); (১১) "আবদু'ল-হা'য়্যি "সাফা", শামীম-ই সুখান, লক্ষ্ণৌ ১৮৮১ খৃ., ২১৭; (১২) সায়্যিদ ফার্যান্দ আহমাদ 'সাফীর' বিল্গ্রামী, জাল্ওয়া-ই খিদ্'র (খাদি'র), পাটনা ১৩০৭/১৮৮৯, ১খ, ২১০, ২৭৪-৫; (১৩) 'আব্দু'র-রা'উফ 'ইশ্রাত', আব্-ই বাকা', লক্ষ্ণৌ ১৯২৮ খৃ., ১৮২; (১৪) 'আলী হা'সান খান, বায্ম-ই সুখান, আগ্রা ১৮৮১ খৃ., ১০৬; (১৫) নাস্রুল্লাহ খান খেশ্গী, গুল্শান-ই হামীশা বাহার, করাচী ১৯৬৭ খৃ., ২০৭; (১৬) মুহা'ম্মাদ খান আ'জমু'দ-দাওলা 'সারওয়ার', 'উম্দা-ই মুন্তাখাবা, দিল্লী ১৯৬১ খৃ., ৬৮২-৭০৬; (১৭) মুখ্তারু'দ-দীন আহ্মাদ, আহ্'ওয়াল-ই গালিব, 'আলীগড় ১৯৫৩ খৃ., ৭৮ প., ২৬৬-৮০; (১৮) খুব চান্দ "ঢাকা", 'ইয়ারু'শ-শু'আরা', (আন্জুমান তারাক্কী-ই উর্দূ, করাচীর ফটোকপি), পত্রক ৬৮৭-৯১; (১৯) মুহাম্মাদ হু'সায়ন আযাদ, আব-ই হায়াত (বিভিন্ন সং. দ্র., "যা'ওক" ও "গা'লিব", কতক উক্তি বিতর্কিত); (২০) A. Sprenger, Catalogue . . . of the Libraries of the King of Oudh, i, Calcutta 1854, আংশিক উর্দূ অনু. য়াদগার-ই শু'আরা', এলাহাবাদ ১৯৪৩ খৃ.,

১৯১; (২১) হাস্‌রাত মোহানী, উরদূ-ই মু'আল্লা সাময়িকীতে, কানপুর ১৯১১ খৃ.; (২২) নূরু'ল-হাসান খান, তায্‌কিরা-ই তূ র-ই কালীম, আগ্রা ১২৯৮/১৮৮১, ৯৩; (২৩) শাহ্ কামাল, মাজ্‌মা'উ'ল-ইন্‌তিখাব (করাচীস্থ আন্‌জুমান-ই তারাক্কী-ই উর্দূর গ্রন্থাগারে রক্ষিত মাইক্রোফিল্‌ম) ; (২৪) Garcin de Tassy, Histoire de la Litterature Hindouie et Hindoustanie2, Pari's 1870, দ্র. Ma'ruf; (২৫) তান্‌বীর আহ্‌মাদ 'আলাবী, যাওক, সাওয়ানিহ্ ওয়া ইনতিকাদ, লাহোর ১৯৬৬ খৃ., ৬৯-৭৮ (এই গ্রন্থে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইলাহী বাখ্‌শ্ অবশ্যই যাওক-এর পরামর্শে উপকৃত হইয়াছিলেন এবং যাওকের হস্তে লিখিত দীওয়ান-ই মা'রূফ-এ অন্তর্ভুক্ত তিনটি কবিতার অনুলিপি প্রদত্ত হইয়াছে)।

A. S. Bazmee Ansari (E.I.[2])/খান মুছলেহ উদ্দিন আহমদ

**ইলাহিয়াত** (দ্র. মা'আরিফ)

**ইলি ঃ** (ঈলী, ঈলা) মধ্যএশিয়ার একটি বৃহৎ নদী। ইহা টেকেস (Tekes) ও কুন্‌জেস (Kunges) নদীদ্বয় সমন্বয়ে গঠিত। তিয়েন সান (Tien-shan) পর্বতমালার উত্তরাঞ্চলের ঢাল হইতে নদী দুইটির উৎপত্তি। নদী দুইটির সম্মিলিত ধারা ইলি মধ্যযুগে "সাত নদীর দেশ", Yeti-su বা Semirecye নামে খ্যাত অঞ্চলের উত্তরভাগে প্রায় ৯৫০ কিলোমিটার (৬০০ মাইল) প্রবাহিত হওয়ার পর বালখাম (Balkhash দ্র.) হ্রদে পতিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে ইহা অর্ধ মাইলের অধিক প্রশস্ত। টেকেস নদীর উপরের অংশ এবং ইলি নদীর নিম্নাংশ কাযাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের এলাকাভুক্ত; অন্যদিকে পূর্বদিকের কুনজেশ নদী ও টেকেস নদীর নিম্নাংশ এবং ইলি নদীর উপরের অংশগুলি চীনের সিনকিয়াং-উইঘুর (Sinkiang-Uyghur) স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

এই নদীর অনেক উপনদী রহিয়াছে। তন্মধ্যে চৈনিক এলাকায় কাশ (كش) ও রুশীয় এলকায় চারীন (چرين) ও চিলিক (cilix) সমধিক প্রসিদ্ধ। মধ্যএশিয়ার সেচব্যবস্থায় বৃহৎ নদীর পরিবর্তে উপনদীগুলি অধিকতর উপযোগী। ফলত এই নদীটিও যখন পর্বতমালা অতিক্রম করত প্রশস্ত সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হয় এবং ইহার কোন উপনদী না থাকায় কৃষিকার্যের জন্য নদীটির কোন গুরুত্বই থাকে না। রুশ এলাকায় ইলি নদী হইতে খননকৃত খাল নালার সংখ্যা নগণ্য; তবে এই এলাকায় আক চূগান' (اق چوغان) নামক একটি উপনদী মোহনা হইতে প্রায় পনর মাইল উজানে ইলির সহিত মিলিত হইয়াছে। সেইখানকার কিরগীয় উপজাতীয় জনগণ নদীর সাহায্যে কৃষিকার্য করিয়া থাকে।

চীনের টাঙ (Tang রাজবংশের ইতিহাসে, খৃ. ৭ম হইতে ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত) সর্বপ্রথম ইলি নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই সময়ও চীন হইতে তুর্কীস্তান যাওয়ার প্রধান রাস্তাসমূহের একটি ইলি নদীর অববাহিকার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছিল [Cehavannes, Documents sur les Toukioue (Turcs) occidentaux, সেন্ট পিটার্সবার্গ 1903, II, ff.]। মুসলিম ইতিহাসের উৎস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এই নদীর উল্লেখ পাওয়া যায় হুদূদু'ল-'আলাম (حدود العالم) গ্রন্থে (৩৭২/৯৮২-৩)। এই গ্রন্থ পরবর্তী কালের অধিকাংশ গ্রন্থে শব্দটি লিখা হয় ঈলা (ايلى)-রূপে।

এইখানে কিভাবে ও কখন ইসলামের প্রসার ঘটে তাহা অজ্ঞাত। ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে, ইলা উত্যকাকে দারু'ল-ইসলাম বা ইসলামী দুনিয়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পূর্বদিকে যে অঞ্চল অবস্থিত তাহার উপর মুসলিমগণের আধিপত্য মোঙ্গল শাসনামলের পরবর্তী কালের ঘটনা। তৎকালীন কতিপয় ইসলামী রাজ্যের তথ্যের জন্য দ্র. শিরো. قالجه। ৭ম-৮ম/১৩শ-১৪শ শতাব্দীতে ইলির উপরিঅংশের উপত্যকার সভ্যতা, ঐ সভ্যতার পতন, আবার অধুনা কালমুক (Calmucks) ও চীনদের শাসনামলে উহার পুনরুজ্জীবন, সর্বশেষ ইসলামী আন্দোলন ও উহার ফলাফল, আবার রুশ-চীনের মধ্যে অঞ্চলটির ভাগ-বাটোয়ারার জন্য উক্ত শিরোনাম দ্র.।

এই নদীর অববাহিকার অন্যান্য অংশ সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রমাণাদি নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। কুন্‌জেসের নাম সর্বপ্রথম তৈমূরের অভিযানের ইতিহাসে উল্লিখিত হয় [ظفر نامه, ভারতে মুদ্রিত, ১খ, ৪৮১, যেখানে শব্দটি কুঁকুয (كونكز) বলিয়া উল্লেখ আছে]। প্রায় সেই সময় তেকেস (تكس)-কে তেকা (تكه) নামে উল্লেখ করা হয় (ظفر نامه-এর পাণ্ডুলিপিতে يكه ও লিপিবদ্ধ আছে)। যাযাবর জনগণের নিকট চারণক্ষেত্র হিসাবে এই দুই নদীর অববাহিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে Ilijskj Viselok নামক স্থানে ইলি নদী পার হইয়া (নদীটির উপর এই স্থানেই একটি পুল রহিয়াছে) যে ডাক যোগাযোগের সড়ক রহিয়াছে সম্ভবত ইহাই ঐ রাস্তা যাহার বর্ণনা রুবরাক (Rubruk) ১২৫৩ খৃস্টাব্দে করিয়াছেন রুবরাকের বর্ণনানুযায়ী ইলির উত্তরে ও পাহাড়ের দক্ষিণে (অর্থাৎ দৃশ্যত Altin-Imel গিরিপথের দক্ষিণে) Equius নামে একটি শহর ছিল যেখানে ফার্সীভাষী 'আরবগণ বাস করিতেন (Recueil des Voyage, etc, ৪খ, ২৮০ প.; F. Schimidt, Uber Rubruses Reise, বার্লিন ১৮৮৫ খৃ., পৃ. ৪২)। অবস্থানের দিক হইতে ইহাকে ঐ শহর বলিয়া মনে হয় যাহাকে আর্মেনিয়ার বাদশাহ হেছুম (Hethum) ইলানবালীখ (النباليخ) Ilanbalekh ও চীনারা ا-لى-با-لى ,ا-لى-با-لى বা الى با لق لى, বা الى با لى (ঐ শহর যাহা ইলি নদীর তীরে অবস্থিত) বলিয়া থাকেন (E. Gretschneider, Mediaevel Researches, etc, ১খ, ১৬৯)। খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে চীনারা এই নাম একটি জেলার জন্য ব্যবহার করেন এবং স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন যে, ঐ স্থানে কোন শহর আবাদ নাই, বরং সমস্ত জনগোষ্ঠী যাযাবর শ্রেণীর (ঐ, ২খ., ২৪২)। জনপথের নীচে এই নদী ঐ سنكى سماق-এর পাথরের বুক চিরিয়া প্রবাহিত হয় যেখানে কালমূক (খৃ. সপ্তদশ/অষ্টাদশ শতাব্দী) আমলের বৌদ্ধ শিলালিপি ও মূর্তি পাওয়া যায়। এইজন্য কিরগীযরা এই পাথরের চাঙরগুলিকে تمغالى تاس বা নকশী পাথর বলিয়া থাকে (A. Pozdnejew ও N. pantusow, in Zapiski Vost. Otd. Arkh. Obshc, ১১খ, ২৭৩ প.—দুইটি শিলালিপিসহ)। Ilijskij Viselok হইতে প্রায় এক শত মাইল নীচে Bokanos নামীয় এক মরা নদীর নীচু জমি রহিয়াছে, যাহা বর্তমান নদী হইতে বাহির হইয়া তিন শাখায় বিভক্ত হইয়াছে এবং বালখাশ হ্রদে মিলিত হইয়াছে। কথিত আছে, এখানে প্রাচীন নদীর নিদর্শন ও প্রাচীন ইমারতের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় (L. Berg, in Izviestiya Imp. Russkago Geogr. Obshe., ৪০খ, ৫৯০)। এই ধ্বংসাবশেষ কোন্ যুগের ও কোন্

জাতির সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা অজ্ঞাত। কেননা আমাদের জানামতে সাহিত্যিক উৎসসমূহ এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব [যাহা হউক, আমরা এখানে এতটুকু যোগ করিতে পারি যে, বাল্খাশ হ্রদকে ظفر نامه (ভারতবর্ষে মুদ্রিত, ১খ, ৪৯৬) গ্রন্থে اتراك كول। নামে উল্লেখ করা হইয়াছে]। এখন পর্যন্ত সেখানে কোন শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

মধ্যএশিয়ার অন্যান্য নদীর মত ইলিও নৌ-চলাচলের অনুপযুক্ত এবং বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে নদীটি কোন গুরুত্ব লাভ করে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ L. Berg নদীপথে উপরের দিকের Ilijskij Viselok হইতে বাল্খাশ হ্রদ পর্যন্ত যে ভ্রমণ করেন তাহার উল্লেখ করা যায় (ঐ, পৃ. ৫৮৮ প.)।

বর্তমান শতাব্দীতে জনবসতির প্রধান কেন্দ্র হইল কুলজা (Kuldja) ও তুর্কিস্তান, সাইবেরিয়ান রেলওয়ে ও নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছোট শহর ইলি। বরফমুক্ত মাসগুলিতে সাবেক সোভিয়েট এলাকাধীন নদীতে বদ্বীপের নিকটবর্তী একটি বিন্দু পর্যন্ত নৌচলাচল সম্ভবপর। ইলি নদীর উপনদীসমূহের পানি সেচকার্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং উপরের বাঁক মধ্যবর্তী অংশগুলি পানি বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস (দ্র. BSE[2]. zvii, ৫৩০-১, একটি মানচিত্রসহ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধ গর্ভে বরাত উল্লিখিত।

C. E. Bosworth S W. Barthold (E.I.[2] ও দা,মা.ই.)/ মোঃ আবদুল মান্নান

**ইলিচপূর** (الچپور) ঃ বর্তমান নাম আচালপুর, ২১° ১৬´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৭° ৩৩´ পূর্ব দ্রাঘিমার অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ মধ্যভারতের তাগতি নদীর পুরান উৎসের মূল ধারার নিকটে অবস্থিত মধ্যযুগীয় মুসলিম প্রদেশ বেরারের একটি শহর। অমরাবতী প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার পর হইতে ১৮৫৩ খৃ. পর্যন্ত ইলিচপুরকে সাধারণত বেরার প্রদেশের রাজধানী হিসাবে ধরা হইত।

প্রাক-ইসলামী ইলিচপুরের ইতিহাস প্রায়ই পৌরাণিক। কথিত আছে, দশম শতাব্দীতে জৈন নৃপতি ইল কর্তৃক ইহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক বারানীর সময়ে (৭ম/১৩শ শতাব্দীর পরে) ইহাকে উত্তর দাক্ষিণাত্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ শহর হিসাবে বর্ণনা করা চলিত। দিল্লীর সুলতান 'আলাউদ-দীন খাল্জী ৬৯৫/১২৯৬ সনে দেওগিরি নৃপতি রামচন্দ্র (দ্র. দাওলাত আবাদ)-এর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানে ইহা দখল করেন এবং উহাকে সুলতানের করদ রাজ্যে পরিণত করেন। ৭১৯/১৩১৮ সনে চূড়ান্তভাবে দেওগিরির পতন হইলে ইলিচপুর এবং বেরার প্রত্যক্ষ মুসলিম শাসনাধীনে আসে। বাহ্মানীদের (দ্র.) শাসনামলে ইহা বেরার প্রদেশের রাজধানী ছিল এবং বাহ্মানীদের বিরুদ্ধে মালওয়ার খাল্জী শাসক (দ্র.) মাহ্মূদ শাহের (৮৩৯-৬৫/১৪৩৬-৬২) অভিযানসমূহে ৮৭০/১৪৬৬ সনে ইহা লুণ্ঠিত হয়, ইহা বিশিষ্ট লক্ষণীয় স্থান অধিকার করে। অতএব বাহ্মানী সুলতান ৩য় মুহাম্মাদ লাশকারী মালওয়াকে বেরার ইলিচপুর পর্যন্ত সমর্পণ করিতে বাধ্য হন (আরও দ্র. খেরলা)। ৮৯০/১৪৮৫ সন হইতে ৯৮০/১৫৭২ সন পর্যন্ত ইলিচপুর বাহ্মানীদের অখ্যাত উত্তরাধিকারী 'ইমাদশাহী (দ্র.)-দের শাসনাধীনে ছিল। মুগলদের শাসনামলে ইহা প্রথমদিকে নূতন কেন্দ্র বালাপুরের প্রভাবে ছিল, কিন্তু শীঘ্রই সেখানে ইট ও পাথরের দুর্গ নির্মিত হইলে পুনরায় ইহা বেরার প্রদেশের রাজধানী হিসাবে খ্যাতি পুনরুদ্ধার করে। আবুল-ফাদ্লের আঈন-ই আক্বারী গ্রন্থানুসারে ইলিচপুরের (যাহা গাভিলের সরকারের অধীনে আসে, নিম্নে দ্রষ্টব্য) মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৪ মিলিয়ন দাম (২খ, অনু. H. S. Jarret, কলিকাতা ১৯৪৯ খৃ, পৃ. ২৩৭, ২৪০)।

কিন্তু হায়দারাবাদের প্রথম স্বাধীন সুলতান আসাফ জান নিজামু'ল-মুল্ক (মৃ. ১১৬১/১৭৪১, দ্র. Haydarabad b. Haydarabad State)-এর অভ্যুত্থানের পরে ইলিচপুর নিজামের গভর্নরদের তত্ত্বাবধানে কেবল স্থানীয় গুরুত্বে অবনমিত হয়। গভর্নর সালাবাত খান উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এই শহরে বিভিন্ন সরকারী দালানকোঠা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি ও তাঁহার পুত্র নামদার খান ১৮৪৩ খৃ. শেষোক্তজনের মৃত্যু পর্যন্ত বেরারের নাওয়াব উপাধি ধারণ করেন। তাঁহাদের পরে এই বংশের বিলুপ্তি ঘটে।

পরবর্তীতে বৃটিশ ভারতের নামমাত্র চিরস্থায়ী ইজারার ভিত্তিতে ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে 'হায়দরাবাদকে প্রদত্ত জেলাসমূহ' হিসাবে নিজামের নিকট হইতে ফেরৎ লওয়া হয়। ফলে ইহা প্রকৃতপক্ষে মধ্যভারত প্রদেশের অংশে পরিণত হয়। ইলিচপুর বর্তমানে বেরারের সর্ববৃহৎ শহর (১৯০১ খৃ., ১৮,৫০০ জন হিন্দু ও ৭,২৫০ জন মুসলমানসহ ইহার মোট জনসংখ্যা ছিল ২৬,০৮২)। প্রথমে ইলিচপুরকে বেরারের একটি জেলার নাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ১৯০৫ খৃ. ইহাকে আমরাওতী (অমরাবতী) জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমান ভারতে ইলিচপুরকে আচালপুর বলা হয় এবং ইহা মহারাষ্ট্র রাজ্যের নাগপুর বিভাগের অমরাবতী জেলার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭১ খৃ. আদমশুমারী অনুযায়ী আচালপুর শহর ও আচালপুর শিবিরের জনসংখ্যা যথাক্রমে ৪৩,৩২৬ ও ২৪,১২৫।

ইলিচপুরের স্মৃতিস্তম্ভের মধ্যে মুসলিম যোদ্ধা 'আবদু'র-রাহমান গাযীর প্রসিদ্ধ সমাধিস্তম্ভ বা দরগাহ্ রহিয়াছে, তিনি গাযনীর সুলতান মাস্'উদের ন্যায়, যাঁহাকে উত্তর প্রদেশের বাহ্রাঈচে দাফন করা হয় [ দ্র. গাযী মিয়াঁ])। কিন্তু খুব সম্ভবত তিনি ফীরোয শাহ খাল্জীর সেনাপতি ছিলেন। ইলিচপুরের দক্ষিণে গাভিলগড় (দ্র.) পাহাড়ী দুর্গ ও নিকটস্থ মুক্তাগিরিতে কতগুলি জৈন মন্দির আছে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) Cambridge history of India, ৩খ, নির্ঘণ্ট; (২) Imperial Gazetteer of India, ১২খ, ১০-২১; (৩) A. C. Layll, সম্পা. Gazetteer for the Haidarabad Assigned Districts, commonly called Berar, বোম্বাই ১৮৭০ খৃ., পৃ. ১৪৪-৮, দ্র. ; (৪) Fitzgerald and A. F. Nelson, সম্পা. Central Provinces District Gazetteers, Amraoti District, বোম্বাই ১৯১১ খৃ., পৃ. ৩০-১০০ স্থা. ও ৩৯৪-৪০১।

C. E. Bosworth (E.I.[2] Suppl.)/এ. বি. এম. আবদুর রব

**ইলিজা** ঃ (তুর্কী) অর্থ উষ্ণ ঝরনা এবং এমন হাম্মাম যাহাতে উষ্ণ ঝরনার পানি প্রবাহিত। ইহা মূলত আরবী শব্দ। 'উছমানীদের পরিভাষায় এমন এক হাম্মাম যাহার পানি কৃত্রিমভাবে গরম করা হয়। ইলিজা একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পশ্চিম তুর্কী শব্দ Ili হইতে উদ্ভূত ক্ষুদ্রত্বব্যঞ্জক রূপ, যাহার অর্থ গরম। মাহ্মূদ কাশগাড়ী ও গুজদের আদ্যাক্ষর বাদ দেওয়ার প্রবণতার দৃষ্টান্তস্বরূপ yilig-এর স্থলে ilig-এর উল্লেখ করিয়াছেন, (Arabic text, i, 31-tr, B. Atalay i. 31.)।

'আসিম-এর মতে একটি উত্তপ্ত ও নিরাময়কারী ঝরনাকে তুর্কী ভাষায় ইলিজা, বুরসা ভাষায় কাপলুজা এবং রুমেলীতে বানা (তু. Serbo-Croat banja) বলা হয় (T. Translation of al-Firuzabadis Muhit, দ্র. al-himma,-ed of 1268-72, iii, 435, TTS, i, 349-এ উল্লিখিত)।

Redhoase পার্থক্য নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, যে উষ্ণ প্রস্রবণের উপর ছাদ নির্মাণ করত হাম্মামে পরিণত করা হইয়াছে তাহা কাপ্লুজা, বিশেষত Brousa-র যে কোন উষ্ণ হাম্মাম। সম্ভবত এই পার্থক্যগুলি কেবল শাব্দিক, বাস্তবে ব্যবহৃত হয় না। Brousa নগরীর Cekirge শহরতলীতে কাপ্লিজা বলিতে সর্বস্বীকৃতভাবে প্রধানত সেই হাম্মামখানাকে বুঝায় যাহাতে উষ্ণ প্রস্রবণের পানি ব্যবহৃত হয়। Evliya Celebi সোফিয়া সম্বন্ধে বলেন (iii 399), এই সমস্ত অঞ্চলে ইলিজাকে বানা বলা হয়। তাহা সত্ত্বেও তিনি নিজেই সোফিয়া ও বুদা-র হাম্মাম সম্পর্কে ইলিজা শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। ফারীদুন (i.[2]-599) এমনিভাবে বানা ও ইলিজাতে কোন আপাতপার্থক্য ছাড়াই রুমেলীর প্রসঙ্গে শব্দদ্বয়ের ব্যবহার করিয়াছেন। ইলিজা আনাতোলিয়া, একটি সাধারণ আঞ্চলিক নাম। Turkiye'de meskun yerler kilavuzu, Ankara 1946-50 গ্রন্থে ইহার ত্রিশের অধিক প্রত্যয়ন বিদ্যমান।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/মোঃ আবদুল লতিফ

**ইলেকখানগণ বা কারাখানীগণ ঃ** তুর্কী রাজবংশ যাঁহারা ৪র্থ/১০ম শতাব্দী হইতে ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত তিয়েনসান পর্বতমালার মধ্যবর্তী এলাকায় অর্থাৎ পশ্চিম তুর্কীস্তান (ট্রান্সঅক্সানিয়া বা মা ওয়ারা'উ'ন-নাহর) ও পূর্ব-তুর্কীস্তান (কাশগারিয়া বা সিন্কিয়াং) উভয় অঞ্চলে রাজত্ব করেন।

১। **পরিচয় ঃ** ইলেক-খান বা ইলগ-খান নামটি য়ুরোপের উনবিংশ শতাব্দীর মুদ্রা ও পদক বিশেষজ্ঞগণ (numismatists) প্রবর্তন করিয়াছেন। সাধারণত উক্ত রাজবংশের মুদ্রাদিতে ইলেক/ইলিগ [হুন, মাইয়ার (Magyar), Uyghur ইত্যাদি তুর্কী ধ্বনিভিত্তিক নামে পরিচিত] অংকিত দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ইহা কোনক্রমেই সার্বজনীন নাম নহে। ইলেক্-খান/ ইলিগ-খান—এই সম্পূর্ণ বিশিষ্টার্থক শব্দটি একটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ যুগ্ম শব্দ। ইলেক/ইলিগ খান/খাকান/কাগান শব্দ দু'টি শাসক রাজবংশের দুইটি বিশিষ্ট শ্রেণীবিভাগ বুঝাইত—পূর্বোক্তটি শেষোক্তটির অধস্তন মর্যাদাবিশিষ্ট [তু. O. Turan, Ilig unvadi hakkinda, in TM, ৭/৮খৃ. (১৯৪০-২ খৃ.), পৃ. ১৯২-৯]। কারাখানী নামটিও উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্যবিদ এবং মুদ্রা ও পদক বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক প্রবর্তিত। কারা (আক্ষরিক অর্থে 'কালো'; কিন্তু প্রাচীন তুর্কী ভাষায় দিক্নির্ণয় যন্ত্রের উত্তর দিকস্থ প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ও তাহার ভিত্তিতে 'প্রধান', 'মুখ্য' অর্থে তু. O. Pritsak, Qara, Studie zur turkischen rechtssymbolik, in Zeki Velidi Togan'a armagan, ইস্তাম্বুল ১৯৫০-৫ খৃ., পৃ. ২৩৯-৬৩) উক্ত রাজবংশের শক্তিশালী খানদের উপাধিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। সমসাময়িক ইসলামী সূত্রে প্রায়শ রাজবংশটিকে খান বংশ বলা হইত (আল-খাকানিয়্যা, আল-খানিয়্যা) ; কখনও কখনও আল-ই আফ্রাসিয়াব "আফ্রাসিয়াব বংশ"-এই বিশিষ্টার্থক উপাধিটিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা ইরানী জাতীয় মহাকাব্যে উল্লিখিত তুরানী নরপতির সঙ্গে রাজবংশটির যোগসূত্র বুঝানো হয় (তুর্কী লোককাহিনীর The Alp Er Tonga, তু. Barthold, Zwolf Vorlesungen. . ., পুনর্মুদ্রণ ১৯৬২ খৃ., পৃ. ৮৬-৭, ফরাসী অনু. Histoire des Turcs d' Asie Centrale, প্যারিস ১৯৪৫ খৃ., পৃ. ৬৯-৭০)।

ইংরেজী ইসলামী বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণে লিখিত নিবন্ধে Barthold বলিয়াছেন, ইতিহাসে উক্ত রাজবংশের উল্লেখ অপর্যাপ্ত। আর Zambaur তৎপ্রণীত Manuel (পৃ. ২০৬)-এ স্বীকার করিয়াছেন যে, কারাখানী 'একমাত্র মুসলিম রাজবংশ যাহার কুলজি অস্পষ্ট' (la seule grande dynastie musulmane dont la genealogie est restee obscure)। মন্তব্যটি প্রধানত অনুমানমূলক। Barthold-এর মতে ঐতিহাসিক সূত্র যতটা স্বল্প সম্ভবত উহা তত স্বল্প নহে। কারণ O. Pritsak কারাখানী বংশ সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে অনেক নূতন তথ্যের আলোকপাত করিয়াছেন। নীচে ইতিহাসের যে পরিচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে, তাঁহার গ্রন্থখানিই উহার প্রধান উৎস।

২। **ইতিহাস ঃ** কারাখানী বংশ কোন্ তুর্কী উপজাতি হইতে উদ্ভূত, উহা এখনও অস্পষ্ট। Pritsak যে তাহাদেরকে বিশিষ্ট কারলুক (দ্র.) গোষ্ঠী সম্পৃক্ত বলিয়াছেন, উহা সঠিক বলিয়া মনে হয়। কারলুকরা ওরখান-তুর্কী বা তু-'চুয়েই (T'u-chueh)-দের মিত্র রাষ্ট্রসংঘের সদস্যগোষ্ঠী ছিল। অতঃপর ৭৪২ খৃ.-র পর তাহারা কারলুক, উইগুর ও বাসমিল উপজাতিত্রয়ের মৈত্রী সংঘে যোগ দেয় এবং মংগোলিয়ার তু-চুয়েহদিগের শাসন কর্তৃত্বের উত্তরাধিকারী হয় (Von den Karluk zu den Karachaniden, পৃ. ২৭০ প.)। ২য়/৯ম শতকে কারলুকগোষ্ঠী ট্রান্সঅক্সানিয়ার উত্তর সীমান্তে ও বিলজে কুল এলাকায় বসবাসকারী সামানীগোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। যে কাদীর খান এই সংগ্রামে নূহ ইব্ন আসাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কারলুক ও কারাখানী নৃপতিবর্গের মধ্যে সম্ভবত সর্বাগ্রে তাঁহার নামই সুনির্দিষ্টভাবে জানা গিয়াছে। যে রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো উক্ত মৈত্রীর বৈশিষ্ট্য হওয়ার কথা তাহা ধীরে ধীরে লক্ষণীয় হইয়া উঠে। অন্য কতিপয় আলতাই জনগোষ্ঠীর মত ইহাদের মধ্যে দ্বৈত নৃপতির শাসন প্রচলিত ছিল। মহান খান মিত্ররাষ্ট্রের পূর্বাংশ সরাসরি শাসন করিতেন। সেমিরেচয়ী (Semirecye)-র 'চু' উপত্যকায় অবস্থিত বালাসাগূন অথবা কারা ওরদুস্থিত শিবিরে তাহার দরবার চলিত। তাঁহার সহযোগী খান প্রধান খান-এর সার্বভৌম কর্তৃত্বাধীনে শাসনকার্য চালাইতেন এবং তালাস কিংবা কাশগড়-এর শিবির হইতে রাজ্যের পশ্চিমাংশ সরাসরি শাসন করিতেন। এই দুই খানের অধীন অধস্তন খানদের ও কারাখানী বংশের আঞ্চলিক শাসকগণের একটি জটিল শ্রেণীবিভাগ ছিল। এই শাসকদের সকলেই totemistic প্রতীকসহ (অন্গুন) তুর্কী রাজকীয় নাম ও উপাধি ধারণ করিতেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর তাঁহারা মুসলিম নাম ও কুন্য়া (উপনাম) গ্রহণ করেন। শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী বংশের কেহ উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হইতে তুর্কী উপাধি পরিবর্তিত হইত। কাজেই লিখিত সূত্র ও মুদ্রার ভিত্তিতে বংশটির তালিকা ও ইতিহাসকে জটমুক্ত করা দুঃসাধ্য কাজ।

সামানী-কারাখানী সীমান্তে সামরিক তৎপরতা ও বাণিজ্যিক যোগাযোগই ৪র্থ/১০ম শতকে কারাখানীদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা দান করে। এই ধর্মান্তর কার্যের অনেকটাই পীর-আওলিয়া ও অন্যান্য

উৎসাহী মুসলমানগণ সম্পন্ন করেন। তন্মধ্যে একজনের নাম জানা গিয়াছে, নীশাপুর-এর আবু'ল-হাসান মুহাম্মাদ কালিমাতী (তু. সাম'আনী, আনসাব, পত্রক ৮৪৬ক)। পশ্চিমাঞ্চলীয় খান-রাজ্যপ্রধান সাতুক বুগ্রা খান (মৃ. ৩৪৪/৯৫৫) ইসলাম গ্রহণ করিয়া 'আবদু'ল-কারীম নাম গ্রহণ করেন। খোতান ও পূর্ব-তুর্কীস্তানের অন্যান্য শহরের এই নূতন ধর্ম গ্রহণের সময় পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলীয় খান রাজ্যের ইসলাম গ্রহণে কিছুদিন বিলম্ব হয়। ৩৪৯/৯৬০ সনে ২ লক্ষ তাঁবুবাসী (যাযাবর) তুর্কী উপজাতির ইসলাম গ্রহণের যে বিবরণ ইবনু'ল-আছীর (৮খ, ৩৯৬) দিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। দক্ষিণ দিকে সীর দরিয়ার উর্বরা ও আকর্ষণীয় অববাহিকায় কারাখানীদের চাপ ৪র্থ/১০ম শতকের শেষের দিকে সামানীগণের পতনের একটি প্রধান কারণ। হারূন ওরফে হাসান বুগ্রা খান ৩৮২/৯৯২ সনে অল্প দিনের জন্য সামানীদের রাজধানী বুখারা অধিকার করেন। উযকেন্দ-এর ইলিগ নাস্র ইব্ন 'আলী ৩৮৯/৯৯৯ সনে চূড়ান্তভাবে বুখারা অধিকার করিয়া সামানী রাজ্যগুলিকে গায্না-র সুলতান মাহ্মূদের সঙ্গে বিভক্ত করিয়া লন। যাহা হউক, ইলিগ কিছুকাল যাবত আমূ দরিয়াকে তুর্কী সাম্রাজ্য দুইটির মধ্যবর্তী সীমানা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এদিকে ভারতের সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযানে মাহ্মূদ ব্যস্ত থাকাকালে ইলগ ৩৯৬/১০০৬ সনে খুরাসান আক্রমণ করেন। তবে মাহ্মূদের ত্বরিত প্রত্যাবর্তনে পরিস্থিতি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। এই বৎসরগুলিতেই পশ্চিমাঞ্চলীয় কারাখানীগণ 'আব্বাসী খলীফাদের কর্তৃত্ব পূর্ণভাবে মানিয়া লয়। খানদের মুদ্রায় প্রায়শ উৎকীর্ণ "মাওলা আমীরু'ল-মু'মিনীন" এই কথা দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রথম যুগের খানগণ তাঁহাদের ধর্মনিষ্ঠার জন্য খ্যাতি লাভ করেন, যাহার অভিব্যক্তি দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহাদের পরিবারে পাওয়া যায়। সাধারণত তুর্কী বংশগুলি যেমন নিষ্ঠাবান মুসলিম ও হানাফী ফিক্হের অনুসারী ছিল, কারাখানীরাও তাঁহারই অনুসরণ করেন। কারাখানীরা মিত্ররাষ্ট্র-সংঘের (Confederation) অভ্যন্তরীণ কাঠামো সম্পর্কে পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে প্রমাণিত হয়, এই সকল রাজ্য কখনও একক রাষ্ট্ররূপে শাসিত না হইয়া বরং শিথিল উপজাতীয় দলের কর্তৃত্বাধীন ছিল। ৫ম/১১শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজবংশটিতে দুইটি স্বতন্ত্র শাখার উদ্ভব ঘটে। তন্মধ্যে প্রথমটি সাতুক বুগ্রা খান-এর পৌত্র 'আলীর বংশধরগণ। বংশটির নিম্নে বর্ণিত বিভক্তির পরে এই শাখায় পশ্চিমা খান রাজ্যের প্রধান খানগণের (Alids) উদ্ভব হয়। দ্বিতীয় শাখায় উদ্ভূত হয় পূর্ব খান রাজ্যের প্রধান খানগণ যাঁহারা ছিলেন সাতুক বুগ্রা খান-এর অন্য পৌত্র হারূন ওরফে হাসান বুগ্রা খান-এর বংশধর (Hasanids)।

যে ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিবারটির বিভিন্ন সদস্য কারাখানী রাজ্যের একাধিক অংশ একই সঙ্গে শাসন করিতেন, তাহা অবশ্যম্ভাবীরূপে পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করিত। গযনীবাসী ঐতিহাসিক বায়হাকী পরিষ্কার ভাষায় গযনীর সুলতান মাহ্মূদের রাজত্বকালের মাঝামাঝি সময়ে খানগোষ্ঠী ও ইলিগগোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণ দিয়াছেন। কারাখানীদের সংহতি দুর্বল হওয়ার আশায় সুল্তান মাহ্মূদ এইরূপ বিভক্তি উৎসাহিত করিতেন, বিশেষত ৪১৬/১০২৫ সনে তিনি খোতান ও কাশগড়ের (৪১৭/১০২৬ সনের পর, রাজধানী 'উযকেন্দ-এর) অধিপতি য়ূসুফ কাদীর খান ইব্ন হারূন বুগ্রা খান-এর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। উভয়ের শত্রু 'আলী তিগিন নামে পরিচিত য়ূসুফের ভাই 'আলী (শেষোক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে O. Pritsak, Karachanidische streit fragen. 3 Wer war 'Ali Tigin ? 216-24)-এর বিরুদ্ধে। এই সময়ে ট্রান্স-অক্সিয়ানা রাজ্যের ইতিহাসে 'আলী তিগিন প্রধান ভূমিকা পালন করেন। সমৃদ্ধশালী বুখারা ও সামারকান্দ শহরে তাঁহার প্রভাবের ভিত্তি ছিল অটুট। তদুপরি আর্সলান ইসরাঈল, তুগরিল এবং চাগরী প্রভৃতি সালজূক দলের সঙ্গে মৈত্রীর কারণে ৪২৫/১০৩৪ সনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি গযনী রাজ্যের অপ্রতিরোধ্য শত্রু ছিলেন। 'আলী তিগিনের মৃত্যুর পর হাসানীগোষ্ঠী উদ্ভূত তাঁহার পুত্রগণ পিতার ট্রান্স-অক্সিয়ানা ক্ষুদ্র রাজ্যটি বেশী দিন রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। ইলগ নাস্র-এর দুই পুত্র 'আলী গোষ্ঠীভুক্ত মুহাম্মাদ 'আয়নু'দ-দাওলা ও বোরি তিগিন ক্রমে ক্রমে সমগ্র অঞ্চলটি অধিকার করেন। মুহাম্মাদ নিজেকে প্রধান খান ঘোষণা করিলে বোরি তিগিন তাঁহার সহযোগী খান হন (৪৩৩/১০৪১-২)।

এই সময় হইতে দুইটি স্বতন্ত্র কারাখানী খান রাজ্য স্থাপিত হয় (তু. O. Pritsak, Karachanidische Streitfragen. 4. Zwei Karachandidische Kaganate, পৃ. ২২৭-৮)। তন্মধ্যে সেমিরেচী, ফারগানার পূর্বাংশ ও কাশগড় লইয়া মূল কারাখানী রাজ্যগুলি পূর্ব-খান রাজ্যে অংগীভূত হয়। বালাসাগূন বা কারা ওরদু উহার রাজধানী এবং কাশগড় উহার গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল। ট্রান্স-অক্সিয়ানা ও খুজান্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ফারগানার পশ্চিমাংশ পশ্চিম খান রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। গোড়ার দিকে উহার রাজধানী ছিল ওযকেন্দ, পরে সামারকান্দ। সীর দরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলটি লইয়া প্রায়শই শাখা দুইটির মধ্যে কলহ-বিবাদ হইত।

কারাখানী রাজবংশের পূর্বাঞ্চলীয় শাখাগোষ্ঠী হাসানীগণ অনতিবিলম্বে সমগ্র ফারগানা প্রদেশ জয় করেন। বহিরাঞ্চলীয় তৃণভূমির বহু সংখ্যক ধর্মহীন তুর্কী ইসলাম গ্রহণ করায় তাঁহাদের জনশক্তি বৃদ্ধি পায়। এইভাবে বুলগাড় হইতে বালাসাগূন পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার ১০ হাজার তাঁবুবাসী যাযাবর তুর্কীরা ৪৩৫/১০৪৩-৪ সনে ইসলাম গ্রহণ করে। প্রধান খান মুহাম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ কাদীর খান সম্ভবত তুর্কী অভিযান-প্রণেতাদের অগ্রদূত মাহ্মূদ কাশগাড়ী (দ্র.)-র পিতামহ ছিলেন। মাহ্মূদের পিতা ছিলেন সেমিরেচয়ী রাজ্যের বারস খান জেলার আমীর [তু. O. Pritsak, Mahmed Kasgari kimdir ? in TM, ১০খ (১৯৫১-৩ খৃ.), পৃ. ২৪৩-৬]। এই বৎসরগুলিতে কাশগড় নগরী একটি ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠে। আর এইখানেই য়ূসুফ খাস্স হাজিব (দ্র.) তাঁহার গ্রন্থ কুতাদগু বিলিগ্ প্রণয়ন করত খান হাসান ইব্ন সুলায়মান (৪৬৭-৯৬/১০৭৪-৫ হইতে ১১০২-৩)-এর নামে উৎসর্গ করেন, বিশেষত অবিলম্বে কাশগড় তারিম অববাহিকায় চীন ও মঙ্গোলিয়া সীমান্তের দিকে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তারের প্রধান যাত্রাকেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে।

হাসান খানের পুত্র ও উত্তরাধিকারী আহ্মাদ পশ্চিমা লিআও বা কারা খিতায় (দ্র.) জাতির অগ্রাভিযানের গতিরোধ করেন। উহারা মোঙ্গল বংশোদ্ভূত ছিল বলিয়া মনে হয়। চীনের উত্তরাংশে তাহাদের দুই শত বৎসরের রাজ্যটির পতন ঘটিলে এই সময়ে তাহারা পশ্চিম দিকে হিজরত করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু আহমাদের ইনতিকালের পর পূর্বাঞ্চলীয় কারাখানীরা কারা খিতায় বাহিনীর অগ্রাভিযান আর প্রতিরোধ করিতে

সমর্থ হয় নাই। ফলে বালাসাগূন কারাখিতায়দের অধিকারে চলিয়া যায় এবং তাহাদের রাজধানীরূপে গড়িয়া উঠে। ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের পরবর্তী কালের পূর্বাঞ্চলীয় কারখানী খানদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। স্বেচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, তাহাদেরকে কারা খিতায় গোর খানদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এই সময়ে কাশগড় ছিল তাহাদের রাজধানী। দুঃসাহসী নায়মান (Nayman) মোঙ্গল অভিযাত্রী কূচলুগ গোর খানকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিয়া সেমিরেচয়ী রাজ্যে তাঁহার স্বল্পকাল স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সময়ে তিনি কারা খিতায় দরবারের বন্দীদশা হইতে কারাখানী ২য় মুহাম্মাদকে মুক্তি দান করিয়া কাশগড়ে প্রেরণ করেন। দুর্ভাগ্যবশত সিংহাসনে পুনরাধিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই এক অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে এই পূর্বাঞ্চলীয় কারাখানী নৃপতির মৃত্যু ঘটে (৬০৭/১২১০-১১)। এইভাবে কাশগড় কূচলুগ-এর অধিকারভুক্ত হইলে বংশটির পূর্বাঞ্চলীয় গোষ্ঠী বিলুপ্ত হয়।

খান বংশের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা-রাজ্য অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যের ইতিহাস সমধিক সুবিদিত। কেননা ইসলামী ঐতিহাসিক সূত্রাদিতে ট্রান্সঅক্সানীয় ঘটনাবলীর অধিকতর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কারণ খুরাসানের ঘটনাবলীর সহিত ঐগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাক্তন বোরিতিগিন (আনু. ৪৪৪-৬০/আনু. ১০৫২-৬৮) ইবরাহীম তামগাচ খান "নৃপতিদের দর্পণে" (Mirrors for Princes) এক গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার আসন লাভ করেন এবং সাহিত্যে একজন ন্যায়বিচারক ধর্মপরায়ণ শাসকের দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হন। অবশ্য ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, ট্রান্স-অক্সিয়ানায় অত্যন্ত প্রভাবশালী ও উচ্চাভিলাষী 'উলামা' শ্রেণীর সঙ্গে একই সময়ে ইবরাহীম বহুবার সংঘর্ষে জড়িত হইয়া পড়েন। এদিকে বিশাল সালজূক সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান এই সকল কারাখানী নৃপতিদের কাছে এক ভয়াবহ বহিঃশত্রুর আক্রমণ-ভীতির কারণরূপে দেখা দেয়। ইহা ৫ম/১১শ শতকে আল্প আরসলান (দ্র.) ও মালিক শাহ (দ্র.)-এর আমলে সর্বাধিক বিস্তৃত হয়। তখন সালজূক চাপের মুখে আমু দরিয়া-র অববাহিকায় খুত্তাল ও চাগানিয়ান প্রদেশ দুইটি স্বীয় অধিকারে রাখা ইব্রাহীমের পক্ষে রীতিমত অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তিনি ইতিপূর্বে গযনীর সুলতানের নিকট হইতে ঐ দুই প্রদেশ জয় করেন। দরবারী জাঁকজমক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত **তৎপুত্র শামসু'ল-মুল্ক** নাস্র (৪৬০-৭২/১০৬৮-৮০)-কে ৪৬৫/১০৭২-৩ সনে সালজূক আক্রমণ বরদাশ্ত করিতে হয়। পর বৎসর সামারকান্দের মালিক শাহের নিকট শান্তিচুক্তির জন্য আবেদন জানাইতে ও ট্রান্স-অক্সিয়ানায় সালজূক সার্বভৌমত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য হন। এই সময়ই পশ্চিমাঞ্চলীয় খানগোষ্ঠী ও দেশের 'উলামা'র মধ্যে উত্তেজনার মনোভাব দানা বাঁধে। ৪৮২/১০৮৯ সনে মুসলিম 'আলিম শ্রেণীর আহ্বানে আহ্মাদ খান ইব্ন খিদ্র-এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়া মালিক শাহ উযকেন্দ অধিকার করেন। ইহার স্বল্পকাল পরে ইসমাঈলীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার অভিযোগে 'উলামা'দল আহ্মাদের সিংহাসনচ্যুতি ও প্রাণদণ্ড কার্যকর করায়। সম্ভবত ইহার পরবর্তী খান্গণ সালজূকদের মনোনীত। ২য় মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান (৪৯৭-৫২৪/১১০২-৩০) সুলতান সানজার-এর ভাগিনেয় ও জামাতা—কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী কারাখানী দাবিদারদের কার্যকলাপের দরুন তাঁহার রাজত্বকাল ঝঞ্ঝাটসংকুল ছিল।

**মুহাম্মাদের পুত্র** ২য় মাহ্মূদ ও সানজার-এর ভাগিনেয় ৫২৬/১১৩২ হইতে ৫৩৬/১১৪১ সন পর্যন্ত প্রধান খানরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিই কারা খিতায় গোষ্ঠীর বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। পূর্বাঞ্চলীয় কারাখানীগণকে পরাভূত করিবার পর কারা খিতায়গণ পশ্চিমদিকে অভিযান অব্যাহত রাখে। ৫৩৬/১১৪১ সনের কাতওয়ান তৃণভূমির ভীষণ যুদ্ধে সান্জার ও তাঁহার কারাখানী আশ্রিত সামন্ত নৃপতির যোদ্ধাবাহিনী ভীষণভাবে পরাস্ত হয়। মাহ্মূদ খুরাসানে পালায়ন করিলে গূরখান ট্রান্স-অক্সানিয়া দখল করেন। তখন গূরখান কয়েকজন কারাখানী নৃপতিকে তাঁহার ক্রীড়নক সামন্ত নৃপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য এই সময়ে বুখারায় প্রকৃত শাসন ক্ষমতা সুন্নী ধর্মীয় নেতাগণের হস্তে অর্থাৎ বুরহান পরিবারের সুদূর (صدور)-গণের হস্তেই নিহিত ছিল [দ্র. O. Pritsak আল-ই বুরহান, Isl., ৩০খ, (১৯৫২ খৃ.), পৃ. ৮১-৯৬]। ইনি অ-কিতাবী ধর্মহীন অথচ উদার কারা খিতায়গণের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করেন। ২য় মাহ্মূদ খান ৫৫৯/১১৬৪ সনে মৃত্যু পর্যন্ত খুরাসানে অবস্থান করেন। গুযয সান্জারকে বন্দী করিলে সেখানকার নেতৃত্বহীন সাল্জূক সেনাদল তাঁহাকে খুরাসানের আমীররূপে সম্বর্ধনা জানায় (এই সময়ে সাল্জূক কবি আনওয়ারী, গুযয কর্তৃক খুরাসান বিধ্বস্ত করিয়া ইহার লুণ্ঠন সম্পর্কে মাহমূদকে সম্বোধন করিয়া রচিত "খুরাসানের অশ্রু" শীর্ষক একটি বিখ্যাত শোকগাথা প্রকাশ করেন) এবং ৫৫২/১১৫৭ সনে সান্জার ইনতিকাল করিলে মাহমূদ সেই দায়িত্ব পুনরায় গ্রহণ করেন।

মাহ্মূদ ও তাঁহার পুত্রগণ ইনতিকাল করিলে কারাখানীদের 'আলী-শাখার অবলুপ্তি ঘটে। তখন পশ্চিমাঞ্চলীয় খানরাজ্য হাসানী পরিবার অর্থাৎ 'আলী তিগিন-এর বংশধরদের অধিকারে চলিয়া যায়। এই হাসানী খানগণও তাঁহাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় কারলুক সেনাদল ও উপজাতিগুলির অবাধ্যতার দরুন সৃষ্ট অত্যধিক অভ্যন্তরীণ গোলযোগে ব্যতিব্যস্ত থাকে। আত্সীয গোষ্ঠীর প্রগতিশীল ও উচ্চাভিলাষী খাওয়ারিয্ম-শাহ পরিবারের কাছে বৈদেশিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের খ্যাতি ম্লান হইয়া যায়। কারাখানী বংশের শেষ শাসক 'উছমান খান ইব্ন ইবরাহীম বুখারী ও সামারকান্দের চতুর্দিকস্থ ক্ষুদ্র একটি রাজ্য শাসন করিতেন। শক্তিশালী প্রতিবেশী রাজ্যগুলির চাপে তিনি খাওয়ারিয্ম-শাহা আলা'উদ-দীন মুহাম্মাদ ও কারা খিতায় গূর খান—এই দুইজনের মধ্যে কাহাকে সমর্থন করিবেন সে সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কারণ তিনি উভয় গোত্রের রাজকুমারীদের পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ৬০৭/১২১০-১১ সনে সামারকান্দে খাওয়ারিযম বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটায় শাহ নগরীটি জয় করেন এবং 'উছমানকে হত্যা করেন। এইরূপে ট্রান্স-অক্সিয়ানায় কারাখানী শাসনের অবসান ঘটে।

ফার্গানা রাজ্যে কারাখানী নৃপতিগণ অবশ্য আরও কয়েক বৎসর কোনমতে অবস্থান করেন। ৫৩৬/১১৪১ সনে কারা খিতায় আক্রমণের পর উয্কেন্দ-কে কেন্দ্র করিয়া সম্ভবত এইখানে একটি ভিন্ন শাখায় অভ্যুদয় ঘটে। ৬০৮/১২১১-১২ সনে ঐ খানগোষ্ঠীর একজন নৃপতি আর্সলান কারা খিতায় গোত্রের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া উদীয়মান রাজশক্তি চেংগীয খানকে স্বীকৃতি দেন। মোঙ্গল খানদের রাজত্বের প্রথমদিকে দৃশ্যত এই বংশোদ্ভূত শাসকগণ ফারগানার গভর্নররূপে অটল থাকিয়া যায়; তবে প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই।

৩। **সংস্কৃতি ঃ** সালজূক সুলতানদের ন্যায় কারাখানী খানগণ ইরানী-ইসলামী সংক্রান্ত ঐতিহ্য ক্রমে ক্রমে আত্মস্থ করে। আনুষ্ঠানিক উৎসবে ব্যবহৃত খানদের লাল ছত্র (parasol)-এর কথা কুতাদগু বিলিগ (Kutadghu bilig)-এ উল্লিখিত হইয়াছে। ইব্রাহীম তাম্গাচ খান ও শামসু'ল-মূলক নাস্র-এর ন্যায় পরহেযগার ও ন্যায়পরায়ণ শাসকগণ Mirrors for Princes= 'নৃপতিদের দর্পণ"-এ লিপিবদ্ধ মুসলিম শাসকগণের জন্য নির্ধারিত আদর্শ মানিয়া চলিতেন। সরকারী ইমারত নির্মাণে শামসু'ল-মুলুক বিশেষ প্রচেষ্টা চালান। তিনি যাত্রীদলের জন্য দুইটি প্রসিদ্ধ পান্থশালা নির্মাণ করেন (উভয়টি রাজকীয় নির্মাতার নামে রিবাত-ই মালিক নামে অভিহিত), বুখারা'র জুমু'আ মসজিদ পুনর্নির্মাণ করেন এবং নগরীর নিকটে শাম্'আবাদ প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপন করেন্। ২য় মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মানও একজন মহান নির্মাতা ছিলেন। তিনি বুখারা-র দুর্গটির পুনর্নির্মাণ করেন। খান গোত্রীয় নৃপতিগণ 'দারু'ল-ইস্লাম'-এর সীমান্ত রক্ষার ঐতিহ্যগত কর্তব্য পালন করিতেন। ২য় মুহাম্মাদ কর্তৃক পার্বত্য তৃণভূমি (Steppes) অঞ্চলের, সম্ভবত কীপচাকদের বিরুদ্ধে অভিযানের কথা আমরা শুনিতে পাই। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে কিপচাক জাতির তৃণভূমি অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ কাল। সায়রাম-এর সূফী শায়খ আহমাদ য়াসাবী (দ্র.) ও তিনি যে য়াসাবিয়্যা তারীকা প্রতিষ্ঠা করেন, তুর্কিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশে ও পার্শ্ববর্তী তৃণভূমি অঞ্চলগুলিতে উহার বিশেষ প্রভাব বর্তমান ছিল। এরূপ প্রভাবের আংশিক কারণ সম্ভবত এই যে, কতিপয় প্রাক-ইসলামী ধর্মীয় রীতিনীতি উক্ত তারীকায় অভিযোজিত (adapt) করা হয় [তু. Kopruluzade Mehmed Fuad, Turk edebiyatinda ilk mutasavviflar, সংক্ষিপ্ত ফরাসী অনু. L. Bouvat in RMM, xliii (১৯২১ খৃ.), পৃ. ২৩৯ প. এবং ঐ লেখক, Influence du chamanisme turco-mongol sur les ordres mystiques musulmans, ইস্তাম্বুল ১৯২৯ খৃ.]।

উল্লিখিত হইয়াছে যে, কারাখানীগণ আগ্রহের সঙ্গে হানাফী ফিক্হ গ্রহণ করেন। ফলে ট্রান্স-অক্সিয়ানা হানাফী মাযহাব ও মাতুরীদী কালাম-এর একটি শক্তিশালী ঘাঁটিরূপে গড়িয়া উঠে, যেমন সেই অঞ্চলের ফিক্হ ও কালাম সম্পর্কীয় সাহিত্যের প্রাচুর্য হইতে প্রমাণিত হয়। খানদের প্রত্যক্ষ উৎসাহ ইহাতে কতটা সক্রিয় ছিল তাহা অনিশ্চিত। তবে তাঁহাদের প্রেরণা সম্ভবত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। সামারকান্দের বাবু'ল-জাদীদ এলাকায় একটি মাদ্রাসার জন্য ওয়াক্ফ (একটি মসজিদ ও খান-এর নিজের কবর যাহার অন্তর্ভুক্ত)-এর প্রতিষ্ঠাতা ইব্রাহীম তাসগাচ খান ওয়াক্ফ দলীলে শর্ত রাখেন যে, মাদ্রাসার অধ্যাপক ও ছাত্রগণ সকলকেই হানাফী মাযহাবভুক্ত হইতে হইবে। ওয়াক্ফটির প্রতিষ্ঠার বৎসর ৪৫৮/১০৬৬ সন বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। নিজামু'ল-মুল্ক ও অন্যান্য সালজূক অভিজাত সম্প্রদায় মাদ্রাসা নির্মাণে যে তরঙ্গের সূচনা করিয়াছিল তাহার প্রভাব কারাখানী রাজ্যে পৌঁছিয়াছিল। ৪৩৬/১০৪৪-৫ সনে ইব্রাহীমের খান রাজ্যে ইসমা'ঈলীদের তৎপরতা দমন দ্বারা তাঁহার রক্ষণশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ সময়ে ফাতিমী প্রচারকগণ স্থানীয় লোকজনের অনেককেই তাঁহাদের কায়রোস্থ খলীফা আল-মুস্তানসিরের আনুগত্য স্বীকার করিতে সম্মত করাইয়াছিলেন। কিন্তু ইসমা'ঈলীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলিয়া আহ্মাদ ইব্ন খিদর খানের বিরুদ্ধে ৪৮৮/১০৯৫ সনে যে অভিযোগ করা হয় তাহা খানগণের বিবেক বর্জিত বিরোধীদের অজুহাতমাত্র বলিয়াই মনে হয় এবং ইহা ট্রান্স-অক্সিয়ানায় ইসমা'ঈলীগণের সাধারণ অনুপ্রবেশের প্রতিফলন নহে।

খান বংশীয় নৃপতিগণ তাঁহাদের দরবারে বিদ্বান ও সাহিত্যিকদের চক্রকে উৎসাহিত করিতেন। "অত্যন্ত অসভ্য ও অজ্ঞদের বংশ" এই বলিয়া উহাদের সম্পর্কে Grenard-এর মন্তব্য অত্যন্ত ন্যায়বিরুদ্ধ। নিজামী 'আরূদী সামারকান্দী (চাহার মাকালা, সম্পা. Browne, পৃ. ২৮, ৪৬, সংশোধিত অনু. পৃ. ৩০, ৫২; তু. Browne, ২খ, ৩৩৫-৬) তেরজন কবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন যাঁহারা আল-ই খাকান-এর প্রশংসা করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া তিনি বদান্য পৃষ্ঠপোষক হিসাবে খিদ্র খান ইব্ন ইব্রাহীম (৪৭২-২/১০৮০-১)-এর প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বকালে বুখারার 'আম'আক-রাজ কবি বা আমীরু'শ-শু'আরা' ও সামারকান্দের রাশীদী কবি প্রধান বা সায়্যিদু'শ-শু'আরা' ছিলেন (অধিকন্তু লুবাবু'ল-আল্বাব পুস্তকের ট্রান্স-অক্সিনিয়ার কবিদের সম্পর্কে 'আওফীর পরিচ্ছেদ দ্র. সম্পা. এস. নাফীসী, তেহ্রান ১৩৩৫/১৯৫৬, পৃ. ৩৭৫-৯৮ ও দাওলাত শাহ, তাযকিরাতু'শ-শু'আরা', সম্পা. এম. 'আব্বাসী, তেহরান ১৩৩৭/১৯৫৮, পৃ. ৭৩-৬, 'আম'আক সম্পর্কে)।

এই সব দ্বারা কারাখানীগণ তাঁহাদের প্রবল তুর্কী চরিত্র বজায় রাখিয়াছিলেন। তুর্কী-সংস্কৃতি-সচেতনা সৃষ্টি, বিশেষত প্রথম তুর্কী-ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁহাদের যুগ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে সেমিরেচয়ী ও কাশগাড়িয়া অঞ্চলদ্বয়ে তুর্কী প্রাধান্য প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তাহাদের পরিবর্তে ট্রান্স-অক্সিয়ানায় তখনও পারস্য সংস্কৃতির স্থান ছিল গৌরবমণ্ডিত। Uyghurs, এমন কি কিয়ৎ পরিমাণে সুদূর চীনদেশীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব পূর্ব কারাখানী এই সকল প্রদেশে প্রবল ছিল। মুসলিম ভূগোলবিদগণ কাশগড় ও খোতান সমেত তামির অববাহিকা অঞ্চল চীনা সামরিক অভিযানের ক্ষেত্র ছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলকে প্রায়শই চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই যে, খোতান অধিকার করিয়া সেইখানে ইসলাম প্রচারের পর য়ূসুফ কাদীর খান 'মালিকু'ল-মাশ্রিক ওয়া'স-সীন" (প্রাচ্য ও চীনের অধিপতি) খেতাব গ্রহণ করেন।

তাঁহার দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি ইব্রাহীম তাম্গাচ খানের খোদিত মুদ্রাতে ৪৫১/১০৫১-এর পর হইতে এবং ৪৫৮/১০৬৬ সনের খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি হাসপাতালের ওয়াক্ফ-এর দলীলে (আলামা বা valiodatio) এই উপাধি দেখিতে পাওয়া যায় [দ্র. M. Khadr in JA, (১৯৬৭ খৃ.) ৩২০, ৩২৪ দ্র. কারাখানীদের উপাধি সংক্রান্ত কাহিনীগুলি এবং তাঁহাদের প্রতি গযনীর মাহমূদের ঈর্ষা নিজামু'ল-মুল্ক-এর সিয়াসাতনামায় উল্লিখিত ৪০তম অধ্যায়, Oriens-এ Bosworth-এর আলোচনা, ১৫শ খণ্ড (১৯৬২ খৃ.), ২২৫-৬]।

কারাখানী মুদ্রালিপিতে আরও দেখা যায় যে, উহাতে 'আরবী বর্ণমালার পাশাপাশি Uyghurs বর্ণমালাও ব্যবহৃত হইয়াছে। য়ূসুফ খান হাজিব (দ্র.)-এর "কুতাদ্গু বিলিগ" গ্রন্থখানির প্রণয়ন কার্য কাশগড়ে ৪৬২/১০৬৯-৭০ সনে সমাপ্ত করিয়া উহাকে তৎকালীন শাসক খান-এর নামে উৎসর্গ করেন। ইহার চারি বৎসর পর মাহ্মূদ কাশগাড়ী (দ্র.) তাঁহার 'দীওয়ানু'ল-লুগাতি'ত-তুর্ক' গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত করেন। তিনি

উহাতে স্পষ্টত দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, ভাষাগত ঐশ্বর্যে আরবী ভাষার সঙ্গে তুর্কী ভাষা তুলনীয়।

আহ্‌মাদ ইব্‌ন মাহ্‌মূদ রচিত 'আতাবাতু'ল-হাকা'ইক' গ্রন্থে কারাখানী যুগের শেষাংশে প্রথম যুগের তুর্কী কবিতার নীতিমূলক (didactie) বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা হয়। এই গ্রন্থের অস্তিত্ব ইহাই প্রমাণ করে যে, এই বিষয়ে কুতাদগু' বিলিগ' পুস্তকখানি কোনক্রমেই বিরল ব্যাপার ছিল না। শায়খ আহ্‌মাদ য়াসাবী (মৃ. ৫৬২/১১৬৬) দীওয়ান-ই হিক্‌মাত নামে স্থানীয় তুর্কী ভাষায় রচিত একখানি কবিতা সংকলন রাখিয়া যান, যদিও বর্তমানে উহার নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়।

৪। **উপসংহার** ঃ সংশ্লিষ্ট সূত্রাদির সীমাবদ্ধতার দরুন কারাখানীদের শাসনামলের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের এবং ট্রান্স-অক্সিয়ানা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে তাহাদের রাজত্বের ফলে সাধিত পরিবর্তনের মূল্যায়ন দুরূহ। আমরা সেখানে সাল্‌জূকদের মতই একটি মুসলিম তুর্কী শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই; তবে তাহা গাযনাবীদের অনুরূপ তুর্কী ক্রীতদাস সেনাপতিদের দ্বারা সংঘটিত না হইয়া বরং উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ ও তাহাদের দলবল দ্বারাই হইয়াছিল। পূর্ববর্তী সামানী বংশের শাসকগণের তুলনায় কারাখানীগণ ট্রান্স-অক্সিয়ানায় প্রশাসন যন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ ও সরকারী কর্তৃত্বের বিভক্তিকরণ ব্যবস্থা কার্যকর করে। বুখারার জনৈক ইতিহাস অনুলেখক নারশাখী বলিয়াছেন যে, সামানী গোত্রকে অধিকারচ্যুতকারী কারাখানীগণ সর্বত্রই করভার হালকা করেন। সম্ভবত 'দিহ্‌কান'ব স্থানীয় ভূস্বামীশ্রেণী পুনরায় সীমিত শাসন ক্ষমতা ভোগ করে। খানগণ তাঁহাদের চিজিল, য়াগমা প্রভৃতি কারলুক অনুসারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিত। একথা ঠিক যে, শাম্‌সু'ল-মুল্‌ক নাস্‌র-এর আমলে খানগণ গ্রীষ্ম মৌসুমে যাযাবর জীবন যাপন করিত, কেবল কঠোর তৃণাঞ্চলীয় শীত মৌসুমেই তাহারা রাজধানীতে অবস্থান করিত। দুর্ভাগ্যবশত আমরা তাহাদের কৃষিজমি ব্যবহার ও ভূমি প্রশাসন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই যদিও মেষপালক যাযাবরদের আগমনে সম্ভবত কিছু পরিবর্তন হইয়া থাকিবে। শাম্‌সু'ল-মুল্‌ক নাস্‌র-এর আমলে কতিপয় গুরুক্‌স বা শিকারভূমি সরকারের জন্য সংরক্ষণের উল্লেখ (নারশাখীর অনুলেখক, অনু. R. Frye, The history of Bukhara, Cambridge Mass. ১৯৫৪ খৃ., ২৯, ১২৫) মেষচারণবৃত্তির কিঞ্চিৎ সম্প্রসারণের নির্দেশ করে।

কারাখানী রাজ্যগুলি সাধারণ অর্থনীতির ধারা অনুসরণ করিয়াছিল, যাহার কারণ অস্পষ্ট। ফলে স্বর্ণ মুদ্রা রৌপ্য মুদ্রার স্থান গ্রহণের প্রবণতা দেখা দেয়। তৎসত্ত্বেও ট্রান্স-অক্সিয়ানায় দিরহাম মুদ্রামানরূপে প্রচলিত থাকে এবং ৫ম/১১শ শতকের শেষ ও ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের প্রথমাংশে মু'আয়্যাদিয়া 'আদ্‌লিয়্যা ও কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট গিতরীফিয়্যা একই সঙ্গে প্রচলিত ছিল। তবে এই দিরহামগুলি সরকারী দীনারের তুলনায় নিকৃষ্ট মানের ছিল এবং ঐ সময় মুদ্রা ব্যবস্থা স্পষ্টতই আংশিক স্থিতিহীন ছিল। ইব্‌রাহীম তাম্‌গাচ খানের উল্লিখিত মাদ্‌রাসার ওয়াক্‌ফ দলীল হইতে প্রতীয়মান হয় যে, দীনারের সরকারী মূল্যমান দিরহামের স্থলে ৪৭ দিরহাম মু'আয়্যাদিয়্যা 'আদ্‌লিয়্যা ছিল [তু. Cahen, in JA (১৯৬৭ খৃ.), পৃ. ৩০৯-১০ এবং নার্‌শাখী-র অনুলেখক, অনু. Frye, ৩৬]।

খান বংশীয়গণ তাঁহাদের উপজাতীয় সেনাদলের সঙ্গে নিজদেরকে অভিন্ন গণ্য করিলেও ট্রান্স-অক্সিয়ানা ও ফারগানার ন্যায় সমৃদ্ধ ও উর্বর অঞ্চলের মুসলিম নৃপতির মর্যাদা তাহাদেরকে অনিবার্যভাবে সাধারণ উপজাতীয় স্তর হইতে উন্নীত করিতে থাকে। সাল্‌জূক শাসিত বিশাল রাজ্যে যেমন, এইখানেও তেমন সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ৬ষ্ঠ/১২শ শতকে খানগণ অবিরাম তাঁহাদের সামরিক সমর্থন কারলুক উপজাতীয়দের সহিত সংঘর্ষের সম্মুখীন হন, যাহার ফল কখনও কখনও বিপজ্জনক হইত। ৫৩৬/১১৪১ সনে কারলুকদের বিরুদ্ধে সানজার-এর নিকট ২য় মাহ্‌মূদ যে আবেদন জানান, তাহাই কারলুকগণকে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে সাহায্যার্থে কারা খিতায়-কে আমন্ত্রণ জানাইতে সংকল্পবদ্ধ করে। খান বংশীয়গণ কিভাবে বুখারা ও সামারকান্দের ধর্মীয় নেতৃবর্গ ও একইভাবে গোঁড়া 'উলামা' ও 'আলীপন্থীদের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইলেন তাহার সঠিক বিবরণ জানা যায় নাই, অথচ এই পরিস্থিতিই উত্তেজনা সৃষ্টির কারণ হইয়াছিল এবং কখনও কখনও তাহা রক্তপাত ও মৃত্যুদণ্ডে পর্যবসিত হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ক্ষুব্ধ হইয়া রাজশক্তির বিরুদ্ধে যে সামরিক অভিযানে যোগ দিতে প্রস্তুত ছিল, উহাই এই পরিস্থিতির ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হয়। সামানী যুগের পরিস্থিতির সহিত এই স্থানের পরিস্থিতির কোনও পার্থক্য ছিল না। আর ইহা ট্রান্স-অক্সিয়ানায় শাসন ক্ষমতা ও সামাজিক অবস্থার অপরিহার্য ধারাবাহিকতা বজায় থাকার একটি দৃষ্টান্ত। এই সকল উত্তেজনার চাপ ও শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা বিভক্তির কারণে কারা খিতায় ও খাওয়ারাযম-শাহ্ প্রভৃতির ন্যায় প্রবল প্রতিপক্ষের প্রতিরোধের জন্য কারাখানীগণ প্রস্তুত ছিল না।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ O. Pritsak তাঁহার Die Karachaniden শীর্ষক প্রবন্ধে একটি বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জী দিয়াছেন নীচে (দ্র.), পৃ. ৬৩-৮। কারলুক জাতির ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার ইতিহাস মধ্যএশিয়ার চীনা, উয়গুর, ওরখন, তুর্কী, বায়যান্টাইন প্রভৃতি জাতির বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রাদি হইতে একত্র করা যাইতে পারে। মুসলিম ইতিহাস রচয়িতাদের মতে কারাখানীরা কেবল মুসলিম জগতের সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দা এবং কেবল বৃহত্তর মুসলিম জগতের পূর্বাংশে অভিযান পরিচালনার কারণেই তাঁহারা খান বংশীয়গণের নাম উল্লেখ করিতে আগ্রহ প্রদর্শন করে। যাহা হউক, 'উতবী, গারদীযী, বায়হাকী, নারশাখী-র সমস্ত অনুলেখক, নিজা-মু'ল-মুল্‌ক, জামাল কারশী, নাসাবী, জুওয়ায়নী, ইবনু'ল-আছীর প্রমুখ গ্রন্থাকার উহা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। য়ূসুফ খাস্‌স হাজিব, মাহমূদ কাশগাড়ী, আল-কাতিবু'স-সামারকান্দী প্রভৃতি লেখকের গ্রন্থাবলীতে কারাখানী যুগের কৃষ্টি সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। অধিকন্তু নিজামী, 'আরূদী ও 'আওফী লিখিত কাহিনীগুলিতেও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কিত পরোক্ষ সাহিত্যের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ (১) F. Sachau, Zur Geschichte und Chronologie von Kwarazm, in SBAk. Wien, ৭৪খ. (১৮৭৩ খৃ.), ৩১৯-৩০; (২) Sir H. Howorth, The northern frontiers of China, ৯খ., The Muhammadan Turks of Turkestan from the tenth to the thirteenth century, in JRAS (১৮৯৮ খৃ.), ৪৬৭-৫০২; (৩) F. Grenard, La legende de Satok Boghra Khan et l'histoire, in JA, Ser. 9. xv (১৯০০ খৃ.), ৫-৭৯; (৪) Barthold, Turkestan; (৫) ঐ লেখক, Zwolf Vorlesungen uber die Geschichte der Turken Mittelasiens, repr. Hildesheim ১৯৬২ খৃ., ফরাসী অনু. Histoire des Turcs

d'Asie Centrale, প্যারিস ১৯৪৫ খৃ.; (৬) ঐ লেখক, A short history of Turkestan and History of the Semirechye, in Four studies on the history of Central Asia, ১খ, লাইডেন ১৯৫৬ খৃ.; (৭) R. Vasmer, Zur Munzkunde der Qarahaniden, in MSOS As. ৩৩খ. (১৯৩০ খৃ.) ৮৩-১০৪; (৮) O. Pritsak, Karachanidische Streitfragen, 1-4, in Oriens, iii (১৯৫০ খৃ.), ২০৯-২৮; (৯) ঐ লেখক, Von den Karluk zu den Karachaniden, in ZDMG, ci (১৯৫১ খৃ.), ২৭০-৩০০; (১০) ঐ লেখক, Die Karachaniden in Isl., ৩১ খ., (১৯৫৩-৪), ১৭৬৮ তুর্কী পাঠ in IA Ast. "Karahanlilar"; (১১) A. Z. V. Togan, Zentral-asiatische Turkische Literaturen. II Die Islamische Zeit, in Handbuch der Orientalistik Abt. 1, Bd. 5.i Turkologie, লাইডেন, ১৯৬৩ খৃ., ২২৯-৩৩; (১২) A. Caferoglu, La litterature turque de l'poque des Karakhanides, in Fundamenta philologiae turcicae, ২খ., Wiesbaden ১৯৬৪ খৃ., ২৬৭-৭৫; (১৩) C. E. Bosworth, The Islamic Dynasties, a chronological nad genealogical handbook, Edinburgh ১৯৬৭ খৃ., ১১১-১৪ খৃ.; (১৪) ঐ লেখক, Cambridge history of Iran, ৫খ., কেমব্রিজ ১৯৬৮ খৃ.; (১৫) Emel Esin, Turk san'at tarihinde kara-hanli devrinin mevkii, in VI, Turk tarih kongresinin ildirileri, আনকারা ১৯৬৭ খৃ., ১০০-৩০; (১৬) M. Khadr and Cl. Cahen, Deux actes de waqf d'un Qarahanide d' Asie Centrale, in JA (১৯৬৭ খৃ.), ৩০৫-৩৪।

C. E. Bosworth (E.I. ²)/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

**ইলেরি জালাল নূরী** (الری جلال نوری) ঃ আধুনিক তুর্কী ভাষায় জালাল নূরী ইলেরি একজন তুর্কী আধুনিকতাবাদী লেখক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজ্ঞ ও সাংবাদিক, ১৮৭৭-১৯৩৮ খৃ.। তিনি গ্যালিপোলীতে (Gallipoli) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হেলওয়াজীযাদে মুস্তাফা নূরী ছিলেন ক্রীটের অধিবাসী। তিনি বিভিন্ন প্রদেশে গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন এবং ১৯০৮ খৃ. সিনেটের সদস্য পদ লাভ করেন। তাঁহার মাতা প্রিযরিনের 'আবিদীন পাশা (দিনো পদবীধারী, ১৮৪৩-১৯০৮ খৃ.)-এর কন্যা ছিলেন। 'আবিদীন পাশা ২য় 'আবদু'ল-হামীদের অধীনে একজন গভর্নর ও উযীর ছিলেন। তিনি মাওলানা রূমীর মাছনাবীর একখানা প্রসিদ্ধ ভাষ্যের রচয়িতা। তাঁহার এক ভাই সুবহী নূরী ইলেরি একজন সমাজতান্ত্রিক লেখক ও সাংবাদিক ছিলেন এবং অন্য এক ভাই সেদাদ নূরী, ছিলেন রঙ্গিন চিত্রের ও ব্যঙ্গ চিত্রের চিত্রকর (Painter & Cartoonist)।

তিনি গালাতাসারায় লীসী (Galatasaray lycee) ও ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। সেইখানে তিনি আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। জালাল নূরী ফরাসী ভাষায় এমন দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন যে, সেই ভাষায় তিনি কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এইগুলির মধ্যে ছিল সুলতান 'আবদু'ল-হামীদের শাসনামলে ইস্তাম্বুলের জীবন সম্বন্ধে Cauchemar নামে একখানা উপন্যাস। তিনি ইংরেজী ভাষাও শিখিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা তাঁহার পরিবারের উপর অনেকাংশে ঋণী। এই পরিবারের মধ্যে ছিলেন তাঁহার চাচা সিররী পাশা ও তাঁহার স্ত্রী লায়লা সায (১৮৫০-১৯৩৬ খৃ.), যিনি ছিলেন একজন মহিলা কবি, সুরকার এবং উনিশ শতকের হারেম জীবনের অনেক মূল্যবান স্মৃতিকথা রচয়িতা।

জালাল নূরী বহুবার য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং 'কুতুব মুসাহাবেলেরি ও শিমাল খাতীরালীরী নামক দুইখানা গ্রন্থে তাঁহার কিছু অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন (নিম্নে দেখুন)। তিনি একজন সাংবাদিক ও স্বাধীনচেতা লেখক হওয়ার জন্য অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার আইন ব্যবসা ত্যাগ করিলেন। তিনি অনেক সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে অবদান রাখিয়াছেন (যেইগুলির কোন কোনটির তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন), বিশেষ করিয়া ইক্দাম, 'আতী, ইলেরী, ইজ্তিহাদ, ইদিবিয়্যাত-ই 'উমূমিয়্যে মেজমূ'আসী, ছেরবেত-ই ফুনূন, তুর্ক য়ুরদু, Le Courrier d'orient ও Le Jeune Turc. সর্বশেষে উল্লিখিত ফরাসী ভাষার সংবাদপত্রগুলিতে তিনি পনর শতেরও বেশী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, উহাদের মধ্যে অনেক কয়টি ১৯০৯ সালের ১৩ এপ্রিল-এর বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ের অত্যন্ত মূল্যবান প্রমাণিক দলীল (৩১ মার্ট, ওয়াক'আসী)।

জালাল নূরী সর্বশেষ তুর্কী সংসদে গেলিবোলু (Gelibolu)-এর প্রতিনিধিত্ব করেন এবং প্রধান জাতীয় পরিষদে চারিবার নির্বাচিত হইয়াছিলেন। আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় কৃষ্টির সহিত তাঁহার পরিচিতি তাঁহাকে আঙ্কারায় নূতন জাতীয়তাবাদী সরকারের অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত উপদেষ্টায় পরিণত করিয়াছিল। তিনি একজন সৎ, অকপট ও স্পষ্টবাদী লেখক ছিলেন এবং তাঁহার নিজস্ব নীতির প্রতি এবং উদার নীতি, সৎ সরকারের পক্ষে প্রচারণার ক্ষেত্রে সর্বদা অটল ছিলেন। তাঁহার পত্রিকা ইস্তাম্বুলের দৈনিক 'ইলেরি'-তে একনায়কতান্ত্রিক শাসন ও উহার ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁহার তীব্র সমালোচনা এবং তাঁহার যুক্তি যে একদলীয়-পদ্ধতি গণতন্ত্রের পরিপন্থী—এইগুলি সংবাদপত্রে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি করিয়াছিল। সরকারের অনেক চরমপন্থী সমর্থক, বিশেষ করিয়া আগাওগলু আহমাদ ও য়ূনুস নাদী তাঁহার সরকারের বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে তীব্রভাবে ইলেরিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিলিজ 'আলী নামক একজন সংসদ সদস্য, যাঁহার নাম যে সকল প্রতিনিধি ও কর্মচারী তাহাদের প্রভাব অপব্যবহারের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিল তাহাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তিনি জালাল নূরীর অফিসে যাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। [এই সমস্ত বিতর্কের বিস্তারিত বিবরণ ও পরবর্তী ঘটনাবলীর জন্য দেখুন সংবাদপত্র—ইলেরি, হাকিমিয়্যেত-ই মিল্লিয়্যে জুমহুরিয়্যেত ও সোন তেলগ্রাফ, জুন হইতে আগস্ট ১৩৪০ (আর্থিক)/১৯২৪]। জালাল নূরীর সাংবাদিক ভাই সুব্হী নূরী পরের দিন ইলেরীতে (৩১ জুলাই, ১৯২৪ খৃ.) একটি কঠোর প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কিন্তু জালাল নূরী নিজে তাহার পর হইতে উক্ত পত্রিকায় শুধু বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে লিখিতেন এবং বিতর্ক এড়াইয়া চলিতেন। তিনি ২ নভেম্বর, ১৯৩৮ খৃ. ইস্তাম্বুলে ইনতিকাল করেন।

জালাল নূরী প্রায় ত্রিশটি গ্রন্থের এবং হাজার হাজার প্রবন্ধের রচয়িতা, যেইগুলি হইতে কিছু সংখ্যক গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হইয়াছে। ১৯০৮ খৃ.

পরবর্তী তিনটি প্রধান দলের—তুর্কীপন্থী, ইসলামপন্থী ও পাশ্চাত্যবাদী, ইহাদের কোনটির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার না করিয়া তিনি শেষোক্ত দুইটির মধ্যে তাঁহার নিজস্ব রীতিতে আপোস করিয়াছেন। তিনি তৎকালীন বিখ্যাত লেখকদের সহিত বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম ও বিচার সম্বন্ধীয় ও ভাষা সম্বন্ধে বিচার্য বিষয়ের বিতর্ক পরিচালনা করিতেন এবং চরম জাতীয়তাবাদী, উগ্র পাশ্চাত্যবাদী ও গোঁড়া ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে সমানভাবে প্রতিবাদ করিতেন (দ্র. গোকাল্প, জাওদাত, মুহাম্মাদ 'আকিফ, প্যান ইসলামিজম, তুরান)।

তিনি নিজে একজন মধ্যপন্থী সংস্কারক ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি সুসম্বদ্ধ চিন্তাশীল ছিলেন না, সুতরাং বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ও অভিভাষণ তাঁহার অধিকাংশ লেখাতে প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত হইয়াছে বিষয়-শিরোনাম উহার যাহাই হউক না কেন (১৯০৮-২৩ খৃ.)। বিতর্কিত বিষয়সমূহের উপর তাঁহার রচনার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তুগুলি নিম্নরূপ ঃ

**আইন সংক্রান্ত বিষয় ঃ** এই ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন ইহাই ছিল তাঁহার রচনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু। তিনি মনে করিতেন কোন একটি দেশের আইন ব্যবস্থায় ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ, চরিত্র, বৈশিষ্ট্যসমূহ, জাতীয় জীবনের অবস্থা ও সমসাময়িক যুগের চাহিদা বিবেচনায় রাখা একান্ত কর্তব্য। মিদহাত পাশার শাসনতন্ত্র, জাওদাত পাশার মেজেল্লে এবং প্রশাসন, ব্যবহারশাস্ত্র, বিচার ব্যবস্থা, সম্পত্তি, বেসামরিক কর্মসংস্থান ইত্যাদি সংক্রান্ত অনেক আইন যেহেতু এই চাহিদাগুলি পূরণ করে না সেইহেতু ইহারা যথেষ্ট নয়। তাহা ছাড়া আইনগুলি অপরিবর্তনীয় নয়, বরং ঐগুলি সময় সময় পুনর্মূল্যায়ন পূর্বক সময়ের পরিবর্তনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সংশোধন করা প্রয়োজন।

**নারী মুক্তি ঃ** তুর্কী সমাজে অনেক সামাজিক অনাচারের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল নারীদের অবমাননাকর অবস্থা। বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত এবং নারীদেরকে সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। বিবাহ, তালাক ও সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে আইনের আধুনিকীকরণ প্রয়োজন এবং ইহাও হইবে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী। নারী ও বিবাহের ব্যাপারে কয়েক শতাব্দী যাবত ইসলামের বিধানসমূহের অপব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই বিষয়ে জালাল নূরীর ধারণা অনেকের কাছেই "অতি প্রগতিশীল" বলিয়া মনে হইয়াছে।

**'উছমানী তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহঃ** তুর্কী সাম্রাজ্যের অনগ্রসরতার প্রধান প্রধান কারণ হিসাবে বলা হয় যে, সমুদ্র সম্বন্ধীয় আবিষ্কার রেনেসাঁ (Renaissance) ও মুদ্রণের সুবিধা গ্রহণে তাহাদের কোন অংশ ছিল না।

**বর্ণমালা ও ভাষা সংস্কার ঃ** 'আরবী বর্ণমালা তুর্কী ভাষার অনুকূল না হওয়ায় রোমান অক্ষরের উপর ভিত্তি করিয়া একটি সংস্কারকৃত বর্ণমালা প্রয়োজন। যাহা হউক, যতদূর পর্যন্ত ভাষা স্বয়ং সংশ্লিষ্ট, জালাল নূরীর বক্তব্য রক্ষণশীল। ইংরেজী ভাষায় ল্যাটিন ও ফরাসী শব্দগুলি যেমন স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় তেমনিভাবে তুর্কী ভাষায় ফারসী-আরবী উপাদানগুলিও স্বাভাবিক ও দরকারী বলিয়া তিনি মনে করিতেন, তবুও পরবর্তীতে প্রজাতান্ত্রিক আমলে সরলীকরণের সমর্থকদের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রচারণা ছিল কোমল।

**ইসলামের সংস্কার ঃ** ইসলাম স্বয়ং কখনও প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক নয়। কিন্তু ইহাকে ক্রমাগতভাবে অপব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং গোঁড়া ভক্ত ও সুবিধাবাদীরা নিজেদের স্বার্থ সাধনে ব্যবহার করিয়াছে। ইসলামে বিশেষ করিয়া মুসলিম আইনে একটি সংস্কার প্রয়োজন। মুসলিম বিশ্বের ঐক্যই ইহার আদর্শ হওয়া উচিত এবং ইহা বিভিন্ন মুসলিম জাতির জাতীয়তাবাদী আদর্শের স্থলাভিষিক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তথাপি আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানে পরিচালিত রাষ্ট্রের আদর্শ যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অস্বীকার করিয়া কোথাও যাওয়ার উপায় নাই। কিন্তু দুই প্রকারের সভ্যতা আছে ঃ যান্ত্রিক সভ্যতা ও প্রকৃত সভ্যতা। তুর্কীদের জাপানীদের মত প্রথমটি গ্রহণ করা প্রয়োজন, কিন্তু নিজেদের মুসলিম তুর্কী সভ্যতাকে সংস্কারের মাধ্যমে প্রয়োজনমত উন্নত করিয়া সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। (ইহা Gokalp-এর পরবর্তী রচনা—'সভ্যতা' ও 'কৃষ্টির' মধ্যে পৃথকীকরণের পূর্বাভাষ দেয়)।

জালাল নূরীর অধিকাংশ ধ্যান-ধারণার সারসংক্ষেপ তাঁহার স্মারকলিপি, যাহা তিনি 'ঐক্য ও প্রগতি' (Union and progress) কমিটির ১৯১১ খৃ. সালোনিকা সম্মেলনে পেশ করিয়াছিলেন। (ইহাতে তুর্কী বৈদেশিক নীতির উপর তাঁহার মতামতও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে) এবং তাঁহার রচিত "তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস"-এ পাওয়া যাইবে (নিম্নে দেখুন)।

তাঁহার প্রধান রচনাবলী হইতেছে ঃ (১) ১৩২৭ হি. Senesinde Setanikde mun`ookid Ittihad ve terakki Kongresine takdim olunan mukktiradir, ইস্তাম্বুল ১৩২৭/১৯১১; (২) কেন্দী নোকতা-ই নাযারীমদান হুকুক-ই দুভেল ১৩২৭/১৯১১; (৩) মুকাদ্দিরাত-ই তা'রীখিয়্যে, ইস্তাম্বুল ১৩৩০/১৯১৪; (৪) শিমাল খাতীরালারী, ইস্তাম্বুল ১৩৩০/১৯১৪; (৫) তা'রীখ-ই তাদান্নিয়্যাত-ই 'উছমানিয়্যে, ইস্তাম্বুল ১৩৩০/১৯১৪; (৬) হাওয়াইজ-ই কানূনিয়্যেমিম, ইস্তাম্বুল ১৩৩১/১৯১৫; (৭) ইত্তিহাদ-ই ইসলাম, ইস্তাম্বুল ১৩৩১/১৯১৫; (৮) Kadinlarimiz, ইস্তাম্বুল ১৩৩১/১৯১৫ ; (৯) কুতুব মুসাহাবেলেরী, ইস্তাম্বুল ১৩৩১/১৯১৫; (১০) তা'রীখ-ই ইস্তিকবাল, ইস্তাম্বুল ১৩৩১-২/১৯১৫-৬, ৩ খণ্ডে; (১১) তা'রীখ-ই তাদান্নিয়্যাত 'উছমানিয়্যে', ইস্তাম্বুল ১৩৩১/১৯১৫ ; (১২) খাতিমু'ল-আম্বিয়া', ইস্তাম্বুল ১৩৩২/১৯১৬; (১৩) 'ইলাল-ই আখলাকিয়্যেমিয, ইস্তাম্বুল ১৩৩২/১৯১৬; (১৪) Musulmanlara, Turklere hakaret, dushmanlara ri`ayet, ইস্তাম্বুল ১৩৩২/১৯১৬; (১৫) ইত্তিহাদ-ই ইসলাম ওয়া আলমান্য়া, ১৩৩৩/১৯১৭ ; (১৬) Kara tehlike, ইস্তাম্বুল ১৩৩৪/১৯১৮; (১৭) Harbden Sonra Turkleri yukseltelim, ইস্তাম্বুল ১৯১৭ খৃ; (১৮) Ishtirak etmedigimiz harekat, ইস্তাম্বুল ১৯১৭ খৃ.; (১৯) Rum ve Bizans, ইস্তাম্বুল ১৯১৭ খৃ.; (২০) Turkcemiz, ইস্তাম্বুল ১৯১৭ খৃ; (২১) জোগরাফিয়া-ই-তা'রীখী, মুলক-ই রূম, ইস্তাম্বুল ১৯১৮ খৃ.; (২২) Tadj giyen millet, ইস্তাম্বুল ১৩৩৯/১৯২৩; (২৩) তুর্কী ইন্কিলাবী, ইস্তাম্বুল ১৯২৬ খৃ.।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) হ্য়দার কামাল, Ta'rikh-i istikbal munasebetiyle Djelal Nuri Bey, ইস্তাম্বুল ১৩৩১/১৯১৩; (২) Peyami Safa, Turk inkelabina bakislar, ইস্তাম্বুল ১৯৩৮ খৃ., স্থা. ; (৩) T. Z. Tunaya, Turkiye'de siyasi partiler, ইস্তাম্বুল ১৯৫২ খৃ., পৃ. ১৬৭-৮; (৪) ঐ লেখক, Garpc'ilik

cereyani, Istambul Hukuk Fakultesi Mecmuasi-তে ১৪খ (১৯৫৪ খৃ.); (৫) H. Z. Ulken, Turkiye'de, cagdas dusunce tarihi, কোনিয়া (ইস্তাম্বুল) ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৬৫৭-৭২; (৬) S. N. Ozerdim, Celal Nuri Ileri ve dilimiz, Diloilere saygi-এ, আঙ্কারা ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৩২৯-৪৭।

Gunay Alpay (E.I.²)/এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

**'ইল্লাঃ (علة)** ঃ অর্থ হেতু, ব. ব. 'ইলাল ও 'ইল্লাত। এই নিবন্ধে 'ইল্লাত' বানান ব্যবহার হইবে।

**(১) ব্যাকরণ**

'ইল্লাত-এর ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাচীন প্রবন্ধসমূহেও ইহার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী ইসহাক (মৃ. ১১৭/৭৩৫)-কে ব্যাকরণের প্রবর্তক হিসেবে স্বীকৃতি দান করিয়া ইব্ন সাল্লাম আল-জুমাহী তাঁহার প্রসঙ্গে বলেন, "তিনি কিয়াসের সুযোগ বহুলাংশে পরিবর্ধিত করিয়াছেন এবং "ইল্লাত-এর ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন" (আল-কিফ্তী, ইনবা', ২ খ, ১০৫)। তবে কোন ব্যাকরণবিদ 'ইলাল সম্পর্কে পৃথকভাবে কোন আলোচনা করেন নাই, আল-যাজ্জাজীর কিতাবু'ল-ঈদাহ' ফী 'ইলালি'ন-নাহ্ব (কায়রো ১৩৭৮/১৯৫৯)-এর পঞ্চম পরিচ্ছেদে (৬৪-৬), ইব্ন জিন্নী খাসা'ইসের কয়েকটি পরিচ্ছেদে, ১খ. (কায়রো ১৩৭১/১৯৫২), ৪৮-৯৫, ১৪৪-৬৩, ১৭৩-৮০, ১৮৩-৪; আস-সুয়ূতী, কিতাবু'ল-ইক্তিরাহ' ফী 'ইল্ম উসূলিন-নাহ্ব (কায়রো ১৩১০ হি.)-র ৪র্থ পরিচ্ছেদে আল-'ইল্লাত (পৃ. ৫৪-৫৬); তাঁহার নিকট হইতে আমরা জানিতে পারি, আস্-সার্রাজ তাঁহার উসূলের প্রারম্ভিক পর্বে এবং আল-হুসায়ন আদ-দীনাওয়ারী আল-জালীস (বুগ্'য়া, পৃ. ২৩৬) তাঁহার ছিমারু'স-সিন'না'আ নামক গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন (পাণ্ডু., দ্র. Brockelmanns, S I, 514)।

আয্-যাজ্জাজী (মৃ. ৩৩৭/৯৪৮-৯) উক্ত পঞ্চম পরিচ্ছেদে 'ইলালু'ন-নাহব'-এ ইহাদের কৃত্রিম (মুসতান্‌বাতা) ও অপরিহার্য নয় (লায়সাত মুজিবা) হিসাবে বর্ণনা করিয়া ইহাদেরকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, তা'লীমিয়্যা, জাদালিয়্যা নাজারিয়্যা। প্রথমোক্তগুলি 'আরবগণের ভাষা শিক্ষার (তা'লীম) সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহা ভাষার অধ্যয়ন সম্ভব করে এবং ইহা ভাষার নিয়ন্ত্রক মানদণ্ডসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে বলা যায় কামা যায়দুন (قام زيد) যায়দ দাঁড়াইয়াছিল, এখানে যায়দ হইতেইছে রাফ'যুক্ত (কর্তৃকারক)। এখানে যদি প্রশ্ন হয়, যায়দ কেন রাফ'যুক্ত হইবে? ইহার উত্তর হইতেছে (এবং ইহাই হইতেছে এই ক্ষেত্রে 'ইল্লাত) কারণ সে হইতেছে ফা'ইল অর্থাৎ ক্রিয়াপদের ইহা একটি কর্তা (agent)। ক্রিয়াপদটি তাহাকে প্রভাবিত করে এবং রাফ' দেয়। যদি বলা হয়, ইন্না যায়দান কা'ইমুন (ان زيدا قائم) "যায়দ দাঁড়াইয়া আছে" এই ক্ষেত্রে কেন যায়দ হইবে নাসাব ও কা'ইমুন হইবে রাফ'? ইহার উত্তর হইতেছে ঃ ইন্না-এর কারণে, ইহা (ইন্না) ইহার অব্যবহিত পরের বিশেষ্যকে নাসাব ও খাবার (বিধেয়)-কে রাফ' দেয়। এই সমাধানের মধ্যে 'ইল্লাত-এর ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

'ইল্লাত কিয়াসিয়্যা-কিয়াস (অনুরূপতা)-এর উপর ভিত্তি করিয়া প্রদত্ত ব্যাখ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট। ইন্না যায়দান কা'ইমুন-এর ক্ষেত্রে ইন্না কেন বিশেষ্যটিকে নাসাব দেয়? কারণ ('ইল্লাত কিয়াসিয়্যা) ইহা একটি সকর্মক ক্রিয়াপদের সদৃশ (من الحروف المشبه بالفعل)। এই সাদৃশ্যের কারণে, মনে করা হয়, ইহা সকর্মক ক্রিয়ার সহিত তুলনীয় এবং একই রূপ আচরণ করে। বিধিবদ্ধ দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে যায়দান্-এ ক্রিয়াপদের কর্মপদের সহিত তুলনীয়, যেমন কর্মপদ নাসাব গ্রহণ করে এবং কা'ইমুন-এর রাফ' গ্রহণের 'ইল্লাত হইল এই যে, ইহার সহিত তুলনীয় যাহাতে রাফ' দেওয়া হয়।

ইহার পরবর্তীতে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য পুনঃপুনঃ আলোচিত (জাদাল) ও গভীর চিন্তার (নাজার) মাধ্যমে প্রাপ্ত ব্যাখ্যাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'ইলাল জাদালিয়্যা-নাজারিয়্যা। পূর্ববর্তী 'ইল্লাত'টির (কিয়াসিয়্যা) সংজ্ঞামতে কোন সকর্মক ক্রিয়াপদের সদৃশ। কিন্তু সেই পদটি কি ? এই ক্রিয়াপদটি কি অতীত কালের, না বর্তমান কালের অথবা ইহা কি ভবিষ্যৎ কাল সম্বন্ধীয় ? একটি সকর্মক ক্রিয়াপদের সহিত সাদৃশ্য প্রদর্শনের জন্য এমন একটি ক্রিয়াপদ নির্বাচনের হেতু কি, যাহার পূরক (Complement) ফা'ইল-এর অগ্রে আসে (যথা দারাবা যায়দান 'আমরুন (ضرب زيدا عمرو) ? মৌলিক গঠন (আস্'ল) প্রকৃতির তুলনায় ইহা হইতেছে একটি দ্বিতীয় পর্বের (ফার') গঠন ঃ দারাবা 'আমরুন যায়দান। এই দ্বিতীয় পর্বের গঠনরীতিই বা কেন নির্বাচিত করা হয় ? এইরূপ সাদৃশ্যমূলক অপরাপর অন্য কোন্ উদাহরণ এই পদ্ধতিকে সমর্থন করে ? উভয় গঠন রীতিই (ফার' ও আস্'ল এই দুই প্রকারের) কি গ্রহণযোগ্য ? ইহার উত্তর নেতিবাচক, কারণ এইরূপ বলা সম্ভব নয় ঃ ইহা কা'ইমুন যায়দান। তবে কেন এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া এই রূপটি গ্রহণযোগ্য হয় ঃ ইন্না আমামাকা বাক্‌রান, "বাক্‌র তোমার সম্মুখবর্তী ?" ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ সকল প্রকার প্রশ্নের উত্তরসমূহ হইতেছে 'ইলাল জাদালিয়্যা- নাজারিয়্যা। 'আরব ব্যাকরণবিদগণ 'ইলাল প্রশ্নে সীমাহীন কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদর জন্য ইহা অনর্থক কর্ম ছিল না, বরং ইহার মাধ্যমে তাহারা হিকমা-র সন্ধান লাভে ব্রতী ছিলেন। ইহা এমন এক প্রজ্ঞা যাহা 'আরবী ভাষাকে সুবিন্যস্ত করে (তু. ইব্নু'স্-সার্রাজ)।

ইব্নু'স-সার্রাজ (মৃ. ৩১৬/৯২৯) দুই শ্রেণীর ই'তিলালাত প্রতিষ্ঠিত করেন (ইক্তিরাহ, ৫৮) ঃ (ক) এইগুলি হইতেছে ব্যাকরণবিদদের যুক্তির বুনিয়াদ 'আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান দান করে, যথা সকল ফা'ইল হইতেছে মারফূ' এবং সকল মাফ্'উল হইতেছে মান্‌সূব [ইহা হইতেছে আল-যাজ্জাজীর প্রথম শ্রেণী]; (খ) যেইগুলি 'ইল্লাতু 'ইল্লাত ("হেতুর হেতু")। উদাহরণস্বরূপ ফা'ইল কেন মারফূ' হইবে এবং মাফ্'উল-ই বা কেন মানসূব হইবে ? 'আরবগণের ন্যায় 'কথন' দ্বারা বিষয়টি সঠিক উপলব্ধি সম্ভব নয়। আমরা কেবল তাহাদের প্রতিষ্ঠিত উসূল (মূলনীতিসমূহ) হইতে সেই প্রজ্ঞা আহরণ করিতে পারি। ইহার মাধ্যমেই অন্যান্য ভাষার তুলনায় এই ভাষাটির উৎকৃষ্টতা প্রকাশ পায়, 'ইল্লাতু 'ইল্লাত আল-যাজ্জাজীর অপর দুইটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ইব্ন জিন্নী (মৃ. ৩৯২/১০০২) ব্যাকরণে 'ইল্লাত-এর ধারণাটিকে আরও গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন (খাসা'ইস-এর বর্ণনাসমূহে)। প্রথমত তিনি ইব্নুস'স-সার্রাজের 'ইল্লা ভাবটিকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন না (১খ, ১৭৩-৪)। ইহা কেবল একটি বাড়াবাড়ি এবং বাস্তবতার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। কারণ ইহা 'ইল্লাত-এর ব্যাখ্যা ও পরিপূরকরূপে সংশ্লিষ্ট। "আসল হেতুটি সংঘটিত হয় না (মা'লূলা)" (১খ. ১৭৪, পৃ. ৫)। ইহা প্রকৃতিগতভাবেই বিদ্যমান। এই

প্রসঙ্গটিই পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং ইব্‌ন জিন্নী এই হেতুর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিয়াছেন। তিনি প্রাথমিকভাবে একটি পার্থক্য স্থির করিয়াছেন (১খ, ১৬৪); আল-'ইল্লাতু'ল-মুজিবা, "অপরিহার্য হেতু" এবং আল-'ইল্লাতু'ল-মুজাওবিযা, "ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তাকারী হেতু"। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ওয়া (و)-কে হামযাঃ (ء)-তে পরিবর্তন করার সম্ভাবনার মাধ্যমে উক্কিতা (وقت)> উক্কিতা (أقت) [কোন কিছুর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় স্থির করা] অথবা উজূহ (وجوه) উজূহ> أجوه "চেহারাসমূহ"— ইহা প্রকৃতপক্ষে কেবল একটি সাবাব। এই পরিবর্তন ব্যাকরণগতভাবে অপরিহার্য নহে; তবে ইহার অনুমতি রহিয়াছে (দ্র. নিম্নোক্ত মন্তব্য 'ক')। সর্বশেষ অবশিষ্ট থাকে আল্-'ইল্লাতু'ল-মুজিবা। ইহা কি ধর্মতত্ত্ববিদগণের ব্যবহৃত অথবা আইনশাস্ত্রবিদগণের ব্যবহৃত শ্রেণীর অনুরূপ ? তাঁহার মতে (১খ, ৪৮, ১৪৫) ইহা দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথমোক্তটির অনেক নিকটতর এবং পরবর্তীটি হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর (১খ, ৫০, ছত্র ১৫)। ইহার কারণ ব্যাকরণবিদগণ অনুভূতির (আল-হিস্‌স) উপর গুরুত্ব দান করেন এবং শব্দ ধ্বনির লঘুত্ব ও ভারিত্ব সম্পর্কে বক্তব্য দান করেন। এই তারতম্য সকলের জন্য সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব। অপরপক্ষে আইন সম্পর্কিত 'ইল্লাত কতিপয় লক্ষণের ইঙ্গিত বহন করে যাহার উপর নির্ভর করিয়া রায় প্রদান (লি-উক্'ইল'ল্-আহ্কাম) করা হইয়া থাকে (আরও দ্র. ১খ, ৪৮, ছত্র ৬-১২; ৫১, ছত্র ১২-৫)। তিনি আল্-'ইল্লাতু'ল-মূজিবা (১খ, ৮৮, ১৬৪)-এর মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য করিয়াছেন ঃ (ক) যে সমস্ত 'ইল্লাত অপরিহার্য এবং যাহা এড়াইবার সুযোগ নাই, আলিফ (الف)-কে ওয়াও(و)-এ পরিবর্তনের মাধ্যমে দারিব (ضارب-আঘাতকারী)-এর ক্ষুদ্রত্ববাচক শব্দ দুওয়ায়রিব (ضويرب); ইহা ধর্মতত্ত্ববিদগণের ব্যবহৃত পদ্ধতির সহিত তুলনীয়। (খ) যে সমস্ত 'ইল্লাত পরিহার করা যায়, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীকে অপসন্দনীয় ও পরিপন্থী কিছু গ্রহণ করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, যখন বলা হয় মুয়াকিন (ميقن) [আসল (يقن)-এর অনুসরণ] হইতে য়া (ى)-কে ওয়া (و)-তে পরিবর্তন না করিয়া ঃ মূকিন্, "যে ব্যক্তি য়াকীন রাখে" অথবা মিওযান হইতে ওয়া (و)-কে য়া (ى)-তে পরিবর্তন না করিয়া ঃ মীযান 'তুলাদণ্ড'; ইহার কারণতত্ত্বটি চূড়ান্ত নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন (১খ, ৮৭ শেষভাগে), "আমরা দাবি করি না যে, ইহার ['ইলালু'ন্-নাহ্‌ব'] ধর্মতত্ত্ববিদগণের 'ইলালের সমমানে (তাবলুগ কাদ্‌র) পৌঁছিয়াছে (তু. ১খ, ১৪৫, ছত্র ৯-১১)। তিনি এই সকল কারণতত্ত্বকে চিহ্নিত করার ইচ্ছা পোষণ করেন নাই, বরং সাধারণভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ইহারা পরস্পরের সহিত অধিকতর লক্ষণীয় সাদৃশ্য প্রদর্শন করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্যাকরণবিদগণের 'ইলাল একদিকে যেমন আইনবিদগণের 'ইলাল হইতে অধিকতর বিকশিত, তেমনি অপরদিক এগুলি ধর্মতত্ত্ববিদগণের 'ইলাল-এর সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ হইলেও ইহা হইতে অপরিস্ফুট। এই প্রেক্ষিতে ইহা বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র্যবোধক। R. Arnaldez তাই বলেন (Grammaire et theologie chez Ibn Hazm de cordoue, প্যারিস ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৯৬), "সমস্যাটি এইরূপে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হইয়াছে এবং তাহার সমাধান প্রদান করা হইয়াছে। তবে এই সমাধান ব্যাকরণগত প্রেক্ষিতে নির্দিষ্টভাবে প্রদান করা হইয়াছে। এই বক্তব্যটি 'আরবীয় দৃষ্টিকোণ হইতে প্রদত্ত। আধুনিক ভাষাবিদগণ ভাষার কারণ বিবেচনা করেন না, বরং বিবেচনা করেন বাক্যস্থিত লক্ষণসমূহের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ বিরোধিতার এবং বিভিন্ন লক্ষণের পারস্পরিক সম্পর্কের"।

যাহা হউক, প্রশ্ন থাকে, ইব্‌ন জিন্নী আল-'ইল্লাতু'ল-মূজিবা দ্বারা ঠিক কি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ? নিঃসন্দেহে যাজ্জাজী ও ইব্‌নু'স-সার্‌রাজ প্রথম শ্রেণীতে যাহা বুঝাইয়াছেন তাহা (তু. ১খ, ১৬৪, ছত্র ২-৫)। শেষোক্তজনের প্রস্তাবিত 'ইল্লাতু 'ইল্লাত বাতিল করার পর তিনি এই প্রথম শ্রেণীটির প্রতি নিজকে নিবদ্ধ করিয়াছেন। এখন উদারণস্বরূপ দেখা যায়, তিনি প্রায়শই ইসতিছ্‌কাল "ভারিত্ব পরিমাপ" (পরিণামে লঘুত্ব)-এর শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি ইসতিছ্কা'াল-এর মাধ্যমে ব্যাকরণবিদগণের যুক্তিসমূহ ব্যবহার করিয়া ব্যাকরণবিদের 'ইলাল আইনবিদের 'ইলাল-এর মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন (উপরে ১খ, ৪৮, ছত্র ৪)। এই ইসতিছ্কাল হইতেছে একটি 'ইল্লাত-নাজারিয়্যা। প্রকৃতপক্ষে উপর উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে মুযকিন> মূকিন, মিওযান>মীযান (অ-চূড়ান্ত 'ইল্লাত মূজিবা)—আল-'ইল্লাতু'ত-তা'লীমিয়্যা শুধু পরিবর্তনসমূহ উয়>উ, ইওয়া>ঈ, ("কেন"?) ইত্যাদির বিবরণ প্রদান করে। ভারিত্ব পরিমাপের সাহায্যে ব্যাখ্যা প্রদান দ্বারা ইসতিছ্‌কাল উদ্ভূত হয় নাজার হইতে বিশেষ ক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক আচরণের প্রতিফলনে। এখন আমাদের করণীয় কি ? সতর্ক পরীক্ষার পর আমরা উপসংহার টানিতে পারি যে, ইব্‌ন জিন্নী 'ইল্লাতু 'ইল্লাত শব্দটি ও অসার প্রশ্নাবলীর অপব্যবহারই কেবল প্রত্যাখ্যান করিয়াছে (দ্র. ১খ, ১৭৩, ছত্র ১১ পৃ.), কিন্তু সব সময়েই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল সরল ব্যাকরণের বর্ণনার অতিরিক্ত সুদূরপ্রসারী একটি পরিকল্পনা— যাহাতে সম্ভব সংঘটনের আলোকে একটি ব্যাখ্যা প্রদান— যাহা উদ্ভূত হইবে তাহার ইস্‌তিছ্‌কাল-এর ন্যায় ভাষাতাত্ত্বিক অনুভবের মাধ্যমে অথবা এমন অপর কোন পদ্ধতিতে যাহা তাঁহার মতে 'আরবীয় ভাষার জন্য যথোপযুক্ত। যে সমস্ত উদাহরণ উল্লেখ করা হইয়াছে (মূকি'ন, মীযান ইত্যাদি), এইগুলি গ্রহণ করিলেও যখন আমরা বিবেচনা করি, তিনি তাঁহার ইসতিছ্কা'াল-এর ব্যবহার কত দূর প্রসারিত করিয়াছেন (১খ, ৫৫, ছত্র ৪-৮)— ইহা আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি পদ্ধতিগত অবিমিশ্র 'ইল্লাত নাজারিয়্যা লাভে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার মতে প্রকৃত ব্যাকরণগত হেতু এমন একটি বিষয় যাহা সুস্পষ্টভাবেই তা'লীমিয়্যা সম্পর্কে প্রাথমিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইহা মোটামুটি সঠিকভাবেই নাজারিয়্যা পর্যন্ত বিস্তৃত।

আদ-দীনাওয়ারী (৫৮৩/১১৮৭ সালের পূর্বে লিখিত, Brockelmann, S I, ৫১৪) উপরে উল্লিখিত কিতাবে (ইব্‌ন মাক্‌তূম-এর শারহ সহযোগে) [আস-সুয়ূতীর ২য় মাস'আলাত 'ইলাল-এর বিভাগ, ইক্‌তিরাহ', পৃ. ৫৬-৮] নিজেও দুইটি বিভাগের উত্থাপন করিয়াছেন। দ্বিতীয়টি, আপাতদৃষ্টিতে ইব্‌নু'স-সাররাজের প্রদত্ত বর্ণনার অনুরূপ বলিয়া মনে হয়, তবে তিনি এই প্রসঙ্গে কোন আলোচনা করেন নাই (ঐ, ৫৮, ছত্র ১৪-৫)। প্রথম ব্যাকরণবিদগণের 'ইলাল-এর বহু পরিচিত ২৪টি প্রকারভেদের (নাও') বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তাত্তারিদ 'আলা কালামি'ল-'আরাব ওয়া তুন্‌সাকু ইলা কানূনি লুগাতিহিম, "আরবী ভাষার সম্পূর্ণ রূপের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ এবং তাহাদের ভাষা-কানূনের সহিত সম্পৃক্ত।" তবে ইহারা এই অবস্থায় আত-তা'লীমিয়্যা অথবা ইব্‌নুস'স-সাররাজের কেবল প্রথম শ্রেণী থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, প্রকৃতপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ

কিয়াসিয়্যা এই স্থানে পাওয়া যায় ঃ 'ইল্লাত তাশ্‌বীহ (সাদৃশ্যের হেতু), যথা মুদারি' (مضارع)-এর ই'রাব, বিশেষ্যের সহিত ইহার সাদৃশ্যের কারণ এবং হুরূফের সহিত তাহাদের সাদৃশ্যের কারণে কতিপয় বিশেষ্য পদের বিনা' (ই'রাব-এর অনুপস্থিতি) [ঐ, পৃ. ৫৭, ছত্র ৫-৬] এবং 'ইল্লাত ফারক', "পার্থক্যের হেতু" (ছত্র ৭-৯), যাহা একটি অবিমিশ্র পদ্ধতিগত 'ইল্লাত নাজারিয়্যা।

ইস্‌তিহুকাল প্রসঙ্গে ইব্‌ন জিন্নীর পদ্ধতি অবলোকন করিলে এবং অবিমিশ্র পদ্ধতিগত নাজারিয়্যার প্রতি তাঁহার আগ্রহ লক্ষ্য করিলে আদ-দীনাওয়ারীর সঙ্গে তাঁহার 'ইলাল-এর তালিকা রচনায় এমন মিশ্রণের সৃষ্টি মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয় না। ইহাতে বুঝা যায় যে, ব্যাকরণবিদগণ তাঁহাদের ব্যাকরণগত চিন্তাধারায় 'আরবী ভাষায় প্রকৃত বিধিসমূহ ও বিধিসমূহের ব্যাখ্যাদানের ব্যাপারে পুঞ্জীভূত কেন-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করেন না। আরও বুঝা যায় যে, এইভাবে তাঁহারা প্রথমটিতে যে যথাযথ মূল্য আরোপ করেন তাহা শেষোক্তটির বেলায়ও প্রযোজ্য। ইহা ছাড়াও আস্-সুয়ূতী, আদ-দীনাওয়ারী (বুগ্য়া, পৃ. ২৩৬)-এর জীবনীমূলক টীকায় উপরিউক্ত ২৪টি প্রকারের বর্ণনা পুনরুল্লেখ করিয়াছেন এবং এইগুলিকে উক্ত গ্রন্থকারের অনুসরণে সাধারণভাবে 'ইলালু'ন-নাহ্‌বি'ল-মাশ্‌হূরা-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন 'ইল্লাত আবার বাসীতা, 'সরল' অথবা মুরাক্কাবা 'যৌগিক'রূপের হইতে পারে। আস্-সুয়ূতীর ৫ম মাস'আলা (ইকতিরাহ', পৃ. ৬১-২)-এর বিষয়বস্তু ইহাই। মুরাক্কাবার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হইতেছে মান'সারফ (منع صرف)-এর ব্যাখ্যা একটি বিশেষ পদের মধ্যে منع صرف-এর নয়টি কারণের মধ্য হইতে দুইটি কারণ বিদ্যমান থাকা বা এমন একটি কারণ থাকা যাহাতে আছে দুইটি কারণের সম্মিলিত ক্রিয়া (আরও দ্র. ইব্‌ন জিন্নী, ১খ, ১৭৪-৮০)।

কি'য়াস-এর তত্ত্বে প্রদত্ত 'ইল্লাত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ অংশটি লক্ষণীয়; ইব্‌নু'ল-আনবারীর বিবরণীতে ইহা দেখা যায় (লুমা'উ'ল-আদিল্লাঃ ফী উসূলিন-নাহ্‌বি, সম্পা. Attia Amer, পৃ. ৫৩)। কিয়াসু'ল-'ইল্লাত সর্বসম্মতিক্রমে (বি-ইজমা') গৃহীত হইয়াছে এবং ইহাই একমাত্র উদাহরণ যাহা ইজমা'প্রাপ্ত, কিয়াসু'শ-শাবাহ, "সাদৃশ্যমূলক কি'য়াস" প্রায় সকল বিদ্বান ব্যক্তি (আকছারু'ল-উলামা') কর্তৃক স্বীকৃত।

মন্তব্য ঃ (ক) 'ইল্লাত সাবাবঃ ইব্‌ন জিন্নী সম্ভবত এই দুইটি শব্দের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নিরূপণ করেন ঃ আল-'ইল্লাতু'ল-মুজাওবি'যা প্রকৃতপক্ষে একটি সাবাবমাত্র, যাহা অনুমতি প্রদান করে কিন্তু অপরিহার্যতা আরোপ করে না (উল্লিখিত ও ১খ, ১৬৪, ছত্র)। ইব্‌ন জিন্নীর একটি উদ্ধৃতির শেষে প্রদত্ত একটি টীকায় আস্-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১/১৫০৫) [ইকতিরাহ', ৫৯, ছত্র ১৪] একটি সুস্পষ্ট পার্থক্যকরণের পক্ষে মত প্রদান করেন, "সুতরাং ইহা এখন সুস্পষ্ট যে, এই পার্থক্য দ্বারা যাহা অপরিহার্য তাহাকে বলা হয় 'ইল্লাত এবং যাহা অনুমতি প্রদান করে তাহাকে বলা হয় সাবাব।" এই প্রসঙ্গটির উন্নয়ন ঘটান ইকতিরাহ'-এর টীকাকার মুহাম্মাদ 'আলী ইব্‌ন 'আল্লান (মৃ. ১০৫৭/১৬৪৮)। যদি শেষোক্ত ব্যক্তি ইব্‌ন জিন্নীর উদ্ধৃতির শেষাংশে প্রদত্ত ইন্‌তাহা-টি লক্ষ্য করিতেন, তবে তিনি একটি স্ববিরোধী মন্তব্য তাঁহার (ঐ) উপর আরোপ করিতেন না। ইব্‌ন হায্‌ম-এ 'ইল্লাত ও সাবাব প্রসঙ্গের জন্য দ্র. I. R. Arnaldez, পূ. গ্র., পৃ. ১৮৬।

(খ) 'ইল্লাত-এর অপর একটি মর্মার্থ ঃ হুরূফু'ল-'ইল্লাত অথবা আল-ই'তিলাল অথবা আল-হ'রূফু'ল-মু'তাল্লাত-এর জন্য দ্র. হু'রূফু'ল-হিজা'। এইগুলি হইতেছে আলিফ, ওয়াও য়া' (ا—و—ى) যাহারা হুরূফু'ল-'ইল্লাত বা দুর্বল হু'রূফ নামে অভিহিত। অন্যগুলি হইতেছে সবল ও বিশুদ্ধ অর্থাৎ আল-হুরূফু'স-সাহীহা। এই সমস্ত হ'রফে যেই সকল পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহা 'আরবী ব্যাকরণের ই'লাল অথবা ই'তিলাল পরিচ্ছেদে বিধৃত হইয়াছে (দ্র. রাশীদ আশ-শার্‌তূনী, মাবাদি'উ'ল-'আরাবিয়্যা, ৪ খ. (৯ম সংস্করণ, বৈরূত ১৯৬১ খৃ.), পৃ. ৩৫-৪০; H. Fleisch, Traite de philologic arabe, ১খ, ১১৮-৩৭)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) নিবন্ধের স্থানে স্থানে; (২) আস্-সুয়ূতীর ইকতিরাহ'-এর চতুর্থ পরিচ্ছেদ। এই পরিচ্ছেদে উদ্ধৃতির সমাবেশ রহিয়াছে। ফলে এই বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিবরণসমূহ এখানে পাওয়ার সুবিধা রহিয়াছে। অবশ্য ইব্‌ন জিন্নীর উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে গ্রন্থকার কতিপয় অংশ বর্জন করিয়াছেন।

H. Fleisch (E. I.[2])/আবদুল বাসেত

**২। দর্শন**

হেতু (এরিস্টোটল প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী) শব্দটি শী'আ চিন্তাবিদগণ, ফালাসিফা ও পরবর্তী কালে মুতাকাল্লিমূন কর্তৃক গৃহীত। তাঁহারা তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ও প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন। মুতাকাল্লিমগণের মধ্যে কারণ পরম্পরা ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির উদ্দেশে 'সাবাব' শব্দটির ব্যবহারের প্রবণতা ছিল। সাবাব-এর ব. ব. আস্‌বাব এবং ইহা প্রধানত একটি যোগসূত্র ও মধ্যস্থ অর্থ প্রকাশ করে। ইহাতে কখনও কখনও কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, বিশেষত ফালাসিফা ও তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে আল-ফারাবী ও ইব্‌ন সীনা সাবাবকে অবাধে 'ইল্লাত-এর সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

গ্রীক গ্রন্থসমূহ অনুবাদে প্রাথমিক কালেই 'ইল্লাত শব্দটি গ্রহণ করা হয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা অত্যন্ত পরিশ্রম সাপেক্ষ। আমরা শুধু অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত এই বিষয়ও এরিস্টোটলের বলিয়া প্রচলিত নব্য-প্লাটোপন্থী রচনাবলীর প্রভাব প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে পারি। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য Elementatio Theologica of Prolus, 'আরবী অনুবাদে যাহার অর্থ হয় "অবিমিশ্র শুভ সম্পর্কিত এরিস্টোটল প্রদত্ত ব্যাখ্যাসম্বলিত ব্যাখ্যা পুস্তক" (আল–খায়রু'ল-মাহ্‌দ') এবং মধ্যযুগের ল্যাটিনে পরিচিত ছিল Liber de Causis ('আরবী সম্পা. Bardenhewer) কৃত, Freiburg, ১খ, B., ১৮৮২ খৃ., পুন সম্পা. by A Badawi, in Neo Platonici opud Arabos, কায়রো ১৯৫৫ খৃ.) নামে রচনাটির প্রথম পংক্তিতেই, ইহাতে বর্ণিত প্রথম হেতু (এই স্থলে আল-'ইল্লাতু'ল-আওওয়ালিয়্যা) ও দ্বিতীয় হেতুর মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কারণিকৃত বাক্যটি (মা'লূল) সার্বিকভাবে সার্বজনীন প্রথম হেতু দ্বারা বজায় থাকে, এমনকি যদি ইহার নিকটতম দ্বিতীয় হেতুটি স্বকীয় প্রভাব বিস্তারে ক্ষান্ত হয় তথাপি ইহা কর্মক্ষম থাকে ঃ "এবং এমনকি ইহার সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া হইতেও, যদি দ্বিতীয় হেতুটিকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তথাপি ইহার উর্ধ্বে অবস্থানরত প্রথম হেতু, উক্ত প্রতিক্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। কারণ ইহা হইতেছে দ্বিতীয় হেতুর হেতু।" ল্যাটিন দর্শনশাস্ত্রে এই সম্পর্কটি

বিশ্ব সম্পর্কে সৃষ্টিবাদীদের দৃষ্টিকোণ হইতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ইহা যথাসময়ে শুরু হইয়াছে এমন একটি বিশ্বের হেতু। অপরদিকে ফালসাফা, অন্ততপক্ষে প্রাচ্য ফালসাফা ইহার জন্য একটি অপরিহার্য ও চিরন্তন সত্তা হইতে উদ্ভব হওয়া প্রয়োজনীয় বলিয়া ব্যাখ্যা প্রদান করে।

এই প্রসঙ্গে সহায়করূপে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা প্রদত্ত হইল।

১। **শী'আ চিন্তাধারা ঃ** ইখওয়ানু'স-সাফা'-র একটি লিখিত গ্রন্থ নিম্নোক্ত শিরোনামে ভূষিত, "হেতুসমূহ ('ইলাল) প্রসঙ্গে এবং কারণিকৃত (মা'লূলাত) ঘটনাবলী" (রাসা'ইলু ইখওয়ানি'স্সাফা', কায়রো ১৩৪৭/১৯২৮, ৩খ, ৩২৪ পৃ.)। ইহার একটি পরিচ্ছেদে কেবল উক্ত প্রশ্নাবলী আলোচিত হইয়াছে (ঐ, ৩৩৬-৭)। প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহ সাবাব-এর ঐতিহ্যগত ধারণার দিকে ইঙ্গিত করে। 'ইল্লাত হইতেছে অপর কোন বস্তুর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মধ্যবর্তী কারণ (সাবাব) এবং মা'লূল (করণীয় ফলাফল) হইতেছে, যাহার অস্তিত্ব রক্ষার্থে কোন সাবাবের প্রয়োজন। হেতুর প্রকারভেদ প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এইগুলির সম্ভাব্য ক্রমবিবরণী প্রধানত দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। (১) এ্যারিস্টোটলের (Physics, ২খ, ৩ ও Metaphysics, ২) বিশ্লেষণের খুব কাছাকাছি একটি বিশ্লেষণ— যাহা তুলিয়া ধরে কার্যকর কারণ ('ইল্লাতু ফা'ইল), বস্তুগত হেতু ('ইল্লাতু হায়ূলানিয়্যা), আনুষ্ঠানিক হেতু ('ইল্লাতু সূরিয়্যা) এবং চূড়ান্ত বা 'নিখুঁত' হেতু ('ইল্লাতু তামামিয়্যাহ)। মূল পাঠ অনুসারে প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুতে এই হেতু চতুষ্টয় বিদ্যমান। (২) ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী শক্তিটির প্রকৃতি অনুযায়ী উহার কি কি প্রয়োজন তাহার তালিকা। যদি কর্মসম্পাদনকারী হয় মানুষ, তবে তাহার প্রয়োজন বস্তু, স্থান, সময় তাহার সহায়তাকারীরূপে যন্ত্র, কারিগরী যন্ত্র ও কিয়ৎ পরিমাণ তৎপরতা। অন্যপক্ষে ইহা যদি হয় প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদনকারী— তবে ইহার জন্য শুধু বস্তু, স্থান, সময় ও কর্মতৎপরতা প্রয়োজন; আর যদি হয় জীবনী শক্তিসম্পন্ন কর্ম সম্পাদনকারী, তবে তাহার প্রয়োজন শুধু বস্তু ও কর্মতৎপরতার। অনুচ্ছেদটির সমাপ্তিতে মন্তব্য করা হইয়াছে, সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা (আল বারি')-এর এই সকলের কিছুই প্রয়োজন হয় না। কারণ বস্তু, সময়, সক্রিয়তা অথবা সাহায্যকারী ছাড়াই তিনি সৃষ্টি করেন। "তাঁহার কর্ম হইতেছে পরম প্রারম্ভ ও সৃষ্টি।" উক্ত লিখিত পৃষ্ঠায় যোগ করা হইয়াছে যে, বস্তুর (মাদ্দা) অপূর্ণতা হেতু সৃষ্ট বাধা, প্রাথমিক বস্তুর (হায়ূলা) রূপ লাভের পথে সৃষ্ট সমস্যাবলী সহায়ক অথবা যন্ত্রাদির অভাবে সৃষ্ট সমস্যা ব্যক্তিগত অক্ষমতার এই সকলই কর্ম সম্পাদনকারী কর্মতৎপরতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে। "সর্বশক্তিমান আল্লাহ এই সকল হইতে কত উর্ধ্বে।"

কারণীকৃত বস্তু (معلول)-কে বিভিন্নভাবে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ মানুষের সৃষ্ট বিভিন্ন বস্তু; 'প্রাকৃতিক' বস্তুসমূহ (খনিজ, উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ); অপর দুইটি শ্রেণীর বিশদ বিবরণ কতিপয় ইসমা'ঈলী ধারণার উপর নির্ভরশীল ঃ একদিকে রহিয়াছে কেবল খাঁটি নাফ্সানিয়্যা বস্তুসামগ্রী (গ্রহ, নক্ষত্র, মৌলিক বস্তুসামগ্রী), অপরদিকে আছে রূহানিয়্যা অথবা 'আত্মিক' বস্তুসামগ্রী (আদি উপাদান, বিভিন্ন অবয়ব, আত্মা, বুদ্ধিবৃত্তি)।

হেতু সম্পর্কীয় এই সকল বর্ণনা সুনিশ্চিতভাবেই এরিস্টোটলীয় ঐতিহ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য ইহার উপস্থাপনা যে বিশ্লেষণী পদ্ধতির মাধ্যমে সাধিত হইয়াছে তাহা এরিস্টোটলীয় নয়, তুলনামূলকভাবে ইহা অনেক বেশী বর্ণনামূলক এবং বস্তুসত্তার ক্রমউচ্চশীল স্থান নির্ধারণে ইহা অধিকতর সাবধানী। বস্তু গঠনের উপাদান সম্পর্কে হেতুসমূহের বিশ্লেষণ যে সমস্ত মধ্যবর্তী অবস্থা ব্যতিরেকে কোন বস্তু অস্তিত্বে আসিতে পারে না সেইগুলিকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করিতে পারে; কিন্তু উহা বুদ্ধিবৃত্তিক জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি ঘটাইতে তেমন সক্ষম নহে। এই অবস্থানসমূহ হেতু ও ফলাফলের মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগসূত্র স্থাপন করে এবং তদ্দ্বারা দ্বিতীয়টির উপর প্রথমটির প্রতিক্রিয়া (তা'ছীর) প্রমাণ করে। আদি উপাদান সত্তার ইসমা'ঈলী মত অনুসারে হায়ূলাকে একটি আত্মিক (রূহানী) বাস্তবতা প্রদান করা হয় এবং বস্তুগত হেতুকে একটি নূতন দিকে নির্দেশিত করা হয়। মুসলিম বিশ্বাস অনুসারে আল্লাহ্ তাঁহার সৃষ্টিশীল কর্মতৎপরতার পরম প্রত্যক্ষতায় যে কোন দ্বিতীয় স্তরের কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত প্রক্রিয়ার উর্ধ্বে অবস্থান করেন। শী'আ (ইসমা'ঈলী) চিন্তাধারা তুলনামূলকভাবে প্রায়োগিক নির্ভুলতা কম হইলে প্রায় একই পথ অনুসরণ করে এবং ইহাদেরকে কিছুটা পরিস্ফুট করিয়া তোলে। প্রথম হেতুটি (আল-'ইল্লাতু'ল-উলা) হইতেছে কোন কোন সময় স্বয়ং আল্লাহ্, কোন কোন সময় প্রথম উদ্ভূত বিষয়টি অর্থাৎ আল্লাহ্কে পরিজ্ঞেয় ও নামকরণযোগ্য বলিয়া চিন্তা করা। এই স্থলে কেবল নাসির-ই খুসরাও-এর কিতাব জামি'ইল-হি'ক্মাতায়ন (সম্পা. H. Corbin ও M. Muin, প্যারিস-তেহরান ১৯৫৩ খৃ.)-এর প্রতি আমরা ইঙ্গিত করিতে পারি অর্থাৎ ৭-৯ পৃষ্ঠায় আছে যে, চারিটি চিরায়ত হেতুর সহিত যুক্ত হইয়াছে স্থানীয় ও পার্থিব হেতুসমূহ এবং ৬৭-৭০ পৃষ্ঠায় প্রথম হেতু প্রসঙ্গে। ছয় শত বৎসর পর মুল্লা সাদরা শীরাযীর বিশ্ব সম্পর্কিত বিশেষভাবে অদ্বৈতবাদী ও উৎসারণবাদী ধারণা; বস্তুর মূল উপাদানের অন্তর্নিহিত গঠনের সহিত প্রাকৃতিক কারণসমূহের প্রেক্ষিতে 'ইল্লাত-মা'লূল সম্পর্ক অস্বীকার করিতে তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যদিকে ইহা অস্তিত্বের প্রশ্নে অধিক জোরের সহিত ইহার সমর্থন জ্ঞাপন করে (তু. কিতাবু'ল-মাশা'ইর, অনু ও সম্পা. H Corbin, প্যারিস-তেহরান ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ৫৩-৪/১৮০-১)। যাহাকে বলা হইয়াছে হেতু, তাহাই হইতেছে উৎস এবং উৎপত্তি (আস্ল), পরম উৎপত্তির মূল হইতেছে প্রথম হেতু (ঐ, পৃ. ৪১-১৬২)।

২। **ফালসাফাঃ** ফালাসাফাতে 'ইল্লাত-এর ধারণাটি বহুল ব্যবহৃত। আল-কিন্দী প্রায়শই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে "সত্তার ও উহার বিকৃতির নিকটতম কার্যকরী হেতু (আল-'ইল্লাতু'ল-ফা'ইলাতি'ল-কারীবা) প্রসঙ্গে একটি রিসালায় তিন-চারটি হেতুর সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন এবং এইগুলির সংজ্ঞা দিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে ইহাদের বলা হইয়াছে 'প্রাকৃতিক'— বস্তুজাত হেতুকে বলা হইয়াছে 'উন্সুরিয়্যা এবং চূড়ান্ত হেতুকে বলা হইয়াছে তামামিয়্যা (২১৭-৮); তৎপর ইহাতে কার্যকর (মাধ্যম, ফা'ইল) হেতুটিকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া এইভাবে স্থিরীকৃত নীতিসমূহ প্রয়োগ করা হইয়াছে। "আসমানী বস্তুসমূহে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য" প্রসঙ্গে আমরা হেতুসমূহের একটি নূতন তালিকার সন্ধান পাই যাহারা চূড়ান্ত হেতুর সহিত সম্পর্কযুক্ত; তবে পৃথকভাবে সুস্পষ্ট কোন শ্রেণীভুক্ত নয় (ঐ, পৃ. ২৪৭-৮)। আসমানী গোলককে বলা হইয়াছে নশ্বর জীবিত প্রাণীসমূহের "নিকটতম কার্যকরী হেতু" এবং কার্যকরী হেতুটি সেইজন্য বস্তুর সংগঠনে সংঘটিত বস্তুর তুলনায় অধিকতর মহৎ (পৃ. ২৪৮)। আল-কিন্দী (ইহা ব্যতীত) কুয়াশার হেতুটি ('ইল্লাত) আলোচনা করিয়াছেন (ঐ, ২খ, কায়রো ১৩৭২/ ১৯৫৩, ৭৬-৮)। এখানে

তিনি 'ইলাল-এর সমর্থকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন আস্‌বাব এবং প্রবাহের জোয়ার ও ভাটার কার্যকর হেতু (ঐ, ১১০-৩৩) ইত্যাদি।

আল-ফারাবীর দর্শনে ব্যবহৃত শব্দমালায় 'ইল্লাত ও সাবাব বিশেষ কোন পার্থক্যকরণ ছাড়াই মিশ্রিত হইয়াছে। এইভাবে 'উয়ূনু'ল-মাসা'ইল (সম্পা. Dieterici, ap. Alfarabi's Philosophische Abhandlungen, লাইডেন ১৮৯০ খৃ., পৃ. ৫৭) গ্রন্থে ঃ যে সমস্ত সম্ভাব্য বস্তু "অন্যান্য বস্তুর কারণে প্রয়োজনীয়" তাহাদের একটি হেতু ('ইল্লাত) প্রয়োজন, যেহেতু ইহারা অসীমিত বা সম্পর্কায়ন দ্বারা একে অন্যের হেতু হইতে পারে না (তু. Ibrahim Madkour, la place d'al-Farabi dans L'ecole philosophique musulmane, প্যারিস ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ৭৯)। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অপরিহার্য সত্তা ইহাদের অস্তিত্বে আনয়ন করে এবং তাহার কোন প্রকার হেতু ('ইল্লাত) থাকিতে পারে না। যেহেতু সে হইতেছে বস্তুসমূহের সত্তার প্রথম হেতু (আস-সাবাবু'ল-আওওয়াল)। অনুচ্ছেদটির সমাপ্তিতে চারটি এরিস্টোটলীয় হেতুর ('ইলাল) সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ব্যবহারিক পর্যায়ের এই মিশ্রণ ইহার পরবর্তী অংশেও (পৃ. ৫৮-৯) পাওয়া যায়, এই অংশে বর্ণিত হইয়াছে সত্তার উৎসারণ; একই রূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে Treatise on the agreement between Plato and Aristotle (ঐ, পৃ. ১১, ২৩ ও স্থা.) ইত্যাদি। আরা'উ আহলি'ল-মাদীনাতি'ল-ফাদিলা (সম্পা. Dieterici, লাইডেন ১৮৯৫ খৃ.)-তে সাবাবু আসবাব ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অগ্রাধিকার দৃষ্ট হয় ঃ ১৭তম পরিচ্ছেদে, প্রথম বস্তু (মাদ্দা) ও প্রথম রূপ-এর মূল হেতু (আসবাব) সম্পর্কে এবং ২২তম অধ্যায়ে বোধশক্তির উপলব্ধি ঘটনের হেতু (সাবাব) সম্পর্কে আলোচিত হয়।

তবে হেতু সম্পর্কিত সুস্পষ্টতম পুনরুল্লেখ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ইব্‌ন সীনার রচনাবলীতে; নিশ্চিতভাবে পরবর্তী শী'আ চিন্তাধারার উপর ইহার যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছিল। অধিবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধসমূহে ইহাদের প্রায়শই সন্ধানলাভ ঘটে। সম্পূর্ণ তালিকা প্রণয়নের প্রচেষ্টা না করিয়া সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ দৃষ্ট হয় ঃ শিফা', আল-ইলাহিয়্যাত, কায়রো ১৯৬০ খৃ., ২ খ, ২৫৭-৩০০ (প্রথম হেতু হিসাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ); নাজাত, কায়রো ১৩৫৭/১৯৩৮, পৃ. ২১১-৩ ও ২৩৫-৪৩ (এইখানে সাবাবু আসবাব এবং নিস্পৃহভাবে 'ইল্লাতু 'ইলাল-এর ব্যবহার করা হইয়াছে ; ইশারাত, সম্পা. Flugel, লাইডেন ১৮৯২ খৃ., পৃ. ১৩৯.৪৩। ইহার সহিত সংযুক্ত করা যাইতে পারে দানিশনামাহ (ফরাসী অনু. Le livre de Science, প্যারিস ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ১২৭-৩৩)। রিসালা ফি'ল-হুদূদ-এ 'ইল্লাত ও মা'লূল শব্দদ্বয় প্রসঙ্গে আলোচনা (তিস্'উ রাসা'ইল ফি'ল-হি'কমা ওয়া'ত-তা'বী'ইয়্যাত, কায়রো ১৩২৬/১৯০৮, পৃ. ১০০-১) ও রিসালা ফি'ত-তাবী'ইয়্যাত (ঐ, পৃ. ৪), এখানে ব্যবহৃত শব্দটি হইতেছে আসবাব।

ইব্‌ন সীনার হেতু প্রসঙ্গে প্রবন্ধাবলী সম্পর্কে এই স্থানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই। তবে তিনি এরিস্টোটলের বিভিন্ন রচনা, বিশেষত Metaphysics-এর উপর সরাসরিভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। ইহাকে তিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে বিশ্লেষণ করেন (বিশেষভাবে শিফা' ও নাজাত অংশ) এবং তাহা মূল পাঠকেও অতিক্রম করিয়া নব্য-প্লাটো ভাবধারার দিকে পরিচালিত করে। তিনি শুধু হেতুসমূহের বিশ্লেষণ তালিকাই প্রদান করেন নাই, বরং হেতুসমূহ ('ইল্লিয়্যাত) ও "মা'লূল"-এর প্রকৃত তত্ত্ব লইয়াও ব্যাপৃত হইয়াছেন; Mlle Goichon যাহাকে অনুবাদ করিয়াছে Causeite (মা'লূলিয়্যা)-রূপে (Lexique de la langue technique d'Ibn Sina, প্যারিস ১৯৩৮ খৃ., নং ৪৫১)। ইহা সম্পর্কে আরও কয়েকটি মন্তব্য ঃ

(১) পরবর্তী কালে চিরায়ত পর্যায়ে উন্নীত, পার্থক্যকরণ দ্বারা (উদাহরণস্বরূপ আল-জুরজানীর তা'রীফাতে গৃহীত, সম্পা. Flugel, লাইপযিগ ১৮৪৫ খৃ., পৃ. ১৬০) ইব্‌ন সীনা স্বকীয় হেতুসমূহ অর্থাৎ বস্তুগত (in potentia) ও আনুষ্ঠানিক (in actu) হেতুসমূহকে "মূল উপাদান হেতুসমূহ"-রূপে অভিহিত করেন। বহির্নিহিত হেতুসমূহ কার্যকরী ও চূড়ান্তভাবে হইতেছে কোন বস্তুর "অস্তিত্বের হেতু" (অথবা সত্তা, উজূদ)। "কোন বস্তুর সংগঠন ইহার কোন উপাদান অথবা ইহার অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে হইতে পারে" (ইশারাত, পৃ. ১৩৯)। এখানে আমরা শুধু মাদ্দা ও অস্তিত্ব এই দুইয়ের মৌল পার্থক্যেরই ইঙ্গিত পাই না, ইহার সঙ্গে সন্ধান লাভ করি ইব্‌ন সীনার বহির্নিহিত হেতুবাদ যাহাতে মূল (যাত) অস্তিত্ব লাভ করে।

(২) কার্যকরী হেতু (আল-'ইল্লাতু'ল-ফা'ইলা)-কে ধারণা করা হয় কোন বস্তুর অস্তিত্বের নিষ্পত্তিমূলক গঠনরূপ হিসাবে। ইহা হইল কোন না কোন স্থানে অস্তিত্বে আনীত সম্ভাব্য বস্তুর প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এই প্রধান তথ্যটির প্রত্যক্ষ প্রয়োগ আল-ফারাবীর রচনাবলীতে এই বক্তব্যটির সন্ধান পাওয়া যায়। শিফা' (ইলাহিয়্যাত, ২খ, ৩৫৭) গ্রন্থের এক প্রবন্ধে ইব্‌ন সীনা এই প্রসঙ্গে 'পদার্থবিদ' (যাঁহারা 'ইল্লাতু'ল-ফা'ইলাতে একটি কার্যকারণ সম্বন্ধে সন্ধান পান) ও ফালাসিফা (যাঁহারা বিবৃত করেন সত্তার স্বরূপ এবং ইহার অস্তিত্ব বজায় রাখার কারণ হিসাবে)-এর মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। ইহার পর তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহাই হইল বিশ্বের মুকাবিলায় স্রষ্টার স্থান। পরবর্তী কালে তিনি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন যে, প্রাথমিক কার্যকরী হেতুটি হইতেছে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, যিনি সকল বস্তু ও সত্তা সৃষ্টি করিয়াছেন (তু. ইশারাত, পৃ. ১৪০) এবং এরিস্টোটলীয় ধারণার ন্যায় ইহা কেবল উদ্দেশ্যমূলক হেতু নয়। ইহাতে Thomas Aquinas-এর "দ্বিতীয় পথ"-এর সম্ভাব্য উৎসের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

(৩) চূড়ান্ত হেতু (গা'ইয়্যা), ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, ইহাকে একটি অত্যন্ত জোরালো বিধিবদ্ধ মত বলা হইয়াছে (ইশারাত, পৃ. ১৩৯) "কার্যকরী হেতুসমূহের কার্যকরী হেতু" (তু. ইতোমধ্যে উল্লিখিত রাসা'ইলু'ল-কিন্দী-এর মূল পাঠ, ১খ, ২৪৮)। ইহা হইতেছে "হেতুসমূহের হেতু" (শিফা', ইলাহিয়্যাত, ২খ, ২৯২)। ইলাহিয়্যাত-এর ১৭তম সংস্করণে তাই ইব্‌রাহীম মাদকূর ভূমিকায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইব্‌ন সীনা এই দৃষ্টিভঙ্গি হইতে চারটি হেতুর বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং ইহা হইতে চূড়ান্ত হেতুতে আগমনের চেষ্টা করেন (ঐ, ২খ, ২৯৪-৮)। কার্যকরী হেতু ও চূড়ান্ত হেতুর পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিও সুগভীরভাবে সংজ্ঞায়িত ও আলোচিত হইয়াছে। ইহার সারবত্তার 'কারণেই কেবল চূড়ান্ত হেতু একটি হেতুরূপে স্বীকৃত এবং ইহার প্রদর্শিত ধারণাসমূহ কার্যকরী হেতুসমূহের কার্যকারণের অন্তর্ভুক্ত (ইশারাত, পৃ. ১৪০; অনু. A.M. Goichon, প্যারিস-বৈরূত ১৯৫১ খৃ., পৃ. ৩৫৬)। কারণ ইহার অস্তিত্বের স্থায়িত্ব শেষোক্তটি দ্বারা সংঘটিত হয়।

(৪) প্রথম পরম তত্ত্বরূপে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়। প্রথমত, বাস্তবতায় অসীম সংখ্যক কার্যকরী ও বস্তুবাদী হেতুর অসম্ভাব্যতা এবং পর্যায়ক্রমে অসীম সংখ্যক চূড়ান্ত হেতুর অসম্ভাব্যতা হইতে (শিফা', ২ খ, ৩২৭-৪৩; তু. ইশারাত, পৃ. ১৪১-২)। আল্লাহ্‌কে তাই উল্লেখ করা হইয়াছে "পরম প্রথম হেতু" ['ইল্লাতু'ল-উলা মুত্‌লাকা-উলা মুত্‌লাকা ও "সকল হেতুর পশ্চাতের হেতু"-রূপে (শিফা', ২খ, ৩৪০)]। তিনি নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ কার্যকরী হেতু, কারণ তিনিই হইতেছেন সকল সত্তা ও অনুষঙ্গী সত্তাসমূহের স্রষ্টা (মুব্‌দি') "পরম উদ্ভাবনা" (ইব্‌দা' মুত্‌লাক)-এর মধ্যে চূড়ান্ত কার্যকারিতা চিহ্নিত করার উর্ধ্বে, সংঘটিত বস্তু স্বয়ং অস্তিত্বহীন (লায়সা)। ইহার হেতুই ইহাকে অস্তিত্বসম্পন্ন করে (ঐ, ২৬৬)।

(৫) সংঘটিত বস্তু ও তাহার হেতুর মধ্যে বিরাজমান সহগামিতা ও পূর্ববর্তিতার সম্পর্কে বিষয়টি ইব্‌ন সীনার প্রবন্ধসমূহে প্রায়শই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে নিম্নরূপ ঃ অনুভূতি বা চেতনার পূর্ববর্তিতা আছে (মা'না), পরবর্তী কালে আমরা প্রকৃতির পূর্ববর্তিতার "সন্ধান পাই কিন্তু সময়ের (যামান) পূর্ববর্তিতা নাই। সময়ের প্রাসঙ্গিক, বাস্তবিকপক্ষে, হেতুর প্রকৃত রূপ হইতেছে, সংগঠিত বস্তুর অস্তিত্ব বাস্তবপক্ষে কেবল হেতুর অস্তিত্বের মাধ্যমেই সম্ভব" (ঐ, ২৬১)। তাই যদি সংগঠিত বস্তুটি অপসারণ করা হয় তাহা হইলে বস্তুটির হেতুটিও অপসারিত হইবে (রিসালা ফি'ল-হুদূদ) এবং হেতুর বাস্তবতা প্রসঙ্গে (بالفعل) হেতু অপসারিত হইলে বস্তুর অস্তিত্বও থাকিবে না, বিশেষত সম্ভাব্য হেতু (বি'ল-কু'ওওয়া)-এর অস্তিত্ব ইহার কার্যকারিতার পূর্বেও হইতে পারে (যেমন কাঠের কাজ করার পূর্বে কাঠমিস্ত্রীর অস্তিত্ব, তু. নাজাত, পৃ. ২১২-৩)। ইহা কার্যকারিতার পরও বিদ্যমান থাকিতে পারে অথবা তাহার পূর্বেই অপমৃত্যু হইতে পারে। যেই হেতু নিয়ত বাস্তবতায় বিদ্যমান তাহা কখনও ইহার কার্যকারিতা ব্যতীত অস্তিত্বশীল থাকিতে পারে না এবং কার্যকারিতাও ইহার হেতু ব্যতীত বিদ্যমান থাকিতে পারে না। ইহার ফলক্রমে পরম উৎস এবং সর্বোচ্চ হেতু, আল্লাহ্ যিনি সর্বসময়েই বাস্তব, সর্বব্যাপী নিত্যতা হইতে বিশ্বকে সৃষ্টি না করা তাঁহার জন্য সম্ভব নহে। ফালসাফার অস্তিত্ববাদী নির্ধারণ বিশ্বজগতের নিত্যতা (যে জগতের শুরু আছে কিন্তু শেষ নাই)-এর সংজ্ঞায়িত ভিত্তি হইল হেতু এবং সংগঠিত বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক।

(৬) ইব্‌ন সীনার ব্যবহৃত শব্দাবলী অত্যন্ত ভাবসমৃদ্ধ ও সাবলীল, (ক) 'ইল্লাত ও মা'লূল-এর সহিত তুলনামূলকভাবে অধিকতর ঐতিহ্যগত শব্দ সাবাব ও মুসাব্বাব তাঁহার রচনায় প্রায়শই লক্ষিত হয়— কখনও কখনও শব্দতাত্ত্বিক ধারণায় ঃ হেতু, কখনও মাধ্যম অথবা উপলক্ষ, কখনও 'ইল্লাত ও সমার্থকরূপে। (খ) যদিও কার্যকর ও আনুষ্ঠানিক হেতুকে সব সময়ই ফা'ইলা ও সুরিয়্যা বলা হইয়াছে— বস্তুগত হেতু অন্যদিকে মাদ্দা-এর তুলনায় হায়ূলা (প্রথম বস্তু) নির্দেশ করে। শেষোক্ত শব্দটি অবশ্য কখনও কখনও (সাধারণত "দ্বিতীয় বস্তু"-রূপে, ইতোমধ্যে যাহার রূপ লাভ ঘটিয়াছে), 'উন্‌সূর (মৌলিক)-এর সহিত "প্রথম আধার" (আল-'ইল্লাতু'ল-'উনসূরিয়্যা, এই বাক্যটি আল-কিন্দীর রচনাতে বর্তমান) অর্থে ব্যবহৃত হয়। চূড়ান্ত হেতুকে বলা হইয়াছে গা'ইয়া, তবে তামামিয়্যা শব্দটিকে পরিহার করা হয় নাই। (গ) দীর্ঘ বর্ণনার মাধ্যমে নিম্নোক্ত হেতুসমূহকে পৃথকীকরণ করা হইয়াছে (নাজাত, ঐ) ঃ (বি'য-যাত হেতু), আকস্মিক (বি'ল-'আরাদ) হেতু, সন্নিকটস্থ (ক'ারীবা) হেতু ও দূরবর্তী (বা'ঈদা) হেতু, নির্দিষ্ট হেতু (জুয'ইয়্যা), সাধারণ ('আম্মা) অথবা সার্বজনীন (কুল্লিয়্যা) হেতু, গ্রহণশীল (কাবিলা) হেতু ও বর্জনশীল হেতু। ইব্‌ন সীনার হেতু সম্পর্কিত তত্ত্বাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক প্রয়োগ পাওয়া যায় শিফা' (সম্পা. এফ. রহ্‌মান, অক্সফোর্ড, ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ২২৮-৯)-এর কিতাবু'ন-নাফ্‌স-এ। ইহাতে মন্তব্য করা হইয়াছে, দেহ ও আত্মার পারস্পরিক সম্পর্কটি হেতু ও সংঘটিত বস্তুর মধ্যকার সম্পর্কের সহিত তুলনীয় নয়। দেহ কেবল আত্মার গ্রাহী ও আকস্মিক হেতু হইতে পারে এবং অপরপক্ষে আত্মাও অস্তিত্ব লাভ করে কেবল পৃথক হেতু (আল-'ইলালু'ল-মুফারিকা)-এর মাধ্যমে।

ইব্‌ন সীনার বিশ্লেষণসমূহের সহিত শিহাবু'দ-দীন সুহ্‌রাওয়ারদীর প্রাসঙ্গিক ধারণাসমূহের তুলনাটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, বিশেষত তাঁহার কিতাবু হিক্‌মাতি'ল-ইশ্‌রাক (সম্পা. A. Corbin, প্যারিস-তেহরান ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৬২-৩, ৯১, ৯৪-৬, ১৪৭-৮, ১৮৪, ১৮৬, ১৯৫); ভিত্তি হিসাবে উভয়ের ধারণাসমূহ সদৃশ, কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি অধিকতর মৌলিক; তিনি এরিস্টোটলীয় উৎসসমূহ পরিস্ফুট করিয়াছেন এবং উৎসারণ তত্ত্ব (ও জ্যোতির্বিদ হইতে ইহার আগমন) ও হেতুর ধারণার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন। ইহা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে 'প্রবাহী' (ফায়্যাদা) হেতু "জ্যোতি প্রদানকারী (নূরিয়্যা) হেতু" ও অস্তিত্বশীল জ্যোতিপ্রদ (উজূদিয়্যা নূরিয়্যা) হেতু (১৯৫) শব্দসমূহের। 'ইল্লা এই ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে প্রভাবশীল জ্যোতি প্রবাহরূপে যাহাতে হেতু এবং সংঘটিত বস্তুর সম্পর্ক বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্যে ('আক্‌লী) উপলব্ধি হয়; তবে তাহা অস্থায়ী নহে, হেতু এবং সংঘটিত বস্তু উভয়ই একই সময়ে বিরাজমান" (৬৩)।

এখন যদি আমরা পশ্চিমী ফালসাফার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তবে দেখা যায়, এই ক্ষেত্রেও হেতুসমূহ ('ইল্লাত) ও কার্যকারণবাদের প্রায়শই ব্যবহার হইয়াছে এবং এই প্রসঙ্গে ভাব ও শব্দাবলী সুপ্রতিষ্ঠিত। এইভাবে দেখা যায়, ইব্‌ন রুশদের রচনাবলী হইতে হেতুবাদ প্রসঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা যায়। ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁহার রচিত এরিস্টোটল সম্পর্কিত পর্যালোচনা এবং তাহাফুতু'ত-তাহাফুত গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি বিশ্বের নিত্যতা প্রসঙ্গে আল-গাযালীকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন (সম্পা. Boyges, বৈরূত ১৯৩০ খৃ., পৃ. ৪ প., তু. ইংরেজী অনু. S. Van den Bergh, লন্ডন ১৯৫৪ খৃ., ১খ, ৩ প.)। এরিস্টোটলীয় চারিটি হেতু প্রসঙ্গে ইব্‌ন রুশ্‌দ মন্তব্য করিয়াছেন, হেতু সম্পর্কিত মূল ধারণাটিই সাদৃশ্যমূলক এবং কেবল কার্যকরী হেতুবাদ বিশ্বের সৃষ্টির হেতুমূলক প্রথম হেতুর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি আরও গুরুত্ব আরোপ করেন, প্রত্যক্ষ হেতু ও বি'য-যাত হেতু প্রসঙ্গে হেতু পরম্পরায় অসীম পশ্চাদগমন অসম্ভব অর্থাৎ "সকল হেতুই ইহা হইতে সৃষ্ট সকল অস্তিত্বের জন্য একটি পূর্ব-শর্ত।" তবে এই পশ্চাৎগমন আকস্মিক ও চক্রাকারে (গ্রথিত) হেতুর জন্য অসম্ভব নয়। এইসঙ্গে যোগ করা প্রয়োজন যে, ইব্‌ন রুশ্‌দ যতই তাঁহার প্রাচ্য (মাগরিবী) ও পূর্ববর্তিগণের নব্য-প্লেটোবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন ততই তিনি অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত হেতুর প্রশ্নে ঐতিহাসিক এরিস্টোটলের নিকটবর্তী হইয়াছেন।

৩। **'ইল্‌মু'ল-কালাম ঃ** শুরুতে হেতুতত্ত্ব সম্পর্কে 'ইল্‌মু'ল-কালামে তেমন কোন আলোচনা হয় নাই। প্রাথমিক অবস্থায় হেতুর ধারণাটিকে

'ইলাল অর্থ দ্বারা প্রকাশ না করিয়া আসবাব শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হইত। মূলত সমস্যাটি প্রথম ও দ্বিতীয় হেতুর সম্পর্কগত নয়, বরং ইহা আরব্ধ কর্ম, বিশেষত মানবীয় কর্মের সৃষ্টি। মু'তাযিলী, আশ'আরী ও হানাফী-মাতুরীদী চিন্তাবিদগণের প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তব্য আমাদের পরিজ্ঞাত (দ্র. আল্লাহ, ২ খ, B)। মু'তাযিলীগণ বলেন, স্বীয় ক্রিয়ার উপর সৃষ্ট-কর্ম সম্পাদনকারীর কার্যকারিতা দ্বিতীয়টি (মুসাব্বাব)-এর উপর প্রথমটি (সাবাব)-এর অন্তর্নিহিত প্রভাব ছাড়াই আল্লাহ কর্তৃক সরাসরিভাবে সৃষ্ট। অপরপক্ষে অন্যান্য মতবাদে প্রধান ধারা সাবাব ও মুসাব্বাবের অপ্রয়োজনীয় পরম্পরার সাথে মুক্ত।

তাহাফুতু'ল-ফালাসিফাতে প্রাচ্য ফালসাফার বিরোধিতা করার জন্য আল-গাযালী (র) হেতু সংগঠিত বস্তু সম্পর্কে ইহার ধারণা ও শব্দাবলী ব্যবহার করিতে বাধ্য হন। একই প্রভাবের ফলে 'ইল্লাত, 'ইল্লিয়্যাত, মা'লূল ও মালূলিয়্যা শব্দসমূহের ব্যবহার পরবর্তীকালে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, সাধারণভাবে "দর্শনতত্ত্ব ভিত্তিক মুখবন্ধে- 'শেষ দিকে। এইরূপ একটি উদাহরণ হইতেছে ফাখ্‌রু'দ-দীন আর-রাযীর (কায়রো তা. বি.) মুহাস্‌সাল, ইহাতে চারটি হেতু বর্ণিত হইয়াছে (৮৯-৯০) এবং একটি পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণভাবে "হেতু ও সংগঠিত বস্তু" প্রসঙ্গে নিবেদিত (১০৪-৬)। 'আদুদু'দ-দীন আল-ঈজীর মাওয়াকিফ এবং ইহার প্রসঙ্গে আল-জুরজানী এই বিষয় সম্পর্কে নিম্নলিখিত আলোচনা করিয়াছেন (শারহু'ল মাওয়াকিফ, সম্পা. কায়রো ১৩২৫/১৯০৭, ৪খ, ৯৮-২০১)। ইহাতে হেতু সম্পর্কে বিশ্লেষণ এবং হেতু ও সংগঠিত বস্তুর মধ্যকার সম্পর্ক প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ আলোচনা রহিয়াছে। এখানে প্রাধান্য প্রাপ্ত ধারণাটি হইতেছে 'হেতু' কেবল তাহাদের প্রতিক্রিয়ার 'শর্ত' (শারত) এবং দ্বিতীয় সত্তায় প্রথমটির কোন ফলপ্রদ প্রভাব (তা'ছীর) থাকিতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আল-জুরজানী তাঁহার তা'রীফাত (সম্পা. Flugel, Leipzig ১৮৪৫ খৃ., পৃ. ১৬০ ও ১২১)-এ তা'ছীরের উল্লেখ বা অনুল্লেখের মাধ্যমেই 'ইল্লাত ও সাবাব-এর ধারণার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন।

পরবর্তী কালে শব্দ ব্যবহারে এই যথার্থতা আর রক্ষিত হয় নাই এবং 'ইল্লাত শব্দটির মোটের উপর ব্যবহারিক প্রয়োগ কমিয়া আসে। ইব্‌ন খালদূনের মুকাদ্দিমায় শুধু আসবাব সম্পর্কে উল্লেখ রহিয়াছে। সমসাময়িক গ্রন্থাবলী, বিশেষত তেলেমসেন-এর আস-সানূসীর মুকাদ্দিমাত অথবা আল-বাজূরীর হাশিয়া (...) 'আলা জাওহারাতি'ত-তাওহীদ, মু'তাযিলাপন্থী ও ফালাসিফাগণকে শিরকু'ল-আসবাব-এর অভিযোগে অভিযুক্ত করেন (প্রথমোক্তগণের তুলনায় শেষোক্তজনদের অধিক তীব্রভাবে)। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র শানে হেতুসমূহকে জড়িত করা ইহার কারণ (দ্র. মুকাদ্দিমাত, সম্পা. ও অনু. Luciani, আলজিয়ার্স ১৯০৮ খৃ., পৃ. ৯২-৫, ১০৮-১৩)। আসবাব-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় নাই, কিন্তু যে সমস্ত 'প্রতিক্রিয়া'র সহিত "সাধারণত ইহাদের সংযুক্ত করা হয়" উহাদের উপর ইহার কোন কার্যকরী প্রভাব নাই ('আদামু তা'ছীরিহা)

সংগঠিত বস্তুর উপর হেতুর তা'ছীর-এর সম্ভাব্যতার সমর্থনকে আশ'আরীপন্থিগণ আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় বিরোধী হিসাবে অন্ততপক্ষে তাঁহার ক্ষমতা সংকোচনকারীরূপে বিবেচনা করে, এমনকি মু'তাযিলাপন্থিগণের মতে যখন ইহা কোন শক্তির মধ্যে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট "প্রারম্ভিক শক্তি"র ফল (কুদ্‌রাতু হাদিছা), তখনও তাহাদের মতামত অপরিবর্তিত থাকে। এই দৃঢ় মনোভাব মানব স্বাধীনতার জন্য গুরুতর পরিণতির সৃষ্টি করে এবং ইহার অনুসারিগণকে এই স্বাধীনতা পরিহারের উপদেশ প্রদান করে। তবে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, উহার উৎপত্তির মূলে একটি ভুল ব্যাখ্যা রহিয়াছে কি না। একদিকে রহিয়াছে ইব্‌ন সীনার হেতুতত্ত্ব ও কার্যকারণ সম্পর্ক সম্পর্কিত বিশ্লেষণ, অপরপক্ষে রহিয়াছে সৃষ্টিকারী উৎসারণ-এর প্রভাবিত বিশ্বের ধারণা— যাহা প্রথম সত্তায় ইচ্ছানুযায়ী সংঘটিত এবং যাহা অপরিহার্য বিধায় চিরস্থায়ী। ইব্‌ন সীনাার ধারণায় আমরা দেখিয়াছি, বাস্তব ক্ষেত্রে একটি হেতু তাহার অন্তর্নিহিত কার্যকারিতার কারণে স্বীয় প্রভাব সৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারে না এবং ইহাকে পোষণও করিতে পারে না। তাঁহার মতে ইহা বিশ্বের সহিত আল্লাহ্‌র সম্পর্কের প্রসঙ্গে সত্য এবং দ্বিতীয় হেতুসমূহের কার্যক্রমের বেলায়ও সমভাবে সত্য— যাহা তাঁহার মতে একটি অবাধ অস্তিত্ববাদ সংক্রান্ত নিমিত্তবাদের অংশবিশেষ। পরিণামে ইহাতে স্বীকার করা হয় সংগঠিত বস্তুর উপর হেতুর প্রভাব এবং অস্বীকার করা হয় মুতাকাল্লিমগণের দৃষ্টিভঙ্গিজাত ঐশী শক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ও শক্তিকে। হেতুগত সম্পর্কের অন্তর্নিহিত বাস্তবতা ও সৃষ্ট কর্মে আল্লাহ্‌র স্বাধীনতা— এই দুইটি বিষয়ের আলোচনা একই সঙ্গে রুদ্ধ হইয়া গেল বিভিন্ন মতবাদের বেড়াজালে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে দ্রষ্টব্য।

L. Gardet (E.I.²) / আবদুল বাসেত

**'ইল্লায়্শ** (عليش) ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ মিসরের এক সময়ের মালিকী মুফ্‌তী এবং ১৮৮২ খৃ. বৃটেন কর্তৃক মিসর দখলের পূর্বে যেইসব ঘটনা-প্রবাহের সৃষ্টি হয়, তিনি উহার অন্যতম নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি মরক্কোর বংশোদ্ভূত এক পরিবারে কায়রোয় জন্মগ্রহণ করেন (রাজাব ১২১৭/অক্টোবর-নভেম্বর ১৮০২)। আল-আযহার (দ্র.)-এ শিক্ষা গ্রহণের পর ১২১৩/১৮১৬-৭ সাল হইতে ১২৪৫/১৮২৯-৩০ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষকতায় নিযুক্ত থাকেন। ঐ সময় একই সঙ্গে তিনি হুসায়ন মসজিদেও শিক্ষা দান করিতেন। তিনি ১২৭০/১৮৫৪ সনে মুহাম্মাদ হুবায়্শ-এর স্থলাভিষিক্ত হইয়া শায়খু'স-সাদা আল-মালিকিয়্যা (شيخ السادة المالكية) (দ্র.) পদে নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু ঐ পদে নিয়োজিত থাকেন। একই সঙ্গে তিনি শাযিলিয়্যা (দ্র.) তারীকার তথা আল-আরাবিয়্যার শীর্ষ নেতৃত্বপদে আসীন ছিলেন। মুহাম্মাদ আল-আমীরু'ল-কাবীর ও মুহাম্মাদ আল-আমীরু'স-সাগীর-এর মত আল-আযহারের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ এই পদে তাঁহার পূর্বসূরী ছিলেন।

অবশ্য ইসলামের একটি বিশেষ সূফীবাদী ধারণার অনুসারী হইলেও তাঁহার রচনাবলীতে তাঁহার প্রকাশ ঘটিয়াছে বড়জোর আকস্মিকভাবে। আর এই লেখাগুলির পরিসরে আলোচিত হইয়াছে মুসলিম জ্ঞানচর্চার চিরাচরিত বিষয়গুলি। এই ক্ষেত্রে তাঁহার ফাতহু'ল-'আলিয়্যি'ল-মালিক ফি'ল-ফাতওয়া 'আলা মাযহাবি'ল-ইমাম মালিক (فتح العلى المالك فى الفتوى على مذهب الامام مالك) কায়রো ১৩১৯/১৯০১-২, ১খ, ৫) নামক গ্রন্থটির কথা নজীর হিসাবে উল্লেখ করা যায়। এই গ্রন্থে তিনি আন-নূরু'ল-মুহাম্মাদী (দ্র.) তত্ত্বের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন। শায়খ মুহাম্মাদ আল-মাহদী আল-'আব্বাসী আল-আযহার-এ যেইসব সংস্কার প্রবর্তন করেন তিনি সেইগুলির বিরোধী ছিলেন। শায়খ মুহাম্মাদ আল-মাহদীকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের আন্দোলনের ফলে মুহাম্মাদ

আল-ইম্বাবী আল-আযহারের শায়খ হিসাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। এই আন্দোলন চলাকালে আল-'আব্বাসীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য মুহাম্মাদ 'ইল্লায়শ আযহারী 'উলামা'র ও ছাত্রদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রার্থীতে পরিণত হন। 'উরাবিয়্যূন (দ্র. 'উরাবী) আন্দোলনে তাঁহার সক্রিয় অংশ গ্রহণ, তাহাদের সপক্ষে তাঁহার সক্রিয় সহযোগিতা ও বৃটিশ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলায় তাঁহার প্রচেষ্টা ও সকলের আগে তাঁহার জিহাদের আহ্বান ইত্যাদি কারণে ১৮৮২ খৃ. বৃটিশ বাহিনী কর্তৃক কায়রো দখলের পর তাঁহাকে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করা হয়। তিনি ৯ যু'ল-হি'জ্জা, ১২৯৯/২২ অক্টোবর, ১৮৮২-তে কারাগারে ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ জীবনীর জন্য দ্র. (১) 'আলী মুবারাক, খিতাত, ৪খ, ৪১-৪৪; (২) ইল্‌য়াস যাখূরা, মির্'আতু'ল-'আস্‌র ফী তা'রীখ ওয়া রুসূম আকাবির রিজাল মিস্‌র, ১খ, ১৯৬ প.; (৩) খায়রু'দ-দীন আয-যিরিক্‌লী, আল-আ'লাম, ৬খ, ২৪৪; ও (৪) মুহাম্মাদ 'ইল্লায়শ প্রণীত ফাতহু'ল-'আলিয়্যি'ল-মালিক ফি'ল-ফাতওয়া 'আলা মাযহাবি'ল-ইমাম মালিক-এর মুখবন্ধ, ২ খণ্ডে, কায়রো ১৩১৯-২১/১৯০১-৪। আরও দ্র. (৫) আবু'ল-ওয়াফা' আল-মারাগী, মিন্ আ'লামি'ল-মালিকিয়্যা আল-মিস্‌রিয়া, আল-হাদয়ি'ল-ইসলামীতে, বায়দা', ৮/১খ., (মার্চ ১৯৬৯ খৃ.), ৭৬-৮। মুহাম্মাদ 'ইল্লায়শ-এর নেতৃত্বে আল-'আরাবিয়্যা আশ-শাযিলিয়্যার অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দ্র. (৬) F. de Jong, Turuq and Turuq-linked institutions in 19th century Egypt, লাইডেন ১৯৭৮ খৃ., পৃ. ১১৩-১৪। অতিরিক্ত জীবনী সংক্রান্ত তথ্যের জন্য দ্র. (৭) 'আলী মুবারাক, খিতাত, ৮খ, ৭৪; (৮) আমীন সামী, তাকবীমু'ন-নীল, ৩খ, ২য় ভাগ, ৫১৯ প.; (৯) মুহাম্মাদ রাশীদ রিদা, তা'রীখু'ল-উসতাযি আল-ইমাম, ১খ, ১৩৩ প.; (১০) আহমাদ শাফীক, মুযাক্কিরাতী ফী নিস্‌ফ কারন, ১খ, ১৫২, ১৭৮; (১১) মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-জাওয়াদ আল-কায়াতী, নাফহাতু'ল-বিশাম ফী রিহলাতি'শ-শাম, কায়রো ১৩১৯/১৯০১-২, পৃ. ৬ প. এবং (১২) সুলায়মান আল-হানাফী আয-যায়্যাতী, কানযু'ল-জাওহার ফী তারীখি'ল-আযহার, কায়রো, তা. বি., পৃ. ১৬২ প.।

F. de Jong (E.I.[2] Suppl.)/আফতাব হোসেন

**ইল্লিয়্যূন** (علـيـون) ঃ উক্ত শব্দটির পবিত্র কু'রআনে দুইবার উল্লেখ রহিয়াছে ঃ

كَلاَّ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ. وَمَا اَدْرٰكَ مَا عِلِّيُّوْنَ

অবশ্যই নেক ব্যক্তিদের আমলনামা ইল্লিয়্যূনে রহিয়াছে। আপনি কি অবহিত আছেন 'ইল্লিয়্যূন কী?" (৮৩ ঃ ১৮-১৯)

সাধারণত উহা দ্বারা সপ্তম আকাশ বুঝায় অথবা এমন একটি বিভাগ যেইখানে সৎ লোকদের সৎ কর্মসমূহ রেকর্ড (লিপিবদ্ধ) করা হয়। উহার বিভিন্ন বিশ্লেষণের জন্য দ্র. Lane, Lexicon, পৃ. ২১২৫ ও ২১৪৭ এবং উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীর গ্রন্থসমূহ (বিশেষত তাফসীর মাওয়াহিবি'র-রাহমান-এ লিপিবদ্ধ উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীর)। উক্ত শব্দটিকে বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত শব্দ মনে করা হয় এবং ইহা এমন একটি বহুবচনমূলক শব্দ, যাহার এক বচন নাই। (কোন কোন তাফসীরকারের মতে ইহা জান্নাতবাসীদের নাম। যদি উহাকে বহুবচনবাচক শব্দ মনে করা হয় তবে ইহা মানুষের জন্য নির্দিষ্ট। ইহার অর্থ হইবে, সৎ ও পুণ্যবান লোকগণও 'ইল্লিয়্যূনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ পবিত্র কু'রআনের তাফ্‌সীরসমূহে উক্ত শব্দের ব্যাখ্যা দ্র.।

L. H. Weir (E.I.[2])/আবদুল আওয়াল

**ইল্লিয়্যূন** (عِلِّيُّوْنَ) ঃ শব্দটি علو হইতে গঠিত যাহার অর্থ উঁচু ও উন্নত। বলা বাহুল্য, যে জিনিস যত বেশি উন্নত ও উঁচু উহা তত বড় ও মহৎ। তাই আল্লাহ্ তা'আলা عليون-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়া বলেন, وَمَا اَدْرٰكَ مَا عِلِّيُّوْنَ-ইল্লিয়্যূন সম্পর্কে তুমি কি জান? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ। পুণ্যবানদের চিহ্নিত আমলনামা। আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ উহা দেখে। আ'মাশ (র) হিলাল ইবন য়াসাফ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হিলাল ইব্‌ন য়াসাফ (র) বলেন, ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) আমার উপস্থিতিতে কা'ব (রা)-কে সিজ্জীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন; উত্তরে তিনি বলিলেন, উহা সপ্তম যমীন। কাফিরদের আত্মা সেথায় অবস্থান করে। আর 'ইল্লিয়্যূন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, উহা সপ্তম আকাশ। সেথায় ঈমানদারদের আত্মা অবস্থান করে। 'আলী ইব্‌ন আবী তালহা (র) ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 'ইল্লিয়্যীন দ্বারা উদ্দেশ্য হইল জান্নাত। (ইব্‌ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আজীম, ৪খ., পৃ. ৫৮৯-৫৯০)। ইমাম ফার্‌রা (র) বলেন, عِلِّيُّوْنَ ارْتِفَاعٌ بَعْدَ ارْتِفَاعٍ 'ইল্লিয়্যূন হইল মর্যাদা ও উচ্চতার শীর্ষ স্থান। তিনি আরও বলেন, ইহা বহু বচনের রূপে একটি স্থানের নাম। ইহার কোন এক বচন নাই। ঠিক عشرون ও ثلاثون -এর অনুরূপ। আরববাসিগণ যখন এমন কোন বহুবচন ব্যবহার করেন যাহার এক বচন ও দ্বিবচন নাই, তখন তাঁহারা স্ত্রী লিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রে –واو نون ব্যবহার করেন। عليون মূলত তদ্রূপ একটি শব্দ। যাজ্জাজ (র) বলেন, বহুবচনের ই'রাব (শব্দের শেষ বর্ণের স্বরচিহ্নগত পরিবর্তন) 'ইল্লিয়্যূনের ই'রাব হইবে। যেমন هٰذِهٖ قِنَّسْرُوْنَ وَ رَأَيْتُ قِنَّسْرِيْنَ ইত্যাদি। নাহু শাস্ত্রবিদ য়ূনুস বলেন, তাহার এক বচন হইল عِلِّيَّةٌ + عِلِّىٌّ - আর আবু'ল ফাত্‌হ (র) বলেন, عليون হইল على -এর বহুবচন। ইব্‌নু'ল আছীর (র) বলেন, 'ইল্লিয়্যূন হইল সপ্তাকাশের নাম। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, هولوح زبرجد خضراء معلق تحت العرش اعمالهم مكتوبة فيها 'ইল্লিয়্যূন হইতেছে সবুজ পান্নার একটি ফলক, সেটি 'আরশের নীচে ঝুলন্ত। তাহাতে মু'মিনদের 'আমলনামা লিপিবদ্ধ করা হয়। ইহারই ভিত্তিতে বলা হয় 'ইল্লিয়্যূন এমন এক রেজিস্টার যাহাতে ফেরেশতা, জিন্ন ও মানব জাতির সৎ কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয় (ইমাম কুরতুবী, আল জামি' লি আহকামিল-কুরআন, ১৯ খ., পৃ. ১৭৮; ইবন মানজূর, লিসানু'ল-'আরাব, ৬খ, পৃ. ৪৩০)। কা'ব (রা) ও কাতাদা (রা) বলেন, 'আরশের ডান পাশের খুঁটি। যাহ্‌হাক (র) বলেন, সিদ্‌রাতুল-মুন্‌তাহা। যাজ্জাজ (র) বলেন, اعلى الامكنة-'ইল্লিয়্যূন হইল সর্বোচ্চ স্থান। আবূ ইস্‌হাক (র) لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, في اعلى الامكنة। সর্বোচ্চ স্থানে। কা'ব (রা) বলেন, 'ইল্লিয়্যূন হইল সপ্তাকাশ যাহাতে মু'মিনগণের রূহ রহিয়াছে। মুজাহিদ ও ইব্‌ন যায়দ (র)-এর মত ইহাই। (কাদী ছানাউল্লাহ, আত্-তাফসীরু'ল-মাযহারী, ১০খ., ২২২-২৩; ইবনু'ল-জাওযী, যাদুল মাসীর ফী'ইলমিত-তাফসীর, ৮খ., পৃ. ২২২)।

ইবনুল মুবারক (র) ইব্ন হাবীব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র বান্দাদের 'আমল লইয়া উপরে উঠেন। তাঁহারা এই 'আমলকে উত্তম মনে করত ইহার প্রশংসা করেন। অনন্তর আল্লাহ্ যতটুকু চাহেন, সেখানে তাহারা পৌঁছেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা আমার বান্দার 'আমলের সংরক্ষক আর আমি আমার বান্দার মনের নিয়ন্ত্রক। তাহার 'আমল আমার জন্য খালিস ছিল না। তাই তোমরা তাহাকে সিজ্জীনে রাখ। ফেরেশতাগণ আরেক বান্দার 'আমল লইয়া উপরে উঠেন। তাহারা ইহাকে তুচ্ছ মনে করেন। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা যতটুকু চাহেন সেখানে তাঁহারা পৌঁছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা আমার বান্দার আমলের সংরক্ষক আর আমি আমার বান্দার মনের নিয়ন্ত্রক। আমার এই বান্দা একনিষ্ঠভাবে আমার সন্তুষ্টির জন্য 'আমল করিয়াছে। সুতরাং তাহাকে 'ইল্লিয়্যীনে রাখ। (আল্লামা আলূসী রূহু'ল মা'আনী, ১৫খ., পৃ. ৮৪-৮৫)। কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন রূহ কব্যকারী ফেরেশতাগণ মু'মিনের রূহ লইয়া যান, তখন প্রতিটি আসমানের নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ তাহাদের সহযাত্রী হন। সপ্তম আসমানে পৌঁছিয়া যখন রূহ যথাস্থানে রাখা হয় তখন সমাগত ফেরেশতাগণ তাহার 'আমলনামা পাঠ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। অনন্তর 'আমলনামা তাহাদেরকে দেখানো হয়। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫)। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, যখন ঈমানদার ও নেককার ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসে, তখন রহ্মতের ফেরেশতা, যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের নূর বর্ষিত হইতে থাকে, তাঁহারা কাছে আসিয়া উপবিষ্ট হন। আর অত্যন্ত নম্র ভাষায় রূহকে ডাক দিয়া বলেন, "চল ! আল্লাহ তা'আলার রহ্মত ও মাগফিরাতের দিকে, বাগ-বাগিচার দিকে, আনন্দ-উল্লাসের দিকে। তখন রূহ সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসে এবং তাহাদের সহিত উপরের দিকে চলিয়া যায় এবং ঐ রূহ যে পথ অতিক্রম করে তাহার চতুর্দিকে সুগন্ধ ছড়াইয়া পড়ে। ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইহা কাহার সুগন্ধময় নূরানী রূহ ? তখন অত্যন্ত সম্মানের সহিত ঐ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়। (ইদরীস কান্ধলাবী, মা'আরিফুল কুরআন, ৭খ, পৃ. ৫১৯)

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন। যদি সে ব্যক্তি নেককার হয়, ফেরেশতাগণ বলেন, বাহির হইয়া আস, হে পবিত্র দেহে অবস্থানকারী পবিত্র প্রাণ ! বাহির হইয়া আস প্রশংসার সাথে এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর সুখ-শান্তি ও সুখাদ্যের এবং তোমার প্রতি প্রভু পরওয়ারদিগার যে রোষহীন তাহার। এভাবে তাহাকে বলা হইতে থাকিবে, যাবৎ না উহা বাহির হইয়া আসে। অতঃপর উহাকে আসমানের দিকে উত্থিত করা হয়, তখন খুলিয়া দেওয়া হয় তাহার জন্য আসমানের দরজা এবং জিজ্ঞাসা করা হয়, উনি কে ? ফেরেশতাগণ বলেন, অমুক। তখন বলা হয়, মারহাবা ! হে পবিত্র প্রাণ যাহা পবিত্র দেহে ছিলে ! প্রবেশ কর প্রশংসার সাথে এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর সুখ-শান্তি, সুখাদ্য ও তোমার প্রতি প্রভু পরওয়ারদিগার যে রোষহীন তাহার। এভাবে বলা হইতে থাকে, যাবৎ না সেই আসমানে উপনীত হয়, যাহাতে আল্লাহ্ রহিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মু'মিনের যখন মৃত্যু আসন্ন হয়, রহমতের ফেরেশতাগণ সাদা রেশমী কাপড় লইয়া তাহার নিকট আসেন এবং বলেন, (হে রূহ !) বাহির হইয়া আস আল্লাহ্র নির্ধারিত সুখ-শান্তি, সুখাদ্য ও রোষহীন প্রভু পরওয়ারদিগারের দিকে, তুমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। তখন রূহ বাহির হইয়া আসে মিশকের সুগন্ধি অপেক্ষাও উত্তম সুগন্ধি সহকারে, আর ফেরেশতাগণ তাহাকে হাতে হাতে গ্রহণ করিতে থাকেন, যাবৎ না তাহাকে লইয়া আসমানের দরজায় পৌঁছেন। তখন ফেরেশতাগণ (উপরের ফেরেশতাগণকে) বলেন, লও, কী উত্তম সুগন্ধি তোমাদের নিকট আসিয়াছে যমীনের দিক হইতে ! তখন তাঁহারা তাহাকে লইয়া মু'মিনগণের রূহ্'সমূহের নিকট পৌঁছেন। মু'মিনগণ তাহাকে পাইয়া তোমাদের কাহারও দূর দেশে অবস্থানকারী আত্মীয়ের আগমনের আনন্দ অপেক্ষাও অধিকতর আনন্দিত হন। তখন মু'মিনগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, অমুকের কী অবস্থা, আর অমুকের কী অবস্থা ? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, তাহাকে প্রশ্ন করা ত্যাগ কর। সে দুনিয়ার কষ্টে ছিল, (এখন তাহাকে স্বস্তি দাও !) প্রশ্নের উত্তরে সে বলিবে, অমুক তো মরিয়া গিয়াছে। তোমাদের নিকট কি আসে নাই? তখন তাঁহারা (মু'মিনগণ) বলিবেন, নিশ্চয় তাহাকে তাহার গন্তব্যস্থল হাবিয়া দোযখের দিকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। আর যখন কাফিরের মৃত্যু আসন্ন হয়, তাহার নিকট আযাবের ফেরেশতাগণ আসেন শক্ত চট লইয়া ও বলেন, বাহির হইয়া আস আল্লাহ্র আযাবের দিকে। তুমি আল্লাহ্র প্রতি বিরূপ ছিলে, তিনিও তোমার প্রতি বিরূপ। তখন উহারা বাহির হইয়া আসে সর্বাধিক দুর্গন্ধযুক্ত শবদেহের দুর্গন্ধ সহকারে এবং উহা লইয়া যান ফেরেশতাগণ যমীনের দরজার দিকে। তখন তাহারা বলেন, কী দুর্গন্ধময় ইহা ! অবশেষে উহাকে ফেরেশতাগণ লইয়া যান কাফিরদের রূহের নিকট সিজ্জীনে। (ইমাম নাসাঈ, আস্সুনান, ১খ., পৃ. ২০৩)। 'ইল্লিয়্যুন সম্পর্কে দীর্ঘ রিওয়ায়াতটি বারা ইবন 'আযিব (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা একবার নবী করীম (সা)-এর সহিত জনৈক আনসারীর জানাযায় গেলাম। আমরা কবরের নিকট গেলাম; কিন্তু তখনও কবর খনন করা হয় নাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসিয়া গেলেন এবং আমরাও এমনভাবে তাঁহার আশেপাশে বসিয়া গেলাম যেন আমাদের মাথায় পাখী বসিয়াছে (অর্থাৎ চুপচাপ)। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে একটি কাষ্ঠখণ্ড ছিল, যদ্বারা তিনি (নিশ্চিত ব্যক্তিদের ন্যায়) মাটিতে দাগ কাটিতেছিলেন। অতঃপর তিনি মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং বলিলেন ঃ আল্লাহ্র নিকটে কবর আযাব হইতে পানাহ্ চাও। তিনি উহা দুই কি তিনবার বলিলেন। তৎপর বলিলেন, মু'মিন বান্দা যখন দুনিয়া ত্যাগ করিতে এবং আখেরাতের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তাহার নিকট আসমান হইতে সূর্যের মত চেহারাবিশিষ্ট একদল ফেরেশতা আগমন করেন, তাহাদের সঙ্গে একটি বেহেশতীর কাফন থাকে এবং বেহেশতের এক রকম খোশবু থাকে। তাঁহারা তাহার নিকট হইতে দৃষ্টিসীমার দূরে বসেন। অতঃপর মালাকুল মউত আযরাঈল (আ) তাহার নিকটে আসেন এবং তাহার শিয়রের নিকট বসিয়া বলেন, হে পবিত্র রূহ্ ! বাহির হইয়া আস আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তোষের দিকে। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, তখন তাহার রূহ বাহির হইয়া আসে, যেমন মশক হইতে পানি বাহির হইয়া আসে (অর্থাৎ সহজে)। তখন মালাকুল মউত উহাকে গ্রহণ করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না বরং সকল অপেক্ষমাণ ফেরেশতা আসিয়া উহাকে গ্রহণ করেন এবং উহাকে ঐ কাফন ও ঐ খোশবুসহ রাখেন। তখন উহা হইতে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত খোশবু অপেক্ষা উত্তম মিশকের খোশবু বাহির হইতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)

বলেন, উহাকে লইয়া ফিরিশতাগণ উপরে উঠিতে থাকেন এবং যখনই তাহারা কোন ফেরেশতাদলের নিকট পৌঁছেন, তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করেন, এই পবিত্র রূহ কাহার ? তখন তাঁহারা দুনিয়াতে তাহাকে লোকেরা যে সকল উপাধি দ্বারা ভূষিত করিত, সে সকলের মধ্যে উত্তমটি দ্বারা ভূষিত করিয়া বলেন, ইহা অমুকের পুত্র, অমুকের রূহ, যাবৎ না তাঁহারা তাহাকে লইয়া প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন (এইরূপ প্রশ্নোত্তর চলিতে থাকিবে)। অতঃপর তাঁহারা আসমানের দরজা খুলিতে চাহেন, আর অমনি তাহাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। তখন প্রতি আসমানের সম্মানিত ফেরেশতাগণ তাঁহাদের পশ্চাৎগামী হন, উহার উপরের আসমান পর্যন্ত, যাবৎ না তাঁহারা সপ্তম আসমান পর্যন্ত গিয়া পৌঁছেন। এই সময় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দার ঠিকানা 'ইল্লিয়্যীনে লিপিবদ্ধ কর এবং তাহাকে (তাহার কবরে) যমীনে ফিরাইয়া লইয়া যাও ! কেননা আমি তাহাদেরকে যমীন হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং যমীনের দিকেই তাহাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করিব। অতঃপর যমীন হইতে আমি তাহাদেরকে পুনরায় নির্গত করিব (হাশরের মাঠে)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সুতরাং তাহার রূহ তাহার দেহে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তাহার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন এবং তাহাকে উঠাইয়া বসান, তৎপর তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার রব কে ? তখন সে উত্তর দেয়, আমার রব আল্লাহ্। অতঃপর তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দীন কি ? তখন সে বলে, আমার দীন হইল ইসলাম ! আবার তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন তিনি কে ? সে উত্তর দেয়, তিনি আল্লাহ্র রাসূল (সা)। পুনরায় তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি ইহা কি করিয়া জানিতে পারিলে ? সে বলে, আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়িয়াছি। অতঃপর তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি। তখন আসমানের দিক হইতে একজন ঘোষক ঘোষণা করবেন, আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে। সুতরাং তাহার জন্য বেহেশতের একটি ফরাশ বিছাইয়া দাও এবং তাহাকে বেহেশতের একটি পোশাক পরাইয়া দাও। এছাড়া তাহার জন্য বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দাও ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তখন তাহার প্রতি বেহেশতের সুখ-শান্তি ও বেহেশতের খোশবু আসিতে থাকে এবং তাহার জন্য তাহার কবর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অতঃপর তাহার নিকট এক সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট সুবেশী ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসে এবং তাহাকে বলে, তোমাকে সন্তুষ্টি দান করিবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ কর ! এই দিবসেরই তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হইয়াছিল। তখন সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কে ? তোমার চেহারা তো দেখিবার মত চেহারা, কল্যাণের বার্তা বহন করে। তখন সে বলে, আমি তোমার নেক আমল। তখন সে বলিবে, হে আল্লাহ্ ! কিয়ামত কায়েম কর ! হে আল্লাহ্ ! কিয়ামত কায়েম কর। হে আল্লাহ্ ! কিয়ামত কায়েম কর যাহাতে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের দিকে যাইতে পারি (অর্থাৎ হুর, গিলমান ও বেহেশতী সম্পদ তাড়াতাড়ি পাইতে পারি) (মিশকাত, পৃ. ১৪২)। 'আব্দ ইবন হুমায়দ (র) 'আজলাহ (র)-এর সূত্রে দাহ্হাক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, যখন মু'মিন বান্দার রূহ কবয করা হয় এবং তাহাকে লইয়া প্রথম আকাশে আরোহণ করা হয়, তখন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ তাহার সহিত দ্বিতীয় আকাশ পর্যন্ত চলিতে থাকেন। অতঃপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশ অতিক্রম করিয়া 'সিদ্রাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত গিয়া পৌঁছেন। 'আজলা (র) বলেন, আমি দাহ্হাক (রা)-কে 'সিদ্রাতুল মুনতাহা'-এর নামকরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি বলেন, 'সিদ্রাতুল মুনতাহা' হইল, যেখানে সব জিনিসের পরিসমাপ্তি ঘটে। ফেরেশতাগণ তখন বলিবেন, হে প্রতিপালক ! আপনার অমুক বান্দা, অথচ তিনি তাহাদের চেয়ে বেশী অবগত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কাছে তাহার শাস্তি হইতে নিষ্কৃতির একটি মোহ্রাঙ্কিত ফরমান প্রদান করিবেন। উহারই বিবরণ আসিয়াছে كَلَّا اِنَّ كِتَـابَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ —(কখনও নহে, নিশ্চয় সৎ লোকদের আমলনামা আছে 'ইল্লিয়্যীনে) আয়াতে কারীমায়। (ইমাম সুয়ূতী, আদ্-দুররুল মানছূর, ৮খ., পৃ. ৪৪৮)। ইবন জুরায়জ (র) হইতে ইবনুল মুনযির (র) আল্লাহ্র বাণী يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তাহারা প্রতিটি আকাশের নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা, যখন তাহাদের পাশ দিয়া মু'মিনদের 'আমল লইয়া অতিক্রম করেন, তখন প্রতিটি আকাশের নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ তাঁহার সঙ্গী হইয়া যান। অনন্তর 'আমল সপ্তম আকাশে পৌঁছে। অতঃপর ফেরেশতাগণের সম্মুখে সপ্তম আকাশে 'আমল লিপিবদ্ধ করা হয় (প্রাগুক্ত)। 'আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) খালিদ ইবন 'আর'আরা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, ইব্ন 'আব্বাস (রা) কা'ব (রা)-কে كلا ان كتاب الابرار لفى عليين আয়াতে কারীমা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন, মু'মিনের যখন মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসে এবং তাহার প্রভুর দূত তাহার নিকট উপস্থিত হয়, তখন ফেরেশতাগণ মৃত্যুর সময় অগ্রে বা পশ্চাতে নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন না। অনন্তর মৃত্যুর নির্ধারিত সময় আসে। যখন মৃত্যুর সময় আসে, তখন ফিরিশতাগণ তাহার রূহ্ কব্য করেন এবং রহমতের ফেরেশতাদের নিকট অর্পণ করেন। রহ্মতের ফেরেশতাগণ তাহাকে কল্যাণকর অনেক দৃশ্যাবলী প্রদর্শন করান। অতঃপর তাহার রূহ লইয়া আকাশে আরোহণ করেন। প্রতিটি আকাশের নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ তাহার সঙ্গে চলিতে থাকেন। অবশেষে তাহাকে লইয়া সপ্তম আকাশে পৌঁছেন। অতঃপর তাঁহারা (রহমতের ফেরেশতা) তাহাকে অন্য ফেরেশতাদের সম্মুখে রাখেন। তাহারা তাহার প্রতি তোমাদের দু'আর অপেক্ষা করেন না, বরং তাঁহারা নিজেরাই দু'আ করিতে থাকেন এবং বলিতে থাকেন, হে আল্লাহ্ ! ইনি তোমার অমুক বান্দা। আমরা তাহার রূহ কব্য করিয়াছি। আমরা আজ তাহার 'আমলনামা দেখিতে চাই। তখন আরশের নীচ হইতে তাহার 'আমলনামা উন্মুক্ত করা হইবে। তাহারা উহাতে তাহার নাম লিখিয়া দিবেন এবং তাহারা তাহার আমলনামা প্রত্যক্ষ করিবেন। উহারই বিবরণ আসিয়াছে كِتَـابٌ مَّرْقُوْمٌ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ (উহা চিহ্নিত আমলনামা। যাহারা আল্লাহ্র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করে।) আয়াতে কারীমায়। আদ্-দুররুল মানছূর, ৮খ., পৃ. ৪৪৯)। উম্মুদ-দারদা (রা) বলিয়াছেন, কুরআনের আয়াতের সংখ্যা হিসাবে বেহেশতের শ্রেণী নির্ধারিত হইবে। কুরআনের হাফিযকে বলা হইবে, পড়িতে থাক এবং উর্ধ্বে আরোহণ করিতে থাক। যদি সে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করে তাহা হইলে সে বেহেশতের একতৃতীয়াংশের উপরে থাকিবে। যদি সে কুরআনের অর্ধেক তিলাওয়াত করে, তাহা হইলে বেহেশতের অর্ধাংশের উপরে তাহার স্থান হইবে। আর যদি সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করে তাহা হইলে তাহার ঠিকানা হইবে على عليين। তথা বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থানে। সিদ্দীক ও শহীদগণের কেহ সেখানে পৌঁছিতে পারিবেন না। (আদ্ দুররুল মানছূর, ৮খ., পৃ. ৪৫০)। ইবন আবী শায়বা (র) আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন, 'ইল্লিয়্যীনবাসীদের জন্য একটি বাতায়ন রহিয়াছে যাহার মধ্য দিয়া তাহারা ঝুঁকিয়া দেখেন। যখন তাঁহাদের কেহ উঁকি মারিয়া দেখেন জান্নাত তখন উদ্ভাসিত হইয়া

উঠে। আর জান্নাতবাসিগণ বলিবেন যে, 'ইল্লিয়্যীনবাসীদের একজন উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন (প্রাগুক্ত)। ইবন আবী শায়বা (র) মুহাম্মদ ইবন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, বেহেশতে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় একটি জ্যোতি দেখা যায়। প্রশ্ন করা হয়, জ্যোতিটি কিসের? উত্তরে বলা হয়, 'ইল্লিয়্যীনবাসীদের একজন এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে যাইতেছেন (প্রাগুক্ত)। কা'ব আল আহ্বার (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'মিনের রূহ্ যখন কব্য করা হয়, তখন তাহাকে লইয়া আকাশে আরোহণ করা হয় এবং তাহার জন্য আকাশের দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। ফেরেশতাগণ তাহাকে স্বাগত জানান। অতঃপর তাঁহারা তাহার সহযাত্রী হন, অনন্তর তাহারা 'আরশ পর্যন্ত গিয়া পৌঁছেন। ইহার পর তাহাদের জন্য 'আরশের নীচ হইতে একটি কাগজ বাহির হয় এবং তাহাতে লেখা হয় এবং উহাতে কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ হইতে নিষ্কৃতির মোহর মারিয়া দেওয়া হয়। ফেরেশতাগণ তাহা প্রত্যক্ষ করেন। (কুরতুবী, আহকামুল কুরআন, ১৯খ., পৃ. ১৯৭)।

**মৃত্যুর পর রূহের স্থান কোথায় ?**

'আবদুর রহমান ইবন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত আছে, মু'মিনের রূহ পাখী হইয়া বেহেশতের গাছে ঝুলিয়া থাকিবে। অন্য বর্ণনায় আছে, মু'মিনের রূহ সবুজ পাখীর মধ্যে হইবে এবং বেহেশতের ফল খাইবে। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মু'মিন, কাফির সকলের রূহ কবরে থাকিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মি'রাজের রজনীতে মূসা (আ)-কে তাঁহার কবরে নামাযরত অবস্থায় দেখিয়াছেন। এমনিভাবে তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের পাশে দাঁড়াইয়া আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, আমি তাহা শুনিতে পাই। আর যে দূরে থাকিয়া আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, তাহা আমার কাছে পৌঁছানো হয়। আর এক বর্ণনায় আসিয়াছে, মু'মিনের রূহ থাকিবে 'ইল্লিয়্যীনে আর কাফিরের রূহ থাকিবে সিজ্জীনে। এই রিওয়ায়তগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। ইহার সামঞ্জস্য বিধান কিভাবে সম্ভব ? উত্তর ঃ উপরে বর্ণিত রিওয়ায়াতগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব এইভাবে যে, মু'মিনদের রূহের অবস্থানস্থল হইল 'ইল্লিয়্যীনে অথবা সপ্তম আকাশে ইত্যাদি যেমনটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। আর কাফিরদের রূহের স্থান হইল সিজ্জীন। তবে প্রত্যেক রূহেরই তাহার কবরস্থ দেহের সহিত সম্পর্ক থাকে। আর ইহা কিভাবে তাহা কেবল আল্লাহ তা'আলা জানেন। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে ইহা সম্ভব যে, দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে যে মানুষ গঠিত, তাহার সামনে জান্নাত বা জাহান্নামের যে স্থানে সে থাকিবে উহা পেশ করা হইবে। সে উহার আরাম বা কষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবে, সে যিয়ারতকারীর সালাম শুনিতে পাইবে। মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের সে জবাব দিতে সক্ষম হইবে। অনুরূপ আরও যাহা কিছু কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, জিবরীল (আ)-এর অবস্থান স্থল হইল আসমান, কিন্তু তথাপি তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সান্নিধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং তাহা এতই কাছে যে, কখনও নবী করীম (সা)-এর উরুর উপর তিনি তাঁহার হাত রাখিয়া দিতেন। তাহা ছাড়া মু'মিনের রূহকে মৃত্যুর সাথে সাথেই 'ইল্লিয়্যীনে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাহার নাম ও আমলের ফিরিস্তি তৈরি করার পর মুনকার-নাকীরের সওয়ালের জন্য কবরে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর গোনাহগারদের রূহ যমীনে আবদ্ধ থাকে আর নেককারদের রূহ 'ইল্লিয়্যীনে অবস্থান করে এবং বেহেশতের ফল খায়। ইবনুল কাইয়্যিম (র)-এর কিতাবুর রূহ-তে অপরাপর রিওয়ায়ত অনুসারে বলা হইয়াছে, গোনাহ্গার মু'মিনের রূহ বেহেশ্তে থাকিবে না। তাহাদের কাহারও রূহ কিয়ামাত পর্যন্ত কবরে আবদ্ধ থাকিবে, কাহারও রূহ রক্তের নদীতে সাঁতার কাটিবে, আর কাহারও রূহ আগুনের চুলাতে থাকিবে। মোট কথা, যাহরা দুনিয়াতে থাকিয়াও ঊর্ধ্ব জগতের সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছে, তাহাদের রূহই ঊর্ধ্ব জগতে যাইবে, আর যাহারা দুনিয়ার মোহে হাবুডুবু খাইয়াছে, তাহাদের রূহ্ দুনিয়াতেই আবদ্ধ থাকিবে এবং যাহারা যত নোংরা পথে চলিয়াছে, তাহাদের রূহ তত নোংরা স্থানেই অবস্থান করিবে। (আত্ তাফসীরুল মাযহারী, ১০খ., পৃ. ২২৩)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) নাসাঈ, আস্-সুনান, ১খ., পৃ. ২০৩, তা.বি., আল-মাকতাবাতুল-আশ্রাফিয়্যা দেওবন্দ, ভারত; (২) ইমাম ইব্ন মাজা, আস-সুনান, পৃ. ১০৪, তা.বি., মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ; (৩) ইমাম সুয়ূতী, আদ-দুররুল মানছূর, ৮খ., পৃ. ৪৪৮-৪৪৯, ১৯৯৩ খৃ., ১৪১৪ হি., দারুল ফিকর, বৈরূত; (৪) কাযী ছানাউল্লাহ, আত-তাফসীরুল মাযহারী, ১০খ., পৃ. ২২২-২২৩ তা. বি., মাকতাবায়ে রাশীদিয়া, কুয়েটা; (৫) 'আল্লামা আলূসী, রূহু'ল-মা'আনী, ১৫খ., পৃ. ৮৪-৮৫, তা. বি., মাকতাবায়ে ইমাদাদিয়্যা, মুলতান, পাকিস্তান; (৬) কুরতুবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, ১৯খ., পৃ. ১৯৭-১৯৮, তা. বি., আল মাকতাবাতুত্- তাওফীকিয়্যাহ, কায়রো; (৭) ইবন কাছীর, আত্-তাফসীর, ৪খ., পৃ. ৫৮৯-৫৯০, ১৪২৩ হি., ২০০৩ ইং, দারুল হাদীছ, কায়রো; (৮) ইমাম ফাখ্রুদ্দীন-আর রাযী, আত্-তাফসীরু'ল-কাবীর, ৩১ খ., পৃ. ৯৭, ৪র্থ সং, ১৪১৩ হি. মাকতাবাতুল 'আলামি'ল-ইসলামিয়্যা; (৯) মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল 'আমাদী, তাফসীরু আবিস্-সা'উদ, ৯খ., পৃ. ১২৭, ৩য় সং, ১৯৯০ ইং ১৪১১ হি., দারু ইয়াহইয়াইত্ তুরাছি'ল 'আরাবী, বৈরূত; (১০) মুহাম্মদ 'আলী আস্-সাবূনী, সাফওয়াতু'ত-তাফাসীর, ৩খ., ১ম সং., ১৪০৬ হি., ১৯৮৬ মাকতাবাতু'ল-গাযালী, দিমাশ্ক, (১১) ইবনুল 'জাওযী, যাদুল মাছয়ীর, ফী'ইলমিত্-তাফসীর, ৮খ., পৃ. ২২২, ১ম সং., ১৪১৪ হি. ১৯৯৪ ইং, দারুল কুতুবি'ল 'ইল্মিয়্যা, বৈরূত; (১২) আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী জামি'উল বয়ান, ১৪১৫ হি. ১৯৯৫ ইং, দারুল ফিক্র, বৈরূত, লেবানন; (১৩) আবূ 'আলী আল-ফাদল ইব্নুল হাসান-আত-তাবরীসী, মাজমা'উ'ল-বয়ান ফী তাফসীরি'ল কুরআন, ১০খ., ২য় সং, ১৯৮৮ ইং, ১৪০৮/১৯৮৮, দারুল মা'রিফাত, বৈরূত; (১৪) সুলায়মান ইব্ন উমার-আল-'উজায়লী, আল-ফুতূহাতু'ল-ইলাহিয়্যাহ, ৮খ., ১৪১৫/১৯৯৪ দারুল ফিকর, বৈরূত; (১৫) জারুল্লাহ্ যামাখ্শারী, কাশ্শাফ, ৪খ., তা.বি., মাকতাবাতু'ল মিস্র, (১৬) জালালুদ্-দীন মাহাল্লী, জালালায়ন, তা.বি. কাসিমিয়্যা লাইব্রেরী, চক বাজার, ঢাকা, (১৭) ইদ্রীস কান্ধলাবী, মা'আরিফুল কুরআন, ২য় সং., ১৯৮৩ ইং মাকতাবা-ই 'উছ'মানিয়্যা, লাহোর; (১৮) ওয়ালিয়্যুদ্-দীন আল-খাতীব তাবরীযী, মিশকাত, তা.বি. কাসিমিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা; (১৯) ইব্ন মানজূর, লিসানুল 'আরাব, ১৪২৩/২০০৩, দারুল হাদীছ, কায়রো; (২০) মুফতী মুহাম্মাদ শাফী', মা'আরিফুল কুরআন, ইদারা-ই আশরাফী, দেওবন্দ।

মোঃ তালেব আলী

**'ইশ্‌ক** (عشق) ঃ ('আ) প্রেম-কামোচ্ছ্বাস। যদিও শব্দটি কু'রআনে ব্যবহৃত হয় নাই, তথাপি ব্যাপক অর্থে আরবী সাহিত্যে শব্দটি সমধিক গুরুত্ব অর্জন করে। ইহার বিশ্লেষণে আমরা আরবী তথ্যে ইসলামী সংবেদনশীলতা ও চিন্তাধারা বিবর্তনের পটভূমি লক্ষ্য করি। আদ-দায়লামী বলেন ('আত্‌ফ, শা. ৫, পৃ. ৮৭ প.), প্রেম (মাহাব্বা) ও 'ইশ্‌ক সম্পর্কে সকল মানুষেরই কোন না কোন অভিমত (মাকালাত) আছে এবং 'ইশ্‌ক হইতেছে প্রেমের সর্বাপেক্ষা সক্রিয় রূপ। মরুভূমির আরব, জ্ঞানিগণ, মহান চিন্তাবিদগণ (আল-ফুদালা'), ধর্মতত্ত্ববিদ, দরবেশ, মরমী প্রমুখ সকলেরই প্রেমের কারণ, অভিব্যক্তি, মাত্রা ও লক্ষ্য সম্পর্কে বক্তব্য আছে। 'ইশ্‌ক-এর সংজ্ঞা নিরূপণের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হইতেছে আল-জাহিজ-এর রিসালা ফি'ল-'ইশ্‌ক (২য় রিসালা, ১৬১-৯; রাসা'ইল, সম্পা. সানদূবী, ২৬৬-৭৫)। প্রশ্নটি মানুষের মনকে এতই আবিষ্ট করে যে, এই বিষয়ে ইতিপূর্বে য়াহ্‌য়া ইব্‌ন খালিদ আল-বারমাকীর উপস্থিতিতে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আল-মাস'ঊদীর মতে একজন মোবাযসহ তেরটি বিভিন্ন ধর্মীয় ভাবধারার প্রতিনিধিবৃন্দ ইহাতে অংশগ্রহণ করেন। মাস'ঊদী ইঁহাদের প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহ তাঁহার মুরূজ (৬খ, ৩৬৮-৮৬)-এ গ্রন্থিত করিয়াছেন। এই সঙ্গে তিনি গ্যালেন, হিপ্পোক্রেতিস ও অন্যদের উদ্ধৃতিও দিয়াছেন। আদ-দায়লামী ইহাদের কোন কোনটির পুনরুল্লেখ করিয়াছেন।

ইহার সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা, 'ইশ্‌ক হইতেছে ভালবাসার কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে (মা'শূক) পাইবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা (শাওক, তাশাওউক) অর্থাৎ যে ব্যক্তির ভালবাসার অভিজ্ঞতা হয় ('আশিক) সে প্রকৃতপক্ষে তাহার নিজের মধ্যে একটি ত্রুটি বা অভাবকেই ব্যক্ত করে যাহা পূর্ণতা (কামাল) লাভের জন্য উক্ত ব্যক্তিকে যে কোন মূল্যে মিটাইতে হইবে। এই কারণে ইহাতে ক্রমউর্ধ্বাভিসারী স্তর (মারাতিব) রহিয়াছে, যাহা আত্মা ও দেহের পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষারই অনুরূপ। ইহার বাহ্য বহুমুখী অনুপ্রেরণা শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র আদর্শবাদে বা অটল অর্থে (معنى) পরিণত হয়, যাহা কমবেশী সকল মানুষকে অনঢ় ও স্পষ্টভাবে অনুসরণ করে। ইহা হইতেছে সৌন্দর্য (الحسن)-এর প্রতি তাহার বাসনা (توقان) যে সৌন্দর্য আল্লাহ্ তা'আলা এই বিশ্বে প্রতিভাত করাইয়াছেন তাঁহার নিজ রূপে আদমকে সৃষ্টির মাধ্যমে ('আত্‌ফ, ১৮, ২৪)। এই কারণেই মানুষের চক্ষু কর্ণ হইতেছে আকর্ষণীয় অঙ্গ। কারণ ইহারা সুন্দর (الحسن)-এর আধারকে প্রত্যক্ষ করে, যেমন মুখমণ্ডল, কেশময় মস্তক, স্বর্গীয় একটি ভূ-দৃশ্য, সুললিত সঙ্গীতের মূর্ছনা ইত্যাদি। যদি ইহার সঙ্গে গ্রীকগণের শিক্ষামতে কেহ যোগ করে যে, শুভ (খায়র) ও সত্য (আল-হাক্‌ক)-এই তিনটিরই সমন্বিত রূপ বিলোপহীন ঐক্য (ওয়াহ'দা) তবেই 'ইশ্‌ক-এর ধারণাতে উদ্ভূত সকল সমকেন্দ্রিকতায় জটিলতা, বাধা ও দূষণের পরিপূর্ণ উপলব্ধি লাভ করা সম্ভব হইবে। প্রাচীন গ্রন্থকারগণের মধ্যে আদ-দায়লামী হইতে লিসানু'দ-দীন ইব্‌নু'ল-খাতীব পর্যন্ত সকলের মধ্যে তিনটি প্রধান ধারার উদ্ভব প্রত্যক্ষ করা যায়। উর্ধ্বক্রমে ইহারা হইতেছে ; (১) স্বাভাবিক প্রেম (মাহাব্বা তাবী'ঈয়্যা) ; (২) বুদ্ধিবৃত্তিক ('আকলিয়্যা) প্রেম ও (৩) আল্লাহ (ইলাহিয়্যা) প্রেম।

প্রকৃতির সকল প্রাণীই (মাওজূদাত) তাহাদের নিজস্ব অস্তিত্বের উপরস্থ মাত্রায় নিজকে উন্নীত করিতে অভিলাষী। এই সক্রিয়তাই, যাহা বিশ্ব চরাচরের সর্বব্যাপী বিস্তৃত, বিশ্বজনীন 'ইশ্‌ক (মিস-কাওয়ায়হ, তাহযীব, ৬৪ প.)। মানুষের মধ্যে স্নেহ (مودة) ক্রমশ পরিণত হয় আবেগ প্রেমে (عـشق) ; এই প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত সন্ধানী ও বাস্তবমুখী বিশ্লেষণ হইতেছে ইব্‌ন হাযম (দ্র.)-এর তাওক্‌'ল-হামামা। ইহা হইতে উদ্ভব হয় মনস্তাত্ত্বিক দৈহিক অবস্থা যাহাদের বর্ণনা করা হইয়াছে, বিশেষত কাব্যে ব্যবহৃত অতি প্রচলিত শব্দাবলী দ্বারা (তু. . . . . مبابة، علاقة، كلف، شغف، شعف تتيم، تتبل، ولع، غرام، هيام، وله، تدله) সকল ইন্দ্রিয়গত দাবী হইতে শোধিত এই আবেগ পরিণতি লাভ করে এক ভক্তির মনোভাবের মধ্যে যাহা শেষ পর্যন্ত এক মানসিক ভারসাম্যহীনতার (اختلاط) উন্মেষ ঘটায়। ইহা হইতেছে কোন একটি কল্পিত আদর্শ নারী চরিত্রের প্রতি আধ্যাত্মিক দাসত্বের অবস্থা যে চরিত্রের উপর ভিত্তি করিয়া কোন অতি উত্তপ্ত (غليان) হৃদয়ের 'প্রেম নিবেদনে'র অনুভূতি দানা বাঁধে। এই সকল অনুভূতির সাহিত্যিক রূপরেখা ২য়/৮ম -৩য়/৯ম শতাব্দীর 'ইরাকী চক্রে এত গভীরভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল যে, ইহাদের উৎপত্তিতে সামাজিক রীতিনীতি, একটি কঠোর ও নির্মম নীতির ব্যবস্থা এবং সুন্দরের প্রতি কোন স্বাভাবিক প্রেরণার ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব নির্ণয় করা অত্যন্ত কষ্টকর।

ফালাসিফাঃ-র মাধ্যমে 'ইশ্‌ক বুদ্ধিবৃত্তিতে রূপান্তরিত হয়। ইহা চরম সৌভাগ্যের (السعادة القصوى) প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত, স্বচ্ছ ও পদ্ধতিগত প্রসারে পরিণত হয় যাহা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের মায়া হইতে মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তির জন্য অবিমিশ্র কল্যাণ (الخمر المحض)-এর অর্থ প্রকাশ করে। 'একমাত্র সত্যে'র (الواحد الحق) জন্য আবেগপ্রবণ সন্ধানরত কোন জ্ঞানী ব্যক্তি যতই তাঁহার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয় ততই তিনি অনুভব করেন তাহার অন্তরের অন্তস্থলে ক্রমবর্ধমান অবর্ণনীয় আনন্দ (ابتهاج), পরম তৃপ্তি (اللذة المطلقة), ইহাতে যাহা অর্জিত হয় পূর্ণাঙ্গ রূপ ও আবশ্যিক সত্তা (ওয়াজিবু'ল-উজূদ)-এর সৌন্দর্যের ধ্যান (মুশাহাদা)-এর মাধ্যমে।

সূফীগণের জন্য 'ইশ্‌ক প্রণয়োদ্দীপক তীব্র আবেগ কিছু পরিমাণ বাধা সত্ত্বেও পরিণত হয় বিশ্বাসী জীবনের অঙ্গরূপে, পরিমিত অনুরাগ (মাহাব্বা)-এর স্বাভাবিক ক্রমোন্নতি হিসাবে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে কু'রআনে (৩ ঃ ৩১; ২০ ঃ ৩৯ ইত্যাদি)। আল্লাহ্‌র জন্য প্রয়োজনীয় আকাঙ্ক্ষা এবং যাহা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা বর্ণনা করিতে মরমীর হৃদয় পূর্ণকারী একটি প্রয়োজনীয় গুণ মাহাব্বা-এর পরিবর্তে 'ইশ্‌ক-এর ব্যবহার সম্ভবত আল-হাল্লাজ (আদ-দায়লামী, 'আত্‌ফ, ১৬৩-৫) কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। প্রেম তখন আর কেবল আল্লাহ্‌র রহমাতের জন্য প্রকাশিত শুকরিয়া নহে, কেবল কঠোর সংযম অনুশীলনে ও নির্ভুল ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সূক্ষ্ম আচার-আচরণ পালনে সন্তুষ্ট নহে। ইহা তখন পরিণত হয় এক অতি আবশ্যকীয় অঙ্গে, ইহাতে উপভোগ নাই, উপশমও নাই, কেবল প্রেমিক ও তাহার প্রিয়জনের মধ্যে বর্তমান পারস্পরিকতার ফলাফলই ক্রমশ তীব্রতর হইতে থাকে। 'ইশ্‌ক মাহাব্বা যুগলের এই ক্রমবিকাশ অপরদিকে eros/ agape-এর প্রতিধ্বনিহীন নয়, কিন্তু ইসলামে এই দুইটি ধারণার মধ্যে বর্তমান সম্পর্কটি জটিলতর হইয়াছে যুগপৎভাবে উদ্ভূত প্রেম নিবেদন ও মরমী প্রবণতা দ্বারা। গ্রীক মূল পাঠগুলির সহিত সংযোগ সমাপ্ত হইলে প্রেমের বৈধতামূলক ধারণায় পুনরাগমন ঘটে, উদাহরণস্বরূপ আল-গাযালী, ইব্‌ন তায়মিয়া (র) প্রমুখের রচনাবলীতে অপরদিকে দেখা যায়,

উদাহরণস্বরূপ, সুহরাওয়ার্দী, এমন কি ইব্নু'ল-'আরাবীর রচনাতে ইহার একটি পরম খাঁটি ধারণার উন্নয়ন। ইহার অন্তর্নিহিত ভাবার্থ সম্পর্কে যত মতপার্থক্যই থাকুক না কেন, 'ইশ্ক' হইতেছে মধ্যযুগীয় আত্মচেতনার একটি বৈশিষ্ট্য যেখানে অনন্ত, অতীন্দ্রিয় ও পবিত্রের সন্ধানে আত্মা আবিষ্ট।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ওয়াশ্‌শা', মুওয়াশ্‌শা, ৫৯ প. ; (২) মুহাম্মাদ ইব্ন দাউদ, কিতাবু'য-যাহরা, সম্পা. Nykl; (৩) দায়লামী, কিতাব 'আতফি'ল-আলিফি'ল-মা'লুফ 'আলা'ল-লামি'ল-মা'তুফ, সম্পা. J. C. Vadet. কায়রো ১৯৬২ খৃ.; (৪) মিস্‌কাওয়ায়হ, তাহযীবু'ল-আখলাক, সম্পা. C. Zurayk, বৈরূত ১৯৬৭ খৃ., ফরাসী অনু. M. Arkoun, Traite d'cthique, দামিশ্ক ১৯৬৯ খৃ.; (৫) ইব্ন সীনা, রিসালা ফি'ল-'ইশক, সম্পা. Mehren, in Traites mystiques, fasc. 3, Leiden ১৮৯৪ খৃ.; (৬) ইব্নু'ল-জাওযী, সায়দু'ল-খাতির, ১০৫-৭; (৭) ইব্নু'ল-কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, রাওদাতুল-মুহিব্বীন, সম্পা. আহ্‌মাদ 'উবায়দ; (৮) লিসানু'দ-দীন ইব্নু'ল-খাতীব, রাওদাতু'ত-তা'রীফ বি'ল-হুব্বি'শ-শারীফ, সম্পা. আহ্‌মাদ 'আতা', কায়রো ১৯৬৮ খৃ.; (৯) L. Massignon. Interferences Philosophiques et Percees metaphysiques dans la mystique hallagienne: notion de 1''essentiel Desir', in opera minora, ২খ., ২২৬-৫৩; (১০) H. Ritter, Das Mcer der Seele, Lieden ১৯৫৫ খৃ.; (১১) j. C. Vadet, L'esprit courtois en Orient dans les cinq premiers de I'siecles Hegire, প্যারিস ১৯৬৮ খৃ.।

M. Arkoun (E.I[2]) / আবদুল বাসেত

**ইশকাশিম** (দ্র. বাদাখশান)

**ইশ্তিকাক** (اشتقاق) ঃ আরবী ব্যাকরণে ব্যবহৃত একটি পারিভাষিক শব্দ। ভাষান্তরে ইহার নিকটস্থ প্রতিশব্দ 'শব্দতত্ত্ব' 'শাক্কা'শ-শায়' (সে বস্তুটি খণ্ডিত করিল)। ইশতাক্কা'শ-শায়' 'সে শিক্কটি (বিভক্ত বস্তুটির অর্ধাংশ) গ্রহণ করিল (Lane, Lex., ১৫৭৭ a) ঃ ইশতিকাক হইতেছে ইশ্তাক্কা-এর মাসদার বা অসমাপিকা রূপ, শব্দতত্ত্বের পারিভাষিক অর্থে ইহা প্রারম্ভিকভাবে এইরূপে চিন্তা করিতে পারা যায় যেন কোন একটি শব্দ বিদীর্ণ হইয়া উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। ফলে শব্দটির অভ্যন্তরে বিদ্যমান প্রত্যয়সিদ্ধ শব্দটি (মুশতাক্ক) বিকাশ করা যায়। বস্তুত সাধারণভাবে 'ইশতিকাক' শব্দটি যে তাৎপর্য বহন করে তাহা হইতেছে ঃ 'নায্‌উ' লাফ্‌জিন মিন আখার' (এক শব্দ হইতে অপর একটি শব্দ নিষ্পন্নকরণ), যাহা অনুশীলন করা সম্ভব কতিপয় পূর্ব নির্ধারিত শর্তাধীনে (আল-জুরজানী, তা'রীফাত, ১৭)।

অনেক প্রাচীন গ্রন্থকার ইশতিকাক সম্পর্কে বিশেষ পর্যালোচনা রচনা করিয়াছেন, আস-সুয়ূতী (মুযহির, ১খ, ৩৫১, ছত্র, ৪-৬) বারজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেনঃ আল-মুফাদ্দাল আদ-দাব্বী (মৃ. ১৭০/৭৮৬ সাল), কুত্‌রুব (মৃ. ২০৬/৮২১ সাল), আল-আসমা'ঈ (মৃ. ২১৬/৮৩১ সাল), আল-আখ্‌ফাশ (মৃ. ২১৫/৮৩০ সাল), আবূ নাসর আল-বাহিলী (মৃ. ২৩১/৮৪৬ সাল), আল-মুবাররাদ (মৃ. ২৮৫/৮৯৮ সাল), আল-যাজ্জাজ (মৃ. ৩১০/৯২২ সাল), ইব্নু'স-সাররাজ (মৃ. ৩১৬/৯২৯ সাল), ইব্ন দুরায়দ (মৃ. ৩২১/৯৩৩ সাল), ইব্নু'ন-নাহহাস (মৃ. ৩৩৮/৯৪৯ সাল), ইব্ন খালাওয়ায়হ (মৃ. ৩৭০/৯৮০ সাল) ও আর-রুম্মানী (মৃ. ৩৮৪/৯৯৪ সাল)। যেহেতু ইব্ন দুরায়দ-এর রচনাটি ভিন্ন (কিন্তু ইহাতে শুধু ইশতিকাক-এর উদাহরণ প্রদান করা হইয়াছে), অন্য সকল রচনাই বর্তমানে অবলুপ্ত। আমাদের জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা হইতেছে অন্য যে সকল রচনায় এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হইয়াছে সেইগুলির শরণাপন্ন হওয়া ঃ ইব্ন দিহয়া (মৃ. ৬৩৩/১২৩৬ সাল)-এর উদ্ধৃতিসম্পন্ন আস্-সুয়ূতী-এর মুযহির-এর একটি পরিচ্ছেদ (১খ, ৩৪৫-৫৪); আল-মুনসিফ শারহ কিতাবি'ত-তাসরীফ লি'ল-মাযিনী (১খ, ৩-৪)-এর ইব্ন জিন্নীকৃত মুখবন্ধ (কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪, ৩খ, ২৭৮-৯)-এর সম্পাদকবৃন্দের খাতিমা; ইহা ভিন্ন আল-জুরজানী (তা'রীফাত, ১৭) প্রদত্ত সংজ্ঞা Dict. of Tech. Terms (১খ, ৭৬৬-৭০)-এ প্রাপ্তব্য বর্ণনা ও আলোচনা।

ইশতিকাক ঃ তত্ত্ব' অবশ্য ইহা নিশ্চিতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে, কীভাবে আরব বৈয়াকরণগণ এই শব্দতত্ত্বের ব্যবহার করিতেন। ইব্ন জিন্নীর মতে তাস্‌রীফ-এর অধিকৃত স্থানটি লুগাত এবং নাহ্‌ব (য়াতাজাযাবানিহ, "তাহারা উভয়ে ইহাকে টানাটানি করে)-এর মধ্যবর্তী। ইশতিকাক ও তাসরীফ-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক (ইত্তিসাল শাদীদ) ও সাদৃশ্য (নাসাব কারীব) আছে কিন্তু তাসরীফ-এর তুলনায় ইশ্‌তিকাক লুগাত (আল'আদফি'ল-লুগা মিনা'ত-তাস্‌রীফ, মুনসিফ, ১খ, ৩, ছত্র ১৭-৪, ছত্র ১০)-এর সহিত অধিকতর জড়িত। লুগাত স্বয়ং শব্দ তালিকার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট; নাহ্‌ব-এর সংস্রব ই'রাব-এর সহিত ঃ ইহা লুগাত-এর শব্দসমূহের অন্তে ব্যবহৃত হারাকাত-এর বিভিন্নতা ও বিভিন্ন 'আওয়ামিল (নিয়ন্ত্রক বিধি)-এর প্রেক্ষিতে তাসরীফ (as inacc. of the verb)-এর অঙ্গ সংস্থানিক গঠনরীতি পর্যালোচনা করে (দ্র. ই'রাব)। তাসরীফ, উপরে বর্ণিত গঠন (অঙ্গ সংস্থানিক) ও লুগাত, বহু বচনে সিয়াগ নামে পরিচিত) বিশ্লেষণ করে। ইশতিকাক ও তাসরীফ-এর কার্যক্রমের বিষয়বস্তু একই কিন্তু ইশতিকাক বিষয়বস্তুকে তাহার উৎসের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করে 'উখিযা মিন. ., "ইহা হইতে গৃহীত . . ." হইতেছে ইহা দ্বারা প্রদত্ত তথ্য।

ইব্ন জিন্নী ইশ্‌তিকাক ও তাস্‌রীফ-এর মধ্যে যে গভীর সাদৃশ্য ও সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করেন তাহা অনুধাবন করিতে হইলে প্রথমে তাসরীফ-এর সহিত গভীর পরিচয় অত্যাবশ্যকীয়। তাসরীফ-এর চর্চা দুই প্রকারে করা হইত। প্রাচীন বিদ্বানগণ ও সীবাওয়ায়হ-এর অনুসৃত প্রথম পদ্ধতিতে প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল কেবল মাসাইলু'ত-তামরীন (অনুশীলন প্রশ্নাবলী) এবং ইহার লক্ষ্য ছিল আর-রিয়াদা ওয়া'ত-তাদারুব "চর্চা ও অভ্যস্তকরণ"। কোন একটি প্রচলিত আরবী শব্দের আদলে একটি কাল্পনিক শব্দ গঠন করা হইত এবং প্রচলিত শব্দটির রূপে (বিনা') বর্তমান সকল বিশেষত্ব কাল্পনিক শব্দটিতে সম্পূর্ণভাবে সঠিকরূপে পুনঃস্থাপন করা হইত (দ্র. সীবাওয়ায়হ), পরিচ্ছেদ ৫১১, ২খ, ৩৪৩ ও পরিচ্ছেদ, ৫৫৭ (২খ, ৪৩৬-৪২)-এর শিরোনাম]। এই কার্য সম্পাদনের জন্য আল-কিতাব-এ প্রদত্ত শব্দের অঙ্গ সংস্থানিক তথ্য এবং উহার মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নাহ্‌ব সঠিকভাবে অনুধাবনের প্রয়োজন অত্যাবশ্যকীয় ছিল। উল্লেখ্য, এই সকল প্রশ্ন বাস্তবপক্ষে শব্দাবলী স্মরণ রাখা এবং কাহাকেও ঐগুলির সঙ্গে পরিচিত করানোর উপায়মাত্র।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি তাসরীফকে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে বিবেচনা করে এবং মনে করেন ইহা ইহার নিজ গুণের কারণে পাঠ করা প্রয়োজন

এবং ইহাকে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে গড়িয়া তোলা উচিত। আল-মাযিনী (মৃ. ২৪৭/৮৬১ সাল)কৃত কিতাবু'ত-তাসরীফ-এ ইহারই বাস্তবায়ন করা হইয়াছে। এই তাস্‌রীফ ইহার লক্ষ্য হিসাবে চালু আরবী শব্দসমূহ গ্রহণ করে এবং ইহাদের রূপান্তর পর্যালোচনা করে। এইরূপে ইহা প্রয়োজনীয় উপাত্ত নূতনভাবে শ্রেণীবিন্যাস করে। ইব্ন জিন্নী তাঁহার মুখতাসারু'ত্-তাস্‌রীফ্ আল-মুলুকী (সম্পা. G. Hoberg, ছত্র ৮, ৯-১০)-তে ইহাদের নিম্নবর্ণিত বিভাগে বিভক্ত করিয়া সুসংবদ্ধ করিয়াছেন ঃ যিয়াদা, বাদাল, হাযাফ, তাগ্‌য়ীর বি-হারাকা আও সুকূন, ইদ্দিগাম (দ্র. ইদগাম, ৩খ, ৩৮৩-৫)।

তাস্‌রীফ ও ইশতিকাক-এর মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্য ও সম্পর্কঃ উপরের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই, ইব্ন জিন্নীর মতে তাসরীফ ও ইশতিকাক-এর মধ্যে গভীর সাদৃশ্য বিদ্যমান। তাস্‌রীফ-এর প্রেক্ষিতে ইশ্‌তিকাক-এর কার্যক্রম ব্যবহারিকভাবে প্রদর্শন করিতে তিনি যে পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এইখানে শিক্ষণীয়। ইহার পর ইব্ন জিন্নী তাস্‌রীফকে বিবেচনা করিয়াছেন সীবাওয়ায়হ এবং কাল্পনিক শব্দ সমষ্টি লইয়া কার্যরত প্রাচীন পণ্ডিতগণের মত একইভাবে এবং ইশ্‌তিকাক-এর এই ধারণার জন্য তিনি যে সমস্ত উদাহরণ ব্যবহার করিয়াছেন সেইগুলির সবগুলিই তাস্‌রীফ-এর বর্ণনা প্রদানে ব্যবহার করা হইয়াছে (দ্র. মুনসিফ, ৩খ, ২৭৮, সম্পাদকবৃন্দ, ছত্র ১৫-২৭৯)। তাস্‌রীফ-এর বর্ণনায় এই সকল উদাহরণের উদ্দেশ্য ছিল, যিয়াদা, বাদাল ইত্যাদি রূপ গঠন করিবার প্রক্রিয়ায় হুরূফু'ল-উসূল (মৌলিক ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ)-এর উপর যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া ঘটে তাহা প্রদর্শন করা। অপরপক্ষে ইশ্‌তিকাক-এ এই সকল উদাহরণের উদ্দেশ্য হইতেছে—কিভাবে একটি রূপ অপর একটি রূপ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করা এবং এই ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া হয় যে, তাসরীফ-এর পদ্ধতিসমূহ ও উল্লিখিত প্রতিক্রিয়াসমূহের পূর্ণ জ্ঞান (ব্যবহার সামর্থ্য) ইতিমধ্যে অর্জিত হইয়াছে। এই পরিস্থিতিতে ইব্ন জিন্নী তাঁহার প্রারম্ভিক বিন্দু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন মাস্‌দার-কে। ইহা হইতেছে ক্রিয়াপদ বাক্যে শব্দ দারব-এর মূল এবং তিনি এই মাসদার হইতে গ্রহণযোগ্য সকল কিছু তালিকাভুক্ত করিয়াছেন মাদী (দারাবা), মুদারি' (য়াদরিবু), কর্তৃকারক (দারিব) ইত্যাদি। ইব্ন জিন্নীর প্রত্যক্ষকৃত ইশতিকাক ও তাস্‌রীফ-এর মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক ও সাদৃশ্যের ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে ইশ্‌তিকাক তাস্‌রীফ-এর তুলনায় কম সার্বজনীন (নিম্নে দ্রষ্টব্য)।

ইশতিকাক এবং লুগাত ঃ ইব্ন জিন্নী আরও মন করেন যে, ইশ্‌তিকাক তাস্‌রীফ-এর তুলনায় লুগা (ভাষা)-এর উপর অধিক নির্ভরশীল। আল-মুবার্‌রাদ-এর মুকতাদাব (কায়রো ১৩৮৬ হি., ৩খ, ১৮৫)-এর একটি অধ্যায় এই ব্যাপারে আমাদের সহায়তা দান করে। আল-মুবার্‌রাদ প্রথমেই 'গায়র মুশ্‌তাক্ক' বিশেষ্য (আসমা')-সমূহকে পৃথকীকৃত করিয়াছেন, যথা 'হাজার' (প্রস্তর), "জাবাল" (পর্বত)। এই সকল শব্দ প্রসঙ্গে ইশ্‌তিকাক নীরব রহিয়াছে। কারণ এমন কোন মূল শব্দ (মাসদার) পাওয়া যায় না যাহা হইতে ইহাদের উদ্ভব হইয়াছে; ইহারা অতি সাধারণভাবেই সাধারণ বিশেষ্য (আসমা'উ'ল-আজ্‌নাস)। অপরপক্ষে তাস্‌রীফ ইহাদের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছে ফা'আলরূপের সহিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আরব বৈয়াকরণগণের মতে ইশতিকাক-এর তুলনায় তাসরীফ অধিকতর সার্বজনীন (উদা. ইব্ন দিহ্‌য়া, মুযহির°, ১খ, ৩৫১, ছত্র ১)। আল-মুবার্‌রাদ ইহার পর মুশতাক্ক বিশেষ্য পদসমূহ উল্লেখ করিয়াছেন যেইগুলি না'ত (বিশেষণ) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; এইগুলি হইতেছে কোন ক্রিয়াপদের সহিত সম্পর্কযুক্ত বিশেষণ যেখানে এইগুলির অর্থ পুনরায় বর্তমান 'সাগীর' (ক্ষুদ্র)-এর সহিত 'সাগুরা'; 'জাহিল' (মূর্খ)-এর সহিত 'জাহিলা', 'আহমাক' (বোকা)-এর সহিত 'হামিকা'। ইহার পর রহিয়াছে যে সমস্ত মুশতাক্ক বিশেষ্য না'ত (বিশেষণ)-রূপে ব্যবহৃত হয় না। উদাহরণসমূহ হইতেছে নির্দিষ্ট নামবাচক শব্দাবলী হানীফা, মুদার, 'আয়লান। এইগুলির ইশ্‌তিকাক, এই সকল বিশেষ্য ও একই মূল হইতে উদ্ভূত অন্যান্য শব্দের মধ্যে প্রাপ্ত অর্থগত সম্পর্ক অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। বলা হইয়া থাকে, হানীফা সরলভাবেই হানীফ হইতে উদ্ভূত (শব্দটি নিষ্প্রয়োজন), মুদার উদ্ভূত হইয়াছে "মাদারা'ল-লাবান" (দুধ টক হইয়া গিয়াছে) হইতে এবং 'আয়লান উদ্ভূত হইয়াছে 'আয়লা হইতে যাহা "আলা" (গরীব হইয়া যাওয়া) শব্দের অসমাপিকা ক্রিয়া মাস্‌দার রূপ ফা'লান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইশ্‌তিকাক-এর তৎপরতা শব্দমালা সংক্রান্ত এবং ইহা বিধিসম্মত পদ্ধতির ভিতর একটি মাত্র মূল, ইহা ইহার রূপসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া শব্দের ব্যতিক্রমী বিন্দুটি "মুশতাক্ক মিন্‌হু" বা উৎসমূলের সন্ধান করে। অপরপক্ষে তাস্‌রীফ যে শব্দের ওয়াযন নির্ণয় করিতে চায় তাহার বাহিরের কোন কিছুর খোঁজ করে না। ইশ্‌তিকাক-এর অপরাপর উদাহরণ পাওয়া যায় মুকতাদাব, ৪খ, ১৪৯-৫০-এর সূচীতে। প্রাসঙ্গিক অংশটি হইতেছে মাস্‌দার হইতে গৃহীত ক্রিয়াপদবাচ্য শব্দ এবং ইসম-এর ইশ্‌তিকাক সম্পর্কিত আলোচনা (ইবনু'ল আনবারী, কিতাবু'ল-ইনসাফ, সম্পা. Weil, বিতর্কিত প্রশ্ন নং ১ ও ২৮)।

ইব্ন দুরায়দ তাঁহার কিতাবু'ল-ইশ্‌তিকাক (সম্পা. Wustenfeld, গটিনজেন ১৮৫৪ খৃ.) গ্রন্থে কেবল আরবীয় গোত্রসমূহের নাম সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন (কিন্তু তিনি তাঁহার অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে কোন পর্যালোচনা করেন নাই)।

আরব বৈয়াকরণগণ কেবল আরবী শব্দের ক্ষেত্রেই ইশ্‌তিকাক চর্চা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আল-জাওয়ালীকী, কিতাবু'ল-মু'আররাব, সম্পা. Sachau, ৩ নং ছত্র ১০-৪, ছত্র ৩) বর্ণিত ইবনু'স-সাররাজ-এর উচ্চারিত সতর্কবাণী ও আস্‌-সুয়ূতী (মুযহির, ১খ, ৩৫১, ছত্র ৭-৯) দ্রষ্টব্য। এই আরবীয় ইশ্‌তিকাক ভাষার অধ্যয়নে কোন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত আনয়ন করে না। সন্ধানপ্রাপ্ত সম্পর্ক ও উৎপত্তি কেবল প্রকাশিত ভাষার অংশমাত্র চিহ্নিত করে এবং একই সংগে প্রদত্ত হয় (তু. Dict. of Tech. Terms, ১খ, ৭৬৬, ছত্র ১৫-৬)। এই ইশ্‌তিকাক-এর ব্যাখ্যামূলক মূল্য অতি নগণ্য। প্রথমত, যেভাবে আরবী ব্যাকরণের উপর এককভাবে নির্ভরশীল তাহাতে স্বভাবতই ইহা উক্ত ব্যাকরণের দুর্বলতাসমূহ দ্বারা প্রভাবিত (উদা. বিতর্কিত দুইটি প্রশ্ন যাহা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে)। ইহা ছাড়া এক শব্দ হইতে অপর শব্দের উৎপত্তি কেবল সকল শর্ত পূর্ণ করার সাপেক্ষেই উল্লেখ করা হয়। এইভাবে আল-জুরজানী প্রদত্ত ইশ্‌তিকাক-এর সংজ্ঞা হইতেছে, "নায্'উ'ল-লাফ্‌জ্ মিন্ আখার বি-শার্‌ত মুনাসাবাতিহিমা মা'নান্ ওয়া তারকীবান ওয়া মুগায়ারাতিহিমা ফি'স্-সীগা" (তা'রীফাত, ১৭) "এক শব্দ হইতে অপর শব্দ গ্রহণ এই শর্তাধীনে যে, তাহারা অর্থ ও গঠনে (মৌলিক ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের) সম্পর্কযুক্ত এবং তাহারা বিভিন্ন রূপসম্পন্ন"।

যে ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে এই উদ্ভাবন আইনসিদ্ধ হয় তাহা প্রদর্শনের কোন প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করা হয় না। আল-মুবাররাদ-এর মতে সাগীর শব্দটির মূল হইতেছে ক্রিয়াপদ সাগুরা (উপরে দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই রূপান্তর কি পদ্ধতিতে সাধিত হয়? গঠনকালে মানসিকভাবে সদাসতর্ক থাকা উচিত, যাহাতে যে সমস্ত ক্ষেত্রে এই ইশ্‌তিকাক গ্রহণযোগ্য তথ্য প্রদান করে তাহা সঠিকভাবে লক্ষ্য করা যায়। ইহা ছাড়া ইব্‌ন দুরায়দ-এর কিতাবু'ল-ইশ্‌তিকাক-এ অনুসৃত শব্দসমূহের উপর দীর্ঘ আলোচনার ন্যায় অধ্যয়নের জন্য ইহা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

ইশ্‌তিকাক-কে বলা হয়ঃ (ক) আস-সাগীর (ক্ষুদ্র), যখন আল-জুরজানী প্রদত্ত পূর্ব উল্লিখিত সংজ্ঞামতে তারকীব-এর জন্য, একই মৌলিক ব্যঞ্জনবর্ণের ক্রমঅবস্থান শব্দ দুইটির জন্য সম্পূর্ণ একই রূপ থাকে; ইহা হইতেছে স্বাভাবিক ইশ্‌তিকাক। (খ) আল-কাবীল (বৃহৎ), যখন মা'না অর্থাৎ মূল শব্দের প্রকৃত অর্থ সংরক্ষিত থাকে কিন্তু তারকীব-এর ক্রমঅবস্থান পরিবর্তিত হইয়া যায়, যথা জাযুব মাসদার হইতে গৃহীত জাবাযা (জাযাবা-এর বর্ণ বিচ্যুতি)। (গ) আল-আক্‌বার (সর্ববৃহৎ)—যখন মূল শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং ক্রমঅবস্থান কোনটিই সংরক্ষিত হয় না। এই ইশ্‌তিকাকটি আবিষ্কার করেন ইব্‌ন জিন্নী এবং তিনি তাঁহার খাসা'ইস (কায়রো ১৩৭১/১৯৫২, ১খ, ৫-১৭ ও কায়রো ১৩৭৪/১৯৫৫, ২খ, ১৩৩-৯)-এ এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি কোন একটি শব্দমূলের তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণের সম্ভব সকল পারস্পরিক অবস্থান বিবেচনা করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ কাওল-এর জন্য: কালও, ওয়াক্‌ল, ওয়াল্‌ক, লাক্‌ও, লাওক। ভাষায় বিদ্যমান বিভিন্ন অর্থবহ সকল মিশ্র শব্দ সংগ্রহ করিয়া তিনি ইহা হইতে সকল ক্ষেত্রে সাধারণ একটি ভাব নিষ্কাশন করিয়াছেনঃ আল-খুফ্‌ফ ওয়া'ল-হারাকা (ত্বরা ও গতি)। আরব বিশ্ব তাহার চিন্তাশীলতার শক্তি ও অসামান্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল; কিন্তু ভাষার সাধারণ অধ্যয়নে তাহারা তাঁহার অনুসরণ করে নাই (দ্র. ইব্‌ন দিহ্‌য়া, মুয্‌হির, ১খ, ৩৪৭, ছত্র ৪৩৪৮ ছত্র ২)।

মন্তব্যঃ (ক) আল-জুরজানী সেই সকল ক্ষেত্রে আল-ইশ্‌তিকাকু'ল-আক্‌বার স্বীকার করেন, যখন দুইটি শব্দের মৌলিক ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের স্বকীয়তা তাহাদের মাখরাজ-এ রূপান্তরিত হয়। যথা না'আকা, যাহা উদ্ভূত হইয়াছে মাসদার নাহ্‌ক হইতে (তু. Dict. of Tech. Terms, ১খ, ৭৬৭, ছত্র ৬-৭)। (খ) আল-ইশ্‌তিকাকু'স-সাগীর ও আল-'আদ্‌ল-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের জন্য দ্রষ্টব্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৭, ২ ff.।

**গ্রন্থপঞ্জী**ঃ মূল পাঠে (১) 'আবদুল্লাহ আমীন, আল-ইশ্‌তিকাক, কায়রো ১৩৭৬/১৯৫৬; ইশ্‌তিকাক-এর একক ধারণায় আলোচিত তিনটি শ্রেণীবিভাগ এবং নাহ্‌ত-কে পূর্ণ শ্রেণীকরণের ইহা নামবাচক ক্রিয়াপদ ও নাহ্‌ত-এর পূর্ণ তালিকাভুক্ত করিয়াছে; (২) ফু'আদ হান্না তারাযী, আল-ইশ্‌তিকাক, বৈরূত ১৯৬৮ খৃ., বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদে ইশ্‌তিকাক-এর ব্যবহার এবং সেই সঙ্গে পূর্ববর্তী ও প্রাচীনগণের নীতির সমালোচনামূলক মুখবন্ধ।

H. Fleisch (E.I.[2])/ আবদুল বাসেত

**ইশ্‌তিকাক** (দ্র. তাজনীস)

**ইশ্‌তিব** (اشتب)ঃ Stip সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার Macedonia প্রদেশের অন্তর্গত Skopje শহরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি শহর। প্রাচীন কালে ইহার নাম ছিল Astibo এবং Serdica হইতে দানিয়ুবগামী রোমান সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত Paeonia এলাকার ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। বায়যানটাইনদের মধ্যে ইহার প্রচলিত নাম ছিল Stipion। দক্ষিণ স্লাভগণ ইহাকে Stip বলিত এবং তুর্কীগণ ইহাকে Ishtip নামে অভিহিত করিত। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইহা ছিল উত্তর Macedonia-র (Vardar Strouma নদীর মধ্যবর্তী) Constantine Dejanovitch (Dragas) অবস্থিত একটি দুর্গ ও প্রশাসনিক জেলা। Cirmen যুদ্ধের (১৩৭১) পর হইতে ইহা উছমানী খলীফাগণের করদ রাজ্যে এবং ১৩৯৪ সালে Constantine-এর মৃত্যু হইলে Rovine-এর যুদ্ধে উহা একটি সান্‌জাক (Kostand-ili-Kustendil)-এ পরিণত হয়। নবম/পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহা ছিল একটি বিলায়েত (প্রশাসনিক বিভাগ)-এর সদর, দশম/ষোড়শ শতকে একটি কাদা' (قضاء = বিচার সংক্রান্ত বিভাগ)-এর কেন্দ্র যাহা Sanjakbey-এর খাস্‌স (خاص)-এর সহিত সংযুক্ত ছিল এবং তাঁহার Voivoda (প্রতিনিধি) কর্তৃক শাসিত হইত। Stip ও ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকার তুর্কী উপনিবেশ বিশেষ ব্যাপক ছিল না। 'Ovce Pole' গোষ্ঠীর কিছু সংখ্যক Yuruks এই স্থানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছিল—Stip-এর কাদা-তে ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে ছিল একাশিজন Odjak। অধিবাসিগণ ছিল প্রধানত খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। ১৪৮৯-৯১ সালে Stip-এর Novkeric-এর কাদা-তে অমুসলিম পরিবারের সংখ্যা ছিল ৮,৪৩৪। ১১শ/১৭শ শতকে শহরে ২৪টি মুসলিম মহল্লা ছিল, ইসলামীকরণের চিহ্ন ছিল নগণ্য।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও হস্তশিল্পের কেন্দ্র হিসাবে এই শহরটি চাকু (Penknife) ও ছুরি প্রস্তুতের জন্য খ্যাত ছিল। অঞ্চলটি মেষ পালনে অতি উন্নত ছিল এবং শহরের কারিগরগণ পশমজাত সামগ্রী, গোশত এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রক্রিয়ায় ব্যাপৃত ছিল। বাজারগুলিতে ছিল স্থানীয় বণিক, য়াহূদী এবং Dubrovnik হইতে আগত ব্যবসায়িগণ, Evliya Celebi-র মতে Carshi-তে চারি শত পঞ্চাশটি দোকান ছিল। শহরটির ব্যবসায় ও কারিগরি সহায়তার জন্য ছিল একটি Bezestan, একটি পান্থশালা ও সাতটি সরাই (Khana)।

শহরটি মুসলিম আকৃতি লাভ করে ইহার গণভবনসমূহের কল্যাণে, যথা বহু মসজিদ, তন্মধ্যে সুলতান মুরাদ (ফাতহিয়া)-এর মসজিদ, Archangel Michael-এর প্রাক্তন খৃষ্টান গির্জা— মসজিদে রূপান্তরিত, যেমন রূপান্তরিত হইয়াছিল St. Elias-এর গির্জা, জনগণের ব্যবহার্য দুইটি হাম্মাম (গোসলখানা) এবং ১১শ/১৭শ শতকে জনৈক স্থানীয় সম্মানিত তুর্কীর প্রাসাদ। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি খৃষ্টান গির্জাও ছিল। Stip ছিল Kolassia-র বিশপের এলাকাস্থ Diocese-এর একটি অংশ। উনবিংশ শতাব্দীতে শহরটিকে Kustendil-এর বুলগেরীয় eparchy-র সহিত সংযুক্ত করা হয়।

১৬৮৩-৯৯ সালের যুদ্ধের সময় অস্ট্রীয় সেনাদল ইশতিব পর্যন্ত পৌঁছায়। উনবিংশ শতাব্দীতে Amy Boue ইশতিব শহরটিকে ১৫-২০,০০০ তুর্কী, বুলগেরীয় ও য়াহূদী অধ্যুষিত একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্ররূপে দেখিয়াছিলেন। ১৮৯৪ সালের দিকেই ইশতিব-এর জনসংখ্যা ছিল ১০,৯০০ বুলগেরীয়, ৮,৭০০ তুর্কী, ৮০০ য়াহূদী ও ৫০০ জিপ্‌সী (যাযাবর), মোট ২০,৯০০ জন।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) Neshri, কিতাব-ই চিহান-নুমা, সম্পা. Unat and Konmen, ii, Ankara 1949, 267 ; (২) M.T. Gokbilgin, Rumeli' de Yurukler, Tatarlar ve Evlad-i Fatihan, ইস্তাম্বুল ১৯৫৭ খৃ., ৮১, ২৬৬, ৩২৯ ; (৩) ঐ, XV-XVI asirlarda Edirne ve Pasa livasi, ইস্তাম্বুল ১৯৫২ খৃ., ১৫৬ ; (৪) ঐ, Kanuni, Sultan Suleyman devri baslarinda Rumeli, eyaleti, in Belleten, ২৮ (১৯৫৬), ২৫৬ ; (৫) J. v. Hammer, Rumed Unel Bosnia, ভিয়েনা ১৮১২ খৃ., ৯২ ; (৬) Evliya Celebi, vi, ১১৮-২৩ ; (৭) Gl. Elezovic, Iz carigradskih turskih arhiva, বেলগ্রেড ১৯৫০ খৃ. ২খ, ৬৭,১২৫৫ ; (৮) I. Ivanov, Severna Makedonija, Sofia ১৯০৬ খৃ. ; (৯) A. Boue, Recueil d'itineraires, ১ খ., ২৪৮ ; (১০) V. Kaniov, Makedonija, etnografija i statistika, Sofia ১৯০০ খৃ., ২৩০; (১১) D. Sopova, Iz carigradskih turskih arhiva, Skopje, ১৯৫৫, ১খ, ২৫, ৪৩, ৫৫, ৫৬ ; (১২) P. Zavoev, Grad Stip. Sofia ১৯৪৩ খৃ.; (১৩) Bibl. Nat, Sofia, Fonds ১৩৭-এ রক্ষিত কতিপয় 'উছমানী আমলের দলীল-দস্তাবেজ।

Bistra Cvetkova (E.I.[2])/আবদুল বাসেত

**ইশ্‌তিরাক** (দ্র. তাওরিয়া)

**ইশ্‌তিরাকিয়্যা** (اشتراكية) ঃ ইশ্‌তিরাক হইতে উদ্ভূত, ভাগাভাগি করা, আধুনিক আরবীতে ব্যবহৃত সমাজতন্ত্রের সমার্থক শব্দ। মনে হয় এই অর্থে প্রথম ব্যবহৃত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর তুর্কী ভাষায়। ইহার রূপ ছিল ইশ্‌তিরাক-ই আমওয়াল, শব্দার্থে সম্পত্তির ভাগাভাগি। ইহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ইশ্‌তিরাকজী অর্থাৎ সমাজতন্ত্রপন্থী এবং ইশ্‌তিরাকী সমাজতান্ত্রিক। তুর্কী ভাষায় শব্দটি ক্রমশ অচল হইয়া পড়ে ও পরিবর্তে সোসালিস্ট শব্দটি ব্যবহৃত হইতে থাকে। আরবী ভাষায় গৃহীত হইলে ইহা দ্রুত আরবদেশসমূহে সার্বিক প্রচলন লাভ করে।

'উছমানী সাম্রাজ্য ও তুরস্ক ঃ তুর্কীদের মধ্যে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে। কিন্তু কেবল ১৯০৮ খৃস্টাব্দের বিপ্লবের পরই এই বিষয়ে 'উছমানী সাম্রাজ্যকে প্রকাশ্যে সমর্থন প্রকাশ করা সম্ভব হয়, য়ুরোপীয়, বিশেষভাবে ফরাসী সমাজতন্ত্রী আন্দোলন তুরস্কের সমাজতান্ত্রিক কার্যকলাপে উৎসাহ যোগায় এবং মডেল হিসাবে কাজ করে। সব সময়ই ক্ষুদ্র সংখ্যক, বিশেষভাবে নির্বাচিত সদস্য বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রী প্রতিষ্ঠানসমূহ তরুণ তুর্কী যুগের অশান্ত রাজনীতিতে নিজ গুণে কোন বিশেষ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। ১৯১০ খৃস্টাব্দে সংগঠিত হুসায়ন হিলমী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অটোমান সোস্যালিস্ট পার্টি ('উছমানলী সোসায়লিস্ট ফিরকাসী) তিন মাস পরেই কর্মতৎপরতা স্থগিত ঘোষণা করে। ১৯১২ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে সরকারী নির্যাতন সাময়িকভাবে প্রশমিত থাকার সুযোগে ইহা এক বৎসরের জন্য পুনরায় আবির্ভূত হয়। ইহার ফরাসী (Paris) শাখাটি ড. রাফীক নেভযাত-এর নেতৃত্বে স্বাধীনভাবে কর্মতৎপর থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের যোগদান পর্যন্ত ইহা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সহিত প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলে।

এই সাংগঠনিক তৎপরতার তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৯০৮ খৃস্টাব্দের বিপ্লবের পর ক্রমশ ঘনীভূত হইয়া উঠা তুর্কী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উপর সমাজবাদী ধারণাসমূহের প্রভাব। ১৯১১ খৃস্টাব্দের পূর্বের বৎসরগুলিতে যিয়া গোকল্প (Gokalp) ও তাঁহার অনুসারিগণের সহিত স্যালোনিকায় সক্রিয় বহু সমাজবাদী স্রোতের যোগাযোগ ছিল। ইহার পর হইতে ইস্তাম্বুল পারভূস (আলেকজান্ডার হেল্পহ্যান্ড) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার উপর জোর দিয়া তুর্কীপন্থীদের সমাজবাদী ভাবধারার পুষ্ট ধারণা দ্বারা প্রভাবিত করিতে থাকেন। তদুপরি নব্য তুর্কী আমলে বেসামরিক ও সামরিক উভয় প্রকার বিদ্যালয়ে মার্কস্‌বাদের সহিত প্রাসঙ্গিক সাধারণ ঘটনা হিসাবে পরিচিত ছিল। মুসতাফা কামাল (আতাতুর্ক)-সহ বহু জাতীয়তাবাদী নেতার মধ্যে সমাজতন্ত্রী মতাদর্শের প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় সমাজতন্ত্রী দলসমূহের পুনর্গঠনের জন্য নূতন উদ্যম সঞ্চার করে। ১৯১৯ খৃস্টাব্দে হিলমী পুনরায় তাঁহার পুরাতন সংগঠনটিকে পুনর্জীবিত করেন। এইবার ইহার নামকরণ করা হয় তুর্কী সমাজতন্ত্রী দল (তুর্কীয়ে সোসায়লিস্টে ফিরকাসী) এবং পুনরায় ইহার প্যারিস শাখা খোলা হয়। এই দলটি বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ধর্মঘটের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা আদায়ে এত সফলতা অর্জন করে যে, ১৯২১ খৃস্টাব্দে এসকিসেহির-এর একটি শাখাসহ ইহার সদস্য সংখ্যা প্রায় ৭,০০০-এর কাছাকাছি পৌঁছায়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলস্বরূপ নভেম্বর ১৯২২ খৃস্টাব্দে হিলমী-এর হত্যাকাণ্ডের সমসাময়িক কালে ইহা প্রায় বিলুপ্তির পর্যায়ে পৌঁছায়।

তুলনামূলকভাবে অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী হয় তুর্কী শ্রমিক ও কৃষক সমাজতন্ত্রী দল (তুর্কীয়ে ইশচিভে চিফ্‌ত চি সোসায়লিস্ট ফিরকাসী)। জার্মানীতে তুর্কী ছাত্রদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ নামের একটি সংগঠনের সম্প্রসারণ হিসাবে ১৯১৯ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ইহার সৃষ্টি হয়। প্রাথমিকভাবে দলটির সহিত বলশেভিজম-এর তুলনায় ফরাসী উগ্র সমাজবাদের সহিত অনেক বেশী সাদৃশ্য ছিল এবং হেনরী বারবুসের Clarfe আন্দোলন হইতে ইহা তাহাদের আন্দোলনের প্রেরণা আহরণ করিত। কিন্তু ১৯২৩ খৃস্টাব্দে ইস্তাম্বুলের মিত্র শক্তির অধিকার সমাপ্তির পর ইহা সরাসরিভাবে মস্কোর প্রভাবে পতিত হয়। দলটি একটি মাসিক তাত্ত্বিক পত্রিকা প্রকাশ করিত (মার্চ ১৯২০ সাল পর্যন্ত কূরতুলুশ; ১৯২১ হইতে ১৯২৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত Aydinlik) এবং শীঘ্রই ইহা পরবর্তী কালে তুরস্কের মতাদর্শগত বিবর্তনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের জন্য শক্তির কেন্দ্র ও পুনর্গঠনের উৎস হিসাবে চিহ্নিত হয়। ১৯৫৯ সালে তাহার মৃত্যু পর্যন্ত ইস্তাম্বুল সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ড. শাফীক হুসনূ (দিয়মার) ছিলেন তুর্কী কমিউনিস্ট আন্দোলনের সর্বজনস্বীকৃত নেতা। (১৯২৩ খৃস্টাব্দে তুর্কী শ্রমিক ও কৃষক সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃবর্গকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া বিচারের সম্মুখীন করা হয়। তবে শীঘ্রই তাঁহারা বিচার হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। ১৯২৫ খৃস্টাব্দে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রণীত বিধি (তাকরীর-ই-সুকূন) কার্যকরী করা হইলে আতাতুর্ক আয়দিনলীক (Aydinlik) বন্ধ করিয়া দেন এবং রাষ্ট্রবিরোধী কর্মতৎপরতার অভিযোগে দলের কয়েকজন নেতাকে অভিযুক্ত করেন।

প্রকৃত তুর্কী কমিউনিস্ট পার্টি (তুর্কীয়ে কোমুনিস্ট পারভিসি) কয়েকটি বিভিন্ন সূত্র হইতে গড়িয়া উঠে। কমিউনিস্টগণ বিভিন্ন দলের ছত্রছায়ায় দলবদ্ধ হয়; এইগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তুর্কী শ্রমিক ও কৃষক সমাজতন্ত্রী দল, রাশিয়াতে দেশত্যাগী মুসতাফা সুবহী-এর আন্দোলন এবং তোকাত (Tokat)-এর পক্ষে সহযোগী নাজিম-এর সংগঠিত ১৯২০ সালের

ডিসেম্বরে আংকারায় প্রতিষ্ঠিত তুরস্কের গণ-কমিউনিস্ট পার্টি (তুর্কীয়ে খালক ইশ্‌তিরাাকিয়্যন ফিরকাসী)। মুসতাফা সুবহী-এর সংগঠনটি ১৯২১ খৃস্টাব্দের জানুয়ারীতে আনাতোলিয়াতে তাঁহার প্রত্যাগমনের পর তিনি নিহত হইলে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়। আংকারা কমিউনিস্টগণ শুরু হইতেই আতাতুর্ক-এর সহিত সংঘাতে লিপ্ত হয়। আতাতুর্ক দ্রুত শক্তিশালী হইয়া উঠা কমিউনিস্ট আন্দোলনকে তাঁহার নিজের নিয়ন্ত্রণে আনয়নের লক্ষ্যে ১৯২০ সালের অক্টোবরে তাঁহার নিজস্ব 'সরকারী' কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারীতে পিপলস কমিউনিস্ট পার্টি তাহার কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে, যদিও সোভিয়েত চাপের মুখে ইহার কার্যকলাপ চালাইয়া যাওয়ার অনুমতি দান করা হয়। মার্চ হইতে অক্টোবর ১৯২২ পর্যন্ত এই দলটি একটি সাপ্তাহিক য়েনী হায়াত প্রকাশ করে এবং পত্রিকাটি ক্রমাগতভাবে সরকারের সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠে। কিন্তু গ্রীকদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর আতাতুর্ক এই বিরোধিতা সহ্য করার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করায় ১৯২২ সালের অক্টোবরে 'আংকারা পার্টি'টিকে দমন করেন। এই সংগঠনের অবশিষ্ট সমর্থকগণ অতঃপর সুবহী-এর সমর্থকগণের অনুসরণে তুর্কী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে। এই দলটি আপাতদৃষ্টিতে ১৯২০ সালের শেষের দিকে দিয়মার ও সাদ্‌রু'দ্‌-দীন জিলাল (আনতিল) গোপনে ইস্তাম্বুলে সংগঠন করেন। এই দলটির সহিত ইস্তাম্বুলের অ-তুর্কী কমিউনিস্টগণের যোগাযোগ ছিল এবং মস্কোতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সমাবেশে ইহারা প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ইহা তরুণ গোষ্ঠী ও ট্রেড ইউনিয়নসমূহ সংগঠনের চেষ্টা চালায়; তবে খুব বেশী সফলতা লাভে অসমর্থ হয়। ইহার প্রধান প্রধান নেতা ১৯২৫ খৃস্টাব্দে কারারুদ্ধ বা দেশত্যাগে বাধ্য হইলে দলটি গোপনে তুরস্কে কর্মতৎপরতা চালাইতে বাধ্য হয়। দিয়মার ১৯২৬ খৃ. ভিয়েনাতে দলের একটি কংগ্রেস আহ্বান করেন। মনে হয় অপর একটি কংগ্রেসও ১৯৩৩ খৃ. তুরস্কের বাহিরে কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। দলটির প্রকাশ্য কর্মতৎপরতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে সোভিয়েট ও অন্যান্য কমিউনিস্ট প্রকাশনায় ঘোষণা প্রকাশ এবং ১৯৫০ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি হইতে পূর্ব য়ূরোপে অবস্থিত 'বিযিম রেডিও' মারফত ইহার দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করা।

১৯৩২ হইতে ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে কিছু সংখ্যক সাবেক কমিউনিস্ট মাসিক পত্র কাদ্‌রো-তে বিতর্কের মধ্যমে কামালপন্থী মতবাদে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পত্রিকাটি তুর্কী জাতীয়তাবাদের সহায়তার্থে মার্কসীয় ধারণাবলী অভিযোজনের প্রচেষ্টা চালায়। যদিও রক্ষণশীল তুর্কী জাতীয়তাবাদীদের প্ররোচনায় সরকার ১৯৩৫ খৃ. কাদরো-এর প্রকাশনা বন্ধ করিয়া দেন তথাপি ইহার প্রস্তাবিত নীতিসমূহ রিপাবলিকান পিপলস পার্টির (জুমহুরিয়্যাত খাল্‌কফিরকাসী) [দ্র.] বিখ্যাত ছয় তীর (Six Arrows)-এর মূল ভিত্তি রচনা করে এবং ১৯৩৭ খৃ. ইহা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হইলে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন দল গঠনের নূতন প্রচেষ্টা দেখা যায়। যাহা হউক, ১৯৪৬ খৃ. দিয়মার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তুর্কী সমাজতন্ত্রী শ্রমিক ও কৃষক দল Turkiye Sosyalist Emekci ve koylu Partisi এবং এসাদ আদিল মুস্‌তাফা ফোগলু প্রতিষ্ঠিত তুর্কী সমাজতন্ত্রী দল (তুরকিয়ে সোসয়ালিস্ট পারটিসি)-কে কমিউনিজম প্রচারের অভিযোগে এক বৎসরের মধ্যে সরকার বন্ধ করিয়া দেয়। সন্দেহপূর্ণ এই আবহাওয়ায় মধ্যপন্থী সমাজতন্ত্রিগণও শীতল প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়। ১৯৬০ খৃ. ডেমোক্রেট পার্টি (দ্র.)-এর শাসনকাল সমাপ্ত হওয়ার পরও তুরস্কের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্রকে বেআইনীরূপে পরিগণিত করিতে থাকে।

১৯৬০ খৃস্টাব্দের সামরিক অভ্যুত্থান সৃষ্ট আলোড়নে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নূতন প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে। ১৯৬১ খৃস্টাব্দের নূতন সংবিধানে সমাজতন্ত্রের প্রতি একটি নূতন অধিকতর সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি দৃশ্যমান হইয়া উঠে। উদাহরণস্বরূপ, ডেমোক্রেট পার্টির সময়কালীন বাড়াবাড়ির প্রতিকারার্থে সরকার কর্তৃক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার প্রস্তাব করা হয়, শ্রমিক ইউনিয়নসমূহ ধর্মঘটের অধিকার লাভ করে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৬১ সালে ডিসেম্বর হইতে প্রকাশিত Yon পত্রিকাটি ইহার ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদ (পশ্চিমা)বিরোধী প্রচারণা ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন কর্মসূচী প্রস্তাবনার মাধ্যমে বুদ্ধিজীবী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। সমাজতন্ত্র সম্পর্কীয় পুস্তক ও পত্রপত্রিকা বাজারে প্রচুর সংখ্যায় আসিতে থাকে, বিশেষত ছাত্রদের মধ্যে ইহার পাঠক সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। ছাত্রগণ সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর প্রদত্ত জোরালো বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়। এই সকল মতাদর্শ প্রচারণার লক্ষ্যে ১৯৬৩ খৃ. আংকারায় একটি সমাজতান্ত্রিক সমিতি (সোসিয়ালিস্ট কূলতুর দারনেগি) গঠন করা হয়।

এই সকল কর্মতৎপরতার ফলে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত হয় তুর্কী শ্রমিক দল (তুরকিয়ে ঈসচি পার্টিসি)। ইহা ছিল ১৯৬০ খৃস্টাব্দের সামরিক বিদ্রোহের পূর্ব হইতে বর্তমান বিভিন্ন প্রচেষ্টার সম্মিলিত ফল। এই দলটির নেতৃত্বে অধিকারী ক্ষুদ্র সংখ্যক শ্রমিক নেতা ১৯৬১ খৃস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় গণসমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হইলে তাহারা কতিপয় প্রখ্যাত বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর সহযোগিতা কামনা করে। ১৯৬২ খৃ. মেহমেত 'আলী আয়বার দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে তুর্কী শ্রমিকদল ৫১টি প্রদেশে প্রার্থী দিতে সক্ষম হয় এবং একই বৎসর ২,৭৬,০০০ ভোট প্রাপ্তির মাধ্যমে নিম্ন পরিষদে ১৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করে। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত ২৪টি প্রদেশে সিনেট নির্বাচনে দলটি ইহার প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হারে কিছুটা উন্নতি প্রদর্শন করিলেও তাহারা একজনও সিনেটর নির্বাচনে ব্যর্থ হয়।

তুর্কী শ্রমিকদল প্রধানত একটি মার্কস্‌বাদী ধারা অনুসরণ করে। তবে ক্ষমতা লাভের পথ হিসাবে ইহা সম্পূর্ণভাবে সংসদীয় পন্থায় বিশ্বাসী। প্রথম হইতেই ইহা অন্তর্দ্বন্দ্বে ও উপদলীয় কোন্দলে জর্জরিত। ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত ইহার দলীয় কংগ্রেসে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীগণের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন প্রসঙ্গে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এই সমস্যাটি আরো তীব্র রূপ ধারণ করে যখন ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের নির্বাচনে দলীয় নেতৃবর্গ সদস্য পদে বুদ্ধিজীবী প্রার্থিগণকে অধিক মাত্রায় নির্বাচন করেন। দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত দলীয় কংগ্রেসে আয়বা-এর নেতৃত্বের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। ফলে এই বৎসরের ডিসেম্বরে একটি জরুরী দলীয় সভা আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইহাতেও অবশ্য দলীয় ভাংগন সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হয় নাই। অধিকন্তু অধিকতর বিপ্লবী কর্মপন্থায় বিশ্বাসী বামপন্থী সদস্যগণও ইহার জন্য বাধাস্বরূপ ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হিলমি ওযগেন, তুর্ক সোসিয়ালিযমিনিন্‌ ইল্‌কেলেরি, আংকারা ১৯৬২ খৃ.; (২) আঃ চেররাহোগলু, ইসলামিয়েতে ভিওসমানলী সোসয়ালিস্টলেরী, ইসলামিয়েতে ভি ইয়ন'কু সোসয়ালিস্টলার, ইস্তাম্বুল ১৯৬৪ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, তুর্কিয়ে'দে সোস্য়ালিযম, ইস্তাম্বুল ১৯৫৪-৬৭ খৃ., ১ম-৩য় খণ্ড ; (৪) হিল্‌মি যিয়া উলকেন, তুর্কিয়েদে জাগদাস দুমুনজি তারিহি, কোন্‌য়া ১৯৬৬ খৃ., ১ম-২য় খণ্ড; (৫) কামাল হ. কারপাত, The Turkish Left, in Journal of Contemporary History, ১খ. (১৯৬৬ খৃ.), ১৬৯-১৮৬; (৬) ঐ লেখক, Socialism and the Labor Party of Turkey, in MEJ, Spring ১৯৬৭ খৃ., ১৫৭-১৭২; (৭) ঐ লেখক, Political & Social thought in the contemporary Middle East, নিউ ইর্য়ক ১৯৬৮ খৃ., (৮) G. S. Harris, The origins of communism in Turkey, স্ট্যানফোর্ড ১৯৬৭ খৃ.; (৯) মিতি তুনজায় তুর্কিয়েদে সোল আকিমলার, আংকারা ১৯৬৭ খৃ.; (১০) ফেথি তেভিতোগলু তুর্কিয়ে'দে সোসিয়ালিস্ট ভি কোমিউনিস্ট ফালিতেলার (১৯১০-১৯৬০ খৃ.), আংকারা ১৯৬৭ খৃ.; (১১) আচলান সায়িলগান, সোলান ৯৪ য়িলি (১৮৭১-১৯৬৫) খৃ.), আংকারা ১৯৬৭ খৃ.।

G. S. Harris (E.I.[2])/ আবদুল বাসেত

২। **আরব দেশসমূহ ঃ** বর্তমান শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই মিসরীয় বুদ্ধিজীবী সমাজের সদস্যবৃন্দ (দ্র. শিব্‌লী শুমায়্যিল, সালামা মূসা ও ইস্‌মা'ঈল মাহার) সমাজতন্ত্রের সামাজিক সংস্কার, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণ নীতি। ১৯২০ খৃ. মাহমূদ হুসনী আল্‌-'আরাবী আলেকজান্দ্রিয়ার শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করেন। ইহার দুই বৎসর পর আলেকজান্দ্রিয়াতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। ইহা ছাড়াও উর্বর অর্ধচন্দ্র এলাকায় ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যুদয় ঘটে।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে য়ূরোপে জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের সফলতা (জার্মানীতে নাৎসীবাদ, ইতালী, স্পেন, গ্রীস ও অন্যত্র ফ্যাসিবাদ) পরোক্ষভাবে আরব দেশসমূহে উগ্র জাতীয় সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী দলও আন্দোলনের উন্মেষে সহায়তা দান করে। ইহাদের সকলেই বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন রূপের "রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদে"র প্রস্তাবনা করে। ইহাদের মধ্যে ছিল মিসরে আহ্‌মাদ হুসায়ন-এর প্রতিষ্ঠিত তরুণ মিশন সমিতি, পরবর্তীতে যাহার নামকরণ করা হয় "সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রী দল", পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আনতূন সা'আদা-এর Parti Populaire Syrien; ইরাকে কামিল আল-চাদিরেচী (Chadirchi)-এর আহালীগোষ্ঠী ইহার সভ্য ও সমর্থকগণের অনেকেই ছিল ফ্যাসীবাদপন্থী আল্‌-মুছান্না গোষ্ঠীর সদস্য, পরবর্তীতে National Democratic Party নামে পরিচিত; লেবাননের প্রগ্রেসিভ সোস্যালিস্ট পার্টি ও অন্যান্য দল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মনোযোগ নিবদ্ধ হয় আরব সমাজতন্ত্রবাদ (আল-ইশ্‌তিরাকিয়্যা আল-'আরাবিয়্যা) নামে পরিচিত মতবাদের উপর। ইহার প্রধান প্রবক্তা ছিল ১৯৪১-৪৩ সালে মাইকেল 'আফ্‌লাক ও সালাহু'দ্‌-দীন আল-বীতার প্রতিষ্ঠিত আরব বাছ (بعث) পার্টি; দশ বৎসর পর ১৯৫৩ খৃ. ইহা আক্‌রাম হুরানীর আরব সমাজতন্ত্রী দলের সহিত অঙ্গীভূত হয়; ১৯৫৫ খৃ. হইতে ১৯৬১ ও ১৯৬১ হইতে ১৯৬৭ খৃ. পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে আরব সমাজতন্ত্রবাদের দুইজন প্রধান প্রবক্তা ছিলেন মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল 'আব্‌দু'ন-নাসি'র এবং উর্বরা অর্ধচন্দ্রস্থ দেশসমূহের, বিশেষত সিরিয়া ও ইরাকের বিভিন্ন বা'ছ পার্টি সংগঠন ও ক্ষমতাসীন দল। মিসরে জামাল 'আবদু'ন্‌-নাসি'র-এর নেতৃত্বে এমন কি সরকারী ধর্মীয় সংস্থা আযহারকেও আরব সমাজতন্ত্রবাদ ও ইসলামের মধ্যে সম্পর্কের বিশ্লেষণ, যৌক্তিকতা ও উন্নয়নের জন্য জড়িত করা হয় (বিশেষত ১৯৬১ সালের জুনে প্রণীত আযহার পুনর্গঠন আইনের পর এই সংস্রব আরো জোরদার হয়)। প্রথমত ধ্বনি তোলা হয় "ইসলাম সমতা ও ন্যায়ের ধর্ম", যাহা পরবর্তীতে আসে "মুহাম্মাদ প্রথম সমাজতন্ত্রী নেতা", ইসলাম ধর্মকে চিহ্নিত করা হয় "একটি বিপ্লবরূপে যাহা সর্বপ্রথম ন্যায়বিচার ও সাম্যের সমাজতন্ত্রী নীতির প্রথম বাস্তবায়ন ঘটায়।" ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের পর আবির্ভূত হয় নূতন কিছু উগ্রপন্থী বিপ্লবী দল। এইগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মার্কস্‌বাদী, লেনিনবাদী ও মাওবাদী আরব সমাজতন্ত্রবাদের অনুসারী ফিলিস্তিনী ও দক্ষিণ আরবীয় বিভিন্ন দল।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আলজিরিয়াও ইহার বিপ্লবের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিরূপে আরব সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ করে। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে সাল্লাল-এর অধিনায়কত্বে সংঘটিত অভ্যুত্থানের পর য়ামানও একই পথ গ্রহণ করে; নব্য স্বাধীন দক্ষিণ য়ামান গণপ্রজাতন্ত্র তাহার জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের নেতৃত্বের অধীনে, যে ১৯৬৯ সালে কর্নেল জা'ফার আন্‌-নুমায়রীর নেতৃত্বে সংগঠিত অভ্যুত্থানের পর সুদান এবং ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরে আমীর ইদরীসকে ক্ষমতাচ্যুতকারী সামরিক অভ্যুত্থানের নেতা কর্নেল মু'আম্মার আল্‌-কাযাফীর নেতৃত্বে নূতন লিবিয়ার সাধারণতন্ত্র একই পথ গ্রহণ করে।

বা'ছ পার্টিসমূহ ও অন্যান্য তথাকথিত আরব বিপ্লবী নেতার এবং ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর অনুসৃত ও বিজ্ঞপিত আরব সমাজতন্ত্রবাদের সহিত য়ূরোপীয় অথবা মার্কসীয় সমাজবাদের বস্তুতপক্ষে কোন সাদৃশ্য নাই। বরং ইহার নীতিসমূহ জাতীয়তাবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের মতাদর্শের সহিত সম্পর্কযুক্ত। একই সাথে ইহা ইসলামের নৈতিক ও আদর্শবাদী শিক্ষার একটি বিশেষ ব্যাখ্যাও সংযুক্ত করিয়াছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার ও ঐতিহ্যবাহী মুসলিম স্বার্থে সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর ইহা বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। ইহা শ্রেণীসংগ্রাম অথবা শ্রমিক শ্রেণীর অথবা সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধী। এই অবস্থার পরিবর্তে ইহা একটি 'গণতান্ত্রিক সহযোগিতামূলক সমাজ" সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রেণীবৈষম্য দূরীকরণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এই সুসংবাদ সামাজের শ্রেণীসমূহ পরস্পরের সহিত বৈরীভাব পোষণ না করিয়া পরস্পরের সহিত সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করিবে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তির বিরুদ্ধে পোষিত সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা ইহা সমর্থন করে না যদিও ইহা উৎপাদনযন্ত্রের প্রধান অংশসমূহ এবং অর্থনৈতিক কার্যপ্রণালীর উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানার নীতি স্বীকার করে ও ক্ষেত্রবিশেষে তাহা কার্যে পরিণত করে। যেহেতু এই সকল দেশের অধিকাংশ মূলত কৃষিনির্ভর, এই সকল দেশের সমাজতন্ত্রিগণ শহুরে শ্রমজীবী শ্রেণী ও সর্বহারা গোষ্ঠীর তুলনায় গ্রামীণ কৃষিজীবী বিশাল জনগোষ্ঠীর দরিদ্র শ্রেণীকে অধিকতর মৌখিক সমর্থন ও সেবা প্রদান করে। শহুরে শ্রমজীবী শ্রেণী সার্বিকভাবে এখনও উক্ত দেশসমূহের একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র; কেননা দেশগুলি শিল্পায়নের প্রাথমিক অবস্থায় আছে। মূলত আরব সমাজতন্ত্রবাদ মার্কসীয় সমাজতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করে। কারণ মার্কসীয় নীতি তত্ত্বগতভাবে জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করে।

ইহা দাবি করা যাইতে পারে যে, মিসরে জামাল 'আবদু'ন্-নাসির ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের অনুসৃত ও প্রচারিত আরব সমাজতন্ত্রবাদ অথবা উর্বরা অর্ধচন্দ্রের দেশসমূহে বা'ছ দলসমূহের অনুসৃত নীতি কেবল আদিম সমাজতন্ত্রের রূপমাত্র। ইহা নগণ্য সংখ্যক ধনী ভূস্বামী এবং পূর্ববর্তী সরকারী বা ক্ষমতাসীন শ্রেণীর নিকট হইতে জোরপূর্বক সম্পত্তি বাজেয়াফত করার পক্ষপাতী; কিন্তু ব্যক্তিমলিকানার বিলোপ সাধন ইহার কাম্য নহে। ইহার ঐকান্তিক ইচ্ছা দারিদ্র্যের বিলোপ সাধন এবং এই লক্ষ্যে পুঁজি জাতীয়করণ ও অন্যান্য ফলপ্রসূ সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনয়নের মাধ্যমে পুনর্বন্টনের দ্বারা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সমতা আনয়নের জন্য ইহা সক্রিয় ; কিন্তু আজ পর্যন্ত ইহা কেবল সাধারণভাবে দারিদ্র্য বিস্তৃতিতেই সমর্থ হইয়াছে। মূলত ইহা দাবি করে যে, ইহা সম্পত্তির বন্টনে ইচ্ছুক কিন্তু ইহার বিলোপ ইহার কাম্য নয় এবং যেহেতু বেশীর ভাগ আরব দেশেই সম্পত্তির অর্থ জমির মালিকানা, মিসর, ইরাক, সিরিয়া ও আলজিরিয়াতে তাই বেশ কয়েকটি কৃষি ও ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, কিন্তু ইহা ফলপ্রসূ হয় নাই।

প্রেসিডেন্ট জামাল 'আবদু'ন্-নাসিরের বক্তব্য ও নীতিসমূহ (জুলাই-নভেম্বর ১৯৬১-এর জাতীয়করণ ডিক্রী, ১৯৬২ খৃস্টাব্দের জাতীয় সনদ ও ১৯৬৩-৪ খৃস্টাব্দের দখলকরণ ব্যবস্থাবলী) অথবা বা'ছ নেতৃবর্গের বক্তব্য (উদাহরণস্বরূপ 'আফ্লাক-এর রচনাবলী, পার্টি কংগ্রেস, বিশেষত ষষ্ঠ কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাব ও কার্যবিবরণীসমূহ) পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করিলে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, আরব সমাজতন্ত্রবাদ প্রকৃতপক্ষে আরব জাতীয়তাবাদের উগ্র রূপমাত্র। ইহা চরমপন্থী রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক নীতি যাহা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা, জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা ও জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রে অধিকতর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ন্যায্যতা সমর্থন করে। আরব শাসকগণের তথাকথিত সমাজবাদী কর্মতৎপরতার অংশ হিসাবে প্রবর্তিত যে কোন কাঠামোগত সামাজিক পরিবর্তন এখন পর্যন্ত রাষ্ট্র বা ক্ষমতা কাঠামোর কোন পরিবর্তন সাধনের পরিকল্পনা করে না। একই সঙ্গে এই সকল দেশে আরব সমাজতন্ত্রবাদ কঠোরভাবে সাম্যের ভিত্তিতে ভোগ্যপণ্যের সমবন্টনের জন্য কোন সমতাপূর্ণ পদ্ধতি প্রবর্তনেরও পরিকল্পনা করে নাই।

আরব সমাজতন্ত্রবাদ কোন বিশেষ আরব দেশের অনুসৃত আন্তর্জাতিক নীতি, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা আন্ত-আরব নীতি নির্ধারণ বা নির্দেশনার জন্য বিশেষভাবে সুবিধাজনক। উদাহরণস্বরূপ মিসরে আরব সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে মূলত প্রেসিডেন্ট জামাল 'আবদু'ন্-নাসিরের অনুসৃত আন্তর্জাতিক নীতিসমূহ বুঝায়, যাহা বিশেষত ১৯৫৫ খৃস্টাব্দের পর এবং অধিকতরভাবে ১৯৬১ খৃস্টাব্দের পর হইতে কার্যকর হয়। ১৯৬২ সালের মধ্যে মিসর ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্র যেইগুলি আরব সমাজতন্ত্রবাদের সহিত নিজদের একীভূত মনে করিত বা যেইগুলির ক্ষমতাসীন দল ঐ মতবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল সেই সকল দেশে ইহা এক মিত্র ধারণায় পরিণত হয়। আরব সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে তখন জাতীয়তাবাদ, আন্ত-আরব রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষে জড়িত হওয়া, সামরিক বাহিনী কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ, অর্থনীতির উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নীতি অনুসরণের এক মিত্র অবস্থান বুঝাইতে থাকে। মিসর, ইরাক ও সিরিয়াতে পূর্ববর্তী ক্ষমতাসীন ক্ষুদ্র একটি গোত্রের হাতে কুক্ষিগত রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন হিসাবে শুরু হওয়া আরব সমাজতন্ত্রবাদ, সামরিক গোষ্ঠীসমূহের নিয়ন্ত্রণে আসে এবং আন্ত-আরব ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে মধ্যপ্রাচ্যের নব আবির্ভূত প্রভাবশালী পরাশক্তি সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দিকে ধাবিত হয়। নিজ দেশে কার্যত ইহা পরিণত হয় আমলাতান্ত্রিক পুলিশী সমাজতন্ত্রে। ইহার লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায় ক্ষমতাসীন চক্রের সেবা। শ্রমজীবী শ্রেণী বা সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে ইহার কোন সুসংবদ্ধ ভিত্তি ছিল না, এমন কি গণমুখী প্রত্যাশায় আকাঙ্ক্ষিত কৃষি শ্রমিক জনতার মধ্যেও ইহা নিজ ঘাঁটি সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। সমাজতন্ত্রী দলসমূহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং স্থানীয় অথবা আঞ্চলিক সমাজবাদীদের নির্যাতিত ও রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় করা হয়। একক দলসমূহ, যথা মিসর ও ইরাকের আরব সোসালিস্ট ইউনিয়ন অথবা সিরিয়া ও ইরাকের বা'ছ পার্টিসমূহ ও আলজিরিয়ার FIN সমাজতন্ত্রের সঠিক ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করে। এই সকল একক দলসমূহ কখনও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে নাই এবং সরকারই এই সকল দলকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ইহা শুধু রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

আরব সমাজতন্ত্রবাদের সঠিক অর্থ অথবা সংজ্ঞা সম্পর্কে 'আফ্লাকে'র সুবিশাল রচনাবলী বা বা'ছ' পার্টির কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবনা বা কার্যবিবরণী হইতে কোন সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করা কষ্টকর। এইটুকু বলা যায় যে, ইহা অর্থনীতিকে রাজনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক বলিয়া ধারণা করে। ইহা ছাড়াও দলের অন্যতম লক্ষ্য হইতেছে সমাজের নিম্নশ্রেণীর অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রসার করা এবং তাহাদের সামাজিক মর্যাদা উন্নত করা।

অভ্যন্তরীণভাবে তাই আরব সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে সামন্ততান্ত্রিকরূপে চিহ্নিত দেশের ক্ষমতাসীন শ্রেণী, বিশেষত বংশপরম্পরায় ক্ষমতাসীন বংশসমূহের বিরুদ্ধে সক্রিয় গোষ্ঠীবর্গ বা সামরিক গোষ্ঠীর বিরোধিতা বুঝায়। ইহারা নিজ নিজ দেশে এই সকল সামন্ত শ্রেণীকে সামরিক শক্তি বলে অপসারণের অভিলাষী। আরব সমাজতন্ত্রীরা এই সকল শ্রেণীর স্বার্থকে বহির্দেশীয় শক্তিবর্গের সহিত সংযুক্ত বলিয়া মনে করে (এই সকল বহিঃশক্তি তাহাদের মতে সাম্রাজ্যবাদী অর্থাৎ পশ্চিমা শক্তিবর্গ)। তাই ইহাদের ক্ষমতাচ্যুতি ও সম্পত্তির বাজেয়াফ্তকরণ তাহাদের মতে ন্যায্য। কারণ ইহারা সাম্রাজ্যবাদের স্থানীয় দালালমাত্র। আন্ত-আরব রাজনীতিতে 'আরব সমাজতন্ত্রবাদ' তথাকথিত চরমপন্থী শাসকবর্গ ও গোষ্ঠীসমূহ কর্তৃক তথাকথিত রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীসমূহের বিরুদ্ধে সংঘাতে একটি স্লোগানরূপেও ব্যবহৃত। বিপরীত স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাব, সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য সংঘর্ষ বিরাজমান। সাধারণভাবে তাই বলা চলে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'আরব সমাজতন্ত্রবাদ' বলিতে আরব অঞ্চলে অবশিষ্ট পশ্চিমা প্রভাবের বিরুদ্ধে পরিচালিত আরব বিরোধিতা ও উগ্র আরব জাতীয়তাবাদ বুঝায়, যাহা তীব্র আন্ত-আরব সংগ্রামে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এই তৎপরতার সহিত ঘটনাচক্রে সংযোগ ঘটে ১৯৫৫ খৃস্টাব্দে মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশ এবং কতিপয় আরব রাষ্ট্রকে ইহার বিশাল অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের অঙ্গীকার। অনিবার্যভাবে আরব সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠীর সোভিয়েটমুখিতা শুরু হয় প্রথমদিকে (১৯৫৫-৬২ খৃ.) ধীরে ধীরে, ১৯৬২ খৃস্টাব্দের পর দ্রুততার সংগে।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) S. A. Hanna and H. Gardner (সম্পা.), Arab Socialism " A documentary survey, লাইডন ১৯৬৯ খৃ.; (২) জামাল 'আবদু'ন-নাসি'র, National Charter, কায়রো ১৯৬২ খৃ.; (৩) H. Kerr, The emergence of a Socialist ideology in Egypt, in MEJ, ১৬/২খ., (বসন্ত ১৯৬২ খৃ.), ১২৭-৪৪; (৪) Gebran Majdalani, The Arab Socialist Movement, in W. Z. Laqueur (সম্পা.); (৫) The Middle East in Transition, নিউ ইয়র্ক ১৯৫৮ খৃ., ৩৩৭-৫০; (৬) G. H. Torry and J. F. Devlin, Arab Socialism, in J. H. Thompson and R. D. Reischauer (xŒJ.), Modernization of the Arab world, নিউ ইয়র্ক ১৯৬৬ খৃ., ১৭৮-৯২; (৭) P. J. Vatikiotis, Islam and the Foreign Policy of Egypt, in J. Harris Proctor (সম্পা.), Islam and International Relations, নিউ ইয়র্ক ১৯৬৫ খৃ., ১২০-৫৭; (৮) L. Binder. The Ideological revolution in the Middle East, নিউ ইয়র্ক ১৯৬৪ খৃ.; (৯) Hisham B. Sharabi, Nationalism and Revolution in the Arab world, নিউ ইয়র্ক ১৯৬৬ খৃ.; (১০) W. Z. Laqueur, Communism and Nationalism in the Middle East, লন্ডন ১৯৫৬ খৃ.; (১১) P. K. O'Brien, The Revolution in Egypt's Economic system, লন্ডন ১৯৬৬ খৃ.; (১২) L. Z. Yamak, The Syrian Social Nationalist Party, কেমব্রিজ, Mass. ১৯৬৬ খৃ.; (১৩) Kamel S. Abu Jaber, The Arab Baath Socialist party" history, ideology and organization, Syracuse ১৯৬৬ খৃ.।

P. J. Vatikiotis (E.I.[2])/আবদুল বাসেত

**ইশ্‌বীলিয়া** (اشبيلية) ঃ ইংরেজীতে Seville, আরবী-মুসলিম লেখকগণ কর্তৃক Seville নামক স্থান বুঝাইবার জন্য এই নামটি ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন রোমান ভিসিগথিক হিসপালিস (Hispalis) গোয়াদেলকুইভারের (جوادالكبير) উপকূল হইতে ৯৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত (১৯৪০ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুযায়ী লোকসংখ্যা ছিল ২,৭০,১২৬, এনসাইক্লো. ব্রিটানিকা)।

১। **ইতিহাস ঃ** মুসলিম ভূগোলবিদগণ ইশ্‌বীলিয়াকে সমুদ্র হইতে ৬০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাকে একটি মাদীনা (শহর) ও কূরা (Kura)-এর রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা এই নাম বহন করিত অথবা কোন কালে হিম্‌স (Hims) নামেও পরিচিত ছিল। ১২৫/৭৪২-৩ সালে সেখানে প্রতিষ্ঠিত সিরীয় জুন্দ হইতে নামটির উৎপত্তি। আল-'উয্‌রী কূরার চৌহদ্দী সঠিকভাবে নির্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ইশ্‌বীলিয়ার প্রদেশসমূহ (Dependencies) পশ্চিমে নিয়েব্‌লার (Niebla)- কূরার সহিত ত্রিশ মাইল দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে শাযুনার সহিত ২৫ মাইল, পূর্বে কর্ডোভার সীমান্তের সহিত ৪০ মাইল সংলগ্ন ছিল। ইহার রাজধানী ছিল ৯০ মাইল দূরে। উত্তরে মেরিডা কূরা পর্যন্ত ইহা ৫০ মাইল বিস্তৃত ছিল।

ইহার ভূমির উর্বরতা সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন আল-'উযরী, ইব্‌ন গালিব, আল-ইদ্‌রীসী ও আল-হিময়ারী। তাঁহারা ইহার চারণভূমি, পানিসিঞ্চত ভূমি (বৃক্ষ রোপণ ও ফলের বাগান উভয়টির জন্য) ও পানি সেচের মাধ্যমে চারণ ভূমির উর্বরতা ও উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আল-জারাফী (আশ-শারাফ) নামটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের প্রতি, জেলা ও পর্বত—উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় (ইক্‌লীম ও জাবালু'শ-শারাফ)। ইশ্‌বীলিয়ার বর্ণনায় এই শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হইয়াছে। শাযুনার ইক্‌লীম-এর সীমান্ত সংলগ্ন হইয়া ইহা সর্বসাকুল্যে ৪০ মাইল বিস্তৃত। আল-ইদ্‌রীসীর মতানুসারে ইশ্‌বীলিয়ার উত্তরে প্রায় তিন মাইল হইতে শুরু করিয়া ইশ্‌বীলিয়া, নিয়েব্‌লা ও সাগরের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত উন্নত ও ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইশ্‌বীলিয়ার, বিশেষ করিয়া আল-জারাফীর অর্থনীতি অবশ্যই জলপাই ও ডুমুর বাগানের উপর, বিশেষভাবে খুব উন্নত মানের তৈল উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল ছিল, যাহা স্পেনের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত হইত এবং প্রাচ্যে রফতানী করা হইত। অতি উৎকৃষ্ট মানের তুলা উৎপাদনও ছিল অর্থনৈতিকভাবে সমান গুরুত্বপূর্ণ যাহা আন্দালুসের অন্যান্য অঞ্চলে ও আফ্রিকায় প্রেরিত হইত। জাফরানও (Safflower) বিদেশে রফ্‌তানী করা হইত এবং দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপকভাবে বণ্টিত হইত। খাদ্যশস্য, বিভিন্ন প্রকারের ফল, অশ্ব, গৃহপালিত পশু, শিকারের পশু, উন্নত মানের মাদুর, ইক্ষু, মধু, ভেষজ তৃণ, অন্যান্য শাকসব্‌জি, বিশেষত কিরমিয (Quercus coccifera) ইত্যাদির সমাহার ছিল ইশ্‌বীলিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ, যাহাতে বারটি কৃষি জেলা বা ইক্‌লীম অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল-'উযারী ও আল-বাক্‌রী নামক দুইজন লেখক উক্ত কৃষি জেলাগুলির নাম ভিন্ন ভিন্নভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আমীর আল-হাকাম ইব্‌ন হিশাম-এর শাসনামলে জিবায়া (রাজস্ব)-এর মোট পরিমাণ ৩৫,১০০ দীনার বলিয়া উক্ত লেখকদ্বয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সিডোনিয়া শহর, আল-কালা ডি গুয়াদায়রা ও কারমোনা দখলের পর ৯৪/৭১৩ সনের বসন্ত কালে মূসা ইব্‌ন নুসায়র (র.) ইশ্‌বীলিয়াকে অপরাপর মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত করেন এবং ইহার সংরক্ষণ ও পরিদর্শনের ভার য়াহূদী সম্প্রদায় ও একটি আরব গোত্রের উপর অর্পণ করেন। অচিরেই জনসাধারণ (খৃষ্টানগণ) বিদ্রোহ করিলে 'আবদু'ল-'আযীয ইব্‌ন মূসাকে কঠোর হস্তে উহা দমন করিতে হয়। তিনি ওয়ালী বা গভর্নর হিসাবে সেখানে আবাস স্থাপন করেন। শহরটি আরব মুসলিম সরকারের সদর দফতরে পরিণত হয়, যতদিন পর্যন্ত না ওয়ালী আল-হুরর ৯৯/৭১৭-৮ সনে কর্ডোভায় সদর দফতর স্থানান্তরিত করেন। উমায়্যা শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ধর্মীয় ও আরব্য বার্‌বার জাতিগত প্রভাবের কারণে ইশ্‌বীলিয়ার সমাজ কাঠামোতে সংস্কার সাধিত হয়, বিশেষ করিয়া সেখানে হিম্‌সের জিরীয় জুন্‌দ্‌ স্থাপনের পর। আদি ভিসিগথিক (Visigothic) অভিজাত শ্রেণীর স্থলে আরব অভিজাত ও সামরিক শ্রেণীর (প্রধানত য়ামানী) সৃষ্টি হয়। তাহারা শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকে। ইব্‌ন হায্‌ম তাঁহার 'জামহারা' গ্রন্থে ইশ্‌বীলিয়া ও এতদঞ্চলে বসবাসরত আরব পরিবারসমূহের বিষয়ে স্পষ্ট ও চাক্ষুষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন [Elias Teres, Linajes Arabes en al-Andalus, in al-And, ১২খ. (১৯৫৭ খৃ.) নির্ঘণ্ট, ৩৭৬]।

দ্বিতীয় 'আবদু'র-রাহমান শহরের চারিপাশে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করেন। তাঁহার শাসনামলেই নরমান জলদস্যুরা ২৩০/৮৪৪ সনে প্রথম বারের মত ইশ্‌বীলিয়া দখল করে। তাহারা স্বল্প সময়ের জন্য শহরটি

অবরোধ করিয়া লুটতরাজের মাধ্যমে উহা দখল করে। ফলে দ্বিতীয়বার ইহাকে জয় করার জন্য খলীফা স্বীয় সেনাবাহিনী লইয়া অগ্রসর হন এবং টলেডোর চূড়ান্ত যুদ্ধে তিনি হামলাকারীদেরকে বিতাড়িত করেন। শহরের উপর অগ্নি উপাসকদের (নরমানদের) দ্বিতীয় হামলার পথরোধকল্পে খলীফা ইশ্‌বীলিয়ায় একটি অস্ত্র নির্মাণ কারখানা ও দ্রুতগামী জাহাজ তৈরি করেন। এই সকল সুরক্ষা ব্যবস্থা সত্ত্বেও নরমান রাজার সহিত খলীফার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, উপরন্তু তিনি নরমান রাজ-দরবারে য়াহয়া ইব্‌নু'ল-হাকাম আল-গাযালকে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন, তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদের শাসনামলে ২৪৫/৮০৯ সনে নরমানগণ দ্বিতীয়বার স্পেনের উপর হামলা করে। কিন্তু সেইবার নরমানগণ গোয়াদেল কুইভারের মুখে অবতরণ করিয়া, সম্ভবত ইশ্‌বীলীয়ার দিকে না যাইয়া বরং সরাসরি আল-জাযীরাতু'ল-খাদ্‌রা (Algeciras) দখল করার জন্য সামনে আগাইয়া যায়, যদিও ইব্‌ন খালদূন ও আন্-নুওয়ায়রী মনে করেন যে, নরমানগণ সেইবারও ইশ্‌বীলিয়ায় অবতরণ করিয়াছিল (দ্র. R. Dozy, Les Normands en Espagne, Recherche, ৮ম সংস্করণ, পৃ. ২৫৬-২৬৩ এবং ২৭৯-২৮৩)।

খলীফা 'আবদুল্লাহ্‌র শাসনামলে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ইশবীলিয়া দুইটি য়ামানী বংশ—বানূ খালদূন ও বানূ হাজ্জাজ-এর কর্মতৎপরতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। তাহারা সমগ্র আরব জাহানে বড় বড় জায়গীরের মালিক ছিল। তাহাদের আত্মীয়-পরিজন ছিল অসংখ্য। কর্ডোভার উমায়্যা খলীফাগণের সহিত তাহাদের যেই রকম ঘৃণ্য সম্পর্ক ছিল, অনুরূপ মনোভাব তাহারা স্পেনের নব্য মুসলিমদের ক্ষেত্রেও পোষণ করিত। 'আবদুল্লাহ্ সিংহাসনারোহণের সংগে সংগে প্রথমোক্ত বংশের নেতা কুরায়ব ইব্‌ন খালদূন সমগ্র আশ-শারাফ্ জুড়িয়া গোলযোগ বিস্তার করে এবং স্বীয় বিদ্রোহের পক্ষে বানূ হাজ্জাজের নেতা ও দক্ষিণ স্পেনের অপরাপর আরব ও বার্‌বার্ গোত্রসমূহকে সংগঠিত করে, ইশবীলিয়ার সমগ্র অঞ্চলকে অগ্নিসংযোগ ও অস্ত্রাঘাতে লণ্ডভণ্ড করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর (মাঝে মাঝে স্বয়ং খলীফার সহযোগিতায়) ইশবীলিয়ার সমুদয় ধর্মত্যাগীদেরকে ধ্বংস করা হয় (২৭৮/৮৯১)। আরবগণ শহরে সর্ববিষয়ে কর্তৃত্ববান হইয়া উঠে। চার বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর খলীফা অগত্যা তাহাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২৮৬/৮৯৯ সনে উভয় গোত্রের নেতৃবৃন্দ যাহারা এতদিন পরস্পর সন্ধি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া আসিতেছিলেন, পরস্পরের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হইয়া উঠেন। পরিণামে ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাজ্জাজ সফল হন এবং কুরায়বকে হত্যা করেন। বিখ্যাত বিদ্রোহী 'উমার ইব্‌ন হাফসূন (দ্র.)-এর সহিত ঐক্য স্থাপনের পর অবশেষে তিনি কর্ডোভার খলীফার বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু কার্যত ইশ্‌বীলিয়ায় তাঁহার সীমাহীন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। তিনি সেইখানে স্বীয় অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। বড় বড় স্বভাবকবি ও নামজাদা গায়ক ছিলেন তাঁহার দরবারের অলংকার। বানূ উমায়্যার প্রতি নূতন করিয়া তাঁহার আনুগত্য প্রকাশের ফলে স্পেনে আবার নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার যুগ সূচিত হয়। মহান খলীফা তৃতীয় 'আবদু'র-রহমানের শাসনামলে ইশবীলিয়া গুরুত্বের দিক হইতে কর্ডোভার সমকক্ষ না হইলেও নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের যুগে প্রবেশ করিয়াছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অনুগত ছিল।

ইশ্‌বীলিয়ার সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল উন্নত ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতেও গুরুত্বপূর্ণ যুগ শুরু হইয়াছিল উমায়্যা খিলাফাতের অবসানের পর যখন ৪১৪/১০২৩ সন হইতে 'আব্বাদীগণের স্বাধীন গোত্র (তু. 'আব্বাদ) ইহাকে রাজধানী নির্বাচিত করে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কাদী আবু'ল-কাসিম মুহাম্মাদ আল-আওওয়াল লাখ্‌মী বংশের নামজাদা ফাকীহ (ইসলামী শাস্ত্রবিদ) ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আব্বাদ-এর পুত্র ছিলেন। তিনি প্রথম প্রথম হাম্মূদী বাদশাহ য়াহয়া ইব্‌ন 'আলীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া শক্তি সঞ্চয় করেন, কিন্তু অচিরেই তাঁহার আনুগত্য অস্বীকার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ৪৩৪/১০৪২ সনে তাঁহার পুত্র আবূ 'আম্‌র 'আব্বাদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন যিনি 'আল-মু'তাদিদ' সম্মানসূচক উপাধিতে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন . . . . .পূর্ব ও পশ্চিমে অবস্থিত প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহকে জয় করিয়া তিনি নিজের সালতানাত বিস্তৃত করেন। এই পর্যায়ে তাঁহাকে শুধু একজন শক্তিশালী শত্রুরই মুকাবিলা করিতে হইয়াছে ; তিনি ছিলেন গ্রানাডার যীরী বংশীয় বাদশাহ বাদীস। আল-মু'তাদিদ ৪৬১/১০৬৮ সনে ইনতিকাল করেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় আবু'ল-কাসিম মুহাম্মাদ আল-মু'তামিদ স্বীয় কাব্যামোদিতা ও কবি প্রতিভার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার আমলে ইশ্‌বীলিয়া সমকালীন জ্ঞানী ব্যক্তিদের উদ্দিষ্ট স্থলে পরিণত হয়। তিনি বানূ জাওহারের নিকট হইতে কর্ডোভা কাড়িয়া লইলেন। কিন্তু অচিরেই ক্যাশটাইলের (Castile) রাজা ষষ্ঠ আলফন্‌সো (Alfonso)-এর রাজ্য বিস্তারের লোলুপ দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। ফলে তিনি আল-মাগরিবের পশ্চিমাংশের নূতন সুলতান য়ূসুফ ইব্‌ন তাশ্‌ফীন আল-মুরাবিতীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন। ইব্‌ন তাশ্‌ফীন নিজের সৈন্য-সামন্তসহ সাগর পাড়ি দিয়া স্পেনে পৌঁছেন এবং ১২ রাজাব, ৪৭৯/২৩ অক্টোবর, ১০৮৬ তারিখে যাল্লাকা-এর যুদ্ধে বিরাট বিজয় লাভ করেন। আল-মুরাবিতগণ মরক্কো প্রত্যাবর্তন করিলে খৃষ্টানগণ তাহাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ পুনরায় শুরু করিয়া দেয়। এইবার সাহায্যের জন্য লামতূনী সুলতানের নিকট আল-মুতামিদকে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইতে হয়। য়ূসুফ তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং অচিরেই মু'তামিদকে তাঁহার রাজত্ব হইতে বঞ্চিত করেন। য়ূসুফের প্রধান সেনাপতি সীর ইব্‌ন 'আবী বাক্‌র ইব্‌ন তাশফীন ৪৮৪/১০৯১ সনে ইশ্‌বীলিয়া ও তৎসঙ্গে কর্ডোভা, আলমেরিয়া, মুরসিয়া ও দনিয়া হস্তগত করেন। বার্‌বার্ উপজাতীয় সৈন্যরা শহর লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়, প্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া কুটির পর্যন্ত সমুদয় ঘরবাড়ী লুণ্ঠন করে। 'আব্বাদীগণের প্রাসাদগুলি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। হতভাগ্য আল-মু'তামিদকে বন্দী করিয়া মরক্কোয় নির্বাসিত করা হয়। সেইখানে তিনি আগমাতে অবস্থানকালে ৪৮৮/১০৯৫ সনে নিজের বিপদ ও দুর্ভোগের উপর শোকগাথা রচনার পর ইনতিকাল করেন। সাহিত্যামোদী মুসলিমগণ অদ্যাবধি তাঁহার রচিত শোকগাথাসমূহের উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি নিজে একজন উদার, সাহসী, শালীন ও সংস্কৃতিবান শাসক ছিলেন। বানূ 'আব্বাদের শাসনামলের ইশ্‌বীলিয়া সম্পর্কীয় সমুদয় মূল পাঠকে Dozy তাঁহার রচিত গ্রন্থ Scriptorum Arabum Loci de Abbadidis-এর তৃতীয় খণ্ডে (লাইডেন ১৮৪৬-১৮৬৩ খৃ.) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

আল-মুরাবিতী সৈন্যাধ্যক্ষ স্বীয় সুলতানের প্রতিনিধি হিসাবে ইশ্‌বীলিয়া শাসন করিতে থাকেন এবং অবশিষ্ট ইসলামী স্পেনের ন্যায় ইশবীলিয়া শহরও আল-মাগরিবী সুলতানদের অধীনে থাকিয়া যায়। রাজাব

৫২৬/মে ১১৩২ সনে টলেডোর খৃস্টানদের একটি বাহিনী ইশ্‌বীলিয়ার আশেপাশে হানা দেয়। যুদ্ধ চলাকালে শহরের শাসনকর্তা 'উমার ইব্‌ন মাকূর নিহত হন।

ইশ্‌বীলিয়ার অধিবাসিগণ আফ্রিকার মুরাবিতদের পতন এবং মুওয়াহ্‌হিদগণের উত্থানের সংবাদ হৃষ্ট চিত্তে শ্রবণ করেন। সুলতান 'আবদু'ল-মু'মিন-এর সেনাপতি বারুরায ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মাসুফী উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ জয় করার পর ইশ্‌বীলিয়া অবরোধ করেন এবং শা'বান ৫৪১/জানুয়ারী ১১৪৭ তারিখে আল-মুরাবিতী শহররক্ষী সেনাদলকে হটাইয়া ইশবীলিয়া জয় করেন। পরবর্তী বৎসর কা'দী আবূ বাক্‌র আল-'আরাবীর নেতৃত্বে ইশবীলিয়ার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ শহরবাসীদের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশের জন্য সুলতানের দরবারে গমন করেন। এই দলটি যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিল তখন পথিমধ্যে ফাস নামক স্থানে কাদী আবূ বাক্‌র ইনতিকাল করেন। 'আবদু'ল-মু'মিন আল-মুওয়াহ্‌হি'দ য়ূসুফ ইব্‌ন সুলায়মানকে শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু ৫৫১/১১৫৬ সনে স্বয়ং শহরবাসীদের আবেদনক্রমে স্বীয় পুত্র আবূ য়া'কূব য়ূসুফকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিলেন। ৫৫৮/১১৬৩ সনে আবূ য়া'কূব য়ূসুফ স্বীয় পিতার সিংহাসনে আরোহণ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তাঁহার শাসনকালে ইশ্‌বীলিয়া স্পেনের আল-মুওয়াহ্‌হিদ সেনাবাহিনীর সদর দফতরে পরিণত হয়। আবূ য়া'কূব সেখানে ৫৬৮/১১৭২ সন হইতে ৫৭১/১১৭৫ সন পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং প্রত্যাবর্তনকালে মুহাম্মাদ ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন ওয়ানূদীন ও নৌসেনাপতি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জামি'-এর সহিত স্বীয় ভ্রাতা আবূ ইসহা'ক মুহ'াম্মাদ ইব্‌রাহীমকে প্রধান সেনাধ্যক্ষ হিসাবে রাখিয়া গেলেন। এই ইশবীলিয়াতেই ৫৮০/১১৮৪ সনে সানতারিম (San Tarim)-এর যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করার সময় আবূ য়া'কূব-এর মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র আবূ য়ূসুফ য়া'কূ ব আল-মানসূর (৫৮০/১১৮৪ সন হইতে ৫৯৫/১১৯৯ সন পর্যন্ত) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং আল-মুওয়াহ্‌হিদ সেনাবাহিনীকে ইশবীলিয়ায় ফেরত আনেন, তাহার পর হাফসী নেতা আবূ য়ূসুফকে ইশবীলিয়ার শাসক মনোনীত করিয়া মরক্কো প্রত্যাবর্তন করেন। শেষোক্ত ব্যক্তির আহ্বানে সাড়া দিয়া আবূ য়ূসুফ য়া'কূ ব ৫৮৬/১১৯০ সনে দ্বিতীয়বারের জন্য সিলভেস (Silves), যাহা খৃস্টানগণ সৈন্য ও অস্ত্রবলে কাড়িয়া লইয়াছিল, বিজয়ের উদ্দেশে পুনরায় ইশবীলিয়া আগমন করেন। আল-আরক (Alarcos)-এর যুদ্ধে ৮ শা'বান, ৫৯১/১৯ জুলাই, ১১৯৫ সালে ক্যাশটিলের রাজা ৮ম আলফনসো-এর বিরুদ্ধে বিরাট বিজয় লাভের পর সুলতান দীর্ঘকাল ইশবীলিয়ায় অবস্থান করেন। এই অবস্থানকালে তিনি কর্ডোভার জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক ইব্‌ন রুশ্‌দকে বন্দী করেন। ৫৯৪/১১৯৮ সনে অর্থাৎ ইনতিকালের এক বৎসর পূর্বেও তিনি মরক্কো প্রত্যাবর্তন করেন নাই।

এই দুইজন সুলতানের যুগে ইশ্‌বীলিয়া বানূ 'আব্বাদের দীর্ঘকালের সুশাসনের মাহাত্ম্য ও যশের সাক্ষ্য বহন করে। সেই যুগে ইহার জনসংখ্যা কর্ডোভার জনসংখ্যাকে অতিক্রম করিয়াছিল। আল-মুওয়াহ্‌হি'দ রাজন্যবর্গ ও তাঁহাদের দরবারের বড় বড় অমাত্য সেখানে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করেন। মসজিদ, হাম্মাম, লংগরখানা ও বাজারের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া যায়। আবূ য়া'কূবের শাসনামলেই সেই স্থানের বিখ্যাত মসজিদটি নির্মিত হয়, যেখানে ১৫শ শতাব্দীতে বিদ্যমান গির্জা নির্মিত হওয়ার কথা ছিল। 'রাওদু'ল-কিরতাস' নামক গ্রন্থে (সম্পা. Tornberg, পৃ. ১৩৮) উক্ত জামে' মসজিদের নির্মাণ-সন ৫৬৭/১১৭২ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 'আল-হুলালু'ল-মাওশিয়া' গ্রন্থের (তিউনিসিয়া সংস্করণ, পৃ. ১২০) অজ্ঞাত লেখকের মতে উহার নির্মাণকাল ৫৭২/১১৭৬-৭৭ সন। ইব্‌ন আবী যার'-এর বর্ণনা মুতাবিক উক্ত মসজিদের নির্মাণকার্য মাত্র এগার মাসে সম্পন্ন হয়— যাহা সর্বাংশে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। উক্ত লেখকের বর্ণনায় এই কথাও বলা হইয়াছে যে, সেই বৎসর ইশবীলিয়ায় গোয়াদেলকুইভার নদীর উপর একটি সেতু, দুইটি ছোট শহর, মাসরিক দুর্গ, পরিখা, নদীর তীরে মাটির বাঁধ ও একটি পানির নালা নির্মিত হইয়াছিল। ইশবীলিয়ায় আল-মুওয়াহ্‌হি'দগণের স্থাপিত বিশাল মসজিদের আঙ্গিনা, দরজা ও মীনার ছাড়া কোন চিহ্নই এখন আর অবশিষ্ট নাই। সেই আঙ্গিনাকে বর্তমানে Patio e los Naraujos (নার্গিস বৃক্ষের আংগিনা) বলা হয়। দরজাটিকে বলা হয় Puerta del perdon (ক্ষমার দ্বার)। উহার বিখ্যাত মীনার (Giralda)-ও বর্তমানে অবশিষ্ট আছে। উহার চূড়ায় 'বিশ্বাসের মূর্তি' (Statue of Faith) স্থাপিত আছে যাহা বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবর্তিত হয়। (স্পেনের ভাষায় Girar অর্থ ঘুরিয়া যাওয়া) সার্বিকভাবে এই মীনারটি, উহার সদৃশ মীনারসমূহ, যথা রিবাতু'ল-ফাত্‌হ' নামক স্থানে হাস্‌সানের মীনার ও মরিক্কোর জামি'উ'ল-কাত্‌বায়ন-এর মীনার-এর মত উন্নত মানের নয়, সেইগুলি সমসাময়িক কালে নির্মিত হইয়াছে। মাটির উপরে উহার ভিত্তি ৪৩ বর্গফুট। উহা ইট দ্বারা নির্মিত। দেওয়াল সাত ফুট উঁচু যাহার মধ্য হইতে অসংখ্য জানালা বাহির করা হইয়াছে। ইহা আরবী ও ভিসিগথিক চূড়াসম্বলিত স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। আলোক টাওয়ার মীনারের ছাদের উপর নির্মিত হইয়াছিল। তিন শত ফুট উচ্চতাসম্পন্ন একটি ঘণ্টা ঘর বর্তমানে তদস্থলে নির্মিত হইয়াছে।

৬০৯/১২১২ সনে আল-মানসূর-এর উত্তরসূরি আল-মুওয়াহ্‌হি'দ মুহ'াম্মাদ আন-নাসি'র ইশ্‌বীলিয়ার দুর্গ প্রাচীরের নীচে বিশাল সৈন্যবাহিনী একত্র করেন, যাহা দ্বারা তিনি পরে স্পেনের সেই হৃত অংশ পুনর্জয় করিবার সংকল্প করেন। ইহা ছিল খৃস্টানদের করতলগত। সেই বিশাল সেনাবাহিনীকে উক্ত সালের ১৫ স'ফার/ ১৬ জুলাই হিস্‌নু'ল-'ইকাব (Las novas de Tolosa) নামক স্থানে পরাজয় বরণ করিতে হয় এবং পরাজিত সেনাবাহিনীসহ সুলতান ইশ্‌বীলিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন।

কিছুকাল পরই ৬১৭/১২২০ সনে আল-মুওয়াহ্‌হিদ দ্বিতীয় য়ূসুফ আল-মুস্‌তানসির-এর রাজত্বকালে সেখানকার শাসক আবু'ল-'আলা গোয়াদেল কুইভারের তীরে একটি উচ্চ স্তম্ভ (Castle) নির্মাণ করিলেন যাহা দ্বারা রাজকীয় ভবন [বর্তমানে আল-কাস্‌র (Alcazar), যাহা ১৪শ শতাব্দীতে নিষ্ঠুর পেড্রু (Pedro The Cruel) কর্তৃক নূতনভাবে নির্মিত হয়] ও নদী সংরক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল। একটি স্পেনীয় অনুবাদে উহার আরবী নাম 'বুরজু'য -যাহাব' (Torre del Oro-স্বর্ণ মিনার) অপরিবর্তিত রাখা হইয়াছে। উহার নিম্নভাগ উপর্যুপরি নির্মিত মোট বারটি অংশে বিভক্ত। উহার উপরের খাঁজকাটা টাওয়ার ও চূড়ায় স্থাপিত সর্বাপেক্ষা ছোট টাওয়ারটি অদ্যাবধি বিদ্যমান।

কয়েক বৎসর পর ইশবীলিয়া আরও একবার আল-মুওয়াহ্‌হিদ সুলতান ইদ্‌রীস আল-মা'মূন-এর রাজধানীতে পরিণত হয় এবং ৬২৬/১২২৮-১২২৯ সনে তিনি মরক্কো প্রত্যাবর্তন করার পর শহরের

উপর বিদ্রোহী মুহাম্মাদ ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন হূদ-এর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি অবশেষে স্পেনের ভূখণ্ড হইতে মুওয়াহ্‌হিদগণকে বিতাড়িত করেন। তৃতীয় ফার্ডিনান্দ গ্রানাডার নাসিরী বংশের প্রথম সুলতান মুহাম্মাদ আওওয়াল ইব্‌ন আল-আহমার-এর সহিত মিত্রতা স্থাপনের সুযোগে নিজের শক্তি সুদৃঢ় করিয়া ১২৪৭ খৃ. ইশ্‌বীলিয়া অবরোধ করেন। ষোল মাসের দীর্ঘ অবরোধের পর ১ শা'বান, ৬৪৬/১৯ নভেম্বর, ১২৪৭ সালে অথবা কোন কোন লেখকের মতে আরও চারিদিন পর উহা জয় করেন। স্থানীয় মুসলিম অধিবাসিগণের জীবন রক্ষা করা হয় এবং তাহাদেরকে তৎকালীন স্পেনের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের দিকে অথবা পুনরায় আফ্রিকার দিকে দেশত্যাগ করার অনুমতি দেওয়া হয়। মরক্কোর মারীনী সুলতানগণ পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে খৃস্টানদের দখল হইতে ইশ্‌বীলিয়া পুনরাধিকারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ৬৭৪/ ১২৭৫ সনে আবূ য়ূসুফ য়া'কূব ইব্‌ন 'আবদি'ল-হাক্ক জেনারেল ডন নিউনো ডি লারা (Don Nuno de Lara)-এর সৈন্যদের উপর বিজয় লাভের পর ইশবীলিয়া ও জিরিয (Jerez) অঞ্চলকে সম্পূর্ণভাবে লুণ্ঠন করেন। কিন্তু তাঁহাকে শীঘ্রই রাজধানীর অবরোধ তুলিয়া লইতে হয়। ৬৭৬/১২৭৮ সনে স্পেনের দ্বিতীয় অভিযানকালে তিনি পুনরায় ইশ্‌বীলিয়ার শহর-প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছেন এবং ইক লিমু'শ্-শারাফ অঞ্চলে ব্যাপক লুটতরাজ করেন। ৬৮৪/১২৮৫ সন পর্যন্ত তাঁহার হামলা নিরবচ্ছিন্ন রাখেন। ইহার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রাওদু'ল-কিরতাস গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। পরিশেষে বাধ্য হইয়া ডন সানচু (Don Sancho) সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। এই সন্ধি আবূ য়ূসুফের উত্তরাধিকারী আবূ য়া'কূব য়ূসুফের শাসনকাল অর্থাৎ ৬৯০/১২৯১ সন পর্যন্ত বলবৎ থাকে। অবশেষে তারিফা (Tarifa)-র প্রাচীর সন্নিকটে সেই বংশের সুলতান আবু'ল-হাসান 'আলী পরাজয় বরণ করিলে মুসলিমদের ইশ্‌বীলিয়া পুনরুদ্ধারের আশা চিরকালের জন্য বিলীন হইয়া যায়।

ইশ্‌বীলিয়ায় জন্মগ্রহণকারী অথবা সেখানে বসবাসকারী বিখ্যাত মুসলিম মনীষীদের তালিকা এই স্থানে প্রদান করা হইলে একটি দীর্ঘ কলেবর প্রবন্ধ হইয়া উঠিবে। কবিদের মধ্যে ইব্‌ন হাম্দীস (দ্র.), ইব্‌ন হানী ও ইব্‌ন কুযমান (দ্র.), হাদীছবেত্তাগণের মধ্যে ইবনু'ল-'আরাবী (দ্র.) এবং জীবনীকার ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে আবূ বাক্র ইব্‌ন খায়র-এর নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন নিবন্ধের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করাই যথেষ্ট হইবে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) আল-ইদ্‌রীসী, Description de l'Afrique et de l'Espagne, সম্পা. ও অনু. Dozy ও de Goeje, মূল পাঠ পৃ. ৭৮, অনু. পৃ. ২১০ ; (২) য়াকূত, মু'জামু'ল-বুলদান, সম্পা. Wustenfeld ; (৩) ইব্‌ন 'আবদি'ল-মুন'ইম আল-হিম্‌য়ারী, আর্-রাওদু'ল-মিতার, অপ্রকাশিত পাণ্ডু. ফেয ও Sali-এ, ইশ্‌বীলিয়া শিরোনামাধীন; (৪) আবু'ল-ফিদা', তাকবীমু'ল-বুলদান, সম্পা. Reinaud ও De Slane, প্যারিস ১৮৪০ খৃ., পৃ. ১৭৪-৭৫ ; (৫) E. Fagnan, Extraits inedits relatifs au Maghreb. আলজিরিয়া ১৯২৪ খৃ., পৃ. ৮৫, ১৩৭, ২০৯ ; (৬) আখবার মাজমূ'আ, সম্পা. ও অনু. E. Laufuentey Alcantara, মাদ্রিদ ১৮৬৭ খৃ., মূল পাঠ পৃ. ১৬-১৮, অনু. পৃ. ২৮-৩০ ; (৭) ইবনু'ল-'ইযারী, আল-বায়ানু'ল-মুগরিব, সম্পা. R. Dozy, অনু. E. Fagnan, ২খ. ; (৮) ইবনু'ল-আছীর, আল-কামিল, সম্পা. Tornberg, আংশিক অনুবাদক E. Fagnan (Annales du Maghreb et de Espagne, আলজিরিয়া ১৯০১ খৃ.) ; (৯) আল-মাররাকুশী, আল-মু'জিব, সম্পা. R. Dozy, অনু. E. Fagnan ; (১০) আল-মাক্কারী, নাফ্‌হু'ত্তীব, লাইডেন, ১খ, ৯৯ ; (১১) ইব্‌ন আবী যার', রাওদু'ল-কিরতাস; (১২) ইব্‌ন খালদূন, আল-'ইবার, সম্পা. ও অনু. de Slane (শেষ যুগের দুইজন আল-মুরাবিতী সুলতান, আল-মুওয়াহ্‌হিদ ও বানূ মারীন-এর শাসনামলের জন্য ; (১৩) Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne, ২ ও ৩খ. ; (১৪) Dozy, Recherches sur l'Histoire et la litterature des Arabes d'Espagne, তৃতীয় সং, প্যারিস ও লাইডেন ১৮৮১ খৃ., ১খ, ৫৩-৫৭, ২০৯-২৬৪ ; (১৫) F. Codera, Decadencia y desaparicion de los Almoravides en Espana, সারাকোসতা ১৮৯৯ খৃ., পৃ. ২৪, ২৮৪ ; (১৬) Lerchnudi ও Simonet, Crestomatia arabigo espanola, গ্রানাডা ১৮৮১ খৃ., পৃ. ৪০ ও ৪১ ; (১৭) Madoz, Diccionario geografico-estadistico-historico de Espana, মাদ্রিদ ১৮৪৯ খৃ., ১৪খ., ২০৯-৪৩৪ ; (১৮) Oritz de Zuniga, Anales eclesiasticosy Seculares de la ciudad de Savilla; ইশ্‌বীলিয়া ১৮৯৩ খৃ., ৬খ. ; (১৯) Gestoso y Perez, Sevilla monumental y artistica, ইশ্‌বীলিয়া ১৮৮৯-১৮৯২ খৃ., ৩ খণ্ড ; (২০) Rodrigo Caro, Antiguedades y principado de la ilustrisima ciudad de Sevilla, ইশ্‌বীলিয়া ১৮৯৬ খৃ., ২ খণ্ড ; (২১) Guichot, Historia de la ciudad de Sevilla y pueblos importantes de su provincia, ইশ্‌বীলিয়া, ৭ খণ্ড ; (২২) Rodrigo Amador de los Rios, Inscripciones arabes de Sevilla ; মাদ্রিদ ১৮৭৫ খৃ. ; (২৩) Contreras Estudio descriptivo de los monumentos arabes de Granade, Sevilla y Cordoba, ৩য় সং., মাদ্রিদ ১৮৮৫ খৃ. ; (২৪) A. F. Calvert, Moorish Remains in Spain, লন্ডন ১৯০৬ খৃ.।

E. Levi-Provencal/(দা.মা.ই.) আ. জ. ম. সিরাজুল ইসলাম হোসাইনী

২. **ঐতিহাসিক ইমারতসমূহ** ঃ ইশ্‌বীলিয়া (Seville) দীর্ঘকালের মুসলিম ইতিহাসের মাত্র গুটিকয়েক ঐতিহাসিক ইমারত আপন বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহা ছিল স্পেনের মহান শিল্প নগরীগুলির অন্যতম। খৃস্টীয় ১৬শ শতাব্দী হইতে শহরটি স্পেন ও নয়া বিশ্বে উহার সাম্রাজ্যের মধ্যে নিরাপদ সংযোগ রক্ষাকারী বিখ্যাত বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। আধুনিক কালে ইহাতে খৃস্টানদের দ্বারা মুসলিম আমলের বিশিষ্ট সৌধরাজির স্থলে নূতন নূতন ইমারত নির্মিত হয়।

(১) **দুর্গ ব্যবস্থা** ঃ (ক) শহর-প্রাচীর, যেহেতু ইশ্‌বীলিয়া একটি বিশাল নাব্য নদীর তীরে সমতল ভূমিতে অবস্থিত ছিল, সেহেতু এখানে একটি প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গ অপরিহার্য ছিল। আরবী ভাষার মৌলিক রচনায় অতি প্রাচীন কালের এই ধরনের প্রাচীরের উল্লেখ আছে। ২৩০/৮৪৪ সনে নরমান আক্রমণের পর প্রাচীরটি মেরামত করিতে হয়। দ্বিতীয়

'আবদু'র-রহমানের নির্দেশে তদীয় সিরীয় মাওয়ালী 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সিনানকে মেরামতকার্য পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করা হয়। বিভিন্ন সময় নদীর পার্শ্বের প্রাচীরের দক্ষিণ দিক গোয়াদেল কুইভারের পানিতে বিনষ্ট হইয়াছে। উপরন্তু 'আবদুল্লাহ-এর সিংহাসনচ্যুতির পর 'আল-মুরাবিতদের আক্রমণ অত্যাসন্ন মনে করিয়া গ্রানাডার যীরী আমীর আল-মু'তামিদ মাটি দ্বারা উহাকে মজবুত করেন।

কিন্তু এই দুর্গ-প্রাচীরটি আল-মুরাবিত সুলতান 'আলী ইব্‌ন য়ূসুফের শাসনামলে হয় মেরামত করা হইয়াছিল, না হয় সম্পূর্ণভাবে পুনর্নির্মাণ করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ভূগোলবিদ আল-ইদ্‌রীসী, যিনি ৫৪১ ও ৫৪৮/১১৪৬-৫৪ সনের মধ্যে রচনাকার্যে নিয়োজিত ছিলেন এবং যিনি আল-মুওয়াহ্‌হিদদের বিজয়ের পূর্বে স্পেন স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছেন যে, সেভিলের শহর-প্রাচীর খুব মজবুত ছিল। সাত শত বৎসর যাবত শহরটিকে পরিবেষ্টিত রাখিবার পর প্রাচীরটি ১৮৬১ ও ১৮৬৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহার ব্যাস ছিল ছয় কিলোমিটার। ১১৬টি টাওয়ার (Tower) দ্বারা ইহার পার্শ্বদেশ নির্মিত হইয়াছিল। কর্ডোভা ও মাকারেনা তোরণের মধ্যবর্তী স্থানে ইহার ধ্বংসাবশেষ আজিও বিদ্যমান। দুইটি টাওয়ারের মধ্যবর্তী সুউচ্চ কঠিন কংক্রিট নির্মিত প্রাচীরটি ৮৩ সেঃ মিঃ স্তরপরম্পরায় গঠিত। ইহার সাতটি টাওয়ার সংরক্ষিত আছে। উহাদের মধ্যে Torre Blanca নামক টাওয়ারটি বহুভুজ ক্ষেত্রাকৃতির। অপর ছয়টি আয়তাকার। সবকয়টির বহির্দেশ ইটের পট্টি দ্বারা খোদাই-কৌশলে অলংকৃত। মূল মাটির ঢিবির বাহিরে বহিস্থ দেওয়াল ৩৫ মিটার দূরে অবস্থিত। পুরু ও পোক্তভাবে তৈরী ফটকসমূহে কৌণিক প্রবেশ পথ রহিয়াছে। এই আল-মুরাবিত দুর্গটি যখন নির্মিত হয় তখন উহা স্পেনে মুসলিম-দুর্গ নির্মাণ কৌশলের সর্বশেষ উৎকর্ষের নিদর্শন উপস্থাপন করে। সমগ্র মধ্যযুগ ধরিয়া ইহার মজবুত নির্মাণ অক্ষুণ্ন থাকে। ৬৪৭/১২৩৯ সনে অবরোধের পর শহরবাসী Castile-এর রাজার নিকট আত্মসমর্পণ করে, ইহা আক্রমণ করিয়া বলপূর্বক দখল করা হয় নাই।

আল-মুওয়াহ্‌হিদ আবূ য়া'কূবের অধীনে নদীর তীরবর্তী প্রাচীর অবশ্যই পুনরায় মেরামত করা হয়। ৬১৭/১২২০-১ সনে শহরের আল-মুওয়াহ্‌হিদ গভর্নর আবু'ল-'আলা' দুর্গের বাহিরে সুরক্ষিত প্রাচীর নির্মাণ করেন (Coracha) যাহা আল-কাযার হইতে নদীমুখী হইয়া মজবুত বারোটি পার্শ্ববিশিষ্ট বর্ধিতাংশ হিসাবে (Bastion) শেষ হইয়াছে, উহাই 'সোনালী মীনার' (Tower)। এই টাওয়ারটির দুইটি নিম্নতলা সংরক্ষিত আছে, কিন্তু উপরের আলোক-প্রকোষ্ঠটি পুনর্নির্মাণ করা হইয়াছে। উহার দেওয়াল সাধারণ ইট ও কংক্রিটের তৈরী। অন্য সকল আল-মুওয়াহ্‌হিদ দুর্গের বর্ধিতাংশের (Bastion) ন্যায় সোনালী মীনারেও খিলান করা কক্ষ আছে। এই ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে আয়তাকার ও ত্রিভুজাকৃতির নকশায় তিনতলা পর্যন্ত বাঁকানো খিলানের সাথে ছাদ নির্মিত হইয়াছিল।

কক্ষসমূহে আলো সরবরাহকারী খিলানযুক্ত জানালাগুলির বহির্দেশ সিরামিকের বর্ডার সহযোগে নিশ্ছিদ্র খিলানগুলি দ্বারা অলংকৃত।

সোনালী মীনার গুয়াদিলকুইভার নদীর তীরের সুরক্ষাব্যবস্থাকে প্রচণ্ডভাবে শক্তিশালী করে। সোনালী মীনার এবং বাম তীরে নির্মিত দুর্গের বর্ধিতাংশের মধ্যে একখানা শিকল দ্বারা নদীটিকে রোধ করা সম্ভব ছিল।

(খ) আল-কাযার (The Alcazar) ঃ স্পেনের অন্যান্য বড় শহরের মত ইশ্‌বীলিয়া ও শহর রক্ষা-দুর্গ ছিল আল-কাযার, যেখানে গভর্নর অথবা স্বাধীন সুলতানগণ বাস করিতেন। ইহার আয়তাকার টাওয়ারগুলির শীর্ষদেশে দ্বিগুণিত পট্টি দ্বারা খোদাই কৌশল দেখিয়া মনে হয় যে, এই দুর্গটি আল-মুওয়াহ্‌হিদ যুগের সৃষ্টি। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের তৎপার্শ্বস্থ পুনরুদ্ধার কর্ম দ্বারা উন্মোচিত হইয়াছে যে, বাহিরের আস্তরণের নীচে টাওয়ার সংযোগকারী দেওয়াল ও টাওয়ারগুলি কাটা পাথরের তৈরী এবং ইহাতে ৩য়/৯ম শতকের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নির্মাণকৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। সুতরাং আল-কাযার-এর আদি আকৃতি দ্বিতীয় 'আবদু'র-রহমানের সময়ের বলিয়া অনুমিত হয়। ৪র্থ/১০ম শতকে বহির্দেশে মাটির ঢিবির কাছে কাটা পাথরের বহির্মুখী একটি সুন্দর প্রবেশপথ নির্মাণের মাধ্যমে একটু পরিবর্তন সাধন করা হয়। আল-মুওয়াহ্‌হিদগণ ইহার পূর্ণ কাঠামোকে পুনরুদ্ধার করিয়া টাওয়ারগুলির উপরিভাগ মেরামত করিয়া সন্তুষ্টি লাভ করেন।

**(২) প্রাসাদরাজি ঃ** আল-কাযার যে সকল মুসলিম-প্রসাদরাজি ধারণ করিয়াছিল সেইগুলির, বিশেষত 'আব্বাদীগণ কর্তৃক অলংকৃত প্রসাদটির ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর পূর্ব হইতে কিছুই আর অবশিষ্ট নাই। আল-মুওয়াহ্‌হিদ নির্মিত সৌধরাজির মধ্যে শুধু খিলানগুলির অংশবিশেষ ও পরস্পরের সহিত জড়িত জাফরির কাজ করা কপাটের খোপ, যাহা Patio de Yeso ও Patio de Banderas-এর একটি পোলিন্দযুক্ত খিলান করা ছাদ, অবশিষ্ট আছে।

আল-কাযারের বাকী অংশ খৃস্টান আমলে পুনর্নির্মাণ ও পরিবর্তন করা হয়। বর্তমানে ইহা সামগ্রিকভাবে মুদেজার (Mudejar) শিল্পের একটি বিখ্যাত কীর্তিস্তম্ভ উপস্থাপন করে। রাষ্ট্রদূতগণের হলঘরে একই আকৃতির বিশাল খিলানের নীচে ত্রিগুণিত প্রায় গোলাকার ঘোড়ার নালের আকৃতির খিলানপথ খিলাফাত যুগের একটি স্থাপত্য-বিন্যাসকে পেশ করিতে পারে।

**(৩) মসজিদসমূহ ঃ** (ক) প্রথম প্রধান মসজিদ যদিও বর্তমানে যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহা মসজিদের মীনারের অংশমাত্র, যাহা সেন্ট সালভাদরের কলেজিয়েট গির্জার বর্তমান ঘড়ি মীনারের তলদেশ বা ভিত্তি—তবু সেভিলের প্রথম প্রধান মসজিদ বিষয়ে আমরা সম্যক অবগত। একটি স্তম্ভের উপর খোদাই করা উহার ভিত্তি প্রস্তরের উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ২৪৪/৮২৯ সনে শহরের কাদী ইব্‌ন 'আব্বাস-এর নির্দেশে মসজিদটি নির্মিত হয়। ইহার প্রস্থ ৪৮.৫ মিটার। কিবলার দিকের দেওয়ালের সমকোণগুলিতে এগারটি Aisel (মধ্যবর্তী যাতায়াতের পথ) ছিল। পাথরের স্তম্ভের উপর ইটের কাজ করা খিলান স্থাপিত ছিল। ৪৭১/১০৭৯ সনে আল-মু'তামিদ কর্তৃক ইহার মীনারের উপরিভাগ মেরামত করা হয়।

ইহার আকৃতি বড় হওয়া সত্ত্বেও মসজিদটি খুব ছোট হইয়া যায়। আল-কাযারের নিকটে শহরের অপর অংশে দ্বিতীয় আল-মুওয়াহ্‌হিদ খলীফা আবূ য়া'কূব একটি নূতন উপাসনা স্থান (Sanctuary) নির্মাণ করেন। তথাপি তাঁহার পুত্র আবূ য়ূসুফ য়া'কূব ৫৯২/১১৯৫ সনে সাবেক প্রধান মসজিদের পুনরুদ্ধারের আদেশ প্রদান করেন, খৃস্টানদের পুনর্বিজয়ের সময় ইহাকে গির্জায় রূপান্তরিত করা হয়। ৭৯৭/১৩৯৫ সনে ভূমিকম্পের ফলে মসজিদটির মীনারের চূড়া ভূপাতিত হয়। অচিরেই একটি মীনার

নির্মাণ করা হয় এবং উহাই বর্তমান ঘন্টি-মীনারের দ্বিতীয়াংশ। মসজিদটির অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। অবশেষে ১৬৭১ খৃ. মসজিদটি ধ্বংস হইয়া যায়।

মীনারের ভিত্তি—১ম 'আবদু'র-রহমানের কর্ডোভার মসজিদের পরে স্পেনে নির্মিত প্রাচীনতম মুসলিম সৌধের প্রস্থ ছিল ৫.৮ মিটার। ইহা বৃহদাকারের সাধারণ পাথরের তৈরী। অভ্যন্তরে একটি সর্পিল সোপানশ্রেণী একটি কেন্দ্রীয় নলাকার স্তম্ভ-দণ্ড সংলগ্ন হইয়া চক্রাকারে উপরে উঠিয়াছে। মুসলিম-প্রাচ্যে অজ্ঞাত সিঁড়ির এই বিন্যাসটি পুনরায় কর্ডোভার দুইটি প্রাচীন মীনারে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অদ্ভুত স্পেনীয় বৈশিষ্ট্য সম্ভবত রোমানদের সৃষ্টি।

(খ) আল-মুওয়াহ্হিদগণের প্রধান মসজিদ ঃ আল-মুওয়াহ্হিদ খলীফা আবূ য়ূসুফ য়া'কূব তাঁহার প্রিয় শহরটিকে একটি বিখ্যাত ও সুন্দর প্রধান মসজিদ দ্বারা ভূষিত করার ইচ্ছা পোষণ করেন। ৫৬৬-৫৭১/১১৭১-৬ পর্যন্ত সময়ে এই স্বাধীন নৃপতির আন্দালুসিয়া সফরকালে উন্মুক্ত 'ইবাদত স্থানটি নির্মিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহা ১৫০/১০০ মিটার পরিমাপের এক বিশাল আকৃতির ইমারত। ইহার ইবাদত কক্ষে ১৭টি 'টি' (T) আকৃতির আইল (Aisle) ছিল। কিব্লার দিকের দেওয়াল বরাবর স্থানগুলিতে সম্ভবত পাঁচটি গম্বুজ ছিল। দৈর্ঘ্যে ১৪টি ফাঁকা স্থান ছিল। ইহার নকশা প্রাচীন আল-মুওয়াহ হি দ মসজিদের অনুরূপ, যদিও ইহার আয়তন (Dimension) বাড়ানো হইয়াছিল। আটটি ফাঁকা স্থান পর্যন্ত দীর্ঘ আংগিনাটি আংশিকভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। ইটনির্মিত উঁচু থামের উপর খিলানশ্রেণী দ্বারা ইহা বেষ্টিত ছিল। কর্ডোভার বিশাল মসজিদের ন্যায় ইহার বহিস্থ দেওয়ালের নির্দিষ্ট দূরত্বে আয়তাকার ঠেস নির্মিত হইয়াছিল। উহাদের শীর্ষদেশে কর্ডোভার প্রধান মসিজদের ন্যায় খাঁজ কাটা মারলোন (Marlon=ফাঁকে ফাঁকে ক্ষুদ্র দেওয়াল) বসানো ছিল। এই আংগিনার দুইটি প্রবেশদ্বার অবশিষ্ট আছে। ইহাদের একটি Puerta del Perdon ইমারতটির মূল অক্ষরেখায়, অপরটি Pureta de Oriente প্রবেশদ্বারের এক পার্শ্বে অবস্থিত। যদিও পাশ্চাত্যে মুসলিমদের দ্বারা নির্মিত বিখ্যাত মসজিদগুলির কিছুই বর্তমানে অবশিষ্ট নাই, কিন্তু আল-মুওয়াহহিদ প্রধান মসজিদের এই মীনারটি যাহা বর্তমানে জিরালডা (Giralda) নামে পরিচিত, এখনও শহরে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আছে। ৫৫১/১১৫৬ সনে আহমাদ ইব্ন বাসু নামক একজন ওভারসিয়ার এই মীনারটির নির্মাণ শুরু করেন। তিনি পূর্বে ব্যবহৃত কাটা পাথর দ্বারা ইহার ভিত্তি টাওয়ারের নিম্নাংশ নির্মাণ করেন। খলীফার মৃত্যুতে ইহার নির্মাণকার্য সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে।

পরবর্তী কালে আবূ য়ূসুফ য়া'কূব আল-মানসূর-এর আদেশে গোমারা (Gomara)-র স্থপতি 'আলী ইহার নির্মাণকাজ পুনরায় শুরু করেন। ৫৮৯/১১৯৮ সনে আবূ লায়ছ আস-সিকিল্লীর ইমারত 'জা'মূর' নির্মাণ করা হয়।

এই বিশাল আল-মুওয়াহহিদ মীনারটির উচ্চতা ৫০' ৮৫ মি. এবং প্রস্থে ১৬' ০১ মিটার। ইহা তুলনামূলকভাবে শুধু মাররাকুশের কুতুবিয়্যার তুলনায় ছোট। ইহাতে ইটের তৈরী একটি কেন্দ্রীয় বলকের চারিপাশে উপর্যুপরি নির্মিত সাতটি কক্ষ রহিয়াছে। টাওয়ারে উঠার জন্য সিঁড়ি নয়, বরং একটি র‍্যাম্প (Ramp) ন্যূনতম কৌণিকে উপরের দিকে তোলা হইয়াছে। ১৫২০-১৫৬৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাতিকক্ষটির আকৃতি পরিবর্তন ও ঘন্টির গ্যালারী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল। মীনারের প্রতিটি দিককে খাড়াভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। মধ্যখানে নিশ্ছিদ্র খিলানের দরজার খোপসমূহ পুষ্পশোভিত খিলান ও আয়তাকার কাঠামোর মধ্যমর্তী স্থানের কাঠামোর দ্বৈত ছিদ্র ঢালু ও সরু পথে আলোক সরবরাহ করে। নিম্নদেশ অলংকারহীন দেওয়ালের উভয় পার্শ্বে দোতলা পর্যন্ত ইট দ্বারা জালির ডিজাইন করা হইয়াছে। এই সকল অলংকরণ নক্শার উৎকর্ষ ও দুর্লভ সূক্ষ্মতার পরিচয় বহন করে।

কর্ডোভার সুদূর প্রতিধ্বনি, মাররাকুশ-এর স্মারক বস্তুসমূহ, প্রাকৃতিক উৎকর্ষ ও সেভিলের হালকা রং এই সকলই ছিল আল-মুওয়াহহিদের প্রধান মসজিদের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য। অদ্যাবধি মীনারটি কর্ডোভার পরই উন্নত শিল্পকেন্দ্র হিসাবে সেভিলের সাক্ষ্য বহন করে।

৪। **শিল্প** ঃ সেভিলে মুদেজ (Mudejar art), পরোক্ষ অথচ সন্দেহাতীতভাবে মুদেজার শিল্পের প্রমাণ সেভিলে সংগৃহীত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ব পর্যন্ত এই শহরে নির্মিত গির্জাসমূহে মুসলিম স্থাপত্য, আকৃতি ও কৌশল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। গির্জাগুলি প্রায়শই ইটনির্মিত। প্রবেশদ্বারগুলি বিশাল প্রজেক্টিং ব্লক (Projecting block) আকারের, প্রায়শই মুসলিম শিল্প বৈশিষ্ট্যে অলংকৃত। গির্জার প্রার্থনাকক্ষের ছাদ Artesenados দ্বারা নির্মিত। আকৃতি ও নকশার দিক হইতে উহাদের ঘন্টা চূড়াগুলি মসজিদের মীনারের সাথে এত সাদৃশ্যপূর্ণ যে, মাঝে মাঝে এইগুলির নির্মাণকাল প্রাচীন মুসলিম যুগের বলিয়া মনে করা হয়। উহাদের নিশ্ছিদ্র খিলান-শ্রেণীর কপাটের খোপ ও সাধারণ শৈলীতে পুষ্পালংকার জিরালডা-র শিল্প বৈশিষ্ট্যকে অনুকরণ করিয়াছে।

আল-কাযারের প্রাসাদসমূহ প্রায়ই মুদেজার (Mudejar) বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। কিন্তু স্থানীয় ঐতিহ্যের সংগে গ্রানাডার শিল্প-প্রভাবও সংমিশ্রিত হইয়াছে। মুদেজার গির্জাসমূহেও জিরালডায় সেভিলের ঐতিহ্যের উৎকর্ষকে সর্বোত্তমভাবে মর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) H. Terrasse, L'art hispano mauresque des origines au XIII^e siecle, প্যারিস ১৯৩২ খৃ.; (২) L. Torres Balbas, Arte alnohade, arte nazri, arte mudejar, in Ars Hispaniae, iv, মাদ্রিদ ১৯৪৯ খৃ. ; (৩) ঐ লেখক, La Primitiva mezquita de Sevilla, in al-And., ১৯৪৬ খৃ., পৃ. ৪২৫-৩৯ ; (৪) ঐ লেখক, El arte de al-Andalus bajo los Almoravides, in al-And., ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৪০৩-২৩ ; (৫) H. Terrasse, La grande Mosquee almohade de Seville, in Memorial Henri Basset, ১৯২৮ খৃ., পৃ. ২৪৯-৬৬ ; (৬) L. Terres Balbas, Reproducciones de la Giralda anteriores a su reforma en el siglo XVI, in al-And., ১৯৪১ খৃ., পৃ. ২১৬-২৯ ; (৭) ঐ লেখক, La Torre del Oro en Sevilla, in al-And., ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ২৭২-৩।

H. Terrasse (E.I.²)/আ.জ.ম. সিরাজুল ইসলাম হোসাইনী

**ইশ্রাক** (اشراق) ঃ সেই জ্যোতিঃপ্রদ প্রজ্ঞা (illuminative wisdom) নাম যাহার প্রবক্তা ছিলেন শিহাবু'দ-দীন সুহ্রাওয়ার্দী (র) [মৃ. ৫৮৭/১১৯১] এবং তিনি নিজেই ইহার 'উৎস'সমূহ (তু. তালিকা)

নির্দেশ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে 'উৎস' বলিতে তাঁহার ধারণাসমূহের ঐতিহাসিক সূত্র তেমন বুঝায় না, বরং ইহাতে জ্ঞানের এমন একটি উৎসরণকে বুঝায়, যে জ্ঞান মরমীবাদের ক্ষেত্রে এই মতবাদে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের এমন পরম্পরা (line) সৃষ্টির অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে—যাহা (line) সূফীদের ইস্‌নাদ-এর সহিত তুলনীয়, যদিও এই ব্যাপারে মুরশিদ তাঁহার মুরীদকে স্পষ্ট কথায় খিলাফাত (delegation) প্রদান করেন না। যাহাই হউক না কেন, ইহাতে প্রাচীন মিসর ও পারস্যের চিরায়ত প্রাচ্য ঐতিহ্যের সহিত সংমিশ্রিত পাশ্চাত্য ও গ্রীক সংস্কৃতির ছাপ পরিলক্ষিত হয়। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে H. Corbin একটি সমস্যা সমাধানে সমর্থ হইয়াছেন ঃ আমরা জানি, 'প্রাচ্য দর্শন' সম্পর্কে ইব্‌ন সীনার মনে যে প্রকল্প দানা বাঁধিয়াছিল, তৎরচিত 'মান্‌তিকু'ল-মাশ্‌রিকিয়্যীন' গ্রন্থে ইহার একটি অসম্পূর্ণ সাক্ষ্য বিদ্যমান এবং ফাখ্‌রু'দ-দীন আর-রাযী 'মাবাহিছু'ল-মাশ্‌রিকিয়্যা' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কোন কোন ব্যক্তি শব্দটিকে 'মুশ্‌রিক' রূপ দান করেন এবং মনে করেন, ইহা ইশ্‌রাক দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত। Nallino এই ভ্রমাত্মক পঠনের সমালোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রাচ্য দর্শনকে পাশ্চাত্য দর্শন হইতে পৃথক করার প্রয়োজন ছিল। ইতোমধ্যেই নব্য-প্লেটোবাদ প্রাচ্য ভাবধারায় ভারাক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল। বিপরীতে খাঁটি এরিস্টোটলীয় দর্শন অনেক বেশী যুক্তিনির্ভর (rationalistic) ছিল। H. Corbin এই সমালোচনা স্বীকার করেন কিন্তু তিনি ইহার এক সম্পূর্ণ নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই দর্শন যদি সত্যই 'প্রাচ্য' হয় তবে তাহার কারণ শুধু ইহা নহে যে, ইহা প্রাচ্যবাসীদের দর্শন, বরং ইহার প্রাথমিক কারণ এই যে, ইহা সত্তা (Being) ও জ্ঞান (Knowledge)-কে অবিমিশ্র আলোক (Pure Light) হইতে দেদীপ্যমান বলিয়া জ্ঞান করে, যাহা (ধারণা) প্রাচ্য হইতে উদ্ভূত। বলা যাইতে পারে, ইহা এমন এক Knowledge-এর প্রশ্ন যাহা Eastern; কারণ ইহা East of thought। সুতরাং দেখা যায় যে, ইশ্‌রাক ও প্রাচ্য জ্ঞান (হিক্‌মাত মাশ্‌রিকিয়্যা)-এর মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্ক বর্তমান। এই ক্ষেত্রে 'ইশ্‌রাক'-এর মর্যাদার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যে জ্যোতির প্রভাবে মানবাত্মায় বিমূর্ত যুক্তির ধারণাগুলির অগম্য সত্যের বিকিরণ ঘটে, জ্যোতি সম্বন্ধে এই প্রচলিত ধ্যান-ধারণার পর্যায়ে নামাইয়া ইশ্‌রাক-এর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই; বরং সকল জ্যোতির উৎস, যাহা হইতে উদ্ভূত হয় সর্বপ্রকার অস্তিত্ব ও প্রামাণিক জ্ঞান, সেই পরম জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইবার আনন্দই অধিকতর মৌলিক অর্থে 'ইশ্‌রাক'।

তাঁহার এই দর্শন উপলব্ধির জন্য শ্রেষ্ঠ মাধ্যম প্লেটো। প্রকৃতিগতভাবে এই দর্শন যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যার নাগালে আসে না। তাঁহার Republic গ্রন্থে মঙ্গলময় (the God)-কে উপস্থাপিত করা হইয়াছে সূর্য (the Sun)-রূপী প্রতীকের প্রেক্ষাপটে যাহার অভাবে অস্তিত্বসম্পন্ন কোন কিছুরই অস্তিত্বে থাকিত না। সকল অস্তিত্ব (being) ও সকল চিন্তার এই উৎস 'মূল সত্তা' (essence)-এর অতীত এবং স্বয়ং ধারণাসমূহের (Ideas)-ও অতীত। মানুষের আত্মা সমগ্রভাবে ইহাতেই নিবদ্ধ হওয়া উচিত। মনে হয়, উল্লিখিত দুইটি প্রস্তাবিত বিষয় (propositions)-এর ধ্যানই ইশ্‌রাকের প্রজ্ঞা (Wisdom of Ishrak)। প্লেটোর লেখায় অস্তিত্ব (existence)-এর অর্থে সত্তা (being)-কে কার্যত সকল সত্য (reality)-এর উৎসরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই being যদি conceptualisable না হয় অর্থাৎ ইহাকে কোন concept-এর রূপ দান অসম্ভব হয়, যদি ইহাকে একটি সম্যক্‌রূপে দ্ব্যর্থক আখ্যা (purely equivocal denomination)-এ পর্যবসিত করা না হয়, যেমন এরিস্টোটল স্পষ্টভাবে অবলোকন করিয়াছেন; তবে ইহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, ইহার সমাধান রহিয়াছে এমন একটি সাদৃশ্যপূর্ণ তত্ত্বে (analogical theory) যাহা বস্তু (Substance)-কে সত্তা (Being)-র প্রথম প্রকাশ (analogue)-রূপে গণ্য করে। Existence (অস্তিত্ব)-কে যুক্তিমূলক প্রকাশধারার বৃত্তে বন্দী করা যায় না, কেহ কোন concept (প্রত্যয়) আকারে ইহার সংজ্ঞা দান করিতে পারেন, এই উপলব্ধির স্বীকৃতির অর্থ ইহা নহে যে, ইহাকে উপলব্ধি করা সম্ভব কেবল যখন ইহা বিভিন্ন শ্রেণীর being (অস্তিত্বসমূহ)-এর সহিত সম্পর্কযুক্ত অবস্থানে নিয়োজিত থাকে (আনুপাতিকতা সদৃশ অবস্থায়) এবং ইহা for-Self ও in self বিবর্জিত। এতদ্দ্বারা এই কথার স্বীকৃতি দেওয়া হয় যে, এমন 'জ্ঞান' রহিয়াছে যাহা যুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর এবং যাহা সংজ্ঞা প্রদান ও যুক্তি প্রদর্শন কর্মতৎপরতা হইতে পৃথক। এই ক্ষেত্রেই জ্যোতির প্রতীক (Symbol of Light)-এর প্রশ্ন জাগে। জ্যোতি ব্যতীত বস্তুজগতে (Physical plane) আর কি এমন আছে যাহা বিশ্বব্যাপী অধিকতর বিদ্যমান? যেহেতু জ্যোতি স্পষ্ট ও অতি উজ্জ্বল এবং ইহার এমন কোন ছায়া নাই যাহা দ্বারা ইহার উপরকার রূপরেখা (Contours) সনাক্ত করা যায়; সুতরাং ইহা (জ্যোতি) হইতে অধিকতর বর্ণনাতীত (indefinable) এমন কি আছে? এইরূপে মানুষের চিন্তায় অস্তিত্ব (existence) প্রতিভাত হয় আধ্যাত্মিক জ্যোতিরূপে, জ্যোতির জ্যোতি যাহা হইতে বিকিরণ রীতিতে সমুদ্ভূত হয় আনওয়ার কাহিরা-র অর্থাৎ বিজয়ী জ্যোতি অথবা শ্রেষ্ঠতম ফেরেশ্‌তাগণের (archangelical) নূর। এই ব্যাখ্যাটি H. Corbin প্রদত্ত। তিনি লিখিয়াছেন, "By this epiphany, the whole hierarchy of the Anwar Kahira, from degree to degree, illumines the presence of each lower degree." অর্থাৎ এই শুভ জ্যোতি বিকিরণ সাহায্যে আনওয়ার কাহিরা-র সমুদয় স্তর (hierarchy) ধাপে ধাপে প্রতিটি নিম্নতর ধাপের উপস্থিতিকে আলোকিত করে। সত্যিকারের জ্ঞান (Authentic knowledge) যখন নিজকে সপ্রকাশিত করে, যখন বস্তুগত সমস্ত পরদা খসিয়া পড়ে, তখন উহা তদীয় বিষয়বস্তু (Object)-কে এক জ্যোতির্ময় সত্তা (Light being)-রূপী অস্তিত্ব প্রদান করে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাকে জ্যোতিষ্মান করে। এই ক্ষেত্রেই ইশ্‌রাক হুদূরী (اشراق حضورى) (Illumination of presence]-এর উদ্ভব হয়। ইহা দুই প্রকার 'ইল্‌ম-এর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য নির্দেশ করে, তন্মধ্যে একটি علم صورى অর্থাৎ বর্ণনালব্ধ জ্ঞান, অপরটি স্বতঃলব্ধ অভিজ্ঞতার অবলোকন [intuitive experiences vision] তথা 'ইল্‌ম হুদূরীর সহিত সম্পৃক্ত 'ইল্‌ম ইত্তিসালী (اتصالى) বা ঐক্য সম্পাদক জ্ঞান (unitive knowledge)। এই প্রসঙ্গে দুইটি বিষয়ে চিন্তা করা যায় ঃ (১) Karl Jespers দর্শনে Existenzerhellung কি ভূমিকা পালন করে এবং (২) নিছক কাঠখোট্টা যুক্তির মাধ্যমে নহে, বরং 'সমগ্র আত্মা' (entire soul)-র সংযোগের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সম্পর্কীয় সুপ্রচলিত আদর্শের ভূমিকাই বা কি? যুক্তির অসমাধ্য অন্তর্বিরোধ অপসারণ করিয়া

রূহ তথা জিবরীলই আলোকিত করে এবং ভ্রাম্যমাণ Aristotle-এর (Peripatetics) দর্শনের সমালোচনা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত ভাষায় সুহ্‌রাওয়ার্দী তাঁহার হিক্‌মাতু'ল-ইশ্‌রাক-এ এই বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করেন যাহা Parmenid-এর সূচনাংশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সুতরাং যুক্তিভিত্তিক (rational) জ্ঞানানুশীলন জ্যোতিপ্রদ (illuminative) জ্ঞান লাভের প্রস্তুতি নহে, যদিও শিক্ষা দানের মাধ্যমে নেতিবাচকভাবে ইহাই প্রতিপন্ন করে যে, ইশরাক যুক্তির অন্তর্নিহিত অসমাধ্য সমস্যাসমূহকে বিগলিত করে, ধারণাসঞ্জাত চিন্তা (Conceptual thought) হইতে উদ্ভুত সমস্যাগুলি সমাধানে সক্ষম হইয়া ইহা অবিরাম ও অনির্দিষ্টভাবে তাসালসুল (تسلسل)-এ নিমজ্জিত হয় অথবা হতাশভাবে দাওর (دور - আর্বতচক্র)-এ নিপতিত থাকে। কিন্তু মানুষ স্বীয় চেষ্টায় এই জটাবদ্ধ অবস্থান হইতে মুক্তি পাইতে পারে না ; তাহাকে অবশ্যই কোন প্রত্যাদেশ (revelation) বা একটি আহ্বান (Call) পাইতে হইবে। কারণ "রূহ-এর উন্মেষ হয় আমার প্রতিপালকের আজ্ঞা হইতে" (১৭ ঃ ৮৫)। ইশ্‌রাকের মূল এই স্বতঃলব্ধ জ্ঞান, এই প্রজ্ঞার বিশদ ব্যাখ্যা দিতে গেলে তাহা হইবে সুহ্‌রাওয়ারদীর চিন্তাধারারই নামান্তর আলো ও ছায়ার খেলা, বার্‌যাখ (برزخ)-এর ধারণা (পর্দা, পৃথকীকরণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার), পদ্ধতিগত রীতিনীতি, বিশ্বের বিকাশ—সমস্তই একযোগে একটি পূর্ণ একক—যাহার বিশ্লেষণ করা সম্ভব প্লেটো-ইব্‌ন সীনার উৎসরণ, বুদ্ধিবৃত্তি ও পরিমণ্ডল সংক্রান্ত দর্শন (Philosophy of emanation, Intellect and Spheres)-এর বাকভঙ্গীতে ; সুহ্‌রাওয়ারদী নিজে তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে রহিয়াছে একটি বন্ধ্যা, অসংলগ্ন একান্ত-সত্য (Reality)-বিবর্জিত আলোচনা যাহা সত্য (Valid) হইতে পারে কেবল তখন সর্বসাকুল্যে ইহাকে একটি ঐক্যস্থাপক (unitive) সুসঙ্গত দর্শনে উন্নীত করা যায়, যখন আত্মা (Spirit) 'আক্‌লকে অবলম্বন করে। এই Spirit লাভ করে সাকীনা অর্থাৎ ইহা অতি প্রাকৃত সত্তা (Transcendental Being)-র সাক্ষাত সান্নিধ্যে অবস্থিতি প্রাপ্ত হয় (H. Corbin)।

R. Arnaldez (E.I.[2])/আবদুল বাসেত

**ইশ্‌রাকিয়্যূন** (اشراقيون) ঃ আলোকপ্রাপ্ত দিব্য জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ (সূফীগণের একটি বিশেষ দল)। ইশ্‌রাক (দ্র.) নামক সূফীতত্ত্বের অনুসারী শায়খ সুহ্‌রাওয়ার্দীর মুরীদগণকে এই নামে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই নামটি আরও পুরাতন। সুতরাং সুহ্‌রাওয়ারদী যেই আধ্যাত্মিক পরিবারের সদস্য তাঁহাদের জন্য এই শব্দটি প্রযোজ্য, কিন্তু এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, যদি তাহা প্রযোজ্য হয় তবে 'হার্মেটিস্ট'গণ (Hermetist) 'সেথিস্ট'গণ (Tethist) যাহারা খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে মিসরে সেথ (শীছ)-এর মধ্যে প্রথম উরিয়া (Uriya) [হিব্রু 'ওর' হইতে উদ্ভূত-আলোক] দর্শন করে, পারস্যের দরবেশগণ, জরাথুস্ত্র-এর শিষ্যগণ-এর Manichaean-গণও ইশ্‌রাকিয়্যূন বলিয়া গণ্য হইবে। H. Corbin ইব্‌ন ওয়াহশিয়্যা কর্তৃক লিখিত প্রাচীন মিসরের হার্মেস-থোহ (Hermes-Thoh) সম্পর্কিত একটি বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বর্ণনাতে উপরিউক্ত শব্দটি অন্তর্ভুক্ত আছে। আবিষ্কারটি নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়, তবে গ্রন্থাকারের আলকেমী সম্পর্কে তৎকালীন মনোযোগের প্রেক্ষাপটে ইহার মূল্যায়নের বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে। সম্পূর্ণ পাঠটির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ হারমেস (Hermes)-এর উত্তরাধিকারিগণ চারিটি উপদলে বিভক্ত ছিল। প্রথম দুইটি উপদল, যাহারা হার্মেস স্বয়ং এবং তাঁহার ভ্রাতার প্রত্যক্ষ বংশধর। তাহারা কোন বহিরাগতের সহিত সামাজিকভাবে সংস্রব রক্ষা করেন নাই। ফলে তাহারা তাহাদের গুপ্তনীতির পবিত্রতা এত পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করে যে, তাঁহাদের দলীয় সদস্য ব্যতীত কোন ব্যক্তির পক্ষে উহার তথ্য প্রাপ্তি সম্ভব হয় নাই। তৃতীয় দলটি হার্মেস-এর ভগ্নীর পুত্রদের দ্বারা গঠিত। তাহাদের সহিত বহিরাগতদের সংযোগ ছিল এবং কতিপয় ব্যক্তি তাহাদের ইসতিলাহাত (পরিভাষাসমূহ)-এর সহিত পরিচিত এবং তাহাদের বিভিন্ন প্রতীকের ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম (ওয়া ফাক্কা রুমূযাহুম)। শেষ অর্থাৎ চতুর্থ দলটি হারামিসাগণের সহিত বিভিন্নভাবে যুক্ত, বহিরাগতগণের সমন্বয়ে গঠিত। শেষোক্ত দল দুইটিকে ইব্‌ন ওয়াহশিয়্যা যথাক্রমে ইশ্‌রাকিয়্যূন (ও ইশরাকিয়্যা) ও মাশা'ইয়্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন। একমাত্র এই শ্রেণীটি শেষ পর্যন্ত আমাদের নিকট পৌঁছিতে পারিয়াছে। এই পাঠটি হইতে যাহা কিছু সিদ্ধান্ত করা যায় তাহাতে অনুমান করা হয় যে, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে আলকেমী চক্রের মধ্যে একটি সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ ঐতিহ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইত ; ইহার ধারক ও বাহকগণ যদিও 'শ্রেষ্ঠ কর্মে'র সম্পূর্ণ জ্ঞানের দাবি করিত না, তথাপি মনে করা হইত তাহারা কিঞ্চিৎ আলোকপ্রাপ্ত। ফলে তাঁহাদের রচনাবলী এরিস্টোটলীয় (Peripatatics)-গণের উপর স্থান পাইত। মূল পাঠে ইহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে "আধ্যাত্মিক রূপের উপাসক"-রূপে। সুতরাং সুহ্‌রাওয়ার্দীকে ইব্‌ন ওয়াহশিয়্যার তালিকাভুক্ত ইশ্‌রাকিয়্যূন-এর অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা তাহা প্রশ্নাতীত নহে। উপরন্তু ফালাসিফাগণ তাঁহাদের ভাষায় দিব্য জ্ঞান লাভ ও আলোক বিকিরণ সম্পর্কে বক্তব্য রাখিয়াছেন। কিন্তু ইহার পারিভাষিক অর্থে ইশরাকী শব্দটি সঠিকভাবে কেবল ইশরাক বিশেষজ্ঞ ও তাঁহার আধ্যাত্মিক উত্তরসুরিদের জন্য প্রযোজ্য হইতে পারে। বস্তুগতভাবে তাহার আহরণের উৎস যতই অধিক হউক না কেন, ইশরাক সম্পর্কে তাঁহার ধারণা এতই স্বকীয় যে, মনে হয় ইহা তাঁহার মধ্যে প্রথম প্রতিভাত হয় এই প্রকারে যে, তিনি প্রত্যক্ষভাবে সেই সত্তা হইতে আলোক লাভ করেন যাহা তাঁহার ধারণায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে 'পূর্ণ প্রকৃতি'রূপে বিদ্যমান।

তালিকা
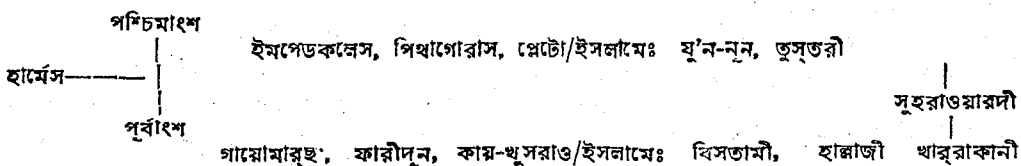
এতদ্ব্যতীত কতিপয় চিন্তাবিদ সুহ্‌রাওয়ারদীর ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হইতে পারেন। তবে সঠিকভাবে বলিতে গেলে তাহাদেরকে ইশরাকিয়্যূন হিসাবে গণ্য করা যায় না। এইভাবে Plotinus-এর ন্যায় ইব্‌নু'ল-'আরাবীর মতে মনে হয় দিব্য আলোক হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া একটি প্রতীকে পরিণত হইয়াছে যাহা পরিণামে রূপ লাভ করিয়াছে বিশ্বজোড়া সৃষ্টিতে। তূসী সুহ্‌রাওয়ারদী হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া ইব্‌ন সীনা মতবাদের ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহার ফলে তিনি নিজে ইশরাকী হইতে পারেন নাই। পরিশেষে H. Corbin সঠিকভাবেই বলেন, "ইশরাক-এর তত্ত্বসমূহের প্রভাব নাসীরু'দ-দীন তূসী, ইব্‌নু'ল-'আরাবী ও ইরানী শী'আ ভাষ্যকারগণের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা এখনও আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে।

কিন্তু অপর দিকে দেখা যায়, 'ইশরাকিয়্যূন' শব্দটি সুহ্‌রাওয়ারদীর সকল ইরানী অনুগামিগণের জন্য অসংকোচে ব্যবহৃত হইতে পারে—যাহাদের সংখ্যা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অতীব বিশাল ছিল এবং বর্তমানেও ইরানে ইহাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে দুইটি বিখ্যাত নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ (১) শামসু'দ-দীন শাহ্‌রাযূরী (মৃ. ১২৪৩ হি.), তিনি তাঁহার দার্শনিকগণের ইতিহাস গ্রন্থে তাঁহার শিক্ষাগুরুর জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার দুইটি প্রবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি একটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধও প্রণয়ন করেন। (২) মোল্লা সাদ্‌রা শীরাযী (মৃ. ১৮৪০ খৃ.) যিনি ঘোষণা করিয়াছেন, আমি সুহ্‌রাওয়ারদীর ইশরাক-এর নীতি অনুসরণ করিয়াছি এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাকে সুস্পষ্টভাবে ইশরাকের ভিত্তি দর্শন করাইয়াছেন।' এই বক্তব্য হইতে অনুধাবন করা যায় যে, স্বীয় শায়খগণের প্রতি তাঁহার আনুগত্য একটি মৌলিক রচনা প্রণয়নে তাঁহাকে বাধা প্রদান করে নাই।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) Carra de Vaux, La philosophie illuminative d'apres Suhrawardi Maqtul, in J. A., ১৯খ. (১৯০২ খৃ.) ; (২) এম. ইক বাল, The Development of Metaphysics in Persia, লন্ডন ১৯১৬ খৃ. ; (৩) C. A. Nallino, Filosofia, 'orientale' od 'illuminative' d' Avicenna, in RSO, ১০/৪, খ. (১৯২৫ খৃ.); (৪) M. Horten, Die Philosophie der Erleuchtung nach Suhrawardi, Halle 1912; (৫) ঐ লেখক, Das philosophische System von Schirazi, Strasbourg 1913 ; (৬) H. Corbin, Le bruissement de l'aile de Gabriel, in J. A. 1935 ; (৭) ঐ লেখক, Les motifs zoroastriens dans la philosophie de Suhrawardi, তেহরান ১৯৪৬ খৃ. ; (৮) ঐ লেখক, Ed. of Euvres philosophiques et mystiques de Shihabaddin Yahya Sohrawardi, I, Bibl. Iran. 2, তেহরান-প্যারিস ১৯৫২ খৃ. ; II. Bibl. Iran. 17, তেহরান-প্যারিস ১৯৭০ খৃ. ; (৯) ঐ লেখক, মোল্লা সাদরা শরিযীর কিতাবু'ল-মাশা'ইর (Le Livre des Penetrations metaphysiques), Bibl. ইরান, ২, খ., তেহরান-প্যারিস ১৯৪৬ খৃ. ; (১০) ঐ লেখক, Histoire de la Philosophie islamique, প্যারিস ১৯৬৪ খৃ. ; (১১) ইব্‌ন ওয়াহশিয়্যা, Ancient alphabet and hieroglyphic character, সম্পা. J. Hammer, লন্ডন ১৮০৬ খৃ., পৃ. ৯০-১০১।

R. Arnaldez (E.I.²)/আবদুল বাসেত

**'ইশা'** (দ্র. স'লাত)

**ইশান** (দ্র. ঈশান)

**ইশারা** (اشارة) ঃ "অংগভঙ্গি, চিহ্ন, ইংগিত"। অলংকারশাস্ত্রে পরিভাষাগতভাবে ইহা allusion (পরোক্ষ উল্লেখ) অর্থ লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহার প্রাথমিক সময়ের গূঢ়ার্থে (Connotation) আল-জাহি'জ (দ্র. বায়ান, ১খ., ৮০ ; হ'য়াওয়ান, ১খ., ৩৩) মনে করেন, বচন, লিখন, নুস্‌বা, আংগুলের সাহায্যে গণনা, মাথা, কনুই, চক্ষু বা চোখের পাতা প্রভৃতির ইংগিতে (দ্র. হি'সাবু'ল-'আক্‌দ যেখানে সংখ্যা নির্দেশক অন্যান্য ভঙ্গিও আলোচিত হইয়াছে) সহকারে যেই পাঁচ প্রকারে মানুষ তাহার চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করিয়া থাকে তন্মধ্যে ইশারা অন্যতম (দ্র. বায়ান)। বাক্য সহযোগে হউক বা না হউক, একটি অঙ্গভঙ্গি (ইশারা ঈমা' ও) মানুষকে মনের কথা পরিষ্কার করিতে সহায়তা করে যদিও তাহাতে সম্পূর্ণরূপে তাহার চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ না হয় (বায়ান, ১খ., ৭৭ প.), এমন কি শ্রোতার অপরিজ্ঞাত কোন মূর্ত ধারণা (Concrete idea) প্রকাশের জন্য ইশারা প্রয়োজনীয় হইতে পারে। ইহা অনেক সময় কথা অপেক্ষা অধিকতর ভাব প্রকাশক এবং ধ্বনি অপেক্ষা ভাবকে অধিক দূর পর্যন্ত লইয়া যায় ; মাথা বা হাতের একটি চমৎকার আন্দোলন (হুস্‌নু'ল-ইশারা) সুন্দরভাবে ও গুরুত্ব সহকারে একটি ভাবের প্রকাশ সম্পন্ন করিয়া থাকে, যদিও কেহ কেহ মনে করে, মর্যাদা (দ্র. হি'ল্‌ম) রক্ষার্থে কথা বলিবার সময় দেহের সম্পূর্ণ অনড়তা প্রয়োজন। প্রেমের কবিতায় প্রায়ই চোখের ভাষার উল্লেখ করা হয় যাহা গভীর অনুভূতিকে, কথা অপেক্ষা উত্তমরূপে, অথচ কম বিপজ্জনকভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে; প্রেমিকদের একটি পরিপূর্ণ সংকেত সংকলন আছে, যাহা ইব্‌ন হা'য্‌ম (তাওক, অধ্যায় ৯, বাবু'ল-ইশারা বি'ল-'আয়ন) সংক্ষিপ্ত আকারে এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (চোখের একটি সংকেত) "বিচ্ছিন্ন করে এবং যুক্ত করে ; ইহা প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, ভীতি প্রদর্শন করে, রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে, পূর্ণ পরিতুষ্টি দেয়, আদেশ করে এবং নিষেধ করে, ভৃত্যকে আঘাত করে, অন্বেষীর প্রতিকূলে সতর্ক-সঙ্কেত দান করে, হাস্যোদ্রেক করে এবং শোকাকুল করে, প্রশ্ন করে এবং উত্তর দেয়, (কৃপণের মত) লুকাইয়া রাখে এবং উদারভাবে দান করে" (A. R. Nykel-এর অনুবাদ, ৪৪)। ইব্‌ন হা'য্‌ম এই ধরনের কিছু ইশারা-এর বর্ণনা দিয়াছেন এবং তাহাদের অর্থ ব্যাখ্যা (যথা পিটপিট করিয়া চোখের পাতা বন্ধ করা সম্মতিজ্ঞাপক ইত্যাদি) প্রদান করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করেন যে, ইশারার অধিকাংশেরই বর্ণনা সম্ভব নহে যদিও তিনি ইংগিত দেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে ইহাদের অর্থ বুঝিতে পারা উচিত।

বস্তুত যাহারা অঙ্গভঙ্গির ভাষা বুঝিতে অক্ষম হইত এবং আলোচককে তাহার ধারণা কথায় প্রকাশে বাধ্য করিত, আরবগণ তাহাকে বোকা ভাবিত [তু. এই প্রবাদ ঃ ইন্না মান্ লা য়া'রিফু'ল-ওয়াহয়ি আহ্‌মাক', (ان من لا يعرف الوحى احمق), এই ক্ষেত্রে وحى অর্থ ইশারা (দ্র. আল-মায়দানী, ১খ., ১৫ ; LA, S.V. WHY)। অর্থসহ ইংগিতসমূহের একটি সংগ্রহ আরবদের কাছে থাকিত, যথা স্বীকৃতি, অস্বীকৃতি, ঔদাসীন্য প্রভৃতি যাহা প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত হইত ; সমসাময়িক সাক্ষ্য অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কথার সহিত অঙ্গভঙ্গি করিতেন যাহার অর্থ কোন কোন সময় স্পষ্ট হইত না। আরবগণ কতিপয় আচার-অনুষ্ঠানে প্রতীকী অঙ্গভঙ্গিও ব্যবহার করিত। যেমন কোন চুক্তি বা

Contents



মৈত্রী বন্ধন সম্পন্ন হইলে বা আনুগত্যের শপথ করিলে বা আনুগত্যসূচক কর্ম করিলে ইত্যাদি উপলক্ষের অংগভঙ্গি [দ্র. Baya (بيع) HILF AL-FUDUL, SAFAKA (صفقة) YAMIN etc. 1। খালি হাতের ইশারার সহিত সম্পৃক্ত লাঠি (দ্র. 'আনাযা) হাতে ইশারা যাহা লাঠি কর্তৃত্বের প্রতীকস্বরূপ বক্তা প্রচারকগণ হস্তে ধারণ করেন। আল-জাহিজ তাঁহার বায়ান গ্রন্থে ছড়ি বা লাঠি ব্যবহারের বহুবিধ ধরন বর্ণনার জন্য একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ জুড়িয়া দিয়াছেন ; চাবুক বা তরবারির সহিত ছড়ি ভীতি প্রকাশের জন্যও ব্যবহৃত হয়।

আরবগণের সুপ্রাচীন আনুষ্ঠানিক বা প্রতিটি ভঙ্গি সম্বন্ধে I. Goldziher-এর মতামতের পূর্ণত্ব প্রদান বা পরিবর্ধনের জন্য বিভিন্ন রচনায়, যথা Orient. St..... Noeldeke, Giessen 1906. i. 303 ff. ; ZDMG, i, 495 ff. ; Abhand. zur arab. philologie, i. 55-7. ii, p. cv (analysis by G. H. Bousquet, in Arabica, vii (1960), 22-3, viii (1961). 269-72) তিনি যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যাচাই করিবার জন্য আরও গবেষণা প্রয়োজন।

কতকগুলি অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার কতকটা ঐন্দ্রজালিকদের ব্যবহারের মত কিছু হাদীছ হইতে ইহা প্রতীয়মান হয়, বিশেষত যেই হাদীছ বিদ্যুতের ঝলকানি বুঝাইবার জন্য হাতের ইশারা নিষেধ করে (ইব্‌নু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, ৫খ., ২৬৬) অথবা শুধু একটি আংগুল দ্বারা কোন ব্যক্তিকে অভিবাদন নিষেধ করে (আয-যাহাবী, মীযান, ২খ., ২৬২)। উদাহরণস্বরূপ কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার (দ্র. عين) জন্য ব্যবহৃত অঙ্গভঙ্গি, যেমন আরবগণের মধ্যে বিদ্যমান, তদ্রূপ অন্যান্য ইশারাও টিকিয়া রহিয়াছে। যেমন হিজা' (দ্র.)-এর ক্ষেত্রে। I. Goldziher বলিয়াছেন, শত্রুকে তর্জনী প্রদর্শন অভিশাপমূলক অর্থ প্রকাশ করে এবং সালাত (দ্র. তাশাহ্‌হুদ)-এ তর্জনীর ইশারার গুরুত্ব বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন, এই দুই সূত্রে তর্জনী কয়েকটি অর্থপূর্ণ নাম অর্জন করিয়াছে, যেমন সাব্বাবা (তর্জনী), মুসাব্বিহা, মুহাল্লিলা, দা'আআ (دعاء)। তাশাহ্‌হুদ-এ রাসূলুল্লাহ (স)-এর তর্জনী উত্তোলন আল্লাহ্‌র একত্বের সাক্ষ্য প্রদানের প্রতীকে পরিণত হয় (দ্র. সালাত), কুনূত (দ্র.)-এ হাতের তালু মুখের দিকে রাখিয়া হস্ত প্রসারণ ফকীহগণের বিস্তারিত আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়াছিল, অথচ মুনাজাত (দ্র. দু'আ)-এর সময় আকাশের দিকে হাতের তালু ধারণ করা একটি বিশেষ তাৎপর্যবাহী ইশারা (দক্ষিণ আফ্রিকার এক ভিন্ন ধরনের ফাত্‌হ-এর জন্য দ্র. ফাতিহা)।

আরও বহু ইশারা গবেষণার অপেক্ষায় রহিয়াছে; তবে উপরে যে সকল ইশারা উল্লেখ করা হইল তাহাই যথেষ্ট, কেবল mora নামক ক্রীড়ার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ইহার সহিত সংযুক্ত হইতে পারে (দ্র. G. Lemoine, Les anciens procedes de calcul surles doigt's in REI, 1932/1. 4-8)। এই ক্রীড়ায় পরস্পর সম্মুখীন অংশগ্রহণকারিগণ ইহাকে একটি নির্দিষ্ট সংকেতে তাহাদের হাতের মুষ্টি (বা মুষ্টিসমূহ) শ্লথ করিয়া ইচ্ছামত যে কোন সংখ্যক আংগুল উত্থিত করে এবং একই সময়ে উত্থিত আংগুলসমূহের মোট সংখ্যা উচ্চারণ করে (অথবা শুধু 'জোড়' বা 'বেজোড়' বলে)। যে ব্যক্তি সঠিক সংখ্যা অনুমান করিতে পারে সে জয়ী হয়, এই প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে বিভিন্ন ধরনের ভাগ-বাটোয়ারার জন্য যাহা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত; যথা মুকারা'আ, মুখারাজা, মুনাহাদা, মুসাহামা (দ্র. মুখারাজা)। ইস্‌মু'ল-'ইশারা (demonstrative)-এর জন্য দ্র. ইস্‌ম।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ বরাত প্রবন্ধ মধ্যে উল্লিখিত। সূফীগণ ইশারা শব্দটিকে প্রায়ই বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু সন্তোষজনকভাবে ইহার যথার্থ অর্থ প্রদান বা ব্যাখ্যা দানের প্রায়স সফল হয় না। ইংরাজীতে ইহার শাব্দিক অর্থ হইতে পারে (পরোক্ষ উল্লেখ) "Allusion" বা "allusive Language" (পরোক্ষ উল্লেখমূলক ভাষা)। ইংরাজীতে এই শব্দসমূহ একটি সাংকেতিক ভাষাকে নির্দেশ করে যাহা প্রত্যক্ষ উল্লেখ (Mallarme) অপেক্ষা ইংগিত (Suggestion)-এর মাধ্যমে উদ্দিষ্ট বস্তুটিকে মনে উদিত করে, অথচ সূফীগণ এই অর্থ প্রকাশের জন্য যে আরবী শব্দটি ( رمز ব. ব. رموز ) এই অর্থে ব্যবহার করা শ্রেয় মনে করেন তাহা ঐ allusion অর্থ প্রদান করে না ( رمز -এর জন্য দ্র. আত্‌-তূসী, লুমা', ৩৩৮)। যখন সূফীগণ নিজেদেরকে আহ্‌লু'ল-ইশারা (the Allusionists) বলিয়া আখ্যায়িত করেন অথবা বলেন যে, তাঁহাদের দর্শনের বিষয়বস্তু 'উলূমু'ল-ইশারা, তখন তাঁহারা অর্থ প্রকাশের উপায়কেই শুধু নির্দেশ করেন না, বরং তাঁহাদের অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুকেও বুঝাইয়া থাকেন যাহা শুধু এই পদ্ধতিতেই স্মৃতিতে জাগরূক করা যায়। ইশারা এই অর্থে 'ইবারা ( عبارة )-এর বিপরীত, এই অর্থে নহে যে, সাংকেতিক (Symbolical) ভাষা বাস্তব (realistic) ভাষার বিপরীত অথবা এইভাবে নহে যে, একটি রূপক (Paneble)-কে বিমূর্ত (abstract) ভাষায় রূপান্তরিত করা যায় না, বরং এই অর্থে যে, "যাহা অপরকে জানান অসাধ্য" (incommunicable) তাহা "অপরকে জানান সম্ভব" (Communicable)-এর বিপরীতার্থক। বিপরীত হইতেছে বোধগম্য কিছু প্রাকৃতিক পন্থায় অর্জিত সকল জ্ঞান 'ইবারা-র অন্তর্ভুক্ত এই অর্থে যে, উহাকে প্রকাশ করা যায় এবং অন্যান্য লোককে তাহাদের ভাষায় জানান সম্ভব। মরমী অভিজ্ঞায় অবশ্য স্বাভাবিক জ্ঞানের সকল বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় এবং মানুষ এক নূতন জগতে উপনীত হয়, যেখানে তাহার ধারণা (concepts) ও বাক্য (words)-এর ব্যবহার চলে না। মরমী সাধক তখন কথা বলিতে পারেন শুধু ইংগিত-ইশারায়, অর্থাৎ সাংকেতিক পদ্ধতিতে নহে, বরং কাছাকাছি কোন পদ্ধতিতে (by approximation)। তবে তিনি সর্বদা অবহিত থাকেন যে, তিনি যে বিষয়ে কথা বলিতেছেন সে বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণই শুধু তাঁহার কথা বুঝিতে সক্ষম (আল-কালাবাযী, তা'আর্‌রুফ, কায়রো সং., পৃ. ৮৭৯)। এইভাবে এই অভিজ্ঞতার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে ইশারার ভাষা যেমন একদিকে গূঢ় (esoteric) ভাষায় পরিণত হয়, যাহা দীক্ষাহীন (uninitiated)-দের বোধগম্য নহে অথবা সুচিন্তিতভাবে ইহাকে তাহাদের জন্য অবোধগম্য করিয়া রাখা হইয়াছে, তদ্রূপ অপরদিকে ইহা অপর্যাপ্ত হওয়ার কারণে এবং সূফী তাঁহার অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু তথা আল্লাহ্‌র মধ্যে পর্দারূপে বিরাজ করিবার কারণে এই ভাষা নিজকে ধ্বংস করিবার প্রবণতা প্রদর্শন করে। জুনায়দ মন্তব্য করেন, নব শিক্ষার্থী (nivice) অবশ্যই একই সময়ে আল্লাহ্‌কে প্রাপ্তদের এবং তাঁহার ইশারার ভাষাও (allusion) প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি মরমী অবস্থান (আহ্‌ওয়াল)-এর সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হইবে সে অবশ্যই allusion বিলুপ্তির মধ্যে আল্লাহ্‌কে পাইবে (লুমা', ২২৪)। আল-হাল্লাজ-এর মতে

"যতক্ষণ তুমি ইশারা প্রয়োগ করিতে থাকিবে তুমি মুওয়াহ্‌হিদ হইবে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার আত্মসচেতনতাকে ধ্বংস করিয়া আল্লাহ্‌ তোমার ইশারা গ্রহণ করেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ না ইশারার হোতা (মুশীর)-কে পরিত্যাগ করেন, না স্বয়ং ইশারাকে (Essai, 361, no. 11)।

বর্ণনাতীত মরমী অভিজ্ঞার গূঢ় ভাষা বলিয়া ইশারার যে বর্ণনা করিলাম, সেই ইশারা ইহার পূর্ণ ও জটিল অর্থ অর্জন করে ৩য়/৯ম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে বাগদাদে ও খুরাসানের মরমী পরিমণ্ডলে (School)। পরবর্তীদের লেখায় ইহার ভিন্ন অর্থ করা হয়—তাফসীরকারদের মতের সহিত কিছুটা সম্পর্কের ভিত্তিতে। জা'ফার আস্‌সাদিক (মৃ.১৪৯/৭৬৫)-এর প্রতি আরোপিত তাফসীর-এ বলা হয় যে, কুরআন যুগপৎভাবে প্রকাশ ('ইবারা) ও ইংগিত (ইশারা) সমন্বিত প্রথমটি সাধারণ বিশ্বাসীদের জন্য এবং দ্বিতীয়টি বিশেষ ব্যক্তিদের (خواص) জন্য। ইশারা ও 'ইবারা প্রথাক্রমে কুরআনে উল্লিখিত বাতিন ও জাহির-এর সমার্থক। সাধারণ বিশ্বাসিগণ কুরআনের বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখিয়া ক্ষান্ত হয় ; কিন্তু অসাধারণ বিশ্বাসিগণ ইহা অতিক্রম করিয়া গ্রন্থের অভ্যন্তরে, তথা ইশারার মধ্যে প্রবেশ করেন যাহা অন্তঃকরণ আবিষ্কার করিতে পারে (দ্র. P. Nwyia, Exigese coranique, 167)। ইব্‌নু'ল-'আরাবী প্রদত্ত ইশারার সংজ্ঞাটিও উল্লেখযোগ্য। হাকীম তিরমিযীর প্রশ্ন ঃ ওয়াহ্‌য়ি কি ? ইহার উত্তরে তিনি লিখেন, "ইহা ঐ জিনিস যাহার মধ্যে ইশারা জন্মলাভ করে—যাহা প্রকাশ ('ইবারা)-এর স্থান অধিকার করে। বিনা প্রকাশে 'ইবারা-র সেতু পার হইয়া উদ্দিষ্ট অর্থে উপনীত হইতে হয় এবং এইজন্যই ইহাকে 'ইবারা তথা passage বলা হয়। অন্যপক্ষে ইশারা তথা প্রত্যাদেশ (وحى)-ই মূল যাহার প্রতি ইংগিত প্রদান করা হইয়াছে" (ذات المشار اليه ; খাত্‌মু'র-আওলিয়া,' সম্পা. O. Yahya, 220)। সুতরাং ইশারা ঐ ভাষা যাহা উক্তি ও যাহা উক্ত হইয়াছে— এই দুইয়ের মধ্যকার দূরত্বকে সর্বাধিক হ্রাস করে। এই কারণেই শিবলী ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র প্রতি প্রকৃত ইংগিত (allusion) স্বয়ং আল্লাহ্‌-ই এবং এই ইংগিত মরমীর কাছে সহজে ধরা দিতে চাহে না (দ্র. লুমা', পৃ. ২২৩)।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** বরাত প্রবন্ধ মধ্যে উল্লিখিত।

P. Niwya (E. I.²)/মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম

**ইস্‌কান্দার আগা** (اسكندر اغا) ঃ ইব্‌ন য়া'কূ ব ইব্‌ন আব্‌কার, বৈরূতবাসী একজন আরমেনিয়ান। 'আবকারিউস' নামে তিনি অধিক সুপরিচিত (মৃ. ১৮৮৫ খৃ.)। আরবী সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন বিধায় তিনি পাঠকবর্গের নিকট অপ্রকাশিত রচনাবলীর সংকলন উপস্থাপনার প্রয়াস পান। তাঁহার এই সফল প্রচেষ্টার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্যভাষা সমীক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখিতে সমর্থ হন। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ (গ্রন্থ) নিহায়াতু'ল-'আরাব ফী আখবারি'ল-'আরাব (Marseilles-এ ১৮৫২ খৃ. প্রকাশিত হয়, তায্‌য়ীন নিহায়াতি'ল-'আরাব নামে ১৮৬৭ খৃ. বৈরূতে সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়)। তিনি বৈরূতে (১৮৬৪ খৃ., ১৮৮১ খৃ.) মুনয়াতু'ন-নাফ্‌স্‌ ফী আশ'আরি 'আনতার 'আব্‌স নামে দীওয়ান 'আনতার ('আনতারার কাব্য সংকলন) সম্পাদনা করেন এবং বৈরূতে অবস্থানকালে 'রাওদাতু'ল-আদাব ফী তাবাকাতি'শ্‌-শু'আরা'ই'ল-'আরাব' নামে ১৮৫৮ খৃ.) এবং রায়হানাতু'ল-আফ্‌কার নামে (১৮৮০ খৃ.) তাঁহার দুইটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ সাল হইতে তাঁহার মিসরে অবস্থানকালে তিনি কতিপয় গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ হন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য আল-মানাকিবুল-ইবরাহীমিয়্যা নামে ইবরাহীম পাশার জীবন চরিত (কায়রো ১২৯৯/১৮৮২) এবং ১৮৭৪ খৃ. জিনান-এ প্রকাশিত কয়েকটি নিবন্ধ কায়রোতেই তাঁহার স্বীয় কাব্যগ্রন্থ (দীওয়ান) 'নুযহাতু'ন্‌-নুসূস ওয়া যীনাতু'ত-তুরূস' নামে প্রকাশ করেন উহাতে তিনি খেদীব তাওফীক (মিসরের গভর্নরদের) ও ইসমা'ঈল পাশাদের বিশেষ প্রশংসা করেন।

পরিশেষে তিনি নাওয়াদিরু'য্‌-যামান ফী ওয়াক'া'ই' জাবাল লুবনান নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থটি রচনা করেন। উহাতে ১৮৬০ খৃ. হইতে ১৮৬৯ খৃ. পর্যন্ত লেবাননের ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ রহিয়াছে। রচনাটির কয়েকটি পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে (দ্র. D. M.)ঃ New Haven শহরে J.P. Scheltema কর্তৃক ১৯২০ খৃ. মূল গ্রন্থটি 'The Lebanon in turmoil; Syria and the powers in 1860 ; Book of the marvels of the time concerning the massacres in the Arab country নামে প্রকাশিত হয়। তাঁহার ভ্রাতা য়ূহান্না (মৃ. ১৮৮৯ খৃ.)-র ইতিহাস ও সাহিত্যে বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁহার প্রধান প্রধান রচনা হইতেছে ঃ কাত্‌ফু'য-যুহর ফী তা'রীখি'দ-দুহূর (বৈরূত ১৮৮৩ খৃ.). নুযহাতু'ল-খাওয়াতির বৈরূতে বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। Brockelmann E.I.। প্রথম সংস্করণে এই গ্রন্থগুলির রচয়িতা হিসাবে লেখকের ভ্রাতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন ( দ্র. আব্‌কারিউস)।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** F. Bustani, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ২খ, ২৪৮।

সম্পাদনা পরিষদ (E. I.²) মোঃ মোসলেম উদ্দীন

**আল-ইসকান্দার আল-আ'জাম** (দ্র. যু'ল-কারনায়ন)

**ইসকান্দার (সিকান্দার) ইব্‌ন কুত্‌বি'দ-দীন আল-কাশমীরী** (اسكندر بن قطب الدين الكشميرى) ঃ কাশ্মীরের প্রতাপশালী সুলতান। পিতা কুতবু'দ-দীনের মৃত্যুর পর মাতা সুরা (سورة)-এর পরামর্শক্রমে কাশ্মীরের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি সিকান্দার ও ইসকান্দার উভয় নামে পরিচিত। কাশ্মীরের মুসলিম সুলতানদের মধ্যে সুলতান ইসকান্দার সামরিক বাহিনী ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বিবেচনায় সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও উল্লেখযোগ্য ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে আল-মালিকু'ল-মুআয়্যাদ আল-মানসূর—সাহায্যপ্রাপ্ত বিজয়ী সম্রাট ও আস-সুল্‌তানু'ল-মুজাহিদ—জিহাদী শাসক—এই উপাধি সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ৭৯৬/১৩৯৩ সালে সিংহাসন আরোহণ এবং হি. ৮১৯ সালে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় ২৩ বৎসর দক্ষতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোরতার সহিত দেশ শাসন করেন।

কাশ্মীরে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারে সুলতান সিকান্দার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। জনৈক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ইসলাম গ্রহণ করিলে তিনি তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। সায়্যিদ বাট (سيد بٹ) নামক এই প্রধান মন্ত্রী অমুসলিম জনসাধারণের মধ্যে ইসলাম প্রচারে জোর-জবরদস্তির নীতি গ্রহণ করেন। সুলতান ও প্রধান মন্ত্রীর প্রচেষ্টায় বহু অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। সুলতান স্বয়ং অনেক মূর্তি ধ্বংস করেন এবং এই কারণে তিনি জনগণের নিকট "সিকান্দার বুত-শিকান' নামে অভিহিত হন। কাশ্মীরের তৎকালীন খ্যাতনামা 'আলিম শায়খ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আল-হুসায়নী আল-হামাদানীর নিকট সিকান্দার

শাহ ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। উল্লেখ্য যে, ১৩৮৮ খৃ. সায়্যিদ 'আলী হামাদানী ৭০০ সায়্যিদ বংশীয় সাধক সমভিব্যাহারে কাশ্মীরে আগমন করেন এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় বহু খানকাহ নির্মাণ করিয়া ইসলামের একত্ববাদ ও ভ্রাতৃত্ববাদ প্রচারে একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহাদের এই কর্মতৎপরতা নিঃসন্দেহে ইসকান্দার শাহের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

সুলতান ইসকান্দার একজন সমাজ সংস্কারকরূপেও অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার সংস্কারমূলক কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ (১) তিনি হিন্দু সমাজের সতীদাহ প্রথা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেন ; (২) মদ্য ব্যবসা সমগ্র দেশে নিষিদ্ধ করা হয় ; (৩) জাতি-ধর্ম নির্বিশেষ জনগণের নিকট হইতে বৈধ কর ছাড়া কোন রকম আবওয়াব বা শুল্ক আদায় অবৈধ ঘোষণা করা হয় (৪) স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত মূর্তিসমূহ টাকশালে প্রেরণ করিয়া উহা দ্বারা স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা তৈরি করা হয়।

১৩৯৮ খৃস্টাব্দে আমীর তায়মূর ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে দুইটি হস্তীসহ দুইজন দূত সুলতান সিকান্দারের নিকট পাঠাইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকারের আহ্বান জানাইলে তিনি দূতদ্বয়কে সাদর সম্বর্ধনা জানান এবং মূল্যবান উপঢৌকন ও একটি আবদেনসহ তাঁহাদেরকে বিদায় করেন। দূতদ্বয়ের বর্ণনায় আমীর সন্তুষ্ট হন এবং সিকান্দার শাহকে আমীরের দিল্লী হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে পাঞ্জাবে সাক্ষাত করিবার নির্দেশ প্রদান করেন। সিকান্দার শাহ নির্দেশমত কাশ্মীর হইতে পাঞ্জাব রওয়ানা হইলে তিনি পথিমধ্যে অবহিত হন যে, আমীরের কোন পদস্থ কর্মকর্তা সিকান্দার শাহকে তিন সহস্র ঘোড়া ও এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা উপঢৌকন প্রদানের নির্দেশ দিয়াছেন। ইহাতে সিকান্দার শাহ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন এবং অবিলম্বে নদীপথে একজন দূতকে একটি আবেদন পত্রসহ আমীরের নিকট প্রেরণ করেন। আবেদনের মর্ম এইরূপ ছিল যে, দাবিকৃত উপঢৌকন সামগ্রী সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে কিছুদিন সময় দিলে তিনি আমীরের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। 'আমীর তখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার কোন অমাত্য তাঁহার অজ্ঞাতসারে সুলতান সিকান্দারের নিকট এই রকম অবাস্তব দাবি পেশ করিয়াছেন। দূতকে অভয় বাণীসহ সুলতানের নিকট ফেরত পাঠান হয়। যাহা হউক, তিনি বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সহিত তায়মূরের আক্রমণ হইতে কাশ্মীর রক্ষা করিতে সক্ষম হন।

জীবন সায়াহ্নে সুলতান সিকান্দার ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইলে মীর খান শাহী খান মুহাম্মদ খান নামক পুত্রদ্বয়কে সম্মুখে ডাকিয়া তিনি তাঁহাদেরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় রাখিয়া জীবন যাপনের উপদেশ দেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহযাদাহ মীর খানকে 'আলী শাহ উপাধি দান করিয়া শাসনভার তাঁহাকে অর্পণ করেন। ২২ বৎসর ৯ মাস শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া ৮১৯/১৪১৬ সালে তিনি ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) মুহাম্মাদ কাসিম ফিরিশতাহ, তারীখ-ই ফিরিশতাহ, ১০ম অধ্যায়, কাশ্মীরের শাসকবৃন্দ; (২) শারীফ 'আবদু'ল-হায়্যি আল-হাসানী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতির (৩) দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফি'ল-উছমানিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত ১৯৪৭ খৃ., ৩খ, ২৯-৩০; (৪) T. W. Arnold, The Preaching of Islam, লাহোর ১৯৬১ খৃ., পৃ. ২৯৪-৫।

ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

**আল-ইস্কান্দার আল-আফ্রূদীসী** (الاسكندر الافروديسي) ঃ আফ্রোদিসিয়াস-এর আলেকজান্ডার নামে পরিচিত এরিস্টোটলীয় দার্শনিক (আনু. ২০০ খৃ.)। মধ্যযুগীয় য়ুরোপ ও রেনেসাঁর কালে এরিস্টোটলের প্রাচীন ভাষ্যকারগণের মধ্যে তাঁহাকেই সর্বাপেক্ষা সঠিক ও প্রামাণিকরূপে গণ্য করা হইত। ইসলামী দেশসমূহেও তাঁহার প্রভাব ছিল অনুরূপ। সক্রিয় বুদ্ধিমত্তা বহিঃদেশ হইতে মানবাত্মায় প্রবেশ করে, তাঁহার এই ধারণা একটি বিশেষ উদ্ভাবনা (illuminism)-এর সৃষ্টি করে এবং তাহা আরব দর্শনে তৎকালীন প্রচলিত নব্য-প্লাটোনীয় ধারার সহিত সংগতিপূর্ণ ছিল। অপরপক্ষে মানবাত্মার অমরতার বিরুদ্ধে তাঁহার প্রদত্ত বস্তুবাদী যুক্তিসমূহ বিস্তৃত আলোচনার সূচনা করে এবং তাহা ক্রমশ ইসলামী বুদ্ধিজীবী চক্র হইতে খৃস্টানগণের মধ্যে সংক্রমিত হয়। এই প্রশ্নে এরিস্টোটল ও আলেকজান্ডারের মধ্যে বিরাজমান মতপার্থক্য সম্রাট ২য় ফ্রেডারিক হোহেনস্টাউফেন (Frederick ii, Hohenstaufen) ও সূফী ইব্ন সাব্'ঈন (দ্র.)-এর মধ্যে পত্র বিনিময়ের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় (দ্র. JA, 7e Serie, xiv, 1879, 404-49)।

আলেকজান্ডার-এর জীবনী সম্পর্কে অতি সামান্য কিছু জানা যায়। ফলে আরবীয় চরিতাভিধানে সম্ভবত গ্রীক উৎস হইতে সংগৃহীত তথ্যাবলীকে যথেষ্ট মাত্রায় বর্ধিত করা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাকে আল-ইস্কান্দার আদ-দিমাশ্কীরূপে বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে দামিশ্কের• জনৈক আলেকজাণ্ডারের সহিত অভিন্নরূপে গণ্য করা হইয়াছে, যিনি রোমে গ্যালেন (Galen) (দ্র. জালীনূস)-এর সহিত বিবাদে লিপ্ত হন এবং পরবর্তী কালে এথেন্সে এরিস্টোটলীয় দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন (দ্র. Galen, ১৪খ, ৬২৭-৯ ও ২খ, ২১৮, সম্পা. Kuhn)। আফ্রোদিসিয়াস-এর আলেকজান্ডারকেও এই একই সম্মানে ভূষিত করা হয় এবং এই পরিচিতিটি কোন ভ্রান্ত যুক্তি অথবা বর্তমানে আমাদের প্রাপ্ত তথ্য অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা তাহা জানা যায় না। এই ক্ষেত্রে কালানুক্রমিক বিবেচনার কোন মূল্য নাই ঃ আফ্রোদিসিয়াস-এর আলেকজান্ডারকে ১৯৮ খৃস্টাব্দে অথবা ইহার পরে এথেন্সে আমন্ত্রণ জানান হয় এবং যদিও গ্যালেনের De anatomicis administrationibus অধ্যায়টি ১৮০ খৃস্টাব্দের পূর্বেই লিখিত হয় এবং সেইখানে দামিশ্কের আলেকজান্ডার সংক্রান্ত মন্তব্য পাওয়া যায়, সম্ভবত এই মন্তব্যটি পরবর্তী কালে তাঁহার জীবন সায়াহ্নে তিনি সন্নিবেশিত করেন। তিনি প্রায়শই তাঁহার পূর্ববর্তী বহু রচনায় নূতন বরাত সন্নিবেশিত করিতেন (তু. K. Bardong, in Nachrichten von der Akad. d. Wissensch. in gottingen, phil.-hist. Kl., ১৯৪২ খৃ., পৃ. ৬০৪, ৬৩১, ৬৩৩)। দামিশ্কের আলেকজান্ডার-এর সহিত গ্যালেনের বিবাদের কথা তিনি নিজে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ব্যতীত গ্রীক উৎসসমূহে আর কোন উল্লেখ নাই। অন্যদিকে আরব গ্রন্থকারগণ ইস্কান্দার আল-আফরূদীসী আদ-দিমাশকী দার্শনিক চিকিৎসক গ্যালেনকে যে 'অশ্বতরের মস্তক' বলিয়া ডাকনাম দিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে সম্যক্‌ভাবে অবহিত ছিলেন (গ্যালেনের সাহিত্যিক ভুলভ্রান্তি যাহা আরবী উৎসে বর্তমান তাহার জন্য দ্র. নিম্নের বিবরণ)। এই প্রসঙ্গে ইহা কৌতূহলোদ্দীপক যে, আরবীয় ঐতিহ্য মতে এরিস্টোটলী দর্শনের শিক্ষকরূপে গ্যালেন ও আফরূদিসিয়াস-এর আলেকজাণ্ডার উভয়েরই নাম উল্লিখিত হইয়াছে, উদাহরণস্বরূপ Herminus ও এই তথ্যটি নিশ্চিতভাবেই সঠিকরূপে গণ্য করা যাইতে

পারে [তু. Heinrich Schmidt, De Hermino Peripatetico, Phil. Diss. Marburg 1907, 6 ; F. Rosenthal, in Oriens, ৭খ (১৯৫৪ খৃ.), ৬৯, ৭৯ ; S. Pines, in Isis, ৫২ খ. (১৯৬১ খৃ.), ২৩]।

বিভিন্ন অনুবাদকের মাধ্যমে আলেকজান্ডার-এর রচনাবলী আরবদের নিকট সুলভ হইয়া উঠে, ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন হুনায়ন ইব্‌ন ইস্‌হাক ইব্‌ন হুনায়ন (দ্র.), আবূ 'উছমান সা'ঈদ আদ-দিমাশকী, আবূ বিশ্‌র মাত্তা ইব্‌ন য়ূনুস, য়াহ্‌য়া ইব্‌ন 'আদী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। আরব গ্রন্থপঞ্জীকারগণ এরিস্টোটলের রচনাবলীর উপর তাঁহার বিস্তৃত ভাষ্যসমূহের প্রায় সকল রচনাতেই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের কিছু কিছু উদ্ধৃতিই কেবল বর্তমানে আরবী অনুবাদে প্রচলিত আছে (তু. উদাহরণস্বরূপ A. Dietrich, Medicinalia arabica, Abhandlungen der Aked . d. Wisswnsch, in Gottingen, phil. hist. Kl., Dritte Folge, নং ৬৬, ১৯৬৬ খৃ., ১৮১ প.)। ইহাদের অধিকাংশ ইব্‌ন রুশ্‌দ (দ্র.) কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে [দ্র. J. Freudenthal, in Abh. Pr. Ak. W., 1884; তু. M. Bouges, in Revue du moyen age latin. ৪খ. (১৯৪৮ খৃ.), ২৮০]। অপরপক্ষে আরবী পাণ্ডুলিপি আকারে বিভিন্ন বিষয়ে ৩৫টির অধিক ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যেইগুলির প্রকাশনা ও পাঠ কেবল গত দশকসমূহে শুরু হইয়াছে। এইগুলির ১৫টিকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে তথাকথিত quaestines (সম্পা. Bruns, ২/২)-এর গ্রীক মূলের সহিত সনাক্তকরণ করা যায় (দ্র. Dietrich, Differentia specifica, পৃ. ৯৪-৯; van Ess, পৃ. ১৫৩ ; Gatje, Uberlieferung, পৃ. ২৬১-৪, ২৭৪-৭)। অপর তিনটি অংশের সন্ধান পাওয়া যায় De Anima Libri Mantissa-তে (ফি'ল-'আক্‌ল 'আলা রা'য় আরিসতূতালীস, সম্পা. Finnegan ; ফী কায়ফা য়াকু'ল-ইব্‌সার 'আলা মায্‌হাব আরিস্‌তালীস, দ্র. Gatje, Uberlieferung, পৃ. ২৬৭-৭০, ২৭২ প. ; ফি'র-রাদ্দি 'আলা মান য়াকূলু ইন্না'ল-ইব্‌সার য়াকূনু বি'শ-শু'আতি'ল-খারিজা মিনা'ল-বাসার পাণ্ডুলিপি তাসখন্দ ২৩৮৫, ৮৫=Bruns ২/১, ১২৭, ২৮-১৩০, ১২)। এই সকল আরবী প্রবন্ধের শিরোনাম নিঃসন্দেহে মৌলিক নয়; বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি ও বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জীকারের তালিকাতে এই সকল প্রবন্ধের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। স্থানে স্থানে, এমনকি হয়ত বা কিছু বর্জন করা হইয়াছে, ফলে পরবর্তী অংশটির সহিত অসঙ্গতির সৃষ্টি হয় (দ্র. Gatje, Uberlieferung, পৃ. ২৬১ প., একই পাঠ-পাণ্ডুলিপি তাসখন্দ ২৩৮৫, ৮৪)। এই সকল দ্বিতীয় পর্যায়ের শিরোনামের কতিপয় গ্যালেন-এর বিরুদ্ধে বিতর্ক নির্দেশ করে (তু. J. Ch. Burgel, in Nachrichten der Akad. d. Wissensch. in Gottingen, I. phil.-hist. Kl., 1967, পৃ. ২৮২ প., ৩৮৭)। তবে এই সকল বিরুদ্ধবাদী তর্ক যে সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার বিরুদ্ধে নির্দেশিত তাহা নিশ্চিত করার জন্য আরও গবেষণা প্রয়োজন।

মাঝে মাঝে দেখা যায়, আরবী সংস্করণটি কেবল গ্রীক মৌলিক নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত রূপমাত্র। মাঝে মাঝে ইহাতে সংযোজন ঘটিয়াছে। একটি ক্ষেত্রে different a specifica (সম্পা. Dietrich)-এর দুইটি আরবী অংশ এত বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ যে, মনে হয় একটি অপরটির সংক্ষিপ্ত রূপমাত্র (তু. van Ess, পৃ. ১১৫৪-৯)। অসম্ভব না হইলেও এখন ইহা নির্ণয় করা অত্যন্ত দুষ্কর, এই সকল পরিবর্তন ঠিক কখনও সংযোজিত হয়, ইহা কি আলেকজান্ডার স্বয়ং করেন অথবা গ্রীক (সিরিয়াক) আরবী ঐতিহ্যের কোন পর্যায়ে ইহা সাধিত হয়। এরিস্টোটলের Metaphysics-এর একটি ব্যাখ্যার দ্বিতীয় অংশ ও একইভাবে একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে—গ্রীক ভাষায় বর্তমান এই ব্যাখ্যাটি সাধারণভাবে নকলরূপে গণ্য করা হয়—ইব্‌ন রুশ্‌দ এই প্রসঙ্গে যে উদ্ধৃতি দান করিয়াছেন তাহার প্রাসঙ্গিকতাও একইভাবে প্রশ্ন সাপেক্ষ (তু. Moraux, Alexandre d' Aphrodise, পৃ. ১৪-৯)। ইহা ছাড়া লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, আরবী ঐতিহ্যে Proclus-কৃত Elements of theology (দ্র. বুরুক্‌লুস)-এর কতিপয় পরিচ্ছেদ আলেকজান্ডারের স্বীকৃত রচনাবলীতে দেখা যায় তাঁহারই লেখা হিসাবে (দ্র. van Ess, পৃ. ১৫৯-৬৮)। গ্রন্থপঞ্জীকারগণ দুইটি চিকিৎসা সম্পর্কিত রচনাকে আলেকজান্ডারের রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (ফি'ল-মালীখূলিয়া এবং ফি'ল-'ইলাল আল্লাতী তাহ্‌দুছু ফী ফামি'ল-মি'দা) ; আর-রাযী (দ্র.) তাঁহার আল-হাবীতে ইহার উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন (তু. Th. Puschmann, Alexander von Tralles, ১খ., ভিয়েনা ১৮৭৮ খৃ., ৯৪ প.)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ফিহরিস্‌ত (নির্ঘণ্ট), তু. August Muller প্রণীত জার্মান অনুবাদ, Die griechischen Philosophen in der arabischen Uberlieferung, Halle a. S. 1873, পৃ.২৩ প. ; (২) আবু'ল-ওয়াফা' আল-মুবাশ্‌শির ইব্‌ন ফাতিক, মুখতারু'ল-হিকাম, সম্পা. 'আ বাদাব ী, মাদ্রিদ ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ২৯১, জার্মান অনু. F. Rosenthal, Das Fortleben der Antike im Islam, জুরিখ ও স্টুটগার্ট ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৫৫ ; (৩) আশ-শাহ্‌রাসতানী, পৃ. ৩৪৪ প., Th. Haarbrucker কর্তৃক জার্মান অনুবাদ, Halle a. S. 1851, ২খ, ২০৭ প. ; (৪) ইব্‌নু'ল-কিফ্‌তী, তা'রীখু'ল-হুকামা', সম্পা. J. Lippert, Leipzig 1903 নির্ঘণ্ট ; (৫) ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ূনু'ল-আন্‌বা' ফী তাবাকাতি'ল-আতিব্বা', সম্পা. A. Muller, কায়রো ১৮৮২ খৃ., ১খ, ৬৯-৭১, ৮৪ ; (৬) আশ-শাহ্‌রায়ূরী, রাওদাতু'ল-আফরাহ ওয়া নুয্‌হাতু'ল-আওয়াহ, পাণ্ডু. বার্লিন-ল্যান্ডবার্গ ৪৩০, পত্রক ৪$^{v}$ এবং ৩৩$^{r}$; (৭) M. Steinschneider, Al-Farabi, Memoires del' Academie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg, 7$^{e}$ seric, ১৩খ, নং ৪ (১৮৬৯ খৃ.); (৮) ঐ লেখক, Die hebraischen Ubersetzungen des Muttelalters, বার্লিন ১৮৯৩ খৃ. পুনপ্রকাশ ঃ Graz (1956), 1049, নির্ঘণ্ট ; (৯) ঐ লেখক, Die arabischen Ubersetzungen aus dem Griechischen, পুনপ্রকাশ" Graz 1960, p. (251) নির্ঘণ্ট ; (১০) Alexandri Aphrodisiensis praeter commentaria scripta minora, সম্পা. I. Bruns, বার্লিন ১৮৮৭, ১৮৯২ খৃ. (Supplementum Aristotelicum ii) ; (১১) G. Sarton, Introduction to the History of Science, ১খ., বাল্টিমোর ১৯২৭ খৃ., ৩১৮ প. ; (১২) P. Kraus, in MIE, ৪৫খ. (১৯৪২

খৃ.), ৩২৪ প. ; (১৩) P. Moraux, Alexandre d'Aphrodise, Exegete de la noetique d'Aristote, Liege and Paris 1942 (Bibliotheque de la Faculte de Philosophie et Lettres de l' Universite de Liege, xcix), quaestiones-এর নির্ভুলতা সম্পর্কে তু. Hermes, xcv (1967), 161 ; ৯১৪) 'আ. বাদাবী, আরিসতু ইন্দা'ল-'আরাব, ১ম খণ্ড, কায়রো ১৯৪৭ খৃ. (দিরাসাত ইসলামিয়্যা ৫), আলেকজান্ডার-এর এগারোটি প্রবন্ধের সংস্করণসহ ; (১৫) J. Finnegan, Texte arabe du d' Alexandre d'Aphrodise, in Melanges de l' Universite Saint Joseph, ৩৩খ. (১৯৫৬ খৃ.), ১৫৭-২০২, তু. Roger Paret, in Byzantion, ১৯-৩০খ. (১৯৫৯-৬০ খৃ.), ৪১০-৫ ; (১৬) H. Ley Studie zur Geschichte des Materialismus im Mittelalter, বার্লিন ১৯৫৭ খৃ. ; (১৭) P. Thillet, Un traite inconnu d'Alexandre d'Aphrodise sur la Providence dans une version arabe inedite, in L'homme et son destin d'apres les pen seurs du Moyen Age, Louvain and Paris 1960, 313-24 ; Escurial পাণ্ডুলিপি ৭৯৮ সম্পর্কিত Carullah ১২৭৯, পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে S. Pines পরীক্ষা করিয়াছেন, in Archives d'Histoire Doctrinale et Litteraire du Moyen Age, 34e annee, ২৬খ. (১৯৫৯ খৃ.), ২৯৫-৯, Cyril of Alexandria কর্তৃক উদ্ধৃত কতিপয় গ্রীক অংশবিশেষের জন্য দ্র. R. M. Grant, in The Journal of Theological Studies, N. S., ১৫খ. (১৯৬৪ খৃ.), ২৭৫-৯ ; (১৮) S. Pines, A new fragment of Xenocrates and its implications, Transactions of the American Philosophical Society, N. S. ৫১/২ (১৯৬১ খৃ.) ; (১৯) ঐ লেখক, Omne quod movetur necesse est ab aliquo moveri " A refutation of Galen by Alexander of Aphrodisias and the theory of motion, in Isis, ৫২খ. (১৯৬১ খৃ.), ২১-৫৪ ; (২০) R. Walzer, Greek into Arabic, অক্সফোর্ড ১৯৬২ খৃ. ; (২১) Moses Maimonides, The guide of the perplexed, IjM. S. Pines. শিকাগো ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ৬৪-৭৫ ; (২২) A. Dietrich, Die arabische Version einer unbekannten Schrift des Alexander von Aphrodisias uber die Differentia specifica, in Nachrichten der Akad. d. Wissensch, in Gottingen, I. phil.-hist. Kl., ১৯৬৪ খৃ., নং ২, দ্র. পৃ. ৯২-১০০, অদ্যাবধি প্রবন্ধ ও পাণ্ডুলিপির তালিকা পাওয়া যায় ; (২৩) J. van Ess, Uber einige neue Fragmente des Alexander von Aphrodisias und des Proklos in arabischer Ubersetzung, in Isl., ৪২ খ. (১৯৬৬ খৃ.), ১৪৮-৬৮, Dietrich প্রদত্ত তালিকার অতিরিক্ত তথ্যসহ; (২৪) H. Gatje, Zur arabischen Uberlieferung des Alexander von Aphrodisias, in ZDMG, ১১৬খ. (১৯৬৬ খৃ.), ২৫৫-৭৮, ২৭৮ পৃ.-তে সংযোজন করিতে হইবে যে মূল পাঠ তাসখন্দ পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান ; (২৫) ঐ লেখক, Die arabische Ubersetzung der Schrift des Alexander von Aphrodisias uber die Farbe, in Nachrichten des Akad. d. Wissensch in Gottingen. I. Plihil.-hist. Kl., ১৯৬৭ খৃ., নং ১০ ; (২৬) F. E. Peters, Aristoteles Arabus, লাইডেন ১৯৬৮ খৃ. ; (২৭) P. Moraux, Der Aristotelismus bei den Griechen, ১ম অংশ, ২খ. (প্রকাশের পথে)।

G. Strohmaier (E.I.$^2$)/আবদুল বাসেত

**ইস্কানদার নামাহ** (اسكندر نامه) ঃ আলেকজান্ডার রমন্যাস।

(১) **আরবী** ঃ সূরা কাহ্ফ (১৮)-এর ৮৩ প. আয়াত হইতে দেখা যায়, সুপ্রাচীন কাল হইতে আরবগণ আলেকজাণ্ডার রোমাঞ্চকর উপাখ্যান (ছদ্ম বীরত্ব-কাহিনী) সম্পর্কে অবহিত ছিল। কারণ এই কুরআনী পরিচ্ছেদে মূসা ('আ) সম্পর্কে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে এই আখ্যান হইতে উদ্ভূত। এই আখ্যানের প্রাথমিক কালের ইতিহাসের জন্য Noldeke, Beitrage zur Geschichte des Alexanderromans, in Denksehriften der Kais. Akad. d. Wiss, ভিয়েনা, ৩৩ খ.। উল্লিখিত এই পণ্ডিতের মতে সিরীয় ও 'আরব কাহিনীসমূহের উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় একটি অতি প্রাচীন পাহ্লাবী তরজমায়। Fraenkel (ZDMG, ৪৫খ, ৩১৯)-এর মতে ইহার রচয়িতা সম্ভবত কোন সিরীয় খৃস্টান এবং ইহার ভাষা ফারসী। কাহিনীর মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রাচীনতম আরবী তরজমা সংগ্রহ করিয়াছেন Friedlander তাঁহার Die Chadhirlegende und de r Alexanderroman-এ, পৃ. ৬৭ প. (দ্র. আল-খাদির)। অতি আধুনিক আরবী তরজমাসমূহের জন্য দ্র. Friedlander-এর একটি প্রবন্ধ এবং E. Garcia Gomez-এর Un texto arabe occidental de la leyena de Alejandro, মাদ্রিদ ১৯২৯ খৃ.।

১৮ ঃ ৮৩ আয়াতের যুল-কারনায়ন, ১৮ ঃ ৬৫ আয়াতের অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা (খিদর) এবং ১৮ ঃ ৯ আয়াতের আসহাবুল কাহ্ফ (গুহাবাসী) কোন কাল্পনিক চরিত্র নয়, বাস্তব চরিত্র, যদিও কালের প্রবাহে তাহাদের সুষ্ঠু ইতিহাস অজ্ঞাত রহিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিদ্বেষবশতই ইহাদেরকে কাল্পনিক চরিত্র প্রমাণের অপপ্রয়াস চালাইয়াছেন। অনন্তর আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট এবং যুল-কারনায়ন একই ব্যক্তি নহেন।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.$^2$)

(২) **ফারসী** ঃ "সিকান্দারনামাহ" গ্রন্থটি নিজামী (দ্র.)-র খামসা-র পঞ্চম কাব্য এবং শারাফনামাহ ও ইকবাল নামাহ এই দুই অংশে বিভক্ত। ম্যাসিডোনিয়ার এই বিজয়ীর ভাবমূর্তি সম্পর্কে মুসলিম ইরানের সকল ধারণা ও অভিব্যক্তির একটি পূর্ণ রূপায়ণ এই গ্রন্থ। তাঁহাকে প্রথম বর্ণনা করা হইয়াছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য এক শত্রুরূপে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি রূপ লাভ করিয়াছেন একজন আদর্শ মুসলিম বীরের, একজন ইরানী মহাযোদ্ধা যিনি নিজ গুণে স্বয়ং আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের মর্যাদা লাভের যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ হন।

শারাফনামাহ (৬৮৯৬ শ্লোক) এই বীরের কাহিনী। সার্বিক আঙ্গিকে, ইহাকে ছদ্ম কাল্পনিক কাহিনীর ঐতিহ্যবাহী বর্ণনার সহিত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ,

তবে খুঁটিনাটি বিষয়ে ইহাতে প্রচুর পরিবর্তন লক্ষণীয়। উপরন্তু নিজামী যেই পদ্ধতি ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে ইহা খুবই মৌলিক বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। ইকবালনামাহ একটি ক্ষুদ্রতর রচনা। কিন্তু ইহাতে রচয়িতার ব্যক্তিগত প্রতিভা আরও বেশী ভাস্বর। ইহাতে সৌর্কয কম কিন্তু চিন্তার সম্পদে ইহা অধিকতর পুষ্ট। মহাবীরের ভাবমূর্তির উৎকর্ষ ইহাতে একজন জ্ঞানী আদর্শ শাসকের ভাবমূর্তির মধ্যে চাপা পড়িয়াছে, যে শাসক তাঁহার দৃঢ় ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে একজন প্রেরিত পুরুষের মর্যাদা লাভের উপযুক্ত। (আরব ঐতিহ্য মুতাবিক ইসকান্দার-যুল্‌-কারনায়ন যুদ্ধপ্রিয় বীরের বৈশিষ্ট্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছেন)।

ইরানী ঐতিহ্যমতে বস্তুতপক্ষে তিনি ছিলেন "দ্রুত (কলহের দেবতা) দ্বারা প্রভাবিত ঘৃণ্য শক্তি 'মার' দৈত্য, ভাল ধর্ম, সেই ধর্মের উপাসনা স্থান এবং পবিত্র গ্রন্থসমূহের ধ্বংসকারী (M.Mole, Culte, Mythe et cosmologie dans l'Iranancien, প্যারিস ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ২১১; তু Pagliaro, Letteratura persiana, মিলান ১৯৫০ খৃ., পৃ. ৩৮, ৯৬)। কিন্তু ইসলাম অনুসারী ইরানে এই নিন্দিত ভাবমূর্তি পরিবর্তিত হইয়া তাঁহার বিজয়সমূহের মাধ্যমে এক বিশ্বজনীন উদ্দেশ্য পরিস্ফুটিত হইয়াছে, এমন ভাবধারা ব্যক্ত হইতে থাকে। এই নূতন রূপ দান করেন আত্‌-তাবারী তাঁহার তা'রীখ গ্রন্থে (Annales, ১খ, ৬৯২-৭০২) এবং কুরআন-এর ১৮ ঃ ৮৩ প. আয়াতের তাফসীরের মাধ্যমে।

শাহনামাহ মহাগ্রন্থে ফিরদাওসী ইতোমধ্যে ইসকান্দারকে একজন দৃষ্টান্ত স্থানীয় ব্যক্তিতে পরিণত করেন—এরিস্টোটলের সাহচর্য যাঁহাকে জ্ঞান ও আত্মসংযমের পথে এবং মিতাচার ও পার্থিব বস্তুর প্রতি অনাসক্তির মাধ্যমে আরও উন্নতির দিকে আগাইয়া দেয় এবং ফিরদাওসী দারা (গ্রীকদের দারিয়াস)-এর পরাজয়কে গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তনের ফল বলিয়া উল্লেখ করেন।

ফিরদাওসী আরও মনে করেন যে, আলেকজান্ডার-এর ললাটে বিরাজিত ছিল কায়ানীদের চিহ্ন, যাহা তাঁহার রাজ্যকে বৈধতার বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে। ইহার পর নিজামী অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার পূর্বসূরীর মত এবং আত্‌-তাবারীর ন্যায় তাঁহাকে দারাব-এর পুত্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ফলে তিনি হইতেছেন দারা-র সৎ ভাই, যিনি ইরানের কর্তৃত্ব তাঁহার নিকট হস্তান্তর করিতে সক্ষম। নিজামী সেইজন্য আলেকজান্ডারকে একজন মহৎ শাসক ও কায়ানীদের যোগ্য উত্তরসুরি বলিয়া মনে করেন।

নিজামীর সময়কালে এবং তখন হইতে ইসলাম ধর্ম ইরানে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কবি তাঁহার কাব্যের নায়কের অবধারিত মহাপুরুষোচিত ও সার্বজনীন চরিত্রটি ইহাতে সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত করেন। একজন প্রাজ্ঞ ইরানী কবি হিসাবে নিজামী তাঁহার নায়কের কাহিনী প্রধানত ইরানে সংস্থাপন করিয়া তাঁহার তথ্যের মাধ্যমে নিজের মানসিক ঔদার্যের প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত করেন (তাঁহার কথায় "আমি সমস্ত উৎস হইতে আমার যাহা কিছু প্রয়োজনীয় সকলই সংগ্রহ করিয়াছি এবং এই কার্যে আমি সাম্প্রতিক ইতিহাস, খৃস্টীয়, পাহ্‌লাবী ও য়াহূদী ইতিহাস হইতে তথ্য ব্যবহার করিয়াছি ... এবং এই সমস্তকে আমি একটি সম্পূর্ণ রূপ দান করিয়াছি")। তিনি তাঁহাকে ইরানী "মহাযোদ্ধা-"র ভাবমূর্তি হিসাবে শান্তিপ্রিয়, উদার, বিনয়ী এবং যে কোন মহৎ উদ্যোগের জন্য সদা প্রস্তুতরূপে উপস্থাপন করেন। নিজামীর সকল নায়কের ন্যায় তিনি স্থূল দৈহিক আবেগের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। বন্ধুত্বে ও কর্তব্যকর্ম সম্পাদনেই তাঁহার মনোযোগ সদা নিবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে তাঁহার এই সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় বিভিন্ন কার্যে ঃ দারিয়ূস-এর পরিবারের মহিলা সদস্যগণের প্রতি তাঁহার আচরণে, দারিয়ূসের মৃত্যুতে তাঁহার ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহারে, রুশ আক্রমণের বিরুদ্ধে রাণী নূশাবা (ফিরদাওসীর কায়দাফ, ছদ্ম বীরত্ব কাহিনীর কান্দাক)-কে প্রদত্ত তাঁহার প্রতিরক্ষার প্রতিশ্রুতিতে ও রাণীর প্রতি ব্যবহারিক আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে। চীনের সমকালীন রাজণ্যবর্গ, খাকান ও ভারতীয় রাজা কায়স (পুরু)-এর অবদমন কর্ম, তাঁহার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রতীকস্বরূপ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

বিশেষত শারাফনামাহ্‌-তে তাঁহার অভিযানের পথ হইল প্রধানত মুসলিম জগত ও ইরান। মিসরে তিনি এক সাম্য ও সুবিচারের শাসন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন এবং এই লক্ষ্যে প্রথমে তিনি দেশটাকে নিগ্রোদের (زنج) ভীতি হইতে মুক্ত করেন। শারাফনামাহ্‌র বর্ণনামতে ইব্‌রাহীম ('আ)-এর এক আল্লাহ্‌র ধর্ম প্রচারই তাঁহার লক্ষ্য হিসাবে তিনি স্থির করেন এবং এই লক্ষ্যে তিনি মক্কা হইতে খুযা'আ পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করেন। ইহারা কা'বার ধর্মীয় ঐতিহ্যকে বিকৃত করিয়াছিল। আর্মেনিয়ার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার প্রাচ্য অভিযান শুরু করেন এবং পথিমধ্যে তিফলিস ও বার্‌দা' নগরদ্বয় পত্তন করেন; পৌরাণিক দারবান্দ দুর্গ অধিকার করেন এবং সাকীর দুর্গের মধ্যে তিনি কায়খুস্‌রাও-এর কল্পকাহিনীর স্মারকসমূহের সন্ধান পান। তিনি রায়, খুরাসান ও মধ্যএশিয়া অতিক্রম করিয়া প্রথমে ভারত ও তৎপরে চীন পর্যন্ত পৌঁছান। ইহার পর রুশগণ কর্তৃক রাণী নূশাবা আক্রান্ত হইলে রাণীকে বিপদমুক্ত করার জন্য নিজামীর নিজ বাসভূমি এই আযারবায়জান-এর বার্‌দা'-এ প্রত্যাবর্তন করেন। প্রকৃতপক্ষে ৯৪৬-৭ খৃ. এইরূপ একটি আক্রমণ সংঘটিত হইয়াছিল।

ইহার পর নিজামী শারাফনামাহ্‌-কে জীবনের উৎস সন্ধানের ব্যর্থ প্রচেষ্টার মূল সুরের প্রাধান্যমণ্ডিত করিতে ব্যর্থ হন নাই। ইহাতে ইকবাল নামাহ্‌র নৈরাজ্যবাদী (nihilist) দর্শনের পূর্বাভাষ পাওয়া যায়।

ইকবালনামাহ জ্ঞানের জন্য গ্রীকদের উদ্দেশে রচিত এক স্তবগান। ইস্‌কান্দার প্রাচীন ইরান হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। পয়গাম্বরীতে উৎসর্গীকৃত এই বীর বিজ্ঞজনের সাহচর্যে তাঁহার মৃত্যুর সময় এই জ্ঞান সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দান করেন। নিজামী প্রাচীন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রদত্ত চূড়ান্ত সমাধানের পুনর্বিবেচনায় এই প্রসঙ্গে তাঁহার পূর্বেই ফিরদাওসী কর্তৃক রচিত স্বর্গীয় কার্যকারণের মৌলিক ভূমিকা, খ্রাত (Khrat)-এর কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

কিংবদন্তীমূলক ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রদত্ত বিবরণী ও পদ্ধতির তুলনায় পাঠককে অনেক বেশী আকৃষ্ট করে ইস্‌কান্দারনামাহ-র বিশ্বকোষ প্রকৃতির চরিত্র ঃ কঠোর সংযমের জন্য গভীর আবেগ ও ইহার যথার্থতা প্রদান, যাহার জন্য ইস্‌কান্দার স্বয়ং কয়েক স্থানে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, বিশেষত বায়যান্টাইন সম্পর্কিত ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণ, গুপ্ত রহস্যপূর্ণ বিজ্ঞানের প্রতি সুগভীর আকর্ষণ, যেইখানে কিবৃতী মেরী ও তাঁহার কল্পনাপ্রসূত আল-কেমীর প্রামাণিক ধারণার উপাখ্যানটি "নায়ক কর্তৃক একটি যাদুর আয়না সৃষ্টি বা পৌরাণিক বালীনাস (Apollonius)-এর সহিত তাঁহার কথোপকথনের আনন্দে মত্ত হওয়া"-র উপাখ্যানটির সংশোধক হিসাবে কাজ করে।

ইস্কান্দারনামাহ সম্পর্কে গবেষণা এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহাতে কেবল সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণের জন্য নয়, বরং যাঁহারা তুলনামূলক পর্যালোচনায় নিযুক্ত অথবা ইরানের ধর্মীয় নীতিশাস্ত্রের ইতিহাসের গবেষক— তাঁহাদের ও লোক-কাহিনীর ছাত্রদের জন্যও প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের উপাদান বিদ্যমান।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) Bertels, Selected works ঃ Nizami and Fuduli (রুশ ভাষায়), মস্কো ১৯৬২ খৃ. (C. ৬. ইস্কান্দার নামাহ, পৃ. ৩৪২-৯৩) ; (২) কুল্লিয়াত দীওয়ান-ই হাকীম নিজামী জান্‌জায়, তেহরান ১৯৩৭ খৃ. (শারাফ নামাহ, পৃ. ৮৩৮-১১৬২, ইকবাল-নামাহ, ১১৬৪-১৩৩৮); (৩) Bausani, Letteratura neopersiana, মিলান ১৯৬০ খৃ., পৃ. ৬৭৫-৯৫ (গ্রন্থপঞ্জী) সম্পর্কিত টীকা, পৃ. ৬৯৬ ও ৮৮৮; (৪) A. Abel, য়ু'ল-কারনায়ন, Prophete de l'Universalite, ব্রাসেলস্, Annuaire de l' Institut de Philologie et d' Histoire Or. et Slaves, ১১খ. (১৯৫১ খৃ.), ৬-১৮ ; (৫) ঐ লেখক, Le Roman d'Alexandre, legendaire medieval, ব্রাসেলস্ ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৮২-৯; (৬) ঐ লেখক, La figure d'Alexandre en Iran, Accademia Nazionale dei Lincei, Convegno sul tema La Persia eil mondo greco-romano, রোম ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ১২০-৩৪।

A. Abel (E.I.[2])/ মুহম্মদ ইমাদুদ্দীন

৩। প্রাচীন ক্লাসিকাল 'উছমানী যুগের সাহিত্যে আলেকজান্ডারের কাহিনী খুব বিরলভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, সম্ভবত (E. J. W. Gibb-এর ধারণামতে HOP, ১খ, ২৮৪) প্রেম সম্পর্কিত বিষয়ে রূপক বর্ণনার ব্যাপারে ইহার বিষয়বস্তু খুব বেশী সহায়ক নহে বলিয়া। এই বিষয়ে একটি অতি জনপ্রিয় ও বিখ্যাত কাব্য হইল আহমাদী [দ্র.] (মৃ. ৮১৫/১৪১২-৩) প্রণীত 'ইস্কেনদের নামে' (আহমাদী) বর্ণিত কাহিনীটি Gibb সংক্ষিপ্ত রূপ দান করিয়াছেন, HOP, ১খ, ২৭০-৮৪ ; এক শ্রেণীর বিশ্বকোষের ন্যায় ইহার চরিত্র পর্যালোচনার জন্য দ্র. Fr. Taeschner, Hb. der Orientalistik-এ I, Abt., ৫/১খ, ১৯৬৩ খৃ., ২৭৬ ; সর্বাপেক্ষা আধুনিক পাণ্ডুলিপির তালিকার জন্য দ্র. B. Flemming, Verzeichnis der or. Handschriften in Deutschland, ১৩/১খ, Wiesbaden ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৩৬)। কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি অর্ধেক গদ্যে ও অর্ধেক পদ্যে রচিত (উদাহরণস্বরূপ দ্র. নিহাদ সামি বানারহ্, TM-এ, ৬খ. (১৯৩৬-৯ খৃ, ১১০)। ইহা ছাড়াও কিছু সংখ্যক গদ্য তরজমা আছে যেইগুলির কোন কোনটি অজ্ঞাত গ্রন্থকার প্রণীত এবং কিছু আহমাদীর ভ্রাতা হাম্‌যাভীর বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় (HOP, ১খ, ২৫৫ ; তু. হাজ্জী খালীফা, ২খ, ১৩২৭; আরো দ্র. F. E. Karatay, Topkapi Sarayi . . . Turkce yazmalar kat., নং ২৭৪৪-৬৯, ইহার কিছু অংশ বা সমস্তটি হাম্‌যাভীর গদ্য তরজমা বলিয়া অনুমতি হয়); আহমাদীর কাব্যের সহিত কোন সংস্রব (যদি থাকে) তদন্ত সাপেক্ষ।

কারামানবাসী জনৈক ফিগানী (flor. আনু. ৯০৬/১৫০০) ইস্কান্দেরনামে নামক একটি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া কথিত (লাতীফী, পৃ. ২৬০-৭)। তবে মনে হয় বর্তমানে ইহা আর বিদ্যমান নাই। আহমাদ রিদওয়ান অর্থাৎ দাফতারদার "তুতুন্‌সূয" আহমাদ বেগ (flor. ২য় বায়াযীদ-এর আমলে) প্রণীত একটি ইস্কেন্দরনামে, যাহাতে আহমাদী-কে বিশেষভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে, একটি একক পাণ্ডুলিপি আকারে আঙ্কারাতে সংরক্ষিত আছে (দ্র. আগাহ সিররি লেভেন্দ, আহ্‌মাদ রিযওয়ান'ইন ইসকেন্দের নামেসি, Turk Dili-তে, ১খ, নং ৩ (ডিসেম্বর ১৯৫১), ২৩-৩১, যেইখানে (পৃ. ২৪) গ্রন্থকার তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত জনৈক হায়াতী প্রণীত অপর একটি ইসকেন্দেরনামে কাব্য গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন)। তাঁহার সমসাময়িক বিহিশ্‌তী (দ্র.) অপর একটি ইসকেন্দেরনামে ৯০৯/১৫০৩-৪ সালে সমাপ্ত করেন (Ushaw College MX)।

চাগাতায় তুর্কী সাহিত্যের আলেকজান্ডার-এর কাহিনী নাওয়া'ঈ (দ্র.)-এর খাম্‌সা (দ্র.)-এর পঞ্চম কাব্যের মূল বিষয়বস্তু সরবরাহ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য J. Eckmann, in Philologicae Turcicae Fundamenta, ২খ, ৩৪৬-৮ ও (গ্রন্থপঞ্জী), পৃ. ৩৫৫-৭।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) Th. Seif, Von Alexander-roman nach orientalischen Bestanden der National-bibliothek, in Festschrift der Nationalbibliothek in Wien, ভিয়েনা ১৯২৬ খৃ., পৃ. ৪৫-৭০ ; (২) Kenan, Islami edebiyatta Iskendername mesnevisi, ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, Tez নং ১৮৭ (১৯৩৩-৪ খৃ.) ; (৩) E. Bertel, Roman ob Aleksandre i, ego glavnie versiina Vostoke, মস্কো ও লেলিনগ্রাড ১৯৪৮ খৃ. ; (৪) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, Iskender-name প্রবন্ধ (ওরহান সায়ক গোকয়ায় কর্তৃক সংযুক্ত অংশসহ); (৫) A. Bombaci, Storia della letteratura turca[2], মিলান ১৯৬৯ খৃ., নির্ঘণ্ট, শিরো. Alessandro Magno (ফরাসী অনু. I. Melik off, প্যারিস ১৯৬৮ খৃ.)।

সম্পাদনা পরিষদ (E. I.[2])/মুহম্মদ ইমাদুদ্দীন

**ইসকান্দার বেগ** (اسكندر بيك) ঃ মুনশী নামে পরিচিত, আনু. ৯৬৮/১৫৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্ভবত আনু. ১০৪২/১৬৩২ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি তারীখ-ই 'আলামআরা-য়ি 'আব্বাসী-র রচয়িতা। ইহা পারস্য দেশীয় ইতিহাস বিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাবলীর অন্যতম। সাফাবীগণের উৎপত্তি ও ১ম ইসমা'ঈল ও ১ম তাহমাস্‌প-এর শাসনামল সম্পর্কিত একটি মুকাদ্দিমার পরেই রহিয়াছে ১ম 'আব্বাস-এর রাজত্বকালের একটি বিস্তারিত ইতিহাস। ১০২৫/১৬১৫ সালে গ্রন্থখানার অধিকাংশ (১ম ও ২য় সাহীফা অথবা অন্যমতে ১ম সাহীফা ও ২য় সাহীফা, ১ম মাকসাদ) সমাপ্ত হইয়াছিল। ১০৩৮/১৬২৯ সালে অর্থাৎ শাহ 'আব্বাস-এর মৃত্যুর বৎসরে ৩য় সাহীফা অথবা ২য় সাহীফা ২য় মাকসাদ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত পরবর্তী একটি অংশ সম্পূর্ণ হয়। এই বৎসরে সিকান্দার বেগ ৭০ বৎসর বয়সকালে শাহ সাফী-র একটি ইতিহাস আরম্ভ করেন, কিন্তু সম্ভবত প্রথম চারি বৎসরের ঘটনাপঞ্জীই ইসকান্দার বেগের রচনা। তথাকথিত যায়ল-ই তারীখ-ই 'আলাম আরা-য়ি 'আব্বাসী-র গ্রন্থকার সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশে দ্র. Storey, ১/১খ., ৩১২-১৪ ও V. Minorsky-র পর্যবেক্ষণ, BSOAS-এ, ১০খ. (১৯৪০-২ খৃ.) ৫৪০-৪১।

ইস্কান্দার বেগ একজন হিসাবরক্ষক হিসাবে তাঁহার পেশা আরম্ভ করেন, কিন্তু শীঘ্রই ইন্শা'র উদ্দেশে হিসাবরক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া রচনা (انشاء) কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি রাজকীয় সচিবালয়ে একটি পদ লাভ করেন এবং দ্রুত মুন্শী-য়ি 'আযীম-এর পদে উন্নীত হন। ১০০১/১৫৯২-৩ হইতে শুরু করিয়া যে সকল ঘটনা তিনি বর্ণনা করেন উহাদের অনেক কয়টির তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) Storey, ১/১খ., ৩০৯-৩১৩ ; (২) Fr. von Erdmann, Iskender Munschi und sein Werk, ZDMG-তে, ১৫খ. (১৮৬১ খৃ.), ৪৫৭-৫০১। তারীখ-ই 'আলাম আরা-য়ি 'আব্বাসী-এর মুদ্রিত সংস্করণ, ২ খণ্ডে, তেহরান ১৩৩৪-৫ হি. শামসী/১৯৫৫-৬।

R. M. Savory (E.I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল বাসেত

**ইসকানদার বেগ** (اسكندر بيگ) ঃ George (Gjergi) Kastriota, (জন্ম ৮০৮/১৪০৫, মৃত্যু ৮৭২/১৪৬৮)-এর তুর্কী 'উছমানী নাম। পাশ্চাত্য সূত্রসমূহে 'Scanderbeg' নামে উল্লিখিত। ৯ম/১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুর্কীদের বিরুদ্ধে আলবেনীয় প্রতিরোধের 'বীর নায়ক'। ৯ম/১৫শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ নাগাদ Kastriota পরিবার উত্তর আলবেনিয়ার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী Bashas (বাশা) শাসক বংশের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং ইহাদের রাজধানী স্থাপিত হয় Matia-য়। এই পরিবার ৭৮৭/১৩৮৫ সন হইতে 'উছমানী আধিপত্য স্বীকার করিয়া আসিতেছিল। ইস্কান্দারের পিতা John/Ivan-এর রাজ্যটি ছিল Scutari (Ishkodra) [স্কুটারী]-তে অধিষ্ঠিত ভেনিসীয় রাজ্য (দ্র.) ও 'উছমানী সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী। কোনও সময় উছমানীরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে জন (John) পার্শ্ববর্তী ভেনিসীয় রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণের জন্য পলাইতে প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহার রাজ্যটি একান্ত জরুরী পণ্য লবণ আমদানীর জন্যও ভেনিসীয় রাজ্যটির শুভেচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। তোপকাপি সারাঈ (E ৬৬৬৫), মোহাফেজখানায় রক্ষিত একটি দলীলে দেখা যায়, John তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণে Kruje/Croia (T. Akcahisar) দখলের জন্য উহা অবরোধের চেষ্টা করেন। Kruje নামক জনপদটি এক সময়ের জন্য ১ম বায়াযীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং ৮১৮/১৪১৫ সন হইতে একনাগাড়ে তুর্কী নিয়ন্ত্রণে ছিল। ইহা ছিল একটি 'উছমানী সুবাশিলিকের কেন্দ্র।

Barletius-এর বিবরণ অনুযায়ী তাঁহার (John) পুত্র George Kastriota-কে নয় বৎসর বয়সে যিম্মী হিসাবে 'উছমানী সুলতানদের প্রাসাদে পাঠান হইয়াছিল এবং এই বিষয় সম্পর্কে তুর্কী ঐতিহাসিকগণ (তুরসুন বেগ, ইদ্রীস) ইহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। ৮২৬/১৪২৩-৮৩৩/১৪৩০ সনে 'উছমানীদের সহিত যুদ্ধে তাঁহার পিতা John (N. Iorga, notes et extraits. . . , i, 435)-এর উপর চাপ বাড়িতে থাকায় তিনি রাজাব ৮৩১/এপ্রিল ১৪২৮ সনে ভেনিস কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দেন যে, সুলতান তাঁহার মুসলিম পুত্রকে তাঁহার রাজ্য দখলের নির্দেশ দিবেন এবং এইজন্য তাঁহার উদ্বেগ বাড়িয়া চলিয়াছে। পুত্র ইসকান্দার বেগ 'উছমানী শাহী প্রাসাদে ইচ-ওগানী (ايچ اوغانى)†হিসাবে চিকমা (দ্র. গুলাম)-র সচরাচর রীতি অনুযায়ী গড়িয়া উঠেন। তাঁহাকে তাঁহার পিতার 'Yuvan-eli' প্রদেশের কাছাকাছি তীমার মঞ্জুর করা হয় (তোপকাপি সারাঈ মোহাফেজখানা, E ৬৬৬৫) এবং ৮৪২/১৪৩৮ সনে তিনি আকচাহিসার (Akcahisar)-এর সুবাশী (H. Inalcik, সম্পা. Suret-i defter-i sancak-i arvanid, timar no. 314) নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরই Yuvan-eli-তে তাহার নয়টি গ্রাম Andre Karlo-কে হস্তান্তরিত করা হয় (ঐ, নং ৩৩৫)। তাঁহার পিতার রাজধানী মূস (Mus/Mysja)-কে একটি যি'আমেত-এ রূপান্তরিত করা হয়। ইস্কান্দার তাঁহার নিজের অনুকূলে মঞ্জুরীর আবেদন জানান (তোপকাপি মোহাফেজখানা, E ৬৬৬৫, তা. বি.)। কিন্তু একজন সানজাক বেগি (ওখরি'র) সমুদ্রতীর সংলগ্ন এই গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশটি জন-এর পুত্রকে মঞ্জুরী দেওয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি জানান। ফলত তাঁহার সেই আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অন্যতম কারণেই ইসকান্দার সুলতানের প্রতি তাঁহার আনুগত্য ছিন্ন করেন। আলবেনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে 'উছমানী তীমার পদ্ধতি বিস্তারের কারণে দক্ষিণাঞ্চলের বিশিষ্ট সামন্তগণ, যেমন Ghin Zenebissi, Andre Thopia, বিশেষত George Araniti বিদ্রোহ (৮৩৫/১৪৩১) করেন। ইসকান্দার শাওয়াল ৮৪৭/ডিসেম্বর ১৪৪৪-এ বিদ্রোহে তাহাদের সহিত যোগ দেন। ইযলাদির (Zlatica) যুদ্ধে (৩ রামাদান, ৮৪৭/২৫ ডিসেম্বর, ১৪৪৩) 'উছমানী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হইয়া পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে সাবেক শাসক পরিবারের সদস্যগণ তাঁহাদের হৃতরাজ্য ও স্বাধীনতা (Chalcocondyles, xŒJ. Darko, ii, 96, Iogra, op. cit., 145) পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে উৎসাহিত হন। এই মর্মে কথিত আছে, ইসকান্দার রুমেলির বেগলারবেগি কাসিমের (যিনি নিস-এর নিকট পরাজিত হন) শিবির হইতে পলায়ন করিয়া 'আক্চাহিসার (Akcahisar) (Gegaj, 45-6) অবরোধ করেন। এই কাহিনী সম্ভবত সত্য (তু. গাযাওয়াতনামে-ই সুলতান মুরাদ)। তিনি সুনিশ্চিতভাবেই ইসলাম পরিত্যাগ করেন এবং খৃষ্ট ধর্মে পুনঃদীক্ষিত হন (বিশেষভাবে দ্র. সমসাময়িক ঐতিহাসিক তুরসুন বেগের রচনা, সম্পা. in TOEM, p. 136)। অতঃপর তিনি 'উছমানীদের নিকট "খা'ইন ইসকেন্দার" (خائن اسكندر = বিশ্বাসঘাতক ইসকান্দার) নামে পরিচিত হন। ১১ যু'ল-কা'দা, ৮৪৭/১ মার্চ, ১৪৪৪ সনে ভেনিসের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি Alessio-তে আলবেনীয় নেতাদের এক বৈঠক ডাকেন (আলবেনীয় গোত্র রীতি [দ্র. M. Hasluck, The unwritten law in Albania, Cambridge 1954, 148] অনুযায়ী এক বিশেষ ধরনের Kuvend) এবং ঐ সভায় তিনি 'উছমানীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতা হিসাবে স্বীকৃত হন। পরে পোপ তাহাকে খৃষ্টীয় ধর্মযুদ্ধের নায়ক হিসাবে স্বীকৃত দেন। ১৯শ শতাব্দীতে আলবেনীয় জাতীয়তাবাদীরা তাহাকে তাহাদের স্বদেশের ঐক্যবদ্ধকরণ ও স্বাধীনতার পক্ষে সংগ্রামী জাতীয় বীর হিসাবে অভিহিত করে। ভেনিস তাহাকে একজন গুরুত্বপূর্ণ Condottiero হিসাবে গণ্য করে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন আলবেনীয় গোত্রপতি ও মধ্যযুগীয় সামন্ত প্রভুর সংমিশ্রণ। আর অন্যান্য আলবেনীয় নেতা প্রাথমিকভাবে জ্ঞাতি—এই বিবেচনাতেই তাহার সহিত সম্পর্কিত ও পক্ষভুক্ত ছিলেন। তিনি নিজে তাহার পরিবারের ক্ষেত্রে যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন তাহা Aragon-এর রাজা ও 'Georgio Kastroti S[re]. সহিত আনুগত্য চুক্তির শর্তাবলীতেই উল্লিখিত ঃ dela dita citate de Croya e de soi parenti, baruni in Albania (Radonic, no. 38)। আর এই কারণেই আলবেনীয় অন্য সামন্তরা যে প্রায়ই তাহার বিরুদ্ধে ভেনিস অথবা

'উছমানীদের সহিত একজোট হইত তাহাতে বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই। ৮১৮/১৪১৫ সন হইতে আলবেনীয় অঞ্চলে 'উছমানী তীমার ব্যবস্থা ও করপদ্ধতি প্রচলনের পরিপ্রেক্ষিতে উহার বিরুদ্ধে সামন্ত পরিবারসমূহ ও পার্বত্য উপজাতীয় লোকজন উভয় পক্ষের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। আর উহারই প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট বিদ্রোহ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন উত্তর আলবেনিয়ার ইসকান্দার। তিনি বিদ্রোহে পোপ, নেপল্‌স ও ভেনিসের রাজার সমর্থন লাভ করেন যাহা তাহার পূর্বপুরুষেরা পান নাই। তিনি তাহার পক্ষে সম্ভবত আট হইতে দশ হাজার অনুসারী সমবেত করিতে সক্ষম হন। অবশ্য তাহার নিজের হিসাবমতে এই অনুসারীদের সংখ্যা ২-৩০০০-এর বেশী (Gegaj, p. 125) ছিল না। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে (Stelush, Letrella, বিশেষত তাহার রাজধানী Kruje) কিছু দুর্গভিত্তিক চোরাগোপ্তা আক্রমণ তথা গেরিলা রণকৌশলই তাহার সাফল্যের কারণ। এই দুর্গগুলির রক্ষা ও প্রহরায় নিয়োজিত ছিল আগ্নেয়াস্ত্র পরিচালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাদল। বিদেশী মিত্ররা তাহাকে এই বাহিনী দিয়া সাহায্য করে। অবশ্য ভেড়ার পাল ও লবণের ব্যবসায়-বাণিজ্য হইতে প্রাপ্ত কিছু আয়ও এই ব্যাপারে অনেকখানি সহায়ক হইয়াছিল। 'উছমানীদের বিরুদ্ধে তিনি দীর্ঘকাল লড়াই করেন। ইহার মেয়াদ ছিল প্রায় সিকি শতাব্দী কাল। এই লড়াই কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত।

৮৫২/১৪৪৮ সন অবধি 'উছমানীগণ তাহাকে তেমন আমল দেন নাই। এই সময়টায় তিনি Dagno-র নিয়ন্ত্রণ (৮৫১/১৪৪৭) লইয়া ভেনিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং বাস্তবিকপক্ষে এমন প্রমাণ রহিয়াছে যে, তিনি স্থানীয় কিছু 'উছমানী শক্তির সহিত (সুলতানও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল দাবি করিয়াছিলেন) [Iorga, পৃ. গ্র., ২খ, ২২৭ ; উল্লেখ্য, ভেনিস কর্তৃপক্ষ তখনও তাহাকে সুলতানের সামন্ত মনে করিত] সহযোগিতা করিয়াছিলেন (পৃ. গ্র., ২খ, ২২৬)। ৪ অক্টোবর, ১৪৪৮-এ স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুযায়ী ইস্‌কান্‌দার Dagno-র উপর দাবি ছাড়িয়া দেন। ৮৫২/১৪৪৮-এর গ্রীষ্মে ২য় মুরাদের বাহিনী Svetigrad (কোজাজিক হিসারী) ['আশেক পাশা যাদে, পৃ. ১১৯ ও তাঁহার বর্ণনার উপর নির্ভরশীল অন্যান্য ঘটনাপঞ্জীকার ভুলক্রমে এই ঘটনাকে আকচাহিসারের ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন] দখল করেন আর উহার ফলে উত্তর আলবেনিয়ার অভ্যন্তরে অগ্রসর হইবার পথ খুলিয়া যায়। ইহার পর মুরাদ Kruje অবরোধ করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে হুনায়দি'র বাহিনী 'উছমানী অঞ্চলে হামলা করায় তিনি সোফিয়াতে সরিয়া যান।

৮৫৩/১৪৪৯ সনে ইসকানদার ও Mois Dibra কোজাজীক পুনর্দখলের প্রয়াস চালান। কিন্তু সেই হামলা প্রতিহত করা হয়। পরের গ্রীষ্মকালে মুরাদ আবার Kruje অবরোধ করেন। কিন্তু দুর্গটি আত্মসমর্পণ করে নাই। ইসকানদার পার্বত্য অঞ্চলে সরিয়া গিয়া চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাইয়া ২য় মুরাদের বাহিনীকে অবরোধ করিয়া রাখেন। দীর্ঘ সাড়ে চার মাসের অবরোধ মুরাদ উঠাইয়া নিলে ইসকানদার গোটা খৃস্টান জগতের বীর নায়ক হইয়া উঠেন। পোপ ৫ম নিকোলাস সকল খৃস্টান শক্তির প্রতি ইসকানদারকে সাহায্যের আহ্বান জানান। কিন্তু Kruje তখনও অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল এবং ইসকানদার জনপদটিকে ভেনিসের হাতে সমর্পণের প্রস্তাব দেন। তিনি অবশেষে নেপল্‌সের রাজা ৫ম আলফনসোর সক্রিয় সাহায্য লাভে সমর্থ হন। এই ব্যাপারে ২৬ মার্চ, ১৪৫১ সনে এক চুক্তি হয়। ঐ চুক্তি অনুযায়ী ইসকানদার নেপলসের রাজার আধিপত্য স্বীকার করিয়া নেন এবং Kruje জনপদকে তাহার বাহিনীর হাতে তুলিয়া দিতে সম্মত হন। নেপল্‌সের বাহিনী অতঃপর জুন মাসে Kruje দখল করে। এই সময়ে আলফনসো কূটনৈতিক ও সামরিক তৎপরতার মাধ্যমে গোটা আলবেনিয়া ও Epirus বরাবর উছমানীদের বিরুদ্ধে সামরিক প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় ছিলেন। নেপল্‌স-এর বাহিনী ছিল আগ্নেয়াস্ত্র পরিচালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছোট ছোট সেনাদল লইয়া গঠিত। আর এই সেনাবাহিনীর সিংহভাগ গঠিত ছিল ইসকানদারের (ইসকানদার ও অন্যান্য আলবেনীয় নেতা আলফনসোর নিকট হইতে আর্থিক সাহায্যও পাইতেন; ইহাতে ইসকানদারের প্রাপ্ত ভাগের পরিমাণ ছিল ১৫০০ ডুকাট) আলবেনীয় লোকজন দ্বারা। এই ব্যবস্থায় আলবেনিয়ায় ইসকানদারের কর্তৃত্ব তথা নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং সেই সুযোগে আলফনসোর প্রতিদ্বন্দ্বী ভেনিস ও 'উছমানীগণ কিছু আলবেনীয় দলপতিকে তাঁহাদের পক্ষে টানিতে সমর্থ হন। এই প্রক্রিয়ার Pavlo Dukagin নামে এক আলবেনীয় দলপতি যিনি তাঁহার তীমার হারাইয়াছিলেন, তিনি ৮৫৩/১৪৪৯ সনে ইসকানদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সাফার ৮৫৫/মার্চ ১৪৫১ সন নাগাদ ঐ হৃত তীমার (দ্র. Suret . . . Arvanid, no. 154) পুনরুদ্ধার করেন এবং এই পরিবারের অন্যান্য সদস্য ভেনিসের পক্ষাবলম্বন করেন। Mois Dibra, Gjergi Balsha ও ইসকানদারের ভ্রাতুষ্পুত্র হামযা 'উছমানী পক্ষ অবলম্বন করেন। ৮৫৭/১৪৫৩ সনে ইসকানদার ইতালীতে আলফনসোর সহিত সাক্ষাত করেন। ৮৫৯/১৪৫৫ সনে নেপল্‌সের প্রায় ১,০০০ সৈন্য লইয়া ইসকানদার বেরাত (Belgrade) অবরোধ করেন। কিন্তু এভরেনোস ওগলু 'ঈসা বেগের সেনাপতিত্বে নূতন একদল তুর্কী বাহিনী তাহাদের পরাজিত করে। নেপল্‌সের সৈন্যদের প্রায় সকলেই এই যুদ্ধে নিহত হয় (১০ শা'বান, ৮৫৯/২৬ জুলাই, ১৪৫৫)। ইসকানদারের জীবনীকারগণ যদিও পরের বৎসর তিনি এক বিরাট বিজয় লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানান (এই যুদ্ধে 'উছমানীদের নাকি ১০,০০০ সৈন্য নিহত হইয়াছিল), তথাপি Mois Dibra ও হামযা আরও একবার 'উছমানী পক্ষাবলম্বন করে এবং Modric দুর্গটি (Dibra অঞ্চলে) 'উছমানীদের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়। এই ধরনের আনুগত্যহীনতার কারণ সম্ভবত ইসকানদারের কিছু বৈরী কার্যকলাপ। তিনি অন্যান্য আলবেনীয় গোত্রপতির এলাকা নিয়ন্ত্রণে আনিয়া উহার উপর নিজ কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন। ৮৬১/১৪৫৭ সনে জনৈক 'ঈসা বেগ (সম্ভবত উসকুপের ইসহাক বেগের পুত্র) Kurje অভিমুখে অভিযান চালাইলে ইসকানদার Mount Tumenish-এর নিকটে Albulena-য় তাহার শিবিরে আক্রমণ চালাইয়া হামযাকে বন্দী করেন। এই সাফল্যকে ইতালীতে এক বিরাট বিজয় হিসাবে উদ্‌যাপন করা হয় এবং পোপ তাহাকে 'হলি সী'র মহাসেনাপতি (Radonic, no. 163) বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তাঁহাকে ৫০০ ডুকাট উপহার দেন।

৮৬২/১৪৫৮ সনে আলফনসোর মৃত্যু হইলে ইসকান্দার সাময়িকভাবে বিদেশী মদদ (নূতন রাজা ফার্ডিন্যান্ড বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তাহাকে সহায়তার জন্য ইসকান্দারকে ইতালীতে আসিতে বলেন) হইতে বঞ্চিত হন এবং সেহেতু ৮৬৪/১৪৬০ সনে তিনি ও অন্যান্য আলবেনীয় নেতা 'উছমানী আধিপত্য মানিয়া লইতে বাধ্য হন। সুলতানের সহিত স্বাক্ষরিত

এক চুক্তিতে (এই চুক্তিকে তিনি "treuga per tre anni, hs. V. Makusev, Monumenta Hist. Slav. Merid., ii, Warsaw, 1874, p. 123) 'উছমানী অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য স্বীয় সৈন্য পাঠাইতে এবং বার্ষিক নজরানাসহ (ভেড়ার আকারে) জানিসারী বাহিনীর জন্য (Critoboulos, ইং অনু, C. T. Riggs Princeton, 1954, p. 147 ; ইহাতে তারিখ দেওয়া আছে ১৪৫৯; তু. নেশরী, সম্পা. Taechner, i, 201) বালক পাঠাইতে সম্মত হন। ৮৬৫/১৪৬১ সনে ফার্ডিনান্ডের অনুগত সামন্ত হিসাবে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনে সহায়তার জন্য ইসকান্দার ইতালীতে যান এবং ১৪৬২ সনের ১১ ফেব্রুয়ারী আলবেনিয়াতে ফিরিয়া আসেন। ৭ শা'বান, ৮৬৭/২৭ এপ্রিল, ১৪৬৩ সালে সুলতানের সহিত তাঁহার সন্ধিচুক্তি (দ্র. Gegaj, p. 132) নবায়ন করা হয়। কিন্তু ঐ বৎসর গ্রীষ্মে 'উছমানী-ভেনিসীয় যুদ্ধ বাঁধিলে ইসকান্দার একজন নূতন পৃষ্ঠপোষক ও মিত্রের সন্ধান (ভেনিসের সহিত তাহার ২০ আগস্ট, ১৪৬৩-র চুক্তির বিবরণের জন্য দ্র. Radonic, no. 148) লাভ করেন। 'উছমানী সূত্রগুলিতে ইসকান্দারের এই 'বিশ্বাস ভঙ্গ'কে ৮৬৮/১৪৬৪ সন হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী কালে তাহার বিরুদ্ধে 'উছমানী সামরিক অভিযানগুলির কারণ হিসাবে দেখান হইয়াছে। Kruje-তে ভেনিসীয় সৈন্যদের ছাউনি স্থাপনের অনুমতি দিয়া ইসকান্দার আলবেনিয়ায় মোতায়েন 'উছমানী সৈন্যদের জন্য সত্যিকারের হুমকি সৃষ্টি করেন। ৮৬৮/১৪৬৪ সনে আশেপাশের সানজাক বেগিগুলি, বিশেষত ওখরির গভর্নর বলবন ত্বরিৎ আক্রমণ চালান। ইসকান্দার দৃশ্যত পার্বত্য দুর্গম অঞ্চল হইতে গেরিলা আক্রমণ চালাইয়া এই অভিযান প্রতিহত করেন, যদিও Mois Dibra-সহ আলবেনিয়ার নেতৃস্থানীয় গোত্রপতিকে ঐ তুর্কী বাহিনী বন্দী করে। ২য় মুহাম্মাদ ৮৬৭/১৪৬৩ সন হইতেই ইসকান্দারের (তুরসুন, পৃ. ১২৩) বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে চাহিতেছিলেন। তিনি অবশেষে ৮৭১/১৪৬৬-র বসন্তে ঐ অভিযান চালান। পুত্র বায়াযীদের নিকট প্রেরিত আদেশনামা (fethname) [N. Lugal and A. Erzi, Munseat Mecmuasi, ইস্তাম্বুল ১৯৫৬ খৃ., ৭৩-৪]-তে তিনি ঘোষণা করেন, যেহেতু আলবেনীয়রা বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে, যেহেতু ইসকান্দার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ দখল করিয়াছে এবং যেহেতু তিনি ঐ এলাকায় দখল কায়েম রাখার জন্য একটি দুর্গ (এলবাসান) নির্মাণ করিয়াছেন সেহেতু এই অভিযান আয়োজন করা হইয়াছে। ঐ বৎসরই মুহাম্মাদ Kurje অবরোধের জন্য তেমন চাপ দেন নাই (দুর্গটি রক্ষায় নিয়োজিত ছিল একজন ভেনিসীয় সেনানায়ক); বরং তিনি ঐ অবরোধ চালাইবার ভার বলবনের হাতে রাখিয়া চলিয়া আসেন। এলবাসান দুর্গটি (দ্র.) ২৫ দিনে নির্মাণ করা হইয়াছিল। ইতালীর নিকট হইতে সাহায্য পাইবার আশায় ইসকান্দার রোম (১২ ডিসেম্বর, ১৪৬৬ ; পোপ তাহাকে ৫,০০০ ডুকাট দেন) ও নেপল্‌স সফর করেন। তিনি এলবাসান আক্রমণ করিবার পরিকল্পনা করিতেছেন এই খবর পাইয়া সুলতান (তুরসূন, পৃ. ১৩৬) শীতকালের জন্য অবস্থান গ্রহণ করেন। ইসকান্দার ১৪৬৭ সনের এপ্রিলের গোড়ার দিকে আলবেনিয়া ফিরিয়া আসিয়া Karje দুর্গ অবরোধরত বলবনের সেনাবাহিনী ও রসদ সরবরাহ পথের উপর (ঘটনাটিকে ইতালীতে এইভাবে প্রচার করা হয় যে, বলবন নিহত হইয়াছেন এবং 'উছমানী সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে (Radonic, nos. 359) আক্রমণ শুরু করেন। কিন্তু আসলে বলবন সেপ্টেম্বরেও জীবিত ছিলেন (Radonic, no 370)। মুহাম্মাদ জুন ১৪৬৭ সনে এক বিশাল বাহিনী লইয়া আলবেনিয়ায় প্রবেশ করেন এবং এলবাসানের দক্ষিণে বুযুরশেকের খাড়া ও বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চলে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া গিরিপথটি দখল করেন। তিনি Durazzo অভিমুখে অভিযান চালান। মাহমূদ পাশাকে পাঠান ইসকুদরা (Ishkodra)-য় এবং তাহার পর Kruje অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি Kruje-র উপর খুব একটা সঘংবদ্ধ অবরোধ আরোপ করেন নাই (জুলাই শেষ)। তুরসুনের বিবরণ অনুযায়ী (যিনি ঐ অভিযানে গিয়াছিলেন) ইসকান্দার আলবেনিয়ার উকূলভাগের দিকে পলায়ন করেন। পরে তিনি ভেনিসীয় দুর্গ Alessio-তে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই ২১ জুমাদা'ল-উখরা, ৮৭২/১৭ জানুয়ারী, ১৪৬৮ সনে মারা যান।

ইসকান্দারের নাম আলবেনীয় লোকগাথায় দেশের অন্যতম বীর হিসাবে স্থায়ী আসন লাভ করেন। [দ্র. নিবন্ধসমূহ : (১) Q. Haxhihasani S A. Fico in Studia Albanica, iv/2 (1967), 135-55 S G. Marlekaj, in Atti 5 convegno intern. di studi albanesi 221-38]। তিনি আলবেনিয়ার আধুনিক জাতীয় সাহিত্যেও Barletius-রচিত জীবনীর কারণে একজন শীর্ষস্থানীয় চরিত্রও বটেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** : (ক) গ্রন্থপঞ্জীমূলক রচনাবলী : (১) G. T. Petrovitch, Scanderbeg (Georges Castriota), essai de bibliographie raisonnee, Paris 1881, re-edited by R. Trofenik, Munich 1967 ; (২) F. Legrand ও H. Guys, Bibliographie, albanaise, Paris 1902 ; (৩) V. Malaj, Necessita d`un coordinamento bibliografico Castriotano, in Atti V. Conveggno Internazionale di Studi Albanesi, Palermo 1959, 19-49।

(খ) দলীল-পত্রাদির সঙ্কলন : (১) L. Thalloczy, C. Jirecek M. Sufflay, Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia, 2 vols, Vienna 1913-18; (২) J. Radonic, Djuradj Kastinot Skenderbeg i Arbanija u XV veku, Belgrade 1942 ; (৩) J. Valentini, Acta Albania Veneta saeculorum XIV et XV, 12 vols. (in progress), Palermo and Munich 1967-71 ; (৪) F. Pall, I rapporti italoalbanesi intorno alla meta del secolo XV, in Archivio Storico per le Provincie Napolitane, 3rd ser., iv (Naples 1965, 123-226)।

(গ) জীবনী ও ঘটনাপঞ্জীমূলক রচনাবলী : (১) M. Barletius (Barlezio), Historia de vita et gestis Scanderbegi Epirotarum principis, Rome (?) [1510 অনুবাদের জন্য দ্র. Petrovitch, পৃ. গ্র., ঐ; (২) রচনার বৈশিষ্ট্যাবলীর জন্য দ্র. F. Pall, Marino Barlezio uno storico umanista, in Melanges d`histoire generale, ii (উফলন 1938),

135-319]। 'উছমানী ঘটনাপঞ্জীতে এই বিষয়ে যেসব উল্লেখ আছে সেগুলি Selami Pulaha, Lufta Shqiptaro-Turke ne shekullin XV, Tirana 1968-তে সংকলিত আছে। এই সংকলনে Dibra-র জন্য ৮৭১/১৪৬৭ সনের তাহ্‌রীর রেজিস্টারের হুবহু অনুলিপি আছে। ইহাতে ইসকান্দার সম্পর্কে দুইটি দলীলও আছে। বায়যান্টীয়, ইতালীয় ও স্লাভ ঘটনাপঞ্জীতে এ সম্পর্কে উল্লেখের জন্য দ্র. Radonic, পূ. গ্র., ঐ, পৃ. ২১৯-৩৫।

(ঘ) সমীক্ষাসমূহ ঃ (১) F. S. Noli, George Castrioti Scanderbeg, New York 1947 ; (২) A. Gegaj, L' Albanie et l'invason turque au XVe siecle, louvain et Paris 1937 ; (৩) K. Frasheri, Geore Kastriote Skanderbeg, Tirana 1962 ; (৪) C. Marinesco, Alphonse V, roi d'Aragon et de Naples, et l'Albanie de Scanderbeg, in Melanges de l'Ecole Roumaine en France, Paris 1932, 1-135 ; (৫) F. Pall, Die Geschichte Skanderbegs im Lichte der neuern Forschung, in Leipziger Vierteljahrschrift fur Sud-osteuropa, vi (1942), 85-98 ; (৬) A. Serra, L'Albania e la Sante Sede ai tempi di G. C. Scanderbeg, Cosenza 1960. ইসকান্দারের ৫০০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ধারাবাহিক কতগুলি নিবন্ধ ঃ in Studia Albanica, iv/2 (Tirana 1967) প্রকাশিত হয় ; Tirana ও Prishtina অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলন সম্পর্কে জ্ঞাতার্থে দ্রঃ (১) R. Schwanke, Ergebnisse der Kongresse in Tirana und Prishtina, in Atti V Conv. Int. de Studi Albanesi, Palermo 1969, 283-303 ; (২) আরও দ্র. H. Inalcik, Arnavutluk'ta Osmanli hakimiyetinin yerlesmesi ve Iskender Bey isyanun mesei, in Fatih ve Istanbul, i/2 (1953), ১৫৩-৭৫।

H. Inalcik (E.I.[2])/আফতাব হোসেন

**ইস্‌কান্দার মির্যা** (اسكندر مرزا) ঃ পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট (১৯৫৬-৮ খৃ.), জ. ১৮৯৯ খৃ.। তিনি বোম্বাই-এর এলফিনস্টোন কলেজ ও পরবর্তী কালে ইংলণ্ডের স্যান্ডহার্স্ট রয়াল মিলিটারী কলেজে অধ্যয়ন করেন। ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম রয়াল মিলিটারী কলেজ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া সেনাবাহিনীতে গেজেটেড মর্যাদাসহ যোগদান করেন। ১৯২১ খৃ. হইতে পরবর্তী ছয় বৎসর অর্থাৎ ১৯২৫ খৃ. পর্যন্ত ক্যামেরোনিয়ানসে দ্বিতীয় স্কটিশ রাইফেলস বাহিনীতে সপ্তদশ পুনা হর্স (অশ্বারোহীতে) চাকুরী করিবার পর ১৯২৬ খৃ. ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সার্ভিসের জন্য নির্বাচিত হন এবং সহকারী কমিশনার হিসাবে অ্যাবোটাবাদ, বান্নু, নওশেহরা ও টংকে কাজ করেন ; পরবর্তী কালে (১৯৩১-৩৬ খৃ.) ডেপুটি কমিশনার হিসাবে হাজারা ও মর্দানে অবস্থান করেন। ১৯৩৮ খৃ. খায়বার অঞ্চলের পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হন। ইহার পর পেশাওয়ারের ডেপুটি কমিশনার (১৯৪০ খৃ.), উড়িষ্যার পলিটিক্যাল এজেন্ট (১৯৪৫ খৃ.) এবং বৃটিশ ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করেন।

১৯৪৭ খৃ. ভারত বিভাগের পর ইসকান্দার মির্যা পাকিস্তান সরকারের প্রতিরক্ষা সচিব নিযুক্ত হন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর হইতেই দেশের দুই অংশের মধ্যে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ফলে দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নও বিলম্বিত হয়। এইদিকে কেন্দ্রীয় সরকার সমর্থনপুষ্ট মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলায় জনসমর্থন হারাইতে শুরু করে। পূর্ব বাংলায় বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জনমতের চাপে ১৯৫৪ খৃ. যেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার বিরোধী জোট যুক্তফ্রন্টের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। নির্বাচনোত্তর কালে তৎকালীন পাকিস্তানের দুই অংশেই রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অপর দিকে পূর্ব বাংলায় মরহুম এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ বিরোধী সরকার গঠিত হইলে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উহা সহজে মানিয়া লইতে পারেন নাই। ফলে পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পতন ঘটাইবার জন্য নানা রকম ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়। ১৯৫৪ সালের মে মাসে নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলে বাঙালী ও অবাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে এক প্রচণ্ড দাঙ্গা বাঁধে। এই অজুহাতে গভর্নর জেনারেল গুলাম মুহাম্মাদ ১৯৫৪ সালের ২৯ মে ফজলুল হক ও তাঁহার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে উৎখাত করিয়া পূর্ব বাংলায় ৯২-ক ধারা জারীর মাধ্যমে গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করেন।

এই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্যাকে পূর্ব বাংলার নূতন গভর্নর নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি ৩১ মে গভর্নর হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি শুরুতেই ব্যাপক ধর-পাকড় ও জেল-জুলুমের অভিযান চালাইলেন। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারেরও রদবদল হইল। ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে এক ঘোষণা বলে গুলাম মুহাম্মাদ সার্বভৌম গণপরিষদ বাতিল করিয়া বগুড়ার মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে নূতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠন করিলেন। ইসকান্দার মির্যা এই মন্ত্রিসভায় পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র, দেশীয় রাজ্য ও সীমান্ত অঞ্চলসমূহের জন্য মন্ত্রীরূপে যোগদান করেন। ১৯৫৫ সালের ৬ অক্টোবর গুলাম মুহাম্মাদ অসুস্থতার অজুহাতে পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে ইসকান্দার মির্যা গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। ইতিপূর্বে (জুন ১৯৫৫) তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করিয়া পাঞ্জাব হইতে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের নূতন শাসনতন্ত্র কার্যকরী করা হইলে ইসকান্দার মির্যা পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। স্থায়ী ও গণতান্ত্রিক সরকার তাঁহার কখনও পসন্দ ছিল বলিয়া মনে হয় না। অতএব তিনি প্রধান মন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মাদ 'আলীর বিরুদ্ধে সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। তিনি ডাক্তার খান সাহেবকে রিপাবলিকান দল গঠন করিতে উৎসাহিত করিলেন। ফলে মুসলিম লীগে ভাঙ্গন ধরিল এবং উহা রাজনৈতিক দল হিসাবে দুর্বল হইয়া পড়িল। একই সঙ্গে সারা পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের দাবি উঠিল। অপরদিকে সাধারণ নির্বাচন যতদিন ঠেকাইয়া রাখা যায় প্রেসিডেন্ট হিসাবে ইসকান্দার মির্যা তাহার জন্যই অধিকতর সচেষ্ট ছিলেন। ফলে অগণতান্ত্রিক উপায়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় বেশ কয়েকবার রদবদল করিলেন। অবশেষে ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত দিন-তারিখ ঘোষণা করা হইল (সর্বদলীয় বৈঠকের মাধ্যমে প্রধান মন্ত্রী ফীরোয খান নূন এই সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন)। এইদিকে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক চরম অস্থিরতায় উপনীত হইল।

আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক দলের বিরোধ সহিংস সংঘর্ষের রূপ পরিগ্রহ করিল এবং একটির পর একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটিতে থাকিলে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্যা দেশের শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা ও আইন পরিষদ বাতিল এবং রাজনৈতিক দলগুলি নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া সারা পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তন করিলেন। একই সঙ্গে তিনি প্রধান সেনাপতি জেনারেল (পরবর্তী কালে ফিল্ড মার্শাল) আয়্যুব খানকে প্রধান সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত করিলেন। বিশ দিন পর ২৭ অক্টোবর ইসকান্দার মির্যাকে অপসারণ করিয়া আয়্যুব খান প্রেসিডেন্ট হিসাবে দেশের সর্বময় ক্ষমতা ও শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন। আয়্যুব খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া ইসকান্দার মির্যা ইংল্যান্ডে বসবাস করিবার জন্য দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং সেখানেই ১৯৬৯ খৃ. ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ১খ, ৪৬, ৪১১, ৪১৭, ৬২৩, ৬৩৪, ৭৭৮ ; (২) বাংলা বিশ্বকোষ (নওরোজ কিতাবিস্তান ও গ্রীন বুক হাউস লিঃ), ১খ, ৩৫১-২ ; (৩)The Pakistan Observer, দৈনিক পত্রিকা (১৯৫৪-১৯৫৮ খৃ., প্রাসংগিক সংখ্যা) ; (৪) Twenty years of Pakistan, 1947-1967, পাকিস্তান প্রকাশনা (তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয়)।

ডঃ কে. এম. মোহসীন

**আল-ইসকান্দারিয়্যা** (الاسكندرية) ঃ আলেকজাণ্ডার (আল-ইস্কানদার)-এর নামের সহিত সংযুক্ত বহু সংখ্যক শহরের নাম। এইগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ (১) যেইগুলি বাস্তবে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল; (২) যেইগুলি তৎকর্তৃক স্থাপিত বলিয়া কিংবদন্তী রহিয়াছে এবং (৩) যেইগুলি তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার স্মরণে ও নামে স্থাপিত হইয়াছে। এইগুলির প্রাসঙ্গিক প্রাচীন বিবরণ Pauly-Wissowa-এর Real-Encyclopadie (১খ, ১৩৭৭-৯৮ ও পরি., ১খ, ৫৪)-তে এবং সংক্ষিপ্তভাবে M. Besnier-এর Lexique de geographic ancienne (প্যারিস ১৯১৪, পৃ. ৩২-৪ খৃ.)-এ লিপিবদ্ধ আছে। এই শহরগুলি হইতেছে ঃ

(১) মিসরে আলেজান্দ্রিয়া (নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)। (২) আলেকজান্দ্রিয়া এরিয়ন ঃ হিরাত (Harat) তু. সুহ্রাব, কিতাব 'আজা'ইবি'ল-আকালীম আস-সাব্'আ, সম্পা. von Mzik, লাইপযিগ ১৯৩০ খৃ., পৃ. ২৯। (৩) মার্ব অঞ্চলের মারজিয়ানার অবস্থিত আলেক্জান্দ্রিয়া। (৪) আলেকজান্দ্রিয়া এস্চেট (Eschate) ঃ খোজান্দ। এই অঞ্চলে আলেকজাণ্ডারের কিংবদন্তীমূলক স্মৃতির স্থায়িত্ব ইস্কান্দার নামক শহরের নামের মধ্যেও প্রতিফলিত হইয়াছে। এই শহরটি তাসখন্দের ৫০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত (তু. Times Atlas of the world, ২খ, লন্ডন ১৯৫৯ খৃ., মানচিত্র ৪৩)। (৫) প্যারাপানিসেডেস-এর আলেক্জান্দ্রিয়া ঃ গাযনী অথবা খুব সম্ভবত কাবুলের উত্তরে অবস্থিত—বেগ্রাম। (৬) সিন্ধু নদের পূর্ব তীরে অবস্থিত আলেক্জান্দ্রিয়া অপিয়ান, (Besnier ইহাকে শেষোক্ত নামীয় এলাকা বলিয়া ভুল করিয়াছেন মনে হয়)। (৭) কোকালার নিকটবর্তী গেড্রসিয়া-র উপকূলে আলেকজান্দ্রিয়া, অরিটাস-এ; পৌরালির মোহনায় সনমিয়ানি। (৮) ম্যাকারেন-এর আলেকজান্দ্রিয়া, মাক্রান-এ মাশকিল নদীর তীরে অবস্থিত। (৯) কারমানিয়াতে আলেকজান্দ্রিয়া ঃ আরব ভৌগোলিকদের নিকট ওয়ালাশজির্দ (তু. য়াকূত, শিরো.)। (১০) আরাকোসিয়া-তে আলেকজান্দ্রিয়া ঃ কান্দাহার। (১১) সুসিয়ানা-র আলেকজান্দ্রিয়া (Alexandria ad Tigrim) দিজলাঃ (Tigris) ও কারূন (Eulaeus) নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। (১২) ত্রোয়াস (Troas)-এ অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া ঃ এস্কি স্তাবুল। (১৩) অ্যাসিরিয়াতে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া (প্লিনীর Histoire naturelle অনুসরণে, ৬খ, ৪২)। (১৪) সিরিয়াতে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া, আলেক্জানড্রেটা (Alexandretta) [দ্র. আল-ইস্কান্দারূন]। (১৫) টায়ার-এর ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণে একটি আলেক্জাদ্রোস্কেন (Alexadroskene)। এই ইসকান্দরূণ (Skandelion) প্রকৃতপক্ষে আলেক্জান্ডার সেভেরাস কর্তৃক নির্মিত হয়, কিন্তু পরবর্তী কালের কিংবদন্তীতে ইহার নির্মাণকার্য আলেকজান্ডারের প্রতি আরোপিত হয়। কথিত আছে, তিনি টায়ারের অবরোধের সময় সেইখানে তাঁহার তাঁবু (Skene) ফেলিয়াছিলেন (তু. Benier, পৃ. ৩৪; Guide Baedeker Palestine-Syrie, লাইপযিগ ১৮৯৩ খৃ., পৃ. ২৭৪; Guide bleu Moyen-Orient " Liban, Syrie, Jordanie, Iraq, Iran, প্যারিস ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ১৬০)। অপরপক্ষে আলেক্জান্দ্রীয় কিংবদন্তীতে আলেকজান্ডার জেনিয়াস (১০২-৭৬ খৃ.) কর্তৃক নির্মিত আলেকজান্দ্রিয়াম-এর দুর্গটিকে নাবলুস-এর দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই (তু. Strabo, ১৬খ, ২, ৪০ ও Guide bleu, পৃ. ৪৮০)। (১৬) ম্যাগনেসিয়া ও মিন্ডার-এর দক্ষিণে লাট্মস-এ অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া। (১৭) সাইপ্রাসে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া। (১৮) থ্রেসে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া। (১৯) সারস উপসাগরে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া (চেরসোনসাস-এর উত্তরে অবস্থিত মেলাস সাইনাস)। (২০) আরমেনিয়াতে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া। (২১) থ্রেসে অবস্থিত আলেকজান্দ্রোপোলিস। (২২) আরব ভূগোলবিদদের নাসা অঞ্চলে পারথিয়া (খুরাসানে)-তে অবস্থিত আলেকজান্দ্রোপোলিস। (২৩) পাঞ্জাবের উত্তরে আধুনিক জালালপুরের নিকটে হাইডাস্প্ (Hydaspe)-এর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া বুকেফালস্ (Alexandria Boukephalos)। (২৪) আসেসাইন্স (চেনাব) নদীর তীরে সিন্ধু নদের সহিত ইহার সংগমস্থলের নিকটে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া। (২৫) পূর্ববর্তী এলাকার দক্ষিণে অবস্থিত সগদীয়দের (ভারতের) আলেকজান্দ্রিয়া। (২৬) ভারতে আলেকজান্দ্রিয়া "প্যারা সরিয়ানোআ" (Alexandreia "Para Sorinois") সম্ভবত Diodorus Siculus-এর Alexandreia, ১৭খ, ১০২ ?)। (২৭) সিন্ধু নদের উত্তর পার্শ্বের মোহনায় আলেকজান্দ্রি বন্দর (Alexandri portus), করাচী। (২৮) বাক্ট্রা-র (বাল্খ) নিকটে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া। (২৯) আলেকজান্দ্রিয়া অক্সিয়ান (অক্সাস জায়হূন) নদীর তীরে। (৩০) আলেকজান্দ্রিয়া এস্চেট (খুত্তাল-এ অক্সাসের উজানে অবস্থিত, ৪ নং হইতে ভিন্ন ঃ আরব ভূগোলবিদদের সিকান্দারা (তু. Ibn Hawkal-Kramers-Wiet, পৃ. ৪৩২, ৪৩৪, মুকাদ্দাসী, পৃ. ২৯১)। (৩১) হইতে (৩৫) অথবা (৩১) হইতে (৩৯), লেখকদের মতে ব্যাকট্রিয়া ও সগদিয়ানাতে অবস্থিত বিভিন্ন আলেকজান্দ্রিয়া।

এই শহরগুলির স্মৃতি যথেচ্ছ ও অনিশ্চিতভাবে রক্ষিত আছে ঃ উদাহরণস্বরূপ, ইব্ন রুস্তাহ তাঁহার নিজস্ব শহর ইস্ফাহানকে এই বীর কর্তৃক স্থাপিত বলিয়া দাবি করেন (Ibn Rusta-Wiet, পৃ. ১৮৬;

Contents



Ibn Hawkal-Kramers-Wiet, পৃ. ৩৫৫)। এই নামকরণ প্রবণতার ঐতিহ্যের আর একটি চিহ্ন হইতেছে ইস্কান্দারী নামের মধ্যে এই এলাকাটি ইস্‌ফাহানের ১১০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। কুদামা নিম্নোক্ত শহরগুলিকে আলেক্‌জান্ডার কর্তৃক নির্মিত বলিয়া মনে করেন (BGA, ৬খ, ২৬৫) ঃ সামারকান্দ, আদ-দাব্‌সিয়্যা (বুখারা অঞ্চলে অবস্থিত আধুনিক যিয়ান্দিন; তু. হুদূদু'ল-'আলাম, পৃ. ১১৩, ৩৫২), আল-ইসকান্দারিয়্যা আল-কুস্‌ওয়া (খোজান্দ), বুখারা, মারব, হারাত, যারান্‌জ, আর-রায়, ইস্‌ফাহান ও হামাযান। ইরানী ঐতিহ্য স্পষ্টতই বীরের স্মৃতি একচেটিয়া করিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু ইবনু'ল-ফাকীহকে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক যোগসূত্রসমূহের প্রারম্ভ বিন্দুর প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা হয়। নিঃসন্দেহে মিসরের আলেক্‌জান্দ্রিয়া ব্যতীত তিনি কেবল আলেকজানড্রেটার এবং আলেকজাণ্ডার কর্তৃক মারব স্থাপিত হওয়ার ঐতিহ্য সম্পর্কে জানিতেন (৩খ, ৭১; আল-মুকাদ্দাসী, পৃ. ২৯৮)। কিন্তু য়াকূত, যাঁহার নিকট ইবনু'ল-ফাকীহ্‌র সম্পূর্ণ রচনাবলী ছিল, বলিয়াছেন যে, ইহাতে তিনি তেরটি আলেকজান্দ্রিয়া শহরের সন্ধান পাইয়াছেন। আলেকজান্ডার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই শহরগুলির 'প্রায় সর্বত্র' এবং যেইগুলিকে নিজের নামে ভূষিত করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে এই নাম পরিবর্তিত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে য়াকূত-এর মূল রচনায় ইবনু'ল-ফাকীহ কর্তৃক উল্লিখিত বারটি শহরের কথা আছে। ইহাদের সহিত তিনি আরও তিনটি শহর যোগ করিয়াছেন। এই তথ্য পুরাপুরি মুহাম্মাদ মুরতাদা কর্তৃক পুনরুল্লিখিত হইয়াছে (তাজু'ল-'আরূস, ৩খ, ২৭৬)।

এই আলেকজান্দ্রিয়াগুলি হইতেছে ঃ (ক) বৃহৎ নদীর তীরে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া (তাজু'ল-'আরূস অনুসারে ইহার নাম জায়হূন)-২৯। (খ) ব্যাবিলন (বাবিল) দেশে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া ঃ ইহাই ইস্কান্দারিয়্যা, বাগদাদের ৬৮ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র শহর। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে ইহা আলেকজান্ডার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, একই অঞ্চলে একটি খালের নামও ইস্কান্দারিয়্যা (তু. Guide bleu, পৃ. ৬২৬; Iraq and the Persian Gulf, সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ খৃ., নৌ-গোয়েন্দা বিভাগের ভৌগোলিক হ্যান্ডবুক সিরিজ, অক্সফোর্ড ১৯৪৪ খৃ., শিরো.; Times Atlas of the world, মানচিত্র ৩৪)। (গ) আলেকজান্দ্রিয়া, সগ্‌দিয়ানা (صغد) দেশে ঃ ইহা 'ইহাতেই সামারকান্দ' (তাজু'ল-'আরূস ঃ সামারকান্দের সুগ্‌দ এলাকায়)-৪। (ঘ) আলেকজান্দ্রিয়া, "মারগাবুলুস নামে পরিচিত ঃ ইহা হইতেছে মারব" (তাজু'ল-'আরূস ঃ মারব-এ)। নিঃসন্দেহে মারগাবুলুস নামের মধ্যে আমরা দুইটি নামের যোগসূত্রের সন্ধান পাই, ইহাদের একটি মার্‌গাস মাগিয়ানা নদী ঃ মুর্‌গাব (مرغاب), অপরটি পলিস-৩। (ঙ) আলেকজান্দ্রিয়া "কূশ বলিয়া অভিহিত এবং ইহা হইতেছে ব্যাকট্রার (বাল্‌খ)" তাজু'ল-'আরূস ঃ "ইহা বালখেরই নাম, কেননা ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আলেকজাণ্ডার"-২৮। (চ) ভারতের নদীসমূহের অববাহিকায় অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া (তাজু'ল-'আরূস যোগ করিয়াছে ঃ যাহার সংখ্যা পাঁচ এবং যাহার নাম পাঞ্জাব)-৬, ২৩ বা ২৪। (ছ) অন্য এক আলেকজান্দ্রিয়া (তাজু'ল-'আরূস ইহাকে আল-ইস্কান্দারা নাম দেয় এবং ইহার সহিত যোগ করে "বৃহৎ") "ভারতবর্ষদেশে" অন্য কোন বিস্তারিত তথ্য ছাড়া-৬ বা ২৩-২৭। ভারতে এইরূপ নামকরণের ঐতিহ্য অত্যন্ত প্রবল (উত্তর ভারতে সিকান্দ্রা নামের বহু অঞ্চল পরিলক্ষিত হয়, Times Atlas of the world, শিরো. ও মানচিত্র ৩০)। (জ) মিসরে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া "মহাআলেকজান্দ্রিয়া" নামে পরিচিত। (ঝ) আলেকজাণ্ডেটা, য়াকূত কর্তৃক অস্পষ্টভাবে বর্ণিত উক্ত বিষয়টি যদি সত্য হয়" আলেপ্পো ও হামাতের মধ্যবর্তী একটি ছোট্ট শহর। অপরপক্ষে তাজু'ল-'আরূস এই সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে নাই। (ঞ) আলেকজান্দ্রিয়া "যাহা আল-জামিদার বিপরীত দিকে, ওয়াসিত হইতে ১৫ প্যারাস্যাং (লীগ) দূরে দিজলা নদীর তীরবর্তী ক্ষুদ্র শহর; ইহা শাফি'ঈ আবূ বাক্‌র আল-ইস্‌কান্দারানীর নিবাস (দ্র. কাহ্‌হালা মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন, ২খ, পৃ. ৯৮)-১১। (ট) হাফিজ আবূ 'আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌নু'ন-নাজ্জারের অভিধানে উল্লিখিত মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র শহর আলেকজান্দ্রিয়া (কাহ্‌হালা, পূ. গ্র., ১১খ, ৩১৭)।

অন্য কোন বিস্তারিত বিবরণ ব্যতীত তাজু'ল-'আরূসে আরও পাঁচটি আলেকজান্দ্রিয়ার উল্লেখ আছে। ফলে নিবন্ধের শুরুতে উল্লিখিত মোট সংখ্যা ষোল ইহাতে পূর্ণ হয়, যাহার সবগুলি "আলেকজান্ডার নামের স্মৃতি বহন করিতেছে"। বস্তুত এই সংখ্যা, শহরগুলি সম্পর্কে ইব্‌নু'ল-ফাকীহ প্রদত্ত সংখ্যার (বার, তের নহে) য়াকূত কর্তৃক ভুল বর্ণনার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং প্রকৃত মোট সংখ্যা হইতেছে পনের, যাহা য়াকূতের উল্লিখিত সংখ্যার সহিত সামঞ্জস্যশীল।

য়াকূতের বর্ণনায় প্রদত্ত চারটি শহর যেইগুলির স্থান নির্ণয়করণ স্পষ্টতই অসুবিধাজনক বলিয়া তাজু'ল-'আরূস-এ ইহার কোন উল্লেখ নাই, সেইগুলি হইতেছে ঃ (ক) একটি শহর যাহা আলেকজান্ডার বাউরনাকূস (فی باورنقوس)-এ প্রতিষ্ঠিত করেন, প্রথম দৃষ্টিতে যাহার পাঠোদ্ধার কষ্টকর, এই নামটি বারূনাকূস (بارونقوس), সম্ভবত পারো (পা) নিসোস-এর অপভ্রংশ, পারোপানিসেইডদের দেশ-৫। (খ) একটি শহর যাহার নাম আল-মুহাস্‌সানা (সুরক্ষিত) ঃ তু. ২৬, যেইখানে Diodorus বলেন ঃ ektise polin Alexandreian (ল্যাটিন, oppidum condidit Alexandriam)। (গ) জালীকূস (فی جليقوس)-এ অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া ঃ গ্যালিকাস (Gallicus) উপাধিখানি সম্ভবত গ্যালাস (Gallus) অথবা গ্লকাস (Glaucus) নির্দেশ করে; প্রথমোক্তটি হইতেছে ফ্রিজিয়া (Phrygia) বা গ্যালাসিয়া (Galacia)-র একটি নদী, শেষোক্তটি আর্মেনিয়ার উত্তরে একটি ক্ষুদ্র নদী অথবা লাইসিয়া (Lycia) ও ক্যারিয়া (Caria)-র মধ্যে একটি উপসাগর (strabo, ১৪খ, ২, ২)-২০ বা ১৬। (ঘ) "আস-সাকূয়াসীস (السقوياسيس) দেশে" এক আলেকজান্দ্রিয়া, ইহার মধ্যে Satnioeis (Satniois, Saphniols " Strabo, ৭খ, ৭, ২, ১৩খ, ১, ৫০ ও ৩, ১) নামের অপভ্রংশ খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব। ইহা হইতেছে একটি নদী যাহা ট্রোয়াসের আলেকজান্দ্রিয়ার দক্ষিণে প্রবাহিত-১২।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে উল্লিখিত।

A. Miquel (E. I.²)/ পারসা বেগম

**আল্-ইস্কান্দারিয়্যা** (الإسكندرية) ঃ আলেকজান্দ্রিয়া (ইহা আল-আস্কান্দারিয়্যা নামেও অভিহিত), মিসরের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর এবং টলেমীর যুগে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ছিল। আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উপকূলবর্তী স্বল্প সংখ্যক বিখ্যাত সামুদ্রিক বন্দরের অন্যতম

হওয়ার কারণে আলেকজান্দ্রিয়ার একটি বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে। প্রায় ১৫,৭৬,২৩৪ (১৯৬০) খৃ.) জনসংখ্যা লইয়া শহরটি বদ্বীপের পশ্চিম কোণে ৩০°১১ উত্তর অক্ষাংশে ও ২৯°৫১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। ইহা খৃস্টপূর্ব ৩৩২ অব্দে মহামতি আলেকজাণ্ডার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। আরবদের অধিকারে আসিবার পর ইহার পূর্বগৌরব স্তিমিত হইয়া গেলেও ইহা একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ নগর হিসাবে পরিচিত ছিল।

২১/৬৪২ সনে যখন আরবদের হাতে আলেকজান্দ্রিয়ার পতন ঘটে তখন বিপুল সংখ্যক গ্রীক অধিবাসী শহরটি ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ব্যাপকভাবে শহর ত্যাগের কারণস্বরূপ বিজেতাদের অনাচার, নির্যাতনের কল্পকাহিনী চলে বলিয়া ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেন, এমনকি আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগার দাহন কর্ম ও বিজাতীয় রোষানলপ্রসূত বলে ঐতিহাসিক তথ্যাবলী সপ্রমাণিত। নূতন শাসকগণ শহরটি অধিকার করিবার পর অধিবাসীদের উপর মোটেই অত্যাচার করেন নাই। খলীফা হযরত 'উমার ইব্নু'ল-খাত্তাব (রা)-এর আদেশে বিরাট গ্রন্থাগার পোড়াইয়া দিবার যে বহুল প্রচারিত কাহিনী ৭ম/১৩শ শতাব্দীর আরব গ্রন্থকারদের দ্বারা বর্ণিত বলিয়া অভিযোগ করা হইয়া থাকে, তাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। নবাগত আরবগণ প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর জাঁকজমক দর্শন করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার দালান-কোঠা ও স্মৃতিস্তম্ভসমূহ তাঁহাদের নিকট অলৌকিক কর্মকাণ্ড বলিয়া মনে হইয়াছিল। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, শহরটি রাত্রিকালে এত উজ্জ্বল দেখাইত যে, দর্জিদের সূঁচের ছিদ্রে সুতা পরাইবার জন্য অন্য কোন কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন হইত না বলিয়া জনশ্রুতি ছিল। কিন্তু খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত আরব ভৌগোলিক য়াকূত এই উক্তির বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, শহরটি অন্যান্য শহরের ন্যায়ই রাত্রিতে অন্ধকার থাকিত। ইহার গৃহাদি শুধু এই কারণে উজ্জ্বল দেখাইত যে, ঐ সকল গৃহ যেমন ছিল শ্বেত বর্ণের, তেমনই গৃহের সম্মুখভাগ ও রাজপথগুলি শ্বেত প্রস্তর নির্মিত ছিল। তৃতীয় / নবম শতাব্দী হইতে ৭ম/১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত আরব লেখকগণের পরিবেশিত তথ্যাদি একত্র যোগ করিলে দেখা যায় যে, উহা আলেকজান্দ্রিয়ার কেবল সাধারণ বিবরণ পেশ করিয়াছে এবং উহাতে শহরটি পুনর্নির্মাণের জন্য পরিকল্পিত নকশার উপাদান উপকরণ নিতান্তই অপর্যাপ্ত বলিয়া মনে হয়। এতদসত্ত্বেও ইহা নিশ্চিত ধারণা করা যায় যে, নগরটিতে মধ্যযুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্তও ইহার সামগ্রিক বিন্যাস সুরক্ষিত আছে। আটটি সোজা সড়ক অপর আটটি সড়ককে সমকোণে ছেদ করিয়া একটি দাবার ছকের ন্যায় সুদীর্ঘ সরল পথের সৃষ্টি করিয়াছে। নূতন শাসকগণ যথার্থভাবে প্রাচীন কালের ধন-সম্পদের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ২য়/ ৮ম শতাব্দীর প্রথম দিকে আর্থিক দুর্গতির কারণে মিসরের শাসনকর্তা একটি পিতল মূর্তি গলাইয়া ধাতু হিসাবে মুদ্রা প্রস্তুতের কাজে ব্যবহার করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন। সুলতান আন্-নাসির মুহ'াম্মাদ ইব্ন কালাউনের শাসনকালে আলেকজান্দ্রিয়ার খাল নির্মাণের জন্য সরকার একটি সুড়ঙ্গ পথে সীসা ব্যবহার করিয়াছিলেন যাহা তখনও বিদ্যমান ছিল। স্থাপত্য শিল্পে মধ্যযুগীয় আলেকজান্দ্রিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং প্রাচীন কাল হইতে গৃহ নির্মাণ কার্যে যে পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছিল তাহা এই যে, ঘরগুলি সারিবদ্ধ থামের উপর নির্মাণ করা হইত এবং সমান্তরাল স্তম্ভগুলি একটি অপরটির উপর তিন স্তরে স্থাপিত হইত। এইরূপে শহরটি সম্পূর্ণভাবে ভূমি ব্যবহার করিয়াছিল এবং একই সঙ্গে সতর্কভাবে নির্মিত ভূগর্ভস্থ খাল, নালা, চৌবাচ্চা ও কূপের সাহায্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থাও করা হইত। আলেকজান্দ্রিয়াতে শীতকালে যেমন প্রচুর বৃষ্টিপাত হইত, বর্তমানেও তদ্রূপ হইয়া থাকে এবং গ্রীষ্মকালে নীল নদের গতিপথ পরিবর্তন করিয়া পানি সংরক্ষণ করা হইত।

আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। মধ্যযুগীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যনির্ভর কোনও সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ২৫/৬৪৫ সনে ম্যানুয়েল-এর আক্রমণের পর যখন 'আম্র ইব্নু'ল-'আস (রা) শহরটি অধিকার করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন তখন তিনি পুনরাধিকারের পর শহরের প্রাচীরগুলি ধ্বংস করিয়া দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কিন্তু বহুল প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও এইরূপ বিবরণের সত্যতা সন্দেহযোগ্য। 'আম্র ইব্নু'ল-'আস্ (রা)-এর ন্যায় একজন সুদক্ষ সতর্ক সৈনিক সামরিক দৃষ্টিকোণ হইতে আলেকজান্দ্রিয়ার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী নগরী প্রাচীরবিহীন অবস্থায় অরক্ষিত রাখিবেন ইহা ধারণা করা যায় না। আমরা আরও জানিতে পারি যে, "আব্বাসী খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল (২৩৪/৮৪৮—২৪৭/৮৬১) আলেকজান্দ্রিয়া শহরটিকে একটি নগর-প্রাচীর দ্বারা সজ্জিত করিয়াছিলেন। যেহেতু আরবী ভাষায় 'বানা' শব্দটি মধ্যযুগে 'পুনঃসংস্কার' বা 'নির্মাণ করা'— এই উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইত, সুতরাং ইহা দ্বারা আমরা কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি না। ইব্ন তূলূন (২৫৪/৮৬৮-২৭০/৮৮৪), সালাহু'দ-দীন (৫৬৭/১১৭২-৫৮৯/১১৯৩), আজ-জাহির বায়বারস (৬৫৯/১২৬০-৬৭৪/১২৭৭), আল-আশ্রাফ শা'বান (৭৬৪/১৩৬৩-৭৭৮/১৩৭৬) সম্পর্কে এবং তাঁহাদের পর অন্যদের সম্পর্কেও অনুরূপ উক্তি করা হয়। অতএব আমরা সঙ্গত কারণেই 'আম্র ইব্নু'ল-'আস (রা) নগর প্রাচীরসমূহ ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছিলেন, এই উক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারি এবং ধারণা করিতে পারি যে, আল-মুতাওয়াক্কিল, ইব্ন তূলূন ও অন্যান্য শাসনকর্তা ক্রমাগত ঐগুলির উন্নয়ন সাধন করেন। একই সঙ্গে ইহাও স্বীকার্য ও বিশ্বাসযোগ্য যে, প্রাচীরগুলি প্রাক-ইসলামী যুগে নির্মিত হইয়াছিল। শহরটির ইতিহাসে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, নূতন প্রাচীরসমূহ— যেগুলি আল্-মুতাওয়াক্কিল কর্তৃক নির্মিত বলিয়া অনুমান করা যায়— গ্রীক-রোমান যুগের নির্মিত প্রাচীরের অর্ধেক এলাকা জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। মধ্যযুগে প্রাচীর বরাবর প্রায় এক শত দুর্গ নির্মাণ করা হয় এবং কামানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণ দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। এতদ্ব্যতীত শহরটি প্রাচীরের সম্মুখভাগ একটি 'দুর্গ-পরিখা' দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সুরক্ষিত ছিল।

আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যযুগীয় সামুদ্রিক বন্দরে, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে, এক একটি পোতাশ্রয় ছিল। ফারোস (Pharos)-এর মূল দ্বীপটি এই পোতাশ্রয়গুলির সাহায্যে বহিরাক্রমণ হইতে সুরক্ষিত হইত এবং মূল ভূখণ্ড পর্যন্ত একটি সাত স্টেডিয়াম (১ স্টেডিয়াম গ্রীক ৬০০ ফুট-ইংরেজী ৬০৬— ফুট) দীর্ঘ উচ্চ রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত ছিল। এই কারণেই ইহা হেপ্টাস্টেডিয়াম (ফার্সী ভাষায় হাফ্ত অর্থ সাত) নামে অভিহিত হইত। ইহা পোতাশ্রয় হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। দ্বীপের উত্তর-পূর্ব দিকে বিরাট বাতিঘর 'ফারস' (Pharos) অবস্থিত। ইহার নির্মাণকার্য টলেমী সোটার (Soter)-এর সময়ে শুরু হইয়াছিল। আমাদের যুগের সকল বাতিঘরের আদর্শ এই বিখ্যাত অট্টালিকাটি পৃথিবীর প্রাচীন কালের কতিপয় আশ্চর্য

বস্তুর অন্যতম ছিল এবং ইহা আরবদের অধিকারের পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। আরব লেখকগণ ইহাকে মানারা, মানার অথবা ফানার নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আমরা আল-বালাবী'র নিকট এই সম্পর্কে তাঁহার ৫৬১/১১৬৫ সনে লিখিত সঠিক বিবরণের জন্য ঋণী। যখন বিভিন্ন সময়ের ভূকম্পনের ফলে 'ফারোস' বিধ্বস্ত হয় তখন মধ্যযুগের শেষদিকে বন্দরটি কোম্ আন্-নাদুরা (কাওমু'ন-নাজুরা) নামক একটি ক্ষুদ্র পাহাড় হইতে পর্যবেক্ষণ করা হইত এবং এইখান হইতেই জাহাজের আগমন ও প্রস্থান লিপিবদ্ধ করা হইত। ৮৮২/১৪৭৭ সনে সুলতান কা'ইত বে (দ্র.)-এর আমলে ফারোসের ধ্বংসাবশেষের উপর একটি উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়; ইহা অদ্যাবধি তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

প্রসঙ্গত আল্-মাস্'ঊদীর এই মন্তব্য উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন কালের শ্রেষ্ঠ এই পূর্ব পোতাশ্রয়টি মধ্যযুগে ব্যবহৃত হয় নাই। পূর্ব পোতাশ্রয়ের তত্ত্বাবধান অধিকতর সুচারু করিবার জন্য আরও একটি বাতিঘর নির্মিত হয়। ইহার নির্মাণকার্য সুলতান কালাউন অথবা তাঁহার পুত্র আন্-নাসির মুহাম্মাদ ইব্ন কালাউনের শাসনকালে আরম্ভ এবং ৭৬৭/১৩৬৫ সনে সমাপ্ত হয়।

এই সংযোজন দ্বারা পূর্বদিকের পোতাশ্রয়কে শক্তিশালী করা হয়। পক্ষান্তরে পশ্চিম পোতাশ্রয় একটি লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা সুরক্ষিত হইত। নিরাপত্তার কারণে পূর্ব শ্রোতাশ্রয় খৃষ্টান ও 'দারু'ল্-হার্ব' অর্থাৎ অমুসলিম দেশের জাহাজ চলাচলের জন্য এবং অন্যদিকে পশ্চিম পোতাশ্রয় মুসলিম জাহাজের জন্য নির্ধারিত ছিল। পূর্ব পোতাশ্রয়ে প্রবেশের জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত নৌচালনার প্রয়োজন হইত। খারাপ আবহাওয়া ও সামুদ্রিক ঝড় হইতে বিপদমুক্ত নোঙ্গরে পৌছিতে জাহাজগুলিকে নৌপথে ফারোসের অতি নিকটবর্তী হইয়া এবং পূর্ব পোতাশ্রয়ের পশ্চিম তীর ঘেঁষিয়া চলিতে হইত, অন্যথায় বিপজ্জনক সীমায় ডুবন্ত শিলার কবলে পতিত হইয়া ডুবিয়া যাইবার আশংকা ছিল। পানির স্বল্পতার কারণে পূর্বদিকে নৌ চালনা করিয়া এই সকল শিলা এড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল। পোতাশ্রয় কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জাহাজ পরিচালক ছিল এবং নোঙ্গরে পৌছিবার জন্য লঞ্চগুলিকে বৃহদাকার ফরাসী জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে হইত। একটি কাষ্ঠনির্মিত অবতরণ মঞ্চ নোঙ্গরকে তীরের সহিত সংযুক্তি করিত; ইহার সাহায্যে জাহাজগুলিতে মাল ভর্তি ও খালাস করা হইত। কারিগরী দিক দিয়া পশ্চিম পোতাশ্রয়ে নোঙ্গর করিতে কোন অসুবিধা হইত না।

আল্-আবদারীর ভ্রমণ গ্রন্থ (৭ম/১৩শ শতাব্দী) ব্যতীত প্রাচ্যের সুপরিচিত কোন সূত্রেই আলেকজান্দ্রিয়ার নগর তোরণের বিস্তারিত বিবরণ নাই। প্রাক্-ইসলামী যুগের সুমহান কৃতিত্বে মুগ্ধ হইয়া আল্-আবদারী নিম্নরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন ঃ "দরজার কাঠামোর সমান্তরাল খুঁটি উপরস্থিত দণ্ড এবং অসাধারণ আয়তন ব্যতীত ও উহা অতীব আশ্চর্যজনক সুন্দর ও কঠিন প্রস্তর খণ্ড দ্বারা নির্মিত। দরজাগুলির প্রতিটি খুঁটি মাত্র এক একটি প্রস্তর খণ্ড দ্বারা নির্মিত। প্রতিটি লিন্টেল ও অন্যান্য কারুকার্যের নির্মাণও অনুরূপ অসাধারণ আকারের দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই সকল প্রস্তরের সংগ্রহ অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্যজনক অন্য কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। সময়ের ব্যবধান এই সকল বস্তুর সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন বা বিনষ্ট করিতে পারে নাই; অদ্যাবধি উহারা স্বকীয়তা, নূতনত্ব ও আপন সৌন্দর্যে দেদীপ্যমান। দরজার পাল্লাগুলি অত্যন্ত মজবুত, ভিতর ও বাহির অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুন্দর কারুকার্য মণ্ডিত।

নগরের চারিটি সদর দরজা ছিল ঃ (১) বাবু'ল্-বাহ্'র; ইহা 'হেপ্টাস্টেডিয়াম' ও পূর্ব পোতাশ্রয়ের দিকে পথনির্দেশ করিত। অপরদিকে (২) বাবু'র-রাশীদ (the Rosetta gate) ছিল পূর্বদিকস্থ দরজা। এইখান হইতে রোসেটা ও ফুওয়ার দিকে রাস্তা চলিয়া গিয়াছিল। দক্ষিণ দরজাকে (৩) বাবু'স সিদ্‌রা (ইহাকে মধ্যযুগের শেষের দিকে সাদ্‌রও বলা হইত)। ইহা পাশ্চাত্য সূত্রে Port du Midi বা Meridionale অথবা Gate of Spices, Bab al-Bahar অথবা Gate of St. Mark বলিয়া পরিচিত। পশ্চিম দেশীয় ও মিসরীয় বণিকদল এই দরজা দিয়া যাতায়াত করিত। (৪) চতুর্থ দরজা বাবু'ল-আখ্দার অথবা বাবু'ল-খিদ্‌র নামে অভিহিত হইত। ইহা প্রাচীরের উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল এবং শহরের তিনটি বৃহৎ সমাধিক্ষেত্রের যে কোন একটির দিকে পথ নির্দেশ করিত। ইহা দর্শনার্থীদের জন্য সপ্তাহে মাত্র একবার— শুক্রবারে খোলা থাকিত। এখানে অসংখ্য যিয়ারাতগাহ এবং পণ্ডিত, মনীষী ও ধার্মিক ব্যক্তিদের সমাধি অবস্থিত ছিল। শহরের পশ্চিমাঞ্চলে দারু'স্-সুলতান [প্রাচীন কালের বিভিন্নমুখী মিশ্র পরিকল্পনার (Complex) একটি আড়ম্বরপূর্ণ প্রতিষ্ঠান], দারু'ল্-'আদ্‌ল, দারু'ল-'ইমারা, কাস্‌রু'স্-সীলাহ ও দারু'ত্-তীরায প্রভৃতি রাজকীয় প্রাসাদ অবস্থিত। দারু'ত্-তীরাযের নিকটে ও বাবু'ল্-বাহ্'র-এর বিপরীত দিকে আলেকজান্দ্রিয়ার সুবিখ্যাত অস্ত্রাগার অবস্থিত, যাহা শেষ মধ্যযুগের যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাসে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে নাই। এই সময়ে ইহা কেবল শুল্ক ভবন হিসাবেই ব্যবহৃত হইত।

নীল নদের রোসেটা শাখার কিছু দূরে আলেকজান্দ্রিয়া শহর অবস্থিত ছিল। পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং নীল নদ উপত্যকার সঙ্গে ব্যবসাগত যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষার্থে সরকার শহরটিকে নদীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিবার ব্যাপারে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতেন। খৃষ্টপূর্ব ৩৩১ অব্দে আলেকজান্দ্রিয়া ও শিডিয়া (Schidia) [বর্তমান আন্-নাশ্‌উ'ল-বাহ্‌রী]-এর মধ্যবর্তী স্থানে একটি খাল খনন করা হইয়াছিল এবং প্রকৃতপক্ষে নীল নদের ক্যানোপ (Kanope) শাখা ব্যবহারে আলেকজান্দ্রিয়াকে যুগপৎ নদের অপর শাখার সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছিল। যেহেতু ক্যানোপ শাখাটি শুকাইয়া যাইত এবং ইহার ফলে আলেকজান্দ্রিয়ার খাল হইতে পানি সরবরাহ ব্যাহত হইত; সুতরাং বিকল্প ব্যবস্থায় বল্‌বিটাইন (bolbitine) শাখা দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন করা হইত। ইহার অর্থ এই যে, এই উন্নয়নকার্য আরবদের মিসর অধিকারের কিছু পূর্বে সমাপ্ত হইয়াছিল। নীল নদের দিকে খালের মোহনা সময় সময় পলি মাটি পড়িয়া বন্ধ হইয়া যাইত। মুসলিম শাসকদের আমলে খালটিকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করিয়া সচল রাখার দায়িত্ব সীমিত পরিমাণে প্রতিপালিত হইত এবং কোন কোন সময়ে আলেকজান্দ্রিয়াবসীদেরকে প্রাচীন কালের ন্যায় পানি সরবরাহের জন্য তাহাদের নিজস্ব চৌবাচ্চা বা জলাধারের উপর নির্ভর করিতে হইত। খালটি ৩য়/৯ম শতাব্দীতে মাত্র দুইবার পরিষ্কার করা হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার এই খাল সংক্রান্ত ফাতিমী যুগের বিবরণ অত্যন্ত অল্প। আমরা বরং এই সম্পর্কে আয়্যূবী আমলের অবস্থা অপেক্ষাকৃত অধিক অবগত। এই সময়েও সম্বৎসর ধরিয়া পানি সেচন ও মালামাল পরিবহনের জন্য খালটি ব্যবহার করিবার পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। সুলতান আজ্-জাহির বায়বার্‌স, বিশেষত সুলতান আন্-নাসির মুহাম্মাদ ইব্ন কালাউন আলেকজান্দ্রিয়া ও উহার রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা এবং পার্শ্ববর্তী

এলাকায় ভূমির উর্বরতার স্বার্থে খালটির গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। আন্-নাসি'র মুহাম্মাদের শাসনামলে ৭১০/১৩১০ হইতে ৭৭০/১৩৬৮ পর্যন্ত নীল নদের পানি সারা বৎসর ধরিয়া আলেকজান্দ্রিয়াতে প্রবাহিত হইত। সুলতান আল-আশরাফ বার্সবায়ও অংশত তাঁহার নিজস্ব একচেটিয়া বাণিজ্য নীতির দৃষ্টিতে খালটিকে সুষ্ঠু অবস্থায় সারা বৎসর নৌ-পরিচালনযোগ্য রাখিতে যত্নবান ছিলেন, যদিও ৯ম/১৫শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে খালটির সংস্কারকার্যে অপেক্ষাকৃত কম মনোযোগ দেওয়া হয়।

কায়রো হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত নৌপথে নীল নদ ভ্রমণে সচরাচর সাত দিন লাগিত। বন্যার মৌসুমে নীল নদের নৌকা আলেকজান্দ্রিয়া ও নীল উপত্যকার অন্যান্য শহরের মধ্যে চলাচল করিত, বিশেষত কায়রো ও কূস্ শহর দুইটি, যেগুলিকে প্রাচ্যের মালামালের কেন্দ্রস্থল মনে করা হইত।

আলেকজান্দ্রিয়ার মোট জনসংখ্যার হিসাব দেওয়া কঠিন। যখন আরবগণ নগরটি অধিকারভুক্ত করেন তখন ৪০,০০০ অথবা অন্য বর্ণনামতে ৭০,০০০ য়াহূদী এখানে বাস করিত। ইব্ন 'আবদি'ল-হা'কাম বিজয়োত্তর কালের গ্রীক অধিবাসীদের ৬,০০,০০০ পুরুষ (মহিলা ও শিশু ব্যতীত) বলিয়া মনে করেন যদিও তিনি বিজয়ের সময়ের নারী ও শিশু ব্যতীতই গ্রীকদের সর্বমোট জনসংখ্যা ২,০০,০০০ বলিয়া বর্ণনা করেন। এই উভয় সংখ্যাই অবিশ্বাস্য। বিশপ আর্কাল্ফ আরব শাসনের প্রায় ২৫ বৎসর পরে শহরটি পরিভ্রমণ করেন। তখন তিনি সংখ্যার কোন হিসাব না দিয়াই নগরটিতে অসংখ্য লোক গৃহে বসবাস করিত বলিয়া উল্লেখ করেন। পরবর্তী সময়ে আমরা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য সংখ্যা জানিতে পারিয়াছি (য়াহূদী পর্যটকগণ আলেকজান্দ্রিয়াতে তাহাদের স্বধর্মীদের জনসংখ্যাই অধিক বলিয়া প্রমাণিত করিতে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিল)। টিউডেলার বেন্জামিন (৫ম/ ১১শ শতাব্দী) এই সময়ের য়াহূদী অধিবাসীদের সংখ্যা ৩,০০০ বলিয়া উল্লেখ করেন। পক্ষান্তরে E. Ashtor বর্ণনা করেন যে, এই সংখ্যায় যাহাদের উপর ট্যাক্স (কর) নির্ধারিত হইত কেবল তাহারাই অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি দাবি করেন যে, য়াহূদীদের সর্বমোট জনসংখ্যা ৯,০০০ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। অপর এক পর্যটকের ৮৮৬/১৪৮১ সালে লিখিত বর্ণনামতে মনে হয়, তাহাদের সংখ্যা ষাট পরিবারে কমিয়া আসিয়াছিল। ইহার কয়েক বৎসর পর অপর এক য়াহূদী ভ্রমণকারী য়াহূদী সম্প্রদায়ের সংখ্যা প্রায় ২৫ পরিবারে নামিয়া আসিয়াছিল বলিয়া মন্তব্য করেন [দ্র. E. Ashtor, The number of Jews in mediaeval Egypt, in Journal of Jewish Studies, xix (1968), 8-12]।

১৩শ শতাব্দীতে শহরের মোট জনসংখ্যা ৬৫,০০০ বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা ৮ম/১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্রুত গতিতে কমিয়া যায়। ৭৪৮/১৩৪৭ এবং ৭৫১/১৩৫০ সালের মধ্যবর্তী বৎসরগুলিতে প্রায় প্রতি দিনই ১ হইতে ২০০শত জন লোক মৃত্যুবরণ করে এবং প্লেগের প্রচণ্ড আক্রমণের সময় মৃত্যুর হার বাড়িয়া ৭০০ জনে পৌঁছে। ইহার ফলে দক্ষ জনশক্তির অভাব ও পণ্য দ্রব্যাদির পরিবহন ব্যবস্থার অবর্তমানে দারু'ত্-তীরায ও দারু'ল-বি'কালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বাজার ও শুল্ক আদায় কেন্দ্রগুলিতেও কাজকর্ম বন্ধ থাকে। এই মহাসংকট অতিক্রম করিয়া শহরটি তাহার অস্তিত্ব কোন রকমে টিকাইয়া রাখিতে সক্ষম হয় এবং শহরের জনসংখ্যা পুনরায় বাড়িয়া যায়। Frescobaldi ইহার জনসংখ্যা ৬০,০০০ (৭৮৬/১৩৮৪) বলিয়া উল্লেখ করেন। পক্ষান্তরে একই বৎসরে Simon Sigoli ইহার জনসংখ্যা প্রায় ৫০,০০০ বলিয়া নিরূপণ করেন। সংখ্যাগুলির এইরূপ ব্যতিক্রম সত্ত্বেও এই কথা প্রমাণিত হয় যে, জনসংখ্যা পুনরায় বাড়িতেছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আলেকজান্দ্রিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রথমত শহরের বাণিজ্য উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং ইহা ছিল কেবল কায়রো শহর ব্যতীত, যেখানে সেনাবাহিনীর অধিকাংশ অবস্থানরত থাকিত এবং অন্য যে কোন শহর কিংবা মিসরীয় অঞ্চলের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইত। প্লেগের প্রাদুর্ভাবের অব্যবহিত পরে ৭৮৮/১৩৮৬ সালে আলেকজান্দ্রিয়া দ্রুত উন্নতির দিকে ফিরিয়া যায়।

মধ্যযুগে কেন্দ্রীয় সরকার শহরের কর্তৃত্বের উৎস হিসাবে বিবেচিত হইত এবং কালক্রমে সর্বময় ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হইয়া গিয়াছিল। মধ্যযুগের শুরুতে আলেকজান্দ্রিয়ার একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল, যেমন ছিল আরবদের আক্রমণের পূর্ব সময়ে। তখন হইতে গভর্নরগণ কেন্দ্রীয় প্রশাসন কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। তথাপি এই পরিস্থিতিতে শহরটি হয় একটি রাজধানী হিসাবে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা ভোগ করিত, না হয় পশ্চিম মিসরীয় উপকূলবর্তী এলাকার অন্তর্ভুক্ত হইত (কোন কোন সময়ে লিবিয়াও যাহার আওতাধীন হইত)। মিসরের গভর্নর শীঘ্রই অন্তত কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করিবার উদ্দেশে আলেকজান্দ্রিয়ায় আসিতেন। একটি রাজধানী বা প্রাদেশিক কেন্দ্র হিসাবে আলেকজান্দ্রিয়ার একটি রাজকোষ ছিল যাহা সচরাচর একজন মুসলিম কর্তৃক পরিচালিত হইত। এই সময়ে প্রাচীন মিসরবাসী খৃষ্টানদের হাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শাসনভার অর্পণ করিবার ঘটনা খুব বিরল নহে। আরব শাসনের প্রথম শতাব্দীতে লিখিত প্রমাণাদি হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, মিসরের আদিম খৃষ্টানগণও আলেকজান্দ্রিয়ার গভর্নর মনোনীত হইতেন। উদাহরণস্বরূপ খলীফা য়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া কর্তৃক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের থিওডোসিয়াসকে এই পদে নিয়োগ করিবার ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আহ্মাদ ইব্ন তূলূন (২৫৬/৮৭০) গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে আলেকজান্দ্রিয়া 'স্বাধীন' ছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার এই বিশেষ মর্যাদা তখন হইতে ৩য়/১০ম শতাব্দী পর্যন্ত বহাল থাকে এবং Grohmann সঙ্গতভাবেই ইহার মধ্যে কিছুটা রোমান আইনের প্রতিফলন লক্ষ্য করেন যদ্দারা রাজধানী হিসাবে আলেকজান্দ্রিয়া মিসরের গ্রামাঞ্চল হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। ইহার আলোকেই আমরা মিসরে ৩৩৭/৯৫৮ সালের 'আব্বাসী বাজেটে মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার পৃথকীকরণ নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারি (ঐতিহাসিক কুদামার বর্ণনানুসারে)।

ফাতিমী শাসনামলে আলেকজান্দ্রিয়ার গভর্নর তদানীন্তন অগাস্টালিসের ভূমিকা অনুসরণে এতটা অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তিনি বুহায়রা প্রদেশের উপর তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হন। এই প্রসঙ্গে Grohmann-এর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শহরের ঐতিহাসিক উন্নয়নের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে ধর্মযুদ্ধ শহরটির গুরুত্ব কমাইয়া দিয়াছিল এবং তথায় গভর্নরের নিয়োগকে রাজকীয় অবজ্ঞা মনে করা উচিত— তাহার এই মন্তব্য বাস্তব ঘটনার যথার্থতার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। প্রকৃতপক্ষে ফাতিমীদের পতনের পর শহরটি ইহার স্বাধীনতার মর্যাদা হারাইতে থাকে। কিন্তু বাণিজ্যিক ও সামরিক দৃষ্টিকোণের বিচারে ইহা পূর্ব গৌরব পুনরায় অর্জন করে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মালামাল আমদানী

ও রফ্তানী বাণিজ্যের মাধ্যমে শহরটি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একটি বাজারে পরিণত হয়।

এই সকল বিষয়ের কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই ঘটনায় পাওয়া যায় যে, প্রায় ৩য়/১০ম শতাব্দী পর্যন্ত সরকারী নির্দেশাদি গ্রহণ অথবা খৃস্টান শাসনকর্তা নির্বাচনের ব্যাপারে আলেকজান্দ্রিয়াতে প্রায়শ 'জনসভা' অনুষ্ঠিত হইত। ৪র্থ/১১শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে খৃস্টান ধর্মযাজক শাসনকর্তাকে তাহার কর্মস্থল আলেকজান্দ্রিয়া হইতে কায়রো নগরীতে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল। সুতরাং মধ্যযুগের শেষ দিকে শহরটিকে একটি ইক্‌তা' (স্বতন্ত্র এলাকা) (দ্র.)-এর মর্যাদা প্রদানের বিষয়টি অস্বাভাবিক ছিল না।

একজন সামরিক কর্মচারী গভর্নর হইতেন। পক্ষান্তরে কাদী একাধারে সরকারী কর্মচারী এবং ধর্মীয় বিচারক ছিলেন। ইতিহাস সূত্রে কোন কোন সময় তাহাকে নগরপ্রধান বা রা'ঈসু'ল্-মাদীনা (Town chief) বলিয়া উল্লেখ করা হইত এবং সংকটকালে তাহাকে শহরের শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইত, যদিও ইহাতে শহরের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইত না। মাম্‌লূক শাসনামলে আলেকজান্দ্রিয়ার গভর্নর একজন আমীর তাব্‌ল্ খানার মর্যাদা পাইতেন। ৭৬৬/১৩৬৫ সালে Peter of Lusignan-এর আক্রমণের পর মাম্‌লূক সরকার শহরটির প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেন এবং তথায় একটি "আমীর মি'আ" প্রবর্তন করেন অর্থাৎ ত্রিপলী, সাফাদ ও সিরিয়ার হামাত-এর গভর্নরগণের যে মর্যাদা, আলেকজান্দ্রিয়ার গভর্নরও সেই মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

আলেকজান্দ্রিয়া শহরে মালিকী মায্‌হাবের প্রাধান্য ছিল। ইহার কারণ ছিল উত্তর আফ্রিকার সহিত ভৌগোলিক নৈকট্য এবং স্পেন ও পাশ্চাত্যের মুসলিমগণের কর্মতৎপরতা। ইহারা মধ্যযুগের শেষদিকে স্পেনের পুনর্বিজয় ও উত্তর আফ্রিকার অভ্যুত্থানের পূর্বে বিতাড়িত হইয়া আলেকজান্দ্রিয়ায় বাস করিতেছিলেন। মধ্যযুগের শেষভাগে কাদি'ল্-কুদাত পদে প্রায় সকল সময়েই একজন মালিকী মতাবলম্বী ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিতেন। এইরূপ কয়েকটি মাত্র উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে ক্ষেত্রে সরকারের নির্বাচন একজন শাফি'ঈর ভাগ্যে জুটিত। তথাপি মালিকী, শাফি'ঈ ও হানাফী— এই তিন মাযহাবের লোকই বিচার বিভাগীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্ব করিতেন। অধিকন্তু যাহাতে বিদেশী ও দেশীয় বণিকগণের দৈহিক নিরাপত্তা ও পণ্যদ্রব্য সংক্রান্ত আইনগত অধিকার সংরক্ষিত হয়, তৎপ্রতি বহু সুলতান লক্ষ্য রাখিতেন। উদাহরণস্বরূপ সুলতান আন্-নাসির ইব্‌ন কালাউন সম্পর্কে কথিত আছে যে, আলেকজান্দ্রিয়ার বিচারক ইব্‌ন মিস্‌কীন ৭৩৫/১৩৩৪ সালে তাঁহার নিজের কর্মচারীর বিরুদ্ধে একজন ফ্রাংক্‌কে সমর্থন করিয়াছিলেন। কোন কোন সময় কাদীদের নিয়োগপত্রে এই সকল দায়িত্বের জন্য ব্যবসায়ী ও নাগরিকদের ব্যাপারে সঠিক ও সঙ্গত ব্যবহারের নিয়মিত শর্তাদির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হইত। মুহ্‌তাসিব গভর্নরের পাশাপাশি শ্রেণীগতভাবে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন এবং কাদী বাজার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালনে এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন উৎপাদনকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সহিত কর্তব্যে নিয়োজিত থাকিতেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ক্ষমতা ক্ষুদ্রতর লেনদেনের মধ্যে সীমিত থাকিত।

আলেকজান্দ্রিয়া শহর ছিল সরকারের, বিশেষত ক্ষমতাসীন দলের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কারিমী সম্প্রদায় ও বিদেশী বণিকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত উচ্চ কর ছাড়াও দেশের শাসনকর্তারা প্রায় প্রতিটি লেনদেন ও শহরের প্রতিটি দোকান হইতে অর্থ উপার্জন করিতেন। দেশের সরকার 'দারু'দ-দারব' নামক টাকশাল হইতেও মুনাফা অর্জন করিত। এখানে দেশী ও বিদেশী নির্বিশেষে সকলেই তাহাদের ধাতু মুদ্রায় রূপান্তরিত করিয়া লইত। বিশেষ শ্রেণীর ব্যবসায়িগণ, যেমন কাটাদার, নাবিক, দালাল, অনুবাদক (দোভাষী), নীলামকারী ও গাধা চালকগণ এই শহরে প্রচুর মুনাফা অর্জন করিত এবং তজ্জন্য সরকারকে উচ্চ হারে কর প্রদান করিত। উষ্ট্র চালক, বিশেষত বণিক-দলপতিগণকে তাহাদের প্রতি আরোপিত নির্দিষ্ট ট্যাক্স, যাহা 'মাক্‌স মানাখ' নামে অভিহিত হইত, ইহা শহরের বাহিরে গৃহীত হইত, যেইখানে তাহাদের উটের বহর অবস্থান করিত। যেহেতু এই কর সম্পর্কে আমাদের কোন সঠিক বিবরণ জানা নাই, সেহেতু আমাদের একটি মাত্র উদাহরণ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। কাদী আল-ফাদিল-এর বর্ণনানুসারে শুল্ক খাতে শহরের বার্ষিক রাজস্ব ২৮,৬১৩ দীনারে দাঁড়াইয়াছিল এবং ইহা ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীর অন্যান্য বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে কোন অতিরঞ্জিত দাবি নহে। সুলতানের দীওয়ান (কর ও শুল্ক আদায়কারী) ৭২১/১৩২১ সালে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে আগত জাহাজসমূহের উপর নগর শুল্ক, কর ইত্যাদি বাবদ ৫০,০০০ দীনার ধার্য করিয়াছিল এবং লেখকের মূল বর্ণনানুসারে ইহাতে বন্দরে আগত সকল জাহাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল না। পাড়ুয়ার ফিডেনযিও (Fidenzio)-এর পর্যবেক্ষণ (৮ম/১৪শ শতাব্দী হইতে) আলেকজান্দ্রিয়ার জনৈক গভর্নর পরিবেশিত ৯ম/১৫শ শতাব্দীর এই তথ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়া হইতে সুলতানকে দৈনিক ১,০০০ ফ্রিস্টি অথবা দীনার দিতে হইত। অবশ্য ইহা ব্যবসা মৌসুমের ঘটনা; আল্-মাক্‌রীযী ৭০৩/১৩০৩ সালে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে আগত একটি ফরাসী জাহাজের উল্লেখ করেন, যাহার পণ্যসামগ্রীর উপর ৪০,০০০ দীনার কর দিতে হইয়াছিল। সমগ্র ফরাসী বাণিজ্যিক নৌবহরের কথা চিন্তা করিলে একটি মাত্র বাণিজ্যিক জাহাজের উপর ধার্যকৃত শুল্কের এই বিরাট অংক নিঃসন্দেহে অবিশ্বাস্য। মনে হয়, বিদেশীদের সঙ্গে বাণিজ্য ক্ষেত্রে আলেকজান্দ্রিয়াতে মোট করলব্ধ বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ১,০০,০০০ দীনার অনুমান করা অতিরিক্ত নহে।

আলেকজান্দ্রিয়া শহর সকল সময়েই বস্ত্রশিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহার উৎপন্ন দ্রব্য ভারতের মত দূর দেশেও পৌঁছিত। এইরূপ বিশ্বাস করা হয় যে, ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে ইতালীয় গির্জায় রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের দ্বারা উপহার স্বরূপ প্রেরিত অধিকাংশ কারুকার্যখচিত বস্ত্র আলেকজান্দ্রিয়ার কারিগরগণের দ্বারা প্রস্তুত হইত। তাঁত, সূতি, রেশমী, পশমী ও সুতী কাপড়ের জন্য বুয়ূতু'ল্-গায্‌ল ব্যতীত কাঁচা রেশমেরও কারখানা ছিল যাহা বুয়ূতু'ল্-কাস্‌যাযীন নামে অভিহিত হইত। শহরে রেশমী ও পশমী কাপড়ে বুটি তোলাজরির কাজ ও বিবিধ সূক্ষ্ম সূঁচীকর্মের নির্মিত সর্বসাধারণের জন্য একটি বিরাট সাধারণ কারখানা স্থাপন করা হইয়াছিল, যাহা দারুত-তিরায নামে অভিহিত হইত। ইহা প্রধানত সভাসদবৃন্দের বিলাস আচ্ছাদনের প্রয়োজন মিটাইত। সরকারী উপহার পর্যায়ের যেমন মোঙ্গলদেরকে অথবা কা'বা ঘরের জন্য মূল্যবান উপাদানে বার্ষিক আচ্ছাদন (গিলাফ) প্রস্তুত করার বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। ৭৬৭/১৩৬৫ সালে ক্রুসেড যুদ্ধে দারু'ত্-তিরায্ পোড়াইয়া ভস্মীভূত করা হয়, যদিও সরকার ইহা পুনরায় স্থাপন করেন। বেসরকারী লোকেরাও তাহাদের শিল্পকর্মের উৎপাদন দ্বারা

শহরের বাণিজ্যিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিত। আমরা এই বিষয়ের প্রমাণ হিসাবে নিম্নবর্ণিত উদাহরণ পেশ করিতে পারি ঃ ৮ম/১৪শ শতাব্দীর ফাকীহ্ বাদ্রু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার ইব্ন আবী বাক্র আদ্-দামামীনী নামে জনৈক তাঁত মালিক রেশমী সুতা উৎপাদনের জন্য মূলধন নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে আগুন লাগিবার ফলে দেউলিয়া হইয়া তিনি ঋণদাতাদের ভয়ে মিসরের উজান এলাকায় (Upper Egypt) পলাইয়া যান এবং তথায় ঋণদাতারা তাঁহাকে গ্রেফতার করেন এবং কায়রোতে ফিরাইয়া আনেন। ব্যাপারটি সম্পর্কে কোন মীমাংসায় উপনীত হইবার উদ্দেশে তাহারা একত্রে মিলিত হন। পরবর্তী ব্যবসাক্ষেত্রে উন্নতির উদ্দেশে সুযোগ-সুবিধা অন্বেষণে আদ-দামামীনী ভারতে চলিয়া যান। ৮২৭/১৪২৩ সালে সেখানেই তিনি ইনতিকাল করেন।

আলেকজান্দ্রিয়ার তন্তুবায়দের অসাধারণ দক্ষতা ও সাফল্য সর্বজনস্বীকৃত। যখন য়ামান সরকার রেশম উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তখন তাহারা তাঁহাদের দেশে আলেকজান্দ্রিয়ার তাঁতীদেরকে প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মিসরীয় কর্তৃপক্ষ এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হন এবং ৭৮৮/১৩৮৬ সালে তন্তুবায়দের একটি দল য়ামানে প্রেরণ করেন। এক বর্ণনানুসারে ৯ম/১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আলেকজান্দ্রিয়াতে মোট ১৪,০০০ তাঁত ছিল। ৮৩৭/১৪৩৪ সালে শহরের সাধারণ অবনতির সময় এই সংখ্যা কমিয়া ৮০০-তে নামিয়া আসে। ঐ সময় সস্তা রেশমী বস্ত্রের, বিশেষত ফ্লাণ্ডার্স ও ইংল্যান্ড হইতে কাপড়ের আমদানী বাড়িয়া যায় এবং ইহার ফলে ভেনিসীয়গণ প্রভূত অর্থ উপার্জন করে।

আলেকজান্দ্রিয়াতে কাচ উৎপাদিত হইত; ইহা মধ্যযুগীয় আরব লেখকদের সূত্রে এখনও প্রমাণিত হয় নাই। তথাপি ১৭৮৯ খৃ. জেনারেল নেপোলিয়ান বোনাপার্টির মিসর অভিযানের সহযাত্রী ফরাসী পণ্ডিতদের রচিত বিখ্যাত মানচিত্রের এক পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে, আলেকজান্দ্রিয়ার কারখানায় কাচ প্রস্তুত হইত। আলেকজান্দ্রিয়ার কোম্ আল-দিক্কা-র খননকার্যে প্রমাণিত হয় যে, স্থানীয় উৎপাদন ব্যতীতও উত্তর আফ্রিকা, ইরান ও অন্যান্য দেশ হইতে মৃৎপাত্র আমদানী করা হইত। চীন দেশীয় চীনা মাটির নানা ধরনের বাসন আলেকজান্দ্রিয়ায় আনা হইত। Damietta-এর ভিন্ন মতানুসারে আলেকজান্দ্রিয়াতে মিসরীয় চিনি উৎপাদনের কোন প্রমাণ নাই, যদিও পরবর্তী মধ্যযুগে আলেকজান্দ্রিয়ার পথে পাশ্চাত্য দেশসমূহে চিনি রফ্তানী করা হইত। আলেকজান্দ্রিয়ায় যে পরিমাণ মদ ব্যবহৃত হইত উহার সবটাই যে বহির্দেশ হইতে আমদানী করা হইত এমন নহে; মিসরের নিজস্ব উৎপাদন (যেমন কায়রোতে) এত পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল যে, ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে ইহা আলেকজান্দ্রিয়ার সরকারী বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ফিট্কিরি ব্যবসা ক্ষেত্রে আলেকজান্দ্রিয়ায় ইহার একমাত্র বহির্গমন পথ 'আল-মাত্জারু'স-সুল্তানী' বৎসরে প্রায় পাঁচ হাজার কান্তার ফিটকিরি রফতানী করে। একচেটিয়া ফিট্কিরি বাণিজ্যের পরিদর্শক ইব্ন মাম্মাতী তাঁহার ক্ষমতাবলে ৫৮৮/১১৯২ সালে আলেকজান্দ্রিয়ায় আগত খৃষ্টান ক্রেতাদের নিকট ১৩,০০০ কান্তার ফিট্কিরি বিক্রয় করেন বলিয়া জানা যায়; মিসরীয় ফিটকিরি বিক্রয় ক্ষেত্রে ইহা একটি রেকর্ড বা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বস্ত্রোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষার (সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড) বিক্রয় ক্ষেত্রেও সরকারের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহা আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোর তাঁতীদের নিকট ধার্যকৃত উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইত।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে আলেকজান্দ্রিয়া একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বিভিন্ন খৃষ্টান দেশের বাসিন্দাগণকে আলেকজান্দ্রিয়ায় একত্র মিলিত হইতে দেখা যাইত। টিউডেলার বেন্জামীন ২৮টি খৃষ্টান নগরী অথবা দেশের নাম উল্লেখ করেন যাহারা তথায় বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ করিত। উইলিয়াম অব টায়ার (Willium of Tyre) বলেন যে, ১২শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আলেকজান্দ্রিয়া শহর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রখ্যাত পর্যটক ইব্ন বাত্তূতা লিখেন যে, আলেকজান্দ্রিয়া পৃথিবীর অন্যতম সামুদ্রিক বন্দর ছিল ঃ "কেবল ভারতের কাউলাম ও কালীকট, তুর্কী ভূ-খণ্ডে অবস্থিত সুদাক বন্দর ও চীনের 'যায়তূন' পোতাশ্রয় ব্যতীত সমগ্র পৃথিবীতে ইহার সমকক্ষ বন্দর আমি দেখি নাই।" ক্রুসেডার রাজ্যসমূহের প্রতিষ্ঠা কিংবা মোঙ্গল রাজ্যের উপস্থিতিও পৃথিবীর বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই অথবা ইহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে সক্ষম হয় নাই।

শহরের তিনটি সদর দরজার (সিংহদ্বারের) উপর সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইত। ইব্ন জুবায়রের ন্যায় প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব, পোতাশ্রয় কর্তৃপক্ষ তাঁহার নাম নিয়মিত তালিকাভুক্ত করিবার এবং শুল্ক কর্মচারিগণ তাঁহার মালপত্র তল্লাসী করিবার পরই কেবল শহরে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিতেন। অনুরূপভাবে বিদেশী খৃষ্টানগণকে তাহাদের দেশের প্রতিনিধি দ্বারা সনাক্ত করিতে হইত। তাহাদের সঙ্গে আনীত জিনিসপত্রও কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরীক্ষা করা হইত। এইরূপে শুল্ক বিভাগীয় প্রচলিত নিয়ম পদ্ধতি সমাপ্ত হইয়া গেলে যদি তাহাদের জন্য কোন 'ফুন্দুক' (আবাসস্থল) নির্ধারিত থাকিত তাহা হইলে পূর্বদেশীয় বণিক তাহার দেশের সেই ফুন্দুকে তাহাদেরকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিত; অন্যথায় সে কোন প্রাইভেট 'ফুন্দুকে' বা 'খানে' থাকিবার ব্যবস্থা করিতে পারিত। পশ্চিম দেশীয় বণিক তাহার দেশের জন্য নির্ধারিত 'ফুন্দুকে' সীমাবদ্ধ থাকিত এবং তথায় তাহার পণ্যদ্রব্য রাখিতে পারিত। বিদেশী রাজ্যের জন্য এই সকল 'ফুন্দুক' স্থাপনের পর আলেকজান্দ্রিয়ার বাণিজ্য ব্যবস্থা সাধারণভাবে কেবল উপকূলবর্তী অঞ্চলের ব্যবসাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রইল না। বিদেশীয় বণিকগণ বহির্দেশীয়দের জন্য প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত (দ্র. 'ইম্তিয়াযাত')।

ইহার ফলে এই সকল 'ফুন্দুক' বন্ধুভাবাপন্ন দেশের কর্মচারী অথবা প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হইত এবং ইহা মিসরীয় তত্ত্বাবধানে থাকিত। একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক শক্তিসম্পন্ন দেশ হওয়ার ফলে ১৩শ শতাব্দীর সময়-কালের মধ্যে ভেনিস (Venice) দ্বিতীয় একটি 'ফুন্দুক' লাভ করিয়াছিল। অতিরিক্ত সুবিধা হিসাবে বণিকগণ তাহাদের 'ফুন্দুকে' নিকটবর্তী দোকান ও মালপত্র রক্ষণের কামরা ভাড়া দিতে পারিত। পাশ্চাত্য দেশে, বায়যানটীয় রাজ্য ও ইথিওপিয়ার খৃষ্টান ব্যতীত স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া ও ভারতের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেরও মুসলমানগণ আলেকজান্দ্রিয়া শহরে আগমন করিতেন।

আন্-নুওয়ায়রী ৭ম/১৪শ শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় বাস করিতেন; তিনি একটি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। উহা আমাদের নিকট আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত নগর সম্পর্কিত সকল বিবরণের মধ্যে দীর্ঘতম। কিন্তু তাঁহার এই সার্বজনীন শহরটির সুদীর্ঘ আলোচনায় শহরের বাণিজ্যিক দিক এতটা

গুরুত্ব পায় নাই, যতটা আল্-মাক্রীযীর প্রতিবেদনে কায়রো শহরের বসবাসগত দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে সকল সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে তাহাতে শহরের বাজারসমূহের একটি বিস্তারিত চিত্র স্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রথমত উল্লেখ্য যে, শুল্ক ভবন ইহার ৫০টি স্টোররুমসহ পোতাশ্রয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে কেবল কর নির্ধারণের কার্যই করিত না, অধিকন্তু ইহা সাধারণ নিলামের কাজেও ব্যবহৃত হইত। দারু'ল্-বিকালাও ইহার বিশেষ ক্ষমতাবলে বিভিন্ন কার্য সম্পন্ন করিত। এই দারের বিজ্ঞপ্তিসমূহ অতীতের ৪র্থ/১১শ শতাব্দী পর্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়। দাবিকালাতি বায়তি'ল্-মাল দ্বারা এমন একটি সরকারী প্রশাসন বুঝায়, যাহা রাষ্ট্রপতির পক্ষ হইতে কর ধার্য ও আদায়ের নিশ্চয়তা বিধান করিত, সরকারী বাণিজ্যনীতিতে সমর্থন দিত, নীতিগতভাবে কেবল মধ্যবর্তী বিক্রয় ব্যবস্থায় চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করিত এবং ঝুঁকি বহনকারী মুসলিম ব্যবসায়ীদের জন্য পণ্যদ্রব্য আমদানী করিত। অন্যান্য প্রতিটি প্রধান মুসলিম শহরের ন্যায় আলেকজান্দ্রিয়াতেও প্রতিটি প্রয়োজনীয় ব্যবসায়ের জন্য পৃথক পৃথক বাজার নির্ধারিত থাকিত। শহরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বাজারের মধ্যে ছিল সূক্'ল্-'আত্তারীন ও আল্-বাহার, এই দুইটি মরিচ ও গরম মসলার বাজার, ইহা সম্ভবত আলেকজান্দ্রিয়ার কারিমী ব্যবসায়ীদের কেন্দ্র। সূক্'ল্-মার্জানিয়্যা ছিল প্রবাল কারখানা ও প্রবাল ব্যবসায়ীদের বাজার। ইহা সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রবাল বাজার ছিল। আলেকজান্দ্রিয়াতে প্রবালের উপর কারুকার্য করা হইত। ইহার নিজস্ব বন্দরে এক পাউন্ড প্রবালের মূল্য ৫ রৌপ্য দির্হাম ছিল। যথানিয়মে ইহার উপর শিল্পকর্ম বা 'আদান (এডেন) ও কালীকট ইহার প্রধান নির্গমন পথ ছিল। আলেকজান্দ্রিয়া হইতে আমদানীকৃত প্রবাল হিজায, য়ামান, ভারতবর্ষ, বিশেষত দূরপ্রাচ্যে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইত।

মিহি বস্ত্রের ব্যবসায়ের জন্য ইহার নিজস্ব বিশেষ 'সূকবিকালাতি'ল্-কাত্তান' নামে অভিহিত হইত। এখানে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িগণ বিপুল লেনদেন করিত। দাস ব্যবসায়ের কেন্দ্র হিসাবে আলেকজান্দ্রিয়ার দাস বাজার কায়রো শহরের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বাটাদার, ফল ব্যবসায়ী, ঔষধ বিক্রেতা, সুগন্ধি ও প্রসাধনীর দোকানদার, মিষ্ট বাদাম বা সুপারী বিক্রেতা, কন্ফেক্শনারী ও শুষ্ক ফল প্রভৃতির ব্যবসায়িগণ সর্বদাই জমজমাট বাজার পাইত। এতদ্ব্যতীত কায়রো শহরের ন্যায় আলেকজান্দ্রিয়াতেও তথাকথিত বেসরকারী 'ফুন্দুক' ব্যবস্থাপনায় 'ফুন্দুক' জাওকান্দার ও 'ফুন্দুক' দামামীনীর মত কৌতূহলোদ্দীপক প্রাচীন জিনিসের অস্থায়ী বাজার (bric a brac bazar) সূক্ কাশশাশীন নামে অভিহিত ছিল। শহরের অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের প্রয়োজন দেশে উৎপাদিত শস্য ছাড়াও বিদেশ হইতে আমদানী দ্বারা পূরণ করা হইত। বর্তমানে কাগজপত্রে ইহা প্রমাণিত হয়। মোমবাতি ও মোম ব্যবসায়ীদের বাজারসমূহ কাষ্ঠ ব্যবসায়ীদের বাজারের ন্যায়ই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ বিশেষ দোকান ও বাজার, ব্যবসায়ীদের বর্ণ ও জাতীয়তা অনুসারে আখ্যায়িত করা হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ সূক্'ল্-আ'আজিম-এর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা বিশেষভাবে ইরানী বণিকদের জন্য নির্ধারিত ছিল; ইহারা আলেকজান্দ্রিয়াতে মিহি সুতা ও মূল্যবান পণ্যসামগ্রী আমদানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সুপরিচিত ছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার'এই সকল গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ বিশেষ বাজার ও 'ফুন্দুকে'র পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত স্বল্প মানের বিপুল সংখ্যক সাধারণ দোকান অবস্থিত ছিল যেখানে ভ্রাম্যমাণ দোকানদার বা ফেরিওয়ালাগণ তাহাদের টেবিল, স্টল, পাকের বাসনপত্র ও সম্প্যান সঙ্গে লইয়া পথচারীদের নিকট তাহাদের জিনিসপত্র বিক্রয় করিত। কোন কোন ব্যবসায়ীর শহরে, ফেরোস উপদ্বীপের উপর ও আলেকজান্দ্রিয়ার খালের ধারে যেখানে জাহাজ ভিড়িত সেখানে বহুদিনের পুরাতন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা ছিল।

আমাদের এই বাস্তব বিষয়টি তুচ্ছ মনে করা উচিত নয় যে, শহরের বড় বড় ব্যবসায়ের উপর সরকারের পরিপূর্ণ ও একচ্ছত্র অধিকার ছিল না কিংবা উহা কেবল পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বাণিজ্য ক্ষেত্রে মহিলারাও অংশগ্রহণ করিত। আমরা আলেকজান্দ্রিয়ার বণিকদের মধ্যে এইরূপ একজন মহিলা ব্যবসায়ীর কথা জানি, যিনি এই কারণেই 'সি'ত-তুজ্জার'-('সিত্তুত্তুআল্-তুজ্জার'-Lady of the merchants-বণিকদের মহিলা') ডাকনামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া ৭৪৯/১৩৪৮ সনে ইনতিকাল করেন।

ইসলামের ইতিহাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ব্যবসাক্ষেত্রে অংশগ্রহণ— এই দুই কার্য কোন অবস্থাতেই পারস্পরিকভাবে বর্জনীয় ছিল না। প্রধান প্রধান সদস্য ও মিসর সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মচারিগণ বড় বড় ব্যবসায়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকিতেন। আল-মাত্জারু'স্-সুল্তানী (সরকারী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান) নামক সংস্থা, যাহা ফাতিমী খলীফা আল্-মুসতানসিরের শাসনকালে দুর্ভিক্ষের সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়, উহা নিশ্চিতভাবেই তখন বর্তমান ছিল এবং উহা আয়্যূবী ও মামলূক শাসনকালে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিত। দাস ও কাষ্ঠ ব্যতীতও এই 'মাত্জার সংস্থা' লোহা, পাতলা ধাতু, টিন, রৌপ্য ও তাম্র (পরবর্তী সময়ে স্বর্ণও) আমদানী করিত এবং তৎপরিবর্তে একচেটিয়া বেশ কিছু পণ্যদ্রব্য প্রদান করিত; ফিটকিরি, ক্ষার, খাদ্যশস্য, মোম ও পরবর্তী সময়ে গরম মসলা, চিনি ও সাবান। মিসরের মমিরও আলেকজান্দ্রিয়ার বাজারে সকল সময়েই উপস্থিত চাহিদা থাকিত। এতদসত্ত্বেও ব্যবসায়ের প্রধানতম লাইন ছিল মরিচ। ফ্রেডারিক সি. লেইন প্রমাণ করিয়াছেন যে, উত্তমাশা অন্তরীপ পরিভ্রমণের পূর্বে ভেনিসীয় জাহাজসমূহ প্রতি বৎসর গড়ে ১৫,০০০,০০০ পাউন্ড মরিচ ভর্তি করিত।

বণিকগণ সর্বদাই সুন্দর জীবিকা অর্জন করিত। একজন প্রখ্যাত ফাকীহ ও তাপস অপেক্ষা কম মর্যাদাসম্পন্ন নহেন এরূপ আত্-তুরতূশী নামক এক ব্যক্তি সুদখোর ঋণদাতাদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইবার জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় আগমন করেন। ইহা একটা আকস্মিক ব্যাপার নয় যে, আলেকজান্দ্রিয়ায় মুদ্রা বিনিময়কারিগণ এইরূপ সচ্ছল অবস্থাপন্ন ছিলেন যে, সুলতান আন্-নাসির মুহাম্মাদ ইব্ন কালাউনকে ৭৩৭/১৩৩৭ সালে ১০,০০০ হাজার দীনার ধার দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ঃ এই সকল দালালদের ব্যবসায়ে লাভজনক অবস্থা প্রমাণের জন্য ইহা যথেষ্ট। ইহাদের কারবারের পরিধি কেবল মুদ্রা বিনিময়ের মধ্যেই সীমিত ছিল না। চলমান ব্যবসা-বাণিজ্য ও উন্নত শিল্পকর্ম, শহরে রাশি রাশি ধন-সম্পদ আহরণে সহায়ক হইয়াছিল। The Guilds নামে অভিহিত দল অথবা সঠিকভাবে বলিতে "ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সমাজের দলসমূহ" স্বতন্ত্র সংস্থা হিসাবে নির্দিষ্ট কতিপয় অধিকার লইয়া কাজ করিত না, যদ্দারা শহরের গভর্নর কিংবা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্বীয় অধিকার সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ পাইত। মূলত কেন্দ্রীয় সরকারই চূড়ান্ত ক্ষমতা হাতে

রাখিত এবং ইসলামের বিচার বিভাগীয় নীতি অনুসারে আইন-কানুন প্রয়োগ করিয়া তাহাদের সমস্যাবলীর সমাধান করিত। যদিও সরকারের স্বরূপ ও ধর্মীয় মতাদর্শ— এই উভয় বস্তুই আলেকজান্দ্রিয়ার আবর্তনশীল উন্নয়নের সহিত সংযুক্ত ও গ্রথিত ছিল, তথাপি একমাত্র বাণিজ্যই ইহার বহুকালের ঐতিহ্য, পদ্ধতি ও নিয়ম-বিধি (Code of honour) অনুসরণে শহরের নাগরিক জীবনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করিত। শহরে স্থানীয় ও বিদেশীদের মধ্যে যে ভাবমূর্তি প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকিত তাহার একটি চিত্র, লিখিত ইতিহাস ও সন্ধিপত্র হইতে নয়, বরং রম্যরচনামূলক সাহিত্যের সূত্র হইতে ধারণা করা সম্ভব। যেমন আরব্য রজনী (আল্ফ-লায়লা) ও 'Boccaccio's Decameron' ও এই সকল উৎস হইতে সরকারের পদ্ধতি, শুল্ক-বিধি ও ব্যবসায়ের ঝুঁকি সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

আলেকজান্দ্রিয়া শহরে সরকার ছিল মুখ্য শাসনকর্তা এবং সেখানে সমগ্র জনসমষ্টি অপেক্ষা বরং সরকারের স্বার্থেই আইন প্রয়োগ করা হইত। ৭২৭/১৩২৬ সনে সংঘটিত বিদ্রোহ ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ ব্যতীত ইহার স্পষ্টতর প্রমাণ আর নাই। বিরাট করভারের ফলে যে বিদ্রোহ হইয়াছিল তাহা অত্যন্ত কঠোরভাবে দমন করা হয়। কারিমী বণিকদের (যাহাদের মধ্যে আল্-কুওয়াইক বা আল্-কাওবাক, যিনি একজন সম্ভ্রান্ত কারিমী বণিক, তাঁহার পুত্রগণও ছিলেন) ও মিহি সুতা ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীদের উপর সরকার যে পরিমাণ জরিমানা ধার্য করে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জরিমানা ও সম্পদ বাজেয়াফতকরণসহ যাহা কার্যকর করা হইয়াছিল এবং যাহার মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল প্রায় ২,৬০,০০০ দীনার। ইহা ব্যতীতও বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দকে শূলবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল।

শহরে শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার ক্রমাবনতি ও সেনাবাহিনীর দুর্বলতা ব্যবসাক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং বাণিজ্যের অবলুপ্তি সূচিত করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। কেননা উপদ্রবের সময় সেনাবাহিনীর অন্যান্য স্বার্থান্বেষী লোকেরা টাকার লোভে ব্যবসায়ীদের উপর তাহাদের বিশেষ ক্ষমতা 'হিমা' প্রয়োগ করিত।

আলেকজান্দ্রিয়া প্রধান দূরদেশীয় বাণিজ্য পরিচালনায় গুরুত্ব প্রদান করিত। যাহারা এই ব্যবসা পরিচালনা করিত, যেমন সরকারী কর্মচারী, দূরপাল্লার ব্যবসায়ী বা বড় ব্যবসায়ীগণ, তাহারা বাজারের মুহতাসিবের তত্ত্বাবধানে অবস্থিত খুচরা ব্যবসায়ীর দোকান হইতে বহু দূরে অবস্থান করিত।

আলেকজান্দ্রিয়া ইহার ধর্মীয় ও মনীষীর ইতিহাসে "পূর্ব ও পরবর্তী মধ্যযুগ"— এই সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র দুইটি যুগের সূচনা করিয়াছিল। পূর্ব মধ্যযুগের খৃস্টান ও য়াহূদীগণই ছিল প্রধান। আরবদের অধিকারের পর গ্রীক ধর্মযাজকগণকে নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। প্রাচীন মিসরবাসী ধর্মযাজক শহরে প্রবেশ করিলে খৃস্টানগণ বায়যানটীয় রাজ্যের সহিত আরবদের পরবর্তী যুদ্ধে সমর্থন যোগায় এবং তাহাদের রাজ্য সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় সহযোগিতা করে। এই সময়টি আলেকজান্দ্রিয়ায় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান উন্নয়নের জন্য উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল। এখানে প্রাচীন কালের সাংস্কৃতিক অনুবাদের উদ্দেশে একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়, যাহা ইসলামী সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভিত্তি রচনা করিয়া প্রভূত কল্যাণ সাধন করে। প্রকৃতপক্ষে নিরংকুশ ও খাঁটি ইসলামী বিজ্ঞান যাহা আস্-সাখাবী স্বকীয় ধারণায় পোষণ করিতেন, তাহা আস্-সিলাফী দ্বারাই সর্বপ্রথম শুরু হয়। আলেকজান্দ্রিয়া ফুসতাত ও কায়রোর উপর নির্ভরশীল ছিল। তদানীন্তন কালে মানুষ কুরআন ও হাদীছ অধ্যয়নের উদ্দেশে মিসরের রাজধানীতে আগমন করিত। উযীর রিদওয়ান ইব্ন আল-ওয়ালাখ্শী ৫৩২/১১৩৭ সনে আলেকজান্দ্রিয়াতে একটি সুন্নী মাদ্রাসা স্থাপন করেন (ফাতিমী আমল শেষ হইবার পূর্বে)। এখানে ফাকীহ্ আবূ তাহির ইব্ন 'আওফ হাদীছের পাঠ দান করিতেন। ইহার প্রায় পনর বৎসর পর আল্-'আদিল ইব্নু'স্-সাল্লার আলেকজান্দ্রিয়ায় বিখ্যাত আল্-হাফিজ আস্-সিলাফীর নামে অপর একটি সুন্নী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা সর্বজনবিদিত যে, পরবর্তী সময়ে সালাহু'দ-দীন নিজে তাঁহার নিকট মুওয়াত্তা ইমাম মালিক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ক্ষমতায় সমাসীন হইবার পর সালাহু'দ-দীনই পশ্চিম দেশীয়দের জন্য একটি স্কুল, একটি হাসপাতাল ও একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করিয়াছিলেন যেখানে তাহারা বিনা মূল্যে অবস্থান, বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ও আনুকূল্য লাভ করিত।

বিভিন্ন সূত্রে বহু রিবাত-এর পুনঃপুনঃ উল্লেখ পাওয়া যায়। অপরদিকে আলেকজান্দ্রিয়ার উপর 'ফাদা'ইল সাহিত্য এই সীমান্তবর্তী পোতাশ্রয় ইসলামের সামরিক গুরুত্ব বর্ণনা করে।

ইসলামের সংস্কৃতিতে অবদান শুধু রাজনীতিবিদ ও যোদ্ধৃবৃন্দই রাখেন নাই, বণিকগণও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়াছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়ার বহু ধনাঢ্য ব্যবসায়ী তাহাদের বদান্যতা ও এককালীন দানের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তাহারা বহু মসজিদ, বিদ্যালয় ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ প্রদান করেন। আমরা আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত মুসলিম কারিমী বণিক সম্প্রদায় হইতে 'আবদু'ল-লাতীফ ইব্ন রুশায়দ আত্-তীকরীতী (মৃ. ৭১৪/১৩১৪)-র একটি উদাহরণ পেশ করিতে পারি। তিনি তাঁহার নামে দারু'ল-হাদীছ আত্-তীক্রীতিয়্যা নামক একটি মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। ইহা তদানীন্তন কালে হাদীছ ও শাফি'ঈ ফিক্হের বিদ্যাপীঠ ছিল (অধুনা এই বিদ্যালয় মস্জিদ আবী 'আলী নামে পরিচিত)। সমসাময়িক সূত্রে কুওয়ায়ক-এর কারিমী বণিক পরিবার সম্পর্কে আনন্দের সহিত লিখিয়াছেন যে, এই পরিবার মাত্র একদিনের ব্যবসার অর্জিত মুনাফা দ্বারা একটি মসজিদ অথবা একটি বিদ্যালয় নির্মাণে ব্যয়ভার বহন করিতে পারিত।

আলেকজান্দ্রিয়া তাহার অতীত কালের বহু প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ও ধর্মীয় পণ্ডিত, পুরুষ ও মহিলা কবি এবং সূফী ও মুরাবিতূন-এর দিকে সগর্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে : ইব্ন কালাকিস, ইব্ন 'আতা'ইল্লাহ, আল্-সাকান্দারী, আশ্-শাতিবী, ইব্নু'ল-মুনায়্যার, ইব্নু'ল্-মুজাবির, ইব্নু'স-সাওওয়াফ, ইব্ন সুলায়ম, ইব্ন কাসিম আন্-নুওয়ায়রী, আবু'ল-হাজিব, আল্-কাব্বার ও আল্-বুসীরী।

আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত মসজিদসমূহের মধ্যে মাসজিদু'ল্-'উমারী বা জামি'উ'ল-গার্বী (পূর্বতন থিওনাস গির্জা-Theonus Church) ও মাসজিদু'ল-জুয়ূশী বা আল্-'আত্তারীন (প্রাক্তন the Church of St. Athanasius) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শহরের রিবাতগুলি সম্পর্কেও বহু তথ্য পাওয়া যায়, যেমন আবু'ল-'আব্বাস আল্-মুরসী-এর মসজিদের পূর্বদিকে নগর-প্রাচীরের বাহিরে উত্তর দিকে অবস্থিত রিবাতু'ল্-ওয়াসিতী (৬৭২/১২৭৪)। ইহা বর্তমানে একটি যাবিয়া ও

রিবাত সাওয়ার যেখানে মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান আশ্-শাতিবী (মৃ. ৬৭২/১২৭৪) নামে জনৈক মুকরী' ও তাপসের বাসস্থান ছিল। শহরের বাহিরে ও রোসেটা তোরণের সন্নিকটে মনীষী ও মুতাওয়াল্লী আছ্-ছাগ্‌র, ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল্-হাক্কারী (মৃ. ৬৮৩/১২৮৪) একটি রিবাত নির্মাণ করেন যাহা তাঁহার নামে পরিচিত ছিল। ইহারই সন্নিকটে তাঁহাকে দাফন করা হয়। ৭ম/১৩শ শতাব্দীর শেষদিকে শহরের একটি তারীকাতপন্থী দল খান্‌কাহ বীলীক আল্-মুহসিনী নামে অপর একটি খান্‌কাহ্ নির্মাণ করে।

**গ্রন্থপঞ্জী** : মধ্যযুগীয় আলেকজান্দ্রিয়ার ইতিহাসের উপাদানসমূহ অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত। মিসরের প্রধান প্রধান আরবী ইতিহাসের প্রায় প্রতিটিতেই এ বিষয়ে লিখিত অবদান পাওয়া যায় : দেখুন, The article MISR. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : (১) ইব্ন 'আবদি'ল-হাকাম, ফুতূহ মিস্‌র, সম্পা. C. Torrey, New Haven 1922; (২) আল্-মাস্'উদী, মুরূজ; (৩) BGA, i-viii; (৪) আল-ইদ্‌রীসী, সম্পা. Dozy and De Goeje, Leiden 1866; (৫) ইবন জুবায়র (GMS, v); (৬) য়াকূত; (৭) 'আবদু'ল-লাতীফ, কিতাবু'ল-ইফাদা ওয়া'ল-ই'তিবার, অক্সফোর্ড ১৮০০ খৃ., কায়রো ১২৩২ হি., অনু. de Sacy, প্যারিস ১৮১০ খৃ.; (৮) আল-মাক্‌রীযী, খিতাত; (৯) ইব্ন ইয়াস, বাদা'ই'উ'জ্-জুহূর ফী ওয়াকা'ই'দ দুহূর; (১০) আল-বালাবী কিতাব আলিফ বা', ২ খণ্ডে, কায়রো ১২৮৭ হি.; (১১) আল-'আবদারী, আর্-রিহ্‌লাতু'ল-মাগ্‌রিবিয়্যা, সম্পা. মুহ. আল্-ফাসী, রাবাত ১৯৬৮ খৃ. (see also W. Hoenerbach, Das nordafrikanische Itinerar des 'Abdari, in Abhandlungen fur die kunde des Morgenlandes, xxv/4, 1940)।

খৃস্টান লেখক Severus, ইব্নু'ল-মুকাফ্‌ফা' ও আল্-মাকীন (দ্র.) যে সামান্য পরিমাণ তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। টিউডেলার বেন্‌জামীন (বহু সংস্করণে) যদিও সংক্ষিপ্ত তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি উহা গুরুত্বপূর্ণ। য়ূরোপীয় পর্যটকগণের ও য়ুরোপীয় ভাষায় লিখিত বিবরণের মধ্যে Arculf (680), Bernard the Wise (870), Ludolf von Suchem (1350)—এই তিনটিই Palestine Pilgrims' Text Society's Series-এর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে; M. Baumgarten (1507) in Churchill's Travels; Leo Africanus (1517), Hakluyt Soc. 92-4, various articles in Hakluyt's Voyages, vol. v, relating to the 16th century, Sandy's (1610) Travels; Blount (1634) in Pinkerton's Voyages vol. x; Maillet (1692); Pococke (1737); Volney (1783) ও অন্যান্য।

আধুনিক কালের রচনাবলী (১) Description de l'Egypte Etat Moderns, tome ii (2e Partie) 270 প.; ইহাতে ১৮শ শতাব্দীর আলেকজান্দ্রিয়ার পূর্ণ বিবরণ রহিয়াছে এবং (২) Planches 84-91, map I " 10,000 views and plans, এতদ্ব্যতীত (৩) Antiquites, tome ii; (৪) T. D. Neroutos L'ancienne Alexandrie, প্যারিস ১৮৮৮ খৃ., মানচিত্রসহ; (৫) A. J. Butler, Arab conquest of Egypt, অক্সফোর্ড ১৯০২ খৃ., ৩০৮ প.; ইহাতে আলেকজান্দ্রিয়ার বিজয়কাল ও পরবর্তীকাল সম্পর্কে মন্তব্যসহ একটি নির্ভুল ও পূর্ণ বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে ; (৬) Map of Alexandria by R. Blomfield in Bulletin de la Societe Archologique d'Alexandrie (BSA), viii (1905); (৭) 'আলী পাশা মুবারাক, আল্-খিতাতু'ল-জাদীদা, section vii; (৮) M. Asin Palacious, Una descripcion nueva del Faro de Alejandria, in al-Andalus, i/2 (1933), 421-92; (৯) E. Levi provencal, Une description arabe inedite du phare d'Alexandria, in Melanges Maspero, iii, Oriental Islamique, কায়রো ১৯৪০ খৃ.; (১০) Et. Combe, Alexandrie Musulmane " notes de topographie et d'histoire..., কায়রো ১৯৩৩ খৃ., ২খ; (১১) ঐ লেখক, Alexandrie au Moyen Age, Alexandria 1928; (১২) ঐ লেখক, Les sultans mamluks Ashraf Sha'ban et Ghouri a Alexandrie, in BSA (1936); (১৩) ঐ লেখক, De la colonne Pompee au Phare d'Alexandrie, in BSA, (1940); (১৪) ঐ লেখক, Notes sur les forts d'Alexandrie, in BSA (1940); (১৫) ঐ লেখক, Notes de topographie d'Alexandrie, in BSA (1940); (১৬) ঐ লেখক, in Bulletin du Faculte des Arts, Universite d'Alexandrie, (1943); (১৭) ঐ লেখক, Notes de topographie et d'histoire d'Alexandrie, in BSA, (1946); (১৮) A Grohmann, Studien Zur historischen Geographie und Verwaltung des fruhmittelaterlichen Agypten in Osterreichische Akademie der Wissenschaften, lxxvii/2 (1959); (১৯) W. Heyd, Histoire du commerce du Levant au moyenage, Leipzig 1936; (২০) S. Labib, তা'রীখু তিজারাতি'ল-ইস্‌কান্দারিয়্যা ফি'ল-কারনি'র-রাবি' আশার (M. A. Thesis, University of Alexandria, 1949); (২১) জামালু'দ-দীন আশ্-শায়্যাল, তা'রীখু মাদীনাতি'ল-ইস্‌কান্দারিয়্যা ফি'ল্-'আসরি'ল্-ইসলামী, আলেকজান্দ্রিয়া ১৯৬৭ খৃ.।

S. Labib (E. I.²)/ এ. কে. এম. আবদুল্লাহ

**ইসকান্দারূন** (اسكندرون) : আলেকজান্দ্রেত্তা, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর, প্রাচীন কালের Alexandreta Khata Isson, মালালাস (Malalas) ভাষায় (সং. বন, ২৯৭) Alexandreta e Mikra আরবদের নিকট আল-ইসকান্দারিয়্যা অথবা ইসকান্দারূনা (Aramaic ভাষায় ক্ষুদ্রার্থক) বলিয়া পরিচিত। এই শেষোক্ত রূপ হইতেই আসিয়াছে Skylitzes (২খ, ৬৭৭)-এর Alexandron; আর এই Alexandron হইতে সৃষ্ট হইতেছে Alexandros রূপটি (Michael Attal, 120; Zonaras, ৩খ, ৬৯১; Georgius Cyprius বিশপদের তালিকা Byz. Zeitschr. ১খ, ২৪৮-এ)। রোমান্‌স (Romance) ভাষাসমূহে ব্যবহৃত Alexadretta রূপটি পাশ্চাত্যের তীর্থযাত্রীদের কাছে মধ্যযুগের পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিল।

আলোচ্য ইস্কানদারূনা (একই নামের আর একটি স্থানের নামের সঙ্গে কোনক্রমেই গোলমাল হওয়া উচিত নয়; সে স্থানটি একদিকে Tyre এবং অপরদিকে Acre-এর Saint-John-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত) কিন্নাসরীন-এর জুন্দ্ (Djund)-এর অংশ। কথিত আছে, এখানকার দুর্গটি নির্মিত হইয়াছিল খলীফা আল-ওয়াছিক-এর আমলে (আবু'ল-ফিদা, সম্পা. Reinaud, ২খ, ২, ৩৩)। আরব ও বায়যানটীয়দের মধ্যে যুদ্ধ চলাকালীন এই শহরটি কয়েকবার আরবগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল (Murait, Chronogr. Byz., a. 1968; ইব্ন হাওকাল, নির্ঘণ্ট) এবং আবু'ল-ফিদা'র সময় ইহা ছিল পরিত্যক্ত। পরবর্তী কালে তদানীন্তন সমৃদ্ধ শহর আলেপ্পোর (Aleppo) বন্দর হিসাবে ইহা কতকটা গুরুত্ব লাভ করে, যদিও ইহা একটা কাদা'র কেন্দ্র ছিল এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইহার অধিবাসী সংখ্যা ছিল ১০,০০০ হইতে ১৫,০০০। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারী অনুসারে ইহার লোকসংখ্যা ছিল ৬২,০৬১।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) Ritter, Erdkunde, xvii (2), 1816 প.; (২) Cuinet, La Turquie D'Asie, ii, 201-8; (৩) Tomaschek, Zur histor. Topographie von Kleinasien in Mittelater, 71 k.; (৪) আওলিয়া' চেলেবি, ৩খ, ৪৬ প.; (৫) কাতিব চেলেবি, জিহান্নুমা, ৫৯৭; (৬) Tavernier, Les six Voyages, i, 129 k.; (৭) Cornelis de Bruyn, Reizen, Delft 1698, 364 (with an engraving); (৮) P. Lucas, Voy. Lans la Greece, l'Asie Mineure....' i, 248-9; (৯) R. Pococke, Descr. of the East, ii, 1, 178; (১০) C. Niebuhr, Reisebeschr, iii, 18-9; (১১) Walpole, Travels in various Parts of the East, 351-2; (১২) আলেপ্পো বিলায়েত-এর 'উছমানী সালেনামে; (১৩) তুর্কী ভাষায় রচিত ইসলামী বিশ্বকোষ, Besim Darkot কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ।

J. H. Mordtmann (E.I.[2]) /ছালেমা খাতুন

১৯১৮ সনের ২৭ নভেম্বর সিরিয়ায় অবস্থিত ফরাসী সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ "আলেকজান্দ্রেত্তা সানজাক" সৃষ্টি করে তাহাদের অধিকৃত এলাকা লইয়া লুজান (Lausanne) সন্ধির মাধ্যমে তুরস্ক এইগুলির অধিকার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই এলাকাটির অন্তর্ভুক্ত ছিল আলেকজান্দ্রেত্তা, এন্টিওক (Antioch) ও কীরীক খান। এখানে ১,২০,০০০-এর অধিক অধিবাসী ছিল। ইহার একটি স্বনিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থা ছিল, বিশেষত এখানে তুর্কী ভাষা ব্যবহার এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে তুর্কী কর্মচারী নিয়োগ করা চলিত। ১৯২৮ খৃ. সানজাক-এর অন্তর্গত তুর্কী সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে; ১৯২৮ খৃ. Genc Spor Klubu (যুবকদের জন্য খেলাধুলার ক্লাব) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য প্রথমে ছিল সাংস্কৃতিক। কিন্তু পরবর্তী কালে খেলাধুলার তুলনায় বরং প্রধানত রাজনৈতিক, শেষ পর্যায়ে খেলাধুলার বিষয়ে স্থিত হয়। বিষয়টি হিটলারের অধীন Tennis court 'OATH' নামক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্মারকস্বরূপ প্রণিধানযোগ্য। একই বৎসর এই ক্লাবের কিছু যুবক কামালপন্থী ভাবধারা অনুসারে কতিপয় শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হয়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে আরব ও তুর্কী সম্প্রদায়ের সদস্যগণ একে অন্যের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা হইতে বিরত রহিল। কিছু সংখ্যক তুর্কী রুটি প্রস্তুতকারকও গোশ্ত বিক্রেতা হইয়া গেল। গতানুগতিকভাবে এইগুলি ছিল নুসায়রীদের ব্যবসা। ১৯৩৪ সালের ২৬ মার্চ একজন উচ্চ পদস্থ তুর্কী সরকারী কর্মচারীর এন্টিওক সফরের ফলে কামালপন্থীদের পরপর কয়েকটি বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হয়। তুরস্কের জাতীয় উৎসব পালনের ও তুরস্কের রঙ্গীন পোশাকে সজ্জিত হওয়ার মাধ্যমে এবং আরও কিছু রীতিনীতিতে অনুরূপ অসন্তোষ প্রকাশ পায়। ১৯৩৬ সালের ৭ জুলাই এন্টিওকে তুর্কী বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে নুসায়রী ও আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত সিরীয় সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। তুর্কী সংবাদপত্রসমূহ দাবি করিল যে, তুর্কী উচ্ছেদ (deturkification) শুরু হইয়াছে ঃ তুর্কী ভাষা শিক্ষা ও ব্যবহারে বিধিনিষেধের মাধ্যমে, তুর্কী কর্মচারী নিয়োগে বিধিনিষেধের মাধ্যমে ইত্যাদি।

ফ্রাঙ্কো-সিরীয় চুক্তির পূর্বেকার আলোচনা ঐ চুক্তির স্বাক্ষর (৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬) এবং এম. হাশিম আল-আতাসীর বিবৃতিসমূহ (আনকারা, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬) যাহাতে নিশ্চয়তা প্রকাশ করা হয় যে, সদ্য স্বাধীন সিরিয়া সানজাক-এর আত্মনিয়ন্ত্রণের নিশ্চয়তা বিধান করিবে। ফলে তুরস্কে শক্তিশালী প্রচার অভিযান শুরু হয়। সেখানে জাতীয় জনমত এই ধারণা অস্বীকার করিল যে, এই তুর্কী সম্প্রদায়টি সিরিয়ার একান্ত নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে। তখন ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয় ও ঘটনাটি লীগ অব নেশন্স-এর কাউন্সিলে আনা হয়। সানজাক-এর মর্যাদা নির্ধারিত হয় ২৯ মে, ১৯৩৭ তারিখের জেনেভা চুক্তিতে। ঐ বৎসরের ২৯ নভেম্বর তারিখে উহা কার্যকর করা হয়। অবশ্য সিরীয় আইনসভা উহাকে বাতিল বলিয়া গণ্য করে; অপরদিকে তুরস্কের পতাকা আলেকজান্দ্রেত্তাতে উত্তোলন করা হয়। কিছুকাল গণ্ডগোলের পর একজন বিশিষ্ট তুর্কী ব্যক্তি সানজাক-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তখন হইতে সানজাক-এর নাম হইল হাতাই (Hatay) এবং নূতন ফ্রাঙ্কো-তুর্কী আলোচনার ফলে শেষ পর্যন্ত ২৩ জুন, ১৯৩৯ তারিখে তুরস্ককে হাতাই সমর্পণ করা হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (A) সরকারী নথিপত্র ; (১) Arretes du Haut commissaire de la Republique francaise en Syrie et au Liban concernant le Sandjak d'Alexandrette, nos. 330 of 1 September 1920, 403 of 9 October 1920, 987 of 8 August 1921, 1135 of 5 December 1921, 1881 of 4 March, 1923, 2980 of 5 December, 1924, 3017 of 31 December 1924, 4415 of 14 February, 1925, 3112 of 14th May, 1930; (২) Accord Franco-turcde Geneve du janvier 1937 portant l'affaire du Sandjak d' Alexandrette devant la S. D. N. Decision de l' Assemblee Generale de la S. D. N. du 29 mai 1937 dotant le Sandjak d'un statut international Special et d'une loi fondamentale; (৩) Traite francoturc du 23 Juin 1939 portant rattachement du Hatay a la Turquie.

(B) Studies ঃ (১) R. de Gontaut-Biron and L. L. Le Reverend, D'Angora a Lausanns, Paris 1924,

39-44, 56-68 ; (২) R. de Feriet, L'application d'un mandat, la France Puissance Mandataire en syrie et au Liban[2], Beirut 1926, ৮৬ ; (৩) R. de, Gontaut-Biron, Sur les routes de syric, apres neuf ans de mandat, Paris 1928, 84-90; (৪) F. Bazartey, La penetration del' enseignement dans le Sandjak d' Alexandrette, Beirut 1935 ; (৫) ঐ লেখক, Enquete sur l'artisanat a Antioche, Beirut 1936 ; (৬) ঐ লেখক, La Communaute turque dans le Sandjak d' Alexandrette, Archives du CHEAM, Paris, no. 1835, n. d., 64p. typescript ; (৭) A. Alexandre, Le Conflit syro-turc du Sandjak d' Alexandrette, d'october 1936, 4 juin 1937, vu d' Antioche in Entretiens sur l'evolution des pays de civilisation arabe, 2nd year, Paris 1938, 104-41 ; (৮) Journal Official de la S. D. N. Years 1936 to 1939 ; (৯) Irfan Jabry, La question d'Alexandrette dans le cadre du Mandat Syrien, Lyons 1940 ; (১০) P. du Veou, Le desastre d'Alexandrette, 1934-1938, Paris 1938 ; (১১) G. Puaux, Deux annees au Levant, souvenirs de Syrie et du Liban, 1939-1940, Paris 1952, 49-56 ; (১২) A. K. Sanjian, The Sandjak of Alexandretta (Hatay), its impact on Turkish-Syrian relations (1939-1956), in Middle East Journal, 1956, 379-94 ; (১৩) R. Massigli, La Turquie devant la guerre, Paris 1964।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/ছালেমা খাতুন

**আল-ইস্‌কাফী** (الاسكافى) ঃ আবূ ইস্‌হাক মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল-কারারিতী, 'আব্বাসী যুগের সচিব ও মন্ত্রী। তিনি ইরাকের নাহ্‌রাওয়ান নদীর তীরবর্তী ইস্‌কাফ-এ জন্মগ্রহণ করেন। ৩২০/৯৩২ সালে তিনি প্রথমবার বাগদাদের পুলিশপ্রধান ইব্‌ন য়াকূত-এর সচিব নিযুক্ত হন। জুমাদা'ল-উলা ৩২৩/এপ্রিল ৯৩৫ সালে একই সময়ে তিনি তাঁহার মনিবসহ গ্রেফতার ও বিপুল অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য হন। শাওওয়াল ৩২৯/জুলাই ৯৪১ সালে খলীফা আল-মুত্তাকী তাঁহাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন ; কিন্তু যু'ল-কা'দা ৩২৯/জুলাই -আগস্ট ৯৪১ সালে তিনি মহান আমীর কূরানকীজ কর্তৃক পদচ্যুত হন।

আমীর কূরানকীজ-এর পলায়নের পর ইব্‌ন রা'ইক-এর অধীনে পুনরায় তিনি স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু যু'ল-হিজ্জা ৩২৯/সেপ্টেম্বর ৯৪১ সালে অল্পকাল পরেই তিনি বন্দী হন। আল-ইস্‌কাফী পুনরায় মন্ত্রিত্ব লাভ করেন যখন খলীফা সর্বোচ্চ ইমারত ন্যস্ত করেন হাম্‌দানী নাসিরু'দ-দাওলার উপর, যিনি শাওওয়াল ৩৩০/জুন-জুলাই ৯৪২ সালে বাগদাদে উপনীত হইয়া নূতন মন্ত্রীকে পুনর্বহাল অবস্থায় দেখিতে পান। কিন্তু আট মাস পর আল-ইস্‌কাফী পুনরায় পদচ্যুত হন (রাজাব ৩৩১/মার্চ-এপ্রিল ৯৪৩) এবং তাঁহাকে জরিমানা দিতে বাধ্য করা হয়। অনুমিত হয় যে, তিনি দুইজন বারীদী অনুচর কর্তৃক আমীরের পারিষদবর্গের মধ্যে সৃষ্ট চক্রান্তের শিকার হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্মজীবনের অবসান প্রসঙ্গে স্বল্প তথ্যই পাওয়া যায়। মনে হয় তিনি আলেপ্পো-তে সায়ফু'দ-দাওলার সচিব ছিলেন এমন পরিপ্রেক্ষিতে যাহার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অতঃপর তিনি মন্ত্রী আল-মুহাল্লাবীর আমলে বাগদাদে ফিরিয়া আসেন এবং ৩৫৭/৯৬৮ সালে ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) ইব্‌নু'ল-আছীর, ৮খ, স্থা..; (২) মিস্‌কাওয়ায়হ, তাজারিবু'ল-উমাম, ১খ, ২৩৬ ; ৩১৮-৯, ২খ, ২৮-৯, ৩৮ ও টীকা ; (৩) M. Canard, আখ্‌বারু'র-রাদী বিল্লাহ, আলজিয়ার্স ১৯৪৬-৫০ খৃ., ১খ, ৭৯, টীকা ৩, ২খ, ২৬, টীকা ১ ; (৪) ঐ লেখক, Histoire de la dynastic des Hamdanides, আলজিয়ার্স ১৯৫১ খৃ., পৃ. ৪২৯।

D. Sourdel (E.I.[2])/পারসা বেগম

**আল-ইস্‌কাফী** (الاسكافى) ঃ আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ, বাগদাদ শাখার একজন মু'তাযিলী ও সামারকান্দ-এর অধিবাসী। তাঁহার জন্মতারিখ জানা যায় নাই, কিন্তু তিনি ২৪০/৮৫৪ সালে অধিক বয়সে মারা গিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। দরজী হিসাবে তিনি জীবন শুরু করেন এবং তাঁহার মাতাপিতা তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষায় বাধা দেন। কিন্তু জা'ফার ইব্‌ন হারব (দ্র.) তাঁহাকে নিজ তত্ত্বাবধানে লইয়া মু'তাযিলী মতবাদে দীক্ষিত করেন। সজীব বুদ্ধিমত্তা, বহু বিষয়ক জ্ঞান ও প্রখর নীতিবোধের জন্য তিনি খলীফা আল-মু'তাসিম-এর শ্রদ্ধা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। আল-মু'তাসিম তাঁহাকে মু'তাযিলী মতবাদের পক্ষে প্রচারকার্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সাধারণভাবে তিনি তাঁহার শিক্ষক জা'ফার-এর মতামতসমূহের কিছু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রসঙ্গ ব্যতীত বাকী অংশের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, মু'তাযিলীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও সফল ব্যক্তিত্ব। এই মতবাদগোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যের মত তিনি এই ধারণা পোষণ করিতেন যে, কুরআন একটি সৃষ্ট বস্তু, কিন্তু যেই স্থানেই তাহা পঠিত, লিখিত ও শ্রুত হইয়াছে সেই স্থানেই ইহার অবস্থান। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সময়ের আওতার বাহিরে এবং বস্তুসমূহের অস্তিত্ব হইতেই তাঁহার অস্তিত্বের নিদর্শন মিলে। আল-ইস্‌কাফীর মতে প্রাণীদেহ দুইটি মৌলের সমষ্টি। তিনি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত মুক্ত ক্রিয়া এবং সৃজিত ক্রিয়া—এই দুই প্রকারের ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি 'উছ মান (রা)-র খিলাফাতের আইনসিদ্ধতা ও মাফদূলের (অর্থাৎ অ-শ্রেষ্ঠের) নেতৃত্ব সমর্থন করেন। কিন্তু তিনি এই মত পোষণ করিতেন যে, আবূ বাক্‌র (রা)-এর তুলনায় 'আলী (রা) শ্রেষ্ঠ। তিনি অংশত আল্-জাহিজ প্রণীত কিতাবু'ল-'উছমানিয়্যার মতবাদ খণ্ডন করেন। এই পুস্তিকাটি অংশত ইব্‌ন আবি'ল-হাদীদ কর্তৃক লিখিত শারহ্ নাহ্‌জি'ল-বালাগা নামক গ্রন্থের সহিত সংরক্ষিত আছে। ইহা প্রথমোক্ত খণ্ডনকারী রচনার শেষে পুনরায় প্রকাশিত হয় (কায়রো ১৩৭৪/১৯৫৫, পৃ. ২৮২-৩৪৩)। এই পুস্তক সম্পর্কে ইব্‌নু'ন-নাদীম স্পষ্টভাবে কিছু বলেন নাই। মনে হয় ইহাই তাঁহার একমাত্র সংরক্ষিত গ্রন্থ। তাঁহার অন্যান্য রচনা ঃ কিতাবু'ল-লাতীফ (كتاب اللطيف) ; কিতাবু'ল-বাদাল (كتاب البدل) ; কিতাব 'আলা'ন-নাজ্জাম ফী আন্না'ত-তাব্'আয়নি'ল-মুখ্‌তালিফায়ন য়াফ'আলু বিহিমা ফা'লান ওয়াহিদান

(كتاب على النظام فى ان الطبعين المختلفين يفعل بهما فعلا واحدا) ; কিতাবু'ল-মাকামাত ফী তাফ্‌দী 'আলী (كتاب المقامات فى تفضيل على) ; কিতাব ইছ্‌বাত খাল্‌কি'ল-কুরআন (كتاب إثبات خلق القر آن); কিতাবু'র-রাদ্দ 'আলা'ল-মুশাব্বিহা (كتاب الرد على المشبهة) ; কিতাবু'ল-মাখ্‌লূক 'আলা'ল-মুজবিরা (كتاب المخلوق على المجبرة); কিতাব বায়ানি'ল-মুশকিল, আলা বুরগূছ (كتاب بيان المشكل على برغوث) ; কিতাবু'ত-তাম্‌বীহ্‌, নাক্‌দ কিতাব হাফ্‌স (كتاب التنبيه نقدكتاب حفص) ; কিতাবু'ন-নাক্‌দিল-কিতাবি'ল-হুসায়ন 'আলা'ন-নাজ্জার (كتاب النقد لكتاب الحسين على النجار); কিতাবু'র-রাদ্দ 'আ্লা মান আন্‌কারা খালকাল-কুরআন (كتاب الرد على من انكر خلق القرآن) ; কিতাবু'শ-শারহ্‌ (?) লি-আকাবীলি'ল-মুজ্‌বিরা (كتاب الشرح لاقاويل المجبرة) কিতাব ইব্‌তাল কাওল মান কালা বি-তা'যীবি'ল-আত্‌ফাল (كتاب إبطال قول من قال بتعذيب الاطفال); কিতাব হাম্‌ল কাওল আহ্‌লি'ল--হাক্ক (كتاب حمل قول أهل الحق); কিতাবু'ন-না'ঈম (كتاب النعيم) ; কিতাব মাখ্‌তালাফা ফীহি'ল-মুতাকাল্লিমূন (كتاب ما اختلف فيه المتكلمون); কিতাব 'আলা হুসায়ন ফি'ল-ইস্‌তিতা'আ (كتاب على حسين فى الا ستطاعة) ; কিতাব ফাদা'ইল 'আলী (كتاب فضائل على) ; কিতাবু'ল-আশ্‌রিবা (كتاب الاشربة) ; কিতাবু'ল-কুতুব (كتاب القطب); কিতাব 'আলা হিশাম (كتاب على هشام) ; কিতাব নাক্‌দ কিতাব ইব্‌ন শাবীব ফি'ল-ওয়া'ঈদ [كتاب نقد كتاب ابن شبيب (؟) فى الوعيد]।

**গ্রন্থপঞ্জী :** (১) মাস'উদী, মুরূজ, নির্ঘণ্ট ; (২) মালাতী, পৃ. ২৭, ৩০, ৩৩ ; (৩) খায়্যাত, ইন্‌তিসার, নির্ঘণ্ট ; (৪) বাগদাদী, ফারক, পৃ. ১৫৫ ; (৫) আশ'আরী, মাকালাত, নির্ঘণ্ট ; (৬) খাতীব বাগদাদী, ৫খ, ৪১৬ ; (৭) ইব্‌ন হাজার, লিসানু'ল-মীযান, ৫খ, ২২১ ; (৮) ইব্‌নু'ন-নাদীম, সম্পা. Fuck, অধ্যাপক মুহাম্মাদ শাফী'কে উপহৃত গ্রন্থে, লাহোর ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৬৬-৭ ; (৯) তূসী, ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ২৫৪ ; (১০) সাম্‌'আনী, আন্‌সাব, পৃ. ৩৫; (১১) ইব্‌নু'ল-মুরতাদা, মু'তাযিলা, নির্ঘণ্ট ; (১২) A. N. Nader, Le systeme philosophique des Mu'tazila, বৈরূত ১৯৫৬ খৃ., নির্ঘণ্ট।

তাঁহার পুত্র আবু'ল-কাসিম জা'ফার ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-ইস্‌কাফীও ছিলেন একজন মু'তাযিলী, কিন্তু তিনি প্রশাসনিক জীবন বাছিয়া লন এবং আল-মু'তাসিম কর্তৃক একটি দীওয়ানের প্রধান নিযুক্ত হন। মেধাবী লেখক বলিয়া তাঁহার পরিচিতি ছিল। তিনি কিতাবু'ল-মি'য়ার ওয়া'ল-মুওয়াযানা ফি'ল-ইমামা (كتاب المعيار والموازنة فى الامامة) গ্রন্থের রচয়িতা (তাঁহাকে ভ্রমবশত মু'তায্য-এর উযীর বলিয়া যেন মনে না করা হয় ; দ্র. পূর্ববর্তী নিবন্ধ)।

**গ্রন্থপঞ্জী :** (১) ইব্‌নু'ন-নাদীম, মুহাম্মাদ শাফী'কে উপহৃত গ্রন্থে, পৃ. ৬৭ (যেইখানে তাঁহাকে শুধু ইব্‌নু'ল-ইস্‌কাফী বলা হইয়াছে)।

সম্পাদনা পরিষদ (E. I.[2])/পারসা বেগম

**আল-ইস্‌কাফী** (الاسكافى) : আবু'ল-ফাদ্‌ল জা'ফার ইব্‌ন মাহ্‌মূদ, 'আব্বাসী প্রশাসনে একজন কর্মকর্তা এবং আল-মু'তায্য (২৫১/৮৬৬)-এর প্রথম উযীর। তিনি স্বল্প সময়ের জন্য এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু খলীফা তুর্কী চাপের মুখে নতি স্বীকার করত ২৫৫/৮৬৯ সালে তাঁহাকে পুনরায় উক্ত পদে বহাল করেন। আল-মুহ্‌তাদীর খিলাফাতের প্রথম দিকে তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল সা'ঈদ ইব্‌ন মাখ্‌লাদ (দ্র.)-এর হাতে। যদিও আল-হুসরী (যাহ্‌র, ৮৭৩) প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, আল-মু'তায্য-এর খিলাফাত লাভের পূর্বে আল-ইস্‌কাফী তাঁহার সহিত বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। গার্‌সু'ন্‌-নি'মা (হাফাওয়াত, ২৭৩) মনে করেন যে, তুর্কীগণ তাঁহাকে মন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য খলীফাকে বাধ্য করিয়াছিলেন। ফাখ্‌রী (৩৩৩-৪, ৩৩৫) এই মত সমর্থন করেন। তিনি আরও বলেন, আল-মু'তায্য তাঁহাকে মোটেই পসন্দ করিতেন না। সন্দেহ করা হইত যে, শী'আদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল, তিনি সম্পূর্ণরূপে অসংস্কৃতিবান ছিলেন এবং কেবল তাঁহার বদান্যতার গুণেই সকলের সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। আল-জাহিজ কর্তৃক উদ্ধৃত কবিতার ছত্র (রাসা'ইল, সম্পা. হারূন, ২খ, ৫৮) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মন্ত্রিত্ব লাভের বহু পূর্বেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদ অধিকার করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী :** প্রবন্ধে উদ্ধৃত বরাতসমূহ ছাড়াও নিম্নবর্ণিত গ্রন্থসমূহ : (১) তাবারী, ৩খ, ১৫৫০, ১৭০৭, ১৭০৯ ; (২) মাস্‌'উদী, তান্‌বীহ্‌, সম্পা. সাবী, ৩১৬, ৩১৮ ; সম্পা. de Goeje, ৩৬৫ (জা'ফার ইব্‌ন মুহাম্মাদ); (৩) ঐ লেখক, মুরূজ, ৭খ, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৭০ (জা'ফার ইব্‌ন মুহাম্মাদ) ; (৪) D. Sourdel, Vizirat, নির্ঘণ্ট।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/পারসা বেগম

**ইসতাখ্‌র** (اصطخر) : ইরানের ফার্‌স প্রদেশের একটি শহর। পাহ্‌লাবী লিপির লিখন অনুযায়ী ইহার আসল নাম সম্ভবত (استخر)। ইহার আর্মেনিয়ান রূপ স্তাহ্‌র স্তাখ্‌র (سـيـهـر) এবং সাসানী মুদ্রার লিখিত সংক্ষিপ্ত লিখন S.T. ঐ একই দিকনির্দেশ করে। আদ্যের অতিরিক্ত স্বরবর্ণসহ (আলিফ) ইহার রূপ হইল আধুনিক ফারসী। ইহা সাধারণত ইস্তাখার (استخر) বা ইস্‌তাখার (اسطخر) রূপে উচ্চারিত হয় এবং 'সীন'বর্ণে স্বরচিহ্নসহ সিতাখার (ستخر), সিতাখার, সিতারাখ্‌ (سطرخ) রূপেও উচ্চারিত হয় (দ্র. Vullers, Lex. Pers.-Lat. i, 94a ; 97a, ii, 223; Noldeke, in Grundr. der Iran, philol., ii, 192)। ইহার সিরীয় রূপ হইল ইস তাহ্‌র্‌ (اسطهر) (কদাচিৎ اسطحر] এবং ইহার তালমূদী রূপ সম্ভবত ইস্তাহার (استهر) [Megilla 13[a], middle]। ফারসী লেখকদের মতে ঐ স্থানে অবস্থিত হ্রদ বা জলাভূমি হইতে ঐ শহরটির নামকরণ করা হইয়াছে। সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য মত হইবে Spiegel (Eranische Altertum-skunde, i, 94, note I) S Justi (Grundr. der Iran, Philol., ii, 448)-এর সংগে ঐকমত্য পোষণ করা। এই মত অনুযায়ী শব্দটি আবেস্তা (Avistan)-এর stakhra— ستخره (শক্ত, মজবুত) শব্দ হইতে উদ্ভূত নহে, শেষোক্ত শব্দটি সম্পর্কে দ্র. Chr Bartholomae, Altiran. Worterbuck, p. 1591)।

ইসতাখ্‌র ২৯° ৫৩ উত্তর অক্ষরেখা ও প্রায় ৫৩° পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহা মাদা'ইন (পারসিপোলিস— Persepolis) হইতে উত্তর দিকে ঘণ্টাখানেকের পথ। ইহার অবস্থান পুলওয়ার (Pulwar অথবা মুরগাব— مرغاب) [ ইহা সিওয়ান্দ রূদ (سوند رود) নামেও পরিচিত]-এর অপ্রশস্ত উপত্যকায়। নিশ্চিতভাবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, আলেকজান্ডার কর্তৃক আকিয়মিনিয় (Achaemenid) রাজধানী পারসিপোলিস বিধ্বস্ত হইবার পরই এই শহরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। নূতন শহর তৈরির কাজে পারসিপোলিস-এর ধ্বংসাবশেষ মালমসলারূপে ব্যবহৃত হয়। ইসতাখ্‌র প্রথমত ফার্‌স জেলার প্রধান শহর মাত্র ছিল এবং এই জেলার কেন্দ্রস্থল খুব সম্ভব সকল সময়েই ইসাতাখ্‌র-এর কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত ছিল। আরসাকী (Arsakid) রাজত্বের পতনের কয়েক দশক পূর্বে এই স্থান স্থানীয় প্রধানদের বাসস্থানরূপে পরিচিত ছিল। সাসানীরা ইসতাখ্‌র অঞ্চল হইতে আসে। প্রথম আরদাশীর (اردشیر)-এর পিতামহ সাসান ইসতাখ্‌র শহরে অবস্থিত আনাহীদ (Anahid) দেবীর অগ্নিমন্দিরের (আতশকাদা) তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন (তাবারী, ১খ., ৮১৪)। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্মগ্রহণের রাত্রিতে এই আগুন হঠাৎ নিভিয়া যায় বলিয়া কথিত আছে। সাসানী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর এই শহর ইহার ধর্মকেন্দ্র নূতন পারস্য রাজত্বের নিয়মতান্ত্রিক রাজধানী হিসাবে গণ্য হয়।

ইসতাখ্‌র-এর অধিবাসীরা মুসলমানদের অগ্রগতিতে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। ১৯/৬৪০ সালে বাহ্‌রায়নের গভর্নর আল-'আলা' ইবনু'ল-হাদরামী (রা)-এর প্রথম অভিযান সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। তিনি অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া হযরত 'উমার (রা)-র সুস্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধেই এই অভিযান পরিচালনা করেন। ইসতাখ্‌র ২৩/৬৪৩ সালে প্রথমবারের মত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) ও 'উছমান ইব্‌নু'ল-'আস (রা) কর্তৃক পরিচালিত মুসলিম বাহিনীর নিকট শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু পরবর্তী কালে এখানকার অধিবাসিগণ বিদ্রোহ করে এবং তাহাদের শাসনকার্যে নিযুক্ত আরব গভর্নরকে হত্যা করে। পরে খলীফা বসরার গভর্নর 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমির (দ্র.)-কে বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য প্রেরণ করেন এবং ভীষণ যুদ্ধের পর তিনি শহরটি দখল করেন। বিদ্রোহ দমনে বহু পারস্যবাসীর মৃত্যু হয়। ২৯/৬৪৯ সালে ইসতাখ্‌র দ্বিতীয়বারের মত দখল করা হয় [দ্র. J. Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten vi (1899), iii f.]। ইসতাখ্‌র-এর বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযানের বিশদ বিবরণের জন্য দ্র. Baladhuri (ed. de Goeje), p. 389 f., Tabari, i, 2546f., 2549, 2696 f., 2830; Ibn al-Athir, ii, 420 f., iii, 30 f., 77 f. ; Chronique de Tabari (Pers. vers, by Bel'ami), trens. zohanberg, iii, 452-3 ; Weil, Gesch. der Chalifen, i, 86-7, 163, and thereon A. D. Mordtmann, in ZDMG, vi, 455-6; Caetani, Annali dell' Islam, iv, 151 f., v, 19-27, vii, 219-20, 248-56)।

ইসলামের প্রথম কয়েক শতাব্দীব্যাপী ইসতাখ্‌র বেশ প্রসিদ্ধ স্থান হিসাবে পরিচিত ছিল। যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে ইহার মর্যাদা শুধু একটি প্রদেশের প্রধান শহরে অবনমিত হয়। পাঁচটি জেলায় বিভক্ত ফার্‌স প্রদেশের বৃহত্তম জেলা কূরা (کوره) যাহা প্রদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অংশ লইয়া গঠিত তাহারই রাজধানী ছিল এই ইসতাখর। তদানীন্তন সাসানী রাজধানীর উপর চরমতম আঘাত আসে ৬৪/৬৮৪ সালে শীরায নগরীর পত্তনের পর, ইহা ইসতাখর-এর দক্ষিণে এক দিনের পথ। শীঘ্রই ইহা ফারস প্রদেশের রাজধানী হইয়া উঠিল, বিশেষ করিয়া ৩য়/৯ম শতাব্দী হইতে চরম উন্নতি লাভ করে। ইহার পর হইতেই ইসতাখর-এর দৃশ্যত পতন ঘটে। ঐ শহরের অধিবাসী ভূগোলবিদ আল-ইসতাখরীর বিবরণ হইতে জানা যায়, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে ইহা এক আরাব (রোমান) মাইল বিস্তৃত মাধ্যম আকারের একটি শহর ছিল। ইহার বহিপ্রাচীর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ত্রিশ বৎসর পরে (৯৮৫ খৃষ্টাব্দ) আল-মাকদিসী তাঁহার লিখিত বিবরণীতে (আহ্‌সানু'ত-তাকাসীম) ইসতাখ্‌রে অবস্থিত চমৎকার উদ্যান ও নদীর সেতুর প্রশংসা করেন। বাজারে অবস্থিত প্রধান মসজিদটির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দর্শনীয় বৃষ-শীর্ষ স্তম্ভগুলির উল্লেখ করেন। এই বিবরণ সম্ভবত আর্কিমিনিয় প্রাসাদের উল্লেখ না করিয়া সাসানী ইমারতের উল্লেখ করিতেছে। আল-মাকদিসী উল্লেখ করেন যে, ঐ মসজিদটি পূর্বে একটি অগ্নিমন্দির ছিল বলিয়া মনে করা হয়। ঐ ইমারত নির্মাণে পারসিপোলিস হইতে কিছু খোদিত কাঁচ ও পাথরের টুকরা ব্যবহৃত হইয়াছে। আল-মাকদিসী কর্তৃক এই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিবার অল্প কয়েক বৎসর পরই এক মারাত্মক বিপর্যয় শহরটিকে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। ইহা ছিল এই শহরের শাসক 'আদুদু'দ-দাওলা-এর পুত্র সামসামু'দ-দাওলার বিরুদ্ধে শহরবাসীর বিদ্রোহী মনোভাবেরই পরিণাম। তিনি বিদ্রোহ দমনের জন্য আমীর কুতুলমিশ-এর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তিনি শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। ইহার ফলেই ইসতাখর-এর অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘটে। ফারসী ফারিসনামা গ্রন্থে ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দী হইতে ফারস প্রদেশের বর্ণনায় ইসতাখরকে মাত্র শতখানেক বাসিন্দার একটি সাধারণ গ্রাম বলা হয়।

ইসতাখর-এর টাকশাল সম্পর্কে বলা হয় যে, এখানে মুদ্রায় সাসানী আমলের পাহলাবী রীতিতে সংক্ষেপে S. T. খোদিত হইত। ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই 'ইসতাখর' বুঝাইত। দ্বিতীয় য়াযদেজারদ (یزدجرد) [৪৩৮ খৃ. হইতে] হইতে ঐ বংশের শেষ পর্যন্ত এই মুদ্রার বহু নমুনা পাওয়া গিয়াছে। ইসলামী যুগেও উক্ত সংক্ষেপ লিখনসহ পাহলাবী প্রবাদ অনেক কাল প্রচলিত ছিল। খলীফা অথবা গভর্নরদের নাম খোদিত এই প্রকার মুদ্রা ৭৮/৬৯৭-৮ সাল পর্যন্ত পরিচিত ছিল (দ্র. J. Walker, A Catalogue of The Arab-Sasanian coins (A Catalogue of the Muhammadan Coins in the British museum), London 1941, cxxix-cxxx, 116)। উমায়্যা ও 'আব্বাসী আমলের প্রথমদিকে প্রাচীন ধরনের মুদ্রা ইসতাখরে মুদ্রিত হইত (দ্র. G. C. Miles, Excavation coins from the Persepolis region, Numismatic Notes and Monographs No. 143, New York 1959 and J. Walker, A Catalogue of the Arab-Byzantine and post-reform Umaiyad coins, London 1956, 112-4)।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যদেশ সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানের একটি দল ১৯৩৫ ও ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ইসতাখরের ধ্বংসাবশেষ আধুনিক পদ্ধতিতে খনন করেন [ দ্র. E. F. Schmidt, The Treasury of

Persepolis (Oriental Institute Communications, No. 21, Chicago 1939), 105-21 ; idem, Flights over ancient cities of Iran (Oriental Institute, Chicago 1940, plates 8-10, and G. C. Miles, op. cit.)]। বিভিন্ন উচ্চতার মাটির স্তূপ দেখিয়া এই শহরের ধ্বংসাবশেষ মূলত চিহ্নিত করা যায়। এখানে সেখানে বহিঃপ্রাচীরের অংশবিশেষ এখনও পরিদৃষ্ট হয়। হাজ্জীআবাদ গ্রামের একটি স্থানকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হয়। পর্যটক J. Morier ও Kar Porter ইহাকে 'জামশীদের হারেম' বলিয়াছেন (নীচে দ্র.)। সেখানে যামের ভগ্নাবশেষ আবৃত একটি স্থানে একটি স্তম্ভ এখনও খাড়া হইয়া আছে। বৃষের দেহরূপে গঠিত ইহার শীর্ষভাগ দেখিলেই জানা যায় যে, ইহা পারসিপোলিস হইতে অপসারিত হইয়াছিল। ইসতাখ্‌রের বিশদ বিবরণ Schmidt ছাড়াও Flandin ও Coste প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে উহার নিকটবর্তী স্থানে দুই মাস অতিবাহিত করেন [দ্র. the picture in the great volume of plates, Voyage en Perse, ii (Paris, 1843 f.), Pl. 58-62, and the archaeological text accompanying it, p. 69-72, and also Flandin's Relation du Voyage, ii (1852), 137.]।

ইসতাখ্‌র সংলগ্ন আরও কতিপয় স্থান ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভের জন্য উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ হাজ্জীআবাদ গ্রামের প্রায় সাত শত গজ উত্তরে কতিপয় প্রাকৃতিক গুহা আছে, যেগুলির একটিতে প্রথম শাপূর (Sapor)-এর ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ উক্তি উৎকীর্ণ আছে (২৪১-২৭২ খৃষ্টাব্দ) ; পারসিকরা ইহাকে শায়খ 'আলী বলে। কারণ কথিত আছে, এই নামের একজন সাধু পুরুষ এইখানেই তাঁহার জীবনকাল অতিবাহিত করেন। একইভাবে ইহাকে যিন্দান-ই জামশীদ বা 'জামশীদের কারাগার' বলিতে শোনা যায়। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন প্রাসাদ ও স্মৃতিস্তম্ভসমূহকে প্রায়ই জামশীদের নির্মিত বলা হয়। জামশীদ ছিলেন প্রাচীন ইরানের একজন পৌরাণিক শাসক। ইরানের মুসলিমগণ তাঁহাকে রূপকথার সুলায়মান বলিয়া চিহ্নিত করেন।

অন্য একটি প্রসিদ্ধ স্থান হইল নাক্‌শ্‌-ই রাজাব বা রাজাব (একজন পৌরাণিক ব্যক্তিত্ব)-এর ভাস্কর্য। ইসতাখ্‌র-এর তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। ইহা পুলওয়ার নদীর দক্ষিণ তীরে প্রস্তর প্রাচীরে সংকীর্ণ গিরি সংকটের মত ফাটল এবং সাসানী পদ্ধতির তিনটি চিত্র দ্বারা সজ্জিত।

পারস্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগ হইতে বিবিধ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিচিত স্থান হইল তখ্‌ত-ই জামশীদ ও নক্‌শ-ই রুস্তাম। প্রথমটি পুলওয়ার নদীর দক্ষিণ তীরে ইসতাখ্‌র-এর দক্ষিণ দিকে প্রায় ঘণ্টাখানেকের পথ। দ্বিতীয়টি ঐ নদীর উত্তর তীরে ইসতাখ্‌র হইতে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। পারসিপোলিসের আকিমিনিয় প্রাসাদসমূহ প্রাচ্যদেশীয় লোকাদের কাছে 'তখ্‌ত্‌-ই জামশীদ, নামেই বেশী পরিচিত। 'তখ্‌ত্‌-ই জামশীদ' ছাড়াও ইহার প্রাচীন নাম 'চিহিল' বা সংক্ষেপে 'চিল মীনার (মিনারা-ও বলা হয়) বা 'চল্লিশ গম্বুজ' বলিতে শোনা যায়, ১৪শ শতাব্দীতে ইরানী ঐতিহাসিকগণ যাহার সন্ধান লাভ করেন।

এই নাম ঐ স্থানের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশের নামানুসারে গ্রহণ করা হয় যে স্থানে ছিল সম্রাট কায়খসরূ (xerxes)-এর গম্বুজসমূহ। গম্বুজের সংখ্যা পূর্বে ৭২টি ছিল এবং বর্তমানে ১৩টি বিদ্যমান আছে। ৩য়/৯ম শতাব্দী হইতে মধ্যযুগের আরব ভূগোলবিদগণ পারসিপোলিসের বিস্তৃত সমতলভূমিকে 'মাল'আব সুলায়মান' (সুলায়মানের খেলার মাঠ) নামে জানিতেন, যাহাকে 'কুরসী সুলায়মান' (সুলায়মানের সিংহাসন)-এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। পারস্যের ইতিহাস (৫ম/১১শ শতাব্দী হইতে) মুজমিল-ই তাওয়ারীখ-এ পরবর্তী কালে ইহারই আদর্শে বর্তমান 'তখ্‌ত্‌-ই জামশীদ' নামকরণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

জামশীদের তখ্‌ত বা সিংহাসন একটি কৃত্রিম পাথুরে চত্বর যাহা প্রায় আয়তাকার বহুভুজবিশিষ্ট। খাড়া ঘন ধূসর পাহাড়ের পাদদেশে ইহা অবস্থিত। পর্যটকদের মতে এই পাহাড়কে বর্তমানে 'কূহ-ই রহমত' বা অনুগ্রহের পাহাড় বলা হয় ; কিন্তু সাহিত্যে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনে হয়, উত্তর মধ্যযুগ হইতে এই ধারণা চালু হয় (১৭শ শতাব্দীর শুরুতে স্যার টমাস হার্বার্ট প্রথম প্রথম উল্লেখ করেন)। Ouseley ইহার নাম শুনিয়াছেন রাজকীয় পাহাড় (শাহী কূহ) যাহা বস্তুত আরও পুরাতন। একই সূত্র অনুসারে স্থানীয় অধিবাসিগণ ইহাকে (জামশীদের) 'সিংহাসনের পাহাড়' (কূহে তখ্‌ত) বলেন। 'অনুগ্রহের পাহাড়'-এর যে অংশ প্লাটফর্মের পশ্চাৎ দেওয়ালরূপে গঠিত, সেখানে আকিমিনিয় সম্রাটদের তিনটি সমাধি রহিয়াছে। সাধারণ মানুষ এইগুলিকে মসজিদ, ইমামখানা ও জামশীদের কারখানা বলিয়া চিহ্নত করেন। ইহা stolze-এর অভিমত (Verhandl. der Gesellsch. f. Erd-Kunde in Berlin, x, 1883, p. 273)।

পারসিপোলিস ইসতাখরের প্রতিষ্ঠাতা নির্ণয়ের ব্যাপারে পারস্যের ঐতিহাসিকগণ নানা মত পোষণ করেন। কেহ বলেন, ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পারস্যের পৌরাণিক পূর্বপুরুষ; কেহ কেহ বলেন, ইহার নির্মাতা বা সম্প্রসারণকারীরা ছিলেন অতীতের পৌরাণিক শাসকগণ, যেমন কিউমারছ (كيومرث)-এর অধস্তন পুরুষ হোশাং (هوشنگ) তাহ্‌মূরাছ্‌, জামশীদ, কায়খসরূ। সুলায়মান ('আ)-কেও ইহার প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হইয়া থাকে। তাঁহার আদেশে তাঁহার অধীনে জীনেরা বহু বিস্ময়কর কার্য সম্পাদন করে। এক পৌরাণিক শাহযাদী হুমা (هما) যিনি ইরানের নির্মাতা হিসাবে সেমিরামিস (Semiramis)-এর ভূমিকা পালন করেন, তাহারও নাম করা হইয়া থাকে। ইরানী ঐতিহ্য পারসিপোলিস ইসতাখ্‌রকেই ইরানী বাদশাহদের বাসস্থান ও সমাধিস্থল মনে করিয়া থাকে। ফিরদাওসীর 'শাহ্‌নামা-তে এই শহরকে কায়কোবাদ-এর সময় হইতে শাসকবংশের বাসস্থান বলা হইয়াছে। মুসলিম লেখকগণ সুলায়মান ('আ)-এর নাম পারসিপোলিসের উৎপত্তির সঙ্গে যুক্ত করিয়া থাকেন ; তাঁহাদের প্রদত্ত নাম মাল'আব সুলায়মান (ملعب سليمان) পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহাদের উপাখ্যানমতে এই বাদশার কিছুকাল এখানে ও কিছুকাল সিরিয়াতে বাস করিতেন এবং জিনেরা তাঁহাকে দ্রুত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইত। তখ্‌ত-ই জাম্‌শীদের প্লাটফর্মে নির্মিত পৃথক পৃথক ইমারতে ইহাদের নাম 'মসজিদ' ও 'সুলায়মানের হাম্মামখানা' আরবী অক্ষরে লিখিত আছে [ইহার সঙ্গে "দয়ার পাহাড়" (কূহে রাহ্‌মাত)-এ অবস্থিত পূর্বে উল্লিখিত দুইটি রাজকীয় সমাধির নাম দেখুন]। গল্পে আছে, সুলায়মান ('আ) সেখানে একটি কক্ষে বাতাস বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৩শ ও ১৪শ শতকের ইরানী উৎসে এখানকার 'বাতাসের কারাগার' (যিন্দানে বাদ- زندان باد )-এর উল্লেখ

রহিয়াছে (দ্র. the reports in Ouseley, পূ. গ্র., ৩৮১, ২৮৭)।

দুর্ভাগ্যক্রমে আরবগণ প্রদত্ত পারসিপালিসের সৌধসমূহের বিবরণ খানিকটা ত্রুটিপূর্ণ এবং অংশবিশেষ বিকৃত হইয়া পরীর কাহিনীতে রূপান্তিরিত হইয়াছে, বিশেষত দ্র. আল-ইসতাখ্‌রী, আল-মাকদিসী ও আল-কাযবীনী প্রমুখ ভূগোলবিদের বিবরণী (দ্র. Schwarz, Iran)। মধ্যযুগের শেষভাগের ইরানী ঐতিহাসিকগণ, বিশেষ করিয়া হামদুল্লাহ আল-মুসতাওফী ও হাফিজ আবরূ বহুবিধ আনন্দদায়ক তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন (দ্র. Ouseley, ii, 380 f., 387 f.)। এই দুইজনের মতে ধ্বংসাবশেষের স্তম্ভগুলি ঔষধ প্রস্তুতিতে প্রয়োজনীয় তুতিয়া (Zinc oxide)-এর এক বিরাট উৎস ছিল। তখ্‌তে জামশীদও নকশে রুস্‌তাম-এর পাদদেশে প্রতিমাগুলির মস্তক বিকৃতকরণের মূল কারণ হইল মানব মুখাকৃতি গঠনে মুসলমানদের আপত্তি।

খলীফা আল-মানসূর (৭৫৪-৭৭৫ খৃ.) আল-মাদাইন টেসীফন-এর ধ্বংসাবশেষের মতই পারসিপোলিসের ধ্বংসাবশেষেকও প্রস্তর সংগ্রহের উৎসরূপে ব্যবহারের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উযীর খালিদ আল-বারমাকীর উপদেশক্রমে তিনি উহা হইতে বিরত থাকেন। কারণ তিনি জানান যে, হযরত 'আলী (রা) পারসিপোলিসে সালাত আদায় করিয়াছিলেন, দ্র. (Fragm. Hist. Arab. ed. de Geoje, p. 256)।

অনেক মুসলিম শাসকই পারসিপোলিসের ধ্বংসাবশেষে তাঁহাদের আগমন বিষয় খোদিত করিয়া স্থায়ী রূপ দিয়াছেন। এখানে দেখা যায় (৪র্থ/১০ম শতাব্দী), বুওয়ায়হী বংশোদ্ভূত লোকজনকৃত কূফীক বৈশিষ্ট্যের তিনটি আরবী শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তায়মূরের (৯ম/১৫শ শতাব্দী) পৌত্র আবু'ল-ফাত্‌হ ইবরাহীম কর্তৃক দুইটি ফারসী ও একটি আরবী মোট তিনটি শিলালিপি এবং উযূন হাসান (৯ম/১৫শ শতাব্দী)-এর পৌত্র 'আলী ইব্‌ন খালীল (দুইটি আরবী ও একটি ফারসী)-এর তিনটি শিলালিপি। এই শিলালিপিসমূহ সম্পর্কে de Sacy তাঁহার Mem. sur diverses antiquites de la Perse (Paris 1793), P. 139 ff. পুস্তকে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। Noldeke, in Stolze, Persepolis, ii, 6-এ উহার কিছু ভ্রম সংশোধন করেন।

H. Petermann তাঁহার Reisen im Orient, ii, 188. গ্রন্থে মুজাফ্‌ফার বংশীয় মুহাম্মাদ ইব্‌নু'ল-মুজাফ্‌ফার ইব্‌নি'ল-মুজাফ্‌ফার ইব্‌নি'ল-মানসূর (d. 765/1363)-এর একটি শিলালিপির উল্লেখ করেন [দ্র. V. Minorsky, Later Islamic Inscriptions at Persepolis, in BSOS (1939), 177-8]। প্রাচীর গাত্রে খোদিত কবিতার বিভিন্ন পঙক্তি প্রমাণ করে যে, পারস্যবাসীগণ পারসিপোলিসকে সর্বদা উচ্চ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন এবং তাহাদের আধুনিক কবিরাও দেশের এই প্রাচীন রাজধানীর কথা প্রায়ই উল্লেখ করিয়া থাকেন।

নক্‌শ-ই রুস্তাম (نقش رستم)-এর প্রধান গুরুত্ব হইল, দক্ষিণের সুউচ্চ প্রাচীর, যাহা হুসায়ন কূহ (حسين كوه) দীর্ঘ ও স্তূপীকৃত প্রস্তরসমূহ দ্বারা গঠিত এবং যাহার পাদদেশে আকিমিনিয় রাজাদের চারিটি সমাধি ও বৈচিত্র্যময় স্যাসানী চিত্রাবলী রহিয়াছে। সমস্ত হুসায়ন কূহও সময় সময় এই নামে আখ্যায়িত হয়। সেখানকার ভাস্কর স্মৃতিসমূহ ইরানের জাতীয় বীর রুস্তামের এই জনপ্রিয় ধারণা অনুসারেই ইহার নাম নক্‌শ-ই রুস্তাম হইয়াছে। এই সমাধিক্ষেত্রের প্রাচীরের সম্মুখে কেল্লার মত একটি উল্লেখযোগ্য ইমারত বিদ্যমান। এখন ইহাকে কা'বা-ই যারদাশ্‌ত (كعبه زردشت) বলা হয়। সম্ভবত অতীতের অগ্নিমন্দিরের সহিত ইহার সম্পর্ক ছিল। সুলায়মান-এর প্রস্তর (سنگ سليمان) নামক পর্বতের শিখরে অবস্থিত কা'বা-ই যারদাশত-এর অদূরে অন্য দুইটি ক্ষুদ্র ইমারতকেও সম্ভবত এইরূপ ধারণা করা হয় (দ্র. Ouseley, পূ. গ্র., ii, 300)। এইখানে উল্লেখ্য যে, শীরায-এর ৫ মাইল পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বারমা দিলাক (بر مه دلك)-এর সাসানী ভাস্কর্যকেও নকশে রুস্তাম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে [দ্র. E. F. Schmidt, Persepolis III, The Royal Tombs and other monuments (Oriental Institute, Chicago, 1970), 122 ff. ; W. B. Henning, The Great Inscriptions of Sapur I, in BSOAS, ix (1937-39) ; M. Spregling, Third-Century Iran. Sapor and Kartir (Oriental Institute, Chicago 1953) ; E. Honigman and A. Mareq, Rocherches sur les Res Gestae Divi Saporis (Memoires, Acad. Royale de Belgique, xlvii, Brussels, 1953)]।

পুলওয়ার ( پلور )-এর দক্ষিণ তীরে [নক্‌শ্‌-ই রাজাব (نقش رجب)-এর প্রায় পাঁচ শত গজ পশ্চিমে] দুই স্তরবিশিষ্ট প্রস্তর মঞ্চকে ঐ জেলার অধিবাসীরা রুস্তামের সিংহাসন (تخت رستم) বলিয়া থাকে। ইহার সীমিত পরিসরের কারণে শেষোক্তটি সমাধিস্তম্ভ বা অগ্নিমন্দিরের পাদভূমিরূপে ব্যবহৃত হইত (দ্র. Flandin et Coste. Voyage en perse, ii, 72-73 and Pl. 63)। 'রুস্তামের সিংহাসন' নামের পরিবর্তে 'ময়ূর সিংহাসন' (تخت طاؤس) নামও ব্যবহৃত হয়। ইরানের অন্যত্রও 'রুস্তামের সিংহাসন' নামটি পরিলক্ষিত হয় (দ্র. Ouseley, পূ. গ্র., ii, 522)।

ইসতাখ্‌র হইতে একটু বেশী দূরে, উত্তর-পশ্চিমে ৩/৪ ঘণ্টা পথের দূরত্বে, পর্বতশৃঙ্গে তিনটি দুর্গ বিদ্যমান। দুর্গ দুইটির পারস্পরিক ব্যবধান দেড় হইতে দুই মাইল। একই সারিতে অবস্থিত এই তিনটিকেই ইস্‌তাখ্‌রের পাহাড় বা দুর্গ (قلعة يا كوه اصطخر) নামে অভিহিত করা হয়। কুর নদী (যাহাতে উল্লিখিত পুলওয়ার নদী পতিত হইয়াছে)-এর বাম তীরে অবস্থিত জিলার নামানুসারে ইহাকে কূহে রামজিরদ (كوه رامجرد) নামেও অভিহিত করা হয়। ফিরদাওসী একটি শ্লোকে ইস্‌তাখ্‌রের তিনটি দুর্গ (مه در كنبيدان اصطخر)-এর উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. Ouseley, পূ. গ্র., ii, 380)। প্রাচীন ঐতিহাসিক ও পর্যটকগণের পৃথক পৃথক প্রাসাদের পৃথক পৃথক নাম ছিল এবং কালক্রমে সেগুলির ঘন ঘন পরিবর্তন হয়। তিনটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রাসাদ ইসতাখ্‌র-এর দুর্গ (قلعه اصطخر)-কে, অন্য দুইটি প্রাসাদের মধ্যস্থানে থাকায় সংকীর্ণ অর্থে কেন্দ্রীয় দুর্গ (قلعه ميان) -ও বলে। ইহার প্রাঙ্গণে একটি সাইপ্রাস বৃক্ষ থাকায় ইহাকে কিল্লাই-বার্সে (قلعه سرو - সাইপ্রাস দুর্গ) বলিতে Flandin ও Coste শুনিয়াছেন। ইরানী লেখকগণ অন্য দুইটি প্রাসাদকে অন্য নাম দিয়াছেন, যেমন 'ভগ্ন

দুর্গ' (قلعه شكسته) ও আশকু-নাওয়ান (اشكنوان) অথবা সাকনুওয়ান (سكنوان) এই জাতীয় নাম।

ফারিস, বিশেষ করিয়া ইসতাখ্‌র সম্পর্কে মুসলিম ইতিহাসে এই দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহ এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হইয়া রহিয়াছে। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের আক্রমণ হইতে সতর্ক থাকিবার জন্য ঐ দুর্গসমূহকে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্র মনে করা হইত। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল স্থানীয় "ইসতাখ্‌রের দুর্গটি"। পারস্য উপকথায় ইহার নির্মাণকাল পৌরাণিক যুগে মনে করা হইয়াছে। ধারণা করা হয়, রাজা জামশীদ ইহা নির্মাণ করেন। প্রাচীন ইরানের শাসক গুশতাস্‌প (كشتسب) যারদাশতের মতবাদ গ্রহণের পর গোচর্মে সোনার কালিতে লিখিত আবেসতা গ্রন্থটি ইসতাখ্‌রের দুর্গে জমা দিয়াছিলেন বলিয়া ধারণা করা হয়। এইজন্য এই দুর্গকে 'লেখার দুর্গ' দিজনাবিশ্‌ত (دژ نبشت) অথবা 'লেখার পাহাড় ও কূহে নাবিশ্‌ত (كوه نبشت) বলা হয় (দ্র. হামদুল্লাহ মুসতাওফী; আত-তাবারী, তু. ১খ, ৬৭৬ ; ইবনু'ল-আছীর, ১খ, ১৮২, ৯ ও the Persian reports in ouseley, পূ. গ্র., ii, 344, 364, 370-1, 375, 384)। প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই সুরক্ষিত এই ঘাঁটিতে খিলাফাতের আমলে ফারিস প্রদেশের গভর্নর প্রায়ই অবস্থান করিতেন। এইজন্য গভর্নর যিয়াদ ইবন আবীহি, 'আলী (রা)-র মৃত্যুর বেশ কিছু পরে, এই স্থান পর্যন্ত মু'আবিয়ার আক্রমণ ঠেকাইয়া রাখিতে সমর্থ হন [দ্র. Wellhausen, Das arabische Rejch, etc. (Berlin 1902), 76]। বুওয়ায়হী শাসকগণ (যাঁহারা প্রায়ই ইসতাখ্‌র অঞ্চলে বাস করিতেন) ইসতাখ্‌রের দুর্গের প্রতি বিশেষ নজর রাখিতেন (তখ্‌ত্-ই জামশীদ-এ খোদাই-এর তারিখ হইতে দেখা যায়, 'ইমাদু'দ-দাওলা ইসতাখ্‌রে সমাধিস্থ হন)। ঐ স্থানে অবস্থিত একটি স্বাভাবিক পুকুরের সুবিধা গ্রহণ করিয়া 'আদুদু'দ-দাওলা ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে এই দুর্গের উপর একটি বিরাট ধরনের জলাধার নির্মাণ করেন। ইহা সারা বৎসর কয়েক সহস্র লোকের জন্য পানি সরবরাহ করিতে পারিত। এই ব্যবস্থা সমকালের জনসাধারণ ও পরবর্তী বংশধরগণের প্রশংসা লাভ করে। ৪৬৭/১০৭৪ সালে ফারিস-এর শাসনভার দখলকারী বিদ্রোহী ফাদলাওয়ায়হ (فضلويه) ইসতাখ্‌রের দুর্গে সুলতান মালিক শাহের সময়ে নিজামু'ল-মুলকের সৈন্যবাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ হন। এক ভূমিকম্পে জলাধারগুলির পানি হঠাৎ ছাপাইয়া উঠিয়া প্লাবনের সৃষ্টি করিলে অবরোধকারিগণ অপ্রত্যাশিত শর্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়ঐ তখন ফাদলাওয়ায়হকে দুর্গবন্দী করা হয় এবং পর বৎসর তিনি পলাইতে চেষ্টা করিলে তাহাকে হত্যা করা হয়। পরবর্তী কালে দুর্গটি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও শাহযাদাদের জন্য সরকারী কারাগার হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দেও এই দুর্গ ভাল অবস্থায় ছিল, কিন্তু সেখানে কেহ বাস করিত না। কিছুকাল পরে ফারিস-এর এক বিদ্রোহী সৈন্যাধ্যক্ষ এইখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে ১ম শাহ্ 'আব্বাস এই দুর্গ অবরোধ ও ঝটিকা আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করেন। Pietro delle Valle, যিনি এখানে ১৬২১ খৃষ্টাব্দে অবস্থান করেন, তিনি ইহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পান।

য়ূরোপীয় পর্যটকগণ ইসতাখ্‌রের দুর্গে ইহার পর খুব কমই পর্যটন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কেবল Morier, Flandin (and Coste) ও Vambery, Flandin ও Coste—যাঁহাদের কাছে এই দুর্গের নক্‌শা ও পরিকল্পনার ব্যাপারে আমরা ঋণী, তাঁহারা বলেন, এই দুর্গ অবস্থিত ছিল ৩০০ গজ গোলাকৃতি উচ্চভূমির উপর এবং সমতলভূমি হইতে ১৩০০ ফুট উর্ধ্বে প্রাচীন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে আজও প্রস্তর নির্মিত মজবুত প্রাচীর বিদ্যমান। বুওয়ায়হী শাসকগণ নির্মিত জলাধারের বিরাট কাঠামো, যাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল পর্বতের মধ্যে গভীরভাবে খোদিত একটি কূপ এখনও দেখা যায়। যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান সেগুলি মুসলিম শাসনামলের বলিয়া মনে হয় (দ্র. on the castles of Istakhr, the accounts from Persian sources in Ousely, পূ. গ্র., ii, 371, 376, 386, 385 f., 289, 395-7, 399, 403-5, 407, 531 ; Ritter, viii, 863-5, 868, 877 ; Flandin and Coste, Voyage en Perse, ii, 71-72; Flandin's Relation du Voyage, ii (1852), 140-2 ; Vambery, Meine Wanderungen und Erlebnisse in Persien, Pest 1867, 250 ; Cl. Huart, in Revue semitique, i (1893), 259 f., 337 f., and in Hist. de Bagdad (Paris 1901), 28, 31 ; G. Le Strange, পূ. গ্র., 276 ; Herzfeld, in sarre and Herzfeld, পূ. গ্র., ১১৪-৫ (Pl. xvi. and Fig. 45)।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) BGA, ed, de Goeje, passim; (২) য়াকূত, মু'জাম (সম্পা. Wustenfeld), i, 299 f.; (৩) কাযবীনী, Kosmographie (সম্পা. Wustenfeld), ii, 99; (৪) তাবারী, নির্ঘণ্ট ; (৫) ইবনু'ল-আছীর, নির্ঘণ্ট ; (৬) হাজ্জী খালীফা, জিহান্নুমা, ল্যাটিন অনু. Norberg, Lund 1878, i, 284-6; (৭) P. Schwarz, Iran im Mittelalter nach den arab. Geographen, i (1896), 13-16 (13-30 on the Province Istakhr); (৮) G. Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, Cambridge 1905, 275-6. 294-5; (৯) Ouseley, Travels of various Countries of the East, ii, London 1821, 339-441; (১০) - C. Niebuhr, Reisebeschr. nach Arabien etc., Copenhague 1778, 120-165 ; (১১) Ouseley, op. cit., ii, 187-191, 224-420; (১২) Ritter, Erdkunde, viii, 858-941; (১৩) A. J. Rich, Collected Memoris, London 1839, 231-261; (১৪) Flandin et Coste, Voyege en Perse, ii, (Paris 1843 f.), Pl. 57-112, and the accompanying Vol. of Text, 68-155 ; (১৫) Flandin's Relation du voyage, ii (1852), 88-214; (১৬) F. Stolze, Persepolis, Berlin 1882, 2 vol; (১৭) ঐ লেখক, in Verhandl. d. Gesellsch. f. Erdkunde in Berlin, x (1883), 251-276; (১৮) Noldeke, Aufsatze zur pers. Geschichte, Leipzig 1887, 134-146; (১৯) Geiger, in Grundr. der iran. Philol., ii (1896 f.), 390 f.; (২০) Justi, ibid., ii, 447-456 ; (২১) A. W. Jackson, Persia Past and

Present, New York 1906, 294-320 ; (২২) E. Herzfeld, in Klio, viii (1907), 1-68 (passim); (২৩) Fr. Sarre and E. Herzfeld, Iranische Felsreliefs, Berlin 1910 (on Istakhr " see especially p. 100-2); (২৪) Of The old Persian inscriptions of Persepolis and Naksh-i Rustam the best accounts are given in E. F. Schmidt, Persepolis i, Structures, Reliefs, Inscriptions, Oriental Institute, Chicago 1953, who includes earlier references; (২৫) On Sasanid monuments and inscriptions, see Schmidt, Op. Cit.-The best maps of Istakhr-Persepolis and its immediate neighbourhood are given by Schmidt, Persepolis, i, and iii, and Flights; (২৬) দা.মা.ই., ২খ., ৮৩২-৪১।

M. Streck (G.C. Miles) (E.I.[2]) / মুহাম্মদ আবদুল কাদের

**আল-ইস্তাখরী** (الا صطخرى) ঃ আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ আল-ফারিসী আল-কারখী, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে আরব মুসলিম ভূগোলে নূতন ধারা প্রবর্তনকারিগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি।

তাঁহার জীবনী অজ্ঞাত বা প্রায় অজ্ঞাত। তাঁহার বিভিন্ন প্রকারের নিসবা সম্পর্কে বিশ্বাস করিতে হইলে তিনি ফারস ও আরো সুনির্দিষ্টভাবে ইস্তাখর-এর স্থানীয় অধিবাসী ছিলেন। য়াকূত-এর অনুসরণে প্রাচ্যবিদগণ বস্তুত তাঁহার আল-ইস্তাখরী নিসবাটি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য বক্তি, বিশেষত তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুবর্তক (continuator) ইব্ন হাওকাল তাঁহাকে আল-ফারিসী নিসবা দ্বারা পরিচিত করাইয়াছেন। আল-মুকাদ্দাসীও একই পন্থা অনুসরণ করেন এবং আর একটি নূতন নিসবা আল-কারখী যুক্ত করিয়াছেন (সম্পা. De Goeje, ৪৭৫ ; তু. প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫, টীকা নং ক)। ইহা হইতে এই মর্মে ধারণা করা যাইতে পারে যে, তাঁহার জীবনকালের এক পর্যায়ে ইস্তাখরী খুযিস্তান অথবা ইরাকে, সম্ভবত আরো সুনির্দিষ্টভাবে ঐ একই নামধারী বাগদাদের কোন অংশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন (তু. য়াকূত, দ্র.)।

আল-ইস্তাখরীর জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে অন্ততপক্ষে একটি নিশ্চিত অংশ হইতেছে ইব্ন হাওকাল-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাত। এই সাক্ষাত সিন্ধু বা বাগদাদে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা আমাদের জন্য ইতিবাচক গুরুত্বের ব্যাপার নয়। ইব্ন হাওকাল (অনু. Kramers-Wiet, ৩২২) প্রদত্ত সিন্ধুর বর্ণনা অংশে তিনি এই সাক্ষাতের ঘটনাটি স্মরণ করিয়াছেন, যদিও এই প্রসঙ্গে তিনি কোন স্থান সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দান করেন নাই। অপরদিকে সাক্ষাতটির সম্ভাব্য স্থান হিসাবে বাগদাদ অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কারণ এই স্থানেই প্রবীণ শিক্ষক অবসর যাপন করিতে আগমন করেন এবং নবীন ভূগোলবিদ এই স্থানে বসবাস করিয়া (ঐ, ৩৩৬) তাঁহার শিক্ষা সমাপন করিয়া ভ্রমণের উদ্দেশে যাত্রার জন্য মনস্থির করেন (ঐ, ৩খ, ৩২২)।

আল-ইস্তাখরীর রচিত গ্রন্থ কিতাবু'ল-মাসালিক ওয়া'ল- মামালিক-কে যে কোন পরিস্থিতিতেই আল-বালখী-এর রচনা, যাহা দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং ইব্ন হাওকাল-এর রচনা, যিনি আল-ইস্তাখরীর রচনার অনুবর্তন করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যবর্তী বলিয়া নির্ধারণ করা যায় (তাঁহার আর একটি রচনা, সম্ভবত ফারস্ সম্পর্কে একটি রিসালা, উক্ত দেশের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে ; তু. সম্পা. আলহীনী, ৬৭)। Kramers তাই অতি সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করিয়াছেন (Analecta, ১৯৬), আল-ইস্তাখরী ও ইব্ন হাওকাল-এর পাণ্ডুলিপি মূলত একটি মাত্র উচ্চমানের মৌলিক পাঠ হইতে গৃহীত যাহা কয়েকবার সংশোধন ও মার্জিত করা হয়। ৪র্থ./১০ম শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষভাগে লিখিত এই কিতাব, আল-বালখী দ্বারা প্রস্তুত ইসলামের মানচিত্রাবলী পুনঃপ্রকাশ এবং ইহাদেরকে আরো উন্নত করে। আল-বালখী-এর ন্যায় এইখানেও ইকলীম (দ্র.) টলেমীয় ভূগোলশাস্ত্রের আবহাওয়া নহে, বরং ইরানী কিশওয়ার ঐতিহ্য অনুসারে ইহা হইতেছে একটি ভৌগোলিক সত্তা— একটি 'দেশ'। আল-বালখীর অনুসরণে মূলত গ্রন্থের প্রকাশ স্থান সামানী খুরাসানে বিদ্যমান পারস্যের 'জাতীয়তাবোধ উক্ত গ্রন্থে অনুকূল মর্যাদা লাভ করে। ইহার প্রমাণ পারস্য সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধের সুদীর্ঘতায়। পরিশেষে আল-বালখীর ন্যায় ইহাতে অনুসৃত মানচিত্র প্রস্তুতির ধারা ও পদ্ধতি ঘনিষ্ঠভাবে পারস্য দেশীয় আদর্শ সদৃশ ; যেভাবেই হউক উহা ইব্ন হাওকালের অনুসৃত পন্থা অপেক্ষা উহাতে অধিকতর সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই ইরানীবাদের জন্যই আল-ইস্তাখরীর রচনা পারস্য ভাষায় অনুবাদের যোগ্যতা অর্জন করে [সেই সঙ্গে তুর্কী ভাষায়ও; [তু. V. Minorsky, A false Jayhani, in BSOAS, ১৩খ. (১৯৪৯-৫০ খৃ.), ১৫৬-৯]। অন্যপক্ষে ইব্ন হাওকাল এবং এই ধারায় (chain) শেষ সংযোগের প্রতিনিধিত্বকারী আল-মুকাদ্দাসীর রচনা অনুবাদের যোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

ইহা ভিন্ন অপর একটি সম্পর্ক বর্তমান। যতদূর বিবেচনা করা যায়, মানচিত্র সম্বন্ধীয় প্রতিরূপ যাহা আল-বালখীর জন্য ছিল অপরিহার্য, তাঁহার পরবর্তীদের চোখে উহা ভূবিদ্যার মৌলিক বিষয়বস্তুরূপেই বিবেচিত হয়, যদিও মানচিত্রে সংশ্লিষ্ট বিবরণী যথেষ্ট সম্প্রসারিত করা হয়। এই কারণেই আল-মুকাদ্দাসী এই রচনা সম্পর্কে তাঁহার মতামতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "অত্যন্ত সতর্কভাবে প্রস্তুত কতিপয় মানচিত্র সম্বলিত একটি পুস্তক। তবে বহু অংশে ইহা বিভ্রান্তিকর এবং স্থানে স্থানে ইহার বিবরণীসমূহ অগভীর। ইহা প্রদেশসমূহকে জেলায় বিভক্ত করিয়া প্রদর্শন করে নাই (ওয়ালা কাওওয়ারা'ল-আকালীম)" (সম্পা. De Goeje, পৃ. ৫, টীকা a)।

পরবর্তিগণের প্রতি আল-মুকাদ্দাসীর মনোভাবের তীব্রতা সুপরিচিত। সংক্ষেপে বলা যায়, যদিও তাঁহার মৌলিক নীতি সমর্থন করা হয়, তবুও বলা যায় ইহা আল-বালখী ও আল-ইস্তাখরীর মধ্যবর্তী সময়ের অর্জিত উন্নতির কথা অনুক্ত থাকিয়া যায়। ভাষ্যের বদৌলতে, সুপারিশ মুতাবিক মানচিত্র হইতে বিবরণসমৃদ্ধ মানচিত্রে উত্তরণ কেবল ক্রমে ক্রমেই সম্ভব, উহা ব্যতীত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মার্জিত হয় সুচিন্তিত বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা ও ব্যক্তিগত পর্যালোচনার ('ইয়ান) সাহায্যে নির্বাচিত মৌখিক ও লিখিত উৎস হইতে লব্ধ তথ্যাদি সঞ্চারণের আগ্রহের দ্বারা। রচনাটিতে এই দুইটি কীর্তি এত ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর বিজড়িত এবং যে সমস্ত স্থানে গ্রন্থকারকে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে তাহাদের বর্ণনায় তিনি এত অধিক বিনয়ী যে, তাঁহার ভ্রমণের মানচিত্র পুনরাংকন অত্যন্ত দুরূহ। উদাহরণস্বরূপ সিন্ধু সম্পর্কিত আলোচনা স্মরণ করা যায়। পরিবেশিত তথ্যের যথার্থতা

কি প্রমাণ করে ? তথ্যদাতাগণের নির্ভরযোগ্যতার দরুন না পর্যটকের ভ্রমণলিপির কারণে নিশ্চিতভাবে ইহা বলা যায় না। ইহা প্রায় নিশ্চিত যে, আল-ইস্‌তাখরী আরবদেশ (অন্ততপক্ষে মক্কা), ইরাক, খুযিস্তান, দায়লাম ও ট্রান্স-অক্সিয়ানা ভ্রমণ করেন।

আল-ইস্‌তাখরীর পরবর্তিগণ তাঁহার গ্রন্থের মূল্য অথবা তাঁহার পদ্ধতির মৌলিকতা সম্বন্ধে প্রভাবিত হন নাই। তাঁহার সমালোচনা সত্ত্বেও আল-মুকাদ্দাসী ইহা ব্যবহারে দ্বিধা করেন নাই ; যেমন করিয়াছেন য়াকূত ও হুদূদু'ল-'আলাম-এর অজ্ঞাত গ্রন্থকার। এই সকল গ্রন্থকারের তুলনায় ইব্‌ন হাওকাল আল-ইসতাখরীর বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত উত্তরাধিকারী ছিলেন। ইব্‌ন হাওকাল (অনু. Wiet, ৩২২) লিখিয়াছেন, আমি আবূ ইসহাক আল-ফারিসীর সাক্ষাত লাভ করিয়াছি। তিনি সিন্ধু দেশের যথাসম্ভব কাছাকাছি (অবিকল) মানচিত্র অংকন করিয়াছেন, যদিও ইহাতে তিনি কতিপয় ভুল করিয়াছেন। তিনি ইহা ব্যতীত ফার্‌স-এর মানচিত্র অংকন করিয়াছেন, যাহা অতি চমৎকার। আমি স্বয়ং আযারবায়জান-এর একটি মানচিত্র অংকন করিয়াছি যাহা তিনি অনুমোদন করিয়াছেন এবং যাহা পরবর্তী পৃষ্ঠাতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন আমি উত্তর মেসোপটেমিয়ারও একটি মানচিত্র অংকন করিয়াছি যাহা তিনি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়াছেন। অবশ্য তিনি আমার অংকিত মিসরের মানচিত্রটি নিকৃষ্ট বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন এবং মাগরিব-এর মানচিত্রটিও অধিকাংশ ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করেন। ইহার পর তিনি আমাকে বলেন, আমি তোমার জন্ম সম্পর্কে সযত্ন অধ্যয়ন করিয়াছি এবং তোমার রাশিচক্র গঠন করিয়াছি। আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, আমার রচনাবলীর যে কোন স্থানে কোন ভ্রম পাওয়া গেলে তাহা তুমি সংশোধন করিবে। আমি একাধিক স্থানে কিছু কিছু পরিবর্তন করি এবং ইহা তাঁহারই নামে প্রকাশ করিতে আগ্রহী হই। তবে পরবর্তী কালে আমি এই রচনাটির কেবল সম্পাদনার সহিত আমার নাম যুক্ত করা সঙ্গত মনে করিয়াছি। ইব্‌ন হাওকালের নিশ্চিত মতামতসমূহ এবং আল-ইস্‌তাখরী প্রসঙ্গে প্রায়শই তাঁহার সংযমের অভাব বাস্তপক্ষে ইস্‌তাখরীর অনুকূলে কার্যকরী হইয়াছে। তাঁহার রচনা অধ্যয়নকালে পাঠককে প্রায় বিস্মৃত হইতে হয় উস্তাদের নিকট শাগরিদের ঋণ কতখানি। কিন্তু ইব্‌ন হাওকাল (দ্র.)-এর রচনাবলীর প্রকৃত মূল্য যাহাই হউক না কেন, ইঁহার একাধিক পৃষ্ঠার সযত্ন অধ্যয়নে ইহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে যে, তিনি তাঁহার পূর্ববর্তীর নিকট কতখানি ঋণী। ইব্‌ন হাওকালের স্বীকারোক্তির তুলনায় কত অধিক পরিমাণে তিনি ঋণী (উদাহরণস্বরূপ দ্র. A. Miquel, Geographie humaine, ৩৬৭-৯০)। সুতরাং যখনই কোন ব্যক্তি এমন কোন রচনা পাঠ করেন, যাহা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে একটি যৌথ প্রচেষ্টা বলিয়া প্রমাণিত এবং যাহাতে আল-বালখী, আল-ইস্‌তাখরী ও ইব্‌ন হাওকালের ব্যক্তিগত গুণাগুণ পৃথকভাবে নির্ণয় করা যায় না, তখন পাঠকের জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন অপরিহার্য।

কিতাবু'ল-মাসালিক ওয়া'ল-মামালিক-এর মূল পাঠটির অংশবিশেষ J. H. Moeller (Liber climatum, Gotha ১৮৩৯ ; অনু. A. D. Mordtmann, Das Buch der Lander, হামবুর্গ ১৮৪৫ খৃ.) কর্তৃক সম্পাদিত ; A. Madini (মিলান ১৮৪২ খৃ.) ইহার একটি অংশবিশেষের (সিজিস্‌তান সম্পর্কে) অনুবাদকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহার পরবর্তী সং. De Goeje (BGA, ১ খ. Leiden ১৮৭০ ও ১৯২৭ খৃ.)-এর এবং আরও পরবর্তী সং. M. G. Abd al-Al alHini (কায়রো ১৩৮১/১৯১৬)-এর।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্‌ন হাওকাল Kramers-Wiet, X, XIII, XIV, XVI, ১৩, ৩১, ৩১৮ (n. ৫৪৫), ৩২২ ; (২) মুকাদ্দাসী, আহসানু'ত-তাকাসীম ফী মা'রিফাতি'ল-আকালীম ; (৩) হুদূ'দুল-'আলাম, ১৭,-১৯, ২১-২ ; (৪) য়াকূত, মু'জামু'ল-বুলদান, অনু. W. Jwaideh, The introductory chapters of Yaqut's Mu'jam al-buldan, Leiden ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১০ ; (৫) কাহহালা, ১০৪ ; (৬) M. Reinaud, Introduction generale a la geographie des Orientaux (Geographie d'Aboul feda), ১খ. প্যারিস ১৮৪৮ খৃ., ৮১ প. ; (৭) ঐ লেখক, Memoire geographique, historique et scientifique sur l'Inde, প্যারিস ১৮৪৯ খৃ., ২২ ; (৮) De Goeje, Die Istakhri-Balkhi-Frage, in ZDMG, ২৫খ, ৪২ প. ; (৯) Brockelmann, S I. ৪০৮ ; (১০) J. H. Kramers, L'influence de la tradition iranienne dans la geograpie arabe, in Analecta orientalia, ১খ, Leiden ১৯৫৪ খৃ., ১৪৮-৫৬; (১১) ঐ লেখক, La Litterature geographique classique des Musulmans, ঐ, ১৯৫ প.; (১২) Blachere-Darman, Extraits des principaux geographes arabes du moyen age, প্যারিস ১৯৫৭ খৃ., ১১২-৩, ১৩৪-৫; (১৩) I. Yu. Krackovskiy, Arabskaya geograficeskaya literatura, মস্কো-লেনিনগ্রাড ১৯৫৭ খৃ., ১৯৬-৮ [S. D. Uthman Hashim-কৃত আরবী অনুবাদ (এখন পর্যন্ত অনুচ্ছেদ ১-১৬ প্রকাশিত), কায়রো ১৯৬৩ খৃ., ১৯৯-২০০] ; (১৪) A. Miquel, Geographique humaine, Paris-The Hague ১৯৬৭ খৃ., নির্ঘণ্ট।

A. Miquel (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইমাদু'দ্দীন

**ইস্‌তান** (দ্র. উস্‌তান)

**ইসতানবুল বা ইস্তাম্বুল** (استنبول) ঃ তুর্কী 'উছমানী সাম্রাজ্যের রাজধানী, ২০ জুমাদাল-উলা—১,৮৫৭/২৯ মে, ১৪৫৩ হইতে শুরু করিয়া ৩ রাবীছানী, ১৩৪২/১৩ অক্টোবর, ১৯২৩ পর্যন্ত এখান হইতে বিশাল সাম্রাজ্য শাসিত হইয়াছিল। একেবারে কড়াকড়ি 'উছমানিয়া ব্যবহারের দিক হইতে এই নামটি দ্বারা Golden Horn- মারমারা উপকূল ও থিওডোসিয়াস-এর দেওয়াল পর্যন্ত এলাকাকে বুঝান হইয়া থাকে, গালাতা, উসকুদার ও এয়ূব জেলাগুলি ভিন্ন ভিন্ন উপশহর, এইগুলির প্রতিটির জন্যই আলাদা আলাদা কাদী রহিয়াছেন, তবে কখনও কখনও এই সমগ্র এলাকাকেই ইস্তাম্বুল বলা হইয়া থাকে।

**নাম** ঃ আনাতোলিয়ার সালজূক সালতানাতের আমলে (দ্র. কামালু'দ-দীন আকসারায়ী, মুসামারাতু'ল-আখবার, সম্পা. ও. তুরান, আঙ্কারা ১৯৪৪, খৃ. নির্ঘণ্ট, পৃ. ৩৪৪) ও 'উছমানিয়া শাসনের প্রাথমিক আমলে (দ্র. Die altosm. anon. Chroniken, সম্পা. F. Fiese, Breslau 1922, 8.28, 33 ইত্যাদি) (استنبول) "ইসতিনবোল", "ইসতানবোল" বা "ইসতানবুল" ঐরূপ লেখা হইত ; "ইসতিনবোল"—এই উচ্চারণ যে ৮ম/১৪শ শতকে করা হইত তাহার

প্রত্যায়ন করিয়াছেন J. Schiltberger (Pauly-Wissowa, দ্র. Constantinopolis Oberhummer), [তু. ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের জন্য আর্মেনীয় রূপ Stampol " H. Dj. Siruni, in Studia et Acta Orientalia, iii, 1960, 164]। ستنبول (স) "(ি) তনবোল", "সৃত ( ا ) নবাল"-এই দুইটি রূপের ব্যবহার দেখা যায় 'উছমানিয়া কবিতাতে [লাতীফী (দ্র.) এভসাফ-ই ইসতানবুল, পাণ্ডু.]।

আল-মাস্'উদী (তানবীহ, পৃ. ১৩৬) ৪র্থ/১০ম শতকে উল্লেখ করিয়াছেন যে, গ্রীকরা এই শহরটিকে বলিত "বুলিন" ও "স্টানবুলিন"; ১০ম/১৬শ শতকের শেষদিকে F. Moryson (An itinerary...., ii, 97) লিখিয়াছেন যে, গ্রীক অধিবাসীরা শহরটিকে বলিত "স্টিমবোলি—Stimboli", কিন্তু তুর্কীরা বলিত "স্তামবোল"। বর্তমানে বিষয়টি প্রশ্নাতীত যে, তুর্কী উচ্চারণ, রূপগুলি [স্তিনবোল/স্তানবাল> ইসতিন (ম) বোল/ইসতান (ম) বোল> ইসতান (ম) বুল]—এইগুলি সবই গ্রীক eistenpolin হইতে সংগৃহীত হইয়াছে (কনস্টান্টিনোপেলিস>, কন্সটান্টিনোপোল এই আহরিত রূপের বিরুদ্ধে মত পোষণকারিগণের বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. Oberhummer, পূ. স্থা.; D. J. Georgacas, The name of Constantinople, in American Philological Association" Transactions, lxxviii, 1947, 347-67)।

ধ্বনি সাদৃশ্যের অলঙ্কারযুক্ত নাম ইসলাম-বোল ("যেখানে ইসলাম বিরাজিত") নামটি এই শহরের বিজেতা সুলতান ২য় মুহাম্মাদ (দ্র.) দিয়াছিলেন বলিয়া একটি সমমাসয়িক আর্মেনীয় তথ্য হইতে (দ্র. সিরুনি, পূ. গ্র., ১৭৩) জানা যায় (তিনি এই রকম আরও যে সকল অর্থবহ নাম আবিষ্কার করিয়াছিলেন সেগুলির বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. বোগায-কেসেন, এলবাসান, বুগুর দেলেন)। ৯ম/১৫শ শতকের দলীলপত্রে এই নাম পাওয়া যায় (যেমন আয়া সোফিয়া এভকাফ দেফতেরি, মালিয়ে নং ১৯; তারিহ ভেসিকালারি, ২/৭, ৩৭)। ১১শ/১৭শ শতকের শিক্ষিত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এই ইসলাম বোল-কে মনে করিতেন যে, উহা শহরটির 'উছমানী নাম (দ্র. আওলিয়া চেলেবি, ১খ., পৃ. ৫৫-৬) এবং ১১৭৪/১৭৬০ সালে একটি ফরমান জারী করিয়া ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয় যে, মুদ্রার গায়ে টাঁকশাল হইতে যে কাসতানতিনিয়্যি অঙ্কিত হইত উহার বদলে এই নাম ব্যবহার করিতে হইবে (এই পাঠটি দেওয়া আছে এ. রেফিক, ইস্তাম্বুল হায়াতি, ১১০০-১২০০ গ্রন্থে, পৃ. ১৮৫)। তবে জনসাধারণ সচরাচর ইসতানবুল ইস্তাম্বুল—এই উভয় রূপই ব্যবহার করিত। বর্তমানে সরকারীভাবে শহরটির নামের উচ্চারণ স্থির করা হইয়াছে ইস্তানবুল।

৩৩০ খৃ. হইতে প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্যে ইহার রাষ্ট্রীয় নাম ছিল কনস্টান্টিনুপোলিস (এই নামটির বিভিন্ন রূপের বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. Oberhummer, পূ. স্থা.)। আরব ও পারস্যবাসিগণ সরকারীভাবে ও সাহিত্যে ইহাকে বলিত কু(ন)সতানতীনিয়্যা, 'উছমানিয়া শিক্ষিত সমাজে ও 'উছমানিয়া দীওয়ানে এই রূপটিই ব্যবহৃত হইতে থাকে, ফরমানে ওয়াকফিয়াতে ও মুদ্রার গায়েও এই রূপটিই প্রচলিত থাকে (দ্র. Die alt. anon. Chr, সম্পা. Giese, 28, 74, 78, etc.)।

থ্রেসীয় উদ্ভূত যে আদি নাম বায়যানটিয়াম (দ্র. Oberhummer, পূ. স্থা.) তাহার উল্লেখ মাঝে মাঝে পাওয়া যায় 'উছমানী দলীলপত্রাদির পাঠে শহরটির সাবেক নামরূপে। তাহা ছাড়া নামটির 'আরবী ও আর্মেনীয় বিভিন্ন রূপও পাওয়া যায়, যেমন বায়যানতিয়া, বায়যানদিয়া, বুযানতিয়্যে, পুযানতা, বুযান্তিস [দ্র. (১) E.I²., i, 889; (২) আওলিয়া চেলেবি, ১খ., পৃ. ৫৫; (৩) সিরুনি, পূ. গ্র., পৃ. ১৬৪]।

রূমিয়্যাতু'ল-কুবরা, তখ্ত-ই রূম ও গুলশু'ল-ই রূম— এই নামগুলি বিভিন্ন মুসলিম সাহিত্যে পাওয়া যায় (দ্র. আওলিয়া চেলেবি, পূ. গ্র.), এইগুলি সবই প্রাথমিক আমলের বায়যান্টীয় নাম, যথা (নোভা) রোমা, (নেয়া) রোম (Rhome)।

ইসলামী দীওয়ানসমূহের দলীলপত্রে উল্লেখের বেলাতে শহরকেও বিশিষ্ট মানুষের প্রতি যেরূপ তেমনি বিশেষ বিশেষ গুণজ্ঞাপক ও কল্যাণকর বলিয়া কথিত নাম (দু'আ-বরকতের উদ্দেশে) প্রদান করা হইত। 'উছমানীগণ ইস্তাম্বুল সম্বন্ধে যে সকল পরিচিতি ব্যবহার করিতেন সেইগুলি হইতে কেন্দ্রীয়ভূত কর্তৃত্বের মুসলিম ও ইরানী ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন পায়তখত-ই সালতানাত, তখতগাহ-ই সালতানাত, মাকারর-ই সালতানাত, দারু'স-সালতানা, দারু'ল-খিলাফা; ইহা ব্যতীত দারু'ন-নাস্র, মাদীনাতু'ল-মুওয়াহহিদীন-ও ব্যবহৃত হইত (তু. প্রবন্ধ ইসলাম-বোল)। ঐতিহ্যগত ধারণার অনুবৃত্তিক্রমে যে শাসকের কর্তৃত্ব ও 'সৌভাগ্য' পরস্পর যুক্ত (প্রাচীন তুর্কী আভিজাত্যের সাহিত্য কুত, কুতলুগ-এ ইহা লিখিত রহিয়াছে) এবং ন্যায়বিচার প্রথমে সুলতানের দরজা হইতেই শুরু করা হইয়া থাকে, ইস্তাম্বুলকে বুঝাইবার জন্য প্রায়শ এই নামগুলি ব্যবহৃত হয়; যথা দের-ই সা'য়াদেত (দের-সাদেত) আসিতানে। সচরাচর যে কল্যাণকর শব্দ দ্বারা ইস্তাম্বুলকে বুঝানো হইয়া থাকে তাহা হইল আল-মাহমিয়্যা বা আল-মাহরূসা অর্থাৎ 'সুরক্ষিত' (আল্লাহর ইচ্ছায় সকল বিপদ-আপদ হইতে রক্ষিত) দীওয়ানের দলীলপত্রে সচরাচর ইস্তাম্বুলকে বুঝাইতে লেখা হইত দারু'ল-খিলাফা আল-'আলিয়্যা ভে মাকার-ই সালতানাত-ই সেনিয়েমে ওলান মাহমিয়্যে- কসতানতিনিয়্যে" (দ্র. এ. রেফিক, পূ. গ্র. পৃ. ১১০)।

কুরআনের যে বাক্যাংশ (بلدة طيبة) সূরা ৩৪, আয়াত ১৪/১৫ এই বর্ণগুলির সংখ্যা (আবজাদ হিসাবে) হইতে ... 'উছমানীগণ এই শহর বিজয়ের সন নির্ধারিত করিয়াছিল (৮৫৭/১৪৫৩) এবং অপর একটি বাক্যাংশ হাসরাতু'ল-মুলূক (দ্র. আওলিয়া চেলেবি, ১খ., পৃ. ৩৩, ৫৫), সেগুলি ইস্তাম্বুলের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় শুধু কাব্যিক ভাবের ক্ষেত্রে। গ্রীক ভাষাতে যেরূপ— ঠিক তেমনই 'উছমানিয়া ব্যবহারের বেলাতেও ইস্তাম্বুলকে প্রায়শ শুধু শেহির (শহর) বলিয়াই উল্লেখ করা হইত (দ্র. ইস্তাম্বুল ভাকিফলারি তাহ্রির দেফতেরি, নং ৭২৭)।

নিবন্ধের নিম্নলিখিত অংশে শুধু 'উছমানী শহর ইস্তাম্বুল সম্বন্ধেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হইবে। ১৪৫৩ খৃ.-এর আগে এই শহর দখল করিবার জন্য যে মুসলিম অভিযানসমূহ প্রেরিত হইয়াছিল, মুসলিম পর্যটকগণ এই শহরটির যে বিবরণ দিয়া গিয়াছেন ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য দ্র. প্রবন্ধ কুসতানতীনিয়্যা। বসফরাস-এর বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. বোগাযিচ ইচি। যে সকল উপশহর ইস্তাম্বুলের সঙ্গে অত্যন্ত নিকটভাবে যুক্ত সেগুলির জন্য দ্র. এয়্যুব, গালাতা (পরিশিষ্টে) ও উসকুদার।

**১। ইস্তাম্বুল বিজয়ের ফলাফল**

**৮৬১/১৪৫৭ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলী**

'উছমানীগণ যে পরিস্থিতিতে কনস্টান্টিনোপল শহরটি দখল করিয়াছিল সেগুলিই উহার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নির্ধারণ করে। সুলতান ২য় মুহাম্মাদ বা ফাতিহ (বিজয়ী) মুহাম্মাদ (দ্র.) যখন শহরটি আক্রমণ

করিবেন বলিয়া মনস্থ করেন এবং স্বীয় সৈন্যগণের নিকট ওয়াদা করেন যে, মাত্র তিন দিনে তিনি শহর দখল করিবেন, তখন ঘোষণা করিয়াছিলেন, "শহরের পাথর, জমিন আর মালিকানা হইবে আমার, আর যত সম্পদ আছে, মালামাল আছে, বন্দী, খাদ্য ও যুদ্ধলব্ধ মাল সকলই হইবে সৈন্যদের" (দ্র. এইচ. ইনালচিক, in Dumbarton Oaks Papers xxiii-xxiv, 1969-70, 232-5)। সেই ঘোষণার ফল হইয়াছিল এই যে, শহরটির পূর্বেকার অধিবাসীদের কেহই আর সেখানে ছিল না এবং বায়যান্টীয় আমলে ইহার যে বৈশিষ্ট্য ছিল সেইগুলিরও আমূল পরিবর্তন ঘটে। 'উছমানী বাহিনী ২০ জুমাদা-১, ৮৫৭/২৯ মে, ১৪৫৩ সালে প্রত্যুষে নগর প্রাচীরে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিয়া সেই পথে শহরের ভিতরে প্রবেশ করে এবং প্রবল প্রতিরোধ মুকাবিলা করিতে করিতে আয়া সোফিয়া (Hagia Sophia) অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু কিছু সংখ্যক প্রতিরোধকারীর সংগ্রামের মুখে তাহাদের অগ্রগতি সাময়িকভাবে ব্যাহত হইতে থাকে [ক্রীটের নৌ-সেনারা আলেক্সিয়াস-এর বুরুজে মধ্যরাত্রির পর পর্যন্ত প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে, দ্র. (১) Sphrantzes, অনু. Ivanka, 80; (২) তু. Braun-Schneider, Bericht, 32] এবং বিকালের মাঝামাঝি সময়ে যুদ্ধ শেষ হয়। জীবিত সকল ব্যক্তিকেই বন্দী করা হয় এবং নগর প্রাচীরের বাহিরে অবস্থিত জাহাজে বা 'উছমানী তাঁবুতে লইয়া যাওয়া হয় [দ্র. (১) তুরসুন, পৃ. ৫৫ ; (২) Critoboulos, অনু. Riggs, 76 ; (৩) তাজী বেগযাদে, পৃ. ২১]। সুলতান বিজয়ী মুহাম্মাদ অতঃপর এই কনস্টান্টিনোপল শহরেই তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিবেন বলিয়া স্থির করেন। তিনি আর কোন হত্যা বা ধ্বংসকাণ্ড চাহেন নাই এবং সেদিন বিকালেই যুদ্ধ বন্ধের আদেশ প্রদান করেন। স্বল্প সময়ের জন্য একবার তিনি শহরটি ঘুরিয়া দেখেন [দ্র. (১) Ducas, সম্পা. Grecu, 375 ; (২) Sphrantzes-এর বিবরণ অনুযায়ী তিনদিন পর্যন্ত লুণ্ঠন চলিয়াছিল, কিন্তু পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, ৩০ মে-এর পর হইতে আর কোন বড় রকমের লুণ্ঠন বা ব্যাপকভাবে বন্দি করিবার ঘটনা ঘটে নাই ]। ৩০ মে তারিখে সুলতান বিজয়ী মুহাম্মাদ জাঁকজমকের সঙ্গে নগরে প্রবেশ করেন (দ্র. তাজী বেগযাদে, পৃ. ২২)। তিনি শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখেন, ভবনসমূহ পরিদর্শন করেন এবং পোতাশ্রয় সংলগ্ন জলাভূমি পরিদর্শন করেন। আয়া সোফিয়াতে প্রবেশ করিয়া তিনি ঘোষণা করেন যে, অতঃপর উহা হইবে প্রধান জামি' মসজিদ (জামি'-ই কেবীর) [দ্র. (১) তাজী বেগযাদে, পৃ. ২৩; (২) তুরসুন, পৃ. ৫৬-৭] এবং ইহাও ঘোষণা করেন যে, তখন হইতে ইস্তাম্বুলই হইবে তাঁহার সাম্রাজ্যের রাজধানী (তখ্ত) [দ্র. ইনালচিক্, পূ. গ্র., ২৩৩]। তাঁহার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল নগরবাসিগণকে উৎসাহিত করা, সেইজন্য বিজয়ের তৃতীয় দিবসে তিনি 'আমান' ঘোষণা করেন ঃ পলাতক যে কোন ব্যক্তি একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নগরে ফিরিয়া আসিলে তাহার নিজ বাড়ী অধিকার করিতে পারিবে এবং নিজস্ব ধর্মও পালন করিতে পারিবে। আর গ্রীকদেরকে বলা হয় যে, তাহারা নিজেদের ধর্মীয় প্রধান হিসাবে একজন প্যাট্রিয়র্ক নির্বাচন করিতে পারিবে [দ্র. (১) Sphrantzes, অনু. Ivanka, 85 ; (২) তু. Zorzo Dolfin ch. xviii]।

১৩ জুমাদা-২/২১ জুন এদীরনেতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সুলতান শহরের কারীশদীরান সুলায়মান বেগ নামে এক ব্যক্তিকে সুবাশী (সামরিক কর্মকর্তা) নিযুক্ত করিয়া তাঁহার অধীনে ১,৫০০ জানিসারী সৈন্য রাখিয়া আসেন এবং খিদ্'র বেগ চেলেবিকে কাদী নিযুক্ত করেন। তিনি ভাঙ্গা নগর দেওয়ালসমূহ মেরামতের হুকুম দেন, Golden Gate-এর পার্শ্বে একটি দুর্গ (য়েদি কুলে) নির্মাণের এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে Forum Tauri-তে তাঁহার জন্য একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণের আদেশ দিয়া যান (পরবর্তী কালে সেই স্থানটির নাম হয় এস্কি সারায়)। শহরে পুনরায় জনবসতি স্থাপনের উদ্দেশে তিনি শাসক হিসাবে তাঁহার সম্মুখে আনীত পঞ্চম বন্দীদলকে সপরিবারে "নগরের পোতাশ্রয়ের কূল ধরিয়া" অর্থাৎ Golden Horn এলাকাতে বসতি স্থাপন করিতে দেন। তিনি তাহাদিগকে বসবাসের জন্য ঘর-বাড়ী প্রদান করেন এবং "একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খাজনাও মওকুফ করিয়া দেন"। বিজয়ের ঠিক পরেই তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, Megadux Lucas Notaras-কে শহর প্রধান নিযুক্ত করিয়া তাহাকেই পুনর্বাসনের দায়িত্ব প্রদান করিবেন, কিন্তু উযীরগণের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত তিনি তাহা করেন নাই। Notaras অন্যান্য বায়যান্টীয় প্রধান ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় (দ্র. ইনালচিক, পূ. গ্র., ২৪০)। যে সকল বন্দী মুক্তিপণ দিয়াছিল বা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে স্বীকার করিয়াছিল তাহাদেরকে তিনি শহরে পুনর্বাসনের আদেশ প্রদান করেন, তাহাদেরকে বসতবাড়ী প্রদান করেন এবং সাময়িকভাবে খাজনা রেয়াত প্রদান করেন। এই ধরনের বন্দিগণকে তিনি নির্মাণ প্রকল্পসমূহে কাজ করিয়া প্রদেয় মুক্তিপণ উপার্জন করিবার সুযোগ দান করেন [দ্র. (১) Critobulos, 83, 93 ; (২) Sphrantzes, পূ. স্থা. ; (৩) N. Barbaro, ইং অনু. New York 1969, 72]। অবরোধ শুরু হইবার আগেই অনেক অধিবাসী নগর হইতে পলায়ন করিয়াছিল (দ্র. Sphrantzes, 47), অনেকে নগর দখল ও লুণ্ঠনের কালে আত্মগোপন করিয়াছিল, অনেকে গালাতাতে পলায়ন করিয়াছিল। ইহারা সকলে ও পণমুক্ত বন্দিগণই হয় শহরের প্রথম গ্রীক অধিবাসী ; তাহারা যে সংখ্যায় কম ছিল উহা ৮৬০/১৪৫৫ সালের আদমশুমারী (তাহ্রীর) হইতেই জানা যায় (উহার বিষয় জানিবার জন্য নিম্নে দ্র.)। উহা হইতে আরও সমর্থন পাওয়া যায় যে, কোন কোন গ্রীক যে ইসলাম কবূল করিয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে তাহা যথার্থ ছিল (বহু সংখ্যক বন্দীকে এদীরনে, বুরসা ও গেলিবোলুতে নিয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল)। ভেনিসীয়গণকে সুলতানের ঘোষিত আমানের বাহিরে রাখা হইয়াছিল ঃ বাইলো Girolamo Minotto ও তাঁহার পুত্রের প্রাণদণ্ড হয় ; আরও ২৯ জন বিশিষ্ট ভেনিসীয় মুক্তিপণ দিয়া প্রাণে বাঁচিয়া যায় ; কিন্তু তাহাদের পুরুষ সন্তানদেরকে 'আজেমী ওগলান (দ্র.) বাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে ভর্তি করা হয়। ভেনিসীয়গণ ১৯ রাবী'-২, ৮৫৮/১৮ এপ্রিল, ১৪৫৪ সনে সম্পাদিত আত্মসমর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরের পরেই শুধু স্থানীয়ভাবে বসবাস করিবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভ করে। শহরটির পুনর্বাসনের জন্য সর্বাধিক কার্যকর যে ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল তাহা অবশ্যই ছিল সূরগুন (দ্র.) অর্থাৎ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে মানুষ আনাইয়া বাধ্যতামূলকভাবে এখানে পুনর্বাসন করানো। ইস্তাম্বুল ত্যাগের আগে সুলতান ২য় মুহাম্মাদ ফরমান জারী করিয়া যান যে, রুমেলি ও আনাতোলিয়া হইতে যেন মুসলমান, খৃস্টান ও য়াহূদী পরিবারকে বসবাস করিবার জন্য ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করা হয় [দ্র. (১) Critoboulos, 93 ; (২) Ducas, সম্পা. Grecu, 393]।

সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ৫,০০০ পরিবার পাঠান হইয়াছিল ঃ Jorna প্রকাশিত একটি দলীল অনুযায়ী (Notes et extraits, iv. 67), আনাতোলিয়া হইতে ৪,০০০ পরিবার এবং রুমেলি হইতে ৪,০০০ পরিবার পাঠান হয়। ১৪৫৩ খৃ. শরৎকালে সুলতান ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া আসেন। তিনি যখন দেখিতে পান যে, স্থানান্তরিত করিবার বিরোধিতাহেতু শহরে পুনর্বাসনের কাজ শ্লথ গতিতে হইতেছে তখন তিনি বুরসাতে গমন করেন এবং কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন (দ্র. ইনালচিক, পূ. গ্র., পৃ. ২৩৭)। এই সময়েই তিনি George Scholarius-কে গির্জা প্রধান নিযুক্ত করেন (৬ জানুয়ারী, ১৪৫৪) [দ্র. (১) ইনালচিক, পূ. গ্র., পৃ. ২৩৬ ; (২) Runciman, Fall, 155]। ৮৫৯/১৪৫৫ সালের শরৎকালে পুনরায় তিনি যখন ইস্তাম্বুল আগমন করেন তখন দেখিয়া খুশী হন যে, দেওয়ালের মেরামত কাজ সমাপ্ত হইয়াছে এবং য়েদি কুলে ও রাজপ্রাসাদের নির্মাণ কাজ শেষ হইয়াছে। কিন্তু তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে, মুসলিম বসতকারীরা শহর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে তখন তিনি আদেশ জারী করেন যে, আনাতোলিয়া ও রুমেলী হইতে সৃরগুন পরিবারগুলিকে অবিলম্বে যেন পুনরায় ইস্তাম্বুলে ফেরত পাঠানো হয়।

মুহাররাম ৮৬০/ডিসেম্বর ১৪৫৫ তারিখ যুক্ত ইস্তাম্বুল ও গালাতার তাহ্রীর দেফতেরির একটি ছিন্ন অংশ অদ্যাবধি টিকিয়া আছে, সেই পাতাগুলিতে ফাতিহ জেলা, আকসেরাইয়ের অংশবিশেষ এবং স্থলভাগের দেওয়াল এলাকা ধরিয়া অঞ্চল ও মারমারা উপকূল অঞ্চলের বিষয় উল্লিখিত আছে (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.)। ২২টি মাহাল্লেতে ৯১৮টি খানে (এখানে 'ঘর') তালিকাভুক্ত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ২৯১ টিকে 'শূন্য' বা 'ধ্বংসের সম্মুখীন' বলিয়া তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। বাড়ীগুলির পার্থক্য করা হইয়াছে একতলা (সুফলী), দোতলা ('উলবী) ও বড় বাড়ী বলিয়া ; বিলাসবহুল (মুকেল্লেফ) বাড়ীগুলিকে গ্রীকরা বলিত 'ড্রাপেয'। কোন কোন বাড়ীর বর্ণনা পাওয়া যায় যে, সেগুলি তিন বা চারটি অংশে বিভক্ত ছিল অথবা একের অধিক পরিবার একই বাড়ীতে বাস করিত। এক বা দোতলা চারদাক-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, এইগুলি ছিল মঠের এলাকার মধ্যে [এইরূপ বসবাসের জন্য দ্র. (১) Buondelmonte and Vavassore-এর নকশা ; (২) Oberhummer, Konst. unter Sultan Suleiman, pp.19, 22 ; (৩) F. Babinger, Drei Stadtansichten . . . , 1959, p. 4)। যে ২৬টি মঠ তালিকাভুক্ত পাওয়া যায় তন্মধ্যে একটিতে অদ্যাবধি গ্রীকরা বসবাস করিতেছে ; বাদবাকীগুলি হয় পরিত্যক্ত হইয়াছে অথবা সেগুলিতে বহিরাগত মুসলিমগণ বসবাস করিতেছে। তালিকাতে ৪২টি গির্জার উল্লেখ রহিয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশগুলিই মঠের এলাকার মধ্যে অবস্থিত ছিল। মাত্র দুইটি এখন পর্যন্ত গ্রীকদের অধিকারে আছে, কিন্তু আলতী মেরমের মাহাল্লের গ্রীকরা সেখানকার একটি বড় বাড়ীকে তাহাদের গির্জারূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। পাঁচটি গির্জাতে মুসলিম বহিরাগতরা বসবাস করিতেছে, একটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। অন্যান্য অধিকাংশগুলিতে বর্তমানে আর প্রার্থনাকারী জমায়েত হয় না বলিয়া ধ্বংসের পথে পড়িয়া আছে।

ইস্তাম্বুলের প্রথম বড় মসজিদ ছিল আয়া সোফিয়া। ইস্তাম্বুলকে একটি 'উছমানী শহররূপে গড়িয়া তুলবার প্রাথমিক স্তরগুলির পরিচয় পাওয়া যায় সেখানকার ওয়াকফসমূহের পঠন-পাঠন হইতে। আয়া সোফিয়ার মসজিদ ও মেদ্রেসে (মাদ্রাসা) ব্যতীত সেগুলির মধ্যে রহিয়াছে অন্যান্য বায়যান্টীয় ধর্মীয় ভবন, সেগুলি বর্তমানে মুসলিমগণের মালিকানা ও ব্যবহারে রহিয়াছে মেইরেক জামি'ই ও উহার মেদ্রেসে (গ্রীক আমলে সেখানে সকলের সম অধিকার ছিল) (দ্র. S. Syice, Istanbul, 57), গালাতা জামি'ই/ 'আরাব জামি'ই (সেন্ট ডিমিনিক) [দ্র. Schneider and Nomidis, Galata, Istambul 1944, pp. 25, 28], সিলিভরীতে অবস্থিত দুর্গের মসজিদ, এসকি 'ইমারেত মসজিদ (পূর্বেকার St, Saviour Pantepoptes) (দ্র. Eyice, 68), মেভলেভী কনভেন্ট কালেন্দেরখানে [দ্র. (১) Schneider, Byzanz, 51 ; (2) Eyice, 54]। সুলতান ২য় বায়েযীদ-এর আমলে ইহা ছিল একটি মেদ্রেসে, অতঃপর মসজিদে রূপান্তরিত হয়। সুলতান ২য় মুহাম্মাদের যে বড় মসজিদ ('ফাতিহ') উহার নির্মাণ কাজ শেষ হয় মাত্র ৮৭৫/১৪৭১ সালে। সেই সময় পর্যন্ত নির্মিত মসজিদগুলি হইতেছে রূমেলি-হিসারী ; য়েনী কেরবানসারায়/চুখাজী খানী মসজিদ ; য়েদিকুলেতে অবস্থিত দেব্বাগলার মসজিদ ; য়েনিজে কাল'-এ/আনাদোলু হিসারী], এইগুলি সবই আয়া সোফিয়ার ওয়াকফ সংলগ্ন স্থানে নির্মিত।

৮৬১/১৪৫৭ সালে ২য় মুহাম্মাদ শহরে অবস্থিত সকল বায়যানটীয় ভবন আয়া সোফিয়ার ওয়াক্ফ সম্পত্তি হিসাবে নির্ধারিত করেন ; দলীলপত্র সেগুলি 'সুলতানী' ও 'মুকাতা'আলী'-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ৮৯৮/১৪৯২ সালে এই সকল মুকাতা'আলী ভবনের সংখ্যা ছিল ১৪২৮ (দ্র. আয়া সোফিয়া এভকাফি তাহ্রীর দেফতেরি, মালিয়ে ১৯)। এই সময়ের মধ্যে অবশ্য অনেক বাড়ীই প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। ৮৯৫/১৪৮৯ সালে গৃহীত একটি জরীপে যেহেতু ইস্তাম্বুল ও গালাতাতে ১০৯৩টি মুক াতা-'আলী বাড়ী ছিল বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে— "পাদিশাহ-এর কুলগণ কর্তৃক অধিকৃত বায়যান্টীয় বাড়িঘরসমূহ ছাড়া"—, "কাজেই এই শেষোক্তগুলির সংখ্যা অবশ্যই ৩৩৫ হইয়া থাকিবে। রীতি এরূপ ছিল যে, মুকাতা'আ (কার্যত খাজনা), কুল পরিবার কর্তৃক অধিকৃত কোন বাড়ীর উপর ধার্য করা হইবে না, যতদিন পর্যন্ত কুল বাস্তবে সেখানে বসবাস করে। অনুরূপভাবে সুলতান ২য় বায়াযীদ-এর শাসনামলে যে সকল বায়যানটীয় বাড়ী মুল্ক ('মুক্ত') হিসাবে মঞ্জুর করা হইয়াছিল সেগুলির উপর মুকাতা'আ খাজনা আরোপ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল (উহা অবশ্য আয়া সোফিয়ার ওয়াকফিয়্যার বিষয় চূড়ান্ত করিবার আগে অর্থাৎ ৮৬১/১৪৫৭ সালের আগে), কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু ২য় মুহাম্মাদ-এর আমলে এই খাজনা আরোপ করা হয় এবং একাধিকবার তুলিয়া লওয়া হয় (দ্র. ইনালচিক, পূ. গ্র., পৃ. ২৪১)। খোদ ইস্তাম্বুলে যে এরূপ ৫০২টি বাড়ী ছিল সেগুলি অবস্থিত ছিল আয়া সোফিয়া, সীরূত হাম্মামী (বেদেস্তানের নিকটে), হাজ্জী 'আবদী, হেকীম য়া'কূব, শাহীন উসকুবী (উনকাপানী ও জিবালির মধ্যে), এদীর্নে কাপীসী, উস্তাদ আয়াস (সার্রাজ খানে), আরসলানলু মাখযেন ও তোপ য়িকীগী (তোপকাপু) মাহাল্লেতে, এই অবস্থানগুলি হইতে প্রাক-'উছমানী যুগের জনবসতির কেন্দ্রীয় এলাকাগুলির ধারণা লাভ করা যায়।

এই সকল বায়যানটীয় ভবন ব্যতীত সুলতান ২য় মুহাম্মাদ আয়া সোফিয়ার ওয়াক্ফতে অন্য কতকগুলি করদায়ক প্রতিষ্ঠানও প্রদান করেন, যেন সেইগুলি হইতে জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন মিটাইতে পারে এবং লোকেরা যেন শহরে আসিয়া বাস করিতে অনুপ্রাণিত

হয়। সেগুলি ছিল বেদেতান ও উহার চতুর্দিকে নির্মিত বুয়ুক চারশী (নিম্নে দ্র.) ; বোদরুম কেরবানসারায়ী, এসকি কেরবানসারায়ী ও তাখতাকাল'এ-তে অবস্থিত য়েমিশ কাপানী কেরবানসারায়ী ; বেদেসতানের নিকটে অবস্থিত য়েনি/বেগ কেরবানসারায়ী; উন-কাপানী, য়েমিশ কাপানী ; তুয আনবারী, মুমখানে, সাবুনখানে, জেনদেরেখানে, দেব্বাগখানে, সেল্লাখানে, বোয়াখানে ও মুয়-তাবান কারখানেসি। এইগুলি ছাড়া আরও ছিল দুইটি গোসলখানা, ৪৬টি কসাইখানা, ৪১টি বাবুর্চিখানা, ২৮টি বোযাখানে, রুটির দোকানসমূহ ও শহরের বিভিন্ন স্থানে অবিস্থত প্রায় ২০০০ দোকান। এইগুলির মধ্যে অনেক দোকানই আয়তাকার স্থানে অবস্থিত ছিল অথবা মুখামুখি দুই সারিতে ছিল (দ্র. ক্ষুদ্র চিত্র, IA, প্রবন্ধ ইসতানবুল), প্রতি সারি কোন একটি বিশেষ কারুশিল্প বা শিল্প কারখানার জন্য নিয়োজিত ছিল।

২। 'উছমানী সাম্রাজ্যের রাজধানী উন্নয়নে গৃহীত নীতি-পদ্ধতিসমূহ

'উছমানী ইস্তাম্বুল নগরী গড়িয়া তুলিবার কালে যে মূল লক্ষ্য ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়াছিল তাহা ছিল এই যে, ইহা যেন একটি মুসলিম শহরের বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়, যাহাতে মুসলিম অধিবাসিগণ এখানে তাহাদের ধর্মীয় বিধানসমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করিবার সুযোগ লাভ করে এবং ঐতিহ্যগত মুসলিম নগর-জীবনের সুযোগ-সুবিধাসমূহ ভোগ করিতে পারে। এই নগরায়ন নীতিটি ছিল সুপ্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। উহা ছিল মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া উহার চতুর্দিকে শহর গড়িয়া তোলা এবং নাগরিক কর্মকাণ্ডসমূহকে ধর্মীয় বিধানসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। আয়া সোফিয়া ছিল অতি সুদৃশ্য প্রধান জামে' মসজিদ। সেইখানেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে ও শুক্রবার দিন জুমু'আর সালাতের সময়ে সুলতানের সঙ্গে মুসলিম সাধারণের সাক্ষাত ঘটিত, সুলতান স্বয়ং সেখানে প্রজাগণের নিকট হইতে আর্জি-আবেদন গ্রহণ করিতেন। সেইখানেই হইত বড় বড় সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও যে সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা নগরের জীবনধারা প্রবহমান রাখিত এবং নগরবাসিগণের কল্যাণ বিধান করিত সেগুলিও প্রথমে এই বড় মসজিদেরই ওয়াকফ সম্পত্তিরূপেই স্থাপিত হইয়াছিল (দ্র. Middle Eastern Cities, সম্পা. I. M. Lapidus, Berkeley 1969)।

এই 'ইসলামী' বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় শহরটির ভৌগোলিক উন্নয়ন হইতেও। ইহার প্রথম যে নাহিয়ে উহা হইতেছে আয়া সোফিয়ার নাহিয়ে। অন্য নাহিয়েগুলিও গড়িয়া উঠিয়াছে পরবর্তী কালের সুলতান ও উযীরগণ কর্তৃক নির্মিত জামে' মসজিদসমূহের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া, আর ছোট ছোট যে মাহাল্লেগুলি লইয়া নাহিয়ে গঠিত হইয়াছে সেগুলিও বিভিন্ন এলাকার মসজিদকে ঘিরিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথম হইতেই ইস্তাম্বুলকে ইসলামের একটি পবিত্র নগরীরূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়। বিজয়ের ঠিক পরে পরেই প্রাক-আয়্যুব এলাকা এই বৈশিষ্ট্যটি লাভ করে যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী আবূ আয়্যুব আল-আনসারী (রা)-র তুরবে নির্মাণ করা হয় [দ্র. (১) M. Canard, Les expeditions des Arabes.... 70 ; ইহার ওয়াকফিয়্যার জন্য দ্র. (২) Fatih Mehmet ii. Vakfiyleri, Ankara 1938, 283-340। আরও দ্র. (৩) এস. আনভের, ইসতানবু'লদা সাহাবে কাবিরলেরি, ইস্তাম্বুল-আঙ্কারা ১৯৫৩ খৃ. ; (৪) P. Wittek Ayvansaray, in Ann. del' Inst. De phl. et d'hist. Orientales et slaves, xi, Brussels 1951, 505-26]। সূফী দরবেশ ও শায়খগণের প্রতি 'উছমানীগণের গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল; সেইজন্যই অনেক দরবেশের নামে, তাঁহাদের যাভিয়ে (যাবিয়া) বা মাযারের এলাকা ঘিরিয়া মাহাল্লে গড়িয়া উঠিয়াছে বা মাহাল্লের নামকরণ হইয়াছে। সুলতান ২য় মুহাম্মাদের আমলেই সেরূপ অনেক দরবেশের নামে মাহাল্লের নামকরণ হইয়াছিল, যেমন শেয়খ এবু'ল-ভেফা (শায়খ আবু'ল-ওয়াফা); শেয়খ আক শেমসেদ্দীন, শেয়খ সেভিনদুক খালভেতী, ইনি কোভাজী দেদে নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন ; শেয়খ মাহমূদ রেশমী ও আরও অনেকে। শহরটিকে ইসলামীকরণের ইচ্ছার আরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়—এবং তাহা ২য় মুহাম্মাদের আমল হইতেই— সরকারী কাগজপত্রে প্রায়শ ইহাকে ইস্তাম্বুল না লিখিয়া লেখা হইত 'ইসলাম-বোল' অর্থাৎ মুসলমানে পূর্ণ শহর (দ্র. ইনালচিক, পূ. গ্র., পৃ. ২৪৬)। মাঝেমধ্যে ২য় মুহাম্মাদের ও পরবর্তী সুলতানগণের আমলেও মুসলিম চেতনাগত স্বকীয়তাবোধ জাগিয়া উঠিত, তখন কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করা হইত যেন খৃস্টান গির্জা ও য়াহূদী সিনাগগগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এই যুক্তিতে যে, শহরটি 'শক্তিবলে' জয় করা হইয়াছে; অতএব অমুসলিম যত অধিবাসী তাহাদের যিম্মীর মর্যাদা রক্ষার জন্য স্বয়ং শায়খু'ল-ইসলাম সাক্ষ্য প্রদান করিলেই যথেষ্ট হইবে (দ্র. ইনালচিক, পূ. গ্র., পৃ. ২৩৩, নং ১১)। নিরাপত্তার কারণেই অন্যান্য বিজিত শহরের ন্যায় এখানেও সুলতান ২য় মুহাম্মাদের মুসলিম সংখ্যাধিক্য রক্ষার নীতি গ্রহণ করা হয়।

'উছমানী সমাজের সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গীতে ইসলামী আদর্শকে খুব সহজেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া নেওয়া সম্ভব ছিল। ফলে প্রথম হইতেই বাণিজ্যিক জেলাগুলিতে মুসলিম ও অমুসলিমগণ পাশাপাশি সহযোগিতার মধ্য দিয়া কাজ করিয়া গিয়াছে, এমনকি (প্রথম দিকে) আবাসিক এলাকাসমূহে পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া বসবাস পর্যন্ত করে। অমুসলিমগণ নিজেদের মধ্যকার ব্যবসায়িক লেনদেনের বিষয়ে বিচার-আচারের জন্য কাদীর নিকটেই গমন করিত এবং আন্তর্জাতিক শহরের যে 'সহ-নাগরিকত্ববোধ' তাহাতে ধর্মের বৈষম্য বা জাতিগত বিভেদ কখনও সৃষ্টি হইতে দিত না। ইস্তাম্বুলের 'উছমানী রূপটি শুধু মুসলিম আদর্শ হইতেই উৎসারিত হয় নাই, রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্যগত যে ধারণা তাহাও কাজ করিয়াছে। ইহা একটি জীবনবোধ, উহার বৈশিষ্ট্য হইতেছে সমৃদ্ধ বণিকশ্রেণী ও কারুশিল্পিগণ, তাহারা সামরিক প্রশাসকগণের একটি শ্রেণীর শাসনাধীনে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কাজ করিয়া যাইতেছে (দ্র. এইচ. ইনালচিক, Capial formation . . . in J. Ec. Hist., xxix (1969), 98-140)। ফলে একই রূপ অর্থাৎ ওয়াকফ-এর উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠা রূপটি যে মধ্যপ্রাচ্যের অন্য শহরগুলিতে দেখা গিয়াছিল, তাহা ইস্তাম্বুলেও দেখা দেয়। এই ঐতিহ্যের কারণেই ব্যবসায়ী শ্রেণীর জন্য একটি বেয্যাযিস্তান ('উছমানী পরিভাষায় বেদেস্তান) নির্মাণ করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়; উহার নিকটেই নির্মাণ করা হয় কারাভানসেরাই (খান)-সমূহ। সেখানে সওদাগরগণ রাত্রিতে অবস্থান করিতেন। প্রধান প্রধান কারুশিল্পের কারিগরকে বেদেস্তানের চতুর্দিকস্থ বিশাল চারশীতে এক জায়গাতে স্থান দেওয়া হয়, একেকটি কারুশিল্পকে পরিকল্পিত সুসমঞ্জসভাবে এক একটি সূক (বাজার) যা চারশীতে কেন্দ্রীভূত করা হয় (ওয়াকফরূপে বিভিন্ন দোকান যখন নির্মাণ করা হয় তখনই এই কেন্দ্রীভূত করিবার বিষয়টি

সহজে নিশ্চিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল)। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বাজার স্থাপন করা হয় যাহাতে কারুশিল্পিগণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ও নগরবাসিগণের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি বাহির হইতে আনিবার ও বিতরণের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং রাষ্ট্রের প্রাপ্য তোলা কর ও অন্যান্য কর সঠিকভাবে আদায় করা যায়। এই বাজারগুলিকে বলা হইত কাপান (<আরবী কাব্বান, অর্থাৎ জনগণের জমাখরচ বা হিসাব-নিকাশ), য়াগ কাপানী, উন কাপানী, বাল কাপানী, য়েমিশ কাপানী (তৈল, আটা-ময়দা, মধু, ফলমূল ইত্যাদির জন্য) ইত্যাদি এবং ইস্তাম্বুল অবস্থিত ছিল পোতাশ্রয় এলাকাতে (অন্যান্য স্থানে ছিল নগর তোরণের পার্শ্বে)। সমুদ্রপথে আমদানী করা দ্রব্যাদির জন্য পোতাশ্রয়ে একটি শুল্ক অফিস ছিল, উহাকে বলা হইত গুমরুক-কাপানী (পরবর্তী কালে গুমরুক এমীনীর নাম অনুসারে বলা হইত এমীন ওনু)। আর স্থলপথে আনীত দ্রব্যাদির শুল্ক আদায় করা হইত এদীরনে-কাপাসীর নিকটে অবস্থিত কারা গুমরুগুতে। চামড়া পরিশোধন ও কসাইখানাগুলি অবস্থিত ছিল নগর দেওয়ালের বাহিরে এবং রঙের কারখানা, পশমের কারখানা, তৈলের কল ইত্যাদি প্রতিটির সংশ্লিষ্ট কারুশিল্পের কেন্দ্রের কাছাকাছি স্থানে নির্মাণ করা হয়। এইগুলি সবই 'শাসক শ্রেণীর' সদস্যগণের ওয়াকফ হিসাবে স্থাপিত হয়। অন্যান্য বিষয়ও হয় ওয়াক্ফ হিসাবে অথবা সুসম্পাদিত কোন ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের (নিম্নে দ্র.) অংশ হিসাবে স্থাপন করা হয়—সেই সকল কিছু স্থাপনারই উদ্দেশ্য ছিল সাধারণভাবে জনগণের কল্যাণ সাধন করা, যেমন পানি সরবরাহ, সড়ক পাকা করা, জন-নিরাপত্তা সাধন করা, হাসপাতাল স্থাপন করা, রাস্তা ঝাড়ু দেওয়া, গরীব দুঃখীজনের ও মুসাফিরগণের জন্য আশ্রয়স্থল নির্মাণ করা।

একটি মত চালু আছে যে, ইস্তাম্বুল যে একটি প্রাচ্য নগরীরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝা যায় একটিমাত্র বিষয় হইতে, উহার যে সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে তাহার কেন্দ্রবিন্দু হইতেছে বাজার এলাকা। সেখান হইতেই প্রধান প্রধান সড়ক বাহির হইয়াছে এবং মাহাল্লেগুলিও সেই কেন্দ্রেরই পর হইতে বৃত্তাকারে গড়িয়া উঠিয়াছে (দ্র. R. Mayer, Byzantion, Lonstantinupolis, Istanbul, Vienna 1943, pp. 9, 20, 254)। কথাটি সামগ্রিকভাবে শহরটির বিষয়ে সত্য নহে, বরং আলাদা আলাদা নাহিয়্যের ক্ষেত্রেই সত্য, সেগুলি একটি 'মূল ভিত্তি'র চতুর্দিক ঘিরিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। 'উছমানী আমলে বায়যানটীয় যুগেরই ন্যায় শহরটির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল কয়েকটি জেলার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা। 'উছমানী শহরের দুইটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল (বুরসা, এদীরনে ইত্যাদির ন্যায়) বড় জামে' মসজিদ, কেন্দ্রীয় বাজার এলাকা এবং এই বৈশিষ্ট্য ইস্তাম্বুলের ক্ষেত্রে প্রথম দেখা দেয় আয়া সোফিয়াতে ও বেদেস্তানে। পরবর্তী কালে নির্মিত হয় ফাতিহ ভবনসমূহ, উহাদের সন্নিকটস্থ সুলতান পাযারী ও সাররাজখানে এবং অতঃপর শহরটি ক্রমান্বয়ে মূল নির্মাণকার্যকে (Foundation complex) কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইগুলি নির্মাণ করেন সুলতান ও শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপরিচালকগণ। আর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বগণ ছোট ছোট নির্মাণকার্য, যেমন মসজিদ ও তৎসংলগ্ন মাদরাসাসমূহ নির্মাণ করেন, সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়া মাহাল্লেগুলি গড়িয়া উঠে। সেইভাবেই বংশপরম্পরায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন নির্মাণ কর্মসমূহ বা কমপ্লেক্সসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে।

যাহা হউক, এই কমপ্লেক্সসমূহ ইস্তাম্বুলকে একের পর এক কতগুলি প্রায় আলাদা আলাদা এলাকা লইয়া গঠিত শহরের রূপ দিলেও দুইটি বৈশিষ্ট্য ইহার গঠন-ঐক্য রক্ষা করিয়াছে ঃ (১) গোল্ডেন হর্ন-এ অবস্থিত পোতাশ্রয় এলাকা ও (২) প্রধান রাজপথ দীভানয়োলু, সেখান দিয়াই সেনাদল ও বাণিজ্য কাফেলা অতিক্রম করিত। এই প্রধান রাজপথের উভয় পার্শ্ব ধরিয়াই প্রধান প্রধান কমপ্লেক্স গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই রাজপথ ও পোতাশ্রয়ের মধ্যবর্তী স্থানগুলিতেই বিশাল বিশাল বাণিজ্যিক ভবন ও প্রধান বাজার এলাকা নির্মিত হইয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রধান প্রধান নির্মাণ কার্য পূর্ব হইতে পরিকল্পিত কোন নক্সা অবলম্বনে করা হয় নাই। ফলে কয়েকটি প্রধান প্রধান রাজপথ ব্যতীত অন্য 'সড়ক নেটওয়ার্ক' যেন খেয়ালখুশী মত নির্মাণ করা হইয়াছে, এদিকে সেদিকে সব অলিগলি বাহির হইয়া গিয়াছে (এই জটিল অবস্থাটা কোন অগ্নিকাণ্ডের ফলে হয় নাই—যদিও কেহ কেহ সেরূপ অনুমান করিয়া থাকেন, একেবারে প্রথম হইতেই শহরটি এই প্রক্রিয়ায় গড়িয়া উঠিয়াছিল)।

**৩। প্রধান প্রধান নগর নির্মাণকার্য সম্পাদন**

ফাতিহ ভবনসমূহ ও সুলতান পাযারী নির্মাণের পূর্বে ইস্তাম্বুলের দুই বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল (ক) বেদেস্তান ও বুয়ুক চারশী এবং (খ) তাখ্ত কাল'ই ও পোতাশ্রয় এলাকা।

(ক) ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দেই স্থির করা হইয়াছিল যে, চাকীর আগা মাহাল্লেতে একটি বেদেস্তান নির্মাণ করা হইবে (উহা ছিল ইস্তাম্বুলের একটি সুবাসী) [দ্র. Critoboulos, 104]। বেদেস্তানে মূল্যবান আমদানীকৃত কারুশিল্প দ্রব্যাদি বিক্রয় হইত এবং উহাই ছিল আর্থিক লেনদেনের কেন্দ্রস্থল, প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীর ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্মস্থল হিসাবে উহাই ছিল শহরের অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র (সে সময়ে ব্যবসায়িগণকে বলা হইত খওয়াজা)। ইস্তাম্বুলের যে বুয়ুক বেদেস্তান (বেযাযিস্তান, দারু'ল-বায্যাজিয়্যা; পরবর্তী কালের নাম জেওয়াহির-বেদেস্তানী বা ঈচবেদেস্তান) উহার গম্বুজ ছিল ১৫টি, একটি দুর্গের ন্যায় মযবুত করিয়া উহা নির্মাণ করা হইয়াছিল যাহাতে চুরি, লুণ্ঠন বা অগ্নিকাণ্ড হইতে বণিকদের শিল্প-দ্রব্যাদি ও ধনী নাগরিকগণের ধন-সম্পদ রক্ষিত হয়। এই নির্মাণ কাজ ছিল 'উছমানী স্থাপত্য শিল্পরীতির এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন, ৮ম/১৪শ শতকের শেষে বুরসাতে বেদেস্তান নির্মাণের পর হইতে যত 'উছমানী রীতির উদ্ভব হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে ইহা ছিল সর্বোত্তম [দ্র. (১) ই. এইচ. আয়ভেরদী, ফাতিহ দেভরী মিমারিসি, পৃ. ৪০৪-৭ ; (২) S. Fyice, in IA, art. Istanbul, pp. 1214/114 ; (৩) ঐ লেখক, Les ÍBedensten"s . . . , in II Congresso int. di Arte turca, Venice 1963, 35-9]। ইহার নক্সা হইতে বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ক কোন তথ্যসূত্র হইতেই এইরূপ কোন আভাষ পাওয়া যায় না যে, বায়যানটীয় কোন নির্মাণ কার্যের সঙ্গে ইহার কোনরূপ সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল। বায়যানটীয় সাম্রাজ্যের ন্যায় মুসলিম দুনিয়াতেও মূল্যবান কারুসামগ্রী রক্ষণ ও বিক্রয়ের জন্য এইরূপ মযবুত ভবন থাকা সকল শহরের জন্যই একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল (বায়যানটীয় সাম্রাজ্যে ছিল বাসিলিকে basilike, দ্র. Janin, Const. byz., 97, 157; আরব দেশসমূহে ছিল কায়সারিয়্যা, দ্র. Lapidus, Muslim cities, 59-60)। কনস্টান্টিনোপলের ইতিহাসের কর্মচঞ্চলতার যুগে এই এলাকাটা, ফোরাম কনস্ট্যানটিনি ও ফোরাম টাউরি-র মাঝখানের জায়গা

ছিল অতি কর্মব্যস্ত বাণিজ্যিক জেলা, এখানেই বেসিলিকে ও রুটির কারখানার মালিক সমিতির artopoleia অবস্থিত ছিল ; ইহাই ছিল শহরের কেন্দ্রীয় স্থান। সকল নগর তোরণ হইতে আগত রাস্তা এখানে আসিয়া মিশিত এবং পোতাশ্রয়ের বাণিজ্যিক এলাকা হইতে রাস্তা আসিয়াও এখানেই মিশিয়াছিল (নিওরিয়ন/ বাগচিকাপি ও Porta ড্রোঙ্গারৌ/যিনদান-কাপির মধ্যবর্তী স্থানে)। এখান হইতে বাসিলিকের ঘাট পর্যন্ত যে প্রধান সড়কটি বায়যানটীয় সময়ে ছিল (সম্ভবত ভাসিলিকো কাপীসী, যে নামটি সুলতান ২য় মুহাম্মাদ-এর ওয়াকফিয়্যাতে প্রায়শ উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়, পরে নাম হয় যিন্দান কাপী) অর্থাৎ কার্মোস এমবোলোস মৌরিয়ানন, 'উছমানী আমলে উহার নাম হয় উযুন চারশী এবং উহাই হয় শহরের সর্বাপেক্ষা ব্যস্ত বাণিজ্যিক জেলা।

বেদেস্তান, কাপালী চারশী এবং সেখানে কর্মরত ব্যবসায়িগণের বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাইবে আয়া সোফিয়ার ওয়াকফসমূহের রেজিস্টারে। বেদেস্তানে আদিতে ১২৬টি সানদূক ছিল (৮৯৩/১৪৮৮ সালে ছিল ১৪০টি ; সানদূক বলা হয় দোকানকে, উহার পিছনে একটি গুদাম থাকে এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য একটি সিন্দুক থাকে, দ্র. C. White, Three years in Constantinople, i, 174 ঃ "মযবুত আগুন-নিরোধক বাক্সসমূহ মেঝের নীচে রাজমিস্ত্রীরা পাকা খোপ করিয়া রাখিত") এবং ১৪টি 'কোশে' দোকান ছিল (প্রথমোক্ত একটি দোকানের মাসিক ভাড়া ছিল ২০ আকচে, আর শেষোক্ত ধরনের দোকানের ছিল ৩, ৫, বা ১৫ আকচে)! ৮৯৮/১৪৯৩ সালে বেদেস্তানের ১০জন ব্যবসায়ী ছিলেন আর্মেনীয়, ৫জন য়াহূদী, ৩জন গ্রীক এবং বাদবাকিগণ মুসলিম [১০ম/১৬শ শতকের বেদেস্তানের বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. (১) Ramberti, apud Lybyer, 241 ; (২) Dernschwam, 93, 113 ; (৩) Schweigger, 129-30 ; ১১শ/১৭শ শতকের জন্য দ্র. (৪) আওলিয়া চেলেবি, ১খ., ৬১৩-১৮ ; (৫) Mantran, 465 ; খৃ. ১৮৪৪ সালের অত্যন্ত চমৎকার বিবরণ দিয়াছেন (৬) White, i, 3-34]।

কিছুকাল পরে কিন্তু ৮৭৮/১৪৭৩ সালের আগে [দ্র. (১) আওলিয়া চেলেবি, ১খ., ৬১৭ ; (২) ওয়াক ফিয়্যা, সম্পা. O. Ergin, ফাতিহ ইমারেতিতে রক্ষিত, ইস্তাম্বুল ১৯৪৫ খৃ., ৬] ২য় মুহাম্মাদ বুয়ূক চারশীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রেশম ও রেশমী বস্ত্রাদির জন্য একটি 'নূতন' বেদেস্তান নির্মাণ করেন (দারু'ল-বায্যাযিয়্যাতি'ল-জাদীদা), পরবর্তী কালে উহা সানদাল-বেদেস্তানী নামে পরিচিত হয় (বর্তমানে নিলাম ঘর=Auction hall)। উহাই ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বেদেস্তান; সেখানে ১২৪টি সানদূক ছিল, উহার বাহিরের দিকেও ৭২টি দোকান ছিল, সেগুলিতে বিভিন্ন কারুশিল্পিগণের ব্যবসায় ছিল।

কন্সটান্টিনোপল বিজয়ের পূর্বে অন্যান্য 'উছমানী শহরে যেরূপ ছিল (দ্র. La ville balkanique, in Studia Balcanica, iii, Sofia 1970 ; ডি. কুবান, আনাদোলু তুর্ক সেহরি, ভাকিফলার দেরগিসি-তে প্রকাশিত, ৭খ, ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৫৩-৭৪) অর্থাৎ বেদেস্তানের চারিটি দরওয়াজা হইতে বহির্গত চারিটি শাহরাহ বা প্রধান সড়কের উভয় পার্শ্বে রাস্তার সমান্তরালে দাবার ঘরের মত করিয়া বণিক ও কারুশিল্পিগণের জন্য সারি সারি দোকান নির্মাণ করা হয়। ৮৯৪/১৪৮৯ সালের ওয়াক্ফ রেজিস্টার অনুযায়ী মোট ৬৪১টি দোকান (দুক্কান)-এর মধ্যে ৩৩টি ছিল জুতা তৈরির, ৩৩টি ছিল চটি জুতা ও পাতলা জুতা তৈরির, ৪৪টি টুপি তৈরির, ৫০টি মোটা পশমী কাপড় ও দরজীর, ৭৬টি গহনার ও জওয়াহিরাতের এবং অন্যান্য কারুশিল্পিগণের [দোকানের বর্ণনার জন্য দ্র. (১) Dernschwam, 93-4 ; (২) White, i, 74]। মুসলিম, আর্মেনীয়, য়াহূদী ও গ্রীকগণের দোকান কোন আলাদা আলাদা রাস্তাতে ছিল না, একসঙ্গেই ছিল তবে শুধু কারুশিল্পেরই নহে, বরং যেওর-জওয়াহিরাত ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের (সার্রাফ) ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল মুসলিম তুর্কীগণ। চারশী বারবারই সম্প্রসারণ করা হইতেছিল, ফলে শেষ পর্যন্ত উহাতে মোট দোকানের সংখ্যা প্রায় ১,০০০ হইয়াছিল। ইহার উপরে ছাদ নির্মাণ করিয়া 'কাপাল চারশী'-তে পরিণত করা হয়, ইহার চতুর্দিকে ২০টি বড় এবং ১২টি ছোট দরওয়াজা নির্মাণ করা হয়। বেদেস্তানের আইন-কানুন এখানেও প্রযোজ্য ছিল ; কাজেই বস্তুত ইহাও বেদেস্তানের সম্প্রসারিত এলাকাস্বরূপই ছিল (দ্র. S. Eyice, in IA, art. Istanbul, pp. 1214/114-5 ; S. Tekiner, The Great Bazar of Istanbul, Turkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, no. 92)।

এই অঞ্চলের দ্বিতীয় বড় চারশী ছিল মাহমূদ পাশা দুক্কানলারী নামে পরিচিত দোকানসমূহের সারি, সেগুলি "ইমারেত মাহমূদ পাশা"-এর নিকটে নির্মিত হয় এবং চতুর্দিকে ও পিছনের দোকানগুলি সমেত সেখানে মোট ২৬৫টি দোকান ছিল। সুলতান ২য় মুহাম্মাদ ইহাকেও আয়া সোফিয়ার ওয়াকফ-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সুলতান ২য় বায়াযীদ পুনরায় ইহাকে মাহমূদ পাশার ফাউন্ডেশনের ওয়াকফ-এর অন্তর্ভুক্ত করেন (দ্র. আয়া সোফিয়া রেজিস্টার, ৮৯৪/১৪৮৯ সাল)।

**খানসমূহ ঃ** খান ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিয়োজিত বণিকদের রাত্রিযাপনের স্থান। সেখানে উপর তলার ঘরগুলিতে বা নীচতলারই গুদাম ঘরে তাহাদের সামানাদি রাখিবার ব্যবস্থা থাকিত এবং সেখানে যথেষ্ট মালামাল ক্রয়-বিক্রয়ও হইত। খান ছিল 'উছমানী বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহের জন্য অত্যাবশ্যক [খানগুলির বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. (১) Mayer, পৃ., গ্র., পৃ. ১১২-১৭ ; (২) এম. এরক্সান, ইসতানবুল হানলারি, ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় এদেবিয়াত অনুষদ সন্দর্ভ, ১৯৫৬ খৃ.]। সুলতান ২য় মুহাম্মাদ চারটি খান নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, দুইটি তাখতাকাল'-এর বাণিজ্যিক এলাকাতে, আর দুইটি বেদেস্তানের নিকটস্থ তথাকথিত বোদরুম কেরবানসারায়ী। উহা দ্বিতল ছিল এবং উহাতে ৩১টি কামরা ছিল, উহার সামনের দেওয়ালের সঙ্গে ১৫টি দোকান এবং ৯টি 'হুজরে' ছিল (অর্থাৎ বড় ধরনের কামরা, সেখানে কারু-কারখানার কাজও হইত অথবা থাকাও যাইত) (উহার অবস্থানের বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. এস. আনভের, সুয়োলু হারিতাসি, চিত্র নং ৩)। খানগুলি হইতে সরকারের বাৎসরিক আয় হইত ১৫,৫০০ আকচে, আর দোকান ও কামরাগুলি হইতে ৩,১০৮ আকচে। যে সকল ব্যবসায়ী ইস্তাম্বুলে আমদানীকৃত সুতী ও রেশমী বা লিনেনবস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবসা করিত তাহারা এই খানগুলি ব্যবহার করিত (দ্র. এ. রেফিক, ইস্তাম্বুল হায়াতি, ১০০০-১১০০ হি., ইস্তাম্বুল ১৯৪০ খৃ., দলীল নং ৭৭)।

সুলায়মান পাশা ওডালারী নামে পরিচিত যে খান (রুমেলীর বেগলারবেগী খাদিম সুলায়মান-এর নামানুসারে) উহা ৮৯৪/১৪৮৯ সালে কেরবানসারায়ী ই-উসেরা' নামে পরিচিত হয়। সাধারণভাবে উহাকে

বলা হইত এসীর পাযারী। ইহার দুই তলা মিলাইয়া ৫২টি কামরা ছিল, সংশ্লিষ্ট কামরা ছিল আরও ৮টি, ১টি গোসলখানা ছিল, ১টি ঘোড়াশালা ছিল। ইহার বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ছিল ১৯,৫০০ আকচে (অর্থাৎ প্রায় ৪০০ সোনার ডুকাটের সমান) [সুয়োলু হারিতাসি বিষয়ে দীভান-য়োলুতে উল্লিখিত আছে যে, উহা 'আতীক 'আলী পাশা মসজিদের পাশে অবস্থিত ছিল ; উহার সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন White, ii, 280]।

বুয়ুক চারশীর পূর্বে অবস্থিত বেগ কেরবানসারায়ী (সচরাচর একটি ওয়াকফিয়্যা খান নামে পরিচিত, পরে বলা হইত চুখাজী খানী) নির্মিত হইয়াছিল ৮৭৮/১৪৭৩ সালের আগে (দ্র. ওয়াকফিয়্যা, সম্পা. O. Ergin, p. 6)। ইহা 'উছমানী খান-এর সকল বৈশিষ্ট্যযুক্ত, একটি আয়তাকার উঠানের চতুর্দিকে ঘিরিয়া নির্মিত, উভয় তলায় ৯৮টি কামরা রহিয়াছে। ইহার দেওয়ালের সঙ্গে গড়িয়া তোলা দোকানের সংখ্যা ৪২ (ওয়াকফিয়্যাতে উল্লেখ আছে ৪৪টি), পূর্বে এইসব দোকানই হাকিমগণের (চিকিৎসক) দখলে ছিল। আয় ছিল খান হইতে ৪০,০০০ আকচে এবং দোকান হইতে ১৯,৫৪৮ আকচে।

সুলতান ২য় মুহাম্মাদ-এর ফাউন্ডেশন সৃষ্টির পূর্বে চামড়ার কারখানার শ্রমিকগণ এই জেলাতে, এসকি আত পাযারীতে অবস্থান করিত, আর তীর-ধনুক নির্মাতাগণ ছিল এসকি সারায় এলাকাতে, রূপার আকচে তৈরির টাকশালও সেখানেই ছিল।

(খ) দ্বিতীয় যে অঞ্চলটিতে সুলতান ২য় মুহাম্মাদের সর্বপ্রাথমিক নির্মাণকাজগুলি হইয়াছিল উহা ছিল তখতাকাল'এ, Golden Horn-এর উপরে পোতাশ্রয় এলাকাতে। লাতিন ঔপনিবেশিকগণ, শেষ বৎসরগুলিতে ভেনিসীয়গণ 'উছমানী বিজয়ের আগে এলাকাটি, পোর্টা পেরামা/বালীক পাযারী কাপীসী ও পোর্টা ড্রোঙ্গারিয়ো/ওদুন কাপীসীর মধ্যবর্তী স্থানটি, নিয়ন্ত্রণ করিতেন (দ্র. Janin. Const. byzantin, 235-44)। পোতাশ্রয়ের কাজকর্ম এমনকি নিওরিয়ন/বাগচি কাপীসী পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। 'উছমানী বিজয়ের পরবর্তী কালে আলোচনাক্রমে ভেনিস বাইলোর পুরাতন প্রাসাদ, ভেনিসীয় দ্রব্যসম্ভার গুদামজাত করিয়া রাখিবার স্থান লোবিয়া ও দুইটি লাতিন গির্জা পুনরাধিকার লাভ করিতে প্রয়াস পায়। ৮৫৮/১৪৫৪ সালের আত্মসমর্পণ চুক্তি অনুযায়ী নূতন বাইলো বারথোলোমিও মারসেলো গির্জা ও অ্যানকোনানগণের বাসস্থানের অধিকার লাভ করিতে অনুমতি পান (দ্র. Thiriet. iii, pp. 195, 201)। ৮৯৮ হি. আয়া সোফিয়ার নিবন্ধনে (রেজিস্টার) ভেনিসীয়গণের 'পূর্বেকার' গির্জার কথা (আল-কানীসাতু'ল-মানসূবা ইলা'ল-ভানাদিকিয়্যীন কাদীমান) ও বাইলোর প্রাসাদের উল্লেখ পাওয়া যায়, আর আরবী ওয়াকফিয়্যাতে (পৃ. ৬০) উল্লেখ আছে একটি "ভেনেদিক লনজাসী মাহাল্লেসি"-এর এবং "আরসলানলু এভ/আর-সালানলু মাখযেন মাহাল্লেসি"-এর [ (১) মূল পাঠ দ্র., সম্পা. টি. ওয, পৃ. ৭০ ; (২) ইস্তাম্বুল ভাকিফলারি তাহরির দেফতেরি, সম্পা. আয়ভেদি বারকান, নং ৫৭০]।

পেরামা/বালীকা পাযারী দরওয়াজার সামনের যে ঘাট উহাই গালাতাতে পার হইবার প্রধান উঠানামার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে, কিন্তু পরবর্তী কালে পারাপারের জন্য আরও অন্যান্য ঘাট ব্যবহৃত হয় (য়েমিশ, লিমান, বালাত ইত্যাদি)। ইস্তাম্বুল সম্বন্ধে প্রাথমিক যুগের মতামত ও নক্সা হইতে জানা যায় যে, এই এলাকাতে জাহাজ ভিড়িবার ব্যস্ততা ও আধিক্য ছিল [ দ্র. (১) M. Lorichs, Tafel VII—IX; (২) Le Bruyn, p. 39 ; (৩) F. Babinger, Drei Stadtanichten . . .)]। এই পোতাশ্রয় এলাকা ও বেদেস্তানের মধ্যকার ঢালু জায়গাগুলিতে খুব দ্রুত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মিত হইতে থাকে। ২য় মুহাম্মাদ আয়া সোফিয়ার ওয়াকফ হিসাবে এখানে দুইটি খান, একটি গুমরুক কাপানী, একটি য়েমিশ কাপানী, একটি লবণের আড়ত, একটি মুমখানে, তিনটি বোযাখানে, সাতটি গুদাম ও ৪২২টি দোকান নির্মাণ করেন। খান-ই সুলতানী ছিল একটি চতুষ্কোণাকার ছাদে ঢাকা ভবন, উহার চতুর্দিকে ৩৬১টি দোকান ছিল, সব কিছু মিলাইয়া উহা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ চারশী (নাজা'র)। য়াহূদীদের উপাসনালয় সিনাগগ (দ্র. M. Lorichs, Tafel VIII) ও মুরাদ পাশার খান উহার নিকটেই ছিল। উহার পূর্বদিকেই ছিল য়েমিশ কাপানী (পরে নাম হয় বাল কাপানী), খান, উহার নীচতলাতে ১১টি গুদাম ঘর এবং উপরে ১৬টি কামরা ছিল [দ্র. (১) S. Eyice, in IA, art. Istanbul, 1214/115 ; (২) T. Bertele, 11 palazzo degli ambassatori di Venezia a Const., Bologna 1932; (৩) R. E. Kocu (কোচু), in Istanbul Ansiklopedisi (ইস্তাম্বুল বিশ্বকোষ), ৪খ., পৃ. ২০৫৩-৬]। এই ভবনটির একতলা সম্ভবত বায়যানটীয়।

ইস্তাম্বুলের প্রধান প্রধান কাপান এখানে অবস্থিত ছিল—মোম, লবণ ও সাবানের জন্য এবং শুল্ক অফিসও এখানেই ছিল [দ্র. (১) M. Lorichs, Tafel VII ; (২) Grelot, p. 283]। লাকড়ি ও কাঠ আনিয়া নামান হইত বাগচে-কাপীসীর আগাচ-পাযারীতে [দ্র. (১) ওয়াকফিয়্যা, ভাকিফলার উম. মুহ কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ২৪৯ ; খৃ. ১৯শ শতকেও এই ঘাট আগের সেই একই প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত ; (২) এম. যিয়া, ইস্তাম্বুল, পৃ. ৩১৯]। শহরের জেলখানা ছিল ভাসিলিকো কাপীসী/যিন্দান কাপীসীতে (দ্র. ওয়াকফিয়্যা, সম্পা. ও এরগিন, পৃ. ৮৩)। পরবর্তী কালে উহাকে বলা হইত বাবা জা'ফের যিন্দানী।

৮৯৮/১৪৯৩ সনের আয়া সোফিয়ার রেজিস্টারে উল্লিখিত আছে যে, ইস্তাম্বুল ও গালাতাতে ২,৩৫০ টি দোকান, ৪টি খান, ২টি গোমালখানা ২১টি বোযাখানে, ২২টি বাশখানে এবং ৯৮৭টি মুকাতা'আলী বাড়ী ছিল, সেগুলি হইতে বাৎসরিক খাজনা আদায় হইত ৭,১৮,৪২১ আকচে (প্রায় ১৪,০০০ ডাকাট ; ৮৯৪/১৪৮৯ সালে খাজনার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১ লক্ষ আকচেতে ; দ্র. বারকান, Ikt. Fak. Mecm.-এ প্রকাশিত, ২৩খ, ৩৪৪)।

শহরের অন্য স্থানে স্থানীয়ভাবেও চারশীসমূহ নির্মিত হয় ঃ আয়া সোফিয়াতে ছিল ৩৯টি দোকান ; কেমেরে অবস্থিত "য়েনী দুক্কানলারে" ১৭টি দোকান [দ্র. (১) ওয়াক্‌ফিয়া, সম্পা. Ergin, 43 ; (২) ভাকিফলার উম. মুদ., পৃ. ৮৪ ; (৩) T. Oz, 25]; দীভান-য়োলুর পার্শ্বে অবস্থিত দিকিলু তাশ/চেনবেরলি তাশ (৭০টি দোকান, নিকটেই একটি টাকশাল ছিল, সেখানে তামার টাকা তৈরি করা হইত) এবং খাওয়াজা পীরী মেসজিদি (২৬টি দোকান ; এই দুইটি সম্ভবত বরং বেদেস্তান এলাকার সম্প্রসারণ ছিল) ; তাভুক পাযারীতে কাপড় রঙ করাইবার ২৪টি দোকান ছিল (ইহা ছিল মাহমূদ পাশার ওয়াক্‌ফ)। জানিসারী সৈন্যদের প্রথম ছাউনী ('এসকি ওদালার') ছিল বর্তমান সেহযাদেবাসী চাদ্দেসিতে [ (১) এস. আনভের, সুয়োলু হারিতাসি, নং ৩; (২) উযুনকারসিলি, কাপুকুলু

ওয়াকলারি, ১খ., ২৩৮-৪২], উহার নিকটেই ১০টি দোকানের একটি চারশী ছিল (দ্র. তাহসিন ওয, পৃ. ২৪)। উহার পশ্চিমে উস্তাদ আয়াস মাহাল্লেসিতে ৩৫টি দোকানের একটি চারশী, ১৯টি দোকানের কাদী 'আসকের দোলাবী চারশীসী ও কারামান পাযারীতে খৃস্টানদের পবিত্র সাধুগণের গির্জা ছিল।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক জেলা ছিল নগর দেওয়ালের বাহিরে আধুনিক উনকাপাম ও সিবালির (বায়যানটীয় প্লাটীয়া) মধ্যবর্তী স্থানে। সুলতান ২য় মুহাম্মাদ এখানে একটি উন-কাপানী (দ্র. M. Lorichs, Tafel ix) এবং ৩১টি দোকানের একটি চারশী নির্মাণ করেন। Golden Horn-এর আরও উজানের দিকে নির্মিত হইয়াছিল শহরের প্রথম কসাইখানা ও চামড়া পরিশোধন কেন্দ্র, দেব্বাগলার মাহাল্লেসিও সেই সময়েই নির্মিত হয় (দ্র. O. Ergin, pp. 12, 34)। উহারও উপরে, আরও সামনে কায়নেজিয়ন (কিনিকোয) দরওয়াজার দিকে ছিল জেলেদের বাড়ী এবং বাদশাহী বাগ-বাগিচা [দ্র. (১) O. Ergin, 12 ; (২) M. Lorichs, Tafel xii— xvii ; (৩) Le Bruyn, p. 39 ]।

৮৬৩/১৪৫৯ সালটি ছিল শহরের উন্নয়নের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা Critoboulos (অনু. Riggs, 140)-এর মতে সেই বৎসর সুলতান ২য় মুহাম্মাদ তাঁহার সকল আমীর-উমারাকে একত্রে আহ্বান করিয়া প্রত্যেককে শহরের যেখানে খুশী একটি করিয়া এলাকা পসন্দ করিয়া লইতে বলেন। সেই এলাকা তাঁহাদের নিজ নিজ নামে পরিচিত হইবে (দ্র. ভাকিফলার উম. মুদ., পৃ. ৩৪) এবং ইহাও বলেন যে, তাঁহারা স্ব স্ব এলাকাতে একটি করিয়া মসজিদ, খান, গোসলখানা ও বাজার নির্মাণ করিবেন। তিনি স্বয়ং নূতন প্রাসাদ নির্মাণের জন্য সারায়বুরনুর পার্শ্বে স্থান নির্বাচিত করেন এবং শহরের ঠিক মাঝখানে সর্বাপেক্ষা সুন্দর জায়গাতে একটি মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—"এমন মসজিদ যাহা সকল দিক হইতে আয়া সোফিয়াকে ছাড়াইয়া যাইবে।" মসজিদটির নির্মাণকাজ শুরু হয় আরও পরে ৮৬৭/১৪৬২-৩ সালের শীতকালে। সেই এলাকাতে (পবিত্র সাধুগণের গির্জার চতুর্দিকে) ইতোমধ্যেই যথেষ্ট মুসলিম অধিবাসী বসবাস করিতেছিল। এই বিশাল নির্মাণকাজের ফলে শহর উত্তর-পশ্চিমে নগর প্রাচীরের দিকে এবং উত্তর-পূর্বে Golden Horn-এর দিকে সম্প্রসারিত হয়।

(গ) ফাতিহ-এর মসজিদ ও 'ইমারেত এবং সেই জেলা (৮৭৫/১৪৭০)। মসজিদটির নির্মাণকাজ শুরু হয় জুমাদা-২, ৮৬৭/ ফেব্রুয়ারী ১৪৬৩ এবং নির্মাণ শেষ হয় রাজাব ৮৭৫/ জানুয়ারী ১৪৭১ (সদর দরওয়াজার উপরের প্রস্তরলিপি ঃ আয়ভেরদি, ফাতিহ দেভরি মিমারিসি, ১৪৩)। উহার সংশ্লিষ্ট অন্য ভবনসমূহ দুই ধরনের ছিল ঃ (১) খায়রাত ভবনগুলি মসজিদের চতুর্দিক ঘিরিয়া ছিল [মেদ্রেসে, হাসপাতাল, 'ইমারেত (মুসাফিরখানা), স্কুল, লাইব্রেরী ইত্যাদি] এবং (২) জনকল্যাণমূলক ভবনসমূহ, সেগুলির আয় দ্বারা মূল প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহ হইত। বুরসাতে ওরখান-এর সংস্থাসমূহ প্রতিষ্ঠার পর হইতে সকল 'উছমানী শহরেরই মূল ভিত্তিরূপ প্রদান করিয়াছে এইরূপ ভবনসমূহ [দ্র. (১) ও. নূরী, 'ইমারেত সিসতেমি, ইস্তাম্বুল ১৯৩৯ খৃ. ; (২) ও. এল. বারকান, Quelques observations sur l'organisation economique et sociale des villes ottomanes, in Recueil Soc. Jean Bodin, vii, 1955, 289-311 ; (৩) এমেল এসিন মনে করেন, সেগুলির মূল রূপটি মধ্যএশিয়া হইতে আসিয়াছিলঃ IV. Int. Congress of Turkish Art., Aixen-provence 1970]।

আনুমানিক ১,০০,০০০ বর্গমিটার এলাকা দখল করিয়া আছে নিম্নলিখিত 'খায়রাত' মসজিদ, উহার বাহিরের দিকে বিশাল চত্বর, তাহাতে ৮টি প্রবেশ দরওয়াজা, ইহার দুই পার্শ্বে ৮টি বড় ও ৮টি ছোট মেদ্রেসে (ছেমানিয়্যা ও তেতিম্মে) ঃ পূর্বদিকে ভিন্ন একটি চত্বরে একটি তাবখানে, একটি মুসাফিরখানা ও একটি খান (পরবর্তী কালে নাম হয় দিভে খানী)ঃ অপর একটি চত্বরে একটি হাসপাতাল। মসজিদের সামনের চত্বরে প্রবেশের দুইটি প্রবেশ দরওয়াজার মধ্যে দুইটি ছোট ভবন, একটি ছোটদের স্কুল (দারু'ত-তা'লীম) এবং একটি বইয়ের দোকান ছিল [দ্র. (১) A. S. Ulgen and b. Kunter, Fatih camii ve Bizans sarnici, Istanbul 1939; (২) Ayverdi, পৃ. গ্র., ১২৫-৭১]। তাহা ছাড়া মেদ্রেসেতে নিযুক্ত 'আলিমগণের জন্য বাসস্থানও ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ের ভবনসমূহের মধ্যে ছিল প্রধানত একটি বড় চারশী (সুলতান পাযারী), সাররাজখানে ও একটি গোসলখানা (চুকুর হামাম বা ইরগাতলার হামামী), এইগুলি ছিল মসজিদের উপর দিকে। সুলতান পাযারী ছিল জান-আলীজী গির্জা যেখানে ছিল সেখানে, উহাতে ২৮০টি দোকান ছিল (৮৯৮/১৪৯৩ সালের রেজিস্টারে সেরূপ লিখিত রহিয়াছে ; আর টি, ওয যে ওয়াকফিয়্যা প্রকাশ করিয়াছেন সেখানে উল্লিখিত আছে ২৮৬টি), খিদ'র বেগ চেলেবি ওদালারীতে ছিল ৩২টি কারখানা ও ৪টি গুদাম ঘর। Vavassore-এর নক্সাতে সুলতান পাযারীকে দেখান হইয়াছে চতুর্দিকে দেওয়াল বেষ্টিতরূপে ; রেজিস্টারে ইহাকে বলা হইয়াছে 'বুক'আ')। সার্‌রাজখানেতে ছিল (উহাও ছিল একটি "বুক'আ") ছাট-দেওয়ালের ভিতরে ১১০টি দোকান (দ্র. এস. আনভের, সুয়োলু হারিতাসি, চিত্র নং ১), উহার পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের সঙ্গে ছিল ৩৫টি দোকান এবং ১৯টি কামরা। সেগুলিকে বলা হইয়াছে বেগলিক দুক্কানলার ভে ওদালার। ৮৯৮/১৪৯৩ সালের রেজিস্টারে ৪২ জন জিনকারের (ঘোড়ার জিন নির্মাতার) কথা লিখিত আছে, তাহারা সকলেই ছিল মুসলিম (কয়েকজন ছিল জানিসারী)। ইতঃপূর্বে যেসব জিনকার বেদেস্তানের নিকটে কাজ করিত তাহাদের সকলকেই এখানে লইয়া আসা হয় এবং অতঃপর এই স্থানই হয় জিন নির্মাণ ও ব্যবসায়ের একমাত্র কেন্দ্রস্থল (দ্র. ৮৭৯/১৪৭৫ সালের বেলাত, চ. উলুচায় কর্তৃক তারিহ দেরগিসিতে প্রকাশিত, ৩/৫-৬, ১৯৫১-২খৃ., পৃ. ১৫১-২, উহার নবায়ন ১১১৯/১৭০৭ সাল এ. রেফিক-এর ইস্তাম্বুল হায়াতি ১১০০-১২০০-তে প্রকাশিত, পৃ. ৪১ প.)। উত্তর দিকে ছিল ঘোড়ার হাট ও আস্তাবলসমূহ। আশেপাশে চতুর্দিকেই সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যের নির্মাণের কারিগরেরা ছিল, যথা লাগাম নির্মাতা, পশম ব্যবসায়িগণ প্রভৃতি। যুদ্ধ দেখা দিলে তখন এই জিলা সৈন্য-সামন্তে, পাইক-বরকন্দাজে ভরিয়া উঠিত, তাহারা সবাই নিজ নিজ ঘোড়া যুদ্ধের সাজে সাজাইত (Schweigger, পৃ. ১২৯, মন্তব্য করিয়াছেন যে, তুর্কীরা চামড়ার কাজে দুনিয়ার সকল জাতিকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল)। খৃ. ১৯শ শতকে যখন য়ুরোপীয় বাজারের দ্রব্যাদি ক্রমেই অধিক পরিমাণে আমদানী করা শুরু হয় তখন হইতে এই বাজারটির গুরুত্ব কমিতে থাকে (দ্র. White, iii, 255 প.)। সার্‌রাজখানার

দক্ষিণে, আকসারায়ের দিকে, সুলতান ২য় মুহাম্মাদ জানিসারীদের জন্য নূতন ছাউনি নির্মাণ করেন, উহার নাম ছিল য়েনি ওদালার। উহা অবস্থিত ছিল এত মেয়দানীতে (ইতিপূর্বে সেই ছাউনি অবস্থিত ছিল এসকি ওদালারে, সেখানে সম্ভবত নির্মিত হইয়াছিল ৮৬৪/১৪৬০ সালে) প্রায়শ অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হইবার পরে পুনঃনির্মাণ করিতে হইলেও এইগুলিই একেবারে শেষ পর্যন্ত জানিসারী ছাউনি ছিল। অবশেষে ১৮২৬ খৃ. তুর্কী সেনাবাহিনীর এই কোরটি বিনষ্ট হইয়া যায় (দ্র. আই. এইচ. উযুনচারসিহ. কাপুকুলু ওসাকলারি, ১খ, পৃ. ২৪১-৩)।

ফাতিহ নির্মাণসমূহের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কিরূপ ছিল তাহা নিম্নলিখিত সারসংক্ষেপ হইতে বুঝা যাইবে (এই তথ্যাবলীর উৎস হইতেছে Barkan, in Ikt. Fak. Mecm., xxiii, 306-41)। ৮৯৪/১৪৮৯ ও ৮৯৫/১৪৯০ সালে আয় ছিল প্রায় ১৫ লক্ষ আক্‌চে (৩০,০০০ ডুকাট, এই পরিমাণ আয়া সোফিয়ার ওয়াক্‌ফ আয় হইতে অনেক বেশী ছিল)। এই আয় আসিত ইস্তাম্বুল ও গালাতার ১২টি গোসলখানা হইতে, এই দুই শহরের জিযয়া হইতে, থ্রেসের পঞ্চাশটিরও বেশী গ্রামের খাজনা ও আরও অন্যান্য কর হইতে। খয়রাতের ব্যয় ছিল নিম্নরূপ ঃ

| | | |
|---|---|---|
| বৃত্তি প্রদান, | ৮,৬৯,২৮০ | আকচে |
| মুসাফিরখানার খাবার, | ৪,৬১,৪১৭ | " |
| হাসপাতালের ব্যয়, | ৭২,০০০ | " |
| মেরামত ইত্যাদি | ১৮,৫২২ | " |
| | মোট ১৪,২১,২১৯ | আকচে |

মসজিদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ছিল সব মিলাইয়া ১০২ জন, 'মেদ্রেসেগুলিতে ছিল ১৬৮ জন, মুসাফিরখানাতে ৪৫ জন, হাসপাতালে ৩০ জন। তাহা ছাড়া খাজনা ইত্যাদি আদায়ের জন্য প্রতিনিধি ও কেরানী ছিল ২১ জন এবং নির্মাতা ও কারিগর ছিল ১৭ জন। এই ৩৮৩ জন ব্যক্তি ছাড়া দরিদ্র 'উলামা' ও তাঁহাদের পরিবার-পরিজন ও পঙ্গু সৈনিকদেরকে নিয়মিত সাহায্য প্রদান করা হইত। এই সকল সাহায্য বাবাদ বাৎসরিক ব্যয় হইত ২,০২,২৯১ আকচে। মুসাফিরখানাতে প্রতিদিন ৩,৩০০ রুটি বিতরণ করা হইত এবং কমপক্ষে ১,১১৭ জন দীন-দুঃখী দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পারিত। এই কমপ্লেক্সটির আয়ের প্রায় অর্ধেক আসিত ইস্তাম্বুলের বাহির হইতে, ইহা শুধু ধর্মীয় ও শিক্ষার উদ্দেশে নিবেদিত প্রতিষ্ঠানই ছিল না, শহরের এই এলাকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধির মূল কেন্দ্রস্বরূপও ছিল।

৪। **৯ম/১৫শ শতকে নাহিয়ে ও মাহাল্লেসমূহ গঠন ঃ** ৮৬৩/১৪৫৯ সালে সুলতান ২য় মুহাম্মাদ-এর জারীকৃত আদেশ অনুসারে পাশাগণ শহরের বিভিন্ন এলাকায় নিজেদের ভবন ও কমপ্লেক্সসমূহ তৈরি করেন, উহাদের প্রতিটি অন্য অধিবাসিগণের বসবাস ও সমৃদ্ধি লাভের প্রেরণা সৃষ্টি করে। ফলে বিজয়ের পরে সত্তর বৎসরের মধ্যেই ১৩টি নাহিয়ের সৃষ্টি হয় এবং 'উছমানী শহরটি যথাযথ রূপ লাভ করে। সমগ্র শহরটি লইয়া একটি কাদা' গঠিত হয়; প্রতিটি নাহিয়ের অধীনে কয়েকটি মাহাল্লে গঠিত হয়, মাহাল্লের প্রতিনিধি হন সেখানকার মসজিদের ইমাম। হালকা জনবসতিপূর্ণ এলাকায় একটি জামে' প্রতিষ্ঠা বা একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার ফলে সেই মসজিদ ও উহার আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাদির আকর্ষণে সেই এলাকায় দ্রুত জনবসতি গড়িয়া উঠে। এভাবেই বিভিন্ন মাহাল্লের সৃষ্টি হয় (এই বসতি গড়িবার ক্রমপদ্ধতিকে বলা হয় শেনলেনদিরমে)। জামে'গুলির ন্যায়ই মসজিদগুলিরও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করিয়া দেওয়া হয়। নিম্নের তালিকা হইতে (আয়ভেদি-বারকান-এর ইস্তাম্বুল ভাকিফলারি তাহরির দেফতেরি অবলম্বনে তৈরী, ইস্তাম্বুল ১৯৭০ খৃ.) প্রতিটি নাহিয়ের জন্য কত সংখ্যক ওয়াকফ সম্পত্তি ছিল তাহা জানা যায় ঃ

| | নাহিয়ের নাম | মাহাল্লের সংখ্যা | ওয়াক্‌ফ ৯৫৩/১৫৪৬ সাল | ওয়াক্‌ফ ১০০৫/১৫৯৬ সাল |
|---|---|---|---|---|
| ১। | আয়া সোফিয়া | ১৭ | ১৯১ | ৩৪৫ |
| ২। | মাহমূদ পাশা | ৯ | ৯৬ | ১১৫ |
| ৩। | 'আলী পাশা | ৫ | ৪৪ | ৭৬ |
| ৪। | ইবরাহীম পাশা | ১০ | ১০৬ | ১২৯ |
| ৫। | সুলতান বায়াযীদ | ২৩ | ১৯৮ | ৩১৯ |
| ৬। | এবু'ল-ভেফা | ১২ | ১৬৫ | ৩০৬ |
| ৭। | সুলতান মুহাম্মাদ | ৪১ | ৩৭২ | ৬৮১ |
| ৮। | সুলতান সেলীম | ৭ | ৩৩ | ৯০ |
| ৯। | মুরাদ পাশা | ২৩ | ১১৯ | ৩৩০ |
| ১০। | দাউদ পাশা | ১৩ | ৮৪ | ২৬৪ |
| ১১। | মুসতাফা পাশা | ৩০ | ৬৫ | ২২৭ |
| ১২। | তোপকাপী | ৭ | ১৩ | ৩৯ |
| ১৩। | 'আলী পাশা | ২২ | ১০৮ | ২৫৯ |
| | মোট | ২১৯ | ১,৫৯৪ | ৩,১৮০ |

(এই রেজিস্টারগুলিতে অমুসলিম মাহাল্লে নাম উল্লেখ করা হয় নাই বা ধরা হয় নাই ঃ সর্বমোট সংখ্যা ছিল সম্ভবত ২৫০ ও ৩০০, নিম্নে দ্র.)।

এই নাহিয়েগুলির মধ্যে প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল সম্ভবত ১, ২, ৬, ৭, ৯ ও ১২ নং মাহাল্লেগুলি। ১০ম/১৬শ শতকে নগর দেওয়ালের ভিতরে স্থাপিত মাহাল্লেগুলির মধ্যে প্রায় ৩০% স্থাপিত হইয়াছিল ২য় মুহাম্মাদের আমলে, প্রায় ৫০% ২য় বায়াযীদের আমলে প্রায় ১৫% হইয়াছিল ১৫১২ ও ১৫৪৬ খৃ.-এর মধ্যে। ইহা দ্বারা অবশ্য এরূপ বুঝায় না যে, ১০ম/১৬শ শতকের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস পাইয়াছিল, কেননা আরও আগে স্থাপিত মাহাল্লেগুলিও ঘন জনবসতিপূর্ণ হইয়াছিল, খৃ. ১৫শ ও ১৬শ শতকের নক্সা হইতে সহজেই বুঝা যায় ঃ Vavassore-এর নক্সাটি ২য় মুহাম্মাদের আমলের একটি নক্সা অবলম্বনে তৈরী (দ্র. Babinger, Drei Stadtansichten . . ., 5)। সেখানে দেখা যায় যে, সর্বাধিক ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা হইতেছে লাঙ্গা বোস্তানলারীর পূর্বদিক হইতে উন্‌কাপানী পর্যন্ত টানা রেখার পূর্ব দিকের অংশে (এবং Golden Horn-এর দক্ষিণ উপকূল ধরিয়া) ; আর আয়ভেদির মানচিত্র অনুসারে (দ্র. ইস্তাম্বুল মাহাল্লের সংখ্যা হইতেছে ৯২টি, আর পশ্চিম দিকের এলাকাতে—আয়তনে দ্বিগুণ বিস্তৃত ৯৮টি। কিন্তু ১০ম/১৬শ ও ১১শ/১৭শ শতকের নক্সাতে (হুনের নামে-র ভেলী-জান নক্সাতে ; পীরী রে'ঈস-এর Oberhummer, Tafel xxii) দেখান হইয়াছে যে,

নগর প্রাচীরের ভিতরের সকল এলাকাই জনবসতিপূর্ণ ছিল, ব্যতিক্রম ছিল শুধু স্থলভাগের দেওয়ালের ভিতরে এক ফালি জায়গা য়েদি কুলে, বায়রাম পাশা দেরেসি, য়েনি বাগচে এলাকা লাঙ্গা বোস্তানলারি। জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি যে হইয়াছিল তাহা আন্দাজ করা যায় ওয়াক্ফ-এর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেও, যেমন ঃ

| সালের সময়কাল ঃ | ওয়াক্ ফ প্রতিষ্ঠার সংখ্যা |
|---|---|
| ৮৫৭ ও ৯২৭/১৫২১-এর মধ্যে | ১,১৬৩ |
| ৯২৭ ও ৯৫৩/১৫৪৬-৭-এর মধ্যে | ১,২৬৮ |
| ৯৫৩ ও ৯৮৬/১৫৭৮-৯-এর মধ্যে | ১,১৯৩ |
| ৯৮৬ ও ১০০৫/১৫৯৬-৭-এর মধ্যে | ৪০৭ |

১০০৫/১৫৯৬-৭ সালে ওয়াক্ফ সম্পত্তির সংখ্যা ছিল ৩,১৮০টি (কিছু সংখ্যক সেই সময়ের মধ্যে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল)। বিজয়ের পরে প্রথম সত্তর বৎসরে ১,১৬৩ টি ওয়াক্ফ স্থাপিত হয়, পরবর্তী ৭৮ বৎসরে (৯২৭-১০০৫ সালের মধ্যে) হয় ২,৮৫৮টি (দ্র. আয়ভেদী-বারকান, পৃ. গ্র. তালিকা-১)। কিন্তু পরবর্তী কালের এই সকল ওয়াক্ফ -এর অধিকাংশই কোন নূতন মসজিদ বা মাহাল্লে স্থাপনের জন্য ছিল না, বরং আগে হইতে স্থাপিত মসজিদের সম্প্রসারণ কাজের জন্য বা প্রতিষ্ঠাতার জন্য দু'আ' করিবার উদ্দেশে ছিল।

**মাহমূদ পাশা নাহিয়েসি** (নক্সাতে ২) ঃ মাহমূদ পাশা তাঁহার নির্মাণকীর্তি (কমপ্লেক্স)-এর জন্য খুবই সুবিধাজনক একটি স্থান নির্বাচন করেন, বেদেস্তান ও তাখতাকালে'-এর সংযোগ সড়ক এবং বাগচি কাপীসী ঘাটের সঙ্গে সংযোগের স্থানে। খয়রাত হইতেছে মসজিদ শিলালিপিতে নির্মাণ তারিখ লেখা ৮৬৭/১৪৬২), মেদ্রেসে (সেখানে শুধু দেরসখানের ব্যবস্থা রহিয়াছে), একটি মুসাফিরখানা (তাঁহার খান-এর পার্শ্বে অবস্থিত), একটি বিদ্যালয় (বর্তমানে আর চালু নাই) এবং তাঁহার তুরবে (পাথর লিপিতে নির্মাণ তারিখ ৮৭৮/১৪৭৩)। এইগুলির পরিচালনার আয় উৎস অধিকাংশ ভবন পোতাশ্রয়ের পথের উপরে ব্যস্ত এলাকাতে অবস্থিত ঃ একটি চারশী, সেখানে দোকানের সংখ্যা ২৬৫ টি (উপরে দ্র.); একটি খান (পরে উহা হয় কুরচুখানী, ভবনটি এখনও রহিয়াছে); একটি হাম্মাম (একদিকে পুরুষদের এবং একদিকে মহিলাদের গোসলের ব্যবস্থা, শিলালিপিতে নির্মাণ তারিখ লেখা রহিয়াছে ৮৭১/১৪৬৬) ; তাভুকপাযারীতে অবস্থিত ১৪টি কাপড় রং করিবার দোকান ; বিভিন্ন জেলাতে অবস্থিত ১৩৯ টি দোকান, ৬৭ টি বাড়ী, ৪৭টি 'কামরা' ও ২টি বাগিচা। ইস্তাম্বুল শহরের বাহিরে ছিল ঃ আঙ্কারাতে একটি বেদেস্তান, সেখানে মোহায়ের পশম বিক্রয় হইত [বর্তমানে সেই ভবনটিতে যাদুঘর (Hittite Museum) অবস্থিত ], উহার পার্শ্বে একটি খান; বুরসাতে একটি খান (ফিদান খানী) এবং কিছু সংখ্যক দোকান ; খাসসকোয় ও গুগেরজিনলিকে কয়েকটি হাম্মাম এবং রূমেলিতে অবস্থিত ১৪টি গ্রাম (এই ওয়াক্ফগুলি সবই ৮৭৮/১৪৭৩ সালের তারিখযুক্ত একটিমাত্র ওয়াক্ফিয়্যার মধ্যে একত্রীভূত করা হয় (দ্র. আয়ভেদি-বারকান, পৃ. ৪২-৫)। মোট আদায়কৃত খাজনার পরিমাণ ছিল ৬,০৬,৫১৩ আকচে (১৩,০০০ ডুকার্টের বেশী)। যে এলাকাতে খয়রাত নির্মিত হইয়াছিল তাহা খৃ. ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক জিলা ছিল। মাহমূদ পাশা এখানে দুইটি মসজিদও নির্মাণ করিয়াছিলেন। পরে সেই দুইটিকে ঘিরিয়া দুইটি মাহাল্লের সৃষ্টি হয়।

**মুরাদ পাশা নাহিয়েসি** (নক্সার ৯ নং) ঃ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল খাসস মুরাদ পাশা মসজিদের (the Paleologue) চতুর্দিকস্থ ২৩টি মাহাল্লে, নির্মাণকাল ৮৭৮/১৪৭৩ সাল। এই নির্মাণ কার্যের মধ্যে ছিল আক্‌সারায়ের মসজিদ (পাথর লিপিতে খোদিত তারিখ ৮৭৬/১৪৭১), একটি মেদ্রেসে ও একটি মুসাফিরখানা, ব্যয় নির্বাহের জন্য তৎসংলগ্ন ৪৫টি দোকান, ২টি বোযাখানে, ১টি বাশখানে এবং আকসারায়ে একটি গোসলখানা, তাখতাকাল'এ-তে একটি খানও একটি বাশখানে এবং য়েনিবাগ চিতে ৯টি দোকান। এই নাহিয়ে বর্তমান আকসারায়, লালেলি, সেরব্রাহ পাশা, লাঙ্গা ও য়েনি কাপি এলাকায় ব্যাপৃত ছিল। প্রথম দিকে এখানে জনবসতি হালকা ছিল ; কিন্তু সুলতান ২য় বায়াযীদের আমলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তখন আরও এগারটি নূতন মাহাল্লে সৃষ্টির প্রয়োজন হয়।

**এবু'ল-ভেফা নাহিয়েসি** (নক্সার ৬ নং) ঃ এমনকি প্রাথমিক যুগেও এই স্থানটি জনপূর্ণ ছিল, ইহা এসকিসারায় ও উন্‌কাপাম চাদ্দেসির মাঝখানে অবস্থিত ছিল, সম্প্রসারিত ছিল Golden horn-এর দিকে। সুলতান ২য় মুহাম্মাদ এখানে শায়খ আবু'ল-ওয়াফার জন্য (মৃ. রামাদান ৮৯৬/জুলাই ১৪৯১) একটি মসজিদ ও একটি যাবিয়ে নির্মাণ করিয়া দেন। ইহা ছিল একটি আবাসিক এলাকা, স্থানে স্থানে তৎকালীন 'আলিমগণ মসজিদ নির্মাণ করেন (মোল্লা খুসরেভ, ইস্তাম্বুলের প্রথম কাদী খিদর বেগ, মোল্লা গুরানী ও অন্যগণ), তবে ধনাঢ্য ব্যবসায়িগণও কিছু কিছু মসজিদ নির্মাণ করেন। ২য় বায়াযীদের আমলে 'আসকেরী শ্রেণীর বহু সদস্য অনেক সম্পদশালী ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠিত করেন (তন্মধ্যে রহিয়াছেন বায়াযীদের কন্যা 'আ'ইশা সুলতান ও তাঁহার স্বামী সিনান পাশা)।

২য় বায়াযীদের রাজত্বকালে প্রভূত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ হয়, সেই সময়ে আরও ছয়টি নাহিয়ে স্থাপিত হয় (উপরের তালিকার ৩, ৪, ৫, ১০, ১১ ও ১৩ নং)। জনবসতির এলাকা ফাতিহ ও আকসারায় হইতে স্থলভূমির প্রাচীরের দিকে প্রসারিত হয়। ফলে এই এলাকার বায়যানটীয় আমলে কয়েকটি গির্জা ও খৃস্টান সন্ন্যাসিগণের বাসস্থান (Monastery)-কে মসজিদে পরিণত করিতে হয় (নক্সা দ্র.)।

**সুলতান বায়াযীদ নাহিয়েসি** (নক্সার ৫ নং) ঃ মসজিদটি এসকি সারায়ের দক্ষিণে Forum Tauri-এর উপরে নির্মিত, নির্মাণকাল ৯০৬/১৫০১ ও ৯১১/১৫০৫ সালের মধ্যে। একই এলাকার ভিতরে একটি মেদ্রেসে, একটি স্কুল, একটি মুসাফিরখানা এবং সেই সঙ্গে একটি হাম্মাম ও একটি খানও ছিল (Vavassore-এর নক্সাতে ভবন নির্মাণের পূর্বে এলাকাটি কিরূপ ছিল তাহা দেখান হইয়াছে)। এই নির্মাণসমূহ একটি নাহিয়ের কেন্দ্রস্থলস্বরূপ ছিল, উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল ২৩টি মাহাল্লে। উহা আধুনিক বায়াযীদ মেয়দাম হইতে শুরু করিয়া মারমারা সাগরের উপকূলবর্তী কুম কাপী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল (নিশানজী মেহমেদ পাশা কমপ্লেক্সসমূহ সাগরের আরও কাছাকাছি ছিল, ইতিপূর্বে উহা এই এলাকাতে দ্বিতীয় কেন্দ্রস্বরূপ ছিল) এবং দীভান-য়োলু ধরিয়া বুয়ুক চারশী হইতে সাররাজ খানে পর্যন্ত এলাকাব্যাপী সম্প্রসারিত ছিল। সুলতান ২য় মুহাম্মাদের আমলে বায়াযীদ মেয়দামের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া ছিল চাকীর আগার মসজিদ মাহাল্লে কমপ্লেক্সসমূহ (ওয়াক্ফিয়্যের তারিখ ৮৬৪/১৪৫৯), দীভানে 'আলী বেগ কমপ্লেক্সসমূহ (৮৬৬/১৪৬১ সাল) ও

বালাবান আগা নির্মাণসমূহ (৮৮৮/১৪৮৩)। আর বর্তমানে যে রাস্তা লালেলিতে গিয়াছে উহার দক্ষিণে ছিল মাহাল্লে এমীন বেগ (৮৬৮/১৪৬৩), সেগবান-বাশী য়া'কূব ও মি'মার কেমাল। বায়াযীদের আমলে অনেক নূতন মাহাল্লে প্রতিষ্ঠিত হয়, অধিকাংশই 'আসকেরী (সেনা) শ্রেণীর সদস্যগণ দ্বারা, তবে কিছু কিছু মাহাল্লে বিভিন্ন কারুশিল্পিগণ দ্বারাও স্থাপিত হয়। এসকি ওদালার (উপরে দ্র.) এই নাহিয়েতে অবস্থিত ছিল, জাহাজ নির্মাণ কারখানাও (কাদীরগা তেরসানেসি) এখানেই ছিল। বায়যানটীয় আমলের বন্দর সোফিয়াতে বিজয়ের ঠিক পরেই নৌবাহিনীর একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয় (এই বন্দরটি যে Palaeologue-দের যুগে একটি দাঁড়টানা জাহাজের পোতাশ্রয়রূপে ব্যবহৃত হইত সে বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. Janin, Const. Byzantine, 223-4 এবং ১৪৫৯/৬১ সালের মধ্যে ২য় মুহাম্মাদ এখানে একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপন করেন (দ্র. Critoboulos, 140, 177)। ৮৬০/১৪৫৫ সালের তাহ্রীর রেজিস্টারে দেখা যায় যে, 'আযেবগণ (দ্র.) য়েনী কাপী ও কুম কাপীর মধ্যবর্তী এলাকাতে বাস করিত, সেই জেলাকে আদিতে বলা হইত 'আযেবলের মাহাল্লেসি। জাহাজ নির্মাণ কারখানা ও উহার বিশাল ফটক নির্মিত হইয়াছিল ঘেরা পোতাশ্রয়ের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া, Vavassore ও ভেলী জান-এর নক্সাতে ইহা পরিষ্কারভাবে দেখান হইয়াছে। পরে সম্ভবত খৃ. ১৮শ শতকে পোতাশ্রয়টির সামনে চর পড়িয়া যায়, ক্রমে সেখানে আধুনিক চুনদি মেয়দানী ও কাদিরগা বোস্তানী গড়িয়া উঠে। এই নাহিয়েতে বিজয়ী সুলতানের আমলের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভবন ছিল টাকশাল (দ্র. দারু'দ-দারব, পৃ. ১১৭), উহা ছিল সেগবান-বাশী য়া'কূব মাহাল্লেতে। ইহাই ছিল সোনার মোহর ও রূপার মুদ্রা তৈরি করিবার প্রধান টাকশাল (পরবর্তী কালে ইহা সিরমাকেশ/সিমকেস খানী নামে পরিচিত হয়)। ইহার নিকটেই ৮টি দোকান সমবায়ে একটি ছোট চারশী ছিল।

'আলী পাশা নাহিয়েসি (নক্সার ৩নং) ঃ খাদিম 'আলী পাশা (দ্র.) ছিলেন দুইবার তুরস্কের উযীরে আ'যাম, তিনি ৯১৭/১৫১১ সালে নিহত হন। তিনি দীভান য়ালুর পার্শ্বে অবস্থিত Forum Constantini-এর একাংশে একটি মসজিদ (নির্মাণকাল ৯০২/১৪৯৬), একটি মেদ্রেসে, একটি স্কুল, একটি মুসাফিরখানা ও একটি খানকাহ স্থাপন করেন, সেই সঙ্গে একটি খান এবং দোকানপাট। এই নাহিয়ের (উল্লিখিত ৩ নং) মধ্যে ছিল ৫টি মাহাল্লে [দ্র. (১) S. Eyice, in Tarih Dergisi, xiv/19, 1964, 99-114; (২) R. E. Kocu, in Istanbul Ansiklopedisi, iii, 1281 ]।

এই একই 'আলী পাশা এদীর্‌নে কাপীসীর নিকটে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন (পরে উহার নাম হয় যিনজিরলি কুয়ো জামে'ই) এবং খোরার খৃস্টান সন্ন্যাসিগণের আশ্রম ও গির্জাকে একটি মসজিদে রূপান্তরিত করেন (কিলিজেত কামি/কামিয়ে কামি; দ্র. S. Eyice, পৃ. গ্র.)। এই নাহিয়ের (উল্লিখিত ১৩ নং নক্সার ৮ নং) মধ্যে ছিল একটি ব্যাপক ও হালকা জনবসতিপূর্ণ এলাকা লইয়া গঠিত ২২টি মাহাল্লে। এই খয়রাতগুলির (মসজিদসহ জনকল্যাণ স্থাপনা) ব্যয় নির্বাহের জন্য চেনবেরলি তাসে অবস্থিত তাঁহার মুসাফিরখানার সংলগ্নই তিনি একটি খান ও একটি 'কোশ্ক' নির্মাণ করিয়া দেন [দ্র. Eyice, এলচি হাম, তারিহ দেরগিসি-তে প্রকাশিত, নং ২৪, (১৯৭০ খৃ.), পৃ. ৯৩-১৩০ ; ১০ম/১৬শ শতকের প্রথম দিকে এই খান হইতে বাৎসরিক আয় হইত ১৩,০০০ আকচে] ; য়েনি-বাগচিতে একটি গোসলখানা, ১৭৮টি দোকান, ২৪৬টি 'কামরা', ইস্তাম্বুলের বাণিজ্যিক এলাকাতে একটি ময়দা তৈরির কারখানা, একটি রুটির দোকান ; আনাতোলিয়া ও রূমেলিতে ৪৪টি গ্রাম, ৭টি গোসলখানা, ৭টি কারখানা, অন্যান্য বিভিন্ন দোকান ও য়ানবোলুতে একটি বেদেস্তান তৈরি করেন। বাৎসরিক আয়ের অধিকাংশই আসিত ইস্তাম্বুলের বাহির হইতে, মোট পরিমাণ ছিল ৪,৭১,৯৯৮ আকচে (৮,০০০ ডুকার্টের বেশী), এই হিসাব ৯১৫/১৫০৯ সালের। নাহিয়ের মাহাল্লেগুলির (১৫টি) মধ্যে অধিকাংশই সুলতান ২য় বায়াযীদের আমলে বালাত-এদীর্‌নে কাপি বায়রাম পাশা দেরেসি এলাকাতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

**ইব্রাহীম পাশা নাহিয়েসি** (নক্সার ৪নং) ঃ চানদারী ইবরাহীম পাশা (৮৯০/১৪৮৫ সালে কাদী 'আসকের, ৯০৪/১৪৯৮ সাল হইতে এক বৎসরের জন্য উযীরে আ'যাম) উযুন চারশীতে একটি মসজিদ (Lorichs, Tafel IX-এ ছাদ ঢাকা ভবনটিকে দেখান হইয়াছে), একটি মেদ্রেসে ও একটি স্কুল নির্মাণ করেন। সেগুলি ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি গোসলখানা, এয়্যুবে একটি কসাইখানা (সেখানে ১৪টি দোকান), ৫টি দোকান, ২৮টি বাড়ী ও ৪০টি কামরা নির্মাণ করেন (সেই সঙ্গে রূমেলি ও আনাতোলিয়াতে ৩টি গ্রাম ও ৩টি কারখানা, সেরেযে একটি বেদেস্তান ইত্যাদি)। প্রতিষ্ঠানটি তুলনামূলকভাবে স্বল্প আয়ের হইলেও (বাৎসরিক আয় ছিল ১,৩৫,৮৮০ আকচে), নাহিয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল বুয়ুক চারশীর ও পোতাশ্রয়ের মাঝখানে অবস্থিত ব্যস্ত বাণিজ্যিক জেলা। আর কয়েকটি মাহাল্লে স্থাপন করিয়াছিলেন সুলতান বিজয়ী মুহাম্মাদের আমলে ধনী ব্যবসায়িগণ।

**দাঊদ পাশা নাহিয়েসি** (নক্সার ১০ নং) ঃ 'কোজা' দাঊদ পাশা (৮৮৭/১৪৮২ হইতে ৯০২/১৪৯৭ সাল পর্যন্ত সাম্রাজ্যের উযীরে আ'জাম) Forum Arcadii-এর নিকটে একটি মসজিদ, একটি মুসাফিরখানা, একটি মেদ্রেসে, একটি স্কুল ও সর্বসাধারণের জন্য একটি ফোয়ারা নির্মাণ করেন (শিলালিপিতে উহার নির্মাণকাল লেখা আছে ৮৯০/১৪৮৫ সাল) এবং মসজিদের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া একটি চারশী নির্মাণ করেন, উহার দোকানের সংখ্যা ছিল ১০৮টি এবং কামরা সংখ্যা ছিল ১১টি। তিনি মর্মর (Marmara) সাগরের উপকূলবর্তী যে এলাকাটি পরে তাঁহারই নামে পরিচিত হয় তাহাও অধিকারভুক্ত করেন (পূর্বেকার Port of Eleutherios-এর পশ্চিমের এলাকা) এবং সেখানে একটি প্রাসাদ, একটি গোসলখানা, একটি বোযাখানে, ১১টি দোকান ও ঘাট নির্মাণ করেন (দ্র. আয়ভের্দী-বারকান, পৃ. ৩৪৫)। ইস্তাম্বুলে ও অন্যান্য স্থানে নির্মিত ছয়টি গোসলখানা, মানাসতীরে নির্মিত একটি বেদেস্তান, উশকুব ও বুরসাতে নির্মিত দোকান, এইগুলির আয় এবং ১২টি গ্রামের খাজনা মিলাইয়া বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ছিল ৩,৭৮,৮৮৬ আকচে (প্রায় ৭,৫০০ ডুকার্ট)। কিছু কিছু মাহাল্লে এখানে আগে হইতে থাকিলেও, বিশেষ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটির কারণেই এলাকাটির সমৃদ্ধি ঘটে, ২য় বায়াযীদের আমলে ৮টি নূতন মাহাল্লে স্থাপিত হয়।

**কোজা মুসতাফা পাশা নাহিয়েসি (নক্সার ১১ নং)** ঃ স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, ২য় বায়াযীদের শাসনের শেষদিকে সিলিভরি কাপীসীর দিকে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এখানে ৮৯৫/১৪৮৯ সালে (শিলালিপিতে এই তারিখ উল্লিখিত রহিয়াছে) ভবিষ্যৎ উযীরে

আ'জাম মুসতাফা পাশা ক্রিসির সেন্ট এন্ড্রু গির্জাটিকে একটি মসজিদে রূপান্তরিত করেন। ওয়াক্‌ফিয়ে অনুযায়ী এই কমপ্লেক্সসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল একটি মুসাফিরখানা, একটি মেদ্রেসে, একটি খানকাহ্‌, একটি স্কুল ও ইমাম সাহেবের বাসস্থান ইত্যাদি (এয়্যুবে ও অন্যান্য স্থানে অবস্থিত খয়রাতের বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. আয়ভেদী-বারকান, পৃ. ৩৬৬-৯)। এইগুলির ব্যয় নির্বাহ হইত নিকটেই অবস্থিত একটি বড় হাম্মাম বা গোসলখানা (বার্ষিক আয় ৬৫,০০০ আকচে) ও ৮১টি দোকানের আয়, ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত অসংখ্য দোকানপাট ও দুইটি খানের আয় ও রূমেলির ২৭টি গ্রামের খাজনা হইতে (এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্র. আয়ভেদী-বারকান, পৃ. ৩৬৫-৭)। বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ আকচের বেশী। ২য় বায়াযীদের আমলে কমপক্ষে ১৭টি মাহাল্লে প্রতিষ্ঠিত হয়।

জমিনে দেওয়াল ঘেরা চারিটি নাহিয়ের অন্তর্গত যে মাহাল্লেগুলি, যথা মুসতাফা পাশা, দাভূদ (দাঊদ) পাশা, 'আলী পাশা ও তোপকাপী, সেগুলি তুলনামূলকভাবে বড়ই ছিল, কিন্তু সেগুলির ওয়াক্‌ফ ছিল সংখ্যায় কম। উহা হইতে আভাষ পাওয়া যায় যে, সেগুলিতে জনসংখ্যা কম এবং বসতিও হালকা ছিল ; আর অনেক মসজিদের ব্যয়ই সুলতানের কোষাগার হইতে বহন করিতে হইত। সুলতান সুলায়মানের আমলে প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ নূতন মাহাল্লে এই এলাকাতেই করা হয়—চারিটি তোপকাপীতে ও তিনটি 'আলী পাশাতে। ৯৭৩/১৫৬৫ সালে মিহরুমাহ্‌ সুলতান কর্তৃক এদীর্‌নে-কাপীতে নির্মাণকার্যসমূহ স্থাপিত হইলে (মসজিদ, মেদ্রেসে, স্কুল, ফোয়ারা এবং সেগুলির ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি খান ও একটি চারশী) তখন এই এলাকাতে জনবসতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে (নিম্নে দ্র.)। আনু. ৯৬১/১৫৫৪ সালে তোপকাপীতে কারা আহ্‌মাদ পাশা মসজিদ এবং ৯৫৮/১৫৫১ সালে সিলিভরি কাপীসীতে খাদিম ইবরাহীম পাশা মসজিদ নির্মাণ হইতে বুঝা যায় যে, নগর-দরওয়াজার নিকটে জনবসতি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

প্রায় ৯০% মাহাল্লের নামকরণ করা হইয়াছিল স্থানীয় মসজিদের প্রতিষ্ঠাতাগণের নামে। স্থানীয় অধিবাসিগণের অনেকেই নূতন নূতন ওয়াক্‌ফ বা দানপত্র দ্বারা মসজিদের মেরামত, সেখানকার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকগণের ব্যয়ভার বহনের ব্যবস্থা করিতেন, কিন্তু স্থানীয় লোকেরা সম্মিলিতভাবে যে একটি নূতন মসজিদ স্থাপন করিয়াছেন সেরূপ দৃষ্টান্ত খুবই কম। যে সকল ব্যক্তি বিজয়ের পরে পরে একাধিক মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহারা হইতেছেন সুবাশী চাকীর আগা, কাদী 'আসকের মোল্লা খুসরেভ এবং কয়েকজন ব্যবসায়ী (এলভান যাদে খওয়াজা সিনান, উসকুবলু হাজ্জী ইবরাহীম, খাওয়াজা উভেয়স, খাওয়াজা খালীল)। ৯৫৩/১৫৪৬ সালের ওয়াক্‌ফ রেজিস্টার হইতে দেখা যায় যে, মসজিদ প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে ৬০% ছিলেন শাসক 'আসকেরী (সেনা প্রশাসক) শ্রেণীর লোক (রাজপ্রাসাদের কর্মকর্তা, সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা, উলামা ও আমলা)। বিভিন্ন পেশার কাহারা কতগুলি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন সেই পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

| | |
|---|---|
| 'উলামা' ও শায়খগণ | ৪৬ |
| সওদাগর ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়িগণ | ৩২ |
| অন্যান্য ছোট ব্যবসায়িগণ | ২৮ |
| রাজপ্রাসাদের আগাগণ | ১৮ |
| বেগগণ | ১৬ |
| পাশাগণ | ১৪ |
| কাপি-কুলুর কর্মকর্তাগণ | ১২ |
| "আমলাগণ" | ৮ |
| স্থপতিগণ | ৬ |
| অন্যরা | ৩৯ |
| মোট | ২১৯ |

'আসকেরী শ্রেণীগণের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ পদস্থ ছিলেন তাঁহারা বস্তুত সওদাগর ও কারুশিল্পিগণ অপেক্ষা ধনাঢ্য ছিলেন, তাঁহারাই ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠিত করিতে অধিকতর উদ্যোগী ছিলেন। উহার কারণ অংশত ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা অর্জন, কিন্তু অন্যতম কারণও অবশ্যই ছিল যে, রাষ্ট্রীয় কোষাগার হইতে যে সম্পদ তাঁহারা আয় করিয়াছিলেন ওয়াক্‌ফ-এর মাধ্যমে তাহা পরিবারেরই নিয়ন্ত্রণে রাখা (দ্র. ইনালচিক, Capital formation ...,133-40)।

**৫। ১০ম/১৬শ শতকের উন্নয়নসমূহ ঃ** ১০ম/১৬শ শতকে প্রাচীরের ভিতরে বসবাসকারী জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে পুরানা মাহাল্লেগুলিতে জনসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা ঘন হয়, কিছু কিছু পাঞ্জেগানা মসজিদের স্থলে জামে' মসজিদ নির্মিত হয়, নূতন মসজিদও নির্মাণ করা হয় এবং পূর্বে যে সকল এলাকা পরিত্যক্ত ছিল সেখানে নূতন কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়, নূতন নূতন মাহাল্লের সৃষ্টি হয়। এইগুলি হয়, বিশেষ করিয়া জমিনের উপরে তৈরী নগর দেওয়ালের দিকে, বায়রাম পাশা দেরেসি (the Lycus) বরাবর, এমনকি দেওয়ালের বাহিরের দিকেও। আর গালাতার চতুর্দিকে জনবসতিপূর্ণ এলাকা একেবারে Golden Horn পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়া ঢালু এলাকা বাহিয়া তোপখানে পর্যন্ত পৌঁছায়। ফলে ফীনদীকলী, জিহাঙ্গীর ও কাসিম পাশা—এই নূতন জেলাগুলির সৃষ্টি হয়। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে নূতন নূতন ভবন নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহার মুকাবিলা করিবার জন্য সুলতানের প্রাসাদের খাসসা মিমারলারী দফতরের কর্মকাণ্ড অনেক বাড়িয়া যায়। উক্ত দফতরে ইতোমধ্যেই পৃথিবী জোড়া খ্যাতিসম্পন্ন অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থপতি সিনান (দ্র.) যোগদান করিয়াছিলেন (৯৩২/১৫২৫ সালে এই দফতরে ১৩ জন স্থপতি নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ছিলেন মুসলিম; ১০১৩/১৬০৪ সালে ছিলেন ২৩ জন মুসলিম ও ১৬ জন খৃস্টান। এই দফতরটির গঠনের বিষয়ে দ্র. এস. তুরান, তারিহ আরাসতিরমালারি দেরগিসি, আঙ্কারা ১৯৬৩ খৃ., ১/১ খ., ১৫৭-২০২)। ফলে সমগ্র 'উছমানী আমলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর স্থাপত্যকীর্তি ও শিল্পকলা এই সময়ের সৃষ্টি। দুইবার উযীরে আযাম রুস্তেম পাশা (দ্র.)-র মসজিদটি নির্মিত হয় শুল্ক গুদাম ও দোকান এলাকাতে হাজ্জী খালীল-এর মসজিদ যেখানে ছিল সেখানে [দ্র. এ. এস. উলগেন, রুস্তেম পাশা হেয়েতি, মিমারলিক দেরগিসিতে প্রকাশিত, ৯খ. (১৯৪২ খৃ.), পৃ. ২৩-৮]। পীরী মেহমেদ পাশা (উযীরে আ'জাম, ৯২৩/১৫১৭-৯২৯/১৫২৩) এক বিশাল ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠিত করেন, উহার মধ্যে ছিল মেয়রেক জেলাতে একটি মসজিদ ও একটি মেদ্রেসে, মেরজানে একটি মসজিদ, মোল্লা পুরানীতে একটি মসজিদ ও একটি খানকাহ এবং সিলিভরিতে একত্রে একটি মসজিদ, একটি গেয়েসে (মাদ্‌রাসা) ও একটি মুসাফিরখানা। এইগুলির ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক ৬,০০০ ডুকার্ট আয়ের উৎস ছিল একটি খান (বেদেস্তানের নিকটে), গালাতার নিকটে

অপর একটি খান এবং তাখতাকাল'এ ও বালীক পাযারীতে কিছু সংখ্যক দোকান, আর Golden Horn-এর উত্তরে তাঁহার যে বাগান ছিল সেখানেই পরবর্তী কালে পীরী পাশা বসত এলাকা গড়িয়া উঠে (দ্র. এভলিয়া, ১খ., ৪১১)।

৯৪৬/১৫৩৯ সালে সুলতান সুলায়মান তাঁহার বেগম খুর্‌রেম-এর নামে আকসারায়ের 'আভরেত-পাযারীতে মহিলাগণের বাজারে একই নির্মাণকে ঘিরিয়া একটি মসজিদ, একটি মেদ্রেসে, একটি হাসপাতাল, একটি মুসাফিরখানা ও একটি স্কুল নির্মাণ করেন। এই আকসারায় ক্রমেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল (এই বাজারটি গড়িয়া উঠিয়াছিল Columa of Arcadius-এর চতুর্দিক ঘিরিয়া, ইহার বিষয়ে ও এই সময়ে উহাই সমৃদ্ধির বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. C. de Villanon, 306 ও তু. Sanderson, 77)। ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত একটি খান, একটি হাম্মাম বা গোসলখানা, একটি কাঠ-গুদাম। একটি কসাইখানা এবং বিভিন্ন শুল্ক গুদাম ও দোকান হইতে বৎসরে পাঁচ লাখ আকচে (৮,৪০০ ডুকার্ট) আয় হইত। সুলতান তাঁহার পুত্র মেহমেদ (মুহাম্মাদ)-এর স্মৃতিতে দীভান-য়োলুর পার্শ্বে, ডেফা ও সাররাজখানের মাঝখানে এক যথার্থ শাহী কমপ্লেক্স (দ্র. এওলিয়া, ১খ., ১৬২)-এর সমারোহ গড়িয়া তোলেন (৯৫১/১৫৪৪-৯৫৫/১৫৪৮; মসজিদ, মেদ্রেসে, মুসাফিরখানা, স্কুল, তুরবে, এবং একটি কেরবান সারায় ইত্যাদির মাধ্যমে)। আর তাঁহার পুত্র জিহাঙ্গীর-এর জন্য তিনি ফীনদীকলীতে একটি মসজিদ ও একটি স্কুল নির্মাণ করেন, তাহা হইতেই পরে জিহাঙ্গীর-জিলার নামকরণ হয় (দ্র. এওলিয়া, ১খ., ৪৪২)।

সর্বশেষে শহরের কেন্দ্রের একটি এলাকাতে আগুন লাগিয়া সব পুড়িয়া যায়। সুলতান সুলায়মান সেই শূন্যস্থানে, পোতাশ্রয়ের মুখামুখী একটি পাহাড়ের উপরে রাজধানীর সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও সুন্দর ভবনসমূহ নির্মাণের জন্য স্থপতি সিনানকে দায়িত্ব প্রদান করেন। এই সুলায়মানিয়া (মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু হয় জুমাদা-২, ৯৫৭/জুলাই ১৫৫০ সনে, আর নির্মাণ শেষ হয় যু'ল-হিজ্জা ৯৬৪/অক্টোবর ১৫৫৭। ইহার শিলালিপির বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. সি. কুলপান, কানুনী আরমাগানী-তে প্রকাশিত, আঙ্কারা ১৯৭০ খৃ., পৃ. ২৯৩) সর্বমোট অন্তত ১৮টি প্রতিষ্ঠান নিয়া গঠিত (দ্র. S. Syice, ইস্তানবুল, পৃ. ৪৯-৫২, গ্রন্থপঞ্জী)। চত্বরের ভিতরে রহিয়াছে মসজিদ, সুলতান সুলায়মান ও খুররেম সুলতান-এর মাযার-সৌধ ও তুর্বেদার-এর ভবন। বাহিরে মসজিদের উভয় পার্শ্বে রহিয়াছে চারিটি মেদ্রেসে এবং সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারু'ল-হাদীছ। অন্য বড় বড় ভবন হইতেছে একটি হাসপাতাল, একটি দারু'দ-দিয়া'আ ও একটি তাবখানে। ছোট ছোট ভবন হইতেছে মুলাযিমগণের (যাহারা মেদ্রেসেতে ভর্তি হইবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণরত) জন্য একটি কলেজ, একটি কুতুবখানা (লাইব্রেরী), একটি চিকিৎসা কেন্দ্র ও ছোটদের একটি স্কুল। মসজিদের নিকটে শিক্ষকগণের ও মসজিদের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারিগণের কয়েকটি বাসস্থান, একটি খান ও মেদ্রেসের সামনে কয়েকটি দোকান লইয়া একটি চারশী গঠিত হইয়াছে। সেইসব মিলাইয়া সুলায়মানিয়্যা ভবনমালা সম্পূর্ণ হইয়াছে। আওলিয়া চেলেবির বর্ণনা অনুযায়ী (১খ, পৃ. ১৫৭) জানিসারী সেনাবাহিনীর আগার যে প্রাসাদ (পরবর্তী কালে উহা শায়খু'ল-ইসলাম-এর দফতররূপে ব্যবহৃত হয়) উহাও এই ভবনগুলির অংশই ছিল (সুলায়মানিয়্যা ও আগার প্রাসাদের বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. M. Lorichs, Tafel x)।

এই কমপ্লেক্সসমূহের ব্যয়ের যে রেজিস্টারসমূহ সেগুলি হইতে জানা যায় যে, এই বিশাল কর্মপ্লেক্সসমূহ নির্মাণ করিবার সময়ে কি কি পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছিল [দ্র. (১) O. L. Barkan, L'organisation du travail dans la chantier d'une grande mowque a Istanbul ou xvie siecle, in Annales, Economies, Societes, civilisations, xvii (1962), 1093-1106; আহমাদ মসজিদ নির্মাণের অনুরূপ রেজিস্টারের জন্য দ্র. ; (২) টি. ওয়, ভাকিফ্‌লার দরেগিসি-তে , ১৯৩৮ খৃ., ১খ., পৃ. ২৬ ; (৩) তু. তা'রীখ-ই জামি'-ই শেরীফ-ই নূর-ই 'উছমানী, 'ইলাভে হইতে TOEM পর্যন্ত, নং ৪৯ ]। নির্মাণসামগ্রী ও কারিগর সংগ্রহ করা হইয়াছিল ইস্তাম্বুল হইতে এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থান হইতে, কারিগর ও শ্রমিকদেরকে কড়া শৃঙ্খলার মধ্যে রাখা হইত। যে সকল স্থপতি ও কারিগর অর্থাৎ ওস্তাগর ও তাহাদের সহযোগী নির্মাণের পুরা ৫ বৎসর ৭ মাস কালই একটানা কাজে নিযুক্ত ছিল এবং নিয়মিত বেতন গ্রহণ করিত, তাহাদের মধ্যে ২৯% ছিল ইস্তাম্বুলের, ১৪% রুমেলি ও দ্বীপ অঞ্চলের ও ১৩% আনাতোলিয়ার (বাকী ৪৪%-এর বিষয়ে কিছু লেখা নাই)। মোট ৩,৫২৩ জন স্থপতি ও কারিগরের মধ্যে ৫১% ছিল খৃস্টান, আর ৪৯% ছিল মুসলিম। দেওয়াল নির্মাণকারিগণ, লোহার কারিগরগণ এবং পয়ঃপ্রণালী ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থাতে যাহারা কাজ করিত তাহারা ছিল প্রধানত খৃস্টান, আর পাথর খোদাই, কাঠের কাজ, চিত্রকর, কাচের কাজ ও সীসার কাজ যাহারা করিত তাহারা ছিল প্রধানত মুসলিম। মোট শ্রমশক্তির ৫৫% ছিল স্বাধীন, তাহারা বেতনে কাজ করিত, ৪০% ছিল 'আজেমী ওগলান, আর ৫% ছিল যুদ্ধ জাহাজের দাঁড়টানা ক্রীতদাস।

সুলতান সুলায়মানের সকল ওয়াক্‌ফই (ইতোমধ্যে উল্লিখিত ভবনসমূহ, সুলতান সেলীমের মেদ্রেসে ও ফীল দামী মাহাল্লের যাবিয়ে ব্যতীত) একটিমাত্র ওয়াক্‌ফিয়্যাতে একত্রীভূত করা ছিল (সম্পা. কে. ই. কুর্কচুওগলু, আঙ্কারা ১৯৬২ খৃ.)। সুলতান ৩য় মুরাদের শাসনামলে কৃত একটি তাহরীর লিখিত ভাষ্য অনুযায়ী (দ্র. আয়ভের্দী-বারকান, পূ. গ্র., ১৭, নং ৩১) তৎকালীন বার্ষিক আয় ছিল ৫২,৭৭,৭৫৯ আক্‌চে (৮৮,০০০ ডুকাট)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই আয়ের ৮১% আসিত রূমেলির ২৩০টি গ্রামের খাজনা হইতে। সমগ্র ভবনরাজিতে নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৭৪৮, আর তাহাদের বার্ষিক ভাতার পরিমাণ ছিল প্রায় ১০ লক্ষ আকচে।

এই শতাব্দীতে জমিনের এলাকার দরওয়াজার কাছে ও Lycus উপত্যকার কাছে যে সকল ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান করা হয় সেগুলি হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এই সকল এলাকাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এদীরনে কাপীসী অঞ্চলে, মিহরুমাহ ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান ছাড়াও (উপরে দ্র.) মেসীহ পাশার মসজিদ ভবনসমূহ ছিল। উহার অবস্থান ছিল এই, দরওয়াজা ও ফাতিহ-এর মাঝখানে (শিলালিপির তারিখ ৯৯৪ ? ১৫৮৬; দ্র. টি. বোযকূর্ত, মেসিহ পাশা কুল্লিয়েসি, ইস্তাম্বুল বিশ্ববি, শিক্ষা অনুষদের সন্দর্ভ, ১৯৬৪ খৃ.) এবং বালাত দোভাষী য়ুনুস বেগ-এর মসজিদ (নির্মাণ ৯৪৮/১৫৪১ সাল), ফেররুখ কেতখুদার মসজিদ (৯৭০/১৫৬২ সাল) ও কাদী সা'দীর মসজিদ ছিল।

তোপকাপীতে রহিয়াছে কারা আহমাদ পাশা ভবনসমূহ, এইগুলি সবই স্থপতি সিনান-এর কাজ (৯৬২/১৫৫৪) ঃ মসজিদ, মেদ্রেসে,

দারু'ল-কুর্‌রা', স্কুল, ফোয়ারা (দ্র. এস. য়ালতকায়া ও 'আলী সাইম উলগেন, ভাকিফ্‌লার দেরগিসি-তে প্রকাশিত, ১৯৪২ খৃ., ২খ, পৃ. ৮৩-৯৭ ও ১৬৯-৭১)। এইগুলির কারণেই জেলার ব্যাপক সমৃদ্ধি ঘটে। আরপা এমীনী (দেফতেরদার) মুস্‌তাফা মসজিদটির কথাও উল্লেখযোগ্য।

য়েনিব্যাগচি জিলাটিও যে শাসকশ্রেণীর বিশেষ সুদৃষ্টি লাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় সুলতান সেলীমের মসজিদ ও মেদ্রেসে স্থাপন হইতে। তাহা ছাড়া রহিয়াছে কাদী 'আসকের 'আবদু'র-রাহমান চেলেবির মসজিদ; খুররেম চাভুশ-এর মসজিদ ; কাপুদান পাশা সিনান পাশার মসজিদ ও মেদ্রেসে ; মি'মার (কোজা) সিনান-এর মসজিদ ; য়েনিচেরি কাতিবি মসজিদ; উযীরে আ'জাম (৯৪৪/১৫৩৭-৯৪৭/১৫৪০ সাল) লুতফী পাশার মসজিদ এবং সেই সঙ্গে তাঁহার বেগম শাহ্-ই খুবান-এর জন্য নির্মিত প্রাসাদ, ফোয়ারা, গোসলখানা ও মাযার। মাহমূদ আগা'র প্রসাদও এখানেই অবস্থিত ছিল।

সিলিভ্‌রি কাপীসী জেলাতে নির্মাণের উদ্যোগ সৃষ্টি হয় খাদিম ইব্‌রাহীম পাশার ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে। এইগুলির মধ্যে ছিল একটি মসজিদ (নির্মাণ ৯৫৮/১৫৫১), একটি মেদ্রেসে, একটি স্কুল, তিনটি হাম্মাম, চারিটি বড় বসতভবন ও সাতটি বাড়ী (দ্র. এ. এরদোগান, ভাকিফ্‌লার দেরগিসি-তে প্রকাশিত, ১খ, ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ২৯-৩৩)। হাজ্জী এভহাদ-এর মসজিদ ও হাম্মামও (উভয়েরই নির্মাতা ছিলেন সিনান) নগর দেওয়ালের কাছেই য়েদিকু'লে স্থাপন করিয়াছিলেন। মর্মর (Marmara) সাগরের উপকূলবর্তী নগর দেওয়াল Golden-Horn-এর উপকূলবর্তী দেওয়াল বরাবর নূতন নূতন ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ শুরু হয় ঃ আখুর কাপীতে মাহমূদ আগা'র মসজিদ, কুম্‌কাপীতে ইবরাহীম পাশার বেগমের মসজিদ, লাঙ্গাতে বাযিরগান যাদের মসজিদ ও শেয়খ ফেরহাদ-এর মসজিদ, কাদিরগাতে সোকোল্লু মেহমেদ (মুহাম্মাদ) পাশা/এসমা খাতুন-এর মসজিদ, মেদ্রেসে ও যাবিয়ে (দ্র. S. Eyice in IA, art. Istanbul, p. 1214/68) ; উন-কাপানীতে সুলায়মান সুবাশীর মসজিদ ও তুফেন খানের স্থপতি সিনানের কীর্তি (দ্র. আ. এম. মেরিস, মি'মার সিনান, আঙ্কারা ১৯৬৫ খৃ.)।

৯৪৭/১৫৪০ হইতে ৯৯৬/১৫৮৮ সাল পর্যন্ত সময়কে বাস্তবিক অতি সঙ্গত কারণেই "সিনান-এর আমল" বলিয়া আখ্যায়িত করা যায়। কেননা তিনি ও তাঁহার অধীনস্থ স্থপতিগণ, সুলতানগণ ও বিশিষ্ট আমীর-উমারার জন্য ইস্তাম্বুলে ৪৩টি জামে' মসজিদ, ৫২টি পাঞ্জেগানা মসজিদ, ৪৯টি মেদ্রেসে, ৭টি দারু'ল-কুররা', ৪০টি হাম্মাম, ২৮টি প্রাসাদ ও কোশ্‌ক , ৩টি মুসাফ্রিরখানা, ৩টি হাসপাতাল ও ৬টি খান নির্মাণ করেন। পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে সিনান-এর অন্যান্য নির্মাণকার্য হইতেছে এয়্যুবে যাগওগ'লী মাহ্‌মূদ পাশা মসজিদ (উহার ফোয়ারার নির্মাণকাল ৯৫৮/১৫৫১), দেফতেরদার মাহ্‌মূদ চেলেবি মসজিদ (নির্মাণ ৯৪৮/১৫৪১) ও শাহ সুলতান মসজিদ ; তোপখানেতে ঃ কীলীচ 'আলী পাশা মসজিদ (নির্মাণ ৯৮৭/১৫৮০) ও মুহীয়ে'দ-দীন চেলেবি মসজিদ ; ফীনদীকলীতে জিহাঙ্গীর-এর মসজিদ ও কাদী 'আসকের মুহাম্মাদ ভুস্‌'লীর (মোল্লা চেলেবি) মসজিদ, স্কুল ও হাম্মাম (নির্মাণ ৯৭৩/১৫৬৫), বেশিকতাশ-এ সিনান পাশার মসজিদ (নির্মাণ ৯৬৩/১৫৫৫), সুতলুজেতে কাভুশবাশী মসজিদ, উসকুদারে মিহরুমাহ সুলতান মসজিদ (নির্মাণ ৯৫৪/১৫৪৮), শেমসী আহমাদ পাশা মসজিদ (৯৮৮/১৫৮০) এবং এসকি ভালিফে (নূর বানূ) সুলতান মসজিদ (৯৯১/১৫৮৩), কাসিম পাশাতে কাসিম পাশা মসজিদ ও মেদ্রেসে ভবন (ওয়াক্‌ফ-এর নগদ মূল্য ছিল ২৬,৩০,০০০ আকচে, আর সম্পদের বিনিময় মূল্য ছিল ১,১৭,০০০ আকচের সমান) এবং ওকমেয়দানীর দিকে পিয়ালে পাশা কমপ্লেক্স; যথা মসজিদ, মেদ্রেসে, স্কুল, তেক্কে, ফোয়ারা ও হাম্মাম (ওয়াক্‌ফিয়্যার তারিখ ৯৮১/১৫৭৩)।

কসাইখানা ও চামড়ার কারখানাগুলি য়েদিকুলের বাহিরের দিকে যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়, আদিতে এখানে ছিল চামড়া পরিশোধনের ২৭টি কারখানা, ৩২টি কসাইয়ের দোকান এবং পশুর রগ হইতে শক্ত রশি তৈরীর ৫টি কারখানা (সুলতান ২য় মুহাম্মাদের ওয়াক্‌ফিয়্যা ও ৮৯৮/১৪৯৩ সালের আয়া সোফিয়ার রেজিস্টার ; আওলিয়া চেলেবির মতে, ১খ., পৃ. ৩৯১)। পরবর্তী শতকের মাঝামাঝি সময়ে এখানে একটি 'সমৃদ্ধ নগরী' গড়িয়া উঠে, তখন এখানে ১টি জামে' মসজিদ, ৭টি মসজিদ, ৩০০ চামড়ার কারখানা, ৫০টি আটার দোকান ও পশুর রগ শুকাইয়া বিভিন্ন প্রয়োজনে শক্ত রশি তৈরীর ৭০টি কারখানা ছিল। এই চামড়ার ব্যবসায়িগণ ইস্তাম্বুল শহরে যবেহ করা সকল পশুর চামড়া কিনিবার দাবিদার ছিল (দ্র. ও. নূরী, মেঝেল্লে-ই উমার-ই বেঁলেদিয়ে, ইস্তানবুল ১৯২২ খৃ., ১খ., ৮৩০-২; ১০১৬/১৬০৭ সালে ইস্তাম্বুলে কসাইখানার সংখ্যা জানিবার জন্য দ্র. এ. রেফিক, ইস্তাম্বুল হায়াতি, ১০০০-১১০০, ইস্তানবুল ১৯৩১ খৃ., পৃ. ৩০-১)।

১০ম/১৬শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও ১১শ/১৭শ শতকের প্রথমার্ধে জনবসতিপূর্ণ এলাকা সম্প্রসারিত হইয়া স্থলভাগের নগর প্রাচীরের বাহিরে এয়্যুবের দিকে অগ্রসর হয় (ওতাকসীলার, নিশানজী পাশা ও চমলেকচিলের মাহাল্লেসমূহ, এইগুলির বর্ণনা দিয়াছেন আওলিয়া চেলেবি, ১খ., ৩৯১-৬)। উল্লিখিত একই সময়ে প্রধান প্রধান নগর দরওয়াজার বাহিরে নির্মিত মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকে জনবসতি গড়িয়া উঠে ঃ তোপকাপীতে তাকয়েজি ইব্‌রাহীম আগা (মৃ. ১০০৪/১৫৯৫-৬ দ্র. এম. এম. যিয়্যা, ইস্তাম্বুল, পৃ. ১২৮ ; ভিত্তি পাথরে লিখিত তারিখ ১০০০/১৫৯১) মসজিদকে ঘিরিয়া তাকয়েজি মাহাল্লেসি গড়িয়া উঠে ; আর য়েনি কাপীতে মেরকেয এফেন্দীর (মৃ. ৯৫৯/১৫৫১; দ্র. T. Yazici, Ist. Enst. Dergisi-তে প্রকাশিত, (১৯৫৬ খৃ.), ২খ, পৃ. ১০৪-১৩) মসজিদ ও যাবিয়ে এবং য়েনিচেরিলের কাতিবি মালকোচ মেহমেদ এফেন্দী কর্তৃক ১০০৬/১৫৯৭ সালে নির্মিত বিশাল মেভলেভীখানেসি। পরবর্তী কালে ইহাকে অনেক সম্প্রসারিত করা হয়, (দ্র. (১) এম. যিয়ায়েনি-কাপী মেভলেভীখানেসি, ইস্তাম্বুল ১৩২৯ হি.; (২) ঐ লেখক, ইস্তাম্বুল, পৃ. ১১৫-৮)। এই সরগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই জনবসতি গড়িয়া উঠে (দ্র. আওলিয়া চেলেবি, ১খ., ৩৯২)। শেষ যে দুইটি মসজিদ ও সংলগ্ন ভবন ঐতিহ্যগত ও চিরায়ত 'উছমানী স্থাপত্যরীতিতে নির্মাণ করা হয় সেগুলি হইল Hippodrome-এর উপরে নির্মিত সুলতান ১ম আহ্‌মাদের মসজিদ এবং এমীন-উনীতে নির্মিত ভালিদে জামি'ই (য়েনি জামে')।

প্রথমোক্ত সুলতান ১ম আহ্‌মাদের মসজিদটি ১০১৮/১৬০৯ হইতে ১০২৬/১৬১৭ সালের মধ্যে নির্মিত হয়, নির্মাণ ব্যয় ছিল ১৫ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, মসজিদের সঙ্গে নির্মিত হয় একটি মেদ্রেসে, একটি হাসপাতাল, একটি লঙ্গরখানা, একটি দারু'দ-দিয়াফা, মুসাফিরখানা, একটি স্কুল, সর্বসাধারণের জন্য একটি পানির ফোয়ারা এবং একটি আরাসতা ধরনের

চারশী [ দ্র. (১) আওলিয়া চেলেবি, ১খ, ২১৬-১৯ ; (২) তাহসিন ওয, ভাকিফ্লার দেরগিসি-তে প্রকাশিত, ১খ., ২৫-৮; (৩) S. Eyice, IA-তে প্রকাশিত, প্রবন্ধ ইস্তানবুল, পৃ. ১২১৪/৫৯]। এই মসজিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য গালাতা'র অধিবাসিগণের উপর আরোপিত জিযয়া ওয়াক্ফ করিয়া দেওয়া হয়।

য়েনি জামি'-এর নির্মাণকাজ শুরু হয় ১০০৬/১৫৯৭ সালে, নির্মাণ শুরু করেন সাফিয়্যে সুলতান (দ্র.), কিন্তু মাঝখানে বহু বৎসর যাবত নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকে, পরে ১০৭১/১৬৬০-১০৭৪/১৬৬৩ সালের মধ্যে তুরখান সুলতান (দ্র.) নির্মাণ শেষ করেন। মসজিদটির সংলগ্ন রহিয়াছে একটি দারু'ল-কুররা', একটি স্কুল, কয়েকটি ফোয়ারা, তুরখান-এর মাযার এবং একটি বাজার (মিস্র চারশীসী) ও দোকানসমূহ [দ্র. (১) এস. উলগেন, ভাকিফ্লার দেরগিসি-তে প্রকাশিত, ২খ., ৩৮৭ ; (২) S. Eyice, পৃ. ১২১৪/৬০ ; এলাকাটির বিস্তারিত খোদাই চিত্রের জন্য দ্র. (৩) Grelot, p. 283]।

১২শ/১৮শ শতকে বুয়ুক চারশীতে নির্মিত হয় নূর-ই 'উছমানিয়্যে মসজিদ ও সংলগ্ন ভবনসমূহ; এগুলির নির্মাণকাল ১১৬১/১৭৪৮-১১৬৯/১৭৫৬ ; মসজিদ, মেদ্রেসে, কুতুবখানে (লাইব্রেরী), সেবিলখানে বা সর্বসাধারণের খাবার পানির ব্যবস্থা রহিয়াছে [দ্র. (১) তা'রীখ-ই জামি'-ই শেরীফ-ই নূর-ই 'উছমানিয়্যা, Suplement to TOEM, ইস্তাম্বুল ১৩৩৭ হি.; (২) দোগান কুবান, তুর্ক বারোক মিমারিসি, ইস্তাম্বুল ১৯৫৪ খৃ.)। এই সময়ের অপর নির্মাণ কাজ হইতেছে লালেলি কমপ্লেক্সসমূহ (১১৭৪/১৭৬০-১১৭৭/১৭৬৪ সাল), এখানে নির্মিত হয় একটি মসজিদ, একটি মেদ্রেসে ও ফোয়ারা। এইগুলি ঠিক চিরায়ত ও ঐতিহ্যগত 'উছমানিয়্যা রীতিতে নির্মিত হয় নাই, 'উছমানিয়্যা রীতির সঙ্গে য়ুরোপীয় বারোক (baroque) রীতির মিশ্রণই এখানে লক্ষণীয়।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এই অবক্ষয়ের যুগে মুসাফিরখানা ও হাসপাতালসমূহ পরিচালনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বাৎসরিক ব্যয়ের প্রয়োজন হইত বলিয়া উহাদের পরিবর্তে লাইব্রেরী ও ফোয়ারা অধিক সংখ্যায় নির্মিত হইতে থাকে। উযীরে আ'জামগণ যে সকল মসজিদ ভিত্তিক নির্মাণ করিতেন সেখানেই এই প্রবণতা বেশী পরিলক্ষিত হয়। কোপরুলু পরিবারের তিনজন উযীর দীভান-য়োলী বরাবর এইরূপ নির্মাণকার্য করান (মেহমেদ পাশা মাযার, মেদ্রেসে, লাইব্রেরী ; কারা মুসতাফা পাশা, ১১০১/১৬৯০ সাল ঃ মসজিদ, মেদ্রেসে, স্কুল, ফোয়ারা ; 'আমজাযাদে হুসেয়ন পাশা. ১১১২/১৭০০ সাল ঃ মসজিদ, মেদ্রেসে, লাইব্রেরী, ফোয়ারাসমূহ)। এখানেও রহিয়াছে চোরলুলু 'আলী পাশার ফাউন্ডেশন (১১২০/১৮৭০৮ সাল ঃ মসজিদ, মেদ্রেসে) ; দামাদ ইব্রাহীম পাশার ফাউন্ডেশনসমূহ (১১৩২/১৭২০ সাল ঃ দারু'ল-হাদীছ , ফোয়ারা) এবং সেয়্যিদ হাসান পাশার কমপ্লেক্সসমূহ (১১৫৮/১৭৪৫ সাল ঃ মেদ্রেসে, স্কুল, ফোয়ারা দোকানসমূহ, রুটি তৈরির দোকান ; দ্র. 'ও. নূরী, মেজেল্লে . . ., ১খ., পৃ. ১০৫৪-৫)। এই আমলের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে শহরের হালকা বসতির এলাকাসমূহে পুরাতন নির্মাণ রীতি অনুসারে নূতন নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করা (যথা হেকীম-ওগলু 'আলী পাশার নির্মাণসমূহ, এগুলি কোজা মুসতাফা পাশা নাহিয়েতে অবস্থিত, নির্মাণকাল ১১৪৬/১৭৩৩-১১৪৭/১৭৩৫)। উসকুদারের নূতন জনবসতির জেলাগুলিতে ও বসফরাসের উপকূল বরাবর অনুরূপ নির্মাণকার্যসমূহ হয়।

এরূপ ওয়াক্ফ করা কমপ্লেক্সসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে কোসেম ভালিদে সুলতান (দ্র.) কমপ্লেক্সসমূহ (মসজিদ, মেদ্রেসে, মুসাফিরখানা, গোসলখানা, খান ; ইহার ওয়াক্ফিয়্যার জন্য দ্র. W. Caskel, in Documenta islamica inedita, Berlin 1952, 251-62) এবং গুলনূশ সুলতান-এর কমপ্লেক্সসমূহ (য়েনি ভালিদে, নির্মাণকাল ১১২০/১৭০৮-১১২২/১৭১০; মসজিদ, ফোয়ারাসমূহ; দ্র. এ. রেফিক, পূ. গ্র., পৃ. ৪২), এইগুলি উসকুদারে অবস্থিত, ১ম 'আবদু'ল-হ'ামীদের মসজিদ (নির্মাণ ১১৯২/১৭৭৮, সেই সঙ্গে ইস্তাম্বুলের বাগচীকাপীতে অন্যান্য সম্পত্তি)। ইহা বেগলারবেগীতে অবস্থিত এবং মিহরি শাহ সুলতান-এর কমপ্লেক্সসমূহ (নির্মাণকাল ১২১০/১৭৯৫ ঃ মুসাফিরখানা, ফোয়ারা স্কুল), এইগুলি এয়্যুবে অবস্থিব।

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে খৃ. ১৭শ শতক পর্যন্ত ইস্তাম্বুলের সকল সম্প্রসারণ কাজই হয় নগর প্রাচীরের ভিতরে। ১৭ ২ বর্গ-কিলোমিটার পরিমিত এই এলাকাটার সমস্তই এই সময়ের বায়যানটীয় আমলের গৌরবের দিনও এই ধরনের কিছু নির্মিত হয় নাই (দ্র. যথা Schneider Mayer, Jacoby)। ৯৫০/১৫৪৩ সালে সুলতান ১ম সুলায়মানের রাজত্বের মাঝামাঝি সময়েও বহু জায়গাতে বিস্তৃত পতিত জমি ছিল (দ্র. Mayer, 63 ; M. Lorichs সুলেয়মানিয়্যে ও Golden Horn-এর মধ্যবর্তী স্থানে সেই পতিত এলাকা চিহ্নিত করিয়াছেন এবং উহাকে খোলা জায়গারূপে দেখাইয়াছেন)। সেই শতাব্দী সময়কালের মধ্যে Lycus উপত্যকা বরাবর ও জমিনের উপরে নির্মিত নগর দরওয়াজাগুলির নিকটস্থ এলাকাগুলিতে যদিও আমীর-উমারার প্রাসাদ ও অন্য ভবনমালা নির্মিত হয়, তথাপি নগরের এই শ্রেণীর অধিবাসিগণ বিচ্ছিন্নভাবেই বসবাস করিতে থাকেন, তাঁহাদের অগণিত প্রমোদ ভবন, বাজার-বাগিচা ইত্যাদি ছিল ঃ ১১শ/১৭শ শতকে, উদাহরণস্বরূপ, য়েনি-বাগচির বর্ণনা পাওয়া যায় (এদীরনে কাপীসীর দ. প. এলাকা) যে, উহা তখন ছিল এক বিস্তীর্ণ শূন্য ময়দান, সেখানে দশ হাজার ঘোড়া চরিতে পারিত (দ্র. হেযারফেনন, তালখীসু'ল-বায়ান)। সে রকমই (নামগুলি লক্ষণীয়) আগা সায়্যিদ এলাকাতে (সিলিভ্‌রি কাপীসী ও য়েদি কুলের মধ্যবর্তী স্থান) অর্থাৎ শহরের একেবারে দক্ষিণের কোণাতে য়েদি কুলের চতুর্দিকে, মর্মর (Marmara) উপকূলের বোস্তান য়েরিতে, সামাত্যা এব দাভুদ পাশা কাপীসীর মধ্যবর্তী স্থানে ও আরও পূর্বে লাঙ্গা বোস্তানলারীতে, কাদিরগা বোস্তানলারীতে মুনদি মেয়দানীতে। জমিনের উপর দিয়া নির্মিত নগর প্রাচীরের নিকটে বিশাল, বিস্তীর্ণ খোলা সংরক্ষিত স্থান ছিল (সবয়টিকে বলা হইত চুকুর বোস্তামনী), সেগুলি ছিল আলতী মেরমের এদীরনে কাপীসী ও সুলতান সেলীম এলাকাতে, এমনকি শহরের ঘন বসতিপূর্ণ এলাকাতেও পুরাতন প্রাসাদের ও নূতন প্রসাদের সামনের চাটান ও বাগিচা (০. ৬৭ বর্গ কিলোমিটার) এবং বিশালাকার মসজিদসমূহের সামনের চত্বর সব খালিই পড়িয়া ছিল (অনুমান করা হইয়াছিল যে, মসজিদগুলিতে ১,০০,০০০ লোকের স্থান সঙ্কুলান হয় (দ্র. Medical and surgical history of the British Army, London 1858)।

এই খোলা জায়গাগুলি নষ্ট করা হয় নাই। মসজিদের সামনে খোলা চত্বর, সেখানকার আকর্ষণীয় দৃশ্যাবলী, ছায়া প্রদানকারী গাছ, এইগুলি বিনোদনের জন্য অথিতি আকর্ষণীয় স্থান (দ্র. আওলিয়া চেলেবি, ১খ.,

পৃ. ৪৮১), কখনও কখনও সেখানে নানা রকম বাজারও বসিত (যেমন বায়েযীদ)। ইহার বিপরীতক্রমে আবার দোকানপাট ও ঘরবাড়ী ক্রমেই এই বায়যানটীয় শহরের স্থান দখল করিয়া লইতে থাকে, ফলে পুরাতন এলাকাসমূহ ক্রমেই অদৃশ্য হইয়া পড়ে। (Forum Constantini=সেনবেরলি তাশ মেয়দানী বা তাভুকপাযারী দিকিলি-তাশী মেয়দানী ; Forum Tauri= বায়েযীদ মেয়দানী ; Forum Arcadii= 'আভবেত-পাযারী; Forum Bovis= আকসারায়) [দ্র. (১) Mayer, 16-20; (২) Le Bruyn, 48]। Hippodrome (মেয়দানীতে)-কে সঙ্কুচিত করা হইলেও উহাই ইস্তাম্বুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার ও গুরুত্বপূর্ণ সর্বসাধারণের স্থানরূপে থাকিয়া যায় (Grelot-এর বইয়ে উহার সুন্দর খোদাই-চিত্র রহিয়াছে, পৃ. ২৭১)। বিনোদনের স্থান ছাড়াও এখানে বাজার বসিত এবং এখানেই ঘোড়ার কসরত দেখান হইত। ('আভরেত-পাযারী' আওরাত-বাজার, অন্যান্য 'উছমানী শহরের ন্যায় এখানেও শুধু মহিলাদের প্রবেশাধিকার ছিল) ধীরে ধীরে উঠিয়া যায় [বর্ণনার জন্য দ্র. (১) dernschwam, 98 ; (২) Sanderson, 77 ; (৩) Le Bruyn, 47]। ঘোড়ার কসরত ও তীর চালনা শুধু Hippodrome-এ করান হইত না, লাঙ্গা মেয়দানীতে ও জুন্দি মেয়দানীতেও করান হইত (দ্র. TOEM, ii 547)। ঐগুলিও জনসাধারণের বিনোদনের স্থান ছিল (দ্র. আওলিয়া চেলেবি, ১খ., পৃ. ৪৮১), উভয় স্থানেই কোনরূপ ভবন নির্মাণ করা বা বাগান করা নিষিদ্ধ ছিল (দ্র. এ. রেফিক, পূ. গ্র., পৃ. ১১২)।

**৬। মাহাল্লেগুলির গঠনরীতি; বড় সড়ক বা শাহী সড়ক; ভবন নির্মাণ বিধিমালা ; বেসরকারী ভবন নির্মাণের স্থাপত্যরীতি ; অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ; ভূমিকম্প**

**(ক) মাহাল্লেসমূহ ঃ** বিজয়ী সুলতান ২য় মুহাম্মাদের রাজত্বের শেষে ইস্তাম্বুল শহর ১৮২ টি মাহাল্লে লইয়া গঠিত ছিল (দ্র. আয়ভের্দী, ইস্তানবুল মাহাল্লেরি ..., আঙ্কারা ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ৮৪)। ৯৫৩/১৫৪৬ সালে এই মাহাল্লের সংখ্যা বাড়িয়া হয় ২১৯ (দ্র. ইস্তানবুল ভাকিফলারি দেফতেরি, সম্পা. আয়ভের্দী-বারকান, ইস্তানবুল ১৯৭০ খৃ., পৃ. ৪২৫; উক্ত সংখ্যা অমুসলিম মাহাল্লে বাদে)। ১০৪৪/১৬৩৪ সালে সর্বমোট মাহাল্লের সংখ্যা ছিল ২৯২ এবং তাহা ছাড়া ১২টি ছিল জেমা'আত (Community) [দ্র. এম. আকতেপে, ইস্তানবুল এন্সটিটুসু দেরগিসিতে প্রকাশিত, ৩খ, ১১৪]। ১০৮৩/১৬৭২ সালের মধ্যে উল্লিখিত সংখ্যা কমিয়া মুসলিম মাহাল্লের সংখ্যা হয় ২৫৩, আর অমুসলিম মাহাল্লের সংখ্যা হয় ২৪। ১২৮৮/১৮৭১ সালে নগর দেওয়ালের ভিতরের এলাকাতে মাহাল্লের সংখ্যা হয় মুসলিম ২৮৪, গ্রীক ২৪, য়াহূদী ৯ ; আর দেওয়ালের বাহিরে মাহালের সংখ্যা ছিল আরও ২৫৬টি, সেগুলি বসফরাস উপকূল, গোল্ডেন হর্ন এলাকা বরাবর এবং উসকুদারে ও কাদীকোয়-এ অবস্থিত ছিল (দ্র. এ. জেভাদ, মা'লূমাতু'ল-কিফায়া, ইস্তানবুল ১২৮৯ হি., পৃ. ১১১)।

এই মাহাল্লে ছিল একটি গঠনগত ঐক্যরূপ, নিজ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লইয়া অবস্থিত একটি স্থান। মসজিদ, গির্জা বা সিনাগগের চতুর্দিকে ঘিরিয়াই প্রতিটি মাহাল্লে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই মাহল্লেবাসিগণের প্রত্যেকে শুধু জন্মগতভাবেই যে পরস্পর সম্পর্কিত ছিল ( অধিকাংশ ক্ষেত্রে) এবং তাহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিই শুধু যে অভিন্ন ছিল তাহাই নহে, বাহ্যিক কিছু কিছু বিষয়ও ছিল, এইগুলি মিলিতভাবে সামাজিক সংহতি গড়িয়া তোলে। মাহাল্লে ও এলাকাবাসিগণের সকলের মিলিত হইবার স্থান এবং ঐক্যের প্রতীক ছিল ধর্মীয় মসজিদ বা গির্জা বা সিনাগগ, সেগুলির মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের ও কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের বেতন প্রদানের দায়িত্ব ছিল মাহাল্লেবাসিগণের সকলের, সেই উপাসনা ঘরের নামেই মাহাল্লেগুলিরও নামকরণ করা হয়। বস্তুত প্রতিটি মাহাল্লেরই আলাদা আলাদা স্কুল ও পানির ফোয়ারা ছিল এবং ধনাঢ্য অধিবাসিগণ সম্পত্তি ওয়াকফ করিয়া দিয়া সেই সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে সহায়তা প্রদান করিতেন (দ্র. যথা ইস্তানবুল ভাকিফলারি দেফতেরি, স্থা.)।

অনুরূপভাবেই আবার কর্তৃপক্ষও মাহাল্লেগুলিকে এইরূপ একক এলাকা বলিয়া মনে করিতেন যেন শৃঙ্খলা রক্ষা, খাজনা প্রদান ও রাষ্ট্রের প্রতি অন্যান্য দায়দায়িত্ব পালনে যৌথভাবেই সকলে যত্নবান হয়। 'আওয়ারিদ (দ্র. ই. বি. ১খ, ২৮-৯) হইতেই সেই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, প্রতি মাহাল্লে হইতে এই খাজনা তথাকার 'আওয়ারিদ খান এলেরির পূর্ব নির্ধারিত সংখ্যা অনুযায়ী আদায় করা হইত। অনেক মাহাল্লেতেই যৌথ "আওয়ারিদ তহবিল" ছিল, সেই সঙ্গে ওয়াক্ফ সম্পত্তির সম্পদ যোগ হইত, সেখান হইতে দরিদ্রজনের 'আওয়ারিদ বা অনুপস্থিত জনের 'আওয়ারিদ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইত এবং মাহাল্লেবাসিগণ আবেদন করিলে সেখান হইতে স্বল্প সুদে ঋণও দেওয়া হইত (দ্র. ও. এন. এরগিন, তুর্কীয়েদে শেরিরসিলিগিণ ইনকিসাফি, ইস্তাম্বুল ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ২৭)। আবার বিভিন্ন সমাজ বা সঙ্গের কেতখুদাগণ ও ওয়াক্ফ সম্পত্তির মুতেভেল্লীগণও মসজিদের ইমামগণের ন্যায় একদিকে সরকার এবং অপর দিকে কারুশিল্পী ও ওয়াক্ফ কর্মচারিগণের মধ্যে মধ্যস্থ ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

সর্বশেষ বলা যায়, প্রতিটি মাহাল্লের অধিবাসিগণই শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করিতেন। কোন বহিরাগত লোকের পক্ষে হঠাৎ গিয়া নিজেকে কোন বিশেষ মাহাল্লের অধিবাসী বলিয়া পরিচয় দেওয়া সহজ ছিল না। সেজন্য সচরাচর ধরিয়া নেওয়া হইত যে, একজন ব্যক্তির একটানা চারি বৎসর কালে কোন মাহাল্লেতে বাস করা প্রয়োজন (দ্র. তাশ-কোপরুল্লুযাদে, মাওদূ'আতু'ল-'উলূম, ২খ., পৃ. ৬৫৪)। ইস্তাম্বুলের ক্ষেত্রে সেরূপ নির্ধারিত সময় ছিল পাঁচ বৎসর (দ্র. এ. রেফিক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১৫৫৩-১৫৯১ খৃ., পৃ. ১৪৫)। ৯৮৭/১৫৭৯ সালে প্রতি মাহাল্লের অধিবাসিগণকে একে অপরের কেফীল (জামিন) বলিয়া ঘোষণা করা হইত যাহাতে অজ্ঞাতপরিচয় কোন অপরাধী গিয়া আইনকে ফাঁকি দিয়া কোথাও আত্মগোপন করিতে না পারে। এই একই কারণে ৯৮৬/১৫৭৮ সালে প্রতি দুই মাহাল্লের মধ্যে ফটক নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয় (দ্র. এ. রেফিক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১৫৫৩-১৫৯১ খৃ., পৃ. ১৪৪)। প্রতি মাহাল্লেতে রাত্রে পাহারা দিবার জন্য চৌকিদার থাকিত। ১০ম/১৬শ শতকে সেই দায়িত্ব মাহাল্লেবাসিগণই পালাক্রমে পালন করিত। পরবর্তী কালে মাহাল্লেবাসিগণ বেতন দিয়া একজন নৈশ চৌকিদার (পাসবান) নিযুক্ত করিয়া নিত। ১১০৭/১৬৯৫ সালে একটি আদেশ জারী করা হয় যে, প্রত্যেক মাহাল্লেবাসীকে দুইজন করিয়া চৌকিদার নিযুক্ত করিতে হইবে, লিখিতভাবে সেই নিযুক্তির নিশ্চয়তা প্রদান করিতে হইবে, তাহারা লণ্ঠন হাতে লইয়া সারা রাত ধরিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া পাহারা দিবে এবং 'ইশা'-র সালাতের পরে কোনও অপরিচিত

ব্যক্তিকে ঘোরাফিরা করিতে দেখিলে তাহাকে গ্রেফতার করিবে (দ্র. মেজেল্লে, ১খ., পৃ. ৯৬৫)। 'বেকচি' মাহাল্লেবাসিগণের জীবনে এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিল যে, ইস্তাম্বুলের লোককাহিনীতে তাহাদেরকে সব সময়ই একটি বিশেষ চরিত্ররূপে দেখান হইয়াছে। অনুরূপভাবে প্রতি মাহাল্লে হইতে দুই হইতে তিনজন রাস্তার ঝাড়ুদার নিয়োগ করিতে হইত (দ্র. ১১৩১/১৭১৮ সালের ফরমান, মেজেল্লেতে উদ্ধৃত, ১খ., ৯৬৫)। ১২৮৫/১৮৬৮ সালে কোন কোন মাহাল্লের প্রতি বাধ্যতামূলক করিয়া দেওয়া হয় যে, তাহারা অগ্নি নিরোধক যন্ত্রপাতি রাখিবে এবং প্রতি মাহাল্লের কিছু কিছু তরুণ যুবককে তুলুমবাজীরূপে নিয়োগ করা হয়। তাহারা ইস্তাম্বুলের নগর জীবনে এক নূতন 'ধরনে'র সৃষ্টি করে, তাহারা হয় বৈচিত্র্যময় 'তুলুমবাজী' (দ্র. মেজেল্লে, ১খ., পৃ. ১১৮৮, ১১৯৫-১২০৪)।

মাহাল্লের মসজিদের যিনি ইমাম তিনিই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সকল প্রকার আলাপ-আলোচনায় প্রতিনিধিত্ব করিতেন। সুলতানের আদেশপত্র কাদীর দরবারে ইমামগণের নিকটে প্রেরণ করা হইত অথবা রাজঘোষক (মুনাদী) রাস্তায় রাস্তায় চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিত, আর মাহাল্লেবাসিগণ যাহাতে সরকারের প্রতি তাহাদের করণীয় কর্তব্য পালন করে তাহা দেখিবার দায়িত্ব ছিল ইমামগণের। ইমাম কর্তৃপক্ষের নিকট, বিশেষ করিয়া কাদীর নিকট আবেদন করিতে পারিতেন তিনি যেন সমাজের উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিগণের মুকাবিলা করিবার জন্য সহায়তা করেন। ১২৪২/১৮২৬ সালে প্রতি মাহাল্লের জন্য একজন করিয়া মুখ্তার নির্বাচন করা হয়, তাহা ছিল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একই ধর্মাবলম্বী ও ধর্মের ভিতরে একই মতাবলম্বী লোকদের একসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মাহাল্লেতে বসবাস করিবার প্রবণতা বাড়িতে থাকে, পরে এরূপ মাহাল্লেগুলি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যময় জেলাতে রূপ লাভ করে ['মিশ্র' মাহাল্লেতে মুসলিম ও খৃস্টানদের মধ্যকার সংঘর্ষের বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. (১) এ. রেফিক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১০০০-১১০০, দলীল নং ১০০ ; (২) ঐ লেখক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১৫৫৩-১৫৯১, পৃ. ৫৩, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত গ্রীক, আর্মেনীয় ও য়াহূদী জেলাসমূহ গড়িয়া উঠিবার বিষয়ে নিম্নে দ্র.]। সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা এই প্রবণতাকে উৎসাহিত করে। ৯৯৯/১৫৯১ সালে Pammakaristos গির্জাকে যখন মসজিদে রূপান্তরিত করা হয় তখন উহার চতুর্দিকের এলাকা নিয়া একটি মাহাল্লে সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা হয়, পতিত জায়গাগুলি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া শুধু মুসলিমগণের কাছে বিক্রয় করা হয়, প্রতিটি খণ্ড এক একটি ভবন নির্মাণের জন্য যথেষ্ট ছিল [ দ্র. (১) এ. রেফিক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১০০০-১১০০, পৃ. ১৪ ; আরও দ্র. (২) Stolpe-এর নক্শা)।

(খ) রাস্তা ঃ Vavassore-এর নক্শাতে দেখা যায় যে, বেশ প্রশস্ত সব সড়ক শহরের এক এক এলাকাতে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীর (১০ম/১৬শ শতক) নক্শাতে (হুনারনামে) দেখা যায় যে, সেই সব সড়ক সম্পর্ণ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে (এই নগরীর সড়ক পরিকল্পনা পরিষ্কারভাবে দেখান হইয়াছে শুধু ১২২৮/১৮১৩ সালে কৃত দোভাষী ও গাইড Lonstantins-এর মানচিত্রে ঃ তোপকাপি সারায় সংগ্রহ নং ১৮৫৮)। বাস্তবিক খৃ. ১৯শ শতকে শহরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সড়ক দীভান য়োলু মাত্র ৩.৫-৫.৫ মিটার প্রশস্ত ছিল (দ্র. মেজেল্ল, ১খ., ১০৬৭)।

ইস্তাম্বুলের রাস্তাগুলি মধ্যযুগের প্রাচ্যদেশীয় রাস্তার ঠিক অনুরূপ (দ্র. Mayer, পূ. গ্র., ৪-৩২)। আঁকাবাঁকা গলিপথে ভর্তি, সেইসব গলি কিছুদূর ভিতরে দিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে কারণেই মাহাল্লেগুলির পরিসর পূর্ব-পরিকল্পিত না হইয়া নিতান্ত ঘটনাক্রমে সৃষ্টি হইয়াছিল (দ্র. Mayer, 9-24, 104, 254)। ১২৯৩/১৮৭৬ সালের বিস্তারিত নগর মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে (দ্র. আয়ভেদী, পৃ. ১৯, আসিরদা ইস্তানবুল হারিতাসি, ইস্তাম্বুল ১৯৫৮ খৃ.), সড়কগুলি সুলতান ২য় মুহাম্মাদের আমলে যেরূপ ছিল পরেও সেই একই সারিবদ্ধতা রক্ষা করিয়া নির্মিত হইয়াছে। কারণ মি'মারবাশী অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হইলে পুনর্নির্মাণ কালেও পূর্বেকার সেই একই নগর-পরিকল্পনা অনুসরণ করা হয় (দ্র. মেজেল্লে, ১খ., ৯৭৮, ১০৬৬)। রাস্তার পার্শ্বে যাহাদের বাড়ী ছিল তাহারা সব সময়ই চেষ্টা করিত যে, কি করিয়া রাস্তার কিছুটা জমি নিজ বাড়ীর এলাকাভুক্ত করা যায় এবং তাহারা বাড়ীর উপরের তলাগুলি সামনে রাস্তার উপরে বাড়াইয়া নির্মাণ করিতে চেষ্টা করিত। ফলে নীচ তলার দিকে আলো-বাতাস বাধা পাইত। সরু রাস্তায় যোগাযোগের এই সকল প্রতিবদ্ধকতা থাকিবার কারণে Golden Horn-এর বিভিন্ন তোরণ বা দরওয়াজা এবং ঘাট হইতে বাণিজ্য দ্রব্যাদি সচরাচর সমুদ্রপথে বহন করা হইত। ১০ম/১৬শ শতকের দলীলপত্রাদি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাস্তাগুলি ইট বিছানো ছিল (দ্র. এ. রেফিক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১৫৫৩-১৫৯১, পৃ. ৬৭)। আর আওলিয়া চেলেবি জোর দিয়া বলেন যে (১খ., পৃ. ৪৪৬), ইস্তানবুল, এয়্যুব, তোপখানে ও কাসিম পাশার রাস্তাগুলি ১১শ/১৭শ শতকে সবই সম্পূর্ণ পাকা ছিল। সড়ক নির্মাণ ও মেরামতের কাজ করিত ঠিকাদারগণ, সড়ক নির্মাণ সংগঠনের কেতখুদার সঙ্গে চুক্তিক্রমে তাহারা কাজ করিত (দ্র. এ. রেফিক, পূ. গ্র., পৃ. ৬৬)। কাজের তত্ত্বাবধান করিতেন শেহর-এমীনী (শহর আমীন), মি'মার-বাশী অথবা সু-য়োলু নাজিরী। প্রধান সড়ক নির্মাণের ব্যয় বহন করিত সরকার, আর ছোট ছোট রাস্তার ব্যয় বহন করিত রাস্তার পার্শ্ববর্তী বাড়ীর মালিকগণ, দোকানদারগণ ও মুতেভেল্লীগণ, বিশেষ করিয়া যাহাদের উপকার হইত তাহারা [দ্র. (১) ১০৮৭/১৬৭৬ সালের একটি দলীল, মেজেল্লেতে উদ্ধৃত, ১খ., পৃ. ১১৪৭ ; (২) এ. রেফিক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১১০০-১২০০, পৃ. ৩০]।

প্রধান প্রধান চৌরাস্তা ও বড় বড় সড়ক ঝাড়ু দিয়া ও ধুইয়া পরিষ্কার রাখিবার দায়িত্ব ছিল 'আজেমী ওগলানলারীর উপর এবং য়েনিসেরি আগাসীর অধীনস্থ অন্যান্য সামরিক কর্মচারীর উপরে। আর ছোট ছোট রাস্তা পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব ছিল বাড়ীর মালিকগণের। তাহারা নিজ নিজ বাড়ী বা সম্পত্তির সামনের অংশ পরিষ্কার করাইত। পরবর্তী কালে প্রতি মাহাল্লে হইতে রাস্তা ঝাড়ুদার (সুপরুনতুজু) নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা হয়। ময়লা-আবর্জনা সরাইবার দায়িত্ব ছিল চোপলুক সুবাশীসীর উপর (তাঁহাকে তাহির সুবাশীসীও বলা হইত)। তিনি চুক্তির ভিত্তিতে আরায়ীজী (খোঁজ করিবার লোক) নামক একদল লোক দ্বারা সেই কাজ করাইতেন, উহারা সংখ্যায় ছিল ৫০০ জন (দ্র. আওলিয়া চেলেবি, ১খ., ৫১৪)। উহারা ময়লা-আবর্জনা কুড়াইয়া তাহা হইতে সংগ্রহের উপযোগী দ্রব্যাদি রাখিয়া আর সব টুকরিতে তুলিয়া নিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিত। এইসব আবর্জনাই সচরাচর লাঙ্গা নামক স্থানে অথবা তাখতাকাল'এ-র দিকে, ওদুন কাপীসীর কাছে বোকলুক নামক স্থানে পানিতে ফেলা হইত (দ্র.

**Oberhummer, Tafel xxii)**। ঘন ঘন ফরমান জারী করিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইত, কেহ যেন রাস্তায় নোংরা আবর্জনা না ফেলে, বাঁধানো পাকা রাস্তা না ভাঙ্গে বা বাড়ীর সামনে রাস্তার উপর সিঁড়ি না বানায় বা কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করে ( দ্র. এ. রেফিক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১০০০-১১০০, দলীল নং ২৫-৩৮]।

রামাদানের সময় ব্যতীত আর সকল সময় সকল নগরবাসীকে 'ইশা'-র সালাতের পরে নিজ নিজ ঘরে থাকিতে হইত [দ্র. (১) **Dernschwam, 70** ; (২) মেজেল্লে, ১খ., পৃ. ৯৬৪]। রাস্তায় বাতি দিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না, কাহাকেও বাহিরে কোথায়ও যাইতে হইলে লণ্ঠন লইয়া যাইতে হইত [দ্র. (১) মেজেল্লে, ১খ., ৯৬৫-৭; (২) **White, iii, 250)**।

প্রথম গ্যাস দ্বারা আলোকিত করা হয় বেয়োগলু জাদ্দেসি সড়কটিকে ১২৭৩/১৮৫৬ সালে, আর ইস্তাম্বুলের প্রধান প্রধান সড়কে গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা করা হয় ১৮৭৯ খৃ. (দ্র. মেজেল্লে, ১খ., ৯৭১)।

সময়ে সময়ে ফরমান জারী করিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও ইস্তাম্বুলের রাস্তাঘাটগুলি যে অবহেলিত ও আবর্জনাপূর্ণ থাকিত সে বিষয়ে শহরের অধিবাসিগণ ও বিদেশিগণ সকলেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৩৯ খৃ. প্রথমবারের মত শহরটিকে আধুনিক করিবার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, যেমন বদ্ধ গলিগুলি খোলা করিয়া দেওয়া, প্রশস্ত ও বড় বড় সড়ক ও চৌরাস্তা নির্মাণ করা ইত্যাদি, কিন্তু সেসব ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে গ্রহণ করা হয় ১৮৬৫ খৃ. 'খোজা পাশা' নামে পরিচিত বিরাট অগ্নিকাণ্ডের পরে (এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্র. মেজেল্লে, ১খ., ৯৮৭-৯৯১)।

(গ) ভবন নির্মাণ-বিধিসমূহ

ভবন নির্মাণ-রীতি, সড়ক নির্মাণ ও শহরের পরিচ্ছন্নতার বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করিবার বিধিমালা 'উছমানী ইস্তাম্বুলের বাহ্যিক রূপ ও পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করে। এসব বিধিমালা জারী করিতেন শেহর এমীনি (দ্র.) (শহর আমীন) এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্মকর্তাগণ, যথা খাস্সা মি'মার-বাশী ও সুয়োলু নাজিরী, আর সেই সব নির্দেশ বাস্তবায়ন করিতেন কাদীগণ ও সুবাশীগণ। ১৮৩১ খৃ. এই সকল দায়িত্ব দেওয়া হয় এবনিয়ে-ই খাস্সা মুদুরলুগুগণকে (দ্র. মেজেল্লে, ১খ., পৃ. ৯৮১-৩)।

প্রথমত সকল ভবনই ছিল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। নির্মাণ কাজ শুরু করিবার আগে সেই স্থানটুকুর অধিকার লাভের জন্য সরকারী কোষাগার দফতরে (মীরী) অথবা যথাযথ ওয়াক্ফ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইত এবং নির্ধারিত ইজারে-ই মু'য়েজ্জেলে পরিশোধ করিয়া নিতে হইত। জমি যদি ওয়াক্ফ করা থাকিত তবে রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের প্রয়োজন হইত। ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদান করিতেন মি'মারবাশী, তিনি প্রচলিত বিধি ও অনুমোদিত পরিমাণ অনুযায়ী সেই অনুমতি দিতেন এবং বিধি অনুযায়ী যে ভবন নির্মিত হইয়াছে তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিতেন [ কোন ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠার সময়ে যে ইসতিজাযে সম্পাদন করা হইত উহার নমুনার জন্য দ্র. (১) **S. Eyice**, এলসি হানি, **TD, no. 24**, পৃ. ১৩০-এর সামনের প্লেট নং ১; (২) মেজেল্লে, ১খ., ১০৪৪-৮]। ১১৯৬/১৭৮২ সালে একটি ফরমান জারী করা হয় যে, কোন নির্মাতা যদি যথাযথ অনুমোদন গ্রহণ ব্যতীত কোন অমুসলিমের জন্য ভবন নির্মাণ করিয়া দেয় তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে (দ্র. মেজেল্লে, স্থা.)।

সরকার বিভিন্ন কারণে এই সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিত ঃ জমির খাজনা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য, সম্ভাব্য অগ্নিকাণ্ড নিরোধের জন্য, পানির অভাব যাহাতে না হয় সেজন্য এবং দেওয়াল, মসজিদ ও অন্যান্য সরকারী ভবন রক্ষা করিবার জন্য। ৯৬৬/১৫৫৯ সালের ভবন নির্মাণ বিধি অনুযায়ী (স্থপতি সিনান-এর সময়ে) কোন বাড়ীই দোতলার বেশী উঁচু হইতে পারিত না, উপরের তলা কিছুতেই রাস্তার উপরে বাড়াইয়া করা যাইত না, কোন রকম ঝুল বারান্দা করা যাইত না (দ্র. এ. রেফিক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১৫৫৩-১৫৯১, পৃ. ৫৮-৯)। সেই নিষেধাজ্ঞাগুলি যে বারবার জারী করিতে হইত [দ্র. (১) এ. রেফিক, পৃ. গ্র., পৃ. ৬৬ ; (২) মেজেল্লে, ১খ., ১০৫২-৪] তাহা হইতেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নিষেধাজ্ঞাগুলি ঠিকভাবে পালিত হইত না। বড় কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডের পরে সরকারী আদেশ জারী করা হয় যে, সকল বাড়ী, বিশেষ করিয়া সরকারী ভবন ও খানসমূহের সংলগ্ন বাড়ী অবশ্যই পাথর বা ইট দিয়া নির্মাণ করিতে হইবে (দ্র. এ. রেফিক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১১০০-১২০০, দলীল নং ৩৪); কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভূমিকম্পের পরে কাঠের বাড়ী নির্মাণের অনুমতি প্রদান করা হয়। কাঠ অত্যন্ত সস্তা ছিল বলিয়া ইস্তাম্বুলের প্রায় বাড়ীই অধিকাংশ সময়ে কাঠের তৈরী হইত। অগ্নিশিখার ধ্বংসলীলা নিরূপণ করিবার জন্য এবং নগর-দরওয়াজাগুলিতে ও ঘাটে পৌঁছানোর সুবিধার জন্য ৯৬৬/১৫৫৮ সালে ফরমান জারী করা হয় যে, নগর দেওয়ালের লাগোয়া সকল বাড়ী ও দোকান যেন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় (দ্র. ইস্তানবুল হায়াতি, ১১০০-১২০০, পৃ. ৬৭) এবং ৪ যিরা' (১১৩১/১৭১৮ সালে করা হয় ৫ যি রা' অর্থাৎ ৩.২৫ মিটার ; দ্র. **Oberhummer, Tafel xxii)** পরিমাণ জায়গা যেন খালি রাখা হয়। পানি সংরক্ষণের প্রয়োজনে কোনও নূতন প্রাসাদ ও গোসলখানা নির্মাণ করিতে হইলে সুলতানের অনুমতির প্রয়োজন হইত। কখনও কখনও বাস্তবিকই গোসলখানা নির্মাণ নিষিদ্ধই করিয়া দেওয়া হইত। জনগণের অত্যধিক ভিড় এড়াইবার জন্য "অবিবাহিতগণের বাসস্থানগুলি" (বেকার ওদালারী) [নিম্নে দ্র.]—যেখানে নবাগতরা আসিয়া থাকিত— কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হইত, কখনও নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইত (দ্র. মেজেল্লে, ১খ., ১০৫২)।

এই সকল বিধিনিষেধ কদাচিৎ অনুসরণ করা হইত। ১০ম/১৬শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে শহরের জনসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ফলে অধিকতর বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে থাকে। তখন বিস্তৃত বাগিচার মধ্যে নির্মিত অনেক প্রাসাদই ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং সেখানে ঘন সন্নিবিষ্ট কাঠের বাড়ীসমূহ ও ছোট ছোট কুঁড়েঘরও নির্মাণ করা হয় (দ্র. এ. রেফিক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১১০০-১২০০, পৃ. ৬৭-৮)।

অমুসলিম অধিবাসিগণের উপর কঠোর বিধি-বিধান ছিল ঃ তাহারা কোন মসজিদের আশেপাশে বাড়ী তৈরি করিতে পারিত না বা সেরূপ কোন বাড়ীতে থাকিতে পারিত না (দ্র. মেজেল্লে, ১খ., পৃ. ১০৭১)। তাহাদের বাড়ী নয় যিরা'-এর বেশী উঁচু হইতে পারিত না, তাহারা পাথর গাঁথিয়া বাড়ী তৈরি করিতে পারিত না, সর্বসাধারণের গোসলখানা নির্মাণ করিতে পারিত না (দ্র. মেজেল্লে, ১খ., ১০৫৬, ১০৯০)। কোন মুসলিম বিক্রীগণের নিকট বা অমুসলিম বিদেশী অধিবাসিগণের নিকট বাড়ী বা বাড়ী করিবার জায়গা বিক্রয় করিতে পারিত না (দ্র. মেজেল্লে, ১খ., পৃ. ১০৭২-৪)। কিন্তু এই নিষেধ এড়াইবার জন্য নানা রকম কৌশল (হীলা)

প্রচলিত ছিল। ১২৩৩/১৮১৭ সালের গৃহ নির্মাণ বিধি অনুযায়ী অমুসলিমগণের বাড়ী ১২ যি'রা পর্যন্ত এবং মুসলিমগণের বাড়ী ১৪ যি'রা' পর্যন্ত উঁচু হইতে পারিত (খৃ. ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে কনস্টান্টিনোপলে সর্বোচ্চ ৩৩ মিটার পর্যন্ত বাড়ী নির্মাণের অনুমতি ছিল ; দ্র. Mayer, 81)। বাড়ী দোতলার বেশী না করিবার যে পুরানো নিষেধাজ্ঞা ছিল তাহা বলবৎ থাকিবার কারণে উপরে নানা রকম 'সম্প্রসারণ' করা হইতে থাকে যেমন, চারদাক, বালাখানে, তাখতাপোষ, জিহান্নুমা, চাতীআরা (এই বিষয়ে M. Lorichs-এর মন্তব্য দেখা যাইতে পারে)। তানজীমাত (দ্র.)-এর পরে বাড়ীর উচ্চতার বিধিনিষেধ উঠাইয়া দেওয়া হয়। তখন হইতে মুসলিম বা অমুসলিম সকলেই যতটুকু খুশী উঁচু করিয়া বাড়ী নির্মাণ করিতে পারিত।

এইরূপ হইতে পারে যে, ভবন নির্মাণের এই বিধি-নিষেধ ও সেই সঙ্গে প্লেগের ভয় থাকিবার কারণেই প্রধানত অমুসলিমগণ নগর দেওয়ালের বাহিরে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল Golden Horn-এর উত্তর দিকে ও বসফরাস উপকূল বরাবর। তাহাদের বাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ১১৬০/১৭৪৭ সালে নিষেধ করিয়া দেওয়া হয় যে, অমুসলিমগণ এই এলাকার খালি জায়গাতে আর গৃহ নির্মাণ করিতে পারিবে না (দ্র. এ. রেফিক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১১০০-১২০০, পৃ. ২১৩)।

**(ঘ) বাসগৃহের স্থাপত্যশিল্প :** ইস্তাম্বুল শহরের ভবনসমূহকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করিয়া উহাদের আলোচনা করা যাইতে পারে।

(১) "কামরাসমূহ" (ওদা, হুজরা) : উঠান বা চত্বরের (মুহাও-ওয়াতা) চারিদিক ঘিরিয়া মাত্র একটি কামরাবিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন করিয়া বা সারি সারি করিয়া নির্মাণ করা হইত অথবা খান-এর মত করিয়া তৈরি করা হইত ; কখনও কখনও দোকানের উপরেও এইরূপ হুজরা বা কামরা নির্মাণ করা হইত। সাধারণত ওয়াক্‌ফ দ্বারাই এরূপ বাড়ী তৈয়ারি করা হইত যাহাতে ভাড়া দেওয়া যায়। আর এইসব ঘরে সাধারণত বহিরাগত অবিবাহিত লোকেরাই বাস করিত কাজের সন্ধানে তাহারা বাহির হইতে ইস্তাম্বুলে আগমন করিত, আর তাহাদিগকে বলা হইত বেকার ওদালীরী। মাহাল্লের ভিতরে সাধারণত এরূপ 'অবিবাহিত' লোকদের বাসস্থান করাকে উৎসাহ প্রদান করা হইত না, সেইখানে শুধু বিবাহিত লোকেরাই সপরিবারে বসবাস করিত (১০৪৪/১৬৩৪ সালের ফরমান, মেজেল্লেতে উদ্ধৃত, ১খ., পৃ. ১০৫৩)। অবিবাহিত শ্রমিকেরা বা কারিগরেরা প্রায়শ কোন খানে বা কারাভাঁসরাইতে এক কক্ষবিশিষ্ট কামরাতে বাস করিত, সেইখানেই থাকিত তাহাদের কর্মস্থল এবং সেইখানেই বাসস্থান। খানে শুধু মুজেররে দলের খানী নামে পরিচিত ব্যক্তিগণই থাকিতেন। ৯৫০/১৫৪৩ সালে একটি কামরা ভাড়া দিয়া বৎসরে প্রায় ১০০ আকচে আয় হইত। ১০৮৩/১৬৭২ সালে ইস্তাম্বুলে ১২,০০০ বেকার ওদালারী ছিল বলিয়া হিসাবে পাওয়া যায় [দ্র. (১) হেয়ারফেন্ন, তালখীস , প্যারিস পাণ্ডু. পত্রক ১৩ বি ; বিভিন্ন এলাকার বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. (২) আওলিয়া চেলেবি, ১খ., ৩২৬]।

(২) মাহাল্লের বাড়ীঘর : দরিদ্র কারুশিল্পিগণ ও অপেক্ষাকৃত হীন আর্থিক অবস্থার লোকেরা বহু পুরাতন এক বা দোতলা কাঠের বা কাদা দ্বারা গাঁথা ইটের বাড়ীতে বাস করিত [দ্র. (১) Ramberti, apud. Lybyer, 239; (২) Dernschwam, 63 ; (৩) Schweigger, 105; (৪) Alberi, iii/I, 393 " "Le case delle citta sono per la maggior parte di legno e terra")। অপেক্ষাকৃত কম ঘন বসতিপূর্ণ এলাকাসমূহে সচরাচর বাড়ীগুলি হইত আনাতোলিয়ার শহরগুলির ন্যায়, ছোট ছোট কাঠ ও ইটের তৈরী, সামনে খোলা চত্বর ও বাগিচা থাকিত, রাস্তার দিকে দেওয়াল দিয়া বন্ধ থাকিত [দ্র. (১) Mayer, 106-12 and bibliography, 381-4; (২) এস. এলদেম, তুর্ক এভি প্লান তিপলেরি, ইস্তাম্বুল ১৯৫৫ খৃ.]। এই ধরনের একটি বাড়ী প্রায় ৪০০ বর্গ আরশীন এলাকা জুড়িয়া নির্মিত হইত (দ্র. এ. রেফিক, ইস্তাম্বুল হায়াতি, ১০০০-১১০০ হি., পৃ. ১৪) এবং ১০ম/১৬শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এইরূপ একটি বাড়ি নির্মাণের ব্যয় পড়িত প্রায় ১০০ স্বর্ণমুদ্রা (ইস্তানবুল ভাকিফলারী তাহরির দেফতেরি, নং ১৩৪৬)।

(৩) দেওয়াল ঘেরা বাড়ী ও বাগিচা : এই ধরনের কোন কোন বাড়ীর সামনের চত্বর দুই ভাগে বিভক্ত হইতঃ একটি ভিতরের ও একটি বাহিরের। বসবাসের জন্য এক বা একাধিক বাড়ী থাকিত এবং সম্ভবত একটি বা একাধিক 'কামরা' ; তাহা ছাড়া থাকিত একটি উচ্চ খোলা কক্ষ, পায়খানা, আস্তাবল, রুটি তৈরির ঘর, গোসলখানা, একটি ছাপরা ঘর, একটু ছায়াঢাকা পথ, গুদাম বা গোলাঘর, একটি 'ঠাণ্ডা ঘর' (সেরদাব), কলের ঘর, চাকরদের থাকিবার ঘর, মুরগীর ঘর, বাগিচা, কুয়া বা ইন্দারা, ফোয়ারা ও একটি চেরাগলীক (সর্বদা আগুন জ্বালাইয়া রাখিবার স্থান)। প্রায় প্রতিটি বাড়ীতেই অন্ততপক্ষে একটি বাগান, একটি আস্তাবল, একটি রুটি বানাইবার ঘর, একটি ইন্দারা ও পায়খানা থাকিত (দ্র. যথা ইস্তানবুল ভাকিফলারী তাহরির দেফতেরী, নং ৭৩২, ৭৮০, ১০৩৭, ১১১১, ১২৩৭, ১৬৪৮)। বড় বাড়ীকে বলা হইত খানে-ই কেবীর (দ্র. ঐ, নং ১৩২), সেইরূপ বাড়ী অবশ্য কমই ছিল : একটি উদাহরণ হইতেছে মি'মার সিনান-এর বাড়ী [দ্র. (১) আই. এইচ. কোনাইয়ালি মি'মার কোসা সিনান, ইস্তানবুল ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ৫৩ ; (২) খৃ. ১৯শ শতকের একটি বর্ণনার জন্য দ্র. White, iii, 176)।

(৪) প্রাসাদ ও বিলাস ভবনসমূহ (ক াস্ র) : রাষ্ট্রনায়ক ও ধনী বণিকদের প্রাসাদসমূহ নির্মিত হয় ব্যাপক এলাকা জুড়িয়া বড় বড় ভবনে; সেখানে সংশ্লিষ্ট ভবনও অনেক থাকিত। বলা যায়, সেইগুলি ছিল উপরের ৩ নং-এ বর্ণিত ভবনসমূহের বিলাসবহুল রূপ। সচরাচর সেইসব প্রাসাদের চত্বর থাকিত দুইটি, আর সমগ্র প্রাসাদ এলাকা উঁচু দেওয়াল দিয়া ঘেরা থাকিত (দ্র. Schweigger, 106) [সিনান পাশা ৩০০ বাড়ী কিনিয়া সেইগুলি সব ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার উপর নিজের প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন ; দ্র. C. de Villalon, Viaje de Turquia, 74। প্রাসাদগুলি একদিকে হারেম ও অপর দিকে সেলামলীক-এ বিভক্ত ছিল। সাধারণত কাঠ নির্মিত অসংখ্য ঘর থাকিত। (সিয়াউশ পাশার বিখ্যাত প্রাসাদে ৩০০ কামরা ছিল, দ্র. তা'রীখ-ই সিলমানী, পৃ. ৬৬)।

এইরূপ প্রাসাদের চত্বরে সচরাচর থাকিত পাকঘর, রুটি তৈরির ঘর, গোসলখানা, আস্তাবল ও সেই বিশিষ্ট ব্যক্তির ইচ ওগলানলারীদের শিক্ষার জন্য একটি স্কুল (দ্র. প্রবন্ধ গুলাম), প্রাসাদের বিবিধ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নিযুক্ত কারুশিল্পিগণের কাজের জন্য একটি কর্মশালা, এমন কি দোকান পর্যন্ত থাকিত (দ্র. আওলিয়া চেলেবি, ১খ., ৩২২-৪)। [তোপকাপীতে অবস্থিত কারা আহমাদ পাশার প্রাসাদের নির্মাণরীতির জন্য দ্র. ভাকিফলারী দেরগিসি, ২খ., পৃ. ৮৮]। এই সব প্রাসাদের

বাগিচাতে যে বিলাস ভবন (কোশ্‌ক, কাসর) নির্মিত হইত সেইগুলির স্থাপত্য কীর্তিও হইত অতুলনীয় [দ্র. (১) এস. এলদেম, কোশকলের, ইস্তানবুল ১৯৬৯ খৃ. ; (২) কে. আলতান, সিয়াউস পাশা কাসরি, Arkitekt-এ প্রকাশিত, ৫খ, পৃ. ২৬৮)। উযীরগণ যেসব প্রাসাদ তৈরি করিতেন সেইগুলি তাঁহাদের মৃত্যুর পর সুলতানের মালিকানাধীনে চলিয়া যাইত। সুলতান সেইগুলি শাহযাদীগণকে বা অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে দান করিতেন। ১১শ/১৭শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অনুমিত হইয়াছিল যে, সুলতান পরিবারের সদস্যগণের ও উযীরদের মালিকানাধীন প্রসাদের সংখ্যা ছিল মোট ১২০টি (দ্র. তা'রীখ-ই গিলমানী, পৃ. ৬৬, ৬৯)। আর অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের ও বণিকদের মালিকানাধীন প্রসাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১,০০০ [দ্র. (১) হেযারফেন্ন, পূ. স্থা.; (২) আওলিয়া চেলেবি, ১খ, ৩২২-৪]। সর্ববৃহৎ ও সুবিখ্যাত প্রাসাদসমূহ নির্মিত হয় সুলতান সুলায়মান-এর আমলে আয়া সোফিয়া ও সুলায়মানিয়্যা জেলা দুইটিতে (সেইগুলির তালিকা আওলিয়া চেলেবির পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থে রহিয়াছে)।

৫। সুলতান ও অভিজাত ব্যক্তিগণের বিলাসভবন বা ভিলা এবং য়ালীসমূহ সবই ইস্তাম্বুলের জমিন এলাকার দেওয়ালের বাহিরে নির্মাণ করা হয় (খালকালী, ফোলোরিয়া ও দাঊদ পাশাতে) Golden Horn-এর উত্তর পার্শ্বে (কারা আগাচ, পীরী পাশা, কাসিম পাশা ও কাগিদখানেতে), বসফরাস প্রণালী বরাবর ও উসকুদারে। সেগুলি সবই ব্যাপক এলাকাতে সুদৃশ্য বাগান ও সুরম্য বনভূমি ঘেরা স্থানে অবস্থিত ছিল, সংখ্যায়ও ছিল অনেক। পরবর্তী কালে সেগুলির প্রতিটিকে ভিত্তি করিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বসবাসের জন্য মাহাল্লে গড়িয়া উঠে। বিনোদন, শিকার, গ্রীষ্মাবাস ও মূল শহরে অগ্নিকাণ্ড বা মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটিলে বিকল্প বাড়ী হিসাবে এইগুলি ব্যবহৃত হইত [এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদির জন্য দ্র. (১) বোস্তানজী-বাশীর রেজিস্টারসমূহ ; (২) আর.ই. কোচু, ইসতানবুল এন্‌স্টিটুসু দেরগিসি, ৪খ, ৩৯-৯০ ; (৩) ফাতিহ লাইব্রেরী, পাণ্ডু. 'আলী এমিরি ১০৩৩ ; সুলতানের প্রাসাদ ও বাগিচার বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. (৪) তোপকাপিতে ও বাসভেকালেতে দলীল রক্ষণাগারে (আর্কাইভ) রক্ষিত খাস্‌সা বাগচিলের মাহ্‌সূলাত দেফতেরলেরি। ইহা ছাড়াও দ্র. (৫) আওলিয়া চেলেবি, ১খ., ৩৯১-৪৮৬; (৬) এরমিয়া চেলেবি, পৃ. ৩৪-৫৮ ; (৭) পি. ইনসিসিয়ান, ইসতানবুল, অনু. H. Andreasyan, ইস্তানবুল ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৯৫-১১৩ ; (৮) Melling, Voyage pittoresque de C., Paris 1819; (৯) J. von Hammer, Constantinopolis und der Bosporus, ii, Pest 1822 ; (১০) এম. রা'ইফ, মিরআত-ই ইস্তানবুল, ইস্তানবুল ১৩১৪ হি. ; (১১) T. Gokbilgin, in IA, art. "Bogaz-ici"; (১২) জামহুরিয়েত পত্রিকাতে ১৯৪৭-৪৯ সালব্যাপী প্রকাশিত এইচ. সেহসুভারোগলু কর্তৃক লিখিত নিবন্ধসমূহ]। ১২শ/১৮শ শতকে সুলতানগণ তাঁহাদের বাগান ও বনভূমির অংশবিশেষ দান অথবা বিক্রয় করিয়া সেখানে ভবনাদি নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন এবং নূতন নূতন মাহাল্লে সৃষ্টি করেন (যেমন সুলতান ৩য় মুসতাফা করিয়াছিলেন ইহসানিয়্যেতে ও বেগলেরবেগিতে)।

### (গ) অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাসমূহ

ঘন বসতিপূর্ণ সরু গলি ও প্রায়শ কাঠের তৈরী ঘরবাড়ীর এই শহরে প্রায়ই অগ্নিকাণ্ড ঘটিবার ফলে নগরবাসিগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এবং শহরটির বাহ্যিক গঠনে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় [বায়যানটীয় আমলের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার জন্য দ্র. (১) F. W. Unger, Quellen der byzantinische Kunstgeschichte, i, Vienna 1879 প. ; (২) Mayer, পূ. গ্র., পৃ. ১০২]। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বাস্তবিকই অত্যন্ত বেশী ছিল। Ergin হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১৮৫৩ ও ১৯০৬ খৃ.-এর মধ্যেকার ৫৩ বৎসর সময়কালে মোট ২২৯টি অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং তাহাতে মোট ৩৬,০০০ বাড়ী ধ্বংস হইয়া যায় (দ্র. মেজেল্লে, ১খ. পৃ. ১৩৩৩)। সর্বাপেক্ষা বিরাট অগ্নিকাণ্ডের তারিখগুলি হইতেছে, রাজাব ৯৭৭/১৫৬৯ সাল, ২৭ সাফার, ১০৪৩/২ সেপ্টেম্বর, ১৬৩৩ সাল, ১৬ যু 'ল-ক'দা, ১০৭০/২৪ জুলাই, ১৬৬০ সাল, ৩ শাওওয়াল, ১১০৪/৭ জুন, ১৬৯৩ সাল, ১৮ শা'বান, ১১৩০/১৭ জুলাই, ১৭১৮ সাল, ১৩ রামাদান, ১১৯৬/২২ আগস্ট, ১৭৮২ সাল, ২৭ যু'ল-হিজ্জা, ১২৪১/২ সেপ্টেম্বর, ১৮২৬ সাল, ১৪ রাবী'-২, ১২৪৯/৩১ আগস্ট, ১৮৩৩ সাল, ২৭ রাবী' ২, ১২৮২/১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৫ সাল এবং ১ রামাদান, ১৩৩৬/১০ জুন, ১৯১৮ সাল [দ্র. (১) A. M. Schneider, Brande in Konstantinopel, in BZ, Xli, 1941, 382-403 ; (২) মেজেল্লে, ১খ ১২৫৪-১৩৫৬ ; (৩) এম. সিযার, ইস্তানবুল য়ানগিনলারি, তুর্ক সানাতি তারিহি আরাসতিরমালারি ভে ইনসেলেমেলেরি-ত, ১খ. (১৯৬৩ খৃ.), ৩২৭-৪১৪]।

মারাত্মক যত অগ্নিকাণ্ড সেইগুলি সবই সংঘটিত হইয়াছিল জিবালি (জুব্বে 'আলী) জেলাতে; তাহাতে নগর কেন্দ্রের সমগ্র এলাকা পুড়িয়া গিয়াছিল। ধ্বংসকাণ্ড মর্মর উপকূলের কুমকাপী, য়েনিকাপী বা লাঙ্গা পর্যন্ত গিয়া পৌঁছাইয়াছিল, বিশেষ করিয়া জিবালিতেই অগ্নিকাণ্ড বেশী হইত, তাহার কারণ ছিল সেখানকার লোকদের পেশা—যেমন সেখানকার লোহার কারখানাতে ঘোড়ার খুরের কাঁটা তৈরি ও লাগান হইত; তাহা ছাড়া জিবালি-উনকাপানী উপত্যকাতে উত্তর-পূর্ব দিক হইতে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হইত এবং একেবারে ফাতিহ পর্যন্ত ঢালু এলাকাগুলিতে বাড়ীঘরও অত্যন্ত ঘন ছিল (এই বিষয়ে Lorichs ও Le Bruyn-এর মন্তব্যসমূহ দেখা যাইতে পারে)। এখানে অগ্নিকাণ্ড শুরু হইলে তাহা দুই সারি ধরিয়া ঘরবাড়ী পোড়াইতে পোড়াইতে ছুটিত, ফাতিহ ও আকসারায় হইয়া লাঙ্গার দিকে এবং ভেফা, শেহযাদে-বাশী ও লালেলী হইয়া য়েনিকাপীর দিকে Golden Horn পাড়ের য়াহূদী এলাকাতে (চুফুত কাপীসী) আগুন লাগিলে তাহাও একই কারণে একদিকে প্রাসাদের দেওয়াল পর্যন্ত এবং অপর দিকে জাগালোগলু পর্যন্ত ধাবিত হইত। পাহাড়ের ঢাল হইতে শুরু করিয়া বুয়ুক চারশী পর্যন্ত সকল ঘরবাড়ী ভস্ম করিয়া ফেলিত। অন্য যে সকল জেলা প্রায়শ অগ্নিকাণ্ড দ্বারা বিনষ্ট হইত সেগুলি হইতেছে তাখতাক ল'এ, বুয়ুক চারশী ও ফেনের-বালাত অঞ্চল।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায়শই অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করা হইলেও ধারণা করা যায় যে, প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি যথেষ্ট হইত। কথিত আছে, ১০৪৩/১৬৩৩ সালের অগ্নিকাণ্ডে ২০,০০০ ঘরবাড়ী ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল [কাতিব চেলেবি তাঁহার ফেযলেকে গ্রন্থে ও Knolles (Generall historie, London 1631, 47) উভয়েই লিখিয়াছেন, "শহরের এক-তৃতীয়াংশ" ও ১০৭০/১৬৬০ সালের অগ্নিকাণ্ডে শহরের দুই-তৃতীয়াংশ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, মৃতের সংখ্যা ছিল ৪,০০০

জন। ১১০৪/১৬৯৩ সালের ভয়াবহ আগুনে ১৮টি জামে' মসজিদ, ১৯টি ছোট মসজিদ, ২,৫৪৭টি ঘর ও ১,১৪৬ টি দোকান পুড়িয়া গিয়াছিল (দ্র. Cezar, 344)। ১১৪২/১৯৭২ সালের আগুনে শহরের এক-অষ্টমাংশ (দ্র. Cezar, 353-5), ১১৬৯/১৭৫৬ সালের মারাত্মক আগুনে শহরের দুই-তৃতীয়াংশ (দ্র. Mayer, 102), ১১৯৬/১৭৮২ সালে ২০,০০০ ঘরবাড়ী এবং ১২৪৯/১৮৩৩ সালে অর্ধেক শহর পুড়িয়া যায়। খৃ. ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ঘটনাবলীর অধিকতর নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় ; ১৮৫৪ ও ১৮৮৫ খৃ. মধ্যকার ৩০টি দুর্ভাগ্যের বৎসরে অসংখ্য ছোট বড় অগ্নিকাণ্ডে ২৭,০০০ বাড়ী এবং ১৯১৮ খৃ. একটিমাত্র ফাতিহ আগুনে ৭,৫০০ ঘরবাড়ী পুড়িয়া ধ্বংস হইয়া যায়।

তাখতাকাল' এতে ও চারশীর চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডসমূহের ফলে বহু মূল্যবান সম্পদ প্রায়শ নষ্ট হইয়া যাইত। অনুমান করা হয় যে, ১১০২/১৬৯০ সালে এক মীসর চারশীসীতে যে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহাতেই অন্তত ৩০ লক্ষ গুরুশ (আনু. ২০ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা) মূল্যের সম্পদ বিনষ্ট হইয়াছিল। ৯২২/১৫১৬ সালে বেদেস্তানে যে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল তাহার পরিণতিতে অনেক সওদাগরই দেউলিয়া হইয়া গিয়াছিল।

আগুনের ধ্বংসকাণ্ডের ফলে ইস্তাম্বুলে নানা রকম রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। শহরের ইতরজনের প্ররোচনায় ক্ষিপ্ত হইয়া অনেক 'আজেমি ওগ' লানলারী ও দলত্যাগী অনেক জানিসারীও ইচ্ছাকৃতভাবে বহু অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করে। প্রাসাদ মহলে অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে তখন যথেষ্ট দুর্ভাবনার কারণ ঘটিত, কেননা তখন সেনাবাহিনীতে অশান্তি দেখা দিত, সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যেও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইত (দ্র. জেওদেত, ১১খ, পৃ. ৪)। উহার ফলে অনেক সময় নেতৃস্থানীয় সরকারী ব্যক্তিত্বের পদচ্যুতিও ঘটিত। অনেক সময় এইরূপ সংবাদ পাওয়া যাইত যে, যে জানিসারীদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল আগুন প্রতিরোধ করা, তাহারাই আগুন বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে (যেমন ৯৭৭/১৫৬৯ সালে ঃ 'আলী কুনহুহুল-আখবার, পাণ্ডু. ; সিলাহদার, ২খ, পৃ. ৩৪৯)। আর অপর দিকে বড় কোন অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে উযীরে আ'জাম, জানিসারীদের আগা, বোস্তানজী-বাশী ও জেবেজি-বাশী নিজেরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া আগুন নিভাইবার কাজ তদারক করিতেন। আর স্বয়ং সুলতান পর্যন্ত সেইখানে উপস্থিত থাকিয়া শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের মনোবল রক্ষার জন্য সাহস যোগাইতেন। সে সময়ে সৈন্যরা ও জনসাধারণ যে লুটতরাজ করিত তাহা দমন করা সম্ভব হইত না (যে সকল লোক এরূপ লুণ্ঠন করিয়া ধনাঢ্য হইয়াছিল তাহাদের বিষয়ে জানিবার জন্য. দ্র. Cezar, 330, n. 6)। যাহারা গৃহহারা হইত তাহারা যতটুকু সম্পদ রক্ষা করিতে পারিত তাহা লইয়া গিয়া কোন মসজিদ প্রাঙ্গণে, মেদ্রেসেতে ও লাঙ্গা বোস্তানী বা অনুরূপ খোলা জায়গাতে আশ্রয় লইত, কিন্তু সেখানেও অনেক সময় তাহারা রক্ষা পাইত না। অগ্নিকাণ্ডের পরে খাদ্য ও গৃহ নির্মাণ সামগ্রীর অভাব দেখা দিত। ফলে দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি পাইত, তখন অনেক লোক বাধ্য হইয়া পার্শ্ববর্তী কোন শহরে আশ্রয় লইত। যেমন ১১৯৬/১৭৮২ সালে অগ্নিকাণ্ডের পরে বহু লোক চোরলু এদ্রীরনে, ইযমীদ ইত্যাদি শহরে যাইয়া উঠিয়াছিল (দ্র. Cezar, 365)। এমন কি পাথরের তৈরী বাড়ীও পুড়িয়া এমন অবস্থা হইত যে, ধ্বংস না হইয়া গেলেও সেগুলিতে আর বসবাস করা যাইত না, তখন সেগুলি পুনঃসংস্কার করিতে সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত, আর ওয়াক্ফ সংস্থাসমূহের সংরক্ষিত তহবিলে ও হাত দিতে হইত। সুলতানকে মাঝে মাঝেই ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিগণকে নির্দেশ দিতে হইত যেন তাহারা জনসাধারণের জন্য নির্মিত ভবনসমূহ মেরামত করিতে সহায়তা প্রদানের জন্য আগাইয়া আসেন। অবক্ষয়ের যুগে গরীব সাধারণকে আর অগ্নিকাণ্ডের স্থানে কুঁড়ে ঘর নির্মাণ করা হইতে বিরত করা যাইত না। ফলে একবার বিনষ্ট ঘর সে সময়ে আর পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইত না। ইহা ও "দুই খাজনা" রীতির যে সকল ওয়াক্ফ ছিল (ইজারাতায়ন, দ্র. শিরো. ওয়াক্ফ) যাহার ফলে ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানসমূহের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল ভগ্নপ্রায় ঘর নির্মাণ করিতে হইত, এই সকল মিলিয়া খৃ. ১৯শ শতকের ইস্তাম্বুলকে ইতিপূর্বেকার যে কোন সময় অপেক্ষা অবহেলিত ও জীর্ণ দেখাইত।

আগুন নিভানোর দায়িত্ব ছিল জানিসারী সৈন্যদল, বোস্তানজী ও জেবেজীদের উপর। তাহা ছাড়া শহরের ভিস্তিওয়ালাগণ (বেহেশ্তী-ওয়ালা) ও বালতাজী সংস্থার সদস্যগণও কতগুলি খাজনা রেয়াতের বিনিময় আগুন নিভাইবার কাজ করিত। ১১৩০/১৭১৮ সালের পরে ডেভিড (দাউদ) নামক একজন ইসলাম গ্রহণকারী ফরাসী নাগরিক ইস্তাম্বুলে অগ্নি নির্বাপক পাম্প ও সরঞ্জামাদির প্রচলন করেন, উহা মহাউপকারী বলিয় প্রমাণিত হয় [দ্র. (১) রাশিদ, ৫খ., ৩০৬ ; (২) কুচুক-চেলেবি-যাদে 'আসিম, পৃ. ২৫৫)। এই যন্ত্র প্রচলনের পরেই ফায়ার ব্রিগেডসমূহ গঠন করা হয়। ১১৩২/১৭১৯ সালে তুলুমবাজীগণের একটি দল গঠন করিয়া তাহাদেরক জানিসারী সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ১২৮৫/১৮৮৮ সালে প্রতি মাহাল্লেতে একদল করিয়া তুলুমবাজী রাখিবার ব্যবস্থা হয় এবং ১২৯০/১৮৭৩ সালে নিয়মিত ফায়ার ব্রিগেড বাহিনী গঠন করা হয়। অগ্নি-বীমা ব্যবস্থার প্রচলন হয় অনেক পরে, ১৮৯০ খৃ. (দ্র. মেজেল্লে, ১খ., ১১৭০-১২১৯)।

**(চ) ভূমিকম্প** ঃ ইস্তাম্বুল শহরের সামগ্রিক চেহারা ভূমিকম্পের ফলেও অনেকখানি পরিবর্তিত হয় (দ্র. Mayer, 98-101 ; ইস্তাম্বুল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভূমিকম্প কবলিত শহরগুলির অন্যতম, ১৭১১ ও ১৮৯৪ খৃ.-এর মধ্যে ৬৬ বার এখানে ভূমিকম্প হয়)। ১০৯৯/১৬৮৮, ১১৮০/১৭৬৬ ও ১৮৯৪ খৃ. মারাত্মক ভূমিকম্প ছাড়াও (দ্র. Cezar, 380-92), ৬ জুমাদা-১, ৯১৫/২২ আগস্ট, ১৫০৯ সালে যে অতি সর্বনাশা দীর্ঘ ভূমিকম্প শুরু হয় তাহার কম্পন কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া থামিয়া থামিয়া আঘাত করিয়াছিল।

ঐতিহাসিকগণ সেই ঘটনাকে 'কূচুক কিয়ামেত' (كوچك قيامت) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দেওয়ালগুলির গুরুতর ক্ষতি হয়, যত মীনার ছিল সবই পড়িয়া যায়, ১০৯টি মসজিদ ও ১০৭০টি বাড়ী ধ্বংস হইয়া যায় ; নিহতের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৫,০০০ হইতে ১৩,০০০ জন। বায়যান্টীয় যুগের অনেক ভবন (যেমন ঈসা কাপীসী) খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কর্তৃপক্ষ জরুরীভাবে পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করেন। সেইজন্য ইস্তাম্বুলের প্রতি পরিবার হইতে একজন করিয়া লোক ২২ আকচের 'আওয়ারিদ করিয়া নেওয়া হয় এবং দেশের অন্যান্য স্থান হইতে নানা শ্রেণীর কাজের লোক আনানো হয় (আনাদোলু হইতে ৩৭,০০০ ও রূমেলি হইতে ২৯,০০০), এইভাবে পুনর্গঠনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা হয় (দ্র. Cezar, 283)।

৭। অধিবাসিগণ— পুনঃঅধিবাসন ; ধর্মীয় সংখ্যালঘুগণ; সামরিক বাহিনী; মহামারী ; জন-পরিসংখ্যান।

(ক) পুনঃঅধিবাসন। সুলতান ২য় মুহাম্মাদের শাসনের সমগ্র কাল ব্যাপীই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল ইস্তাম্বুলকে পুনঃঅধিবাসন করা। বিশেষ করিয়া প্রাথমিক কালে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পরিবারের সদস্যগণকে ইস্তাম্বুলে লইয়া গিয়া বসবাস করানো হয় (দ্র. প্রবন্ধ সুরগুন)। পরবর্তীতে অন্যান্য বিজিত শহর হইতে বিভিন্ন পেশার লোকদেরকে ইস্তাম্বুলে নেওয়া হয়—অভিজাত শ্রেণীর লোক, বিভিন্ন কারুশিল্পিগণ ও ব্যবসায়িগণ ছিলেন ইঁহাদের অন্তর্ভুক্ত। আর সব সময়েই দুনিয়ার যে কোন স্থান হইতে যে কোন ধর্মের বা যে কোন জাতির অধিবাসী আসিয়া ইস্তাম্বুলে বসবাস করুক, এই মনোভাব ও কাজকে উৎসাহ প্রদান করা হইত (দ্র. এইচ. ইনালচিক, Dumbarton Oaks Papers-এ প্রকাশিত, ২৩-২৪খ, ২৩৭-৪৯)।

৮৬০/১৪৫৫ সালের আদমশুমারীর বিবরণী হইতে জানা যায় যে, কোজা-এলি, সারুখান, আয়দীন, বালীকেসির ইত্যাদি স্থান হইতে যে সকল মুসলিম অধিবাসীকে আনাইয়া এখানে বসতি স্থাপন করানো হইয়াছিল তাহারা দলে দলে পলাইয়া গিয়াছিল, তখন বিভিন্ন মাহাল্লেতে (যেমন কির নিকোলা ও কির মারতাস মাহাল্লে) আবার বাহির হইতে লোক আনাইয়া (উল্লিখিত দুই মাহাল্লেতে তেকিরদাগ ও চোরলু হইতে আনীত লোক) সেইখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। সেই 'পলায়নে'র অন্যতম কারণ ছিল যুদ্ধে লণ্ডভণ্ড একটি শহরে থাকিবার সাধারণ অসুবিধা এবং সেই মুহাজিরগণের ঘর প্রতি সুলতানের মুকাতা'আ বা কর আরোপ করিবার চেষ্টা— ইহার বর্ণনা করিয়াছেন 'আশিক পাশা যাদে (দ্র. এইচ. ইনালচিক, পূ. গ্র., পৃ. ২৪২-৪৩)। আনু. ৮৬০/১৪৫৫ সালে রুমেলি হইতে আনীত অসংখ্য য়াহূদী দলকে এই শহরে বসবাসের ব্যবস্থা করানো হয় ঃ ইখদিনের (লামিয়া) ৪২টি পরিবারকে মামাতিয়ার বিভিন্ন বাড়ীতে থাকিতে দেওয়া হয়, সেই সব বাড়ী বালীকেসিরের মুসলমানগণ পরিত্যাগ করিয়া যায় ; ফিলিবের ৩৮টি য়াহূদী পরিবারকে তোপ য়ীকুগীর বিভিন্ন মাহাল্লের বাড়ীতে বাস করিতে দেওয়া হয়, সেইসব বাড়ী পাফালাগোনিয়া ও তেকিরদানের মুসলমানগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। তাহা ছাড়া এদীর্নে, নিগবোলু ত্রিক্কালা ইত্যাদি স্থান হইতেও আগত য়াহূদীদেরকে বসবাস করিতে দেওয়া হয়।

মুসলমান যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ছিল বিভিন্ন পেশাদার ও ব্যবসায়িগণ, যেমন দর্জি, কর্মকার প্রভৃতি এবং তাহা ছাড়া ছিলেন বিভিন্ন তরীকার ওয়ালী-দরবেশগণ। সেনাবাহিনীর লোকেরা (জানিসারী, দোগানজী ইত্যাদি বাহিনী) প্রায়ই বিভিন্ন মাহাল্লেতে অধিবাসীরূপে বসবাস করিত ; নৌবাহিনীর 'আযেবগণ একযোগে 'আযেবলার মাহাল্লেসিতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। বহিরাগত এক একটি দল সচরাচর কোন একটি বিশেষ মাহাল্লেসি বা ধর্মীয় ভবন এলাকাতে আসিয়া একত্রে বসতি স্থাপন করিত (যদিও কখনও কখনও গ্রীকগণ, য়াহূদীগণ এবং মুসলিমগণ একত্রে একই ভবনে বাস করিয়াছে এরূপও দেখা গিয়াছে; ৮৬০/১৪৫৫ সালে সামাতিয়াতে ৪২টি য়াহূদী, ১৪টি গ্রীক ও ১৩টি মুসলিম পরিবার বাস করিত)। নিবন্ধনে দেখা যায় যে, উক্ত সময়ে সেই মাহাল্লেসিটিতে জনবসতি হালকা ছিল, মাত্র অল্প কয়েকটি দোকান ছিল, গির্জা ও পাদ্রীগণের বাসস্থানগুলি (monastery) সবই পরিত্যক্ত পড়িয়াছিল, ঘরবাড়ীগুলি শূন্য ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় ছিল। অল্পকাল পরেই মনে হয় যেন সুলতান আসিয়া তাঁহার নবনির্মিত প্রাসাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে শুরু করেন এবং নির্মাণ কর্মকাণ্ড, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও নূতন জনবসতি স্থানের কার্যকর উৎসাহ প্রদানে মনোনিবেশ করেন। যে সকল গ্রীক বিজয়ের আগে ও পরে নগর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল ৮৬৩/১৪৫৯ সালে তিনি তাহাদেরকে ফিরিয়া আসিবার নির্দেশ প্রদান করেন (দ্র. ইনালচিক, পূ. গ্র., পৃ. ২৩৭-৮)। এই বৎসরগুলিতেই নিজ রাজধানী এক বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল হিসাবে গিড়য়া তুলিবার উদ্দেশে তিনি একজন অর্থডক্স প্যাট্রিয়ার্ক (৬ জানুয়ারী, ১৪৫৪), একজন আর্মানী প্যাট্রিয়ার্ক (৮৬৫/১৪৬১ সালে) ও একজন প্রধান রাব্বী নিযুক্ত করেন (নিম্নে দ্র.) এবং অতীত ইসলামী ঐতিহ্য অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন কারুশিল্পী ও ব্যবসায়ীদেরকে বসতি স্থাপনে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেন।

গোলাম কৃষিজীবিগণকে সুলতানের ভূমিদাস বা প্রজা হিসাবে (খাস, কুল, ওরতাকচি কুল) আশেপাশের গ্রামগুলিতে বসবাসের ব্যবস্থা করানো হয় যাহাতে পুনরায় সমৃদ্ধি আনয়ন করা যায়। ১০ম/১৬শ শতকের মধ্যে সাধারণ প্রজা (রা'আয়া'-রায়ত)-রূপে পরিগণিত হইয়া তাহারা তথাকথিত খাসকয় জনগণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইয়া গিয়াছিল (দ্র. ও. এল. বারকান, Ikt. Fak. Meem-এ প্রকাশিত , ১খ, ১৯৪০ খৃ., পৃ. ২৯ প.)। ৯০৪/১৪৯৮ সালে এয়্যুবের কাদা'র ১৬৩টি গ্রামের মধ্যে (এলাকাটি খাসলার কাদাসী নামেও পরিচিত ছিল)। ১১০টি গ্রামে প্রায় ২,০০০ পূর্ণবয়স্ক খাসকুল বাস করিত (বাদবাকী অধিবাসিগণ ছিল সাধারণ রা'আয়া' বা সুরগুন)। খাসকয়রা দুই চেকমেজে ও বাকীর কয় হইতে কৃষ্ণ সাগর উপকূল পর্যন্ত এবং বসফরাস ও বেশিকতাশের দিকে বাস করিত (কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন খাসকুল ইস্তাম্বুলে বাস করিত না)।

বিজিত শহরগুলি হইতে যে সকল লোককে আনা হইয়াছিল তাহাদের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল [দ্র. (১) A. M. Schneider, in Belleten, xvi/61, 41-3 ; (২) ইনালচিক, পূ. গ্র., পৃ. ২৩৭-৮ ; (৩) Jorga, Byzance apres Byzance, Bucharest 1972, 48-62] ঃ

৮৬৩/১৪৫৯ সাল দুই ফোকাস ও আমাসরা হইতে আর্মেনীয় ও গ্রীক ব্যবসায়িগণকে, ৮৬৪/১৪৬০ সাল মোরিয়া, থ্যাসস, লেমনস, ইমব্রোস, সামোথ্রেস হইতে গ্রীকগণকে, ৮৬৫/১৪৬২ সাল মাইটিলিন হইতে গ্রীকগণকে এবং ৮৬৭/১৪৬৩ সাল আরগোস হইতে গ্রীকগণকে আনয়ন করা হয়। ৮৭৩/১৪৬৮-৮৭৯/১৪৭৪ সাল কোনিয়া, লারেন্দা, আকসারায়, এরগলি হইতে মুসলিম, গ্রীক ও আর্মানীগণকে আনা হয়। ৮৭৫/১৪৭০ সাল ইউবিয়া হইতে গ্রীকগণকে আনা হয়। ৮৮০/১৪৭৫ সাল কাফ্ফা হইতে আর্মেনীয়, গ্রীক ও লাটিনগণকে আনা হয়।

যে ১৫৪২টি গ্রীক পরিবারের জিয়্য়া সুলতান ২য় মুহাম্মাদ তাঁহার ওয়াক্ফতে প্রদান করিয়াছিলেন (দ্র. বাসভেকালেত আরসি ভি, তাপু দেফতেরি ২৪০) সেইগুলি "জেমা'য়াত"-এ তালিকাভুক্ত হয় (Foca হইতে আগত লোকদের", Midilli হইতে আগত লোকদের" ইত্যাদি)। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যায় ছিল জেমা'য়াত-ইরূমীয়ান-ইমিদিলুয়ান। ১০ম/১৬শ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এই জেমা'য়াতগুলি ইস্তাম্বুল ও গালাতা'র বিভিন্ন গ্রীক মাহাল্লের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। একই নিবন্ধন হইতে জানা যায় যে, ২৪টি জেমা'য়াতে মোট

৭৭৭টি আর্মেনীয় পরিবার ছিল (লারেন্ডে, কোনিয়া, সিভাস, আকসেহির, ইত্যাদি স্থান হইতে আগত) এবং ১,৪৯০ টি য়াহূদী পরিবার ছিল (লামিয়া, সালোনিকা, ইউবিয়া ইত্যাদি স্থান হইতে আগত)।

২য় মুহাম্মাদের ওয়াকফিয়্যাসমূহ হইতে জানা যায় যে, বাগচেকাপী এমীনোনু অঞ্চলে প্রায় এককভাবেই য়াহূদীগণ বাস করিত, ফীল-দামী মাহাল্লেতে গ্রীকগণ, য়াহূদীগণ ও মুসলিমগণ বাস করিত, আর পোতাশ্রয়ের কাছাকাছি এলাকা ধরিয়া (খালীল পাশা বুরগোসী, 'আজেমোগ লুহাজ্জী খালীল) প্রধানত য়াহূদীগণ বাস করিত। সেইগুলি হইতে কারামান, আঙ্কারা, ইযনীক ইত্যাদি স্থান হইতে আগত এবং ট্রেবিযোন্দ ও মাইটিলীন হইতে আগত গ্রীক অধিবাসিগণের নামও পাওয়া যায়।

ইস্তাম্বুলে ব্যাপকভাবে স্বেচ্ছামূলক জনবসতি শুরু হয় আরও পরে যখন অবস্থা পুনরুদ্ধারের প্রথম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয় এবং শহরটির সমৃদ্ধি শুরু হয়। ৮৭১/১৪৬৬ সালের প্লেগে অনেক লোক মারা যাওয়া সত্ত্বেও ৮৮২/১৪৭৭ সালের আদম শুমারী হইতে দেখা যায় (দ্র. তোপকাপী সারায়ি দলীল রক্ষণাগার, ডি ৯৫২৪) যে, তৎকালীন ইস্তাম্বুল শহর ভূমধ্যসাগরের অন্যান্য শহরের ন্যায়ই জনবহুল ছিল ঃ

১। ইস্তাম্বুল

| | গৃহস্থালি | = % |
|---|---|---|
| মুসলিম | ৮,৯৫১ | ৬০% |
| গ্রীক অর্থোডক্স | ৩,১৫১ | ২১.৫ |
| য়াহূদী | ১,৬৪৭ | ১১ |
| কাফ্ফান | ২৬৭ | ২ |
| ইস্তাম্বুলের আর্মেনীয় | ৩৭২ | ২.৬ |
| কারামানের আর্মেনীয় ও গ্রীক | ৩৮৪ | ২.৭ |
| জিপসী | ৩১ | .২ |
| | ১৪,৮০৩ | |

২। গালাতা

| | গৃহস্থালি | = % |
|---|---|---|
| মুসলিম | ৫৩৫ | ৩৫ |
| গ্রীক অর্থোডক্স | ৫৯২ | ৩৯ |
| য়ূরোপীয় | ৩৩২ | ২২ |
| আর্মেনীয় | ৬২ | ৪ |
| | ১,৫২১ | |

সর্বমোট ঃ ১৬, ৩২৪

সৈন্যগণ, মেদ্রেসের ছাত্র বা ক্রীতদাসগণকে এই মোট জনসংখ্যার মধ্যে ধরা হয় নাই। বারকান এই সংখ্যাকে সমগ্র জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ ধরিয়া এবং প্রতি গৃহস্থালি পিছু পাঁচজন করিয়া লোক ধরিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, ইস্তাম্বুলের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১,০০,০০০ [দ্র. (১) JESHO, i/I, 21 ; (২) Schneider, পূ. গ্র., p. 44, অনুমান করিয়াছেন ৬০-৭০,০০০ জন ; (৩) আয়ভেদীর অনুমান, ইস্তানবুল মাহাল্লেলেরি, পৃ. ৮২, ১,৬৭-১৭৫,০০০ জন]।

পরবর্তী সুলতানগণও নূতন নূতন বিজিত এলাকা হইতে লোকদেরকে পাঠাইয়া ইস্তাম্বুলে বসবাস করাইবার নীতি অনুসরণ করেন। ২য় বায়াযীদ আক্কেরমান হইতে ৫০০ পরিবার সিলিভরি কাপীসীতে প্রেরণ করেন (দ্র. Schneider, p. 44; ৮৯৪/১৪৮৯ সালের জিয্য়া নিবন্ধন হইতে জানা যায় যে, আক্কেরমান হইতে প্রেরিত বসতকারী পরিবারের সংখ্যা ছিল ৬৭০, দ্র. বারকান, বেলগেলের-এ প্রকাশিত, ১/I, পৃ. ৩৮, তালিকা ২)। স্পেন, পর্তুগাল ও দক্ষিণ ইতালী হইতে ১৪৯২ খৃ. বিতাড়িত য়াহূদীগণকে 'উছমানীগণ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করিয়ালয়, ফলে পরবর্তী বৎসরগুলিতে শহরের য়াহূদী জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় (Von Harff, p. 244, তাহাদের সংখ্যা ৩৬,০০০ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন)। ১ম সেলিম (সালীম) তাবরীয হইতে ২০০ ঘর সওদাগর ও কারুশিল্পী (দ্র. লুতফী পাশা, তা'রীখ, পৃ. ২৩৭) এবং কায়রো হইতে আরও অনুরূপ ৫০০ ঘর লোক আনেন (পরবর্তীতে সুলতান সুলায়মান তাহাদের মধ্যে অনেককে পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করেন)। বেলগ্রেড দখল করিবার পরে সুলায়মান তথাকার অনেক খৃষ্টান ও য়াহূদীকে আনিয়া সামাতিয়া কাপীসীতে (পরবর্তী নাম বেলগেরাদ কাপীসী) বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন, সেইখানে ক্রমে বেলগেরাদ মাহাল্লেসি গড়িয়া উঠে [দ্র. (১) Hammer-Purgstall, iii, 14 ; (২) উযুনচারসিলি, 'উছমানিয়্যা তারিহি, ২/২খ. ৩১২ ; (৩) U. Heyd in Oriens ; vi, 306]। বিশেষ উল্লেখযোগ্য আর একটি দেশান্তর আগমনের ঘটনা হইতেছে ৯৭৮/১৫৭০ সালের পরে স্পেন হইতে বিতাড়িত মরিস্কোদের অন্যান্য ভূমধ্যসাগরীয় মুসলিম দেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ। স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিলে ক্যাথলিক শাসকশক্তি সেখানকার মুসলমানগণকে প্রথমে যবরদস্তিমূলকভাবে খৃষ্টান করে এবং তাহাদের নাম দেয় মরিসকো। কিন্তু তাহারা যখন কিছুতেই আনুগত্য স্বীকার করে নাই তখন নির্যাতনমূলকভাবে তাহাদেরকে সেখান হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হয় (দ্র. প্রবন্ধ আন্দালুসিয়া, কর্ডোভা) ['উছমানিয়্যা নথিপত্রে তাহাদেরকে বলা হইয়াছে এনদুলুসলু বা মুদেজ্জেল (পড়া হয় মুদেজ্জেন ; দ্র. Dozy, Suppl., s. v. ও প্রবন্ধ মুদেজারেস 'আরবলারী দ্র. A. Hess, The Moriscos, in Amer. Hist. Rev., lxxxiv/1); ইহারা সকলে একযোগে গালাতাতে সেন্ট পাওলো গির্জার ও সেন্ট ডমেনিকো গির্জার চারিদিকে বসতি স্থাপন করে (পরে ক্রমে এলাকাটিকে বলা হয় 'আরব জামি'ই ; দ্র. তারিখের জন্য, Belin, Histoire de la Latinite de Constantinople, Paris 1894, 217); তাহাদের আগমনের ফলে ইস্তাম্বুলে যথেষ্ট খৃষ্টানবিরোধী উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল [দ্র, (১) Charriere, iii, 787; (২) Hasluck, ii, 727]।

যে সকল শহর হইতে ব্যাপকভাবে লোক আনাইয়া ইস্তাম্বুলে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করান হইয়াছিল সেই সকল শহরের যে কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছিল সে বিষয়ে 'উছমানী কর্তৃপক্ষের খুব একটা ভাবনা ছিল বলিয়া মনে হয় না সকল কিছু বিবেচনার ঊর্ধ্বে তাঁহাদের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণের প্রতি গুরুত্ব ও সচেতন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ইস্তাম্বুলকে শুধু সাম্রাজ্যেরই প্রধান শহর নহে, বরং সমগ্র বিশ্বেরই কেন্দ্রীয় শহর ও বিশ্ব-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্পই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল (দ্র. T. Stoianovich, The Conquering Balkan Orthodox Merchant, in JEH. xx, at p. 239)।

দেশান্তরী হইয়া আগতরা এক বিশেষ মর্যাদা ভোগ করিত। নির্ধারিত কিছু সময়ের জন্য তাহাদের 'আওয়ারিদ মওকুফ ছিল; তবে তাহারা সুবাশীর অনুমতি ব্যতীত শহর ত্যাগ করিতে পারিত না। আগমনের পরে কিছুকাল পর্যন্ত—হয় তাহাদের নিজেদের প্রবণতা হেতু বা তাহাদের বিশেষ মর্যাদার কারণে—প্রতিটি দলকে এক একটি বৈশিষ্ট্যময় জেমা'আতরূপে গণ্য করা হইত, তাহারা সকলে একত্রে বসবাস করিত এবং নিজেদের জন্মভূমির নামে পরিচিত হইত। সেই কারণেই শহরের বিভিন্ন আদমশুমারীতে নবাগত লোকদেরকে জেমা'আতরূপে আলাদাভাবে তালিকাভুক্ত করা হইত, মাহাল্লের স্থায়ী অধিবাসিগণের অন্তর্ভুক্ত করা হইত না। ৮৮২/১৪৭৭ সালের আদমশুমারীতে দেখা যায় যে, ক্যাফ্ফা ও কারামানের জেমা'আতরূপে গণ্য করা হইয়াছে, কিন্তু ৮৯৪/১৪৮৯ সালের মধ্যে তাহাদেরকে সাধারণ খৃস্টান অধিবাসিগণের সঙ্গেই একযোগে ধরা হইয়াছে ; সেই বৎসর আক্কেরমান হইতে স্থানান্তরে আগমনকারী লোকদেরকেই শুধু জেমা'আতরূপে তালিকাভুক্ত করা হয়। ১১শ/১৭শ শতকে ২৯২ মাহাল্লে ব্যতীত ১২টি মুসলিম জেমা'আত তালিকাভুক্ত হয়, তাহাদেরকে বলা হয় "তোকাত হইতে আগত, আঙ্কারা হইতে আগত, বুরসা হইতে আগত" এবং ধরিয়া নেওয়া যায় যে, তাহারা ঐ ঐ স্থান হইতেই আগমন করিয়াছিল (দ্র. এম. আকতেপে, ইস্তাম্বুল এন্সটিটুসু দেরগিসি-তে প্রকাশিত, ১১খ, পৃ. ১১৬-২৪)। জেমা'আতগুলি হয় সমধর্মীয় মাহাল্লেগুলির সঙ্গে মিলিয়া যাইত অথবা ভিন্ন কোন নাম লইয়া (সাধারণত মাহাল্লের মসজিদের প্রতিষ্ঠাতার নামে) নূতন একটি মাহাল্লেতে পরিণত হইত। এই যে গ্রহণশীলতার ক্রমপদ্ধতি—ইহা মুসলমানগণের মধ্যে খুব দ্রুত কার্যকরী হয়, কিন্তু য়াহূদীদের ক্ষেত্রে তাহা হয় খুবই ধীরে (দ্র. u Heyd, in Oriens, vi, 305—14)।

১০ম/১৬শ শতকের প্রথমার্ধে শহরের জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং তাহা প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে। ওয়াক্‌ রেজিস্টারসমূহ হইতে দেখা যায় যে, এদীর্‌নে, বুরসা, আঙ্কারা, কোনিয়া, আলেপ্পো, দামিশ্‌ক, কায়রো, এমনকি (সংখ্যায় কম হইলেও) পারস্য হইতেও অনেক সওদাগর ও কারুশিল্পী আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল ; কিন্তু প্রধান জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল সাম্রাজ্যের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এলাকাগুলি হইতে আগত লোকদের দ্বারা, সেখানকার তরুণ যুবকগণ বা সম্পূর্ণ কৃষক পরিবারই (তাহাদেরকে বলা হইত এভ-গোচু) নিজেদের বসতবাড়ী ছাড়িয়া শহরে কাজের জন্য চলিয়া আসে। মধ্য ও পূর্ব আনাতোলিয়া এবং রুমেলি (বিশেষ করিয়া আলবানিয়া) হইতে এই সকল লোক শহরে আসিয়া কুলী, ভিস্তিওয়ালা, নৌকার মাঝি, হাম্মামখানার কর্মচারী, ফেরীওয়ালা ও শ্রমিক হিসাবে কাজ করিতে থাকে।

খৃ. ১৬শ শতকে সকল 'উছমানী শহরেরই জনসংখ্যা সাধারণভাবে ৮০% বৃদ্ধি পায় (দ্র. বারকান, পূ. গ্র., পৃ. ২৫-৩১) এবং ইস্তাম্বুলে সম্ভবত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও বেশী ছিল। শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কর্তৃপক্ষ অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে সচেতন হইতে শুরু করেন (অথচ তাহা সত্ত্বেও ৯৩৫/১৫২৮ সালে তখন পর্যন্ত খৃস্টানগণকে আসিয়া বসবাস করিবার এবং তাহাদের বিভিন্ন খাজনা মওকুফের আইনসমূহ বলবৎ ছিল (দ্র. বারকান, কানুনলার, পৃ. ২৪)। যে যে কারণে লোকজন গ্রাম এলাকা হইতে ইস্তাম্বুল শহরে গিয়া বসবাস করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল সেগুলি ছিল এই [দ্র. (১) এ. রেফীক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১৫৫৩-১৫৯১, পৃ. ১৪৫ ; (২) ঐ লেখক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১১০০-১২০০, পৃ. ১১০, ১৩১, ১৯৯ ; (৩) রাশীদ, ৪খ., পৃ. ১২০ ; (৪) মেজেল্লে, ১খ., পৃ. ৩৫৫ ; (৫) এম. আকতেপে, in TD, ix/13, 1-30] ঃ (১) জীবনযাত্রার অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ; (২) শহরে রা'ইয়েত খাজনা দিতে হইত না [দ্র. প্রবন্ধ চিফত রেসমি এবং (৩) সেনাবাহিনীর লোকেরা এবং কর্মকর্তাগণ সকল সময়ে যে বেআইনী তেকালিফ-ই শাক্কা (অসাধ্য কষ্ট) দিত ও অবৈধভাবে অর্থ আদায় করিত এবং পরবর্তী কালে আ'য়ান ও দেরেবেগিগণ যেসব খাজনা ইত্যাদি আদায় করিত শহরে সেই সকল বিপদাপদ ছিল না (দ্র. ইনালচিক, আদালেতনামেলের, বেলগেলের-এ প্রকাশিত, ২খ., ৩-৪)। এই সকল কৃষক শ্রেণীর আগন্তুকগণ শহরের উপকণ্ঠস্থ এলাকাসমূহে নিজেদের বাসস্থান নির্মাণ করিয়া লইয়াছিল (প্রধানত কাসীম পাশা ও এয়ূব এলাকাতে ; দ্র. এ. রেফিক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১৫৫৩-৯১, পৃ. ১৪০) এবং শহরের ভিতরে তাহারা বেকার ওদালারী বা বেকার খানলারী এলাকাতে বাস করিতে থাকে (উপরে দ্র.)। প্রদেশগুলিতে যখন অস্বাভাবিক রকমের কোন অভাব-অনটন বা বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করিত সেই সময়ে এত বেশী সংখ্যক লোক শহরে চলিয়া আসিত যে, কর্তৃপক্ষের টনক নড়িয়া উঠিত। ১০০৫/১৫৯৬—১০১৯/১৬১০ সালের জেলালী গোলযোগের সময়ে হাজার হাজার পরিবার পলাইয়া ইস্তাম্বুলে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল (শুধু আর্মেনীয় পরিবারই আসিয়াছিল ৪০,০০০ (?), দ্র. Polanyali Simeon'un Seyahatnamesi, অনু. H. Andreasyan, Istanbul 1964, p. 4 ; উহাদের অধিকাংশকে বা অনেককে পরে নিজ নিজ বাসস্থানে ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হয়)।

ইস্তাম্বুল শহরে শুধু যে জনজীবনের নিরাপত্তাই বেশী ছিল তাহাই নহে, সেখানে সকলেই সচ্ছল ছিল, অনাহারী লোক কেহই ছিল না। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাভাবিকভাবেই স্থানান্তরে আগমনকারী লোকদেরকে আকর্ষণ করিত, বিভিন্ন মুসাফিরখানা হইতে যে অন্ন দান করা হইত তাহা হইতেই হাজার হাজার লোকের অন্ন সংস্থান হইত (এক ফাতিহ মুসাফিরখানা হইতেই দৈনিক এক হাজার লোককে খাওয়ান হইত)। মেদ্রেসের ছাত্রগণ ওয়াক্‌ ফ প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে ন্যূনতম আর্থিক ভাতা লাভ করিত, অনেকে মসজিদ বা মাযার দেখাশুনার কাজ করিয়াও জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিত [ দ্র. (১) Ramberti, apud Lybyer, 240 ; (২) বারকান, in IFM, xxiii, 281]। একজন বিদেশী পর্যটক পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন যে, শহরের মুসাফিরখানাগুলি যদি না থাকিত তবে অধিবাসীদেরকে হয়ত একে অপরের গোশ্‌ত খাইতে হইত (দ্র. Dernschwam 67)। ১০২৬/১৬১৭ সালে মাদরাসার ছাত্রগণ (সুখতে) যখন আনাতোলিয়াতে গোলযোগ সৃষ্টি করে তখন এরূপ স্থির হইয়াছিল যে, কয়েকটি প্রধান শহর ব্যতীত আর সকল স্থানের সকল মাদরাসা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং প্রদেশে মুসাফিরখানাগুলি সব বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় (দ্র. চ. উলুচায়, সারুহানদা এস কিয়ালিক, পৃ. ২৪)। ছাত্ররা সকলে তখন ইস্তাম্বুলে ছুটিয়া আসে এবং সেখানে তাহারা প্রচারকার্যে উৎসাহিগণের জন্য যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি করে (বিভিন্ন সময়ে এই ছাত্রগণের সংখ্যা হয় ৫-৮,০০০)। ফকীর বা ভিক্ষুক ও দরবেশগণ সব সময়ই সমস্যার সৃষ্টি করিত, বিশেষ করিয়া রামাদানে তাহারা হাজারে হাজারে আসিয়া ইস্তাম্বুলের রাস্তা ভরিয়া ফেলিত (দ্র. এ. রেফিক,

ইস্তাম্বুল
ISTANBUL IN ABOUT 1500 A.D.
GOLDEN HORN
GHALATA
BOSPHORUS
HARBOUR
HARBOUR
SEA OF MARMARA
Eğri K.
Tekfur Sarāyï
(Blachernae)
Balat Mh
Ghalata Sarāyï
Edirne K.
Kefeli Mh
St.Nicholas
St.Mary
Čukur Bŭstān
Fener K.
Patriarchate
Čukur Bŭstān
Arsenal
Topkhāne
Djübbe
ʿAli K.
Slaughterhouse
Un-kapanï
Topkapï
Topyïkughï Mh
VIII
VII
Complex of
MEHEMMED II (Fātih)
Medrese
Medrese
Dār al-Shifā
VI
M. of Ebu'l-Vefā
Zindān K.
Odun K.
Balïk Pāzārï K.
Saray Burnï
Baghče K.
Takhtakalʿe
Monastir M.
XII
Yeñi Odalar
Sarrādjkhāne
Aqueduct of Valens
(Eski Kemerler)
The
«Old»
Palace
Eski
Sarāy
IV
The «New» Palace
Khān of
Mahmūd Pasha
II
X
IX
Eski
Odalar
Büyük
Čarshï
M. of
Mahmūd Pasha
Aya
Irini
Alti-Mermer Mh
Čukur Bŭstān
M. of
Murād Pasha
Complex of Bāyezīd II
Cistern
Aksarāy
Mint
Mint
Silivri K.
M. of Aya Sofya
M. of Dāvūd Pasha
III
V
Hippodrome
I
Langa
Yeñikapï
Dāvūd Pasha K.
Kadïrgha
Limanï
Kumkapï
Arsenal
M. of Kodja Mustafā Pasha
Surp Georg
(Armenian
Patriarchate)
Samatya K.
XI
Narlï K.
Yedikule K.
Yedikule
Slaughter-
house
Tanneries
K. Kapï(sï)
M. Mosque
Mh Mahalle
Principal Streets
Walls
Silted-up Harbours
Cisterns
NĀHIYES
I Aya Sofya
II Mahmūd Pasha
III ʿAli Pasha
IV Ibrāhim Pasha
V Sultān Bāyezīd
VI Ebu 'l-Vefā
VII Sultān Mehemmed
VIII ʿAli Pasha
IX Murād Pasha
X Dāvūd Pasha
XI Kodja Mustafā Pasha
XII Topkapï

ইস্তাম্বুল শহর পরিকল্পনা ১৫৮০ খৃ. কাছাকাছি
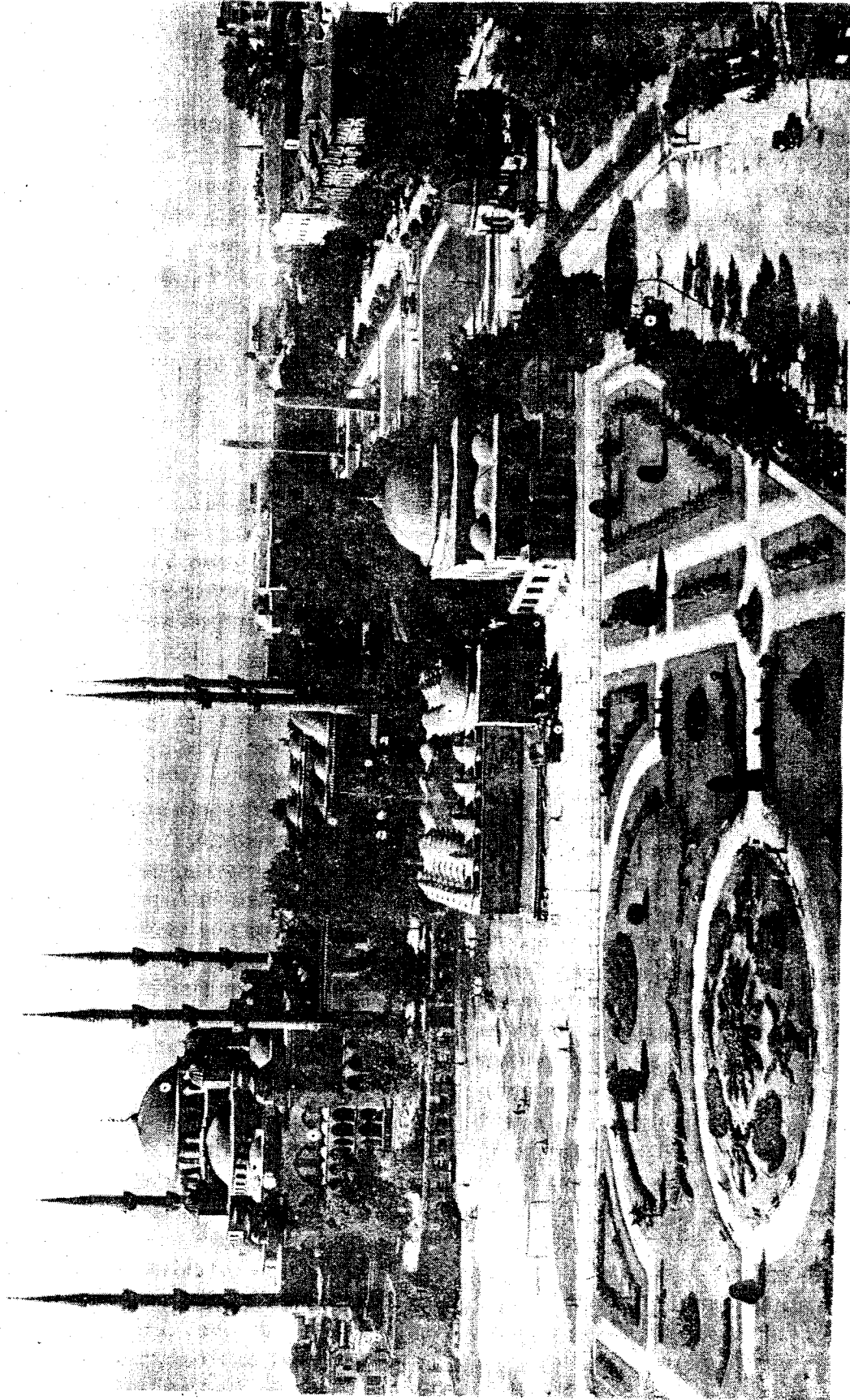
সুলতান আহমদ মসজিদ ও মাঠ

ইস্তানবুল হায়াতি, ১৫৫৩-৯১, পৃ. ১৩৯) এবং সুলতান সুলায়মানের শাসনামলে আলেকজান্দ্রিয়া (আল-ইসকান্দারিয়্যা) ও দামিয়েত্তাতে এইরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল যে, সেখানকার ফকীরগণ যেন কিছুতেই ইস্তাম্বুলে না যাইতে পারে (দ্র. মুহিম্মে দেফতেরি, নং ১৬, পৃ. ১৯৩)।

শহরের ভাসমান অধিবাসিগণের মধ্যে ছিল, যেমন 'আযেব সৈনিকগণ, তাহারা বিভিন্ন শহর হইতে রাজধানীতে আসিত নৌবাহিনীর জাহাজে চাকুরী করিবার জন্য, বিভিন্ন জেলা হইতে লোকেরা আসিত নানা স্থানীয় কাজ উপলক্ষে, তাহাদের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার লোকদের বিষয়ে রাজধানীতে নালিশ জানাইবার জন্য বা খাজনা সম্বন্ধে আপীল জানাইবার জন্য। তাহা ছাড়া জাহাজ নির্মাণের জন্য বা রাষ্ট্রের বিবিধ কাজের জন্যও দলে দলে শ্রমিকদেরকে আনা হইত (দ্র. বারকান, Annales-এ প্রকাশিত, ১৯৬২ খৃ. ১৭খ,. পৃ. ১০৯৮, ১১০৫)।

কর্তৃপক্ষ মনে করিতেন যে, এই জনসংখ্যাধিক্যের ফলে তিনটি প্রধান সমস্যার সৃষ্টি হইত ঃ (১) পানি সরবরাহ ক্রমেই অপ্রতুল হইয়া পড়িতেছিল, খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করাও ক্রমেই বেশী কঠিন হইয়া পড়িতেছিল এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ও ক্রমেই বাড়িতেছিল [দ্র. (১) সেলানিকী, পৃ. ৩; (২) মেজেল্লে, ১খ., পৃ. ১০৫২]। (২) নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। কেননা সেই সব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শহরে চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবিও বৃদ্ধি পাইতেছিল (দ্র. এ. রেফিক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১৫৫৩-৯১, পৃ. ১৪৫) এবং অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ও লুটপাট প্রায়শ হইত। (৩) ইস্তাম্বুলে বেকার ও ভবঘুরে লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, প্রদেশগুলি হইতে প্রাপ্ত খাজনার পরিমাণও কমিয়া যায়। এই সকল কারণেই বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করিয়া কোন দাঙ্গা, অগ্নিকাণ্ড বা খাদ্যাভাবের পরে কর্তৃপক্ষ সাধারণত এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ঃ (১) অবিবাহিত শ্রমিকরাই যেহেতু গোলযোগের প্রধান কারণস্বরূপ ছিল, তাই কোন একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে যাহারা ইস্তাম্বুল শহরে আসিয়াছিল (পাঁচ বৎসর, দশ বৎসর) তাহাদেরকে পাকড়াও করিয়া শহর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইত। অনুরূপভাবে ভিক্ষুকদেরকেও মাঝে মাঝে ধরিয়া নিকটবর্তী অন্যান্য শহরে লইয়া গিয়া কাজ করিতে দেওয়া হইত [দ্র. (১) এ. রেফিক, পূ. গ্র., পৃ. ১৪৫ ; (২) ঐ লেখক, ইস্তাম্বুল হায়াতি, ১১০০-১২০০, পৃ. ১১০, ১৩১, ১৯৪, ১৯৯ ]। আলবানীয় ভবঘুরে শ্রেণীর লোকেরা যেহেতু ১১৪৩/১৭৩০ সালের প্যাট্রোনা খালীল-এর বিদ্রোহে প্রধান ভূমিকা পালন করিয়াছিল, সেই কারণে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর দমননীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল (দ্র. এ. রেফিক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১১০০-১২০০, পৃ. ১২০-১২)। ১৮২৯ খৃ. একবার খাদ্যাভাব দেখা দিলে তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল যে, বিগত দশ বৎসরের মধ্যে যে সকল অবিবাহিত লোক শহরে আসিয়াছে তাহাদের সকলকেই বাহির করিয়া দেওয়া হইবে এবং তখন ৪,০০০ জনকে বহিষ্কার করা হয় (দ্র. লুতফী, ২খ., পৃ. ৬৩)। (২) কোন ব্যক্তি যদি মামলা-মোকদ্দমার কাজে ইস্তাম্বুলে আসিতে চাহিত তাহা হইলে আগে তাহাকে সেইরূপ প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে স্থানীয় কাদীর নিকট হইতে অনুমতিপত্র গ্রহণ করিতে হইত এবং কোন প্রয়োজনেই রাজধানীতে যাতায়াত খুব বেশী ঘন ঘন হইতে পারিত না। (৩) বহিরাগত লোকদের, বিশেষ করিয়া এভ-গোচুদের যথেচ্ছ আগমন নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বিভিন্ন রাস্তায় ও নগরের প্রবেশ পথসমূহে পর্যবেক্ষক রাখিবার ব্যবস্থা করা হয় (দ্র. এ. রেফিক, পূ. গ্র., পৃ. ৮০-১০৫)। (৪) সকল মাহাল্লের অধিবাসিগণকে এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তাহারা যেন একে অপরের সনাক্তকরণের বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করে (দ্র. এ. রেফিক, পূ. গ্র., পৃ. ১৪৫) এবং ইমামগণকে নির্দেশ দেওয়া হয় তাহারা যেন আগন্তুকদেরকে মাহাল্লেতে বসবাস করিতে না দেন (দ্র. এ. রেফিক, পূ. গ্র., পৃ. ১৩৯-৪০)। (৫) কাহারও নিশ্চয়তা প্রদান ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে খানে বা বেকার ওদাসীতে আসিয়া থাকিতে দেওয়া হইত না। (৬) নূতন কোন 'অবিবাহিতদের বাসস্থান' নির্মাণ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

কিন্তু এইসব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। কারণ বাস্তব নিয়ন্ত্রণ কিছুতেই সম্ভব হয় নাই এবং পরবর্তী সময়ে য়ূরোপে যুদ্ধে পরাজয় ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ভূখণ্ড হারাইবার ফলেও সেই সকল স্থান হইতে অনেক আগমনকারী মানুষের ঢেউ ইস্তাম্বুলে আসিয়া লাগে (দ্র. এ. রেফিক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১১০০-১২০০, পৃ. ৮০-১০৫), এইরূপ সর্বশেষ গণআগমন ঘটিয়াছিল ১৯১২ খৃ. বলকান যুদ্ধসমূহের সময়ে।

**(খ) অমুসলিমগণ**

ইস্তাম্বুলের অমুসলিমগণকে ১০০১/১৫৯২ সালে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ গ্রীক (রূম), আর্মেনীয়, য়াহূদী, কারামানলী, গালাতার ফ্রাঙ্ক এবং গালাতার গ্রীক (দ্র. এ. রেফিক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১০০০-১১০০, পৃ. ৪)। তন্মধ্যে অবশ্য শুধু অর্থোডক্স গির্জার অনুসারী, আর্মেনীয় গির্জার অনুসারী ও য়াহূদী রাব্বী অনুসারিগণই সরকারীভাবে স্বীকৃত ছিল।

নগর দেওয়ালের ভিতরে একমাত্র রোমান ক্যাথলিক ধর্মানুসারী ছিল ৮৮০/১৪৭৫ সালে কাফ্ফা হইতে আনীত পরিবারসমূহ (আর্মেনীয়দের সমবায়ে তাহাদের মোট পরিবার সংখ্যা ছিল ২৬৭), তাহাদেরকে এদীরনে কাপীসীর সেন্ট নিকোলাস গির্জা ও সেন্ট মেরী গির্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে তাহারা সকলেই গালাতাতে চলিয়া গেলে তখন সেই গির্জাগুলিকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয় এবং নামকরণ করা হয় যথাক্রমে কেফেলি জামেই (১০৩৮/১৬২৯ সালে) ও ওদালার জামে'ই (১০৫০/১৬৪০ সালে) [দ্র. Belin, পূ. গ্র., 112-19]। তাহার পর হইতে ক্যাথলিক গির্জা শুধুমাত্র গালাতাতেই ছিল, রাষ্ট্রীয় চুক্তি দ্বারা সেইগুলির নিরাপত্তা রক্ষিত হয়। আর ফ্রাঙ্কগণকে শুধু গালাতাতেই থাকিবার অনুমতি প্রদান করা হয় ঃ তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক যখন খৃ. ১৯শ শতকের প্রথম দিকে চিকিৎসক হিসাবে বা কাপড়ের ব্যবসায়ীরূপে বাগচে কাপীতে বা দীভানয়োলুর পার্শ্বে ব্যবসা শুরু করে তখন সুলতানের আদেশে তাহাদের সেই সকল স্থানই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় (দ্র. মেজেল্লে, ১খ., পৃ. ৬৪৯)।

যে সকল এলাকাতে বিশেষভাবে গ্রীকরা ও আর্মেনীয়রা বসবাস করিত সেইগুলি ছিল শহরের মার্মারা উপকূল, ফেনের-বালাত জেলা এবং বসফরাস প্রণালীর রূমেলির দিক। অমুসলিমগণ সাধারণত নিজেদের বৈশিষ্ট্যময় মাহাল্লে গঠন করিত, তাহাদের প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর নিজস্ব গির্জা বা সিনাগগ থাকিত। মুসলিমগণ নিজেদের এলাকার ভিতরে অমুসলিমগণকে বসতি স্থাপন করিতে দিতে অনীহা প্রকাশ করিত, তাহাতে তাহারা নিজেদের ধর্ম ও রীতিনীতি পালনে অস্বস্তি বোধ করিত (দ্র. এ. রেফিক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১৫৫৩-১৫৯১, পৃ. ৪৬, ৪৮, ৫০, ৫২ ; ১০০০-১১০০ পৃ. ২৯ ; ১১০০-১২০০, পৃ. ১০, ৮৮)।

কখনও কখনও মুসলিম অধিবাসিগণের মধ্যে এইরূপ সাধারণ মনোভাব মাথাচাড়া দিয়া উঠিত যে, ইস্তাম্বুল যেন একান্তভাবেই একটি মুসলিম শহর হয় এবং তখন সুলতানগণ বাধ্য হইয়া যিম্মীগণের উপরে আরোপিত বিভিন্ন বিধিনিষেধ পুনরায় ঘোষণা করিতেন এবং বলবৎ করিতেন [আলাদা বৈশিষ্ট্যবোধক পোশাক ঃ দ্র. (১) জেওদেত, ৭খ., পৃ. ২৭৭ ; (২) মেজেল্লে, ১খ, পৃ. ৫২০ ; (৩) এ. রেফিক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১৫৫৩-৯১, পৃ. ৪৭, ৫১ ; ১০০০-১১০০, পৃ. ২০, ৫২ ; ১১০০-১২৯৯, পৃ. ১৮২; তাহারা ঘোড়ায় চড়িতে পারিবে না বা দাস নিযুক্ত করিতে পারিবে না ; (৪) ঐ লেখক, পৃ. গ্র., ১৫৫৩-৯১, পৃ. ৪৩, ৫০; যথোপযুক্তভাবে নির্মিত নহে সেইরূপ গির্জা ভাঙ্গিয়া ফেলা; (৫) ঐ লেখক, পৃ. গ্র., ১৫৫৩-৯১, পৃ. ৪৪, ৪৫; ১১০০-১২০০, পৃ. ৮১, ১৩৯; মদ বিক্রয় করিতে পারিবে না; (৬) ঐ লেখক, পৃ. গ্র., ৯০০-১১০০, পৃ. ৪৯]। বিভিন্ন ঘটনা হইতেই অমুসলিমগণের প্রতি অবিশ্বাস ও শত্রুতার মনোভাব প্রকাশ পাইত, যেমন ২য় মুহাম্মাদের আমলে মীরী ভবনসমূহ দখল করিবার বিষয় (দ্র. ইনালচিক, in Dumbarton Oaks Papers, 240-9), খৃষ্টান নৌবহরের আক্রমণের ভয় (৯৪৪/১৫৩৭, ৯৭৯/১৫৭১, ১০৬৬/১৬৫৫ সাল), ১০৯৪/১৬৮৩ সালের পরে অস্ট্রীয় ও রুশ আক্রমণ ও ১৮২১ খৃ. গ্রীকদের বিদ্রোহ। এই সব উত্তেজনাকর পরিস্থিতি এবং সেই সঙ্গে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ও অমুসলিম মাহাল্লের নিকটবর্তী স্থানে মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদি কারণে অমুসলিমগণ দূরে সরিয়া গিয়া মার্মারা উপকূল ও গোল্ডেন হর্ন খাড়ির উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে ও নগর দেওয়ালের কাছাকাছি এলাকাতে বসবাস করিতে উৎসাহিত হয় (দ্র. এ. রেফিক, ইস্তাম্বুল হায়াতি, ১০০০-১১০০, পৃ. ৫৩-৪)।

অপরদিকে আবার যে সকল মুসলিম ও অমুসলিম ব্যবসায়ী ও কারুশিল্পীর কাজ একই হিসবা বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহারা বাজারে পাশাপাশি সম্প্রীতির সঙ্গেই কাজ করিত। অমুসলিমগণকে আশ্রয় দেওয়া রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক স্বার্থেরই বিষয় ছিল; তাহা ছাড়া রাষ্ট্রের অভিজাত ব্যক্তিগণেরও স্বার্থের বিষয় ছিল এবং সর্বোপরি কর্তৃপক্ষও দেখিয়া খুশী হইতেন যে, ইসলামে যে পরম সহিষ্ণুতার বিধান রহিয়াছে তাহা দেশের অমুসলিমগণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হইতেছে। কাজেই সরকার অমুসলিম অধিবাসিগণের প্রতি মাদরাসার ছাত্রগণ, 'আজেমী-ওগলানলারী বা সাধারণ লোক দ্বারা কোনরূপ আক্রমণ হইলে তখন হস্তক্ষেপ করিত এবং তাহাদেরকে রক্ষা করিত [দ্র. (১) Dernschwam, 116 ; (২) Charriere, iii, 262 ; (৩) এ. রেফিক, রাফিদীলিক, in Edeb. Fak. Medjm. ix/2, doc. 11)। অমুসলিমগণ, বিশেষ করিয়া আনাতোলিয়ার আর্মেনীয়গণ, তুর্কী সংস্কৃতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। প্রতিটি ধর্মীয় সমাজেরই নিজস্ব ভাষা থাকা সত্ত্বেও ইস্তাম্বুল শহরের সার্বজনীন ভাষা ছিল তুর্কী এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা লাভের জন্য অমুসলিম অধিবাসীরাও সচরাচর তুর্কীদের মতই পোশাক পরিত এবং জীবন যাপন করিত। বিপরীতক্রমে আবার ইস্তাম্বুলের তুর্কী ভাষা ও লোক-সাহিত্য সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রভাবিত হয় [দ্র. (১) W. Hasluck, Christinaity and Islam under the Sultans, Oxford 1929 ; (২) এম. হালিত বায়রি, Istanbul Folklore, repr. Istanbul 1972; (৩) ঐ লেখক, হাল্ক আদেতলেরি ভে ইনানমালারি, ইস্তাম্বুল ১৯৪০ খৃ. ; (৪) আর. ই. কোচু, ইস্তানবুল আনসিকলোপেডিসি, স্থা.]।

গ্রীক অর্থোডক্সগণ, আর্মেনীয়গণ ও য়াহূদীগণকে যথাক্রমে গ্রীক প্যাট্রিয়ার্ক, আর্মেনীয় প্যাট্রিয়ার্ক ও প্রধান রাব্বীর কর্তৃত্বাধীন আলাদা আলাদা মিল্লেত বা তা'ইফেরূপে বিবেচনা করা হইত। তাহাদের প্রতিটি সমাজই নিজ নিজ অভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধিকার ভোগ করিত (দ্র. প্রবন্ধ মিল্লেত ; পাতরীক)। গ্রীক প্যাট্রিয়ার্ক ও রূম মিল্লেতি রু'এসাসী অপর দুই দল অভিজাতগণের উপরে অগ্রাধিকার লাভ করিতেন (দ্র. এ. রেফিক, ১১০০-১২০০, পৃ. ২৮)। তিনজন ধর্মীয় নেতা তাহাদের সমাজবাসিগণ দ্বারা নির্বাচিত হইতেন কিন্তু বেরাত হইতে লব্ধ তাহাদের যে কর্তৃত্ব [তাহা পেশকাশ (পিশকেশ) প্রদান করিয়া তবে লাভ করিতে হইত], তাহা সুলতান মঞ্জুর করিতেন। কোন সমাজ তাহাদের নেতাকে বরখাস্ত করিতে চাহিলে সমবেতভাবে সুলতানের নিকটে আবেদন করিতে হইত (দ্র. সি. ওরহোনলু, তেলহিসলের, ইস্তানবুল ১৯৭০ খৃ., পৃ. ১৬১) এবং দলনেতা সুলতানকে অনুরোধ করিতে পারিতেন যে, তিনি যেন তাঁহাকে নেতৃত্বের অধিকার দান করেন [গ্রীক প্যাট্রিয়ার্কবাদের জন্য দ্র. (১) S. Runciman, The Great Church in captivity, Cambridge 1968 ; (২) রূম প্যাট্রিক লিগি নিজামাতী, দুস্তূর-এ প্রকাশিত, ১খ., পৃ. ৯০২-৩৮]।

১২শ/১৮শ শতক পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে প্রায় ৪০টি গ্রীক গির্জা ছিল, অথচ বিজয়ের আগে ছিল মাত্র ৩টি (Schneider-এর বইয়ে সেইগুলির তালিকা রহিয়াছে, Byzanz, 38-40)। যুদ্ধে অধিকৃত একটি শহরে এই সব গির্জা কি করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে এই প্রশ্ন যখন উত্থাপিত হইয়াছিল তখন পরিস্থিতির সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিবার জন্য বানোয়াটভাবে একটি ধারণা গ্রহণ করা হয় যে, উহারা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিল [দ্র. (১) ইনালচিক, in Dumbarton Oaks Papers, 233; (২) Runciman, 153, 157, 199, 204; য়াহূদীদের বিষয়ে দ্র. (৩) এ. রেফিক, ইস্তাম্বুল হায়াতি, ১১০০-১২০০, পৃ. ১৩]।

প্যাট্রিয়ার্কীকে বিশেষ দায়িত্ব দ্বারা বাধ্য করা হয় যে, তাঁহারা শহরের গ্রীক অধিবাসিগণের বিভিন্ন বেসামরিক বিষয়াদির জন্য দায়ী থাকিবেন এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার হইতে এই সমাজের উপর সামগ্রিকভাবে (মাকতূ') যখন ক্রমেই অধিকতর খাজনা আরোপ করা হইতে থাকে তখন তাঁহাদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়া যায়। প্যাট্রিয়ার্ক প্রশাসনের যে আমলাতন্ত্র তাহা সে কারণেই ক্রমে অধিক প্রভাবশালী হইতে থাকে (Logothete-গণের প্রভাবের বিষয়ে দ্র. এ. রেফিক, ১১০০-১২০০, পৃ. ১৩)।

অর্থনৈতিকভাবে গ্রীকরা বায়যানটীয় শাসনের শেষ দশকগুলিতে যেরূপ অবস্থায় ছিল 'উছমানী আমলে তাহা অপেক্ষা অনেক সচ্ছলতা অর্জন করে [দ্র. (১) Jorga, Byzance apres Byzance, repr. Bucharest 1971; (২) T. Stoianovich, পূ. গ্র. ; (৩)The Greek Merchant Marine, 1453-1850, সম্পা. S. A. Papadopoulos, Athens 1972; (৪) A. E. Vacalopoulos, Origins of the Greek Nation, 1970-77; (৫) ইনালচিক, in Isl., xliii, 153-5 ], সেই ভাগ্য পরিবর্তনে তাহারা সন্তুষ্ট ছিল (দ্র. Runciman. pp. 180, 394)। ইলতিযাম রাষ্ট্রীয় ঠিকাদারী কাজসমূহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাহাদের অধিকারে ছিল, কৃষ্ণ সাগরে ও ঈজীয়ান সাগরে ইতালীয় নৌ-বাণিজ্যের সুযোগ-

সুবিধাগুলি তাহারা দখল করিয়া লয় এবং তাহা ছাড়া শহরের খাদ্য ব্যবসায়ের বড় অংশ তাহারা নিয়ন্ত্রণ করিত। প্যাট্রিয়ার্কীর নূতন কেন্দ্রস্থলে ফেনেরে এগারটি যথার্থ গ্রীক অভিজাত পরিবারের উদ্ভব হয়, তাহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ইলতিযাম চুক্তির কাজ দ্বারা ধনাঢ্য হন এবং দাবি করেন যে, তাহারা ছিলেন বায়াযানটীয় সাম্রাজ্যের সুবিখ্যাত পরিবারসমূহের বংশধর; নিজেদের মধ্য হইতে সুলতানের চিকিৎসক দিয়া ও ব্যবসায়িক মাধ্যম ব্যক্তি দিয়া, দীওয়ানের প্রধান দোভাষীয় পদ অধিকার করিয়া এবং ১১শ/১৭শ শতকে নৌবহরে দোভাষী হিসাবে নিযুক্ত থাকিয়া তাহারা সেই প্রভাব ও ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে তাহাদের মধ্য হইতেই মোলদাভিয়া ও ওয়াল্লাচিয়ার গভর্নর (hospodar) নিয়োগ করা হইত [দ্র. (১) Jorga, পূ.গ্র., 226-47; (২) J. Gottwald, Phanriotische Studien, in Leipziger Viertelsjahrschr " Sudosteuropa, v (1941), 1-58]। ১৮৩৩ খৃ. আদমশুমারীতে বৃহত্তর ইস্তাম্বুলে রূম মিল্লেতের সংখ্যা ছিল ৫০,৩৪৩ জন পুরুষ।

কারামান হইতে প্রেরিত একদল অর্থোডক্স খৃস্টান ছিল তুর্কী ভাষাভাষী, গ্রীক ভাষা আদৌ জানিত না (দ্র. Dernschwam, 52), তাহাদেরকে গ্রীক প্যাট্রিয়ার্কের কর্তৃত্বাধীনে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা একটি ভিন্ন মিল্লেতের বৈশিষ্ট্য রাখিয়া চলিত। ১০ম/১৬শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাহারা য়েদিকুলেতে বসতি করিয়াছিল, কিন্তু এক শতাব্দী বা কিছু বেশী সময় পরে এরোমিয়া চেলেবি লেখেন যে, তখন তাহারা নারলীকাপীতে বাস করিতেছিল, নগর দেওয়ালের ভিতরে ও বাহিরে তাহাদের বাস ছিল। তাহারা দক্ষ স্বর্ণকার ও সূঁচীকাজে বিশেষ পারদর্শী ছিল এবং ধনী ছিল (N. de Nicolay, Navigations ··· Anvers 1577, 239)।

আর্মেনীয়রা প্রথমে সুলতানের আদেশে ১৪৬১ খৃ. একজন প্যাট্রিয়ার্ক নির্বাচিত করে। তিনি সামাতিয়ার সুর্প কেভর্ক-গির্জাতে বাস করিতে থাকেন [দ্র. (১) সুলুমানাসতীর; (২) F. Babinger, Ein Besitzstreit um Sulu Manastir ···, in Festschrift fur Jan Rypka, Prague 1956, 29-37 ], সেখানেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আর্মেনীয় সমাজের লোকেরা বাস করিতেন [এরোমিয়া চেলেবী লিখিয়াছেন (পৃ. ৩) যে, পরবর্তী কালে সেখানে গ্রীকদের পাশাপাশি এক হাজারেরও বেশী আর্মেনীয় পরিবার বাস করিত]। ১১শ/১৭শ শতকে আর্মেনীয়রা সর্বাধিক সংখ্যায় বাস করিত কুমকাপীতে এবং ১০৫১/১৬৪১ সালে প্যাট্রিয়ার্কীর স্থানও এখানে স্থানান্তরিত করা হয়, সুরূপ আসদুয়াদযাদযিন গির্জা হয় উহার কেন্দ্র (দ্র. H. Andreasyan, notes to Eremya Celebi, pp. 87-90)। আর্মেনীয়রা, বিশেষ করিয়া য়েনিকাপী, কুমকাপী, বালাত ও তোপকাপী এলাকাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। গালাতার বহু আর্মেনীয় পরিবার জেনোয়া আমল হইতেই সেখানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। বেশিকর্তাশে কুরুচেশমে ও ওবতাকয়ে য়াহূদীদের সঙ্গেও আর্মেনীয়রা বাস করিত (দ্র. এরেমিয়া চেলেবি, পৃ. ৪৩-৫২)। ১১শ/১৭শ শতকে আর্মেনীয়রা পারস্য, তুরস্ক ও ইতালীর মধ্যকার রেশম বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিত (দ্র. হারীর, পৃ. ২১৪) এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে ইলতিযাম চুক্তি দ্বারা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় দ্বারা বিশাল ধনী হন (দ্র. ওয়াই, চারক, তুর্ক দেভলেতি হিযমেতিনদে এরমেনিলের, ইস্তানবুল ১৯৫৩ খৃ.)। খৃ. ১৯শ শতকের প্রথমভাগ হইতেই তাহারা টাঁকশাল পরিচালনা করে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিও নিয়ন্ত্রণ করে [দ্র. (১) জেওদেত, ১১ খ., পৃ. ২৮; (২) White, iii, 188, 287]। ব্যাঙ্ক মালিক পরিবারগুলি প্যাট্রিয়ার্কী ও আর্মেনীয় ব্যবসায়িগণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিলে তখন সমাজের মধ্যে বিভেদ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয় (দ্র. H. G. O. Dwight, Christianity in Turkey, London 1854, 131-2)। ইতঃপূর্বে ক্যাথলিক মিশনারীদের কর্মতৎপরতার কারণে জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়, তখন ১১০৮/১৬৯৬ সালের পরে তুর্কী সরকার দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় [ দ্র. (১) এ. রেফিক, ইস্তানবুল হায়াতি, ১১০০-১২০০, পৃ. ২১, ৩২, ৩৫, ১৬০; (২) জেওদেত, ২খ., ৯৩; ১১খ. ৮, ৩৪]। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পরে, বিশেষ করিয়া ধনাঢ্য ও শিক্ষিত আর্মেনীয়রা মিলিয়া একটি ক্যাথলিক (Uniate) সমাজ গঠন করে, ১৮২৬ খৃ. আদমশুমারী অনুযায়ী (লূতফী, পৃ. ২৭৫) তাহাদের সংখ্যা ছিল ১,০০০ (L. Arpee, The Armenian awakening . . . . 1820-1860, Chieago 1909)। ১৮৩৩ খৃ. আদমশুমারী অনুযায়ী বৃহত্তর ইস্তাম্বুলের আর্মেনীয় মিল্লেতে ৪৮,০৯৯ জন পুরুষ অধিবাসী ছিল।

সুলতান ২য় মুহাম্মাদের শাসনের শেষভাগে ইস্তাম্বুলে ১,৬৪৭ ঘর য়াহূদী বাস করিত (উপরে দ্র.)। উহাদের প্রধান প্রধান দল বা বিভাগ ছিল এইরূপ ঃ বিজয়ের পরে যাহারা জীবিত ছিল তাহারা; যে সকল কারাইতীকে এদীরনে হইতে আনাইয়া পোতাশ্রয় এলাকাতে বসত করানো হইয়াছিল তাহারা; রাব্বানী ও কারাইতী সমাজের য়াহূদী, ইহাদেরকে পরে আনাতোলিয়া ও রূমেলির বিভিন্ন শহর হইতে, প্রায় ক্ষেত্রেই বলপূর্বকভাবে লইয়া আসা হইয়াছিল, পূর্বের স্থানসমূহে তাহারা বায়যানটীয় যুগ হইতেই বাস করিয়া আসিতেছিল, সেখানে তাহারা রোমানীয়ব' নামে পরিচিত ছিল (দ্র. Ankori, Karaites in Byzantium, New York 1959, 140)। ২য় মুহাম্মাদের ওয়াক্ফ-এর জিয্য়া রেজিস্টারসমূহে (বাসভেকালেত আরসি ভি, তাপু দেফতেরি নং ২১০ ও ২৪০) তাদের সংখ্যা ও প্রত্যেকের আদি বাসস্থানের নাম উল্লিখিত রহিয়াছে। মনে হয় ২য় মুহাম্মাদ বিজয়ের সময়ে ইস্তাম্বুলে বসবাসকারী য়াহূদীদেরকে আমান মঞ্জুর করিয়াছিলেন (দ্র. আনকোরী, পূ. গ্র., পৃ. ৫৯-৬৪) এবং তাহাদেরকে নিজ নিজ বাড়ীতেই থাকিতে দিয়াছিলেন (কোনরূপ একটি চুক্তিপত্র হইয়াছিল বলিয়া যে কথিত [সে বিষয়ে দ্র. (১) Schneider, in Belletin, xvi/61, 40; (২) Heyd, p. 305 ; (৩) এ. রেফিক, ১১০০-১২০০, পৃ. ১১]। একটি জিয্য়া রেজিস্টারে (তাপু দেফতেরি নং ২৪০, পৃ. ১০) দেখা যায় যে, তাহারা সংখ্যায় ছিল ১১৬টি পরিবার। রাব্বী ইসাক সারফাতি পত্র দ্বারা য়ূরোপের য়াহূদীগণকে আসিয়া 'উছমানী রাজ্যে বসবাস করিবার আহ্বান জানাইলে, জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী হইতে কিছু কিছু পরিবার আসিয়া বসতি স্থাপন করে [ দ্র. (১) H. Graetz, Gesch. der Juden, Leipzig 1881, viii, 214 ; (২) Heyd, 306 ]। কিন্তু উল্লিখিত রেজিস্টারে জেমা'আত-ই এসকিনাস-ই আলামান-এর সংখ্যা মাত্র ২৬টি পরিবার বলিয়া লেখা রহিয়াছে। ৮৯৪/১৪৮৯ সালের মধ্যে য়াহূদী গৃহস্থালির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় সর্বমোট ২০২৭টি।

ইস্তাম্বুলে বসবাসকারী য়াহূদীগণ জেমা'আতে সংগঠিত ছিল, প্রতি জেমা'আতের আলাদা আলাদা সিনাগগ ছিল, সেই উপাসনালয়ই ছিল

তাহাদের আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক একত্বের স্থান (দ্র. A. Galante, i, 75,-99-101)। ১০ম/১৬শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ৪০-৪৪টি সিনাগগ ও জেমা'আত ছিল [ দ্র. (১) Heyd, 303; (২) Dernschwam, 107-11 (৪২টি স্কুল ও আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিস্তারিত তথ্য ; মোট য়াহূদী জনসংখ্যা, ১৫,০৩৫) ]। ৯৫৯/১৫৫২ সালে মাররানোরা সুলতানের আশ্রয় লাভ করিয়া ইস্তাম্বুলে বসতি স্থাপন করে এবং অতঃপর মেন্ডেসের মার্‌রানো ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী পরিবার রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে ও য়ুরোপের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভাবশালী মর্যাদা লাভ করে [ দ্র. (১) ইনালচিক, capital formation, JEH, xxix, 121-3 ; (২) S. Schwarzfuchs, Annales, xii, 1957, 112-18]। স্পেন ও ইতালী হইতে আগত য়াহূদীগণ নানা রকম কর্মকৌশলের প্রবর্তন করিয়াছিল [দ্র. (১) Ramberti, 241 ; (২) Villalon, 116 ; (৩) Dernschwam, ১১১]।

রোমানীয়োত, সেফার্দী ও কারাইতী মতবাদী য়াহূদী সমাজ ১১শ/১৭শ শতক পর্যন্ত তাহাদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলে ; কিন্তু পরে ১০৪৩/১৬৩৩ ও ১০৭১/১৬৬০ সালের অগ্নিকাণ্ডের ফলে তাহারা যখন স্থান পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়, আর তখন এই সম্প্রদায়গুলি সব একত্রে মিশিয়া যায় (Hyed, 313)। শেষ পর্যন্ত একটিমাত্র সম্প্রদায় বা সমাজ সেফার্দীমে পরিণত হয়। ফলে অর্থনৈতিকভাবে তাহারা অনেক বেশী শক্তিশালী হয় এবং প্রথমে আশ-কেনাযিমদের ও পরে রোমানীয়তদের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে ৯৯০/১৫৮২ সালে উল্লিখিত তিন সম্প্রদায়ের লোকেরা মিলিয়া যৌথভাবে সুলতানের নিকট আর্জি পেশ করে যে, তাহাদের জন্য যেন খাস স'কয়ে একটি নূতন গোরস্তান খোলা হয় (এ. রেফিক, পৃ. ৫৩)। খাসকয়ের য়াহূদীরা ক্রমে সংখ্যায় অগণিত হয় (দ্র. আওলিয়া চেলেবি, ১খ, পৃ. ৪১৩)। ১০৪৪/১৬৩৪ সালে ইস্তাম্বুলে ১,২৫৫টি য়াহূদী 'আওয়ারিদ-খানেসি ছিল (আকতেপে, পৃ. ১১০) এবং শতাব্দীর শেষভাগে ৫,০০০ য়াহূদী জিযয়া প্রদান করিত (তাহাদের মাহাল্লের জন্য দ্র. Heyd, 300-12)। ভালিদে জামি'ই-এর নির্মাণ কাজ শুরু হইলে (১০০৬/১৫৯৭) এমীনোনুর য়াহূদীদেরকে (প্রায় ১০০ পরিবার বা ঘর দ্র. এরেমিয়া চেলেবি, পৃ. ১৬৪) খাসসাকয়ে স্থানান্তরিত করা হয় (দ্র. আওলিয়া চেলেবি, ১খ, পৃ. ৪১৩-৪)। ১১৩৯/১৭২৭ সালে যে সকল য়াহূদী বার্লীক পাযারী তোরণের বাহিরে মসজিদের কাছে বাস করিত তাহাদেরকে মুসলমানদের নিকট জায়গা-জমি-বাড়ী বিক্রয় করিয়া গিয়া য়াহূদী মাহাল্লেতে বসবাস করিবার হুকুম দেওয়া হয় (দ্র. এ. রেফিক, ১১০০-১২০০, পৃ. ৮৮-৯)। তাহার পর হইতে খাসসকয়ই হয় ইস্তাম্বুলের য়াহূদীদের প্রধান আবাসিক এলাকা (Galante, 54)। খৃ. ১৯শ শতকে য়াহূদীদের মোট সংখ্যা ৩৯,০০০ এবং তাহাদের গৃহস্থালির সংখ্যা ১২,০০০ বলিয়া অনুমান করা হয় [ দ্র. (১) White, ii, 230; (২) ১৮৩৩ খৃ. সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১,৪১৪ জন পুরুষ ; তু. (৩) La. A. Frankl, Nach Jerusalem, Leipzig 1858-60, 194-5, তাঁহার অনুমানের সহিত ১৯২৭ খৃ. আদমশুমারীর প্রাপ্ত সংখ্যা ৩৯,১৯৯-এর সামঞ্জস্য পাওয়া যায় ]।

ব্যক্তিবিশেষ প্রায়শই স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিত, নও-মুসলিমগণ, বিশেষ করিয়া অন্যদেরকে মুসলমান করাইবার কাজে বিশেষ উৎসাহ দেখাইত [দ্র. (১) Villalon, 72 ; (২) Dernschwam, 111]। নও-মুসলিমগণকে (নেভ-মুসলিম আকচাসী) নূতন কাপড় দিবার জন্য দীওয়ান হইতে অর্থ সরবরাহ করা হইত ; অতঃপর তাহাকে ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া গৌরবের সঙ্গে রাস্তা দিয়া লইয়া যাওয়া হইত। কিন্তু কাহাকেও জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত যেন না করা হয় সেই নীতি সতর্কতার সঙ্গে অনুসৃত হইত। কর্তৃপক্ষ কাহাকেও ইসলাম গ্রহণ করাইবার বিষয়ে আদৌ কোন উৎসাহ দেখাইতেন না। গণ-ইসলামীকরণের একটি উদাহরণ হইতেছে তোপকাপীতে আর্মেনীয় জিপসীদের একযোগে মুসলমান হইয়া যাওয়া (দ্র. এরেমিয়া চেলেবি, পৃ. ২৩)। মুসলিম পুরুষেরা প্রায়ই অমুসলিম মেয়ে বিবাহ করিত (উহা খুবই প্রশংসার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত), তাহাতেও অনেককে মুসলমান করা হইত। ক্রীতদাসেরা সকলেই সাধারণত ইসলাম গ্রহণ করিত। শুধু দেশে দাসপ্রথা ছিল বলিয়াই নহে, রাজপ্রাসাদে ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বাড়ীতেও অসংখ্য দাস থাকিত। যে কোন অবস্থার লোকেরাও পারিবারিক কাজের জন্য এক বা একাধিক দাস রাখিত। তাহাদের রাখা বস্তুত লাভজনক বিনিয়োগ ছিল ; দাস বা মুক্তিপ্রাপ্তরা (আযাদলু, 'আলীক , মু'তাক ) ব্যবসায়ের দালালরূপে বা শিল্প কারখানার শ্রমিকরূপে কাজ করিত এবং অনেক সময়ে তাহাদেরকে ভাড়াও দেওয়া হইত। মুকাতাবা (দ্র.) ব্যবস্থা সর্বত্রই প্রচলিত ছিল [ক্রীতদাসগণের প্রতি আচরণের বিষয়ে দ্র. বিশেষ করিয়া (১) Villalon, 56 প. ; (২) Dernschwam, 111, 121, 129, 140-2, 161]।

(গ) 'আসকেরী শ্রেণী

সুলতানের প্রাসাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ এবং কাপী-কুলু সৈন্যদলকে যেহেতু কোন খাজনা দিতে হইত না সেহেতু ইস্তাম্বুলের জনসংখ্যার বিভিন্ন রেজিস্টারে তাহাদেরকে ধরা হইত না ; কিন্তু সংখ্যায় ও দায়িত্বের দিক হইতে তাহারা শহুরে জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিত।

| তারিখ | প্রাসাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী | কাপী-কুলু সেনাবাহিনী | নৌ-ও অস্ত্রাগার | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ৮৮০/১৪৭৫ (১) | ১২,৮০০ | | ? | ১২,৮০০ |
| ৯২০/১৫১৪ (২) | ৩,৭৪২ | ১৬,৬৪৩ | ? | ২০,৩৮৫ |
| ৯৩৩/১৫২৬ (৩) | ১১,৪৫৭ | ১২,৬৮৯ | ? | ২৪,১৪৬ |
| ১০১৮/১৬০৯ (৪) | ১২,৯৭১ | ৭৭,৫২৩ | ২,৩৬৪ | ৯২,৮৫৮ |
| ১০৮০/১৬৬৯ (৫) | আনু. ১৯,০০০ | আনু. ৮০,০০০ | ১,০০৩ | আনু. ১০০,০০০ |

তথ্য উৎস ঃ (১) Iacopo de Promontorio-de Campis, ed. Babinger, Munich 1957, 48 ; (২) বারকান, IFM, xv, 312; (৩) বারকান, IFM, xv 300; (৪) 'আয়নী 'আলী, রিসালা ইস্তাম্বুল ১২৮০ ১২৮০ হি., পৃ. ৮২-৯৮ ; (৫) বারকান, IFM, xvii, 216, 227)।

উপরের সংখ্যা হইতে দেখা যায় যে, কাপী-কুলুর সংখ্যা ৯২০/১৫১৪ সনের পরের শতাব্দীকালের মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় পাঁচ গুণ হয়। এই বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল প্রধানত জানিসারী সৈন্যদলের ক্ষেত্রে ও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল ১০০১/১৫৯৩ ও ১০১৫/১৬০৬ সালের মধ্যে, তখন পদাতিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা বেশী অনুভূত হয় (দ্র. CH Isl., i, 344-50) ; ১০০৬/১৫৯৭ সালের যুদ্ধে মাত্র ১৫,০০০ জানিসারী সৈন্য অংশগ্রহণ করে, কিন্তু ১০১৮/১৬০৯ সালের মধ্যে জানিসারী সৈন্যের

সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ৩৭,০০০। কিন্তু জানিসারী সৈন্য ইস্তাম্বুলে থাকিত, আর কিছু নিযুক্ত থাকিত প্রাদেশিক শহরগুলিতে ও সীমান্ত এলাকাতে ; ৪৯,৫০০ জানিসারী সৈন্যের মধ্যে ২০,৪৬৮ জন ১০৭৬/১৬৬৫ সালে ইস্তাম্বুলে ছিল, আর ১০৮০/১৬৬৯ সালে ছিল ৩৭,০৯৪ জন (দ্র. IFM. xvii, 216)। কোপরুলুগণ তাহাদের সংখ্যা কমাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলে ১০৮৩/১৬৭২ সালে জানিসারী সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল মাত্র ১৮,১৫০ জনে আর মোট কাপী-কুলু সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল মাত্র ৩৪,৮২৫ জনে (দ্র. সিলাহদার, ১খ., পৃ. ৪৯৯, ৫৮০)। ১২শ/১৮শ শতকে জানিসারী সৈন্যের সংখ্যা ছিল ৪০,০০০। কিন্তু অনুমিত হইয়াছিল যে, সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী ছড়াইয়া থাকা এই সেনাবাহিনীর মোট সংখ্যা ছিল বা দাবি করা হইত ১,৬০,০০০ বলিয়া (একটি তফাৎ মনে রাখিতে হইবে যে, এই বাহিনীতে সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য এমনও বহু লোক প্রবেশ করিয়াছিল যাহারা ঠিক কার্যকর সৈনিকের কাজ করিত না)। বিপরীতক্রমে সেই প্রথম দিকে সুলতান ২য় মুহাম্মাদের শাসনামলে কিছু কিছু জানিসারীকে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেই সওদাগর ও কারুশিল্পীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং তাহাদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। কারণ বেতন কমাইবার ফলে একজন জানিসারীর মাহিনা—কোন সময়েই আট আকচের বেশী ছিল না—বস্তুত মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে ক্রমেই তাহারা বেশী করিয়া 'ইসনাফ' হইতেছিল। ১০ম/১৬শ শতকের শেষের দিকে এই সকল 'ব্যবসায়ী' জানিসারীদেরকে চাকুরীর জন্য নিয়োগ করিতে কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয় [দ্র. (১) Selaniki, passim; (২) অরহোনলু, তেলহিসলের, দলীল নং ১৫, ১৯)। ১১শ/১৭শ শতকে ইস্তাম্বুলে (অন্যান্য আরও অনেক স্থানে) বহু ব্যক্তি নিজেকে 'জানিসারী' বলিয়া (রাজিল, বেশে) বা 'সিপাহী, (জুনদী) বলিয়া পরিচয় দিত। প্রকৃতপক্ষে তাহারা ছিল ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী। এই জানিসারীরা ও অন্যান্য কাপী-কুলুযে শহরের অর্থনৈতিক জীবনে প্রবেশ করিয়াছিল তাহার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়িয়াছিল, বিশেষ করিয়া এই কারণে যে, তাহারা নিজেদেরকে হিসাব বহির্ভূত বলিয়া মনে করিত।

এই জানিসারীদের মধ্য হইতে ব্যাপকভাবে শহরের পুলিস বাহিনীতে লোক নিয়োগ করা হইত। তাহাদের দায়িত্ব ছিল শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, বাজারগুলিতে পাহারাদারের কাজ করা। তাহা ছাড়া বন্দরের ঘাটে ও অন্যান্য জনসমাবেশের স্থানে পাহারার দায়িত্ব পালন করা। এই কর্তৃত্বের বলে অনেক সময়ে নানা রকমভাবে তাহারা জোর-জুলুম করিয়া অর্থ আদায় করিত, এমনকি ব্যবসার সামগ্রীও সরাইয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিত। অমুসলিমদের জানমাল অনেক সময়ে ইহাদের কৃপার উপর নির্ভর করিত। ১৬০০ খৃ.-এর পরে ইতিপূর্বেকার অপেক্ষা অনেক ঘন ঘন জানিসারী বিদ্রোহ দেখা দিতে থাকিলে তখন শহরে সম্পূর্ণ অরাজকতা বিরাজ করিতে থাকে, লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে, অগ্নিকাণ্ডের ভীতি আর লুণ্ঠন সার্বক্ষণিক হইয়া পড়ে (দ্র. Hammer-purgstall, x, index s. v. Janitscharen-Aufruhr)। এত বেশী সংখ্যক নামেমাত্র জানিসারী ব্যবসায়-বাণিজ্যে জড়িত থাকিবার কারণে এই সকল গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে কতগুলিকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গণউত্থান বলিয়াই গণ্য করা যাইতে পারে (দ্র. Porter, Observations, p. xxviii)।

ইস্তাম্বুলের সমাজ-জীবনে 'আজেমী-ওগলানলারীগণেরও (দ্র.) যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইস্তাম্বুলের ছাউনিতে যাহারা ছিল তাহাদের সংখ্যা প্রথমে ছিল ৩,০০০ (দ্র. উযুনচারসিলি, কাপুকুলু ও চাকলারী, ১খ., ৭৯), ১৫৫৫ খৃ. এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ৭,০০০ (দ্র. Dernschwam, 65)। জনগণের জন্য সরকারী কাজে নিযুক্ত ইহারা ছিল গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিকশক্তি [দ্র. (১) বারকান, L'organisation du travail . . . Annales, xvii, 1094; (২) এ. রেফিক, in Edeb. Fak. Mejdm., v/I, 6-10, 12), সুলতানের বাগানের কাজেও ইহারা অপরিহার্য ছিল (দ্র. Dern-Schwam, 64-5)। তাহাদের দৈনিক মজুরি ছিল খুবই কম (১৫৫৫ খৃ. ২-১ আকচে)। সুলতানের গোলামস্বরূপ ছিল বলিয়া তাহারা যেহেতু বিচার-আচার মওকুফ পাইত—সে কারণেই জনসাধারণের মধ্যে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিল, ছিল হামবড়া মনোবৃত্তির এবং সুযোগ পাইলেই তাহারা গোলযোগ সৃষ্টি করিত।

সুলতান যখন যুদ্ধযাত্রা করিতেন তখন বস্তুত প্রাসাদের সকল লোক ও কাপী-কুলুর সকলেই তাঁহার সঙ্গে যাইত। সে রকম সময়ে বাজারগুলির অবস্থা একেবারে বিশৃঙ্খল হইত, জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইত, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরাইয়া রাখা হইত এবং দ্রব্যসামগ্রীর অভাব দেখা দিত (দ্র. সেলানিকী, পাণ্ডু.)। যে সকল জানিসারী ব্যবসা-বাণিজ্য করিত তাহারা বাধ্য হইয়া তখন কারবার বন্ধ করিয়া দিত। বিভিন্ন সংস্থার সদস্যগণের মধ্যে কিছু সংখ্যককে অরদুজুরূপে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যাইতে আইনগতভাবে বাধ্য করা হইত (দ্র. মেজেল্লে, ১খ., ৬১৯-৩৬)। ফলে নগরবাসিগণের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যককেও শহর ত্যাগ করিয়া যাইতে হইত। সুলতান ২য় সেলীমের শাসনের পূর্ব পর্যন্ত বস্তুত প্রতি বৎসরই এইরূপ ঘটিত। ইহার ফলে যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হইত তাহা বিবেচনা করিয়াই রাষ্ট্রনায়কগণ পরে আর চাহিতেন না যে, স্বয়ং সুলতান ব্যক্তিগতভাবে অভিযানে যান [তু. (১) ১৫৭০ খৃ.-এর জন্য Hill, iii, 892 ; ১৫৯৬ খৃ.-এর জন্য সেলানিকী, পাণ্ডু.]।

**(ঘ) মহামারী**

অগ্নিকাণ্ডের ফলে যেমন প্রায়শ লোকদের বাসস্থান ধ্বংস হইয়া যাইত, ঠিক সে রকমই আবার প্লেগ, কলেরা ও গুটিবসন্ত রোগ মাঝে মাঝে মহামারী আকারে দেখা দিয়া বহু প্রাণহানি ঘটাইত। ৮৭১/১৪৬৬ সালের প্লেগে প্রতি দিন ৬০০ করিয়া লোক প্রাণ হারায় তখন বহু লোক শহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ঃ "শহর জনশূন্য হইয়া পড়ে" (দ্র. Critoboulos, tr. Riggs, 220-2)। উহার চারি বৎসর পর আবারও প্লেগ দেখা দেয় এবং শহরের সকল ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায় (দ্র. W. Heyd, Hist. du commerce du Levant, ii, 341)। পরবর্তী কালে ৯১৭/১৫১১, ৯৩২/১৫২৬, ৯৬৯/১৫৬১, ৯৯২/১৫৮৪, ৯৯৪/১৫৮৬ সালে (দ্র. The Fugger Newsletters, ed. V. von Klarwill, London 1928, 104), ৯৯৮/১৫৯০, ১০০০/১৫৯২ সালে (দ্র. সেলানিকী, পাণ্ডু.), ১০০৮/১৫৯৯, ১০৩৪/১৬২৫, ১০৪৭/১৬৩৭, ১০৫৮/১৬৪৮ সালে (দ্র. Chalkokondyles, Histoire de la decadence . . . tr. B. de Vigenere, Rouen 1660, 1013), ১০৬৩/১৬৫৩, ১০৮৪/১৬৭৩ সালে (দ্র. Galland, ii, 178), ১১৭৯/১৭৬৫ সালে

(দ্র. Grenyille, Observations, ed. S. Ehrenkreutz, Ann Arbor 1965, 71, 74, 106), ১২০৭/১৭৯২ সালে (দ্র. জেওদেত, ১০খ., ৯৪), ১৮১২ খৃ. (দ্র. Andreossy, 178-84), ১৮৩৭ খৃ. (দ্র. Memoire of Mrs. Elisabeth S. Dwigth . . . New York 1840), ১৮৪৫-৭ খৃ., (দ্র. M. P. Verrolet, Du Choleramorbus en 1845, 1846 et 1847, Constantinople 1848), ও ১৮৬৫ খৃ. (দ্র. H. Leach, Brief notes . . . , London 1866) মারাত্মক সব মহামারী দেখা দেয়। এই সকল মহামারী একবার দেখা দিলে কয়েক মাসব্যাপী চলিতে থাকিত এবং কোন কোন সময় কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিত এবং তাহাতে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু ঘটিত ঃ ১৫৯২ খৃ. ও ১৬৪৮ খৃ. প্রতিদিন ১,০০০ করিয়া এবং ১৭৯২ খৃ. প্রতিদিন ৩,০০০ করিয়া লোক মারা যায়। ১৮১২ খৃ. যে মহামারী দেখা দেয় তাহাতে সর্বমোট মৃতের সংখ্যা নথিভুক্ত করা হয় ১,৫০,০০০ জন (দ্র. Andreossy, 180) এবং অপর এক বর্ণনামতে (Lettres ecrites des missions etrangeres, Lyon 1819, p. 2)। এই সংখ্যা ও এমনকি আরও বেশী ২-৩,০০,০০০ বলিয়া লেখা হইয়াছে। ১৮৩৭ খৃ. Von Moltke-এর বর্ণনামতে (দ্র. Letter 26) শহরের সর্বমোট জনসংখ্যার বিশ ভাগের এক ভাগই শেষ হইয়া যায়। ১৮৩৮ খৃ. নিরাপদে থাকিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় (১৮৩৯ খৃ. একটি কারানতিনা নাজীরলীগী স্থাপন করা হয়), কিন্তু তাহাতে প্রতিকার খুব বেশী হয় নাই [দ্র. (১) এস. আনভের, 'উছমানলি তাবাবেতী ডে তানযিমাত, তানযিমাতে প্রকাশিত, ১খ., পৃ. ৯৪৭-৫০; (২) বি. সে হসুভারোগলু, তুর্কীয়ে কারানতাইন তারিহিনে বির বাকিস, ইস্তাম্বুল ১৯৫৮ খৃ. ]। প্লেগ রোগের কারণেই ইস্তাম্বুলের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি ঘটে, খৃ. ১৮শ শতকে ইংরেজদের মহামারী রোগ নিরোধক ব্যবস্থাসমূহ (Quarantine regulations) গ্রহণের ফলে বাণিজ্যের একটা বড় অংশ এখান হইতে লেগহর্নে চলিয়া যায় (দ্র. Porter ; Grenville, p. 64)।

(ঙ) জনসংখ্যা

বিভিন্ন সময়ে ইস্তাম্বুল শহরের জনসংখ্যা আনুমানিক কত ছিল তাহা জানিবার সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য তথ্য-উৎস হইতেছে অবশ্যই বিভিন্ন 'উছমানী নিবন্ধন বা রেজিস্টার, এমনকি সেগুলিও যেহেতু মূলত খাজনা আদায়ের প্রয়োজনে তৈরি করা হয়, এইজন্য সকল অধিবাসীকে সেই গণনার মধ্যে ধরা হয় নাই (মহিলা ও শিশুগণ, 'আসকেরী শ্রেণী, ছাত্র এবং অন্যান্য যাহাদের উপরে খাজনা ধার্য হইত না তাহাদেরকে গণনার মধ্যে ধরা হয় নাই)। আর তাহারা প্রায়শ যে লোক গণনার একক বিবেচনা করিত তাহা ছিল 'খানে' বা গৃহস্থালীর সংখ্যা ; জিয্য়া রেজিস্টারে শুধু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদেরকে তালিকাভুক্ত করা হয়, আর 'আওয়ারিদ কর ধরা হইত আবার অন্য এক কাল্পনিক বা আনুমানিক 'খানে' ধরিয়া, সেখানে কয়েকটি গৃহস্থালিকে মিলাইয়া একটি খানা (খানে) ধরা হইত (দ্র. প্রবন্ধ 'আওয়ারিদ)। ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সংখ্যা পাওয়া যায় (নিম্নে দ্র.) তাহা হইতে বুঝা যায় যে, এক একটি খানাতে গড়ে ৩-৪ জন লোক ছিল (বায়যানটীয় আমলে ছিল ২৬—৫২ জন, দ্র. Jacoby, p. 102) এবং এই সংখ্যাই সম্ভবত তৎপূর্বেকার সময়ের জন্যও প্রযোজ্য হইতে পারে। কেননা যে শহরে অধিকাংশ অধিবাসীই পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতায় ভুগিত, যেখানে মানুষের গড় আয়ু ছিল ২৫ বৎসর এবং অবিবাহিত লোক এত বেশী ছিল (১৮৫৬ খৃ.- ৪৫,০০০ ঃ শ্রমিক ও মাদরাসার ছাত্র) সেখানে পরিবারের জনসংখ্যা সেরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

বর্তমান গবেষণার পর্যায়ে নিম্নের সংখ্যা অবশ্যই তুলনামূলক বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা উচিত। দেখা যায় যে, ১৪৭৭ খৃ. যে জনসংখ্যা (গালাতা সমেত) ১৬,৩২৬টি খানে তাহা ১৫৩৫ খৃ.-এর মধ্যে প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পায়। আনু. ১৫৫০, খৃ. C. de Villalon (Viaje de Turquia, p. 306) আন্দাজ করিয়াছিলেন যে, ইস্তাম্বুল ও উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী এলাকার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১,২০,০০০ খানা বা গৃহস্থালি, তাহা হইতে ধরা যায় যে, ১৫ বৎসরের কিছু বেশী সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা ৫০% বৃদ্ধি পায়। বস্তুত বারকান (JESHO, i/I, p. 28) দেখাইয়াছেন যে, সাধারণভাবে ১০শ/১৬শ শতকে 'উছমানিয়া শহরগুলিতে জনসংখ্যা ৮০% বৃদ্ধি পায়। আধুনিক লেখকগণ অনুমান করেন যে, খৃ. ১৬শ শতকে মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭,০০,০০০।

---

| বৎসর | 'খানে বা জন, | মুসলিম | খৃষ্টান | য়াহূদী | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ৮৮২/১৪৭৭ | (১) খানে | ৯,৫১৭ | ৫,১৬২ | ১,৬৪৭ | ১৬,৩২৬ |
| ৮৯৪/১৪৮৯ | (২) খানে | [ ] | ৫,৪৬২ | ২,৪৯১ | . . . |
| আনু. ৯৪২/১৫৩৫ | (৩) খানে | ৪৬,৬৩৫ | ২৫,২৯৫ | ৮,০৭০ | ৮০,০০০ |
| ১০৪৪/১৬৩৪ | 'আওয়ারিদ খানেসি | ১,৫২৫ | [ ] | ১,২৫৫ | . . . |
| ১১০২/১৬৯০ | (৪) খানে | [ ] | ১৪,২৩১ | ৯,৬৪২ | . . . |
| ১১০২/১৬৯০ | (৫) মাথাপিছু ধার্য করদাতা | [ ] | ৪৫,১১২ | ৮,২৩৬ | . . . |
| ১২৪২/১৮২৬ | (৬) পুরুষ | ৪৫,০০০ | ৫০,০০০ | [ ] | . . . |
| ১২৪৫/১৮২৯ | (৭) ব্যক্তি | ---------- | ---------- | ---------- | ৩,৫৯,৮৯০ |
| ১২৪৯/১৮৩৩ | (৮) পুরুষ | ৭৩,৪৯৬ | ১,০২,৬৪৯ | ১১,৪১৬ | |
| | খানে | ২৯,৩৮৩ | ১৯,০১৫ | | |
| ১২৭৩/১৮৫৬ | ব্যক্তি | ৭৩,০৯৩ | ৬২,৩৮৩ | | |
| ১৯১৮ খৃ. | (৯) ব্যক্তি | ---------- | ---------- | ---------- ৭,০০,০০০ | |
| ১৯২৭ খৃ. | (১০) ব্যক্তি | ৪,৪৭,৮৫১ | ২,৪৩,০৬০ | ৬,৯০,৯১১ | |

**টীকা** ঃ (১) উপরে দ্র., পৃ. ২৩৮ ; (২) বারকান, বেলগেলার, ১খ., পৃ. ৩৯ ; মোট খৃষ্টান জনসংখ্যার মধ্যে ৪৪৭ য়াহূদী ও খৃষ্টানকে মিশ্রিতভাবে ধরা হইয়াছে; (৩) বারকানের অনুমান, in JESHO, i/I, p. 20 ; (৪) তোপকাপী সারায়ি দলীল রক্ষণাগার (আর্কাইভ), নং ৪০০৭, শহরতলী এলাকা সমেত ; (৫) Mantran, Istanbul, 46-7 ঃ আরও ১৪, ৬৫৩ জনকে বাদ দেওয়া Mantran অনুমান করেন যে, সর্বমোট খানের সংখ্যা ছিল ৬২,০০০ ; (৬) লুতফী, ২খ, পৃ. ৬২ ; (৭) তোপকাপী সারায়ি সংরক্ষিত দলীল নং ৭৫০ ; (৮) ইস্তানবুল রেহবেরি, ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ১৬৩ ; বিদেশিগণকে ধরা হয় নাই ; (৯) প্রথম আদমশুমারী]। (১) Lybyer, Constantinople as capital . . ., দ্র. গ্রন্থপঞ্জী, 377 ; (২) Braudel, Medierranee, 272, Mantran পরবর্তী শতকের জন্য জনসংখ্যার অনুমান করেন (Istanbul, 44-7) ৬,৫০-৭,৫০,০০০ বা ৭,০০-৮,০০,০০০ (শহরতলী সমেত)। অন্যান্য যে সকল অনুমান

সেগুলিও এই সংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ Sanderson, ১২,৩১,০০০; ।G. Moro (Alberi, ser. 3, iii, 334); ৮,০০,০০০ (কিন্তু Garzoni [Alberi, 389] বলেন যে, মাত্র "Piu di trecento mila persone")।

যাহা হউক, উছমানিয়া ইস্তাম্বুলের নগর প্রাচীরের ভিতরের এই সংখ্যা-তথ্য অতিরঞ্জিত বলিয়াই মনে হয়। ইস্তাম্বুল ও গালাতার জনসংখ্যা একত্রে বায়যানটীয় আমলে কোন সময়েই ৪,০০,০০০-এর বেশী ছিল না (দ্র. Jacoby, in Byzantion, xxxi, 1961, 82-109)। গত পঞ্চাশ বৎসরের নির্ভরযোগ্য সংখ্যা হইতেছেঃ

| | |
|---|---|
| ১৯২৭ খৃ. | ২,৪৫,০০০ |
| ১৯৪০ " | ২,৭২,০০০ |
| ১৯৫০ " | ৩,৫০,০০০ |
| ১৯৬০ " | ৪,৩৩,০০০ |
| ১৯৬৫ " | ৪,৮২,০০০ |

এবং ১৯শ শতকের আগে ইস্তাম্বুলে জনসংখ্যা যে ইহা অপেক্ষা বেশী ছিল তাহা গ্রহণ করা কঠিন (এই কারণে যে, সেই সময়ে অধিকাংশ বাড়ীই একতলা ছিল এবং বাগান ও খোলা জায়গা যথেষ্ট থাকিত ; উপরের দিকে কয়েক তলা ভবন নির্মাণ শুরু হয় ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরে, ধীরে ধীরে)। ১৯২৭ খৃ.-এর সংখ্যা (১৭.২ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ব্যাপিয়া) হইতে দেখা যায় যে, সে সময়ে প্রতি হেক্টরে ১৪৫ জন লোক বাস করিত (প্রাক খৃ. ১৫শ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় শহরগুলিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ২০০-এর নীচে, দ্র. Jacoby, 105)। Garzoni-র যে অনুমান, ১৫৭৩ খৃ. লোকসংখ্যা ছিল ৩,০০,০০০ এবং ১৮২৯ খৃ.-এর গণনায় প্রাপ্ত সংখ্যা ৩,৬০,০০০। উহাই অধিকতর সম্ভাব্য বলিয়া মনে হয় (অন্যগণ ইস্তাম্বুলের প্রাচীরের ভিতরের লোকসংখ্যার যে অনুমান করিয়াছেন সেইগুলি হইল ঃ J. E. Dekay (১৮৩৩ খৃ.) ঃ ২,৫০,০০০; Hoffman ঃ ৩,৮০,০০০; Visquenel (১৮৪৮ খৃ.) ঃ ৩,২১,০০০; Verrolot (১৮৪৮ খৃ.) ঃ ৩,৬০,০০০ ; এই সবের জন্য দ্র. V. Michoff, La population . . ., i-iv)। ইস্তাম্বুলের নগর-প্রাচীরের ভিতরের ও বাহিরের জনসংখ্যার তুলনামূলক যে অবস্থান নিম্নে উল্লিখিত রুটির দোকানের সংখ্যাগুলি হইতে তাহার একটি মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায় ঃ

| | ১০৮৩/১৬৭২ | ১১৬৯/১৭৫৫ | ১১৮২/১৭৬৮ |
|---|---|---|---|
| ইস্তাম্বুল | ৮৪ | ১৪১ | ২৯৭ |
| গালাতা | ২৫ | ৬১ | ১১৬ |
| উসকুডার | ১৪ | ২২ | ৬৫ |
| এয়্যুব | ১১ | ৭ | ২৮ |

ও তৈল-বাওিয়ালাদের দোকান (১০৮৩/১৬৭২ সাল)

| | |
|---|---|
| ইস্তাম্বুল | ২৪ |
| গালাতা | ৫ |
| উসকুডার | ৪ |
| এয়্যুব | ৯ (য়েদিকুলেতে কসাইখানা থাকা সত্ত্বেও এই সংখ্যা হওয়াটা বেশী)। |

আমদানী করা মালপত্রের মুদি দোকানের মধ্যে ১০১৮/১৬০৯ সালে তিন-পঞ্চমাংশই ছিল ইস্তাম্বুলে, আর মাত্র দুই-পঞ্চমাংশ ছিল তিনটি "উপশহরে" (Township), শেষ পর্যন্ত সেগুলি হইতে অভিযোগ আসে (দ্র. এ. রেফিক , ১০০০-১১০০, দলীল নং ৭৪)। আমদানী করা ফলের এক-অষ্টমাংশ ৯ম/১৫শ শতকের শেষভাগে যাইত গালাতাতে [দ্র. ইহতিসাব বিধিমালা, in TV, i (5, 339)]। খৃ. ১৭শ ও ১৮শ শতকে গালাতাতে যদিও জনসংখ্যা বৃদ্ধি অনেক বেশী ছিল এবং তোপখানে, বেয়োগলু ও কাসীম পাশা যথেষ্ট সম্প্রসারিত হইয়াছিল, তথাপি ১৮৪০ খৃ. পর্যন্ত ইস্তাম্বুল বলিতে প্রাচীর-ঘেরা ইস্তাম্বুল অংশকেই বুঝাইত।

১৯৪৫ খৃ. পর্যন্ত ইস্তাম্বুলের প্রাচীর-ঘেরা অংশ ও 'বৃহত্তর' ইস্তাম্বুলের মধ্যে জনসংখ্যার যে 'বিতরণ' তাহা উনবিংশ শতাব্দীর মতই ছিল। তাহার পর হইতে জনসংখ্যা বিস্তারের কিছু কিছু বিভিন্নতা ঘটিয়াছে, সেইগুলি নিম্নের সংখ্যাতথ্য হইতে বুঝা যাইবে ঃ

| বৎসর | তুরস্কের জনসংখ্যা | ইস্তাম্বুলের জনসংখ্যা নগর প্রাচীরের ভিতরে | বৃহত্তর ইস্তাম্বুলের জনসংখ্যা (বেয়োগলু, বেসিরতাস, সি স লি কাদিকোয় ও এয়্যুবসমেত) |
|---|---|---|---|
| ১৯২৭ খৃ. | ১,৩৬,৪৮,০০০ | ২,৪৫,৯৮২ | ৬,৯৪,২৯২ |
| ১৯৪০ খৃ. | ১,৭৮,২১,০০০ | ২,৬৬,২৭২ | ৮,৪১,৬১১ |
| ১৯৫০ খৃ. | ২,০৯,৪৭,০০০ | ৩,৪৯,৯০৯ | ১০,৩৫,২০২ |
| ১৯৬০ খৃ. | ২,৭৭,৫৫,০০০ | ৪,৩৩,৬২৯ | ১৪,৬৬, ৪৩৫ |
| ১৯৬৫ খৃ. | ৩,১৩,৯১,০০০ | ৪,৮২,৪৫১ | ১৫,৪১,৬৯৫ |

কাজেই যেখানে বৃহত্তর ইস্তাম্বুলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমগ্র দেশের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ, সেখানে ইস্তাম্বুল নগর প্রাচীরের ভিতরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কম।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (ক) 'উছমানী দলীলপত্র। (i) ওয়াক্ফ বিষয়ক দলীলপত্র। (১) ওয়াক্ফিয়্যাসমূহ। এয়্যুবের মূল ওয়াক্ফিয়্যাসমূহের অনুলিপি, তারিখ ৮৬১/১৪৫৭ সাল, ফাতিহ ২য় মুহাম্মাদ ভাকফিয়েলেরি, প্রকাশক ভাকিফলার জেনেল মুদুরলুগু, আঙ্কারা ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ৩৩৬-৪০; (২) কালেন্দের খান (Church of Akataleptos)- এর জন্য, Nwei Stiftungsurkunden des Sultans Mehmet II. Fatih, সম্পা. টি. ওয়, ইস্তাম্বুল ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ১-১৫। এই ধরনের যত ব্যক্তিগত ওয়াক্ফিয়্যা ছিল সেগুলি সবই সুলতান ২য় মুহাম্মাদের মসজিদ ও সংলগ্ন ভবনসমূহ নির্মাণের পরে একটিমাত্র ওয়াকফিয়্যার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। তাহার সর্বাধিক প্রাচীন যে ওয়াকফনামা সেটি আরবীতে লিখিত, আদিতে ২য় মুহাম্মাদের তুরবেতে রক্ষিত ছিল, বর্তমানে তুর্ক-ইসলাম এসারলেরি মুযেসিতে রক্ষিত আছে (পুরাতন নং ১৮৭২, নূতন নং ৬৬৭) ; উহার তারিখ ৮৭৭/১৪৭২ বা ৮৭৮/১৪৭৩ সাল, অনুলিপি (মুদ্রণ ভাল নহে) হইয়া প্রকাশিত হয় ; (৩) ও. এন. এরগিন, ফাতিহ্ ইমারেতি ভাকফিয়েসি-তে, ইস্তাম্বুল ১৯৪৫ খৃ., পৃ. ১-৬৮। শাসনের পরবর্তী সময়ে একটি নূতন পূর্ণাঙ্গ ওয়াকফিয়্যা তৈরি করা হয়, উহার একটি সরকারী অনুলিপি (২য় বায়েযীদ-এর তুগরা) টিকিয়া আছে, উহার প্রতিরূপ পাওয়া যাইবে (৪) Zwei Stiftungsurkunden . . .-এ, পৃ. ১-১৪৯। ১০ম/১৬শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে (দ্র. এরগিন, পূ. গ্র., পৃ. ২৯-৩৪) এই ওয়াকফিয়্যাটি তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয় (যখন কিছুটা ভিন্নভাবে সাজান হয় এবং ভাষা সৌকর্যের কারণে কিছুটা বাড়ানও হয়), অনুচিত্রের জন্য দ্র. (৫) ফাতিহ

২য় মুহাম্মাদ ভাকফিয়েলেরি, পৃ. ১৪-১৯৮। ১ম সুলায়মান (অনুচিত্র) ঃ (৬) কে. ই. কুর্কচুওগলু, সুলেয়মানিয়ে ভাকফিয়েসি, আঙ্কারা ১৯৬২ খৃ.। ভাকিফলার দেরগিসিতে প্রকাশিত ঃ (৭) কারা আহমাদ পাশা, ১খ, ৮৩-১৬৮ (এস. য়ালতকায়া); (৮) কায়মাক মুসতাফা পাশা, ৮খ, ১৫-৩৫ (এম. আকতেপে)। ইস্তাম্বুল বিষয়ক বা অধিকাংশ ওয়াকফিয়্যা যেগুলি ভাকিফলার উমুম মুদুরলুগু দলীল রক্ষণাগার, আঙ্কারাতে রক্ষিত আছে সেইগুলি ইস্তাম্বুল সিরিজের রেজিস্টার কপিতে পাওয়া যায়।

২। **পরিদর্শন (তেফতীশ) ও ভাড়ার (জিবায়েত) রেজিস্টার।** এই রেজিস্টারগুলি ওয়াক্‌ফ-এর আয়ও লিপিবদ্ধ করিবার জন্য এবং ভাড়া আদায়কারিগণ (জাবী)-এর জন্য তৈরি করা হইত, এইগুলি ওয়াক্‌ফ-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা সম্পত্তির বিস্তারিত জানিবার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জানামতে সর্বাপেক্ষা পুরাতন হইতেছে (৯) আয়া সোফিয়ার ৮৯৫/১৪৮৯ সালের জিবায়েত রেজিস্টার (বাস ভেকালেত আরসিভি, মালিয়েদেন মুদেভভের নং ১৯, পৃ. ৫৬ প., আরবী ; কোন কোন পাতার সংখ্যার মিল নাই, লেখক কাদী য়ূসুফ ইব্‌ন খালীল) ; ৮৭৪/১৪৬৯ সালে লেখা অনুরূপ আর একটি রেজিস্টারও রহিয়াছে। এই রকম আরও একটি রেজিস্টার লিখিয়াছিলেন (১০) মেহমেদ ইব্‌ন 'আলী আল-ফেনারী, তিনি ৯২৬/১৫১৯ সালে এদীরনের কাদী ছিলেন (বেলেদিয়ে লাইব্রেরী, পাণ্ডু. সেগদেত ৬৪, ৪৪৪ প.)। ২য় মুহাম্মাদের সকল ওয়াক্‌ফ-এর রেজিস্টার রহিয়াছে ইস্তাম্বুলে। (১১) বাসভেকালেত আরসিভি, তাপু দেফতেরি নং ২১০ (৯৪৭/১৫৪০ সাল) ও নং ২৪০ (৯৫২/১৫৪৫ সাল)।

অন্যান্য অনুরূপ রেজিস্টারে সাধারণ নাগরিকগণের ওয়াকফসমূহের বিষয় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সেইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণগুলি (বাস ভেকালেত আরসিভি, তাপু দেফতেরি নং ২৫১) প্রকাশিত হইয়াছেঃ (১২) ইস্তানবুল ভাকিফলারি তাহরির দেফতেরি, ৯৫৩ (১৫৪৬ খৃ.) তারিহলি, সম্পা. ও. এল. বারকান ও ই. এইচ. আয়ভেদী, ইস্তানবুল ১৯৭০ খৃ। অপ্রকাশিত এই রকম দুইটি রেজিস্টার হইতেছে; (১৩) বাসভেকালেত আরসি ভি. তাপু দেফতেরি, ৬৭০, ৯৮৬/১৫৭৮ ও ৯৮৮/১৫৮০ সালের মধ্যে ইহা লেখেন হাসান ইব্‌ন য়ূসুফ এবং (১৪) তাপু ভে কাদাসত্রো উমুম মুদুরলুগু, আঙ্কারা, এসকি কায়িতলার নং ৫৪২ ও ৫৪৩, ইহা ১০০৫/১৫৯৬ সালের পরে লেখা।

বাৎসরিক হিসাবের রেজিস্টারও রহিয়াছে। ফাতিহ মসজিদ ও আয়া সোফিয়া মসজিদের ৮৯৪/১৪৮৯-৮৯৬/১৪৯১ সালের সংক্ষিপ্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন (১৫) ও. এল. বারকান (IFM, xxiii, (1962-3), 342-79)। তাহা ব্যতীত দ্র. (১৬) ঐ লেখক, সুলেয়মানিয়ে কামিই ইভে ইমারেতি তেসিসলেরিনে আইত য়িল্লিক বির মুহাসেবে বিলানচোসু, ৯৯৩/৯৯৪, ভাকিফলার দেরগিসিতে প্রকাশিত, ৯খ, ১০৯-৬২।

(২) হিসবা বিষয়ক (ইহতিসাব) দলীলপত্র। এইগুলি প্রধানত তিন ধরনের ঃ ১। বিধিমালা, নির্ধারিত দরের তালিকা; ২। রুসূম-ই ইহতিসাবিয়্যে-এর রেজিস্টারসমূহ ; (৩) বিভিন্ন কাজের জন্য সংস্থাভুক্ত ব্যক্তিগণের রেজিস্টার ; (৪) ৯০৭/১৫০১ সালের বিধিমালা (১৬) ও. এল. বারকান সেইগুলি তারিহ ভেসিকালারিতে প্রকাশ করিয়াছেন, ১/৫খ. (১৯৪২ খৃ.), পৃ. ৩২৯-৪০; ফরাসী অনুবাদ (১৭) R. Mantran, in Les Cahiers de Tunisie, no. 14 (1956), 213-41। পরবর্তী কালের বিধিমালাতেও প্রায় ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা দেখা যায় (সেইগুলি এফেন্দী লাইব্রেরী পাণ্ডু. নং ১৭৩৪ ; বায়াযীদ লাইব্রেরীতে, পাণ্ডু. নং ভেলিয়ুদ্দিন ১০৭০ ; বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, পাণ্ডু. নং টি. ৭৩৪ ও সারাজেভো, ওরিয়েন্টালনি ইন্সটিটা, পাণ্ডু. নং ১০৫৪ রক্ষিত আছে)। ইহতিসাব বিষয়ক ফরমানসমূহ প্রাত্যহিক ব্যবহারের নথিতে রক্ষিত আছে (নিম্নে ৩ দ্র.) এবং দ্রব্যমূলের নিয়ন্ত্রণ বিধিসমূহ (নার্‌খ) রক্ষিত আছে কাদীগণের রেজিস্টার ; শেষোক্তগুলির উদাহরণের জন্য দ্র. (১৮) ও. নূরী এরগিন, মেজেল্লে-ই উমূর-ই বেলেদিয়্যে, ইস্তাম্বুল ১৯২২ খৃ.। ২। এই রেজিস্টারগুলিতে ইস্তাম্বুলের ১৫টি আলাদা আলাদা ক্ষেত্রের ব্যবসায়িগণের নাম ও তথ্যাবলী লিখিত রহিয়াছে, সেখানে প্রতিটি ব্যবসায়ের মালিকের নাম, ব্যবসায়ের স্থান, কি ব্যবসায় ও প্রদেয় খাজনা কত তাহা উল্লিখিত রহিয়াছে। সেই রেজিস্টারগুলিতে যেসব জাহাজ বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্যাদি নিয়া আসিত সেই বিষয়েও অনুরূপ তথ্যাদি পাওয়া যায় (আতিফ এফেন্দী লাইব্রেরী, det B ২ (১০৯২/১৬৮১ সাল), B ১০ ও B ২৩ ; বাসভেকালেত আরসিভি, মালিয়েদেন মুদেভ্‌ভের নং ৫১৪ ও ৫২৬। এই ধরনের দলীল আংশিকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন (১৯) R. Mantran, in Melanges Louis Massignon, Damascus 1957, iii, 127-49 ; আরও দ্র. (২০) নিহাত গোল, ১৭৬৩ তারিহলি এসনাফ তাহরির দেফতেরিনে গোরে . . ., ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়, এদেবিয়াত ফাকুলতেসি, তেয ১০৭১। ৩। ভিস্তিওয়ালাগণের (কায়ীক্‌চী) রেজিস্টার ঃ বেলেদিয়ে লাইব্রেরী, পাণ্ডু. সেভদেত B ৮ ; রুটি প্রস্তুতকারগণের রেজিস্টার ঃ তোপকাপী আরসিভি, D ৯৫৮০।

(৩) ইস্তাম্বুল সম্বন্ধে অসংখ্য দলীলপত্রের সংগ্রহ 'উছমানিয়া দলীল রক্ষণাগারসমূহে (আর্কাইভ) ছড়াইয়া ছিটাইয়া রহিয়াছে। সেইরূপ কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেখান গেল ঃ ১। মুহিম্মে দেফতেরি। এই সিরিজের অনেক দলীল প্রকাশ করিয়াছেন (২১) আহমাদ রেফিক [ আলতিনায় ] তাঁহার হিজরী ওনুনজু আসি রদা ইস্তাম্বুল হায়াতি সিরিজে, ৯৬১-১০০০, ইস্তাম্বুল ১৩৩৩ হি., (২য় সংস্করণ, ইস্তাম্বুল ১৯৩৫ খৃ.) ; . . . ১১০০-১২০০, ইস্তাম্বুল ১৯৩১ খৃ. ; . . . ১১০০-১২০০ ইস্তাম্বুল ১৯৩০ খৃ. ১২০০-১২৫৫, ইস্তাম্বুল ১৯৩২ খৃ.। মুহিম্মে রেজিস্টারের অনেক দলীল সংকলন করা হইয়াছে (২২) এরগিন-এর মেহেল্লে-তে, ১খ.।

২। (২৩) মালিয়ে আহ কাম দেফতেরলেরি, নং ২৭৭৫ ও ৯৮২৪ মালিয়েদেন মুদেভভের সিরিজে রহিয়াছে, সেইগুলি বিশেষ করিয়া ইস্তাম্বুলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৩। (২৪) কুয়ূদ-ই আহকামু'শ-শিকায়াত সিরিজ। ইস্তাম্বুল বিষয়ক রেজিস্টার শুরু হইয়াছে ১১৫৫/১৭৪২ সাল হইতে। সেইখানে ব্যবসায়িগণের সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য রহিয়াছে।

৪। কাদীগণের রেজিস্টার। ইস্তাম্বুল, গালাতা ও উসকুদারের অধিকাংশ রেজিস্টার বর্তমানে পাওয়া যায় না, কিন্তু কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ টিকিয়া আছে ইস্তাম্বুল মুফতুলুগু ও তোপকাপী সারায়ির দলীল রক্ষণাগারে। তন্মধ্যে কিছু কিছু প্রকাশ করিয়াছেন এরগিন, মেহেল্লে, ১খ.-তে।

৫। মুকাতা'আ রেজিস্টারসমূহ (সেইগুলিতে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আয় নিবন্ধীকৃত করা হইত) ঃ সুলতান ২য় মুহাম্মাদের আমলের একটি

গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণের জন্য দ্র. (২৫) JESHO, iii (1960), 132. শুল্ক রেজিস্টারসমূহ ঃ (২৬) বাসভেকালেত আরসিভি, মালিয়ে নং ৩১২ (৯৯২/১৫৮৫ সালের ), নং ৫২২৭ (১০৯৮/১৬৮৭ সালের জন্য), নং ৩১২৯ (১১০২/১৬৯০ সালের জন্য), নং ৯১৮ (১১০৮/১৬৯৬ সালের জন্য), নং ৬১৬৪ (১১৩৮/১৭২৫ সালের জন্য) ; নং ২৯৯৬ (১২০৬/১৭৯১ সালের জন্য) ; তাহা ছাড়া দ্র. (২৭) কামিল কেপেসি তাসনিফি নং ৪২৪১—৪৩৬৮, ৫২০৭-৬৬।

৬। মুহাসেবে ইজমাল দেফতেরলেরিতে (বেলেদিয়ে লাইব্রেরীসমূহের মধ্যে সর্বপুরাতন, পাণ্ডু. সেভদেত ৯১) ইস্তাম্বুলের সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয়ের হিসাব রক্ষিত আছে।

৭। ইস্তাম্বুলের বিষয়টি শিক্ক-ঈ সানী দেফতেরদারীর আওতাধীন ছিল, সেই কারণেই তাহার বিভিন্ন দফতর হইত, বিশেষ করিয়া ইস্তানবুল মুকাতা'আসী কালেমি হইতে যে সকল দলীল বাহির হইত, সেইগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

(৮) ব্যক্তিবিশেষের দলীলপত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ করিয়াছেন সেভদেত, সংগ্রহ বিভিন্ন শিরোনামে করা হইয়াছে, [যথা বেলেদিয়্যে, ঈকতিসাত, সিহহিয়্যে, সারায়, যাপতিয়্যে ও মা'আরিফ (দ্র. (২৮) এম. সেরতোগলু, মুহ্তেভা বাকিসিনদান বাসভেকালেত আরসিভি, ইস্তানবুল ১৯৫৫ খৃ., পৃ., ৭১]।

ইস্তাম্বুলের পরবর্তী আমলের ইতিহাসের তথ্য-উৎস হইতেছে সরকারী সালনামে বা বর্ষপঞ্জীসমূহ এবং পৌর কর্তৃপক্ষের (বেলেদিয়্যে) বিভিন্ন প্রকাশনাসমূহ, যথা ঃ (২৯) সালনামে সিরিজ, ১৮৪৭-১৯১৮ খৃ. [দ্র. (৩০) IA, art. Salname] ; (৩১) ইস্তাম্বুল বেলেদিয়েসি ইহসা'ইয়্যাত মেজমূ'আসী, ১৩২৮-১৩৩৫ ; (৩২) আই. বি. মেজমূ'আসী, ১৯৩০-৭ ; (৩৩) ইস্তাম্বুল সেহরি ইসটাটিসটিক য়িল্লিগি, ১৯৩০-৩ ; (৩৪) বেলেদিয়া য়িল্লিগি, আঙ্কারা ১৯৪৯ খৃ. (পৃ. ৩৪১-৬৯ পর্যন্ত ইস্তাম্বুল বিষয়ক)।

(খ) 'উছমানী আমলের বর্ণনা ও বিবরণমূলক তথ্য-উৎসসমূহ। (৩৫) কুতবু'দ-দীন আল-মাক্কী, সম্পা. ই. কামিল, তারিহ্ সেমিনেরী দেরগিসিতে প্রকাশিত, ১-২ খ. (১৯৩৭ খৃ.), পৃ. ৫ ; (৩৬) আওলিয়া চেলেবি, সিয়াহাতনামে, ১খ., ইস্তাম্বুল ১৩১৪ হি. [ইংরাজী অনু. (৩৭) J. von Hammar, Narrative of travels . . . ., London 1846]; (৩৮) A. S. Levend, তুর্ক এদেবিয়াতিনদা সেহরেনগিযলের ডে সেহরেগিযলেরদে ইস্তাম্বুল ১৯৫৮ খৃ.; (৩৯) লাতীফী (দ্র.) এসাফ-ই ইস্তানবুল; (৪০) য়াহ্য়া, শেহরঙ্গিয-ই ইস্তানবুল, দ্র. TDED, xvil (1969), 73-108; (৪১) H. Warm, Der osmanische Historiker Huseyn b. Ga'fer, Freiberg 1971; (৪২) আসাফ হালেত চেলিবি, দিভান সিইরিনদে, ইস্তানবুল ১৯৫৩ খৃ.; (৪৩) হেয়'য়েত-ই সাবীকা-ই কোসত'নিয়ো, ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, পাণ্ডু. য়িলদিয ৬১২।

(গ) সাধারণ গ্রন্থাবলী ঃ (৪৪) কে. এম. বাযিলি, ওচেরকি কসটানটিনোপ্লিয়া, সেন্ট পিটাসবার্গ ১৮৩৫ খৃ.; (৪৫) E. A. Grosvenor, Constantinople, 2 vols., London 1895; (৪৬) E. Oberhummer, Constantinopolis, in Pauly-Wissowa, Real-Encyc. des Class. Aitertums, vii (Stuttgart 1900), 963-1013 (গুরুত্বপূর্ণ)। (৪৭) W. Kubitschck, Byzantion, in Pauly-Wissowa, V. 1115-58 ; (৪৮) জেলাল এস্‌সাদ, Constantinople, de Byzance a Stambul, Paris 1909; (৪৯) Robert Maycr, Byzantian Konstantinupolis, Istanbul, eine genetisohe Stadtgeographie (গুরুত্বপূর্ণ) ; (৫০) Akad. der Wis. in Wien, pil.-hist. kl., Denkschriften 71 Bd., 3 Abhndlung, Vienna and Leipzig 1942 (Bibliography 267-90) ; (৫১) A. H. Lybyer, Constantionple as capilal of the Ottoman Empire, in Annual Report of the American Hist. Assoc., 1916 ; (৫২) B. Lewis, Istanbul and the civilization of the Ottoman Empire, Norman, Oklahome 1963[3], 1972 ; (৫৩) R. Mantran, Istanbul dans la seconde moitie du xvii siecle, Paris 1962 (Bibliography 639-90) ; (৫৪) ঐ লেখক, La vie quotidienne a Constantinople, Paris 1965 ; (৫৫) N. Iorga, Byzance apres Byzance, new ed., Bucharest 1971; (৫৬) বেসিম দারকোট, ইস্তাম্বুল কগ্রাফয়াসি, ইস্তাম্বুল ১৯৩৮ খৃ.; (৫৭) A. S. Soyar, Istanbul, Geschichte und Entwicklung der Stadt, in Festschrift zum 60. Geburtstag von Kurt Albrecht, ed. K. Bachteler, Ludwigsburg 1967; (৫৮) J. Jastrow, Die Weltstellung Konstantinopels in ihrer historischen Entwicklung, in Orientbucherei Heft 4, 1915; (৫৯) Muhlis Ethem, Der Hafen von Stambul und seine Organization, Leipzig 1929; (৬০) E. Oberhummer, Aufgaben der Stadtgeographie von Istanbul, in Festschrift A. Ischirkoff, Sofia 1933; (৬১) R. Busch-Zantner, Zur Kenntnis der osmanischen Stadt, in Geographische Zeitschrift, No. 38, 1932, 1-13 ; (৬২) দোগান কুবান, ইস্তানবুল'উন তারিহী য়াপিসি, মিমারলিক-এ প্রকাশিত, ৭০/৫, ১৯৭০ খৃ. ; (৬৩) মেহমেদ দিয়া, ইস্তানবুল ভে বোগাযিচি, ২ খণ্ডে, ইস্তানবুল ১৩৩৬ হি.; (৬৪) মেহমেদ রা'ইফ, মির'আত-ই ইস্তাম্বুল, ইস্তানবুল ১৩১৪ হি. (অপ্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ড রহিয়াছে তুর্কী ইতিহাস পরিষদে, আঙ্কারা, সেইখানি বিশেষ করিয়া লিপির জন্য গুরুত্বপূর্ণ) ; (৬৫) ও. এন. এরগিন, ইস্তানবুল'দা ইমারভে ইসকান হারেকেতলেরি, ইস্তাম্বুল ১৯৩৮ খৃ. ; (৬৬) ঐ লেখক, মেজেল্লে-ই উমার-ই বেলেদিয়্যে, ইস্তাম্বুল ১৯২২ খৃ. ; (৬৭) ঐ লেখক, জুমহুরিয়েত ভে ইস্তানবুল মাহাল্লী ঈদারেসী, ইস্তাম্বুল ১৯৩৮ খৃ.; (৬৮) ঐ লেখক, তুর্ক সেহিরলেরিনদে ইমারেত সিসটেমি, ইস্তাম্বুল ১৯৩৯ খৃ. ; (৬৯) ঐ লেখক, তুর্কিয়ে'দে সেহিরসিলিগিণ তারিহি ইনকিসাফি, ইস্তাম্বুল ১৯৩৬ খৃ.; (৭০) রেফিক আহমেদ

(সেভেনজিল), ইস্তানবুল নাসিল এগলেনিয়োরদু ? ইস্তাম্বুল ১৯২৭ খৃ.; (৭১) মুসাহিপযাদে সেলাল, এসকি ইস্তানবুল য়াসায়িসি, ইস্তাম্বুল ১৯৪৬ খৃ.; (৭২) A. M. Schneider, Die Bevolkerung Konstantinopels in XV. Jahrh, in Nachr. Akad. d. W. Gottingen ph.-H. Kl. 1949; (৭৩) ই. এইচ. আয়ভের্দী, ইস্তানবুল মাহাল্লেলারি ঃ সেহরিন ইসকানি ভে নুফুসু, আঙ্কারা ১৯৫৮ খৃ.।

(ঘ) বায়যানটীয় আমল ঃ ভৌগোলিক বিবরণ ও সৌধসমূহ। (৭৪) F. W. Unger, Quellen der byzantinischen Kunstgeschichte, Vienna 1878 ; (75) A. D. Mordtmann, Esquisse topographique de Constantinople, Lille 1892; (৭৬) A. van Millingen, Byzantine const., the walls of the city and adjoining historical sites, London 1899; (৭৭) A. M. Schneider, Mauern und Tore am Goldenen Hore, Gottingen 1950 ; (৭৮) ঐ লেখক, Regionen und Quartiere in C., in Kleinasien und Byzanz, Ist Forch., Bd. xvii, 149-58; (৭৯) ঐ লেখক, Byzanz, Vorarbeiten zur Topographie und Archaologie der Stadt., Berlin 1936 ; (৮০) ঐ লেখক, Konstantinopel, Maizz 1956 ; (৮১) ঐ লেখক, Brande in Knstantinopel, in BZ, xli (1941), 382-403 ; (৮২) ঐ লেখক, Die Blachernen, in Oriens, iv (1951), 180 প.; (৮৩) R. Janin, Constantionple byzantine, developement urbain et repertoire topographique, Paris 1950; (৮৪) ঐ লেখক, Du Forum Bovis au Forum Tauri, etude topographique, in Rev. des Et. Byz., iii (1955), 85-108 ; (৮৫) ঐ লেখক, La geographie ecclesiastique de l'empire byzantin, Part 1. Le siege de Constantinople t le patriarcat ocecumenique, Paris 1969; (৮৬) C. Dietrich, Die Byz. Stadt im 6. Jahrh., Munich 1964; (৮৭) S. Eyice, Son devir Bizans mimarisi, Istanbul 1963; (৮৮) F. Dirimtekin, Fetihten snce Halic surlari, Istanbul 1956 ; (৮৯) এম. যি-য়া, কারিয়ে জামে'-ই শেরীফি, ইস্তানবুল ১৩২৬ হি.; (৯০) A. Underwood, The Kariye Djami, 3 vols., New York 1966; (৯১) R. Guilland, Etudes sur l'Hippodrome de Byzance, in Byzantinoslavica, xxi-l (1958), 26-72 xxiii-2 (1962), 203-29 ; (৯২) ঐ লেখক, Les hippodromes de Byzance, in Byzantinoslavica, xxxii-l, 30-34; (৯৩) L. de Beylie, L'Habitation byzantine, Supplement, Grenoble-Paris 1903 ; (৯৪) E. Fenster, Die Stellung konstantinopels im Denken der Byzantiner, Dissertation, 1968, Inst. fur Byz. und Neugriech; (৯৫) V. Hrochova, Buzantska Mesta ve 13-15 Stoleti, Univ. Karlova, Prague 1967।

(ঙ) 'উছমানী আমল ঃ ভৌগোলিক বিবরণ ও সৌধসমূহ। (৯৬) হুসায়ন আয়ানসারায়ী, হাদীকাতু'ল-জাওয়ামি', ইস্তাম্বুল ১২৮১ হি.; (৯৭) তাহসীন ওয, ইস্তানবুল কামিলেরি, ২ খণ্ডে, আঙ্কারা ১৯৬২-৫ খৃ.; (৯৮) A. Gabriel Les mosquees de Constantinople in Syria, vii. (1926), 353-419; (৯৯) এইচ. এদহেম (Eldem), Nos mosquees du Stamboul, ইস্তাম্বুল ১৯৩৪ খৃ.; (১০০) ঐ লেখক, য়েদিকুলে হিসারি, ইস্তানবুল ১৯৩২ খৃ. ; (১০১) S. Eyice, ইস্তানবুলদা য়ায়লা কামিলেরি, তারিহ দেরগিসি-তে প্রকাশিত, ১০খ, ৩১-৪২ ; (১০২) ঐ লেখক, আতিক 'আলী পাশা কামিই . . . , ঐ, ১৪খ, ৯৯-১১৪ ; (১০৩) যাভিয়েলের ভে যাভিয়েলি কামিলের, ইস্তানবুল বিশ্ববি., ইকতিসাত ফাকালটি মেকমুয়াসি, ২৩খ. (১৯৬২-৩), পৃ. ১-৮০ ; (১০৪) ঐ লেখক, ইস্তাম্বুল মিনারেলেরি, তুর্ক তারিহি আরাসতিরমা ভে ইনকেলেমেলেরি, ১খ. (১৯৬৩ খৃ.), পৃ. ৩১-১৩২; (১০৫) নীশলি 'ওছমান বেগ, মেযজমূ'আ-ই জাওয়ামি', ইস্তানবুল ১৩০৪ হি. ; (১০৬) ই. এইচ. আয়ভেদী, ফাতিহ দেভরি মিমারিসি, ইস্তানবুল ১৯৫৩ খৃ.; (১০৭) এদহম পাশা, L'architecture ottomane, Constantinople 1873 ; (১০৮) C. Gurlitt, Die Baukunst konstantinopels, 2 vols., Berlin 1908-12 ; (১০৯) H. Gluck, Die Kunst der Osmanen, Leipzig 1922 ; (১১০) 'আলী সাইম উলগেন, ইস্তানবুল ভে এসকি এসেরলেরি, ইস্তানবুল ১৯৩৩ খৃ. ; (১১১) ঐ লেখক, ফাতিহ দেভরিনদে ইস্তানবুল, আঙ্কারা ১৯৩৯ খৃ.; (১১২) H. Gluck, Die Baeder konstantinopels, Vienna 1921; (১১৩) H. Hogg, Turkenburgen an Bosporos und Hellespont, Dresden 1932; (১১৪) A. Gabriel, Chateaux turcs du Bosphore, Paris 1943; (১১৫) এ. মুনিব, মেজমূ'আ-ই তেকায়া, ইস্তাম্বুল ১৩০৭ হি.; (১১৬) K. O. Dalman and Paul Wittek, Der Valens Aquadukt in Konstantinopel, Ist. Torschungen Bd. 3, Bamberg 1933 ; (১১৭) আই. এইচ. কোনায়াহ, ইস্তানবুল আবিদেলেরি, ইস্তানবুল ১৯৪১ খৃ.; (১১৮) ঐ লেখক, মি'মার কোচা সিনান'ইন এসেরলেরি, ইস্তানবুল ১৯৫০ খৃ.; (১১৯) ঐ লেখক, ইস্তানবুল সারায়লারি, ইস্তানবুল ১৯৪২ খৃ.,; (১২০) ই. এগলি, Sinan der Baumeister osmanischer Glanzzeit, Zurich 1954; (১২১) আর. এম. মেরিচ, মিমার সিনানইন হায়াতি ভে এসেরলেরি, আঙ্কারা ১৯৬৫ খৃ.; (১২২) U. Vogt-Goknil, Living Architecture " Ottoman, London 1966; (১২৩) এস. উনভের, ফাতিহ কুল্লিয়েসি ভে যামানি ইলিম হায়াতি, ইস্তানবুল ১৯৪৬ খৃ. ; (১২৪) S. Eyice, ইস্তানবুল'দা মাহাল্লে ভে সেমৃত আদলারি হাক্কিনদা বির দেনেমে, তুর্কিয়াত মেক-এ প্রকাশিত, ১৪খ ; (১২৫) ঐ লেখক, এলসি হানি, তারিহ দেরগিসি-তে প্রকাশিত, নং ২৪, পৃ. ৯৩-১৩০ ; (১২৬) এইচ. ইনালচিক, The policy of Mehmed II

towards the Greek population of Istanbul and the Byzantine buildings of the city, in Dumbarton Oaks Papers, no. xxiii-xxiv, 231-49; (১২৭) আই. এইচ. তানিসিক, ইস্তানবুল চেস মেলেরি, ২খ., ইস্তান্বুল ১৯৪৩-৫ খৃ.; (১২৮) আই. কুমবারাসিলার, ইস্তানবুল সেবিল্লেরি, ইস্তানবুল ১৯৩৮ খৃ.; (১২৯) এম. এরদোগান, ইস্তানবুল বারুথানেলেরি, ইস্তানবুল এন্সটিটুসু দেরগিসি-তে প্রকাশিত, ২খণ্ড, পৃ. ১১৫-৩৮; (১৩০) W. Beneschewitsh, Die turkischen Namen der Tore von Konstantinopel, in Byz. Zeitschrift, xxiii (1914-19) ; (১৩১) এস. এন. নিরভেন, ইস্তানবুল সুলারি, ইস্তানবুল ১৯৪৬ খৃ. ; (১৩২) আয়গেন বিলজে, ফাতিহ যামানিন্দা তোপ্কাপী সারায়ি, তুর্ক সানাতি তারিহি আরাস্তির্মা ভে ইনসেলেমেলেরি-তে প্রকাশিত, ২খ. (১৯৬৯ খৃ.), পৃ. ২১৪-২২ ; (১৩৩) সাদী আবাচ, কাসিমপাসানিন তারিহচেসি, ইস্তাম্বুল ১৯৩৫ খৃ. ; (১৩৪) সি. অর্হোনলু, ফিনদিকলি সেমতিনিন তারিহি দেরগিসি-তে প্রকাশিত, ৮খ., নং ১১-১২, ৫১-৭০ ; (১৩৫) ফেতহি ইসফেনদিয়ারোগলু, গালাতাসারায় তারিহি, ইস্তাম্বুল ১৯৫২ খৃ.; (১৩৬) মেহমেদ এস্'আদ, মির'আত-ই মেকতেব-ই হার্বিয়ে, ইস্তাম্বুল ১৩১০ হি. ; (১৩৭) এফ. আকোযান, তুর্ক হান ভে কেরভানসারায়লারি, তুর্ক সানাতি আরাসতিরমা ভে ইনসেলে-মেলেরি-তে প্রকাশিত, ১খ. (১৯৬৩ খৃ.), পৃ. ১৩৩-৭ ; (১৩৮) জি. ওযদেস, তুর্ক কারসিলারি, ইস্তাম্বুল ১৯৫২ খৃ. ; (১৩৯) এম. এরদোগান, 'উছমানলী দেভরিনদে ইস্তানবুল বাহচেলেরি, ভাকিফলার দেরগিসি-তে প্রকাশিত, ৪খ. (১৯৫৮ খৃ.), পৃ. ১৪৯-৮২ ; (১৪০) এস. আনভের, তুর্কিয়ে'দে কাহভে ভে কাহভেহানএলের, তুর্ক এতনোগ্রাফিয়া দেরগিসি-তে প্রকাশিত, ৫খ. (১৯৬২ খৃ.), পৃ. ৩৯-৮৪ ; (১৪১) ও. বোলাক, হাসতাহানেলেরিমিয, ইস্তাম্বুল ১৯৫০ খৃ. ; (১৪২) ও. এন. এরগিন, ইস্তানবুল মু'এসসেসাত-ই খায়রিয়ে-ই সীহহিয়েসি, ইস্তানবুল ১৯১২ খৃ. ; (১৪৩) যিহনি বিলগে, ইস্তানবুল রিহতিমলারিনিন তারিহচেসি, ইস্তাম্বুল ১৯৪৯ খৃ. ; (১৪৪) এস. নুযহেত এরগুন, ইস্তানবুল মেসাহীরিনে আইত মেযার কিতাবেলেরি, ইস্তানবুল ১৯৩২ খৃ.। আঙ্কারাতে অবস্থিত তুর্ক তারিহ কুরুমু লাইব্রেরীতে ইস্তাম্বুলের 'উছমানিয়া লিপিসমূহের একটি অপ্রকাশিত পাঠের সংগ্রহ রহিয়াছে।

(চ) মানচিত্র ও নক্শা ঃ বিভিন্ন দৃশ্যের অ্যালবাম ; শহরের গাইড বই ; (১৪৫) ইস্তানবুল হারিতা ভে প্ল্যানলার সেরগিসি, তোপকাপী সারায়ি মুযেসি য়ায়িনলারি, নং ১১, ইস্তানবুল ১৯৬১ খৃ. ; (১৪৬) E. Overhummer, Constantinopolis, Pauly-Wissowa, vii, 1013 ; ইস্তাম্বুল পরিকল্পনাসমূহের একটি তালিকা রহিয়াছে প্যারিসের Bibl. Nationale, সেইগুলি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে 'আলী সাইম উলগেন-এর ফাতিহ দেভরিনদে ইস্তানবুল গ্রন্থে, পৃ. ৪৫ ; (১৪৭) Ansichten und Plane von konst., in Mayer, Byzantion, Konstantinopolis, Istambul, pp. 387-9; (১৪৮) Caedicius (A. Mordtmann), Ancien plan de Constantinople imprime entre 1566 et 1574, Constantinople 1889 ; Zuan Andrea Vavassore (Valvassore)-এর জারী করা নক্শার জন্য দ্র. (১৪৯) Oberhummer, Konstantinopel unter Sultan Suleyman, Munich 1902, 21, ও (১৫০) F. Babinger, Drei Stadtansichten, Vienna 1959, p5 ; J. B. Homann-এর সর্বাধিক পুরাতন নক্শার জন্য দ্র. (১৫১) Oberhummer, Constantinopolis, in Pauly-Wissowa, 1011; ১৭৭৬ খৃ.-এ F. Kauffer কৃত নক্শার জন্য দ্র. (১৫২) Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque . . . , ii, 115, ও (১৫৩) J. B. Lechevalier, Voyage (plan); H. Von Moltke ও C. Stolpe-এর নক্শার জন্য দ্র. (১৫৪) Mayer, 388 ; (১৫৫) Oberhummer, 1012 ; নাসূহ' আল-মাতরাকীর নক্শার জন্য দ্র. (১৫৬) ইস্তাম্বুল বিশ্ববি. লাইব্রেরীতে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি, নং T. ৫৯৬৪), A Gabriel, Les etapes d'une Campagne dans les deux Iraks (1537-1538), in Syria, ix (1928), 328-49)। হুনেরনামেতে আনু. ৯৮৮/১৫৮০ সালের যে নক্শা (পাণ্ডু. হাযিনে ১৫২৩) তাহা (১৫৭) হুনেরনামে মিনিয়াতুরলেরি ভে সানাতচিলারিতে রঙ্গীন করিয়া উপস্থাপন করা হইয়াছে, ইস্তাম্বুল ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ৩৭। খৃ. ১৮শ শতকের নক্শার জন্য দ্র.। (১৫৮) হাজ্জী খালীফা, জিহাননুমা, সম্পা. ইবরাহীম মুতেফেররিকা, ইস্তাম্বুল ১১৪৫ হি. ; পীরি রেঈ'স-এর কিতাব-ই বাহরিয়্যের কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে ইস্তাম্বুলের যে নক্শা আছে উহার জন্য দ্র. (১৫৯) Oberhummer, Suleiman, Tafel xxii।

পানি পরিবাহিক দীর্ঘ পাকা নালা বা aqeduct ও অন্যান্য পানি সরবরাহের জন্য নির্মাণাদির বিষয়ে জানা যাইবে; (১৬০) Chester Beatty Libray Ms. 414 (সুলায়মান নামে), পত্রক ২২b-২৩a; (১৬১) তোপকাপী সারায়ি লাইব্রেরী, পাণ্ডু. হাযিনে ১০১৬, ১৮১৫ ও ১৮১৬ ; (১৬২) K. O. Dalman, Der Valens-Aquadukt, Tafel 15-17; (১৬৩) ফাতিহ লাইব্রেরী, পাণ্ডু. 'আলী এমীরী ১২৮২। আরও দ্র. (১৬৪) এস. অনভার, ফাতিহ'ইন ওগলু বায়াযিদ'নি সু-য়োলু হারিতাসি ডোলায়িসিলে ১৪০ সেনে ওনসে ইস্তানবুল, ইস্তানবুল ১৯৪৫খৃ.।

ইস্তাম্বুলের (ও বসফরাসের) মানচিত্র ঃ (১৬৫) ইস্তাম্বুল বিশ্ববি. লাইব্রেরী, নং ৯২৭৬০-১ (১২৬১/১৮৪৫ সালের ১ ঃ ২০০০) ; (১৬৬) প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘর লাইব্রেরী, ইস্তাম্বুল, ৩০৩১/২৩/৭ (১৩১২/১৮৯৬ সালের); (১৬৭) ই. এইচ. আয়ভেদী (সম্পা.), ১৯ আসিরদা ইস্তানবুল হারিতাসি, ইস্তানবুল ১৯৫৮ খৃ. (১ ঃ ২০০০, আনু. ১২৯৩/১৮৭৬ সাল, গুরুত্বপূর্ণ)। সরকারী মানচিত্রের জন্য দ্র. (১৬৮) হারিতা ভে প্ল্যানলার সেরগিসি, নং ৫১-৭। তাহা ব্যতীত ঃ (১৬৯) Plan general de Constantinople, Istanbul 1922 (১ ঃ ১০,০০০) ; (১৭০) ইস্তানবুল বেলেদিয়ে হুদূদ, ইস্তানবুল ১৯৩, খৃ. (১ ঃ ৫০,০০০) ; (১৭১) ইস্তানবুল সেহির রেহবেরি, ইস্তানবুল ১৯৩১ খৃ. (১ ঃ ৬,০০০, গুরুত্বপূর্ণ); (১৭২) ইস্তানবুল প্ল্যানি, হারিতা জেনেল মুদুরলুগু ১৯৪৭ খৃ. ; (১ ঃ ১৫,০০০)।

দৃশ্য ইত্যাদি (১৭৩) ইস্তানবুল মানযারালারি সেরগিসি, তোপকাপি সারায়ি মুযেসি য়ায়িনলারি নং ৯, ইস্তানম্বুল ১৯৫৯ খৃ.; (১৭৪) A. D. Mordtmann, Historiche Bilder vom Bosporos, Constantinople 1907 ; (১৭৫) A. Pope, Les peintres

du Bosphore au dex-huitieme siecle, Paris 1911; (১৭৬) G. Gerola, Le vedute di constantinopoli di Cristoforo Buondelmonti, in Studi Bizantini e Neoellenici, iii, Rome 1931; ফরাসী ভাষায় ঃ (১৭৭) Description des iles de l'Archipel par Chris. Buondelmonti, IjM. E. Legrand, i, Paris 1897 ; (১৭৮) Eugen Oberhummer (সম্পা.), Konstantinopel unter Sultan Suleiman dem Grossen, aufgenommen im Jahre 1559 durch Melchior Lorichs, Munich 1902; (১৭৯) ঐ লেখক, Ein neuer Plan von Konstantinopel, in Mitteil. der geogr. Gesell. in Wien, lxi 1918, 527-30 ; (১৮০) W. S. Maxwell (সম্পা.), The Turks in MDXXXIII, a Series of Drawings by Peter Coeck of Aelst, London-Edinburgh 1873 ; (১৮১) Veduto di Constantinopoli, Museo Correr, Venice, i, 1248; (১৮২) Fr. Babinger, Drei Stadtansichten von Konstantinopel-Galata ("Pera") und Skutari aus dem Ende des 16. Jahrh., Vienna 1959; (১৮৩) G. Rodenwaldt, Stackelbergs Panorama von C., in Kleinasien und Byzanz, Ist. Forsch., Bd. xvii, 1950, 132-6; (১৮৪) Fr. Taeschner, Alt Stambuler, Hofund Volksleben, ein Turkisches Miniaturenalbum aus dem oo. Jahrhundert, Hanover 1925 ; (১৮৫) Album National bibliotkek, Vienna Cod. 8615, dated 1586 ; (১৮৬) Album, ibid., Cod. 8626, আনু. 1590 ; (১৮৭) H. Gache (সম্পা.), La Turquie, dessinee et litogr. par C. Rogier, Paris-London-Constantinople n. d.; (১৮৮) J. F. Lewis, Lewis's illustrations of Constantinople during a residence in that city in the years 1835-6, London; (১৮৯) The Graphic, an illastrated weekly, vols. 13-16, 1876-8, London; (১৯০) L'Univers Illustre, vols. 1876-8।

গাইড বই ঃ (১৯১) J. Murray, A handbook for Travellers in Turkey in Asia including Constantinople, London 1845, 1878, 1893 and 1900 ; (১৯২) E. Mamboury, Constantinople, guide touristique, Istanbul 1925; (১৯৩) S. Eyice, Istânbul, petit guide a travers les monuments byzantins et turcs, Istanbul 1955।

ছ। পর্যটকগণের বিবরণ ঃ (১৯৪) J. Ebersolt, Constantinople byzantine et les voyageurs du Levant, Paris 1918; (১৯৫) W. Hasluck, Notes on Mss. in the British Museum relating to Levantine geography and travel, in British School of Athens, vol. xii, 1905-6, 196 প., supplementary notes, vol. xiii, 1906-7, 339 r.; (১৯৬) Carl Gollner, Turcica, Die Turkendrucke des XVI. Jh., 2 vols., Bucharest 1961-8; (১৯৭) A. Leval, Voyages en Levant Pendant les XVI^e, XVII^e et XVII^e siecles, in Revue d'Orient et de Hongrie, Budapest 1897; (১৯৮) N. Iorga, Les voyageurs francais dans l'Orient europeen, Paris 1928 ; (১৯৯) ঐ লেখক, Une vingtaine de voyageurs dans l'Orient europeen, in Rev. Hist. du Sud-Est Europeen, V (1928), 288-354 ; (২০০) Nicolas V. Michoff, Sources Bibliographiques sur l'histoire de la Turquie et de la Bulgarie, 4 vols., Sofia 1914-34; (২০১) ঐ লেখক, La population de la Turquie et de la Bulgarie au XVIII^e et au XIX^e siecles, recherches bibliographiques avec les donnees statistiques et ethnographiques 4 vols., Sofia 1915-67; (২০২) A. M. Mansel, Turkiye'nin arkeoloji, epigrafi ve tarihi cografyasi icin bibliyografya, Ankara 1948; (২০৩) এইচ. টি. দাগলিওগলু, ইস্তানবুল বিবলিওগ্রাফিয়াসি, য়েনি তুর্ক-এ প্রকাশিত, ১৯৩৭ খৃ.; (২০৪) B. Moran, তুর্কলেরলি ইলগিলি ইঙ্গিলিযচে য়ায়িনলার বিবলিওগ্রাফিয়াসি, ইস্তানবুল ১৯৬৪ খৃ.; (২০৫) H. Bowen, British contributions to Turkish studies, London-New York-Toronto 1945 ; (২০৬) A. von Harff, The pilgrimage of Arnold von Harff . . . , Hakluyt Society, London 1946 ; (২০৭) J.org von Nurnberg, Ayn Tractat von den Turck, Memmigen 1482 (Staatsbibliothek, Munich, Inc. Fa. 901); (২০৮) C. T. Forster and F. H. B. Daniel (eds.), Life and Letters of Ogier Ghiselin de Busbecq. 2 vols., London 1881; (২০৯) Jean Chesneau, Le voyage de M. d' Aramon . . . (1547-49), সম্পা. Ch. Schefer, Paris 1887; (২১০) H. Derschwam, Tagebuch einer Reise nach Konstantionopel und Kleinasien, সম্পা. Fr. Babinger, Munich-Leipzig 1923; (২১১) R. Lubenau, Baschreibung der Reisen . . . . 1573-1589, xŒJ. W. Sahm, 2 vols., Konigsberg 1912-30; (২১২) W. Dillich, Eigentliche kurze Beschreibung und Abriss der weitberuhmten Kaiserl. Stadt Constantinopel, Cassel 1616; (২১৩) Fr. Arnaud, Voyages a Athenes, Constantinople et Jerusalem, সম্পা. M. H. Omont, Paris 1909; (২১৪) Moses Almosino, Extremos y Grandezas

de Constantinople, Madrid 1638 ; (২১৫) Thomas Roe, The Negociations of Sir Thomas Roe in his embassy to the Ottoman-Porte from the year 1621 to 1628, London 1740 ; (২১৬) P. Gyllius (Gilles), De Topographia Constantinopolis et de illius antiquitatibus, Lyon 1561; (২১৭) অনু. J. Ball, Abtiquities of Constantinople, London 1729; (২১৮) Stephan Gerlach, Tage-Buch, Frankfurt on Main 1674; (২১৯) L. Dorez (সম্পা.), Itineraire de Jerome Maurand d' Antibes a Constantinople, Paris 1901 ; (২২০) Fr. Babinger, Ludwigvon Rauter und sein verschollenes Reisebuch (1567-71), in Voderasiatische Studien, Festschrift for V. Christian, Vienna 1956, 4-11 ; (২২১) N. de. Nicolay, Les navigations, peregrinations et voyages faicts en la Turquie, Anvers 1576; (২২২) Ph. Canaye, Le voyage du Levant, 1551-1610, সম্পা. H. Hauser, Paris 1987; (২২৩) V. Vratislav, Adventures of Baron Wenceslas Wratislaw of Mitrowitz in the year of Our Lord 1599, London 1862; (২২৪) A. Mordtmann, Eine deutsche Botschaft in Konstantinopel, Berne 1895 ; (২২৫) Johann Wild, Reysbeschreibung eines gefangenen Christen anno 1604, সম্পা. G. A. Narciss, Stuttgart 1964; (২২৬) S. Schweigger, Constantinopel und Jerusalem, xŒJ. R. Neck, Graz 1964; (২২৭) John Sanderson, The Travels of John Sanderson in the Levant, 1584-1602, London 1931; (২২৮) Pietro della valle, Viaggi, 3 vols., Rome 1650; (২২৯) Fr. tr, Voyages, 4 vols., Paris 1661-4; (২৩০) Cornelius Le- Bruyn (Brun), Voyage au Levant, Roune-Paris 1728; (২৩১) K. Tuchelt, Turkische-Gewander und osmanische Gesellschaft, Graz 1966; (২৩২) P. Bruno, Ambassadeurs de France et Capucins a Constantinople au XVIII[e] siecle d'apres le journal du P. Thomas, Etudes Franciscaines, vols, xxix, xxxi, 1913-4; (২৩৩) A. Gailand, Journal d'Antoine Galland pendant son sejour a Constantinople, 1672-1673, সম্পা. Ch. Schefer, 2 vols., Paris 1881; (২৩৪) L. Gedoyn, Journal et Correspondance, সম্পা. A. Poppe, Paris 1909; (২৩৫) Du Loir, Les voyages, Paris 1654; (২৩৬) J. de Thevenot, Retation d'un voyage fait en Levant. Paris 1664; (২৩৭) L. L. d' Arvieux, Memoires, ed. J. B. Ladot, 6 vols., Paris 1735; (২৩৮) R. C, Temple, xŒJ. The travels of Peter Mundy, 1608-1667, 3 vols., Cambridge 1907; (২৩৯) T. Smith, Remarks upon the Manners, Religion and Government of the Turks, London 1678; (২৪০) Guillaume Joseph Grelot, Relation nouvelle d'un voyage a Constantinopte. Paris 1680; (২৪১) Fr. de la Croix, Memoires, Paris 1684; (২৪২) M. Fabvre, Etat present de la Turquie, Paris 1675; (২৪৩) N. Mussi, Relatione della oitta di Constantinopoli, Bologna-Bassano 1675; (২৪৪) Jean-Baptiste Tavernier. Les six voyages de J.-B. Tavernier en Turquie en Paris et aux Indes. Paris 1677 ; (২৪৫) ঐ লেখক, Nouvelle relation de l'interieur du serail du G. Seigneure, Cologne 1675 ; (২৪৬) J. Covel, Extracts from the Diaries of Dr. John Covel, সম্পা. J. T. Bent, London 1893 ; (২৪৭) J. P. Tournefort, Relation d'un voyage du Levant, Paris 1717; (২৪৮) R. Pococke, A description of the East and some other countries, 2 vols, London 1743; (২৪৯) T. Thornton, The present state of Turkey., 2 vols., London 1809; (২৫০) H. C. von Reimers, Reise . . . im Jahr 1793, 3 vols., St. Petersburg 1803; (২৫১) Fr. Sevin, Lettres sur Constantinople, Paris 1802 ; (২৫২) J. Dallaway, Constantinople, ancient and modern, London 1797; (২৫৩) F. C. H. L. Pouqueville, Voyage en Moree, a Constantinople . . ., 3 vols., Paris 1805; (২৫৪) Ch. Pertusier, Promenades pittoresques dans Constantinople et sur les rives du Boshpore, Paris 1815; (২৫৫) Eremya Celebi Komurcuyan Istanbul Tarihi, তুর্কী অনু. Hrand D. Andreasyan, Istanbul 1952; (২৫৬) Le Hay, Recueil de cent estampes representant differentes nations du Levant, 2vols., Paris 1714-5; (২৫৭) J.-B. Lechevalier, Voyage de la Propontide et du Pont-Exin, 2 vols., Paris 1800; (২৫৮) M. G. F. A. Comte de Choiseul-Gouffier, Voyage Pittoresque de la Grece, 2 vols., Paris 1822; (২৫৯) G. A. Olivier, Voyage dans l'empire othoman, 6 vols., Paris 1798; (২৬০) P. G. Ingigiȧn, Description du Bosphore, অনু. T. Martin, Paris 1813; (২৬১) তুর্কী অনু. H. Andreasyan, XVIII. Asirda Istanbul, Istanbul 1956; (২৬২) D. Sestini, Viaggio da Constantinopoli a Bassora, Academico Etrusco 1786; (২৬৩) C. Comidas de Carbognano,

Descrizione topografica dello stato presente di Constantinopoli, Bassano 1794; (২৬৪) Ch. Salaberry, Voyage a Constantinople, Paris 1799; (২৬৫)Fr. Murhard, Gemalde von Konstantino-ple, 2 vols., Penig. 1805 ; (২৬৬) C. Hobhouse, A journey through Albania . . . to Constantinople, London 1872; (২৬৭) A. F. Andreossy, Constantinople et le Bosphore de Thrace Pendant les annees 1812, 1813, et 1814 et pendant l'annee 1826, Paris 1828; (২৬৮) L. von Sturmer, Skizzen einer Reise nach Konstantinopel in den letzten Monathen des Jahres 1816, Pest 1821 ; (২৬৯) Mme. de la Ferte-Meun, Lettres sur le Bosphore, Paris 1821; (২৭০) M. D'Ohsson, Tableau general de 'Empire Ottoman, 7 vols., Paris 1787-1824 ; (২৭১) C. MacFarlane, Constantinople in 1828, London 1829 ; (২৭২) A. Slade, Records of travel in Turkey and Greece, 1829-1831, London 1833 ; (২৭৩) J. Brewer, A Residence at. Constantinople in the year 1827, New Haven 1830; (২৭৪) D. Porter, Contantinople and its environs, 2 vols., New York 1835; (২৭৫) R. Walsh, A residence at Constantinople, 2 vols., London 1836; (২৭৬) C. C. Frankland, Travels to and from Constantinople in the years 1827-28, London 1829; (২৭৭) J. Pardoe, The beauties of the Bosphorus, London 1839 ; (২৭৮) Idem, The city of the Sultan and the domestic manners of the Turks in 1836, London 1837 ; (২৭৯) J. F. Michaud and J. J. Poujoulat, Correspondance d' Orient 1830-1831, 7 vols., Paris 1833 ; (২৮০) A. Brayer, Neuf Annees a Constantinople, Paris 1836 ; (২৮১) Alb. Circourt, Constantinople en 1829, Paris 1837; (২৮২) Th. Allom and R. Walsh, Constantinople and the scenery of the Seven Churches of Asia Minor, 2 vols., London 1838 ; (২৮৩) J. E. De Kay, Sketches of Turkey in 1831 and 1832, New York 1833 ; (২৮৪) H. von Moltke, Briefe uber Zustande und Begebenheiten in der Turkei aus den Jahren 1835-39, Belrin 1841; (২৮৫) W. Colton, Visit to Constantinople and Athens, New York 1836 ; (২৮৬) Th. Allom, Constantinople ancienne et moderne, 3 vols., Paris 1840; (২৮৭) Patriarc Constantios, Constantiniade ou description de Constantinople ancienne et moderne, Constantinople 1846 ; (২৮৮) C. White, Three years in Constantinople or domestic manners of the Turks. 3 vols., London 1845 ; (২৮৯) I. Hahn-Hahn, Orientalische Briefe 3 vols., Berlin 1844 ; (২৯০) C. T. Newton, Travels and Discoveries in the Levant, 2 vols., London 1865; (২৯১) Ed. Thouvenel, Constantinople sous Abdul-Medjid, in Revue de deux Mondes, 4th ser., No. 21, 1840, 68-89 ; (২৯২) C. Hamlin, Among the Turks, New York 1878 ; (২৯৩) Edmund Hornby, In and around Stamboul, Philadelphia, n.d.; (২৯৪) J. H. A. Ubicini, Lettere sulla Turchia, Milan 1853 ; (২৯৫) ইংরেজী অনু. Letters onTurkey, IjM. Lady Easthope, London 1856 ; (২৯৬) F. Elliot, Diary of an Idle Woman in Constantinople, Leipzig 1893 ; (২৯৭) E. de Amicis, Contantinopoli, Milan 1878; (২৯৮) ইংরেজী অনু. M. H. Landsdale, Philadelphia 1896 ; (২৯৯) E. Pears, Forty years in Constantinople ; recollections 1873-1915, New York 1916.

H. Inalcik (E.I.$^2$)/হুমায়ুন খান

(সংযোজন)

**ইস্তানবুল বা ইস্তাম্বুল** (استنبول) ঃ এশিয়া ও য়ুরোপের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী তুরস্কের সর্ববৃহৎ শহর ও সমুদ্র বন্দর, বৃহত্তর শহরের মোট আয়তন প্রায় ৩২০ বর্গ কিলোমিটার; তন্মধ্যে ১৪৭ বর্গ কিলোমিটার য়ুরোপীয় অংশে, ১৬২ বর্গ কিলোমিটার এশিয়া অংশে এবং ১১ বর্গ কিলোমিটার প্রিন্সেস দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত। বৃহত্তর ইস্তাম্বুলের মোট জনসংখ্যা (১৯৮৫ খৃ. আদমশুমারী অনুযায়ী) ৫৮,৫৬,৭৪৫ জন, আর পৌর এলাকার ভিতরে জনসংখ্যা (১৯৮০ খৃ.) ২৭,৭২,৭০৮ জন। ইহা পৃথিবীর অন্যতম বড় শহর, প্রায় সাড়ে চার শত বৎসরেরও অধিক কাল ইহা ছিল তিন মহাদেশব্যাপী বিস্তৃত বিশাল 'উছমানী সাম্রাজ্যের রাজধানী। এই গৌরবময় নগরী হইতেই পূর্ব য়ুরোপ, পারস্যের অংশবিশেষ সমেত সমগ্র মধ্যাপ্রাচ্য, আরব ভূমি ও উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্তব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য শাসিত হইত। ইহাই ছিল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তির প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু, মুসলিম বিশ্বের খিলাফাতও এখানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯২২ খৃ. তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হইলে সেই বৎসরই দেশের রাজধানী এখান হইতে আঙ্কারা (বা আঙ্গোরা)-তে স্থানান্তরিত করা হয়। ৮৫৭/১৪৫৩ সালে তুরস্কের বিশ্বিজয়ী সুলতান ২য় মুহাম্মাদ এই নগরীটি জয় করিলে সেই বৎসর হইতে বিশ্বের ইতিহাসে প্রাচীন যুগের অবসান ঘটে এবং মধ্যযুগের সূচনা হয়। অনেকের মতে সেইদিন হইতেই আধুনিক যুগের সূচনা হয়। রাষ্ট্রীয় নাম ইস্তানবুল, কিন্তু সচরাচর ইস্তাম্বুলই লেখা হয়। উত্তরে কৃষ্ণসাগর ও দক্ষিণে মর্মর সাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী বিখ্যাত বসফরাস প্রণালীর দক্ষিণ অংশের উভয় তীরে ইস্তাম্বুল শহর। পশ্চিম পাড়ে য়ুরোপ মহাদেশ এবং পূর্ব পাড়ে এশিয়া মহাদেশ। এশীয় অংশে রহিয়াছে কাদিকয় (সাবেক কালসিদন) ও উসকুদার (প্রাচীন নাম স্কুটারী), আর য়ুরোপীয়

অংশের নাম থ্রেস। শহরটির ঐতিহাসিক অংশ সম্পূর্ণই য়ূরোপীয় ভাগে পড়িয়াছে। ১৮ মাইল দীর্ঘ বসফরাস প্রণালী এই অংশে কোথাও ২ মাইল, কোথাও মাত্র এক-চতুর্থাংশ মাইল প্রশস্ত। য়ূরোপীয় অংশে এই বসফরাস প্রণালী হইতে ৪ মাইল দীর্ঘ একটি খাড়ি স্থলভাগের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, উহার নাম গোল্ডেন হর্ন, আবার "য়ূরোপের মিষ্টি পানি" নামেও উহা পরিচিত। নগরের য়ূরোপীয় অংশ এই গোল্ডেন হর্নের উভয় তীরে সাতটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত, নগরের চতুর্দিকে কয়েক মাইল বিস্তৃত মধ্যযুগের পরিখা বেষ্টিত প্রাচীর ও অনেক দুর্গ অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছে। গোল্ডেন হর্নের উপর নির্মিত তিনটি বিখ্যাত ও সুদৃশ্য সেতু য়ূরোপীয় উভয় অংশকে যুক্ত করিয়াছে, আর বসফরাস প্রণালীর সঙ্কীর্ণ অংশের উপরে নির্মিত বিখ্যাত বসফরাস সেতু (ঝুলন্ত সেতু) নগরীর এশীয় ও য়ূরোপীয় অংশকে অর্থাৎ দুই মহাদেশকে যুক্ত করিয়াছে (নিম্নে দ্র.)।

ইস্তাম্বুল শহরের তিনটি অংশ ঃ প্রাচীন ইস্তাম্বুল ও বেয়োগলু বা আধুনিক শহর (এই উভয় অংশই য়ূরোপে, গোল্ডেন হর্নের উভয় তীরে) এবং উসকুদার (ইহা আনাতোলীয় অংশে অর্থাৎ এশিয়াতে পড়িয়াছে)। দেশের রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার পরেও ইহা তুরস্কের বৃহত্তম বন্দর ও শিল্প নগরী এবং ইস্তাম্বুল প্রদেশের রাজধানী। সুবর্ণ ইতিহাস, বিশাল ও অতি সুন্দর সব স্থাপত্যকীর্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের জন্য এই শহর অদ্যাবধি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক বড় আকর্ষণ, শহরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি মনোরম।

**ইতিহাস ঃ** ইস্তাম্বুল অতি প্রাচীন শহর। কথিত আছে, এই শহর ২৭ শতাব্দী আগে স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সময়ে প্রথমে স্থাপিত নগরীর নাম ছিল কালসিদন, উহা এশীয় তীরে অবস্থিত ছিল। গ্রীসের এথেন্স ও কোরিন্ট (Corint)-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ম্যাজারিয়া (Magarian)-র গোত্রীয় নেতা বায়যাস তাঁহার জনদলকে লইয়া ডেলফি হইতে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুযায়ী এখানকার কালসিদনে (আধুনিক কাদিকয়) আগমন করেন এবং স্থানীয় ব্লিন্দিদের (Blindis) মধ্যে একটি শহর স্থাপন করেন। প্রতীয়মান হয় যে, বায়যাসের (Byzas) নাম অনুসারেই শহরটির নামকরণ হয় বায়যানটিয়াম (Istanbul, পৃ. ৬), উহাই আদি ইস্তাম্বুল। পারস্যের প্রতাপশালী রাজা দারা বা দারিয়ূস (Darius) এই শহরটি জয় করেন এবং পোড়াইয়া ধ্বংস করিয়া দেন। পরে খৃ. পূ. ৪৭৯ সালে রাজা Pausanius শহরটি পুনরায় নির্মাণ করেন। খৃ. ৩৪০ সালে আলেকজান্ডারের পিতা মেসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ এই নগর জয় করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। খৃ. পূ. ২৭৯ সালে কেল্টরা (Calts)-ও নগরটি জয় করিতে আসিয়া ব্যর্থ হয়। খৃ. ২য় শতাব্দীর শেষভাগে রোম সাম্রাজ্যের ভাঙন দেখা দিলে বায়যানাটিয়াম দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রোম সম্রাটের মধ্যকার যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে, তখন প্রথমে সম্রাট Septimus Severius কয়েক বৎসর নগরটি দখল করিয়া রাখেন। এই সময়ে রোমের কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িলে সাম্রাজ্য দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িবার আশংকা দেখা দেয়। ৩২৪ খৃ. রোম সম্রাট কন্সটান্টিনাস (Constantinus the Great) এই নগর দখল করেন এবং স্থানটির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া ইহাকেই সাম্রাজ্যের রাজধানী করেন। নিজ নাম অনুসারে তিনি বায়যানটিয়ামের নূতন নামকরণ করেন কন্সটান্টিনোপল (Constantinople)। ৩৯৫ খৃ. বিশাল রোম সাম্রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্য ও পাশ্চাত্য রোম সাম্রাজ্য। কন্সটান্টিনোপল হয় প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী, এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল আধুনিক পূর্ব য়ূরোপীয় বলকান রাজ্যসমূহ এবং সমগ্র তুরস্ক। ৪৭৬ খৃ. পাশ্চাত্য রোম সাম্রাজ্য খুবই দুর্বল হইয়া পড়িলে তখন হইতে কন্সটান্টিনোপলের প্রাচ্য রোম সম্রাটগণই সমগ্র রোম সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবি করেন। রাজধানী বায়যানটিয়ামের নাম অনুসারে কথিত এই মিশ্র গ্রীকো-রোমান সাম্রাজ্যের নাম হয় বায়যানটীয় সাম্রাজ্য (এবং এই বায়যানটীয় সংস্কৃতি) অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে ইহাই ছিল পরবর্তী ১০০০ বৎসর পর্যন্ত প্রকৃত রোম সাম্রাজ্য। নানা শত্রুর আক্রমণ এবং খৃষ্ট ধর্ম ও পূর্ববর্তী রোমক ও গ্রীক ধর্মের মধ্যকার বিভেদজাত অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও এই সাম্রাজ্য য়ূরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা ব্যাপিয়া বিস্তৃত হয়। অবশেষে তুর্কী শক্তির নিকট ইহার পতন ঘটে (নিম্নে দ্র.)। কু'রআন শরীফে (৩০ ঃ ২) যে রোম সাম্রাজ্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর আমলের ইতিহাসে যে রোমকদের কথা বলা হইয়াছে তাহা কন্সটান্টিনোপল কেন্দ্রিক এই প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্য। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর দুইটি 'আরব অভিযান কন্সটান্টিনোপল অভিমুখে প্রেরিত হয়, কিন্তু উভয়টিই ব্যর্থ হয়। প্রথমটিতে অংশগ্রহণকারী একজন বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) (দ্র.) যুদ্ধক্ষেত্রে অসুস্থ হইয়া ইনতিকাল করেন। তাঁহার কবর ইস্তাম্বুল শহরে অদ্যাবধি রক্ষিত হইয়াছে (নিম্নে দ্র.)। এখানকার সম্রাট ১ম জাস্টিনিয়ান (Justinian I)-এর আমলেই বিখ্যাত রোমান আইন (Roman Law) সঙ্কলিত হয়, সেই আইন পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে। তাহার আমলেই রোম সাম্রাজ্য পুনরায় সাবেক পূর্ণ গৌরব লাভ করে এবং তাহার আমলেই ইস্তাম্বুলের বিখ্যাত হেজিয়া সোফিয়া গির্জা (পরবর্তী নাম আয়া সোফিয়া, নিম্নে দ্র.) নির্মিত হয়। কিন্তু 'আরব শক্তির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তিশালী রোম সাম্রাজ্যের ক্রমঃপতন সূচিত হয়। বিশ্বের সর্বকালের সমর-ইতিহাসে অতি গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা য়ারমুকের যুদ্ধ (৬৩৬ খৃ.)। মুসলিম মুজাহিদগণ আড়াই লক্ষ শক্তিশালী রোমক সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া (১ লক্ষ রোমক সৈন্য নিহত) সিরিয়া (তৎকালীন নাম শাম) দখল করিয়া নেন। অতঃপর মুসলিমদের নিকট একে একে রোম সাম্রাজ্যের ফিলিস্তীন (প্যালেস্টাইন), মিসর, উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চল ও সিসিলির পতন ঘটে।

তুরস্কে তুর্কী শক্তিসমূহের উদ্ভব ঘটিবার পরে এই কন্সটান্টিনোপল এবং পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের নানা অংশ বারবার তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। রোমক সম্রাটগণ প্রায় প্রতিবারেই পাশ্চাত্যের খৃষ্টান শক্তিসমূহের সাহায্য গ্রহণ করিয়া নিজ রাজ্য রক্ষা করিতে থাকেন। ইহারই এক পর্যায়ে বিখ্যাত মালাযগার্টের যুদ্ধে (Malzikert বা Manzikert) (দ্র.) তুর্কী বাহিনীর নিকট বায়যানটীয় সম্রাটের শোচনীয় পরাজয় ঘটে, পরে ৪র্থ ক্রুসেডের সময়ে (১২০৪ খৃ., দ্র. ক্রুসেডের যুদ্ধসমূহ) এই সাম্রাজ্য প্রায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। পরবর্তী কালে ১২৬১ খৃ. সম্রাট ৭ম মাইকেল পুনরায় সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করেন। কিন্তু এই রাজধানী ও রাজ্যটির উপর মুসলিম তুর্কী আক্রমণ প্রায় অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। তুর্কী সুলতান ২য় মুহাম্মাদ যখন চূড়ান্ত পথে এই ঐতিহাসিক রাজধানীটি দখল করিয়া রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটান, তখন কন্সটান্টিনোপলের শেষ বায়যানটীয় সম্রাট ছিলেন একাদশ কন্সট্যানটাইন।

'উছমানী তুর্কীরাও আদিতে আধুনিক সোভিয়েত মধ্যএশীয় অর্থাৎ তুর্কী জাতির আদি বাসভূমি হইতেই যাযাবর জাতিরূপে বহির্গত হইয়াছিল। প্রথমে তাহারা পারস্যে এবং পরে সালজূক সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িলে তুরস্কে প্রবেশ করে। ইহারা ছিল আলতাই তুর্কী, প্রথমে উত্তর-পশ্চিম তুরস্কের একটি অংশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরে তাহাদের নেতা 'উছমান (১২৮৮-১৩২৬ খৃ.) দ্র. প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার নাম অনুসারেই এই বংশের নাম হয় 'উছমানিয়া বা 'উছমানলি বংশ, আর প্রথমে রাজ্য ও পরে সাম্রাজ্যের নাম হয় 'উছমানিয়্যা সাম্রাজ্য। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ 'উছমান শব্দটিকে লিখিতেন Ottoman, সেই কারণেই অধিকাংশ গ্রন্থে এই সাম্রাজ্যটিকে বলা হয় Ottoman empire। প্রথমে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। ব্রুসাতে, কন্সটান্টিনোপল বিজয়ের পরে রাজধানী সেখানে স্থানান্তরিত হয় এবং শহরটি বিশ্বের ইতিহাসে এক মহান ও গৌরবময় সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে প্রায় চারি শত বৎসর পর্যন্ত মহিমামণ্ডিত হয়। অন্তত ১৩২৬ খৃ. হইতে ১৬৮৩ খৃ. পর্যন্ত এই শক্তি বিশ্বে অপরাজেয় ছিল আর এই রাজধানী ছিল প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রধান কেন্দ্রবিন্দু এবং মুসলিম সভ্যতার প্রধান ধারক। ভারত উপমহাদেশের মুগল শক্তি প্রায় দুই শত বৎসর পর্যন্ত তাহাদের সমকক্ষ ছিল, কিন্তু মুগল শক্তি যেখানে উপমহাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তুর্কী শক্তি সেইখানে বিজয়ী শক্তিরূপে সমগ্র য়ূরোপে অপ্রতিরোধ্য ছিল, রাষ্ট্রীয়ভাবে এই সাম্রাজ্যের নাম ছিল দাওলাত-ই 'উছমানিয়্যা এবং শাসকের উপাধি ছিল সুলতান। বিজয়ের পর হইতে সালতানাতের সমগ্রকালব্যাপী তাঁহাদের রাজধানী ছিল এই কন্সটান্টিনোপল। আর তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তি ছিল ইসলামের সামাজিক সুবিচার।

ঐতিহাসিক ও (প্রাচ্য) রোম সাম্রাজ্যের গৌরববাহী কন্সটান্টিনোপল শহর জয় করেন তুর্কী সুলতান ২য় মুহাম্মাদ (১৪২৯-৮২ খৃ.)। তিনি ছিলেন দিগ্বিজয়ী সেনাপতি ও দক্ষ সমরনায়ক, একজন সুশাসক ও বিদ্বান সম্রাট। পাঁচটি ভাষায় (তন্মধ্যে সম্ভবত গ্রীক ও ল্যাটিন) তিনি অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। বিজয় নিশ্চিত করিবার জন্য পূর্ব হইতেই তিনি বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বসফরাস হইতে গোল্ডেন হর্নে প্রবেশের মুখে রোমানগণ এপার-ওপার লোহার শিকল টানা দিয়া রাখিয়াছিল। কোন জাহাজ সেই শিকল অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিত না, কোন শক্তি সেই শিকল ভাঙ্গিতে পারিত না। সুলতান স্থল পথে কন্সটান্টিনোপল অবরোধ করিয়া অতঃপর তাঁহার রণতরীসমূহের তলায় চাকা লাগাইয়া সেগুলিকে ঠেলিয়া ও টানিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া নিয়া গিয়া শিকলের ওপারে গোল্ডন হর্নে ফেলেন এবং অতঃপর জল ও স্থল উভয় দিক হইতেই প্রাচীরবেষ্টিত নগর ও ভিতরে অবস্থিত দুর্গসমূহ অবরোধ করিয়া ফেলেন। দীর্ঘ ৫০ দিন অবরোধের পর অবশেষে ২৯ মে, ১৪৫৩ খৃস্টাব্দে নগর দেওয়ালের একটি ফাটল-পথে তাঁহার সৈন্যগণ ভিতরে প্রবেশ করে। প্রায় সারা দিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর কন্সটান্টিনোপলের পতন ঘটে এবং রোমক সাম্রাজ্যের সমাপ্তি এবং মুসলিম তুর্কী শক্তির উত্থান ঘটে। সুলতান ২য় মুহাম্মাদ (দ্র.) ফাতিহ শাহ বা বিজয়ী মুহাম্মদ নামে পরিচিত হন। অনেক ঐতিহাসিক তাঁহাকেই তুর্কী সাম্রাজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া থাকেন। সাম্রাজ্যের রাজধানী এই য়ূরোপীয় ঐতিহাসিক শহরে স্থানান্তরিত হয় এবং তুরস্ক একটি য়ূরোপীয় শক্তি হিসাবে গণ্য হয়। বসফরাস প্রণালী, কৃষ্ণসাগর, মর্মর সাগর, ঈজিয়ান সাগর ও ভূমধ্যসাগরে রক্ষিত তুর্কী নৌবাহিনী পরবর্তী প্রায় আড়াই শত বৎসর যাবত বিশ্বে অপ্রতিরোধ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

খৃ. ১৮শ শতকে 'উছমানী শক্তির অবক্ষয় শুরু হয়। উহার পূর্বে, এমন কি পরেও যুগে যুগে প্রতাপশালী মুসলিমগণ, উযীরগণ, বিশিষ্ট সেনাপতি ও কর্মকর্তাগণ এবং ব্যবসায়িগণ শহরটির সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে নিজ নিজ অবদান রাখেন। বহু সুন্দর মসজিদ, প্রাসাদ, বাগিচা, মাদ্রাসা, সরাইখানা বা খান, হাম্মামখানা, পানির ফোয়ারা ও গোসলখানা, সড়ক, সেতু ইত্যাদি নির্মিত হয়। বহু শতাব্দী ধরিয়া বহুজনের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে নির্মিত এই মহানগরটির সৌন্দর্যের—এমন কি শুধু স্থাপত্য কীর্তিসমূহেরই—বর্ণনা দিতে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের প্রয়োজন হইবে, বর্তমান নিবন্ধে সেগুলির কিছু কিছু বর্ণনামাত্র দেওয়া হইবে।

**মসজিদ ঃ** নীল মসজিদ বা সুলতান ১ম আহমাদ মসজিদ। অনেকে ইহাকে এই শহরের সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও বিশ্বের সুন্দরতম মসজিদগুলির অন্যতম বলিয়া মনে করেন। প্রাচীন হিপ্পোড্রোমের পূর্ব পার্শ্বে শহরের বিশেষ আকর্ষণরূপে ইহা দণ্ডায়মান। ইহার স্থপতি ছিলেন মেহমেদ (মুহাম্মাদ) আগা, ১৬০৯-১৬১৬ খৃস্টাব্দের মধ্যে ইহা নির্মিত হয়। নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করিবার জন্য স্বয়ং সুলতান প্রায়শ আসিয়া এখানে তাঁবু খাটাইয়া থাকিতেন। যেদিন মসজিদটি ওয়াক্‌ফ করিয়া দেওয়া হয় সেদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পায়ের আকারে একটি টুপি নিজ মাথায় পরিয়াছিলেন। এই ধর্মভীরু, স্থাপত্যে উৎসাহী তরুণ সুলতান তাঁহার প্রিয় মসজিদটি নির্মাণ শেষ হইবার এক বৎসর পরেই মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। মসজিদের সামনে বিশাল চত্বর। তিনি প্রবেশ পথে তিন বিশাল দরওয়াজা, তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় বা পশ্চিমের দরওয়াজা সর্বাপেক্ষা বিরাট, উহার প্রস্তর লিপির কাজ করিয়াছিলেন বিখ্যাত পর্যটক ও লেখক আওলিয়া চেলেবির পিতা দরবেশ মুহাম্মাদ। ইহার ছয়টি দীর্ঘ সরু মিনার, প্রধান গম্বুজ ও চতুষ্পার্শ্বের আরও অনেক ছোট গম্বুজ ও অর্ধ-গম্বুজ, অতি সুদৃশ্য ধূসর বর্ণের পাথরের উপর কারুকাজ ইহাকে অশেষ সৌন্দর্য দান করিয়াছে। মসজিদটি প্রায় বর্গাকৃত (৫১ মিটার x ৫৩ মিটার), প্রধান গম্বুজের বেড় ২৩.৫ মিটার, উচ্চতা ৪৩ মিটার ; উহা চারিটি বিশাল স্তম্ভ ও খিলানের উপর নির্মিত। নানা ফুলের নক্শা শোভিত সর্বোৎকৃষ্ট ইজনিক টালি দ্বারা ভিতরের অংশ আগাগোড়া শোভিত। এই টালির রঙ বিভিন্ন কিন্তু অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ, সর্বোপরি নীল রঙের প্রাধান্য রহিয়াছে বলিয়াই ইহাকে নীল মসজিদ বলা হয়। কেন্দ্রীয় গম্বুজের উপর একেবারে চূড়ান্তে অলংকৃত হরফে লেখা রহিয়াছে, "আল্লাহ্ই এই দুনিয়ার ও মহাবিশ্বের আলো।" চতুর্দিকের ২৬০ টি জানালা দিয়া এই মসজিদের ভিতরে আলো প্রবেশ করে। সুলতান ১ম আহমাদ যে কুল্লিয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে তাহাও ব্যাপক। একটি মাদ্রাসা, একটি তুরবে, একটি হাসপাতাল, একটি মুসাফিরখানা, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি সর্বসাধারণের পাকঘর ও একটি বাজার। সুলতান আহমাদ তাঁর পত্নী কোসেম ও তাঁহাদের দুই উত্তরাধিকারী পুত্র ৪র্থ মুরাদ ও ২য় 'উছমান এবং তাহা ছাড়া আরও কয়েকজন পরিবারের সদস্যের মাযার এই মসজিদের পার্শ্বে অবস্থিত।

**হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা)-এর মাযার ও মসজিদ ঃ** ইস্তাম্বুলের সর্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান এবং মুসলিমগণের নিকট প্রায় তীর্থস্থানের মত মর্যাদাবান। পরে তাঁহার মাযার বলিয়া চিহ্নিত সেই স্থানের পার্শ্বে

বিজয়ী সুলতান ২য় মুহাম্মাদ ১৪৫৮ খৃ. এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদের পার্শ্বেই হযরত আবূ আয়্যুব (রা)-এর মাযার। সুলতান সেখানে একটি মাদরাসা, একটি গোসলখানা, একটি ইমারত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি বাজার নির্মাণ করিয়া দেন। ১৭৬৬ খৃ. ভূমিকম্পে মসজিদটির অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া যায়, পরে সুলতান ৩য় সেলীম ১৭৯৮-১৮০০ খৃ. ইহা আবার নির্মাণ করিয়া দেন, মূল মসজিদের দুইটি মিনার অদ্যাবধি অক্ষত রহিয়াছে। মধু রঙের পাথর দিয়া মসজিদটি তৈরী; সোনার পাতের সুন্দর অলঙ্করণ উহাকে বিশেষ আকর্ষণীয় করিয়াছে। মেঝে জুড়িয়া ফিরোজা রঙের গালিচা ও গম্বুজের কেন্দ্র হইতে ঝুলায়মান একটি বিশাল ও অতি সুন্দর ঝাড়বাতি ইহার সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি করিয়াছে। মসজিদের এক পাশের দেওয়ালের ভিতর দিয়া দরজা আছে, সেখান দিয়া মাযারে প্রবেশ করিতে হয়। মাযারটিও খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত।

**দলমাবাহ্চে মসজিদ** ঃ সাগরের পাড়ে দলমাবাহচে প্রাসাদ হইতে কয়েক শত মিটার দূরে এই সুন্দর মসজিদটি নির্মাণ করেন সুলতান 'আবদু'ল-মাজীদের মা বেযমি 'আলেম। বর্তমানে ইহা একটি নৌ-যাদুঘর; সেখানে বিভিন্ন জাহাজের সুদৃশ্য সামগ্রী, নমুনা, পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র, চিত্র, মানচিত্র, পোশাক ইত্যাদি দর্শক ও পর্যটকগণকে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

**নুসরেতিয়্যা মসজিদ** ঃ ১৮২২-২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত। গম্বুজ ও অতি সুদৃশ্য সরু ও লম্বা দুইটি মিনার ইহার বড় স্থাপত্যগত আকর্ষণ। বিখ্যাত হস্তলিপিবিশারদ রাকিম ইহার ভিতরের সূক্ষ্ম ও সুন্দর অলঙ্কৃত লিপির কাজ করেন।

**মিহরিমাহ সুলতান মসজিদ** ঃ ফেরী পারাপারের ঘাটের উপরই এই বড় মসজিদটি অবস্থিত। সুলতান সুলায়মানের প্রিয় কন্যা ও উযীরে আ'জাম রুস্তেম পাশার পত্নী মিহিরমাহ্ সুলতান-এর জন্য স্থপতি সিনান এই মসজিদটি নির্মাণ করিয়া দেন। বেশ উঁচুতে নির্মিত এই মসজিদটি, বিশেষ করিয়া বাহিরের দিক খুবই আকর্ষণীয় ও সুন্দর। ইহার দুইটি বারান্দা এবং উহার পরে একটি বর্ধিত অংশ গিয়া একটি ফোয়ারাতে পৌঁছিয়াছে, সেই ফোয়ারাটিও দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর।

**বায়াযীদ মসজিদ** ঃ চিরায়ত স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত একটি সুন্দর পুরাতন মসজিদ। ১৫০১-১৫০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহা নির্মাণ করেন সুলতান বিজয়ী মুহাম্মাদ-এর পুত্র ও উত্তরাধিকারী ২য় বায়াযীদ। একটি বড় কেন্দ্রীয় গম্বুজ এবং উহার দুই পাশে দুইটি ছোট গম্বুজ খুবই সুন্দর। সামনের উঠানে নির্মিত একটি ফোয়ারা সামগ্রিক সৌন্দর্যকে অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়াছে।

**সোকুল্লু মসজিদ** ঃ আযাপকাপীতে অবস্থিত। স্থপতি সিনান-এর ছোট কিন্তু সুন্দর একটি কীর্তি। তিনি এদিরনের বিখ্যাত সেলীমিয়্যা মসজিদের নকশা অনুসরণে ইহা নির্মাণ করেন। আটটি থামের উপর নির্মিত ইহার কেন্দ্রীয় গম্বুজ এবং উহার চতুর্দিকে নির্মিত ছোট ছোট অর্ধ-গম্বুজ ইহাকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করিয়াছে।

**রুস্তেম পাশা মসজিদ** ঃ সুলতান সুলায়মানের জামাতা ও দুইবার উযীরে আ'জাম রুস্তেম পাশা ১৫৬১ খৃ. ইহা নির্মাণ করেন। ইযনিকের টালি দ্বারা শোভিত এই বিরাটাকারের মসজিদটিও স্থাপত্য রীতি ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত।

**সুলতান সেলীম মসজিদ** ঃ ইহার নির্মাণ কাজ শুরু করেন সুলতান সেলীম শেষ করেন সুলতান সুলায়মান। খাঁটি তুর্কী স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত ইহার বিরাট গম্বুজ ও দুইটি মিনার ইহাকে খুবই আকর্ষণীয় করিয়াছে, ভিতরের কারুকাজও খুবই সুন্দর।

**লালেলী মসজিদ** ঃ সুলতান ৩য় মুস্তাফা ইহা নির্মাণ করান। ১৭৫৯-৬৩ খৃ. মধ্যে তুর্কী ব্যারোক রীতির সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি বলিয়া কথিত মুহাম্মাদ তাহির আগা এই সুদৃশ্য মসজিদটি নির্মাণ করেন। ভিতরে ইট ও পাথরের মিশ্র কাজ, উপরে পাথরের কাজ, ইহারই এক পাশের বারান্দা দিয়া পিছনে সুলতানের প্রাসাদে প্রবেশ করিবার পথ। মসজিদটির ভিতরের দিক আয়তাকার অষ্টকোণাকৃতির। দেওয়াল সব হলুদে, লাল, নীল ও অন্যান্য বিভিন্ন রঙের মর্মর পাথর দিয়া ঢাকা। বাহিরে ও ভিতরে উভয় দিকেই ইহার স্থাপত্য সৌন্দর্য আকর্ষণীয়।

**সুলায়মানিয়্যা মসজিদ ও সংলগ্ন অন্য নির্মাণসমূহ** ঃ সম্ভবত 'উছমানিয়্যা শক্তির সর্বোত্তম ও বৃহত্তম স্থাপত্যগত পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনে সুলতান সুলায়মানের আদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ তুর্কী স্থপতি সিনান এই বিশাল কীর্তি নির্মাণ করেন। মসজিদের সংলগ্নই রহিয়াছে সুলতান ও তাঁহার পত্নী খুররেম সুলতান (Roxalona)-এর মাযার-সৌধ, মাদরাসা, স্কুল, ছাপাখানা, সরাইখানা, দোকান ইত্যাদি। বসফরাস হইতে যেখানে গোল্ডেন হর্ন বাহির হইয়াছে উহার সম্মুখে একটি পাহাড়ের উপরে বিশাল আকারের এই নির্মাণকীর্তি দণ্ডায়মান থাকিয়া যেন তুর্কী সাম্রাজ্যের গৌরব ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে। মসজিদের সামনে রহিয়াছে বিশাল ও সুসজ্জিত চত্বর। মূল মসজিদের ভিত্তির পরিমাপ হইতেছে ৬৮x৬৩ মিটার, কেন্দ্রীয় গম্বুজের উচ্চতা ৫৩ মিটার, পরিধি ২৭·২৫ মিটার। মসজিদের সামনে দুইটি এবং পিছনে দুইটি উঁচু ও খুবই সুষম মিনার দণ্ডায়মান। ভিতরের অলঙ্কৃত লিপির কারুকাজগুলি অত্যন্ত যত্ন ও পারদর্শিতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিল্পী কারাহিসারি আহমাদ এফেন্দী হাসান চেলেবি। পরবর্তী কালে অন্যান্য অলঙ্কৃত লিপির কাজ করেন কাযাসকের মুস্তাফা 'ইযযেত এফেন্দী। প্রধান দরওয়াজা ও ভিতরের জানালাতে খোদাই কাজ, হাতীর দাঁতের কারুকাজ ও সুন্দর মসৃণ ঝিনুক বসানো সুদৃশ্য সব কাজ রহিয়াছে। এই সুলায়মানিয়্যা সমগ্র বসফরাস ও গোল্ডেন হর্নের এলাকাতে সর্বাধিক দৃশ্যমান ও বিশাল স্থাপত্য কীর্তি, সকল ঐতিহাসিক ও স্থাপত্য বিশেষজ্ঞের মতে ইহাই স্থপতি সিনান-এর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

ইস্তাম্বুল ও আনাতোলিয়ার (আনাদোলু) অন্যান্য অনেক শহরের বিখ্যাত সব স্থাপত্য কীর্তির সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে তুরস্কের সর্বশ্রেষ্ঠ ও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর সিনান-এর নাম, পূর্ণ নাম সিনান বে বা সিনান পাশা (দ্র.)। সুলতান সেলীম তাঁহাকে রাষ্ট্রের প্রধান স্থপতি নিযুক্ত করেন। পরবর্তী কালে তিনি আরও তিনজন সুলতানের রাজত্বকাল ব্যাপিয়া কয়েক শত মসজিদ, প্রাসাদ, স্কুল, মাদরাসা, সেতু, গোসলখানা, ফোয়ারা, বাজার, মুসাফিরখানা ও মাযার নির্মাণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। ইস্তাম্বুলের অসংখ্য বড় ছোট স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি সুলতান সুলায়মানের আমলে সম্পূর্ণ করা হয়। সিনান-এর মাযারও ইস্তাম্বুলেই অবস্থিত।

ইস্তাম্বুলের অপর একটি বিখ্যাত মসজিদ হইতেছে নূতন ওয়ালীদে মসজিদ, ইহাকে য়েকি কামিও বলা হয়। গালাতা সেতুর ঠিক সামনে এই সুদৃশ্য ও বিশাল মসজিদটি দণ্ডায়মান। ১৫৯৭ খৃ. ওয়ালীদ সুলতান সাফিয়ে কর্তৃক ইহার নির্মাণ শুরু হয় এবং দীর্ঘকাল পরে সুলতান ৪র্থ

Contents
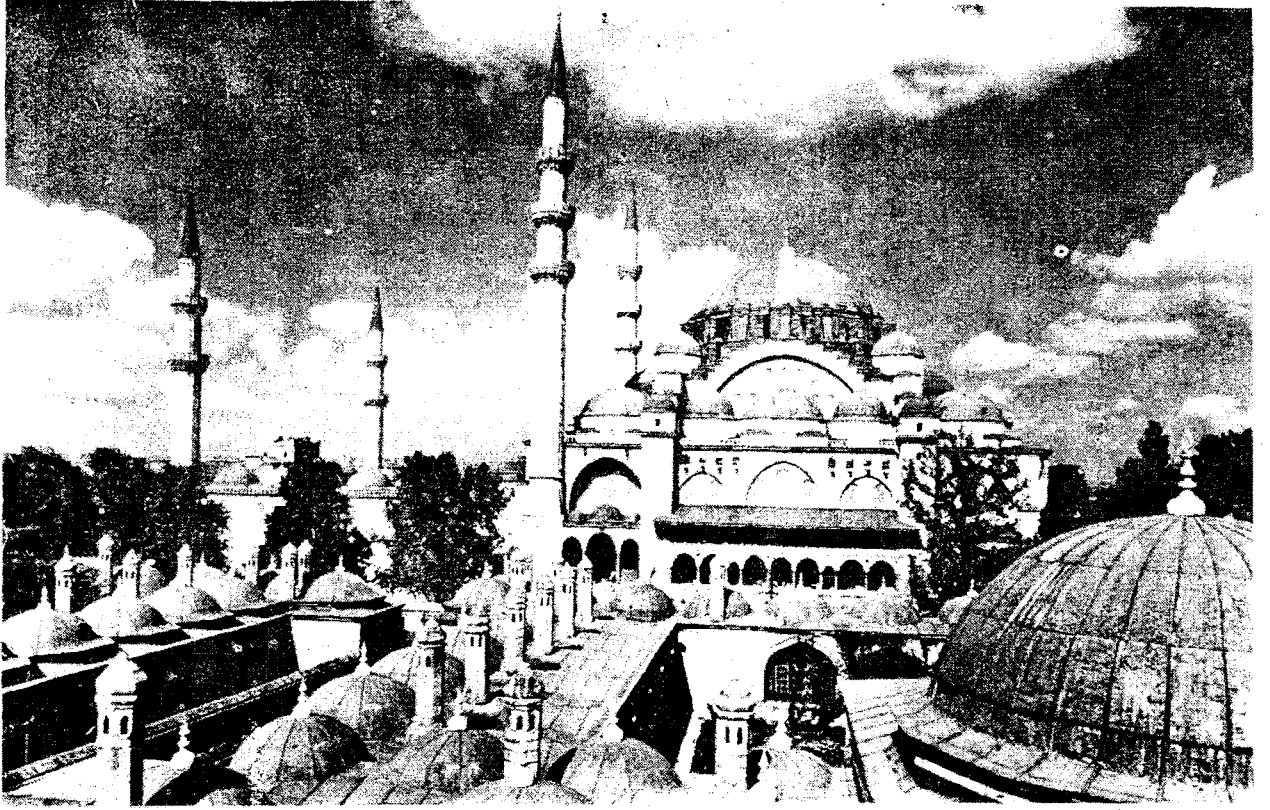


সুলায়ামিয়ে মসজিদ ও মাদ্রাসা
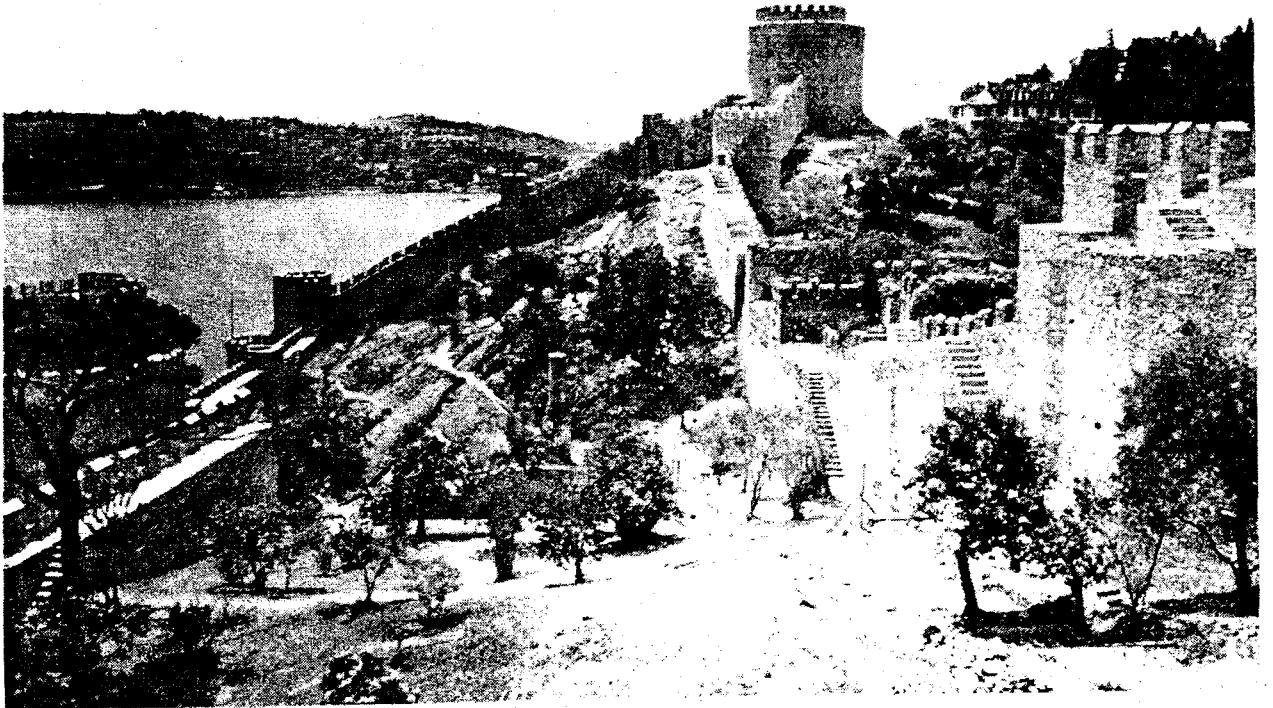
বসফরাসের তীরে রুমেলী হিসারীর দৃশ্য
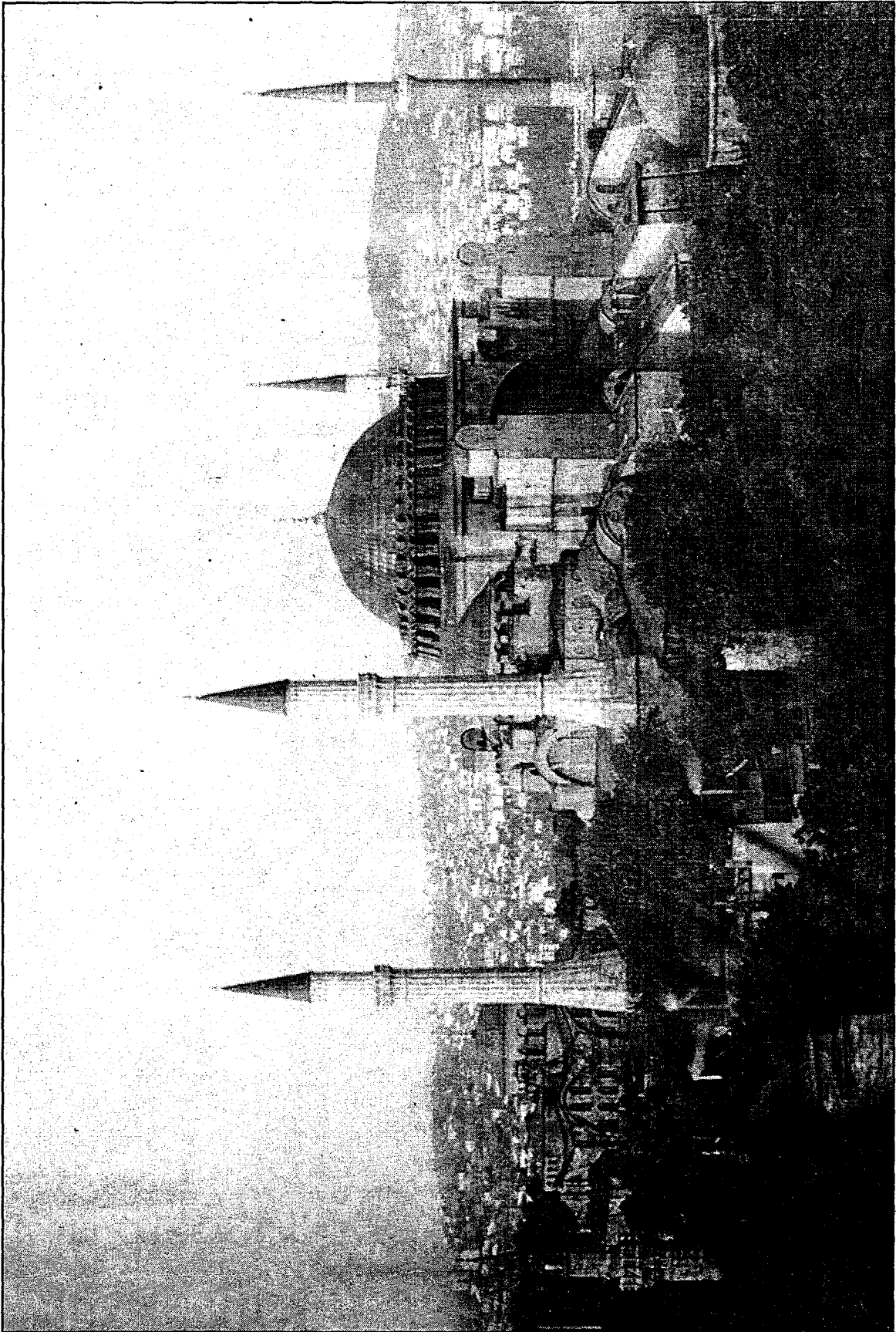
আয়া সোফিয়া, ইস্তানবুল।
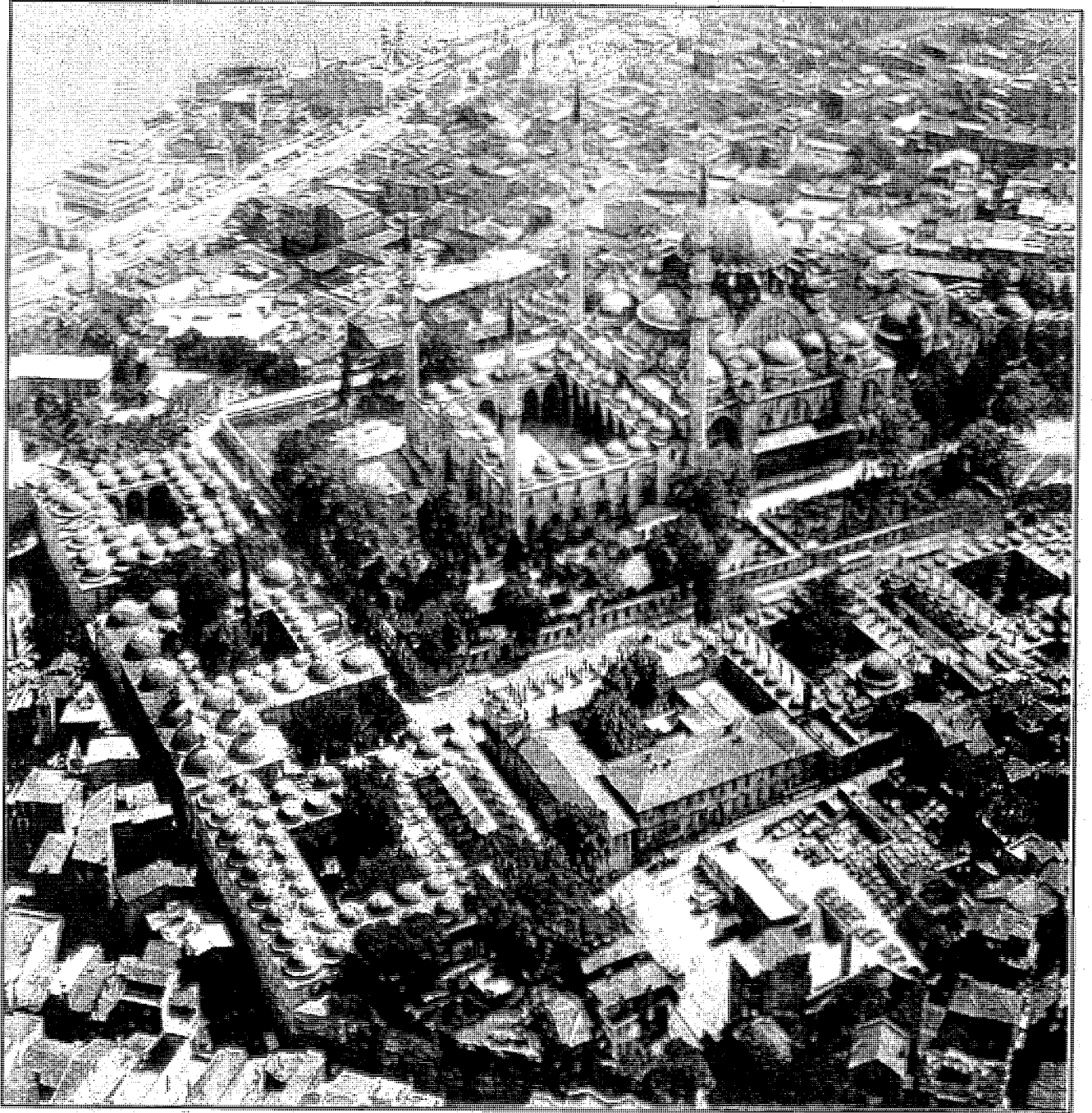
সুলায়মানিয়ে কমপ্লেক্স, ইসতানবুল ১৫৫০-১৫৫৭ খৃ.।

ইস্তানবুল বা ইস্তাম্বুল
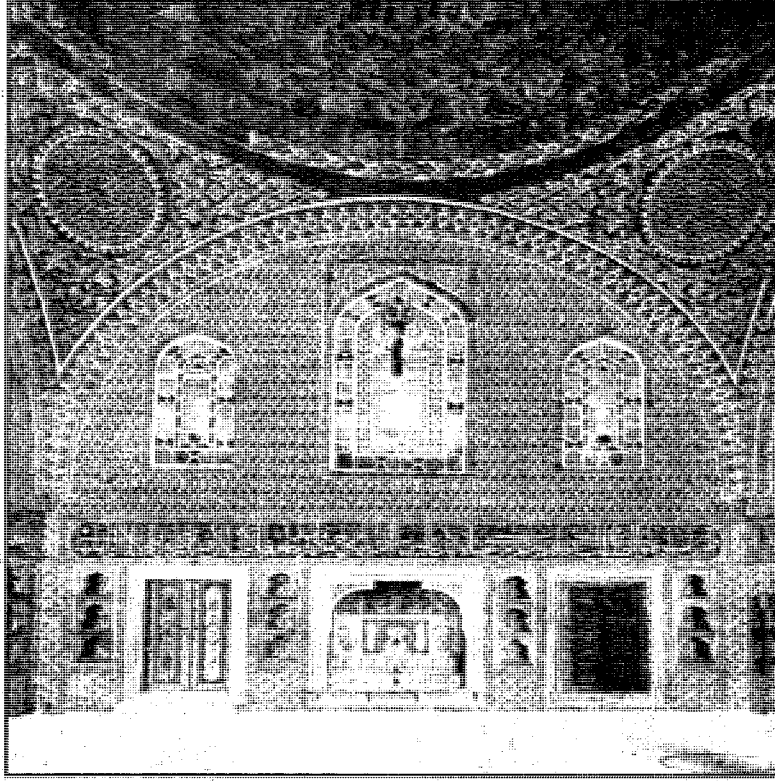
সুলতান তৃতীয় মুরাদের অভ্যর্থনা কক্ষ, তোপকাপি রাজপ্রাসাদ,
ইসতানবুল খৃ. ১৬শ শতকের শেষদিক।

সিংহাসন কক্ষ, তোপকাপি রাজপ্রাসাদ, ইসতানবুল খৃ. ১৭শ শতকের মধ্যভাগ।
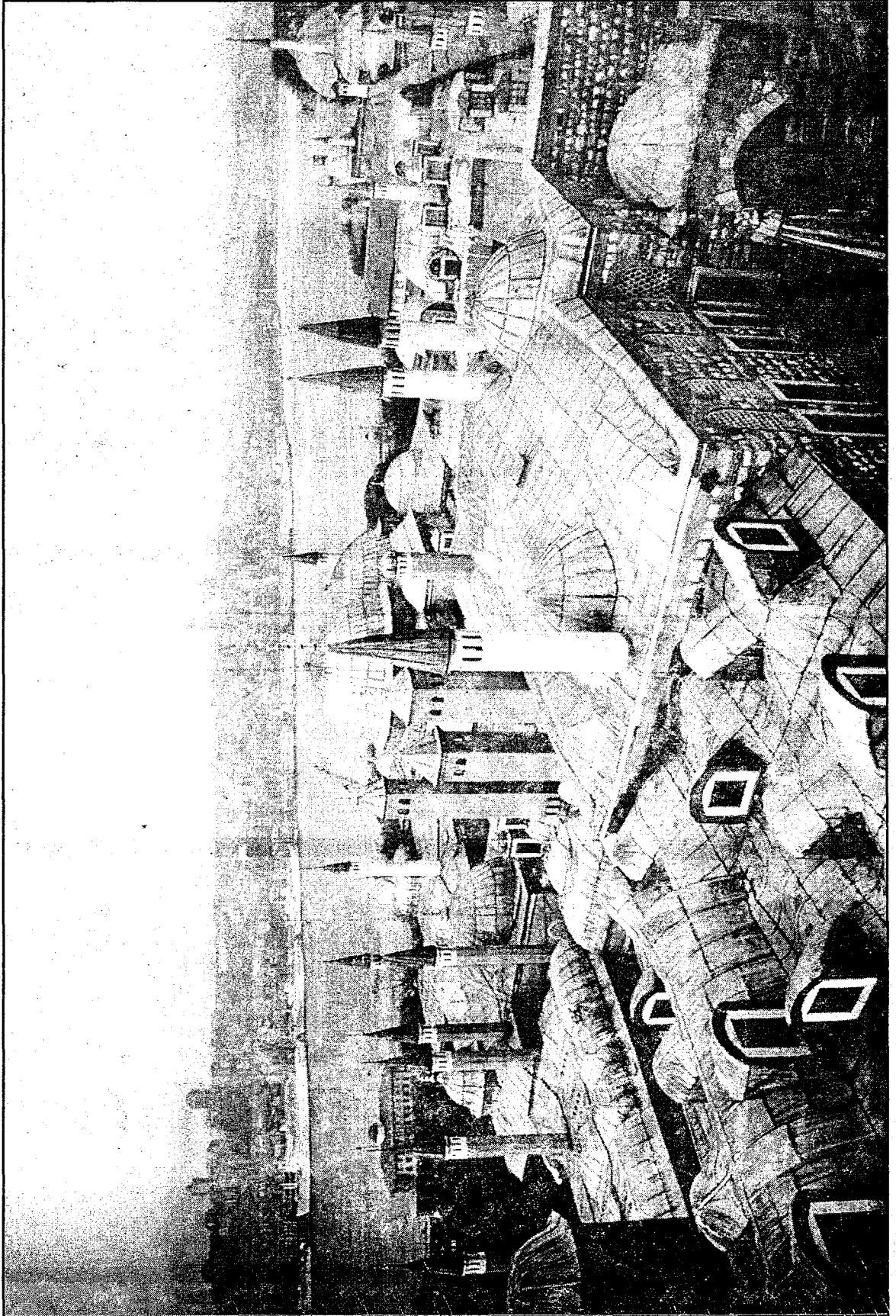
তোপকাপি প্যালেস (রাজপ্রাসাদ), ইস্তানবুল, ১৬শ শতকের শেষদিকে নির্মিত। ইহা প্রাচীন এক্রোপলিস উপদ্বীপে অবস্থিত। এখান হইতে গোল্ডেন হর্ণ, বসফরাস প্রণালী ও মারমারা সাগর দৃষ্টিগোচর হয়।
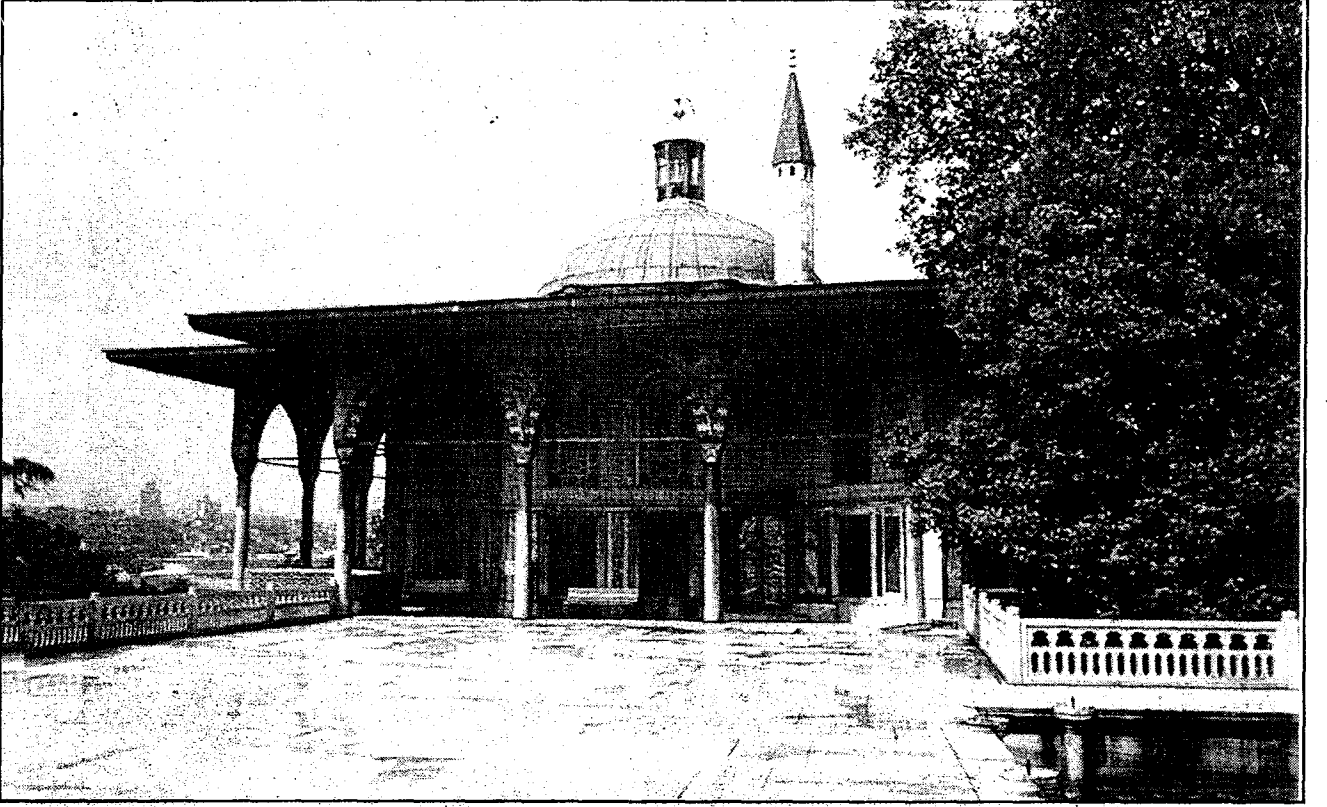
বাগদাদ কোশ্‌ক (কিওশ্‌ক), ইসতানবুল ১৬৩৮-১৬৩৯ খৃ. । সুলতান ৪র্থ মুরাদ বাগদাদ বিজয়কে স্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য তোপকাপী প্রাসাদের উত্তর-পশ্চিম কোণে ১৬৩৮ সালে এই মসজিদ নির্মাণ করেন।
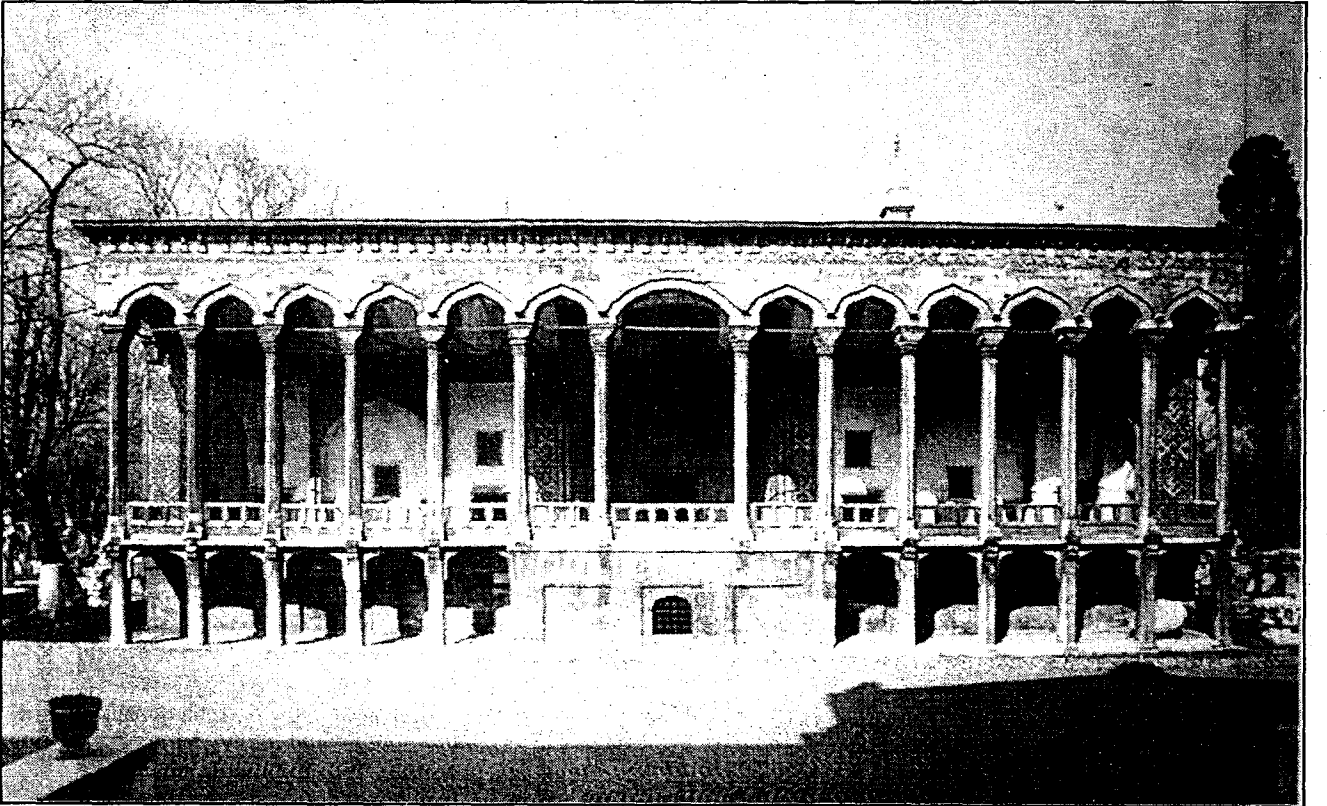
চিনিলি কোশ্‌ক, রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে, সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ্ কর্তৃক ১৪৭৩ খৃ. নির্মিত।
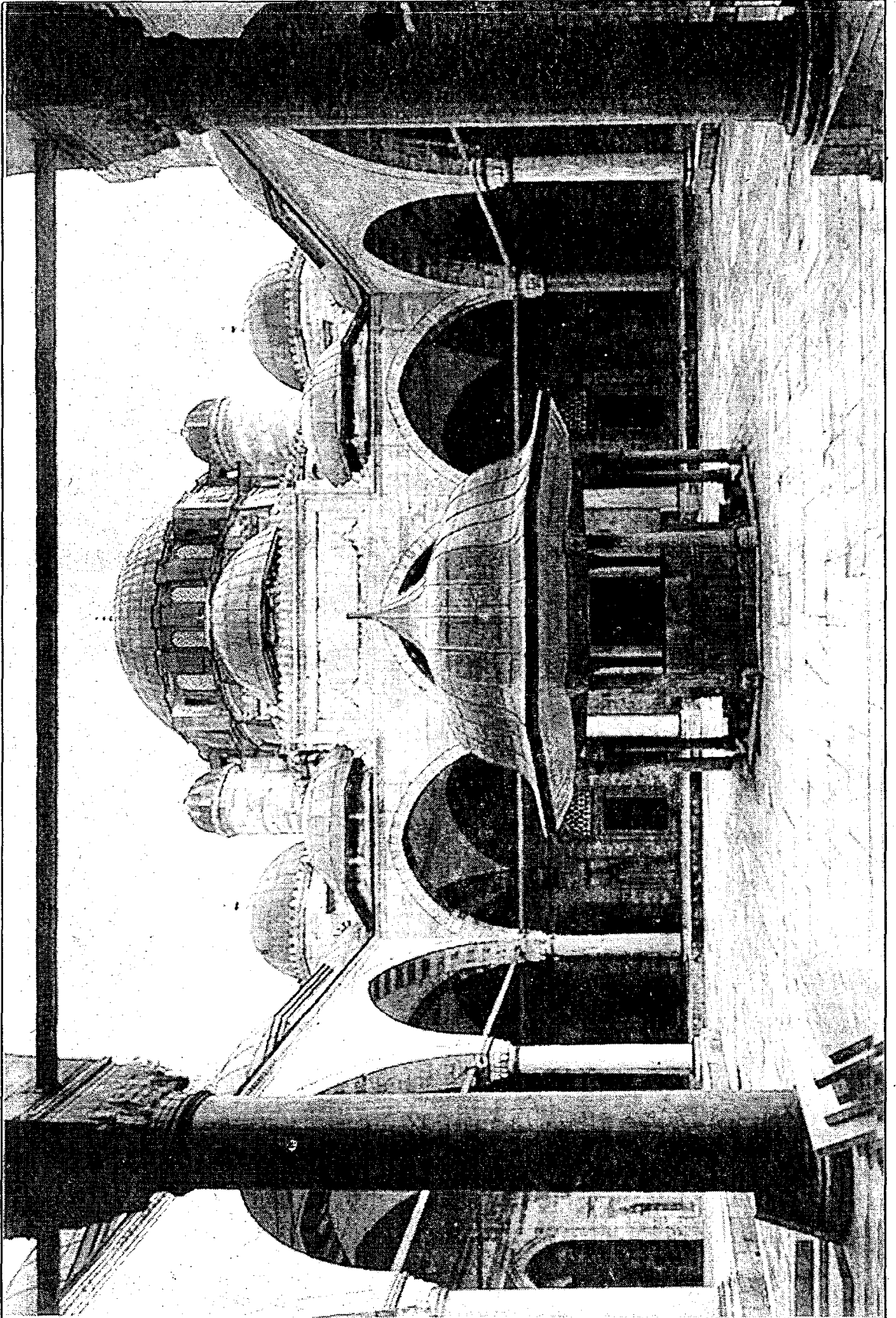
শাহযাদে মসজিদের প্রাঙ্গন ও আভ্যন্তরীণ দৃশ্য, ইসতানবুল ১৫৪৪-১৫৪৮ খৃ.।

শাহযাদে কমপ্লেক্স, ইসতানবুল ১৫৪৪-১৫৪৮ খৃ.।
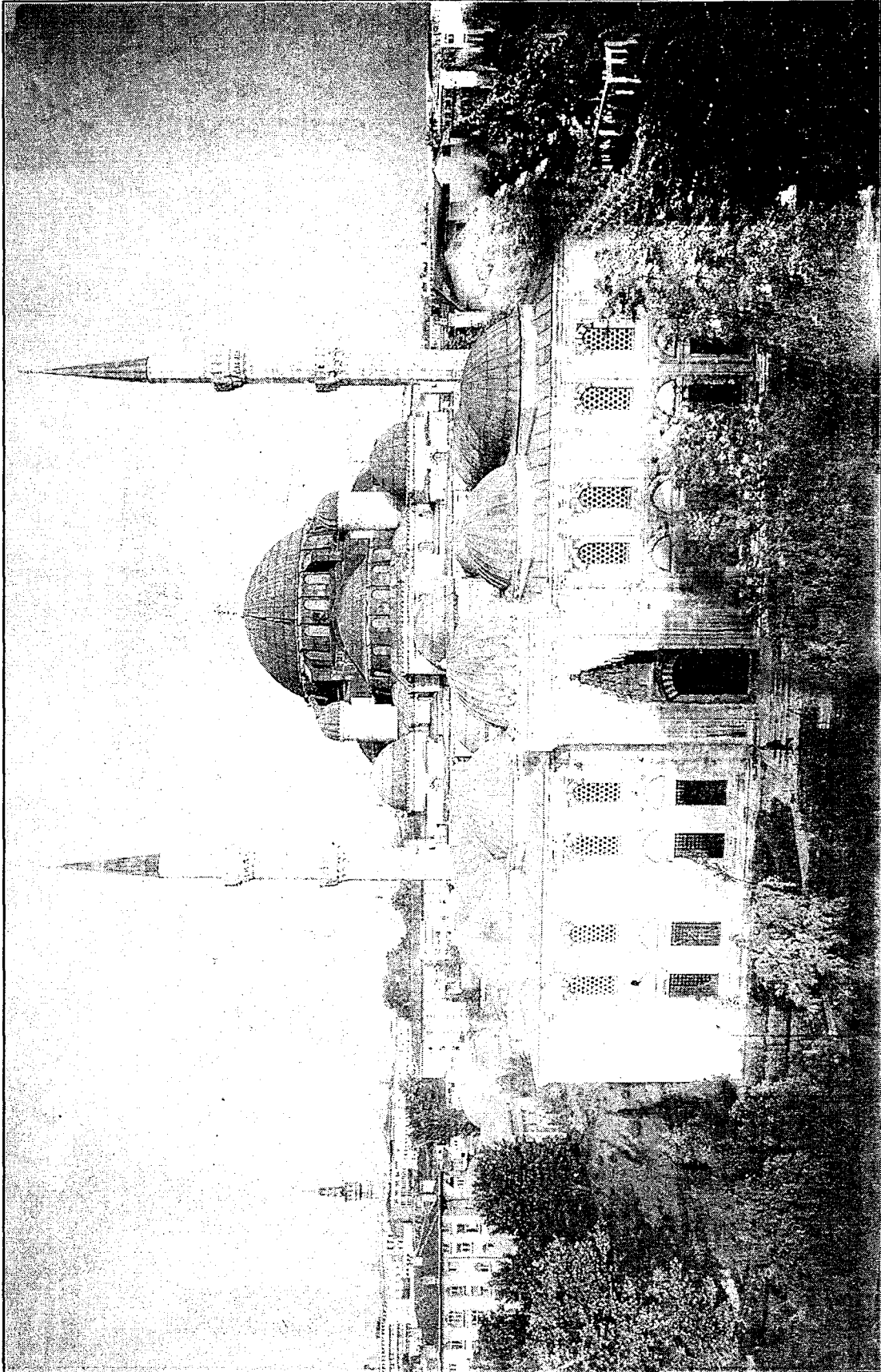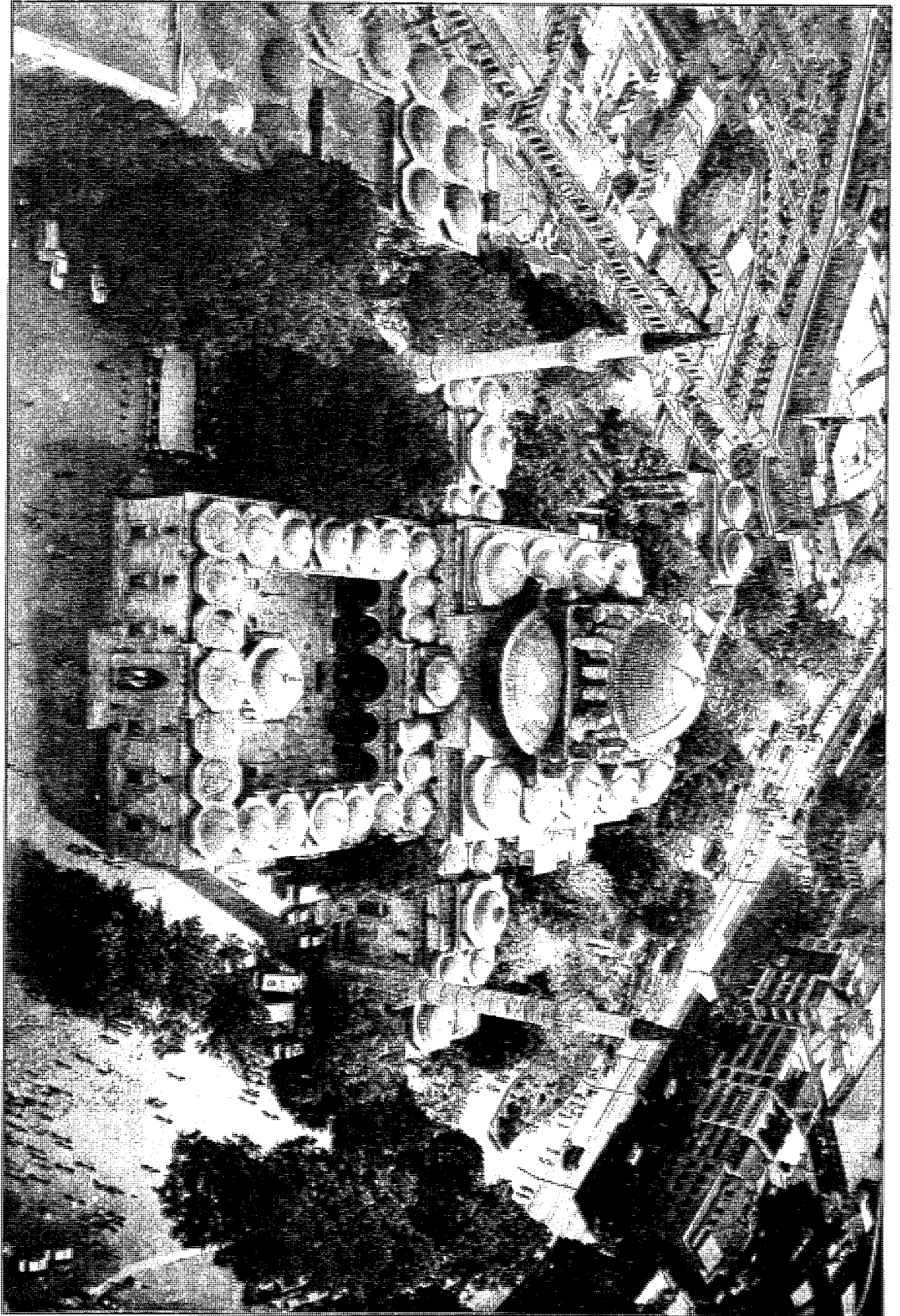
সুলতান বায়াযীদ জামে', ইসতানবুল ১৫০১-১৫০৬ খৃ.।
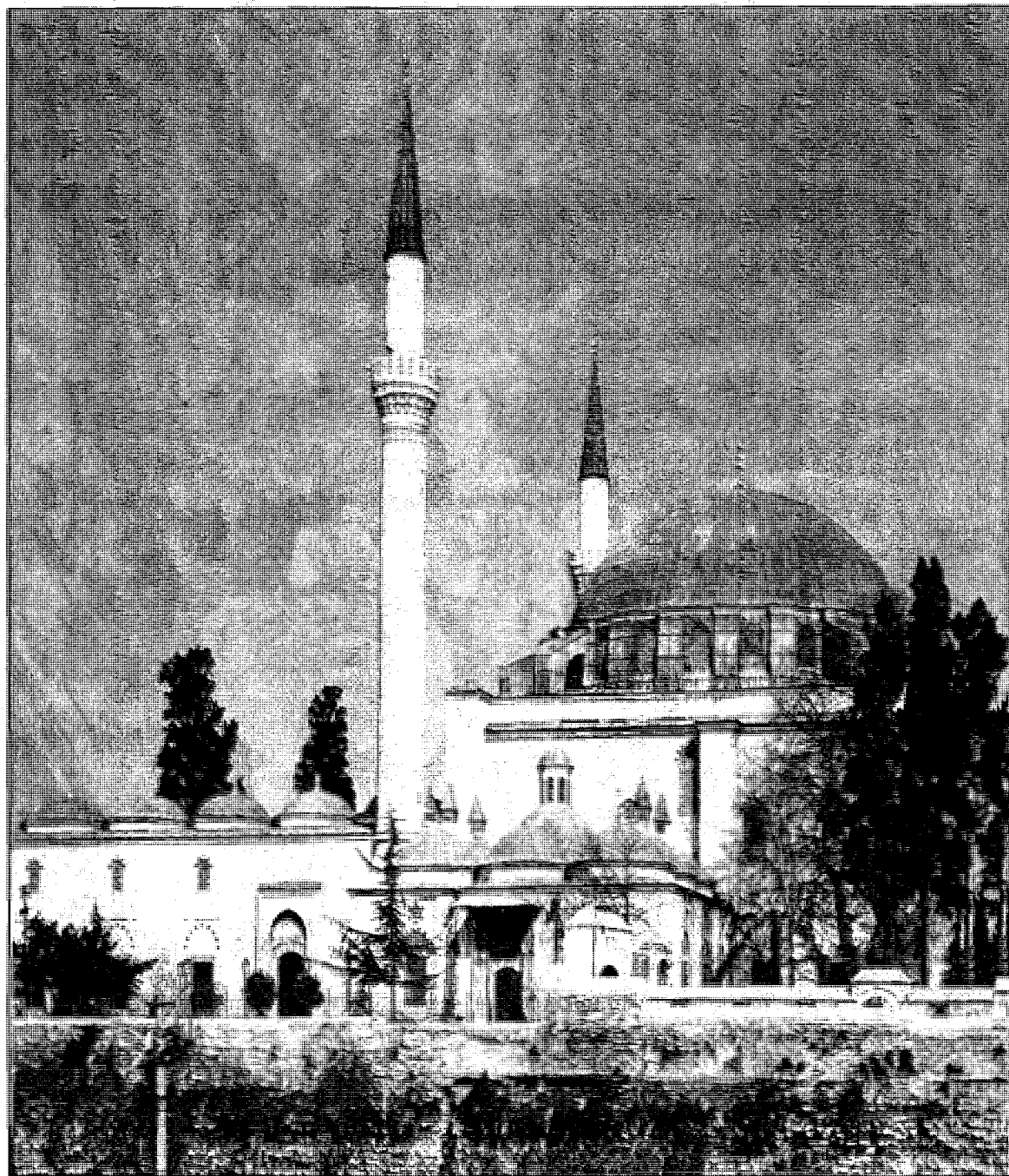
সুলতান সেলীম জামে', ইসতানবুল ১৫২২ খৃ.।

মুহাম্মাদ-এর মাতার আদেশে নির্মাণ শেষ হয়। সুবিশাল মসজিদটি মূলত হেজিয়া সোফিয়ার নকশার অনুসরণে নির্মিত। সামনে বিশাল সুপরিকল্পিত চত্বর, সেখানে নির্মিত অষ্টকোণাকৃতির একটি ফোয়ারা দেখিতে অতি সুন্দর।

**প্রাসাদসমূহ ঃ** তোপকাপী প্রাসাদ। য়ূরোপীয় অংশের সর্বপূর্ব প্রান্তে মর্মর সাগরের পাড়ে-ঠিক যেখানে মর্মর সাগর হইতে গোল্ডেন হর্ন বাহির হইয়াছে, সেই সংযোগস্থলে অতি মনোরম পরিবেশে বিশাল এলাকা ব্যাপিয়া তুর্কী সুলতানগণের বিখ্যাত প্রাসাদ তোপকাপী সারায়ি অবস্থিত। বিশাল তিনটি তোরণ পার হইয়া প্রাসাদসমূহে প্রবেশ করিতে হয়। প্রতি তোরণের পরেই বড় বড় চত্বর, সেই চত্বরগুলি ঘিরিয়াই প্রাসাদের বিভিন্ন ভবন নির্মিত হইয়াছে। প্রধান দরওয়াজার নাম বাব-ই হুমায়ুন; মাঝের দরওয়াজার নাম বাবু'স্-সালাম; এখানকার বিশাল লোহার দরওয়াজা নির্মাণ করিয়াছিলেন 'ঈসা ইব্ন মুহাম্মাদ ১৫২৫ খৃ.। সারায়ির মধ্যে মোট রাজপ্রাসাদের সংখ্যা ৫-৬টি। এখান হইতেই সুলতানগণ বিশাল তুর্কী সাম্রাজ্য শাসন করেন। এইগুলির বিশালত্ব ও নির্মাণ সৌকর্য বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এখানকার রাষ্ট্রীয় কোষাগারেই ধনরত্ন ও মণিমাণিক্য সঞ্চিত ছিল। ১৪৭৮-১৮৩৯ খৃ. পর্যন্ত এই প্রাসাদ সারা বিশ্বের রাজনীতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিল। পরবর্তী কালে সুলতাগণ দলমা বাগচী ও য়িলদীয কিয়স্কে বাস করিতেন।

তোপকাপী সারায়ি বর্তমানে যাদুঘর। সুলতানগণ ও তাঁহাদের পরিবারের রত্নসামগ্রী এখানে রক্ষিত আছে। স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যের পরিমাণ একই সঙ্গে ভয় ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। তুরস্কের ইযনীক ও অন্যান্য স্থানের তৈরী সর্বোৎকৃষ্ট চীনা মাটির তৈজস ও অন্যান্য দ্রব্যের সব অমূল্য সংগ্রহ। সুলতানগণের সিংহাসন, সোনার কাজ করা পোশাক, মণিমুক্তা বসানো সোনার বাসন-কোসন, চামচ ও অন্যান্য সামগ্রী, যথা মণি-মাণিক্যের কারুকাজ করা তলোয়ার, খঞ্জর, ছোরা, পালঙ্ক, বিছানার চাদর, বালিশ ইত্যাদি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হইতেছে দিল্লীর একটি সিংহাসন, সোনার তৈরী এবং আগাগোড়া মুক্তা ও হীরার কাজ করা। নাদির শাহ দিল্লী হইতে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়া ১৭৪৭ খৃ. উপহারস্বরূপ উহা সুলতান মুরাদকে পাঠান। হীরা বসানো একটি ছোরা ও ৮৬ ক্যারেট ওজনের বিখ্যাত "কাশিকটি" হীরাও এখানেই রক্ষিত, কাশক বা চামচের আকারের বলিয়া হীরাটির এইরূপ নাম হইয়াছে। আদিতে উহা ভারতবর্ষের ছিল। খৃ. ১৭শ শতকে ৪র্থ মাহমূদ উহা জনৈক বিদেশীর নিকট হইতে ক্রয় করেন।

প্রাসাদের কক্ষগুলি খুবই সুন্দর কারুকাজ করা, পাথর, স্বর্ণ, বিশেষ করিয়া ইযনীক চীনা মাটির নানা বর্ণ ও নকশার কারুকাজ ও কাঠের খোদাই কাজ। হেরেম মহলগুলিও খুবই সুন্দর ও বিলাসবহুল। প্রত্যেক সুলতানই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী হেরেমের একেক অংশ সংযোজন করিতেন এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করিতেন। খৃ. ১৭শ শতকে তোপকাপীর এই হেরেম মহলে ৪,০০০ বাঁদী ও পরিচারিকা থাকিত। সুলতানের মাতাদের জন্য হেরেমের ভিতরেই আলাদা বসবাসের ব্যবস্থা ছিল। এই প্রাসাদের চিত্রসংগ্রহ ও দেওয়ালে অলঙ্কৃত হরফে কুরআনের আয়াত ও অন্যান্য বাণীও বিশেষ আকর্ষণীয়। তোপকাপী সারায়ির যে কুতুবখানা বা লাইব্রেরী তাহা বিশ্বের মুসলিমগণের ও সকলেরই জন্য এক বড় সম্পদ, কুরআন ও অন্যান্য মূল্যবান সকল ইসলামী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, 'উছমানিয়্যা সরকারের দলীলপত্র ও অন্যান্য সামগ্রীর বিপুল সংগ্রহ বিশ্ববাসীর গবেষণার জন্য রক্ষিত আছে। মুসলমানদের জন্য ও সকলের জন্যই এমন মূল্যবান গ্রন্থের সংগ্রহশালা দুনিয়াতে খুব কমই আছে।

কিন্তু তোপকাপী সারায়ির সর্বাপেক্ষা গৌরবময় সংগ্রহ হইতেছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জোব্বা বা খিরকাহ ; ইহাকে বলা হয় "খিরকা-ই সা'আদাহ"। ইহা প্রথমে ছিল সুলতানগণের তখ্ত বা সিংহাসন কক্ষে, ইসলামের নিশানবরদাররূপে ইসলামের ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা বিধানের ইচ্ছায় এবং তাহা ছাড়া গৌরবেরও জন্য ইহা সিংহাসনের পিছনে রাখা হইত। পরে বিজয়ী সুলতান ২য় মুহাম্মাদ কর্তৃক নির্মিত সেই সম্পূর্ণ কক্ষটিই রাসূলের খিরকার কক্ষরূপে নির্ধারিত হয়। খিরকাহ পাক সুলতান 'আবদু'ল-'আযীয কর্তৃক সম্পূর্ণ সোনার তৈরী একটি অতি সুন্দর বাক্সে রাখা আছে। তাহা আবার সুলতান ২য় মাহমূদ কর্তৃক ২৪৪ কিলোগ্রাম খাঁটি রূপায় তৈরী একটি মস্ত বড় আধারে রাখা আছে। খিরকার সামনেই রক্ষিত আছে রাসূল (স)-এর ব্যবহৃত তরবারি। এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি শ্মশ্রুও সোনা বাঁধানো কাচের কৌটাতে রক্ষিত আছে।

**দলমাবাহ্চে প্রাসাদ ঃ** সুলতান 'আবদু'ল-'আযীয বসফরাস প্রণালীর তীরে শ্বেত পাথরের এই সুদৃশ্য আধুনিক প্রাসাদটি নির্মাণ করেন। বিশাল আকারের এই প্রাসাদটির পরিকল্পনাকারী ও স্থপতি ছিলেন কারাবেত ও তাঁহার পুত্র নিকোগোস। পরবর্তী কালের সুলতানগণও এই প্রাসাদেই বাস করেন। সুলতান ২য় 'আবদু'ল-হামীদ এখান হইতে আরও একটু দূরে য়িলদিয প্রাসাদে বাস করিতেন। তুর্কী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মুসতাফা কামাল পাশা ইস্তাম্বুলে আসিলে এই প্রাসাদেই থাকিতেন, ১৯৩৮ খৃ. ১০ নভেম্বর এইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারী কাজে প্রাসাদটি ব্যবহৃত হয়।

**য়িলদিয প্রাসাদ ঃ** ১৮৪৮ খৃ. সুলতান 'আবদু'ল-মাজীদ ইহা নির্মাণ করেন বসফরাসের তীরে। সামনে মনোরম বাগান ও কিয়স্কসমূহ। পরবর্তী কালে সুলতান ২য় 'আবদু'ল-হামীদ আরও অন্য কয়েকটি সংলগ্ন ভবন নির্মাণ করেন। প্রাসাদের প্রধান দরওয়াজার সঙ্গেই হামীদিয়্যা মসজিদ নির্মাণ করেন ২য় 'আবদু'ল-হামীদ। বসফরাস হইতে এই প্রাসাদটি খুবই সুন্দর দেখায়।

উল্লিখিত ইমারতগুলি ব্যতীত এই শহরের দুইটি বিখ্যাত যাদুঘর হইতেছে তুর্কী ও ইসলামী শিল্প যাদুঘর। ইহা বিশাল আকারের (এক সময়ে এইখান হইতে প্রতিদিন কয়েক হাজার লোককে খাদ্য সরবরাহ করা হইত)। এইখানে চীনামাটির দ্রব্যাদি, সুদৃশ্য কাচের সামগ্রী, গালিচা, সোনা-রূপার অলঙ্কার, ধাতব দ্রব্যাদি, কুরআন রাখিবার অতি আকর্ষণীয় পেটারা, পাণ্ডুলিপি, হস্তলিপি, ক্ষুদ্র চিত্র ইত্যাদির বিরাট সংগ্রহ রহিয়াছে। অপরটি হইতেছে প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘর, সেইখানে গ্রীক ও রোমান আমলের মূর্তি, চিত্র ইত্যাদি রক্ষিত, আলেকজান্ডারের আবক্ষ মূর্তি ও বিখ্যাত শবাধার (Sarcophayus) এখানে রাখা আছে।

**আয়া সোফিয়া ঃ** ইস্তাম্বুলের রোমান বায়যান্টীয় আমলের সর্বাধিক আকর্ষণীয় স্থাপত্য কীর্তি হইতেছে হেজিয়া সোফিয়া (Hagia Sofia) বা সেন্ট সোফিয়া। একই স্থানে ইতিপূর্বে দুইবার এই গির্জাটি নির্মিত হইয়াছিল (প্রথমবার ৩৬০ খৃ.), কিন্তু অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হইয়া যায়। তৃতীয়বারের মত বর্তমানের এই সুবিশাল গির্জাটি নির্মাণ করেন সম্রাট জাস্টিনিয়ান ৫৩৭ খৃ.। পরে অবশ্য একাধিকবার ইহার সংস্কার সাধন ও

সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। ভূমি হইতে প্রধান গম্বুজের চূড়াটি ১৫ তলা ভবনের সমান উঁচু। বিজয়ের পরে সুলতান ফাতিহ (২য় মুহাম্মাদ) ইহাকে মসজিদে পরিণত করেন এবং তখন ইহার নাম হয় আয়া সোফিয়া। পরবর্তী কালে তিনজন সুলতানের প্রত্যেকে দুইটি করিয়া ইহাতে ছয়টি সুদৃশ্য ও সুউচ্চ মিনার সংযোজন করেন। সুলতান মুরাদের আমলের মিনার দুইটি নির্মাণ করেন স্থপতি সিনান। মূল মসজিদ অংশে ইসলামী অলঙ্কৃত লিপির সুন্দর কারুকাজ করা হইয়াছে, কিন্তু বিভিন্ন অংশে, যেমন স্তম্ভে, খিলানে, দেওয়ালে ও ছাদের বিভিন্ন অংশে কাটা পাথরের যে কারুকাজ ও নকশা সেগুলি এতই সুন্দর যে, দেখিলে প্রায় সূচীশিল্পের নকশা বলিয়া ভুল হয়। ইহার বিভিন্ন অংশে খৃষ্ট ধর্মীয় নানা মূল্যবান চিত্র আঁকা রহিয়াছে। আয়া সোফিয়া বর্তমানে একটি যাদুঘর।

**হিপ্পোড্রাম** (Hippodrome) ঃ একটি বিশাল এলাকা, রোমক সম্রাটগণের আমলের ক্রীড়াকেন্দ্র এবং সর্বসাধারণের বিনোদনের স্থান অর্থাৎ বেসামরিক সর্বসাধারণের কর্মকাণ্ডের স্থান। প্রথমে ইহা নির্মাণ করেন সম্রাট সেপটিমাস সেভেরাস (Septimus Severus) ২০৩ খৃ.। পরে মহান কন্স্ট্যানটাইন (Constantine the Great) ইহার সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন। সেই সময়ে এখানকার ক্রীড়াঙ্গনটিতে একসঙ্গে ১ লক্ষ লোক বসিয়া রথ ও অন্যান্য খেলা দেখিতে পারিত। ইহার সম্মুখে তিনটি কীলক স্তম্ভ (Obelisk) দণ্ডায়মান থাকিয়া সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে, বিভিন্ন সময়ে রোমক সম্রাটগণ মিসর হইতে সেইগুলি এখানে আনিয়া স্থাপন করেন। এখানকার আর একটি দর্শনীয় বস্তু হইতেছে পিতলের তিনটি সাপ জড়ানো একটি বহু প্রাচীন গ্রীক স্তম্ভ।

**কিল'আ** (কেল্লা) ঃ ইস্তাম্বুলে মুসলিম আমলের দুইটি কিল'আ দর্শনীয়। একটি রূমেলি হিসার, কন্সটান্টিনোপল বিজয়ের পূর্ব-প্রস্তুতিস্বরূপ ১৪৫২ খৃ. সুলতান ২য় মুহাম্মাদ য়ূরোপীয় প্রান্তে ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৯৫৪ খৃ. তুরস্ক সরকার ইহার সংস্কার করেন এবং ভিতরে সুন্দর বাগিচা নির্মাণ করেন। বর্তমানে প্রতি রবিবার বিকালে এখানকার সৈন্যগণ পুরাতন জানিসারী সৈন্যদের পোশাক পরিয়া, প্রাচীন বাজনা বাজাইয়া জনগণকে প্রাচীন কালের গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আনন্দ দিয়া থাকে। এশীয় প্রান্তে অবস্থিত অপর কিল'আটির নাম আনাদোলু হি'সারি বা আনাতোলীয় কিল'আ। ১ম বায়াযীদ ১৩৯০ খৃ. ইহা নির্মাণ করেন।

একটি চিত্তাকর্ষক নির্মাণ কাজ হইতেছে মর্মর সাগর, বসফরাস ও গোল্ডেন হর্নের সংযোগস্থানে সাপ ঘেরা একটি পাথরের উপর নির্মিত ২ মিটার (?) উঁচু একটি স্তম্ভ বা টাওয়ার। বর্তমানে ইহা প্রধানত একটি বাতিঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ ইহাকে Leander's Tower বলে। কিন্তু তুর্কীরা বলে 'কুমারী স্তম্ভ' (The Tower of the Maiden)। তুরস্ক রূপকথা ও উপকথার জন্য বিখ্যাত দেশ। এই স্তম্ভটি সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে, কোন একজন সুলতানের কন্যা সাপের কামড়ে অকালে মারা যাইবে বলিয়া এক জিপসী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল। সুলতান তাহা বিশ্বাস করিয়া প্রিয় কন্যাকে সাগরের মাঝে এই ঘরে নিরাপদে রাখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাকদীরের লেখা ! পারস্যের যুবরাজ এই কন্যাকে এক ঝুড়ি ফুল উপহার পাঠায়। সেই ফুলের মধ্যে এক বিষধর সাপ ছিল। সাপের কামড়ে নিষ্পাপ কুমারী কন্যার মৃত্যু হয় এবং জিপসীর কথা সত্য হয়। এই শহরের অপর একটি স্তম্ভ (Tower) হইতেছে গালাতা স্তম্ভ। প্রাচীন এই স্তম্ভটি নির্মাণ করিয়াছিল জেনোয়াবাসীরা এবং তখন উচ্চতা ছিল ৫৭ মিটার। বিজয়ের পরে সুলতান ২য় মুহাম্মাদ ইহার উচ্চতা ৭ মিটার কমাইয়া সংস্কার করাইয়া বর্তমান উচ্চতা দান করেন। পরবর্তী কালে ইহার আরও সংস্কার করা হয়। বর্তমানে এখানে অগ্নি নির্বাপক দফতর। উঁচু ও সুন্দর এই স্তম্ভটি বহু দর্শককে আকর্ষণ করে।

**বাজার** ঃ শহরের দুইটি বড় আকর্ষণ হইতেছে মিসরীয় বাজার ও বড় বাজার (Grand Bazar)। মিসরীয় বাজার প্রধানত শহরবাসিগণের খাদ্যদ্রব্য ও মসলার বাজার। ১৬৬০ খৃ. ইহা নির্মিত হইয়াছিল প্রধানত মিসর হইতে আনীত মসলা বিক্রয়ের জন্য, এমন কি বর্তমানেও এখানে হাজারও রকমের মসলা পাওয়া যায়। আর সেই কারণেই ইহার অপর নাম মসলা বাজার। এই বাজার সংলগ্ন একটি মসজিদও বিখ্যাত। গ্র্যান্ড বাজার নির্মিত হয় ১৪৬১ খৃ., পরে বিভিন্ন সময়ে অগ্নিকাণ্ডে ইহার ক্ষতি সাধিত হয়। কিন্তু প্রতিবারই পূর্বাপেক্ষা সুন্দর করিয়া পুনরায় নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হয়। দেশী-বিদেশী সকল শ্রেণীর সকল লোকের জন্য অগণিত দোকান লইয়া গঠিত এই সুসজ্জিত বাজার, তুরস্কের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ও আধুনিক সকল দ্রব্যসামগ্রী এখানে পাওয়া যায়। আলো ঝলমল বাজারে মণিমুক্তা, স্বর্ণালঙ্কার, অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও বিলাস সামগ্রী, চামড়ার দ্রব্যাদি, বিখ্যাত তুর্কী গালিচা ও অন্যান্য বহু রকমের কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিপুল সম্ভার এখানে রহিয়াছে। বিদেশী পর্যটকদের ইহা বড় আকর্ষণ।

**ফোয়ারা** ঃ ইস্তাম্বুল ফোয়ারার শহর, যুগে যুগে শাসকগণ ও বিভিন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ শহরের বিভিন্ন স্থানে জনগণের কল্যাণার্থে এই ফোয়ারাগুলি নির্মাণ করেন। এইগুলির স্থাপত্য সৌন্দর্য অতুলনীয় এবং ঐতিহাসিক ও পর্যটকগণের বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। অতি বিখ্যাত কতগুলি ফোয়ারা হইতেছে ঃ তোফানে ফোয়ারা (Tophane Fountain) অত্যন্ত সুন্দর, ১৭৩২ খৃ. নির্মিত। ওয়ালীদে সুলতান ফোয়ারা, সোকুল্লু মেহমেত (মুহাম্মাদ) পাশা মসজিদের পার্শ্বে ১৭৩২ খৃ. নির্মিত। তথাকথিত টিউলিপ আমলের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, অতি সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত। জার্মান ফোয়ারা, সুলতান আহমাদ চত্বরে স্থাপিত এই বিখ্যাত ফোয়ারাটি জার্মান সম্রাট কাইজার উইলহেল্ম-এর উপহার, জার্মানী হইতে তৈরি করাইয়া, খণ্ড খণ্ড অবস্থায় সম্রাট ইহা সঙ্গে লইয়া তুর্কী রাজধানীতে বেড়াইতে আসেন। পরে সেইগুলি আবার একত্র করিয়া বসানো হয়। সৌহার্দ্যের নিদর্শন এই ফোয়ারাটি বহু পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হাতিসে তুরহান ফোয়ারা, ১৬৬০ খৃ. নূতন মসজিদের চত্বরে নির্মিত হয়, সামনের অংশ মর্মর পাথরে তৈরী। উহাতে সুদৃশ্য লিপি খোদাই করা, ভিতরের কারুকার্যও খুবই সুন্দর। সুলতান আহমাদ ফোয়ারা সম্ভবত সমগ্র ইস্তাম্বুল শহরের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর, ১৭২৮ খৃ. টিউলিপ আমলে ইহা নির্মিত হয়। আয়া সোফিয়ার দক্ষিণে এবং তোপকাপী সারায়িতে যাইবার পথে ইহা অবস্থিত। উপরে ছাদের নির্মাণ কৌশল ও লিপি-সৌন্দর্যের জন্য ইহা বাস্তবিকই তুলনাহীন।

**সেতু** ঃ চারিটি বিখ্যাত সেতু এই ঐতিহাসিক নগরীর বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশ যুক্ত করিয়া একদিকে যেমন সর্বসাধারণের চলাচলের সুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনই একই সঙ্গে আবার নগরীর শোভাও বৃদ্ধি করিয়াছে। এই চারিটি সেতু বাস্তবিকই এখন ইস্তাম্বুলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হইয়া গিয়াছে। গালাতা সেতু সর্বাপেক্ষা পুরাতন, গোল্ডেন হর্নের মুখেই ইহা

নির্মিত এবং য়ুরোপীয় অংশের পুরাতন ইস্তাম্বুল ও নূতন শহরকে যুক্ত করিয়াছে। অগণিত যানবাহন ও লোক চলাচলে পূর্ণ থাকে এই সেতু। ইহার বাহিরের দিকে জাহাজ ভিড়িয়া থাকে। রাত্রিবেলা সেতুটি মাঝখানে খুলিয়া দেওয়া হয়। তখন গোল্ডেন হর্নের ভিতরে জাহাজ, লঞ্চ ও নৌকা প্রবেশ করিতে পারে। দ্বিতীয় সেতুটিও গোল্ডেন হর্নের উপরই নির্মিত। ইহা উনকাপানি সেতু বা আতাতুর্ক সেতু নামে পরিচিত। নির্মাণকাল ১৯৩৬ খৃ., ইহা বেয়োগলুর সঙ্গে উনকাপানির সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। ইহার এক পার্শ্বেই নগরীর প্রধান ফলমূল ও তরিতরকারির বাজার। গালাতা সেতু ও উনকাপানি সেতুর ঠিক মাঝখানেই সুলায়মানিয়্যা মসজিদ (উপরে দ্র.) দণ্ডায়মান। তৃতীয় সেতুটি গোল্ডেন হর্ন সেতু নামে পরিচিত।

১৯৭৩ খৃ. ২৯ অক্টোবর প্রজাতন্ত্রের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন উপলক্ষে তুরস্ক সরকার তাঁহাদের অতি গৌরবময় বসফরাস সেতুর উদ্বোধন করেন। এই সেতুর মাধ্যমেই সড়ক পথে সর্বপ্রথম এশিয়ার সঙ্গে য়ুরোপের সংযোগ স্থাপিত হয়। অতি আধুনিক, ঝুলায়মান এই সেতুটির মোট দৈর্ঘ ১,৫০০ মিটার, প্রস্থ ৩৩ মিটার। রাত্রিবেলা আলোককোজ্জ্বল সেতুটির সৌন্দর্য হয় অশেষ। ইহার নির্মাণ ব্যয় ছিল ২৫০ মিলিয়ন ডলার।

ইস্তাম্বুল রেলপথও এশিয়া ও য়ুরোপের সকল গুরুত্বপূর্ণ অংশের সঙ্গে যুক্ত। এশীয় অংশে বিখ্যাত বাগদাদ রেলওয়ে এই শহরের হায়দার পাশা স্টেশন হইতে শুরু হইয়াছে। আর য়ুরোপীয় অংশে বিখ্যাত ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসের শেষ প্রান্ত অবস্থিত। ইস্তাম্বুল একটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। ইস্তাম্বুলই তুরস্কের প্রধান সমুদ্র বন্দর এবং প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানকার পোতাশ্রয় পূর্ব হইতেই সুবিখ্যাত।

ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় অনেক পুরাতন। সুলতান বিজয়ী মুহাম্মাদ ১৪৫৩ খৃ. ইহাকে প্রথমে একটি ইসলাম ধর্ম শিক্ষাকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্রমে ইহা আকারে ও আয়তনে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আধুনিক কালে ১৯৩৩ খৃ. একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়রূপে ইহাকে পুনর্গঠিত করা হয়।

এই শহর ১৪৫৩ খৃ. বিজয়ের পর হইতেই একটি বহু জাতিক নগররূপে গড়িয়া উঠে (মূল প্রবন্ধ দ্র.)। মুসলিম প্রধান শহর হইলেও এইখানে য়ুরোপীয় খৃস্টান, গ্রীক, য়াহূদী ও আর্মেনীয় অধিবাসিগণই সেই প্রথম হইতেই বসবাস করিয়া আসিতেছে। য়ুরোপ হইতে যখন য়াহূদীদেরকে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বহিষ্কৃত করা হয় তখন 'উছমানিয়্যা শক্তিই তাহাদেরকে আশ্চর্যজনক উদারতার সঙ্গে এই শহরে ও রাজ্যের অন্যান্য স্থানে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছিল। মুসলিম অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৯ জনই সুন্নী। সকল অধিবাসীর প্রধান ভাষা তুর্কী। পূর্বে এই ভাষা 'আরবী হরফে লিখিত হইত, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরে ১৯২৮ খৃ. মুসতাফা কামাল পাশা আরবীর পরিবর্তে রোমান বর্ণমালা গ্রহণ করেন। এই শহর হইতে অনেক দৈনিক ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রধানগুলি হইতেছে (দৈনিক) বুলভার, প্রচার-সংখ্যা ১,৩০,০০০ ; জমহুরিয়েত (প্রজাতন্ত্র), প্রতিষ্ঠা ১৯৮৪ খৃ., প্রচার-সংখ্যা ১,৫০,০০০ ; গুনায়দিন, ৩,০০,০০০ ; হুর্‌রিয়েত, প্রতিষ্ঠা ১৯২৪ খৃ., প্রচার-সংখ্যা ৭,৬৭,০০০ ও য়েনি নেসীল, ৪,৫০, ০০০ ; প্রধান সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম গির্‌গির্, ইহা মূলত একটি ব্যঙ্গ পত্রিকা, প্রচার সংখ্যা ৫,০০,০০০।

সুপ্রাচীন ও তিনটি বিশ্ব-সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী, শক্তিশালী তুর্কী সাম্রাজ্যের সকল গৌরববাহী ইস্তাম্বুল শহর বিশ্বের পর্যটকগণের বিশেষ আকর্ষণের স্থান। ১৯৮০ খৃ. তুরস্ক ও প্রধানত এই শহরটি দেখিবার জন্য সারা দুনিয়া হইতে ২১ লক্ষেরও বেশী পর্যটকের আগমন ঘটিয়াছিল, আর তাহা হইতে সরকারের আয় হইয়াছিল ৩৭২' ৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১৯২২ খৃ. মুসতাফা কামাল পাশা তুর্কী সালতানাতের অবলুপ্তি এবং তুরস্ককে একটি আধুনিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। ১৯২৩ খৃ. ২৩ অক্টোবর তিনি নূতন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হন এবং পরের বৎসর মার্চ মাসে খিলাফাতেরও সমাপ্তি ঘোষণা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পরে আক্রমণকারী বিভিন্ন য়ুরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে (ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, গ্রীস, বুলগেরিয়া) এবং একই সঙ্গে নিজ দেশের সুলতানের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামে কামাল-এর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল আঙ্গোরা বা আঙ্কারা। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয়ী প্রধান সেনাপতি কামাল দেশকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিয়া রাজধানী ইস্তাম্বুল হইতে আঙ্কারাতে স্থানান্তরিত করেন। সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার পরবর্তী বিশৃঙ্খলার সময়ে তোপকাপী সারায়িতে শত শত বৎসরের গৌরবময় শাসনের কালে তিনটি মহাদেশ হইতে আহরিত ও সঞ্চিত যে ধনরত্নের ভাণ্ডার ছিল তাহার অধিকাংশই সেনাবাহিনী, রক্ষী ও অন্যদের দ্বারা লুণ্ঠিত হইয়া যায়। বিশ্বের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ইতিহাসে সেইরূপ নিষ্ঠুর লুণ্ঠন সম্ভবত খুব কমই হইয়াছিল। একই সঙ্গে সরকারী আদেশে ইস্তাম্বুলের ও দেশের সকল মাদরাসা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, সকল ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বাজেয়াফত ও রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়, সুলতান ও দরবেশগণের মাযার যিয়ারত নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ঐতিহ্যবাহী পোশাক বাতিল করিয়া য়ুরোপীয় পোশাক (নারী-পুরুষ সকলের জন্য) ও হ্যাট পরিবার নির্দেশ দেওয়া হয়, দাড়ি রাখা ও বোরখা পরা বস্তুত নিষিদ্ধ করা হয়, য়ুরোপীয় রীতিতে প্রত্যেকের নামের শেষে পারিবারিক নাম (Family name বা sur name) ব্যবহারের রীতি প্রবর্তিত হয় এবং দেশের শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করা হয়। কামাল পাশার সহকর্মী খ্যাতনাম্নী রাজনীতিক, সমাজকর্মী ও লেখিকা হালিমে এদীব হানুম (খালিদা এদীব খানম) [দ্র.] যথার্থই বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজনৈতিক বিজয় হওয়া সত্ত্বেও উহা ছিল বাস্তবিক য়ুরোপীয় শক্তির নিকটে তুরস্কের সাংস্কৃতিক পরাজয়।

কিন্তু সকল কিছু সত্ত্বেও তুর্কী জাতি তাহাদের মূল নৈতিকতা ও অকৃত্রিম ইসলামী জাতীয় সত্তা কখনও হারায় নাই। তাহাদের রাজধানী ইস্তাম্বুল অদ্যাবধি উহার সকল মহিমা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ১৯৩০ খৃ. পর্যন্ত এই নগরীর সরকারী নাম ছিল সেই প্রাচীন কন্সটান্টিনোপল, সেই বৎসর নাম পরিবর্তন করিয়া সরকারীভাবে রাখা হয় ইসতানবুল, ইহার তুর্কী উচ্চারণ ইস্তাম্বুল।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) Whitaker's Almanack, 1980, London, Whitaker, 1980, art. Turkey ; (২) Europa Year Book, 1987, London, Europa, 1987, art. Turkey; (৩) Encyclopedia Americana, New York, Grohir, art. Istambul; (৪) মেহমেত 'আলী বীরান্ত ও মু'মিন আকবাজ, Istanbul, AND Rub., Istanbul 1984, স্থা. ; (৫) বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রাম্‌স কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত এবং নওরোজ কিতাবিস্তান ও গ্রীন বুক হাউজ কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা ১৯৭২ খৃ., প্রবন্ধ ইস্‌তাম্বুল; (৬) Columbia Viking Desk

Encyclopedia, Columbia, U. S. A. . . ., art " Istanbul ; Constantinople, Byzantine Empire, Mohammad II; (৭) মাহবুবুল আলম, তুর্কী, য়ুনেস্কোর উদ্যোগে ঢাকা কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬০ খৃ., স্থা.।

হুমায়ুন খান

**ইসতাবল** ( اصطبل বা استبل) ঃ [আ., দ্বিবিধ বানান, বহুবচন ইসতাবলাত, কদাচ আসাবিল, লিসানু'ল-'আরাব (দ্র.) অনুসারে] ব্যুৎপত্তির দিক দিয়া আস্তাবল সেই ইমারতকে বুঝায় যেখানে ভারবাহী পশু ও সওয়ারী পশু বা অশ্ব বাঁধিয়া রাখা হয় (Eqitdae and Camelidae) এবং লক্ষ্যার্থক শব্দের বিচারে এই পশুগুলির পাল একজন মাত্র মালিকের অধিকারভুক্ত থাকিবে। ইসতাবল শব্দটি নিম্ন গ্রীক শব্দ (দেখুন Du Cange, Glossarium ad seriptores mediae et inflmae Graceitatis, Lyons 1688, s. v.)-এর আরবীকৃত রূপ, যাহা পর্যায়ক্রমে ল্যাটিন শব্দ স্ট্যাবুলাম (Stabulum) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা 'সভ্যতা'র তথাকথিত পরিভাষা বা শব্দসমূহের একটি যাহা ব্যাপক বিস্তার লাভ করিয়াছে। কারণ ইহাকে সমুদয় পাশ্চাত্য ভাষায় একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের বহু পূর্বে সিরিয়ার গাস্সানীদের মাধ্যমে 'আরবী ভাষায় শব্দটি গৃহীত হয়।

**(১) কেন্দ্রীয় ইসলামী দেশসমূহ ঃ** অশ্বসমূহকে আচ্ছাদনের নীচে রাখার রীতি নিষ্কর্ম গৃহবাসী লোকদের বৈশিষ্ট্য ছিল। যাযাবর 'আরব বেদুঈনদের নিকট আস্তাবলের ধারণা অজ্ঞাত ছিল। তাহাদের অশ্বগুলিকে নিছক তাঁবু বা ঝোপের ছায়ায় বাঁধিয়া রাখা হইত (মারবাত', মারবিত') ঘটনাক্রমে এই রীতি শহরাঞ্চলে ও মরুযাত্রীদের সরাইখানায়ও (ফুনদুক, খান দ্র.) স্থায়িত্ব লাভ করে। সেখানে যাত্রী ও তাহাদের মালপত্রের উপর ছাদের আশ্রয় থাকিত এবং তাহাদের পশুগুলি বিস্তীর্ণ মধ্যবর্তী আঙ্গিনায় বাঁধা থাকিত। অনুরূপভাবে মুসলিম অশ্বারোহিগণ তাহাদের যুদ্ধশিবিরে (Extra muros) মু'আসকার ঘোড়াগুলির জন্য পাম গাছের পাতার তৈরী হালকা আশ্রয়ের ব্যবস্থার অধিক আর কিছুই করিত না। এই হালকা আশ্রয় ঘোড়াগুলিকে রোদবৃষ্টি হইতে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট ছিল এবং অশ্বারোহিগণের দ্রুত স্থানান্তর গমনের সহায়ক হইত। কেননা তাহাদেরকে সর্বক্ষণ সতর্কাবস্থায় থাকিতে হইত। তাই ইসতাবল শব্দটি শুধু ইট-পাথরের তৈরী স্থায়ী নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে থাকে যাহা কেবল যথেষ্ট সংখ্যক অশ্বের অধিকারী শাসক বা উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের পক্ষেই তাঁহাদের প্রাসাদের নিকট নির্মাণ করা সম্ভব ছিল, তবু এই জাতীয় ইমারত ছিল অত্যল্প। ইসলাম-পূর্ব আরবগণের পক্ষে আস্তাবল দেখার সুযোগ প্রায় ছিল না বলিলেই চলে—বায়যাটাইনদের আমলের দামিশ্‌ক ও লাখমীগণের শাসিত হীরার আস্তাবল ব্যতীত মেসোপটেমিয়া ও পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অবলুপ্ত সভ্যতার চিত্তাকর্ষক ধ্বংসাবশেষগুলি সেকালের ব্যয়বহুল আস্তাবল সম্পর্কিত লোককাহিনীর সত্যতারই প্রমাণ করে। যেমন সুলায়মান ('আ)-এর আস্তাবলসমূহ, যদিও সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের আলোকে এইগুলি নিছক বিশাল শয্যাগার বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের নিকটতর উদাহরণ, মরক্কোর সুলতান মাওলায় ইসমা'ঈল (নীচে দেখুন)-এর আস্তাবলের বেলায়ও একই কথা সত্য যাহা Fr. Busnot-এর নিকট মনে হইয়াছে প্রাসাদের সুন্দরতম অংশ, অর্ধগোলাকার ছাদযুক্ত পথের দুইটি সারি এক লীগের (প্রায় দেড় ক্রোশ) তিন-চতুর্থাংশ পর্যন্ত লম্বা এবং উহাতে আছে পানি সরবরাহকারী খাল। কেশ-রজ্জু দ্বারা দুইটি রিং-এর সহিত চার পা বাঁধিয়া রাখা অশ্বগুলির তত্ত্ব-তালাবি করিত মুসলিম সহিস ও খৃষ্টান আস্তাবল কর্মচারিগণ (Ch. A. Julien, Hstoire de l'Afrique du nord, প্যারিস ১৯৩১ খৃ., ৫০৪; ইং. অনু., লন্ডন ১৯৭০ খৃ., ২৬০)। আস্তাবল সম্পর্কে প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বে গৃহীত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার একটি পূর্ণাংগ ধারণা মিশনারীদের বর্ণনা হইতে লাভ করা যায়। এই মঠের মত গ্যালারীতে অর্ধগোলাকার ছাদযুক্ত (রিওয়াক) পথে আস্তাবলের প্রকোষ্ঠগুলির (নিম্ন ল্যাটিন stallum from stabulum, 'আরবী শিক্কা, বহুবচন শিকাক) একটিকে অপরটি হইতে নীচু পার্টিশন দ্বারা অথবা কাষ্ঠনির্মিত জাফরী দ্বারা আলাদা করা হইত। এই সব আস্তাবলের ভিতরে আস্তাবলের এক কোণের আড়াআড়ি করা কাষ্ঠখণ্ডের সহিত আটকানো দুইটি রিং-এর মাধ্যমে একটি নমনীয় ফাঁস-রশি (শিকাল, বহুবচন, শুকুল) দ্বারা অশ্বগুলির তিন পা (চার পা নহে) বাঁধিয়া রাখা হইত (আখিয়্যা বহুবচন আখাব', আখায়া ও ইরা, আরিয়্য, বহুবচন আওয়ারী)। অশ্বগুলির শিরা বাঁধিয়া নাকের ডগায় ঝুলানো ব্যাগে বার্লি জাতীয় খাদ্য দেওয়া হইত। শুকনা ঘাসের সহিত খড় ('আলাফ) মিশাইয়া উহাদের জন্য শয্যা রচনা করা হইত। এই ক্ষেত্রে ঘোড়ার জন্য স্থায়ী কোন চাঁড়ি (বড় আকারের মাটির পাত্র) বা দেওয়াল-সংলগ্ন র‍্যাক ব্যবহারের জ্ঞান ছিল না বলিয়া মনে হয়, অথচ ঘোটকবিদ্যা বা অশ্ব পালনের উপর লিখিত 'আরবী গ্রন্থসমূহে আদর্শ আস্তাবলের তাত্ত্বিক বর্ণায় ইহার উপর খুব জোর দেওয়া হইয়াছে (যেমন ইব্‌ন হুযায়ল, দেখুন L. Mercier-এর parure . . .,৩৬৫-৬) যাহা এই বিষয়ে গ্রীকদের মন্তব্যের নিছক পুনরাবৃত্তি বিশেষ (তু. Xenophon, On equitation, অধ্যায় iv)।

যেই সকল ঐতিহাসিক ও কালানুক্রমিক ইতিহাস সংরক্ষক 'আরবী ভাষায় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহারা মুসলিম খলীফা, সুলতান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের আস্তাবল ভবন সম্পর্কে অতি সামান্য তথ্যই পরিবেশন করিয়াছেন। এইসব বিবরণ হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে এই জাতীয় বিক্ষিপ্ত বৃত্তান্তের মধ্যে এমন একটি বর্ণনা আছে যাহা সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে। বিবরণটি হইল কাদী আল-মুহায্যাব-এর প্রতি আরোপিত (মৃ. ৫ম/১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি) কিতাবুয'-যাখাইর-ওয়া'ত-তুহাফ (কুওয়ায়ত ১৯৫৯ খৃ.) গ্রন্থে বর্ণিত 'আব্বাসী খলীফা আল-মুকতাদির বিল্লাহ্‌র বাগদাদে নির্মিত আস্তাবল সম্পর্কিত, যে তথ্যটি মাক্‌রিযী তাঁহার খিতাত গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন। এই বর্ণনাটি ৩০৫/৯১৭ সালে তৎকালীন খলীফার সহিত সাক্ষাতের জন্য সম্রাট ৭ম কন্‌স্টাটাইন প্রেরিত দূত সম্পর্কিত নিম্নের বর্ণনাটি (Arabica, vii/3, ১৯৬০ খৃ.) ২৯৫, এম. হামীদুল্লাহ্‌ কর্তৃক অনুবাদের অংশবিশেষ, যাহার পাণ্ডুলিপি তিনি আবিষ্কার ও সম্পাদনা করিয়াছেন "মুহাররাম মাস শেষ হওয়ার পূর্বে ৬ষ্ঠ দিনে (অর্থাৎ ২৪ মুহাররাম) বৃহস্পতিবার তাগিয়ার (বায়যানটাইনের সম্রাট) দূতগণ ঘোড়া ও তাঁহাদের দোভাষী ইব্‌ন 'আবদি'ল-বাকীকে সংগে লইলেন এবং আস্তাবল (খানু'ল-খায়ল) নামে পরিচিত ভবনে আগমনের জন্য (রাজপ্রাসাদের) বিরাট গণ-প্রবেশদ্বারের করিডোর দিয়া প্রবেশ করিলেন। এই ভবনটির বৃহত্তর অংশ মারবেলের থাম সহযোগে সমান্তরাল

স্তম্ভ দ্বারা গঠিত। উহার এক পার্শ্বে ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত বিভিন্ন ধরনের পাঁচ শত জিন্ (মারকাব) ও পাঁচ শত ঘোড়া, কিন্তু কোন প্রস্তরাবরণ ছিল না। অপর পার্শ্বে ছিল আরও পাঁচ শত অশ্ব, উহাদের প্রতিটি সিল্কের উপর কারুকার্য করা জাঁকালো অশ্বসাজে ও আবরণে ঢাকা ছিল। প্রতিটি অশ্বের তত্ত্বাবধানে ছিল একজন শাকিরিয়া শ্রেণীর (নিয়মিত অশ্বসেনা) সৈনিক।" পাঠকগণ এই বর্ণনাটির সহিত উল্লিখিত Fr. Busnot-এর বর্ণনার সাযুজ্য লক্ষ্য করিবেন, যদিও উহাদের মধ্যে ব্যবধান আট শত বৎসরের এবং ইসলামী বিশ্বের বিপরীত প্রান্তে উহাদের অবস্থা। এইখানেই আস্তাবল সম্পর্কিত স্থাপত্য রীতিতে পূর্বোল্লিখিত রক্ষণশীলতার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বিদ্যমান। রাষ্ট্রীয় হউক অথবা ব্যক্তিবিশেষেরই হউক, আস্তাবল ভবনের জন্য বিস্তীর্ণ এলাকার প্রয়োজন, কেননা শত শত পশুর থাকার প্রকোষ্ঠ ছাড়াও উহাদের জন্য কামারশালা, ঘোড়ার সাজ ও জিন রাখার গুদাম, খড়ের গোলাবাড়ী, ঘোড়ার বিষ্ঠা রাখার স্থান, উহাদের নিয়মিত দৈনিক অনুশীলন ও বালিতে গড়াগড়ি (তামরীগ) দেওয়ার জন্য সংলগ্ন অশ্ব চালার মাঠের প্রয়োজন। অশ্ব চলার মাঠের অভাব হইলে উন্মুক্ত মাঠের (ময়দান) আশ্রয় নেওয়া হইত। এইগুলির সহিত বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের বসবাসের ঘর সংযুক্ত করা হইলে এই জাতীয় আস্তাবলকে নগরীর অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র নগরী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অনুরূপভাবে ইহা স্পষ্ট যে, প্রচুর পানি সরবরাহ আস্তাবলের একটি প্রধান প্রয়োজন। এই কারণে আস্তাবলের জন্য নির্বাচিত স্থান সাধারণ ঝর্ণার নিকটে হইত; সেখান হইতে খাল খনন করিয়া আস্তাবলে পানি দেওয়া হইত।

দামিশ্কের (দ্র. দামিশ্ক্) উমায়্যা খলীফাদের আস্তাবলের স্থান চিহ্নিত করা অদ্যাবধি অত্যন্ত কঠিন। কেননা এমন কি মুকাদ্দাসীর (৪র্থ/১০ম শতাব্দী) প্রমাণানুযায়ীও "...উমায়্যাদের ভবনগুলি ছিল কাষ্ঠ (খাশাব) ও মাটি (তীন) নির্মিত ..." (সম্পা. De Geoje, ১৫৬, অনু. Miquel, ১৬৫)। দামিশ্কের ভূ-বিবরণে পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করিবেন যে, দারু'ল-খায়ল, রাষ্ট্রদূতগণের জন্য সংরক্ষিত সরাইখানা, প্রাক্তন গাস্সানীদের বসতি পাশাপাশি অবস্থিত যাহা প্রথম দিকের মুসলমান অর্থাৎ য়াযীদ ইব্ন আবী সুফয়ান ও তদীয় ভ্রাতা মু'আবিয়া' (রা) ও পরবর্তী খলীফাগণের আবাস স্থলে (আল-কাদরা') পরিণত হইয়াছিল। এই নামকরণ যাহা নিশ্চয়ই 'আরবী, ইহা হইতে মনে করা খুবই সঙ্গত যে, ভবনটি প্রাচীন বায়যান্টাইন আস্তাবলের স্থান পূরণ করিয়াছে, যাহার নাম সম্ভবত 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন মারওয়ান (৬৫/৬৮৫-৮৬/৭০৫)-এর সময়ে অনূদিত হয়। বিভিন্ন উমায়্যা শাসকের আদেশে মরুপ্রান্তে যেসব দুর্গবেষ্টিত আবাসিক ভবন নির্মিত হয় সেগুলির ক্ষেত্রে বলা যায় যে, আস্তাবলের নকশা সঠিকভাবে নিরূপণের মত যথেষ্ট পরিমাণ প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান অদ্যাবধি হয় নাই।

১৪৬/৭৬৩ সনে দ্বিতীয় 'আব্বাসী খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূর যখন বাগদাদে তাঁহার 'গোলাকার নগরী' প্রতিষ্ঠিত করেন তখন উহার সহিত শাসক বা তাহার প্রতিপাল্যদের জন্য আস্তাবল সংযোজন করার ব্যবস্থা ছিল না। সম্ভবত স্থানাভাবের জন্যই তাহা সম্ভব হয় নাই এবং আস্তাবল ও সংশ্লিষ্ট ভবনগুলি নগরীর বহির্দেশে নির্মাণ করিতে হইয়াছিল। "অন্য একটি বসতি এলাকা একদিকে খুরাসান গেইট হইতে তাইগ্রীস নদীর উপর নির্মিত নৌ-সেতু পর্যন্ত, অপরদিকে খুল্দ (প্রাসাদ)-এর বিপরীত বিন্দু পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হইয়াছিল। শেষোক্ত স্থানে রাজকীয় আস্তাবলসমূহ অবস্থিত ছিল। তাহা ছাড়া একটি প্যারেড ময়দান ও তাইগ্রীস নদীর দিকে মুখ করা একটি প্রাসাদও নির্মাণ করা হইয়াছিল। আবূ জা'ফার সব সময় এইখানেই বাস করিতেন। তাইগ্রীসের পূর্বতীরে তাঁহার রুসাফা প্রাসাদ স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত আল-মাহদীও এইখানেই বসবাস করিয়াছেন" (আল-য়া'কূবী/Wiet, Les pays, ৩১)। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ দিকে আরও দূরে কূফা গেইটের বিপরীত পার্শ্বের চতুষ্কোণ আঙ্গিনার দিকে মুখ করিয়াছিল উষ্ট্র-পরিচর্যাকারী কর্মচারীদের প্রধান য়াসীন-এর জন্য প্রদত্ত স্থান; ইহার পাশাপাশি ছিল উষ্ট্রীপালের আস্তাবল। এই আস্তাবলসমূহের পার্শ্বেই ছিল দাসত্ব হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আস্তাবল (ঐ, ২০)।

খলীফা হইবার পর এবং ইতিমধ্যেই রুসাফায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়া খলীফা আল-মাহদী নদীর অপর তীর হইতে প্রশাসন বিভাগকে পুরাপুরি স্থানান্তরের ব্যবস্থা করিলেন। তখন আস্তাবলসমূহকেও স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। অতঃপর আমরা মুখার্রিম বসতি-এলাকার মাওলা নাজী (ঐ, ৪০)-র পরিচালাধীন আস্তাবলসমূহ দেখিতে পাই, যাহাতে ছিল অশ্ব, উষ্ট্র বাহিনী ও হাতীসমূহ। ইহাদের শেষোক্তটি হইতে দারু'ল-ফীল (হাতীশালা)-এর নামকরণ করা হইয়াছে। চিড়িয়াখানা (হায়রু'ল-উহূশ) নামটি ইহারই অনুক্রমণ। এই সরকারী আস্তাবলগুলি বাহ্যত ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুখার্রিম কোয়ার্টারেই অবস্থিত ছিল। আস-সূলী তাঁহার আল-মুত্তাকী-এর খিলাফাত (৩২৯/৯৪০-৩৩৩/৯৪৪) সম্পর্কিত কালানুক্রমিক ইতিহাসে (আখবারু'র-রাদী, অনু. M. Canard, ৩০ ও n ৬) এই আস্তাবলগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন রা'য়িক-কে গদিচ্যুত করার লক্ষ্যে কূরানকিজের নেতৃত্বে দায়লামীদের বাগদাদ আক্রমণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, অবশেষে ২৫ যু'ল-হি জ্জা, ৩২৯/২০ সেপ্টেম্বর, ৯৪১ সালে আক্রমণকারী ও তাহাদের নেতাকে আস্তাবলে হত্যা করা হয়। ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কালক্রমে সালজূক তুগরিল বেগ কর্তৃক ৪৪৮/১০৫৬ সনে ভবনগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মুখার্রিম ও দারু'ল-ফীল-এর দুর্গ প্রাচীর ভেদ করার জন্যই এই ভবনগুলি ধ্বংস করা হইয়াছিল। ইহার একাংশ পরে একটি সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

চমৎকার অশ্বারোহী খলীফা আল-মু'তাসিম (দ্র. কুশাজিম, মাসায়িদ . . . , বাগদাদ ১৯৫৪ খৃ., ৫ ও F. Vire-এর অনুবাদ Art De Volerie, in Arabica, xii/২, ১১৯) যখন সামার্রার উদ্দেশে ২২৩/৮৩৮ সনে বাগদাদ ত্যাগ করিলেন, তখন তিনি তাঁহার নিজের ও তাঁহার পরিবারের আস্তাবলসমূহকে নিতে ভুলেন নাই। ঐতিহাসিক আল-য়া'কূবীকে ধন্যবাদ যে (পূ. গ্র., ৫২), তাঁহার মাধ্যমে আমরা জানিতে পারি, এই আস্তাবলগুলিকে সারীজা শহরের প্রধান এভিন্যুর (the decumanus of the city) পাশে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। " . . . . খুরাসানী অফিসারগণকে প্রদত্ত অনুদান (ভূমি)-সমূহও এই এভিন্যুতে অবস্থিত ছিল। যেমন হিযাম ইব্ন গালিবকে প্রদত্ত ভূমি হিযামের প্রাপ্ত স্থানের পিছনেই খলীফার ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যবহৃত অশ্বসমূহের আস্তাবল অবস্থিত ছিল। উহাদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হিযাম ও তদীয় ভ্রাতা য়া'কূবের উপর ন্যস্ত ছিল।" [এই ক্ষেত্রে য়া'কূবীর পাণ্ডুলিপি পাঠে একটি ভুলের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত হইবে। কেননা বাস্তবে ইহা ছিল আখী খায্যামামক বিখ্যাত এক ব্যক্তির প্রশ্ন, যাঁহার

কাজসমূহ তাঁহার পুত্র য়া'কূব কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত হইয়াছিল (পরে দ্র.)। আখী (দ্র.) নামক নাইটতুল্য (Knightly) উপাধির কারণেই ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা ইতিমধ্যেই খলীফার কন্সটেবল (Comes stabuli) হিসাবে তুর্কী 'খায্যাম' বহন করিতেছিলেন। খলীফা আল-মু'তামিদ (২৫৬/৮৭০-২৭৯/৮৯২) সামাররা ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত এই প্রকাণ্ড আস্তাবলসমূহ বিদ্যমান ছিল। খলীফার আস্তাবল ছাড়াও বাগদাদে মালিকদের মর্যাদানুসারে বিভিন্ন আকারের আস্তাবল ছিল, বিশেষ করিয়া আবাসিক এলাকার বিলাসবহুল বাড়ীর সন্নিকটে এইগুলি পরিদৃষ্ট হইত। খলীফা মাহদীর অনুকরণে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ তাইগ্রীস নদীর পূর্বতীরে আস্তাবলগুলি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ৫ম/১১শ শতকে ইব্ন 'আকীল (মৃত্যু ৪৬৩/১০৭১) (ইব্নু'ল-জাওযী রচিত মানাকিব বাগদাদ, ১৩৪২/ ১৯২৩) এই প্রাচুর্যপূর্ণ কোয়ার্টারসমূহ ও আত্-তাক হইতে তাইগ্রীসের তীর পর্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে উহাদের ধ্বংসাবশেষের বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন, " . . . . সড়কসমূহের বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, উহাদের একটি তাইগ্রীসের পাশ ঘেঁষিয়া চলিয়া গিয়াছে। উহার এক পার্শ্বে এমন কিছু স্থান আছে যেখান হইতে নদীর দৃশ্য দেখা যায় এবং উহারা এইভাবে বিন্যস্ত যে, জাহির বাগ-এর শুরু হইতে সেতু পর্যন্ত সমগ্র পথ জুড়িয়া এইগুলি ছড়াইয়া আছে . . . । রাস্তার অপর পার্শ্বে প্রাসাদসমূহের মালিকদের মসজিদ ও তাঁহাদের সেনাবাহিনীর আবাসস্থল। মসজিদ ও সেনানিবাসের মধ্যস্থলে তাঁহাদের আস্তাবলগুলি অবস্থিত" (G. Makdisi, The topography of eleventh century Baghdad, in Arabica, vi/২, ১৯৫৯ খৃ., ১৮৬)। এই আস্তাবলগুলির আয়তন বিচার করা যাইতে পারে তাঁহার এই সুনির্দিষ্ট বর্ণনা হইতে যখন তিনি বলেন (ঐ, ১৮৭) ঃ " . . . এবং আল-ওয়াফী প্রাসাদ যাহার অশ্বগুলি প্রতিদিন প্রায় এক হাজার রেশন পশুখাদ্য (সামরিক অশ্বের খাদ্য) ভোগ করে।" একই সময়ে কিতাবুলহাবী-এর নামহীন লেখক কর আদায়কারী কর্মকর্তাদের জন্য সঠিক রেকর্ডস্বরূপ উক্ত গ্রন্থে একটি অশ্বের মাসিক খাদ্য ৪০ কাফীয (দ্র.) পশুখাদ্য বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন [দ্র. Cl. Cahen, Problemes economiques de l'Iraq buyide, in AIEO Alger, x (১৯৫২ খৃ.), ৩৩৭]।

কায়রোর ফাতিমী শাসকদের আস্তাবলসমূহ বাগদাদের শাসকবর্গের আস্তাবলগুলির তুলনায় কোন দিক দিয়াই নিকৃষ্ট ছিল না। পবিত্র রামাদান মাসের শেষে অথবা নববর্ষ উপলক্ষে রাজপ্রাসাদের আঙ্গিনায় খলীফার অধিকারভুক্ত অশ্বসমূহের যে মিছিল বাহির করা হইত [দ্র. M. Canard, la Procession . . . in AIEO, Alger, x, (১৯৫২ খৃ.), ৩৭৬ প.] উহার পর্যালোচনা করিতে গিয়া ইব্নু'ত-তুওয়ায়র (নুযহাতু'ল-মুক্লাতায়ন ফী আখ্বারি'দ-দাওলাতায়ন . . .) তাহাদের আয়তন ও বিস্তার সম্বন্ধে একটি বর্ণনা দিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থখানিকে আল-মাকরীযী (খিতাত, ১খ, ৪১৬) ইব্ন তাগীরবিরদী (নুজূম, ৪খ, ৭৯) ও আল-কালকাশানদী (সুবহ্ , ৩খ, ৫০৩) অভিন্ন তথ্যসূত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। এইখানেও শাসনকর্তার সম্মুখে কুচকাওয়াজের জন্য এক হাজার বা ততোধিক অশ্ব বাহির করা হইত। এক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের অবকাশ সত্ত্বেও বাস্তব অবস্থান এই যে, এই সকল আস্তাবলে যথেষ্ট সংখ্যক ঘোড়া মওজুদ ছিল। আয়্যূবী ও সালজূকীদের আমলেরও অবস্থা ছিল অনুরূপ। মাঝে মাঝে এতগুলি পশু রাখার জন্য পর্যাপ্ত স্থান পাওয়া যাইত না, তখন অশ্বের মালিকগণ প্রাচীন প্রাসাদসমূহ ভাঙ্গিয়া সেখানে আস্তাবল নির্মাণ করিতে দ্বিধা করিতেন না (খিতাত, apud De Sacy, Chrestomathie, ii, ৪৪)।

শহর-নগরের এই বৃহদাকার আস্তাবল ছাড়াও ডাক ও তথ্য বিভাগ (বারীদ)-এর অধীনে ন্যস্ত মুসলিম সাম্রাজ্যের সকল প্রধান সড়কে অবস্থিত ডাকঘর (সিক্কা)-সমূহেও অনেক আস্তাবল ছিল। এই বিভাগটি উমায়্যা ও 'আব্বাসী আমলে সক্রিয় ছিল, কিন্তু আয়্যূবী আমলে উহা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সুলতান বায়বার্স্ (দ্র.) এই বিভাগটিকে সামগ্রিকভাবে পুনর্গঠিত করেন এবং বিভাগীয় আস্তাবলসমূহও পুনঃনির্মাণ করেন (দ্র. J. Sauvaget, La poste aux chevaux dans l'empire des Mamelouks, Paris 1941)। তদুপরি মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্তে নির্মিত দুর্গ ও কেল্লা (হিস্ন, কাল'আ)-গুলিতে এবং ক্রুসেডারদের ঝটিকা আক্রমণ প্রতিরোধার্থে নির্মিত সিরিয়ার দুর্গ ও কেল্লাসমূহেও তাহাদের নিজস্ব যোদ্ধাশ্ব ও মালবাহী পশুর আস্তাবল ছিল (দ্র. উসামা ইব্ন মুনকিয-এর ই'তিবার, ৪৬, ৬০)।

ইহা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতীয়মান হইবে যে, এই প্রতিষ্ঠাগুলির জন্য যোগ্যতার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত প্রচুর সংখ্যক লোকের প্রয়োজন ছিল। এই শ্রেণীর সর্বনিম্ন সোপানে ছিল আস্তাবল রক্ষক (Stable Boy) বা বালক (গুলাম)। তাহার দায়িত্ব ছিল খোঁয়াড়গুলি পরিষ্কার রাখা এবং ঘোড়ার মল পরিষ্কার করা। তাহার উপরে ছিল সহিস (সা'ইস, বহুবচন সুওওয়াম, সাসা, সিয়াস ও রাবী বহুবচন রুওয়াত), তাহার দায়িত্ব ছিল এক বা একাধিক অশ্বের পরিচর্যা, দৈনিক অনুশীলনের মাঠে ও পানির পাত্রের নিকট অশ্বকে লইয়া যাওয়া। মনে হয় অশ্বের সাজসজ্জাকারীর (শাদ্দাদ) ইহা ছিল বিশেষ কার্যক্ষেত্র। এতদুপরি সে প্রভুর ব্যবহারোপলক্ষে অশ্বকে প্রস্তুত করিয়া দিত। এই অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার কার্যকারিতার সামগ্রিক দায়িত্ব 'কন্সটেবল' বা আস্তাবল প্রধানের (সামগ্রিক দায়িত্ব 'কন্সটেবল' বা আস্তাবল প্রধানের (সাহিবু'ল-ইসতাবাত) উপর ন্যস্ত ছিল। সময় ও অঞ্চলানুসারে এই ব্যবস্থায় একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কার্যালয় জড়িত ছিল। সেই অফিসের প্রধানকে (কায়্যিম, মুদাব্বির, মুতাওয়াল্লী, উসতায', মুসরিফু'ল-সি তাবলাত) অশ্ববিদ্যার সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইত। এতদ্ব্যতীত প্রশাসক হিসাবে দক্ষ, পশুখাদ্যের পরিমাণগত ও গুণগত মান এবং উহার সঠিক বন্টন ও পশুখাদ্য ক্রয়পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত ছিল। কোন প্রতারণা ও অপচয় সর্বপ্রজন্মের মানুষেরই সাধারণ দোষ। সে নিজে যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে আস্তাবল প্রধান একজন পশুচিকিৎসক (বায়তার দ্র.)-এর সাহায্য নিতেন। তাহাকে অশ্বসমূহের বিভিন্ন প্রকার রোগের চিকিৎসা, জরুরী শৈল্য চিকিৎসা ও অশ্বগুলির প্রসব করানোর কাজে ব্যস্ত রাখা হইত। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ আস্তাবলে একটি অশ্ব পালন প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকিত, যাহাতে উৎকৃষ্ট প্রজাতির ঘোড়া উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন ও অশ্বের মওজুদ অক্ষুণ্ণ থাকে। ইসলামী নীতি অশ্বের মুখচ্ছেদ অনুমোদন করে নাই। কেননা সুনির্দিষ্ট হাদীছ মুতাবেক মহানবী (স ) আনুষ্ঠানিকভাবে উহার বিরোধিতা করিয়াছেন (দেখুন L. Mercier, পূ. গ্র., ৪১ এবং টীকা)।

আস্তাবলসমূহের ব্যবস্থাপনা একটি সূক্ষ্ম ও কঠিন কাজ ছিল। এই কারণে কেবল বিশেষজ্ঞগণকেই আস্তাবলের দায়িত্ব দেওয়া হইত। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে নিজের সন্তানদেরকে শিক্ষিত

করিয়া তাহাদেরকে উত্তরসুরি হিসাবে রাখিয়া গিয়াছেন, যেমন খুত্তালীগণ (বাগদাদের নিকট খুত্তাল গ্রামের অধিবাসী)। তাঁহাদের প্রথম পুরুষ আখী খায্যাম ইব্ন গালিব খলীফা আল-মু'তাসিম-এর আস্তাবলের কন্সটেবল ছিলেন। পরবর্তী কালে আমরা তাঁহার পুত্র আবূ য়ূসুফ য়া'কূ ব এবং তারপর তাঁহার দুই পৌত্র আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ও আহমাদকে আল-মু'তাদিদের আমল পর্যন্ত (২৭৯/৮৯২-২৮৯/৯০২) একই পদমর্যাদায় সমাসীন দেখিতে পাই। এই একটিমাত্র পরিবারের সদস্যগণ সম্মিলিত রচনা হিসাবে অশ্বারোহণ কৌশল, অশ্ব চিকিৎসা ও অশ্বপৃষ্ঠে অস্ত্রধারণ সম্পর্কিত অনেক উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ রাখিয়া গিয়াছেন—যেগুলি পরস্পর মিলাইয়া দেখা ও প্রকাশনার যোগ্য (দ্র. Brockelmann, ২৪৩-৪, ও SI, ৪৩২-৩ যাহার সংশোধন প্রয়োজন ঃ L. Mercier, op. cit., xii-xiii, ৪৩৩-৬)। আল-বায়তারু'ন্-নাসিরী নামে পরিচিত মামলূক ইব্নু'ল-মুনযির কর্তৃক রচিত নিবন্ধসমূহ সমধিক পরিচিত ; কেননা ইহা অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক নিজে মিসরের সুলতান আন-নাসির মুহাম্মাদ ইব্ন কালা'উন (৬৯৩/১২৯৪-৭৪১/১৩৪১)-এর আস্তাবল ও অশ্বপালন খামারের নিয়ন্ত্রক ছিলেন।

এই জমকালো আস্তাবলসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অজস্র অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইত। এই অর্থ কর্মচারীদের বেতন, সাজ-সরঞ্জামের খরচ, সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বেদুঈন প্রজনকদের নিকট হইতে পশু ক্রয় করার কাজে ব্যয়িত হইত। আস্তাবলসমূহের নিরবচ্ছিন্ন ও বিচিত্র প্রয়োজনে ও সুষ্ঠু লাভজনক ব্যবসার সূত্র হইতে স্থানীয় ও ব্যক্তিগতভাবে অসংখ্য কারিগর লাভবান হইয়াছে। 'আব্বাসী খলীফাগণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত আস্তাবলের খরচ নিজস্ব কোষাগার হইতে নির্বাহ করিতেন, যাহা খলীফা আল-মানসূর, আল-মাহ্দী ও আল-হাদীর অধীনে বায়ত মালি'ল-মাজালিম হইতে সরবরাহ করা হইত। আর-রাশীদ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ এই ব্যয় নির্বাহের জন্য দীওয়ানুন-নাফাকাতিল-খাস্সা-এর আশ্রয় লইয়াছেন (দ্র. D. Sourdel, Vizirat, ৫৯৫-৬)। শাসনকর্তা দীওয়ানু'ল-আহশাম হইতে কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হইত (দ্র. আল-য়া'কূবী/Wiet, ১৫)। পরবর্তী কালে আল-মুতাওয়াক্কিলের অধীনে এই খরচ দীওয়ানু'ল-মাওয়ালী ওয়া'ল-গিলমান কর্তৃক নির্বাহিত হইত।

রাষ্ট্রীয় আস্তাবলগুলির ব্যয় দীওয়ানু'ল বারীদ-এর উপর নির্ভর করিত এবং দীওয়ানু'ল-আহ্রা'-এর বাজেট হইতে সেই অর্থ যোগানো হইত। বুওয়ায়হীগণের আমলেও এই সংগঠনটির কোন সুদূর প্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। ফাতিমীদের যুগে মিসরে আমরা একই বাজেট বিভাগ দেখিতে পাই, যদিও ভিন্ন পরিভাষায়। খলীফাদের ব্যক্তিগত ব্যয় দীওয়ানু'ল-মাজলিস হইতে নির্বাহ করা হইত। রাষ্ট্রীয় আস্তাবলসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ একটি বিশেষ বিভাগের উপর নির্ভরশীল ছিল, ঐ সময়ে যাহা ছিল দীওয়ানু'ল-ইসতাবলাত অর্থাৎ আর্থিক প্রশাসনের (দীওয়ানু'ল-আম্ওয়াল) ১৪টি বিভাগের ১৩ম বিভাগ। আয়্যূবী আমীরাতসমূহে নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি কিছু মাত্রায় অনির্দিষ্ট ছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, সামগ্রিকভাবে আস্তাবলসমূহের দায়িত্ব দীওয়ান বি'ল-বাব-এর নিকট প্রদান করা হয়। অবশেষে কঠোরভাবে সামরিকীকৃত মামলূক প্রশাসনে সুলতানের ব্যক্তিগত আস্তাবলগুলি দীওয়ানু'ল-খাসস-এর সহিত অন্তর্ভুক্ত হয় আর রাষ্ট্রীয় আস্তাবলের দায়িত্ব অর্পিত হয় বারীদ-এর উপর। বায়বারস (৬৫৯/১২৬১) রাজনৈতিক ও রণকৌশলগত কারণে বারীদ বিভাগকে পুনর্গঠিত করিয়া একান্ত সচিবের (কাতিবু'স্-সিরর্) নিয়ন্ত্রণাধীনে ন্যস্ত করেন। এই রাজনৈতিক সংগঠনটি পরবর্তীকালে তায়মূর (৮০৩/১৪০০)-এর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া যায়।

ইসলামের ঘটনাবহুল ইতিহাসে ঘোড়া ও উট যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছে তাহা মনোযোগ এড়াইয়া গিয়া না থাকিলে নিদেনপক্ষে ইহাই মনে হয় যে, এই বিষয়ের উপর যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারা সেই ভূমিকাকে অবহেলা করিয়াছেন। এই কারণে সক্রিয়ভাবে সমৃদ্ধিশীল হইলেও মুসলিম আস্তাবল সম্পর্কিত তথ্যের অপ্রতুলতায় কেহ বিস্মিত হয় না। ইসতাব্ল্ শব্দটির বিদ্যমানতা এবং বর্তমানকালে নিকট প্রাচ্য ও মিসরের 'আরবী ভাষায় ইহার ব্যবহার এই বাস্তব ঘটনার সুস্পষ্ট প্রমাণ (দ্র. Cl Denizeau Dictionaire . . . , প্যারিস ১৯৬০ খৃ.)।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** মূল রচনায় প্রদত্ত বরাতগুলির সহিত বিশ্বকোষ জাতীয় রচনা এবং কালানুক্রমিক ইতিহাসের প্রধান গ্রন্থসমূহ হইতে কিছু ক্ষুদ্র তথ্য সংগ্রহ করিয়া সংযোজন করা যাইতে পারে।

**(২) স্পেন মাগরিব ঃ** ইসতাব্ল শব্দটি বর্তমানে উত্তর আফ্রিকায় প্রচলিত আরবী পরিভাষায় প্রচলিত নাই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু স্পেনীয় উপভাষায় ইহা অবশ্যই প্রচলিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে ভ্যালেনসিয়া (Valencia) রাজ্যের ৭ম/১৩শ শতাব্দীর উপভাষার উপর রচিত Vocabulista in Arabico নামক গ্রন্থে সম্পাদক C. Schiaperelli (Florence ১৮৭১ খৃ.) ল্যাটিন শব্দ Stabulum-এর অনুবাদ শুধু ক্লাসিক্যাল ইসতাব্ল্ই করেন নাই, বরং উপভাষার শব্দ বলিয়া অনূদিত শব্দের পাঠান্তরও অনুবাদ করিয়াছেন, সাবাল, বহুবচন, সূবূল। মাল্টাবাসীদের ভাষায় স্তাবাল (stabal) শব্দটি দেখা যায়, কিন্তু ইহা হয়ত কোন রোমান ভাষা হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে।

একই Vocabulista গ্রন্থে ইসতাব্ল্ শব্দের সমার্থক হিসাবে domus magna stabuli-এর টীকাসহ রিওয়া, বহুবচন আরবিয়াহ-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। ৯ম/১৫শ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে গ্রানাডায় প্রকাশিত 'আরবীর ক্ষেত্রে P. de Alcala গ্রানাডীয় ইমালায় উচ্চারিত এই শেষ শব্দটিকে শুধু স্বীকৃতি দিয়াছেন রিবী, বহুবচন আরবিয়া (সম্পা. De Lagarde, ১৪৫, ২৪৫)।

মাগরিব অর্থাৎ মরক্কো হইতে তিউনিসিয়া পর্যন্ত এলাকায় বর্তমান কালের আঞ্চলিক 'আরবী ভাষায় রওয়া শব্দটি বিভিন্ন বহুবচনসহ (রবীয়া, রওয়ায়াত) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল দেশে সর্বদা এই শব্দটি দ্বারা কোন আচ্ছাদিত স্থান বুঝানো হয়, যাহা খচ্চর অথবা ঘোড়ার মত মূল্যবান বাহনের জন্য আশ্রয় হিসাবে তৈরী করা হয়।

৪র্থ/১০ম ও ৫ম/১১শ শতাব্দীর উমায়্যা শাসিত স্পেনের সওয়ারী ঘোড়া ও বোঝাবাহী (আল-ইসতাবলাত লি'ল-জাহ্র ওয়া'ল-কিরা') পশুর জন্য নির্মিত রাজকীয় আস্তাবলসমূহের কিছু বিশদ বর্ণনা আমাদের নিকট বিদ্যমান। উহাদের প্রতিটিতে এক হাজার যোদ্ধাশ্ব থাকার ব্যবস্থা ছিল। ১ম হাকামের দুইটি আস্তাবল ছিল যেইগুলি তাঁহার কর্ডোভার প্রাসাদের নিকটে নির্মিত হইয়াছিল। উহাদের আরোহিগণ 'আরীফ' উপাধিধারী একজন অফিসারের নির্দেশাধীনে এক শতজনের এক একটি স্কোয়াড্রনে বিভক্ত ছিল। সমগ্র অশ্বারোহী বাহিনী কাইদু'ল-খায়ল বা কা'ইদু'ল-আ'ইন্না নামে পরিচিত একজনের নির্দেশাধীন ছিল। নামসর্বস্ব সুলতান ২য় হিশামের 'প্রাসাদের মেয়র' প্রখ্যাত আল-মানসূরের অধীনে বার হাজার নিয়মিত অশ্বারোহী সৈনিক ছিল।

আস্তাবলগুলির প্রধান নিয়ন্ত্রক বা আস্তাবল প্রধানকে 'সাহিবু'ল-খায়ল' নামে ডাকা হইত। অপর একজন অফিসার ('আরীফ) ভারবাহী পশু, অশ্ব ও খচ্চরের (খায়লু'ল-হুমলান, যাওয়ামিল) দায়িত্বে ছিলেন। ভিন্ন একজন অফিসার পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত উটের দায়িত্বে থাকিতেন।

সেভিল (Seville)-এর উজানে অবস্থিত গোয়াদেল কুইভার (Guadel Quivir)-এর সবুজাস্তীর্ণ দ্বীপসমূহে অবস্থিত ছিল অশ্ব প্রজনন খামারগুলি ; উত্তর আফ্রিকা হইতেও বিখাত যিনিত (Jinetes) নামক ঘোড়া আমদানী করা হইত। এই নামটি যানাত নামক স্থানের বার্বার গোত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

নাসরী আমলের গ্রানাডার ক্ষেত্রে P. Alcala (পূ. গ্র., ২৪৫) 'কা'ইদু'র-রিভী' খিতাব প্রদান করেন। মেকনেস (Meknes)-এ ১০৮৯/১৬৭৮, মাওলায় ইসমা'ঈল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত আস্তাবল সম্পর্কে উপরে দেখুন।

বিংশ শতাব্দী শুরু হওয়ার পূর্বে মরক্কোর রাজপ্রাসাদের বহিরাঙ্গন—কর্মচারীদের মধ্যে মাওয়ালীন আর-রাওয়া 'আস্তাবলের লোক' নামে পরিচিত একটি বিশেষ বাহিনী (corps) অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাহারা শাসনকর্তার অশ্ব ও খচ্চরগুলির দেখাশুনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল। সহিসদের (একবচন রূওয়ায়) সংগে আস্তাবল কর্মচারীরা কাজ করিত। তাহাদের দায়িত্ব ছিল আস্তাবলসমূহ পরিষ্কার করা (কিন্নাস) অথবা গভীর পানিতে পশুগুলিকে গোসল করানো ('আওয়াম)। নির্দিষ্ট আস্তাবল কর্মিগণ (সাইস অথবা সিয়্যাস) বিশেষভাবে ঘোড়ার প্রশিক্ষণের কাজে নিজদেরকে ব্যস্ত রাখিত। সমগ্র মরক্কো ব্যাপিয়া 'আয'ীর নামে পরিচিত বিস্তীর্ণ চারণভূমির মালিক ছিলেন সেই দেশের শাসনকর্তা। বিদ্রোহী গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর তাঁহার ঘোড়াগুলিকে এই সব চারণভূমিতে চরিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এই ভূমিগুলির কতক অশ্ব প্রজনন খামার হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

যথাযথভাবে বলিতে গেলে সহিস বাহিনীর সংগে সংযুক্ত ছিল ঃ ১। মালপত্র পরিবহনের দায়িত্বপ্রাপ্ত খচ্চর চালকদল (হাম্মারা), ২। উষ্ট্র চালকদল (জাম্মালা), ৩। উৎসবাদিতে ব্যবহৃত বিশেষ গাড়ী [কূ দশী ; স্পেনীয় কোচ্ (coche) অথবা 'আরাবা হইতে উৎপন্ন ] অথবা শাসক ও তাঁহার হারেমের মহিলাদের ভ্রমণকালে ব্যবহৃত শিবিকার (পালকির মত) [মহাফ্ফা] দায়িত্বে নিযুক্ত চাকরগণ।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) উমায়্যাদের অধীনস্থ স্পেনের জন্য —(১) E. Levi-Provencal, L'Espagne musulmane auXe siecle, ৫৫, ১৩৩, ১৪১, ১৪৫ ; (২) ইবনু'ল-খাতীব, আ'মালু'ল-আ'লাম, সম্পা. Levi-Provencal, ১৯৩৪ খৃ., ৭০, ১১৫-৯; (৩) মেকনেসের আস্তাবলের জন্য দেখুন আহমাদ আন-নাসিরী, কিতাবু'ল ইস্তিকসা, কায়রো ১৩১২ হি., iv ২৫ ; ঐ, trans. Fumey, i, ৭২; (৪) Busnot, Histoire du rene de Mouley Ismael, Rouen ১৭১৪ খৃ., ৫৬-৯ ; (৫) Sources inedites de l'histoire du Maroc, 2e serie, France, iv, ১৮৯, ৬৮৯; (৬) Windus, A Journey to Mequinez, লণ্ডন ১৭২৫ খৃ., ১৭৪ ; (৭) আধুনিক কালের মরক্কোর জন্য E. Aubin, Le Maroc d'aujourd'hui, 198, 200 ; (৮) Archives Marocaines, v/6, ৩০৮; (৯) W. Marcais, Textes arabes de Tanger, ৩১৪; (১০) G. S. Colin, Chrestomathie marocaine, ২০৯।

নিবন্ধক ঃ G. S. Colin

(৩) **উছ মানী বংশ** ঃ (দেখুন মীর আখুর)

(৪) **পারস্য** ঃ খিলাফাতের ভাঙ্গনের যুগে পারস্যে যে সকল রাষ্ট্র স্বায়ত্তশাসিত এবং পরে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে অভ্যুদয় ঘটে সেই রাষ্ট্রগুলি তৎকালীন পরিস্থিতিতে যতদূর সম্ভব 'আব্বাসী প্রাসাদ-প্রশাসনের অনুকরণ করিতে সাধারণভাবে সচেষ্ট ছিল। এই কারণে ইহা সম্ভব যে, দক্ষিণ ও পশ্চিম ইরানের ট্রান্স-অক্সনিয়া ও খুরাসানের সামানীদের মত রাজবংশগুলির রাজদরবার সংলগ্ন স্থানে রাজকীয় আস্তাবল বিদ্যমা ছিল—যদিও এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু খুব কমই জানা গিয়াছে। অনেক কারণে রাজকীয় আস্তাবল প্রতিষ্ঠানটি অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। পেলো জাতীয় খেলা ও শিকারের জন্য বাহন হাতের কাছেই রাখিতে হইত, শিকার শুধু খেলা বা আধাসামরিক ক্রিয়াকলাপই ছিল না, বরং রাজদরবারের খাদ্য সরবরাহের সহিত সংযুক্ত হওয়ার মত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপারও ছিল। [ এখান হইতেই আমরা খাওয়ারাযম্ শাহদের অধীনে পশু ও বাজ পাখী শিকারের দায়িত্বে নিযুক্ত 'আমীর শিকার' (শিকারের কমান্ডার)-এর কথা শুনিতে পাই। সাফাবীদের সময়ে আমীর শিকার-বাশী ছিলেন একজন উচ্চ পদস্থ কমান্ডার, যিনি নিজের অফিসকে প্রাদেশিক গভর্নর পদের সহিত সংযুক্ত করিতে পারিতেন। আসতারাবাদ-এর একটি উদাহরণের জন্য দেখুন (১) H. Horst, Die Staatsverwaltung der Grosselguqen und Horazmsahs (১০৩৮-১২৩১); (২) Wiesbaden ১৯৬৪ খৃ., ১৯, ১০২ ; (৩) K. M. Rohtborn, provinzen und Zentralgewalt Persiens im 16. und 17. Jahrhunderts, Berlin ১৯৬৬ খৃ., ২৭ ; (৪) তাযকিরাতু'ল-মুলূক, সম্পা. Minorsky, ch. xiii=tr. ৫১]। তাহা ছাড়া শাসকের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের বাহনের সূত্র হিসাবেও রাজকীয় আস্তাবলগুলিকে ব্যবহার করা হইত। এই দেহরক্ষী বাহিনী সাধারণত তাঁহার সশস্ত্র ক্রীতদাসগণের দ্বারা গঠিত হইত। পরিশেষে সর্বদা হাতের কাছে বেশ কিছু সংখ্যক ঘোড়া রাখিতে হইত। কেননা বিদেশী রাজন্যবর্গের জন্য প্রেরিত উপঢৌকনের সহিত মাঝে মাঝে উত্তম ঘোড়া (এবং পূর্ব ইরানের কোন কোন রাজন্যের ক্ষেত্রে হস্তীও) ও অন্যান্য রাজপুরুষ বা গভর্নরদেরকে পাঠান হইত সম্মাজনক জোব্বা ও পতাকাসহ অফিসের প্রতীক হিসাবে (দেখুন হিবা)।

গাযঠাবী (দ্র.) শাসকগণের অধীনে সুলতানের আস্তাবলের দায়িত্বে নিযুক্ত অফিসার আখুর-সালার অথবা আমীর-ই আখুর সাধারণত রাজপ্রাসাদের ক্রীতদাসদের (গুলাম) জেনারেল বা সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। গাযঠাবী শাসকগণ সামরিক উদ্দেশে ব্যাপকভাবে হাতী ব্যবহার করিয়াছেন (দ্র. যুদ্ধের পশু হিসাবে ফীল)। গযনীতে ঘোড়ার জন্য আস্তাবলের মত একটি পিলখানাও ছিল, যাহাতে এক হাজার হাতীর সংকুলান হইত। হাতী পরিচর্যার জন্য হিন্দু কর্মচারী ছিল (Bosworth-এর The Gaznavids, their empire in Afganistan and eastern Iran, ৯৯৪-১০৪০, ১১২, ১১৩, ১১৭)। রাজকীয় আস্তাবলের কর্মকর্তাগণকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশেও দেখা যাইত, যেখানে ঘোড়াগুলি প্রজনন ও চারণের জন্য পাঠানো হইত। উদাহরণস্বরূপ

খুত্তাল ও তুখারিস্তানের উজান অক্সাসের পার্শ্ববর্তী অশ্ব পালন অঞ্চলসমূহের নাম করা যাইতে পারে (দ্র. Spuler, ইরান, ৩৯২)।

রায়, ইসফাহান ও মার্ব-এর মত কিছু শহর ছিল মহাসালজূক সুলতানগণের স্থায়ী সরকারী কেন্দ্র, যদিও প্রদেশসমূহের মধ্য দিয়া সুলতানের অগ্রযাত্রার সময় অথবা যুদ্ধরত অবস্থায় দারগাহ বা রাজদরবার সুলতানের অনুষংগী হইত (তু. Lambton, in Cambridge history of Iran, v., ২২২-৩)। সানজার ও সম্ভবত অন্যান্য সুলতানের ব্যক্তিগত বিশাল অশ্বপাল ছিল বলিয়া মনে হয় (ঐ, ২২৬)। নিঃসন্দেহে উল্লিখিত সরকারী কেন্দ্রগুলিতে রাজকীয় আস্তাবল অবস্থিত ছিল। নিজামু'ল-মুল্ক্ বলেন যে, ওয়াকীল-ই খাসস বা রাজকীয় গৃহসরঞ্জামের ব্যবস্থাপকের দায়িত্বসমূহের একটি ছিল আস্তাবলের তত্ত্বাবধান, যদিও তিনি এই অভিযোগও করেন যে, তাঁহার সময়ে এই দফতরটি রীতি-নিয়ম অনুসরণের দিক দিয়া বিশৃঙ্খলায় পতিত হইয়াছিল (সিয়াসাতনামা, অধ্যায় xvi-text সম্পা. Darke, ১১২, অনু. ৯২)। সালজূকদের আমলে রাজকীয় অশ্বপ্রধানকে সাধারণত আমীর আখুর, আখুর বেগ ইত্যাদি উপাধি দেওয়া হইত। তিনি প্রায়ই সুলতানের একজন ক্রীতদাস (গুলাম) কমান্ডার হইতেন। যেমন আখুর সালার কিযিল, শিহানা অথবা ৫৩৬/১১৪১-২ সনে বাগদাদের সামরিক গভর্নর ও সুলতান মাহমূদ ইবন মুহাম্মাদের একজন সাবেক গুলাম, (ইবনু'ল-আছীর, ১১খ, ৮৯, সাদরু'দ-দীন আল-হুসায়নী, আখ্বারু'দ-দাওলা'স-সালজূকিয়্যা, ১১৭)।

ট্রান্স-অক্সানিয়ার কারাখানী বংশের (দ্র. ইলেক খানগণ) অনুরূপ তুর্কী রাজবংশের, যাহার খানগণ অন্তত গরমের মাসগুলিতে অর্ধযাযাবর জীবন যাপন করিত, এমন কোন স্থায়ী আস্তাবল ছিল কিনা ইহা অনিশ্চিত। শামসু'ল-মুলূক নাস্ র্ ইব্ন ইব্রাহীম তামগাচ খান নামক একজন খান (৪৬০/১০৬৮-৪৭২/১০৮০) বুখারার বহির্দেশে শামসাবাদ নামক স্থানে একটি প্রাসাদ কমপ্লেক্স স্থাপন করিয়াছিলেন। নারশাখীর একজন উত্তর পুরুষ উল্লেখ করেন যে, রাজকীয় অশ্ব ও অন্যান্য পশুর জন্য এই প্রাসাদ কমপ্লেক্সের সন্নিকটেই একটি প্রাকারবেষ্টিত স্থান ছিল (গুরুক, দ্র. Radloff, Versuch cincs Worterbuches der Turk-Dialecte, ii, ৫৫৮-৯) [তা'রীখ-ই বুখারা, অনু. Frye, ২৯]। গু'রুক' বা কোরুক (দেখুন প্রাচীন 'আরবী প্রতিষ্ঠান হিমা')। জাতীয় রাজকীয় সংরক্ষণ স্থান পরবর্তীকালে মোংগল খানগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থায়ী ভবনাকারে রাজকীয় আস্তাবল সম্ভবত পারস্য ইতিহাসে কেবল মোঙ্গলদের বিরতির পরই আবার দেখা যায়।

সাফাবী আমলের রাজকীয় আস্তাবলের প্রতিষ্ঠানগুলি Chardin ও Kaempfer-এর ন্যায় য়ূরোপীয় পরিব্রাজক ও পরবর্তী কালে সাফাবী প্রশাসনের ম্যানুয়েল, তাযকিরাতু'ল-মুলূক উভয় কর্তৃক উত্তমরূপে সত্যায়িত হইয়াছে। দ্বিতীয় সূত্রটি (অধ্যায় xv. xvi. xc, xci-অনু. ৫২, ৮৭, মন্তব্য ১২০-১) মীর আখুর বাশী-য়ি জিলাও ও আখুর বাশী সাহা' নামক দুইজন আস্তাবল প্রধানের (Stable Master) মধ্যে পার্থক্য করিয়াছে। প্রথম কর্মকর্তাকে উচ্চতর বেতনধারী হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। মীর আখুর বাশী-য়ি জিলাও [জিলাও-মোংগল "রিন (Rein) যে বস্তু বা ব্যক্তি থামায় লাগাম", দ্র. G. Doerfer-এর Turkiche und Mongolischc Dlemente im Neuperschen, Wiesbaden ১৯৬৩ খৃ., ২৯৬-৭, এখান হইতে জিলাওদার অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাহার প্রভুর আগে অশ্ব চালান করে এবং উহার লাগাম ধারণ করে] রাজধানীতে রাজকীয় আস্তাবলের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। চার্ডিন বলেন যে, ইসফাহানে এই জাতীয় তিনটি আস্তাবল ছিল। এইগুলিতে বহু সংখ্যক কর্মচারী ছিল, যাহাদের সমন্বয়ে নিম্ন পদস্থ মার্শাল (মীর আখুরান), সহিস, পানিবাহক, অশ্ব চিকিৎসক, জিনকার, পশু চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি দলসমূহ গঠিত হইত। যেহেতু রাজকীয় আস্তাবল ছিল রাজদরবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেহেতু আখুর বাশী-য়ি জিলাও কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তিদের নিযুক্তি নাজির বুয়ুতাত বা রাজকীয় গৃহ সরঞ্জামের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক অথবা খাসসা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজনীয় ছিল। মীর আখুর বাশী-য়ি সাহরা' বা অশ্বগুলির দ্বিতীয় কর্মাধ্যক্ষ পল্লী অঞ্চলের অশ্ব বিষয়ক প্রতিষ্ঠান, সাহরা' অর্থাৎ প্রজা খামারে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁহার দায়িত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল নাযি র-ই দাওয়াব্ব বা পশু তত্ত্বাবধায়ক সমভিব্যাহারে পাল ধরানোর অশ্ব ('আরদ-ই ঈলখী)-গুলির বাৎসরিক পরিদর্শন এবং রাজকীয় সংগ্রহশালা (কুরুকাত)-সমূহের ব্যাপারে দৃষ্টি রাখা। আরও উল্লিখিত হইয়াছে ঐ অধ্যায় cxliii, clx-অনু. ৯৭, ১০০, সাহিব জাম' (অর্থাৎ রাজকীয় গৃহস্থালির কোন একটি বুয়ূতাত, বিভাগ অথবা কারখানাগুলির প্রধান) জিনশালার (যীনখানা) এবং কোন একটি আস্তাবলের (ইসতাব্ল্) প্রধান।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ বরাত নিবন্ধ গর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

C. E. Bosworth

(৫) **মুসলিম ভারত** ঃ ইসতাব্ল শব্দটি ভারতীয় ও পারস্য সাহিত্যে কিছুটা অসধারণ, কিন্তু ভারতীয় মুগল [আবু'ল-ফাদ্ল্, আঈন-ই আকবারী, i, ৪৮, ৫৪] ও ৯ম/১৫শ শতাব্দীর মালওয়া সুলতানগণের (ফারিশতা, তা'রীখ, বোম্বে ১৮৩২ খৃ., ২খ, ৪৭৪) রাজকীয় আস্তাবলগুলির সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে। আস্তাবলকে ভারতে সাধারণভাবে ফারসী শব্দ 'পায়গাহ' দ্বারা আখ্যায়িত করা হইয়াছে যাহা অরাজকীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা একটি খানকাহ্-র আস্তাবল যেখানে পরিব্রাজকদের অশ্বগুলিকে বাঁধিয়া রাখা হইত (সিজ্যী, ফাওয়াইদু'ল-ফু'আদ, সম্পা. এম. এল. মালিক, লাহোর ১৯৬৬ খৃ., ৩৪৪ ঃ তু. Barant, তা'রীখ-ই ফীরূযশাহী, ৫৫৪)।

মুসলিম ভারতে রাজকীয় আস্তাবলগুলির নামকরণ ও সংগঠনের মধ্যে গাযনাবীদের মাধ্যমে আগত পূর্ব-ইরানের ঐতিহ্য প্রতিফলিত (দ্র. উল্লিখিত বিভাগ (iv), যদিও মুসলিম ভারতের আস্তাবলসমূহ কিছু পরিমাণ পশু চিকিৎসাবিদ্যা ও নির্দিষ্ট প্রজাতির অশ্ব সম্পর্কিত জ্ঞানেরও উত্তরাধিকারী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বাংশের প্রাচীন হিন্দু শাসকদের বিশাল ও বিচিত্র আস্তাবলগুলির টাংগা (tangan) ঘোড়া (১ম/৭ম শতাব্দীর শাসক হর্ষ-এর জন্য দেখুন Bana, হর্ষচরিত, অনু. F. B. Cowell ও F. W. Thomas, লন্ডন ১৮৯৭ খৃ., ৫০, ২০১)। প্রধান যে সকল উদ্দেশে পারস্যে আস্তাবল রাখা হইত, অনুরূপ কারণে ভারতেও আস্তাবল রাখা হইয়াছে অর্থাৎ সুলতান, তাঁহার পোষ্য ও যথেষ্ট সংখ্যক রাজকীয় গুলাম অথবা সিলাস (celas)-দের বহনের জন্য, এতদ্ব্যতীত ডাক পরিবহন ও উৎসব উপলক্ষে অশ্ব দান অথবা উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণের জন্য আস্তাবল রাখা হইত। সর্বকালে অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান অংশ সেই সকল অশ্বসেনা দ্বারাই গঠিত হইত যাহারা রাজকীয় আস্তাবলের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেদের বাহনগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণে সক্ষম ছিল (দিল্লী সালতানাতের জন্য দেখুন বারানী, ৩০৩,

৩১৩ ; 'আফীফ, তারীখ-ই ফীরূযশাহী, ২২০-১, ৩০১; মুগল আমলের জন্য দেখুন V. Irvine, The army of the Indian Moghuls, লণ্ডন ১৯ ৩ খৃ., ৪৭, ৫১ ; আরও দ্র. ইসতি'রাদ)।

দিল্লী সালতানাত (দ্র.)-এ মীর আখুর (জূয্জানী, তাবাকাত-ই নাসিরী, ২৩২, ২৪২) অথবা শাহ্‌া-য়ি আখুর (জূযজানী, ২৫২) বা আখুর বেগ (বারানী, ১৭৪, ২৪১, ৪২৪, ৫৩৭)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্রের অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল পায়গাহ (কারখানা ঃ 'আফীফ, ৩৩৯-৪০)। মাঝে মাঝে ইহা আখুর বেগ-ই মায়সারা ও আখুর বেগ-ই মায়মানা (ডান ও বাম দল)-এর মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইত (বারানী, ২৪, ৪৫৪)। পায়গাহ্ শব্দটি আস্তাবল ও রাজকীয় ঘোড়া—দুই-ই বুঝাইত এবং বলা যায়, সেইগুলি সুলতানের রাজধানী ত্যাগের সময় তাঁহার সঙ্গী হইত (সিরহিনদী, তা'রীখ-ই মুবারাক শাহী ১০৯)। কথিত আছে, 'আলাউদ্-দীন মুহাম্মাদ শাহ্ খিলজী (৬৯৫/১২৯৬-৭১৫/১৩১৬)-র পায়গাহ-এ সত্তর হাজার অশ্ব ছিল (বারানী, ২৬২)। Circa ১৩৪০ A. D. দিল্লীর সুলতান (Sc. মুহাম্মাদ ইব্‌ন তুগলুক) স্বীয় অনুচরবর্গকে বাৎসরিক দশ হাজার 'আরবী ঘোড়া ও অন্যদেরকে অসংখ্য ঘোড়া বিতরণ করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে (আল-'উমারী, মাসালিকু'ল-আবসার, ৪৬২, সম্পা. কে. এ. ফারিক , দিল্লী ১৯৬১ খৃ., ২৮)। উদাহরণস্বরূপ মুহাম্মাদ ইব্‌ন তুগলুক চীনের সম্রাটকে এক শত ঘোড়া উপহার হিসাবে পাঠাইয়াছিলেন (ইব্‌ন বাতূতা, রিহলা, প্যারিস ১৮৫৩-৭ খৃ., ৪খ, ২)। বাংলার সুলতান সিকান্দারকে ৭৬১/১৩৬০ সনে ফীরূয শাহ তুগলুক পাঁচ শত তুর্কী ও তাজী ঘোড়া দান করিয়াছিলেন ('আফীফ, ১৫৯)। অধীনস্থ সর্দার ও প্রাদেশিক কর্মকর্তাগণ, যাঁহারা আমদানী পথের নিকট অবস্থান করিতেন তাঁহারা সুলতানকে ঘোড়া উপহার দিতেন ('আয়ন-ই মাহরূ, ইনশা'-য়ি মাহরূ, সম্পা. এস. এ. রাশীদ, লাহোর ১৯৬৫ খৃ., ১১১)। কোন কোন ক্ষেত্রে পায়গাহ-এ প্রেরিত ঘোড়ার জন্য কোন একটি দীওয়ান হইতে অর্থ প্রদান করা হইয়াছে (মাহরূ, ২০৪, ২০৭)। অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বাৎসরিক কর হিসাবে ঘোড়া প্রেরণ করা হইত। শামস্ দামগানী যখন ৭৭৮/১৩৭৬ সনে গুজরাটের কর আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তিনি বাৎসরিক দুই শত ঘোড়া প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন (সিহরিনদী ১৩২)। থাট্টা ও সিন্ধুর জামগণ প্রতি বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা মূল্যের ৫০টি অশ্ব প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছিলেন (মাহরূ, ১৮৭)।

৮ম/১৪শ শতাব্দীর শেষার্ধে পায়গাহকে চারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভাগ করা হয়। 'বৃহৎ' পায়গাহ ও অন্য একটি পায়গাহ অবস্থিত ছিল দিল্লী হইতে প্রায় এক শত মাইল দূরে পূর্ব পাঞ্জাবে। তৃতীয় পায়গাহটি ছিল রাজধানীর শাহী প্রাসাদের সংলগ্ন স্থানে (পায়গাহ-ই মাহাল্ল-ই খাসস্)। বার শত অশ্বসম্বলিত চতুর্থ পায়গাহটি রাজকীয় শিকারখানা বা মৃগয়া বিভাগের সংলগ্ন ছিল (পায়গাহ-ই শিকার খানা-য়ি খাসস্)। পঞ্চম পায়গাহটি রাজকীয় ক্রীতদাস ও পোষ্যদের জন্য বাহন সরবরাহ করিত। (পায়গাহ-ই বারগীরদারান-ই বাদাগান-ই খাস স্ ; 'আফীফ, ৩১৮, ৩৪০)। এই সময়কার দিল্লীর পায়গাহ-এ অশ্বপ্রজা সুসম্পর্কিত আধুনিক কালের একটি উল্লিখিত সত্যতা (I. H. Qureshi, The administration of the Sultanate of Delhi[4], করাচী ১৯৫৮ খৃ, ৭০) প্রমাণিত নহে। কিন্তু ইহা ইঙ্গিতসূচক যে, পূর্ব পাঞ্জাবের যে স্থানে বর্তমানে অমুসলিম উপজাতীয়রা বসবাস করে সেখানে বিশাল পায়গাহটি অবস্থিত ছিল ; ইহা অতীতে দিল্লীর সুলতানগণের সামরিক প্রয়োজনে অশ্ব প্রজননের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল (বারানী, ৫২-৩ ; S. Digby, War-horse and elephant in the Dehli Sultanate, Oxford ১৯৭১ খৃ., ২৭-৮)। অনুরূপভাবে পরবর্তী মুসলিম ভারতের রাষ্ট্রগুলিতে পায়গাহ ছাড়াও পীলখানা (হাতীশালা) নামে একটি ভিন্ন ভাগ ছিল। শাহ্‌া-য়ি ফীল নামক একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ইহার প্রধান ছিলেন ('উমারীর মতে ৫১-২; একটি ইকতার সহিত একটি বৃহৎ অঞ্চলের আয়তন যাহা প্রায় ইরাকের সমান, দেখুন ফীল, পীলখানা)। তৈমূর (৮০১/১৩৯৮)-এর আক্রমণের পূর্ববর্তী দশকে রাজধানী শহরের ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে পায়াগাহ্ ও পীলখানার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ গণ্য হইত।

৯ম/১৫শ শতাব্দী ও ১০ম/১৬শ শতাব্দীর পূর্বাহ্নের রাজকীয় আস্তাবল সম্পর্কিত তথ্য অপ্রতুল। অশ্ব চিকিৎসা বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একখানি পুস্তককে ফারসী ভাষায় উপযোজিত করিয়া একখানি ফারাসনামা দাক্ষিণাত্যের ওয়ালী বাহমানী (r. ৮২৫/১৪২২-৮৩৯/১৪৩৬) ৮১০/১৪০৭-৮ সনে আহমাদ শাহ (১)-এর উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয় ; অনুরূপ আরেকখানি পুস্তক উৎসর্গ করা হইয়াছিল গুজরাটের শামসু'দ-দীন মুজাফ্ফার (২)-কে ( r. ৯১৭/১৫১১—৯৩২/১৫২৫) ৯২৬/১৫২০ সালে (এই রচনাসমূহ ও ইহাদের মৌলিক গ্রন্থের ঐতিহ্য সম্পর্কে দ্র. M. Z. Huda, in JASP, xiv, 2, ১৯৬৯ খৃ., ১৪৪-৬৫)। কাশ্মীর সালতানাতে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রাজকীয় আস্তাবলের নিয়ন্ত্রণ অন্তত দুইটি ঘটনার ক্ষেত্রে লাভজনক হইয়াছে (মুহিব্বু'ল-হাসা, Kashmir Under the Sultans, কলিকাতা ১৯৫৯ খৃ., ২০১)। একজন মুসলিম শাসকের অশ্ব ব্যবসায়ী হওয়ার সম্ভবত অদ্বিতীয় নজির স্থাপন করিয়াছেন মালাবার সুলতান। ৮২৫/১৪২২ সনের দিকে সুলতান হুশাং (r. ৮০৮/১৪০৫—৮৩৮/১৪৩৫) জয়নগরের স্পষ্টত উড়িষ্যার পূর্ব গাংগের রাজবংশের ৪র্থ ভানুচন্দ্র) নিজামু'দ-দীন আহমাদ, তাবাক াত-ই আকবারী, ৩খ, ২৯৫-৬ ঃ ফারিশতা, তা'রীখ, বোম্বে ১৮৩২ খৃ., ২খ, ৪৬৬)। রায়-এর নিকট হইতে যুদ্ধহস্তী সংগ্রহের বিনিময়ে দেয় এক পাল মূল্যবান ঘোড়া মধ্যভারতের দুস্তর বিস্তীর্ণ ভূমির মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়াছেন। কিন্তু এই কাহিনীতে লোককথার উপাদান থাকিতে পারে। সুলতান হুশাং যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তদীয় পুত্র গাযনীন খান আস্তাবল হইতে ৫০টি অশ্ব চাহিয়া পাঠান। মীর আখুর এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন, গাযনীনের এই দাবি তাঁহার মুমূর্ষু পিতাকে দুঃখ দিয়াছিল (ফারিশতা, ২খ, ৪৭৪)। দিল্লীর সায়্যিদ ও লোদী সুলতান এবং জওনপুর ও বাংলার সুলতানগণের আস্তাবল সম্পর্কে আমাদের নিকট কোন তথ্য নাই। সুলতান বুহলুল লোদীর (r. ৮৫৫/১৪৫১— ৮৯৪/১৪৮৯) পিতা কালা লোদী একজন অশ্ব ব্যবসায়ী হিসাবেই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাহাড় হইতে ঘোড়া আমদানী করিতেন (মুহাম্মাদ কাবীর, কিসানা-য়ি শাহান-ই হিন্দ, B. M. Add. Ms. ২৪, ৪০৯, Fols. ৭-৯)।

১০ম/১৬শ শতাব্দীর শেষ হইতে মুগল সম্রাট জালালু'দ-দীন মুহাম্মদ আকবারের আস্তাবলসমূহের নিয়ম-কানূনের বিস্তারিত বর্ণনা আমাদের নিকট আছে [আবু'ল-ফাদ্‌ল আ'ঈন-ই আকবারী, ১খ. ১৪০-৬, অনু. H. Blochmann ও D. C. Phillott.,[2] কলিকাতা ১৯২৭ খৃ. (১৯৩৯),

১খ, ১৪০-৫০]। পূর্ব কালের মতই অতি মূল্যবান অশ্বগুলি আমদানী করা হইত প্রধানত মধ্যএশিয়া, ইরান ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল হইতে। আস্তাবল কয়েকটি তাভীলায় বিভক্ত ছিল, যাহার আক্ষরিক অর্থ 'দলসমূহ'। কিন্তু সেইগুলি সম্ভবত ভিন্ন ভিন্ন আস্তাবলে রাখা হইত। সর্বমোট অশ্ব সংখ্যা ছিল বার হাজার। কিন্তু এই সংখ্যার মধ্যে ভারতের দেশীয় জাতের ঘোড়াগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, যেগুলির মধ্য হইতে উন্নততর জাতের অশ্বসমূহকেও সংগ্রহ করা হইত। একজন আমীন-ই কারাভানসারায়-এর অধীনে অশ্ব ব্যবসায়ীদের থাকার ব্যবস্থা করা হইত। সম্রাটের নিজের আরোহণের খাস (খাসসা) ঘোড়াগুলির ছয়টি তাভীলা ছিল। অনুরূপভাবে রাজকুমারদের জন্য কয়েকটি তাবীলা এবং মধ্য এশিয়ার ডাক-পরিবহণের জন্য অশ্বের একটি তাভীলা ছিল ( ? রাহবার-ই তুর্কী নিযহাদ)। মূল্যানুসারে নিম্নমানের ঘোড়াগুলিকেও তাভীলায় বিভক্ত করা হইত। ঘোড়ার শুষ্ক খাদ্য বা জাবের জন্য প্রদত্ত ভাতা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হইত (খাদ্যদ্রব্যের পরিচয়ের জন্য দ্র. D. C. Phillott-এর টীকা অনু., ১৪২-৩)। অশ্বসাজ সংরক্ষণ, জিনের সরঞ্জাম, নাল পরানো, আস্তাবল ও অশ্ব পরিচর্যার সরঞ্জামের জন্য বাৎসরিক অর্থ নির্ধারণ বা বরাদ্দ করা হইত। আস্তাবল বিভাগ (কারখানা) আতবেগি (১৭শ শতাব্দীর সূত্রসমূহে 'আখতাবেগি' বলা হইয়াছে)-এর দায়িত্বে ছিল। এই দফতরটি উচ্চ পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পূরণ করা হইত; যথা 'আবদু'র-রাহীম খানখানান, সেই সময় আকবরের দরবারে প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাভীলার কর্মচারিগণ একজন দারোগা (তত্ত্বাবধায়ক), মুশরিফ (হিসাব রক্ষক) ও দীদাভার (পরিদর্শক)-এর অধীনে পরিচালিত হইত। অন্য কর্মচারিগণ ছিল নিম্নরূপ ঃ আগতাচী (অশ্ব সাজের দায়িত্বে), চাবুকসুভার (ঘোড়ার গতি পরীক্ষক), হাদা (অশ্ব প্রশিক্ষক রাজপুত), মীর দাহা (দশ জন সহিসের ভারপ্রাপ্ত), বায়তার (অশ্ব চিকিৎসক) ও নাকীব। প্রতি দুইটি ঘোড়ার জন্য একজন সাইস (সহিস) নিযুক্ত ছিল। তাভীলায় কর্মরত অন্য কর্মচারীরা ছিল নিম্নবর্ণিত শ্রেণীর ঃ জিলাভদার (দ্র. পূর্বোক্ত বিভাগ iv), না'লবান্দ (ঘোড়ার নাল লাগানোর কারিগর), যীনদার (জিন পরানোর কর্মচারী), আব্‌কাশ (ভিস্তি), ফার্‌রাশ, সিপান্দসূয (বন্য তৃণ দগ্ধকারী) ও খাকরূব (ঝাড়ুদার)।

লিখিত আদেশে দেখানো সাপেক্ষে বারগীর সুভারান (নিম্ন মানের অশ্বারোহী সৈনিক, যাহাদের নিজস্ব ঘোড়া নাই)-গণকে আস্তাবল হইতে ঘোড়া বরাদ্দ করা হইত। আস্তাবল হইতে কোন ঘোড়া চুরি হইলে বা মারা গেলে অথবা অবহেলার কারণে আঘাত পাইলে আস্তাবল কর্মচারিগণকে ভিন্ন ভিন্ন অংকের জরিমানা দিতে হইত। সম্রাট ও রাজপুতগণের আরোহণার্থে আস্তাবল হইতে একদল অশ্বকে পালাক্রমে প্রস্তুত রাখা হইত। কিছুটা অপর্যাপ্ত বা শিথিল হইলেও শুতুরখানা (উষ্ট্রশালা), গাওখানা (গোশালা) ও আস্‌তারখানা (খচ্চরশালা) একই নিয়মের অধীন ছিল (আঈন-ই আকবারী, ১খ, ১৪৬-৫৩)। পীলখানা বা হাতীশালার নিয়ম-কানূন আস্তাবলেরও ঊর্ধ্বে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই বিভাগের (কারখানা) সমমর্যাদাসম্পন্ন একজন প্রধানের অভাব ছিল (দ্র. শাহা-য় পীল of the Dihli Sultanate)। ইহা হয়ত এই ধারণাকেই প্রতিফলিত করে যে, হস্তীবাহিনীকে নির্দেশ প্রদান করা সার্বভৌমত্বের প্রতীক ছিল ('আঈন-ই আকবারী, i, ১২৭-৪০)।

১২শ /১৮শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে মুসলিম শাসিত রাজ্যে যে দুইটি বিষয়ের বিকাশ সাধিত হইয়াছে সে বিষয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন। আসাফজাহী শাসিত হায়দরাবাদে (হায়দারাবাদ) পায়গাহ্-এর আমীরগণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অগ্রগণ্য দলে পরিণত হইয়াছিলেন, ইহা অতি সম্প্রতিকাল পর্যন্ত টিকিয়াছিল। নূতন মুসলিম রাজ্য মায়সূর (মহিশূর)-এ হায়দার 'আলী (r. ১১৭৪/১৭৬১—১১৯৭/১৭৮২) এবং টিপু সুলতান (১১৯৭/১৭৮২—১২১৩/১৭৯৯)-এর শাসনাধীনে অশ্বারোহী সৈনিকদের একটি বিরাট অংশকে রাজকীয় আস্তাবল হইতে বাহন দেওয়া হইত। এই প্রকারের বারগীর অশ্বকে (যে সকল সৈন্যের নিজস্ব বাহন নাই) টিপু সুলতানের পরিভাষায় "সুভার 'আসকার" এবং সেই আমলের বৃটিশ সূত্রে "আস্তাবল ঘোড়া" (stable horse) ও "নিয়মিত অশ্বারোহী সৈনিক" (regular cavalry) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে (M. H. Gopal, Tipu Sultan's Mysore, বোম্বে ১৯৭১ খৃ., ২৮-৬২; W. Kirkpatrick, Select Letters of Tippoo Sultan, লন্ডন ১৮১১ খৃ.; W. Miles, A history of the Hyder Naik, লন্ডন ১৮৪২ খৃ., ১৭৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে। যেই সকল মৌলিক গ্রন্থের বরাতে তারিখ ও প্রকাশার স্থান উল্লেখ করা হয় নাই সেইগুলি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত বিব্‌লিওথিকা ইন্‌ডিকা সিরিজের অন্তর্গত।

S. Digby (E. I.[2])/আ. জ. ম. সিরাজুল ইসলাম হুসাইনী

**ইস্‌তার** ঃ ঔষধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা; স্বর্ণকার ও জহুরীদের দ্বারা ব্যবহৃত ওজন পদ্ধতিকে ইস্‌তার বলে। শব্দটি গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত। সাধারণভাবে বিভিন্ন মাপনী অনুসরণ করিয়া ইহার মূল্যমান নিরূপণ করা হয়। প্রথম মাপনীতে এই অনুপাত পাওয়া যায় ঃ ১. ই্তার-৬ দিরহাম ও ২ দানাক -৪ মিছকাল (ঔষধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতার ওজন নির্ধারক)। অন্যপক্ষে ১ ইস্‌তার বলিতে আমরা পাই $৬\frac{১}{২}$ দিরহাম-৪ $\frac{১}{২}$ মিছকাল (তদানীন্তন প্রাচ্য দেশে ইহাই ছিল বাণিজ্যিক ইস্‌তার)। প্রথম সমীকরণটি তখনই শুদ্ধ হইতে পারে যখন দিরহাম মুদ্রা ও মিছকাল

$$\left(\frac{২\cdot০৭\times২\times২\cdot৯৭}{৬}=১৮\cdot৮১=৪\cdot৭২\times৪=১৮\cdot৮৮\right)$$

মাইয়াল ধরিয়া লওয়া হয়। দ্বিতীয় সমীকরণটি মোটামুটি শুদ্ধ হইত যদি আমরা দিরহাম মুদ্রা ও পুরাতন মিছকাল (স্বর্ণ দীনার) ধরি (২ ৯৭×৬ ৫ = ১৯ ৩ = ৪ ২৪×৪ ৫=১৯ ১২৫)। এই উভয় ক্ষেত্রেরই পরিমাণ ফল হইবে সাধারণ (Greek stater) অপেক্ষা অনেক বড়। ২০ ইস্‌তার ১ রাতল (পাউন্ড)-এর সমান। এই অনুপাতটিও শুদ্ধ হইবে $৬\frac{১}{২}$ দিরহামের ইস্‌তার ও ১৩০ দিরহামের বাগ্‌দাদী রাতলের ক্ষেত্রে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. Sauvaire Materiaux, দ্র.; (২) don Vasquez Queipo, Essai sur les Systemes metriques, ১খ.।

E. V. Zambaur (E. I.[2])/মুহাম্মাদ ইউনুস

**ইস্‌তি'আরা** (استعارة)ঃ ইহা অলংকারশাস্ত্রে সাধারণত রূপক উপমা (Metaphor) অলংকার বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। যেই সকল শব্দ বিভিন্ন যুগের বহু লেখক কর্তৃক বারবার আলোচিত হইয়াছে, এই শব্দটি ইহাদেরই একটি। ইহার সকল সংজ্ঞার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব এবং এইগুলি হইতে ইহার শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি ও বিভিন্ন পারিভাষিক অর্থে এই শব্দটির ব্যবহারের বিবরণ দেওয়া সুকঠিন। অনেক সময় এমন লেখার মধ্যে ইহার ব্যবহার দেখা যায় যাহার সহিত অলঙ্কারশাস্ত্রের কোনও সম্পর্ক নাই। নিম্নে প্রদত্ত বিবরণটি কতিপয় প্রতিনিধি স্থানীয় লেখকের অভিমতের পরিলেখ্য দেওয়ার প্রচেষ্টামাত্র।

প্রথম যুগে ইস্‌তি'আরা শব্দটি কখনও কখনও "একজন লেখক কর্তৃক অন্য একজনের মূল ভাবকে ধার করা" বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত (উদাহরণস্বরূপ দ্র. ইব্ন 'আব্‌দ রাব্বিহ, আল-'ইকদু'ল-ফারীদ, কায়রো ১৩৫৯/১৯৪০, ৫খ., ৩৩৮-৪০) এবং রূপক উপমাকে মাছাল ("রূপক বাক্যালংকার") পরিভাষা দ্বারা ব্যক্ত করা যাইতে পারে (উদাহরণস্বরূপ দ্র. আল-মুফাদ্দালিয়্যাত, সম্পা. Lyall, অক্সফোর্ড ১৯২১ খৃ., ১৭৩, ছত্র ৪; সুক্কারী, শার্‌হ আশ্'আরি'ল-হুযালিয়্যীন, সম্পা. 'আবদুস-সাত্তার আহ্‌মাদ ফার্‌রাজ, কায়রো ১৩৮৩/১৯৬৫, ৩খ, ১২০০; আমিদী, আল-মুওয়াযানা, সম্পা. আহমাদ সাক্‌র, কায়রো ১৩৮০/১৯৬১, ১খ, ১০৯ এবং তু. Bonebakker, কিতাব নাদরাতি'ল-ইগ্‌রীদ-এর উপর টীকা, ইস্তাম্বুল ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৩৭) অথবা শুধু বাদী' ("বাক্যালংকারে ভূষিত লিখন পদ্ধতি") পরিভাষা দ্বারা [দ্র. জাহিজ , আল-বায়ান, সম্পা. 'আবদু'স-সালাম মুহাম্মাদ হারূন, কায়রো ১৩৬৭/১৯৪৮, ৪খ, ৫৫ কিন্তু তু. ১খ, ১৫৩ ; ঐ লেখক, আল-হায়াওয়ান, সম্পা. হারূন, ৩খ, ৫৮-৯ ; ও 'আত্তাবী, মৃ. ৩য়/৯ম শতাব্দীর প্রারম্ভে-র বক্তব্য, মার্‌যুবানীর আল-মুওয়াশশাহ গ্রন্থে, কায়রো ১৩৪৩/১৯২৩, পৃ. ২৭১]। 'রূপক উপমা' অর্থেই ইহা ইতোমধ্যে প্রথম যুগীয় ভাষাতত্ত্ববিদগণের, যেমন আবূ 'আম্‌র ইবনু'ল-'আলা'র (মৃ. ১৫৪/৭৭০ সালের কাছাকাছি), নিকট সাধারণভাবে পরিচিত ছিল বলিয়া জানা যায় [দ্র. হাতিমী, হিল্‌য়াতু'ল-মুহাদারা, পাণ্ডু. ফেয, কারাবিয়্যীন ২৯৩৪ পত্র, ৪খ ; বাকিল্লানী, ই'জায, সম্পা. সাক্‌র, কায়রো ১৩৭৪/১৯৫৪, পৃ. ১০৮ =G. E. von Grunebaum, A Tenth century document . . ., Chicago ১৯৫০ ১খ., পৃ. ৭) ইব্ন রাশীক , আল-'উমদা, কায়রো ১৩৫৩/১৯৫৪, ১খ, ২৩৯ হাম্মাদ (মৃ. ১৫৫/৭৭২ অথবা ১৫৬/৭৭৩), আবূ 'উবায়দা (মৃ. ২০৯/৮২৪-৫) ও আস্‌মা'ঈ [মৃ. ২১৩/৮০৮)। দ্র. ই'জায, পৃ. ১০৮]। কিন্তু যেহেতু আসমা'ঈও মাছাল পরিভাষাটি রূপক উপমা বুঝাইতে ব্যবহার করিতেন বলিয়া জানা যায় (দ্র. আল-মুফাদ্দালিয়্যাত, ৮৫৫, ছত্র ১৩) সুতরাং ইহাতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই প্রতিবেদনগুলি পরবর্তী রূপসমূহে অন্য কোনও ভাবধারা বুঝাইতে ইস্‌তি'আরা শব্দটি বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, ইহা ইতোমধ্যে 'আরবী ভাষা কাব্য সমালোচনা বিষয়ে সম্ভবত প্রথম সুব্যবস্থিত গ্রন্থখানায় স্থান লাভ করিয়াছিল। এই গ্রন্থখানা ছা'লাব (২০০/৮১৫-২৯১/৯০৪) কর্তৃক প্রণীত (কাওয়া'ইদু'শ-শি'র) সম্পা. রামাদান 'আবদু'ত-তাওওয়াব, কায়রো ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৫৭-৬০, গ্রন্থখানার রচনার তারিখ জানা যায় না এবং ছা'লাব ইহার রচয়িতা কিনা সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন রহিয়াছে) এবং ইহাতে ইহার এইভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, " কোন কিছুর জন্য অন্য কিছুর নাম ধার করা অথবা ইহাকে বিশেষিত করা এমন একটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা যাহা তাহার নিজস্ব নহে" (أن يستعار للشيء اسم غيره او معنى سواه)। ইব্ন কুতায়বা (মৃ. ২৭৬/৮৮৯) তাঁহার তা'বীল মুশকিলি'ল-কুরআন (সম্পা. আহমাদ সাক্‌র, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৪, পৃ. ১০২) নামক পুস্তকে এবং ইবনু'ল-মু'তায্‌য (২৭৪/৮৮৭ সনে লেখা) তাঁহার কিতাবু'ল-বাদী' (সম্পা. Kratchkovsky, লন্ডন ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ২) নামক পুস্তকে যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন তাহাও পুরাপুরি বিশুদ্ধ নহে। প্রকৃতপক্ষে শেষোক্ত গ্রন্থকারদ্বয় যেই সকল উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন সেইগুলি পরবর্তী সমালোচকগণ 'গূঢ়োক্তি' (trope = مجاز), 'উপমা' (simile = تشبيه) অথবা 'লক্ষণ' (Metonymy = كناية) হিসাবে গণ্য করিয়া থাকিবেন, যদিও পরবর্তী সংজ্ঞানুসারে উদাহরণগুলির অধিকাংশই 'ইস্‌তি'আরা' এবং পরবর্তী পুস্তকগুলিতে প্রায়শই অনুরূপভাবে পুনরুক্ত হইয়াছে। ইহা কুদামা ইব্ন জা'ফার (মৃ. ৩২০/৯৩২ সনের পরে)-এর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য, যিনি অধিকন্তু তাঁহার নাক্‌দু'শ-শি'র (সম্পা. Bonebakker, লাইডেন ১৯৫৬ খৃ.) পুস্তকে তাম্‌ছীল (পৃ. ৯০-২) ও ইস্‌তি'আরা (পৃ. ১০৪-৫) শিরোনামে রূপক উপমার উদাহরণ দিয়াছেন, কিন্তু বাক্যালংকার দুইটির সম্পর্ককে পরিষ্কারভাবে দেখান নাই। তিনি অনুমোদিত ইস্‌তি'আরাকে মূলত একটি উপমা হিসাবে এবং তাম্‌ছীলকে বাক্যালংকারে (মাছাল) কবির মনোভাবকে ব্যক্ত করার একটি বাহন হিসাবে দেখিয়াছেন (আরও দ্র. জাওয়াহিরু'ল-আলফাজ -এ প্রদত্ত সংজ্ঞা ও উদাহরণসমূহ, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২, পৃ. ৫, ৭-৮, কুদামার রচিত বলিয়া পরিচিত)। ইমরু'উ'ল-কায়স্‌-এর কবিতা হইতে প্রায়শ উদ্ধৃত উদাহরণ ঃ বন্য জন্তুর পশ্চাদ্ধাবনকারী লাগামধরা অশ্বের জন্য ব্যবহৃত কায়দু'ল-আওয়াবিদ (قيد الاوابد = "বন্য জন্তুর পায়ে বেড়ি") কুদামার লক্ষণা (ارداف) অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে (পৃ. ৮৮)। আবূ হিলাল আল-'আসকারী (মৃ. ৩৯৫/১০০৪ সনের পরে) প্রণীত কিতাবু'স-সিনাআতায়ন (কায়রো ১৩৭১/১৯৫২, পৃ. ২৬৮-৩০৬, ৩৫৩-৬) পুস্তকের ইস্‌তি'আরা ও মুমাছালা (=তাম্‌ছীল) অধ্যায়গুলির মধ্যে একই বিভ্রান্তি বিরাজমান। যাহা হউক, আবূ হিলাল রূপক উপমার পদ্ধতিগত গঠনের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়াছেন এবং প্রায়শ দেখাইয়াছেন (বিশেষ করিয়া কুরআন হইতে গৃহীত উদাহরণগুলিতে) কেমনভাবে গূঢ়োক্তি বিষয়ক বাক্যালংকারের ব্যঞ্জনা গ্রন্থকারের ধারণাকে তাঁহার ভাষায় ব্যক্ত করার ইচ্ছার সহিত সম্পৃক্ত এবং রূপক উপমা সাধারণ প্রকাশভঙ্গী অপেক্ষা কেনই বা অধিক চিত্তাকর্ষক। কুরআনী রূপক উপমাগুলি সম্পর্কে তাঁহার আলোচনা তাঁহার সমসাময়িক রুম্মানী (মৃ. ৩৮৪/৯৯৪)-র কিতাবু'ন-নুকাত ফী ই'জাযি'ল-কুরআন (সম্পা. মুহাম্মাদ খালাফুল্লাহ ও মুহাম্মাদ যাগলু'স-সালাম, ছালাছা রাসাইল-এ, কায়রো তা. বি., পৃ. ৭৯-৮৭) পুস্তকের আলোচনার সহিত অনেক সাদৃশ্যপূর্ণ, যদিও রুম্মানীর ধারাপ্রকরণ অধিকতর সঠিক। উভয় গ্রন্থকারই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রূপক উপমা দ্বারা বিমূর্ত ধারণাকে মূর্ত সাদৃশ্যে চিত্রায়িত করা সম্ভব হয় এবং জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, রূপক উপমা সেইখানেই গ্রহণযোগ্য যেইখানে ইহা প্রচলিত বাক্যের ধারা অপেক্ষা প্রকাশভঙ্গীকে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করিয়া তোলে। শেষের এই বিষয়টি হাতিমী (মৃ. ৩৮৮/৯৯৮)-এর আলোচনারও বিষয়বস্তু এবং তিনি তাঁহার আর-

রিসালাতু'ল-মূদিহা ফী যিক্‌র সারিকাত আবি'ত-তায়্যিব আল-মুতানাব্বী . . . (সম্পা. মুহাম্মাদ য়ূসুফ নাজ্‌ম, বৈরূত ১৩৮৫/১৯৬৫, পৃ. ৬৯-৭৩, ৯০-৪) পুস্তকে তিন প্রকারের ইসতিআরা বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়াছেন ঃ প্রথম প্রকার উল্লিখিত রীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ইহার রূপক উপমাগুলি সমর্থনযোগ্য। তিনি এই প্রকারকে "সুচারু রূপক উপমা" (استعارة مستحسنة) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়টিকে চিহ্নিত করা হয় মানুষের জন্য প্রযোজ্য পদের পরিবর্তে জন্তুর জন্য প্রযোজ্য অনুরূপ পদের ব্যবহার দ্বারা, যেমন 'পায়ে'র জন্য হাফির (حافر) যাহার অর্থ 'খুর', শাফা (شفة) মানুষের 'ঠোঁট'-এর জন্য মিশ্‌ফার (مشفر) যাহার অর্থ "উটের ঠোঁট" ইত্যাদি। তিনি ইহাকে "কুৎসিত রূপক উপমা" (استعارة مستهجنة) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তৃতীয় প্রকারকে তিনি দ্বিতীয় প্রকার অপেক্ষা কম কুৎসিত বলিয়া বিবেচনা করেন এবং ইহা জীবজন্তুর জন্য নির্দিষ্টভাবে প্রযোজ্য পদের পরিবর্তে মানুষের জন্য প্রযোজ্য পদের ব্যবহার দ্বারা গঠিত হয় [তু. দ্বিতীয় প্রকারভুক্ত উদাহরণগুলি সম্পর্কে আলোচনা, ইব্‌ন কুতায়বা, তা'বীল মুশ্‌কিলি'ল-কুরআন, পৃ. ১১৬-৭। মুআজালা (معاظلة) পরিভাষা বিষয়ে আলোচনা, কুদামা, নাক্‌দ, পৃ. ১০৩; ইব্‌ন দুরায়দ, জাম্‌হারা, হায়দরাবাদ ১৩৪৪/১৯২৫, ৩খ., ৪৮৯খ-৯১ ক; আমিদী, আল-মুওয়াযানা, ১খ, ৪৩-৪। আবূ হিলাল, কিতাবু'স -সি'না'আতায়ন, পৃ. ৩০৯ ও 'আবদু'ল-কাহির আল-জুরজানী-র এই প্রকারের অভিব্যক্তি সম্পর্কে নিম্নে প্রদত্ত অভিমত]। ইহা চতুর্থ প্রকারের বলিয়া অনুমিত হয় যে, যেই ক্ষেত্রে তিনি এমন কতগুলি উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন [যেমন "আমার চিন্তাধারা হোঁচট খায় (যখন চিন্তা করি) তোমার মহিমা সম্বন্ধে"] যেইগুলিতে রূপক উপমাগুলি "অস্পষ্ট ও সুদূর প্রসারী" (خافية بعيدة)।

'আলী ইব্‌ন 'আবদিল-'আযীয আল-জুরজানী (মৃ. ৩৯২/১০০১) সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি যিনি তাশ্‌বীহ ও ইসতি'আরার মধ্যে যত্ন সহকারে পার্থক্য নির্ণয় করেন এবং বাক্যালংকারটির নিকটতম সংজ্ঞা প্রদান করেন। তিনি তাঁহার আল-ওয়াসাতা (কায়রো ১৩৭০/১৯৫১, পৃ. ৪১) পুস্তকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ নুওয়াস-এর এই কবিতা পংক্তিটি "প্রেম একটি বাহন আর তুমি তাহার সাওয়ার, ইহার বলগা ঘুরাও আর সে তোমার বাধ্য হইবে" ইসতি'আরা নহে, বরং উহা উপমা (তাশবীহ) অথবা প্রবাদবাক্য (দারব মাছাল)। প্রকৃত ইসতি'আরাতে ধার করা শব্দ (আল-ইসমু'ল-মুস্‌তাআর = الاسم المستعار) পূর্ণরূপে প্রকৃত পদ (আল-আসল-الاصل)-এর স্থলাভিষিক্ত হয়। তাঁহার মতে ইসতি'আরা ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য স্থাপন, প্রকৃত ও ধার করা বাক্যের ধারার মধ্যে সাদৃশ্যের (অস্তিত্ব), কল্পিত বিষয়ের সহিত (নূতন) পদের সাংকর্য ইত্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত (وملاكها تقريب الشبه ومناسبة المستعار له للمستعار منه و امتزاج اللفظ بالمعنى) ইত্যাদি; রিটার (Ritter) কর্তৃক 'আবদু'ল-কাহির আল-জুরজানীর আস্‌রার, পৃ. ৪২৯-এর অনুবাদে পাঠান্তর এবং ইহার ব্যাখ্যা রহিয়াছে; আরও তু. আল-'উমদা, ১খ, ২৪০)। তিনি মুতানাব্বীর একটি ইসতি'আরায় সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানব ধর্ম আরোপ রূপকে ঃ "তাঁহার মানসপটে দেখা যায় একসঙ্গে অনেক কার্য-পরিকল্পনা অভিপ্রায়, অথচ ইহাদের একটিই (এই) কালকে দখলে রাখিবে (অর্থাৎ ইহার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত)" নিন্দা করিয়াছেন এবং ইহাকে তিনি ইব্‌ন আহমার-এর একটি ইস'তিআরার সহিত তুলনা করিয়াছেন, যেইখানে বাতাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে "ইহার মনের মধ্যে কোন স্থিরতা নাই (ليس للبها زبرق)"। দ্বিতীয় উদাহরণে ইস্‌তি'আরাটি বিভিন্ন দিক হইতে প্রবাহিত বাতাস অস্থিরমতি একজন লোকের অনিশ্চিত আচরণের সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম উদাহরণের ক্ষেত্রে এইরূপ কোন সাদৃশ্য শ্রোতার নিকট প্রকাশিত হয় নাই। এইরূপ ইসতি'আরাকে কিছুটা গ্রহণযোগ্য করার একমাত্র উপায় বারবার কাল অথবা ভাগ্যকে নরত্ব বা মানবমূর্তিতে রূপায়িত হওয়ার বিষয় চিন্তা করা অথবা একটি শব্দের লোপ ধরিয়া লওয়া (এই যুগে বসবাসকারী মানুষের জন্য 'এই যুগ'), যদিও তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দ এইরূপ করিবেন আশা করা যায়, তথাপি কবি রুচিবোধ বিচারের ও ব্যাকরণগতভাবে গৃহীত সীমার বাহিরে চলিয়া যান (রচনার শূন্যস্থানগুলি খাফাজী, মিসর, পৃ. ১৪৪ প. হইতে উদ্ধৃতি দ্বারা পূরণ করিতে হইবে; 'আলী-জুরজানীর বিশেষভাবে গৃহীত এই সকল ও অন্যান্য উদাহরণের সহিত খাফাজী একমত নহেন)।

ইব্‌ন রাশীক (মৃ. ৪৫৬/১০৬৩-৪ অথবা ৪৬৩/১০৭০-১) তাঁহার কিতাবু'ল-'উম্‌দা (কায়রো ১৩৫৩/১৯৩৪, ১খ, ২৩৯-৫০) পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং 'আলী আল-জুরজানীর সংজ্ঞার সহিত পরিচিত ছিলেন, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার উদাহরণে উপমা ও রূপক উপমার মধ্যে কোন পার্থক্য পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন নাই এবং তাঁহার পূর্বসূরিগণের ন্যায় তিনিও এই শেষোক্ত বাক্যালংকারটি ও তামছীল-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, যদিও তিনি তামছীল-কে এক প্রকারের ইস্‌তি'আরা বলিয়া শ্রেণীবিভাগ দেখাইয়াছেন (পৃ. ২৪৭; যাহা হউক, তু. পৃ. ২৪৫, ছত্র ৪-৫, ও ২৪৭ পৃষ্ঠার নিম্নাংশ ও পৃ. ২৪৯, ছত্র ১৫ পৃষ্ঠায় তামছীল ও ইসতি'আরা উভয় ক্ষেত্রেই তুলনার্থক অব্যয়ের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য)। তিনি কম সহজবোধ্য রূপক উপমাগুলি অপেক্ষা, যেমন "উত্তরা বাতাস প্রভাতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে" বাক্যটির পরিবর্তে রূপক উপমা "উত্তরা বাতাসের হাতে আসিয়াছে প্রভাতের বলগা" যেইখানে কবি প্রভাত ও উত্তরা বাতাসের প্রতিটিকে এমন বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন যাহা উহার সহিত সম্পৃক্ত নহে (ما ليس منه و لا اليه), সহজবোধ্য রূপক উপমাগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন, যেমন "ভোরের প্রথম আলো মিলিয়ে দিল কৃত্তিকায়" বাক্যটির পরিবর্তে রূপক উপমা "ভোরের প্রথম আলো সরাইয়া নিল কৃত্তিকায় পীতবর্ণ (অথবা শুভ্র) বসনা", সেইখানে তিনি বলিয়াছেন রূপক উপমাটি একটি উপমার উপর প্রতিষ্ঠিত (কবির ভোরের প্রথম আলোর সহিত উজ্জ্বল বসনের তুলনা)। কতিপয় "চরমপন্থী" (?) (متعكب) মতবাদীরা প্রথম প্রকারের রূপক উপমা (যাহা ব্যক্তিত্বারোপ ও সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত) পসন্দ করেন এবং দ্বিতীয় প্রকারের রূপক উপমাকে নিম্নস্তরের মনে করেন, কারণ এইগুলি (সহজবোধ্য) উপমার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের অভিমত তিনি সমর্থন করেন না। এই মূলনীতিকে তিনি আরও ব্যাপকভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু যথাযথ বিশ্লেষণ দিতে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং তিনি আরও বলিয়াছেন যে, একই ধরনের রূপক উপমা প্রসঙ্গভেদে উপযুক্ত ও কুৎসিৎ হইতে পারে।

খাফাজী (মৃ. ৪৬৬/১০৭৩-৪) তাঁহার সিররু'ল-ফাসাহা (কায়রো ১৩৭২/১৯৫৩, তু. পৃ. ১৩৪-৬৯) পুস্তকে রুম্মানী ও 'আলী আল-জুরজানীর (ব্যাখ্যার) ভিত্তিতে ইস্‌তি'আরা সম্বন্ধে তাঁহার পর্যালোচনা ব্যক্ত করিয়াছেন।

তিনি অবশ্য "সে (প্রেয়সী) নার্গিস ফুল হইতে ঝরাইল মুক্তা" প্রভৃতি ধরনের বাক্যগুলিকে ইস্‌তি'আরা হিসাবে গ্রহণ করেন নাই এবং এইগুলিকে তিনি তাশ্‌বীহ্ আখ্যা দিয়াছেন। তিনি ইহার কোনও ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। সম্ভবত তাঁহার মনে উদয় হইয়া থাকিবে যে, আস্‌বালাত (اسبلت) "সে (স্ত্রী) ঝরাইল" বলিতে এই ক্ষেত্রে আমাদিগকে কেবল "মুক্তাসমূহ" ধরিতে হইবে এবং "নার্গিসসমূহ" বলিতে "আঁখিলোর" এবং 'আখিসমূহ" ধরা হইবে—ইহা এমন একটি উপমা যাহা শ্রোতার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যুক্তি দ্বারা বুঝান অসম্ভব হইয়া পড়ে যে, শব্দদ্বয় ইহাদের প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই (কিন্তু তু. ইবনু'ল-আছীর, আল-মাছাল, ১খ., ৩৫৯)। "এবং মস্তক শুভ্র কেশে জ্বলন্ত" (কুরআন, ১৯ ঃ ৪) "আয়াতটিতে শুভ্রতা" ধারণাকে, যাহার জন্য রূপক উপমা প্রয়োগ করা হইয়াছে (المستعار له), 'আগুন' ধারণার সহিত তুলনা করা হইয়াছে, যেই ধারণা হইতে ইহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে (المستعار منه)। কিন্তু আগুন উল্লিখিত হয় নাই, কেবল ইহার একটি গুণ উল্লিখিত হইয়াছে এবং জ্বলন্ত হওয়া (المستعار) পদটি বিশেষ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করার সঙ্গত যুক্তি রহিয়াছে (সিরর, পৃ. ১৩৪-৬)। যেইগুলি বোধগম্য সদৃশ উপমার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সমর্থন করা যায় না অথবা যেইগুলি এমন প্রকাশভঙ্গী হইতে লওয়া হইয়াছে যাহারা নিজেরাই রূপক উপমা সেইগুলি অপেক্ষা যেই ইসতিআরাগুলি শ্রোতৃবৃন্দের নিকট তাৎক্ষণিকভাবে সুস্পষ্ট বোধ হয়, তিনি সেইগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন। একজন হয়ত বলিতে পারেন, "পুষ্পের চক্ষু", যেহেতু এই ক্ষেত্রে জ্ঞাত সাদৃশ্য রহিয়াছে, কিন্তু "সান্ত্বনাদর্শী বিশ্বাসের চক্ষু" নহে, যেহেতু বিশ্বাসে এমন কিছু নাই যাহাকে চক্ষুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। "জিন উষ্ট্রের কুঁজের চর্বি ভক্ষণ করে" (লইয়া যায়) বাক্যের রূপক উপমাটি "ভাবাবেগের অশ্ব আর আরোহণযোগ্য জন্তুগুলি হইয়াছে সাজহীন" রূপক উপমাটি অপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট, পরবর্তী উদাহরণটি অন্য একটি অধিক প্রচলিত রূপক উপমা ঃ "সে তাহার ভাবাবেগের সাওয়ার হইল, আর চলিল তাহার দৌড়ের গতিপথ ধরিয়া" হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। গতানুগতিকভাবেই ইসতি'আরা ও তাম্‌ছীল-এর পার্থক্য পরিষ্কারভাবে নির্ণয় করা হয় নাই।

ইসতিআরা বিষয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পাওয়া 'আবদু'ল-কাহির আল-জুরজানীর (মৃ. ৪৭১/১০৭৮) আসরারু'ল-বালাগা পুস্তকে (সম্পা. H. Ritter. ইস্তাম্বুল ১৯৫৪ খৃ. ; জার্মান অনু. H. Ritter, Die Geheimnisse der Wortkunst des 'Abdalqahir al-Curcanc. Wiesbaden ১৯৫৯ খৃ.)। 'আবদুল-কাহির তাঁহার দালা'ইলু'ল-ই'জায পুস্তকে (কায়রো ১৩৬৭/১৯৪৭-৮, পৃ. ৩৩১-৪৬), Ritter-এর মতে (দ্র. তাঁহার সম্পাদিত আস্‌রার-এর সংস্করণের ভূমিকা, পৃ. ৬) যাহা সম্ভবত আসরার-এর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল, তাঁহার পূর্বসূরিগণ কর্তৃক ইসতি'আরাকে পদের স্থানান্তর (নাক্‌ল) হিসাবে আখ্যায়িত করার জন্য তাঁহাদেরকে দোষারূপ করিয়াছেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, ইসতি'আরা হইল কোন কিছুকে অন্য কিছুর হুবহু সদৃশ বলিয়া দাবি করা (ادعاء)। বাক্যালঙ্কারটির ভাবান্তর এই দাবির উপরে নির্ভরশীল এবং ফলত পদটির স্থানান্তরের পূর্বে ধারণার স্থানান্তর হইয়া থাকে। যাহা হউক, আস্‌রার পুস্তকে তিনি ইসতি'আরা-কে কোন পদের সাধারণ মূল অর্থ (অর্থাৎ সাহিত্যের ভিত্তিতে সমর্থিত অতি পরিচিত অর্থ) হইতে অন্য আনুষঙ্গিক ব্যবহার (نقل غير لازم) উপযোগী সাধারণভাবে ব্যক্ত (فى الجملة) বাক্যের ধারা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যাহাতে ইহা ধার (عارية) বলিয়া প্রতীয়মান হয় (পৃ. ২৯, অনু. পৃ. ৪৬; তু. পৃ. ৩৭৯-৮১, অনু. পৃ. ৪৪১-৩) এবং স্বীকার করেন যে, বাক্যালঙ্কারটি সম্পর্কে তাঁহার ধারণা মূলত তাঁহার পূর্বসূরিগণের, যাঁহাদের মধ্যে আমিদী (মৃ. ৩৭০/৯৮০) ও 'আলী আল-জুর্‌জানীর (পৃ. ২৯৮, অনু. পৃ. ৩৪৮, পৃ. ৩৬৮, অনু. পৃ. ৪২৯, পৃ. ৩৭০, ১, অনু. পৃ. ৪৩১-২) নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত তাঁহাদের তফাৎ এই যে, তাঁহারা উপমা (تشبيه), সাদৃশ্য সিদ্ধান্ত (تمثيل) এবং রূপক উপমা (استعارة)-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই এবং তাঁহারা এই সমস্ত বাক্যালঙ্কারগুলির যথাযথ সংজ্ঞা না দিয়া কেবল কয়েকটি উদাহরণ প্রদান করিয়াই তৃপ্ত রহিয়াছেন (পৃ. ২৬-৮, অনু. পৃ. ৪৩-৫)। 'আবদু'ল-কাহির-এর নিকট ইসতিআরা বিভিন্ন গূঢ়োক্তি (مجاز)-এর একটি, যেহেতু পদটির সাধারণ অর্থের ইহার সহিত সর্বদাই একটি যোগ (ملاحظة) রহিয়াছে (পৃ. ৩২৫-৬, অনু. পৃ. ৩৭৮-৮০, পৃ. ৩৬৫, অনু. ৪২৫-৬)। যাহা হউক, ইসতি'আরার ক্ষেত্রে যেই বস্তুর জন্য পদটি সাধারণভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং সেই বস্তুর জন্য রূপক উপমা হিসাবে ইহা প্রয়োগ করা হয় তাহাদের কিছু সাধারণ ধর্ম থাকিতে হইবে। তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যে, শব্দতত্ত্ব অনুসারে পদটি 'আরিয়া (عارية) "ধার করা সম্পদ", 'ঋণ' শব্দ হইতে উদ্ভূত। মালিকের সম্পত্তির উপর তাহার দাবি কোন দিন শেষ হয় না, কিন্তু ধার করা সম্পত্তি খাতকের হাতে সেই কার্যই সম্পাদন করে যাহা সেই মালিকের হাতে থাকার সময় করিত (পৃ. ৩৭২-৩, অনু. পৃ. ৪৩২-৪; তু. পৃ. ৩০০-২, অনু. পৃ. ৩৫০-২)। একজন সাহসী লোককে বুঝাইবার নিমিত্ত যদি কেহ বলে, "আমি একটি সিংহ দেখিতেছি", তাহাতে তাহার মনে যাহা আছে তাহা হইল সিংহের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় গুণটি, ইহার সাহস লোকটির উপর আরোপ করা। কিন্তু যদি কেহ "আমি তাহার অনুগ্রহের জন্য তাহার নিকট ঋণী" (له عندى يد) বাক্যে 'অনুগ্রহ' বুঝাইবার জন্য য়াদ (يد) 'হাত', শব্দটি ব্যবহার করে, তবে হাতের গুণ বর্ণনা করা তাহার মোটেই অভিপ্রায় নহে। তর্ক করা চলে যে, 'অনুগ্রহ' হইল য়াদ শব্দের মূল অর্থ, 'হাত' নহে, যদিও সুসঙ্গত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, কোন একটি কার্যক্রম সূত্রে মূলত হাত জড়িত থাকে (আরও তু. পৃ. ৩২৬ প., অনু.। পৃ. ৩৮০ প.) 'আবদু'ল-কাহির আরও স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন যে, ইসতি'আরা প্রচলিত প্রকাশভঙ্গী অপেক্ষা বেশী হৃদয়গ্রাহী (আর এই কারণে ইহাতে সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন ধর্ম আছে) ঃ যখন কোন কবি অশ্বের জিহ্বা (جحفل) অথবা উষ্ট্রের জিহ্বা (مشفر) বুঝাইতে শাফা (شفة) 'জিহ্বা' পদটি ব্যবহার করেন, তখন কেবল ইহার নিকট সমার্থক শব্দ অথবা নির্দিষ্ট পদের পরিবর্তে সাধারণ পদের সহজ ব্যবহারই বুঝায় (পৃ. ৩০-১, অনু. পৃ. ৪৮-৯, পৃ. ৩৭৩-৪, অনু. পৃ. ৪৩৪-৪), কিন্তু যখন তিনি মনুষ্য-জিহ্বা বুঝাইতে 'অশ্ব জিহ্বা' অথবা 'উষ্ট্র-জিহ্বা' ব্যবহার করেন, তখন একজন ইতিমধ্যে সীমারেখা উপলক্ষে পৌঁছাইয়াছে, কারণ সে সহজেই কল্পনা করিতে পারে যে, কবি যাহা বলিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহা হইল, (সংশ্লিষ্ট) লোকটির জিহ্বা মোটা বা একই পশুর ন্যায় হতভাগ্য (পৃ. ৩৪ প.; অনু. পৃ. ৫২ প.)। 'আবদু'ল-কাহির তিন ধরনের রূপক উপমার বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন ঃ

(ক) যেই রূপক উপমাগুলি এমন সব ধারণার তুলনার উপর প্রতিষ্ঠিত যেইগুলি নিকট সম্বন্ধ প্রকাশ করে এবং যে কোন ক্ষেত্রে একই শ্রেণীভুক্তঃ 'ধাবমান'-এর জন্য 'উড়ন্ত'।

(খ) যেই রূপক উপমাগুলি এমন সব বস্তুর তুলনার উপর প্রতিষ্ঠিত যেইগুলি কোন বিশেষ গুণের অংশীদার 'সুন্দর চেহারা'-র জন্য 'সূর্য'।

(গ) যেই রূপক উপমাগুলি এমন এক সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা কেবল বুদ্ধির সাহায্যে বোধগম্য এবং এই রূপক উপমাগুলি হইল (১) বুদ্ধিভিত্তিক ধারণার জন্য যেই বস্তুগুলি ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়ঃ 'সন্দেহাতীত যুক্তি'-র জন্য 'আলো'; (২) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি বস্তুর জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্য একটি বস্তু, যদিও সাদৃশ্যবোধ-বুদ্ধি-ভিত্তি নির্ভরশীলঃ "দুশ্চরিত্রা সুন্দরী রমণী"-র জন্য "গোবর-গাদার সবুজ তরু" ও (৩) বুদ্ধিভিত্তিক ধারণাকৃত একটি বস্তুর জন্য বুদ্ধিভিত্তিক ধারণাকৃত অন্য একটি বস্তুঃ 'অজ্ঞতা'-র জন্য মৃত্যু, "গুরুতর সংকটের সম্মুখীন"-এর জন্য 'মৃত্যুর সম্মুখীন'। বিমূর্ত সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রূপক উপমাগুলি ও বিভিন্ন প্রকারের স্পষ্ট উপমাগুলির, যেইগুলি উহাদের অনুরূপ, জন্য তিনি তামছীল পরিভাষাটি ব্যবহার করিয়াছেন। সাদৃশ্যটি কেবল বিশ্লেষণ (تعـول) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যায়, যেহেতু রূপক উপমা বা উপমাটি একটি সাধারণ গুণের উপর (যেমন গোলাপের সহিত গালের তুলনার ক্ষেত্রে) প্রতিষ্ঠিত নহে, তবে একটি গুণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোন বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত (যেমন সূর্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যেমন কঠিন, সন্দেহাতীত যুক্তিকেও অস্বীকার করা তেমনই কঠিন)। কোন কোন ক্ষেত্রে "দুই শ্রেণীর বস্তুর মধ্যেও সাদৃশ্য থাকে তাহাদের প্রতিটির মধ্যে, শুধু সাধারণ সহযোজন নহে, বিভিন্ন উপাদানের একটি আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ থাকে, সেই সম্বন্ধ কেবল একটি বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায়" (অথবা উহার সমতুল্য দ্বারা) আসরার, ভূমিকা, পৃ. ১৪ এবং কাজেই তামছীল প্রবচন বাক্য (মাছাল مـثـل)-এর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্তঃ "বিষয়টি যোগ্য ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে"-এর জন্য "ধনুকটি ধনুক নির্মাতার হস্তে" (পৃ. ৯৪, অনু. পৃ. ১২০)। 'আবদু'ল-কাহির-এর মতে এইরূপ বাক্যগুলি বিশেষ প্রভাব লাভ করিয়াছে। কারণ মন অতিপরিচিত ধারণা সহজে গ্রহণ করিয়া থাকে যদি লেখক ইহাকে এমন একটি অবস্থা দ্বারা চিত্রিত করিতে পারেন যাহার সহিত ইহা সম্পূর্ণরূপে পরিচিত, যেমন যখন কেহ একজন আগন্তুককে পরিচয় করাইয়া দিতে পুরাতন বন্ধুকে ব্যবহার করে (আস্‌রার, ভূমিকা, পৃ. ১৫)। এই সকল বাক্যে পদগুলিকে অবশ্য ইহাদের যথাযথ অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং এইজন্য কুরআনে বাহ্যত আল্লাহর প্রতি যে মানব-ধর্ম আরোপ করা হইয়াছে, যেমন "গোটা বিশ্ব পুনরুত্থান দিবসে তাঁহার হাতের দৃঢ় মুষ্টিতে থাকিবে" (কুরআন, ৩৯ ঃ ৬৭), তাহার ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব হইয়াছে বুদ্ধিভিত্তিক ধারণার সদৃশ সিদ্ধান্ত হিসাবে (পৃ. ৩৩১-২, অনু. পৃ. ৩৮৬-৭ : ভূমিকা পৃ. ১১), যদিও তিনি খেয়ালনির্ভর ব্যাখ্যা সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন (পৃ. ৩৩৬-৪, অনু. পৃ. ৪২২-৪)।

'আবদু'ল-কাহির আল-জুরজানী কাল্পনিক হেতু-নির্দেশ সৃষ্টিতে, যেমন ক্লাসিকাল-উত্তর 'আরবী ও ফার্সী কবিতায় প্রচলিত ছিল, রূপক উপমা ব্যবহার পদ্ধতিও পর্যালোচনা করিয়াছেন। "তাঁহার কামিজ ছিঁড়িয়াছে, আশ্চর্য হইও না ঃ সে যে চন্দ্রালোকে ইহার বোতাম লাগাইয়াছিল"—এখানে কবি ধরিয়া লন যে, "সুন্দর চেহারা"-র জন্য 'চন্দ্র'-এর প্রচলিত রূপক উপমাকে বাস্তব হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং অতঃপর (এই) সাধারণ বিশ্বাসের প্রতি তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, চন্দ্রালোক সুতীবস্ত্রকে জীর্ণ করে (আস্‌রার, ভূমিকা, পৃ. ২১-২)।

'আবদু'ল-কাহির আল-জুরজানী এবং তাঁহার কতিপয় পূর্বসূরী ও উত্তরসুরির মধ্যে একটি মূল পার্থক্য এই যে, زيد أسـد অথবা زيد كالأسد। "যায়দ একটি সিংহ" বাক্যের মত বাক্যগুলিকে তিনি রূপক উপমা হিসাবে গ্রহণ করেন না, কারণ এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অব্যয় কিংবা ক্রিয়ার সাহায্য ছাড়াই উপমা ব্যবহার করা হইয়াছে (যাহা হউক, তু. পৃ. ৩০৪-৫, অনু. পৃ. ৩৫৪-৫)। তাজ্‌রীদ (تجـريد) প্রকাশভঙ্গী ধরনের বাক্যগুলিও, যেমন رأيت منه ليثـاً / لقيت به اسداً, "আমি সাক্ষাত করিয়াছিলাম/আমি দেখিয়াছিলাম তাঁহার মধ্যে একটি সিংহকে" (পৃ. ৩১০-১১, অনু. পৃ. ৩৬১-২)। তিনি রূপক উপমা হিসাবে বিবেচনা করেন না। যাহা হউক, তিনি "(সে) একটি পূর্ণ চন্দ্র যাহা পূর্ব ও পশ্চিম হইতে আলোক ছড়ায় ধরাতলে, অথচ রাখিয়া যায় আমার উষ্ট্রের জিনের স্থানটি কাল আঁধারে" ধরনের বাক্যের ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত। কেননা কেহ একজনকে চন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়া অতঃপর তাহাকে এমন গুণে বিশেষিত করিতে পারে না যেই গুণটি চন্দ্রের নাই। এইরূপ বাক্যগুলি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, শ্রোতা ইতোমধ্যে ধরিয়া লইয়াছে যে, কবিতার বিষয়বস্তু হইল একটি বিশেষ ধরনের চন্দ্র, যাহাতে কবি এই চন্দ্রের উপর অপ্রচলিত গুণাবলী অর্পণ করিতে পারেন (পৃ. ৩০৫ প., অনু. পৃ. ৩৫৫ প.; 'আবদু'ল-কাহির-এর মতবাদগুলির আরও বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য দ্র. আস্‌রার, ভূমিকা, যাহা ইহাতে উপরিউক্ত কিছু সংখ্যক সংজ্ঞা ও অনুবাদ লওয়া হইয়াছে)।

ফাখরু'দ-দীন আর-রাযী ([দ্র.] (মৃ. ৬০৬/১২০৯)-র নিহায়াতু'ল-ঈজায ফী দিরায়াতি'ল-ই'জায (কায়রো ১৩১৭/১৮৯৯)ও সাক্কাকী [দ্র.] মৃ. ৬২৬/১২২৮-৯-র 'মিফতাহু'ল-'উলূম' (কায়রো ১৩৫৬/১৯৩৭) হইতে শুরু করিয়া এই সমস্ত সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থসমূহের উপর রচিত অসংখ্য ভাষ্যসহ 'আবদু'ল-কাহির আল-জুরজানীর দালাইলু'ল-ইজায ও আসরারু'ল-বালাগার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থগুলি প্রায় পুরাপুরিভাবে এই গ্রন্থদ্বয়ে স্থান দখল করিয়াছে। নিহায়া পুস্তকে, যাহাতে জুরজানীর অভিমতের প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্তসার রহিয়াছে, ফাখরু'দ-দীন, ইস্‌তি'আরার বৈশিষ্ট্যের উপর জুরজানী যেই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়াস পাইয়াছেন। দালা'ইল-এ বর্ণিত মতবাদের সপক্ষে চিত্তাকর্ষক যুক্তি প্রদর্শনের পর তিনি আস্‌রার-এ বর্ণিত জুরজানীর শেষোক্ত মতবাদের সমর্থক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। একজন মানুষকে 'সিংহ' নামে অভিহিত করায় একজন তাহাকে (ঐ মানুষকে) সিংহের সাহসগুণে গুণান্বিত করে, ইহার দৈহিক গুণাবলীতে নহে, যাহার অর্থ এই যে, আসাদ (أسد) শব্দটি আরও অধিক সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (পৃ. ৮৪-৫; তু. আস্‌রার, ৩৭৯-৮১, অনু. ৪৪১-৩), কাজেই রূপক উপমাটিকে 'ভাষার গূঢ়োক্তি' (مـجـاز لغـوى) বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। যাহা হউক [তু. ক্রিয়া ও ইহার কর্তার মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে মাজায 'আক্‌লী (مـجـاز عـقلى), "বুদ্ধিমত্তাজনিত গূঢ়োক্তি" বিষয়ে জুরজানীর মন্তব্য, আস্‌রার গ্রন্থে, পৃ. ৩৪২-৫, অনু. ৩৯৯-৪০২, ৩৭৬ পৃ. অনু. ৪৩৭ প. ও ভূমিকা, পৃ. ২৩-৪] মিফতাহুল-

'উলূম-এর ভিত্তিতে রচিত রচনাবলীর মধ্যে ঃ খাতীব দিমাশ্‌ক (মৃ. ৭৩৯-১৩৩৮) নামেও পরিচিত জালালু'দ-দীন আল-কায্‌বীনী (দ্র.) প্রণীত তালখীসু'ল-মিফ্‌তাহ্‌ (মিফতাহুল-'উলূম-এর একটি সারসংক্ষেপ), তাফ্‌তাজানী (মৃ. ৬৯১/১৩৮৯ ও ৭৯৭/১৩৯৫-এর মধ্যে) প্রণীত আশ-শারহু'ল-মুখ্‌তাসার ও সুয়ূতী (দ্র.) (মৃ. ১১/১৫০৫) প্রণীত 'উকূদু'ল-জুমান পুস্তকগুলির সার-সংকলন করা হইয়াছে A. F. Mehren প্রণীত Die Rhetorik der Araber (কোপেনহেগেন/ভিয়েনা ১৮৫৩ খৃ.)। ইস্‌তি'আরা কি দাবি করে যে, কোন একটি বস্তু হুবহু অন্য একটি বস্তু (এবং সেইহেতু ইহা বুদ্ধিমত্তা বা 'আক্‌লভিত্তিক একটি বাক্যালঙ্কার) অথবা ইহা একটি পদের অপপ্রয়োগ (এবং সেইহেতু ইহা শব্দের অর্থ সম্বন্ধীয় একটি আকৃতি, লুগাবী)-এই প্রশ্নটির মীমাংসা শেষোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকূলে যায় এই স্বতঃসিদ্ধতা দ্বারা যে, একটি মানুষের জন্য একটি সিংহের বৈশিষ্ট্য (আসাদিয়া =اسدية) দাবি করিয়া একজন দাবি করে যে, পদটি দ্বারা দুইটি সম্ভাব্য প্রকারের সিংহ বুঝাইতেছে, একটি সাধারণভাবে পরিচিত (متعارف) এবং জন্তুটির সমস্ত মানসিক ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, অন্যটি সাধারণভাবে পরিচিত নহে এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, কিন্তু দৈহিক বৈশিষ্ট্যের নহে। প্রসঙ্গটি (قرينة) ইঙ্গিত করে যে, সাধারণভাবে পরিচিত অর্থ অভিপ্রেত নহে এবং ইস্‌তি'আরাটিকে মিথ্যা দাবি হইতে পৃথক করা হইয়াছে সেই স্থানে এমন কোন কিছু এই প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না করাই গ্রন্থকারের জন্য অপরিহার্য হইবে যাহা এই দাবিকে খণ্ডন করে (মিফাতাহ, পৃ. ১৭৫-৬)। যদিও প্রসঙ্গটি হইতে গ্রন্থকারের একটি শব্দকে রূপক উপমা হিসাবে ব্যবহার করার অভিপ্রায় এইভাবে বুঝা যায়, তথাপি প্রসঙ্গটিতে এমন উপাদান থাকিতে পারে যাহা সাধারণ শব্দার্থের সমর্থন করে, যেমন أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ "উহারাই তাহারা যাহারা ভ্রান্তি ক্রয় করিয়াছে হিদায়াতের বিনিময়ে। সুতরাং তাহাদের ব্যবসা লাভজনক হয় নাই" (কুরআন, ১ ঃ ১৬) বাক্যে 'ক্রয়'-এর সাধারণ অর্থ "বাজারে মালামাল ক্রয়" অর্থে "তাহাদের ব্যবসা লাভজনক হয় নাই" দ্বারা সমর্থিত। এই ক্ষেত্রে আমরা ইহাকে ইসতি'আরা মুরাশ্‌শাহা (استعارة مرشحة) অথবা সজ্জিত ইস্‌তি'আরা বলিয়া থাকি। যেই ক্ষেত্রে এইরূপ কোন উপাদান থাকে না, সেইখানে আমরা ইহাকে ইস্‌তি'আরা মুজাররাদা (استعارة مجردة) অথবা "অসজ্জিত ইস্‌তি'আরা" বলিয়া থাকি, যেমন "স্বীয় বর্মের (দুর্বহ) তলায় আর্তনাদকারী একটি সিংহকে আমি আক্রমণ করিয়াছিলাম"-ইহাকে ইস্‌তি'আরা মুত'লাকা (استعارة مطلقة) অথবা "অবিমিশ্র ইস্‌তি'আরা", যেমন 'ইন্‌দী আসাদুন (عندى أسد) "আমার সহিত আছে একটি সিংহ" অর্থাৎ একজন সাহসী লোক, যেইখানে প্রসঙ্গটিতে এমন কোন উপাদান নাই যাহা 'সিংহ' শব্দটির উহার প্রকৃত অর্থে অথবা রূপক উপমা অর্থে ব্যবহৃত হওয়া সমর্থন করে, এইরূপ ইসতি'আরা হইতে ভিন্ন ধরনের মনে করিতে হইবে; এই প্রকার ইস্‌তি'আরার বিভিন্ন ব্যাখ্যা রহিয়াছে শুরূহুত-তাল্‌খীস' পুস্তকে, কায়রো ১৯৩৭ খৃ., ৪খ., ১২৭-৮। ইস্‌তি'আরার "মৌলিক উপাদান" (ذات) সম্বন্ধে জুরজানীর আলোচনার (আস্‌রার, পৃ. ৪২-৭, অনু. পৃ. ৬৩-৮) অনুসরণে এই গ্রন্থকারগণ আরও চিহ্নিত করিয়াছেন ইসতি'আরা তাখ্‌য়ীলিয়্যা (استعارة تخييلية = "কাল্পনিক ইস্‌তি'আরা") নামক আর এক প্রকার ইসতি'আরা। যেমন-আবূ যু'আয়ব আল-হুযালীর প্রসিদ্ধ শ্লোকটিতে (المنية انشبت اظفارها- الفيكل تيمية لا تنفع) "যখন নিয়তি ইহার শিকারের উপর থাবা বিদ্ধ করে, তখন তুমি দেখিবে কোন তাবিজ উপকারে আসিবে না।" এইখানে নিয়তির প্রতি নখর আরোপণ নির্দেশ করে যে, নিয়তি একটি বন্য জন্তু। যেহেতু 'নিয়তি' এখানে অদ্যাপি ইহার প্রকৃত শব্দার্থ দ্বারা নির্দেশিত হইয়াছে, ইসতি'আরাটি অর্জিত হইয়াছে লক্ষণ দ্বারা (بالكناية) (সাক্কাকীর যেই দৃষ্টিভঙ্গী মিফ্‌তাহ্‌ পুস্তকে, পৃ. ১৭৮, ছত্র ৬.১৫; ব্যক্ত হইয়াছে তাহার সহিত কাযবীনীর আল-ঈদাহ্‌, ৫খ, ১৬৫ প. ও সুয়ূতীর 'উকূদু'ল-জুমান, পৃ. ৯৯-১০০ গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত মতের গরমিল পরিলক্ষিত হয়)। 'আবদু'ল-কাহির আল-জুরজানীর অনুসারিগণের বর্ণিত এতদসমূহ ও অন্যান্য পরিভাষা ও ইহাদের সংজ্ঞাগুলি তাঁহার ধারণাকে সুবিন্যস্ত আকারে প্রকাশ করিতে সাহায্য করে, তবে তাঁহার রূপক উপমার মতবাদ সম্পর্কে বিশেষ কোন নূতন পথ নির্দেশ করে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না (আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. Mehren, পৃ. ৩১-৪০, ৭৫-৯১)। কিন্তু এই মতাবলম্বী গ্রন্থকারগণের রচিত অসংখ্য রচনার অনুসন্ধান এখনও বাকী আছে।

ইবনু'ল-আছীর ( ৬৩৭/১২৩৯) তাঁহার আল-মাছালু'স-সা'ইর (কায়রো ১৩৫৮/১৯৩৯, ১খ, ৫৭-৬৪, ৩৫৫-৮৮) পুস্তকে রূপক উপমাকে উহ্য উপমা (تشبيه محذوف) হিসাবে দেখিয়াছেন। তিনি ইহা অতি প্রয়োজনীয় মনে করেন যে, মূল ধারণা এবং এই মূল ধারণার পরিবর্তে ব্যবহৃত অন্য একটি ধারণা একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অংশীদার হইবে যাহা সহজে চেনা যাইবে ও হইবে সুস্পষ্ট ও ঋণদাতা ও ঋণ গ্রহণকারীর মধ্যে ঋণ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিচিতি (معرفة) সদৃশ। সুতরাং তিনি আবূ নুওয়াস-এর "গলাভাঙ্গা সম্পদের কণ্ঠস্বর (بح صوت المال) তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগে এবং (উহার অতিরিক্ত মুক্তহস্তে ব্যয়ের বিরুদ্ধে) সোচ্চার হওয়ার ব্যাপারে" পংক্তিটির মত উদাহরণসমূহকে ইসতি'আরা হিসাবে বিবেচনা করেন না। কারণ স্পষ্টত তিনি সম্পদকে বাকশক্তিসম্পন্ন মানুষের সহিত তুলনায় কোন সুযুক্তি দেখেন না (তু. ইব্‌ন রাশীক, আল-'উম্‌দা, ১খ, ২৪০)। তিনি ইহাকে ও এই ধরনের উদাহরণসমূহকে বাক্যের প্রয়োগরীতির সম্প্রসারণ (توسع فى الكلام) হইতে উদ্ভূত গূঢ়োক্তি (مجاز) ছাড়া আর বেশী কিছু বিবেচনা করেন না, যাহা তুলনাসূচক অব্যয় দ্বারা সম্বদ্ধ পদে সংযোগকৃত উপমা অলংকারের প্রায় অনুরূপ (পৃ. ৩৫৬, ৩৬১-২)। কোন কিছুতে মানব ধর্মের গুণ আরোপ করাকেও তিনি ইসতি'আরা হিসাবে বিবেচনা করেন না, যেমন— فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ "আসমান কিংবা যমীন তাহাদের জন্য অশ্রুপাত করে নাই" (কুরআন, ৪৪ ঃ ২৯) এবং নবী কারীম (স)-এর উহুদ পাহাড়ের বিবরণ ঃ "এই পাহাড়কে আমরা ভালবাসি আর ইহাও আমাদের ভালবাসে", যদিও তুলনাসূচক অব্যয় দ্বারা সম্বদ্ধ পদের সংযোগের অনুপস্থিতি এই প্রকাশভঙ্গীগুলিকে গ্রহণযোগ্য করে। ইবনু'ল-আছীর-এর নিজের প্রদত্ত ইস্‌তি'আরার সংজ্ঞা অস্পষ্ট এবং তাঁহার উদাহরণ চয়নে অসঙ্গতি দেখা যায়, যদিও তিনি তাঁহার কতিপয় পূর্বসূরীর অভিমত সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করিয়াছেন।

য়াহ্‌য়া ইব্‌ন হামযা আল-'আলাবী (মৃ. ৭৪৭/১৩৪৬) রচিত কিতাবু'ত-তিরায (কায়রো ১৩৩২/১৯১৪, ১ খ., ১৯৭-২৬০) পুস্তকে এইরূপ অসঙ্গতি দেখা যায়, যদিও পুস্তকটিতে কতিপয় পূর্ব এবং পরবর্তী গ্রন্থকারের (ইবনু'ল-আছীর এবং 'আবদু'ল-কাহির আল-জুরজানীর অনুসারিগণের) অভিমতের প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার যায়দুন আসাদুন (زيد اسد)-এর ন্যায় প্রকাশভঙ্গীকে রূপক উপমা হিসাবে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখাইয়াছন; কিন্তু 'যাযদুনি'ল-আসাদু' (زيد الاسد)-কে, এমনকি অন্যান্য প্রকাশভঙ্গী যাহাতে তুলনাসূচক অব্যয় ব্যবহৃত হয়, সেইগুলিকে উপমা হিসাবে (পৃ. ২০২-৯) বিবেচনা করিয়াছেন। 'আবদু'ল-কাহির কর্তৃক বিষয়টি বহুল বিতর্কিত। ইসতি'আরা মুরাশশাহা (مرشحة)-কে ইসতিআরা মুওয়াশশাহা (موشحة), 'অলংকৃত ইস্‌তি'আরা'-এর পরিবর্তন হিসাবে তাঁহার গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে ভুল পাঠবশত হইয়াছে।

পরবর্তী সারগ্রন্থগুলির ইস্‌তি'আরা অধ্যায়গুলিতে একইভাবে পূর্ববর্তী সংজ্ঞাগুলির সারসংক্ষেপ ব্যতীত বেশী কিছু দেওয়া হয় নাই এবং 'আবদু'ল-কাহির আল-জুরজানীর ও তাঁহার মতানুসারিগণের মূল উপাদানগুলির পুনরাবৃত্তি অথবা কিছু সংস্কারসহ সম্প্রসারণ করা হইয়াছে, যেমন "উহারাই তাহারা যাহারা ভ্রান্তি ক্রয় করিয়াছে হিদায়াতের বিনিময়ে। সুতরাং তাহাদের ব্যবসা লাভজনক হয় নাই" বাক্যের মন্তব্যে আমরা একটি ইসতি'আরা মুরাশ্‌শাহা পাই যাহাতে দুইটি ইস্‌তি'আরা 'ক্রয়' ও 'লাভজনক ব্যবসা' পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে (ইব্‌ন হিজ্জা, খিযানা, কায়রো ১৩০৪/১৮৮৬, পৃ. ৪৯)। ক্লাসিকাল যুগোত্তর কবিগণের কর্মকাণ্ড হইতে এই গ্রন্থগুলি ইসতি'আরার প্রচুর উদাহরণ মাঝে মাঝে দেয়।

জনৈক আবূ বিশ্‌র (মৃ. ৩২৮/৯৩৯) কর্তৃক এরিস্টোটলের কাব্যনীতির অনুবাদ এবং ইহা হইতে ইব্‌ন সীনা ও ইব্‌ন রুশ্‌দ প্রণীত এই কাব্যনীতির সারসংগ্রহে রূপক উপমা বিষয়ে যেই ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইয়াছ তাহার জন্য দ্র. F. Gabrieli, RSO-তে, ১২খ. (১৯২৯-৩০ খৃ.), ২৯৩, ৩০১, টীকা ৩, ৩০৪, ৩১৮, ৩২৯; কুদামা, নাক্‌দ, ভূমিকা, পৃ. ৪২ [কিন্তু তু. S. Afnan, The Cpmmentary of Avicenna on Aristotle's Poetics; JBAS-তে (১৯৪৭ খৃ.), পৃ. ১৮৮; W. Heinrichs Arabische Dichtung und Griechische Poctik, বৈরূত ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ১৫৬]।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** নিবন্ধগর্ভে উল্লিখিত বরাত ছাড়াও (১) আমিদী, আল-মুওয়াযানা, কায়রো ১৩৮৩/১৯৬১, ১খ., ২৪৫-৬৪; (২) ইব্‌ন আবি'ল-ইস'বা, তাহ্‌রীরু'ত-তাহ'বীর, কায়রো ১৩৮৩/১৯৬৩, পৃ. ৯৭-১০৯; (৩) ঐ লেখক, বাদী'উ'ল-কুরআন, কায়রো ১৩৭৭/১৯৫৭, পৃ. ১৭-২৭; (৪) শামসুদ্‌-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন কায়স আর-রাযী, আল-মু'জাম ফী মা'আয়ীর আশ্‌'আরি'ল-'আজাম, সম্পা. মিরযা মুহাম্মাদ আল-কায্‌বীনী, লাইডেন ১৯০৯ খৃ., পৃ. ৩৩৬-৪০; (৫) জালালু'দ-দীন আল-কায্‌বীনী, আল-ঈদাহ ফী 'উলূমি'ল-বালাগা, কায়রো ১৩৬৮/১৯৪৯, ৫খ., ৪৩-১৮৩ ('আবদু'ল-কাহির আল-জুরজানীর মতানুসারিগণের মতবাদের উপর বিস্তারিত টীকাসমূহ); (৬) তাফতাযানী, আশ্‌-শারহু'ল-মুতাওওয়াল, ইস্তাম্বুল ১৩৩০/১৯১১, পৃ. ৩৫৪-৪০৫; (৭) সুয়ূতী, 'উকূদু'ল-জুমান, কায়রো ১৩৫৮/১৯৩৯, পৃ. ৯২-১০০; (৮) 'আব্বাসী, মা'আহিদু'ত-তান্‌সীস', কায়রো ১৩৬৭/১৯৪৭, ২খ, ১৩২-৭২; (৯) ইব্‌ন মা'সূম, আনওয়ারু'র-রাবী' ফী আনওয়াইল-বাদী', নাজাফ ১৩৮৮/১৯৬৮, ১খ., ২৪৩-৯৭; (১০) H. Ritter, Uber die Bildersprache Nizamis, বার্লিন ১৯২৭ খৃ.; (১১) T. Sabbagh, La metaphore dans le Coran., প্যারিস ১৯৪৩ খৃ. (সমালোচনা ছাড়া); (১২) মুহাম্মাদ খালাফাল্লাহ, নাজারিয়্যাত 'আবদি'ল-কাহির আল-জুরজানী, Farouk 1 University Bulletin of the Faculty of Arts-এ, ২খ. (১৯৪৪ খৃ.), পৃ. ১৪-৪৮; (১৩) রূপক উপমার সমসাময়িক পাশ্চাত্য সংজ্ঞার উপর প্রয়োজনীয় আলোচনা, উহাতে উত্থাপিত এমন কতিপয় প্রশ্ন যাহা মধ্যযুগীয় 'আরব সমালোচকদের নিকটও পরিচিত ছিল—বিষয়ক একখানা গ্রন্থ হইল Die Metaphore (Bochumer Diskussion) in Poetica, Zeitschr. fur Sprach und Literatur-wissenschaft-এ, ২খ. (১৯৬৮ খৃ.), পৃ. ১০০-৩০। আরও দ্র. কিনায়া, মাজায, তাখ্‌য়ীল, তাম্‌ছীল ও তাশ্‌বীহ বিষয়ক প্রবন্ধগুলি ইসলামী বিশ্বকোষে।

S. A. Bonebakker (E.I.[2])/আ.র. মামুন

**ইস্‌তিওয়া' (খাত্তুল)** (خط الاستواء) ঃ দুই সমবিভক্তক রেখা বা সমতা রেখা অর্থাৎ বিষুবরেখা বা নিরক্ষরেখা যাহা পৃথিবীকে উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ গোলার্ধ—এই দুই গোলার্ধে বিভক্ত করিয়াছে এবং যাহা পৃথিবীর যে যে স্থানে দিবারাত্রি সমান সেই সকল স্থানকে একত্রে সংযোজন করিয়াছে। বিষুবরেখা বা পৃথিবী বিভাগ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাইবে সূরাতু'ল-আর্‌দ গ্রন্থে; গ্রন্থখানি গ্রীসীয় (বা য়ুনানী), ভারতীয় বা পারস্য দেশীয় অনুপ্রেরণা দ্বারা রচিত এবং আল-মা'মূনের আমলের ভূ-বিজ্ঞানী পণ্ডিতগণের পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা সংশোধিত ও পরিশুদ্ধ করা হয়।

খাত্তু'ল-ইস্‌তিওয়া' বা বিষুবরেখা পৃথিবীর বৃহত্তম বৃত্ত, এই হিসাবে ইহা রাশিচক্রের বৃত্তের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, এই রাশিচক্রের বৃত্ত মহাকাশমণ্ডলের সকল বৃত্তের মধ্যে বৃহত্তর। ইহার পরিধি ৩৬০° ডিগ্রী বলিয়া অনুমান করা হয় বা সাধারণভাবে ৯.০০০ পারাসাঙ (বা ফারসাঙ) (৫৪,০০০ কিলোমিটারের সমপরিমাণ) এবং উভয় মেরুবিন্দু হইতে দূরত্ব ৯০° ডিগ্রী। অন্যান্য অনুমান অনুযায়ী বিষুবরেখার পরিধি ২৪,০০০ মাইল (১ মাইল= সোয়া তিন পারাসাঙ) যে হিসাবে ব্যাস হয় ৭,৬৩৬ মাইল, আনুমানিক, যথাক্রমে ৪৮,০০০ ও ১৫,০০০ কিলোমিটার। স্বয়ং আল-মাস'ঊদী যথেষ্ট ভিন্নতর সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অর্ধেক পরিধি বলিয়াছেন ১৩,৫০০ মাইল বা সম্পূর্ণ পরিধি ২০,১৬০ মাইল, সেই ক্ষেত্রে ব্যাস হয় ৫,৪১৪·৫ মাইল বা পুনরায় সম্পূর্ণ পরিধি ৬,৬০০ পারাসঙ, (=১৯,৮০০ মাইল) এবং সেই ক্ষেত্রে ব্যাস হয় ২,১০০ পারাসাঙ (=৬,৩০০ মাইল) বা সবশেষে ২৪,০০০ মাইল আর ব্যাস ৭,৬৬৭ মাইল। য়াকূত যে সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ৬,৮০০ হইতে ২৭,০০০ পারাসাঙের মধ্যে।

বিষুবরেখার কাজ শুধু ভূমণ্ডলকে দুই ভাগে বিভক্ত করাই নহে। ইহা সর্বপূর্বে চীনদেশ হইতে এবং পশ্চিমে Eternal Islands (আল-জাযাইরু'ল-খালিদাত দ্র.) পর্যন্ত দ্রাঘিমা রেখাংশের মধ্যে জনবসতির শেষ সীমাও নির্ধারণ করে। ভারতবর্ষ হইতে লব্ধ একটি ধারণামতে উক্ত দুই প্রান্তের মাঝখানে একটি দ্বীপ অবস্থিত। উহা উত্তর ও দক্ষিণের এবং

পূর্ব ও পশ্চিমের ঠিক মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত ; উহা হইল পৃথিবীর গম্বুজ বা চূড়া (আরিন, উযায়ন, উজ্জায়ন দ্র.)।

পরিশেষে খাত্তু'ল-ইস্তিওয়া' বা বিষুবরেখা আবহাওয়ার বিভিন্ন বিভাগ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (আকালীম, এক বচনে ইকলীম দ্র.) এবং সেই সব বিভাগের মাধ্যমে জনবসতিপূর্ণ ও জনবসতিহীন ভূভাগের মধ্যে পার্থক্যরেখা নির্ধারণ করে, এই পার্থক্য অবশ্য উত্তর-দক্ষিণে। উত্তরে, যেমন Thule-এর দিকে প্রায় ৬০° অক্ষাংশে তীব্র ঠাণ্ডার জন্য জীবন ধারণ করা সম্ভব হয় না, তেমনি দক্ষিণেও আনুমানিক ২১° হইতে ২৪° অক্ষাংশে অত্যধিক তীব্র তাপদাহের জন্য জীবন ধারণ করা সম্ভব হয় না। মোটামুটিভাবে উত্তর হইতে দক্ষিণে আনুমানিক ৮০° অক্ষাংশ জুড়িয়া মানব বসতি রহিয়াছে। কোন কোন লেখক যদিও উত্তর গোলার্ধের ন্যায় দক্ষিণ গোলার্ধেও সাতটি আবহাওয়া অঞ্চলের কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তথাপি প্রাণ ধারণ বা জীবন যাপনের ক্ষেত্রে উভয় গোলার্ধে ঠিক সমঅবস্থা বিরাজ করে না। জীবন পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশেই সীমাবদ্ধ, পূর্ব-পশ্চিমে '0' হইতে ১৮০° পর্যন্ত এবং উত্তর দক্ষিণে ২০° হইতে + ৬০° পর্যন্ত সীমার মধ্যে। সাধারণভাবে পৃথিবীর অবস্থানগত পরিসরের মধ্যে যদি একটি সমতার রেখা টানার বিষয় কল্পনা করা হইত, তবে মানব বসতিপূর্ণ স্থলভাগের বর্ণনায় মোটামুটিভাবে বিষুবরেখাকেই শেষ সীমা বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইত এবং উহা অতিক্রম করা মারাত্মক ও বিপদসংকুল বলিয়াই গণ্য হইত। আরবগণের রচিত ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থসমূহে অনুরূপ ধারণা করে, এমনকি দক্ষিণের দেশগুলি সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়াও তাঁহারা "রেখা অতিক্রম করিবার" ধারণা সম্বন্ধে কোন কিছুই বলেন নাই। আধুনিক অভিযাত্রিগণের নিকটে বিষুবরেখার দক্ষিণে যাওয়া অতি প্রিয় বিষয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) খাওয়ারিয্‌মী, কিতাব সূরাতি'ল-আর্‌দ, সম্পা. von Mzik, Leipzig 1926 (১৯৬৩ খৃ. বহুরঙা পুনর্মুদ্রণ), উহার সর্বত্র; (২) ইব্‌ন খুর্‌রাদাযবিহ, পৃ. ৪-৫, ১৫৭-৮; (৩) বাত্তানী Opus astronomicum, সম্পা. Nallino, ৩ খণ্ড, মিলান ১৮৯৯-১৯০৭ খৃ., উহার সর্বত্র ; (৪) ইব্‌নু'ল-ফাকীহ, ৪-৫ ; (৫) ইব্‌ন রুশ্‌তা-wiet, পৃ. ১৬; (৬) সুহ্‌রাব, কিতাব 'আজা'ইবি'ল-আকালীমি'স্-সাব'আ, সম্পা. von Mzik, Lepzig 1930, পৃ. ৬-৮ ; (৭) মাস'উদী, মুরূজ, সম্পা. Pellat, পৃ. ১৮৭, ১৮৯, ১৯৪, এবং (৮) তানবীহ, অনু. Carra de Vaux, Paris 1897, ৩৭-৪৫; (৯) ইসতাখ্‌রী, সম্পা. এম. জি. 'আবদু'ল-'আল 'আল-হীনী, কায়রো ১৯৬১ খৃ., পৃ. ১৬ ; (১০) হুদূদু'ল-'আলাম, পৃ. ৫০-১ ; (১১) ইব্‌ন হাওকাল-Kramers-Wiet, পৃ. ৫০১ ; (১২) মুকাদ্দাসী, পৃ. ৫৮-৯; (১৩) বীরূনী, আল-কানূনুল-মাস্'উদী, ৩ খণ্ড, হায়দরাবাদ ১৩৭৩-৫/১৯৫৪-৬, ১খ, পৃ. ৩৭৭ প., ৫০২, ২খ, ৫৩২ প., ৫৪৭-৯ ও স্থা. ; (১৪) ইদরীসী, Jaubert, ১খ, পৃ. ২-৩ ; (১৫) যুহ্‌রী (ফাযারী অনুসরণে), কিতাবু'জ-জা'রাফিয়্যা, সম্পা. M. Hadj-Sadok, in B. Et. Or., xxi, দামিশ্‌ক ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৩০১-২; (১৬) য়াকূত, বুলদান, ভূমিকা (tr. W. Jwaideh, The introductory chapters of Yaqut's Muqjam al-buldan, Leiden 1959, পৃ. ২২ প.) ; (১৭) কায্‌বীনী, আছারু'ল-বিলাদ (সম্পা. Wustenfeld, Kosmographie, ii), Gottingen ১৮৪৮ খৃ., পৃ. ৭-৯ ; (১৮) আবু'ল-ফিদা', তাকবীম, পৃ. ৬-৭ ; ইহা ছাড়া সূরাতু'ল-আর্‌দ গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জী দ্র., উহা বর্তমান গ্রন্থপঞ্জীর পরিপূরক হইবে।

A. Miquel (E. I.²)/হুমায়ুন খান

**ইস্তিকবাল** (استقبال) ঃ জ্যোতির্বিদ্যা মতে ইস্তিকবাল-এর অর্থ চন্দ্র ও সূর্যের একে অন্যের বিপরীত দিকে অবস্থান অর্থাৎ এমন একটি অবস্থান যাহাতে পরস্পরের কৌণিক দূরত্ব ১৮০° ডিগ্রী। শব্দটি আপাত অথবা 'প্রকৃত' বৈপরীত্য অর্থে ব্যবহার্য। ইস্তিকবালের বিপরীত হইতেছে ইজ্‌তিমা' (اجتماع) অর্থাৎ দুইটি জ্যোতিষ্কের সম্মিলন (আপাত অথবা প্রকৃত)। এই দুইটি ধারণার ব্যবহারিক গুরুত্ব দুই প্রকারের। গ্রহণসমূহ সংঘটিত হইতে পারে কেবল দুইটি জ্যোতিষ্কের একই রেখায় অবস্থানকালে; বিপরীত দিকে অবস্থানকালে চন্দ্রগ্রহণ এবং একই দিকে অবস্থানকালে সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়। জ্যোতিষ্কদ্বয়ের সংযোগ সময় সঠিকভাবে জানা গেলেই নূতন চন্দ্রের উদয়ের সময় নির্ণয় করা সম্ভব। এই দুই কারণে প্রতিটি যীজ (Zidj)-এ ইস্তিকবালাত (استقبالات) ও ইজ্‌তিমা'আাত (اجتماعات)-এর হিসাবের সারণী (tables) সন্নিবেশিত করা হয়।

কখনও কখনও এই শব্দ দুইটি, যেমন জ্যোতিষীবিদ্যায়, গ্রহসমূহের ব্যাস সংক্রান্ত বিষয় এবং ইহাদের সম্মিলনসূচক ভাব জ্ঞাপনার্থে ব্যবহৃত হয়। যদিও জ্যোতিষিগণ সাধারণত মুকাবালা (مقابلة) ও কিরান (قران) শব্দদ্বয়কেই বেশি পসন্দ করেন, আবার শেষোক্ত শব্দ দুইটি জ্যোতির্বিদগণ কখনও কখনও ইস্তিকবাল ও ইজ্‌তিমা' শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে ব্যবহার করিয়া থাকেন। জ্যোতির্বিদ্যার অপরাপর ক্ষেত্রে ৬০° ডিগ্রী, ৯০° ডিগ্রী এবং ১২০° ডিগ্রী কৌণিক দূরত্বের অর্থে (বিভিন্নভাবে গণনাকৃত) যথাক্রম ষষ্ঠাংশ (تسديس) চতুর্থাংশ (تربيع) ও তৃতীয়াংশ (تثليث) ব্যবহৃত হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক ব্যবহারের জন্য দ্র. C. A. Nallino, Al-Battani, ২খ, ২৯-৩২, ২০৫-৯ ও ৩০৬-৭; (২) জ্যোতিষবিদ্যা বিষয়ক ব্যবহারের জন্য বিশেষ উপযোগী বরাত হইতেছে আল-বীরূনী, কিতাবু'ত-তাফ্‌হীম, দ্র.।

David Pingree (E.I.²)/ শেখ মোঃ তাবীবুর রহমান

**ইস্তিক্‌লাল** (استقلال) ঃ 'আরবী ق-ل-ل ধাতুর ১০ম রূপান্তরে باب استفعال -এর مصدر। প্রাচীন ও মধ্যযুগে 'আরবী ভাষায় এই রূপটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইত (দ্র. Dozy ও অন্যান্য অভিধান), বিশেষত পৃথক, বিচ্ছিন্ন, অবাধ, অবিভক্ত অথবা কোন কোন সময় স্বেচ্ছাচারী অর্থেও। কখনও কখনও রাজনৈতিক প্রসঙ্গে যেমন কার্যকরভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অধীন নহে এমন কোন রাজবংশ। কোন অঞ্চল, কোন জনগোষ্ঠী অথবা কোন নগরের অংশবিশেষকে বুঝাইবার জন্য এই শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তবে এই ধরনের ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে বিরল ও এই শব্দটি কোন অর্থেই পূর্বে রাজনৈতিক পরিভাষা ছিল না। 'উছমানী আমলে সরকারী ব্যবহারে 'অসীম ক্ষমতা'-র অর্থ পরিগ্রহ করে, যথা কোন প্রাদেশিক গভর্নর অথবা সেনাপতির নিয়োগের শর্তাদিতে। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও অনুরূপ অর্থ সংরক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। Botta-এর Storia d'Italia (Italya ta'rikhi, Cairo 1249/1834, 4, 8, 9 etc.) তুর্কী অনুবাদে স্বাধীন সরকারের

বিপরীত অনিয়ন্ত্রিত অভিজাততান্ত্রিক শাসনের অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে এবং শাসকের স্বেচ্ছাচারী কর্তৃত্ব নির্দেশের ক্ষেত্রে রুখসাত (Rukhsat privilege— বিশেষ অধিকার)-এর সহিতই ইহার সচরাচর সংযোগ লক্ষণীয়।

প্রজাপুঞ্জ অথবা আমীর-উমারাদের প্রতিরোধমুক্ত অবাধ স্বাধীনতার অর্থে ইস্‌তিকলাল শব্দটির ব্যবহার খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সাধারণত তুর্কী ও 'আরবী উভয় ভাষাতেই পরিদৃষ্ট হয়। একই সময় য়ূরোপীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও প্রয়োগের প্রভাব কোন দেশ বা জাতির রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের সর্বাধুনিক অর্থে শব্দটি প্রচলিত থাকে (উদাহরণস্বরূপ দ্র. ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার তাতারদের স্বাধীনতা সংক্রান্ত Kucuk Kaynardja-র সন্ধির তুর্কী মূল পাঠ cit. above s. v. Hurriyya ii) ও ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে গ্রীসের স্বাধীনতা সম্পর্কে লন্ডন চুক্তির খসড়া দ্রষ্টব্য (istiklal-i kamil; text in Lutfi, Ta'rikh, ii, 15; A. L. Tibawi, British Interests in Palestine 1800-1901, London 1961, 147-8, citing a British consular despatch of 1858)। ইস্‌তিকলাল প্রবন্ধে আরবদেশসমূহে স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/ শেখ মোঃ তাবীবুর রহমান

**ইস্‌তিকলাল** (استقلال) ঃ ইস্‌তিকলাল শব্দটি আরবী ভাষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি বেশ সাম্প্রতিক সংযোজন। সাধারণ কথাবার্তায় ইহার ব্যবহার, যেমন আনাা মুস্‌তাকিল্ল ("আমি স্বাধীন" অর্থাৎ মুক্ত অথবা শৃঙ্খলমুক্ত) অথবা কখনও কখনও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বনির্ভরতা (ইস্‌তিকলাল ইক্‌তিসাদী) অর্থে ব্যবহৃত হইলেও মুখ্যত শব্দটি বর্তমান শতাব্দীতে আরবদের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত সম্পর্কিত। এই আন্দোলনসমূহই বর্তমান নিবন্ধটির বিষয়বস্তু।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রশক্তিসমূহের দ্বারা চাপাইয়া দেয়া 'উছমানী রাজ্যগুলি সম্পর্কিত খৃ. ১৯১৯-২০ সালে শান্তি শর্তে মিসর, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ আরব ও উপসাগরীয় এলাকা সম্পর্কে তখন বিদ্যমান সুবিধাদির সঙ্গে অর্ধচন্দ্রাকৃতি উর্বর আরব ভূখণ্ডের (Fertile Crescent) উপর বৃটেন ও ফ্রান্সকে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই সমস্ত ঘটনা না ঘটিলে এবং খৃ. ১৯১৬-১৮-এ আরব বিদ্রোহ সংঘটিত না হইলে ইস্‌তিক্‌লাল শব্দটি সম্ভবত খুব সীমিত অর্থই বহন করিত অথবা অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইত। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে 'উছমানী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 'আরবদের রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহের মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ আল-লামার্‌কাযিয়্যা কাঠামোর আওতায়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা ও শব্দকোষে ইস্‌তিকলাল শব্দের কোন বিশেষ অর্থ বা গুরুত্ব ছিল না। ইহা সম্পূর্ণরূপেই একটি আধুনিক, আরোপিত (Attributive) ও আমদানীকৃত রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা— যাহা উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ আরব এলাকার উপর য়ূরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণ অথবা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই কেবল সাধারণ্যে প্রচলিত হয় এবং বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

১৯১৮-২০ খৃ. দামিশ্‌কে ফায়সালের স্বল্পস্থায়ী আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইতেই 'আরব রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও আন্দোলনে ইসতিকলাল শব্দটির দুইটি পৃথক রূপ বা উপাদান সৃষ্টি হয়। ইহাদের একটি প্রথমত ফায়সালের প্রতিষ্ঠা অথবা আরব বিদ্রোহকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পরে সিরিয়া, ট্রান্স-জর্দান, ফিলিস্তীন ও ইরাকে ইস্‌তিক্‌লালপন্থীদের অথবা ইস্‌তিকলাল পার্টির মাধ্যমে ইহা আরবীয় রূপ পরিগ্রহণের দিকে অগ্রসর হয়। এই পার্টি দামিশ্‌কে ফায়সালের রাজ্য ধ্বংস হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং উর্বর আরব ভূমির উপর বৃহৎ শক্তিবর্গের অভিভাবকত্ব নীতির বিরোধিতা করে। বিভিন্ন আরব দেশ, যেমন মিসর, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, মরক্কো, তিউনিসিয়া ও আলজিরিয়ায় এবং তাহার সহিত ট্রান্সজর্ডান ও সুদানেও বৃটিশ অথবা ফরাসী অভিভাকত্ব ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলন গড়িয়া উঠে তাহা বুঝাইতে ইস্‌তিকলাল শব্দ দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হইত। যদিও শেষোক্ত দুইটি স্থানে আন্দোলন তত উত্তাল ছিল না। ফিলিস্তীনের অবস্থা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এইখানে ফিলিস্তিনী আরবদের স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হয় এবং য়াহূদীবাদ বৃটিশ অভিভাবকত্বের উত্তরসুরি হিসাবে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়। অতএব ১৯২২ খৃ.-এর পর ইস্‌তিকলাল শব্দ দ্বারা বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত নূতনভাবে প্রতিষ্ঠিত আরব রাজনৈতিক ভূখণ্ডসমূহের অভিভাবকত্ব ও প্রভুত্ব সম্পর্কের অবসান ঘটাইবার আকাঙ্ক্ষাকেই বিশেষভাবে বুঝাইত।

মিসরে কিছুটা ভিন্নভাবে "আল-ইস্‌তিক্‌লালু'ত-তাম্ম" (পূর্ণ স্বাধীনতা) অন্ততপক্ষে দুইটি দলের রাজনৈতিক শ্লোগানে পরিণত হয় ঃ ন্যাশনাল (ওয়াতানী) পার্টি ও ওয়াফ্‌দ পার্টি। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চার দফা সংরক্ষিত একপক্ষীয় বৃটিশ ঘোষণার অধীনে যতটুকু স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলন বুঝাইতে এই শ্লোগানটি প্রচলিত হয়। বাস্তবিকপক্ষে ইহা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের শ্লোগানে পরিণত হয় এবং মিসরের প্রতিটি সরকারের এক নম্বর নীতি না হইলেও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত নীতি হিসাবে স্বীকৃতি পায়। প্রথমদিকে ইহার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল বৃটেনের সহিত নির্ধারিত সম্পর্কের শর্ত পরিবর্তন, কিন্তু পরে এই সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করাই ইহার লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। ১৯৩৬ সালের ২৬ আগস্ট বৃটেন-মিসর চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে ওয়াফ্‌দ কর্তৃক প্রথম লক্ষ্যটি অর্জিত হয়। দ্বিতীয়টি মিসরের রাজনীতিতে ১৯৩৬ হইতে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তুমুল আন্দোলনের বিষয় ছিল। ১৯৫৪ সালের ১৯ অক্টোবর স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে এবং অধিকতর নাটকীয়ভাবে সুয়েজ খাল এলাকা হইতে বৃটিশ বাহিনীর অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত এই লক্ষ্য অর্জিত হয় নাই।

আরব রাষ্ট্রগুলিতে অভ্যন্তরীণ ও নাগরিক স্বাধীনতার ধারণার সহিত ইস্‌তিকলাল শব্দের কখনও সম্পর্ক ছিল না কিংবা এখনও এই অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই (দ্র. হুররিয়্যা)। কেবল বিদেশী রাজনৈতিক আধিপত্য হইতে মুক্তি অর্জন করা বুঝাইতেই ইহা ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী শক্তির সহিত সম্পাদিত সম্পর্ক-চুক্তি হইতে মুক্তি লাভের ধারণা বুঝাইতেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। ইস্‌তিক্‌লাল শব্দের এই সংকীর্ণ তাৎপর্য গ্রহণের একটি বড় কারণ হইতেছে— সাধারণভাবে আরব রাষ্ট্রগুলির তৎকালীন দুর্বল অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা। এই দুর্বল অবস্থার কারণে বিদেশী শক্তির সহিত যে কোন সম্পর্কেই অসম শক্তির দুই অংশীদারের সম্পর্ক হিসাবে গণ্য করা হয়।

আরব উপদ্বীপ ও উপসাগরীয় অঞ্চলের বাদশাহ ও শায়খ শাসিত রাজ্যসমূহ— যেগুলিতে গোষ্ঠীতান্ত্রিক, ধর্মীয় গোত্রভিত্তিক ও বংশানুক্রমিক

শাসন বিদ্যমান— এইগুলি স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত জড়িত ছিল না। সুতরাং তাহাদের রাজনৈতিক শব্দতালিকায় ইস্‌তিকলাল শব্দের বিশেষ স্থান ছিল না। ইব্‌ন সা'উদ ও তাঁহার ওয়াহ্‌হাবী যোদ্ধাগণ শক্তিবলে বর্তমানে সা'উদী আরব নামে পরিচিত এলাকার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন এবং ১৯৩২ খৃ. আনুষ্ঠানিকভাবে সা'উদী 'আরব একটি রাজ্যে পরিণত হয়। ইব্‌ন সা'উদ তাঁহার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রপতি, যেমন নাজ্‌দের আর-রাশীদ ও হিজাযে মক্কার শারীফকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। য়ামানের যায়দী ইমামাত স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করিত এবং 'উছ্‌মানী খিলাফাতের অধীনে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিত। ইসলামের প্রথম যুগ হইতেই এখানে ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল। উপসাগরীয় এলাকার ছোট ছোট শায়খ শাসিত রাজ্য— যেগুলি ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃটিশ শাসনের তত্ত্বাবধানে আশ্রিত রাজ্য ছিল— সেইগুলি ছিল স্বায়ত্তশাসিত, মরুময় ও গোত্রপতিদের শাসনাধীন ভূমিখণ্ড; পরে ১৮৯৯ খৃ.-এ সম্পাদিত অনুরূপ এক চুক্তির ফলে বৃটেনের আশ্রিত রাজ্য, উপসাগরীয় এলাকার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত আলসাবাহ কর্তৃক শাসিত, তেলসমৃদ্ধ কুয়েত ১৯৬১-এর জুনে স্বাধীনতা লাভ করে। সাম্প্রতিককালে, বিশেষ করিয়া ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকের 'আব্‌দু'ন্‌-নাসির (Nasser) ও বা'ছ (Ba'th) পার্টির নেতৃত্বে আন্ত-আরব রাজনীতির মৌলিক পরিবর্তন এবং এডেন ও দক্ষিণ আরব অঞ্চল হইতে বৃটিশ বাহিনীর অপসারণ, ১৯৬৭ সালের ২৭ নভেম্বর দক্ষিণ য়ামান প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, ১৯৬৮ সালের ৩০ মার্চ উপসাগরীয় এলাকার ছোট ছোট চুক্তিবদ্ধ দেশ (Trucial States)-সহ আরব আমীরাতসমূহের ফেডারেশন গঠন এবং ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর তাহার স্বাধীন সার্বভৌম মর্যাদা লাভ প্রকৃতির বাস্তবতার ভিত্তিতে আরব জগতের এই পূর্বতন এলাকা ইস্‌তিকলালের আরব আদর্শের স্রোতধারায় আনীত হয়। বাহ্‌রায়ন তাহার দ্বীপের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ প্রকৃতি ও ফেডারেশনভুক্ত অন্য আরব আমীরাতসমূহ হইতে স্বাতন্ত্র্যের কারণে ১৯৭১ সালের সেপ্টম্বরে নিজস্ব স্বাধীনতার পক্ষে মত প্রকাশ করে।

রাজনৈতিক ধারণা ও আন্দোলন হিসাবে ইস্‌তিকলাল উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহ ও আরবের অর্ধচন্দ্রাকৃতি উর্বর (Fertile Crescent) এলাকার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিতই প্রকৃতপক্ষে সঠিকভাবে সম্পর্কিত। এইভাবে ১৯৩২ সালের অক্টোবরে ইরাকের উপর বৃটিশ অভিভাবকত্বের অবসান ঘটে তখন ইরাক League of Nations-এর সদস্য পদ লাভ করে। তথাপি ১৯৩০-এর ৩০ জুনের বৃটেন-ইরাক পক্ষপাতী মৈত্রী চুক্তি (Preferential Alliancc) বলে অর্জিত স্বাধীনতাও পূর্ণাঙ্গ ছিল না, কারণ বৃটেন ইরাকের বৈদিশিক সম্পর্কের উপর নিয়ন্ত্রণ ও শু'আয়বা (বসরা) ও হাববানিয়্যায় (বাগদাদ) তাহার বিমান ঘাঁটি বজায় রাখে। ইস্‌তিকলালকে আরও অগ্রসর করিবার প্রচেষ্টায় ১৯৪৮-এর ১৫ জানুয়ারি পোর্টসমাউথ চুক্তি (Portsmouth Treaty) স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ইহার শর্তাবলীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদের মুখে ইহা বাতিল হইয়া যায় এবং ফলস্বরূপ ইরাকীরা ইহাকে প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৫৫ খৃ.-এ বৃটেনের বাগদাদ চুক্তিতে যোগদানের ফলে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তি নূতন বিন্যাস লাভ করে। পরে প্রেসিডেন্ট কাসিমের অধীনে ইরাক বাগদাদ চুক্তি হইতে বাহির হইয়া আসে। এই ব্যবস্থাকে বৃটেনের সহিত ৪০ বৎসর স্থায়ী সম্পর্কের অবসান ঘটানোর চূড়ান্ত পদক্ষেপ গণ্য করা যায়। আর এইভাবে অন্ততপক্ষে মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়া ইরাক ইস্‌তিকলালু'ত-তাম্ম (পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা) লাভ করে।

সিরিয়া ও লেবাননও যুদ্ধ-মধ্যবর্তী সময়ে ফরাসী অভিভাবকত্বে সীমিত স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিয়া বসে। উভয় দেশে ইস্‌তিকলাল সকল রাজনৈতিক দল ও সংস্থার কার্যকলাপের স্লোগান ও রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির ভিতরে ইহা বিবাদের বিষয়ে পরিণত হয়। ইহা অর্জনের জন্য আপোসহীন ও দৃঢ় ভূমিকা দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক সম্মানের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়ায়। যাহা হউক, সিরিয়া ও লেবানন উভয়েই ১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝি হইতে ফরাসী ম্যান্ডেটের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র হিসাবে বিদ্যমান ছিল। অতঃপর লেবানন ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পাদিত ১৯৩৬-এর নভেম্বর চুক্তি স্বাধীনতার পথে একটি পদক্ষেপরূপে প্রমাণিত হয় এবং তিন বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সূচনা করে। সেই বৎসরেরই প্রথমদিকে ফ্রান্সের সহিত অনুরূপ এক চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব সিরিয়া প্রত্যাখ্যান করে। এই চুক্তিসমূহ স্বাধীন মর্যাদার স্বীকৃতি ও আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে সাবেক ম্যান্ডেটরী শক্তির সহিত এক বিশেষ সম্পর্কের সৃষ্টি করে। ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে এই প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। অবশেষে ফ্রান্স যুদ্ধ হইতে সরিয়া আসার পর ১৯৪১ সালে এই দুইটি দেশকে স্বাধীনতা প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। ফরাসী সেনাপতি General Catroux ১৯৪১-এর সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর মাসে যথাক্রমে সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। তবুও ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত নানা রকম বাধা ও অসুবিধার সৃষ্টি হইতে থাকে। অবশেষে ১৯৪৬-এর শেষের দিকে উভয় দেশ হইতে সর্বশেষ ফরাসী বাহিনী অপসারিত হয় এবং তখনই দেশ দুইটি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আমীর 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু'ল-হুসায়নের শাসনাধীনে একটি অর্ধ-স্বাধীন আমীরাত (আমীর শাসিত রাজ্য) হিসাবে ট্রান্সজর্ডান শেষ পর্যন্ত জেরুসালেমে নিযুক্ত বৃটিশ হাইকমিশনারের নিয়ন্ত্রণেই থাকিয়া যায়। ১৯২৯-এ এক চুক্তির মাধ্যমে বৃটেন ট্রান্সজর্ডানকে বৃটিশ অভিভাবকত্বে আমীর 'আবদুল্লাহ্‌র শাসনাধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ইস্‌তিকলালপন্থীদের কার্যকলাপ ও বৃটেনের নিয়ন্ত্রণ হইতে পূর্ণ মুক্তি লাভের জন্য তাহাদের আরব জাতীয়তাবাদী দাবির পরোক্ষ প্রভাবেই আমীর 'আবদুল্লাহ ১৯২৮ সনে বৃটেনের সহিত সম্পাদিত এক চুক্তি দ্বারা তাঁহার সদ্য প্রতিষ্ঠিত শিশু রাষ্ট্রটির জন্য আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে অধিকার অর্জন করিতে সমর্থ হন। ১৯৩৪ সনে তাঁহাকে বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং ১৯৩৯ সনে তাঁহার ব্যবস্থাপক সভা মন্ত্রী পরিষদে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৬-এর ২২ মার্চ বৃটেনের সহিত সম্পাদিত লন্ডন চুক্তিতে জর্দানকে স্বাধীন হাশিমী রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং 'আবদুল্লাহকে ইহার প্রথম বাদশাহ ঘোষণা করা হয়। এই চুক্তি ১৯৩৬-এর মিসরীয় চুক্তির নমুনায় করা হইয়াছিল— কারণ ইহাতে বৃটেনের সহিত জর্দানের এক বিশেষ সম্পর্কের ব্যবস্থা রাখিয়া তাহার স্বাধীনতাকে সীমিত রাখা হয়। ইহার পর ১৯৪৮ সনে আর একটি বৃটেন-জর্দান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরাধীনতার সর্বশেষ বন্ধন ছিন্ন করিয়া ১৯৫৭-এর ১৩ মার্চ দেশটি পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে।

১৯২০, ৩০ ও ৪০-এর দশকের দিকে ইস্‌তিকলাল আন্দোলন মিসর ও ফার্টাইল ক্রিসেন্ট (Fertile Crescent) নামে পরিচিত আরব এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণভাবে বিশ্বব্যাপী বৃটিশ আধিপত্য হ্রাস ও বিভিন্ন উপনিবেশ হইতে তাহাদের সরিয়া আসা, বিশেষ করিয়া ১৯৪৭ সনে পাক-ভারত উপমহাদেশীয় সাম্রাজ্যকে অনেকটা স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা প্রদান— এ সবের ফলে ইস্‌তিকলাল আন্দোলন আরব-প্রাচ্যের অন্যান্য এলাকায় দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথমে ইন্দোচীনে ও পরে আফ্রিকায় ফরাসী সাম্রাজ্যের অবসানের ফলে আফ্রিকার মাগরিবেও ফরাসী মর্যাদা হ্রাস পায়। '৫০-এর দশকে ইসতিকলাল আন্দোলন লিবিয়া, সুদান, তিউনিসিয়া ও মরক্কোতে গিয়া পৌঁছে। পূর্বে কুয়েত ও পশ্চিমে আলজিরিয়া, যথাক্রমে ১৯৬১ ও ১৯৬২ সনে একই কর্মপন্থা অনুসরণ করে। অন্যান্য দেশ হইতে আলজিরিয়ার ঘটনা প্রবাহ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করে। কারণ আলজিরিয়া অস্ত্রসজ্জিত ফরাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সাত বৎসরের এক অভূতপূর্ব রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে।

মিসর ও সুদানের মধ্যে দীর্ঘকালের ঐতিহাসিক যোগসূত্র থাকা সত্ত্বেও ১৯২৪ সনের পর হইতে সুদান কার্যত বৃটেন কর্তৃক শাসিত হইয়া থাকে। ইহার ফলে ১৮৯৯ সালে গঠিত বৃটিশ-মিসরীয় যুগ্ম-শাসনের (Condominium) অবসান ঘটে। দেশের স্থানীয় প্রশাসনে বৃহত্তর সুদানীকরণ চলিতে থাকে। ১৯৩৬ সালে বৃটিশ-মিসরীয় চুক্তি দ্রুত সুদানী জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটায় এবং বিশেষভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীন সুদান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সৃষ্টি করে, যাহার পিছনে বৃটেন উৎসাহ যোগাইয়াছিল। মিসরের পরিকল্পনা ছিল মিসরের বাদশাহ্‌র অধীনে কিংবা ১৯৫২-এর পর মিসর প্রজাতন্ত্রের অধীনে মিসর ও সুদান সমন্বয়ে সংযুক্ত নীল উপত্যকায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে। সুদানের অভ্যন্তরে মিসরের রাজনৈতিক পোষকতাপ্রাপ্তরাও এই পরিকল্পনা সমর্থন করে। কিন্তু সুদানের জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আন্দোলন অধিকতর শক্তিশালী প্রমাণিত হয়। সুয়েজ খাল হইতে বৃটিশ শক্তি অপসারণের জন্য ১৯৫৩-৫৪ সনের বৃটিশ মিসরীয় সমঝোতার অংশ হিসাবে সুদান তিন বৎসরের পরিবর্তনকাল অতিক্রম করিয়া ১৯৫৬-এর ১ জানুয়ারী স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

উত্তর আফ্রিকার সর্বাপেক্ষা কম উন্নত দেশ লিবিয়াতেই প্রথম ১৯৫১-এর ২৪ ডিসেম্বর ইস্‌তিকলাল গড়িয়া উঠে। দেশে ইতালীয় দখলের সময়ে (১৯১১-৪২ খৃ.) ইতালীয় শাসন হইতে মুক্তি অর্জনের জন্য ইদ্‌রীসের নেতৃত্বাধীন সানূসী ভ্রাতৃসংঘের আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্ত কোন স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল না। ইহা ছিল প্রধানত সাইরেনিকারই নিজস্ব ব্যাপার এবং ৩০ ও ৪০ দশকের মিসরের সহিত ছিল ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক— যেখানে ইদ্‌রীস তাঁহার প্রধান প্রধান রাজনৈতিক সহযোগীকে লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই নয় যে, ত্রিপোলিতানিয়ার অধিবাসীরা স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত জড়িত ছিল না— কিন্তু তাহাদের বেশি ঝোঁক ছিল মাগরিবের দিকে এবং আরব প্রাচ্যে সিরিয়ার দিকে। যাহা হউক, বৃটিশ শক্তিই ১৯৪৯-৫০-এ ইদ্‌রীসকে লিবিয়ায় ক্ষমতায় বসায়। মিসর ও আরবের ফার্টাইল ক্রিসেন্ট ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সময় বৃটিশ শক্তি লিবিয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সম্পর্ক-ব্যবস্থার সেই পুরাতন নীতি চালু করে— যে লিবিয়ার স্বাধীনতা অর্জনে বৃটিশ সাহায্য করিয়াছিল। ১৯৫২-৫৩-এ সম্পাদিত এই চুক্তিতে দেশের ভিতর বিদেশী ঘাঁটির অস্তিত্ব থাকিয়া যায়। যাহা হউক, অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের মত লিবিয়া ১৯৬৪ সালের দিকে আল-ইস্‌তিকলাল্‌'ত তাম্ম (পূর্ণ স্বাধীনতা) অর্জনের লক্ষ্যে ও আন্ত-আরব রাষ্ট্রসমূহের দ্বন্দ্বে সৃষ্ট পরিস্থিতি ও উগ্র আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তাহার ভূখণ্ড হইতে বিদেশী ঘাঁটি (বৃটিশ ও মার্কিন ঘাঁটি) অপসারণ করার দাবি উত্থাপন করে। ১৯৬৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর এক সামরিক অভ্যুত্থানে সানূসী রাজতন্ত্র ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং দেশকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। অভ্যুত্থান কর্তৃপক্ষ ইস্‌তিকলাল অর্থাৎ স্বাধীনতার সকল প্রতিবন্ধকতা, বিদেশী আধিপত্যের সকল চিহ্ন ও নিদর্শন, ঘাঁটি, বিদেশী প্রতিষ্ঠান, এমনকি দেশের ভিতর বসবাসকারী বৃহৎ ইতালীয় জনগোষ্ঠীকে অবিলম্বে অপসারণের নির্দেশ প্রদান করে।

তিউনিসিয়া ও মরক্কো ১৯৫৬ সনে স্বাধীনতা লাভ করে। পাশ্চাত্যে, বিশেষভাবে ফ্রান্সে শিক্ষিত, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বুর্জোয়া গোষ্ঠীর দস্তুর পার্টি (Destour Party) ও অধিকতর রক্ষণশীল মুসলিম আরবদের যৌথ নেতৃত্বে তিউনিসিয়ার ইসতিকলাল আন্দোলন পরিচালিত হয়। পরবর্তী সময়ে পরিচালিত খায়রু'দ্‌-দীন আত্‌-তূনিসী (দ্র.)-এর শাসনতান্ত্রিক সংস্কার আন্দোলনেরই উত্তরসুরি এই আন্দোলন 'আরবী ভাষায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা বুঝাইবার জন্য নির্দিষ্ট কোন পরিভাষা না থাকায় স্বাধীনতা পূর্বকালীন মধ্যবর্তী স্তর বুঝাইবার জন্য ইস্‌তিকলাল দাখিলী (অভ্যন্তরীণ) পরিভাষা ব্যবহৃত হইত। এই অবস্থা স্বাধীনতার উত্তরণে সাহায্য করিত। তিউনিসের 'বে'শাসকগণ তিউনিসিয়ার আধুনিক স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু মরক্কোর শারীফী 'আলাবী সুলতান পঞ্চম মুহাম্মাদ ফরাসী অভিভাবকত্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। তবে মরক্কো ও তিউনিসিয়া উভয় দেশেরই 'ইস্‌তিকলাল' অর্জনের জন্য পরিচালিত যুদ্ধ আলজিরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ হইতে আলাদা ছিল। কারণ ফ্রান্স পূর্বে সম্পাদিত অভিভাবকত্ব চুক্তির বলে দেশ দুইটিকে শাসন করিলেও তাহারা কিছুটা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিত। উভয় রাষ্ট্রেই ফরাসী কর্তৃত্বের অধীনেও দেশীয় ইসলামী কর্তৃপক্ষ ও ইহার প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যকর ছিল। কিন্তু আলজিরিয়াকে আইন দ্বারা ফ্রান্সের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। সুতরাং ফ্রান্স হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য সেইখানে ইস্‌তিকলাল আন্দোলন হিংস্র ও রক্তাক্ত যুদ্ধের রূপ নেয়। মরক্কোতে স্বাধীনতা লাভের পরও 'আলাবী রাজবংশ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু তিউনিসিয়ায় বংশানুক্রমিক 'বে' বংশের শাসনের অবসান ঘটে। সর্বশেষ 'বে' শাসক মুহাম্মাদ আল-আমীন ক্ষমতাচ্যুত হন যখন ১৯৫৭ সালের ২৫ জুলাই গণপরিষদ তাঁহার পদের বিলুপ্তি ঘটায় এবং তিউনিসিয়াকে একটি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে।

মোটকথা, বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া জাতীয় রাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভের জন্য আরব জাহানে বেশ কিছু আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছে। এই আন্দোলনসমূহ কখনও এক সঙ্গে পাশাপাশি চলিয়াছে ; আবার কখনও কেহ কেহ ইস্‌তিকলালের তাৎপর্য ব্যাপকতর করিয়া প্রচলিত রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর আরব জাহানকে আন্দোলনের আওতায় আনিতে চাহিয়াছে। বিস্তৃততর ইস্‌তিকলালের ধারণা আন্ত-আরব রাজনীতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটাইয়া তাহাকে বিপ্লবী রূপ দানে কী ভূমিকা পালন করিয়াছে তাহা ৫০-এর দশকে আরব ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বা'ছ (Bath) পার্টির ভূমিকায় দেখা যায়। পৃথক পৃথকভাবে

বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলসমূহ ইস্‌তিকলালের নামে অধিকতর আরব ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও পাশ্চাত্য বিরোধী জাতীয় কর্মপন্থাও পরিচালিত করিত। উদাহরণস্বরূপ মুহাম্মাদ মাহ্‌দী কুব্বা, সি‌দ্দীক‌ শান্‌শাল ও ফা'ইকু'স-সামাররা'ঈ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইরাকের ইস্‌তিকলাল পার্টি ও মরক্কোতে 'আল্লাল আল্‌-ফাসী পরিচালিত 'ইস্‌তিকলাল' পার্টির কথা উল্লেখ করা যায়।

মজার ব্যাপার এই যে, ১৯৫৭ হইতে ১৯৬৭ খৃ. পর্যন্ত আরব রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিবাদের এই সময়ে ইস্‌তিক‌লাল অধিকতর আদর্শ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। এই সময়ে আরব রাষ্ট্রসমূহ মেরুকরণ প্রক্রিয়ায় মোটামুটি দুইটি শিবিরে ভাগ হইয়া যায়। একদিকে বিপ্লবী আরব সোসালিস্ট ও উন্নত জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রসমূহ এবং অন্যদিকে রক্ষণশীল অথবা ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্রসমূহ। প্রথম শিবির নাসি‌রের নেতৃত্বের সহিত অভিন্নরূপে চিহ্নিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বা'ছ পার্টির আদর্শে অনুপ্রাণিত। এই শিবিরের প্রায় সব কয়টি রাষ্ট্রই সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সাবেক শাহী শাসনকে পূর্বেই ক্ষমতাচ্যুত করে, যে শাসন কোন না কোন য়ুরোপীয় শক্তির সহিত পূর্ব সম্পর্ক বজায় রাখিত। ৫০-এর দশকের শেষের দিকে আসিয়া ইহাদের অনেকেই পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। মিসর, সিরিয়া, ইরাক, আলজিরিয়া এবং ১৯৬২-এর পর য়ামানের এই অবস্থা ঘটে। দ্বিতীয় শিবিরে থাকে প্রধানত ঐতিহ্যগত রাজতান্ত্রিক দেশসমূহ। ইহাদের কোন কোনটি তৈলসমৃদ্ধ, যেমন সা'ঊদী 'আরব, মরক্কো, কুওয়ায়ত এবং জর্দান।

বিপ্লবী শিবির যুক্তি প্রদর্শন করে যে, তাহাদের বিরোধী অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে কোন প্রকৃত ইস্‌তিকলাল নাই। কেননা এই শিবিরভুক্ত শাসকসমূহ প্রতিবিপ্লবী এবং এখনও পাশ্চাত্যের য়ুরোপীয় ও আমেরিকান শক্তিসমূহের সহিত বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিতেছে। এই সম্পর্ক রাখার জন্য তাহাদেরকে "সাম্রাজ্যবাদ ও নব্য উপনিবেশবাদের এজেন্ট"-রূপে আখ্যায়িত করা হয়। এমনকি বলা হয় যে, তাহারা 'প্রকৃত স্বাধীন' নয়। প্রাচ্য আরব ও পশ্চিমী আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার এই 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' ১৯৬৭ সালের জুনে সংঘটিত আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের পর কমিয়া আসে। আরব রাষ্ট্রসমূহ উপলব্ধি করিতে পারে যে, তাহাদের ইস্‌তিক‌লাল থাকা সত্ত্বেও তাহাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পারিপার্শ্বিকতার কৌশলগত অবস্থা ও নিজেদের অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখার প্রয়োজনীয়তা বিদেশী শক্তির সহিত তাহাদেরকে অসম সম্পর্ক বজায় রাখিতে বাধ্য করিয়াছে।

**গ্রন্থপঞ্জী** : সাধারণ : (১) G. Antonius, The Arab Awakening, London 1938; (২) S. Haim, Arab Nationalism বার্কলে এবং লস্‌ এঞ্জেল্‌স ১৯৬২ খৃ.; (৩) E. Kedourie, England and the Middle East' The destruction of the Ottoman Empire, ১৯১৪-২১ খৃ., লণ্ডন ১৯৫৬ খৃ.; (৪) B. Lewis, The Middle East and the West, London 1954; (৫) H. Sharabi, Governments and Politics of the Middle East in the Twentieth Century, প্রিনসটন-নিউজার্সী ১৯৬২ খৃ.; (৬) ঐ লেখক, Nationalism and Revolution in the Arab world, প্রিন্সটন, নিউজার্সী ১৯৬৬ খৃ.; (৭) Z. N. Zeine, The Struggle for Arab independence, বৈরূত ১৯৬০ খৃ.।

দি ফার্টাইল ক্রিসেন্ট : (৮) A. Abidi, Jordan " a political study, London 1965; (৯) A. Hourani, Syria and Lebanon, a political essay, London 1954; (১০) P. Ireland, Iraq " a study in political development, London 1938; (১১) M. Khadduri, Independent Iraq, London 1960; (১২) K. Salibi, The Modern History of Lebanon, London 1965.

মিসর, সুদান ও উত্তর আফ্রিকা : (১৩) J. Berque, Egypt, imperialism and revolution, London 1972; (১৪) P. J. Vatikiotis, The Modern history of Egypt, London 1969; (১৫) P. M. Holt, A Modern history of the Sudan, London 1961; (১৬) C. Julien, L' Afrique Du Nord er. Marche" Nationalism Musulmans et Souverainete Francaise, প্যারিস ১৯৫২ খৃ.; (১৭) N. Barbour, A Survey of North West Africa, London 1962; (১৮) R. Le Tourneau, Evolution Politique de I' Afrique Du nord musulmane. 1920-1961, প্যারিস ১৯৬২ খৃ.।

P. J. Vatikiotis (E. I.[2])/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

**ইস্‌তিক্‌সাম** (استقسام) : ق-س-م ধাতু হইতে উদ্ভূত استقسام। পদটি দুই প্রকার অর্থ জ্ঞাপক, এক প্রকার অর্থ 'যাদু' (magic) সম্পর্কিত, অপরটি divination (ভবিষ্যদ্বাণী) সংক্রান্ত। বাব্‌ ইস্‌তিফ'আল-এর ইস্‌তিকসাম পদটি দেও-দানব তাড়ান, ঝাড়ফুঁক প্রভৃতির মন্ত্র এবং প্রক্রিয়া জ্ঞাপনার্থে ব্যবহৃত। Divination সম্পর্কিত অর্থে প্রয়োগ করা হয় বাব্‌ তাফ'ঈল-এর "কাস্‌সামা" (قسم) এবং বাব ইফ'আল-এর "আক্‌সামা" (اقسم), বিশেষভাবে খৃষ্টান আরব জাহান-এর একই অর্থবহ হিব্রু 'কে‌সেম' (e. g. deut. xxiii, 23) শব্দের সুস্পষ্ট প্রভাবে। এই প্রয়োগ পরবর্তী ও কথ্য ভাষাগত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় খৃষ্টান আরবদের মধ্যে যাহারা قسام পদটি ব্যবহার করেন বিভিন্ন অর্থে, যথা বশীকরণ (adjuration, exorcism formula), ও যাজকত্ব সংক্রান্ত অধ্যাদেশ (priestly ordination), تقسيم পদটি conjuration (ভূত নামান মন্ত্র) অর্থে এবং سقف قاسم কথাটি অধ্যাদেশ প্রাপ্ত যাজক (ordinant bishop) অর্থে (তু. Dozy, Supp. ii. 345 ff.; Fagnan, Additions aux dicionnaires arabes, 14)। এইরূপ ব্যবহার প্রাচীন 'আরবীতে দৃষ্ট হয় না অথবা ইহার প্রয়োগ অন্তত দুইটি অর্থে সীমাবদ্ধ থাকে; যথা استقسمة। [শপথ তলব করা হইল এবং استقسم ب। (কোন জিনিসের নামে শপথ করা হইল (اقسم অর্থে)] তু. T. A. Bulak, ix, 26; W. R. Smith, in Jounal of Philology, xiii (1885), 274; T. W. Davies, Magic, divination and demonology among the Hebrews and their neighbours, London 1899, 44-7)।

দৈব প্রক্রিয়ার সমুদয় ক্ষেত্রে সর্বত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন সিরীয় ভাষায় 'দৈব প্রক্রিয়া ব্যবহার' অর্থজ্ঞাপক 'কা‌সাম'

(قصم) শব্দের অর্থে দৈবপ্রক্রিয়ার মূল বাণী (essence) হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। এই 'কাস্‌ম' শব্দ হইতেই দৈবজ্ঞ (soothsayer-গণক) অর্থে 'কুসুমো' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে [তু. ref. in Semitica, viii (1958), 73, n. 4)]। প্রাথমিক পর্যায়ে ইস্‌তিক্‌সাম কেবল তীর নিক্ষেপ প্রক্রিয়ায় (استقسام بالازلام) ভাগ্য বা শুভাশুভ নির্ধারণ পদ্ধতি (belomancy) নির্দেশ করিত যাহা কুরআনে (৫ ঃ ৩) মায়্‌সির নামক অপর এক ভাগ্য পরীক্ষা পদ্ধতিসহ নিন্দিত (৫ ঃ ৯০) ও নিষিদ্ধ হইয়াছে। দৈবনির্ভর ঝুঁকিপূর্ণ (chance)-পূর্ণ সমস্ত সদৃশ ভাগ্য এবং শুভাশুভ নির্ণয় প্রক্রিয়া পর্যন্ত কুরআনের এই নিষেধাজ্ঞাকে সম্প্রসারণ করা হইয়াছে (তু. al-Tabari, Tafsir, ii, 201, 1.3ff.)। পৌত্তলিক সম্প্রদায়ে প্রচলিত belomancy-র পদ্ধতি ইস্‌তিকসাম-এর কিছু ধর্মীয় দিক এবং মায়্‌সির-এর ধর্ম বিরুদ্ধ দিক রহিয়াছে, T. Fahd এই কথাটি প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন (Divination, 180 ff., 204 ff.)। তবে উভয়ই পৌত্তলিক দৈব প্রক্রিয়ার প্রতীক রূপ প্রাপ্ত হয়।

এই নিবন্ধে ইস্‌তিক্‌সাম শব্দটি কেবল পৌত্তলিকদের ধর্মীয় বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গীতে তীর নিক্ষেপ প্রক্রিয়ায় শুভাশুভ নির্ণয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আরবে অনুরূপ আরও অনেকগুলি দৈব প্রক্রিয়ার সহিত ইহার ব্যবহার প্রচলিত ছিল (দ্র. জামারা (ব. ব. জিমার), রাম্‌ল, মায়্‌সির, কুর'আ, জাফ্‌র, মালাহিম, হুরূফ; আল-আসমা'উ'ল-হুস্‌না, খাওয়াস্‌সু'ল-কুরআন, যা'ইরজা ; তু. Divination, 195-204 ]।

প্রাচীন আরবগণ ভবিষ্যত নির্ণয়ের জন্য তিন প্রকার পদ্ধতি ব্যবহার করিত। ইহাতে ব্যবহৃত কিদ্‌হ (قدح ব. ব. اقداح) এবং যালাম (زلم ব. ব. ازلام) হইত পালক বা ফলাবিহীন। বেদুঈনদের মধ্যে প্রচলিত প্রথম পদ্ধতিতে দুইটি তীর বা বর্শাকে কোন মেষ-চর্ম (قرابة) বা চর্মাধার (مدارة)-এর মধ্যে রাখিয়া নিক্ষেপ (toss) করা হইত। বিবাদমীমাংসার ক্ষেত্রে যাহাতে মধ্যস্থতাকারীকে অবশ্যই গোত্রের কাহিন (كاهن) হইতে হইবে এবং তীর-বর্শাগুলি হইত তাহার নিজ দায়িত্বে রক্ষিত ধর্মকার্যে (Cult) ব্যবহৃত উপকরণাদির অন্তর্ভুক্ত। এই পদ্ধতি ছিল কিছুটা হিব্রু যাযাবরদের 'Urim' ও Thummim প্রক্রিয়ার ন্যায়।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি আল-খালাসা (الخلاصة) নামক দেবীর মন্দিরে অনুশীলন করা হইত। আগন্তুকগণের জিজ্ঞাস্যের মুকাবিলায় ব্যবহৃত হইত তিনটি তীর যাহাদের নাম ছিল ঃ আল-আমির (নির্দেশক), আন-নাহী (নিষেধক) ও আল-মুতারাব্বিস (المتربص। প্রতীক্ষারত)। গির্জাধিকর্তা' 'সাদিন' (سادن) তীরগুলি নিক্ষেপ করিতেন। কবি ইম্‌রু'উ'ল-কায়স তীরের সাহায্যে শুভাশুভ নির্ণয় করিবার শেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয় (আগানী, ৮খ, ৭০)। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে নিষেধসূচক ইঙ্গিত পাইবার কারণে তিনি তীরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলেন বলিয়া কথিত আছে।

তৃতীয় ও অতীব সুবিদিত ছিল পবিত্র কা'বা গৃহে 'হুবাল' (দ্র.) দেবতার সমক্ষে ব্যবহৃত বিশেষ পদ্ধতি। সাতটি তীর এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হইত। কিছু আনুতোষিক বা হাদিয়া (Gratuity) ও দেবতার প্রতি নিবেদিত কোন বলির বিনিময়ে 'সাদিন' তীরগুলিকে চালু করিত। ঐ তীরগুলির নাম ছিল ঃ আল-'আক্‌ল (শোণিতপণ), রক্তপাতের বদলা কে দিবে তাহা নির্ণয়ার্থ ইহা ব্যবহৃত হইত; 'না'আম' (نعم - হাঁ) ও 'লা' (لا-না), এই দুইটি তীর 'করা' বা 'না করা'-র মধ্যে কোন্‌টি সমীচীন তাহা নির্ণয় করিত। কোন ব্যক্তির গোত্রীয় সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত তীরগুলির গায়ে লেখা থাকিত ঃ منكم (তোমাদের গোত্রভুক্ত) অথবা من غيركم (ভিন্ন গোত্রের) অথবা ملصق (সংযুক্ত বা সম্পৃক্ত), তৃতীয়টি সন্দেহসূচক; আল-মিয়াহ্ (المياه-পানি) চিহ্নিত তীর কোন নির্দিষ্ট স্থানে পানির উপস্থিতি নির্ণয় করিত (তু. ইব্‌ন হিশাম, ৯৭ প.)।

কোন গুরুতর বিবাদের সূত্রপাত হইলে মক্কার জনগণ এক শত দিরহাম বা পরিবর্তে একটি উট প্রদান করিয়া দেবতার কিনানাঃ (كنانة-তূণীর)-তে রক্ষিত, সাদিন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তীরের নির্দেশ চাহিত। ইব্‌ন হিশাম প্রণীত সীরাত গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিতামহ 'আবদু'ল-মুত্তালিব কর্তৃক তাঁহার জীবনের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দুইবার তীরের সাহায্য গ্রহণের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। প্রথমবার ঃ 'যমযম' কূপ পুনরুদ্ধারের জন্য স্থান পরিষ্কার করার সময়ে তিনি যে মূল্যবান গুপ্তধন আবিষ্কার করেন, উহা কাহার নিকট প্রত্যর্পণ করিবেন তাহা নির্ণয়ের জন্য (ইব্‌ন হিশাম, ৯৪)। দ্বিতীয়বার ঃ তাঁহার পুত্র সংখ্যা দশে উপনীত হইলে তিনি তাহাদের একজনকে কা'বায় কুরবানী করিবার শপথ পালনের জন্য দশ পুত্রের কাহাকে কুরবানী করিবেন তাহা স্থির করিতে (ঐ, ৯৭-১০০)।

তীর্থযাত্রিগণও তীরের সাহায্যে শুভাশুভ নির্ণয় পন্থা গ্রহণ হইতে বিরত থাকিতে পারে নাই এবং পৌত্তলিক আরবের এই প্রখ্যাত নগরীর বহু আকর্ষণের ইহা ছিল অন্যতম। বহু দলীলে উল্লেখ পাওয়া যায়, এই প্রথাটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। পবিত্র কা'বার সহিত সম্পৃক্ত তীরসমূহের পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল আরও কতিপয় ধরনের তীর (উদাহরণের জন্য দ্র. Divination, 189f.), যাহা গণক (دهن) অথবা গোত্রজ্যেষ্ঠগণ অথবা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত। আন-নুওয়ায়রী (নিহায়া, ৩খ, ১১২ প.) প্রদত্ত কা'বার বাহিরে ব্যবহৃত তীরসমূহের একটি দীর্ঘতর ও বহু প্রকারভেদ সম্বলিত তালিকায় সন্নিবেশিত হইয়াছে অনেক প্রকার শুভাশুভ নির্দেশক তীর যাহা একটি মাদারা (বালতির ন্যায় পাত্রে সেলাইকৃত একটি চর্ম)-তে, কোন কাহিন বা কাহিনের অবর্তমানে গোত্র বা শহরের সম্মানিত যে কোন ব্যক্তি নিক্ষেপ করিতে পারিতেন। ইব্‌ন ইস্‌হাক-এর সীরাত-এ ও তাঁহার সংক্ষেপক ইব্‌ন হিশামের গ্রন্থে উল্লিখিত না'আম, লাও মুল্‌সাক অতিরিক্ত এই তিন প্রকার তীরের, আন-নুওয়ায়রী অপর দশটি তীরের নাম যোগ করিয়াছেন, উহাদের নাম ইফ্‌'আল (কর), লা তাফ্‌'আল (করিও না), খায়্‌র (ভাল), শার্‌র (মন্দ), বাতী' (মন্থর), সারী' (দ্রুত), হাদ্দার (অবস্থান), সাফার (ভ্রমণ) ও সারীহ (ইব্‌ন হিশামের 'মিনকুম'-এর অনুরূপ)। সর্বশেষে তৈরি হইল القداح البيضاء (শ্বেত তীরসমূহ), যাহার গায়ে কাহিন ও নির্দেশ প্রার্থীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির প্রেক্ষিত অধিকতর স্পষ্ট এবং ব্যাপক অর্থবাচক অনেক শব্দ লিখিত হইত। এইভাবে দৈব নির্দেশ গ্রহণের ক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করে এবং তীর নিক্ষেপণের সাহায্যে ভাগ্য নিরূপণ পদ্ধতিকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া লওয়া হয়। ইসলাম এই সমস্তই অবৈধ ঘোষণা করে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত সূত্রসমূহের অতিরিক্ত (১) আয্‌রাকী, আখ্‌বারু মাক্কা, সম্পা. Wustenfeld, ৭৩-৪; (২) ত্বাবারী, ১খ, ১০৭৪-৭৮; in Semitica, ৮খ, (১৯৫৮ খৃ.), ৫৪-৭৯; গঠনগত ত্রুটি সত্ত্বেও প্রবন্ধটি এই বিষয়ে মৌলিক তথ্যের উৎস; ইহার পরিপূরক দ্র. (৫) Fahd, Kihana, E.I.[2] v. 99-101।

T. Fahd, (E.I.[2])/ শেখ মোঃ তাবীবুর রহমান ও মোঃ আবদুল বাসেত

**ইসতিখদাম** (দ্র. তাওরিয়্যা)

**ইসতিখারা** (استخارة) ঃ আরবী শব্দ, অর্থ যাহাতে কল্যাণ নিহিত তাহা প্রার্থনা করা। শারী'আতের মূলনীতি ও বিশ্বাস অথবা প্রয়োজনীয় মাস'আলা ব্যতীত জীবন যাপনের সাধারণ বিষয়াদিতে যদি কেহ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে চাহে, তবে সে উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য ইস্‌তিখারা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স) হইতে প্রামাণিক হাদীছ রহিয়াছে (দ্র. বুখারী, কিতাবু'দ-দা'ওয়াত, পরিচ্ছেদ ৪৮) ঃ

كان النبى صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الامور كلها ... اذاهم احد كم بالامر فليركع ركعتين ثم يقول "اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم. فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم و انت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خيرلى فى دينى ومعاشى وعاقبة امرى فاقدره لى وان كنت تعلم ان هذا الامر شرلى فى دينى ومعاشى وعاقبة امرى فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان ثم ارضنى به. ويسمى حاجته.

"রাসূলুল্লাহ্ (স) আমাদের প্রতিটি বিষয়ে ইস্তিখারা শিক্ষা দিতেন ·· যখন তোমাদের কেহ কোন সমস্যায় পতিত হয় তখন সে যেন দুই রাক'আত সালাত আদায় করে এবং সালাত সমাপ্ত করিয়া উক্ত দু'আ' পাঠ করে ঃ "হে আল্লাহ্! আমি তোমার জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমার নিকট হইতে কল্যাণ কামনা করি এবং তোমার শক্তি হইতে শক্তি চাই, তোমার মহান অনুগ্রহ প্রত্যাশা করি। সকল শক্তি তোমার, আমার কোন শক্তি নাই। তুমিই সব কিছু জান, আমি কিছুই জানি না। তুমি সকল অদৃশ্য বিষয় ভালভাবে জ্ঞাত। হে আল্লাহ্ ! আমার দীন, জীবন বিধান এবং পরিণাম হিসাবে যদি তুমি এই কাজ আমার জন্য কল্যাণকর মনে কর তবে আমাকে ইহার শক্তি দাও। তুমি যদি মনে কর যে, এই কাজ আমার ধর্ম, আমার জীবন ও পরিণাম হিসাবে অকল্যাণকর— তবে আমা হইতে ইহাকে দূরে রাখ এবং ইহা হইতে আমাকে দূরে রাখ এবং আমার জন্য যেখানে কল্যাণ নিহিত উহার আমাকে শক্তি দাও এবং উহার মাধ্যমে আমাকে সন্তুষ্ট করিয়া দাও।"

অনুরূপভাবে বুখারী শারীফের কিতাবু'ত-তাওহীদ, ১০ম পরিচ্ছেদে এই দু'আ বর্ধিত আকারে বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন মাজা শারীফের "আল-ইস্তিখারা" পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে, পৃ. ৪৪০ (সুনান, খ. ১, মুহাম্মাদ ফু'আদ 'আবদু'ল-বাকী কর্তৃক বিন্যস্ত)। এই দু'আ' প্রায় অনুরূপ আকারে শী'আ ইমামিয়্যা মাযহাবেও প্রচলিত আছে (দ্র. আবূ জা'ফার আল-কুম্মী, من لايحضره الفقيه, ১খ, ৩৫৫, দারু'ল-কুতুব আল-ইসলামিয়্যা, নাজাফ ১৩৭৭ হি.)। ইহাতে আবূ 'আব্‌দিল্লাহ্ ইমাম জা'ফার আস্‌-সাদিক (র) হইতে বর্ণিত আছে ঃ

اذا اراد احدكم شيئاً فليصل ركعتين ثم ليحمد الله عزوجل ويثن عليه وليصل على النبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويقول اللهم اذاكان هذا الامر خير لى فى دينى ...

"যখন তোমাদের কেহ কোন কাজের ইচ্ছা করে, তখন যেন দুই রাক'আত সালাত আদায় করে, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উপর ও তাঁহার বংশধরদের উপর দরূদ পাঠ করে ও বলে ঃ হে আল্লাহ্ ! যদি এই কাজ আমার জন্য কল্যাণকর হয় .....)। শারী'আতের নিয়ম অনুযায়ী এই ইস্তিখারায় দুই রাক্'আত সালাতের পর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কল্যাণ কামনা করিয়া দু'আ' করা হয়।

استخارة শব্দটি يخير–خار হইতে উদ্ভূত। নিম্নোক্ত বর্ণনাসমূহে এই শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন اللهم خر لرسولك (আত্-তাবারী, তা'রীখ, ১খ, ১৮৩২, লা. ৬); خرله (ইব্‌ন সা'দ, ২/২খ, ৯৩, লা. ১১, ৭৫, লা. ২) এবং خار الله لى (ঐ লেখক, ৮খ, ৯২, লা. ২৫)। অনুরূপভাবে واستخير الله فى السماء يخر لك بعلمه فى القضاء "তুমি আকাশস্থ আল্লাহ্‌র নিকট কল্যাণ প্রার্থনা কর। তিনি তোমার জন্য তাহাই নির্বাচন করেন যাহা তাঁহার জানানুসারে তাকদীরে রহিয়াছে।" সম্ভবত ইহা ইসলাম-পূর্ব যুগে একটি প্রবাদ বাক্য।

বিভিন্ন হাদীছ হইতে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুসলিমগণ প্রাচীন কাল হইতেই ইস্তিখারার উপর আমল করিয়া আসিতেছিলেন। যখনই ইস্তিখারা করা হউক না কেন, তাহা কেবল একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য করিতে হয়। কালের বিবর্তনে ইস্তিখারার মধ্যে এমন কিছু নিয়ম প্রবিষ্ট হইয়াছে, শারী'আতের দৃষ্টিতে যাহার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। যেমন ইস্তিখারার জন্য মসজিদে যাওয়া আবশ্যক অথবা এমন মনে করা যে, ইস্তিখারার পর স্বপ্নে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে কোন সিদ্ধান্ত আসে (Snouck Hurgronje, Mekka, ২খ, ১৬, পার্শ্বটীকা ৪; Doutte, Magic et religion dans l' Afrique du Nord, পৃ. ৪১৩)। অনুরূপভাবে দুইটি পৃথক কাগজে পরস্পর বিরোধী দুইটি বিষয় লিখিয়া লটারীর মাধ্যমে শুভাশুভ নির্ণয় করার নীতিও প্রচলিত হয় (আত্-তাবরাসী, মাকারিমু'ল- আখ্‌লাক, কায়রো ১৩০৩ হি., পৃ. ১০০)। আহ্‌লে সুন্নাত অনুসারী 'আলিমগণ ইস্তিখারা সম্পর্কে উপরিউক্ত মনগড়া রীতিনীতির কঠোর বিরোধিতা করিয়াছেন (আল-'আবদারী, মাদখাল, ৩খ, ৯১ প.)। কুরআন মাজীদ খুলিয়াও ইস্তিখারা করা হয় (و الضر... فى المصحف ... تقديم الاستخارة), ইব্‌ন বাশকুওয়াল, পৃ. ২৪৩, শেষ লাইন; তু. الفرج بعد الشدة, ১খ, ৪৪; এই শিরোনামে আল-কাযবীনী, Wustenfeld সংস্করণ, ২খ, ১১৩, লা. ১৮ প. একটি কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন)। ইস্‌তিখারা-এর উদ্দেশে অন্যান্য গ্রন্থও ব্যবহার করা (দ্র. আস-সুয়ূতী, বুগয়াতু'ল-উ আ, পৃ. ১০, ১৭) হইয়া থাকে। যেমন ইরানীদের দীওয়ান-ই হাফিজ অথবা মাওলানা জালালু'দ-দীন রূমীর মাছনাবী (তু. Bankipore Catalogue,

১খ, নং ১৫১) ব্যবহার করে। কিন্তু এইসব গ্রন্থের অনুসরণ করার ব্যাপারে আহ্‌লে সুন্নাতের 'আলিমগণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন (তু. আদ্-দামীরী, طي শিরো., ২খ, ১১৯, লা. ৮ প., বুলাক সংস্করণ ১২৮৪ হি.; আল-মুরতাদা اتحاف السادة المتقين, কায়রো ১৩১১ হি., ২খ, ২৮৫)। ইস্‌তিখারার দ্বারা কুরআন মাজীদের ফাল (ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ণয়) বাহির করার যে রীতি সর্বসাধারণ্যে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ Lane, Manners and Customs, ৫ম সংস্করণ, পরিচ্ছেদ ১১, ১খ, ৩২৮-এ রহিয়াছে।

ما خاب من استخار ولاندم من استشار

"যে ব্যক্তি ইস্‌তিখারা করে সে অসফল হয় না আর যে পরামর্শ করে সে লজ্জিত হয় না" (আত্-তাবারানী, আল-মু'জামু'স্-সাগীর, দিল্লী সংস্করণ, পৃ. ৩০৪ প., উক্ত গ্রন্থে এই বাক্যটিকে হাদীছ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে)।

৪র্থ/১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে আবূ 'আবদিল্লাহ্ আয্ যুহ্‌রী "কিতাবু'ল-ইস্তিশারা ওয়া'ল-ইস্তিখারা" রচনা করেন (আল্-নাওয়াবী, পৃ. ৭৪৪, লা. ৩)।

ইস্তিখারার নিয়ম-নীতি সম্পর্কিত প্রথম উদাহরণ "আল-আগানী" (১৯ খ, ৯২, লা, ৩ প.)-তে বিবৃত হইয়াছে। কবি আল-'আজ্জাজ (العجاج, দীওয়ান, কাসীদা, ১২, কবিতা ৮৩; আরাজীযুল-'আরাব, পৃ. ১২০) হাজ্জাজের প্রশংসায় বলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র নিকট ইস্‌তিখারা না করিয়া কোন কাজ করেন না। যখন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তাহির ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত হন, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে একটি উপদেশমূলক পত্রে বারবার তাকীদ দিয়া বলেন, তিনি ('আবদুল্লাহ্) যেন প্রশাসনের প্রতিটি কাজ ইস্‌তিখারা করার পর করেন (তায়ফূর, কিতাবু বাগদাদ, পৃ. ৪৯, লা. ৭, ৫২, লা. ৩ ", ৫৩, লা.৪)। এইরূপভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে ইস্‌তিখারার রীতি-পদ্ধতি ও বিবরণ সম্পর্কে অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। মুসলিমগণ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি অনেক সময় গুরুত্বহীন কাজ করার সময়ে এবং জাতীয় ও প্রশাসনিক কোন কাজে, সেনাবাহিনীর আক্রমণের উদ্যোগে অধিকাংশ কাজের পূর্বে ইস্‌তিখারা দ্বারা আল্লাহ্‌র সম্মতি অর্জনের বিধি মানিয়া চলিতেন। খলীফা আল-মামূন, 'আবদুল্লাহ্ (তায়ফূর, ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৩৪, লা. ৬); ইহার সঙ্গে সিংহাসনে আরোহণের সময় খালীফা আল-মুক্‌তাদিরের উচ্চ স্তরে ইস্তিখারার দু'আ' পাঠ তুলনীয় (চারি রাক্'আতের পর 'আরীব, de Goeje সংস্করণ, পৃ. ২২, লা. ১৪)। الف ليلة و ليلة-এর মধ্যে ইস্‌তিখারার বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ রহিয়াছে। অনেকে তাহাদের নবজাতকের নাম নির্বাচনের জন্য ইস্‌তিখারা করে (Snouck Hargronje, Mekka, ২খ, ১৩৯, লা. ১)। এমন অনেক উদাহরণও আছে যে, ফিক্‌হশাস্ত্রের কোন কঠিন মাস'আলার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য প্রজ্ঞাভিত্তিক প্রমাণ (عقلى دليل) সমর্থনে ইস্তিখারার সাহায্য নেওয়া হইত [উদাহরণত আন-নাওয়াবী, তাহ্‌যীব, Wustenfeld সংস্করণ, পৃ. ২৩৭, লা. ৩ "]। যে ক্ষেত্রে লেখকগণ তাহাদের গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থ রচনার কারণ হিসাবে ইস্‌তিখারার উল্লেখ করিয়াছেন (তু. আয-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফফাজ, ২খ, ২৮৮, লা. ১)—'উমার ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-'আযীয (দ্বিতীয় 'উমার) সম্পর্কে একটি কাহিনী বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁহার কুতুবখানায় সংরক্ষিত আহ্‌রান ইব্‌ন আ'য়ানের গ্রন্থটি প্রকাশের অনুমতি দানের পূর্বে চল্লিশ দিন পর্যন্ত উহা সালাতের স্থানে খোলা অবস্থায় রাখিয়া ইস্‌তিখারা করেন। তবে এই ঘটনাটির ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না (ইব্‌ন আবী উসায়বি'আঃ, ১খ, ১৬৩ প.)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) বুখারী, ইব্‌ন মাজা ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ; (২) আবূ জা'ফার আল-কুম্মী, من لايحضره الفقيه দারু'ল-কুতুব আল-ইসলামিয়্যা, নাজাফ ১৩৭৭ হি.; (৩) আল-গাযালী, ইহ্‌য়া 'উলূম (বুলাক ১২৮৯ হি.), ১ খ, ১৯৭; (৪) আল-মুরতাদা, ইত্তিহাদ, ৩খ, ৪৬৭-৪৬৯; (৫) ফিক্‌হশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহের ইস্‌তিখারা শিরোনামের পরিচ্ছেদসমূহ, তু. JA, ১৮৬১ খৃ., ১খ, ২০১, পার্শ্বটীকা ২ ও ১৮৬৬ খৃ., ১খ, ৪৪৭; (৬) Phillot, Biblomancy, Divination, Superstitions among the Persians, Journal of the Asiatic Society of Bengal-এ মুদ্রিত, ১৯০৬ খৃ., ২খ, ৩৯৯ প.; (৭) Bulletin de la Societe de Geographie d' Oran (১৯০৮ খৃ.), ২৮খ., সংখ্যা ১।

Goldziher ও সায়্যিদ নাযীর নিয়াযী (দা. মা. ই.)/ সিরাজ উদ্দীন আহ্‌মাদ

**ইস্‌তিছনা'** (الاستثناء) ঃ আরবী, ইস্‌তাছনা "ব্যত্যয় করা" বা "ব্যতিক্রম করা" এই ক্রিয়ার অসমাপিকা রূপ, আরবী ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক (technical) শব্দ; ইহা দ্বারা বর্জিত বা ব্যতিক্রম বুঝায়। প্রথমত ইহা একটি সম্পূর্ণ বাক্যের রূপ ধারণ করে; অতঃপর (যখন পদান্বয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হইয়া যায়) বাক্যের কার্য হইতে এক বা একাধিক অংশ ব্যতিক্রমী হইয়া যায়। ইংরাজীতে except (ব্যতীত) শব্দটি ব্যবহৃত হয় এইভাবে, যেমন Everyone came except Zayd, (যায়দ ব্যতীত সকলেই আসিয়াছিল)। আরবী ভাষায় বিভিন্ন মূল হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন শব্দ এইরূপ ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা (সীবাওয়ায়হ্, ১খ, অধ্যায় ১৮৫) ঃ গায়রা (ভিন্নতা অর্থবোধক একটি বিশেষ্য); সিওআ, সুওআ (খুবই কচিৎ সাওআআ, সিওআ'আ) (ইহাও একটি বিশেষ্য পদ), ইল্লা "যদি না") 'ব্যতীত'; (খালা, 'আদা নামপুরুষ, পুংলিঙ্গ, এক বচন); হাশা (>হাশা) [একটি প্রাচীন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, মূল ভাব হইতে পরিবর্তিত ও বিস্ময়সূচক অর্থে ব্যবহৃত একটি প্রাচীন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, দ্র. Flesischer, Kleinere Schriften, p. 405]; কদাচিতই 'ইল্লা'-এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয় ঃ লাা য়াকূনু, লায়সা, ইহার পর কর্মপদ বসে।

গায়রা, সিওয়া, হাশা, বিশেষ্যরূপে সংযোগের প্রথম পদ হয় এবং দ্বিতীয়টি সম্বন্ধ পদ হয়; উপরের ইংরাজী বাক্যটির আরবী করিলে এইরূপ হইবে ঃ জাা'আ'ল-কাওমু গায়রা বা সিওআ বা হাশা যায়দিন। আল-ফাররা' ও আল-মুবাররাদও হাশা-এর পরে কর্মপদের ব্যবহার সমর্থন করেন (দ্র. ইব্‌ন য়া'ঈশ, পৃ. ২৬৯, ছত্র ২-১৯)।

ইল্লা, খালা, 'আদা-এর পরে কর্মপদ বসে ঃ জা'আ'ল-কাওমু ইল্লা বা খালা বা 'আদা যায়দান। ইব্‌ন মালিক (আল্‌ফিয়্যা, ছত্র ৩২৯) খালা ও 'আদা-এর পরে সম্বন্ধ পদের ব্যবহারও স্বীকার করেন, আল-আখ্‌ফাশ আল-আওসাতও এই ব্যবহার স্বীকার করিয়াছিলেন (খালা-এর জন্য যামাখ্‌শারীর মুফাস্‌সাল, পৃ. ৩১, ছত্র ৭ এবং ইব্‌ন য়া'ঈশ, পৃ. ২৬১, ছত্র ১৬-২০ ও দ্র.)

ইল্লা-কে একটি সম্পূর্ণ হাঁ-বাচক বাক্যের সহিত সংযুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়; এই বাক্য যদি না-বাচক হয় (বা না-সূচক প্রশ্নবোধক হয়), তবে কর্মপদ ব্যবহার করা যায় বা পূর্ববর্তী সাধারণ পদটির কারক ব্যবহার করা যায় (ইব্‌ন মালিক, আলফিয়্যা, ছত্র ৩১৬-১৭ ও ইব্‌ন 'আকীল, ১খ, ৫০৭); মা জা'আ'ল কাওমু ইল্লা যায়্‌দুন (বা যায়দান) (দ্র. Wright, ii, 336)। যাহা বাদ দেওয়া হয় তাহা যদি প্রকারের দিক হইতে যাহা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে উহা অপেক্ষা ভিন্নতর হয় তাহা হইলে হিজাযে ইল্লা-এর পরে শুধু কর্মপদ ব্যবহার করা হয় এবং তামীম কর্তৃক কর্মপদ বা পূর্ববর্তী সাধারণ পদের কারক ব্যবহৃত হয়। তাই গৎবাঁধা বাক্য ঃ মা জা'আ'ল-কাওম ইল্লা হি'মারান (হিজায), ইল্লা হিমারুন (তামীম) "লোকজন আসে নাই, শুধু একটা গাধা আসিয়াছিল" (ইব্‌ন য়া'ঈশ, ২৬৪ ছত্র ৮-১৭)-এর অনুসরণে Noldeke (Zur Grammatik, 37) 'ইল্লা'-এর গঠনরূপে আরো বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখাইয়াছেন।

আমাদের মতে কেহ যদি ইল্লা-এর বিভিন্ন গঠনরূপ দেখাইতে চান তবে তিনি যেন গায়র শব্দের রূপ দ্বারা শুরু করেন। ইহা ছিল একটি বিশেষ্য পদ ও গায়রা যায়্‌দিন, শাব্দিক অর্থ ঃ "যায়দ ইহার ব্যতিক্রম" এই বাক্যটির গুরুত্বপূর্ণ শব্দ [গায়রা কর্মপদের ক্ষেত্রে কর্তার অবস্থা (হাল) প্রকাশ করে বা কেহ ইচ্ছা করিলে কর্তার অবস্থার পরিপূরক অর্থেও ব্যবহার করিতে পারেন]। ইল্লা ছিল সাধারণ অব্যয় বা উপসর্গ; ভাবের সাদৃশ্য থাকা হেতু বলা যায় যে, কর্মপদরূপে গায়রা-এর গঠিত রূপকে ইল্লা (ব্যতীত)-এর পরে বিশেষ্যে পরিবর্তিত করা হয়। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, ইহা একটি সহজ সরল সাদৃশ্যগত গঠনরূপ। এই সাদৃশ্যের নিয়ম না মানা হেতু বাক্য গঠনে বিভিন্নতা আসিয়াছে। যেমন মা জা'আ'ল-কাওমু ইল্লা যায়দান (সাদৃশ্যগত গঠন), ইল্লা যায়দুন (গঠন নিতান্তই ভাবার্থগত ad sensum)।

মন্তব্য (ক) 'আরব বৈয়াকরণগণ (তু. সীবাওয়ায়হি, ১খ, ৩১৪, ছত্র ১৭; ইব্‌ন য়া'ঈশ, ২৬০, ছত্র ১৭) "ইল্লা"-তে ইসতিছনা'-র মূল হরফ মনে করেন; কিন্তু 'গায়রা' প্রায়শ ব্যবহৃত হয় এবং ব্যবহারে সিওআ'-ও মাঝে মাঝেই দেখা যায়; খালা, 'আদা, বিশেষ করিয়া হাশা অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত হয়। সংখ্যা অনুসারে পাঠের বিস্তারিত বিশ্লেষণ হইতে অবশ্য তখন পর্যন্ত আমরা কোন শব্দ ঘন ঘন ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই। প্রকৃতপক্ষে 'আরব গোত্রসমূহের মধ্যে শব্দ ব্যবহারের তারতম্য নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকিবে।

(খ) Flesishcer (Kleinere Schriften, পৃ. ৭৩৪) গায়র (ব্যতিক্রম)-এর মধ্যে গারা ক্রিয়ার প্রথম রূপের প্রাচীন অসমাপিকা ক্রিয়া লক্ষ্য করেন, যাহা এখন আর ব্যবহৃত হয় না, যাহা গায়্যারা (পরিবর্তন করা)-এর মূলরূপ ছিল। Reckendorj (Die syntaktischen Verhaltnisse, 146, Anm, I) 'গায়র' শব্দের মূল জানা যায় না বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তুলনামূলক শব্দার্থতত্ত্ব হইতে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা লাভ করা যায় না অতএব Fleischer সম্ভবত ঠিকই বলিয়াছেন। 'সিওয়া' শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য দ্র. Fleischer, loc. cit., পৃ. ৭৩৫, ছত্র নং ১৩ প.।

(গ) 'গায়র', 'সিওআ', 'হাশা'-এর সম্বন্ধ পদের সঙ্গে সংযোগ হেতুও গঠনরূপের পরিবর্তন হয়। কিন্তু ইহা নিশ্চিতই যে, ঘন ঘন ব্যবহারের ফলে এই শব্দগুলির মূল রূপ অজ্ঞাত হইয়া পড়ে এবং এগুলি নিতান্ত ব্যাকরণের ব্যবহার্য বস্তুতে পরিণত হয়। গায়রা অন্যান্য গঠনের কারণে উহার নামমাত্র বৈশিষ্ট্য রাখিতে পারিয়াছে। বস্‌রাবাসিগণের মতে সিওআ এবং সাওআ'আ শুধু জারফ (অধিকরণ কারক); কূফাবাসিগণের মতে ইহা ইস্‌ম ও জারফ (ইব্‌নু'ল-আনবারী, কিতাবু'ল-ইনসাফ, সম্পা. G. Weil, আলোচনা ৩৯)। হাশা-কে কূফাবাসিগণ ক্রিয়া পদ বলিয়া গণ্য করে (দ্র. ঐ, আলোচনা ৩৭)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত (১) W. Wright, Arabic Grammar[3], ii, 335-43; (২) M. Gaudefroy Demombynes and R. Blachere, Gr. Ar. Classique[5], pp. 386-7; (৩) J. -B. Belot, Gr., Ar[5]., a resume : pp. 293-5; (৪) Lane, Lexicon, সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি বিষয়ে নিবন্ধ; (৫) Reckendorf, Arabische Syntax, pp. 262; 'আরব লেখকগণঃ (৬) সীবাওয়ায়হি, ১খ, অধ্যায় ১৮৫-২০২ (প্যারিস সংস্করণ), বিশেষ করিয়া অধ্যায় ১৮৫-৭, ১৯০, ১৯৩, ১৯৯, ২০১-২; (৭) যামাখ্‌শারী, মুফাস্‌সাল, ২য় সংস্করণ, Broch, পৃ. ৮৮-৯৬, বিশেষ করিয়া ৮৮-৯০ এবং ইব্‌ন য়া'ঈশ-এর শারহ, পৃ. ২৫৮-৮২, বিশেষ করিয়া ২৫৮-৭৫, সম্পা. G. Jahn; (৮) ইব্‌ন মালিক, আল্‌ফিয়্যা, ছত্র ৩১৬-৩১ ও ইব্‌ন 'আকীল-এর শারহ, ১খ, ৫০৫-২৭, সম্পা. মুহয়ি'দ-দীন 'আবদু'ল-হামীদ; (৯) রাদিয়্যু'দ-দীন আল-আসতারাবাযী, শারহু'ল-কাফিয়া, ১খ, ২০৫-২৮, সং ইস্তানবুল ১২৭৫ হি., এইখানি সর্বশেষে পাঠ করিতে হইবে; চিত্তাকর্ষক, কিন্তু আলোচনা অনুসরণ করা বেশী কষ্টকর।

H. Fleisch (E. I.[2]) / হুমায়ুন খান

**ইস্‌তিজা** (Ecija- استجة) ঃ আন্দালুসিয়ার একটি কেন্দ্রীয় শহর। ইহার অবস্থান কর্ডোভার (Cordova) দক্ষিণ-পশ্চিমে। শহরটি বর্তমানে ৫০,০০০ অধিবাসী অধ্যুষিত। ইহা জেনিল (Genil) নদীর তীরে অবস্থিত। নদীটি পুরাকালে গুয়াডেলকুইভারের (Guadalquiver—الوادى الكبير) সহিত ইহার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত নাব্য ছিল। আইবেরীয় (IBerian) বংশোদ্ভূত ও গ্রীকদের দ্বারা বসতি স্থাপিত শহরটি কার্থেজীয়দের দ্বারা (Cathaginians) অধিকৃত হইয়াছিল; কিন্তু সেইখানে তাহারা তাহাদের অবস্থানের কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই। পরে এই স্থানে রোমানদের দ্বারা দুর্জয় দুর্গ নির্মিত ও সুসজ্জিত হয়, বিশেষ করিয়া অগাস্টাসের (Augustus) সময় ইহাকে ঐ জেলাটির বিচার কেন্দ্রে (conventus) পরিণত করা হয়। পথিকদের (Visigoths) অধীনে ইহার সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। Lago de la Janda, Don Rodrigo পরাজয়ের পর শহরটি 'আরবদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে এবং ইহার চতুর্দিকের সকল এলাকাই বিনা বাধায় বিজয়ীদের অধীনে ন্যস্ত হয়। আমীরু'ল-হাকাম (১ম)-এর শাসনকালে ক্ষমতাসীন শাসক ও তাঁহার দুই চাচা, প্রথম 'আবদু'র-রহমানের দুই পুত্র সুলায়মান ও 'আবদুল্লাহ্‌র মধ্যে উত্তরাধিকার সম্পর্কে দ্বন্দ্ব শুরু হওয়ায় সুলায়মান কর্ডোভা দখল করার চেষ্টা করেন এবং পরাজিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সংঘর্ষটি দুই বৎসরব্যাপী ইসিজা-র পার্শ্ববর্তী এলাকায় এবং জেনিল ও গুয়াডেলকুইভার উপত্যকায় চলিতে থাকে। অবশেষে তিনি পরাজিত ও বন্দী হইয়া মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হন। এই সময় তাঁহার ভ্রাতা

'আবদুল্লাহ্ Aiy-La-Chapelle গমন করিয়া শার্লিমেনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। 'উমার ইব্‌ন হাফস্‌নের বিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত ইসিজা তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল। ইহার অধিবাসীদেরকে কর্ডোভা প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে তিনি উত্তেজিত করেন। বাসিন্দাদের অধিকাংশই ছিল মোযারাব (Mozarab)। এই বিদ্রোহের কারণে ইসিজা অভিশপ্ত নগরী হিসাবে বিবেচিত হয়; সেই স্থানে উমায়্যা শাসনের শত্রুদের দ্বারা এককভাবে বসতি স্থাপিত হয়। 'আমীর 'আবদুল্লাহ ইহা আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী তৃতীয় 'আবদু'র-রহমান সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ইব্‌ন হাফস্‌নের বিরুদ্ধে তাঁহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধাভিযানসমূহ প্রেরণ করেন এবং ইসিজার বিরুদ্ধে তাঁহার হাজিব বদরের অধীনে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। তাহারা শহরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা নষ্ট করে এবং ইহার সেতু ধ্বংস করে (পরবর্তীতে আল-মানসূর ইব্‌ন আবী 'আমির কর্তৃক পুনঃনির্মিত হইয়াছিল)।

খিলাফাতের পতনের পর ইসিজা কিছুদিনের জন্য কর্ডোভার জাহওয়ারীদের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে এক সময় ইহা বানূ বিরযালের ক্ষমতাধীনে আসে, তাহারা কারমোনায় (Carmona) নিজেদেরকে স্বাধীন বলিয়া দাবি করে। কিন্তু সেভিলের আল-মু'তাদিদ মেরোনা (Morona) হইতে রোন্ডা (Ronda) পর্যন্ত সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারবার রাজ্য হস্তগত করেন। অত্যন্ত নির্মম অভিযানক্রমে এলাকাগুলি দখল করা হয়; ক্ষুদ্র শাসক শাসিত কারমোনাসহ ইজিসা, ওসূনা (OSuna) এবং আলমোদাভার (Almodover) সেভিলের শাসনাধীনে আসে। পরবর্তী কালে তৃতীয় ফার্ডিন্যান্ড কর্তৃক কর্ডোভা অবরোধের প্রারম্ভে আল-মুতাওয়াক্কিল ইব্‌ন হূদ অবরোধকারী বাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার সেনাদলকে ইসিজা পর্যন্ত অগ্রসর করান; কিন্তু তাহারা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে সাহসী না হওয়ায় তিনি আলমেরিয়া (Almeria)-র দিকে অবরোধ প্রত্যাহার করেন এবং কর্ডোভাবাসীদের রসদ সরবরাহ নিঃশেষ হইলে ২২ শাওওয়াল, ৬৩৩/২৯ জুন, ১২৩৬ সালে আত্মসমর্পণ করেন। মুসলমানদের মধ্যে যাহারা সেই স্থানে অবস্থান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহারা ৬৮১/১২৮২ সাল পর্যন্ত শহরটি ত্যাগ করেন নাই। ঐ বৎসরই মুসলিমগণ সেই স্থান হইতে বহিষ্কৃত হন এবং তাহাদের পরিবর্তে খৃস্টানদের দ্বারা বসতি স্থাপিত হয়। তখন হইতেই ইসিজা খৃস্টানদের নিকট অন্যতম সেনাঘাটিতে পরিণত হয় এবং ঐ স্থান হইতেই গ্রানাডা রাজ্যের পুনঃবিজয় (Reconquista) সংগঠিত হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) হিময়ারী, আর-রাওদু'ল-মি'তার, সম্পা. ও অনু. E. Levi-Proveral, মূল গ্রন্থের পৃ. ১৪-৫, অনূদিত গ্রন্থের পৃ. ২০-১; (২) ইব্‌ন 'ইযারী, বায়ান মূল গ্রন্থের ২খ, পৃ. ১৬৪-৫, অনূদিত গ্রন্থের পৃ. ২৬৪-৫; (৩) R. Dozy, Hist. Mus. Esp., ২খ, ৫৯-৯৯, ২৮৭-৯০; (৪) E. Levi-Provencal, Hist. Mus. Esp., ১খ, ১৫২, ২খ, ৬-২২; (৫) Madoz, Diccionario geografico, ৭খ, ৪৩৮; (৬) E. Saavedra, Estudio sobre la invasion de los arabes en Espana, 77।

A. Huici Miranda (E. I.[2]) / মুহাঃ আবু তাহের

**ইস্‌তিতা'আ** (الاستطاعة) ঃ ক্ষমতা, কর্মশক্তি, তা'আ অনুগত হওয়া, এই ধাতুর দশম রূপের মাস্‌দার। শব্দটি কুরআন শারীফে না থাকিলেও ইস্‌তাতা'আ এই ক্রিয়া পদটির বহু ব্যবহার রহিয়াছে। মাস্‌দারের ন্যায় ইহাও উসূলু'দ-দীন ও 'ইল্‌মু'ল-কালাম-এ একটি পারিভাষিক (technical) শব্দে পরিণত হয়। ইংরেজী অনুবাদে সাধারণত Capacity শব্দটি ব্যবহৃত হয় (যথা Tritton, Muslim Theology, London 1947, pp. 68 & n. 2)Ç Wensinck ইহার অনুবাদে Faculty ও অন্যগণ Power (pouvoir) ব্যবহারের পক্ষপাতী। এই শেষোক্ত অর্থে 'ইল্‌মু'ল-কালামশাস্ত্রে শব্দটি কু'দ্‌রা ও ইস্‌তিতা'আ-এর সমার্থকরূপে গৃহীত হইয়াছে (দ্র. শারহু'ল-উসূলি'ল-খামসা গ্রন্থে 'আবদু'ল-জাব্বার-এর মন্তব্যসমূহ, সম্পা. 'আবদু'ল-কারীম 'উছমান, কায়রো ১৩৮৪/১৯৬৫, পৃ. ৩৯৩)। শব্দটির প্রায় সমার্থকরূপে আল-জুরজানী উল্লেখ করিয়াছেন (তা'রীফাত, সম্পা. Flugel, Leipzig 1845, pp. 18) কু'দ্‌রা (শক্তি), কু'ওওয়া (সম্ভাবনাময় শক্তি অর্থে ইন্দ্রিয় ক্ষমতা), ওয়াস্‌'আ (শক্তি অর্থে ইন্দ্রিয়) ও তাকা (ইন্দ্রিয় শক্তি) এই শব্দগুলি।

প্রশ্নাধীন ধারণাটি ইচ্ছা-স্বাধীনতার (এখ্‌তিয়ার) ক্রিয়ার বিশ্লেষণকে প্রভাবিত করে। কালাম বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আদি যুগ হইতেই শব্দটির অর্থের বিভিন্নতা বা অর্থের ন্যূনতম তারতম্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হইয়াছে। আল-আশ'আরী তাঁহার মাকালাতু'ল-ইস্‌লামিয়্যীন গ্রন্থে তাঁহার পূর্ববর্তিগণের মতামতসমূহের মোটামুটি সংক্ষিপ্তসার প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থে যে সকল বিভিন্ন মতের উল্লেখ রহিয়াছে সেইগুলির বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দ্র. R. Brunschvig-এর Devoir et pouvoir, in St. Isl., xx, 1-46। আমাদের এই আলোচনা শুধু কয়েকটি মতামতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে ঃ

১। গায়লান ও মুরজি'আরা ইসতিতা'আ ও কু'দ্‌রা-এর মধ্যে, এমনকি কু'ওওয়া-র মধ্যেও প্রায় কোন পার্থক্যই করে নাই। তাহাদের মতে কোন মানুষের পক্ষে কোন একটি কাজ করিবার যে ক্ষমতা তাহা নির্ভর করে সর্বোপরি তাহার দৈহিক প্রবণতার উপর।

২। মু'তাযিলীগণের মধ্যে বাগদাদের পণ্ডিতগণ অনুরূপভাবে ইস্‌তিতা'আ দ্বারা দৈহিক সংহতি অর্থ গ্রহণ করিতেন, যাহা দ্বারা কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়। আবু'ল-হুযায়ল ও অন্যান্য বস্‌রাবাসী মনে করিতেন যে, ইহা এমন এক ধরনের আকস্মিক ঘটনাক্রম (accident) যাহা এই সংহতির উপরে আরোপিত হইয়া থাকে (দ্র. R. Brunschvig, art. cit., 14)। সাধারণভাবে মু'তাযিলীগণের মতে ইহা কার্যের পূর্বে ঘটিয়া থাকে। তবে ইহা কার্যকে বাধ্যতামূলকভাবে সংঘটিত করে না এবং কার্যটি সম্পাদিত হইবার পরে ইহা শেষ হইয়া যায়। মানুষ কর্তৃক কার্যটি সৃষ্টি হইবার পরে 'কার্য করিবার ক্ষমতা'র ধারণা বিষয়ে আর প্রশ্ন উঠে না। মু'তাযিলী দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিষয়টির আলোচনা পাওয়া যাইবে 'আবদু'ল-জাব্বার-এর গ্রন্থে, পৃ. ৩১০ প. (দ্র. পৃ. ৩৯০, 'আবদু'ল-করীম 'উছমান-এর নোট, আরও দ্র. আল-খায়্যাত, কিতাবু'ল-ইন্তিসার, সম্পা. Nyberg ও অনু. Nader, বৈরূত ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৬২-৭২)। দিরারের মতে যে ক্ষমতা বা শক্তি কার্যের পূর্বে ঘটিয়া থাকে তাহা কার্য চলাকালীনও বিদ্যমান থাকে।

৩। মুজ্‌বিরা' নামে পরিচিত যে দলটিকে আল-আশ'আরী তাঁহার পূর্বসূরী বলিয়া মনে করিতেন এবং আহ্‌লু'ল-ইছ্‌বাত নাম প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার ইস্‌তিতা'আ-র এইভাবে সংজ্ঞা দিয়াছেন ঃ কার্য

সম্পাদনের জন্য যে সমগ্র উপাদান একযোগে কাজ করে, তাহা। রাফিদী শি'আ হিশাম ইব্‌নু'ল-হাকাম সেই উপাদানসমূহের মধ্যে পাঁচটি গণনা করিয়াছেন স্বাস্থ্য ও (দৈহিক) সংহতি; অনুকূল পরিস্থিতি; আকাঙ্ক্ষিত সময়; যন্ত্রাদি ও উদ্দেশ্য (সাবাব)। কার্য সৃষ্টি হয় এবং উপরিউক্ত এই প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ বিদ্যমান থাকিলে কার্য অসৃষ্ট থাকিতে পারে না (দ্র. আল-আশ'আরী, মাকালাত, সম্পা. 'আবদু'ল-হামীদ, কায়রো, তা. বি., ১খ, ১১০-২ ও W. Montgomery Watt, Free will and Predstination, London 1948, pp. 116-7)। এই প্রবণতাসমূহের সঙ্গে আন-নাজ্জার-এর মতামতকে সংযুক্ত করা যাইতে পারে, যাহা আল-আশ'আরী ধারার সঙ্গে খুবই নৈকট্যযুক্ত ঃ 'শক্তি বা ক্ষমতা' Capacity স্থায়ী থাকে না, কার্যের পূর্বে ইহার অস্তিত্বও থাকে না, কার্যের উদ্দেশ্যে ও যে কার্যের ইহা নিয়ন্ত্রক সেই কার্যের মুহূর্তে আল্লাহ ইহা সৃষ্টি করেন।

৪। আল-আশ'আরী তাঁহার ইবানা (কায়রো সংস্করণ, তা. বি., পৃ. ৫৩-৫) গ্রন্থে তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইস্‌তিতা'আ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং লুম্'আ (সম্পা. ও ইংরাজী অনু. R. Mc Carthy, বৈরূত ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৫৪-৯, ৭৬-৯৬) গ্রন্থেরও একটি অধ্যায়ে শুধু এই বিষয়ই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ক্ষমতা বা শক্তি সরাসরি আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন "কার্যের সঙ্গে ও কার্যের প্রয়োজনে।" শক্তি কার্যের পূর্বে বিদ্যমান থাকে না, এইখানেই মু'তাযিলীগণের সঙ্গে তাঁহার মতের গরমিল। যে ব্যক্তির প্রয়োজনীয় দৈহিক সংহতি নাই সে শক্তিহীনতা ('আজ্য) দ্বারা আক্রান্ত হয়— সে অবশ্যই কার্যটি সম্পাদন করিতে অক্ষম হইবে। কিন্তু উহা ইসতিতা'আ-এর যথার্থ ধারণা নহে। অপরপক্ষে কার্য সম্পাদনার শক্তি (কুদ্‌রা) যদি তাহাতে না বর্তায় তবে তাহার দৈহিক সংহতি যাহাই হউক না কেন, সে উক্ত কার্যটি সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইবে; কারণ আল্লাহ্ তাহার মধ্যে সেই শক্তি সৃষ্টি করেন নাই। এইভাবে আল্লাহ্ তাহাকে কাস্‌ব বা ইক্‌তিসাব দান করেন নাই, যাহা দ্বারা কোন বিশেষ কার্য লব্ধ হইয়া থাকে এবং যাহা নৈতিক যোগ্যতা অর্জনের উৎস। এই অর্থেই বলা যায়, 'আল্লাহ্ হইলেন মানুষের কর্মের স্রষ্টা", ভাল বা মন্দ যে কোন কার্যেরই স্রষ্টা। তাহা হইলে কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে হইবে যে, মানুষের 'সীমাবদ্ধতা' রহিয়াছে? 'কার্যের অর্জন' (Acquisition of acts) এই বিষয়টি সম্বন্ধে আশ'আরীগণের প্রচুর আলোচনা রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ আল-বাকিল্লানী তাঁহার তাম্‌হীদ (সম্পা. Mc Carthy, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ২৮৬-৯৫) গ্রন্থে ইস্‌তিতা'আ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সীমাবদ্ধতার (দ্র. ইদ্‌তিরার) সঙ্গে খুব সহজে ইহার পার্থক্য নির্ধারণ করিতে পারেন নাই; পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তির কম্পমান হাত 'সীমাবদ্ধতা', অপরপক্ষে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট 'ইস্‌তিতা'আ-এর দৌলতে মানুষ নিজ পসন্দ অনুযায়ী যে কোন কার্য নির্বাচন করিতে পারে। অতএব তাহাকে 'সীমাবদ্ধ' (মুদ্‌তার) বলা যায় না (দ্র. ঐ. পৃ. ৩৯৩)। আল-জুওয়ায়নী তাঁহার ইর্‌শাদ গ্রন্থে 'ইস্‌তিতা'আ-এর উল্লেখ করিয়াছেন (সম্পা. ও ফরাসী অনু. Luciani, Paris 1938, 122/196, 125/201) শক্তি বা ক্ষমতার প্রায় সমার্থকরূপে, যে শক্তি 'কাস্‌ব'-এর নিশ্চয়তা দিয়া থাকে এবং এই ক্ষমতাকে বাস্তবিক উপায় ও অবলম্বনের সংহতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে ঘটনা দাঁড়ায় যে, প্রতিটি আকস্মিক ঘটনার ন্যায় ইহা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট হয় এবং প্রতিটি আকস্মিক ঘটনার ন্যায়ই ইহাও 'স্থায়ী' হয় না। অতএব মু'তাযিলীদের যেরূপ ধারণা সে অনুযায়ী ইহা কার্যের পূর্বে সংঘটিত হয় না, বরং উহার সঙ্গেই ঘটে (দ্র. ঐ, ১২৫/২০১)। আশ'আরী রচনাবলীর সর্বত্র ঘন ঘন স্বীকৃতি রহিয়াছে, সেইগুলির মৌলিক মিল রহিয়াছে, কিন্তু বিভিন্ন লেখকের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কিছু পার্থক্যও রহিয়াছে। আল-জুরজানী তাঁহার তা'রীফাত গ্রন্থে (পৃ. ১৮-১৯) এইগুলির সারসংক্ষেপ করিয়াছেন। শক্তি বা ক্ষমতার (Capacity) সংজ্ঞা তিনি এইভাবে দিয়াছেন, "অনিত্য গুণ যাহা আল্লাহ্ প্রাণীর মধ্যে সৃষ্টি করেন, যাহারা ইহারই দৌলতে স্বাধীন পসন্দ অনুযায়ী কার্য করিয়া থাকে।" তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রকৃত যোগ্যতা (হাকীকিয়্যা) হইতেছে শক্তি বা ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গতা যাহা বাধ্যতামূলকভাবে কার্যের সূচনা নির্ধারণ করিয়া থাকে এবং কার্যের সঙ্গেই ঘটিয়া থাকে। সংক্ষেপে আমরা বলিতে পারি যে, 'ইস্‌তিতা'আ'-এর যে ধারণা তাহা আশ'আরীর কাস্‌ব'-এর যে ধারণা তাহার মূলে বর্তমান রহিয়াছে, উহা হইল কারণ এবং কার্যের সম্পর্ক বা উভয়ের একত্রে গ্রন্থনা।

৫। আল্-আশ'আরীগণের বৈসাদৃশ্যে আল-মাতুরীদী তাঁহার কিতাবু'ত-তাওহীদ (R. Brunschvig-কৃত উল্লিখিত প্রবন্ধে পৃ. ২৫-২৬, বিশ্লেষণ ও নির্দেশিকা দ্র.)-এর দুইটি ধারাবাহিক সময়কালের উল্লেখ করেন ঃ (ক) দৈহিক উপাদান ও উপায়ের সংহতি, যাহা আল্লাহ্‌র দান এবং যাহা কার্যের পূর্বে বর্তমান থাকে, আল-আশ'আরীগণ যাহাকে 'আজ্য-এর অনুপস্থিতি বা অভাব বলিয়াছেন, তিনি তাহার নাম দেন ক্ষমতা (Capacity); (খ) যোগ্যতা (Qualification) (মা'না) যাহা কার্যটিকে সংঘটিত করায়, যাহা ইহাকে প্রতিদান বা শাস্তির সঙ্গে সম্পর্কিত করে এবং ইহাতে নৈতিক মূল্য আরোপ করে। যে 'যোগ্যতা' শব্দ ইস্‌তিতা'আ-কে সংজ্ঞা দান করে ইহা যেন মাতুরীদীর 'কাস্‌ব'-এর ধারণার প্রতিরূপ; ইহা এক 'গুণ' বা 'যোগ্যতা' (quality) যাহা মানুষের শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৬। ইব্‌ন হায্‌ম-এর বর্ণনার মধ্যে আমরা বিভিন্ন পূর্বানুমানসহ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত পার্থক্য দেখিতে পাই ঃ (ক) কর্মের পূর্বে স্বাস্থ্য ও দৈহিক সংহতি; (খ) কর্মটি সম্পূর্ণ হইবার জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে ও তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট একটি আকস্মিক গুণ (accident); ইহা কর্মের সঙ্গে সহবিদ্যমান, ইহার বেশী কিছু নহে। ইব্‌ন হায্‌ম বলেন, এই দ্বিতীয় অর্থ হইল 'সামর্থ্যের চূড়ান্ত রূপ' (Perfection of capacity)। ইহা হইতে এই ধারণা উদ্ভূত হয় যে, প্রথম অর্থ অনুযায়ী অবিশ্বাসীরও 'বিশ্বাস করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে', কিন্তু দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী তাহার সে যোগ্যতা নাই (কিতাবু'ল-ফিসাল ফি'ল-মিলাল, কায়রো সং, ১৩৪৭ হি., ৩খ, ২১-৬, ৩১)। এইখানে আরো একটি কথা যোগ করা যায় যে, জাহিরী মতবাদ হইতে বহু ভিন্নমুখী চিন্তাধারার কোন কোন আইনবেত্তা ও ধর্মতত্ত্ববিদও অনুরূপ ধারণা পোষণ করিতেন, যেমন হানাফী আত-তাহাবী ও ইমামী আল-কুলায়নী। তদুপরি ইব্‌ন তায়মিয়া-এর চিন্তাধারার সঙ্গেও তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতে পারে। ইহা সত্য যে, তিনি কখনও ইস্‌তিতা'আ-এর উল্লেখ করেন নাই। বরং 'কুদ্‌রা'-এর কথা বলেন যাহা কর্মের পূর্বে ঘটে, যাহা কর্মের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার সংঘটন অবশ্যম্ভাবী করে না। তিনি আরেকটি 'কুদ্‌রা'-এর কথাও

বলেন যাহা কর্মের সহিত সহবিদ্যমান; কিন্তু ইহাকে অবশ্যম্ভাবী করে (দ্র. R. Brunschvig উল্লিখিত প্রবন্ধ, ৪১)। নিঃসন্দেহে আল-মাতুরীদী ও ইব্‌ন হায্‌ম কর্তৃক গৃহীত 'পূর্বে বিদ্যমান' ইস্‌তিতা'আ সম্বন্ধেই আল-জুরজানী নির্দেশ করিয়াছেন (তা'রীফাত, ১৯) যখন তিনি উপরে উদ্ধৃত আশ'আরী সংজ্ঞায় এই কথাটি যোগ করেন যে, দক্ষতা বা ক্ষমতা (Capacity) তখনই স্বাস্থ্যকর হয় যখন রোগ ও অনুরূপ অন্যান্য বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হইয়া যায়।

অন্যান্য আরও অসংখ্য উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। সেগুলি দ্বারা এই বিষয়টিকেই জোর দিয়া বুঝানো হইত যে, পারিভাষিক শব্দ হিসাবে ইস্‌তিতা'আ-এর ধারণা বিভিন্ন চিন্তাধারার ব্যক্তিগণের কাছে এবং অনেক সময়ে বিভিন্ন লেখকের কাছেও বিভিন্ন অর্থে গৃহীত হইয়াছে। ইহা সব সময়ে মানুষের স্বাধীন পসন্দের স্বকীয় বাস্তবতা বা অবাস্তবতা ভিত্তিক চিন্তাধারার উপর ঘনিষ্ঠভাবে নির্ভরশীল।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ বরাতসমূহ প্রবন্ধ গর্ভে উল্লিখিত।

L. Gardet (E.I.[2])/ হুমায়ুন খান

**ইসতিদলাল** (দ্র. মানতি ক )

**ইস্‌তিনজা'** (استنجاء) ঃ অর্থ পবিত্রতা অর্জন, পাক হওয়া। ফিক্‌হ্-এর কিতাবসমূহে কিতাবু'ত-তাহারা বা আনুষ্ঠানিক পবিত্রতা অধ্যায় ইস্‌তিন্‌জার পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। বাহ্য-প্রস্রাবের পর বর্ণিত পদ্ধতিতে পবিত্রতা অর্জন প্রত্যেক মুসলিমের অপরিহার্য কর্তব্য। সালাত এবং অনুরূপ 'ইবাদতের প্রস্তুতিস্বরূপ বাহ্যে-প্রসাবের পর ইস্‌তিন্‌জা' করিয়া লইতে হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) আল-দামিশ্‌কী, রাহমাতু'ল-উম্মাফী ইস্‌তিলাফি'ল-আ'ইম্মা (বূলাক' ১৩০০ হি.), পৃ. ৭; (২) A. J. Wensinck, in Isl. i, 101 পৃ.।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

**ইসতিন্‌বাতি** (দ্র. মা' ও রিয়াফা)

**ইস্‌তিন্‌যাল** (استنزال) ঃ পানির অলৌকিক ক্ষমতা নির্দেশ একটি শব্দ, Doutte-এর মতানুসার Magie et religion dans l'Afrique du Nord (আলজিয়ার্স ১৯০৯ খৃ.), পৃ. ৩৮৯ ; কিন্তু ইব্‌ন খালদূন-এর মুকাদ্দিমা (৩খ, ১৩৭ প.)-তে ইস্‌তিন্‌যাল রূহানিয়্যাতি'ল-আফ্‌লাক, সীমূয়া (দ্র.)-দের মধ্যে প্রচলিত একটি কৌশল, স্বাভাবিক বা ঐন্দ্রজালিক যাদুবিদ্যা (তু. T. Fahd, Divination, পৃ. ৪৯, টীকা ১)। 'ছদ্ম মাজরীতীগণ' ইস্‌তিজলাব (استجلاب) শব্দটি ব্যবহার করা অধিকতর পসন্দ করে (তু. Sources Orientales, ৭ম, ১৯৬৬ খৃ., ১৭০ প.)। অন্যত্র আল-বূনী ও ইবনু'ল-মুওয়াক্কি'-এর গ্রন্থে "ইস্‌তিনযালু'ল-আরওয়াহ ওয়াস্‌তিহ্‌ দারুহা ফী কাওয়ালিবি'ল-আশবাহ " দ্বারা ভূত-প্রেত সংক্রান্ত কৌশলকে নির্দেশ করে, যদিও এইগুলি সাধারণত 'ইল্‌মু'ল-'ইসতিহ দার (علم الاستحضار) নামে নির্দেশিত হয়।

হাজ্জী খালীফার মতানুসারে এই বিদ্যা দ্বারা জিন্ন অথবা ফিরিশতাদেরকে আমন্ত্রণ করিয়া উপস্থিত করা এবং তাহাদেরকে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবনীয় করা হয়। কেবল রাসূলগণ ফিরিশতা দ্বারা ইহা করিতে পারেন। পার্থিব ভূত-প্রেতদের সম্পর্কিত বিষয়টি বিতর্কিত রহিয়াছে। ইহাকে এই যুক্তিতে 'ইল্‌মু'ল-'আথা'ইম, (علم العزائم) বা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা হইতে পৃথক করা হয় যে, ইহা দ্বারা জিন্ন ও ফিরিশতাগণকে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য অশরীরীভাবে আহ্বান করা হয়, অথচ ইস্‌তিহ'দা'র (দ্র. সিহ্‌'র)-এর মূল উদ্দেশ্য তাহাদের শরীরীভাবে উপস্থিত করা।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) হাজ্জী খালীফা, ১খ, ৫৭৫ প., তাশ-কোপরুজাদে-র মিফতাহু 'স-'আদা নামক বিজ্ঞান বিশ্বকোষের বরাতসহ সংজ্ঞা। এই মানবিক বিদ্যা বিষয়ে লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন কিতাব যাতি'দ-দাওয়া'ইর ওয়া'স -সু ওয়ার, "জিন্নদেরকে আহ্বান করার এবং তাহাদেরকে (মানুষের) অনুগত করার বিষয়ে সচিত্র গ্রন্থ, সুলয়মান ('আ.)-এর উযীর আসাফ ইব্‌ন বারাখ্য়া-এর মতানুসারে · · ·, "ইহা নিঃসন্দেহে মিথ্যা" (১খ, ২৭৬ ও ৩খ, ৩২৪) ; (২) কামালু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইবনিল-ওয়াফা'-এর ইলহামু'ল-ফাত্তাহ বি-হি কামাত ইন্‌যালি'ল-আরওয়াহ ওয়া-বাছ ছি হা ফী'ল-আশবাহ , যিনি ইবনু'ল-মুওয়াকি ' নামে পরিচিত, মৃ. ১১৬২/১৭৪৮-৯ (১খ, ৪২৩) ; (৩) তু. Brockelmann, পরি. ২, পৃ. ৯৮১ ; (৪) আল-বুস্‌তান লি'সতিহ দার আরওয়াহি 'ল-জিন্ন ওয়া'শ-শায়াতীন ফী 'ইলমি'স-সিহ্‌র 'আলা তারীকাতি'ল-কি ফতওয়া'ল-'আরাব, অজ্ঞাতনামা প্রণেতা (২খ, ৫০) ; (৫) আহমাদ আল-বূনী (মৃ. ৬২২/১২২৫) প্রণীত তান্‌যীলু'ল-আরওয়াহ ফী কাওয়ালিবি'ল-আশবাহ (২খ, ৪৪০)। আমরা এখনও এই লেখাগুলি দেখিতে পাই নাই, বর্তমানে আমরা সেই সকল পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ খুঁজিয়া দেখিতে সক্ষম হইয়াছি। ইহাদের কোনটিতেই এইগুলি প্রকাশ লাভ করে নাই। যাদুবিদ্যা (سحر) বিষয়ে রচনার প্রকাশ লাভ সাপেক্ষে, দ্রষ্টব্য—Le Monde du sorcier-এ একটি ক্ষুদ্র বর্ণনামূলক প্রবন্ধ ও একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী in Le Monde du sorcier " T. Fahd, Le Monde du sorcier en Islam, Sources Orientales-এ (৭খ), ১৯৬৬ খৃ., ১৫৫-২০৪। ইসলামে ফিরিশতা তত্ত্ব ও পিশাচতত্ত্ব-এর জন্য দ্র. Genies anges et demons " T. Fahd, Anges, demons et djinns en Islam, in Scures Orientales, ৮খ. (১৯৭১ খৃ.), ১৫৫-২১৪।

T. Fahd (E.I.[2])/মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

**ইস্‌তিন্‌শাক** (استنشاق) ঃ উযূ ও গোসল করিবার সময় নাসারন্ধ্র দিয়া পানি গ্রহণ করা। শারী'আতের বিভিন্ন বিধানে এই অভ্যাসকে সুপারিশ করা হইয়াছে (ইব্‌ন হাম্বাল-এর মতানুসারে অবশ্য কর্তব্য)। অভ্যাসগতভাবে ইহা প্রকৃতপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ একজন মুসলমান উযূ করার সময় সর্বদাই ইহা করিয়া থাকে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ দ্র. ইস্‌তিন্‌জা'।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী)

**ইস্‌তি'নাফ** (استئناف) ঃ ইস্‌তা'নাফা (استأنف) (পুনরায় আঁখা করা) পুনরাবৃত্তি করা ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত। আধুনিক 'আরবিতে ইহার অর্থ হয় পুনর্বিচার প্রার্থনা করা। কারণ বিষয়টি যখন পুনর্বিচার-আদালতে আনা হয়, তখন প্রথম হইতে (উহার) পুনরায় পরীক্ষা করা হয়। সনাতন ফিক্‌হে শব্দটি 'ইবাদত বা ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ, বিশেষত সালাত পুনরায় আরম্ভ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইস্‌তি'লাফ (মালিকীরা ইহাকে ইব্‌তিদা' বলে) তখন অবলম্বন করা হয় যখন ধর্মগত আনুষ্ঠানিক অপবিত্রতা (হাদাছ দ্র.), সংঘটিত হওয়ায় বিঘ্নিত গোটা নামায (স'লাত) পুনরায় আরম্ভ করার প্রয়োজন হয়।

কয়েকটি অবস্থায় ফুকাহা'র সিদ্ধান্ত ঃ যেই মুহূর্তে নামাযীর ইচ্ছার বহির্ভূত কোন কিছু দ্বারা (ধর্মগত আনুষ্ঠানিক অপবিত্রতার জন্য নয়), যথাঃ নাসিকা হইতে সাংঘাতিক রক্তপাতের জন্য নামায (সালাত) বিঘ্নিত হইয়াছিল, সেই মুহূর্তে ইহার অবিচ্ছিন্ন অনুক্রম (বিনা') বজায় রাখা সম্পূর্ণ ইসতি'নাফ অপেক্ষা ভাল। বিভিন্ন মাযহাবের ও একই মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত 'আলিমগণ কোন্ কোন্ অবস্থায় ইসতি'নাফ অথবা বিনা' করা যায় সেই সম্বন্ধে সব সময় একমত হইতে পারেন নাই।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) মারগীনানী, আল-হিদায়া, কায়রো ১৯৩৭ খৃ. ১খ, ৩৯, ৪০ ; (২) যায়লা'ঈ, তাব্‌য়ীন, কায়রো ১৩৯৩ হি., ১খ, ১৪৫ ; (৩) খালীল, মুখ্‌তাসার, অনু. Bousquet, ১খ, ৪৬-৭ ; (৪) ইহার উপর দারদীর-দাসূকী-এর ভাষ্য, আশ-শারহু'ল কাবীর কায়রো, সম্পা. হালাবী, ১খ, ২০৪প., আরও দ্র. ইব্‌ন হায্‌ম, মুহাল্লা, কায়রো ১৩৪৭ হি., ৩খ, ২০২-৩ ও ৪খ, ১৫৩, ১৭৭।

Y. Linant de Bellefonds (E.I.[2])/
মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

**ইস্‌তিফ্‌হাম** (استفهام) ঃ (আ.) বুঝিতে চাওয়া, জিজ্ঞাসা করা অর্থব্যঞ্জক, ইস্‌তিফ্‌হামা (استفهم) ক্রিয়াপদের ক্রিয়া--বিশেষ্য (مصدر)। ইহা 'আরবী ব্যাকরণের প্রশ্নবোধক একটি পারিভাষিক শব্দ।

কেবল স্বরভঙ্গী তারতম্যের মাধ্যমেই প্রশ্ন জ্ঞাপন করা যায়, বিশেষত কথ্য ভাষার কাছাকাছি গদ্যে। 'আরবীতে সাধারণত দুইটি অব্যয় ব্যবহৃত হয়, যথাঃ আ। (না-সূচক—আলা ألا, আমা أما, আলাম ألم ) এবং হাল هل। দ্বিতীয়টি (هل) প্রথমোক্তটি ( أ ) অপেক্ষা অধিকতর জোরাল; কিন্তু ইহার ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত (Reckendorf, Arabische Syntax, ১৯, ১০)। সীবাওয়ায়হ্ (১খ, ৪৩৪, ছত্র ১৯ ; ৪৩৫, ছত্র ১-২) أ এবং هَل-এর ব্যবহারের পার্থক্য এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন ঃ "যদি বলা হয় ঃ ؟ هل تضرب زيدا ("তুমি কি যায়দকে আঘাত কর?") ইহাতে তোমার মনে যায়দকে সত্য সত্যই আঘাত করিবার কোন অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত বহন করে না ; কিন্তু যদি বলা হয় ঃ ؟ أ تضرب زيدا ইহাতে যায়দকে তোমার আঘাত করিবার কার্যটি একটি বাস্তব—এই ভাব জ্ঞাপন করিতেছে।" ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, أ হইতেছে বাস্তবব্যঞ্জক প্রশ্নাত্মক রূপ এবং هل হইতেছে বাস্তব রূপায়ণ সম্পর্কে সঠিক অভিপ্রায়হীন কোন ক্রিয়া সম্পাদন বা ইহার সম্ভাবনাব্যঞ্জক প্রশ্নাত্মক রূপ (তু. Reckendof, পূ. স্থা., পৃ. ৩৫, টীকা ২)। W. H. Worrel এই দুইটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নির্ধারণে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, هل-এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রশ্নাত্মক রূপকে জোরালো করিয়া তোলা হয় অর্থাৎ একটি আবেগগর্ভ অনুভূতির অনুপ্রবেশ ঘটান হয়। G. Bergstrasser, أ, هَلْ এবং أَمْ-এর ব্যবহার সম্পর্কে (অন্ততপক্ষে কুরআন-এ) Verneinungs und Fragepartikeln und Verwandtes im Kur'an (Leipziger Semitische Studien, ৫/৪খ., ১৯১৪ খৃ., ধারা ৬৮-৯)-এ যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। ইহা ছাড়াও أ-এর পরে و বা ف ( জোরাল ভাবব্যঞ্জক)- এর ব্যবহার হইতে পারে, যেমন ؟ أو تضرب, ؟ أفتضرب; أ-এর পরে অবস্থানের পরিবর্তন করিয়া ক্রিয়াবাচক শব্দটির পূর্বে مفعول বা মুখ্য কর্মবাচক শব্দের ব্যবহার হইতে পারে, যেমন ؟ أزيدا تضرب । কিন্তু هل দ্বারা এই ধরনের বাক্য গঠন নিষিদ্ধ।

বিয়োজক প্রশ্নবোধক ঃ মরুবাসীদের বিশুদ্ধ 'আরবীতে أ-এর সহিত أم (সংযুক্ত অর্থে, মুত্তাসিলা متصلة) অথবা او ব্যবহৃত হয়, যেমন— ؟ أزيد عندك أم عمرو অথবা ؟ اوعمرو ("তোমার সঙ্গে সে কি যায়দ অথবা 'আম্‌র ?") ؟ أ او أزيدألقيت أم بشير অথবা ؟ بشير (তুমি কি যায়দের সহিত না বশীরের সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলে?") "এই ব্যবহারে أم বা أو-এর অর্থগত পার্থক ছিল না। কিন্তু বিবর্তনের ফলে পরবর্তীকালে অপ্রশ্নাত্মক বাক্যের জন্য او এবং প্রশ্নাত্মক বাক্যের জন্য أم ব্যবহার করা হয়" (M. Gaudefroy-Demombynes ও R. Blachere; Gr. Ar[3]., পৃ. ৪৭০, ছত্র ১-৪)। আরব ব্যাকরণবিদগণ প্রশ্নাত্মক বাক্যে أو ও أو-এর ব্যবহারের একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন ঃ দ্র. সীবাওয়ায়হ্, ২৮১ অধ্যায় ; আয-যামাখ্‌শারী, "মুফাস্‌সাল, ধারা ৫৪২ ও ইব্‌ন য়া'ঈশ, পৃ. ১১৫৩-৪; Wright-এর Ar. Br[3]., পৃ. ৩০৮ B ও Reckendof-এর Ar. Synt., পৃ. ৩১১, ছত্র ১৬ f-এ এই মতবাদের উল্লেখ আছে। Gaudefroy-Demombynes ও Blachere-এর বর্ণনায় আপাতপার্থক্যের অভাব অপনোদনার্থে পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয় এই সূক্ষ্ম পার্থক্য (পূ. গ্র., পৃ. ৪৭০ টীকা ১)।

هل.... أو অথবা هل .... أم (অধিকতর ব্যবহৃত بل .... ام)-এর ব্যবহারের জন্য দ্র. সীবাওয়ায়হ্, অধ্যায় ২৮০ ; Wright, ২খ, ধারা ১৬৭ ; Reckendorf. Ar. Synt., পৃ. ৩১১। আরব ব্যাকরণবিদগণ 'বরং' অর্থে ব্যবহৃত এই أم-কে আল-মুন্‌ক াতি 'আঃ অর্থাৎ 'পৃথককারী' বলিয়া অভিহিত করেন। এই المنقطعة أم-এর ব্যবহার আরও দেখিতে পাওয়া যায় ام .... أ-এর أم-এ (দ্র. Bergstrasser, পূ. স্থা., ধারা ৭৩-৪)।

মন্তব্য ঃ (ক) বিয়োজক প্রশ্নবোধক শব্দদ্বয়ের একটির না-সূচক উত্তরের জন্য দ্র. Reckendorf-এর Ar. Synt., ধারা ১৬০ c।

(খ) আলা (ألا) অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি সতর্কতাসূচক অথবা দৃঢ়তাব্যঞ্জক অথবা বিনয় সহকারে প্রার্থনামূলক অব্যয়। আমা (أما)-কেও এই অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, দ্র. Wright, ২খ, ধারা ১৬৮ ; Reckendorf-এর Ar. Synt., পৃ. ৩৯।

আল্‌লা ألا (আলা ألا=আ-লা أ-لا) পূর্বটি অপেক্ষা কম জোরালো) আল্‌লা هلا—কাহাকেও কোন কিছু করিবার জন্য উৎসাহ, সম্মতি বা মিনতিসূচক অব্যয় হিসাবে [ঘটমান অর্থবোধক ক্রিয়া (مضارع)-এর সহিত অথবা কোন কার্য না করিবার জন্য কাহাকেও তিরস্কার করা অর্থে পুরাঘটিত অর্থবোধক ক্রিয়া (ماضى)-এর সহিত], এই দুইটি অব্যয় ব্যবহৃত হয়, দ্র. Wright, ২খ, ধারা ১৬৯, Reckendorf-এর Ar. Synt., পৃ. ৩৯।

(গ) অলংকার প্রসঙ্গভূত বিষয়াদির জন্য দ্র. Reckendorf, ঐ ধারা ২১।

(ঘ) আঞ্চলিক ভাষায় أ-এর পরিবর্তে ها : أما-এর পরিবর্তে هما এবং ইহার বিপরীত ঃ هن -এর স্থলে ال, هلا-এর স্থলে ألا ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় (Wright, ১খ, ২৮৪গ ও ২৮৮ ক)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ মূল নিবন্ধে উল্লিখিত বরাত ছাড়াও 'আরব গ্রন্থকারদের রচনাবলী ঃ (১) সীবাওয়ায়হ, ১খ, অধ্যায় ২৮-৯, ৪৬ (পরোক্ষ প্রশ্নের জন্য, যাহার নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিশেষত্ব নাই), পৃ. ২৭৭-৮১, ২৮৩-৪, প্যারিস সং,; (২) যামাখ্‌শারী, মুফাস্‌সাল, ধারা ৫৪১-২, ৫৮১-৪, ২য় সং Brock ও ইব্‌ন য়া'ঈশ-এর শারহ , পৃ. ১১৫১-৪, ১২০১-৪, সম্পা. G. Jahn ; (৩) ইব্‌ন হিশাম আল-আনসারী, মুগ নি'ল-লাবীব, ১খ, ১৩-১৬, ২খ, ৩৪৯-৫৩, সম্পা. মুহ য়ি'দ-দীন 'আবদু'ল-হামীদ ; (৪) রাদি -য়্য'দ-দীন আল-আস্‌তারাবাযী, শারহু ল-কাফিয়া, ২খ, ৩৬১-২, ইস্তাম্বুল সং, ১২৭৫ হি. ; (৫) আরব সূত্রগুলির (বিশেষ করিয়া মুগ নি'ল-লাবীব-এর) সমালোচনার জন্য দ্র. W. H. Worrell, The Interrogative Particle hal in Arabic, According to Native Sources and the Kur'an, in ZA, ২১খ, (১৯০৮ খৃ.), ১১৬-৫০।

H. Fleisch (E.I.[2])/শেখ মোঃ তাবীবুর রহমান

**ইস্‌তিফান ইব্‌ন বাসীল** (اصطفن بن بسيل) ঃ Stephanos; Dioscorides-এর মেটেরিয়া মেডিকা (Materia medica)-র সর্বপ্রথম অনুবাদক। ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ তাঁহার গ্রন্থে দুইটি অনুচ্ছেদে তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম অনুচ্ছেদে মূসা ইব্‌ন খালিদের সঙ্গে তাঁহার নাম ও দক্ষ লেখক (কুত্তাব নাহারীর) হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহাকে খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল—হুনায়ন ইব্‌ন ইসহাক [দ্র.]-এর অধীনে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের রচনা সমীক্ষার (য়াতাসাফ্‌ফাহ) দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তাঁহার সম্পর্কে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ইব্‌ন জুলজুল-এর বরাতে প্রদত্ত হইয়াছে; ইহা Dioscorides-এর প্রবন্ধ অনুসারে লিখিত মৌলিক সংজ্ঞার ব্যাখ্যার (Explanation of the names of simples) উপর তাঁহার গ্রন্থ (বর্তমানে বিলুপ্ত) হইতে পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন, আল-মুতাওয়াক্কিলের সময় বাগদাদে ইসতি ফান ইব্‌ন বাসীল (আত-তুরজুমান) কর্তৃক মেটেরিয়া মেডিকা (Materia medica) গ্রীক ভাষা হইতে 'আরবীতে অনূদিত হয়। অনুবাদ কর্মটি হুনায়ন ইব্‌ন ইসহাকের (আল-মুতারজিম) তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ হয় এবং তিনি ইহার অনুমোদন দান করেন (আজাযাহু)। ইসতিফান ঔষধ সংক্রান্ত উপাদানের গ্রীক নামের 'আরবী পরিভাষা প্রদান করেন এবং তৎকালে ঐগুলির সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। যেই সমস্ত শব্দের আরবী পরিভাষা তাঁহার জানা ছিল না, সেইগুলিকে গ্রীক নামেই অভিহিত করেন "এই প্রত্যয়ে যে, পরে হয়ত সৃষ্টিকর্তা কোন লোককে পাঠাইতে পারেন, যিনি এইগুলির সঠিক পরিভাষা প্রণয়নে সক্ষম হইবেন।" ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, এই প্রথম অনুবাদকর্মটি কোন মধ্যবর্তী সিরীয় অনুবাদ ছাড়াই সরাসরি গ্রীক ভাষা হইতে সম্পাদন করা হইয়াছে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) M. Steinschneider, Die griechischen Aerzte in arabischen, Uebersetzungen, in Virchows Archiv, Cxxiv(১৮৯১ খৃ.), ৪৮০-৩ ; (২) Max Meyerhof, Die Materia medica des Dioskurides bei den Arabern, in Quellen und Studien zur Geschichte der Naturwissenschaft und der Medizin, ৩/৪খ. (বার্লিন ১৯৩৩ খৃ.)।

R. Arnaldez (E.I.[2])/মুহাঃ আবু তাহের

**ইস্‌তিবদাদ** (দ্র. জুল্‌ম)

**ইস্‌তিব্‌রা'** (استبراء) ঃ [এই ব্যাপারটি বিশ্বব্যাপী ক্রীতদাস প্রথা চালু থাকার সময়কার। রাসূলুল্লাহ্ (স) ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের অনুকূলে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায়ই এই প্রথার বিলোপ সাধন সম্ভবপর হয় নাই। উনবিংশ শতক পর্যন্ত, বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্যের দেশসমূহে দাসপ্রথা চালু থাকিলেও মুসলিম বিশ্বে মহানবী (স)-এর ইনতিকালের দেড় শত বৎসরের মধ্যেই এই প্রথা বিলুপ্ত হইয়া যায়। দাসীদিগকে ভোগ করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স) কতিপয় বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। ইস্‌তিবরা উহাদের অন্যতম]। ইস্‌তিব্‌রা' শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিষ্কারকরণ, পবিত্রকরণ, ঋণ অথবা গুনাহ্ হইতে নিষ্কৃতি চাওয়া। ইসলামী আইনের পরিভাষায় ঃ কোন দাসীর মালিকানা পরিবর্তন কিংবা তাহাকে মুক্তি দান কিংবা বিবাহ দেওয়ার সময় সে গর্ভবতী কিনা তাহা জানিবার জন্য যে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাহার সহিত সংগম করা হইতে বিরত থাকিতে হয় তাহাকে ইস্‌তিবরা' বলা হয়। সুতরাং কোন মুসলমান কোন বাঁদীকে ক্রয়সূত্রে অথবা ওয়ারিসীসূত্রে অথবা অন্য কোনভাবে লাভ করার সংগে সংগেই সে তাহার সহিত সংগম করিতে পারে না। সে গর্ভবর্তী কিনা তাহা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাহার সহিত সংগম করা নিষিদ্ধ। গর্ভস্থ সন্তানের বংশ পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যই এই বিধি-বিধান আরোপ করা হইয়াছে। ইস্‌তিব্‌রার সময়সীমা এক মাসিক ঋতু। বাঁদী যদি গর্ভবর্তী হইয়া থাকে তাহা হইলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংগে সংগেই ইস্‌তিব্‌রা' শেষ হইয়া যায়। যে দাসীর মাসিক ঋতু হয় না তাহার ইস্‌তিব্‌রার সময়সীমা এক মাস।

**ইস্‌তিব্‌রা' বাধ্যতামূলক হওয়ার ভিত্তি হইতেছে মহানবী (স)-এর হাদীছ।** "হুনায়নের যুদ্ধশেষে আওতাস নামক স্থানে যুদ্ধবন্দীদেরকে একত্র করা হয়। তাহাদের মধ্যে নারীও ছিল। নবী (স ) তাহাদের সম্পর্কে এই নির্দেশ দিলেন যে, গর্ভবর্তী মহিলাদের সহিত সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত এবং যাহারা গর্ভবতী নয় তাহারা ইস্‌তিব্‌রার সময়সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত তাহাদের সহিত সহবাস করা যাইবে না।" ফিক্‌হবিদগণের বিস্তারিত আলোচনা এখানে উল্লেখ করা হইল ঃ

১। যখন কোন দাসী বিক্রয়, দান, বিক্রয় বাতিল, বিনিময়, উত্তরাধিকার, লুণ্ঠন বা উইলের মাধ্যমে একজনের মালিকানা হইতে অন্যজনের মালিকানায় চলিয়া যাইত তখন তাহাকে ইস্‌তিব্‌রা' পালন করিতে হইত। তাত্ত্বিকভাবে সকল দাসী এই বিধি-নিষেধের আওতায় ছিল। তাহাদের মধ্যে কেবল সন্তান ধারণে সক্ষম স্ত্রীলোকেরাই ছিল না, বরং ঋতুপূর্ব বালিকা, ঋতুবন্ধ স্ত্রীলোক, এমন কি স্বল্প বয়স্কা বালিকা যাহাদের সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাও সম্ভব ছিল না—এইরূপ সকলেই ইহার আওতাভুক্ত ছিল। অবশ্য মালিকী মাযহাবে ইহার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় (খালীল, মুখ্‌তাস ার, ২খ, ১২৫)।

মালিকানা হস্তান্তরের সময় যে বাঁদী কুমারী ছিল, এমন কি তাহার উপরও ইস্‌তিব্‌রা' বাধ্যতামূলকভাবে আরোপিত হইত, যদিও এই ক্ষেত্রে পিতৃত্ব নিরূপণের জটিলতার কোন অবকাশ ছিল না। কারণ মালিকানা হস্তান্তরের পরে ছাড়া তাহার গর্ভ ধারণের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এই ক্ষেতে বিভিন্ন মাযহাবের ঐকমত্য সত্যই বিস্ময়কর ! কেবল জাহিরী মায্হাবের বিশেষজ্ঞগণ কুমারী দাসীদেরকে ইস্‌তিব্‌রা' পালন হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন (ইব্‌ন হায্‌ম, মুহ ল্লা, ১০খ, পৃ. ৩১৫)। একটি সাধারণ উদাহরণ হইতে এই ক্ষেত্রে ফাকীহগণের দাবী অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। যেমন একটি দাসী একজন স্ত্রীমালিক অথবা নপুংসক মালিক কর্তৃক বিক্রিত হইল (এই ধরনের ক্ষেত্রসমূহে ইস্‌তিব্‌রাা' অনুমোদন করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা বাধ্যতামূলক নহে), পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ক্রেতা তাহার দখল বুঝিয়া পাওয়ার আগেই বিক্রয় রদ হওয়ার মাধ্যমে সে তাহার পূর্ব মালিক স্ত্রীলোক অথবা নপুংসকের কাছে ফিরিয়া আসিল। এই ক্ষেত্রে দাসীর গর্ভের সন্তানের পিতৃত্ব লইয়া কোন প্রশ্ন দেখা দিতে পারে না বা কাহারও গর্ভ ধারণের কোন আশংকা থাকে না—তবুও তাহাকে ইস্‌তিব্‌রা' পালন করিতে হইত। অবশ্য হানাফী ফিক্‌হবিদগণ এই ক্ষেত্রে ইস্‌তিব্‌রার বাধ্যবাধকতা তুলিয়া নিয়াছেন। তবে ক্রেতা কর্তৃক দাসীর দখল নেওয়ার পর বিক্রয় রদ হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁহারা ইস্‌তিব্‌রা' আরোপ করিয়াছেন।

২। প্রত্যেক দাসীকে ও উম্মু ওয়ালাদকে (দ্র. 'আব্‌দ প্রবন্ধ)-ও তাহার মনিবের জীবদ্দশায় দাসত্ব মোচনের ফলে অথবা মনিবের মৃত্যুতে ইস্‌তিব্‌রা' পালন করিতে হইত। এই ক্ষেত্রে হানাফী মতাবলম্বিগণ অপর তিন মায্হাব হইতে ভিন্ন মত পোষণ করিয়া এক হায়যকাল ইস্‌তিব্‌রা' পালন করার পরিবর্তে তিন হায়য-কাল পর্যন্ত 'ইদ্দাত (দ্র. ই. বি., ৩খ, ৩৮৬-৯) পালনের সুপারিশ করিয়াছেন। তাহার মনিবের জীবদ্দশায় তাহার দাসত্ব মোচন হউক অথবা তাহার মৃত্যুর কারণে হউক, ইহাতে কোন পার্থক্য নাই (আয-যায়লা'ঈ', তাব্‌য়ীন, ৩খ, ৩০)।

৩। পরিশেষে কোন দাসীকে তাহার মালিক কোন আযাদ ব্যক্তি অথবা দাসের কাছে বিবাহ দিলে তাহাকে ইস্‌তিব্‌রা' পালন করিতে হইত। এই ক্ষেত্রে হানাফী আইন কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী।

ইস্‌তিব্‌রার উপর তাঁহাদের জেদ পুরাপুরি বজায় থাকিলেও ইহা লইয়া অযৌক্তিক বাড়াবাড়ি তাঁহারা এড়াইয়া চলিয়াছেন। তাই যে দাসী তাহার মনিবের সহিত সংগম করিয়াছে, অতঃপর তাহার মনিব তাহাকে আযাদ করিয়া বিবাহ করিয়াছে—এই ক্ষেত্রে তাহাকে ইস্‌তিব্‌রা' পালন করা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। কারণ এই ক্ষেত্রে ইস্‌তিব্‌রা' উদ্দেশ্যহীন। অবশ্য ইহা এমন ব্যাপারের সহিত তুলনীয় নহে যেখানে এক ব্যক্তি একটি দাসীকে ক্রয় করিয়া তৎক্ষণাৎ আযাদ করিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বালী মাযহাবের ফিক্‌হবিদগণ ইস্‌তিব্‌রার উপর জোর তাকীদ দিয়াছেন। তাঁহারা এই কথাও বলিয়াছেন, হানাফীগণ যদি ভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন তাহা এইজন্য যে, ইমাম আবূ য়ূসুফ খলীফা হারূনু'র-রাশীদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই ইহা করিয়াছেন। কারণ হারূনু'র-রাশীদ একটি দাসীকে ক্রয় করিয়া পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই তিনি খলীফাকে দাসীটি ক্রয় করার পর আযাদ করিয়া দিয়া বিবাহ করার পরামর্শ দেন (ইব্‌ন কু দামা, মুগনী, ৭খ, ৫০৭-৮)।

ইস্‌তিব্‌রার সময়সীমা যে দাসী তাহার বিক্রয়, দাসত্ব মোচন বা বিবাহ কালে গর্ভবতী হইয়াছে তাহার ইস্‌তিব্‌রার সময়সীমা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত। যেসব দাসীর মাসিক ঋতু (حيض) হয় তাহাদের ইস্‌তিব্‌রা' একটি পূর্ণ ঋতুকাল যাহা তাহাদের জরায়ুর মধ্যে কিছু নাই বলিয়া প্রমাণ করে। যাহাদের এখনও মাসিক ঋতু শুরু হয় নাই এবং যাহাদের মাসিক ঋতু হওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাদের ইস্‌তিব্‌রার সময়সীমা একটি পূর্ণ চান্দ্র মাস। মনিবের মৃত্যুর ক্ষেত্রেও ইহার সময়সীমা একই। অবশ্য হানাফী মাযহাব মতে এই ক্ষেত্রে ইস্‌তিব্‌রার সময়সীমা তিন হায়য-কাল। এই বিষয়ে হাম্বালী মাযহাবের আইন অধিকতর কৌতূহলোদ্দীপক। যদি কোন দাসীর দুইজন মনিব তাহার সহিত সংগম করিয়া থাকে এবং উভয়ই তাহাকে বিক্রয় করিয়া দেয় তাহা হইলে দাসীটিকে দুইটি ইস্‌তিব্‌রাা' পালন করিতে হইবে (ইব্‌ন কুদামা, মুগনী, ৭খ, ৫০৯)। ইস্‌তিব্‌রার এই সময় সীমা অবিবাহিত দাসীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সময়ই হইবে। অবশ্য যখন কোন দাসী বিবাহিতা হয় এবং অন্য কোন কারণে বা স্বামীর মৃত্যুতে তাহার বিবাহ ভাংগিয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে ইস্‌তিব্‌রা' পালন না করিয়া বরং 'ইদ্দাত পালন করিতে হইবে। ইসলামী আইন অনুযায়ী একজন দাসীর দায়িত্ব একজন স্বাধীন স্ত্রীলোকের অর্ধেক হওয়ায় স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে তাহার 'ইদ্দাতকাল হইবে দুই মাস পাঁচ দিন এবং তালাকপ্রাপ্তা হইলে তাহার 'ইদ্দাতকাল হইবে দুই হায়য-।

দাসত্ব মোচনের ক্ষেত্রে ইস্‌তিব্‌রা কোন দাসী যখন মনিব পরিবর্তন করে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যখন কোন দাসীকে ক্রয়, দান বা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে তখন এই দাসীর ইস্‌তিব্‌রা' পালন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে তাহার সহিত সংগম করিতে পারিবে না। এই ক্ষেত্রে চার মাযহাবই একমত। কেবল জাহিলী মায্হাবের বিশেষজ্ঞগণ এই বাধ্যবাধকতা বিক্রেতার উপর চাপাইয়াছেন (ইব্‌ন হায্‌ম, আল-মুহাল্লা, ১০খ, ৩১৫)। এই ব্যাপারে মালিকী মায-হাবের আইন অধিকতর কার্যকর এবং সহজে প্রয়োগযোগ্য। এই আইন অনুযায়ী ইস্‌তিব্‌রা' পালনকারী দাসীকে কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি, বিশেষ করিয়া এমন একজন মহিলার নিকট অর্পণ করিতে হইবে যাহাতে তাহার নূতন মনিব তাহার ইস্‌তিব্‌রা' পালনের সময় তাহার নিকটেও আসিতে না পারে। এই পদ্ধতি অছি (Trust) বা মুওয়াদা'আ (ওয়াদী'আ হইতে) নামে পরিচিত।

ইস্‌তিব্‌রা' পালন না করিলে তাহার প্রতিবিধান ঃ যে ব্যক্তি কোন নূতন দাসী অর্জন করার পর তাহার ইস্‌তিব্‌রাা' চলাকালীন তাহার সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে, সে গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হয়। এই ক্ষেত্রে হানাফী আইনবিদগণ কিছু বিশেষ সুবিধার সুপারিশ করিয়াছেন। ইহার ফলে অসংযমী ব্যক্তিরা এই বিধি এড়াইয়া চলিতে সক্ষম হইলেও তাহা অমান্য করিতে সক্ষম হয় না। তাঁহারা হিলাঃ (দ্র.) নামে একটি বিধির উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহার অধীনে নূতন অর্জিত দাসীকে কোন তুচ্ছ ব্যক্তির নিকট বিবাহ দেওয়া হইত এবং এই শেষোক্ত ব্যক্তি তাহাকে তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ সহবাসের মাধ্যমে বিবাহ পূর্ণতা লাভ করার পূর্বেই তালাক প্রদান করিত। এইভাবে তাহাকে 'ইদ্দাত পালন করা হইতে রেহাই দেওয়া হইত। আর যেহেতু তাহার বিবাহ হইয়াছে, তাই তাহার ক্ষেত্রে ইস্‌তিব্‌রা' প্রযোজ্য নহে। কিন্তু হাম্বালী ও মালিকী ফিক্‌হবিদগণ এই সুবিধাকে দ্বিধাহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন (ইব্‌ন কুদামা, মুগনী, ৭খ, ৫১৩ ; খালীল, মুখ্‌তাসার, ২খ, ১২৩)।

এই দিকে ইস্‌তিব্‌রার বিধিনিষেধ অমান্যকারী নূতন মনিবকে তাহার অবহেলার দরুন ইহার মন্দ পরিণতি ভোগ করিতে হইত। যেমন, দাসীটি নূতন মনিব কর্তৃক ক্রয়ের ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে একটি সন্তান প্রসব করিল। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, দাসীটি তাহার পূর্ববর্তী মনিব কর্তৃক গর্ভবতী হইয়াছিল। অতএব, সে ছিল উম্মে ওয়ালাদ, যাহার ফলে তাহার বিক্রয় ও হস্তান্তর বৈধ হয় নাই। এই দাসীটিকে তাহার পূর্ব মনিবের কাছে ফেরত দিতে হইবে।

ইস্‌তিব্‌রার সহিত আযাদকৃত দাসীদের 'ইদ্দাত (যাহারা আযাদ স্ত্রীলোকের সমতুল্য) এবং বিবাহিতা দাসীদের 'ইদ্দাতের মধ্যে সম্ভাব্য সমন্বয় সাধন করার জন্য ফিক্‌হের গ্রন্থসমূহে দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করা হইয়াছে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ [(১) সাহীহ বুখারী, কিতাবুল'ল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ ঃ 'ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যুদ্ধবন্দিনিগণকে লইয়া সফর করা যায় কি না ; (২) সুনান আবী দাঊদ, কিতাবু'ন-নিকাহ , অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধবন্দিনিগণের সহিত সহবাস প্রসঙ্গ ; (৩) মুসনাদ আহমাদ, ৪ ও ৫খ ; (৪) সুনান দারিমী, কিতাবু'ত-তাহারাত, অনুচ্ছেদ ঃ বাঁদীর ইস্‌তিব্‌রা' প্রসঙ্গ, কিতাবু'ত-তালাক, অনুচ্ছেদ-ঐ, কিতাবু'স-সায়র, অনুচ্ছেদ-ঐ,] ; ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহের 'ইদ্দাত অনুচ্ছেদ, (বিশেষত (৫) মারগীনানী, হিদায়া, কায়রো ১৯৩৬ খৃ., ৪খ, ৬৫ প.) ; (৬) রামলী, নিহায়াতু'ল-মুহতাজ (শাফী'ঈ), কায়রো ১৯৩৮ খৃ., ৭খ, ১৫৪-৬২ ; (৭) খালীল, মুখতাসার, অনু. Bousquet, ২খ, ১২৩-৮ ; (৮) ইব্‌ন কুদামা, মুগনী, কায়রো ১৩৬৭ হি., ৭খ, ৫০০ প. ; (৯) বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার জন্য দেখুন দিমাশকী প্রণীত রাহমাতু'ল-উম্মা গ্রন্থ, শা'রানী প্রণীত মীযান-এর প্রান্তে উল্লিখিত, সম্পা/ হালাবী, ২খ, ৮৮-৯ ; (১০) Santillana, Istituzioni, রোম ১৯২৫ খৃ., ১খ, ২৫২-৩। আরও দ্রষ্টব্য ঃ 'আব্‌দ, 'ইদ্দাত ও উম্ম ওয়ালাদ প্রবন্ধ। [(১১) সারাখসী, আল-মাবসূত , ১৩খ, ১৪৬ প., অনুচ্ছেদ ঃ ইস্‌তিব্‌রা' ; (১২) ইমাম নাওয়াবী, মিনহাজু'ত-তালিবীন (মুদ্রণ, Van den Berg), ৩খ, ৬০প. ; (১৩) ফাতহু 'ল-কারিব (মুদ্রণ, Van den Berg), ৫১৪ প. ; (১৪) আল-বাজূরী (কায়রো ১৩০৭ হি.), ২খ, ১৮২; (১৫) শা'রানী, আল-মীযানু'ল-কুব্‌রা (কায়রো ২৭৯ হি.), ১১খ, ১৫৫ প. ; (১৬) কাদী যাদাহ আফেন্দী, তাকমিলা ফাতহি'ল-কাদীর লি-ইব্‌নি'ল-হুমাম, শারহি হিদায়া (মিসর ১৩১৮ হি.); (১৭) মাহমূদ আল-বাবারতী, শারহু'ল-কি নায়া 'আলা'ল-হিদায়া ; (১৮) আল-মুদাওওয়ানাতু'ল-কুব্‌রা, কিতাবু'ল-ইস্‌তিব্‌রা', ১ম সংস্করণ, ১৩২৪ হি.; (১৯) Snouck Hurgronje, Mekka, ২খ, ১৩৫ ; (২০) দা. মা. ই., ৩খ, ৫৬৬]।

Y. Linant De Bellefonds (E.I.[2])/মুহাম্মদ মূসা

**ইস্‌তিব্‌সার** (كتاب الاستبصار فى عجائب الامصار) ঃ (استبصار) বেনামে লিখিত একটি ভূগোল-ইতিহাস সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। মূল গ্রন্থটি লেখক সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পরিবেশন করে নাই। খুব সম্ভবত তিনি মরক্কো দেশীয় এবং ৬ষ্ঠ/১২শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন। বস্তুত ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, মূল গ্রন্থটি এমনি একজন লেখকের রচনা যিনি মু'আল্লিফ অথবা ওয়াদি ' হিসাবে উল্লিখিত ছিলেন। পরবর্তীকালে ইহা একজন নাজির কর্তৃক সংশোধিত হয় এবং তাঁহার সময় পর্যন্ত লেখা হয়। তিনি মাগরিবের ইতিহাসের সঙ্গে একত্র করিয়া একটি রচনা লেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন (পৃ. ২২৬)। ইহা তিনি ৫৮০/১১৮৪-৮৫ সালে রাষ্ট্রপ্রধান (সম্ভবত য়া'কূব আল-মানসূর, ৫৮০-৯৫/১১৮৪-৯৯)-কে উপহার দেন। যদিও লেখক বর্ণনা করেন যে, রামাদান ৫৮৭/সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১১৯১ সালে তিনি গ্রন্থটি লিখিতেছিলেন, কিন্তু ঐ সময়ের পরবর্তী ঘটনাও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, যাহা ইঙ্গিত দেয় যে, 'সংশোধনকারী' পরস্পরবিরোধী ঘটনাবলী বর্জন ছাড়াই সংযোজনের ক্ষেত্রে তাঁহার প্রচেষ্টা সীমিত রাখেন। রচনাটি জনৈক আবূ 'ইমরান ইব্‌ন য়াহয়া ইব্‌ন ওয়াকতীনকে উৎসর্গ করা হয় যাঁহার সম্বন্ধে অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

কিতাবু'ল-ইস্‌তিব্‌সার তিন অংশে বিভক্ত ; ইহাতে যথাক্রমে মক্কা ও মদীনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। মিসরের ইতিহাস ও ভৌগোলিক বর্ণনায় কম বেশী কিছু অলীক তথ্য সংযোজিত হইয়াছে এবং পরিশেষে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে উত্তর আফ্রিকা ও বিলাদ সূদানের বর্ণনা ঐতিহাসিক তথ্যের সংগে মিশ্রিতভাবে পরিবেশিত হইয়াছে, সমসাময়িক অনস্বীকার্য ও মনোজ্ঞ দলীল-পত্রাদির বর্ণনার পাশাপাশি উদ্ভট কল্পিত কাহিনীর বর্ণনা থাকায় রচনাটির মূল্য অত্যন্ত অকিঞ্চিতকর প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ইহা A. Von Kremer কর্তৃক একটি আংশিক সম্পাদনার বিষয় ছিল Description de l' Afrique par un geographe arabe anonyme du 6e siecle de l'hegire, ভিয়েনা ১৮৫২ খৃ. ; আলজির্য়াস ১৫৬০ ও প্যারিস বিবলিওথিক ন্যাশনেল ২২২৫, পাণ্ডুলিপিগুলির প্রতি ধন্যবাদ E. Fagnan, von Kremer-এর অসমাপ্ত গ্রন্থের কিছু কিছু শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি ইহা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন L' Afrique septentrionale au xiie siecle de notre ere, in Recueil de notices et mem. de la Soc. archeol. de Constantine, xxxiii (1899), কনস্টানটাইন ১৯০০ খৃ.। অবশেষে সা'দ যাগলুল 'আবদি'ল-হামিদ বিবলিওথেক ন্যাশনেল ২২২৫, আলজিয়ার্স ১৫৬০ ও ৩২১৬ পাণ্ডুলিপিগুলির উপর ভিত্তি করিয়া পবিত্র স্থানসমূহের ও মিসরের প্রাসঙ্গিক অধ্যায়ের ফরাসী অনুবাদসহ একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ কিতাবু'ল-ইস্‌তিব্‌স ার ইত্যাদি নামে প্রকাশ করেন, আলেকজান্দ্রিয়া ১৯৫৮ খৃ.। যথাক্রমে Von Kremer ও Fagnan কর্তৃক ব্যবহৃত দুইটি পাণ্ডুলিপির অনুরূপ আরও দুইটি পাণ্ডুলিপি রাবাতের বিবলিওথেক জেনারেল (Bibl. Gen.) ১১৫ ও ৪১৫ নং-এর অভিন্ন ছিল। সম্ভবত এই পর্যন্ত ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিগুলিতে শূন্য স্থান বিদ্যমান ; কারণ ইব্‌ন আবী যার' (কিরতাস, ২৪) নামক জনৈক লেখক এই রচনা হইতে উদ্ধৃতি দানকালে এমন একটি অংশ তুলিয়া ধরিয়াছেন যাহা ঐ সংরক্ষিত গ্রন্থে অনুপস্থিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধ গর্ভে উল্লিখিত।

Ch. Pellat (E.I.[2])/মুহাঃ আবু তাহের

**ইসতিমতার** (দ্র. ইসতিসকা')

**ইস্‌তি'রাদ** (استعراض) ঃ (আ.), ইহা খাওয়ারিজ (দ্র.)-সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত একটি পারিভাষিক শব্দ, সাধারণভাবে ইহা ধর্মীয় কারণে হত্যাকাণ্ড অর্থে ব্যবহৃত হয়, বিশেষত আযারিকা ঃ (দ্র.) কর্তৃক তাহাদের

প্রতিষ্ঠিত মৌলিক মতবাদের বিরোধিতাকারী মুসলিম ও পৌত্তলিকদের মৃত্যুদণ্ড দান বুঝানো হয়। যাহা হউক, এইরূপ অর্থকরণ শব্দার্থ-বিদ্যার ক্রমবিকাশের ধারা অনুসারে হইয়া থাকিবে বলিয়া অনুমিত হয়। ইস্‌তা'রাদা ক্রিয়াটির (বাব ইস্‌তিফ 'আল) অর্থ "কাহাকেও তাহার অধিকারভুক্ত বিষয়াদি প্রদর্শনের জন্য বলা" এবং ইহা হইতে এই অর্থ উদ্ভূত হয় "নিজস্ব মতামতের বিবরণ প্রদান করা"। সুতরাং ইসতি'রাদ হইতেছে তাহাদের যে সমস্ত শত্রু তাহাদের করতলগত হইত তাহাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা। باب افتعال = ক্রিয়ারূপ ই'তারাদা-এর সহিতও ইহার অধিস্থাপন ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়- যাহার অর্থ "এক এক করিয়া পরীক্ষা করা, নিরীক্ষণের সম্মুখীন হওয়া", ইহা ছাড়াও "কাহাকেও আক্রমণ করা" এবং "চতুর্দিক হইতে বিক্ষিপ্তভাবে আঘাত করা" অর্থও করা হয় (তু. আল-কালী, আমালী, ১খ, ১১৯)। আল-মুবাররাদ (কামিল, পৃ. ৬১৬ ; কায়রো সং. ১০৪১ ; তু. ইব্ন আবি'ল-হাদীদ, শারহ নাহজি'ল-বালাগা, ১খ, ৩৮২) নাফি'-এর তথ্য বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, আল-আহ্‌ওয়াজ-এর সন্নিকটে ইয়া'তারি-দু'ন-নাস্ অর্থাৎ তিনি তাহাদেরকে একটি জিজ্ঞাসাবাদের মুখামুখি করিয়াছেন এবং শিশুদের হত্যা করেন (ওয়া য়াক তুলু'ল-আহ্' ফাল)। কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে এবং ইয়া'তারিদু ক্রিয়া সুস্পষ্টরূপে এই কর্মের অর্থ প্রকাশ করিয়াছে। এইজন্য ই'তারাদা ও ইসতা'রাদা—এই ক্রিয়াদ্বয় সমার্থক বলিয়া অনুমিত হয়। ইসতি'রাদ প্রসঙ্গে আদ-দীনাওয়ারী (তিও-য়াল, পৃ. ২২১) যখন ইসতি'রাদু 'ন-নাস বাক্যটির উল্লেখ করেন তখন ইহা সুনিশ্চিত যে, তিনি জেরা করা প্রসঙ্গই উল্লেখ করেন, যেহেতু তিনি ইহার সহিত য়াক তুলূনাহুম বাক্যটি যোগ করেন। একটি সমাবেশের আমন্ত্রণ প্রসঙ্গে লিখিত 'আলা মান্ লাম য়াক তুল ওয়া (-লাম) য়াস্‌তা'রিদ এই শিরোনামটির শব্দ চয়নের বিবরণ পেশ করিতে গিয়া আত-তাবারীও একই পন্থা অবলম্বন করেন (১খ, ৩৩৮০, পংক্তি ১১-২)। যাহা হউক, কাতারী (দ্র.) সম্পর্কে আল-জাহিজ যখন বলেন (বায়ান, ৩খ, ২৬৪) যে, তিনি "ইসতি'রাদ অর্থাৎ (নারীদের) বন্দী (সিবা') করা এবং শিশুদের হত্যা করা"-এর প্রবক্তা ছিলেন তখন এই উক্তিটি নিশ্চিতভাবে এমন একটি মতবাদের অর্থও প্রকাশ করে যাহা শুধু জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কিত বিষয়ের সঙ্গেই জড়িত নহে, বরং ইহা যে কোন অবাধ্য ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড দানের অর্থও প্রকাশ করে (অথবা যাহারা ঐ উদ্দেশ্যে সমাবেশে অংশগ্রহণ করিয়াছিল একজন বন্দীকে হত্যা করিয়া নিজেদের আন্তরিকতার প্রমাণ দেওয়া ; তু. H. Laoust, Schismes, 45)। আবূ বায়হাসে প্রতি আরোপিত একটি উক্তিতে ইসতি'রাদ একই অর্থে ব্যবহৃত (আল-মুবাব্‌রাদ, কামিল, পৃ. ৬১৬ ; কায়রো সং., ১০৪১) যাহা এই ধরনের সন্ত্রাসবাদের অনুমোদন দান করে। সেইহেতু ইসতি'রাদ শব্দটি খারিজীদের চরমপন্থী দল কর্তৃক 'স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাহাদের মতবাদ গ্রহণে অনিচ্ছুক শত্রুগণ'কে হত্যা করা অর্থের তুলনায় জেরার অর্থে কম ব্যবহৃত হইয়াছে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে।

Ch. Pellat (E.I.[2]) মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

**ইস্‌তি'রাদ** (استعراض) ঃ 'আর্‌দ ইহা সৈন্যদের সমাবেশ, অগ্রসর হওয়া, নিরীক্ষণ করা এবং পরিদর্শন করা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। যে কর্মকর্তার উপর এই সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে তিনি 'আরিদ (বহুবচন উর্‌রাদ) নামে পরিচিত। প্রারম্ভ হইতেই 'আর্‌দ সংস্থাপনটি ছিল দীয়ানু'ল্-জায়শ অথবা প্রশাসনের সেই বিভাগটি যাহা সামরিক বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। সৈন্য দলে ভর্তি, রংরুট সংগ্রহ, সেনা সমাবেশ ও পরিদর্শন ইত্যাদি দায়িত্ব দীওয়ানের প্রধান কার্যাবলী। অন্যান্য কার্য ছিল অবসর-ভাতা ও বেতন ইত্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি (দ্র. দীওয়ান ও জায়শ)। 'আব্বাসী খিলাফাতের প্রথম দিকের সাহি'বু দীওয়ানিল্-জায়শ অথবা ইহার উত্তরাধিকারী রাজ্যগুলির (বিশেষ করিয়া খিলাফাতের কেন্দ্রীয় ও পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাগুলিতে) 'আরিদু'ল্-জায়শ এইরূপে আধুনিক কালের যুদ্ধ-মন্ত্রী, প্রধান বেতনদাতা (Paymaster-General), প্রধান সেনানিবাস কর্মকর্তা (Quartermaster-General)-র দায়িত্বাবলীসহ পূর্ববর্তীকালীন সৈন্যদলের তালিকা ও অস্ত্রাদির হিসাব রক্ষণকারী প্রধানের (Muster-Master) দায়িত্বভারও পালন করিতেন। খিলাফাতের প্রথমদিকে ও ইহার অধস্তন পুরুষগণের সময়ে দৃঢ় সামরিক প্রবণতার দরুন 'আরিদ-এর পদ অপরিহার্য ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং সব সময়ে না হইলেও সর্বোচ্চ পদে উন্নতি লাভের সোপানস্বরূপ ছিল, যেমন উযীর পদ। এইভাবে উযীর পদ লাভের অব্যবহিত পূর্বে 'আলী ইব্‌নু'ল-ফুরাত (দ্র. ইব্‌নু'ল-ফুরাত) আল-মুক্‌তাফী-র শাসনকালের শেষভাগে সৈন্য বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং সালজূক আমলা ও ঐতিহাসিক আনুশির্‌ওয়ান্ ইব্‌ন খালিদ্ (দ্র.)--সুলতান মুহাম্মাদ ইব্‌ন মালিক শাহ্ ও মাহ্‌মুদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ-এর 'আরিদু 'ল-জায়শ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরিণামে বিভিন্ন সময়ে 'আব্বাসী ও সাল্‌জূক -- উভয় শাসকের উযীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

পরিদর্শক হিসাবে সম্রাটের সমভিব্যাহারে সেনাবাহিনী পরিদর্শন করিবার ধারণাটি নিকটপ্রাচ্যের প্রাক-ইসলামী যুগ হইতে গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব রোম সাম্রাজ্যে ইসলামী 'আরিদ-এর কার্যাবলী Logothetes tou Stratiotikou বিভাগ কর্তৃক পালিত হইত। সাসানীয় সাম্রাজ্যে সামরিক বাহিনী সম্পর্কিত কোন স্বতন্ত্র বিভাগের অস্তিত্বের প্রমাণ সুস্পষ্ট নহে, যদিও ক্রিস্‌টেন্‌সেন বিশ্বাস করিতেন যে, সম্রাটগণের অধীনে এইরূপ একটি বিভাগ থাকা সম্ভব (তু. L' Iran sous les Sassanides[2], ২১৩-১৪)। দীনাওয়ারী ও তাবারী উভয়ের সবিশেষ বর্ণনা হইতে আমরা নিশ্চিতভাবে একটি সাসানীয় 'আরদ্ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ প্রাপ্ত হই। এতদনুসারে খুস্‌রাও আনুশির্‌ওয়ান্ (পারভেজ) (৫৩১-৭৯) তাঁহার সম্ভ্রান্ত বংশীয় সচিবগণের মধ্য হইতে বাবাক্-কে দীওয়ান'ল্-মুকাতিলা বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করেন। সৈন্যদলের যথাযথ পরিদর্শন উপলক্ষে পরিদর্শক কর্মকর্তার জন্য কাষ্ঠ-নির্মিত মঞ্চ স্থাপন করা হইত, এমন কি সম্রাটকে স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে হইত। তিনি অশ্বারোহী সৈনিকের পরিধেয় বর্ম, বক্ষ-আবরণী, পদ-বর্ম, তরবারি, বল্লম, ঢাল, দণ্ড, কুঠার অথবা গদা ইত্যাদি অস্ত্রাদিতে সজ্জিত থাকিতেন এবং তূণীরসহ জ্যা-যোজিত ধনু ও ত্রিশটি তীর তাঁহার কটিবন্ধে থাকিত এবং দুইটি উদ্বৃত্ত জ্যা থাকিত। Noldeke- এই বর্ণনাকে উপাখ্যানমূলক, বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া বিবেচনা করেন; কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে সম্ভবত অযথা সন্দেহপরায়ণ ছিলেন। আমরা যুক্তিযুক্তভাবেই ধরিয়া লইতে পারি যে, প্রাক-ইসলামী পারস্যে সৈন্যদল পর্যবেক্ষণের জন্য কোন একটি কার্যপ্রণালী প্রচলিত ছিল (দীনাওয়ারী, ৭৪-৫ ; তাবারী, ১খ, ৯৬৩-৫ = Noldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der

Sassaniden, ২৪৭-৯ ; তু. বেনামী মুজমালু'ত্-তাওয়ারীখ, ৭৪; ইহাতে বলা হইয়াছে যে, মূবায় অথবা জরথুস্ত্রীয় প্রধান পুরোহিত আনূশির্ওয়ান-এর অধীনে 'আরিদ হিসাবে কাজ করিতেন)।

হযরত মু'আবিয়া (রা)-র আমলের দীওয়ানু'ল-মুকাতিলা অথবা দীওয়ানু'ল-জুন্দ হইতে সম্প্রসারিত হইয়া 'আব্বাসী প্রথম যুগে দীওয়ানু'ল-জায়শ্-এর কার্যে জটিলতা বৃদ্ধি পায়, ইহাতে সাহিবু দীওয়ানি'ল-জায়শ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন (যাহা হউক, লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, 'আর্দ-এর কার্য, যাহা খলীফার একান্ত সচিব হিসাবে উযীরের একটি কর্তব্যকর্ম ছিল, শব্দটির অতিরিক্ত অর্থ-'আবেদন, নিবেদন পেশ করা" অর্থাৎ 'আর্দ'ল্-মাতালিব বুঝায় এবং কোন সামরিক কর্তব্য নির্দেশ করে না, তু. Sourdel, Le vizirat Abbaside, ২খ, ৬২২-৩। অনুরূপভাবে ভারতের মোগল সাম্রাজ্যে মীর-'আর্দ ছিলেন সম্রাটের নিকট আবেদন পত্রাদি পেশ করার দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তা)। দীওয়ানু'ল্-জায়শ্-এর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বসমূহ যাহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সৈন্যগণের নিযুক্তিকরণ তালিকাভুক্তিকরণ ও সৈন্যদলের যুদ্ধ নৈপুণ্য, তাহাদের অস্ত্রাদি ও বাহনসমূহের অতি সাম্প্রতিক অবস্থার রেজিস্টারী বই রাখা কেবল নিয়মিত পরিদর্শন মাধ্যমেই নিশ্চিত করা যায়। সেন্যদলে অনধিকার প্রবেশকারী অথবা প্রতিস্থাপিত ব্যক্তির প্রবেশ অথবা আস্তাবল হইতে ভাল ঘোড়া বদলান বা সরাইয়া ফেলা ইত্যাদি প্রতিরোধ করার জন্য সৈন্যগণের শারীরিক অবয়ব (হু লাউ'র্-রিজাল্)-এর ও বাহনগুলির জাত অথবা দাগ বা চিহ্ন (সিমাত) ইত্যাদির বিবরণ সযত্নে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন হইত। এইরূপ অন্যায় কার্যাবলী দ্বারা প্রতারিত হইয়া দীওয়ান কর্তৃক অযোগ্য ব্যক্তিদের বেতন প্রদানের আশংকা ছিল এবং পাছে শত্রু গুপ্তচরগণ ধীরে ধীরে সৈন্যদলে প্রবেশ করে, তাহারও আশংকা ছিল। সুতরাং ইহাই স্বাভাবিক যে, কুদামা হিলালু'স্ -সাবি', মিস্কাওয়ায়হ ও মাওয়ার্দীর ন্যায় লেখকগণ এই সনাক্তকরণ প্রণালীগুলির প্রভূত গুরুত্বের উপর জোর দিয়াছেন, তু. W. Hoenerbach, Zur Heeresverwaltung der 'Abbasiden: Diwan algais, in Isl., xxix (১৯৪৯-৫০ খৃ.), ২৬৮ প., সৈন্যদল পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন অনুষ্ঠানগুলি সাধারণত বেতনের হিসাব উপলক্ষেও অনুষ্ঠিত হইত যখন দীওয়ানের আর্থিক অবস্থা প্রকাশ করা হইত।

হিলালু'স্-সাবি', আল-মু'তাদিদ-এর শাসনামলের একটি খিলাফাতী বাজেটের (সম্ভাব্য তারিখ, মুহার্রাম্ ২৮০/মার্চ-এপ্রিল ৮৯৩) বিস্তারিত বিশ্লেষণ দিয়াছেন এবং এই বর্ণনার সময় তিনি উক্ত শাসকের অধীনে 'আর্দ প্রক্রিয়ার বিবরণ দিয়াছেন। আল-মু'তাদিদ সমগ্র সেনাবাহিনীকে তাঁহার সম্মুখে ব্যক্তিগতভাবে বাগদাদের ক্ষুদ্রতর পৌরোদ্যানে (Lesser Square) সমবেত করিতেন এবং হাসানী প্রাসাদের গ্যালারী হইতে বসিয়া ইহা অবলোকন করিতেন। তাঁহার নিম্ন সারিতে আসন গ্রহণ করিতেন সচিবগণ যাঁহারা বেতন দানের ব্যবস্থা করিতেন (কুত্তাবু'ল-'আতা')। সেনাধ্যক্ষগণ ও তাঁহাদের গুলাম্গণ (দ্র.) অথবা সামরিক দাস সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ অবস্থায় খলীফার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিত। অতঃপর শুরু হয় পরিদর্শন প্রক্রিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক (সামরিক) কর্মকর্তা তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণের নাম ও তাঁহাদের প্রাপ্য বেতনের তালিকার লিখিত বিবরণ-বহি পেশ করিতেন। উযীর 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন ওয়াহ্ব প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথকভাবে ডাকিতেন এবং বির্জাস্ খেলায় উক্ত ব্যক্তির দক্ষতা যাচাই করা হইত—ইহাতে প্রতিযোগীকে একটি কাঠের স্তম্ভের উপরে রক্ষিত একটি ধাতু-নির্মিত গোলকের ভিতর দিয়া তাঁহার বর্শা-ফলককে পার করাইতে হইত এবং এইভাবে তাহার অশ্বকে বশে রাখার এবং অস্ত্রের লক্ষ্যভেদের দক্ষতা প্রদর্শন করিতে হইত (চার অথবা পাঁচ শতাব্দী পরে অশ্বারোহণপূর্বক ধাবিত হইয়া বর্শাদি দ্বারা বির্জাস্-এ লক্ষ্য ভেদ করা ফুরুসিয়্যা (দ্র.) কসরত ও মামলূক অশ্বারোহী সৈন্যদলের প্রশিক্ষণের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়)। প্রত্যেক ব্যক্তির কৃতকার্যতা অনুসারে আল-মু'তাদিদ বিবরণ-বহিতে (জারীদা) একটি জীম (=জায়্যিদ্, উত্তম), একটি তা' (= মুতাওয়াস্সিত, মধ্যম), অথবা একটি দাল, (দুন্, নিকৃষ্ট) চিহ্ন দিয়া তাঁহার ক্রমমান নির্ণয় করিতেন। 'আরদ্-এর এই পর্যায়ের কার্যকলাপের পর যে সচিবগণ ব্যবহারিক সামরিক ব্যাপারের (কুত্তাবু'ল-জায়শ্) দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা আগাইয়া আসিতেন এবং বিবরণ-বহিতে লিপিবদ্ধ বিবরণের সহিত মিলাইয়া দেখিবার জন্য সৈন্যগণের শারীরিক অবয়ব পরীক্ষা করিতেন, ইহাতে তাঁহারা অনধিকার প্রবেশকারী ও বদলী ব্যক্তিগণকে (দুখালাা', বুদালা') আবিষ্কার করিতে এবং তাড়াইয়া দিতে সক্ষম হইতেন। খলীফার চিহ্নিতকরণসহ বিবরণ-বহিগুলি উযীরের নিকট ফেরত দেওয়া হয় এবং সচিবগণ অতঃপর ত্রিধাকৃতিত্ব ক্রমমান নির্ণয় ভিত্তিতে একটি নূতন অনুক্রমের বিবরণ-বহি প্রস্তুত করেন। জায়্যিদ্ সৈন্যগণকে লইয়া ৯০ দিন বেতনকালের (রায্কা) জন্য খলীফার 'ব্যক্তিগত সেনাবহিনী' ('আস্কারু'ল্-খাস্সা) গঠন করা হইত। সাহি ব্'শ্-শুর্তা বা বাগদাদের পুলিশ অধিনায়ক, যিনি বদর নামে পরিচিত, তাঁহার অধীনে 'মুতাওয়াস্সিত ' সৈন্যগণকে ন্যস্ত করা হইত এবং বাদগাদ হইতে নিম্ন ইরাক ও পশ্চিম পারস্য পর্যন্ত রাস্তার উপর সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে দুর্গ রক্ষার্থে উহাদেরকে ব্যবহার করা হইত; তাহাদেরকে 'সেবারত সৈন্যদল' ('আস্কারু'ল-খিদ্মা) বলিয়া অভিহিত করা হইত এবং তাঁহাদের বেতনকাল ছিল ১২০ দিন। 'দুন্' বলিয়া বিবেচিত সেনাদলকে প্রদেশগুলিতে কর আদায়ে সাহায্য কল্পে পাঠাইয়া দেওয়া হইত এবং ইহাদেরকে ঘোড়া পোষ মানান ও আস্তাবলের কাজে লাগান হইত অথবা বাগ্দাদ, ওয়াসিত্ ও কূফা-র পুলিশ অধিনায়কের অধীনে ন্যস্ত করা হইত (হিলাল, উযারা', সম্পা. 'আব্দু'স্-সাত্তার্ আহ্মাদ ফারাজ, কায়রো ১৯৫৮ খৃ., ১৭-১৯, অনু. H. Busse Das Hofbudget des Chalifen al-Mu`tadid billah, ২৭৯-২৮৯/৮৯২-৯০২, in Isl., xliii (১৯৬৭ খৃ.), ১৭২০, তু. Hoenerbach, পূ. স্থা.)। আল-মু'তাদিদ রাজকীয় আস্তাবলতদারক করার ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন এবং সুলতানের 'ব্যক্তিগত আস্তাবল', যাহা রাজপ্রাসাদের অংশবিশেষ ছিল এবং সব সময়ে তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে থাকিত। ইহা ব্যতীত তিনি প্রতি মাসে দারু'ল-'আম্মা-তে অবস্থিত সকল আস্তাবল, রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন অট্টালিকাগুলি ও কারখানাগুলির মিশ্র ভবনসমূহের 'আর্দ পরিচালনা করিতেন এবং এইভাবে নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও হাযিরার প্রচলিত মান বজায় রাখা নিশ্চিত করা হইত (হিলাল্, পূ. গ্র., ২২-৩, অনু. Busse, ২৪-৫ ; আরও দেখুন ইস্তাব্ল)।

তৃতীয়/নবম শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে খিলাফাতের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে যে সমস্ত রাজবংশের উত্থান হয় তাহারা সাধারণত তাহাদের প্রশাসনিক সংস্থাগুলি বাগ্দাদ-এর 'আব্বাসীগণের অনুকরণে গঠন করেন।

মিসর ও সিরিয়ার ফাতিমীদের শাসন সংস্থাপন বিভাগগুলির মধ্যে দীওয়ানু'ল-জায়শ্‌কে কাল্‌কাশান্দী সাধারণ দীওয়ানু'ল-জায়শ্‌ ওয়া'ল্‌-মারাতিব্‌-এর তিনটি বিভাগের একটি বিভাগ বলিয়া বর্ণনা করেন। অন্য বিভাগগুলি ছিল সেনাবাহিনীর বিবরণবহি সংরক্ষণ এবং ইক্‌তা' (খাস ভূমি)-সমূহ বরাদ্দ ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত। সাহিবু দীয়ানি'ল-জায়শ এবং তাঁহার সহকারী হাজিব-এর দায়িত্ব ছিল সেনাবাহিনীর 'আরদ্‌ অনুষ্ঠাগুলি সম্পন্ন করা। এই অনুষ্ঠানগুলিতে সৈন্যগণের শারীরিক গঠন বৈশিষ্ট্য ও বাহনগুলির দাগ ও চিহ্নগুলি নিরীক্ষা করা হইত এবং সেনা অধিনায়কের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মচারিগণ দ্বারা সামরিক কর্মচারিগণের অবস্থা সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করা হইত (সু বৃহ 'ল-আ'শা, ৩খ, ৪৯২-৩)।

পারস্য দেশে সামরিক বিভাগের প্রধানের পদবী 'আরিদ্‌ ক্রমশ 'আব্বাসীগণের প্রচলিত সাধারণ পদবী 'সাহিবু দীওয়ানি'ল-জায়শ দ্বারা পরিবর্তিত হয়। সাফ্‌ফারী ভ্রাতৃদ্বয়, য়া'কূব্‌ ও 'আম্‌র ইব্‌ন লায়ছ একটি স্বল্পকাল স্থায়ী বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, যাহা পূর্ব আফগানিস্তান হইতে ইরাকের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সাফ্‌ফারী সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ ও বেতন প্রদানের জন্য অবশ্যম্ভাবীরূপেই একটি দীওয়ানু'ল-'আরদ্‌ গড়িয়া উঠে। বেতন প্রদান উপলক্ষে ও গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের পূর্বে 'আরিদ্বা রা'ঈস্‌-ই লশ্‌কর নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর 'আরদ অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করিতেন। ইব্‌ন খাল্লিকান এই ভ্রাতৃদ্বয় সম্বন্ধে তাঁহার দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে বর্ণনা করেন, প্রথম যোদ্ধা 'আম্‌র কিভাবে 'আরিদের সম্মুখে হাযির হন এবং সেই সময় তাঁহার বরাদ্দ বেতন প্রদানের পূর্বে তাঁহার শারীরিক গঠন, অস্ত্রাদি ও বাহন পরীক্ষা করা হয় এবং প্রবন্ধকার বিশদভাবে এই প্রণালীকে উপরে বর্ণিত খুস্‌রাও আনুশিরওয়ান-এর আমলের সাসানীয় 'আরদ্‌-এর সহিত তুলনা করেন। [ দেখুন, Bosworth, The armies of the Saffarids, in BSOAS, xxxi (১৯৬৮ খৃ.), ৫৪৮-৫১]।

পশ্চিম পারস্য ও ইরাকে দায়লামী বুওয়ায়হ্‌গণের প্রতিষ্ঠায় অন্য বিষয়গুলির মধ্যে বেসামরিক কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর সংরক্ষণের খরচের জন্য অনুদানরূপে প্রদত্ত এলাকার (ইকতা' দ্র.) পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয় হইয়া উঠে। এই কারণে "বুওয়ায়হ্‌ দীওয়ানু'ল-জায়শ্‌"-এর কার্যক্ষেত্রের পরিধি সামরিক ও আর্থিক— উভয় ক্ষেত্রেই সম্প্রসারণ লাভ করে এবং ইহা এতই বৃদ্ধি লাভ করে যে, অন্য সরকারী বিভাগগুলিকে খাটো করিয়া তোলে (দ্র. Cahen, L' Evolution de l'iqta' du ix$^{e}$ au xiii$^{e}$ siecle, in Annales ঃ econmies, societes, civilisations, ৮খ., ১৯৫৩ খৃ., ৩৬-৭)। মু'ইয্‌যু'দ্‌-দাওলা বাগদাদে টাইগ্রিস নদীর তীর বরাবর এবং শাম্মাসিয়্যা দরজার বাহিরে একটি নূতন প্রাসাদ নির্মাণ করেন, যাহাতে পোলো খেলার জন্য (পোলো খেলা প্রায়ই "আর্‌দ -এর একটি অংশ হিসাবে গণ্য হইত, তু ইব্‌ন ইস্‌ফান্‌দিয়ার, তা'রীখ-ই তাবারিস্‌তান, অনু. Browne ২৪৯, এখানে ৫৫৮/১১৬৩ সালে বাওয়ানদীয় শাহ্‌ গাযী রুস্‌তাম তাঁহার মৃত্যুর ঠিক কিছু পূর্বে সারী-তে তাঁহার শেষ 'আর্‌দ-এ এক অসাধারণ পোলো খেলা দেখান) এবং তাঁহার সেনাবাহিনী পরিদর্শনের জন্য একটি ময়দান বা উন্মুক্ত স্থান রাখা হয়। (তানূখী, নিশ্‌ওয়ারু'ল-মুহাদারা, সম্পা. ও অনু. Margoliouth, The table-talk of a Mesopotamian judge, মূল গ্রন্থাংশ ৭০-১, অনু. ৭৫-৭)। 'আদু দু'দ্‌-দাওলার আমলে যথাসময়ে বেতন প্রদান ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশে 'আরিদ্‌-এর বিভাগে বর্ধিত সংখ্যায় সচিব ও কেরানী নিয়োগ করা হয় এবং এইভাবে অশান্ত সেনাবাহিনীকে শান্ত রাখা হয় (রুয্‌ রাওয়ারী, in Eclipse of the ÈAbbasid Caliphate, iii, 43, tr. vil 40), 'আদুদু'দ্‌- দাওলা ও তদীয় পুত্র বাহা'উ'দ্‌-দাওলার মত সম্রাটের শাসনামলে যখন বুওয়ায়হ্‌গণ তাঁহাদের ক্ষমতার শীর্ষ স্থানে তখন দুইটি পৃথক 'আরিদ্‌ ছিল, একটি দায়লামীদের জন্য এবং অপরটি তুর্কী, কুর্দী ও আরবদের জন্য এবং ইহাতে সেনাবাহিনীর মধ্যে জাতিগত বিভেদ প্রতিফলিত হয় যাহা সময় সময় দুর্বলতার উৎস বলিয়া প্রমাণিত হয়। যেহেতু বুওয়ায়হ্‌গণের মধ্যে দায়লামী বা জীলী রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল, বুওয়ায়হী 'আর্‌দগণের বিশেষত্ব ছিল সেনাদলের ভিতর হইতে অনধিকার প্রবেশকারীকে বাহির করিয়া দেওয়া এবং গোত্রীয় বংশপঞ্জী বিশেষজ্ঞগণকে নিযুক্ত করা। যখন 'আর্‌দ অনুষ্ঠিত হইত, তখন ইকতা'সমূহের বরাদ্দ পুনঃপরীক্ষা করা হইত অথবা এই অনুদানগুলিকে নগদ টাকায় পরিশোধ্যরূপে পরিবর্তন করা হইত ; কিন্তু আমীরকে অবশ্যই ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত অবস্থা হইতে কার্য পরিচালনায় সক্ষম হইতে হইত। বুওয়ায়হ্‌গণের ও অন্যান্য শাসক বংশের আমলে এমন ঘটনা বিরল নহে যে, যখন 'আর্‌দ অনুষ্ঠানের ভীতি প্রদর্শন (যাহাতে আর্থিক ও ভূমিস্বত্ব অনুদানগুলি পুনঃপরীক্ষা করা হইত অথবা সম্ভবত বাতিল করা হইত) সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহ জাগাইয়া তোলে। বুওয়ায়হ্‌ 'আর্‌দ ও 'আরিদ্‌-এর কার্যাবলী প্রসঙ্গে পূর্ণ বিবরণীর জন্য দ্র. Bosworth, Military organisation under the Buyids of Persia and Iraq, in Oriens, xviii-xix (1965-6), 143-67, esp. 162 ff. S IJrS hs. Busse, Chalif und Grosskonig, die Buyiden im Iraq (945-1055), বৈরূত ১৯৬৯ খৃ., ৩১৪-১৫, ৩৪০-১।

ট্রান্‌স-অক্সিয়ানা ও খুরাসান-এর সামানীয়গণের সামরিক বিভাগের আনুষ্ঠানিক গঠন প্রণালী সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়, যদিও নাস্‌র ইব্‌ন আহ্‌মাদ (৪র্থ/১০শ শতাব্দীর প্রথমভাগে)-এর আমলে একটি দীওয়ানু সাহি বি'শ্‌-শুরাত্‌ নামীয় রক্ষিগণের অধিনায়ক বুখারা-তে অধিষ্ঠিত ছিল, তু. নার্‌শাখী, The history of Bukhara, অনু. Frye, ২৬ ও খাওয়ারিয্‌মী একটি বিশেষ "কৃষ্ণ বর্ণ বিবরণ বহি" (আল্‌-জারীদা আস্‌-সাওদা') সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে সৈন্যগণের নাম ও কর্তব্য কর্ম লিপিবদ্ধ থাকিত (মাফাতীহু 'ল্‌-'উলূম, ৫৬, ৬৪ ; দেখুন দফ্‌তর্‌)। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সামানীয় সামরিক বাহিনীর জন্য 'আর্‌দ প্রতিষ্ঠান খুব সম্ভবত বিদ্যমান ছিল (এই প্রসঙ্গে দ্র., Bosworth, An alleged embassy from the Emperor of China to the Amir Nasr b. Ahmad " a contribution to Samanid military history, in Yad-name-yi Minorsky, তেহ্‌রান ১৯৬৯ খৃ., ১৭-২৯)। কারণ সামানীয় শাসন ব্যবস্থা তাঁহাদের উত্তরাধিকারী গায্‌নাবীগণের প্রত্যক্ষ আদর্শস্বরূপ ছিল এবং শেষোক্তগণের শাসন পদ্ধতিতে নিশ্চিতভাবে রাজ্যের পাঁচটি প্রধান বিভাগের মধ্যে দীওয়ান্‌-ই 'আর একটি ছিল।

গায্‌নাবী 'আরিদ্‌-এর কর্তব্যের মধ্যে আর্থিক ও সামরিক কার্যবলীর স্বাভাবিক বিন্যাস অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং গুরুত্বের দিক দিয়া উযীরের পরই পদটি মর্যাদা পাইত। গায্‌নীর উপকণ্ঠে শাবাহার্‌ ময়দানে সমগ্র

সেনাবাহিনী, অশ্বারোহী সৈন্যদল, পদাতিক বাহিনী ও হস্তীযূথের 'আরদ অনুষ্ঠিত হইত এবং গার্‌দীযী বর্ণনা করেন যে, ৪১৪/১০২৩ সালের 'আরদ-এ ৫৪,০০০ অশ্বারোহী সৈনিক ও ১,৩০০ হস্তীযূথের পরিদর্শন হয়। এই ধরনের অনুষ্ঠানে তালিকা বহি অথবা জারীদা-ই 'আরদ অনুসারে সৈন্যদের নাম যাচাই করা হইত, সৈন্যগণ তাহাদের বেতন পাইত এবং অনুষ্ঠান শেষে প্রায়ই সুলতান কর্তৃক প্রদত্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভোজে উপস্থিত সকলকে আপ্যায়িত করা হইত। প্রদেশগুলিতে অবস্থানরত গায্‌নাবী সেনাবহিনীর জন্য নিম্নতর 'আরিদ্‌গণ নিযুক্ত থাকিতেন এবং এই কর্মকর্তাগণ সেনাবাহিনীর স্থানীয় পর্যবেক্ষণ অনুষ্ঠান প্রতিপালন করিতেন এবং প্রাদেশিক সরকারী কোষাগারের প্রদত্ত অর্থ হইতে তাহাদের বেতন প্রদান করিতেন। ঐ সময় সমগ্র ইসলামী ভূখণ্ডে যেমন প্রচলিত ছিল, 'আরিদ-এর পদে সব সময়েই বেসামরিক প্রশাসনের একজন সদস্য, 'আরব বা ইরানী নিযুক্ত হইতেন যিনি তুর্কী সৈন্যদলের কোন সদস্য নন। যুদ্ধক্ষেত্রের পরাক্রম অপেক্ষা প্রশাসনিক ক্ষেত্রের দক্ষতাই সমধিক বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হইত। এই সম্পর্কে দ্র. ম. নাজিম, The life and times of Sultan Mahmud of Ghazna, কেমব্রিজ ১৯৩১ খৃ., ১৩৭ প.; Bosworth, Ghaznavid military organisation, in Isl., xxxvi (১৯৬০ খৃ.), ৬৮ প. ও ঐ লেখক, The Ghaznavids their empire in Afghanistan and Eastern Iran ৯৯৪-১০৪০ হি., ১২২ প.।

কেমনভাবে 'আরদ অনুষ্ঠান পরিচালিত হইবে সেই সম্বন্ধে একটি বিশেষ চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায় সপ্তম/ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঘুরীয় গ্রন্থকার ফাখর্-ই মুদাব্বির মুবারাক শাহ্ কর্তৃক রচিত সুলতানের মর্যাদা ও সামরিক পদ্ধতি সম্পর্কিত একটি নিবন্ধে, আদাবু'ল্-মুলূক্ ওয়া কিফায়াতু'ল্-মাম্‌লূক্ অথবা আদাবু'ল্- হার্‌ব ওয়া'শ্-শাজা'আ (bab 18 of the more complete India Office Ms 647, bab 12 of the B. M. Ms Rieu, ii 487-8=267-8 of the printed text by A. S. Khwansari, তেহরান ১৩৪৬/১৯৬৭)। এই বিবরণে পরিষ্কারভাবে যথেষ্ট তথ্যগত ভিত্তি রহিয়াছে, তাহা যতই আদর্শবাদী হউক না কেন, ইহাতে ইসলামী জগতের পূর্বপ্রান্তীয় গায্‌নাবী, ঘুরীর প্রভৃতি রাজবংশগুলির এবং সম্ভবত উত্তর ভারতের ঘুরী দাস সেনাধ্যক্ষগণের অধীনে 'আরদ সংস্থাপনাটি যেভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল তাহার প্রতিফলন ঘটিয়াছে। ফাখ্‌র-ই মুদাব্বির-এর বিবরণ অনুসারে "আরিদ্ ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান অবলম্বন—প্রকৃত মাতাপিতা যাহার উপর সামরিক বাহিনীর শক্তিমত্তা ও নির্ভরশীলতা স্থাপিত, 'আরদ উপলক্ষে তাঁহার সহকারী ও নাকীব্‌কে সহচর হিসাবে সঙ্গে লইতেন এবং তাঁহারা বিশিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান থাকিতেন এবং সেনাদলের বাম ভাগ, মধ্যভাগ ও দক্ষিণ ভাগ, এইভাবে পরিদর্শন করিতেন। পর্যবেক্ষণের এই কাঠামোগত পদ্ধতিতে যথাক্রমে ভারি অস্ত্রসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য দল, লঘু-অস্ত্রসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্যদল, নিয়মিত বেতনভুক্ত পদাতিক বাহিনী ও সাহায্যকারী পদাতিক বাহিনী সকলকে পযায়ক্রমে পরিদর্শন করা হইত এবং নাকীব্-কে সকল সৈন্যদলের তালিকা প্রদান করা হইত যাহাতে তিনি যুদ্ধের দিনে সামরিক বাহিনীর যথাযথ পরিকল্পনা করিতে পারিতেন। সৈন্যাধ্যক্ষগণের সকলকে পর্যবেক্ষণ করা হইত এবং প্রত্যেক সাধারণ অশ্বারোহী সৈনিককে তাহার উপরস্থ কর্মকর্তার অধীনে তালিকাভুক্ত করা হইত। যুদ্ধ-পূর্ব 'আরদ অনুষ্ঠান প্রতিপালনের সময় 'আরিদ-কে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইত যেন তিনি অশ্বসমূহ ও অস্ত্রাদি প্রদর্শনের ব্যাপারে জোর না করেন, বরং তিনি সৈন্যগণকে পারিতোষিক ও পদোন্নতির প্রতিশ্রুতি দিবেন যাহার ফলে তাহারা বীরত্ব ও কৃতিত্ব প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়। 'আরদ অনুষ্ঠানের শেষে 'আরিদ সেনাবাহিনীর প্রধানগণকে শাসকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন এবং তাঁহাদের সৈন্যগণের প্রশংসা করিতেন। শত্রুগুপ্তচরের ভয় সব সময়েই থাকিত এবং 'আরিদ-কে তদনুসারে শাসকের নিকট সতর্কতার সহিত প্রতিবেদন পেশ করিতে হইত এবং যদি অশ্বারোহী সৈন্যগণ, যাহাদের পর্যবেক্ষণ করা হইয়া গিয়াছে, তাহার পিছনে গিয়া অপর্যবেক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্যগণের সহিত মিশিয়া যায় তাহা হইলে গুপ্তচরগণ বিভ্রান্ত হইবে এবং সেনাবাহিনীর শক্তি সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা লাভ করিবে। 'আদাবু'ল্-মুলূক-এর এই বিবরণ হইতে 'আরদ অনুষ্ঠান প্রতিপালনের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যবহারিক যুক্তি প্রকাশ লাভ করে। প্রথমত ইহা ভূম্যাধিকারী অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ন্ত্রণের সুযোগ করিয়া দিত যাহারা নিজেরাই অস্ত্রাদি, সাজ-সরঞ্জাম, বাহন ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতেন। কেননা শাসকের জন্য তাঁহার গৃহরক্ষিগণের অস্ত্রশস্ত্র যোগান দেওয়াই যথেষ্ট বিবেচিত হইত। দ্বিতীয়ত স্থলবাহিনীর উচ্চতম সেনাপতি রণক্ষেত্রে সৈন্যদলকে সঠিক স্থানে সমাবেশ ও শ্রেণীবদ্ধ করিবার জন্য 'আরদ অনুষ্ঠান হইতে লব্ধ জ্ঞানসমূহ সঠিকভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের কাজে লাগাইতে পারিতেন।

পরাক্রমশালী সাল্‌জূকগণের অধীনে দীওয়ানু'ল-জায়শ অথবা দীওয়ান-ই 'আরদ টিদীওয়ান-ই আ'লা অথবা মহা-দীওয়ানের অংশ ছিল এবং বুওয়ায়হী রাজবংশের সময়ের মতই ইহা সরকারের যেমন অর্থ বিষয়ক সংস্থা ছিল, তেমনি সামরিক বিষয়ক সংস্থাও ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইক্‌তা'-র তত্ত্বাধান করা এবং এইগুলি খালি হইলে পুনর্বরাদ্দ করা। মালিক শাহ্-এর মৃত্যু পর্যন্ত 'আরিদু'ল্-জায়শ অথবা সাহি ব-ই দীওয়ান-ই 'আরদ স্বাভাবিকভাবেই একজন বেসামরিক কর্মকর্তা ছিলেন, কিন্তু তারপর সময়ে সময়ে তুর্কী আমীর উক্ত পদাভিষিক্ত হইতেন (Lambton, in Cambridge history of Iran, ৫খ, ২৩৩, ২৫৯-৬০)। কেন্দ্রীয় সামরিক দফতর ও প্রাদেশিক দফতরও সন্দেহাতীতভাবে বর্তমান ছিল। এই শেষোক্ত তথ্যটির ব্যাপারে খাওয়ারিয্‌ম্ শাহ্ জালালু'দ্-দীন-এর ভ্রাতা গিয়াছু'দ্-দীন্ পীর্ শাহ্ অথবা শেরশাহ্-এর উদ্দেশে রাশীদু'দ্-দীন্ ওয়াত্ কর্তৃক সংকলিত পত্র সংকলন, ওয়াসা'ইলু'র্-রাসা'ইল্ ওয়া দালা'ইলু'ল্-ফাদা'ইল-এর দ্বিতীয় ভাগে প্রদত্ত একজন 'আরিদ-এর অভিষেকনামার বিষয়বস্তু হইতে ধারণা নেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে সালজূক্ এবং খাওয়ারিয্‌ম শাহী আমলের সাধারণ ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটিয়াছে। এই পদে নিযুক্ত ব্যক্তিকে 'আরিদ্ দার্ জুম্‌লা-ই মামালিক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব ছিল ঃ প্রথমত সৈন্যগণের সঠিক বেতন প্রাপ্য সম্বন্ধে যত্নবান হওয়া এবং দ্বিতীয়ত সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রাদির যথাযথ নিরীক্ষাসহ 'আরদ অনুষ্ঠানগুলি প্রতিপালন করা [H. Horst, Die Staatsverwaltung der Grosselguqen und Horazmsahs (১০৩৮-১২৩১ হি.), Wiesbaden ১৯৬৪ খৃ., ৩৯-৪১, ১০৯-১০]। 'আরদ অনুষ্ঠানগুলি সচরাচর এই সব সময়ে অনুষ্ঠিত হইত যেমন কোন সামরিক অভিযানের সূচনাকালে (দৃষ্টান্তস্বরূপ, আল্‌প আরসলান-এর আনাতোলিয়া অভিযানের প্রাক্কালে এই অভিযানে Mantzikert বিজিত হইয়াছিল)। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও 'আরদ অনুষ্ঠানটি অসন্তোষের কারণও হইয়া পড়িত, যেমন

মালিক শাহ রায় নগরীতে ৪৭৩/১০৮১ সালে একটি 'আর্‌দ অনুষ্ঠানের পর ৭০০০ সৈন্যকে বরখাস্ত করিলে তাহারা তাঁহার ভ্রাতা তেকিশ্‌ (Tekish)-এর সহিত পূর্ব খুরাসান-এ যোগদান করে এবং শেষোক্ত ব্যক্তি তাহাদেরকে বিদ্রোহের কাজে ব্যবহার করেন (Bosworth, in Cambridge history of Iran, ৫খ, ৯০)।

যদিও বিশাল সালজূক সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গিয়াছিল, তথাপি স্থায়ী পেশাদার সৈন্যবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের সহিত সংশ্লিষ্ট সামরিক ঐতিহ্য মোংগল আক্রমণের বিভীষিকার পরেও বিরাজমান ছিল এবং আনাতোলিয়ায় রূম-এর পরবর্তী সালজূকগণের এবং বিভিন্ন মোংগল ও তুর্কী রাজবংশীয়গণের, যাহারা সিরিয়া হইতে আফগানিস্তান পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড শাসন করিতেন, তাহাদের নিকট এই ঐতিহ্য হস্তান্তরিত করা হয়। ঈল্‌খানগণের আমলে আমরা দেখিতে পাই যে, 'আরিদ অথবা আমীর-ই 'আরিদ-এর কার্যালয় তখনও বর্ধিষ্ণু ; তাঁহার কর্তব্যকর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সেনাদলের ইক্‌তা'সমূহের তত্ত্বাবধান করা এবং সম্ভবত খানকে সৈন্য পর্যবেক্ষণে সাহায্য করা (তু. I. H. Uzuncarsili, Osmanli devleti teskilatina medhal, ইস্তাম্বুল ১৯৪১ খৃ., ২৫৭)। জালালু'দ-দীন্‌ দাওয়ানী (মৃ. ৯০৮/১৫০২) [দ্র.] কর্তৃক লিখিত 'আর্‌দ নামা অথবা সৈন্য পর্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানের বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, আক্‌ কোয়ুনলু তুর্কীগণের মধ্যে 'আর্‌দ সংস্থাপনটি তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ শাসক উযুন হাসান-এর অধীনে সাধারণভাবেই প্রচলিত ছিল। এই দলীলে উযুন হাসানের পুত্র ফার্‌স-এর গভর্নর সুলতান খালীল কর্তৃক পারসিপোলিস (Persepolis-Istakbr-এর নিকট বান্দ-ই আমীর-এতে উদ্‌যাপিত একটি 'আর্‌দ অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিবরণ রহিয়াছে এবং এই অনুষ্ঠানটি তিন দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। ফারস-এর প্রাদেশিক সৈন্যবাহিনীর প্রায় ২৩,০০০ সৈন্য তুর্কী সেনাবাহিনীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ত্রিদলীয় বিন্যাসে বাম পার্শ্বে, দক্ষিণ পার্শ্বে ও কেন্দ্রে পরিদর্শন অনুষ্ঠানের জন্য হাযির হয়। রাজপরিবারের সদস্যগণ তালিকার শীর্ষস্থানে ছিলেন। ইহার পরে ছিলেন তাওয়াজীস-এর বাছাই করা দলসহ কর্মকর্তাগণ এবং ইহার পরে আনুক্রমিকভাবে সাধারণ সৈনিকদের ছোট ছোট দল (কোশুনগণ), সাঁজোয়া বাহিনী, তীরন্দাজ লইয়া গঠিত নোকারগণ, ভৃত্যগণ ও কুল্লুগ্‌ চীস (Minorsky, A civil and military review in Fars in 881/1476, in BSOS), (1940-2), 141-78; Uzuncarsili, op. cit. 304-12)।

মিসর ও সিরিয়ার মামলুকগণের সৈন্যবাহিনী পর্যবেক্ষণের চিরাচরিত অনুষ্ঠানগুলি প্রত্যাশিতভাবেই ঘটনাপঞ্জী বিবরণীতে স্থান লাভ করিয়াছে। এইরূপে ৮৩২/১৪২৮-৯ সালে আল-আশ্‌রাফ বার্‌সবায় যখন তায়মুর বংশীয় শাহরুখ-এর বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন তখন হালকা (দ্র.) পর্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানটি শাহী ময়দানে (আল-হাওশু'স্‌-সাল্‌তানী) অনুষ্ঠিত হয় ও এমন কি বালক, বৃদ্ধ ও অন্ধদেরকেও ঐ দুঃসাহসিকতাপূর্ণ অনুষ্ঠানের হাযির হইতে হয় (D. Ayalon, Studies on the structure of the Mamluk army, ii, in BSOAS, xv (1953), 455, সামরিক দফতরের বেসামরিক প্রধান ছিলেন নাজিরুল-জায়শ, কিন্তু যে কর্মকর্তার কাজ ছিল নানাভাবে আগেকার 'আরিদ-এর মত পর্যবেক্ষণ তত্ত্বাবধান করা, তিনি ছিলেন নাকীবু'ল-জুয়ূশ নামে পরিচিত এক সামরিক কর্মকর্তা (অন্যান্য পদবীতেও দেখা যায়—যেমন মুকাদ্দামু'ল-জুয়ূশ, আমীরু'ল-জুয়ূশ, নাকীব নুকাবা'ই'ল-জুয়ূশ ও আতা-বেকু'ল-'আসাকির এবং তাঁহার কায়রোস্থিত দফতরের দুইটি শাখা ছিল—একটি মিসরের জন্য এবং অপরটি সিরিয়ার জন্য। তিনি সামরিক পুলিশের কার্যাবলী সম্পন্ন করিতেন। সুতরাং তিনি ছিলেন কিছুটা সামরিক পুলিশপ্রধান (Provost-Marshal)-এর সমতুল্য। তিনিই কোন অভিযানের পূর্বে সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইবার এবং পরিদর্শনের উদ্দেশে কুচকাওয়াজে রত হইবার জন্য ঘোষণা প্রচার করিতেন। এইজন্য তিনি তাঁহার অধস্তন কর্মচারী নুকাবা আজনাদি'ল-হালকাগণকে কায়রো ও জেলার চারিদিকে পাঠাইয়া দিতেন এবং বারীদ (দ্র.) বা ডাক বিভাগের বার্তাবহকগণকে মিসরের অন্য অঞ্চলগুলিতে পাঠাইতেন (তু. M. Gaudefroy-Demombynes, La Syre a l'epoque des Mamelouks d'apres les auteurs arabes, Paris 1923, lxii, Uzuncarsili, Medhal, 283; এবং Ayalon, in BSOAS, xvi (1954), 64 প.)।

'উছমানী সাম্রাজ্যের প্রথমদিকের বহু প্রশাসনিক ও সামরিক প্রথা তাঁহাদের পূর্ববর্তী শাসক রূমের সালজূকগণের নিকট হইতে আসিয়াছে। 'আর্‌দ ও 'আরিদ নামগুলি সাধারণত ব্যবহৃত হইত না, কিন্তু সামরিক পর্যবেক্ষণের জন্য ইওক্‌লামা (Yoklama) নামে একটি সদৃশ সংস্থাপন বর্তমান ছিল এবং যে কর্মকর্তাগণ এই সমস্ত পরিদর্শন এবং ইহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিতেন তাঁহারা 'ইওক্‌লামা জেলার নামে পরিচিত ছিলেন। মহামতি সুলায়মান-এর সময় পর্যন্ত সংস্থাপনাটি নিশ্চিতভাবে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সামরিক অভিযানগুলির বর্ণনাসম্বলিত সাময়িকীতে ইওকলামা-র তথ্যপূর্ণ বিবরণী রহিয়াছে। যেমন ফেরীদূন বেগ-এর মুন্‌শে'আত-ই সেলাত'ীন-এ কোন অভিযানের প্রাক্কালে প্রদেশগুলি হইতে সৈন্যদল আসিয়া হাযির হইত এবং সুলতানের তাঁবুর সামনে সেনাবাহিনীর শিবির প্রাঙ্গণে তাহাদের পর্যবেক্ষণ অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হইত। সমাবেশে অংশ গ্রহণকারী সৈন্যগণের অবস্থা একটি বিশেষ বহি বা তালিকা-বহি, ইওক্‌লামা দেফতের্‌লেরি (Yoklama defterleri)-তে লিপিবদ্ধ করা হইত এবং অতঃপর এইগুলিকে সুলতান বা প্রধান সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করা হইত। সৈন্যদল হইতে অনুপস্থিতগণের হিসাব মিলানোর জন্য ইওকলামা একটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পন্থা ছিল। কারণ দশম/ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে যুদ্ধের প্রতি অনীহা বৃদ্ধি পাইলে সৈন্যদল হইতে অনুপস্থিতি একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। ইওক্‌লামা অনুষ্ঠানকল্পে জারিকৃত আদেশনামাগুলি প্রায়ই ভীতিপ্রদর্শক ভাষায় লিপিবদ্ধ হইত। ৯৮০/১৫৭২-৩ সালে একটি অভিযানে যাত্রার প্রাক্কালে বুর্‌সা-র সান্‌জাক্‌ (Sandjak)-এর কাদীর নিকট প্রেরিত জেনিসারি অশ্বারোহী বাহিনীর উদ্দেশে লিখিত একটি দলীলে যাহারা ইওক্‌ লামায় উপস্থিত থাকিবে না তাহাদের জন্য সর্বপ্রকারের চরম শাস্তির (এন্‌ওয়া'-ই ইতাব্‌বি 'ইকাব) হুমকি দেখান হইয়াছিল। যখন চতুর্থ মুরাদ্‌ ১০৪৪/১৬৩৪-৫ সালে ইরভান্‌ অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, তখন অনুপস্থিতির চূড়ান্ত শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখাইয়া, এমন কি অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ও স্থানীয় রক্ষী সৈন্যগণকেও পতাকাতলে সমবেত হইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় ; জেনিসারিগণের পর্যবেক্ষণ পূর্ব-আনাতোলিয়ার সীমান্তে সমাপন করা হয় এবং অফিসারগণকে তাঁহাদের অধীনস্থ সেনাদলে অনুপস্থিত সৈন্যদের জন্য তিরস্কার করা হয় (Texts in Uzuncarsili, Osmanli Devleti teskilatindan kapukulu ocaklari, আংকারা ১৯৪৩-৪খৃ., ১খ, ৩৬৮, ২খ, ২৪৪)। যাহা হউক, ইহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, আমাদের তথ্যগুলি কেবল নির্দিষ্ট অভিযানগুলির আগে বা তৎসময়ে অনুষ্ঠিত পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত

এবং শান্তিকালীন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ অনুষ্ঠান, যেমন ইসলামের প্রাথমিক কালের প্রামাণিক পর্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানগুলি সম্পর্কীয় নহে।

ইহা সম্ভব যে, যদিও কার্যপ্রণালীটি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা দুষ্কর, 'আর্‌দ সংস্থাপনাটি দিল্লীর দাস বংশীয় সুলতানরূপে পরিচিত গায়্‌নাবী ও গূরীগণের অধস্তন বংশধরদের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলিম সেনাবাহিনীতে আসিয়াছে। দিল্লীর সুলতানগণের নিয়োজিত অষ্টম/চতুর্দশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক বারানী সুপারিশ করেন যে, 'আর্‌দ বৎসরে দুইবার অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং অশ্বারোহণ দক্ষতার পরীক্ষা এবং অস্ত্রাদি, তীর অশ্বের দাগ-চিহ্ন ইত্যাদির নিরীক্ষা এবং হুলা, সৈন্যগণের শারীরিক গঠন বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করা ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে (ফাতাওয়া-ই জাহান্দারী, অনু. এম. হাবীব ও এ. ইউ. এস. খান, এলাহাবাদ তা. বি., ২৫ ; তা'রীখ-ই ফীরূয্‌শাহী, সম্পা. সায়্যিদ আহমাদ খান, কলিকাতা ১৮৬২ খৃ., ৩১৯, ৩২৮)। মুখ্য সমাবেশগুলি রাজধানী দিল্লীতেই অনুষ্ঠিত হইত, সম্ভবত দেওয়াল ঘেরা প্রশস্ত ময়দানে। ইহাকে বলা হইত আলাং এবং এই শব্দটি পর্যবেক্ষণের জন্যও প্রযোজ্য ; অষ্টম/চতুর্দশ শতাব্দীর বুরুজ এখনও দিল্লীতে বিরাজমান, যাহাকে 'বিজয়মণ্ডল' পরিদর্শন এলাকা বলা হয় এবং মনে হয় যে, ইহাকেও 'আর্‌দ উপলক্ষে পর্যবেক্ষণ মঞ্চ হিসাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়। মধ্যসপ্তম/ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাওয়াত্-ই 'আর্‌দ (রাওয়াত্-হিন্দী 'যোদ্ধা') অথবা 'আরিদু 'ল-হাশাম নামে অভিহিত একজন কর্মকর্তা সুলতানের দীওয়ান-ই 'আর্‌দ-এর প্রধান থাকিতেন এবং "না'ইবান্-ই 'আর্‌দ -ই মুলূক" উপাধিধারী তাঁহার অধস্তন কর্মচারীবৃন্দ থাকিতেন। মনে হয় এই সমস্ত উপ-'আরিদগণের একটি কাজ ছিল, কোন সামরিক অভিযানে যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি পাইবার সম্ভাবনা থাকিত তখন সেই অভিযানের অভিযাত্রী হওয়া এবং তারপর যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি হইতে সুলতানের অংশ দিল্লীতে পাঠান। খাল্‌জী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালু'দ্-দীন ফীরূয (৬৮৯-৯৫)/১২৯০-৬) যখন ক্ষমতা দখল করেন সেই সময় তিনি 'আরিদ্ -ই মামালিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (বারানী, তা'রীখ-ই ফীরূয্ শাহী, ১১৪, ১১৬, ১৯৭, ৩২৬, ৪৫০)।

৮০০/১৩৯৮ সালের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে মুসলিম ভারতের 'আর্‌দ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না, যদিও ইহা সম্ভাব্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, (সৈন্য) সমাবেশ ও পর্যবেক্ষণের চিরাচরিত কার্যপ্রণালী মুগলগণ কর্তৃক নূতন করিয়া পুনঃপ্রচলিত হয় নাই, বরং ভারতীয় সালতানাতে উহা অক্ষুণ্ণ ছিল। কথিত আছে, দিল্লীর শের্ শাহ সূর্ (৯৪৫-৫২/১৫৩৮-৪৫) কর্তৃক হুলাউ'র-রিজাল লিপিবদ্ধকরণ পুনর্জীবিত করা হয়, নবম/পঞ্চদশ শতাব্দীতে মালওয়া-তে একটি দীওয়ান-ই 'আর্‌দ -ই মামালিক প্রতিষ্ঠিত ছিল; এবং নবম/পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সালতানাতে ওয়াযীর-ই লশ্‌কর অথবা লশ্‌কর-ওয়াযীর নামে অভিহিত আমলা দ্বারা 'আরিদ-এর কার্যকলাপ সম্পাদিত হইয়া থাকিতে পারে।

মুগল ভারতে প্রাচীন যুগের 'আরিদ্-এর কার্যাবলীর অনেকটাই মীর-বাখ্‌শী অথবা বাখ্‌শীউ'ল-মামালিক দ্বারা সম্পাদিত হইত (বাখ্‌শী, মূলত 'লৈখক, সচিব', মোংগল প্রশাসনিক ব্যাপারে ব্যবহৃত শব্দ হইতে উদ্‌গত শব্দ)। তাঁহার কার্যে কয়েকজন বাখ্‌শী সাহায্য করিতেন এবং এই বাখ্‌শীর সংখ্যা দশম/ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে দ্বাদশ/অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে এক হইতে তিনে উন্নীত হয়। ইহা ছাড়া সময়ে সময়ে কোন নির্দিষ্ট সামরিক অভিযানে অংশ গ্রহণের উদ্দেশে সাময়িকভাবে একজন বাখ্‌শী-ই লশকর নিযুক্ত করা হইত। প্রধান বাখ্‌শীর দায়িত্ব মোটামুটি রাজ্যের প্রধান সেনাপতির সহকারী (Adjutant General) ও সৈন্যগণের বিবরণীরক্ষণ কর্মকর্তার (Muster-Master) সমতুল্য ছিল। তিনি সৈন্যগণের নিযুক্তি, মন্‌সব্‌দার বা কর্মচারিগণের তালিকারক্ষণ, প্রাসাদরক্ষিগণের কার্য-তালিকা, বেতন বরাদ্দের (তান্‌খাওয়াহ) আদেশনামা এবং পর্যবেক্ষণ হইতে অনুপস্থিত ও পলাতক সৈন্যগণের বিবরণ-তালিকা সংরক্ষণ ইত্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মুগল বাহিনী, অন্যান্য ইসলামী বাহিনীর মতই মিথ্যা তালিকা-ভুক্তি এবং অনুপস্থিতিজনিত সমস্যার সম্মুখীন হইত। সম্রাট আকবর সৈনিক ও অশ্বাদির তালিকা ও সৈন্যবাহিনীর জন্তুগুলির দাগ-চিহ্নগুলির বিবরণী নির্ভুলভাবে রক্ষা করিবার নিয়ম প্রচলন করিয়া দিল্লীর সুলতানগণের প্রচলিত প্রথার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সৈন্যগণের তালিকাকে চিহ্‌রা (Cihra) আক্ষরিক অর্থে (মুখমণ্ডল) বলা হইত। কারণ সংশ্লিষ্ট যোদ্ধার বংশ-তালিকা ও গোত্রীয় বিবরণসহ দৈহিক বর্ণনাও ইহাতে লিপিবদ্ধ থাকিত ; একইভাবে অশ্বসমূহের তালিকাকে বলা হইত চিহ্‌রা-ই আস্‌পান্। অশ্বসমূহকে সাধারণত বাখ্‌শীর অধস্তন কর্মচারিগণ, দারোগাহ্ (দ্র.) দাগ-চিহ্নিতকরণ করিত, এই চিহ্নিতকরণ কার্য প্রণালীটি দাগ্‌ওয়া তাস হীহা, (দাগ চিহ্নিতকরণ ও সত্যতা যাচাই) নামে পরিচিত ছিল। কেবল ৫,০০০ ও তদূর্ধ্ব সংখ্যার সৈন্যের সেনাধ্যক্ষগণ দাগ-চিহ্নিতকরণ প্রথা হইতে অব্যাহতি পাইতেন। একাদশ/সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকের প্রশাসনিক বিধি-গ্রন্থ অনুসারে দাসতূরু'ল্-'আমাল্ নামে অভিহিত সেনাধ্যক্ষ এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন (B. M. পাণ্ডুলিপি ৬৫৯৯, পাণ্ডুলিপিটির দ্বিতীয়বারের রচনা), কিন্তু তাঁহাদেরকে প্রয়োজনবোধে পরিদর্শনের জন্য তাঁহাদের অশ্বসমূহের সামরিক কুচকাওয়াজ দেখাইতে হইত (তবে অন্যান্য উৎস হইতে জানা যায় যে, উচ্চকর্মকর্তাগণের নিজস্ব দাগ-চিহ্ন ছিল)। এইভাবে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তাস্-হীহার সাধারণ কার্য প্রণালী, কুচকাওয়াজে সৈন্যদলের অংশ গ্রহণ করা এবং তাহাদের অস্ত্রাদির নিরীক্ষণ, ক্ল্যাসিক্যাল 'আর্‌দ-এর উত্তরসুরি এবং ইহা শান্তিকালীন সময়ে নিয়মিত ব্যবধানে প্রতিপালিত হইত এবং নির্দিষ্ট সময়কালটি বেতনের প্রকৃতি ও হারের উপর নির্ভরশীল ছিল। এইরূপে যে মানসাবদাার-এর লোকজনকে জায়গীর অথবা ব্যক্তিগত অনুদান দেওয়া হইত (ইক্‌তা' অধ্যায় দেখুন) তাঁহাদেরকে বৎসরে একবার পর্যবেক্ষণের জন্য কুচকাওয়াজে হাযির হইতে হইত, আবার যাহাদেরকে নগদ টাকায় বেতন দেওয়া হইত তাঁহাদেরকে বরং আরও স্বল্পকালীন ব্যবধানে কুচকাওয়াজে হাযির হইতে হইত। সামরিক অভিযানের সময় সঙ্গী হিসাবে গমনকারী মীর-বাখ্‌শী বা বাখ্‌শীকে সম্রাট বা প্রধান সেনাপতির নিকট যুদ্ধের দিন সকালে সৈন্যগণের বিস্তারিত তালিকা-বিবরণী পেশ করিতে হইত। ফাখ্‌র-ই মুদাব্বির-এর 'আদা-বু'ল্-মূলূক' গ্রন্থে বর্ণিত আদর্শ 'আরিদ-এর ন্যায় তিনিই প্রায় সময় সৈন্যদলকে তাঁহাদের জন্য প্রকৃত অভিযানের পূর্বে স্থিরীকৃত অবস্থানসমূহে পাঠাইতেন। সম্রাটের অনুপস্থিতিতে সময় সময় বাখ্‌শীই সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হইতেন এবং অপরাপর অনেক ক্ষেত্রে তিনি সেনাবাহিনীর এক ডিভিশন সৈন্য পরিচালনা করিতেন, এমন কি মীর বাখ্‌শী একজন সাধারণ আমীরের অধীনে সেনানায়ক হিসাবেও কর্তব্যরত থাকিতেন। দেখুন W. Irvine, The army of the Indian Moghuls:

its organization and administration, লন্ডন ১৯০৩ খৃ., ৩৬-৫৬, আরও দেখুন JARS (১৮৯৬ খৃ.), ৫৩৭-৫৫ ; ইব্‌ন হসান, The central structure of the Moghul empire, করাচী ১৯৬৬ খৃ., ৭৭-৯, ১২৫।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ প্রবন্ধটিতে দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বিষয়ের উপর কোন বিশেষ গবেষণামূলক প্রবন্ধ নাই। তবে দেখুন, Bosworth, Muster, Recruitment and review in mediaeval Islamic armies, in War, technology and society in the Middle East, London, Forthcoming.

C.E. Bosworth (E.I.[2])/আ. র. মামুন

**ইসতিশরাক** (দ্র. মুসতাশরিক্‌ ন)

**ইস্‌তিস্‌কা'** (استسقاء) ঃ পানি প্রার্থনা করা, অনাবৃষ্টির জন্য দু'আ' করা। ইহাতে দুই রাক'আত সালাত জামা'আতে আদায় করা হয়। ইস্‌তিস্‌কার সালাত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। সাহীহ বুখারী গ্রন্থে 'আল-ইসতিসকা' অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী কারীম (স) ইস্‌তিস্‌কা'-র সালাত আদায় করিয়াছেন। উক্ত অধ্যায় (ابواب الاستسقاء)-এ ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স), এমন কি মুশরিকদের আবেদনের ভিত্তিতেও (বার ৩, ১১ ও ১২) বৃষ্টির জন্য দু'আ' করিয়াছেন। কখনও কখনও দুর্ভিক্ষ বা অনাবৃষ্টির নির্দশন দেখিতে পাইয়া রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই দু'আ' করিয়াছেন (বাব ২)। ইহাও বর্ণিত আছে, অন্যান্য স্থানেও রাসূলুল্লাহ (স) বিভিন্ন সময় বৃষ্টির জন্য দু'আ' করিতেন, যেমন জুমু'আর খুতবার সময় (বাব ৮) বা বক্তৃতার সময় (বাব ৭) অথবা লোকালয়ের বাইরে মুক্ত মাঠে (বাব ১৫, ১৬)। এমতাবস্থায় তিনি তাঁহার গায়ের চাদরের ডান পার্শ্ব বামে ও বাম পার্শ্ব ডানে পরিবর্তন করিতেন (বাব ১৭, ১৮) ; অতঃপর দুই রাক'আত সালাত আদায় করিতেন। ইহাতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কিরা'আত পড়িতেন (বাব ১৬, ১৮)। ইসতিস্‌কার সালাত শেষে দু'আর সময় তিনি হাতও উঠাইতেন (বাব ২০)।

ইস্‌তিস্‌কার সালাতের প্রচলিত রীতি এইরূপ ঃ একজন ইমামের পিছনে দুই রাক'আত সালাত আদায় করা হয়, পরে বৃষ্টির জন্য দু'আ' করা হয়। হাদীছ গ্রন্থসমূহে সেই দু'আর বাক্যেরও উল্লেখ রহিয়াছে (দ্র. বুখারী, আবওয়াবু'ল-ইস্‌তিস্‌কা'-২২; আন-নাসা'ঈ, সুনান, কিতাবু'ল-ইস্‌তিস্‌কা'; ইহাতে ইসতিক্‌সকার সালাত ও দু'আর বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে, পৃ. ১৫৪-১৬৪; আরও দ্র. আদ-দারিমী, সুনান, সালাতু'ল-ইসতিসকা ও ইব্‌ন মাজা, আবওয়াবু সালাতি'ল-ইস্‌তিস্‌কা' ও দু'আ' ফি'ল-ইস্‌তিস্‌কা')। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইহাতে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা এবং নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে থামিয়া থামিয়া 'ঈদের সালাতের ন্যায় দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে সঙ্গে লইয়া ইস্‌তিস্‌কা'র সালাতের জন্য বাহির হইলেন এবং আযান ও ইকামাত ব্যতীত দুই রাক'আত সালাত আদায় করিলেন। অতঃপর খুতবা দিলেন এবং গায়ের চাদরের ডান পার্শ্ব বামে ও বাম পার্শ্ব ডানে পরিবর্তন করিয়া কিবলামুখী অবস্থায় হাত উঠাইয়া দু'আ' করিলেন। দু'আর একটি বাক্য নিম্নরূপ ঃ

اللهم استغثنا غيثا مريئا طبقا غدقا عاجلا غير رائث هنيئا

(হে আল্লাহ্ ! আমাদিগের উপর অনতিবিলম্বে প্রচুর উত্তম বৃষ্টি বর্ষণ কর)।

ইমাম মুহাম্মাদ আল-বাকির (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) দুই রাক'আত ইস্‌তিস্‌কার সালাত আদায় করিতেন। ইহার পর বসিয়া দু'আ' করিতেন। বর্ণনাকারী বলেন, সালাত শেষে নবী কারীম (স) খুতবা দিতেন এবং সালাতে সশব্দে কিরা'আত পাঠ করিতেন (আল-কুমী, যান লা য়াহ'দু'রু'ল-ফাকীহ, কিতাবু'স'-স'লাত)। ইমাম জা'ফার আস-সাদিক বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইস্‌তিস্‌কার সালাত শেষে এই দু'আ' করিতেন ঃ

اللهم اسق عبادك وانشر رحمتك الى بلادك الميتة

"হে আল্লাহ্ ! তুমি তোমার বান্দাদের উপর পানি বর্ষণ কর এবং মৃত দেশের উপর তোমার রহমত প্রসারিত কর" (পৃ. গ্র.)।

ইস্‌তিস্‌কা'র সালাত ওয়াজিব বলিয়া ধারণ করা সঠিক নহে ; তবে সুন্নাত অবশ্যই। ইহা আদায় করার জন্য সকাল বেলা হওয়া বা বিশেষ কোন নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করা আবশ্যিক নহে। তবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি নিষ্ঠা ও একাগ্রতা থাকা অপরিহার্য। ইহার জন্য দুইটি খুতবা নির্দিষ্ট, শারীরিক বা আত্মিক অনুশীলন অথবা বিশেষ কোন সঙ্গীত জরুরী নহে। মুশরিকদের রীতিনীতির সঙ্গে ইস্‌তিস্‌কা'র সালাতের কোন সম্পর্ক নাই। মুসলমানদের মনে অনুরূপ কোন ধারণাই থাকিতে পারে না। তবে য়াহূদী, নাসারা ও অগ্নিপূজকদেরও ইস্‌তিস্‌কা'র সালাতে শরীক হওয়ার অনুমতি রহিয়াছে; কিন্তু ইহাতে শিঙ্গা ফুঁকা কিংবা শারী'আত বিরোধী কোন কাজ করা বৈধ নহে। ইব্‌ন হায্‌ম (র) বলেন, ইস্‌তিস্‌কা'র সালাতে য়াহূদী, নাসারা ও অগ্নি উপাসকদের অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ নহে। তবে শিঙ্গা ফুঁকা অথবা ইসলামী শারী'আত বিরোধী কোন কাজ করা নিষিদ্ধ। ইস্‌তিস্‌কা'র সালাতের ব্যাপারে চারিটি মাযহাবের মধ্যে যে মতপার্থক্য রহিয়াছে, ইহার জন্য দ্র. 'আবদু'র-রাহ্‌মান আল-জাযা'ইরী, কিতাবু'ল-ফিক্‌হ 'আলা মাযাহিবি'ল-আরবা'আঃ, ১খ., কিতাবু'ল-'ইবাদাত, পৃ. ৩৫৮-৩৬২। সংক্ষেপে বলা যায়, রিয্‌কের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে বৃষ্টি চাওয়ার মানুষের যে সহজাত প্রবৃত্তি রহিয়াছে, ইসলাম ইহাকে সকল প্রকার কুফ্‌র ও শির্‌ক হইতে মুক্ত রাখিয়াছে, যদিও অন্যান্য জাতির মধ্যে অথবা প্রাচীন লোকদের মধ্যে এই সম্পর্কে বিভিন্ন রীতি প্রচলিত ছিল (দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ [তুর্কী] দ্র. শিরো., যাহাতে সমসাময়িককালে প্রচলিত ইস্‌তিস্‌কা'র সালাতের বিভিন্ন রীতির বর্ণনা রহিয়াছে)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) হাদীছ গ্রন্থাবলী; (২) আন-নাওয়াবী, আল-মাজমূ'; (৩) ইব্‌ন হায্‌ম, আল-মুহাল্লা ; (৪) আশ-শাওকানী, নায়লু'ল-আওতার; (৫) Goldziher, Rev. de l'hist. des Rel., ৫২ (১৯০৫ খৃ.) ঃ ২২৬-২২৯ ; (৬) ঐ লেখক, Oriental. Studien Th. Noldeke... gewidmet, Giessen 1906 ১খ., ৩০৮-৩১২ ও Der Islam, ৬খ, ৩০৪; (৭) Narbeshuber, Aus dem Leben der arabischen Bevolkerung in Sfax, লাইপযিগ, ১৯০৭ খৃ., পৃ. ২৬-২৯; (৮) A.J. Wensinck, Mohammed eu de Joden te Media, লাইডেন ১৯০৮ খৃ., ১৪০ প. ; (৯) Juynboll, Handb. des islam Gesetzes. পৃ. ৯৩; (১০) Biarnay, Etude Surele Dialec

te des Bettioua, আলজিরিয়া ১৯১১ খৃ., ২৪১-৪৩; (১১) Doutte, Magie et religion dans l'Afrique du Nord, আলজিয়ার্স ১৯০৯ খৃ., পৃ. ৫৮২-৯৬; (১২) ইসলামী বিশ্বকোষ (তুর্কী), দ্র. শিরো; (১৩) ইব্‌ন হাজার, বুলূগু'ল-মারাম; (১৪) 'আবদু'র-রাহ্‌মান আল-জাযা'ইরী, কিতাবু'ল-ফিক্‌হ, মিসর; (১৫) ফিক্‌হশাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থাবলী; (১৬) E. I.², ৪খ., ২৬৯-৭১।

সায়্যিদ নাযীর নিয়াযী (দা.মা.ই.)/ এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা।

**ইস্‌তিস্‌লাহ** (দ্র. ইস্‌তিহ্‌সান)

**ইস্‌তিস্‌হাব** (استصحاب): একটি ফিক্‌হী পরিভাষা। ইহার আভিধানিক অর্থ অপরিবর্তিত রাখা অর্থাৎ কোন জিনিসের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রমাণের ভিত্তিতে পূর্বাবস্থায় অপরিবর্তিত রাখা যাহাতে অবস্থার পরিবর্তনে তাহাতে কোন প্রকার পরিবর্তন না ঘটে। ইহা এমন এক প্রকার যুক্তিভিত্তিক প্রক্রিয়া যাহার ভিত্তি কুরআন- হাদীছ, ইজমা' কিংবা কিয়াস নহে। আল-আমিদী বলেন, هو عبادة عن دليل لايكون نصا و لا اجماعا ولاقياسا (আল-ইহ্‌কাম, ৪খ, ১৬১)। দলীল-প্রমাণ দুই প্রকার: (১) ন্যায়শাস্ত্রভিত্তিক প্রমাণ যাহার উদাহরণ এইভাবে দেওয়া যায় যে, ক্রয়-বিক্রয় একটি প্রক্রিয়া এবং প্রতিটি প্রক্রিয়ার সর্বাধিক প্রধান অংশ হইল স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি এমন একটি বিষয় যাহা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও কতগুলি বিষয়ের সমর্থন অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ইহাই হইল যুক্তির ফল। বুদ্ধি দ্বারা সেইখানে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা সঙ্গত নহে; বরং ইহার আনুষঙ্গিক শর্তাবলী মানিয়া লওয়াই অপরিহার্য হইয়া পড়ে। (২) বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ: যাহাকে শারী'আতের পরিভাষায় ইসতিসহাবু'ল-হাল (পূর্বাবস্থায় সংরক্ষণ) বলা হয়। ইহার সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া হয় যে, অন্য কোন প্রমাণ (কুরআন, হাদীছ, ইজমা', কিয়াস) না থাকা অবস্থায় বুদ্ধিজ্ঞান দ্বারা কোন জিনিসের সিদ্ধান্ত দেওয়ার যে প্রক্রিয়া, ইহা হইল বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ। ইহারই ভিত্তিতে অবস্থার পরিবর্তনেও কোন জিনিসের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব পূর্বাবস্থায় ঠিক রাখা হয়। ইমাম শাফি'ঈর অনুসারীদের অধিকাংশ, যেমন, আল-মুযানী, আস-সায়রাফী ও আল-গাযালী এবং ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র) ও তাঁহার অধিকাংশ অনুসারী, এমন কি ইমামিয়্যা শী'আগণও কোন কোন অবস্থায় ইস্‌তিস্‌হাব-এর প্রয়োগ স্বীকার করেন; তবে হানাফীদের কেহ কেহ ও মুতাকাল্লিমদের (ধর্মতাত্ত্বিক) একটি দল এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ অস্বীকার করিয়া থাকেন।

ইব্‌নু'ল-কায়্যিম (র) ইস্‌তিসহাবের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়া থাকেন যে, ইহার অর্থ— যাহা বিদ্যমান আছে তাহা অব্যাহত রাখা এবং যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহার নিষেধকে প্রতিষ্ঠিত রাখা (استدامة اثبات ما كان ثابتا او نفي ماكان منفيا)। ইহা তিন প্রকার: (১) ইস্‌তিসহাবু'ল-বারা'আতি'ল-আস্‌লিয়্যাঃ (استصحاب البراة الاصلية) অথবা আল-খুদারী-এর বর্ণনা অনুসারে: ইস্‌তিসহাবু হুকমি'ল-'আকলি বি'ল-বারা'আতি'ল-আসলিয়্যা কাবলা'শ-শার'ই (استصحاب حكم العقل بالبراة الاصلية قبل الشرع)। (২) ইস্‌তিসহাবু'ল-ওয়াসফি'ল-মুছবাতি'শ-শার'ঈ হাত্তা যুছবাতা খিলাফুহু استصحاب الوصف المثبت الشرعي حتى يثبت (خلافه) অথবা আল-খুদারীর বর্ণনা অনুযায়ী ইস্‌তিসহাবু হুকমিন দাল্লা'শ্‌-শার'উ 'আলা ছুবূতিহি ওয়া দাওয়ামিহি (استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه)। (৩) ইস্‌তিসহাবু হুকমি'ল-ইজমা' ফী মাহাল্লি'ন্‌- নাযা' (استصحاب حكم الاجماع في محل النزع)। আল-খুদারী দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে বলেন: ইস্‌তিসহাবু 'আলা'ল-উমূমি ইলা আন য়ারিদা'ত-তাখ্‌সীস ওয়া ইসতিসহাবু'ন-নাসসি ইলা আন য়ারিদা'ন-নাস্‌খ (استصحاب على العموم الى ان يرد التخصيص و استصحاب النص الى ان يرد النسخ) (দ্র. আল-খুদারী, উসূলু'ল-ফিক্‌হ, পৃ. ৩৪৬)। আল-মাহ্‌মাসানী (ফালসাফা-ই শারী'আতে ইসলাম, পৃ. ১৪৪) আল-খুদারী বর্ণিত দ্বিতীয় প্রকারকে দুইভাবে বিভক্ত করিয়াছেন: (ক) ইস্‌তিসহাবু'ন-নাস্‌সি ইলা আন য়ারিদা'ন-নাস্‌খ (استصحاب النص الى ان يرد النسخ); (খ) ইস্‌তিসহাবুল-'উমূমি ইলা আন য়ারিদা'ত-তাখ্‌সীস (استصحاب العموم الى ان يرد التخصيص) এবং দ্বিতীয় প্রকারকে ইস্‌তিসহাবু'ল-মাযী বি'ল-হাল (استصحاب الماضي بالحال)-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব, আল-মাহ্‌মা-সানীর মতে ইস্‌তিস্‌হাবু'ল-কুলূব (استصحاب القلوب) অথবা ইস্‌তিস্‌হাবু'ল-হাল বি'ল-মাযী (استسحاب الحال بالماضي)।

ব্যাখ্যা: প্রথম প্রকার, ইস্‌তিস্‌হাবু'ল-বারা'আতি'ল-আস্‌লিয়্যা-এর মর্ম হইল: কোন বিষয়কে পূর্বাবস্থায় বহাল রাখা এই অর্থে যে, কোন ব্যক্তির উপর কখনও কোন নূতন দায়িত্ব অর্পিত হয় না যতক্ষণ শারী'আতের কোন বিধান দ্বারা সেই দায়িত্বটি নির্ধারণ করা না হয়। এইজন্য উসূলশাস্ত্রবিদ ও ফাকীহ্‌দের কাহারও কাহারও মতে, উদাহরণস্বরূপ হানাফীদের অভিমত হইল প্রকৃতপক্ষে ইসতিসহাব প্রতিরোধের জন্য, স্থিতির জন্য নহে।

দ্বিতীয়: ইস্‌তিস্‌হাবু'ল-ওয়াসফি'ল-মুছবাতি'শ-শার'ঈ হাত্তা যুছবিতা খিলাফুহু-এর মর্মার্থ হইল: যে অবস্থাটি শারী'আতের বিধান দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, উহাকে সেই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত রাখা যাহাতে উহার মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন আসিতে না পারে। এইভাবে অতীতের বিধান বর্তমানেও প্রতিষ্ঠিত থাকে। আল-মাহ্‌মাসানী ইহাকেই 'ইস্‌তিস্‌হাবু'ল-মাযী বি'ল-হাল' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌নু'ল-কায়্যিম (র) আল-জাওযিয়্যা (দ্র. ই'লামু'ল-মুওয়াক্কি'ঈন)-এর মতে ইস্‌তিস্‌হাব একটি দলীল যতক্ষণ না ইহা নিষেধ হওয়ার পক্ষে অপর কোন দলীল পাওয়া যায়; যেমন যতক্ষণ না কোন বিবাহ ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীল পাওয়া যাইবে ততক্ষণ বিবাহ অটুট থাকিবে।

তৃতীয় প্রকার: (ইস্‌তিস্‌হাবু হুকমি'ল-ইজ্‌মা' ফী মাহাল্লি'ন-নিযা')-র ব্যাপারে উসূলবিদদের মধ্যে দুইটি মত রহিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ইজমা'-এর হুকুম দলীল, যেমন আল-মুযানী, আস-সায়রাফী, ইব্‌ন শাকিলা, আবূ 'আবদিল্লাহ আর-রাযী প্রমুখ এই মত পোষণ করেন। আবার কেহ কেহ ইহাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। যেমন আবূ হামিদ, আবু'ত্‌-তায়্যিব, কাদী আবূ য়া'লা প্রমুখ এই মত পোষণ করেন। কিন্তু এই ব্যাপারে বিবেচ্য বিষয় হইল, যে

ইজমা' সম্পর্কে বিতর্ক রহিয়াছে, উহার প্রকৃত অবস্থা কি ছিল; যে বিষয়টি সম্পর্কে ইজমা' হইয়াছে উহা ইজমা'-র বিষয় কি না এবং উহাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে কি না।

আল-মাহ্‌মাসানী (পৃ. ১৪৪) যে দুইটি প্রকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যথাঃ (১) ইস্‌তিস্‌হাবু'ল-'উমূম ইলা আন য়ারিদা'ত-তাখসীস যাহার মর্মার্থ এই যে, যদি নির্দিষ্টকরণের কোন কার্যকারণ পাওয়া না যায় তবে সার্বজনীনতার সাধারণ হুকুমই বহাল থাকিবে অর্থাৎ অনির্দিষ্ট (عام) দলীলের হুকুমও অনির্দিষ্টই থাকিবে যতক্ষণ না নির্দিষ্টকরণের কোন দলীল কোন বিষয়কে নির্দিষ্ট করিয়া দিবে। অতএব, অনির্দিষ্ট কোন হুকুমকে ইহার ব্যতিক্রমরূপে প্রতিপাদ্য করা বৈধ নহে। (২) ইস্‌তিসহাবু'ন-নাস্‌স্‌ ইলা আন য়ারিদা'ন-নাস্‌খ, যাহার মর্মার্থ এই যে, কোন আয়াতের নির্দেশ ততক্ষণ পর্যন্ত বহাল থাকিবে যতক্ষণ না সেই আয়াতটি অন্য কোন আয়াত দ্বারা মানসূখ (রহিতকরণ) হয়।

আল-মাহমাসানী ইস্‌তিসহাবের পঞ্চম প্রকাররূপে যাহার উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ ইস্‌তিসহাবু'ল-কুলূব বা ইস্‌তিসহাবু'ল-হাল ফি'ল-মাযী, ইহার মর্মার্থ এই যে, কোন জিনিসের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের বর্তমান অবস্থা দ্বারা জিনিসটির অতীত অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রমাণ করা। যেমন আমাদের সামনে কাল-পরিক্রমার কিছু নিয়ম-নীতি পরিদৃষ্ট হয়। অতএব প্রশ্ন জাগে, অতীতেও কী এরূপ নিয়ম-নীতি বিদ্যমান ছিল? যতক্ষণ না ইহার নেতিবাচক কোন প্রমাণ পাওয়া যাইবে, ততক্ষণ ইহাকে বর্তমানের অনুরূপই মানিয়া লওয়া উচিত হইবে। তবে আল-মাহমাসানীর মতে অনুরূপ ইস্‌তিস্‌হাব দ্বারা ঔচিত্য প্রমাণ করা সঠিক নহে।

এইখানে আরও একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, ইসলামী শারী'আত কি ইসলাম-পূর্ব যুগের শারী'আতের রহিতকারী ? এই ব্যাপারে 'আলিমগণ, যেমন আল-আমিদী বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন (আল-ইহ্‌কাম, ৪খ, ১৮৭)। ইহার উত্তর এইরূপ যে, ইসলাম যে সকল বিধান বজায় রাখিয়াছে, সেই সকল বিধান ছাড়া বাকী সকল কিছুই রহিত বলিয়া ধরিতে হইবে। উসূলবিদদের অভিমত ইহাই।

ইস্‌তিস্‌হাবু'ল-হাল দ্বারা ফাকীহ্‌গণ কি অর্থ করিয়া থাকেন, উপরের আলোচনা দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট রহিয়াছে। অতএব, যে জিনিসটি যে অবস্থায় রহিয়াছে, সেই ব্যাপারে শারী'আতেরও একটি বিধান রহিয়াছে অর্থাৎ সেই জিনিসটিকে সেই অবস্থায়ই ধরা হইবে যতক্ষণ না সেই অবস্থায় স্পষ্টত কোন ব্যতিক্রম দেখা যাইবে। অনুরূপভাবে যদি কোন জিনিসের ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন অবস্থাই নির্দিষ্ট না থাকে, তবে ইস্‌তিস্‌হাবু'ল-হাল-এর মর্মানুযায়ী উহাকে সেই অবস্থায়ই বহাল রাখা হইবে। কিন্তু যদি ইহার অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কিত কোন দলীল পাওয়া যায়, তবে উহার হুকুমও পরিবর্তিত হইবে। উদাহরণস্বরূপ কোন নিখোঁজ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা যায়। যতক্ষণ না তাহার মৃত্যু বা জীবিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানা যাইবে, ততক্ষণ তাহাকে জীবিত বলিয়াই ধরা হইবে। ইস্‌তিস্‌হাবু'ল-হালের ক্ষেত্রে হুকুম ও অবস্থার মধ্যে সম্পর্ক অন্বেষণ করিতে হইবে। সেই সম্পর্কে ভিত্তিতে হুকুম নির্ধারণ করিতে হইবে। অতএব, হুকুম নির্ধারণের ইহাও একটি প্রক্রিয়া। তবে ইহা মানিতেই হইবে যে, এই প্রক্রিয়ার প্রধান ভিত্তি অনুমান (ظن), সেই অনুমানের ভিত্তিতেই হুকুম নির্ধারণ করা হয়। যেমন আল-আমিদী বর্ণনা করেন, যখন কোন জিনিসের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব কোন নির্দিষ্ট অবস্থায় নির্ধারিত না হয়, তখন অনুমানের ভিত্তিতে জিনিসটির অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া লওয়াই অপরিহার্য হইয়া পড়ে এবং শারী'আতে অনুমান হইল আনুষঙ্গিক দলীল (আল-ইহ্‌কাম, ৪খ, ১৭২) (ما تحقق وجوده و عدمه فى حالة من الاحوال فانه يستلزم ظن بقائه و الظن حجة متبعة فى الشرعيات)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) আল-আমিদী, আল-ইহ্‌কাম ফী উসূলি'ল-আহ্‌কাম, মাত'বা'উ'ল-মাআরিফ, মিসর ১৩৩২/১৯১৪; (২) আল-গাযালী, আল-মুসতাসফা, মাতবা আমীরিয়া, মিসর ১৩২২/১৯০৪; (৩) আবূ যাহ্‌রাঃ, ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ, ১ম সংস্করণ, দারু'ল-ফিক্‌র আলা-'আরাবী; (৪) ইব্‌নু'ল-কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা; ইলামু'ল-মুওকি'ঈন, ইদারাতু'ত-তাবা'আ আল-মুনীরিয়্যা; (৫) আল-খুদারী, উসূলু'ল-ফিক্‌হ্‌, ৩য় সংস্করণ, মাতবা'আ মাতবা'আ আল-ইসতিকামা, কায়রো ১৩৫৮/১৯৩৮; (৬) আল-মাহমাসানী, ফালসাফা-ই শারী'আতে ইসলাম, মাজলিসে তারাক্কীয়ে আদাব, লাহোর; (৭) আস্‌-সুয়ূতী, আল-আশ্‌বাহ ওয়ান-নাজা'ইর, মাতবা' মুসতাফা মুহাম্মাদ, ১৯৩৬ খৃ.; (৮) ইব্‌নু'ন-নুজায়ফ, আল-আশবাহ ও য়া'ন-নাজাইর, মাতবা' হুসায়নিয়্যা মিসরিয়্যা, ১৩২২ হি.; (৯) আল-কাজিমী, 'আনাবীনু'ল-উসূল, বাগদাদ ১৩৪৩ হি.; (১০) I, Goldziher, Das Prinzip des Istishab in der Muhammedan, Gesetzwissenschaft, in The wiener Zeitschrift f. d. Junde d. morgenl. ১খ, ১২৮-২৩৬।

Th. W. Juynboll (সায়্যিদ নাযীর নিয়াযী) (দা. মা. ই.)
/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভুঞা

**ইস্‌তিহ্‌দার** (দ্র. ইস্‌তিনযাল)

**ইস্‌তিহ্‌সান** (استحسان) ঃ ও ইসতিস্‌লাহ (استصلاح)-কিয়াস (দ্র.) মতবাদ প্রসঙ্গে উসূলু'ল-ফিক্‌হ (দ্র.) সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ বহুলভাবে আলোচিত যুক্তিশাস্ত্রের দুইটি পদ্ধতি। পদ্ধতি দুইটির পারস্পরিক নিকট সম্পর্কের কারণে মাঝে মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় (তু. শাতিবী, ৪খ, ১১৬-১৮; ইব্‌ন তায়মিয়্যা, ৫খ, ২২)। কিন্তু এতকাল যাবত কেহ ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কোন সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য সংজ্ঞা প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই।

১। কুরআন (৩৯ ঃ ১৮-১৯), হাদীছ-(ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) মুসলিমগণ যাহা উত্তম মনে করে তাহা আল্লাহ্‌র নিকটও উত্তম এবং ইজ্‌মা' (প্রদেয় সম্বন্ধে অগ্রিম বন্দোবস্ত না করিয়া হাম্মামে গমন ইত্যাদি) হইতে উদ্ধৃতি প্রদানের মাধ্যমে ইস্‌তিহ্‌'সানের অনুসারিগণ ইহার কর্তৃত্বের সপক্ষে যে যুক্তি প্রদান করেন তাহা বিরোধিগণের যুক্তির স্থলে অতি সহজেই গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে। ফলে এই সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আবার অন্যদিকে ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক যে, ইস্‌তিহ্‌সান ইতিমধ্যেই হাদীছে' ইহার সাহিত্যিক প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে, সেইজন্য ইহা ৮ম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত (দ্র. Wensinck, The Muslim Creed, ৫৯)। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ইতিমধ্যেই বুখারী শরীফে (ওয়াসায়া, বাব ৮) ইসতাহ্‌সানা শব্দটির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার অর্থ "কাহারও ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার

ফলে একটি বিশেষ ব্যাখ্যার সপক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করা"। অর্ধ শতাব্দী পর ইমাম মালিক (মৃ. ১৭৯/৭৯৫) এই শব্দটি এমন আইন বিষয়ক প্রশংসামূলক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ব্যবহার করিয়াছেন, যাহার সপক্ষে হাদীছে' কোন প্রমাণ পান নাই (মুদাওওয়ানা, কায়রো ১৩২৩ হি., ১৬খ, ২১৭; একইভাবে ১৪খ, ইহা এমন একটি বিষয়, যে সম্বন্ধে আমি আমার পূর্ববর্তীগণের নিকট হইতে কোন নির্দেশ পাই নাই, বরঞ্চ ইহা এমন একটি বিষয় যাহা আমরা মতামতের ভিত্তিতে স্থির করিয়াছি" (وانما هو شيئ استحسناه) — ইহা এমন একটি বিষয় যাহা আমরা কল্যাণের ভিত্তিতে স্থির করিয়াছি)। প্রায় একই সময়ে ইমাম আবূ য়ুসূফ (মৃ. ১৮২/৭৯৮; হানাফী) বলেন ঃ (القياس كان ان... الانى استحسنت ...) "কিয়াস অনুসারে এই ব্যাপারে কতিপয় ব্যবস্থা স্থিরীকৃত আছে, আমি আমার বিবেচনা অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি" (কিতাবু'ল-খারাজ, বূলাক ১৩০২ হি., ১১৭)। সুতরাং দেখা যায় যে, শাসনবিধি প্রণয়নের প্রচলিত রীতির সহিত ইস্‌তিহ্‌সান ক্রমবর্ধমানভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ হইতে থাকে। পরবর্তী শতাব্দীসমূহেও এই বিশেষ শব্দটি স্বাভাবিক কিয়াসের পরিপন্থী যে কোন আইন সন্ধানের পদ্ধতি নির্দেশ করিতে থাকে।

এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উসূলু'ল-ফিক্‌হ-এর প্রতিষ্ঠাতা ইমাম শাফি'ঈ (মৃ. ৮২০ খৃ.) মৌলিকভাবেই ইস্‌তিহ্‌সান প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার আশংকা ছিল যে, আইন ব্যাখ্যার পদ্ধতিগতভাবে নিরাপদ ও সার্বিকভাবে স্বীকৃত নীতিমালা ইহতে এইভাবে দূরত্ব সৃষ্টি হইলে তাহা স্বেচ্ছাচারী মতামত দানের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে সহায়তা করিবে। "আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূলের পর অপর কোন মানবকে আল্লাহ কোন বিষয়ে নিজ মতামত (কাওল) প্রদানের অনুমতি দান করেন নাই—যে বিষয়ে তাহার পূর্বেই সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হইয়াছে" (রিসালা, ৭০)। যদি ইহার পরও কেহ ইসতিহসান প্রয়োগ করে তবে সে সর্বোচ্চ আইনদাতা আল্লাহ্‌র কর্মের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে (মান ইস্‌তাহ্‌সানা ফাকাদ শাবা'আ (গা'যালী, ১খ, ২৭৪ ও স্থা-এর উদ্ধৃত)। গাযালী (মৃ. ৫০৪/১১১১) ও বায়দাবী (রহ.) [৬৮১/১২৮২ পরবর্তীতে যিনি একজন শাফি'ঈ ছিলেন] এই প্রসঙ্গে শাফি'ঈ প্রস্তাবিত আলোচনা পুনঃপ্রচলন এবং একটি সুষ্ঠু ও পদ্ধতিগতরূপে ইহার বিকাশ সাধন করেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে ইস্‌তিহসান কেবল সেই সকল ক্ষেত্রেই বৈধরূপে গণ্য হইতে পারে যখন তাহা উৎপত্তিগত দিক হইতে তাখ্‌স'ীস (সাধারণ ব্যবস্থার উপর বিশেষ ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া)-এর নীতিমালার সহিত সংশ্লিষ্ট। কিন্তু যেহেতু কিয়াস মতবাদের মধ্যে তাখ্‌সীস ইতিমধ্যেই সম্পৃক্ত, তাই দেখা যাইতেছে যে, ইস্‌তিহ্‌সান প্রকৃতপক্ষে কোন বিশেষ ভূমিকা পালন করিতে পারে না। সুবকী (র.) মৃ. ১৩৭০ খৃ.) ও মাহাল্লী (র.) (৮৬৪/১৪৬০)-এর ন্যায় পরবর্তী শাফি'ঈ 'আলিমগণ একই প্রকার মতামত প্রদান করেন।

ইস্‌তিহ্‌সান মতবাদের সমর্থকগণ এই সকল আপত্তিসমূহের সকল শক্তি বিনাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। ইঁহারা প্রায় সকলেই হানাফী মায্‌হাবের; বাযদাবী (মৃ. ৪৮২/১০৮৯), সারাখসী (মৃ. ৪৮৩/১০৯০), নাসাফী (৭০৯/১৩১০) প্রমুখ হইতে শুরু করিয়া বাহ্‌রু'ল-'উলূম (১২২৫/১৮১০) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক আইন ব্যাখ্যাকারীর ব্যক্তিগত ও একতরফা মতামতকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে—এই বক্তব্যে বিপরীতে তাঁহারা আরও নিখুঁতভাবে ইসতিহসানকে বিন্যস্ত করিয়া উহার সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের দাবী অনুযায়ী ক্ষেত্র বিশেষে কিয়াস হইতে বিচ্যুত হওয়ার নীতি ও ইস্‌তিহ্‌সান প্রয়োগ কোন প্রকার ব্যক্তিগত অভিরুচি অথবা সুষ্ঠু চিন্তার অভাবপ্রসূত সিদ্ধান্ত নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে ইহা আইনের অন্তর্নিহিত উপাদানের বিবেচনা দ্বারা নির্ধারিত। ইহা একটি "সূক্ষ্ম কিয়াস" (قياس خفى) বাহ্যত কিয়াস হইতে বিচ্যুত একটি অন্তস্থ ও স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত সিদ্ধান্ত। ইস্‌তিহ্‌সানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিবার কারণ কুরআন, সুন্না, ইজমা' অথবা দারূরা-এর নীতিমালায় প্রদত্ত হইতে পারে। তবে সকল ক্ষেত্রেই ইহার ব্যবহার নির্ণীত হয় সার্বিকভাবে স্বীকৃত প্রমাণ পদ্ধতি দ্বারা। ইহা সত্য নহে যে, ইস্‌তিহ্‌সান উৎপত্তিগত দিক দিয়া তাখসীস নীতি হইতে উদ্ভূত এবং এই কারণে ইহাকে মৌল কিয়াসের পরিধিতে আনয়ন করা যায় না। বস্তুতপক্ষে ইহার অবস্থান এই ক্ষুদ্র পরিসরের বাহিরের এবং সেই কারণে ইহাকে একটি বিশেষ রূপের সিদ্ধান্ত হিসাবে স্বীকার করিতে হইবে। অপরাপর বিষয়ে যদি অধিকতর মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করা হয় তবে ইহা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব যে, হানাফীগণের উপস্থাপিত ইস্‌তিহ্‌সানের রূপটি অন্যান্য মায্‌হাবের প্রতিনিধিদের দ্বারাও ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারিক দিক হইতে ইহা সকল বিধায়কদের অভিন্ন সম্পদ।

পরবর্তীকালের হানাফীগণ (যথাঃ ইবনু'ল-হুমাম (মৃ. ৮৬১/১৪৫৭), ইব্‌ন আমীরি'ল-হাজ্জ (৮৭৯/১৪৭৪) ও বিহারী (১২২০/১৭০৪), বাহ্‌রু'ল-'উলূম (১২২৫/১৮১০) অতি সূক্ষ্ম পর্যায়ে ইস্‌তিহ্‌সানকে যেইভাবে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলে আমরা প্রকৃতপক্ষে শেষোক্ত এই সিদ্ধান্তের সহিত ঐকমত্যে উপনীত হইতে পারি। এই যুক্তি পদ্ধতিটি প্রাথমিকভাবে সংজ্ঞায়নের অভাবে প্রবল মতবিরোধ ও ভ্রান্তি সৃষ্টিকারী উসূলু'ল-ফিক্‌হ-এর নৈতিক নীতি নির্ধারক ধাপসমষ্টিতে স্থান লাভ করিয়াছে এবং এই কারণে ইহার প্রয়োগের সম্ভাবত্য নির্ভুলভাবে বর্ণিত স্বল্প সংখ্যক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। ইহার পরও যদি ইহার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত থাকে, তবে তাহার কেবল এইভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় যে, শাফি'ঈগণ কতিপয় ঐতিহ্যগত নীতিমালা দ্বারা নিজেদের আবদ্ধ মনে করিতেন, যাহার ফলে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ও অধিকতর যুক্তিসঙ্গত কারণে তাহাদের পূর্ববর্তিগণ দ্বারা প্রবর্তিত ইস্‌তিহ্‌সানবিরোধী বিতর্ককে তাঁহার বর্জন করিতে পারেন নাই।

২। ইস্‌তিস্‌লাহ ঃ নেতিবাচক দিক হইতে বিবেচনা করিলে ইহা ইস্‌তিহ্‌সানের সহিত গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। আমরা পুনরায় এমন একটি নীতিগত প্রশ্নের সম্মুখীন হই যাহার ফলে আইনগত সিদ্ধান্ত প্রণয়নের বিকল্প অতি স্বাভাবিক পদ্ধতিকে বর্জন করিতে হয়। ইস্‌তিহ্‌সানের সহিত ইহার পার্থক্য কেবল তখনই পরিস্ফুট হয় যখন আমরা এই নীতিটির ইতিবাচক ভিত্তির পিছনে যে মূল ধ্যান-ধারণা কাজ করিতেছে তাহা পর্যালোচনা করি। ইহার ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইস্‌তিহ্‌সানের সংকীর্ণ বিধিবদ্ধ 'শুভ-সন্ধানে'র প্রতিস্থাপনায় মাসলাহা-এর বাস্তব নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইস্‌তিস্‌লাহ ইস্‌তিহ্‌সানের তুলনায় অধিকতর সীমাবদ্ধ এবং বক্তব্যে অধিকতর স্পষ্টরূপে সংজ্ঞায়িত। ইহার যুক্তিসমূহ মানব কল্যাণের সর্বাপেক্ষা সুপরিসর অর্থের প্রেক্ষাপটে রচিত। সুতরাং ইস্‌তিহ্‌সানের অধিকতর ব্যাপক ও তুলনামূলকভাবে অধিকতর অনিশ্চিত সার্বিক ধারণার বিপরীতে ইহাকে অধিকতর সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত উপধারারূপে উপলব্ধি করা যায় ও বস্তুতপক্ষে আল-ইশবীলী (মালিকী,

মৃ. ৫৪৬/১১৫১) ইহার প্রতি ইতোমধ্যেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন (শাতিবী, পৃ. ১১৭)। কেবল এই অধিকতর সুস্পষ্টতার মাধ্যমেই ইস্‌তিস্‌লাহ ইস্‌তিহ্‌সানের তুলনায় শক্তি অর্জন করে। স্বাভাবিকভাবেই আনুষ্ঠানিক ও অন্তঃসারশূন্য গুণের তুলনায় যে কোন আইনগত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে মানব কল্যাণের জন্য উদ্বেগের ন্যায় একটি ন্যায়সঙ্গত ধারণা অনেক বেশী আস্থা বহন করে এবং অনেক সহজে তাহা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। সম্ভবত এইভাবেই ইহা অনুধাবন করা যায়, কেন ইস্‌তিস্‌লাহ-এর নীতি সার্বিকভাবে ইস্‌তিহ্‌সানের ন্যায় কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হয় নাই, ক্ষেত্র বিশেষে ইহা সাধারণ কিয়াসকেই কেবল অস্বীকার করে নাই, এমন কি কুরআন, সুন্না ও ইজ্‌মা' হইতে সরাসরিভাবে উদ্ভূত আইনগত নীতিমালার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে (নিম্নে দ্রষ্টব্য)।

"লা দারারা ওয়ালা দিরারা ফি'ল-ইসলাম" (ইসলামে কোন প্রকার আঘাত অথবা ইচ্ছাকৃত ক্ষতির অবকাশ নাই) এই হাদীছ ও কুরআন, সুন্না ও ইজ্‌মা' হইতে সংগৃহীত অন্যান্য সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া 'ইল্‌ম উসূলি'ল-ফিক্‌হ-এর অনুসারিগণ নীতিটির সপক্ষে প্রচারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সমগ্র শারী'আ মানব জাতির জন্য কল্যাণকর অথবা ইহার লক্ষ্য কল্যাণ সাধন (রি'আয়াতু'ল-মাসালিহ)। অবশ্য ইহার ফলে ইস্‌তিস্‌লাহ-এর নীতিকে স্বীকার করা হয় না, কেবল ইহার ভিত্তি স্থাপিত হয়। রি'আয়াতু'ল-মাসালিহ-এর তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নে ইস্‌তিস্‌লাহ-এর উপস্থিতি দেখা যায় না; ইহার প্রথম আবির্ভাব কেবল কতিপয় ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, যেমন যে সকল ক্ষেত্রে শারী'আতের নীতিমালা (উসূল) ইহার প্রতি প্রযোজ্য প্রত্যক্ষ ভিত্তি প্রদান করিতে পারে না। সুতরাং অধিকতর নির্ভুলভাবে ইহাকে আল-মাসালিহু'ল-মুরসালা-র নীতিরূপে অভিহিত করা যাইতে পারে অর্থৎ কেবল রি'আয়াতু'ল-মাসলাহা-র যেই সকল বিশেষ অবস্থা সিদ্ধান্ত পৌঁছিবার ধাপসমূহ নিরবচ্ছিন্নভাবে গঠিত নহে এবং আইন প্রণয়নের প্রাথমিক অবস্থানে ফেরত যাওয়ার পদ্ধতিটি স্থানে স্থানে সংযোগহীন (তু. হাদীছশাস্ত্রে 'মুরসাল' শব্দটির ব্যবহার)। সুতরাং দেখা যাইতেছে ইস্‌তিহ্‌সানে ন্যায় ইস্‌তিস্‌লাহও এক প্রকার কিয়াস খাফী (উপরে দ্র.) যাহা সব সময়েই স্বাভাবিক উসূলের বিপরীত। ইহার লক্ষ্য, মাস্‌লাহা-র সঠিক অর্থের প্রতি দৃকপাত না করিয়া যে সকল আইনগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহা পরিহার অথবা অন্ততপক্ষে সংশোধন করা। বহুল উদ্ধৃত একটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে, যদি ইসলামের শত্রুগণ মুসলিমদের আক্রমণ করে এবং নিজেদের প্রতিরক্ষার্থে মুসলিম বন্দীদের তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করে তবে মুসলিমগণের উচিত নিরপরাধ সহধর্মীদের হত্যার বিরুদ্ধে বিদ্যমান সুস্পষ্ট নিষেধ অনুযায়ী ঐ সকল মুসলিম বন্দীর পারতপক্ষে আক্রমণ বা হত্যা না করা। ইহার পরও যদি নিষেধটি অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তবে তাহা হইবে ইস্‌তিসলাহ-এর সমর্থনে ঃ সমগ্র মুসলিমগোষ্ঠীকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ না করিয়া অল্প সংখ্যক মুসলিমের জীবন উৎসর্গ করাকে আইনের মর্মার্থের নিকটতর বলিয়া গণ্য করা।

ইস্‌তিস্‌লাহের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস ইস্‌তিহ্‌সানের ন্যায় প্রাচীন কাল পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ইহা সত্য যে, কতিপয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মতে ইমাম মালিক (র) প্রথম ইস্‌তিসলাহ ব্যবহার করেন এবং প্রকৃতপক্ষেই এইরূপ করিবার কিছু যুক্তি রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, তাঁহার মতে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে পাকা খেজুর হিসাবে আহরণ করা হয় নাই—এইরূপ তাজা খেজুর বিক্রয় বৈধ বলিয়া পরিগণিত হইবে (মুদাওওয়ানা, কায়রো ১৩২৩ হি., ১০খ., ৯০ প., কিতাবু'ল-'আরায়া)। কিন্তু প্রথমত ইহা মোটেও সুনিশ্চিত নহে যে, এই মতটি মালিকের সময় কালে প্রতিষ্ঠিত ছিল (দ্র. পৃ. ৯৪) এবং দ্বিতীয়ত এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা যাহা ইস্‌তিস্‌লাহের সহিত তুলনীয় (পৃ. ৯৩ প., তু. পৃ. ৯৫) স্পষ্টতই তাঁহার নিজস্ব বক্তব্য নহে, বরং সাহ্‌নুন (মৃ. ৮৫৪)-এর মতে তাঁহার শিষ্যচক্র হইতে প্রাপ্ত। ইহা ব্যতীত স্মরণ করা প্রয়োজন যে, এই প্রসঙ্গে মাস্‌লাহা অথবা ইস্‌তিস্‌লাহ শব্দটি আদৌ ব্যবহার করা হয় না। অবশেষে ইহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, ইমাম শাফি'ঈ (র) তাঁহার প্রখ্যাত রিসালা গ্রন্থে কেবল ইসতিহ্‌সান সম্পর্কেই তাঁহার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। ইহা হইতে সম্ভবত নিরাপদভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে যে, ইস্‌তিস্‌লাহ সংক্রান্ত সমস্যাটি তাঁহার আমলে ব্যাপক আলোচনার বিষয় হইয়া উঠে নাই অথবা তখন পর্যন্ত ইহাকে ইসতিহ্‌সানের একটি উপ-বিভাগরূপে গণ্য করা হইত এবং সেইহেতু ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং মনে হয় ম্যালিক (র) প্রথম ইস্‌তিস্‌লাহ ব্যবহার করেন এই দাবীটি খুব সম্ভবত পরবর্তী কালের এবং ইহার ভিত্তি হইতেছে মালিকীগণই এই রীতিটির সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহার করিয়াছেন।

এমন কি মালিক (র)-এর পরবর্তী পর্যায়েও সুস্পষ্টভাবে ইস্‌তিস্‌লাহের বিকাশ ধারা নির্ণয় এখন পর্যন্ত নহে। এই নীতিটি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে পরবর্তী গ্রন্থাবলীতে মালিক ও শাফি'ঈ (!) ব্যতীত যে সকল বিশেষজ্ঞের উল্লেখ করা হয় তাঁহারা কেহই একাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহেন। সম্ভবত এই ফাঁক অন্তত কিছু পরিমাণে পূরণ হওয়া সম্ভব যদি প্রাচীন ও অদ্যাবধি অপ্রকাশিত উসূল রচনাবলী সঠিক পদ্ধতি মত পর্যালোচনা করা যায়। ইস্‌তিস্‌লাহের উৎস সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জ্ঞান তুলনামূলকভাবে পরে প্রাপ্ত প্রমাণাদিনির্ভর ; তবে বাহিরের কোন প্রভাব কার্যকর ছিল কোন অবস্থাতেই নিশ্চিতভাবে তাহা বলা যায় না (উদাহরণস্বরূপ, রোমান আইনের ratio utilitatis)। একইভাবে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক গবেষণার অনুপস্থিতিতে ইহাও দাবী করা অযৌক্তিক যে, ইস্‌তিস্‌লাহ শেষ পর্যন্ত মু'তাযিলী নীতি 'আদ্‌ল হইতে উদ্ভূত।

ইস্‌তিস্‌লাহ নীতির অনুসারীরূপে যে সকল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয় তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ইমামু'ল-হারামায়ন আল-জুওয়ায়নী (র) (মৃ. ৪৭৮/১০৮৫, শাফি'ঈ)। দুর্ভাগ্যবশত উসূল সম্পর্কে তাঁহার সংক্ষিপ্ত রচনা আল-ওয়ারাকাত-এর তিনি এই প্রসঙ্গে কোন আলোচনা করেন নাই (WZKM, ১খ, ১২৯, টীকা ৫-এ Goldziher কর্তৃক তাঁহার মুগীছুল-খাল্‌ক হইতে উদ্ধৃতি)। অপর দিকে আর একজন বিশেষজ্ঞ ইমাম গাযালী (র) প্রদত্ত প্রামাণিক মতামতমূলক বর্ণনার সন্ধান পাওয়া যায় যাহা আমদেরকে এই আলোচনার গভীরে লইয়া যায় (মুসতাসফা, ১খ, ২৮৪-৩১৫)। গাযালী (র) তাঁহার প্রদত্ত সংজ্ঞায় পারিভাষিক শব্দ মাস্‌লাহাকে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন "শারী'আতের উদ্দেশ্য সাধনের বিবেচনা" (আল-'মুহাফাজা 'আলা মাকসূদি'শ-শার্'ই', পৃ. ২৮৬ প.)। ইহা দ্বারা তিনি পাঁচটি বিষয় বুঝাইয়াছেন ঃ ধর্ম সংরক্ষণ, জীবন সংরক্ষণ, বুদ্ধি ('আক্‌ল) সংরক্ষণ, বংশ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ। গাযালীর মতে

মাস্‌লাহা'র সংরক্ষণ এবং ইহার প্রতিপক্ষ অর্থাৎ দুর্নীতি দমন (দাফ'উ'ল-মাফ্‌সাদা) সম্পর্কে বিধান সাধারণত ফিক্‌হী পাঠ্যসমূহে অন্তর্ভুক্ত থাকে ; সুতরাং এইগুলিকে স্বাভাবিক কিয়াসরূপে গণ্য করা যায়। যে সকল ক্ষেত্রে ইহা সাধারণ পদ্ধতিতে (মাসলাহা' মুরসালা) উপনীত হইতে ব্যর্থ হইবে সে সকল ক্ষেত্রে ইহা তখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদায়ক হইবে যখন সমগ্র গোষ্ঠীকে আক্রান্ত অথবা ক্ষতিগ্রস্তকারী অকাট্য ও দ্বিধাহীন বিবেচনা থাকিবে (দারূরী, কাত্'ঈ, কুল্লী); উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম বন্দীদেরকে অগ্রে রাখিয়া কোন মুসলিমগোষ্ঠীর উপর আক্রমণের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার পরিস্থিতিতে (উপরে দ্রষ্টব্য)। অন্যথায় ইস্‌তিস্‌লাহ' প্রযোগ বৈধ নয়। ইহার পরও যদি কোন ব্যক্তি ইহা প্রয়োগ করে তবে যে সে আইনপ্রণেতা আল্লাহ্‌র কার্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে (পৃ. ৩১১ ঃ ওয়ামান সারা ইলায়হা ফাকাদ শারা'আ, ইস্‌তিহ্‌সান প্রসঙ্গে শাফি'ঈ-র উল্লিখিত উদ্ধৃতির পরিপ্রেক্ষিতে)। অপরাপর ক্ষেত্রে গাযালী (র) ইস্‌তিস্‌লাহে'র প্রয়োগ মানেন না ; তাঁহার মতে এই সীমাবদ্ধ বিশেষ রূপটি অন্যান্য উসূলু'র-ফিক্‌হ-এর একটি বিশিষ্ট মূলমাত্র এবং ইহা কু'রআন, হাদীছ ইত্যাদি হইতে সংগৃহীত প্রমাণের সংকলনের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ইহা একটি স্বতন্ত্র ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না।

গাযালী (র)-এর পরবর্তীকালে অন্যান্য শাফি'ঈ আইন তাত্ত্বিকগণ ইসতিস্‌লাহ' প্রশ্নে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা ঃ বায়দা'বী (র) [মৃ. ১২৮২- অথবা পরে], ইসনাবী (র) [৭৭২/১৩৭০] এবং সুব্‌কী (র) [৭৭১/১৩৭০]-মাহাল্লী (র) [৮৬৪/১৪৬০]-বান্নানী (র) [১১৯৮/১৭৮৪]। তাঁহারা অতি বিশদভাবে তাঁহাদের পূর্ববর্তিগণের, বিশেষত গাযালীর মতামত সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের নিজস্ব অবদান অত্যন্ত নগণ্য। অন্যদিকে ইসতিস'লাহে'র বিভিন্ন উদাহরণ সুবিন্যস্তকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুবিন্যস্তকরণের এই প্রবণতা অবশ্য উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছায় উসূ'ল সম্পর্কিত পরবর্তী হানাফী রচনাসমূহে। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন— সাদরু'শ-শারী'আ মাহ্‌বুবী (মৃ. ৭৪৭/১৩৪৬), আত-তাফ্‌তাযানী (৭৯২/১৩৯০ অথবা পরে), আল-ফানারী (আনু. ৯০৫/১৫০০), বিশেষভাবে ইবনু'ল-হুমাম (র) (৮৬১/১৪৫৭), ইব্‌ন আমীরি'ল-হাজ্জ (র) (৮৭৯/১৪৭৪) ও আল-বিহারী (১১২০/১৭০৮), বাহরু'ল- 'উলূম (১২২৫/১৮১০)। এখানে আমরা তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যার বিস্তারিত আলোচনা করিব না। প্রায়শই এই সকল ব্যাখ্যা অত্যন্ত জটিল ও অবোধ্য।

ইসতিস'লাহে'র সর্বাপেক্ষা কঠোর বিরোধীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আল-আমিদী (র) [মৃ. ৬৩১/১২৩৩, প্রথমত হানবালী, পরে শাফি'ঈ] ও ইবনু'ল-হাজিব (র) (৬৪৬/১২৪৯, মালিকী) [বায়দা'বী, ৩খ, ১৩৫]। ইহার কিছুকাল পরে সম্ভবত এই শিরোনামের অধীনে আমরা প্রখ্যাত হাম্বালী ধর্মতাত্ত্বিক ইব্‌ন তায়মিয়্যার (মৃ. ৭২৮/১৩২৮) নামও অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। তাঁহার পত্রাবলীর একটিতে তিনি মা'লিহ মুরসালা সম্পর্কে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত ব্যাখ্যা কিছুটা অস্পষ্ট কিন্তু সমুদয় বিষয়টি যে তাঁহার জন্য জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন যে, বহু শাসক ও সাধারণ মানুষ মাসালিহে'র নীতিটি আইনের প্রতিকূলে অথবা উহার অজ্ঞানতাবশত ব্যবহার করিয়াছে। ফলে যাহা ইস্‌তিহ'সানের ক্ষেত্রেও ঘটিয়াছিল— আইন প্রণেতারূপে অবৈধভাবে কার্য করিয়াছে। তাঁহার মতে শারী'আ মাস'লাহাকে অবহেলা করে নাই। যদি মানবিক উপলব্ধিতে চিন্তা করা হয় যে, এমন একটি মাসলাহা' গ্রহণ করা প্রয়োজন যাহা আইনে ইতোমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয় নাই সেই ক্ষেত্রে কেবল দুইটি সম্ভাবনা থাকিতে পারে ঃ হয় ইহা ইতোমধ্যেই তাহার জ্ঞানের অগোচরে ফিক'হে নির্দেশিত হইয়াছে অথবা ইহা কেবল একটি কল্পিত মাস'লাহা সংক্রান্ত প্রশ্ন, বাস্তব মাসলাহা' নহে।

পূর্বোক্ত বক্তব্যে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মালিকীগণই ইসতিস'লাহে'র প্রধান প্রবক্তা। কিন্তু এই সাধারণ ধারণাটির প্রতি অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নহে। ইহা অবশ্য সত্য যে, শাতিবী (র) [মৃ. ৫৯০/১১৯৪] ও কারাফী (৬৮৪/১২৮৫) প্রমুখ মালিকী আইন তাত্ত্বিকগণ মাসা'লিহ' মুরসালা সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করেন এবং ইহার বিকাশ সাধন করেন। কিন্তু অন্যদিকে অপর একজন মালিকী ইবনু'ল-হাজিবকে এই নীতির একজন বিরোধীরূপে গণ্য করা হয় (উপরে দ্র.)। ইহার বিপরীতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইস্‌তিসলাহ' রীতির স্বীকৃতি মালিকী চক্রটি অতিক্রম করত বহু দূরদূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কারাফী, এমন কি ইহাও তুলিয়া ধরিয়াছেন যে, সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ইহা মাযহাবসমূহে সার্বিকভাবে ব্যবহৃত (পৃ. ১৭০)। শাফি'ঈ ও হানাফীগণও কতিপয় সীমাবদ্ধতাসহ ও ক্ষেত্র বিশেষে অন্য নামের ছদ্মাবরণে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং আরও বিকাশ সাধন করিয়াছেন। তবে ইসতিস'লাহ-এর সর্বাপেক্ষা চরমপন্থী সমর্থক হইতেছেন জনৈক নাজমু'দ-দীন আত-তাওফী (মৃ. ৭১৬/১৩১৬)। তাঁহাকে হাম্বালী বিবেচনা করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইসতি'লাহ প্রশ্নে তাঁহার মনোভাবের প্রেক্ষিতে তাঁহাকে একজন স্বাধীনচেতা আইনের গবেষক মুজতাহিদরূপে গণ্য করা যায়।

তাঁহার রিসালা ফি'ল-মাসালিহি'ল-মুরসালা গ্রন্থে (জামালু'দ-দীন আল-কাসিমী কর্তৃক তাঁহার নাওয়াবী প্রণীত আরবা'উ'না হা'দীছান-এর ভাষ্য হইতে সংকলিত) আত-তা'ওফী এই জটিল প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াছেন, সার্বজনীন কল্যাণের (রি'আয়াতু'ল-মাস'লাহা') প্রেক্ষিতে যদি মূল পাঠ (নাস্‌স) ও ইজ্‌মা'-এর বক্তব্য পরিপন্থী হয়, তবে সে ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি ? তাঁহার উত্তর সম্পূর্ণভাবে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার (মু'আমালাত) আইনগত প্রশ্নে দ্ব্যর্থহীন ঃ রি'আয়াতু'ল-মাস'লাহা হইবে চূড়ান্ত ('ইবাদাত) সম্পর্কিত দায়িত্বসমূহে ইহার ফলে প্রভাবিত হয় না। কারণ ইহা এমন কিছুর সহিত সম্পর্কিত যাহা মানব কল্যাণের সংরক্ষণ হইতে মৌলিকভাবে পৃথক)। অবশ্য নাস্'স ও ইজমা'-কে সহজভাবে পরিত্যাগ করা যাইবে না, বরং এইগুলিকে ব্যাখ্যা (বায়ান) অথবা বিশেষিতকরণ (তাখসীস' অর্থাৎ সার্বিক দিক হইতে একটি বিশেষ উপবিভাগ পৃথকীকরণের মাধ্যমে এবং ইহার প্রতি প্রযোজ্য নীতি)-সমূহের সাহায্যে মাস্‌লাহার প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর সহিত সমন্বিত করিতে হইবে। যে কোন অবস্থাতেই অবশ্য রি'আয়াতু'ল-মাস'লাহা' সর্বোচ্চ আপীল আদালতরূপে গণ্য।

রি'আয়াতু'ল-মাস'লাহার নীতি জোরদার এবং নাস্'স' ও ইজমা'-এর উপর ইহার স্থান যে যুক্তিযুক্ত তাহা প্রমাণ করিতে আত-তা'ওফী কু'রআান, সুন্না, ইজ্‌মা' ও নাজা'র (যুক্তি) হইতে প্রমাণ ও সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন; অবশ্য তিনি প্রথম স্থান দান করিয়াছেন মুহা'ম্মাদ (স')-এর কথিত উক্তিটিকে, "ইহাতে কোন আঘাত অথবা ইচ্ছাকৃত ক্ষতি নাই" (লাা দারারা ওয়ালা

দিরারা)। ইহা ভিন্ন তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যে, আইনগত পাঠসমূহ বহু প্রকারের ও পরস্পরবিরোধী, অন্যদিকে মাস্লাহা'র ধারণাটি একটি মৌলিক ভিত্তি এবং আইনগত সমস্যা সমাধানে উৎকৃষ্টের পথ নির্দেশ করিতে সক্ষম (নির্দেশনা কুরআন ৩ ঃ ১০৩- তোমরা আল্লাহ্র রুজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না")। এই প্রসঙ্গে তিনি আইনগত ব্যাখ্যার বিভিন্নতা মুসলিম ধর্মের একটি বিশেষ সুবিধা— এই বক্তব্যের বিরোধিতা করিয়াছেন (তু. হাদীছ ঃ ইখ্তিলাফু উম্মাতী রাহ্মা)। ইহার ফলে সৃষ্ট সুবিধাবলীর তুলনায় অসুবিধা অনেক বেশী ঃ যেহেতু বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্তমান থাকায় ব্যক্তি বিশেষের সুবিধা অনুযায়ী একটি শিথিল ব্যাখ্যার সন্ধান করিয়া অধিকতর কঠোর অনুশাসন অবহেলা করা সহজেই সম্ভব। ইহা ভিন্ন বহু অমুসলিম, যাঁহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক তাঁহারা কেবল আইনজ্ঞগণের বিভিন্ন প্রকারের মতবাদ ও মতামতের জন্য এবং ইহার ফলে সৃষ্ট ইসলামী আইন ব্যবস্থার সামঞ্জস্যের অভাবে চূড়ান্ত পদক্ষেপটি গ্রহণে বাধা প্রাপ্ত হন।

গ্রন্থকার এই ব্যাপারে সচেতন যে, তাঁহার মতামত মালিকী ইস্তিসলাহে'র গণ্ডি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে (পৃ. ৬০ প.)। তাঁহার মতাদর্শের মাধ্যমে তিনি মুসলিম সমাজের গরিষ্ঠ অংশের (আস-সাওয়াদু'ল-আ'জাম) অনুসৃত পথ পরিহার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করা হইয়াছে এবং রাসূলের উক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে, "সংখ্যা গরিষ্ঠকে অনুসরণ কর। সেই ব্যক্তি যে নিজ পথ অনুসরণ করে সে নিজ পথে দোযখের অভিমুখেও যাইবে" (ইত্তাবি'উ'স-সাওয়াদ আল-আ'জাম ফা-ইন্না মান শায যা শায যা ফি'ন্-নার)। কিন্তু ইহার অর্থ সকল নূতন মত ও নূতন পদ্ধতিসমূহে চরম অসম্ভাব্যতায় পর্যবসিত করা। মুহাম্মাদ (স)-এর নির্দেশ অনুযায়ী যে গরিষ্ঠ অংশকে অনুসরণ করিতে হইবে তাহা প্রকৃতপক্ষে সুস্পষ্ট প্রদর্শনের পথ এবং এই শেষোক্ত শর্তটি তাঁহার (তা'ওফী-এর) পদ্ধতির রি'আয়াতু'ল-মাস্লাহা'তে পূরণ করা হইয়াছে।

পূর্বে উল্লেখ করা ইব্ন তায়মিয়্যা (র) তাঁহার রিসালা-তে সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যে, মানুষের মন মাস্লাহা ব্যবহারে অতি সহজেই ভুল করিতে পারে, বিশেষত যদি ইহার সহিত আইনের ভাষ্য একমত না হয়। অন্যদিকে তাঁহার সমসাময়িক ও কিছুকালের জন্য শাগরিদ, তাওফী তাঁহার রিসালা ফি'ল-মাসালিহি'ল-মুরসালা নিম্নোক্ত বক্তব্য দ্বারা সমাপ্ত করিয়াছেন, "মানুষের সহিত মানুষের আইনগত সম্পর্কের প্রেক্ষিতে মাস্লাহা সম্পর্কে বলা যায় যে, ইহা তাহাদের নিকট পরিজ্ঞাত যাহারা আচার বা বুদ্ধিমত্তার কারণে এই আইনগত সম্পর্কের সহিত সংশ্লিষ্ট। যদি এখন এইরূপ দেখা যায় যে, আইনের সিদ্ধান্ত ইহার (মাস্লাহা) সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তবে ইহা পূর্ণভাবে জানিতে হইলে ইহাকে ইহার প্রকৃতি উপস্থাপিত করিতে হইবে

فاذا راينا دليل الشرع متاعداً عن افادتها علمنا انا احلنا فى تحصيلها على رعايتها ... এবং আল্লাহ্ জানেন সর্বাপেক্ষা কোন্টি নির্ভুল।"

তাওফী এমন যুগে বাস করিতেন যখন ইসলামী আইনের সুসম্বন্ধকরণ ইতোমধ্যেই অর্জিত হইয়াছে। রি'আয়াতু'ল-মাস্লাহা নীতির প্রবক্তারূপে অতীতের ন্যায় বর্তমানেও তিনি একজন বহিরাগত। ইহা সত্য যে, তাঁহার রিসালা (উসূলি'ল-ফিক্হ সম্বন্ধে) ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে সংকলিত ও মুদ্রিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। সাময়িকী আল-মানারেও ইহা প্রকাশিত হয়। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, মিসর ও অন্যান্য স্থানে ইদানিং ইসলামী আইনের সংস্কার দাবীতে যে সকল চক্র সোচ্চার রহিয়াছে তাহাদের উপর ইহার কোন তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়ে নাই। যাহা হউক, ইহার চরমপন্থী মতবাদের ফলে সৃষ্ট পরস্পর বিরোধিতার কারণে ইহা মাস্লাহা'র তাত্ত্বিক আইনগত গুরুত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রাথমিক সূচনা করিয়াছেন।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ (ক) ইস্তিহ্সান ঃ** (১) শাফি'ঈ, রিসালা (কিতাবু'ল-উম্ম-এর প্রারম্ভে, বূলাক ১৩২১ হি.), ৬৯ প.; (২) কিতাবু'ল-উম্ম, ৭খ, বুলাক ১৩২৫ হি., ২৭০-৭; (৩) আবু'ল-হুসায়ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্নি'ত-তায়্যিব আল-বাস্রী আল-মু'তাযিলী, কিতাবু'ল-মু'তামাদ ফী উসূলি'ল-ফিক্হ, ২খ, দামিশ্ক ১৩৮৫/১৯৬৫, ৮৩৮-৪০; (৪) গাযালী, আল-মুসতাস্ফা, ২খণ্ডে, কায়রো ১৩৫৬/১৯৩৭, ১খ, ১৩৭-৯; (৫) বায়দাবী, মিনহাজু'ল-উসূল, ভাষ্যসহ জামালু'দ-দীন আল্-ইসনাবী প্রণীত নিহায়াতু'স-সু'উল (ইব্ন আমীরি'ল-হাজ্জ প্রণীত আত-তাক্রীর ওয়াততাহ্বীর-এর মার্জিনে), ৩খ, বূলাক ১৩১৬-১৩১৭ হি., ৩খ, ১৪০-১৪৭; (৬) তাজু'দ-দীন আস-সুবকী, জাম'উ'ল-জাওয়ামি', জালালু'দ-দীন আল-মাহাল্লী-এর ভাষ্য ও বান্নানীর টীকাসহ, ২ খণ্ডে, কায়রো, ১২৯৭ হি., ২খ, ২৮৮; (৭) বাযদাবী, কানযু'ল-উসূল, 'আবদু'ল-'আযীয আল-বুখারীর ভাষ্য (কাশফু'ল-আসরার)-সহ, ৪খণ্ডে, ইস্তাম্বুল ১৩০৭-১৩০৮; ৪খ, ২-১৪, ৪০, ৮৩; (৮) সারাখসী, আল-মাবসূত, ১০খ, কায়রো ১৩২৪ হি., ১৪৫; (৯) আবু'ল-বারাকাত আন-নাসাফী, কাশফু'ল-আসরার (শারহ মানারি'ল-আনওয়ার), তৎসহ মুল্লা জীওয়ানের ভাষ্য ও মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-হালীম আল-লাকনাবীর টীকা, ২খ, বূলাক ১৩১৬ হি., ২খ, ১৬৪-৮; (১০) সাদরু'শ-শারী'আ আল-মাহবূবী, শারহু'তাওদীহ 'আলা'ত-তান-কীহ, তৎসহ তাফতাযানীর ভাষ্য (আত-তালবীহ্) এবং ফানারী ও মুল্লা খুসরাও-এর টীকা, ৩খণ্ডে, কায়রো ১৩২২ হি., ৩খ, ২-১০; (১১) ইবনু'ল-হুমাম, আত্-তাহ্রীর তৎসহ ইব্ন আমীরি'ল-হাজ্জ-এর ভাষ্য (আত-তাক্রীর, ওয়া'ত-তাহ্বীর), ৩খণ্ডে, বূলাক ১৩১৬-১৩১৭ হি., ৩খ, ২২১-৩৮; (১২) (মুল্লা খুসরাও), মিরকাতু'ল-উসূল ইলা 'ইল্মি'ল-উসূল, ইস্তাম্বুল ১৩০৭ হি., ২৩ প.; (১৩) মুহি ব্বুলাহ ইব্ন 'আবদি'শ-শাকূর (বিহারী), মুসাল্লামু'ছ-ছুবূত, তৎসহ মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-'আলী নিজামু'দ-দীন (বাহরুল-'উলূম)-এর ভাষ্য ফাওয়াতিহু'র-রাহামূত), গাযালীর আল-মুসতাসফাহ মুদ্রিত, ২খণ্ডে, বূলাক ১৩২২-১৩২৪ হি., ২খ, ২৩০-৪; (১৪) ইব্ন তায়মিয়্যা, মাজমূ'আতু'র-রাসা'ইল ওয়া'ল-মাসা'ইল, ৫খণ্ডে, কায়রো ১৩৪১-১৩৪৯ হি., ৫খ, ২২ প.; (১৫) George Makdis, Ibn Taimiya's Autograph Manuscript on Istihasan : Materials for the Study of Islamic Legal Thoughts, in Arabic and Islamic Studies in Honor of Hamilton A. R. Gibb, লাইডেন ১৯৬৫ খৃ., ৪৪৬-৪৭৯ (ত্রুটিপূর্ণভাবে লিখিত পাঠের সংস্করণ); (১৬) শাতিবী, আল-মুওয়াফাকাত, ৪খ, কায়রো ১৩৪১ হি., ৪খ, ১১৬-১১৮; (১৭) আল-ই'তিসাম, ২খণ্ডে, কায়রো ১৩৩২ হি., ৩১৬-৩৫৬; (১৮) আশ-শায়খ মুহাম্মাদ আল-খিদরী বে, উসূলু'ল-ফিক্হ[2], কায়রো ১৩৫২/১৯৩৩, ৪১৩-৬; (১৯) 'আবদু'র-রাহীম I

Principi della Giurisprudenza Musulmana, অনু. Guido Cimino, রোম ১৯২২ খৃ., ১৮১-৪; (২০) সুব্হী মাহ্মাসানী, ফালসাফাতু'ত-তাশরীফি'ল-ইসলাম[3], বৈরূত ১৩৮০/১৯৬১, ১৭২-৭৫ (অনু. ফারহাত জ. যিয়াদেহ, লাইডেন ১৯৬১ খৃ., ৮৫-৮৭); (২১) মুহাম্মাদ সা'ঈদ রামাদান আল-বূতী, দাওয়াবিতু'ল-মাস্লাহাঃ ফি'শ-শারী'আ আল-ইসলামিয়্যা, দামিশ্ক ১৯৬৬-১৯৬৭ খৃ., ২৩৬-৪৭, ৩৭৭, ৩৮০-৩; (২২) I. GoldZiher, WZKM, ১ম. (১৮৮৭ খৃ.), ২২৮ প.; (২৩) D. Santillana, Istituzioni di diritto Musulmano Malichita, ১খ, রোম ১৯২৬ খৃ., ৫৬ প., ১৯৩৮ খৃ., ৭১-৭৩; (২৪) E. Tyan, Methodologic et sources du droit en Islam (Studia Islamica, ১০খ, ১৯৫৯ খৃ., ৭৯-১০৯), বিশেষভাবে ৮৪-৯৬; (২৫) Malcom H. Kerr, Islamic reform, বার্কলে ও লসএঞ্জেলস ১৯৬৬ খৃ., ৮৯ প.।

(খ) ইস্তিস্লাহ ঃ (২৬) গাযালী, পূ. গ্র., ১খ, ১৩৯-১৪৪; (২৭) বায়দাবী-ইসনাবী, পূ. গ্র., ৩খ, ১৩৪-১৩৯; (২৮) সুবকী-মাহাল্লী-বান্নানী, পূ. গ্র., ২খ, ২২৯-২৩৪; (২৯) মাহ্বূবী-তাফ্তাযানী-ফানারী, পূ. গ্র., ২খ, ৩৭৪., বিশেষত ৩৯১-৬; (৩০) ইবনু'ল-হুমাম-ইবন আমীরি'ল-হাজ্জ, পূ. গ্র., ৩খ, ১৪১-১৬৭, বিশেষ করিয়া ১৫০ প.; (৩১) বিহারী বাহ্রু'ল-'উলূম, পূ. গ্র., ২খ, ২৬০ প., বিশেষ করে ২৬৬ প. এবং ৩০১; (৩২) ইব্ন তায়মিয়্যা, পূ. গ্র. ৫খ. ২২ প., বিশেষ করে ১১৬-৮; (৩৩) আল-ই'তিসাম, ২খ, ৩০৭-৩১৬, ৩২৪; (৩৪) কারাফী, শার্হ তানকীহি'ল-ফুসূল, কায়রো ১৩০৬ হি., ১৭০ প.; (৩৫) নাজমু'দ-দীন আত-তাওফী, রিসালা ফি'ল-মাসালিহি'ল-মুরসালা (মাজমূ রাসা'ঈল ফী উসূলি'ল-ফিক্হ, বৈরূত ১৩২৪ হি., ৩৭-৭০); (৩৬) রাশীদ রিদার সাময়িকী আল-মানার-এ প্রকাশিত একই রচনা, ৯খ (১৩২৪ হি.), ৭৪৫-৭০; (৩৭) মুহাম্মাদ আল-খিদ্রী, পূ. গ্র., ৩৮১-৯২; (৩৮) 'আবদু'র-রাহীম, পূ. গ্র., ১৭৩, ১৮৪; (৩৯) মাহ্মাসানী, পূ. গ্র., ১৭৫-৮, ২১৫ প. (অনু. Ziadeh, পৃ. ৮৭-৮৯, ১১৬ প.); (৪০) মুসতাফা যায়দ, আল-মাসলাহা ফি'ত-তাশ্রী'ই'ল-ইসলামী ওয়া নাজমু'দ-দীন আত-তাওফী, কায়রো ১৩৭৪/১৯৫৪; (৪১) মুহাম্মাদ সা'ঈদ রামাদান আল-বূতী, দাওয়াবিতু'ল-মাস্লাহা ফি'শ-শারী'আ আল-ইসলামিয়্যা, দামিশ্ক ১৯৬৬-১৯৬৭ খৃ.; (৪২) মুহাম্মাদ তাকী আল-হাকীম (শী'আপন্থী), আল-উসূলু'ল-'আম্মা লি'ল-ফিকহি'ল-মুকারান, বৈরূত, n.d., ৩৮০-৪০৪; (৪৩) আস-সায়্যিদ 'আলী নাকী আল-হায়দারী (শী'আপন্থী), 'উসূলু'ল-ইসতিনবাত', কুম্ম ১৩৭৯-৮০/১৯৫৯-৬০, ২৭৯-২৮১; (৪৪) I. Goldziher, WZKM, ১খ. (১৮৮৭ খৃ.), ২২৯ প.; (৪৫) Santillana, পূ. গ্র., ১খ, রোম ১৯২৬ খৃ., ৫৫ প., ১৯৩৮ খৃ., ৭০ প.; (৪৬) E. Tyan, পূ. গ্র., বিশেষত ৯৬-১০১; (৪৭) Malcom Kerr, Rashid Rida and Islamic legal reform, in MW, ১খ. (১৯৬০ খৃ.), ৯৯-১০৮, ১৭০-১৮১; (৪৮) ঐ লেখক, Islamic Reform, ৫৫ প., ৭৫ প.; ৮০-১০২, ১৮৭-৯৭, ২০৭। R. Paret (E.I.[2])/ইমাদুদ্দীন

**ইসতীফা'** (দ্র. মুসতাওফী)

**ইস্তোল্নী** (ইসতোনী- Istoni) ঃ বেলগ্রাড (also Ustolni, ustoni Belghrad)—তু. সারবিয়ান ঃ Stolni Belgrad; জার্মানঃ Stuhlweissenburg, ল্যাটিন ঃ Alba Regia; হাঙ্গেরীয়ান Szekesfehervarg—বুদা (Buda)-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি সুরক্ষিত শহর। এইখানে ১০ম/১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত সেন্ট স্টীফেন গির্জায় হাঙ্গেরীয় রাজাদের অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। গির্জা সংলগ্ন ছিল তাঁহাদের গোরস্তান। ইসতোল্নী বেলগ্রাড [আওলিয়া চেলেবীর (Ewliya Celebi, vii, 55) কথায় beyaz Iskemli Kal'esi], বালাটন হ্রদ হইতে প্রবাহিত সারভিসিয়ান নদীর তীরে অবস্থিত (Isthvanfius, ২৬৭-তু. উইলিয়ার অন্তর্গত নহরে সারভিজ' Celebi, ৭, ৬৩) যেখান হইতে নদী বাহিরের দিকে বিস্তার লাভ করিয়া নলখাগড়াপূর্ণ জলাভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। সেই জলাভূমি হইতে আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশে লম্বা লম্বা গম্বুজ দ্বারা মযবুত করা হইয়াছিল এবং পরিখা ও প্রাচীর দ্বারা আরও নিরাপদ করা হইয়াছিল (তু. Giovio Historiac, ২খ, ৩০৮r.)। তাই ঐ সুরক্ষিত শহর আক্রমণ করা খুবই দুরূহ ছিল। এতদসত্ত্বেও ৯৫০/ ১৫৪৩ সালে শহরটি 'উছমানী তুরস্কের আওতাধীন হইয়া যায়। অবশেষে ৯৯৫/১৫৮৬-৭ সালে (তু. Fekete, Siyaqat-Schrift, ১খ, ৪৪২) ইসতোলনী বেলগ্রাড কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ 'উছমানীয়দের একটি বৃহৎ সান্জাক (Sandjak)-এর কেন্দ্রে পরিণত হয়। ঐ গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের মধ্যে পেসপ্যারিম (Vezprem), পোলাটা (Polata) ও ইয়ানিক (Gyor) প্রধান। ১০১০/১৬০১ সনে খৃষ্টানগণ ঐ সুরক্ষিত শহর অবরোধ করিয়া দখল করে, অবশ্য পরবর্তী বৎসরই ১০১১/ ১৬০২ সনে উহা পুনরায় 'উছমানী তুরস্কের দখলে আসে। সেকরা লিগা' (Sacra Liga) যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইসতোল্নী বেলগ্রাড 'উছমানী তুরস্ক রাজ্যের শাসনাধীন ছিল (১৬৮৪-১৬৯৯ খৃ.)। সেই সময় একটা (Ultima esuric confracta " Wagner, ii, 43) দুর্ভেদ্য অবরোধের ফলে ইহা একটি সংকীর্ণ প্রণালীতে পরিণত হয় এবং ১০৯৯/১৬৮৮ সালে ইহা খৃষ্টানদের হস্তে পতিত হয় এবং চূড়ান্তভাবে তখন হইতে তাহাদের অধিকারে আসে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) Pecewi, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১২৮৩ হি., ১খ, ২৫৭ প. ও ২৩৬ প., ২৪২ প.; (২) Solakzade, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১২৯৮ হি., ৫০৩, ৬৬৫ প.; (৩) Naima, তা'রীখ ইস্তাম্বুল ১২৮১-১২৮৩ হি., ২৪৪ প., ২৮৫ প.; (৪) হাজ্জী খালীফা, ফাযলিকা, (Fedhlek), ইস্তাম্বুল ১২৮৬-৭ হি., ১খ, ১৭৮ প.; (৫) রাশীদ, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১২৮২ হি., ১খ., ৪৯৩; (৬) সিলাহ্দার, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ., ২খ, ৩১৭ প.; (৭) আওলিয়া চেলেবী, সিয়াহাত-নামা, ৭খ. (ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ.), ৫৫ প.; (৮) L. Fekete, Die Siyaqat-Schrift in der turkischen Finanzverwaltung, Budapest 1955, i, 144, 244, 280 প., 280 প., 873 (index) and ii, Plates 26-27, 48-50; (৯) Paolo Giovio, Historiac sui temporis, Paris 1558-60, ii, 308r k. (-Paolo Giovio, Dell' Istorie di Suo Tempotr, L. Domenichi, Venice 1560, ii, 702 প.); (১০) I. M. Stella, De Tucarum in Regno Hungraiae anni M. D. XLII et XLIII Successibus, in P. Lonicerus, Chronicorum Turcicorum ... Liber Primus—

(Secundus), Frankfull a. M. 1584, ii 177 প.; (১১) Scriptores Rerum Hungaricarum Minores Hactenus Inediti, ed. M. G. Kovachich, Buda 1798, i, 77 প. (Deditio Albae Regalis); (১২) N. de Montreux, Histoire universelle des guerres du Turc, depuis I'an 1565, iusques a, la trefve faicte en I'annee 1606, Paris 1608, 737 প., 750 প. 787 প., 839 প.; (১৩) Hieronymus Ortelius, Chronologia order historische Beschreibung aller Kriegsemporungen und Belagerungen ..... in ober und under ungern auch Sibenburgen mit dem Turcken von A 1395 biss auf gegenwirtige Zeit denckwutig geschehen, Nuremburg 1620-22, i, 503 প., ৫৫২ প.; (১৪) Nicolai Isthvafi Pannoni Historiaum de rebus Ungaricis libri XXXIV, Coloniae Agrippinae 1622, 9 প., 267 প., 777 প., 787 প.; (১৫) F. Wagner, Historia leopodi Magni Caesaris Augusti, Augustae Vindelicorum, 1719-31, ii, 43 প.; (১৬) A. Stauffer, Hermann Christoph Graf von Russworm, Munich 1884, 73 প.; (১৭) G. Heile, Der Feldzug gegen die Turken und die Eroberung Stuhlewissenburgs unter Erzherzog Matthias 1601, Rostock 1902; (১৮) K. Horvat, Vojne Ekspedicije Klementa VIII u Ugarski u Hrvatsku, Zagreb 1910, 181 প.; (১৯) L. A. Maggiorotti, L'Opera del Genio Italiano al Estero (Ser. iv. 3 vols., Rome 1932-39), ii (Gli Architelli Militari), 259-65, 465 (index) also PlateIvii; (২০) J. von Hammer-Purgstall, Histoire de I'Empire Ottoman, tr. J.-J. Hellert. v (Paris 1836). 373 প., viii (Paris 1837), 8, 17; (২১) J. W. Zinkeisen, Geschichte des Osmanischen Reiches, ii. (Gotha, 1854), 850 প., iii (Gotha 1855), 610 প.; (২২) N. Jorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, iii (Gotha 1910), 24 প., 329, 334 ff., iv (Gotha, 1911), 229; (২৩) A. Huber, Geschichte Oesterreichs, iv (Gotha 1892), 407 প.; (২৪) F. Babinger, Geschichtsschreiber der Osmanen und Ihre Werke, Leipzig 1927, 77 প., 102 প.।

V. J. Parry (E. I.[2])/ হাফিজ সৈয়দ নুরুদ্দীন

**ইস্না** (اسنا) ঃ দক্ষিণ মিসরের একটি শহরের 'আরবী নাম (মিসরীয় টে-স্নেট (Te-snet), মিসর দেশীয় খৃস্টানগণের স্নে (Sne); গ্রীক ল্যাটোপলিস, ল্যাটোস এক প্রকারের মাছ যাহার উপাসনা করা হয়; য়ুরোপীয়দের ভাষায় এসনে (Esne), এসনেহ (Esneh) প্রাচীন ইংরাজ আমলের স্বদেশীয় ক্রীতদাস ], ইহা লাক্সের ও এডফু (Edfu)-র মধ্যপথে নীল নদের বাম তীরে অবস্থিত। ইসনা এক সময় জেলা মুদিরিয়্যা-র সদর ছিল এবং বর্তমানে কিনাা (দ্র.)-র মুদিরিয়্যা-র একটি মারকায (কেন্দ্র), ইহা ২০,০০০ অধিবাসী অধ্যুষিত; একটি উপশহর টলেমীদের আমলে Chnum দেবতার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। উক্ত মন্দিরে প্রাচীন মিসরের ফির'আওনদের পোশাকে বিমূর্ত করিয়া কতিপয় রোমীয় সম্রাটকে প্রদর্শিত করা হইয়াছে। মুসলিমগণের রাজত্বের সময় ইসনা একটি অতি সমৃদ্ধ প্রাদেশিক শহর ছিল। মাকরীযী কর্তৃক উদ্ধৃত Edfu-র বর্ণনা অনুসারে উক্ত শহরে ১০,০০০ গৃহ ছিল এবং বার্ষিক ৪০,০০০ ইর্‌দাব্ (irdabb) খেজুর ও ১০,০০০ ইর্‌দাব্ কিশমিশ (Zabib) উৎপাদিত হইত। বর্তমানে সমগ্র মিসরে ব্যবহৃত নীল রংয়ের সুতিবস্ত্র ইসনাতেই বয়ন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়া'কূত, ১খ., ২৬৫ প.; (২) মাকরীযী, খিতাত, ১খ, ২৩৭; (৩) Ame lineau, Geographile de I'Egypt, ১৭২; (৪) A. Boinet Bey, Dictionnaire geographique de I'Egypte, কায়রো ১৮৯৯ খৃ., ১৮৩। সর্বাপেক্ষা বিশদ বিবরণ, যাহাতে অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনাও আছে, উহা (৫) 'আলী মুবারাক, Khitat Djadida, ৮খ, ৫৯; (৬) আরও দ্র. Baedeker, Egypt 6; (৭) Guide Bleu, Egupt, 1956 খৃ. ৪৩৯-৪০।

H. Ritter (E. I.[2])/ মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার

**ইসপার্‌টা** (Isparta) ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম তুরস্কের একটি শহর। ইহার পুরাতন নাম পিসিডিয়া (Pisidia)। প্রাচীন কালের বুর্‌দুর্, এগ্রিডির ও এপোলোনিয়া-সোযোপোলিসের মধ্যবর্তী উর্বর সমতল ভূমিতে ১০২৫ মিটার উচ্চতায় ইহা অবস্থিত। বায়যান্টাইন দুর্গ সাপোর্ডার আধুনিক নাম ইস্‌পার্‌টা। ৭ম, ৮ম শতাব্দী/ ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীতে মুসলিম সূত্রে ইহার নাম সাবার্‌তা পাওয়া যায়। ৬০০-৬০১/ ১২০৩-১২০৪ সালে সালজূক'গণ ইহা দখল করে। তখন হইতে ইহা তাহাদের পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সালজূক সাম্রাজ্যের পতনের পর হামীদ ও গুল্লারী (দ্র.) গোত্র (যাঁহাদের কর্মকেন্দ্র ছিল এগ্রিডির) ইস্‌পার্‌টাকে তাঁহাদের এলাকাভুক্ত করেন।

৭৮৩/ ১৩৮১ সালে 'উছমানীয় শাসক ১ম মুরাাদ অর্থের বিনিময়ে হামীদ ওগ্‌লু হুসায়ন বেগকে তাঁহার এলাকার অধিকাংশ (ইস্‌পার্‌টাসহ) 'উছমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি মানিয়া লইতে সম্মত করান। ফলে শহরটি হামীদ ইলির 'উছমানীয় সান্‌জাকের (প্রশাসনিক বিভাগ) আওতাধীনে আসে, পরবর্তীতে ইহা প্রধান শহরে পরিণত হয়। সংস্কারক খালীল হামীদ পাশা (মৃ. ১৭৭৫ খৃ.) এই শহরের অধিবাসী ছিলেন এবং তিনি তথায় কয়েকটি সরকারী 'ইমারত ও একটি গ্রন্থাগার নির্মাণ করেন। ৮ম/১৪শ শতাব্দী হইতে পিসিডিয়ার প্রধান শহর হিসাবে ইস্‌পারটায় কতকগুলি গির্জা ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খৃস্টান অধিবাসী ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জনসংখ্যা বিনিময়ের সময় ইহাদেরকে স্থানান্তরিত করা হয়। পূর্বে ইহার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল বয়ন শিল্প ও গোলাপের আতর। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে কার্পেট শিল্প গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

'উছমানীয় রাজত্বের শেষের দিকে শহরটিকে হামীদাবাদ নাম দেওয়া হয়। ইহা এখন ইস্‌পারটা প্রদেশের রাজধানী। ইস্‌পারটা, এগ্রিডির, উলুবর্‌লু, য়াল্‌ভাক, সারকী, কারাগাক ও সুট্‌চুলার অঞ্চল এই প্রদেশের অন্তর্গত। ১৯৬০ খৃস্টাব্দে এই শহরের জনসংখ্যা ছিল ৩৫,৯৮১।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্ন বাত্তুতা, ২খ, ২৬৬; (২) কাতিব চেলিবি, জিহান্নুমা, পৃ. ৬৩৯-৪০; (৩) Evliya Celebi, সিয়াহাত নামা, ৯খ, ২৮৩; (৪) P. Lucas, Voyage dans la Grece ... i, 246 প.; (৫) V. J. Arundell, A visit to the Seven Chruches of Asia, London 1828, 118-32; (৬) ঐ লেখক, Discoveries in Asia Minor, London 1834, i, 346, k., ii 1-22; (৭) W. J. Hamilton, Researches in Asia Minor, i, London 1842, 483; (৮) F. Sarre. Reisen in Kleinasien, Berlin 1896, 167-8; (৯) V. Cuinet, La Turquie d'Asie, Paris 1890, i, 850 প.; (১০) de Laborde-কৃত চিত্রাবলী, Voyage de l'Asie Mineure, Paris 1838, 106; (১১) I A. s. v. (by Besim Darkot), পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীসহ।

B. Flemming (E. I.[2])/ মোহাম্মদ ইউনুছ

**ইস্পাহ্বায** (اسپهبذ) ঃ ফারসী ভাষায় 'সেনাধ্যক্ষ'; ইসলাম-পূর্ব পারস্য সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত সামরিক পদবীর ইসলামী রূপ; মঙ্গোল আক্রমণের সময় পর্যন্ত পারস্যের কাস্পিয়ান প্রদেশসমূহে এই উপাধি ব্যবহৃত হইত।

আকিমেনীয় (Achaemenid) শাসনামলে স্থলবাহিনীর অধিনায়ককে 'স্পাহ্পাত' (سپاه پت) বলা হইত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আরসাসী (Arsacid) আমলে 'স্পাহ্পাত' পদটি একটি প্রভাবশালী পার্থীয় (Parthian) পরিবারের বংশগত উপাধি ছিল। আরমেনীয় ভূগোলবেত্তা চোরেন (Choren)-এর মোজেস (Moses) (খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী) বলেন, রাজা আর্শাবির (Arshavir) [ইনিই চতুর্থ ফ্রাতেস-Phrates]-এর কন্যা কশ্ম (Koshm) বা কম্শ্ (Komsh) পার্থীয় সেনাবাহিনীর সেনাধ্যক্ষের সহিত বিবাহিতা হইলে তাঁহাদের অধঃবংশধরগণ আস্পাহাপেত পাহ্লাব (Aspahapet Pahvav) নামে অভিহিত হইতেন (দ্র. Marquart in ZDMG, xlix (1895), 635-9; ঐ, ইরানসাহ্র (Eransahr), 71-2; Christensen, L-Iran sous les Sassanides[2], 104)। শব্দটি অবশ্য আরমেনীয় ভাষায় দুইবার আমদানী করা হইয়াছে ঃ একবার আরমাসীদ আমলে প্রাচীন ফারসী হইতে— তখন (আ) স্পারাপেত [(a) Sparapet]-রূপে আর একবার সাসানীয় আমলের প্রথমদিকে মধ্যফারসী রূপ হইতে আস্পাহাপেত (Aspahapet)-রূপে (এই শব্দটি "বুক অফ জেনেসিস"-এর আর্মেনীয় সংস্করণে গ্রীক Arkhistratagos শব্দটির তরজমা 'সর্বাধিনায়ক' করা হইয়াছে) [Hubschmann, Armenische Grammatik, i, 22-3, 240]। পারস্যের যুদ্ধসমূহের বায়যান্টীয় ঐতিহাসিকগণের লেখায় মধ্যফারসী 'স্পাহ্পাত্'-এর গ্রীক তরজমা করা হইয়াছে Aspabedas। এই সামরিক উপাধিটি পূর্ব তুর্কিস্তান পর্যন্ত প্রসারিত হয় এবং শক ভাষা খোতান (khotan)-এ ইহা 'স্পাতা' (Spata) রূপ গ্রহণ করে; ইহার পরবর্তী রূপ হয় 'স্পা' (Spa) (H. W. Bailey), Indoscythian studies, Khotanese texts iv, Cambridge 1961, 7, 55); তবে Soghdian-এ এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় না।

সাসানী আমলের গোড়ার দিকে একজন সামরিক সর্বাধিনায়ক ও সমরমন্ত্রী থাকিতেন, যাঁহাকে বলা হইতে 'ইরান স্পাহ্পাত' বা 'সাম্রাজ্যের সেনা সর্বাধ্যক্ষ'; তবে বিশেষ বিশেষ এলাকার জন্য নিযুক্ত স্পাহ্পাত-এর সাক্ষাতও পাওয়া যায়। যেমন মেসোপটেমিয়ার সাওয়াদ-এর (Christensen, পূ. গ্র. ১৩০)। সম্রাট কাওয়ায' তাঁহার অতি শক্তিশালী প্রজা 'ইরান স্পাহ্পাত' যারমিহ্র বা সুখরাকে বাধ্য হইয়া দমন করিবার পর তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী খাসরূ আনুশিরওয়াঁ কতিপয় সামরিক সংস্কার সাধন করেন। এতদনুসারে মাত্র একজন সর্বশক্তিধর সেনাধ্যক্ষের পরিবর্তে চারিজন স্পাহ্পাত নিযুক্ত করা হয়। ইঁহাদের এক একজন সাম্রাজ্যের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম— এই এক এক অংশের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিতেন। য়া'কূবী (Historiac, i, 202) প্রদত্ত সাসানী সাম্রাজ্যের পদমর্যাদাসূচক বিবরণীতে স্পাহ্পাতের স্থান ছিল উযীরে আ'জাম (বুযুর্গ-ফ্রামাযার), মোবাযান মোবায, হেরবাযান হেরবায ও প্রধান সচিব (দিবহেরবায)-এর পরে। মনে হয় ইহাতে সংস্কারপূর্ব ব্যবস্থা প্রতিফলিত। এদিকে মাস্'উদী (মুরূজ, ২খ, ১৫৬) প্রদত্ত তালিকায় আবার চারিজন স্পাহ্পাতের স্থান রাজ্যের উযীরগণ ও মোবাযান মোযাব-এর পরেই। যদিও মাস'উদী বলেন যে, এই ব্যবস্থা আরদাসীর আমলে চালু ছিল, তবুও ইহা সুস্পষ্ট যে, ইহা আনুশিরওয়াঁর আমলে ও তৎপরবর্তীকালে চালু ব্যবস্থারই প্রতিফলন (দ্র. Noldeke-তে তাবারী, ১৩৯, ১৫৫-৬, ৪৪৪; Marquart, in ZDMG (1895), পৃ. গ্র.; Christensen, ৩৩৬, ৩৭০-১)। আরমেনীয় রাজ্যে স্পারাপেত বা সেনাধ্যক্ষের পদ মর্যাদা ছিল অনুরূপ উচ্চ, এই পদটি- (আ) স্পারাপেতি 'উন [(a) Sparapet 'I'un] মামিকোনীয় (Mamikonian) পরিবারের মধ্যে বংশগত ছিল (দ্র. Hubschmann, 240; Marquart, Eransahr, 165-7]।

'আরবদের পারস্য বিজয়ের সময় সাসানী সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের 'স্পাহ্পাত' তাবারিস্তানের কাস্পিয়ান অগ্রবর্তী এলাকাসমূহে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেইখানে তিনি পলাতক সম্রাট তৃতীয় য়াযদিগিরদকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ জানান (Christensen, ৫০৭)। এখন আবার শব্দটির নূতন ফারসী রূপ 'স্পাহ্বায'-এর সাক্ষাত আমরা পাই; "মু'জামু'ত্-তাওয়ারীখ" (পৃ. ৪২০) গ্রন্থে ইহার অর্থ দেওয়া আছে 'আমীর' অথবা 'আমীর সিপাহ্সালার'। 'আরবীতে ইহা 'ইস্পাহ্বায' রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে (তু. জাওয়ালীকী, আল-মু'আররাব, সম্পা. Sachau, ৯৯; লিসানু'ল-'আরাব', ৫খ, ৮; তাজু'ল-'আরূস, ২খ, ৫৬৯-তে 'ইস্বাহ্বাযান' শব্দটি রহিয়াছে; বলা হইয়াছে যে, শব্দটি জারীর কর্তৃক রচিত একটি কবিতায় আছে); আবার কদাচিৎ 'ইস্বাহ্বায' শব্দটিরও সাক্ষাত মিলে (তু. আল-বীরূনী, আল-আছারু'ল-বাকিয়্যা, ১০১, অনু. ১০৯, 'আনাবায'-এর Marquart-কৃত শুদ্ধিকরণ অনুসরণে; গুরগানের রাজন্যবর্গের উপাধি বলিয়া কথিত)।

গীলানের ইস্পাহ্বাযদের উল্লেখ আরব বিজয়সমূহের প্রাচীন বিবরণীতে দেখা যায়। সেইজন্য ২২/৬৪৩ সনে সুওয়ায়দ ইব্ন মুকাররিন আল-ফাররুখান-এর নিকট "তাবারিস্তানের খুরাসানী ইসবাহ্বায ও জীল-ই জীলান"-এর কথা (তাবারী, ১খ, ২৬৫৯) লিখিয়াছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে ঐ শতাব্দীতে এই ধরনের উল্লেখ আরও ঘন ঘন পাওয়া যায়; যেমন কাতারী ইব্নু'ল-ফুজা'আর বিদ্রোহের কাহিনীতে (য়া'কূবী, Historiae, ২খ, ৩২৯, ৭৮-৯/৬৯৭-৯ সন) এবং 'রায়'-এ 'উমার ইব্ন আবি'স-সাল্ত্-এর বিদ্রোহের কাহিনীতে (ইব্নু'ল-আছীর, ৪খ,

৩৯৫-৬, ৮৩-৭০২ সন)। এই সকল ইস্পাহ্বাযের পাহ্লাবী চিহ্নখচিত মুদ্রা ইহার অল্পকাল পরেই দেখা যায় (দ্র. A. D. Mordtmann, in ZDMG, ৩৩খ. ১৮৭৯ খৃ., ১১০-২; R. Vasmer, EI[1] Mazandaran প্রবন্ধটির মুদ্রা সম্বন্ধীয় পরিশিষ্ট)। এই ইস্পাহ্বায'গণ ছিলেন দাবূয়ী বংশের (৪০-১৪১/৬৬০-৭৫৮ সন); এই বংশেরই সমসাময়িক ছিলেন রূয়ান ও পশ্চিম তাবারিস্তানের দীর্ঘস্থায়ী পাযু স্পানী বংশ (দ্র. দাবূয়া ও বাদূসবানী)।

তাবারিস্তানের পার্বত্য এলাকায় গোত্রপ্রধান বুঝাইতে স্থানীয় যাহারা ইস্পাহ্বায শব্দটি ব্যবহার করিত তাহাদের অন্যতম ছিল কারিনওয়ান্দ অথবা সুখরানিয়্যানগণ (৫৭২ হইতে ৮৩৯-৪০ সাল)। ইহারা পরবর্তীকালে বাওয়ান্দী বংশধরগণ (باوند خاندان)-এর কর্তৃত্ব মানিয়া লয়। এই গোত্রের শেষ শাসক ছিলেন সুবিখ্যাত মাযয়ার ইব্ন কারিন (مازيار بن قارن) (দ্র.)। খলীফা আল-মু'তাসিম-এর আমলে জরথুস্ট্রীয় (জারদাশতী) বিদ্রোহ সংঘটনের ষড়যন্ত্র করার ফলে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ইনি নিজেকে "জীল-ই জীলান, ইস্পাহ্বায খুরাসান, আল-মাযয়ার, মুহাম্মাদ ইব্ন কারিন, মুওয়ালী [মাওলা নহে] আমীরু'ল-মু'মিনীন" বলিয়া দাবী করিতেন (য়া'কূবী, বুলদান, ২৭৭, অনু. ৮১, তু. ঐ, Historiae, ২খ, ৫৮২ ও তাবারী, ৩খ, ১২৯৮)।

কাস্পিয়ান এলাকার এই সকল রাজবংশের মধ্যে তাবারিস্তানের বাওয়ান্দীগণও ইস্পাহ্বায উপাধি ব্যবহার করিতেন। এই বংশটি আরব বিজয়ের সময় হইতে মঙ্গোলদের বিজয় অভিযানের বেশ পরবর্তীকাল পর্যন্ত টিকিয়া থাকে, বিশেষত এই বংশের তিনটি শাখার মধ্যে দ্বিতীয়টি (৪৬৬-৬০৬/১০৭৪-১২১০ সন) ইস্পাহ্বাযিয়্যা (দ্র. বাওয়ান্দ) নামে পরিচিত। এইভাবে 'ইস্পাহ্বায' শব্দটি ৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রথমদিকে বাওয়ান্দীগণ কর্তৃক রাজকীয় উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়াও এই এলাকায় 'স্থানীয় প্রধান'-বোধক একটি বংশ নির্দেশক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইত (তু. ইব্ন ইসফানদিয়ার, তা'রীখ-ই তাবারিস্তান, সম্পা. ইকবাল, ২খ, ১৭১, অনু. Browne 255)। ঐ গ্রন্থে শামসু'ল-মুলূক রুস্তাম (দ্বিতীয়) ইব্ন আরদাশীর ৬০২/১২০৬ সনে সিংহাসনারোহণ কালে 'ইস্পাহ্বায'ান, বাওয়ানদানগণ, সামরিক প্রধানগণ ও শহরের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্তৃক অভিনন্দিত হন বলিয়া উল্লেখ আছে।

যাহা হউক, কাস্পিয়ান এলাকার দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণস্থ দায়লামীদের নিকটও উপাধিটি পরিচিত ছিল। যিয়ারীদ উশমাগীর (মধ্য ৪র্থ/১০ম শতাব্দী)-এর আমলে জনৈক মূগান-এর ইস্পাহ্বায ছিলেন; তাঁহার নাম ছিল পিসর-ই দায়লামী লুলা (আ. কাসরাভী, শাহরিয়ারান-ই গুমনাম ১খ, ৫৭-৮)। ইসলামের প্রথম দুই শতাব্দীতে কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ববর্তী এলাকায়, খুরাসানের উত্তর ও পূর্ববর্তী সীমান্ত এলাকায় উপাধিটির প্রচলন ছিল। বাল্খের ইস্পাহ্বায ছিলেন বাদগীস ও তুখারিস্তানের স্থানীয় সেই সকল রাজন্যবর্গের অন্যতম, যাঁহাদেরকে হেফথালী তারখান নীযাক (দ্র. হায়াতিলা) ৯০/৭০৯ সনে কুতায়বা ইব্ন মুসলিমের প্রতিষ্ঠিত 'আরব রাষ্ট্রের আনুগত্য অস্বীকার করিতে রাযী করিতে পারিয়াছিলেন (তাবারী, ২খ, ১২০৬, ১২১৮; তু. ১৩০০)। ইহার অনতিকাল পরেই ১১৯/৭৩৭ সনে নাসা-র জনৈক ইস্পাহ্বায— তাঁহার নাম ছিল আল-ইশকান্দ (দ্র. Justi, Iranisches Namenbuch, 142)— আরবদের বিরুদ্ধে পশ্চিমাঞ্চলীয় তুর্কিস্তান খাকানের সেনাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন (তাবারী, ২খ, ১৫৯৭-৮)। শব্দটির একটি কৌতূহলোদ্দীপক ব্যবহার দেখা যায় পবিত্র কা'বা শারীফের গায়ে খোদিত একটি লিপিতে। লিপিটির তারিখ ২০০/৮১৫-৬ সন— আল-মা'মূনের খিলাফাত কাল। এই লিপিটি হইতেছে খুরাসান হইতে মক্কায় "ইস্পাহবায কাবুল শাহ"-এর সিংহাসনটি পাঠাইয়া দিবার স্মারক (আযরাকী, আখবার মাক্কা, সম্পা. Westenfeld, ১খ, ১৫৮; Repertoire, ১খ, ৯২-৩, নং ১১৬); কিন্তু কাবুল-শাহ্গণ কর্তৃক ইস্পাহবায উপাধি ব্যবহারের প্রমাণ অন্যত্র পাওয়া যায় না। সালজূকদের একজন তুর্কী দাস সেনাপতির ব্যক্তিগত নাম হিসাবেও 'ইস্পাহ্বায' শব্দটি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়ঃ ৪৮৭/১০৯৪ সন অথবা ৪৮৮/১০৯৫ সনে আমীর ইস্ফাবায ইব্ন সাওতিগীন আত্-তুরকুমানী মক্কার 'আলীপন্থী প্রশাসককে বিতাড়িত করিয়া কিছুকাল শহরটি অধিকারে রাখেন (ইবনু'ল-আছীর, ১০খ, ১৬৩; ইবনু'ল-কালানিসী, যায়ল তা'রীখ দিমাশ্ক, সম্পা. Amedroz, 130; আরো তু. ১৫৮)।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে, ৬ষ্ঠ/ ১২শ শতাব্দীর বিভিন্ন জর্জীয় গ্রন্থের মূল পাঠ ধার করা বিদেশী শব্দ স্পাস্পেতি (Spaspeti) [প্রধান সেনাপতি] যাহা ইস্পাহ্বায শব্দটি হইতে উদ্ভূত, 'আমীর স্পাসলারী' কথাটির সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্র. Georgian Academy of Sciences কর্তৃক প্রকাশিত Dictionary of Georgian, সম্পা. A. S. Chikobava, Tbilisi ১৯৫০ খৃ., ৬খ, কলাম ১১৩৪; M. Andronikashvili, Studies in Iranian, Georgian linguistic contacts, Tbilisi 1966, 371-2; আরও দ্র. ইস্পাহসালার)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (প্রবন্ধে উল্লিখিত উৎসসমূহ ছাড়াও দ্র.) (১) T. Noldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sassaniden, 139, 155-6, 437-8, 444; (২) H. Hubschmann, Armenische Grammatik, i, 22-3, 239-40 ; (৩) F. Justi, Iranisches Namenbuch, 306; (৪) J. Marquart, Beitrage zur Geschichte und Sage von Eran, in ZDMG, xlix (1895), 635-9; (৫) ঐ লেখক, Eransahr, 68, 71-2, 131, 165-7; (৬) A. Christensen, L' Iran sous les Sassanides[2], Copenhagen 1944, p. 99, 104, 130-1, 138, 336, 370-1, 518-21; (৭) Spuler, Iran, index; (৮) H. L. Rabino di Borgomale, L'histoire du Mazandaran, in JA, ccxliv (1943-5), 216-21; (৯) হাসান আল-বাশা, আল-আলকাবু'ল-ইসলামিয়্যা, কায়রো ১৯৫৮ খৃ., ১৩৯; (১০) W. Eilers, Iranisches Legngut im arab ischen Lexikon" uber einige Berufsnamen und Titel, in Indo-Iranian Journal, v (1962), 215; (১১) দা.মা.ই, ২খ, ৫৩৯-৪০।

C.E. Bosworth (E.I.[2])/ছালেমা খাতুন

**ইসপেনজে** (Ispendje) ঃ 'উছমানী শাসনামলে তুর্কী সাম্রাজ্যে প্রচলিত প্রাপ্ত বয়স্ক অমুসলিমদের উপর আরোপিত কর বিশেষ (Orfi-'উরফী)। সাধারণত এই করের পরিমাণ ছিল বাৎসরিক ২৫ আকচাস (Akcas) [রৌপ্য মুদ্রা]। শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে দুইটি ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার একটি 'পেনজিক' (Pendjik), Hammer-

Purgstall, (Staatsverfassung, i, ২১৩) এবং অপরটি স্পেনজা (Spenza" C. Truhelka, in THIM, i, ৬৩)। ব্যাখ্যা দুইটির কোনটিই প্রত্যয় উৎপাদক নয়। ৯ম/১৫শ শতকের প্রথমার্ধে দলীল পত্রে শব্দটির বানান ছিল ইস্পেনচে (Ispence) (যথা H. Inalcik, সম্পা., Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, আঙ্কারা ১৯৫৪ খৃ., ১৩০)। সুলতান প্রথম বায়েযীদের শাসনামলে সর্বপ্রথম এই করের উল্লেখ পাওয়া যায় (Arvanid, ১০৩)। উপরিউক্ত দফতর (৮৩৫/১৪৩১; দ্র. উক্ত দফতরের ভূমিকা, পৃ. ৩৩) অনুসারে বিবাহিত পুরুষের নিকট হইতে ২৫ রৌপ্য মুদ্রা আদায় করা হইত। এই সময়ে বিধবাদের নিকট হইতে প্রতি বৎসর ৬ রৌপ্য মুদ্রা দস্তুরী নামে আদায় করা হইত। সুলতান দ্বিতীয় মুহ'াম্মাদের কানূন-নামাহ্ অনুসারে (MOG, i, ২৮-৯) প্রত্যেক বিবাহিত মুসলিমকে সুলতানের সিপাহীকে বৎসরে ২৫ রৌপ্য মুদ্রা করিয়া দিতে হইত। যদি ঐ অমুসলিমের কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র সন্তান থাকিত তাহা হইলে ঐ পুত্র সন্তানের জন্যও ইস্পেনজে দিতে হইত। ১০ম/১৬শ ও ১১শ/১৭শ শতকের কানূন অনুসারে (দ্র. O. L. Barkan, Kanunlar, ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ., নির্ঘণ্ট) অনুরূপ পরিমাণ কর ধার্য করা হইত। কখনও কখনও ইহা ২৫ রৌপ্য মুদ্রার কম (২০ রৌপ্য মুদ্রা Kerkuk) কিংবা বেশীও (৩০ রৌপ্য মুদ্রা ঃ সাইপ্রাস) ধার্য করা হইত। কোন অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলে তাঁহাকে ইস্পেনজের পরিবর্তে বেন্যাক রেস্মী [দ্র.] (bennak resmi) (হ্রাসকৃত কর) প্রদান করিতে হইত।

'উছমানী শাসকগণ ইসপেনজেকে ব্যক্তিকর (Poll tex) হিসাবে অথবা চিফ্‌ট রেস্মী (Cift-resmi)-র বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করিতেন যাহা Timariot-এ প্রদত্ত হইত। সম্ভবত ইহা প্রথমে স্টেফান দুশান (Stefan Dushan) সাম্রাজ্যে ব্যক্তিকর হিসাবে প্রবর্তিত হয় এবং পরে 'উছমানী শাসকগণ তাহা প্রচলিত রাখেন। হাঙ্গেরীতে প্রচলিত কাপু রেস্মীকেই (Kapu resmi) 'উছমানী শাসনামলে ইস্পেনজে হিসাবে অভিহিত করা হয়। আনাতোলিয়াতে শুধু ১০ম/১৬শ শতকে ইহা 'উছমানী বিশেষ কররূপে প্রবর্তিত হয়। খৃস্টান সৈনিক যাহারা 'আসকেরী পদ লাভ করিত তাহারা ইসপেনজে কর হইতে রেহাই পাইত (Voynuk, doghandji, eflak, etc.)। কৃষকদের মধ্যে যাহারা খনিতে কাজ করিত কিংবা গিরিপথ পাহারা দিত তাহারা হয় এই কর হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইত অথবা ৬ কিংবা ১২ রৌপ্য মুদ্রা করিয়া দিত। সাধারণত ইসপেনজে স্থানীয় সরকারকে দিতে হইলেও কখনও কখনও উহা রাজকোষেও জমা হইত।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ H. Inalcik, Osmanlilar'da raiyyet rusumu, in Belleten, xxiii (1959), ৬০২-৮, পূর্ণ বরাতসহ।

H. Inalcik (E.I.[2]) / আলী আহমদ রুশদী

**ইস্ফারায়ীন** (اسفرايين) ঃ ইরানের খুরাসান প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি জেলা এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের একটি শহর। পশ্চিমে বিস্তাম ও শাহরূদ হইতে পূর্বে প্রায় নীশাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ সমভূমির উত্তর প্রান্তে অবস্থিত, সমভূমির মধ্যভাগ কাল-ই শূর নদী দ্বারা বিধৌত, নদীটি অতঃপর দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়া দাশ্ত-ই কাবীর-এ পতিত হইয়েছে। মধ্যযুগের ইসলামী আমলে নীশাপুর হইতে জুরজান পর্যন্ত বাণিজ্যিকপথ এই সমভূমির উপর দিয়া গিয়াছিল এবং ভূগোলবিদগণ ইসফারাঈনের অবস্থান উক্ত পথের মধ্যস্থলে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, নীশাপুর হইতে পাঁচ 'মনযিল' এবং জুরজান হইতেও পাঁচ 'মনযিল'-এর পথ।

স্থানটি ইসফানদিয়ার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত থাকিলেও ইসফারাঈনের প্রাক-ইসলামী যুগের ইতিহাস প্রায় কিছুই জানা যায় না। শুধু এইটুকু জানা যায় যে, তখন ইহা একজন দিহ্কান (دهقان)-এর অধীনে ছিল (ছা'আলিবী, গুরারু'স-সিয়ার, সম্পা. Zotenberg, পৃ. ৫৯১)। স্থানের এই নামটির জনপ্রিয় ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন য়াকূত। তাঁহার মতে শব্দটি ইস্পার আয়ীন (اسپر آيين) 'ঢালসদৃশ' হইতে উদ্ভূত এবং হয়ত হুদূদু'ল-আলামপ্রদত্ত 'সিপারায়ীন' (سپر آيين) বানানে উহাকে প্রভাবিত করিয়া থাকিবে। এইরূপও কথিত আছে, পূর্বে এই স্থানটির নাম ছিল মিহ্রাজান (مهرجان), ইসফারাঈনের রুসতাক'র একটি গ্রাম যাহা পরবর্তীকালে এই নামে পরিচিত ছিল।

৪র্থ/১০ম শতকের ভূগোলবিদগণ ইসফারাঈনকে প্রশাসনিকভাবে নীশাপুরের অন্যতম 'রুসতাক'-রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। মুকাদ্দাসীর মতে ইহার শহরটি ছিল এই "রুসতাক"-সমূহের শহরগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এইখানে পাঁচটি বাজার ও একটি সুরক্ষিত নগর-দুর্গ ছিল, সেইটির নাম ছিল 'সোনার প্রাসাদ' (قلعة زر)। অধিবাসিগণ ছিল শাফি'ঈ মাযহাবভুক্ত; ইসফারাঈন খুরাসানের শাফি'ঈপন্থিগণের সর্বশেষ অবস্থাগুলির অন্যতম ছিল। সমগ্র এলাকাটিতেই হানাফী মাযহাব দ্রুত বিস্তার লাভ করে। চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গ্রামের সংখ্যা ছিল ৪০ হইতে ৫০টি। সেইগুলিতে গম, ধান, আঙ্গুর ও অন্যান্য ফলমূল উৎপাদিত হইত। সাম্'আনী ও য়াকূত উভয়েই ইসফারাঈনের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচিত ধর্মতত্ত্ববিদ (متكلمون), ফাকীহগণ (فقهاء) ও আবু'ল-মুজাফ্ফার তা'হির ইব্ন মুহাম্মাদ আল-ইসফারাঈনী (মৃ. ৪৭১/১০৭৮-৯) যিনি নিজামু'ল-মুলক-এর আশ্রয়পুষ্ট এবং ফার্সী ভাষায় কুরআনের ভাষ্য তাজু'ত-তারাজিম রচনা করিয়াছিলেন। ইহা তাবারীর ভাষ্যের ফার্সী সংস্করণের পরে কৃত প্রাচীনতম ভাষ্যসমূহের অন্যতম (তু. G. Lazard, La langue des plus anciens monuments de la Prose Persane, প্যারিস ১৯৬৩ খৃ., ৯৪-৬)। ইস্ফারাঈনের অপর এক সুসন্তান ছিলেন গাযনীর সুলতান মাহ্মূদ-এর উযীর আবু'ল-'আব্বাস ফাদ্ল ইব্ন আহ্মাদ আল-ইসফারাঈনী (মৃ. ৪০৪/১০১৩-১৪)। অবশ্য খুরাসানে তাঁহার অত্যধিক কর আরোপের দরুন অধিবাসিগণের উপরে জুলুম হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিক 'উতবী উল্লেখ করিয়াছেন (তু. Barthold, Turkestan, পৃ. ২৮৭)।

পারস্যে মঙ্গোল অভিযানকালে সেনাপতি সুবেতাই (Subetey) ৬১৭/১২২০ সালে নীশাপুর হইতে আসিয়া ইসফারীন-এর ধ্বংস সাধন করেন; কিন্তু খুরাসানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল (তন্মধ্যে জুওয়ায়ন, জাজারম ও আরগিয়ান অন্তর্ভুক্ত) প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলিয়া মনে হয় এবং ৬৩০/১২৩৩ সালে ইহাকে খুরাসানের মঙ্গোল গভর্নর চিন তৈমুর (Cin-Temur)-এর অধীনস্থ জনৈক স্থানীয় মালিকের শাসনাধীনে রাখা হয় (জুওয়ায়নী-Boyle, ১খ., ১৪৬, ২খ, ৪৮৭)।

এক শতাব্দীকাল পরে মুস্তাওফী-র আমলে তখনও ইসফারাঈনে একটি সমৃদ্ধিশালী শহর ও কৃষিজ পশ্চাদ্ভূমি ছিল। শহরে পানি সরবরাহ হইতে নিকটস্থ নদী হইতে, আর গ্রামগুলি নির্ভরশীল ছিল কানাত (কাটা খালি)-গুলির উপরে। ঈলখানীদের আমলে ও পরে সাফাবীদের আমলে সেইখানে মুদ্রা তৈরির টাঁকশাল ছিল বলিয়াও জানা যায়।

সাফাবীদের আমলে ইসফারাঈন মাশহাদ প্রদেশের সঠিক উত্তর সীমান্তের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল এবং উযবেকদের বার বার আক্রমণে ইহা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তন্মধ্যে ১০০৬/১৫৯৭ সনের কিছু পূর্বের ধ্বংসলীলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১২শ/১৮শ শতকে আফগানরা পুনরায় তাহার ধ্বংস সাধন করে। বর্তমানে শাহ্‌র-ই বিল্‌কীস নামে পরিচিত ধ্বংসাবশেষই খুব সম্ভবত মধ্যযুগের সেই ইসফারাঈন শহর (তু. Yate, Khurasan and Sistan, পৃ. ৩৭৮-৮৯)। বর্তমানে ইসফারঈন এলাকা সমৃদ্ধিশালী ও উর্বর, ফলমূল উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। ১৯৫৮ খৃ. পর হইতে ইহা খুরাসানের একটি আলাদা ঝিলা বা শাহ্‌রিস্তানে পরিণত হইয়াছে। জেলার প্রধান শহর মিয়ানাবাদ।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ ৪র্থ/ ১০ম শতকের ভূগোলবিদগণের (য়া'কূ'বী, ইব্‌ন হাওকাল, মুকাদ্দাসী, হুদূদু'ল-'আলাম) গ্রন্থাবলীতে বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়, দ্র. নির্ঘন্টসমূহ; (১) য়াকূত, বুল্‌দান, ১খ, ২৪৬; (২) সাম'আনী, আন্‌সাব, পত্রক ৩৩ b—৩৪a, ৫৪৫ b; (৩) মুসতাওফী, নুযহা, অনু. পৃ. ১৪৮; (৪) Barbier de Meynard, Dictinaire geographique, historique et litteraire de la Perse, প্যারিস ১৮৬১ খৃ., পৃ. ৩৪-৫, ৫৫২; (৫) C. E. Yate, Khurasan and Sistan, এডিনবার্গ ১৯০০ খৃ., পৃ. ৩৮৩ প.; (৬) Le Strange, পৃ. ৩৯৩; (৭) B. R. Spooner, Arghiyan, The area of Jajarm in western Khurasan, in Iran শীর্ষক প্রবন্ধ, Journal of the British Institute of Persian Studies-এ প্রকাশিত, ৩খ. (১৯৬৫ খৃ.), ৯৭-১০৮।

C. E. Bosworth (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

**আল-ইস্‌ফারাঈনী** (الاسفرايينى) ঃ আবূ ইস্‌হাক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মিহ্‌রান আল-মিহ্‌রজানী ছিলেন আশ্'আরী ধর্মতত্ত্ববিদ ও শাফি'ঈ ফাকীহ, ৫ম/ ১১শ শতকের শুরুতে নীশাপুরে ইব্‌ন ফূরাক (দ্র.)-সহ আশ্'আরী ধর্মতত্ত্বের প্রধান প্রচারক। জন্ম ইস্‌ফারায়ীন-এ, প্রধানত বাগদাদে শিক্ষাপ্রাপ্ত, যথায় তিনি উপনীত হইয়া থাকিবেন অবশ্যই ৩৫১/ ৯৬২ সনের পূর্বে। আল-বাকিল্লানী (দ্র.) ও ইব্‌ন ফূরাকের সহিত একই সময়ে তিনি আবু'ল-হাসান আল-বাহিলী-র আশ্'আরী ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। বাগদাদ ত্যাগ করিবার পর তিনি ইস্‌ফারাঈনে শিক্ষকতা করেন। পরে তিনি নীশাপুর গমনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্য তথায় একটি মাদ্‌রাসা নির্মিত হয়। গাযনার সুলতান মাহ্‌মুদের দরবারে তিনি কার্‌রামী 'আলিমগণের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হন। ৪১১/১০২০ হইতে তিনি নীশাপুর জামি' মসজিদে হাদীছ শিক্ষা দানের লক্ষ্যে অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। মুহাররাম ৪১৮/ ফেব্রুয়ারী ১০২৭ সনে মৃত্যুর পর ইস্‌ফারাঈনে আনিয়া তাঁহার লাশ দাফন করা হয়। ৬ষ্ঠ/ ১২শ শতক পর্যন্ত বহু ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহার মাযার যিয়ারাত করিতে আসিতেন।

শাফি'ঈ ফিক্‌হ (উসূলু'ল-ফিক্‌হ) ও কালাম বিষয়ে লিখিত তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে কোনটিই বিদ্যমান নাই। কিন্তু পরবর্তী রচনাসমূহে তাঁহার মতবাদের বহুল উল্লেখ তাঁহার মৃত্যুর পর বহু যুগ পর্যন্ত তাঁহার রচনাগুলির জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করে। আশ্'আরী মতবাদ সম্প্রসারণ কর্মে তদীয় যুগে তিনি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্দেশ প্রদান করেন এমন নূতন ভূমির যাহাতে স্বয়ং মতবাদের প্রবর্তকও বিচরণ করেন নাই। কাররামিয়্যাগণের সর্বেশ্বরবাদের (anthropomorphism) বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইব্‌ন ফূরাকের ন্যায় তিনি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন এক অধিকতর বিমূর্ত মতবাদ সমর্থন করেন, যাহা আশ'আরীবাদ অপেক্ষা বরং মু'তাযিলীবাদেরই নিকটতর ছিল। আশ্'আরী ছিলেন মু'তাযিলীগণের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ 'ইল্‌ম, নুবূওয়াত, কালামুল্লাহ্‌র প্রকৃতি ও মানুষের কর্ম বিষয়ে ইসফারাঈনীর মতবাদের বিপরীত এবং অনেক সময়েই মু'তাযিলী মতবাদের নিকটতর ছিল। তিনি আল-বাকিল্লানী অপেক্ষা মিথ্যা কথন সম্পর্কে নবীগণের প্রতি ব্যাপকতর নিষ্পাপতা (দ্র. 'ইস্‌মাঃ) আরোপ করিয়াছেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে, আওলিয়ার কারামাত নবীগণের মু'জিযাত-এর স্তরে উপনীত হইতে পারে না। আওলিয়ার কারামাতের সম্ভাব্যতা প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে তিনি মু'তাযিলী অবস্থানের প্রতি আকৃষ্ট বলিয়া আল-জুওয়ায়নী মন্তব্য করিয়াছেন। আল-বাকিল্লানীর সহিত প্রায় ঐকমত্যে তিনি আল্লাহ্‌র চিরন্তন বাণী (كلام ازلى) যাহা তাঁহার মতে শ্রবণ করা সম্ভব নহে) এবং কুরআনের অলৌকিক অননুকরণীয়তার মূলে রহিয়াছে উহার ত্রুটিমুক্ত রচনাশৈলী ও অতুলনীয় শব্দালংকার। এই মতের বিপরীতে তিনি মু'তাযিলী আন-নায্‌য মত সমর্থন করিয়া বলিতেন যে, আল্লাহ মানুষকে কুরআন অনুকরণ হইতে বিরত রাখেন। আল-বাকিল্লানীর ন্যায় তিনিও মানুষের কর্মতৎপরতা বিষয়ক কাস্‌ব (كسب)-এর ধারণা (concept)-র ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন, অথচ আশ'আরীগণের মতবাদে ইহার কোন গুরুত্বই ছিল না। কেননা এই মতবাদ একান্তভাবে আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতার (Omnipotence) উপর জোর দিত। মু'তাযিলী মতবাদের সহিত ঐক্য স্থাপন ও প্রচলিত আশ'আরী মতের বিরোধিতা করিয়া তিনি এই মত পোষণ করিতেন যে, নবীগণের প্রচারের মুখাপেক্ষী না হইয়া যুক্তির মাধ্যমে আল্লাহ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভই মানুষের সর্বপ্রথম কর্তব্য। আর সাধ্যাতীত কর্মে বাধ্যকরণ (تكليف ما لا يطاق) আল্লাহ মানুষকে দিতে পারেন— এই মতবাদের তিনি বিরোধিতা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-'আব্বাদী, কিতাবু তাবাকাতি'ল-ফুকাহা'ই'শ-শাফি'ইয়্যাঃ সম্পা. G. Vitestam, Lieden ১৯৬৪ খৃ., ১০৪; (২) আবু'ল-মুজাফ্‌ফার আল-ইসফারাঈনী, আত-তাবসীর ফি'দ-দীন, সম্পা. 'ইয্‌যাত আল-'আত্তার আল-হুসায়নী, কায়রো ১৯৪০ খৃ., ৬৬; (৩) আবূ ইস্‌হাক আশ-শীরাযী, তাবাকাতু'ল-ফুকাহা', বাগদাদ ১৩৫৬ হি., ১০৬; (৪) সাম'আনী, fol. 33v; (৫) আল-সারীফীনী, আল-মুনতাখাব মিন কিতাবি'স-সিয়াক লি-তা'রীখ নীসাবূর, সম্পা. R. N. Frye, The Histories of Nishapur, The Hague ১৯৬৫ খৃ., fol. 25 f.; (৬) ইব্‌ন 'আসাকির, তাবয়ীনু কাযিবি'ল-মুফ্‌তারী, সম্পা. আল-কুদ্‌সী, দামিশ্‌ক ১৩৪৭ হি., ২৩৪ প.; (৭) আস-সুব্‌কী তাবাকাতু'শ-শাফি'ইয়্যাতি'ল-কুব্‌রা, কায়রো তা. বি., ৩খ. ১১১-৪; (৮) কামালু'দ-দীন আল-বায়াদী, ইশারাতু'ল-মারাম, সম্পা. য়ুসুফ 'আব্‌দু'র-রায্‌যাক, কায়রো ১৯৪৭ খৃ., ৫৪, ৮৪, ২৪৯; (৯) ইব্‌ন খাল্লিকান, নং ৪; (১০) Brockelmann, S I, ৬৬। মতবাদ বিষয়েঃ

(১১) M. Horten, Die Philosophischen Systeme der Spekulativen Theologie im Islam, Bonn, ১৯১২ খৃ., ৫৫৬ প.; (১২) A. S. Tritton, Muslim theology, লন্ডন ১৯৪৭ খৃ., ১৮৪। প্রদত্ত বরাতগুলির অতিরিক্ত ঃ (১৩) আল-জুওয়ায়নী, আশ-শামিল, সম্পা. H. Klopfer ১খ., কায়রো ১৯৬১ খৃ., স্থা.; (১৪) ঐ লেখক, আল-ইর্শাদ, সম্পা. এম. ওয়াই. মূসাা ও এ. এ. 'আবদু'ল-হামীদ, কায়রো তা.বি., ৩১৬, ৩৩৩। জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে মতবাদ বিষয়ে ঃ (১৫) J. von Ess, Die Erkenntnislehre des ĖAddaddin al-Ici, Wiesbaden ১৯৬৬ খৃ., নির্ঘন্ট, দ্র. শিরো. ইসফারা'ঈনী।

W. Madelung (E.I.[2])/ হুমায়ুন খান

**ইসফাহান** ঃ আরবীতে اصفهان। 'ফা' হরফের স্থলে 'বা' হরফে উচ্চারিত, ইরানের একটি শহর ও প্রদেশ, হামযা আল-ইসফাহানীর মতে উহার নামের অর্থ সেনাবাহিনী (মাফার্রুখী, কিতাব মাহাসিন ইসফাহান, সম্পা. সায়্যিদ জালালু'দ-দীন তিহরানী, তেহরান তা. বি., পৃ. ৫-৬)।

১। ইতিহাস

প্রদেশটির সুনির্দিষ্ট চতুঃসীমা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় মরুভূমি দ্বারা উহার উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব সীমানা বেষ্টিত। দক্ষিণ-পূর্ব সীমানা য়াযদ ও ফার্স অঞ্চল, আর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানা বাখতিয়ারী পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত। উহার কোন কোনও শৃঙ্গ ১১ হাজার ফুট হইতেও উচ্চতর। উহার উত্তর-পশ্চিমে লুরিস্তান, কায্যায, কামারা ও মাহাল্লা, এলাকা এবং উত্তরে ৫ হইতে ৭ হাজার ফুট উচ্চতায় জাওশাকান ও নাতান্য জেলা অবস্থিত। সেইখানে আরও অনেক উচ্চ গিরিশৃঙ্গ রহিয়াছে। সাসানী শাসকদের আমলে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশরূপে কেন্দ্রীয় মর্যাদা ভোগ করিত (তু. Christensen, L'Iran Sous Sassanides[2], কোপেনহেগেন ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ৫০৬)। হযরত 'উমার ইব্নু'ল-খাত্তাব (রা) আরও অধিক রাজ্য জয়ের পরিকল্পনা সম্পর্কে শাসনকর্তা হুরমুযান-এর পরামর্শ চাহিলে তিনি ইসফাহান অবরোধ করার পরামর্শ দেন। শহরটিকে তিনি মস্তকের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলেন যে, উহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে উহার আযারবায়জান ও ফার্স—এই দুইটি পাখারও পতন ঘটিবে (বালাযুরী, ফুতূহ, কায়রো ১৯৫৭ খৃ., ২খ, ৩৭১-২; আবূ নু'আয়ম, Geschichte Isbahans, সম্পা. S. Dedering, লাইডেন ১৯১৩ খৃ., ১খ, ২১ ; মাফার্রুখী, পৃ. ৬)। বাল'আমী ফার্স ও কিরমানকে ইসফাহানের দুইখানি হাতের সঙ্গে আর আযারবায়জান ও রায়কে উহার দুইখানি পায়ের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন (তারজমা-ই তা'রীখ-ই তাবারী, সম্পা. মুহাম্মাদ জাওয়াদ মাশকূর, তেহরান ১৯৫৯-৬০ খৃ., পৃ. ৩২৬)।

'আরবগণ কর্তৃক বিজিত হইলে ইসফাহান জিবাল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়—পূর্বে উহাই ছিল মেদিয়া। ৬ষ্ঠ/১২শ শতকে উহা 'ইরাক-ই 'আজাম নামে পরিচিত ছিল (G. Le Strange, The lands of the Eastern Caliphate, পৃ. ৫, ১৮৫)। হামযার মতে হামাদান ও মাহ নিহাওয়ান্দ হইতে কিরমান, আর রায় ও কূমিস হইতে ফার্স ও খুযিস্তান পর্যন্ত ইসফাহানের সীমানা বিস্তৃত ছিল। উহা প্রাক-ইসলামী যুগে তিনটি উসতান, ৩০টি রুসতাক, ১২০টি তাসূজ, ৫ হাজার গ্রাম ও ৭টি নগরী লইয়া গঠিত ছিল; তন্মধ্যে ৪টি ধ্বংস হইয়া যায়। অতঃপর ২ কূরা, ২৭ রুসতাক ও ৩৩১৩টি গ্রাম লইয়া প্রদেশটি টিকিয়া থাকে। 'আরবদের আগমনের পর আরও দুইটি নগরী ধ্বংস হইলে শুধু 'জায়' (আবূ নু'আয়ম, পৃ. ১৪) অবশিষ্ট থাকে। ১৮৯/৮০৪-৫ সনে খলীফা হারূনু'র-রাশীদ, ৪টি রুস্তাক লইয়া গঠিত কুম্মকে তাহার সহিত সংযুক্ত হামাদান ও নিহাওয়ান্দের রুসতাকগুলির অংশগুলিসহ ইসফাহান হইতে পৃথক করিয়া দেন। ইহার পর মাত্র ২৩টি রুসতাক ইসফাহান-এর এলাকাভুক্ত থাকে (আবূ নু'আয়ম, পৃ. ১৪; হাসানা ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান কুম্মী, তা'রীখ-ই কুম্ম, সম্পা. সায়্যিদ জালালু'দ-দীন তিহরানী, তেহরান ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ২৪-৫, ২৮ প., ৫৭ ও ১০১)। খলীফা আল-মু'তাসিম ইসফাহান হইতে ৪টি রুসতাক এবং নিহাওয়ান্দ ও হামাদান হইতে কয়েকটি ভূভাগ লইয়া কারাত-কে একটি কূরারূপে গঠন করিয়া ইহার আরও পরিবর্তন সাধন করেন। অতঃপর ১৯টি রুসতাক, ১টি কূরা ও ২৫০০ গ্রাম সমন্বয়ে ইসফাহান পুনর্গঠিত হয়।

মোঙ্গল শাসনাধীনে ইসফাহান প্রদেশটিতে ইসফাহান-লিন্জান-এর বুলূক (প্রশাসনিক ইউনিট)-এর অন্তর্ভুক্ত ফীরূযান ও রূদাশত-এর অন্তর্গত ফারিফা'আন—এই তিনটি প্রধান নগরী ছিল। উহাতে ছিল ৮টি বুলূক ও ৪০০ গ্রাম এবং তৎসহ ছিল ঐ সকল গ্রামের বিস্তর কৃষিযোগ্য জমি। এই বুলূকগুলি হইল ৭৫ খানি গ্রাম লইয়া 'জায়' (ইসফাহান শহর ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা উহার অন্তর্গত), ২৩ খানি লইয়া কারারিজ, ৪০খানি লইয়া কুহাব—উভয়ই শহরটির দক্ষিণে অবস্থিত, ৮০খানি গ্রাম লইয়া বারা'আন, পূর্বদিকে ৬০ খানি লইয়া রূদাশ্ত, উত্তর দিকে ৩২ খানি লইয়া বুর্খওয়ার ও পশ্চিমদিকে ৫৮ খানি লাইয়া মারবীন, ২০ খানি লইয়া লিনজান (হামদুল্লাহ মুসতাওফী, নুযহাতু'ল-কুলূব, সম্পা. G. Le Strange, লন্ডন ১৯১৯ খৃ. পৃ. ৪৮, ৫০-১) গঠিত।

উনিশ শতকে ইসফাহান একটি বৃহৎ প্রদেশ হইয়া উঠে। ৯টি বুলূকে বিভক্ত প্রদেশটিতে লিনজান-এর উত্তরে অবস্থিত কারভান ছিল ৯ম বুলূক। ইহাতে ছিল রার, কিয়ার, মীযদাজ ও গান্দুমান (সমন্বয়ে গঠিত চাহার মাহাল্ল), সিমীরুম, জারকূয়া, আর্দিস্তান ও কুহপায়া (আরদিস্তানের দক্ষিণে ও ইসফাহানের পূর্বে যায়ানদা-রূদ নদীর উভয় তীরে)-এই আটটি মাহাল্ল; নাজাফাবাদ ও কুমিশা (হাল নাম শাহ্রিদা) এই দুইটি কাসাবা; চাদাগান, ভারযাক', তুযমাকলু, গুরজী ও চিলারূদ-এই পাঁচটি নাহিয়া, যাহার সমন্বয়ে গঠিত ছিল ফিরায়দান (মুহাম্মদ মিহদী ইব্ন মুহাম্মাদ রিদা আল-ইসফাহানী, নিসফ-ই জাহান ফী তা'রীখি'ল-ইসফাহান, সম্পা, মানুচিহর সুতূদা, তেহরান ১৯৬২-৩ খৃ., পৃ. ২১-২, ২৯৬-৩৩৬; A. Houtum-Schindler, Eastern Persian Irak, লন্ডন ১৮৯৮ খৃ., পৃ. ১২৫-৯)। অবনতির কারণে কারারিজ ও বারা'আন এবং অপরিবর্তিত থাকার কারণে রূদাশ্ত-এর কথা বাদ দিলে বুলূকগুলিতে উনিশ শতকে গ্রামের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় (হাসান খান শায়খ জাবিরী আনসারী, তা'রীখ-ই নিস্ফ-ই জাহান ওয়া হামা-ই জাহান, লিথু., তা. বি., পৃ. ১৬৮ পৃ.)। রিদা শাহের অধীনে ইসফাহানকে একটি জেলা বা বিভাগ (শাহরিস্তান)-এর মর্যাদায় অবনমিত করা হইলে উহা ১০ম উস্তান-এর অঙ্গীভূত হয়। স্বতন্ত্র শাহরিস্তানরূপে যাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল শাহর-ই কুর্দ, শাহরিদা, ফিরায়দান, য়ায্দ, আরদিস্তান ও নাঈন (হাসান 'আবিদী, ইসফাহান আয্ লিহাজ-ই ইজতিমা'ঈ ওয়া ইকতিসাদী, ইসফাহান ১৯৫৬-৭ খৃ., পৃ. ৬)। ১৩১৯/১৯৪১-২ সনের আদমশুমারী

অনুযায়ী ইহার জনসংখ্যা ছিল ২,৪০,৫৯৮। ইসফাহান, সিদিহ, ফালাভারজান, নাজাফাবাদ ও কুহপায়া শহর লইয়া যে শাহরিস্তান এলাকা গঠিত, ১৯৫৬-৭ খৃ. তাহার লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৮,৮০,০২৭ জনে (ঐ, পৃ. ৫৩)।

প্রকৃতপক্ষে আবহাওয়া দিক দিয়া ইসফাহান একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রদেশ। ফিরায়দান ও চাহার মাহাল্লে হইতে শুরু করিয়া যেইখানে মেষ পালকেরা তাঁবু খাটাইয়া মেষ চরায় এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলসমূহ, ইসফাহানের অতি উর্বর নদীমাতৃক সমভূমি এলাকা এবং পূর্বে ও উত্তর-পূর্বে কাভির সীমান্তের জেলাসমূহ লইয়া ইহা গঠিত। ফিরায়দান ও চাহার মাহাল্লের পার্বত্য জেলাগুলিতেই বৃষ্টিপাত সর্বাধিক—যেখানে শীতকালে প্রবল তুষারপাত ও আনুমানিক ১০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। ইসফাহান শহরের বার্ষিক বৃষ্টিপাত আনুমানিক ৫ ইঞ্চি আর বর্ষাঋতু প্রধানত নভেম্বর-এপ্রিল মাস পর্যন্ত। শীতকালে উত্তর-পশ্চিম দিক আর গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। এলাকার তাপমাত্রা ভূভাগের উচ্চতার উপরে নির্ভরশীল। আগস্ট ও জানুয়ারী মাসে যথাক্রমে তাপ ও শৈত্যের চরম আধিক্য ঘটে। পার্বত্য জিলাগুলিতে শীতকালে শৈত্যের আধিক্য হইলেও গ্রীষ্মকালে তাপ বৃদ্ধি খুব বেশী হয় না। ইসফাহানের পার্শ্ববর্তী এলাকার ঋতুগুলির প্রভাব খুবই নিয়মিত। আগস্ট মাসে শহরটির তাপমাত্রার সর্বোচ্চ মাসিক গড় ৩৬.১ সে. এবং জানুয়ারী মাসে উহার তাপমাত্রার সর্বনিম্ন মাসিক গড়-২.০ সে; বায়ুর আর্দ্রতা কম। ৩২৪/ ৯৩৬, ৩৪৪/৯৫৫-৬ সনে মহামারীরূপে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া সরকারী নথিপত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে (Von Kremer, Culturgeschichte, ভিয়েনা ১৮৭৫ খৃ., ২খ., ৪৯২)। আবার ৪২৩/১০৩১-২ সনে উহার আক্রমণে ৪ হাজার লোকের মৃত্যু হয় (ইব্নু'ল-আছীর, ৯খ, পৃ. ২৯০)। ইহা ব্যতীত ৮১০/১৪০৭-৮ সনেও প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয় ('আবদু'র-রায্যাক, মাত'লা'উ'স-সা'দায়ন, সম্পা. মুহাম্মাদ শাফী', লাহোর ১৯৪১ খৃ., ১খ, ১১০)। রাবী'উ'ল-আওওয়াল ২৩৯/৮৫০ সনে মাত্র একবার ভয়াবহ ভূমিকম্প হইলে এখানে বহু লোক নিহত হয় (Houtum-Schindler, পৃ. ১২৪; মুহাম্মাদ মিহ্দী, পৃ. ৯৬)।

ফিরয়াদান ও চাহার মাহাল্লা—যেখানে শুষ্ক মওসুমে চাষাবাদ প্রচলিত—এই অঞ্চলগুলি ব্যতীত আর সকল স্থানে কৃষিকার্যে সেচের জন্য নদীর পানি, কানাত অথবা কুয়ার পানি ব্যবহৃত হয়। ইসফাহানের সমভূমিতে ১২-১৫ ফুট নীচেই পানি পাওয়া যায় (মুহাম্মাদ মিহ্দী, পৃ. ৮৩)। সম্প্রতি এখানে বহু সংখ্যক যন্ত্র চালিত কূপ খনন পানির স্তর নিম্নগামী হওয়ার একটি কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যায়ান্দা-রূদ বা যান্দা-রূদ (ইহাকে ইব্ন রুস্তা, মাফাররুখী ও অন্যরা যারীন-রূদ নামে আখ্যায়িত করেন) নদী যারদাকূহ পর্বতের পূর্বদিকস্থ ঢালু অংশে উৎপন্ন হইয়া ফিরায়দান ও চাহার মাহাল্লের বিভিন্ন উপনদী হইতে গৃহীত পানি লইয়া ইসফাহানের ভিতর দিয়া দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে শহরটির পূর্বদিকে অবস্থিত গাব্খওয়ানী জলাভূমিতে বিলীন হয়। যে লিনজান এলাকায় যায়ান্দা-রূদ ইসফাহান সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে, সেই স্থান হইতে গাব্খওয়ানী পর্যন্ত দীর্ঘ উক্ত নদী সমগ্র লিনজান, মারবীন, জায়, ফারারিজ, বারাআন ও রূদাশত বুলূকসমূহে ১০৫টি খালের (স্থানীয়ভাবে মাদীস নামে অভিহিত) মাধ্যমে সেচের পানি সরবরাহ করে। আর্দাশীর ইব্ন বাবাক (১৫৫ খৃ.)-ই মূল পানি বিতরণ ব্যবস্থার প্রবর্তক বলিয়া ইব্ন রুস্তা মনে করেন। ইতিবৃত্ত অনুযায়ী শাহ 'আব্বাসই আধুনিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার প্রবর্তক। লিনজান হইতে গাব্খওয়ানী পর্যন্ত দীর্ঘ নদীটির উপরে ১২টি স্থায়ী ও ২টি অস্থায়ী সেতু দ্বারা উভয় তীর সংযুক্ত। ইহাদের সর্বশেষটির একটিতে নদীর উভয় তীরে সেচের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য ভারযানায় ৩টি বাঁধ নির্মাণ করা হয়। উহাদের প্রথমটি বান্দ-ই মারওয়ান, উমায়্যা শাসনামলে নির্মিত হয় (ইব্ন হাওক'াল, ২খ, পৃ. ৩৬৫-৬; মুহাম্মাদ মিহ্দী, পৃ. ১৬-১৭, ৯৪-১০৪; Houtum-Schindler, পৃ. ১৭১৮; হুসায়ন খান তাহ'বীলদার-ই ইস'ফাহান, জুগ্রাফিয়ায়ি ইসফাহান, সম্পা. মানূচিহ্র সুতূদা, তেহরান ১৯৬৪-৫ খৃ., পৃ. ৩৭ প.; A.K.S. Lambton, The Regulation of the waters of the Zayanda Rud in BSOAS, ৯/৩খ., ১৯৩৭-৯ খৃ., পৃ. ৬৬৩-৭৩)। কূহরাং-এর নিকট নির্মিত একটি সুড়ঙ্গ দ্বারা কারূন নদীকে যায়ান্দা রূদের সঙ্গে ১৯৫৪ খৃ. সংযুক্ত করা হইলে উহা কার্যত যায়ানদা-হ্রদের পানির প্রবাহ বৃদ্ধি করে। প্রথমে শাহ তাহ্মাসপ এই পরিকল্পনাটির চিন্তা করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী শাহ 'আব্বাস কূহরাং-এর সন্নিকটবর্তী পর্বতের মধ্য দিয়া সুড়ঙ্গটি কাটিতে থাকেন, কিন্তু সমাপ্তির পূর্বেই কার্যটি পরিত্যক্ত হয়। কূহরাং-এর ভিতর দিয়া নদীদ্বয়ের সংযোগ সাধনের লক্ষ্যে রিদা শাহের আমলে আবার সুড়ঙ্গ কাটার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ('আবিদী, পৃ. ৭৪)। ১৯৭০ খৃ. কাভান্দ জেলায় বৃহৎ শাহ 'আব্বাস বাঁধ উদ্বোধন করা হয়। বাঁধটি পানির প্রবাহকে সারা বৎসর এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি আর কখনও গাব্খওয়ানী জলাভূমিতে প্রবেশ করে নাই। জনশ্রুতি এই যে, উহা এখন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে।

প্রাচীন ইসলামী ভূগোলবিদদের অনেকে, মাফাররুখী, তাঁহার গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবি'র-রিদা আভী (তারজুমা-ই মাহাসিন-ই ইস'ফাহান, সম্পা. 'আব্বাস ইকবাল, তেহরান ১৯৪৯-৫০ খৃ.) ও অন্য অনেক গ্রন্থকার ইসফাহানের অতি উৎকৃষ্ট আবহাওয়া ও ফসলের প্রাচুর্যের কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে আছে গম, যব, ভুট্টা, আফিম, যাহা ১৯শ শতকে ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ রফতানী পণ্য (Curzon, Persia and the Persian question, লন্ডন ১৮৯২ খৃ., ২খ., ৪২; মুহাম্মাদ মিহ্দী, পৃ. ১২৫), চাউল (লিনজান ও আলিনজান এলাকায়), তুলা, তামাক, বিভিন্ন তৈলবীজ, নানা প্রকার ডাল, শুঁটী, রীট, রঞ্জক, লতা, জাফরান, নানা প্রকার শাকসবজি ও লতাগুল্ম, ফুটি, খরমুজ, তরমুজ, বিভিন্ন জাতের ফল, কাগজি বাদাম ও চীনা বাদাম (ইব্ন হাওক'াল, ২খ, পৃ. ৩৬৩-৭; মুকাদ্দাসী, পৃ. ৩৮৬-৯; ইসতাখরী, পৃ. ১৯৮-২০০; হুসায়ন খান তাহ'বীলদার, পৃ. ৪৩ প.; শায়খ জাবারী আনসারী, পৃ. ১৬৮ প.; মুহাম্মাদ মিহ্দী, পৃ. ১৯-২০, ১১৩-২৫)। ইসফাহানের কৃষক মিতব্যায়িতা ও উত্তম চাষাবাদের জন্য বিখ্যাত (A. K. S. Lambton, The Persian Land Reform/1962-66, অক্সফোর্ড ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ১৪৫)। অনেক পর্যটক মন্তব্য করিয়াছেন যে, জীবজন্তুর

গোবর, সার, রাস্তার নর্দমায় নিষ্কাশিত আবর্জনা, কবুতরের বিষ্ঠা যাহা উহাদের জন্য নির্মিত উচ্চ বাসা হইতে সংগ্রহ করা হয়, ইসফাহানের সমতল অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের একটি বৈশিষ্ট্য (দ্র. Curzon, ২ খ., ১৯-২০), ঐতিহ্যগতভাবে এইগুলিই ইসফাহানের চারিদিকে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। হামদুল্লাহ মুস্তাওফী ইসফাহানের সন্নিহিত অঞ্চলে উৎকৃষ্ট গোচারণ ভূমির উল্লেখ করিয়াছেন (নুযহাত, পৃ. ৪৯)। প্রদেশটির অনেক অংশে জীবিকা অর্জনের সম্পূরক উৎস হিসাবে মেষ পালন করা হয় এবং ফিরায়দান ও চাহার মাহাল্লা-এ উহাই জীবিকার প্রধান উৎস। এই জেলা দুইটি হইতে ইসফাহানে পর্যাপ্ত গোশ্ত সরবরাহ করা হইত। অতীতে চাহার মাহাল্লে গুরুত্বের সঙ্গে অশ্ব ও খচ্চর প্রজনন ও লালন-পালনের কাজ করা হইত (শায়খ জাবারী আনসারী, পৃ. ১৮২-৩) এবং আদিস্তান জেলায় উট রাখা (ঐ, পৃ. ১৯১) হইত। প্রদেশটির বিভিন্ন অংশে কম্বল ও কার্পেট বয়ন করা হইত। ইসফাহান বস্ত্রশিল্প (তু. Olearius, The voyages and travels of the ambassadors. লন্ডন ১৬৬৯ খৃ., পৃ. ২২৫), বর্ম নির্মাণ ও পিতলের তৈজসপত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্বে কুহিস্তান ও তায়মারার খনিগুলি হইতে স্বল্প পরিমাণ খনিজ ধাতু উত্তোলন করা হইত (আবূ নু'আয়ম, ১খ., ৩২; মাফাররুখী, পৃ. ১৮ ও ৩৯)। কিন্তু ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ঐগুলি আর চালু নাই (মুহাম্মাদ মিহদী, পৃ. ২০)। ইসফাহান নগরী ৫১.৩৫ প. দ্রা. ও ৩২৪০ উ. অ-এ এবং সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৫২০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। শুরুতে এই নগরী 'জায়' নামক গ্রাম যাহা শাহরিস্তান বা শাহরিস্তানা নামেও পরিচিত, উহাকে কেন্দ্র করিয়া স্থাপিত হয়। ইহার দুই মাইল পশ্চিমে য়াহূদিয়্যা নামক উপনিবেশ ছিল। সেখানে Nebuchadnezzar Rev. des Etudes Juives, ১২খ., ২৫৯; ইব্নু'ল-ফাকীহ, পৃ. ২৬১) কিংবা ১ম য়াযদিগিরদ, শোশানদুখত নাম্নী তাঁহার য়াহূদী স্ত্রীর অনুরোধে য়াহূদীগণকে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে দেন বলিয়া ধারণা করা হয় (E. Blochet, Liste des villes, প্যারা ৫৪, in Recuil des travaux, ১৭খ., ১৮৯৫ খৃ.; J. Marquart, Eransahr, পৃ. ২৯)। ইব্ন রুস্তা লিখিত লোককাহিনীতে নগর দুর্গটি কায়কা'উস (দ্র.) নির্মাণ করেন বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে। পরবর্তী কালে য়াহূদিয়্যা এলাকা নগরীর কেন্দ্র ও শাহরিস্তান উহার উপকণ্ঠে পরিণত হয়।

কেন্দ্রস্থলে উহার অবস্থানের দরুন 'আরব অধিকারে আসার পর হইতেই ইসফাহান প্রদেশটিকে দেশটির অধিকাংশ ভাগ্য পরিবর্তনের আঘাত সহ্য করিতে হয়। তথাপি অধিবাসীরা লক্ষণীয়ভাবে, অবশ্য কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ভূভাগ ব্যতীত. . ., বিশেষত ফিরায়দান ও চাহার মাহাল্ল যেখানে বাখ্তিয়ারী উপজাতি (দ্র.) বাস করে, ইসফাহান শহরে বসবাসকারী অল্প সংখ্যক য়াহূদী ও খৃষ্টান সংখ্যালঘু। অবশিষ্ট অংশে যে সকল রাজবংশ একের পর এক প্রদেশটিকে শাসন করিয়াছে তাহারা বহিরাগত যে সকল লোকজনকে স্থায়ীভাবে বসবাস করাইয়াছে উহারাও স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে (তু. হুসায়ন খান তাহবীলদার, পৃ. ৯১-২)। উপরে বলা হইয়াছে যে, প্রাচীনকাল হইতেই য়াহূদীরা ইসফাহান শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়া আসিতেছে। ৬ষ্ঠ/১২শ শতকে 'তুদেলা'র বেনজামিন লিখিয়াছেন, তখন শহরটিতে ১৫ হাজার য়াহূদী বাস করিত (Elkan Adler, Jewish Travellers, লন্ডন ১৯৩০ খৃ., পৃ. ৫৩)। ১৯শ শতক নাগাদ তাহাদের সংখ্যা কমিয়া যায়। Curzon সংখ্যাটিকে ৩৭০০ বলিয়াছেন (১খ., ৫১০; W. J. Fischel, Isfahan, the story of a Jewish community in Persia, in The Joshua Starr Memorial Volume, নিউ ইয়র্ক ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ১১ প.)। শাহ 'আববাস-এর আমলে জুলফা হইতে আর্মেনীয়গণকে আনয়ন করিয়া ইসফাহানের দক্ষিণে একটি উপকণ্ঠে স্থায়ীভাবে বসবাস করান হইলে উহা নও-জুলফা নামে পরিচিত হয়। ১১শ/১৭শ শতকের শেষের দিকে তাহাদের সংখ্যা ৩০ হাজারে উন্নীত হয়। সাফাবী রাজবংশের পতনের পর অবিচার ও নির্যাতনের ফলে তাহাদের সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। ১৮৮৯ খৃ. জুলফায় আনু. ২ হাজার আর্মেনীয় বসবাস করিত (Curzon ২খ., ৫১-৩; L. Lockhart, The fall of the Safavi dynasty and Afghan occupation of Persia, কেমব্রিজ ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ৪৮৪-৫)। ফিরায়দান ও চাহার মাহাল্ল-এ যে স্বল্প সংখ্যক আর্মেনীয় ও জর্জিয়ার অধিবাসী উপনিবেশ স্থাপন করে তাহারা অতীতে শাহ 'আববাস-এর শাসনকালেই সেখানে আগমন করিয়াছিল (Curzon, ২খ, ২৮৪)।

ইসফাহানীগণ তাহাদের কর্মশক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতি ও কারিগরি শিল্প দক্ষতার জন্য প্রসিদ্ধ। মাফাররুখী বলিয়াছেন যে, সর্বোত্তম ইসফাহানবাসিগণ ছিল সর্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু নিকৃষ্টরা অতি নিকৃষ্ট (পৃ. ২১)। হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবি'র-রিদা আবীও তাহাদের বুদ্ধিমত্তা ও কারিগরি দক্ষতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৭৮; তু. মুহাম্মাদ মিহদী, পৃ. ১৬)। অনুরূপভাবে আল-কাযবীনী তাহাদের কারিগরি দক্ষতা, ইসলামী আইন, সাহিত্য, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভেষজবিদ্যা বিষয়ক পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেন (আছারু'ল-বিলাদ ওয়া'ল-আখাবারু'ল-'ইবাদ, বৈরূত ১৯৬০ খৃ., পৃ. ২৯৭)। মাফাররুখী বর্ণনা করেন যে, আনুশীরওয়ান ইসফাহানের, বিশেষত ফিরায়দানের সেনাদলকে অন্যান্য এলাকার সৈন্যদের উপর প্রাধান্য দিতেন (পৃ. ৪২)। নগরীটিতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি, ওয়ালী ও সাহিত্যিকবর্গ জন্মলাভ করেন (বিবরণের জন্যঃ আবূ নু'আয়ম; মাফাররুখী, শায়খ জাবারী আনসারী; 'আবদু'ল-কারীম, জাযী, রিজাল-ই-ইসফাহান য়াতাযকিরাতু'ন-কুবুর, সম্পা. মুসলিহু'দ-দীন মাহদাবী, তাযকিরা-ই শু'আরা-য়ি ইসফাহান, ইসফাহান ১৯৬৬-৭ খৃ.)।

মধ্যযুগে ইসফাহানের জনজীবনে দলাদলি ও ধর্মীয় গোঁড়ামিমূলক বিবাদ লাগিয়াই থাকিত (তু. হামদুল্লাহ মুসতাওফী, নুযহাঃ, পৃ. ৪৯-৫০ ও অন্যান গ্রন্থকার কর্তৃক কামালু'দ-দীন ইসফাহানীর কবিতার উদ্ধৃতি)। ৭২৭/১৩২৬-৭ সনে ইসফাহান নগরী পরিদর্শনের পর ইব্ন বাত্তুতা বলেন যে, ইসফাহানবাসীরা সুন্দর দেহের অধিকারী, উহাদের ত্বক সাদা হইলেও উহাতে লালের আভা রহিয়াছে। তাহারা সাহসী, যুদ্ধপ্রিয়, দানশীল, অতিশয় অতিথিপরায়ণ ও মতবাদ সংক্রান্ত দলাদলিতে অভ্যস্ত। ইসফাহান বৃহত্তম ও সুন্দর নগরীগুলির অন্যতম। কিন্তু সুন্নী ও রাফিদীদের মধ্যকার দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বে বর্তমানে নগরীটির বৃহত্তর অংশই ধ্বংসস্তূপে পরিণত

হইয়াছে (The travels of Ibn Battuta, A. D. 1325-54, Hakluyt, সম্পা. H. A. R. Gibb, ২খ., ২৯৪-৫)। হ'ামদুল্লাহ্ মুসতাওফীও তাহাদের সাহস আর শ্রেণীবিভেদের প্রাধান্যের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বাসিন্দাদের অধিকাংশই শাফিঈ মাযহাবভুক্ত সুন্নী এবং তাহারা তাহাদের ধর্মীয় কর্তব্যাদি সঠিক বিধি মতই পালন করে (নুযহাত, পৃ. ৫৬)। সাফাবী আমলে শী'আ মতবাদ গ্রহণের পর মাযহাবগত দ্বন্দ্বের কিছুটা অবসান হইল বটে, তবে হায়দারী ও নি'মাতীদের মধ্যে এক নূতন ধরনের শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সাধারণের বিশ্বাস, উহা শাহ 'আব্বাসের নির্দেশে ও উৎসাহে শুরু হয়। ১৯শ শতকেও উক্ত বিবাদ-বিসম্বাদ প্রচণ্ডভাবে চলে (হুসায়ন খান তাহবীলদার, পৃ. ৮৯; Chardin, Voyages, সম্পা. Langles, প্যারিস ১৮১১ খৃ., সম্পাদকের সংযোজন, ৮খ., ১৫৫-৬; The travels of Monsicur de Thevenot into the Levant, লন্ডন ১৬৮৭ খৃ., ২খ, ১০৮ bis)। Curzon ১৯শ শতকের শেষের দিকে যে লিখিত বিবরণ দেন তাহাতে ইসফাহানীদের প্রশংসা করা হয় নাই। তিনি অভিযোগ করেন যে, এই যুগে ভীরুতা ও নৈতিকতার জন্য ইসফাহানীদের বিপুল খ্যাতি ছিল। তাহারা কৃপণ স্বভাবের ও ব্যবসায়ী বুদ্ধিসম্পন্ন লোক এবং ইসফাহানের লুতীরাই ইরানের বৃহত্তম ইতরের দল (২খ., ৪৩)।

ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলিতে ইসফাহানের অবস্থাঃ মুসলমানদের ইসফাহান অধিকার সম্পর্কে দুইটি ঐতিহাসিক বিবরণ রহিয়াছে। কূফাবাসী ইতিবৃত্তকারদের মতে ঘটনাটি ঘটে ১৯/৬৪০ সনে, খলীফা 'উমার (রা)-এর আদেশে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'ইতবান (রা) 'জায়' দখলের অভিযান পরিচালনা করেন। অন্যদিকে পারস্য সম্রাটের ৪ জন পাযোসপান-এর একজন তাঁহার বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন (দ্র. Noldeke, Gesch. der Perser und Araber, etc, পৃ. ১৫১, নং ২; তু. Christensen, L'empire des Sassanides, পৃ. ৮৭)। ইনি কয়েকটি যুদ্ধের পর এই শর্তে আত্মসমর্পণ করেন যে, বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ একটা নির্ধারিত হারে বার্ষিক করের বিনিময়ে জিয্য়া রহিত করা হইবে। তাবারী তারিখটিকে ২১/৬৪১-২ (সং লাইডেন, ১খ., ২৬৩৭ প.) বলিয়া উল্লেখ করেন, অথচ বসরাবাসী ঐতিহাসিকদের মতে আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) [দ্র.] নিহাওয়ান্দ দখলের পর ইসফাহান অধিকার করেন কিংবা তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতি 'আবদুল্লাহ ইব্ন বুদায়ল খারাজ ও জিয্য়া দেওয়া হইবে—এই সাধারণ শর্তে শহরটির আত্মসমর্পণ গ্রহণ করেন (বালাযুরী, ফুতূহু'ল-বুলদান, কায়রো ১৯৫৭ খৃ., ২খ., ৩৮৩-৪; এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ সম্পর্কে Caetani, Annali, ৫খ., বৎসর ২৩, প্যারা ৪-২৫)। মাফাররুখী বলেন, ইসফাহান বিজয়ের প্রথম বৎসরে জিয্য়া ও খারাজ বাবদ সাকুল্যে ৪ কোটি দিরহাম (পৃ. ১২) আয় হয়। ইসফাহান খুলাফা-ই রাশিদীন ও উমায়্যা শাসকদের আমলে বসরা ও ইরাকের শাসনকর্তাদের এলাকাভুক্ত হয়। সাধারণত তাঁহারাই ইসফাহানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। খারিজীরা যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, শহরটি উহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। ৬৮/৬৮৭-৮ সনে আযারিকা শাখা শহরটি অবরোধ করে, কিন্তু তাহারা 'ইতাব ইব্ন ওয়ারাকা' কর্তৃক পরাজিত হইয়া ফারস ও কিরমান এলাকার পলায়ন করে। ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইব্ন য়ূসুফ (দ্র.) ৭৫/৬৯৪ সন হইতে ইসফাহানে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তাঁহার শাসনকালে 'জায়' এলাকায় বানূ তামীম, আনার ও তায়মারার রুসতাক-এর বানূ কায়স, জাপালাক ও বারকরূদ-এ বানূ 'আনাযা ও কুমীদান-এ আশ'আরী বসতি স্থাপন করে। রায় ও কুমীস সীমান্তে রুসতাক ছিল (তা'রীখ-ই কুম্ম, পৃ. ২৬৪)। ঐতিহ্যমতে ইসলামের প্রাথমিক যুগেই আর্দিস্তানে 'আরবরা উপনিবেশ স্থাপন করে; ১৯শ শতকের শেষের দিকেও আর্দিস্তানীরা তাঁহাদের বংশের কুরসীনামায় 'আরব পূর্বপুরুষদের নাম খুঁজিয়া বাহির করিত [শায়খ জাবারী আনসারী (দ্র.), পৃ. ১৯১]।

'আলী বংশীয় বিদ্রোহী 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মু'আবিয়া১২৭/৭৪৪-৫ সনে ইসফাহান অবরোধ করিয়া 'আমির ইব্ন দাবারা কর্তৃক বিতাড়িত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেইখানে মোটামুটি দুই বৎসর কাল অবস্থান করেন। তিনি ইসফাহানকে পুনরুদ্ধার করিয়া উমায়্যাদের অধিকারভুক্ত করেন। ১৩০/৭৪৭ সনে 'আব্বাসী বিদ্রোহ শুরু হইলে আবূ মুসলিমের সেনাপতি কাহতাবা ইসফাহানের নিকটবর্তী এলাকায় একটি উমায়্যা সেনাদলকে পরাভূত করেন। 'আমির ইব্ন দাবারার অধীনস্থ অপর বৃহত্তর একটি সেনাদলকে শহরের নিকটস্থ এলাকায় পরাজিত করা হয়। ১৩২/৭৪৯-৫০ হইতে ইসফাহানে 'আব্বাসী শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়। মোটের উপর প্রাথমিক যুগের 'আব্বাসী শাসকদের অধীনে ইসফাহানের ইতিহাসে মাত্র একটিই উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তাহা হইল ঃ ১৩৮/৭৫৫-৬ সনে খলীফা আল-মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া জুমহূর ইবনু'ল-'ইজলী ইসফাহান দখল করিতে ব্যর্থ হন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ১৮৯/৮০৪-৫ সনে খলীফা হারূনু'র-রাশীদের আমলে কুম্ম শহরটিকে ইসফাহান হইতে আলাদা করা হয়। তৎপর শহরটির 'খারাজ'-এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ২০ লক্ষ দিরহাম (তা'রীখ-ই কুম্ম, পৃ. ৩১)। গৃহযুদ্ধের অবসানে ইসফাহান হাসান ইব্ন সাহ্ল-এর রাজ্যভুক্ত হয়।

২০০/৮১৫-৬ ও ২০১/৮১৬-৭ সনে ইসফাহান ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়। রাজস্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে এই ঘটনার কোনও সম্পর্ক থাকুক আর নাই থাকুক, কুদামার মতে উহার পরিমাণ কমিয়া ১ কোটি ৫ লক্ষ দিরহাম-এ দাঁড়ায় (von Kremer, Culturgeschichte, ১খ., ৩৩৭)। ইব্ন খুররাদাযবিহ্-এর মতে (ঐ, পৃ. ৩৬৪) ২২১-২/৮৩৬-৭ সনে উহা আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া মাত্র ৭০ লক্ষ দিরহামে দাঁড়ায়। এই কারণে উহা ঘটিতে পারে যে, আনু. ২১৮/৮৩৩ সনে যে খুররাম দীনী আন্দোলনের ফলে বহু বৎসর যাবত আযারবায়জানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, উহা ইসফাহান অবধি পরিব্যাপ্ত হয়। আল-মু'তাসিম কর্তৃক প্রেরিত একটি সেনাদল ঐ বিদ্রোহ দমন করে। য়া'কূবীর মতে ঐ শতকের শেষাংশে রাজস্ব আবার বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটি দিরহামে পৌঁছায় (ঐ, পৃ. ৩৭৭), অথচ ইব্ন রুস্তা সংখ্যাটিকে ১ কোটি ৩ লক্ষ দিরহাম বলিয়া উল্লেখ করেন (পৃ. ১৫৪)।

২৫৩/৮৬৭ সনে 'আবদু'ল-'আযীয ইব্ন আবী দুলাফ ইসফাহানে প্রশাসক নিযুক্ত হন। ২৮২/৮৯৫-৬ সন পর্যন্ত উহা বানূ দুলাফ-এর করায়ত্ত থাকে। ঐ সময় আল-মু'তাদিদ, ইব্ন আবী দুলাফের সম্পত্তি দখল করিয়া লন (ইবনুল-আছীর, ৭খ., ৩২৭)। ২৬০/৮৭৩-৪ সনে সম্ভবত য়াহ্য়া ইব্ন হারছামা ইসফাহানের খাজনা পুনর্নির্ধারণ করেন (তা'রীখ-ই কুম্ম, পৃ. ১৮৫)। পরবর্তী বৎসর কয়েক দিনের জন্য ইসফাহান সাফ্ফারী য়া'কূব ইব্ন লায়ছ-এর নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যায়। বানূ দুলাফ বংশকে আগেকার মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইলে তাহারা প্রাদেশিক

সরকারের দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন। ২৬৫/৮৭৯ সনে 'আম্র ইব্ন লায়ছ য়া'কূব-এর স্থলাভিষিক্ত হইলেও তাঁহারা পূর্ববৎ দায়িত্ব পালন করেন। কালক্রমে যখন 'আম্‌রের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য আল-মুওয়াফ্‌ফাক্ নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করিলেন, তখন তিনি ২৭১/৮৮৪-৫ সনে 'আম্‌রকে আক্রমণের জন্য আহ্‌মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয ইব্ন আবী দুলাফকে আদেশ করেন। 'আম্র পরাজয় বরণ করিলে ইস্‌ফাহান পুনরায় খলীফার নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যায়। ২৮৪/৮৯৭-৮ সনে 'আলী ইব্ন 'ঈসাকে 'জিবাল'-এ প্রেরণ করিয়া ইস্‌ফাহানের খাজনা পুনর্নির্ধারণ ও য়াহ্‌য়া ইব্ন হারছামা কর্তৃক নির্ধারিত কর (দাস্‌তূর) বাতিল করার আদেশ দেন (তা'রীখ-ই কুম্ম, পৃ. ১৮৪-৫)। ইব্ন রুস্তা, যিনি ইস্‌ফাহানের বাসিন্দা ছিলেন এবং সম্ভবত ২৯০/৯০৩ সনে শহরটির ইতিহাস রচনা করেন, তিনি 'জায়' এলাকাটিকে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ উভয় দিকে পৌণে দুই মাইল বিস্তৃত এবং ২ হাজার জারীব (আনু. ৬০০ একর) আয়তনবিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার ৪টি সদর দরজা ও ১০০টি কেল্লা ছিল (পৃ. ১৫২)।

২৯০/৯০২-৩ সনে 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইবরাহীম আল-মিস্‌মা'ঈ-কে ইস্‌ফাহানের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হইলে তিনি উহার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পার্বত্য এলাকার কুর্দী বাসিন্দাদের সহায়তায় ২৯৫/৯০৭ সনে বিদ্রোহ করেন। সেনাপতি বাদরু'ল-হাম্মামীর নেতৃত্বে আল-মুকতাদির প্রেরিত সেনাদল তাঁহাকে দমন করে এবং হাম্মামী ইস্‌ফাহানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন (ইব্নু'ল আছীর, ৮খ., ৯) এবং দায়লামী 'আলী ইব্ন ওয়াহ্‌সুদান তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। ইনি যখন ৩০০/৯১২-৩ সনে ফার্‌স-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন তখন তিনি ইস্‌ফাহানেরও শাসনকর্তা হন। ৩০১/৯১৩ সনে ইস্‌ফাহান স্বল্পকালের জন্য সামানীদের নামমাত্র শাসনাধীনে চলিয়া যায়, কিন্তু ৩০৪/৯১৬-১৭ সনে আবার ইহা 'আব্বাসী শাসনকর্তা আহ্‌মাদ সা'লূক-এর অধীনে আসে। তাঁহার শাসনামলে ৩০৭/৯১৯-২০ সনে আল-মুক্‌তাদিরের প্রধান মন্ত্রী হামীদ ইস্‌ফাহানের খারাজ বা রাজস্বকে মুকাতা'আ চুক্তির ভিত্তিতে ইজারা দেন। ৩১১/৯২৩-৪ সনে আহ্‌মাদ বিদ্রোহ করেন, কিন্তু পরাজিত ও নিহত হন।

**বুওয়ায়হী বংশ ঃ** এইবার ইস্‌ফাহানে অশান্তির যুগ আরম্ভ হয়। ৩১৫/৯২৭ সনে মারদাবীজ ইব্ন যিয়ার (দ্র.) নগরীটি দখল করিয়া আহ্‌মাদ ইব্ন কায়গুলুগ'কে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ৩১৯/৯৩১ সনে দায়লামী লাশকারী আহ্‌মাদের নিকট হইতে ইস্‌ফাহান অধিকার করেন। তবে পরবর্তী কালে আহমাদ পুনরায় নগরটি পুনরুদ্ধার করিয়া লাশকারীকে হত্যা করেন (The eclipse of the ÈAbbasid Caliphate, সম্পা., অনু. ও ভাষ্যকার H. F. Amedroz, অক্সফোর্ড ১৯২১ খৃ., ৪খ., ২৩৯-৪০)। আল-মুক্তাদির সেই বৎসরই মুজাফ্‌ফার ইব্ন য়াকূতকে ইস্‌ফাহানের শাসনকর্তা নিয়োগ করিলে তিনি কর্মস্থলে যান নাই বলিয়া মনে হয় (ঐ, পৃ. ২৩৬)। ইতোমধ্যে মার্‌দাবীজ শহরে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেইখানে বিপুল সংখ্যক সৈন্যের বসবাসের ব্যবস্থা করেন।

আনুমানিক দুই বৎসর পর ৩২১/৯৩৩ সনে মারদাবীজ যখন 'আলী ইব্ন বূয়া 'ইমাদু'দ-দাওলাকে কারাজ-এর নিয়ন্ত্রণভার দান করিলে তিনি ইস্‌ফাহান অধিকার করেন। কিন্তু মারদাবীজ তাঁহার ভাই উশ্‌মগীরকে সেইখানে পাঠাইলে তিনি উহা পরিত্যাগ করেন। সেই একই বৎসর আল-কাহির, 'রায় ও 'জিবাল'-এর অধিপতিরূপে তাঁহাকে স্বীকৃতি দানের বিনিময়ে ইস্‌ফাহান নগরীর দখল ত্যাগ করার জন্য মারদাবীজকে নির্দেশ দিয়া মুহাম্মাদ ইব্ন য়াকূতকে উহার শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করেন এবং উশ্‌মগীরকে ইস্‌ফাহান হইতে সরিয়া যাইতে বলেন। ইহার অল্পকাল পরেই আল-কাহিরকে সিংহাসনচ্যুত করা হয় (ঐ, পৃ. ৩০৭)। মার্‌দাবীজ ইস্‌ফাহানের দখল বজায় রাখেন। পরের বৎসর 'আলী ইব্ন বূয়া ও তাঁহার আপন ভ্রাতা আহ্‌মাদ পর্যায়ক্রমে ফার্‌স ও কিরমান দখল করেন। মারদাবীজ পুনরায় ইস্‌ফাহানের দিকে অগ্রসর হইলে সেইখানে তিনি তাঁহার তুর্কী সেনাদল কর্তৃক নিহত হন। তাঁহার পর 'আলী বূয়া ও তাঁহার ভাই হাসান রুকনু'দ-দাওলা উশ্‌মগীরকে সেখান হইতে হটাইয়া দিয়া ইস্‌ফাহান দখল করেন। ৩২৭/৯৩৮-৯ সনে উশ্‌মগীর ইস্‌ফাহান পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু পরের বৎসর হাসান আবার উহা অধিকার করিয়া ৩৬৬/৯৭৬ সনে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উহা শাসন করেন। অবশ্য মানসূর ইব্ন কারাতেগীন-এর নেতৃত্বে একটি খুরাসানী সেনাদল ৩৩৯/৯৫০-১ সনে কিছু দিনের জন্য আবার সেখানে অনুপ্রবেশ করে এবং বু'আলী চাগানী কর্তৃক উহা লুণ্ঠিত হয়।

রুকনু'দ-দাওলার মৃত্যু হইলে ইস্‌ফাহান তৎপুত্র মু'আয়্যিদু'দ-দাওলার অধিকারে চলিয়া যায়। ইনি ৩৬৭/৯৭৭ সন হইতে 'আদু'দু'দ-দাওলার অধীনস্থ শাসকরূপে তাহা শাসন করেন। ৩৭২/৯৮২-৩ সনে তাঁহার ভাই ফাখরু'দ-দাওলা তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। ৩৮৭/৯৯৭ সনে তিনি ইনতিকাল করিলে উত্তরাধিকারীরূপে তাঁহার ৪ বৎসর বয়স্ক পুত্র মাজদু'দ-দাওলা সিংহাসনে আরোহণ করে। এই সময় তাহার মাতা রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্ত্রী হন। শাসনকার্যে মাতার হস্তক্ষেপের দরুন মাজদু'দ-দাওলা ৩৯৭/১০০৬ সনে তাঁহার নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব রহিত করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। পরবর্তী বৎসর ফাখরু'দ-দাওলার পত্নীর মামা 'আলাউ'দ-দাওলা 'আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন দাশনানাবিয়ার ইস্‌ফাহানের শাসনকর্তা হন। মাঝেমধ্যে সামরিক বিরতিকাল বাদে ৪৩৩/১০৪১-২ সনে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি নগরীটি শাসন করেন। ৪০৭/১০১৬-৭ সনে তিনি বুওয়ায়হী ইব্ন ফুলাদ কর্তৃক ইস্‌ফাহান হইতে বহিষ্কৃত হন, কিন্তু ৪১১/১০২০-১ সনে উহা পুনরাধিকার করেন। ৪১৮/১০২৭-৮ সনে তিনি ইসপাহ্‌বী 'আলী ইব্ন 'উমরান ও মানুচিহ্‌র ইব্ন কাবুস কর্তৃক ৪ মাস যাবত অবরুদ্ধ থাকেন। গযনীপতি মাস'উদ ইব্ন মাহ্‌মূদ-এর আক্রমণে ৪২০/১০২৯ সনে ইস্‌ফাহান তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। নগরীটি শাসনের জন্য একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া মাস'উদ চলিয়া যান। কিন্তু যখন ইস্‌ফাহানের অধিবাসীরা বিদ্রোহ করিয়া গযনীর শাসককে হত্যা করে তখন তিনি ফিরিয়া আসিয়া ইস্‌ফাহানের বহু লোককে হত্যা করেন। পরবর্তী বৎসর 'আলা'উ'দ-দাওলা নগরীটি পুনরায় অধিকার করেন; কিন্তু গযনীর সৈন্যদের সাহায্যে আনুশীরওয়ান ইব্ন কাবুস তাঁহাকে পলাইতে বাধ্য করেন। ৪২৩/১০৩২ সনে তিনি ইস্‌ফাহানে প্রত্যাবর্তন করেন। ৪২৪/১০৩২-৩ সনে মাস'উদ কিছু অর্থের বিনিময়ে তাঁহাকে ইস্‌ফাহান শাসনের অধিকার ছাড়িয়া দেন। পরবর্তী বৎসর পুনরায় গযনীর সেনাদল কর্তৃক 'আলা'উ'দ-দাওলা পরাভূত হন। তখন তিনি ফিরায়দান ও খাওয়ানসারে ফিরিয়া যান। কিন্তু তিনি পুনরায় সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া ৪২৭/১০৩৫-৬ সনে ইস্‌ফাহান অধিকার করেন।

বুওয়ায়হী শাসনকালে উপর্যুপরি বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও মুআয়্যিদু'দ-দাওলা ও ফাখরু'দ-দাওলার মন্ত্রী ইসমা'ঈল ইব্ন 'আব্বাদের মন্ত্রিত্বকালে

ইসফাহান ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হয় (মাফাররুখী, পৃ. ৪০)। তাবারাক নামক সেনাশিবির বুওয়ায়হী নৃপতিরাই নির্মাণ করেন। কিংবদন্তী অনুসারে রুকনুদ-দাওলা কিংবা মুআয়্যিদুদ-দাওলা সেখানকার দুর্গটি নির্মাণ করেন। ৪২৯/১০৩৭-৮ সনে 'আলাা'উ'দ-দাওলা নগরীটির বেষ্টক-প্রাচীর নির্মাণ করেন এবং সেই কারণে তিনি নাগরিকদের উপর গুরুভার করারোপ করেন (মাফার্‌রুখী, পৃ. ৮১ ও ১১৩)। বুওয়ায়হী শাসকদের আমলে নগরটিতে জমকাল ব্যক্তিগত ও সরকারী বাসভবন, অশ্বশালা, হাম্মাম, উদ্যান ও পর্যাপ্ত গণসম্ভারে পরিপূর্ণ অনেক বাজার ছিল (মাফাররুখী, পৃ. ৮৩)। ইব্‌ন হাওকাল ইসফাহানের ধন-দৌলতের প্রাচুর্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা এবং অন্যান্য প্রদেশে রেশম ও বস্ত্রাদি রফতানীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইরাক এবং খুরাসানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে একমাত্র 'রায়' ব্যতীত অন্য কোনও নগরীতে ইসফাহান অপেক্ষা অধিক লেনদেন হইত না। শাহরিস্তানে একটি ও য়াহূদিয়াতে অন্য একটি জুমু'আ মসজিদ ছিল। য়াহূদিয়ার মসজিদটি ছিল আকারে শাহরিস্তানের মসজিদের দ্বিগুণ, আর হামাদান হইতেও বৃহত্তর (২খ., ৩৬২-৩; ইসতাখ্‌রী, পৃ. ১৯৮-৯; Le Strange, পৃ. ২০৩-৪; হুদূদু'ল'আলাম, অনু. ও ভাষ্য V. Minorsky, লন্ডন ১৯৩৭ খৃ., পৃ. ১৩১)। অতীতে ইসফাহানে দৈনিক আনু. ২ হাজার মেষ ও ছাগ এবং ১ শত গবাদি পশু যবেহ করা হইত বলিয়া মাফার্‌রুখী উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৮৬-৭)। তথায় অত্যধিক সমৃদ্ধির কারণে বেশী গুরুপাক খাদ্য আহার করা হইত—ইহা অনুমান করা হইলে আর পরিসংখ্যান যদি নির্ভুল হয়, তবে মাঝামাঝি হিসাবে ইসফাহানের তৎকালীন লোকসংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক হওয়ার কথা।

**সালজূক বংশ ঃ** মাহমূদের রাজত্বকালে গুয্যগণ (দ্র.) বসবাসের জন্য ইরানে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। তাহারা ইসফাহানের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে কর্মতৎপর থাকিলেও খোদ ইসফাহান নগরীতে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য ৪৩০/১০৩৮-৯ সনে 'আলাউদ-দাওলা দীনাওয়ারের সন্নিকটে সক্রিয় গুয্য দলের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য ইসফাহান হইতে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাহাদেরকে পরাভূত করেন (ইব্‌নু'ল-আছীর, ৯খ., ২১৭)। দানদানকান-এর যুদ্ধের (৪৩১/১০৪০) পর কয়েক বৎসর অতীত হওয়ার আগে সালজূকরা ইসফাহান অধিকার করিতে পারে নাই। ৪৩৪/১০৪২-৩ সনে তুগ্‌রিল বেগ নগরীটি আক্রমণ করেন। যে ফারামুর্‌য পূর্ববর্তী বৎসর তাঁহার পিতা 'আলা'উ'দ-দাওলার স্থলাভিষিক্ত হন, তাঁহাকে তিনি উৎকোচাদি দিয়া বশীভূত করেন এবং তাঁহার নামে খুত্‌বা পাঠ করাইতে সম্মত করান (ইব্‌নু'ল-আছীর, ৯খ., ৩৪৯)। ফারামুর্‌য পরে বুওয়ায়হী গোত্রীর আবূ কালীজার-এর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়া খুতবা হইতে তুগরিল-এর নাম বাদ দেন। ৪৩৮/১০৪৬-৭ সনে তুগ্‌রিল আরও একবার ইসফাহান আক্রমণ করেন; আর সেইবার কেবল ইসফাহান নগরী অবরোধ করেন। অধীনতার নিদর্শনস্বরূপ বার্ষিক কর দিতে ও তুগ্‌রিলের নামে খুতবা পাঠ করিতে রাযী হইয়া ফারামুর্‌য তখন বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু তুগ্‌রিল এলাকাটি ছড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁহার বশ্যতা প্রত্যাহার করেন।

৪৪২/১০৫০ সনে তুগ্‌রিল দ্বিতীয়বার ইসফাহান নগরী অবরোধ করেন। প্রায় এক বৎসর পর ৪৪৩/১০৫১ সনে মুহার্‌রাম মাসে উহা আত্মসমর্পণ করে (ইব্‌নু'ল-আছীর, ৯খ, ৩৮৫)। তুগ্‌রিল জনৈক নীশাপুরবাসী যুবককে শাসক নিযুক্ত করিয়া আদেশ দেন যে, তৎপরবর্তী তিন বৎসর যাবত কোনও প্রকার দাবি করা যাইবে না। তাঁহার এই আপোসমূলক নীতি সফল হয়। নগরীটি সমৃদ্ধির পথে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে; আর গোলযোগ ও দুর্ভিক্ষের বৎসরগুলিতে যাহারা দূরবর্তী এলাকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহারাও ফিরিয়া আসে। নাসীর-ই খুস্‌রাও খানলিন্‌জানের পথে ৪৪৪/১০৫২ সনে ইসফাহানে আসেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তথাকার জনসাধারণ নিরাপদে ও শান্তিপূর্ণভাবে আপন আপন কর্তব্য পালনে রত রহিয়াছে। ইসফাহান সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তিনি ফারসীভাষী অঞ্চলের মধ্যে ইসফাহানকেই সর্বাধিক জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী নগররূপে দেখিয়াছেন। শহরটির সমৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, সেইখানে একটি বিশাল জুমু'আ মসজিদ ও অনেক বাজার রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি ছিল ২ শত সার্‌রাফ-এর অধীনে এবং সেইখানে মরুযাত্রীদের বিশ্রামাগারও ছিল, যেখানে অনেক বণিককে দেখা যাইত। আত্মরক্ষা ও পাল্টা আক্রমণের সুবিধার্থে সচ্ছিদ্র প্রাচীর বেষ্টিত শহরটির একটি মযবুত প্রাচীর ছিল। কথিত আছে, উহার পরিধি সাড়ে তিন ফারসাখ। শহরটির অঞ্চলগুলি দ্বারবিশিষ্ট প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত (সাফার নামা, সম্পা. C. Schefer, প্যারিস ১৮৮১ খৃ., ফারসী মূল পাঠ, পৃ. ৯২-৩)।

নগরীটির প্রতি তুগ্‌রিল বেগের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি তাঁহার রাজধানী রায় হইতে সেইখানে স্থানান্তরিত করিয়া তাঁহার রাজত্বের শেষ ১২ বৎসর ইহাকে তাঁহার প্রধান আবাসস্থলে পরিণত করেন। তিনি সরকারী ভবনাদি নির্মাণে, নগরী ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার উন্নয়নে ৫ লক্ষেরও অধিক দীনার ব্যয় করেন (মাফার্‌রুখী, পৃ. ১০১)। মহান সালজূক যুগে সাম্রাজ্যের একটি প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্ররূপে ইহা সরাসরি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন ছিল (অথচ অধিকাংশ এলাকাই ইকতা' হওয়ায় সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল না)। আল্‌প আর্‌সলানও ইসফাহানবাসিগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন (মাফাররুখী, পৃ. ১০০১-২)। ৪৬৪/১০৭১-২ সনে সেখানে মালিক শাহ্ খলীফার নিকট হইতে ওয়ালিয়্যু'ল-'আহ্‌দ উপাধিতে অভিষিক্ত হন (ইব্‌নু'ল-আছীর, ১০খ., ৪৮)। আল্‌প আরসলানের মৃত্যু হইলে কাউরদ ইব্‌ন চাগরী বেগ সিংহাসনে তাঁহার দাবি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিদ্রোহ করিয়া ব্যর্থ হন। তখন তিনি স্বল্পকালের জন্য ইসফাহান দখল করেন। মালিক শাহের আমলে ইসফাহান উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করে এবং সুন্নী মতবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয় (A. Bausani, Religion in the Saljuq period, in the Cambridge History of Iran, Cambridge ১৯৬৮ খৃ., ৫খ, ২৮৩-৩০২ দ্র.)। তিনি স্বয়ং ও তাঁহার মন্ত্রী নিজামু'ল-মুল্‌ক

ইহার উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হন। মাফাররুখী বলিয়াছেন, মালিক শাহের রাজত্বকালে কিসমা, তাক্সীত এবং অতিরিক্ত করাদি প্রদানের দায়িত্ব হইতে শহরবাসিগণকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এতদুদ্দেশে মসজিদে মসজিদে ঘোষণাটি প্রচার করা হয় উহার সদর দরজার সম্মুখে ও ছোট-বাজারের প্রাচীর গাত্রে ক্ষুদ্র ফলকেও বিজ্ঞপ্তিটি টাঙানো হয় (পৃ. ১০৩-৪)। গুলবার এলাকা, এখন যেখানে মায়াদান-ই কুহনা নামক স্কোয়ারে (চতুর্ভুজাকার খোলা জায়গায়, চক) সরকারী অফিস ও বাসভবনাদি রহিয়াছে, তিনিই উহা গড়িয়া তোলেন। বহু নূতন মসজিদ নির্মাণ ও পুরাতনগুলির— বিশেষত পুরাতন জুমু'আঃ মসজিদের পরিবর্ধন সাধন করা হয় (দ্র. A. Godard, Historique du Masddjid-e Djuma d'Isfahan, in আছার-ই ঈরান, ১খ, ২খ. ও ৩খ, ১৯৩৬-৮ খৃ.; A. Gabriel, Le Masddjid-i Djuma d'Isfahan, in Ars Islamica, ২খ, ১৯৩৫ খৃ.)। দিয্কুহ (শাহদিয) এলাকায় একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া সেইখানে মালিক শাহ তাঁহার অস্ত্রাগার ও কোষাগার স্থাপন করেন। দারদাশত এলাকায় নিজামিয়া (মাদরাসা) প্রতিষ্ঠিত করেন। এইজন্য তিনি যে পরিমাণ ভূসম্পত্তি ওয়াক্ফ করেন তাহার বার্ষিক খাজনা ছিল ১০ হাজার দীনারেরও অধিক (মাফাররুখী, পৃ. ১০৪-৫)। হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবি'র-রিদা আবীর মতে ৭২৯/১৩২৮-৯ সনে মাদ্রাসটি চালু ছিল ; কিন্তু উহার ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি তৎপূর্বে বেদখল হইয়া যায় (পৃ. ১৪২)।

৪৮৫/১০৯২ সনে মালিক শাহের মৃত্যু হইলে ইসফাহানের সমৃদ্ধিতে নিবৃত্তি ঘটে। অবশ্য যাঁহারা শক্তি অর্জনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন, সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে ইহার কর্তৃত্ব তাঁহাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শহরটির বাসিন্দারা এই সকল সংঘর্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল না বলিয়া মনে হয়। তবে তৎকালীন নিরাপত্তাহীনতা ও সেনাদলের আগমন-নির্গমনে তাহাদের জীবনযাত্রা কিছুটা গ্রন্থিচ্যুত হওয়ায় অসন্তুষ্টি সৃষ্টির আশংকা ছিল। তখনকার নিম্নবর্ণিত ঘটনায় দেখা যাইবে যে, শহরটি শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যকার ভারসাম্য সর্বদাই নাযুক ছিল। বাতিনী বলিয়া কথিত একজন অন্ধ লোক নাকি সরল বিশ্বাসী লোকজনকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের মৃত্যু ঘটাইতেছে—এই সংবাদে জনসাধারণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়া তথাকথিত বাতিনীদের সকলকে ধরিয়া আনিয়া পোড়াইয়া ফেলে (ইব্নু'ল-আছীর, ১০খ, ২১৪-৫)। তবে ইহার ফলে বাতিনীদের কার্যকলাপ বন্ধ হইয়া যায় নাই। মালিক শাহের আমলে দা'ঈ 'আবদু'ল-মালিক 'আত্তাশ সতর্কতার সহিত আন্দোলনটির সূত্রপাত করেন এবং শাহের মৃত্যুপরবর্তী বিশৃঙ্খলার যুগে তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

তাজু'ল-মুলক ও মালিক শাহের পত্নী তুরকান খাতুন বাগদাদে, যেখানে মালিক শাহের মৃত্যু হয়, তাঁহার ৪ বৎসর বয়স্ক পুত্র মাহমূদের নামে খুতবা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া ইসফাহানে গমন করেন। যুবায়দা খাতুনের পুত্র বারকয়ারুক— যাহাকে তুরকান খাতুনের সমর্থকরা বন্দী করিলে নিজাম মামলূকরা মুক্তি দেয়—তুরকান খাতুনের আগমনে নগরী পরিত্যাগ করেন, কিন্তু পরে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহাকে সেখানে অবরুদ্ধ করেন (ঐ, ১০খ, ১৪৬-৭)। তুরকান খাতুন ইসফাহানের সরকারী কোষাগার ও ভাণ্ডারে মওজুদ অর্থবিত্ত ও মালপত্রাদি তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে বিলিবণ্টন করিয়া দেন। ৪৮৭/১০৯৪ সন তুরকান-এর অকস্মাৎ মৃত্যু হইলে বারকায়ারুক পুনরায় নগরীতে প্রবেশ করেন এবং কয়েক বৎসর উহার দখল বজায় রাখেন। অবশ্য সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের বিদ্রোহ দমনের জন্য অনেক সময়ই তিনি সেখানে থাকিতে পারিতেন না। আনু. ৪৯০/১০৯৭ সনে তাঁহার সৎভাই মুহাম্মাদের সঙ্গে লড়াই শুরু হইলে তাঁহার আর নগরীতে অবস্থান নিরাপদ ছিল না। ৪৯২/১০৯৮-৯ সনে তাঁহার সেনাদলের অনেকে পক্ষ ত্যাগ করিয়া মুহাম্মাদের পক্ষে যোগদান করিলে তাঁহাকে ইসফাহানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। তিনি খুযিস্তান প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন (ঐ, ১০খ, ১৯৫)। ইহার পর আনু. আরও ৫ বৎসর যাবত দুই ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। ঐ সুযোগে বাতিনীরা ইসফাহানে ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাহাদের শক্তি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করিয়া ফেলে। আহমাদ ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক 'আত্তাশ উত্তরাধিকার সূত্রে তাহার পিতার পরে ইসফাহানের দাঈ নিযুক্ত হন এবং শাহদিয দুর্গে প্রবেশ করিতে সক্ষম হন (এক বর্ণনামতে সৈনিকদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে)। এখন তিনি সকলকে স্বমতে আনয়ন করিয়া দুর্গটি অধিকার করেন। ৪৯৪/১১০০ সনে নগরীর নিকটবর্তী অঞ্চলে বাতিনীরা করাদি আদায় করিতে থাকে এবং খান লিনজান দুর্গের দখলও পায়। অভিযোগটি সত্য হউক বা না হউক, যে বারকয়ারুকের বিরুদ্ধে বাতিনীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ার অভিযোগ করা হইত, তিনি এখন বাতিনীদের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত লইলেন। শাফি'ঈ কাদী আবুল-কাসিম খুজান্দী জনগণকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলেন। ফলে বহু সংখ্যক লোককে বাতিনী হওয়ার অভিযোগে ধরিয়া পোড়াইয়া মারা হয় (ঐ, ১০খ, ২১৪-৫)। যাহা হউক, শাহদিয দুর্গটি বাতিনীদের দখলেই রহিয়া যায়।

৪৯৫/১১০২ সনে রায়-এর সন্নিকটে বারকয়ারুক কর্তৃক মুহাম্মাদ পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। তাঁহার ভ্রাতা আনু. নয় মাসকাল তাঁহাকে সেখানে অবরুদ্ধ রাখেন। তখন তাঁহার সেনাদলের দাবি পূরণের জন্য তিনি নগরীর বিশিষ্ট লোকদের কাছে দুইবার অর্থ ধার চাহিতে বাধ্য হন (ঐ, ১০খ, ২২৮), পরিশেষে নগরীতে খাদ্যাভাব দেখা দিলে আযারবায়জানে চলিয়া যান। সেইখানে বারকয়ারুক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকেন (ঐ, ১০খ, ২২৭-৮)। ৪৯৭/১১০৩ সন পর্যন্ত বিবাদ চলার পর শান্তি স্থাপিত হইলে বারকয়ারুক ইসফাহানে প্রত্যাবর্তন করেন (ঐ, ১১খ, ২৫৩-৪)। পর বৎসর বারকয়ারুক-এর মৃত্যু হইলে মুহাম্মাদ নগরীতে প্রবেশ করেন (ঐ, ১০খ, ২৭৩)। শাহদিয দুর্গ ও উহার সন্নিহিত এলাকায় বাতিনীগণকে দমন করাই সেখানে তাঁহার অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। আলাপ-আলোচনায় ঐকমত্য অর্জিত হইলে আহমাদ ইব্ন 'আত্তাশ কিছু দিনের জন্য দুর্গের অধ্যক্ষ থাকিয়া যান। ৫০০/১১০৭ সনের পূর্বে তিনি আর শর্তাধীন আত্মসমর্পণ করেন নাই। দুর্গের কিছু সংখ্যক সেনা নিষ্ক্রিয় থাকার নীতি মানিয়া লয়, কিন্তু অবশিষ্টরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া যায়। অবশেষে আহমাদকে বন্দী করিয়া শহরের সর্বত্র সাড়ম্বরে প্রদর্শন করান হয়। অতঃপর তাহার দেহ হইতে চর্ম খসাইয়া ফেলা হয় (M. G. S. Hodgson, The order of the Assassins, হেগ ১৯৫৫ খৃ. ও ঐ লেখক, The Isma'ili State, in the Cambridge History of Iran,

৫খ, ৪২২৮২ দ্র.)। ইহার পর কতিপয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা ব্যতিরেকে বাতিনীরা আবার কর্মতৎপর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। যেমন ৫১৫/১১২১-২ সনে জুমু'আ মসজিদ ও উহার গ্রন্থাগার ভস্মীভূত করার অভিযোগ তাহাদের উপর আরোপিত হয় (ইবনু'ল-আছীর, ১০খ, ৪২০)।

৫০০/১১০৬-৭ সন হইতে ৫১১/১১১৮ সনে মুহাম্মাদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল সালজূক সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল ইসফাহান। ইহার পর তাহাদের কর্তৃত্ব খুরাসানে স্থানান্তরিত হয়। মহান সালজূক সুলতান সানজার সেখানকার শাসক ছিলেন। অপর দিকে ইসফাহান ও পশ্চিমাংশের প্রদেশগুলির অধিকার লইয়া ইরাকের সালজূক ও তাঁহাদের সামন্ত আতাবেগদের মধ্যে কলহ চলিতে থাকে। সেখানে বারংবার দলগত বিবাদ-বিসম্বাদের ঘটনা ঘটে, বিশেষত ৫৬০/১১৬৪-৫ সনে খুজান্দী দল ও অন্যদের মধ্যে সংঘটিত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় গৃহাদিতে অগ্নিসংযোগ, সম্পদাদি ধ্বংস ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে (ঐ, ১১খ, ২১০)। খাওয়ারাযম শাহ তেকিশ ৫৯০/১১৯৪ সনে ইসফাহান অধিকার করেন। তাঁহার কাছে আনু. ৫৮৮/১১৯২ সনে খলীফা আন-নাসির ইরাকের সর্বশেষ সালজূক নৃপতি তুগরিলের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। অতঃপর দুই পক্ষের যুদ্ধাভিযান আরম্ভ হইলে খলীফা ও খাওয়ারাযম শাহ তেকিশের মধ্যে ইসফাহান কয়েকবার হাতবদল হয়। ৬২৩/১২২৬ সনে জুরমাগ্‌নের নেতৃত্বে মোঙ্গল বাহিনী ইসফাহানের সন্নিকটে আসিয়া পৌঁছে। ৬২৫/১২২৮ সনে জালালু'দ-দীন খাওয়ারাযম শাহ নগরীর বহির্দেশেই তাহাদিগকে পরাভূত করেন (J. A. Boyle, Dynastic and political history of the Il-Khans, in the Cambridge History of Iran, ৫খ, ৩৩০ দ্র.)। তিনি এই বিজয়কে টিকাইয়া রাখিতে সমর্থ না হইলেও আনু. ৬৩৮/১২৪০-১ সনের পূর্বে ইসফাহানের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে নাই। সেই সময় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দুর্গ প্রাকারের অভ্যন্তরেই নগরীর শাসনকর্তৃত্ব মোঙ্গলদের হস্তে অর্পণ করা হয় (মিনহাজু'দ-দীন আল-জুযজানী, তাবাকাত-ই নাসিরী, কলিকাতা ১৮২৪ খৃ., পৃ. ৪২২-৩)।

**ঈলখান বংশ ও তীমূর বংশ** ঃ মোঙ্গল শাসনের সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা ও অত্যাচার চলিত বলিয়া শহরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহা ছাড়াও রাজ্যটির শাসনকেন্দ্র আযারবায়জানে স্থানান্তরিত হইবার ফলে ইসফাহানের ক্ষতি হইয়াছিল। ইসফাহানবাসীরা সহজে মোঙ্গল শাসন মানিয়া লয় নাই। তাহাদেরকে সামাল দেওয়া বিজেতাদের পক্ষে কষ্টকর ছিল। আবাকা কর্তৃক ইসফাহান ও ইরাকের শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত বাহা'উ'দ্-দীন ইব্‌ন মুহাম্মাদ জুওয়ায়নী শাসনকার্যে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। কেননা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে ইসফাহানবাসীদের দুর্নাম ছিল। তাই তিনি তাহাদের উপর গুরুভার কর আরোপ করিলেন। আরোপিত করভারের ভয়াবহতায় তাহারা দেউলিয়া হইয়া পড়ে। দেশে তস্কর ও শান্তিভঙ্গকারীরা বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ফলে নগরীতে ও মফস্বলে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় (বানাকাতী, তা'রীখ, সম্পা. জা'ফার শি'আর, তেহরান ১৯৭০-১ খৃ., পৃ. ৪২৭; মুহাম্মাদ মুফীদ, জামি'ই মুফীদী, সম্পা. ঈরাজ আফশার, তেহরান ১৯৬১ খৃ., ৩খ, ১১৯-২১)।

ইসফাহানের প্রাকৃতিক সুবিধাদির কারণে ইহার হৃত শ্রীবৃদ্ধির কিয়দংশ ৮ম/১৪শ শতাব্দী নাগাদ ফিরিয়া আসে। হামদুল্লাহ মুস্তাওফী লিখিয়াছেন যে, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য শস্যদানার নির্ধারিত মূল্য সর্বদাই পরিমিত ও ফলমূল অত্যন্ত সস্তা ছিল (নুযহাত, পৃ. ৪৯)। ৭৩৫/১৩৩৫ সনে তৎকালে প্রচলিত মুদ্রা অনুযায়ী ইসফাহানে তামগা (দ্র.) খাতে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার দীনার ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ জেলাগুলিতে ৫ লক্ষ দীওয়ানী কর ধার্য করা হয়। বাহা'উ'দ্-দীনের শাসনামলে ইসফাহান প্রদেশের তিনটি প্রধান নগরীর অন্যতম ফীরূযানী কর খাতে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫ শত দীনার পরিশোধ করিত (হুকুক-ই দীওয়ানী, ঐ, পৃ. ৫০-২)। মুদ্রার বিনিময় হারের অস্থিরতা ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত পদ্ধতির বিভিন্নতার দরুন এই সকল হিসাবের সঙ্গে অতীতের হিসাবের তুলনামূলক বিচার একটা শক্ত কাজ। অবশ্য হামাদুল্লাহ বলিয়াছেন যে, মঙ্গোল শাসনামলে ইসফাহানের রাজস্ব লক্ষণীয় হারে কমিয়া যায়। গাযান খানের আমলের উন্নতিও টিকিয়া থাকে নাই। একথা মনে করিবার কোনও যুক্তি নাই যে, এই নিত্যনৈমিত্তিক প্রবণতা হইতে ইসফাহান কখনও অব্যাহিত লাভ করিয়াছে। হামদুল্লাহ আরও উল্লেখ করেন যে, ইসফাহানে অনেক মাদরাসা, খানকাহ ও আওকাফ (ওয়াকফকৃত সম্পত্তি; ঐ, পৃ. ৪৯) ছিল। অবশ্য পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উহাদের কোন কোনটি বেদখল হইয়া যায়। ইব্‌ন বাত্তূতার বিবরণ হইতে মনে হয়, সমৃদ্ধিশালী কারিগরগণের সংঘ-সমিতিসমূহ সমৃদ্ধি অর্জন করে (২খ, ২৯৫-৬)। অবশ্য দুর্ভাগ্যবশত ইসফাহানের এই সময়কার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে জানা নাই।

ঈলখানী সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইলে ইসফাহান চুবানী গোত্রের (দ্র.) অধিকারে চলিয়া যায়। ৭৪২/১৩৪১-২ সনে ইঞ্জুবংশীয় (ইঞ্জু দ্র.) শাহ শায়খ আবূ ইসহাক তাহাদের নিকট হইতে উহা দখল করেন এবং ৭৫৮/১৩৫৭ সনে মুবারিযু'দ্-দীন মুহাম্মাদ মুজাফ্‌ফার তাঁহার নিকট হইতে ইহা অধিকার করেন। মারাত্মক শত্রুতায় লিপ্ত থাকিলেও মুজাফ্‌ফার বংশীয়রা উত্তরাধিকারের রীতি অনুযায়ী কবলিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সর্বাধিক সমৃদ্ধি অর্জন করে। তবে তাহাদের প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্র ফারস ও কিরমানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাদের আমলে ইসফাহানকে রাজ্যের রাজনৈতিক কেন্দ্রে পুনঃঅধিষ্ঠিত করা হয় নাই। নগরীটি কয়েকবার অবরুদ্ধ হয় এবং ঘন ঘন উহার হাত বদল ঘটে (মু'ঈনু'দ্-দীন নাতানযী, মুনতাখাবু'ত-তাওয়ারীখ, সম্পা. J. Aubin, তেহরান ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ১৮৩)। ৭৮৬-৯/১৩৮৪-৭ সনে তীমূরের দ্বিতীয়বারের পারস্য অভিযানকালে মুজাফ্‌ফার বংশীয় সুলতান যায়নু'ল-'আবিদীন ইবন শাহ শুজা' তীমূরের সঙ্গে সাক্ষাতের 'তলবী পরওয়ানা' অগ্রাহ্য করেন। তখন তীমূর অভিযান পরিচালনা করিয়া ৭৮৯/১৩৮৭ সনে ইসফাহানে পৌঁছান। এই সময় 'উলামা দল শান্তির জন্য আবেদন করেন। তাহাদের প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য তীমূর একদল মুহাস্‌সিলকে (অর্থ সংগ্রাহক) শহরে পাঠান। অতঃপর শহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটাইয়া মুহাসসিলরা এবং নিজ নিজ প্রয়োজনে তীমূরের যে সকল সৈন্য শহরে আসিয়াছিল তাহারা নিহত হয়। ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে গিয়া তীমূর ৭০ হাজার নগরবাসীকে হত্যা করেন (নিজামু'দ্-দীন শামী, জাফারনামা, সম্পা. F. Tauer, প্রাগ ১৯৩৭ খৃ., ১খ, ১০৪-৫)।

তীমূরের উত্তরাধিকারীদের আমলে ইসফাহান তাহার সমৃদ্ধি ফিরিয়া পায় নাই। ৮১৭/১৪১৪ সনের ৪ রাবী'উ'ল- আওওয়াল হইতে ২ জুমাদা'ল-উলা পর্যন্ত সেখানে শাহরুখ মীর্যা ইসকান্দারকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। তখন প্রবল আক্রমণে নগরটির পতন ঘটে এবং উহা লুণ্ঠিত হয়

(মাত'লা'উ'স-সা'দায়ন, ১খ, ২৬৯ প.)। ৮৫৬/১৪৫২ সনে উক্ত পরিবারের কলঙ্ক জাহান শাহ নগরটি দখল করেন। কিন্তু পরবর্তী বৎসর শাহরুখ কর্তৃক গদিচ্যুত হন। কালক্রমে শহরটি পরিবারের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর নিয়ন্ত্রণে আসিলে তিনি আযারবায়জান হইতে উহার শাসন পরিচালনা করেন। ৮৭৯/১৪৭৪-৫ সনে উযুন হাসান তথাকার শাসনকর্তা থাকাকালে Josapha Barbaro ও Ambrogio Contarini নামক দুইজন ভেনিসবাসী শহরটি পরিদর্শন করেন। সেই সময় এই শহরটির জনসংখ্যা মাত্র ৫০ হাজার বলিয়া যোসাফা বার্বারো অনুমান করেন (Travels to Tana and Persia by Josafa BarBaro and Ambrogio Contarini Hakluyt, ১৮৭৩ খৃ., পৃ. ৭১-২ ; তু. G. Berchet, La Repubblica di Venezia e la Persia, তুরিন ১৮৬৫ খৃ.)। হিসাবটি আনুমানিক বিবেচনা করিলেও ইহা স্পষ্ট যে, মাফাররুখীর বিবরণী লেখার সময় হইতে নগরীর জনসংখ্যা বিপুলভাবে হ্রাস পাইতে থাকে।

সাফাব ী বংশ ঃ সাফাব ী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শাহ ইসমা'ঈল ৯০৮/১৫০২-৩ সনে ইস'ফাহান অধিকার করেন। তিনি ও শাহ তাহমাস্প উভয়েই ইস'ফাহানবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের প্রমাণ দেন। জুমু'আ মসজিদে গ্রথিত এক শিলালিপিতে জানা যায় যে, ৯১১/১৫৫-৬ সনে শাহ ইসমা'ঈল ইস'ফাহানের জেলাগুলির ভূসম্পত্তি ও সংশ্লিষ্ট বাসিন্দাদের কাছ কোন অর্থের দাবি পেশ করা নিষিদ্ধ করেন (লুত'ফুল্লাহ্ হুনারফার, গাঞ্জীনা-ই আছার-ই তারীখ-ই ইস'ফাহান, ইস'ফাহান ১৯৬৬-৭ খৃ., পৃ. ৭৬-৭) এবং শাহ তাহমাসপ জুমু'আ মসজিদের শিলালিপির নির্দেশ অনুযায়ী ৯৭১/১৫৬৩-৪ সনে পৌরসভাগুলিকে কতিপয় দেয় ঋণ ও কর হইতে রেহাই দেন, আর আমদানীকৃত চিনি ভিন্ন খাদ্যশস্যাদির রাহ্দারী (শুল্ক) মওকুফ করেন (ঐ, পৃ. ১৫৩-৭ ও ৮৯-৯০)। তিনি শহর এলাকায় সেনাবাহিনীর বসবাস ব্যবস্থাও নিষিদ্ধ করেন (ঐ, পৃ. ৭৫-৬)। ইলকাস মীর্যার নেতৃত্বে বিদ্রোহের সময় ৯৫৫/১৫৪৮ সনে 'উছমানী তুর্কীরা স্বল্পকালের জন্য ইসফাহান অধিকার করে। শাহ আব্বাসের সিংহাসনে অধিরোহণের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে বলিয়া মনে হয় (ইসকান্দার বেগ, 'আলামআরা-য়ি 'আব্বাসী, লিথো, তেহরান ১৮৯৬-৭ খৃ., পৃ. ২৬৫)। ১১শ/১৭শ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই সাফাবী সাম্রাজ্য জর্জিয়া হইতে আফগানিস্তান এবং কাস্পিয়ান সাগর হইতে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সালজূক সাম্রাজ্যের যামানায় যেমন ঘটিয়াছিল, তেমনই এই যামানায়ও ইসফাহান স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। আর ১০০৫/১৫৯৬-৭ সনে শাহ 'আব্বাস এখানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি শহরটিতে ব্যাপক নির্মাণকার্য সম্পাদন করেন। পরে ২য় শাহ 'আব্বাস ও শাহ সুলতান উহাকে আরও সম্প্রসারিত করেন। য়ূরোপীয় নৃপতিদের দূতবৃন্দ, প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক সঙ্ঘের গোমশতারা ও খৃষ্ট ধর্মযাজকদের প্রতিনিধিগণ এই নগরীতেই সাফাবী সুলতানদের সঙ্গে সাক্ষাত করিতেন। এই সকল বিদেশী আগন্তুকদের অনেকেই এখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। কেননা আড়ম্বরপূর্ণ পর্বানুষ্ঠান ও ছুটির দিনের উল্লাস-উৎসবাদি ইসফাহানকে প্রাচ্যের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কল্পনা-বিলাসের শহরে পরিণত করে (Curzon, ২খ, ২২ প. ও ৫৪৬ প. ; আরও দ্র. Lockhart, The fall of the Safavi dynasty, পরিশিষ্ট ৩, পৃ. ৪৭৩-৮৫)।

Chardin ১৬৬৪-৭০ সন ও ১৬৭১-৭৭ সন পর্যন্ত তৎকালীন পারস্য দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি ইস'ফাহানকে সমগ্র প্রাচ্যের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও নয়নাভিরাম শহর বলিয়া বর্ণনা করেন। সেখানে তখন মুসলিম, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক, য়াহূদী ও অন্যরা অর্থাৎ সকল ধর্মের অনুসারীরা ও জগতের সকল দেশের বণিকরা বসবাস করিত Voyages, সম্পা. Langles, প্যারিস ১৮১১ খৃ., ৮খ, ১৩৪)। তিনি বলেন যে, নগর প্রাচীরের মধ্যে ১৬২টি মসজিদ, ৪৮টি কলেজ, ১৮০২টি পান্থশালা, ২৭৩টি হাম্মাম ও ১২টি গোরস্থান ছিল। পান্থশালায় সর্বদা পশ্চিম এশিয়ার আরমেনীয় বস্ত্র ব্যবসায়ীরা অবস্থান করিত (৭খ., ৩৬৭)। অন্যদিকে অতীতের সাররাফ (মুদ্রা-পরিবর্তক)-দের স্থান গ্রহণ করে বেনিয়ারা (Banians)। Thevenot-এর মতে ১৬৬৫ খৃ., ইহাদের সংখ্যা ১৫ শত ছিল (২খ, ১১১; আরও দ্র. Jean-Baptiste Tavernier, Voyages en Perse 1632-67, সম্পা. Pascal Pia. প্যারিস ১৯৩০ খৃ., পৃ. ১৭৬ প.)। এই সময়ে নগরীটির আয়তন সম্প্রসারিত হইয়া বিশাল হইয়া পড়ে। তখন উহার লোকসংখ্যা আনুমানিক ৬ হইতে ১১ লক্ষের মধ্যে ছিল। Chardin তাঁহার বিবরণীতে বলেন যে, নগরীতে প্রত্যহ ২ হাজার, উহার উপকণ্ঠে ৫ শত ও শাহের রন্ধনশালায় ৯০টি করিয়া মেষ যবেহ হইত (৮খ., ১৩৫)। নগরীর জনসংখ্যা সম্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ না করিয়াও তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ইস'ফাহানের লোকসংখ্যা লন্ডনের মতই হইবে। এইজন্য ধারণা করা হয় যে, ইস'ফাহানের লোকসংখ্যা তখন ৬ কিংবা ৭ লক্ষ ছিল। শাহ 'আব্বাসের মৃত্যুর পর মুহাম্মাদ মিহ্দী নগরীর লোকসংখ্যা ৭ লক্ষ বলিয়া উল্লেখ করেন ও শাহ সাফী-র আমলে ১০ লক্ষ ও শাহ সুলতানের আমলে উহা আরও বেশী ছিল বলিয়া অনুমান করেন (পৃ. ১৭৬-৮; আরও দ্র. Lockhart, পৃ. গ্র., পৃ. ৪৭৬-৭)।

শাহ 'আব্বাস ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের আমলে শাসন অত্যন্ত এককেন্দ্রিক ছিল। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও তাহাদের কার্যপরিচালকের দফতরগুলি ইস'ফাহানেই অবস্থিত ছিল (মীর্যা রাফী'আ দাস্তূরু'ল-মুলূক, সম্পা. মুহাম্মাদ তাকী দানিশ পাযহুহ, Rev. de la faculte des lettres et des sciences humaines, Univ. of Tehran, ১৫ খ., ৫-৬ এবং ১৬খ., ১-৪, ইহাতে কোনও কোনও বিষয় সম্পর্কে তায'কিরাতু'ল-মুলূক-এর বর্ণনা অপেক্ষা রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের অধিকতর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়; অনু. ও ভাষ্য V. Minorsky, লন্ডন ১৯৪৩ খৃ.)। নগরী ও তৎসন্নিহিত জেলাগুলি 'খাস'সা' প্রশাসনাধীন আনীত হয়। ভূসম্পত্তির অধিকাংশকেই খালিসা শ্রেণীভুক্ত ও কিয়দংশকে ওয়াক্'ফভুক্ত করা হয় ('আবদু'ল-হুসায়ন সিপিন্তা, তা'রীখচা-ই আওকাফ-ই ইস'ফাহান, ইস'ফাহান ১৯৬৮-৯ খৃ., পৃ. ৩৫ প., ৪৪-৫, ৫১ প., ৬৪ প. ও ১১১-২; গানজীনা, ৭২৯-৩০; মুহাম্মাদ তাকীদানীশ পাযহুহ, আসনাদ-ই ওয়াক্ফা-ই খানদার-ই খালীফা সুলত'ান, in নামা-ই আসতান-ই কুদস, ৯খ, ১-২ ও ৯৭-১১৭; এ. এ. সালমাসীযাদা, তা'রীখ চা-ই ওয়াক্ফদার ইসলাম, তেহরান ১৯৬৪ খৃ.)। ইস'ফাহানের মন্ত্রী খালিসা শ্রেণীর জমির চাষাবাদ ও ওয়াযীর-ই মাওকূ'ফাত (তাঁহাকে ওয়াযীর-ই ফায়দ আছা'রও বলা হয়) ওয়াক্'ফকৃত জমির চাষাবাদের ব্যবস্থা করেন (দাস্তূরুল-মুলূক, ১৬খ., ৩. ৩১৯-২১)। ওয়াযীর-ই হ'ালাল নামক একটি বিশেষ বিভাগ শাহ সুলতান হু'সায়নের আওকাফ (-

ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি) রক্ষণাবেক্ষণ করিত (ঐ, ১৬খ., ৩, ৩২২)।

ভূমি ও সম্পত্তি বাবদ খাজনা, প্রাপ্য কর ও উপশুল্ক ও করসমূহ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ উদ্দেশে প্রজাসাধারণের উপর কর ধার্য করা হইত। এতদ্ভিন্ন বহু স্থানীয় কর্মচারিগণ (যেমন মীরাব, ঐ, ১৬খ, ৪, ৪৩২) তাহাদের মাসোহারার ষোল আনাই কিংবা আংশিক প্রাপ্য আদায় করিয়া লইত। রাজস্ব বাবদ অতিরিক্ত দাবি আদায় করা একটা সাধারণ রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর বিশেষত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের প্রাপ্য মিটাইবার জন্য কোনও কোনও শ্রেণীর করদাতাদের নিকট হইতে অতিরিক্ত দাবিরূপে "তোলা" আদায় করা হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমীর শিকারবাশীর ইনাম-ই হামাসালার দরুন জুলফা-এর জাওলাহার আরমেনীয় বাসিন্দাদের উপরে ৫০ তুমান কর ধার্য করা হইত (ঐ, ১৬খ, ১-২ ও ৮৯)।' এই সকল সাবেক সরকারের আমলেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু সাফাবী আমলের ন্যায় এতটা ব্যাপকভাবে ছিল না।

নাকীবু'ল-আশরাফ সমবৃত্তিধারী কারিগরদল কর্তৃক দেয় কর টাকায় নির্ধারণ করিতেন। সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক সমর্থিত হওয়ার পর উহা প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হইত। নাকীবুল-আশরাফ দরবেশদলের প্রধান (রীশসিফীদান) ও অন্য কয়েকটি সংঘের নেতৃবৃন্দকে নিয়োগ করিতেন (ঐ, ১৬খ, ৫-৬, ৫৪৯)। মুহতাসিবু'ল-মামালিক দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতেন (ঐ, ১৬খ, ৪, ৪১৮)। কতিপয় সজ্ঞ বাদশাহের জন্য বেগার খাটিত এবং কোনও কোনও সজ্ঞকে কখনও কখনও কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত (Tavernier, পৃ. ২৩৯; Chardin, ৪খ, ৯৫, ৬খ, ১১৯-২০; A.K.S. Lambton, Islamic society in Persia, inaugural lecture, School of Oricntal and African Studies, লন্ডন ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ২২ প.। ক্ষৌরকারদের প্রতি সর্বপ্রকার করারোপ নিষিদ্ধ করিয়া ১০৩৮/১৬২৯ সনে প্রচারিত শাহ 'আব্বাসের ঘোষণা সম্বলিত ইসফাহানের শাহ মসজিদে প্রোথিত শিলালিপিটি সম্পর্কে গান্জীনা, পৃ. ৪৩৪-৬ দ্র.)। শহরের শান্তি-শৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রক ছিলেন দারোগা (দ্র.)। বিশৃঙ্খলা ও শারী'আতবিরোধী কার্যের অভিযোগ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিচারকার্য সম্পন্ন করিতেন (ঐ, ১৬খ, ৪, ৩২৮-৩০)। দারোগা'র কার্যালয়ের সদস্য 'আসাস তাঁহার সহযোগীদের সঙ্গে পর্যবেক্ষণের জন্য শহর পরিভ্রমণ করিতেন (ঐ, ১৬খ, ৫-৬, ৫৫১)।

কালানতার (দ্র.) ছিলেন জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যকার প্রধান সংযোগ রক্ষাকারী কর্মকর্তা, অংশত সাবেক রা'ঈস পদবীধারীদের অনুরূপ। দুই পক্ষের স্বার্থের সমন্বয় সাধন করাই ছিল তাঁহার কাজ। সাধারণত শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতেই তাঁহাকে নিয়োগ করা হইত। তিনি কারিগরগণের স্বত্বাধি ও তাহাদের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা কাদখুদাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি উযীরের সহযোগিতায় কাদখুদাগণকে নিয়োগ করিতেন (ঐ, ১৬খ, ৪, ৪২১-২; আরও দ্র. A.K.S. Lambton, The office of Kalantar under the Safavids and Afshars, in Melanges Masse, তেহরান ১৯৬৩ খৃ.)।

শাহ 'আব্বাসের শাসনামলে ইসফাহান আবার গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম প্রচার কেন্দ্রে পরিণত হয়। তবে পার্থক্য এই যে, উহা ছিল গোঁড়া ইছ্না 'আশারী শী'আ মতবাদ। অন্যান্য স্থান হইতে শী'আ' ইমামগণকে ইসফাহানে আনয়ন করিয়া উক্ত মতবাদের শিক্ষা দান ও উহার যথার্থতা প্রমাণের জন্য আহ্বান জানান হয়। তবে দুর্ভাগ্যবশত শহরবাসীদের আলোচনার ধরন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। ১৭শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 'ঈদ-ই কুরবান Thevenot ২খ, ১০৭-৮ লীগ ইয়ার) ও মুহাররাম পর্বাদি আবেগ-অনুভূতি ও উদ্দীপনার সহিত পালিত হইত। শাহ 'আব্বাসের আমলে জনজীবনের অন্যান্য দিকের ন্যায় নগরীর ধর্মীয় বিষয়াদিরও সবিশেষ তত্ত্বাবধান করা হইত। সাদ্র-এর সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন শ্রেণীর ধর্মীয় 'আলিমদের জন্য বিভিন্ন যৌথ প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয় (দাসতূরু'ল-মুলূক, ১৬খ, ১-২, ৬৪)। শাহ সুলতান হুসায়নের আমলে মুল্লা বাশী নামে একটি নূতন অফিস স্থাপন করিয়া উহার কর্মকর্তাকে সকল শ্রেণীর 'আলিমদের প্রধান স্বরূপ নিযুক্ত করা হয় (ঐ)। শারী'আত বিষয়ক মামলাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার শায়খু'ল-ইসলাম ও কাদীর উপর ন্যস্ত ছিল (ঐ, ১৬খ, ১-২, ৬৯)। শাহ 'আব্বাস ও তাঁহার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারীরা অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতার নীতি অবলম্বন করেন। কিন্তু শাহ সুলায়মানের আমলে ধর্মীয় কারণে নির্যাতন শুরু হয়। শাহ সুলতান হুসায়নের রাজত্বকালে কেবল বিধর্মীরাই নির্যাতিত হয় নাই, সুন্নী ও সূফীদের বিরুদ্ধেও উহা পরিচালিত হইয়াছে (আরও দ্র. Lockhart, প. গ্র., পৃ. ৩২-৫, ৭০-৯)।

পূর্ববর্তী সালজূক আমলেও রাজধানী থাকার কারণে সালজূক রাজবংশের মতই সাফাবী সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে ইসফাহানের সমৃদ্ধি উক্ত রাজবংশের ভাগ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল। সালজূক অপেক্ষা সাফাবীদের পতনের ফলেই ইসফাহান অনেক বেশী দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। শাহ সুলতান হুসায়নের রাজত্বকাল নাগাদ সরকারী ও বেসরকারী জনগণের জীবনযাত্রা ও প্রশাসনিক দক্ষতার মানের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অধঃপতন ঘটে (মুহাম্মাদ হাশিম আসিফ রুস্তাম আল-হুকামা', রুস্তাম আত-তাওয়ারীখ, সম্পা. মুহাম্মাদ মুশীরী, তেহরান ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ৮২-৩, ৯০ প., ৯৮-৯, ১০২ প.; L. Lockhart, প. গ্র.)। শহরের নিরাপত্তা পরিস্থিতিও নিম্নমানের ও হতাশাব্যঞ্জক ছিল। রুস্তাম আল-হুকামা রক্তপিপাসু হাঙ্গামাকারীদের একটি তালিকা দিয়াছেন ("পাহলাওয়ানান ওয়া যাবারদাস্তান ওয়া গুরদান শাবরাও ওয়া 'আয়্যার"), আর অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাহাদেরকে শাস্তি দিবার সামর্থ্য শাহের ছিল না; কেননা রাষ্ট্রের রক্ষকগণ তাহাদের নিরাপত্তা বিধান করিতেন ও তাহাদেরকে সাহায্য করিতেন (পৃ. ১০৬)।

১২শ/১৮শ ও ১৩শ ১৯শ শতকের ঘটনাপরম্পরায় অবশেষে আফগানরা পারস্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চল আক্রমণ করে। ১১৩৪/১৭২২ সনে ইসফাহানের নিকটবর্তী গুলনাবাদ-এর যুদ্ধে সাফাবী সেনাবাহিনী চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করিলে নগরটি অবরুদ্ধ হয় (অবরোধের বিশদ বিবরণের জন্য Lockhart, পূ. গ্র., পৃ. ১৪৪ দ্র. ও অবরোধকালীন ইসফাহানীদের অনৈক্য, গুপ্ত চক্রান্ত ইত্যাদি সম্পর্কে রুস্তাম আত-তাওয়ারীখ, পৃ. ১৩৩ দ্র.)। শহরটিকে ভয়াবহ দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া দুর্বল করিয়া ফেলা হয়। ফলে ৬ মাসের মধ্যেই উহার পতন ঘটে। শত্রুর আক্রমণে আনু. ২০ হাজার অধিবাসী নিহত হয়, আর অনাহারে ও প্লেগ-মহামারীতে উহার চতুর্গুণ সংখ্যক প্রাণহানি ঘটে বলিয়া অনুমিত হয়। নগরটি শক্তি প্রয়োগে (আনাওয়াতান) অধিকৃত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হয় এবং সমস্ত জমিজমা 'খালিসা' (সরকারী মালিকানাধীন) বলিয়া ঘোষণা করা হয়। অবরোধকালে

পলায়নকারীরা ভারতে ও 'উছমানী সাম্রাজ্যে চলিয়া যায় (শায়খ জাবিরী আনসারী, পৃ. ৩২-৩, ১১৩-১৪)। স্বল্পকালের জন্য হইলেও ইসফাহানে আবার সুন্নী মতবাদ সরকারী ধর্মমতে পরিণত হয়।

মুরচাখওয়ার্ত-এর নিকটস্থ যুদ্ধক্ষেত্রে আফগানদেরকে পরাস্ত করিয়া তাহামাস্প-এর সঙ্গে ১১৪১/১৭২৯ সনে নাদির শাহের ইসফাহানে প্রবেশের ফলে সাফাবী রাজত্ব পুনঃস্থাপিত হইলেও উহা ছিল স্বল্পকাল স্থায়ী। এই সময় ইসফাহান উহার পূর্ব গৌরবের ছায়ামাত্রে পর্যবসিত হয়। অবরোধ তুলিয়া লওয়ার পরও যাহারা জীবিত ছিল তাহাদের অনেকেই পরবর্তী গণহত্যাকালে প্রাণ হারায়। বিজয়ী সেনাদল নগরবাসীদের সঙ্গে নিতান্ত নির্দয় ব্যবহার করে (Lockhart, Nadir Shah, লণ্ডন ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ৩৯ প.)। সেনাদল তাহাদের উপর বিপুল করভার চাপায়। পরিশেষে ১১৪৮/১৭৩৬ সনে নাদির শাহ সম্রাট হইয়া মাশহাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। নাদিরের সাম্রাজ্যের অপরাপর অংশের ন্যায় ইসফাহান হইতেও নিতান্ত অন্যায়ভাবে জুলুম করিয়া দাবিকৃত করাদি আদায় করা হয়। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আরও অধিক পরিমাণে জমি বাজেয়াফ্ত করা হয়। নাদির শাহ আওকাফ পুনরায় সরকারের দখলভুক্ত করার নির্দেশ দেন। ১১৬০/১৭৪৭-৮ সনে সিংহাসনে আরোহণের পর 'আদিল শাহ নাদিরের ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত হুকুমগুলি প্রত্যাহার করেন। তবুও স্বত্ব সম্পর্কিত অসংখ্য মিথ্যা দলীল, রাজস্ব বিভাগের নথিপত্র বিনষ্ট ও বেআইনী দখলের কারণে বিশৃঙ্খলা চলিতেই থাকে (শায়খ জাবিরী আন্সারী, পৃ. ৩৫ প. ও ১২২ প.; A.K.S. Lambton, Landlord and peasant in Persia, পৃ. ১৩১-২)। নাদির শাহের মৃত্যু হইলে জনসাধারণ প্রাদেশিক শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তখন তিনি তাবারাক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলে সেইখানে অবরুদ্ধ হন। অবশেষে তিনি তাঁহার নিজের জনৈক গোলাম কর্তৃক নিহত হন। ইহার পর ইব্রাহীম শাহ শহরটির জন্য জনৈক আবু'ল-ফাত্হ খান বাখ্তিয়ারীকে নূতন 'বেগলারবেগী' নিয়োগ করেন। ইব্রাহীম শাহের মৃত্যুর স্বল্পকাল পরেই ইনি শাহ সুলতান হুসায়নের ৮ বৎসর বয়স্ক দৌহিত্র আবূ তুরাব মীর্যার নামে শাসন পরিচালনা করিতে থাকেন। ইহার অল্পকাল পরে 'আলী মারদান খান বাখ্তিয়ারী শহরটি আক্রমণ করিয়া দখল করিতে ব্যর্থ হইলে পশ্চাদ্পসরণ করিয়া লুরিস্তানে যান। নূতনভাবে সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াও যান্দদলের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ১১৬৪/১৭৫০ সনে তিনি ২য়বার ইসফাহান আক্রমণ করেন। শহরবাসীদের নিকট অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হইয়া আবু'ল-ফাত্হ খান তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহে অক্ষম হইলে 'আলী মারদান খান নগরীতে প্রবেশ করেন। তখন তাহার সেনাবাহিনী শহরটি লুণ্ঠন করে (রুস্তামু'ত-তাওয়ারীখ, পৃ. ২৪৪ প.)। 'আলী মারদান খান, কারীম খান যান্দ ও আবু'ল-ফাত্হ খান ইসফাহান ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকা যৌথভাবে কিছুকাল যাবত শাসন করেন। অতঃপর আবু'ল-ফাত্হ খান 'আলী মারদান খান কর্তৃক নিহত হন। অপরদিকে ১১৬৫/১৭৫১-২ সনে কারীম খান তাঁহাকে গদিচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা সাদিক খানকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। লুণ্ঠনের উদ্দেশে যে সকল যান্দ, আফগান ও কাজারগণ ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইত পরবর্তী কয়েক বৎসর ধরিয়া ইসফাহানের অধিকার লইয়া তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করে। ১১৭০/১৭৫৬-৭ সনে দুর্ভিক্ষে শহরটির দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পায়। ঐ সময়ে ৪০ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে। অবশেষে ১১৭২/১৭৫৮-৯ সনে কারীম খান নগরটি অধিকার করেন। এই সময় শান্তির যুগ আরম্ভ হয় এবং মুহাম্মাদ রিনানীর নেতৃত্বাধীন সরকারের জনৈক স্থানীয় শাসনকর্তার আমলে (তাঁহাকে ১১৭৩/১৭৫৯ সনে কারীম খান নিয়োগ করেন) পূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে বিধ্বস্ত নগরটি অংশত পুনর্গঠিত হয় (শায়খ জাবিরী আনসারী, পৃ. ১২৭ প.; মুহাম্মাদ মিহ্দী, পৃ. ২৭৯)। তবে ইসফাহান আর কখনও তাহার সাবেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শানশওকত ফিরিয়া পায় নাই। ১১৮০/১৭৬৬-৭ সনে শীরায রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে।

কারীম খানের মৃত্যু হইলে আবার অরাজকতা দেখা দেয়। বাকির খান নামক খুরাস্কানের যে কাতখুদা ইসফাহানের স্বঘোষিত শাসনকর্তা ছিলেন, জা'ফার খান যান্দ-এর অভিযানকালে তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অক্ষম হন। তিন দিন ধরিয়া ইসফাহানে লুণ্ঠন অব্যাহত থাকে (রুস্তামু'ত-তাওয়ারীখ, পৃ. ৫৯; ইব্ন 'আবদি'ল-কারীম, তা'রীখ-ই যানদিয়্যা, সম্পা. B. Beer, লাইডেন ১৮৮৮ খৃ., পৃ. ৩০)। পরবর্তী বৎসর আকা মুহাম্মাদ খান কাজার তাঁহার ভাই জা'ফার কুলী খানকে ইসফাহানের শাসক নিযুক্ত করেন (শায়খ জাবিরী আনসারী, পৃ. ১২৬)। কাজার গোত্রের শাসনামলে তেহ্রানে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় এবং আপাতত ইসফাহান সাম্রাজ্যের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্ররূপেই থাকিয়া যায় (J. Macdonald Kinneir, A geographical memoir of the Persian Empire. লণ্ডন ১৮১৩ খৃ., পৃ. ১১৩), কিন্তু ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উহা তাবরীযের কাছে হার মানে (Curzon, ২খ, ৪১)। ১৮শ শতকের ঘটনাবলীতে ইসফাহানের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। ১৭৯৬ সনে Olivier ইসফাহান পর্যটন করেন। তিনি ইহার বিধ্বস্ত অবস্থা দেখিয়া লিখিয়াছেন যে, শহরটির জনসংখ্যা ৫০ হাজারের অধিক হইবে না (Voyage dans L'Empire Ottoman, L'Egypte et la Perse, প্যারিস ১৮০৭ খৃ., ৩খ., ১০১)। ১৮১১ খৃ. Morier তাঁহার পূর্বেকার আনুমানিক হিসাব, যাহাতে লোকসংখ্যা আরও বেশী ধরা হয়, সংশোধন করিয়া দৈনিক ৩ শত মেষ যবেহ করার ভিত্তিতে জনসংখ্যা ৬০ হাজার হওয়ার কথা বলিয়াছেন (A second journey through Persia, Armenia and Asia Minor, লণ্ডন ১৮১৮ খৃ., পৃ. ১৪১-২)।

আকা মুহাম্মাদ খানের মৃত্যুর পর মুহাম্মাদ খান যান্দ্ ১২১২/১৭৯৭-৮ সনে এক অভ্যুত্থানে নগরটি দখলের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ইহার পরপরই হুসায়ন কুলী খান কাজার বিদ্রোহী হন, কিন্তু ফাত্হ 'আলী শাহের আগমনে ১২১৬/১৮০১-২ সনে নগরী হইতে পলায়ন করেন। ১২১৯/১৮০৪-৫ সনে পঙ্গপালের আক্রমণের ফলে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটে, তজ্জন্য নগরীর সমৃদ্ধি আরও বেশী ব্যাহত হয়। এই সময়ে (বা সম্ভবত তৎপূর্বে) মুহাম্মাদ হুসায়ন খান নাজিমু'দ-দাওলাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। ইনি ছিলেন ইসফাহানের বাসিন্দা স্বীয় ভাগ্যনির্মাতা এক ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জন করেন, তবে তাহা ছিল প্রধান ভূসম্পত্তি, ইহার কিয়দংশ তিনি ওয়াক্ফ করিয়া যান। তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারী তৎপুত্র আমীনু'দ-দাওলার আমলে—যখন তিনি সাদ্র-ই আজাম হন—ইসফাহান পুনর্বার সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয় (শায়খ জাবিরী আনসারী, পৃ. ৪২ প. ও ১৩৭ প.; মুহাম্মাদ মিহ্দী, পৃ. ২৮১; Sipinta পৃ. ৩৯৮ প., পৃ. ৪০৮ প.; Macdonald Kinneir, kO. 113

Morier, Second Journey, পৃ. ১৩২; রুস্তামু'ত-তাওয়ারীখ, পৃ. ১১২-৩; গান্‌জীনা; পৃ. ৭৪৩-৪)। ১২৩৯/১৮২৩-৪ সনে মুহাম্মাদ হুসায়ন খানের মৃত্যু হইলে আসিফু'দ-দাওলা সাদ্‌র-ই আজাম হন এবং ইসফাহানে বকেয়া হিসাবে বিপুল পরিমাণ কর দাবি করেন (পরে তাহা মওকুফ করিয়া দেন) এবং আমীনু'দ-দাওলাকে পদচ্যুত করেন। ১২৪২/১৮২৬-৭ সনে আবার তিনি সুনজরে পড়িয়া ইসফাহানের নূতন শাসনকর্তা সায়ফু'দ-দাওলার মন্ত্রী নিযুক্ত হন। পর বৎসর তিনি সাদ্‌র-ই আজাম হন কিন্তু ফার্‌স অভিযানকালে ১২৫০/১৮৩৪-৫ সনে ইসফাহানে ফাত্‌হ 'আলীর মৃত্যু হইলে তিনি অপসারিত হন। তখন প্রাদেশিক শাসনকর্তা ফারমান-ফারমা সিংহাসন দখলের চেষ্টা করিলে ইসফাহানের নিকটে তিনি যুদ্ধে পরাস্ত হন। ১২৫২/১৮৩৬-৭, ১২৫৪/১৮৩৮-৯ ও ১২৫৫/১৮৩৯-৪০ সনগুলিতে বারংবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটিতে থাকিলে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য মুহাম্মাদ শাহকে ১২৫৬/১৮৪০-১ সনে ইসফাহানে আসিতে হয়। আনু. ১৫০ জন লুতীকে গ্রেফতার করিলে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় (শায়খ জাবারী আনসারী, পৃ. ৪৮ প., ১৪৩ প.)। ১২৬৫-৬/১৮৪৮-৯ সনে নাসিরু'দ-দীনের রাজত্বকালে আবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। তিনি ১২৬৭/১৮৫০ সনে শহর পরিদর্শন করিলে অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে। কিন্তু ১২৮৮/১৮৭১-২ এবং ১২৮৯/১৮৭২-৩ সনের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে পুনরায় ইসফাহানের উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তখন শহরের জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে কমিয়া যায় (হুসায়ন খান তাহবীলদার, পৃ. ৬৫; মুহাম্মাদ মিহ্‌দী, পৃ. ২৮১-২; শায়খ জাবিরী আনসারী, পৃ. ১৫৮-৯)। ১৮৭৪ খৃ. জিল্লু'স-সুলতানকে ইসফাহানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় ও ১৮৮১ খৃ. নাগাদ ইনি পারস্যের প্রায় সমগ্র দক্ষিণাংশের প্রকৃত শাসনকর্তা হইয়া বসেন। তাঁহার সরকার ছিল কঠোর স্বৈরতন্ত্রী। কোনরূপ বিশৃঙ্খলা সহ্য করা হইত না। এই অবস্থায় নগরীটির জাঁকজমক আবার বৃদ্ধি পাইতে ও উহার অধিবাসীর সংখ্যা বাড়িতে থাকে। ১৮৮২ খৃ. গৃহীত এক আদমশুমারী অনুসারে উহার জনসংখ্যা ছিল ৭৩,৬৫৪। তাহার ১১ বৎসর পর Houtum-Schindler মনে করেন যে, স্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইয়া ও নূতন অভিবাসনের ফলে জনসংখ্যা ৮২ হাজারের কাছাকাছি দাঁড়ায় (পৃ. ১১৯-২০; অবশ্য মুহাম্মাদ মিহ্‌দী ও শায়খ জাবিরী আনসারী সংখ্যাটি আরও অধিক বলিয়া অনুমান করেন)। ১৮৮৮ খৃ. জিল্লু'স-সুলতান ক্ষমতাচ্যুত হইলে ইসফাহান ব্যতীত অপরাপর সকল এলাকার শাসনাধিকার হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে ১৮৯৬ খৃ. হইতে মুজাফ্‌ফারু'দ-দীনের রাজত্বকাল শুরু হইলে নগরীতে যে কয়েকবার হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত হয়, ১৯০৩-৪ খৃ. বাবীদের প্রতি আক্রমণও উহাদের অন্তর্ভুক্ত (শায়খ জাবিরী আনসারী, পৃ. ১৮২)। ইতোমধ্যে অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ইসফাহানেও পরিবর্তনের হাওয়া বহিতেছিল। সরকার ও তাঁহাদের নীতির প্রতি অসন্তুষ্টি ক্রমেই ছড়াইয়া পড়ে; শাসনতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় আসিলে ইসফাহান তাহাতে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে (জাম'ইয়া দ্র.)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ নিবন্ধ গর্ভে যে সকল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তদ্ব্যতীতঃ (১) মুহাম্মাদ হাসান খান, মারাগা'ঈ সানীউ'দ-দাওলা (ইতিমাদু'স-সালতানা), মির'আতু'ল-বুলদান, তেহরান ১৮৭৭-৮০ খৃ.; (২) শায়খ হাসান জাবিরী আনসারী, তা'রীখ-ই ইসফাহান ওয়া রায়, তেহরান ১৯৪৪ খৃ.; (৩) 'আলী জাওয়াহির কালাম, যান্‌দা-রূদ যা জুগরাফিয়া-য়ি তা'রীখ-ই ইসফাহান ওয়া জুলফা[২], তেহরান ১৯৭০-১ খৃ.; (৪) মুজমালু'ত-তাওয়ারীখ, সম্পা. মালিকু'শ-শু'আরা' বাহার, তেহরান ১৯৪০-১ খৃ.; (৫) B. Spuler, Iran in Fruhislamischer Zeit., Wiesbaden ১৯৫২ খৃ.; (৬) মুহাম্মাদ 'আলী হাযীন, তা'রীখ-ই হাযীন[২], ইসফাহান ১৯৬৪-৫ খৃ.; (৭) ঐ লেখক, তাযকিরা-ই হাযীন[২], ইসফাহান ১৯৬৬-৭ খৃ.; (৮) A. chronicle of the Carmelites in Persia and the Papal Mission of the xviith and xviith centuries, দুই খণ্ডে. লন্ডন ১৯৩৯ খৃ.; (৯) E. Aubin, La Perse d'aujourdhui, প্যারিস ১৯০৮ খৃ.; (১০) E. E. Beaudouia, Ispahan sous les grands chahs, xviie siecle, in Urbanisme, ১০খ., প্যারিস ১৯৩২ খৃ.; (১১) A. Godard, Ispahan, in আছার-ই ঈরান, Aunales du Service Archeologique de l'Iran, প্যারিস ১৯৩৭ খৃ., ২খ. fasc, ১; (১২) A. V. Pope (সম্পা), A survey of Persian Art, অক্সফোর্ড ১৯৩৮ খৃ.; (১৩) P. Sykes, History of Persia, লন্ডন ১৯১৫ খৃ., ২খ.; (১৪) J. Aubin, Etudes Safawides I. Sah Isma'il et les notables de 1'Iraq Persane, JESHO, ২/১খ. (১৯৫৯ খৃ.); (১৫) S. M. Stern, E. Beazley S A. Dobson, The fortress of Khan Lanjan, in Iran (Journal of the British Institute of Persian Studies), ৯খ. (১৯৭১ খৃ.)। (১৬) মুহাম্মাদ মিহ্‌রয়ার, শাহ্‌দিয কুঞ্জাত্ত, in Rev. de la fac. des lettres, University of Isfahan, ১খ. (১৯৬৫ খৃ.)। (১৭) C. O. Minasian, Shahdiz of Ismaili fame its siege and destruction, লন্ডন ১৯৭১ খৃ.। অনেক ভ্রমণকারীর ভ্রমণ কাহিনীতে ইসফাহানের উল্লেখ আছে। প্রবন্ধ মধ্যে উল্লিখিত গ্রন্থাদি ছাড়াও নিম্নোক্ত পুস্তকাদি অধিক গুরুত্বপূর্ণ ঃ (১৮) Comelius de Bruyn, Travels into Muscovy. Persia and Part of the East Indies, মূল ওলন্দাজ ভাষায় লিখিত গ্রন্থ হইতে অনূদিত, ২ খণ্ডে, লন্ডন ১৭৭৩ খৃ.; (১৯) J. Fryer, Travels into persia begun in 1672, finished 1681, লন্ডন ১৬৯৩ খৃ.; (২০) Sir Thomas Herbert, Some years travels, লণ্ডন ১৬৩৮ খৃ.; (২১) E. Kaempfer, Amoenitatum exoticarum politica physico-medicarum faseiculi v...Lemgo ১৭১২ খৃ.; (২২) Raphael du Mans, Estat de la Perse en 1660, প্যারিস ১৮৯০ খৃ.; (২৩) Sir Antony Sherley and his Persian adventure, xŒJ. E. D. Ross, লন্ডন ১৯৩৩ খৃ.; (২৪) J. Struys, Les voyages de Jean Struys, en Muscovie en Tartarie en Perse aux Indes et plusieurs etc. par M. glanius, আমস্টারডাম ১৬৮১ খৃ.; (২৫) P. della Valle, Viaggi di Pietro della Valle, রোম ১৬৫০ খৃ.; (২৬) J. Hanway An historical account of the British trade over the Caspian Sea[2], লন্ডন ১৭৬২ খৃ., ২খ.; (২৭) T. J. Krusinski, Histoire de la

derniere revolution de Perse, ২ খণ্ড., হেগ ১৭২৮ খৃ., ইং. অনু. অজ্ঞাতনামা, The history of the revolution of Persia taken from the memoirs of Father Krusinski, লন্ডন ১৭২৮ খৃ., Dublin 1729; (২৮) J. Otter, Voyage en Turquie et en Perse, প্যারিস ১৭৪৮ খৃ.; (২৯) A. Arnold, Through Persia by caravan, লন্ডন ১৮৭৭ খৃ., ১খ.; (৩০) R. B. M. Binning, A Journal of two years travel in Persia Ceylon, etc., লন্ডন ১৮৫৭ খৃ., ২খ; (৩১) E. L. Bishop, Journeys in Persia and Kurdistan, লণ্ডন ১৮৯১ খৃ., ২খণ্ড; (৩২) C. A. de Bode, Travels in Luristan and Arabistan, লন্ডন ১৮৪৫ খৃ., ২খ.; (৩৩) Mme. J. Dieulafoy, La Perse, প্যারিস ১৮৮৭ খৃ.; (৩৪) A. V. Williams Jackson, Persia Past and Present, নিউ ইয়র্ক ১৯০৬ খৃ.; (৩৫) Ke Porter, Travels, লন্ডন ১৮২১ খৃ., ১খ.; (৩৬) J. Morier, A journey through Persia, Armenia and Asia Minor to Constaninople, in the years 1808 and 1809, লন্ডন ১৮১২ খৃ.; (৩৭) F. Stack, Six months in Persia, লন্ডন ১৮৮২ খৃ., ২খ.; (৩৮) Gazetteer of Persia, সিমলা ১৯১৮ খৃ., ২খ., ২৩৯-৪৯।

A. K. S. Lambton (E. I.[2])/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

২। **পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী বা স্মৃতিস্তম্ভাদি** ঃ ইসফাহানের ন্যায় একটি আধুনিক নগরীর কেন্দ্রস্থলে যে ইসলামী পুরাতাত্ত্বিক স্মৃতিস্তম্ভাদি বর্তমান, খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিখুঁত স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনরূপে শহরটির মর্যাদা রক্ষায় উহাদের যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। সযত্নে মেরামত করিয়া পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনার দরুন উহাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিস্তম্ভটি শহরের যে উন্নয়নশীল প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের মধ্যে অবস্থিত, তন্মধ্যে সকলকেই উহা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। অথচ পুরাতন আবাসিক এলাকাগুলিতে, ইসফাহানের ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা ও অনেক পার্শ্ববর্তী গ্রামে এখন পর্যন্তও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আংশিক ধ্বংসপ্রাপ্ত অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার ভবনাদি রহিয়াছে, যাহাদের সম্পর্কে এখনও পর্যাপ্ত গবেষণা সম্পন্ন হয় নাই। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে Andre Godard যে ৫০ টিরও অধিক সংখ্যক ভবনের সংক্ষিপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা হইতে উক্ত হর্মরাজির নির্মাণে যে মোটা অঙ্ক ব্যয় হইয়াছে তাহা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে। ১১শ/১৭শ শতকের শেষের দিকে বিশ্বস্ত ভ্রমণকারী ও পর্যবেক্ষক Chardin-এর গণনামতে তৎকালীন ১৬২টি মসজিদ, ৪৮টি কলেজ, ১৮০২টি মরুযাত্রীদের পান্থশালা ও ২৭৩ তুর্কী গোসলখানার তুলনায় এই সংখ্যা যৎপরোনাস্তি ক্ষুদ্র বটে।

ইরানের ইসলামী ইতিহাসে যে নগরী ১ম/৭ম শতক হইতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া আসিয়াছে, এই সকল খ্যাত-অখ্যাত হরেক রকম অট্টালিকার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, বিশেষত নির্মাণের তারিখ প্রভৃতি তাহার অতীত ঐতিহ্যের এক অসম্পূর্ণ সাক্ষীমাত্র। ঐ সকল অট্টালিকার অধিকাংশই ১১শ/১৭শ শতকে ইসফাহানে সাফাবী রাজবংশের ১ম শাহ 'আব্বাসের অভিষেক অনুষ্ঠানের পূর্বেই নির্মিত এবং সর্বাধিক পুরাতন অংশটি ৫ম/১১শ শতকেরও (সালজূক আমল) আগে নির্মিত, যখন মালিক শাহ ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গ নগরীতে সবেমাত্র রাজকীয় জীবনযাত্রা পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছেন। 'আরবগণ কর্তৃক বিজয়ের পরপরই যে নগরীর উন্নয়ন শুরু হয় এবং যে সম্পর্কে পুঁথি সাহিত্য সূত্রেই সর্বাধিক প্রামাণিক তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহা সততই অপ্রতুল অনুরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণাদির পথরেখা অনুসরণ পূর্বক ঐতিহাসিক সত্যের উৎসে যথাসম্ভব নিশ্চয়তার সঙ্গে ফিরিয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। 'আব্বাসী শাসনামলের শুরু হইতেই ইতঃপূর্বে সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য কেন্দ্রটির বাসিন্দারা জায় ও আল-য়াহূদিয়্যা নামক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত যে দুইটি নগরীতে বসবাস করিত, আর যে এলাকাটিতে বুওয়ায়হী সুলতানগণ বাস করিতেন, উহাদের পরিকল্পনার ব্যাপক নক্শা-চিত্রের মধ্যে স্থায়ীভাবে নির্মিত সমারোহপূর্ণ মসজিদটিও কয়েকবার নির্মিত একটি কাদা প্রাচীরবেষ্টিত নগর দুর্গ, আর ইদানিং আবিষ্কৃত প্রবেশ পথটি—যাহা সম্ভবত আস-সাহি'ব আব্বাদ নামক মসজিদের পথ ছিল—এই সকল চিহ্নই কেবল বর্তমান রহিয়াছে। সালজূক-রাজধানীর প্রতিষ্ঠানাদি (দরবারাদি) সম্পর্কিত চিহ্নসমূহ এত বেশী অস্পষ্ট যে, পূর্বে উল্লিখিত বৃহদাকার মসজিদটিও নগর-দুর্গ ব্যতীত মিনারগুলি দ্বারা সূচিত কতিপয় মসজিদের এবং অতীতে যে বিশাল 'মায়দান' এলাকায় রাজপ্রাসাদ ও নিজা'মিয়্যা মাদ্রাসা ছিল উহাদের অবস্থান স্থলগুলিকে আমরা কষ্টেসৃষ্টেই নির্দেশ করিতে পারি। ইসফাহান নগরীর নির্মাণ কৌশল সম্পর্কিত কোনও রীতিনীতি স্পষ্টভাবে জানা কঠিন। যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শহরটির 'অস্তিত্ব টিকিয়া আছে উহাদের মধ্যেই ইহার কারণ নিহিত আছে বলা যাইতে পারে। আংশিকভাবে শহরটি একাধিকবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ঐ এলাকার ভূসংস্থানগত ঐতিহ্য অনুযায়ী পাকা ইট, কাঁচা, ইট, এমন কি কাদাবালি দ্বারা অস্থায়ী নির্মাণ পদ্ধতিতে অপরিবর্তিতরূপে পূর্ববৎ উহা পুনর্নির্মিত হইয়াছে। পাশাপাশি অথবা একের উপরে আরেকটি—এইভাবে শহরের প্রাণকেন্দ্রগুলি প্রতিস্থাপিত হইয়াছে। ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে উহাদেরকে, এমন কি মরূদ্যানের বিশাল গ্রামগুলির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। ঐগুলিতেও সময়ে সময়ে স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিক পরিবর্তনাদিসূচক ঘটনাদির স্বল্পতা ও নির্ভরযোগ্যতার অভাবজনিক কারণে আধুনিক ইসফাহানের পুরাতন অঞ্চলগুলি ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমৃদ্ধিশালী কিংবা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত উপনিবেশগুলি সম্পর্কিত গবেষণা ব্যাহত হইতেছে। সুপরিচিত স্থানগুলির মধ্যে বূয়ূন, বারসুয়ান, গার, সীন, যিয়ার, লিনজান/পীর-ই বাক্রান অথবা আশতারজান— এই কয়েকটির নাম কেবল দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখযোগ্য। এই সকল স্থানে সালজূক আমল ও ঈলখানী যুগ হইতে গুরুত্বপূর্ণ ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বজায় ছিল এবং কোনও কোনটি এখনও সংরক্ষিত হইতেছে।

সমগ্র কেন্দ্রটির মধ্যে মাসজিদ-ই জুমু'আ নামক বড় মসজিদটির প্রতি আমাদেরকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হইবে। একটি প্রাচীন নিদর্শনরূপে উহার আয়তনের বিশালতা আমাদের কাছে অসাধারণ গুরুত্বসম্পন্ন একটি প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ সরবরাহ করিয়াছে। পরবর্তী নির্মাণকার্য ও সংস্কারাদি সত্ত্বেও মসজিদটিতে ৪৬৫/১০৭২ সন হইতে ৪৮৫/১০৯২ সন পর্যন্ত সময়কালীন মালিক শাহের যুগের নির্ভরযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক চিহ্নাদি যে এখনও পর্যন্ত টিকিয়া রহিয়াছে তাহা মোটেই কম আকর্ষণীয় নহে। উহাতে ৫ম/১১শ শতক ও তাহার পরবর্তী কালের

অনেক শিলালিপি রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন সালজূক বংশ নির্মিত গুম্বজবিশিষ্ট দুইটি হলঘরের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ইষ্টকের কারুকার্য দ্বারা বৃদ্ধি করা হইয়াছে, আরও রহিয়াছে মোঙ্গল শাসক উলজেয়তু-নির্মিত আস্তর প্রলিপ্ত মিহ্‌রাবগুলি। তদুপরি ঈওয়ানের পশ্চাৎ দিকে ও উহার সদরের বহির্ভাগে চক্‌চকে চীনা মাটির আস্তর প্রলিপ্ত হওয়ায় উহার অঙ্গনটিকে সাফাবী স্থাপত্য রীতিতে সজ্জিত করিয়াছে। কিন্তু এই প্রাচীন অসম অট্টালিকা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণাদির বিভিন্নতাই ইহার প্রকৃত ইতিহাস রচনায় আমাদেরকে বাধাগ্রস্ত করিয়াছে। কেননা ঐ সকল প্রামাণিক তথ্য কখনও তদন্ত করিয়া দেখা হয় নাই। ইহার ইতিহাসের জন্য পরস্পরবিরোধী প্রকল্প ব্যাপক মতপার্থক্যমূলক ব্যাখ্যার কথাই মনে জাগাইয়া দেয়, আর এমন কি 'কিঅস্ক মসজিদ' সম্পর্কে এমন একটা সাধারণ মতবাদ মানিয়া লওয়া হইয়াছে যাহা প্রমাণ করা বা খণ্ডন করা উভয়ই অসম্ভব। এই ধরনের আরও অনেক সাধারণ ধারণা বা মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে।

বস্তুত স্বতন্ত্রভাবেই হউক বা তৎপূর্বে নির্মিত কম গুরুত্বপূর্ণ ইমারতাদিকে সাফাবী আমলে পুনর্নির্মাণ করিয়াই হউক (সালজূক বা ঈলখানী আমলে নির্মিত অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার প্রায় অপ্রকাশ্য মসজিদের অবস্থা এইরূপই ছিল), ঐগুলিকে লইয়াই আজিকার ইসফাহানের পুরাতাত্ত্বিক প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যাবলী রচিত। এক সময় ১ম শাহ 'আব্বাস রাজধানীরূপে সামগ্রিকভাবে ইহার যে জাঁকজমকপূর্ণ পরিকল্পনা করেন, শহরটির সঙ্গতিপূর্ণ প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের দরুন তৎপূর্ববর্তী কীর্তিগুলি অচিহ্নিত থাকায় পরিকল্পনাটি সম্পর্কে শুধু একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মে। যাহাই হউক, তাহার অতীত বৈশিষ্ট্যের পর্যাপ্ত অংশ আজও সংরক্ষিত থাকায় যে কেহ রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত স্থান বা ময়দান-ই শাহ-এর সামগ্রিক পরিকল্পনার পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারে। যে পুরাতন রাস্তাটি বড় মসজিদটিকে নগরদুর্গের ও পুল-ই খাজূ কিংবা অন্তত ২য় শাহ 'আব্বাস কর্তৃক নির্মিত বর্তমান সেতুবাঁধের পূর্বেকার সেতুমুখকে সংযুক্ত করিয়াছিল, তাহা এই কেন্দ্রটি হইতেই শুরু হইয়াছে। ইহা রাজপ্রাসাদ ও নূতন চাহারবাগ নামক রাস্তার পার্শ্ববর্তী বাগিচার বিপরীত দিকে গিয়া শেষ হইয়াছে। রাস্তাটি উক্ত বাগিচা হইতে আল্লাহ ওয়ারদী খান সেতু পর্যন্ত গিয়াছে। উহাও ১০০৬/১৫৯৮ সনে সুলতানের স্থাপত্যকর্মাদি আরম্ভের প্রাথমিক পর্যায়েই নির্মিত হয়। এক পার্শ্বে বিপণিশ্রেণী শোভিত তোরণবিশিষ্ট প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত মায়দান-ই শাহ দৈর্ঘ্যে ৫১০ এবং প্রস্থে ১৬৫ মিটার আয়তনবিশিষ্ট এক আয়তক্ষেত্র। তন্মধ্যস্থ রাস্তাটি ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিপণিতে পরিপূর্ণ একটি বিস্ময়কর শিল্পকর্ম মনোরম অনুপাত অনুযায়ী জমকালভাবে বৃক্ষাদি শোভিত এবং দেড় কিলোমিটারেরও অধিক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ধারাপ্রবাহ দ্বারা পরিবেষ্টিত চাহারবাগ উহার দৃশ্যাবলীকে সম্পূর্ণ সুশোভিত করিয়াছে। কিন্তু ১ম শাহ 'আব্বাসের রাজত্বকালের শেষভাগে এই স্কোয়ারের (নগরমধ্যস্থ উন্মুক্ত বর্গক্ষেত্রাকার জায়গার) চতুষ্পার্শ্বে যে সকল অট্টালিকা ছিল, তন্মধ্যে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ রাজকীয় মাসজিদ-ই শাহ (নির্মাণকার্য শুরু হয় সম্ভবত ১০২১/১৬১২-১৩ সনে), পূর্বদিকস্থ মাসজিদ-ই শায়খ লুত্‌ফুল্লাহ (১০১২/১৬০৩ সনে আরম্ভ), উত্তরে তোরণ শোভিত রাজকীয় বিপণিকেন্দ্রের (বাজারের) (১০২৯/১৬২০ সনে নির্মিত) ইমারতগুলিকে সর্বোপরি তীমূর-নির্মিত তাঁবুর ভিত্তিতে ১ম শাহ 'আব্বাস কর্তৃক নির্মিত 'আলী কাপূ রাজপ্রাসাদের যথাযোগ্য আনুষঙ্গিক হর্ম্যরাজিরূপে বিবেচিত হইয়াছে। প্রাসাদটির সুউচ্চ পীঠস্থান হইতে সুলতান নগরদুর্গ ও নগরীর অট্টালিকা শ্রেণীর মধ্যবর্তী গড়ের মাঠ ও তৎপার্শ্ববর্তী পরিবেশের পরিপূর্ণ দৃশ্য অবলোকন করিতে পারিতেন। একই পরিবেষ্টনীর মধ্যে অল্প সময়ে নির্মিত চিহিল সুতূন রাজপ্রাসাদটি, ১০০৬/১৫৯৮ সনে যাহার নির্মাণকার্য অবশ্যই আরম্ভ হইয়া থাকিবে, ইসফাহানকে শাহ 'আব্বাসের বসবাসের যোগ্য একটি পরিবেষ্টিত জহ্‌রত-পেটিকা-নগরীতে পরিণত করে এবং ইহাকে তাঁহার পরিকল্পনার অপরিহার্য প্রাথমিক কার্যক্রমের সূত্রপাত বলা চলে।

অধিকন্তু মায়দান-ই শাহ ও চাহারবাগ মধ্যস্থ এই রাজকীয় নগরীর জাঁকজমককে পরবর্তী সুলতাগণ অন্যান্য ঐশ্বর্যশালী আরামদায়ক তাঁবু প্রভৃতি নির্মাণের দ্বারা ক্রমাগত বৃদ্ধি করিতে থাকেন। তবে ১২শ/১৮শ শতকে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নির্মিত সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য সাফাবী অট্টালিকা হইল ১১১৮/১৭০৬ হইতে ১১২৬/১৭১৪ সনের মধ্যে নির্মিত মাদের-ই শাহ মাদরাসা ও তৎসংলগ্ন মরুযাত্রী পান্থশালাটি, যাহা অতি সম্প্রতিও বিদ্যমান ছিল। রাজনৈতিক কারণে স্বদেশ-তাড়িত বাসিন্দাগণ কর্তৃক নির্মিত নও জুলফা অঞ্চলের আরমেনিয়ার গির্জাগুলিও অবশ্য উল্লেখযোগ্য। এইসব অবকাঠামোসমূহে রাজকীয় স্থাপত্যরীতির মৌল বৈশিষ্ট্যগুলির প্রাধান্য লক্ষণীয়।

সাফাবী যুগের ইসফাহান নগরীর পরিপূর্ণ দৃশ্যের একটি চিত্রাঙ্কনকল্পে এখানে যে সকল অট্টালিকার সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা হইয়াছে, তাহাদের সকলের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হইল একটি সুরুচিসম্মত স্থাপত্যশিল্প-নমুনার জীবন্ত প্রামাণিক সাক্ষ্যস্বরূপ অবস্থান। এজন্যই নগরীটিকে Gobineau-এর বিস্ময়কর সমালোচনামূলক উপলব্ধির ভাষায় 'সুরুচিপূর্ণতার পরম বিজয় ও সৌন্দর্যের আদর্শ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সর্বোপরি ইহা নগরীর আকারবিশিষ্ট একটি পুরাতত্ত্বের যাদুঘর।

ইহার আসল সুখ্যাতির মূলে যে সকল ভ্রমণকারী ও গ্রন্থকার রহিয়াছেন তাঁহারা এই পর্যন্ত বেশ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। আশা করা যায় যে, সাফাবী যুগের এই স্মৃতিরক্ষক সৌধসমূহে এখন হইতে বিজ্ঞানভিত্তিক ও কান্তিবিদ্যা সম্বন্ধীয় গবেষণাকার্য পরিচালনা করা হইবে। তাহার ফলে সুনির্দিষ্ট স্থান-কালের বর্ণনা সমন্বিত একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইতিহাস আরও সুস্পষ্টভাবে রচিত হইবে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ অতীতের ভ্রমণকারীদের বিবরণী ও ১৯শ শতকের শেষাংশের যে সকল বিবরণী পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসঙ্গে বিশেষত প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহল নিবৃত্তির এবং শিলালিপি উৎকিরণবিদ্যা গবেষণার স্বার্থে নিম্নোক্ত পুস্তকাদির নামও অবশ্য উল্লেখযোগ্য ঃ (১) P. Ceste, Monuments modernes de la Perse, প্যারিস ১৮৬৭ খৃ., পৃ. ৫-৩৬; (২) F. Sarre, Denkmaler persischen Baukunst, বার্লিন ১৯০১-১০ খৃ., পৃ. ৭৩ প.; (৩) A. U. Pope. Survey of Persian Art, ১৯৩৯ খৃ., ২খ. বিশেষত পৃ. ৯৫৪-৬৪, ১০৩০-৩২, ১০৭৭-৮০, ১১৭৯-১২০১, ১৪০৪-১০; (৪) M. B. Smith, The Minars of Isfahan, আছার-ই ঈরান-এর ১খ. (১৯৩৬ খৃ.), পৃ. ৩১৩-৫৮; (৫) A. and Y. Godard. Notes epigraphiques sur les minarets d'Isfahan, ঐ, পৃ. ৩৬১-৫; (৬) A. Godard, ইসফাহান, আছার-ই ঈরান, ২খ. (১৯৩৭ খৃ.), পৃ. ৭-১৭৬; (৭) ঐ লেখক, Le Tombeau de Baba Kasem et la Madrasa Imami, আছার-ই ঈরান-এ

৪খ., (১৯৪৯ খৃ.), পৃ. ১৬৫-৮৩; (৮) G. Wiet, Inscriptions Koufiques de Perse, in Melanges Maspero, ৩খ. (১৯৪০ খৃ.), পৃ. ১২৭-৩৬; (৯) M. Siroux, La Mosquree Shaya et 1'Imam-Zadeh Ismael a Ispahan, in Melanges Islamologiques, ১খ., (১৯৫৪ খৃ.,), পৃ. ১-৫১; (১০) D. N. Wilber, The Architecture of Islamic Iran, the Ilkhanid period, প্রিন্সটন ১৯৫৫ খৃ., বিশেষত পৃ. ১১৯-২৪, ১৩৮, ১৪১-৪৫, ১৪৯-৫৪, ১৬১-৭২, ১৭৯-৮০, ১৮২-৮; (১১) বড় মসজিদটি সম্পর্কে বিশেষভাবে M. van Berchem. Une Inscription du sultan mongole Uldjaitu, in Melanges Hartwig Derenbourg. প্যারিস ১৯০৯ খৃ., পৃ. ৩৬৭-৭৮; (১২) A. Gabriel, Le Masdjid-i Djum'a d'Isfahan, in Ars Islamica. ২খ., (১৯৩৫ খৃ. ৭-৪৪; (১৩) A. Godard, Histori1ue du Masdjid-e DjumÈa d'Isfahan. আছার-ই ঈরান, ১খ. (১৯৩৬ খৃ.), পৃ. ২১৩-৮২; ২খ. (১৯৩৭ খৃ.), পৃ. ৩৫০-৫১,৩খ. (১৯৪৭ খৃ.), পৃ. ৩১৫-২৬; (১৪) J. Sauvaget, Observations sur quelques mosquees seldjoukides, সাময়িকী A. I. E. O.-তে, ৪খ. (১৯৩৮ খৃ.), পৃ. ৮১-১২০; (১৫) আর্মেনিয়ার গির্জা বিষয়ে J. Carswell, New Julfa, the Armenian churches and other buildings, অক্সফোর্ড ১৯৬৮ খৃ.।

J. Sourdl-Thomine (E. I$^2$.)/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

**আল-ইসফাহানী** (দ্র. আবু'ল-ফারাজ ইব্‌ন দাঊদ)

**ইসফীদ দিয** (দ্র. কা'ল'আ-য়ি সাফীদ)

**ইস্‌ফেন্দিয়ার ওগ্‌লূ** (اسفنديار أغلو) ঃ একটি তুর্কোমান রাজংশের নাম, ৭ম/১৩শ শতকের শেষভাগে, উত্তর-পশ্চিম এশিয়া মাইনরে সুপ্রাচীন পাফলাগোনিয়াতের এই বংশধরগণ স্বাধীন কাসতামুনী (قسطموني) রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন কো'নয়াতে সালজূক বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ইসফেন্দিয়ার বে-এর নাম হইতে ১০ম/১৬শ শতকে আমরা কিযিল আহমেদলু-এর নাম পাই ; উহা ইসমা'ঈল বে-এর ভাই কিযিল আহমাদ-এর নাম হইতে গৃহীত। বায়যানটীয়গণ ইসফেন্দিয়ার ওগ্‌লুদেরকে বলিত 'আমুরিয়াপুত্র' 'উমর পুত্র'। শামসুদ'-দীন ইব্‌ন তামান (তীমূর) জানদার এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। তিনি আফ্‌ফানী জেলার জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ২য় মাসঊদ (৬৮১/১২৮২—৬৯৭/১৯৮)-এর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন, কাসতামূনু শহর দখল করেন এবং ৬৯০/১২৯১ (মুনেজ্‌জিমবাশীর সূত্রমতে) সালে ঈলখানী শাহযাদা গায়খাতূ কর্তৃক স্বীয় বিজিত জেলাগুলির গভর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি ও সুনগুর বে শামসী পাশা, যিনি আওলিয়া-এর মতে (২খ, ১৭৩) বূলীন (بولين) জয় করেন, অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার পুত্র শুজা'উ'দ-দীন সুলায়মান পাশা (৭০০/১৩০১—৭৪০/১৩৪০ প্রথমে ঈলখানীদের আধিপত্য মানিয়া লন, কিন্তু পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সিনোপ (Sinope) জয় করেন। উহা তখন পর্যন্ত ২য় মাসউদের এক কন্যার অধিকারে ছিল। ইব্‌ন বাত্তুতা, (২খ, ৩৪৩), শিহাবু'দ-দীন (Not., et Entr., ১৩খ., ২৪০-৩৬১ প.) ও আবু'ল-ফিদা' (Geographie, সম্পা. Reinaud, ২খ, ১, পৃ. ৩৫ ; ২খ, পৃ. ১৪২, ১৪৫) তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন ; Pachymeres, ২খ, ৩৪৫ পৃ. ও ৪৫৬ প. ও ৪৫৬ প. তাঁহার নাম লিখিয়াছেন Solumompakm তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ছিলেন ঃ (১) তাঁহার পুত্র ইবরাহীম পাশা ; (২) 'আদিল বে-আমীর য়া'কূব-এর পুত্র ও শামসু'দ-দীন-এর পৌত্র (আনু. ৭৪৬/১৩৪৫) ; (৩) জালালু'দ-দীন বায়াযীদ-'আদিল বে-এর পুত্র, 'উছমানিয়া তুর্কীগণ ইঁহাকে বলিতেন কুতরুম, মৃ. ৭৮৭/১৩৮৫ ; (৪) সুলায়মান বে, বায়াযীদ-এর পুত্র, শাসনকাল ৭৮৭-১৩৮৫—৭৯৫/১৩৯৩, তুরস্কের সুলতান ১ম বায়াযীদ তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজ্য দখল করিয়া নেন (Rev Hist., ৩৮৯ প. মতে, উছমানিয়া ইতিহাস অনুযায়ী সুলায়মান বে-এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, সেইখানে দেখা যায় যে, বায়াযীদ কুতরুম ৭৯৫/১৩৯৩ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন); (৫) মুবারিযু'দ-দীন ইসফেন্দিয়ার, বায়াযীদ-এর পুত্র, ৮০৫/১৩০২-৩ তীমূর ইঁহাকে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ২২ রামাদান, ৮৪৩/২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৪৪০ ইনতিকাল করেন। আনুমানিক ৮২০/১৪১৭ তিনি তোসাইয়া (bèYO) চারকিরিও কাল'এজিক শহর ও জানিক জেলা তুরস্কের ১ম মুহাম্মাদের নিকট এবং পরে তামার খনিসমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহ সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের নিকট ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন; ইবরাহীম, ইনি ইসফেন্দিয়ার-এর পুত্র, ৮৪৩/১৪৩৯—৮৫৭/১৪৪৩; (৭) ইসমা'ঈল, ইনি ইবরাহীম-এর পুত্র, তাঁর ভাই কিযিল আহ্‌মাদ-এর প্ররোচনায় তুরস্কের বিজয়ী সুলতান ২য় মুহাম্মাদ কর্তক সিংহাসনচ্যুত হন (৮৬৪/১৪৬০) এবং ফিলিপ্পোলিসে মারা যান। এই জায়গাটি সুলতান তাঁহাকে বাসস্থানরূপে প্রদান করিয়াছিলেন যিনি ইসলামের আচার-আচরণ বিষয়ক হুলুবিয়াত-ই সুলতানী (حلويات سلطاني) নামক একখানি বহুল পঠিত গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া জানা যায়।

তাঁহার ভাই কিযিল আহমাদ, তিনি কাসতামূনু অধিকৃত হইলে উযূন হাসানের নিকট পলায়ন করেন, পরে সুলতান ২য় মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর কন্‌স্টান্টিনোপলে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন সুলতান ২য় বায়াযীদ তাঁহাকে সসম্মানে গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র মীর্যা মুহাম্মাদ সুলতানের এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার পৌত্রদ্বয় শামসী ও মুস্তাফা পাশা সুলতান ২য় সেলীম ও ৩য় মুরাদের দরবারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার আসন অলঙ্কৃত করেন, বিশেষ করিয়া শামসী পাশা সুলতান ৩য় মুরাদের বিশ্বস্ত ব্যক্তিরূপে (মুসাহিব) যথেষ্ট ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগ করিতে সক্ষম হন। তিনি কিযিল আহ্‌মাদলু ইসফেন্দিয়ার-ওগ্‌লুগণের একখানি বংশতালিকা তৈরি করেন (তালিকায় পূর্বপুরুষের নাম খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ পর্যন্ত এবং ইসফেন্দিয়ার-ওগ'লু রাজবংশের জন্য কিযিল আহ্‌মাদলূ নামটির উদ্ভাবন করেন)। এই বংশের উত্তরাধিকারিগণ এখনো রহিয়াছেন এবং ১১শ/১৭শ শতকের শুরুতে যখন তুরস্কের 'উছমানিয়া বংশ বিলুপ্ত হইয়া যাইবার আশংকা দেখা দেয় তখন সিংহাসনের সম্ভাব্য দাবিদারগণের মধ্যে কিযিল আহ্‌মাদলূগণের নামও উত্থাপিত হয় ; কেননা সুলতানের বংশধর ও আত্মীয়-স্বজনগণের সঙ্গে তাঁহাদের প্রায়স বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া আসিতেছিল।

এই বংশতালিকা সম্বন্ধে তুলনীয় ইসমা'ঈল বে-এর তালিকা, যাহা হুলুবি'য়্যাত-ই সুলতানী, Rieu-তে রক্ষিত, Catal of Turkish MSS., বৃটিশ লাইব্রেরী, ২ ও শামসী পাশার বংশ

### ইস্ফেন্দিয়ার-ওগ্লূ বংশতালিকা

১। য়ামান জানদার (য়ামান ইব্ন জানদার-এর পরিবর্তে ?)

২। শামসু'দ-দীন (-সুনগুর বে শামসী পাশা ?)

৩। শুজা'উ'দ-দীন সুলায়মান পাশা　　৪। আমীর য়া'কূব

৫। ইবরাহীম, ৬। 'আলী বে ; ৭। Nastratio (নাসিরু'দ-দীন) ; ৮। 'আদিল বে ('আলী) পাশা

৯। বায়াযীদ কুতরুম (ওয়ালী)

১০। সুলায়মান পাশা ; ১১। মুবারিযু'দ-দীন ইসফেন্দিয়ার শাসন-কাল ৭৯৫-৮৪৩ হি.) ১২। ইসকান্দার ১৩। কন্যা

১৪। কন্যা ১ম মুরাদের সঙ্গে বিবাহিতা　　১৫। কারা য়াহ্‌য়া

১৬। ইবরাহীম শাসনকাল ঃ ৮৪৩-৮৪৭/১৪৩৯-৪৩ ১৭। কীওয়া মু 'দ-দীন ২য় মুরাদের ভগ্নিকে বিবাহ করেন ৮২৮/৪২৫ ১৮। খিদির কাসিম বে ১৯। মুরাদ বে ২০। হালীমা সুলতান ২য় মুরাদের সঙ্গে বিবাহিতা ৮২৮/১৪২৫

২৪। ইসকান্দার, মীর্যা বে নামে পরিচিত　　২৫। হাসান নিহত ৮৫৫/১৪৫১

২১। কামালু'দ-দীন আবু'ল হাসান ইসমা'ঈল, শাসনকাল ৮৪৭-৮৬৪/১৪৪৩-৬০ ;ইনি ৮৪৪/১৪৪০ সুলতান ২য় মুরাদের কন্যাকে বিবাহ করেন। ২২। কিযিল আহমাদ ২৩। খাদীজা

২৭। মুহাম্মাদ, মীর্যা নামে পরিচিতি, সুলতান ২য় বায়যীদের কন্যাকে

২৬। হাসান　　২৮। শামসী পাশা　　২৯। মুসতাফা পাশা

তালিকা, পেসেবি, ২খ, ১০,প. ৪ সম্ভবত সুলায়মান পাশার ভাই, ইব্ন বাতূতা তাঁহাকে আল-এফিন্দি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; সুলায়মান পাশার পুত্রগণ, ৫-৭ ইব্ন বাতূতা গ্রন্থে, ২খ., ৩৪০, ৩৪৮, শিহাবু'দ-দীন ও পাসিমেরিস (Pachymeres), ২খ, ৩২৭, ৬১১ ; এর মতে ১খ., ১৯২ ; ইসফেন্দিয়ার-এর অপর এক ভগ্নির উল্লেখ করিয়াছেন ঐতিহাসিক Clavijo, ৯২, কিন্তু সেই ভগ্নির নাম উল্লেখ করেন নাই ; ১৪ তা'রীখ-ই সাফ, ১খ., ৩৯ ; ১৭ সম্বন্ধে দ্র. সা'দু'দ-দীন, ১খ., ২৮৭ ; ১৯ সম্বন্ধেও দ্র. সা'দু'দ-দীন ১খ, ৩১৮, ২১ সম্বন্ধে ফারীদুন-এর গ্রন্থে বৈশিষ্ট্যময় বর্ণনা, ১খ, ২৫০ ; সুলতান ২য় মুরাদের কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধে দ্র. Dukas, ২৪৩ ; সা'দু'দ-দীন, ১খ., ৩৪৩, ৩ সম্বন্ধে তুলনীয় Rev. Hist., ৩৯০ ; ২৪ সম্বন্ধে দ্র. হামীদ ওয়াহবী, ১৩৫৪; ২৬ সম্বন্ধে দ্র. সা'দু'দ-দীন, ১খ, ৪৭৪, ৪৭৬।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) মুনেজ্জিমবাশী, সাহা'ইফু'ল-আখবার, ৩খ, ২৯ প. ; (২) হামীদ ওয়াহবী, মাশাহীর-ই ইসলাম, নং ৪৩ (=সমগ্র সিরিজের পৃ. ১৩২৯-১৩৫৮); (৩) Revue Historique publiée par l'Institut d'Histoire Ottomane, 382-392 (আহমাদ তাওহীদ-এর গবেষণা প্রবন্ধ) ; (৪) বায়যানটীয় Pachymeres, Dukas, Chalkokondyles, Phrantzes, Clavijo। ইসফেন্দিয়ার ওগ্লূ বংশের মুদ্রা সম্বন্ধে ঃ (৫) ইসমা'ঈল গালিব, তাকবীম-ই মাসকূকাত-ই সালজূকিয়্যা (تقويم مسكوكات سلجوقية) , পৃ. ১২০-২১ ; (৬) আহমাদ তাওহীদ, মাসকূকাত-ই কাদীমি-ই ইসলামীয়্যি, ৪খ, ৪০০ প.।

J. H. Mordtmann (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

**ইস্‌বা'** (اصبع) ঃ (আ.) আসবা', আস্‌বু', ইসবু', উস্‌বু' (ব. ব. আসাবি'-اصابع) 'আংগুল', মধ্যমা আংগুলের মধ্য গ্রন্থির প্রস্থের পরিমাপ। প্রচলিতভাবে এক হাত বা যিরা' (ذراع)-এর চব্বিশ ভাগের এক ভাগ (দ্র. যিরা')।

'আরবদের নাবিকবিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহে ইস্‌বা' নক্ষত্রের অবস্থানের উচ্চতা পরিমাপের একক ('ইলমু'ল-কিয়াস)। সমুদ্রের কোন স্থানের অক্ষাংশ (Latitude) নির্দেশ করা হইত কোন নির্দিষ্ট তারকা [সাধারণত ধ্রুবতারা (Pole star) বা সপ্তর্ষিমণ্ডল (Great Bear) বা শিশুমার (Litlle Bear)-এর কোন নির্দিষ্ট সময়ে দিগন্ত রেখা হইতে উচ্চতার দ্বারা। ধ্রুবতারা সপ্তর্ষিমণ্ডল শিশুমার প্রভৃতির ভারত মহাসাগরের বন্দরগুলি হইতে উচ্চতার সম্পূর্ণ তালিকা 'আরব নৌবিদ্যা গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। তাহা ব্যতীত ত্রিশঙ্কু (দক্ষিণ ক্রস-Southern Cross) S অন্য কয়েকটি নক্ষত্রের উচ্চতার আংশিক তালিকাও দেওয়া হইয়াছে। দিগন্ত রেখার সঙ্গে বাহুর দূরত্বে আংগুলের প্রশস্ততা দ্বারা যে কোণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ইসবা' বলা হইত। চার আংগুল অর্থাৎ এক হাত পরিমাণ (বৃদ্ধাংগুলি ব্যবহার করা যাইত না) ছিল এক যুব্বান, শব্দটির উৎস জানা যায় না। কোন আদর্শ পরিমাপক যন্ত্র (খাশাবাতু'ল-আরাবা')-এর প্রস্থকে বলা হইত যুব্বান এবং আরিগ্যা (Aurigar)-এর নক্ষত্রের দূরত্বের সহিত তুলনা করিয়া একটি সার্বজনীন মান পাওয়া যাইতে পারে। এই দুই নক্ষত্রের দূরত্ব ৪ ইসবা'। নাবিকগণ ইসবা' আট ভাগে ভাগ করিতেন। প্রতিটি ভাগ যাম নামে পরিচিত। এই যাম-এর পরিমাপ তিন ঘণ্টার। ইব্ন মাজিদ ও সুলায়মান আল-মাহ্‌রীর নৌবিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, একটা জাহাজ সোজা উত্তর দিকে এক যাম গেলে ধ্রুবতারা ১/৮ ইসবা' উপরে দেখা যায়। সুতরাং ধরিয়া লওয়া হয় যে, সাধারণভাবে জাহাজ ২৪ ঘণ্টার সোজা উত্তর দিকে ১ ইসবা' দূরত্ব অতিক্রম করে। কোন জাহাজ কোন এক স্থান হইতে যাত্রা করিয়া একই দিকে ভ্রমণ করিলে যে স্থানে ধ্রুবতারা ১ ইসবা' উচ্চে

দেখা যায় যাত্রাস্থান হইতে সেই স্থানের দূরত্বকে (Rhumb) বলা হয় 'তিরফা'। এই দূরত্ব অনুসারে 'তিরফা' পরিবর্তিত হয়। সোজা উত্তরে বা সোজা দক্ষিণে ১ তিরফাই ১ ইসবা'।

য়ূরোপীয় পরিমাপ অনুযায়ী ইসবা'-এর প্রকৃত মান কিছু পরিবর্তিত হয়। প্রথমদিকে ইহা নাবিকদের আংগুলের সহিত পরিবর্তিত হইত। কিন্তু 'আরব নৌবিদ্যা সম্বন্ধে গ্রন্থসমূহ টিকিয়া থাকা পর্যন্ত (১৪৫০-১৫১৩ খৃ.) ইসবা'-এর পরিমাপ নির্দিষ্ট হইয়া যায়। অবশ্য জাতি বা অঞ্চল ভেদে বিভিন্নতা ছিল এবং কোন বিশেষ বন্দরে নক্ষত্রের উচ্চতার যে বিভিন্নতা দেখা যাইত তাহা পর্যবেক্ষণে ভুলের জন্য হইয়া থাকিতে পারে। 'আরবদের ব্যবহৃত পরিমাপ ছিল ৩৬০° তে-২৪৪ ইসবা' (অর্থাৎ ১ ইসবা'-১°৩৬´), তবে ইহা ছিল একটা সুবিধাজনক সংখ্যা। কারণ দিকদর্শন যন্ত্রে প্রতি rhumb-এর উচ্চতার মধ্যে ৭ এবং প্রতি চান্দ্র কক্ষের (Lunarmansion)-এর মধ্যে ৮। সুলায়মান আল-মাহ্‌রী ধ্রুবতারা মেরুর চারিদিকে যে বৃত্ত সৃষ্টি করে তাহার ব্যাস ৪ ইসবা' (নাবিকদের সচরাচর সংখ্যা) এই তথ্যটি ব্যবহার করিতেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের মারফত দেখান যে, ইহা হইল ৬.৬/৭ ডিগ্রি। সুতরাং ১ ইসবা' সংখ্যা ব্যবহার করিতেন।

য়ূরোপীয় পণ্ডিতগণ—ধ্রুবতারার মেরু দূরত্ব হইল ২ ইসবা'—এই সমীকরণ অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন মান নির্দিষ্ট করিয়াছেন। প্রিন্সেপ (Princep) আয়ন চলনের (Precession) কথা বিবেচনা করিয়া ইসবা'র পরিমাপ ১৩৯৪ সনের জন্য ১°৫৬´ এবং ১৫৫০ সনের জন্য ১°৩৩´ নির্দিষ্ট করেন। G. Ferrand ১৫০০ সনের জন্য ইহার পরিমাপ নির্দিষ্ট করেন ১°৪৫´। 'আরবগণ তাঁহাদের সংখ্যার সহিত কখনো কোন যুগ সূচনা দেন নাই—তাঁহাদের অধিকাংশ সংখ্যা সম্ভবত পূর্ব শতাব্দীসমূহ হইতে প্রাপ্ত এবং সব একই সময়ের নহে। কাজেই এইসব পরিমাপের প্রকৃত মানের জন্য খুব বেশী অনুমান বা গবেষণা করা সম্ভবত ফলপ্রসূ হইবে না।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) G. Ferrand, Instruction nautiques arabes et portugais, paris 1921-8, ১খ ও ২খ, আহ্‌মাদ ইব্‌ন মাজিদ ও সুলায়মান আল-মাহ্‌রীর পাঠসমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত, ৩খ, Introduction a l'astronomie nautique arabe, L. de Saussure-এর তত্ত্ব এবং (২) Ferrand. J. Princep, Note of the nautical instruments of the Arabs, in J. Asiatic. Soc. of Bengal, 1836, 784-94, Hammer Purgstall-এর অনূদিত Sidi Celebi'-r Extracts from the Mohit, that is the Ocean, a Turkish work on navigations in the Indian seas, in J. As. Soc. of Bengal (1834-39)-এর সহিত সংযোজিত; (৩) G. R. Tibbetts, Arab Navigation in the Indian Ocean before the coming of the Portuguese.

G. R. Tibbetts (E. I.[2])/মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম

**ইস্‌ম** (اسم) ঃ 'আ' ইসলামী রীতি অনুযায়ী 'আরবী ভাষায় কোন ব্যক্তির পূর্ণ নাম সাধারণত (১) কুন্‌য়া (كنية) (২) ইস্‌ম (اسم) (৩) নাসাব (نسب), (৪) নিস্‌বা (نسبة) এই সকল অংশ লইয়া গঠিত হইয়া থাকে। কিছু সংখ্যক লোক লাকাব (لقب = উপাধি) কিংবা নাবায (نبز) অর্থাৎ নামের শেষে যুক্ত নিন্দাসূচক উপনাম দ্বারাও পরিচিত হয়। পূর্ণ নামটি বিবৃত হইলে এই শেষোক্ত অংশ নিসবা অর্থাৎ দেশ বা গোত্রগত পরিচয়ের পরে বসে। সমাজের কিয়ৎ পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ৩য়/৯ম শতকের শেষাংশ হইতে কুনয়ার পূর্বে বা পরে সম্মানসূচক উপাধির ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

(১) কুন্‌য়া (দ্র.), সাধারণত আবূ (কাহারও পিতা) অথবা উম্ম (কাহারও মাতা) যোগে গঠিত যুগ্ম শব্দকে কুন্‌য়া বলা হয়। যথা আবুল-ফাদ্‌ল, উম্মু'ল-হাসান।

(২) ইস্‌ম, যাহাকে 'আলাম ও ইস্‌ম বলা হয় প্রকৃতপক্ষে আসল নাম। ইহা কয়েক প্রকারের হইতে পারে ঃ

(ক) প্রাচীন 'আরব নাম অনেক ক্ষেত্রে প্রাক-ইসলামী উৎস হইতে উদ্ভূত, বিশেষণ, গর্ববোধক, স্বাতন্ত্র্যবাচক, অন্তর্থ ক্রিয়াবাচক, কালবোধক কৃদন্ত ও অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত পদ। যথা আল-হাসান, আহ্‌মাদ, আসাদ, মুহাম্মাদ, য়াযীদ। সাধারণত কোন কোনটি 'আরবী ভাষার নির্দেশক অব্যয় আল সহযোগে, যথা আন্‌-নামিরু (النمر) আর কখনও বা নির্দেশক অব্যয়সহ বা ব্যতিরেকে (যথা 'আব্বাস/আল-'আব্বাস প্রচলিত থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অব্যয় (আল-) ছাড়াই প্রচলিত রহিয়াছে। প্রকৃত অভিজ্ঞতা ব্যতীত কেবল শ্রু ধারণ (سماع)-র ভিত্তিতে উহার منصرف কি غير منصرف (যথা عمرو এবং عمر) তাহা জ্ঞাত হওয়া সর্বদা সহজ নহে। বস্তুত যে কোন ব্যক্তির নাম সুনির্দিষ্ট হওয়ায় নামগুলিকে প্রায়ই غير منصرف রূপে ব্যবহার করা হয়, আর প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শব্দের সর্বশেষ اعراب টিকে উহ্য রাখার প্রবণতা দেখা যায়। অধিকন্তু সাধারণত ব্যবহৃত স্ত্রীলিঙ্গবোধক চিহ্ন দ্বারা সর্বক্ষেত্রে স্ত্রীজাতি বুঝায় না, যথা طلحة বা جارية যাহা পুরুষের নাম। সাধারণত এই সকল প্রাচীন নামের তালিকায় কেবল মহানবী (স) [মুহাম্মাদ, আল-মুস্‌তাফা প্রভৃতি] কিংবা ইসলামের প্রথম যুগের কতিপয় ব্যক্তির ['উমার (রা), 'আলী (রা), 'উছমান (রা) প্রমুখ] নাম টিকিয়া রহিয়াছে। ১৬৬ খৃষ্টাব্দে লাইডেন হইতে প্রকাশিত ইব্‌নু'ল-কালবীর জামহারাতু'ন-নাসাব-এ ঐগুলির নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়।

(খ) আল-কুরআনে লিপিবদ্ধ আকারে বাইবেলে উল্লিখিত নামসমূহ (ابراهيم) = Abraham; ইসহাক (اسحاق) = Isaac; মূসা (موسى) = Moses ; ইসমা'ঈল (اسماعيل) = Ishmail.

(গ) দুইটি প্রধান বিশেষ্যের সংযোগে গঠিত যৌগিক নামসমূহ ঃ (১) আল্লাহ্‌ কিংবা তাঁহার কোন গুণবাচক নামের পূর্বে 'আব্‌দ (তাঁহার দাস) [আল-আস্‌মা'উল-হুস্‌না দ্র.] ব্যবহার করিয়া গঠিত। ইসলাম প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুশরিকদের প্রাচীন উপাস্য দেবতার নামে 'আব্‌দ যোগে গঠিত যৌগিক নামসমূহ অন্তর্হিত হইয়াছে। (২) আল্লাহ্‌র নামের পূর্বে বিশেষ্যমূলক শব্দযোগে গঠিত নামসমূহ (যথা হিবাতুল্লাহ=আল্লাহ্‌র দান) (ঘ) ইরানের প্রাচীন ইতিহাস ও লোককাহিনী হইতে সংগৃহীত নামসমূহ (যথা খুসরাও, জাম্‌শীদ, রুস্তাম)। (ঙ) তুর্কী নামসমূহ (আর্‌সলান, তুগরিল, তীমূর)। তুর্কী জাতির লোকজন প্রথমে যখন মধ্যপ্রাচ্যে হিজরত করে তখন এইগুলি ছিল সচরাচর ব্যবহৃত নাম (যদিও অতি বিকৃত অবস্থায়)। আরও অধিক বানান-বিকৃতিসহ সিরিয়া

ও মিসরের 'আরবী ভাষায় লিখিত মধ্যযুগের ইতিহাসে সমরনায়কগণ প্রায়শ এই সকল নামে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তী কালে নামগুলি আর প্রচলিত না থাকিলেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে আধুনিক তুরস্কে ঐগুলি পুনরায় প্রচলিত হইয়াছে। বহু ক্ষেত্রে এইগুলি শিকারী জন্তু বা পক্ষীর নাম ঃ বাবুর = চিতাবাঘ), (আলপ) আর্সলান = (সিংহ), লাচিন (=বাজ পাখী), সন্‌কুন (=শঙ্খ চিল) ইত্যাদি। ক্ষেত্রবিশেষে নামগুলি পিতামাতার অভিলাষ প্রকাশ করে ঃ য়েতের (='ঢের'-একাধিক্রমে অনেক কন্যা সন্তান লাভের পর), তুর্‌সুন ("সে বাঁচিয়া থাকুক"-পরপর অনেকগুলি মৃতাবস্থায় জাত সন্তানের পর ; তুর-'আলী তু'র-হাসান শব্দ দুইটির শব্দমূল সম্ভবত অভিন্ন), সাতীলমীশ ("সে বিক্রীত হইয়াছে—কোন মাতা বন্ধ্যা থাকাকালে কোন পীরের নিকট অঙ্গীকার করিয়া থাকিলে)। বিবিধ উৎস—বিশেষত বার্বার গোত্র হইতে প্রাপ্ত নাম (যথা য়িদ্দের "সে বাঁচিয়া আছে"); (ছ) গুণবাচক বিশেষ্য পদের ভিত্তিতে গৃহীত নাম—কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যয়যুক্ত, যথা তাওফীক, হি'কমাত, ফিক্‌রী)। 'উছমানী যুগে সচরাচর এই সকল নাম রাখা হইত। (জ) সম্মানসূচক উপাধি ভিত্তিক নাম (নিম্নে লাকাব শীর্ষক অনুচ্ছেদ দ্র.)।

(৩) নাসাব বা বংশতালিকা, পূর্বপুরুষদের কুলুজিতে প্রতিটি নামের প্রথমাংশে ইব্‌ন (দ্র.) 'অমুকের পুত্র' লিখিত থাকে। তালিকাটির প্রথম নাম স্ত্রীলোকের হইলে উহার দ্বিতীয় নামের প্রথমাংশ বিন্‌ত, 'অমুকের কন্যা দ্বারা শুরু হয়। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ কুলুজিতে যত বেশী সংখ্যক পুরুষের (বংশপর্যায়) উল্লেখ করা দরকার বিবেচনা করেন, ততগুলি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, আর কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে কিংবা বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে তাঁহারা পূর্বপুরুষদের অনেক পর্যায় তালিকাভুক্ত করেন তবে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নাসাব তালিকা পূর্বপুরুষগণের এক বা দুইটি পর্যায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। বংশ তালিকার মধ্যে পূর্বপুরুষগণের এক বা একাধিক ব্যক্তিকে ইস্‌ম অর্থাৎ প্রকৃত নাম ভিন্ন অন্য নামে তালিকাভুক্ত হওয়ার ঘটনা (যথা 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব) বিরল নয়। যদি ইতিহাসের একই কুরসীনামায় অভিন্ন ইস্‌ম বা প্রকৃত নামধারী দুই ব্যক্তি তালিকাভুক্ত হন, তখন ক্ষেত্রবিশেষে গুণবাচক উপাধি আল-আক্‌বার ও আল-আস্‌গার ব্যবহৃত হইয়া থাকে ঃ মারওয়ান আল-আস্‌গার ইব্‌ন আবি'ল জানূব য়াহ্‌য়া ইব্‌ন মারওয়ান আল-আকবার ইব্‌ন আবী হাফ্‌সা। ইসলামে নবদীক্ষিত যে সকল নও-মুসলিমের জন্মদাতাগণ ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাহাদেরকে—বিশেষত 'উছমানী রাজত্বকালে 'আবদুল্লাহ্ (অথবা 'আব্‌দ ও আল্লাহ্‌র যে কোন নাম) নাসাব দান করা হইত। অবশ্য প্রচলিত প্রথার চাপে বাধ্য হইয়াই এইরূপ একটা অলীক নাসাব ব্যবহার করা হইত ; যেমন কোন বিধিসম্মত প্রত্যায়ন কিংবা কবর শীর্ষে উৎকীর্ণ লিপির ক্ষেত্রে।

ফারসী ভাষায় সচরাচর ইব্‌ন শব্দটি বাদ দিয়া তৎপরিবর্তে ইযাফাতের 'ই' ব্যবহার করা হয় ; যেমন, হাসান-ই সাব্বাহ্। 'আরব ও মাগ্‌রিব ব্যতীত অন্যান্য মুসলিম দেশে সাধারণত ইব্‌ন শব্দটি আর ব্যবহৃত হয় না; বরং নাম ও পিতার নামগুলিকে সংক্ষেপে পাশাপাশি স্থাপন করা হয়ঃ আহ্‌মাদ 'আলী-'আলীর পুত্র আহ্‌মাদ। তুর্কীদের অনুকরণে ইরানীরা বহুক্ষেত্রে পিতার নাম, উপনাম বা উপাধির শেষাংশে যাদেহ (زاده) শব্দটি যোগ করিয়া ইহা পুত্রের ইস্‌ম অর্থাৎ প্রকৃত নামের পূর্বে স্থাপন করে। যেমন কাদীযাদেহ্ = 'বিচারকের পুত্র, ; শারিহ আল-মানারযাদে আল-মানার পত্রিকাটির টীকাকারের পুত্র ; পীরীপাশা যাদেহ্='পীরীপাশার পুত্র'। তুর্কী শব্দ 'ওগ্‌লু' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে 'আলিমদের বংশে নহে, সচরাচর অভিজাত কিংবা শাসকশ্রেণীর ক্ষেত্রে উহা ব্যবহৃত হয়। যথা মিখালোগ্‌লু="মিখাল-এর পুত্র"। এই ধরনের 'যাদেহ' এবং 'ওগ্‌লু'-যুক্ত অসংখ্য নাম সাক্ষাত পিতার না হইয়া অভিন্ন পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকারী বিভিন্ন পরিবারের সকল লোকজনের এক রকম উপনামে পরিণত হইয়াছে, যেমন কোপরুলু যাদেহ ইহা এমন একটি গোত্রের নাম (নিসবা) যাহারা বিখ্যাত 'উছমানী উযীরের বংশধর বলিয়া দাবি করে। একইভাবে 'আরবী 'ইব্‌ন' শব্দটি কোন পিতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হইয়া কোন পিতৃপুরুষ বুঝাইতে পারে যেমন, ইব্‌ন খালদূন, ইব্‌ন বাতূতা ইব্‌ন সীনা, ইব্‌ন কামাল (কামাল পাশা যাদেহ)।

(৪) 'নিস্‌বা' এমন একটি বিশেষণ পদ, যাহার শেষে ই-প্রত্যয় যুক্ত হয়, মূলত ইহা উদ্ভূত হয় ব্যক্তিবিশেষের গোত্র বা বংশের নাম হইতে, পরে তাহার পৈতৃক জন্মস্থান বা আবাসস্থলের নাম হইতে, কোন কোন ক্ষেত্রে একটি মায্‌হাব অথবা সম্প্রদায়ের নাম এবং ক্ষেত্রবিশেষে কোন বৃত্তি বা পেশার নাম হইতে। এইভাবে কোন লোকের যুগপৎ কয়েকটি 'নিস্‌বা' থাকিতে পারে যাহা সচরাচর সাধারণ হইতে একাদিক্রমে বিশেষ সীমাবদ্ধ অর্থে এবং কালক্রম অনুযায়ী বাসস্থলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাকে দান করা হয়। যেমন, আল-কু'রাশী আল-হাশিমী আল-বাগ'দাদী ছুম্মা'ল-মাওসি'লী আস-সা'ররাফী (صرّافى) = "কু'রায়শ বংশোদ্ভূত, হাশিম গোত্রোদ্ভূত, বাগদাদের অধিবাসী, অতঃপর মাওসিলবাসী, পোদ্দার। বিশেষ বৃত্তি অর্থাৎ পেশার কথাটি প্রায়ই নামান্তে 'ঈ' প্রত্যয় ব্যতীত দেখান হয় ঃ আল- হাফিজী। 'আরবী ভাষায় নিসবার পূর্বে সর্বদাই নির্দেশক অব্যয় (ال) বসে; কিন্তু ফার্‌সীতে বসে না। তুর্কীগণ বাসস্থান সম্পর্কিত নিস্‌বাটিকে—যাহার শেষে 'লি' বা 'লূ' প্রত্যয় যুক্ত হয়—সচরাচর নামের প্রথমাংশে স্থাপন করে। যেমন ইযমিরলি 'আলী রিদা, "ইযমির (স্মার্না)-এর বাসিন্দা 'আলী রিদা"। মূল উৎসের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হইয়া পড়িলেও পিতা ইচ্ছা করিলে পুত্রের কাছে নিস্‌বা হস্তান্তর করিতে পারে।

সচরাচর এই সকল অপরিহার্য অংশ লইয়াই নাম গঠিত হয়। 'লাকাব' একটি সম্মানসূচক আখ্যা। সাধারণত 'নিস্‌বা'র পরে স্থাপন করিয়া উহাকে কোন কোন ক্ষেত্রে একটি উপনাম, অনেক ক্ষেত্রে একটি উপাধিরূপে যোগ করা যায়। মূল অমিশ্র আকারে ইহা একটি বর্ণনামূলক উপনামরূপে সচরাচর দৈহিক আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকে। যেমন আত্-তা'বীল 'দীর্ঘাঙ্গী', আল-আ'ওয়ার 'কানা', আল-আত'রাশ 'বধির', ইহা ইস্‌ম-এর পরে বসে। এই সকল ডাকনাম অপনাম (নাবায), যথা আল-হিমার 'গাধা' (=১ম মারওয়ান) প্রভৃতি অপেক্ষা কম নিন্দাসূচক বলিয়া মনে করা হয়।

বাগদাদের আব্বাসী খলীফাগণ এক ভিন্ন ধরনের লাকাব (=উপাধি) গ্রহণ করিতেন (B. Lewis লিখিত The Regnal Titles of the first Abbasid Caliphs শীর্ষক নিবন্ধ, in Dr. Zakir Husain Presentation volume, নয়াদিল্লী ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ১৩-২২ দ্র.) এবং তাঁহাদের অনুকরণে অধিকাংশ পরবর্তী মুসলিম সুলতানও এইরূপ করিতেন। যেমন আর-রাশীদ "সঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত", আল-

মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্, আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পিত। পরবর্তী কালে ফারসী, তুর্কী ও 'আরবী লাকাব বা উপাধিগুলি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবতীর্ণ হয়। যেমন জাহানগীর (বিশ্বজয়ী) য়ীলদীরীম ('বজ্র')।

পূর্বে য়ামানের রাজন্যবর্গের যূ (ذو) উপসর্গের সঙ্গে বিশেষ্য যোগে সে সকল নাম (যথা যূ-নুওয়াস, আল-আয্'ওয়া' দ্র.) ছিল, তৎসঙ্গে সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও 'আরবী ভাষায় যূ (স্ত্রীলিঙ্গে যাত) উপসর্গের সঙ্গে একটি দ্বিবচনবিশিষ্ট বিশেষ্যযোগে কাহারো কোন আচরণ বৈশিষ্ট্য বা কীর্তির স্মৃতি রক্ষাকল্পে তাহার ডাকনাম রাখার রীতি ছিল। যথা যাতু'ন-নিতাকায়ন="দুই কোমরবন্ধওয়ালী মহিলা" (=আসমা' বিন্‌ত আবী বাক্‌র); যু'ল-হিজ্‌রাতায়ন-দুইবার হিজরতকারী (=জা'ফার ইব্‌ন আবী তালিব); যু'ল-য়ামীনায়ন="উভয় হস্ত ব্যবহারে পারদর্শী" (তাহির ইব্‌নু'ল-হুসায়ন)। 'আব্বাসী শাসন যুগে অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অনুরূপ সম্মানসূচক উপাধি দেওয়া হইত। যথা যু'ল-কালামায়ন='দুই কলমের অধিকারী" যু'ল-বিযারাতায়ন="দুই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

৩য়/৯ম শতকের শেষাংশ, বিশেষত ৪র্থ/১০ম শতক হইতে খলীফাগণ, রাজন্য, রাষ্ট্রনেতা, প্রধান সেনাপতি ও উচ্চ পদস্থ আমলাগণকে সম্মানসূচক উপাধি দান করিতেন। সচরাচর দাওলা (রাষ্ট্র), দীন (ধর্ম) বা একত্রে এতদুভয়ের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যুগ্মশব্দরূপে সেইগুলি গঠিত হইত। যেমন বাদ্‌রু'দ-দীন-'দীনের পূর্ণচন্দ্র', নাসিরু'দ-দাওলা='রাষ্ট্রে সহায়ক'। মুলক-রাজ্য—শব্দযোগে অনুরূপ যুগ্মশব্দ গঠন করা যাইতে পারে, (নিজামু'ল-মুল্‌ক = 'রাজ্যের শান্তিপূর্ণ শৃঙ্খলা' এবং ইসলাম শব্দ সহযোগে (সায়ফু'ল ইসলাম-ইসলামের তরবারি) ইত্যাদি। বহু লোক প্রধানত তাহাদের লাকাব অর্থাৎ উপাধি দ্বারাই পরিচিত হইয়াছেন। যেমন সালাহু'দ-দীন।

কালক্রমে এইরূপ বহু লাকাব ক্ষমতাশীন সুলতান বা তাঁহাদের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের উপাধিরূপে ব্যবহৃত না হইয়া তাঁহাদের নিজস্ব নামের অতিরিক্ত বিশেষ কিছু বলিয়া গৃহীত হয় না। 'উছমানী শাসন আমলে 'আলিমগণ সচরাচর 'ইস্‌ম'-এর সঙ্গে লাকাবযুক্ত নামে পরিচিত ছিলেন। সেই ক্ষেত্রে কোন বিশেষ 'ইস্‌ম' বা নামের সঙ্গে কোন নির্ধারিত লাকাব সংযুক্ত রাখার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন সিনানু'দ-দীন য়ূসুফ, মুহয়ি'দ-দীন মুহাম্মাদ (দ্র. F. Babinger, in Isl., xi)। য়ূরোপীয় কূটনৈতিক তালিকায় মর্যাদা বিন্যাস রীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ইসলামী বিচারালয় ও দূতাবাসে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ কর্মকর্তা, বিদেশী শাসক ও রাষ্ট্রদূতগণকে সম্মানসূচক সম্বোধন রীতির যে সতর্ক ক্রমবিন্যাস কার্যকর করা হয়, তাহা লাকাব শব্দের বহুবচন আল্‌কাব (তুর্কী এল্‌কাব) শব্দ দ্বারা পরিচিত। এইগুলি ক্রমে ক্রমে কঠোর আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ হইলে বোধগম্য কারণে বিচারালয় ও দূতাবাসের কেরানীকুল পালনের জন্য প্রণীত বিধি পুস্তকে সচরাচর একটি সমগ্র অধ্যায় এই সম্পর্কিত আলোচনায় পূর্ণ হইয়া যায় (যথা ফারীদূন, মুনশা'আতু'স-সালাতীন[২], ১খ, পৃ. ২-১৩) (দ্র. Diplomatic)।

'উছমানী শাসন আমলে বিভিন্ন ধরনের ডাকনাম বা উপনামের ব্যবহার উৎসাহিত করা হয়। কেননা ঐ আমলে দেহরক্ষী বিপুল 'জানিছারী' সেনাবাহিনী ব্যতীত বহু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান বংশের ছিলেন না যাহাদের জন্য বেতন তালিকা রক্ষিত হইত। ফলে তন্মধ্যে অভিন্ন 'ইস্‌ম' বা নামধারী বহু লোকের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা যাইত না, অথচ 'নাসাব'-এর সাহায্যে মুসলিম বংশীয়দেরকে সনাক্ত করা যাইত। তুর্কী ভাষার বাকরীতি অনুযায়ী যে কোন উপনাম সচরাচর 'ইস্‌ম'-এর আগে বসে ; কিন্তু কাহারও চাকুরীর প্রকৃত পদমর্যাদার ভিত্তিতে উপাধি, যেমন পাশা, আগা, মুতাফার্‌রিকা, রা'ঈস (সমুদ্রগামী জাহাজের কাপ্তানদের জন্য), চাউ'শ প্রভৃতি উহার পরে বসে। বাহ্যত ব্যতিক্রম হইতেছে সুলতান ও শাহ্‌যাদে 'যুবরাজ' যাহা সর্বক্ষেত্রেই উহাদের নামের পূর্বে বসে (তবে শাহ্‌যাদী কিংবা কতিপয় প্রসিদ্ধ সূফীর ক্ষেত্রে নামের পরে বসে)। কিন্তু এক্ষেত্রেও শব্দটি ইস্‌ম-এর পূর্বে বসিলে মূলত উহা উপনাম আর পরে বসিলে একটি সম্মানসূচক উপাধি হইতে পারে।

উপনাম নিস্‌বাও হইতে পারে, তখন উহা হয় সঠিক অর্থে কোন শহরের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (ফিলিবেলী, এদ্রিনেলী প্রভৃতি) নতুবা বংশের (সোকোল্লু) কিংবা অস্পষ্টভাবে জাতিগত ঐতিহ্যের সঙ্গে [আর্নাবুদ, উনগুরুস, চারকিস, 'আরব (তুর্কী ভাষায় সচরাচর নিগ্রো অর্থে ব্যবহৃত হয়] সংশ্লিষ্ট থাকিবে। উহারা কখনও বা নির্দয়ভাবে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে ঃ উযূন (দীর্ঘদেহী), সারী (সুকেশী), তাবানী য়াস্‌সী (চেপটা পা)। মৃত্যুর পরও এইরূপ উপনাম দেওয়া যায় ঃ মাক্‌তূল (নিহত), খা'ইন (বিশ্বাসঘাতক), হাযার পারা (সহস্র ফালি)। উপনাম কোন লোকের মর্যাদা বা চাকুরীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হইতে পারে ঃ নিশানজী (লক্ষ্যভেদী), মি'মার (রাজমিস্ত্রী), দামাদ (জামাতা)। আর অনেক ক্ষেত্রেই কিছুটা বিভ্রান্তিকর হইলেও পূর্ববর্তী চাকুরীর মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে, দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজপরিবারে চাকুরীরতদের ক্ষেত্রে ঃ লালা [গৃহশিক্ষক (কোন শাহ্‌যাদার)], সিলিহ্‌দার [ 'অসিবাহক' (সুলতানের বালক ভৃত্য থাকাকালে)]। উপনাম ধর্মীয় খেতাব হইতে পারে ঃ হাজ্জী, আখী (ভ্রাতা), সোফূ (ধার্মিক), গাভুর (বিধর্মী), প্রভৃতি।

এমনকি সচরাচর সুলতানগণও অভিষেককালে গৃহীত নামের স্থলে উপনামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন। যথা 'ফাতিহ' ২য় মুহাম্মদ, Gene ২য় 'উছমান, 'আবজী (=Avdji যোদ্ধা ?) ৪র্থ মেহমেদ। সাধারণ তুর্কী রীতির বিপরীতে উপনাম যখন ইস্‌ম-এর পরে বসে, তখন একটি ফারসী ইদাফা উহ্য থাকে বলিয়া মনে হয়। মেহেম্মেদ-(ই) ফাতিহ, বায়াযীদ-ই ওয়ালী (২য়)।

১০ম/১৬শ শতকের শেষাংশে বিশেষত তুর্কী প্রধান বিচারালয়ে বা তাহার দূতাবাসে ইরানী নাম গ্রহণের একটি অস্থায়ী রীতি গড়িয়া উঠে উপরে ২য় দ্রষ্টব্য) [এইভাবে প্রখ্যাত ফারীদূন তাঁহার ওয়াকফিয়ে-তে "আহমাদ আগা... আশ্-শাহীর বি-ফেরীদুন আগা" নামে পরিচিত হন]। আবার নিজের নাম কেবল আদ্যাক্ষরটি ব্যবহারের অস্থায়ী রীতিও গড়িয়া উঠে। যথা দাল-ই মেহমেদ-এর স্থলে দাল (د), এফেন্দি, তু. 'আয়ন (ع)-ই 'আলী, লাম (ل)-ই 'আলী, (U. Heyd, Ottoman Documents on Palestine, অক্সফোর্ড ১৯৬০ খৃ., পৃ. ১৬ ও টীকা)।

তুর্কীদের মধ্যে Gobek adi (গাবেক=মাতৃজঠর ও শিশুর নাভির সহিত সংলগ্ন নাড়ী, adi=প্রথা) সদ্যপ্রসূত শিশুর নাভিচ্ছেদকালে নামকরণ প্রথা বর্তমান। মাতৃজঠর ও শিশুর নাভির সহিত সংলগ্ন নাড়ী কাটার সময়ে ধাত্রী শিশুকে যে নাম প্রদান করে, ইহা তাহাই। সর্বক্ষেত্রেই একটি উত্তম ইসলামী নাম—পুত্র সন্তানের বেলায় মুহাম্মাদ বা আলী আর কন্যা সন্তানের বেলায় ফাতিমা বা 'আ'ইশা হইয়া থাকে। ইহার ব্যাখ্যা

এই যে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে শিশুর নামকরণ অমঙ্গলজনক মনে করা হয় বলিয়া তাহারা স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রথম মুহূর্তে একটি সাময়িক নামকরণের দ্বারা এই নিশ্চয়তা বিধান করা হয় যে, শিশুটি যদি না-ই বাঁচে, তবে অন্তত মুসলিমরূপে মারা যাইবে। কার্যত Gobek adi প্রথা আজকাল আর পালন করা হয় না, তৎপরিবর্তে Ezan (=আযা'ন) adi পালন করা হয়—পরিবার কর্তৃক ধীরে-সুস্থে স্থিরীকৃত বিধিসম্মত নামটি কয়েক দিন পর (সচরাচর ৩ দিন পর, অবশ্য তাহাদের নিকট বলিয়া বিবেচিত মঙ্গলবার বাদে) ['আকীকা উৎসবকালে] আযা'ন আবৃত্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। কোন শিশু হৃষ্টপুষ্ট না হইলে বদ্‌মেযাজী হইলে তাহার নাম বদল করাও তুর্কীদের একটি প্রচলিত রীতি। তুরস্কে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলের জেলাগুলিতে নিয়মানুগ ইসলামী নামগুলি এমন ডাক নামে (hypocoristic) পরিণত করা হয় যে, সেগুলি চেনা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে : মুস্তাফা> মিসতিক, ফাতিমা> ফাদিক, মেহ্‌মেদ (মুহ'ম্মাদ)>মেমো বা মেমি, সুলায়মান>সোলো, ইব্‌রাহীম>ইবিশ প্রভৃতি।

নামকরণের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল তাখাল্লুস অর্থাৎ কবি-সাহিত্যিকের লিপি (ছদ্ম) নাম গ্রহণ, যেমন—ফিরদাওসী='বেহেশ্‌তী।

এইভাবে এক বা একাধিক মূল অংশ বা একসঙ্গে কয়েকটি উপাদান দ্বারা কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট বিধি না থাকায় কেবল প্রচলিত রীতিই ইহার নিয়ামক বলিয়া মনে হয়, যদিও কোন আখ্যা সম্পর্কে সর্বসম্মত মতৈক্য নাই। এইরূপ আবূ নুওয়াস নামে খ্যাত কবি কোন কোন সময় আল-হাসান ইব্‌ন হানি' কিংবা তাঁহার নিসবা আল-হাকামী নামে উল্লিখিত হয়। বিভ্রান্তি এড়াইবার জন্য জীবনীকারগণ লোকজনকে তাঁহাদের ইস্‌ম বা মূল নাম অনুযায়ী শ্রেণীভুক্ত করেন এবং তৎসঙ্গে কুন্‌য়া, নিস্‌বা ও নাসাবের পরে লাকাব উল্লেখসহ তাহাদের সর্বাধিক ব্যবহৃত নামও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেন। এইভাবে হামযা ইব্‌ন আসাদ নামের অধীনে "Damascus Chronicle of the Crusades" গ্রন্থের প্রণেতা ইব্‌নু'ল-কালানিসীর জীবনী পাওয়া যাইবে। তাঁহার পুরা নাম আবূ য়া'লা হামযা ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আত-তামীমী আদ্‌-দিমাশকী আল-'আমীদ ইব্‌নু'ল-কালানিসী (য়া'লার পিতা ও দামিশক নগরীর তামীম গোত্রভুক্ত মুহাম্মাদের পুত্র 'আলীর পুত্র আসাদের পুত্র হা'মযা, প্রধান বিচারালয়ের অধ্যক্ষ, টুপি নির্মাতার পুত্র)।

নামের এই অংশগুলির কোনটিই সঠিক অর্থে পারিবারিক নাম বা পদবী নহে, যদিও প্রথা অনুযায়ী লাকাব বা নিস্‌বা কিংবা মা'রিফা [ইব্‌নু'ল-কালানিসীর (ইবন দ্র.) ক্ষেত্রে যেমন ঘটিয়াছে] কখনও কখনও সে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইদানীং প্রাচ্যদেশগুলিতে দুইটি নাম ব্যবহারের রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। উহাদের প্রথমটি নিজের ব্যক্তিগত ও দ্বিতীয়টি সচরাচর পিতার নাম। তবে দ্বিতীয়টি পিতামহ কিংবা দূর পর্যায়ের কোন পূর্বপুরুষের অথবা স্বেচ্ছায় গৃহীত দ্বিতীয় ব্যক্তিগত নাম বা পরিবার, বিদ্যালয় অথবা সেনাবাহিনী প্রদত্ত কোন নাম কিংবা উল্লিখিত শ্রেণীগুলির অন্তর্ভুক্ত কোন উপনামও হইতে পারে। সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে পারিবারিক নাম ব্যবহারের রীতি ক্রমেই অধিকতর প্রচলিত হইতেছে এবং কয়েকটি মুসলিম দেশে বাধ্যতামূলকভাবে নামের নিবন্ধন পারিবারিক নাম গ্রহণ রীতিকে আরও ব্যাপক করিবে। তুরস্কে (১৯৩৪ খৃ.) ও ইরানে আইন পাশ করিয়া পারিবারিক নাম গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

**গ্রন্থপঞ্জী** : প্রবন্ধগর্ভে যাহা দেওয়া হইয়াছে তদতিরিক্ত : (১) Dict. of Techn. terms, ১খ, ৭১০, ছত্র ২৪, ৭১৫, ছত্র ১৮ ; (২) আবু'ল-বাকা' 'আবদুল্লাহ আল-'উকবারী (মৃ. ৬১৬/১২১৯)-র কিতাব আল-মাসাইলি'ল-খিলাফিয়্যা ফি'ন-নাহ'বি (পাণ্ডু, কায়রো[২], ২খ, পৃ. ১৫৮) পুস্তকে ইস্‌ম-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে (২য় প্রশ্ন) ও ইস্‌ম-এর উৎপত্তি (ইশ্‌তিকাক') [৪র্থ প্রশ্ন] সম্পর্কে আলোচনা আছে। বসরার লেখকদের মতে শেষোক্ত প্রশ্নে তিনি ইস্‌ম শব্দটি সুমুও (سـمـو) হইতে গঠন করিয়াছেন এবং পরবর্তীতে (২য় প্রশ্নে) ইস্‌ম-এর সংজ্ঞা নিরূপণে তিনি আয-যাজ্জাজ (মৃ. ৩১০/৯২২)-এর সমসাময়িক ইব্‌নু'স-সার্‌রাজ (মৃ. ৩১৬/৯২৯)-এর অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন, অথচ ঐ সংজ্ঞাটি এত জটিল যে, তাঁহার দাবির সত্যতা মানিয়া লওয়া যায় না : হুওয়া কুল্লু লাফ্‌জি'ন দাল্লা 'আলা মা'না ফী নাফ্‌সিহ্‌, গায়র মুক্‌তারীন বি-যামান মুহাস্‌সার (৯৩ r., ছত্র ৪-৫)। বস্তুত আল-মুযাজ ফি'ন-নাহ'বি-এর, বৈরূত ১৩৮৫/১৯৬৫ পৃ. ২৭, ইব্‌নু'স-সার্‌রাজ সংক্ষেপে আল-যাজ্জাজ-এর পূর্ববর্তী লেখকদের সংজ্ঞার মতই 'ইস্‌ম'-এর সংজ্ঞা দান করিয়াছেন।

H. Fleisch (E. I.[2])/মুহম্মদ ইলাহি বখ্‌শ

**ইস্‌ম** (إسم) : ব. ব. আস্‌মা' (اسـمـاء) , প্রকৃত অর্থ 'নাম', 'আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় বিশেষ্য পদ (noun)-কে ইস্‌ম বলা হয়। মূলত দুইটি অক্ষর যোগে ইস্‌ম শব্দটি গঠিত আর সেইজন্য উহা অতি প্রাচীন শব্দগোষ্ঠীভুক্ত (দ্র. H. Fleisch, Traite de la philologie arabe, ১খ, শাখা ৫২)। ইহার তৃতীয় মূল অক্ষররূপে "و" অক্ষরটিকে উহার সঙ্গে এমনভাবে যোগ করা হইয়াছে যেন উহা শব্দের রূপান্তর পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে পারে, যথা অনিয়মিত বহুবচন : আসমা' (اسـمـاء), নির্দেশক ক্রিয়া সামা (سـمـا), য়াসমূ (يـسـمـو), অধিক প্রচলিত ক্রিয়া সাম্মা' (سـمـى), য়ুসাম্মী (يـسـمـى), 'ডাকা, নাম রাখা'। আরব ব্যাকরণবেত্তাদের মধ্যে কূফীগণের মতে ইস্‌ম (اسم) শব্দটি 'ওয়াস্‌ম' (وسـم)-চিহ্ন (ধাতু و س م) হইতে গঠিত হইয়াছে, আর বস্‌রীগণের মতে 'সুমুব্ব (سـمـو) উচ্চতা" ধাতু (س م و) হইতে গঠিত হইয়াছে (তাঁহাদের আলোচনা দ্রষ্টব্য, ইব্‌নুল-আনবারী, কিতাবু'ল-ইনসাফ, সম্পা. G. Weil, প্রথম প্রশ্ন আলোচিত)।

সীবাওয়ায়হি প্রণীত 'আল-কিতাব'-এর যে ইস্‌ম, ফি'ল ও হারফ—'আরবী শব্দাবলীর এই তিনটি প্রধান ভাগের কথা আলোচিত হইয়াছে ইহাদের প্রথমটিই ইস্‌ম। শব্দটির বুৎপত্তি সম্পর্কে [দ্র. ফি'ল ও E. I.[1]-এ ইস্‌ম]।

সীবাওয়ায়হি ইস্‌ম-এর কোন সংজ্ঞা দেন নাই। তিনি শুধু উদাহরণ দিয়াছেন : রাজুল (رجل)-'মানুষ', ফারাস (فـرس)-ঘোড়া, হা'ইত (حائط 'দেয়াল')। আল-আখফাশ (সীবাওয়ায়হির শাগরিদ) আল-কিসাঈ (মৃ. ১৮৯/৮৬৫), আল-ফাররা' (মৃ. ২০৭/৮২২), হিশাম আদ-দারীর (মৃ. ২০৯/৮২৪), আল-মুবাররাদ (মৃ. ২৮৫/৮৯৮) এবং আয-যাজ্জাজ (মৃ. ২১০/৯২২), ভাষাবিদগণ যেই সকল সংজ্ঞার ধারণা দিয়াছেন, ইব্‌ন

ফারিস (মৃ. ৩৯৫/১০০৪) তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (আস-সাহিবী, পৃ. ৮২-৩, বৈরূত সং. ১৩৮২/১৯৬৩)। সংজ্ঞাগুলির কোনটিই ইব্‌ন ফারিস-এর মনঃপূত হয় নাই। বস্তুত শেষোক্ত ব্যক্তি ছাড়া এই ভাষাবিদদের কেহই সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন নাই। তাঁহারা কেবল ব্যাকরণগত বিভিন্ন সম্পর্কের ভিত্তিতে ইস্‌ম-এর বর্ণনা দিয়াছেন। আল-ফার্‌রা' বলেন, "যাহা তান্‌বীন (تنوين), ইদাফা (اضافة সম্বন্ধ পদ) বা আলিফ-লাম (ال নির্দিষ্টসূচক অব্যয়) গ্রহণ করে, তাহাই বিশেষ্য পদ (اسم)। ইবনু'ল-আনবারী ও আল-মুবাররাদ-এর একটি সংজ্ঞা (পূ. গ্র., পৃ. ২, ছত্র ১০) এবং আছ-ছা'লাব (মৃ. ২৯১/৯০৪) (ঐ, ছত্র ৪)-এর প্রদত্ত সংজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইবনু'ল-আনবারী স্বয়ং আল-মুবাররাদ সম্পর্কে বলিয়াছেন (ঐ, ছত্র ১০-১১) যে, তাহাদের সূত্র দ্বারা বড়জোর শব্দ প্রকরণ (اشتقاق)-এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাত হইতে পারে—সংজ্ঞার উদ্দেশ্য নহে। অপরপক্ষে আয-যাজ্জাজ ইস্‌ম-এর একটি সঠিক সংজ্ঞা দিয়াছেন যাহা গ্রীক যুক্তিবিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত।

এরিস্টোটল তাঁহার [যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক) Organon গ্রন্থটির Peri Hermeneias অধ্যায়ে (the De Interperetatione, সম্পা. L. Minio-Paluello, অক্সফোর্ড ১৯৯৬ খৃ.) নিম্নোক্ত দুইটি সংজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ বিশেষ্যের জন্য (১৬ a, ১৯-২০) Onoma (একটি বিশেষ্য) esti (হয়) phone (একটি ধ্বনি) Semantike (অর্থবোধক) kata suntheken (সম্মতিক্রমে) aneu kheonou (কাল সম্পর্কহীন)। তিনি আরও যোগ করিয়াছেন ঃ উহার খণ্ডিত কোন অংশের স্বতন্ত্র কোন অর্থ নাই ; ক্রিয়া পদের জন্য (১৬ b, ৬-৯) ঃ rhema (একটি ক্রিয়া) esti (হয়) to prossemainon (যাহা আরও নির্দেশ করে) Khronon (কাল) [অর্থাৎ যাহা তাহার স্বকীয় অর্থ ছাড়াও কোন একটি কালও নির্দেশ করে] এবং তিনি বিশেষ্যের অনুরূপ মন্তব্য এইখানে সংযোগ করেন।

এরিস্টোটলের বিশেষ্যের সংজ্ঞাটি আয-যাজ্জাজ-এর ইস্‌ম-এর সংজ্ঞায় প্রবর্তিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সাওত মুকাত্তা' মাফহূম দাল্লা 'আলা মা'না গায়র দাল্লা 'আলা যামান ওয়া-লা মাক্কান ঃ phone সাওত এইখানে (মুকাত্তা') [অন্যান্য শব্দ হইতে] বিচ্ছিন্ন, মাফহূম 'জ্ঞাত', দাল্লা 'আলা মা'না-semantike অর্থবোধক' ; aneu khronou-র জন্য "কাল সম্পর্কহীন"-এর সহিত "স্থান সম্পর্কহীন" যোগ করা হইয়াছে; kata suntheken 'সর্বসম্মতিক্রমে' বিলুপ্ত করা হইয়াছে; ইহা ভাষার উৎপত্তি বিষয়ক একটি বড় সমস্যার সহিত সম্পর্কিত—ইহা কি প্রবর্তনমূলক (تواضع واصطلاح) না অতি প্রাকৃত উপায়ে লব্ধ (وحى وتوقيف)।

যেই 'আরব সংজ্ঞাটি, কিছু ভিন্ন পাঠসহ পরবর্তী কালে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়, গ্রন্থকার আস-সীরাফী (মৃ. ৩৬৮/৯৭৮), "আল-কিতাব" গ্রন্থটি তৎকৃত ভাষ্যে (পাণ্ডু. কায়রো, ২খ, ১৩৪) তাহা লিপিবদ্ধ করেন ঃ كل شيء دل لفظه على معنى غير مقترن بزمان محصل من مضى او غيره فهو اسم [১ম ভাগ, ৭ শেষ]। "অতীত বা অন্য কোন সুনির্দিষ্ট কালের সহিত সম্পর্কশূন্য এমন কিছুর অর্থবোধক অভিব্যক্তিকে বলা হয় ইস্‌ম।"

'সুনির্দিষ্ট কাল'—এই বাক্যাংশটি উল্লেখ করিয়া বর্তমান সংজ্ঞাটি পূর্ববর্তী সংজ্ঞাটির অর্থকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আয-যাজ্জাজ প্রদত্ত ইস্‌ম-এর সংজ্ঞাটি হারফ (حرف-অব্যয়)-এর প্রতিও সমানভাবেই প্রয়োজ্য—ইব্‌ন ফারিস-এর এই আপত্তি (আস-সাহিবী, পৃ. ৮৪, ছত্র ১৩-১৫) খণ্ডনের জন্য উহা যথেষ্ট নহে। আয-যামাখশারী (মৃ. ৫৩৮/১১৪৩) 'মুহাস্‌সাল' শর্তটিকে বাদ দিয়া (মুফাস্‌সাল, সম্পা. J. P. Broch, শাখা ২) [দ্র. ফি'ল] ফী নাফ্‌সিহ (স্বকীয়) কথাটি যোগ করিয়াছেন ঃ (الاسم ما دل على معنى فى نفسه دلالة مجردة عن الاقتران) আল-জুরজানী (মৃ. ৮১৬/১৪১৩) (তারীফাত, পৃ. ১৫) 'ইক্‌তিরান' শব্দটি বাদ দিলে কি বুঝায় শুধু তাহাই ব্যাখ্যা করেন ঃ (الاسم ما دل على معنى فى نفسه غير مقترن باحد الازمنة الثلاثة)।

মন্তব্য ঃ দার্শনিক আল-ফারাবী (মৃ. ৩৩৯/৯৫০) তৎকৃত শারহ্ আরিস্‌তূতালীস ফি'ল-'ইবারা (the Peri Hermeneias), সম্পা. W. Kutsch ও S. Marrow, বৈরূত ১৯৬০ খৃ.), পৃ. ২৯, ছত্র ২৫-৬ গ্রন্থে aneu khronou অনূদিত ঃ মুজাররাদা মিনা'য-যামান (কাল সম্পর্কহীন)-এর সহিত বি-যাতিহ ওয়া বি-শাক্‌লিহ (স্বক ও গঠনগত) বাক্যাংশটি যোগ করার উপদেশ দেন, যদি ইহা মাতা'ইনু'ল-মুগালিতীন (مطاعن المغالطين = কুতার্কিকদের আক্রমণ)-এর আশঙ্কায় যোগ করার প্রয়োজন হয় ; না হয় তাহা বাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু আয-যামাখশারীর সংজ্ঞায় হার্‌ফ হইতে ইস্‌মকে পৃথক করার জন্যই 'ফী নাফসিহ' শর্তটি সংযুক্ত হয়।

প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখ করা অস্বাভাবিক মনে হইবে যে, ব্যাকরণবিদ আবূ 'আলী আল-ফারিসী (মৃ. ৩৭৭/৯৮৭) ও ইব্‌ন জিন্নী (মৃ. ৩৯২/১০০২), যাঁহারা 'আল-কিতাব' গ্রন্থখানায় আস-সীরাফী রচিত ভাষ্য সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন, তাঁহারা ইস্‌ম ও ফি'ল সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আয-যাজ্জাজ-এর পূর্বসূরীদের অনুসরণ করিয়াছেন ঃ আবূ 'আলী, ঈদাহ (পাণ্ডু. কায়রো, ২খ, ৮১) ৩ ; ইব্‌ন জিন্নী, লুমা' (পাণ্ডু. বার্লিন ৬৪৬৬) ২।

ইস্‌ম ও ফি'ল-এর যে সকল সংজ্ঞা আরব ব্যাকরণবিদগণের মধ্যে বহুল প্রচলিত সেইগুলি সম্ভবত গ্রীক যুক্তিবিদ্যা হইত গৃহীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন [এরিস্টোটলের অনুসরণে প্রবর্তিত] 'আরবী ভাষায় কাল সম্পর্কিত নিয়মটি যে কতটা অযৌক্তিক তাহা ফি'ল অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই সকল সংজ্ঞা প্রতিপাদন করা ছিল এক দুষ্কর ব্যাপার। এই সম্পর্কে আধুনিক ভাষাবিদ্যায় সুদীর্ঘ আলোচনা করা হইয়াছে (দ্র. H. Fleisch, Traite, ১খ, ধারা ৫৩ এ ও অতিরিক্ত পৃ. ৫২৫-৬; BSLP ৫৪/১খ, ২৭-৮)। The J. Marouzeau, Lexique de La terminologie linguistique, ৩য় সং-এ ক্রিয়াপদের একটি সংজ্ঞা (পৃ. ২৩৬) দেওয়া হইয়াছে—বিশেষ্যের (পৃ. ১৫৬) নহে।

পূর্বোল্লিখিত তিনটি প্রধান ভাগের কারণে 'আরব বৈয়াকরণগণ ইস্‌ম-এর অধীনে প্রথমে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন প্রকৃত বিশেষ্যকে, যেমন ইস্‌মু'ল-জিন্‌স (জাতিবাচক বিশেষ্য), আল-ইস্‌মু'ল-'আলাম বা ইস্‌মু'ল-'আলাম (নামবাচক বিশেষ্য) [দ্র. 'আলাম], ইস্‌মু'ল-'আয়ন (বস্তুবাচক বিশেষ্য), ইস্‌মু'ল-মা'না (গুনবাচক বিশেষ্য), ইস্‌মু'ল-ফা'ইল (Active

Participle) [কর্তৃবাচক বিশেষ্য], ইসমু'ল-মাফ'উউ (Passive Participle) [কর্মবাচক বিশেষ্য]। শেষোক্ত দুইটি প্রকৃত অর্থে সিফা (বিশেষণ) [দ্র. সিফাত] ; বিশেষণ (সিফাত মুশাব্বাহা صفة مشبهة) 'সিফাতের' অন্তর্ভুক্ত ; গুণবাচক উক্তিরূপে ব্যবহৃত সিফাত ও তাহার পূরকসমূহকে না'ত نعت বলা হয়। অতঃপর আল-মাসদার (المصدر) (infinitive) [ক্রিয়াভাব] ও ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন সকল বিশেষ্যকে, যেমন— ইসমু'য-যামান ওয়া'ল-মাকান (اسم الزمان والمكان) (কাল ও স্থানবাচক বিশেষ্য) প্রভৃতি। অতঃপর সকল সর্বনামকে, যেমন ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ঃ আল-মুদ্‌মারাত (المضمرات) [দ্র. মুদমার], নির্দেশক সর্বনাম (ইস্‌ম ইশারা = اسم اشارة) সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ঃ (আল-ইসমু'ল-মাওসূল), যাহারা একত্রে আল-মুবহামাত (المبهمات) নামে অভিহিত। অতঃপর সংখ্যাবাচক বিশেষ্য (ইস্‌মু'ল-'আদাদ = اسم العدد)-কে। এই সকল শ্রেণীবিভাগ পাওয়া যাইবে পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ মুফাসসাল-এর সারণীগুলিতে (পৃ. ২১২-৩) মূল পাঠের বরাতসহ। এতদ্ভিন্ন Wright-এর 'আরবী ব্যাকরণে (৩য় সং, ১খ, ১০৪-১০) আরও উন্নত ধরনের পরিভাষা পাওয়া যাইবে। 'আরব ব্যাকরণবিদগণ ইস্‌ম বলিয়া মনে করেন প্রশ্নবোধক শব্দগুলিকে, যেমন কায়ফা (كيف=কেমন) ? আয়না (اين =কোথায়)? কাম (كم=কতটুকু)? মাতা (কখন) ? ইয (إذ) ও ইযা (إذا) [সাধারণত সংযোজনমূলক অব্যয়] শব্দদ্বয়কে, হাইছু حيث (যেইখানে) শব্দটিকে (ইব্‌ন ফারিস, ঐ ; কাম শব্দটির জন্য সীবাওয়ায়হি, ১খ, ২৫০, ছত্র ১৩, প্যারিস সং ; মাতা শব্দটির জন্য ইব্‌ন হিশাম, মুগনি'ল-লাবীব, শিরো.)। উপসংহারে যেই সকল অভিব্যক্তি আমাদের কাছে অন্তর্ভাবার্থক অব্যয়, বিস্ময়সূচক বাচনভঙ্গি, এমনকি ধ্বন্যাত্মক শব্দ 'আরব বৈয়াকরণগণ সেইগুলিকে আসমা'ল-আফ'আল (اسماء الافعال = ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য) -এর শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, যখন ইহাদের মধ্যে ক্রিয়ার আচরণ বিশেষত অজ্ঞাতসূচকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ বরাতের জন্য পূর্ববর্তী নিবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী দ্র.।

H. Fliisch (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

**'ইস্‌মা (عصمة)** ঃ ইসমাত, ('আ) দীনের বিধান ও 'আকা'ইদ মতে ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং পাপ হইতে মুক্ত থাকা। যেমন আহ্‌লু'স-সুন্না ওয়া'ল-জামা'আ আম্বিয়া ('আ)-কে ও শী'আ সম্প্রদায় আম্বিয়া (আ)-সহ ইমামগণকেও নিষ্পাপ ও অপরাধমুক্ত (মা'সূম) মনে করেন। ইসলামী মতে নবী-রাসূলগণ যাবতীয় পাপ হইতে মুক্ত (নিষ্পাপ)। মানবিক চাহিদার কারণে তাঁহাদের দ্বারা ভুল-ত্রুটি হইতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিজ ওয়াহ্‌য়ি দ্বারা তাঁহাদের ভুলও সংশোধন করিতে থাকেন। ইসলাম প্রত্যেক নবীর পবিত্রতা বর্ণনা করিয়াছে এবং যে সমস্ত ঘটনা য়াহূদী খৃষ্টানগণ তাঁহাদের জীবনীতে সংযোজন করিয়াছে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আহ্‌লু'স-সুন্না-র প্রখ্যাত 'আলিমগণের মধ্যে ইমাম ফাখ্‌রু'দ-দীন আর-রাযী (র) সকল নবী সম্পূর্ণ নিষ্পাপ— এই মতের পক্ষপাতী, বিশেষ করিয়া ইব্‌ন হায্‌ম আন্দালুসী (আল-ফাস্‌লু ফি'ল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, ৪খ.), কাদী 'ইয়াদ (আশ-শিফা, ভাগ ৩, প্রথম অধ্যায়), আল-খাফাজী (শারহু'শ-শিফা' খণ্ড ৪) ও দোস্ত মুহাম্মাদ কাবুলী (তুহ্‌ফাতু'ল-আখিল্লা' ফী 'ইসমাতি'ল-আম্বিয়া') এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন এবং বিরোধীদের সমস্ত সন্দেহ পুরাপুরি নিরসন করিয়াছেন (সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, সীরাতু'ন-নাবী, ৪খ., ১০২ আজামগড় ১৯৫১ খৃ.)। শী'আ শিক্ষা মতে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ও মৌলিক গুণাবলীর কারণে ইমামদের মধ্যে এই গুণ স্বাভাবিকভাবে নবীদের তুলনায় বেশী থাকে। আবূ যায়দ আল-বাল্‌খী (মৃ. ৩২২/৯৩৪) ইস্‌মাতু'ল-আম্বিয়া' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (য়াকূত, ইরশাদ, ১৪২--শেষ পর্যন্ত) এবং এইভাবে ফাখরু'দ-দীন আর্‌-রাযীও (ব্রকেলম্যান, খণ্ড ১, ৫০৭ পৃ. ১৪)। ইসলামী 'আকা'ইদের প্রতি গ্রন্থে উক্ত বিষয়সমূহ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে একটি অধ্যায় থাকে (যেমন ইব্‌ন হায্‌ম, আল-মিলাল, কায়রো ১৩২১ হি. ৪খ. ১-৩১; আল্‌-মাওয়াকিফ, সম্পা. Soerensen, পৃ. ২২০ প.)। 'ইসমাত-এর একটি সূফীসুলভ সংজ্ঞা ইমাম গাযালী (র) দিয়াছেন (মীযানু'ল-'আমাল, কায়রো ১৩২৮ হি., পৃ. ১১৬০)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) C. Snouck-Hurgonje, Nieuwe Bijdragen tot de Kennis van den Islam, in Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde v. Ned-Indie, ৪র্থ পর্যায়, খণ্ড ৬, পৃ. ৪১; (২) Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, পৃ. ২২০-২৩; (৩) ঐ লেখক, in Der Islam, ৩খ, ২৩৮-২৪৫; (৪) মানার, ৫খ, ১২-২১ ও ৮৭-৯৩; (৫) E. I.[2], ৩খ., ১৮২-৩।

Goldziher ও দা.মা.ই.-র সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/ মোহাম্মদ হোসাইন

**'ইসমা ইব্‌ন উবায়র (عصمة بن ابير)** ঃ (রা) ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন সুরায়ম ইব্‌ন ওয়াছিলা, আত-তায়মী, সাহাবী। তিনি তায়ম গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার গোত্রের প্রতিনিধি হইয়া মহানবী (স)-এর নিকট আগমন করেন এবং স্বীয় গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ প্রদান করেন। আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফাতকালে নবূওয়াতের দাবীকারিণী সাজাহ্‌-এর বিরুদ্ধে মুসলমানদের যেই যুদ্ধ হয় তাহাতে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তখন তিনি তাঁহার গোত্রের নেতৃত্বে ছিলেন। উষ্ট্র-যুদ্ধের সময় 'উতবা ইব্‌ন আবী সুফয়ান, য়াহ্‌য়া ইব্‌নু'ল-হাকীম এবং 'আবদু'র-রাহমানসহ বানূ উমায়্যার কতিপয় ব্যক্তি পলায়ন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি তাঁহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন ও পরে তাঁহাদের নিরাপদ স্থান সিরিয়ায় পৌঁছাইয়া দেন। ইব্‌নু'ল-আছীরের বর্ণনামতে একমাত্র ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র স্বীয় গ্রন্থে তাঁহার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ৪৮১-৪৮২, নং ৫৫৪৬; (২) ইব্‌নু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, বৈরূত ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৪০৮; (৩) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র, ইসতী'আব (ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ১৩৯); (৪) যাহাবী, তাজরীদ আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৩৮০, নং ৪০৯৩।

লিয়াকত আলী

**'ইসমা ইব্‌ন কায়স (عصمة بن قيس)** ঃ (রা), সাহাবী। তিনি হাওয়াযিন গোত্রের (মতান্তরে সুলায়ম গোত্রের) লোক ছিলেন। তিনি মহানবী (স) হইতে কতিপয় হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে আযহার ইব্‌ন কায়স হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণিত

আছে যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁহার নাম ছিল 'উসায়্যা (عصية)। মহানবী (স)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণের শপথবাণী পাঠ করার পর তিনি তাঁহার নাম পরিবর্তন করিয়া 'ইস্‌মা রাখেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি পশ্চিমাঞ্চলের (মতান্তরে পূর্বাঞ্চলের) ভবিষ্যত বিপর্যয় হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিতেন, এই বিপর্যয় অতি ভয়ানক। ইবনু'ল-আছীরের বর্ণনামতে ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র, ইব্‌ন মানদা ও আবূ নু'আয়ম তাঁহাদের গ্রন্থে তাঁহার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ৪৮২, নং ৫৫৫১; (২) যাহাবী, তাজরীদ আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত, তা. বি., ১খ, ৩৮১, নং ৪০৯৯; (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু''র-গাবা, বৈরূত ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৪০৯; (৪) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র, ইসতী'আব (ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ১৩৮)।

লিয়াকত আলী

**'ইসমা ইব্‌ন রি'আব্** (عصمة بن رئاب) ঃ (রা) ইব্‌ন হানীফ ইব্‌ন রি'আব ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন যায়দ, সাহাবী। তিনি মদীনার অধিবাসী ছিলেন। তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানকার একটি বৃক্ষতলে অনুষ্ঠিত শপথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আরও অনেক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং য়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ৪৮১, নং ৫৫৪৮; (২) ইব্‌নু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, বৈরূত ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৪০৯; (৩) যাহাবী, তাজরীদ আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৩৮০, নং ৪০৯৭।

লিয়াকত আলী

**'ইসমা ইব্‌ন সারাজ** (عصمة بن سرج) ঃ (রা), সাহাবী। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি মহানবী (স)-এর সহিত হুনায়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ্‌ তাঁহার সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন এবং ইব্‌ন আবী হাতিম তাঁহার গ্রন্থে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। 'আসকারী তাঁহাকে সাহাবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র-এর ইস্‌তী'আব গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ৪৮১, নং ৫৫৪৯; (২) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র, ইস্‌তী'আব, ইসাবার, হাশিয়া, ৩খ, ১৩৯; (৩) ইব্‌নু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, বৈরূত ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৪০৯; (৪) যাহাবী, তাজরীদ আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৩৮১, নং ৪০৯৮।

লিয়াকত আলী

**'ইস্‌মা ইব্‌নু'ল-হুসায়ন** (عصمة بن الحصين) ঃ (রা) ইব্‌ন ওয়াবরা আল-আনসারী, রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর সাহাবী, মদীনার খায্‌রাজ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। প্রামাণিক সূত্রে তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ পাওয়া যায় না। তাঁহার পিতার নাম ছিল হুসায়ন ইব্‌ন ওয়াবরা। অবশ্য আবু'ল-আসওয়াদ প্রমুখ তাঁহাকে তাঁহার দাদার দিকে নিসবা করিয়া 'ইসমা ইব্‌ন ওয়াবরা বলিয়াছেন। ইবনু'ল-কালবীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মূসা ইব্‌ন 'উকবা, ইব্‌ন 'উমারা ও ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে তিনি বদর্ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। 'আফরাা' ও আসমাা' নামে তাঁহার দুই কন্যা ছিল। আনসারীদের মধ্যেই তাঁহাদের বিবাহ হয়। তাঁহার অন্য কোন বংশধর ছিল না।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ৪৮১, নং, ৫৫৪৭; (২) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব, (ইসাাবার হাশিয়ায় সন্নিবেশিত, ৩খ, ১৩৮; (৩) ইব্‌ন সা'দ, আত্‌-তাবাকাতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৫৫১; (৪) ইবনু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৪০৯; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাা'ই'স-সাহাাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৩৮১, নং ৪০৯৬; (৬) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদাায়া ওয়া'ন-নিহাায়া, বৈরূত, ২য় সং., ১৯৭৮ খৃ., ৩খ, ৩২২; (৭) ইদ্‌রীস কান্‌ধলাবী, সীরাতু'ল-মুসতাফা, রাব্বানী বুক ডিপো, দিল্লী ১৯৮১ খৃ., ১খ, ৬১৬; (৮) ইব্‌ন হিশাাম, আস-সীরাতু'ন-নাাবাবিয়্যা, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ., ২খ, ২৫০।

ড. আবদুল জলীল

**ইস্‌মা'ঈল** (اسماعيل) ঃ ('আ) একজন প্রসিদ্ধ নবী, যাবীহুল্লাহ, কুরায়শ বংশের আদি পিতা, হযরত ইবরাাহীম ('আ)-এর প্রিয়তম ও জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইসমাা'ঈল শব্দটির হিব্রু রূপ হইল শিমাা'ঈল (شماع) (ايل শماع অর্থ শ্রবণ করা, ايل অর্থ আল্লাহ) যাহার অর্থ, আল্লাাহ শ্রবণ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বিবি হাজিরা ('আ) (মূল উচ্চারণ 'হাজার বা আাজার, বুখারী, ১খ, ৩৫৯) ও হযরত ইবরাাহীম ('আ)-এর দু'আ' শ্রবণ করিয়াছিলেন— এই নামটি সেই দিকে ইঙ্গিতবহ। কুরআান কারীমে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হযরত ইবরাাহীম ('আ) বৃদ্ধ বয়সে একজন পুণ্যবান সাালিহ্‌ সন্তানের জন্য দু'আ' করিয়াছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে এক সালিহ্‌ (সৎকর্মপরায়ণ) সন্তান দান কর। অতঃপর আমি তাহাকে এক হালীম (স্থিরবুদ্ধি ও ধৈর্যশীল) পুত্রের সুসংবাদ দিলাম" (৩৭ ঃ ১০০-১০১)। এই দু'আার ফলেই হযরত ইসমাা'ঈল ('আ) জন্মগ্রহণ করেন। কুরআান কারীমের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে। ২ ঃ ১২৫, ১২৭, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০; ৩ ঃ ৮৪; ৪ ঃ ১৬৩; ৬ ঃ ৮৬; ১৪ ঃ ৩৯; ১৯ ঃ ৫৪; ২১ ঃ ৮৫; ৩৮ ঃ ৪৮ ইত্যাদি।

হযরত ইসমাা'ঈল ('আ) ছিলেন হযরত হাজিরা ('আ)-এর গর্ভজাত এবং হযরত ইব্‌রাাহীম ('আ)-এর সর্বপ্রথম সন্তান (Jewish Encyclopaedia, ৬খ, ৬৪৭, শিরো.)। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-এর বয়স ছিল তখন ৮৬ বৎসর (বাইবেলের আদিপুস্তক, ১৬ ঃ ১৬)। তাঁহার স্ত্রী হযরত সারা-র গর্ভজাত হযরত ইসহাাক ('আ) তাঁহার ১৪ বৎসরের (মতান্তরে ১৩ বৎসরের) ছোট ছিলেন।

হযরত ইসমাা'ঈল ('আ)-এর জন্মের অল্প কিছুদিন পর অর্থাৎ তিনি যখন দুগ্ধপোষ্য শিশু— তখন পিতা হযরত ইব্‌রাাহীম ('আ) আল্লাাহ্‌র নির্দেশক্রমে তাঁহাকে ও তাঁহার মাতাকে বর্তমানে যেখানে কা'বা গৃহ ও যামযাম কূপ অবস্থিত— সেখানে এক বিজন মরু প্রান্তরে রাখিয়া আসেন। তিনি তাঁহাদের নিকট একটি থলিয়ায় কিছু খেজুর ও একটি মশকে কিছু পানি রাখিয়া যখন চলিয়া আসিতে উদ্যত হইলেন, ইসমাা'ঈল ('আ)-এর মাতা বিবি হাাজিরা তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আপনি এই জন-মানবশূন্য ও খাদ্যশস্যহীন মরু প্রান্তরে আমাদেরকে ফেলিয়া কোথায়

যাইতেছেন ?" কয়েকবার তিনি এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। কিন্তু ইব্‌রাহীম (আ) সেদিকে কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে হাজিরা বলিলেন, "আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন ?" ইব্‌রাহীম (আ) উত্তর দিলেন, "হাঁ"। হাজিরা (আ) তখন বলিলেন, "তাহা হইলে আমাদেরকে আর কোন কিছুই ধ্বংস করিতে পারিবে না।" হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহাদেরকে রাখিয়া কুদা'-এর নিকটবর্তী ছানিয়্যায় পৌঁছিয়া যেখান হইতে শিশু ইসমা'ঈল ও তাঁহার মা হাজিরা আর দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না— বায়তুল্লাহ-এর দিকে মুখ ফিরাইয়া দু'আ করিলেন, "হে আমাদের প্রতিপালক ! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করাইলাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট, হে আমাদের প্রতিপালক! এইজন্য যে, উহারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব, তুমি কিছু লোকের অন্তর উহাদের প্রতি অনুরাগী করিয়া দাও এবং ফলাদি দ্বারা উহাদের রিয্‌কে'র ব্যবস্থা করিও যাহাতে উহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে" (১৪ ঃ ৩৭)।

কয়েকদিন পর মশকের পানি ফুরাইয়া গেলে হাজিরা (আ) ও শিশু ইসমা'ঈল তৃষ্ণায় ছটফট করিতে লাগিলেন। তখন হাজিরা পানির সন্ধানে ছুটিলেন। নিকটস্থ সাফা পর্বতে আরোহণ করিয়া তিনি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন— কোথাও পানি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না বা কোন কাফিলা এইদিকে আগমন করিতেছে কি না। কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে না পাইয়া তিনি নিম্নে নামিয়া আসিলেন। অতঃপর তিনি নিকটবর্তী মারওয়া পর্বতে আরোহণ করিয়া চতুর্দিকে দেখিলেন। কিন্তু কোথাও কোন কাফিলা কিংবা পানির নিদর্শন দেখিতে না পাইয়া সেখান হইতে নামিয়া আসিয়া আবার সাফা পর্বতে আরোহণ করিলেন। এই প্রকারে সাতবার আরোহণ, অবরোহণ এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে উদ্বিগ্নভাবে ছোটাছুটি (সা'ঈ দ্র.) করিলেন। অবশেষে তিনি যখন মারওয়া পাহাড়ের উপর, তখন নীচে একটি শব্দ শুনিয়া সেখান হইতে ইসমা'ঈলের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, শায়িত শিশু ইসমা'ঈলের পদাঘাতে সেই স্থানে একটি পানির ধারা প্রবাহিত হইতেছে। ইহাই পরবর্তীকালে যাময়াম কূপ (بئــر زمــزم) নামে খ্যাত হয়। হাজিরা (আ) সেই পানি পান করিলেন এবং শিশু পুত্রকেও পান করাইলেন। অদৃশ্য হইতে জনৈক ফিরিশতা তাঁহাকে বলিলেন ঃ আপনি অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার ভয় করিবেন না। কারণ এইখানে বায়তুল্লাহ রহিয়াছে। এই শিশু ও ইহার পিতা উহা মেরামত করিবেন। আর আল্লাহ তা'আলা উহার অধিবাসিগণকে ধ্বংস করিবেন না (সাহীহ আল-বুখারী, কলিকাতা তা.বি., ১খ, ৪৭৪-৪৭৫)। বিবি হাজিরা (আ) প্রস্তরাদি দ্বারা পানি ধারার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া উহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

এইখানেই শিশু ইসমা'ঈল (আ) স্নেহময়ী মাতার আদর-যত্নে ধীরে ধীরে বড় হইতে থাকেন। ইবরাহীম (আ) তাঁহার প্রচার ক্ষেত্র কান'আন হইতে মাঝে মাঝে মক্কায় আসিয়া তাঁহাদের খোঁজ-খবর নিতেন। একদা তিনি আসিয়া দেখিলেন, ইসমা'ঈল (আ) কিছুটা বড় এবং পিতার সহিত চলাফিরা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইবরাহীম (আ) একদা স্বপ্নে তাঁহার একমাত্র পুত্র ইসমা'ঈল (আ)-কে কুরবানী করিতে আদিষ্ট হন। তখন তিনি পুত্রের মতামত জানিতে চাহিয়া বলিলেন, "আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি তোমাকে কুরবানী করিতেছি, তুমি কি বল ?" তিনি বলিলেন, "পিতা ! আপনি যাহা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন তাহাই করুন। আপনি ইন্শাআল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন" (আল-কুরআন, ৩৭ ঃ ১০২)। অতঃপর পুত্রকে কুরবানী করিবার উদ্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহাকে লইয়া ময়দানের এক প্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং কুরবানীর সকল আয়োজন সমাপ্ত করত যখন ইসমা'ঈল (আ)-এর গলায় ছুরি চালাইতে উদ্যত হইলেন, তখন আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এই বাণী শুনিতে পাইলেন, "হে ইবরাহীম ! তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিয়াছ। আমি এই প্রকারেই সৎ কর্মশীল ব্যক্তিদেরকে পুরস্কৃত করি" (আল-কুরআন, ৩৭ ঃ ১০১-১০৫)। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইসমা'ঈল-এর পরিবর্তে কুরবানী করিবার জন্য বেহেশত হইতে একটি পশু পাঠাইলেন (আল-কুরআন, ৩৭ ঃ ১০৭)। তখন হইতে হযরত ইসমা'ঈল (আ) "যাবীহুল্লাহ" উপাধিতে খ্যাত হইলেন।

কুরআন কারীমে যাবহ ও কুরবানী সম্পর্কিত এই ঘটনায় ইসমা'ঈল (আ)-এর নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকায় য়াহূদী ও খৃষ্টান লেখকগণ তাঁহাদের নিকটতম পূর্বপুরুষ সারা-র গর্ভজাত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক (আ)-কে যাবীহুল্লাহ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। আর এই ইসমা'ঈলী রিওয়ায়াতের উপর ভিত্তি করিয়া মুসলিম মুফাসসির ইব্‌ন জারীর তাবারীও উক্ত মত ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁহার "একমাত্র পুত্র"-কে কুরবানী দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন—যাহা বাইবেলেও (আদি পুস্তক) উক্ত হইয়াছে, "Thine Only Son" (Gensis, ২২ ঃ ২)। আর ইসহাক (আ) ইব্‌রাহীম (আ)-এর একমাত্র পুত্র ছিলেন। তাঁহার পূর্বে ইসমা'ঈল (আ)-এর জন্ম হইয়াছিল। Genesis, ১৬ ঃ ১৬ অনুযায়ী ইবরাহীম (আ)-এর ৮৬ বৎসর বয়সে ইসমা'ঈল-এর জন্ম এবং Genesis, ২১ ঃ ৫ অনুযায়ী ১০০ বৎসর বয়সে ইসহাক (আ)-এর জন্ম। অতএব, ইসমা'ঈল (আ) ইসহাক (আ) হইতে ১৪ বৎসরের বড় ছিলেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র এই নির্দেশকালে ইসমা'ঈল (আ)-ই ছিলেন একমাত্র পুত্র, তাই তাঁহাকেই যাবহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

কুরআন কারীমের আয়াত দ্বারাও এই সত্য প্রমাণিত। কুরআন-এর যেখানেই ইসমা'ঈল ও ইসহাক-এর কথা বর্ণনা করা হইয়াছে সেখানে প্রথমে ইসমা'ঈল এবং পরে ইসহাক-এর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. ২ ঃ ১৩৩, ১৩৬, ১৪০; ৩ ঃ ৮৪; ৪ ঃ ১৬৩; ১৪ ঃ ৩৯)। তদুপরি হযরত সারাকে যখন ইসহাক-এর সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন ইবরাহীম (আ) ফিলিসতীনে এবং ইসমা'ঈল (আ) হিজাযে বসবাসরত ছিলেন। সুতরাং ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, হিজাযে অবস্থারত ইসমা'ঈল (আ)-ই যাবীহুল্লাহ।

কুরআন কারীমের অপর এক বিবরণ হইতেও এই সত্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাহা হইল, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দুই পুত্রকে দুইটি খিতাবে ভূষিত করিয়াছেন ঃ একজনকে গুলাম হালীম (ধৈর্যশীল পুত্র সন্তান), অপরজনকে গুলাম 'আলীম (জ্ঞানী পুত্র সন্তান)। আর 'গুলাম 'আলীম" দ্বারা যে হযরত সারার গর্ভজাত ইসহাক (আ)-কে বুঝানো হইয়াছে, তাহা কুরআন কারীমের বর্ণনায় সুস্পষ্ট। ইসহাক (আ) সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে, "অতঃপর উহারা তাহাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তান (গুলাম 'আলীম)-এর সুসংবাদ দিল (৫১ ঃ ২৮, আরও দ্র. ১৫ ঃ ৫৩)। অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-এর দু'আর পরিপ্রেক্ষিতে যে "গুলাম হালীম"-এর সুসংবাদ দিয়াছিলেন তিনি ছিলেন

তাঁহার প্রথম পুত্র হযরত ইসমা'ঈল ('আ)। আর তাঁহার সম্পর্কেই যাব্‌হ্‌-এর কথা বলা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে, "এবং সে (ইবরাহীম) বলিল, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চলিলাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎ পথে পরিচালিত করিবেন। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎ কর্মপরায়ণ সন্তান দান কর। অতঃপর আমি তাহাকে এক ধৈর্যশীল পুত্র সন্তান (গুলাম হালীম)-এর সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর সে যখন তাহার পিতার সঙ্গে কাজ করিবার মত বয়সে উপনীত হইল তখন ইবরাহীম বলিল ঃ বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যাব্‌হ্‌ করিতেছি, এখন তোমার অভিমত কি বল? সে বলিল ঃ হে আমার পিতা! আপনি যাহা আদিষ্ট হইয়াছেন তাহাই করুন। ইন্‌শা আল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন। তখন তাহারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করিল এবং ইব্‌রাহীম তাহার পুত্রকে কাত করিয়া শায়িত করিল তখন আমি তাহাকে আহ্‌বান করিয়া বলিলাম, "হে ইব্‌রাহীম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করিলে! এইভাবেই আমি সৎ কর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি। নিশ্চয়ই ইহা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাহাকে মুক্ত করিলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে" (৩৭ ঃ ৯৯-১০৭)। এইখানে যাবীহুল্লাহ নিজেকে সবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন। কুরআন কারীমের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইব্‌রাহীম-তনয় হযরত ইস্‌মাা'ঈল ('আ)-এর নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন। ইর্‌শাদ হইয়াছে ঃ "এবং স্মরণ কর ইস্‌মা'ঈল, ইদ্‌রীস ও যুলকিফল-এর কথা, তাহাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল" (২১ ঃ ৮৫); সুতরাং ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, যাবীহুল্লাহ্ হযরত ইস্‌মা'ঈল ('আ)-ই।

খলীফা 'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয (র) একদা ইসলামে দীক্ষিত একজন য়াহূদীকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "য়াহূদীরা জানে যে, ইসমা'ঈল ('আ)-ই প্রকৃত যাবীহ্; কিন্তু তাহারা আপনাদের প্রতি ঈর্ষাবশত ইহা স্বীকার করে না।"

যামযাম কূপের মালিকানা ছিল হাজিরা ও ইস্‌মা'ঈল ('আ)-এর। মক্কা মরুভূমিতে পানির ব্যবস্থা দেখিয়া বিভিন্ন যাযাবর গোত্র ও ব্যবসায়ী কাফিলা এইখানে অবস্থান করিয়া খাদ্যের বিনিময়ে পানি গ্রহণ করিত। কিছুকাল পর জুরহুম গোত্রীয় একদল বণিক মক্কার নিম্নভূমিতে যাত্রা বিরতি করে। তাহারা এক স্থানে পাখিকে চক্রাকারে উড্ডয়ন করিতে দেখিয়া মনে করিল যে, নিশ্চয়ই ঐ স্থানে পানি আছে। অতঃপর তাহারা যামযামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হাজিরার নিকট সেখানে বসতি স্থাপনের অনুমতি চাহিল। হাজিরা ('আ)-ও জন-মানবের সঙ্গ কামনা করিতেছিলেন। তিনি তাহাদেরকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু স্পষ্ট বলিয়া দিলেন যে, যামযামের উপর কোন অধিকার তাহাদের থাকিবে না। অতঃপর জুরহুম বংশ সেইখানে বসবাস করিতে লাগিল। এইদিকে ইস্‌মা'ঈল ('আ) যৌবনে পদার্পণ করিলেন এবং 'আরবী ভাষাভাষী জুরহুমদের নিকট হইতে 'আরবী ভাষা শিক্ষা করিলেন। তিনি জুরহুম গোত্রীয় এক কন্যাকে বিবাহ করিলেন। ইতোমধ্যেই হযরত হাজিরা ('আ) ইনতিকাল করেন।

হযরত ইস্‌মা'ঈল ('আ)-এর বিবাহের পর ইব্‌রাহীম ('আ) পুত্রের খোঁজ-খবর লইবার জন্য একবার মক্কায় আগমন করেন। ইস্‌মা'ঈল ('আ) তখন খাদ্যের সন্ধানে বাহিরে গিয়াছিলেন। ইব্‌রাহীম (আ) তখন ইস্‌মা'ঈল ('আ)-এর স্ত্রীকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করায় সে তাহাদের দুরবস্থা ও খাদ্য সঙ্কটের কথা জানাইয়া অভিযোগ করিল। ইব্‌রাহীম ('আ) বলিলেন, "তোমার স্বামী ফিরিয়া আসিলে তাহাকে আমার সালাম দিবে এবং বলিবে, সে যেন তাহার দরজার চৌকাঠ পাল্টাইয়া ফেলে।" হযরত ইসমাা'ঈল ('আ) আসিয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া কিছু যেন একটা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ আসিয়াছিল কি?" তাঁহার স্ত্রী উত্তর দিলেন যে, এমন ধরনের এক বৃদ্ধ আসিয়াছিলেন। তিনি আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইসমা'ঈল ('আ) বলিলেন, "তিনি কি কোন উপদেশ দিয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "তিনি আপনাকে সালাম দিয়াছেন এবং দরজার চৌকাঠ পাল্টাইয়া ফেলিতে বলিয়াছেন।" তখন ইসমাা'ঈল ('আ) বলিলেন, "তিনি আমার পিতা। তিনি ইঙ্গিতে তোমার পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং তুমি তোমার পরিজনের নিকট চলিয়া যাও।" অতঃপর ইসমা'ঈল ('আ) তাঁহাকে তালাক দিয়া সেই গোত্রেরই আর এক কন্যাকে বিবাহ করিলেন। কিছুদিন পর হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) পুনরায় আগমন করিলেন। এইবারও তিনি ইসমা'ঈল ('আ)-কে গৃহে পাইলেন না। তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "আমরা খুব ভালই আছি।" ইব্‌রাহীম ('আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, " তোমাদের খাদ্যদ্রব্য কি?" তিনি বলিলেন, "গোশ্‌ত ও দুধ।" ইব্‌রাহীম ('আ) উহাতে বরকত দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ' করিলেন। অতঃপর তিনি চলিয়া যাওয়ার সময় বলিলেন, "তোমার স্বামী ফিরিয়া আসিলে আমার সালাম দিয়া বলিবে, সে যেন তাহার দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখে।" অতঃপর ইসমা'ঈল ('আ) ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার খোঁজে কেহ আসিয়াছিল কি?" তিনি বলিলেন, এমন ধরনের এক বৃদ্ধ আসিয়াছিলেন। ইসমা'ঈল ('আ) বলিলেন, "তিনি কোন ওয়াসিয়্যাত করিয়াছেন কি?" তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "তিনি আপনাকে সালাম দিয়াছেন এবং আপনার দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখিতে বলিয়াছেন।" ইসমা'ঈল ('আ) বলিলেন, "তিনি আমার পিতা এবং দরজার চৌকাঠ হইলে তুমি।" অতঃপর হযরত ইসমা'ঈল ('আ) এই দ্বিতীয় স্ত্রী লইয়া বসবাস করিতে থাকেন। বেশ কিছুদিন পর হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) আবার মক্কায় আগমন করেন। ইসমা'ঈল ('আ) তখন যামযামের নিকটে একটি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া তীর ঠিক করিতেছিলেন। পিতা-পুত্র সাক্ষাত হওয়ায় উভয়ে মুসাফাহা (করমর্দন) ও মু'আনাকা (কোলাকুলি) করিলেন। অতঃপর ইব্‌রাহীম ('আ) বলিলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে একটি কাজ করার নির্দেশ দিয়াছেন, তুমি কি উহাতে আমার সহায়তা করিবে?" ইসমা'ঈল ('আ) সানন্দে ইহাতে রাজী হইলেন। ইব্‌রাহীম ('আ) পার্শ্বে একটি উঁচু স্থান দেখাইয়া বলিলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই স্থানে কা'বা গৃহ পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দিয়াছেন।" অতঃপর পিতা-পুত্র উভয়ে মিলিয়া আল্লাহ্‌র সেই নির্দেশিত স্থানে কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণ শুরু করিলেন। ইসমা'ঈল ('আ) পাথর বহন করিয়া আনিয়া দিতেন। আর ইব্‌রাহীম ('আ) একটি পাথরের উপর দাঁড়াইয়া গাঁথুনির কাজ করিতেন। এইভাবে পিতা-পুত্র উভয়ে মিলিয়া কা'বা নির্মাণ সমাপ্ত করত উহাকে আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গ করিয়া দু'আ করেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা " (আল-কুরআন, ২ ঃ ১২৭) [সাহীহ আল-বুখারী, কলিকাতা, তা. বি., ১খ, ৪৭৪-৪৭৬]। ইহার কিছুকাল পরে হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) ইনতিকাল করেন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবু'ল-ফিদার বর্ণনামতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইসমা'ঈল ('আ)-কে য়ামানবাসী ও 'আমালীক গোত্রের রাসূলরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন। তিনি সারা জীবন আরবদের নিকট আল্লাহ্র পয়গাম পৌঁছান এবং মানুষকে বায়তুল্লাহ্র হাজ্জ-এর দিকে দা'ওয়াত দেন। এই বায়তুল্লাহ্রই চতুষ্পার্শ্বে পরবর্তীতে শহরের পত্তন হয় যাহাকে বর্তমানে মক্কা মুকাররামা বলা হয়।

হযরত ইসমা'ঈল ('আ)-এর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে বারটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে যাঁহাদের বংশধরগণ সমগ্র 'আরবে ছড়াইয়া পড়ে। ইঁহাদেরকে "আল-'আরাবু'ল-মুসতা'রিবা" অর্থাৎ নাগরিকতাপ্রাপ্ত আরব বলা হয়। ইঁহাদের মধ্যে নিবতীদের আদি পুরুষ—যিনি উত্তর আরবে খুবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন এবং কায়দার (قيدار) বা কায়দমাহ (قيدماه) সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এই কায়দার হইতেই অধস্তন পুরুষে আসিয়া কু'রায়শ বংশের উৎপত্তি। সর্বশেষ ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত ইসমা'ঈল ('আ) ১৩৭ বৎসর বয়সে মক্কায় ইনতিকাল করেন এবং স্বীয় মাতার পার্শ্বে হাতীম-এর মধ্যে সমাহিত হন (সায়্যিদ কাসিম মাহমূদ সম্পা. ইসলামী ইনসাইক্লোপিডিয়া, করাচী তা.বি., ১৬৬-১৬৭)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসীর গ্রন্থসমূহ ছাড়াও দ্র. ঃ (১) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কলিকাতা তা.বি., ১খ, ৪৭৪-৭৬, ৩৫৯; (২) ইব্ন খাল্দূন, তা'রীখ, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ২খ, ৩২ প.; (৩) ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তা'রীখ, বৈরূত তা.বি., ১খ, ১৩৫ প.; (৪) ইব্নু'ল-আছীর, তা'রীখ আল-কামিল, ১খ, আযহারিয়্যা সং., মিসর ১৩০১ হি.; (৫) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ১৫৩ প.; (৬) ছা'লাবী, কিসাসু'ল-আম্বিয়া', কায়রো ১২৯০ হি., পৃ. ৬৯ প., ৮৮-৯০; (৭) The Holy Bible, Cambridge University Press, Jesson Kitab Takwin, Abwab 18, 20, 21; (৮) Jewish Encyclopaedia, ৬খ, শিরো.; (৯) দা. মা. ই., ২খ, ৭২৮-৭৩৪; (১০) E.I.², Vol. 4, 184-85; (১১) সায়্যিদ কাসিম মাহমুদ সম্পা. ইসলামী ইনসাইক্লোপিডিয়া, করাচী তা.বি., ১৬৬-৬৭; (১২) সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খৃ., ২য় সং., ১খ, ১৮৫-৮৬।

ড. আবদুল জলীল

**ইসমা'ঈল (১ম)** (إسماعيل اول) ঃ জ. ৮৯২/১৪৮৭, সিংহাসন আরোহণ ঃ ৯০৫/১৪৯৯, মৃ. ৯৩০/১৫২৩, ইরানের সাফাবী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। সাসানীদের পর নূতন করিয়া ইরানী জাতীয়তাবাদের পুনর্জাগরণ যেন তিনিই শুরু করেন ! অবশ্য এই পুনর্জাগরণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর অর্থাৎ ইসলামী ভাবধারাসম্বলিত এবং তাহাও এক ফাতিমী আরব পরিবার ও উহার সমর্থক কতিপয় তুর্কী গোত্রের সহায়তায় যাহা একটু পরেই আমরা দেখিতে পাইব। অন্য কথায় সাসানীদের সম্পূর্ণ বিপরীতে ইরানী জাতীয়তাবাদের এই পুনর্জাগরণে প্রকৃতপক্ষে ইরানীদের কোন অবদান ছিল না।

ইসমা'ঈলের পূর্বতন পুরুষ শায়খ সাফিয়্যু'দ-দীন (মৃ. ৭২৫/১৩২৪)-এর নাসাবনামাহ ইমাম মূসা কাজিম পর্যন্ত পৌঁছে। সাফিয়্যু'দ-দীন শায়খ যাহিদ গীলানী (মৃ. ৭০০/১৩০০)-এর মুরীদ ও জামাতা ছিলেন। তিনি আরদাবীল-এ বসবাস করিতেন এবং স্বীয় খানকায় তাসাওউফ শিক্ষা দান করিতেন। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নজরে পড়িত না। তিনি জীবদ্দশায়ই সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং শাসক কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। কাজেই তাঁহার মুরীদানের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, যাঁহাদের নেতৃত্ব একের পর এক তাঁহার পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার বংশ একদিকে যেমন আহ্ল-ই বায়ত-এর প্রতি অত্যধিক ভালবাসা শী'ঈ সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করে, অন্যদিকে তেমনই উহা যেমন পার্থিব মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী হয় যে, শায়খ সাফিয়্যু'দ-দীনের চতুর্থ স্থলাভিষিক্ত শায়খ জুনায়দ উল্লেখযোগ্য সামরিক শক্তিরও অধিকারী হন। ফলে তাঁহাকে শায়খ নামের পরিবর্তে শাহ্ নামে অভিহিত করা হয়। শায়খ জুনায়দ দিয়্যার বাক্র-এর আক'কোয়ূনলু অধিপতি উযুন হাসান-এর সহোদরাকে বিবাহ করেন এবং এই ঘরে তাঁহাদের পুত্র শায়খ হায়দার জন্মগ্রহণ করেন। পরে শায়খ হায়দার নিজ মামা উযুন হাসান-এর কন্যার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইতিমধ্যে শায়খ জুনায়দ-এর শাগরিদগণের মধ্য হইতে প্রায় দশ হাজার সৈন্য তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হয়। তাহা ছাড়া উযুন হাসানের সহযোগিতার হস্তও তাঁহার প্রতি সম্প্রসারিত ছিল। শায়খ জুনায়দ-এর এই অবস্থা দৃষ্টে তুর্কমান শাসক জাহান শাহ, যিনি শীরওয়ান শাহ নামে খ্যাত ছিলেন এবং আযারবায়জান, 'ইরাক-ই 'আরব ও 'ইরাক-ই 'আজাম-এর তখনকার শাসনকর্তা ছিলেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধে শায়খ জুনায়দ নিহত হন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী শায়খ হায়দার-এর সহিতও শীরওয়ান শাহ-এর যুদ্ধ হয় এবং উহার পরিণতিও অনুরূপ হয় ২০ রাজাব, ৮৯৩/৩০ জুলাই, ১৪৮৮)। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শাহ ইসমা'ঈলের বয়স তখন মাত্র এক বৎসর এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছিল যেন তাঁহাকে নিজ ভাই ও অন্য ছেলেদের সঙ্গে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে। কারণ উযূন হাসানের উত্তরাধিকারীও তখন তাঁহার শত্রুতে পরিণত হয়। কিন্তু স্বীয় ভক্তদের জান কুরবানীর দরুন তিনি শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পান। দীর্ঘ তের বৎসর তিনি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জীবন যাপন করেন এবং প্রাণের ভয়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পলাইয়া বেড়ান। অবশেষে শাহ ইসমা'ঈল তাঁহার তের বৎসর বয়ঃক্রমকালে নিজ শাগরিদদের লইয়া লাহীজান-আরদাবীল অভিমুখে রওয়ানা হন। যাত্রাপথে তাঁহারা যতই অগ্রসর হইতে থাকেন ততই তাঁহার শাগরিদ ও জান কুরবানকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আরদাবীল হইতে শাহ ইসমা'ঈল কাস্পিয়ান সাগরের দিকে অগ্রসর হন। অতঃপর ১৫০০ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে সেই সাতটি তুর্কী গোত্রের (ইসতাজ্লু, তাক্লিলু, বহোরলু, যু'ল-কাদার, শামলু, কাচার ও আফশার) সহায়তায়, যাহারা সাফাবী বংশের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল, এমন এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠিত হয় যে, শাহ ইসমা'ঈল শীরওয়ান শাহ ফাররুখ য়াসার-এর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং প্রথম যুদ্ধেই অর্থাৎ জর্জিয়ার গুলিস্তান নগরের যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন। যুদ্ধে শীরওয়ান শাহ নিহত হন এবং ইসমা'ঈল অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে পিতার হত্যাকারীদের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। বাকু জয়ের পর ইসমা'ঈল আযারবায়জানের দিকে অগ্রসর হন। আক-কোয়ূনলুর সৈন্যবাহিনী তাঁহাকে বাধা দানের

চেষ্টা করে, কিন্তু তাহারাও পরাস্ত হয় এবং ইসমা'ঈল প্রথমে আরযানজান ও তৎপর তিব্‌রীয অধিকার করেন। এই তিবরীযে আড়ম্বরের সহিত ইসমা'ঈল-এর অভিষেক অনুষ্ঠান পালন করা হয় এবং 'শাহ' উপাধি ছাড়াও তিনি 'খাকান-ই ইস্‌কান্দার শাহ' ও 'শাহ-ই দীন পানাহ' উপাধি গ্রহণ করেন।

সিংহাসনে আরোহণের পর সর্বপ্রথম ইসমা'ঈল এক ঘোষণা দ্বারা শী'আ (ইমামিয়্যা) ধর্মমতকে ইরানের রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকৃতি দান করেন। তিবরীযে তখন অনেক সুন্নী মুসলমানের বাস ছিল বলিয়া উক্ত ঘোষণার ফলে সাফাবী শক্তির সমূহ ক্ষতির আশংকা ছিল। কিন্তু সরকারের উচ্চ পদে আসীন কর্মকর্তাদের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া ইসমা'ঈল নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। উক্ত ঘোষণার ফলে যখন সমগ্র 'উছমানী সাম্রাজ্যে প্রতিক্রিয়ার ঝড় বহিয়া যায়, তখন যে ইরানের বিভিন্ন এলাকা উহা দ্বারা প্রভাবিত হইবে না এইরূপ হইতে পারে না। আসলে এই সময়টি ছিল এতদঞ্চলের এক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতাপূর্ণ যুগ। তায়মূরের মৃত্যুর পরে এই যুগের শুরু এবং ইহার ফলে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য কয়েকজন স্বাধীন নৃপতির মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। খুরাসান ও বাল্‌খ-এ তায়মুর বংশীয় শাসনকর্তার রাজত্ব চলিতেছিল এবং দিয়ার বাক্‌র-এ আক-কোয়ূনলু বংশের শাসন চালু ছিল। অনুরূপভাবে ইরাক ('আরব ও 'আজাম), য়ায্‌দ, কান্দাহার, কিরমান ও কাশান ছাড়া অন্যান্য এলাকাতেও স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৫০৩ খৃ. হইতে ১৫১৪ খৃ. পর্যন্ত শাহ ইসমা'ঈল এক এক করিয়া নিজের সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করেন এবং বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতাপূর্ণ যুগের অবসান ঘটান। এইরূপে বাগদাদ ও দিয়ার-বাক্‌র হইতে হিরাত পর্যন্ত সমগ্র এলাকা সাফাবীদের অধিকারভুক্ত হয়। ১৫০৬ খৃ. হইতে ১৫১০ খৃ. মধ্যবর্তী সময়ে তিনি হামাদান, বাগদাদ, লুরিস্তান ও ফারস প্রদেশসমূহ জয় করেন। অতঃপর পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ইরান অধিকার করেন। পশ্চিমাঞ্চলে নিজের প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার পর তিনি পূর্বদিকে অগ্রসর হন। হিরাতে তখন সুলতান হুসায়ন রাজত্ব করিতেছিলেন। ফারগানাতে সিংহাসনের অপর এক তীমুর বংশীয় দাবীদার অর্থাৎ বাবুর— যিনি পরবর্তী কালে ভারতে মুগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন— সিংহাসনের জন্য যুদ্ধরত ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহার বিরোধীদের দ্বারা ফারগানা হইতে বহিষ্কৃত হন। ইসমা'ঈলের অভিপ্রায় ছিল খুরাসানেও যবরদস্তীমূলক শী'ঈ মতবাদ চালু করার। সুন্নী মতাবলম্বী বাবুরও এই ব্যাপারে ইসমা'ঈলের প্রতি পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত ছিলেন, এমন কি ইসমা'ঈল ও বাবুর হিরাতের তীমূর বংশীয় রাজন্যদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধও হইয়াছিলেন, কিন্তু আক্রমণের কোন সুযোগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কারণ এই সময় শায়বানী খান উযবেক সামারকান্দ ও বুখারা দখল করিয়া লইয়াছিলেন (১৫০০ খৃ.) এবং খুরাসান আক্রমণ করিয়া (১৫০৬ খৃ.) বাবুর বাদী'উ'য-যামান ব্যতীত তীমূর বংশের অন্য সকলকে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছিলেন (বাদী'উয'-যামান শাহ ইসমা'ঈলের নিকট ও বাবুর আফগানিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন)। এইবার একদিকে রহিলেন ইসমা'ঈল, যিনি ইরানকে যবরদস্তীমূলক শী'আ মতাবলম্বী রাজ্যে পরিণত করিতেছিলেন এবং তাঁহার হাতে সুন্নীগণ নিষ্ঠুর অত্যাচারে নিষ্পেষিত হইতেছিল। সুতরাং ১৫১২ খৃস্টাব্দে তিনি কার্‌শীতে যে গণহত্যার নির্দেশ দেন উহাতে অনেক বড় বড় সুন্নী 'আলিম নিহত হন। অন্যদিকে ছিলেন শায়বানী খান, যিনি সুন্নী মতাদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন সংঘর্ষ বাধিবে না তাহা ছিল একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। অবশেষে ১৫১০ খৃ. মারব-এর নিকট এক বিরাট রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে শায়বানী খান নিহত এবং ইসমা'ঈল জয়ী হন। কিন্তু এই সাফল্যে প্রতিশোধ স্পৃহা দমন ব্যতীত যদি অন্য কোন ফল লাভ হইয়া থাকে, তবে তাহা হইল তাঁহার ঘোরতর সুন্নী প্রতিদ্বন্দ্বী ইরানে একটি চিরস্থায়ী শী'ঈ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইসমা'ঈলকে আর বাধা দান করিতে পারিল না, এমন কি মতাদর্শগত পার্থক্য সত্ত্বেও উযবেক ও সাফাবীগণ পুনরায় একে অন্যের বিরুদ্ধে এইরূপে দাঁড়াইতে সক্ষম হয় নাই যে, একজন অন্যজনকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে।

যাহা হউক, শায়বানী খানের মৃত্যুর পরও মধ্যএশিয়ায় কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত উযবেক সাম্রাজ্য বহাল ছিল। অন্যদিকে 'উছমানী সাম্রাজ্যের দিক হইতে ইসমা'ঈলের যেই ভয় ছিল তাহা ছিল অত্যন্ত সঙ্গীন। 'উছমানী তুর্কীদের সৌভাগ্য সূর্য তখন মধ্যগগনে বিরাজমান। তাহারা এইরূপ শৌর্য-বীর্য ও ক্ষমতার অধিকারী ছিল যে, সুলতান সালীম সুন্নী জগতে স্বীয় খিলাফাতের ঘোষণা করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে তখন কেহই সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। ইরানে ইসমা'ঈলের হাতে সুন্নীগণ যেইভাবে লাঞ্ছিত হইতেছিল তাহাতে তুর্কীরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত ছিল। ইহার উপর এশিয়া মাইনরে শী'আগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে অত্যন্ত কঠোর হস্তে তাহা দমন করা হয় এবং প্রতিশোধস্বরূপ হাজার হাজার শী'আকে হত্যা করা হয়। এই সকল ঘটনায় ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি যে অনেকখানি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল তাহা য়ুরোপীয়গণও স্বীকার করিয়াছেন। অবশেষে শেষ দিনটিও আসিয়া পড়িল যখন এই শক্তিদ্বয় একে অপরের সহিত সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়। তিব্‌রীয হইতে বিশ ফার্‌সাখ (১ ফারসাখ = ৩ মাইলের মত) দূরে অবস্থিত চালদিরান-এ এক ঘোরতর যুদ্ধে ইসমা'ঈল শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন। তুর্কী বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তিবরীয অধিকার করে এবং সুলতান সালীম এক সপ্তাহকাল সেইখানে অবস্থান করেন এবং বিজয়ের আনন্দে চতুর্দিকে পত্র ও সংবাদ প্রেরণ করেন। এই সকল যুদ্ধে যেহেতু সাম্প্রদায়িক মনোভাব ক্রিয়াশীল ছিল, শাহ ইসমা'ঈলের ন্যায় তুর্কীরাও বিজিতদের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার চালায়। তাহা সত্ত্বেও সুলতান সালীমের এই বিজয়ের প্রকৃতি এক হিসাবে শায়বানী খানের উপর ইসমা'ঈলের বিজয়ের মতই ছিল। কারণ শাহ ইসমা'ঈলের মনে যদিও এই পরাজয়ের গ্লানি মৃত্যু পর্যন্ত জাগরূক ছিল এবং তাঁহার সদা উৎফুল্ল মন বিষণ্ণতায় ভরিয়া গিয়াছিল (শুধু তাহাই নহে, বরং তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া একটি পত্রও সুলতান সালীমের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন), তবুও তুর্কীদের এই বিজয় ও আধিপত্য ইরানে শী'ঈ শাসন প্রতিষ্ঠা বন্ধ করিতে পারে নাই, অবিকল যেইরূপ ইসমা'ঈলের বিজয় সত্ত্বেও তুর্কিস্তানে সুন্নী শাসন বিলুপ্ত হয় নাই। মনে হয় ইতিহাসের সিদ্ধান্ত কিছু এইরূপ ছিল— উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার ভূখণ্ড আগামী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তুর্কিস্তানে সুন্নী (উযবেক), ভারতে আধা-শী'আ আধা-সুন্নী (মুগল), ইরানে শী'ঈ (সাফাবী) ও 'উছমানী শাসনের মধ্যে বিভক্ত থাকিবে। এই প্রসঙ্গে একটি দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, শী'ঈ-সুন্নী বিবাদ শুধু ইসলামের রাজনৈতিক শক্তিরই ধ্বংস সাধন করে নাই, বরং বিবাদের সুযোগে পরবর্তী কালে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলি ইরান ও তুরস্কের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সুযোগ পায়। যাহা হউক, এই শাহ

ইসমা'ঈল-এ একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে ১০ম লিও (Leo x) ও ১ম ম্যাক্সিমিলিয়ান (Maximililian)-এর সহিত মৈত্রী স্থাপনের প্রচেষ্টা চালান। ১৫১৪ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ চালদিরান-এর পরাজয়ের পর তিনি পঞ্চম চার্লস (Charles V)-কেও নিজ দলে ভিড়াইবার চেষ্টা করেন, যাহাতে উভয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু সেই সময় এইরূপ দূত প্রেরণের কোন সুফল পাওয়া যায় নাই।

চালদিরান-এর যুদ্ধে যদিও ইসমা'ঈলকে আল-জাযীরা ও আর্মেনিয়ার পশ্চিমাংশ হারাইতে হইয়াছিল, কিন্তু ১৫১৫ খৃস্টাব্দে তিনি জর্জিয়া পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হন এবং এইভাবে তাঁহার পরাজয়ের সামান্য ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হয়। সুলতান সালীমের নিকট প্রেরিত তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষার পত্রও বিফলে যায়। ইহা ছাড়াও 'উছমানী শাসকবর্গ উযবেকদেরকে সাফাবীদের বিরুদ্ধে সর্বদা উস্কানি দিতে থাকে এবং মারব ও চাল্‌দিরান যুদ্ধের পর এই শক্তিগুলি একে অন্যের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে। তাহা সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে কোন চূড়ান্ত ফয়সালাকারী যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই।

শাহ ইসমা'ঈল আটত্রিশ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন এবং আরদাবীল-এ নিজ পারিবারিক গোরস্থানে সমাহিত হন। এই সময়ে তাঁহার উত্তরাধিকারী (ও জ্যেষ্ঠ পুত্র) শাহ তাহ্‌মাস্‌প-এর বয়স মাত্র দশ বৎসর ছিল। সাফাবী বংশের ইতিহাসের অত্যন্ত সুন্দর ও মূল্যবান পাণ্ডুলিপিটি, যাহা বর্তমানে লেনিনগ্রাড (পেট্রোগ্রাড)-এর রাজকীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে, শাহ সাফিয়্যু'দ-দীন-এর সমাধি সংলগ্ন গ্রন্থাগার হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) খাওয়ান্‌দামীর, হাবীবু'স-সিয়ার, ৩/৪খ, ২৩ প.; (২) Le P. Raphael du Mans, Estar de la Perse en 1660, প্যারিস ১৮৯০ খৃ., পৃ. ২৬৩-২৭৬; (৩) P. Horn, Grundr. der Iran, philol.-এ, ২খ, ৫৭৯-৮২; (৪) Malcom, The History of Persia, ১খ, ৩২০-২৮; (৫) Dubeux, La perse, প্যারিস ১৮৪১ খৃ., ৩৫৩ প.; (৬) P.M. Sykes, History of Persia, লন্ডন ১৯১৫ খৃ., ১খ, ২৪১ প.; (৭) A. Muller, Der Islam etc., ২খ., ৩৪৮-৫৪, ৩৫৭-৬০; (৮) আহ্‌ওয়াল শাহ ইসমা'ঈল (অজ্ঞাতনামা লেখকের এক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, যাহা ড. রানার নিকট রক্ষিত আছে); (৯) E.I.[2], ৪খ, ১৯৬-৮।

(দা.মা.ই.)/ মু. আবদুল মান্নান

**ইস্‌মা'ঈল (২য়)** (اسماعيل الثانى) ঃ জ. ৯৪০/১৫৩৩-৪ (প্রাপ্ত তথ্য হইতে অনুমিত; তাঁহার জন্ম তারিখ কোন ঐতিহাসিক ধারা বিবরণী হইতে পাওয়া যায় না), ১৩ রামাদান, ৯৮৫/২৪ নভেম্বর, ১৫৭৭ সনে ইনতিকাল করেন; সাফাবী রাজবংশের পারস্যের শাহ, শাহ তাহ্‌মাস্‌প (দ্র.) (৯৮৪-৫/ ১৫৭৬-৭)-এর দ্বিতীয় পুত্র।

তাঁহার চাচা আলকাস (দ্র.)-এর বিদ্রোহের পর ইসমা'ঈল শীরওয়ান-এর প্রশাসক নিযুক্ত হন (৯৫৪/১৫৪৭) এবং ককেশাস ও আনাতোলিয়ায় 'উছমানীদের বিরুদ্ধে কতিপয় সফল অভিযান পরিচালনা করেন। ৯৬২/১৫৫৫ সনে তিনি শাহ্ নি'মাতুল্লাহ্ ওয়ালী (দ্র.)-র ঔরসজাত তাঁহার ফুফাতো ভগ্নিকে বিবাহ করেন। পরবর্তী বৎসর শা'বান ৯৬৩/জুন ১৫৫৬ তিনি খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত হন।

হারাতে অল্প কয়েক মাস অবস্থানের পর ইসমা'ঈলকে হঠাৎ বন্দী করা হয় (সাফার ৯৬৪/ ডিসেম্বর ১৫৫৬) এবং আযারবায়জান-এর কাহ্‌কাহা দুর্গে নীত হন। সেইখানে তিনি প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া বন্দী থাকেন। তাহ্‌মাস্‌প কর্তৃক এই কাজের ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিভিন্ন কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। কোন কোন সূত্র উল্লেখ করিয়া থাকে যে, ইস্‌মা'ঈলের গ্রেফতার আমাসিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরের (৯৬২/১৫৫৫) সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল যাহা 'উছমানীদের সহিত ত্রিশ বৎসরাধিক শান্তি আনিয়াছিল এবং তাহ্‌মাস্‌প আশংকা করিয়াছিলেন যে, ইস্‌মা'ঈলের যুদ্ধপ্রিয় স্বভাব এই শান্তিকে বিপন্ন করিতে পারে। কিন্তু 'উছমানী সীমান্ত সংলগ্ন শীরওয়ান হইতে হারাতে ইসমা'ঈলের স্থানান্তর পূর্ব হইতে এই ধরনের বিপদ এড়াইবার কৌশল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অন্যান্য সূত্রে পাওয়া যায় যে, কঠোর নীতিবাদী তাহ্‌মাসপ ইসমা'ঈলের অসংযমী জীবন যাপন সহ্য করিতে পারেন নাই। তবে ইস্‌মা'ঈলের উপর হইতে হঠাৎ কৃপাদৃষ্টি সরাইয়া নেওয়ার প্রকৃত কারণ ইহাও হইতে পারে যে, তাহমাস্‌প এই আশংকা করিতেছিলেন যে, ইস্‌মা'ঈল হয়ত তাঁহাকে সরাইয়া ক্ষমতায় আসিবার আশা পোষণ করিতেছে। এই আশংকা বৃদ্ধির জন্য ইস্‌মা'ঈলের ঘোর শত্রু ওয়াকীল মা'সূম বেগ সাফাবী দীর্ঘদিন ধরিয়া ইন্ধন যোগাইতেছিলেন। হারাতে ইস্‌মা'ঈলের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কর্তৃত্বপূর্ণ ও উদ্ধত ব্যবহার তাহ্‌মাসপ-এর সন্দেহকে আরো ঘনীভূত করিয়া তোলে এবং তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তোলে। ইহা ছাড়া তাঁহার দুই ভ্রাতা আলকাস ও সামের সাম্প্রতিক বিদ্রোহের স্পষ্ট স্মৃতি তাঁহাকে ইস্‌মা'ঈলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণেও উদ্বুদ্ধ করে। ইস্‌মা'ঈলের বন্দীত্ব সম্বন্ধে প্রথম দৃষ্টিতে তারীখ-ই 'আলাম আরা-ই 'আব্বাসী (১খ, ১২৫) গ্রন্থে আপাতত অস্পষ্ট উক্তি হইতে উপরিউক্ত পরিস্থিতির প্রতিফলন পাওয়া যায়। উহাতে আছে যে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্বার্থে ও তাঁহার বিভিন্ন অসঙ্গত কর্মের জন্য শাহ-এর অসন্তোষের কারণে তাঁহাকে বন্দী করা হইয়াছিল। শাহ তাহ্‌মাস্‌পের মৃত্যু হইলে (৯৮৪/১৫৭৬), ৩০,০০০ কিযিলবাশ কাহ্‌কাহাতে একত্র হয় এবং ইসমা'ঈলের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে এবং ২৭ জুমাদা— ১, ৯৮৪/২২ আগস্ট, ১৫৭৬ সালে রাজধানী কাযবীনে ইস্‌মা'ঈল শাহ ২য় ইস্‌মা'ঈলরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দীর্ঘদিন কারাবাসের ফলে ইস্‌মা'ঈল মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল যে কোন উপায়ে নিজের ক্ষমতা সুসংহত করা। এই অভিপ্রায়ে তিনি উসতাজালু গোত্রীয় কিযিলবাশ কর্মকর্তাগণকে সরকারী চাকুরী হইতে বিতাড়নের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। কারণ ঐ গোত্র তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহার ভ্রাতা হায়দারের পক্ষে অভ্যুত্থানে সমর্থন দিয়াছিল। অতঃপর তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সম্ভাব্য কারণ হইতে পারে এই সন্দেহে একই রাজবংশের এমন সব রাজপুত্রদেরকে হত্যা করিতে কিংবা অন্ধ করিয়া দিতে শুরু করিলেন। এইরূপ হত্যালীলায় তাঁহার পাঁচ ভাই ও অন্য চারজন সাফাবী যুবরাজ নিহত হন। ইস্‌মা'ঈল যখন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণকে তাঁহার পিতার আমলে গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করিবার অপরাধে হত্যা করিতে শুরু করিলেন, তখন কিযিলবাশগণ তাঁহার সিংহাসন আরোহণে দুঃখিত হইল এবং তাঁহাকে গোপনে হত্যা করার ব্যাপারে একমত হইল। ইস্‌মা'ঈলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছিল

যে, তিনি একনিষ্ঠ "দ্বাদশ পন্থী" (ইছনা 'আশারী) শী'আ ছিলেন না। ইহাতে কিযিলবাশগণ তাঁহাকে অপসারণের জন্য অধিকতর উৎসাহিত হইয়াছিল এবং গ্রহণযোগ্য একটি ওজরও লাভ করিয়াছিল। মাদক দ্রব্যের প্রতি ইসমা'ঈলের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বলিয়া চালাইয়া দেওয়াকে সহজ করিয়া তুলিয়াছিল। ইসমা'ঈলের ভগ্নী পরী খান খানুম-এর পরোক্ষ সহযোগিতায় ষড়যন্ত্রকারীরা আফিমের পাত্রে বিষ রাখিয়া দেয় যাহা ইস্‌মা'ঈল ও তাঁহার একজন সঙ্গী গ্রহণ করেন। ইসমা'ঈলের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুহাম্মাদ খুদাবান্দাহ (দ্র.) ক্ষমতারোহণ করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) W. Hinz, Schah Esmail II, Ein Beitrag zur Geschichte der Safaviden, in MSOS, ৩৬খ. (১৯৩৩ খৃ.), পৃ. ১৯-১০০; (২) য়ূরোপীয় ও পারস্য উৎসসমূহের বিস্তারিত বিবরণসহ, পৃ. ৩০-২৪।

R. M. Savory (E.I.²)/ মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম

**ইসমা'ঈল** (اسماعيل) ঃ (রা), সাহাবী। তিনি বস্‌রায় বসবাস করিতেন। মুসলিম ও নাসাঈ উভয় হাদীছ গ্রন্থে ইসমা'ঈল কর্তৃক বর্ণিত নিম্নলিখিত হাদীছটি সংকলিত হইয়াছে ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরে সালাত আদায় করিবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। হাদীছটি সাহীহ (নির্ভরযোগ্য) বলিয়া ইব্‌ন হাজার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সাহাবী সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ৪০ নং ১৪০; (২) ইব্‌নু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ১খ, ৭১।

লিয়াকত আলী

**ইসমা'ঈল** (اسماعيل) ঃ 'উছমানী দুর্গ শহর ইসমা'ঈল বেসারাবিয়ার (Bessarabia) বুজাক (দ্র.) অঞ্চলে দানিয়ূবের (Danube) শাখা নদী কিলয়া (Kilya)-এর বাম তীরে অবস্থিত। আওলিয়া চেলেবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, ৮৮৯/১৪৮৪ সালে যখন সুলতান দ্বিতীয় বায়াযীদ মোলদাভিয়ার (Moldavia) নিকট হইতে কিলয়া ও আক্‌-কিরমান হস্তগত করেন, উক্ত সময়েই ইসমা'ঈল নামক জনৈক 'কাপুদান' এলাকাটি 'উছমানী শাসনাধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ৯৯৭/১৫৮৮-৯ সালে (তু. উযুনকারসিলি, ৪/১খ, ৫৭৬, নোট-১) ইসমা'ঈলে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ (পালাংকা) নির্মাণ করা হইয়াছিল; উক্ত নির্মাণকার্যে অংশগ্রহণের জন্য ওয়াল্লাচিয়া (Wallachia) ও মোলদাভিয়া হইতে কতিপয় দক্ষ কারিগরকে আহ্বান করা হইয়াছিল, ১০০১/ ১৫৯৩ হইতে ১০১৫/১৬০৬ সাল পর্যন্ত 'উছমানী সাম্রাজ্য ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের সময় ১০০৩/১৫৯৫ সালে আন্দে বাজাই-এর (তু. হুরমুযাকি, ৩খ, ৯৫) নেতৃত্বে ট্রানসিলভানীয় (Transylvanians), মোলদাভীয় ও ওয়াল্লাচীয় সম্মিলিত শক্তির নিকট ইসমা'ঈলের পতন ঘটে। কয়েক বৎসর পরে Georgius Dousa শহরটিকে মৎস্য ব্যবসায়ে অত্যন্ত মশহুর ছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইসমা'ঈল ১০১০-১০১১/ ১৬০২ ও ১০৩৩-১০৩৪/ ১৬২৪ সালে কসাক (Cossack) আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আওলিয়া চেলেবী ১০৬৭/১৬৫৭ সালে ইসমা'ঈলে তাঁহার ভ্রমণের আকর্ষণীয় বিষয়ের সবিশেষ বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, এখানে একজন শুল্ক তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন; কিন্তু কোনও পুরাদস্তুর দুর্গ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সেখানে কোন দুর্গাধিপতি নিয়োজিত ছিলেন না। মুসলিম (তিনটি পৃথক এলাকায় বসবাসরত), গ্রীক, আরমেনীয় ও য়াহূদী জনসমষ্টি অধ্যুষিত এই শহরটিতে দুই হাজার বাসগৃহ ছিল। শহর সন্নিহিত এলাকাগুলিতে তাতারগণ বাস করিত। ইসমা'ঈলের মাখন, পনির, ওয়াল্লাচিয়ার লবণ, শস্য, বৃহৎ স্টার্জন মৎস্য ও বৃহৎ মৎস্যের লবণাক্ত ডিম হইতে প্রস্তুত ক্যাভিয়ার (Caviar)-এর ন্যায় বহুবিধ সামগ্রীর বর্ধিষ্ণু ব্যবসায় পরিচালিত হইত। ইসমা'ঈল হইতে পোল্যাণ্ড ও মস্কোর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতি বৎসরই লবণাক্ত মাছ ভর্তি প্রায় দুই হাজার ওয়াগন চালান হইত। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন মৎস্য ক্ষেত্রগুলির অবস্থান ছিল দানিয়ুব নদীর তীর বরাবর। ইসমা'ঈলে আরও একটি বাজার ছিল যেখানে শ্বেতাংগ দাসদাসী বিক্রয় হইতে দেখা যাইত। কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পরে ১১৮২-৮৩/১৭৬৯ সালে de tott বুজাকের ভিতর দিয়া যাইবার সময় লক্ষ্য করেন যে, ইসমা'ঈল ঐ সময় দানিয়ুবের তীরের অন্যতম বাণিজ্য ও কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত ছিল। গালাত্‌য (Galatz), খোতিন (Khotin), বেনদার (Bender) ও কিল্‌য়া হইতে আগত রাস্তাসমূহের সংযোগ স্থলে ইসমা'ঈলের অবস্থান হওয়ায় এবং একাদশ/ সপ্তদশ শতাব্দী ও দ্বাদশ/ অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণসাগরের সীমান্ত বরাবর এলাকায় রাশিয়া ও 'উছমানী সাম্রাজ্যের ম[illegible] সংঘর্ষের ফলে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গে পরিণত হইয়াছে। ১১৮৪/১৭৭০ সালে রুশ সেনাদল ইসমা'ঈল অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু ১১৮৮/১৭৭৪ সালে কূঁচুক কায়নারজার শান্তি চুক্তির পর শহরটির উপর 'উছমানী অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। একটি বৃহৎ সেনাদল নিয়ন্ত্রণ ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশে তুর্কীগণ বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় ইসমা'ঈলকে নূতনভাবে শক্তিশালী দুর্গে পরিণত করেন। রাবী'উ'ল-আখির ১২০৫/ ডিসেম্বর ১৭৯০ সালে রুশ বাহিনী সুভোরোভ (Suvorov)-এর অধিনায়কত্বে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়া ইসমা'ঈল অধিকার করিয়া ধ্বংস করে। ঘটনাটি বায়রন (Byron) ও দারযাভিনের (Derzavin) কবিতায় খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ১২০৬/১৭৯২ সালে য়্যাসি (Jassy)-এর শান্তি চুক্তি অনুসারে ইসমা'ঈল 'উছমানী শাসনাধীনে ফেরত দেওয়ায় তাঁহারা অতি শীঘ্রই ইহার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন। শহরটি ১২২৪/১৮০৯ সালে পুনরায় রুশ হস্তে চলিয়া যায়। জেনারেল তুচকোভ (Tuckov) পরবর্তী বৎসরে ইসমা'ঈলের নিকটেই তাঁহার নিজের নামে একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন যাহা পরবর্তী কালে ইসমা'ঈলের সঙ্গে একত্র করা হইয়াছিল। ১২২৭/১৮১২ সালে বুখারেস্ট শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় ইসমা'ঈলের উপর রাশিয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৭২/১৮৫৬ সালে অনুষ্ঠিত প্যারিস শান্তিচুক্তি আলোচনায় ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটায় দক্ষিণ বেসারাবিয়াসহ ইসমা'ঈলকে (ইহার দুর্গগুলি এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত) রাশিয়ার নিকট হইতে মোলদাভিয়ার অধীনে হস্তান্তর করা হয়। রুশ বাহিনী ১২৯৪/১৮৭৭ সালে ইসমা'ঈল পুনর্দখল করে এবং ১২৯৫/১৮৭৮ সালে বার্লিন কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে শহরটি রাশিয়ার অধীনে সমর্পণ করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ইহা রুমানিয়ার নিয়ন্ত্রণে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইহার উপর সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসমা'ঈল বর্তমানে ইউক্রেইন প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে। শহরটিতে ১৯৫৬ খৃ. বসবাসকারী লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৪৩,০০০; ইহাদের মধ্যে রুমানীয়,

ইউক্রেনীয়, তুর্কী, বুলগেরীয়, রুশ ও য়াহূদী জাতীর লোকও ছিল। ইসমা'ঈল একটি নদী বন্দর এবং ব্যবসায় বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে ও এখানে নানাবিধ শস্য, কাষ্ঠ ও পশুচর্মের ব্যবসায় আছে।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) আওলিয়া চেলেবী, সিয়াহাত নামে, ৫খ, ইস্তাম্বুল ১৩১৫ হি., ১০৬-৭; (২) আহমাদ জেওদেত, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১৩০৯ হি., ৪খ, ৩২৬, ৫খ, ৯৪; (৩) Georgii Dousae de itinere suo Constantinopolitano epistola, Lugduno Batavae ১৫৯৯ খৃ., ১৭-১৮; (৪) Memoires du Baron de Tott, আমস্টারডাম ১৭৮৪ খৃ., ২খ, ১৫১-১৫২; (৫) F. von Smitt, Der Sturm von Ismail, ভিয়েনা ১৮৩০ খৃ.; (৬) A. Zashcuk, Bessarabskaya Oblast, in Materiali dlya geografii i statistiki Rossii, সেন্ট পিটার্সবুর্গ ১৮৬২ খৃ.; (৭) A. Nakko, Istoria Bessarabii s drevneishikh vremyen, ওডেসা ১৮৭৩ খৃ.; (৮) N. Orlov, Shturm Izmaila Suvorovymy 1790 godu, সেন্ট পিটার্সবুর্গ ১৮৯০ খৃ.; (৯) P. N. Batyushkov, Bessarabia. Istoriceskoye opisaniye, সেন্ট পিটার্সবুর্গ ১৮৯২ খৃ.; (১০) Statisiceskoye opisaniye Bessarabii ... ili Budjaka ... s 1822 po 1828 g. Izdaniye Akkermanskago zemstva, আক্-কেরমান ১৮৯৯ খৃ.; (১১) Mogilyanskiy, Materialy dlya geografii i statistiki Bessarabii, Kishinev ১৯১৩ খৃ.; (১২) N. M. Korobkov, Vzyatiya Izmaila (১৭৯০), in Voenno-Istoriceskiy Zurnal (১৯৪১ খৃ.), ২৪ প.; (১৩) Y. Yefimove, Shturm turetskoy kreposti Izmaila v 1790 g. Neopublik. report A.V. Suvorova, in Voenno-Istoriceskiy Zurnal(১৯৪১ খৃ.), 126প.; (১৪) I.S. Procko, Russkaya artilleriya v shturme Izmaila v 1790 godu, in Artilleriyskiy Zurnal (১৯৫০ খৃ.), 42 প.; (১৫) I. Rusztukov, Shturm Izmaila, in Voenno-Istoriceskiy Zurnal (১৯৬৫ খৃ.), ১১২ প.; (১৬) A. V. Suvorov, Dokumenty, সম্পা. G. P. Meshceryakov, মস্কো ১৯৪৯-১৯৫৩ খৃ., ২খ, স্থা.; (১৭) E. de Hurmuzaki Documente privitore la Istoria Romanilor, ৩/১খ. (বুখারেস্ট ১৮৮০ খৃ.), ২৩২, ৩/২খ. (বুখারেস্ট ১৮৮৮ খৃ.), ৯৫ ও পরিশিষ্ট ১/২ (বুখারেস্ট ১৮৮৫ খৃ.), ২৩২ এবং ৮১৩ (নির্ঘণ্ট)

ইহা ব্যতীত (১৮) Documents privind Istoria Rominiei. Colectia Euduxi de Hurmuzaki (Academia Republicii Populare Romine-Institutul de Istorie), Serie Nova, I (Rapoarte Consulare Ruse ১৭৭০-১৭৯৬), বুখারেস্ট ১৯৬২ খৃ., ৮০৫ (নির্ঘণ্ট); (১৯) J. W. Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches, Gotha ১৮৪০-১৮৬৩ খৃ., ৫খ, ৯৪১, ৬খ, ৮৮০, ৭খ, ৬৫৫; (২০) N. Jorga, Geschichte des osmanischen Reiches, Gotha ১৯০৮-১৯১৩ খৃ., ৫খ, ৯৬; (২১) I. H. Uzuncarsili, Osmanli Tarihi (Turk Kurumu Yayinlarindan ১৩, ক্রমিক নং ১৬), ৪/১খ, আঙ্কারা ১৯৫৬ খৃ., ৫৭৬, নোট ১; (২২) J. Pohler, Biblioheca Historico-Militaris, Kassel ১৮৮৭-১৮৯৯ খৃ., ২খ, ১০৩ প. এবং ২৩৫ প.; (২৩) von Schafenort, Quellenkunde der Kriegswissenschaften fur den Zeitraum ১৭৪০-১৯১০ খৃ., বার্লিন ১৯১০ খৃ., ৫০৩, (২৪) তুর্কী ভাষার ইসলামী বিশ্বকোষ, দ্র. ISMAIL (Aurel Decei) প্রবন্ধ।

T. Menzel (V. J. Parry) (E.I.[2])/মুহাঃ আবু তাহের

**ইসমা'ঈল** (اسماعيل) ঃ ইব্‌ন 'আব্‌দি'র-রাশীদ ইব্‌ন মিঠা খান ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন শাহ মালিক ইব্‌ন সুলতান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন বুলানজী ইব্‌ন দুসা ইব্‌ন তারা চাঁদ, লার শাহ্-এর বংশধর এবং উজ্জায়ন (اجين=উজ্জয়িনী) নামক স্থানের একজন সম্মানিত 'আলিম ও শায়খ ছিলেন। তিনি ১১৮৩/১৭৬৯ মতান্তরে ১১৮৪/১৭৭০ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি ও তাঁহার পুত্র হিবাতুল্লাহ উভয়েই বোহ্‌রা 'আলিম ওয়াজীহু'দ-দীন লুকমান জী (মৃ. ১১৭৩/১৭৬০)-এর শাগরিদ ছিলেন। মাশায়িখ চক্রের ষড়যন্ত্রে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা হিবাতুল্লাহ নামের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া 'হিব্‌তিয়াই' নামক একটি নূতন মতবাদ ও আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। মৌলবাদী বোহ্‌রাগণ এই আন্দোলনকে নির্যাতন নিপীড়নের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে নির্ধারণ করে এবং জনৈক চরমপন্থী ব্যক্তির পুত্র হিবাতুল্লাহ্‌র নাক কাটিয়া ফেলে। ফলে পিতা-পুত্র উভয়কে 'مجدوع' (নাক কাটা) নামে অভিহিত করা হইতে থাকে (অবশ্য পিতার নাক কাটা হয় নাই)। ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আবদির-রাশীদ কতিপয় মাযহাবী গ্রন্থের (তাঁহাদের মতবাদ সম্পর্কীয়) রচয়িতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল ইসমা'ঈলী সাহিত্যের বিস্তারিত তালিকাসম্বলিত গ্রন্থ ইহা ১১৭৩/১৭৬০ সালের পূর্বে সঙ্কলিত হয় এবং فهرست المجدوع নামে পরিচিতি লাভ করে, কিন্তু ইহার প্রকৃত নাম ছিল "المجموع فهرست الكتب"। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হিব্‌তিয়াহ ফেরকার অনুসারিগণ অদ্যাবধি উজ্জয়িনীতে বসবাস করিতেছে। ইসমা'ঈলী মতবাদের কোন কোন গ্রন্থের ইসমা'ঈলের স্বহস্তে লিখিত কপি তাঁহার পরবর্তী বংশধরের নিকট রক্ষিত আছে।

W. Ivanow (দা. মা. ই.)/ সিরাজ উদ্দীন আহ্‌মাদ

**ইসমা'ঈল 'আসিম ইফেন্দী** (দ্র. চেলেবী যাদে)

**ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ** (إسماعيل بن عبد الله)ঃ আল-ইসফাহানী আল-গুজরাটী, আশ-শায়খ, আল-কাদী, ৯ম/১৫শ শতকের গুজরাটের একজন প্রখ্যাত 'আলিম, ফিক্‌হ ও ইসলামী আইন দর্শনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পিতা শায়খ 'আবদুল্লাহ আল-ইসফাহানীর সঙ্গে শৈশবে তিনি ইসফাহান হইতে গুজরাটে আগমন করেন। পিতার নিকট ও গুজরাটের অন্যান্য 'আলিমের নিকট ইসলামী বিষয়সমূহে শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি বাহ্‌রূচ (بهروچ)-এর কাদী নিয়োজিত হন। এই পদে তিনি বহু দিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর গুজরাটের তৎকালীন শাসনকর্তা সুলতান মাহ্‌মূদ আল-কাবীর-এর রাজত্বকালে তিনি আহ্‌মাদাবাদের কাদী নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি অতিশয় ন্যায়নিষ্ঠ ও সদাচারী ছিলেন এবং গুজরাটের তৎকালীন সূফী সাধক শায়খ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-হুসায়নীর নিকট 'ইল্ম মা'রিফাত'-এর দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ৮৬৫/১৪৬০ সালে রাবী'উ'ল-আওওয়ালের শেষ দিকে ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) আল-আসাফী, তা'রীখু'দ-দিকান, দ্র. কাদী ইসমা'ঈল; (২) শারীফ 'আবদু'ল-হায়্যি আল-হাসানী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ৩খ, ৩১, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ আল-'উছমানিয়্যা, হায়দরাবাদ (ভারত) ১৯৫১ খৃ.।

ড. এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

**ইসমা'ঈল ইব্ন 'আব্বাদ** (দ্র. ইব্ন 'আব্বাদ)

**ইসমা'ঈল ইব্ন আবী খালিদ** (اسماعيل بن ابى خالد) ঃ (র) একজন বিখ্যাত তাবি'ঈ। উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। পিতার নাম সা'দ মতান্তরে হুরমুয, যাঁহার উপনাম আবূ খালিদ। বানূ বাজীলার শাখাগোত্র বানু'ল-আহমাস কর্তৃক আযাদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বিধায় আবূ খালিদ ও তাঁহার পরবর্তী বংশধরদেরকে যথাক্রমে আল-আহমাসী আল-বাজালী বলা হইয়া থাকে। ইসমা'ঈল কূফানিবাসী ছিলেন। তিনি ইব্রাহীম আন-নাখ'ঈর দুই বৎসরের ছোট ছিলেন। ইমাম শিহাব ইব্ন 'উব্বাদ আল-'আবদীর মতে তিনি ছয়জন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেন। তাঁহারা হইলেন আনাস ইব্ন মালিক (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী 'আওফা (রা), আবূ কাহিল (রা), আবূ জুহায়ফাঃ (রা), 'আমর ইব্ন হুরায়ছ (রা) ও তারিক ইব্ন শিহাব (রা)। আবূ নু'আয়ম-এর মতে তিনি মোট বারজন সাহাবীর কাল পাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অনেকের নিকট হইতে রাসূল (স)-এর হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন। কয়েকজনের শুধু দর্শন লাভ করিয়াছেন এবং কয়েকজনের কেবল কালই পাইয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) 'আলী ইব্নু'ল-মাদীনীর উদ্ধৃতিতে বলেন যে, ইসমা'ঈল (র) হইতে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা আনুমানিক তিন শত হইবে। আল-'আজালীর মতে ইহাদের সংখ্যা অনূন পাঁচ শত। সকল ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিছ ও সমালোচকগণ এক বাক্যে হাদীছ বর্ণনায় ইসমা'ঈল (র)-এর নির্ভর-যোগ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। আবূ ইসহাক আস-সাবী'ঈ বলেন, ইসমা'ঈল 'ইল্মের বারিধারা পর্যাপ্ত পরিমাণে পান করিয়াছেন। ইমাম সুফয়ান আছ-ছাওরী বলেন, মানুষের মধ্যে সত্যিকারের হাফিজ চারজন, তাঁহারা হইলেন 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন আবী সুলায়মান, ইসমা'ঈল ইব্ন আবী খালিদ, 'আসিম আল-আহওয়াল ও য়াহ্য়া ইব্ন সা'ঈদ আল-কাত্তান। ইহা ছাড়াও ইব্ন মাহ্দী, ইব্ন মু'ঈন, ইমাম নাসা'ঈ, য়া'কূব আবী শায়বা, আবূ হাতিম প্রমুখ অকুণ্ঠভাবে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। ইস্‌মা'ঈল (র)-এর শাগরিদ সংখ্যা অগণিত। তাঁহাদের মধ্যে শু'বা, সুফ্য়ান আছ-ছাওরী, সুফ্য়ান ইব্ন 'উয়ায়না, আবূ উমামা, য়াযীদ ইব্ন হারূন, ইব্ন নুমায়র, য়াহয়া ইব্ন সা'ঈদ আল-কাত্তান ও য়া'লা ইব্ন 'উবায়দ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি হিজরী ১৪৫, মতান্তরে ১৪৬ সালে ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত ১৯৬৮/১৩৮৮, ৬খ, ৩৪৪; (২) আয-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফ্ফাজ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৭৬/১৯৫৬, ১খ, ১৫৩, ১৫৪; (৩) ইব্ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ, ১৯, ২০; (৪) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহ্যীবু'ত-তাহ্যীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৫ হি., ১খ, ২৯১, ২৯২; (৫) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ১খ, ৬৮; (৬) ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, করাচী ১৩৯৬/১৯৭৬, ২১১; (৭) মুহয়ি'দ-দীন ইব্ন আশরাফ আন-নাওয়াবী, তাহ্যীবু'ল-আসমা' ওয়া'ল-লুগাত, মিসর তা. বি., ২খ, ১ ভাগ, ১২১।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

**ইসমা'ঈল ইব্ন 'আলী** (اسماعيل بن على) ঃ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা ইব্ন য়াকূব আছ-ছাকাফী, আস-সিন্ধী, ৭/১৩ শতকের সিন্ধু অঞ্চলের 'আলোরের একজন প্রখ্যাত 'আরবী ভাষাবিদ, ফাকীহ ও কাদী। তিনি তর্কশাস্ত্র (মানতিক) ও হিকমাত (বিজ্ঞান) বিষয়েও পারদর্শী ছিলেন। 'আছ-ছাকাফী' নিসবা দ্বারা অনুমিত হয় যে, তিনি 'আরবের প্রসিদ্ধ 'ছাকীফ' গোত্রসম্ভূত এবং তাঁহার পূর্বপুরুষ সম্ভবত 'আরব শাসনামলে য়ামান হইতে সিন্ধুর আলোর শহরে আগমন করিয়া তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁহার পিতা ও পিতামহ আলোরের কাদী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তিনি নিজেও এই পদ বংশসূত্রে লাভ করেন।

কাদী ইসমা'ঈলের পিতামহ কিংবা প্রপিতামহ 'আরবী ভাষায় সিন্ধুর প্রাচীন বিবরণ ও মুসলিম বিজয়সম্বলিত একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন, 'আলী ইব্নু'ল-হামীদ আল-কূফী আস-সিন্ধী তাহা ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। অনুবাদক গ্রন্থের ভূমিকায় কাদী ইসমা'ঈলের প্রশংসামূলক উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম-মৃত্যু তারিখ কোন সূত্রে উল্লিখিত হয় নাই। তিনি পূত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং জ্ঞান-গরিমা ও বাগ্মিতার জন্য খ্যাতি লাভ করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) 'আবদু'ল-হায়্যি আল-হাসানী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ১ম সং, ১খ, পৃ. ১২৫, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ আল-'উছমানিয়্যা, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৪৭ খৃ.।

ড. এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

**ইসমা'ঈল ইব্ন আহমাদ** (اسماعيل بن احمد) ঃ আবূ ইবরাহীম, আল-আমীর আল-মাদী অথবা আল-আমীর আল-'আদিল নামে পরিচিত, সামানী রাজপরিবারের প্রথম সদস্য, যিনি শক্তিশালী স্বাধীন শাসক হিসাবে সমগ্র ট্রান্স অক্সানিয়া ও ফারগানায় শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি ২৩৪/৮৪৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ভ্রাতা নাস্‌র-এর পক্ষ হইয়া তিনি বুখারায় গভর্নর হিসাবে ২০ বৎসর অতিবাহিত করেন। এই সময় তাঁহার ভ্রাতা সামারকান্দে বসবাস করিতেন (২৬০/৮৭৪-২৭৯/৮৯২)। তাহিরীদের পতন এবং সেইখানে 'আম্র ইব্নু'ল-লায়ছ (দ্র.)-এর চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠার অন্তর্বর্তী বৎসরগুলিতে খুরাসানের বিশৃঙ্খল অবস্থার প্রতিক্রিয়া ট্রান্স অক্সানিয়াতেও প্রতিফলিত হয়। ইসমা'ঈল বুখারায় জনৈক হুসায়ন ইব্ন তাহির আততাঈ (তিনি নিশ্চিতভাবে তাহিরী পরিবারের সদস্য ছিলেন না, Pace Barthold, তু. Vasmer, Num. Zeitschr-এ, ৬৩খ, ১৯৩০ খৃ., ১৪৮)-এর অধীনে খাওয়ারাযমের আক্রমণকারী সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাঁহার অবিশ্বাসী ভাই নাস্‌র (যিনি বুখারার বিরুদ্ধে দুইবার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন)-এর সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রাখেন।

নাস্‌র ২৭৯/৮৯২ সালে ইনতিকাল করিলে ইসমা'ঈল সমগ্র ট্রান্স অক্সানিয়ার অধিপতি নিযুক্ত হন। তিনি বুখারায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং ইহা এই বংশের পতন পর্যন্ত এইখানেই ছিল। তিনি

'আব্বাসী খলীফার স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তী বৎসর তিনি তুর্কী স্তেপ (Stepps) অঞ্চলে তালাস (Talas) আধুনিক জাম্বুল-এর কারলুক্ কাগান শিবিরের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করেন; এই অভিযান হইতে পর্যাপ্ত দাসদাসী, পশু হস্তগত করিয়াছিলেন এবং তালাসের প্রধান গির্জাটি মসজিদে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও তিনি সীর দারয়া উপত্যকায় উপরূসানার স্থানীয় ইরানী বংশসম্ভূত শাসকগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন। সাফফারীগণের (দ্র.) দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা করা যায় যে, তাহারাই ছিল পূর্বাঞ্চলে তাহিরীদের উত্তরাধিকারী এবং খাওয়ারাযম ও ট্রান্স অক্সানিয়ায় আম্র ইবনু'ল-লায়ছ-এর আধিপত্য স্থাপনের পদক্ষেপ ছিল ইহার পূর্বাভাস। সাফফারীগণ পারস্যে এইরূপ শক্তিশালী ছিলেন যে, ২৮৫/৮৯৮ সনে ইসমা'ঈলকে পদচ্যুত ঘোষণার আদেশ জারী করিয়া 'আম্রকে ট্রান্স অক্সানিয়া ও বাল্খ-এর জন্য স্থলাভিষিক্ত করিবার রায় প্রদান করিতে খালীফা আল-মু'তাদিদকে বাধ্য করা হইয়াছিল। 'আমর নূতন রাজ্যগুলি অধিকারের জন্য উত্তরাভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করেন এবং ইসমা'ঈল, তুখারিস্তানের আবূ দাঊদীদের ও গুয্গানের ফারীগূনীদের আনুগত্য স্বীকারের জন্য আহ্বান জানান। অক্সাস (Oxus) নদীর দক্ষিণে বাল্খের নিকট সামানী ও সাফফারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ২৮৭/৯০০ সালে 'আমর পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকে, ফলে বাল্খ অধিকৃত হয়। ইসমা'ঈল কৌশলগতভাবে 'আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে জড়িত থাকিলেও 'আম্রের মত একজন অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বীর অপসারণে খলীফা অতিশয় আহ্লাদিত হন। ইসমা'ঈলের এই বিজয়ে সামানীগণ খুরাসানে অধিকতর আধিপত্য লাভ করেন এবং প্রদেশটি গাযনীর সুলতান মাহমূদের হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত ৪র্থ/১০ম শতাব্দীব্যাপী তাহাদেরই দখলে ছিল।

জীবনের শেষ বৎসরগুলিতে ইসমা'ঈল স্তেপ অঞ্চল অধিবাসী তুর্কীদের আক্রমণ (২৯১/৯০৪) প্রতিহত করেন এবং উত্তর পারস্য ও কাস্পিয়ান অঞ্চলে সামানী আধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত থাকেন। তাবারিস্তানের শী'ঈ শাসক মুহাম্মাদ ইব্ন যায়দকে খুরাসান হইতে বিতাড়িত করেন ও এমন কি তাবারিস্তানের বিরুদ্ধে একটি আক্রমণাত্মক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। ২৮৭/৯০২ সালের মধ্যে পশ্চিম দিকের রাজ্যগুলি, যেমন রায় ও কায্বীন সামানী অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। অবশ্য পরে দায়লামী জনগণের পুনরুত্থানের মুখে ইসমা'ঈলের উত্তরাধিকারিগণ এইগুলির উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। ২৯৫/৯০৭ সালে ইসমা'ঈল ইনতিকাল করেন। মিতাচার ও ন্যায়বিচারের জন্য তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন এবং তাঁহার সম্পর্কে বহু উপাখ্যানও প্রচলিত রহিয়াছে। তাঁহার বিজয় দ্বারা সাফফারীগণ প্রভাবিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা খলীফাদের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং সুন্নী অনুরাগের জন্য তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার সমাধি এখনও বুখারায় বিদ্যমান বলিয়া উল্লিখিত হয় (তু. Schroe-der, Survey of Persian art-এ, ৩খ, ৯৪৬-৯)। তবে সমাধি সৌধটি সামানী যুগের শেষভাগে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) নার্শাখী-তে ইসমা'ঈল সম্বন্ধে দীর্ঘ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য, অনু. R. N. Frye, পৃ. ৭৭-৯৪, এতদসঙ্গে দ্র. তাবারী ও ইবনু'ল-আছীর-এর ইতিহাস গ্রন্থদ্বয়; (২) নিজামু'ল-মুল্ক ও 'আওফী-র 'আরবী সাহিত্য গ্রন্থসমূহ; (৩) Barthold, Turkestan², পৃ. ২২২-৬; (৪) R. N. Frye, Bukhara, the medieval achievement, Norman, Okla., ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৩৮-৪৯।

C. E. Bosworth (E. I.²) / মুহঃ আবু তাহের

**ইসমা'ঈল ইব্ন ইব্রাহীম আল-আসাদী** (اسماعيل بن ابراهيم الاسدى) ঃ প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও তাব'উ তাবি'ঈন, হিজরী ১১০ সালে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে তিনি বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছেন। তাঁহার উপনাম আবূ বিশ্র। বানূ আসাদ গোত্রের 'আবদু'র-রাহ্মান ইব্ন কুতবা-এর মাওলা ছিলেন বিধায় তাঁহার নামের সহিত আল-আসাদী সংযুক্ত করা হয়। ইব্ন 'উলায়্যা নামে তিনি সমধিক পরিচিত। 'উলায়্যা তাঁহার মাতার নাম। তিনি বানূ শায়বান গোত্রের মাওলা এবং হাস্সান-এর কন্যা ছিলেন। অনেকে এই নাম তাঁহার মাতামহীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন 'উলায়্যা সেই যুগের মুহাদ্দিছ ও ফাকীহ ছিলেন। সমকালীন 'আলিমগণ তাঁহার অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কোন দ্বিমত নাই। 'আবদু'ল-'আযীয ইব্ন সুহায়ব, সুলায়মান আত-তায়মী, হুমায়দ আত-তাবীল, 'আসিম আল-আহওয়াল, ইব্ন 'আওন, আবূ-রায়হানা, আল-জারীরী, ইব্ন নাজীহ, মা'সার, 'আওফ, আয়্যুব আস-সুখতিয়ানী প্রমুখের নিকট তিনি হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন। আবু'ত-তায়্যাহ-র সূত্রে তিনি একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ছাত্র সংখ্যা অগণিত। তাঁহাদের মধ্যে শু'বা, ইব্ন জুরায়জ, বাকিয়্যা, হাম্মাদ ইব্ন যায়দ, ইব্রাহীম ইব্ন তাহ্হান, ইব্ন ওয়াহ্ব, আহমাদ ইব্ন সা'ঈদ আল-কাত্তান, 'আলী ইব্নু'ল-মাদীনী, ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়হ, আল-ফাল্লাস, আবু মা'মার আল-হুযালী, আবূ খায়ছামা ও ইব্ন আবী শায়বা-র নাম উল্লেখযোগ্য। শু'বা তাঁহাকে রায়হানাতু'ল-ফুকাহা' (ফাকীহদের সৌরভ) ও সায়্যিদু'ল-মুহাদ্দিছীন (নেতৃস্থানীয় মুহাদ্দিছ) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। য়াহ্য়া ইব্ন মু'ঈন বলেন, তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ। ইব্ন মাহ্দী তাঁহাকে হুশায়ম-এর উপর প্রাধান্য দিতেন। য়াহ্য়া ইব্ন সা'ঈদ আল-কাত্তান বলিতেন, ইব্ন 'উলায়্যা উহায়ব অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য। হাম্মাদ ইব্ন সালামা বলেন, আমরা ইব্ন 'উলায়্যা-কে য়ূনুস ইব্ন 'উবায়দ-এর সমতুল্য মনে করিতাম। 'আফ্ফান বলেন, একদা আমরা হাম্মাদ-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি একটি হাদীছ কিছুটা ভিন্নরূপে বর্ণনা করিলেন। এই ব্যাপারে তখন তাঁহাকে বলা হইল যে, অন্যান্য মুহাদ্দিছ তো এই হাদীছ অন্যরূপে বলিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ মুহাদ্দিছ ? বলা হইল, হাম্মাদ ইব্ন যায়দ। কিন্তু ইহার প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিলেন না। আর এক ব্যক্তি বলিল, ইব্ন 'উলায়্যা তো হাদীছটি আপনার বর্ণনামত বলেন নাই। এইবার তিনি উঠিয়া তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং আসিয়া বলিলেন, ইব্ন 'উলায়্যা যাহা বলিয়াছেন তাহাই সঠিক। ইমাম আহমাদ তাঁহাকে নির্ভরযোগ্যতায় বসরার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি বলিতেন, ইমাম মালিককে আমি হারাইয়াছি; অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সুফ্য়ানকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। আর হাম্মাদ ইব্ন যায়দকে হারাইয়াছি এবং তাঁহার পরিবর্তে ইসমা'ঈল ইব্ন 'উলায়্যা-কে লাভ করিয়াছি। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ও গুন্দার বলেন, আমি জন্ম হইতেই হাদীছের পরিবেশে লালিত-পালিত হইয়াছি। কিন্তু ইস্মা'ঈল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অগ্রবর্তী কোন মুহাদ্দিছ পাই নাই।

কুতায়বা বর্ণনা করেন, মানুষ চার ব্যক্তিকে যথার্থ হাফিজ-হাদীছ হিসাবে জানিত। তাঁহারা হইলেন ইসমাঈল ইব্ন 'উলায়্যা, 'আবদুল-ওয়ারিছ, য়াযীদ ইব্ন যুরায়' ও উহায়ব্। আল-হায়ছাম ইব্ন খালিদ বলেন, একদা বসরা ওস কূফার মুহাদ্দিছগণ বসরানিবাসী মুহদ্দিছগণকে এক মজলিসে একত্র হইয়াছিলেন। তখন কূফার মুহাদ্দিছগণ বলিয়াছিলেন, ইসলা'ঈল ইব্ন 'উলায়্যা ব্যক্তিরেকে আর যাহাকে ইচ্ছা পেশ করুন। ইব্ন 'উলায়্যা-র একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, তিনি হাদীছ বর্ণনায় কোন ভুল করিতেন না। আবূ দা'উদ আস-সিজিসতানী বলেন, ইব্ন 'উলায়্যা ও বিশ্র ইব্নুল-মুফাদ্দাল ব্যতীত আমি এমন কোন মুহাদ্দিছ পাই নাই, যাঁহার কোন ভুল সংঘটিত হয় নাই। আহমাদ ইব্ন সা'ঈদ আদ-দারিমী বলেন, ইব্ন 'উলায়্যা কখনও কোন হাদীছ বর্ণনায় ভুল করেন নাই। তবে হযরত জাবির (রা) বর্ণিত গোলাম সম্পর্কিত একটি হাদীছে তিনি মাওলার স্থলে ও গুলাম-এর নাম এবং গুলাম-এর স্থলে মাওলার নাম বলিয়াছিলেন। ইব্নু'ল-মাদীনী একদা তাঁহার প্রশংসা করিতে যাইয়া বলেন, আমি হাদীছের ক্ষেত্রে ইসমা'ঈল-এর তুলনায় অন্য কাহাকেও অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলি না। একবার আমি তাঁহার নিকট রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম। সেই রাত্রে তিনি সম্পূর্ণ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করিয়াছিলেন। আমি কোনদিন তাঁহাকে হাসিতে দেখি নাই। 'উমার ইব্ন যুরারা বলেন, আমি একটানা চৌদ্দ বৎসর তাঁহার সাহচর্যে থাকিয়াছি, ইহার মধ্যে তাঁহাকে হাসিতে দেখি নাই। ইব্ন আবী শায়বা-র মতে তিনি উভয় হাম্মাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। তিনি বলিতেন, আমি বসরার কোন মুহাদ্দিছকে তাঁহার উপর প্রাধান্য দেই না— য়াহ্য়া, ইব্ন মাহদী ও বিশর ইব্নু'ল-মুফাদ্দাল কাহাকেও না। হারূনু'র-রাশীদের শাসনের শেষার্ধে তিনি বাগদাদের কাদী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় একজন জ্ঞানসাধকের এই কাদীর পদ গ্রহণ 'আবদুল্লাহ ইব্নু'ল-মুবারাকের মনঃপূত হয় নাই এবং তাঁহার বিরূপ মন্তব্যে সচকিত হইয়া তিনি এই পদে ইস্তফা দিলেন। আল-কুরআন সম্পর্কে তিনি বলিতেন 'আবদু'স-সামাদ ইব্ন য়াযীদ বলেন, আমি ইব্ন 'উলায়্যা-কে বলিতে শুনিয়াছি, ইহা আল্লাহ্র বাণী, তাহার সৃষ্ট নহে।

তিনি হিজরী ১৯৩ মতান্তরে ১৯৪ সালে ১৩ যু'ল-কা'দা রোজ মঙ্গলবার বাগদাদে ইনতিকাল করেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন মালিক-এর গোরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার পুত্র ইব্রাহীম তাঁহার জানাযা পড়ান।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৫ হি., ১খ, ২৭৫-৮; (২) ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, করাচী ১৯৭৬/১৩৯৬, পৃ. ২২১; (৩) আয-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফ্ফাজ, বৈরূত ১৩৭৪ হি., ১খ, ৩২২-৩; (৪) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাকরীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৯৭৫/১৩৯৫, ১খ, ৬৫-৬; (৫) মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্রা, বৈরূত ১৯৬৮/১৩৮৮, ৬খ, ৩৬২; (৬) মুহয়ি'দ-দীন ইব্ন শারাফ আন-নাওয়াবী, তাহযীবু'ল-আসমা' ওয়া'ল-লুগাত, মিসর, তা.বি., ১ম ভাগ, ১খ, ১২০, ১২১।

আবুল বাশার মু. সাইফুল ইসলাম

**ইসমা'ঈল ইব্ন ইসহাক** (إسماعيل بن اسحاق) ঃ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন যায়দ আল-আয্দী আল-কাদী, উপনাম আবূ ইসহাক, মালিকী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফাকীহ। তিনি ২০০/৮১৫ সালে বস্রায় জন্মগ্রহণ করেন, এই স্থানেই লালিত-পালিত হন এবং পরবর্তীকালে বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। পিতা শায়খ ইসহাকের নিকট শিক্ষালাভ ছাড়াও তিনি হাদীছ, ফিক্হ প্রভৃতি বিষয় নিম্নোক্ত খ্যাতনামা 'আলিমদের নিকট শিক্ষালাভ করেন ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-আন্সারী, সুলায়মান ইব্ন হারব আল-ওয়াশিহী, হাজ্জাজ ইব্ন মিন্হাল আল-আন্মাতী, মুসাদ্দাদ ইব্ন মুসারহাদ আল-কা'নী ও আবু'ল-ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী। একজন বিশিষ্ট কারী, মুহাদ্দিছ, আদীব (সাহিত্যিক) ও ব্যাকরণবিদ হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। উসূলু'ল-ফিক্হ (اصول الفقه) বিদ্যায়ও তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল।

ইরাকে মালিকী মাযহাবের প্রসারে তাঁহার ও তাঁহার বংশের 'আলিমদের বিশেষ অবদান রহিয়াছে। জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার বংশের বিদ্বান ব্যক্তিরা একাধারে তিন শত বৎসর যাবত সুনাম অক্ষুণ্ন রাখেন। কাদী ইসমা'ঈল আল-আয্দীর খ্যাতনামা শাগরিদগণের মধ্যে মূসা ইব্ন হারূন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, আবু'ল-কাসিম আল-বাগাবী ও য়াহ্য়া ইব্ন সা'ঈদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রহিয়াছে ঃ আহকামু'ল-কুরআন, কিতাব ফি'ল-কিরাআত, কিতাব ফি'ল-ফারা'ইদ, কিতাব ফী শাওয়াহিদি'ল-মুওয়াত্তা। ইমাম মুহাম্মাদ ইব্নু'ল-হাসান-এর মতামতের বিরোধিতা করিয়াও তিনি তিনখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি যু'ল-হিজ্জা। ২৮২/৮৯৫ সালে ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) 'আবদুল্লাহ মুসতাফা আল-মারাগী, আল-ফাতহু'ল-মুবীন ফী তাবাকাতি'ল-উসূলিয়্যীন, কায়রো ১৯৪৭ খৃ., ১খ, ১৬২; (২) আরও দ্র. আদ-দীবাজ, পৃ. ৯২।

ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

**ইসমা'ঈল ইব্ন 'উছমান** (اسماعيل بن عثمان) ঃ ইব্ন 'আবদি'ল-কারীম আল-কুরাশী, রাশীদু'দ-দীন আদ-দিমাশকী ইব্নু'ল-মু'আল্লিম নামে পরিচিত। তিনি অসাধারণ মেধা ও কৃতিত্বের জন্য বিপুল যশ ও সম্মান অর্জন করিয়াছিলেন। হাদীছ, তাফসীর, ফিক্হ, উসূল, কালাম, ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের একজন বিশেষজ্ঞ ইমাম হিসাবে তিনি সুখ্যাত ছিলেন। দামিশকের খ্যাতনামা 'আলিমদের নিকট তিনি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকালে ফিক্হশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন শায়খ জামালু'দ-দীন আল-হুসায়নীর কাছে। ইমামু'ল-কুবরা 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-হামদানী আস-সাখাবীর নিকট তাজবীদসহ কুরআন কারীমের সপ্ত কিরাআত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ফিক্হশাস্ত্র এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিশেষভাবে ইব্নু'য যুবায়দীর কাছে অধ্যয়ন করেন। ৭০০/১৩০০ সালে তিনি কায়রো গমন করেন এবং অবশিষ্ট জীবন এইখানেই অতিবাহিত করেন। অধ্যাপনা ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফাতওয়া দান ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। তাঁহার অসংখ্য শাগরিদের মধ্যে তাঁহার পুত্র শায়খ যূসুফ আল-কুরাশী, তাকিয়্যু'দ-দীন ও শায়খ ইব্ন হাবীব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'আল্লামা যাহাবী ও সুয়ূতী তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও নিরাসক্ত সহজ সরল জীবন যাপনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শায়খ ইস্‌মা'ঈল ৬২৩/১২২৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭১৪/১৩১৪ সালে ৯১ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের দুই বৎসর পূর্বে তাঁহার স্মৃতিবিভ্রম ঘটে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ আয-যাহাবী, আল-'ইবার ফী আখ্‌বার মান্ গাবারা; (২) জালালু'দ-দীন আস-সুয়ূতী, হুসনু'ল-মুহাদারা বি-আখ্‌বার মিস্‌'র ওয়া'ল-কাহিরা; (৩) ঐ লেখক, বুগ্‌য়াতু'ল-উ'আত ফী তাবাকাতি'ন-নুহাত; (৪) আল-য়াফি'ঈ, মির'আতু'ল-জিনান; (৫) আবু'ল-হাসনাত মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-হায়্যি আল-লাকনাবী, আল-ফাওয়া'ইদু'ল-বাহিয়্যা, মিসর ১৩২৪ হি., পৃ. ৪৬-৪৭।

ড. এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

**ইসমা'ঈল ইব্‌ন খালীল** (اسماعيل بن خليل) ঃ তাজু'দ-দীন আল-ফারাদী আন-নাহ্‌বী, মিসরের একজন খ্যাতনামা হানাফী মতাবলম্বী ফাকীহ্, উসূলশাস্ত্রবিদ ও ব্যাকরণবিদ। জনগণের নিকট ইমাম তাজু'দ-দীন নামে পরিচিত। তিনি ফিক্‌হ ও অন্যান্য ইসলামী বিষয় অধ্যয়ন করেন শায়খ ফাখরু'দ-দীন 'উছমান ইব্‌ন মুস'তাফা আল-মারদীনী, শায়খ নাজমু'দ-দীন আল-মালাতী ও শায়খ শামসু'দ-দীন মাহ'মূদ ইব্‌ন আহ'মাদ-এর নিকট। 'ইলমু'ল-ফারা'ইদ শিক্ষা করেন শায়খ আল-লারিন্দীর কাছে। তিনি কায়রো শহরের আল-হুসায়নিয়্যা এলাকায় বসবাস করিতেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তার খ্যাতি শুনিয়া বহু শিক্ষার্থী এইখানে আসিয়া তাঁহার নিকট বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিত। তাঁহার ছাত্রদের অনেকেই বিশিষ্ট 'আলিম হিসাবে খ্যাত হন।

ইমাম তাজু'দ-দীন অতি মহৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, নফল সালাত অধিক পড়িতেন। তাঁহার প্রায় স্বপ্নই বাস্তবে পরিণত হইত। আল-জাওয়াহিরু'ল-মুদিয়্যা ফী তাবাকাতি'ল-হানাফিয়্যা গ্রন্থের লেখক শায়খ 'আবদু'ল-কাদির আল-কুরাশী বলেন, "আমি বহুদিন তাঁহার সাহচর্যে ছিলাম। তিনি তাঁহার স্বপ্নের বহু বিস্ময়কর ঘটনা আমাকে বলিয়াছেন। তিনি কোন স্বপ্ন দেখিলে তাহা ভোরের আলোকরশ্মির ন্যায় প্রতিভাত হইত। তিনি প্রতি বৎসর নীল নদের অবস্থার পূর্বাভাস দিতেন এবং কখনও ইহার ব্যতিক্রম হইত না। তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত, ধর্মপরায়ণ ও পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন।"

তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে মুকাদ্দিমা ফী উসূলি'ল-ফিক্‌হ ও আল-ফারা'ইদ উল্লেখযোগ্য। তিনি কায়রো শহরে ৮ জুমাদা'ল-আখিরা, ৭৩৯/১৩৩৮ সালে ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) 'আবদু'ল-কাদির আল-কুরাশী, আল-জাওয়াহিরু'ল-মুদিয়্যা, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ১খ, ১৪৯; (২) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আদ-দুরারু'ল-কামিনা, ১খ, ৩৬৬; (৩) আবদু'ল-হায়্যি আল-লাকনাবী, আল-ফাওয়া'ইদু'ল-বাহিয়্যা, মিসর ১৩২৪ হি., পৃ. ৪৬; (৪) 'আবদুল্লাহ মুস'তাফা আল-মারাগী, আল-ফাতহু'ল-মুবীন, কায়রো ১৯৪৭ খৃ., ২খ, ১৪২।

ড. এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

**ইসমা'ঈল ইব্‌ন নূহ** (إسماعيل بن نوح) ঃ আবূ ইব্‌রাহীম আল-মুনতাসি'র, ট্রান্স অক্সানিয়া ও খুরাসানের সামানী রাজবংশের শেষ ব্যক্তি। ৩৮৯/৯৯৯ সনে যখন কারাখানী ইলিগ খান নাস্‌'র সামানীদের রাজধানী বুখারা দখল করেন, ইস্‌মা'ঈল ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে উজখেন্দ-এ স্থানান্তরিত করা হয়। তবে তিনি খাওয়ারাযম-এ পলায়ন করিতে সক্ষম হন এবং পরবর্তী চারি বৎসর বুখারার কারাখানী ও উত্তর খুরাসানের গায্‌নাবীদের উপর অনবরত আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। ৩৯৩/১০০৩ সনে তিনি সামানীদের ঐতিহ্যগত মিত্র ওগুয গোত্রের সাহায্য লাভ করেন এবং গার্‌দীযী-র মতে ঠিক এই সময়েই সালজূকদের নেতা ইসলাম গ্রহণ করেন। বংশের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে ইস্‌মা'ঈলের সমুদয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়; তিনি কারাকুম মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানে তিনি বানূ 'ইজ্‌ল গোত্রের একদল আরব দ্বারা রাবী'উ'ল-আওওয়াল বা রাবী'উ'ল-আখির ৩৯৫/ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১০০৪-৫ বা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১০০৫ সনে নিহত হন। 'আওফীর মতে কাব্য ও ইহার প্রসারে ইস্‌মা'ঈল তাঁহার পরিবারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান ছিলেন এবং বুখারায় তাঁহার স্বল্পকালীন দরবারে বহু সাহিত্যিকের সমাবেশ ঘটে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) 'উত্‌বী-মানানী, ১খ, ৩২০-৪৬; (২) গার্‌দীযী, সম্পা. নাজিম, পৃ. ৬৩-৫; (৩) 'আওফী, লুবাবু'ল-আল্‌বাব, সম্পা. এস. নাসীরী, তেহরান ১৩৩৩/১৯৫৪, পৃ. ২৩-৪; (৪) Barthold, Turkestan², পৃ. ২৬৯-৭০; (৫) নাজি'ম, Sultan Mahmud of Ghazna, পৃ. ৪৫-৬।

C. E. Bosworth (E.I.²) / মু. আলী আসগর খান

**ইস্‌মা'ঈল ইব্‌ন বুলবুল** (اسماعيل بن بلبل)ঃ আবু'স-সাক্‌র ছিলেন 'আব্বাসী খলীফা আল-মু'তামিদ (দ্র.)-এর উযীর। তিনি ২৩০/৮৪৪-৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পারস্য অথবা মেসোপটেমিয়ার বংশোদ্ভূত হইলেও তিনি নিজেকে আরব শায়বান গোত্রের অন্তর্গত বলিয়া দাবি করিতেন। আবু'স-সাক্‌'র রাজকীয় একজন সচিব এবং খলীফার খাস স্টেট (Royal Domains)-এর দীওয়ানের দায়িত্বে সমাসীন ছিলেন। রাজপ্রতিনিধি (Rgent) আল-মুওয়াফ্‌ফাক ২৬৫/৮৭৮ সালে তাঁহাকে উযীর পদে নিয়োগ করিলে রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁহার আগমন ঘটে। অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাকে পদটি পরিত্যাগ করিতে হয়। তবে ঐ বৎসরের শেষেই তিনি পুনরায় তাহা লাভ করেন। যতদিন সা'ঈদ ইব্‌ন মাখ্‌লাদ (দ্র.) রাজপ্রতিনিধির ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন, ততদিন ইস্‌মা'ঈল গৌণ ভূমিকা পালন করিতেন এবং একমাত্র ২৭২/৮৮৫-৬ সাল হইতেই তিনি উযীরের প্রকৃত ক্ষমতা পালন করিতে সমর্থ হন। সামরিক কার্যকলাপের দায়িত্ব না থাকিলেও তিনি প্রশাসন পরিচালনা করিতেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন কর্মকর্তা নিয়োগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এই সময়েই তিনি বানু'ল-ফুরাত ভ্রাতৃগণকে রাষ্ট্রীয় আর্থিক দায়িত্বে নিয়োগ করেন। এই ভ্রাতৃবর্গের শী'ঈ মতবাদের সঙ্গে তাঁহার অনুরাগ থাকায় উক্ত সময়ে তিনি যে সমস্ত অসুবিধায় পরিবেষ্টিত ছিলেন, সেগুলি মুকাবিলা করিতে তাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। তিনি আল-মুওয়াফ্‌ফাক-এর পুত্রের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী আল-মু'তাদিদ-এর শত্রুতার সম্মুখীন হন। তাঁহার পিতা আল-মু'তাদিদকে তূলূনীদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণে বিরত করিয়াছিলেন। ইস্‌মা'ঈল নিজে প্রথমে তাঁহার অনুপস্থিতিতে এবং পরে রাজপ্রতিনিধির অসুস্থতার সময় সর্বসাধারণের ব্যাপার হইতে তাঁহাকে দূরে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাফার ২৭৮/মে ৮৯২ সালে শেষোক্তের মৃত্যুর পর আল-মু'তাদিদ রাজপ্রতিনিধির দায়িত্ব লইয়া অতি সত্বর ইস্‌মা'ঈলকে গ্রেফতার করেন। ইহার কিছুদিন পরেই খলীফার সঙ্গে বন্ধুত্ব, শী'ঈ

ধর্মমতের প্রতি সমর্থন প্রদান এবং সম্ভবত তাঁহার গোঁড়া মতবাদবিরোধী মনোভাবের জন্য তাঁহাকে মৃত্যুবরণ করিতে হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) D. Sowrdel, Vizirat, নির্ঘণ্ট; (২) S. Boustany, ইবনু'র-রূমী, বৈরূত, ১৫৭-৬৬।

D. Sourdel (E.I.[2])/ মুহঃ আবু তাহের

**ইসমা'ঈল ইব্ন মুহাম্মাদ** (اسماعيل بن محمد) ঃ 'আলিম ও ফাকীহ, উপাধি ইমামুদ্দীন, পিতামহের নাম যাকারিয়্যা আল-কুরাশী, মুলতান শহরে জন্মগ্রহণ করেন করেন এবং পিতা ও চাচা (আবু'ল-ফাত্হ রুক্নু'দ-দীন মুলতানী)-এর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। তিনি ফিক্হ ও উসূল-ই ফিক্হ-এ বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং বিশিষ্ট মুফতী হিসাবে পরিচিত হন। চাচার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং 'ইল্মে মা'রিফাতের শিক্ষা দান করিতে থাকেন। তাঁহার ইনতিকালের পর পুত্র সাদরু'দ-দীন হালীম তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। গুলযারে আবরার (گلزار ابرار) গ্রন্থে অনুরূপ উল্লেখ আছে। তিনি ৭৯৫/১৩৯২ সনে ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) 'আবদু'ল-হায়্যি আল-লাকনাবী, নুযহাতু'ল খাওয়াতির, ২য় সং, হায়দরাবাদ ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ, ১১।

মুহাম্মদ মূসা

**ইসমাঈল ইব্ন মূসা আল-ফাযারী** (اسماعيل ابن موسى الفزارى)ঃ মুহাদ্দিছ। তাঁহার উপনাম আবূ ইসহাক। তিনি আস্-সুদ্দী (السدى)-র দৌহিত্র এবং কূফার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার হাদীছ বর্ণনায় কখনও কখনও ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেও সঠিক বিচারে তাঁহাকে বিশ্বস্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কেহ কেহ তাঁহাকে রাফিদী শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত হাদীছ ইমাম বুখারীকৃত খাল্কু আফ-'আলিল-'ইবাদ (خلق افعال العباد) গ্রন্থে এবং ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা-কৃত সুনানসমূহে সংকলিত হইয়াছে। তিনি ২৪৫/৮৫৯ সালে ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাকরীবু'ত-তাহযীব, বৈরুত, ১৯৭৫ খৃ. ১খ., ৭৫; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্রা, বৈরূত তা. বি., ৬খ. ৪১২; (৩) আয-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফফাজ, হায়দরাবাদ, ২খ., ৫৪১; (৪) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৭ খৃ., ১০খ., ৩৪৬।

লিয়াকত আলী

**ইসমা'ঈল ইব্ন য়াসার আন্-নাসাঈ** (اسماعيل بن يسار النسائى)ঃ মদীনার কবি। তিনি উমায়্যা বংশের পতনের (১৩২/৭৫০) কয়েক বৎসর পূর্বে অতি বৃদ্ধ বয়সে ইনতিকাল করেন। তিনি জনৈক আযারবায়জানী বন্দীর বংশধর এবং কুরায়শ গোত্রের তায়ম ইব্ন মুররার একজন মাওলা (মিত্র) ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার পিতা বিবাহ-উৎসবের খাদ্য প্রস্তুত অথবা কার্পেট বিক্রয় করিতেন বলিয়া তিনি এই সম্বন্ধসূচক নামে অভিহিত হইতেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সতর্কতার সহিত বিবেচনা করা উচিত। তাঁহার মদীনায় অবস্থানকালে তিনি যুবায়রীদের সমর্থকে পরিণত হন, কিন্তু 'উরওয়া ইব্নু'য-যুবায়র (দ্র.)-এর সহিত তাঁহার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে 'আবদুল্লাহ ইব্নু'য-যুবায়র-এর পতনের ৭৩/৬৯২) পর তাঁহার সহিত তিনি 'আবদু'ল-মালিক-এর দরবারে যান এবং খলীফার সাক্ষাত লাভে সমর্থ হন। তিনি তাঁহার উদ্দেশে একটি স্তুতি কবিতা রচনা করেন। মারওয়ানীদের প্রতি তাঁহার অপ্রকাশ্য ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও তিনি পরবর্তীকালে আল-ওয়ালীদ ইব্ন য়াযীদ (১২৫/৭৪৩) পর্যন্ত কয়েকজন উমায়্যা খলীফা ও রাজপুত্রের প্রশংসা করিয়া কবিতা রচনা করেন। কিতাবু'ল-আগানীর বিবরণ অনুসারে ইসমা'ঈল ইব্ন য়াসার-এর কাব্য গ্রন্থে কদাচিৎ ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে স্তুতি কবিতা, শোকগাথা (বিশেষত তাঁহার ভাই মুহাম্মাদ ও 'উরওয়া ইব্ন যুবায়র-এর এক পুত্রের)-ও গাযাল অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, যেইগুলি পরে সঙ্গীত হিসাবে পরিবেশিত হয়। যাহা হউক, অনারবদের গুণগান ও 'আরবদের হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য একটি সুস্পষ্ট অভিপ্রায় তাঁহার কবিতার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হয়। একটি শ্লোকে প্রাক-ইসলামী আরবদের নবজাত শিশু-কন্যা জীবিত প্রোথিত করার এবং অন্যগুলিতে কবি তাঁহার নিজের বংশাভিজাত্যের বিবরণ দিয়াছেন। কথিত আছে, তিনি রুসাফা-তে হিশাম ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক-এর সম্মুখে সাহসের সহিত এমন একটি কবিতা আবৃত্তি করেন যাহাতে তিনি খলীফার প্রশংসা বাদ দিয়া তাঁহার নিজের বিখ্যাত পূর্বপুরুষদের গৌরবগাথা বর্ণনা করেন। এই ঔদ্ধত্যের জন্য তাঁহাকে পূর্ণ পোশাক পরিহিত অবস্থায় পুকুরে নিক্ষেপপূর্বক শাস্তি প্রদান করা হয় এবং পরে তাঁহাকে হিজাযে নির্বাসিত করা হয়। এই ব্যাপারে ইসমা'ঈল ইব্ন য়াসার আন-নাসাঈকে শু'উবীদের (দ্র.) অন্যতম প্রথম ব্যক্তি গণ্য করা হইত। আগানীর মতে তাঁহার পুত্র ইবরাহীম এই ব্যাপারে তাঁহাকে অনুসরণ করেন, অবশ্য তাঁহার সম্বন্ধে ইহাতে মাত্র কয়েকটি পংক্তি রচিত হইয়াছে। তাঁহার ভাই মুহাম্মাদ ও মূসা 'শাহাওয়াত' নামে পরিচিত ও কবি ছিলেন (দ্র. মূসা শাহাওয়াত)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্ন কুতায়বা, শি'র, ৩৬৬-৫৫৯; (২) ইব্ন সাল্লাম আল-জুমাহী, পৃ. ৩৪৫-৬; (৩) আগানী, ৪খ, ১১৯-২৭, বৈরূত সং, ৪খ, ৪০৯-২৬; (৪) বাগদাদী, খিযানা, ১খ, ১৪৪ (কায়রো সং, ১খ, ২৭১); (৫) তাহা, হুসায়ন, আল-আদাবু'ল জাহিলী, পৃ. ১৭৬; (৬) Goldziher, Muh. stud., ১খ, ১৬০; (৭) Reccher, Abriss, ১খ, ১৮৬-৮ ; (৮) Nallino, Letteratura, পৃ. ১৩৯-৪০ (ফরাসী অনু. পৃ. ২১৪-৫) ; (৯) Brockclmann, পরি. ১, পৃ. ৯৫।

Ch. Pellat (E.I[2]) মুঃ আলী আসগার খান

**ইসমা'ঈল ইব্ন য়াহ্য়া** (اسماعيل بن يحيى) ঃ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন তীক্রুয আত-তামীমী আশ-শীরাযী আল-বালী, শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারে ইরানের একজন প্রখ্যাত ফাকীহ, যিনি কাদী মাজ্দু'দ-দীন শীরাযী উপাধিতে সমধিক পরিচিত। কুন্য়া (উপনাম) আবূ ইব্রাহীম। শীরায-এর অন্তর্গত বাল নগরে জন্ম, এইজন্য নিসবা 'আল-বালী'। পিতা শায়খ য়াহয়া-র নিকট ফিক্হশাস্ত্র ও শায়খ কুত্বু'দ-দীন আশ-শি'আরু'ল-বালী (الشعار البالى)-এর নিকট তাফসীর অধ্যয়নের পর অন্যান্য আলেমের নিকট বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেন। একজন বিজ্ঞ 'আলিম হিসাবে খ্যাতি লাভের পর অল্প বয়সেই ফার্স প্রদেশের কাদী পদে নিযুক্ত হন। একবার প্রায় ৬ মাসের জন্য তাঁহাকে এই পদ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়, পরে আবার এই পদে বহাল করা হয়।

তাঁহার ধর্মপরায়ণতা, সদাচার, শারী'আতের বিধি-বিধান পালনে পরম নিষ্ঠা, সর্বোপরি সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় নির্ভীকতা এবং তজ্জন্য সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন অকাতরে সহ্য করার দরুন তাঁহার খুব সুনাম ছিল। সেই সময় রাফিদী সম্প্রদায়ের উগ্র কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইলে তিনি তাহাদের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনে এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতিরোধে বহু নির্যাতন ভোগ করেন। আপদ-বিপদ ও দুর্বিপাকের সময় তাঁহার অশেষ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। একে একে তাঁহার তিনটি শিক্ষিত পুত্রের যৌবনেই মৃত্যু হইলে তিনি নির্বিকার চিত্তে তাহাদের জানাযা পড়ান, শোকে তিনি কখনও মুহ্যমান হন নাই।

তিনি দেশের ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ন রাখিতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। জনগণ ও শাসকশ্রেণীর মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য তিনি তৎপর থাকিতেন। একদা শীরাযের জনগণ ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে চরম বিরোধের সৃষ্টি হইলে তিনি বিবাদ মীমাংসা ও শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করিলে একদল উগ্রপন্থী বিশৃঙ্খল জনতা তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। ইহাতে তাঁহার সঙ্গিগণ ভীত হইয়া সরিয়া পড়িলে তিনি একাই তাহাদের মুকাবিলা করেন। তাঁহার এই দুর্জয় সাহসের ফলেই উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণ ও দেশের কল্যাণে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ।

তিনি ৬৬২/১২৬৩ সালে জন্মগ্রহণ এবং ৭৫৬/১৩৫৫ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁহার এই দীর্ঘ জীবনে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, জনহিতকর কার্য, শিক্ষা বিস্তার ও গ্রন্থ রচনায় অতিবাহিত করেন। জনগণ ও শাসন কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ফিক্‌হশাস্ত্রে আল-ফারা'ইদুর-রুক্‌নিয়্যা (الفرائض الركنية); উসূলু'ল-ফিক্‌হ-এ শারহু মুখতাসার ইব্‌নি'ল-হাজিব; (شرح مختصر ابن الحاجب) এবং কালামশাস্ত্রে আল-মুখ্‌তাসার (المختصر) উল্লেখযোগ্য।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইবনু'ল 'ইমাদ আল-হাম্বালী, শাযারাতু'য-যাহাব, ৬খ, ১৮০; (২) তাজু'দ-দীন আস-সুব্‌কী, তাবাকাতু'শ-শাফি'ইয়্যাতি'ল-কুব্‌রা, ৬খ, ৮৩; (৩) 'আবদুল্লাহ মুস্‌তাফা আল-মারাগী, আল-ফাত্‌হুল-মুবীন ফী তাবাকাতি'ল-উসূলিয়্যীন, কায়রো ১৯৪৭ খৃ., ২খ, ১৬৭।

ড. এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

**ইসমা'ঈল ইব্‌ন য়াহ্‌য়া** (اسماعيل بن يحيى) ঃ ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌ন ইসহাক আল-মুযানী আল-মিসরী, উপনাম আবূ ইবরাহীম, য়ামান-এর প্রসিদ্ধ মুযায়না গোত্রসম্ভূত বলিয়া তাঁহার নিস্‌বা আল-মুযানী। ইমাম শাফি'ঈ (র)-র একজন খ্যাতনামা শাগরিদ ও তাঁহার মাযহাবের ভাষ্যকার এবং ফিক্‌হশাস্ত্র বিষয়ে বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি ১৭৫/৭৯১ সালে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি হাদীছ ও 'ইল্‌ম কালাম অধ্যয়ন করেন। ১৯৯/৮১৪ সালে ইমাম শাফি'ঈ (র) মিসর আগমন করিলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ফিক্‌হশাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। এই সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়। একদা আল-মুযানী 'ইল্‌ম কালাম সম্পর্কিত বিষয়ে ইমাম শাফি'ঈর সম্মুখে আলোচনা করিলে ইমাম সাহেব তাঁহাকে 'ইল্‌ম কালাম পরিত্যাগ করিয়া ফিক্‌হশাস্ত্র অধ্যয়নের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, "বৎস ! ইহা (কালাম) এমন একটি বিদ্যা যদি তুমি ইহাতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হও— কোন পুণ্য লাভ হইবে না. আর যদি ভুল কর তবে কুফ্‌র-এ পতিত হইবে" (يا بنى، هذا علم ان أصبت فيه لم تؤجر وأن أخطأت فيه كفرت)। এমতাবস্থায় তুমি কি এমন একটি 'ইল্‌ম শিক্ষা করিবে যদি তুমি তাহাতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হও তবে পুণ্য লাভ করিবে, আর যদি উহাতে ভুলও কর তবে গুনাহগার হইবে না ? আল-মুযানী জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কোন্ 'ইলম ? ইমাম শাফি'ঈ বলিলেন, উহা ফিক্‌হশাস্ত্র। ইহার পর হইতে তিনি ইমাম শাফি'ঈর নিকট ফিক্‌হশাস্ত্র অধ্যয়নে রত থাকেন এবং তাঁহার সাহচর্যে জীবন অতিবাহিত করেন।

ফিক্‌হশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভের পর আল-মুযানী অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত থাকেন। মিসর ছাড়াও ইরাক, সিরিয়া ও খুরাসানের বহু শিক্ষার্থী তাঁহার নিকট ফিক্‌হশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার খ্যাতনামা ছাত্রদের মধ্যে ইব্‌ন খুযায়মা, যাকারিয়্যা আস-সাজী, ইব্‌ন যূসা, ইব্‌ন আবী হাতিম ও আত-তাহাবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এইখানে ইমাম আবূ জা'ফার আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আত-তাহাবী (মৃ. ৩২১/ ৯৩৩)-এর সহিত ইমাম আল-মুযানীর মতদ্বৈততার ঘটনাটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহাবী তাঁহার মাতুল ইমাম মুযানীর নিকট অধ্যয়নকালে ইমাম আবূ হানীফা (র)-র ফিক্‌হও গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতেন এবং এইজন্য বহু সময় ব্যয় করিতেন। ইহাতে ইমাম মুযানী বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, و الله لايجىء منك شيىء "আল্লাহর কসম, তোমা দ্বারা কিছুই হইবে না।" ইহাতে তাহাবী মনঃক্ষুণ্ন হইয়া তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হানাফী ফিক্‌হ অধ্যয়নে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তী কালে তাহাবী ফিক্‌হশাস্ত্রের একজন ইমামরূপে স্বীকৃতি লাভ করিলে তিনি বলিতেন, "আমার মামা এখন জীবিত থাকিলে তাঁহার কসমের জন্য কাফ্‌ফারা দিতে হইত।"

ইমাম মুযানী ফিক্‌শাস্ত্রে ইমাম শাফি'ঈ (র)-র শাগরিদ, তাঁহার মায্‌হাবের ভাষ্যকার ও অনুসারী হইলেও বহু প্রশ্নে তিনি ভিন্নমত পোষণ করিতেন। এইজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে একজন স্বাধীন মুজ্‌তাহিদ গণ্য করেন। তিনি উসূলু'ল-ফিক্‌হশাস্ত্রেও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইমাম শাফি'ঈ (র) তাঁহার সম্পর্কে বলেন, "আল-মুযানী আমার মাযহাবের সোচ্চার প্রচারক (ناصر مذهبى), শয়তানকেও তর্কে সে পরাভূত করিতে পারে।" মিসরের প্রধান বিচারক হানাফী মতাবলম্বী কাদী বাক্কার ইব্‌ন কুতায়বা আল-বাসরী ফিক্‌হশাস্ত্রে ইমাম আল-মুযানীর জ্ঞানবত্তা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় লাভের উদ্দেশে কাদী সাহেবের এক সহকর্মীকে এক মজলিসে আল-মুযানীর সহিত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করিতে বলেন। তিনি আল-মুযানীকে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, "হাদীছ শারীফে নাবীয (খুরমা বা কিশমিশ হইতে প্রস্তুত শরবত) হারাম হওয়ার যেমন উল্লেখ আছে, তদ্রূপ হালাল হওয়ারও প্রমাণ আছে। এমতাবস্থায় হারাম সম্পর্কিত হাদীছকে আপনি হালাল সম্পর্কিত হাদীছের উপর কোন্ যুক্তিতে প্রাধান্য দেন ?" আল-মুযানী উত্তরে বলেন, "উলামা সম্প্রদায়ের কেহই এইরূপ মত পোষণ করেন না যে, জাহিলী যুগে 'নাবীয' হারাম ছিল, পরে হালাল করা হয় এবং হালাল হওয়া সম্পর্কে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নাবীয হারাম হওয়া সম্পর্কিত হাদীছের বিশুদ্ধতার ইহা একটি প্রমাণ।" কাদী বাক্কার তাঁহার এই উত্তরে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আল-মুযানী রচিত গ্রন্থাবলী শাফি'ঈ মাযহাবের প্রামাণিক সূত্ররূপে বিবেচিত হয়। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী ঃ (১) আল-মুখ্তাসার (المختصر); (২) আল-জামি'উ'ল-কাবীর (الجامع الكبير); (৩) আল-জামি'উ'স-সাগীর (الجامع الصغير); (৪) আল-মানছূর (المنثور); (৫) আল-মাসা'ইলু'ল-মু'তাবিরা (المسائل المعتبرة); (৬) আত-তারগীব ফি'ল্-'ইল্ম (الترغيب فى العلم); (৭) আল-ওয়াছা'ইক (الوثائق); (৮) কিতাবু'ল-'আকারিব (كتاب الاقارب); (৯) কিতাব্ নিহায়াতি'ল-ইখতিসার (كتاب نهاية الاختصار), ইমাম শাফি'ঈ (র)-র কিতাবু'ল-উম্ম গ্রন্থের সারসংক্ষেপ।

ইমাম আল-মুযানী অতি সহজ সরল সূফীসুলভ নিরাসক্ত জীবন যাপন করিতেন, অধিক নফল সালাতে অভ্যস্ত ছিলেন। মৃত ব্যক্তিদের গোসলের কাজ সানন্দে করিতেন। কেননা ইহাতে মনে নম্রতা ও আল্লাহ-ভীতি সৃষ্টি হয়। জনগণের বিশ্বাস ছিল তাঁহার দু'আ আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। তিনি রামাদান মাসের ৬ দিন অবিশিষ্ট থাকিতে ২৬৪/৮৭৮ সালে মিসরে ইনতিকাল করেন এবং হযরত 'আম্র ইবনু'ল-'আস (রা) প্রতিষ্ঠিত মিসরের প্রাচীনতম মসজিদ আল-মাসজিদু'ল-'আতীক-এর মুওয়াযযিন শায়খ আর-রাবী' ইব্ন সুলায়মান আল-মুরাদী (الربيع بن سليمان المرادى) তাঁহার জানাযা পড়ান। আল-মুকাত্তাম পর্বতের পাদদেশে ইমাম শাফি'ঈ (র)-র মাযারের সন্নিকটে আল-কারাফাতু'স-সুগরা' গোরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ১খ, ১৯৬-৯৭; (২) তাজু'দ-দীন সুবকী, তাবাকাতু'শ-শাফি'ইয়্যা, কায়রো ১৩২৪ হি., ১খ, ২৩৮; (৩) আহমাদ ইব্ন মুসতাফা, মিফ্তাহু'স-সা'আদা, কায়রো ১৯২৮ খৃ., ২খ, ১৫৮; (৪) ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, কায়রো, নির্ঘণ্ট; (৫) আল-খাতীবু'ল-বাগদাদী, তা'রীখ, বাগদাদ, কায়রো ১৩৪৯ হি., ৪খ, ৩০০; (৬) আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, কায়রো ১৩৪৭ হি., ১খ, ১০৫; (৭) 'আবদুল্লাহ মুস্তাফা আল-মারাগী, আল-ফাত্হুল-মুবীন ফী তাবাকাতি'ল-উসূলিয়্যীন, কায়রো ১৯৪৭ খৃ., ১খ, ১৫৬-৫৮।

ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

**ইসমা'ঈল ইব্ন সা'ঈদ** (اسماعيل بن سعيد) ঃ (রা) ইব্ন 'উবায়দ ইব্ন আবী উসায়দ ইব্ন 'আম্র ইব্ন 'ইলাজ আছ-ছাকাফী, সাহাবী। তিনি বানূ ছাকীফ গোত্রের লোক ছিলেন। ইমাম বুখারী তাঁহার তা'রীখ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইসমা'ঈল কবি উমায়্যা ইব্ন আবি'স-সাল্ত (দ্র.)-এর মৃত্যুর সময় কবির নিকট উপস্থিত ছিলেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্ন হাজার 'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ৪০, নং ১৪১; (২) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত্-তাহযীব, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ., ১খ, ৭০, নং ৫১০।

লিয়াকত আলী

**ইসমা'ঈল ইব্ন সাফিয়্যি'দ-দীন** (اسماعيل بن صفى الدين) ঃ ইব্ন নাসীরি'দ-দীন ইব্ন নিজামি'দ-দীন আর-রুদুলাবী, আশ-শায়খু'ল-কাবীর, ইমাম আ'জাম আবূ হানীফা (র)-র বংশধর, ফাকীহ, মুফ্তী, শিক্ষাবিদ ও বাগ্মী। উপনাম আবু'ল-মাকারিম, উপাধি আল-খাতীবু'ন-নু'মানী। তাঁহার প্রপিতামহ শায়খ নিজামু'দ-দীন ইরাক হইতে উপমহাদেশে আগমন করেন এবং কিছুকাল দিল্লীতে অবস্থান করিয়া জৌনপুরে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। পিতা শায়খ সাফিয়্যু'দ-দীন ছিলেন দাওলাতাবাদের কাদী, শায়খ শিহাবু'দ-দীনের দৌহিত্র। শায়খ সাফী অসাধারণ মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি শারী'আত সম্পর্কীয় ও ভাষা বিষয়ক জ্ঞান স্বীয় মাতামহ কাদী শিহাবের নিকট শিক্ষা করেন। তৎকালীন প্রখ্যাত সূফী সাধক শায়খ আশরাফ ইব্ন ইব্রাহীম আস-সিম্নানীর নিকট তিনি তারীকাত ও মা'রিফাতের দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শায়খ সাফী পুত্র ইসমা'ঈলের শিক্ষার ভার নিজেই গ্রহণ করেন। আরবী ব্যাকরণ ও ভাষা শায়খ ইসমা'ঈলকে হাতেকলমে শিক্ষা দানের উদ্দেশে শায়খ সাফী শিশু-কিশোরদের উপযোগী দুইটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। প্রথম পুস্তিকাটির নাম ঃ দাসতূরু'ল-মুবতাদী, 'আরবী শব্দ প্রকরণ (صرف) শিক্ষার একটি শিশু পাঠ্য। 'আরবী ব্যাকরণের প্রাথমিক জ্ঞানের এই সহজবোধ্য পুস্তকটি একটি আদর্শ শিশু ব্যাকরণের পুস্তক হিসাবে উপমহাদেশের সর্বত্র বিপুলভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দ্বিতীয় পুস্তকটির নাম গায়াতু'ত-তাহকীক (غاية التحقيق), ইহা ইবনু'ল-হাজিব-এর বিখ্যাত 'আরবী ব্যাকরণের পদবিন্যাস প্রকরণ (نحو) বিষয়ক একটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত কাফিয়া নামক পুস্তকের সহজ সরল ভাষ্য। কাশফু'জ-জুনূন গ্রন্থ প্রণেতা হাজ্জী খালীফা এই পুস্তকটির প্রশংসা করিয়াছেন।

শায়খ ইসমা'ঈল বস্তুত পিতার নিকট উপরিউক্ত দুইটি পুস্তকের সাহায্যে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ইসলামী অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষাও তিনি তাঁহার পিতার নিকট গ্রহণ করেন। শায়খ ইসমা'ঈলও পিতার অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। ১৬ বৎসর বয়সেই তাঁহার প্রচলিত বিষয়সমূহের অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। ইহার পর হইতেই তিনি শিক্ষা দান কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। হিজরী ৮১৯ সালে পিতার মৃত্যুর পর তিনি তদস্থলে প্রধান অধ্যাপক হিসাবে অধ্যাপনার দায়িত্ব কৃতিত্বের সহিত পালন করিতে থাকেন। জনপ্রিয় শিক্ষক হিসাবে তাঁহার বিপুল খ্যাতি ছিল। অধ্যাপনা, ফাতওয়া প্রদান ও ওয়া'জ-নাসীহাতে তিনি ব্যস্ত জীবন যাপন করিতেন। সপ্তাহে একবার শুক্রবার দিবস তিনি নিয়মিতভাবে জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দান করিতেন।

১২ রাবী'উছ-ছানী, ৭৮৯ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং বুধবার, ১৩ রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৮৬০ সালে প্রায় ৭১ বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

শায়খ ইসমা'ঈল স্বীয় পিতা ও উস্তাদের নিম্নোক্ত উপদেশমালা আন্তরিকতার সহিত পালনে যত্নবান ছিলেন ঃ পরিমিত পানাহার ও নিদ্রা, অধিক রাত্রে গভীর অধ্যয়ন। তিনি বলিতেন, রাত্রিকালের গ্রন্থ পাঠ স্মৃতি শক্তি প্রখর ও সুদৃঢ় করে। শারী'আতের বিধানসমূহ সঠিকভাবে ব্যক্তিগত জীবনে পালন করত 'আলিম বা-'আমাল হইবার এবং 'আলিম-ই সূ' বা মন্দ 'আলিমদের শ্রেণীভুক্ত না হইবার জন্য তিনি পুত্রকে বিশেষভাবে তাকীদ করিতেন। 'ইল্ম ও 'আমাল বা বিদ্যা ও কর্মের সংযোগের উপর তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তিনি বলিতেন ঃ 'আমলবিহীন 'আলিম বা কর্মহীন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলাবিহীন ধনুকের ন্যায়, আর বে-'আমল 'আলিম ব্যক্তি অস্বচ্ছ আয়নার ন্যায়। পিতার এই উপদেশাবলী নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া শায়খ ইসমা'ঈল গৌরবময় জীবনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) শারীফ 'আবদু'ল-হায়্যি আল-হাসানী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ৩খ, ৩১-৩২, ৮৯-৯০, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ আল-'উছমানিয়্যা, হায়দরাবাদ ১৯৫১ খৃ.; (২) আন্-ওয়ারু'স-সাফী।

ড. এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

**ইসমা'ঈল ইব্ন সুবুক্তিগীন** (اسماعيل بن سبكتگين)ঃ 'গাযনীর আমীর সুবুক্তগীনের কনিষ্ঠ পুত্র এবং আলপ্তগীনের এক কন্যার গর্ভজাত সন্তান। শা'বান ৩৮৭/আগস্ট ৯৯৭ সনে সুবুক্তগীন মৃত্যুকালে তাঁহাকে স্বীয় স্থলাভিষিক্তরূপে ঘোষণা করেন এবং তাঁহার সকল রাজকর্মচারীর নিকট হইতে আনুগত্যের স্বীকৃতি গ্রহণ করেন। ইসমা'ঈল বাল্খ শহরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাহমূদ (দ্র.) যিনি বুখারার সাসানী শাসকের পক্ষ হইতে "খুরাসানের সেনাধ্যক্ষ" ছিলেন, তাঁহার সহিত সমঝোতা করার চেষ্টা করিলেন এবং তাঁহাকে গাযনীর পরিবর্তে বালখ অথবা খুরাসান প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ইসমা'ঈল উহা প্রত্যাখ্যান করিলে মাহমূদ গাযনী আক্রমণ করেন। তাঁহার সহিত ইসমা'ঈলের রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৩৮৮/মার্চ ৯৯৮ সালে গাযনীর মাঠে সংঘর্ষ হইয়াছিল। ইসমা'ঈল পরাজিত হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগে বাধ্য হইলেন। মাত্র সাত মাস ইসমা'ঈলের রাজত্বকাল ছিল। মাহমূদ তাঁহার সহিত অত্যন্ত সদাচরণ করিয়াছিলেন। ইহার স্বল্পকাল পরে ইসমা'ঈল মাহমূদকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখিবার উদ্দেশে জুয-জানান পাঠাইয়া দিলেন— যেখানে তিনি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি নিরাপদে অতিবাহিত করেন।

ইসমা'ঈল একজন জ্ঞান পিপাসু দুর্বল চিত্তের মানুষ ছিলেন। তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় সংক্ষিপ্তাকারে অনেক পুস্তিকা রচনা এবং কবিতা লিখেন। তিনি একজন ধর্মভীরু মুসলমান ছিলেন এবং বলা হইয়া থাকে যে, তাঁহার সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে তিনি নিজে খুলাফা-ই রাশিদা-র অনুকরণে জুমু'আর সালাতের ইমামতি করিতেন।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) আল-'উতবী, তারীখ-ই য়ামীনী, লাহোর, পৃ. ১১-১১৮; (২) ইব্নু'ল-আছীর, Tornberg, ৯খ, পৃ. ১০৩-১০৫; (৩) হামদুল্লাহ মুসতাওফী, তারীখ গুযীদা, পৃ. ৩৯৩; (৪) রাওদাতু'স-সাফা (নওল কিশোর প্রেস), ৪খ, ৭৩৩-৭৩৪।

মুহাম্মাদ নাজি'ম (দা. মা. ই.)/ মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন

**ইস্মা'ঈল ইব্ন হাম্মাদ** (اسماعيل بن حماد) ঃ ইব্নি'ল-ইমাম আবী হানীফা (র) আন্-নু'মান ইব্ন ছাবিত আল-কূফী, ইমাম আবূ হানীফা (র)-র পৌত্র এবং মুসলিম বিশ্বের তৎকালীন একজন সুখ্যাত হাদীছবেত্তা, ফাকীহ, 'ইল্মু'ল-কালামের ইমাম ও কাদী। তিনি ফিক্হ প্রধানত তাঁহার পিতা কাদী মুফ্তী শায়খ হাম্মাদের নিকট অধ্যয়ন করেন। ইমাম আ'জাম (আবূ হানীফা)-এর অন্যতম শাগরিদ আল-হাসান ইব্ন যিয়াদ-এর নিকটও তিনি 'ইল্মু'ল-ফিক্হ অধ্যয়ন করেন। ইমাম আবূ য়ূসুফ (র)-এর শিক্ষা মাজলিসে তিনি যোগদান করিতেন, কিন্তু মতদ্বৈধতার কারণে পরে যোগদানে বিরত থাকেন।

হাদীছশাস্ত্রে তাঁহার শায়খদের অন্যতম 'আম্র ইব্ন যার্র (ذر), মালিক ইব্ন মাগূল (مغول) ও ইব্ন আবী যি'ব (ذئب)। বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী তাঁহার নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করেন; তন্মধ্যে সাহ্ল ইব্ন 'উছমান আল-'আসকারী ও 'আবদু'ল-মু'মিন ইব্ন 'আলী আর-রাযী উল্লেখযোগ্য।

সম্ভবত 'আব্বাসী খলীফা আল-মা'মূনের শাসনামলেই শায়খ ইসমা'ঈল বাগদাদ, বস্রা ও গ্রীষ্মকালীন রাজধানী আর-রাক্কা শহরের কাদী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জীবনবেত্তাগণ বিচার কার্যে ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ, সত্য উদ্ঘাটন ও আইনের সঠিক প্রয়োগে তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও ন্যায়নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করেন। হাদীছ, ফিক্হ ও কালাম-এ তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ফিক্হ-এ একখানা (আল-জামি') ও কালাম-এ দুইখানা গ্রন্থ (কিতাবু'র-রাদ্দি 'আলা'ল-কাদারিয়্যা ও কিতাবু'ল-ইর্জা' যথাক্রমে কাদারিয়্যা ও মুরজিয়া মতের খণ্ডন)-ও তিনি রচনা করেন।

উল্লেখ্য, মুসলিম সমাজে 'ইল্মু'ল-কালামের কয়েকটি জটিল প্রশ্নে যে মতভেদের সৃষ্টি হয় তন্মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কালাম (বাণী) সম্পর্কিত প্রশ্নটি খলীফা আল-মা'মূনের আমলে বিভিন্ন কারণে বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। কুর্আন কারীম আল্লাহ্র কালাম এই সম্পর্কে সকলেই একমত, কিন্তু এই কালাম আল্লাহ্র একটি চিরন্তন গুণ (صفة) অথবা ইহা তাঁহার সৃষ্ট বস্তু— এই সম্পর্কে আহ্লু'স-সুন্নাহ-র সহিত মু'তাযিলাঃ সম্প্রদায়ের তীব্র মতভেদের সৃষ্টি হয়। আহ্লু'স-সুন্নাহ-র মতে কুরআন আল্লাহ্র চিরন্তন (কাদীম) বাণী, মু'তাযিলাদের অভিমত—কুরআন আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তু। ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁহার ফিক্হু'ল-আক্বার ও অন্যান্য পুস্তকে প্রশ্নটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে বলেন ঃ আল-কুরআন আল্লাহ্র চিরন্তন কালাম, কিন্তু আমাদের পঠন, লিখন অনিত্য, মাখ্লূক। আহ্লু'স-সুন্নাহ-ও সর্বসম্মতভাবে এই মতের অনুসারী। তবে ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র-এর একটি বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে, কাদী ইসমা'ঈল এই প্রশ্নে মু'তাযিলা মতবাদ সমর্থন করিতেন। তিনি বলিতেনঃ কুরআন আল্লাহ্র সৃষ্ট এবং এই অভিমত আমার পিতা ও পিতামহেরও। কাদী ইসমা'ঈলের প্রতিবাদে সুপ্রসিদ্ধ ফাকীহ কাদী বিশ্র ইব্নু'ল-ওয়ালীদ বলেনঃ ইহা আপনার ব্যক্তিগত অভিমত হইতে পারে; কিন্তু আপনার পিতৃপুরুষের কাহারও এই অভিমত নহে।

কাদী ইস্মা'ঈল ২১২/৮২৭ সালে যৌবনকালেই ইনতিকাল করেন। তাঁহার জন্ম তারিখ অজ্ঞাত; তবে তিনি তাঁহার পিতামহ ইমাম আবূ হানীফার (মৃ. ১৫০/৭৬৭) মৃত্যুর পরেই জন্মগ্রহণ করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) কাসিম ইব্ন কুতলুবুগা, তাজু'ত-তারাজিম, সম্পা. G. Flugel, Leipzig 1862; (২) মুল্লা 'আলী আল-কারী, তাবাকাতু'ল-হানাফিয়্যা, নির্ঘণ্ট; (৩) আয-যাহাবী, মীযানু'ল-ই'তিদাল; (৪) 'আল্লামাঃ আবু'ল-হাসানাত মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-হায়্যি আল-লাক্নাবী, ফাওয়া'ইদু'ল-বাহিয়্যা, সা'আদাঃ প্রেস, কায়রো ১৩২৪ হি., পৃ. ৪৬; (৫) ড. এ. কে. এম. আইয়ূব আলী, 'আকীদাতু'ল-ইসলাম ওয়া'ল-ইমাম আল-মাতুরীদী, ঢাকা ১৯৮৩ খৃ., পৃ. ২৪৯, নির্ঘণ্ট।

ড. এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

**ইসমা'ঈল ইব্নু'ল-কাসিম** (اسماعيل بن القاسم) ঃ ইব্ন 'আয়যূন ইব্ন হারূন ইব্ন 'ঈসা ইব্ন মুহাম্মাদ সালমান-আবূ 'আলী আল-কালী, প্রখ্যাত লেখক, ব্যাকরণবিদ, সাহিত্যিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ। সাধারণত আবূ 'আলী আল-কালী এই উপনামে সমধিক পরিচিত। তাঁহার পূর্বপুরুষ সালমান ছিলেন উমায়্যা খলীফা 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন মারওয়ানের মাওলা (মিত্র)।

তাঁহার আত্মবিবরণী অনুযায়ী তিনি ২৮৮/৯০০ সালে আর্মেনিয়ার অন্তর্গত দিয়ার-বাক্র (প্রাচীন আমিদ)-এর শহরতলীর মানায-ই কুরদ (مناز كرد) নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্বদেশে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশে ৩০৩/৯১৫ সালে বাগদাদের পথে মাওসিল পৌছেন। এইখানে দুই বৎসর অবস্থান করিয়া আবূ য়া'লা আল-মাওসিলী ও অন্যদের নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করেন। ৩০৫/৯১৭ সালে তিনি বাগদাদ পৌছেন এবং ৩২৮/৯৩৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৩ বৎসর এই শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাকেন্দ্রে থাকিয়া প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞগণের নিকট হাদীছ, তাফসীর, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন এবং এই সকল বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। যেই সকল মুহাদ্দিছের নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করিয়া তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছ তিনি লিপিবদ্ধ করিতেন তাঁহাদের মধ্যে আবূ বাক্র 'আবদুল্লাহ ইব্ন দাঊদ আস-সিজিস্তানী, আবূ মুহাম্মাদ য়াহ্য়া ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সা'ইদ, কাদী আবূ 'উমার মুহাম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ, 'আবু'ল-কাসিম 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয আল-বাগাবী, ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদি'স-সামাদ আল-হাশিমী, কাদী আহমাদ ইব্ন ইসহাক আল-বুহলূল, কাদী আবূ 'আবদিল্লাহ আল-হুসায়ন, আবূ বাক্র ইব্ন য়ূসুফ ইব্ন য়া'কূব, আবূ বাক্র আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-বুস্তান বান, আবূ সা'ঈদ আল-হাসান ইব্ন 'আলী আল-'আদাবী প্রমুখ প্রধান।

আবূ 'আলী আল-কালী পুরাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, কুরআনতত্ত্ব ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন নিম্নোক্ত বিশেষজ্ঞগণের নিকটঃ আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইব্ন দুরায়দ আল-আয্‌দী আল-বাসরী, আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইব্নু'ল-কাসিম আল-আম্বারী, আবূ 'আবদিল্লাহ ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আরাফা যিনি সাধারণ্যে নিফ্তাওয়ায়হ নামে পরিচিত, আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইব্নু'স-সারী আন-নাহ্‌বী, আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইব্ন শুকায়র আন-নাহ্‌বী, আবূ ইস্হাক ইব্রাহীম ইব্নু'স-সারী ইব্ন সাহ্ল আয-যাজ্জাজ আন-নাহ্‌বী, আবু'ল-হুসায়ন 'আলী ইব্ন সুলায়মান ইবনি'ল-ফাদল আল-আখ্ফাশ, আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইব্ন আবি'ল-আয্হার, আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফার। দারাসতাওয়ায়হ তাঁহার লেখক সীবাওয়ায়হ-এর ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থ আল-কিতাব অধ্যয়ন করেন। আবূ জা'ফার আহমাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন মুসলিম ইব্ন কুতায়বা— তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন। ইব্ন কুতায়বার গ্রন্থাদি আবূ বাক্র আহমাদ ইব্ন মূসা ইব্ন মুজাহিদ তাঁহার নিকট আল-কুরআনের সপ্ত কিরাআত (القراءات السبع) অধ্যয়ন করেন, আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক তাঁহার নিকট ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, আহমাদ ইব্ন য়াহ্য়া আল-মুনাজ্জিম আল-আদীব তাঁহার নিকট জ্যোতির্বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং 'আলী ইব্নু'ল-হাসান ইব্ন 'আলী— তাঁহার নিকট বংশ-বৃত্তান্ত (علم الانساب) অধ্যয়ন করেন। আল-কালী প্রদত্ত তাঁহার শিক্ষকবৃন্দের তালিকায় আরও কয়েকজন খ্যাতনামা বিজ্ঞ 'আলিমের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

উপরিউক্ত তালিকা হইতে ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় শিক্ষা লাভের যে বিপুল সুযোগ-সুবিধা বাগদাদে বিদ্যমান ছিল এবং বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের অপূর্ব সমাবেশের দরুন বাগদাদ নগরী যে সমসাময়িক বিশ্বের জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল তাঁহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। জ্ঞান-সাধনায় আবূ 'আলী আল-কালীর দীর্ঘদিনের নিরলস প্রচেষ্টা ও অদম্য স্পৃহা যুগে যুগে শিক্ষার্থীদের মনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে। বাগদাদে অবস্থানকালে আল-কালী কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কিনা অথবা অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন কিনা সেই সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। সেইখানে অবস্থানকালে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যপূর্ণ গ্রন্থাবলীর প্রণেতা ও সুবিজ্ঞ শিক্ষক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি বিস্তার লাভ করে।

আল-কালী বাগদাদ হইতে আন্দালুসের উদ্দেশ্যে ৩২৮/৯৩৯ সালে রওয়ানা হন। রাজাব মাসে ৩৩০/৯৪১ সালে আলজিরিয়ার সাম্প্রতিক বন্দর বিজায়া (Bougie) পৌছেন এবং উক্ত সনে শা'বান মাসের তিন দিন অবশিষ্ট থাকিতে আন্দালুসের রাজধানী কুরতুবা (কর্ডোভা) নগরীতে উপনীত হন। বাগদাদ হইতে যাত্রার পর পথিমধ্যে তিনি কোন্ কোন্ শহরে অবস্থান করেন তাহাদের বিবরণ পাওয়া যায় না। স্পেনের তৎকালীন উমায়্যা খলীফা 'আবদু'র-রাহমান আন-নাসির (৩০০-৩৫০/৯১২-৯৬১) তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে তাঁহার বসবাসের সুব্যবস্থা করেন। আবূ 'আলী আল-কালী অবশিষ্ট জীবন স্পেনে অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনায় অতিবাহিত করেন। খলীফা আন-নাসির ও তৎপুত্র আল-হাকাম বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং তাঁহারা উভয়ই আল-কালীকে শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞান সাধনার জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। কুরতুবা-র উপকণ্ঠের বিখ্যাত আয্-যাহ্রা জামি' মসজিদ ছিল তাঁহার অধ্যাপনা ও সাহিত্যকর্মের প্রধান কেন্দ্র। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ এইখানেই রচিত হয়। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থই ইম্লা' (املاء-dictation) পদ্ধতিতে রচিত হয়। তিনি সব কিছু মুখস্থ বলিয়া যাইতেন এবং লিপিকার তাহা লিপিবদ্ধ করিত।

**গ্রন্থাবলী** ঃ তাঁহার সর্বাধিক খ্যাত পুস্তক হইল আন-নাওয়াদির ওয়া'ল-আমালী (النوادر و الامالى), সংক্ষেপে আল-আমালী নামে পরিচিত। এই গ্রন্থে বহু ঐতিহাসিক কাহিনী, প্রবাদবাক্য, ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্রের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও কবিতার উদ্ধৃতির সমাবেশ ঘটিয়াছে যাহা অন্য কোন 'আরবী গ্রন্থে পাওয়া যায় না। 'আরবী সংকলন গ্রন্থাবলীতে এই গ্রন্থ হইতে নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশের মাদ্রাসাসমূহের উচ্চ শ্রেণীতে এক সময় গ্রন্থখানা পাঠ্যভুক্ত ছিল। তাঁহার 'আল-মাকসূর ওয়া'ল-মামদূদ' (المقصور والممدود) গ্রন্থটি আরবী বর্ণমালার উচ্চারণ স্থল ও ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিতাব ফি'ল-ইবিল ওয়া নিতাজিহা (كتاب فى الابل و نتاجها), কিতাবুন ফী হুলিয়্যি'ল-ইন্সান ওয়া'ল-খায়ল ওয়া শিয়াতিহা (كتاب فى حلى الانسان والخيل وشياتها), কিতাব ফা'আল্তু ওয়া আফ'আল্তু (كتاب فعلت وأفعلت), মাকাতিলু'ল-ইন্সান (مقاتل الانسان) এবং মু'আল্লাকাসমূহের ভাষ্য (شرح المعلقات)।

আবূ 'আলী আল-কালীর শব্দকোষ ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত সুবৃহৎ গ্রন্থটির নাম আল-বারি' (البارع)। বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত পাঁচ হাজার পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে প্রতিটি শব্দের মূল, রূপান্তর, বিভিন্ন অর্থের উদাহরণ ভাষাবিদগণের অভিমতসহ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। পুস্তকটির রচনাকাল সম্বন্ধে গ্রন্থকারের পুত্র বলেন, "আমার মরহূম পিতা আল-বারি' কিতাবটি রাজাব মাসে ৩৩৯/৯৫০ সালে রচনা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু কর্মব্যস্ততা ও অন্যান্য কারণে কিছুকাল পর রচনাকার্য বন্ধ থাকে।

অতঃপর আমীরু'ল-মু'মিনীন ('আবদুর-রাহমান আন-নাসির)-এর বিশেষ নির্দেশে ৩৪৯ হি. হইতে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নসহকারে গ্রন্থটির রচনাকার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। মুসাবিদা সমাপ্ত হইলে তিনি স্বহস্তে উহার পাণ্ডুলিপি লিখিতে শুরু করিয়া ৩৫৫/৯৬৫ সালের শাওওয়াল মাসে উহার কতিপয় অধ্যায় সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি এই মাসেই অসুস্থ হইয়া পড়েন।"

আল-কালীর খ্যাতনামা শাগরিদ আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনু'ল-হাসান আয-যুবায়দী আল-আন্দালুসীর বর্ণনামতে আল-কালী গ্রন্থটির পরিষ্কার পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত করিবার পূর্বেই ইনতিকাল করেন এবং পরে তাঁহার অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করা হয়। উপরে বর্ণিত আল-কালীর জীবন-বৃত্তান্ত তাঁহার নিজস্ব বর্ণনা হইতে গৃহীত। আয-যুবায়দীর প্রশ্নসমূহের উত্তরে তিনি উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

তাঁহার 'আল-কালী' নিস্‌বা সম্পর্কে যুবায়দীর প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন, "আমরা যখন স্বদেশ হইতে বাগ্‌দাদের উদ্দেশে রওয়ানা হই তখন আমাদের কাফিলায় পার্শ্ববর্তী কালীকালা (قاليقلا) অঞ্চলের একদল লোক ছিল। তাহাদের সঙ্গে অশ্ব ও অন্যান্য পশু ছিল। আমরা কোন শহরে প্রবেশ করিলে স্থানীয় জনগণ কালী-কালা-র যাত্রিগণের বিশেষ যত্ন নিতেন। কোন কোন স্থানের কর্মচারী যাত্রীদের নিকট হইতে কিছু পশু রাখিতে চাহিলে কালীকালার নাম শুনিয়া ইহা হইতে বিরত থাকিতেন। আমি লক্ষ্য করিলাম যে, সর্বত্রই জনগণ কালীকালার যাত্রীদের বিশেষ সম্মান করিত। বাগ্‌দাদে পৌঁছিয়া আমার মনে এই ধারণা হইল যে, কালীকালা-র নিস্‌বা আমার জন্য কল্যাণজনক হইতে পারে। অতঃপর বাগ্‌দাদে আমি 'আল-কালী' এই নামেই পরিচিত হইলাম।"

এখানে উল্লেখ্য যে, তৎকালীন কালীকালা অঞ্চলের বিশেষ খ্যাতির অন্যতম কারণ ছিল— এই সীমান্ত অঞ্চলে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার উদ্দেশে বহু স্বেচ্ছাসেবী আল-মুরাবিতুন ছাউনি স্থাপন করিয়া বসবাস করিতেন। ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ মুরাবিতগণ ছিলেন মুজাহিদ দরবেশ। মহৎ চরিত্র ও নিঃস্বার্থ জনসেবার জন্য তাঁহাদেরকে লোকেরা বিশেষ সম্মান করিত।

আল-বালাযুরী 'কালীকালা' নামকরণ সম্পর্কে বলেন, আরমিনিয়া অঞ্চলের 'কাল' নাম্নী জনৈক রোমান সামন্ত নৃপতির বিধবা রাণী একটি শহর স্থাপন করিয়া উহার নামকরণ করেন কালী কালাহ (قالى قالاه), যাহার অর্থ কালীর অবদান। 'আরবগণ উহাকে কালীকালা' (قالى قلا) বলেন।

আবূ 'আলী আল-কালী শনিবার রাত্রে, ৭ মতান্তরে ৬ জুমাদা'ল-উলা, মতান্তরে রাবী'উ'ল-'আখির ৩৫৬/৯৬৬ সালে কর্ডোভা শহরে ইনতিকাল করেন। শায়খ আবূ 'আবদিল্লাহ আল-জুবায়রী তাঁহার জানাযার সালাত পড়ান এবং শহরের উপকণ্ঠে মাত্'আ (متعه) নামক কবরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

জীবনীকারগণ তাঁহার জ্ঞান-চর্চা ও সাহিত্যকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। স্পেনের সমসাময়িক প্রখ্যাত কবি আবূ 'উমার য়ূসুফ ইবন হারূন আল-কিন্দী আর-রামাদী তাঁহার স্পেন আগমন উপলক্ষে প্রশস্তিগাথা এবং তাঁহার মৃত্যুতে যেই শোকগাথা রচনা করেন আছ-ছা'আলিবী য়াতীমাতু'দ-দাহ্‌র গ্রন্থে তাঁহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) আস-সাম'আনী, আল-আনসাব, নির্ঘণ্ট ; (২) আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ আয-যুবায়দী, আত-তাবাকাত, নির্ঘণ্ট ; (৩) আস-সুয়ূতী, বুগ্‌য়া, নির্ঘণ্ট ; (৪) হাজ্জী খালীফা, কাশ্‌ফু'জ-জুনূন, গ্রন্থ শিরো.; (৫) ইবনু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহাব, কায়রো ১৩৫১ হি., ৩খ, ১৮; (৬) আল-য়াফিঈ, মির'আতু'ল-জিনান, হায়দরাবাদ সং., ২খ, ৩৫৯ ; (৭) য়াকূত, মু'জামু'ল-উদাবা', নির্ঘণ্ট ; (৮) জামালু'দ-দীন আল-কিফ্‌তী, ইনবাহুর-রুওয়াত, সম্পা. মু. আবু'ল-ফাদ্‌ল ইবরাহীম, কায়রো ১৯৫০ খৃ., ১খ, ২০৪-৯ ; (৯) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, সম্পা. মু. মুহ্‌য়ি'দ-দীন 'আবদু'ল-হামীদ, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ১খ, ২০৪-৬; (১০) বালাযুরী, ফুতূহু'ল-বুলদান (অধ্যায় আরমিনিয়া'); আরও দ্র.ঃ (১১) তা'রীখ 'উলামা'ই'ল-আন্দালুস, নাফ্‌হু'ত-তীব।

ড. এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

**ইসমা'ঈল ইবনুল-কাসিম** (দ্র. আবু'ল-'আতাহিয়্যা)

**ইসমা'ঈল কামালু'দ-দীন আল-কারাবানী** (اسماعيل كمال الدين القرباني) ঃ কারাহ কামাল (قره كمال) নামে পরিচিত, ৯ম/১৫শ শতকের তুরস্কের একজন খ্যাতনামা 'আলিম, শিক্ষাবিদ ও বহু গ্রন্থের লেখক। তিনি যাঁহাদের নিকট বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ের শিক্ষা লাভ করেন তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইলেন— শায়খ শামসুদ'দ-দীন আহমাদ ইবন মূসা আল-খিয়ালী ও মাওলা খাসরূও নামে পরিচিত শায়খ মুহাম্মাদ ইবন ফারামূয। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি য়ূরোপীয়-তুরস্কের এককালীন প্রধান শহর আদিরনা (Aadranople) নগরীর প্রসিদ্ধ মাদরাসা ও অন্যান্য মাদরাসা-তে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন এই সময় তিনি প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ, ফিকহশাস্ত্র, 'ইলমু'ল-কালাম ও 'আকা'ইদশাস্ত্রের গ্রন্থাবলীর মূল্যবান ভাষ্য ও টীকা রচনা করেন। হাজ্জী খালীফা নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ ১। 'আল্লামা নাসিরু'দ-দীন 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার আল-বায়দাবী রচিত প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ ঃ আনওয়ারু'ত-তানযীল ওয়া আসরারু'ত-তা'বীল-এর টীকা ; ২। 'আল্লামা মাহমূদ ইবন 'উমার আয-যামাখশারী-এর আল-কাশ্‌শাফ 'আন হাকা'ইকি'ত-তানযীল নামক তাফসীর গ্রন্থের টীকা ; ৩। হানাফী ফিকহশাস্ত্রের অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থ শারহু'ল— বিকায়াঃ-এর টীকা; ৪। আস-সায়্যিদ আশ-শারীফ আল-জুরজানী রচিত আহলু'স-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আতের ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত বিশাল গ্রন্থ; শারহু'ল-মাওয়াকিফ-এর টীকা। দুর্বোধ্য দার্শনিক ও ন্যায়শাস্ত্রীয় তাত্ত্বিক আলোচনাসমৃদ্ধ গ্রন্থটির ইহাই টীকা-ভাষ্য ; ৫। 'আল্লামা আল-খিয়ালী শারহুল-'আকা'ইদ গ্রন্থের যে ভাষ্যে লিখেন শায়খ ইসমা'ঈল উহার প্রধান টীকাকার।

উপরিউক্ত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও শায়খ ইসমা'ঈল আরও কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া জীবনবেত্তাগণ উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ তালিকা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ খৃ. শতকে তুরস্কের মাদরাসাসমূহে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তিনি প্রধানত এই তিনটি বিষয়ে শিক্ষা দান করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনূন, নির্ঘণ্ট ; (২) 'আল্লামা 'আবদু'ল-হায়্যি আল-লাকনাবী, আল-ফাওয়া'ইদু'ল-বাহিয়্যা, মিসর ১৩২৪ হি., পৃ. ৪৯।

ড. এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

**ইসমা'ঈল গালিব** (اسماعيل غالب) ঃ (১৮৪৮-১৮৯৫ খৃ.); বিখ্যাত তুর্কী ঐতিহাসিক ও মুদ্রা বিশেষজ্ঞ। প্রধান মন্ত্রী ইবরাহীম

আদ্‌হাম পাশা (দ্র.)-এর পুত্র, ঐতিহাসিক খালীল আদ্‌হাম (দ্র.) Eldem ও Imperial museum-এর পরিচালক হামদী বে-র ভ্রাতা। তিনি ইস্তাম্বুলে জন্মগ্রহণ করেন, অল্প বয়সে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন, রাজ্যসভার সদস্য হন এবং ১৮৯৪ খৃ. ক্রীট (Crete)-এর গভর্নরের বিশেষ সহকারী নিযুক্ত হন। সেইখানে ভীষণভাবে অসুস্থ হইয়া তিনি ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া আসেন এবং পরবর্তী বৎসরে ইনতিকাল করেন। Uskuder-F Iskele Djami'a-এর গোরস্তানে তাঁহার কবর বিদ্যমান। ইসলামী মুদ্রা ও পদক বিষয়ে তাঁহার বিশেষ জ্ঞানের জন্য তিনি বিখ্যাত। হামদী বে-র শাসন আমলে ও পরবর্তী সময়ে যাদুঘরের ইসলামী মুদ্রার যে বিশাল সংগ্রহ স্তূপীকৃত হইয়াছিল সেইগুলির সুশৃঙ্খল রক্ষণ ও সংগ্রহ বৃদ্ধির দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ব্যক্তিগত সংগ্রহ রাজকীয় টাকশাল ক্রয় করে। তাঁহার প্রধান পুস্তকসমূহ নির্ভুল তালিকা ও বিবৃতি প্রণয়নের আদর্শ (Standard Index) রূপে পরিগণিত, সেইগুলি হইতেছেঃ Takwimi meskukati 'othmaniye (1307-1890), Takwimi meskukati seldjukiye (1309/1892), Meskukati turkmaniye kataloghi, এইগুলির ফরাসী সংস্করণেও (1311/1894), Essai de numismatique turcomane (তাঁহার ব্যক্তিগত সংগ্রহ) (1311/1894) Meskukati kadimieyi islamiye kataloghi 1312, তাঁহার কতিপয় পুস্তিকা ও প্রবন্ধের জন্য দ্র. L. A. Mayer, Bibliography of Moslem Numismatics, ২য় সং., and Halil Ethem, Islami Numismatik icin bir bibliografi tecrubesi (আঙ্কারা ১৯৩৩ খৃ.)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) J. H. Mordtmann, in E.I.² দ্র. গালিব (তুর্কী অনুবাদ, in IA, hs. Galib); (২) Ibrahim Alaeddin Govsa, Meshur Adamlar Ansiklopedisi, ইস্তাম্বুল ১৯৩৩-১৯৩৫ খৃ.।

G. C. Miles (E.I.²)/ মুহাম্মদ আবদুল কাদের

**ইসমা'ঈল গাযী শাহ** (اسماعيل غازى شاه) ঃ সুলতান রুকনু'দ-দীন বরবক (১৪৫৯-৭৪ খৃ.)-এর ইঞ্জিনিয়ার ও সেনাপতি এবং একজন সুখ্যাত দরবেশ। তাঁহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় ১৬৩৩ খৃ. জনৈক পীর মুহাম্মাদ সাত্তারী রচিত রিসালাতু'স-সু'আদা নামক কিতাবে। তিনি ছিলেন মক্কার কুরায়শ গোত্রের লোক, মক্কা হইতে রুকনু'দ-দীনের দরবারে আসিয়া তিনি গৌড়ের পূর্বদিক চুমিয়া পুতিয়া জলাভূমিতে একটা বাঁধ নির্মাণ করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। পূর্বে গঙ্গার পানি এই জলাভূমি দিয়া প্রবেশ করিয়া বর্ষাকালে শহর জলমগ্ন করিয়া ফেলিত। এই বাঁধ নির্মাণের ফলে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। উড়িষ্যা সীমান্তের মান্দারান দুর্গ লইয়া দুই শতাব্দী যাবত বাংলার বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্র দেব এই সময় বাংলা আক্রমণ করেন। কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা লাভ করেন বলিয়া মনে হয় না। মান্দারান দুর্গের কিল'আদার রাজা গজপতি এই সুযোগে বিদ্রোহী হইলে তাঁহাকে শায়েস্তা করার ভার ইসমা'ঈল গাযীর উপর ন্যস্ত হয়। ইহার সঠিক তারিখ পাওয়া যায় না। ঘটনাটি ঘটে সম্ভবত বরবকের রাজত্বের প্রথম ভাগে।

ইসমা'ঈল গাযী অতঃপর কামরূপের রাজা কামেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরিত হন। এই রাজ্যটি তখন কুচবিহার, দরং, কামরূপ ও মোমেনশাহী জেলার উত্তরাংশ লইয়া গঠিত ছিল। খেন বংশীয় রাজারা ইহা শাসন করিতেন। তাঁহাদের রাজধানী কামরূপ বাহিনী এ সময় করতোয়া নদীর পশ্চিম পাড়েও হানা দেয় এবং পূর্ব দিনাজপুর দখল করিয়া লয়। তাহা পুনরুদ্ধার করাই ছিল এই অভিযানের লক্ষ্য। সন্তোষের ২ (দুই)-টি শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে, ১৪৭১-৭২ সন ছিল এই অভিযানের সময়। খেন বংশের তিন রাজার মধ্যে এই নামে কোন লোক নাই। ইনি তৎকালীন রাজার সামন্ত বা সেনাপতি ছিলেন। কামরূপ বাহিনী ইসমা'ঈলকে প্রবল বাধা দান করে এবং তিনি মাহি সন্তোষের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। তথাপি কামেশ্বর তাঁহার সাধু চরিত্রের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া আত্মসর্ম্পণ করিয়া ইসলামে দীক্ষিত হন। এইরূপে প্রভুর হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া ইসমা'ঈল গাযী পীরগঞ্জ থানার কাটা দুয়ারে তাঁহার সদর দফতর স্থাপন করেন। তাঁহার এই অসাধারণ সফলতা ও বিপুল সুখ্যাতি কয়েক মাইল দূরবর্তী ঘোড়াঘাটের কিল'আদার ভানসিরায়ের ঈর্ষার উদ্রেক করে। তিনি তাঁহার মিথ্যা বদনাম করায় তাঁহার রাজভক্তি সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া সুলতান তাঁহার ফাঁসির হুকুম দেন। ইসমা'ঈল বিনা প্রতিবাদে এই নির্দেশ মানিয়া লইয়া ১৪৭৪ সনের জানুয়ারীর প্রথমে শহীদের দরজা লাভ করেন। তাঁহাকে কাটা দুয়ারে কবর দেওয়া হয়। তাঁহার মাযার এখন জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের যিয়ারাতগাহ্।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) R. C. Mazumdar, History of Bengal, Dhaka University, vol. ii, first edition, 1964, Pages 1 ও 3-34, (২) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭৬, ৪খ, ৪৫১।

ড. এম. আবদুল কাদের

**ইসমা'ঈল পাশা** (اسماعيل پاشا) ঃ ১৮০৩-৭৯ মিসরের খেদীব (خديو) ছিলেন। তিনি ইব্‌রাহীম পাশা (দ্র.)-র দ্বিতীয় পুত্র এবং মুহাম্মাদ 'আলী (দ্র)-র পৌত্র, জ. ১৮৩০ খৃ. ৩১ ডিসেম্বর কায়রোতে। তিনি তাঁহার পিতামহ কর্তৃক পরিবারের জন্য প্রতিষ্ঠিত রাজপ্রাসাদের বেসরকারী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। সেইখানে তিনি 'আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষা শিক্ষা করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি ভিয়েনায় কিছু দিন অতিবাহিত করেন ; সেইখানে তাঁহাকে চক্ষু চিকিৎসার জন্য পাঠান হয়। দুই বৎসর পরে ১৮৪৬ খৃ. আর্মেনীয় শিক্ষক ইসতিফান বে-র অধীনে একটি মিসরীয় শিক্ষা মিশনে যোগদানের উদ্দেশে তাঁহাকে প্যারিস প্রেরণ করা হয়। তথায় তিনি ফরাসী ভাষা, কিছু আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের কতিপয় বিষয় অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৮ খৃ. তিনি মিসরে ফিরিয়া আসেন।

১৮৪৮ খৃ. ইব্‌রাহীম পাশার মৃত্যুতে ইসমা'ঈলের চাচাত ভাই প্রথম 'আব্বাস হিল্‌মী [দ্র.] (তূসূন পাশার পুত্র), পাশা পদে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন। পরবর্তী বৎসর তাঁহার পিতামহ মুহাম্মাদ 'আলীর মৃত্যুর পর প্রচলিত 'উক্তি' অনুযায়ী প্রথম 'আব্বাস তাঁহার পিতৃব্য সা'ঈদ পাশা (১৮৫৪-৬৩) ও তাঁহার চাচাত ভাইয়ের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করেন। তাঁহাদের সকলের সঙ্গেই তিনি মুহাম্মাদ 'আলীর উত্তরাধিকারের প্রশ্নে কলহে লিপ্ত হন। ফলে ইসমা'ঈল রাজপরিবারের অন্যান্য যুবরাজের সহিত কিছু দিনের জন্য বসবাস এবং প্রথম 'আব্বাসের বিরুদ্ধে সুলতানের

সাহায্য প্রার্থনার উদ্দেশে ইস্তাম্বুলে গমন করেন। সুলতান 'আবদু'ল-মাজীদ ইসমা'ঈলকে রাষ্ট্রীয় বিচার পরিষদের সদস্য নিয়োগ করেন। কয়েক বৎসর পরে ১৮৫৪ খৃ. তাঁহার পিতৃব্য সা'ঈদ পাশা রাজপ্রতিনিধির সিংহাসনে আরোহণ করিলে ইসমা'ঈল মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাষ্ট্রীয় বিচার পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। পরবর্তী বৎসরে (১৮৫৫ খৃ.) ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-৬ খৃ.) মিসরের অংশগ্রহণ হইতে সুবিধা আদায়ের মাধ্যমে এবং সা'ঈদ পাশার নীতির সপক্ষে তুরস্ক সাম্রাজ্যের সুলতানের নিকট হইতে ব্যাপক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে তাঁহাকে প্যারিসে তৃতীয় নেপোলিয়ানের রাজদরবারের একটি মিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত তিনি ভ্যাটিকানে সা'ঈদ পাশার পক্ষে অপর একটি কূটনৈতিক মিশনের নেতৃত্ব দেন। ১৮৬১ খৃ. যখন সূদানের গোত্রগুলি বিদ্রোহে রত ছিল, সা'ঈদ তাঁহাকে সেনাবাহিনীর সিরদার (সর্বাধিনায়ক) নিয়োগ করেন।

ইতোমধ্যে ১৮৬৩ খৃ. ১৮ জানুয়ারী ইসমা'ঈল মিসরে রাজপ্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগকালে প্রশাসনিক, কূটনৈতিক ও দেশের সামরিক ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে তাঁহার ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল। অধিকন্তু য়ুরোপের রাজনীতি ও তুরস্ক সরকারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তাঁহার সরাসরি অভিজ্ঞতা ছিল।

তাঁহার দুই পূর্ববর্তী শাসক প্রথম 'আব্বাস হিলমী (১৮৪৮-৫৪ খৃ.) ও সা'ঈদ পাশার (১৮৫৪-৬৩ খৃ.) সুষ্ঠ প্রকল্পহীন ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবিবর্জিত শাসনের তুলনায় অপেক্ষাকৃতভাবে ইসমা'ঈলের রাজত্বকাল মিসরে বৈষয়িক অগ্রগতি এবং আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি আনয়ন করে। কিন্তু উহা আর্থিক ঘাটতি এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমস্যাও সৃষ্টি করে। বংশের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার খ্যাতিমান পিতামহের ন্যায় তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ; কিন্তু পিতামহের সামরিক সম্পদ অথবা ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক শক্তির অভাব সত্ত্বেও তাঁহাকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কাজ করিতে হয়। ইসমা'ঈল অতি দ্রুত বহু কাজ সম্পাদন করিতে সচেষ্ট হন। মিসরের ক্ষেত্রেও নিজের জন্য তাঁহার নীতি ক্ষতিকর বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ইহার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এইগুলির একটি ঃ সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকরণ এবং শেষ পর্যন্ত 'উছমানী সুলতানের নিয়ন্ত্রণ হইতে মিসরের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা অর্জন। দ্বিতীয়টি দেশের বাণিজ্যিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ত্বরান্বিত করা। তৃতীয়টি আফ্রিকীয় একটি সাম্রাজ্য অর্জন করা। তিনটি উদ্দেশ্যই অনিবার্যভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী য়ূরোপীয় শক্তি (যথা বৃটেন ও ফ্রান্স)-এর সহিত জটিল ও বিপজ্জনক অবস্থার উদ্ভব ঘটায়। দেশের 'উছমানী কর্তৃত্বের সহিত ঝুঁকিপূর্ণ বিরোধের সৃষ্টি করে। অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্যাপক মৌলিক ও দ্রুত য়ূরোপীয়করণের এই নীতি শাসকের পক্ষে ছিল বিশেষ বিপজ্জনক। কারণ ইহা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের বীজ বপন করে। 'উছমানী সুলতানের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই নীতি য়ুরোপীয় শক্তির অর্থ ও রাজনৈতিক সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ মিসরের ব্যাপারে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ঘটে। পরিণামে বৃটিশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ইহা অধিকৃত হয়। ফলে য়ূরোপীয় ও নিজস্ব শাসকদের বিরুদ্ধে— যাহারা য়ুরোপীয় নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ ১৮৭৫ খৃ. পূর্বে মিসর কর্তৃক ভোগকৃত স্বায়ত্তশাসনের অবসানের সহিত জড়িত ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে মিসরীয়দের অসন্তোষ ও বিরোধিতার সৃষ্টি হয়।

তাঁহার নীতির প্রথম উদ্দেশ্য অর্থাৎ ব্যাপকতর স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টায় ইসমা'ঈল সুলতানের নিকট হইতে ১৮৬৬ খৃ. ২৭ মে'র ফরমান লাভ করেন, যদ্দ্বারা তাঁহার নিজ বংশে সিংহাসনের জন্য জ্যেষ্ঠাধিকার প্রবর্তিত হয়। ইহা ব্যতীত তিনি তাঁহার সেনাবাহিনীর আকার বৃদ্ধি, তাঁহার স্বনামে মুদ্রা প্রবর্তন এবং উপাধি প্রদানের অধিকার অর্জন করেন। ১৮৬৭ খৃ. ৮ জুন অপর একটি ফরমানে তাঁহাকে খেদীব উপাধি প্রদান, তাঁহার অভ্যন্তরীণ ও আর্থিক বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন, অন্যান্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের সহিত আমদানী ও রফতানী, শুল্ক, বন্দর, বাণিজ্য পরিবহণ ও বিদেশী সম্প্রদায় বিষয়ক বিধি সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের কর্তৃত্ব অনুমোদিত হয়। তুরস্ক সাম্রাজ্যের সুলতানের সহিত বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত বিরতির পর ১৮৬৬ খৃ. ক্রীটবাসীদের বিদ্রোহে মিসরীয়দের জড়িত হওয়া এবং সুয়েজ খালের উদ্বোধনের ক্ষেত্রে ইসমা'ঈলের আর্থিক অমিতব্যয় ইত্যকার বিষয়সমূহ তাঁহার ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করা হয়। এই কারণে সুলতান ১৮৬৯ খৃ. ২৯ নভেম্বর একটি ফরমান জারী করেন যাহা কার্যত ১৮৬৭ খৃ. ইসমা'ঈলের অর্জিত সকল সুযোগ-সুবিধা বাতিল করে। যাহা হউক, তিনি ইস্তাম্বুলে গমন করেন এবং ব্যক্তিগত প্রভাবে তুর্কী কর্মকর্তাগণ তাঁহাকে আরও দুইটি ফরমানের আওতায় আনয়ন করেন ঃ ১৮৬৯ খৃ. ফরমানটি রহিত করিয়া ১৮৭২ সনের ১০ সেপ্টেম্বরে একটি ফরমান জারী করেন; ইহাতে তাঁহাকে য়ুরোপ হইতে ঋণ সংগ্রহ করার অধিকার পুনরায় দেওয়া হয়। অপরটি ১৮৭৩ খৃ.-এর ৮ জুনের; ইহাতে তাঁহার শর্তাদি বলবৎ ও স্বীকৃত হয়।

ইসমা'ঈল পাশা নিজ দেশে ও য়ুরোপে একজন আধুনিক শাসকের সাজসজ্জা ও আচরণ অবলম্বন করেন। ১৮৬৭ খৃ. প্যারিস প্রদর্শনীতে মিসরের অংশগ্রহণের দুই বৎসর পরে— সুয়েজ খালের আড়ম্বরপূর্ণ উদ্বোধনী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের (১৮০১-৫) ফলে মিসরীয় তুলা রফতানী ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইলেও ইসমা'ঈলের আফ্রিকা সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা তাঁহাকে সূদান, ইথিওপিয়া ও উগান্ডায় ব্যয়বহুল সামরিক অভিযানে ব্যাপৃত রাখে। ইতোমধ্যে সুলতানের নিকট হইতে ব্যয়বহুল ফরমান আদায় এবং ১৮৭১ খৃ. তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনে মিসরে যুগপৎভাবে ফরাসী প্রভাব হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ফলে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্যের জন্য ইসমা'ঈল ইংল্যান্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

এই সমস্ত অভিযানের সঙ্গে তাঁহার অভ্যন্তরীণ নীতির পরিবর্তন ঘটে। ইসমা'ঈল পাশা সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও সামরিক প্রশিক্ষণ প্রণালী পুনর্গঠন করেন। ইহা ব্যতীত তিনি অনেক নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মিসরে বসবাসকারী য়ূরোপীয়দেরকে নিজেদের জন্য আরও অধিক বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করেন। তিনি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদিকে ভর্তুকি প্রদান করেন। বূলাক (দ্র.)-এ সরকারী মুদ্রণালয়ের প্রসার ও উন্নতি বিধান করেন। তিনি একটি জাতীয় গ্রন্থাগার (পরবর্তীতে দারু'ল-কুতুব আল-মিসরিয়্যা), ভূগোলবিদ্‌দের একটি সংস্থা, ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ ম্যারিয়েত (Mariette) পাশার পরিচালনাধীন একটি জাতীয় যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তাঁহার রাজ্যে দাস ব্যবসাকে অবৈধ ঘোষণা করিয়া একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং মিসরে প্রথম রাষ্ট্রীয় ডাক ব্যবস্থা সংগঠিত করেন। সমগ্র দেশের চৌদ্দটি প্রদেশে তাঁহার সংগঠন, পরবর্তী এক শত বৎসরের জন্য মিসরীয় প্রশাসনের ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসমা'ঈলের শাসনামলে মিসরের রফতানী এক দশকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় এবং রাষ্ট্রের বার্ষিক রাজস্ব ১৮৬৪ খৃ. ৫,০০০,০০০ পাউন্ড হইতে ১৪৫,০০০,০০০ পাউন্ডে বৃদ্ধি পায়।

টেলিগ্রাফ ও রেলপথ কার্যক্রম মিসর ও সূদানে বিস্তৃতি লাভ করে। ইসমা'ঈলিয়্যা শহরটি নির্মিত হয় এবং সুয়েজ ও কায়রোর মধ্যে অবস্থিত উজান মিসর (Upper Egypt) ইসমা'ঈলিয়্যার অন্তর্গত ইবরাহীমিয়্যার পানি সেচের নূতন ও প্রধান খালগুলি নির্মিত হয়। তিনি চিনি পরিশোধন ও কাপড়ের কারখানাগুলি আরও উন্নত করেন। অধিকন্তু কায়রো ও প্রধান শহরগুলির পৌর প্রাসাদ নির্মাণ, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্যকে আকর্ষণ করেন, পক্ষান্তরে কতিপয় মিসরীয় কোম্পানী ও ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

যাহা হউক, ইসমা'ঈল পাশা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ব্যাপক আর্থিক অসুবিধায় পতিত হন। স্বদেশে তিনি ১৮৭১ খৃ.-র কুখ্যাত মুকাবালা আইনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। এই আইন দ্বারা সরকার জমির মালিকগণকে বার্ষিক ছয়গুণ জমি ভূমি কর আগাম প্রদানের আহ্বান জানান, বিনিময়ে এই করের অর্ধাংশ স্থায়ীভাবে হ্রাস করা হয়। য়ূরোপে তাঁহার ধারের কারণে মিসর সরকারের ঋণের পরিমাণ প্রায় ৯০,০০০,০০০ পাউন্ডে দাঁড়ায়। ১৮৭৫ খৃ. বৃটিশ সরকারকে অনতিবিলম্বে ৪,০০০,০০০ পাউন্ড নগদ প্রদানের জন্য তাঁহাকে সুয়েজ খাল কোম্পানীর ১,৭৬,৬০২টি শেয়ার বিক্রয় করিতে বাধ্য করা হয়।

১৮৭৬ খৃ. ইসমা'ঈল পাশার আর্থিক সমস্যাবলী, য়ূরোপীয় ঋণদাতা রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া মিসরের অর্থ ব্যবস্থার উপর একটি য়ূরোপীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন (European Control Commission) গঠিত হয়। পূর্ববর্তী বৎসর (১৮৭৫ খৃ., মিশ্র ট্রাইবুনাল-Mixed Tribunal)-কে মিসরীয় ও বিদেশী এবং মিসরে বসবাসকারী বিদেশীদের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদ বিচারপূর্বক রায় দেওয়ার জন্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ইহাতে স্ব-শাসন এবং খেদীব ও তাঁহার সরকারের কর্তৃত্ব আরও খর্ব করা হয়।

১৮৭৫--৯ খৃ. আর্থিক দুর্যোগ অপরিহার্যভাবে মিসরের অভ্যন্তরে, বিশেষ করিয়া ইসমা'ঈল পাশা ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গ, বিশিষ্ট ভূস্বামিগণ, ধর্মীয় নেতৃবর্গ ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাঁহার স্বাধীনতা ও য়ূরোপীয়করণ নীতির সহিত এই সমস্ত ব্যাপার সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ, প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে তাঁহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। ১৮৬৬ খৃ. প্রতিনিধিদের একটি পরামর্শমূলক পরিষদ (A Consultative Assembly of Deputies) প্রবর্তিত হয়। তাঁহার পদচ্যুতির অল্প কিছুদিন পূর্বে সংসদের নিকটে খেদীব সরকারকে দায়ী করিয়া ১৮৭৮-৯ খৃ. একটি মিশ্রিত (Coalition) ও দুর্বল পদ্ধতির মন্ত্রী পরিষদ গঠনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই সকল পদক্ষেপ দেশের অধিকতর খারাপ আর্থিক অবস্থার উন্নতি কিংবা ইসমা'ঈল পাশার নিজস্ব মর্যাদার নিরাপত্তা বিধান করিতে পারে নাই। সেনাবাহিনীর বিক্ষোভের সহিত তাঁহার দেওলিয়াপনার কারণে বিদেশী ঋণদাতাদের পক্ষ হইতে প্রবল চাপের সৃষ্টি হয়। তাঁহার আর্থিক সংস্থানের ক্ষেত্রে য়ূরোপীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে একটি মিসরীয় জাতীয় বুনিয়াদ ব্যবহারের বেপরোয়া উদ্যোগও ব্যর্থ হয়। অধিকন্তু নব প্রকাশিত একটি মিসরীয় সংবাদপত্রের প্রতি তাঁহার ব্যয়বহুল পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থ সাহায্য তাঁহার মর্যাদার আরও ক্ষতি সাধন করে। 'উছমানী সার্বভৌমত্বের সপক্ষে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের রুশ তুর্কী যুদ্ধে তাঁহার অংশগ্রহণও ২৫ জুন, ১৮৭৫ খৃ. তাঁহার পদচ্যুতির জন্য য়ূরোপীয় শক্তির জিদ 'উছমানী সরকারকে বিরত করিতে পারে নাই। পরের দিন ইসমা'ঈল পাশা য়ূরোপের উদ্দেশে মিসর ত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি ইস্তাম্বুলে ৬ মার্চ, ১৮৯৫ খৃ. ইনতিকাল করেন বলিয়া জানা যায়।

এমন কি ইসমা'ঈলের রাজত্বকালে সংঘটিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলি মিসরের উন্নতি ও আধুনিকীকরণের ভিত্তি গঠন করিতে সাহায্য করিলেও খেদীবের ধৈর্যহীন য়ূরোপীয়করণ কর্মসূচী ছিল রাজনৈতিকভাবে একটি ভাসাভাসা দুর্বল কার্যক্রম মাত্র। আর্থিক সমস্যাবলি ও ইহাদের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া নিরীক্ষণপূর্বক ইহা নিরপেক্ষভাবে ধারণা করা যায় যে, ইসমা'ঈল পাশার রাজত্বকাল মিসরের জন্য জটিল সমস্যাবলীর উদ্ভব ঘটায় যেগুলির সহিত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অনভিজ্ঞ নেতৃবর্গ ও আধুনিক প্রশাসকদের সেরা ব্যক্তিগণ আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। এইগুলি বৃটেনকে দেশটি অধিকার করিতে প্ররোচিত করে এবং পরবর্তী ৭৫ বৎসরের জন্য রাজনৈতিক অসুবিধাগুলি সৃষ্টি করে।

তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আর্থিক হঠকারিতা সত্ত্বেও ইসমা'ঈল জোরপূর্বক মিসরকে আধুনিকীকরণে এবং ইহার ভবিষ্যৎ অগ্রগতির খসড়া প্রণয়নে উদ্দীপিত ও উৎসাহিত করে। ইসমা'ঈল পাশা মিসরের ক্রমাবনতির জন্য অনেকাংশে দায়ী হইলেও দেশের অন্যতম সৃজনশীল শাসক হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) E. de Leon, Egypt under its Khedives, লন্ডন ১৮৮২ খৃ.; (২) J. McCoan, Egypt under Ismail, লন্ডন ১৮৮৯ খৃ.; (৩) P. Crabites. Islmail, the maligned Khedive, লন্ডন ১৯৩৩ খৃ.; (৪) D. Landes, Bankers and Pashas, লন্ডন ও কেমব্রিজ, Mass. ১৯৫৮ খৃ.; (৫) A. Colvin, The making of modern Egypt, লন্ডন ১৯০৬ খৃ.; (৬) J. Landau, Parliaments and parties in Egypt, Tel-Aviv ১৯৫৩ খৃ.; (৭) P. M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent 1516-1922, লন্ডন ১৯৬৬ খৃ.; (৮) A. Abel-Malek, Ideologie et renaissance national, L' Egypt modern, প্যারিস ১৯৬৯ খৃ.; (৯) P. J. Vatikiotis, The modern history of Egypt, লন্ডন ১৯৬৯ খৃ.।

P. J. Vatikiotis (E.I.$^2$)/ মুহাঃ আবু তাহের

**ইসমা'ঈল পাশা নিশানজী** (اسماعيل پاشا نشانجى)ঃ 'উছমানী সাম্রাজ্যের প্রধান উযীর ছিলেন। তিনি আয়াশ নামক শহর এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন যাহা বর্তমানে আঙ্কারা প্রদেশ ('ইল')-এর অন্তর্ভুক্ত। ১১০১/১৬৯০ সালে যখন তিনি ইনতিকাল করেন তখন তাঁহার বয়স ৭০-এরও বেশী ছিল। সেই হিসাবে ধারণা করা যায় যে, তিনি ১০৩০/১৬২০ সালের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পরিবার কিংবা তাঁহার বংশ-পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তিনি কোনভাবে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ লাভ করেন এবং আনদেরুন-ই হুমায়ূনে প্রতিপালিত হন। ১৩ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ১০৭৮/৩ সেপ্টেম্বর, ১৬৬৭ সালে তিনি

এদিরনে-এ 'খাসস-ওদা এসকিসি পদ হইতে 'কিলার কেতখুদাসী' পদে উন্নীত হন এবং ইহার অল্প কিছুদিন পরেই তিনি চোখাদার (সুলতানের পোশাকের বহিরাংশ ধারণকারী) হন। ১৩ যু'ল-হিজ্জা, ১০৭৯/২৫ মে, ১৬৬৮-এ তিনি রুমিলি পদমর্যাদা (পায়ে) ও দৈনিক ২৫০ আক্‌চে (akce)-এর একটি বৃত্তি সহকারে কাপুর্তাসী (kapucrtasi)-তে অবসর গ্রহণ করেন। ২০ মুহার্‌রাম, ১০৮৯/১৫ মার্চ ১৬৭৮-এ তাঁহাকে নিশান্‌জী নিযুক্ত করা হয় এবং বহু বৎসর তিনি এই পদ অধিকার করিয়া থাকেন। ২০ শা'বান, ১০৮৯/৮ অক্টোবর ১৬৭৮ হইতে তিনি ইস্তাম্বুলে উযীরের পদমর্যাদায় অস্থায়ী কায়মাকাম হিসাবে কাজ করিতে থাকেন যতদিন না প্রণালীর মুহাফিজ হইতে কায়মাকাম পদে নিয়োগপ্রাপ্ত কোপরুলু-যাদে ফাদিল মুসতাফা পাশা রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিতে সক্ষম হন। এই সময়ের ভিতরেই সাবেক প্রধান উযীর সুলায়মান পাশা ও ফিরারী কায়মাকাম রাজাব পাশাকে গ্রেফতার করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ দেওয়া হয়। এক সপ্তাহ পরে তিনি দুই তুগ (মর্যাদাসূচক সূত্রগুচ্ছ)-এর উযীরের পদমর্যাদাসহ পুনরায় নিশান্‌জীর পদ গ্রহণ করেন। ২ মুহার্‌রাম, ১০৯৯/৮ নভেম্বর, ১৬৮৭-এ তিনি পঞ্চম উযীর হিসাবে দীওয়ানে প্রবেশ করেন। কুখ্যাত বিদ্রোহী নেতা ('ফেতওয়াজী' নামে পরিচিত) বাশচাভুশ হুসায়ন আগাকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার ফলে ১৬৮৮ খৃ.-এ ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে ইস্তাম্বুলে উদ্ভূত অধিকতর গোলযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় সুলায়মান কর্তৃক তিনি কায়মমাকাম নিযুক্ত হন (২৭ রাবী'উ'ছ-ছানী, ১০৯৯/১ মার্চ, ১৬৮৮)। সুতরাং তাঁহাকে আরও অধিক গোলযোগের মুকাবিলা করিতে হয়। প্রধান উযীর সিয়াভিশ পাশার (কোপরুলু মুহাম্মাদ পাশার জামাতা) হত্যাকাণ্ড ও তাঁহার প্রাসাদের লুণ্ঠন, বিদ্রোহী নাগরিকদের দমন করিবার জন্য জনৈক য়াগলিকচি আমীর কর্তৃক শহরবাসিগণকে পবিত্র পতাকার অধীনে আহ্বান এবং রাজকীয় প্রাসাদে জনসাধারণকে সমবেতকরণের দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পণ করা হয়। দীওয়ানের একটি সভায়, যেখানে ইসমা'ঈল পাশা উপস্থিত ছিলেন, শহরবাসিগণ বিদ্রোহীদের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে সুলতানের নিকট প্রতিবাদ পেশ করেন। বিদ্রোহীরা রাজপ্রাসাদে বার্তা পাঠাইয়া দাবি জানায় যে, (যেহেতু সেই সময় কোন প্রধান উযীর ছিলেন না), ইসমা'ঈল পাশা ও কাপু আগাসীকে 'পবিত্র পতাকা' বাহিরকরণের সমস্ত উদ্যোগ প্রতিহত করিতে হইবে। অবশেষে শহরবাসীদের প্রতিনিধিগণ যখন পবিত্র পতাকা'-এর অধীনে ওর্তা কাপুর সম্মুখে সমবেত হইলেন, তখন সায়্যিদ 'উছমান এফেনদী সুলতানের প্রাসাদ প্রবেশ করেন এবং দাবি জানান যে (ওযি-এর মুহাফিজ, যিনি তখনও তাঁহার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার পরিবর্তে), অবিলম্বে একজন নূতন প্রধান উযীর নিয়োগ করিতে হইবে। ইসমা'ঈল পাশাকে নিয়োগের জন্য কাপু আগাসি হাজ্জী মুহাম্মাদ আগার প্রস্তাবটি দীওয়ান কর্তৃক সমর্থিত হয় এবং সুলতানও তাহা গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রধান উযীরের সীলমোহর ছিল বিদ্রোহীদের সমর্থনকারী শায়খু'ল-ইসলাম ফাদলুল্লাহ এফেন্দীর হাতে। বিদ্রোহী নেতৃবর্গকে বিভিন্ন সরকারী পদ প্রদানের মাধ্যমে শান্ত করা হয় ঃ ফাদলুল্লাহ রাজপ্রাসাদে আগমন করেন এবং সীলমোহরটি সুলতানের হস্তে অর্পণ করেন। অবশেষে ইসমা'ঈল পাশা আনুষ্ঠানিকভাবে উযীর-এর পদে অভিষিক্ত হন। ইহার ফলে সকল উচ্চ পদস্থ 'আলিম' (শায়খু'ল-ইসলাম ও ইস্তাম্বুলের কাদীসহ) বরখাস্ত হন। প্রাসাদে সমবেত জনতা নূতন নিয়োগসমূহ সমর্থন করিয়া চলিয়া যান। সুতরাং ইসমা'ঈল পাশা ২৬ রাবী'উ'ছ-ছানী, ১০৯৯/২ মার্চ, ১৬৮৮-এ অবিসংবাদিতভাবে কর্তৃত্ব সহকারে দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ এবং তাঁহাদের সমর্থনকারিগণকে গ্রেফতার করিয়া অবিলম্বে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় ও রাজপ্রাসাদের পদসমূহ ও প্রাদেশিক সরকারে ব্যাপক রদবদল করা হয়। কিন্তু এই পদক্ষেপসমূহ শুধু একদিকে শহরবাসী ও কাপীকুল্লারী'র মধ্যে এবং অন্যদিকে 'উলামা' ও প্রধান উযীরের মধ্যে নূতনভাবে বিরোধের সৃষ্টি করে। অধিকন্তু এগরি-কীর্কা (Egri-kirka) এলাকায় কতিপয় শক্ত ঘাঁটি ও কানীন দুর্গের পতন রাজধানীতে উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। এই সময় প্রধান উযীর একটি মারাত্মক ভুল করিয়া বসেন। তিনি রুমেলি'র গভর্নর ও বিদ্রোহীদের অন্যতম য়েগেন 'উছমান পাশাকে উযীরের পদ-মর্যাদায় অস্ট্রিয়ার সীমান্তে সর্দার নিয়োগ করেন। 'উছমান পাশা যে সমস্ত বিরোধী দলীয় ব্যক্তি ইস্তাম্বুল হইতে পলাইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিল তাহাদের অনেককে ও রুমেলির সেগবান ও সারিজাগণকে তাঁহার নিজের পক্ষে একত্র করেন ও প্রধান ওযারতীর দাবী করেন। ইহাতে ইসমা'ঈল পাশা রুমেলি ও আনাতোলিয়ায় তাঁহার সমর্থকদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধের অবস্থা ঘোষণা [নেফীর-ই 'আম্ম (দ্র. নাফীর)] করিতে বাধ্য হন। শায়খু'ল-ইসলাম দেব্বাগ-যাদে মুহাম্মাদ এফেন্দী প্রথম হইতেই ইসমা'ঈল পাশার বিরুদ্ধে যে শত্রুতার মনোভাব পোষণ করিতেছিলেন, তাহা এখন সকল 'আলিম-এর মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ঘুষ গ্রহণ করিয়াছে এই অভিযোগের ভিত্তিতে ইসমা'ঈল পাশা সুলতানের খোজা 'আরাব-যাদে 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব এফেন্দী ও দারু'স-সা'আদা আগাসী মুসতাফা আগা এই দুইজনকে বরখাস্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ; ইঁহারা 'উলামা' সদস্যদের সহিত একমত ছিলেন এবং সুলতানের নিকট গোপন অভিযোগ পেশ করিতে শুরু করিয়াছিলেন। অবশেষে সুলতান তাঁহার অন্তরঙ্গ মুসতাফা আগা কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া ইসমা'ঈল পাশাকে ২৮ জুমাদা'ছ-ছানী, ১০৯৯/৩০ এপ্রিল, ১৬৮৮-এ বরখাস্ত করেন।

ইসমা'ঈল পাশাকে আনাদোলুহিসারে তাঁহার 'য়ালী'-তে নির্জন বসবাসের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং অতঃপর ১০ রাজাব, ১০৯৯/১১ মে, ১৬৮৮-এ কাভালায় নির্বাসিত করা হয়। আগস্ট মাসে ভেনিসীয় নৌবহর যখন এগরিবোয অবরোধ করে, তখন ইসমা'ঈল পাশা রোড্‌সে অপসারিত হন এবং সেইখানেই কোপরুলু-যাদে ফাদিল মুসতফা পাশার প্রধান ওযারতীর সময়ে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় (শা'বান ১১০১/ মে ১৬৯০)। তাঁহার মৃত্যুর প্রধান কারণসমূহের মধ্যে ছিল ফাদিল মুসতাফা ও কোপরুলু পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সহিত তাঁহার মতপার্থক্য। যায়নু'ল'-আবিদীন পাশার পুত্রদের অভিযোগ যে, ইসমা'ঈল পাশার প্রধান ওযারতীর আমলে তাঁহাদের পিতাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় এবং সিয়াভুশ পাশার উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতে তিনি অবৈধভাবে জোরপূর্বক অর্থ গ্রহণ করেন। তাঁহার কর্তিত মস্তক ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করা হয় এবং দেহ রোডসে দাফন করা হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) মুহাফিজখানার দলীলপত্র ঃ রাজাব ১১০১/ এপ্রিল ১৬৯০-এর দুইটি ফরমান যাহাতে সরকারী বাসবাকানলিক আরসিভি-এ ৪০০ পার্স পরিশোধ করিবার জন্য তাঁহার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে (রোড্‌স-এ তাঁহার নির্বাসন হইতে), মুহিম্মে রেজিস্টার বহি নং ৯৯, পৃ. ১৫৫, ১৫৯; (২) তাঁহার শিরশ্ছেদের আদেশ প্রভৃতি, একই রেজিস্টার

বহি. পৃ. ১৬২, ১৬৩, ১৭৩; (৩) ঘটনাপঞ্জীর বিবরণী প্রভৃতি, দেফতেরদার হাজ্জী মেহমেদ পাশা, যুবদাতু'ত-তাওয়ারীখ, Ist. Un. Lib. Ms T 2389, ff. 89a-93a, 98a and Ms T 5, 124a-129b; (৪) 'আবদু'র-রাহমান 'আবদী পাশা, তুর্ক তারিহ কুরুমু'-এর পাণ্ডুলিপি (Ms of Turk Tarih kurumu) (ইস্তাম্বুলের তুর্কিয়াত ইন্সটিটিউসুতে ফটোকপি বর্তমান), প. ১৩২, ১৩৭, ২০৮; (৫) ফিনদিক্‌লিলি মেহমেদ আগা, সিলাহদার তা'রীখি, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ., ১খ, ৩৮৮, ৪৭৩, ৬৭১, ৭২৮-৯, ৭৬২, ২খ., ২৪০, ২৮৩-৮৪, ২৮৭, ২৯৫-৯৮, ৩০৩, ৩২৫, ৩৩০-৭০, ৩৯৬, ৪০২, ৪৭৮, ৫০৯, ৫৭৫ ; (৬) রাশিদ, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১২৮২ হি., ১খ, ৩৪৫, ৫২৬, ২খ, ৩৬-৩৭, ১১৯; (৭) শেয়খী মেহমেদ এফেন্দী, ওয়াকা'ই'-ই ফুদালা', Ist. Un., Lib., Ms T 2489, fol. 35 b; (৮) 'উছমান-যাদে তা'ইব, হাদীকাতু'ল-উযারা', ইস্তাম্বুল ১২৭১ হি., পৃ. ১১৩-১৪; (৯) তায়্যার-যাদে আহমাদ 'আতা', তা'রী-ই 'আতা', ইস্তাম্বুল ১২৯৩ হি., ২খ, ৭২; (১০) ফেরা'ইদী-যাদে সায়্যিদ মেহমেদ সা'ঈদ, তা'রীখ-ই গুলশান-ই মা'আরিফ, ইস্তাম্বুল ১২৫২ হি., ২খ, ৯৬৭-৭৮; (১১) De La Croix, Abrege chron. de l'hist. ott. Paris 1768, ii, 600-2; (১২) Hammer-Purgstall, Histoire, xiii, 247-57, ৩০৮-৯; (১৩) সিজিল্ল-ই 'উছমানী, ১খ, ৩৫৪-৫৫; (১৪) I. H. Uzuncarili, উছমানলি তারিহী (Osmanli tarihi), iii/2 খ., আঙ্কারা ১৯৫৪ খৃ., ৪২৭-২৯; (১৫) I. H. Danismend, Kronoloji, iii, 465-466, 517; (১৬) তুর্কী ভাষার ইসলামী বিশ্বকোষে প্রবন্ধ ঃ Mehmed IV (M. Cavid Baysun); (১৭) সামী বেগ, কামুসু'ল-আ'লাম, ২খ, ৯৪৮; (১৮) V. Hammer, Gesch. des Osman. Reiches, ৬খ, ৫০৬, ৫০৯ প., ৫৫৩।

Munir Aktepe (E.I.[2]) / মোঃ মনিরুল ইসলাম

**ইস্‌মা'ঈল রুসূখু'দ্-দীন ইস্‌মা'ঈল** (اسماعيل رسوخ الدين اسماعيل) ঃ ইব্‌ন আহমাদ আল-আন্‌কারাবী (? ১০৪১/১৬৩১-২), জালালুদ'দ্-দীন রূমীর মাছনাবীর একজন ভাষ্যকার। তাঁহার জন্মতারিখ অজ্ঞাত, কিন্তু ইহা জানা যায় যে, তিনি আঙ্কারায় জন্মগ্রহণ করেন, উত্তম শিক্ষা লাভ করেন, ব্যবসায়ে দক্ষ ছিলেন এবং খাল্‌ওয়াতিয়্যা তারীকার মুরীদ ছিলেন (তু. শারহ-ই মাছনাবী, ১খ, ১১, ভূমিকা)। চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়া ইস্‌মা'ঈল কোনিয়াতে চলিয়া যান এবং তথায় মাওলাবী শায়খ বুস্তান চেলেবী (মৃ. ১০৪০/১৬৩০)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, যিনি তাঁহাকে খলীফা মনোনীত করেন।

ইস্‌মা'ঈল তখন ইস্তাম্বুলে গমন করেন। সেইখানে তিনি গালাতা (Galata)-র 'মাওলাবী খানকাহ-এর শায়খ হন এবং এই পদে তিনি আমরণ অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহাকে উক্ত খান্‌কাহ্‌র প্রাঙ্গণে দাফন করা হয়।

ইস্‌মা'ঈল 'আরবী ও ফারসী উভয় ভাষাতেই দক্ষ ছিলেন, বিশেষ করিয়া এই দুই ভাষাতে লিখিত পুস্তকাদির ভাষ্য রচনার জন্য পরিচিত হন (তু. M. Tahir, 'Othmanli Mu'ellifleri, i, 24 প.; Khwadja-zade Ahmad Hilmi, Ziyaret-i Ewliya, Istanbul 1325 A. H., 71)। তাঁহার প্রধান পুস্তকগুলিঃ

(১) ফাতিহু'ল-আব্‌য়াত, মাছ্‌নাবীর আঠারটি শ্লোক ও কতিপয় কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা। (২) জামি'উ'ল-আয়াত, মাছ্‌নাবীতে উদ্ধৃত কু'রআনের আয়াত, হাদীছ ও আরবী কবিতাসমূহের ব্যাখ্যা। (৩) শারহ্‌-ই মাছ্‌নাবী, পূর্বোক্ত পুস্তক দুইটির পরে লিখিত মাছ্‌নাবীর ভাষ্য। ইস্‌মা'ঈলের খ্যাতি এই ভাষ্যের জন্য এবং সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ইহা মাছ্‌নাবী ভাষ্য হিসাবে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল। এই ভাষ্য প্রধানত ইব্‌নু'ল-'আরাবী (মৃ. ৬৩৮/১২৪০)-এর ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত।

ইহা রূমীর বায়তগুলির ব্যাকরণগত দিক অপেক্ষা আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও ইহাতে মাছ্‌নাবীর প্রক্ষিপ্ত সপ্তম খণ্ডের ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত থাকায় মাছ্‌নাবীপন্থিগণ ইহার সমালোচনা করিয়াছেন (দ্র. A. Golpinarli, Mevlana' dan sonra Mevlevilik, Istanbul 1953, 143)। ইস্‌মা'ঈলের সাত কলামবিশিষ্ট ভাষ্য ১২৮৯/১৮৭২-৩ সালে ইস্তাম্বুলে মুদ্রিত হয়।

ইহা ত্রিপোলীর জাঙ্গী য়ূসুফ দাদা (মৃ. ১০৮০/১৬৬৯) কর্তৃক খানিকটা সংক্ষিপ্ত আকারে আল-মিন্‌হাজু'ল-কাবী শারহু'ল-মাছ্‌নাবী নামে 'আরবী ভাষাতেও অনূদিত হয় এবং ১২৮৯/১৮৭২-৩ সালে কায়রোতে প্রকাশিত হয়। R. A. Nicholson-Fr Commentary on the Mathnawi of Jalaluddin Rumi (লন্ডন ১৯৩৭ খৃ.) ইস্‌মা'ঈল-এর গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। অবশেষে ইহা ফারসী ভাষাতে ডক্টর 'ইসমাত সাত্তার যাদে কর্তৃক অনূদিত (শারহ-ই কাবীর-ই আন্‌কারাবী দার মাছ্‌নাবী-য়ি মা'নাবী-য়ি মাওলাবী, ১খ, তেহরান ১৩৪৮ সৌর Solar)। (৪) যুবদাতু'ল-ফুতূহ্‌স ফী নাক্‌সি'ল-ফুসূস, ইব্‌নু'ল-'আরাবীর ফুসূসু'ল-হিকাম-এর সংক্ষিপ্তসারসহ ভাষ্য। (৫) শিহাবু'দ-দীন সুহ্‌রাওয়ারদী আল-মাক্‌তূল (মৃ. ৫৮৭/১১৯১) কর্তৃক রচিত হায়াকিলু'ন-নূর (অথবা ঈদাহু'ল-হিকাম্‌)-এর ভাষ্য শারহ্‌-ই হায়াকিলি'ন-নূর। (৬) শারহ কাসীদা-ই তা'ইয়্যা, ইব্‌নু'ল-ফারিদ-এর উক্ত নামের বিখ্যাত কাসীদা ভাষ্য।

এই সকল ভাষ্য পুস্তক ব্যতীত ইস্‌মা'ঈল নিজেও কিছু পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন (পূর্ণ তালিকার জন্য দ্র. মুহাম্মাদ তাহির ও আহমাদ হিল্‌মী, পূ. গ্র., এবং স্থা.)। উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিচিত হইল ঃ (১) মিফতাহু'ল-বালাগা ওয়া মিছবাহু'ল-ফাসাহা, 'আরবী ও ফারসী অলংকারশাস্ত্রের পুস্তকাদির উপর ভিত্তি করিয়া তুর্কী ভাষায় রচিত। ইহা ১২৮৪/১৮৬৭-৮ সালে ইস্তাম্বুলে মুদ্রিত। (২) মিন্‌হাজু'ল-ফুকারা', সূফীতত্ত্বের পারিভাষিক শব্দসমূহের ব্যাখ্যা; ইহার ভিত্তি প্রধানত 'আব্‌দুল্লাহ আনসারী (মৃ. ৪৮১/১০৮৮-৯)-এর মানাযিলু'স্‌-সা'ইরীন, ইস্তাম্বুলে ১২৮৬/১৮৬৯-৭০ সালে প্রকাশিত। (৩) হুজ্জাতু'স-সামা', মাওলাবী নর্তনশীল দরবেশদের সা' নৃত্যের সমর্থনে এক সংক্ষিপ্ত পুস্তক। এই পুস্তক পৃথকভাবে ও পূর্বোক্ত পুস্তকের (মিন্‌হাজ) সহিত প্রকাশিত।

সর্বশেষে ইস্‌মা'ঈলের কবিতা এক দীওয়ান-এ প্রকাশিত হয় (দ্র. দীওয়ান-এর তালিকা)। কবি শায়খ গালিব তাঁহার প্রশংসায় একটি কাসীদা রচনা করেন; ইহা প্রমাণ করে যে, তিনি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য সর্বত্র শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন (দ্র. আহমাদ হিল্‌মী, পূ. গ্র., ৭৩-৬)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) নিবন্ধগর্ভে উল্লিখিত বরাত ব্যতীত (১) সাকিব দাদা, সাফীনা-ই হাফীসা-ই মাওলবি'রান, কায়রো ১২৮৩/১৮৬৬-৭,

২খ, ৩৭-৪৪, যাহা শারহ-ই মাছ্নাবী, ১খ, ১-১১, ভূমিকার অনুরূপ; (২) ইস্রার দাদা, তায্কিরা-ই শু'আরা'-ই মাওলাবিয়্যা, Ist. Univ. Lib., TY 89, 125-7; (৩) 'আলী আন্ওয়ার, সামা' খানা-ই আদাব, ইস্তাম্বুল ১৩০৯/১৮৯১-২, ৮০-৮৩।

Tahsin Yazici (E.I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল কাদের

**ইসমা'ঈল লাহোরী** (اسماعيل لاهورى) ঃ শায়খ মুহাম্মাদ (মৃ. ৪৪৮/১০৫৬) ঐতিহাসিক, লাহোর শহরের প্রখ্যাত ইসলাম প্রচারক, শারী'আত ও 'ইল্ম-ই মা'রিফাতে পারদর্শী ও হাদীছবিশারদ। খাযীনাতু'ল-আস্ফিয়া গ্রন্থের লেখক গুলাম সারওয়ার-এর মতে লাহোর শহরে শায়খ ইসমা'ঈল সর্বপ্রথম ইসলামের আলোক বহন করিয়া আনেন। অসংখ্য অমুসলিম তাঁহার মহান আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া ইসলামের শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। শায়খ ইসমা'ঈল বুখারার প্রসিদ্ধ সায়্যিদ বংশের একজন খ্যাতনামা সূফী সাধক। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে তিনি ৩৯৫/১০০৪ সালে এই উপমহাদেশে আগমন করিয়া লাহোরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। লাহোর তখন পাল বংশীয় ব্রাহ্মণরাজ জয়পালের অধিকারভুক্ত ছিল। ঐতিহাসিক ফিরিশ্তার মতে সুলতান মাহ্মূদ সর্বপ্রথম ৪১২/১০২১ সালে লাহোর নগর অধিকার করেন (১খ, পৃ. ৫২)। এই বর্ণনা অনুযায়ী লাহোর মুসলিম শাসনাধীনে আসিবার ১৭ বৎসর পূর্বে শায়খ ইসমা'ঈলের প্রচেষ্টায় তথায় ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রসার লাভ করে। প্রফেসর টি. ডব্লু. আর্নল্ড লাহোর শহর ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে শায়খ ইসমা'ঈলের অসাধারণ কৃতিত্ব ও সাফল্য সম্পর্কে বলেন ঃ "One of the earliest of these (Muslim missionaries) is Shaykh Isma`il, one of the most famous of the Sayyids of Bukhara, distinguished alike for his secular and religious learning; he is said to have been the first Muslim missionary who preached the faith of Islam in the city of Lahore, whither he came in the year A.D. 1005. Crowds flocked to listen to his sermons and the number of his converts swelled rapidly day by day, and it is said that no unbeliever ever came into personal contact with him without being converted to the faith of Islam" (The Preaching of Islam. pp 283-84).

তৎকালে লাহোরের অমুসলিম অধিবাসীরা জাঠ, রাজপূত প্রভৃতি উপজাতিতে বিভক্ত ছিল এবং পাল রাজত্বকালে এখানে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা খুব প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হয়। শায়খ ইসমা'ঈলের অর্ধ শতাব্দীব্যাপী প্রচেষ্টায় লাহোরের এই সকল দুর্ধর্ষ উপজাতীয় প্রভাবশালী বহু ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করায় লাহোর ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়। শায়খ ইসমা'ঈলই সর্বপ্রথম লাহোরে হাদীছ শিক্ষা প্রবর্তন করেন। লাহোরে কয়েকজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিছের আবির্ভাব হয় এবং এই নগর হাদীছের প্রচার কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। শায়খ শারাফু'দ-দীন আবূ তাওওয়ামার প্রচেষ্টায় ৭/১৩ শতকে বাংলাদেশের সোনারগাঁও যেমন উচ্চ ইসলামী ও হাদীছ শিক্ষার পাদপীঠে পরিণত হইয়াছিল, শায়খ ইসমা'ঈলের প্রচেষ্টায় ৫/১১ শতকে লাহোর অনুরূপভাবে উত্তর ভারত, বিশেষভাবে সমগ্র পাঞ্জাবের 'ইল্মে হাদীছ ও ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। শায়খ ইসমা'ঈল ৪৪৮/১০৫৬ সালে লাহোরে ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) T. W. Arnold. The Preaching of Islam, (SH. Muhammad Ashraf), Lahore 1961, pp 283-84, (২) গুলাম সারওয়ার মুফতী, খাযীনাতু'ল-আস্ফিয়া (৩) ড. মুহম্মদ ইসহাক, India's Contribution to the study of hadith literature, Dhaka University, 1976, pp. 45-46, (৪) মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৬৭০।

ড. এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

**(শাহ্) ইসমা'ঈল শহীদ** (شاه اسمعيل شهيد) ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল ইব্ন শাহ 'আবদি'ল-গানী ইব্ন শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ মুহাদ্দিছ দিহলাবী (র), শাহ 'আবদু'ল-'আযীয, শাহ রাফী'উ'দ-দীন ও শাহ 'আবদু'ল-কাদির (র)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ; ১২ রাবী'-২, ১১৯৩/২৯ এপ্রিল, ১৭৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন (হায়াত-ই ওয়ালী ; হায়াত-ই তায়্যিবা ; ওয়ালিয়্যুল্লাহ)। এক বর্ণনায় জন্ম তারিখ ২৮ শাওওয়াল, ১১৯৬/৬ অক্টোবর, ১৭৮১ বলা হইয়াছে (E.I.[1], লাইডেন, ২খ, ৫৪৯)। কিন্তু ইহার উৎস অজ্ঞাত। মাতার নাম এক বর্ণনানুসারে ফাতিমা (হায়াত-ই ওয়ালী) এবং অপর বর্ণনায় ফাদীলাতু'ন-নিসা' বিন্ত মাওলাবী 'আলা'উ'দ-দীন (শাহ ইসমা'ঈল শাহীদ ইংরেজী) বলা হইয়াছে। শেষোক্ত বর্ণনা মুতাবিক মাওলানা শাহ ইসমা'ঈল মুজাফফারনগর জেলার 'ফলত' নামক স্থানে স্বীয় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

কু'রআন মাজীদ ভিন্ন সারফ ও নাহ্ও-র মামুলী পাঠ্যপুস্তক স্বীয় পিতার নিকট অধ্যয়ন করেন। আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি হাফিজ-ই কু'রআন হন (হায়াত-ই ওয়ালী)। ১৬ রাজাব, ১২০৩/১২ এপ্রিল, ১৭৮৯ সালে পিতা শাহ 'আবদু'ল-গানী ইনতিকাল করিলে পিতৃব্য শাহ 'আবদু'ল-কাদির য়াতীম ভ্রাতুষ্পুত্রকে পুত্ররূপে গ্রহণ করত তাঁহার শিক্ষার ও লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন (আছারু'স-সানাদীদ, ১ম সং ; ইতহাফু'ন-নুবালা')। অপর বর্ণনানুসারে শাহ 'আবদু'ল-'আযীয প্রতিশ্রুতিশীল ও সম্ভাবনাময় এই ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন (হায়াত-ই ওয়ালী)।

শাহ 'আবদু'ল-কাদির স্বীয় জীবদ্দশায়ই তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি শার'ঈ অংশ মুতাবিক স্বীয় একমাত্র কন্যা বিবি যায়নাব ও আপন ভ্রাতাদের নামে ভাগ-বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। শাহ ইসমা'ঈলকে আপন পুত্রের ন্যায় লালন-পালন করিয়াছিলেন বিধায় কন্যার ও ভ্রাতাদের অনুমতিক্রমে কিছু অংশ তাঁহাকেও প্রদান করিয়াছিলেন এবং স্বীয় দৌহিত্রী বিবি কুলছূম-এর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন (আরওয়াহ-ই ছালাছা)।

প্রাথমিক অবস্থায় শাহ ইসমা'ঈল পড়াশোনার প্রতি আদৌ মনোযোগী ছিলেন না। শাহ 'আবদু'ল-কাদিরের খেদমতে পাঠের জন্য হাযির হইলে বেপরোয়া মনোভাবের কারণে তিনি ভুলিয়া যাইতেন কোথা হইতে সবক শুরু করিতে হইবে। কখনও পরের পাঠ (عبارت) আগে পড়া শুরু করিলে শাহ 'আবদু'ল-কাদির থামাইতে গেলে কিংবা ভুলের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিলে তিনি বলিতেন, ইহার মর্মার্থ সহজ মনে করিয়া আমি ইহা

পাঠ করি নাই। যদি ইহা কঠিনও হইত তবুও তিনি ইহার ব্যাখ্যায় এমন বক্তব্য প্রদান করিতেন যে, ছোট-বড় সকলেই বিস্মিত হইয়া যাইত। কখনও পূর্ব হইতে পাঠ শুরু করিতেন। শাহ 'আবদু'ল-কাদির এতদসম্পর্কে সতর্ক করিলে তিনি এমন সব সংশয় উত্থাপন করিতেন যে, বিজ্ঞ উস্তাদকে ইহার সমাধানে বেশ হিমশিম খাইতে হইত।

আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভার অধিকারী হইবার কারণে পনের-ষোল বৎসর বয়সেই তিনি কুরআন, হাদীছ, ফিক্‌হসহ যাবতীয় ধর্মীয় জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের সকল শাখার পড়াশোনা সমাপ্ত করেন। গোটা শহরেই ছিল তাঁহার মেধা ও ও প্রতিভার খ্যাতি। অনেক সময় সূক্ষ্মদর্শী মনীষী পণ্ডিত পরীক্ষাচ্ছলে পথিমধ্যে কোন কঠিন মাস'আলা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কিতাবের সাহায্য ছাড়াই উহার এমন ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন যে, প্রশ্নকারীকে লজ্জিত হইতে হইত (আছারু'স-সানাদীদ)। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ছিল অসাধারণ। তিনি কঠিন ও দুরূহ বাক্য যথাসত্বর অনুধাবন করত ইহার গভীরে প্রবেশ করিতে পারিতেন। তাঁহার মেধা ও প্রতিভার কাহিনী ছিল জ্ঞানবানদের প্রতিটি মাহফিলের সৌন্দর্যের উপকরণ (ইতহাফু'ন-নুবালা')।

শিক্ষা সমাপনান্তে শাহ ইসমা'ঈল (জনগণের) সংস্কার-সংশোধন ও পথ প্রদর্শনের কাজ শুরু করিয়া দেন। তিনি যেখানেই কোন বদ 'আকীদা ও বদ 'আমল শ্রেণীর লোকের সংবাদ পাইতেন, ওয়াজ-নসীহতের জন্য কোনরূপ লৌকিকতা ছাড়াই সেখানে গমন করিতেন। সপ্তাহে দুই দিন—শুক্রবার ও মঙ্গলবার তিনি জামে' মসজিদে ওয়াজ ফরমাইতেন (হায়াত-ই ওয়ালী; আছারু'স-সানাদীদ)। হাজার হাজার শ্রোতা তাঁহার ওয়া'জ অত্যন্ত আগ্রহভরে ও মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিত। মধ্যবর্তী বিরতির সময় কতিপয় পথভ্রষ্ট লোক বিভিন্ন সাথীদের অন্তর-মানসে নানা সন্দেহের সৃষ্টি করিয়া দিত। শাহ সাহেব আগামী ওয়াজ-এর সূচনায় ভূমিকা হিসাবে এমন কতগুলো বাক্য বলিয়া দিতেন যাহার মধ্যে প্রত্যেকের সন্দেহের জওয়াব থাকিত। বক্তৃতার অবস্থা ছিল এই যে, 'আলিম ও সাধারণ মানুষ সকলেই তাঁহার উপদেশ হইতে সমভাবে উপকৃত হইত। তাঁহার ওয়া'জ ও নাসীহাতের বরকতে সুন্নাহ্‌র সত্য ধ্বনি প্রত্যেক মানুষের কানে পৌছিয়া যায়, শিরক ও বিদ'আতের বুনিয়াদ ধসিয়া পড়ে, মানুষ সুন্নাত-ই নাবাবী গ্রহণ ও বিদ'আত পরিত্যাগের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়। জামি' মসজিদে জুমু'আর সালাত আদায়ের জন্য এত অধিক সংখ্যক মুসাল্লীর সমাগম হইতে থাকে যেমনটি হয় 'ঈদগাহে দুই 'ঈদে (আছারু'স-সানাদীদ)। তাঁহার চেষ্টায় বহু সংখ্যক লোক হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়। শত্রুমিত্র সকলেই ইহার স্বীকৃতি দিয়াছে এবং বলিয়াছে, ইসলামের যে ঔজ্জ্বল্য ও জাঁকজমক দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহা শাহ ইসমা'ঈল (র) ও মাওলাবী 'আবদু'ল-হায়্যি (র)-এর সযত্ন প্রয়াসের ফল। এই দুইজন বুযুর্গ স্বীয় শায়খ সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (র)-এর উযীর ছিলেন। সত্য বলিতে কি, ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্জাগরণের জন্য কাজ করিবার মত এমন কর্মী পুরুষ ভারতীয় উপমহাদেশের মাটিতে বিগত বার শত বৎসরে জন্মায় নাই (ইতাফু'ন-নুবালা')।

কতক জীবনীকার তাঁহার প্রথম দিককার ব্যায়ামের আলোচনায় বেশ অতিশয়োক্তি করিয়াছেন (হায়াত-ই তায়্যিবাহ)। ইহা সম্ভব যে, শাহ সাহেব সে সময়কার প্রচলিত প্রথা মুতাবিক সাঁতার, অশ্বারোহণ, তীরন্দাযী, বন্দুক চালনা ইত্যাদি শিখিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই সমস্ত বর্ণনার সনদ পরীক্ষা সাপেক্ষ। ঠিক তেমনই পাঞ্জাবে শিখদের অধীনে মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে অবগতি লাভের জন্য তাঁহার যে ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে (হায়াত-ই তায়্যিবাহ) সমসাময়িক বর্ণনায় ইহার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না।

১২৩৩/১৮১৮ সালে সায়্যিদ আহমাদ বেরেলাবী (র) নওয়াব আমীর খান হইতে পৃথক হইয়া দিল্লী পৌছিলে প্রথমে মাওলাবী 'আবদুল-হায়্যি, অতঃপর শাহ ইসমা'ঈল একাগ্র চিত্তে দুই রাক'আত সালাত সায়্যিদ সাহেব-এর ইমামতিতে আদায় করিয়া বায়'আত (দ্র.) হন (মাখযান-ই আহমাদী; মানজূরা; ওয়াকা'ই')। তখন হইতে সায়্যিদ সাহেবের দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেন যাহাতে ইনতিকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অবিচল থাকেন এবং জীবনের অবশিষ্ট অধিকাংশ সময় সায়্যিদ সাহেবের সাহচর্যে অতিবাহিত করেন। যদিও তাঁহার (শাহ ইসমা'ঈলের) খান্দান জনসাধারণের সম্মানিত কেন্দ্রস্থল ছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার শায়খ-এর পাদুকা বহনকে গর্ব ও গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। সায়্যিদ সাহেবের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অবস্থা ছিল এই যে, তিনি তাঁহার সামনে স্থির চিত্রের ন্যায় থাকিতেন। কখনও কখনও রোগের প্রাবল্যে নড়াচড়া করিবার শক্তি পর্যন্ত রহিত হইয়া যাইত, তথাপি সায়্যিদ সাহেবের হুকুমে যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণের জন্য এতটুকু ইতঃস্তত না করিয়া প্রস্তুত হইয়া যাইতেন (ওয়াসায়া'উ'ল-ওয়াযীর)।

সায়্যিদ সাহেব মুসলমানদের সংস্কার, সংশোধন ও জিহাদ সংগঠনের উদ্দেশে যতগুলি সফর করিয়াছিলেন শাহ ইসমা'ঈল সব কয়টিতেই শরীক ছিলেন। সায়্যিদ সাহেবের ইঙ্গিতে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র প্রচারাভিযান শুরু করিলে তাঁহার বক্তৃতার যাদুকরী প্রভাবে মুসলমানদের অন্তঃচক্ষু প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাহারা চাহিতে থাকে যে, তাহাদের মস্তক আল্লাহর রাহে কর্তিত হউক এবং দীন-ই মুহাম্মাদী (স)-এর পতাকার সমুন্নতির জন্য তাহাদের জীবন উৎসর্গীকৃত হউক (আছারু'স-সানাদীদ)।

সায়্যিদ সাহেব বিধবা বিবাহের পুনঃপ্রচলন করিলে শাহ ইসমা'ঈল-এর বিধবা বোনের, যিনি বয়সে বড় এবং যৌবনের শেষ প্রান্তে গিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, সুন্নাত পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশে মাওলাবী 'আবদু'ল-হায়্যি-এর সহিত বিবাহ দিয়া দেন (ওয়াসায়াউ'ল-ওয়াযীর)। হজ্জ সফরে (শাওওয়াল, ১২৩৬ হি.-এর শেষ হইতে শা'বান, ১২৩৯ হি.-র শেষ পর্যন্ত) মাতা ও ভগ্নিসহ সায়্যিদ সাহেবের সংগে ছিলেন। মাতা মক্কা মুকাররামাতে ইনতিকাল করেন (ওয়াকা'ই'; ওয়াসায়া'উ'ল-ওয়াযীর)। সায়্যিদ সাহেব জুমাদা'ল-আখিরা, ১২৪১ হি. জিহাদের উদ্দেশে দারু'ল-হারব ভারতবর্ষ হইতে হিজরত করিলে শাহ সাহেব মুহাজির ও মুজাহিদীনের প্রথম কাফিলায় শরীক ছিলেন (ওয়াকা'ই', মানজূরা প্রভৃতি)।

সীমান্তে অবস্থানকালীন ওয়া'জ ও আলোচনা, দা'ওয়াত ও প্রচার, প্রতিরক্ষা ও অগ্রাভিযান, কৌশল গ্রহণ ও রাজনীতির সমস্ত কাজে তিনি সকলের আগে থাকেন। তাঁহার মুজাহিদসুলভ কর্মকাণ্ডের জন্য দ্র. শিরো. আহমাদ শহীদ, সায়্যিদ। যে সমস্ত কর্মকাণ্ডে শাহ ইসমা'ঈল বিশিষ্টতা লাভ করেন উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ঃ

১. হুন্ড নামক স্থানে ইমামাত ও জিহাদ বিষয়ে সীমান্তের 'উলামা-ই কিরাম ও খানদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সমস্ত আলোচনা শাহ সাহেবই করিয়াছিলেন।

২. শায়দূ যুদ্ধে সায়্যিদ সাহেবের পীড়ার কারণে তিনি তাঁহার সহিত হস্তীপৃষ্ঠে সওয়ার ছিলেন। দুররানীগণের পলায়নের পর শিখেরা সায়্যিদ সাহেবের পশ্চাদ্ধাবন করিলে শাহ সাহেব যুদ্ধের ময়দান হইতে হাতী বাহির করিয়া সায়্যিদ সাহেবকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করান এবং একটি জামা'আতসহ পাঠাইয়া দেন। অতঃপর শিখ বাহিনীকে পশ্চাদ্ধাবন হইতে বিরত রাখিবার জন্য তিনি নিজে স্বয়ং হস্তীপৃষ্ঠেই সওয়ার থাকেন এবং পরে সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে মিলিত হন।

৩. হাযারা-তে জিহাদের প্রাথমিক প্রস্তুতি তিনিই সম্পন্ন করেন।

৪. শিনকিয়ারী যুদ্ধে তিনি স্বল্প সংখ্যক সাথী লইয়া শিখদের বিরাট দলকে পর্যুদস্ত করত তাড়াইয়া দেন। শাহ সাহেবের কাবা (লম্বা জামা) শত্রুর গুলীতে ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীকে শাহাদাত অঙ্গুলী বলিতেন।

৫. শাহ সাহেবই শার'ঈ বিধান প্রতিষ্ঠার বায়'আত (দ্র.)-এর জন্য আড়াই হাজার 'উলামা' ও খান-কে ঐকমতে পৌঁছিতে সম্মত করাইয়াছিলেন।

৬. স্বল্প সংখ্যক গাযী সমভিব্যাহারে তিনি হুন্ড-এর সুদৃঢ় দুর্গ দখল করিয়া লন এবং ইহাতে শত্রুপক্ষ হইতে কেবল দুইটি জীবন নষ্ট হয়।

৭. যায়দাহ্ নামক স্থানে শুধু সাত শত গাযী (তিন শত হিন্দুস্তানী, চারি শত দেশীয়)-সহ য়ার মুহাম্মাদ খানের দশ হাজার সৈন্য ও সাতটি কামানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে মাত্র দুইজন গাযী শহীদ হন।

৮. পাইন্দাহ খান তানুলীকে পরাজিত করিয়া আম্ব ও 'আশারাহ দখল করেন।

৯. মায়ার যুদ্ধে তিন হাজার গাযী সমভিব্যাহারে, যাহাদের অধিকাংশই ছিল দেশীয়, আট হাজার দুররানীকে পরাজিত ও পরাভূত করেন।

১০. পেশাওয়ার বিজয়ের পর সুলতান মুহাম্মাদ দুররানীর সহিত অনুষ্ঠিত সন্ধি আলোচনায় সায়্যিদ সাহেব শাহ সাহেবকেই মালিক-মুখতার বানাইয়াছিলেন (মানজূরা; ওয়াকা'ই' ইত্যাদি)।

২৪. যু'ল-কা'দা ১২৪৬/৬ মে ১৮৩১ সালে শাহ সাহেব বালাকোটে শাহাদাত বরণ করেন। শেষ মুহূর্তের অবস্থা সম্পর্কে কথিত আছে, মস্তক বা কর্ণের অংশবিশেষে গুলীর হাল্কা যখম ছিল। দাড়ি রক্তে ভিজিয়া গিয়াছিল। মস্তক ছিল অনাবৃত। গুলীভর্তি বন্দুক কাঁধের উপর ছিল এবং খোলা তলোয়ার ছিল হাতে। একটি ভিড়ের ভিতর তিনি ঢুকিয়া পড়েন। অতঃপর কেহ আর তাঁহাকে জীবিত দেখে নাই। যুদ্ধের পর তাঁহার লাশ সায়্যিদ সাহেবের শাহাদাত গাহ হইতে প্রায় আধা মাইল দূরে কাস'বা-ই বালাকোটের উত্তরে সিতবেনে নালার ধারে পাওয়া যায়। সেখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

তাঁহার 'ইল্ম-এর গৌরব ও মহিমার শান ছিল এই যে, শাহ 'আবদু'ল-'আযীয (র) এক পত্রে তাঁহাকে 'হুজ্জাতু'ল-ইসলাম' লিখেন। একবার বলেন, যাহারা আমার যৌবনকালের 'ইল্ম তথা বিদ্যাবত্তা দেখিয়াছে তাহারা উহার নমুনা দেখিতে চাহিলে ইসমা'ঈলকে দেখুক। শাহ ইসমা'ঈল ও শাহ ইসহাক (শাহ 'আবদু'ল-'আযীযের দৌহিত্র)-কে আল্লাহ্র বিশেষ দান হিসাবে অভিহিত করত তিনি এই পবিত্র আয়াতটি তিলাওয়াত করিতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ

"যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি আমাকে বার্ধক্যে ইসমা'ঈল ও ইসহাক'কে দান করিয়াছেন" (১৪ ঃ ৩৯)।

তাঁহার যুগে তিনিই সর্বাধিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, সত্য সুন্দর ধর্ম তথা দীন-ই হাক্ক-এ সর্বাধিক দৃঢ় বিশ্বাসী এবং সুন্নাহ্র সর্বাপেক্ষা বড় রক্ষক ছিলেন (আবজাদু'ল-'উলূম)।

দীনের খেদমতে নিমগ্নতা এই পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিয়াছিল যে, খাবার ও পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি কখনও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। হজ্জ সফরে কলিকাতা পৌঁছিলে কোম্পানীর উকিল মুনশী আমীনু'দ-দীন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আসেন। সেই সময় তাঁহার পোশাক এতই সাধারণ ছিল যে, মুনশী সাহেব বিশ্বাসই করিতে পারেন নাই যে, বিখ্যাত মাওলানা শাহ ইসমা'ঈল ইনিই (ওয়াকাই" আহমাদী)।

কু'রআন মাজীদ ভিন্ন কখনও কোন গ্রন্থ তিনি কাছে রাখেন নাই। 'উলামা"-ই কিরাম মাসআলা-মাসা'ইল জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে বুরুশ দিয়া অশ্বগাত্র মর্দন করিতে করিতে এতটুকু ইতঃস্তত কিংবা বিলম্ব না করিয়া জওয়াব দিতে থাকিতেন (আরওয়াহ-ই ছালাছা)। প্রতিটি মাস'আলাকে আয়াত পাক ও হাদীছের সাহায্যে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিতেন। ফিক্হ-এর খুঁটিনাটি বিষয় এমন পদ্ধতিতে পেশ করিতেন যে, প্রসিদ্ধ ও নামকরা ফাকীহ পর্যন্ত ইহা শ্রবণে হতবাক হইয়া যাইত (হায়াত-ই ওয়ালী)।

সায়্যিদ সাহেব আরোহণের জন্য তাঁহাকে একটি ঘোড়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অভ্যাস ছিল তিনি নিজে পদব্রজে চলিতেন এবং ঘোড়ার উপর কাহাকেও আরোহণ করাইতেন। নিয়াত থাকিত, আল্লাহ্র কাজে শরীরকে যতখানি কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে— ছাওয়াব ততখানিই (ওয়াকা'ই' আহমাদী)। 'আমলের ক্ষেত্রে সর্বদাই সর্বোচ্চ নমুনা পেশ করিতেন। যদিও তাঁহার শরীর কমযোর ছিল, তবুও একবার কতিপয় সাথীসহ একটি ভারী ছোট কামান উঠান এবং তাঁহার কাঁধে তুলিয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। কামানটি কাঁধে দিতেই তাঁহার পা টলমল করিতে থাকে (মানজূরা)। পাহাড়ের উপর উঠিতে যাইয়া কয়েক কদম চলিবার পর হাঁপাইয়া গেলে তিনি কোন পাথরের উপর বসিয়া ওয়া'জ' শুরু করিয়া দিতেন এবং সত্যের রাস্তায় কষ্ট ও পরিশ্রমের ফযীলাত বয়ান করিতেন। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হইয়া আসিলে পুনরায় উপরে উঠিতে শুরু করিতেন (মানজূরা)।

একবার বালাকোটে সালাত পড়াইতে গিয়া দুই রাকা'আতে সূরা, বানী ইসরা'ঈল সম্পূর্ণ পড়েন। সায়্যিদ জা'ফার 'আলী নাক্বী লিখিয়াছেন যে, উক্ত সালাতে যে স্বাদ ও আনন্দ পাইয়াছিলাম সারা জীবন অপর কোন সালাতে কোন ইমামের পিছনে তাহা পাই নাই (মানজূরা)। সায়্যিদ সাহেবের প্রতি যদিও তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু শার'ঈ ও জামা'আতী ব্যাপারে তিনি স্বীয় মতামত এত নির্ভীকভাবে ও দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করিতেন যে, স্বয়ং সায়্যিদ সাহেব একবার স্বীকার করেন যে, সত্য বিষয় প্রকাশে এতখানি নির্ভীকতা আমি আমার ভাতিজা সায়্যিদ আহমাদ 'আলী ব্যতীত অপর কাহারও মধ্যে দেখি নাই (মানজূরাঃ)।

সুন্দর হাতের লেখার চর্চা তাঁহার ছিল না (মানজূরা)। একবার দিল্লীর প্রসিদ্ধ হস্ত লিপিকর মীর পাঞ্জাকাশ জিজ্ঞাসা করেন, সুন্দর হাতের

লেখা লিখিতে কেন শিখিলেন না? তিনি বলিলেন, অপরে লেখা বুঝিতে পারিলেই যথেষ্ট; বাকীটুকু অনর্থক (আরওয়াহ-ই ছালাছা)। শাহ মুহাম্মাদ 'উমার তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিল যিনি মাজযূব অবস্থায় জীবন কাটান এবং ১২৬৮/১৮৫১-৫২ সালে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান।

মোটকথা শাহ ইসমা'ঈল (র) স্বীয় কামালিয়াতের কারণে মহান আল্লাহ্র কুদরতের একটি নমুনা ছিলেন (আছারু'স-সানাদীদ)।

**রচনাবলী** ঃ সায়্যিদ সাহেবের সাহিত সম্পর্কিত হইবার পর শাহ ইসমা'ঈলের জীবন জনগণের সংস্কার-সংশোধন ও পথ প্রদর্শন এবং দা'ওয়াত ও জিহাদের জন্য ওয়াক্ফ হইয়া যায় এবং পুস্তক রচনা ও গ্রন্থ প্রণয়নের সুযোগ খুব কমই পান। ইহার পরও তাঁহার রচনাসমূহ বিখ্যাত 'আলিমগণের তুলনায় সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক দিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংক্ষেপে উহা নিম্নরূপ ঃ

১. রাদ্দু'ল-ইশরাক ('আরবী), ইহা শির্ক ও শার'ঈ দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য নহে— এমন সব রসম প্রত্যাখ্যানে আয়াতে কারীমা ও আহাদীছ পাক-এর সংকলন। ইহার দুইটি অধ্যায়। নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ইহা একবার কাতফু'ছ-ছামারসহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং হাদীছসমূহ খুঁজিয়া বাহিরপূর্বক ইহার নাম রাখেন "আল-ইদরাক বি-তাখরীজ আহাদীছ রাদ্দি'ল-ইশরাক"। এই পুস্তিকা স্বতন্ত্রভাবেও প্রকাশিত হইয়াছে [অধিকন্তু দ্র. Brockelmann, ২খ., ৮৫৩ (ইহাতে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল না পড়িয়া মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল পড়ুন এবং মুহাম্মাদ সিদ্দীক খান পড়িবার পরিবর্তে মুহাম্মাদ সিদ্দীক হাসান খান পড়ুন)]।

২. তাকবিয়াতু'ল-ঈমান (উর্দূ) ঃ ঐ সমস্ত আয়াত-ই কারীমা ও আহাদীছ-এর প্রথম ভাগে বিশ্লেষণমূলক উর্দূ তরজমা যাহা রাদ্দু'ল-ইশরাক গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থটি অদ্যাবধি লক্ষাধিক সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। নিবন্ধকারের জানামতে প্রথমবার মাতবা' দারু'ল-ইসলাম, দিল্লী ১৮৪৭ খৃ.-এ করিয়াছিল। ইহার ইংরেজী তরজমা মাওলাবী শাহাদাত 'আলী সম্ভবত ১৮৫৪ খৃ.-এ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাদ্দু'ল-ইশরাক-এর দ্বিতীয় অংশের বিশ্লেষণমূলক উর্দূ তরজমা মাওলাবী মুহাম্মাদ সুলতান 'তাযকীরু'ল-ইখওয়ান' নামে ছাপাইয়াছিলেন।

৩. মানসাব-ই ইমামত (ফারসী) [অসম্পূর্ণ] ঃ ইমামাত-এর মাস'আলা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক গবেষণাধর্মী পুস্তিকা। ইহা একবার মাত্র ছাপা হয়। ইহার উর্দূ তরজমাও প্রকাশিত হইয়াছে।

৪. ঈদাহু'ল-হাক্ক আস-সারীহ ফী আহকামি'ল-মায়্যিত ওয়া'দ-দারীহ (ফারসী) [অসম্পূর্ণ] ঃ ইহা প্রথমবার মাতবা' ফাকীহ, দিল্লী ১২৯৭ হি.-তে উর্দূ তরজমাসহ প্রকাশ করিয়াছিল। কতক প্রখ্যাত 'উলামা'র অভিমত যে, বিদ'আত প্রত্যাখ্যানে ইহার তুলনায় উত্তম কোন গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। গ্রন্থটি দ্বিতীয় বার ১৩০৬ হি.-তে কুতুবখানা আশরাফিয়া, দিল্লী নূতন উর্দূ তরজমাসহ প্রকাশ করে।

৫. রিসালা ইয়াক রোযী (ফারসী) ঃ তাকবিয়াতু'ল-ঈমান-এর উপর মাওলানা ফাদ্ল-ই হাক্ক খায়রাবাদী কতিপয় আপত্তি উত্থাপন করেন। শাহ্ সাহেব এক বৈঠকে উহার উত্তর প্রণয়ন করেন। ১৫ যু'ল-হিজ্জা, ১২৪১ হি. যখন শাহ সাহেব জিহাদের উদ্দেশে হিজরতসূত্রে শিকারপুর পৌঁছেন তখন ইহা আলোর মুখ দেখে। এই রিসালা-টি ঈদাহু'ল-হাক্ক, ১ম সংস্করণের সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৬. রিসালা উসূল-ই ফিক্হ ('আরবী)।

৭. তানবীরু'ল-'আয়নায়ন ফী ইছবাতি রাফ'ই'ল-য়াদায়ন ঃ পুস্তকটির নামকরণের মধ্যেই ইহার প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে সেই সমস্ত হাদীছ সংকলিত হইয়াছে যেগুলি দ্বারা রাফ'উ'ল-য়াদায়ন অর্থাৎ সালাতে কান্ পর্যন্ত হাত উঠান সমর্থিত হয়। ইহা কয়েকবার বায়না'স-সুতূর (উপর লাইনে আরবী— নীচে তরজমা) উর্দূ তরজমাসহ প্রকাশিত হইয়াছে (ইতহাফ; পৃ. ৪৪)।

৮. তানকীদু'ল-জাওয়াব দর ইছবাত-ই রাফ'ই'ল-য়াদায়নঃ ইতহাফু'ন-নুবালা' (৪৪ পৃ.) গ্রন্থে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। নামেই গ্রন্থের পরিচয় বিধৃত।

৯. 'আবাকাত ঃ ইহাতে তাসাওউফের বিষয়বস্তু ব্যক্ত হইয়াছে, কেবল একবারই ছাপা হইয়াছে, বর্তমানে ইহা দুষ্প্রাপ্য।

১০. সিরাত-ই মুস্তাকীম (ফারসী) ঃ গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু সায়্যিদ আহমাদ শহীদের। কেবল প্রথম অধ্যায় শাহ ইসমা'ঈল প্রণয়ন করেন (দ্র. JASB)।

১১. রিসালা-ই মানতিক ঃ স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান তাঁহার আছারু'স-সানাদীদ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

১২. মাছনাবী সিলক-ই নূর (অসম্পূর্ণ) ঃ ইহা মুদ্রিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদ্দেশে নিবেদিত শাহ সাহেব-এর একটি লম্বা প্রশংসাসূচক কাসীদা এবং একটি কাসীদা সায়্যিদ আহমাদ শহীদের প্রশংসায় বর্তমান— যেগুলির বিক্ষিপ্ত কবিতাগুচ্ছ কতক গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। খুতবা (বক্তৃতামালা) ও বিতর্কের সীমা সংখ্যা নাই। জিহাদের ফযীলাত বিষয়ে কতকগুলি খুতবা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান একটি খুতবা সংকলনে প্রকাশ করিয়াছিলেন। নওয়াব মরহুমের উপর যখন ইংরেজদের আক্রোশ নামিয়া আসে তখন এই খুতবাঃ সংকলনটি বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। শাহ সাহেবের কতিপয় চিঠিও বর্তমান রহিয়াছে। সায়্যিদ সাহেবের সমস্ত পত্র ও ঘোষণা বিষয়ক সকল কিছুই শাহ সাহেবের লিখিত, যদিও উহার বিষয়বস্তু সায়্যিদ সাহেব-ই বলিয়া দিতেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) মীরযা হায়রাত দিহলাবী, হায়াত-ই তায়্যিবাহ (উর্দূ), দিল্লী ১৮৯০ খৃ.; (২) স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান, আছারু'স-সানাদীদ (উর্দূ), ১ম সং. দিল্লী; (৩) নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, ইতহাফু'ন-নুবালা (ফারসী), কানপুর ১২৮৮ হি., পৃ. ৪১৬ প.; (৪) ঐ লেখক, আবজাদু'ল-'উলূম ('আরবী), ভূপাল ১২৯৫ হি.; (৫) আরওয়াহ-ই ছালাছা (উর্দূ), সাহারানপুর ১৩৭০ হি.; (৬) মুহাম্মাদ জা'ফার থানেশ্বরী, তাওয়ারীখ-ই 'আজীবাহ অথবা সাওয়ানিহ আহমাদী (উর্দূ), দিল্লী ১৮৯১ খৃ., সাঢুরাহ ১৯১৪ খৃ.; (৭) নওয়াব ওয়াযীরু'দ-দাওলা, টুংকের শাসনকর্তা, ওয়াসায়াউ'ল-ওয়াযীর 'আলা তারীকি'ল-বাশীর ওয়া'ন-নাজীর (ফারসী); (৮) সায়্যিদ মুহাম্মাদ 'আলী বেরলাবী (সায়্যিদ আহমাদ শহীদের ভাগিনা), মাখযান-ই আহমাদী (ফারসী), ১২৯৯ হি. সং.; (৯) জা'ফার 'আলী নাকবী, মানজূরাতু'স-সু'আদা, (তারীখ-ই আহমাদী নামে খ্যাত) (ফারসী) পাণ্ডু. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে; (১০) নওয়াব ওয়াযীরু'দ-দাওলাঃ, ওয়াকাই আহমাদী (উর্দূ) পাণ্ডু. (নুসখা রায়বেরেলী ও টুংকে এবং নিবন্ধকারের নিকট); (১১) সায়্যিদ আবু'ল-হাসান 'আলী নাদবী, সীরাত-ই সায়্যিদ আহমাদ শাহীদ (উর্দূ), ১ ও ২খ, লখনৌ ১৯৩৯ খৃ.; (১২) W. W. Hunter, The Indian Musalman,

লন্ডন ১৮৭১ খৃ.; (১৩) রাহীম বাখ্শ, হায়াত-ই ওয়ালী, লাহোর ১৯৫৫ খৃ.; (১৪) রাহমান 'আলী, তাযকিরা-ই 'উলামা'-ই হিন্দ, লখনৌ ১৯১৪ খৃ.; পৃ. ১৭৯; (১৫) মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল গুদহারাবী, ওয়ালিয়্যুল্লাহ, জামি'আ মিল্লিয়া প্রেস, দিল্লী; (১৬) শাহ ইসমা'ঈল শাহীদ (ইংরেজী ও উর্দূ) (ইসমা'ঈল শহীদ দিবস উপলক্ষে রচিত নিবন্ধ, কাওমী কুতুবখানাহ, লাহোর হইতে প্রকাশিত)।

গুলাম রাসূল মিহির (দা. মা. ই.)/ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

**ইসমা'ঈল সাফা** (اسماعيل صفا) ঃ [১৮৬৭-১৯০১ খৃ.] তারজীমাত ও ছারওয়াত-ই-ফুনূন, ক্রান্তিযুগের তুর্কী কবি। জন্ম মক্কায়, যেখানে তাঁহার পিতা মাহমূদ বাহজাত হি'জায প্রদেশের প্রধান সচিব ছিলেন। তিনি ছিলেন ট্রাবযন (Trabzon)-এর অধিবাসী এবং প্রাচীনপন্থী একজন স্বল্পখ্যাত কবি (ইবনু'ল-আমীন মাহমূদ কামাল, Son asir Turk sairleri, ইস্তাম্বুল. ১৯৩০ খৃ., ১৯৩০ খৃ., ১খ, ১৭৭-৭৮)। ইসমা'ঈল সাফা সাত বৎসর বয়সে তাঁহার মাতা সামিয়া 'আ'ইশাকে হারান। ১৮৮০ খৃ. তাঁহার পিতা ইনতিকাল করিলে ইসমা'ঈল সাফা তাঁহার দুই ভ্রাতাসহ ইস্তাম্বুল চলিয়া যান। 'আরব দেশ ও মরুভূমির সুখী জীবন তাঁহার স্মৃতিপটে গভীর অনুভূতি সৃষ্টি করে যাহা তাঁহার প্রাথমিক জীবনের কবিতায় প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার পিতা মক্কায় তাঁহাকে 'আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা দেন। তাঁহার দুই ভ্রাতাসহ ইস্তাম্বুলে প্রতিভাবান য়াতীমদের জন্য সুবিখ্যাত দারু'শ-শাফাকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আবাসিক ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন। তিনি ১৮৯০ খৃ. শেষ পরীক্ষায় পাস করিবার পর কিছুকালের জন্য তার বিভাগে চাকুরী করেন। অতঃপর তিনি বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাহিত্য শিক্ষা দান করেন। তিনি অতি অল্প বয়সেই বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু অচিরেই তাঁহার স্ত্রী ইনতিকাল করেন এবং তিনি নিজে যক্ষা ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। রোগমুক্তির আশায় তিনি মিডিল্লি (Mytilene) দ্বীপপুঞ্জে কিছুকাল অবস্থান করার পর ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার উদার ধ্যান-ধারণার জন্য, যাহা গোপন রাখিতে তিনি চেষ্টা করেন নাই, হামীদিয়া গুপ্ত পুলিশ তাঁহাকে একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে। গেদিক (Gedik) পাশার বাড়ীতে তাঁহার প্রগতিশীল বন্ধুবর্গ প্রায়ই সমবেত হইতেন বিধায় উহার উপর সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইত। ইসমা'ঈল কামালের। (১৯০৮ খৃ. সংবিধানের পরবর্তী সময়ে বেরাত (Berat) নিযুক্ত একজন আলবেনীয় ডেপুটি-র] পরামর্শক্রমে ইসমা'ঈল সাফা ও অন্যতম ছারওয়াত-ই ফুনূন কবি তাওফীক ফিক্রাতসহ এক প্রখ্যাত চিন্তাবিদগোষ্ঠী বৃটেন বোয়ের্য (Boers) বিজয়ের জন্যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে বৃটিশ দূতাবাসে গমন করেন। তাঁহারা নিজস্ব ধ্যান-ধারণার স্ববিরোধিতা অনুধাবন না করিয়া পরবর্তীতে এই বলিয়া ইহার ব্যাখ্যা দান করিতে প্রয়াস পান যে, তাঁহারা এই কাজটি সুলতানের বিরুদ্ধে তাঁহাদের বিরূপ মনোভাব প্রকাশের জন্যই করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরকে গ্রেফতার করিয়া অন্য প্রদেশে নির্বাসনের উপলক্ষ হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইসমা'ঈল সাফা সিভাসে নির্বাসিত হন এবং তথাকার প্রতিকূল আবহাওয়া সহ্য না হওয়ায় এক বৎসর পর ১৯০১ খৃ. তিনি ইনতিকাল করেন।

ইসমা'ঈল সাফা তাঁহার প্রথম কবিতাগুচ্ছ নাজী-র মাজমূ'আ-ই মু'আল্লিম এবং পরবর্তী কালে পাক্ষিক মিরসাদ নামক সাময়িকীতে প্রকাশ করেন। বিশ বৎসর বয়সে তিনি সাহিত্য পরিমণ্ডলে একজন সুপরিচিত কবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁহার লেখনী হইতে স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীলভাবে কবিতা নিঃসৃত হইত। তাঁহার প্রাথমিক কবিতাসমূহে স্বীয় উস্তাদ নাজী-র প্রভাব স্পষ্ট ও স্বাভাবিক ছিল। তাহা সত্ত্বেও ঐ উস্তাদ তাঁহাকে স্বভাবকবি হিসাবে অভিহিত করেন। স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি মিরসাদ-এর শীর্ষস্থানীয় লেখক বলিয়া পরিগণিত হন যেই পর্যন্ত না সরকারী আদেশে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ক্রমান্বয়ে নাজী-র সাহিত্যিক প্রভাবের স্থান গ্রহণ করে রাজা-ই-যাদা আকরাম, 'আবদু'ল-হাক্ক হামিদ, বিশেষভাবে তাওফীক ফিক্রাত-এর প্রভাব। তাঁহাদের সহিত তিনি প্রগাঢ় বন্ধুত্বে আবদ্ধ হন এবং যাঁহারা নিয়মিতভাবে ছারওয়াত-ই ফুনূন-এ রচনা প্রকাশ করিতে থাকেন। নব্য ও প্রাচীন উভয় মতাদর্শের সমালোচকবৃন্দ তাঁহার অসাধারণ কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতি দানে ঐকমত্য পোষণ করেন। প্রারম্ভিক কবিতাগুলির অধিকাংশই ছিল বাল্যস্মৃতি বিজড়িত ও আবেগপূর্ণ। ইসমা'ঈল সাফা এমন একজন সংবেদনশীল কবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন যিনি সাবলীল ভঙ্গিতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আকুতিজ্ঞাপক সরল বিষাদময় কবিতা, ছন্দময় গীতিগাথা ও ধর্মীয় ভাবোন্মাদনা সম্বলিত কবিতাগুচ্ছ রচনা করিতেন। তাঁহার সৃষ্টিকর্মের উপর এই প্রারম্ভিক ও অসম্পূর্ণ বিশ্লেষণ পরবর্তী সমালোচনাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কিন্তু উহাতে তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত অধিকাংশ রচনাকর্ম উপেক্ষিত হইয়াছে যাহা তাঁহাকে একাধারে হাস্যরসাত্মক, অপরদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যকর্মের এক অনন্যসাধারণ কবি প্রতিভা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, বিশেষভাবে তাঁহার রচিত কবিতা তাজাল্লুম (অবিচারের অভিযোগ) যাহা প্রথমে প্যারিসে আহমাদ রিদার নব্য তুর্কীর মুখপাত্র মাশওয়ারেত-এ (৯ নং পরিশিষ্ট, ১৮৯৩ খৃ.) এবং পরে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও সংশোধিতভাবে 'আবদুল্লাহ্ জাওদাত-এর ইজ্‌তিহাদ (নং ১০৫, ১৩৩০ হি.)-এ প্রকাশিত হয়। উহা পরবর্তী সময়ের আশরাফ ও ফিক্রাত ঐতিহ্যের একটি প্রকৃত রাজনৈতিক ব্যঙ্গ কবিতার অগ্রদূত ঃ তুমি তোমার আশেপাশে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিবর্গ সংগ্রহ করিয়াছ যাহাদের পরামর্শে তুমি জনসাধারণকে উৎপীড়িত করিয়াছ। তুমি ক্ষমতা দিয়াছ দুর্নীতিবাজদের, মূর্খদের ও স্বদেশ প্রেমবিবর্জিত লোকদের; তুমি গুপ্তচরবৃত্তিকে পেশা হিসাবে সম্মানিত করিয়াছ ; তুমি প্রতিভাবান ব্যক্তিদেরকে নির্বাসিত করিয়াছ; তুমি চাপ প্রয়োগ করিয়াছ মিদহাত পাশার মত একজন বিশিষ্ট প্রতিভাধরের মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করিবার জন্য ; বল হে খলীফা ! তুমি কি একজন জল্লাদ ব্যতীত অন্য কেহ ! তাঁহারা তোমাকে অন্যায় কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন, তুমি উপেক্ষা করিয়াছ ; তোমার ক্রীতদাসগণ জনসাধারণের ক্ষতি করিয়াছে, তুমি উহা উপেক্ষা করিয়াছ; বিদেশিগণ দেশের স্বার্থের বিনিময়ে ধনার্জন করিয়াছে, তুমি উহা উপেক্ষা করিয়াছ ; বন্ধুগণ, তোমাকে দেশের সমস্ত বিষয়ে সাবধান করিয়াছে, কিন্তু তুমি তাহাও উপেক্ষা করিয়াছ। তুমি নিন্দুকের বিবরণকে পথনির্দেশক বাণীর উপর অগ্রাধিকার দিয়াছ, রাষ্ট্রীয় সম্পদ কতিপয় তস্করের হস্তে ন্যস্ত— দেশ ধ্বংসোন্মুখ, জনগণ ক্ষুধার্ত, তোমার পতনের দিন তাহারা নিষ্কৃতি দিবস হিসাবে উৎসব করিবে।"

ঘনিষ্ঠ বন্ধু মহলে ইসমা'ঈল সাফা 'আবদু'ল-হামীদকে উৎখাত করিবার সহজ পরিকল্পনার বিশদ ব্যাখ্যা দিতেন (খালিদ যিয়া উসাকলিগিল, Kirk yil, ইস্তাম্বুল ১৯৩৬ খৃ., ৪খ, পৃ. ৭৯)। তাঁহার অপর একটি

উল্লেখযোগ্য কবিতা প্রায় দৃষ্টির অগোচরে রহিয়াছে। উহা দামাদ মাহ্‌মূদ পাশার কাসীদার ভিত্তিতে রচিত তাঁহার 'তাখ্‌মীস' (দুই চরণবিশিষ্ট কবিতাংশের সহিত নূতন তিন চরণ যোগ করত উহাকে পঞ্চপদিতে পরিণত করা) যাহা ১৮৯৭ খৃ.-এর গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধের নৌবাহিনী মন্ত্রী হাসান পাশার বিদ্রূপাত্মক স্তুতিগাঁথা। ইহা একটি কটু রসিকতা পরিপূর্ণ আক্রমণাত্মক ব্যঙ্গগাথা যাহা 'আবদু'ল-হামীদের বিরুদ্ধে লিখিত দিয়া পাশার বিখ্যাত রচনা জাফারনামা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। 'আবদু'ল-হামীদ তাঁহার শাসনামলে তুর্কী নৌবাহিনীকে স্থায়ীভাবে গোল্ডেন হর্নে নোঙ্গর করিয়া রাখিয়াছিলেন বিধায় উহার চরম অবনতি ঘটিয়াছিল। ইসমা'ঈল সাফা উজ্জ্বল চিত্রকল্পের সাহায্যে তুলিয়া ধরেন ক্ষয়িষ্ণু নৌবহরের দুর্দশা এবং তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করেন দায়িত্বহীন ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের ঔদাসীন্যের কথা।

ইসমা'ঈল সাফা নিম্নলিখিত প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর রচয়িতা ঃ (১) খুয্‌মা সাফা, ইস্তাম্বুল ১৩০৮ হি. (ইহাতে তাঁহার পিতার অপ্রকাশিত কবিতাগুলিও অন্তর্ভুক্ত); (২) মাগদূরি-ই সেভদা, (Maghdure-i Sevda), ইস্তাম্বুল ১৩০৮ হি.; (৩) সুনহা,, ইস্তাম্বুল ১৩০৮ হি.; (৪) মেনসিয়্যাত, ইস্তাম্বুল ১৩১২ হি.; (৫) মাওলিদ-ই পেদারী যিয়ারাত (একটি ক্ষুদ্র কবিতা যাহা তাঁহার পিতার জন্ম শহর ট্রাবযনে প্রথম ভ্রমণের উপর রচিত), ইস্তাম্বুলে ১৩১২ হি.; (৬) ইনতাক-ই হাক্ক ইন তাখ্‌মীসি, ইস্তাম্বুল ১৩২৮ হি.; (৭) হিস্‌সিয়্যাত [তাঁহার ভ্রাতা 'আলী কামি (Akyuz) লিখিত একটি উত্তম ভূমিকা সম্বলিত], ইস্তাম্বুলে ১৩২৮ হি.।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইসমা'ঈল হিকমাত, ইসমা'ঈল সাফা, ইস্তাম্বুল ১৯৩৩ খৃ.; (২) খালিদ দিয়া উসাকলিগিল, কির্ক ইল, ইস্তাম্বুল ১৯৩৬ খৃ., ৪খ, ৭৯ প.; (৩) হুসেইন চাহিদ য়ালচিন, এদিবী খাতিরালার, ইস্তাম্বুল ১৯৩৩ খৃ., স্থা.; আরো দ্র. তাওফীক ফিক্‌রাত-এর উপর অধিকাংশ বিশেষ প্রবন্ধসমূহ যেখানেই ইসমা'ঈল সাফাকে প্রায়শ সূত্র হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

Fahir Iz (E. I.[2])/ হেদায়েতুল ইসলাম খান

**ইস্‌মা'ঈল সাবরী** (اسماعيل صبرى) ঃ মিসরীয় কবি (১৮৮৬-১৯৫৩ খৃ.); তাঁহার গৃহীত উপনাম আবূ উমায়মা দ্বারাই অধিকতর খ্যাতিমান, অন্য এক ইস্‌মা'ঈল সাব্‌রী হইতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য সূচিত হয়। তাঁহার কাব্যকর্মের শুরু ১৯১০ খৃস্টাব্দে; আর সামগ্রিকভাবে তাঁহার সকল রচনা সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয় তাঁহার মৃত্যুর পরে। তাঁহার 'প্রেমগীতি'সমূহ (গাযালু'ল-আগানী), (দীওয়ান, পৃ. ১৮৩-২৫৮) ছন্দকৌশল, ভাষা ও রচনাশৈলীর বিশুদ্ধতার জন্য বিশেষ মনোযোগের দাবিদার। এই সমস্ত গানের মধ্যে কতিপয় সুরারোপিত হইয়াছে; এইগুলির গীতিধর্মিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই যুগের ঐতিহ্যবাহী সর্বাধিক আবেগ ও বেদনাময় এবং মর্মস্পর্শী সঙ্গীতমালায় ঐগুলি মূল্যবান সংযোজন। পরিণত বয়সে ইস্‌মা'ঈল সাব্‌রী তাঁহার যৌবনে রচিত অনেক কাসীদার ভাবগত অসংগতি হ্রাস করিতে পারিয়াছিলেন। এই ব্যাপারটি অবশ্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নহে। তবে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইস্‌মা'ঈল সাব্‌রী ক্লাসিক্যাল 'আরবী কবিতা রচনায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কোন কোন সময় তিনি তাঁহার নিজের কবিতায় আল-বুহ্‌তুরী, আল-মুতানাব্বী ও অন্যান্য স্মরণীয় 'আব্বাসী কবিদের দুই-চারিটি চরণ নিজের কবিতায় অন্তর্ভুক্ত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। যেখানেই এইরূপ ঘটিয়াছে, সেখানেই (দীওয়ান) সংকলনের সম্পাদকগণ কবির এই খামখেয়ালী নির্দেশক মন্তব্য করিয়াছেন।

দুইটি কাব্যে আন্‌-নূনিয়্যাতু'ল-কুব্‌রা ও আল-হাম্‌যিয়্যাতু'ল-কুব্‌রা যথাক্রমে (দীওয়ানের ২৭-৭৫ ও ৭৬-১০৪ পৃষ্ঠা) বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এইগুলিতে কবি স্বীয় অনুধ্যান কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এইগুলিতে রহিয়াছে স্তবগাথা, ধর্মীয় সমর্থনমূলক ও পারলৌকিক চিন্তাসম্বলিত এবং ইসলামের ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যে রচিত কবিতা। কিন্তু আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রশংসা ও আম্বিয়া' ('আ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত তাঁহার রচনাবলীতে আমরা পাই নীতিগর্ভ নানা প্রসঙ্গ। এইগুলিও সম্ভবত কুরআন হইতেই গৃহীত। এই সব লেখার মধ্যে বর্ণনামূলক অনুচ্ছেদের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু অপরপক্ষে এইখানে বিশেষ উপলক্ষ কেন্দ্রিক কবিতা অনেক আছে। সেইগুলি রচনায় তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছেন নানা সামাজিক ঘটনা দ্বারা। লেখকের এই বৈশিষ্ট্য অন্যান্য বিখ্যাত সমসাময়িক কবিদের অনুরূপ ছিল। এই সব কবি ছিলেন আহমাদ শাওকী (দ্র.), হাফিজ ইব্‌রাহীম (দ্র.) প্রমুখ। ইসমা'ঈল সাব্‌রী 'বিদ্যালয় সঙ্গীত' ও মঞ্চের জন্য নাটকও লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদকর্মের কিছু নমুনা 'দীওয়ানে'র শেষ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ দীওয়ানের এই সংস্করণে লেখকের জীবন ও পেশাগত কার্যাবলী সম্পর্কে বিবরণ সামান্যই আছে। ইহার সংকলক আহ্‌মাদ কামাল যাকী, 'আমির মুহাম্মাদ বুহায়রী ও মুহাম্মাদ আল-কাস্‌স'াস; ইহা কায়রোতে প্রকাশিত হইয়াছিল (তা. বি.); প্রকাশক ঃ The Ministry of Culture and National Guidance.

U. Rizzitano (E.I.[2])/ ছালেমা খাতুন

**ইস্‌মা'ঈল সাব্‌রী পাশা** (اسماعيل صبرى پاشا) ঃ মিসরীয় কবি ও রাজনীতিজ্ঞ। যাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মিসরীয় জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তোলার জন্য অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার জন্ম ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৪ সনে কায়রোতে। ইসমা'ঈল সাব্‌রী উপকৃত হইয়াছিলেন দুইটি কৃষ্টির প্রভাবেঃ প্রাচীন 'আরব কৃষ্টি ও ফরাসী কৃষ্টি। ফরাসী কৃষ্টির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হইয়াছিল যখন তিনি আইন বিষয়ে অধ্যয়ন শেষ করিবার জন্য Aix-en-Provence-এ গিয়াছিলেন। তিনি ১৮৬৭ খৃ. আইন বিষয়ে ডিগ্রী লাভ করিয়া মিসরে ফিরিয়া আসেন। তিনি প্রথমে আল-মান্‌সূরায় ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন ; তৎপর আলেকজান্দ্রিয়ার গভর্নর হন (১৮৯৬-৯ খৃ.); পরবর্তীকালে তিনি আইন মন্ত্রণালয়ে আন্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট নিযুক্ত হন এবং ১৯২৩ সনের ১৬ মার্চ তারিখে ইনতিকাল করেন।

তরুণ বয়সেই ইসমা'ঈল সাব্‌রীর কাব্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। "রাওদু'ল-মাদারিসি'ল-মিস্‌রিয়্যা" নামক সাময়িকীতে ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার যৌবনের রচনাগুলি প্রকাশ করেন। ইহা অবশ্য অনস্বীকার্য যে, এই সকল কবিতা ছিল সহজ কাব্যানুশীলন মাত্র ; তথাপি 'আব্বাসী আমলের ক্লাসিকাল কাব্যাদর্শের প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাঁহার অল্প বয়সেই উহার প্রকাশ ঘটিয়াছিল। সে যাহাই হউক, আধুনিক ফরাসী কবিতার সংস্পর্শে উপকৃত এই কবির মন শুধু যে ঐ সংস্পর্শে সমৃদ্ধ

হইয়াছিল তাহাই নহে, উহার ফলে পারিপার্শ্বিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী অনুধাবনের তীক্ষ্ণ অনুভূতি তিনি লাভ করেন। আর ইহারই ফলে মানবতার ভবিষ্যত সম্বন্ধে অধিকতর সার্বিক চিন্তা ও অনুধ্যান তাঁহার কাব্যে আরও অধিক প্রতিফলিত হইয়াছিল।

তাঁহার সময়ে অনেক লেখক তাঁহাদের প্রতিভা প্রয়োগ করিয়াছেন সময়-উপযোগী কাব্যে ; ইস্‌মা'ঈল সাব্‌রী ছিলেন এই প্রবণতার বিরোধী। তিনি ছিলেন আদর্শ দেশপ্রেমিক ও সততার প্রতীক। তিনি সেই সময়ের মিসরের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিদ্বয়— তুরস্ক ও ইংল্যান্ডের সহিত কোনরূপ সহজ আপোসে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার দীওয়ানে সুলতান 'আবদু'ল-হামীদকে অথবা তাঁহার কোনও উচ্চ পদস্থ কর্মচারীকে উৎসর্গীকৃত কোন কাসীদা নাই। প্রেম, মৃত্যু ও জন্মভূমি ছিল তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু। তাঁহার সাবলীল উপমা ব্যবহারসমৃদ্ধ কাব্যের উজ্জ্বলতার উৎস ছিল চিন্তার গভীরতা ও উন্নত মানের রচনাশৈলী। সমসাময়িকদের তুলনায় তাঁহার রচিত কবিতা গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না— সম্ভবত এই কারণে যে, তিনি অপরের চাহিদা উপেক্ষা করিয়া নিজের আনন্দেই কাব্য রচনা করিতেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ কবির মৃত্যুর পনর বৎসর পরে আহ্‌মাদ আয্‌যায়ন কর্তৃক (১) তাঁহার দীওয়ান প্রকাশিত, কায়রো ১৯৩৮ খৃ.; তাহা হুসায়ন লিখিত এই গ্রন্থটির ভূমিকা সমালোচনার দৃষ্টিকোণ হইতে চিত্তাকর্ষক ; (২, ৩) জীম, আলিফ, দাগির প্রণীত মাসাদিরু'দ-দিরাসাতি'ল-আদাবিয়্যা (২/১খ) ঃ আর-রাহিলুন ১৮০০-১৯৫৫ খৃ. (বৈরূত ১৯৫৬ খৃ. ৫৩৪-৬, ও 'উমার রিদা কাহ্‌হালা প্রণীত মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন, দামিশ্‌ক ১৩৭৬/১৯৫৭, ২৭২-৩); সাময়িকীসমূহে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে প্রচুর তথ্যের বা উৎসের উল্লেখ রহিয়াছে ; (৪) মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-মুন্'ইম খাফাজী, কিস্‌সাতু'ল-আদাব ফী মিস্‌র, ৫খ, কায়রো ১৯৫৬ খৃ., ১৩৮-৪৭; (৫) 'উমার আদ্-দাসূকী, ফি'ল-আদাবি'ল-হা'দীছ, কায়রো ১৯৫০ খৃ., ২খ, ১১৭-২৫; তাঁহার জীবনের কিছু কিছু ঘটনার ভিন্নতর বিবরণের জন্য দ্র. (৬) Brockelmann, S III, ১৮-২১; (৭) এইখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আহ্‌মাদ শাওকী একটি দীর্ঘ শোকগাথা তাঁহার জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন (আশ-শাওকিয়্যাত, কায়রো ১৯৩৬ খৃ., ৩খ, ১১৩-৮)।

U. Rizzitano (E.I.[2])/ছালেমা খাতুন

**ইস্‌মা'ঈল সিদ্‌কী** (اسماعيل صدقى) ঃ মিসরীয় বিশিষ্ট রাজনীতিক ও রাষ্ট্রবিদ ইসমা'ঈল সিদ্‌কী ১৮৭৫ খৃষ্টব্দে মিসরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ও মাতামহ উভয়ই খেদীব শাসনামলে উচ্চ রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদায় আসীন ছিলেন। রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী তাঁহার অধিকাংশ সমসাময়িকের ন্যায় তিনিও আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং খেদীব কর্তৃক অনুপ্রাণিত বৃটিশবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে অধ্যয়নপর্ব সম্পন্ন করিয়া তিনি দেশের আইন মন্ত্রণালয়ে একজন নিম্ন মর্যাদার কর্মকর্তার দায়িত্বে নিয়োজিত হন। নিজ চেষ্টা ও উদ্যোগের ফলে, বিশেষ করিয়া তাঁহার পরিবারের ব্যাপক বন্ধু মহলের প্রভাবে দ্রুত পদোন্নতি লাভ করিয়া ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্থায়ী সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯১৪ খৃ. রুশ্‌দী পাশা সরকারের মন্ত্রীসভায় সিদ্‌কী সদস্যপদ লাভ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি পদত্যাগ করেন।

১৯১৮ খৃ. প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের পর সিদ্‌কী ওয়াফ্‌দ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৯ খৃ. সা'দ জগলূলসহ তাঁহাকে মাল্‌টা দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়। ওয়াফ্‌দ দলকে শান্তি সম্মেলনে (Peace Congress) যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি উক্ত প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। প্যারিসে প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে ওয়াফ্‌দপন্থীদের দাবির অসারতা উপলব্ধি করিয়া সিদ্‌কী কায়রো ফিরিয়া আসেন। ওয়াফ্‌দ পার্টি ত্যাগ তাঁহার জীবনে এক নূতন মোড় সূচনা করে। কেননা তখন হইতে তিনি মিসরীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ওয়াফ্‌দ-বিরোধী এক সক্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ঘোষণাপত্রের খসড়া প্রণয়নে এবং তাহা বাস্তবায়নে তিনি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। এই ঘোষণাপত্রের বলেই পরবর্তীতে মিসর স্বাধীনতা লাভ করে এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের সংবিধান রচিত হয়। আর উক্ত ঘোষণা ও সংবিধান উভয়টিই ওয়াফ্‌দপন্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এই সময় হইতে ১৯৪৬ খৃ. অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সিদ্‌কীতে মিসরের গণপ্রশাসন পরিচালনার কাজে ওয়াফ্‌দপন্থী নীতির সহিত নিরলস সংগ্রাম করিতে হয়। ওয়াফ্‌দপন্থীদের বিরোধিতা দমন ও তাহাদের প্রচারণা বন্ধ করিবার কাজে তিনি সশস্ত্রবাহিনী, এমন কি বৃটিশ সেনাবাহিনীও ব্যবহার করেন। এই কাজের জন্যই মিসরের রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি একজন বিতর্কিত ব্যক্তিরূপে প্রতিপন্ন হন। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁহার যে খ্যাতি ছিল, তিনি উহার যোগ্য ছিলেন।

১৯৩০ ও ১৯৪৬ খৃ. দুইবার ইসমা'ঈল সিদ্‌কী মিসরের প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। প্রতিবারই মিসর ও সুদানে ওয়াফ্‌দপন্থীদের আসন লইয়া বৃটেনের সহিত একটা চুক্তিতে আসিবার প্রচেষ্টায় ওয়াফ্‌দপন্থীদের ব্যর্থতার কারণে উদ্ভূত জাতীয় গোলযোগ ও গণবিশৃঙ্খলার মুখে সিদ্‌কীকে প্রধান মন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। ১৯৩১ খৃ. ভোটাধিকার সীমিত করিয়া সিদ্‌কী সংবিধানে সংশোধনী আনয়ন করেন এবং সংসদে তাঁহাকে সমর্থন দানের জন্য পিপলস পার্টি নামে তিনি একটি দল গঠন করেন। সিদ্‌কীর মন্ত্রিত্বকাল তেমন সুখকর বা জনপ্রিয় ছিল না। বৃটেন ও মিসরের মধ্যকার সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের কাজে বৃটেনের পর্যাপ্ত সহযোগিতা লাভে তিনি ব্যর্থ হন। চরমপন্থী ওয়াফ্‌দপন্থীদের প্রতি মিসরের মধ্যপন্থীদের সমর্থন দমনেও তিনি সাফল্য লাভ করিতে অসমর্থ হন। ১৯৪৬ খৃ. লন্ডনে তৎকালীন বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব আর্নেস্ট বেনীন (Ernest Benin) ও সিদ্‌কীর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এইবারও ওয়াফ্‌দপন্থীদের বিরোধিতার কারণে ইহার বাস্তবায়ন সম্ভব হয় নাই। ইংল্যান্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ভগ্ন হৃদয় ও অসুস্থ দেহে তিনি তাঁহার কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে ইসমা'ঈল সিদ্‌কী ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইসমা'ঈল সিদ্‌কী, মুযাক্কিরাতী, কায়রো ১৯৫০ খৃ.; (২) 'আবদু'র-রাহ্‌মান আর-রাফী'ঈ, ছাওরাতু সানাত ১৯১৯ খৃ., কায়রো ১৯৪৬ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, ফী আ'কাবি'ছ-ছাওরাতি'ল-মিস্‌রিয়্যা; ৩ খণ্ডে কায়রো ১৯৪৭-৫১ খৃ.; (৪) Mahmud. Y. Zayid; Egypt's Struggle for Independence, Beirut 1965; (৫) P. J. Vatikiotis, The Modern History of Egypt, London 1969।

A. Kelidar (E.I.[2])/ এ. এইচ. এম. রফিক

**ইসমা'ঈল হাক্কী** (اسماعيل حقى) ঃ শায়খ ইসমা'ঈল হাক্কী আল-ব্রুসাবী বা আল-উসকুদারী (১০৬৩/১৬৫২-১১৩৭/১৭২৫) তুর্কী 'আলিম, সূফী ও কবি, জ. এদির্নে (Edirne)-এর নিকটবর্তী আইডস্ (Aydos)-এ। ইস্তাম্বুলে এক অগ্নিকাণ্ডে তাঁহাদের বাড়ী ধ্বংস হওয়ায় তাঁহাদের পরিবার এইখানে স্থানান্তরিত হয়। তাঁহার রচিত 'কিতাবু'স-সিলসিলা' (বায়াযীদ লাইব্রেরী, পাণ্ডু. নং ৩৩৮৪) পরবর্তী সকল জীবন বৃত্তান্তের প্রকৃষ্ট উৎস। উহাতে তাঁহার পিতামহের নাম শাহ্ খুদাবান্দার পুত্র বায়রাম চাউশ (Bayram Cawush) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইসমা'ঈল হাক্কীর পিতার নাম ছিল মুস্তাফা। খুব অল্প বয়সেই তিনি মাতৃহারা হন। শায়খ 'উছমান ফাদ্লীর উপদেশানুসারে শিক্ষা লাভের উদ্দেশে তাঁহাকে এদির্নে-এ প্রেরণ করা হয়। তথায় শায়খের জনৈক আত্মীয় 'আলিম 'আবদু'ল-বাকী তাঁহাকে ব্যাকরণ, পদবিন্যাসবিদ্যা, অলংকারশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, ফিক্হ, ধর্মতত্ত্ব, তাফ্সীর ও হাদীছ শিক্ষা দান করেন। ইত্যবসরে তিনি তাঁহার মাতৃত্যক্ত অর্থ দ্বারা একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী গড়িয়া তোলেন। ১০৮৪/১৬৭৩ সালে লেখাপড়া শেষ করিয়া তিনি 'উছমান ফাদ্লীর বক্তৃতা শ্রবণ করিতে ইস্তাম্বুলে গমন করেন। ফিলিবে (Filibe)-এ পনের বৎসর অধ্যাপনা করিয়া 'উছমান ফাদ্'লী রাজধানীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি তরুণ ইসমা'ঈল হাক্কীকে স্বীয় জিল্ওয়াতিয়্যা (Djilwatiyya) তারীকায় দীক্ষা দান করেন। ইস্তাম্বুলের ইসমা'ঈল হাক্কীর আরও বহু 'আলিমের বক্তৃতা শ্রবণের সুযোগ হইয়াছিল। তিনি ফার্সী ভাষা শিখিয়া পারস্য সাহিত্যের নামজাদা কবি লেখকদের রচনা অধ্যয়ন করেন, বিশেষত 'আত্তার, রূমী, হাফিজ ও জামী লিখিত গ্রন্থরাজি। তিনি সুলিপিবিদ্যা ও সংগীতবিদ্যাও শিক্ষা করেন এবং একাদশ/ সপ্তদশ শতকের সূফী হুদায়ী (দ্র.) রচিত বহু স্তোত্রে সুরারোপ করেন। ১০৮৬/১৬৭৫ সালে 'উছমান ফাদলী তাঁহাকে তাবলীগের উদ্দেশে উসকুবে (Skopje) প্রেরণ করেন। তথায় তিনি জিলওয়াতিয়্যা তারীকার একটি খানকাহ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শায়খ মুসতাফা 'উশ্শাকীর কন্যাকে বিবাহ করেন। এইখানে তিনি ছয় বৎসর যাবত অজ্ঞ ইমামদের ও 'জাহিরী' শায়খদের অসহিষ্ণুতা ও অজ্ঞতা নিরসনের লক্ষ্যে কাজ করেন। প্রতিনিয়ত তাঁহার পীর 'উছমান ফাদ্লীর পত্র দ্বারা উজ্জীবিত হইয়া এইখানেই তিনি তাঁহার প্রোজ্জ্বলতম খুতবাসমূহ রচনা করেন (তাঁহার এই খুতবাসমূহের উত্তম পাণ্ডুলিপির উদাহরণ হিসাবে দ্র. বায়াযীদ লাইব্রেরীর ওয়ালিয়্যু'দ-দীন, নং ১৯০১)। কোপরুলু (Kuprulu) ও উস্তরুমচা (Stroumitza)-তেও তিনি প্রচারকার্য চালান। ১০৯৭/১৬৮৫ সালে বুরসায় 'উছমান ফাদলীর প্রতিনিধির মৃত্যুর পর তাঁহাকে সেখানকার জিলওয়াতিয়্যা খানকাহ্র প্রধান হিসাবে কাজ করিবার জন্য তাঁহার পীর তাঁহাকে নির্দেশ দেন। বুরসায় তাঁহার প্রথম বৎসরগুলি ছিল ১০৯৫/১৬৮৩ সালের মারাত্মক অস্ট্রীয় যুদ্ধাভিযান পরবর্তী সংকটের সময়। বাঁচার তাকীদে তখন ইসমা'ঈল হাক্কীকে তাঁহার পুস্তকসমূহ বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। হজ্জ পালন করিতে তিনি কয়েকবারই মক্কায় গমন করেন এবং তাঁহার পীর 'উছমান ফাদলীর সহিত সাক্ষাত করিতে সাইপ্রাসের ফামাগুসতা (Famagusta) যান (দৃঢ়তা সহকারে 'উছমানী পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করিবার অভিযোগে 'উছমান ফাদ্লীকে সেইখানে নির্বাসিত করা হইয়াছিল)। ইসমা'ঈল হাক্কী বিভিন্ন অভিযানেও অংশগ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর তিনি দামিশ্কে ও পরে উসকুদারে বসবাস করেন এবং অবশেষে বুরসায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন (তথা হইতেই তাঁহার নাম হয় ব্রুসাবী)। ১১০৩/১৬৯১ সালে পীরের মৃত্যুর পর উক্ত তারীকার প্রধান হিসাবে তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। বুরসায় তিনি একটি মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ করেন। সেইখানে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহাতে তিনি তাঁহার সব বইপত্র প্রদান করিয়া যান। ১১৩৭/ ১৭২৫ জুলাইতে তিনি বুরসায় ইনতিকাল করেন। তুযপাযারি (Tuzpazari)-র নিকট তাঁহার খানকাহ্য় তাঁহাকে দাফন করা হয়।

ইসমা'ঈল হাক্কী ছিলেন 'উছমানী 'আলিমদের মধ্যে সর্বাধিক গ্রন্থ রচয়িতাদের অন্যতম। তাঁহার রচিত ১০৬ খানা গ্রন্থ ও পুস্তিকার মধ্যে ৬০ খানা তুর্কী ভাষায়, বাকীগুলি 'আরবী ভাষায়। তাঁহার স্বাক্ষরিত পাণ্ডুলিপিসমূহের অধিকাংশ বুরসায় ইসমা'ঈল হাক্কী লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। তাঁহার রচনাবলী সহজ সাবলীল তুর্কী ভাষায় রচিত। সমকালীন অনেক লেখকের অলংকারবহুল রচনাশৈলী তিনি পরিহার করিয়াছিলেন।

**তাঁহার প্রধান রচনাবলী** ঃ (১) চার খণ্ডের রূহু'ল-বায়ান, বূলাক ১২৭৬ হি., আল-কুরআনের ভাষ্য এবং মাঝে মাঝে সূফীবাদী ব্যাখ্যা; (২) দুই খণ্ডের রূহু'ল-মাছনাবী, ইস্তাম্বুল ১২৮৭-৮৯ হি., জালালু'দ-দীন রূমীর মাছনাবীর অবতরণিকা অংশের ঐতিহ্যবাহী টীকা; (৩) ফারাহু'র-রূহ য়াযিজী ওঘলু (Yazidji oghlu) মুহাম্মাদের রচিত 'মুহাম্মাদিয়্যা'-এর ভাষ্য বূলাক ১২৫২ হি.; (৪) "শারহ-ই পান্দে 'আত্তার" ব্যাকরণগত টীকাসহ ফারীদু'দ-দীন 'আত্তার-এর পান্দেনামা-এর অনুবাদও ভাষ্য, ইস্তাম্বুল ১২৫০; (৫) সিলসিলা-ই তারীকাত-ই জিল্ওয়াতিয়্যা, উক্ত তারীকা সংক্রান্ত গ্রন্থ যাহাতে তাঁহার নিজের ও নেতৃস্থানীয় শায়খদের জীবনীও রহিয়াছে, ইস্তাম্বুল ১২৯১ হি.; (৬) দীওয়ান; তৎসহ একই খণ্ডে মাকালাত, বূলাক ১২৫৭ হি., ইস্তাম্বুল ১২৮৮ হি.; (৭) কানূন-ই মাখ্ফী, এই গ্রন্থে তিনি সূফীবাদ সম্পর্কে নিজ মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন, ইস্তাম্বুল ১২৯০ হি.; (৮) তুহ্ফা-ই খালীলিয়্যা, ইহা একখানি নৈতিক উপদেশ সংকলন, ইস্তাম্বুল ১২৫৬ হি.; (৯) মি'রাজিয়্যা, পদ্যে মুহাম্মাদ (স)-এর পবিত্র মি'রাজ সম্পর্কিত বর্ণনা, ইস্তাম্বুল ১২৬৯ হি.; (১০) কিতাবু'ন-নাতীজা, ১১৩৬/১৭২৪ সালে লিখিত তাঁহার অপ্রকাশিত শেষ রচনা (একটি ভাল পাণ্ডুলিপি 'আতীফ আফেন্দী লাইব্রেরী-তে আছে, নং ১৪৮৩)। য়ূনুস আমরী (Yunus Emre) হাজ্জী বায়রাম ও নিয়াযী-ই মিস্রী-র বিভিন্ন কবিতা সম্পর্কে তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষ্য বিভিন্ন সংকলনে (মাজমূ'আতে) পাওয়া যাইবে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) Brockelmann, II, 440 and S II, 652; (২) বুরসালী তাহির, মাওলানা শায়খ ইসমা'ঈল হাক্কী আল্-জিলওয়াতীর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের পূর্ণ বৃত্তান্তসহ জীবনী ইস্তাম্বুল ১৩২৯ হি.; (৩) ঐ লেখক, 'Othmanli Mu'ellifleri, ১খ, ২৮-৩২; (৪) Mehmed 'Ali' 'Ayni, Isma'il Hakki Bursawi hakkinda bir tedkik, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ.; (৫) ঐ লেখক, ইসমা'ঈল হাক্কী, Philosophe mystique, প্যারিস ১৯৩৩ খৃ., (৬) তুর্কী ভাষার ইসলামী বিশ্বকোষে ইসমা'ঈল হাক্কী প্রবন্ধ; (৭) Ruhnevaz Deringor, Ismail Hakki Bursavi, Hayative Turkee serleri, অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ, Turkiyat Library, ইস্তাম্বুল, নং ৪৭৫; (৮) Mahir Iz,

Tasavvuf, ইস্তাম্বুল ১৯৬৯ খৃ., ১৯৭-৯।

Gunay Kut (E.I.[2])/ এ. এইচ. এম. রফিক

**ইস্‌মা'ঈল হাক্কী 'আলীশান** (اسماعيل حقى عاليشان)ঃ 'আলীশান যাদা ইস্‌মা'ঈল হাক্কী আধুনিক তুর্কী ভাষায় ইসমা'ঈল হাক্কী-ইলদেম), ১৮৭১-১৯৪৪ খৃ., তুর্কী লেখক ও কূটনীতিক। ইম্পেরিয়াল স্কুলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে (Mulkiye) শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন এবং কনসুলার সার্ভিসের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন এবং মার্সিলিস, জুরিখ ও মিউনিখ-এ কনসাল জেনারেল ছিলেন। অবসর গ্রহণের অল্পকাল পরেই ১৯২৩ খৃ. তিনি 'আবদুল্লাহ জাওদাত (Djewdets)-এর ইজতিহাদ পত্রিকায় নিবন্ধকার হিসাবে যোগ দেন এবং নিয়মিতভাবে ১৯৩২ খৃ. পর্যন্ত তাঁহার সাহিত্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ক প্রবন্ধাদি উহাতে প্রকাশিত হয়। তিনি প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ইব্‌রাহীম আদ্‌হাম পাশা (দ্র.) (১৮১৮-১৮৯৩)-র দৌহিত্রী 'আযীযে হানিমকে বিবাহ করেন।

ইস্‌মা'ঈল হাক্কী ছাত্র জীবন হইতে সাহিত্য চর্চাকেই বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ এবং বহু গ্রন্থ, পুস্তিকা ও অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, বিশেষ করিয়া সাহিত্যিকদের জীবনচরিত ও ফরাসী সাহিত্য হইতে অনুবাদ। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে তিনি জীবনচরিত সাহিত্যের দুইটি ধারাবাহিক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই সাধারণ শিরোনামে সিরিজ দুইটি প্রকাশিত হয় ঃ On dordum dju "asir Turk muharrirleri S Othmanli meshahir-i udebasi. তাঁহার রচিত নিম্নোক্ত পাঁচটি পুস্তিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০; (Ahmed Midhat Efendi) [১৩০৮/১৮৯২] (Djewdet Pasha ১৩০৮/১৮৯২), রিজা'ইযাদে ইকরিম বে (Redja Izade Ekrem Bey) ১৩০৮/১৮৯২, জেওদেত পাশা (Djewdet Pasha ১৩০৮/১৮৯২)।

মু'আল্লিম নাজী আফিন্দি (Muallim Nadji Efendi) (১৩১১/১৮৯৫), শামসু'দ-দীন শামী বে (Shems-ed-Din Sami Bey) [১৩১১/১৮৯৫] এই সকল জীবনচরিত আধুনিক তুরস্কের সাহিত্য সমালোচনার প্রারম্ভিক দৃষ্টান্ত যাহা প্রায়ই উপেক্ষিত ছিল। ইহার কারণ এই যে, লেখক তৎকালীন কোন সক্রিয় সাহিত্য গোষ্ঠীর দলভুক্ত ছিলেন না। তাঁহার মুনতাখাবাত ঃ তারাজিম-ই মাশাহির (Muntakhanbul-feradisni meshahir) [১৩০৭/ ১৮৯১] তুর্কী লেখকগণ কর্তৃক অনূদিত বহু সংখ্যক ফরাসী সাহিত্যের সংকলন, তাঁহার অনূদিত বহু সংখ্যক ফরাসী গ্রন্থের মধ্যে Charles Baudelaire's Les Fleurs du mal, Elem cicekleri-এর অনুবাদ (ইস্তাম্বুল ১৯২৭ খৃ.) ১৯৩০ দশকের তুর্কী কবিদের নিকট ফরাসী প্রতীকবাদী কবিদের জনপ্রিয় করিয়া তোলে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) F. E. Karatay, Istanbul universitesi Kutuphanesi, Turkce basmalar alfabe Katalogu, Istanbul 1956, i, 183-84; (২) Idjtihad, স্থা.; (৩) Istanbul Ansiklopedisi দ্র., সংশ্লিষ্ট শব্দ, (S. H. Eldem); মাদ্রিদের তুর্কী রাষ্ট্রদূত কর্তৃক তাঁহার পুত্র মাদী ইলদেম-এর নিকট লিখিত পত্র (১৯৭১ খৃ.)।

Fahir Iz (E.I.[2])/ মমিন উল্লাহ

**ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী** (اسماعيل حسين سراجى)ঃ সৈয়দ আবু মোহাম্মদ কবি, সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক।

**জন্ম ও শৈশব** ঃ ১৮৭৯ মতান্তরে ১৮৮০ সালের ৫ আগস্ট বৃহত্তর পাবনা জেলার অন্তর্গত বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলা সদরে মাতুলালয়ে জন্ম। তাঁহার পিতা সৈয়দ আবদুর করীম ছিলেন প্রসিদ্ধ হাকীম (ইউনানী চিকিৎসক) ও ইসলাম প্রচারক, মাতার নাম নূরজাহান খানম। জন্মের পর তাঁহার নানা বাবু খান ও নানী গোলাপ বানু তাঁহার নাম রাখেন যথাক্রমে রুস্তম ও সেরাজুদ্দীন, ইসমাইল হোসেন মায়ের দেয়া নাম। সৈয়দ তাঁহার পারিবারিক উপাধি, পরে তিনি নামের আগে আবূ মুহাম্মদ উপনাম যোগ করেন এবং জন্মভূমি সিরাজগঞ্জ হইতে সিরাজী নিসবা গ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি ইসমাইল হোসেন সিরাজী নামেই সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। অবশ্য তাঁহার নামের প্রধান তিনটি অংশই এই স্বনামধন্য পুরুষের জীবনে সমভাবে সার্থক হইয়াছিল। যাঁহারা বাংলার এই অগ্নিপুরুষের প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা জানেন যে, তিনি কিংবদন্তীর ইরানী বীর রুস্তমের মতই অপরিসীম বীর্যবত্তার অধিকারী ছিলেন। আর বাংলার পতনযুগে মুসলিম জীবনের ঘন তমসায় তিনি ছিলেন সেরাজুদ্দীন— দীনের চেরাগ বা ধর্মের মশাল। আবার হযরত ইবরাহীম ('আ)-এর পুত্র ইসমা'ঈল ('আ)-এর মতই জাতি ও ধর্মের সেবায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। ইসমাইল হোসেন সিরাজী স্বধর্ম, স্বজাতি ও স্বদেশের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

ইসমাইল হোসেনের বাল্যকাল অতিবাহিত হয় তাঁহার মাতুলালয়ে। শৈশবে তিনি মায়ের নিকট কুরআন শরীফ পাঠ শিখেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পণ্ডিত সাহেব উদ্দীনের পাঠশালায় ভর্তি হন, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানদায়িনী মধ্য ইংরেজী স্কুলে, অতঃপর বানোয়ারী লাল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি পত্র-পত্রিকা পাঠ, বক্তৃতা দান, সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চা, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগ দেন। মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্যের কারণে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই।

ইসমাইল হোসেন সিরাজীর বানোয়ারী লাল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে পণ্ডিত রিয়াজ উদ্দীন আহমদ মাশহাদী রচিত 'সমাজ ও সংস্কারক' পুস্তকখানি তাঁহার হস্তগত হয়। এই গ্রন্থে প্রাচ্যের অগ্নিপুরুষ সৈয়দ জামালু'দ-দীন আফগানীর ঘটনাবহুল অসামান্য জীবনকর্ম ও অবদান সম্পর্কে অবগত হইয়া কিশোর সিরাজীর মনে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাঁহার ধারণা হয় যে, এই দেশে শিক্ষা লাভ করিয়া প্রকৃত জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের অধিকারী হওয়া যাইবে না। তাই তিনি তুরস্ক গমনের সংকল্প করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে স্কুলের শিক্ষা অসমাপ্ত রাখিয়া গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া এক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া তুরস্কে যাইবার মানসে তিনি কলিকাতা গমন করেন। সেইখানে ৯ নং কড়েয়া গোরস্তান লেনের মাসিক 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার অফিসে গিয়া উপস্থিত হন। পত্রিকার সম্পাদক মুনশী মুহাম্মদ রিয়াজ উদ্দীন আহমদ কিশোর সিরাজীর সংকল্পে বিস্ময় বোধ করেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে তাঁহাদেরকে তুরস্কে প্রেরণ সম্ভবপর ছিল না। তিনি প্রায় দেড় মাস কাল এইখানে সেইখানে ঘুরিয়া বিফল মনোরথ হইয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসেন এবং পুনরায় লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন। তিনি যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন যশোর জেলার ছাতিয়ানতলায়

স্বনামখ্যাত ধর্মবক্তা মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ সিরাজগঞ্জের বড়ইতলা মাঠে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। সেই সভায় কিশোর সিরাজী তাঁহার 'অনল প্রবাহ' কবিতা পাঠ করেন। কবিতা শুনিয়া মুনশী মেহেরুল্লাহ অতিশয় মুগ্ধ হন এবং নিজ খরচে তাহা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন।

**মায়ের প্রভাব ঃ** ইসমাইল হোসেনের জীবনে তাঁহার মায়ের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। তাঁহার মাতা অবসর সময়ে বই পড়িতে ভালবাসিতেন। মাতার এই অভ্যাস সিরাজীর জীবনেও কার্যকর হইয়াছিল। তিনি শৈশবকাল হইতেই পুস্তক পাঠে অভ্যস্ত হইয়া উঠেন। স্কুল ছুটির পর তাঁহার সহপাঠীরা যখন খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকিত তখন তিনি বই পড়ায় মনোনিবেশ করিতেন এবং মায়ের কাছে গল্প শুনিতেন। তিনি ছিলেন মাতাপিতার প্রথম সন্তান। মাতা নূরজহান খানম তাঁহার প্রথম সন্তানকে বিজ্ঞ, তেজস্বী ও ত্যাগী পুরুষ ও আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে বিশেষ যত্নবান হন। এই বিষয়ে নূরজাহান খানম বলেন, "আমি বই-পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম যে, মাতার সাধনার উপরেই সন্তানের সকল কিছু নির্ভর করে। সেইহেতু গর্ভের ভ্রূণাবস্থায় ধীর, জ্ঞানী, পণ্ডিত, সাধক, কবি ও বাগ্মী সন্তান লাভ করিব বলিয়া আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি এবং ধ্যান-ধারণা, মহৎ লোকের জীবনী আলোচনা, দান-খয়রাত, ইবাদত-বন্দেগী, যুদ্ধের কাহিনী, কারাবালার ঘটনা, সিরিয়া ও মিসর বিজয়, ইরান বিজয়, রামায়ণ, মহাভারত, খালেদ, নেপোলিয়নের জীবনী প্রভৃতি পাঠ করিতাম।" শিশু সিরাজীর নামকরণ তাঁহার জননীর ইচ্ছা অনুসারে করা হয়। শিশুর নাম কী হইবে সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ আমি ত ইহার নাম রাখিতে চাই ইসমাইল হোসেন। ইসমা'ঈল ('আ) যেমন আল্লাহ্‌র নামে 'জবেহ' হইয়াছেন এবং হুসায়ন (রা) যেমন ধর্মের জন্য, জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থে নিখিল বন্দী মানবের বন্ধন বেদনায় অধীর হইয়া নিজেকে, নিজের স্বগোষ্ঠীকে বিসর্জন দিয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, আমিও আমার পুত্রকে সেইরূপ দেখিতে চাই।"

**কর্মজীবন ঃ** খুব অল্প বয়সে বালক সিরাজী যখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র তখন তিনি তাঁহার এক শিক্ষকের কাছে আমাদের পরাধীনতার কারণ জানিতে চাহিয়াছিলেন। শিক্ষক এই বয়সের বালকের মুখে এই কথা শুনিয়া বিস্মিত ও আশান্বিত হইয়াছিলেন। স্কুলের মানচিত্রে খাইবার পাশের রেখা সন্ধান করিতে দেখিয়া তাঁহার এক সহপাঠী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি খাইবার পাশের দিকে বারবার কী দেখিতেছ?" জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন, "য়ুরোপ কোন্ পথে যাইতে হয় তাহাই দেখিতেছি।" শৈশব হইতেই সিরাজীর মনে দেশের পরাধীনতার জন্য ক্ষোভ ও বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচিত হইবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি নিজেকে একজন তেজস্বী বক্তারূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন।

তদানীনন্তন বিশ্বের বিপ্লবী নেতা জামালু'দ-দীন আফগানীর জীবনী পাঠ করিয়া তিনি অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেকে ভবিষ্যত রাজনৈতিক ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের কর্মী হিসাবে গড়িয়া তোলার সাধনায় নিয়োজিত হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম হইতেই তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাহসিকতার পরিচয় দেন। এই আন্দোলন উপলক্ষেই তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের সূচনা হয়। সিরাজী সারা জীবন দৃঢ় প্রত্যয় ও আপোসহীন সাহসিকতার সহিত সেই লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের মুকাবিলা করেন।

তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে তাঁহার প্রথম কাব্য 'আল প্রবাহ'-কে কেন্দ্র করিয়া। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হওয়ামাত্র সরকার ইহা বাজেয়াফত করে এবং সিরাজীকে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়। 'কারাকাহিনী' নামক প্রবন্ধে তিনি তাঁহারা কারাজীবনের হৃদয়বিদারক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৯১২ সালের ১৪ মে তিনি কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং সেই সময় বলকান যুদ্ধে লিপ্ত তুরস্কের সাহায্যের জন্য ডাক্তার আনসারীর নেতৃত্বে যে মেডিক্যাল মিশন পাঠান হয় তিনি ইহার সদস্যরূপে তুরস্ক গমন করেন (২ ডিসেম্বর, ১৯১২ খৃ.)। সেখানে তিনি আহত সৈনিকদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তুরস্কের সুলতান তাঁহাকে গা'যী উপাধিতে ভূষিত করেন এবং পদক ও শাহী পোশাক উপহার দিয়া সম্মানিত করেন। সেই সময় তিনি তুরস্কের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করেন এবং দেশপ্রেমমূলক অনেক কবিতা রচনা করেন। ১৯১৩ সালের ১৫ জুলাই তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন।

তুরস্ক হইতে ফিরিয়া সিরাজী নূতন উদ্যমে রাজনৈতিক ও সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং এই সংগঠনের সঙ্গে তিনি আজীবন সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হয়। স্থানীয় হিন্দু সমাজ সিরাজীকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করিতে রাযী না হওয়ায় স্থানীয় মুসলিম নাগরিকগণ ক্ষুব্ধ হইয়া পৃথকভাবে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মুসলিম মহাসভার আয়োজন করিয়া ইসমাইল হোসেনকে তাঁহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করেন। মাত্র এক সপ্তাহের আয়োজনে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১ থেকে ৩ জুন তিনদিনব্যাপী মুসলিম মহাসভার অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা হইতে আগত প্রায় পঁচিশ হাজার মুসলিম সদস্য যোগদান করেন এবং প্রায় পাঁচ হাজার মুসলিম তরুণ সেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করেন। জলপাইগুড়ির নওয়াব বাহাদুর মুশাররফ হুসায়ন এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে ইসমাইল হোসেন যে ভাষণ দেন তাহাতে তৎকালীন বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক দুর্গতি, স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, কংগ্রেসের নীতি, হিন্দু-মুসলিম বিরোধের কারণ, মুসলিমদের প্রতি ইংরেজ সরকারের বৈরীসুলভ আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ ও বিস্তারিত আলোচনা করেন। ভাষণে তিনি বাঙ্গালী মুসলিম সমাজকে সংঘটিত ও জাগ্রত হইবার আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, বাঙ্গালার মুসলিম সমাজ আজ জীবন সংগ্রামে সকলের পিছনে পড়িয়া আছে। ... সে এখনও প্রাচীন জগতের স্বপ্ন ও গাফলতির কবরেই যেন শায়িত রহিয়াছে, চোখ মেলিয়া আধুনিক দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব মহিমা দেখিতেছে না, তাহার দৃষ্টি পরকালের দিকেই খুব বেশী। কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছে যে, পারলৌকিক গৌরব ও প্রাধান্য কামনার ন্যায় ইহ জগতেও বৃহৎ, মহৎ ও শক্তিশালী হইতে তাহার পূর্ণ অধিকার আছে। জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্যই পৃথিবীতে মানবের আগমন, আর এই বিকাশ হইতেছে ধর্মে এবং কর্মে। কর্ম ব্যতীত মানব জীবন ব্যর্থ, বরং কর্মই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতি দৃঢ় আস্থা পোষণ করিয়াও তিনি অনগ্রসর মুসলিম সমাজের জন্য আলাদা সংগঠন করিবার উপদেশ দেন।

মুসলমানদেরকে স্বরাজ সংগ্রামে দ্রুত অগ্রসর করিবার জন্যই স্বতন্ত্র জাতীয় সভা ও জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠন করা কর্তব্য। বর্ণ হিন্দুর সহিত সর্বতোভাবে মিশিয়া গেলে মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কিছুই থাকিবে না।... গঙ্গা ও যমুনা বিভিন্ন নির্ঝর হইতে নির্গত হইলেও প্রয়াগ বা আহমদাবাদে আসিয়া উভয়ে যেমন সম্মিলিত হইয়াছে, তেমনি একদিন সত্যিকার মুক্তির জন্য হিন্দু-মুসলমানকে সমানভাবে মিলিতেই হইবে। পরে মোহাম্মদ আবদুল হাকিম সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'ইসলাম-দর্শন'-এর ১৩৩১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় এই সম্মেলনের বিবরণ ও ইসমাইল হোসেন সিরাজীর ভাষণ প্রকাশিত হয়।

**সংস্কৃতি ও সংগঠনমূলক কাজ** ঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর উদ্যম ও সহায়তায় বেশ কয়েকটি সমাজ কল্যাণ ও সংগঠনমূলক সংস্থা গড়িয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে 'মুসলিম তরুণ সঙ্ঘ', 'নূরনবী সেবক সঙ্ঘ', 'আঞ্জুমানে খাদেমুল ইসলা[illegible] এই কয়েকটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলাদেশের [illegible]ভিন্ন জায়গায় মুসলিমদের মধ্যে 'বায়তু'ল-মাল ফান্ড', 'লোন কোম্পানী বা ঋণ দান সমিতি' এবং নানা ধরনের সেবা সমিতি ও সমবায়মূলক 'তেজারতি কারবার সমিতি' গঠন ও পরিচালনা করেন। তিনি পুরাতন ইসলামী বিদ্যাপীঠ বা মাদ্‌রাসাগুলিকে মাতৃভাষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন এবং মসজিদসমূহে বাংলা ভাষায় খুত্‌বা দেওয়ার আন্দোলন করেন। মুসলিম জনগণকে উৎসাহিত ও সংগঠিত করিবার উদ্দেশে তিনি মুহাররাম, শবে 'মি'রাজ, শবে বরাত, শবে কাদর, 'ঈদু'ল-ফিত্‌র, 'ঈদু'ল-আদ্‌হা প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেলা করার এবং মেলায় খেলাধূলা, শরীর চর্চা ও বিভিন্ন রকমের নির্দোষ আনন্দ করার ব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা করেন। 'নহুয়া' ও 'নিকিরী' শ্রেণীর মুসলিমদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চার বড় অভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচার মানসে পাঠশালা, নৈশ বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করেন। সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির নানাবিধ অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন গড়িয়া তোলেন এবং এই সকল বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের উদ্দেশে 'রেট পেয়ার্স এসোসিয়েশন' গঠন করেন। কৃষক সমাজের মধ্যেও তিনি সংগঠনমূলক আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ ও আসামের বড়পেটা অঞ্চলের প্রজা আন্দোলনে এবং ওয়াটসন কোম্পানীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি সফল নেতৃত্ব দান করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় কাউন্সিল সদস্য পদের জন্য নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করিয়া অকৃতকার্য হন। তাঁহার শেষ জীবনে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দানের 'অপরাধে' তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আসাদউদ্দৌলা সিরাজীকে তাঁহার আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ১৯ বৎসর বয়সের তরুণ আসাদউদ্দৌলা সিরাজী কলিকাতায় দেশবন্ধু পার্কে সরকার-বিরোধী বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হন। তাঁহার তরুণ বয়স বিবেচনা করিয়া উচ্চ আদালতের বিচারপতি মিস্টার সি. সি. ঘোষ ইসমাইল হোসেন সিরাজীকে ডাকিয়া পিতা হিসাবে এই মর্মে মুচলেকা দিতে বলেন যে, আসাদউদ্দৌলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে উত্তেজনামূলক প্রচার হইতে বিরত থাকিবেন। সিরাজী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে আসাদউদ্দৌলার তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। সিরাজগঞ্জের অধিবাসীরা উৎফুল্ল হইয়া তাঁহাকে জেল বরণ করার জন্য অভিনন্দন জানায় এবং স্বর্ণ মাল্যে ভূষিত করিয়া সম্মান প্রদর্শন করে। গর্বিত পিতা ইসমাইল হোসেন তাঁহার নিজের ডান হাতের আঙ্গুল কাটিয়া পুত্রের কপালে রক্ততিলক পরাইয়া দেন। দেশের স্বাধীনতা ও জাতির কল্যাণের জন্য স্বধর্ম ও স্বীয় ঐতিহ্য উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিবার জন্য ইসমাইল হোসেন সিরাজীর মনোভাব কিরূপ ছিল, এই ঘটনা হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

**চরিত্র-বৈশিষ্ট্য** ঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী শৈশবে অবস্থাপন্ন সরকারী কর্মচারী মাতামহের বাড়িতে প্রাচুর্যের মধ্যে ও আত্মীয়-স্বজনের আদরে লালিত হন। তাঁহার জননী স্বধর্ম, স্বসমাজ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, আদর্শপরায়ণ বিদুষী মহিলা ছিলেন। উত্তরকালে সিরাজীর সাহিত্যে মুসলিম সমাজের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় চেতনার যে অকুতোভয় অনুসন্ধান-প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহার সূচনা তাঁহার শৈশব জীবনের এই পরিবেশের মধ্যেই হইয়াছিল। সিরাজীর চরিত্রে কড়ি ও কোমলের সম্মেলন ঘটিয়াছিল। তিনি কোন কোন কারণে অনমনীয় ভাব পোষণ করিতেন, আবার কখনও বা বেশী পরিমাণে উদারতা প্রদর্শন করিতেন। শৈশব হইতেই তাঁহার সৌন্দর্যবোধ ছিল প্রখর। তিনি ফুল খুব ভালবাসিতেন। পাঠশালায় অধ্যয়নকালে স্কুলে একবার পরিদর্শক আসেন। তিনি ছাত্রদেরকে কোন্ ফুল পসন্দ করেন জানিতে চাহিলে সিরাজী নিজের পকেট হইতে এক মুষ্টি গোলাপ বাহির করিয়া পরিদর্শকের হাতে দেন। তাঁহার সহপাঠিরা বলে, সকল সময়ই তাঁহার কাছে ফুল থাকে।

সিরাজীর আত্মমর্যাদা ও সৌজন্যবোধ ছিল খুবই তীক্ষ্ণ। তিনি কখনও খালি গায়ে বাড়ির বাহিরে যাইতেন না। বাড়ির ভিতরে খালি গায়ে খেলাধুলা করিলেও বাহিরে যাইবার সময় তিনি জামা-কাপড়ে সজ্জিত হইয়া যাইতেন। তাঁহার আত্মসম্মানবোধ সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে। একবার খৃষ্টানদের বড়দিন উপলক্ষে তিনি তাঁহার মাতামহের সঙ্গে একটি সরকারী উৎসবে যান। সেইখানে কোন কারণে এক সিপাহী তাঁহাকে 'হেইও ছোকরা' বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া সিপাহীর শাস্তি দাবী করেন। পরে সিপাহী তাঁহার মাতামহের পরিচয় জানিতে পারিয়া লজ্জিত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। তের-চৌদ্দ বৎসর বয়সে একবার তিনি তাঁহার পিতামহের সঙ্গে জমিদার ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তীর বাড়ী যান। সেইখানে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের বসিবার জন্য বিভিন্ন রকমের আসন পাতা ছিল। জমিদার ইঙ্গিতে তাহাদেরকে মোড়ায় বসিতে বলায় সিরাজীর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। তিনি তাঁহার তীব্র প্রতিবাদ করিলে জমিদার তাঁহাদের বসিবার জন্য চেয়ার দেন।

তিনি পোশাক-পরিচ্ছদ ও আদব-কায়দায় নিজস্ব জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে দৃঢ় মনোভাব পোষণ করিতেন। একবার এক হিন্দু শিক্ষক তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, "টুপি না পরিলে তোমাকে ব্রাহ্মণ বালকের মতো দেখাইত।" তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তরে বলেন, "আর টুপি পরিলে শাহযাদার মত দেখায়।" আর একবার এক শিক্ষক তাঁহাকে বলেন, "তোমার উচ্চারণ মুসলিম ছেলেদের মত অস্পষ্ট নয়, হিন্দু ছেলেদের মত স্পষ্ট।" তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "পল্লী গ্রামের অশুদ্ধ উচ্চারণের সঙ্গে হিন্দু চাষীর ছেলেদের উচ্চারণেরই তুলনা হয়। আমাদের মুসলিম পরিবারের সহিত সকলের তুলনা হইতে পারে না।"

ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজের প্রতি কোন বিরূপ মন্তব্য কিংবা কোন অশোভন উক্তি বা আচরণ সিরাজী সহ্য করিতে পারিতেন না। ছাত্র

অবস্থায় একবার বি.এল. স্কুলের কোন ছাত্র স্বরস্বতী সম্মেলনের রচনা প্রতিযোগিতায় মুসলিমদেরকে 'যবন' বলিয়া উল্লেখ করায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন এবং ছাত্রটির শাস্তি দাবী করেন। কোন এক শ্রেণীর ইংরেজী পাঠ্য পুস্তকের এক স্থানে 'আল্লাহ' শব্দটি ছিল। কোন ছাত্র পাঠ পড়ার সময় সেই স্থলে 'গড' পড়ে। সিরাজী তাহাতে উত্তেজিত হইয়া ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, 'আল্লাহ' ও 'গড' উভয়ই বিদেশী শব্দ। 'গড' পড়িতে পারিলে 'আল্লাহ' পড়িতে আপত্তি কেন ? একবার এক ধর্মসভায় ব্রাহ্ম ধর্মের বিশিষ্ট নেতা গিরিশচন্দ্র সেন হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে শেষ নবী বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি করেন। তাঁহার মতে শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য, কবীর, নানক, রামমোহন, ইঁহারাও নবী ছিলেন। সেই সভায় অনেক শিক্ষিত মুসলিমও উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের কেহই প্রতিবাদ করিতেছেন না দেখিয়া বালক সিরাজী ক্ষুব্ধ হন এবং দাঁড়াইয়া কঠোর ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করেন। তিনি যুক্তি সহকারে হযরত মুহাম্মাদ (স) যে শেষ নবী ছিলেন তাহা প্রতিষ্ঠিত করেন। একবার স্কুলে 'পলাশীর যুদ্ধ' নাটক মঞ্চস্থ করিবার আয়োজন করা হয়। ইহাতে সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র কলঙ্কপূর্ণ করিয়া অঙ্কিত হইয়াছিল বলিয়া সিরাজী এই নাটকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। অবশেষে কর্তৃপক্ষ তাহা বন্ধ করিতে বাধ্য হন।

সিরাজী ধর্মীয় ব্যাপারে অন্ধ গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি পুরাতন রীতির মাদ্‌রাসায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তিনি নিজে বিজ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাস পড়িতে ভালবাসিতেন। তিনি বাংলা, ইংরেজী, 'আরবী, ফারসী, তুর্কী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

**সাহিত্যকর্ম ঃ** উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার মুসলিম জাগরণে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর অবদান অবিস্মরণীয়। আধুনিক বাংলার তথা পাক-ভারত বাংলা উপমহাদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিক্ষা ও ইসলামী ভাবধারার উপর পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবের ফলে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য বাঙ্গালী হিন্দু মানসে এক নূতন সাড়া জাগাইয়াছিল, সৃষ্টি করিয়াছিল এক নব জাগৃতিবোধের। ইহারই প্রভাব, বিশেষ করিয়া ১৮০০ খৃস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইবার পর হইতে এই দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্য চর্চারও বিস্তার লাভ ঘটিয়াছিল।

কিন্তু কতগুলি বোধগম্য কারণেই বাঙ্গালী মুসলিম সমাজ এই শিক্ষাধারায় অংশগ্রহণে আপত্তি করিয়াছিল। ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশী প্রান্তরে এই দেশের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হইয়া গেলে মুসলিম জীবনে এক ঘন দুর্যোগময় অমানিশা নামিয়া আসে। রাজ্যহারা মুসলিমগণ কিছুতেই চরম শত্রু পররাজ্যলোভী ইংরেজদের সঙ্গে আপোস করিতে পারে নাই। তাহাদের ক্ষোভ ও আক্রোশ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর এই সুযোগে তাহাদেরকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া প্রতিবেশী হিন্দু সমাজকে হাত করিয়া ছলেবলে ও কৌশলে ইংরেজরা তাহাদের শাসন সুদৃঢ় করিবার ব্যবস্থা করে। ফলে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা দিক হইতে বাঙ্গালী মুসলিমের মেরুদণ্ড কুব্জ হইয়া গিয়াছিল।

এই ঘোর কাটাইয়া মুসলিম সমাজ যখন আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইল, তাহারা যখন বুঝিতে পারিল যে, আপোস ছাড়া গত্যন্তর নাই, তখন ধীরে ধীরে ইংরেজী শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। মুসলিমের এই নব জাগরণের যুগে যাঁহারা সাহিত্য চর্চায় অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁহাদের অন্যতম। এই সময় শিক্ষা ও সাহিত্যকর্মে, ধর্মীয় চেতনা ও কর্তব্যবোধে বাঙ্গালী মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করিবার ব্রত লইয়া আরও অনেক মনীষীই অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মীর মোশাররফ হোসেন, রিয়াজউদ্দীন মাশহাদী, মুনশী রিয়াজউদ্দীন আহমদ, মুনশী মেহেরুল্লাহ, মুনশী জমীর উদ্দীন, শেখ আবদুর রহীম, দাদ আলী, মোজাম্মেল হক প্রমুখ মনীষীর নাম অবিস্মরণীয়।

বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য সাধনা এই সময়ে দুইটি বিশিষ্ট ধারায় চলিতে থাকে। ইহাদের একটিতে দেখা যায় নিছক ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস। সুধাকর দল ইহার উদ্যোক্তা ও অনুসারী। অপর একটি দল নিছক সাহিত্যধর্মী সৃষ্টির চেষ্টা করেন। মুসলিম ঐতিহ্যকে বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে রূপায়িত করিয়া বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করাই ছিল এই শেষোক্ত দলের বিশেষ লক্ষ্য। ইহাদের আদর্শ ছিলেন তদানীন্তন হিন্দু লেখকরা। ইঁহারা সাহিত্য সৃষ্টি করিবার জন্য যতখানি বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন, মুসলিম জাতীয় জীবন রচনা করিবার জন্য ততখানি করেন নাই। এই দলে ছিলেন মীর মোশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক প্রমুখ। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর হইতে ১৯১১ খৃস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হইবার পূর্ব পর্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে ইসলামী সাহিত্য রচনা করিবার প্রয়াস সত্ত্বেও মুসলিমদের পক্ষ হইতে হিন্দুদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া একটি সমন্বয়ধর্মী সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য বাংলার হিন্দুগণ যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে এই প্রয়াসের ভিত্তিমূলে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রথমবারের মত প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছিল। মুসলিমদের মধ্যে কেহ কেহ এই কথা বুঝিতে পারিলেন যে, যেমন রাজনীতিতে তেমন সাহিত্য ক্ষেত্রেও হিন্দু মুসলিমের মত ও পথ এক নয়। মুসলিমকে বাঁচিতে হইলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই এই শতাব্দীর প্রথম দশকে (১৯০৬ খৃ.) যেমন বাংলাদেশেই ঢাকা নগরীতে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়, তেমনি সাহিত্যেও এই সময় থেকেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর মধ্যেই প্রথমবারের মত এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবলতর আত্মকেন্দ্রিক প্রকাশ দেখা যায়। রাজনৈতিক কারণে ১৯১০ খৃস্টাব্দে তাঁহাকে দুই বৎসর কারাবাস করিতে হয়। এই কারাবাসকালেই তাঁহার মতামত সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। ইহার পর তাঁহার বক্তৃতায়, কথায়, কাজে ও সাহিত্য সৃষ্টিতে মুসলিমদের মনের উপর হইতে হিন্দু প্রভাবজনিত দুর্বলতা অপসারিত করিয়া তাহাদের আত্মসম্বিৎ ও আত্মবিশ্বাস ফিরাইবার এবং হীনমন্যতা দূর করিয়া আত্মসম্মানবোধ উজ্জীবিত করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। বাঙ্গালী মুসলিমের সাহিত্য সাধনায় এবং জাতীয় জীবনের ইতিহাস রচনায় ইসমাইল হোসেন সিরাজীর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি এই যুগের সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে পরিবর্তনের সূত্রপাত করেন, — খিলাফত আন্দোলনের সমসাময়িককাল এবং অব্যবহিত পরের কাজী নজরুল ইসলাম ও কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ সাহিত্যিকের সমন্বয়ধর্মী সৃষ্টি সাধনাকে বাদ দিলে দেখা যায়, সিরাজী প্রবর্তিত সেই পথই পাকিস্তান আন্দোলনে যেমন সহায়তা করিয়াছে, তেমনি পূর্ববাংলার জাতীয় সাহিত্যের পথকেও সুগম করিয়াছে।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রত্যক্ষভাবে ওহাবী আন্দোলনে জড়িত ছিলেন না। তবু ভাবে, চিন্তায় ও কর্মে ওহাবী আন্দোলনের সহিত

তাঁহার কর্মের ও চিন্তার আদর্শগত মিল দেখা যায়। ভারতীয় মুসলিমদের সংঘবদ্ধ করিতে হইলে তাহাদের অতীত গৌরব, শৌর্যবীর্য আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে— এই পুনর্জাগরণ-চিন্তা-পদ্ধতিও তাঁহার মধ্যে মূর্ত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে ভারতীয় মুসলিমদের পুনরুজ্জীবনবাদ, অপর দিকে নিখিল বিশ্ব মুসলিমের সংঘবদ্ধতাজনিত 'প্যান-ইসলামী' দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জীবনের গতিপথ নির্ধারিত করিয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে মুসলিম ইসমাইল হোসেন সিরাজী বাংলা সাহিত্যে হিন্দু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখের সমধর্মী। মুসলিম জাতীয়তার পরিকল্পনায় তিনি 'আল্লামা শিবলী নু'মানী, 'আল্লামা ইকবাল প্রমুখ মনীষীরই জীবনাদর্শবাহী ও সাহিত্য সৃষ্টিতে ইসলামী জীবনাদর্শের ব্যাখ্যাকার। এই দিক দিয়া সাহিত্যিক জীবনে 'সুধাকর' দলেরই তিনি অনুবর্তী অর্থাৎ শেখ আবদুর রহীম, মুনশী মুহম্মদ রিয়াজ উদ্দীন আহমদ, পণ্ডিত রিয়াজ উদ্দীন মাশহাদী ও মৌলবী মেয়রাজ উদ্দীনের তিনি উত্তরসাধক। ইঁহাদের সঙ্গে সিরাজীর পার্থক্য এই যে, এক শেখ আবদুর রহীম ব্যতিরেকে তাঁহার পূর্ববর্তীদের কাহারও সাহিত্যিক জীবন তাঁহার মত তত বিস্তৃত নয়। তবে এই কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তাঁহার রচিত সাহিত্যে যতখানি হৃদয়ের উষ্ণতা আছে, সেই পরিমাণে তাহা সার্থক সাহিত্য হইয়া উঠে নাই। মুসলিম জাতির ঘুম ভাঙ্গানই ছিল তাঁহার একমাত্র সাধনা। নিপীড়িত মুসলিম জ্ঞানে, কর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে সমুন্নত হউক— এইই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত।

ইসমাইল হোসেন সিরাজীর প্রথম রচনা কোথায় কিভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, স্কুলে পড়িবার সময় হইতেই তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করেন। পত্র-পত্রিকার সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছিল। তিনি সমসাময়িক কালের হিন্দু ও মুসলিম পরিচালিত প্রায় সকল পত্রিকায়ই লিখিতেন। পত্রিকা লেখক হিসাবে তাঁহার মর্যাদা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল। কেবল লেখক হিসাবেই নয়, পত্রিকার পরিচালনার ব্যাপারেও তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। 'ইসলাম প্রচারক', 'কোহিনূর', 'নবনূর', 'আল-এছলাম', 'বাসনা', 'প্রচারক', 'নুরুল ইমান', 'মসজিদ', 'মোসলেম জগৎ', 'সন্ধ্যা', 'আরতি', 'সঞ্জীবনী', 'যুগান্তর', 'উপাসনা', 'সহচর', 'প্রবাসী', 'নব্যভারত', 'ইসলাম দর্শন' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখিতেন বলিয়া জানা যায়।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী গীতি-কবিতা, মহাকাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনায় দক্ষতা প্রদর্শন করেন। তিনি প্রায় ত্রিশটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার রচিত সাহিত্যকর্মের অনেক আজও অপ্রকাশিত রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ

(ক) গীতিকাব্য ঃ ১. অনল প্রবাহ (১৩০৭/১৯০০); ২. উদ্বোধন (১৩১৪/১৯০৭); ৩. নব উদ্দীপনা (১৩১৪/১৯০৭); ৪. প্রেমাঞ্জলি (১৩২৩/১৯১৬) ও ৫. সঙ্গীত সঞ্জীবনী (১৩২৩/১৯১৬)।

(খ) মহাকাব্য ঃ ১. উচ্ছ্বাস (১৩১৪/১৯০৭) ও ২. স্পেন বিজয় কাব্য (১৩২১/১৯১৪)।

(গ) উপন্যাস ঃ ১. রায়নন্দিনী (১৩২৩/১৯১৬); ২. তারাবাই (১৩২৩/১৯১৬); ৩. নূর উদ্দীন (১৩২৩/১৯১৬) ও ৪. ফিরোজা বেগম (১৩২৫/১৯১৮)।

(ঘ) প্রবন্ধ ঃ ১. স্ত্রী শিক্ষা (১৩১১/১৯০৪); ২. স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা (২য় সং ১৩২০/১৯১৩); ৩. তুরস্ক ভ্রমণ (১৩২০/১৯১৩); ৪. তুর্কী নারী জীবন (১৩২০/১৯১৩); ৫. আদব কায়দা শিক্ষা (১৩২১/১৯১৪) ও ৬. সুচিন্তা ১ম খণ্ড (১৩২৩/ ১৯১৬)।

তাঁহার অপ্রকাশিত রচনা ঃ (ক) গীতি কবিতা— ১. সুধাঞ্জলি; ২. কুসুমাঞ্জলি; ৩. পুষ্পাঞ্জলি; ৪. কাব্য কুসুমোদ্যান; ৫. আবে হায়াত। (খ) মহাকাব্য ঃ মহাশিক্ষা কাব্য; (গ) কাহিনী কাব্য ঃ গৌরব কাহিনী, (ঘ) গদ্য রচনা— ১. তুরস্ক ভ্রমণ (২য় খণ্ড); ২. সুচিন্তা (২য় খণ্ড); ৩. নব্যতুর্কী, ৪. মুক্তির বাণী; ৫. কারা কাহিনী।

ক. গীতিকাব্য ঃ ১. 'অনল প্রবাহ' কাব্য গ্রন্থ তুর্যধ্বনি, মূচ্ছর্না, বীর পূজা, অভিভাষণ, ছাত্রগণের প্রতি, মরক্কো সংকট, আমীর আগমনে, দীপনা ও আমীর অভ্যর্থনা— এই নয়টি কবিতার সংকলন। পরে ১৩৬০ সালে প্রকাশিত 'অনল প্রবাহ' কাব্যের নব সংস্করণে তিনটি কবিতা সংযোজিত হয়। এই কবিতা তিনটি আগে 'উদ্বোধন' কাব্যে সংকলিত হইয়াছিল। 'উদ্বোধন' কাব্যের অষ্টম, নবম, ও দশম সংখ্যা কবিতা যথাক্রমে 'মিসরের অভ্যুত্থান' 'উন্মেষণা' ও 'স্পেনের প্রতি'। উদ্দীপনাময় 'অনল প্রবাহ' ২৯ পৃষ্ঠার দীর্ঘ কবিতাটির সহিত আরও ছয়টি কবিতা যুক্ত করিয়া কাব্যাকারে প্রকাশ করা হয় (১৩০৭ বাংলা)। 'অনল প্রবাহ' কাব্যের অগ্নিবাণী, ভাবের তীব্রতা ও ভাষার তেজস্বিতা গুণে সমাজের সর্বত্র এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সকল রচনার ভাবাদর্শ ও ভাবৈশ্বর্য দেখিয়া দেশবাসী কবির প্রতিভা শক্তি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উচ্চকিত হইয়া উঠে। কাব্যখানি খুবই সমাদর লাভ করিয়াছিল। কতিপয় 'হিংসুক ও নিন্দুক' কাব্যখানির দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করিয়া বেনামীতে নানাভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া কবিতা লেখায় কবি মনক্ষুণ্ন হন।

২. 'উদ্বোধন' কাব্যখানি ১২টি খণ্ড কবিতার সংকলন। বোধনগীতি, এই কি সেই দেশ, কল্য ও অদ্য, অতীত কাহিনী, বিলাপ, স্বাধীনতা-ব্যঞ্জনী, চাঁদ সুলতানা, মিসরের অভ্যুত্থান, উন্মেষণা ও স্পেনের প্রতি, বজ্রধ্বনি ও 'আরব— এই কয়টি কবিতা প্রথম সংস্করণে এই কাব্যে স্থান পাইলেও পরবর্তী সংস্করণে মিসরের অভ্যুত্থান, উন্মেষণা ও স্পেনের প্রতি, কবিতা তিনটি বাদ পড়ে। কাব্যখানি কবি তাঁহার ভগিনী 'নূরজাহান খানুম' সাহেবার সুপবিত্র চরণারবিন্দে উৎসর্গ করেন। সুদানের মহাবীর মুহাম্মাদ আহমাদ মাহদী যে আরবী কাফিয়ার উদ্দীপন রসে জাতীয় জীবনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন, 'স্বাধীনতা বন্দনা' কবিতাটি তাহারই ভাবানুবাদ। স্বাধীনতার জন্য এই উপমহাদেশের জনগণকে মুক্তির আহ্বান জানানোই এই কাব্যের কবিতাগুলির প্রাণরস। কবির ভাষায় ঃ

পতিত জাতির উদ্ধার হেতু
উড়াও আকাশে রক্তিম কেতু
জাগুক মাতুক ফুটুক দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা !
জয় জয় জয় স্বাধীনতা !!

৩. 'নব উদ্দীপনা' কাব্যখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও দেশাত্মবোধক একটি দীর্ঘ কবিতা। সাতাইশ পৃষ্ঠাব্যাপী এই কবিতায় একান্নটি স্তবক এবং প্রতি স্তবকে আটটি চরণ। এই কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে 'হিন্দুর প্রতি', 'মুসলিমানের প্রতি', 'দুর্ভিক্ষের ভিক্ষা', 'আহ্বান', 'বন্দনা' প্রভৃতি চৌত্রিশটি দেশপ্রেমমূলক গান স্থান লাভ করিয়াছে। স্বদেশ-প্রীতি ও মানবতার জয়গান এই কাব্যের প্রধান উপজীব্য। জনগণের

জাগরণ ছাড়া যে দেশের মুক্তি সম্ভব নয়, এই কথা তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তীর্যক ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনিই বলিয়াছেন ঃ

কিছুতেই হবে না সাধন
যতই কেন বল না ভাই 'বন্দেমাতরম' !
কামার কুমার চাষী তাঁতি,
যতদিন না উঠবে মাতি,
যতদিন না করে তারা নেত্র উন্মীলন !

লক্ষণীয় যে, 'উদ্বোধন' ও 'নব উদ্দীপনা' একই বৎসর প্রকাশিত হয়। ইহাদের গান ও কবিতাগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তৃতীয় কাব্যখানি কবি তাঁহার মাতামহের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন।

৪. 'প্রেমাঞ্জলি কাব্য'— এই কাব্যে ২০৩টি প্রেম ও অধ্যাত্মমূলক কবিতা সংকলিত হইয়াছে। ইহার কবিতাগুলি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ১২৮টি এবং দ্বিতীয় ভাগে ৭৫টি কবিতা রহিয়াছে। ভূমিকায় প্রকাশক নিবেদন করিয়াছেন ঃ

সেই বিসুবিয়াসের অনল শিখাপুঞ্জের পার্শ্বেই নন্দন কাননে অপার্থিব পুষ্পপুঞ্জমণ্ডিত মঞ্জু-কুঞ্জ কাননে প্রেমের কুঞ্জনাদিনী সহস্র নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইয়াছে। আজ তাহার তীরসহ কুঞ্জে কুঞ্জে সহস্রা পাপিয়া, সহস্র বুলবুল, সহস্র কোকিল ও সহস্র ভ্রমর মধুর কূজনে এবং ললিত গুঞ্জনে ভাবের লহরী ছুটাইয়াছে এবং ফুলবালাদিগের বক্ষবসন উন্মোচন করিয়াছে। পৃথিবীর কোনও কবির জীবনে এমন অদ্ভূত বৈচিত্র্য কখনও দেখা যায় নাই।

অনল প্রবাহ বীররসের কাব্য আর প্রেমাঞ্জলি মধুর সঙ্গীত উৎসারিত গীতি কবিতার সমষ্টি। প্রকাশক লিখিয়াছেন ঃ

বাঙ্গালার বিশ্ববিশ্রুতযশা গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' এবং 'গীতাঞ্জলি' ও 'প্রেমাঞ্জলি'র কোমলতা, স্বচ্ছতা এবং ভাব-সম্পদের নিকট মলিন বলিয়া প্রতিভাত হইবে। প্রাতঃস্মরণীয় হাফেজের গযল অপেক্ষাও 'প্রেমাঞ্জলির' অনেক কবিতা সুরসাল এবং সুললিত। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই অবোধ্য এবং দুর্বোধ্য। কিন্তু 'প্রেমাঞ্জলি'তে একটিও অবোধ্য বা দুর্বোধ্য কবিতা নাই। সিন্ধু সলিলের ন্যায় সকলগুলিই স্বচ্ছ, শারদীয় নৈশ আকাশের তারকামালার ন্যায় সকলগুলিই উজ্জ্বল এবং প্রভাত প্রফুল্ল কমলের ন্যায় সকলগুলিই মনোহর।

৫. 'সঙ্গীত সঞ্জীবনী' বিভিন্ন ধরনের গান ও গযলের সংকলন। কবি তরুণদের উত্থানের জন্য নিজেকে নিজে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ঃ

আমি আঁধার দেখে ভয় পেয়ে ভাই
পথ কখনও ছাড়ব না।
চলতে যদি করেছি শুরু চলবই
তবে থামব না।

অথবা ঊষার উদয় হইয়াছে, পাখি ডাকিতেছে, ফুল ফুটিয়াছে, মন্দ সমীরণ বহিতেছে। অতএব আর ঘুম-ঘোরে থাকিবার সময় নাই।

জাগো জাগো নওজোয়ানরা কোমর বাঁধ কর জোর
আর কতকাল মোহের ঘোরে রবি তোরা মুসলমান,
বন্দী মায়ের করুণ ছবি, চোখে কি বহায় না লোর !

(খ) মহাকাব্য ঃ ১. উচ্ছ্বাস, আট সর্গে সমাপ্ত মহাকাব্য। কলিকাতার নব্যভারত প্রেস হইতে মুদ্রিত। সিরাজীর এইখানি তৃতীয় প্রকাশিত কাব্য। এইখানি তিনি তাঁহার অন্নদাতা ও শিক্ষাদাতা মাতামহ বাবুখান সাহেবের চরণ কমলে উৎসর্গ করেন। কাব্যখানি মুসাদ্দাস-ই হালীর ধরনে রচিত জাতীয় বোধনমূলক কাব্য। তিনি জাতিকে তাহার অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মহিমায় জাগরিত হওয়ার আহ্বান করেন। চলার পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয় জ্ঞানকে অবলম্বন করার জন্য তিনি উপদেশ দেন। তিনি বলেন ঃ

জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই ধরম,
জ্ঞানই বিশ্বাস, জ্ঞানই মরম,
জ্ঞান ভক্তি মুক্তি, জ্ঞানই করম,
এই মহামন্ত্র করহ সার।

২. 'স্পেন বিজয় কাব্য'-ও আট সর্গে বিভক্ত। এই কাব্যের 'বন্দনা' অংশে কবি লিখিয়াছেন ঃ

গৌরব কাহিনী গাথা করুক স্মরণ
গঠিত করুক সবে জাতীয় জীবন।
উঠুক গগনে পুনঃসৌভাগ্য চন্দ্রমা
মোহিত করুক বিশ্ব ইস্‌লাম সুষমা।

'হিস্পানের গর্বান্ধ ভূপতি' পাপমতি রডারিকের সহিত মুসলিমদের যুদ্ধই এই কাব্যে উপজীব্য।

(গ) উপন্যাস ঃ ১. রায়নন্দিনী। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লেখক স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি 'উপন্যাসের ঘোর বিরোধী'। এতদসত্ত্বেও কেন উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন তাহার কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন ঃ

নীচমতি বঙ্কিমচন্দ্র ও রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক উদ্ভট ঔপন্যাসিক লেখকই এই অতি জঘন্য চিত্র অঙ্কিত করিয়া বিশ্বপূজ্য মুসলমানের মুণ্ডপাত এবং মর্ম বিদ্ধ করিতে অসাধারণ প্রয়াস স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। আমি নিজে এবং আরও কতিপয় মুসলমান লেখক এই সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ নানা পত্র-পত্রিকায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় নাই। দেশমাতৃকার কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহাদের সাবধানতার জন্য এবং মুসলমানের আত্মবোধ জন্মাইবার জন্যই উপন্যাসের ঘোর বিরোধী আমি, কর্তব্যের নিদারুণ তাড়নায় রায়-নন্দিনী রচনা করিয়াছি। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমানের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, তাহাই অতীতের স্বাভাবিক চিত্র।

এই উপন্যাসের কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ী ঈসা খাঁকে বরমাল্য দিয়া বরণ করিয়াছেন। এইখানে যশোরাধিপতি প্রতাপ রায়ের কন্যা অরুণাবতী ও তাঁর প্রেমিকপ্রবর মাহতাব খাঁর নদীপথে পলায়ন ও গোপন অরণ্যবাসের মধ্যে একটা রোমান্টিক আবহ সৃষ্টি হুইয়াছে। একদিকে বিপদ ও অন্যদিকে মানুষের লোকালয় হইতে দূরে বনভূমির মধ্যে প্রেমনীড় রচনা— এই উপন্যাসের মধ্যে সিরাজী এই ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া যে রোমান্স-প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই এই উপন্যাসের সৌন্দর্য বাড়িয়াছে। রায়নন্দিনীর কোন কোন দৃশ্যের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' ও 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের কোন কোন দৃশ্যের অদ্ভুত মিল দেখা যায়। রায়নন্দিনীই ইসমাইল হোসেন সিরাজীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

২. 'তারাবাঈ' উপন্যাসে বিজাপুর রাজ্যের সেনাপতি আফজাল খাঁর শৌর্য-বীর্যে মুগ্ধ হইয়া মারাঠা দস্যু শিবাজীর কন্যা তারাবাঈ তাঁহার কাছে প্রেম নিবেদন করিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি হইয়াছে, কুচক্রীর চক্রান্তে উভয়েই প্রাণ হারাইয়াছেন, মিলন হইতে

পারে নাই। ঔপন্যাসিক নায়ক-নায়িকার আকস্মিক মৃত্যু ঘটাইয়া এই প্রেমের করুণ পরিণতি টানিয়াছেন।

৩. 'নূরউদ্দীন' উপন্যাসে মালাবারের সুলতান রুক্‌নু'দ-দীনের পুত্র নুরু'দ-দীনের সঙ্গে চিতোরের রাণা উদয় সিংহের সুন্দরী কন্যা রুক্‌মিনী বাঈ-এর প্রেম ও মিলন এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। ইহাতে উদয় সিংহের বিধবা ভগ্নী স্বর্ণ বাঈয়ের সহিত তাঁহার সেনাপতি তুর্কী বংশসম্ভূত রূমি খানের প্রেম ও বিবাহের কথাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'নূরউদ্দীন' একখানি সুলিখিত ও সুখপাঠ্য রোমান্টিক ট্র্যাজিক্ কমেডি।

৪. 'ফিরোজা বেগম' উপন্যাসের নায়িকা দিল্লীর বাদশাহের উযীর সাফদার জাঙ্গের কন্যা ফিরোজা বেগম বীর্যবতী। স্বদেশ ও স্বধর্মের জন্য তিনি প্রাণ দিতে প্রস্তুত। রোহিলা খণ্ডের প্রবল পরাক্রান্ত নজীবুদ্দৌলার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর স্বামী গৃহে যাওয়ার সময় ফিরোজার রূপে মুগ্ধ মারাঠা সেনাপতি সদাশিব রাও তাঁহাকে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। ফিরোজা বেগম তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসীম সাহস ও অদম্য শক্তির বলে নিজেকে এবং মুসলিমদেরকে মুক্ত করেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় আহ্‌মাদ শাহ্ দুররানী ভারতে আসিয়া মুসলিমদেরকে সহায়তা করেন।

সিরাজীর সকল উপন্যাসই ঐতিহাসিক উপন্যাস। তাঁহার কোন উপন্যাসেই চরিত্র যথাযথ বিকশিত হয় নাই। আদর্শের ভারবাহীরূপে তাঁহার মতবাদের ক্রীড়নক হইয়া উঠিয়াছে। মুসলিম চরিত্রগুলির শৌর্যবীর্যে মুগ্ধ হইয়া বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। অধ্যাপক আবদুল হাই বলিয়াছেন যে, সিরাজীর উপন্যাসগুলি নিতান্ত উদ্দেশ্যমূলক। এইগুলিতে সিরাজীর স্বপ্নাবিষ্ট মনের বিচিত্র পরিচয় পাওয়া যায়। 'রায়নন্দিনী' ও 'নূরউদ্দীন' উপন্যাসে তাঁহার কবি মানস রোমান্সের কল্পলোকে যেইভাবে মুক্ত বিহার করিয়াছে, অপরগুলিতে তাহা ততখানি সার্থক হয় নাই। তাহার উপন্যাসে বর্ণিত উপমাঅলঙ্কারাদি ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত রীতির। তাঁহার ভাষাও বিশুদ্ধ সংস্কৃত সমাসবদ্ধ। তাঁহার ভাষার কাঠামো ছিল ঐশ্বর্যময়, তবু গতি ছিল স্বচ্ছন্দ; সেই ভাষা ছিল অনলবর্ষী অমৃতময়। তাঁহার ভাষা তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী'র ভাষার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি একজন বড় বাগ্মী ছিলেন, তাঁহার সেই বাগ্মিতা তাঁহার উপন্যাসেও ঝরিয়া পড়িয়াছে।

এই সকল উপন্যাস ছাড়াও তিনি 'বঙ্গ ও বিহার বিজয়' নামক একটি ঐতিহাসিক কাহিনী কথা রচনা শুরু করেন। 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় ইহার তিন কিস্তি প্রকাশিত হয়। বইখানি তিনি সমাপ্ত করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। 'জাহানারা' তাঁহার এইরূপ অসম্পূর্ণ আর একটি উপন্যাস। ইহার প্রথম পরিচ্ছেদ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এইখানি শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ঘ. প্রবন্ধ ঃ ১. স্ত্রী শিক্ষা। এই গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "চিন্তার বিস্ফোরণকারিণী শিক্ষা এবং স্বাধীনতাই হইতেছে মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায়।" এই শিক্ষা ও স্বাধীনতা দেশের সকল শ্রেণীর নর ও নারী লাভ না করিলে সমাজের ও সংসারের অভীপ্সিত উন্নতি ও কল্যাণ নাই। এই কথা তিনি অকাট্য যুক্তি ও প্রামাণিক নজীরসহ কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় আবেগপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করেন। তাঁহার সেই ভাষণই পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে 'স্ত্রী-শিক্ষা' নামে প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সম্মানিত পুরোধা ছিলেন ইসমাইল হোসেন সিরাজী।

২. 'স্পেনীয় মুসলিম সভ্যতা' পুস্তকে 'স্পেনে মুসলিমদের জ্ঞান চর্চা এবং সভ্যতার ইতিবৃত্ত' সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন এই আশায় যে, 'ইহা পাঠে নব যুবক এবং ছাত্রদিগের প্রাণে আত্মগরিমা এবং তৎসঙ্গে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব কদম্বিৎরূপে ফুটিয়া উঠিলেও দগ্ধ প্রাণ শীতল হইবে।' এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সিরাজী ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন ঃ বিজ্ঞান যে মানব জীবনের সর্বাপেক্ষা আলোচ্য ও আবশ্যকীয় বিষয়, বিজ্ঞানই যে অজ্ঞান মানবের উন্নতি-পথ-প্রদর্শক, স্পেনীয় মোসলেমগণই এই মহাসত্য বর্বর য়ুরোপীয় মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছিলেন। হায় মুসলমান ! কবে আবার তোমার মনে বিজ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগ ফুটিয়া উঠিবে ? কবে আবার তোমার হীনতার অন্ধকার দূরীভূত হইবে ?

৩. 'তুরস্ক ভ্রমণ', প্রথম খণ্ড, গ্রন্থে প্রকাশক নিবেদন করিয়াছেন ঃ বহু লোকের অনুরোধ ও জনসাধারণের আগ্রহাতিশয় দর্শনে আমরা প্রশংসিত কবিবরের অনুমতিক্রমে মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রাবলী একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিলাম। তুরস্ক যাওয়ার সময় পথে এবং বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকালে তাঁহার যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাই পত্রগুচ্ছরূপে এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মধ্যে মধ্যে কবিতাও আছে। তুরস্কে যাত্রাকালে সমুদ্রবক্ষে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া কবির মনে যে ভাবাবেগের সৃষ্টি হইয়াছে, এইগুলি তাহারই অভিব্যক্তি।

৪. 'তুর্কী নারীজীবন' নামক পুস্তিকায় তুরস্কের নারীসমাজের পরিচয় দিয়া সিরাজী বাংলাদেশের বিশেষ করিয়া মুসলিম নারী সমাজের উন্নতি বিধানের প্রয়াস পাইয়াছেন।

৫. 'আদব কায়দা' নামক পুস্তকে মুসলমানদের নামকরণ, 'উপবেশন প্রণালী', 'স্বাস্থ্য নীতি', 'বিবাহ নীতি', 'বিনয়' প্রভৃতি বহু আচার-ব্যবহারের রীতি-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে।

৬. 'সুচিন্তা' প্রথম খণ্ড, গ্রন্থখানিতে ১. ইসলামের মূল শক্তি, ২. সাহিত্য শক্তি ও জাতি সংগঠন, ৩. মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি, ৪. অভিভাষণ, ৫. স্বাধীন চিন্তাশীলতা, ৬. ইসলামের ভবিষ্যৎ, ৭. সাহিত্য ও জাতীয় জীবন এবং ৮. আত্মশক্তি ও প্রতিষ্ঠা— এই আটটি প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলিতে লেখকের দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, ইসলামের একত্ববাদ ও সাম্যভাবই হইল শক্তির উৎস। দ্বিতীয় প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, বহু সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যে পরিণত করিতে হইলে ইসলামের পবিত্রতা ও নীতির প্রাচীরের ভিতরে থাকিয়া সাহিত্য সেবা করিতে হইবে। এই প্রবন্ধে সিরাজী উপন্যাস চর্চার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন। জাতীয় উন্নতি ব্যাহত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি 'উপন্যাস বিন্যাস' হইতে মুসলিম সাহিত্যিকদেরকে বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। তৃতীয় নিবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, মাতৃভাষা ব্যতীত কোন জাতিই উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। তিনি 'স্বাধীন চিন্তাশীলতা' প্রবন্ধে দুঃখ সহকারে বলিয়াছেন ঃ সমাজে স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি নাই; তাই আমি বঙ্গীয় মুসলমানের এহেন দুর্দশা দর্শন করিতেছি। আত্মশক্তি ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তিনি এই বলিয়া জাতিকে গন্তব্য পথের নির্দেশ দিয়াছেন যে, অতীতের আলোক ধরিয়া ভবিষ্যতের অন্ধকারাচ্ছন্ন গন্তব্যপথকে আলোকিত করিতে হইবে। 'অতীতের আলোক' বলিতে তিনি প্রকৃতপক্ষে অতীতের মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনাই বুঝাইয়াছেন।

সিরাজীর অপ্রকাশিত গদ্য রচনাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'কারা কাহিনী'। রাজদ্রোহের অপরাধে দুই বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিবার পর কারাজীবনের অভিজ্ঞতা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনার সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৩২৬ সালের মাঘ মাসে তাঁহার সম্পাদনায় 'নূর' নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৩৩০ সালে নবপর্যায় 'ছোলতান' প্রকাশিত হইলে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সঙ্গে তিনি যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। সাপ্তাহিক 'হাবলুল মতীন' পত্রিকারও তিনি কিছুকাল সহ-সম্পাদক ছিলেন।

বাগ্মিতা ঃ মুসলিম বাংলার শোচনীয় দুর্দিনে সিরাজী ভাগ্যাহত জাতির ভাগ্য উন্নয়নের সঠিক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন খাঁটি মুসলমান। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, পরাধীনতার শৃঙ্খলাবদ্ধ মানব সন্তানকে খাঁটি মুসলমান বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায় না। তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ 'আলীর মত মুক্ত ভারতে মুক্ত ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন। শহীদ সায়্যিদ আহ্‌মাদ বেরেলবী, হাজী শরী'য়তুল্লাহ ও স্বাধীনতা সংগ্রামী অন্যান্য মুসলিম মনীষীর মত মুসলিম সন্তান পরের গোলামী করিবে, এমন কথা কল্পনা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। প্রাচ্যের অগ্নিপুরুষ জামালু'দ-দীন আফগানীর ঘটনাবহুল প্রদীপ্ত জীবনাদর্শ এবং তাঁহার অগ্নিগর্ভ বাণী কিশোর সিরাজীর মনে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। মাধ্যমিক স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সিরাজীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, পরাধীন দেশে মনুষ্যত্বহীন পরিবেশে লেখাপড়া করিয়া প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ ও মনুষ্যত্বের স্ফূর্তি সম্ভবপর নহে।

লেখক সিরাজীর চাইতে অনেক বড় ছিলেন বাগ্মী সিরাজী। তাঁহার সেই অগ্নিক্ষরা বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারা কোনদিন তাহা ভুলিতে পারেন নাই। অগ্নিগিরির লাভা প্রবাহের মত, কল্লোলিনী স্রোতস্বিনীর প্রবল প্রবাহের মত, বর্ষার অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণের মত সিরাজীর মুখ-নিঃসৃত সুললিত অথচ বজ্র-কঠিন বাণী সকলকে মুগ্ধ করিত, জাতীয়ভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিত, সকলেই বিস্মিত হইত। এমন সমাসবহুল বাক্য বিস্তার করিয়া, বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া প্রদান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ রাখা কাহারও পক্ষে সম্ভব কিনা সিরাজীর বক্তৃতা শুনিবার আগে তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারিতেন না। অনেকে মনে করেন, অতীত কালের ডেমোস্থিনিস, বার্ক, বাংলার সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ বাগ্মীর সমগোত্রীয় ছিলেন ইসমাইল হোসেন সিরাজী। মুসলিম বাংলায় বাগ্মিতায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

সিরাজীর গীতি কবিতা, মহাকাব্য, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী ও প্রবন্ধাবলী ভাষার ওজস্বিতায় ও বর্ণনার মনোহারিত্বে তাঁহার স্বকীয়তার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। তাঁহার কাব্য-সাহিত্য চর্চার প্রেরণা যোগাইয়াছে দুরন্ত জাত্যাভিমান ও স্বধর্ম প্রীতি। যেমন সাহিত্যে তেমন বক্তৃতার মাধ্যমেও সিরাজী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জাতি হিসাবে মুসলমানের শ্রেষ্ঠত্ব, আল্লাহ্‌র একত্ববাদের মহিমা ও মুসলিম ঐতিহ্যের স্বরূপ প্রচার করিয়াছেন। খাঁটি মুসলিম হিসাবে তিনি কোন দিন সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার অতুলনীয় বক্তৃতাবলী ও তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যের সর্বত্র কুসংস্কার ও প্রথানুগত্যের অনেক ঊর্ধ্বে স্থান পাইয়াছে বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ববোধের ও দেশাত্মবোধের একনিষ্ঠতা।

সিরাজী ১৯৩১ সালের ১৭ জুলাই সিরাজগঞ্জে ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা ১৩৭১ বাংলা; (২) আবদুল কাদির, সিরাজী রচনাবলী, উপন্যাস খণ্ড, ঢাকা ১৯৬৭ খৃ.; (৩) আমিনুল ইসলাম, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও কাব্য, ঢাকা ১৯৫৯ খৃ.; (৪) এম. আর. আখতার, বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন রহস্য, কলিকাতা; (৫) এম. সেরাজুল হক, সিরাজী চরিত, কলিকাতা ১৯৩৫ খৃ.; (৬) এস. এম. আকবর উদ্দীন, বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানদের স্থান; (৭) কাজী আবদুল মান্নান, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ঢাকা ১৯৭০ খৃ.; (৮) কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১-৪ খণ্ড, ঢাকা ১৯৬৮ খৃ. (৯) খয়ের খা মুনশি, রাজনৈতিক আন্দোলন ও মুসলমান, নবনুর, ভাদ্র ১৩১২ বঙ্গাব্দ; (১০) খাদেমুল ইসলাম, বঙ্গবাসী, বাঙালীর মাতৃভাষা আল এসলাম, কলিকাতা ১৩২২ বঙ্গাব্দ; (১১) খালেদ মাসুকে রসুল, অগ্নিপুরুষ সিরাজী, ঢাকা ১৯৮৩ খৃ.; (১২) মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পঞ্চম সংস্করণ, ঢাকা ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ; (১৩) মোঃ এয়াকুব আলী চৌধুরী, বাঙ্গালী মুসলমানদের ভাষা ও সাহিত্য, কোহিনুর, মাঘ ১৩২২ বঙ্গাব্দ; (১৪) মোঃ কে. চাঁদ, বঙ্গ ভাষা ও মুসলমান, আল এসলামা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৩ বঙ্গাব্দ; (১৫) মোহাম্মদ গোলাম হোসেন, বঙ্গীয় হিন্দু মুসলমান, কলিকাতা ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ; (১৬) মোঃ হেদায়েতুল্লাহ, বঙ্গ সাহিত্য হিন্দু মুসলমান, নবনূর, কার্তিক ১৩১১ বঙ্গাব্দ; (১৭) রেজাউল করিম, বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, কলিকাতা ১৯৩৯ খৃ.; (১৮) শেখ ওসমান আলী, কংগ্রেস ও মুসলমান জাতি, হাফেজ, জানুয়ারী ১৮৯৭ খৃ., হিন্দু মুসলমানের বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়, কোহিনুর, মাঘ-ফাল্গুন ১৩১৩, বৈশাখ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ; (১৯) সৈয়দ এমদাদ আলী, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে নেতার অভাব, ইসলাম প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩ খৃ.; (২০) বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম সংস্করণ, ১৯৭২ খৃ., ১খ, ৩৫৩; (২১) Bangladesh District Gazetteer, Pabna, B. G. Press, Dhaka 1978, 229-30।

ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ

**ইসমা'ঈলিয়্যা** (اسماعيلية) ঃ সুয়েজ খালের পশ্চিম তীরে এবং তিমসাহ হ্রদের উত্তর তীরে অবস্থিত একটি মিসরীয় শহর। সুয়েজ খাল খননে নিয়োজিত ইঞ্জিনিয়ার ও শ্রমিকদের বাসের জন্য নির্মিত অস্থায়ী কুটিরসমূহ হইতে শহরটির উৎপত্তি। ১৮৬২ খৃ. ২৭ এপ্রিল সুয়েজ খাল কোম্পানীর মহাপরিদর্শক ইহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৮৬৩ খৃ. ১৮ জানুয়ারী খেদীব ইসমা'ঈল-এর সিংহাসন আরোহণের পর ইহাকে বলা হয় ইসমা'ঈলিয়্যা। ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে শহরজোড়া রাস্তাঘাট, বাসস্থান, একটি কেন্দ্রীয় স্কোয়ার (মাঠ), একটি সরকারী ইমারত (সারায়) ও পানি সরবরাহের একটি পাম্প স্থাপিত হয় এবং ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে শহরটিকে মিসরীয় রেলপথের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। খাল খনন সমাপ্ত হইলে ইহাতে নিয়োজিত অধিকাংশ কর্মচারী পোর্ট সা'ঈদ-এ চলিয়া যায় এবং ১৮৭০ হইতে পরবর্তী প্রায় দুই দশক পর্যন্ত ইসমা'ঈলিয়ার জনসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে (প্রায় ৩,০০০)। ১৮৯০ খৃ. হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নাগাদ শহরের লোকসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫,০০০-এর উপর হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাগাদ ৫০,০০০-এর উপর হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে ১৯৫০-এর দশকে ইংরেজ সৈন্যদের চূড়ান্ত অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত ইসমা'ঈলিয়্যার নিকট একটি বৃহৎ ইংরেজ সৈন্যবাহিনী ও বিমান বাহিনীর ছাউনি অবস্থিত ছিল এং এইখানে অনেক বিদেশী নাগরিক বাস করিত। ১৯২৮ সালে হাসান আল-বান্না' শহীদ (দ্র.) ইসমা'ঈলিয়ায় আল-ইখওয়ানু'ল-মুসলিমূন (দ্র.) আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫১ খৃ.

অক্টোবরে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ইঙ্গমিসরীয় চুক্তি একতরফাভাবে বাতিল করার পর ইসমা'ঈলিয়্যা প্রায়শ ইংরেজ সৈন্য ও মিসরীয় পুলিশের সংঘর্ষস্থলে পরিণত হয়—যেই সংঘর্ষ ১৯৫২ খৃ. ১৫ জানুয়ারী ছয় ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধে পর্যবসিত হয়। ইহার ফলে একদিন পর 'কৃষ্ণ শনিবার' নামে পরিচিত কায়রো দাঙ্গা সংঘটিত হয়।

১৯৬০ খৃ. পর্যন্ত ইসমা'ঈলিয়্যা খাল প্রশাসনের অংশ ছিল, কিন্তু উক্ত বৎসরই ইহা পৃথক একটি প্রদেশের (محافظة) কেন্দ্রে পরিণত হয় ; উত্তর দিকে আল-কানতারা এবং পশ্চিম দিকে আত-তাল্লু'ল-কাবীর ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৬৬ খৃ. ইসমা'ঈলিয়্যা প্রদেশের অধিবাসীর সংখ্যা হয় ৩,৪৪,৭৮৯ ; ইহার মধ্যে ১৬২, ৩৭০ জন পল্লী অঞ্চলে (ريف) এবং ১,৮২, ৪১৯ জন শহরাঞ্চলে (حضر) বাস করিত। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের পর ইসমা'ঈলিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী শহর ত্যাগ করে বা অপসারিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আলী মুবারাক, আল-খিতাতু'ল-জাদীদা, কায়রো ১৩০৫ হি., ৮খ, পৃ. ৫৯; (২) H. de Vaujany, Alexandrie et la Basse-Egypte, প্যারিস ১৮৮৫ খৃ., পৃ. ২৪৫; (৩) Population censuses of Egypt, ১৮৯৭-১৯৬৬ খৃ.; (৪) আল - আহ্রাম, অক্টোবর ১৯৫১ - জানুয়ারী ১৮৫২ ও ২৬ জুলাই, ১৯৬৫ খৃ.।

G. Baer (E.I.[2])/আ. খা. ম. আবদুল মান্নান

**ইস্‌মা'ঈলিয়্যা** (اسماعيلية) ঃ একটি শী'ঈ দল, তাহারা এই নামে এইজন্য বিখ্যাত যে, তাহাদের আক্বীদা মতে ইমাম জা'ফার আস-সাদিক (র)-এর পর তাঁহার প্রথম সন্তান ইসমা'ঈল ইমাম হইবেন, ইমাম মূসা কাজি‌ম নহে—যেমন ইমামিয়্যা (দ্র. ইছনা 'আশারিয়্যা) শী'আদের বিশ্বাস। ইসমা'ঈল সপ্তম ইমাম ছিলেন এবং এইজন্য ইসমা'ঈলিয়্যাগণকে সাব'ঈয়্যা-ও বলা হইয়া থাকে। তবে ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে অন্যান্য নামেও উহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম নাম কারামিতা, অতঃপর দারূযিয়া ও বাতিনিয়া দলের উদ্ভব হয়। বর্তমানকালে তাহাদেরকে পারস্যে আগা খানের অনুসারী মাহাল্লাতী, মধ্যএশিয়ায় মুল্লাঈ অথবা মাওলাঈ, ভারতবর্ষে খোজা (নাযারী), (দাঊদী অথবা সুলায়মানী) বোহ্রা (মুসতা'লিয়ান) ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে।

**১. ইসমা'ঈলী আন্দোলনের ইতিহাস** ঃ "ইসমা'ঈলী মতবাদ ঈর্ষাপরায়ণ, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মায়মূন আল-কাদ্দাহ্'-এর উদ্ভাবিত, তিনি স্বয়ং চাতুর্যের সহিত এই ষড়যন্ত্র জাল রচনা করিয়াছিলেন যে, ইসলামের ভিত্তিমূলে আঘাত হানিয়া তদস্থলে জরথুস্ট্রীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।" ইহা কল্পকাহিনীমাত্র, যাহা 'আব্বাসীদের খিলাফাতের দাবীকে যথার্থ প্রমাণিত করিবার জন্য তাহাদের অনুসারিগণ প্রচার করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে এই দল প্রতিশ্রুত 'ঈসা ('আ)-এর আগমনে বিশ্বাসী ও অপেক্ষমাণ ফিরকা (দল)-সমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাহারা ২য়/৮ম শতকের মধ্যবর্তী সময়ে সর্বত্র বিরাজ করিত। এই ফিরকার অনুসারিগণ 'আলী (রা)-র অধস্তন পুরুষদের মধ্যে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে প্রতিশ্রুত মাহদী বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং তাহারা ওয়াকিফা নামে খ্যাতি লাভ করে অর্থাৎ ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা ইমামগণের ধারাবাহিক সূত্র একজন বিশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া থামাইয়া দিয়াছে (ওয়াকাফা)।

ইসমা'ঈলীগণের নিকট এই সূত্রের শেষ ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন জা'ফার , যিনি ইমাম জা'ফারের মৃত্যুর (আনু. ১৪৮/৭৬৫) কিছুদিন পরে অন্তর্হিত হইয়া যান। বলা হইয়া থাকে, ইসমা'ঈল ইমাম জা'ফার সাদিকের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্বেই ১৪৩/৭৬১-৭৬২ সনে মদীনা মুনাওয়ারায় ইনতিকাল করেন এবং বাকী' কবরস্থানে সমাহিত হন। ইমাম জা'ফার বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে এই বিষয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ রাখিয়া যান যে, তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইয়া গিয়াছে। ইসমা'ঈলের অনুসারীরা উহা মানিয়া লইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। তাহাদের দাবী ছিল যে, ইমাম জা'ফারের মৃত্যুর (আনু. ১৪৮/৭৬৫) পাঁচ বৎসর পরেও ইসমা'ঈল জীবিত ছিলেন। এক শত বৎসরের অধিককাল পর্যন্ত এই ফির্কা দক্ষিণ ইরাক, 'আরব, সিরিয়া ও য়ামানে বিস্তৃত ছিল। ইহার পরে ২৭৬/৮৯৯ সনের কাছাকাছি সময়ে তাহারা তাহাদের নেতা (আহমাদ ইব্‌ন কা'রমাত)-এর নামানুসারে কারামিতা নামে খ্যাতি লাভ করে। বাহ্যত এইরূপ মনে হয় যে, যখন ২৬০/৮৭৪ সনে ইছনা 'আশারী ইমামগণের ধারাবাহিক সূত্র ছিন্ন হইয়া যায় তখন ২৮০/৮৯৫ সনের (অনুরূপ ? ৮৯৩ খৃ.) নিকটবর্তী সময়ে ইহাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে একটি পরিবর্তন ঘটে, যাহার ফলে তাহারা পুনরায় ইমামাতের চিরস্থায়ী ধারার ইছনা 'আশারী মতবাদ গ্রহণ করিয়া এই মতবাদ পরিত্যাগ করে যে, আত্মগোপনকারী মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দীরূপে পুনরায় আবির্ভূত হইবেন। এই পরিবর্তনের কারণে ইসমা'ঈলীগণ কারামিতা হইতে—যাহারা সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া ইহার বিরোধিতা করিয়াছিল —পৃথক হইয়া পড়ে। ফাতিমীগণ এই নূতন মতবাদ গ্রহণ করিয়া ইহার সপক্ষে জোর প্রচারণা শুরু করিয়া দেয়। ২৯৭/৯০৮ সনে তাহারা উত্তর আফ্রিকায় নিজেদের প্রতিনিধিত্বশীল রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে।

বস্তুত তৃতীয়/নবম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইসমা'ঈলীগণ পুরাপুরিভাবে সুশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। ইরান, য়ামান ও সিরিয়ায় ইহাদের গোড়াপত্তন সুদৃঢ় হয় এবং উত্তর আফ্রিকায়ও ইহারা অতি দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। আল-মাহ্দী ও অন্যান্য ফাতিমী রাষ্ট্রনায়কদের সম্পর্কে সকলেই অবগত ছিল (দ্র. ঐ নামের অধীনে তাঁহাদের ইতিহাস)। চতুর্থ/ দশম শতাব্দীতে ঐ মতবাদের প্রচার খুব জোরেশোরে করা হয় এবং হিজরী পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ইসমা'ঈলী শী'আ আটলান্টিক মহাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া ইসলামী দুনিয়ার দূরতম পূর্ব এলাকা অর্থাৎ 'আমূ দরিয়ার অপর পারে, বাদাখশান ও ভারতবর্ষে যথেষ্ট দৃঢ়তা লাভ করে। ইরানে তাহারা বিশেষভাবে প্রতিপত্তি লাভ করে। এইভাবে প্রাদেশিক বাহ্র খিযি-র, আযারবায়জান, রায়, কূমিস, ইসফাহান, ফার্স, খূযিস্তান, কিরমান, খুরাসান (তাবাস ও তুরশীষসহ), কূহিস্তান, বাদাখ্শান ও আমুদরিয়ার অপর পারে তাহাদের প্রসার ও প্রচারের প্রধান প্রধান কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল। ইরানেই ইসমা'ঈলী মতবাদের শীর্ষস্থানীয় চিন্তাবিদগণ জন্মগ্রহণ করেন, যাহাদেরকে প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মতবাদ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের নীতি নির্ধারকরূপে চিহ্নিত করা যাইতে পারে। যেমন আবূ হাতিম রাযী (মৃ. চতুর্থ/দশম শতকের শতকের মধ্যবর্তী সময়ে), আবূ য়া'কূব সিজিস্তানী (মৃ. ৩৮৬ হি. পরে/৯৯৬ খৃ.), হামীদু'দ-দীন কিরমানী (মৃ. ৪১২/১০২১ সনের নিকটবর্তী সময়) ও মুওয়ায়্যিদ আশ্-শীরাযী (মৃ. ৫৭০/১০৭৭)।

ইসমা'ঈলী আন্দোলনকে একটি বিপজ্জনক রাজনৈতিক আন্দোলন সাব্যস্ত করিয়া সর্বত্র কঠোরতার সহিত ইহার বিরোধিতা করা হয়। কিন্তু

এইরূপ অপ্রত্যাশিত সফলতা লাভের পর এত দ্রুততার সহিত ইহাদের পতনের প্রকৃত কারণ উল্লিখিত বিরোধিতা নহে, বরং তাহাদের নেতৃবৃন্দের আত্মকলহই ইহার জন্য সর্বাধিক দায়ী। ইহা বলা যাইতে পারে, এমন কি তাহাদের স্বীয় ইমামগণের পরিবারের মধ্যেও মুনাফিক ী ও প্রতারণার ভাব দেখা দেয়। মিসরের ফাতিমী ইমামগণের ধারাবাহিকতা শেষ হইবার পর মিসরের বর্ধিষ্ণু ইসমা'ঈলীদের মধ্যেও এই প্রকারের পার্থক্য মাথা চাড়া দিয়া উঠে। আল-'আমির-এর হত্যার (৫২৪/১১৩০, ইসমা'ঈলী উৎসের দিক দিয়া ৫২৬/১১৩২) পর তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্র আত -তায়্যিব (যাহার অস্তিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন)-কে কোথাও গোপন করিয়া রাখা হয়। মিসরের সর্বশেষ চারজন ফাতিমী খলীফা নিজদেরকে ইমামদের মধ্যে গণ্য করিতেন না এবং খুতবা আল-কা'ইমের নামে, যিনি প্রতিশ্রুত ইমাম ছিলেন এবং যিনি শেষ দিবসে আত্মপ্রকাশ করিবেন, তাঁহার নামে পঠিত হইত। মুস্তা'লিয়ীদের, যাহারা বানূ ফাতিমার মতাদর্শের অনুসারী, তাহারা এখন পর্যন্ত এই ধারণা পোষণ করেন যে, আত-তায়্যিবের স্থলাভিষিক্ত ইমাম নিজ জীবন কোন এক গোপনীয় স্থানে অতিবাহিত করিতেছেন এবং 'যথাসময়ে' নিজকে প্রকাশ করিবেন।

মুসতা'লীদের ব্যবস্থাপনার কেন্দ্র য়ামানে স্থানান্তরিত হয় এবং এখান হইতেই তাহাদের সকল দল-উপদলের নিকট প্রধান উপদেষ্টার উপদেশ ও নির্দেশ পৌঁছিত। মিসর ও উত্তর আফ্রিকা হইতে ইসমা'ঈলী মাযহাব অস্বাভাবিক দ্রুততার সহিত স্বল্প কালের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহারা য়ামানেও প্রায় ৫০০ বৎসর পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কালাতিপাত করে। কিন্তু ভারতবর্ষে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, এখানে তাহারা সমৃদ্ধি লাভ করে। এখানকার প্রাথমিক (ইসমা'ঈলী) উপনিবেশ একাদশ/সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে খুবই প্রসার লাভ করে, তাহাদের গুরুত্ব প্রথম যুগের দলীয় লোকজনের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়, যাহার ফলে ধর্মীয় নেতৃবর্গের স্থায়ী বাসস্থান ভারতে স্থানান্তরের তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের সহিত ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ঈর্ষার আগুন জ্বলিয়া উঠে। ২৬তম আহ্বায়ক (দা'ঈ) দাঊদ ইব্ন 'আজাব শাহ-এর আহমাদাবাদে মৃত্যুর (৯৯৯/১৫৯১) পর অধিকাংশ (দাঊদী) দাঊদ ইব্ন কুতব শাহ্-এর অনুগত হইয়া যায় এবং তাঁহাকে নিজেদের ২৭তম আহ্বায়ক মানিয়া লয়। কিন্তু য়ামানী দল (সুলায়মানী) সুলায়মান ইব্ন হাসানের সহিত মিলিয়া যায়, (উভয় শাখার আহ্বায়কদের নামের জন্য দেখুন আসাফ 'আলী আস‌ গার ফায়দী, A Chronological List of the Imams and DaÉis of the MustaÉlian Ismailis, in FBBRAS, ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ৪৫-৫৬)। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ছোটখাটো মতপার্থক্য ছিল। ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, দাঊদীদের ও সুলায়মানীদের মধ্যে মূলত কোন নিয়মতান্ত্রিক পার্থক্য ছিল না।

নিযারিয়্যা ইসমা'ঈলী বর্ণনানুযায়ী যাহা সত্য বলিয়া অনুমিত হয় নিযার-এর পুত্র আল-হাদী নিজ পিতার সহিতই জেলখানায় নিহত হন, অবশ্য তাঁহার দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তান আল্-হাদীকে বিশ্বস্ত অনুচরগণ গোপনে ইরানের আলামূত নামক স্থানে লইয়া আসে এবং হাসান ইব্ন সাব্বাহ্ তথায় এক নির্জন স্থানে খুবই সতর্কতার সহিত তাঁহাকে লালন-পালন করে। ৫৫৭/১১৬২ সনে মৃত্যু হইলে তাঁহার সন্তান আল-কাহির বি-আহ কামিল্লাহ্ হাসান (নিযারীদের বর্ণিত কুষ্ঠিনামায, যাহা বর্তমানে প্রচলিত, তদস্থলে দুইজন ইমামের নাম উল্লেখ করিয়াছে ঃ কাহির ও হাসান প্রকাশ্যভাবে স্থলাভিষিক্ত হন এবং ১৭ রামাদান, ৫৫৯/৮ আগস্ট, ১১৬৪ সনে তিনি প্রধান কিয়ামাত (কিয়ামা আল-কি য়ামাত) সংঘটিত হওয়ার ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি তাঁহার অনুসারীদের উপর বাতিনী 'ইবাদাত (গোপনভাবে আধ্যাত্মিক 'ইবাদাত) ফারয করিয়া দেন এবং জাহিরী 'ইবাদাত (শারী'আতসম্মত প্রকাশ্য 'ইবাদাত)-এর গুরুত্ব কমাইয়া দেন। কেননা মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের জন্য, যাহারা আধ্যাত্মিক জান্নাতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহাদের জন্য উপাসনার এই প্রকৃতিই ছিল। মু'মিনদের এই আধ্যাত্মিক বেহেশতী অবস্থা, সম্ভবত ঐ ইতিহাস প্রসিদ্ধ উদ্যান-কাহিনীর মূল ভিত্তি যাহা জান্নাতের আকৃতিতে হাসান ইব্ন সাব্বাহ নিজ অনুসারীদেরকে প্রতারিত করিবার জন্য আলামূতের বৃক্ষ-গুল্মহীন মাঠে তৈরি করিয়াছিল।

ভারতের নিযারী বা খোজা ফিরকা (দ্র.) আনু. অষ্টম/চতুর্দশ শতাব্দীতে হিন্দু হইতে ইসলামে ধর্মান্তরিত হন। তাহাদের ধর্মীয় গ্রন্থ সিন্ধী ও গুজরাটী ভাষায় লিখিত। তাহারা 'আরব-ইরানীদের মুকাবিলায় কিছুটা হিন্দুদের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু হিন্দু ধর্মীয় রীতিনীতির প্রচলন আছে। আর তাহাদের মধ্যে কতক হিন্দু ধর্মীয় দর্শনের পারিভাষিক শব্দও বর্তমান আছে।

**২. ইসমা'ঈলীদের বর্তমান অবস্থানের বিবরণ ঃ** বর্তমানে নিযারী ফিরকা নিম্নবর্ণিত এলাকায় বসবাস করিতেছে সিরিয়ায় হিমা-র নিকটে, ইরানের খুরাসান ও কিরমান প্রদেশে, আফগানিস্তানের জালালাবাদের উত্তরে এবং বাদাখশানে, রাশিয়া ও চীনের অন্তর্গত তুর্কিস্তানের আমু দরিয়ার জেলাসমূহে ও ইয়ারকান্দ ইত্যাদি এলাকাসমূহে, উত্তর ভারতের চিত্রল, গিলগিট, হুন্যা ইত্যাদি অঞ্চলে এবং পশ্চিম ভারতের (ও পাকিস্তানে) সিন্ধু, গুজরাট, বোম্বাই ইত্যাদি অঞ্চলে। তাহাদের নূতন বসতি সম্পূর্ণ হিন্দুস্তান (পাকিস্তান) বাংলাদেশ ও পূর্ব আফ্রিকায় পাওয়া যায়, নিযারীদের মোট জনসংখ্যা প্রায় পঁচিশ লক্ষ।

বোহরা দল ভারতের গুজরাট, মধ্যভারত ও মুম্বাইতে বসবাস করিতেছে। ভারতের শেষ আদমশুমারী অনুযায়ী তাহাদের সংখ্যা ২,১২,০০০। পূর্ব আফ্রিকায় তাহাদের অনেক নূতন বসতি স্থাপিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সুলায়মানীদের সংখ্যা মাত্র কয়েক শত এবং অন্যান্য সকলে দাঊদী দলের। য়ামানে বর্তমান সময় পর্যন্ত কয়েক হাজার ইসমা'ঈলী বর্তমান, যাহাদের মধ্যে অধিকাংশ সুলায়মানী।

**৩. 'আকা'ইদ ঃ** ইসমা'ঈলীদের 'আকা'ইদ বা ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে আমরা বর্তমান সময় পর্যন্ত যতটুকু অবগত হইয়াছি উহা ঐ সকল অভিজ্ঞতার ফল, যাহা যথার্থ ধর্মবিশ্বাসসম্পন্ন, ঐতিহাসিক ও ধর্মদ্রোহী মতবাদ সম্পর্কে যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাদের বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে গৃহীত কিন্তু স্বয়ং ইসমা'ঈলীদের লিখিত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর সহিত ইহার তুলনা করা হইলে তখন উহার মূল্য ও নির্ভরযোগ্যতা খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। মনে হয় যে, তাহারা ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটনাপঞ্জীকে এমন জটিল ও বিকৃত করিয়া দিয়াছে যে, সত্য ও মিথ্যা বর্ণনার পার্থক্য নির্ণয় অনেক সময় দুরূহ হইয়া পড়ে। সর্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা ইহাই যে, ইস্মা'ঈলী ও শী'আদের মূল রচনাবলী হইতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের উপর নির্ভর করা।

ফাতিমী ইসমা'ঈলীর পূর্বেকার রচিত গ্রন্থাবলী ঐ সময়ে খুব কমই সংরক্ষিত ছিল এবং ধারণা করা হয় যে, সংশ্লিষ্ট পৌরাণিক গ্রন্থাবলী

চতুর্থ/দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে লিপিবদ্ধ ছিল। ইহাও জানা যায় যে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় প্রকারের ধর্মীয় বিশ্বাস তাহাদের মধ্যে প্রবলভাবে কার্যকর ছিল। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মায়মূন আল-কাদ্দাহ্ কর্তৃক অসদুদ্দেশে উদ্ভাবিত 'ইস্মা'ঈলী আকা'ইদ' সম্পর্কে এইরূপ উক্তি সঠিক নহে, বরং এই মতবাদ ধীরে ধীরে আপন শক্তিতে উহাদের মাঝে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইসমা'ঈলী ধর্মবিশ্বাসের উত্থানের সময়ে অর্থাৎ দ্বিতীয়-তৃতীয়/অষ্টম-নবম শতকে মুসলমানদের প্রায় সকল দল, বিশেষ করিয়া শী'আ দলের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ গ্রীক জ্ঞান ও দর্শনের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে এবং ঐ সময়ে 'আব্বাসী খলীফাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম সমাজে জ্ঞানের সকল শাখার চর্চা ও উৎকর্ষ সাধিত হয়।

বাতিন বা গোপন বিষয়ের অর্থ কোন ইসলামী নির্দেশের ঐ গোপন অর্থ যাহা একমাত্র ইমামই ব্যক্ত করিতে পারেন, কিন্তু এখানে এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে যে, কোথাও 'জাহির'-এর অর্থ 'খোলা' এবং বাতিন-এর অর্থ 'গোপনীয়' হিসাবে লওয়া যাইবে না। এই উভয় শব্দ নাম বিশেষ্য, গুণবাচক বিশেষ্য নহে। জাহির-এর অর্থ 'শাব্দিক অনুবাদ' ও 'শাব্দিক ব্যাখ্যা' নেওয়াই যুক্তিযুক্ত, অপর পক্ষে বাতিন দ্বারা 'আকার-ইংগিত' যাহা (ইমামের) বিশুদ্ধ ব্যাখ্যার মাধ্যমে বোধগম্য হইতে পারে-অনেক গোপনীয় কল্পনা ও গোপন দর্শনের বক্তব্য ছিল এবং অনেক সাধারণ কথা (যেমন দা'ওয়াত বা প্রচার পদ্ধতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা, দলবদ্ধ শৃঙ্খলা ইত্যাদি)-কে অত্যন্ত গোপন রাখা হইত।

৪. **বাতিনী দৃষ্টিভঙ্গি ঃ** ইসমা'ঈলীদের গোপনীয় ধর্মীয় বিশ্বাসকে চরম খোদাদ্রোহী ও ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী বলিয়া বর্ণিত সর্বসাধারণ্যে প্রচারিত বর্ণনাসমূহ পাঠে প্রভাবান্বিত একজন সত্য সন্ধানী যখন ইসমা'ঈলীদের অত্যন্ত গোপনীয় গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন তখন তাঁহার পক্ষে হতাশ হওয়া ব্যতীত গত্যান্তর থাকে না। যেমন হামীদু'দ-দীন কিরমানীর রাহাতু'ল-'আক্ল, আল-মু'আয়্যিদ শীরাযীর গোপনীয় তথ্যসম্বলিত', 'চান্দ মাজালিস' গ্রন্থ, ইবরাহীম আল-হামিদীর 'কান্যু'ল-ওয়ালাদ', 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আল-ওয়ালীদের 'যাখীরা', 'ইমাদু'দ-দীন ইদরীসের 'যাহ্রু'ল-মা'আনী' ইত্যাদি। এই সকল গ্রন্থের মাধ্যমে নিঃসন্দেহে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, প্রধান প্রধান গোপনীয় 'আকা'ইদের মূল ভিত্তি ইহাই যাহাকে ইসলামী চিন্তাধারায় মূল মনে করা হয় অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ, মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালাত ও কুরআন মাজীদ আল্লাহ্র কালাম হওয়া সম্পর্কে পূর্ণ ঈমান ...

ইসমা'ঈলীদের বাতিনী 'আকা'ইদকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে ঃ প্রথমত তা'বীল যাহার অর্থ কুরআনের কাহিনীসমষ্টি এবং ইবাদাতের অবয়ব বা আকৃতির (যাহাকে পরিপূর্ণভাবে হাকাইক-ই 'আলিয়া-এর গোপন তত্ত্ব হিসাবে ধরা হয়) গভীর অভ্যন্তরীণ তত্ত্বের বাহ্যিক প্রকাশ, এইরূপ ব্যাখ্যা ও প্রকাশের অধিকার শুধু তাহাদের ইমামগণের, অন্য কাহারও নহে। দ্বিতীয়ত মূলতত্ত্ব, যাহা গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন জ্যোতির্বিজ্ঞান, রহস্যজ্ঞান, যাদুবিদ্যা ও অন্যান্য চিন্তাধারা সংমিশ্রিত ফলমাত্র। আমরা এমন সকল ইসমা'ঈলী চিন্তাবিদের সন্ধান লাভ করিয়াছি যাঁহারা খৃস্টীয় ধর্ম যাজকদের লিখিত বিষয়াবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। বস্তুত ইহা স্মরণযোগ্য যে, এই সকল নীতিবাক্যের মধ্যে কখনও অসঙ্গতি সৃষ্টি হয় নাই যে, 'পরিষ্কার ধর্মীয় বর্ণনাকে সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অলৌকিক ঘটনা বর্ণনার উপরে প্রাধান্য দেওয়া হইবে। শুধু ফাতিমী 'ক্লাসিক্যাল' সাহিত্যের প্রথম যুগে কোথাও কোথাও ব্যক্তিগত সৃজনশীল প্রতিভার আভাস পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চম/একাদশ শতাব্দী হইতে 'নির্ধারিত' দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করত স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, ইহা এত স্বয়ংসম্পন্ন যাহার অধিক আর পূর্ণতা দেওয়া সম্ভব নহে। অতএব, এখন উহার নকলই করা যাইতে পারে। অন্ধ অনুকরণের প্রবণতা এইভাবে বৃদ্ধি পায় যে, ইমামগণের উক্তি তোতা পাখীর ন্যায় উচ্চারণ করাকেই শ্রেয় মনে করা হইতে থাকে।

**ব্যবস্থাপনার রূপরেখা ঃ** 'হাকাইক' (ইসমাঈলীগণের তত্ত্বজ্ঞানমূলক ধর্মীয় বিশ্বাস) দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করে যে, 'আলাম কাবীর' (মহাবিশ্ব) ও 'আলাম সাগীর' (ক্ষুদ্র বিশ্ব)-এর মাঝে এক সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। উহাতে ইসলামী একত্ববাদের চরমোৎকর্ষ সাধন করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে এমন কোন গুণের অবস্থান স্বীকার করা হয় না, যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুধাবন করা যায়। মনুষ্য সমাজের যদি কোন পূর্ণ চিত্র, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হইতে পারে তাহা এই পৃথিবীতে হওয়া কর্তব্য, অন্যথায় মানব জন্মের সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া যায়। অতএব আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ মুসতাফা (সা) ব্যতীত অন্য কেহই এই পূর্ণ মানবতার মর্যাদা পাইতে পারে না। যেহেতু মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এবং মানব জাতির মধ্যে পূর্ণ মানব সর্বশ্রেষ্ঠ, সেইহেতু মানুষের মাঝে রাসূলের ঐ মর্যাদা যাহা বিশ্ব-প্রকৃতিতে পূর্ণ জ্ঞানের (আকলুল-কুল)। অতঃপর 'আকল-কুল অর্থাৎ রাসূলের ওয়াসী (রাসূলের শেষ সংকল্প পূর্ণকারী) 'আলী মুরতাদা (রা) ভিন্ন এই নশ্বর ধরাধামে আর কেহ হইতে পারে না। ইমামগণ যাহাদের হাতে বিশেষভাবে দুনিয়ার পরিচালন শক্তি তাঁহার-ই কার্যকর জ্ঞানের প্রতিচ্ছবি। প্রাণ যেহেতু মানুষেরই 'প্রতিকৃতি' সেইহেতু উর্ধ্বজগত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জগতের সহিত উহার সম্পর্ক। কিন্তু উহা (نفس) এই নশ্বর জগতের মোহজালে জড়াইয়া পড়িয়াছে। যদি ঐ মানবাত্মা নিজ নিকটতম প্রধান সত্তা (جوهر اعلى) অর্থাৎ ইমামের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তবে সে উচ্চাসনে সমাসীন হইয়া নিজ উৎসমূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়া পরকালীন মুক্তি লাভ করিতে পারে। নৈকট্য লাভের উপায় জ্ঞানসমৃদ্ধ 'ইবাদত (العبادة العلمية) অর্থাৎ ইমামগণ কর্তৃক ব্যক্ত জ্ঞানের অনুশীলন ও তাঁহাদের নির্দেশের অনুসরণ "যে ব্যক্তি সমকালীন ইমামকে না মানিয়া মৃত্যুবরণ করে সে যেন বিধর্মীদের মৃত্যু লাভ করিল।"

এই রীতিনীতিসমূহ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বর্ণনায় সংরক্ষিত রহিয়াছে। কিন্তু নিযারী ফিরকা ইহাতে সামান্য কাটছাঁট করিয়া দিয়াছে। ফাতিমীগণ উগ্র মতের সমর্থন করিতেন না এবং তাঁহাদের পুরাতন গ্রন্থাবলীতে ইমামের মর্যাদা প্রায় ঐরূপ যাহা খলীফার হইয়া থাকে। নিযারীগণ আত্মিক জীবনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়া থাকেন। তাহারা বাহ্যিক কার্যাবলীর গুরুত্ব কমাইয়া দিয়াছেন এবং 'নূরে ইমামাত'-কে নিজেদের মূল পদ্ধতি নির্বাচন করিয়াছে। তাঁহাদের নিকট 'নূরে ইমামাত' অথবা 'আল্লাহ্র নির্দেশ' একটি অবিসংবাদিত নির্দেশ, যাহা এই নশ্বর পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেই শুরু হইয়াছিল। পৃথিবী কখনও ইমামবিহীন ছিল না। যদি ইমাম না থাকে তাহা হইলে পৃথিবী তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইমাম প্রাথমিক নির্দেশের প্রতিচ্ছবি, যাহাকে নির্দেশ (Logos, word)-সূচক বাক্য অথবা কুরআনের ভাষায় কুন (كن = হও) বলা হইয়াছে। এই নৈপুণ্য ইমামের মধ্যে বিদ্যমান, যাহা ঐরূপ একটি নশ্বর বস্তু। অতঃপর এই নৈপুণ্য আল্লাহ্র নির্দেশে পিতা হইতে শুধু পুত্রের মধ্যে স্থানান্তরিত

হইয়া থাকে। ইমামদের মধ্যে কেহ বড় ছোট হইতে পারে না। তাঁহারা সকলে এক এবং তাঁহাদের এই নিপুণতাও এক। ইমাম প্রকাশ্যে আসেন না। ইসমা'ঈলীগণ অনুপ্রবেশ (حلول) বা পুনর্জন্মে (تناسخ) বিশ্বাসী নহে, মুহাম্মাদী (স) যুগের সূচনার পর সর্বপ্রথম ইমাম ছিলেন 'আলী (রা) এবং তাঁহার সন্তানগণ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত। হাসান (রা) যাঁহাকে শী'আগণ প্রথম ইমাম মনে করেন, তাঁহাকে ইমামদের তালিকা হইতে পৃথক করিয়া লওয়া হইয়াছে। কেননা তিনি শুধু নিজ ভ্রাতার স্থলে সাময়িকভাবে কাজ সম্পাদন করিয়াছিলেন। নবী আকরাম (স)-তো পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু পূণ্যাত্মার প্রতিচ্ছবিকে 'হুজ্জা' বলা হইয়াছে (যিনি ফাতিমী রাজত্বকালে ১২ অথবা ২৪ জন প্রধান আহ্বায়কের মধ্যে একজন হইতেন)। সাধারণত হুজ্জাঃ ইমামের নিকটতম ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হইতে পারে। এমন কি তিনি কোন কোন সময় একজন মহিলা অথবা একটি বালকও হইতে পারেন। হুজ্জাঃ ইমামের জ্ঞানের বহনকারী হইতে পারেন, যাহার মাধ্যমে তিনি মু'মিনদেরকে উপদেশ দিতে পারেন।

ইসমা'ঈলীদের মূল রচনা অথবা বর্ণনার মধ্যে ঐ প্রকারের "শিক্ষার স্তর ও প্রশিক্ষণ" (Degress of Initiations)-এর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, "ফ্রী-মেসন" (Free-mason) [মধ্যযুগীয় গুপ্তভ্রাতৃসঙ্ঘ]-এর মধ্যে পাওয়া যায় যাহাতে প্রতিটি স্তরের ব্যক্তিত্বের একটা বিশেষ 'গোপন তত্ত্ব' থাকে। বাতিনী পদ্ধতির প্রকাশ প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষা ও তাহার জ্ঞান-বুদ্ধির তারতম্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। উচ্চ মর্যাদা ও পদের অধিকারীদের মান (হুদূদ)-এর নির্ধারণ এই দলে প্রবেশ অনুযায়ী হয়ত পূর্বকালে বিদ্যমান ছিল যখন শিক্ষা শুধু এই মতবাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে 'হুদূদ'-এর মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয় অথবা এইরূপ বলা যায় যে, ঐ নীতির স্থলে একটি অন্য নীতি চালু করা হয়। মূল মর্যাদার স্তর নিম্নবর্ণিতভাবে ছিল ঃ মুস্তাজীব (নূতন প্রবেশকারী), মা'যূন (শিক্ষা দানের যোগ্য), দা'ঈ (প্রচারক) ও হুজ্জাঃ (একটি বিশেষ দলের জন্য আদেশপ্রাপ্ত)। রহস্যময় সংখ্যাসমূহের গণনা সাত সংখ্যাটি দ্বারা হইয়া থাকে। ইমামগণের কাল সাতটি ছিল ; সাত হাজার বৎসর পরে প্রধান নবী-রাসূলগণের দুনিয়ায় আবির্ভাব (আদাম, নূহ , ইব্রাহীম, মূসা, 'ঈসা ('আ) ও মুহাম্মাদ (স) যাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকের সহিত এক একজন ওয়াস ী ছিলেন ; ইমাম 'মুনতাজার' ('কাইম') তাঁহাদের মধ্যে সপ্তম ইমাম, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কাদী মু'মান ফিক্হ পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা শী'ঈদের নিকট রক্ষিত আছে ; কখনও উহার পরিবর্তন ও শুদ্ধিকরণ হয় নাই। মুসতা'লিয়ূন বর্ষ গণনা সাধারণ মুসলমানদের বর্ষ গণনা হইতে স্বতন্ত্র এবং উহা এক অথবা দুইদিন পূর্বে থাকে। কেননা চান্দ্র মাসের সূচনার হিসাব জ্যোতির্বিজ্ঞানের পদ্ধতির উপর করা হইয়াছে এবং উহা চাঁদ দেখার উপরে নির্ভরশীল নহে।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** ইসমা'ঈলীদের সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লেখকগণের অগণিত গ্রন্থ বর্তমান। কিন্তু কয়েকটি গ্রন্থ ব্যতীত ঐগুলি সম্পূর্ণ অসার। এই গ্রন্থাবলী গ্রহণযোগ্য ইসমা'ঈলী গ্রন্থাবলীর পঠনের ফল নহে, বরং ইসমা'ঈলী আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদীদের অথবা তাহাদের কল্পিত বর্ণনা এবং অজ্ঞ' 'দার্শনিক'-দের চিন্তাধারার উপর সীমাবদ্ধ। বর্তমানে এই পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কাজের বুনিয়াদ হইতেছে ইসমা'ঈলী গ্রন্থাবলীর অনুবাদ এবং উহার সংরক্ষণ ও মুদ্রণের উপর গুরুত্ব প্রদান। এই পর্যায়ে বর্তমানে একটি বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে যখন ১৯৩১ খৃ. 'ইসমা'ঈলী সোসাইটি বোম্বাই' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতঃপূর্বে তথা হইতে ডজন খানেক যোগ্য মূল গ্রন্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। উহাদের পূর্ণ তালিকা উপস্থাপন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অতএব, এখানে শুধু বিখ্যাত গ্রন্থাবলীর নামের উল্লেখ করা হইল।

**ইসমা'ঈলী** সোসাইটি নিযারীদের ফারসী গ্রন্থাবলীর উপরে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহাম্মদ কামিল হুসায়ন ফাতিমী যুগের মূল গ্রন্থের এক বিরাট তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার সংখ্যা এগার, উহার মধ্যে হামীদু'দ-দীন আল-কিরমানীর বৃহদাকার গ্রন্থ 'রাহাতু'ল-'আক্ল'ও গণনা করা হয়, প্রফেসর H. Corbin নাসির খুসরাও এবং অন্য কতক গ্রন্থকাব্যের ফারসী পাঠের অনুবাদ ও বিন্যাসের ব্যবস্থা করেন। প্রফেসর R. Strothmann ফাতিমী যুগের পরে য়ামানী সংস্কৃতি সম্পর্কিত মূল পাঠের কিছু প্রয়োজনীয় অংশ প্রকাশ করেন। প্রফেসর আসাফ 'আলী আসগার ফায়দী (কাদী নু'মান ইব্ন মুহাম্মাদের) দা'আইমু'ল-ইসলাম (দুই খণ্ডে) ও ফিক্হ ইসমা'ঈলী কতক গ্রন্থ প্রকাশ করেন (এবং ড. মুহাম্মাদ ওয়াহীদ মিরযা প্রকাশ করেন ঐ লেখকের কিতাবু'ল-ইক্তিসার)। কায়রো, দামিশক, বাগদাদ ও তেহরানের আরবী পণ্ডিতগণ বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থাবলী সুন্দর মুদ্রণে প্রকাশ করেন এবং বৈরূতে নিম্ন মানের মুদ্রণে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইসমা'ঈলী সাহিত্য সম্পর্কে মোটামুটি জানার জন্য দেখুন W. Ivanow, Aguide to Ismaili Literature, লন্ডন ১৯৩৩ খৃ.। উহার নূতন সংস্করণ পরিবর্ধনসহ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

**ইসমা'ঈলী ফিরকা** সম্পর্কিত মূল গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া সঠিক তথ্যের পূর্ণাঙ্গ সংক্ষিপ্তসার পেশ করার চেষ্টা একমাত্র W. Ivanow নিজ গ্রন্থ Brief Survey of the Evolution of Ismailism (বোম্বাই ১৯৫২ খৃ.)-এর মধ্যে করা হইয়াছে। এই গ্রন্থকার কর্তৃক উহার বর্ধিত সংস্করণও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার নাম Introduction to the study of Ismailism. আরও দেখুন (১) আল্-ফিহ্রিস্ত, ১খ, ১৮৬ প. ; (২) আশ-শাহ্রাস্তানী, সম্পা. Cureton, পৃ. ১৪৫. ; (৩) ইব্ন হায্ম, আল-ফাস্ল, ২খ, ১১৬ ; (৪) ইব্নু'ল-আছীর, আল-কামিল, সম্পা. Tornber, ১০খ, ২১৩ প.; (৫) ইব্ন খালদূন, মুকাদ্দামা, সম্পা. Quatremere, ১খ, ৩৬২ প.; (৬) ঐ লেখক, আল-'ইবার, ৫খ, ২৬ ; (৭) খান্দমীর, হাবীবু'স-সিয়ার, ২/৪খ, ৭৯ প. ; (৮) মুনাজ্জিম বাশী, ২খ, ৪৬৮ প. ; (৯) Edward G. Browne, A. Literary History of Persia, ১খ, ৩৯১ প. ও ২খ, ২০৪ প., বেং নির্ঘণ্ট ; (১০) ইসমা'ঈলীয়্যা প্রবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী, (লাউডেন)।

W. Ivanow (E.I.[1], দা.মা.ই.)/মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন

**'ইস্মাত ইনূনূ** (عصمت انونو) ঃ (উনূনূ) 'ইসমাত পাশা নামে পরিচিত। যেই সকল যোগ্য ও খ্যাতিমান ব্যক্তি স্বীয় দেশ ও জাতির পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন এবং তুর্কী জাতিকে স্বৈরতন্ত্র ও পরনির্ভরতা হইতে মুক্তি দানের সংগ্রামকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছান যাহার সূত্রপাত হয় শানাসী, নামিক কালাল, দিয়া পাশা ও মিদ্হাত পাশা প্রমুখ দেশপ্রেমিক তুর্কী নেতৃবৃন্দ দ্বারা, তিনি তাঁহাদের

অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে নব্য তুর্কী জাতির ইতিহাসে, যিনি পুরাতন ও ধ্বংসোন্মুখ খিলাফাতের মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেন এবং গাযী মুস্‌তাফা কামাল পাশা (তুর্কী জাতির পিতা) ও তাঁহার অন্তরঙ্গ ও সাহসী সহকর্মীদের ক্রোড়ে যাঁহারা প্রতিপালিত হন, তাঁহাদের মধ্যে 'ইসমাত উনূনূর নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

'ইসমাত পাশা ১৮৮০ খৃস্টাব্দে স্মার্নায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন সরকারী চাকুরীজীবী ছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্রও লেখাপড়া করিয়া কোন সরকারী পদে নিয়োজিত হইবে। কিন্তু 'ইসমাত-এর বাল্যকাল হইতেই সৈনিক হওয়ার আগ্রহ ছিল বলিয়া প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর তাঁহাকে ইস্তাম্বুলের সামরিক স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। এইখান হইতে শিক্ষা সমাপনের পর ১৯০৭ খৃস্টাব্দে ক্যাপটেন পদ লাভ করেন। ইহা সুলতান দ্বিতীয় 'আবদু'ল হামীদ খানের শাসনামলের শেষকাল—যিনি স্বেচ্ছাচারিতা ও আইন-বহির্ভূত পদক্ষেপের কারণে নব্য শিক্ষিত তুর্কীদের মধ্যে অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠেন এবং একবার প্রতিনিধি কমিটি ও সংসদ কমিটি প্রতিষ্ঠা স্বীকৃতি দান করার মুহূর্তে স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভংগ করেন। তিনি কয়েকজন দেশপ্রেমিক সদস্যকে, যাঁহাদের মধ্যে দিয়া পাশা, নামিক কামাল, মার্‌হাম পাশা ও শায়খু'ল-ইসলাম খায়রুল্লাহ আফিন্দীকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন এবং মিদ্‌হাত পাশা, যাঁহাকে তা'ইফে বন্দী করা হইয়াছিল—শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের দরুন তুর্কী সৈনিক ও অন্যান্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকে অন্তরে সুলতানের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং একটি গুপ্ত আন্দোলন, যাহা নব্য তুর্কী অথবা "আঞ্জুমান-এ ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কী" নামে পরিচিত ছিল, মাথা চাড়া দিয়া উঠে এবং উহার কেন্দ্রসমূহ য়ূরোপের শহরে ও তুরস্কের সালানীকে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে ১৯০৯ খৃস্টাব্দে একদল সৈনিক, যাহাদের নেতৃত্ব মাহমূদ শাওকাত পাশা ও আনওয়ার বেগ করিতেছিলেন, সালানীক হইতে রওয়ানা হইয়া সুলতানের প্রাসাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং সুলতানকে পদচ্যুত করত তাঁহার স্থলে তাঁহার ভ্রাতা মুহাম্মাদ রাশাদ আফিন্দীকে '৫ম মুহাম্মাদ' উপাধি দান করিয়া সিংহাসনে আসীন করান। এইভাবে সুলতান 'আবদু'ল-হামীদের একনায়কত্ব ও অত্যাচার হইতে জনসাধারণ নিষ্কৃতি লাভ করে। এই আক্রমণে 'ইসমাত পাশাও আনওয়ার পাশার সহযোগী ও পরামর্শদাতা ছিলেন। ইহাতে তুরস্কে আইনশৃংখলার শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল।

অভ্যন্তরীণ অবস্থার এই চরম অবনতি ছাড়াও তুরস্কের বিরুদ্ধে অন্যান্য দেশের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে ১৯১১ খৃ. ইটালী লিবিয়ার ত্রিপোলী আক্রমণ করে। এই সময় মিসরে তুর্কী আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও ইংরেজগণ তুর্কী সৈনিকদের নিজেদের এলাকা রক্ষার জন্য মিসরের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে বাধা দেয়। আনওয়ার পাশা তাঁহার স্বল্প সংখ্যক সঙ্গীদের লইয়া অতিশয় কষ্টসাধ্য পথে খার্তুম ও লিবিয়া মরুভূমি হইয়া ত্রিপোলী পৌঁছেন এবং ইটালীর আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে থাকেন। এই যুদ্ধেও 'ইস্‌মাত পাশা তাঁহার সহযোগী হিসাবে বেশ কিছুকাল সালূম দুর্গ প্রতিরোধ করিতে থাকেন। স্পষ্টত ইহা একটি অসম যুদ্ধ ছিল। তুর্কীগণ ইটালীয়দের তুলনায় অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধ পরিচালনা করিতে সক্ষম ছিল না ; ফলে ত্রিপোলী ইটালীর দখলে চলিয়া যায়। ইহার এক বৎসর পর ১৯১২ খৃ. বলকান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বুলগেরিয়া, সার্ভিয়া, মন্টিনিগ্রো ইত্যাদি তুর্কীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। এই সব রাজ্য রাশিয়া ও য়ূরোপের অন্যান্য রাজ্যের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সাহায্য পাইত। ফলে তুর্কীদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও যে সমস্ত রাষ্ট্র বহুকাল যাবত 'উছমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল স্বাধীন হইয়া গেল। তুর্কীদের এই বিপর্যয় হইতে মুক্তি লাভ মাত্রই ১৯১৪ খৃ. প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল এবং তুর্কীদের মিত্র জার্মান জাতিকে—যাহারা প্রথমে বিজয় অর্জন করে, পরিণামে পরাজয় বরণ করিতে হয়। ফলে সিরিয়া, ইরাক, হিজায ও আরব উপদ্বীপের অন্যান্য অধিকৃত দেশ তুর্কীদের হস্তচ্যুত হয়। গ্রীকগণ স্মার্না ও এশিয়া মাইনরের এক বিরাট অংশ অধিকার করে। অন্যদিকে বুলগেরিয়া-ইদির্‌না ও থ্রেস হস্তগত করে এবং মিত্র শক্তি অর্থাৎ ইংরেজ ও ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী ইস্তাম্বুল ও দারদানেলিস প্রণালী নিজেদের অধীনে আনয়ন করে। মনে হয় যে, তুর্কীদের শত শত বৎসরের প্রাচীন সাম্রাজ্যের এই বুঝি সমাপ্তি ঘটিল ! এই বিপর্যয় ও সংকট মুহূর্তে এমন একজন বীর সেনানীর আবির্ভাব হইল, যিনি স্বীয় জাতিকে সমূহ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া উহাতে এক নব জীবন সঞ্চার করিলেন। তিনি ছিলেন মুসতাফা কামাল পাশা, যিনি ইস্তাম্বুল হইতে আত্মগোপন করিয়া আঙ্কারায় পৌঁছেন। তথায় স্বীয় বন্ধু-বান্ধব ও নিজ কর্মের সাথীদের সাহায্য ও সহযোগিতায় একটি সংগ্রামী সংস্থা গঠন করেন। সুলতানের নিকট হইতে তাঁহার গ্রেফতারী পরওয়ানা বাহির হইলে তিনি আঙ্কারায় একটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করিয়া দেন এবং একাধারে মিত্র শক্তি, গ্রীস ও ইস্তাম্বুলের দুর্বল সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এই সময় 'ইসমাত পাশার নাম মুসতাফা কামালের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন এবং তাঁহার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সামরিক দূরদৃষ্টি মুসতাফা কামালকে বিশেষ সাহায্য করে। প্রথম তিনি গ্রীকদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদেরকে এশিয়া মাইনর হইতে বহিষ্কৃত করেন। এই যুদ্ধে 'ইসমাত পাশা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করেন। অতঃপর উনূনূ (যাহা পরে তাঁহার নামের অংশ হইয়া যায়) সাকারিয়ার যুদ্ধ (জানুয়ারী ও আগস্ট, ১৯২১ খৃ.) বিজয় মাল্য তাঁহার কণ্ঠেই শোভা পায়। ইহা ছাড়া ককেশাসে রুশদের বিরুদ্ধে কাজে মকারাহ বকর পাশার বিজয়ে এবং কারিস-এর অধিকারে তাঁহার বিশেষ অবদান ছিল। এই স্থানে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বের বিস্তারিত বর্ণনার অবকাশ নাই; কিন্তু এই সংঘাতের সময় গ্যালীপলীর যুদ্ধে সাফল্যে এবং মিত্রশক্তির ইস্তাম্বুল হইতে বহিষ্কারে 'ইসমাত পাশার বিরাট প্রভাব ছিল। অবশেষে ১৯২২ খৃ. বিখ্যাত লুজান কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইলে 'ইসমাত পাশাই তুরস্কের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং মিত্রশক্তির নিকট হইতে ঈপ্সিত শর্তসমূহ অনুমোদন করাইতে সফলকাম হন। গ্রীকগণ ইদির্‌না ও থ্রেস ছাড়িয়া দিলে তুরস্কের রাজ্যসীমানা নির্ধারিত হয়, যাহা অদ্যাবধি বর্তমান।

যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে 'মুক্তি লাভের পর মুসতাফা কামাল সুলতান ওয়াহীদু'দ-দীন ৬ষ্ঠ মুহাম্মাদকে (যিনি ১৯০৮ খৃস্টাব্দে পঞ্চম মুহাম্মাদ-এর মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভ করেন) পদচ্যুত করিলে তিনি একটি বৃটিশ সামরিক জাহাজে আরোহণ করিয়া তুরস্ক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। এইভাবে সুলতানের পদ বিলোপ করিয়া 'আবদু'ল-হামীদকে নামমাত্র খলীফার আসনে সমাসীন করেন। রাজ্যের যাবতীয় কাজকর্ম জাতীয় কমিটির সভাপতি মুসতাফা কামাল পাশা সম্পাদন করেন। অতঃপর আতাতুর্ক গণতান্ত্রিক তুরস্কের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলে 'ইস মাত উনূনূকে প্রধান মন্ত্রী পদে নিয়োগ করা হয়। ১৯২৪ সনে জাতীয় সংসদ

খিলাফাতের পদ বিলোপ করে। এইভাবে খলীফার যে নামমাত্র আধ্যাত্মিক অধিকার ছিল তাহারও পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯৩৮ খৃস্টাব্দে আতাতুর্কের মৃত্যুর পর তাঁহার স্থলে 'ইসমাত উনূনূ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। উনূনূ তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে কোন কোন বিষয়ে মুসতাফা কামালের সহিত ভিন্ন মত পোষণ করিলেও এই দুই মহান জাতীয় নেতার পরস্পর সম্পর্ক সর্বদা মধুর ও অন্তরঙ্গ ছিল এবং প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হইবার পরেও তিনি যতদূর সম্ভব মুসতাফা কামালের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

'ইসমাত উনূনূ তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ কীর্তি সাধন করিয়াছিলেন সেগুলির মধ্যে বলকান চুক্তি (অর্থাৎ বলকান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তি ও বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি) এবং সা'দাআবাদ চুক্তি (প্রতিবেশী ইরান-ইরাকরে সহিত বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্কের চুক্তি যাহাতে পরে আফগানিস্তানও অংশগ্রহণ করে) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি দেশের আইনে জাতীয় সংসদ দ্বারা কিছু অত্যাবশ্যকীয় সংশোধন করান এবং শাসন ব্যবস্থায়ও মঙ্গলজনক পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁহারই মন্তিত্বকালে জাতীয় সংসদে একটি বিরোধী দলের সৃষ্টি হয়, যাহার নেতৃত্ব দেন ফাতহ়ী বেগ। কিন্তু এই দল কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্য করিতে পারে নাই এবং উহা বেশী দিন স্থায়ীও হয় নাই।

'ইসমাত উনূনূর আমলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি প্রজ্ঞার সহিত তুরস্ককে জোট-নিরপেক্ষ রাখেন। ১৯৫০ হইতে ১৯৬০ খৃ. পর্যন্ত তিনি বিরোধী দলের নেতা ছিলেন। ১৯৬০ খৃস্টাব্দে সামরিক বিপ্লবের পরে তিনি তিনবার মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। কিন্তু দেশের প্রতি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই এবং ১৯৭২ খৃস্টাব্দে উহার স্থলে উচ্চ অভিজাত পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ খৃ. 'ইসমাত উনূনূ ইনতিকাল করেন।

'ইসমাত উনূনূ খর্বকায় ও ক্ষীণকায় ছিলেন। তাঁহার মস্তক ক্ষুদ্র, নাসিকা কিঞ্চিৎ উঁচু, চক্ষু নীলাভ ও ক্ষুদ্র এবং চুল কোঁকড়ান ছিল। কানে কম শুনিতেন এবং স্বল্পভাষী ছিলেন। তাঁহার বাহ্যিক শারীরিক গঠন ও আকৃতি দেখিয়া কেহ ইহা অনুমান করিতে পারিত না যে, তিনি কিরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী ছিলেন! তিনি বিনয়ী ও ভদ্র ছিলেন এবং মনে হয় স্বীয় শ্রবণ শক্তির দুর্বলতার জন্য স্মিত হাস্য করিতেন। উল্লেখ্য যে, লুজান কনফারেন্স চলাকালীন লর্ড কার্জন ও মিত্র শক্তির অন্যান্য প্রতিনিধির দীর্ঘ বক্তৃতার সময় তিনি নিশ্চুপ বসিয়া থাকিয়া স্মিত হাস্য করিতে থাকেন এবং তাঁহার বক্তৃতার পালা আসিলে বলিয়া উঠেন, "আমি এই বক্তৃতাগুলি শুনিতে পাই নাই।" অতঃপর তিনি সংক্ষেপে অথচ জোরালো ভাষায় তুরস্কের মূলনীতি ব্যক্ত করেন। মিত্রশক্তির প্রতিনিধিগণ তাঁহার এই আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু যেহেতু তুরস্কের পেশ করা শর্তসমূহ সত্য ও ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেইজন্য তাঁহাদের উহা মানিয়া লইতে হইল।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) মুহাম্মাদ আশরাফ খান 'আতা, 'ইসমাত উনূনূ, লাহোর মুদ্রণ ঃ (২) মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ আ'ওয়ান, গাযী 'ইসমাত উনূনূ, লাহোর মুদ্রণ ঃ (৩) Ency. Brit. সংশ্লিষ্ট নিবন্ধ।

মুহ়াম্মাদ ওয়াহ়ীদ মির্যা (দা.মা.ই.)/মোহাম্মদ হোসাইন

**ইস্‌রা** (إسراء) ঃ শব্দটি سرى হইতে باب إفعال-এর مصدر اسرى أ ক্রিয়ার অর্থ "রাত্রিকালে চলিল"। সাধারণত إسراء ও سرى (ثلاثى مجرد) -কে সমার্থক বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে إسراء শব্দটি রাত্রির প্রথমাংশে ও سرى উহার শেষাংশে ভ্রমণ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। سير এবং اسراء-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, سير শব্দটি দিবসে হউক কিংবা নিশিথে হউক, সাধারণ 'গমন' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু إسراء শব্দটি শুধু নৈশ ভ্রমণের জন্য নির্দিষ্ট। যখন ইহার صله (Preposition) "ب" হয় আর বলা হয় أسرى به, তখন ইহার অর্থ হয় "তাহাকে রাত্রিকালে লইয়া গেল", "তাহাকে রাত্রিতে ভ্রমণ করাইল (سيره)"।

'পরিভাষায় إسراء রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর জীবনের সেই ঘটনার সহিত সম্পৃক্ত যাহা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। আয়াতটি হইলঃ

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ·

"পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাঁহার বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন মাসজিদু'ল-হারাম হইতে মাসজিদু'ল-আকসায় যাহার পরিবেশ আমি করিয়াছিলাম বরকতময়" (১৭ ঃ ১)।

সম্পূর্ণ এই সূরাটি ইসরা-র রহস্য, পরিণাম ও বিধান সম্পর্কিত। ইস্‌রা'র ঘটনা সম্পর্কে ইসলামী বিশ্বাস এই যে, এই ভ্রমণে চক্ষু দ্বারা দেখার জন্য যেসব শর্ত পূরণ আবশ্যক, সেইসব শর্তের যাবতীয় বাধা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর চক্ষু হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, শ্রবণের সাধারণ নিয়মাবলী অপসারিত হইয়াছিল এবং স্থান ও কালের সকল দূরত্ব তাঁহার জন্য সঙ্কুচিত করা হইয়াছিল। যদিও সকল নবীকে নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী এই ধরনের বিশেষ বিশেষ পর্যবেক্ষণ-সুযোগে ধন্য করা হইয়াছিল, তথাপি এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বিচরণ যতদূর পর্যন্ত হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

ইসরা' (মিরাজ) কখন সংঘটিত হইয়াছিল সেই বিষয়ে সকলেই একমত যে, নুবুওয়াত প্রাপ্তি তথা ওয়াহ়য়ির সূচনা-পরবর্তী ও হিজরাত-পূর্ববর্তী সময়ের সহিত ঘটনাটির সম্পর্ক রহিয়াছে এবং ইহা রাত্রিকালে পবিত্র মক্কায় সংঘটিত হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা অধিক নিশ্চিত করিয়া বলিবার পথে বাধা এই যে, ঘটনাটি হিজরত-পূর্ববর্তী সময়ের, যখন জাহিলী যুগ কেবল শেষ হইয়াছে এবং সন-তারিখ লেখা তখনও শুরু হয় নাই। মুহাদ্দিছীন-এর কাহারও নিকট হইতে শব্দ বর্ণনাসূত্রে এই ঘটনার সুনির্দিষ্ট সময়কাল সংক্রান্ত বিবরণ পাওয়া যায় না। সীরাত লেখকদের ঐ ঘটনা সম্পর্কে দশটিরও অধিক বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। সীরাত ইব্ন হিশাম-এ ইহাকে আবূ তা'লিব ও হযরত খাদীজা (রা)-র ইনতিকালের পরবর্তী ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আবূ তালিব ও হযরত খাদীজা (রা)-র ইনতিকাল 'শি'ব আবী তা'লিব'-এ অবরোধ শেষ হওয়ার পর হইয়াছিল। হযরত 'আা'ইশা (র)-র বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত খাদীজা (র) হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে ইনতিকাল করেন। অন্যদের বর্ণনানুযায়ী তাঁহার ইনতিকাল হয় হিজরতের পাঁচ বৎসর পূর্বে। এই বিষয়গুলি একত্র করিলে ইহাই দাঁড়ায় যে, মি'রাজ তথা ইসরা'র ঘটনা ইবনু'ল-আছ়ীর ও ইব্ন হিশামের বর্ণনানুসারে হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে সংঘটিত হয়। পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ ইমাম যুহ্‌রীর বরাত দিয়া লিখিয়াছেন যে, এই ঘটনা নবূওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বৎসর পর ঘটিয়াছিল।

'আল্লামাঃ ইব্‌ন হাজার 'ফাত্‌হু'ল-বারী (৭খ, ১৫৫, মিসর)-তে এই মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইভাবে ঘটনাটির সময়কালে হিজরতের প্রায় সাত বৎসর পূর্বে স্থির হইয়া থাকে। কতিপয় লোকের যুক্তি এই যে, পাঁচ ওয়াক্'ত সালাত সর্বসম্মতিক্রমে মি'রাজ-এ ফারদ হয় এবং এই সালাত নুবূওয়াত প্রাপ্তির পরপরই ফারদ হইয়া গিয়াছিল। অতএব, মি'রাজ ও ইসরা'র ঘটনা নবূওওয়াত প্রাপ্তির প্রাথমিক যুগের সহিত সম্পর্কযুক্ত।

হযরত 'আ'ইশা (রা), হযরত উম্মু সালামা (রা), হযরত উম্মু হানী (রা), হযরত 'আব্বাস (রা), হযরত 'আম্‌র ইব্‌নু'ল-'আস (রা) প্রমুখ বহু সংখ্যক প্রাথমিক রাবী ও কাতাদা, মুক'াতিল, ইব্‌ন জুরায়জ, 'উরওয়া ইব্‌নু'য-যুবায়র প্রমুখ তাবি'ঈ এই মতের সমর্থক যে, ইহা হিজরত অর্থাৎ প্রথম হিজরীর রাবী'উ'ল-আওওয়াল মাস হইতে প্রায় এক বৎসর পূর্বের ঘটনা। ইমাম বুখারী (র) তাঁহার 'স াহ'ীহ' ' গ্রন্থে যদিও কোন নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করেন নাই, তথাপি ধারাবাহিক বিন্যাস হিজরত-পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর বর্ণনায় সকলের শেষে এবং 'আকাবার শপথ (১ম আকাবার শপথ, রাজাব ১০ম নাবাবী সন) ও হিজরত (রাবী'উ'ল-আওওয়াল ১ হি.)-এর ঘটনার একেবারে পূর্বে ইসরা' ও মিরাজের ঘটনাকে স্থান দিয়াছেন। ইব্‌ন সা'দও ঘটনাবলীর বিন্যাসধারায় মি'রাজের ঘটনার এই রাখিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই দুই বিশেষজ্ঞের মতে হিজরতের কিছুকাল পূর্বে এই ঘটনার সময়কাল নির্দিষ্ট। মুসলিম ইব্‌ন ক'াতাদা হিজরতের ১৮ মাস এবং আস-সুদ্দী ১৭ কিংবা ১৬ মাস পূর্বের সময়কে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সুবিদিত যে, আস-সুদ্দী গ্রহণযোগ্য রাবীদের পর্যায়ভুক্ত নহেন। যাহা হউক, এই রাবীগণের মতে হিজরতের কিছু পূর্বে এক বৎসর পূর্বে হউক কিংবা কিছু কম-বেশী হউক, ইসরা' ও মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়।

খৃষ্টান লেখকগণ ঘটনাটি নুবুওয়াতের দ্বাদশ বর্ষে সংঘটিত বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন (W. Muir, Life of Mehomet, ১৯২৩ খৃ., পৃ. ১২১)। এই ঘটনা কোন্ মাসে ঘটিয়াছিল সেই সম্পর্কে ইব্‌ন 'উমার (রা) হইতে বর্ণিত আছে (খাসা'ইসু'ল-কুবরা, ১খ, ১৬১) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে হিজরতের এক বৎসর পূর্বে রাবী'উল-আওওয়াল মাসের ১৭ তারিখে নৈশ ভ্রমণ করান হইয়াছিল। একই বর্ণনা উম্ম সালামাঃ (রা) হইতে ইব্‌ন সা'দও বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন সা'দ আল-ওয়াকি দীর সূত্রে ১৭ রামাদানের বর্ণনাটিও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কেহ কেহ রাবী'উছ-ছানী ও শা'বান মাস বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন (আয-যুর্‌কানী, ১খ, ৩০৬)। ইব্‌ন কুতায়বা, আদ-দীনাওয়ারী (মৃ. ২৬৭ হি.) ও ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-রাব্‌র (মৃ. ৪৬৩ হি.) রাজাব মাস স্থির করিয়াছেন। পরবর্তীকালীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইমাম আর-রাফি'ঈ ও ইমাম আন-নাওয়াব ী 'রাওদা গ্রন্থে এই তারিখই দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। মুহাদ্দিছ 'আব্‌দু'ল-গানী আল-মাক্‌দিসী ২৭ রাজাব লিখিয়াছেন। 'আল্লামা আযরক 'ানী বলেন যে, লোকেরা এই মতই গ্রহণ করিয়াছে এবং মনে করা হয় যে, এই বর্ণনাই অধিকতর শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য। কেননা নিয়ম এই যে, পূর্ববর্তীদের মধ্যে যখন কোন ব্যাপারে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় এবং কোন পক্ষকেই অগ্রাধিকার দেওয়া যায় না, তখন অধিকতর সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে সেই পক্ষকেই সঠিক ধরিতে হইবে যাহার উপর আমল পাওয়া যায় এবং যাহা লোকদের নিকট প্রচলিত ও স্বীকৃত (আয-যুরক 'ানী, ১খ, ৩৫৫)।

মি'রাজ ও ইস্‌রা' একই জিনিস, না ভিন্ন ভিন্ন আত্মিক পর্যবেক্ষণ, সেই ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশের মতে ইস্‌রা' ও মি'রাজ একই বাস্তবতার দুইটি ভিন্ন নাম। معراج শব্দটি عروج হইতে উদ্ভূত, ইহার অর্থ ঊর্ধ্ব-গমন। আর إسراء -র অর্থ রাত্রিতে ভ্রমণ, যেন স্থান হিসাবে উহার নাম মি'রাজ আর কাল হিসাবে ইস্‌রা'। কিন্তু কতিপয় লোকের ধারণা এই যে, ইস্‌রাা' ও 'মি'রাাজ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন আত্মিক পর্যবেক্ষণ। এই ধারণার ভিত্তিতে তাঁহারা বলেন যে, মি'রাজ দুইবার হইয়াছে—একটিকে ইস্‌রা' ও অপরটিকে মি'রাজ বলে। তাঁহাদের মতে ইস্‌রা' পবিত্র মক্কা হইতে বায়তু'ল-মাক্ দিস পর্যন্ত, আর মি'রাজ পৃথিবী হইতে ঊর্ধ্বলোক পর্যন্ত। ইঁহাদের মতে সাহাবীদের মধ্যে উভয় ঘটনা সম্পর্কে ইস্‌রা' শব্দের ব্যবহার ছিল। সাহাবীগণ কখনও ইস্‌রা' শব্দ বলিয়া মি'রাজ বুঝাইতেন, আবার কখনও শুধু "ঊর্ধ্বলোকে গমন" অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করিতেন। আবার এই ঘটনা দুইটি রাত্রিকালে সংঘটিত হইয়াছিল, যেই কারণে ইস্‌রা' শব্দটি উভয় ঘটনার প্রতি প্রযোজ্য। অধিকন্তু উভয় পর্যবেক্ষণের কতিপয় ঘটনা একই রকম ছিল। যেমন বাহন বুরাক, নবীগণের সহিত সাক্ষাত এবং জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্য। যেহেতু নাম ও কাজের বিবরণসমূহে অনেক মিল ছিল এবং ঊর্ধ্বলোকের অদ্ভুত ও বিস্ময়কর দৃশ্যাবলীর উল্লেখ ছিল, তাই পরবর্তীকালে কতিপয় বর্ণনাকারীর চিন্তায় উভয় ঘটনা বিজড়িত হইয়া যায় এবং তাঁহারা দুইটি ঘটনাকে অভিন্ন মনে করিয়া তাহা একত্রে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন ; আর ইহাতে পরবর্তীকালের অনেকেই ধোঁকায় পড়িয়া ইহাকে একই ঘটনার বিবরণ মনে করিয়া বসেন। তাঁহাদের মতে মি'রাাজ নুবূওয়াতের প্রথম দিকে কিংবা বেশী হইলে সূরা আন্-নাজ্‌ম নাযিল হওয়ার (নুবূওয়াতের ৫ম বৎসর) পূর্বে সংঘটিত হয়। তাঁহাদের মত অনুযায়ী ইস্‌রা'র ঘটনা পবিত্র কুর্‌আনের সূরা বানী ইস্‌রা'ঈলে উল্লিখিত রহিয়াছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ হযরত আনাস (রা)-র বর্ণনায় পাওয়া যায়। আর মি'রাজের ঘটনার উল্লেখ আছে সূরা 'আন-নাজ্‌ম-এ, যাহার বিবরণ বিস্তারিতভাবে বিধৃত হইয়াছে আবূ যার্‌র (রা), মালিক ইব্‌ন সা'সা'আ (রা) প্রমুখ সাহ 'াবীদের বর্ণনাসমূহে। এই ব্যক্তিবৃন্দ উভয় ঘটনার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন এই কারণে যে, পবিত্র কুরআনের সূরা বানী ইস্‌রা'ঈলে ইস্‌রা'র যে বর্ণনা রহিয়াছে উহাতে কেবল পবিত্র মক্কা হইতে বায়তু'ল-মাক্‌দিস পর্যন্ত ভ্রমণের উল্লেখ আছে। পক্ষান্তরে মি'রাজের ভ্রমণ ছিল আস্‌মান পর্যন্ত। এই বিভক্তির ফলে তাঁহাদের মতে ইস্‌রা' ও মি'রাজ সম্পর্কে বর্ণিত কতিপয় বিবরণের বিভিন্নতা অনেকাংশে দূরীভূত হইয়া যায়। তাহা ছাড়া ইস্‌রা'-র স্থান বর্ণনাকারী রাবী শুধু একজন, তিনি হযরত উম্মু হানী' (রা) বিন্‌ত আবী ত 'ালিব। ইঁনি বলেন যে, ইস্‌রার রজনীতে রাসূলুল্লাহ্ (স) আমার ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। উম্মু হানী' (রা) হইতে সাতজন মুহ 'াদ্দিছ কমপক্ষে চারিটি বিভিন্ন সূত্রে নিজ নিজ গ্রন্থে এই ঘটনা সম্পর্কিত বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এইসব বর্ণনার প্রতিটিতে ইস্‌রা'র প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর শুধু বায়তু'ল-মাক্‌দিস পর্যন্ত গমনের কথা বলা হইয়াছে। এইসব সূত্রের কোন বর্ণনায় রাসূলুল্লাাহ (স)-এর আসমান পর্যন্ত ভ্রমণের কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত নাই। অতএব, ইব্‌ন মাস্'উদ (রা), শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (রা), 'আ'ইশা (রা) ও উম্মু সালামা (রা)-র বর্ণনাসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর শুধু বায়তু'ল-মাক্ দিস পর্যন্ত গমনের উল্লেখ রহিয়াছে; আস্‌মান ভ্রমণের কোনই উল্লেখ নাই, যাহা মি'রাজের প্রধান অংশ। তাহা ছাড়া এই ঘটনার প্রাচীন বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত আবূ যার্‌র (রা) ও

মালিক ইব্‌ন সা'সা'আ (রা) রহিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে হযরত আবূ যার্‌র (রা) একেবারে শুরুর দিকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দুই প্রখ্যাত সাহাবী তাঁহাদের বর্ণনাসমূহে যখন মি'রাজের ঘটনা উল্লেখ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণের বর্ণনায় বায়তু'ল মাক্‌দিস কিংবা যেরুসালেমের কথা উল্লেখ করেন না অর্থাৎ যেসব প্রবীণ সাহাবী (রা) মি'রাজের উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা ঊর্ধ্বলোকে গমনের কথা অবশ্যই উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু বায়তু'ল-মাক্‌দিসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা ঊর্ধ্বলোকে গমনের কথা বলেন না। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহাদের নিকট ইস্‌রা' ও মি'রাজ সম্পূর্ণ দুইটি ভিন্ন ঘটনা। এই ভিন্নতায় বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত অন্যান্য কতিপয় বিবরণের মতপার্থক্য ছাড়াও এই মতভেদও অনেকাংশে দূর হইয়া যায় যে, এই ঘটনা' রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কী জীবনের প্রথমদিকে সংঘটিত হইয়াছিল না শেষের দিকে। কেননা এইভাবে যাঁহারা উহাকে নুবূওয়াতের ৫ম বর্ষের পূর্বের ঘটনা বলিয়াছেন তাঁহারা মি'রাজের কথা বলেন, আর যাঁহারা তাহার পরের ঘটনা বলিয়াছেন তাঁহাদের বর্ণনা ইস্‌রাা' সম্পর্কিত। এইসব কারণে কেহ কেহ আবার দুইয়ের অধিক মি'রাজের কথাও বলিয়া থাকেন। 'আল্লামা সুহায়লীর ঝোঁক একাধিক মি'রাজের প্রতি (রাওদু'ল-উনুফ, মিসর, ১খ, ২৪৪)। কিন্তু 'আল্লামা ইব্‌ন কাছীর তাঁহার তাফসীরে একাধিক মি'রাজের মতকে অসমর্থিত আখ্যা দিয়াছেন। আয যুর্‌কানী বলিয়াছেন যে, ইস্‌রা' ও মি'রাজ একই ঘটনা। তিনি লিখিয়াছেন, ইহাই অধিকাংশ মুহাদ্দিছ, কালামশাস্ত্রবিদ ও ফিক্‌হশাস্ত্রবিদের অভিমত এবং ক্রমাগত সাহীহ বর্ণনাসমূহে ইহারই সমর্থন পাওয়া যায়" (শার্‌হ মাওয়াহিব, ১খ, ২৫৫)।

ইস্‌রা' বা মি'রাজ কি সশরীরে হইয়াছিল না আত্মিকভাবে, স্বপ্নে হইয়াছিল না জাগ্রত অবস্থায়-এই প্রশ্নে কতক লোকের ধারণা, ইহা শারীরিক ও জাগ্রত অবস্থায় ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীছে সুস্পষ্ট ভাষায় এই ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নাই। আর এইজন্য কাদী 'ইয়াদ 'শিফা' গ্রন্থে ও ইমাম নাওয়াবী 'শারহ মুসলিম' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "লোকেরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে নৈশ ভ্রমণ করানোর ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করিয়াছে। একটি মত এই যে, এই ঘটনার সবটাই স্বপ্নে ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোক, বিরাট সংখ্যক পূর্বসূরী ও উত্তরসুরিদের মধ্যে সাধারণ ফিক্‌হ-শাস্ত্রবিদ, মুহাদ্দিছ ও ধর্মতাত্ত্বিকগণ যে সঠিক মত পোষণ করেন তাহা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে সশরীরে নৈশ ভ্রমণ করান হইয়াছিল। যেই ব্যক্তি হাদীছ অধ্যয়ন ও গবেষণা করিয়াছেন তিনি উহাতে ইহার প্রমাণ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। হাদীছগুলির প্রকাশ্য অর্থ এড়াইয়া যাওয়ার কোন দরকার নাই, যদি না উহাদের বিরুদ্ধে কোন সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া যায় এবং প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা কোন কারণেই অসম্ভব নহে, তাহা হইলে রূপক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইত" (শারহ মুস্‌লিম, বাবু'ল-ইস্‌রা")।

অন্যদের ধারণা, ইহা রাত্রিকালের এক স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছু ছিল না। ইহাদের যুক্তি এই সূরা বানী ইস্‌রাঈলে ইস্‌রা'র প্রসংগ বর্ণনার পর বলা হইয়াছে ঃ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنٰكَ "আমি যে (স্বপ্নবৎ) দৃশ্য তোমাকে দেখাইয়াছি" (১৭ ঃ ৬০)।

এখানে পরিষ্কার ভাষায় ইহাকে رؤيا(স্বপ্ন) বলা হইয়াছে। আর স্বপ্ন ত ঘুমের মধ্যেই হইয়া থাকে। ইহার সমর্থনে 'মুফরাদাত রাগিব' গ্রন্থের উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য ঃ الرؤيا ما يرى فى المنام "রু'য়াা তাহাকেই বলে যাহা মানুষ ঘুমের মধ্যে দেখিয়া থাকে।" দ্বিতীয়ত, কাফিরগণ যখন রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে সশরীরে ঊর্ধ্বলোকে গমনের দাবি তুলিয়া বলিল ঃ أَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَاءِ "অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করিবে" (১৭ ৯৩), তখন তাহার জওয়াবে বলা হইল ঃ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلاَّ بَشَرًا رَّسُوْلاً "বল, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি ত হইতেছি কেবল একজন মানুষ একজন রাসূল" (১৭ ঃ ৯৩)।

ইহাতে যেন বলা হইয়াছে যে, মানুষের পক্ষে সশরীরে এই বিশ্বচরাচর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া মানব প্রকৃতির পরিপন্থী। তৃতীয়ত, সাহাহ বুখারীর বর্ণনায় আছে ঃ فيما يرى قلبه وتنام عينه ولاينام قلبه অর্থাৎ "মি'রাজ এমন অবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল যখন তাঁহার (স) অন্তর দেখিতেছিল, চক্ষু ঘুমাইতেছিল এবং তাঁহার অন্তর ছিল জাগ্রত। এই হাদীছের শেষে এই কথাগুলি রহিয়াছে ঃ واستيقظ وهو فى المسجد الحرام অর্থাৎ "তিনি ঘুম হইতে জাগ্রত হইলেন, যখন তিনি ছিলেন 'আল-মাস্‌জিদু'ল-হারাম'-এ। এই সকল উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঘটনাটির সব কিছুই রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট স্বপ্নে আসিয়াছিল। চতুর্থত, আল্লাহ্ যখন সর্বত্র বিদ্যমান, তখন কোন মানুষের স্থান পরিবর্তন করিয়া 'ঊর্ধ্বে' আস্‌মানের কোন অংশে আল্লাহ্‌র সহিত মিলন এবং সেইখানে যাইয়া قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى (৫৩ ঃ ৯) অর্থাৎ "দুই ধনুক কিংবা তাহা অপেক্ষা কম পরিমাণ দূরত্বে" অবস্থানকে কিভাবে বাহ্যিক ও শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করা যায়? পঞ্চমত, রাসূলুল্লাহ্ (স) মি'রাজ ও ইস্‌রা'-তে যাহা কিছু অবলোকন করিয়াছেন তাহা এই পৃথিবীতে কাশ্‌ফ ও স্বপ্নাবস্থায় দেখা যেমন সম্ভব তেমনি তাহার প্রমাণও রহিয়াছে এবং ইহাতে অসম্ভব কোন কিছু নাই অর্থাৎ তিনি মাস্‌জিদু'ল-হারামে থাকিয়াই বায়তু'ল-মাক্‌দিস দর্শন করিয়াছেন। হাদীছে আছে, কাফিররা যখন ইস্‌রা' সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কথা অবিশ্বাস করিল এবং পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে তাঁহার নিকট বায়তু'ল-মাক্‌দিসের বিবরণ জানিতে চাহিল, তখন আল্লাহ্ বায়তু'ল-মাক্‌দিসকে তাঁহার অন্তর-চক্ষুর সামনে আনিয়া ধরিলেন আর তিনি একে একে তাহাদের সকল প্রশ্নের জওয়াব দিলেন। এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর এই কথাগুলি হাদীছে পাওয়া যায় ঃ قمت إلى الحجر فجلى الله لى بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن أياته وأنا أنظر إليه অর্থাৎ "আমি হাতীমে দাঁড়াইলাম আর আল্লাহ্ বায়তু'ল-মাক্‌দিসকে আমার সামনে আনিয়া দিলেন। আমি তখন তাহাদেরকে উহার নিদর্শনাদি বলিতে লাগিলাম তখন আমি বায়তু'ল-মাক্‌দিস্‌কে দৃষ্টিপাত করিয়া যাইতেছিল।" যেন বায়তু'ল-মাক্‌দিসকে রাসূলুল্লাহ্ (স) হাতীমে দাঁড়াইয়া অন্তর-চক্ষু দ্বারা অবলোকন করিয়াছিলেন। আবার জান্নাত ও জাহান্নাম সম্বন্ধে কুসূফ (সূর্যগ্রহণ)-এর হাদীছে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন "আমাকে সেইখানে সব কিছুই দেখান হইয়াছে, এমন কি জান্নাত ও জাহান্নাম।" ইহা সেই সময়ের কথা যখন তিনি মদীনায় কুসূফের সালাতের ইমামতি করিতেছিলেন (বুখারী কুসূফ)। তারপর যেভাবে মি'রাজে (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى) "অতঃপর সে তাহার নিকটবর্তী হইল" (৫৩ ঃ ৮) কথাটি আছে তেমনি মুস্‌নাদ আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বাল ও তিরমিযীতে মু'আয

(রা)-র বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স ) বলিয়াছেন, "আমি আমার প্রতিপালককে সুন্দরতম আকৃতিতে দেখিয়াছি" আর ইহা এই পৃথিবীরই কথা। এইসব দর্শনের জন্য স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় নাই। এইভাবে ইস্‌রা' ও মি'রাজেও তিনি কার্যত স্থান পরিবর্তনের কথা বলেন নাই। আল্লাহ্‌র যেমন কোন মানুষকে ঊর্ধ্বলোকে উঠাইয়া নিয়া জান্নাত ও জাহান্নাম দেখাইবার ক্ষমতা আছে, তেমনি তাঁহার জান্নাত ও জাহান্নামকে মর্ত্যে নামাইয়া আনিবার ক্ষমতাও রহিয়াছে, যাহাতে মানুষ নিজের জায়গায় থাকিয়াই উহা দেখিতে পারে। আবার তাঁহার এমন ক্ষমতাও আছে যে, বেহেশ্‌ত, দোযখ আর মানুষ স্ব স্ব স্থানে থাকিবে এবং কোনরূপ স্থান পরিবর্তন ছাড়াই মানুষ জান্নাত ও জাহান্নাম অবলোকন করিবে। এই তিন অবস্থার কোনটিতেই আল্লাহ্‌র ক্ষমতা প্রদর্শনের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য হয় না। একইভাবে ঘটনাটি ইস্‌রা'তে সংঘটিত হইয়াছিল— বায়তু'ল-মাক্‌দিস নিজের জায়গায় ছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (স )-ও নিজের জায়গায় ছিলেন, আর মধ্যবর্তী সকল অন্তরায় উঠিয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ (স) বায়তু'ল-মাক্‌দিস দেখিতে পাইলেন। এই ঘটনাও একটি রু'য়া ছিল। সাহাবীদের মধ্যে হযরত মু'আবি'য়া (রা) উহাকে রু'য়া-ই আখ্যায়িত করিতেন।

ইব্‌ন জারীর বলেন, "মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইস্‌হাক হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, য়া'কূব ইব্‌ন 'উত্‌বা আমাকে বলিয়াছেন যে, মু'আবিয়া ইব্‌ন আবী সুফ্‌য়ান (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ (স )-এর নৈশ ভ্রমণ (ইসরা') সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিতেন, উহা ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে একটি সত্য স্বপ্ন (كانت رؤيا من الله صادقة) (ইব্‌ন জারীর, তাফ্‌সীর, সূরা বানী ইস্‌রা'ঈল, ইব্‌ন হিশাম, যি কৃরু'ল-মি'রাজ; দুর্‌র মান্‌ছূর, ৪খ, ১৯৭)। কিন্তু এই বর্ণনাটির সূত্রে বিচ্ছিন্নতা রহিয়াছে (منقطع); কেননা য়া'কূ ব ইব্‌ন 'উত্‌বা হযরত মু'আবিয়ার সমকালীন ছিলেন না। ইব্‌ন জারীর-এর আর একটি বর্ণনা ঃ حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد قال حدثنى بعض ال أبى بكر أن عائشة كانت تقول : ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسرى بروحه 'আ'ইশা (রা) বলিতেন, "রাসূলুল্লাহ্ (স )-এর দেহ অদৃশ্য হয় নাই, বরং তাঁহাকে আত্মিকভাবে রাত্রি ভ্রমণ করানো হয়" (ইব্‌ন জারীর, তাফসীর সূরা বানী ইসরা'ঈল ; ইব্‌ন হিশাম, যি করু'ল-ইসরা')।

এই বর্ণনাটিতেও মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইস্‌হাক ও হযরত 'আ'ইশা সিদ্দীকা (রা)-র মধ্যে একজন রাবী অর্থাৎ আবূ বাক্‌র-পরিবারের জনৈক ব্যক্তির নাম উল্লেখ নাই। যাহা হউক, এই লোকদের মতে মি'রাজ ও ইস্‌রা' এই ভৌত (عنصرى) শরীরে নয়, বরং সেই নূরানী শরীরে হইয়াছিল, যাহা আল্লাহ্ তাঁহার প্রিয় বান্দাগণকে কাশ্‌ফ ও রু'য়া অবস্থায় আধ্যাত্মিক জগৎ ভ্রমণের জন্য দান করিয়া থাকেন। তৃতীয় দলের মতে ইহা ছিল بين اليقظة والنوم অর্থাৎ "জাগরণ ও নিদ্রার মধ্যবর্তী অবস্থা"। চতুর্থ মত এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ইস্‌রা' কিংবা মি'রাজ শুধু সচরাচর লোকেরা দেখিয়া থাকে এমন কোন সাধারণ স্বপ্ন ছিল না ; আবার জাগ্রত অবস্থার সাধারণ কোন ঘটনাও ছিল না, বরং সেই জাগরণ সাধারণ জাগরণ হইতে অনেক গুণ বেশী শক্তিসম্পন্ন ছিল এবং তাহাতে রাসূলুল্লাহ্ (স )-এর অনুভূতিসমূহে এত তীব্রতা দান করা হইয়াছিল যে, উহার তুলনায় আমাদের এই জাগরণও শুধু এক স্বপ্নসদৃশ। আর যদি ইহা স্বপ্ন কিংবা কাশ্‌ফ হইয়া থাকে, তবে তাহা এমন স্বপ্ন কিংবা কাশ্‌ফ ছিল যাহার জন্য লক্ষ জাগরণকে উৎসর্গ করা যায়, এমন কি তাহা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অন্যান্য স্বপ্ন ও কাশ্‌ফ হইতেও বহু গুণ প্রবল ছিল। ইহা এমন এক অবস্থা ছিল যাহা বাহ্যত স্বপ্ন মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে জাগরণ, বরং জাগরণ অপেক্ষাও বেশী কিছু ছিল। তাঁহাদের মতে আসলে যাঁহারা উহাকে জাগ্রত অবস্থার ঘটনা বলিয়াছেন তাঁহারাও স্বীকার করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ইন্দ্রিয়সমূহ অসাধারণভাবে জ্যোতির্ময় ছিল। আর যাঁহারা উহাকে 'কাশ্‌ফ' কিংবা স্বপ্ন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকেন তাঁহারাও ঐ ঘটনার জন্য منام ও رؤيا শব্দদ্বয় ব্যবহার করিয়া প্রকৃতপক্ষে রূপকের আশ্রয় লইয়াছেন এবং তাঁহারাও উহাকে এমন স্বপ্ন মনে করেন যাহা চাক্ষুষ অবলোকনের মতই প্রতিভাত হইয়া থাকে। 'মা'আলিমু'স-সুনান'-এর লেখক ইমাম খাত্ত াবীও তাহাই লিখিয়াছেন (ফাত্‌হু 'ল-বারী, ১৩খ, ৪০২)। যেন উভয় দলের বক্তব্য হইল যে, ইহা ছিল এমন একটি আত্মিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা যাহা সাধারণ জাগরণ ও সাধারণ স্বপ্ন হইতে বহু গুণ উর্ধ্বের বিষয়, যেইখানে আমাদের বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাভাবিক জাগতিক নিয়মে যেইসব জিনিস অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা অসম্ভব থাকে না। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ইস্‌রা' সম্পন্ন হইবার সেই মহান অবস্থা পুরাপুরি আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না, সেইহেতু নির্জেদের অসম্পূর্ণ প্রকাশ ক্ষমতার ত্রুটির জন্য উহাকে কেহ 'কাশ্‌ফ' ও স্বপ্ন, কেহ 'জাগরণ', আবার কেহ 'জাগরণ ও নিদ্রার মধ্যবর্তী অবস্থা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা উহাকে কাশ্‌ফ ও স্বপ্ন আখ্যায়িত করিয়াছেন তাঁহারা ইহা এইজন্য করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) ঐ সময়ে যাহা কিছু পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং যেইভাবে দর্শন-শ্রবণের শর্তাবলীর জাগতিক শর্তাবলী তাঁহার জন্য রহিত করা হয় এবং সর্বোপরি স্থান-কালের ব্যবধানসমূহ যেইভাবে ঘুচিয়া যায়, তাহা আমাদের সাধারণ পর্যবেক্ষণের উর্ধ্বে ছিল। তদুপরি স্বপ্নের জগৎ আত্মা ও প্রাণের রহস্যসমূহের এক বিস্ময়কর ক্ষেত্র ! অতএব, নিদ্রাবস্থায় আত্মার বহির্জগতের সহিত বাহ্যিক ও শারীরিক সম্পর্ক কমিয়া যায়, আর মানুষ আধ্যাত্মিক জগৎ ভ্রমণ করিতে পারে। অতঃপর আত্মার বহির্জগতের সহিত বাহ্যিক সম্পর্কহীনতা যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আধ্যাত্মিক জগতে উহার ভ্রমণ ততই বাড়িয়া যায়। এইজন্য ঐ অসাধারণ অবস্থা বর্ণনার জন্য, যাহা আমরা সাধারণ জাগরণে পর্যবেক্ষণ করিতে পারি না, তাঁহারা রু'য়া (رؤيا) ও 'কাশ্‌ফ' (كشف) শব্দগুলি ব্যবহার করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের রু'য়া ও কাশ্‌ফ-এর অর্থ আমাদের কল্পনাপ্রসূত দৈনন্দিন স্বপ্ন নয়, যাহাতে সত্য দর্শন ও বাস্তব-পরিচিতি অনুপস্থিত থাকে। যাঁহারা মনে করেন যে, কিছু লোক এই জড় জগতের বন্ধনে থাকিয়াও উহাতে বন্দী হন না, তাঁহাদের মতে জাগ্রত অবস্থাও আধ্যাত্মিক জগতের পর্যবেক্ষণে বাধার সৃষ্টি করে না। ইঁহারা বিনিদ্র অবস্থায়ও অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভূতির জোরে সাধারণ মানব-সীমার উর্ধ্বে অবস্থিত উক্ত জগতে পৌঁছিতে সক্ষম হন, যাহা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত। তাহা ছাড়া সজাগ অবস্থা ত আছেই, তাঁহারা নিদ্রাবস্থায়ও জাগ্রত। আর এই কারণে তাঁহারা উহাকে স্বপ্ন কিংবা রু'য়া বলিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। তাঁহারা বলেন, এই ঘটনা একেবারে জাগ্রত অবস্থায় ঘটিয়াছে এবং ইহা জাগ্রত অবস্থায় এক মহান ও অসাধারণ কাশ্‌ফ ছিল যাহার দ্বিতীয় কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না

অর্থাৎ এই মনীষিগণ ঐ ঘটনাকে জাগ্রত অবস্থার ঘটনা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। যাঁহারা উহাকে بين اليقظة و النوم অর্থাৎ "জাগরণ ও নিদ্রার মধ্যবর্তী অবস্থা" নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন যেমন মালিক ইব্‌ন সা'সা'আ-র বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে (বুখারী, বাব যি'ক্‌রি'ল-মালা'ইকা) যাহার অর্থ জাগ্রত অবস্থায় আত্মনিমগ্নতা, যাহাতে মানুষ পৃথিবী ও উহার যাবতীয় বস্তু হইতে অমনোযোগী হইয়া যায়। তবে ইহাতেও তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) এই পৃথিবীতেই বিদ্যমান ছিলেন এবং ঊর্ধ্বলোকের সহিতও তাঁহার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলকথা, সকলের বক্তব্য আসলে একই এবং একই উদ্দেশ্য বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

'আল্লামা ইব্‌নু'ল-কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা-ও এই বাস্তবতার একটি দিক বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইস্‌রা'-র প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক লিখিয়াছেন, ইব্‌ন ইস্‌হাক হযরত 'আ'ইশা (রা) ও মু'আবিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা উভয়েই বলিয়াছেন যে, মি'রাজে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর আত্মাকে ঊর্ধ্বলোকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এব তাঁহার দেহ এই পৃথিবীতে স্ব স্থানে বিদ্যমান ছিল। হাসান বাস্‌রী (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু জানিয়া রাখা উচিত যে, ইস্‌রা' নিদ্রাবস্থায় হইয়াছিল কিংবা সশরীরে না হইয়া কেবল আত্মিকভাবে হইয়াছিল, এই দুই কথার মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। হযরত 'আ'ইশা ও মু'আবিয়া (রা) বলেন নাই যে, ইস্‌রা' কেবল একটি স্বপ্ন ছিল। তাঁহারা বলিয়াছেন, ইস্‌রা'-তে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর আত্মাকে ঊর্ধ্বলোকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহার দেহ নিজ বিছানায় বিদ্যমান ছিল। এই দুইয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। কেননা ঘুমন্ত ব্যক্তি যাহা কিছু দেখিয়া থাকে তাহার স্বরূপ এই যে, কতিপয় পরিচিত বস্তুর প্রতিচ্ছবি তাহার সম্মুখে আনা হয়। সে দেখিতে পায় যে, তাহাকে আসমানে কিংবা মক্কা বা পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, অথচ তাহার আত্মা ঊর্ধ্বে উঠে নাই কিংবা কোথাও যায় নাই। শুধু এতটুকু হইয়াছে যে, স্বপ্নের ফিরিশতা তাহার সামনে এক প্রতিচ্ছবি হাযির করিয়া দিয়াছে। যাঁহারা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে আসমানে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত। এক দল বলেন যে, তাঁহার মি'রাজ দেহ ও আত্মা উভয়ের সহিত হইয়াছিল, আর অন্য দল বলেন, উহা কেবল আত্মিকভাবে সংঘটিত হইয়াছিল এবং দেহ স্বস্থানে বিদ্যমান ছিল। ইঁহারাও বলিতে চাহেন না যে, ঘটনাটি কেবল একটি সাধারণ স্বপ্ন ছিল। ইহাদের বক্তব্য, স্বয়ং আত্মার মি'রাজ হইয়াছিল এবং আত্মাকেই ঊর্ধ্বলোকে তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। অতএব, মি'রাজে রাসূলুল্লাহ্ (স) যেসব অবস্থার সম্মুখীন হন এবং তথায় তিনি যাহা কিছু লাভ করেন তাহা উহা অপেক্ষাও পূর্ণাঙ্গতর ছিল আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে শ্রেষ্ঠতর যাহা ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিতে পায়। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ্ (স) আলৌকিক পরিস্থিতিতে ছিলেন, এমন কি তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ (সীনা চাক) করা হইয়াছিল—তিনি জীবিত ছিলেন, অথচ তাঁহার কোনরূপ কষ্ট হয় নাই। ঠিক সেইভাবে মি'রাজেও মহানবীর রূহ ঊর্ধ্বলোকে তুলিয়া লওয়া হয়, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয় নাই। তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও আত্মা মৃত্যু ও বিচ্ছেদ ব্যতীত এইরূপ ঊর্ধ্বলোক ভ্রমণের সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। অন্য নবীগণের রূহ যে এইখানে অবস্থান করিতেছিল, তাহা ছিল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পরে। কিন্তু মহানবী (স)-এর পবিত্র রূহ জীবদ্দশায়ই তথায় গমন করে এবং পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে। তবে তাঁহার দেহের সহিত রূহের এক প্রকার সম্পর্ক ও সংযোগ বজায় ছিল। ঐ সম্পর্কের বলেই তিনি তখন হযরত মূসা ('আ)-কে তাঁহার কবরের মধ্যে সালাত আদায় করিতে দেখিয়াছিলেন, পরে আবার তিনি তাঁহাকে ৬ষ্ঠ আসমানেও দেখিতে পাইয়াছিলেন, অথচ সকলেই জানে যে, হযরত মূসা ('আ)-কে তাঁহার কবর হইতে তুলিয়া ৬ষ্ঠ আসমানে লইয়া যাওয়া হয় নাই এবং তাঁহাকে সেখান হইতে আবার কবরে ফিরাইয়া আনা হয় নাই। এই জটিলতার সমাধান এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) যখন হযরত মূসা ('আ)-কে আসমানে দেখিয়াছিলেন তখন উহা ছিল তাঁহার আত্মার অবস্থান, আর পৃথিবীর কবরে ছিল তাঁহার দেহের অবস্থান।

ইস্‌রা' ও মি'রাজ সম্পর্কে হযরত শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ মুহাদ্দিছ দিহ্‌লাবীর অভিমত এই যে, ঐ ঘটনা জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে সংঘটিত হইয়াছিল। তবে ইহা ছিল দৈহিক ও আত্মিক জগৎদ্বয়ের মধ্যবর্তী এক তৃতীয় জগৎ অর্থাৎ 'আলাম-ই বারযাখ ও 'আলাম-ই মিছাল-এর ভ্রমণ, যেইখানে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর শরীরে আত্মিক বৈশিষ্ট্যাবলী সন্নিবেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহার বিষয়বস্তু ও ঘটনাবলী বিভিন্ন স্বরূপ ও আকারে দেখান হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, মি'রাজে তাঁহাকে আল-আক্‌সা মসজিদে লইয়া যাওয়া হয় এবং তারপর সিদ্‌রাতু'ল-মুন্‌তাহা ও আল্লাহ্‌র পসন্দ অনুসারে অন্যান্য স্থানে। ইহার সব কিছুই তাঁহার সশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায় ঘটিয়াছিল। তবে ইহার (শরীর) সম্পর্ক সেই জগতের সহিত যাহা উপমার জগৎ (عالم مثال) ও বাহ্যিক জগতের মধ্যবর্তী বারযাখ-স্বরূপ এবং যেখানে উভয় জগতের নিয়মাবলীর সহঅবস্থান রহিয়াছে। এই কারণে দেহের উপর আত্মার রীতিনীতির প্রতিফলন ঘটিয়াছে, আর আত্মার উপর আত্মিক বিষয়াদি দেহের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এইভাবে এইসব ঘটনা প্রতিটির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।

যেই সকল জিনিস ইস্‌রা' ও মি'রাজে রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে দেখান হইয়াছে তাহাও নিজ নিজ স্থানে ঠিক, কিন্তু সেইগুলি অন্য কতিপয় বাস্তবতার জন্য নিদর্শনস্বরূপও ছিল। উহাতে মূলত রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর অপরিমেয় শ্রেষ্ঠত্বের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে আর বলা হইয়াছে যে, তিনি এমন এক উচ্চ স্থান পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন যেইখানে অন্য কোন মানুষ কিংবা ফিরিশ্‌তা পৌঁছিতে পারে নাই। ইস্‌রা'-র ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে মাস্‌জিদু'ল-হারাম হইতে মাস্‌জিদু'ল-আক্‌সার দিকে লইয়া যাওয়ার মধ্যে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, বানী ইস্‌রাঈ'লের নবীগণের কেন্দ্রভূমি বায়তু'ল-মাক্‌দিস এইবার মুসলমানদেরকে দেওয়া হইবে। ইহাতে এই ইঙ্গিতও রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) উভয় কিবলার নবী, আর হযরত ইবরাহীম ('আ)-এর যে উত্তরাধিকার শত শত বৎসর ধরিয়া দুই পুত্রের বংশধরদের মধ্যে বণ্টিত হইয়া আসিতেছিল তাহা মুহাম্মাদ (স)-এর মধ্যে পুনরায় একত্র করিয়া দেওয়া হইল। যেই য়াহূদীরা এতদিন পর্যন্ত বায়তু'ল-মাকদিসের উত্তরাধিকারীরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছিল, এখন তাহাদের কর্তৃত্বের মেয়াদ আল্লাহ্‌র ওয়াদা মুতাবিক সমাপ্ত হইল। অতঃপর ইহাতে মক্কার কাফ়িরদের প্রতি এই সতর্কবাণীও ছিল যে, ইসলামের সত্যতা প্রমাণের জন্য তাহারা যেই শাস্তি চাহিতেছিল তাহা এখন আসিবার সময় হইয়াছে। আর সেই শাস্তি হইতেছে কুফরের নেতৃবৃন্দের পরাজয় ও ধ্বংস এবং ইসলামী আদর্শের বিজয়। কিন্তু তৎপূর্বে এই রাসূল (স) মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিয়া যাইবেন। তাই এই সূরায় রাসূলুল্লাহ্

(স)-কে হিজরতের এই দু'আ' শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে ঃ وَقُلْ رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّي مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا "বল, হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সহিত এবং আমাকে নিষ্ক্রান্ত করাও কল্যাণের সহিত এবং তোমার নিকট হইতে আমাকে দান করিও সাহায্যকারী শক্তি" (১৭ ঃ ৮০ ; আরও তু. আল-বুখারী, কিতাবু'ল-হিজরা)।

ইহার পর جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ "সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে" (১৭ ঃ ৮১) এই ভাষায় ইসলামের বিজয়ের এক নব যুগের সাক্ষ্য ঘোষিত এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বাভাস ধ্বনিত হয়। এই কারণেই মক্কা বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মুখে কেবলই এই আয়াতটি উচ্চারিত হইতেছিল (আল-বুখারী, মক্কা বিজয় অধ্যায়)।

হযরত শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্‌ও মি'রাজ ও ইস্‌রা'র তাৎপর্য বর্ণনা করিবার পর উভয় ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক দৃষ্ট বস্তুসমূহের এক একটি করিয়া ব্যাখ্যা দান করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ঐ উপমার জগতে (عالم مثال) প্রকৃতিকে দুগ্ধ ও ভ্রষ্টতাকে মদ্যের রঙে দেখান হইয়াছে। মাসজিদু'ল-আক্‌সাতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে লইয়া যাওয়ার কারণ এই যে, স্থানটি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রকাশ, ফিরিশ্‌তাদের বাসনার প্রতিফলন ও নবী-রাসূল (আ)-দের দর্শনধন্য ছিল। উহা যেন একটি উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ, যেখান হইতে বিচ্ছুরিত আলোক-রশ্মি সারা পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতেছে। রাসূলুল্লাহ্ (স) অন্য নবীদের ইমাম হইয়াছিলেন, এই কথাটির তাৎপর্য এই যে, ইঁহারা সকলেই হাদীরাতু'ল-কুদ্‌স-এর সহিত একই বন্ধনে আবদ্ধ এবং সকলের উপর রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে। এইভাবে শাহ সাহেব স্তরে স্তরে সকল দৃষ্ট বস্তু ও অবস্থাগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন (হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা, বাবু'ল-ইস্‌রা')।

পবিত্র কুরআন ছাড়াও হাদীছ, তাফ্‌সীর ও সীরাতগ্রন্থসমূহে অসংখ্য রাবী (বর্ণনাকারী) কর্তৃক ইস্‌রা' ও মি'রাজ সংক্রান্ত বর্ণনা বিধৃত হইয়াছে। আয-যুরকানী পঁয়তাল্লিশজন সাহাবী (রা)-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং যেইসব হাদীছ, সীরাত ও তাফ্‌সীর গ্রন্থে তাঁহাদের বর্ণনা পাওয়া যায় সেই সমুদয়ের বিস্তারিত বিবরণ দান করিয়াছেন। ইব্‌ন কাছীর সূরা বানী ইস্‌রা'ঈলের ব্যাখ্যায় ঐসব বর্ণনার অধিকাংশই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সিহাহ সিত্তার মধ্যে ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র) তাঁহাদের নিজ নিজ সাহীহ গ্রন্থে ইসরা' ও মি'রাজের ঘটনাবলী স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী, নাসা'ঈ ইত্যাদি গ্রন্থে গৌণভাবে ও সংক্ষিপ্ত আকারে এই সকল ঘটনা বিভিন্ন অধ্যায়ে কোথাও কোথাও উল্লিখিত হইয়াছে। সাহাবীদের মধ্যে উম্মুহানী' (রা)-এর বর্ণনা এইসব ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষ্যস্বরূপ। কিন্তু যেইসব সূত্রে তাঁহার বর্ণনা আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে ইঁহাদের মধ্যে একজন রাবী হইলেন আল-কালবী, যাঁহার উপর নির্ভর করা যায় না। ইমাম বুখারী (রা) ও ইমাম মুসলিম (র)-এর সাহীহ গ্রন্থদ্বয়ে ইসরা' ও মি'রাজের ঘটনাবলী আবূ যার (রা), মালিক ইব্‌ন সা'সা'আ (রা), আনাস ইব্‌ন মালিক (রা), ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (রা) ও ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে শেষোক্ত চারজন সাহাবী (র) কেবল কয়েকটি ছোটখাট বিবরণ পেশ করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে এই মহান দৃশ্যাবলীর বিস্তারিত ও ধারাবাহিক বর্ণনা আবূ যার্‌র (রা), মালিক ইব্‌ন সা'স'আ (রা) ও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) এই সকল ঘটনা মালিক ইব্‌ন সাসা'আ (রা) [বুখারী, কিতাবুস-সালাত] হইতে শুনিয়াছিলেন। যেইসব তাবি'ঈ-র মাধ্যমে হযরত আনাসের বর্ণনা আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক নিখুঁত ছাবিত আল-বুনানীর বর্ণনা। শারীক ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ্‌র মাধ্যমেও আনাস (রা)-এর বর্ণনাটি বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ বর্ণনার অংশগুলি নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনাসমূহের বিপরীত। এই কারণে ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার 'সাহীহ' গ্রন্থের 'বাবু'ল-ইস্‌রা'তে উহার প্রতি শুধু ইঙ্গিত দান করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার বর্ণনায় ঘটনাবলীর পরম্পরাগত বৈপরীত্য হ্রাস-বৃদ্ধি রহিয়াছে। আবূ যার্‌র (রা) ও মালিক ইব্‌ন সা'সা'আ (রা) স্পষ্টত বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মি'রাজের ঘটনাবলীর প্রতিটি শব্দ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পবিত্র মুখে শ্রবণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (রা) বায়তু'ল-মাক্‌দিসে নৈশ ভ্রমণের ঘটনাটি হযরত আনাসের বর্ণনাসূত্রে অধিক বিস্তারিতভাবে পেশ করিয়াছেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ জিব্‌রা'ঈল ('আ) যখন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট বুরাক আনিলেন, তখন সে যেন তাহার লেজ নাড়াইতেছিল। জিব্‌রা'ঈল ('আ) ইহাকে বলিলেন ঃ হে বুরাক! স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাক। আল্লাহ্‌র শপথ ! তোমার পিঠে এমন আরোহী আর কখনও আরোহণ করেন নাই। যখন রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহার পিঠে আরোহণ করিয়া যাত্রা শুরু করিলেন তখন পথে দেখিলেন, এক বৃদ্ধা রাস্তার এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান। রাসূলুল্লাহ্ (স) জিব্‌রা'ঈল ('আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ইনি কে ? জিব্‌রা'ঈল ('আ) প্রশ্নের তখন কোন উত্তর না দিয়া শুধু বলিলেন ঃ মুহাম্মাদ (স), সামনে চলুন। অতঃপর তিনি অনেক পথ অতিক্রম করিলেন। এবার দেখিতে পাইলেন যে, এক লোক রাস্তার এক পার্শ্বে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছে ঃ হে মুহাম্মাদ (স) ! এই দিকে আসুন। তখন জিব্‌রা'ঈল তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ সামনে চলুন। আবার তিনি বহুদূর অগ্রসর হইলেন। এইবার আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কতিপয় লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাত ঘটিল। তাহারা বলিল, হে আওওয়াল, আপনাকে সালাম ! হে আখির, আপনাকে সালাম ! হে হাশির, আপনাকে সালাম ! তখন জিব্‌রা'ঈল ('আ) তাঁহাকে বলিলেন ঃ তাহাদের সালামের জওয়াব দিন। তিনি তাহাদের সালামের জওয়াব দিলেন। ইহার পর এইরূপ আর একটি দলের সহিত তাঁহার দেখা হইল। এই দলটিও তাঁহাকে পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় সালাম করিল। তিনি সামনে চলিলেন। অবশেষে বায়তু'ল-মাক্‌দিসে উপনীত হইলেন। সেইখানে তাঁহার সম্মুখে তিনটি পাত্র আনা হইল। একটি পানির, একটি দুধের ও একটি মদের পাত্র। তিনি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করিলেন। ইব্‌ন কাছীরের বর্ণনায় (৬খ, ৮) পানির পরে মদ ও তাহার পরে দুধের পাত্রের কথা উল্লেখ রহিয়াছে (আরও দেখুন আল-খাসা'ইসু 'ল-কুব্‌রা, ১খ, ১৫৯ ও দুর্‌র মানছূর)। তখন জিব্‌রা'ঈল ('আ) বলিলেন ঃ আপনি সঠিক প্রকৃতি (فطرة صحيحة) গ্রহণ করিয়াছেন। যদি পানি পান করিতেন তাহা হইলে আপনি ডুবিয়া যাইতেন, আপনার উম্মাতও ডুবিয়া যাইত ; আর যদি মদ্য পান করিতেন, তাহা হইলে আপনি নিজেও পথভ্রষ্ট হইতেন, আপনার উম্মাতও পথভ্রষ্ট হইয়া যাইত। অতঃপর তাঁহার সম্মুখে হযরত আদাম ('আ) ও অন্যান্য নবীকে উপস্থিত করা হইল। সেই রাত্রিতে তিনি তাঁহাদের ইমাম হইয়া সালাত আদায় করিলেন। জিবরা'ঈল ('আ) এবার

বলিলেন ঃ যেই বৃদ্ধাকে আপনি রাস্তার ধারে দেখিয়াছিলেন, সে ছিল পৃথিবী, আর পৃথিবীর আয়ু অতটুকুই অবশিষ্ট আছে, যতটুকু ঐ বৃদ্ধার বয়স বাকী রহিয়াছে। আর যেই ব্যক্তি রাস্তা হইতে সরিয়া আপনাকে ডাকিয়াছিল, যাহাতে আপনি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন, সে ছিল আল্লাহ্‌র শত্রু ইব্‌লীস। আপনাকে সালামকারিগণ ছিলেন ইব্‌রাহীম ('আ), মূসা ('আ) ও 'ঈসা ('আ) [ইব্‌ন জারীর, ১৫খ., ৬]।

ইব্‌ন কাছীরও তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, হাফিজ বায়হাকীও "দালা'ইলু'ন-নুবূওয়া" গ্রন্থে ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব হইতে একই বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উহাতে কতিপয় বিতর্কযোগ্য শব্দ রহিয়াছে যেইগুলির যথার্থতা অন্যান্য সূত্র দ্বারা প্রমাণিত হয় না। অন্য একটি সূত্রেও তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন। সেইখানেও কতিপয় বিতর্কের অংশ আছে, যাহার সত্যতা অন্যান্য সূত্র দ্বারা প্রমাণিত নহে (ইব্‌ন কাছীর, তাফ্‌সীর, ৬খ, ৮০)। কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ্ (স) দেখিতে পাইলেন, একটি কাফেলা (قافلة) পবিত্র মক্কার দিকে আসিতেছে এবং ঐ কাফেলার জনৈক ব্যক্তির একটি উট হারাইয়া গিয়াছে, আর লোকগুলি উটটিকে খুঁজিতেছে। কিছুদিন পরে জানা গেল যে, মক্কায় এক কাফেলায় এই ঘটনাই ঘটিয়াছিল। অতএব, কাফেলাটি যখন মক্কায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন কাফেলার লোকেরা বিষয়টি বিশ্বাস করিল (আল-খাসা'ইসু'ল-কুব্‌রা, ১খ, ১৫৮)। আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ আমি যখন রাতারাতি আমার বায়তু'ল-মাকদিস গমনের কথা লোকদেরকে বলিলাম, তখন তাহারা বলিল যে, এই কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বায়তু'ল-মাক্‌দিসের নক্সা বর্ণনা করুন। লোকদের এই জিজ্ঞাসার পর আমার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায় এবং বায়তু'ল-মাক্‌দিসের চিত্র আমার সামনে তুলিয়া ধরা হয়। আমি তখন দেখিতে থাকি আর লোকদের নিকট উহার বিবরণ দিতে থাকি (ইব্‌ন কাছীর, ৬খ, ১৮) বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. 'মি'রাজ' নিবন্ধ।

ইসরা ও মি'রাজ সম্পর্কিত সকল হাদীছ বর্ণনার পর ইব্‌ন কাছীর মন্তব্য করেন, والحق انه عليه السلام اسرى به يقظة لا مناما অর্থাৎ "বিশুদ্ধমত হইল, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ইসরা ছিল জাগ্রত অবস্থায়, নিদ্রিত অবস্থায় নহে"। ইসরা সম্পর্কে আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 'আকীদা বর্ণনা করিতে গিয়া ইমাম তাহাবী বলেন, নাবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় উর্ধ্বগগনে ভ্রমণ করানো হয়। সেখান হইতে তাঁহাকে আল্লাহ উর্ধ্বলোকে যেখানে ইচ্ছা লইয়া যান, (আল আকীদাতু'ত তাহাবিয়্যা, প. ১২) ইসরা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াতের সমন্বিত পর্যালোচনার জন্য দ্র. মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর নাশরুততীব। দ্বাদশ অধ্যায়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) তাফ্‌সীর-গ্রন্থাবলীতে সূরা ঃ ১৭ (বানী ইসরা'ঈল), ৫৩ (আন-নাজ্‌ম) ও ৮১ (তাক্‌বীর), বিশেষ করিয়া ইব্‌ন জারীর, কাশশাফ, রূহু'ল-মা'আনী, বাহ্‌র মুহীত, তাফসীর কাবীর গ্রন্থসমূহে; (২) হাদীছ গ্রন্থাবলীর মধ্যে (ক) বুখারী, কিতাবু'স-সালাত, অধ্যায় ১; কিতাবু'ল-হাজ্জ, অধ্যায় ৭৬ ; কিতাবু'ল-মানাকিব, অধ্যায় ৪২ ও ৪৩; কিতাবু'ত-তাওহীদ, অধ্যায় ৩৭ ; কিতাবু'ল-আম্বিয়া', অধ্যায় ৭ ; কিতাবু'ল-মানাকিব, অধ্যায় ২২ ; কিতাবু বাদ্'ই'ল-খাল্‌ক অধ্যায় ৬ ; (খ) মুসলিম, বাবু'ল-মি'রাজ ; (গ) আহ্‌মাদ, মুসনাদ, ১খ, ২৫৭ ; ২খ, ৩৫৩ ; ৩খ, ১৮২, ২২৪, ২৩১, ২৩৯ ; ৪খ, ৬৬, ১৪৩, ২০৭ ; ৫খ, ১৪৩, ৩৮৭ ; (৩) ইব্‌ন হিশাম, সীরা ঃ ; (৪) ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত, ১/১খ, ১৪৩, ১৭৬ ; (৫) আত-তাবারী, ১খ, ১১৫৭ প.; (৬) সুহায়লী, আর-রাওদু'ল-উনুফ, ১খ ; (৭) ইবনু'ল-'আরাবী, কিতাবু'ল-ইস্‌রা' ইলা মাকানি'ল-আস্‌রা ; (৮) ইবনু'ল-কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদু'ল-মা'আদ, ১খ, ৩০৪ ; (৯) শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা ; (১) সায়্যিদ সুলায়মান নাদ্‌বী, সীরাতু'ন-নাবী, ৩খ, ৩৯৩ প. ; (১১) নাজমু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল-'আনতী (জীবন্ত ৯৮১ হি.), আল-ইবতিহাজ ফি'ল-কালাম 'আলা'-ইসরা' ওয়া'ল-মি'রাজ, বুলাক ১২৯৫/১৮৯১।

'আবদু'ল-মান্নান 'উমার (দা. মা. ই.)/ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

**ইস্‌রাঈল ('আ)** (اسرائيل) ঃ বানূ ইসরা'ঈলের প্রধান য়া'কূব ('আ)-এর এক নাম। ইসরা'ঈলের বংশধর অর্থে বানূ ইসরা'ঈল পুনঃপুনঃ উল্লিখিত। ইসরা'ঈল শব্দটি কুরআনে একবার মাত্র দৃষ্ট হয়। ৩ ঃ ৯৩ আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ "তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইসরা'ঈল নিজের জন্য যাহা হারাম করিয়াছিল, তদ্ভিন্ন ইসরা'ঈল সন্তানদের জন্য যাবতীয় খাদ্যই হালাল ছিল। ভাষ্যকারগণের মতে ইহার অর্থ এই যে, শুধু ইসরা'ঈলীদের কুকর্মের জন্যই খাদ্যের উপর নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারি হয়। তাহাদের পূর্বপুরুষ স্বয়ং শুধু উটের গোশত ভক্ষণের বা উটের দুধ পানে বিরত থাকিতেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি 'ইর্‌কু'ন-নাসা নামক রোগে কষ্ট পাইতেন। ইহার ফলে তিনি রাতে ঘুমাইতে পারিতেন না। কিন্তু উহা তাঁহাকে দিনে ছাড়িয়া যাইত। কাজেই তিনি শপথ করেন যে, রোগমুক্ত হইলে তাঁহার প্রিয় খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকিবেন। অন্যদের মতে তিনি তাঁহার চিকিৎসকদের পরামর্শে 'ইর্‌কুন'-নাসা (nerves ischiadicus) উটের নিতম্ব দেশের রসও ভক্ষণ করিতেন না অথবা তিনি সমস্ত মাংসপেশী ('ইর্‌ক) আহারে বিরত থাকিতেন। শব্দটি হিব্রু 'গিদ' শব্দের অনুবাদ এবং আন-নাসা হিব্রু 'নাশে'র অনুলিখন। ইসরা'ঈলীরা যে অদ্যাপি 'ইরকু'ন-নাসা খায় না, তাহার ব্যাখ্যা হিসাবে ইহা আদি পুস্তক ৩২ অধ্যায়ে ফিরিশতা কর্তৃক য়া'কূব ('আ)-এর উরু স্থানচ্যুতির সুপরিচিত গল্পের প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

পানাহারে য়া'কূব ('আ)-এর ব্যক্তিগত সংযম কিরূপে ইসরা'ঈলীদের জন্য বাধ্যতামূলক হইতে পারে, এই প্রশ্নটা অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে পয়গাম্বরের স্বভাবতই আইনগত সমস্যা মীমাংসার (ইজতিহাদ দ্র.) যোগ্যতা রহিয়াছে। আর য়া'কূব ('আ)-ও ছিলেন একজন পয়গাম্বর। অন্যান্যের মতে তিনি এই আইন প্রণয়নের জন্য আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। কুরআনের ইসরা'ঈল সম্বন্ধে অবশিষ্ট কথা পাওয়া যায় হযরত য়া'কূব ('আ)-এর নামে। কুরআনে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, য়া'কূব ('আ) মৃত্যুশয্যায় তাঁহার পুত্রগণকে ইবরাহীমের ধর্মে দৃঢ় থাকার জন্য সতর্ক করিয়া যান (২ ঃ ১৩২)। তিনি একজন নবী ছিলেন এবং প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ছিলেন (২ ঃ ১৩৬ ইত্যাদি)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) কুরআনের উদ্ধৃত আয়াতগুলির তাফসীর; (২) তাবারী, ১খ, ৩৫৩ প. ; (৩) য়া'কূবী, ১খ, ২৬ প. ; (৪) ছা'লাবী, কিসাসু'ল-আম্বিয়া' (কায়রো ১২৯০ হি.), পৃ. ৮৮ প. ; (৫) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, p. 91.

A.J. Wensinck (S. E. I.)/ ড. এম. আবদুল কাদের

**ইসরাঈল ইব্‌ন মূসা** (اسرائيل بن موسى) ঃ আশ্‌-শায়খ, আল-বাস্‌রী, আল-হিন্দী (মৃ. ১৫৫/৭৭১), উপনাম-আবূ মূসা, ২/৮ শতকের একজন খ্যাতনামা হাদীছবিশারদ। তাঁহার জন্মভূমি বসরায়। এইজন্য তাঁহার নিস্‌বা আল-বাস্‌রী। তবে কার্যোপলক্ষে তিনি উপমহাদেশে আগমন করেন এবং সিন্ধুতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এই কারণে তাঁহাকে আল-হিন্দী বলা হয়। বসরায় অবস্থানকালে তিনি কয়েকজন খ্যাতনামা তাবি'ঈ মুহাদ্দিছের নিকট হাদীছ অধ্যয়নের সৌভাগ্য লাভ করেন। এইজন্য একজন 'তাব'উ-তাবি'ঈনরূপে তিনি বিশেষ সম্মানিত। তিনি যে কয়জন তাবি'ঈর নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করেন তাঁহারা হইলেন ঃ (১) হযরত আল-হাসান আল-বাসরী (মৃ. ১১০/৭২৮); (২) আবূ হাযিম আল-আশ্‌জা'ঈ (মৃ. ১১৫/৭৩৩) ; (৩) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (মৃ. ১১০/৭২৮) ও (৪) ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌ (মৃ. ১১৪/৭৩২)। হাদীছশাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও অসাধারণ ব্যুৎপত্তির বিপুল খ্যাতি তাঁহার শাগরিদগণের তালিকা হইতেই প্রতিপন্ন হয়। শায়খ আবূ মূসার নিকট নিম্নোক্ত কয়েকজন বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন মুহাদ্দিছ অধ্যয়ন করেন ঃ (১) সুফয়ান আছ-ছাওরী (মৃ. ১৬১/৭৭৮), (২) সুফয়ান ইব্‌ন 'উয়ায়না (মৃ. ১৯৮/৮১৩); (৩) হুসায়ন ইব্‌ন 'আলী আল-জু'ফী ও (৪) য়াহ্‌য়া ইব্‌ন সা'ঈদ আল-কাত্তান (মৃ. ১৯৮/৮১৩)। হাফিজ ইব্‌ন হাজার, য়াহ্‌য়া ইব্‌ন মু'ঈন ও আবূ হাতিম প্রমুখ হাদীছতত্ত্ববিদ তাঁহাকে একজন বিশ্বস্ত হাদীছ বর্ণনাকারীরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছশাস্ত্রে আবূ মূসার উন্নত মর্যাদা ও বিশ্বস্ত বর্ণনার অন্যতম প্রমাণ হইল—ইমাম বুখারী (র) তাঁহার হাদীছ গ্রন্থে আবূ মূসার সূত্রে কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন এবং সুনান গ্রন্থেও তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) আস-সাম'আনী, আল-আনসাব, পত্র ৫৯৩; (২) আয-যাহাবী, মীযান, ১খ, পৃ. ৯৭ ; (৩) ইব্‌ন হাজার, তাহ্‌যীব, ১খ, পৃ. ২৬১ ; (৪) 'আবদু'ল-হায়্যি আল-হাসানী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ১খ, পৃ. ২৩-২৪, দা. মা., হায়দরাবাদ (ভারত), ১৯৪৭ খৃ. ; (৫) মোহাম্মদ এছহাক, India's contribution to the study of Hadith Literature, pp 25-26, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৬ খৃ.; (৬) নূর মোহাম্মদ আ'জমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ১ম সং., পৃ. ১৭৬, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৬৬ খৃ. ; (৭) মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ২য় সং., পৃ. ৬৬৫, ই. ফা. বা. ১৯৮০ খৃ.।

ড. এ.কে.এম. আইয়ুব আলী

**ইস্‌রাঈল শাহ সায়্যিদ** (سيد اسرائيل شاه) ঃ বাংলাদেশের ওয়ালীকুল শিরোমণি সিলেট বিজেতা শাহ জালাল (র)-এর অন্যতম প্রখ্যাত অনুসারী সায়্যিদ নাসিরু'দ-দীন-এর বংশধর সায়্যিদ ইস্‌রা'ঈল একজন সূফী সাধক ছিলেন। তিনি 'আরবী ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং হি. ৯৪১ সালে 'মাদনু'ল (মা'দিনু'ল?)-ফাওয়া'ইদ' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য। এই বংশীয় এমদাদুল হকের নিকট ইহার একটি কপি মওজুদ ছিল বলিয়া হোমনাবাদের ইতিহাসে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। "মুলূকু'ল (মালিকু'ল ?)-'উলামা" এই গ্রন্থের রচয়িতার অন্যতম উপাধি ছিল বলিয়া "তরপের ইতিহাসে" উল্লিখিত হইয়াছে। সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বর্ণিত তাঁহার বংশ-পরিচিতি সঠিক নহে। কারণ সায়্যিদ নাসিরু'দ-দীনের প্রপৌত্র খোদাওন্দ শাহ-এর পুত্র ছিলেন শাহ ইস্‌রা'ঈল এবং সায়্যিদ ইব্‌রাহীমের ভাই ছিলেন খোদাওন্দ শাহ।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, জালালাবাদের কথা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩ খৃ., ৬৩-৬৪ ; (২) সৈয়দ আবদুল আগ্‌ফর, তরপের ইতিহাস, ১২৯২ বাংলা, পৃ. ৯৮ ; (৩) সৈয়দ এমদাদুল হক, হোমনাবাদের ইতিহাস, পৃ. ৩৪-৩৫ ; (৪) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হযরত শাহ জালাল (র), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৭ খৃ., পৃ. ৩৫০-৫১ ; (৫) সম্পা. এস. এন. এইচ. রিজভী, সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, ঢাকা ১৯৭০ খৃ., ৩২৫ ; (৬) সিলেট দর্পণ [সিলেটে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির ইতিহাস সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ, সম্পা. মুহাম্মদ আসাদ্দর আলী, সিলেট ১৯৮৭ খৃ., পৃ. ৮খ ; (৭) সৈয়দ হাসান ইমাম হোছেনী চিশ্‌তী, তরফ-এর ইতিকথা, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৭ খৃ., ৬৫-৬৬]। (নিবন্ধকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে গ্রন্থগুলি বিদ্যমান)।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

**ইস্‌রাঈলিয়্যাত** (اسرائيليات) ঃ একটি আরবী পদ বা পরিভাষা যাহা তিন ধরনের বর্ণনাকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেগুলি পবিত্র কুরআনের টীকাকার বা ব্যাখ্যাকার, অতীন্দ্রিয় বা মরমীবাদী উপদেশমূলক ইতিহাস সংকলক এবং বিভিন্ন স্তরের লেখকদের রচনায় দৃষ্ট হয়।

১। ঐতিহাসিক বলিয়া পরিগণিত বর্ণনাসমূহ যাহা বাইবেল (তাওরাত ও ইনজীল) গ্রন্থের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ, বিশেষত নবীগণের (কিসাসু'ল-আম্বিয়া') বিষয়ে অবতীর্ণ গ্রন্থে (পবিত্র কুরআনে) কদাচ প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত তথ্যসমূহের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে।

২। "(প্রাচীন) ইসরা'ঈলী আমলের" ('আহ্‌দা বানী ইস্‌রা'ঈল) কালানুক্রমিক (কিন্তু সার্বিকভাবে অনির্দিষ্ট) কাঠামোর মধ্যে স্থাপিত হিতোপদেশমূলক বর্ণনাসমূহকে।

৩। লোককাহিনীনির্ভর কল্পকথাগুলি যেগুলি য়াহূদী সূত্রসমূহ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে (ক্ষেত্র বিশেষে এই অভিযোগ সত্য বটে)। উল্লিখিত হিতোপদেশমূলক বর্ণনা ও এই কল্পকথাগুলির মধ্যে সীমারেখা নির্ণয় করা কঠিন।

নবী বা রাসূলগণের কাহিনী বর্তমানে আমাদের নিকট যে আকারে বিদ্যমান তাহা সর্বপ্রথম মুসলমানদের সাহিত্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। যদিও সে সব কাহিনীর কিয়দংশের উৎস, অদ্যাবধি অবশিষ্ট থাকে তবে বাস্তবে হিজরী প্রথম শতক হইতে চলিয়া আসিতেছে।

প্রাচীনতম তথ্যসূত্রসমূহ হয়ত ধর্মান্তরিত য়াহূদী অথবা সম্ভবত সেইসব 'আরববাসী যাহারা ইসলামে দীক্ষা লাভের পূর্বে 'আরব উপদ্বীপ ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকার য়াহূদী ও খৃষ্টানদের সহিত সম্পৃক্ত ছিল তাহাদের নিকট হইতে আসিয়াছে। এক্ষেত্রে 'আবীদ/'উবায়দ ইব্‌ন শারয়া আল-জুরহুমীর (দেখুন ইব্‌ন শারয়া)-র নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বলা হইয়া থাকে যে, তাঁহার বর্ণিত প্রাচীন আরব্য ও পারস্য রাজন্যবর্গের ইতিহাস, বাইবেলে বর্ণিত ইতিহাস (মানব জাতির বিবরণ বা বিস্তার ও ভাষার বিশৃঙ্খলা) মু'আবিয়া, 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালাম (দ্র.) কা'ব আল-আহবার (দ্র.) এবং পরবর্তীকালে ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (দ্র.)-এর আদেশক্রমে লিখিত আকারে নথিভুক্ত করা হইয়াছে। শেষোক্ত ব্যক্তি কিতাবু'ল-মুবতাদা' বা ইসরা'ঈলিয়্যাত শিরোনামে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া

বিশ্বাস করা হয়। এই বিশ্বাসের প্রামাণিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনের কোন হেতু নাই এবং ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, ইব্ন হিশামের মত গ্রন্থকারগণ উক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, যাহা পরবর্তীকালের লেখকগণ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। তবু যে সকল সুনির্দিষ্ট সংকলনে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ মনীষীদের নির্দিষ্ট বাণীসমূহ বর্ণনার দাবী করা হয় উহা প্রাচীনত্ব বা প্রামাণিকতা অথবা পূর্ববর্তিতার ক্ষেত্রে ৩য়/৯ম হইতে ৫ম/১১শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত তা'রীখ, তাফসীর ও কিসাসু'ল-আম্বিয়া'র বৃহৎ সংকলনসমূহের তুলনায় ন্যূনতম নিশ্চয়তাও প্রদান করে না।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ণনাসমূহ ইতোমধ্যে সম্ভবত হ'াসান আল-বাসরী, (মৃত্যু ১১০/৭২৮) কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে ; সুতরাং তিনি ওয়াহ্বের সমসাময়িক। অন্তত মালিক ইব্ন দীনার (মৃত্যু প্রায় ১৩১/৭৪৮)-এর সময় হইতে তাহারা শিক্ষাপ্রদ উপদেশাবলীর সঞ্চয়ের আংশিক রচনা করিয়াছেন। সুতরাং এই কথা মনে করা যাইতে পারে যে, তাবি'ঊন-এর আমলে ভক্তিমূলক সাহিত্যে এই সমাজচিত্র প্রথম আবির্ভূত হয়। আল-মুহাসিবী ইহা অবলম্বন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই (রি'আয়া, সম্পা. এম. স্মিথ, ২৩৪, ছত্র ১১-১২, ২৪২ প.)। ইব্ন আবি'দ-দুন্য়া ও পরবর্তীকালের খুব জনপ্রিয় গ্রন্থকারগণও ইহাকে অবাধে ব্যবহার করিয়াছেন। শুধু ব্যতিক্রম ছিলেন আবূ নু'আয়ম আল-ইস ফাহানী (হিল্য়াতু'ল-আওলিয়া'), আল-গাযালী (য়াহ্য়া') ও মুওয়াফ্ফাক 'দ-দীন ইব্ন কুদামা (কিতাবু'ত্-তাওওয়াবীন, সম্পা. জি. মাক দিসি, দামিশ্ক ১৯৬২ খৃ.)।

বর্ণনামূলক সাহিত্যে লোকগাথাকে বিষয়বস্তু হিসাবে উপস্থাপন করার রেওয়াজ ("The Three wishes"-এর বিষয়বস্তুর অনুরূপ) বানূ ইসরা'ঈলের যুগে পত্তন হয়, যাহাকে নীতিবাগীশ ও পণ্ডিতগণ তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহা ছিল এই জাতীয় নিরেট কল্পনার সৃষ্টি এবং কুস্সাস (গল্পকারগণ)-এর নবী-রাসূল সম্পর্কিত ইতিহাসের অলংকারশোভিত, অতিরঞ্জিত বর্ণনা ও অযৌক্তিক কল্পনার বিবরণ। এই কারণে কঠোরপন্থী পণ্ডিতগণ ইসরা'ঈলিয়্যাতকে নিন্দা করিয়াছেন। যেমন ইব্ন কাছীর [H. Laoust, in Arabica, ২খ. (১৯৫৫ খৃ.), পৃ. ৭৫, যেখানে বরাতটি বিদায়া ১খ., ৬, হওয়া উচিত]। আস-সাখাবী কর্তৃক এই নিন্দাবাদ আরও নির্দিষ্ট ভাষায় পুনরাবৃত্ত হইয়াছে ('ইলাহন অনু. Apud Fr. Rosenthal, A History of Muslim Historiography[2]. Leiden ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৩৩৫)। এই বিষয়ে অবিশ্বাসের চেতনা ও হুশিয়ারী অতি প্রাচীনকালে ধ্বনিত হইয়াছে। সেই অবিশ্বাস ও হুশিয়ারী দৃষ্ট হয় ইব্ন কুতায়বার তা'বীল মুখ্তালিফু'ল-হাদীছ (দেখুন, G. Lecomte, Le Traite' des divergences du Hadith d'Ibn Qutayba দামিশ্ক ১৯৬২ খৃ., পৃ. ৩১০-১৬) গ্রন্থে। হাদীছের প্রাচীন সংগ্রহের মধ্যেও উহাদের ছাপ বিদ্যমান। যেমন G. Vajda, in JA, ১৯৩৭ খৃ., পৃ. ১১৫-২০)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত সূত্রসমূহের সহিত ও Brockelmann-এর বর্ণনা S. I, ১০১ ও Sezgin, i, ৩০৫-৭; আরও দেখুন (১) M. Lidzbarski-এর De propheticis, quae dicuntur, legendis arabicis, লাইপযিগ ১৮৯৩ খৃ.; (২) I. Goldziher, Israiliyyat, in REJ, xliv (১৯০২ খৃ.), ৬৩-৫; (৩) C. H. Becker-Fr Papyri Schott-Reinhardt, ছত্র ৮প. হাইডেলবার্গ ১৯০৬ খৃ.; (৪) Cheikho, Qulques legendes islamiques apocryphes, in MFOB, iv (১৯১০ খৃ.), ৩৩-৫৬; (৫) B. Chapira-এর Begendes bibliques attribuees a Kab al-Ahbar, in REF, lxix (১৯১৯ খৃ.), ৮৬-১০৭, lxx (১৯২০ খৃ.), ৩৭-৪৩; (৬) R. Basset, Mille et un contes, recits et legendes arabes, প্যারিস ১৯২৪-৭ খৃ. [তু.; (৭) B. Heller, Recits et personnages bibleques dans la legende mahometane, in REJ, lxxxv (১৯২৮) ১১৩-৩৬ খৃ.; (৮) ঐ লেখক, la legende biblique dans l'Islam, প্রাগুক্ত, xcviii, ১৯৩৪ খৃ., ১-১৮ ; (৯) ঐ লেখক, The Relation of the Aggada to Islamic Legends, in MW, xxiv (১৯৩৪ খৃ.), ২৮১-৬ ; (১০) J. horovitz, in IC, i (১৯২৭ খৃ.), ৫৫৩-৭ ; (১১) S. D. Goitein, Israiliyyat (হিব্রু ভাষায়), in Tarbiz, vi (১৯৩৪-৫ খৃ.), ৮৯-১০১, ৫১০-২২ ; (১২) G. Vajda, in REJ, ci (১৯৩৭ খৃ.), ৯৪-৬ ; (১৩) J. Fenkel, An Arabic story of Abraham, in HUCA. xii-xiii (১৯৩৭-৮ খৃ.), ৩৮৭-৪০৯; (১৪) H. Ritter, Das meer der seele, Leiden ১৯৫৫ খৃ., ৯৫ f., ৩০৫, ৩৫৬, ৪৩০, ৫৬৭ ; (১৫) A. A. Duri, 'ইলমু'ত-তা'রীখ, বৈরূত ১৯৬০ খৃ., ১০৩-১৭ ; (১৬) N. Abbot, Studies in Arabic Literary Papyri, চিকাগো ১৯৫৭ খৃ., ৩৬ (তু. A. Dietrich, in Isl., ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ২০২)]; (১৭) G. Vajda, La description du Temple de Jerusalem d'Apres le K. al-Masalik wal-mamalik d'al-Mauhallabi, in JA, ১৯৫৯ খৃ., ১৯৩-২০২ ; (১৮) H. Schutzinger, Ursprung und Entwicklung der arabischen Abraham-Nimcod Legende, Bonn ১৯৬১ খৃ. ; (১৯) G. H. A. Juynboll, The authenticity of the tradition Literature, Leiden ১৯৬৯ খৃ., ১২১-৩৮। আরও দ্র. বানূ ইসরা'ঈল।

G. Vajda (E.I.[2])/আ.জ.ম. সিরাজুল ইসলাম হুসাইনী

**ইস্নাদ** (اسناد) ঃ অথবা সানাদ (سند), হ'াদীছ বর্ণনাকারীদের নামের পরম্পরা। ইহা হ'াদীছ বর্ণনার একটি অপরিহার্য অংশ। প্রথম দিকে অর্থাৎ সাহাবীগণের জীবদ্দশায় হাদীছের সূত্র উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিকভাবেই অনুভূত হয় নাই। কিন্তু প্রথম শতাব্দীর অগ্রগতির সহিত গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করার তাগিদে হাদীছ বর্ণনায় ইস্নাদের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হইতে থাকে। প্রধানত ৩য়/৯ম শতাব্দী বা তৎপরবর্তী সময়ে যে সমস্ত হাদীছ গ্রন্থ সংকলিত হয়, উহাতে প্রতিটি হাদীছের পূর্ণাঙ্গ ইস্নাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আল-জারহ ওয়া'ত-তা'দীল ও হাদীছ প্রবন্ধদ্বয় দেখুন এবং তৎসঙ্গে যোগ করুন ঃ (১) Nabia Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri II, Quranic commentary and tradition, Chiagc 1967, দ্র. নির্ঘণ্ট।

**ইস্রাফীল** (اسرافيل) ঃ ('আ) প্রধান ফিরিশতাগণের একজন, সম্ভবত হিব্রু সেরাফীম (Serafim) শব্দের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ

থাকিতে পারে। পাঠভেদে শব্দটি সারাফীল কিংবা সারাফীন হিসাবেও প্রচলিত (তাজু'ল-'আরূস, ৭খ. ৩৭৫)। এই সকল ক্ষেত্রে শব্দের শেষাংশের পরিবর্তন অস্বাভাবিক কিছু নহে।

হাদীছের বর্ণনামতে ইস্রাফীল ('আ) ফিরিশ্তা শিঙ্গার মালিক (صاحب الصور), তিনি শিঙ্গা মুখে লইয়া আল্লাহ্র আদেশের অপেক্ষায় সর্বদা দণ্ডায়মান আছেন। আল্লাহ্র আদেশ পাওয়া মাত্র তিনি শিঙ্গা বাজাইবেন (মিশকাতু'ল-মাসাবীহ, কিতাবু'ল-ফিতান)। শিঙ্গার প্রথমবারের ফুৎকারে আসমান-যমীন প্রকম্পিত হইবে, উহাদের সকল অধিবাসী মূর্ছিত হইয়া পড়িবে এবং পরিণামে সব কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে দ্বিতীয়বারের ফুৎকারে সকলে পুনরুজ্জীবিত হইবে এবং দাঁড়াইয়া উঠিবে (১৮ ঃ ৯৯; ৩৬ ঃ ৫১; ৩৯ ঃ ৬৮; ৭৯ ঃ ৬, ৭)।

কাব আল-আহ্বার (মৃ. ৬৫২ অথবা ৬৫৪ খৃ.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইস্রাফীল ('আ) একজন সম্মানিত ফিরিশ্তা। তাঁহার চারিটি ডানা আছে ঃ একটি পূর্ব দিকে, একটি পশ্চিম দিকে, একটি দ্বারা তিনি নিজ দেহ আবৃত করেন এবং একটি দ্বারা আল্লাহ তা'আলার তেজ হইতে আত্মরক্ষা করেন, তাঁহার পদদ্বয় পৃথিবীর সপ্তম স্তরের নিম্নে এবং তাঁহার মস্তক 'আরশের স্তম্ভ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

কথিত আছে, যু'ল-কারনায়ন (দ্র.) আঁধারপুরীতে পৌঁছার পূর্বে ইস্রাফীল ('আ) ফিরিশ্তাকে দেখিয়াছিলেন। সেখানে তিনি একটি পাহাড়ের উপরে অশ্রুসিক্ত নয়নে শিঙ্গা মুখে লাগাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, তিনি এখনই শিঙ্গা বাজাইবেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) আল-কিসা'ঈ, 'আজা'ইবু'ল-মালাকূত, দ্র. পাণ্ডু. লাইডেন, ৫৩৮ ওয়ারনার, পত্রক ৪ প.; (২) কায্বীনী, 'আজা'ইবু'ল-মাখ্লূকাত, সম্পা. Wustenfeld. ৫৬-৭; (৩) তাবারী, ১খ, ১২৪৮ প., ১২৫৫; (৪) আল-গাযালী, আদ-দুর্রাতু'ল-ফাখিরা, সম্পা. Gautier, পৃ. ৪২; (৫) M. Wolff, Mohammed. Eshatologic, 9, 99; (৬) Sale, The Koran, Preliminary Discoures, পৃ. ৯৪; (৭) Friedlander, Die Chadhirlegende und der Alexanderroman,পৃ. ১৭১, ২০৮; (৮) Lane. Manners and customs, London 1899, পৃ. ৮০; (৯) দা.মা.ই., ২খ., ৬২০-১।

A. J. Wensinek, (E.I[2])/আলী আহমদ রুশদী

**ইসলাম** (اسلام) ঃ পৃথিবীর সকল দেশের মুসলিম নিজেদের ধর্মকে ইসলাম নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহা (س-ل-م) শব্দমূল হইতে গঠিত, (باب افعال)-এর মাস্দার (ক্রিয়ামূল)। আল-কুরআনের আট জায়গায় ইসলাম শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে (৩ ঃ ১৯, ৮৫; ৫ ঃ ৩; ৬ ঃ ১২৫; ৯ ঃ ৭৪; ৩৯ ঃ ২২; ৪৯ ঃ ১৭; ৬১ ঃ ৭)। সাল্ম (سلم) শব্দটির নিম্নোক্ত ব্যুৎপত্তিগত অর্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ (১) বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ উভয়বিধ অপবিত্রতা (বিপদ-আপদ) ও দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত (পবিত্র) থাকা; (২) সন্ধি ও নিরাপত্তা; (৩) শান্তি ও (৪) আনুগত্য ও হুকুম পালন। সালাম (سلم) ও সাল্ম (سلم)-এই উভয় শব্দেরই অর্থ হইতেছে আনুগত্য, আত্মসমর্পণ ও হুকুম পালন (আস-সিজিস্তানী, গারীবু'ল-কুরআন, আল-মুফরাদাত, লিসানু'ল-'আরাব, তাজুল-'আরূস, আল-ইশতিকাক, আস-সিহাহ্)। উক্ত অর্থগুলির মধ্যে 'পবিত্র ও দোষ-ত্রুটিমুক্ত হওয়া' অর্থটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

সিল্ম (سلم), সিলাম (سلام) ও সালিম (سلم)-এর অর্থ কঠিন প্রস্তর; কারণ উহাতে কোমলতা নাই, নরম হওয়া হইতে মুক্ত। সালাম (سلم)-এর অর্থ বাবলা বৃক্ষের ন্যায় কণ্টকমুক্ত বৃক্ষ; যে বৃক্ষ কণ্টক থাকায় বিপদাপদ হইতে মুক্ত থাকে (লিসানু'ল-'আরাব, আল-ইশতিকাক', আল-মুফরাদাত, আস-সিহাহ, গারীবু'ল-কুরআন)। আস-সালাম (السلام) শব্দটির মধ্যেও যাহা আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম বটে, যাবতীয় দুর্বলতা হইতে মুক্ত হইবার অর্থ নিহিত রহিয়াছে। রূহু'ল-মা'আনী গ্রন্থে আস-সালাম শব্দটির নিম্নোক্ত অর্থ বর্ণিত রহিয়াছে ঃ

ذُو السَّلَامَةِ مِنْ كُلِّ نَقْصٍ وَآفَةٍ (১)

"যাবতীয় বিপদাপদ ও দোষত্রুটি হইতে মুক্ত।"

هُوَ الَّذِيْ تُرْجَى مِنْهُ السَّلَامَةُ (২)

"সেই সত্তা যাঁহার নিকট হইতে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের আশা করা যায়" (২৮ ঃ ৬৩ আয়াতের ভাষ্য)। ইব্নু'ল-আছীর-এর মতে ঃ

اَلسَّلَامُ اِسْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى لِسَلَامَتِهِ مِنَ الْعَيْبِ وَالنَّقْصِ (৩)

"আস-সালাম আল্লাহ তা'আলার একটি নাম এই কারণে যে, তিনি যাবতীয় দোষত্রুটি হইতে মুক্ত ও পবিত্র" (আন-নিহায়া, ২খ. ১৯২)। ইমাম রাগিবের মতে আল্লাহ তা'আলার এক নাম আস-সালাম এই কারণে যে,

وُصِفَ بِذٰلِكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَلْحَقُهُ الْعُيُوْبُ وَالْاٰفَاتُ (৪) الَّتِىْ تَلْحَقُ الْخَلْقَ

"যেই সকল বিপদাপদ ও দোষত্রুটি সৃষ্টিতে রহিয়াছে সেইগুলি তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না" (আল-মুফরাদাত, পৃ. ২৩৯)। সালাম শব্দটির আরেক অর্থ দু'আ", কারণ উহাও বিপদাপদ এবং পাপ-পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত ও পবিত্র করিবার জন্য একটি নিবেদন। এই একই শব্দমূল হইতে গঠিত শব্দ আস্লামা (اسلم), য়ুস্লিমু (يسلم), ইসলামান (اسلاما) সকর্মক উভয়বিধ ক্রিয়ারূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিবন্ধের প্রথম দিকে সাল্ম শব্দের যে সকল অর্থ বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের সবই ইসলাম শব্দের মধ্যে যাহা (باب افعال) মাসদার-নিহিত রহিয়াছে। মুক্ত ও পবিত্র হওয়া অথবা মুক্ত ও পবিত্র করাও উহার আর একটি অর্থ। অতএব, ইসলাম শব্দের একটি অর্থ হইতেছে 'ইবাদাত, দীন ও 'আকীদাকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট করা।

اَلْاِسْلَامُ : اَلدُّخُوْلُ فِى السَّلْمِ

অর্থাৎ "আনুগত্যে প্রবেশ করা" (আল-মুফরাদাত, পৃ. ২৪০)।

اَلْاِسْلَامُ وَالْاِسْتِسْلَامُ : اَلْاِنْقِيَادُ

"আল-ইসলাম ও আল-ইস্তিসলাম উভয় শব্দের অর্থ আনুগত্য করা" (লিসানু'ল-'আরাব)।

কুরআন মাজীদের আলোচ্য শব্দমূল হইতে গঠিত বহু শব্দ উপরিউক্ত ব্যুৎপত্তিগত অর্থসমূহে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শব্দমূল, কয়েকটি আয়াতে বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ উভয়বিধ কলুষ ও দোষত্রুটি হইতে মুক্ত ও পবিত্র থাকা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন

مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيْهَا

"উহা সম্পূর্ণ দোষত্রুটিমুক্ত (مسلمة), উহাতে কোন খুঁত থাকিবে না" (২ ঃ ৭১)।

اِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

"কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র অন্তর লইয়া আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হইবে" ...(২৬ ঃ ৮৯)। কয়েকটি আয়াতে উহা সন্ধি ও নিরাপত্তা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন

فَلاَ تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا اِلَى السَّلْمِ

"অতএব তোমরা হীনবল হইও না এবং সন্ধি (اسلم) প্রস্তাব করিও না" (৪৭ ঃ ৩৫)।

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

"আর যদি তাহারা সন্ধি (اسلم)-র দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকিবে" ( ৮ ঃ ৬১)। কয়েকটি আয়াতে উহা আনুগত্য ও বাধ্যতা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন

هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ

"বরং আজ তাহারা অনুগত" (مُسْتَسْلِمُوْنَ) (৩৭ ঃ ২৬)। আবার কয়েকটি আয়াতে উহা আত্মসমর্পণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন,

اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

"আমি জগতসমূহের প্রতিপালক প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম" ( ২ ঃ ১৩১)।

হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

"যে ব্যক্তির জিহ্বা ও হাত হইতে মুসলমানগণ নিরাপদে থাকে (سلم) সেই ব্যক্তিই হইতেছে প্রকৃত মুসলিম" (বুখারী, কিতাব-২, বাব ৪, কিতাব ৮১, বাব ২৬; মুসলিম, কিতাব-১, বাব ৬৫, আবূ দাউদ, কিতাব ১৫, বাব ২; তিরমিযী কিতাব-৩৮, বাব ১২। নাসা'ঈ, কিতাব ৪৬, বাব ৮ প.। দারিমী, কিতাব ২০, বাব ৪, ৮)। উক্ত হাদীছে সালিমা (سلم) শব্দটি 'নিরাপদ রহিয়াছে' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। হাদীছে ইসলাম ও উহা হইতে গঠিত বিভিন্ন শব্দের আরও ব্যবহার সম্বন্ধে জানিবার জন্য দেখুন ঃ A. J. Wensinck, আল-মু'জামু'ল-মুফাহ্‌রাস লি-আলফাজিল-হাদীছ, শব্দমূলের অধীনে)।

ইসলাম শব্দের পারিভাষিক অর্থ ঃ সায়ফু'দ-দীন আবু'ল-হাসান আল-আমিদী (মৃ. ৬৩১/১২৩৩) তাঁহার কিতাবু ইহকামি'ল-হুক্কাম ফী উসূলি'ল-আহকাম গ্রন্থে ইসলাম শব্দের অর্থ সম্বন্ধে যে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন উহার নির্গলিত অর্থ দাঁড়ায় যে, মুসলিম 'আলিমদের মতে ইসলাম শব্দটির পারিভাষিক অর্থ উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেই উদ্ভূত এবং উভয় প্রকারের অর্থের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে। অভিধান রচয়িতাগণ ইসলাম শব্দের নিম্নোক্ত পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

اَلْاِسْلاَمُ مِنَ الشَّرِيْعَةِ اِظْهَارُ الْخُضُوْعِ وَاِظْهَارُ الشَّرِيْعَةِ وَالْتِزَامُ لِمَا اَتٰى بِهِ النَّبِىُّ ﷺ وَبِذٰلِكَ يُحْقَنُ الدَّمُ وَيُسْتَدْفَعُ الْمَكْرُوْهُ

"শারী'আতী পরিভাষায় ইসলাম শব্দের অর্থ হইতেছে (আল্লাহ্‌র প্রতি) আনুগত্য প্রকাশ ও আত্মসমর্পণ এবং রাসূল (সা) কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে আনীত সুন্নাঃ-কে দৃঢ়রূপে গ্রহণ ও ধারণ" (লিসানু'ল-'আরাব); ইমাম রাযী (মৃ. ৬০৬/১২০৯)।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلاَمُ

"নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন হইতেছে ইসলাম" (৩ ঃ ১৯)–এই আয়াতের তাফসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ইসলাম শব্দের নিম্নোক্ত চারিটি অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

(১) اَلْاِسْلاَمُ هُوَ الدُّخُوْلُ فِى الْاِسْلاَمِ اَىْ فِى الْاِنْقِيَادِ وَالْمُتَابَعَةِ

"ইসলামে প্রবেশ করা"

(২) اَلْاِسْلاَمُ مَعْنَاهُ اِخْلاَصُ الدِّيْنِ وَالْعَقِيْدَةِ وَالْمُسْلِمُ اَىِ الْمُخْلِصُ لِلّٰهِ عِبَادَتَهٗ

"আকীদা ও দীন-কে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করা ... যে ব্যক্তি স্বীয় 'ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করে সে মুসলিম।"

(৩) فِى عُرْفِ الشَّرْعِ فَالْاِسْلاَمُ هُوَ الْاِيْمَانُ

"ঈমান"

(৪) اَلْاِسْلاَمُ عِبَادَةٌ عَنِ الْاِنْقِيَادِ

"আনুগত্য ও ফরমাঁবরদারী" (তাফসীর-ই কাবীর, মিসর ১৩১০ হি., ২খ., ৬২৮; এতদ্ব্যতীত ঈমান নিবন্ধ দ্র.)।

মুসনাদ আহ্‌মাদ গ্রন্থে (১খ, ২৭, ২৮) হযরত 'উমার (রা) হইতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছে ইসলাম শব্দের শারী'আতী অর্থগুলি বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে ঃ হযরত 'উমার (রা) বলেন, "একদা আমরা রাসূল (স)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। এই সময়ে তথায় একটি অপরিচিত লোক আগমন করিলেন। লোকটির পরিধানের পোশাক ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও সাদা, আর তাঁহার চুলগুলি ছিল অত্যন্ত কাল। তাঁহার চেহারা ও পোশাক-পরিচ্ছদে সফরের কোনও চিহ্ন দৃশ্যমান ছিল না, অথচ আমাদের কাহারও নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন না। লোকটি রাসূল (স)-এর নিকট আসিয়া তাঁহার হাঁটুকে রাসূল (স)-এর হাঁটুর সঙ্গে মিলাইয়া নিজ হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন। অতঃপর তিনি রাসূল (স)-এর খিদমতে আরয করিলেন ঃ হে মুহাম্মাদ ! আমাকে ইসলামের পরিচয় বলিয়া দিন। রাসূল (স) বলিলেন ঃ ইসলাম এই যে, তুমি সাক্ষ্য প্রদান করিবে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও মা'বূদ নাই এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র রাসূল; সালাত কায়েম করিবে, যাকাত প্রদান করিবে, রামাদান মাসের সাওম পালন করিবে এবং সংগতি থাকিলে বায়তুল্লাহ্ শারীফের হাজ্জ পালন করিবে। ইহাতে লোকটি বলিলেনঃ আপনি সত্য বলিয়াছেন। হযরত 'উমার (রা) বলেনঃ আমরা ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলাম যে, লোকটি নিজেই প্রশ্ন করিতেছে। আবার নিজেই প্রশ্নের উত্তরকে সঠিক বলিয়া রায় দিতেছে। অতঃপর তিনি রাসূল (স)-এর নিকট আরয করিলেনঃ আপনি আমাকে ঈমানের পরিচয় বলিয়া দিন। রাসূল (স) বলিলেনঃ ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহে, তাঁহার ফিরিশতাগণে, তাঁহার কিতাবসমূহে, তাঁহার রাসূলগণে, আখিরাতে ও ভাল-মন্দ সকল প্রকারের তাক্‌দীরে (নিয়তিতে) বিশ্বাস স্থাপন করিবে। ইহাতে লোকটি বলিলেনঃ আপনি ঠিক বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি রাসূল (স)-এর নিকট আরয করিলেনঃ এইবার আমাকে ইহসান সম্বন্ধেও কিছু বলুন। রাসূল (স) বলিলেনঃ ইহসান এই যে, তুমি এইভাবে আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদাত করিবে যেন তাঁহাকে দেখিতেছ। যদি ঐরূপ অবস্থা

নিজের মধ্যে সৃষ্টি করিতে না পার, তবে অন্তত অনুভব করিবে যে, তিনি তোমাকে দেখিতেছেন। হযরত 'উমার (রা) বলেনঃ লোকটি চলিয়া যাইবার পর রাসূল (স) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হে 'উমার ! এই প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি কে ছিলেন তাহা কি জান ? আমি আরয করিলামঃ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই উত্তম জানেন। রাসূল (স) বলিলেনঃ ইনি ছিলেন হযরত জিব্রীল ('আ)। ইনি তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা প্রদান করিতে আগমন করিয়াছিলেন (বুখারী, অধ্যায় ৫৯, অনুচ্ছেদ ৬., ৬০ অ., ৮২ অ., ১ হা., ৯৭ অ., ২৮ হা,; মুসলিম, ৩৩ অ., ১২২ হা, প., ৪৩ অ, ১৬৮ হা., ৪৬ অ., ১১ হা, ও ১৫ হা.। তিরমিযী, ৩১ অ., ৭৭ হা., ৩৪ অ., ২১ হা, ও ২২ হা., ৩০ অ., ৪ হা; আবূ দাউদ, ৩৯ অ., ১৮ হা; ইব্ন মাজাহ, মুকাদ্দিমা, ১০ হা.; তায়ালিসী, পৃ. ২৯৮, ২০৭৩; এতদ্ব্যতীত দেখুন ঃ আল-মু'জামুল-মুফাহ্রিস, ২খ. ৫১৮ প.; মিফতাহু' কুনূযি'স-সুন্না; শব্দমূল আল-ইসলাম ও আল-ঈমান (দ্র.)।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূল (স) বলিয়াছেন ঃ

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ : شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ .

"পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামরূপ ইমারত প্রতিষ্ঠিত ঃ (১) এই বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনও মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। (২) সালাত কায়েম করা; (৩) যাকাত প্রদান করা; (৪) হাজ্জ পালন করা এবং (৫) রামাদান মাসের সাওম পালন করা" (বুখারী, ২ অ., ২ হা., ৬৫ অ., ৩০ হা, ; মুসলিম, ১ অ., ১৯-২২ হা; তিরমিযী, ৩৮ অ., ৩ হা,; নাসা'ঈ, ৪৭ অ., ১৩ হা; মুসনাদ-ই আহমাদ, ২খ., পৃ. ২৬, ৯২, ১৪৩, ৪খ., পৃ. ৩৬৩)। উক্ত পাঁচটি বিষয় আরকান-ই ইসলাম (দ্র.) নামে অভিহিত হইয়াছে।

ইসলাম ও ঈমান বিষয়ক পর্যালোচনা ঃ কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ .

"বেদুঈনগণ বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি; (হে রাসূল) তুমি (তাহাদেরকে) বল, তোমরা ঈমান আন নাই; তবে তোমরা বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। বস্তুত তোমাদের মধ্যে এখনও ঈমান প্রবেশ করে নাই" (৪৯ ঃ ১৪)। উক্ত আয়াত ও অনুরূপ আরও কতকগুলি আয়াত দ্বারা ধারণা হয় যে, ইসলাম ও ঈমান দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র অবস্থার প্রকাশক। ইব্ন হাযম আল-ফিসাল গ্রন্থে আল-গাযালী, ইহ্'য়া'-'উলূম গ্রন্থে ও আশ-শাহরাস্তানী আল-মিলাল গ্রন্থে এতদ্বিষয়ে বিভিন্ন অভিমত বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের উক্ত বর্ণনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ঃ

(১) কাহারও কাহারও মতে শব্দদ্বয় পৃথক অর্থের প্রকাশক। যেমন, উপরে বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ ইসলাম অর্থ সাধারণভাবে স্বীকৃতি আর ঈমান অর্থ উহার আন্তরিক স্বীকৃতি। ছা'লাব-এর মতে ইসলাম মৌখিক স্বীকৃতির সহিত আর ঈমান অন্তরের স্বীকৃতির সহিত সম্পর্কিত (লিসানু'ল-'আরাব, ১৫খ, ১৮৬)। হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূল (স) বলিতেন ঃ

اَلْاِسْلَامُ عَلَانِيَةٌ وَالْاِيْمَانُ فِي الْقَلْبِ

"ইসলাম হইতেছে বাহিরের বিষয়, আর ঈমান হইতেছে অন্তরের বিষয়" (আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১খ, ৬৬)।

(২) ভিন্ন মতে ঈমান ও ইসলাম একটি আর একটিতে প্রবিষ্ট, পরস্পরের প্রতিনিধিত্বকারী। যেমন ঃ হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ একদা রাসূল (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইলঃ

اَيُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ ؟ فَقَالَ الْاِيْمَانُ

"ইসলামের কোন্ বিষয়টি শ্রেষ্ঠতম ? তিনি বলিলেন ঃ "ঈমান" (মুস্নাদ আহ্মাদ, নব বিন্যাস অনুসারে, ১খ, ৭৪)। ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ রাসূল (স) বানূ 'আবদি'ল-কায়স-এর প্রতিনিধিদলের নিকট ঈমানের নিম্নোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছিলেনঃ "ঈমান হইতেছে কালিমা-ই শাহাদাত, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং রামাদান মাসে সাওম পালন করা (মুসনাদ, নব বিন্যাস অনুসারে, ১খ., ৭১, ৭২)। এইরূপে জারীর ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছেঃ একদা জনৈক বেদুঈনকে ঈমান শিখাইতে যাইয়া রাসূল (স) বলিয়াছিলেন, "তুমি এই সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল; সালাত কায়েম করিবে, যাকাত প্রদান করিবে, রামাদান মাসের সাওম পালন করিবে এবং বায়তুল্লাহ্ শারীফের হাজ্জ পালন করিবে।"

اَلْمُسْلِمُ التَّامُّ الْاِسْلَامِ مُظْهِرٌ لِّلطَّاعَةِ مُؤْمِنٌ بِهَا .

"যে ব্যক্তির কার্যকলাপ ও দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আল্লাহ্র আনুগত্য প্রকাশ পায় এবং সে উহার উপর ঈমান রাখে, সেই ব্যক্তিই পূর্ণ মুসলিম" (লিসানু'ল-'আরাব, ১৫খ, ১৮৬)।

(৩) কেহ কেহ বলেন, ইসলাম ও ঈমান শব্দ দুইটি সমার্থক শব্দ। যেমন কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ . فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

"সেখানে যাহারা মু'মিন ছিল, আমি তাহাদেরকে (শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশে) বাহির করিয়া আনিলাম। সেইখানে আমি মাত্র একটির অধিক মুসলিম পরিবার পাইলাম না" (৫১ ঃ ৩৫ ও ৩৬)। এতদ্ব্যতীত (৩ ঃ ১৯) ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

(নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন হইতেছে ইসলাম)—এই আয়াতের তাফসীর (দ্র. আর-রাযী, ইব্ন জারীর, আত-তাবারাসী, মাজমা'উ'ল-বায়ান, ইরান ১৩০৪ হি., ১খ, ১৭৫)। আরও দ্র. ১০ ঃ ৮৪ আয়াত ঃ

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ .

"আর মূসা বলিল, হে আমার জাতি ! যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়া থাক তবে তাঁহারই উপর তাওয়াক্কুল কর, যদি তোমরা প্রকৃত মুসলিম হইয়া থাক।" এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

(ক) ইসলাম শব্দের অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করা। যদিও ব্যুৎপত্তিগত দিক দিয়া ঈমান ও

ইসলাম শব্দদ্বয়ের অর্থে পার্থক্য রহিয়াছে, কিন্তু শারী'আতী পরিভাষায় ইসলাম ছাড়া ঈমানের অস্তিত্ব এবং ঈমান ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। উহাদের একটির অস্তিত্বের জন্য অপরটির অস্তিত্ব অপরিহার্য (আল-ফিক্হু'ল-আক্বার, মুল্লা 'আলী আল-কারী-কৃত ভাষ্যসহ, মিসর ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৮৯, ৯০)।

(খ) শারী'আতের তত্ত্বগত বিচারে ইসলাম ও ঈমান সমার্থক শব্দ এবং দুইটি একই অর্থ প্রদান করে। "নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন হইতেছে ইসলাম" (৩ ঃ ১৯), এই আয়াতের ইহাই মর্ম (ইব্ন হাজার, ফাত্হু'ল-বারী, ১খ, ঈমান অধ্যায়)।

(গ) ইসলাম ও ঈমান-এর অর্থ পৃথক পৃথক হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে উহাদের একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব সম্ভব নহে। ঈমান শব্দের অর্থ 'অন্তরের বিশ্বাস' এবং ইসলাম শব্দের অর্থ "দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়া আল্লাহ্র আনুগত্য করা" হইলেও শারী'আতে কাহাকেও মু'মিন বলা সত্ত্বেও তাহাকে মুসলিম না বলা অথবা কাহাকেও মুসলিম বলা সত্ত্বেও তাহাকে মু'মিন না বলা সম্ভব নহে। শব্দদ্বয়ের সমার্থক শব্দ হইবার তাৎপর্য ইহাই (আল-কাস্তাল্লানী, ইরশাদু'স সারী, ১খ, ঈমান অধ্যায়)।

উপরিউক্ত অভিমতগুলির মধ্যে শেষোক্ত অভিমতই অধিক গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উহার সহিত অতিরিক্ত এই কথাটি যোগ করা যায় যে, 'ঈমান' হইতেছে ইসলামের পরিপূর্ণ অবস্থার নাম অর্থাৎ ঈমান ব্যতিরেকে কাহারও ইসলামকে পরিপূর্ণ মনে করা যায় না। কথাটিকে এইভাবেও বলা যায় যে, ইসলাম শব্দের অর্থ ঈমান শব্দের অর্থ অপেক্ষা অধিক ব্যাপক।

এই বিষয়ে শী'আদের অভিমত এই ঃ ইসলাম ও ঈমান-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, হাদীছে'র বর্ণনার ভিত্তিতে ইসলাম হইতেছে আল্লাহ্র তাওহীদের এবং রাসূল (স)-এর রিসালাতের স্বীকৃতির নাম। উক্ত স্বীকৃতির পর স্বীকৃতিদাতা তাহার জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করে, মুসলমানদের সহিত তাহার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হালাল হইয়া যায় এবং সে মুসলিম আত্মীয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবার অধিকার লাভ করে। পক্ষান্তরে ঈমান হইতেছে হিদায়াত ও ইসলামের গুণ কাহারও অন্তরে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইবার এবং 'আমলের মাধ্যমে উহার প্রকাশ ঘটিবার নাম। ঈমান ইসলাম অপেক্ষা এক স্তর ঊর্ধ্বে। ঈমান ইসলামের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু ইসলাম-এর অর্থে আবশ্যিকভাবে ঈমান-এর অর্থ অন্তর্ভুক্ত নহে (মুনতাখাবু'দ-দীন, তু. রায়হী নাজাফী [মৃ. ১০৮৫ হি.], মাজমা'উ'ল-বাহরায়ন, ইরান তা. বি., (س-ل-م) শব্দমূলের অধীনে)। ইসলাম ও ঈমান-এর উদাহরণ কা'বা ও হারাম-এর উদাহরণের অনুরূপ। কোনও ব্যক্তি হারাম শরীফে থাকিলে তাহার জন্য কা'বা শারীফে থাকা জরুরী নহে। কিন্তু কোনও ব্যক্তি কা'বা শারীফে অবস্থানরত থাকিলে তাহাকে অবশ্যই হারাম শারীফেও অবস্থানরত বলিতে হইবে (সায়্যিদ মুহাম্মাদ হুসায়ন তাবাতাবা'ঈ, আল-মীযান ফী তাফ্সীরি'ল-কুরআন, ১খ, ৩১০, তেহরান, নূতন মুদ্রণ; আল-কাফী, ২খ.)।

হাদীছে ইসলাম শব্দ দ্বারা কখনও কখনও ইসলামী আখলাক্কেও বুঝান হইয়াছে। যেমন একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করিল ঃ

اَیُّ الْاِسْلَامِ خَیْرٌ ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ .

"ইসলামের কোন্ বিষয়টি উত্তম ? রাসূল (স) বলিলেনঃ তুমি খাদ্য খাওয়াইবে এবং সালাম দিবে" (আল-বুখারী)। এইরূপ হাদীছ'গুলিতে উল্লিখিত ইসলাম শব্দ দ্বারা ইসলামী আখলাক বুঝান হইয়াছে। ইসলামের বিভিন্ন পর্যায়ের একটি পর্যায় হইতেছে হুস্ন-ই ইসলাম বা ইসলামের সৌন্দর্য। এই সম্বন্ধে হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছেঃ

مِنْ حُسْنِ الْاِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُ مَا لَا يَعْنِيْهِ

"মানুষের ইসলামের একটি সৌন্দর্য হইতেছে যাহা তাহার জন্য দরকারী নহে তাহা ত্যাগ করা" (আল-বুখারী)। এই স্থলে অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন আচরণ ত্যাগ করাই হুস্ন-ই ইসলাম বা ইসলামের সৌন্দর্য নামে আখ্যায়িত।

**ইসলাম একটি দীন** ঃ উপরে ইসলাম শব্দের অর্থ বর্ণনা করা হইয়াছে উহা দ্বারা একথা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, ইহা একটি ব্যাপকার্থক শব্দ। ইহার ব্যাপকার্থক হইবার আরেকটি প্রমাণ এই যে, ইসলামকে 'দীন' নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। বস্তুত 'দীন' সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসাবে ব্যাপকতর অর্থ বহন করে।

'দীন' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আনুগত্য ও ইখলাস (নিষ্ঠা) হইলেও উহার মর্মার্থ হইতেছে মিল্লাত ও শারী'আত (দেখুন ঃ আস-সিজিস্তানী ও আল-মুফ্রাদাত, 'দীন ও শারী'আত' শব্দদ্বয়)। আল-কুরআনে আল্লাহ্ বলিতেছেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন হইতেছে ইসলাম" (৩ ঃ ১৯)। এইরূপে কুরআনে আল্লাহ্ ইসলামকে সত্যের দীন (৯ ঃ ৩৩), আল্লাহ্র দীন ১১০ ঃ ২) ও মযবুত দীন (৩০ ঃ ৩০) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। দশম হিজরীতে যে আয়াতে আল্লাহ্ দীন-এর পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ হইবার সুসংবাদ শোনান, সেখানে ইসলামকে বুঝাইবার উদ্দেশে দীন শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলিতেছেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ·

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি'মাতকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম এবং দীন হিসাবে ইসলামকেই তোমাদের জন্য পসন্দ করিলাম" (৫ ঃ ৩)। ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মতে দীন শব্দটি ঈমান, ইসলাম ও শারী'আতের যাবতীয় বিধিবিধান-এই তিন অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে (আল-ফিকহু'ল-আকবার, মুল্লা 'আলী আল-কারী-কৃত ভাষ্যসহ, পৃ. ৯০)। সায়্যিদ শারীফ জুরজানীর মতে দীন হইতেছে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত জীবন-ব্যবস্থা যাহা জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মানুষকে রাসূল (স)-এর আনীত জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আহ্বান জানায় (কিতাবু'ত-তা'রীফাত, পৃ. ৭৩)।

উপরিউক্ত আলোচনায় এই কথা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, ইসলাম 'আকীদা ও মৌখিক স্বীকৃতি, ইসলাম 'আমল, আবার পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন-বিধানও। আর উহাদের সবার সমষ্টির নাম হইতেছে দীন। এই দীনে রহিয়াছে ঃ (১) 'আকীদা, (২) 'ইবাদাত ও (৩) মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, আইন বিষয়ক ও আন্তর্জাতিক)। যদিও সকল নবীই দীন-ই ইসলাম প্রচার করিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রচারিত দীনের মধ্যে খুঁটিনাটি বিধি-বিধানে পার্থক্য থাকিলেও মূলনীতির ক্ষেত্রে কোনরূপ পার্থক্য নাই। কিন্তু এই নিবন্ধে ইসলাম বলিতে সাধারণত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ কর্তৃক মানব জাতির জন্য প্রেরিত দীন ও শারী'আতকেই বুঝান হইয়া থাকে।

**ইসলামী আকীদা ও 'ইবাদাতসমূহের প্রাণ ঃ** ইসলামী 'আকীদা ও 'ইবাদাতসমূহ একদিকে আল্লাহ্র সহিত বান্দার সম্পর্ককে মযবুত ও সুদৃঢ় করিবার মাধ্যম ও উপায়, অন্য দিকে উহা উক্ত সম্পর্কের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করিবার উদ্দেশ্যে জীবনের কার্যাবলীকে সুমহান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার মহান লক্ষ্যের ধারকও বটে। এইরূপ কার্যাবলী ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা আনয়ন করে। মোটকথা ইসলামের চরম লক্ষ্য হইতেছে আত্মার পবিত্রতা অর্জন, আত্মার শান্তি লাভ, অন্তরের পরিতৃপ্তি সাধন, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান।

**ইসলাম ও তাওহীদ ঃ** ইসলামী 'আকীদাসমূহের মধ্যে তাওহীদ-ই বুনিয়াদী 'আকীদা; তাওহীদের অর্থ ও তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ এক; তিনি পবিত্র ও সর্বদোষমুক্ত। তিনিই সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা ও পালনকর্তা; জীবন দান ও জীবন হরণ তাঁহারই অধিকারে রহিয়াছে। তিনিই সকলের প্রয়োজন পূরণকারী, তিনিই 'ইবাদাত পাইবার যোগ্য এবং সাহায্য কেবল তাঁহার নিকটই চাহিতে হইবে। তাঁহার কোনও শরীক নাই। তাওহীদ সূক্ষ্ম ও স্থুল সর্বপ্রকারের শির্ক-এর সম্পূর্ণ বিরোধী। উহা সর্বপ্রকারের শিরক্‌কে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করে। তাওহীদের 'আকীদা মানুষের অন্তরে সৃষ্টির দাসত্ব না করিবার এবং শির উচ্চ করিয়া স্বীয় ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করিবার সাহস সৃষ্টি করে। তাওহীদের 'আকীদা যাবতীয় শির্কী রসম-রেওয়াজ ও আকীদা-বিশ্বাসকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করে (এতদ্ব্যতীত 'আল্লাহ' ও 'আল-আস্‌মা'উ'ল-হুস্‌না নিবন্ধদ্বয়ও দ্র.) তাওহীদের কল্যাণে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন বিশৃঙ্খলা হইতে মুক্তি পাইয়া শৃঙ্খলা ও সংযমের গুণে বিভূষিত হয়। তাওহীদের 'আকীদা বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারণাকে মযবুত করে। তাওহীদের 'আকীদার কল্যাণে মানবাত্মা জীবনের সম্ভাবনাসমূহ সম্বন্ধে তাওয়াক্কুল ও আত্মপ্রত্যয় লাভ করে। কু'রআন মাজীদে তাওহীদের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তাওহীদের প্রচারকে নবী ও রাসূল প্রেরণের প্রধানতম উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্রত্যেক নবীই তাঁহার জাতিকে সর্বপ্রথমে তাওহীদের বাণী শুনাইয়াছেন। রাসূল (স) তাঁহার মক্কা জীবনের তেরটি বৎসরে বিশেষত তাওহীদেরই তাব্‌লীগ করিয়াছেন। কু'রআন মাজীদ আল্লাহ্র সহিত তাঁহার কোনও সৃষ্টিকে 'ইবাদাতে শরীক করাকে শির্ক নামে অভিহিত করিয়াছে এবং শির্ককে জুলুম-ই 'আজীম বা জঘন্য পাপাচাররূপে নির্দেশ করিয়াছে (৩১ ঃ ১৩)। অনুরূপভাবে উহা মুশরিক ব্যক্তির যাবতীয় নেক 'আমল গ্রহণযোগ্য নয় (৬ ঃ ৮৮) এবং তাহার জন্য জান্নাত হারাম, এই ঘোষণা দিয়াছে (৫ ঃ ৭২)।

তাওহীদের 'আকীদা ভিন্ন আল্লাহ তা'আলার অন্য সকল গুণও—যেইগুলি তাঁহার আস্‌মা'উ'ল-হুসনা (সুন্দর সুন্দর গুণবাচক) নামে বর্ণিত হইয়াছে–মানুষের অন্তরে শান্তি ও হিদায়াত আনয়ন করে। এই সকল গুণবাচক নামের মধ্যে রাব্‌ব (رب) [প্রতিপালক] একটি মহামহিমান্বিত নাম। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আল-আসমা'উ'ল-হুসনা নিবন্ধ।

রিসালাতে বিশ্বাসও ইসলামে একটি বুনিয়াদী 'আকীদা। 'আল্লাহ্র সত্তা অদৃশ্য। তাই তাঁহার আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানের প্রচারের জন্য কোনও দৃশ্যমান মাধ্যমের প্রয়োজন ছিল। নবী-রাসূলগণই হইতেছেন আল্লাহ্র দীনের তাব্‌লীগের উক্ত মাধ্যম। তাঁহারা আল্লাহ্ প্রেরিত ওয়াহ্‌য়ির সাহায্যে লোকদেরকে চিন্তা ও কর্মের বিভ্রান্তি হইতে মুক্ত করিয়া সঠিক ও নির্ভুল পথে আনয়ন করেন। একথা সত্য যে, ইসলামে মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দান করা হইয়াছে কিন্তু উহাতে মানবীয় বুদ্ধিকে জ্ঞান লাভের ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব অর্জনের একমাত্র উৎস বলিয়া নির্দেশ করা হয় নাই বরং ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান লাভ ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব অর্জনের বিশুদ্ধতম ও উন্নততম উৎস হইতেছে আল্লাহ প্রেরিত ওয়াহয়ি, নুবুওয়াত (দ্র.) ও রিসালাত (দ্র.)। একমাত্র আল্লাহ প্রেরিত ওয়াহয়ির সাহায্যেই মানুষ তাওহীদের নিগূঢ় তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম ও উপলব্ধি করিতে পারে এবং পাপাচার, অন্যায়, ফাসাদ ও অন্য যাবতীয় ব্যক্তিগত ও সামাজিক অনাচার সম্বন্ধে অবহিত হইতে ও উহাদের হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। আল্লাহ কর্তৃক নবীগণের প্রেরণের উদ্দেশ হইতেছে মানব জাতির হিদায়াত এবং তাহার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের পথ-নির্দেশ। নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হইয়াছেন সমাজ হইতে গোমরাহী ও বদবখ্‌তীকে দূর করিবার উদ্দেশে, লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা, গুণাবলী ও ক্রিয়াকলাপের সহিত পরিচিত করিবার উদ্দেশে, পৃথিবীর আরম্ভ ও পরিণতির সহিত সম্পর্কিত ওয়াহ্‌য়ি মারফত প্রাপ্ত জ্ঞান সম্পদকে তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশে এবং মৃত্যুর পর মানুষকে যে সকল মন্‌যিল অতিক্রম করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে তাহাকে অবহিত করিবার উদ্দেশে। উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে গবেষণা ও আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক ও বুনিয়াদী তথ্য আমাদের বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডারে নাই। প্রত্যেক পয়গম্বর লোকদেরকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদাতের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন (১৬ ঃ ৩৬)। রুশ্‌দ ও হিদায়াত এবং দীন ও শারী'আত বিষয়ে কোনও পয়গাম্বর নিজ হইতে কিছুই বলেন না বরং তাঁহারা তো শুধু আল্লাহ্র হুকুম-আহ্‌কাম ও বিধি-বিধানের তাব্‌লীগ করেন (৫৩ ঃ ৩, ৪)। রিসালাতের 'আকীদার কল্যাণে মানুষের অন্তরে আল্লাহ্র শিক্ষা ও হিকমতের বিষয় দৃঢ় প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয় এবং রাসূল (স)-এর প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্যের প্রেরণা সঞ্চারিত হয় (দেখুন আল-গাযালী, ইহ্‌য়া' 'উলুম, শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ, হু'জ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা)

ফিরিশ্‌তায় ভালমন্দ বিষয়ক তাক্‌দীরে ও আখিরাতে বিশ্বাস মানব জীবনের জন্য একটি উদ্দেশ্য নির্ধারিত করিয়া দেয় এবং তাহাকে নেক 'আমল করিতে উৎসাহিত করে। এতদ্বারা মানব জীবন উদ্দেশ্যবিহীন একটি চলন্ত তরী—আধুনিক যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বা অস্তিত্ববাদী (Existentialists)-দের এই ধারণা বাতিল হইয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

"তোমরা কি ভাবিয়াছ যে, আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করিয়াছি আর তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে না ?" (২৩ ঃ ১১৫)। ইসলামে মানব জীবনের একটি উদ্দেশ্য নির্ধারিত রহিয়াছে। উক্ত উদ্দেশ্য আখিরাতের সহিত সম্পর্কিত। ইসলাম আখিরাতের 'আকীদাকে প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়াছে। আখিরাতের নেক্‌কার লোকদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত, উহার নি'মাতসমূহ এবং বদ্‌কার লোকদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নাম ও উহার 'আযাব। ইসলামে নেক 'আমলের পুরস্কারের জন্য জান্নাতের ধারণা এবং বদ 'আমলের শাস্তির জন্য জাহান্নামের ধারণা পেশ করা হইয়াছে। উক্ত ধারণার সঙ্গে গুনাহ্ ও ইসতিগ্‌ফার (ক্ষমা প্রার্থনা)-এর ধারণাও ইসলামের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি বিশেষ

লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই বিষয়েও ইসলাম অন্য ধর্মের তুলনায় এইরূপ মধ্যপন্থা গ্রহণ করিয়াছে যাহা অত্যন্ত ন্যায়ানুগ ও যুক্তিসঙ্গত। ইসলাম ঘোষণা করিয়াছে যে, যদি কোনও ব্যক্তি কোন গুনাহ্ করিয়া বসে, অতঃপর সে আন্তরিকভাবে তাওবাঃ ও ইসতিগ্ফার করে এবং এতদসহ আল্লাহ্র নিকট এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, ভবিষ্যতে সে এই ধরনের গুনাহে লিপ্ত হইবে না, তবে আল্লাহ্ তাহার গুনাহ মা'ফ করিয়া দেন আর ইহাই হইতেছে তাঁহার রহমত ও মাগফিরাতের দাবী। মানুষের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাওবার দরজা তাহার জন্য সর্বদা খোলা থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেনও (তওবা নিবন্ধ দ্র.)।

সালাত (দ্র.) একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাত যাহা ব্যক্তির আত্মাকে পবিত্র করে, উপরন্ত সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করে এবং সমাজে শৃঙ্খলা ও ঐক্য সৃষ্টি করে। ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সালাত কায়েমকারীকে ইহা অন্যায় ও পাপকার্য হইতে বিরত রাখে। অন্যতম বিশেষ 'ইবাদাত যাকাত (দ্র.) যাহা মালদৌলতকে পবিত্র করে এবং যাকাতদাতার অন্তরে অপরের আর্থিক দৈন্যের অনুভূতি আনিয়া দিয়া উহা দূর করিতে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করে। যাকাত সমাজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি সৃষ্টির একটি শক্তিশালী মাধ্যম ও উপায়। তদ্রূপ আর একটি 'ইবাদাত সাওম (দ্র.) যাহা আত্মসংযম অর্জনের একটি প্রকৃষ্ট পন্থা। আর একটি 'ইবাদাত হাজ্জ (দ্র.), মুসলিম উম্মাঃ-র আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং মুসলিম উম্মাঃ-র ঐতিহ্যসমূহের স্মৃতিকে জাগরূক রাখিবার একটি মাধ্যমও বটে। ইসলামী 'ইবাদাতসমূহের উদ্দেশ্য হইতেছে আত্মার পবিত্রতা সাধন ও আত্মসমালোচনা যাহা দ্বারা মানুষ তাহার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে পরহেযগারী, পবিত্রতা ও ভারসাম্য হাসিল করে। উল্লেখ্য যে, কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তাক্ওয়া বা পরহেযগারীকে উত্তম পাথেয় (خير الزاد) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাক্ওয়ার মর্ম হইতেছে খুঁটিনাটি বিষয়েও আল্লাহ্র অপসন্দ কাজকর্ম পরিত্যাগ করা এবং এইজন্য আল্লাহ্কেই সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করা।

ইসলাম একটি ভীতির ধর্ম—প্রাচ্যবিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই ধারণা সঠিক নহে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইসলামে ভীতির সঙ্গে সঙ্গে রহমত ও মুহব্বতের দিকটিরও প্রাধান্য রহিয়াছে। কু'রআন মাজীদের বহু আয়াতে আল্লাহ্ তা'আল্লার রহমতের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। উহাদের মধ্য হইতে কয়েকটি আয়াত বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন, যাহারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ্ বলিতেছেনঃ

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

"তোমরা আল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ হইও না" (৩৯ ঃ ৫৩)। অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْئٍ رَّحْمَةً ....

"হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু ! তোমার রহমত ও জ্ঞান তো প্রতিটি বস্তুকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে।" (৪০ ঃ ৭)। অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

"আর আমার রহমত প্রতিটি বস্তুকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে" (৭ ঃ ১৫৬)। এতদ্ব্যতীত কুরআন মাজীদ রাহীম (পরম করুণাময়), রাহমান (দয়াময়), আর্হামু'র-রাহিমীন (শ্রেষ্ঠ করুণাময় সত্তা) ইত্যাদি রহমতবাচক নামসমূহও আল্লাহ্র জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়াছে। পবিত্র হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ মাতা তাহার সন্তানের প্রতি যে পরিমাণে স্নেহশীল হইয়া থাকে আল্লাহ্ স্বীয় সৃষ্টির প্রতি তদপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে স্নেহশীল। যদি ইসলামে ভীতির শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকেও, তবে উহা হইতেছে মুহব্বত ও ভালবাসা হইতে উদ্ভূত যাহা মুহব্বত ও ভালবাসাকে রক্ষা করে।

ইসলামে দীন একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ফলে শিষ্টাচার ও নৈতিকতাও দীনের একটি অংশ। যদি মুসলিমের পূর্ণ জীবনটাই দীনের মৌলিক নীতিসমূহের অধীন হয়, তবে তাহার জীবনের সকল কার্যকলাপই 'ইবাদাত। তাই ইসলামে শারী'আত কর্তৃক অনুমোদিত নৈতিক বিধিবিধান মানিয়া চলাও 'ইবাদাত (আল-গাযালী, কীমিয়া-ই সা'আদাত ; ইব্ন মিসকাওয়ায়হ, আল-ফাওযু'ল-আস্গার)।

**ইসলামী আখলাক** ঃ যদিও ইসলামে প্রতিটি সৎ কাজই একটি 'ইবাদাত, তথাপি এইরূপ কতগুলি বিষয় ও কার্য রহিয়াছে যেইগুলি 'ইবাদাত ও পারস্পরিক আচার-আচরণ ও ব্যবহারের মধ্যবর্তী পর্যায়ে রহিয়াছে। এই সকল কার্য সম্পূর্ণত অভ্যন্তরীণ বিষয়ও নহে, আবার পূর্ণমাত্রায় বাহ্য বিষয়ও নহে। এইগুলি আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পন্ন করানো যায় না বরং ইহারা ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চেষ্টায় সম্পন্ন হয়। মানুষের অন্তর যদি আধ্যাত্মিক দিক দিয়া সুস্থ থাকে, তবে তাহার এই সকল কার্য সুন্দর ও সুচারু হয়। পক্ষান্তরে ইহার বিপরীত হইতে অর্থাৎ অন্তর অসুস্থ হইতে সম্পাদিত এই সকল কার্যও সুন্দর হয় না। হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ রাসূল (স) বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ .

"নিশ্চয় দেহের মধ্যে এইরূপ একটি মাংসপিণ্ড রহিয়াছে যাহা সুস্থ থাকিলে সমগ্র দেহ সুস্থ থাকে এবং যাহা অসুস্থ হইলে সমগ্র দেহ অসুস্থ হয়। উহা হইতেছে কাল্ব (হৃৎপিণ্ড)" (আল-বুখারী, কিতাবু'ল-ঈমান, বাব ফাদ্লী মান ইস্তাব্রাআ লি দীনিহ্)। অন্তরের সঠিক অবস্থা দ্বারা ভাল মন্দ, উভয়েরই পরিচয় মিলে। রাসূল (স) বলিয়াছেন ঃ

اَلْبِرُّ مَا اطْمَئَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَاطْمَئَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ
وَالاِثْمُ مَا حَاكَ فِى الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ فِى النَّفْسِ .

"অন্তর যে কার্যের দিকে তৃপ্তি সহকারে অগ্রসর হয় তাহাই নেক কাজ এবং অন্তর যে কার্যের প্রতি অগ্রসর হইতে দ্বিধান্বিত হয়, তাহাই বদ কাজ" (আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪খ, ২২৮)। পূর্ণ মু'মিনের লক্ষণ বর্ণনা করিতে যাইয়া রাসূল (স) বলিয়াছেন ঃ

اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ .

"যদি তোমার কোন নেক 'আমল তোমাকে আনন্দ দেয় এবং তোমার বদ 'আমল তোমাকে দুঃখ দেয় তবে বুঝিতে হইবে যে, তুমি মু'মিন।" এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আখলাক মানুষের স্বভাবের শুধু বাহ্য সৌন্দর্যের নাম নহে বরং উহা অন্তরের পবিত্রতা এবং আত্মার গুণাবলীর নাম। বিবেক ও সঠিক জ্ঞান হইতেছে ইহার মানদণ্ড। মোটকথা, আখলাকের প্রকাশ বাহ্য বিষয় হইলেও উহার মূল নিহিত থাকে মানুষের অন্তরে। আখ্লাক দ্বারা সমাজের সদস্যগণ প্রভাবিত হইয়া থাকে এবং সামাজিক জীবনে এক বিশেষ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। উক্ত বিষয়টি ইসলামের

আখ্‌লাক সম্পর্কিত ধারণার মূল কথা। আখলাকের অর্থে দীন, স্বভার ও অভ্যাস—এই তিনটি বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত (লিসানু'ল-'আরাব)।

ইসলামী আখ্‌লাকের উৎস দুইটি ঃ (১) আল-কু'রআন এবং (২) রাসূল (স)-এর সুন্দর আদর্শ ও উত্তম চরিত্র। আল-কুরআনে আল্লাহ বলিতেছেন,

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

"আর নিশ্চয় তুমি সুমহান চরিত্রের অধিকারী" (৬৮ ঃ ৪)।

আরও বলিতেছেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

"নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের চরিত্রের মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে" (৩৩ ঃ ২১)। আল-কু'রআনে সূরা মু'মিনূন-এর প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াতে (২৩ ঃ ১-১১) আল্লাহ মু'মিন বান্দার গুণাবলীর মধ্যে সচ্চরিত্রতা বা আখ্‌লাক-ই হাসানাকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। সূরা বাকারা (২ ঃ ১৭৭) ও সূরাঃ আল-ফুরকান (২৫ ঃ ৩৬-৭৫)-এও আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণের সৎ গুণাবলীর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

রাসূল (স) একদিকে যেমন সুমহান চরিত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি উত্তম চরিত্রের শিক্ষাগুরুও ছিলেন। আল-কুরআনে আল্লাহ বলিতেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ .

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাহাদের একজনকে রাসূলরূপে পাঠাইয়াছেন—যে তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাহাদেরকে পবিত্র করে এবং তাহাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়; ইতিপূর্বে তো তাহারা ছিল স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে" (৬২ ঃ ২)। উক্ত আয়াতে উল্লিখিত يزكيهم এবং الحكمة। এই অংশদ্বয় দ্বারা আল্লাহ রাসূল (স) কর্তৃক লোকদের আত্মার পরিশুদ্ধি সাধনের প্রতি এবং রাসূল (স)-এর আখ্‌লাক ও সুমহান আদর্শের প্রতি বিশ্বমানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। রাসূল (স)-এর সত্তার মধ্যে যে চারিত্রিক গুণাবলীর সমাবেশ ঘটিয়াছিল উহারা ছিল মানবতার সর্বোচ্চ স্তরের প্রকাশক (তিরমিযী, শামা'ঈল মিফতাহু কুনূযি'স-সুন্না, আদাব শব্দমূল)। বাস্তব জীবনের উক্ত আদর্শ ছাড়াও তিনি সাধারণ সচ্চরিত্রতা ও নেক আখ্‌লাকের বিশেষ বিশেষ দিক সম্বন্ধে যে সকল বাণী রাখিয়া গিয়াছেন, উহাদের সংক্ষিপ্তসার এই ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ঈমানের কোন্ কাজটি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ? রাসূল (স) বলিলেন ঃ সুন্দর স্বভাব (আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪খ, ৩৮৫)। আবূ দাউদ-এ বর্ণিত রহিয়াছে ঃ

مَا مِنْ شَيْئٍ اَثْقَلَ فِى الْمِيْزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ

"কোন 'আমলই দাঁড়িপাল্লায় সুন্দর স্বভাব অপেক্ষা অধিকতর ওযনবিশিষ্ট হইবে না" (আস-সুনান, কিতাবু'ল-আদাব, বাব ফী হুস্‌নি'ল-খুলুক)। রাসূল (স) স্বীয় রিসালাতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেনঃ

بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ حُسْنَ الْاَخْلاَقِ

"আমি সুন্দর স্বভাবগুলিকে পরিপূর্ণতা দানের উদ্দেশে প্রেরিত হইয়াছি" (আল-মুওয়াত্তা', কিতাবু'ল-জামি', বাব মা জাআ ফী হু'সনি'ল-খুলুক আহ'মাদ, আল-মুসনাদ, ২খ, ৩৮১)। রাসূল (স) লোকদেরকে সুন্দর স্বভাবের অধিকারী হইবার আদেশ দিতেন (আল-বুখারী, কিতাবু'ল-আদাব, বাব হুসনি'ল-খুলুক)। তিনি ইহাও বলিতেন ঃ

خِيَارُكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلاَقًا .

"তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যাহার স্বভাব সর্বাপেক্ষা সুন্দর" (পূ. গ্র.)। অন্য এক হাদীছে রাসূল (স) সচ্চরিত্রতাকে ব্যক্তিগত মহত্ত্ব ও কৌলিন্যের বস্তু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

حَسْبُهٗ خُلُقُهٗ

"মানুষের কুলীনত্ব হইতেছে তাহার সুন্দর চরিত্র" (আল-মুসনাদ, ২খ, ৩৬৫)। অন্য এক হাদীছে রাসূল (স) সচ্চরিত্রতাকে ঈমানের পরিপূর্ণতার মানদণ্ডরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

"মু'মিনদের মধ্যে পূর্ণতম ঈমানের অধিকারী তাহারা যাহারা সুন্দরতম স্বভাবের অধিকারী" (আবূ দাউদ, আস-সুনান, কিতাবু'স-সুন্না, বাব ১৬)। অন্য এক হাদীছে রাসূল (স) সুন্দর স্বভাবকে সাওম ও সালাত-এর সমমর্যাদাসম্পন্ন 'ইবাদাত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهٖ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ

"নিশ্চয় মু'মিন ব্যক্তি তাহার সুন্দর স্বভাব দ্বারা সাওম পালনকারী ও সালাত প্রতিষ্ঠাকারীর মর্যাদা লাভ করে" (আবূ দাউদ, কিতাবু'ল-আদাব, বাব ফী হুসনি'ল-খুলুক)। ইসলামী আখলাকে কতিপয় সৎ গুণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে এবং কুরআন-হাদীছে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী আখ্‌লাকের সবিশেষ ফাদীলাতের উল্লেখ রহিয়াছে। আল-কু'রআনে বলা হইয়াছে ঃ

وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

"আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রভুর 'ইবাদাত কর এবং নেক কাজ (খায়র) কর। আশা করা যায়, তোমরা কৃতকার্য হইতে পারিবে" (২২ ঃ ৭৭)। 'খায়র' শব্দের মধ্যে ব্যক্তিগত সুন্দর স্বভাব এবং মানুষের সহিত সদ্ব্যবহার করিবার বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

আল-কু'রআনে 'আদল ও ইনসাফের গুণকে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। 'আদল শব্দের অর্থ ন্যায় বিচার, সাম্য, ন্যায়পরায়ণতা, জুলুম করা হইতে দূরে থাকা, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রদান করা, উক্ত অধিকার প্রদানে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না করা এবং চরম ও নরম উভয়বিধ পন্থা হইতে দূরে থাকা। ন্যায়বিচারের উক্ত গুণ মানুষের কার্যাবলীতে সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের সৃষ্টি করে। 'আদল-এর ক্ষেত্র এত ব্যাপক যে, আল-কু'রআনে শত্রুর ব্যাপারেও ন্যায়বিচার কায়েম করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا .

"আর কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন ন্যায় বিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, ন্যায়বিচার কায়েম করিবে, উহা তাক'ওয়ার নিকটতর" (৫ ঃ ৮)। সাব্‌র ও শুকর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী আখলাক। আল-কু'রআনে বহু স্থানে সা'ব্‌র ও শুক্‌র-এর গুণ অর্জন করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বিপদাপদ ও প্রতিকূল অবস্থায় ধৈর্যশীল থাকা এবং

আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত নি'মাতসমূহের জন্য তাঁহার প্রতি শুক্র বা কৃতজ্ঞতা আদায় করা, এই দুইটি গুণ উচ্চতম স্তরের আখলাকের অংশ। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল ও অস্থিরচিত্ত, যেমন আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

انَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا - اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا .

"মানুষ তো সৃজিত হইয়াছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে। যখন বিপদ তাহাকে স্পর্শ করে, সে হয় হা-হুতাশকারী" (৭০ ঃ ১৯, ২০)। তাই মু'মিন ব্যক্তির সঠিক কর্তব্য এই যে, সে সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্র প্রতি আস্থাশীল থাকিবে। বস্তুত ধৈর্য অবলম্বন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কল্যাণেই আল্লাহ্র প্রতি আস্থাশীলতা ও নির্ভরশীলতা তথা চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত ইসলামে আত্মত্যাগ, দয়া ও কৃপা, সহানুভূতি, রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তাবন্ধনকে অবিচ্ছিন্ন রাখা, আত্মমর্যাদাবোধ ও মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। ইসলামে দীনী কর্তব্যসমূহের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এই সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন ঃ

اَوْ فُوْا بِالْعُقُوْدِ

"তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করিবে" (৫ ঃ ১)। নেক্কার মু'মিনের গুণাবলীর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا .

"আর যাহারা প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর তাহা পালন করে" . . . (২ ঃ ১৭৭)। ইসলামে প্রতিশ্রুতি পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলিয়া নির্দেশিত হইবার কারণ এই যে, প্রতিশ্রুতি পালনের উপর সমগ্র সমাজের সুন্দর কাঠামো এবং সমাজের সদস্যদের পারস্পরিক আচার-আচরণ ও লেনদেনের পূর্ণ শৃঙ্খলা নির্ভর করে। হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ রাসূল (স) বলিয়াছেনঃ

لاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَّ عَهْدَ لَهُ .

"যাহার মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালনের গুণ নাই, তাহার মধ্যে দীন নাই" (আহ্মাদ, আল-মুসনাদ, ৩খ, পৃ. ১৩৫)। ইসলামী আখলাকের অন্যান্য অংশ জানিবার জন্য দেখুন ঃ আত্-তিরমিযী, আশ-শামা'ইল, এতদসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ মিফ্তাহু কুনূযি'স-সুন্নাহ গ্রন্থের সহযোগিতায়)।

উপরিউক্ত মৌলিক আখ্লাকী গুণাবলীর ভিত্তিতে অতীতে মুসলিমদের মধ্যে আখলাকশাস্ত্র পরিবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে উহার সহিত অন্যান্য উপাদানের সংমিশ্রণও ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পরবর্তীকালে যুহদ বা সন্ন্যাসবৃত্তির একটি বিশেষ ধারণাও মুসলিম চিন্তাধারায় অনুপ্রবেশ করে। এইরূপে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা বরণের ধারণাও ইসলামী আখলাকে বিদ্যমান ছিল না। এতদ্ব্যতীত গ্রীক আখ্লাকশাস্ত্রের গ্রন্থাবলীর অনুবাদের মাধ্যমে পরবর্তীকালে গ্রীক চিন্তাধারার উপকরণও মুসলিম চিন্তাধারায় অনুপ্রবেশ করে। এইরূপে ইরানী ও ভারতীয় চিন্তাধারার কতগুলি অংশও পরবর্তীকালে মুসলিম আখলাকী চিন্তাধারায় অনুপ্রবেশ করে (মুসলিম আখলাকশাস্ত্র বিষয়ে জানিবার জন্য দেখুন ঃ আল-গাযালী, কীমিয়া-ই সা'আদাত; ইব্ন মিস্কাওয়ায়হ, আল-ফাওযু'ল-আসগার। নাসীরু'দ-দীন তূসী, আখলাক-ই নাসিরী দাওওয়ানী, আখ্লাক-ই জালালী, যাকী মুবারাক, আল-আখ্লাকু 'ইনদা'ল-গাযালী; উর্দূ অনু. নুরু'ল-হাসান খান)।

উপরিউক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ এই যে, ইসলামে আখলাকের ধারণা মূলত দীনী ও আধ্যাত্মিক ধারণা হইলেও উহার পরিধি বাস্তব কর্ম ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি পর্যন্ত বিস্তৃত। উহার উৎস সৎ চিন্তা ও সৎ কর্ম সম্পাদনের সহজাত যোগ্যতা হইলেও উহার বিকাশ ও উন্নতি ঘটে সঠিক শিক্ষা, আত্মার পবিত্রতা ও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে পূর্ণ কর্ম সম্পাদন দ্বারা। ইসলামী আখলাকের লক্ষ্য যে শুধু ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শান্তি তাহা নহে, বরং উহার একটি সামাজিক দিকও রহিয়াছে। ন্যায় বিচার ও পুণ্য কর্ম দ্বারা এক দিকে যেমন সামাজিক জীবন শান্তিময় হয়, অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তিও উহা দ্বারা শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে এবং আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে সক্ষম হয়। বস্তুত উহাই হইতেছে মু'মিনের যিন্দেগীর পরম ও চরম উদ্দেশ্য। ইসলামী আখ্লাকের মূল কথা হইতেছে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পালন এবং তাঁহার সৃষ্টির প্রতি প্রেম ও ভালবাসা।

**ইসলামী আইন ঃ** ইসলামী আইনের উৎস ওয়াহ্য়ি হইলেও উহার প্রাণ হইতেছে মনুষ্যত্ব, যৌক্তিকতা, বাস্তব কর্ম ও সভ্যতা- সংস্কৃতি (দ্র. স্যার 'আবদু'র-রাহীম, Muhammadan Jurisprudence, পৃ. ৫৪ প.)। উহার লক্ষ্য আল্লাহ্র বান্দাদের উপর প্রভুত্ব ও আধিপত্য করা নহে বরং উহার লক্ষ্য বান্দাদের কল্যাণ সাধন। উহাতে শক্তি প্রয়োগের নীতি স্বীকৃত নহে; বরং উহা সংশোধন ও পবিত্রকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কথা সত্য যে, ইসলামী আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও রহিয়াছে; তবে ইহাও মানব কল্যাণের নিমিত্ত। তদুপরি শাস্তিমূলক আইন প্রযুক্ত হইবার পূর্বে আত্মসমালোচনা ও আত্মসংশোধনেরও কতক পর্যায় বর্তমান থাকে। এই কারণেই ইসলামে আইন-কানূনের বর্ণনার পাশাপাশি তাকওয়া, আত্মার সংশোধন ও তাওবাঃ-র প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে।

ইসলামী আইনে ব্যক্তির মর্যাদা ও মানুষের সম্মানের প্রতি সর্বাবস্থায় লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। ইসলামী আইনের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য রহিয়াছে ঃ (১) কুরআন ও সুন্না-র আলোকে আল্লাহ্র রাজত্ব ও শাসন কায়েম করা (কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্রই, ৬ ঃ ৫৭)। (২) শাসনকর্তাদের মাধ্যমে আল্লাহ্র হাক্কসমূহের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হাক্কসমূহকেও প্রতিষ্ঠিত করা এবং (৩) উন্নততম সামাজিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা বিধান ছাড়াও ব্যক্তির আত্মার পবিত্রতা সাধনের উদ্দেশে ন্যায়বিচার ও সৎ গুণাবলীর সংরক্ষণ। ইসলামী আইন ব্যক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠী বিশেষের স্বার্থ সংরক্ষণের হাতিয়ার নহে বরং উহা মানব সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য এবং 'আদ্ল ও ইন্সাফের গুণাবলী সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ইসলামী আইনের মূলনীতিসমূহের বিশদ বিবরণ ফিক্হ্শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, ইসলামী আইনের রূপ দানের কার্য চারিটি পর্যায়ের বা আমলে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম পর্যায় রাসূল (স)-এর হিজরত হইতে তাঁহার ইনতিকাল পর্যন্ত। রাসূল (স)-এর দশ বৎসরের মাদানী যিন্দিগীতে আল-কুরআনের মাধ্যমে দীন ইসলামের পূর্ণতা সাধনের কার্য সম্পন্ন হয়। কুরআনে বর্ণিত আইনের ভিত্তিতেই পরবর্তীকালের ফিক্হী আইন-কানূন ও বিধি-বিধান রচিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় বা 'আমল হইতেছে খিলাফাত-ই রাশিদার যুগ। এই যুগটি ছিল খলীফা (রা) চতুষ্টয় এবং অন্যান্য সাহাবী (রা) কর্তৃক কুরআন ও সুন্না-র ব্যাখ্যা প্রদানের যুগ। তৃতীয় আমলে আহ্লু'স-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আতের চারিটি মায্হাবের পূর্ণ ও বিধিসম্মত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্থ আমলে ফাকীহ্গণ স্ব স্ব ইমামের নির্দিষ্ট মায্হাবের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা প্রদানে মনোনিবেশ করেন। 'আল্লামা খুদারীর বর্ণনা মতে উক্ত

যুগসমূহের শেষে আরও দুইটি যুগ নির্দিষ্ট করা যায় ঃ প্রথমটিতে মাস্'আলাসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও পর্যালোচনার উদ্দেশে ফাকীহ্গণের মধ্যে বাহাছ্-মুবাহাছা ও তর্ক-বিতর্কের ঝড় বহিতে থাকে এবং দ্বিতীয়টিতে ইজ্তিহাদ ও বিচার পর্যালোচনার পরিবর্তে তাকলীদ বা অনুকরণকেই নীতিরূপে গ্রহণ করা হয়। তাক্'লীদের উক্ত শেষ পর্যায়টি এখনও কায়েম রহিয়াছে (আল-খুদারী, তা'রীখ-ই ফিক্'হ্-ই ইসলাম, উর্দু অনু. 'আবদুস-সালাম নাদবী, পৃ. ২)।

আল-কু'রআনের বর্ণনায় স্পষ্ট যে, ইসলামী আইনের রূপ দানে নিম্নোক্ত তিনটি মৌলিক নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে ঃ (১) ক্ষতিজনক বিষয় ও সংকীর্ণতা দূরীভূতকরণ এবং কঠোরতার পরিবর্তে সহজকরণ। (২) কঠোরতা নিরসন, যাহাতে আইন সহজে পালন করা যায়। (৩) যে সকল অভ্যাস ও রসম-রেওয়াজ দৃঢ়মূল হইয়া লোকদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে, উহাদেরকে প্রথমবারেই সম্পূর্ণরূপে দূর না করিয়া বরং উহাদেরকে পর্যায়ক্রমে দূর করা।

ইসলামী আইনের মূল ও প্রকৃত উৎস আল-কুরআন। উহার দ্বিতীয় মূল উৎস হইতেছে রাসূল (স)-এর সুন্নাঃ। রাসূ'ল (স) বিভিন্ন সময়ে কু'রআন মাজীদের যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন উহাকেই এবং স্বীয় কার্য দ্বারা কুরআন মাজীদের বিধি-বিধানের যে রূপ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন উহাকেই সুন্না বলা হয় (সুন্না ও হাদীছ নিবন্ধদ্বয় দ্র.)। সুন্না ইসলামী আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। উহার তৃতীয় উৎস কি'য়াস (দ্র.)। ফাকীহ্গণ কু'রআন ও হাদীছে'র আলোকে কি'য়াস প্রয়োগ করত তাঁহাদের স্ব স্ব যুগের বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধান পেশ করিয়াছেন। সেইগুলিও প্রণিধানযোগ্য বিষয়। উক্ত আইনের চতুর্থ উৎস ইজমা' (দ্র.)। কোনও মাস'আলার নির্দিষ্ট কোনও সমাধানের বিষয়ে কোনও যুগের সকল অথবা অধিকাংশ 'আলিমের মতৈক্যের নাম ইজমা'। কিন্তু উহাও একমাত্র তখন গ্রহণযোগ্য হইবে যখন উহা কু'রআন ও হাদীছে'র পরিপন্থী না হয়, বরং কু'রআন ও হাদীছে'র মর্ম ও উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যশীল হয় (দ্র. স্যার 'আবদু'র-রাহীম, পৃ. গ্র.)। শেষোক্ত দুইটি বিষয়কে এই উদ্দেশে ইসলামী আইনের উৎসরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে যে, প্রতি যুগেই মানুষের সামাজিক জীবনের রূপ ও উহার সমস্যার প্রকৃতি পরিবর্তিত হইতেছে। আর এই সকল পরিবর্তিত নূতন নূতন সমস্যার শারী'আতী সমাধান বাহির করিবার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তাই কুরআন ও হা'দীছের আলোকে ও পথ-নির্দেশনায় কি'য়াস ও ইজমা'-এর সাহায্যে নূতন নূতন সমস্যার সমাধান বাহির করিবার দ্বার উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে। ইসলাম যেহেতু সর্বকালের জন্য, তাই উহাতে সর্বকালের সকল সমস্যার সমাধান থাকার অপরিহার্যতা সুস্পষ্ট (ইকবাল, তাশ্কীল-ই ইলাহিয়্যাত-ই ইসলামিয়্যা, বাবু'ল-ইজ্তিহাদ ফি'ল-ইসলাম)।

'আল্লামা আল-খুদারী তাঁহার গ্রন্থে প্রতি যুগের বিশিষ্ট ফাকীহ্গণের নামের তালিকা পেশ করিয়াছেন। উক্ত তালিকায় আহ্লু'স-সুন্না ওয়া'ল-জামা'আ ও শী'আ এই উভয় দলের বিশিষ্ট ইমামগণের নাম স্থান পাইয়াছে। উহাতে আহ্লু'স-সুন্না ওয়া'ল-জামা'আর ইমামগণের মধ্য হইতে ফাকীহ্ সাহাবীগণের নামের পর ইমাম আবূ হানীফাঃ (র), ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফি'ঈ (র) ও ইমাম আহ্'মাদ ইব্ন হাম্বাল (র)-এর নাম এবং শী'আঃ ইমামগণের মধ্য হইতে হযরত 'আলী (রা)-র নামের পর ইমাম আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ বাকি'র (র)-এর নাম, তৎপুত্র ইমাম জা'ফার সাদিক' (র)-এর নাম এবং অন্যান্য ইমাম ও মুজতাহিদের নাম অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে (আল-খুদারী, বিষয়সূচীর সাহায্যে ; এতদ্ব্যতীত ফিক্'হ নিবন্ধ দ্র.; বিশ্বের অন্যান্য জাতির আইনের সঙ্গে ইসলামী আইনের তুলনার জন্য 'কানূন' ও 'শারী'আত' নিবন্ধদ্বয় দ্র.)।

ইসলামের সামাজিক জীবন সম্পর্কিত ধারণা ঃ কুরআন মাজীদে উক্ত হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ .

"হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি তাহা হইতে তাঁহার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বিপুল সংখ্যক নর-নারী ছড়াইয়া দেন। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর যাঁহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর। আর তোমরা সতর্ক থাক জ্ঞাতি বন্ধন সম্পর্কে" ( ৪ ঃ ১)। উক্ত আয়াত হইতে দুইটি মূলনীতি বাহির হয়ঃ (১) সকল মানুষ একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব সকল মানুষ সমান। (২) উক্ত সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের ভিত্তি হইতেছে আল্লাহ্র সহিত সম্পর্ক। বস্তুত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা উক্ত মূলনীতি দুইটির উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ইসলাম আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, বিশ্ব-মানব সকলে মূলত পরস্পর ভাই ভাই এবং উক্ত বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মিক ঐক্য ও সংহতি অপরিহার্য। সূরাঃ ফাতিহাঃ আল-কু'রআনের প্রথম সূরা যাহার শুরুতেই আছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

"সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই প্রাপ্য।" প্রথমোক্ত আয়াতে সূরা ফাতিহার এই আয়াতে আল্লাহ্কে রবূবিয়্যাত বা প্রতিপালকত্বের বিশেষণে বিশেষিত করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছ। আল্লাহ্ তা'আলার রবূবিয়্যাত গুণের পরিধিকেও সীমাবদ্ধ রাখা হয় নাই, বরং প্রথমোক্ত আয়াতে উহাকে সমগ্র মানব জাতির সহিত এবং শেষোক্ত আয়াতে উহাকে জগতসমূহের সহিত সম্পর্কিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, ইসলামের সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্য হইতেছে, জীবনের সকল প্রয়োজনে ও জীবিকা অর্জনের ব্যাপারে সকল মানুষ এক ভ্রাতৃসংঘের ন্যায়। একটি বিশেষ পরিবেশে সমানাধিকারের ভিত্তিতে সকলেই জীবিত থাকিবার ও আত্মবিকাশ লাভ করিবার সমান সুযোগ লাভ করিবে। ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বয়ং তাওহীদের 'আকীদাও সমগ্র মানব জাতির ঐক্যকে সুদৃঢ় করে। হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللّٰهِ

"সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবার" (আবূ য়া'লা আল-বায়্যার)। মানব জাতির ঐক্য ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় করার জন্য ইসলাম আধ্যাত্মিক দা'ওয়াতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে। কারণ শুধু পার্থিব বস্তুর উপায়-উপকরণের উপর ভিত্তি করিয়া যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, উহা নিশ্চিত ও সুদৃঢ় হইতে পারে না। এই কারণেই ইসলামে 'আকীদা-বিশ্বাসের সাহায্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত কার্য নবী-রাসূলগণই সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন উক্ত দা'ওয়াতের সর্বশেষ উদ্গাতা। ইসলামী সমাজ সর্বপ্রথম গঠিত হয় মদীনাতে। উহাতে আনসা'র, মুহাজির ও য়াহূদ-নাসারাগণকে লইয়া একটি সমাজের রূপ দান করা হয়। উহা

দ্বারা যে মহৎ বিশ্ব-সমাজ গঠনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত্ব হয়, তাহা নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর কারণে সমগ্র বিশ্বে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হইয়া রহিয়াছেঃ

(১) সাম্য ঃ বর্ণ, গোত্র, বংশ ও জাতিত্বকে কোনরূপ গুরুত্ব না দিয়া বরং একমাত্র তাক্ওয়াকেই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড বলিয়া নির্ধারিতকরণ; (২) মৌলিক মানবীয় প্রয়োজনসমূহের ক্ষেত্রে সকলের প্রতি সমান আচরণ ; (৩) মানুষের বিধানের স্থলে আল্লাহ্র বিধান কায়েম করিবার মাধ্যমে সকল মানুষের জন্য ইন্সাফ ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তিকে সহজ করিয়া দেওয়া।

ইসলাম মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে, অমুসলিমদের উপাসনালয়সমূহকে হেফাজত করিবার নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছে, প্রতিশ্রুতি পূরণ করাকে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে এবং মধ্যপন্থী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইসলামী সমাজ বর্ণবাদ, গোত্রবাদ, গোষ্ঠীবাদ ও ভৌগোলিক সীমারেখাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ঘৃণ্য মানসিকতা হইতে মুক্ত ও পবিত্র। ইসলামে জাতিভেদের কোনও স্থান নাই। উহাতে কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের এবং অনারবের উপর 'আরবের কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব নাই। এইরূপে উহাতে গোত্রবাদ বা গোষ্ঠীবাদের ভিত্তিতেও কাহারও উপর কাহারও কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব নাই, বরং ইসলামের দৃষ্টিতে একমাত্র তাক্ওয়ার ভিত্তিতেই মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হইয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

"নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক তাক্ওয়ার অধিকারী" (৪৯ ঃ ১৩)। আরও বলা হইয়াছে ঃ

وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا

"আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করিয়াছি যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার" (৪৯ ঃ ১৩)। আরও উক্ত হইয়াছে ঃ "হে মানব জাতি ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন" (৪ ঃ ১)। শেষোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ সমগ্র মানব জাতির ঐক্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যাহাতে সুন্দর ও সুসভ্য সমাজ গঠনে ও উহার দৃঢ়তা সাধনে সহায়তা লাভ করা যায়, তদুদ্দেশে ইসলাম মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে। এই সম্বন্ধে আল-কুরআনে উল্লিখিত হইয়াছেঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

"মু'মিনগণ পরস্পর পরস্পরের ভাই। অতএব, তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যাহাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও" (৪৯ ঃ ১০)। এইরূপে অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ .

"অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর" (৮ ঃ ১) [এতদ্ব্যতীত দ্র. খুত্বাঃ হাজ্জাতু'ল-বিদা']।

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এই মেযাজ ও স্বভাব ইসলামী সমাজের যাবতীয় কার্য ও আচরণে প্রতিফলিত দেখা যায়। উহা দ্বারাই সমাজে এইরূপ সাম্য সৃষ্টি হইয়াছে যাহার নজীর দুনিয়ার অন্য কোনও সমাজে পাওয়া যায় না। উহার স্পষ্ট ও বিশেষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় হাজ্জ পালনের ক্ষেত্রে। অবশ্য হাজ্জ পালনের ক্ষেত্রটি ইসলামী সাম্য প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্য হইতে মাত্র একটি ক্ষেত্র। হাজ্জ পালনের সময়ে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ব্যক্তির স্বতন্ত্র পরিচয় প্রায় অস্তিত্বহীন হইয়া যায়। একদা জাবালা ইব্নু'ল-আয়হাম (দ্র.) গাস্সানী সর্বশেষ গাস্সান বাদশাহ যিনি হযরত 'উমার (রা)-এর খিলাফাতের যুগে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, হাজ্জের সময়ে বায়তুল্লাহ শারীফের তাওয়াফ করিতেছিলেন। এই সময়ে হঠাৎ তাঁহার চাদরের কোণে জনৈক বেদুঈনের পা পড়িল। তিনি রাগান্বিত হইয়া বেদুঈনকে চপেটাঘাত করিলেন। বেদুঈন হযরত 'উমার (রা)-এর নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। হযরত 'উমার (রা) রায় দিলেন ঃ বেদুঈন যেন আমীর জাবালাকে অনুরূপ একটি চপেটাঘাত করে। ইহাতে আমীর জাবালা স্বীয় প্রতিপত্তির অহংকারে বলিলেন, "আমি হইতেছি সেই মর্যাদাবান ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি যাহার প্রতি কেহ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করিলে সে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তির যোগ্য হইয়া যায়।" হযরত 'উমার (রা) বলিলেন, "জাহিলিয়্যা যুগে ঐরূপ নিয়মই প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইসলাম আসিয়া বাদশাহ ও ফাকীরকে এবং উচ্চ ও নীচকে সমান ও একাকার করিয়া দিয়াছে" (তু. শিবলী নু'মানী, আল-ফারূক', ২খ.)।

মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইসলামী সমাজের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً .

"আমি তো আদাম-সন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি, তাহাদেরকে জলে-স্থলে চলাচলের বাহন দিয়াছি এবং আমি তাহাদেরকে উত্তম রিয্ক' দান করিয়াছি। আর আমি যাহাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের অনেকের উপর তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি" (১৭ ঃ ৭০)। ইসলাম মানুষ হিসাবে মানুষের সম্মান ও মর্যাদাকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। ইসলাম মাতাপিতা, স্ত্রী প্রমুখ পরিবারের সদস্যদেরকে বুদ্ধিমত্তা ও মানবতার ভিত্তিতে অতিশয় মর্যাদাবান করিয়াছে। ইসলাম পুরুষকে জীবন-যুদ্ধের কর্ণধার করিয়াছে এবং নারীকে পুরুষের জীবন-সঙ্গিনী বানাইয়া সম্মানের আসনে সমাসীন করিয়াছে। উহা দাসকে মুক্তির সুসংবাদ শুনাইয়াছে, দরিদ্র ও নিঃস্বদের জন্য আর্থিক সহায়তা দানের বিধান প্রবর্তন করিয়াছে, মুসাফিরদের হেফাজত ও মেহমানদারীর ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে, য়াতীমদেরকে 'ইয্যাত ও সম্মানের আসন দান করিয়াছে, প্রতিবেশীদের সহিত সহানুভূতিমূলক আচরণ করিতে নির্দেশ দিয়াছে এবং বিধবাদেরকে সম্মানিত জীবন যাপন করিবার পূর্ণ অধিকার প্রদান করিয়াছে।

মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলাম দাসপ্রথা হইতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানও প্রশংসনীয় পন্থায় সম্পন্ন করিয়াছে এবং পৃথিবীব্যাপী প্রচলিত এই ঘৃণ্য প্রথাকে অত্যন্ত হিক্মাতের সহিত রহিত করিয়া দিয়াছে। ইসলাম মানবাধিকারের দিক দিয়া দাসদেরকে তাহাদের স্বাধীন মুনিবদের সমান করিয়া দিয়াছে। স্বাধীন মুসলিম মুনিবগণও তাহাদের প্রতি কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা জা'ইয মনে করিতেন না। তাঁহারা একই দস্তরখানে বসিয়া তাহাদের সহিত একত্রে আহার গ্রহণ করিতেন। ইসলাম দাসদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনার অন্ধকূপ হইতে বাহিরে আনিয়াছে এবং তাহাদিগকে সম্মানের উচ্চ স্থানে পৌছিবার সুযোগ দিয়াছে। সর্বোপরি

তাহাদের অন্তর হইতে হীনতাবোধ দূর করিয়াছে। রাসূল (স) দাসদাসীদেরকে সমাজে সম্মান ও মর্যাদার আসন দান করিয়াছেন। হিজরতের পর মদীনাতে গিয়া মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করিবার কালে তিনি স্বীয় পিতৃব্য হযরত হাম্‌যা (রা)-কে স্বীয় খাদেম ও মুক্ত কৃতদাস হযরত যায়্‌দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-র ভাই, হযরত খালিদ ইব্‌ন রাওয়ায়্‌হা আল-খায়্‌ছামী (রা)-কে হযরত বিলাল হা'বশী (রা)-র ও হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-কে হযরত খারিজা ইব্‌ন যায়দ (রা)-র ভাই বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর কাবা শারীফের ছাদে চড়িয়া আযান দিবার সম্মান ও সৌভাগ্যও হযরত বিলাল (রা)-ই লাভ করিয়াছিলেন। আর যখন এই বিষয়টি কুরায়শ গোত্রের নেতৃবর্গের নিকট অমনঃপূত ঠেকিয়াছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদে "নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী" (৪৯ ঃ ১৩)—এই আয়াত নাযিল করিয়া লোকদের সম্মুখে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। এতদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয়টি তাহাদের নিকট পরিষ্কার করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন যে, বংশ নহে, বরং তাক্‌ওয়া ও ব্যক্তিগত পুণ্যই হইতেছে সম্মান ও মর্যাদা লাভের একমাত্র মানদণ্ড। রাসূল (স) একটি বিখ্যাত হা'দীছে বলিয়াছেন ঃ "তোমাদের দাসগণ তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদেরকে তোমাদের খাদেম বানাইয়াছেন। যে ব্যক্তির অধিকারে তাহার ভাই ন্যস্ত থাকে, সে যেন তাহাকে নিজে যাহা খায় তাহাই খাওয়ায় এবং নিজে যাহা পরিধান করে তাহাই পরিধান করায়। তোমরা তাহাদেরকে দিয়া তাহাদের ক্ষমতার অতীত বোঝা বহন করাইও না। যদি কখনও তাহাদের মাথায় তাহাদের সাধ্যের অতীত বোঝা রাখিতেও হয়, তবে উহা বহনে তোমরা তাহাদেরকে সাহায্য করিও। তোমাদের কেহ যেন স্বীয় দাসদাসীকে 'আমার দাস' বা 'আমার দাসী' বলিয়া সম্বোধন না করে বরং তোমরা তাহাদেরকে 'আমার পুত্র' বা 'আমার কন্যা' বলিয়া সম্বোধন করিবে"(সুব্‌হী আস্-সালিহ্, আন্-নাজ্‌'মু'ল্-ইস্‌লামিয়্যা, পৃ. ৪৬৮ প.)। বস্তুত ইসলামের কল্যাণে দাসগণ ও যাহারা ইসলামী সমাজে মাওলা (ব. ব. মাওয়ালী) নামে পরিচিত ছিলেন, উচ্চ উচ্চ রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। খলীফা হযরত 'উমার ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-'আযীয (র) তাঁহার শাসনমলে কয়েকজন দাসকে কায়রোতে বিচারপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন (আল-মাক্‌রীযী, আল-খিতাত, ২খ, ৩৩২)। ভারতীয় উপমহাদেশে গোলাম বংশের (দ্র. গু লাম) এবং মিসরে মামলূক বংশের (দ্র. মাম্‌লূক) রাজত্ব ও রাজ্য শাসনের ইতিহাস ইসলামে দাসদের উচ্চ মর্যাদা লাভ করার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

ইসলাম দাসদেরকে মুক্তি দিবার কার্যের ফযীলতের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে এবং তাহাদের প্রতি সদয় ও সহৃদয় ব্যবহার করিতে তাকীদ দিয়াছে। দাসদাসীদের বিষয়ে ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত বিধানাবলীর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধান এই যে, উহা যাকাতের একটি নির্দিষ্ট অংশকে দাসদাসীদের মুক্তির উদ্দেশে ব্যবহৃত হইবার জন্য (তাহাদের মুক্তিপণ হিসাবে) নির্দেশ করিয়াছে। আর যেহেতু কোনও দাসদাসীকে মুক্ত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় মূল্য বা মুক্তিপণের সম্পূর্ণ অর্থ অথবা উহার অংশবিশেষ কোনও ব্যক্তির পক্ষে এককভাবে পরিশোধ করা সাধারণত সম্ভব হয় না, তাই ইসলামে সমাজের একাধিক বিত্তশালী সদস্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত যাকাতের অর্থ দ্বারা উক্ত কর্তব্য সম্পাদন করিবার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। ইসলাম দাস-দাসীদের অধিকারসমূহের রক্ষার প্রতি এইরূপ গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে এবং তাহাদের অধিকার রক্ষার জন্য এইরূপ বিধি-বিধান প্রবর্তন করিয়াছে যে, ইসলামী সমাজে দাসত্ব প্রথা আর দাসত্ব প্রথা থাকে নাই।

ইসলাম অমুসলিমদের প্রতি সদাচার ও সদ্ব্যবহার করিবার আদেশ দিয়াছে এবং তাহাদের অধিকারসমূহকে রক্ষা করিয়াছে অর্থাৎ ইসলাম তাহাদের জান-মাল ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, হযরত 'উমার (রা) স্বীয় খিলাফাতের যুগে আল-বায়তু'ল-মুকাদ্দাসের খৃস্টানদের সহিত সম্পাদিত চুক্তির অধীনে তাহাদেরকে যে সকল অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, উহাদের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ ইহা হইতেছে আল্লাহ্‌র বান্দা আমীরু'ল-মু'মিনীন 'উমার কর্তৃক ঈলিয়া (ايليا)-বাসীদেরকে প্রদত্ত নিরাপত্তা। এই নিরাপত্তা তাহাদের জান, মাল, গির্জা ও ক্রুশের জন্য, তাহাদের সুস্থ ও অসুস্থ সকলের জন্য এবং তাহাদের সকল সমধর্মাবলম্বীর জন্য প্রদত্ত হইল। অতএব তাহাদের উপাসনালয়সমূহে বসবাসও করা যাইবে না। এবং উহাদেরকে বিধ্বস্তও করা যাইবে না। আর উহাদের সীমানা ও আয়তন কমানও যাইবে না। আর তাহাদের ক্রুশসমূহের সংখ্যা বা তাহাদের ধন-সম্পদের পরিমাণকেও কমান যাইবে না। ধর্মীয় ব্যাপারে তাহাদের প্রতি কোনরূপ শক্তি প্রয়োগ করা যাইবে না (আত'-তাবারী, ১খ, ২৬৫৮; আল-বালাযু'রী, পৃ. ১৪৫)। উক্ত অধিকারসমূহ শুধু ঈলিয়ার অধিবাসীদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না, বরং মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত সকল দেশের অধিবাসীদেরকেই এই সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে। তাহাদের সহিত সম্পাদিত চুক্তিনামাসমূহে এই সকল বিষয় উল্লিখিত রহিয়াছে।

আল-কুরআন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে যে পরিবেশ রচনা করিয়াছে, উহা দ্বারা সমাজে কতগুলি বিশেষ গুণসম্পন্ন মানুষ গঠিত হয়। উক্ত বিশেষ গুণগুলি দুইটি শব্দে নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করা যায় ঃ (১) মুত্তাকী ও (২) সালিহ্। মুত্তাকী এইরূপ মানুষ যে আল্লাহ্‌র ভয়ে সকল প্রকারের গুনাহ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে। সালিহ্ এইরূপ মানুষ যে যাবতীয় সৎ কার্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করে, যদ্দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্রতা অর্জিত হইতে পারে, সমাজে সততা ও শান্তি আসিতে পারে এবং সর্বোপরি জীবনের উত্তম উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে মানুষ সফল হইতে পারে। ইসলামে নেক 'আমলের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। নেক 'আমল বলিতে শুধু কতগুলি নির্দিষ্ট 'ইবাদাতকেই বুঝান হয় না, বরং উহা দ্বারা এইরূপ যাবতীয় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সৎ কাজকে বুঝান হয় যাহাদের উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্কিত গভীর রহস্যাবলীর জ্ঞান লাভ, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কল্যাণ সাধন, সৎ কার্যসমূহ ব্যাপকভাবে বিস্তীর্ণ এলাকায় সম্পাদন, পাপাচারের মূলোৎপাটন ও উন্নত সমাজের প্রতিষ্ঠা। এতদ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় যে, সালিহ্ মানুষ অর্থাৎ মুসলিম ব্যক্তি স্বীয় নেক 'আমালের সঙ্গে 'ইল্‌ম ও হি‌ক্‌মাতের নি'মাত দ্বারা লাভবান হইবে, সৎ কার্যাবলীতে সদা তৎপর এবং গম্ভীর অথচ সৃষ্টির প্রতি স্নেহপরায়ণ হইবে। আল-কুরআনে নেক আমলের যে ধারণা পেশ করা হইয়াছে, উহার মধ্যে সৎ উদ্দেশ্যাবলী (যেমন, আল্লাহ্‌র মা'রিফাত ও হিক্‌মাতের সন্ধান এবং আল্লাহ্‌র রহ্‌মত কামনা) অর্জনের লক্ষ্যে সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা চালাইবার বিষয়টি ছাড়াও রহিয়াছে সৎ কার্যের প্রতি আহ্বান জানাইবার এবং অসৎ কার্য হইতে বিরত থাকিতে আদেশ-উপদেশ প্রদান করিবার বিশেষ নির্দেশ।

মা'রিফাতের জ্ঞান লাভ হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টিকে মানব কল্যাণে নিয়োজিতকরণ পর্যন্ত এবং নিজ কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রের জিহাদ (অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সশস্ত্র যুদ্ধ চালনা) পর্যন্ত যাবতীয় নেক আমল সেই সকল ব্যক্তির ধ্যানে ও কর্মে প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হইবে। যাহারা ইসলামী সমাজ কায়েম করিবে বা কায়েম করিতে প্রচেষ্টা চালাইবে।

**ইসলামে রাষ্ট্র বিষয়ক চিন্তাধারা** ঃ এই চিন্তাধারা দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ (১) প্রথম চিন্তাধারার ভিত্তিমূল ৪ ঃ ৫৯ আয়াত ঃ

اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

"তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিলে উহা উপস্থিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট।" (২) দ্বিতীয় চিন্তাধারাটিও কুরআনী আয়াতকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছেঃ (ক) وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ " আর তুমি কাজেকর্মে তাহাদের সহিত পরামর্শ কর" (৩ ঃ ১৫৯)। وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ "তাহাদের পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে নিজদিগের কর্ম সম্পাদন করে" (৪২ ঃ ৩৮)।

উক্ত আয়াতগুলি দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত হয় ঃ প্রথমটি এই যে, (খ) اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ "কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র" (৬ ঃ ৫৭)।

আল্লাহ্‌র উক্ত কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁহার রাসূল। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুসরণ হইতেছে মৌলিক বিষয়। আর যে সকল শাসনকর্তা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি অনুগত থাকিয়া দীনী লক্ষ্য পূর্ণ করিবার উদ্দেশে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, তাহাদের অনুসরণ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুসরণেরই অধীন। উক্ত অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র একটি দীনী রাষ্ট্র। তবে উহা লৌকিক রাষ্ট্রও হইবে এই কারণে যে, ইসলাম মানব জীবনের সকল বিভাগ ও সকল ক্ষেত্রকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তবে এই রাষ্ট্রের উক্ত বৈশিষ্ট্য পুরোহিততন্ত্র (Theocracy) হইতে পৃথক। কারণ পুরোহিততন্ত্রে ধর্মীয় নেতাদের কথাই ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণের মানদণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হইতেছে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। উক্ত পারস্পরিক পরামর্শের পদ্ধতি কি ? উহার বিশদ বিবরণ স্বয়ং রাসূল (স)-এর মহান আদর্শে এবং তাঁহার সম্মানিত সাহাবীদের কার্যাবলীতে বিধৃত রহিয়াছে।

নীতি দর্শনের দিক দিয়া ইসলামী রাষ্ট্র বিষয়ে সুন্নী ও শী'আঃ দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য রহিয়াছে। সুন্নী মতানুসারে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে খিলাফাতের নীতি অবশ্য পালনীয়। উক্ত নীতির সারকথা এই যে, আমীরু'ল্-মু'মিনীন নির্বাচিত হইবেন পারস্পরিক পরামর্শের যে কোনও এক পদ্ধতিতে। পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কোনও ব্যক্তি আমীরু'ল্-মু'মিনীন নির্বাচিত হইয়া গেলে তিনি আজীবন আমীরু'ল-মু'মিনীন থাকিবেন। যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ ব্যতিরেকে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইবে না (দ্র. খিলাফাত)। পক্ষান্তরে শী'আঃ মতানুসারে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ইমামাতের নীতি অবশ্য পালনীয়। উক্ত নীতির সারকথা এই যে, ইমাম শুধু আহ্‌ল-ই বায়্ত বা রাসূল (স)-এর পরিবার হইতেই নির্বাচিত হইবেন। ইমাম নিষ্পাপ। প্রথম ইমাম ছিলেন হযরত 'আলী (রা) [দ্র. 'ইমাম ও 'আমীরু'ল-মু'মিনীন'। এতদ্ব্যতীত আল-মাওয়ার্দী, আল-আহ্‌কামু'স-সুল্‌তানিয়্যা]।

ইসলামী রাষ্ট্রের চরম ও পরম লক্ষ্য হইতেছে আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর অধীনে থাকিয়া দীনী ও দুনয়াবী বিষয়াবলীতে সমাজের যাবতীয় কার্য পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ। আল্লাহ্‌র হকসমূহ ও বান্দার হকসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা এবং ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে বিভিন্ন মানবশ্রেণীর মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা, তাহাদের সুখ এবং সমৃদ্ধ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

ইসলাম যে সকল মৌলিক নীতির উপর সামগ্রিক মানব জীবনের পরিচালনা ও ব্যবস্থা কায়েম করিতে চাহে, সেইগুলি আল-কু'রআনের বিভিন্ন স্থানে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ১৭ ঃ ২৩-৩৯ ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ ... ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ

"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও 'ইবাদাত না করিতে এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিতে। তাহাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধ্যক্য উপনীত হইলে তাহাদেরকে উফ্ (বিরক্তি বা উপেক্ষাসূচক কোন কথা) বলিও না এবং তাহাদেরকে ধমক দিও না। তাহাদের সহিত সম্মানসূচক নম্র কথা বলিও। মমতাবশে তাহাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করিও এবং বলিও ঃ হে আমার প্রতিপালক ! তাহাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তাহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তোমাদের প্রতিপালক তোমদের অন্তরে যাহা আছে তাহা ভাল জানেন। তোমরা সৎ কর্মপরায়ণ হইলে যাহারা সতত আল্লাহ্ অভিমুখী তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ ক্ষমাশীল; আত্মীয়-স্বজনকে তাহার প্রাপ্য দিবে এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করিও না। যাহারা অপব্যয় করে তাহারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তাহার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। এবং যদি উহাদের হইতে তোমার মুখ ফিরাইতেই হয়, যখন তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় থাক, তখন উহাদের সহিত নম্রভাবে কথা বলিও। তুমি তোমার হস্ত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করিয়া রাখিও না এবং উহা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করিও না, তাহা হইলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হইবে। তোমার প্রতিপালক যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিয্‌ক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা সীমিত করেন; তিনি তাঁহার-বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক্ পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা। তোমাদের সন্তানদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই রিয্‌ক দিয়া থাকি, উহাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। অবৈধ যৌন-সংযোগের নিকটবর্তী হইও না, ইহা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করিও না! কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হইলে তাহার উত্তরাধিকারীকে তো আমি উহা প্রতিকারের অধিকার দিয়াছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেই। য়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইও না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করিও; প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে। মাপিয়া দিবার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন

করিবে; ইহাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট। যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই উহার অনুসরণ করিও না; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় –উহাদের প্রতিটির সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে। ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করিও না; তুমি তো কখনই পদভারে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিতে পারিবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত-প্রমাণ হইতে পারিবে না। এই সমস্তের মধ্যে যেগুলি মন্দ সেইগুলি তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য। তোমার প্রতিপালক ওয়াহ্‌য়ির মাধ্যমে তোমাকে যে হিকমাত দান করিয়াছেন এইগুলি তাহার অন্তর্ভুক্ত।"

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাষ্ট্র পরিচালনায় যে সকল গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি অনুসৃত হইত, খুলাফা-ই রাশিদীন, বিশেষত হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) ও হযরত 'উমার ফারূক (রা) কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ফায়সালা হইতে এবং হযরত 'আলী (রা) কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন খুত্‌বাঃ ও উপদেশ হইতে উহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। ইসলামের উক্ত প্রাথমিক যুগে বাস্তব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে সকল মূলনীতি কায়েম ছিল, উহাদের মধ্য হইতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ছিল ঃ খলীফা যাবতীয় অধিকারের ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল মানুষের সমান ছিলেন। একদা হযরত 'উমার (রা) লোকদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "য়াতীমের মালে তাহার অভিভাবকের যতটুকু হক আছে, তোমাদের মালে (বায়তু'ল-মালে) আমার শুধু ততটুকু হক-ই আছে। যদি আমি ধনী হই, তবে উহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিব না। আর যদি প্রয়োজন পড়ে, তবে আমি উহা হইতে নিয়মানুসারে ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য গ্রহণ করিব। ভ্রাতৃগণ! আমার নিকট আপনাদের কতগুলি অধিকার প্রাপ্য রহিয়াছে। এই সকল অধিকারের বিষয়ে আমার নিকট হইতে হিসাব লওয়া আপনাদের কর্তব্য। অধিকারগুলি এই ঃ (১) দেশের খারাজ বা রাজস্ব এবং গানীমাতের মাল যেন অযৌক্তিকভাবে সঞ্চিত করিয়া রাখা না হয়। (২) আমার হাতে খারাজ ও গানীমাতের মাল আসিবার পর যেন উহা অন্যায়ভাবে ব্যয় করা না হয়; (৩) আমি যেন আপনাদের ভাতা বৃদ্ধি করি এবং দেশের সীমান্তকে রক্ষিত রাখি; (৪) আমি যেন আপনাদেরকে বিপদে নিক্ষিপ্ত না করি" (আবূ য়ূসুফ, কিতাবু'ল-খারাজ, পৃ. ৬৭)। হযরত 'উমার (রা)-এর উক্ত ঘোষণার পরিণতি এই হইয়াছিল যে, জনসাধারণ তাঁহার নিকট বিভিন্ন বিষয়ে কৈফিয়ত চাহিত এবং তিনি সানন্দে উহাদের জওয়াব দিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রতি বৎসর হাজ্জের সময়ে পবিত্র মক্কায় সকল সরকারী কর্মচারীকে একত্র করিয়া তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের কার্যাবলীর হিসাব লইতেন।

উম্মা-র অধিকারের উপর হস্তক্ষেপকারীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের কোনরূপ অবকাশ ইসলামে নাই। একদা হযরত 'আলী (রা) তাঁহার জনৈক নিকট আত্মীয় সরকারী কর্মকর্তা সম্বন্ধে জানিতে পারিলেন যে, সে বায়তু'ল-মালের অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে। ইহাতে তিনি তাহাকে লিখিলেন, "হে সেই ব্যক্তি যাহাকে আমি বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করিতাম ! তুমি যে হারাম খাদ্য খাইতেছ এবং হারাম পোশাক পরিধান করিতেছ সে কথা তোমার জানা থাকা অবস্থায় খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা তোমার নিকট কিরূপ মনে হয় ? তুমি বহু দাসী ক্রয় করিতেছ এবং বারবার বিবাহ করিতেছ; কিন্তু কোন্ অর্থ দিয়া উহা করিতেছ ? য়াতীম, মিস্‌কীন, মু'মিন, মুজাহিদ, ইহাদের অর্থ দিয়া ? যে অর্থ আল্লাহ্ মু'মিন ও মুজাহিদদেরকে গানীমাত হিসাবে দান করিয়াছিলেন এবং যে অর্থ দিয়া এই দেশকে রক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল, সেই অর্থ দিয়া ? তুমি এখনও কেন আল্লাহ্‌কে ভয় করিতেছ না এবং মুসলিম উম্মা-র নিকট উহার মাল ফিরাইয়া দিতেছ না ? যদি তুমি তাহা না কর এবং আল্লাহ্ তো তোমাকে আমার কজায় আনিয়া দিবেন, তখন তোমার বিষয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে আমার নিবেদন পূর্ণ হইবে। আমি তোমাকে স্বীয় তরবারি দ্বারা হত্যা করিয়া তোমাকে জাহান্নামে পৌঁছাইয়া ছাড়িব। আল্লাহ্‌র কসম ! তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, যদি হাসান-হুসায়নও উহা করিত, তবে তাহারাও আমার তরফ হইতে কোনক্রমে কোনরূপ অনুকম্পা পাইত না এবং এই বিষয়ে আমার মধ্যে কোনরূপ দুর্বলতাও দেখিতে পাইত না। তাহাদের প্রতি কোনরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন না করিয়া আমি তাহাদের নিকট হইতে আল্লাহ্‌র হক আদায় করিয়া লইতাম এবং তাহাদের জুলুম হইতে উদ্ভূত বাতিলকে নির্মূল করিয়া দিতাম" (নাহ্‌জু'ল-বালাগা, ২খ, ৬৬-৬৭, মিসর, তা. বি.)।

ইসলামী রাষ্ট্র-দর্শনে অমুসলিমদের জন্য তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং যাবতীয় নাগরিক অধিকার রহিয়াছে। ধর্ম প্রচারের বিষয়ে আল-কুরআনে সুস্পষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে ঃ

لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

"দীনের ব্যাপারে জোর-যবরদস্তী নাই" (২ ঃ ২৫৬)। হযরত 'উমার (রা) আল-বায়তু'ল-মুকাদ্দাসের খৃস্টানদের সহিত যে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন, উহাতে ইসলাম কর্তৃক অমুসলিমদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতার উক্ত স্বীকৃতি প্রদানের বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায়। ঐতিহাসিক তাবারী তাঁহার ইতিহাস-গ্রন্থে আল-বায়তু'ল-মুকাদ্দাস বিজয়ের ঘটনার বর্ণনায় উক্ত সন্ধি-চুক্তির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন (১খ. ২৬৫৮)।

রাষ্ট্র-পরিচালনায় দেশ রক্ষার বিষয়টিও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যুদ্ধ ও সন্ধি বিষয়ক ইসলামী বিধি-বিধানের মূল লক্ষ্য হইতেছে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, শান্তি ও নিরাপত্তাকে রক্ষা করা। ইসলাম যুদ্ধকে একটি চরম ও সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। আল-কুরআনে আল্লাহ্ যুদ্ধের অনুমতি দিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ۙ اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ......

"যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল তাহাদেরকে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে, কারণ তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক্ সক্ষম—যাহাদেরকে তাহাদের গৃহ হইতে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত করা হইয়াছে। শুধু এই কারণে যে, তাহারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্। আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা দমন না করিতেন, তবে নিশ্চয় বিধ্বস্ত হইয়া যাইত খৃস্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনা স্থান, গির্জা, য়াহূদী উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ যাহাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্‌র নাম . . ." (২২ ঃ ৩৯-৪০)। (যুদ্ধ বিষয়ক অন্যান্য বিধান জানিবার জন্য দেখুন ঃ শিবলী নু'মানী, সীরাতু'ন-নাবী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১খ., ৬০৬ প.)। যুদ্ধ বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۚ اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

"আর কোনও জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে (যুদ্ধের অবস্থায়ও তাহাদের বিষয়ে) সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা 'আদ্ল কায়েম করিবে'। উহা তাক্ওয়ার নিকটতর" (৫ ঃ ৮)।

আমীরু'ল-মু'মিনীন হযরত 'আলী (রা) মিসরে শাসনকর্তা নিযুক্তকরণের কালে একটি আদেশনামায় অত্যন্ত সংক্ষেপের অথচ বর্ণনা-সৌকর্যের সহিত রাষ্ট্র-পরিচালনা ও সভ্য রাজনীতির মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত আদেশনামার বিবরণ নাহ্জু'ল-বালাগা গ্রন্থে (২খ, ২প., সম্পা. 'ঈসা আল-বাবী, মিসর) সংরক্ষিত রহিয়াছে। এই স্থলে আমরা উহার কিয়দংশের মর্মার্থ পেশ করিতেছি। ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি কোন্ কোন্ চিন্তাগত, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা উহা হইতে জানা যাইবে। শাসনকর্তার কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে হযরত 'আলী (রা) বলেন "শাসনকর্তা দেশের রাজস্ব সংগ্রহ করিবে, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, দেশের জনসাধারণের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে এবং দেশের জমি আবাদ করিবার ব্যবস্থা করিবে।"

এতদ্ব্যতীত হযরত 'আলী (রা) উক্ত শাসকর্তাকে আদেশ দেন যে, সে যেন তাক্ওয়া ও আল্লাহ্র আনুগত্যকে সর্বাগ্রে স্থান দেয় এবং আল্লাহ্র কিতাব কর্তৃক নির্ধারিত ফরয ও রাসূল (স)-এর সুন্নাতসমূহ পালন করে। তিনি তাহাকে এই আদেশও দেন যে, সে যেন আল্লাহ্র পথে মানুষকে সাহায্য দান করিতে অন্তরে ও মুখে সদা সচেষ্ট থাকে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ "নিজের জন্য সৎকার্যের সঞ্চয়কে প্রিয় জানিবে এবং হারাম কার্যাবলী হইতে দূরে থাকিবে।

"স্বীয় অন্তরে দেশের জনসাধারণের জন্য আনুগ্রহ, স্নেহ ও করুণা পয়দা করিবে। হিংস্র পশুর ন্যায় অত্যাচারী হইয়া যাইবে না। তুমি যেরূপে আশা কর যে, আল্লাহ্ তোমার গুনাহ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করুন, সেইরূপে তুমিও ত্রুটি-বিচ্যুতিকারী লোকদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিবে।

"এই কথাও স্মরণ রাখিবে যে, তুমি জনসাধারণের রক্ষক। খলীফা তোমার রক্ষক আর আল্লাহ্ খলীফার বিধাতা। শাসন কর্তৃত্বের মত্ততা ও অহংকার হইতে মুক্ত থাকা কর্তব্য। আপন-পর—সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করিবে এবং জুলুম করা হইতে দূরে থাকিবে। জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবে। দীনের মূল স্তম্ভ, মুসলমানদের মূল জামা'আত ও শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য প্রয়োজনীয় মূল শক্তি হইতেছে জনসাধারণ। অতএব, জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের প্রতিই বিশেষ মনোযোগী হইবে। হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ও পর-নিন্দা চর্চার কারণসমূহ খতম করিয়া দিবে এবং কৃপণ ও লোভাতুর লোকদেরকে স্বীয় উপদেষ্টা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিবে না।

"নেক্কার, বিশ্বাসযোগ্য ও সততাপরায়ণ ব্যক্তিকে উযীর নিযুক্ত করিবে। নেক্কার ও বদ্কার এই দুই শ্রেণীর লোককে সমান মনে করিবে না। এইরূপ করিলে নেক্কার লোকদের হিম্মত কমিয়া যাইবে এবং বদ্কার লোকেরা বদ কাজ করিতে আরও সাহস পাইয়া যাইবে. . .। জনগণের প্রতি কৃপা ও দয়া প্রদর্শন করিয়া তাহাদের আস্থা অর্জন করিতে চেষ্টা করিবে।

"জনসাধারণের মধ্যে কয়েক শ্রেণীর লোক থাকে। এই সকল শ্রেণী সমাজে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া বসবাস করে। তাহারা একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল থাকে। তাহাদের মধ্যে এমন একটি শ্রেণী আছে যাহাদেরকে আল্লাহ্র সৈনিক নামে অভিহিত করা যায়. . . .। এই শ্রেণীটি হইতেছে জনগণের দুর্গ, শাসনকর্তার অলংকার, দীনের শক্তি ও দেশের নিরাপত্তার যিম্মাদার! দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা দ্বারাই শাসনকর্তার অন্তরের স্বস্তি আসে। ইন্সাফ ও ন্যায়বিচার কায়েম করিবার লক্ষ্যে বিচারপতি পদে এইরূপ লোক নিযুক্ত করিবে যাহারা সংকীর্ণ দৃষ্টি, সংকীর্ণচেতা, লোভী বা চাটুকারিতাপ্রিয় নহে।

"জটিল ও কঠিন সমস্যাবলীর সমাধান বাহির করিবার প্রয়োজনে কুরআন ও সুন্নাঃ-র পথ-নির্দেশনা গ্রহণ করিতে হইবে।"

ইসলাম সর্বদা সুষ্ঠুভাবে যিম্মী (অমুসলিম নাগরিক)-দের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে। ইসলাম সকল অবস্থায় তাহাদের জান-মাল ও পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়াছে (ইবনু'ল-কায়্যিম, আহ্কামু আহ্লি'য্-যিম্মা, পৃ. ১৫৭)। আর উক্ত নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ও সুখ-শান্তির বিনিময়ে উহা তাহাদের নিকট হইতে জিয্য়াঃ (দ্র.) নামক সামান্য পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। যদি কোনও বৎসর যিম্মীদের নিকট হইতে সামরিক সেবা গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তবে তাহাদের সেই বৎসরের জিয্য়া মওকুফ করিয়া দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জুর্জানে অধিবাসীদের সহিত মুসলিমগণ নিম্নোক্ত সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন, "তোমাদেরকে হিফাজত করিবার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিলাম। তবে তজ্জন্য শর্ত এই যে, তোমরা উহার বিনিময়ে প্রতি বৎসর নিজেদের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী আমাদের নিকট জিয্য়া অর্পণ করিবে। যদি আমরা তোমাদের নিকট হইতে সামরিক সেবা গ্রহণ করি তবে উহার বিনিময়ে জিয্য়া মওকুফ করিয়া দেওয়া হইবে" (আত্-তাবারী, ১খ, ২৬৬৫)।

য়ারমূক (দ্র.)-এর যুদ্ধে মুসলিমগণ যখন হিম্স-এর যিম্মীদেরকে হিফাজত করিতে অক্ষম হইলেন, তখন তাহারা জিয্য়া-র সমুদয় অর্থ যিম্মীদের নিকট প্রত্যর্পণ করিলেন। হযরত আবূ 'উবায়দা ইবনু'ল-জার্রাহ্ (রা) সিরিয়ার সকল বিজিত অঞ্চলের শাসনকর্তাদিগকে এই মর্মে আদেশ দিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন যে, যিম্মীদের নিকট হইতে যে জিয্য়া উসূল করা হইয়াছে, উহার সমুদয়ই যেন তাহাদের নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হয় (আল-বালাযুরী, পৃ. ১৩৭)। নারী, শিশু, পাদরী, ক্রীতদাস, নিঃস্ব ব্যক্তি, অসহায় ব্যক্তি, দুর্বল ও কর্ম-ক্ষমতাহীন লোক, ইহাদের নিকট হইতে কোনও জিয্য়া লওয়া হইত না এমন কি বায়তু'ল-মালের অর্থ হইতে তাহাদেরকে সাহায্যও প্রদান করা হইত। হযরত 'উমার ফারূক' (রা) স্বীয় খিলাফাতের যুদ্ধে একদা জনৈক বৃদ্ধ য়াহূদী যিম্মীকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া তাহার নিকট তাহার ভিক্ষা করিবার কারণ জানিতে চাহিলেন। বৃদ্ধ য়াহূদী উত্তর দিল যে, বার্ধক্যের কারণে কাজ করিতে অক্ষম হওয়ায় জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও জিয্য়া-র অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশে সে ভিক্ষা করিতেছে। ইহাতে হযরত 'উমার (রা) তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া কিছু অর্থ সাহায্য দিলেন। অতঃপর তিনি যে তাহার জিয্য়া মওকুফ করিয়া দিলেন। শুধু তাহাই নহে, বরং তাহার জন্য ও তাহার ন্যায় দরিদ্র বৃদ্ধদের জন্য বায়তু'ল-মাল হইতে ভাতা নির্ধারিত করিয়া দিলেন (আবূ 'উবায়দ আল-কাসিম ইব্ন সাল্লাম, আল-আমওয়াল, পৃ. ৪৫)। তিনি তাঁহার উক্ত কার্যের সমর্থনে কুরআনের যাকাত সম্পর্কিত আয়াতটি ৯ ঃ ৬৯ পেশ করিলেন। ইমাম আবূ য়ূসুফ-এর মতে উক্ত আয়াতে উল্লিখিত আল-ফুকারা' (الفقراء) শব্দ দ্বারা মুসলিম দরিদ্র

লোকদেরকে ও আল-মাসাকীন (المساكين) শব্দ দ্বারা কি কিতাবীদের দরিদ্রদেরকে বুঝান হইয়াছে (কিতাবু'ল্-খারাজ, পৃ. ৭২)।

ইসলামী সমাজে যিম্মীগণ সর্বদা মুসলমানদের ন্যায় যাবতীয় নাগরিক অধিকার ভোগ করিয়া আসিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একদা হযরত 'আলী (রা)-এর যুদ্ধের যিরা (বর্ম) চুরি হইয়া গেল। যিরা-টি চুরি করিয়াছিল জনৈক খৃস্টান। কিছুদিন পর হযরত 'আলী (রা) তাহার নিকট উহা দেখিয়া চিনিয়া ফেলিলেন। তিনি কাযী শুরায়হ্-এর আদালতে উক্ত খৃস্টানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিলেন। খৃস্টান বিবাদী আদালতের প্রশ্নের উত্তরে বলিল যে, যিরা-টির মালিক সে-ই। কাদী শুরায়হ্ হযরত 'আলী (রা)-র নিকট তাঁহার দাবীর সপক্ষে কোনও প্রমাণ আছে কিনা তাহা তাঁহার নিকট জানিতে চাহিলেন। হযরত 'আলী (রা) কাদীকে নেতিবাচক জওয়াব দিলেন। ইহাতে তিনি খৃস্টান বিবাদীর পক্ষে রায় দিলেন। খৃস্টান লোকটি হযরত 'আলী (রা) ও কাদী শুরায়হ্-এর ন্যায়পরায়ণতায় অভিভূত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করত মন্তব্য করিল : দেশের খলীফা আমাকে তাঁহার অধীনস্থ কাযীর 'আদালতে পেশ করেন আর কাযী খলীফার বিরুদ্ধে আমার পক্ষে রায় দেন, ইহা তো নবী-রাসূলগণের অনুরূপ ন্যায়বিচার (ইব্নু'ল-আছীর, ৩খ, ১৬০)।

পৃথিবীতে অর্থনৈতিক সাম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশে ইসলাম যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, উহা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য বরং উহা অত্যন্ত কল্যাণকরও। মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের উদ্দেশে ইসলাম ধন-সম্পদকে মানব জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপকরণরূপে নির্ধারিত করিয়াছে এবং উহাকে খায়র (কল্যাণ) ও আল্লাহ্র ফাদ্ল (অনুগ্রহ) নামে অভিহিত করিয়াছে এবং উহার উপার্জনকে জরুরী বরং বরকতময় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে (দ্র. ২ : ১৮০ ; ৬২ : ১০)। এতদুদ্দেশে হালাল মাল উপার্জন এবং এই ক্ষেত্রে পরিশ্রমের মূলনীতি কায়েম করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে ইসলাম অর্থ উপার্জনে যাহাতে প্রতারণা, শঠতা, স্বার্থপরতা ও মানব-নিধন তথা মানুষের প্রতি জুলুমের আশ্রয় গ্রহণ করা না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছে।

ইসলাম জীবিকা উপার্জনের কোন জা'ইয পন্থার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— কৃষিকার্য, ব্যবসায়, শিল্প ও কারিগরী কর্ম—উহাদের সবগুলোই ইহাদের স্ব স্ব স্থানে জা'ইয ও বৈধ। তবে তজ্জন্য শর্ত এই যে, উহাদের দ্বারা উপরে বর্ণিত বিভিন্ন অন্যায় ও পাপাচারের সৃষ্টি যেন না হয়।

ইসলাম মানুষের বিভিন্ন আর্থিক প্রয়োজনে ঋণ দানের প্রতি তাকীদ দিয়াছে এবং সুদী কারবারকে হারাম করিয়াছে। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সাধারণ মানব কল্যাণ ও মানবতার প্রতি সহানুভূতির ধারণা বর্তমান রহিয়াছে। ইসলাম বিত্তবানদের জন্য তাহাদের অভাবী বিত্তহীন ভাইদের অন্নবস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করাকে ফরয করিয়া দিয়াছে। কুরআন মাজীদ বিত্তবানদের বিত্তে বিত্তহীনদের জন্য একটি অংশ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। আল-কুরআনে উক্ত হইয়াছেঃ

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ·

"আর তাহাদের ধন-সম্পত্তিতে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক রহিয়াছে" (৫১ : ১৯)।

হাদীছে ও বর্ণিত রহিয়াছে, রাসূল (স) বলিয়াছেন, "যাকাত বিত্তবানদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া যেন বিত্তহীন ও অভাবী লোকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।" অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূল (স) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তির প্রতিবেশী অভুক্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, সে ব্যক্তি মু'মিন নহে" (আল-বুখারী)। অভাবী, ঋণগ্রস্ত লোক ও অর্থাভাবে পতিত বিদেশী মুসাফিরগণও যাহাতে আর্থিক দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তদুদ্দেশে কুরআন মাজীদ তাহাদেরকেও যাকাত ও অন্যান্য সাদাকা-র প্রাপক দরিদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। এতদুদ্দেশে উহা সাদাকা-র বিভিন্ন শ্রেণী প্রবর্তিত করিয়াছে। কুরআন মাজীদ য়ামীন বা কসমের কাফফারা হিসাবে দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য অথবা বস্ত্র প্রদানের (৮ : ৮৯), জিহারের কাফফারা হিসাবে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানোর (৫৮ : ৪) এবং সাওমের ফিদ্য়া হিসাবে মিস্কীনকে খাদ্য খাওয়ানোর (২ : ১৮৪) বিধান নির্ধারিত করিয়াছে। একটি হাদীছে রাসূল (স) বলিয়াছেন, "তিনটি বস্তু সমগ্র মানব জাতির সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে : পানি, চারণ ভূমি ও আগুন" (আবূ দাউদ ও আহ্মাদ)। হাদীছে প্রতিবেশীর প্রয়োজনাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার প্রতি অত্যন্ত তাকীদ দেওয়া হইয়াছে। এই সকল আদেশ ও বিধানের উদ্দেশ্য এই যে, উহা দ্বারা দরিদ্র লোকদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদির অভাব পূরণ হইবে এবং কোনও দরিদ্র ব্যক্তি তাহার জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব রহিয়াছে বলিয়া মনে করিবে না। উক্ত উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করিবার লক্ষ্যে কুরআন মাজীদ একদিকে যেমন আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করিবার প্রতি তাকীদ দিয়াছে, অন্য দিকে তেমনি অর্থ ও ধন-সম্পত্তি সম্বন্ধে লোকদের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করিয়াছে যে, বিশ্বের সকল ধন-সম্পদের মালিক হইতেছেন আল্লাহ। তিনি কাহাকেও অধিক ধন-সম্পদের মালিক বানান এবং কাহাকেও অল্প ধন-সম্পদের মালিক বানান ; একজন মুসলিম উক্ত ধন-সম্পদের শুধু রক্ষক বটে; উহার প্রকৃত মালিক হইতেছেন আল্লাহ (৫৭ : ৭)।

ইসলাম সম্পত্তির উত্তরাধিকারের আইন প্রবর্তিত করিবার মাধ্যমে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পত্তির বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়া এবং যাকাতের বিধান প্রবর্তিত করিবার মাধ্যমে নিঃস্ব ও দরিদ্র লোকদের জন্য আর্থিক সাহায্যের সাধারণ ও ব্যাপক ব্যবস্থা করিয়া নেকী ও পুণ্যের এইরূপ পন্থা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে যাহা ইসলামী সমাজে আর্থিক ভারসাম্য সৃষ্টি করিয়াছে এবং যাহার ফলে কখনও ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে শ্রেণী-সংঘর্ষ তথা শত্রুতা সৃষ্টি হইতে পারে নাই।

ইসলাম কর্তৃক প্রবর্তিত উত্তরাধিকার আইনের আরেকটি মহৎ উদ্দেশ্য এই যে, উহার ফলে ধন-সম্পদ মুষ্টিমের স্বল্প সংখ্যক লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হইবার পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত ইসলাম নির্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ উত্তরাধিকারিগণ ছাড়া সমাজের দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের জন্য মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অংশ বিশেষে মালিক হইবার সুযোগ রাখিয়াছে। যে সকল আত্মীয় ও আপনজন শারী'আতী বিধানে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নহে, মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তাহাদের জন্যও স্বীয় সম্পত্তির একটি অংশ নির্দিষ্ট করিয়া যাইতে পারে। ইসলাম ধনী ব্যক্তিকে স্বীয় সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ কল্যাণমূলক কার্যে দান করিয়া যাইতেও উৎসাহ প্রদান করিয়াছে।

জনগণের খাদ্যের ও অন্যান্য আর্থিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশে ইসলাম যাকাত ও অন্যান্য সাদাকা-র ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ছাড়া আরও কতগুলি পন্থা গ্রহণ করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইব্ন হাযম-এর মতে যদি কখনও এইরূপ দেখা যায় যে, যাকাতের অর্থ সমাজের অভাবগ্রস্ত

লোকদের আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করিতে পারিতেছে না এবং বায়তু'ল-মালের অর্থও উহার পূরণে সমর্থ হইতেছে না, তবে দেশের প্রতিটি শহরের জন্য তাহাদের স্ব স্ব এলাকার দরিদ্র লোকদের খাদ্যের ও অন্যান্য আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করা ফরয হইয়া যায় (আল-মুহাল্লা, ৬খ, ১৫৬)। এতদ্ব্যতীত ইসলাম কর্তৃক প্রবর্তিত বিভিন্ন প্রকারের কল্যাণমূলক ওয়াক্ফের ব্যবস্থাও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পাদন করিবার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা বটে। মসজিদ, মাদরাসা, পুল, রাস্তা ইত্যাদির নির্মাণ ও মেরামত কার্যে, মুসাফিরখানা ও সেনা-ছাউনির নির্মাণকার্যে, এমন কি কৃষকদেরকে বীজ সরবরাহ করিবার ও মূলধন সংগ্রহে ইচ্ছুক দরিদ্র ব্যবসায়ীদেরকে সুদমুক্ত ঋণ প্রদানকার্যে, অন্ধ ও বিকলাঙ্গদেরকে আর্থিক সাহায্য দান ও য়াতীমদের সেবা ও লালন-পালনের কার্যে গবাদি পশুর চিকিৎসার কার্যেও ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির আয় ব্যয়িত হইতে পারে। দামিশ্কে রুগ্ন ও অকর্মণ্য চতুষ্পদ প্রাণীদের আজীবন চরিয়া খাইবার জন্য 'আল-মারজু'ল-আখ্দার' নামক একটি চারণভূমি ওয়াক্ফকৃত ছিল। দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানদের লালন-পালনের ব্যবস্থাকে সহজ করিবার লক্ষ্যে সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যুবী (র) শিশু-সন্তান লালন-পালনকারিণী মাতৃদেরকে বিনামূল্যে দুগ্ধ ও চিনি সরবরাহ করিবার উদ্দেশে দামিশ্কের দুর্গের মধ্যে নুকতাতু'ল-হালীব (দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র) নামক একটি ওয়াক্ফ কেন্দ্র কায়েম করিয়াছিলেন। সেইখান হইতে সপ্তাহে নির্দিষ্ট দুই দিন মাতৃদেরকে বিনা মূল্যে দুগ্ধ ও চিনি সরবরাহ করা হইত। রাসূল (স) গানীমাতের মাল বণ্টন করিবার কালে দরিদ্র ও অভাবী লোকদের প্রতি প্রায়ই লক্ষ্য রাখিতেন এবং এইরূপে তিনি আন্সার ও মুহাজিরদের মধ্যে সামগ্রিক ও সামাজিক ভারসাম্য কায়েম রাখিতে সচেষ্ট থাকিতেন। সারকথা এই যে, ইসলাম সমাজ হইতে দারিদ্র, বুভুক্ষা, অজ্ঞতা, রোগব্যাধি ও আর্থিক দৈন্য দূর করিবার উদ্দেশে বিভিন্নরূপ পন্থা গ্রহণ করিয়াছে।

বর্তমান যুগে আর্থিক সমস্যাবলীর যত প্রকারের সমাধান উপস্থিত করা হইয়াছে, উহাদের সব কয়টিতে শ্রেণী-বিদ্বেষ ও শ্রেণী-শত্রুতা সৃষ্টি হইবার বীজ নিহিত রহিয়াছে। এইরূপ সমাধানে সমাজে শ্রেণী-বিদ্বেষ দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইসলামের যাকাত, বিভিন্ন প্রকারের সাদাকা ও ওয়াক্ফ ব্যবস্থায় উক্ত সমস্যাবলীর সঠিক সমাধান নিহিত (দ্র. যাকাত, সাদাকা ও ওয়াক্ফ)।

এই স্থলে ইসলামের 'ফাক্র' (অভাব, দারিদ্র্য) সম্পর্কিত ধারণার ব্যাখ্যা প্রদানও জরুরী। আল-কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ .

"একমাত্র আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত" (৪৭ ঃ ৩৮)। উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ মানুষের প্রকৃতিগত অভাব ও প্রয়োজনের কারণে তাহাকে 'ফাকীর' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। ফাক্'র শব্দের অর্থ দারিদ্র্য বা সম্পদহীনতা নহে, বরং উহার অর্থ হইতেছে প্রয়োজন ও মুখাপেক্ষিতা। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে গানী বলিয়া মানিয়া লইবার কারণে মুসলিম সমাজে অর্থ পূজা ও পুঁজিবাদের রোগ খুবই কম দেখা গিয়াছে।

ইসলামে সম্পদের ব্যক্তিমালিকানাকে বৈধ বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়াছে। কারণ উহা মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক দাবী। সম্পদের উপর ব্যক্তি-মালিকানা থাকিলে মানুষের মনে কর্মোদ্যম ও কর্মস্পৃহা জাগরিত হয়। কিন্তু যাহাতে ব্যক্তি-মালিকানার সুযোগে ধন-সম্পদ সমাজের মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হইয়া না পড়ে, ইসলামে সেই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। সেই সকল জিনিসের সহিত সর্বসাধারণের স্বার্থ জড়িত ইসলাম উহাদেরকে ব্যক্তিবিশেষের মালিকানার অধীন না করিয়া বরং রাষ্ট্রীয় মালিকানার সেই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, যেই সকল জিনিসের অধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। উহা রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র তথা ন্যায়পন্থী লোকদের শাসন কায়েম করিয়াছে। উহা জমিদারীর প্রাচীন রূপকে–যাহাতে কৃষকের স্থান ক্রীতদাসের ঊর্ধ্বে ছিল না, সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে। উহার ফলে কৃষকগণ স্বাধীন শ্রমজীবী কৃষক সমাজে উন্নীত হইয়াছে। ইসলাম মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুঁজি ও শ্রম বিষয়ে অন্য কোনরূপ চরম অথবা নরম পন্থাও গ্রহণ করে নাই। উহা যবরদস্তিমূলকভাবে কাহারও নিকট হইতে শ্রম আদায় করিবার কোনরূপ বিধানও প্রবর্তন করে নাই।

**ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঃ** ইসলামের অভ্যুদয়ের কালে পৃথিবীর মানুষের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও তামাদ্দুনিক অবস্থা অত্যন্ত অধঃপতিত ছিল। তাওহীদ ও আল্লাহ্ পরস্তির জ্যোতি তখন নক্ষত্র পূজা, মূর্তি পূজা, কাল্পনিক বস্তু ও ধারণার পূজা ও গণনাশাস্ত্রের বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। নৈতিক মূল্যবোধ তখন বিকৃত আবেগানুভূতি দ্বারা পদদলিত ছিল। বিশ্বের জাতিসমূহের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ, যুদ্ধ-বিসম্বাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বর্বরতার কারণে মানব জাতির ঐক্য ও সংহতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তৎকালে প্রচলিত বিশ্বের বড় বড় ধর্ম (হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, অগ্নি-পূজা বা পারসিক ধর্ম, য়াহূদী ধর্ম ও খৃষ্ট ধর্ম) ও বড় বড় সভ্যতা (ভারতীয় সভ্যতা, ইরানী সভ্যতা ও রোমান সভ্যতা) নির্জীব ও নিষ্প্রাণ হইয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় নুবুওয়াতের সূর্য উদিত হইয়া মঙ্গল ও হিদায়াতের আলোক বিচ্ছুরণে অত্যল্প কালের মধ্যে চতুর্দিক আলোকিত করিয়া দিল।

রিসালাতের মূল ফরয হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার বাণীকে লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া। যেমন আল-কুরআনে উক্ত হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ .

"হে রাসূল! তোমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে। তাহা তুমি যথাযথভাবে (লোকদের নিকট) পৌঁছাইয়া দাও" (৫ ঃ ৬৭)। ফলত রাসূল (স) তাঁহার রিসালাত লাভের পর স্বীয় মাক্কী জীবনের তেরটি বৎসর এবং মাদানী জীবনের দশটি বৎসর দীনের এইরূপ তাবলীগ ও প্রচারে ব্যয় করিয়াছেন যে, ইনতিকালের সময়ে তিনি যে ইসলামকে সমগ্র 'আরব উপদ্বীপের অধিবাসিগণ কর্তৃক গৃহীত দেখিয়া গিয়াছেন, শুধু তাহাই নহে, বরং 'আরব উপদ্বীপের বাহিরেও উহাকে প্রচারিত ও গৃহীত দেখিয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু যেহেতু ইসলাম বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট জাতির জন্য নহে বরং উহা যেহেতু সমগ্র মানব জাতির জন্য হিদায়াতের পয়গাম, তাই তিনি স্বীয় জীবদ্দশায়ই প্রতিবেশী সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকটও ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। ইসলাম যে সমগ্র মানব জাতির জন্য হিদায়াতের পয়গাম, কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ..... (১)

"আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠাইয়াছি" (৩৪ ঃ ২৮)।

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (২)

"আমি তো তোমাকে জগতসমূহের প্রতি কেবল রাহমাতরূপেই প্রেরণ করিয়াছি" (২১ ঃ ১০৭)।

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (৩)

"তুমি বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্র রাসূল" (৭ ঃ ১৫৮)।

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ (৪)

"ইহা (আল-কুরআন) সমগ্র মানব জাতির জন্য এক পয়গাম" (১৪ ঃ ৫২)।

اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ (৫)

"ইহা তো সমগ্র বিশ্বের জন্য উপদেশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে" (৩৮ ঃ ৮৭)।

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উক্ত ধারা রাসূল (স)-এর ইনতিকালের পরও অব্যাহত ছিল। আর প্রচারের ক্ষেত্রে অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে অতি অল্পকালের মধ্যে ভূমধ্যসাগরের তীর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হাজার হাজার মাইলব্যাপী সুবিস্তীর্ণ ও সুবিশাল ভূখণ্ডের অধিবাসী, বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মের অনুসারী ও বিভিন্ন প্রাচীনতম সভ্যতার ধারক হইবার দাবীদার বিভিন্ন বর্ণ ও গোত্রের বিভিন্ন জাতি, রাজা-বাদশাসহ বিভিন্ন দার্শনিক, মরুভূমির যাযাবর শ্রেণীর লোক এবং জঙ্গল ও পাহাড়-পর্বতের অতি নিম্নমানের জীবন যাপনকারী মানবগোষ্ঠী ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া এবং ইসলাম প্রচারকারীদের আখলাক ও চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উক্ত বিস্ময়কর সাফল্যের কারণে নিহিত ছিল রাসূল (স)-এর তব্লীগের মূলনীতির সমূহের মধ্যে। আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত হইতে ইসলামের তাব্লীগের তিনটি মূলনীতি জানা যায় ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ وَالْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ

"তুমি (লোকদেরকে) হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথে ডাক এবং উহাদের সহিত সদ্ভাবে আলোচনা কর" (১৬ ঃ ১২৫)। উক্ত আয়াত হইতে জানা যায় যে, ইসলামের তাব্লীগে তিনটি উপায়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে ঃ (১) বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্ম জ্ঞান; (২) সদুপদেশ ও (৩) উত্তম পন্থায় আলোচনা।

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত তিনটি তাবলীগী উসূলের বাস্তবায়নের উদ্দেশে রাসূল (স) নিম্নোক্ত সাতটি মূলনীতি নির্ধারণ করিয়াছেন ঃ

(১) নম্রতাপূর্ণ ও বাৎসল্যময় ভাষা ঃ দা'ওয়াত ও তাব্লীগের কার্যে বিনয়, নম্রতা ও স্নেহ-ভালবাসাকে স্বীয় চরিত্রের ভূষণ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ কঠোরতা ও কর্কশতা অন্যের অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

(২) সহজকরণ ও সুসংবাদ প্রদান ঃ দা'ওয়াত ও তাব্লীগের কার্যে দীনের বৈধ, সহজ ও আসান দিকগুলি লোকদের সম্মুখে উপস্থিত করা বাঞ্ছনীয়। দীনকে কঠিন ও অসাধ্য বিষয়রূপে লোকদের সম্মুখে হাযির করা উচিত নহে। আল্লাহ্র দয়া, কৃপা ও রাহমাতের কথা শুনাইয়া লোকদের অন্তরকে সর্বদা আশান্বিত ও আনন্দিত রাখিতে হইবে। কথায় কথায় আল্লাহ্র গযব ও 'আযাবের কথা শুনাইয়া তাহাদের আত্মাকে নিরাশ, বিমর্ষ ও ভীতসন্ত্রস্ত রাখা সমীচীন নহে। রাসূল (স) বলিয়াছেন ঃ

يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا ·

"তোমরা লোকদেরকে সহজ বিধান দিও; কঠিন বিধান দিও না। আর তোমরা লোকদেরকে সুসংবাদ শুনাইও এবং তাহাদেরকে (ভীতির কথা শুনাইয়া) ঘৃণাপরায়ণ বানাইয়া দিও না" (আল-বুখারী, ২খ., বা'ছু' মু'আয ইলা'ল-য়ামান)।

(৩) ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষাকে লোকদের সম্মুখে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপিতকরণ ঃ ইসলামের দা'ওয়াত ও তাব্লীগকালে অমুসলিমদের উপর একত্রে ও এক সঙ্গে শারী'আতের যাবতীয় বিধি-বিধানের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া ঠিক নহে, বরং তাহাদের সম্মুখে ইসলামের বিধি-বিধানকে পর্যায়ক্রমে একটির পর একটি করিয়া পেশ করিতে হইবে। যেমন প্রথমে তাওহীদ ও রিসালাতের দা'ওয়াত, অতঃপর বিভিন্ন 'ইবাদাতের দা'ওয়াত এবং সর্বশেষে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগযোগ্য আর্থিক ও অন্যান্য লেনদেন বিষয়ক বিধি-বিধান।

(৪) অমুসলিমদের মনস্তুষ্টি সাধন ঃ ইসলামের দা'ওয়াত ও তাব্লীগে অমুসলিমদের প্রতি স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা দেখাইয়া এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের অন্তরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে। ইসলামের মুবাল্লিগ তাহাদের প্রতি এইরূপ মহানুভবতাপূর্ণ আচরণ করিলে উহাতে তাহাদের অন্তর অভিভূত হইবে এবং তাহাদের অন্তর হইতে হঠকারিতা ও সত্যবিদ্বেষ দূরীভূত হইবে।

(৫) বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিপূর্ণ পন্থায় দা'ওয়াত পেশ করা ঃ অমুসলিমদের নিকট ইসলামকে পেশ করিবার কালে তাহাদেরকে নিজেদের বুদ্ধি, বিবেক ও চিন্তাশক্তিকে প্রয়োগ করিতে আহ্বান জানান অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহ্ তা 'আলার অস্তিত্ব, তাওহীদ, রিসালাত, কিয়ামত, ভাল-মন্দ কার্যের প্রতিফল প্রাপ্তি, 'ইবাদাত, সালাত, সাওম, হাজ্জ, আখলাক ইত্যাদি শিক্ষা দিবার কালে উহাদের সত্যতার সপক্ষে বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তি পেশ করা এবং প্রতিটি বিষয়ের পশ্চাতে নিহিত কল্যাণ ও হিকমাতকে প্রকাশ করা জরুরী। স্বয়ং আল্লাহ্ আল-কুরআনে বিভিন্ন স্থানে যুক্তিবাদী হইবার জন্য মানুষকে উপদেশ দিয়াছেন।

(৬) বল প্রয়োগ হইতে বিরত থাকা ঃ ধর্মের ব্যাপারে যবরদস্তী ও শক্তিপ্রয়োগ হইতে দূরে থাকা অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন "দীন সম্পর্কে যবরদস্তী নাই" (২ ঃ ২৫৬)। ইসলামে ধর্মের প্রধান অংশ ঈমান (দ্র.)। ঈমান বিশ্বাসের নাম। বলা অনাবশ্যক যে, পৃথিবীর কোনও শক্তিই যবরদস্তীমূলকভাবে কাহারও অন্তরে সামান্যতম বিশ্বাসও উৎপন্ন করিয়া দিতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ·

"আর তুমি বল, তোমাদের পরওয়ারদিগারের নিকট হইতে সত্য আসিয়াছে। অতঃপর যাহার ইচ্ছা সে উহাকে গ্রহণকরুক আর যাহার ইচ্ছা সে উহাকে প্রত্যাখ্যান করুক" (১৮ ঃ ২৯)। এই কথা সত্য যে, ইসলাম সত্য ও ন্যায়কে সহায়তা দান করিতে এবং অসত্য ও অন্যায়কে পরাজিত করিবার উদ্দেশে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছে। কিন্তু উহা হইতে এই অর্থ বাহির করা ঠিক নহে যে, ইসলামে জিহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে তরবারির শক্তিতে লোকদের মধ্যে ইসলামকে ছড়াইয়া দেওয়া। আল-কুরআনের একটি আয়াতেও কোনও কাফিরকে যবরদস্তীমূলকভাবে মুসলিম বানাইবার আদেশ প্রদান করা হয় নাই। এইরূপে রাসূল (স)-এর পবিত্র

জীবনীতে এইরূপ একটি ঘটনাও দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাতে তিনি কাহাকেও যবরদস্তীমূলকভাবে মুসলিম বানাইয়াছেন। আল-কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হইয়াছে ঃ

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ .

"আর (যুদ্ধ চলিবার কালে) কোনও মুশ্‌রিক তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তুমি তাহাকে আশ্রয় দিবে যাহাতে সে আল্লাহ্‌র কালাম শুনিতে পায়। অতঃপর তাহাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবে, কারণ তাহারা অজ্ঞ লোক" (৯ ঃ ৬)। আল্লাহ্‌র কালাম শুনিয়া আশ্রিত ব্যক্তি উহা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইবে এবং মুসলিমদের সদ্ব্যবহার ও সদাচার তাহার অন্তর হইতে সত্য-বিদ্বেষ ও হঠকারিতাকে দূর করিয়া দিবে। সারকথা এই যে, ইসলামে তরবারি কাহারও ধর্ম পরিবর্তনে কোনরূপ ভূমিকা পালন করিতে পারে না।

(৭) মুবাল্লিগদের তা'লীম ও তারবিয়াত ঃ ইসলামী তাব্‌লীগের প্রধানতম শিক্ষণীয় বিষয় হইতেছে কুরআন মাজীদ। তাই রাসূল (স)-এর যুগে মুবাল্লিগদেরকে কুরআনের সূরাসমূহ শিখান হইত, তাহাদেরকে লেখাপড়া শিখান হইত, তাঁহারা দিবারাত্র রাসূল (স)-এর বাণীসমূহ শুনিবার সুযোগ লাভ করিতেন এবং রাসূল (স)-এর মহান ও পবিত্র আখলাক দ্বারা প্রভাবিত হইতেন। রাসূল (স) ও অন্যান্য মুবাল্লিগ ইসলামের তাব্‌লীগে লোকদেরকে কুরআনের সূরাসমূহ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতেন। মুবাল্লিগগণ রাসূল (স)-এর মহান আদর্শ চরিত্রের প্রতি লোকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেন। ইসলামের সহজ সরল শিক্ষা এবং রাসূল (স) ও অন্যান্য মুবাল্লিগের সৎ কর্মময় জীবন এইরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী ক্ষমতার অধিকারী ছিল যে, উহার ফলে সত্যের বাণী লোকদের অন্তরে দৃঢ়রূপে আসন করিয়া লইত। মহৎ চরিত্রের উক্ত অস্ত্র এমনই অব্যর্থ ও শক্তিশালী ছিল যে, উহার প্রয়োগ কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই।

ইসলামের ব্যাপক ও বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসার লাভের কারণসমূহ সম্বন্ধে গভীরভাবে গবেষণা করিলে দেখা যায় যে, উহার প্রচার ও প্রসার লাভের প্রধানতম কারণ ছিল আল-কুরআনের অলৌকিক ক্ষমতা ও প্রভাব। 'আকীদা, 'ইবাদাত, আখলাক– মোটকথা প্রতিটি বিষয়কে কুরআন এইরূপ শক্তিশালী পদ্ধতিতে লোকদের সম্মুখে পেশ করিয়াছে যে, উহা সত্য-প্রেমিক অন্তরে সহজেই আসন করিয়া লয়। কুরআনের অলৌকিক ক্ষমতা যে পরিমাণে নিহিত রহিয়াছে উহার বাহ্য ভাষা ও রচনাশৈলীতে তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে নিহিত রহিয়াছে উহার অর্থ ও তাৎপর্যে।

ইসলামের ব্যাপক ও বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসার লাভের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে, ইসলামে ধর্ম কোনও বিশেষ শ্রেণী বা দলের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে, বরং ইসলামে প্রত্যেক মুসলিমকে দাওয়াত ও বাস্তব জীবনের কর্মের মাধ্যমে তাব্‌লীগের দায়িত্ব পালন করিতে আদেশ করা হইয়াছে। এই কারণেই দেখা যায় যে, মুসলমান যেখানেই গিয়াছে সেখানেই সত্যের পয়গামকে নিজের সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং অপরিচিত দেশে উহার বীজ বপন করিয়া চলিয়াছে। 'আলিমগণ, ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ, সূফীগণ এবং ইসলামের জন্য আত্মনিবেদিত ফাকীরগণ— তাঁহাদের তো কাজই এই যে, ইঁহারা লোকদেরকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া, ওয়া'জ ও নাসীহাত শুনাইয়া, তাহাদের নিকট ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়া ও শিরকের দোষ-ত্রুটি তুলিয়া ধরিয়া এবং নিজেদের জীবনের নেক নমুনা তাহাদের সামনে পেশ করিয়া তাহাদেরকে গোমরাহীর পথ হইতে বাহিরে আনিবেন, এমন কি ব্যবসায়ী ও পর্যটকগণও অতীতে উক্ত দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ও সাফল্যের সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতে মুসলিম ব্যবসায়ী ও পর্যটকগণের উক্ত দায়িত্ব পালনের ইতিহাস এই কথার সত্যতার প্রমাণ বহন করে।

ব্যাপকভাবে পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইহাও ছিল যে, ইসলাম মানুষকে বিচার-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি প্রয়োগের আহ্বান জানায়। বস্তুত কোনও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি যদি সত্যবিদ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া ইসলাম ও উহার শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করে তবে উহার সত্যতাকে স্বীকার না করিয়া পারে না। ইতিহাসে আমরা এইরূপ অনেক ঘটনার বর্ণনা দেখিতে পাই–যাহাতে অমুসলিম শাসনকর্তা ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ চিন্তা ও গবেষণা করিয়া নিজ উদ্যোগে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

ইসলামের ব্যাপক ও বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসার লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইতেছে উহার অতুলনীয় সাম্যনীতি। এই সাম্যনীতির শিক্ষা এই যে, কোনও অনারবের উপর কোনও আরবের কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব নাই। ইসলামের শিক্ষা এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি সর্বাধিক অনুগত, সে-ই (তাঁহার নিকট) সর্বাধিক সম্মানিত। শুধু রাসূল (স) ও খুলাফা-ই রাশিদীনের যুগের ইতিহাস নহে, বরং ইসলামের পূর্ণ ইতিহাসই মুসলমানগণ কর্তৃক উক্ত সাম্যনীতি অনুসৃত হইবার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

ইসলামের ব্যাপক ও বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসার লাভের ক্ষেত্রে ইসলামী তাহ্‌যীব-তামাদ্দুন ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির অবদানের গুরুত্বও কম ছিল না। মুসলমানগণ যে দেশেই বিজয়ী বেশে প্রবেশ করিয়াছে সেই দেশের অধিবাসী তাহাদের উন্নত তাহ্‌যীব-তামাদ্দুন, আচার-ব্যবহার ও চাল-চলন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে, এমন কি প্রতিবেশী দেশসমূহেরও জনসাধারণ তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং বিজয়ী মুসলিমদের সহিত তাহাদের সম্পর্ক ও মেলামেশা যতই গভীর হইয়াছে, তাহারা ততই তাহাদের তাহ্‌যীব-তামাদ্দুন ও আচার-ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। অবশেষে উহাই বহু লোকের ইসলাম গ্রহণের কারণ হইয়াছে (পৃথিবীর কোন্ দেশে কীভাবে ইসলাম ছড়াইয়া পড়িয়াছে, উহার বিশদ বিবরণ জানিবার জন্য দেখুন ঃ Arnold, The preaching of Islam, এতদ্ব্যতীত 'মুসলিম' নিবন্ধও দ্র.)।

মানব জাতির ধর্মীয় চিন্তায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইসলামের প্রভাবঃ ইসলামের নিম্নোক্ত তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ 'আকীদা মানব সভ্যতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে ঃ (১) তাওহীদের 'আকীদা, (২) বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব তথা সাম্যের 'আকীদা ও (৩) বাস্তব কর্মভিত্তিক ও যুক্তিসঙ্গত জীবনবোধ।

ইসলামের তাওহীদের 'আকীদা মূর্তি পূজা, নক্ষত্র পূজা ও অন্যান্য যাবতীয় কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন বাতিল 'আকীদা-বিশ্বাসকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। এইরূপে তাওহীদের 'আকীদা-র কল্যাণে মানুষের অন্তর হইতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি তথা বাতিল মা'বূদের ভয় দূর হওয়ায় সৃষ্টিকে জয় করিয়া উহাকে নিজের সেবায় নিয়োজিত করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। পৃথিবীর সকল ধর্মই কোন না কোনরূপে ইসলামী তাওহীদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহে পরিবর্তন ঘটাইয়াছে।

মার্টিন লুথার কর্তৃক পরিচালিত খৃস্ট ধর্মের সংস্কার-আন্দোলন ইসলামের প্রভাবে প্রভাবিত হইবার বিষয়টি একটি প্রমাণিত সত্য। অনুরূপভাবে টমাস একুইন্যাস কর্তৃক পরিচালিত খৃষ্ট ধর্মের চিন্তা-সংস্কারের উপরও ইসলামের প্রভাব থাকিবার কথা অস্বীকার করা যায় না। ইসলামের সাম্য ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের 'আকীদা 'আরবের পার্শ্ববর্তী অনারব দেশসমূহের লোকদেরকে ছাড়া য়ূরোপ, ভারতীয় উপমহাদেশ, জাভা দ্বীপ, সুমাত্রা দ্বীপ ও চীনের লোকদেরকেও প্রভাবিত করিয়াছে। ভারতীয় উপমহাদেশে বর্ণভেদ প্রথা বদ্ধমূল ধর্মীয় বিশ্বাসরূপে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তথায় যতগুলি সংস্কার আন্দোলন জন্মলাভ করিয়াছে, উহাদের সবই যে ইসলামের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে তাহা তো একটি সুস্পষ্ট ও প্রমাণিত সত্য।

ভারতীয় উপমহাদেশে অংশীবাদ, মূর্তি পূজা ও বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে যে সকল আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছে, যেমন কবীর কর্তৃক পরিচালিত ভক্তিবাদ আন্দোলন এবং গুরু নানক কর্তৃক পরিচালিত শিখপন্থী আন্দোলন—উহাদের সবই ছিল ইসলামী 'আকীদা-বিশ্বাসের সহিত পরিচিত হইবারই পরিণতি। হিন্দু দার্শনিক ও চিন্তাবিদ, যেমন রামানুজ (মৃ. আনু. ১১৩৭ খৃ.), শ্রীচৈতন্য দেব (মৃ. ১৫৩৩ খৃ.), গুরু নানক (মৃ. আনু. ১৫৩৯ খৃ.), রাজা রামমোহন রায় (মৃ. ১৮৩৩ খৃ.) প্রমুখ ইসলামী 'আকীদা-বিশ্বাসের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। এইরূপে স্বামী দয়ানন্দ (মৃ. ১৮৮৩ খৃ.)-ও ইসলামের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া আর্য সমাজের সংস্কার-আন্দোলনে তাওহীদের আকিদাকে প্রচলিত করিয়াছেন।

ইসলাম জীবন সম্পর্কিত যে ধারণা পেশ করিয়াছে উহা একাধারে যুক্তিসঙ্গত, কর্মবাদী, নীতিজ্ঞানপূর্ণ ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বটে। উহাতে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী ও মানব-প্রকৃতির দাবীসমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا .

"আল্লাহ্ কোনও মানুষকে তাহার ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন দায়িত্ব দেন না" (২ : ২৮৬)। আল-কুরআনের এই আয়াত উক্ত বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত করে। এইরূপে :

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ .

"হে আমাদের প্রতিপালক! যে বোঝা বহন করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, তুমি আমাদের উপর সেই বোঝা চাপাইয়া দিও না" (২ : ২৮৬) এই আয়াতও উক্ত বক্তব্যের সত্যতার সাক্ষ্য।

ইসলাম সত্য ধর্ম, তাই উহাতে সুন্নাতুল্লাহ্ বা আল্লাহর নিয়ম ও আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী সংরক্ষণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। উহাতে এইরূপ কোনও বিধান নাই যাহা সুন্নাতুল্লাহ্-এর অথবা

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا .

"আল্লাহ্র ফিত্রাত যাহার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন" (৩০ : ৩০)-এর বিরোধী।

উপরিউক্ত কারণে ইসলাম একটি যুক্তিবাদী, কর্মবাদী ও প্রগতিবাদী জীবন-ব্যবস্থা। উহা মানুষকে তাহার জীবনকে পূর্ণরূপে কাজে লাগাইতে এবং উহা দ্বারা পূর্ণরূপে উপকৃত হইতে উৎসাহ দিয়াছে। উহা মানুষকে আল্লাহ্র নি'মাতসমূহের জন্য তাহার প্রতি শুকরগুযার হইতে আদেশ দিয়াছে। এই কারণে উহা তাহাকে একদিকে যেমন সন্ন্যাসীসুলভ বৈরাগ্যবাদী আত্মহননের জীবন যাপন করিতে নিষেধ করিয়াছে, অন্য দিকে তেমনি তাহাকে অপচয়পূর্ণ ও বিলাসিতাপূর্ণ জীবন যাপন করিতেও নিষেধ করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ .

"তোমরা আল্লাহ্র রিয্ক হইতে খাও এবং পান কর এবং দুষ্কৃতিকারীরূপে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না" (২ : ৬০)। তিনি আরও বলিতেছেন :

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ .

"তোমরা খাও এবং পান কর; কিন্তু অপব্যয় ও অপচয় করিও না" (৭ : ৩১)।

অতীতে যে সকল জাতি ইসলামের সহিত পরিচিত হইয়াছে তাহারা উহার উপরিউক্ত সৌন্দর্যাবলীর কারণে উহাকে মানব-প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যশীল পাইয়া উহার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইসলাম একদিকে মানুষকে সরল পথে (সিরাতু'ল-মুস্তাকীমে) চলিতে পুনঃপুন আদেশ দিয়াছে, অন্যদিকে তাহাকে মধ্যপন্থা অনুসরণ করিতেও নির্দেশ দিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ .

"আর এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মাহ্রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি যাহাতে তোমরা মানব জাতির অন্য সাক্ষীস্বরূপ হইতে পার এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হইবে" (২ : ১৪৩)। বস্তুত ইসলামের উক্ত শিক্ষাসমূহের কারণে প্রাচীন ও আধুনিক— উভয় যুগের মানুষ-স্বীকৃতির সহিতই হউক অথবা বিনা স্বীকৃতিতেই হউক— তাহাদের বাস্তব জীবনে ইসলাম দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে।

ইহা সুবিদিত যে, অমুসলিম জগত ইসলাম দ্বারা কয়েকভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। সেই সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। যেমন, ধর্মীয়, নৈতিক, তাহ্যীব-তামাদ্দুন, রাষ্ট্রনীতি, মানবিক পারস্পরিক সম্পর্ক, সমগ্র মানব জাতির ব্যাপক কল্যাণ সাধন ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রভাব। শেষোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে বলা যায় যে, ইসলাম অতি সুন্দরভাবে ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে, যাহার ফলে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে উদারতা ও ব্যাপকতা সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বরং তাহারা পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইভাবে মানুষের মধ্যে যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতা, মানসিক সংকীর্ণতাবোধ, নানারূপ বিবাদ ও ভেদবুদ্ধি চলিয়া আসিতেছিল, ইসলামের উক্ত নীতির কারণে তাহা দূরীভূত হইয়াছে। কোন ব্যক্তি কি 'আকীদা পোষণ করে অথবা সে কোন্ বংশ হইতে উদ্ভূত অথবা সমাজে তাহার কিরূপ মর্যাদা, ইসলাম এই সকল বিষয় না দেখিয়া বরং সকল মানুষকে তাহার নেতৃত্বে পরিচালিত তাহ্যীব-তামাদ্দুনের বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ডে শরীক করিয়া লইয়াছে। উহার ফলে বহু শতাব্দীর পশ্চাদপদ জাতিসমূহ এক নব জীবন লাভ করে। এতদ্ব্যতীত সেই সকল জাতির মধ্যেও এক নব জীবনের সঞ্চার হয় এবং অগ্রগতি লাভের নব অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়–যাহারা ধর্মীয়, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়া নিজদেরকে সমগ্র বিশ্বের নেতা বলিয়া দাবী করা সত্ত্বেও অবক্ষয় ও অধঃপতনের অতলতলে তলাইয়া গিয়াছিল।

প্রাচ্যবিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিত সারটন-এর মতানুসারে য়াহূদী ও খৃস্টান— উভয় জাতির কালাম শাস্ত্র (দ্র.) ইসলামী কালামশাস্ত্রের প্রতিধ্বনি বৈ অন্য

কিছু নহে। এই স্থলে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, খৃস্টান জগৎ য়াহূদীদের মাধ্যমেও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন কর্তৃক নানাভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে, বিশেষত যেই সময়ে হযরত 'আলী (রা) ব্যবিলনে অবস্থিত সূরা একাডেমীকে য়াহূদীদের প্রধান নেতার কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত করেন, তখন য়াহূদী জাতির জ্ঞান-চর্চায় নব জীবনের সঞ্চার হয়। য়াহূদী কালামশাস্ত্রবিদগণ ইসলামী অধিবিদ্যা দ্বারা এত অধিক প্রভাবিত হন যে, তাঁহারা তৎকালে ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থাবলী হিব্রু ভাষার পরিবর্তে 'আরবী ভাষায় রচনা করা শুরু করেন। মূসা ইব্ন মায়মূন আল-কুর্তুবী আল-ইসরা'ঈলী নামক জনৈক অধিবিদ্যাবিদ য়াহূদী পণ্ডিত মুসলিম 'আলিমগণের, বিশেষত ইমাম গাযালী (র)-র নিকট হইতে তত্ত্বাবলী গ্রহণ করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত য়াহূদী পণ্ডিত দ্বারা য়াহূদী অধিবিদ্যা চরম বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রেও কুরআন মাজীদ সাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। গ্রীকদের অত্যন্ত প্রশংসনীয় গুণ এই ছিল যে, তাহারা সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা, গবেষণা ও যুক্তিভিত্তিক পর্যালোচনার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে আল-কুরআনে পুনঃপুন পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও পর্যালোচনা করিবার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। এইরূপে উহা বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সেই আন্দোলন ও প্রচেষ্টাকে উজ্জীবিত করিয়াছে, উহারই ভিত্তিতে জগতে বিজ্ঞান জন্মলাভ করিয়াছে।

আল্লাহ্ আল-কুরআনের তাঁহার আয়াতসমূহ বা নিদর্শনাবলীকে পর্যবেক্ষণ ও উহাদের হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবার যে আদেশ দিয়াছেন, মুসলিমগণ উহা পালন করিবার মাধ্যমে পদার্থবিদ্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিদ্যার উদ্ভব ঘটাইয়াছেন। আল-কুরআনের বর্ণনানুসারে প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু আল্লাহ্‌র এককেটি আয়াত বা নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ .

"তবে কি তাহারা উটের প্রতি তাকাইয়া দেখে না কিভাবে উহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে ? এবং আকাশের দিকে, কিভাবে উহাকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হইয়াছে ? এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে উহাদেরকে স্থাপন করা হইয়াছে ? এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে উহাকে সমতল করা হইয়াছে ?" ( ৮৮ ঃ ১৭-২০)। উক্ত আয়াতসমূহে যে বিশ্লেষণমূলক বর্ণনা পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে, উহা দ্বারা আমরা পদার্থবিদ্যার জ্ঞানের সংগে সংগে পদার্থের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ধর্মের জ্ঞানও লাভ করি। বস্তুত ইহা ছিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবলী ও তথ্যাবলীর উদ্‌ঘাটনের প্রাথমিক পদক্ষেপ। আল-কুরআনে বেশ কিছু প্রাচীন জাতির ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। যেমন, নূহে'র জাতি, 'আাদ ও ছামূদ জাতি, রাস্স-এর অধিবাসী, আল-আয়কা-এর অধিবাসী, তুব্বা' জাতি ও লূতের জাতি। উহার ফলে আমাদের সম্মুখে ইতিহাসবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা ও ভূগোলশাস্ত্রের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, মুসলিমগণ উক্ত বিষয়সমূহে বিশ্ববাসীকে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন।

রাসূল কারীম (স)-এর হাদীছের ও তাঁহার পবিত্র জীবনীর আলোচনা ও পর্যালোচনা উপলক্ষে জীবনচরিত রচনা, কুলজীবিদ্যা, জীবনচরিত সম্পর্কিত মনোবিজ্ঞান, ভূগোলশাস্ত্র ও ইতিহাসশাস্ত্র উন্নতি লাভ করিয়াছে। বিশ্ব-প্রকৃতিকে কাজে লাগাইবার এবং উহাকে মানব জাতির সেবায় নিয়োজিত করিবার প্রেরণাও আল-কুরআন হইতে আসিয়াছে। আকাশ ও পৃথিবী, সূর্য-চন্দ্র, দিবারাত্রি, নদী ও সমুদ্র, ফল-ফসলাদি, জীবজন্তু—এক কথায় সৃষ্টির সকল বস্তু মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। আল-কুরআনের দীপ্তিমান ঘোষণা ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا .

"তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, (২ ঃ ২৯)। আরও এই মর্মের বহু আয়াত রহিয়াছে (দ্র. ১৪ ঃ ৩২, ৩৩ ; ৪৫ ঃ ১২, ১৩ ইত্যাদি)। অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে সম্বোধন করত বলিয়াছেন ঃ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ "আর তোমরাই হইতেছ বিজয়ী, (৩ ঃ ১৩৯)। এইরূপে অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ .

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে" (৩ ঃ ১১০)। আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত ও তদ্রূপ উদ্দীপনাময় অন্যান্য ঘোষণা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে জল-স্থল ও মহাকাশ বিজয়ের জন্য মুসলিমদের প্রতি ও তাহাদের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। মুসলিমগণ অতীতে এই শিক্ষার প্রভাবে উক্ত বিজয় লাভের প্রচেষ্টার সূচনা করিয়াছিলেন এবং বর্তমানে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ উহার উন্নতি বিধানে তৎপর ও সচেষ্ট রহিয়াছে।

আধুনিক দর্শনও ইসলামের প্রভাবিত। ইসলাম প্রথমে গ্রীক দর্শনের যাদুর জাল ছিন্ন করে। উল্লেখ্য যে, গ্রীক দর্শনের পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োজিত ছিল নূতন নূতন সমস্যা ও নূতন নূতন মতবাদ সৃষ্টি করিবার কাজে। ইসলাম অগ্নি উপাসকদের দ্বিত্ববাদের অসারতা প্রমাণ করে। এতদ্ব্যতীত বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শন কতকটা অনুমান ও ধারণা এবং অমূর্ত বিষয়ের সহিত সম্পৃক্ত বিধায় ইসলাম উহারও প্রতিবাদ করে এবং উহার বিপরীতে দর্শনকে মূর্ত ও বাস্তব বিষয়ের সহিত সম্পৃক্ত করিয়া দেয়। পাশ্চাত্য দার্শনিক ডেকার্টে (Descartes) কর্তৃক অনুসৃত প্রাথমিক সংশয়মূলক বিচার-পদ্ধতি, যাহা হইতে আধুনিক দর্শন সূচিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, আল-গাযালী (র) কর্তৃক প্রচারিত প্রাথমিক সংশয়বাদ-এরই প্রতিধ্বনি মাত্র। এইরূপে লাইব্‌নিয (Leibnitz) কর্তৃক প্রচারিত চিৎ পরমাণুবাদ (Monadology) মুসলিম দার্শনিক ফিরকা আশ'আরিয়া (اشعرية) কর্তৃক প্রচারিত মতবাদের সহিত সামঞ্জস্যশীল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক দিক দিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনও উহার বিভিন্ন মতবাদ [যেমন কান্ট (Kant)-এর বিচারমূলক বুদ্ধিবাদ] ইসলামী দর্শন ও উহার বিভিন্ন মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। মুসলিম ইতিহাস-দর্শনবিদ ইব্ন খালদূন অবচেতন মনে অবস্থিত বিষয়াবলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং মুসলিম দার্শনিক ইব্ন সীনা মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের চিন্তাধারা শুধু মনোবিজ্ঞান চর্চায় নহে, বরং ধর্মীয় বিষয়াবলীর ও তাসাওউফ-এর চর্চায়ও এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছে। এইরূপে রাজনীতি, সমাজনীতি ও পৌরবিজ্ঞানে মুসলিম মনীষিগণ (যেমন আল-ফারাবী ও ইব্ন খাল্দূন)-এর গবেষণা ও মতবাদসমূহ, সমাজ ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তাধারাকে গ্রীক চিন্তাবিদগণ যে স্তরে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে উন্নততর স্তরে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত উক্ত চিন্তাধারা এবং তৎসহ ইসলামী সমাজের গণতান্ত্রিক ভাবধারা ন্যায়পরায়ণতা, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বাস্তব দৃষ্টান্তসমূহ

স্থাপন করিয়াছে অতীতে। ফলে ইহার প্রভাবে অমুসলিম সমাজ হইতেও রাজনৈতিক ও সামাজিক জুলুম-অত্যাচার নির্মূল হইয়াছে। এই কথা সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে, য়ূরোপে ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের যে আন্দোলন জন্ম লাভ করিয়াছে, উহার পশ্চাতে ইসলামের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব সক্রিয় ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রুশো (Rousseau)-এর সামাজিক চুক্তি মতবাদ আমাদেরকে সুন্নী মুসলিমদের খিলাফাত মতবাদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, যাহার ভিত্তি জনগণ ও শাসনকর্তার পারস্পরিক সম্মতি। এই প্রসঙ্গে আরও জানার জন্য কমরেড এম. এন. রায় রচিত Historical Role of Islam ও ক্রিস্টোফার কডভেল রচিত Studies in a Dying Culture গ্রন্থ দুইটি অধ্যয়ন করা যায়। আধুনিক সাহিত্য ক্ষেত্রেও ইসলামের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

কোনও জাতির তাহ্যীব-তামাদ্দুন ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি অন্য কোনও জাতির তাহ্যীব-তামাদ্দুন ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি হইতে যে প্রভাব গ্রহণ করে, উহা দুই প্রকারে হইতে পারে ঃ (১) তত্ত্ব ও তথ্যাবলীর প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে এবং ভাব বিনিময় ও চিন্তাধারার আদান-প্রদানের মাধ্যমে এবং (২) বাস্তব আদর্শ ও কর্ম পদ্ধতির অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, মধ্যযুগে যে গুণটি বীরত্ব-সাহসিকতা (Chivalry) নামে পরিচিত ছিল অর্থাৎ যাহা দ্বারা বুঝান হইত কর্তব্য সম্পাদন ও ভদ্রতা প্রকাশ, বিশেষত যুদ্ধক্ষেত্রে এবং বিনোদন আসরে নারীর প্রতি যুবকদের শালীন ও শিষ্টতাপূর্ণ আচরণে—উহা 'আরবদের সহিত খৃষ্টান জগতের মেলামেশারই ফল ছিল। বর্তমান যুগে আমরা যে সভ্যতাকে পাশ্চাত্য সভ্যতা নামে অভিহিত করিয়া থাকি এবং য়ূরোপে রেনেসাঁ যুগের প্রারম্ভে যে সভ্যতা সূচিত হইয়াছে, উহা প্রকৃতপক্ষে নৈতিক ও সামাজিক—উভয় দিক দিয়াই ইসলামী তাহ্যীব-তামাদ্দুনের নিকট ঋণী। প্রাচ্যবিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ব্রিফল্ট এই বিষয়ে বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। ইসলামী প্রভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রভাবিত হইবার বিষয়কে এখন আর অস্বীকার করা যায় না।

ইসলামী তাহ্যীব-তামাদ্দুন গোড়া হইতেই বিশ্বজনীন ও আন্তর্জাতিক রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে। উহা নির্দিষ্ট কোনও মানবগোষ্ঠী অথবা নির্দিষ্ট কোনও ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। সমগ্র বিশ্ব মানবতা উহা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে এবং উহার প্রভাব প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সর্বত্র সুপরিস্ফুট রহিয়াছে। ইসলাম ব্যক্তিকে অহেতুক বাধ্যবাধকতা, অনৈক্য, হিংসা-বিদ্বেষ, কুসংস্কার ও সন্দেহবাদিতা হইতে এবং সমাজকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক উৎপীড়ন হইতে মুক্ত করিয়াছে। উহার ফলে মানব জাতির চিন্তাধারায় নূতন প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে এবং তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, পার্থিব জীবনের উপাদান-উপকরণের অনুসন্ধান ও অর্জনের জন্য এই জগত একটি বিশাল কর্মক্ষেত্র। ইসলাম এই কর্মক্ষেত্রে সঠিক পথ-নির্দেশনার লক্ষ্যে সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত এক জীবনব্যবস্থা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। অতএব, ইহা বলা সঙ্গত যে, ইসলামের আবেদন ও আহ্বান অতীতেও যেইরূপ মানব সভ্যতাকে প্রভাবিত করিয়াছে, ভবিষ্যতেও তদ্রূপ করিবে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ আল-কুরআন ও আল-হাদীছ ছাড়াও দেখুন ঃ 'আরবী ঃ (১) আল-আমিদী, ইহ্কামু'ল-হুক্কাম ফী উসূলি'ল-আহ্কাম, মিসর ১৯১৪ খৃ.; (২) ইব্ন জারীর, জামি'উ'ল-বায়ান (তাফসীরু'ত'-তাবারী); (৩) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, ফাত্হু'ল-বারী, ১খ.; (৪) ইব্ন হায্ম, আল-ইহ্কাম ফী উসূলি'ল-আহ্কাম, সম্পা. আহ্মাদ মুহাম্মাদ শাকির, কায়রো ১৩৪৫ হি.; (৫) ঐ লেখক, আল-ফিসালু ফি'ল-মিলালি ওয়া'ল-আহ্ওয়া' ওয়া'ন-নিহাল, কায়রো ১৯২৮ খৃ.; (৬) ইব্ন রুশ্দ, বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ, কায়রো ১৩৭১ হি.; (৭) ইব্ন কুতায়বা, আল-ইমামা ওয়া'স-সিয়াসা, কায়রো ১৯০৪ খৃ.; (৮) ইবনু'ল-কায়্যিম, আহ্কামু আহ্লি'য-যিম্মাঃ, দামিশ্ক ১৩৮১/১৯৬১; (৯) ঐ লেখক, আ'লামু'ল-মুওয়াক্কি'ঈন, কায়রো; (১০) ইব্ন মানজূর, লিসানু'ল-'আরাব; (১১) আবু'ল-হাসান আল-আশ'আরী, আল-ইবানা 'আলা উসূলি'দ-দিয়ানা, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য); (১২) ঐ লেখক, মাকালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন, কায়রো; (১৩) আবূ হানীফা (র), আল-ফিক্হু'ল-আকবার (মুল্লা 'আলী আল-কারীকৃত ভাষ্যসহ), মিসর ১৯৫৫ খৃ.; (১৪) আবূ 'উবায়দ আল-কাসিম ইব্ন সাল্লাম, আল-আমওয়াল, কায়রো ১৩৫৩ হি.; (১৫) আবূ য়া'লা আল-হাম্বালী, আল-আহ্কামু'স-সুলতানিয়্যা, সম্পা, মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাকী, মিসর ১৯৩৮ খৃ.; (১৬) আবূ য়ূসুফ, কিতাবু'ল-খারাজ, কায়রো ১৯৫২ খৃ.; (১৭) আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল (র), আল-মুসনাদ (নবতর বিন্যাসযুক্ত আল-মুসনাদ দ্র. সম্পা. আহ্মাদ 'আবদু'র-রাহ্মান আল-বান্না আস-সা'আতী); (১৮) আল-বুখারী, আল-জামি'উ'স-সাহীহ'; (১৯) আল-জুরজানী, আত্-তা'রীফাত, মিসর ১৩২১ হি.; (২০) জুরজী যায়দান, তা'রীখু'ত-তামাদ্দুনি'ল-ইসলামী, কায়রো; (২১) আল-জাস্সাস, আহ্কামু'ল-কুরআন, আসতানাহ ১৩২৮ হি.; (২২) হাসান ইব্রাহীম হাসান, আন-নুজূমু'ল ইসলামিয়া, কায়রো; (২৩) আর-রাযী, ই'তিকাদাতু ফিরাকি'ল-মুসলিমীন ওয়া'ল-মুশ্রিকীন, মিসর ১৯৩৮ খৃ.; (২৪) ঐ লেখক, মাফাতীহু'ল-গায়ব (আত-তাফসীরু'ল-কাবীর); (২৫) আর-রাগিব, আল-মুফ্রাদাত; (২৬) আস-সিজিসতানী, তাফসীরু গারীবি'ল-কুরআন; (২৭) সা'ঈদ আল-আফগানী, আল-ইসলামু ওয়া'ল-মারআ, দামিশ্ক ১৯৬৪ খৃ.; (২৮) সায়্যিদ কুতুব, আস-সালামু'ল-'আলামী ওয়া'ল-ইসলাম, কায়রো; (২৯) আশ-শাতি'বী, আল-মুওয়াফাকাতু ফী উসূলি'শ-শারী'আঃ, কায়রো; (৩০) সুব্হী আস'-সালিহ, আন্-নুজূ'মু'ল-ইসলামিয়া, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ.; (৩১) 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আককাদ, হাকাইকুল-ইসলাম ওয়া আবাতীল, কায়রো; (৩২) 'আবদু'ল-'আযীয 'আমির, খাওয়াতিরু হাওলি কানূনি'ল-উস্রাতি ফি'ল-ইসলাম, বৈরূত ১৯৬১ খৃ. ও ১৯৬২ খৃ.; (৩৩) 'আবদু'ল-কাহির আল-বাগদাদী, আল-ফারকু বায়না'ল-ফিরাক, কায়রো ১৯১০ খৃ.; (৩৪) 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব খালাফ, আস-সিয়াসাতু'শ-শার'ইয়্যা, কায়রো; (৩৫) 'আলী 'আবদু'র-রায্যাক, আল-ইসলামু ওয়া উস্লু'ল-হুকুম, মিসর; (৩৬) 'আলী মুসতাফা আল-গারাবী, তা'রীখু'ল-ফিরাকি'ল-ইসলামিয়্যা, কায়রো ১৯৪৮ খৃ.; (৩৭) আল-গাযালী, ইহ্য়া' 'উলূমি'দ-দীন, কায়রো ১৩৪৬ হি.; (৩৮) ফুআদ শাবাত, আল-হুকূকু'দ-দুওয়ালিয়্যাতু'ল-'আম্মা, দামিশ্ক ১৯৫৯ খৃ.; (৩৯) আল-কুরতুবী, আল-জামি'উ লি-আহ্কামি'ল-কুরআন, মিসর ১৯৩৯ খৃ.; (৪০) আল-কাস্তাল্লানী, ইরশাদু'স-সারী, ১খ; (৪১) আল-মাওয়ারদী, আল-আহ্কামু'স-সুলতানিয়্যা, মিসর ১৩৫৭ হি.; (৪২) মুহাম্মাদ আবূ যাহ্রা, আল-আহ্ওয়ালু'শ-শাখসিয়্যা, 'কিসমু'য-যাওয়াজ' অধ্যায়, কায়রো ১৯৫০ খৃ.; (৪৩) ঐ লেখক, আত-তাকাফুলু'ল-ইজতিমা'ইয়্যু ফি'ল-ইসলাম, কায়রো ১৩৮৪/১৯৬৪; (৪৪) মুহাম্মাদ রাশীদ রিদা', আল-ইমামাতু ওয়া'ল-খিলাফাতু'ল-'উজ্মা, কায়রো; (৪৫) মুহাম্মাদ দি'য়া'উ'দ-দীন

আর-রায়স, আল-খারাজু ওয়া'ন-নুজূ'মু'ল-মালিয়া, কায়রো ১৯৬১ খৃ.; (৪৬) ঐ লেখক, আন-নাজ'রিয়্যাতু'স-সিয়্যাসিয়্যাতু'ল -ইসলামিয়্যা, কায়রো ১৯৬০ খৃ.; (৪৭) মুরতাদা আয-যাবীদী, তাজু'ল-'আরূস; (৪৮) মুস'তাফা আস-সাবা'ঈ, ইশতিরাকিয়্যাতু'ল-ইসলাম, দামিশ্‌ক ১৯৫৯ খৃ.; (৪৯) ঐ লেখক, শারহু কানূনি'ল-আহ'ওয়ালি'শ-শাখসি'য়্যা, দামিশ্‌ক; (৫০) ঐ লেখক, আল-মার'আতু বায়না'ল-ফিক্‌'হি ওয়া'ল-কানূন, দামিশ্‌ক ১৩৮২/১৯৬২; (৫১) মুহাম্মাদ য়ুসুফ মূসা, আহ'কামু'ল-আহ'ওয়ালি'শ-শাখ্‌সিয়্যাঃ, কায়রো; (৫২) শাহ্‌ ওয়ালিয়ুল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগাঃ, মিসর ১৩৪১ হি.; (৫৩) ওয়াহ্‌বাঃ আয-যুহায়লী, আছারু'ল-হারবি ফি'ল-ফিকহি'ল-ইসলামী, দারু'ল-ফিক্‌র, দামিশ্‌ক ১৯৬২ খৃ.; (৫৪) য়াহ্‌য়া ইব্‌ন আদাম, কিতাবু'ল-খারাজ, সম্পা. আহ'মাদ মুহাম্মাদ শাকির, কায়রো ১৩৪৭ হি.।

উর্দূ ঃ (১) আবু'ল-আ'লা মাওদূদী, ইসলাম কা নিজাম-ই হ'য়াত, লাহোর ১৯৫৩ খৃ.; (২) ঐ লেখক, ইসলামী তাহ্‌যীব আওর উসকে উসূল ওয়া মাবাদী, লাহোর ১৯৬০ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, তাফহীমাত, লাহোর ১৩৫৯ হি.; (৪) আবু'ল-কালাম আযাদ, ইসলামী জামহুরিয়্যা, লাহোর ১৯৫৬ খৃ.; (৫) ইহ'সানুল্লাহ্‌ 'আব্বাসী ও আবু'ল-ফাদ'ল মুহাম্মাদ, ইসলাম, গোরখপুর ১৯০২ খৃ.; (৬) আসগার 'আলী রূহী, মা ফি'ল-ইসলাম, লাহোর ১৩৫০ হি.; (৭) ইক্‌বাল, তাশ্‌কীল-ই জাদীদ-ই ইলাহিয়্যাত-ই ইসলামিয়্যা, অনু. সায়্যিদ নাযীর নিয়াযী, লাহোর ১৯৫৮ খৃ.,; (৮) ছানাউল্লা পানীপাতী, হু'কূকু'ল-ইসলাম, অনু. ওয়াহীদু'দ-দীন সালীম, করাচী ১৯৬২ খৃ.; (৯) গাযী হামিদ আল-আনসারী, ইসলাম কা নিজাম-ই হুকূমাত, দিল্লী ১৯৫৬ খৃ.; (১০) হিফজু'র-রাহ'মান সুয়ূহারুবী, ইসলাম কা ইকতিসাদী নিজাম, দিল্লী, ১৯৪২ খৃ.; (১১) হায়দার যামান সিদ্দীকী, ইসলাম কা মা'আশিয়াতী নিজাম, লাহোর ১৯৪৯ খৃ.; (১২) রা'ঈস আহ'মাদ জা'ফারী, ইসলাম আওর রাওয়াদারী, লাহোর ১৯৫৫ খৃ.; (১৩) সায়্যিদ রাশীদ রিদা, আল-ওয়াহ'য়ু'ল-মুহাম্মাদী, অনু. রাশীদ আহমাদ আরশাদ, লাহোর ১৯৬০ খৃ.; ওয়াহ-ই মুহাম্মাদী, অনু. 'আবদু'র-রায্‌যাক মালীহাবাদী; (১৪) সা'ঈদ আহ'মাদ, আর-রিক্‌কু ফি'ল-ইসলাম, দিল্লী ১৯৬১ খৃ.; (১৫) সায়্যিদ কু'তু'ব, আল-'আদালাতু'ল-ইজতিমা'ইয়্যাতু ফি'ল-ইসলাম, অনু. নাজাতুল্লাহ্‌ সিদ্দীকী, ইসলাম, কা নিজ'াম-ই 'আদ্‌ল, লাহোর ১৯৬৩ খৃ.; (১৬) শাবীশ 'আবদু'ল-'আযীয, আল-ইসলাম দীনু'ল-ফিত'রা, অনু. ইফ্‌তিখার আহ'মাদ, করাচী ১৩৭১ হি.; (১৭) শিব্‌লী নু'মানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদাবী, সীরাতু'ন-নাবী, ১খ. ৬খ., আ'জামগড়; (১৮) 'আবদু'ল-হা'ক্ক হাক্কানী, 'আকাইদু'ল-ইসলাম, দেওবান্দ ১২৯২ হি.; (১৯) খালীফা 'আবদু'ল-হাকীম, ইসলাম কা নাজরিয়্যা-ই হায়াত, অনু. কু'ত'বু'দ-দীন আহমাদ, লাহোর ১৯৫৭ খৃ.; (২০) 'আবদু'স-সালাম নাদাবী, তা'লীমাত-ই ইসলাম, দিল্লী ১৯৬১ খৃ.; (২১) 'আবদু'ল-লাতীফ, ইসলাম মেঁ মু'আশারাত কা তাসাওউর, অনু. মুস'হি'দ-দীন সি'দ্দীকী, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য; (২২) 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব জুহূরী, ইসলাম কা নিজাম-ই হায়াত, লাহোর ১৯৫৯ খৃ.; (২৩) গুলাম দাস্‌তগীর রাশীদ, ইসলাম কে মা'আশী তাস'ওউরাত, হায়দরাবাদ ১৯৪৫ খৃ.; (২৪) ফারীদ ওয়াজ্‌দী, ইসলাম কে 'আলামগীর উসূল, অনু. আহ'মাদ হাসান নাকাবী, লাহোর ১৯৪৮ খৃ.; (২৫) মুহাম্মাদ তাকী আমীনী, ইসলাম কা যার'ঈ নিজাম, দিল্লী ১৯৫৫ খৃ.; (২৬) মুহাম্মাদ হাবীবু'র-রাহমান, তা'লীমাত-ই ইসলাম, দেওবান্দ ১৯২৮ খৃ.; (২৭) মুহাম্মাদ তায়্যিব, তালীমাত-ই ইসলাম আওর মাসীহী আক্‌ওয়াম, দেওবান্দ ১৩৫৬ হি.; (২৮) মুহাম্মাদ কাসিম নানূতাবী, সাদাকাত-ই ইসলাম, লাহোর ১৯৫৬ খৃ.; (২৯) মাজ'হারু'দ-দীন সিদ্দীকী, ইসলাম মেঁ হায়ছিয়াতা-ই-নিসওয়ান-লাহোর ১৯৫৪ খৃ.; (৩০) ঐ লেখক, ইসলাম কা মা'আশী নাজ'রিয়্যা, লাহোর ১৯৫১ খৃ.; (৩১) ঐ লেখক, ইসলাম কা নাজরিয়্যা-ই আখলাক, লাহোর ১৯৫১ খৃ.; (৩২) মানাজির আহ'সান গীলানী, দীন-ই কায়্যিম, লাহোর ১৯৪৮ খৃ.; (৩৩) ঐ লেখক ও গুলাম দাস্‌তগীর রাশীদ, ইসলামী ইশ্‌তিরাকিয়্যাত, করাচী ১৯৪৯ খৃ.; (৩৪) নাযীর আহ'মাদ, আল-হুকূক ওয়া'ল-ফারা'ইদ। (৩৫) সায়্যিদ য়াহ্‌য়া নাদাবী, ইসলাম কা তাহ্‌যী'বী নিজাম, করাচী ১৯৬৪ খৃ.।

**ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী ঃ** (১) Khalifa Abdul Hakim, Islam and Communism, লাহোর ১৯৬২ খৃ.; (২) ঐ লেখক, Islamic Ideology, লাহোর ১৯৫৩ খৃ.; (৩) Abdur Rahim, The principles of Muhammadan Jurisprudence, লাহোর ১৯৫৮ খৃ.; (৪) Abu'l-A'la Maududi, Towards Understanding Islam, লাহোর ১৯৬০ খৃ.; (৫) C.C. Adams, Islam and Modernism in Egypt, অক্‌স্‌ফোর্ড ১৯৩৩ খৃ.; (৬) N. P. Aghnides, Mohammedan Theories of Finance, লাহোর ১৯৬১ খৃ.; (৭) Syed Ameer Ali, Islam, লন্ডন ১৯০৯ খৃ.; (৮) ঐ লেখক, Personal Law of Mohamimedans, লন্ডন ১৮৮০ খৃ.; (৯) ঐ লেখক, The Spirit of Islam, লন্ডন ১৯২২ খৃ.; (১০) Tor Andrae, Mohammad. The Man and his Faith. লন্ডন ১৯৩৬ খৃ.; (১১) A. J. Arberry, Revelation and Reason in Islam, লন্ডন ১৯৫৭ খৃ.; (১২) T. W. Arnold, The Preaching of Islam, লন্ডন ১৯১৩ খৃ.; (১৩) Arnold ও Guillaume, The Legacy of Islam. অক্‌সফোর্ড ১৯৩১ খৃ.; (১৪) T. Burckhardt, An Introduction to Sufi Doctrine, লাহোর ১৯৫৯ খৃ.; (১৫) N. Daniel, Islam, Europe and Empire, এডিনবার্গ ১৯৬৬ খৃ.; (১৬) M. Fazil Jamali, Letters on Islam, লন্ডন ১৯৬৫ খৃ.; (১৭) M. M. Pickthal, Islamic Culture, লাহোর; (১৮) F. W. Fervan, Moslems on the March, লন্ডন ১৯৫৫ খৃ.; (১৯) A. A. A. Fyzee, A Modern Approach to Islam. বোম্বাই ১৯৬৩ খৃ.; (২০) ঐ লেখক, Outlines of Muhammadan Law, অক্সফোর্ড ১৯৫৫ খৃ.; (২১) H. A. R. Gibb, Modern Trends in Islam, শিকাগো ১৯৪৭ খৃ.; (২২) ঐ লেখক, Mohammadanism, লন্ডন ১৯৪৯ খৃ.; (২৩) I. Goldziher, Mohammadanische Studien, Halle 1890 A. D.; ইংরেজী অনু. S. M. Stern. Muslim Studies, লন্ডন ১৯৬৭ খৃ.; (২৪) G. E. Von Grunehaum, Islam. লন্ডন ১৯৬১ খৃ.; (২৫) Henri Masse, Islam, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ.; (২৬) Philip K. Hitti, Islam and the West, নিইয়র্ক ১৯৬২ খৃ.; (২৭) Hossein Nasr (Seyyed), Ieala and Realities of Islam, লন্ডন ১৯৬৬ খৃ,; (২৮) ঐ লেখক, Islamic Studies,

বৈরূত ১৯৬৫ খৃ.; (২৯) Hughes, Dictionary of Islam, লাহোর ১৯৬৫ খৃ.; (৩০) T. A. Klein. The Religion of Islam. লন্ডন ১৯০৬ খৃ.; (৩১) H. Lammens, Islam, Believes and Institutions, লন্ডন ১৯২৯ খৃ.; (৩২) R. Levy, An Introduction to the Sociology of Islam, লন্ডন ১৯৩৩ খৃ.; (৩৩) ঐ লেখক, The Social Structure of Islam. কেম্ব্রিজ ১৯৬২ খৃ.; (৩৪) Lin Chai Lien. The Arabian Prophet, সাংহাই ১৯২১ খৃ.; (৩৫) D. B. Macdonald, Development of Muslim Theology, লন্ডন ১৯০৩ খৃ.; (৩৬) S. Mahmasani, The Philosophy of Jurisprudence in Islam, লন্ডন ১৯৬২ খৃ.; (৩৭) Mahmud Ahmad, Eonomies of Islam, লাহোর ১৯৬৪ খৃ;ঃ.; (৩৮) Mahmud Brelvi, Islam in Africa, লাহোর ১৯৬৪ খৃ.; (৩৯) ঐ লেখক, Islamic Ideology and its Impact on our Times, করাচী ১৯৬৭ খৃ; (৪০) Majid Khadduri, War and Peace in the Law of Islam, ভার্জিনিয়া ১৯৬২ খৃ.; (৪১) Majid Khadduri ও H. J. Liebsy, Law in the Middle East, ১খ, Origins and Development of Islamic Law. ওয়াশিংটন ১৯৫৫ খৃ.; (৪২) D. S. Margoliouth, Te Early Development of Mohammedanism, নিইয়র্ক ও লন্ডন ১৯১৪ খৃ.; (৪৩) Mazharud Din Siddiqi, Islam and Theocracy, লন্ডন ১৯৬৩ খৃ.; (৪৪) M. V. Merchant, ABook of Quranic Laws, লাহোর ১৯৬০ খৃ.; (৪৫) Motamar al-Alam al-Islam, Some Economic Aspects of Islam, করাচী ১৯৬৪ খৃ.; (৪৬) Muhammad Ali, The Religion of Islam, লাহোর ১৯৪৫ খৃ.; (৪৭) Muhammad Asad, Islam at the Cross Roads, লাহোর ১৯৫৫ খৃ.; (৪৮) ঐ লেখক, The Road to Mecca, লন্ডন ১৯৫৪ খৃ.; (৪৯) Muhammad Hamidullah, Muslim Conduct of State, লাহোর ১৯৫৪ খৃ.; (৫০) Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, লন্ডন ১৯৩৪ খৃ.; (৫১) Muhammad Nur Nabi, Development of Muslim Religious Thought in India, আলীগড় ১৯৬২ খৃ.; (৫২) R. A. Nicholson, Studies in Islamic Mysticism, কেম্ব্রিজ ১৯২১ খৃ.; (৫৩) O'leary, Arabic Thought and its Place in History, লন্ডন ১৯২২ খৃ.; (৫৪) John J. Poole, Studies in Mohammedanism, লন্ডন ১৮৯২ খৃ.; (৫৫) S. Lane Poole, Studies in a Mosque, লন্ডন ১৮৮৩ খৃ.; (৫৬) Rafiud Din, The Manifesto of Islam, করাচী; (৫৭) R. Roberts, The Social Laws of the Quran, লন্ডন ১৯২৫ খৃ.; (৫৮) J. Robson, An Introduction to the Science of Traditon, লন্ডন ১৯৫৩ খৃ.; (৫৯) E. I. J. Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam, কেম্ব্রিজ ১৯৫৮ খৃ.; (৬০) E. A. Salem, Political Theory and Institution of the Khawaij, বাল্টিমোর ১৯৫৬ খৃ.; (৬১) J. Schacht, An Introduction to Islamic Law, অক্সফোর্ড ১৯৬৪ খৃ.; (৬২) ঐ লেখক, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, অক্সফোর্ড ১৯৫২ খৃ.; (৬৩) Shushtari, Outlines of Islamic Culrure, লাহোর ১৯৬৬ খৃ.; (৬৪) R. B. Smith, Mohammed and Mohammedanism, লন্ডন ১৮৭৪ খৃ.; (৬৫) Tara Chand, Influence of Islam on Indian Culture, এলাহাবাদ ১৯৬৩ খৃ.; (৬৬) Murray Titus, Islam in India and Pakistan, অক্সফোর্ড ১৯৬১ খৃ.; (৬৭) J. S. Triningham, A History of Islam in West Africa, লন্ডন ১৯৬৫ খৃ.; (৬৮) ঐ লেখক, Islam in East Africa, লন্ডন,; (৬৯) A. S. Tritton, Islam, লন্ডন ১৯৬৬ খৃ.; (৭০) Mir Valiud Din, The Quranic Sufism, দিল্লী ১৯৫৯ খৃ.; (৭১) E. R. J. Verhoeven Islam, Its Origin and Spread, নিইয়র্ক ১৯৬২ খৃ.; (৭২) W. M. Watt, Free Will and Predestination in Early Islam, লন্ডন ১৯৪৮ খৃ.; (৭৩) ঐ লেখক, Islamic Philosophy and Theology, এডেনবার্গ ১৯৬২ খৃ.; (৭৪) A. J. Wensinck, The Muslim Creed, কেম্ব্রিজ ১৯৩২ খৃ.; (৭৫) Yusuf al-Daghawi, Islam, The Ideal Religion, লাহোর ১৯৫৪ খৃ.; (৭৬) F. de Zayas, The Law and Philosophy of Zakat, দামিশক ১৯৬০ খৃ.। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন য়ুরোপীয় ভাষার ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে রচিত গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলীর জন্য দেখুন ঃ Pearson Index Islamicus, কেম্ব্রিজ ১৯৫৮ খৃ.; ইসলাম বিষয়ক কোনও কোনও গ্রন্থ বিদ্বেষমূলক। এই সকল গ্রন্থ পাঠ কালে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

(এই নিবন্ধটি ড. রানা ইহ্সান ইলাহী কর্তৃক রচিত। অধ্যাপক আলা'উ'দ-দীন সিদ্দীকী কর্তৃক উহা পরিমার্জিত ও দা. মা. ই. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত। এতদ্ব্যতীত মাওলানা গুলাম খুরশিদ, সায়্যিদ মুরতাদা হুসায়ন ফাদি'ল, মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নাদাবী, অধ্যাপক হামীদ আহমাদ খান, ড. জাস্টিস এস. এ. রাহমান, সায়্যিদ য়াকূব শাহ, চৌধুরী নাযীর আহমাদ খান ও খান ইন'আমুল্লাহ খান এতদ্বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন)।

দা. মা. ই. (ই. বি. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পরিমার্জিত)/মু. মাজহারুল হক

বর্তমান কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলাম কি পরিমাণে প্রচার ও প্রসার লাভ করিয়াছে, সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবরণ সহকারে তাহা এই নিবন্ধে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইসলামের ধর্মীয় 'আকীদা বিশ্বাস, হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধানের বিশদ বিবরণ, ইসলামের ধর্মীয় মূলনীতিসমূহের ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানিবার জন্য 'আল্লাহ', 'মুহাম্মাদ' ইত্যাদি শিরোনামের নিবন্ধসমূহ ও সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধাদি পাঠ করা উচিত। সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের মোট সংখ্যা সম্বন্ধে যে বিভিন্ন রূপ আনুমানিক হিসাব প্রকাশ করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে যথেষ্ট গরমিল দেখা যায়। উক্ত সংখ্যা বিভিন্ন পন্থায় এক শত পঁচাত্তর কোটি হইতে দুই শত সত্তর কোটি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রতিটি সংখ্যার মধ্যেই উহার অনিশ্চিত হইবার একাধিক আশংকা নিহিত রহিয়াছে। কারণ অনেক দেশ আছে,

সেখানে বিপুল সংখ্যক মুসলিম বসবাস করেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কখনও ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশের আনুপাতিক জনসংখ্যা নির্ধারণের উদ্দেশে সেখানে আদমশুমারী করা হয় নাই। তাই সেই সকল দেশের মুসলিম জনসংখ্যার স্বতন্ত্র কোনও হিসাব ও পরিসংখ্যান বিদ্যমান নাই। যে সকল দেশে ইসলাম বিকশিত হইয়াছে, বিশেষত সেই সকল দেশেই উক্ত অসুবিধাটি বর্তমান। ফলে 'আরবদের সামগ্রিক সংখ্যা যাহাই বর্ণনা করা হউক না কেন, উহা নিছক অনুমান ভিত্তিক ছাড়া অন্য কিছু হইবে না। 'আরব ভূমির যে সকল অঞ্চল য়ুরোপীয়দের শাসনাধীন ছিল, সেই সকল অঞ্চলের মুসলিম জনসংখ্যা সম্পর্কিত পরিসংখ্যানের উপর অনেকখানি নির্ভর করা যায়। যেমন এডেন ও তৎসন্নিহিত Perim, Sokotra ইত্যাদি দ্বীপের জনসংখ্যা ছাপ্পান্ন হাজার এবং বাহ্‌রায়ন দ্বীপের জনসংখ্যা উননব্বই হাজার। কিন্তু 'আরব ভূমির স্বাধীন অংশসমূহের জনসংখ্যার হিসাব, যেমন নাজ্‌দ, হাদ্‌রামাওত ইত্যাদি অঞ্চলের জনসংখ্যা Zwemer-এর বর্ণনামতে পঁচিশ লক্ষ ও Haritmann-এর বর্ণনামতে পঁয়ত্রিশ লক্ষ এবং যে সকল অঞ্চল এককালে তুরস্কের 'উছমানী শাসনের অধীন ছিল (যেমন হিজায ও য়ামান, উহাদের জনসংখ্যা এক লক্ষ পাঁচ হাজার) নিছক অনুমান ভিত্তিক ছাড়া অন্য কিছু নহে। এতদ্ব্যতীত আরেকটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যে ভূখণ্ডটি 'আরবদের নামানুসারে 'আরব' নামে পরিচিত, 'আরবগণ সেই ভূখণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। খৃ. তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকেই আরবগণ বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া উত্তর দিকে হিজরত করিতে আরম্ভ করে। উহারই পরিণতিতে ক্রমে ফিলিস্‌তীন, সিরিয়া ও আল-আমীরাতে তাহাদের বসতি কায়েম হইয়া যায়। কালের বিবর্তনে বায়যান্টাইন ও ইরানীদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের সুযোগ গ্রহণ করিয়া যাযাবর 'আরবদের বিপুল অংশ তাহাদের অনুর্বর ও মরুময় দেশের সীমান্তে অবস্থিত তুলনামূলকভাবে অধিক উর্বর দেশসমূহে বসতি স্থাপন করে। আরবদের উক্ত দেশত্যাগের পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, তাহারা তাহাদের পিতৃভূমি হইতে দূর-দূরান্তে ছড়াইয়া পড়ে। খৃ. সপ্তম শতাব্দীর বিজয়সমূহ, উক্ত অবস্থাকে এই রূপ দান করে যে, 'আরবগণ বায়যান্টীয়দের নিকট হইতে তাহাদের কয়েকটি অতি উর্বর প্রদেশ এবং সাসানী সাম্রাজ্য তথা সমগ্র ইরান অধিকার করিয়া লয়। সিরিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলে, মিসরে ও উত্তর আফ্রিকায় ক্রমে 'আরবী ভাষা প্রচলিত হইবার বিষয়টি এই কথাকে অনেকাংশে প্রমাণিত করে যে, এই সকল দেশের অধিবাসীদের রক্তের সহিত 'আরবীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল এবং 'আরবদেশ হইতে লোহিত সাগরের পথে আফ্রিকা মহাদেশে 'আরবদের হিজরতের একটি অবিরাম ধারা—যদিও উক্ত ধারায় কখনও কখনও সাময়িক বিরাম দেখা দিয়াছে—প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। 'আরবদের হিজরতের আরেকটি ধারা ভারত মহাসাগরের পূর্ব তীরের দিকে চলে। খৃ. অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে 'আরব ব্যবসায়িগণ সুদূর চীন পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। এই সময়ে বিপুল সংখ্যক 'আরব চীনের ক্যান্টন (Canton)-এ বসবাস করিত। ব্যবসায়ী 'আরবদের বসতি মালয় দ্বীপপুঞ্জ (ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জসহ)-এর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। তাহাদের ক্ষুদ্র দল ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারত উপমহাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। এতদ্ব্যতীত 'আরবের বহু লোক মুসলিম জাহানের অধিকাংশ অঞ্চলে, বিশেষত যেই সকল অঞ্চলে নৌপথে পৌঁছান সম্ভব ছিল, সেই সকল অঞ্চলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় গিয়া বসতি স্থাপন করে। কিন্তু যেই সকল 'আরব উপদ্বীপের বাহিরে গিয়া বিভিন্ন মুসলিম দেশে সেই সকল দেশের অধিবাসীর অংশ হিসাবে স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর আকারে বসবাস করিতে থাকে, তাহাদের সামগ্রিক সংখ্যা কত ছিল, তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা কখনও করা হয় নাই।

এশিয়ার যেই সকল দেশ য়ুরোপীয় জাতিসমূহের শাসনাধীন ছিল, উহাদের মধ্য হইতে কতগুলি দেশের জনসংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের নিকট পরিজ্ঞাত রহিয়াছে। ভারত উপমহাদেশে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী লোকদের সংখ্যার হিসাব অত্যন্ত সতর্কতার সহিত লিপিবদ্ধ করা হইত। ১৯১১ খৃ. পরিচালিত আদমশুমারীর হিসাব মুতাবিক উপমহাদেশের সর্বমোট জনসংখ্যা একত্রিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ছয় কোটি ছেষট্টি লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুই শত নিরানব্বই জন [দেশ বিভাগের পর ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারী মুতাবিক ভারতের সর্বমোট জনসংখ্যা ছিল ৪৯,৮৬,৮০,০০০। তন্মধ্যে ১১% জন মুসলিম E. I.[2] IV, 177] এবং পাকিস্তানের (বাংলাদেশসহ) সর্বমোট জনসংখ্যা ছিল ১০,৫০,৪৪,০০০। তন্মধ্যে ৮৬% জন মুসলিম (ঐ)। ভারত উপমহাদেশে হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক দেখা যায়। ১৯০১ খৃ. শেষ দশকের মধ্যে উপমহাদেশের মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার যেখানে ছিল দুই দশমিক চারি শতাংশ, সেখানে মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল আট দশমিক নয় শতাংশ। পরবর্তী দশকে তাহাদের সংখ্যা ছয় দশমিক সাত শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে সেই সময়ে হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় পাঁচ শতাংশ। মুসলিম জনসংখ্যা অধিকতর উচ্চ হারে বৃদ্ধি পাইবার একটি কারণ সম্ভবত অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণ হইবে। তবে এইরূপ উচ্চ হারে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ বাহ্যত এই বলিয়া মনে হয় যে, মুসলিমদের সামাজিক রসম-রেওয়াজ হিন্দুদের সামাজিক রসম-রেওয়াজের তুলনায় জন্ম বৃদ্ধির পক্ষে অধিকতর সহায়ক। মুসলিম সমাজে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার উপর তুলনামূলকভাবে কম কড়াকড়ি আরোপিত রহিয়াছে। তাহাদের সমাজে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। মুসলিমগণ সাধারণত ধর্মান্তর গ্রহণ করে না। তবে উত্তর ভারতে, বিশেষত পাঞ্জাবে ইসলাম ত্যাগ করিয়া খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণকারী হাযার হাযার লোক রহিয়াছে (The Mohammedan World of Today, পৃ. ১৭০-২৯৪)। আবার আর্য সমাজের প্রচারমূলক তৎপরতার কারণে অনেক হিন্দু নওমুসলিম পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়া গিয়াছে (দ্র. হিন্দু নিবন্ধ, ৫ম পরিচ্ছেদ)। শ্রীলংকা ও 'আরবের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শ্রীলংকায় ইসলাম ধর্ম তেমন বেশী প্রচার ও প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ১৯১২ খৃ. সেই দেশে চল্লিশ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম ছিল মাত্র দুই লক্ষ চুরাশি হাযার (বর্তমানে সেই দেশে মুসলিম জনসংখ্যা হইতেছে সাত লক্ষ ত্রিশ হাযার নয় শত চল্লিশজন অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র সাত শতাংশ)।

মালয়েশিয়া ও তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জের জনসংখ্যার কোনও নির্ভুল ও পরিপূর্ণ পরিসংখ্যান আমাদের কাছে নাই। তবে Zwemer কর্তৃক বর্ণিত আনুমানিক পরিসংখ্যান মুতাবিক মালয়েশিয়া ও তৎসন্নিহিত দ্বীপসমূহের মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ তিহাত্তর হাযার এক শত উনষাট জন। পক্ষান্তরে Hartmann কর্তৃক বর্ণিত আনুমানিক পরিসংখ্যান মুতাবিক উক্ত ভূখণ্ডের মুসলিম জনসংখ্যা ছিল উহার দ্বিগুণ। (১৯৪৭ খৃ. পরিচালিত আদমশুমারীর হিসাব মুতাবিক উক্ত অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ছিল আটচল্লিশ লক্ষ সাতষট্টি হাযার চার শত একানব্বই

জন। তন্মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল পঁচিশ লক্ষ অর্থাৎ উক্ত অঞ্চলের মুসলিম জনসংখ্যা ছিল সেখানকার মোট জনসংখ্যার একান্ন শতাংশ)। ইসলাম ভারত উপমহাদেশ হইতে মালাক্কা দ্বীপে প্রবেশ করত জাভা ও তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জগামী বাণিজ্যিক মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়ে। এক কালে ওলন্দাজশাসিত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মুসলিম জনসংখ্যা ১৯০৫ খৃ. ছিল তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ চৌত্রিশ হাযার পঁচিশ জন। জাভা দ্বীপের দুই কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ পাঁচ হাযার ছয় শত তেপ্পান্নজন মুসলিম জনসংখ্যাও উহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত অঞ্চলের স্থানীয় অমুসলিম অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের উক্ত সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। উহার বিপরীতে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে খৃস্টান মিশনারীগণ জাভা দ্বীপে মুসলিমদেরকে খৃস্টান বানাইতেছে এবং সেখানে প্রতি বৎসর তিন শতাধিক লোককে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হইতেছে। ১৯০৬ খৃ. সেখানে ইসলাম ত্যাগকারী আঠার হাযার ধর্মান্তরিত খৃস্টান ছিল (The Mohammedan World of Today, পৃ. ২৩৭)। সুমাত্রা দ্বীপে মিশনারী তৎপরতায় লিপ্ত বিভিন্ন খৃস্টান মিশনারী সংস্থা দাবি করে যে, তাহারা ১৮৬০ খৃ. হইতে এই পর্যন্ত (?) ৬৫০০ জন লোককে খৃস্টান বানাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহারা আরও ১১৫০ জন মুসলিমকে খৃস্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছে (পূ. গ্র., পৃ. ২২২, ২২৮)। ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান মোট জনসংখ্যা দশ কোটির (১৯৬৬ খৃ. ১০,৭০,০০,০০০, E.I.[2], IV, 177) অধিক। উহার মধ্যে নয় কোটি আটান্ন লক্ষ আশি হাযার দুই শত ছিয়াত্তরজন হইতেছে মুসলিম অর্থাৎ সেই দেশের মোট জনসংখ্যার আটানব্বই শতাংশই (৮৭% মুসলিম, E.I.[2], IV. 177) হইতেছে মুসলিম।

থাইল্যান্ডে ইসলাম প্রচার কখনও তেমন বেশী সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। প্রতিবেশী মালয়েশিয়া ও তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জের সহিত সম্পর্ক থাকিবার কারণে থাইল্যান্ডের উত্তরাঞ্চল ও উপকূলীয় শহরগুলিতে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু সেই দেশের মুসলিমদের মোট জনসংখ্যা সম্ভবত তিন লক্ষের (?) অধিক নহে। ১৯৪৯ খৃ. পরিচালিত আদমশুমারীর পরিসংখ্যান মুতাবিক থাইল্যান্ডের মোট জনসংখ্যা ছিল এক কোটি ঊনআশি লক্ষ সাতাশি হাযার। উহার মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার ৩% ছিল মুসলিম। বর্তমান থাইল্যান্ডের মোট জনসংখ্যা হইতেছে দুই কোটি আশি লক্ষ। উহার মধ্যে ত্রিশ লক্ষ আশি হাযার অর্থাৎ ১১% হইতেছে মুসলিম।

এক কালে য়ূরোপীয়গণ কর্তৃক শাসিত এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে ইন্দোচীনের ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলগুলির মোট জনসংখ্যা এক কোটি আটাত্তর লক্ষের মধ্যে এগার লক্ষ ছেচল্লিশ হাযারজন ছিল মুসলিম (পরবর্তী আনুমানিক পরিসংখ্যান মুতাবিক উক্ত অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ছিল দুই কোটি সত্তর লক্ষ ত্রিশ হাযার। তন্মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষ। তবে উক্ত আনুমানিক পরিসংখ্যানে শুধু কম্পুচিয়া, লাওস ও ভিয়েতনামের জনসংখ্যা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। রাশিয়া অধিকৃত ককেশাস অঞ্চলসহ মধ্যএশিয়ার মোট জনসংখ্যা দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা এক কোটি উনিশ লক্ষ ছেষট্টি হাযার সাত শতজন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মোট জনসংখ্যা পঁচাশি লক্ষের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল দুই লক্ষ সত্তর হাযার পাঁচ শত সাতচল্লিশ জন (১৯৬০ খৃ. ফেব্রুয়ারীতে পরিচালিত আদমশুমারীর হিসাব মুতাবিক ফিলিপাইনের মোট জনসংখ্যা ছিল দুই কোটি সত্তর লক্ষ সাতাশি হাযার ছয় শত পাঁচাশিজন। তন্মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল প্রায় আট লক্ষ)।

কিন্তু যেই সকল দেশে য়ূরোপীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত সঠিক আদমশুমারীর পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না, যখন আমরা সেই সকল দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান নির্ণয়ের চেষ্টা করি, তখন সেই সকল দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কিত পরিসংখ্যানের যথার্থতা আরও অধিক সংশয়ের ব্যাপারে পরিণত হয়। খৃস্টান মিশনারীদের অনুমান মুতাবিক ইরানের মোট জনসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষের মধ্যে মাত্র পাঁচ লক্ষ ছাড়া সকলেই ছিল মুসলিম [১৯৬০ খৃ. পরিচালিত আদমশুমারির হিসাব মুতাবিক সেই দেশের জনসংখ্যা ছিল দুই কোটিরও (১৯৬৬ খৃ., ২,৫৭,৮১,০০০, E. I.[2], IV. 177) অধিক। উহার আটানব্বই শতাংশই ছিল মুসলিম]। আফগানিস্তানের মুসলিম জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক চল্লিশ লক্ষ (বর্তমানে (?) সেই দেশের লোকসংখ্যা আনুমানিক এক কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ চুরাশি হাযার। উহার নিরানব্বই শতাংশই হইতেছে মুসলমান)।

চীন দেশের মুসলিমদের সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা করেন সর্বপ্রথমে পাশ্চাত্য পণ্ডিত Broomhall ও d'Ollone প্রথমোক্ত ব্যক্তি সেই দেশের মুসিলম জনসংখ্যা চুরাশি লক্ষ একুশ হাযার বলিয়া বর্ণনা করেন (Islam in China, পৃ. ২১৫)। পক্ষান্তরে শেষোক্ত ব্যক্তি সেই দেশের মুসলিম জনসংখ্যা বর্ণনা করেন মাত্র চল্লিশ লক্ষ বলিয়া (Recherches Sur les Musulmans Chinoi, পৃ. ৪৩০)। (শুধু ১৯৪৮ খৃ. নির্ধারিত আনুমানিক হিসাব মুতাবিক আধুনিক চীনের বর্তমান জনসংখ্যা নির্ণয়ের বিষয়টি কিয়ৎ পরিমাণ বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। চীনের যেই অংশটি Chung Iwamin Kow নামে অভিহিত হইত, উহা বর্তমানে কয়েক ভাগে অর্থাৎ কোয়েমন টাং চীন, সোভিয়েম চীন, সোভিয়েত মাঞ্চুরিয়া, সোভিয়েত আন্তর মঙ্গোলিয়া ও সোভিয়েত সিংকিয়াং-এ বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। সমগ্র চীনের মোট জনসংখ্যা ছেচল্লিশ কোটি চৌত্রিশ লক্ষ তিরানব্বই হাযার। তন্মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা পাঁচ শতাংশ অর্থাৎ দুই কোটি একত্রিশ লক্ষ। মূল চীন ভূখণ্ডে আঠারটি প্রদেশ রহিয়াছে। সিংকিয়াং ও চারফাই প্রদেশদ্বয় উহার অন্তর্ভুক্ত নহে। মূল চীনের মোট জনসংখ্যা চল্লিশ কোটি। তন্মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় দুই কোটি)। চীনের মুসলিম জনসংখ্যার উপরিউক্ত হিসাব ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রদত্ত অতিরঞ্জনমূলক বিভিন্ন হিসাব যাহাতে মুসলিমদের সংখ্যা দুই কোটি, তিন কোটি, এমন কি সাত কোটি পর্যন্ত বর্ণনা করা হইয়াছে ইহাদের মধ্যে বিরাট অমিল রহিয়াছে, কিন্তু কোনও কোনও খৃস্টান মিশনারীর ধারণা এই যে, চীনের মুসলিম জনসংখ্যা সম্পর্কিত বর্তমান বিভিন্ন ধারণা উহার প্রকৃত মুসলিম জনসংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। সে যাহা হউক, বর্তমানে চীনের মোট জনসংখ্যা ও উহার মুসলিম জনসংখ্যা—এতদুভয়ের আনুপাতিক হার যাহাই হউক না কেন—এইরূপ বিশ্বাস করা যুক্তিসংগত হইবে যে, চীনের মুসলিমদের কতগুলি বিদ্রোহ দমন করিবার উদ্দেশে তাহাদের উপর যে গণহত্যা চালান হয়, উহার পূর্বে সেই দেশে তাহাদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। উল্লেখ্য যে, উক্ত গণহত্যায় লক্ষ লক্ষ মুসলিম নিহত হয়। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক d'Ollone তাঁহার গ্রন্থে উহার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন (পূ. গ্র., পৃ. ৪৩৬)। তিব্বতের মুসলিম জনসংখ্যা আটাশ হাযার পাঁচ শত বলিয়া ধারণা করা হইয়া থাকে। ইহাদের অধিকাংশই আসিয়াছে চীন ও কাশ্মীর হইতে। ইহাদের কিয়দংশ হইতেছে

স্থানীয় নও মুসলিম ও তাহাদের বংশধরগণ। জাপানে খুব অল্প সংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। তাহাও আবার সাম্প্রতিক কয়েক বৎসরে। জাপানের মুসলিম জনসংখ্যা দুই শতের (?) অধিক নহে; কিন্তু ফরমোজায় তাহাদের সংখ্যা হইবে প্রায় পঁচিশ হাযার পাঁচ শত।

মুসলিম জাহানের প্রাচীনতম অংশের উত্তরাঞ্চল (ইরাক, তুরস্ক, সিরিয়া, জর্দান, লেবানন, ফিলিস্তীন প্রভৃতি রাষ্ট্রসমূহ) এর মুসলিম জনসংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্নরূপ আনুমানিক হিসাব প্রকাশ করা হইয়া থাকে। Hartmann কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব মুতাবিক উক্ত অঞ্চলের মুসলিম জনসংখ্যা এক কোটি এগার লক্ষ নব্বই হাযার। পক্ষান্তরে Zwemer কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব মুতাবিক উক্ত অঞ্চলের মুসলিম জনসংখ্যা এক কোটি বাইশ লক্ষ আটাত্তর হাযার আট শত। কিন্তু আদমশুমারী যথার্থ ও রীতিসিদ্ধ না হওয়ায় জনসংখ্যা সম্পর্কিত সঠিক পরিসংখ্যান নাই। ফলে উক্ত হিসাবগুলিকে নিছক আনুমানিক হিসাবই মনে করা উচিত (V. A. de la Jonquiere, Histoire del'empire Ottoman, প্যারিস ১৯১৪ খৃ., পৃ. ৪৫৭ প.)।

এশিয়ার পরে আফ্রিকা মহাদেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক মুসলিম রহিয়াছে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা জানিবার জন্য প্রয়োজনীয় নির্ভুল তথ্য ও উপকরণের অভাব রহিয়াছে। উক্ত মহাদেশের মুসলিম জনসংখ্যা সাম্প্রতিক তথ্যাদির ভিত্তিতে চারি কোটি বিশ লক্ষ হইতে সাত কোটি ষাট লক্ষ পর্যন্ত বলিয়া অনুমান করা হয়। অধ্যাপক D. Westermann এই বিষয়ে একটি জরীপ চালান। উক্ত জরীপের ভিত্তিতে তিনি আফ্রিকা মহাদেশের মোট মুসলিম জনসংখ্যা চারি কোটি বিশ লক্ষ উনচল্লিশ হাযার তিন শত উনপঞ্চাশ জন বলিয়া বর্ণনা করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Zwemer তাঁহার উক্ত বর্ণনাকে নিম্নোক্ত বিস্তারিত বিবরণ সহকারে গ্রহণ করেন।

আবিসিনিয়ায় পাঁচ লক্ষ, মিসরে এক কোটি দুই লক্ষ উনসত্তর হাযার চারি শত পঁয়তাল্লিশ জন এবং লাইবেরিয়ায় দুই লক্ষ আশি হাযার। উক্ত মহাদেশের অবশিষ্টাংশ এক কালে য়ূরোপের কোনও না কোনও শক্তির শাসনাধীন ছিল। কিন্তু উক্ত বিশাল ভূখণ্ডের অধিকাংশ অঞ্চলের জনসংখ্যা সম্পর্কিত কোনও নির্ভুল তথ্য ও পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। বিভিন্ন য়ূরোপীয় শক্তির শাসনাধীন বিভিন্ন দেশের মুসলিম জনসংখ্যার আনুমানিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ

বেলজিয়াম শাসিত অঞ্চলে ষাট হাযার; ফ্রান্স শাসিত অঞ্চলে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পঁচাশি হাযার। জার্মানী শাসিত অঞ্চলে চৌদ্দ লক্ষ আশি হাযার; গ্রেট বৃটেন শাসিত অঞ্চলে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ উনচল্লিশ হাযার নয় শত চারিজন; ইটালী শাসিত অঞ্চলে তের লক্ষ পঁয়ষট্টি হাযার; পর্তুগাল শাসিত অঞ্চলে তিন লক্ষ ত্রিশ হাযার এবং স্পেন শাসিত অঞ্চলে এক লক্ষ ত্রিশ হাযার। উক্ত পরিসংখ্যান যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমানভিত্তিক, তথাপি যেই সকল দেশের প্রায় সকল অধিবাসী মুসলমান, (যেমন মরক্কো; উহার মোট জনসংখ্যা বত্রিশ লক্ষ বিশ হাযার-এর মধ্যে একত্রিশ লক্ষই হইতেছে মুসলিম) সেই সকল দেশের ক্ষেত্রে এবং যেই সকল দেশের জনসংখ্যার সমুদয় অংশই নও মুসলিম, যেমন হাওয়া (Hausas) ও ফুল্বে (Fulbe) অঞ্চলদ্বয়–সেই সকল দেশের ক্ষেত্রে উক্ত পরিসংখ্যানের উপর অধিক পরিমাণে বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। আফ্রিকা মহাদেশে ইসলাম এখনও মুশ্‌রিক গোত্রসমূহে প্রচারিত হইতেছে এবং প্রতি বৎসর সেই সকল গোত্রের বিপুল সংখ্যক লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে।

ইসলামের চরম উন্নতির যুগে ইসলামী স্পেনের মুসলিম জনসংখ্যা কত ছিল তাহা অনুমান করিয়াও বলা সম্ভব নহে। তবে ১৪৯২ খৃ. সে দেশের য়াহূদী ও মুসলিমদের মোট জনসংখ্যা ছিল বিশ লক্ষের কিছু অধিক এবং ১৬০৯ ও ১৬১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে যখন সম্রাট তৃতীয় ফিলিপ অবশিষ্ট 'আরবদেরকে সেই দেশ হইত নির্বাসিত করিয়া দেন তখন তাহাদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক পাঁচ লক্ষের কাছাকাছি (H.C. Lea, The Moriscos of Spain, পৃ. ৩৫৯, লন্ডন ১৯০৯ খৃ.)।

বর্তমানে য়ূরোপে মুসলিমদের প্রায় সমগ্র জনসংখ্যাই সোভিয়েত রাশিয়ার য়ূরোপীয় অংশের মধ্যে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে য়ূরোপের যে অংশ তুরস্কের শাসনাধীন ছিল, সেই অংশের মধ্যে মুসলমানদের বসবাস ঘনত্ব ((Population Density) সন্নিহিত দেখা। সোভিয়েত রাশিয়ার য়ূরোপীয় অংশের মোট মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ। কিন্তু ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের পর রাশিয়ায় কোনও ধর্মীয় আদমশুমারী হয় নাই। সেই দেশের মুসলিমগণ সাধারণভাবে তাতারী বংশোদ্ভূত। তবে Finn অঞ্চলের গোত্রসমূহ যেমন Cheremss, Votiiaks ও Chuvash গোত্রসমূহের লোকেরাও বিপুল সংখ্যায় ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯০৫ খৃ. ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতি ঘোষিত হইবার পর বিপুল সংখ্যক লোক ধর্মমত পরিবর্তন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করে। বলকান উপদ্বীপের মোট জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক পরিসংখ্যান সংশয়াচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই বিষয়ে এমন কি সরকারী হিসাবের উপরও এই কারণে সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করা যায় না যে, সেখানে কোনও রাজনৈতিক অথবা গোষ্ঠীগত স্বার্থে উক্ত পরিসংখ্যান রদবদল ঘটান হইয়াছে বলিয়া আশংকা রহিয়াছে।

য়ূরোপের তুরস্ক শাসিত অংশে ১৯০০ খৃ. মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় বত্রিশ লক্ষ ছিল বলিয়া অনুমিত হইত। পাশ্চাত্য লেখক Hartmann ১৯০৯ খৃ. উক্ত সংখ্যা বত্রিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাযার বলিয়া বর্ণনা করেন। বুলগেরিয়ার মোট জনসংখ্যা প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ তিন হাযার আট শত ছিয়াত্তর জন। রুমানিয়ার মুসলিমদের সংখ্যা ছিল প্রায় তেতাল্লিশ হাযার সাত শত জন। ইহারা প্রধানত Dobrudja অঞ্চলে বসবাস করে। ১৯১০ খৃ. সাইবেরিয়াতে চৌদ্দ হাযার চার শত পঁয়ত্রিশ জন এবং মন্টেনিগ্রো (Montenegro)-তে চৌদ্দ হাযার মুসলমান ছিল। আলবেনিয়ার মোট মুসলিম জনসংখ্যা তিন লক্ষ চৌত্রিশ হাযার ছিল বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহাদের মধ্যে বার হাযার ছিল যাযাবর বেদুঈন, চল্লিশ হাযার ছিল সার্ব (Serb) গোত্রীয় এবং ছাব্বিশ হাযার ছিল আলবেনীয় বংশোদ্ভূত। গ্রীসে এখনও চব্বিশ হাযার (?) মুসলিম রহিয়াছে। কিন্তু ক্রীট (Crete) দ্বীপে তাহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইতে পাইতে সাতাশ হাযার আট শত বায়ান্নতে নামিয়া আসিয়াছে। ১৯০৯ খৃ. দ্বীপটিতে তেত্রিশ হাযার চারি শত ছিয়ানব্বই জন এবং ১৮৮১ খৃ. তিহাত্তর হাযারের অধিক মুসলিম ছিল। Bosnia ও Herzegovina অঞ্চলদ্বয়ে স্থানীয় Serb গোত্রীয় অধিবাসীদের মধ্যে ছয় লক্ষ বার হাযার এক শত সাইত্রিশ জন মুসলিমও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। অস্ট্রিয়ার অবশিষ্ট অঞ্চলে আরও প্রায় এক হাযার চারি শত পঞ্চাশ জন

মুসলমান রহিয়াছে। য়ূরোপের অন্যান্য দেশে, বিশেষত ফ্রান্স ও বৃটেনে মুসলিমদের এক কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী বাস করিত। ইহাদের অধিকাংশই এশীয় অথবা আফ্রিকীয় বংশোদ্ভূত। এই সকল দেশে ইহারা অস্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে।

দেশত্যাগ ও বাণিজ্যিক তৎপরতার ফলে উত্তর আমেরিকায় আট হাযার এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় এক লক্ষ ছেষট্টি হাযার মুসলিম বাস করে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জও যাহার অন্তর্ভুক্ত (ত্রিনিদাদে দশ হাযার চারি শত উনপঞ্চাশ জন এবং জামাইকায় তিন হাযার)। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে এক লক্ষ পঁচানব্বই হাযার মুসলিম রহিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই Perth অঞ্চলে বসবাস করে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) বিশ্বের মুসলিমদের সামগ্রিক সংখ্যার বর্ণনার প্রথম প্রচেষ্টা চালান Hubert Jansen, Verbreitung des Islams in den Verschiedenen Landern der Erde, বার্লিন ১৮৯৭ খৃ.; (২) মু'তামার-ই 'আলাম-ই ইসলামী কর্তৃক প্রকাশিত World Muslim Gazetteer নামীয় গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্য মুতাবিক বিশ্বের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মোট মুসলিম জনসংখ্যা (প্রবন্ধটির রচনাকালে) হইতেছে বিয়াল্লিশ কোটি বিশ লক্ষ তিরানব্বই হাযার নয় শত ছেষট্টিজন। অর্ধস্বাধীন ও পরাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মোট মুসলিম জনসংখ্যা হইতেছে পাঁচ কোটি সাতাশ লক্ষ বায়ান্ন হাযার আট শত নব্বই জন। অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহে তাহাদের সংখ্যা হইতেছে সতের কোটি একুশ লক্ষ চৌষট্টি হাযার দুই শত দুই জন। দেখা যাইতেছে–সমগ্র বিশ্বের মোট মুসলিম জনসংখ্যা চৌষট্টি কোটি সত্তর লক্ষ এগার হাযার আটাশি জন। বিস্তারিত বিবরণ জানিবার জন্য দেখুন। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫৫৬-৫৬৩; (৩) Martin Hartmann, Der Islam : Geshichte_Glaube_Recht, লাইপযিগ ১৯০৯ খৃ.; উক্ত গ্রন্থে মুসলিম জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু তথ্যাদির সূত্র উহাতে উল্লিখিত হয় নাই; (৪) S. M. Zwemer, Mohemmed or Christ, ৩য় পরিচ্ছেদ, লন্ডন ১৯১৬ খৃ.; উক্ত গ্রন্থে তথ্যাবলীর সূত্রসহ মুসলিম জাহানের জনসংখ্যার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। (৫) M. Broomhall, Islam in China, লন্ডন ১৯১০ খৃ.; উক্ত গ্রন্থে মুসলিম জাহানের কোনও কোনও অংশের জনসংখ্যা বিষয়ে পৃথক পৃথক পর্যালোচনা করা হইয়াছে; (৬) S. Bobrovinkoff, Moslems in Russia, ÈThe Moslem World' সাময়িকীতে প্রকাশিত, ১খ, লন্ডন ১৯১১ খৃ.; (৭) D. Westermann, Der Islam in West-undzentral-Suden, ÈDie Welt des Islams' সাময়িকীতে প্রকাশিত, ১খ, ৮৫ প., বার্লিন ১৯১৩ খৃ.; (৮) G. Kampffmeyer, Statistik der Mohammedener auf der Balkanhaibinsel und in Osterreich, (পৃ. গ্র., ১খ, ৩২-৩৩); আফ্রিকা ও এশিয়ার মুসলিম জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি জানিবার জন্য দেখুন ঃ (৯) The Mohamamedan World of Today, নিউ ইয়র্ক, ১৯০৬ খৃ.; বৃটিশ ও ওলন্দায সরকারদ্বয় প্রতি দশক অন্তরে প্রকাশিত তাহাদের বিবরণী পুস্তকাবলীতে স্ব স্ব শাসনাধীন দেশসমূহে ইসলাম প্রচারের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন; (১০) The Census of India; (11) Koloniaal Verslag: (১২) The States-man's Year Book-যাহা লন্ডন হইতে প্রতি বৎসর প্রকাশিত হইয়া থাকে—গ্রন্থে জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক হিসাব ও পরিসংখ্যান প্রদত্ত হইয়া থাকে: (১৩) Revue du Monde Musulman গ্রন্থের কতগুলি নিবন্ধে কতক মুসলিম রাষ্ট্রের জনসংখ্যা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে; দেখুন ঃ Index general des volumes I a XVI. (প্যারিস ১৯১২ খৃ.), পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের সঠিক সংখ্যা জানিবার জন্য দেখুন ঃ (১৪) Harry W. Hazaid, Atlas of Islamic History. প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ১৯৫১ খৃ.; (১৫) The Statesman's Year Book ১৯৬৪-১৯৬৫ খৃ.।

T. W. Arnold (দা. মা. ই.)/মু. মাজহারুল হক

পৃথিবীর সকল দেশের সকল প্রান্তে মুসলিমগণ বাস করে। যদি আমরা পৃথিবীর মানচিত্রের উপর চোখ বুলাই, তবে দেখিতে পাইব যে, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশদ্বয়ের বিরাট অংশের অধিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হইতেছে মুসলিম। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে বিভক্ত উক্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডটি অর্থাৎ মরক্কো হইতে সোমালিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত তাঞ্জানিয়া ছাড়া সমগ্র উত্তর ও মধ্যআফ্রিকা এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীর হইতে সিংকিয়াং পর্যন্ত বিস্তৃত বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া ছাড়া সমগ্র পশ্চিম ও উত্তর এশিয়া—ভৌগোলিক দিক দিয়া পরস্পর সংযুক্ত রহিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও এইরূপ কোন দেশ পাওয়া যায় না, যেখানে কম-বেশী মুসলিম নাই। এই সকল দেশের কোনও কোনটিতে মুসলিমগণ দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এবং কোনও কোনটিতে সেইরূপ না হইলেও তাহারা দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্থান অধিকার করিয়া আছে।

রাজনৈতিক দিক দিয়া মুসলিম-অধ্যুষিত দেশগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ (১) স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ; (২) অর্ধস্বাধীন মুসলিম দেশসমূহ এবং অমুসলিম শক্তির শাসনাধীন মুসলিম দেশসমূহ; (৩) অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম, সংখ্যালঘু হিসাবে।

স্বতন্ত্রভাবে পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রের মুসলিম জনসংখ্যার সঠিক হিসাব অথবা সমগ্র বিশ্বের মোট মুসলিম জনসংখ্যার সঠিক হিসাব পেশ করা অত্যন্ত কঠিন। পৃথিবীতে এইরূপ অনেক অঞ্চল রহিয়াছে, যেখানে আজ পর্যন্ত আদৌ কোনও আদমশুমারী হয় নাই। আবার এইরূপ কিছু অঞ্চলও রহিয়াছে, যেখানে লোকেরা স্থায়ীভাবে বসবাস না করিয়া বরং যাযাবর জীবন যাপন করে। আবার অধিকাংশ দেশে অমুসলিম সরকার অথবা সংস্থা কর্তৃক আদমশুমারীকার্য সম্পদিত হইয়াছে। এইরূপ আদমশুমারীতে তাহাদের ধর্মীয় জাতিগত সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা সক্রিয় থাকায় উহাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করা কঠিন। আবার য়ূরোপ-আমেরিকায় সম্পাদিত আদমশুমারীতে অনেক সময় বর্ণ ও লিঙ্গের ভিত্তিতে জনসংখ্যা বিষয়ক পরিসংখ্যান প্রস্তুত করণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইলেও উহাতে ধর্মীয় ভিত্তিতে জনসংখ্যার পরিসংখ্যান প্রস্তুত হয় না। অতএব এই সকল দেশের মুসলিমদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা মোটেই সহজ নহে। "মু'তামার আল-'আলাম আল-ইসলামী" নামক মক্কাভিত্তিক একটি সংস্থার প্রচেষ্টায় বহু পূর্বে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলিম জনসংখ্যার একটি পূর্ণ হিসাব প্রস্তুত হইয়াছিল (দেখুন ঃ World Muslim Gazetteer, করাচী ১৯৬৫ খৃ.)। মু'তামার আল-'আলাম আল-ইসলামী সংস্থার পাকিস্তান শাখা (World Muslim Gazetteer, 1985 edition. করাচী) বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মুসলিম জনসংখ্যার নিম্নোক্ত হিসাব প্রচার করিয়াছেঃ

(১) স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ

| দেশের নাম | মোট মুসলিম জনসংখ্যা | মোট জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ মুসলিম |
|---|---|---|
| আইভরিকোস্ট | ৫১,০০,২৪২ | ৫৫ |
| আপার ভোলটা (বোরকিনা ফাস্সো) | ৩৬,৭৮,৬৪০ | ৫৬ |
| আফগানিস্তান | ১,৪০,৩৫,২৩০ | ৯৯ |
| আলজেরিয়া | ২,০৮,৭৪,০০০ | ৯৮ |
| আলবেনিয়া | ২২,৭৬,৮০০ | ৮০ |
| ইউনাইটেড 'আরব আমীরাত | ১৩,৭৪,০০০ | ১০০ |
| ইন্দোনেশিয়া | ১৪,৯২,০৮,৩০০ | ৯০ |
| ইরাক | ১,৩৭,৮৩,৫৫০ | ৯৫ |
| ইরান | ৪,১৬,৪০,২০০ | ৯৮ |
| ওমান ('উমান) | ৯,৭৮,০০০ | ১০০ |
| কাতার | ২,৬৭,০০০ | ১০০ |
| কুয়েত | ১৬,৫২,০০০ | ১০০ |
| কমোরোস (Comoros) | ৩,৫৩,৬০০ | ৮০ |
| ক্যামেরুন | ৪৬,২৫,৫০০ | ৫০ |
| গাম্বিয়া (Gambia- جامبيا) | ৫,৯৫,০০০ | ৮৫ |
| গিনি (Guinea) | ৫১,৫৮,৫০০ | ৯৫ |
| গিনিবিসাও | ৫,৭৮,৯০০ | ৭০ |
| জর্দান | ৩৩,২৫,০০০ | ৯৫ |
| জিবুতি | ৩,০৯,৬৮০ | ৯৮ |
| তানযানিয়া (তাঞ্জানিয়া) | ১,৪৩,৬৬,৮০০ | ৭০ |
| তিউনিসিয়া | ৬৮,০৯,৪০০ | ৯৭ |
| তুরস্ক | ৪,৮৬,৬৩,৪৫০ | ৯৯ |
| তোগো | ১৫,৬০,৯০০ | ৫৫ |
| নাইজার | ৫৭,৭৮,৮৫০ | ৯৫ |
| নাইজেরিয়া | ৬,৩৯,১৪,২৫০ | ৭৫ |
| পাকিস্তান | ৯,৪৩,৮১,০০০ | ৯৫ |
| বাংলাদেশ | ৮,৩০,২৩,৫৪০ | ৮৬ |
| বাহরায়ন | ৩,৮৯,০৭০ | ৯৯ |
| বোনন | ১৮,৯৬,০০০ | ৫০ |
| ব্রুনাই | ১,৫৬,৭৫০ | ৭৫ |
| মরক্কো | ২,২৬,৬০,১১০ | ৯৯ |
| মালদ্বীপ | ১,৬৮,০০০ | ১০০ |
| মালাবিঃ | ৩৩,০৬,০০০ | ৫০ |
| মালয়েশিয়া | ৮০,৯৭,৩০০ | ৫৪ |
| মালি | ৬৮,৯২,৬৪০ | ৯২ |
| মিসর | ৪,২১,৪৪,২৮০ | ৯২ |
| মোযাম্বিক | ৭৮,২৮,২০০ | ৬০ |
| মৌরিতানিয়া | ১৫,৯১,০০০ | ১০০ |
| য়ামান | ৮৪,১৫,০০০ | ৯৯ |
| দক্ষিণ য়ামান | ১৯,৮১,৭০০ | ৯৫ |
| লিবিয়া | ৩৫,০০,০০০ | ১০০ |
| লেবানন | ১৮,১৮,৬০০ | ৭০ |
| শাদ (চাদ) | ৩৯,৯২,০০০ | ৮০ |
| সাঊদী 'আরাব | ১,০৪,৪৩,০০০ | ১০০ |
| সিয়েরা লিওন | ২৫,৯৩,৫০০ | ৭০ |
| সিরিয়া | ৮৪,৩৯,০০০ | ৮৭ |
| সুদান | ১,৭৪,৫৮,১৫০ | ৮৫ |
| সেনেগাল | ৬১,৪৪,৯৫০ | ৯৭ |
| সোমালিয়া | ৬২,৪৮,০০০ | ১০০ |

(২) অর্ধ স্বাধীন মুসলিম দেশসমূহ ও অমুসলিম শক্তির শাসনাধীন মুসলিম দেশসমূহঃ (এই হিসাব World Muslim Gazetteer, 1965 edition, হইতে গৃহীত)

| | | |
|---|---|---|
| আযারবায়জান (সোভিয়েট রাশিয়ার অধীন) | ৩৩,০০,৯৬০ | ৭৮ |
| ইথিওপিয়া (ইরিত্রিয়াসহ) [পূ. গ্র. ১৯৮৫ সং] (খৃস্টান সম্প্রদায় শাসিত) | ২,৩১,০৫,৬০০ | ৭০ |
| ইফেনী (স্পেনের শাসনাধীন) | ৪৫,০০০ | ৯০ |
| উয্বেকিস্তান (সোভিয়েট রাশিয়ার অধীন) | ৮৩,৫৫,৬০০ | ৮৮ |
| কাযাকিস্তান (সোভিয়েত রাশিয়ার অধীন) | ৭৬,৬১,৫৬০ | ৬৮ |
| কারগীযিয়াহ (সোভিয়েত রাশিয়ার অধীন) | ২১,৬৮,৬৮০ | ৯২ |
| কাশ্মীর (ভারত অধিকৃত) | ৩৯,০০,০০০ | ৭৮ |
| তাজাকিস্তান (সোভিয়েত রাশিয়ার অধীন) | ২২,২১,৬৬০ | ৯৮ |
| তুর্কমেনিয়া (সোভিয়েত রাশিয়ার অধীন) | ১৫,৬৮,৭০০ | ৯০ |
| সিংকিয়াং (চীনের শাসনাধীন) | ৪৬,২৪,৮০০ | ৮২ |

এতদ্ব্যতীত অমুসলিম দেশসমূহে বসবাসরত মুসলিমদের সংখ্যা চল্লিশ কোটি (World Muslim Gazettecr, Motamar al-Alam al-Islami, 1985 edition, Karachi, p. 895) বলিয়া কথিত হয় (দ্র. মু'তামার কর্তৃক প্রকাশিত A Profile of Muslim Minorities)।

মু'তামার আল-'আলাম আল-ইসলামী করাচী কর্তৃক পরিবেশিত অতি সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের মোট মুসলিম জনসংখ্যা হইতেছে ১১৭,৪৩,৩৭,৬৮২ (World Muslim Gazetteer, 1985 edition)। কিন্তু যদি সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা নির্ণয়ের উদ্দেশে বিশ্বস্ততার সহিত আদমশুমারী করা হয়, তবে নিশ্চয় সমগ্র বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যা উক্ত সংখ্যা অপেক্ষা আরও অধিক হইবে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ নিবন্ধ গর্ভে বরাত উল্লিখিত হইয়াছে।

ই.বি. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংশোধিত (দা.মা.ই.)/মু. মাজহারুল হক

**ইসলাম** (اسلام) ঃ ইসলাম শব্দের মূল, উহার অর্থ ও অর্থের ক্রমবিকাশের ধারা ঃ

(১) 'ইসলাম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সহিত উহার শারী'আতী পারিভাষিক অর্থের সম্পর্ক বিষয়ে বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে।

(ক) মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত দীনকে "ইসলাম" নামে অভিহিতকরণ বিষয়ে একটি ভূমিকা 'ইসলাম' শব্দের বিভিন্ন শারী'আতী ও পারিভাষিক অর্থ ও উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থসমূহের সহিত শারী'আতী ও পারিভাষিক অর্থসমূহের সম্পর্কের বিষয়; (খ) 'ইসলাম' শব্দের শারী'আতী ও পারিভাষিক অর্থের সহিত উহার যেই সকল ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সংযোগ বিদ্যমান সেইগুলি সম্পর্কে আলোচনা এবং মুসলিম 'আলিমদের এই সকল বিষয়ে বিভিন্ন অভিমতের উপর একটি সাধারণ সমীক্ষা; উপরন্তু এতদ্বিষয়ে ইমাম রাযী প্রদত্ত বর্ণনা; (গ) আধুনিক কালের 'আলিমগণের বিভিন্ন মতামত ও উহাদের পর্যালোচনা (এতদ্বিষয়ে প্রাচ্যবিদ কয়েকজন আধুনিক পণ্ডিত, যেমন Goldzher, Arnold, Babinger, সায়্যিদ আমীর আলী, এডওয়ার্ড সেল; কারা দ্যা বো-এর মতামতের বিচার)।

(ক) মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) [মক্কায় জ. ৫৭১ (কিন্তু সাধারণ্যে ৫৭০ খৃ. প্রসিদ্ধ), মদীনায় মৃ. ৬৩২ খৃ.] ইব্ন 'আবদিল্লাহ যে দীন লইয়া আসিয়াছিলেন উহা প্রথম হইতেই 'ইসলাম' নামে অভিহিত। লিসানু'ল-'আরাব অভিধান গ্রন্থ অনুসারে উহা 'আস-সিল্ম' ও 'আস-সাল্ম' এই দুই মূল ধাতু (মাদ্দা) হইতে উদ্ভূত। উক্ত নাম তিনটি ধাতু ও পদ উভয় দিক দিয়াই 'আরবী শব্দ; উহাদের কয়েকটি অর্থ রহিয়াছে, যেই অর্থগুলির ভিত্তি উহাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কুরআন ও হাদীছ উক্ত শব্দ তিনটিকে 'দীন ইসলাম' অর্থে ব্যবহার করিবার কালে নিশ্চয় উহাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে প্রয়োজনে সামান্য পরিবর্তন সাধিত হয়। যে সকল শব্দ শারী'আতে তৎসম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, মুসলিম 'আলিমগণ উহাদেরকে 'শারী'আতী, পারিভাষিক' বা 'শারী'আতী নাম' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। যেমন সালাত, যাকাত, হাজ্জ, ঈমান, কুফ্র ইত্যাদি। 'আলিমগণ কখনও কখনও বিশেষত 'আকীদা সম্পর্কিত বিষয়াবলীকে বুঝাইবার উদ্দেশে 'দীনী নাম' ব্যবহার করিয়া থাকেন, যেমন ঈমান, কুফ্র, ইসলাম ইত্যাদি। 'আলিমগণ উসূলে ফিক্হ গ্রন্থে এই বিষয়ে তাঁহাদের মতবিরোধেরও উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন মহানবী (স) 'আরবী ভাষাভাষীদের যে সকল শব্দ (যেমন সাওম, ঈমান ইত্যাদি) দীনী অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তিনি সেইগুলি কি কোন নূতন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন অথবা সেই অর্থের সহিত সম্পর্কিত রূপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন যেই রূপক অর্থ ভাষাভাষীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল? এই বিষয়ে কাদী আবূ বাক্র আল-বাকিল্লানী (মৃ. ৪০৪/১০১৩) প্রথমোক্ত অভিমতের প্রবক্তা এবং খারিজী ও মু'তাযিলা ফিরকা ও ফাকীহ্গণ শেষোক্ত অভিমতের প্রবক্তা। সায়ফু'দ-দীন আবু'ল-হাসান আল-আমিদী (মৃ. ৫৮৩/১১৮৬ (?) ১১৮৭) তাঁহার কিতাবু'ল-আহ্কাম ফী উসূলি'ল-ইহ্কাম গ্রন্থে এই বিষয়ে যে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন, উহার সারকথা এই যে, 'আলিমদের মতে শারী'আতে পরিভাষাসমূহের শারী'আতী অর্থ উহাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেই উদ্ভূত এবং উভয়বিধ অর্থের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

(খ) তাফসীরকারগণ, কালাম (দ্র.)-শাস্ত্রবিদগণ, অভিধানশাস্ত্রবিদগণ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ 'ইসলাম' শব্দের শারী'আতী অর্থের সহিত উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সম্পর্ক দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইমাম ফাখরু'দ-দীন রাযী (মৃ. ৬০৬/১২০৯) এতদ্বিষয়ক সকল অভিমতকে তাঁহার 'তাফসীরে কবীর' গ্রন্থে একত্রে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, ব্যুৎপত্তিগত দিক দিয়া ইসলাম শব্দের তিনটি ব্যাখ্যা হইতে পারে ঃ (১) 'ইসলাম' শব্দের অর্থ 'আনুগত্য পোষণ ও বশ্যতা স্বীকার'। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا.

"আর যদি কোনও ব্যক্তি তোমাদের প্রতি 'সালাম' (আনুগত্য প্রকাশ করে) নিবেদন করে তবে তোমরা তাহাকে বলিও না, তুমি মু'মিন নহ" (৪ ঃ ৯৪)।

(২) 'ইসলাম' শব্দের অর্থ সন্ধি ও মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করা (اَسْلَمَ— সে সন্ধি ও মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে, باب افعال হইতে গঠিত অনুরূপ [অকর্মক] ক্রিয়ার উদাহরণ ঃ اسنى— সে এক বৎসরের জন্য [কোথাও] অবস্থান করিয়াছে ; اقحط القوم। (অনাবৃষ্টির ফলে] জাতি দুর্ভিক্ষে পতিত হইয়াছে)। 'সাল্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা। (৩) ইব্নু'ল-আন্বারী (মৃ. ৩২৮/৯৩৮ (?), ৯৩৯) বলেন, 'মুসলিম' এইরূপ ব্যক্তি যে তাহার যাবতীয় 'ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে। سلم الشيء لفلان- 'সে বস্তুটিকে শুধু অমুকের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে' অর্থাৎ 'ইসলাম' শব্দের অর্থ দীন ও 'আকীদাকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করা (২খ, ৪৬৩, মাত্বাউল-খায়রিয়্যা, ১৩০৮ হি.)।

(গ) আধুনিক যুগের অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন যে, 'ইসলাম' শব্দটির অর্থ এখতিয়ার বহির্ভূত আনুগত্য অর্থাৎ এক পরাক্রমশালী ইচ্ছা (আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা)-র অনুগত ও বাধ্য হইয়া যাওয়া। Goldziher বলেন, ইসলাম শব্দের অর্থ সবিনয় ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্য অর্থাৎ মু'মিন কর্তৃক আল্লাহর প্রতি বিনীত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্য পোষণ করা। মহানবী (স) আল্লাহর সঙ্গে মু'মিনের যে 'বিশেষ সম্পর্ক' নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, উহাকে বুঝাইবার জন্য 'ইসলাম' শব্দটি অন্য যে কোনও শব্দ অপেক্ষা অধিক উপযোগী। উক্ত শব্দটির অর্থের মধ্যে এক অসীম কুদরতের প্রতি অনুগত হইবার অনুভূতির সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান রহিয়াছে। বস্তুত আল্লাহর সহিত মু'মিনের উক্ত 'বিশেষ সম্পর্কে'র দাবি এই যে, মানুষ নিজের যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতাকে বিসর্জন দিয়া সেই অসীম কুদরতের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে (Goldziher, Vorlesungen-ফরাসী অনু. La dogme et la loi de l'Islam, প্যারিস ১৯২০ খৃ., পৃ. ২)। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Arnold-ও তাঁহার এক নিবন্ধে অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Babinger তাঁহার গ্রন্থে ('আরবী অনু. আদ্য়ানু'ল-'আলাম) এই সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, উহা Goldziher-এর অভিমত হইতে তেমন অধিক পৃথক নহে। সর্বপ্রথমে সায়্যিদ আমীর 'আলী লক্ষ্য করেন যে, 'ইসলাম' শব্দের অর্থ যে আনুগত্য, এই সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত উহাকে এইরূপ এক ইচ্ছার প্রতি অন্ধ এখ্তিয়ার বহির্ভূত আনুগত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহার কুদ্রাত ও এখ্তিয়ার অসীম এবং যাহার অস্তিত্বের অবস্থার অন্য কাহারও কোনরূপ ইচ্ছা বা ইখ্তিয়ার থাকে না। ফলে তিনি তাঁহার The Spirit of Islam গ্রন্থে এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন যে, 'ইসলাম' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অথবা শারী'আতী কোনও অর্থের মধ্যেই এইরূপ অন্ধ ও এখ্তিয়ার বহির্ভূত

আনুগত্যের ভাব নিহিত নাই, যাহাতে আনুগত্যকারী বান্দার ইচ্ছা শক্তির কোনও স্বাধীনতা থাকে না। যেমন অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত উহার অর্থের মধ্যে এখ্‌তিয়ার বহির্ভূত আনুগত্যের ভাব নিহিত রহিয়াছে বলিয়া সাধারণত মনে করেন। সায়্যিদ আমীর 'আলীর মতে, 'ইসলাম' শব্দের শারী'আতী অর্থ হইল আত্মাকে পবিত্র করিবার মাধ্যমে সত্য পথ ও হিদায়াত লাভ করা এবং সাফল্য ও কল্যাণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্দেশে পরম সাধনা ও প্রচেষ্টা চালান। কুরআন মাজীদের ৭২ ঃ ১৪ ও ৯১ ঃ ৭-১০ আয়াতগুলি দ্বারা উহা প্রমাণিত হয়। কুরআন মজীদ 'আল্লাহকে সত্য মানিয়া লওয়া এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধকে মানিয়া চলাকেই 'ইসলাম' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে। ইবনু'ল-কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.) কর্তৃক রচিত মিফতাহু দারিস'স-সা'আদা গ্রন্থে (১খ, ৪০-৪২) উহাই বর্ণিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত এডওয়ার্ড সেল সায়্যিদ আমীর 'আলীর অভিমতের ব্যাখ্যায় যে বিভ্রান্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন, উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা তাহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে (এডওয়ার্ড সেল কর্তৃক ইসলাম বিষয়ে লিখিত নিবন্ধ দ্র. Encyclopaedia of Religions and Ethics, ৭খ.)। এডওয়ার্ড সেল এই ধারণা ব্যক্ত করেন যে, য়ূরোপীয় লেখকগণ 'ইসলাম' শব্দের অর্থের মধ্যে ব্যাপকতা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশে ইসলামের এই অর্থ করিয়াছেন, যাবতীয় 'আকীদা-বিশ্বাস ও হুকুম-আহ্‌কামের বিষয়ে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য। কারণ 'ইসলাম' সাধারণ আনুগত্য অপেক্ষা বিশেষ আনুগত্যের অর্থ প্রকাশ করে, যাহার প্রকৃত অর্থ হইতেছে শুধু আমল ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য।' তিনি তাঁহার উক্ত অভিমতের সপক্ষে সাক্ষ্য হিসেবে 'ইসলাম' হইতেছে 'সত্য পথ ও হিদায়াত লাভ করিবার নাম' সায়্যিদ আমীর 'আলীর এই উক্তিকে পেশ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি কুরআন মাজীদের যে সকল স্থানে 'ইসলাম' অথবা উহা হইতে গঠিত শব্দাবলী ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সকল স্থানে উহা দ্বারা 'শুধু আমল ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে আনুগত্য করা' অর্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি আরও দাবি করেন যে, বাহ্যত মনে হয় সকল তাফসীরকার এই বিষয়ে একমত যে, 'ইসলাম' শব্দকে 'আনুগত্য' অর্থে ব্যবহার করা উচিত। তিনি আরও দাবি করেন, প্রথমে নাযিলকৃত সূরাগুলিতে ইসলাম শব্দটি নাই। কুরআন মাজীদে মাত্র আটবার 'ইসলাম' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, ছয়বার হইয়াছে মাদানী সূরাসমূহে এবং মাত্র দুইবার শেষ দিকের মাক্কী সূরাসমূহে। উহার কারণ এই যে, রাসূল (স)-এর হিজরতের পর দীনকে একটি বাস্তব রূপ দান করিবার পরই দীনের 'আমালী বিধানসমূহ নিশ্চিতরূপে ঈমানের অংশরূপে বিবেচিত হইবার মর্যাদা লাভ করে। এডওয়ার্ড সেল-এর উক্ত ব্যাখ্যায় ইসলামের অর্থে আমল বা কার্য অধিক প্রাধান্য পায় বলিয়া আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য রহিয়াছে তাহা আর বিদ্যমান থাকে না। উক্ত ধারণায় য়াহূদীদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়; তাহাদের ধারণায় শারী'আতের অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উহার রূহ বা আত্মা নহে, বরং বাহ্য কর্তব্যসমূহের প্রাণহীন অনুশীলন ও প্রতিপালন। কিন্তু এডওয়ার্ড সেল-এর এই দাবি সত্য নহে যে, সায়্যিদ আমীর 'আলীর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি ইসলামকে শুধু কর্মক্ষেত্রে আনুগত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে করেন এবং অন্তরের আনুগত্যকে ইসলাম বহির্ভূত বিষয় বলিয়া মনে করেন। সায়্যিদ আমীর 'আলী রচিত দুইটি গ্রন্থের কোন গ্রন্থ হইতেই ইহা প্রমাণিত হয় না। কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত 'ইসলাম' শব্দের অর্থ 'শুধু বাহ্য বা দৈহিক আনুগত্য' বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য এডওয়ার্ড সেল-এর প্রচেষ্টা একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা বৈ কিছু নহে। কারণ ইহা মূলত ভিত্তিহীন একটি ধারণামাত্র। কুরআন মাজীদে 'ইসলাম' শব্দটি অথবা উহা হইতে গঠিত শব্দাবলী 'ঈমান' শব্দের মুকাবিলায় ও উহা হইতে ভিন্নার্থক শব্দ হিসাবে (অর্থাৎ ইসলাম অর্থ শুধু দৈহিক আমল এবং 'ঈমান অর্থ অন্তরের বিশ্বাস) ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র চারিটি স্থানে। আবু'ল-ফাদ্‌ল আহ্‌মাদ ইব্‌নু'ল-মুজাফ্‌ফার আর-রাযী আল-হানাফী ৬৩০/১২৩২ সনে রচিত তাঁহার 'হুজাজু'ল-কুরআন' গ্রন্থে ইহাদের সংখ্যা তিন বলিয়া নির্দেশ করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহাদের সংখ্যা চার। কারণ উক্ত গ্রন্থে কুরআন মাজীদের ৬৬ ঃ ৫ আয়াতটি উল্লিখিত হয় নাই।

কুরআন মাজীদের মাক্কী সূরাসমূহে 'ইসলাম' শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই, এডওয়ার্ড সেল-এর এই দাবি প্রমাণিত হয় নাই। কারণ কুরআন মাজীদের উনচল্লিশটি আয়াতে 'আস্‌লামা (اسلم) ক্রিয়া হইতে গঠিত اسم فاعل বা কর্তৃবাচক বিশেষ্য পদ (মুসলিম) ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে চব্বিশটি আয়াত হইতেছে মাক্কী সূরার এবং মাত্র পনরটি হইতেছে মাদানী সূরার। আবার মাক্কী সূরাগুলির কতগুলি একেবারেই প্রথম দিকে নাযিলকৃত সূরা, যেমন ঃ ৬৮ ঃ ৩৫ আয়াত; উক্ত সূরা কুরআন মাজীদ নাযিল হইবার ক্রম অনুসারে দ্বিতীয় সূরা। আল-ফিহ্‌রিস্ত গ্রন্থে নু'মান ইবন বাশীর-এর বর্ণনার বরাতে ইহা নির্দেশ করা হইয়াছে। আরও যেমন ঃ ৭২ ঃ ১৪ আয়াত; উক্ত সূরায় ইসলাম শব্দ হইতে গঠিত ক্রিয়া এবং اسم فاعل এই উভয়বিধ পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

'ইসলাম' শব্দটি ও উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে Carra de Vaux-এর নিজস্ব একটি অভিমত রহিয়াছে। তাহা হইল, "যাহারা হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর অনুসরণ করিত, তাহাদেরকে হানীফ বলা হইত। 'হানীফ' সেই ব্যক্তি যে কোনও দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। তাঁহার অনুসরণেও তিনি নিজে হানীফ ছিলেন এই কারণে যে, তাঁহারা সেই যুগে প্রচলিত মূর্তিপূজা হইতে বিরত থাকিয়া আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদতের প্রতি ঝুঁকিয়াছিলেন। তাঁহাদেরকে 'মুসলিম'-ও বলা হইত। 'মুসলিম' এইরূপ ব্যক্তি, যে নূতন কোনও বিষয় উদ্ভাবন করে অথবা উহার হিফাজত করে এবং উহাকে নিরাপদে রাখে। হযরত ইবরাহীম ('আ) অবিমিশ্রিত তাওহীদ-এর উদ্ভাবন করেন এবং উহাকে রক্ষা করেন। 'আল্লাহ তা'আলার নিকট 'আত্মসমর্পণকারী' 'মুসলিম' শব্দের এই অর্থ তাসাওউফশাস্ত্রে এত অধিক গভীরে চলিয়া গিয়াছে যে, উহাকে আর উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলিয়া নির্দেশ করা যায় না (Les Penseurs des Islam, মুফাক্কির ওয়া'ল-ইসলাম, ৩খ, ৫৫)। Carra de Vaux-এর উক্ত অভিমত আভিধানিক দিক দিয়া গ্রহণযোগ্য অভিমত নহে। কারণ 'ইসলাম' শব্দ অথবা উহা হইতে গঠিত কোন শব্দের ব্যাখ্যায় এইরূপ কোনও কথা পাওয়া যায় না, যাহা অভিধানশাস্ত্রের মূলনীতি ও শব্দ গঠনের সূত্রাবলীর দিক দিয়া উক্ত অভিমতকে সমর্থন করে। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ 'নূতন বিষয়ের উদ্ভাবন' অথবা 'উহার হিফাযত'— এইরূপ কোনও কথা আমাদের নিকট জ্ঞাত নহে, এমনকি باب افعال-এ ইহা হইতে গঠিত কোনও শব্দ এইরূপ বিশিষ্টার্থ (خاصية) প্রকাশ করে বলিয়াও আমাদের জানা নাই।

(খ) 'ইসলাম' শব্দের অর্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিমতের মধ্য হইতে অধিকতর সঠিক বলিয়া বিবেচিত অভিমতগুলির আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(১) 'সাল্ম' (سلم) শব্দমূলের বিভিন্ন ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে যে অর্থটি সকলের মূল, সেই অর্থটির আলোচনা এবং তৎসহ অন্যান্য ব্যুৎপত্তিগত অর্থেরও আলোচনা।

(২) 'ইসলাম' শব্দ ও উহা হইতে গঠিত শব্দাবলীর শারী'আতী অর্থের আলোচনা। উক্ত শারী'আতী অর্থ বিষয়ে মুসলিম মনীষীদের কয়েকটি অভিমত রহিয়াছে ঃ (ক) যাঁহারা মনে করেন যে, 'ইসলাম' শব্দের মাত্র একটি শারী'আতী অর্থ রহিয়াছে (আর উহা হইতেছে 'ঈমান') তাঁহাদের অভিমত। (খ) যাঁহাদের মতে 'ইসলাম' শব্দের দুইটি শারী'আতী অর্থ রহিয়াছে, তাঁহাদের অভিমত। (গ) যাঁহারা বলেন যে, 'ইসলাম' শব্দের তিনটি শারী'আতী অর্থ রহিয়াছে, তাঁহাদের অভিমত।

(৩) উক্ত মতভেদে বিভিন্ন ইসলামী মতাদর্শী জনগোষ্ঠী প্রভাব বিষয়ে বরং তাহাদের উক্ত মতভেদের উদ্যোক্তা হইবার বিষয়ে আলোচনা।

(৪) একটি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা যাহা মুসলিম মনীষীবৃন্দকে 'ইসলাম' শব্দের বিভিন্ন শারীআতী অর্থ উদ্ভাবন করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, উক্ত সমস্যার সমাধান ঃ কুরআন মাজীদের 'সাল্ম' শব্দমূল হইতে গঠিত বিভিন্ন শব্দ উক্ত শব্দমূলের ব্যুৎপত্তিগত মূল অর্থসমূহে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাদের কোনও কোনটি বিভিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে, তবে সেইগুলি 'সাল্ম' শব্দমূলের মূল ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সহিত সম্পৃক্ত।

(৫) 'ইসলাম' শব্দের শারী'আতী অর্থ যে অন্তরের একনিষ্ঠ বিশ্বাস তদ্বিষয়ে দলীল পেশ করা।

(৬) 'ইসলাম' শব্দের শারী'আতী অর্থসমূহে কি কি পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং উক্ত পরিবর্তনসমূহে পূর্ববর্তী শারী'আতী অর্থসমূহের কি প্রভাব পড়িয়াছে তদ্বিষয়ে আলোচনা।

অভিধানশাস্ত্রবিদগণ 'সাল্ম' শব্দমূল ও উহা হইতে গঠিত শব্দাবলীর বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, যদি কেহ মনোযোগ সহকারে উহা পাঠ করে এবং অর্থগুলির মধ্যে কোন্‌টি মূল অর্থ — যাহা হইতে অন্যান্য অর্থ উৎসারিত হইয়াছে— তাহা জানিবার চেষ্টা করে, তবে সে নির্ভরযোগ্য অভিধান গ্রন্থসমূহ (যেমন ইব্ন দুরায়দ রচিত কিতাবু'ল-ইশ্‌তিকাক; জাওহারী রচিত আস-সিহাহ; রাগিব ইস্‌ফাহানী রচিত আল-মুফরাদাত ফী গারীবি'ল-কুরআন; ইব্ন মান্‌জূর রচিত লিসানু'ল-'আরাব এবং আল-ফায়্যূমী রচিত আল-মিস্‌বাহু'ল-মুনীর) হইতে জানিতে পারিবে যে, সিল্ম (سلم) ও সালিম (سلم) শব্দদ্বয়ের অর্থ কঠিন প্রস্তর। কারণ উহা নরম হওয়া তথা বিগলিত হওয়া হইতে সালিম (سالم) বা নিরাপদে থাকে। ইহার একবচন সাল্‌মাতুন (سلمة) বা নিরাপদে থাকে। ইহার একবচন সাল্‌মাতুন (سلمة)। استلم فلان الحجر الاسود—'অমুক ব্যক্তি হাজার-ই আসওয়াদকে চুম্বন করিয়াছে'— এই বাক্যের অন্তর্গত استلم ক্রিয়াপদটি سلمة শব্দ হইতে গঠিত باب افتعال-এর অতীত কালবাচক ক্রিয়া পদ। এতদ্ব্যতীত সালাম (سلم) শব্দটির অর্থ— বাবলা জাতীয় এক প্রকারের বৃক্ষ (Acacia)। উহার পাতা কারাজ (قرظ) নামে পরিচিত। উহা চামড়া রং করিবার কার্যে ব্যবহৃত হয়। সালামুন শব্দের এক বচন সালামাতুন। বাবলা জাতীয় উক্ত বৃক্ষকে সালাম বলা হয় সম্ভবত এই কারণে যে, লোকেরা বিশ্বাস করিত যে, উক্ত বৃক্ষ বিপদাপদ ও রোগবালাই হইতে মুক্ত ও নিরাপদ (سليم) থাকে। উক্ত সালামুন শব্দ হইতেই সালামা (سلم) ও আসলামা (اسلم) ক্রিয়া পদদ্বয় গঠন করিয়া বলা হয় سلمت الجلد— আমি সালাম দ্বারা চামড়ার রং করিয়াছি এবং اسلمه— সালাম দ্বারা উহা রং কর।

উপরিউক্ত অর্থকেই 'সাল্ম' শব্দমূলের মূল অর্থ বলিয়া এবং উহার অন্যান্য অর্থকে উক্ত অর্থ হইতে উদ্ভূত বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কারণ উক্ত অর্থ দ্বারা যাহা বুঝান হয়, উহা জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। বলা আবশ্যক যে, জড় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহই বেদুঈন জীবনের অধিকতর নিকটবর্তী। তাই সাল্ম শব্দমূলের বিমূর্ত (Abstract) অর্থগুলিকে উহার উক্ত মূর্ত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থেরই মূল বলিয়া নির্দেশ করা উচিত। 'আরবগণ সাল্ম শব্দমূলের উক্ত মূল অর্থ হইতেই উহার অন্যান্য ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। উক্ত মূল অর্থ হইতেছে একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা, পবিত্রতা, উহার প্রাথমিক অর্থে এই সকল অর্থ উহা রহিয়াছে। উহার নব-সৃষ্ট ব্যুৎপত্তিগত অর্থগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) বাহ্য ও গোপন দোষ-ত্রুটি ও পাপাচার হইতে পবিত্র হওয়া বা পবিত্র থাকা। অভিধান গ্রন্থাবলীতে উল্লিখিত রহিয়াছে যে, سلم (সাল্ম), سلم (সিল্ম), سلم (সালাম) এই শব্দ পঞ্চকের سلام ও سلامة অর্থ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিপদ-আপদ হইতে মুক্ত থাকা।

(২) সন্ধি ও নিরাপত্তা। অভিধানশাস্ত্রবিদগণ বলেন, سلم (সাল্ম) ও سلم (সিল্ম)—এই উভয়রূপ উচ্চারণ শুদ্ধ। উহাদের অর্থ সন্ধি। উহারা سلم শব্দেরই ন্যায় পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ— উভয়ই হইতে পারে।

(৩) আনুগত্য ও বাধ্যতা। অভিধান গ্রন্থাবলীর বর্ণনানুসারে سلم ও سلم শব্দদ্বয়ের অর্থ استسلام-এরই ন্যায় আত্মসমর্পণ, আনুগত্য ও বাধ্যতা। অভিধানশাস্ত্রবিদ আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম গুণবাচক নাম سلم (শান্তি) এবং অভিবাদন ও দু'আ অর্থে ব্যবহৃত سلم এই উভয় শব্দের অর্থকে উহাদের মূল অর্থ বিপদ-আপদ ও বালা-মুসীবত হইতে নিরাপদ থাকা হইতে উদ্ভূত বলিয়া নির্দেশ করেন। আবার سلم-এর অর্থ 'আনুগত্য' ও বাধ্যতাকেও উক্ত মূল অর্থ বলিয়া নির্দেশ করা এবং উভয় অর্থের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কঠিন নহে। باب افعال হইতে গঠিত .... (আসলামা) ক্রিয়াপদটি অকর্মক ক্রিয়া ও সকর্মক ক্রিয়া—উভয় রূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অকর্মক ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইবার কালে উহার অর্থ হইবে সন্ধিতে ও আনুগত্যে প্রবেশ করা। 'আরবী ব্যাকারণবিদগণ বলেন, ..... ইহতে গঠিত অকর্মক ক্রিয়া পদ 'কোনও বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন اصبح-'সে প্রাতঃকালের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে'; اقحط। 'সে দুর্ভিক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে'; اعرق। 'সে ইরাকে প্রবেশ করিয়াছে।' পক্ষান্তরে اسلم। ক্রিয়া পদটি সকর্মক ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইবার কালে স্বভাবতই উহার সহিত কর্তৃ কারকের পদ ছাড়া কর্ম কারকের পদও থাকে। এইরূপ অবস্থায় الشيء لفلان। (সাল্লামা) سلم-এর অর্থ হইবে 'বিনা বিবাদেই উক্ত

বস্তুটি একমাত্র অমুক ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে', ক্রিয়া পদটির পূর্বে الف। যোগ হইয়া اسلم الشيء لفلان— যাহার অর্থ হইবে 'সে বস্তুটিকে একমাত্র অমুক ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে'। বলা অনাবশ্যক যে, اسلم ক্রিয়া পদটি سلم ক্রিয়া পদ হইতেই রূপান্তরিত হইয়া সকর্মক ক্রিয়া পদরূপে ব্যবহৃত হয়। এইরূপে تسليما (সাল্লামাহু)-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থও হইবে 'সে উহাকে একামাত্র তাহার (ভিন্ন ব্যক্তি) জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং সেই ব্যক্তি উহাকে তাহার জন্য সালিম বা নির্বিঘ্ন বানাইয়া দিয়াছে'। اسلام শব্দটি— যাহা اسلم ক্রিয়াপদের মাসদার (ক্রিয়ামূল) তাহা অকর্মক বা সকর্মক যাহাই হউক না কেন, উহার ক্রিয়া পদের অর্থের অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইবার উপযোগী।

উপরে সালম (سلم) শব্দমূল ও উহা হইতে গঠিত শব্দাবলীর যে সকল অর্থ বর্ণনা করা হইল উহারা উহাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। কু'রআন মাজীদের বহু স্থানে উক্ত শব্দমূল হইতে গঠিত শব্দাবলী উহাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দোষত্রুটি হইতে পবিত্র থাকা অর্থে ২ ঃ ৭১ ও ২৬ ঃ ৮৯ আয়াতদ্বয়; অন্য আয়াতেও এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং 'সন্ধি' অর্থে ৪৭ ঃ ৩৫ ও ৮ ঃ ৬১ আয়াতদ্বয়ে ব্যবহৃত হইয়াছে। কুরআন মাজীদে 'সাল্‌ম' শব্দমূল হইতে গঠিত শব্দাবলী 'বিনীত ও আনুগত্য' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন ৩৭ ঃ ২৬।

(২) কু'রআন মাজীদে 'ইসলাম' উহা হইতে গঠিত ক্রিয়াপদ 'আসলামা' এবং উহা হইতে গঠিত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ 'মুসলিম'— এই তিনটি শব্দ একটি বিশেষ শারী'আতী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাদের শারী'আতী অর্থ সম্বন্ধেও তাফ্‌সীরকারগণের তিনটি অভিমত ঃ যেমন (ক) 'ইসলাম' শব্দের অর্থ— 'ঈমান'। আর অভিধানশাস্ত্রবিদগণ ও অন্যান্য 'আলিম ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে বলেন যে, 'ঈমান' শব্দের অর্থ 'সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা' (লিসানু'ল-আরাব)। ইমাম ফাখরু'দ-দীন রাযী তাঁহার তাফ্‌সীর গ্রন্থে "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন হইতেছে 'ইসলাম' (৩ ঃ ১৯), এই আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনায় উক্ত অভিমতকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং 'ইসলাম' শব্দটির উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইবার দাবির সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে উক্ত আয়াতকে পেশ করিয়াছেন। (খ) 'ইসলাম' শব্দটির দুইটি শারী'আতী অর্থ রহিয়াছে ঃ (১) ঈমান ও (২) অন্য একটি আরও ব্যাপক অর্থে অর্থাৎ মুখে অথবা অন্তরে আনুগত্য প্রকাশ। ইমাম নাওয়াবী সাহীহ মুসলিম-এর ভাষ্যগ্রন্থে উক্ত অভিমতকে আল-খাত্তাবী হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত অভিমতের প্রবক্তা কয়েকজন ভাষ্যকার— যেমন রাগি'ব আল-ইস্‌ফাহানী— 'ইসলাম' শব্দের দুইটি শারী'আতী অর্থের ব্যাখ্যা এইরূপ করেন যে, উহার একটি অর্থ 'ঈমান' অপেক্ষা নিম্নতর পর্যায়ের অর্থাৎ— 'সত্যের প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান' উহার আরেক অর্থ 'ঈমান' অপেক্ষা উচ্চতর পর্যায়ের অর্থাৎ সত্যের প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে বিশ্বাস করা, বিশ্বাস আনুগত্যমূলক 'আমল করা এবং আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা' (আল-মুফ্‌রাদাত ফী গারীবি'ল-কু'রআন)। (গ) 'ইসলাম' শব্দের তিনটি শারী'আতী অর্থ রহিয়াছে ঃ (১) 'ইসলাম' শব্দের অর্থ— মৌখিক ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ; পক্ষান্তরে 'ঈমান' শব্দের অর্থ অন্তরের আনুগত্য। উক্ত অর্থ অনুসারে ইসলাম ও ঈমান— এই শব্দ দুইটি ভিন্নার্থক ; (২) 'ইসলাম' শব্দের অর্থ— অন্তরে, মুখে ও কার্যাবলী দ্বারা স্বীকৃতি। পক্ষান্তরে 'ঈমান' শব্দটির অর্থ— শুধু অন্তর দিয়া স্বীকার করা। উক্ত অর্থ অনুসারে 'ঈমান' শব্দটির অর্থ 'ইসলাম' শব্দটির অর্থ অপেক্ষা সংকীর্ণ। (৩) 'ইসলাম' শব্দের অর্থ— বাহ্য ও আন্তরিক উভয়বিধ আনুগত্য। ঈমান-এর অর্থও অনুরূপ। এই অর্থে উভয় শব্দ পরস্পর সমার্থক শব্দ হইয়া যায়।

(৩) শারী'আতী অর্থ বিষয়ের এই মতভেদে বিভিন্ন মুসলিম মতাদর্শীর (School of Thought) সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী প্রভাব রহিয়াছে। উক্ত মতভেদ এইরূপ একটি মাস্‌আলার সহিত সম্পর্কিত, যাহা লইয়া বিভিন্ন মুসলিম মতাদর্শীর মধ্যে তীব্র মতভেদ রহিয়াছে। আর তাহা হইল, কোনও ব্যক্তি কাবীরা গুনাহ্ করিলে সে কাফির হইয়া যায় কিনা ইহার উত্তর। আশ'আরী ফিরকার অভিমত এই যে, যাহারা একইরূপে কিবলামুখী হইয়া সালাত আদায় করে, তাহাদের কাহাকেও তাহার কাবীরা গুনাহ্ করিবার কারণে কাফির বলা যাইবে না, যদি না সে কাবীরা গুনাহ্‌কে হালাল মনে করিয়া এবং উহার হারাম হইবার বিষয়কে অস্বীকার করিয়া উহা করে। খারিজী ফিরকার মতে কোনও ব্যক্তি কাবীরা গুনাহ্ করিলেও সে কাফির হইয়া যায় এবং তাহার ঈমান বিলুপ্ত হয়। অপরপক্ষে কাদ্‌রিয়্যা ও মু'তাযিলা ফিরকাদ্বয়ের অভিমত এই যে, কোনও ব্যক্তি কাবীরা গুনাহ্ করিলে তাহার ঈমান বিলুপ্ত হইয়া যায়; কিন্তু সে 'কুফ্‌র'-এর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায় না। এইরূপ অবস্থায় সেই ব্যক্তি কুফ্‌র ও ঈমান— এই উভয়ের মধ্যবর্তী একটি অবস্থানে থাকে [আল-আশ'আরী, আল-ইবানা, পৃ. ১০; আবূ মানসূর আল-মাতুরীদী (মৃ. ৩৩৩ হি)., শারহু'ল-ফিকহি'ল-আক্‌বার, ভারতে মুদ্রিত, পৃ. ২-৪]। প্রকৃত কথা এই যে, উপরিউক্ত ফিরকাগুলি 'ইসলাম' ও 'ঈমান' শব্দদ্বয়ের শারী'আতী অর্থকে স্পষ্টরূপে পারস্পরিক মতভেদের একটি ভিত্তি বানাইয়াছে। আল-আশ'আরী তাঁহার আল-ইবানা গ্রন্থে বলেন, আমাদের বিশ্বাস, 'ইসলাম' শব্দটির অর্থ 'ঈমান' শব্দটির অর্থ অপেক্ষা অধিক ব্যাপক। প্রতিটি ইসলামকেই ঈমান বলা যায় না (আল-ইবানা, পৃ. ১০)। আত-তাবারী তাঁহার তাফ্‌সীর গ্রন্থ মাজমা'উ'ল-বায়ান-এ বলেন, আমাদের ও মু'তাযিলাদের মতে 'ইসলাম' ও 'ঈমান' একই অর্থে ব্যবহৃত (১খ, ১৭৫, ইরান ১৩০৪ হি.)। আলোচ্য বিষয়ে বিভিন্ন ফিরকার মতভেদের কারণ বস্তুত যুক্তির অবতারণা ও বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশে তাঁহাদের সূক্ষ্ম প্রহেলিকার অনুসন্ধান ছাড়া অন্য কিছু নহে। তাই উক্ত মতভেদ বিভিন্ন ফিরকার কষ্টকল্পিত ধ্যান-ধারণার ফলমাত্র।

(৪) কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের মতভেদের কারণ কু'রআন মাজীদ হইতেই খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে উক্ত মতভেদের সূচনা এইরূপে হইয়াছে যে, মুসলিম 'আলিমগণ কু'রআন মাজীদে এইরূপ কতগুলি আয়াত পাইয়াছেন, যাহাতে ঈমান ও ইসলাম এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, তাহাতে ইহাদের একটিকে অন্যটির বিপরীতার্থক শব্দ বলিয়া মনে হয় (যেমন ৪৯ ঃ ১৪; ৬৬ ঃ ৫; ৩৩ ঃ ৩৫ এবং ৪৩ ঃ ৬৯)। আবার কুরআন মাজীদে এইরূপ কতগুলি আয়াতও রহিয়াছে যাহা দ্বারা 'ইসলাম' ও 'ঈমান' একই বিষয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় (যেমন, ১০ ঃ ৮৪; ৫১ ঃ ৩৫-৩৬; এবং ৪৯ ঃ ১৭)। উক্ত বিভিন্ন আয়াতের ভিত্তিতে বিভিন্ন শারী'আতী অর্থে ইসলাম শব্দের ব্যবহার তাহাদের মতে বৈধ। অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, ইহা অর্থাৎ একাধিক অর্থ গ্রহণ অভিপ্রেত নহে। কারণ কু'রআন মাজীদে 'সাল্‌ম' শব্দমূল হইতে গঠিত অনেক শব্দ

ইহাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে এইরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে যেইরূপে 'আরবগণ ইহাদেরকে ব্যবহার করিত। কিন্তু কুরআন মাজীদ 'ইসলাম' শব্দ ও ইহা হইতে গঠিত কতগুলি শব্দের জন্য মাত্র একটি শারী'আতী নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন আয়াতে সেই শারী'আতী অর্থ প্রকাশিত। সেই অর্থটি হইতেছে 'তাওহীদ' এবং নিজ আত্মাকে শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্য এইরূপ নির্দিষ্ট ও নির্ণীত করা যাহাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু ইলাহ হিসাবে গণ্য না হয় এবং 'ইবাদত প্রাপ্তিতে আল্লাহর শরীক আর কেহ না হয়। বলা অনাবশ্যক যে, 'ইসলাম' ও উহা হইতে গঠিত শব্দাবলীর উক্ত শারী'আতী অর্থ ইহাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'পবিত্রতা', 'অবিমিশ্রতা' ও নিরাপত্তা' হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। ইব্ন দুরায়দ তাঁহার কিতাবু'ল-ইশতিকাক গ্রন্থে (১খ, ২২) বলেন, 'ইসলাম' শব্দটি অর্থের দিক দিয়া اسلمت لله— আমার অন্তর আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট ও নির্ভেজাল করিয়া দিয়াছি— এই বাক্যের অন্তর্গত اسلمت শব্দের মাস'দার اسلام শব্দ হইতে অভিন্ন। কু'রআন মাজীদে 'সালম' শব্দমূলটির অন্য অর্থে ব্যবহার, উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহার বৈ আর কিছু নহে। এইরূপ ব্যবহারের ভিত্তি হইতেছে আরবী ভাষায় শব্দের কোনও অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের কিছু না কিছু সম্পর্ক থাকা জরুরী (আস-সুয়ূতী, আল মুযহির, মিসর তা. বি., ১খ, ৩৪৫-৬)। 'আল্লামা যামাখশারী ان الدين عند الله الاسلام আয়াতের ব্যাখ্যার যাহা বর্ণনা করেন, ইহাই উহার অর্থ।

(৫) 'ইসলাম' শব্দের শারী'আতী অর্থ যে 'তাওহীদ' ও 'অন্তরকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট ও পবিত্র করিয়া দেওয়া' উহার কতগুলি প্রমাণ রহিয়াছে। প্রথম প্রমাণ এই যে, কুরআন মাজীদ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সকল নবী আল্লাহ তা'আলার নিকট হইতে একই 'দীন' লইয়া আসেন। আর সেই 'দীন' হইতেছে, যেই সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব, উহাদের প্রতি ঈমান আনিতে হইবে। বিভিন্ন নবীর শুধু শারী'আত অর্থাৎ 'আমাল বিষয়ক বিধি-বিধানের মধ্যেই পার্থক্য ছিল (তাফসীরু'ত-তাবারী, তাফসীর আল-কাশ্শাফ, আর-রাযী, আল-বায়দাবী, ৬ ঃ ৯০ আয়াতের তাফসীর; এতদ্ব্যতীত দ্র. ঃ আত-তাবারী, মিফ্তাহু'স-সা'আদা, প্রথম প্রকাশ, মিসর, ২খ, ১২৬, ১২৭; হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা, ১খ, ৬৮-৬৯)। আল্লাহর 'দীন' একই। উহাতে কোনরূপ নাস্খ বা রহিতকরণের অবকাশ নাই। নবী পরিবর্তনেও উহাতে পরিবর্তন ঘটে না। কুরআন মাজীদের ভাষায় আল্লাহর সেই শাশ্বত ও অপরিবর্তনশীল দীনের নাম 'ইসলাম ('আল-কাশ্শাফ, ৩ ঃ ৮৪-৮৫; এতদ্ব্যতীত দ্র. ঃ ৫ ঃ ৩)। উক্ত ৫ (আল-মা'ইদা) ঃ ৩ আয়াতটি বিদায় হজ্জে 'আরাফাতের ময়দানে নাযিল হইয়াছিল। কথিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) উক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর মাত্র একাশি দিন জীবিত ছিলেন। উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'ইসলাম' নামে পরিচিত যে দীন উহা গুরুত্বপূর্ণ 'আকীদাসমূহকে নির্দেশ করে এবং বিভিন্ন শারী'আতের মৌলিক বিধান ও নীতিসমূহকে— যেইগুলিকে কু'রআন মাজীদে পরিপূর্ণতা দান করা হইয়াছে— বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে। 'আমালী বিধি-বিধান নবী ও জাতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। কোনও কোনও সময় স্থানের পরিবর্তনের সহিত উহা পরিবর্তিত হইয়াছে। কুরআন মাজীদে শুধু সংক্ষেপে উহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু যে সকল মৌলিক বিধান ও নীতির ভিত্তিতে উক্ত 'আমালী বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পূর্বোক্ত ৫ (আল-মা'ইদা) ঃ ৩ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত সকল মৌলিক বিধান পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং কুরআন মাজীদে ইহাদেরকে বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে (আরও দেখুন আল-বায়দাবীতে, উক্ত আয়াতের তাফসীর, আশ-শাতিবী, আল-মুওয়াফাকাত, ৩খ, ৬২, ৪খ, ১১৬-১১৭)। উপরে আমরা যাহা বর্ণনা করিয়াছি, উহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মাজীদের ভাষায় 'দীন' হইতেছে এইরূপ কতগুলি মৌলিক বিশ্বাস ও বিধানের প্রতি ঈমান আনিবার নাম যেইগুলি শাশ্বত ও চিরস্থায়ী যেইগুলিতে নাস্খ বা রহিতকরণের কোনও অবকাশ নাই এবং যেইগুলির বিষয়ে নবীগণের দায়িত্ব ও প্রচারে কোনরূপ পার্থক্য নাই। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামই হইতেছে সেই শাশ্বত, অবিনাশী ও অপরিবর্তনশীল দীন। কারণ 'ইসলাম' ব্যতীত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য অন্য কোনও 'দীন' নাই।

দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, 'ইসলাম' শব্দটি মুদাফ (مضاف-সম্বন্ধ পদের সহগামী পদ) আকারে অথবা গায়র-মুদাফ আকারে কু'রআন মাজীদে মোট আটটি আয়াতে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে ছয়টি আয়াত মাদানী এবং দুইটি আয়াত মাক্কী। মাক্কী আয়াত দুইটি হইতেছে ৬ ঃ ১২৫ ও ৩৯ ঃ ২২। উভয় আয়াতেই এই বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে যে, 'ইসলাম' শব্দটি উহাতে অবিমিশ্র 'ঈমান' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত অবিমিশ্র 'ঈমান'-এর স্থান হইতেছে মানুষের অন্তর। মাদানী আয়াতগুলির একটি হইতেছে ৬১ ঃ ৭। ইহাতে 'ইসলাম' শব্দটি যে 'ঈমান' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পরবর্তী কতগুলি আয়াতে বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্বিতীয় মাদানী আয়াত হইতেছে ৯ ঃ ৭৪। উহাতে 'ইসলাম' শব্দটি 'কুফর'-এর বিপরীতে ব্যবহৃত হইয়াছে। কুরআন মাজীদের কয়েকটি স্থানেই 'ইসলাম' ও উহা হইতে গঠিত শব্দাবলী 'কুফ্র'-এর বিপরীতে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন আলোচ্য আয়াতে ৩ ঃ ৮ এবং ১৫ ঃ ২ আয়াতদ্বয়। আবার উহা 'শির্ক'-এর বিপরীতেও বেশ কয়েকটি স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ৩ ঃ ৭৬; ৬ ঃ ১৪ ও ৪৯ ঃ ১৭ আয়াতগুলিতে। যাহারা 'ইসলাম' ও 'ঈমান'কে পরস্পর সমার্থবোধক শব্দ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের দলীল-প্রমাণ উল্লেখ প্রসঙ্গে হুজাজু'ল-কু'রআন গ্রন্থে উক্ত ৪৯ ঃ ১৭ আয়াতটি উল্লিখিত হইয়াছে। যেই সকল আয়াতে 'ইসলাম' শব্দটি 'শির্ক'-এর বিপরীতে ব্যবহৃত হইয়াছে, উহাদের আরও কয়েকটি ঃ ৩ ঃ ১৯, ৮৫ ও ৫ ঃ ৩। 'আল্লামা যামাখশারী ও অন্য ইসলামী চিন্তাবিদগণ এই সকল আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, এই সকল আয়াতে ব্যবহৃত 'ইসলাম' শব্দের অর্থ হইতেছে 'তাওহীদ' এবং 'আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে কৃত তাঁহার প্রতি আনুগত্য'। উক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম শব্দটি কুরআন মাজীদে শুধু ইহার শারী'আতী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে আর সেই শারী'আতী অর্থে ইহা 'ঈমান' শব্দের সমার্থক।

তৃতীয় প্রমাণ এই যে, কু'রআন মাজীদের বেশ কয়েকটি আয়াতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক আনীত দীনের অনুসারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা 'ঈমানদারগণ' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। এইরূপ কয়েকটি আয়াত এই ঃ ২ ঃ ৬২; ৫ ঃ ৬৯ ও ২২ ঃ ১৭। আবার কোনও কোনও আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদেরকে 'মুসলিম' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন, যেমন ২২ ঃ ৭৮ ও ২ ঃ ১০২। এতদ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, 'ইসলাম' ও 'ঈমান' পরস্পর সমার্থক শব্দ।

(৬) কু'রআন মাজীদের ভাষায় 'ইসলাম' দ্বারা এইরূপ কতগুলি মৌলিক বিশ্বাস ও মৌলিক বিধি-বিধান বুঝায়, যাহাদের উপর ঈমান রাখা ফরয এবং যাহাদেরকে কু'রআন মাজীদে পরিপূর্ণরূপে একত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রেক্ষাপটে 'ইসলাম' হইতেছে আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে তাঁহার নবী মুহ'াম্মাদ (স)-এর প্রতি প্রত্যাদিষ্ট এইরূপ ওহী— যাহা কু'রআন মাজীদে সংরক্ষিত রহিয়াছে এবং যেইগুলিকে মানব জাতির নিকট প্রচার করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবীকে আদেশ দিয়াছেন। কুরআন মাজীদের ১৬ ঃ ৪৪ আয়াতে ইহার প্রতি ইঙ্গিতও রহিয়াছে। ইসলামের এই সংজ্ঞা মুতাবিক কুরআন মাজীদে বর্ণিত মৌলিক বিশ্বাসসমূহ ও 'আমালী বিধি-বিধান ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। 'দীন' শব্দের অর্থেও অনুরূপ পরিবর্তন আসিয়াছে। মুসলিমদের নিকট দীনের ব্যাপকতর নূতন সংজ্ঞা এই ঃ 'দীন' হইতেছে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মানব জাতিকে প্রদত্ত এইরূপ জীবন বিধান যাহাকে গ্রহণ ও অনুসরণ করিয়া মানুষ ইহকালীন কল্যাণ এবং পরকালীন সাফল্য ও সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। বলা অনাবশ্যক যে, 'আকীদা ও 'আমাল— উভয়বিধ বিষয়ই দীনের অন্তর্ভুক্ত (কাশ্শাফু ইস'তি'লাহাতি'ল-ফুনূন)।

'ইসলাম' ও 'দীন'-এর অর্থে উপরিউক্ত পরিবর্তন আসা সত্ত্বেও শারী'আতী অর্থের নিদর্শন এখনও মুসলিমদের চিন্তাধারায় বিদ্যমান। তাই তাঁহারা এই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া দীনকে 'মৌলিক বিষয়সমূহ' ও 'খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ' এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন অর্থাৎ দীন হইতেছে মা'রিফাত, যাহা অন্তরের ব্যাপার এবং মৌলিক বিষয় ও আনুগত্য যাহা দেহ তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পন্ন হয়, এই দুই ভাগে বিভক্ত। মা'রিফাত মৌলিক বিষয় এবং আনুগত্য উহার শাখা-প্রশাখা। তাঁহারা আরও বলেন যে, 'আকীদা যেহেতু অন্তরের বিশ্বাসের বস্তু, তাই উহা দীনী, নিশ্চিত ও সংশয়াতীত প্রমাণে প্রমাণিত হইতে হইবে। আর একমাত্র কুরআন মাজীদই হইতেছে সেই নিশ্চিত ও সংশয়াতীত প্রমাণ। কারণ সংক্ষিপ্ত ও বিশদ— উভয়বিধ বিবরণের দিক দিয়াই উহা একটি নিশ্চিত প্রমাণ।

'আমালী বিধি-বিধান প্রমাণিত হইবার জন্য শুধু প্রায় নিশ্চিত প্রমাণই যথেষ্ট (শারহুল-মাওয়াকি'ফ, ১খ, ৩৮; আল-মুওয়াফাকা'ত, ৪খ, ৩)। এতদ্ব্যতীত মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, কালামশাস্ত্রের কোনও বিষয় রহিত হইতে পারে না, বরং শুধু ফিক্'হের বিধি-বিধানই রহিত হইতে পারে। ইহা ছাড়া মুসলিমদের নিকট 'আকীদার বিষয়াবলীতে মতভেদ যে পরিমাণ গুরুত্বের অধিকারী, 'আমালী বিধি-বিধানে মতভেদ সেই পরিমাণ গুরুত্বের অধিকারী নহে। শেষোক্ত বিষয় সম্পর্কে মতভেদের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে বিভিন্ন মায'হাব নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রতিটি মায'হাবের অনুসারিগণ মনে করেন যে, তাঁহাদের মায'হাব সঠিক। যদিও প্রতিটি মায'হাবেই ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ রহিয়াছে, এমন কি তাহাদের কেহ কেহ মনে করেন যে, ইজতিহাদী বিষয়সমূহে সত্যের একাধিক রূপ থাকিতে পারে। কারণ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এই বিষয়ে বাধ্য করেন নাই যে, সে সত্যকে লাভ করিবার উদ্দেশে নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতার সর্বাংশ নিয়োজিত করিবে। অতএব সে নিজ প্রচেষ্টায় যতটুকু সত্য লাভ করিতে পারিবে, তাহার জন্য ততটুকুই সত্য। উহা ত্যাগ করা তাহার জন্য বৈধ হইবে না। ই'তিকাদিয়াত বিষয়ে গবেষণা যথাসম্ভব পরিহার করাই ইমামদের নীতি; যদি কোন উপযুক্ত ব্যক্তি ইহাতে জড়িত হন তাহার জ্ঞান বুদ্ধি যথাসাধ্য প্রয়োগ করা তাঁহার কর্তব্য। ইমামদের মতে এই ক্ষেত্রে 'বাযলুল মাজহূদ' বা যথাসাধ্য প্রয়াস-প্রচেষ্টার প্রয়োগ গবেষকদের উপর বাধ্যতামূলক হইয়া পড়ে (আল-বাকিল্লানী)।

পক্ষান্তরে মৌলিক 'আকীদাঃ- বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতভেদের ভিত্তিতে একাধিক দল সৃষ্টি হইতে পারে না এবং এক দল অন্য দলকে কাফির আখ্যায়িত করিতে পারে না। কারণ 'আকীদা সম্পর্কিত বিষয়াবলীতে সত্য একাধিক নহে, বরং একটিই। একই বিষয় সম্পর্কিত একাধিক পরস্পর বিরোধী 'আকীদার মধ্য হইতে একটিমাত্র আকীদা ভিন্ন অন্য সকল 'আকীদা ভ্রান্ত হইবার কথা। মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য এই যে, সে নিজের সমগ্র যোগ্যতা দিয়া বিশ্বাস সংক্রান্ত বাতিল বিষয় গ্রহণ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে যাহাতে সে 'আযাবে গ্রেফতার না হয়। এতদ্ব্যতীত ইসলামে দৈহিক 'ইবাদাতসমূহ উহাদের বাহ্য রূপের দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী নহে, বরং উহাদের গুরুত্ব শুধু উহাদের নিয়াত (সংকল্প) এবং উহাদের অনুষ্ঠানের পশ্চাতে নিহিত অন্তরের ভাব ও অবস্থার দিক দিয়া (হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা, ১খ, ৪)। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ.

"ইহার (কুরবানীর পশুর) গোশ্ত অথবা রক্ত আল্লাহর নিকট কখনও পৌঁছে না, বরং আল্লাহর নিকট পৌঁছে তোমাদের (অন্তরের) তাক'ওয়া" (২২ ঃ ৩৭)।

রাসূলুল্লাহ (স) হইতে এইরূপ একটি হ'াদীছ' বর্ণিত হইয়াছে। সেই হ'াদীছটি যেই সকল হ'াদীছ' ইসলামের মৌল বিষয়গুলির প্রাণকেন্দ্র উহাদের অন্যতম। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র) উক্ত হ'াদীছ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহাতে সমগ্র দীনী 'ইল্মের এক-তৃতীয়াংশ বিধৃত হইয়াছে এবং ইহা অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও বিখ্যাত হাদীছগুলির অন্যতম, এমনকি কেহ কেহ এইরূপও দাবি করেন যে, ইহা একটি মুতাওয়াতির হ'াদীছ (যে হাদীছের সনদের প্রতিটি স্তরে বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারী রহিয়াছে) [আল-কাসতা'ল্লানী-কৃত বুখারী শরীফের ভাষ্য গ্রন্থ, ১খ, ৫৫]। হাদীছশাস্ত্রে উহার স্থান কত ঊর্ধ্বে তাহা এই বিষয়টি হইতে জানা যায় যে, হাদীছ'টি হ'াদীছ গ্রন্থসমূহের, যেমন সাহ'ীহ'ল-বুখারী ও সাহীহ-মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ের শুরুতেই স্থান লাভ করিয়াছে। হাদীছটি এই, "আমলসমূহ নিয়াত মুতাবিকই হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি যে বিষয়ের নিয়ত করে, তাহার জন্য শুধু উহাই রহিয়াছে" (মুস'তা'ফা 'আবদু'র-রাযযাক', 'আরবী বিশ্বকোষ, 'ইসলাম' নিবন্ধ)।

**তাহযীব-তমদ্দুন ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান** ঃ উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় ও পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইসলামী তাহ্যীব-তমদ্দুনের অনুপ্রবেশ ও বিকাশ লাভ ঃ বারবার জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত আল-মাগ'রিব অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার বাগদাদের তমদ্দুনিক জীবনধারার সহিত গভীর কোন সম্পর্ক ছিল না; স্বভাবত মিসরের মাধ্যমেই উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় বাগদাদের তমদ্দুনিক প্রভাব পৌঁছিতে পারে। হি. তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের পূর্বে বাগদাদ, বসরা ও কূফার তমদ্দুনিক জীবনধারায় মিসর কোনরূপ অংশগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। এক সময়ে 'আবদু'ল-হাসান 'আলী ইব্ন সুলায়মান বাগ'দাদী (মৃ. ৩১৫/৯২৭-৯২৮)-র সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আবির্ভাব ঘটে। তিনি সাধারণত আল-আখফাশু'ল-আস'গ'র নামে পরিচিত। আল-আখফাশ আল-আক'বার

ও আল-আখফাশ আল-আওসাত উপনামের আরও দুইজন আখ্ফাশ হইতে তাঁহাকে পৃথক করিবার উদ্দেশে তাঁহার উপনামের সহিত 'আল-আসগার' বিশেষণটি যোগ করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে, সর্বপ্রথম তিনিই বাগদাদের দার্শনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মিসরে পরিচিত করিয়া দেন। তিনি ছা'লাব আল-কূফী, আল-মুবার্‌রাদ আল-বাস্‌রী, আস-সুক্কারী ও আল-য়াযীদীর ছাত্র ছিলেন। উক্ত পণ্ডিতগণ সকলেই ৩১৩/৯২৫ সনের পূর্বেই ইনতিকাল করেন। কথিত আছে, আল-আখ্ফাশুল-আসগার প্রায় আশি বৎসর বয়স পাইয়াছিলেন।

প্রাচ্যে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা মিসরে পূর্ব হইতেই ছিল। আখফাশু'ল-আসগারের সমসাময়িক মিসরের অধিবাসী আবূ জা'ফার আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মুরাদী (মৃ. ৩৩৪/৯৪৫ ও ৩৩৯/৯৫০-এর মধ্যবর্তী কোনও সন) বাগদাদে গমন করতে আল-মুবার্‌রাদ আল-বাস্‌রী, আয-যাজ্জাজী, ওয়াসিত-এর অধিবাসী নিফ্‌তাওয়ায়হ, ইব্‌নু'ল-আনবারী ও আল-আখফাশু'ল-আসগার-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি আন-নাহ্‌হাস নামে খ্যাত ছিলেন। সম্ভবত তিনিই আল-আখফাশু'ল-আসগারকে মিসরে গমন করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই কথা স্পষ্ট যে, সে যুগে মিসর বাগদাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারায় অংশগ্রহণ করিতেছিল। সম্ভবত সেই যুগেই ইসহাক ইব্‌ন 'ইমরান (যিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষা বাগদাদে লাভ করিয়াছিলেন)-এর মাধ্যমে মিসরে চিকিৎসাশাস্ত্র প্রবেশ লাভ করে। উক্ত লেখক কর্তৃক রচিত 'মাকালাতুন ফী মালীখুলিয়া' নামীয় একখানা পুস্তিকা জার্মানীর মিউনিখের একটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহশালায় এখনও সংরক্ষিত রহিয়াছে (মিউনিখ, পাণ্ডু-র নং ৮০৫/২)। মিসর চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চার কেন্দ্রভূমি, মিসরের এই প্রাচীন খ্যাতি তখন আর বর্তমান ছিল না; তবুও সেই যুগেও সেই দেশে অনেক চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ উক্ত শাস্ত্রের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সকল চিকিৎসাশাস্ত্রবিদদের অধিকাংশই ছিলেন য়াহূদী ও খৃস্টান। ইসহাক ইব্‌ন 'ইমরানেরই যুগে মিসর ইরাকের নব কর্মময় জীবন ধারার সহিত পরিচিত হয়। উল্লেখ্য যে, ইরাকের জীবনধারার উক্ত কর্মতৎপরতা ছিল সে দেশে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবিতকরণের নিকট, বিশেষত খলীফা হারূনু'র-রাশীদের (?) শাসনামলে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত দারু'ল-হিকমা বা বায়তু'ল-হিকমা-র কার্যক্রম ও তৎপরতার নিকট ঋণী (বাগদাদের বায়তু'ল-হিকমা খলীফা হারূনু'র-রাশীদের শাসনামলে নহে, বরং খলীফা মা'মূনু'র-রাশীদের শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দারু'ল-হিকমা, বিশেষত ফাতিমী খলীফা আল-হাকিম বি-আমরিল্লাহ কর্তৃক ৩৯৫/১০০৫ সনে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান নিকেতনের নাম। দেখুন "দারু'ল-হিকমা" নিবন্ধ)।

মিসরের পশ্চিম সীমান্তের কাছেই বারবার অধ্যুষিত আল-মাগরিব অবস্থিত ছিল। আফ্রিকার এই অংশটি তখন একটি অশান্ত অঞ্চল ছিল। সেখানে তখন মুসলিম শিক্ষকগণ তাঁহাদের জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান বিতরণের মহান ব্রত সবেমাত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন। অব্যাহত বিদ্রোহের ফলে সেখানকার সমাজ সেই যুগে স্থায়ী অশান্তিতে জর্জরিত ছিল। খলীফা হারূনু'র-রাশীদ আফ্রিকার এই অঞ্চলকে একটি করদ রাজ্য হিসাবে তুর্কী সেনাপতি ইবরাহীম ইব্‌নু'ল আগলাব-এর অধীনে ন্যস্ত করিয়া সেখানকার অবস্থাকে স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ করিতে সহায়তা করেন। উক্ত ইবরাহীম ইব্‌নু'ল-আগলাব হইতেই উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় আগলাবী রাজবংশের সূচনা ঘটে। আগলাবী শাসনকর্তাদের অধিকাংশই ছিলেন সুযোগ্য ও ন্যায়বিচারক শাসক। ফলে তাঁহাদের শাসনামলে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও উহার রাজধানী কায়রাওয়ান সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ২৯১/৯০৩ সনে আগলাবী শাসনকর্তা আবু'ল-'আব্বাস আল-আগলাবীর পুত্র দ্বিতীয় যিয়াদাতুল্লাহ তাঁহাকে হত্যা করাইয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি তাঁহার সহোদর ভ্রাতাদের ও পিতৃব্য-জাত ভ্রাতাদের মধ্য হইতে ঊনত্রিশ জনকে কুওয়াত দ্বীপে নির্বাসিত করিয়া তথায় তাঁহাদেরকে হত্যা করাইবার পাশবিক ঘটনা দ্বারা স্বীয় শাসনামলের সূচনা করেন। অতঃপর তিনি নিজ সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবু'ল-কু'ওয়াকেও হত্যা করান। এই সকল কার্য তাঁহাকে একজন অত্যাচারী ও অশান্তি সৃষ্টিকারী শাসকরূপে প্রমাণিত করিয়া দেয়। কিন্তু তিনি তৎকালে বাগদাদে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে চর্চা চলিতেছিল তাঁহার দেশেও উহার প্রচলনের ব্যবস্থা করিতে বিশেষ যত্নবান হন। তিনি যুগের প্রয়োজনের সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া চলিবার উদ্দেশ্যে ইসহাক ইব্‌ন সুলায়মান আল-ইস্‌রা'ঈলী (মৃ. ৩২০/৯৩২ সনের দিকে) নামক জনৈক মিসরীয় য়াহূদী চিকিৎসাশাস্ত্রবিদকে স্বীয় রাজধানী কায়রাওয়ানে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ ব্যয়ের জন্য পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং রাজধানীতে তাঁহার উপস্থিতকালে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। তিনি ইসহাক ইব্‌ন সুলায়মানের প্রতি যে সকল দায়িত্ব অর্পণ করিলেন, দরবারের অমাত্যবর্গকে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দান ছিল ইহাদের অন্যতম। কিন্তু ইসহাক ইব্‌ন সুলায়মান অচিরেই বুঝিতে পারিলেন যে, যিয়াদাতুল্লাহ সম্পূর্ণরূপে আরাম-আয়েশ ও আমোদ-প্রমোদের প্রতি আসক্ত। ইসহাকের বক্তৃতাবলী শুনিবার জন্য তাঁহার নিকট সময়ও নাই, ইহার জন্য তাঁহার কোন আগ্রহও নাই। এই অবস্থা দেখিয়া ইসহাক ইবন সুলায়মান ইসহাক ইব্‌ন 'ইমরান কর্তৃক মিসরে আনীত নব নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধ্যয়নে একনিষ্ঠ চিত্তে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। অবশেষে তিনি তৎকালীন নব আবিষ্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুফলকে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় পৌঁছাইয়া দিবার সর্বপ্রথম মাধ্যম হইয়া গেলেন। পরিণতিতে তিনি ল্যাটিন খৃস্টান জগতে 'Isaac' নামে চিকিৎসাশস্ত্রের 'প্রথম গুরু' উপাধিতে পরিচিত হন। ২৯৭/৯০৯ সনে কুতামা গোষ্ঠীর বারবারীয় বিপ্লবিগণ যিয়াদাতুল্লাহকে সিংহাসনচ্যুত করিল, তখন ইসহাক ইব্‌ন সুলায়মান অবিলম্বে ইসমা'ঈলী আল-মাহ্‌দীর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ৩২১/৯৩৩ সনে উক্ত শাসনকর্তার ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁহার দরবারের চিকিৎসক ছিলেন।

ইসহাক ইব্‌ন সুলায়মান কায়রাওয়ানে একটি চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উহার অধিকাংশ শিক্ষার্থী ছিল য়াহূদী। বিদ্যালয়টির প্রভাব মুসলিম জাহানের পশ্চিমাংশে দীর্ঘকাল ধরিয়া সক্রিয় ছিল। উক্ত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতি পাশ্চাত্য দেশসমূহে ছড়াইয়া পড়ে। যদিও ইসহাক ইব্‌ন সুলায়মান চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষক হিসাবে ইমাম রাযীর সমান যোগ্যতা ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না, তথাপি পাশ্চাত্য জগতে তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হইত। পাশ্চাত্য দেশসমূহে তাঁহার গ্রন্থাবলীর মূল 'আরবী পাঠ এবং হিব্রু ও ল্যাটিন ভাষাদ্বয়ে অনূদিত আকারে দূর-দূরান্তে প্রচারিত হয়। উক্ত গ্রন্থাবলী পাশ্চাত্য জগতের যে দেশেই প্রাপ্ত হয়, তাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সেই দেশেই দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারের ক্ষেত্রে কায়রাওয়ানের দান ও প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। 'আরবদের তাহ্‌যীব-

তমদ্দুন ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি পাশ্চাত্য জগতে ক্রুসেড যুদ্ধসমূহের মাধ্যমে যে পরিমাণে প্রসার লাভ করিয়াছিল তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে স্পেন ও সিসিলী দ্বীপের মাধ্যমে প্রসার লাভ করে। কারণ ক্রুসেড যুদ্ধের সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল একেবারেই সামান্য; এমনকি ক্রুসেড যুদ্ধের অনেক পরে ডোমিনিকান (Dominican) খৃষ্টান সাধুগণও (যাহারা সিরিয়ায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল) এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এমনকি আলেকজান্দ্রিয়া, ভেনিস ও জেনেভার মাধ্যমে অর্জিত সাফল্য অপেক্ষাও এই ক্ষেত্রে তাহাদের সাফল্য অধিকতর ছিল। উল্লেখ্য যে, উক্ত স্থানগুলির সহিত মুসলিমদের সম্পর্ক ছিল, বিশেষত ও প্রধানত বাণিজ্যিক ধরনের। পাশ্চাত্য জগতে ইসলামী কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রাচীন ও অধিকতর প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রচার ও প্রসার উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার মাধ্যমেই ঘটে। আর কায়রাওয়ানই ছিল উহার প্রধান প্রচার কেন্দ্র। এইখানেই ইসহাক ইব্ন সুলায়মান তাঁহার চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইসহাক ইব্ন সুলায়মান কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে দুইটি গ্রন্থ বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। মধ্যযুগে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই দুইখানা অতি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পুস্তিকা। ইহাদের একখানার নাম কিতাবু'ল-বাওল এবং অন্যখানার নাম কিতাবু'ল হু'ম্মায়াত। উভয় পুস্তিকাই প্রথমে মূল 'আরবী পাঠে এবং পরবর্তী কালে হিব্রু ও ল্যাটিন ভাষাদ্বয়ে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে রচিত তাঁহার গ্রন্থ 'কিতাবু'ল-আদ্‌বিয়াতি ওয়া'ল-আগ্‌যিয়া অধিকতর জনপ্রিয় ছিল। গ্রন্থখানার একখানি 'আরবী পাণ্ডুলিপি মিউনিখে সংরক্ষিত রহিয়াছে (মিউনিখ, পাণ্ডু. নং ৮০৯)। উহার ল্যাটিন অনুবাদ "De diaetis Universalibus et Particularibus" দীর্ঘকাল ধরিয়া একখানা নির্ভরযোগ্য সনদ হিসাবে পাশ্চাত্য জগতে স্বীকৃত ছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ ইসহাক (Isaac)-কে মধ্যযুগে য়ুরোপের সকল চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা নিকেতনে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হইত। উক্ত গ্রন্থই সর্বপ্রথমে বাগদাদের নব-আবিষ্কৃত চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুফলকে পাশ্চাত্যের খৃষ্টান শিক্ষার্থীদের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। উহা দীর্ঘকাল ধরিয়া য়ুরোপে পঠিত ও অধীত হয়। অবশেষে ১৪৮৭ খৃ. উহার মুদ্রিত সংস্করণ পাদুয়া (Padua) হইতে প্রকাশিত হয়। ইসহাক ইব্ন সুলায়মান 'চিকিৎসকদের পথনির্দেশক' নামীয় একখানা গ্রন্থও রচনা করেন। গ্রন্থখানি বর্তমানে হিব্রু অনুবাদরূপে সংরক্ষিত রহিয়াছে। উক্ত অনুবাদ গ্রন্থখানার নাম মান্‌হিজ (Manhig-المنهج l-Musar ha-rofo' im)। ইহা য়ুরোপের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে প্রচারিত ও অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। Constantine the African ইহাকে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত করেন। ইসহাক ইব্ন সুলায়মান কর্তৃক রচিত আরেকখানা উল্লেখযোগ্য প্রভাব সৃষ্টিকারী গ্রন্থের নাম আল-ইস্‌তিক'সাত। ইহা মৌলিক পদার্থসমূহ বিষয়ে চিকিৎসা-দর্শনবিদ সুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত হইয়াছে। ইহার মূল 'আরবী পাঠ বর্তমানে আর পাওয়া যায় না। কিন্তু Constantine the African কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় কৃত অনুবাদ ও একটি হিব্রু অনুবাদ (S. Fried, Das Buch Uber die Elements, লাইপযিগ ১৯০০ খৃ.) বর্তমানেও পাওয়া যায়। গ্রন্থখানায় হিপোক্রাটিস (Hippocrates), এরিস্টোটল, গ্যালেন (Galen) ও কয়েকজন প্লেটোপন্থী লেখকের রচনার উদ্ধৃতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ইসহাক ইব্ন সুলায়মান, কায়রাওয়ানের শাহী দরবারে যে সকল বিষয় শিক্ষা প্রদান করিতে চেষ্টা করেন, ইহাতে সম্ভবত তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে। হি. চতুর্থ শতাব্দীতে বাগদাদে যে দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটিয়াছিল, গ্রন্থখানা উহার সারসংক্ষেপ। ইব্নু'ল-মায়মূন (Maimonides) যিনি ইসহাক ইব্ন সুলায়মানকে চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থকার হিসাবে বেশ মর্যাদা দান করিয়াছেন— কিয়ৎ পরিমাণ তাচ্ছিল্যের সহিত ইসহাক-এর উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "ইসহাক ইব্ন সুলায়মান নিছক একজন চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ ছিলেন; কিন্তু যে দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার কোনই জ্ঞান ছিল না, সেই বিষয়ে লেখনী ধারণ করিতে গিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন, উহা নিছক অনুমানভিত্তিক বাজে কথা ছাড়া আর কিছু নহে।" বস্তুত উভয়ের মধ্যকার উক্ত বিরোধ একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ ইব্নু'ল-মায়মূনের যুগ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের বেশ বিকাশ ও উন্নতি সাধিত হয়। পক্ষান্তরে ইসহাক ইব্ন সুলায়মানের গ্রন্থাবলী ছিল একটি প্রাচীনতর ও অপেক্ষাকৃত অল্প পরিপক্ব যুগের রচনা।

ইসহাক ইব্ন সুলায়মানের ছাত্রদের মধ্যে য়াহূদী দুনাশ ইব্ন তামীন (Adomin) ও আবূ জা'ফার ইব্‌রাহীম ইব্ন আবী খালিদ আল-জায্‌যার (মৃ. ৩৯৫/১০০৪)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ছাত্রটিও হয়তো য়াহূদী ছিলেন। উভয়ের মধ্যে দুনাশই অধিকতর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ ইসহাকের মৃত্যুর পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে তিনিই কায়রাওয়ানের শাহী দরবারের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। এতদ্ব্যতীত তিনি ইসহাক রচিত দার্শনিক গ্রন্থাবলীকে জীবন্ত ও প্রচলিত রাখেন। মনে হয়, এই দুনাশই হইতেছেন সেই ব্যক্তি— যিনি বিস্ময়করভাবে গ্যালেন ও Rabbi Gamaliel-কে একই ব্যক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইসহাকের ছাত্র আল-জায্‌যার— যিনি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যঅঞ্চলে আল-গিযার (Algizar) নামে পরিচিত হইয়া গিয়াছেন— চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক বহু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। উহাদের মধ্যে যাদু'ল-মুসাফির ওয়া কূতু'ল-হাদির গ্রন্থখানাই অধিক বিখ্যাত। উহা চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক একখানা সারগ্রন্থ। Constantine the African, Viaticum নামে ল্যাটিন ভাষায় উহার অনুবাদ করেন। অনুবাদখানা য়ুরোপের ল্যাটিন দেশসমূহে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও প্রচারিত হয়। আল-জায্‌যার কর্তৃক প্রণীত আরও কতগুলি গ্রন্থ বর্তমানেও পাওয়া যায়। উহাদের কতগুলি পাওয়া যায় হিব্রু ও ল্যাটিন অনুবাদসহ মূল 'আরবী পাঠে আর কতগুলি পাওয়া যায় শুধু উক্ত ভাষাদ্বয়ে কৃত অনুবাদের আকারে। মনে হয়, এইরূপ ধারণা করা অমূলক হইবে না যে, কায়রাওয়ানে এইরূপ একটি চিকিৎসাশাস্ত্র বিদ্যালয় চালু ছিল যাহাতে য়াহূদী চিকিৎসাশাস্ত্রবিদগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রীক লেখকগণের রচনাবলীর অধ্যয়নে চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের যে ধারা লব্ধ হইয়াছিল এবং যাহার পুনরুজ্জীবন বাগদাদে পূর্বেই ঘটিয়া গিয়াছিল, মনে হয়, কায়রাওয়ানের উক্ত বিদ্যালয়ে সেই জ্ঞানের ধারণাটিই শিক্ষা দেওয়া হইত। উক্ত বিদ্যালয় উন্নতি লাভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে পৌঁছিতে পারে নাই। চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিবার পূর্বে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার একাধিক স্থানে অনুরূপ বিদ্যালয় কায়েম ছিল। সেই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করিতেন এবং তাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে পৃথিবীতে নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে উক্ত মর্যাদার

অধিকারী ছিলেন। কায়রাওয়ানের বিদ্যালয়টি ছিল উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় অবস্থিত একই শ্রেণীর একাধিক বিদ্যালয়ের একটি। Salerno ও সম্ভবত সিসিলীতে উহার গভীর প্রভাব পড়িয়াছিল। এতদ্ব্যতীত উক্ত কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে উহার প্রভাব পড়িয়াছিল ইটালীতেও।

কায়রাওয়ানের আগলাবী শাসনকর্তাগণ ২১২/৮২৭-২৬৫/৮৭৮ সময়কালের মধ্যে সিসিলী জয় করেন। ২৯৭/৯০৯ সনে আগলাবী রাজবংশের শাসনাধীন অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় উক্ত দ্বীপটিও ইস্মা'ঈলী মাহ্দীর অধিকারে চলিয়া যায়। কিন্তু তিনি ৩০০/৯১২ সনে ফাতিমী (ইস্মা'ঈলী) শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করত রাজ্যের শাসনভার আহ্মাদ ইব্ন যিয়াদাতুল্লাহ্র নিকট হস্তান্তর করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রস্তাব পেশ করেন। উল্লেখ্য যে, আহমাদ ইব্ন যিয়াদাতুল্লাহ ছিলেন কায়রাওয়ানের সর্বশেষ আগ্লাবী শাসনকর্তা। তিনি কিয়ৎ পরিমাণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর মাহ্দীর প্রস্তাব মঞ্জুর করেন এবং সিসিলীতে তাঁহার শাসনকর্তৃত্ব দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাগদাদের 'আব্বাসী খলীফা বশ্যতা স্বীকার করেন। কারণ আগলাব বংশীয় শাসনকর্তাগণ প্রথম হইতেই বাগদাদের খলীফাগণের প্রতি অনুগত ছিলেন। এইরূপে সিসিলী দ্বীপটি পুনরায় বাগদাদের 'আব্বাসী খলীফাদের শাসনাধীনে চলিয়া যায় এবং নরমানগণ কর্তৃক অধিকৃত না হওয়া পর্যন্ত উহা তাঁহাদের শাসনাধীনেই থাকে।

সিসিলী দ্বীপে বাগদাদের 'আব্বাসী খলীফাদের শাসন নূতন করিয়া পুনরায় কায়েম হইবার প্রারম্ভিক যুগে সেখানে Sabbathai ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন Joel Donolo (জীবনকাল ৩০১/৯১৩-৩৭২/৯৮৩) নামক জনৈক য়াহূদী চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ বাস করিতেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ের একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে একটি গ্রন্থের নাম সিফির খা জো-কার (Sfer ha-jokar)। উহা হিব্রু ভাষায় রচিত চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক একখানা পুস্তিকা, পাণ্ডুলিপি আকারে এখনও সংরক্ষিত রহিয়াছে। আলোচ্য যুগটিকে এবং সিসিলী দ্বীপ ও কায়রাওয়ানের মধ্যে তৎকালে বিরাজমান গভীর সম্পর্কের বিষয়কে দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া বিবেচনা করিলে Sabbathai কর্তৃক রচিত উক্ত পুস্তিকাখানাকে ইসহাক ইব্ন সুলায়মান কর্তৃক ইতিপূর্বে সূচিত জ্ঞান চর্চা ধারা প্রবাহের ফলশ্রুতি ব্যতীত অন্য কিছু মনে করা যায় না। মনে হয় সিসিলী দ্বপটি চিন্তাধারাগত কৃষ্টি-সংস্কৃতির দিক দিয়া কায়রাওয়ানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি বাহিরের ঘাঁটি হিসাবে বিরাজমান ছিল। আমাদেরকে এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কায়রাওয়ানে অবস্থিত পূর্বোক্ত চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা ইসহাক এবং তাঁহার ছাত্র ও স্থলাভিষিক্ত দুনাশ (Dunash) উভয়েই ছিলেন য়াহূদী। ধারণা করা যায় যে, Sabbathai-ও এই জ্ঞান ধারার সহিত যুক্ত ছিলেন। সিসিলী দ্বীপের শিক্ষকগণ কর্তৃক রচিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত যে সকল গ্রন্থ ল্যাটিনে অনূদিত হইয়াছিল সেইগুলি সম্ভবত হিব্রু ভাষার মাধ্যমে অতিক্রম করিয়া ল্যাটিনে অনূদিত হইয়াছিল। উক্ত চিকিৎসাশাস্ত্রবিদগণের য়াহূদী হওয়াই ইহার কারণ মনে হয়। উল্লেখ্য যে, প্রাচীনকালের আরব চিকিৎসাশাস্ত্রবিদগণ কর্তৃক রচিত 'আরবী গ্রন্থাবলী ল্যাটিন ভাষায় সরাসরি মূল 'আরবী হইতে অনূদিত হইত না, বরং হিব্রু অনুবাদ হইতে অনূদিত হইত।

সিসিলী দ্বীপের উপর নরমানদের বিজয় ও অধিকার সূচিত হয় 'ধূর্ত' Robert Guiscard the Crafty-এর রাজত্বকাল হইতে। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা Roger ৪৬৬/১০৭২ (১০৭৩?) সনে প্যালরমো (Palermo) অধিকার করিবার মাধ্যমে সিসিলী দ্বীপের উপর কর্তৃত্ব লাভ করেন।

ইত্যবসরে রবার্ট গুইস্কার্ড কালাব্রিয়া (Calabria)-তে নিজের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করিতে এবং 'আরবদেরকে, গ্রীকদেরকে ও লোম্বার্ডদেরকে (Lombards) পশ্চাতে হটাইয়া দিতে সমর্থ হন। অবশেষে লোম্বার্ডদের শক্তিশালী উপনিবেশ সালেরনো (Salerno)-ও রবার্টের দখলে আসে এবং তিনি উহাকে নিজের রাজধানী করেন। সেখানে পূর্ব হইতেই একটি চিকিৎসা বিদ্যালয় কায়েম ছিল। কায়রাওয়ানের চিকিৎসা বিদ্যালয় চিকিৎসাশাস্ত্র যে নীতি ও ধারায় শিক্ষা দেওয়া হইত, উহাতেও তাহাই অনুসৃত হইত।

সালেরনোতে অবস্থিত চিকিৎসা বিদ্যালয়টিকে সাধারণত মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। অবশ্য ইহার প্রকৃতি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি হইতে কিয়ৎ পরিমাণ স্বতন্ত্র এবং উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ক্রমবিকাশের ধারার মাপকাঠিতে নিম্ন মানের ও তুলনামূলকভাবে অধিকতর পরিমাণে প্রাথমিক স্তরের বিশ্ববিদ্যালয়। ইহাকে আংশিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ মানদণ্ড মুতাবিক গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছিল। নরমানগণ কর্তৃক সালেরনো বিজিত হইবার ফলে সালেরনোর উক্ত চিকিৎসা বিদ্যালয়টি প্যারিসের তৎকালীন অপূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়টির সহিত সম্পর্ক কায়েম করিতে সমর্থ হয়। উল্লেখ্য যে, প্যারিসের উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি তখন স্বীয় অস্তিত্ব তথা উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছিল। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে সালেরনোর বিদ্যালয়টি ছিল সম্পূর্ণ একটি চিকিৎসা বিদ্যালয়। স্বীয় চরম উন্নতির যুগে সেখানে বিপুল সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের সমাবেশ ঘটে। ৬২৯/১২৩১ সনে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক এই মর্মে এক ফরমান জারী করেন যে, কোনও ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে অনুমতিপত্র (Licence) গ্রহণ ব্যতিরেকে তাঁহার শাসনাধীন কোনও স্থানে চিকিৎসকবৃত্তির পেশা গ্রহণ করিতে পারিবে না, আর যে ব্যক্তি সালেরনোতে অবস্থিত চিকিৎসা বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া উহাতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, একমাত্র সেই ব্যক্তিকেই অনুমতিপত্র প্রদান করা হইবে। পরীক্ষা গ্রহণের পর সালেরনোর বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে সাধারণ চিকিৎসকদেরকে সনদপত্র প্রদান করা হয়। তবে সেই সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের সাধারণ কার্যক্রম ও কার্যপদ্ধতি বেশ মজবুত ও উন্নত হইয়া গিয়াছিল। কথিত আছে, সালেরনোর চিকিৎসা বিশ্ববিদয়টিতে য়াহূদী শিক্ষকমণ্ডলীর একটি ধারাবাহিক শ্রেণী শিক্ষা দান কার্যে ব্যাপৃত থাকেন। সহজেই বোঝা যায় যে, কায়রাওয়ান ও সালেরনোতে এইরূপ একদল চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ ছিলেন যাঁহারা তাঁহাদের অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডারকে তাঁহাদের প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রদের নিকট সমর্পিত করিবার মহান ব্রতে আত্মনিবেদিত থাকিতেন। কায়রাওয়ানের চিকিৎসা বিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের যে সকল গ্রন্থ পড়ান হইত, উহা ছিল বাস্তব প্রয়োজনে ব্যবহৃত উন্নত মানের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। নিঃসন্দেহে সেই সকল গ্রন্থ ইসহাক ইব্ন সুলায়মান ও কায়রাওয়ানের অন্যান্য চিকিৎসাশাস্ত্রবিদগণ কর্তৃক রচিত। উক্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলি 'আরবী ভাষায় রচিত হইলেও সম্ভবত প্রাথমিক যুগেই হিব্রু ভাষায় উহাদের অনুবাদ ও ভাষ্য গ্রন্থ রচিত হইয়া গিয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কায়রাওয়ানের চিকিৎসা বিদ্যালয়ে য়াহূদী শিক্ষকবৃন্দ

শিক্ষা দান করিতেন। অনুমিত হয় যে, নরমানদের আগমনের পূর্বে সালেরনোতে ল্যাটিন ভাষার ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই, আর উহা সম্ভবত সালেরনোতে লোম্বার্ডরদের আগমনের পূর্বে ঘটে নাই।

সালেরনো বিশ্ববিদ্যালয় স্বীয় উদ্দেশ্য মুতাবিক গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে রবার্ট গুইস্কার্ডের ব্যক্তিগত সচিব Constantine the African তাঁহাকে সাহায্য করেন। রবার্ট গুইস্কার্ড তাঁহাকে সিসিলী হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন এবং সম্ভবত তাঁহাকে উক্ত কার্য সম্পাদনে উৎসাহিত করেন। তাঁহার আফ্রিকান উপাধি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি কায়রাওয়ানের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, কায়রাওয়ান ছিল উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার রাজধানী। তবে তাঁহার 'আফ্রিকান' উপাধির অর্থ এই নহে যে, তিনি আফ্রিকার অধিবাসী ছিলেন, বরং তিনি আফ্রিকার একটি জ্ঞান-নিকেতনের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। তাঁহার নিজ বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেন। তাঁহার কোনও রচনার অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য দ্বারা তাঁহার উক্ত দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হয় না। তিনি তাঁহার উক্ত দাবী দ্বারা সম্ভবত এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, তিনি বাগদাদ ও কায়রোর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাধারার সহিত পরিচিত। তবে তিনি নিজের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও মহাজ্ঞানী শিক্ষক হইবার যে দাবী করিয়াছেন, উহা সম্ভবত একটি অতিরঞ্জিত ও অবাস্তব দাবী। তিনি সালেরনোর চিকিৎসা বিদ্যালয়ে পূর্ব হইতেই শিক্ষা দানে কার্যরত হিব্রু ভাষাভাষী শিক্ষকবৃন্দকে পদচ্যুত করেন নাই, বরং তাঁহাদের শিক্ষার মাধ্যমে ল্যাটিন ভাষায় ভাষান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করেন, যাহাতে খৃস্টান শিক্ষার্থীদের নিকট এই শিক্ষা গ্রহণ সহজ হয়।

কনস্ট্যান্টাইন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে কার্যটি সম্পাদন করিয়াছেন, উহা ছিল 'আলী ইব্ন আবদি'ল-মাজূসী কর্তৃক রচিত চিকিসাশাস্ত্র বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ 'কামিল'-এর অনুবাদ অথবা ভাষ্য গ্রন্থ প্রস্তুত করিবার কার্য। আল-মাজূসী বুওয়ায়হী শাসনকর্তা 'আদুদু'দ দাওলা (৩৬৮/৯৭৮-৩৮০/৯৯০)-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থকে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক উক্ত সুলতানের নামেই উৎসর্গ করেন। সুলতানের সহিত তাঁহার উক্ত সম্পর্কের কারণেই তাঁহার গ্রন্থটি আল-মালিকী, আশ-শাহী নামে অভিহিত। ইহার ল্যাটিন অনুবাদ Regalis dispositio নামে পরিচিত, ল্যাটিন ভাষায় তাঁহার নাম Haly Abbas বলিয়া পাওয়া যায় এবং তিনি উক্ত নামেই পাশ্চাত্য দেশে মধ্যযুগে পরিচিত ছিলেন। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁহার রচিত গ্রন্থকে কায়রাওয়ানে চিকিৎসাশাস্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে মনোনীত করা হয়। বলা অনাবশ্যক যে, উক্ত মনোনয়ন খুবই বাস্তবানুগ ও যুক্তিসংগত ছিল। কারণ গ্রন্থখানা ছিল 'আরবী ভাষায় রচিত চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক যেই সকল গ্রন্থকে ল্যাটিন দুনিয়ার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, উহাদের মধ্যে প্রথম। ইব্ন সীনা কর্তৃক 'কানূন' গ্রন্থখানা রচিত হইবার পূর্বে আল-মাজূসীর 'কামিল' গ্রন্থ 'আরবী ভাষার একখানা অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা গ্রন্থের মর্যাদা অধিকার করে। সম্ভবত অনেক চিকিৎসা বিজ্ঞানী যাঁহারা ইহাকে ইব্ন সীনার আল-কানূন-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতেন, ইহাকে তাঁহাদের চিকিৎসা পেশায় ব্যবহার করেন। ইব্ন সীনার গ্রন্থ সম্বন্ধে বলা যায় যে, উহা ক্রমে খ্যাতি অর্জন করিতে থাকে। অধ্যাপক ব্রাউন, যিনি নিজে একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত ছিলেন, 'কামিলকে' 'কানূন'-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন। কারণ প্রকৃতিগত দিক দিয়া উহা অধিকতর প্রয়োগযোগ্য। যে সকল মতামত ও মতবাদ চিকিৎসাশাস্ত্রকে অন্যান্য শাস্ত্রের তুলনায় উহার সঠিক মর্যাদা ও অবস্থান অধিষ্ঠিত করিতে পারিবে বলিয়া ইব্ন সীনা বিশ্বাস করিতেন, তিনি 'কানূন' গ্রন্থে প্রধানত সেই সকল মতামত ও মতবাদকেই স্থান দিয়াছেন। কিন্তু এইগুলি প্রকৃতিগত দিক দিয়া নিছক মতবাদ শ্রেণীর বিষয়। 'কামিল'-এর হিব্রু অনুবাদও সালেরনোতে বর্তমান ছিল এবং কন্সট্যান্টিন উহাকে ব্যবহারও করিতেন। উহার ল্যাটিন অনুবাদ অতি অল্পকালের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। কন্সট্যান্টিন মতবাদ সম্পর্কীয় প্রথম খণ্ডের দশটি নিবন্ধের, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমার্ধের, নবম নিবন্ধের প্রথম অংশের (অস্ত্রোপচারের সহিত যাহার সম্পর্ক) ভাষ্য লিখেন, আনুমানিক এক শতাব্দী পর উহা চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক একখানা অতি গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য 'আরবী গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে এবং পীসা Pisa)-এর পাদরী পরিষদের Stephen নামক জনৈক সদস্য, যিনি তখন আনতাকিয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন, উহার সংশোধন করেন (৫১২/১১২৭ সনে)। Canon Stephen-এর উক্ত নিরীক্ষাকার্য নিশ্চয় ক্রুসেড যুদ্ধের সহিত সম্পর্কিত ছিল। কারণ আনতাকিয়া ল্যাটিন সম্রাটগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি রাজ্য যাহা ক্রুসেডারগণই কায়েম করিয়াছিল। রাজ্যটি যেই যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই যুগে ক্রুসেডারদের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনও কোনও পাদরী 'আরবদের তাহযীব-তামাদ্দুন ও কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রতি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করে।

কন্সট্যান্টিনকৃত অনুবাদ গ্রন্থগুলি অনুবাদ হিসাবে ত্রুটিপূর্ণ ও অস্পষ্ট হইলেও এইগুলি এই কারণে অতি দ্রুত দূর-দূরান্ত দেশসমূহে ছড়াইয়া পড়ে যে, এইগুলির মাধ্যমে 'আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞান পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে উন্মোচিত হয়। আরবদের উক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করে এবং য়ুরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানিগণ উহাকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। পরবর্তীকালে Cremona-এর Gerhard ও অন্যান্য বিজ্ঞ অনুবাদক কন্সট্যান্টিনের সকল অনুবাদের সংশোধন করেন এবং সেইগুলি অধিক পরিমাণে ও সামগ্রিকভাবে সন্তোষজনক ফল প্রদান করে। ল্যাটিন অনুবাদগুলি প্রাচীন যুগের মুদ্রণযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অনুবাদ গ্রন্থগুলি বেশ কিছুকাল ধরিয়া সমাদৃত ছিল এবং ব্যাপক আকারে পঠিত হইত। কন্সট্যান্টিনের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি পাশ্চাত্য জগতকে 'আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। ফলে 'আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও শিক্ষার প্রতি পাশ্চাত্যে অধিক আগ্রহ প্রকাশ পায় এবং ল্যাটিন চিন্তাধারাকে গ্রীক জ্ঞান-ভাণ্ডারের 'আরবী অনুবাদের সন্ধান দেয়। এদ্ব্যতীত আরবগণ গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত যে স্বাভাবিক ও বাস্তব জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব-আবিষ্কৃত ধারা সংযোজিত করিয়াছিলেন, উহাও পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়। ফলে পরবর্তীকালে ল্যাটিন দুনিয়া প্রকৃতি বিজ্ঞানের অনুশীলনের প্রতি আরও আকৃষ্ট হয় এবং পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষার্থিগণ দর্শন, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা শিখিবার জন্যও 'আরব পণ্ডিতদের শরণাপন্ন হন। উল্লেখ্য যে, 'আরবদের মাধ্যমেই গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান মধ্যযুগীয় পশ্চিমা বিশ্বে প্রবেশ লাভ করে।

কন্সট্যান্টিনের রচনাবলীর ত্রুটির দিকটিকেও স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। উহা এই যে, তিনি বিভিন্ন 'আরবী গ্রন্থের হিব্রু অনুবাদ যেইভাবে করিয়াছেন উহাতে মনে হইত যে, গ্রন্থগুলি তাঁহার নিজস্ব প্রতিভাজাত

রচনা। এইগুলি যে 'আরবী ভাষ্য হইতে কৃত অনুবাদ, তাঁহার ভাষা ও উপস্থাপনায় উহা বুঝিবার উপায় ছিল না। সেই যুগে কোনও গ্রন্থের মূল লেখক ও উহার অনুবাদকের আপেক্ষিক ও নৈতিক দায়িত্বসমূহের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা অঙ্কিত ছিল না। প্রকাশনা অথবা পৌনঃপুনিক প্রকাশনা স্বত্ব আইন শুধু আধুনিক যুগের সৃষ্টি। এইরূপও হইতে পারে যে, কন্সট্যান্টিন ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি যে অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছেন, উহাকে তাঁহার নিজস্ব ও মৌলিক রচনা বলিয়া দাবী করিবার অধিকার তাঁহার রহিয়াছে।

কন্সট্যান্টিন আফ্রিকানের একজন ছাত্র John the Saracen অথবা Afflaxius নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি আল-মালিকীর দ্বিতীয় খণ্ডের নবম নিবন্ধের শেষার্ধের হিব্রু অনুবাদ করেন। এইরূপে তিনি উক্ত গ্রন্থের অস্ত্রোপচার বিষয়ক নিবন্ধের অনুবাদকার্য সমাপ্ত করেন। আর উহার ফলে পাশ্চাত্য জগত 'আরবী চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। তাহারা 'আরবদের নিকট হইতে যেই সকল রচনা লাভ করে, সৌভাগ্যক্রমে উহাদের মধ্যে এইরূপ কতগুলি পুস্তিকাও ছিল যাহা তাহাদের ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক প্রয়োজনে ফলপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

**স্পেনে গ্রীক কৃষ্টি-সংস্কৃতি ঃ** ইসলামী তাহ্যীব-তমদ্দুনের উন্নতির যুগে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের ফলে জ্ঞান চর্চার পুনরুজ্জীবন ঘটে। উল্লেখ্য যে, গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান তৎকালে কেবল 'আরবী অনুবাদ গ্রন্থাবলীতে বিধৃত ছিল। উক্ত পুনরুজ্জীবনের কেন্দ্র ছিল খলীফা হারূনু'র রাশীদ ও তদীয় পুত্র মামূনের শাসনকালের বাগদাদ নগরী। জ্ঞানচর্চার পুনরুজ্জীবনের উক্ত আন্দোলন যথাসময়ে মিসরে এবং পরবর্তীকালে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু স্পেনে উক্ত আন্দোলন পৌঁছে আরও কিছুকাল পরে, গ্রানাডার খলীফা তৃতীয় 'আবদু'র-রাহমানের শাসনামলে, যখন উহা নিজ অস্তিত্বে শক্ত ও পরাক্রমশালী হইয়া দাঁড়ায়।

তৃতীয় 'আবদু'র-রাহমানের উপদেষ্টাদের মধ্যে য়ূসুফ হাস্‌দাঈ (Hasdai) ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন শাপরূত (Shaprut) [মৃ. ৩৬০/৯৭০] নামক জনৈক য়াহূদীও ছিলেন। তিনি শুল্ক বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। খলীফা 'আবদু'র-রাহমান বায়যান্টীয় সাম্রাজ্যের অধীন গ্রীকদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের কার্যে তাঁহাকে ব্যবহার করেন। উল্লেখ্য যে, গ্রীস দেশ সেই সময়ে সপ্তম কন্সট্যান্টিন-এর শাসনাধীন ছিল। ৩৩৮/৯৪৯ সনে বায়যান্টীয় সাম্রাজ্যের একটি প্রতিনিধিদল গ্রানাডায় পৌঁছে। প্রতিনিধিদলের নেতা সম্রাটের পক্ষ হইতে গ্রানাডার খলীফার জন্য বিভিন্ন উপঢৌকন সঙ্গে আনেন। উপঢৌকনগুলির মধ্যে গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানী Dioscorides কর্তৃক রচিত একখানা পুস্তিকার অনুলিপিও ছিল। উহাতে সেই যুগে প্রচলিত ঔষধাদিতে ব্যবহৃত গাছ-গাছড়ার গুণাগুণের বিবরণ (Materia Medica)-ও লিপিবদ্ধ ছিল। উহাতে বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার নাম, পরিচয় ও গুণাগুণের সুস্পষ্ট উল্লেখসহ উহাদের মধ্যকার পার্থক্য বুঝাইবার উদ্দেশে বিভিন্ন রঙ্গীনচিত্র সন্নিবেশিত ছিল। খলীফা পুস্তিকাখানার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলেও উহার ভাষা গ্রীক হইবার কারণে এবং গ্রানাডায় কোনও গ্রীক ভাষাবিদ ব্যক্তি না থাকিবার কারণে উহার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই। খলীফা 'আবদু'র-রাহমান বায়যান্টীয় সম্রাটের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার নিকট একখানা পত্র লিখিলেন। পত্রে তিনি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়া উক্ত পুস্তিকাখানাকে বুঝাইতে পারেন এইরূপ কোনও ব্যক্তিকে গ্রানাডায় পাঠাইবার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করেন। সম্রাট ৩৪০/৯৫১ সনে Nicolas নামক জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তিকে গ্রানাডায় পাঠান। নিকোলা 'আরবী জানিতেন এবং 'আরবী ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন। তিনি Dioscorides-এর উক্ত পুস্তিকাসহ কয়েকটি গ্রীক পুস্তককে 'আরবীতে অনুবাদ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি গ্রীক ভাষায় পাঠ দানের একটি অব্যাহত ধারার সূচনা করেন। তিনি শাহী দরবারের অমাত্যবর্গের উপস্থিতিতে তাঁহার পাঠ দান কার্য চালাইতেন। কথিত আছে যে, বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ও শ্রোতা সেইখানে উপস্থিত থাকিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে বিপুল আগ্রহ ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়। বাগদাদে সূচিত জ্ঞানানুশীলনের আলোচ্য পুনরুজ্জীবন আন্দোলন, সংবাদ আদান-প্রদান ও রিওয়ায়েতের মাধ্যমে খ্যাতি লাভ করে এবং উহার ফলে গ্রীক ভাষা ও গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্ভবত নিছক সাময়িক ধরনের হইলেও— জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত হয়। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার শাসনকর্তা যিয়াদাতুল্লাহ তাঁহার রাজধানী কায়রাওয়ানে জ্ঞান চর্চার পুনরুজ্জীবন-আন্দোলনকে সূচক করিলেও তিনি অচিরেই উহা ত্যাগ করেন। উক্ত আন্দোলনের প্রবর্তক ইসহাক ইব্‌ন সুলায়মান বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার বক্তৃতাবলী কেহ শুনে না। কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্য ছিল এই যে, তিনি ইসমা'ঈল মাহ্‌দীর ন্যায় একজন মহৎ ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

মনে হয় স্পেনে গ্রীক ভাষার উপরিউক্ত প্রচলনের প্রধান কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন খলীফার পূর্বোক্ত উপদেষ্টা ও শুল্ক বিভাগের পূর্বোল্লিখিত প্রধান কর্মকর্তা হাস্‌দাঈ ইব্‌ন শাপ্‌রূত। তিনি ইরাকের Sora ও Pumbanditha-তে অবস্থিত য়াহূদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট উদার চিত্তে নানারূপ উপঢৌকন প্রেরণ করেন এবং জন্‌ সা'দিয়্যা আল-ফায়্যূমীর সহিত পত্রালাপ করেন। উল্লেখ্য যে, জন্‌ সা'দিয়্যা ইরাকে য়াহূদীদের মধ্যে সক্রিয় অনুরূপ একটি জ্ঞান চর্চা আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। একদা হাস্‌দাঈ, মূসা ইব্‌ন এনাখ (Enoch) নামক জনৈক য়াহূদী সাধু ব্যক্তিকে লাভ করেন। উক্ত সাধু ব্যক্তিটিকে গ্রানাডার বাজারে দাস হিসাবে বিক্রয়ের জন্য হাযির করা হইলে জলদস্যুরা তাঁহাকে ধরিয়া স্পেনে লইয়া আসে। দাস ক্রেতাদের নিকট তাঁহার তেমন চাহিদা ছিল না। কারণ তিনি না ছিলেন যুবক, না তাঁহার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ছিল মযবুত, আর তাঁহার দেহে না ছিল পুরুষসুলভ সৌন্দর্য। হাস্‌দাঈ তাঁহাকে খরিদ করিয়া লইয়া আযাদ করিয়া দেন। অতঃপর তিনি য়াহূদী ধর্ম গ্রন্থ 'তালমুদ' শিক্ষা দানের উদ্দেশে একটি মাদরাসা কায়েম করিয়া তাঁহাকে উহার প্রধান নিযুক্ত করেন। ইব্‌ন আবী উসায়বি'আঃ বলেন— তিনি (হাস্‌দাঈ) স্পেনে তাঁহার স্বজাতীয়দের সম্মুখে তাঁহাদের শারী'আতের বিধি-বিধান, ইতিহাস ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখার অধ্যয়নের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার যুগের পূর্বে পঞ্জিকা ও উৎসবাদির দিন-তারিখ সম্পর্কিত নিয়মাবলী বিষয়ক সমস্যাবলীর সমাধান জানিবার জন্য স্পেনের য়াহূদীদেরকে বাগদাদের য়াহূদীদের নিকট সাহায্যের আবেদন জানাইতে হইত (ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ, সম্পা. Muller, ২খ, ৫০)।

Dioscorides-এর পুস্তিকা 'আরবী ভাষায় অনূদিত হইবার ফলে স্পেনে উদ্ভিদবিদ্যার যে সযত্ন চর্চা ও অনুশীলন চলিতে থাকে, উহার ফল কিছুকাল পর খলীফা দ্বিতীয় হিশামের দরবারী চিকিৎসক আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন জুল্‌জুল (মৃ. ৩৯১/ ১০০০ সনের দিকে) কর্তৃক রচিত

গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। আবূ দাঊদ সুলায়মান Dioscorides-এর পুস্তিকার একটি পরিপূরক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে তিনি স্পেনে জন্মায়—এইরূপ বহুবিধ উদ্ভিদ ও ওষধির বিবরণ প্রদান করেন। স্পেনের মাটিতে বিশেষভাবে নানা প্রকারের উদ্ভিদ ও গাছ-গাছড়া বিপুল পরিমাণে জন্মাইত। উহাদের মধ্যে এইরূপ কতগুলি উদ্ভিদ ও গাছগাছড়া ছিল যাহাদের সহিত গ্রীকগণ পরিচিত ছিল না। উক্ত গ্রন্থের একখানা অনুলিপি Bodleian গ্রন্থাগারে (পাণ্ডু. নং ৪-৫৭৩-১) সংরক্ষিত রহিয়াছে। প্রাচীন উদ্ভিদবিদ্যার একটি বড় ত্রুটি এই ছিল যে, উহাতে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ ও লতা-গুল্মের সন্তোষজনক শ্রেণীবিভাগ বিবৃত হইত না। উক্ত ত্রুটি উদ্ভিদবিদ্যাবিশারদ Linnaeus-এর যুগের পূর্বে দূরীভূত হইতে পারে নাই। জীবনীকার ইব্ন খাল্লিকান লিখিয়াছেন যে, ইব্ন জুলজুল চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের ইতিহাসও রচনা করেন। কিন্তু তাঁহার সেই ইতিহাস গ্রন্থের সন্ধান এখন পাওয়া যায় না। পূর্বোক্ত গ্রীক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী নিকোলাস সম্বন্ধে বলা যায় যে, তিনি স্পেনবাসীদের মধ্যে উদ্ভিদবিদ্যার অনুশীলনের যে নিশ্চিত আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, উহা ব্যতীত অন্য কোনও কৃতিত্বপূর্ণ অবদান তিনি রাখেন নাই। স্পেনে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবেশ লাভ ঘটে প্রধানত মিসর ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার মাধ্যমে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে গ্রানাডায় গারিব ইব্ন সা'ঈদ (মৃ. ৩৫৩/৯৬৪) নামক জনৈক খৃস্টান চিকিৎসা বিজ্ঞানীর কর্মতৎপরতাও পরিলক্ষিত হয়। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তৃতীয় 'আবদু'র-রাহমান ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত দ্বিতীয় হাকাম-এর ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। তিনি তাঁহার যুগের স্পেনের ইতিহাস বর্ণনায় 'তা'রীখ উনদুলুস' নামক একখানা ইতিহাস গ্রন্থ ও 'খালকু'ল্-জানীন' নামক একখানা চিকিৎসা-পুস্তিকার রচয়িতা ছিলেন। শেষোক্ত পুস্তিকাখানায় ধাত্রীবিদ্যা এবং নারী ও শিশুদের বিভিন্ন রোগব্যাধি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

আলোচ্য যুগের অল্প কিছুকাল পরে স্পেনে 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন 'আবদি'ল-কারীম আল-লাখমী (মৃ. ৪৬১/১০৬৮ সনের দিকে) নামক জনৈক চিকিৎসা বিজ্ঞানী লেখকের আবির্ভাব ঘটে। তিনি 'আল-আদ্‌বিয়াতু'ল-মুফ্‌রাদা' নামীয় একখানা চিকিৎসা গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। উক্ত গ্রন্থের একখানা অনুলিপি এস্‌কোরিয়াল গ্রন্থাগারে (পাণ্ডু., নং ১-৮২৮) সংরক্ষিত রহিয়াছে।

ইহার অল্প কিছুকাল পরে য়ূসুফ ইব্ন ইস্‌হাক ইব্ন বেকলারেশ (Beklaresh) মৃ. ৫০০/১১০৬ সনের দিকে নামজ জনৈক য়াহূদী চিকিৎসকের আবির্ভাব হয়। তিনি 'আরবী ভাষায় একখানা চিকিৎসা-পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। উহাতে তিনি স্বাস্থ্য, খাদ্য ইত্যাদির মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করেন। তিনি উক্ত পুস্তিকায় এইগুলিকে একটি ছকে বিন্যস্ত করিয়া দেখান। পুস্তিকাখানা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মুসলিম জাহানের পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহে সমাদৃত ও জনপ্রিয় ছিল। উহা Saragoza রাজ্যের শাসনকর্তা আল-মুস্‌তা'ঈন বিল্লাহ আহমাদ ইব্ন হূদ-এর নামে উৎসর্গীকৃত হয়।

উহার কিছু কাল পরে আবু'স-সাল্‌ত উমায়্যা ইবন 'আবদি'ল-'আযীয (মৃ. ৫২৯/১১৩৪) নামক জনৈক চিকিৎসা বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়ায়, পরে কায়রোতে এবং সর্বশেষে তিউনিসে চলিয়া যান। তিনি 'আল-আদ্‌বিয়াতু'ল-মুফ্‌রাদা' নামীয় একখানা চিকিৎসা পুস্তক প্রণয়ন করেন। উহাতে তিনি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন রোগব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইবার দিক দিয়া রোগব্যাধিকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া দেখান (Bodleian, পাণ্ডু., নং ১-৫৭৮; ২-৫৮৭)। তিনি নক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাপক যন্ত্র সম্বন্ধেও একখানা পুস্তিকা রচনা করেন (Bodleian, পাণ্ড. নং ১-৯৬৭-১০)। এতদ্ব্যতীত তিনি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়েও একখানা গ্রন্থ রচনা করেন (এস্‌কোরিয়াল, পাণ্ডু., নং ২-৬৪৬-২)।

স্পেনের চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসে বানূ যাহ্‌র বংশ বিশেষ মর্যাদার আসনের অধিকারী ছিলেন। উক্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যাহ্‌রু'ল-আয়াদী। তাঁহার পুত্র মারওয়ান তালাবেরাহ্ (Talavera) শহরের একজন বিশিষ্ট নাগরিক ছিলেন। তিনি ৪২২/১০৩০ সনে সেখানেই ইনতিকাল করেন। যাহ্‌রু'ল-আয়াদীর পৌত্র আবূ মার্‌ওয়ান 'আবদু'ল-মালিক চিকিৎসক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি এক সময়ে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় গিয়া সেখানে কিছু কাল চিকিৎসকের পেশা চালান। অতঃপর তিনি কায়রো গমন করেন, সেখানে দীর্ঘ কাল অবস্থান করেন এবং সেই সময়ে স্বীয় সফল চিকিৎসাবৃত্তির কারণে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি স্পেনে ফিরিয়া গিয়া Valencia প্রদেশের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত Denia নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। সেই সময়ে দানিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন আবু'ল-জায়শ মুজাহিদ আল-মুওয়াফ্‌ফাক। তিনি 'আবদু'ল-মালিককে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করত তাঁহাকে নিজের দরবারে একটি উচ্চ পদ দান করেন। 'আবদু'ল-মালিক তাঁহার ইনতিকাল পর্যন্ত দানিয়ায় বসবাসরত ছিলেন অথবা অন্য কোথাও চলিয়া যান কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না।

'আবদু'ল-মালিকের পুত্র 'আবু'ল-'আলা' যাহ্‌র ইব্ন আবী মারওয়ান দানিয়াতেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে পিতার নিকট অতঃপর জনৈক মিসরীয় ব্যক্তির নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তৎপর তিনি উচ্চ লাভ করিবার উদ্দেশে গ্রানাডায় গমন করেন। তিনি ফাকীহ ও চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ ছিলেন। তাঁহাকে খলীফা আল-মু'তামিদ-এর ইযাবেলাস্থ দরবারে ডাকাইয়া আনা হয়। ৪৮৪/১০৯১ সনে মুরাবিত বংশীয় য়ূসুফ ইব্ন তাশফীন সুলতান আল-মু'তামাদকে সিংহাসনচ্যুত করিবার পর তিনি কিছু কাল তাঁহার (আল-মু'তামাদের) অধীনে চাকুরী করেন। অতঃপর মুরাবিদদের নিকট গমন করত তাঁহাদের উযীর নিযুক্ত হন। তিনি 'মুজাররাবাতু'ল-খাওয়াসস' নামীয় একখানা চিকিৎসা গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানির কয়েকটি অনুলিপি এখনও সংরক্ষিত রহিয়াছে। উহার একখানা অনুলিপি Bodleian গ্রন্থাগারে (পাণ্ডু. নং ১-৬২৬) সংরক্ষিত রহিয়াছে। তৎকর্তৃক রচিত আত-তায-কিরা নামীয় গ্রন্থখানারও কয়েকটি অনুলিপি এখনও সংরক্ষিত (প্যারিস, পাণ্ডু. নং B. N. ২-৯২৬০) রহিয়াছে। উহাতে তিনি তদীয় পুত্রের উদ্দেশে চিকিৎসা বিষয়ক কতগুলি উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী বেশ প্রচারিত ও সমাদৃত হইয়াছে। উহা ল্যাটিন ভাষায় অনূদিতও হইয়াছে। ল্যাটিন ভাষায় তাহার নাম 'Aboali', 'Abulelli' ও 'Ebilule' এই তিনরূপে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার নামকে কখনও কখনও তাঁহার পূর্বপুরুষ (প্রপিতামহ) যাহ্‌র-এর নামের সহিত যুক্ত করিয়া Abulelizor অথবা Abuleizor-রূপে লেখা হইয়া থাকে। তিনি ৫২৫/১১৩০-১১৩১ সনে ইযাবেলায় অথবা গ্রানাডায় ইনতিকাল করেন এবং ইযাবেলায় তাঁহাকে দাফন করা হয়।

আবু'ল-'আলার পুত্র আবূ মারওয়ান 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন আবি'ল-'আলা', ল্যাটিন অনুবাদে যাঁহার নাম 'Avendor' লিখিত হইয়াছে,

চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিসাবে অত্যন্ত মর্যাদার আসন লাভ করেন। ব্যবহারিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি সম্পূর্ণ নূতন নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। তাঁহার বন্ধু দার্শনিক ইব্ন রুশ্দ তাঁহাকে Galen-এর পর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী বলিয়া মনে করিতেন। তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি— যিনি হৃদ্‌যন্ত্রের ঝিল্লী (pericardium mediastinal)-এর বিষয়ে আলোচনা ও অবিরাম পুঁজ ক্ষরণকারী ক্ষতের বিভিন্ন রূপ, অবস্থা ও উহাদের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা ও পর্যালোচনা করেন এবং তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসক, যিনি শ্বাসনালীর অস্ত্রোপচার (Tracheotomy)-এর পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি কিতাবু'ল-ইক্তিসাদ ফী ইস্লাহি'ল-আনফুস ওয়া'ল-আজসাদ নামীয় একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানা তিনি খলীফা ইব্রাহীম ইব্ন য়ূসুফ-এর জন্য রচনা করেন। ইহার একখানা অনুলিপি প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারে (পাণ্ডু. নং ২৯৫৯) সংরক্ষিত রহিয়াছে। গ্রন্থখানা 'Devegimine Sanitatis' নামে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তিনি কিতাবু'ত-তা'ছীর ফি'ল-'আদ্‌ওয়াত ওয়া'ত-তাদ্‌বীর নামীয় একখানা গ্রন্থও রচনা করেন। Bodleian গ্রন্থাগারে (পাণ্ডু. নং ১-৬২৮) ও প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারে (পাণ্ডু. নং ২৯৬০) উহার অনুলিপি সংরক্ষিত রহিয়াছে। ইব্ন রুশ্দ তাঁহাকে গ্রন্থখানা রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। কথিত হয়, তিনি য়াহূদী ছিলেন এবং ইব্ন রুশ্দ তাঁহার শিষ্য ছিলেন বলিয়া যে বর্ণনা আছে উহা ভ্রান্ত। মুরাবিতী শাসনকর্তাদের পতনের পর তিনি তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত 'মুওয়াহ্‌হিদগণের নিকট চলিয়া যান এবং তাঁহাদের উযীর নিযুক্ত হন। তাঁহার রচনাকর্মের অধিকাংশই মুওয়াহ্‌হিদ শাসনকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পন্ন হয়। তিনি ৫৫৭/১১৬১ সনে ইন্তিকাল করেন।

আবূ মারওয়ানের পুত্র আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইব্ন আবী 'আব্‌দি'ল-মালিকও, যিনি আল-হাফিয নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন, একজন বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু তিনি বিজ্ঞ পেশাজীবী চিকিৎসক হিসাবে অধিকতর বিখ্যাত হন। অবশ্য কথিত আছে, তিনি চক্ষুরোগ বিষয়ক একখানা পুস্তিকা রচনা করেন। মুওয়াহ্‌হিদ খলীফা য়া'কূব ইব্ন য়ূসুফ তাঁহাকে মরক্কোতে ডাকাইয়া নিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত তাঁহাকে একটি উচ্চ পদ দান করেন। ইহাতে খলীফার উযীর আবূ যায়দ 'আবদু'র-রাহমান তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিবার পরিকল্পনা করেন। উল্লেখ্য যে, তাঁহার ভাতীজীও একজন বিজ্ঞ চিকিৎসা বিজ্ঞানী ছিলেন। এই ঘটনা ৫৯৫/১১৯৮ সনে সংঘটিত হয়।

আবূ বাক্‌র-এর পুত্র আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন আল-হাফিযও একজন বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ছিলেন। মুওয়াহ্‌হিদ খলীফা আল-মান্‌সূর ও আন-নাসির তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। ৬০২/১২০৫ সনে রাবাত হইতে তাঁহার মরক্কোতে গমনকালে মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

দার্শনিক মুহাম্মাদ ইব্ন য়াহ্‌য়া ইব্ন বাজ্জা (মৃ. ৫৩৩/১১৩৮ সনের দিকে), আল-ফারাবী এরিস্টোটলের ভাবশিষ্য ছিলেন। আল-ফারাবীর যুগ হইতে দর্শনশাস্ত্রের বেশ উন্নতি হইতে থাকে এবং আল-ফারাবীর দার্শনিক মতবাদসমূহ হইতে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এইগুলিকে ফারাবীর মতবাদ বলিয়া স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয় নাই। কারণ অধিকাংশ লোক তাঁহাকে রক্ষণশীল 'আকীদা-র বিরোধী বলিয়া মনে করিত। সর্বদা স্পেনে রক্ষণশীলতার প্রাবল্য ছিল। পরবর্তী কালে মুওয়াহ্‌হিদ শাসনকর্তাদের শাসনামলে তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহাতে আরো কঠোরতা সৃষ্টি হয়। মুওয়াহ্‌হিদী শাসনামলের প্রথম দশ বৎসরে অমুসলিমদের প্রতি দুর্ব্যবহার চলিতে থাকে। ইব্ন বাজ্জার যুগের পরেও অব্যাহত থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় তাঁহাদের শাসন তুলনামূলকভাবে অধিকতর সহনশীলতার গুণে গুণান্বিত ছিল। যখন ইব্ন বাজ্জার রচনাবলীকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়, তখন তাঁহার নাম রাখা হয় Avempace। তিনি Saragoza-র অধিবাসী ছিলেন এবং 'ইব্নু'স্-সা'ইগ' (স্বর্ণকারের পুত্র) নামে পরিচিত ছিলেন। ইব্ন খাল্লিকান বলেন, 'পাশ্চাত্য ফিরিঙ্গীদের ভাষায় 'বাজ্জা' শব্দের অর্থ 'রৌপ্য'। মনে হয় ইব্ন বাজ্জা লোকদেরকে দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত পরিচিত করিবার বিষয়ে নিরাশ হইয়া গিয়াছিলেন। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যে বিরোধী ভাবাপন্ন ধ্যান-ধারণা সেই যুগে সমগ্র স্পেনকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখে, ইহাতে তিনি অত্যন্ত মনক্ষুণ্ন ও ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়েন। তিনি দার্শনিক সত্যকে সমাজের শুধু চিন্তাশীল, জ্ঞানপিপাসু ও প্রতিভাবান শ্রেণীর অনুসন্ধান ও গবেষণার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। এই কারণে তিনি দার্শনিক চিন্তাধারাকে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অবুঝ ও প্রতিভাহীন শ্রেণী হইতে সযত্নে গোপন রাখিতেন। পরবর্তী কালে ইব্ন তুমায়ল কর্তৃক রচিত হায়্যি ইব্ন য়াক্‌যান নামক গ্রন্থেও অনুরূপ নীতি অনুসৃত হইয়াছে। ইব্ন বাজ্জার মতে সত্যকে লাভ করিতে হইলে বুদ্ধির সঠিক প্রয়োগের সাহায্যেই লাভ করিতে হইবে। উহাকে সংজ্ঞা বা ভাবাচ্ছন্ন অনুভূতি (ওয়াজ্‌দ)-র সাহায্যে (যেমন সূফীগণ করিয়া থাকেন) লাভ করা সম্ভব নহে। বুদ্ধি হইতেছে মানবীয় সত্তার শ্রেষ্ঠতম অংশ; কিন্তু ইহা একমাত্র তখনই অবিনশ্বরতার গুণে গুণান্বিত হয়, যখন ইহা একমাত্র "সক্রিয় বুদ্ধি"র সহিত, যাহাকে সে আল্লাহ্ নামে অভিহিত করিয়া থাকে, মিলিত হয়। এই স্থলে আমরা সেই দার্শনিক চিন্তাধারার সূচনার সন্ধান পাই যাহা পরবর্তী কালে, "ইব্ন রুশ্দ-এর দার্শনিক চিন্তাধারা" ও "Pampsychiom" নামে য়ুরোপের দার্শনিক সমাজে দাবানলের ন্যায় ছড়াইয়া পড়ে (Macdonald, Development of Muslim Theology, পৃ. ১৫১)। তাঁহার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা গোপন এরিস্টোটলীয় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারারই একটি সংস্করণ ছিল। উহা বাহ্য ইসলামী শিক্ষার সহিত সঙ্গতিশীল বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা রক্ষণশীলতাকে সন্দেহের চোখে দেখিত। তৎকালে স্পেনে প্রচলিত গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতার সহিত উহার সঙ্গতি ছিল না। অবশ্য এই দার্শনিক গোষ্ঠী কোন কোন মুরাবিত সুলতানের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের ফলে অত্যাচার ও শাস্তি হইতে রক্ষা পায়। ইব্ন বাজ্জা ৫৩৩/১১৩৮ সনে বিষ-মিশ্রিত ডিম খাইবার ফলে 'ফাস' নামক স্থানে ইনতিকাল করেন।

৫৪০/১১৪৫ সনে দার্শনিক ইব্ন তুফায়ল গ্রানাডায় চিকিৎসক হিসাবে এবং অতঃপর উক্ত প্রদেশের শাসনকর্তার ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাঁহাকে ৫৪০/১১৪৫ সনে Ceuta ও তাঞ্জার শাসনকর্তা (যিনি মুওয়াহ্‌হিদ খলীফা 'আবদু'ল-মু'মিন-এর পুত্র ছিলেন) ব্যক্তিগত সচিব নিযুক্ত করা হয়। এইরূপে শাহী দরবারের অমাত্যবর্গের সহিত তাঁহার সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং তিনি সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হন। সেই সময়ে তাঁহার বয়স চল্লিশোর্ধ। ইব্ন তুফায়ল খাঁটি মুসলিম ছিলেন;

তবে তিনি এরিস্টোটলীয় চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত আল-ফারাবী ও ইব্ন সীনার মতবাদের অনুসারী ছিলেন। তিনি ইমাম গাযালী ও ইব্ন বাজ্জার প্রশংসা করিতেন। তাঁহার খ্যাতির প্রধান কারণ ছিল তৎকর্তৃক রচিত হায়্যি ইব্ন য়াক্জান নামীয় একখানা দর্শনভিত্তিক উপন্যাসগ্রন্থ। উপন্যাসখানা রচনার উদ্দেশ্য ছিল এই কথা প্রকাশ করা "দার্শনিক অনুসন্ধান ও গবেষণা শুধু সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও বিশাল প্রতিভার অধিকারী শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। ইহাকে মূর্খ ও অজ্ঞ লোকদের মধ্যে প্রচার করা সমীচীন নহে। ধর্মীয় বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকাম রচনা করা হয় সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিভাহীন শ্রেণীর জন্য। শুধু সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও প্রতিভার অধিকারী মস্তিষ্কই ইহাদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বুঝিতে পারে।" ইহাই ছিল ইব্ন বাজ্জা ও ইব্ন তুফায়ল-এর এবং সম্ভবত তৎকালে 'দার্শনিক' নামে পরিচিত জ্ঞানী শ্রেণীর সকলের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। মুওয়াহ্হিদ শাসনকর্তাগণ সাধারণ লোকদের ও দার্শনিকদের ব্যাপারে যে নীতি অনুসরণ করিতেন, 'হায়্যি ইব্ন য়াক্যান উপন্যাসখানায় উহার বিরোধিতা করা হয়। উদারচেতা ও সংস্কারমুক্ত খলীফা আবূ য়া'কূব-এর উদারতা ও মহানুভবতার বদৌলতে ইব্ন তুফায়ল কলহ-কোন্দল হইতে মুক্ত ও নিপীড়ন-অত্যাচার হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত জীবন যাপন করিতে সক্ষম হন। উক্ত নিরাপত্তা তিনি এরিস্টোটলীয় দার্শনিক চিন্তাধারার ধারক হওয়া সত্ত্বেও লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, গোঁড়া ও রক্ষণশীল মুসলিমগণ এরিস্টোটলীয় দার্শনিক চিন্তাধারাকে ভ্রান্ত ও বিপথগামী মনে করিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। ইব্ন বাজ্জা স্বীয় ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও স্থির স্বভাব দ্বারা উক্ত চিন্তাধারার ধারক প্রত্যেক দার্শনিকের প্রতি নীরব সমর্থন ও সহায়তা দান করেন।

দার্শনিক ইব্ন রুশ্দ (মৃ. ৫৯৫/১১৯৮) বয়সে ইব্ন তুফায়ল অপেক্ষা ছোট এবং তাঁহার বন্ধু ছিলেন। ল্যাটিন দার্শনিকদের নিকট তাঁহার নাম Averroes হইয়া যায়। তিনি গ্রানাডার প্রাক্তন কাদীদের বংশধর ছিলেন। তিনি একটি উচ্চ বংশের 'প্রদীপ' ছিলেন। তিনি ফিক্হ ও চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। ৫৪৮/১১৫৩ সনে সাতাশ বৎসর বয়সে তিনি মুওয়াহ্হিদ সুলতানদের রাজধানী মরক্কোতে বসবাস করেন। সম্ভবত ইব্ন তুফায়লই তাঁহাকে তথায় ডাকিয়া লইয়া যান। তিনি একজন দার্শনিক ছিলেন এবং আল-ফারাবী ও ইব্ন সীনা এরিস্টোটলীয় দার্শনিক চিন্তাধারাকে যেইরূপে ও যেই ব্যাখ্যায় সঠিক বলিয়া মানিতেন, তিনিও উহাকে সেইরূপ ও সেই ব্যাখ্যায় সঠিক বলিয়া মানেন। কিন্তু যেহেতু তিনি রাজনৈতিক জীবন যাপনের অভিলাষী ছিলেন, তাই তিনি এরিস্টোটলীয় দার্শনিক চিন্তাধারাকে পূর্ববর্তী মুওয়াহ্হিদ শাসনকর্তাদের কঠোর 'আকীদাসমূহের সহিত বাহ্যত সামঞ্জস্যশীল বানাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। অবশ্য তাঁহার নিজস্ব দার্শনিক চিন্তাধারা তাঁহাদের রক্ষণশীল চিন্তাধারা হইতে অনেক পৃথক ছিল। মরক্কোতে ইব্ন তুফায়ল তাঁহাকে সুলতানের দরবারে পেশ করেন। মুওয়াহ্হিদ খলীফা তাঁহার নিকট জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কিত তাঁহার মতবাদ জানিতে চান। খলীফা জানিতে চাহিলেন, তিনি কি বিশ্বজগৎকে এরিস্টোটল যেরূপ অনাদি মনে করিতেন, সেই রূপে উহাকে অনাদি বলিয়া মনে করেন অথবা উহাকে সৃষ্টি অর্থাৎ অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বপ্রাপ্ত বলিয়া মনে করেন? উক্ত সরাসরি প্রশ্নে ইব্ন রুশ্দ ভড়কাইয়া গেলেন এবং ইহার কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। ইহাতে খলীফা তাঁহাকে সাহস দিবার উদ্দেশে এই বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। এইরূপে খলীফা অনুমান ভিত্তিক দর্শন সম্বন্ধে নিজের অবগত থাকিবার বিষয়টি ইব্ন রুশ্দের নিকট প্রকাশ করিলেন এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপ-আলোচনার পর পছন্দনীয় উপহারাদি দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। উক্ত পরিচয়ের ফলে ইব্ন রুশ্দ শাহী দরবার পর্যন্ত পৌঁছিলেন এবং খলীফার সদয় দৃষ্টির পাত্র হইয়া গেলেন। ইহার অল্পকাল পরে ইব্ন তুফায়ল খলীফার ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন এবং তিনি তাঁহার এই বন্ধু ইব্ন রুশ্দ-এর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ইব্ন রুশদ-এর দর্শন চর্চা ও তাঁহার দার্শনিক জ্ঞানের পরিধি আরও ব্যাপক হইবার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিতেন। বলা অনাবশ্যক যে, দর্শনের প্রতি ইব্ন রুশদ-এর অনুরাগের বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল এবং উহার চর্চায় তাঁহার অসাধারণ সাফল্য ও উন্নতি লাভ করিবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল। ইব্ন তুফায়ল তাঁহাকে বলিলেন যে, খলীফা এইজন্য আফসোস প্রকাশ করেন যে, 'আরব লেখকগণ এরিস্টোটলের শিক্ষার বর্ণনা প্রদানে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি ইব্ন রুশ্দকে উক্ত পরিভাষাগত জটিলতা দূর করিবার লক্ষ্যে এরিস্টোটলের শিক্ষার ব্যাখ্যায় একখানা গ্রন্থ রচনা করিতে পরামর্শ দিলেন। উক্ত পরামর্শের ফলস্বরূপ ইব্ন রুশ্দ এরিস্টোটলের শিক্ষার এইরূপ একখানা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করিলেন, যাহা খলীফার অত্যন্ত মনঃপূত হইল। এতদসহ উহা ল্যাটিন জগতে এরিস্টোটলীয় শিক্ষা বিষয়ক একখানা জনপ্রিয় ব্যাখ্যা গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করিল। এই কারণে ইব্ন রুশ্দ ল্যাটিন দার্শনিকদের নিকট আশ-শারিহ (ভাষ্যকার) নামে বিখ্যাত হইয়া গেলেন অর্থাৎ— ইব্ন রুশদ এরিস্টোটলের সর্বশেষ ও অধিকতর নির্ভরযোগ্য ভাষ্যকার। তাঁহার উক্ত ভাষ্যগ্রন্থ পরিশেষে তিনখানা পৃথক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়ঃ (১) পরিপূর্ণ ও বিশদ ভাষ্যগ্রন্থ। যাঁহারা উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিবার যোগ্যতার অধিকারী এবং যাঁহারা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের স্বরূপকে ভালরূপে বুঝিয়াছেন, উক্ত গ্রন্থ তাঁহাদের অধ্যয়নের জন্য রচিত হইয়াছে। (২) মধ্যম কলেবরের ভাষ্য গ্রন্থ। উহা প্রথমোক্ত গ্রন্থের তুলনায় সংক্ষিপ্ত আকারে রচিত। যাঁহাদের অধ্যয়ন ও পড়াশুনা তুলনামূলকভাবে অল্প ছিল, উহা তাঁহাদের পাঠের উদ্দেশে রচিত হইয়াছিল। (৩) সংক্ষিপ্ত ভাষ্যগ্রন্থ। যাহারা এরিস্টোটলের শিক্ষার অন্তর্গত বিষয়সমূহের মূল্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে এখনও ধারণা লাভ করিতে পারে নাই, সংক্ষিপ্ত এই গ্রন্থ তাহাদের পাঠের জন্য রচিত। উক্ত তিনখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ পর্যায়ক্রমিক পাঠক্রম হিসাবে, যাহা মুসলিম মাদ্রাসাসমূহে সাধারণত প্রচলিত রহিয়াছে— পঠিত হইতে পারে। গ্রন্থ তিনখানা সাধারণত যথাক্রমে 'আল-আক্বার' বা বৃহত্তর, 'আল-আওসাত' বা মধ্যম ও 'আল-আস্গার' বা ক্ষুদ্রতর এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

৫৫৯/১১৬৩ সনে মুওয়াহ্হিদ খলীফা 'আবদু'ল-মু'মিন ইনতিকাল করিলে তাঁহার পুত্র আবূ য়া'কূব তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। আবূ য়া'কূবের শাসনামলেও ইব্ন রুশ্দ পূর্বের ন্যায় শাহী আনুকূল্য ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে থাকেন। তিনি ছয় বৎসর পর ইযাবেলা নগরীর কাদী নিযুক্ত হন। ইহার দুই বৎসর পর তিনি পদোন্নতি লাভ করিয়া গ্রানাডার কাদী নিযুক্ত হন। ইতঃপূর্বে তাঁহার পিতা ও পিতামহও ঐ একই পদে নিযুক্ত ছিলেন। কাদী হিসাবে ইব্ন রুশ্দ শহরের সর্বোচ্চ পদের অধিকারী ছিলেন এবং নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এই সময়ে তিনি আইন সম্পর্কিত বিষয়াবলী লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতেন। এতদসত্ত্বেও দেখা যায় যে, এই

পদে কর্মরত থাকিবার যুগটিই ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁহার সৃজনশীল প্রতিভার উন্মেষের যুগ। তিনি এই যুগে জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে যে পরিশ্রম করেন, উহার ফলাফল ছিল অত্যধিক ও ব্যাপক। ইব্ন রুশ্দ যতগুলি গ্রন্থ রচনা করেন, উহাদের মধ্য হইতে মাত্র একখানা গ্রন্থ হইতে ফিক্‌হ বিষয়ক এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই হইতে দর্শন বিষয়ক। ইব্ন রুশ্দকে আমরা অতি কষ্টেই স্বভাবজাত দার্শনিক বা জন্মগতভাবে চিন্তাবিদ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। কারণ দার্শনিক হওয়া তাঁহার উদ্দেশ্যও ছিল না, বরং তিনি তো তাঁহার সমকালীন দার্শনিকদের সম্মুখে এরিস্টোটলীয় দার্শনিক চিন্তাধারা যেইরূপে পেশ করা হইয়াছে, তদনুসারে ইহারই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার নিজস্ব সুস্পষ্ট বর্ণনাভঙ্গি ও নির্ভীক প্রকাশ-রীতির কারণে তাঁহাকে ইহাতে এইরূপ কতগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইয়াছে, যেইগুলি সম্পর্কে তাঁহার পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। দার্শনিক হিসাবে ইব্ন রুশ্দ ছিলেন বাগদাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের পুনরুজ্জীবনের যে অব্যাহত ধারা সূচিত হইয়াছিল, উহারই ধারক। এই দিক দিয়া প্রধানত প্লেটোবাদের (Plotinus) প্রচার ও প্রভাবে প্রভাবিত হইবার মাধ্যমে নব্য প্লেটোবাদে প্রভাবিত হওয়া তাঁহার জন্য অপরিহার্য ছিল। উল্লেখ্য যে, নব্য প্লেটোবাদ প্রথম হইতেই আরবীয় এরিস্টোটলবাদ দ্বারা পরিপূর্ণভাবে প্রভাবিত ছিল। নিঃসন্দেহে ইব্ন রুশ্দ এরিস্টোটল ও তাঁহার দার্শনিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে সম্যক্ অবগত ছিলেন এবং তাঁহার পূর্ববর্তী সকল এরিস্টোটলবাদের তুলনায় এই বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অনেক বেশী ছিল। ইব্ন রুশ্দের মতে এরিস্টোটলীয় যুক্তিবিদ্যার মূলনীতিসমূহের পথ নির্দেশনায় বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সত্যকে লাভ করা যায়। কিন্তু ইহার জন্য চাই গভীর অধ্যয়ন— যাহা অনেকের প্রতিভার নাগালবহির্ভূত। তাঁহার মতে সাধু-সন্ন্যাসী সুলভ তপস্যা ও চিন্তা-ভাবনা নিষ্ফল ও অনর্থক, আর ইহা অপেক্ষাও অধিকতর নিষ্ফল ও অনর্থক হইতেছে সজ্ঞা ও ভাবাচ্ছন্ন অনুভূতি। ইব্ন রুশ্দ স্বীকার করেন যে, 'সক্রিয় বুদ্ধি' (দার্শনিকগণ যাহাকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন)-এর সহিত সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব। কিন্তু এই গভীর তত্ত্বটিকে খুব কমই গুরুত্ব দেওয়া হয়। সন্ন্যাসীসুলভ ধ্যান ও তপস্যা নিষ্ফল ও অনর্থক, এই বিষয়ে ইব্ন রুশ্দ ইব্ন বাজ্জা হইতে ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। তিনি সকল 'আরব দার্শনিকের ন্যায় ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন, আর ধর্মতত্ত্ববিদ হিসাবেই তিনি বিশ্বাস করিতেন, "দীন যেভাবে আল্লাহ তা'আলার ওহী দ্বারা বিবৃত হইয়াছে সেইভাবে সত্য।" তিনি বিশ্বাস করিতেন, "দুইটি সত্য পরস্পর বিরোধী হইতে পারে না। ইহাদের একটি অন্যটিকে আবশ্যিকভাবে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেই।" বুদ্ধির প্রয়োগ সম্বন্ধে ইব্ন রুশ্দ-এর অভিমত এই যে, স্বয়ং কুরআন মাজীদ লোকদেরকে বিভিন্ন বস্তু ও বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা, গবেষণা ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেয়। এইরূপে ইহা বুদ্ধির প্রয়োগকে জাইয বলিয়া নির্দেশ করে। এই দিক দিয়া কুরআন মাজীদ দর্শনের প্রশংসা করে। কুরআন মাজীদের যেইখানেই বাহ্য দৃষ্টিতে কোনরূপ পরস্পর বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়, সেইখানেই এরূপ কোন অর্থ প্রচ্ছন্ন থাকে, যাহা প্রতীয়মান পরস্পর বিরোধিতাকে দূর করিয়া দেয়। সাধারণ মানুষ যাহাদের নিকট দার্শনিক অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও নাই এবং প্রয়োজনীয় প্রতিভাও নাই, তাহাদের জন্য কুরআনে হাকীমের শাব্দিক অর্থই যথেষ্ট। কিন্তু যাঁহারা অনুসন্ধান চালান, তাঁহাদের বিরুদ্ধে শুধু এই কারণে কুফ্র ও গোমরাহীর ফাত্ওয়া দেওয়া উচিত নহে যে, তাঁহারা এমন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, উহা যাঁহারা ভাসা ভাসা ও অগভীর বিষয়াবলী অপেক্ষা ঊর্ধ্বতর কিছু জানেন না, তাঁহাদের 'আকীদা বিশ্বাস হইতে ভিন্নতর। এইরূপ গভীর তাত্ত্বিক বিষয় সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষের সহিতই আলোচনা করা সঙ্গত নহে। কারণ তাহারা যে সকল দলীল-প্রমাণ বুঝিতে পারে না, উহা দ্বারা তাহাদের মস্তিষ্ক বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়া ছাড়া অন্য কিছু সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই। এইরূপ অধ্যাত্মিক সত্যও আছে, যাহা বুদ্ধির নাগালের বাহিরে অবস্থিত এবং যাহা শুধু 'কাশ্ফ' বা দিব্য দর্শনের সাহায্যেই জানা যায়, ইমাম গাযালী (র) এই অভিমতকে ইব্ন রুশ্দ ভ্রান্ত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার মতে মানবীয় বুদ্ধি সকল সত্যকেই লাভ করিতে পারে। তবে তজ্জন্য শর্ত এই যে, ইহাকে সঠিকভাবে ও সঠিক পথে পরিচালিত করিতে হইবে। ইমাম গাযালী (র) মানবীয় বুদ্ধির ক্ষমতা ও নাগালের সীমাবদ্ধতার সপক্ষে তাঁহার মতবাদকে তাহাফুতু'ল-ফালাসিফা নামীয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইব্ন রুশ্দ তাঁহার তাহাফুতু'ত-তাহাফুত নামীয় গ্রন্থে ইমাম গাযালীর উক্ত পুস্তকের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন।

ইব্ন রুশ্দ জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ধর্মীয় 'আকীদা বিশ্বাসের সহিত সম্পর্কিত নিম্নোক্ত সূক্ষ্ম বিষয়াবলীকে গবেষণার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন ঃ (ক) জড় জগতের সৃষ্টির বিষয়; (খ) আল্লাহ তা'আলার হস্তক্ষেপে পার্থিব বিষয়াবলীতে হিদায়াত লাভের বিষয়; (গ) মৃত্যুর পর আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী থাকিবার বিষয় এবং (ঘ) পার্থিব কার্যকলাপ মুতাবিক আত্মার পুরস্কার লাভের ও শাস্তি ভোগের বিষয়। ইব্ন রুশ্দের অভিমত এই যে, উপরিউক্ত বিষয়সমূহকে বাহ্য অর্থে নহে, বরং রূপক অর্থে গ্রহণ করা উচিত। ইব্ন রুশ্দের পূর্বে ইব্ন বাজ্জা প্রচার করিয়াছিলেন যে, বুদ্ধি হইতেছে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠতম উপাদান। কারণ ইহার অনন্ত অস্তিত্বের অধিকারী হওয়া একমাত্র তখনই নিশ্চিত হইয়া যায়, যখন ইহা সক্রিয় বুদ্ধির (active intellect) সহিত (যাঁহাকে আল্লাহ নামে অভিহিত করা হয়) মিলিত হইয়া একাত্ম হইয়া যায় এবং ইহার মধ্যে এইরূপে শোষিত হইয়া যায়, যেরূপে মহাসাগরের বিশাল পানিরাশির মধ্যে এক বিন্দু পানি। উল্লেখ্য যে, ইব্ন বাজ্জার উক্ত মতবাদ সূফীবাদের ওয়াহ্দাতু'ল-উজূদ (সর্বেশ্বরবাদ) মতবাদ অপেক্ষা মাত্র এক কদম পিছনে।

যদিও ইব্ন রুশ্দ ইব্ন তুফায়লেরই ন্যায় 'সংরক্ষণ' নীতির, যাহার ভিত্তিতে মূর্খ ও প্রতিভাহীন লোকদের সহিত দর্শনশাস্ত্রের বিষয় লইয়া আলোচনা করা সমীচীন নহে— প্রবক্তা ছিলেন, তথাপি তাঁহার রচনাবলীর প্রচারের ফলে এবং তাঁহার তার্কিকসুলভ কার্যকলাপের পরিণতিতে সাধারণ জনগণ তাঁহার দার্শনিক চিন্তাধারার মূল কাঠামোর সহিত পরিচিত হইয়া পড়ে। স্পেনের মুসলিমগণ ছিল গোঁড়াপন্থী ও রক্ষণশীল এবং কুরআন মাজীদের তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রাচীন বর্ণনা ও ঐতিহ্যের অনুসারী। তাই তাহারা ইব্ন রুশ্দের 'আকীদা-কে, বিশেষত এইজন্যও আদৌ বরদাশ্ত করিতে পারিত না যে, তিনি তখন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন, যাহার ফলে সর্বদা তাঁহার কার্যকলাপ ও 'আকীদা-র সমালোচনা হইতে পারিত। ৫৭৮/১১৮২ সনে ইব্ন তুফায়লকে তাঁহার বার্ধক্যের কারণে শাহী চিকিৎসকের পদ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ইব্ন রুশ্দকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিবার উদ্দেশে মরক্কোতে ডাকিয়া

পাঠান হয়। ফলে তাঁহাকে কাদীর পদ ত্যাগ করিতে হয়। তিনি তৎকালীন খলীফা আবূ য়া'কূব য়ূসুফের ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। এইরূপে তিনি খলীফা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বিশ্বস্ত সুহৃদ হইয়া যান।

প্রায় সেই যুগে মুওয়াহ্হিদ শাসন উহার উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলে বেশ শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। শুধু স্পেনে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার কিছু কিছু চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। আর ইহাও ছিল দেশের উত্তরাঞ্চলে খৃস্টান শাসনকর্তাদের চাপ সৃষ্টির কারণে। এমতাবস্থায় ৫৮০/১১৮৪ সনে Santarem যুদ্ধক্ষেত্রের অবরোধে খলীফা আবূ য়া'কূব য়ুসুফ পরাজিত ও নিহত হইবার ফলে স্পেনে একটি বিপর্যয়াত্মক বিপ্লব ঘটিয়া যায়। ইহাই ছিল মুওয়াহ্হিদী খলীফাদের সর্বাধিক শোচনীয় পরাজয়। উক্ত পরাজয়ের পর নিহত খলীফার পুত্র আবূ য়ূসুফ য়া'কূব ছত্রভঙ্গ সৈন্যদেরকে (যাহাদেরকে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বাহিরে লইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন) একত্র করত পিতার সিংহাসন লাভ করিবার উদ্দেশে তাহাদেরকে সঙ্গে লইয়া মরক্কোতে চলিয়া যান। ইব্ন রুশ্দ নূতন খলীফার বিশেষ উপদেষ্টাও তাঁহার ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ইহার ফলে তাঁহার প্রতি খলীফার আর্থিক আনুকূল্য ও সৌহার্দ্য বর্ষিত হইতে থাকে। নূতন খলীফার সিংহাসনারোহণের পর দ্বিতীয় বর্ষে ইব্ন তুফায়ল ইনতিকাল করেন। ইহার অল্পকাল পর খলীফা রাজধানী পরিবর্তন করত স্পেনে চলিয়া যান। তিনি ইব্ন রুশ্দকেও তাঁহার সঙ্গে লইয়া যান। স্পেনে গিয়া Santarem-এর যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়া ফেলিবার উদ্দেশে খৃস্টান বাহিনীর বিরুদ্ধে নূতন একটি যুদ্ধাভিযান চালাইবার পরিকল্পনা করেন। ৫৯২/১১৯৫ সনের গ্রীষ্মকালে Badajoz-এর নিকটে অবস্থিত Alarcas নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে খৃস্টান বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিরাট ও গৌরবময় বিজয় লাভের মাধ্যমে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। উক্ত যুদ্ধাভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি পর্ব চলাকালে খলীফা কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার উদ্দেশে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হইবার জন্য মুসলিম জনগণের প্রতি আহ্বান জানাইলেন এবং তাঁহাদের আবেগানুভূতিকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টায় তিনি ধর্মকে অগ্রভাগে রাখেন। তিনি বেশ ভালরূপে অবগত ছিলেন যে, জনসাধারণ ইব্ন রুশ্দের দার্শনিক চিন্তাধারা সম্পর্কে সাধারণত অবগত রহিয়াছে। তাহারা তাঁহাকে কাফির ও গোমরাহ মনে করে। তাই তিনি ইব্ন রুশ্দকে Lucena নামক স্থানে নির্বাসিত করা প্রয়োজন মনে করিলেন। এতদ্সহ তিনি আদেশ জারী করিলেন যে, ইব্ন রুশ্দ কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্য হইতে মাত্র চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থাবলী ছাড়া দর্শন বিষয়ক সকল গ্রন্থকে যেন বাযেয়াফ্ত করত বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। খলীফার উক্ত আদেশটি ছিল সম্পূর্ণত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। উহার উদ্দেশ্য ছিল রক্ষণশীল গোঁড়াপন্থী লোকদেরকে পুনরায় এই নিশ্চয়তা প্রদান করা যে, খলীফা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের একজন গাযী বা মুজাহিদ। যাহা হউক, স্পেনীয় খৃস্টানদের পরাজয়ের পর খলীফা ইব্ন রুশ্দকে মরক্কোতে নিজের নিকট ডাকাইয়া নেন এবং ৫৯৩/১১৯৬ সনে ইব্ন রুশ্দের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার প্রতি খলীফার কৃপা ও আনুকূল্য বজায় থাকে।

পরবর্তী যুগের 'আরবীয় চিন্তাধারার উপর ইব্ন রুশ্দের তেমন প্রভাব না পড়িলেও তিনি য়াহূদী চিন্তাবিদদের জন্য প্রেরণার উৎস প্রমাণিত হন। পরবর্তী যুগের ল্যাটিন খৃস্টান জগতে তাঁহার জনপ্রিয়তার জন্য প্রধানত য়াহূদী জ্ঞানচর্চাকারিগণই কৃতিত্বের অধিকারী। তিনি য়াহূদী পণ্ডিতদেরকে তাঁহার নিজস্ব দার্শনিক চিন্তাধারা দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে তৃপ্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দর্শনের যে সকল বিষয় সম্বন্ধে দার্শনিকগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া গবেষণা ও বিতর্ক করিয়া আসিতেছিলেন, সেই সকল বিষয়কে সহজ, সাবলীল ও সুস্পষ্ট প্রকাশ ভঙ্গিমায় তিনি তাঁহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হন। পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন দার্শনিক ওয়াহ্'হি ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে ইতঃপূর্বে যে প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন, ইব্ন রুশ্দও সেই একই প্রচেষ্টা চালান। য়াহূদীদের মধ্যে ইব্ন রুশ্দের রচনাবলীর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। অবশ্য তাঁহার রচনাবলীর বিখ্যাত হিব্রু অনুবাদকার্য কিছুকাল পরে সম্পন্ন হয়। তাঁহার রচনাবলী ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। হিব্রু ভাষায় অনূদিত হইবার প্রায় সমসাময়িক যুগে ল্যাটিন ভাষায় তাঁহার রচনার প্রথম অনুবাদ করেন Michacl Scot ৬২৮/১২৩০ সনে। উহার দশ বৎসর পর Carinthia অঞ্চলের Hermann তাঁহার রচনার ল্যাটিন অনুবাদ করেন। উভয়েরই Hohenstaufen বংশের সহিত সম্পর্ক ছিল। ইব্ন রুশ্দের দার্শনিক চিন্তাধারার কল্যাণে প্যারিসের বিদ্যালয়সমূহে এরিস্টোটলীয় দর্শনের অধ্যয়ন সূচিত হয়। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে উহার চর্চা সেখানে নিষিদ্ধ ছিল। ইব্ন রুশ্দের মৃত্যুর কিছুকাল পর জানা যায় যে, তিনি তাঁহার দার্শনিক মতবাদসমূহের ব্যাপারে আবশ্যিকভাবে এরিস্টোটলকে অনুসরণ করিতেন না।

তবে বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ব্রাট্রান্ড রাসেল তাঁহার Unpopular Essays গ্রন্থে ব্যক্ত করেন যে, পাশ্চাত্যের দার্শনিকবৃন্দের 'বস্তুবাদী দর্শন'-এর ভিত খৃস্টানজগতে ঐতিহ্যসূত্রে অনুপস্থিত বরং ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ মধ্যযুগীয় মুসলিম দার্শনিক, বিশেষত ইবন রুশ্দ-এর 'যেই ভাবে প্রতীয়মান' শরীয়ত বিরোধী বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতায় অতিমাত্রায় বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া ধর্মত্যাগী হিসাবে পরিগণিত হন; বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করিবার ক্ষেত্র বলিয়া গবেষণাযোগ্য। মুসলমানগণ কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়া তিনি জ্ঞানের জগতে আলোকিত ব্যক্তিস্বরূপ স্বীকৃতি লাভ করেন (সম্পাদনা পরিষদ)।

**মুসলিম স্পেনে কাব্য চর্চা** ঃ স্পেনের বুদ্ধিবৃত্তি, কৃষ্টি ও সভ্যতা দার্শনিক গবেষণা ও দর্শন চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সেখানে কবি ও গদ্য লেখকেরও আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কর্ডোভার কবি আবূ 'উমার আহ্মাদ ইব্ন 'আব্দি রাব্বিহী (মৃ. ৩২৮/৯৪০)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার কাব্য রচনা বাগদাদের কবি ইব্নু'ল-মু'তায্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। তিনি কবি আবূ তাম্মাম ও কবি আল-বুহ্তুরীর অনুকরণে 'আল-'ইক্দ নামক একখানা কাব্য সংকলন প্রকাশ করেন। উক্ত কাব্য সংকলনখানা কবি আবূ তাম্মাম কর্তৃক সংকলিত 'হামাসা' কাব্য-সংকলনের পরিপূরক কাব্যগ্রন্থ; ইহাতে স্পেনীয় ও আফ্রিকীয় কবিদের কবিতাবলীর মধ্য হইতে নির্বাচিত কতগুলি কবিতা স্থান পায়। তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কবি আবু'ল-হাসান 'আলী আল-আয়াদী আত-তিউনিসীর সহিত বিতর্কে জড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার রচিত সকল কবিতা একটি দীওয়ান-এ সংকলিত হইয়াছে। তিনি তৃতীয় 'আবদু'র-রাহ্মান কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের বর্ণনায় 'রাযায' ছন্দে একখানা কাসীদা (রায্মিয়্যা)-ও রচনা করেন। উক্ত কাসীদাটিকে

একদিক দিয়া 'যুদ্ধ কাব্য' নামে অভিহিত করা গেলেও প্রকৃতি ও আকার-আকৃতির দিক দিয়া ইহাকে কতগুলি ঘটনার ছন্দোবদ্ধ বিবরণের অধিক কিছু বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সেই যুগে কবিতায় যুদ্ধ বিষয়ক ঘটনাবলীর বর্ণনা 'আরবদের নিকট পসন্দনীয় ছিল না, বরং এই ধরনের বর্ণনার জন্য গদ্যকেই উপযোগী মনে করা হইত। কবি ইব্ন 'আব্দি রাব্বিহী সংকলিত পঁচিশ খণ্ডে বিভক্ত পূর্বোক্ত আল-'ইকদু'ল-ফারীদ গ্রন্থে ইব্ন কুতায়বার সংকলন হইতে বিপুল সংখ্যক কবিতা গৃহীত হইয়াছে।

আবু'ল-কাসিম মুহাম্মাদ ইব্ন হানী (মৃ. ৩৬২/৯৭৩) মুসলিম স্পেনের একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন। ইযাবেলায় তাঁহার জন্ম। তাঁহার পরিবার উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার মাহ্দিয়া অঞ্চল হইতে স্পেনে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। কবি আবু'ল কাসিম তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে একজন বিপথগামী ও পাপাচারী ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি 'দার্শনিকদের' আকীদা-বিশ্বাসের ধারক ছিলেন। উহার তাৎপর্য এই যে, তিনি আল-ফারাবী ও ইব্ন সীনার এরিস্টোটলীয় দার্শনিক ও ইব্ন সীনার এরিস্টোটলীয় দার্শনিক চিন্তাধারার অনুসারী ছিলেন। এই কারণে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে কাফির ও গোমরাহ হইবার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। ফলে ইযাবেলার শাসনকর্তা তাঁহাকে অন্যত্র কোথাও চলিয়া যাইতে নির্দেশ দেন। ইহাতে তিনি সাতাশ বৎসর বয়সে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় চলিয়া যান। সেই সময়ে সেখানকার ইসমা'ঈলী (ফাতিমী) খলীফা মিসর আক্রমণের সূচনা করেন। কবি আবু'ল-কাসিম ফাতিমী সেনাপতি জাওহার-এর প্রশংসায় একটি কাসীদা রচনা করেন। তিনি কিছুকাল 'যাব' অঞ্চলের রাজধানী মাসীরাতে অবস্থান করেন। সেখানে তাঁহার অবস্থান কালে ফাতিমী খলীফা আল-মু'ইয্য তাঁহার সম্বন্ধে অবগত হইয়া তাঁহাকে নিজের কাছে ডাকাইয়া নেন। তিনি কিছুকাল খলীফার কাছে কাটান। অতঃপর তিনি খলীফাকে ত্যাগ করিয়া বারকায় চলিয়া যান। সেখানেই তিনি একদা মাতাল অবস্থায় বিবাদ করিতে গিয়া নিহত হন। তাঁহার কবিতাবলীর কিছু কিছু অংশ অত্যন্ত উন্নত মানের রচনা। সেইগুলি একটি দীওয়ান-এ সংকলিত ও সংরক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার উৎকৃষ্ট মানের কবিতাবলীর মধ্যে একটি কবিতা খলীফা আল-মু'ইয্য-এর প্রশংসায় রচিত। উক্ত কবিতা বিরূপভাবে সমালোচিত হইয়াছে। এইরূপ অতিরঞ্জনমূলক প্রশংসা মৌলবাদী রক্ষণশীল লোকদের নিকট ছিল কুফ্রী কথা।

গ্রানাডার বিশিষ্ট কবি আবূ মহাম্মাদ য়ূসুফ আর-রামাদী (মৃ. ৪০৩/১০১৩) অত্যন্ত সহজে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং বিপুল সংখ্যক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি স্পেনের মুসলিম কবিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁহার কতগুলি কবিতা আছ-ছা'আলিবীর য়াতীমাতু'দ-দাহ্র গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার একটি বিখ্যাত কাসীদাঃ আবূ 'আলী ইসমা'ঈল আল-কালীর প্রশংসায় রচিত। কাসীদাটি তিনি ৩৩০/৯৪২ সনে স্পেনে আবূ 'আলীর আগমন উপলক্ষে রচনা করেন। সেই যুগে কবিদেরকে বড় বড় পুরস্কার ও পারিতোষিক প্রদান করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না। তাই কবি আর-রামাদী দরিদ্র অবস্থায় ইনতিকাল করেন।

আবু'ল-ওয়ালীদ 'আবদুল্লাহ্ ইবনু'ল-ফার্দী (মৃ. ৪০৩/১০১৩) স্পেনের 'আলিমগণের জীবনচরিতের রচয়িতা ছিলেন। গ্রন্থখানা ইব্ন বাশ্কুওয়াল কর্তৃক রচিত সিলা গ্রন্থের ধারায় রচিত। আবু'ল-ওয়ালীদ প্রাচ্যের দূর দূরান্ত দেশসমূহ ভ্রমণ করেন। ৪০৩/১০১৩ সনে যখন উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার বার্বারগণ গ্রানাডাতে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং সেখানকার সর্বশেষ উমায়্যা খলীফা আত্মগোপন করেন, তখন আবু'ল-ওয়ালীদ নিহত হন।

আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্ন 'ঈসা আর-রাব্বা'ঈ (মৃ. ৪১৭/ ১০২৬-১০২৭) বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বাগদাদের বিশিষ্ট 'আলিমগণের নিকট জ্ঞানার্জন করিবার পর ৩৮০/৯৯০-৯৯১ সনের দিকে স্পেনে চলিয়া যান। যখন দ্বিতীয় হিশামকে গ্রানাডার ভাবী খলীফা ঘোষণা করা হয় তখন রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষমতা 'আমির আল-মান্সূর-এর হস্তে ন্যাস্ত ছিল, যাঁহার অনুগ্রহ আবু'ল-হাসান লাভ করেন। তিনি আল-মানসূর-এর জন্য আল-কালী রচিত 'আমালী' গ্রন্থের রচনা-পদ্ধতিতে কিতাবু'ল-ফুসূস নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। আল-মানসূর ইহার পারিতোষিক হিসাবে তাঁহাকে পাঁচ হাযার স্বর্ণ মুদ্রা দান করেন। কিন্তু গ্রন্থখানা প্রকাশিত হইবার পর উহা নানারূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। উহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, ইহাতে অনেক ভ্রান্ত কথা লিখিত রহিয়াছে। অবশেষে আল-মানসূর আর-রাব্বাঈ কর্তৃক রচিত কিতাবু'ল-ফুসূস গ্রন্থখানা ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ বলিয়া যখন নিশ্চিত হন তখন তিনি উহা বিনষ্ট করিয়া দেন।

স্পেনের একজন কবি আবূ 'উমার আহমাদ ইব্ন দার্রাজ (মৃ. ৪২১/১০৩০) আল-মানসূরের সভাসদ ও দ্বিতীয় হিশামের হাজিব ছিলেন। কেদা আল-মানসূর তাঁহাকে রাজস্ব বিভাগে প্রধান কর্মকর্তা আল-খাসীব ইব্ন আবদি'ল-মাজীদ-এর প্রশংসায় এইরূপ একটি কাসীদাঃ রচনা করিতে আদেশ দিলেন, যাহা আবূ নুওয়াস রচিত কাসীদার সমতুল্য হয়। ইব্ন দার্রাজ বেশ দীর্ঘ একটি কাসীদা রচনা করেন, যাহা আল-মানসূরের মনঃপূত হয়। ইব্ন খাল্লিকান তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে ইব্ন দাররাজ-এর কবিতার নমুনা সংরক্ষণ করেন।

মুসলিম স্পেনের আরেকজন কবি 'উবাদা ইব্ন মা'ই'স্-সামা' (মৃ. ৪২৩/১০৩১) বালানসিয়াহ্ প্রদেশের বানূ 'আমির বংশীয় শাসনকর্তাদের দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কাব্য রচনায় 'তাওশীহ (Strophic) নামীয় একটি সুষম ছন্দ উদ্ভাবন করেন। উহা লোকগীতিতে কাসীদার স্থান গ্রহণ করে। কারণ উক্ত ছন্দ সংগীতের জন্য বিশেষ উপযোগী ছিল। তাঁহার পূর্ববর্তী কোনও কবি উহা প্রয়োগ করেন নাই। শিক্ষিত সম্প্রদায় লোকগীতিকে সাধারণত অপসন্দ করিত। সর্বপ্রথম কবি 'উবাদাই উক্ত ছন্দ কবিতা রচনায় প্রয়োগ করিতে সাহসী হন। উক্ত ছন্দের ব্যবহার স্পেন হইতে পূর্বদেশে ছড়াইয়া পড়ে। গাযী সলাহু'দ-দীনের শাসনামলে কবি ইব্ন শামসিল-মালিক তাঁহার কবিতায় উক্ত ছন্দ প্রয়োগ করেন। কিন্তু মনে হয় হি. সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের পর উক্ত ছন্দ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়। যদিও তাওশীহ ছন্দে রচিত কবিতা লোকগীতির ন্যায় সদৃশ, তথাপি ইহাতে বর্ণিত বিষয়বস্তু ও উপমাসমূহ ক্লাসিক্যাল কবিতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ ছিল।

আবূ জা'ফার আহমাদ ইব্ন আল-আব্বার (মৃ. ৪৩৩/১০৪১) ইযাবেলার অধিবাসী এবং একজন যোগ্য কবি ছিলেন। ইযাবেলার 'আব্বাদ তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। তিনি একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন এবং অনেক হৃদয়গ্রাহী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতাবলী দীওয়ানে সংকলিত হইয়াছে। ইব্ন খাল্লিকান তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে কবি আবূ জা'ফার রচিত প্রেমসূচক কবিতাবলীর কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করেন।

উমায়্যা ইব্‌ন আবি'স-সাল্‌ত (মৃ. ৫২৯/১১৩৪) দেনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি সাহিত্যের সকল শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। স্পেনে মুরাবিত শাসনের অবসান ঘটিবার পূর্বেই তিনি স্পেন ত্যাগ করিয়া আলেকজান্দ্রিয়ায় চলিয়া যান। কিন্তু ফাতিমী খলীফা আল-মুস্‌তা'লীর উযীর আল-আফদাল শাহানশাহ তাঁহাকে সেই স্থান হইতে বহিষ্কার করিয়া দেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার মাহ্‌দিয়ায় চলিয়া যান। সেখানকার যীরী শাসনকর্তা য়াহ্‌য়া ইব্‌ন তামীম তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। তিনি একখানা গ্রন্থ রচনা করেন এবং আছ-ছা'আলিবীর গ্রন্থ য়াতীমা-র অনুকরণে ইহার নামকরণ করেন 'আল-হাদীকা'। তাঁহার রচনাবলীর মাত্র সামান্য অংশ বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা পায়। ইব্‌ন খাল্লিকানের যুগেও তাঁহার রচনাবলীর মাত্র ঐ পরিমাণই সংরক্ষিত ছিল।

স্পেনীর লেখক ইব্‌ন খাকান (৫৩৫/১১৪০) সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ করিয়া স্পেনীয় কবিদের একখানা জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মাত্‌মাহ্'ল-আনফুস ওয়া মাস্‌রাহু'ত-তা'আনুস ফী মুলহি আহ্‌লি'ল-আন্দালুস নামক একখানা গ্রন্থও রচনা করেন। ইব্‌ন খাকান একজন দৃঢ় চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি দূর পাশ্চাত্যের একটি সরাইখানায় ইনতিকাল করেন।

**জ্যোতির্বিদ্যায় মুসলিম স্পেন ঃ** 'আরবদের জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy) আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী টলেমী (মৃ. ১৮০ খৃষ্টাব্দের দিকে) কর্তৃক রচিত আল-মাজিস্‌তী (Almadjist) গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত গ্রন্থ হাজ্জাজ ইব্‌ন য়ূসুফ অথবা সাহ্‌ল ইবন রাব্বান আত-তাবারী (মৃ. ২১২/৮২৭ সনের দিকে) কর্তৃক 'আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। উক্ত গ্রন্থে সমগ্র মহাবিশ্বকে এইরূপে উপস্থাপিত করা হয় যে, মহাবিশ্বের কেন্দ্র হইতেছে আমাদের এই পৃথিবী এবং চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহরাজি উহার চতুর্দিকে কতগুলি সমকেন্দ্রিক বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে। উক্ত মতবাদের ভিত্তিতে মহাবিশ্বের মোটামুটিভাবে একটি চিত্র প্রস্তুত হইতে পারিত। কিন্তু কালের পরিক্রমায় এই কথা স্পষ্ট ও নিশ্চিত হইয়া যায় যে, এই ছক নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না এবং এই মতবাদ মূলত অভ্রান্ত ছিল না। ইহাকে নির্ভুল ও অভ্রান্ত রূপ দিবার চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু ইহাকে পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র মনে করিবার মতবাদ অন্তর্ভুক্ত থাকায় উহার ভিত্তিতে গঠিত মতবাদসমূহে ভ্রান্তি থাকিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। সূর্যকেন্দ্রিক (Heliocentric) মতবাদ টলেমীর মতবাদকে দশম/ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত স্থান হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, টলেমীয় মতবাদের উক্ত সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা উহারও আনুমানিক চারি শত বৎসর পূর্বে প্রকাশ করা হয়। আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি, বিশেষত স্পেনে প্রকাশ লাভ করে, যখন নব্য জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা সেখানে হইতেছিল। সেই যুগে স্পেনে নব্য জ্যোতির্বিদ্যা বেশ বিকশিত হইয়াছিল এবং তৎকালে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ল্যাটিন খৃষ্টান জগতের অন্যান্য অংশ হইতে শিক্ষার্থীগণ উন্নত বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার ধারক ও প্রচারক দেশ হিসাবে স্পেনে জ্ঞানার্জনব্যপদেশে গমন করিতেন। সেই দেশে তখন প্রাচীন মতবাদসমূহের সমালোচনা ও পর্যালোচনা চলিতেছিল এবং তদস্থলে স্থাপনযোগ্য সম্ভাব্য সমাধান বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা হইতেছিল।

জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক উক্ত নব্য চিন্তাধারার একজন বিশিষ্ট নায়ক ছিলেন মাদ্রিদের আবু'ল-কাসিম মাস্‌লামা ইব্‌ন আহ্‌মাদ (মৃ. ৩৯৮/১০০৭ সনের দিকে)। তিনি পারস্যের আল-খাওয়ারিয্‌মী (মৃ. ২১৫/৮৩০) কর্তৃক প্রস্তুত জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক মহাজাগতিক চিত্রসমূহ সমীক্ষা করত উহাদেরকে সংশোধিত করেন। তাঁহার সংশোধিত ও পুনঃপ্রস্তুতকৃত চিত্রগুলি বাথ নামক স্থানের অধিবাসী অ্যাডেলার্ড (Adelard of Bath, মৃ. ৪৮৩/১০৯০ সনের দিকে) কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় রূপান্তরিত হয়। আবু'ল-কাসিম মাসলামা নক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাপক যন্ত্রের প্রস্তুতকরণ বিষয়েও একখানা পুস্তিকা রচনা করেন। উক্ত পুস্তিকাখানা Petrus Hispalensis কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। তিনি টলেমী রচিত Planispherium গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন। ব্রুজেস অঞ্চলের রুডলফ (Rudolf of Bruges) ল্যাটিন ভাষায় উক্ত ভাষ্যখানার অনুবাদ করেন এবং উহা ১৫৩৬ খৃ. Basle-তে ও ১৫৫৮ খৃ. ভেনিসে প্রকাশিত হয়। আবু'ল-কাসিম মাসলামা রসায়ন ও যাদুবিদ্যা বিষয়েও কতগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অথবা তাঁহার অনুসারী কিরমানী, ইখওয়ানু'স-সাফা (দ্র.) নামক সংঘ কর্তৃক রচিত রিসালাসমূহকে স্পেনে পরিচিত করান। উক্ত রিসালাসমূহ সম্ভবত হি. চতুর্থ শতাব্দীতে বসরা শহরে রচিত হয়। ইহাতে এরিস্টোটলীয় অতীন্দ্রিয়বাদ ও প্লেটো-প্রচারিত অধ্যাত্মবিদ্যার সমন্বিত রূপ উপস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে মু'তাযিলা সম্প্রদায় প্রচারিত অধ্যাত্মবিদ্যা ও গ্রীক দার্শনিক Pythagoras কর্তৃক প্রচারিত 'সংখ্যার গুরুত্ব' মতবাদেরও কিয়ৎ পরিমাণ সংমিশ্রণ রহিয়াছে। উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে বরং ভাসা ভাসাভাবে সেইগুলিও আলোচনা করা হইয়াছে। এখন জানা যায় যে, এইরূপ বুদ্ধিভিত্তিক দর্শন সেই যুগের পূর্বেও যখন আল-কিন্‌দী ও ইব্‌ন সীনা তুলনামূলকভাবে অধিকতর কঠোর এরিস্টোটলীয় দর্শনকে সংহত ও সংরক্ষিত করিয়াছিলেন, তখনও প্রচলিত ছিল। হি. পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে মুসলিম স্পেন দর্শন ও মুক্ত বুদ্ধির অনুশীলনও চর্চাকেন্দ্র ছিল। অবশ্য মুওয়াহ্‌হিদী শাসনকর্তাদের শাসনামলে চিন্তা ও বুদ্ধির উক্ত স্বাধীনতা তিরোহিত হইয়া যায়।

কর্ডোভার আবু'ল-কাসিম আহ্‌মাদ আল-য়াফিকী (মৃ. ৪২৬/১০৩৪) রিসালাতু'ল-আস্‌তুরলাবি ওয়া'ল-আস্‌মা' (তু. বৃটিশ মিউজিয়াম, নং ৯৭৬) নামীয় একখানা পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় পুস্তিকাখানা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় ছিল। উহা Profatius (Meirson of Jacob) কর্তৃক হিব্রু ভাষায় এবং Tivoli অঞ্চলের Plato কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। আহ্‌মাদ আল-য়াফিকী ভারতীয় উপমহাদেশের 'সিদ্ধান্ত' মূলনীতির ভিত্তিতে ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের সহিত সম্পর্কিত কতগুলি কোষ্ঠী বা জন্ম-পত্রিকা (Horoscope)-ও প্রস্তুত করেন। শেষ জীবনে তিনি গ্রানাডা ত্যাগ করিয়া দেনিয়ায় চলিয়া যান এবং জীবনের শেষ দিনগুলি সেখানেই অতিবাহিত করেন।

মধ্যযুগে জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ সৃষ্টি করেন। সেই যুগের জ্যোতির্বিদ্যাকে মোটেই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা সমীচীন নহে। কারণ সেই যুগের জ্যোতির্বিদ্যা চর্চাকারী মনীষিগণ যতদিন তাঁহাদের বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন, ততদিন তাঁহারা সাধারণত পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী এবং নিজেদের পর্যবেক্ষণে সঠিক পন্থার অনুসারী ছিলেন। আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্‌ন আবি'র-রিজাল (মৃ. ৪৩২/১০৪০) মধ্যযুগের একজন বিখ্যাত মুসলিম জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদ। তিনি ল্যাটিন ভাষায় Albohazen,

Abenragel ও Alboacen— এই তিন নামে পরিচিত। তিনি স্পেন অথবা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার অধিবাসী ছিলেন এবং তিউনিসিয়ায় লালিত-পালিত হন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে কিতাবু'ল-বারি' ফী আহ্কামি'ন-নুজূম (আত-তাওয়ালি') নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে তিনি নক্ষত্রসমূহ ও এইগুলির অবস্থানের চিত্রের সাহায্যে কতগুলি জন্ম-পত্রিকা Birth Table রচনা করেন। গ্রন্থখানার অনুলিপি বৃটিশ যাদুঘরে (নং ১৩৪৭), ইন্ডিয়ান অফিস লাইব্রেরীতে (নং ৭৩৫) প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারে (নং ২৫৯০) সংরক্ষিত রহিয়াছে। আবু'ল-হাসান জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে কতগুলি কবিতাও রচনা করেন। তাঁহার রচিত কিতাবু'ল বারি' জ্যোতির্বিদ্যার একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ। উহা হিব্রু ল্যাটিনে অনূদিত হয়। ইহার ল্যাটিন অনুবাদ ১৫৫১ খৃ. Basle প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানা সম্পর্কিত একটি চিত্তাকর্ষক তথ্য এই যে, জনৈক য়াহূদী ইব্ন মূসা কাস্তালা ভাষায়ও উহার অনুবাদ করেন।

বিজ্ঞানের জগতে এক উল্লেখযোগ্য প্রতিভা ছিলেন ইব্রাহীম ইব্ন য়াহ্য়া আয-যিরিক্লী আন-নাক্কাস (মৃ. ৪৯৪/১১০০)। তিনি তুলায়তালা ইযাবেলায় তাঁহার জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি শুধু একজন যন্ত্রনির্মাতা এবং বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যতিরেকেই একজন সুনিপুণ কারিগর ছিলেন। কিন্তু তাঁহার নির্মাণশালায় বিজ্ঞানীদের যাতায়াত ছিল। তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিতেন। তিনি তাঁহাদের অনুপ্রেরণায় বিজ্ঞান-সাধনায় প্রবৃত্ত হন। অতঃপর কঠোর সাধনা ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি তাঁহার যুগের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে পরিগণিত হইতে থাকেন। তিনি একটি নূতন ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করেন যাহার নাম তিনি রাখেন সাফীহা (صفيحة)। যন্ত্রটি উসতুরলাব (اسطرلاب)-এরই একটি উন্নততর সংস্করণ। তিনি উহাকে তুলায়তালার শাসনকর্তার জন্য নির্মাণ করেন। অতঃপর তিনি গ্রানাডার 'আব্বাদী শাসনকর্তা আল-মু'তামিদ-এর জন্য উক্ত যন্ত্রের অধিকতর উন্নত নমুনা প্রস্তুত করেন। উক্ত যন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদানের উদ্দেশে তিনি একখানা পুস্তিকাও প্রণয়ন করেন। পুস্তিকাখানার একটি অনুলিপি বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে (নং ১২০৪২৬) সংরক্ষিত রহিয়াছে। উহা হিব্রু ভাষায় অনূদিতও হইয়াছে। Montpelier-এর এক য়াহূদী জনৈক খৃস্টানের সহায়তায় উহার হিব্রু অনুবাদ হইতে উহাকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। কাস্তালা-এর সম্রাট Alfonso উহাকে কাস্তালা ভাষায় অনুবাদ করেন।

ইবরাহীম আন-নাককাশ সৌর কক্ষপথের পৃথিবী হইতে দূরতম স্থানে (apogee)-র বিচরণের বিষয়টি প্রমাণিত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি উক্ত বিষয়ক স্বীয় প্রমাণকে সৌর কক্ষপথের কম্পন (trepidation) সম্পর্কিত ভ্রান্ত মতবাদের সপক্ষে প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি তুলায়তালাতে দুইটি জল-ঘড়ি নির্মাণ করেন এবং মা'রূফু'য-যীজ প্রস্তুতকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। উক্ত নকশামালা ছিল মহাকাশ বিষয়ক কতগুলি চিত্রের সংশোধিত রূপের সমষ্টি। ইহা পাশ্চাত্য দেশে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে এবং নির্ভরযোগ্য বলিয়া স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়, যতদিন না দশম Alfonso (৬৬১/১২৬২—৬৮৩/১২৮৪)-র শাসনামলে প্রস্তুত সংশোধিত ও পরিমার্জিত নক্শামালা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। অবশ্য উক্ত নকশামালায়ও সৌর কক্ষপথের কম্পন বিশিষ্ট হইবার ভ্রান্ত মতবাদ সমর্থিত হইয়াছে।

De Lacy O'Leary (দা.মা.ই.)/মু. মাজহারুল হক

**সংযোজন**

**মুসলমানগণ বিশ্বের সর্ববৃহৎ জাতি**

বর্তমান বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৬ শত ২৭ কোটি ৯৯ লাখ। তন্মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ১৬০ কোটি। অপরদিকে ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট ও অর্থডক্স খৃস্টানদের সংখ্যা একত্রে ১৫২ কেটি ৭৮ লাখ। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত খৃস্টানরাই বিশ্বের সর্ববৃহৎ জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯৯৯ সালে মুসলমানদের সংখ্যা খৃস্টানদের ছাড়াইয়া যায়। বর্তমানে মুসলিম জনসংখ্যা খৃস্টানদের তুলনায় প্রায় ৭ কোটি বেশি।

দ্রুত মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ এই যে, বিশ্বের সর্বত্রই খৃস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ ইসলাম গ্রহণ করিতেছেন। ফলে সংখ্যাগত দিক হইতে মুসলমানরা আজ বিশ্বের সর্ববৃহৎ জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। য়ূরোপের খৃস্টান বুদ্ধিজীবীরা মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা বৃদ্ধিতে আশংকা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, 'এভাবে মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে তাহা আগামী একবিংশ শতাব্দীতে মোট জনসংখ্যার ৪০ ভাগে উত্তীর্ণ হইবে। 'খৃস্টান বুদ্ধিজীবিদের এই আশংকা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম দ্রুত বর্ধিষ্ণু জীবন ব্যবস্থা হিসাবে প্রসার লাভ করিতেছে। বিশ্বের আনাচে-কানাচে বিপুল আগ্রহ-উদ্দীপনা সহকারে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করিতেছেন। মুসলিম বিশ্ব তো বটেই, য়ূরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও ওসেনিয়ার বিভিন্ন দেশে ইসলামী পুনর্জাগরণ শুরু হইয়াছে। পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় পাশ্চাত্য জগতে ইসলামের যৌক্তিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

**মুসলিম দেশ** ঃ বর্তমানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সংখ্যা ৬৭টি। তন্মধ্যে ওআইসিভুক্ত দেশ ৫৬টি। তাহা ছাড়া উগান্ডা, ইথিওপিয়া, তানজানিয়া, পশ্চিম সাহারা, লাইবেরিয়া প্রভৃতি দেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও খৃস্টানদের দ্বারা শাসিত।

**স্বাধীনতাকামী মুসলিম অঞ্চল** ঃ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানরা স্বাধীনতা আন্দোলনে লিপ্ত রহিয়াছে। এসব অঞ্চলে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবুও য়াহূদী, খৃস্টান ও হিন্দুবাদী শক্তি স্বাধীনতাকামীদের অধিকার দিতে নারাজ। বিশেষত কাশ্মীর, মিন্দানাও, আরাকান, কসোভো, চেচনিয়া, ঈঙ্গোলেটিয়ার আন্দোলন দিন দিন বেগবান হইতেছে। তাহা ছাড়া রাশিয়ার ৪টি রাজ্যে, থাইল্যান্ডের ১টি রাজ্যে ও বুলগেরিয়ার ২টি অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

**যেসব দেশে মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তর জাতি**

**এশিয়া** ঃ সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, চীন, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, শ্রীলংকা , ভারত, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ইসরাঈলে মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তর জাতি। এই সব দেশে দ্রুত গতিতে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটিতেছে।

**আফ্রিকা** ঃ এই মহাদেশকে বলা হয় ইসলামের মহাদেশ। এই মহাদেশের বেশির ভাগ দেশেই মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। মোট জনসংখ্যার ৫৬% ভাগ মুসলিম। অপরদিকে ১২টি দেশে মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তর জাতি। এসব দেশের লোকজন ব্যাপক হারে ইসলামে দীক্ষিত হইতেছে।

**য়ূরোপ** ঃ এককালে গোটা য়ূরোপ ইসলামী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। তখন য়ূরোপের সিংহভাগ এলাকা মুসলিম শাসনাধীন ছিল।

পরবর্তী কালে খৃস্টশক্তি ষড়যন্ত্র ও নৃশংসতার মাধ্যমে য়ূরোপ হইতে মুসলমানদের উৎখাত করে। সময়ের ব্যবধানে সেই য়ূরোপেও ইসলামী পুনর্জাগরণ সৃষ্টি হইয়াছে। য়ূরোপের আইসল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, বাইলোরাশিয়া, রাশিয়া, ইউক্রেন, শ্লোভাকিয়া, জর্জিয়া, আরমেনিয়া , বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, চেকপ্রজাতন্ত্র, পোল্যান্ড, জার্মান, ফ্রান্স, মাল্টা, স্পেন, পর্তুগালসহ অধিকাংশ দেশেই মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী।

**উত্তর আমেরিকা ঃ** এই মহাদেশের ত্রিনিদাদ এণ্ড টোবাগো, গ্রেনাডা, হাইতি, জ্যামাইকা, কিউবা, নিকারাগুয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ অধিকাংশ দেশে খৃস্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও সেসব দেশে মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তর জাতি। খোদ যুক্তরাষ্ট্রেও দ্রুতগতিতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম জনসংখ্যা ১ কোটি ছাড়াইয়া গিয়াছে।

**দক্ষিণ আমেরিকা ঃ** এই মহাদেশের ভেনিজুয়েলা, গায়ানা, পেরু, ইকুয়েডর, ফ্রেঞ্চ গায়ানা, বলিভিয়া ও উরুগুয়েতে মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তর জাতি।

**ওসেনিয়া ঃ** এই মহাদেশের ফিজি, টাভালু, সলোমান দ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া, পাপুয়া নিউগিনি ও টোঙ্গায় মুসলমানরা দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় জাতি।

**বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী জনসংখ্যা**

| | ধর্ম | হার | অনুসারী মোট জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১. | ইসলাম | ২৬.৫৯% | ১৫৯,৫৯,৮৯,২৭৫ |
| ২. | খৃস্টান | ২৫.৪৫% | ১৫২,৭৮,৪০,৬৯০ |
| ৩. | বৌদ্ধ কনফুসিয়ান | ১৬.০৭% | ৯৬,৪৭,১০,৮৫০ |
| ৪. | হিন্দু | ১৪.০৪% | ৮৪,৩০, ৫১, ৩৫৮ |
| ৫. | য়াহূদী | ০.২৩% | ১,৪১,১১,৪৪২ |
| ৬. | শিখ | ০.৩৭% | ২,২৩,৩২,০০০ |
| ৭. | লোকধর্ম | ১২.৫১% | ৭৫.০৯,৫৫,০০০ |
| ৮. | নিউ রিলিজিওনিষ্ট | ১.৬৭% | ১০.০১,৩৪,০০০ |
| ৯. | এথিয়িস্ট (নাস্তিক) | ২.৫০% | ১৪,৯৯,১৩,০০০ |
| ১০. | অন্যান্য | ০.৫৭% | ৩,৩৭,৬১,৯০৫ |
| | সর্বমোট | | ৬,০০,২৭,৯৯,৫৩০ |

**মহাদেশ ভিত্তিক মুসলিম জনসংখ্যা**

| মহাদেশের নাম | মোট লোকসংখ্যা | মুসলিম হার | মোট মুসলিম সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১. এশিয়া | ৩,৬৫,৫৭,৮১,২৮৮ | ২৮.৯% | ১,০৫,৭৪,৪৯,৯৬৬ |
| ২. আফ্রিকা | ৮০,৫৮,৫৭,৯২০ | ৫৬.১% | ৪৫,২১,০৮,৮৬৯ |
| ৩. য়ূরোপ | ৬৯,৩৮,৪২,৭৪০ | ৮.২৪% | ৫,৭১,৪৫,২৯৪ |
| ৪. উত্তর আমেরিকা | ৪৭,৪২,৩৩,৯৫১ | ৩.২৪% | ১,৫৩,৪৭,৬৫০ |
| ৫. দক্ষিণ আমেরিকা | ৩৪,৪৬,৯৮,৩২৩ | ৩.৭৬% | ১,২৯,৫৩,৬২৮ |
| ৬. ওসেনিয়া | ২,৮৩,৮৫,৩০৮ | ৩.৪৭% | ৯,৮৩,৮৬৮ |
| বিশ্ব | ৬,০০,২৭,৯৯,৮৩০ | ২৬.৫৯% | ১,৫৯,৫৯,৮৯,২৭৫ |

**দেশভিত্তিক মোট জনসংখ্যা ও মুসলিম জনসংখ্যা**

**এশিয়া**

| দেশের নাম | মোট লোকসংখ্যা | মুসলিম হার | মোট মুসলিম জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১. ইন্দোনেশিয়া | ২১,৯১,০৮,৩৪৬ | ৯০% | ১৯,৭১,৯৭,৫১০ |
| ২. মালয়েশিয়া | ২,২৪,০০,০০০ | ৫৯% | ১,৩২,১৬,০০০ |
| ৩. ব্রুনেই | ৩,২২,৯৮২ | ৭৮% | ২,৫১,৯২৫ |
| ৪. সিঙ্গাপুর | ৩৫,৩১,৬০০ | ২৫% | ৮,৮২,৯০০ |
| ৫. ফিলিপাইন | ৭,৯৩,৪৫,৮১২ | ১২% | ৯৫,২১,৪৯৭ |
| ৬. তাইওয়ান | ২,২১,১৩, ২৫০ | ৩% | ৬,৬৩,৩৯৮ |
| ৭. দক্ষিণ কোরিয়া | ৪,৬৮,৮৪,৮০০ | ২% | ৯,৩৭,৬৯৬ |
| ৮. উত্তর কোরিয়া | ২,১৩,৮৬,১০৯ | ২,৫% | ৫,৩৪,৬৫৩ |
| ৯. জাপান | ১২,৭২,৮২,০৭৭ | ২% | ২৫,৪৫,৬৪২ |
| ১০. চীন | ১২৪,৬৮,৭১,৯৫১ | ৮% | ৯,৯৭,৪৯,৭৫৬ |
| ১১. মঙ্গোলিয়া | ২৬,১৭,৩৭৯ | ৮ % | ২,০৯,৩৯০ |
| ১২. লাওস | ৫৪,০৭,৫৪৩ | ৬% | ৩,২৪,৪৪৮ |
| ১৩. ভিয়েতনাম | ৭,৭৩,১১,২১০ | ৬% | ৪৬,৩৮,৬৭৩ |
| ১৪. পালাও | ১৮,৪৬৭ | ৩% | ৫৫৪ |
| ১৫. কম্বোডিয়া | ১,১৬,২৬,৫২০ | ৫% | ৫,৮১,৩২৬ |
| ১৬. থাইল্যান্ড | ৬,৪৬,০৯,০৪৬ | ৮% | ৪৮,৪৮,৭২৪ |
| ১৭. মায়ানমার | ৪,৮০,৮১,৩০২ | ৯% | ৪৩,২৭,৩১৭ |
| ১৮. বাংলাদেশ | ১৩,০১,১৭,৯৬৭ | ৮৯% | ১১,৫৮,০৪,৯৯১ |
| ১৯. ভূটান | ১৯,৫১,৯৬৫ | ৪% | ৭৮.০৭৮ |
| ২০. নেপাল | ২,৪৩,০২,৬৫৩ | ৪% | ৯,৭২,১০৬ |
| ২১. ভারত | ১০০,০৮,৪৮,৫৫০ | ১৪% | ১৪,০১,১৮,৭৯৭ |
| ২২. শ্রীলংকা | ১৯১,৪৪,৮৭৫ | ৯% | ১৭,২৩,০৩৯ |
| ২৩. মালদ্বীপ | ৩,০০,২২০ | ১০০% | ৩,০০,২২০ |
| ২৪. পাকিস্তান | ১৪,০০,২৩,৩৫৯ | ৯৭% | ১৩,৫৮,২২,৬৫৯ |
| ২৫. আফগানিস্তান | ২,৫৮,২৪,৮৮২ | ৯৯% | ২,৫৫,৬৬,৬৩৩ |
| ২৬. কাজাখস্তান | ১,৯৪,০৬,০০০ | ৭৪% | ১,৪৩,৬০,৪৪০ |
| ২৭. তাজিকিস্তান | ৮৯,৭৮,০০০ | ৯৩% | ৮৩,৪৯,৫৪০ |
| ২৮. উজবেকিস্তান | ২,৪১,০২,৪৭৩ | ৮৯% | ২,১৪,৫১,২০১ |
| ২৯. কিরগিজিস্তান | ৫৩,০৭,০০০ | ৯০% | ৪৭,৭৬,৩০০ |
| ৩০. তুর্কমেনিস্তান | ৬২,১১,০০০ | ৯৩% | ৫৭,৭৬,২৩০ |
| ৩১. আজারবাইজান | ৮৯,০০,৯০০ | ৯৩% | ৮২,৭৭,৮৩৭ |
| ৩২. তুরস্ক | ৬,৬০,০৯,৬০০ | ১০০% | ৬,৬০,০৯,৬০০ |
| ৩৩. উত্তর সাইপ্রাস | ২,৩২,৫০০ | ৯১% | ২,১১,৫৭৫ |
| ৩৪. সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্র | ৭,৫৪,০৬৪ | ১৮% | ১,৩৫,৭৩২ |
| ৩৫. চেচনিয়া | ১৪,৫৩,৯৫০ | ৯৬% | ১৩,৯৫,৭৯২ |
| ৩৬. সিরিয়া | ১,৭৬,০৩,৮৫০ | ৯২% | ১,৬১,৯৫,৫৪২ |
| ৩৭. লেবানন | ৪১,১১,০০০ | ৭০% | ২৮,৭৭,৭০০ |
| ৩৮. ফিলিস্তীন | ২৬,৬৯,৫৭৩ | ৮২% | ২১,৮৯,০৫০ |
| ৩৯. ইসরাঈল | ৩০,৮০,১৮৭ | ৩০% | ৯,২৪,০৫৬ |
| ৪০. জর্ডান | ৪৫,৬১,১৪৭ | ৯৬% | ৪৩,৭৮,৭০১ |
| ৪১. সৌদি আরব | ২,২৫,০৪,৬১৩ | ১০০% | ২,২৫,০৪,৬১৩ |
| ৪২. ইরাক | ২,৪৭,০৯০০০ | ৯৭% | ২,৩৯,৬৭,৭০০ |
| ৪৩. ইরান | ৬,৭৫,৬০,৭০০ | ৯৯% | ৬,৬৮,৮৫,০৯৩ |
| ৪৪. ইয়েমেন | ১,৬৯,৪২,২৩০ | ৯৯.৯% | ১,৬৯,২৫,২৮৮ |
| ৪৫. ওমান | ২৪,৪৬,৬৪৫ | ১০০% | ২৪,৪৬,৬৪৫ |
| ৪৬. সংযুক্ত আরব | ২৮,৪৪,৪৫০ | ৯৭% | ২৭,৫৯,১১৭ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| আমীরাত | | | |
| ৪৭. কাতার | ৮,২৩,৫৪২ | ১০০% | ৮,২৩,৫৪২ |
| ৪৮. বাহরাইন | ৬,২৯,০৯০ | ১০০% | ৬,২৯,০৯০ |
| ৪৯. কুয়েত | ২৫,০৭,০০০ | ৯৫% | ২৩,৮১,৬৫০ |
| মোট | ৩৬৫,৫৭,৮১,২৮৮ | ২৮.৯% | ১০৫,৭৪,৪৯,৯৬৬ |
| **আফ্রিকা** | | | |
| ১. কমোরস | ৫,৬২,৭২৩ | ৯৮% | ৫,৫১,৪৬৮ |
| ২. সোমালিয়া | ৯৮,৩১,৫২০ | ৯৯.৮% | ৯৮,১১,৮৫৭ |
| ৩. জিবুতি | ৪,৪৭,৪৩৯ | ৯৪% | ৪,২০,৫৯৩ |
| ৪. ইরিত্রিয়া | ৪০,৯১,৩২৫ | ৭৮% | ৩১,৯১,২৩৪ |
| ৫. ইথিওপিয়া | ৫,৯৬,৮০,৩৮৩ | ৪৯% | ২,৯২,৪৩,৩৮৭ |
| ৬. কেনিয়া | ২,৮৮,০৮,৬৫৮ | ২৬% | ৭৪,৯০,২৫১ |
| ৭. উগান্ডা | ২,২৮,০৪,৯৭৩ | ৫৫% | ১,২৫,৪২,৭৩৫ |
| ৮. সুদান | ৩,৬২,৭৫,৬৯০ | ৮৪% | ৩,০৪,৭১,৫৮০ |
| ৯. মিসর | ৬,৭২,৭৩,৯০৬ | ৯৪% | ৬,৩২,৩৭,৪৭১ |
| ১০. লিবিয়া | ৫৯,৪০,০০০ | ৯৮% | ৫৮,২১,২০০ |
| ১১. চাঁদ(শাদ) | ৭৫,৫৭,৪৩৬ | ৬৪% | ৪৮,৩৬,৭৫০ |
| ১২. মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র | ৩৪,৪৪,৯৫১ | ২২% | ৭,৫৭,৮৮৯ |
| ১৩. আলজিরিয়া | ৩,৮৭,৪৩,৪৮৬ | ৯৯% | ৩,৮৩,৫৬,০৫১ |
| ১৪. তিউনিসিয়া | ১,৪২,০২,০০০ | ৯৯.৫% | ১,৪১,৩০,৯৯০ |
| ১৫. মরক্কো | ২,৯৬,৬১,৬৩৬ | ৯৯.২% | ২,৯৪,২৪,৩৪৩ |
| ১৬. পশ্চিম সাহারা | ২,০৭,০০০ | ৪২% | ৮৬,৯৪০ |
| ১৭. কেপভার্ট দ্বীপপুঞ্জ | ৪,০৫,৭৪৮ | ২৬% | ১,০৫,৪৯৪ |
| ১৮. লাইবেরিয়া | ২৯,২৩,৭২৫ | ৫০% | ১৪,৬১,৮৬৩ |
| ১৯. মৌরিতানিয়া | ২৭,৮১,৭৩৮ | ১০০% | ২৭,৮১,৭৩৮ |
| ২০. মালি | ১,১৪,২৯,১২৪ | ৯৫% | ১,০৮,৫৭,৬৬৮ |
| ২১. সেনেগাল | ১,২০,৫১,৯৩০ | ৯৫% | ১,১৪,৪৯,৩৩৪ |
| ২২. গাম্বিয়া | ১৩,৩৬,৩২০ | ৯১% | ১২,১৬,০৫১ |
| ২৩. গিনি | ৯৬,০৮,৪৫০ | ৮৫% | ৭৩,১৭,১৮৩ |
| ২৪. গিনি বিসাউ | ১২,৩৪,৫৫৫ | ৭৩% | ৯,০১,২২৫ |
| ২৫. সিয়েরালিওন | ৫২,৯৬,৬৫১ | ৬০% | ৩১,৭৭,৩৯১ |
| ২৬. বারকিনা ফাসো | ১,১৫,৭৫,৮৯৮ | ৫৫% | ৬৩,৬৬,৭৪৪ |
| ২৭. বেনিন | ৬৩,০৫,৫৬৭ | ৩৫% | ২২,০৬,৯৪৮ |
| ২৮. আইভরিকোস্ট | ১,৫৮,১৮,০৬৮ | ৬০% | ৯৪,৯০,৮৪১ |
| ২৯. ঘানা | ১,৮৮,৮৭,৬২৬ | ৪০% | ৭৫,৫৫,০৫০ |
| ৩০. টোগো | ৫০,৮১,৪১৩ | ২৪% | ১২,১৯,৫৩৯ |
| ৩১. নাইজার | ৯৯,৯৭,০০০ | ৯৭% | ৯৬,৯৭,০৯০ |
| ৩২. নাইজেরিয়া | ১১,৯৯,৫০,০০০ | ৬৪% | ৭,৬৭,৬৮,০০০ |
| ৩৩. ক্যামেরুন | ১,৫৪,৫৬,০৯২ | ৫৫% | ৮৫,০০,৮৫১ |
| ৩৪. গ্যাবন | ১২,৬৩,৭৬৪ | ৪০% | ৫,০৫,৫০৬ |
| ৩৫. ইকুয়েটরিয়েল গিনি | ৪,৬৫,৭৪৬ | ১৬% | ৭৪,৫১৯ |
| ৩৬. সাওটম প্রিন্সিপি | ১,৫৪,৮৭৮ | ৪% | ৬,৪৯৫ |
| ৩৭. কঙ্গো | ২৭,১৬,৮১৬ | ১২% | ৩,৫০,০১৮ |
| ৩৮. কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (জায়ারে) | ৫,০৪,৮১,৩০৫ | ১৬% | ৮০,৭৭,০০৯ |
| ৩৯. রুয়ান্ডা | ৮১,৮৪,৯৩৩ | ১৫% | ১২,২৩,২৯৬ |
| ৪০. বুরুন্ডি | ৫৭,৩৫,৯৩৭ | ৭% | ৪,০১,৫১৬ |
| ৪১. তানজানিয়া | ৩,১২,৭০,৮২০ | ৩৫% | ১,০৯,৪৪,৭৮৭ |
| ৪২. মালাবি | ১,০০,০০,৪১৬ | ৩৩% | ৩৩,০০,১৩৭ |
| ৪৩. সিসিলি | ১,০৩,০০০ | ৬% | ৬,১৮০ |
| ৪৪. মালাগাছি | ১,৪৮,৭৩,৩৮৭ | ৭% | ১১,৮৯,৮৭১ |
| ৪৫. মোজাম্বিক | ১,৯১,২৪,৩৩৫ | ২৩% | ৪৩,৯৮,৫৯৭ |
| ৪৬. মরিসাস | ১১,৮২,২১২ | ২১% | ২,৪৮,২৬৫ |
| ৪৭. জিম্বাবুয়ে | ১,১১,৬৩,১৬০ | ২৬% | ২৯,০২,৪২২ |
| ৪৮. এঙ্গোলা | ১,১১,৭৭,৫৩৭ | ২৩% | ২৫,৭০,৮৩৪ |
| ৪৯. জাম্বিয়া | ৯৬,৬৩,৫৩৫ | ২৪% | ২৩,১৯,২৪৮ |
| ৫০. নামিবিয়া | ১৬,৪৮,২৭০ | ১৪% | ২,৩০,৭৫৮ |
| ৫১. বোতসোয়ানা | ১৪,৬৪,১৬৭ | ৫% | ৭৩,২০৮ |
| ৫২. সোয়াজিল্যান্ড | ৯,৮৫,৩৩৫ | ৬% | ৫৯,১২০ |
| ৫৩. লেসোথো | ২১,২৮,৯৫০ | ২% | ৪২,৫৭৯ |
| ৫৪. দক্ষিণ অফ্রিকা | ৪,৩৪,২৬,৩৮৬ | ৪% | ১৭,৩৭,০৫৫ |
| মোট | ৮০,৫৮,৫৭,৯২০ | ৫৬.১% | ৪৫,২১,০৮,৮৬৯ |
| **য়ুরোপ** | | | |
| ১. আলবেনিয়া | ৪০,৭২,০০০ | ৮০% | ৩২,৫৭,৬০০ |
| ২. বোসনিয়া হারজেগোভিনা | ৪৪,০৭,৫০০ | ৪৪% | ১৯,৩৯,৩০০ |
| ৩. আইসল্যান্ড | ২,৭২,৫১২ | ৯% | ২৪,৫২৬ |
| ৪. আয়ারল্যান্ড | ৩৬,৩২,৯৪৪ | ২% | ৭২,৬৫৯ |
| ৫. যুক্তরাজ্য | ৫,৯১,১৩,৪৩৯ | ৩% | ১৭,৭৩,৪০৩ |
| ৬. নরওয়ে | ৪৪,৩৮,৫৪৭ | ২% | ৮৮,৭৭১ |
| ৭. সুইডেন | ৮৯,১১,২৯৬ | ২% | ১,৭৮,২২৬ |
| ৮. ফিনল্যান্ড | ৫১,৫৮,৩৭২ | ২.৫% | ১,২৮,৯৫৯ |
| ৯. এস্তোনিয়া | ১৪,০৮,৫২৩ | ৩% | ৪২,২৫৬ |
| ১০.লাটভিয়া | ২৩,৫৩,৮৭৪ | ৫% | ১,১৭,৬৯৪ |
| ১১. লিথুয়ানিয়া | ৩৫,৮৪,৯৬৬ | ৪% | ১,৪৩,৩৯৯ |
| ১২. বাইলোরাশিয়া | ১,০৪,০১,৭৮৪ | ৭% | ৭,২৮,১২৫ |
| ১৩. ইউক্রেন | ৫৬,৮০,৩০০ | ২৩% | ১৩,০৬,৪৬৯ |
| ১৪. রাশিয়া | ১৪,৫১,৯৩,৫৬৯ | ১৫% | ২,১৭,৭৯,০৩৫ |
| ১৫. মোলদাভিয়া | ৪৪,৬০,৮৩৮ | ১৪% | ৬,২৪,৫১৭ |
| ১৬. জর্জিয়া | ৫২,৩৪,০৫০ | ১৫% | ৭,৮৫,১০৮ |
| ১৭. আরমেনিয়া | ৩৪,০৯,২৩৪ | ১২% | ৪,০৯,১০৮ |
| ১৮. বুলগেরিয়া | ৮১,৯৪,৭৭২ | ২৫% | ২০,৪৮,৬৯০ |
| ১৯. রুমানিয়া | ২,২৩,৩৪,৩১২ | ৪% | ৮,৯৩,৩৭২ |
| ২০. মেসিডোনিয়া | ২০,২২,৬০৪ | ৩০% | ৬,০৬,৭৮১ |
| ২১. গ্রীস | ১,০৭,০৭,১৩৫ | ২% | ২,১৪,১৪৩ |
| ২২. সার্বিয়া | ১,০৬,৮৭,৩৮০ | ১০% | ১০,৬৮,৭৩৮ |
| ২৩. কসোভো | ২০,৭১,৫০০ | ৯০% | ১৮,৬৪,৩৫০ |
| ২৪. ক্রোয়েশিয়া | ৫০,৩৪,২৩০ | ৯% | ৪,৫৩,০৮১ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৫. হাঙ্গেরী | ১,০১,৮৬,৩৭২ | ৩% | ৩,০৫,৫৯১ |
| ২৬. শ্লোভানিয়া | ১৯,৭০,৫৭০ | ১১% | ২,১৬,৭৬৩ |
| ২৭. শ্লোভাকিয়া | ৫৩,৯৬,১৯৩ | ৯% | ৪,৮৫,৬৫৭ |
| ২৮. চেক প্রজাতন্ত্র | ১,০২,৮০,৫১৩ | ৬% | ৬,১৬,৮৩১ |
| ২৯. পোল্যান্ড | ৩,৮৬,০৮,৯২৯ | ৬% | ২৩,১৬,৫৩৬ |
| ৩০. জার্মানী | ৮,২০,৮৭,৩৬১ | ৪% | ৩২,৮৩,৪৯৪ |
| ৩১. ডেনমার্ক | ৫৩,৫৬,৮৪৫ | ২% | ১,০৭,১৪০ |
| ৩২. নেদারল্যান্ড | ১,৫৮,০৭,৬৪১ | ৩% | ৪,৭৪,২২৯ |
| ৩৩. বেলজিয়াম | ১,০১,৮২,০৩৪ | ৪% | ৪,০৭,২৮১ |
| ৩৪. ফ্রান্স | ৫,৮৯,৭৮,১৭২ | ৭% | ৪১,২৮,৪৭২ |
| ৩৫. সুইজারল্যান্ড | ৭২,৭৫,৪৬৭ | ২% | ১,৪৫,৫০৯ |
| ৩৬. অস্ট্রিয়া | ৮১,৩৯,২৯৯ | ২% | ১,৬২,৭৮৬ |
| ৩৭. ইতালী | ৫,৬৭,৩৫,১৩০ | ২% | ১১,৩৪,৭০৩ |
| ৩৮. ভ্যাটিক্যান | ৮৬০ | - | - |
| ৩৯. সানমারিনো | ২৫,০৬১ | ৫% | ১,২৫৩ |
| ৪০. মাল্টা | ৩,৮১,৬০৩ | ১৪% | ৫৩,৪২৪ |
| ৪১. মোনাকো | ৩২,১৪৯ | ২% | ৬৪৩ |
| ৪২. লিচেন ষ্টেইন | ৩২,০৫৭ | ২% | ৬৪১ |
| ৪৩. এন্ডোরা | ৬৫,৯৩৯ | ১% | ৬৫৯ |
| ৪৪. স্পেন | ৩,৯১,৬৭,৭৪৪ | ৬% | ২৩,৫০,০৬৫ |
| ৪৫. পর্তুগাল | ৯৯,১৮,০৪০ | ৪% | ৩,৯৬,৭২২ |
| ৪৬. লুক্সেমবার্গ | ৪,২৯,০৮০ | ২% | ৮,৫৮২ |
| মোট | ৬৯,৩৮,৪২,৭৪০ | ৮,২৪% | ৫,৭১,৪৫,২৯৪ |

**উত্তর আমেরিকা**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. ত্রিনিদাদ এণ্ড টোবাগো | ১১,০২,০৯৬ | ১৩% | ১,৪৩,২৭৩ |
| ২. গেনাডা | ৯৮,৩০০ | ৬% | ৫,৮৯৮ |
| ৩. বার্বাডোস | ২,৫৯,১৯১ | ২% | ৫,১৮৪ |
| ৪. ডোমিনিকা | ৬৪,৮৮১ | ২% | ১,২৯৮ |
| ৫. সেন্টলুসিয়া | ১,৫৪,০২১ | ১% | ১,৫৪০ |
| ৬. সেন্টিকিট্স এণ্ড নেভিস | ৪২,৮৩৮ | ১% | ৪২৮ |
| ৭. পোর্টোরিকো | ৩৬,৩০,০০০ | ৩% | ১,০৮,৯০০ |
| ৮. ডোমিনিক্যান প্রজাতন্ত্র | ৮১,২৯,৭৩৪ | ৩% | ২,৪৩,৮৯০ |
| ৯. হাইতি | ৬৮,৮৪,২৬৪ | ৪% | ২,৭৫,৩৭১ |
| ১০. জ্যামাইকা | ২৬,৫২৪৪৩ | ৫% | ১,৩২,৬২২ |
| ১১. কিউবা | ১,১০,৯৬,৩৯৫ | ২% | ২,২১,৯২৮ |
| ১২. বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | ২,৮৩,৭০৫ | ১% | ২,৮৩৭ |
| ১৩. বারমুডা (এন্তিগরাও বারমুডা) | ৬৪,৪০০ | ১% | ৬৪৪ |
| ১৪. পানামা | ২৭,৭৮,৫২৬ | ২% | ৫৫,৫৭০ |
| ১৫. কোষ্টারিকা | ৩৬,৭৪,৪৯০ | ২% | ৭৩,৪৯০ |
| ১৬. নিকারাগুয়া | ৪৭,১৭,১৩২ | ৫% | ২,৩৫,৮৫৭ |
| ১৭. হন্ডুরাস | ৫৯,৯৭,৩২৭ | ১% | ৫৯,৯৭৩ |
| ১৮. এলসালভেদর | ৫৮,৩৯,০৭৯ | ২% | ১,১৬,৭৮২ |
| ১৯. গুয়েতেমালা | ১,২৩,৩৫,৫৮০ | ১% | ১,২৩,৩৫৬ |
| ২০. বেলিজ | ২,৩৫,৭৮৯ | ১% | ২,৩৫৭ |
| ২১. মেক্সিকো | ১০,০২,৯৪,০৩৬ | ২% | ২০,০৫,৮৮০ |
| ২২. আঙ্গুইলা | ১,০৫,৩০০ | ১% | ১,০৫৩ |
| ২৩.কেইম্যান দ্বীপপুঞ্জ | ২৭,৯৫০ | ৫% | ১,৩৯৮ |
| ২৪.সেন্টভিনসেন্ট ও গ্রোনাডাইন্স | ১,২০,৫১৯ | ২% | ২,৪১০ |
| ২৫. কানাডা | ৩,১০,০৬,৩৪৭ | ২% | ৬,২০,১২৭ |
| ২৬. যুক্তরাষ্ট্র | ২৭,২৬,৩৯,৬০৮ | ৪% | ১,০৯,০৫,৫৮৪ |
| মোট | ৪৭,৪২,৩৩,৯৫১ | ৩.২৪% | ১,৫৩,৪৭,৬৫০ |

**দক্ষিণ আমেরিকা**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. আর্জেন্টিনা | ৩,৬৭,৩৭,৬৬৪ | ২% | ৭,৩৪,৭৫৩ |
| ২. ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ | ১,৯৩,২০০ | ১.৫% | ৪,৮৩০ |
| ৩. উরুগুয়ে | ৩৩,০৮,৫২৩ | ৫% | ১,৬৫,৪২৬ |
| ৪. বলিভিয়া | ৭৯,৮২,৮৫০ | ৩% | ২,৩৯,৪৮৬ |
| ৫. প্যারাগুয়ে | ৫৪,৩৪,০৯৫ | ১% | ৫৪,৩৪০ |
| ৬. ব্রাজিল | ১৭,১৮,৫৩,১২৬ | ২% | ৩৪,৩৭,০৬৩ |
| ৭. চিলি | ১,৪৯,৭৩,৮৪৩ | ১% | ১,৪৯,৭৩৮ |
| ৮. পেরু | ২,৬৬,২৪,৫৮২ | ২% | ৫,৩২,৪৯২ |
| ৯. ইকুয়েডর | ১,১৬,৯০,৮৯০ | ৫% | ৫,৮৪,৫৪৫ |
| ১০. কলম্বিয়া | ৩,৯৩,০৯,৪২২ | ৩% | ১১,৭৯,২৮৩ |
| ১১. ভেনিজুয়েলা | ২,৪২,০৩,৪৬৬ | ২৩% | ৫৫,৬৬,৭৯৭ |
| ১২. গায়ানা | ৭,১৫,১৫৬ | ১৭% | ১,২১,৫৭৭ |
| ১৩. সুরিনাম | ৪,৬১,১৫৬ | ২৪% | ১,১০,৬৭৭ |
| ১৪. ফ্রেঞ্চগায়ানা | ১২,১০,৩৫০ | ৬% | ৭২,৬২১ |
| মোট | ৩৪,৪৬,৯৮,৩২৩ | ৩.৭৬% | ১,২৯,৫৩,৬২৮ |

**ওসেনিয়া**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. অস্ট্রেলিয়া | ১,৮০,৮৩,৫৫১ | ৩% | ৫,৪২,৫০৬ |
| ২. পাপুয়া নিউগিনি | ৪৭,০৫,১২৬ | ৪% | ১,৮৮,২০৫ |
| ৩. নিউজিল্যান্ড | ৩৬,৬২,২৬৫ | ৩% | ১,০৯,৮৬৮ |
| ৪. নাউরু | ১০,৬০৫ | ২% | ২১২ |
| ৫. কিবিবাতি | ৮৫,৫০১ | ২% | ১,৭১০ |
| ৬. ভানুয়াতু | ১,৮৯,০৩৬ | ২% | ৩,৭৮১ |
| ৭. টাভালু | ১০,৫৮৮ | ৩% | ৩১৮ |
| ৮. মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | ৬৫,৫০৭ | ২% | ১,৩১০ |
| ৯. ফিজি | ৮,১২,৯১৮ | ১৩% | ১,০৫,৬৭৯ |
| ১০. টোঙ্গা | ১,০৯,০৮২ | ৩% | ৩,২৭২ |
| ১১. সোলেমান দ্বীপপুঞ্জ | ৩,৯৯,৫০০ | ৫.৫% | ২১,৯৭৩ |
| ১২. সামোয়া | ২,২৯,৯৭৯ | ২% | ৪,৬০০ |
| ১৩. নিউক্যালি ডোনিয়া | ৮,৫৫০ | ২% | ১৭১ |
| ১৪. গুয়ান | ১,৩০০ | ২% | ২৬২ |
| মোট | ২,৮৩,৮৫,৩০৮ | ৩.৪৭% | ৯,৮৩,৮৬৮ |

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) World Almanuc,—2000 ; (২) The Europa yearbook—2000 ; (৩) ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগ জার্নাল; (৪) United Nations Information Centre, Dhaka ; (৫) ঢাকাস্থ বিভিন্ন দেশের দূতাবাস হইতে প্রাপ্ত তথ্য; (৬) উপরোক্ত

সূত্রসমূহের বরাতে 'মাসিক কওমী কণ্ঠ; মে—২০০০ খৃ. সংখ্যা হইতে উক্ত পরিসংখ্যান গৃহীত, পৃ. ১৩-১৫।

মুহাম্মদ লোকমান হোসাইন কর্তৃক সংগৃহীত
মাসিক কওমী কণ্ঠ-এর সৌজন্যে

**ইসলাম খান** (اسلام خان) ঃ বাংলার সু'বাদার (১৬০৮-১৬১৩ খৃ.)। ফতেহপুর সিক্রির বিখ্যাত দরবেশ শায়খ সালীম চিশ্তীর দৌহিত্র ইসলাম খান (প্রকৃত নাম শায়খ 'আলা'উ'দ-দীন) যে ১৬০৮ সালে বাংলার সু'বাদার নিযুক্ত হন। তিনি মুগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমবয়সী এবং বাল্য জীবনের সহচর ছিলেন। ইসলাম খানের প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহাকে পাঁচ হাজারী মানসাবদার পদে উন্নীত করেন এবং পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য রাখিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ১৬০৮ সালের জুন মাসে তিনি রাজমহল আসিয়া বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। রাজমহল পৌঁছার কিছুকালের মধ্যেই বুকাইনগরের জমিদার খাজা 'উছমান ময়মনসিংহের নিকটবর্তী ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত মুগল সামরিক ঘাঁটি আক্রমণ করিয়া ঘাঁটিটি ও পার্শ্ববর্তী এলাকা দখল করেন। ইসলাম খান অনতিবিলম্বে তাঁহার ভ্রাতা শায়খ গিয়াছু'দ-দীনের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী প্রেরণ করিয়া মুগল ঘাঁটি পুনরুদ্ধার করেন। ইতিপূর্বে বাংলাদেশ মুগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও তৎকালীন রাজধানী শহর রাজমহল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলির মধ্যেই মুগলদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার বড় বড় জমিদার ও বিদ্রোহী পাঠান নেতা মুগল শাসন মানিয়া লন নাই। নিজ নিজ এলাকায় এইসব জমিদার, যাঁহারা বার ভূঁইয়া নামে পরিচিত, প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করিতে থাকেন। ইঁহাদের নিজস্ব সৈন্যদল ও শক্তিশালী নৌবহর ছিল। তাঁহারা প্রথম হইতেই বাংলায় মুগল শাসনের বিরোধিতা করেন। ইঁহাদের মধ্যে বার ভূঁইয়াদের নেতা 'ঈসা খান মসনদ-ই আ'লার পুত্র মূসা খান ছিলেন সর্বাধিক শক্তিশালী এবং পূর্ব বাংলার এক বিরাট এলাকা জুড়িয়া তিনি কর্তৃত্ব করিতেন। ইসলাম খান অনুধাবন করেন, মূসা খানকে দমন করিতে না পরিলে পূর্ব বাংলার এক বিরাট অংশ মুগল কর্তৃত্বের বাহিরে থাকিবে। অতএব মূসা খানকে দমন করিবার জন্য ইসলাম খান রাজমহল হইতে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি একটি শক্তিশালী নৌবহর গঠন করেন এবং মূসা খান ও অন্যান্য ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি বহু রণতরী ও কামান-বন্দুকসহ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া পূর্ব বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন (জানুয়ারী ১৬০৯ খৃ.)। তিনি রাজমহল হইতে রংপুরের ঘোড়াঘাট পৌঁছিলে যশোরের জমিদার প্রতাপাদিত্য স্বেচ্ছায় তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। ইহা ছাড়া বিষ্ণুপুরের বীরহামির, বীরভূমের শাম্‌স খান, হিজলীর সালীম খান ও ভূষণা অঞ্চলের সত্যজিত মুগলদের অধীনতা মানিয়া লইলেন।

অতঃপর ইসলাম খান ঘোড়াঘাট হইতে (অক্টোবর ১৬০৯) মুগল বাহিনীসহ করতোয়া নদীর তীর ধরিয়া পাবনা জিলার শাহজাদপুরে পৌঁছেন এবং নদীর পূর্ব তীরে মূসা খানের যাত্রাপুর দুর্গ আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এই সময়ে ইহতিমাস খান ও মিরযা নাথান পাবনা জিলার বিস্তৃত অঞ্চলে বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করিয়া মুগল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এইদিকে মূসা খান ও তাঁহার অনুসারী জমিদারগণ যাত্রাপুরের অল্প দূরে ডাকচরায় একটি সুদীর্ঘ মাটির দুর্গ নির্মাণ করেন এবং এই দুর্গ হইতে মুগলদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। মুগলদের তীব্র আক্রমণে মূসা খান, মধু রায় ও বিনোদ রায় দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। এই সময় ইসলাম খান অতর্কিতে যাত্রাপুর দুর্গ আক্রমণ করিয়া উহা দখল করেন। ইহার পর মুগল বাহিনী কিছুকাল যুদ্ধের পর মূসা খানের ডাকচর দুর্গ হস্তগত করিলেন। অতঃপর ইসলাম খান ঢাকায় তাঁহার বিশাল স্থল ও নৌবাহিনী লইয়া উপস্থিত হন (জুলাই ১৬১০) এবং এইখানে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং মুগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে শহরের নাম রাখিলেন জাহাঙ্গীর নগর। ঢাকায় পৌঁছিয়া তিনি প্রশাসনিক পদে কয়েকজন দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের উপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করিলেন।

অপরদিকে মূসা খানের নেতৃত্বে মিরযা মু'মিন প্রমুখ জমিদার লক্ষ্যা নদীতে মুগলদের বাধা দিবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন। ইসলাম খান নদীর পশ্চিম তীরে তাঁহার সৈন্যবাহিনী ও নৌবহর পাঠাইলেন। ১৬১১ খৃ. মুগলদের সহিত নৌযুদ্ধে মূসা খানের নেতৃত্বে জমিদারদের সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হয়। ইহার পর মুগল সৈন্যগণ মূসা খানের পৈত্রিক বাসস্থান কতরাবু এবং আরও কয়েকটি দুর্গ দখল করে। ইহাতে মূসা খান মেঘনা নদীতে অবস্থিত ইবরাহীমপুর দ্বীপে (বর্তমানে এই দ্বীপের অস্তিত্ব নাই) আশ্রয় লইলেন। তাঁহার রাজধানী সোনার গাঁও সহজেই মুগলদের হস্তগত হয়। ইহার পর মূসা খানের পক্ষের জমিদাররাও একে একে মুগল বশ্যতা স্বীকার করিয়া ইসলাম খানের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। ইসলাম খান এই সময় ভুলুয়ার রাজা অনন্ত মাণিক্যের বিরুদ্ধে শায়খ 'আবদু'ল-ওয়াহি'দের নেতৃত্বে একদল মুগল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। রাজা অনন্ত মাণিক্য তাহার রাজধানী রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইয়া আরাকানে পলায়ন করিলেন। ভুলুয়াতে মুগলদের পূর্বাঞ্চলের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হইল। ভুলুয়ার রাজা ও অপরাপর জমিদারের শোচনীয় পরাজয়ের পর নিরুপায় হইয়া মূসা খানও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ইসলাম খান অতঃপর মুগলদের বশ্যতা স্বীকার করায় মূসা খান ও তাঁহার মিত্রদের পূর্ব জমিদারী জায়গীরস্বরূপ ফিরাইয়া দিলেন। এইভাবে প্রায় এক বৎসরকাল যুদ্ধের ফলে বাংলার বার ভূঁইয়াদের নায়ক ও মুগলদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দূরীভূত হইল। ইহার পর চন্দ্রদ্বীপের জমিদার রামচন্দ্র মুগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। অপরদিকে যশোরের প্রতাপাদিত্য ইসলাম খানের নিকট আনুগত্য প্রকাশের পরও মুগলদের বিরুদ্ধাচরণ করায় সু'বাদার তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতাপাদিত্য আত্মসমর্পণ করেন (১৬১২ খৃ.) এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া ঢাকায় আনা হয়। কথিত আছে যে, বন্দী অবস্থায় দিল্লীর পথে বারানসিতে তাহার মৃত্যু হয়।

মূসা খান মুগলদের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার পরও বুকাই নগরের আফগান জমিদার 'উছমান খান লোহানী মুগলদের বিরোধিতা করিতে থাকেন। ইসলাম খান তাঁহার বিরুদ্ধে পদাতিক, বন্দুক, হস্তী ও নৌবহরসহ এক বিপুল সৈন্যবাহিনী তাঁহার দুইজন বিশ্বস্ত কর্মচারী শায়খ কামাল ও শায়খ 'আবদু'ল-ওয়াহি'দের নেতৃত্বে প্রেরণ করিলেন (অক্টোবর ১৬১১)। শ্রীহট্টের অন্তর্গত দৌলম্বাপুরে মুগলদের সহিত 'উছমান খান লোহানীর এক ভীষণ যুদ্ধ হয় (১২ মার্চ, ১৬১২)। এই যুদ্ধে অসীম বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াও 'উছমান খান দুর্ভাগ্যক্রমে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুতে আফগানগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে এবং মুগলদের বশ্যতা স্বীকার

করিয়া লয়। এইভাবে ইসলাম খানের প্রচেষ্টায় শ্রীহট্ট পর্যন্ত সূবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। অপরদিকে বার ভুঁইয়া ও বাংলার অন্যান্য জমিদার মুগল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়া বাংলায় মুগল সাম্রাজ্য বিস্তারে সূবাদারকে সাহায্য করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলায় তাঁহার সাফল্যের জন্য ইসলাম খানকে ছয় হাজারী মানসাবদার মর্যাদায় উন্নীত করেন (১০২১/১৬১২)।

বাংলায় মুগল শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইসলাম খান পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি জয় করিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রথমেই তিনি কাছাড় রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। কাছাড়ের রাজা (প্রতাপ নারায়ণ) শত্রু দমন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মুগল সম্রাটের আধিপত্য মানিয়া লন এবং নিয়মিত কর দিতে স্বীকৃত হন। ইতিপূর্বে সুসাংয়ের কোচ জমিদার রাজা রঘুনাথ মুগল আধিপত্য মানিয়া লইয়াছিলেন। কামরূপের রাজা পরীক্ষিৎ নারায়ণ ইসলাম খানের সময় রঘুনাথের জমিদারী দখল করেন। রঘুনাথ মুগল সুবাদারের সাহায্য প্রার্থনা করিলে ইসলাম খান তাঁহার সাহায্যার্থে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী ও নৌবহর প্রেরণ করিলেন। পরীক্ষিৎ নারায়ণ মুগলদের বিরুদ্ধে বহু সৈন্য, হস্তী ও রণতরী লইয়া যুদ্ধ করিয়াও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইলেন। ফলে সমস্ত কামরূপ মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল (১৬১৩ খৃ.)।

ইসলাম খান মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাংলায় মুগল শক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সারা প্রদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন। প্রশাসনের দিক দিয়া তিনি দক্ষতা, সাহস ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। মগ, আরাকান ও বার ভূঁইয়াদের দমনের জন্য রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর একটি সময়োচিত পদক্ষেপ বলিয়া বিবেচিত হয়। জনশ্রুতি আছে যে, ইসলাম খান ঢাকায় আসিয়া একদল ঢাক বাদককে ঢাক বাজাইতে আদেশ করেন এবং চারিদিকে চারজন অনুচর পাঠাইয়া যতদূর পর্যন্ত ঢাকের শব্দ শোনা গিয়াছিল ততদূর পর্যন্ত নূতন রাজধানী শহরের সীমানা নির্ধারণ করেন। ইসলাম খান অধিকাংশ সময় ঢাকায় অবস্থান করিতেন এবং মাঝেমধ্যে পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিদর্শনে যাইতেন। তবে তাঁহার সময়ে পরিচালিত যুদ্ধাভিযান ও সৈন্যদলের অবস্থান সম্পর্কে যথাশীঘ্র সম্ভব খবরাখবর পাইবার জন্য বহু দূত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যাহাদের মাধ্যমে তিনি দ্রুত রণাঙ্গণের খবর সংগ্রহ করিতেন। নারায়ণগঞ্জ শহরের পার্শ্ববর্তী লক্ষ্যা ও পুরাতন বুড়িগঙ্গা নদীর সংযোগ স্থলের নিকটবর্তী হাজীগঞ্জ ফোর্ট নূতন রাজধানী ঢাকাকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইসলাম খান কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। ঢাকা শহর উন্নয়নে তাঁহার অবদান রহিয়াছে। তিনি একটি নূতন দুর্গ, একটি প্রাসাদ এবং বেশ কয়েকটি রাস্তাঘাট নির্মাণ করিয়াছিলেন। সদরঘাট হইতে চকবাজার পর্যন্ত রাস্তাটি ইসলামপুর রোড এবং আশিক জমাদার লেনের মসজিদটি ইসলাম খান মসজিদ নামে আজও পরিচিত। ঢাকায় আসিবার পর যে সকল সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছিল তিনি সেইগুলি একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও যোদ্ধার ন্যায় মুকাবিলা করিয়াছিলেন। অতএব অনেকেই মনে করেন, ইসলাম খানের কিছুকাল পূর্বে মুগলরা বাংলা জয় করিলেও তিনিই প্রকৃতপক্ষে সারা বাংলাদেশে মুগল আধিপত্য সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ১৬১৩ খৃ. ২১ আগস্ট ইসলাম খান ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ); (২) গোলাম হুসেন সালীম, বাংলার ইতিহাস (রিয়াদু'স-সালাতীনের অনুবাদ); (৩) জে. এন. সরকার, History of Bengal, ২খ. ; (৪) মিরযা নাথান, বাহারিস্তান-ই গায়বী (ইংরেজী অনু. ডঃ বোরাহ); (৫) এ. এইচ. দানী, Muslim Architecture in Bengal.

ড. কে. এম. মোহসীন

**ইসলাম খান মাশহাদী** (اسلام خان مشهدی) ঃ বাংলার সুবাদার (১৬৩৫-১৬৩৮ খৃ.)। তাঁহার প্রকৃত নাম মীর 'আবদু'স-সালাম। প্রথমে তিনি ইখতিসাস খান ও পরে ইসলাম খান উপাধিতে ভূষিত হন। কর্মজীবনের প্রথম দিকে মীর 'আবদু'স-সালাম দিল্লীতে যুবরাজ খুররাম (পরবর্তী কালে শাহজাহান)-এর অধীনে মুন্শী ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় যুবরাজ খুররাম দক্ষিণ ভারতে রাজকর্মে ব্যস্ত থাকায় দিল্লীর দরবারে মীর 'আবদু'স-সালাম তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিতেন— সেই সময় তাঁহাকে 'ইখতিসাস খান' উপাধি প্রদান করা হয়। পরবর্তী কালে খুররাম-এর সহিত সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরোধ বাধিলে মীর 'আবদু'স-সালাম যুবরাজের পক্ষ অবলম্বন করেন। দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের পর শাহজাহান তাঁহাকে চার হাজারী মানসাবদার মর্যাদা ও ইসলাম খান উপাধি প্রদান করেন। ইহার পর তাঁহাকে বাখ্শী এবং পরবর্তী কালে পাঁচ হাজারী মানসাবের মর্যাদার সহিত গুজরাটের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের প্রথমদিকে সুবাদার আ'জাম খানের পরিবর্তে মীর 'আবদু'স-সালাম 'ওরেফে ইসলাম খান মাশহাদীকে বাংলা সূবাদার নিযুক্ত করা হয় (১৬৩৫ খৃ.)।

ইসলাম খান মাশহাদীর সময় আসামের রাজা প্রতাপ সিং (১৬০৩-৪১ খৃ.) মুগলদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। খৃ. ১৬৩০-এর দশকের প্রথমভাগে প্রতাপ সিং অনেকগুলি দুর্গ ও বাঁধ নির্মাণ করিয়া নিজ রাজ্য সুরক্ষিত করেন এবং বিবাহ, মিত্রতা অথবা রাজ্য রক্ষার প্রতিশ্রুতিতে প্রতিবেশী রাজাদের সমর্থন লাভ করেন। তাঁহার রাজ্যসীমা সম্প্রসারণের জন্য পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলে কামরূপের মুগল শক্তির সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি কামরূপের প্রাক্তন রাজা পরীক্ষিৎ নারায়ণের ভ্রাতা বলি নারায়ণকে আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে দরাংয়ের সামন্ত রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রতাপ সিং ও বলি নারায়ণ সম্মিলিতভাবে মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত কামরূপ পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন (১৬৩৬ খৃ.)। এই সময় মুগল থানাদার সত্যজিৎ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ইহাতে বিদ্রোহীরা সহজেই পাণ্ডু এবং কামরূপের হাজু দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হয়। কামরূপের ফৌজদার কয়েক মাস যুদ্ধ করিয়াও দুর্গ রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই খবর পাইয়া ইসলাম খান মাশহাদী একটি শক্তিশালী নৌবহর ও বিপুল সংখ্যক সৈন্য কামরূপে প্রেরণ করেন। মুগলদের সহিত যুদ্ধে বিদ্রোহী অহমরা অবশেষে পরাজিত হন এবং তাহাদের চার হাজারের অধিক সৈন্য নিহত এবং বহু সামরিক কর্মকর্তা মুগলদের হাতে বন্দী হন (অক্টোবর ১৬৩৭)। ইহাতে পাণ্ডু ও শ্রীঘাটসহ অন্যান্য দুর্গ পুনরুদ্ধার করিয়া সুবাদার কামরূপে মুগল কর্তৃত পুনর্বহাল করিতে সমর্থ হন। ইহার পর মুগল বাহিনী আসামের দিকে অগ্রসর হইয়া আসাম সীমান্তে অবস্থিত কাজলি দুর্গ আক্রমণ করে। সমগ্র কোচ হাজো এলাকা (কামরূপ) হইতে অহমগণ বিতাড়িত এবং তাহাদের সীমান্ত দুর্গ কালাং ও কাজলি মুগলদের হস্তগত হয়। এই সকল অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করিয়া তিনি বিদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী উপজাতীয়দের শাস্তি দেন এবং তাহারা যেই সকল মুগল অধিকৃত এলাকা দখল করিয়াছিল

সেইগুলি পুনরুদ্ধার করেন (ডিসেম্বর ১৬৩৭)। ইসলাম খান মাশহাদী পরপর কয়েকটি যুদ্ধে বিদ্রোহীদের পর্যুদস্ত করিয়া বহু দুর্গ দখল করেন। বাধ্য হইয়া অহমরাজ মুগলদের সহিত সন্ধি এবং যুদ্ধবন্দী বিনিময় করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী উত্তরে বড় নদী ও দক্ষিণে আশুরালী আসাম রাজ্য ও মুগল অধিকৃত কামরূপের মধ্যবর্তী সীমানা স্থির করা হয় (সেপ্টেম্বর ১৬৩৮) এবং গৌহাটিতে কামরূপের ফৌজদারের সদর দফতর স্থাপন করা হয়।

ইসলাম খান মাশহাদীর শাসনকালের শেষদিকে আরাকানের রাজা থুধম্ম রাজের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারীকে হত্যা করিয়া জনৈক কর্মচারী আরাকানের সিংহাসন দখল করেন। থুধম্মার ভ্রাতা ও চট্টগ্রামের শাসনকর্তা মংগতরায় তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মংগত রায় তাহার অনুসারীসহ জাহাঙ্গীর নগরে আসিয়া ইসলাম খান মাশহাদীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাতে আরাকানের রাজা এক বিরাট নৌবাহিনী লইয়া মেঘনা নদীতে প্রবেশ করেন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় লুটতরাজ করিতে থাকেন। সুবাদার ইসলাম খান মাশহাদী মগদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী নৌবহর লইয়া অগ্রসর হইলে মগরাজা স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন (সেপ্টেম্বর ১৬৩৮)। এই সময় মুগল সম্রাট শাহজাহান তাঁহাকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠান এবং সম্রাটের উযীর পদে নিযুক্ত করেন। কিছুকাল পর তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। সেইখানে সুবাদার থাকাকালীন ১৬৪৮ খৃ. (১০৫৭ হি.) তাঁহার মৃত্যু হয় এবং দাক্ষিণাত্যের আওরাঙ্গাবাদে তাঁহাকে দাফন করা হয়। ইসলাম খান মাশহাদী একজন সুপণ্ডিত, সাহসী সেনাপতি ও দক্ষ শাসনকর্তা ছিলেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) জে. এন. সরকার (সম্পা.) ঃ History of Bengal, ২খ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত; (২) গোলাম হুসেন সালীম, বাংলার ইতিহাস, অনু. আকবর উদ্দীন (রিয়াদু'স-সালাতীনের অনুবাদ), বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত।

ড. কে. এম. মোহসীন

**ইসলাম গিরায়** (اسلام كراى) ঃ ক্রিমিয়ায় তিনজন খানের নাম। প্রথম ইসলাম গিরায় (৯৩৮/১৫৩২) মেঙ্গলি গিরায় (দ্র.)-এর পুত্র ছিলেন। স্বাধীন নীতি অনুসরণে ইচ্ছুক দলের নেতা হিসাবে তিনি তদীয় ভ্রাতা ও 'উছমানী সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত খান সা'আদাত গিরায়ের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি ক্রিমিয়ার উপজাতীয় অভিজাত শ্রেণীরও সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। ইহারা রুশীয়দের উপর নির্দয় আক্রমণের অভিলাষ পোষণ করিত। ইহাদের সহায়তায় তিনি ৯৩৩/১৫২৭ সারে রায়াযান অঞ্চল বিধ্বস্ত এবং মস্কোকে আতংকিত করিয়া তোলেন। সা'আদাত গিরায় ৯৩৮/১৫৩২ সালে কেফে এবং আযাকের 'উছমানী গভর্নরদের সহায়তাপুষ্ট হইয়া ইসলাম গিরায়কে যুদ্ধে অবতীর্ণ করেন, কিন্তু নিজেই পরাজিত হইয়া ইস্তাম্বুলে পলায়ন করেন (মে মাসে)। অবশ্য ইসলাম গিরায় সুলতানকে অমান্য করিতে সাহসী হন নাই, বরং ইস্তাম্বুল হইতে প্রেরিত নবনিযুক্ত খান সাহিব গিরায়ের কালগায় (দ্র.)-রূপে কাজ করিতে সম্মত হন। ফলে তিনি মস্কোর প্রতি বন্ধুত্বের প্রস্তাব প্রেরণ করেন। অবশ্য দুই মাস পর তিনি খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং অর-কাপীর "স্তেপ" (তৃণভূমি) অঞ্চলে পলায়ন করেন। সাহিব গিরায় কর্তৃক পরাস্ত হইয়া তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং অর-আগযীতে বসবাসের অনুমতি লাভ করেন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি মীরযাদের অন্যতম বাকী বেগ কর্তৃক এক আকস্মিক আক্রমণে নিহত হন।

দ্বিতীয় ইসলাম গিরায় (৯২২/১৫৮৪—৯৯৬/ ১৫৮৮)। প্রথম সুলায়মান এবং দ্বিতীয় সালীমের নিকট ইস্তাম্বুলে জামিন হিসাবে কাটাইবার পর তৃতীয় মুরাদ সিংহাসনে আরোহণ করিলে তিনি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া কোনিয়ায় প্রস্থান করেন। সেই স্থানে তিনি 'মাওলাবী' সূফীবাদে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু মুহাম্মাদ গিরায়-এর বিদ্রোহের পর তিনি খান নিযুক্ত হন এবং কাপুদান পাশার নেতৃত্বে এক স্কোয়াড্রন 'উছমানী সৈন্যের প্রহরায় তিনি ক্রিমিয়ায় নীত হন। মীর্যাগণ তাঁহাকে 'খান' হিসাবে স্বীকার করিয়া লইলেন। মুহাম্মাদ গিরায় স্তেপ অঞ্চলের নোগায় অনুচরদের আশ্রয়ের জন্য উদ্যোগ গ্রহণের সময়ে বন্দী ও নিহত হন (যুল-কা'দা ৯৯২/ ১৫৮৪-র শেষ)। কিন্তু মুহাম্মাদের পুত্র সা'আদাত গিরায় তাঁহার নোগায় অনুসারীদের সহায়তায় তাঁহাকে পরাস্ত করিলে আহত অবস্থায় তিনি কেফেতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর 'উছমানীদের সহায়তায় তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করেন (আনদালের যুদ্ধ, ৯৯২/১৫৮৪) এবং বাগচে সারায়ে প্রবেশ করেন। অবশেষে সা'আদাত গিরায়ের দ্বিতীয়বার অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে ভলগা অঞ্চলে পলায়ন করেন। অবশ্য তাঁহার ভাই মুরাদ মস্কো গমন করিয়া ক্রিমিয়া আক্রমণের উদ্দেশ্যে নোগায় ও কোয়াক অনুসারিগণসহ প্রত্যাবর্তন করেন। 'উছমানী সুলতান জারকে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দেন। আস্ত্রাখানে যুদ্ধাভিযান প্রেরণের জন্য প্রস্তুতি গৃহীত হয়, কারণ মুরাদের সৈন্যগণ এইখানে সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু মুরাদের অপ্রত্যাশিতভাবে মৃত্যু ঘটে। ইহার পর হইতে ইসলাম গিরায় রুশীয় এলাকায় পুনঃপুনঃ হামলা চালান (করাপিডনা দখল, ৯৯৫/১৫৮৭)। ইসলাম গিরায়-এর আমলে ক্রিমিয়ায় তুর্কী আধিপত্য সুদৃঢ় হয় এবং খুতবায় খানদের নামের পূর্বে সুলতানদের নাম উল্লেখের রীতি প্রচলিত হয়। তিনি সাফার ৯৯৭/ ডিসেম্বর ১৫৮৮ সনে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁহাকে আককিরমান-এর উলু জামি' মস্জিদের পার্শ্ববর্তী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

তৃতীয় ইসলাম গিরায় (১০৫৪/১৬৪৪— ১০৬৪/১৬৫৪), সালামাত গিরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তরুণ বয়সে পোলদের এক অভিযানকালে তিনি বন্দী হন। সাত বৎসর পর মুক্তি পাইয়া তিনি য়ানবোলুতে বসতি স্থাপন করেন। বাহাদীর গিরায় ১০৪৫/১৬৩৫ সনে তাঁহাকে কালগায় হিসাবে নিযুক্ত করেন। এই পদের সুবাদে তিনি মানসূর গোত্রের উপর খানান্তের প্রভাব সংরক্ষণে সহায়তা করেন। বাহাদীর গিরায়-এর মৃত্যুর পর মুহাম্মাদ গিরায় খান নিযুক্ত হইলে ইসলাম গিরায় কালগায়-এর পদ হইতে বরখাস্ত হন এবং প্রথমে কাল'আ-ই সুলতানিয়্যেতে ও পরে রোড্স-এ নির্বাসিত হন। অবশেষে জিন্জি খোজার (দ্র. হুসায়ন জিন্জি) পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি রাবী'উ'ছ-ছানী ১০৫৪/ জুন ১৬৪৪ সনে খানাতের পদবী লাভ করেন। এইবার প্রথমেই তিনি ঝানার বেগ হাকশুমাককে অপসারণ করিয়া সাকাসিয়ানদের উপর কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। ফলে তিনি একদিকে উলুগআগা (অর্থাৎ উযীর) সেফেরে গাযীর (যিনি তাঁহাকে খানাতে উত্তরণের জন্য সহায়তা করিয়াছিলেন) এবং অন্যদিকে মীরযাগণের (যাহারা রুশীয় ও পোলিশ এলাকায় অতর্কিত হামলা চালাইবার অভিলাষী ছিল) সহিত সংঘর্ষে জড়াইয়া পড়েন। শক্তির প্রথম পরীক্ষায় (রাজাব ১০৫৫/ আগস্ট ১৬৪৫) তাঁহারা পরাজিত হন কিন্তু বিধ্বস্ত হন

নাই। তাঁহারা ১০৫৭/ ১৬৪৭ সনে উলুগ আগা হিসাবে সেফের আগার পুনর্নিয়োগ লাভে সমর্থ হন।

১০৫৫/১৬৪৫-৬ সনে পরিচালিত সফল আক্রমণ পরিচালনার ফলে রাশিয়ার জার এক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। তিনি সন্ধির শর্তানুসারে বার্ষিক কর উলুগ-খাযীনা ও Bolek পাঠাইতে এবং আযাক ও অন্যান্য 'উছমানী অঞ্চলে কোযাকদের আক্রমণ বন্ধ করিতে সম্মত হন (V. Velyaminov-Zernov, Materiaux pour servir a L'histoire du Khanat de Crimee, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৬৪ খৃ., নং ১০৪-এ মূল পাঠ)। শীরীন গোত্রের বেগ কর্তৃক রুশীয় এলাকায় ১০৫৭/১৬৪৭ সনে পরিচালিত এক হামলা ব্যর্থ হয়। অতঃপর রাশিয়া এবং ক্রিমিয়ার খানাতের মধ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী শান্তির সূত্রপাত হয়।

বোগদান খমেলনিৎস্কির নেতৃত্বে যাপোরোযহ-এর কোযাকগণ পোল্যাণ্ডের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ক্রিমিয়ার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে পোল্যাণ্ডের জন্য এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পোল্যাণ্ডের সহিত শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখিতে ইচ্ছুক 'উছমানী কর্তৃপক্ষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইসলাম গিরায় এই সুবর্ণ সুযোগ হারাইতে চাহিলেন না। তিনি খমেলনিৎস্কিকে হেতমান-এর পদমর্যাদা মঞ্জুর করিলেন এবং উর-বেগী তুগায়-এর নেতৃত্বে ৪,০০০ সৈন্যের এক ক্রিমীয় বাহিনী তাঁহার অধীনে ন্যস্ত করিলেন।

একই কোযাক ও তাতার সৈন্যদল পোলদের বিরুদ্ধে রাবী'উ'ছ-ছানী ১০৫৮/মে ১৬৪৮ সনে যুদ্ধে জয়ী হয় এবং খানের মধ্যস্থতার ফলে কোযাকগণ পোল্যাণ্ডের নৃপতির সহিত একটি অত্যন্ত অনুকূল চুক্তি সম্পাদনে সমর্থ হয় (Zborov-এর সন্ধি, ১০৫৯/১৬৪৯)। বোগদানের (মোলদাভিয়া) Voyvoda লুপুল খানের চাপের ফলে খমেলনিৎস্কির সহিত এক মিত্রতার চুক্তিতে আবদ্ধ হন (১০৬০/১৬৫০)। পরবর্তী বৎসর 'উছমানী সুলতান তাহাকে প্রকাশ্যে তাঁহার আশ্রয়ে আনয়ন করেন। কিন্তু ঐ বৎসরই খমেলনিৎস্কি খানের ব্যক্তিগত পরিচালিত তাতার বাহিনী পোলদের দ্বারা পরাস্ত হয় (খানের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যে এই পরাজয় সংঘটিত হয় এইরূপ ধারণার কোন যৌক্তিকতা নাই ঃ Cambridge History of Poland, কেমব্রিজ ১৯৫০ খৃ., পৃ. ৫১৪)। পোলাণ্ড ও খানাতের মধ্যে ২৪ মুহাররাম, ১০৬৪/১৫ ডিসেম্বর, ১৬৫৩ সনে শান্তির মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কোযাক-তাতার মিত্রতা অব্যাহত ছিল। খমেলনিৎস্কি যখন ১০৬৪/১৬৫৩ সনে 'উছমানী সুলতানের (যিনি তাঁহাকে ঘোড়ার লাংগুল ও একটি পতাকা পাঠাইয়াছিলেন, দেখুন না'ঈমা, ৫খ, ২৭৮) সহিত চুক্তির জন্য আলাপ-আলোচনা চালাইতেছিলেন সেই সময়ে তিনি জারেরও আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছিলেন।

ইসলাম গিরায় শা'বান ১০৬৪/জুন ১৬৬৪ সনে ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** দেখুন, সাধারণভাবে বংশ সম্বন্ধে গিরায় নিবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী এবং বিশদ আলোচনার জন্য ১ম, ২য় ও ৩য় ইসলাম গিরায়-এর উপর নিবন্ধ, (IA, fasc. 52, পৃ. ১১০৪-৮)।

Halil Inalcik (E.I.[2])/ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

**ইসলাম প্রচার সমিতি ঃ** একটি সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা। আবুল হোসেন ভট্টাচার্য (দ্র.) ১৯৬৮ খৃ. এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি মুখ্যত নও মুসলিমদিগকে মুসলিম সমাজে পুনর্বাসিত করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হইলেও আবুল হোসেন কাজ শুরু করেন একটি চার দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঃ (১) নও মুসলিমদিগের পুনর্বাসন; (২) অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পৌছান; (৩) খৃস্টান মিশনারীদের প্রচারণার মুকাবিলা করিয়া উপজাতীয়দের নিকট ইসলামের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা এবং (৪) সমাজসেবামূলক তৎপরতা।

আবুল হোসেনের জন্ম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পুরোহিত পরিবারে। যথাযোগ্য নিষ্ঠা ও যোগ্যতার বিচারে তিনি অল্প বয়সেই গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জিলা তৎকালীন মহকুমাদ্বয়ের জন্য পৌরোহিত্যে বরিত হইয়াছিলেন। সেইখানে পুরোহিত থাকাকালে তিনি ২১ বৎসর বয়সে ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নানাভাবে নির্যাতিত হইয়াছিলেন এবং নিজ জীবনে নও মুসলিমদের অসহায় অবস্থা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অধিকাংশ নও মুসলিম ছিন্নমূল, নিরাশ্রয় এবং নিঃসম্বল হইয়া পড়েন। ফলে অস্তিত্ব রক্ষার তাকীদে তাহাদের অনেককেই ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় লইতে হয়। এই অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নওমুসলিমদের সমস্যাকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন করেন। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই সমিতি রেজিস্ট্রিকৃত হয়। ইহার কেন্দ্রীয় দফতর ঢাকার কলাবাগানে স্থাপিত।

এই সমিতির পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা এবং ইসলাম প্রচারের সহায়ক পুস্তক প্রণয়ন (প্রকাশিত পুস্তকের বর্তমান সংখ্যা ৩৯), পাঠাগার পরিচালন, দেশের বিভিন্ন স্তরে, বিশেষত অমুসলিম অপপ্রচারদুষ্ট অঞ্চলসমূহে শাখা সমিতি (বর্তমান সংখ্যা ২৮) গঠন করিয়া তন্মধ্যে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়ন, ডাকযোগে শিক্ষা-প্রয়াস, নও মুসলিম পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ভবন (Home) স্থাপন, ভবনবাসীদের চিকিৎসা, বিবাহ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাকাত, সাদাকা, ফিত্‌রা, কুরবানীর পশুর চামড়া, মাসিক চাঁদা, এককালীন দান প্রভৃতি সমিতির আয়ের প্রধান উৎস। সকল প্রকার আয় আয়করমুক্ত। এগারজন সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক ইহা পরিচালিত। অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা এবং ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণই সাধারণত সদস্যরূপে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। পনর সদস্যের একটি উপদেষ্টা পরিষদে রহিয়াছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং সমাজ সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। দেশের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এবং মুসলিম জগতের সম্মানিত রাষ্ট্রদূতগণ ইসলাম প্রচার সমিতির অফিস ও কার্যক্রম পরিদর্শন করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) Fact about Islam Prochar Samity, Central office, Kalabagan, Dhaka 1983; (২) Khondakar Abul Kahair, A Memorandum to brethren in Islam, Islam Prochar Samity, Dhaka 1983; (৩) ইসলাম প্রচার সমিতির কার্যবিবরণী ১৯৮৩, ১৯৮৫, ১৯৮৬ খৃ; (৪) গঠনতন্ত্র, ইসলাম প্রচার সমিতি; (৫) ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৮৬ খৃ., ২খ, ৫৪-৫৫, আবুল হোসেন শিরো.; (৬) ইসলাম প্রচার সমিতির প্রসপেক্টাস।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

**ইসলামাবাদ** (اسلام آباد) ঃ পাকিস্তানের রাজধানী, পৃথিবীর স্বল্প সংখ্যক পরিকল্পিত রাজধানীগুলির অন্যতম। বস্তুত ইহা রাওয়ালপিণ্ডির সঙ্গে যুগ্ম-শহর, উভয়ের মধ্যকার দূরত্ব মাত্র ৮ মাইল, পরিকল্পনা অনুযায়ী

উভয় শহর একই সঙ্গে বর্ধিত হইবে এবং পিণ্ডি মাতৃশহররূপে গণ্য হইবে। মারগাল্লা পাহাড়ের পাদদেশে, ৩৩°৪৯ উত্তর দ্রাঘিমাংশে এবং ৭২°২৪ পূর্ব অক্ষাংশে, একটি মালভূমির উ. পূ. প্রান্তে অবস্থিত, উহার পূর্বনাম ছিল পোতওয়ার। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে স্থানটির উচ্চতা ৫০৩-৬১০ মিটার। উভয় দিকেই মালভূমি ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতায় উঠিয়া পাহাড়ে গিয়া মিশিয়াছে। ইসলামাবাদ হইতে পার্বত্য পথে আরোহণ ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিবার জন্য ১৫টি পথ নির্মাণ করা হইয়াছে; এইগুলির মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১১০ কিলোমিটার, স্থানে স্থানে এসব পার্বত্য পথ ১,৫০০ মিটার পর্যন্ত উচ্চে উঠিয়াছে, তন্মধ্যে গিরিখাতও রহিয়াছে। এখানে সরকারের সংরক্ষিত বনভূমির পরিমাণ ৩১,০০০ একর। এই অঞ্চলে সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম নিলান ভাতু, উহার উচ্চতা ১,৬০৪ মিটার। ইসলামাবাদের উত্তর সীমান্ত দিয়া হাররো নদী প্রবাহিত, রাজধানী এলাকার ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে রাওয়াল বাঁধ নির্মাণ দ্বারা ৮.৮ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী রাওয়াল হ্রদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই নদী ও হ্রদ হইতে ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিণ্ডি— উভয় শহরে সারা বৎসর প্রচুর পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয়। শহরে পানি সরবরাহের অপর উৎস হইতেছে ২৪ মাইল উ. পূ. দিয়া প্রবাহিত সোন নদী এবং উহাতে বাঁধ নির্মাণ করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে সিমলী হ্রদ। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে এই কৃত্রিম জলাধারের উচ্চতা ২,২৯৫ ফুট। ইহা ছাড়া এই দুই নদীরই অনেক ছোট ছোট উপনদীও রহিয়াছে, সেইগুলি স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন। মারগাল্লা পাহাড় ও মারী পর্বতের কোন কোন শৃঙ্গে শীতকালে বরফ জমে।

কথিত আছে যে, এই অঞ্চলটি ছিল মানুষের অন্যতম আদি বাসভূমি। পোতওয়ার মালভূমিতেই ৪ লক্ষ বৎসর পূর্বেকার প্রস্তর যুগের সোন সংস্কৃতির নিদর্শনাদি পাওয়া গিয়াছে। অনেক কাল পরে সেই একই স্থানে অর্থাৎ মারগাল্লা পাহাড়ের অপর পারে তক্ষশীলাতে বিখ্যাত গান্ধারা সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, উহারও নিদর্শনাদি বর্তমান রহিয়াছে। ইসলামাবাদের সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছে অতীতের রহস্যময় আকর্ষণ, আর বর্তমানের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ। সামগ্রিকভাবে স্থানটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। উত্তরে মারগাল্লা ও মারী পাহাড়শ্রেণী থাকিবার কারণে বর্তমান শহর এলাকাতে শীত বা গ্রীষ্ম কোনটিই খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালে (মে হইতে সেপ্টেম্বর) ৬৯ সেন্টিমিটার (২৭´), আর শীতকালে (নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারি) ২৩ সেন্টিমিটার (৯´)। গড় তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে ২৪° হইতে ৩৯° সেলসিয়াস, আর শীতকালে ২০ হইতে ২৪° সেলসিয়াস।

সমগ্র পরিকল্পিত শহর এলাকার পরিমাণ ৯০৬°৫০ বর্গ কিলোমিটার, তন্মধ্যে মূল শহরের আয়তন ২২০ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৭২ খৃ. সমগ্র শহরটির জনসংখ্যা ছিল ৭৬,০০০। দশ বৎসর পরে উহার জনসংখ্যা হয় ২,১০,০০০; আর বর্তমান জনসংখ্যা (১৯৮৬ খৃ.) ৩,২৫,০০০। শহরটি খুবই দ্রুত গড়িয়া উঠিতেছে, যদিও তখন পর্যন্ত অধিবাসিগণের অধিকাংশই সরকারী কর্মচারী ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ। প্রশাসনিকভাবে সমগ্র রাজধানী এলাকাটি পূর্বে রাওয়ালপিণ্ডি জিলার রাওয়ালপিণ্ডি, মারী ও কালুতা তহশীল এবং অ্যাবোটাবাদ জিলার অ্যাবোটাবাদ ও হরিপুর তহশীলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৮১ খৃ. ৬ জানুয়ারী সমগ্র রাজধানী এলাকাটিকে লইয়া ইসলামাবাদ জিলা গঠন করা হয়। ইহা পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত।

**পাকিস্তানের রাজধানীর ইতিবৃত্ত ঃ** ১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান (দ্র.) প্রতিষ্ঠিত হইলে কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থাপিত হয় কায়দে আজম মুহাম্মাদ 'আলী জিন্নাহ্-এর জন্মস্থান করাচী শহরে। সেই সময়ে শেরে বাংলা আফসোস করিয়া বলিয়াছিলেন, "পাকিস্তান সৃষ্টি হইল সত্য, কিন্তু কেন্দ্র স্থাপিত হইল বৃত্তের এক প্রান্তে।" সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী হইলেও করাচী তখন ছিল বস্তুত মৎস্য শিকার ও ব্যবসায়ের একটি বন্দর মাত্র। অতঃপর অত্যন্ত আকস্মিকভাবে এবং অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে করাচী শহরটি সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে। ভারত হইতে মুসলিম মুহাজিরগণের মধ্যে যাহারা (পশ্চিম) পাকিস্তানে গমন করিয়াছিলেন তাহাদের প্রধান অংশটিই করাচীতে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। ফলে সেই শহরের জনসংখ্যা স্ফীত হইয়া বিশাল আকার ধারণ করে, পাকিস্তান সরকারও বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এই রাজধানী শহরের সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে থাকে। অতঃপর দেশের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা চলিতে থাকিলে ১৯৫৮ খৃ. অক্টোবর মাসে দেশের প্রধান সেনাপতি জেনারেল (পরে ফীল্ড মার্শাল) মুহাম্মাদ আয়্যুব খান সমগ্র দেশে সামরিক আইন জারী করেন এবং প্রথমে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও পরে প্রেসিডেন্ট হন। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচী হইতে স্থানান্তরিত হয়। আয়্যুব খান (দ্র.) দেশের সেনাবাহিনীর সদর দফতর রাওয়ালপিণ্ডি হইতে বিশেষ ফরমান জারী করিয়া দেশ শাসন করিতে থাকেন। তিনি বিভিন্ন সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সেইজন্য কতগুলি কমিশন গঠন করেন। ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র তিন মাস পরেই ২৩ জানুয়ারী, ১৯৫৯ সালে তিনি রাষ্ট্রের রাজধানীর উপযোগী স্থান নির্বাচনের জন্য (Location of Federal Capital) কমিশন গঠন করেন। উহার দায়িত্ব ছিল ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা, আবহাওয়া এবং উৎপাদনশক্তিপূর্ণ পশ্চাদভূমির বিবেচনায় করাচী যথোপযুক্ত কিনা তাহা বিবেচনা করা এবং উপরিউক্ত বিবেচনায় অনুপযোগী হইলে অন্য কোন উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা। ৯ সদস্যবিশিষ্ট সেই রাজধানী কমিশনের সভাপতি ছিলেন জেনারেল আগা মুহাম্মাদ য়াহ্‌য়া খান। পরে তিনি পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি হন এবং তাঁহার হাতেই ক্ষমতা দিয়া আয়্যুব খান রাষ্ট্রপ্রধানের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার শাসনামলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। প্রায় ৫ মাস পরে কমিশন যে রিপোর্ট পেশ করেন তাহাতে করাচীর উপযোগিতা বাতিল করা হয় এবং দেশরক্ষা, আবহাওয়া, স্থানীয় সম্পদ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইত্যাদির বিবেচনায় পোতওয়ারকে দেশের রাজধানীর যথোপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্বাচন করা হয়। বলা হয় যে, রাওয়ালপিণ্ডি ইহার মাতৃশহররূপে থাকিবে এবং উভয় শহরই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া সমৃদ্ধি অর্জন করিয়া যাইবে। ১৯৫৯ খৃ. জুন মাসে আয়্যুব খান কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং পোতওয়ার পাকিস্তানের নূতন রাজধানী বলিয়া ঘোষিত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০ নূতন রাজধানীর নামকরণ করা হয় ইসলামাবাদ। ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের স্থাপয়িতা আয়্যুব খান। এই শহরেই স্বীয় বাসভবনে তিনি ইনতিকাল করেন এবং এইখান হইতে অল্প দূরে উ. প. সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত স্বগ্রাম রেহানাতে তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়। ইসলামাবাদ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি (তৎকালীন) পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ঢাকা শহরের উত্তরাংশে দ্বিতীয় রাজধানী নির্মাণেও হাত দেন এবং জাতীয় সংসদ ভবন ও অন্যান্য সুরম্য ভবনসমূহ নির্মাণ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পরে এই দ্বিতীয় রাজধানীর নামকরণ করা হয় শেরেবাংলা নগর।

ইসলামাবাদের মূল পরিকল্পনা ও নক্সা তৈরি করে এথেন্সের নগর পরিকল্পনাকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ডক্সিয়াডেস অ্যাসোসিয়েটস। Dynapolis নগর গঠন অনুযায়ী এই শহরটির পরিকল্পনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ আবাসিক প্রয়োজনে চতুর্দিকস্থ সম্প্রসারণ অনুযায়ী মূল নগর কেন্দ্রটিও তুলনামূলকভাবে সম্প্রসারিত হইতে থাকিবে। বহিঃযোগাযোগের জন্য শাহ্‌রাহ্‌-ই-ইসলামাবাদ এবং শাহ্‌রাহ্‌-ই-কাশ্মীর নামক দুইটি মহাসড়ক দ্বারা ইহা সমগ্র দেশের সঙ্গে যুক্ত এবং শাহ্‌রাহ্‌-ই-পাকিস্তান নামক মহাসড়ক দ্বারা লাহোর, পেশোয়ার ও কাশ্মীরের সঙ্গে যুক্ত। নগরের সামগ্রিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রাজধানী উন্নয়ন সংস্থা (Capital Development Authority-CDA) গঠন করা হইয়াছে। সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পিত শহর বলিয়া এইখানে বিভিন্ন চিহ্নিত এলাকা রহিয়াছে এবং সেইগুলি একান্তভাবেই নির্দিষ্ট প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মূল রাজধানী কেন্দ্রে প্রশাসনিক এলাকা, কূটনৈতিক মিশন এলাকা, নাগরিকগণের ভবন এলাকা, আবাসিক এলাকা, নীল এলাকা (প্রধান সড়কের পার্শ্বে বহুতলা বাণিজ্যিক এলাকা), শিল্প এলাকা ইত্যাদি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

এখানকার সড়কগুলির বৈশিষ্ট্য ঃ কতগুলি প্রধান প্রধান সড়ক আছে, যেমন খায়াবান-ই কাইদে আ'জাম, আতাতুর্ক এভিনিউ, শাহ্‌রাহ্‌-ই-সুহ্‌রাওয়ার্দী, ৭ম এভিনিউ, শাসনতন্ত্র (constitution) এভিনিউ ইত্যাদি। আর ইহাদের মধ্যবর্তী সড়কগুলি নম্বর দ্বারা চিহ্নিত, যেমন ৫১ নং স্ট্রীট, ৫২ নং স্ট্রীট, ৫৩ নং স্ট্রীট ইত্যাদি।

ইসলামাবাদকে পাকিস্তানের স্থায়ী রাজধানীরূপে পরিকল্পনা করা হইয়াছে। কাজেই এখানকার প্রধান প্রধান ভবন এমন বিশেষ পরিকল্পনা মত নির্মাণ করা হইয়াছে ও হইতেছে যেন পরবর্তী কালের ভবনসমূহকেও মূল ভবনগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া নির্মাণ করা যায়। এই নগরীর প্রধান উপদেষ্টা স্থপতি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের স্যার রবার্ট ম্যাথিও (Sir Robert Mathew)। ইসলামাবাদের বিশিষ্ট ভবনসমূহের মধ্যে রহিয়াছে ঃ (১) পার্লামেন্ট ভবন, শহরের অন্যতম প্রধান পার্লামেন্ট সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত, ১৯৭৪ খৃ. ইহার নির্মাণকাজ শুরু হয়, সুদৃশ্য ও বিশাল এলাকাব্যাপী পাঁচতলা ভবন, সর্বমোট আয়তন ৫,৯৮,৫৭২ বর্গফুট। জাতীয় সংসদ ভবন ও সিনেট হল তিন তলাতে অবস্থিত, উভয়টিই অতি সুদৃশ্য। সর্বমোট নির্মাণ ব্যয় ছিল ৪৫৪ মিলিয়ন টাকা। ইহার প্রধান স্থপতি-সংস্থা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের M/S Eolward Durel Stone, সহযোগী ছিল পাকিস্তানের মেসার্স নাবাভী অ্যাণ্ড সি'দ্দিকী এ্যাসোসিয়েটস।

(২) সচিবালয় ভবনসমূহ (Secretariat Block), মারগাল্লা পাহাড়ের পাদদেশে পাঁচ বৎসরে নির্মাণ করা হইয়াছে, মোট এলাকা ৯২,৯০০ বর্গমিটার। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, প্রতি ভাগে চারিটি করিয়া পরস্পর সংলগ্ন চার হইতে ছয়তলা ভবন। এইগুলির বহির্দেশে মুগল ধরনের স্থাপত্য রীতি এবং অভ্যন্তর ভাগে আধুনিক রীতি অনুসৃত হইয়াছে।

(৩) আইওয়ান-ই সদর বা রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ঃ একটি পাহাড়ের উপরে ও চতুর্দিক ঘিরিয়া নির্মিত, সুদৃশ্য আধুনিক রীতির ভবন, মোট নির্মাণ এলাকা ৩০,১৯৩ বর্গমিটার। ইহা একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, রাষ্ট্রীয় মেহমান খানা এবং সম্মানিত রাষ্ট্রীয় মেহমানগণের ভোজসভা গৃহ।

(৪) স্টেট ব্যাঙ্ক ভবন— ইহার ভিত্তিতে সাধারণ পাথর এবং উপরে মর্মর পাথর ব্যবহার করা হইয়াছে ; উভয়ের সুসমঞ্জসতায় ভবনটি খুবই সুদৃশ্য দেখায়। অন্যান্য আকর্ষণীয় ভবনের মধ্যে রহিয়াছে রেডিও ভবন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভবন, জাতীয় আর্কাইভ বা দলীল সংরক্ষণ ভবন, বিজ্ঞান একাডেমী ভবন, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট ইত্যাদি। জাতীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় যাদুঘর, সেনাবাহিনী যাদুঘর, সুপ্রীমকোর্ট ভবন, জাতীয় শিল্পকলা ভবন ইত্যাদি রহিয়াছে।

শহরের পরিকল্পিত এলাকাতে ১৯ তলা গৃহ নির্মাণ ঋণ দান কর্পোরেশন সমেত নানা আকর্ষণীয় ভবনসমূহ নির্মিত হইতেছে, বিভিন্ন বাণিজ্যিক এলাকা এক একটি মার্‌কায নামে পরিচিত। আবাসিক এলাকাতে বিভিন্ন আকার ও ধরনের বাড়ি নির্দিষ্ট রহিয়াছে। ১৯৮৬ খৃ. পর্যন্ত ইসলামাবাদ শহরে ১৫,৭৭৮টি আবাসিক গৃহ নির্মিত হয়।

কিন্তু সমগ্র ইসলামাবাদ শহরের মধ্যে যেই ভবনটি সর্বাগ্রে দৃষ্টিগোচর হয় যেই ভবনটি স্বীয় বিশালত্ব, স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য, আঙ্গিক সৌন্দর্য ও পবিত্রতা নিয়া বিরাজমান তাহা হইতেছে ফয়সল মসজিদ। বস্তুতপক্ষে ইহা পাকিস্তানের রাজধানীর প্রধান পরিচায়ক ধর্মীয় ভবন। মারগাল্লা পাহাড়ের পাদদেশে, শাহ্‌রাহ্‌-ই-ইসলামাবাদ সড়কের মোড়ে উচ্চ স্থানে ইহা নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহার মোট আয়তন ১,৮৯,৭০৫ বর্গমিটার, কয়েকটি পিরামিড আকারের ছাদ ৪০ মিটার উচ্চ, চারটি মীনার সরু, গোল ও কীলকাকারের, প্রতিটি ৮৮ মিটার উচ্চ। এই মসজিদ দিনে বা রাত্রে সব সময়ে শহরের যে কোন স্থান হইতে এবং শহরের বাহিরের বহু দূর হইতে দেখা যায়। মসজিদটির মূল ভবনে একসঙ্গে ১০,০০০ লোক সালাত আদায় করিতে পারে। চতুর্দিকের ছাদযুক্ত বারান্দাতে ২৪,০০০ লোক এবং প্রধান চত্বর ও পূর্ব পার্শ্বের খোলা জায়গাতে আরও ৪০,০০০ লোক একই সঙ্গে সালাত আদায় করিতে পারে। ভিতরে একসঙ্গে ৩০০ জনের উযূর ব্যবস্থা রহিয়াছে। মসজিদের একাংশে ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রধান প্রবেশ পথ দক্ষিণ দিক দিয়া, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্য পশ্চিম দিক দিয়া একটি আলাদা প্রবেশ পথও রাখা হইয়াছে। এই বিশাল ও সুন্দর মসজিদটির মূল নক্সা প্রণয়ন করেন খ্যাতনামা তুর্কী স্থপতি ভেদাত দালোকায় (vedat Dalokay)। মসজিদটি নির্মাণের সামগ্রিক ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন সৌদি আরবের মরহূম বাদশাহ ফায়সাল। তাঁহার নামেই ইহার নামকরণ করা হইয়াছে।
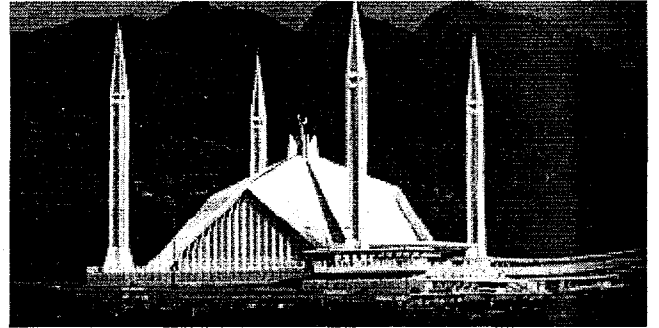
ফয়সাল মসজিদ

১৯৮৬ খৃ. জুন মাসে ইসলামাবাদে নবনির্মিত হজ্জ ভবনসমূহ উদ্বোধন করা হয়। পাকিস্তানের প্রধান হাজ্জী ক্যাম্প ছিল করাচীতে। কিন্তু দেশের উত্তরাঞ্চলের হাজ্জযাত্রীদের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য ইসলামাবাদেও

একটি হাজ্জযাত্রী কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। উ. প. সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও আযাদ কাশ্মীরের হাজ্জযাত্রিগণ সরাসরি এখান হইতে মক্কা শারীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া যাইতে পারেন। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্বে সেক্টর এইচ ১৪-তে সমতল স্থানে ২২ একর এলাকাব্যাপী এই বিশাল ক্যাম্প নির্মিত হইয়াছে। বাহির হইতে অননুমোদিত কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারে না। দূর হইতে ইহার সৌন্দর্য অবলোকন করা যায়। এখানে দোতলা ১০টি পাকা ভবন রহিয়াছে, সেইগুলিতে একসঙ্গে ১,০০০ হাজ্জযাত্রী আরামে থাকিতে পারেন। হজ্জের সময়ে প্রায় ৫০,০০০ লোক এখানকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারেন। বাহিরে সড়ক যোগাযোগ, গাড়ী রাখিবার ব্যবস্থা, ভিতরে পানি সরবরাহ, ক্যান্টিন, ডিসপেনসারী, পোস্ট অফিস, টেলিফোন ইত্যাদির সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার সঙ্গেই একটি মসজিদ নির্মাণাধীন রহিয়াছে।

ইসলামাবাদে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। (১) কাইদে আ'জাম বিশ্ববিদ্যালয় ঃ এখানেই প্রথম এম. এ. পর্যায়ে শিক্ষাদান শুরু হয়। মারগাল্লা পাহাড়ের পাদদেশে, পাকিস্তান সচিবালয়ের পূর্বদিকে ইহা অবস্থিত। ইহা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। (২) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ মারগাল্লা পাহাড়ের পাদদেশেই ফায়সাল মসজিদের চত্বরে অবিস্থত। ইহার লক্ষ্য ইসলামী শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করা এবং ইসলামী সমাজের উপযোগী অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত, দৈহিক, মানসিক ও সৌন্দর্যবোধের প্রয়োজন মিটানো। (৩) 'আল্লামা ইক্বাল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ঃ শহরের জিরো পয়েন্টের নিকটে সেক্টর এইচ-৮ এ অবস্থিত। সাধারণ বেতনের বিনিময়ে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রিগণ বাড়িতে বসিয়াই প্রাথমিক পর্যায় হইতে ডিগ্রী শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারে। সেমিস্টার পদ্ধতিতে বৎসরে দুইবার পরীক্ষা নেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সরবরাহ করা হয়। সেক্টর এইচ-৯-এ স্থাপন করা হইয়াছে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট। সেখানে 'আরবী, ফার্সী, হিন্দী, তুর্কী, ইংরাজী, ফরাসী, জর্মান, চীনা, জাপানী ইত্যাদি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়।

রাজধানীর নাগরিকগণের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের জন্য সেক্টর জি-৮/৩-এ ১৪০ একর এলাকাব্যাপী নির্মিত হইতেছে বিশাল হাসপাতাল কমপ্লেক্স। এখানে হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, শিশু হাসপাতাল, প্রসূতি সদন, মস্তিষ্কের রোগ গবেষণা কেন্দ্র, চক্ষু হাসপাতাল, ডায়াবেটিক হাসপাতাল, কান, নাক ও গলার রোগের চিকিৎসা বিভাগ, যকৃতের চিকিৎসা, পোড়া ঘায়ের চিকিৎসা, প্লাস্টিক সার্জারী ইত্যাদি বিশেষ চিকিৎসার আলাদা আলাদা বিভাগ নির্মিত হইতেছে। এই কমপ্লেক্সের অন্তর্ভুক্ত হইতেছে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস বা জাতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট।

জাতীয় ক্রীড়া কমপ্লেক্স রাজধানীর প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এখান হইতে ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, রেল স্টেশনসমূহ ও বাস টার্মিনালের সরাসরি যোগাযোগ রহিয়াছে। এখানে এশীয় অলিম্পিক খেলাসমূহ সমেত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাধূলা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। জাতীয় স্টেডিয়ামের নাম জিন্নাহ্ স্টেডিয়াম। ইসলামাবাদের এই ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণে চীন সহায়তা প্রদান করিতেছে।

বড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের জন্য খায়াবান-ই স্যার সায়্যিদ-এর পার্শ্ববর্তী এলাকা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে দেশের অন্য প্রধান শহরের সঙ্গে রেল ও সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করা হইয়াছে। সেখানে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করা হইয়াছে; শিল্প এলাকা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। নিত্য ব্যবহার্য ও প্রয়োজনীয় ছোট ছোট শিল্পদ্রব্য নির্মাণ ও ব্যবসায়ের জন্য খায়াবান-ই সুহরাওয়ার্দীর উত্তরাংশের এলাকা নির্ধারিত করা হইয়াছে ; সেইখানে এই ধরনের শিল্প দ্রব্যাদি নির্মাণ এবং সরবরাহ করা হইতেছে। ইহা ছাড়া সব ধরনের শিল্প কারখানার জন্য ১ হইতে ৯ পর্যন্ত সেক্টর আলাদাভাবে নির্ধারিত রহিয়াছে।

শহরবাসিগণের চিত্তবিনোদনেরও বিভিন্ন ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। রাওয়াল হ্রদ ও সিমলি হ্রদে নৌভ্রমণ, ২,০২,৩৬০ বর্গমিটার জোড়া গোলাপ ও যুঁইফুলের বাগানে বেড়াইবার ব্যবস্থা, আর্জেন্টিনা পার্ক ও মারগাল্লা জাতীয় পার্কে ভ্রমণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা সম্বলিত ২২০ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী ইসলামাবাদ পার্ক নির্মীয়মান রহিয়াছে। জাপানী শিশুদের বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ জাপানী সহযোগিতায় নির্মিত ১৬ একর এলাকাব্যাপী শিশু উদ্যান বিশেষ আকর্ষণীয়।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণের জন্য এই শহরে দুইটি কেন্দ্রস্থল রহিয়াছে, একটি সেক্টর এফ-৮/৪-এ নির্মিত সুদৃশ্য খৃষ্টান গির্জা। উহা গথিক স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত। ভিতরে একসঙ্গে ৬০০ লোক প্রার্থনা করিতে পারে এবং অপরটি হইতেছে মারগাল্লা পাহাড়ের পাদদেশে সেক্টর এফ-৭-এ অবস্থিত একটি সুপ্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ। কথিত আছে যে, এই বৃক্ষের (বা খুব সম্ভবত ইহার মূল বৃক্ষের) নীচে বসিয়া গৌতম বুদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বিদেশী দূতাবাসের অনেক বৌদ্ধ কূটনৈতিক এই পবিত্র বৃক্ষতলে আসিয়া থাকেন। ইসলামের আগমনের পূর্বে এই সমগ্র অঞ্চলটিতে যথেষ্ট বৌদ্ধ প্রভাব ছিল।

পাকিস্তানের নূতন রাজধানী ইসলামাবাদ দ্রুত গড়িয়া উঠিতেছে। এখানকার প্রায় কোনো প্রকল্পই এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইলে ভবিষ্যতে ইহা একটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় শহরে পরিণত হইবে।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) মুহাম্মাদ যুবায়র, Islamabad, Directorate of Public Relations, Capital Dev. Authority, ইসলামাবাদ ১৯৮৬ খৃ.; (২) Trekkiu the-Margalla hills, C.D.A. Publication; (৩) Parliament Building, do; (4) Hajj Complex, do; (৫) আয়্যূব খান, Friends not Master, Karachi o. u. p. 1967, Appendix no. v.।

হুমায়ুন খান

**ইসলামাবাদ** (اسـلام ابـاد) ঃ কাশ্মীর উপত্যকার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ঝিলাম নদীর তীরে একটি স্থান, যাহা ৩৩°-৪৭ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৭৫°-পূর্ব-দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এখানে অনন্ত নাগ (اننـت نـاگ) নামের একটি কূপ আছে এবং এই কারণেই এই স্থানকে অনন্ত নাগও বলা হয়। সুলতান যায়নু'ল-'আবিদীন (৮২০/১৪১৭ হইতে ৮৭২/১৪৬৭) পঞ্চদশ শতাব্দীতে মীলাদী নামক স্থানে যখন ইসলামী হুকূমাত কায়েম করেন, তখন উহার নাম ইসলামাবাদ রাখিয়াছিলেন। প্রাথমিক যুগে এই স্থানের শাল কাপড় খুব বিখ্যাত ছিল। বর্তমান কালে সাদামোজা নকশা করা মোটা কম্বল ও গালিচা উৎপাদিত হইয়া থাকে। উহার নিকটেই হিন্দুদের মারতুন্দ (مارتند) নামের বিখ্যাত মন্দির। আচ্ছাবাল (اچهابل) নামক স্থানে সম্রাট জাহাঙ্গীর-এর বিখ্যাত বাগানসমূহ বিদ্যমান।

কাদী সা'ঈদুদ্দীন আহমাদ (দা. মা. ই.)/ এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ

**ইসলামাবাদ** (اسلام آباد) ঃ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সমুদ্র বন্দর ও দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী, চট্টগ্রামের পূর্ব নাম ইসলামাবাদ। মুগল আমলে এই নামকরণ করা হয় (দ্র. চট্টগ্রাম)।

**ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ** (المؤسسة الاسلامية بنغلاديش) ঃ ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারী করিয়া এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। 'বায়তুল মোকাররম সোসাইটি' এবং 'ইসলামিক একাডেমী' নামক তৎকালীন দুইটি সংস্থার বিলোপ সাধন করিয়া এই ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। প্রথমোক্ত দুই সংস্থার সমুদয় সম্পদ, দায়দায়িত্ব ও কর্মসূচী নবগঠিত ফাউন্ডেশনের আওতাভুক্ত হয়। সুতরাং ঐ দুই সংস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাসঙ্গিকভাবেই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

**বায়তুল মোকাররম সোসাইটি** ঃ ঢাকায় একটি বৃহৎ মসজিদ স্থাপন এবং ইহার আওতায় একটি 'দারুল-'উলূম', একটি দারু'ল-ইফ্তা' (ফাত্ওয়া প্রদান সংগঠন) এবং একটি ইসলামী পাঠাগার পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ খৃ. 'বায়তুল মোকাররম সোসাইটি' নামক একটি সমিতি গঠন করা হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল 'উমরাও খানের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আলহাজ্জ 'আব্দু'ল-লাতীফ ইব্রাহীম বাওয়ানী প্রমুখ কয়েকজন শিল্পপতির উদ্যোগে উপরিউক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বায়তুল মোকাররম নামক মসজিদের নির্মাণের এবং প্রকল্পটির ব্যয় নির্মাণের জন্য একটি বিপণিকেন্দ্র স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৬০ খৃ. ফেব্রুয়ারী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মরহুম মুহাম্মাদ আয়ূব খান। সোসাইটির কর্মসূচী ছিল অত্যন্ত ব্যাপক এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার, ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুনের আদর্শে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা, সেবা-প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা, ইসলামী গ্রন্থ ও সাময়িকী প্রকাশ, বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মুসলিম বেকারদিগের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা ইত্যাদি। বায়তুল মোকাররম সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন ঃ

১. জনাব জি. এ. মাদানী (কমিশনার ওয়ার্কস, হাউজিং এবং সেটেলমেন্ট), চেয়ারম্যান

২. জনাব হানীফ আদমজী (আদমজী জুট মিলস লিঃ), কোষাধ্যক্ষ

৩. জনাব এ. যেড. এম. রিযা'ই কারীম (সাত্তার ম্যাচ ওয়ার্কস লিঃ), সচিব

৪. জনাব এ. রায্যাক (আমীন জুট মিলস লিঃ), সদস্য

৫. জনাব স. সাত্তার ম্যানিয়া (করীম জুট মিলস লিঃ), সদস্য

৬. জনাব কায়সার এ. মান্নু (অলিম্পিয়া টেক্সটাইলস মিলস লিঃ), সদস্য

৭. জনাব এ. রশীদ (ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান), সদস্য

৮. জনাব ওয়াই. এ. বাওয়ানী (লতীফ বাওয়ানী জুট মিলস লিঃ), সদস্য

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের সমন্বয়ে সোসাইটির প্রথম ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইয়াছিল। বায়তুল মোকাররম কমপ্লেক্সের নীল-নকশা প্রণয়ন করেন প্রখ্যাত স্থপতি জনাব 'আবু'ল-হুসায়ন থারিয়ানী, কর্ম তত্ত্বাবধানে ছিলেন তাঁহার সুযোগ্য সন্তান জনাব টি. থারিয়ানী এবং ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার জনাব মু'ঈনু'ল-ইসলাম (দ্র. 'বায়তুল মুকাররম মস্ক' নামক মুখপত্র, ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৬-৯)।

এখনও বায়তুল মোকাররম মসজিদের যাবতীয় নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় নাই। প্রেসিডেন্ট ও রাষ্ট্রপ্রধান লেফটেনেন্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তাঁহার রাজত্বকালে বায়তুল মোকাররমকে 'জাতীয় মসজিদ'রূপে ঘোষণা করেন, মসজিদের ভবনের অসমাপ্ত অংশের নির্মাণের এবং মসজিদের শোভা বর্ধনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করিবার নির্দেশ দেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এ. জেড. এম. শামসুল আলমের নিরলস প্রচেষ্টায় উপরিউক্ত কাজগুলির নীল-নক্শা নূতন সূত্রে তৈরি করা হয় এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মহাপরিচালক জনাব এ. এফ. এম. ইয়াহিয়া-র নেতৃত্বে মসজিদের উত্তর প্রান্তের অসমাপ্ত কাজ, শোভা বর্ধনের জন্য ফোয়ারাসহ উদ্যান রচনা ও কারুকার্যমণ্ডিত পাঁচিল নির্মাণ সমাপ্ত হয়। সরকারের গণপূর্ত বিভাগ অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত বায়তুল মোকাররম কমপ্লেক্সের যাবতীয় নির্মাণ কাজের দায়িত্ব পালন করে। মীনার ও পূর্বদিকের ডি.আই.টি. সড়কের সহিত সংযোগ রাস্তা নির্মাণ, সাহান শীতল পাথরে মণ্ডিত ও লিফ্ট সংস্থাপনসহ আরও কিছু কাজ এখনও বাকী রহিয়াছে। তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব এম. এ. সোবহান এইসব কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৮৬ সালের ৭ জানুয়ারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এক অধ্যাদেশবলে দেশের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ চট্টগ্রামস্থ আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেক্সকে উহার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং সকল দায়-দায়িত্বসহ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দায়িত্বে অর্পণ করেন। বর্তমানে উক্ত মসজিদ কমপ্লেক্সের উন্নয়ন কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে (চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদ অধ্যাদেশ, ১৯৮৬; ১৯৮৬ সালের অধ্যাদেশ নং ২, ১ জানুয়ারী, ১৯৮৬)।

**ইসলামিক একাডেমী** ঃ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ঢাকার কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে 'দারু'ল-উলূম' (ইসলামিক একাডেমী) নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর বিচারপতি হামুদুর রহমান এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং অধুনালুপ্ত ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রামস-এর ডিরেক্টর এ. টি. এম. আবদুল মতীন ইহার পরিচালক নির্বাচিত হন। বায়তুল মোকাররম চত্বরের উত্তর পার্শ্বে তৎকালে অবস্থিত বয়েজ-স্কাউট ভবনের উপর তলায় দারু'ল-'উলূমের কার্যালয় স্থাপিত হয়।

১৯৬০ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে করাচীতে কেন্দ্রীয় ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় (Govt. of Pakistan Notn. No. F. 15—59—E. IV dt. Rawalpindi, March 10, 1960)। স্বাভাবিকভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দাবি উঠে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনাক্রমে ঢাকার দারু'ল-'উলূমকে কেন্দ্রীয় ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউটের শাখারূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয় (Letter No. F. 19—1/60 CUR dt. Nov. 8.

1960)। ইহার পরিবর্তিত নাম হয় 'ইসলামিক একাডেমী ঢাকা'। অধিকন্তু ইহাকে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের রূপ দেওয়া হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদাধিকারবলে একাডেমীর পৃষ্ঠপোষক থাকিতেন। একাডেমীর কর্তৃপক্ষের মধ্যে ছিল একটি উপদেষ্টা বোর্ড, বোর্ড অব গভর্নরস এবং একটি নির্বাহী কমিটি। বিচারপতি হামুদুর রহমান একাডেমীর প্রথম চেয়ারম্যান মনোনীত হন। ২৮ নভেম্বর, ১৯৬০ খৃ. তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আয়ূ্যব খান প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ ও ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব আবুল হাশিম (দ্র.)-কে একাডেমীর প্রথম ডিরেক্টর নিযুক্ত করেন।

উপরিউক্ত সাংগঠনিক বিবর্তনাদি সত্ত্বেও ইসলামিক একাডেমী ইহার কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের খুবই অপ্রতুল অনুদান হইতে কোনক্রমে একাডেমীর ব্যয় নির্বাহ হইত। পুস্তক বিক্রয় ইত্যাদি সূত্রে অর্জিত একাডেমীর নিজস্ব আয় ছিল অকিঞ্চিৎকর। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণা এবং সভা-সেমিনার, গ্রন্থ-সাময়িকীর মাধ্যমে গবেষণাপ্রসূত তত্ত্ব ও তথ্যের প্রচার এই ছিল মূলত ইসলামিক একাডেমীর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত একাডেমীর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের মধ্যে ছিল ঃ 'কুরআনুল করীম' শিরোনামে প্রকাশিত 'কুরআনের একটি প্রামাণিক ও প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, The Creed of Islam (দ্র. আবুল হাশিম) ইত্যাদি কয়েকখানি ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশ, ত্রৈমাসিক 'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা' ও 'সবুজ পাতা' নামক একটি শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা প্রকাশনা ও 'আরবী শিক্ষার একটি কোর্স পরিচালনা। এতদ্ভিন্ন একাডেমী বিভিন্ন উপলক্ষে ও বিষয়ে সেমিনার এবং আলোচনা সভার আয়োজন করিত।

অন্যপক্ষে বায়তুল মোকাররম সোসাইটিও ইহার কর্মসূচী বাস্তবায়নে তেমন অগ্রগতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। মসজিদ ভবন এবং বিপণিকেন্দ্র উভয়ের নির্মাণকাজ অসমাপ্ত রহিল। গবেষণা, সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা, প্রশিক্ষণ, গ্রন্থাগার স্থাপন ইত্যাদিতে সোসাইটি মোটেই অগ্রসর হইতে পারিল না। ১৯৭০-৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলিতে সোসাইটির কর্মকর্তাগণ স্থানচ্যুত হইলেন, বিপণিকেন্দ্রের বহু দোকান পরিত্যক্ত হইল এবং বহু ক্ষেত্রে সেইগুলি অনধিকার প্রবেশকারীদের কবলে পড়িল। অতঃপর সোসাইটির কার্যনির্বাহক কমিটি পুনর্গঠিত হইল। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে পরিত্যক্ত দোকানগুলি পত্তন হইতে পারিল না; বরং ইহাতে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। ফলে বিপণি কেন্দ্রের আয় কমিল। সুতরাং বায়তুল মোকাররম মসজিদ পরিচালনার মধ্যেই সোসাইটির কর্ম প্রায় সীমাবদ্ধ রহিল।

১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৫ খৃস্টাব্দের ২৮ মার্চ বায়তুল মোকাররম সোসাইটি এবং ইসলামিক একাডেমী এই দুই সংগঠনের স্বতন্ত্র সত্তা বিলুপ্ত করিয়া 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' নামে একটি নূতন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম (তৎপূর্বে শিক্ষা ও সংস্কৃতি) বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইহা একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করে। ইহার পরিচালনার ভার একটি শক্তিশালী বোর্ড অব গভর্নরস-এর উপর ন্যস্ত হইল। সরকার ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক এবং সচিব নিযুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। ১৯৮৩ সালের সংশোধিত অধ্যাদেশ (Ordinance No. LXVII of 1983, Notification in Bangladesh Gazette dt. 19th December, 1983; ধর্ম/উঃ ৯-৭/৮৫/৩৪৭ ইসলামিক ফাউন্ডেশন) [এ্যাক্ট নং ১৭, ১৯৭৫-এর চতুর্থ সংশোধন অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (অধ্যাদেশ নং ২২, ১৯৮৫)-এর ধারাতে] বিঘোষিত বোর্ড অব গভর্নরস-এর গঠন নিম্নরূপ ঃ

১. চেয়ারম্যান ঃ পদাধিকারে ঃ ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী,

২. ভাইস চেয়ারম্যান ঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব,

৩. সদস্য ঃ পদাধিকারে ঃ সেক্রেটারী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,

৪. সদস্য ঃ পদাধিকারে ঃ চেয়ারম্যান, 'আরবী এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

৫. সদস্য ঃ পদাধিকারে ঃ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা এডুকেশন বোর্ড,

৬. সদস্য ঃ পদাধিকারে ঃ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন,

৭. সদস্য ঃ পদাধিকারে ঃ ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,

৮-১০. নির্বাচিত সদস্য তিনজন ঃ ফাউন্ডেশনের সদস্যগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচিত

১১-১৫. মনোনীত সদস্য পাঁচজন ঃ প্রখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত এবং ধর্মবেত্তাগণের মধ্য হইতে পাঁচজন সরকার কর্তৃক মনোনীত,

১৬-১৭. মনোনীত সদস্য দুইজন ঃ পার্লামেন্টের সদস্যগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

১৮. সদস্যসচিব ঃ পদাধিকারে ঃ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক।

ইসলামিক একাডেমী এবং বায়তুল মোকাররম সোসাইটি প্রায় একই সময়ে মূলত অভিন্ন কর্মসূচী লইয়া যাত্রা শুরু করিয়াছিল। নূতন প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন সেই কর্মসূচীকে সমন্বিত ও সম্প্রসারিত করিল। নিম্নে সেই কর্মসূচীর সারসংক্ষেপ দেওয়া হইল ঃ

* মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার, একাডেমী, ইন্সটিটিউট ইত্যাদি স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণ বা উহাদিগকে আর্থিক সাহায্য প্রদান যাহাতে উহাদের মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসার সম্ভব হয় ;

* সংস্কৃতি, মনন, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলাম ও মুসলিমদের অবদান সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা ;

* সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও ন্যায়বিচার সংক্রান্ত ইসলামের মৌল আদর্শের প্রচার এবং প্রসারের ব্যবস্থা ;

* ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে অধ্যয়ন এবং গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ, অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি প্রদান, গবেষণা ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য পুরস্কার এবং পদক প্রবর্তন ও প্রদান, এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা, বক্তৃতা, বিতর্ক-সভা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন, গবেষণা ও আলোচনা প্রসূত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ, অনুবাদ, সংকলন, সাময়িকী এবং পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদি।

* উপরিউক্ত কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রকল্প রচনা, সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানাদিকে প্রকল্প প্রণয়নে এবং বাস্তবায়নে সহায়তা-সাহায্য দান এবং ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুকূল অন্য যে কোন কর্মসূচী গ্রহণ।

উপরিউক্ত অধ্যাদেশবলে বায়তুল মোকাররম সোসাইটি কর্তৃক স্থাপিত বিপণি কেন্দ্রের আয় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হস্তগত হয়। বিলিবন্টনের মধ্যে ক্রটি এবং তজ্জন্য মামলা-মোকদ্দমা সৃষ্টি ও দোকান ভাড়ার হার খুবই নিম্ন হওয়ার দরুন ফাউন্ডেশন ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও এই আয় এবং সরকারের অনুদান ছিল উল্লেখযোগ্য। 'কুরআন মঞ্জিল' নামক একটি মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, যাহা পরিত্যক্ত সম্পত্তিরূপে সরকারের কর্তৃত্বাধীনে ছিল, তাহা ফাউন্ডেশনকে দান করা হয়। সুতরাং ফাউন্ডেশন সবল অথচ ধীর পদক্ষেপে ইহার কর্মসূচী বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হয়।

এই সময়ে ফাউন্ডেশন মুসলিম বিশ্বের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'Human and Natural Resources in the Islamic Countries' (মুসলিম দেশসমূহের মানবিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদ) শিরোনামে ও.আই.সি. (Organisation of Islamic Conference)-এর উদ্যোগে একটি সেমিনার (২০-২২ মার্চ, ১৯৭৮ খৃ.) ঢাকায় পুরাতন বিধান সভার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ইহার সাংগঠনিক দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর। বাংলাদেশ ছাড়া ১৫টি মুসলিম দেশ হইতে আগত প্রতিনিধিগণ এই সেমিনারে যোগদান করেন। ও.আই.সি., যুক্তরাজ্যের ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং ইউনেস্‌কোও প্রতিনিধি প্রেরণ করে। সেমিনারের ভাষা ছিল 'আরবী, ইংরেজী ও ফরাসী এবং এই সেমিনারেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যুগপৎ তরজমার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঢাকায় ইহাই ছিল এ ধরনের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সেমিনার। তৎকালীন মহাপরিচালক (আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী, কার্যকাল ১৬-১০-৭৭ হইতে ২৩-৭-৭৯)-এর দক্ষ নেতৃত্বে এই সেমিনার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধগুলি এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য দ্র. ড. কে. টি. হোসেন সম্পা. The Muslim World's Resources, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1983.

১৯৭৯—৮০ অর্থ বৎসর হইতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রায় উল্লেখযোগ্য গতি সঞ্চারিত হয়। এই সময় হইতে সরকার ফাউন্ডেশনের প্রতি অধিকতর সক্রিয় মনোযোগ প্রদান করেন এবং উদ্যমশীল ইসলামভক্ত কর্মী জনাব আবূ জাফর মুহাম্মদ শামসুল আলমকে (কার্যকাল ২৪ জুলাই, ১৯৭৯ হইতে ৩০ জুলাই ১৯৮২ খৃ.) ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক নিযুক্ত করেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও কর্মদক্ষতায় ফাউন্ডেশনের পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রমে অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ এবং সাফল্য লাভ ঘটে, ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগারের বিস্তর উন্নতি সাধিত হয়, অসম্পূর্ণ বায়তুল মোকাররম মসজিদ ভবনের সমাপ্তি এবং মসজিদ অঙ্গনের শোভা বর্ধনমূলক কাজের নীল-নকশা তৈরি হয়, ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ছাপাখানার উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ হয়। ভূতপূর্ব মহাপরিচালক জনাব আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী কর্তৃক আরব্ধ বাংলায় সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলনের কাজ এই আমলে গতিশীল এবং সমাপ্ত হয়। শামসুল আলম সাহেবের উদ্যোগে ফাউন্ডেশন কয়েকটি নূতন প্রকল্প গ্রহণ করে। যথা ঃ (১) ফাউন্ডেশনের শাখারূপে ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে, প্রথমে বিভাগীয় সদর ও পরে কয়েকটি জিলা সদরে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন; (২) ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ যাহাতে মসজিদের ইমামগণ ইমামত ছাড়াও মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব এবং উন্নয়নকর্মে সক্রিয় সহায়তা দান করিতে পারেন; (৩) মসজিদ পাঠাগার স্থাপন এবং মসজিদ ভিত্তিক সমাজকল্যাণ কার্যক্রম গ্রহণ; (৪) বাংলায় একটি বৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন এবং (৫) কুরআনের একটি বৃহৎ তাফসীর সংকলনের কাজের সূচনাও হয় এই আমলে। তখন হইতে ফাউন্ডেশনে ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং দেশ-বিদেশের 'উলামা' ও বিজ্ঞজনের দৃষ্টি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত দেশের শিক্ষিত সমাজ এবং বুদ্ধিজীবিগণের দৃষ্টিতেও ফাউন্ডেশনের মর্যাদা বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। শামসুল আলম সাহেবের পরবর্তী মহাপরিচালক জনাব আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া (কার্যকাল ৩১ জুলাই, ১৯৮২ হইতে ১২ এপ্রিল, ১৯৮৪ খৃ.) যোগ্যতা এবং কর্মকুশলতার সহিত ফাউন্ডেশনের কর্মসূচী বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কয়েকটি নূতন প্রকল্প গ্রহণ করেন, যথা ঃ 'আমল-ই সালিহ' অর্থাৎ ইসলামী মিশন প্রকল্প, মক্তব শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ, মহাসমারোহে সীরাতুন্নবী পক্ষ উদ্‌যাপন। ইহা ছাড়া তিনি কয়েকটি সম্পাদনা বোর্ড গঠন করিয়া জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়নের দায়িত্ব ইহাদের উপর ন্যস্ত করেন। তাঁহার গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক প্রকল্পের মধ্যে রহিয়াছে আল-কুরআনে অর্থনীতি; আল-কুরআনে বিজ্ঞান ; ইসলাম ও মুসলিম উম্মার ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান, মুসলিম বাংলার উৎপত্তি ও বিকাশ। ইয়াহিয়া সাহেবের পরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব এম. এ. সোবহানকে ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক নিযুক্ত করেন (১২ এপ্রিল, ১৯৮৪ খৃ.)। তিনিও অত্যন্ত যোগ্যতা, সতর্কতা ও স্থির পদক্ষেপে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং আর্থিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সাধন করিয়াছেন। তিনি ফাউন্ডেশনের শত শত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে পেনশন স্কীমসহ চাকরির বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করিয়াছেন।

অতঃপর জনাব মুহাম্মদ ওমর ফারুক (কার্যকাল ২৪-১২-৮৭ হইতে ১-৬-৮৮ পর্যন্ত) এবং তাঁহার পরে কয়েক দিনের জন্য জনাব মোঃ শফিউদ্দিন (১-৬-৮৮ হইতে ৪-৬-৮৮ পর্যন্ত) ইফার মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে (৪-৬-৮৮ তারিখ হইতে) বিগ্রেডিয়ার মোহাম্মদ মসাহেদ চৌধুরী (অবঃ) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

নিম্নে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ হইল ঃ

**সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন ঃ** ১৯৭৯-৮০ সালে চারটি বিভাগীয় এবং তিনটি জিলা সদরে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৮০-৮১ অর্থ সালে এইরূপ কেন্দ্র স্থাপিত হয় আরও তেরটি জিলা সদরে। বর্তমানে (১৯৮৮ খৃ.-জুন পর্যন্ত) ফাউন্ডেশনের শাখা ৪১টি পৌঁছিয়াছিল। এইগুলি ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় এবং জেলা দপ্তর হিসাবে কাজ করিতেছে। ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বৎসরে অবশিষ্ট ২৩টি জিলা সদরে ফাউন্ডেশনের শাখা খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। ৪টি বিভাগীয় শাখা হইতে ৪টি শিশু-কিশোর মাসিক পত্র নিয়মিত প্রকাশিত হইত। বর্তমানে শুধু ঢাকা বিভাগ হইতে দুইটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং চারিটি তথ্যযান (Book Mobile)-এর সাহায্যে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে বই পরিবেশন এবং বই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইত। ১৯৮৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ৪১টি শাখায় ৪৬,৬৫৪টি ইসলামী সাংস্কৃতিক আলোচনা সভা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির নাম পরিবর্তন করিয়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শাখা করা হয়। যেমন পূর্বে বলা হইত ইসলামী সাংস্কৃতিক

কেন্দ্র, ঢাকা; বর্তমানে বলা হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন রাজশাহী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম ইত্যাদি। ৪১টি জিলায় ৪১টি লাইব্রেরী ও ৪৬২৩টি বুক ক্লাব স্থাপন করা হইয়াছে।

**গ্রন্থ রচনা, গবেষণা ও অনুবাদ কার্যক্রম** ঃ ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত (পুনর্মুদ্রণ সহ) ১১ শতের অধিক টাইটেলে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া একটি সীরাতুন্নবী গ্রন্থ রচনা, সিহাহ সিত্তাঃ অর্থাৎ ছয়টি প্রামাণ্য হাদীছ গ্রন্থের অনুবাদ, কুরআন মজীদের পূর্বতন ১৩টি এবং আধুনিক চারিটি তাফসীর গ্রন্থের অনুবাদ ও মুদ্রণ কার্য চলিতেছে। পাঁচটি মৌলিক গবেষণার উপর কাজ চলিতেছে ঃ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান, আল-কুরআনে অর্থনীতি, আল-কুরআনে বিজ্ঞান, মুসলিম বাংলার উৎপত্তি ও বিকাশ। ইহা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে বহু গবেষণামূলক পুস্তক সংকলনের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

**ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম** ঃ ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে এই প্রকল্প গৃহীত হয়। ১৯৭৮-৭৯ অর্থ সালে ৫৪১ জন ইমাম দুই দলে এক মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় বিষয়াদির আধিক্য ছিল। ইহা ছাড়া পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল সমাজ সেবা, বয়স্ক শিক্ষা, পাঠাগার সংগঠন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ইহার পাঠ্যক্রমে কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষ, সমবায়, কুটির শিল্প, গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি যোগ করা হয়। এই সম্প্রসারিত কোর্সের উদ্দেশ্য ছিল মসজিদকে সমাজের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করা এবং ইমামগণকে সর্বপ্রকার উন্নয়ন কর্মে অংশগ্রহণের উপযোগী করা। সম্প্রসারিত কোর্সে পরীক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ফলে প্রথম দলের ইমামগণ জনসাধারণের এবং কর্তৃপক্ষের বিপুল স্বীকৃতি লাভ করেন। এই সাফল্যের কারণে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী (১৯৮০-৮৫) পরিকল্পনায় এই কার্যক্রম এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করে— লক্ষ্য স্থির হয়, পর্যায়ক্রমে দেশের সকল মসজিদের ইমামকে প্রশিক্ষণ দান করিয়া তাহাদিগকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, অন্য কথায় সমাজ উন্নয়ন কর্মকে জোরদার করা। এই কার্যক্রম বাংলাদেশকে মুসলিম বিশ্বে পথিকৃতের আসন দিয়াছে।

অক্টোবর ১৯৮৮ পর্যন্ত ২২৪৪৬ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের কর্মলব্দ অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট সকলের গোচরীভূত করিবার জন্য ফাউন্ডেশন হইতে আল-ইমামত শীর্ষক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হইতেছে। চলতি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৮৬—১৯৮৯-৯০) আওতায় ১৫৫০০ জন ইমামের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে। ৩০ জুন ১৯৯০ সাল পর্যন্ত আরো ৫৭৭৭ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কর্মসূচীর আওতায় চারটি বিভাগীয় সদরে প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, দিনাজপুর এবং রাজশাহীতে ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রহিয়াছে।

**গ্রন্থাগার উন্নয়ন** ঃ জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি আধুনিক ইসলামী গ্রন্থাগার স্থাপন ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য। বায়তুল মোকাররম ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলের কিছু রদবদল সাধন করিয়া গ্রন্থাগারের আয়তন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই পর্যন্ত ৭৫ হাজারের অধিক দেশী-বিদেশী গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। বর্তমানেও পূর্ণোদ্যমে সংগ্রহকার্য চলিতেছে। দেশী-বিদেশী অনেক সাময়িকীও এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থাগারের স্থানাভাব দেখা দেওয়ায় ইহার একটি বৃহদাকার ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৮৫-১৯৯০) আওতায় ৩৫ হাজার দেশী-বিদেশী পুস্তক সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে (৩০ জুন ৮৮ পর্যন্ত ১৫২২৯টি বই সংগ্রহ করা হইয়াছে)।

**বিশ্বকোষ সংকলন** ঃ তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব আবদুল হক ফরিদীর সভাপতিত্বে পাঁচ (পরে বর্ধিত সংখ্যক) সদস্যবিশিষ্ট একটি সম্পাদনা পরিষদ বাংলায় সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনার (পাণ্ডুলিপি বাংলা একাডেমীর তৈরী) কাজ শুরু করে ১৯৭৮ সালের ২২ জানুয়ারী (দ্র. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ভূমিকা পৃ. ৫-৭)। ১৯৮২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে দুই খণ্ডে এই সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় ইহাই ছিল সর্বপ্রথম ইসলামী বিশ্বকোষ। প্রকাশনা উৎসবের পর অল্পকালের মধ্যেই অপ্রত্যাশিতভাবে প্রথম মুদ্রণের কপিগুলি প্রায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। পরিকল্পিত বিশ খণ্ডে সমাপ্য বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ-এর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড ইতিমধ্যে সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৯০ সাল নাগাদ আরো পাঁচ খণ্ডের সংকলন ও প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

**মসজিদ পাঠাগার** ঃ এই পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জিলায় ৫,৩৩৮ মসজিদে ইসলামী পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অধীনে ৩৪০০০টি মসজিদ পাঠাগার ও পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ২৯৫টি পাঠাগারে পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকা সংযোজনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পর্যায়ক্রমে দেশের প্রায় প্রতিটি মসজিদে অনুরূপ পাঠাগার স্থাপনের পরিকল্পনা রহিয়াছে।

**মসজিদকেন্দ্রিক সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম** ঃ শিক্ষিত, বিশেষত মাদরাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ৮০০ বেকার যুবককে এই পর্যন্ত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়া উপার্জনক্ষম করা হইয়াছে। প্রশিক্ষণের বিষয় যথা ঃ ওয়েল্ডিং, রেডিও-টেলিভিশন মেরামত, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি সংযোজন ও মেরামত, দর্জির কাজ ইত্যাদি।

**ফাউন্ডেশনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম** ঃ পূর্বে ফাউন্ডেশনের শাখাসমূহের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের উল্লেখ করা হইয়াছে। নিজস্ব পরিমণ্ডলে ফাউন্ডেশন ঢাকায় বহু সুধী সমাবেশের আয়োজন করিয়া থাকে। ১৯৮২-৮৩ সাল হইতে প্রতি বৎসর নিয়মিত সীরাতুন্নবী পক্ষ উদ্‌যাপন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উপলক্ষে সেমিনার, ওয়াজ মাহফিল, আলোচনা সভা, সাহিত্য সভা, শিশু-কিশোর, মহিলা ও যুব সমাবেশ, কেরাত ও আযান প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুষ্প-প্রদর্শনী এবং গ্রন্থমেলা ইত্যাদি যথেষ্ট জনপ্রিয় হইয়াছে। সেমিনারগুলিতে ইসলামী 'আকাইদ এবং ব্যবহারিক জীবনের প্রায় সব দিকের উপর, বিশেষত যুগ পরিবর্তনে উদ্ভূত বিভিন্ন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিতর্কিত সমস্যাবলীর উপর আলোকপাত করিবার চেষ্টা করা হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় ১৯৮০ সাল হইতে এই পর্যন্ত ২২৫৮টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

**ইসলামী মিশন** ঃ ১৯৮৩ সারের জুলাই মাস হইতে ইসলামী মিশন প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। ইহার সেবামূলক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে চিকিৎসা, য়াতিম ও দুঃস্থ নারিগণের সেবা ও তাহাদিগকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান, দুঃস্থ ও বেকারগণকে প্রশিক্ষণ ও সুদমুক্ত ঋণ এবং বৃত্তিমূলক উপকরণ সরবরাহ করিয়া উপার্জনক্ষম করা এবং সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষরতা দান এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান বিতরণ।

মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই এই কর্মসূচীর সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। দেশের অবহেলিত, দুর্গত এবং দুর্গম ২৮টি অঞ্চলে ২৮টি মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পর্যায়ক্রমে প্রতি জিলায় মিশন স্থাপনের পরিকল্পনা রহিয়াছে। নানা প্রারম্ভিক অসুবিধা সত্ত্বেও এই স্বল্পকালের মধ্যে (৩০ জুন ১৯৮৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত) ২১ লাখ দুঃস্থ ও গরীব রোগীর চিকিৎসা করা হয়। ২,১৫১ জনকে স্বনির্ভর কর্ম সংস্থা কর্মসূচীর আওতায় জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ২৮৭টি মক্তব ও নৈশ বিদ্যালয়ে, ৬২,০০০ জনকে সাক্ষরতা জ্ঞান দান ও দৈনন্দিন কাজ কর্ম চালানোর মত শিক্ষা দান করা হইয়াছে (Functional education)। ইহা ছাড়াও সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধ এবং ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবী। প্রশিক্ষণ ও ৩০৮৪টি মাহ্ফিলের আয়োজন করা হইয়াছে।

এই মিশনের আওতায় আরও দুইটি কাজ শুরু হইয়াছে ঃ (১) মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং (২) মুবাল্লিগ (প্রচারক) প্রশিক্ষণ। মসজিদ এবং দহ্লীজে পরিচালিত মক্তব (ফুরকানিয়াঃ মাদরাসা)-এর শিক্ষকগণকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইতেছে, যাহাতে তাঁহারা কুরআন পাঠ শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা, অংক, স্বাস্থ্যবিধি, ইত্যাদি সম্পর্কেও ছাত্রদিগকে প্রাথমিক জ্ঞান দান করিতে পারেন এবং কৃষি, পশু পালন, পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি সম্বন্ধেও কিছু ধারণা জন্মাইতে পারেন। এই পর্যন্ত ১৬২৫ জন্য মুবাল্লিগ ও মক্তব শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ইসলামী মিশনের কর্মসূচীর একটি নিয়মিত অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। অধিকন্তু ডাক্তার, প্রকৌশলী, প্রশাসক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের প্রশিক্ষণ গ্রহণেচ্ছু নাগরিকদিগকে মুবাল্লিগ প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়। মিশনে কর্মরত সকল ডাক্তার, কম্পাউন্ডার বা শিক্ষক ও মুবাল্লিগরূপে প্রশিক্ষণ লাভ করিয়া থাকেন।

**কুরআন ক্যাসেট ঃ** দেশের প্রখ্যাত কারীগণের কণ্ঠে কুরআন মজীদের কিরাআত এবং প্রসিদ্ধ 'আলিমগণের তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীরসম্বলিত ক্যাসেট তৈরি করিয়া বিভিন্ন সূত্রে তাহা বণ্টন এবং স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করিলে দেশের সর্বস্তরে কুরআন মজীদের শিক্ষা বিস্তার সুগম হইবে, এইরূপ চিন্তা-ভাবনার প্রেক্ষিতে ক্যাসেট তৈয়ারীর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করা হইয়াছে। তিন পর্যায়ে ক্যাসেট করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে ঃ (১) শুধুমাত্র বাংলা তরজমাসহ ক্যাসেট ; (২) সংক্ষিপ্ত তাফসীর ও বঙ্গানুবাদসহ ক্যাসেট এবং (৩) ধীর গতিতে 'আরবী উচ্চারণ ও বঙ্গানুবাদসহ ক্যাসেট করা। সর্বমোট ১৮৭৫ সেট ক্যাসেটে রেকডিং-এর লক্ষমাত্রা নির্ধারিত ছিল এবং ইতিমধ্যে তাহা সম্পন্ন হইয়াছে।

**অন্যান্য কার্যক্রম ঃ** সাময়িকী প্রকাশ (১) ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ত্রৈমাসিক); (২) সবুজ পাতা (মাসিক, শিশু-কিশোর পত্রিকা); (৩) Islamic Solidarity (ইংরেজি পাক্ষিক, বর্তমানে মাসিক); (৪) مجلة المؤسسة الاسلامية ('আরবী, ত্রৈমাসিক); (৫) অগ্রপথিক (সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন, বর্তমানে মাসিক পত্রিকা); এবং ঐতিহ্য ও নতুন চাঁদ নামে দুইটি পত্রিকা ফাউন্ডেশনের ঢাকা শাখা হইতে প্রকাশিত হয়।

**চিকিৎসা ঃ** দরিদ্র রোগীদের জন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে। এই পর্যন্ত প্রায় ৭,৯৭,৬০৮ জন রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে। সারা দেশে ফাউন্ডেশনের মোট এগারটি (স্থায়ী ৮টি, ভ্রাম্যমান ৩টি) হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় রহিয়াছে। প্রতিদিন শত শত গরীব ও দুঃস্থ মানুষ এই সকল চিকিৎসা কেন্দ্র হইতে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ পাইতেছে। ইহা ছাড়া এলোপ্যাথিক এবং ইউনানী পদ্ধতিতে দরিদ্রগণকে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হইতেছে।

**'আরবী শিক্ষা ঃ** ইসলামিক একাডেমী কর্তৃক প্রবর্তিত 'আরবী শিক্ষা দানের কোর্সটি বরাবর চালু রাখা এবং পরে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে।

**হুককুল এবাদ কার্যক্রম ঃ** দুঃস্থ ও বাস্তুহারা মানুষের কার্যসংস্থান ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার আওতায় এই পর্যন্ত ৫০০ জনের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

**ফাউন্ডেশন পুরস্কার ঃ** ইসলামের ও মুসলিম জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৮২ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার প্রবর্তন করা হইয়াছে। ইসলামের মৌলতত্ত্ব, সীরাত গ্রন্থ, সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান চর্চা, সৃজনশীল সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী গ্রন্থ, শিশু-সাহিত্য, অনুবাদ, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, শিল্পকলা, ইসলাম প্রচার ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে প্রতি হিজরী সনে এই পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে।

উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি বোর্ড অব গভর্নরস ফাউন্ডেশন-এর সিদ্ধান্তক্রমে ঢাকায় একটি হাফিজিয়া মাদ্রাসা চালু করিয়াছে। অক্টোবর ১৯৮৭-এ রাজশাহী শহরের হেতেম খাঁ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, তৎকর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সরকারী মধ্যস্থতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তরিত হয়। ফলে ইহার প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও আর্থিক দায়দায়িত্ব ফাউন্ডেশনের উপর ন্যস্ত হয় (দ্র. চুক্তিপত্র তারিখ ২/৮/৮৮ ইং, ইফা. রাজশাহীর সূত্র নং ০১/ইসঃ ফাউঃ প্রশাঃ/৬/৮৭/১৫৬-৫৮, তারিখ ১০/৫/৯৫ বাং/২৫/৮/৮৮ ইং)।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** বরাত প্রবন্ধ গর্ভে উল্লিখিত।

ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান

**সংযোজন**

(১) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ (ক) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ ; (খ) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইনস্টিটিউট এবং সমাজসেবায় নিবেদিত সংগঠনসমূহকে আর্থিক সহায়তা দান; (গ) সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের উপর গবেষণা পরিচালনা; (ঘ) ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমত সহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার করা ও ইহাতে সহায়তা করা এবং সমাজের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ সুপারিশ করা; (ঙ) ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করিয়া তোলার লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও ইহার প্রসার ঘটানো এবং জনপ্রিয় ইসলামী সাহিত্য সুলভে প্রকাশ করা এবং সেগুলির সুলভ প্রকাশনা ও বিলি-বণ্টনকে উৎসাহিত করা; (চ) ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই-পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকা অনুবাদ করা, সংকলন করা ও প্রকাশ করা; (ছ) ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর সম্মেলন বক্তৃতামালার আয়োজন করা; (জ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা; (ঝ)

ইসলাম সম্পর্কিত প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া, প্রকল্প গ্রহণ করা কিংবা তাহাতে সহায়তা দান করা; (ঞ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা; (ট) বায়তুল মুকাররম মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নতি বিধান করা এবং (ঠ) উপরোক্ত কার্যাবলীর যে কোনটির ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক বা আপতিক সকল কাজ সম্পাদন করা।

২. ব্যবস্থাপনা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন অধ্যাদেশ অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠান ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। ইহার সাধারণ পথনির্দেশনা ও কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব বোর্ড অব গভর্নরস (উপরে দ্র.)-এর উপর ন্যস্ত।

৩. সাংগঠনিক কাঠামো ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিয়া থাকে। কার্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য প্রধান কার্যালয়ে ১০টি বিভাগ, ৪টি বিভাগীয় শহরে বিভাগীয় কার্যালয়সহ ৬৪ জেলা সদরে ১টি করিয়া অফিস আছে। এতদ্ব্যতীত ৬টি বিভাগীয় শহর এবং দিনাজপুরে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর মোট ৭টি কেন্দ্র আছে। ইহা ছাড়াও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ২৯টি ইসলামিক মিশন অফিস আছে।

৪. জনবল ঃ বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ১৪ জন পরিচালকসহ ৩০০ জন কর্মকর্তা ও ৯৮৫ জন কর্মচারী নিয়োজিত আছেন।

৫. তহবিল ঃ (ক) ২০ নং অনুচ্ছেদের অধীনে ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তরিত বায়তুল মোকাররম ও ইসলামী একাডেমীর তহবিলের অর্থ; (খ) সরকারের অনুদান ও ঋণ ; (গ) বাংলাদেশে সংগৃহীত ঋণ ; (ঘ) সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে বিদেশী রাষ্ট্র ও সংস্থার নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্য ও ঋণ ; (ঙ) চাঁদা ও দান ; (চ) বিনিয়োগ, রয়ালটি ও সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় এবং (ছ) ফাউন্ডেশনের অন্য আর সকল প্রাপ্তি।

৬. নির্বাহী বিভাগ

(ক) মহাপরিচালক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী হইলেন মহাপরিচালক। তিনি সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বোর্ডের সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করাই তাঁহার দায়িত্ব এবং তিনি বোর্ডের সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

(খ) সচিব ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশনে একজন সচিব আছেন, যিনি সরকারের নির্ধারিত শর্তে সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিযুক্ত হন। তিনি বোর্ড অথবা মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করেন।

৭. বিভিন্ন বিভাগ ও উহার কার্যাবলী

(ক) প্রশাসন বিভাগ ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর যাবতীয় প্রশাসনিক ও সংস্থাপন কাজ, বায়তুল মোকাররম মসজিদ ও মার্কেট পরিচালনা, বোর্ড অব গভর্নরস-সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সুপারিশ ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন এই বিভাগের কাজের আওতাভুক্ত। সচিব এই বিভাগের প্রধান।

(খ) অর্থ ও হিসাব বিভাগ ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন, এতদসংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ, বাজেট প্রণয়ন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগ ও মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসের নিরীক্ষা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পরিচালক, অর্থ ও হিসাব এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

যাকাত বোর্ড

১৯৮২ সালের ৫ জুন যাকাত বোর্ড গঠন করা হয়। যাকাত বোর্ড পরিচালনা করার জন্য দেশের খ্যাতনামা মনীষীদের সমন্বয়ে গঠিত ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি আছে। সরকারী যাকাত ফান্ডে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে সমাজের অসহায় ও দুঃস্থদেরকে পুনর্বাসন করা হয়।

(গ) সমন্বয় বিভাগ ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধন, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পর্যালোচনা, জাতীয় পর্যায়ে শিশু-কিশোর ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বাস্তবায়ন, ধর্মীয় ও জাতীয় দিবস পালনসহ সমন্বয় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন জেলা কার্যালয়সমূহ জেলা প্রশাসকগণকে সহায়তা ছাড়াও জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান, জেলা পর্যায়ে চাঁদ দেখা কমিটির কার্যক্রম এবং যাকাত সংগ্রহের কাজও এ বিভাগের মাধ্যমে সমন্বয় হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প, যেমন ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য প্রশিক্ষণার্থী ইমাম বাছাই ও তাহাদের কাজের অগ্রগতি, মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, মানব সম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ, প্রকল্পের কর্মসূচী বাস্তবায়ন, বই বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা, জাতীয় ও সামাজিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন, যেমন যৌতুক, শিশু ও নারী পাচার রোধ, জাতীয় টিকা দিবস, পরিবেশ ও বনায়ন, এইডস ও মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে মুসল্লীগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করাসহ যাবতীয় কাজ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়গুলির এই বিভাগের মাধ্যমে সমন্বয় করা হইয়া থাকে।

মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প ঃ পর্যায়ক্রমে দেশের সকল মসজিদে ইসলামী পাঠাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে মসজিদ ভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম সমন্বয় বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই পর্যন্ত ২১,২৪২টি মসজিদ পাঠাগার এবং ৬৪ জেলায় ৬৪টি মডেল পাঠাগার স্থাপন করিয়াছে। পরিচালক, সমন্বয় এই বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

(ঘ) পরিকল্পনা বিভাগ ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতের প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবীক্ষণ, অগ্রগতি পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন, প্রতিবেদন প্রণয়নসহ প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন ও মনিটরিং করাও পরিকল্পনা বিভাগের কাজের আওতাভুক্ত। এই পরিকল্পনা ছাড়া উক্ত বিভাগের মাধ্যমে প্রকল্পের এডিপি প্রণয়ন, পরিসংখ্যানগত তথ্যাদি প্রণয়ন, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করিয়া তাহা ধর্ম মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরিচালক পরিকল্পনা এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

(ঙ) প্রকাশনা বিভাগ ঃ ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী, কুরআন ও কুরআন সম্পর্কিত, মহানবী (স)-এর সীরাত ও হাদীছ সম্পর্কিত, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ইসলামী আইন ও দর্শন, মুসলিম মনীষীদের জীবনী, শিশু-কিশোর উপযোগী চরিত্র গঠনমূলক সাহিত্য, ইসলামী অর্থনীতি, নারী, যৌতুক ও মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে

ইসলামী আদর্শ, মূল্যবোধ ও শিক্ষার প্রচার ও প্রসার এই বিভাগের প্রধান কাজ। এই উদ্দেশ্যে প্রকাশনা বিভাগ এই পর্যন্ত ৩০২০ শিরোনামের পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে। সেই সঙ্গে এই বিভাগ হইতে অগ্রপথিক ও সবুজপাতা নামে দুইটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকসহ অন্যান্য সকল বিভাগের প্রকাশিত পুস্তকের পুনর্মুদ্রণের কাজ এই বিভাগ সম্পন্ন করে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকসমূহে চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে পুনর্মুদ্রণের হারও বৃদ্ধি পাইতেছে। ইতোমধ্যে কুরআনুল কারীমের বাংলা অনুবাদের ৩০তম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনসহ অন্যান্য হাদীছ, তাফসীর, সীরাত, জীবনীগ্রন্থ, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও শিশুতোষ গ্রন্থগুলি ২ থেকে ১১ বার পর্যন্ত এই বিভাগ কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক ও পত্রিকা বিক্রয় করাও এই বিভাগের দায়িত্ব। বায়তুল মুকাররমস্থ কেন্দ্রীয় বই বিক্রয় কেন্দ্রসহ দেশের সকল জেলায় অবস্থিত ৬৪টি বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে সুলভ মূল্যে বই বিক্রয় করা হয়। ২০০২ খৃ. হইতে ২০০৫ খৃ. পর্যন্ত চার বৎসরে এইসব কেন্দ্র এগার কোটি টাকার অধিক বই বিক্রয় করিয়াছে। প্রকাশিত পুস্তকের স্টোর ব্যবস্থাপনাও এই বিভাগের দায়িত্বে। পরিচালক প্রকাশনা এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি 'ইসলামী প্রকাশনা, অনুবাদ, গবেষণা ও বিশ্বকোষ কার্যক্রম' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেন।

(চ) গবেষণা বিভাগ ঃ ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কুরআন ও হাদীছ সম্পর্কে গবেষণাকর্ম পরিচালনা ও প্রকাশনা, গবেষণালব্ধ বিষয়াবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ এবং গবেষণামূলক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এই বিভাগের অন্যতম কাজ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস, দেশবরেণ্য সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের জীবন ও কর্ম, আল-কুরআনে অর্থনীতি, আল-কুরআনে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদানসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থ গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ছোটদের বিশ্বকোষ, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত, জরুরী ফাতওয়া ও মাসাইল বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হইয়াছে এবং গবেষণালব্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত হাদীছের গ্রন্থনা, হাদীছের আলোকে হানাফী মাযহাবের তত্ত্ব ও দর্শন সম্পর্কিত গবেষণা, আরবী-বাংলা ও বাংলা-আরবী অভিধান (দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে) প্রণয়নসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রহিয়াছে। গবেষণা বিভাগ হইতে বিভিন্ন বিষয়ে এই পর্যন্ত প্রায় ১১৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' নামে একটি গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকাও এই বিভাগ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। পরিচালক, গবেষণা এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

(ছ) অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ ঃ কুরআনুল করীমের অনুবাদ, তাফসীর, হাদীছগ্রন্থ ও ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে অন্য ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ ও ক্লাসিক্যাল এবং আধুনিক গ্রন্থাদি অনুবাদ ও সংকলন করা এই বিভাগের কাজ। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের মাধ্যমে সিহাহ সিত্তাহর পূর্ণাঙ্গ সেট, যেমন বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, নাসাঈ শরীফ, আবূ দাঊদ শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফসহ মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, তাহাবী শরীফ, তাজুরীদুস সিহাহ (পুনরাবৃত্তিমুক্ত সহীহ হাদীছ) ইত্যাদি হাদীছগ্রন্থের অনুবাদ ও সংকলন সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিভাগ কর্তৃক তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে উসমানী, তাফসীরে ইবনে আব্বাস, ফাতাওয়া আলমগীরী, আল- হিদায়া, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (ইসলামের ইতিহাস), সীরাতে ইব্‌ন ইসহাক, সীরাত ইব্‌ন হিশাম আসাহ্‌হুস-সিয়ার, সীরাতুল মুস্তাফা-এর বাংলা অনুবাদসহ সীরাত বিষয়ক ১০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পর্যন্ত উক্ত বিভাগ কর্তৃক মোট ৩১২টি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া মুসনাদে আহমাদ, ই'লাউস সুনান, ফিকহুস সুনান ও জামউল ফাওয়ায়েদ ইতোমধ্যে অনূদিত হইয়াছে এবং আংশিক প্রকাশিত হইয়াছে। তাফসীরে কাবীর, তাফসীরে রূহুল মা'আনী ও সাফওয়াতুত তাফসীর-এর অনুবাদ কার্য চলিতেছে। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের পরিচালক এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

(জ) ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ ঃ দেশের প্রখ্যাত ও প্রথিতযশা ইসলামী চিন্তাবিদ, আলিম, বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক ও দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবিগণ কর্তৃক মৌলিকভাবে লিখিত, অন্য ভাষা হইতে অনূদিত ও সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী বাংলা ভাষায় প্রকাশের লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বাংলা ভাষায় দুই খণ্ডে সমাপ্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৮ খণ্ডে সমাপ্ত বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে ইসলামী বিশ্বকোষ ২য় সংস্করণের কাজ চলিতেছে। ইতিমধ্যে ইহার পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। চলতি পঞ্চবার্ষিকী পারিকল্পনার আওতায় সীরাত বিশ্বকোষ ২২ খণ্ডে সমাপ্য আরেকটি প্রকল্পের কাজ চলিতেছে। ইহাতে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর জীবনী স্থান পাইবে। ইতিমধ্যে এই কার্যক্রমের আওতায় ১২ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে এবং আরও ২ খণ্ড অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। ইহা ছাড়া ১০ খণ্ডে প্রকাশিতব্য 'আল-কুরআন বিশ্বকোষ' প্রণয়নের উদ্যোগও গ্রহণ করা হইয়াছে। পরিচালক, ইসলামী বিশ্বকোষ এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

(ঝ) দীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ ঃ ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার, ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদযাপন, সাহাবায়ে কিরাম (রা), মুসলিম মনীষী ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের স্মরণ সভা এবং ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, তাফসীর, দরসে হাদীছ, বিষয়ভিত্তিক ওয়ায মাহফিল, ঈদ, ঈদে মিলাদুন্নবী (স) প্রভৃতি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও পরিচালনা, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য কিরাআত ও হিফয প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা দীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্যতম কাজ। ইহা ছাড়া এই বিভাগ জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা, জাতীয় পর্যায়ে ফিতরা নির্ধারণ ও ঘোষণার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এই বিভাগ গত বৎসর ধর্মীয় ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ৩২টি অনুষ্ঠান, সাহাবায়ে কিরাম ও মুসলিম মনীষীদের স্মরণে ১৫টি অনুষ্ঠান, ১৫০ টি তাফসীর মাহফিল, ১৩০টি ওয়ায মাহফিল, দরসে হাদীছ ও সীরাতে রাসূল (স) ১৩১ টি,

ফাযায়েল ও মাসায়েল ৫০টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ১১২টি, বৃত্তি সংক্রান্ত ১৭টি এবং ১০টি আন্তর্জাতিক কিরাআত ও হিফয প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। পরিচালক, দাওয়াহ ও সংস্কৃতি এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

মহিলা শাখা ঃ দীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে মহিলা শাখা নারী সমাজের মাঝে ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে কাজ করিতেছে। এই শাখা প্রতি বৎসর তাফসীর মাহফিল, মহিলা বিষয়ক ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক অনুষ্ঠান ও মাসলা-মাসায়েল সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ইহা ছাড়াও দুঃস্থ ও বিধবা মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্স চালু আছে এবং মহিলাদেরকে কুরআন শিক্ষা প্রদান করা হয়। মহিলা শাখায় মহিলাদের লেখাপড়ার জন্য একটি লাইব্রেরীরও ব্যবস্থা আছে।

আরবী ভাষা কোর্স ঃ এই বিভাগের অধীনে আধুনিক আরবী ভাষা শিক্ষা প্রদান এবং সনদপত্র ও বিভিন্ন দলীলপত্র অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ৩০ পারা কুরআনের তিলাওয়াত ও তরজমাসহ সংক্ষিপ্ত তাফসীরের সংকলিত ক্যাসেট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিক্রয় কেন্দ্রে পাওয়া যায়। পরিচালক দীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

(ঞ) ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী ঃ ইমাম প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইল মসজিদে নববীর আদর্শে বাংলাদেশের মসজিদগুলিকে পুনর্গঠন করিয়া মসজিদের ইমামগণকে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান দান করা, ইমামতির পাশাপাশি গণশিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, কৃষি ও বৃক্ষ রোপণ, পশু পালন, মৎস্য চাষ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা, গবাদি পশুর চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করিয়া তাহাদেরকে উপার্জনক্ষম করা এবং সামাজিক নেতৃত্বদান ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার মত উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা। ইমাম প্রশিক্ষণ প্রকল্প ১৯৭৯ সালে আরম্ভ হওয়ার পর কয়েক বৎসর পর্যন্ত ইমামদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে এই প্রকল্প ১৯৯৫ সালে একাডেমীর রূপ লাভ করে এবং বহুমুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। কার্যক্রমসমূহের মধ্যে আছে ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্স, মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মুবাল্লিগ প্রশিক্ষণ, এনআইডি ও ডিজেস্টার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। পরবর্তীতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরম্ভ হয় এবং প্রকল্প কার্যক্রম রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হইয়া বর্তমানে স্থায়ী একাডেমীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। দেশ-বিদেশে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর কার্যক্রম প্রশংসিত হইয়াছে এবং দেশের উন্নয়ন স্রোতধারায় অবদান রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। কয়েকটি বিদেশী সংস্থা যৌথ উদ্যোগে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নে আগাইয়া আসিয়াছে। ইতিমধ্যে ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রমসমূহ চালু হইয়াছে। এই যাবত প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ নিয়মিত/বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ ৫৩,০৮৮ জন, রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ ১৩,৩৮৮ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ২৭২ জন, কর্মচারী প্রশিক্ষণ ৭৭৮ জন, মুবাল্লিগ প্রশিক্ষণ ১,৫৯৪ জন, মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ ১,৫৯৪ জন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ৫৮২ জন, মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৪০০ জন, মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২১,৯৮৩ জন, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ২৬৫ জন, এইডস/এস.টি.ডি. বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২০০ জন, এল.ও.আই. বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২,২০৪ জন। ইহা ছাড়াও ইউ.এন.এফ.পি. এর অর্থানুকূল্যে ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ প্রকল্পের আওতায় প্রজনন, স্বাস্থ্য, শিশু ও মাতৃমঙ্গল, এইডস প্রতিরোধ, সন্ত্রাস ও যৌতুক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি, জেন্ডার ইকুইটি ইত্যাদি বিষয়ে ২০০ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ইমামগণ প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাইয়া আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখিতেছেন।

এই যাবত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণ আর্থ-সামাজিক ও সেবামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে অবদান রাখিয়া জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইমাম হিসাবে নির্বাচিত হইয়া পুরস্কৃত হইয়াছেন। ইহা ছাড়া আত্মনির্ভরশীল হইয়া নিজেদের উদ্যোগে বিভিন্ন ক্ষুদ্র প্রকল্প তৈরি করিয়া শ্রেষ্ঠ খামার প্রতিষ্ঠাকারী হিসাবে পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। জেলা হইতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণের উন্নয়ন কার্যক্রম বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রতিমাসে নিয়মিত প্রচার করিতেছে। একজন পরিচালক ১৮৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহযোগিতায় একাডেমীর কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

(ট) ইসলামিক ফাউন্ডেশন ছাপাখানাঃ ইসলামী গ্রন্থাবলী ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর নিজস্ব একটি ছাপাখানা আছে। বিদ্যমান ছাপাখানাকে আধুনিকীকরণের লক্ষে ৯.৯৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। এই প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে প্রেসের কাজের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রেসের জন্য আলাদা একটি ভবন নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে প্রেসের কর্মচারীদের পরিবেশগত যথেষ্ট সুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

(ঠ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সূচনা হইতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণাসহ সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান বিকাশের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরীর কার্যক্রম শুরু হয়।। বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরীতে হস্তলিখিত সর্ববৃহৎ পবিত্র কুরআনুল কারীম, হযরত উছমান (রা)-এর সময়ের হাতে লেখা কুরআন, অন্ধদের জন্য ব্রেইলি কুরআন শরীফসহ অন্যান্য কুরআন শরীফ, তাফসীরগ্রন্থ এবং অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য, যথা ইসলাম ও বিজ্ঞান, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী দর্শন, বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী আইন ও বিচারসহ অন্যান্য বিষয়ের উপর লক্ষাধিক বই আছে। লাইব্রেরীটি বর্তমানে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী লাইব্রেরী হিসাবে পাঠক ও গবেষকদের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। একজন লাইব্রেরীয়ান এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

(ড) ইসলামিক মিশন ঃ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সেবা ভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা, যেমন বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে হালাল জীবিকা অর্জনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে তাহাদেরকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলার জন্য সুদমুক্ত ঋণদান ও সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান, মক্তব ভিত্তিক গণশিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে মুবাল্লিগ, নওমুসলিম ও মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ইসলামী মূল্যবোধে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে

জীবন যাপন প্রণালী অনুসরণে জনগণকে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে দেশের দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামিক মিশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। বর্তমানে দেশের ২৮টি জেলায় ৩১টি মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে উল্লিখিত কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়িত হইতেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হইতে জুন ২০০৫ পর্যন্ত সেবা প্রদান ৩,৯৪,৬৮৮ জন নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান, ৩২০৬৪ জনকে নূরানী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষাদান করা হইয়াছে, ১৫,৫৩১টি অনুষ্ঠান ও ৪,৫৮০টি উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা হইয়াছে। ৫৭,৮৩৬টি বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই বিভাগের আওতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বায়তুল মুকাররমে একটি ডায়গনস্টিক সেন্টার চালু রহিয়াছে। এখানে বিশেষ হ্রাসকৃত মূল্যে (৪০% রেয়াত) ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক সকল প্রকার রোগ নিরূপণী পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ চিকিৎসার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে মসজিদ ভিত্তিক মুসল্লীদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরিচালক ইসলামিক মিশন এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

(ঢ) মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প ঃ মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ প্রকল্প। প্রকল্পটির ১ম পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম ১৯৯৩ সালে শুরু হয় এবং ১৯৯৩ সাল হইতে ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ২৪,২১,১৫০ জন শিশু ও বয়স্ককে শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে। ২০০৬ শিক্ষাবর্ষে এই প্রকল্পের আওতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ৪৭৬টি উপজেলার ২৪,০০০ টি (শিশু ২৩ম৭৪৪টি ও বয়স্ক ২৫৬টি) কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭,১৮,৭২০ জনকে (শিশু ৭,১২,৩২০ জন ও বয়স্ক ৬৪০০ জন) শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে। চলমান এই প্রকল্পের শিক্ষার্থী পিছু কর্মসূচি ব্যয় ৫০৮ টাকা মাত্র। বিশ্বের অন্য কোন দেশে ইহার তুলনায় কম খরচে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা আদৌ সম্ভব হয় নাই। ইহা ব্যতীত এই প্রকল্পের আওতায় প্রতি জেলায় গড়ে ১৮টি হিসাবে সারাদেশে ১২০০টি জীবনব্যাপী শিক্ষা পাঠাগার ও মডেল পাঠাগার চালু করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। উপরন্তু এই প্রকল্পের আওতায় প্রতি উপজেলায় ১টি করিয়া মোট ৪৭৬টি মডেল পাঠাগার কাম উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্পের সাব অফিস চালু করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ২০০৫ শিক্ষাবর্ষে কোর্স সম্পন্নকারী ৪,১৪,৮৮০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৬,০০০ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী, ৭৬৮ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং ২০০৬ সালে ৬৪ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী, ৭৬৮ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং ৬৪ জন শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরীয়ানকে পুরস্কার প্রদানের পরিকল্পনা আছে। পাঠদান পদ্ধতিকে আকর্ষণীয় ও মানসম্মত করার লক্ষ্যে শিক্ষাকেন্দ্রে উন্নত ও আকর্ষণীয় প্লাস্টিকের বাংলা ও আরবী বর্ণমালা চার্ট, অক্ষর ও ছবি সম্বলিত লেমিনেটিং বাংলা ও আরবী বর্ণমালা চার্ট (এ্যাবাকাস), কিছু কেন্দ্রে নমুনা হিসাবে ত্রিমাত্রিক অক্ষর (থ্রি-ডাইমেনশনাল লেটার)-এর প্রচলন করা হইয়াছে। ২০০৪-২০০৫ অর্থ বৎসরে প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা কার্যালয়কে প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটারাইজ করা হইয়াছে। একজন প্রকল্প পরিচালক এই প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

(ণ) মসজিদ ভিত্তিক নূরানী পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন শিক্ষা কার্যক্রম ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত 'মসজিদ ভিত্তিক নূরানী পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ৬৪টি জেলায় ২০০৩-২০০৪ অর্থ বৎসর হইতে ২০০৫-২০০৬ সাল পর্যন্ত ৩ বৎসর মেয়াদে বাস্তবায়ন করিতেছে। সমগ্র বাংলাদেশে নির্বাচিত মসজিদ এলাকায় ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়সের শিশু-কিশোর এবং বয়স্কদের কম সময়ের মধ্যে নূরানী পদ্ধতিতে শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি অর্থ বুঝিয়া পবিত্র কুরআন পাঠে উদ্বুদ্ধকরণ ও যোগ্য করিয়া গড়িয়া তোলাই এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য। ২০০৩-২০০৪ এবং ২০০৪-২০০৫ অর্থ বৎসরে নূরানী পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন শিক্ষাদানে অভিজ্ঞ ৮৩২ জন প্রশিক্ষকের দ্বারা ৮৩২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে সারাদেশে ৮৩,২০০ জন শিক্ষার্থীকে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে। ২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরে ৪১,৬০০ জন শিক্ষার্থীকে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং বর্তমানে এই কার্যক্রম অব্যাহত রহিয়াছে।

ইসলামিক একাডেমী ঃ প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬০ খৃ. পরিচালক

০১. আল্লামা আবুল হাশিম ২৮-১১-১৯৬০ খৃ. হইতে ০২-০৪-১৯৬৯ খৃ. পর্যন্ত।

০২. জনাব আহমদ হোসাইন ০৩-০৪-১৯৬৯ খৃ. হইতে ০৫-০৪-১৯৭৩ খৃ. পর্যন্ত।

০৩. মাওলানা ফজলুল করিম (ভারপ্রাপ্ত) ১৭-০৪-১৯৭৩ খৃ. হইতে ১৪-০৯-১৯৭৩ খৃ. পর্যন্ত।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঃ ১৯৭৫ খৃ. হইতে

মহাপরিচালকবৃন্দের কার্যকাল

১. ড. মঈন উদ্দীন আহমদ খান ১৫-১০১৯৭৬ খৃ. হইতে ১৫-১০-১৯৭৭ খৃ. পর্যন্ত।

২. জনাব এ এফ এম আবদুল হক ফরিদী ১৬-১০-১৯৭৭ খৃ. হইতে ২৩-০৭-১৯৭৯ খৃ. পর্যন্ত।

৩. জনাব এ জেড এম শামসুল আলম ২৪-০৭-১৯৭৯ খৃ. হইতে ৩০-০৭-১৯৮২ খৃ. পর্যন্ত।

৪. জনাব এ এফ এ ইয়াহিয়া ৩০-০৭-১৯৮২ খৃ. হইতে ১২-০৪-১৯৮৪ খৃ. পর্যন্ত।

৫. জনাব এম এ সোবহান ১২-০৪-১৯৮৪ খৃ. হইতে ২৪-১২-১৯৮৭ খৃ. পর্যন্ত।

৬. জনাব মুহাম্মাদ ওমর ফারুক ২৪-১২-১৯৮৭ খৃ. হইতে ০১-০৬-১৯৮৮ খৃ. পর্যন্ত।

৭. ব্রিগেডিয়ার মোঃ মোশাহেদ চৌধুরী (অবঃ) ০৪-০৬-১৯৮৮ খৃ. হইতে ০৫-১২-১৯৮৮ খৃ. পর্যন্ত।

৮. জনাব মুহাম্মাদ ওমর ফারুক (২য় বার) ০৫-১২-১৯৮৮ খৃ. হইতে ২২-০২-১৯৮৯ খৃ. পর্যন্ত।

৯. ব্রিগেডিয়ার মোসলেম উদ্দিন আহমেদ (অবঃ) ০১-০৩-১৯৮৯ খৃ. হইতে ১৯-০৯-১৯৯০ খৃ. পর্যন্ত।

১০. জনাব এম এ সোবহান (২য় বার) ২১-০৯-১৯৯০ খৃ. হইতে ২৭-১২-১৯৯০ খৃ. পর্যন্ত।

১১. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (অবঃ) ২৭-১২-১৯৯০ খৃ. হইতে ১৪-০৩-১৯৯১ খৃ. পর্যন্ত।

১২. জনাব মোহাম্মদ মনসুরুল হক খান ১৪-০৩-১৯৯১ খৃ. হইতে ২৪-০৪-১৯৯৩ খৃ. পর্যন্ত।

১৩. জনাব মুহাম্মদ শফিউদ্দিন ২৪-০৪-১৯৯৩ খৃ. হইতে ০৯-০১-১৯৯৪ খৃ. পর্যন্ত।

১৪. জনাব দাউদ -উজ-জামান চৌধুরী ০৯-০১-১৯৯৪ খৃ. হইতে ১৯-০৯-১৯৯৫ খৃ. পর্যন্ত।

১৫. সৈয়দ আশরাফ আলী ১৯-০৯-১৯৯৫ খৃ. হইতে ৩১-০৮-১৯৯৬ খৃ. পর্যন্ত।

১৬. জনাব আবদুল কুদ্দুস (ভারপ্রাপ্ত) ৩১-০৮-১৯৯৬ হইতে ১৬-০৯-১৯৯৬ খৃ. পর্যন্ত।

১৭. জনাব মোরশেদ হোসেন ১৬-০৯-১৯৯৬ হইতে ১৮-০২-১৯৯৮ খৃ. পর্যন্ত।

১৮. মাওলানা আব্দুল আউয়াল ১৮-০২-১৯৯৮হইতে ০৪-০৯-২০০১ খৃ. পর্যন্ত।

১৯. জনাব মোঃ আবদুর রশীদ খান ০৪-০৯-২০০১ হইতে ২০-১১-২০০১ খৃ. পর্যন্ত।

২০. সৈয়দ আশরাফ আলী (২য় বার)১৯-১১-২০০১ হইতে ০৪-১০-২০০৩ খৃ. পর্যন্ত।

২১. জনাব এ জেড এম শামসুল আলম (২য় বার) ০৪-১০-২০০৩ খৃ. হইতে ০৩-১০-২০০৫ খৃ. পর্যন্ত।

২২. জনাব এ. এম. বদরুদ্দোজা (ভারপ্রাপ্ত) ০৪-১০-২০০৫ খৃ. হইতে ৩০-১০-২০০৫ খৃ. পর্যন্ত।

২৩. জনাব মোঃ ফজলুর রহমান ৩১-১০-২০০৫ খৃ. হইতে .............

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচিতি হইতে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে; (২) মহাপরিচালকবৃন্দের কার্যকাল সংক্রান্ত বিবরণী দীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ হইতে সরবরাহ করা হইয়াছে।

**ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন** ঃ মে ১৯৭০ হইতে জানুয়ারী ১৯৮৬ ঃ

**প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন** ঃ প্রথম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৩ মার্চ হইতে ২৫ মার্চ, ১৯৭০ সালে জেদ্দায় ইতিহাসে প্রথম বারের মত মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিশ্বের ২৩টি মুসলিম রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীগণ যোগদান করেন। প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে যেসব দেশ যোগদান করিয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে শাদ, মালি ও দক্ষিণ য়ামান প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে যোগদানে বিরত থাকে। এই পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনেই স্থায়ী ইসলামী সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তের প্রস্তাবক ছিল পাকিস্তান। জেরুসালেম মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই সেক্রেটারিয়েট জেদ্দায় রাখার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। মালয়েশিয়ার প্রধান মন্ত্রী টেঙ্কু 'আবদু'র-রাহমানকে দুই বৎসরের জন্য ইসলামী সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারী জেনারেল মনোনীত করা হয়। এই সম্মেলনের আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল এই ঃ (১) পিএলওকে রাজনৈতিক, বৈষয়িক, নৈতিক সমর্থন দান ও মুসলিম রাজধানীগুলিতে পিএলও-এর অফিস খোলার জন্য স্ব স্ব দেশের ব্যবস্থা গ্রহণ ; (২) প্রতি বৎসর পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।

**দ্বিতীয় ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন** ঃ ইহা অনুষ্ঠিত হয় ২৫-২৮ ডিসেম্বর, ১৯৭০ সালে করাচীর স্টেট ব্যাংক ভবনের মার্বেল হলে। ২৩টি দেশ সম্মেলনে যোগদান করে। সুদান যোগদানে বিরত থাকে।

সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে টেঙ্কু 'আবদু'র-রাহমানের মনোনয়ন অনুমোদন, সচিবালয়ে ব্যয় বহনের জন্য ৪ লক্ষ ৫০ হাজার ডলারের একটি তহবিল গঠন, ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বার্তা সংস্থা প্রতিষ্ঠা এবং পারস্পরিক বিরোধ নিরসনের জন্য পিএলও ও 'আম্মানের প্রতি আহ্বান।

**তৃতীয় ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন** ঃ এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৯ ফেব্রুয়ারী—৪ মার্চ, ১৯৭২ সালে, জেদ্দা নগরীতে। বাহরায়ন, ওমান, কাতার, সিয়েরা লিওন, সুদান, সিরিয়া ও সংযুক্ত 'আরব আমীরাতসহ ৩০টি দেশ এই সম্মেলনে যোগদান করে। ইরাক ও দক্ষিণ য়ামান তখনও যোগদান করে নাই। এই সম্মেলনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল ওআইসির খসড়া সনদ অনুমোদন। উপমহাদেশের বিরোধ লইয়া আলোচনা হয়। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তিকারী মিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। ইসলামী বার্তা সংস্থার কাজ শুরু করার সিদ্ধান্তও এই সম্মেলনে গৃহীত হয়। সম্মেলনে গৃহীত সনদের ভূমিকায় মুসলিম সরকারসমূহ স্বীকার করেন যে, ইসলামী জনতার সাধারণ বিশ্বাসের বন্ধনই মুসলিম দেশসমূহের পুনর্মিলন ও সংহতির বুনিয়াদ। এই বুনিয়াদকে সামনে রাখিয়াই তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা ইসলামের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধকে নিষ্ঠার সহিত সংরক্ষণ করিবেন এবং তাহাই হইবে মানবতার অগ্রগতি বিধানে তাঁহাদের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

**চতুর্থ ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন** ঃ চতুর্থ ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (২৪-২৬ মার্চ, ১৯৭৩ সালে) বেনগাজীতে। ২৭টি দেশ সম্মেলনে যোগদান করে। লিবিয়ার সংগে মরক্কো ও জর্দানের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হইবার কারণে এই দুইটি দেশ যোগ দেয় নাই। সিরিয়াও অনুপস্থিত ছিল। ইরাক ও দক্ষিণ য়ামান পর্যবেক্ষকরূপে যোগ দেয়।

সংস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন আনয়নের প্রেক্ষিতে ইসলামী দেশসমূহের স্বাধীনতা সংগ্রামে সার্বিক সমর্থনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জেরুসালেমকে য়াহূদীকরণসহ ইসরাইলের প্রশাসনকে লোহিত সাগর পর্যন্ত সম্প্রসারণের ব্যাপারে সম্মেলনে কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করে। ইরিত্রিয়ার জনগণের বৈধ সংগ্রামের প্রতি সমর্থন, আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থনের জন্য সদস্য দেশসমূহকে আহ্বান, ফিলিপাইনের মুসলমানদের অবস্থা সরেজমিনে তদন্তের জন্য মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি প্রেরণ এবং প্রেসিডেন্ট আনওয়ার সাদাতের ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা জনাব হাসান তোহামিকে সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে টেংকু 'আবদু'র-রাহমানের স্থলাভিষিক্তকরণ প্রভৃতি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**পঞ্চম ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন** ঃ এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কুয়ালালামপুরে ২১-২৫ জুন, ১৯৭৪ সালে। ৩৬টি দেশ ইহাতে যোগদান করে। পিএলও পূর্ণ সদস্য হিসাবে যোগ দেয়। সম্মেলনে চূড়ান্ত ইশতেহার ছাড়াও অতিরিক্ত ১৮টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। লেবাননে ইসরাঈলী আক্রমণের নিন্দা, ইসলাঈলের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপসহ

পবিত্র শহর জেরুসালেমকে 'আরবের সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরের জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান, জেরুসালেমের আন্তর্জাতিকীকরণের অভিসন্ধি প্রত্যাখ্যান, পিএলওকে ফিলিস্তিনী জনগণের বৈধ প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃতি, ফিলিপাইনের মুসলমানদের উপর সবরকম অত্যাচারমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করিয়া সমস্যার সমাধানকল্পে মরো মুক্তিফ্রন্টের সহিত সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মিটাইয়া ফেলার জন্য ফিলিপাইন সরকারের প্রতি আহ্বান এবং ইসলামিক সলিডারিটি তহবিলের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**ষষ্ঠ ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন ঃ** জেদ্দায় ১২-১৫ জুলাই, ১৯৭৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়। ৪০টি মুসলিম দেশ সম্মেলনে যোগদান করে। ইরাক এবং মালদ্বীপ প্রজাতন্ত্র পূর্ণ সদস্য পদ লাভ করে। নাইজেরিয়া পর্যবেক্ষক হিসাবে যোগদান করে। সম্মেলনের চূড়ান্ত ইশতেহার ইসরাঈলের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব পোষণ করে। ইসরাঈলের সহিত সকল ইসলামী দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কচ্ছেদের জন্য সিরিয়া ও পিএলও-এর প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ফিলিস্তীনী জনগণের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত এবং ইসরাঈল অধিকৃত এলাকায় ইসরাঈলের মানবাধিকার লংঘনের নিন্দা করা হয়। জেরুসালেম সম্পর্কিত পরবর্তী অবস্থার প্রেক্ষিতে কমিটি গঠনের প্রস্তাব এবং ইসরাঈলের প্রতি মার্কিনীদের সামরিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার নিন্দা প্রস্তাবও এই ইশতেহারে স্থানে পায়। সম্মেলনে সাইপ্রাস সম্পর্কিত প্রশ্ন প্রথমবারের মত উত্থাপিত হয় (দৈনিক সংগ্রাম, ৮ ডিসেম্বর, ওআইসি ম্যাগাজিন সংখ্যা, ১৯৮৩)।

**সপ্তম ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন ঃ** এই সম্মেলন ইস্তাম্বুলের আতাতুর্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তনে ১২-১৫ মে, ১৯৭৬ সালে অনুষ্ঠিত হয়। ৪১টি দেশ সম্মেলনে যোগদান করে এবং ক্যামেরুন এই সম্মেলনে পূর্ণ সদস্য পদ লাভ করে। সম্মেলনের ইশতেহারে প্রস্তাব আকারে যেসব বিষয় স্থান পায় তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি ছিল প্রধান ঃ

গঙ্গার পানি নায্য বণ্টন প্রশ্নে যুক্ত ইশতেহারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার ত্বরিৎ ও সন্তোষজনক সমাধানের জন্য সম্মেলন সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। ইসরাঈলকে জাতিসংঘ হইতে বহিষ্কারের জন্য সদস্য দেশসমূহকে তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান হয়। সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ইসরাঈলের সহযোগিতার নিন্দা করা হয় এবং ইসরাঈলকে উপনিবেশবাদ ও ফ্যাসিবাদের ঘাটি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। সাইপ্রাসে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের তুর্কী মনোভাবের প্রতি সম্মেলন সমর্থন জানায়। পরবর্তী সম্মেলনসমূহে তুর্কী সাইপ্রিয়ট প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানান হইবে বলিয়া পররাষ্ট্র মন্ত্রীগণ একমত হন। সম্মেলনে ভারত মহাসাগরীয় কমোরো দ্বীপপুঞ্জের মেওটি দ্বীপ দখল করিবার কারণে ফ্রান্সের নিন্দা করা হয় এবং পূর্ব আফ্রিকার আসরস ও ইসাম এলাকাকে অবিলম্বে শর্তহীন আযাদী দানের দাবি জানান হয়। এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, ফ্রান্সের উচিত অবিলম্বে সমস্ত সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা এবং জিবুতি শহরের চতুষ্পার্শ্বে যে কাঁটাতারের বৈদ্যুতিক বেড়া ও মাইন পাতা রহিয়াছে তাহা অপসারণ করা। এই ব্যাপারে ভূখণ্ডদ্বয়ের স্বাধীনতার জন্য ফরাসী সরকারের উপর কূটনৈতিক প্রভাব খাটাইবার জন্য সকল মুসলিম রাষ্ট্রকে অনুরোধ করা হয়। সম্মেলনে পূর্ব তিমুরের সাবেক পতুর্গীজ ভূখণ্ডের মুসলমানদের সমস্যাটি আলোচিত হয়।

মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন জেরুসালেম ও ইসরাঈল প্রভৃতি শহরের 'আরব জনগণকে সাহায্য করিবার জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠন অনুমোদন করে। আগামী দুই বৎসরের মধ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে ৬ কোটি ডলারের এই তহবিল গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাকিস্তান, সউদী 'আরব, গায়েনা, জর্দান ও পিএলও প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি বোর্ড এই তহবিল পরিচালনা করিবে। সম্মেলনে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগরকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা গঠনের আহ্বান জানান হয়। যে কোন মুসলিম দেশের উপর সম্ভাব্য পারমাণবিক হামলা প্রতিরোধ এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত পাকিস্তানের একটি প্রস্তাব সম্মেলনে আলোচিত হয় এবং পরে প্রস্তাব আকারে ইশতেহারে স্থান পায়। ফিলিপাইনে সংখ্যালঘু মুসলমানদের সমস্যাবলীসহ অন্যান্য অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমানদের বিভিন্নমুখী সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সম্মেলনে মাসজিদু'ল-আকসা, দখলীকৃত 'আরব এলাকা য়াহূদীদের কবলমুক্ত করণ, জেরুসালেম শহর হইতে য়াহূদীদের বহিষ্কার এবং লেবানন সমস্যার উপর সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ইশতেহারে স্থান পায়। সম্মেলনে ইসলামী সংহতি তহবিল, ইসলামী সংবাদ সংস্থা ও ইসলামী ব্রডকাস্টিং ব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা হয়। তথাকথিত আধুনিক তুরস্কের জনক কামাল পাশা কর্তৃক ১৯২৪ খৃ. খিলাফাত ব্যবস্থা বাতিল করিয়া একটি ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতন্ত্র প্রদানের পর এই সম্মেলনই ছিল তুরস্কে অনুষ্ঠিত সর্ববৃহৎ ইসলামী সম্মেলন।

সম্মেলনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্ক 'আরব বিশ্বের সহিত সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে। তুর্কী প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়া বলেন, এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে তাঁহার দেশ অন্যান্য মুসলিম দেশের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা (সাপ্তাহিক বাংলার ডাক, জুন ১৯৭৬; দৈনিক ইত্তেফাক, ১২-১৫ মে, ১৯৭৬)।

**অষ্টম ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন ঃ** ত্রিপোলীতে ১১-১৪ মে, ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ৩৮টি দেশ, লিবিয়ার সঙ্গে মতবিরোধের কারণে মিসর এবং সূদানের অনুপস্থিতি। পর্যবেক্ষক হিসাবে যোগদান করে নাইজেরিয়া, জাতিসংঘ, আফ্রিকা ইউনিটি সংস্থা, আরব লীগ, ফিলিপাইনের মরো লিবারেশন ফ্রন্টসহ আটটি ইসলামী সংস্থা।

সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ছিল, ইসরাঈলকে জাতিসংঘ হইতে বহিষ্কারের ব্যাপারে মন্ত্রীগণ তাঁহাদের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। দক্ষিণ ফিলিপাইনের সংগ্রামী মুসলমানদের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি মরো মুক্তি ফ্রন্ট ফিলিপাইন সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসার অধিকার রাখেন। য়াহূদী রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিটি দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবার আহ্বান; ফিলিস্তীনের উপর ডাক টিকিট প্রকাশের ব্যাপারে ইসলামী দেশমূহের কাছে প্রস্তাব পেশ; জাতিসংঘ হইতে পাঁচটি স্থায়ী ভেটো শক্তি বিলোপের ব্যাপারে লিবিয়ার প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন; সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে জনাব আহমাদ কারীম গাইয়েকে পুনর্নির্বাচন।

**নবম ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন ঃ** সেনেগালের রাজধানী ডাকারে ২৪-২৮ এপ্রিল, ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিতি ৪২টি দেশ; নাইজেরিয়া এবং অষ্টম সম্মেলনে যেসব সংস্থা যোগদান করিয়াছিল, এই সম্মেলনেও সেইসব সংস্থা পর্যবেক্ষক হিসাবে যোগ দেয়।

**সিদ্ধান্ত ঃ** মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তে সম্মেলনের দৃঢ় আস্থাসহ পিএলও-এর অধিকারের প্রতি পুনঃসমর্থন, দক্ষিণ আফ্রিকার ঔপনিবেশিক ও বর্ণবাদী সরকারের বিরুদ্ধে মোযাম্বিক, জাম্বিয়া, বসতোয়ানা সরকার ও জনগণের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন, একটি ইসলামী নগর সংস্থা স্থাপনের ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রীগণের ঐকমত্য।

**দশম ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন ঃ** মরক্কোর ফেজ নগরীতে ৮-১২ মে, ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিতি ৪০টি দেশ, পর্যবেক্ষক হিসাবে যোগ দেয় মরো লিবারেশন ফ্রন্ট এবং সাইপ্রাসের তুর্কী মুসলিম কমিউনিটি। ইসরাঈলের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করিবার কারণে মিসরের সদস্যপদ সাসপেণ্ড করা হয়। ফলে মিসর যোগদান হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হয়। তাঞ্জানিয়ার সঙ্গে বিরোধের কারণে উগাণ্ডাও অনুপস্থিত ছিল।

**সিদ্ধান্ত ঃ** মিসর-ইসরাঈল শান্তি চুক্তি বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসাবে কেন্দ্রীভূত থাকে। মিসরের সদস্য পদ বাতিলের সিদ্ধান্ত; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে পঁচাত্তরটি প্রস্তাব অনুমোদন; ফিলিপাইনের মুসলমানদের জিহাদের সাহায্যার্থে বিশেষ তহবিল গঠনের ব্যাপারে ঐকমত্য।

**একাদশ ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন ঃ** পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ১৭-২২ মে, ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিতি ৪০টি দেশ। নাইজেরিয়া, মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট, ইরিত্রিয়ান লিবারেশন ফ্রন্ট, তুর্কী ফেডারেল স্টেট অব সাইপ্রাস, জাতিসংঘ এবং 'আরব লীগসহ বিশটি পর্যবেক্ষক সংস্থার যোগদান, ইরানী ডেলিগেটদের অংশ হিসাবে আটজন আফগান মুজাহিদ যোগদান করেন।

**সিদ্ধান্ত ঃ** আফগানিস্তানে রুশীয় আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে মস্কোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য তিন সদস্যের কমিটি গঠন ঃ সেক্রেটারী জেনারেল হাবীব শাত্তি এবং পাকিস্তান ও ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদ্বয়ের উপর দায়িত্ব অর্পণ। জেরুসালেমে য়াহূদীবাদের অনুপ্রবেশ এবং উহাকে রাজধানী ঘোষণায় উদ্ভূত সমস্যার ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ বৈঠক ডাকার জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান। ইসলামী দেশসমূহের সংগে কোন প্রকার মতপার্থক্য দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে সেই মতপার্থক্য নিরসনের লক্ষ্যে বার সদস্যের একটি কমিটি গঠন।

**দ্বাদশ ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন ঃ** বাগদাদে ১-৫ জুন, ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত হয়। পিএলও-সহ ৩৯টি দেশ যোগদান করে। আফগানিস্তান এবং মিসরের সদস্যপদ বাতিলের কারণে এই দুইটি দেশ যোগদান করিতে পারে নাই; ইরাক-ইরান যুদ্ধের কারণে ইরাক ও সিরিয়া অনুপস্থিত ছিল।

**সিদ্ধান্ত ঃ** ফিলিস্তিনী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারসহ জন্মভূমির মাটিতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নূতন প্রস্তাব পাস করিবার জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান। ফিলিস্তিনী জনগণের সম্মানে ২১ আগস্টকে ইসলামী সংহতি দিবস ঘোষণা। ফিলিস্তিনী সংগ্রামকে জিহাদ হিসাবে ঘোষণা ; ইসরাঈলের সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাজধানীগুলিতে পিএলও-কে কূটনৈতিক মর্যাদায় গ্রহণের জন্য মুসলিম দেশগুলির প্রতি আবেদন। দক্ষিণ আফ্রিকার ও নামিবিয়ার নির্যাতিত জনগণের বৈধ সংগ্রামের প্রতি আন্তরিক সমর্থনসহ দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘু বর্ণবাদী শাসক গোষ্ঠী এবং ইসরাঈলী সহযোগীদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জ্ঞাপন।

**ত্রয়োদশ ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন ঃ** নাইজারের রাজধানী নিয়ামীতে ২২-২৬ আগস্ট, ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সিরিয়া ও শাদ যোগদান করে নাই। লিবিয়ার কয়েকজন সদস্যকে নাইজারে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় নাই, তাহাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হইয়াছে— এই অজুহাতে লিবিয়া সম্মেলন বর্জন করে। মিসর এবং আফগানিস্তান তাহাদের সদস্যপদ বাতিল হওয়ার কারণে যোগদান করিতে পারে নাই। অবশিষ্ট মুসলিম দেশ যোগদান করে।

পাঁচদিন ব্যাপী সম্মেলন শেষে প্রকাশিত এক ইশতেহারে আফগানিস্তানে অব্যাহত সোভিয়েত দখলের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ, দেশটি হইতে অবিলম্বে সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার এবং এই সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রচেষ্টা চালাইবার দাবি জানান হয়। ইশ্‌তাহারে ফিলিস্তিনী জনগণের জাতীয় অধিকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুতামূলক আচরণের নিন্দা করা হয় এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান হয়। ইহাতে ইসরাঈলী সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে ঘোষিত সর্বাত্মক জিহাদ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সম্মেলন ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ও মিসর-ইসরাঈল শান্তি চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে। পিএলও-কে সমর্থনের পদক্ষেপ হিসাবে সম্মেলনে ওআইসির আওতায় প্রতিরোধের সহিত সামগ্রিক সমন্বয়ের জন্য দ্রুত একটি কার্যালয় স্থাপন এবং ইসরাঈলের বিরুদ্ধে বয়কট জোরদার করার জন্যও একটি কার্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সম্মেলন লেবাননের স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং ইহার সকল এলাকার উপর নিজ সার্বভৌমত্বের প্রতি জোর সমর্থন জানায়। সম্মেলন ইরান-ইরাক বিরোধ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রীগণ যুদ্ধরত দেশ দুইটিকে লড়াই বন্ধ এবং নিজ নিজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সীমান্তের অভ্যন্তরে সৈন্য সরাইয়া লইবার আহ্বান জানায়। উভয় দেশকে শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের সমস্যা সমাধান করিবার আহ্বান জানান হয় এবং একটি ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সমাধানের জন্য ইসলামী শান্তি কমিটিকে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য অনুরোধ জানান হয়।

কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্র স্বেচ্ছামূলক সাহায্য প্রদানের কথা ঘোষণা করে। পাকিস্তান জেরুসালেম তহবিলের জন্য ৫০ হাজার ডলার, জেরুসালেম তহবিল ওয়াক্‌ফ-এর জন্য ১০ লক্ষ ডলার, নাইজার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর জন্য ২৫ হাজার ডলার, সাউদী 'আরব অন্যান্য তৎপরতার জন্য ৫০ লক্ষ ডলার ছাড়াও জেরুসালেম তহবিলের জন্য ৫০ লক্ষ ডলার নাইজার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৫০ লক্ষ ডলার ও ইসলামী সংহতি তহবিলের জন্য ১ কোটি ডলার, নাইজার ঃ জেরুসালেম তহবিলের জন্য ২৫ হাজার ডলার ও ইসলামী সংহতি তহবিলের জন্য ১০ হাজার ডলার, গিনি ঃ জেরুসালেম তহবিলের জন্য এক লক্ষ ডলার, নাইজার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২৫ হাজার ডলার ও আই. এস. এফ.-এর জন্য ১৫ হাজার ডলার, সংযুক্ত 'আরব আমীরাত ঃ নাইজার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক লক্ষ ডলার; জিবুতি ঃ জেরুসালেম তহবিলের জন্য ৩ হাজার ডলার, আপার ভোল্টাঃ আই. এস. এফ. ওয়াকফ-এর জন্য ৫ হাজার ডলার এবং নাইজার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও আই. এস. এফ.-এর জন্য ৫ হাজার ডলার করিয়া প্রদান করিবে। তিউনিসিয়া জেরুসালেম তহবিলের জন্য ৪০ হাজার ডলার, নাইজার ইসলামী

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২০ হাজার ডলার, আই. এস. এফ. ওয়াক্ফ-এর জন্য ২০ হাজার ডলার ও আই. এস. এফ.-এর জন্য এক লক্ষ ডলার, মরক্কো ঃ নাইজার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক লক্ষ ডলার।

অধিবেশনে চূড়ান্ত ইশ্তেহার পাঠের পর স্বাগতিক দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ১৩তম সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের ঘটনাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য প্রেসিডেন্ট সেনী কুঞ্চি রাজধানী নিয়ামীতে একটি বিরাট মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন (দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ ও ২৮ আগস্ট সংখ্যা, ১৯৮২ খৃ.)।

**চতুর্দশ ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন** ঃ চতুর্দশ ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন ঢাকার শেরেবাংলা নগরের বিশাল সংসদ ভবনে ১৯৮৩ সালের ৬-১০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। ৬ ডিসেম্বর সকাল ১০-২৫ মিনিটে লেঃ জেঃ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ২০ মিনিটের বাংলা ভাষণের মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এই সম্মেলন বাংলাদেশসহ ৪১টি দেশের প্রতিনিধি যোগদান করেন। স্বাগতিক দেশ বাংলাদেশসহ ১৮টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী, ৮টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন মন্ত্রী পরিষদের সদস্য পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ, ৫টি দেশ হইতে প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ের, অবশিষ্ট দেশগুলি হইতে রাষ্ট্রদূত ও পদস্থ কর্মকর্তা পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

এই সম্মেলনে আফ্রিকার গণপ্রজাতন্ত্রী বেনিন ইসলামী সম্মেলন সংস্থার নূতন সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এতদিন বেনিনের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা ছিল। সদস্যপদের জন্য বেনিন আবেদন করিলে সম্মেলনে তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বেনিনকে লইয়া ও আই সি-র সদস্য সংখ্যা ৪৪-এ উন্নীত হইল। ১৯৬০ খৃ. বেনিন ফ্রান্সের নিকট হইতে স্বাধীনতা লাভ করে। বেনিনের পূর্ব নাম ছিল দাহোমি। পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটির আয়তন ৪৩ হাজার ৪ শত বর্গমাইল। রাজধানীর নাম পরটোনভো।

১৫ নভেম্বর, ১৯৮৩ সালে সাইপ্রাস স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তুর্কী সাইপ্রাসের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আতাকল ইসলামী সম্মেলন সংস্থায় পর্যবেক্ষক হিসাবে যোগ দেন। তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দলের তিনি নেতৃত্ব দান করেন। জাতিসংঘের আণ্ডার সেক্রেটারী জনাব রাফী'উ'দ-দীন আহমাদ এই সম্মেলনে জাতিসংঘ মহাসচিব পিরেজ দ্যা কুয়েলারের প্রতিনিধিত্ব করেন। রাবিতা আল-'আলাম আল-ইসলামীর মহাসচিব বিচারপতি আফদাল চীমাও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। আরাকানের (বার্মা) রোহিঙ্গা মুসলিম পেট্রিয়টিক ফ্রন্টের সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ জা'ফার হাবীব ফ্রন্টকে পর্যবেক্ষক-এর মর্যাদা দেওয়ার দাবি পেশ করেন। এই সম্মেলনের সর্বাধিক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে উদ্বোধনী দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে। মালদ্বীপ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আণ্ডার সেক্রেটারী হুসায়ন হালীম ১০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় অধিবেশন চলাকালে প্রায় ৭টার সময় হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন। সেইখানেই দুইজন চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা শুরু করেন। সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইলে তাঁহাকে সেইখানে মৃত ঘোষণা করা হয়। তাঁহার মৃত্যুর খবর সম্মেলন কক্ষে পৌঁছামাত্র সম্মেলনের অধিবেশন রাত্র ১০টা পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়।

ঢাকা সম্মেলনে ৯৪টি বিষয় লইয়া আলোচনা হয়। উপসাগরীয় যুদ্ধের বিষয়টি সম্পর্কে দীর্ঘ ষোল ঘণ্টা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এক পর্যায়ে ইরান সম্মেলন কক্ষ হইতে ওয়াক আউট করে। লেবানন পরিস্থিতি, শাদ-লিবিয়া সম্পর্ক, উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং পিএলও-এর অভ্যন্তরীণ বিরোধ প্রভৃতি বিষয় লইয়া আলোচনা হয়। তুর্কী সাইপ্রাস এবং মরোর স্বাধীনতাও আলোচিত হয়। চূড়ান্ত ঘোষণায় বলা হয় ঃ পিএলও হইতেছে ফিলিস্তিনী জনগণের বৈধ ও একমাত্র প্রতিনিধি। স্বাধীন ও সমমর্যদায় পিএলও-এর অংশগ্রহণ ছাড়া কোন সমাধানই ন্যায়সঙ্গত বা সর্বাঙ্গীন বলিয়া বিবেচ্য হইতে পারে না।

দ্ব্যর্থহীনভাবে আরও ঘোষণা করা হয় যে, 'আরব-ইসরাঈল বিরোধের প্রশ্নে কোন 'আরব পক্ষেরই একতরফাভাবে কোন সমাধান চাহিবার অধিকার নাই এবং ক্যাম্প ডেভিড প্রবণতা বা চুক্তি কিংবা তাহা হইতে উদ্ভূত যে কোন উদ্যোগ মানিয়া লইবার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অব্যাহত থাকিবে। সম্মেলন পুনরায় দৃঢ়তার সহিত লেবাননের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের এবং লেবাননবাসীর ঐক্য ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও লেবাননীদের নিজেদের সমঝোতা প্রতিষ্ঠার সহায়ক সকল পদক্ষেপের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থনের কথা ঘোষণা করে।

সম্মেলনে আল-কুদ্স শারীফ প্রশ্নে অতীত প্রস্তাবসমূহ পুনরায় দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা এবং আল-কুদ্স কমিটির পূর্ববর্তী সকল বৈঠকের সুপারিশসমূহ পুনঃঅনুমোদন করা হয়। ইসলামী উম্মাহ-র সর্বপ্রধান বিষয় হিসাবে ইসলামের স্বার্থের প্রতি দৃঢ়ভাবে সর্বাত্মক সমর্থন ঘোষণা করিয়া সম্মেলন সদস্য দেশগুলির প্রতি খৃস্টীয় ১৯৮৪-৮৫ স্কুল বর্ষ হইতে তাহাদের শিক্ষা পাঠ্যক্রমে ফিলিস্তীনের ইতিহাস ও ভূগোলকে একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান হয়। ইসরাঈল অধিকৃত সকল ভূখণ্ড হইতে ইসরাঈলী সৈন্য প্রত্যাহারের সুস্পষ্ট আহ্বান সম্বলিত স্বস্তি পরিষদের একটি নূতন প্রস্তাবের জন্য যৌথ প্রচেষ্টা চালাইবার আহ্বান জানান হয়। 'আরব ও ফিলিস্তিনী অধিকার ও ভূখণ্ডসমূহের বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র যেইসব নীতি চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে সম্মেলন সেইগুলির তীব্র নিন্দা করে। ৪ ডিসেম্বর (১৯৮৩) লেবাননে সিরীয় অবস্থানের উপর মার্কিন বিমান হামলার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে যে অবনতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং যাহার ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে এক নূতন সংঘর্ষ বাধার হুমকি দেখা দেয় এবং বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হয়, সম্মেলন তাহাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। সম্মেলন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাঈলের মধ্যে কৌশলগত মৈত্রীর তীব্র নিন্দা করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আগ্রাসী নীতি অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত হওয়ার আহ্বান জানায়।

আফগানিস্তান প্রশ্নে সম্মেলন সেখানে অব্যাহত সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপ ও ইহার ফলে আফগান জনগণের স্বাধীনভাবে নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার প্রয়োগের পথে সৃষ্ট বিভিন্ন বাধায় গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করে। সম্মেলন পুনরায় দৃঢ়তার সহিত আফগানিস্তান হইতে অবিলম্বে সম্পূর্ণ ও নিঃশর্তভাবে সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানায়। সাইপ্রাস প্রশ্নে সম্মেলন তুর্কী মুসলিম সাইপ্রিয়টদের সমমর্যাদা ও তাহাদের ন্যায়সংগত অধিকার অর্জনের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন প্রকাশ করে। নামিবিয়া, কমরো দীপপুঞ্জ, আফ্রিকার শৃঙ্গ, সোমালিয়া, বিশ্বশান্তি, নিরস্ত্রীকরণ, উপনিবেশবাদ বিলোপ ও নূতন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন প্রশ্নে প্রস্তাব গ্রহণ করে।

সম্মেলনে খৃস্টীয় ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বৎসরের জন্য ৯৮ লক্ষ ৮৩ হাজার ৬৬০ ডলারের বাজেট অনুমোদন করা হয়। বাজেটে টঙ্গীস্থ

কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ইসলামী কেন্দ্রের জন্য ৫০ লক্ষ ডলারের ব্যয় বরাদ্দ প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে ইসলামী আদালত গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঘোষণায় আরও বলা হয়, ইসলামে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা ইসলামী বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংগ। সামগ্রিকভাবেই হউক বা আংশিকভাবেই হউক, ইহাকে নস্যাৎ করিবার বা লংঘন করিবার অথবা অগ্রাহ্য করিবার অধিকার কাহারও নাই (সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১১/১২/৮৩)।

**ঢাকা ঘোষণা ঃ** ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য দেশসমূহ ঘোষণা করে যে, তাহারা আল্লাহ্‌য় বিশ্বাসী, যিনি দোজাহানের মালিক, সকল জিনিসের স্রষ্টা, পরম করুণাময়, যিনি মানুষকে আশরাফু'ল-মাখলূকাত হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে মর্যাদা দিয়াছেন, ইহজগতে মানুষকে আল্লাহ্‌র খলীফা হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং মর্যাদার উন্নতি বিধানের ক্ষমতা দিয়াছেন, মানুষের জন্য কর্তব্যসমূহ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং যমীন ও আসমানের সকল কিছুই যিনি মানুষের খেদমতে নিয়োজিত করিয়াছেন।

তাঁহারা রাসূলে কারীম হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিও পূর্ণ আস্থা ঘোষণা করেন—যাঁহাকে মহান আল্লাহ্ দোজাহানের করুণা হিসাবে নির্যাতিতদের মুক্তির জন্য, প্রকৃত পথনির্দেশ ও ধর্মসহ প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার অধিকার নাকচ করিয়া দিয়া মানব জাতির মধ্যে সাম্য ঘোষণা এবং একই আকৃতি ও আত্মার দ্বারা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষের মধ্যে সকল ভেদাভেদ ও ঘৃণার অবসান ঘটান এবং এমন এক ধর্মবিশ্বাস প্রচার করেন যাহাতে আল্লাহ্‌র পূর্ণ একত্ব ঘোষণা (লাশারীক আল্লাহ্), আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহাকেও উপাসনা করিতে নিষেধ, মানব জাতির প্রকৃত স্বাধীনতা ও মর্যাদার মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা এবং দাসত্ব হইতে মানুষের মুক্তির পথনির্দেশ করা হইয়াছে। তাঁহারা অপরিবর্তনীয় ইসলামী শারী'আতের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারও ঘোষণা করেন যাহাতে মানুষের ধর্ম, আত্মা, মন, মর্যাদা, সম্পদ ও বংশধরদের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং যাহার প্রয়োগ সার্বজনীন ও যাহার নীতিমালা ও নির্দেশনাসমূহ ঔদার্যমণ্ডিত, যাহাতে বস্তুর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় সাধন এবং ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য এবং যৌথ সুযোগ-সুবিধার মধ্যে সমতা সৃষ্টি, যুক্তি, ভাবাবেগ, আদর্শ ও বাস্তবতার মধ্যে সুসামঞ্জস্য বিধান এবং যাহাতে প্রতিপক্ষের প্রতি এমনভাবে ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে—যাহার ফলে নির্যাতন অথবা নৈরাজ্যের প্রকাশ ঘটিবে না।

তাহারা ইসলামী উম্মাহ্‌র সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ভূমিকার গুরুত্বের কথাও পূনর্ব্যক্ত করেন এবং যাহারা মানব জাতিকে একটি সার্বজনীন সুসমন্বিত সভ্যতা উপহার দিয়াছেন, যে সভ্যতায় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং বিশ্বাসের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

ও আই সি-র সদস্য দেশসমূহ বিভেদ, আদর্শ ও সংঘাতে জর্জরিত বর্তমান সংশয়পূর্ণ মানব জাতিকে পরিচালনার জন্য এই উম্মাহ্‌র প্রতি যে প্রত্যাশা রহিয়াছে তাহা পূরণ এবং বস্তুবাদী বিশ্বের সকল দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান ও সকল শোষণ ও নির্যাতন হইতে মানব জাতিকে রক্ষার জন্য মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সহায়তা এবং ইসলামী শারী'আত অনুযায়ী মানুষের মর্যাদা ও স্বাধীনতা সুরক্ষার অঙ্গীকার প্রদান করে।

তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ইসলামের বিধান অনুযায়ী মৌলিক অধিকারসমূহ ও স্বাধীনতা ইসলামী বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংগ এবং কেহই উহা সামগ্রিক অথবা আংশিকভাবে লংঘন বা অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না, যেভাবে তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী মানিতে বাধ্য, যাহা তাঁহার (আল্লাহ্) নাযিলকৃত কিতাবসমূহে সন্নিবেশিত এবং যাহা তাঁহার নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে প্রেরিত এবং যাহার দ্বারা তাঁহার প্রত্যাদেশসমূহ সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং এইসব আদেশের প্রতি আনুগত্য 'ইবাদতের কাজ হওয়ায় এবং গাফলতি বা লংঘন গুনাহ্‌র কাজ হওয়ায় প্রত্যেকে এবং উম্মাহ্ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে দায়ী।

তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন যে, সকল মানুষ একই পরিবারভুক্ত এবং ইহার সকল সদস্য আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ এবং মানব জাতি আদমের বংশধর বিধায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক মতাদর্শ, সামাজিক মর্যাদা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষ মর্যাদা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে সমান। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, সকল মানুষ আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাহারাই আল্লাহ্‌র পরম ভালবাসার পাত্র যাহারা তাঁহার সৃষ্টিকে ভালবাসে।

এই নীতিমালাই এখন হইতে ইসলামী মানবাধিকার সংক্রান্ত ঢাকা ঘোষণা হিসাবে বিবেচিত। এই ঘোষণা পরে চতুর্থ ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে অনুমোদন লাভ করে (দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ ডিসেম্বর, ১৯৮৩)।

**পঞ্চদশ ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন ঃ** য়ামান 'আরব প্রজাতন্ত্রের রাজধানী সান'আ'-য় ১৮-২২ ডিসেম্বর, ১৯৮৪ সালে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৪৫ জাতিসংস্থার ৪২টি দেশ ইহাতে যোগদান করে। পর্যবেক্ষক হিসাবে যে সব সংস্থা ও দেশ উপস্থিত ছিল তন্মধ্যে আরব লীগ, রাবিতা আল-'আলাম আল-ইসলামী, নাইজিরিয়া, মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট, আফগান মুজাহিদ প্রতিনিধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাঁচ দিন ব্যাপী পঞ্চদশ ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন ইরান ও ইরাকের প্রতি অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হওয়ার আহ্বান জানায় এবং আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া সেখান হইতে সম্পূর্ণরূপে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি পুনর্ব্যক্ত করে। সম্মেলন বিমান ছিনতাই-এর নিন্দা করিয়া ছিনতাইকারীদের রাজনৈতিক আশ্রয় না দেওয়ার জন্য সদস্য দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানায়। দখলীকৃত পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকায় স্থায়ী য়াহূদী বসতি স্থাপনের ইসরাঈলী পরিকল্পনার নিন্দা করিয়া ফিলিস্তিনীদের সহিত আন্তর্জাতিক সংহতি আরও সুসংহত করিবার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং পিএলও-এর নেতৃত্বে ফিলিস্তিনী জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। সম্মেলনের এক প্রস্তাবে শান্তি প্রচেষ্টায় ইসলামী শান্তি কমিটির কাজের প্রশংসা করা হয় এবং ইসলামী শারী'আতের বিধান, যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত জেনেভা কন্‌ভেনশনের ধারা ও রাসায়নিক অস্ত্র সংক্রান্ত জেনেভা প্রটোকল মানিয়া চলিবার জন্য ইরাক-ইরানের প্রতি আহ্বান জানান হয়। আফগানিস্তান প্রশ্নে সম্মেলনে কাসাব্লাংকায় অনুষ্ঠিত চতুর্থ শীর্ষ বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা পুনর্ব্যক্ত করিয়া একটি জোট-নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা রক্ষার আহ্বান জানান হয়। এক প্রস্তাবে দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘু শাসন ও তাহাদের অনুসৃত বর্ণবৈষম্য নীতির তীব্র নিন্দা করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ও নামিবিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সদস্য দেশসমূহের

সমর্থন জোরদার করার আহ্বান জানান হয়। সম্মেলনে ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলে মুসলিম নির্যাতনের নিন্দা করা হয় এবং ওআইসি-বহির্ভূত দেশসমূহের মুসলিম সম্প্রদায়ের সমস্যা পর্যালোচনার জন্য একটি মন্ত্রী পর্যায়ের কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্মেলনে আফ্রিকার সাহিল (Gold Coast) অঞ্চলের দশটি দেশে জরুরী খাদ্য সাহায্য কর্মসূচী ও উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রাখিবার আহ্বান জানান হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা খরা নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সাহিল অঞ্চলের দেশগুলির মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহারা মেয়ট দ্বীপের উপর কমোরোর সার্বভৌমত্বের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। সর্বমোট ১১৩টি বিষয় সম্মেলনে আলোচিত হয়। এই সম্মেলনেই (১৯-১২-৮৪) শারীফু'দ-দীন পীরযাদাকে মহাসচিব হিসাবে পরবর্তী সময়ের জন্য নির্বাচিত করা হয় (১৮-২৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৪ সালের দৈনিক সংগ্রাম ও দৈনিক ইত্তেফাক হইতে গৃহীত)।

**ষোড়শ ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন ঃ** মরক্কোর ফেজ নগরীতে ১৯৮৬ সালের ৬-৯ জানুয়ারী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে নাইজিরিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে ওআইসি-র সদস্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ইহার ফলে নাইজিরিয়া ওআইসি-র ৪৬তম সদস্য পদ লাভ করে।

পাঁচদিন ব্যাপী সম্মেলনের ৯০ দফা আলোচ্যসূচীতে ইসরাঈলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী দেশগুলির সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবার প্রস্তাবও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্মেলনে উপসাগরীয় যুদ্ধের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই। লিবিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন অর্থনৈতিক অবরোধের নিন্দা করা হয় এবং অবিলম্বে ইহা প্রত্যাহারের দাবি জানান হয়। যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা ব্যবস্থা মুকাবিলায় যথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আরব দেশগুলির প্রতি আহ্বান জানান হয়। এই সম্মেলন ঘোষণা করে যে, মার্কিন সিদ্ধান্ত লিবিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে খর্ব করিবার প্রচেষ্টায় সেই দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার উপর ইহা একটি হামলা। মরো মুক্তিফ্রন্টকে সকল রকমের বৈষয়িক ও আর্থিক সাহায্য দানের কথা ঘোষণা করা হয়।

সপ্তদশ ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন জর্দানে অনুষ্ঠানের ঘোষণা করা হয় (৬ জানুয়ারী, ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংগ্রাম ও দৈনিক সংবাদ)।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** বরাত নিবন্ধগর্ভে উল্লিখিত।

সালেহ উদ্দিন আহমদ

**ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ** কুষ্টিয়া, বাংলাদেশী মানুষের সুদীর্ঘ আন্দোলনের ফসল, যাহা কুষ্টিয়া শহর হইতে ২৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণে ঝিনাইদহ হইতে ২০ কিঃ মিঃ উত্তরে কুষ্টিয়া- যশোর মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ জেলার মধ্যবর্তী সীমানায় শান্তিডাংগা- দুলালপুর নামক স্থানে ১৭৫ একর জমির উপর অবস্থিত। ১৯৭৯ সালের ২২ নভেম্বর শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ইহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ১৭৫৭ খৃ. সালে ইংরেজ অধিকারের ২৩ বৎসর পর ১৭৮০ খৃ. সালে ইংরেজ শাসক ওয়ারেন হেস্টিং কলিকাতা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত তখন থেকেই এই অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই আলীগড় আন্দোলন ও দেওবন্দ দারুল উলূম (১৮৬৬) আন্দোলনের প্রভাবে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার অনুপস্থিতি ও মুসলমানদের প্রতি অবহেলার ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলে মুসলমানদের জন্য উচ্চ শিক্ষার পাদপীঠ হিসাবে একটি স্বতন্ত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনের সূচনা ঘটে। ১৯০৩ খৃ. জুলাই মাসে আলীগড় কলেজের প্রাক্তন কিছু প্রবাসী ছাত্র সায়্যিদ আমীর আলীর লণ্ডনস্থ বাসভবনে আয়োজিত এক সভায় মুসলমানদের জন্য একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন (ড. সুনীল কান্তি দে, আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও মুসলিম সমাজ, পৃ. ৬০)। একই বৎসর "নবনুর" সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' আখ্যা দিয়া মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি জানান। "ইসলাম প্রচারক"-এর সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদও অনুরূপ দাবি উত্থাপন করেন। সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীও একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সমর্থনে এক প্রচারপত্র বিলি করেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০ ; ড. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ২খ, পৃ. ১২৩)।

১৯০৬ খৃ. পূর্ববংগে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন মোহামেডান এডুকেশনাল কন্‌ফারেন্স (Mohammadan Educational Conference)-এর অনারারী জয়েন্ট সেক্রেটারী ব্যারিষ্টার আফতাব আহমদ খাঁ। ১৯০৬ সালের ২৭-২৯ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত কন্‌ফারেন্সে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি দেশের এই অঞ্চলের অশিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন (মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, নওয়াব সলীমুল্লাহ ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৫৬)। তিনি বলেন, 'মুসলিম প্রধান পূর্ব বাঙলার উচ্চ শিক্ষার জন্য আমার প্রথম প্রস্তাব হইল এই দেশে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত (Report, All India Mohammadan Anglo-Oriental Educational Conference, p. 92)।

পরবর্তীতে বৃটিশ সরকার মুসলিম জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে ১৯১২ ইং সালের ৪ এপ্রিল ঢাকায় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। *১৯১২ সালের মে মাসে স্যার রবার্ট নাথান*(Sir Robert Nathan)-কে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠন করা হয়। নাথান কমিটির অন্যতম সদস্য নওয়াব আলী চৌধুরী প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ (Faculty of Islamic Studies) গঠনের প্রস্তাব করেন। এতদ্ভিন্ন ভারত সরকারও ১৯১২ সালের ৪ এপ্রিল এক পত্রের মাধ্যমে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ গঠনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু নাথান কমিটি ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের পরিবর্তে ইহাকে কলা অনুষদের (Faculty of Arts) অন্তর্ভুক্ত একটি বিভাগে পরিণত করেন এবং ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে কলা অনুষদের অধীনেই আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ নামে একটি বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয় (নওয়াব আলী চৌধুরী ঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১১৪, ১২১ ; আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান (১৯২১-১৯৯৬), পৃ. ৬৫; A. K. M. Ayub Ali, History of Traditional Islamic Education in Bangladesh, p. 85)।

১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে "মোহামেডান এডুকেশন এডভাইজারী কমিটি" (The Muhammadan Education Advisory committee 1914-15) ঢাকায় একটি সম্মেলনের আয়োজন করে।

ঐ সম্মেলনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশসহ ১৯৭ টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতেও আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই। (A.K.M. Ayub Ali, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬)। তাই সরকার অতীতের বিভিন্ন কমিটি ও তাহাদের সুপারিশ পর্যালোচনার জন্য ১৯৩১ সালে "The Muslim Education Advisory Committee" নামে আরেকটি কমিটি গঠন করেন যাহা 'মমিন কমিটি' হিসাবে পরিচিত (প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮)। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় নাই।

"আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার" জয়েন্ট সেক্রেটারী মাওলানা মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সর্বপ্রথম জাতীয়ভাবে একটি 'আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যায়ের রূপরেখা তুলিয়া ধরেন। তিনি তাঁহার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ১৯২০ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ পাড়ে 'দিয়াং' পাহাড়ের পাদদেশে প্রায় ছয় শত একর জমি সংগ্রহ করেন এবং প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের জন্য বাংলায় প্রতিটি জেলায় একটি বোর্ড গঠন করেন। ১৯৩৫ সালে মওলানা শওকত আলী স্বয়ং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয় "মাওলানা শওকত আলী 'আরবী বিশ্ববিদ্যালয়" (ড. সুনীল কান্তি দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭)। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহকে ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্যও তিনি প্রস্তাব করেন (ড. মুজিবুর রহমান, মাওলানা ইসলামাবাদী, মাসিক আত-তাওহীদ, জুন ১৯৭৭ খৃ., পৃ. ৩৯)।

১৯৩৭ সালে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩- ১৯৬২) অবিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পর তাঁহার উদ্যোগে ১৯৩৮ সালের ২৭ জুলাই "মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি" (The Madrasha Education Committee) গঠিত হইয়াছে যাহা 'মাওলা বক্স' কমিটি নামে খ্যাত (A.K.M. Ayub Ali, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২)। ১৯৩৯ সালে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে আগমন করিলে ছাত্ররা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। তাহাদের দাবির প্রেক্ষিতে তিনি বলিলেন, "I intend to bring into existence an Arabic University. I am waiting the report of the committee which has been set-up for the purpose and I shall do whatever is possible for the implementation of the recommendation of the Committee" (প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩)। অবশেষে "মাওলা বক্স" কমিটি ১৯৪১ সালে তাহাদের রিপোর্ট পেশ করেন। এই কমিটি তাহাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হিসাবে কলিকাতায় একটি ইসলামী শিক্ষাবিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় (University of Islamic Learning) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন।

কমিটির সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ ঃ "That the proposed University of Islamic Learning be established for the purpose of ascertaining, means of examination or otherwise, the persons who have acquired proficiency in different branches of Literature, particularly in Arabic Literature and Islamic Studies, Sciences and Arts, and for the purpose of confering upon them academic digrees, diplomas, oriental literary titles, licences, and marks of honour". (প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২)।

ইহা ছাড়া মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করা এবং দুর্বল ও অদক্ষ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ রোধ করার জন্যও কমিটি একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মাদরাসার উপর সরকার ও শিক্ষা বোর্ডের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে কমিটি অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং একক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনুভব করে। তাই কমিটি সুপারিশ করে, "The University when establieshed, will in the beginning be an affiliating one, but should be developed gradually into one which will also deal actual teaching and research in the University itself." [অর্থাৎ "বিশ্ববিদ্যালয়টি যখন প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন শুরুতেই ইহা একটি অধিভুক্তিকরণ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে কাজ করিবে, কিন্তু ক্রমান্বয়ে ইহাকে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করিতে হইবে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যিকারের শিক্ষা ও গবেষণা কর্মও অব্যাহত থাকিবে]" (প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩)। শেরে বাংলার একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে তাহা আর বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই।

এদিকে ১৯৪৬-৪৭ সালে মাদ্রাসা সিলেবাস কমিটির সভাপতি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ মোয়াজ্জম উদ্দীন হোসেন অবিলম্বে 'মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার জোর সুপারিশ করেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১-২২)। ১৯৪৯ সালে মাওলানা আকরম খাঁর (১৮৬৮-১৯৬৮) সভাপতিত্বে গঠিত "ইষ্ট বেংগল এডুকেশনাল সিস্টেম রিকন্সট্রাকশন কমিটি" (*East Bengal Educational system Reconstruction Committee*) সরকারের নিকট কতিপয় প্রস্তাব পেশ করে। উক্ত কমিটি আধুনিক শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার করিবার জন্য "ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক লার্নিং" (University of Islamic Learning) প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২, ১৬৭।) ইহার পর ১৯৫৭ সালের ৩ জানুয়ারী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে পূর্ব-পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন (The Educational Reforms Commission East Pakistan, 1957; প্রাগুক্ত পৃ. ১৬৯), ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর জনাব এস. এম. শরীফের সভাপতিত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিশন (Commission on National Education, 1958; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১) এবং ১৯৬৩ সালের ৩১ মে পূর্ব পাকিস্তান সরকার ড. এস. এম. হোসাইন (পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য)-এর সভাপতিত্বে 'ইসলামিক-এরাবিক ইউনিভার্সিটি কমিশন-১৯৬৩-৬৪' (Islamic-Arabic University Commission-1963-64) গঠিত হইয়াছিল। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬; ড. মু. সেকান্দর আলী ইব্রাহিমী, বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার অতীত ও বর্তমান, পৃ. ৮৭)। সময়মত তাহাদের রিপোর্ট প্রকাশিত হইলেও দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের দাবি বাস্তবায়িত হয় নাই।

১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর আব্দুল মোনায়েম খান ছাত্র-জনতার দাবির প্রেক্ষিতে বরিশালের কাসেমাবাদে এক

সমাবেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দিয়াছেন (দৈনিক আজাদ, ১২ অক্টোবর, ১৯৬৪)। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে সুনামগঞ্জেও একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয় (প্রাগুক্ত, ১২ ডিসেম্বর, ১৯৬৪) এবং ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫ সালে চট্টগ্রামে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেন (দৈনিক পাকিস্তান, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫), কিন্তু এই সকল প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয় নাই।

পরবর্তীতে মাওলানা ভাসানীও একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া টাঙ্গাইলের সন্তোষে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭০ সালে জাতীয় পত্রপত্রিকায় 'আমার পরিকল্পনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' নামে একটি নিবন্ধ লিখেন এবং চৌদ্দটি দেশের সাথে যোগাযোগ করেন। এই উপলক্ষে ১৯৭০, ১৯৭৩ ও ১৯৭৫ সালে তিনি কয়েকটি সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং ১৯৭৪ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজও আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন (প্রথম সমাবর্তন '৯৩, পৃ. ৩৯)।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর মাওলানা ভাসানী ছাড়াও জমিয়তে তোলাবায়ে আরাবিয়াসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ হইতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি উচ্চারিত হইতে থাকে। পরবর্তীতে মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন ও বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে তৎকালীন সামরিক আইন প্রশাসক (পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট) শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালের ১ ডিসেম্বর সরকারীভাবে দেশে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং উহা প্রতিষ্ঠার জন্য বিস্তারিত স্কীম তৈরী করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৭ সালের ২৭ জানুয়ারী খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডঃ এম. এ. বারী (তৎকালীন সভাপতি, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)-এর সভাপতিত্বে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা কমিটি ১৯৭৭" (The Islamic University Scheme Committee 1977) গঠন করেন (মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশ নং S IV/5-88/76/64 dated 27/1/1977; A.K.M. Ayub Ali, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭)।

এই কমিটি নিয়োগের উদ্দেশ্য (Terms of reference) সম্পর্কে বলা হয় ঃ (১) কলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় কিভাবে করা যায়? (২) নূতন আঙ্গিকে মাদ্রাসা শিক্ষা কিভাবে যুগোপযুগী করিয়া ইহার উন্নতি সাধন করা যায় ? (৩) ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা কিভাবে করা যায় ? উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত দায়িত্ব ছাড়াও এই কমিটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় স্থাপন করা যায়, এই শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি হইবে, এখানে শিক্ষার মাধ্যম কি হইবে, কি কি ডিগ্রী দেওয়া হবে, শিক্ষা সংক্রান্ত ও প্রশাসনিক কাঠামো কি হইবে, কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে, কিভাবে ছাত্র ভর্তি করানো হইবে ইত্যাদি বিষয়ে এই কমিটি সুপারিশ করিবেন (প্রথম সমাবর্তন '৯৩, পৃ. ৪০)।

বিচারপতি আবূ সাদাত মোহাম্মদ সায়েম ১৯৭৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বঙ্গভবনে এই কমিটির প্রথম মিটিং উদ্বোধন করেন ইহা ছাড়া অধ্যাপক আবুল ফজল (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী) উপস্থিত ছিলেন (প্রাগুক্ত পৃ. ১৯৮)। অবশেষে এই কমিটি ৭ মাস কঠোর পরিশ্রম করিবার পর ২০ অক্টোবর, ১৯৭৭ সালে ১০টি অধ্যায় সম্বলিত একটি রিপোর্ট তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমানের নিকট হস্তান্তর করে (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮ ; ড. মু সেকান্দর আলী ইব্রাহীমী পৃ. ৯৪)।

কমিটির সুপারিশকৃত একাডেমিক কাঠামো নিম্নরূপঃ (ক) ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের অধীনে বিভাগগুলি যথাক্রমেঃ (১) "আল-কুরআন ওয়া 'উলূমুল কুরআন" (বর্তমানে আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ), (২) উলূমুত-তাওহীদ ওয়াদ-দা'ওয়াহ (বর্তমানে দা'ওয়া এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ), (৩) আল-হাদীস ওয়া 'উলূমুল' হাদীস (বর্তমানে আল-হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ), (৪) আশ-শরীয়াহ ওয়া উসূলুশ-শরীয়াহ (বর্তমানে আইন ও মুসলিম বিধান), (৫) আল-ফালসাফাহ আত-তাসাওউফ ওয়াল-আখলাক। (খ) মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে বিভাগগুলি যথাক্রমে (১) 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য, (২) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, (৩) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, (৪) অর্থনীতি, (৫) রাষ্ট্রনীতি ও লোক-প্রশাসন, (৬) তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, (৭) ভাষাতত্ত্ব ও (৮) বাণিজ্য। (গ) বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে বিভাগগুলি যথাক্রমে ঃ (১) পদার্থ বিজ্ঞান, (২) গণিত, (৩) রসায়ন, (৪) উদ্ভিদ বিদ্যা, (৫) প্রাণী বিদ্যা।

ইহা ছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কয়েকটি ইনষ্টিটিউট থাকিবেঃ (১) টিচার্স ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, (২) অনুবাদ প্রকাশনা ব্যুরো, (৩) মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন ও মুসলিম বিশ্বের ভাষা শিক্ষা ইনষ্টিটিউট।

উল্লেখ্য যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্কুল কাম-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কমিটি সুপারিশ করেন যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর সন্তান-সন্ততি পড়াশুনা করিবে (প্রথম সমাবর্তন '৯৩, পৃ. ৪০, ৫৩; The First Statiute of the Islamic University, p. 5; A.K.M. Ayub Ali, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১)।

উল্লেখ্য যে, ১৯৭৭ সালের শুরুতে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। তিনি ঐ সম্মেলনে মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পেশ করেন (তৃতীয় সমাবর্তন, ৯)। ইহার পর ১৯৭৭ সালের ৩১ মার্চ হইতে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত সৌদী 'আরবের মক্কা শরীফে ও. আই. সি. (OIC)-এর উদ্যোগে মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানদের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। এই উপলক্ষে 'OIC' ইসলামী সলিড্যারিটি ফাণ্ডসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশ ও সংস্থা আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। ইহার প্রেক্ষিতে ১৯৭৯ সালে ঢাকায় একটি প্রকল্প অফিস স্থাপিত হয় এবং ড. এ. এন. এম. মমতাজ উদ্দিন চৌধুরীকে প্রকল্প পরিচালক নিযুক্ত করা হয় (প্রথম সমাবর্তন '৯৩, পৃ. ৫১)।

পরিশেষে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটাইয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য প্রেসিডেন্ট লেঃ জেনারেল (অবঃ) জিয়াউর রহমান বীর উত্তম, পি. এস. সি. ২২ নভেম্বর, ১৯৭৯ খৃ., ৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ বাংলা/ ১ মুহাররাম ১৪০০ হিজরী তারিখে আধুনিক বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও আইন শাস্ত্রের সাথে থিওলজি ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধন করিয়া দক্ষ জনশক্তি প্রস্তুত করিবার জন্য কুষ্টিয়া-যশোর জেলার সীমান্তবর্তী স্থান শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর

স্থাপন করেন (A.K.M. Ayub Ali, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২)। এই বিশ্ববিদ্যালয় একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় হইবে সেই আশা ব্যক্ত করিয়া প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন, "I hope, this university will set-up a bridge in the field of exchang thoughts among the intellectuals of the world" (A.K.M. Ayub Ali, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩ ; The Bangladesh Observer, 23 November, 1979)।

১৭৫ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নমূলক অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু হয়। পরবর্তী বৎসর ১৯৮০ সালের ২৭ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদে "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট ৮০" (ACT NO. XXXVII OF 1980) পাশ হয় (The Bangladesh Gazette, Extra ordinary, dated 27. 12. 1980, p. 01)। ১৯৮১ সালের ৩১ জানুয়ারী তৎকালীন প্রকল্প পরিচালক ড. এ.এন.এম. মমতাজ উদ্দীন চৌধুরীকে সরকার প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রারসহ বেশ কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮১ সালের ৩০ মে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য প্রেসিডেন্ট লেঃ জেনারেল (অবঃ) জিয়াউর রহমান শাহাদত বরণ করিবার পর দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং ১৯৮২ সালে লেঃ জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ দেশের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালের ১৬ জানুয়ারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান "সাদ্দাম হোসেন হল" নামে একটি হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

পরিকল্পনা মোতাবেক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০% নির্মাণ কাজ শেষ না করিতেই সামরিক সরকার এক ফরমানের মাধ্যমে শান্তিডাঙ্গা -দুলালপুরে নির্মাণের কাজ স্থগিত রাখেন। ১৯৮২ সালের ২১ জুলাই লেঃ জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ ঢাকা হইতে ৩০ কিঃ মিঃ উত্তরে গাজীপুর জেলার বোর্ড বাজারের নিকটবর্তী এক মনোরম স্থানে দ্বিতীয়বারের মত ইহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করিয়া সেখানে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকে। ১৯৮৪/৮৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করিলেও পরবর্তীতে তাহা স্থগিত করা হয়। ১৯৮৫/৮৬ শিক্ষাবর্ষে পুনরায় ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এবং যথাসময়ে সকল ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। সকল আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি সম্পাদনের মাধ্যমে ১৯৮৬ সালের ২৮ জুন 'ধর্মতত্ত্ব এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ এবং মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদদ্বয়ের আওতায় যথাক্রমে "আল-কুরআন ওয়া 'উলূমুল কুরআন" (বর্তমানে আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ) ও উলূমুত তাওহীদ ওয়াদ-দা'ওয়াহ (বর্তমানে দা'ওয়া এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ) এবং হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা এই চারটি বিভাগে সর্বমোট ৮জন শিক্ষক ও ৩০০ জন ছাত্র নিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় ঃ (১) কলা ও বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার সাথে ইসলামী শিক্ষার সংযোগ ও সমন্বয় সাধন, (২) নূতন আঙ্গিকে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন পুনর্বিন্যস্তকরণ, (৩) ধর্মীয় ও সাধারণ জ্ঞানের বিবিধ ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে দেশে একটি সুসংহত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন (A. K. M. Ayub Ali, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮; প্রস্পেক্টাস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮, পৃ. ১)। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা হইতে আগত শিক্ষার্থীদের জন্য ভিত্তিমূলক (Backgound) কোর্স হিসাবে ১০০ নম্বরের 'আরবী ও ইসলামিয়াত এবং মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা হইতে আগত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ১০০ নম্বরের ইংরেজি বাধ্যতামূলক রাখা হয় (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বি-বার্ষিক রিপোর্ট, ৮৬-৮৭/৮৭-৮৮, প্রকাশ ১৯৮৮, পৃ. ৩৩)।

১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষ হইতে 'ধর্মতত্ত্ব এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ' অনুষদে 'আইন ও শরী'আহ এবং মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে 'অর্থনীতি' বিভাগ প্রবর্তনের মাধ্যমে ৬টি বিভাগের শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু হয়।

২৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৮ সালের তৎকালীন সরকার ড. এ. এন. এম. মমতাজ উদ্দীন চৌধুরীকে তাঁহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. মুহম্মদ সিরাজুল ইসলামকে চার বৎসরের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণের পর বোর্ড বাজার ক্যাম্পাসের উন্নয়ন ও শিক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন বৃহত্তর কুষ্টিয়া-যশোর অঞ্চলের জনগণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের জন্য ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। ফলে ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ড বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং সরকার মন্ত্রী পরিষদের এক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ২ জানুয়ারী, ১৯৯০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়কে গাজীপুর ক্যাম্পাস হইতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ জাতীয় সংসদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় উহার সাবেক ক্যাম্পাস শান্তিডাঙ্গা -দুলালপুরে স্থানান্তরের কথা ঘোষণা করেন। সেই মর্মে ১৯৯০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাননীয় রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে। উক্ত বিজ্ঞপ্তির ভাষা নিম্নরূপ ঃ

"ঢাকা, ১২ই ফাল্গুন, ১৩৯৬/২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ নং শাঃ/৭-ইউ-৫.৮৭/১৭০-শিক্ষা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধিত) অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ এর ধারা ৪ (বি) মোতাবেক এবং ১৮ জুলাই ১৯৮৩ তারিখের আদেশ নং ৭-ইউ-১১/৮৩/৫১১-শিক্ষা বাতিল পূর্বক সরকার গাজীপুর জেলার বোর্ড বাজারস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ জেলার মধ্যবর্তী সীমানায় অবস্থিত শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুর নামক স্থানে স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই আদেশ ২২ জানুয়ারী, ১৯৮৯ তারিখ হতে কার্যকরী হয়েছে", [শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নং শাঃ/৮/৭-ইউ-৫/৮৭, শিক্ষা/১৭০(৬), তারিখ-১২/১১/১৩৯৬ বাংলা, ২৪/০২/১৯৯০ ইংরেজী]।

অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আসবাবপত্র কুষ্টিয়াস্থ অস্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত করা হয় এবং মূল ক্যাম্পাসের নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় পি.টি. আই. ভবনকে 'ধর্মতত্ত্ব এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ' অনুষদ ও ম্যাটস ভবনকে 'মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান' অনুষদের অফিস ও একাডেমিক ভবন হিসাবে চালানো হয়। ইহাছাড়া শহরের ভাড়া করা ভবনে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড চালানো হয়। ১৬ মে, ১৯৯০ সালে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী কাজী

জাফর আহমেদ কুষ্টিয়াস্থ অস্থায়ী ক্যাম্পাস উদ্বোধন করেন। এদিকে একটি শিক্ষাবর্ষে ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়। পরবর্তী শিক্ষা বর্ষ (৯০-৯১) হইতে আরও নূতন পাঁচটি বিভাগ যথাক্রমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য, 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রনীতি ও লোক-প্রশাসন খোলা হয় এবং প্রথম বারের মত ছাত্রী ভর্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯৯১ সালের ১৭ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বেগম খালেদা জিয়া প্রফেসর ড. মুহম্মদ সিরাজুল ইসলামের স্থলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল হামিদকে চার বৎসরের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। তিনি ভি. সি. হিসাবে দায়িত্ব লাভের পর মূল ক্যাম্পাসের নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করেন এবং ১৯৯১/৯২ শিক্ষা বর্ষ হইতে থিওলজি এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের অধীনে আল-হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ নামে একটি নূতন বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নেন। মূল ক্যাম্পাসে একটি একাডেমিক ভবন, ২টি আবাসিক হল, প্রশাসনিক ভবন ও কিছু বাসভবনসহ অবকাঠামো নির্মাণ হওয়ার পর ১ নভেম্বর, ১৯৯২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ড শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরস্থ মূল ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত করেন এবং শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করেন। ১৪ বৈশাখ, ১৪০০/ ৫ যুলকা'দ, ১৩১৪/ ২৭ এপ্রিল, ১৯৯৩ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম সমাবর্তন ১৯৯৩ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়েই ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদ প্রবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। শিক্ষকদের গবেষণা কার্যে উৎসাহ দানের জন্য প্রতিটি অনুষদে ষান্মাসিক জার্নাল প্রকাশের ব্যবস্থাসহ এম. ফিল. ও পি-এইচ. ডি. গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়।

উল্লেখ্য যে, ' OIC ' (ও.আই.সি) সর্বপ্রথম বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও পরবর্তীতে এই বিশ্ববিদ্যালয় একাধিকবার স্থানান্তরের কারণে এই সংস্থা পাকিস্তান, উগাণ্ডা, নাইজেরিয়া ও মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক মানের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। ভাইস- চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল হামিদ ও. আই. সি.-এর পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং ১৯৯২ সালে জেদ্দায় ও. আই. সি-এর মিটিং-এ অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে IDB এর আর্থিক সহযোগিতায় মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানস্থ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সফর করিয়া তাহাদের একাডেমিক অবস্থা, সিলেবাস, কার্যক্রম সংবিধি পর্যবেক্ষণ করিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে IDB ও OIC সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশ ও সংস্থা কর্তৃক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদর্শনের ব্যাপারে সাড়া পাওয়া গিয়াছে (প্রথম সমাবর্তন '৯৩, পৃ. ৫২)।

১৯৯৫ সালের ৯ মে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বেগম খালেদা জিয়া প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল হামিদ-এর স্থলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হককে ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে নিয়োগ দান করেন। তিনি বি. এন. সি.সি. ও রোভার স্কাউট কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেন। তাঁহার আমলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নির্মিত শহীদ জিয়াউর রহমান হল, খালেদা জিয়া হল, খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ গ্রন্থাগার, চিকিৎসা কেন্দ্র, অতিথি ভবন, ডরমেটরি ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস ২৯ আগস্ট, ১৯৯৫ সালে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। প্রফেসর ইনাম-উল হকের উদ্যোগে আইন ও শরীয়াহ অনুষদ নামে একটি নূতন অনুষদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহার আমলেই মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য 'মুক্তবাংলা' নির্মিত হয়। ইহা ছাড়া তাঁহার আমলেই ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের অধীনে ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগ, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ এবং ইলেক্ট্রনিক্স ও ফলিত পদার্থ বিভাগের কার্যক্রম চালু হয়।

১৯৯৭ সালে ৩ সেপ্টম্বর তারিখে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হকের স্থলে তৎকালীন সরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ কায়েস উদ্দীনকে ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে নিয়োগ দান করেন। তিনি ৩ বৎসরের অনার্স কোর্স-এর পরিবর্তে ৪ বৎসর মেয়াদি অনার্স কোর্স এবং ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের অধীনে ইনফরমেশন এণ্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিভাগ, বায়ো-টেকনোলজি বিভাগ এবং ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিভাগ নামে তিনটি বিভাগ চালু করেন। তিনিই প্রথমবারের মত ধর্ম-বর্ণ -নির্বিশেষে শিক্ষক নিয়োগের রেওয়াজ প্রবর্তন করেন। উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে আই. ডি. বি. ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক অনুদানে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, একটি একাডেমিক ভবন, অডিটোরিয়াম, মসজিদ, জিমনেশিয়াম, উপাচার্য ভবন, অভ্যন্তরীণ রাস্তাসহ বিভিন্ন নির্মাণ কাজ শুরু করেন। ২১ অগ্রায়ণ, ১৪০৬/ ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর শেখ হাসিনা সমাবর্তন '৯৯ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল উদ্বোধন করেন এবং শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০০০ সালের ১৯ অক্টোবর সরকার প্রফেসর ড. মুহাম্মদ কায়েস উদ্দিন-এর স্থলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ লুৎফর রহমানকে ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে নিয়োগ দান করেন। তিনি মাত্র ১ বৎসর ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০০১ সালের ১০ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বেগম খালেদা জিয়া প্রফেসর ড. মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান পদত্যাগ করিবার কারণে তাঁহার স্থলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানকে ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে নিয়োগ দান করেন। তিনি ২৫ পৌষ, ১৪০৮/ ৮ জানুয়ারী, ২০০২ সালে নূতন ডিজিটাল টেলিফোন (২০+৫০০) লাইনবিশিষ্ট এক্সচেঞ্জ-এর উদ্বোধন করেন। তাঁহার আমলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক ১৯.০৩.২০০২ তারিখে 'শাহ আজিজুর রহমান মিলনায়তন'

উদ্বোধন করেন এবং ১৪ চৈত্র, ১৪০৮/ ২৮ মার্চ, ২০০২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বেগম খালেদা জিয়া তৃতীয় সমাবর্তন ২০০২-এ যোগদান করেন। ইহাছাড়া প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান ২৭ জুলাই, ২০০৩ ১২ শ্রাবণ ১৪১০ তারিখে মীর মোশাররফ হোসেন একাডেমিক ভবন-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

২০০৪ সালের ৪ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বেগম খালেদা জিয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর এম রফিকুল ইসলামকে চার বৎসরের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। ভি. সি. হিসাবে দায়িত্ব লাভের পর হইতে তিনি একাডেমিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। আইন ও শরীয়াহ অনুষদের অধীনে 'আল-ফিকহ' বিভাগ চালু করেন এবং 'গণিত' বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁহার সভাপতিত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আ. ন. ম. এহ্ছানুল হক মিলন ২৮ জুন, ২০০৪ তারিখ সোমবার 'জিমন্যাসিয়ামের উডেন ফ্লোর ও বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের এক্সটেনশন ব্লক-এর শুভ উদ্বোধন করেন। ইহা ছাড়া তিনি ৩১.০৭.২০০৪ তারিখ হইতে "ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ"-এর কার্যক্রম চালু করেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম যথাক্রমে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি বা প্লানিং কমিটি, অনুষদীয় সভা, বোর্ড অব এ্যাডভান্সড্ স্টাডিজ, একাডেমিক কাউন্সিল ও সিণ্ডিকেট-এর মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়। অন্যান্য অফিসের অন্তর্ভুক্ত আছে ভাইস-চান্সেলর অফিস, ট্রেজারার অফিস, রেজিস্ট্রার অফিস, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস, অর্থ ও হিসাব অফিস, প্রকৌশল অফিস, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিস, গ্রন্থাগার অফিস, চিকিৎসা কেন্দ্র, তথ্য, প্রেস, প্রকাশনা ও জনসংযোগ অফিস, শরীরচর্চা ও শিক্ষা অফিস, কেন্দ্রীয় মসজিদ, এস্টেট অফিস, প্রক্টর অফিস, ছাত্র উপদেষ্টা অফিস, ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কম্পিউটার কেন্দ্র, বি. এন. সি. সি. অফিস, রোভার স্কাউটস অফিস, পরিবহন অফিস, প্রিন্টিং প্রেস, ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ অফিস ও আবাসিক হলসমূহ।

পরিশেষে বলা যায়, সরকার ও দাতা-দেশসমূহের প্রয়োজনীয় আর্থিক আনুকূল্য ও বিদ্যোৎসাহী জনগণের সহযোগিতার মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রত্যাশা মাফিক সম্প্রসারিত হইতে পারিবে এবং অদূর ভবিষ্যতে একটি আদর্শ আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে বিকাশ লাভ করিবে।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ**

(১) ড. সুনীল কান্তি দে, আঞ্জমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও মুসলিম সমাজ, কলিকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২; (২) ড. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২খ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩; (৩) ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, নওয়াব সলীমুল্লাহ ঃ জীবন ও কর্ম, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬ খৃ.; (৪) Report, All India Mohammadan Anglo-Oriental Educational Conference, Institute press, Aligar 1906; (৫) ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, নওয়াব আলী চৌধুরী ঃ জীবন ও কর্ম, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট ১৯৮৭ খৃ.; (৬) মোহাম্মদ তোজাম্মেল হোসেন, 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান (১৯২১-১৯৯৬), পি-এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, (অপ্রকাশিত); (৭) Dr. A.K.M. Ayub Ali, History of Traditional Islamic Education in Bangladesh, Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh, First Edition 1983; (৮) ড. মুজিবুর রহমান, মাওলানা ইসলামাবাদী, মাসিক আত-তাওহীদ, জুন-১৯৭৭ খৃ.; (৯) ড. মু. সেকান্দর আলী ইব্রাহিমী, বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার অতীত ও বর্তমান, ঢাকা, জাকিয়া পাবলিকেসান্স ১৯৯১ খৃ.; (১০) দৈনিক আজাদ, ১২ অক্টোবর ও ১২ ডিসেম্বর ১৯৬৪ খৃ.; (১১) দৈনিক পাকিস্তান, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫ খৃ.; (১২) প্রথম সমাবর্তন '৯৩, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ; (১৩) The BangladeshObserver, 23 November, 1979; (১৪) The Bangladesh Gazette, Extra ordinary, dated 27.12.1980; (১৫) The First and Second Statiute of the Islamic University, Kushtia, Bangladesh; (১৬) প্রস্পেক্টাস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮ খৃ.; (১৭) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বি-বার্ষিক রিপোর্ট, ৮৬-৮৭/৮৭-৮৮, প্রকাশ ১৯৮৮ খৃ.; (১৮) বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন, রিপোর্ট, প্রথম অংশঃ সার-সংক্ষেপ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ খৃ.; (১৯) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নং শাঃ/৮/৭-ইউ-৫/৮৭, শিক্ষা/১৭০)৬), তারিখ-১২/১১/১৩৯৬ বাংলা, ২৪/০২/১৯৯০ খৃ.; (২০) ড. ইউছুফ সিদ্দিক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কি ও কেন ? দাওয়া বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২ ইং ; (২১) Dr. M. Sekander Ali Ibrahimy, Reports on Islamic Education and Madrasha Education in Bengal (1861-1977), vol. 3-4, Islamic Foundation Bangladesh, 1947; (২২) দ্বিতীয় সমাবর্তন ও তৃতীয় সমাবর্তন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মালেক

**ইসলামী ব্যাংক** (اسلامی بینك) ঃ ইসলামী সভ্যতায় ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক চিন্তা ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাবকালে তৎকালীন মক্কায় অর্থ আমানত ও বিনিয়োগের তিনটি পদ্ধতির প্রচলন লক্ষ্য করা যায় ঃ (১) বিশ্বস্ত লোকের কাছে আমানত রাখা, (২) অংশীদারী ভিত্তিতে ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ এবং (৩) সুদে টাকা লগ্নি করা। মক্কায় বিশ্বস্ততম ব্যক্তিরূপে রাসূলুল্লাহ (স) নবূওয়াত লাভের আগেই 'আল-আমীন' হিসাবে সম্মানিত ছিলেন। বহু লোক তাহাদের ধন-সম্পদ তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিতেন। মদীনায় হিজরত করিবার সময়ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বহু লোকের অর্থসম্পদ গচ্ছিত ছিল। সেইগুলি যথাযথ মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলী (রা)-কে দায়িত্ব দিয়াছিলেন। লোকজনের সম্পদ হেফাযত ও সংরক্ষণ করা ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (স) নবূওয়াতের অনেক আগেই হযরত খাদীজা (রা)-এর কারবারে 'মুদারাবা' (দ্র.) পদ্ধতিতে অংশীদার নিয়োজিত হইয়াছিলেন (ড. মুহাম্মাদ ইউসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ১৮২)।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধি-বিধানসমূহ প্রবর্তন করা হয়। জনগণের বিশ্বাসের সকল বিচ্যুতি সংশোধন, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ বন্ধ করিবার লক্ষ্যে এই সময় সকল প্রকার সুদী কারবার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়। ইসলামের প্রথম অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময় প্রতিষ্ঠিত হয় 'বায়তুল মাল' (بيت المال)। কাঠামোগতভাবে 'বায়তুল-মাল' কোন মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান (Financial Intermediary) ছিল না, বরং ইহাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার (Exchequer) বলা যাইতে পারে। প্রাচুর্যসম্পন্ন ব্যক্তিরা বায়তুল-মালে সাহায্য পাঠাইতেন এবং অভাবগ্রস্ত লোকদের মাঝে তাহা বণ্টন করা হইত।

রিবা (সুদ) নিষিদ্ধ হইবার ফলে প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা জীবন ও সমাজে কোনরূপ বাধা বা জটিলতা সৃষ্টি হয় নাই। বরং খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে রিবা নিষিদ্ধ হইবার পর হইতে ইসলামী সভ্যতা মানবজাতিকে প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম হয়। কুরআন, সুন্নাহ এবং অনুসরণীয় ইমামগণের ইজমা' ও কিয়াসের মাধ্যমে প্রাপ্ত নীতিমালা মানবজাতির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যস্তভাবে কল্যাণ ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম (রা)-এর দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার বিশ্বস্ততার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। বহু লোক তাহাদের অর্থসম্পদ হেফাযত করিবার স্বার্থে তাঁহার নিকট জমা রাখিতে আসিতেন। হযরত যুবায়র (রা) উহা আমানত হিসাবে গ্রহণ না করিয়া কর্জ হিসাবে নিতেন। ইহার ফলে তিনি (১) ঐ অর্থ ব্যবহার করিবার সুযোগ লাভ করিতেন এবং (২) অর্থের মালিকের জন্য তাহা অধিকতর নিরাপত্তার কারণ হইত। তখনকার দিনেই হযরত যুবায়র (রা)-এর কাছে বিশ-বাইশ লাখ দিরহাম জমা হইয়াছিল (Sudin Haron & Bala Shanmugam, Islamic Banking System, Conception & Application, P. 4)।

খুলাফা-ই রাশেদীনের যুগে হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) দিরহাম জমা গ্রহণ করিয়া কূফায় তাহা ভাঙানোর স্বীকারপত্র লিখিয়া দিতেন (পূর্বোক্ত বরাত)। একইভাবে হযরত যুবায়র (স)-এর পুত্র 'আবদুল্লাহ (রা) মক্কায় দিরহাম জমা গ্রহণ করিয়া ইরাকে তাহা ভাঙানোর স্বীকারপত্র লিখিয়া দিতেন। আবদুল্লাহর ভাই মুস'আব ইরাকে সেই স্বীকারপত্র ভাঙাইয়া নগদ অর্থ প্রদান করিতেন। উমায়্যা শাসনামলে মুসলমানদের ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়। এই ক্ষেত্রে হাজ্জাজ ইব্ন য়ূসুফের সময়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে আলেপ্পোর আমীর সায়ফুদ-দাওলা হামাদানীর সময় হুণ্ডির ভিত্তিতে লেনদেনের ব্যাপক প্রচলনের তথ্য জানা যায়। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর সূচনালগ্নে/১০১০ খৃস্টাব্দে বসরায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হুণ্ডির লেনদেন এবং মুদ্রা বিনিময় ব্যবসায়ের ব্যাপক প্রসার ঘটে। খৃ. একাদশ শতকের মধ্যভাগে পারস্য দেশীয় পর্যটক নাসির-ই খুসরাও (দ্র.) বসরায় ব্যাংকিং লেনদেনের ব্যাপক প্রচলনের কথা তাঁহার সফরনামায় উল্লেখ করিয়াছেন।

ইসলামী সভ্যতার বিকাশের শুরু হইতে প্রায় হাজার বৎসরব্যাপী ইসলামের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রভাবকালে অর্থনৈতিক চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে মুসলমানদের নেতৃত্ব অব্যাহত ছিল। ইসলামী অর্থব্যবস্থার কল্যাণধর্মী আদর্শের ভিত্তিতে জনগণকে অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনার পথ দেখাইতে ইসলামের প্রথম পর্যায়ের সাহাবীগণ ছাড়াও আব্বাসী যুগের বিশিষ্ট দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ অমূল্য অবদান রাখিয়াছেন। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর আবূ য়ূসুফ (৭৩১-৭৯৮ খৃ.), মুহাম্মাদ আশ-শায়বানী (৭৫০-৮০৪ খৃ.), আবূ উবায়দ (৭৬৬-৮৩৮ খৃ.), য়াহ্য়া ইব্ন আদাম (৭৫২-৮১৮ খৃ.), আল-মুহাসিবী (৭৮১-৮৫৭ খৃ.), কুদামা ইব্ন জাফির (মৃত্যু ৯৪৮ খৃ.), ইব্নুল-মুকাফ্ফা', আল-জাহিজ, আল-মাওয়ারদী (৯৭৪-১০৫৮ খৃ.), ইব্ন হাযম (৯৯৪-১০৬৪ খৃ.), আল-ফারাবী (৯৫০ খৃ.), আল-হারীরী (১০৫৪-১১২২ খৃ.), গাযালী (১০৫৫-১১১ খৃ.), নাসিরুদ্দীন তূসী (১২০১-১২৭৪ খৃ.), ইবন তায়মিয়া (১২৬২-১৩২৮ খৃ.), ইবনুল কায়্যিম (১২৯২-১৩৫০ খৃ.), আশ-শাতিবী (মৃত্যু ১৩৮৮ খৃ.), আদ-দিমাশকী, ইব্ন খালদূন (১৩৩২-১৪০৬ খৃ.), আহ্মাদ আলী আদ-দা'লাযী (মৃত্যু ১৪২১ খৃ.) হইতে শুরু করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দিহলাভী (১৭০৩-১৭৬৩ খৃ.) পর্যন্ত ইসলামী চিন্তা, দর্শন ও মনীষার ক্ষেত্রে বিরাট সংখ্যক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অর্থনৈতিক চিন্তার বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়াছেন।

সরকারী আয়-ব্যয়, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, বিনিময় বাণিজ্য, কর, শ্রম বিভাজন, একচেটিয়াবাদ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ তথা অর্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁহাদের অবদান সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীকে সামনের দিকে আগাইয়া যাওয়ার পথ দেখাইয়াছে। তাঁহাদের চেষ্টা ও অবদান পদ্ধতিগত অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে হাজার বৎসরের একটি অব্যাহত ধারা রচনা করিয়াছে। অন্য কোন সভ্যতায় অর্থনৈতিক চিন্তার এমন ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা দেখা যায় না। এখানে কয়েকজন পূর্বসূরী চিন্তাবিদ ও তাঁহাদের অবদান সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে কিছুটা ধারণা পেশ করা হইল।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর যোগ্য ছাত্র বাগদাদের প্রধান বিচারপতি ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে অর্থনৈতিক বিধান রচনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁহার 'কিতাবুল-খারাজ' বিধিবদ্ধ অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি সুপ্রাচীন মূল্যবান দলীল। সামষ্টিক অর্থনীতিতে (Macro Economics) তিনি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়াছেন। তিনি জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, কর আরোপ ও আদায়ের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও সমতা রক্ষা, কৃষি উন্নয়ন এবং কৃষি ভূমির উপর কর আরোপের ব্যাপারে মূল্যবান সুপারিশ পেশ করেন। সরকারী অর্থায়ন এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়েও তাঁহার আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। আবূ য়ূসুফের অর্থনৈতিক চিন্তা ছিল পরবর্তী কালের ইসলামী গবেষকদের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ।

**ইমাম মুহাম্মাদ ইবুনল হাসান আশ-শায়বানী** (র) তাঁহার গ্রন্থ 'কিতাবুল-ইকতিসাব ফির্-রিয্ক আল-মুসতাতিবাহ' (দার আল-কুতুব আল-ইসলামিয়া, বৈরূত ১৯৮৬)-এ সৎ উপার্জন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ইজারা (ভাড়া), তিজারা (ব্যবসা), যিরা'আ (কৃষি) এবং সিনা'আ (শিল্প) প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁহার পদ্ধতিগত আলোচনা ও সুপারিশ অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। শায়বানী মনে করিতেন, একজন মুসলিম তাহার আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে জনকল্যাণের নীতি অনুসরণ করিবেন। তিনি হইবেন অমুখাপেক্ষী, পর-মুখাপেক্ষী হইবেন না। তাঁহার মতে, কৃষিকাজই সর্বোত্তম পেশা। সমাজের জন্য ইহা সবচাইতে অপরিহার্য ও কল্যাণধর্মী। এই

কারণে সমকালীন ইমাম ও ফকীহদের মধ্যে তিনি মৌলিকত্বের দাবিদার। শায়বানী লোকদেরকে সংসারত্যাগী না হইয়া নিজ সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য যতটুকু প্রয়োজন অন্তত ততটুকু আয় করিবার জন্য চেষ্টা চালাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'কিতাবুল-আসল' (করাচী, ইদারা আল-কুরআন ওয়াল-'উলূম আল-ইসলামিয়া) নামক গ্রন্থে এবং অন্যান্য রচনায় সালাম (অগ্রিম ক্রয়), শিরকাত (অংশীদারিত্ব) ও মুদারাবা (মুনাফায় অংশীদারিত্ব) ইত্যাদি লেনদেন সম্পর্কে মূল্যবান আলোকপাত করিয়াছেন (মুহাম্মাদ নাজাতুল্লাহ সিদ্দীকী, ইসলামী ব্যাংকিং, পঞ্চম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জানু.-জুন ১৯৯৯, পৃ. ৯)।

**আবূ 'উবায়দ আল-কাসিম ইবন সাল্লাম** (৭৬৬-৮৩৮ খৃ.) তাঁহার 'কিতাবুল আমওয়াল' (দারুল-কুতুব আল-ইসলামিয়া, বৈরূত ১৯৮৬) নামক পুস্তকে রাষ্ট্রের নাগরিক ও শাসকের মধ্যকার সম্পর্ক নিরূপণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি শাসক ও জনগণের পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যাকাত, 'উশর, খুমুস, ফায়, খারাজ, জিযয়া ইত্যাদি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ পেশ করিয়াছেন। ইসলামের প্রথম দুই শতাব্দীর অর্থনৈতিক ইতিহাস হিসাবে তাঁহার গ্রন্থ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ (পূর্বোক্ত, পৃ. ১০)।

**আবূ আবদুল্লাহ আল-হারিছ ইবনে আসাদ আল-'আনাযী আল-মুহাসিবী** (৭৮১-৮৫৭ খৃ.) 'রিসালাহ আল-মাকাসিব ওয়াল-ওয়রা শুবুহাহ' নামক গ্রন্থে বলেন, ভোগ ও ব্যবহারে শারী'আত পরিপন্থী সব কিছু বর্জন এবং জীবন যাপনে যুহ্দ (মিতাচার) ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করিবার মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতার বিস্তার ঘটাইতে হইবে। এইভাবেই একটি দায়িত্বশীল দরদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

**আবুল হাসান আলী** ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাবীব আল-বাসরী আল-বাগদাদী আল-মাওয়ারদী (৯৭৪-১০৫৮ খৃ.) ইরাকের বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবনের দীর্ঘ সময় বাগদাদে অবস্থানকালে প্রধান কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। শাসকের কর্তব্য, সরকারী আয় ও ব্যয়, সরকারী জমি, খাস জমি ইত্যাদি বিষয়ে তিনি তাঁহার 'আল-আহাকামুস-সুলতানিয়া' (দার আল-ফিকর, বৈরূত ১৯৮৩) নামক গ্রন্থে মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, একজন আদর্শ শাসকের দায়িত্ব হইবে: (১) বাজার তদারকী, (২) সঠিক ওযন নিশ্চিত করা, (৩) প্রতারণা রোধ এবং (৪) ব্যবসায়ী ও কারিগরদের লেনদেনে শরী'আহর নিয়ম-কানূনের অনুসরণ নিশ্চিত করা। অর্থনৈতিক আচরণ সম্পর্কে তিনি তাঁহার 'কিতাব আদাবিদ-দীন ওয়াদ-দুন্য়া' (দার ইহ্য়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত ১৯৭৯) নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সৎ উপার্জনের প্রধান উপায় হইল কৃষিকাজ, পশুপালন, ব্যবসা ও শিল্প (পূর্বোক্ত, ১৮৭)।

**আবূ মুহাম্মদ আলী** ইব্ন আবূ উমার আহ্মাদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন হায্ম আল-কুরতুবী আল-আন্দালুসী (৯৯৪-১০৬৪ খৃ., জন্ম স্পেনের কর্ডোভায়)-এর প্রধান গ্রন্থ 'আল-মুহাল্লা শারহু আলা মিনহাজিত তালিবীন।' তাঁহার মতে, গরীব মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব ধনীদের নিতে হইবে। এই দায়িত্ব ধনীরা এড়াইয়া যাইতে চাহিলে তাহাদের সম্পদের অংশ এই কাজে ব্যয় করিতে বাধ্য করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ভূমিস্বত্ব এবং কৃষি অর্থনীতি সম্পর্কে এবং কর আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন। পীড়ন ও শোষণমূলক বা জবরদস্তী করের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কেহ যাকাত পরিশোধ না করিয়া মারা গেলে তাহার সম্পদ হইতে রাষ্ট্রকে যাকাত আদায় করিতে হইবে।

**আবূ হামিদ** মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মাদ আত-তূসী আশ-শাফি'ঈ আল-গাযালী (১০৫৫-১১১১ খৃ.) বলিয়াছেন, একজন ব্যবসায়ী এমনভাবে তাহার দায়িত্ব পালন করিবে যাহাতে তাহার সামাজিক বাধ্যতামূলক কর্তব্য বা 'ফরযে কিফায়া' পালিত হয় (ইহ্য়া উলূম আদ-দীন, মুসতাফা বাবিল-হালাবী, মিসর ১৯৩৯, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৫)। শারী'আতের উদ্দেশ্য হইতেছে জনগণের কল্যাণ সাধনের মাধমে তাহাদের আকীদা-বিশ্বাস, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের সংরক্ষণ করা। যাহা কিছু এই পাঁচটি বিষয়ের সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করে তাহাই জনস্বার্থ বলিয়া গণ্য এবং উহাই কাম্য। তাঁহার মতে, সাধারণভাবে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য যতটুকু আয় দরকার, তাহার চাইতে বেশী বা কম আয় করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে (পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৮)। ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে থাকিবে আসবাবপত্র, বিবাহ ও সন্তান পালন, আর কিছু সম্পত্তি (পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৫)। প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জন করিয়া তাহা মজুত রাখা এবং গরীব ভাইদের সহায়তা না করা যুলুমের নামান্তর। জনগণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের শিকার হইলে খাদ্য-বস্ত্র ছাড়াও সরকারী কোষাগার হইতে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্যও তিনি সরকারকে তাগিদ দিয়াছেন। শ্রম বিভাগ ও মুদ্রার ক্রমবিকাশেও গাযালীর অবদান মূল্যবান। 'রিবা আল-ফাদল' প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইহা মুদ্রার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী (পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৯)। তিনি যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করিবার জন্য, মুদ্রা গচ্ছিত রাখিবার ফলে সেই প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

**নাসিরুদ্দীন আত-তূসী** (১২০১-১২৭৪ খৃ.) তাঁহার 'রিসালা মালিয়াত' গ্রন্থে করের বোঝা কমাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহার মতে, উন্নয়নের জন্য সঞ্চয়ের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি স্বর্ণালংকার ও আবাদযোগ্য জমি ক্রয় করিবার বিরোধিতা করিয়াছেন। তিনি আড়ম্বরপূর্ণ ভোগব্যয় তথা বস্তুবাদী ও ভোগবাদী জীবনধারার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। সঠিক অর্থনৈতিক ভিত্তি অর্জন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করিবার মধ্যেই জনগণের সমৃদ্ধি এবং শাসকদের সাফল্য নিহিত বলিয়া তিনি মত দিয়াছেন।

**তাকিয়্যুদ্দীন আবূ আব্বাস** আহ্মাদ ইব্ন আবদুল হালীম ইব্ন আবদুস সালাম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ **ইব্ন তায়মিয়া** আল-হাররানী আল-হাম্বালী (১২৬২-১৩২৮ খৃ.)-এর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'আল-হিসবাহ ফিল-ইসলাম'। এই গ্রন্থে তিনি চুক্তি ও তাহার রাস্তবায়ন, দাম ও ন্যায্য মূল্য, বাজার তদারকী, সরকারী অর্থব্যবস্থা, জনগণের প্রয়োজন পূরণে সরকারের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমান বিশ্ব যে অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্য অ্যাডাম স্মীথের কছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, অ্যাডাম স্মীথের পাঁচ শত বৎসর পূর্বে ইমাম ইবন তায়মিয়া সেই সম্পর্কে ধারণা পেশ করিয়াছেন (মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা, সেন্ট্রাল শরীয়া বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ)। প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'আল-হিসবাহ'র ধারণা অর্থনীতির ইতিহাসে ইব্ন তায়মিয়ার মৌলিক চিন্তার ফসল। 'আল-হিসবাহ' নামক প্রতিষ্ঠান সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে কাজ করিবে এবং অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রীর যোগান নিশ্চিত করিবে, শিল্প, ব্যবসা ও অন্যান্য সেবা তদারকি করিবে, দ্রব্যের

মান ও পরিমাপ যাচাই করিবে এবং মজুতদারী, মুনাফাখোরী, একচেটিয়া কারবার, ফটকাবাজারী, জুয়া ও সূদের কারবারসহ অর্থনৈতিক অপরাধসমূহ দমন করিবে। ইবন তায়মিয়া সম্পদের মালিকানার ধারণা সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

**শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবূ বাকর ইবনুল কায়্যিম** (১২৯২-১৩৫০ খৃ.)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আত-তুরুক আল-হুকমিয়্যা'। তিনি ন্যায়সঙ্গত মূল্য, যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ, উপযুক্ত মজুরী এবং সঙ্গত মুনাফার প্রবক্তা ছিলেন। একচেটিয়া কারবার অথবা দুর্বল বাজার ব্যবস্থাপনা মুকাবিলা করিবার উপায় নিয়া তিনি আলোচনা করিয়াছেন। বাজার দর নিয়ন্ত্রণের একটি নীতিমালাও তিনি পেশ করিয়াছেন। ইবন তায়মিয়ার মতো তিনিও প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'হিসবাহ' সংস্থার সমর্থক ছিলেন। তাঁহার মতে, শারী'আতের উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের জ্ঞানগত উৎকর্ষ সাধন এবং তাহার ইহজাগতিক ও পরকালীন কল্যাণসাধন। সার্বিক ন্যায়বিচার, দয়া, সমৃদ্ধি ও জ্ঞানের মধ্যে এই কল্যাণ নিহিত। কোন সমাজে ন্যায়বিচারের পরিবর্তে যুলুম, দয়ার পরিবর্তে কঠোরতা, কল্যাণের পরিবর্তে কার্পণ্য এবং জ্ঞানের বদলে মূর্খতা প্রবল হইলে সেখানে শারী'আতের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইয়া যায়। তাঁহার অর্থনীতি-চিন্তার প্রধান লক্ষ্য ছিল ঃ ১. সুবিচার (আদল) প্রতিষ্ঠা, ২. জনস্বার্থ (আল-মাসলাহা আল-'আম্মাহ) সংরক্ষণ, ৩. জনস্বার্থ ও সুবিচার বিরোধী কাজ (সাদ্দ আয়-যারা'ই) প্রতিহতকরণ।

**আবূ ইসহাক আশ-শাতিবীর** (মৃত্যু ১৩৮৮ খৃ.) সর্বাধিক আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'আল-মুওয়াফিকাত ফী উসূলিশ-শারী'আহ'। শারী'আহর প্রকৃত উদ্দেশ্য (মাকাসিদ আশ-শারী'আহ) কিভাবে হাসিল হইবে, তাহার পদ্ধতি ও কর্মকৌশল সম্পর্কে তিনি মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন। শারী'আহর উদ্দেশ্য বাস্তবানের দৃষ্টিতেই তিনি রাষ্ট্রের ভূমিকা নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, রাষ্ট্রের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারমূলক চারটি কাজ হইল ঃ (১) যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, (২) জীবনের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণ, (৩) সম্পত্তি সংরক্ষণ, সম্পদের অপচয় রোধ ও অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হইতে বিরত রাখা এবং (৪) নেশা জাতীয় যাবতীয় উপকরণ এবং বিচারাবোধ বিনষ্টকারী সব দ্রব্যের উৎপাদন, বিপণন ও ভোগ নিষিদ্ধ করা। ইমাম শাতিবী মানুষের চাহিদা বা প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার অনুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেন ঃ (১) অপরিহার্য (দারুরিয়াহ), (২) প্রয়োজনীয় (হাজিরাহ) এবং (৩) উৎকর্ষমূলক (তাহসনিয়াহ)'। ইমাম শাতিবীর মতে, সকল নাগরিকের জরুরী বা অত্যাবশ্যকীয় পাঁচটি চাহিদা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারমূলক দায়িত্ব। মানুষের এই পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজন নিশ্চিত ও হিফাযত করিবার মধ্যেই পার্থিব জীবনের শান্তি ও সফলতা এবং আখিরাতের মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত। এই পাঁচটি মৌলিক চাহিদা ও অধিকার হইল ঃ (১) বিশ্বাস (আদ-দীন), (২) জীবন (আন-নাফস), (৩) বংশধর (আন-নাসল), (৪) সম্পত্তি (আল-মাল) এবং (৫) বুদ্ধিমত্তা (আল-'আক'ল)।

**ওয়ালিয়্যুদ্দীন আবদুর রহমান ইব্‌ন খালদূন (১৩৩২-১৪০৬ খৃ.)** একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে বিশ্বখ্যাত হইলেও দীর্ঘকাল পর এখন তাঁহাকে অনেকেই অর্থনৈতিক চিন্তার অন্যতম আদি পিতা হিসাবেও স্বীকার করিয়াছেন। ইব্‌ন খালদূন তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ আল-মুকাদ্দিমা'য় (দার আল-কালাম, বৈরূত ১৯৮১ খৃ.) (১) শ্রম বিভাজন, (২) মূল্য পদ্ধতি, (৩) উৎপাদন ও বন্টন, (৪) মূলধন সংগঠন, (৫) চাহিদা ও যোগান, (৬) মুদ্রা, (৭) জনসংখ্যা, (৮) বাণিজ্যচক্র, (৯) সরকারী অর্থব্যবস্থা, (১০) উন্নয়নের স্তর এবং এমনি আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেন। শ্রম বিভাজন ও ইহার ইতিবাচক ফল সম্বন্ধে ইবন খালদূনের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দেখাইয়াছেন, একজন গম উৎপাদনকারীকে তাহার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ছয় হইতে দশ ধরনের সেবা নিতে হয়। এইভাবেই পরস্পর নির্ভরতার মধ্য দিয়া প্রাচুর্য আসে। তিনি বিভিন্ন পেশার সামাজিক উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং উৎপাদনের সামাজিক সংগঠনে মানবীয় শ্রমের গুরুত্ব তুলিয়া ধরেন। ইবন খালদূনের শ্রমের মূল্যতত্ত্বে শ্রমিকের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ভূমিকা স্বীকৃত হইয়াছে। দারিদ্র্যের ভিত্তি ও তাহার কারণ নিয়াও তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। ইবন খালদূন তাঁহার 'কিতাব আল-'ইবার' নামক গ্রন্থে রাষ্ট্রসমূহের ধনী কিংব দরিদ্র হওয়ার কারণ চিহ্নিত করেন এবং ধনী ও গরীব দেশগুলির মধ্যে বিনিময়ের হার, আমদানী ও রফ্‌তানীর প্রবণতা, উন্নয়নের উপর অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রভাব প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া বহু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তাঁহার এই তত্ত্ব আধুনিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের আদি সূত্র বলিয়া বিবেচিত। তিনি সোনা-রূপাকে যে অর্থে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করিয়াছেন এবং উহার ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন, এই কারণে তাঁহাকে বাণিজ্যবাদীদের পূর্বসরী হিসাবেও গণ্য করা হয়।

ইব্‌ন খালদূনের মতে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরস্পর নির্ভরশীল। ইতিহাস ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের উপর তিনিই প্রথম গুরুত্ব দিয়াছেন। এই ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রপথিক। তাঁহার 'সভ্যতার চক্রতত্ত্ব'কে স্পেঙ্গার তুলনা করিয়াছে জে. আর. হিক্‌সের বাণিজ্য চক্রতত্ত্বের সহিত। কীনসের বহু শতাব্দী আগে ইব্‌ন খালদূন অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখিতে ও ব্যবসায়ের মন্দা কাটাইয়া উঠিতে সরকারী ব্যয়ের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন।

তাঁহার মতে জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জনসংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জনসংখ্যা বেশী হইলে শ্রম বিভাজন ও বিশেষীকরণ সহজ হয়। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, বিলাস দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে ও শিল্পে বৈচিত্র আসে। তাঁহার মতে, প্রাকৃতিক সম্পদ নয়; বরং বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিকদের দক্ষতার উপর ভিত্তি করিয়া শ্রমের আন্তর্জাতিক বিভাজন ঘটে।

অনেকে তাঁহাকে রিকার্ডো, প্রুঁধো, মার্কস, এঙ্গেল্‌স প্রমুখের অগ্রবর্তী ও পূর্বসূরী মনে করেন। শূমপীটার, জে. স্পেঙ্গার, ফ্রাঞ্জ রোজেনথাল, টি.বি. আয়ারভিং ও বোলাকিয়াসহ বহু য়ুরোপীয় গবেষক ইবন খালদূনের অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার জন্য তাঁহাকে আধুনিক অর্থনীতির অন্যতম পুরোধা হিসাবে বিবেচনা করিয়াছেন।

**শাহ্‌ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দিহ্‌লাবী** (১৭০৩-১৭৬৩ খৃ.) তাঁহার 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ব্যক্তিগত আচরণ ও সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি সম্পর্কে শারী'আহর দৃষ্টিকোণ হইতে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, বৈরূত, দার আল-মা'রিফাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩)। তাঁহার মতে, সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের সার্বিক কল্যাণ তাহাদের পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে নিহিত। বিনিময়, চুক্তি,

মুনাফা, ভোগ, ভাগচাষ ইত্যাদির মাধ্যমে এই সহযোগিতা বিকশিত হয়। কিন্তু সুদ ও জুয়ার মত বিষয়গুলি সমাজে সহযোগিতার সেই কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ নষ্ট করে। জনগণের অজ্ঞতা, লোভ ও আশাকে কাজে লাগাইয়া জুয়া হইতে অর্থ আয় করা হয়। ইহার সহিত মানবিক সহযোগিতা বা সভ্যতার সম্পর্ক নাই। সুদ নিষিদ্ধ হইবার ব্যাপারেও তিনি একই রকম ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

তাঁহার মতে, সভ্যতার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য মানবিক সহযোগিতার কাঠামো উন্নয়ন প্রয়োজন। এই সহযোগিতার ক্ষেত্র রচনার জন্য সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করিয়া আবাদী জীম ভাগ করা উচিত। মসজিদের মতই সমস্ত জমি ভ্রমণকারীদের আশ্রয়স্থল। 'আগে আসিলে আগে পাইবে' নীতির ভিত্তিতে সবাইকে এইসব সম্পদে অংশ দিতে হইবে। মালিকানার অর্থ হইল 'সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার'। সরকারী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার মত হইল, প্রতিটি সভ্য সমাজের জন্য একটি সরকার থাকিবে। সরকার দেশরক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার কায়েম, জনগণের স্বার্থে ঘর-বাড়ী, রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ করিবে। এই ধরনের কাজ করিবার জন্য সরকারকে অবশ্যই সামর্থ্যবানদের উপর কর আরোপ করিতে হইবে। ইমাম শাতিবীর মত তিনিও মানুষের চাহিদাকে প্রয়োজনীয়, আরামদায়ক ও বিলাসমূলক এই তিনটি ক্রম-অগ্রাধিকারে ভাগ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এক শ্রেণীর লোকের বিলাস ও ভোগের চাহিদা মিটাইতে পৃথিবীর সম্পদরাজি বিলাস দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করিবার ফলে সাধারণ মানুষের চাহিদা উপেক্ষিত হয়।

শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র) ভারতবর্ষে দশজন মুগল শাসকের শাসনকাল প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের পতনের জন্য প্রধান দুইটি বিষয়কে দায়ী করেন। (এক) অনুৎপানশীল কাজে ব্যয় এবং (দুই) চাষী, ব্যবসায়ী ও কারিগরদের উপর উচ্চহারে কর আরোপ (পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৫-১০৬)। তিনিই প্রথম অনুধাবন করেন যে, মধ্যযুগের অবসানে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটিতেছে। এই যুগে তলোয়ারের পরিবর্তে কলমকে প্রাধান্য দিতে হইবে।

ইসলামী জ্ঞান ও চিন্তার পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ইজতিহাদকে তিনি সকল যুগের জন্য ফরযে কিফায়া বলিয়া উল্লেখ করেন এবং ইজতিহাদের নিয়ম-নীতি, সংবিধান ও শর্তাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের যমানার নির্বোধ ব্যক্তিরা ইজতিহাদের নামে ক্ষেপিয়া উঠেন। উহাদের নাকে উটের মত দড়ি বাঁধা আছে। তাহারা জানেন না কোন দিকে চলিতেছেন। তিনি ইসলামের নৈতিক, তমুদ্দুনিক ও আইনগত ব্যবস্থাকে লিখিত আকারে পেশ করিবার উদ্যোগ নেন। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা', 'ইযালাতুল খাফা' প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা ছাড়াও কুরআন-হাদীছের জ্ঞানের সহিত জনগণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়িয়া তুলিতে তিনি তখনকার সামাজিক ভাষা ফারসীতে আল-কুরআন তরজমা করেন এবং হাদীছের প্রথম সংকলিত গ্রন্থ 'মুওয়াত্তা ইমাম মালিক-এর তরজমা করেন এবং তাহাতে টীকা সংযোজন করেন। শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণের চেষ্টায় ভারতবর্ষে কুরআন ও হাদীছ চর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। পারিবারিক জীবন সংগঠন, সামাজিক রীতি-নীতি, রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা, দেশ শাসন, সামরিক সংগঠন প্রভৃতি দিক নিয়া তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন।

সমাজ-সভ্যতার বিপর্যয়ের কারণগুলি চিহ্নিত করিয়া 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'য় তিনি লিখিয়াছেন, "কোন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সভ্যতার বিকাশধারা অব্যাহত থাকিলে তাহাদের শিল্পকলা পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। অপরদিকে শাসকগোষ্ঠী ভোগবিলাস, আরাম-আয়েশ ও ঐশ্বর্যের জীবন বাছিয়া নিলে তখন তাহারা তাহাদের আয়েশী জীবনের বোঝা শ্রমিক শ্রেণীর উপর চাপায়। ফলে সমাজের অধিকাংশ লোক মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয়। জনগণকে অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে জীবনযাপনে বাধ্য করিলে সমাজ জীবনের নৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয়। মানুষ তখন রুযি-রুটির জন্য পশুর মত কঠোর পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়। এই চরম নির্যাতন ও অর্থনৈতিক দুর্ভোগ হইতে মানুষকে মুক্ত করিতে আল্লাহর পক্ষ হইতে পথনির্দেশ আসে। অর্থাৎ স্রষ্টা নিজেই বিপ্লবের আয়োজন করেন। জনগণের বুকের উপর হইতে অবৈধ শাসকচক্রের বোঝা সরাইবার ব্যবস্থা তিনি করেন। রোম ও পারস্যের শাসকরা যুলুমবাজির পথে আগাইয়াছিল। তাহাদের ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার যোগান দিতে গিয়া জনসাধারণকে পশুর স্তরে নামিয়া আসিতে হইয়াছিল। এই যুলুমশাহীর প্রতিকারের জন্যই আরবের জনগণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রেরণ করা হইয়াছিল। মিসরে ফিরাউন বা ফারাওদের ধ্বংস এবং রোম ও পারস্য সম্রাটের পতন এ নীতি অনুসারে নবুওয়াতের আনুষঙ্গিক কর্তব্যরূপে প্রতিপালিত হইয়াছে।"

মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের ক্রান্তিকালে শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহর তত্ত্ব তাঁহার শতবর্ষ পরের চিন্তানায়ক কার্ল মার্ক্সের চাইতেও অধিক বিপ্লবী ছিল। কিন্তু জার্মানীর য়াহূদী পরিবারের সন্তান কার্ল মার্ক্স তাঁহার সময়ের সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র লণ্ডনে বসিয়া তাহার চিন্তাকে সেই যুগের সবচাইতে আধুনিক গণমাধ্যমের সাহায্যে সারা দুনিয়ায় ছড়াইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। অন্যদিকে শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ কাজ করিয়াছেন একটি পতনমুখী সভ্যতার রাজধানী দিল্লীতে বসিয়া। কোন গণমাধ্যম দূরে থাকুক, তাঁহার ধারণাকে হজম করিবার মত লোক তাঁহার চারিপাশে খুবই কম ছিল। তাঁহার মূল্যবান গ্রন্থসমূহ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় দেড় শত বৎসর লাগিয়াছে (ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা, সেন্ট্রাল শরীয়া বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ)।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তার এক অসামান্য ধারাবাহিকতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাইতে পারে। দীর্ঘ হাজার বৎসরব্যাপী তৈয়ার করা এই পথ বাহিয়াই বর্তমান শতকের মধ্যভাগ হইতে ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তা ও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বিকাশে উপমহাদেশের চিন্তাবিদগণ বিশিষ্ট ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছেন। আল্লামা হিফযুর রহমান, সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, ডক্টর য়ূসুফুদ্দীন, ডক্টর আনোয়ার ইকবার কোরেশী, শেখ মাহমূদ আহমাদ, মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ডক্টর নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, প্রফেসর খুরশীদ আহমাদ, ডক্টর এম. উমার চাপরা, বিচারপতি তাকী উছমানীসহ উপমহাদেশীয় মনীষিগণ বিশ্ববাসীর জন্য পুনরায় ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-এর দিগন্তকে আলোকিত করিয়াছেন (পূর্বোক্ত)।

**সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার উত্থানের পটভূমি** ঃ মধ্যযুগে পশ্চিমা দুনিয়া যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন, প্রাচ্য তখন ছিল ইসলামের আলোকপ্রভায় উদ্ভাসিত। সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া মাত্র এক শত বৎসরের মধ্যে ইসলাম অর্ধ পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বস্তুগত উৎকর্ষের জোয়ার সৃষ্টি করে। মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার ক্ষেত্রে মধ্যযুগে যে উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, আল-কুরআন ও

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ ছিল উহার ভিত্তি ও প্রেরণা। পরবর্তীতে ইসলামী সংস্কৃতি ও জীবনধারায় এই দুই প্রধান উৎসের সহিত মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ফলে উদ্ভূত নানা অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে এবং বাহ্যিক আগ্রাসনের শিকার হইয়া মুসলমানগণ সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকাশে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা হারান। আদর্শচ্যুত মুসলমানদের এমনি অসংহত, ক্ষয়িষ্ণু ও বিক্ষিপ্ত অবস্থার মধ্যেই তের শতকের মধ্যভাগে বাগদাদ ও মধ্য এশিয়া হালাকু খানের হাতে ধ্বংস হয়। বাগদাদের পর কর্ডোভা, দিল্লী, ইস্তাম্বুল ক্রমশ পতনের সম্মুখীন হয়।

চতুর্দশ ও ষোড়শ শতকের য়ুরোপীয় রেনেসাঁর পর পশ্চিমা নবোদ্ভূত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করিয়া কুরআনের প্রভাবমুক্ত বিকৃত আদর্শের প্রসার ঘটাইতে সমর্থ হয়। মুসলমানগণ ইসলামের উদার বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বা উম্মাহ-চেতনা ও ভ্রাতৃত্ববোধ হারাইয়া ফেলে। পশ্চিমা এই নূতন জড়বাদী ও ভোগবাদী সভ্যতার সবচাইতে শক্তিশালী হাতিয়ার ও শোষণযন্ত্ররূপে হাজির হয় সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা। য়াহূদীরাই প্রথমে ব্যাংক ব্যবসায়ে সুদের প্রবর্তন করে। খৃস্টানরা গোড়াতে ইহার বিরোধিতা করে। কিন্তু পরে তাহারাও শোষণমূলক এই সুদী কারবারে জড়াইয়া পড়ে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী চিন্তার উন্মেষযুগে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১১৫৭ খৃস্টাব্দে ভেনিসে প্রথম আধুনিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর ১৪০১ সালে বার্সেলোনায় দীর্ঘ প্রায় আড়াই শত বৎসর পর প্রতিষ্ঠিত 'ব্যাংক অব ডিপোজিট' আধুনিক ব্যাংকের তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। স্বীকৃত প্রথম আধুনিক ব্যাংকরূপে ১৫৮৭ সালে ভেনিসে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ব্যাংক ডেল্লা পিজা দ্যা রিয়ালটো'। ইহার পর ১৬০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ডাচ আমস্টার্ডাম ব্যাংক'। ইহা য়ুরোপে আধুনিক ব্যাংকিং-এর মডেল হিসাবে কাজ করিয়াছে (Glyn Davis, A Hsitory of Money From Ancient Times to the Present Day, 3rd ed., Cardiff, University of Wales Press, 2002)।

**সুদ সম্পর্কে বিভিন্ন যুগে প্রচলিত ধারণা ও মনোভাব** ঃ সুদ (দ্র. রিবা) হইতেছে অর্থনীতির সবচাইতে প্রাচীন ও জটিল সমস্যা। মানুষের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সূচনাকাল হইতেই সুদ সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনা ও বিতর্ক চালু রহিয়াছে। মিসর, গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ষের মত প্রাচীন সভ্য দেশগুলিতে বহুকাল আগেই সুদ বিষয়ক আইন-কানুন প্রণীত হয়। দুনিয়ার সকল প্রধান ধর্মে সুদকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। বেদ, তাওরাত, ইনজীল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে সুদ সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে। রোমীয় আইনশাস্ত্রে এবং হিন্দু ধর্মদর্শনে সুদের নিন্দা করা হইয়াছে। য়াহূদী সংস্কারকগণ সুদকে নিষিদ্ধ মনে করিতেন। ঈসায়ী ধর্মবেত্তা ও পাদ্রীগণ তাওরাত ও যাবূরের বিধান অনুসারে সুদ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। (ডক্টর মুহাম্মাদ য়ূসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯-৩২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৮৩; আফজালুর রহমান, ইকনোমিক ডকট্রিনস অব ইসলাম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১; ডক্টর আহমাদ আবদুল আযীয আন-নাজ্জার, মোহাম্মদ সামির ইবরাহীম ও মাহমূদ নোমান আল আনসারী, ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন? পৃ. ৩৩-৩৪, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১৯৮৩)। সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টোটলের মত প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ সুদকে ঘৃণার চোখে দেখিয়াছেন। অর্থকে পণ্যের মত বেচাকেনা করাকে তাহারা কৃত্রিম জালিয়াতি কারবার বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন (এরিস্টোটল, পলিটিক্স, ডক্টর মুহাম্মদ য়ূসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯-৩২; ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন? পৃ. ৩৩)।

আরবের জাহিলী যুগেও সুদের অর্থকে সাধারণভাবে অপবিত্র মনে করা হইত। য়ুরোপীয় দেশগুলিতে ধর্ম ও আইনের চোখে সুদ নিষিদ্ধ ও নীতিবিরুদ্ধ গণ্য হইত। লণ্ডনের অধিবাসীরা সুদখোর য়াহূদীদের শোষণে ক্ষিপ্ত হইয়া মধ্যযুগে বহু য়াহূদীকে হত্যা করিয়াছিল। জনগণের চাপে বাধ্য হইয়া প্রথম এডওয়ার্ড ১২৯০ খৃস্টাব্দে বৃটেন হইতে য়াহূদীদের বিতাড়িত করিয়াছিলেন। সেই সাথে সুদের ব্যবসাকে তিনি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯-৩২)।

আধুনিক কালের একটি নূতন অর্থনৈতিক দর্শনের স্রষ্টা কার্লমার্ক্স সুদের ব্যবসায়ীকে 'বিকট শয়তান' নামে অভিহিত করিয়াছেন (পূর্বোক্ত)। সুদখোরকে তিনি তুলনা করিয়াছেন ডাকাত ও সিঁদেল চোরের সহিত। সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে সুদ 'শ্রমিক সমাজের উপর একটি অসহনীয় বোঝা'। ইহা ধনীকে আরো ধনী এবং গরীবকে আরো গরীবে পরিণত করে।

সুদের ক্লাসিকেল তত্ত্বের প্রবক্তা এডাম স্মীথ ও রিকার্ডোর মতে সুদ হইল বিনিয়োগকৃত মূলধনের উপর নির্ধারিত হারে আয়। এই তত্ত্বে সুদের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হয়, জমির উপর খাজনা ধার্য করা গেলে মূলধনের উপরও সুদ থাকা উচিত। এই শ্রেণীর কোন কোন অর্থনীতিবিদের মতে সুদের উচ্চ হার সঞ্চয় বাড়াইতে সাহায্য করে। ক্ল্যাসিক্যাল থিওরীতে ধরিয়াই লওয়া হয় যে, ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকায় লাভবান হয় কিন্তু বাস্তবে প্রত্যেক ঋণগ্রহীতাই ঋণের টাকায় মুনাফা লাভ করে না। মৌলিক প্রয়োজন পূরণে ঋণ গ্রহণ করা হইলে সেই ক্ষেত্রে ঋণের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। ব্যবসায়ে লাভের পাশাপাশি লোকাসনের ঝুঁকিও থাকে। লাভ হইলেও সবসময় তাহার পরিমাণ সমান নহে। কিন্তু সর্বাবস্থায় সুদ প্রায়শ অপরিবর্তিত থাকে। এইজন্য ইহা স্বভাব ও প্রকৃতি বিরোধী। ক্লাসিকেল সুদতত্ত্বে মূলধনকে বাজারের অন্যান্য উপকরণের মত বিবেচনা করা হয় এবং সরবরাহ ও চাহিদার ভিত্তিতে ইহার মূল্য নির্ধারণ করা হয়। জন ম্যানার্ড কীন্‌স এই ধারণার বিরোধিতা করিয়া বলেন, সুদের হার নয়, বরং আয়ের পরিমাণই সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে।

সুদের এবস্টিন্যান্স থিওরীর প্রবক্তা উইলিয়াম সিনিয়রের মতে, ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতাকে টাকা দিয়া নিজে ভোগে বিরত থাকে বা ত্যাগ স্বীকার করে। এই কারণে ঋণদাতাকে ঋণগ্রহীতার সুদ দেওয়া উচিত। মার্শাল বলিয়াছেন, ঋণ দিয়া অপেক্ষায় থাকিবার কারণে এই সুদ ধার্য হওয়া উচিৎ। সুদের উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের (Productivity Theory) প্রবক্তা বহাম বেওয়ার্ক-এর মতে, মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতার জন্য সুদ দেওয়া উচিত। তাহার চিন্তাধারা প্রসূত অস্ট্রীয়ান বা ওগীয় থিওরী অনুসারে সমকালীন উৎপাদন যাহা পরবর্তী উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হয়, তাহাই মূলধন। সুদ হইতেছে সেই মূলধনের অন্তর্বর্তী সময় ক্ষেপণের মূল্য। তাহার মতে, ভবিষ্যতের চাইতে বর্তমানই মানুষের অধিক পছন্দ ও ভাবনার বিষয়। তাই সুদ একটি অর্থনৈতিক

প্রয়োজন। বর্তমান পণ্য সব সময়ই ভবিষ্যত পণ্য হইতে অগ্রাধিকার পাইবে। কাজেই ভবিষ্যত পণ্যকে বর্তমানে রূপান্তরের জন্য অবশ্যই একটি ধনাত্মক সুদের হার থাকা উচিত। উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের বিপরীতে বলা হইয়াছে, শ্রম ও ক্ষেত্র ছাড়া মূলধনের কোন একক উৎপাদন ক্ষমতা নাই। সেই কারণে মূলধনের জন্য নির্দিষ্ট হারে সুদ নির্ধারণ অযৌক্তিক। সুদের প্রান্তিক তত্ত্বও সুদের হার নির্ধারণ করিতে অসমর্থ। বরং মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা সুদের হার দ্বারাই নির্ণীত হয়। এই থিওরীগুলিতে সুদের হার নির্ধারণের চাইতে সুদের কারণ সন্ধানে অধিক মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে (K.K. Dewelt & Adesa Chand, Modern Economic Theory, P. 284)। তাই এইগুলিকে অমুদ্রা তত্ত্ব (Non Monetary Theory) বলা হয়।

অন্যদিকে সুদের মুদ্রাতত্ত্বে (Monetary Theory) সুদকে একটি প্রয়োজনীয় আর্থিক উপাদান বলিয়া মনে করা হয়। এইগুলির প্রতিপাদ্য সুদের অস্তিত্বের কারণ বা যৌক্তিকতা নির্ধারণ নয়; বরং সুদের হার নির্ধারণ। কীন্সের চিন্তাধারাপুষ্ট ঋণযোগ্য তহবিল ও তারল্য অগ্রাধিকার তত্ত্ব এই ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কীন্স কখনও সুদকে ব্যবহারিক বিষয় বলিয়াছেন, আবার কখনও মনস্তাত্ত্বিক বিষয় বলিয়াছেন। এই দোলাচলের মধ্যে তিনি সুদের একান্ত অল্প হারের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আবার তিনি সুদহীন অর্থব্যবস্থার সম্ভাব্যতাও স্বীকার করিয়াছেন। অর্থনীতিতে বিনিয়োগ সর্বাধিক করিবার উপায় হিসাবে তিনি সুদের শূন্য হারকে চিহ্নিত করিয়াছেন। লর্ড কীনস ১৯৩৩ সালের অর্থনৈতিক মন্দা মুকাবিলার জন্য সুদের হার শূন্যের কোঠায় নামাইয়া আনার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা প্রমাণ করিতে গিয়া তিনি বলেন, এইভাবেই পুঁজিবাদী সমাজের অনেক দোষত্রুটি দূর করা সম্ভব। সুদভিত্তিক বিনিয়োগের পরিবর্তে উৎপাদনমুখী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি আহ্বান জানান (J. M. Keynes, The General Theory of Employment , Interest and Money, London, Macmillan, P. 166, 334, 351)।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, সুদের পক্ষের অর্থনীতিবিদগণ সুদের পক্ষে কোন বলিষ্ঠ ও যৌক্তিক মত দাঁড় করাইতে পারেন নাই। তাহাদের কেহই সুদকে ন্যায়সঙ্গত ও যৌক্তিক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন নাই। সুদের বিষয়টি এই শ্রেণীর অর্থনীতিবিদদের কাছেও অমীমাংসিত ব্যাপার রহিয়া গিয়াছে।

**এক নযরে সুদ ও মুনাফার পার্থক্য**

১. সময়ের সহিত ঋণের অতিরিক্ত কোন কিছু গ্রহণ করিলে তাহা হয় সুদ। অন্যদিকে ব্যবসায় মূলধন খাটানোর মাধ্যমে মূলধনের অতিরিক্ত আয় হইল মুনাফা।
২. সুদের উপাদান হইল সময়, সুদের হার ও ঋণের পরিমাণ। অন্যদিকে মুনাফা নির্ভর করে ব্যয়-সাশ্রয় ও অনুকূল বাজার চাহিদার উপর।
৩. সুদের উৎপত্তি হয় ঋণ হইতে। ঋণ সুদমুক্তও হইতে পারে। তবে ঋণ ছাড়া সুদের উৎপত্তি অসম্ভব। কিন্তু মুনাফার সৃষ্টি হয় ব্যবসায়ে সরাসরি মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে।
৪. সুদের লগ্নীতে ঋণদাতা পুঁজি হারানোর ঝুঁকি বহন করে না। কিন্তু মুনাফার কারবারে মূলধন ক্ষতির ঝুঁকি থাকে এবং পুঁজির যোগানদার এই ঝুঁকি বহন করেন।
৫. মূলধনী তহবিলে ঋণের পরিমাণ বেশী হইলে প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি বাড়ে। কিন্তু লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত কারবারে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িবার কারণে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ঝুঁকি বাড়ে না। ফলে এই পদ্ধতিতে নূতন বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়।
৬. সুদের ফল ঋণদাতা একাই ভোগ করে, কিন্তু মুনাফা ভাগ হয় পুঁজি যোগানদার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে।
৭. সুদের হার এবং সুদ ও আসল ফেরত দেওয়ার সময়সীমা পূর্ব নির্ধারিত হওয়ায় সুদের লগ্নীতে অনিশ্চয়তার কোন উপাদান থাকে না। অন্যদিকে বিনিয়োগ হইতে মুনাফা পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা নাই এবং এই ক্ষেত্রে মূলধন কমিয়া যাওয়ার আশংকা থাকে।
৮. একই ঋণচুক্তির বিপরীতে ঋণদাতা নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ বারবার পাইতে পারে। এই ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধিরও সুযোগ থাকে। কিন্তু কেনা-বেচার কারবারে কোন পণ্যের দাম একবারই নির্ধারিত হয়। সেই কেনা-বেচা হইতে মুনাফা একবারই পাওয়া যায়। কোন কারণে সময় বাড়িয়া গেলেও মুনাফা বাড়ে না।
৯. আসল ও সুদ যোগ করিয়া সুদ-আসল নির্ধারণ করা হয় এবং সময় বৃদ্ধির সহিত সুদ চক্রাকারে বাড়িয়া যায়। অন্যদিকে মোট বিক্রয় মূল্য হইতে যাবতীয় খরচ বাদ দিলে মুনাফা বাহির হয়।
১০. সুদ একটি নির্ধারিত ব্যয় হিসাবে মূল্যস্তর ফাঁপাইয়া তোলে এবং মূল্যস্ফীতির সুযোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু মুনাফা হইল ব্যবসায়ের খরচের অতিরিক্ত আয়। ফলে এই ক্ষেত্রে মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ঘটার সুযোগ নাই।
১১. ইসলামে সুদ চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ এবং কোন ধরনের সুদের ব্যবসায়ের অনুমোদন নাই। কিন্তু মুনাফা ইসলামে অনুমোদিত। স্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে কারবার পরিচালনাকে ইসলাম উৎসহিত করে।
১২. সুদী কারবারে মূলধন সর্বাবস্থায় সুরক্ষিত থাকে। অপরদিকে ব্যবসায়ে লোকসান হইলে মূলধন কমিয়া যায়।

**ইসলামের 'রিবা' বা সুদ**

'রিবা' আরবী শব্দ। ইহার অর্থ বৃদ্ধি, আধিক্য, অতিরিক্ত, স্ফীতি, সম্প্রসারণ ইত্যাদি। ঋণের বিপরীতে সময়ের সহিত যে কোন বৃদ্ধিই হইতেছে 'রিবা'। কুরআন মজীদে এই অর্থেই 'রিবা' শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার পারিভাষিক অর্থ হইতেছে সুদ (Interest/Usury)। তাফসীরে তাবারীর তৃতীয় খণ্ডে বলা হইয়াছে, "রিবা হইল সেই বাড়তি অর্থ যাহার বিনিময়ে ঋণদাতা ঋণ পরিশোধের সময়টা আরো কিছু দিনের জন্য বাড়াইয়া দেয়।" ইবনুল আরাবী 'আহকামুল কুরআন'-এর প্রথম খণ্ডে বলিয়াছেন, "রিবা হইতেছে সেই বাড়তি দাম, যাহা কোন মালের বিনিময় নহে" (ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, পৃ. ৩৬)।

সুদের মংজ্ঞা হইতে সুদী কারবারের ৩টি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় ঃ (১) ঋণের আসল বৃদ্ধি পাওয়া, (২) সময়ের সহিত ঋণের আসল বৃদ্ধির সীমা বা পরিমাণ বা হার পরিবর্তন হওয়া, (৩) উপরোক্ত দুইটি উপাদানকে শর্ত হিসাবে গ্রহণ করা।

ঋণ সংক্রান্ত কোন লেনদেনে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলে তাহা সুদী লেনদেন হিসাবে চিহ্নিত হইবে। ঋণের উদ্দেশ্য কিংবা ঋণ গ্রহীতার আর্থ-সামাজিক অবস্থানের কারণে তাহাতে কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

**'রিবা'র প্রকারভেদ**

ইসলামী শারী'আ অনুযায়ী 'রিবা' বা সুদ দুই ধরনের। ১. 'রিবা আন-নাসিয়া' ও ২. 'রিবা আল-ফাদল'।

সাধারণত ঋণের ক্ষেত্রে 'রিবা আন-নাসিয়া'র উদ্ভব হয়। ঋণের উপর সময়ের ব্যবধানের প্রেক্ষিতে পূর্বনির্ধারিত অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করিলে তাহা 'রিবা আন-নিসিয়া'। ঋণদাতা কোন অর্থ বা পণ্য ঋণ দেওয়ার বিনিময়ে ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে সময়ের ব্যবধানে পূর্বনির্ধারিত হারে বা পরিমাণে ঋণ বাবদ দেওয়া অর্থ বা পণ্যের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করিলে তাহা রিবা আন-নাসিয়া। যেমন, ক. খ.-কে ১০০ টাকা এক বৎসরের জন্য এই শর্তে ধার দেয় যে, এক বৎসর পর খ. উক্ত ১০০ টাকার সহিত অতিরিক্ত আরও ২০ টাকা ফেরত দিবে। এই ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত কুড়ি টাকা হইবে 'রিবা আন-নাসিয়া'। এইভাবে ঋণদাতা যদি ঋণ গ্রহীতাকে ১০০ কেজি লবণ এই শর্তে ধার দিয় যে, ছয় মাস পর ঋণ গ্রহীতা ১২০ কেজি লবণ ফেরত দিবে, তাহা হইলে এই অতিরিক্ত ২০ কেজি লবণ হইবে 'রিবা আন-নাসিয়া'।

সমজাতীয় দ্রব্য হাতে হাতে বিনিময়ের ক্ষেত্রে 'রিবা আল-ফাদল-এর উদ্ভব হয়। কোন দ্রব্যের সহিত একই জাতীয় দ্রব্য বাড়তি পরিমাণে বিনিময় করিলে, দ্রব্যের উক্ত অতিরিক্ত পরিমাণ 'রিবা আল-ফাদল' বলা হয়। যেমন ১ কেজি উন্নত মানের খেজুরের সহিত ২ কেজি নিম্নমানের খেজুর বিনিময় করা হইলে, নিম্নমানের খেজুরের ঐ অতিরিক্ত ১ কেজি হইবে 'রিবা আল-ফাদল'। এই ব্যাপারে নবী করীম (স)-এর একখানা হাদীছ এখানে উল্লেখ করা হইল ঃ

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "সোনার সহিত সোনা, রূপার সহিত রূপা, গমের সহিত গম, যবের সহিত যব, খেজুরের সহিত খেজুর এবং লবণের সহিত লবণ বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমান সমান এবং হাতে হাতে (নগদ) বিনিময় হওয়া উচিত। এইরূপ বিনিময়ে যে বেশী বা কম দেয় বা নেয়, সে সুদী কারবার করে। এই ক্ষেত্রে (অপরাধে) দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে সমান" (সহীহ মুসলিমের বরাতে মিশকাতুল মাসাবীহ, বাংলা অনু. ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৭ নং ২৬৮৫)।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত বিলাল (রা) একবার রাসূলে করীম (স)-এর নিকট কিছু উন্নত মানের খেজুর আনিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কোথা হইতে এই খেজুর আনিলে?' বিলাল (রা) উত্তরে বলিলেন, 'আমাদের খেজুর খারাপ ছিল। তাই আমি দ্বিগুণ পরিমাণ খারাপ খেজুরের পরিবর্তে ভাল খেজুর বদলাইয়া নিয়াছি।' রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, 'আহ! ইহা তো সুদের মতই হইল, ইহা তো সুদের মতই। কখনও এইরূপ করিও না। ভাল খেজুর পাইতে চাহিলে প্রথমে তোমার খেজুর বাজারে অন্য দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করিবে। সে পণ্যের বিনিময়ে ভাল খেজুর কিনিয়া লইবে' (Muhammad Mushin Khan, The Translation of the Meanngs of Sahih Al-Bukhari, vol. III, 6th Edition, Lahore, Kazi Publication, 1986)।

কোন কোন ফকীহ্র মতে, শুধুমাত্র হাদীছে উল্লেখিত ছয়টি পণ্যের ব্যাপারে 'রিবা আল-ফাদল'-এর সীমা নির্ধারিত। কিন্তু অধিকাংশ শারী'আহ বিশেষজ্ঞ মনে করেন, হাদীছে উল্লেখিত কয়'টি পণ্য উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। হাতে হাতে অন্য যে কোন পণ্য বদলের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য হইবে। উল্লেখ্য যে, 'রিবা আল-ফাদলে'র বিষয়টি হাদীছের মাধ্যমে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

**ইসলামে সুদ শর্তহীনভাবে নিষিদ্ধ**

শারী'আর পর্যালোচনা ও গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞগণ সর্বসম্মতভাবে একমত যে, ইসলামে সব ধরনের সুদ নিষিদ্ধ। এই ব্যাপারে ইসলামী জ্ঞান ও গবেষণা জগতের সকল স্তরের বিশেষজ্ঞদের অনুমোদন রহিয়াছে। শারী'আহ বিশেষজ্ঞদের সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা এই ব্যাপারে অভিন্ন ও দ্ব্যর্থহীন রায় বা ফাতওয়া দিয়াছেন। সাধারণভাবে তাঁহারা সুদের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন, মূল ঋণের উপর পূর্বনির্ধারিত লাভই সুদ।

সুদ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছের নির্দেশ স্পষ্ট। কোন কোন মহলে অজ্ঞতার কারণে এই ব্যাপারে কিছু বিভ্রান্তি রহিয়াছে। কুরআন-হাদীছের অনুসারী হিসাবে দাবি করিবার পরও যাহারা সুদ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন তাহাদের বক্তব্য মূলত দুইটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত।

১. সরল ও নিম্নহারের সুদ ঃ কিছু লোকের ধারণা, ইসলাম শুধু চক্রবৃদ্ধি বা উচ্চহারের সুদ নিষিদ্ধ করিয়াছে অর্থাৎ সরল ও নিম্নহারের সুদের ব্যাপারে ইসলামে নিষেধাজ্ঞা নাই। এই উচ্চ সুদ স্বল্প সময়ের মধ্যে মূলের উপর দিগুণ-চারগুণ হারে বাড়িয়া যায়। এই যুক্তির পক্ষে তাহারা কুরআন মাজীদে সূরা আল 'ইমরান-এর ১৩০ তম আয়াত উদ্ধৃত করেন। এই আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া ত্যাগ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর; আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করিবে।"

এই শ্রেণীর লোকেরা সমগ্র কুরআন সামনে রাখিলে দেখিবেন, মক্কা ও মদীনা শরীফে সময়ের ব্যবধানে চারটি স্তরে সুদ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হইয়াছে। প্রতিটি সময়ের একটি তাৎপর্য রহিয়াছে। প্রতিবার আয়াত নাযিলের রহিয়াছে স্বতন্ত্র পটভূমি ও প্রেক্ষাপট। সামগ্রিক বিষয় একসাথে না দেখিয়া এবং কুরআন হইতে বিধান অনুসরণের সঠিক নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া বিচ্ছিন্নভাবে কোন আয়াত বা তাহার অংশ উদ্ধৃত করিলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইতেই পারে। সুদ সম্পর্কিত সকল আয়াত সামনে রখিলে তাহারা এই ধরনের ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইবার সুযোগ পাইবেন। ইহা ছাড়া উদ্ধৃত আয়াত দ্বারাও এই কথা প্রমাণ করা যাইবে না যে, সরল সুদকে এইখানে বৈধ করা হইয়াছে। কোন মদখোরকে কেহ যদি বলেন, মদের মধ্যে ডুবিয়া থাকিও না, তাহার অর্থ এই নয় যে, মদের উপর ভাষিয়া থাকা যাইবে।

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হইয়াছে ঃ ".... কিন্তু পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য (বৈধ)" (নিসা : ২৯), ".... অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল ও সুদ হারাম করিয়াছেন..." (বাকারা : ২৭৫)। এই আয়াতে সাধারণভাবে সুদের নিষিদ্ধতা ঘোষণা করা হইয়াছে।

২. ভোগ্য ঋণের সুদ বনাব উৎপাদন ঋণের সুদ ঃ কেহ কেহ এই কথা বলিতে চাহেন যে, ব্যবহার্য পণ্য সংগ্রহণ বা ভোগ্য ঋণের বেলায় সুদ পুরাপুরি নিষিদ্ধ হইলেও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ঋণ

গ্রহণ বা উৎপাদন ঋণের বেলায় সুদ নিষিদ্ধ নহে। এই ধারণার পিছনে তাহাদের যুক্তি হইল, প্রথমত, বাণিজ্যিক ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকা দিয়া ব্যবসা করেন লাভের উদ্দেশ্যে। কাজেই তাহার উপার্জিত লাভ হইতে একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ দেওয়াতে আপত্তির কারণ নাই। তাহাদের দ্বিতীয় যুক্তি হইল, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে মূলত ভোগ-ব্যয়ের উদ্দেশ্যেই ঋণের লেনদেন হইত। বর্তমান যুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নেওয়া ঋণের বেলায় সুদ গ্রহণ ও প্রদান তাহাদের মতে অবৈধ না হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ব্যবসায়িক সুদ বা ব্যাংকিং সুদকে তাহারা বৈধ বলিতে চান।

তাহাদের এই যুক্তিও সঠিক নয় এইজন্য যে, ব্যবাসায়ে লাভের সম্ভাবনার পাশাপাশি লোকসানের ঝুঁকিও থাকে। সুদের কারবারে লোকসানের ঝুঁকি পুরাটাই উদ্যোক্তার মাথায় চাপাইয়া দিয়া মূলধনের যোগানদাতা পূর্ব নির্ধারিত নিশ্চিত লাভের সুযোগ ভোগ করিবে; ইহা ন্যায়বিচার হইতে পারে না। শুধু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাবকালেই নয়, বরং ইহার পূর্বকালেও আরব ব্যবসায়ীরা তাহাদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য ঋণ গ্রহণ করিত। ইরাকী পণ্ডিত ডঃ যাওয়াদ আলী তাঁহার 'তারীখুল আরাব কাবলাল ইসলাম' শীর্ষক ইতিহাস বিশ্বকোষের ৭ম খণ্ডে দই শত পৃষ্ঠাব্যাপী এই ব্যবসায়িক ঋণ সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছেন।

**কুরআন মজীদে সুদ প্রসঙ্গ**

সুদ সম্পর্কে কুরআন মজীদের প্রথম আয়াত নাযিল হয় রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কী যুগে ৬১৫ খৃস্টাব্দে। এই আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ "মানুষের ধন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তোমরা যে সুদ দিয়া থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তাহা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না; কিন্তু যে যাকাত তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য দিয়া থাক, তাহাই বৃদ্ধি পায়; তাহারাই সমৃদ্ধিশালী" (সূরা রূম ঃ ৩৯)।

এই আয়াতে সুদ ও যাকাত সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণার উপর আঘাত করা হইয়াছে। সেই কালে সুদখোর পুঁজিপতিরা মনে করিত যে, সুদের মাধ্যমে তাহাদের সম্পদ বাড়িতেছে এবং যাকাত দিলে বা দান-খয়রাত করিলে তাহাদের সম্পদ কমিয়া যাইবে। ঋণগ্রহীতারা মনে করিত যে, তাহাদের নিকট হইতে সুদ খাইয়া ধনীরা তাহাদের সম্পদ বাড়ইতেছে। উপরের আয়াতে সুদ ও যাকাত সম্পর্কে প্রচলিত সাধারণ ধারণার প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

**দ্বিতীয় আয়াত ঃ** চতুর্থ হিজরী সনে বা উহার কাছাকাছি সময়ে য়াহূদীদের অতীত কীর্তিকলাপ উল্লেখ প্রসঙ্গে নিষ্ঠুর অর্থলোভী য়াহূদীদের সুদখোরীর কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "এবং তাহাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও তাহা তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করিবার জন্য, আর আমি তাহাদের মধ্যে অবিশ্বাসীদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি তৈয়ার রাখিয়াছি" (নিসা ঃ ১৬১)।

**তৃতীয় আয়াত ঃ** সুদ সম্পর্কে অন্য বিধান নাযিল হয় সূরা আল ইমরানে রাসূলে করীম (স)-এর মদীনা যুগে উহুদ যুদ্ধের পর। এই আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা এই চক্রবৃদ্ধি সুদ খাইও না এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার" (আলে ইমরান ঃ ১৩০)।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, সুদ সংক্রান্ত প্রথম আয়াত নাযিলের প্রায় এগার বৎসর পর এই সম্পর্কে উপর্যুক্ত তৃতীয় আয়াত নাযিল হয়। এই সময় মদীনার নাগরিকদের সহযোগিতায় একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হইয়াছে। ইসলামী সমাজের উপযোগী আইন-কানুন, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বাস্তবায়নের কাজ তখন শুরু হইয়াছে।

**সর্বশেষ আয়াত ঃ** সুদ সম্পর্কে আল-কুরআনে সর্বশেষ আয়াত নাযিল হয় মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবন মিশন যখন সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে সেই সময়। হযরত ইবন আব্বাস ও হযরত উমার (রা) রিবা সংক্রান্ত সূরা বাকারার সেই আয়াতকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন আব্বাস বলেন, "শেষ যে আয়াত রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর নাযিল হইয়াছিল, তাহা ছিল আয়াতে রিবা" (তাফসীর তাবারী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৭০)।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ "যাহারা সুদ খায় তাহারা সেই ব্যক্তিরই মত দাঁড়াইবে যাহাকে শয়তান তাহার স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। ইহা এইজন্য যে, তাহারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করিয়াছেন। যাহার কাছে তাহার রবের নির্দেশ আসিয়াছে এবং সে বিরত হইয়াছে, তবে অতীতে যাহা হইয়াছে তাহা তাহারই; এবং তাহার ব্যাপারে আল্লাহ্র এখতিয়ারে। আর যাহারা আবার আরম্ভ করিবে তাহারাই জাহান্নামী। সেইখানে তাহারা স্থায়ী হইবে" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৫)।

"আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বাড়াইয়া দেন। আর আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৮)।

"যাহারা ঈমান আনে, নেক কাজ করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহাদের পুরস্কার তাহাদের রবের কাছে আছে। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৭)।

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আর সুদের যাহা বকেয়া আছে তাহা ছাড়িয়া দাও, যদি তোমরা মুমিন হও।" "যদি তোমরা না ছাড়ো, তবে আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। ইহাতে তোমরা অত্যাচার করিবে না এবং অত্যাচারিতও হইবে না" (সূরা বাকারা ঃ ২৮৯)।

এইভাবে একটি অতি পুরাতন ও জটিল অসুখ হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ও সহজ পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছেন।

**সুদ সম্পর্কে মহানবী (স)-এর কয়েকখানা হাদীছ**

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) সুদদাতা ও সুদগ্রহীতা উভয়কে লা'নত দিয়াছেন (মুসলিম, হাদীছ নং ২৯৯৫, কিতাবুল মুসাকাত, দারু ইহ্য়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৭২)।

২. হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) সুদদাতা ও সুদগ্রহীতা, সুদের চুক্তিপত্রের লেখক ও সাক্ষী সকলের উপর লা'নত দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তাহারা সকলে সমান অপরাধী (সহীহ মুসলিমের বরাতে মিশকাতুল মাসাবীহ, বাংলা অনু. ৬, খ. ২৬ নং ২৬৮৭/১)।

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবূ আওফা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, সুদভিত্তিক মুদ্রা ব্যবসায়ীদের জাহান্নামের খবর পৌঁছাইয়া দিও (তাবরানী)

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বর্ণনা করিতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সুদের ৭০টি স্তর রহিয়াছে। তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা হালকাস্তরের অপরাধের পরিমাণ হইল নিজ মায়ের সহিত যেনায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হওয়া (ইবন মাজা ও বায়হাকীর শুআবুল-ঈমান বরাতে মিশকাত, বাংলা অনু., ৬ খ., ৩৭, নং ২৭০২/২০)।

৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তোমরা ৭টি নিশ্চিত ধ্বংসকারী বিষয় হইতে আত্মরক্ষা করিবে। তাহার মধ্যে ৪র্থ হইল সুদ (বুখারী, হাদীছ নং ২৫৬০, দারুল কালাম, বৈরূত ১৯৮৭; বিস্তারিত দ্র. শিরো. রিবা)।

**আধুনিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশধারা**

ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের ইতিহাসকে দুই পর্যায়ে ভাগ করা যায়। এই আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে কেবল চিন্তা ও তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই ব্যবস্থা কোথাও বেসরকারী উদ্যোগে আবার কোথাও রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে বাস্তবে রূপ নেয়।

পরাধীন মুসলিম দেশগুলিতে পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবির সহিত তাহাদের বিশ্বাসভিত্তিক নিজস্ব বিধি-বিধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা যুক্ত ছিল। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজ পুনর্গঠনের এই আকাঙ্ক্ষা কুড়ি শতাব্দীর শুরুতে আসিয়া অধিকতর সংহত রূপ অর্জন করে। এই শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজ রচনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের চিন্তার রাজ্যে বিপ্লব সূচিত করেন আল্লামা ইকবাল, হাসান আল-বান্না ও সায়্যিদ মওদূদীর মতো কয়েকজন বিশ্ববরেণ্য মনীষী। চল্লিশের দশকে উপনিবেশিক শাসনের অবসান এবং আজাদী হাসিলের ফলে বিভিন্ন মুসলিম দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ও ব্যাংক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার দাবি উচ্চকিত হইতে থাকে। পঞ্চাশের দশকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে চিন্তা ও গবেষণা কার্যক্রম অধিকতর জোরদার হয়।

এই ক্ষেত্রে হিমালয়ান উপমহাদেশের ইসলামী চিন্তাবিদগণ আল্লামা হিফযুর রহমান ও সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী চল্লিশের দশকের শুরুর দিকে প্রকাশিত তাঁহাদের গ্রন্থে ইসলামী অর্থনীতির প্রায়োগিক দিকের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেন। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আনোয়ার ইকবাল কোরেশী ইসলামী ব্যাংকিং-এর একটি কাঠামোগত ধারণা পেশ করেন। ১৯৫২ সালে শেখ মাহমুদ আহমাদ তাঁহার 'Economics of Islam' নামক প্রবন্ধে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয় উত্থাপন করেন। ১৯৫৫ সালে মোহাম্মদ উজায়ের তাঁহার An Outline of Interestless Banking শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামী ব্যাংকের কর্মপদ্ধতিতে মুদারাবা মূলনীতি সংযুক্ত করিবার কথা বলেন। মোহাম্মদ আল-আরাবী (১৯৬৪) ও এস.এ. ইরশাদ (১৯৬৪) ইসলামী ব্যাংকের কর্মকৌশল হিসাবে মুদারাবা নীতি অনুসরণের পরামর্শ দেন। ১৯৬৮ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকিং-এর দ্বি-স্তরবিশিষ্ট মডেল উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি মুশারাকা নীতি অন্তর্ভুক্ত করিয়া তহবিল ব্যবস্থাপনার দ্বি-স্তরবিশিষ্ট মডেল অধিকতর সম্প্রসারণের প্রস্তাব করেন (M. Kabir Hasan, Text Book on Islamic Banking, IERB, 2003)। ১৯৮২ সালে এম. মোহসিন আধুনিক পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর ব্যাপারে একটি বিস্তৃত কাঠামোগত ধারণা উপস্থাপন করেন।

ষাটের দশকের শুরুতে ১৯৬১ সালে মিসরে ইসলামী গবেষণার সর্বোচ্চ কেন্দ্ররূপে 'কলেজ অব ইসলামিক রিসার্চ' কায়েম করা হয়। ১৯৬৪ সালের ৭ মার্চ এই কলেজের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ৪০টিরও বেশী মুসলিম দেশের শতাধিক নেতৃস্থানীয় ইসলামী বিশেষজ্ঞ যোগদান করেন। তাঁহারা সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার বিকল্পস্বরূপ ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি গড়িয়া তুলিবার উপায় নিয়া আলোচনা করেন। এই সম্মেলনে সর্বসম্মত অভিমত ঘোষণা করা হয় যে, ভোগ বা উৎপাদন যে কোন উদ্দেশ্যে ঋণের উপর ধার্যকৃত বাড়তি অর্থ, পরিমাণে কম হউক বা বেশী হইক, তাহা নিষিদ্ধ 'রিবা'র পর্যায়ভুক্ত। সম্মেলনে ব্যাংকিং কার্যক্রমের কতিপয় কার্যক্রম অনুমোদন করা হয়। আরো কতিপয় বিষয় অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গ্রহণ করা হয়। এই সম্মেলনে প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার ইসলামী বিকল্প উদ্ভাবনের ব্যাপারে মুসলিম মনীষী ও অর্থনীতিবিদগণের মতামত আহ্বান করা হয়।

১৯৬২ সালে মালয়েশিয়ায় হজ্জযাত্রীদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে কিস্তিতে হজ্জের অর্থ জমা গ্রহণের জন্য 'পিলগ্রিমস সেভিংস কর্পোরেশন' নামে সুদমুক্ত একটি সংস্থা কায়েম করা হয়। ১৯৬৩ সালে মালয়েশিয়ার পার্লামেন্টে আইন পাশ করিয়া ইসলামী শারী'আভিত্তিক সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানরূপে 'তাবুং হাজী' প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকারী পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার এই সকল প্রাথমিক উদ্যোগ ইসলামী ব্যাংকিং-এর জন্য এক ধাপ অগ্রগতি হিসাবে বিবেচিত হয়। এইভাবে ষাটের দশকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার দশকরূপে চিহ্নিত হয়।

১৯৭৪ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থাভুক্ত দেশগুলি শারী'আভিত্তিক ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সনদে স্বাক্ষর করে। এই উপলক্ষে সদস্য দেশসমূহের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে এক আবেগপূর্ণ ভাষণে সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশাহ ফয়সল মুসলমানদের অবস্থাকে মরুভূমিতে হারাইয়া যাওয়া সেই উটের সহিত তুলনা করেন, যাহার পিঠে মশক ভর্তি পানি থাকা সত্ত্বেও সেই উট পিপাসার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে (অধুনালুপ্ত 'ঢাকা ডাইজেস্ট'-এর প্রধান সম্পাদক, ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরোর অন্যতম সংগঠক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অন্যতম উদ্যোক্তা জনাব এম.এ. রশীদ চৌধুরী এক সাক্ষাতকারে লেখককে এই তথ্য জানান)। মুসলিম উম্মাহর প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র লইয়া ১৯৭৫ সালে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) যাত্রা শুরু করে। আইডিবি প্রতিষ্ঠার মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে সত্তরের দশকের শেষ নাগাদ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে কুড়িটিরও বেশী ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে (The International Association of Islamic Banks : Directory of Islamic Banks and Financial Instititution-1997; Banker's Almanac : Directory of Islamic Banks and Financial Institutions)। এই সময় শেখ সাঈদ আহমাদ লুতাহ-এর উদ্যোগে ১৯৭৫ সালে 'দুবাই ইসলামিক ব্যাংক', ১৯৭৭ সালে মিসর ও সুদানে 'ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক' এবং কুয়েতে শেখ আহমদ বা'জি আল-য়াসীনের নেতৃত্বে 'কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিভিন্ন মুসলিম দেশ ছাড়াও ডেনমার্ক,

লুক্সেমবার্গ, সুইজারল্যাণ্ড ও যুক্তরাজ্যে এই সময়ে কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে সত্তর দশক ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার দশকরূপে চিহ্নিত হয়।

হিজরী চতুর্দশ শতককে স্বাগত জানাইবার প্রস্তুতির মধ্য দিয়া বিশ শতকের আশির দশকের সূচনা হয়। নূতন হিজরী শতক মুসলিম উম্মাহর জন্য নূতন আশা আর তাজা উদ্যম লইয়া হাজির হয়। মুসলিম দুনিয়া এই শতাব্দীকে ইসলামী রেনেসাঁর শতাব্দীরূপেও চিহ্নিত করে। এই পটভূমিতে আশির দশকের শুরু হইতে বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে গতি ও আবেগ সঞ্চারিত হয়। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে এই দশকে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জোরদার প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। এই ব্যবস্থার পরিচালনাগত সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে এই সময় নানামুখী বাস্তব পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

১৯৮০ সালের মে মাসে ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের একাদশ সম্মেলন ইসলামবাদে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রফেসর মুহাম্মদ শামস-উল-হক এই সম্মেলনে ইসলামী আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান, যাহার শাখা সকল সদস্য দেশে সম্প্রসারিত হইবে। তিনি ইসলামিক কমন মার্কেট প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব করেন [M. Azizul Huq (Editor), Readings in Islamic Banking, Bangladesh Islamic Bankers Association (BIBA), vol-1, 1983 & 1984]।

১৯৮১ সালের জানুয়ারীতে মক্কা ও তায়েফে তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শীর্ষ সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে মুসলমানাদের 'নিজস্ব ও স্বতন্ত্র' ব্যাংক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন ঃ

'The Islamic countries should develop a separate banking system of their own in order to facilitate their trade and commerce' (পূর্বোক্ত)।

১৯৭৯ সালে ইরানে রাজতন্ত্রের উৎখাত করিয়া আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হইবার পর ১৯৮১ সাল হইতে সেই দেশের গোটা ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী পদ্ধতিতে ঢালিয়া সাজাইবার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ১৯৮১ সালে পাকিস্তানও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী ব্যাংকিং চালুর সিদ্ধান্ত নেয় (M. Kabir Hasan Ph.D (Chief Deitor), Text Book on Islamic Banking, Economics Research Bureau, 2003)। ১৯৮৩ সালে মালয়েশিয়ায় ও তুরস্কে ইসলামী ব্যাংকিং আইন পাশ করা হয়।

১৯৮৪ সাল হইতে ইরান তাহার সার্বিক ব্যবস্থা ইসলামী শারী'আতের আলোকে পুনর্গঠন করে। পাকিস্তানের সার্বিক ব্যাংকিং খাত পর্যায়ক্রমিকভাবে পুনর্গঠনের সিদ্ধান্তও এই সময়ই গৃহীত হয়। ১৯৮৫ সালের ১ জুলাই হইতে পাকিস্তানে সুদভিত্তিক ব্যাংকিং লেনদেন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়। সুদানের ব্যাংক ব্যবস্থা শারী'আহ মোতাবেক পুনর্গঠনের জন্যও এই সময় উদ্যোগ নেওয়া হয়।

আশির দশকের প্রথম সাত বৎসরে নূতন ৫৬টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে আশির দশকের শেষ নাগাদ এক শতটির বেশী ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। (The International Association of Islamic Banks: Directory of Islamic Bank and Financial Institutions-1997)। বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংকের শাখার সংখ্যা এই সময় দশ হাজারের কোঠা ছাড়াইয়া যায়।

নব্বই দশকে সারা বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকসমূহ দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। এই সকল ব্যাংকের পরিচাল্পনাগত সাফল্য ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রতি বিশ্বের ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া সৃষ্টিতে সমর্থ হয়। ফলে দেশে-দেশে ইসলামী ব্যাংক তথা সুদবিহীন ব্যাংকের প্রসার বৃদ্ধি পায়। ইরান, পাকিস্তান ও সুদানের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণ-সহ সারা বিশ্বে কুড়ি শতকের শেষ নাগাদ তিন শতের বেশী ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কায়েম হয় (List published in the Diary of Islami Bank Bangladesh Limited in 2003 referring to the sources of IAIb & Bankers Almanac)।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের আন্তর্জাতিক সমিতি (আইএআইবি)-এর উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে এই সময় পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার সুযোগ ও পরিবেশ সম্প্রসারিত হয়। নীতি ও পদ্ধতিগত বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক সমন্বয় ও সংযোগ দৃঢ়তর হয়। ফলে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক রূপ লাভে সক্ষম হয়। শুধু তেলসমৃদ্ধ দেশগুলিতেই নয়, অনেক স্বল্পোন্নত দেশে এবং মুসলিম বিশ্বের বাহিরেও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের তালিকার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এই যাবত তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশসমূহে যে কয়টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার চাইতে বেশি সংখ্যক ইসলামী ব্যাংক কায়েম হইয়াছে অন্যান্য দেশে। উদাহারণস্বরূপ সুদান, মিসর, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, জর্দান, লুক্সেমবার্গ, যুক্তরাজ্য এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিভিন্নতা সত্ত্বেও ইসলামী ব্যাংকিং এইসব দেশে যে সফলতা অর্জন করিয়াছে ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী ব্যাংকিং মডেল সার্বজনীনতা ও বিশ্বজনীনতা লাভে সমর্থ হইয়াছে।

ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বিষয়ক বহু আন্তর্জাতিক বা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং পদ্ধতিগত ঐক্যের লক্ষ্যে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। একাডেমিক গবেষণা ও অধ্যয়নের দিক হইতেও ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে ইতোমধ্যে যথেষ্ট অগ্রগতি হইয়াছে। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ব্যাংকিং এখন একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পঠিত হইতেছে। এই বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা ও ডিপ্লোমা সনদ প্রদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

**এক নযরে ইসলামী ব্যাংকিং বিকাশের ক্রমধারা**

- ❑ ইসলামী নীতিমালার আলোকে ১৯৬২ সালে মালয়েশিয়ায় 'Pilgrims Saings Corporation' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ❑ মিসরের মিটাগামারে ১৯৬৩ সালে 'সেভিংস ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ❑ ১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়ায় 'তাবুং হাজী' নামে একটি বিশেষায়িত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ❑ ১৯৭১ সালে মিসরের কায়রোতে 'নাসের সোস্যাল ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ❑ ১৯৭৩ সালে ওআইসি দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীগণ আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

- ১৯৭৪ সালে ওআইসি দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীগণ আইডিবি চার্টারে স্বাক্ষর করেন।
- ১৯৭৫ সালে জেদ্দায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৫ সালে সংযুক্ত আরব আমীরাতে 'দুবাই ইসলামী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৭ সালে সুদানে 'ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৭ সালে কুয়েতে 'কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৭ সালে ইসলামী ব্যাংসমূহের আন্তর্জাতিক সমিতি 'International Association of Islamic Banks' সৌদী আরবে গঠিত হয়।
- ১৯৭৮ সালে জর্দানে 'জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এণ্ড ইনভেস্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৮ সালে পাকিস্তান তাহার সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামী করণের ঘোষণা দেয়। পাকিস্তানের সামগ্রিক ব্যংক ব্যবস্থাকে ইসলামী পদ্ধতিতে ঢালিয়া সাজাইবার লক্ষ্যে ঃ

ক. প্রাথমিকভাবে তিনটি সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সুদমুক্ত করা হয় ঃ (i) The House Building Corporation of Pakistan, (ii) National Investment Trut এবং (iii) Mutual Trust Funds of Investment Corporation of Pakistan.

খ. 'লাভ-লোকসান' অংশীদারী (Profit-Loss Sharing-PLS) ভিত্তিতে জমা গ্রহণের জন্য বাণিজ্যিক বাংকসমূহে আলাদা কাউন্টার খোলা হয়।

গ. আমদানী-রফতানী ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদমুক্ত বিনিয়োগ প্রদানের অনুমতি দিয়া স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর পক্ষ হইতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

ঘ. ১৯৮৪ সালের এক ঘোষণার মাধ্যমে পাকিস্তান সরকার এক বৎসরের মধ্যে দেশে দুই ধারার ব্যাংকিং-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করিবার নির্দেশ দেয়।

ঙ. ব্যাংকারগণ দীর্ঘদিন সুদভিত্তিক গতানুগতিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে অভ্যস্ত থাকায় সরকার কর্তৃক আনীত এইসব পরিবর্তন মানিয়া নিতে মনস্তাত্ত্বিকভাবে তৈয়ার না করিয়া উপর হইতে পদ্ধতি ও কর্মসূচী চাপাইয়া দেওয়ার কারণে এই নূতন ব্যবস্থার প্রতি ব্যাংকারদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

- ইরান সরকার ১৯৭৯ সাল হইতে তাহার সামগ্রিক ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই ব্যাপারে তাহারা তিনটি ধাপে অগ্রসর হয়।

ক. প্রথম ধাপ ১৯৭৯-১৯৮২ ঃ গোটা ব্যাংকিং ব্যবস্থা জাতীয়করণ, কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন করা হয়।

খ. দ্বিতীয় ধাপ ১৯৮২-১৯৮৬ ঃ এই পর্বে ইসলামী ব্যাংকিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন কাঠামো তৈরী করা হয় এবং এই নূতন সিস্টেমকে ধারণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

গ. তৃতীয় ধাপ ১৯৮৬ সাল হইতে ইসলামী সরকারের অবিচ্ছেদ্য দায়িত্ব হিসাবে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনে ব্যাংকসমূহের ভূমিকা নিশ্চিত করিবার পদক্ষেপ হিসাবে এই খাতে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস করা হয়।

ব্যাংকিং কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে ইরান সরকার সেবা ও ভোগ খাত হইতে আর্থিক সম্পদসমূহ উৎপাদন খাতে স্থানান্তরের জন্য চারটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে :

১. স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ সম্প্রসারণ স্থগিত এবং মধ্যমেয়াদী বিনিয়োগের আকৃতি কমাইয়া আনা।

২. কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বীজ, সার, কৃষি সরঞ্জাম ও শস্য বীমা চালু করিবার ক্ষেত্রে সরকারী ভর্তুকী প্রদানসহ কৃষিখাতে ব্যাংকের বিনিয়োগ সম্প্রসারণ।

৩. কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সমবায় খাতকে উৎসাহিত করিতে ব্যাংক ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো।

৪. সরকারের সহিত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বড় শিল্প ও সামাজিক খাতে বিনিয়োগে ব্যাংকসমূহের অংশগ্রহণ।

- ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাকং 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৮৩ সালে তুরস্কে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯৯১ সালে বাহরায়নে 'The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) একটি আন্তর্জাতিক অমুনাফাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিবন্ধিত হয়। ইহার আগে আলজেরিয়ার আলজিয়ার্সে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য AAOIFI প্রতিষ্ঠিত হয়।

নিম্নোক্ত দেশসমূহে এ যাবত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ঃ ১. আফগানিস্তান, ২. আলজেরিয়া, ৩. আলবেনিয়া, ৪. আর্জেন্টিনা, ৫. অস্ট্রেলিয়া, ৬. বাহামা, ৭. বাহরায়ন, ৮. বাংলাদেশ, ৯. ব্রুনাই, ১০. কেইমান দ্বীপপুঞ্জ, ১১. সাইপ্রাস, ১২. ডেনমার্ক, ১৩. জিবুতি, ১৪. মিসর, ১৫. জার্মানী, ১৬. গিনি, ১৭. গাম্বিয়া, ১৮. ভারত, ১৯. ইন্দোনেশিয়া, ২০. ইরান, ২১, ইরাক, ২২. জর্দান, ২৩. কাজাকিস্তান, ২৪. সাইপ্রাস তুর্কী প্রজাতন্ত্র, ২৫. কুয়েত, ২৬. লেবানন, ২৭. লিচটেনস্টিন, ২৮. লুক্সেমবার্গ, ২৯. মালয়েশিয়া, ৩০. মৌরিতানিয়া, ৩১. মরক্কো, ৩২. নাইজার, ৩৩. পাকিস্তান, ৩৪. ফিলিস্তীন, ৩৫. ফিলিপাইন, ৩৬. কাতার, ৩৭. রাশিয়া, ৩৮. সৌদী আরব, ৩৯. সেনেগাল, ৪০. দক্ষিণ আফ্রিকা, ৪১. সুদান, ৪২. সুইজারল্যাণ্ড, ৪৩. থাইল্যাণ্ড, ৪৪. তিউনিশিয়া, ৪৫. তুরস্ক, ৪৬. সংযুক্ত আরব আমীরাত, ৪৭. যুক্তরাজ্য, ৪৮. যুক্তরাষ্ট্র, ৪৯. ইয়ামেন।

ইসলামী ব্যাংক অত্যল্প সময়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বল্প মূলধনী দেশগুলিতে, মিসর ও সুদানে এবং তাহার পাশে আফ্রিকার শৃংগবর্তী দেশসমূহে এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যের রাজধানী বলিয়া কথিত ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকটি এলাকায়। যেই কোন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে ইসলামী ব্যাংক কাজ করিতে সক্ষম, এই আন্তর্জাতিক উপযোগিতা প্রমাণে এই ব্যবস্থা ইতোমধ্যে সমর্থ হইয়াছে। গত কয়েক দশকের উপর্যুপরি অর্থনৈতিক

মন্দা সত্ত্বেও উপসাগরীয় অঞ্চলের ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সর্বত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রচলিত পদ্ধতির ব্যাংকসমূহের তুলনায় অধিকতর পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। কোন কোন দেশ নিজ নিজ ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ইসলামী শারী'আর নীতির ভিত্তিতে পনর্গঠন করিয়া প্রমাণ করিয়াছে যে, একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী নীতির মাধ্যমে পরিচালনা করা এবং জনগণের নিকট অধিকতর সুফল পৌছাইয়া দেওয়া সম্ভব।

সাইপ্রাস ভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সংস্থা 'ক্যাপিটাল ইনটেলিজেন্স' এক গবেষণা জরিপে এইভাবে উপসংহার টানিয়াছে, সাম্প্রতিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ক্রমশ অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করিতেছে। বহু দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে এই ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিতে সক্ষম হইতেছে। আন্তর্জাতিক বাজারেও ব্যাপকতর গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। লণ্ডনের 'ফিনান্সিয়াল টাইমস'-এর সিন্ডিকেশন সার্ভিসের প্রতিবেদক মার্ক হাজবেণ্ড এক মূল্যায়নে দেখাইয়াছেন, বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ মূলধনের শতকরা ৫৬ ভাগ যোগান দিয়াছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ। তাহার মধ্যে উপসাগরীয় দেশসমূহের অংশীদারিত্ব ১৮%। ইহার পরই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির অংশীদারিত্ব ১৪%, য়ুরোপ ৭%, আফ্রিকা, ৩% এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ২%।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণে বহু সুদভিত্তিক আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানও ইতোমধ্যে ইসলামী পদ্ধতির প্রতি ঝুঁকিতেছে। বিশ্বের কর্তৃত্বশীল সিটি গ্রুপের 'গ্লোবাল ইসলামিক ফিন্যান্স গ্রুপ', দি ইউ এস গ্রুপ-এর 'ইসলামিক ফাণ্ড', এইচ এস বি সি-এর 'গ্লোবাল ইসলামিক ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্ট', তাহাদের গ্রাহকদের সামনে শারী'আ অনুমোদিত নানা পদ্ধতি ও সেবা লইয়া হাজির হইয়াছে।

**বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন**

এই উপমহাদেশে সুদী কারবারের মন্দ প্রভাব সম্পর্কে ভারতের একটি সরকারী কমিশনের (বালুহ কমিশন) রিপোর্টে মন্তব্য করা হইয়াছে, "অধিকাংশ মানুষ ঋণী হইয়া জন্মায়, ঋণগ্রস্ত অবস্থায় জীবন কাটায় এবং ঋণের বোঝা মাথায় লইয়াই পরপাড়ে পাড়ি জমায়, এমনকি মৃত্যুর পরও উত্তরাধিকারীদের মাথায় সেই ঋণের বোঝা চাপিয়া থাকে।"

বাংলাদেশের মানুষ ঐতিহ্যগতভাবেই সুদের বিরোধী। সুদের বিরুদ্ধে তাহারা যুগ যুগ ধরিয়া সংগ্রাম করিয়াছে। সুদের বিরুদ্ধে তাহাদের ক্ষোভ ও ঘৃণার পরিচয় এই দেশের নানা পুরাণ ও উপাখ্যানে প্রকাশ পাইয়াছে। এই দেশের নানা লৌকিক বিশ্বাস ও আচরণে জনগণের সুদ-বিরোধী মনোভাব স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই দেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষ বিশ্বাস করেন যে, সাতজন সুদখোরের নাম লিখিয়া গরুর গলায় ঝুলাইয়া রাখিলে সেই গরুর ঘায়ের পোকা মরিয়া যায়।

সন্দেহ নাই, সুদ সম্পর্কে জনগণের এইরূপ মনোভাব তাহাদের বিশ্বাস, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। সুদের হিংস্র থাবা তাহাদেরকে বারবার ক্ষত-বিক্ষত, রিক্ত-নিঃস্ব ও বিপন্ন করিয়াছে। এই অভিজ্ঞতা সুদ সম্পর্কে তাহাদের বোধ ও বিশ্বাসের শিকড় দৃঢ় করিয়াছে। এই দেশের বহু জননায়ক মহাজনী সুদের বিরুদ্ধে যুগ যুগ ধরিয়া জনগণের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়াছেন। আধুনিক কালে প্রাতিষ্ঠানিক সুদের বিরুদ্ধে এবং সুদভিত্তিক লেনদেনের ব্যাপারে এই দেশের মানুষের নেতিবাচক মনোভাব স্থায়ী ও অবচিল।

বর্তমান বাংলাদেশ হইতেছে পৃথিবীর মানচিত্রে এমন এক স্বাধীন রাষ্ট্র, যাহা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ নব্বই বৎসর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কলোনীরূপে শাসিত হইয়াছে এবং তাহারও আগে পুরা এক শত বৎসর এই ভূখণ্ড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নামক একটি বিলাতি ব্যবসায়ী কোম্পানী ও তাহাদের কলকাতা কেন্দ্রিক সহযোগী শ্রেণীর মিলিত শোষণ ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্র ছিল। এই সময় সুদখোর মহাজনদের নিষ্ঠুর নির্যাতন তাহাদের নিত্যদিনের ভাগ্যলিপিতে পরিণত হয়।

এই দেশের মানুষ দীর্ঘদিন উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে, তাহাদের দেশীয় লুটেরা সহযোগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছেন। তাহাদের এই লড়াই, এই রাজনৈতিক আযাদী আকাঙ্ক্ষার সহিত জড়াইয়া ছিল তাহাদের বোধ-বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনা গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন। বিশ্বাসগত কারণে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুদের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিবাদ প্রতিরোধমূলক মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছে। সুদের বিরুদ্ধে তাহারা যুগ যুগ ধরিয়া সংগ্রাম করিয়াছেন। বাংলাদেশের ফকীর বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, ফরায়েযী আন্দোলন এবং শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির আন্দোলনে সুদ উচ্ছেদের দাবি ছিল সমুচ্চারিত।

সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা তাই এই দেশের মানুষের বহু পুরাতন প্রত্যাশা। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৃটিশ শাসনাধীন বাংলাদেশের কক্সবাজার ও যশোরসহ একাধিক এলাকায় সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। কিন্তু তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে সেই সব উদ্যোগ স্থায়ী ভিত্তি অর্জন করিতে পারে নাই। (বিশ শতকের গোড়ার দিকে কক্সবাজারে সুদমুক্ত স্বল্পকালস্থায়ী ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। কক্সবাজারের দায়রা জজ আদালতের প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটর এডভোকেট ফিরোজ আহমদ চৌধুরী ইসলামী ব্যাংক কক্সবাজার শাখার উদ্বোধন উপলক্ষে ১৯৮৬ সালের ২৬ আগস্ট ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতায় এই তথ্য উল্লেখ করিয়াছেন)। কুড়ি শতকের শুরুর দিকে যশোরের দড়াটানা মোড়ে (যেখানে মুন্সী মেহেরুল্লাহর দর্জির দোকান ছিল, তাহার পাশে) একটি স্বল্পকালস্থায়ী ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় বলিয়া এই লেখককে ১৯৮৯ সালে যশোরের প্রবীণ রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব জনাব ওয়াহেদ আলী আনসারী এক সাক্ষাতকারে জানান।

১৯৪৭ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই এই ভূখণ্ডটিতে মেজরিটি জনগণের আদর্শিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে তাহাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ক্রমশ সংহত ও জোরদার হইয়া উঠিতে থাকে।

১৯৪৮ সালের ১ জুলাই স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাংকের প্রথম গভর্নর জনাব জাহিদ হোসেন দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে শারী'আতের নীতিমালার ভিত্তিতে পুনর্গঠনের আহ্বান জানান। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির ভাষণে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে মত দেন।

১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের জন্য কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক 'আদর্শিক মূলনীতি প্রস্তাব' গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে দেশের অর্থব্যবস্থা ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পুনর্গঠনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের উভয় অংশের ৩১ জন বিশিষ্ট আলিম করাচীতে চারদিনের সম্মেলন শেষে সর্বসম্মতভাবে ইসলামী শাসনতন্ত্রের জন্য ২২ দফা শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি প্রণয়ন করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ দলীলের চতুর্থ দফায় 'কুরআন-সুন্নাহ মুতাবিক মারূফ (সৎ) কার্যাবলী জারী করা, নিষিদ্ধ কার্যাবলীর রহিতকরা, ইসলামী রীতি-প্রথা ও আচার-আচারণের পুনরুজ্জীবন... ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য' বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

পাকিস্তান আমলের প্রায় সবটুকু সময় জুড়িয়াই শাসনতান্ত্রিক বিতর্ক অব্যাহত থাকে। এই সময় ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়নের দাবি ক্রমশ জোরদার হয়। সুদমুক্ত অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার দাবি তাহার অংশ ছিল। একাডেমিক ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ডক্টর এম এন হুদা, প্রফেসর ডক্টর কেটি হোসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ডক্টর হাসান জামান, ভাষা সৈনিক প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম প্রমুখ এই ক্ষেত্রে সমধিক সোচ্চার ছিলেন। জামায়াতের পক্ষ হইতে মওলানা সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদীর 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং', 'ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ' প্রভৃতি পুস্তকের বাংলা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিবার ফলে এই ব্যাপারে সুধী জনগণের মনোযোগ অধিকতর আকৃষ্ট হয়। এইসব বই ছাড়াও মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীমের লেখা 'ইসলামী অর্থনীতি' এই দেশে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং আন্দোলনের তত্ত্বীয় ভিত্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ভিত্তির উপরই এই ক্ষেত্রে লেখালেখি, আলোচনা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম প্রভৃতির মাধ্যমে জনসচেতনতা ক্রমশ জোরদার হইয়া উঠে। এই ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মওলানা সামছুল হক ফরিদপুরী ও মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমীর নামও উল্লেখযোগ্য (ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা)।

মুসলিম বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলন শক্তিশালী হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে। ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক বা আইডিবি'র চার্টারে অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে বাংলাদেশ ইহার অর্থনীতি ও ব্যাংকিং কার্যক্রম ইসলামী শারী'আহর ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে পুনর্গঠনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে।

১৯৭৬ সালে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীমের নেতৃত্বে 'ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো' ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠন বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশ ও ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশ এই সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়া এই সুপারিশ অনুমোদন করে।

১৯৭৯ সালের নভেম্বরে সংযুক্ত আরব আমীরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ মহসিন দুবাই ইসলামী ব্যাংকের অনুরূপ বাংলাদেশে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য পররাষ্ট্র সচিবের কাছে লেখা এক চিঠিতে সুপারিশ করেন। ইহার পরপরই ডিসেম্বর মাসে অর্থ মন্ত্রণায়ের ব্যাংকিং উইং বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিমত জানিতে চায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসাবে তৎকালীন গবেষণা পরিচালক জনাব এ.এস.এম. ফখরুল আহসান ১৯৮০ সালে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য দুবাই ইসলামী ব্যাংক, মিসরের ফয়সল ইসলামী ব্যাংক, নাসের সোশ্যাল ব্যাংক এবং ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকস-এর কায়রো অফিস পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করিয়া ১৯৮১ সালে তিনি একটি প্রতিবেদন পেশ করেন।

১৯৮০ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক সদস্য দেশসমূহের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন (Readings in Islamic Banking, BIBA, vol. 1, 1984)।

১৯৮০ সালের ১৫-১৭ ডিসেম্বর ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরোর উদ্যোগে ঢাকায় ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর জনাব নুরুল ইসলাম উক্ত সেমিনার উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে বাংলাদেশে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সকলকে আগাইয়া আসিবার আহ্বান জানান (Thoughts on Isamic Economics, IERB, Special Issue on Banking, February 1982)।

১৯৮১ সালের মার্চে ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহের গভর্নরদের সম্মেলন সুদানের খার্তুমে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পেশকৃত এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জানান যে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে (Readings in Islamic Banking, BIBA, vol. 1, 1984)।

১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হইতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে লেখা এক পত্রে পাকিস্তানের অনুরূপ বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের সকল শাখায়ও পরীক্ষামূলকভাবে পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং কাউন্টার চালু করিয়া এইজন্য পৃথক লেজার রাখার পরামর্শ দেওয়া হয় (পূর্বোক্ত)।

১৯৮১ সালের ২৬ অক্টোবর হইতে সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজে ইসলামী ব্যাংকিং-এর এক মাস স্থায়ী এক সার্বক্ষণিক আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, সকল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বিআইবিএম ও প্রস্তাবিত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক অব ঢাকা লিমিটেড (বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড)-এর ৩৭ জন কর্মকর্তা অংশ নেন। সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল এম. আযীযুল হক এই ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন (এম. কামালউদ্দিন চৌধুরী, ইসলামিক ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে দৈনিক সংগ্রামে ২৩ জুলাই, ২০০৪ তারিখে প্রকাশিত সাক্ষাতকার)। ১৯৮২ সালের ১৮ জানুয়ারী হইতে বি.আই.বি.এম. এর উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয় (পূর্বোক্ত)।

সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি ১৯৭৭ হইতে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর

সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুল হইল ঃ ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ওয়ার্কিং গ্রুপ ফল ইসলামী ব্যাংকিং ইন বাংলাদেশ, বায়তুশ শরফ ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইত্যাদি (Readings in Islamic Banking, BIBA, vol 1, 1983 & 1984)।

হিজরী চৌদ্দ শতকের ভোরে ১ মুহররম তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর আলহাজ্জ এম খালেদের নেতৃত্বে ঢাকায় বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন (বিবা) কাজ শুরু করে। ইতোপূর্বে সোনালী ব্যাংক স্টাফ ট্রেনিং কলেজে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী বিভিন্ন ব্যাংকের ব্যাংকারদের অনেকে বিবা-এর কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯৮২ সালে এই সংগঠন ব্যাংকার, আইনজীবী, সাংবাদিক, বাণিজ্যিক উদ্যোক্তাসহ বিভিন্ন স্তরের লোকদের জন্য পাঁচটি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করে।

১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করেন। প্রতিনিধি দল সন্তোষ প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর প্রচুর কাজ হইয়াছে এবং শীঘ্রই এই দেশে ইসলামী ব্যাংকিং চালু করিবার ব্যাপারে প্রক্রিয়া চলিতেছে। এই সময়ই তাঁহারা বাংলাদেশে বেসরকারী খাতে যৌথ উদ্যোগে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে আইডিবি'র অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার ব্যাপারে 'ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো' (আ.ই.আর.বি.) এবং 'বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন' (বিবি) বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিতব্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য দক্ষ ব্যাংকারের শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদকে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর পক্ষে জনমত গঠন ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাহারা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। মুসলিম বিজনেসমেন এসোসিয়েশন (বর্তমানে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস এণ্ড বিজনেসমেন এসোসিয়েশন) ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোক্তা-মূলধন সংগ্রহে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

**বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের প্রসার**

বহুমাত্রিক দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফসলরূপে বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই ক্ষেত্রে ১৯ জন বাংলাদেশী ৪টি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান এবং আইডিবিসহ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের ১১টি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারী সংস্থা এবং সৌদী আরবের দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তারূপে আগাইয়া আসেন। ১৯৮৩ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক অব ঢাকা লিমিটেড' নামে বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকের প্রস্তুতিমূলক কাজ করা হয় এবং এই নামেই তখন পর্যন্ত ব্যাংকের সাইনবোর্ড ও প্রচার পুস্তিকা ব্যবহার করা হয়। আলহাজ্জ মফিজুর রহমান ২৯ মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকের প্রকল্প পরিচালক ছিলেন। ইহার পর এই ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' নামে কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকের মনোগ্রামটি তৈয়ার করিয়া দেন দেশের খ্যাতিমান শিল্পী ও ক্যালিগ্রাফার জনাব সবিহউল আলম।

১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ বুধবার লাইসেন্সের শর্ত পূরণের জন্য ৭৫ নং মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় ব্যাংকের রেজিষ্টার্ড অফিসে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। বাংকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে কোন আনুষ্ঠানিক দাওয়াতপত্র ছাপা হয় নাই। পত্রিকায় খবর দেখিয়া বহু লোক এই অনুষ্ঠানে স্বতস্ফূর্তভাবে হাজির হন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বায়তুশ শরফ-এর পীর সাহেব মওলানা আবদুল জব্বার, মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব এ.এফ.এম. ইয়াহিয়া, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব ও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের নির্বাহী সহ-সভাপতি জনাব কফিলউদ্দীন মাহমুদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা পরিচালক জনাব এ.এস.এম. ফখরুল আহসান, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর জনাব এম. খালেদ, ঢাকার কালেক্টর অব কাষ্টমস পরে বাংলাদেশ সরকারের সচিব জনাব শাহ আবদুল হান্নান, 'দৈনিক দেশ'-এর সম্পাদক জনাব সানাউল্লাহ নূরী ও দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক জনাব আখতার-উল-আলমসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আলহাজ্জ মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক লস্করের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জনাব এ.এফ.এম. ইয়াহিয়া, জনাব এ.এস.এম. ফখরুল আহসান, জনাব কফিলউদ্দীন মাহমুদ, ব্যাংকের সাবেক প্রকল্প পরিচালক ও পরে ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এর প্রথম ভাইস চেয়ারম্যন জনাব আলহাজ্জ মফিজুর রহমান বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রথম প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সি ই ও) জনাব এম. আযীযুল হক। ৩০ মার্চ ব্যাকের অনানুষ্ঠানিক উদ্বোধনী দিনে ৪৮টি হিসাব খোলা হয় এবং তাহাতে জমার পরিমাণ ছিল ৩৫ লাখ টাকা। ৩০ মার্চ হইতে ১১ আগস্ট পর্যন্ত শুধু চলতি হিসাবেই টাকা জমা নেওয়া হয়। ব্যাংকের প্রথম হিসাবটি খোলা হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর নামে। ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব এ.এফ.এম. ইয়াহিয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষে পঁচিশ লাখ টাকা জমা দিয়া বাংলাদেশে ইসলামী শারী'আত মুতাবেক প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকে আল-ওয়াদি'আ নীতির ভিত্তিতে প্রথম হিসাবটি খোলেন।

১৯৮৩ সালে ১২ আগস্ট পূর্বাহ্নে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার প্রধান সড়কে ব্যাংকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তৎকালীন বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব এস এম শফিউল আজম দেশী-বিদেশী বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে এক আবেগঘন পরিবেশে ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

ইসলামী ব্যাংকের প্রথম এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও রূপালী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম. এ. করিম। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম. খালেদ প্রথম উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ব্যাংকের শরীয়া কাউন্সিলের প্রথম চেয়ারম্যান ও মেম্বার সেক্রেটারী ছিলেন যথাক্রমে বায়তুশ শরফের পীর সাহেব মওলানা আবদুল জব্বার ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সফল অগ্রযাত্রার পথ ধরিয়া পরবর্তীতে দেশে আর কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশে 'আল-বারাকা ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নূতন ব্যবস্থাপনায় ইহার বর্তমান নাম 'দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড। ১৯৯৫

সালে বাংলাদেশে 'আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড' এবং 'সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে 'শামিল ব্যাংক অব বাহরাইন' (ইসলামী ব্যাংকার্স) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ব্যাংক আল-ফালাহ্ ইহার অধিগ্রহণ করে। ২০০১ সালে বাংলাদেশে 'শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৪ সালের ১ জুলাই হইতে সুদভিত্তিক 'এক্সিম ব্যাংক' তাহার কার্যক্রম ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে। সাতটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক ছাড়াও বেশ কয়েকটি সুদভিত্তিক ব্যাংকের অনেকগুলি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বর্তমানে কাজ করিতেছে।

এই সকল ইসলামী ব্যাংক তাহাদের কার্যক্রমে শরীয়া পরিপালন তত্ত্বাবধানের জন্য শরীয়া কাউন্সিল গঠন করিয়াছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের সমন্বয়ে 'ইসলামী ব্যাংক কনসালটেটিভ ফোরাম' এবং বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী শাখাধারী ব্যাংকসমূহের শরীয়া কাউন্সিলসমূহের সমন্বয়ে গঠন করা হইয়াছে 'সেন্ট্রাল শরীয়া বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস'।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) এবং ১৯৯৮ সালে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠিত General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (GCIBFI)-এর নির্বাহী পরিষদে সদস্য হিসাবে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিকাশে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করিতেছে।

**ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা ঃ** ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাহার উদ্দেশ্য হইতেছে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ইসলামের অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিমালার বাস্তবায়ন। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা প্রদান করিয়া বলিয়াছে ঃ 'Islami Bank is a Financial Institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of th receipt and payment of interest on any of its operation.' (Definition by the General Secretariate of the Organization of the Islamic Conference accepted in the Foreign Ministers Conference held in Dakar in 1978; cited in many books & journals including in different publications of IBBL & in the Text Book on Islamic Banking. IERB, 2003)। অর্থাৎ 'ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যাহা তাহার উদ্দেশ্য, মূলনীতি এবং কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শারী'আহর সকল নীতিমালা মানিয়া চলে এবং তাহার সকল কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে।'

১৯৮৩ সালে প্রণীত মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকিং আইন অনুসারে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা হইল ঃ 'Islamic Bank is a company which carries on Islamic Banking Business... Islamic Banking Business means banking business whose aimes and operations do not involve any element which is not approved by the religion Islam' (Islamic Banking Act 1983 of Malaysia, Act No. 272; cited in many books & journals including the Text Book on Islamic Banking : IERB 2004)।

অর্থাৎ 'ইসলামী ব্যাংক হইতেছে এমন একটি কোম্পানি যাহা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত;.... ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসা হইতেছে এমন এক ধরনের ব্যবসা যাহার লক্ষ্য এবং কার্যক্রমের কোথায়ও এমন কোন উপাদান নাই যাহা ইসলাম অনুমোদন করে না'।

ডক্টর জিয়াউদ্দীন আহমদ-এর মত ঃ "Islamic banking is essentially a normative concept and could be defined as conduct of banking in consonance with the ethos of the value system of Islam. ("ইসলামী ব্যাংকিং হইল একটি নীতিগত ধারণা এবং ইহাকে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকিং হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়)।"

উপরের সংজ্ঞাসমূহ হইতে ইহা স্পষ্ট যে, ইসলামী ব্যাংকিং আর্থিক মধ্যস্থতার এমন একটি পদ্ধতি যাহা তাহার লেনদেনে সুদ গ্রহণ ও প্রদান করে না এবং ইহার কার্যাবলী এমনভাবে পরিচালনা করে যাহাতে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হয়। ইহা এমন এক ব্যাংকিং পদ্ধতি যাহা লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই লেনদেনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনীতিতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

**ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ** ইসলামী ব্যাংকসমূহের আন্তর্জাতিক সংস্থা International Association of Islamic Banks ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলিয়াছে ঃ 'The Islamic Bank basically implements a new banking concetp, in that it adheres strictly to the ruling of the Islamic Shariah in the fields of finance and other dealings. Moreover, the bank which is functioning in this way, must reflect Islamic principles in real life. The bank should work towards the establishment of an Islamic Society, hence, one of its primary goals is the deepening of the religious spirit among the people' (Mohammad Hasny :The Role of Religious Bord, Encylcopedia of Islamic Banking & Insurance, IIBL, London, UK 1995)।

অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক মূলত একটি নূতন ব্যাংকিং ধারণা বাস্তবায়ন করে। এই ব্যাংক আর্থিক অন্যান্য কার্যক্রমে ইসলামী শারী'আহ-এর বিধিবিধান কঠোরভাবে মানিয়া চলে। ইসলামী ব্যাংক এইভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করিতে গিয়া বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধি-বিধানের অবশ্যই প্রতিফলন ঘটাইবে। এই ব্যাংক ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করিবে এবং সেইজন্য ইহার অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্য হইল জনগণের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা গভীরভাবে প্রোথিত করা।

ডক্টর শাওকী ইসমাঈল শাহতা ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বলিয়াছেন, "It is therefore... imperative for an Islamic bank to incorporate in its functions and practices commercial investment and social activities, as an institution designed to promote the civilized mission of an Islamic economy."(কাজেই ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম ও প্রয়োগ রীতিতে বাণিজ্যিক বিনিয়োগ এবং সামাজিক কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন অত্যন্ত জরুরী, যেন ইহা (ইসলামী ব্যাংক) ইসলামী অর্থনীতির সুশীল লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করিতে পারে)।

ইসলামের আর্থ-সামাজিক মূলনীতির আলোকে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়িয়া তুলিবার তাকীদ হইতে ইসলামী ব্যাংকিং চেতনার উন্মেষ ঘটিয়াছে। প্রচলিত ধারার ব্যাংক ব্যবস্থার সহিত এই ব্যাংকের পার্থক্য নীতিগত এবং এই ব্যাংকের কর্মধারাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইসলামী শারী'আর উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাংকের সকল লেনদেন হইবে সুদমুক্ত এবং ন্যায়ানুগ মুনাফা হইবে এই ব্যাংকের আর্থিক লেনদেনের ভিত্তি। আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েম এই ব্যাংকের উদ্দেশ্য। ফলে ইসলামী ব্যাংক অর্থনীতি, আর্থিক লেনদেন ও সম্পদ বণ্টনে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে বৈষম্য দূরীকরণ, ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা এবং আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো তৈরী ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী লাভ-লোকসানে অংশগ্রহণ এবং ইসলামে অনুমোদিত অন্যান্য পদ্ধতিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

সংক্ষেপে ইসলামী ব্যাংকের মৌলিক আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যগুলি হইল ঃ (১) সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যায়, অবিচার, যুলুম, শোষণ ও বৈষম্য দূর করা; (২) অর্থনীতিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও লেনদেনের অন্য সব ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি ও সুবিচার কায়েম করিয়া আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা; (৩) মানব সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের সুষ্ঠ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করিয়া মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, তাহাদের দুঃখ মোচন ও জীবনমানের উন্নয়ন; (৪) সুদের সর্বনাশা কুফল হইতে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে মুক্ত করা এবং আয়ের উৎস হিসাবে শ্রমের মর্যাদার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এবং (৫) ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক ভাবধারার মূলোৎপাটন করিয়া ব্যষ্টিক ও সামাজিক কল্যাণের আদর্শ কায়েম করা।

**ইসলামী ব্যাংকের কর্মনীতি ঃ** (১) শারী'আহ মুতাবিক সকল কাজ পরিচালনা করা; (২) আর্থিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে সুদমুক্ত করা; (৩) ব্যাংকিং কার্যক্রমকে জনকল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত করা; (৪) বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামী নীতির অনুসরণ করিবার কারণে কেবলমাত্র মুনাফাকে অগ্রাধিকার দানের পরিবর্তে সমাজের সাধারণ মানুষের চাহিদার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিনিয়োগ খাতের অগ্রাধিকার নিরূপণ করা; (৫) ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা; (৬) স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা; (৭) মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; (৮) অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং (৯) ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

**ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ঃ** ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ইসলামী ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যাহা তাহার মৌলিক বিধান ও কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শারি'আতের নীতিমালা মানিয়া চলিতে বদ্ধপরিকর এবং কর্মকাণ্ডের সকল পর্যায়ে সুদকে বর্জন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' এই সংজ্ঞার মধ্যে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পরিচয়ও সম্যকরূপে বিধৃত। ইসলামী শারী'আর নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবার কারণে এই ব্যাংকের সকল লেনদেন সুদের নেতিবাচক প্রভাব হইতে মুক্ত এবং সেই সাথে আর্থ-সামাজিক সুবিচার ও মানুষের সার্বিক উন্নয়ন এই ব্যাংক ব্যবস্থার লক্ষ্য। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সহিত প্রচলিত সুদ-ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার পার্থক্য নীতিগত ও মৌলিক। ইসলামী ব্যাংকের কর্মধারাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র লক্ষ্য ও অনন্য কর্মকৌশলের মধ্য দিয়া এই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ ঘটে এবং শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় ফুটিয়া উঠে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক কয়েকটি দিক এইখানে প্রচলিত ধারার ব্যাংক ব্যবস্থার সহিত তুলনামূলকভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

১. অর্থনীতিতে নৈতিক শৃংখলার বিধান অনুসরণ ঃ অর্থ-সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন ও আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েম ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য। অর্থনীতিতে মানবকল্যাণের এই নৈতিক বাধ্যবাধকতা বা নৈতিক শৃংখলা ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ভিত্তি। অন্যদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থ-সম্পদ, মানব সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিক শৃংখলার বিধান অনুপস্থিত। ফলে অর্থনীতি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশৃংখলা ও অস্থিরতা দেখা দেয় এবং সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অবস্থার আর অবনতি ঘটে। নৈতিকতাহীন অর্থনীতি অশান্ত সাগরের বুকে হালবিহীন জাহাজের মতই বিপন্ন। ইসলামী ব্যবস্থার উদ্দেশ্য শুধু একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান কায়েম করা নয়, সামাজিক কল্যাণের আদর্শের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠা এই ব্যবস্থার লক্ষ্য। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার নৈতিক বিধানের সারকাথা হইল ঃ

ক. সকল সম্পদের নিরংকুশ মালিক আল্লাহ। মানুষ ট্রাস্টি হিসাবে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের অনুবর্তী হইয়া সেই সম্পদ অর্জন ও ব্যবহার করিবে। আল্লাহর মালিকানা সম্পর্কে কুরআন মজীদের ঘোষণা ঃ "আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে, সমস্ত আল্লাহরই" (বাকারা ঃ ২৮৪)। "...আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই" (হাদীদ ঃ ১০)। "আল্লাহ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই" (ইবরাহীম ঃ ২)। "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই..." (হজ্জ ঃ ৬৪)। "আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই" (আলে ইমরান ঃ ১৮০)। "আর আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী" (কাসাস ঃ ৫৮)। "...যমীন তো আল্লাহ্রই। তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার উত্তরাধিকারী করেন..." (আ'রাফ ঃ ১২৮)। আল্লাহর মালিকানা মূলত মানুষেরই জন্য। সৃষ্ট জীবের মধ্যে সুষম বণ্টনের মাধ্যমে কল্যাণের লক্ষ্যে ঃ "তিনি পৃথিবী স্থাপন করিয়াছেন সৃষ্ট জীবের জন্য" (আর-রাহমান ঃ ১০)। "তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন..." (বাকারা ঃ ২৯)।

খ. মানুষ সম্পদ ব্যবহার করিবে ইহকালীন ও পরকালীন 'হাসানাহ' এবং 'ফালাহ (কল্যাণ) আহরণ করিবার জন্য। সম্পদের ব্যয় ও ব্যবহার সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ "... আর আল্লাহ তোমাদেরকে যাহা কিছুর উত্তরাধিকারী করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় কর (শারী'আতের বিধান অনুসারে)..." (হাদীদ ঃ ৭)। এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম

কুরতুবী বলিয়াছেন, আল্লাহই নিরংকুশ মালিক এবং বান্দার শুধু ব্যয়-ব্যহারের অধিকার। "তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও..." (বাকারা ঃ ৪৩; ১১০) "পথনির্দেশ ও সুসংবাদ মুমিনদের জন্য, যাহারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়..." (নামল ঃ ২-৩)। "...হে মুমিনগণ! আমি যাহা তোমাদের দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় কর" (বাকারা ঃ ২৫৪)। "আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়াছেন তাহা হইতে তোমরা তাহাদেরকে দান করিবে" (নূর ঃ ৩৩)। "হে মু'মিনগণ! তোমরা যাহা উপার্জন কর এবং আমি যাহা ভূমি হইতে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করিয়া দেই, তাহার মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা ব্যয় কর..." (বাকারা ঃ ২৬৭)। "আল্লাহ যাহা কিছু তোমাকে দিয়াছেন তাহার মাধ্যমে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর..." (কাসাস ঃ ৭৭)। "...আর ফসল তুলিবার দিন তাহার হক প্রদান করিবে" (আনআম ঃ ১৪১)। "তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় করিবে না?" (হাদীদ ঃ ১০)। "কে আছে যে আল্লাহকে দিবে উত্তম ঋণ?..." (হাদীদ ঃ ১১)। "তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করিবে না, যতক্ষণ না তোমরা যাহা ভালবাস তাহা হইতে ব্যয় কর.,." (আলে ইমরান ঃ ৯২)। "তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ কর না" (বাকারা ঃ ১৯৫)। "আমি তোমাদের যে রিযিক দিয়াছি, তোমাদের কাহারও মৃত্যু আসিবার পূর্বে তাহা হইতে ব্যয় করিবে" (মুনাফিকূন ঃ ১০)। "লোকে কি ব্যয় করিবে সে সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করে। বলুন যে ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় কর তাহা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য" (বাকারা ঃ ২১৫)।

গ. 'আদল বা ন্যায়বিচার এবং 'ইহ্সান' বা দয়া প্রতিষ্ঠা ইসলামের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের লক্ষ্য। ইহ্সান এবং আদল প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ..." (নিসা ঃ ১৩৫)। "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিতেছেন আমানত তাহার হকদারকে প্রত্যর্পণ করিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকাজ পরিচালনা করিবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার করিবে..." (নিসা ঃ ৫৮)। "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা চুক্তি ভংগকারীকে পছন্দ করেন না" (আনফাল ঃ ৫৮)। "...আর যদি বিচার নিষ্পত্তি কর, তবে তাহাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিবে, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন" (মাইদা ঃ ৪২)। "আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন, সে অনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই যালিম" (মাইদা ঃ ৪৫) "...আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন সেই অনুসারে যাহারা বিধান দেয় না তাহারাই ফাসিক" (মাইদা ঃ ৪৭)। "তাহারা বলিবে, আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা মিসকীনকে খাবার দান করিতাম না" (মুদ্দাচ্ছির ঃ ৪৩-৪৪)। "...অতএব আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হইবেন না, প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করিবেন না" (দুহা ঃ ৯-১০)। "সেই তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয় এবং মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না" (মা'উন ঃ ১-৩)। "... সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদার ছিল না এবং মিসকীনকে অন্নদানে উৎসাহিত করিত না" (আল- হাক্কাহ ঃ ৩৩-৪৪)। "তুমি কি জানো বন্ধুর গিরিপথটি কি? ইহা হইতেছে দাসমুক্তি বা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য দান, ইয়াতীম আত্মীয়কে বা দারিদ্র্য নিষ্পেষিত মিসকীনকে" (বালাদ ঃ ১২-১৬)। "এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোটখাট সাহায্যদানে বিরত থাকে" (মা'উন ঃ ৭)। "হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না ; কিন্তু তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা বৈধ এবং একে অপরকে হত্যা করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু" (নিসা ঃ ২৯)। "... এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে" (নিসা ঃ ৩৬)। "সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা একে অপরের সাহায্য করিবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সাহায্য করিবে না" (মাইদা ঃ ২)।

ঘ. অর্থনৈতিক বণ্টন হইবে আদল ও ইহসানের ধারায়। ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী ও অন্য ধর্মের অনুসারীরাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়নে প্রশাসন হইবে সার্বজনীন। পবিত্র কুরআনে এই সম্পর্কে রহিয়াছে সর্বমানবিক দৃষ্টিকোণ ঃ "আল্লাহকে ছাড়িয়া যাহাদেরকে তাহারা ডাকে, তাহাদেরকে তোমরা গালি দিও না।...", "হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকিবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করিবে, ইহা তাকওয়ার নিকটতর..." (সূরা মাইদা ঃ ৮)।

মানবিকতা ও সততা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী ঃ "বিধবা ও মিসকীনের সাহায্যার্থে চেষ্টাকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারী অথবা রোযাদার ও রাতে কিয়ামকারী ব্যক্তির সমমর্যাদাসম্পন্ন" (বুখারী, হাদীস নং ৪৯৭৪, কিতাবুন নাফাকাত, দারুল কালাম, বৈরূত ১৯৮৭)। "সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীদের হাশর হইবে নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সংগে" (তিরমিযী, হাদীছ নং ১১৩০, কিতাবুল বুয়ূ, দারুল ফিকর, ১৯৮৩)।

ঙ. তাহারা 'মা'রূফ' বা কল্যাণমূলক ইনস্টিটিউশন কায়েম করিবে এবং নিজেদের জীবনকে 'মুনকার' বা সকল বোঝা-বন্ধন ও কষ্ট-যাতনার শৃংখল হইতে মুক্ত করিবে। মানুষের জীবনকে ভারমুক্ত ও সহজ করিয়া তোলা ইসলামী ব্যবস্থার লক্ষ্য। মা'রূফ ও মুনকার সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ "এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ" (হাক্কা ঃ ৪৮)। "ইহা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ" (তাকবীর ঃ ২৭)। "তুমি মানুষকে তোমার প্রভুর দিকে আহ্বান জানাও হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে এবং তাহাদের সংগে সংলাপ (মতবিনিময়) কর উত্তম পন্থায়" (নাহল ঃ ১২৫)। "তাহাদেরকে উপদেশ দাও, যাহাতে কেহ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়..." (আন'আম ঃ ৭০)। "উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দাও" (আ'লা ঃ ৯)। "অতএব আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো একজন উপদেশদাতা" (গাশিয়া ঃ ২১)। "...রাসূলগণের কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া" (নাহল ঃ ৩৫)। "অতঃপর তাহারা যদি মুখ ফিরাইয়া নেয়, তবে আপনার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া" (নাহল ঃ ৮২)। "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহ-তে বিশ্বাস কর" (আলে ইমরান ঃ ১১০)। "...তবে উপদেশ দেওয়া কর্তব্য যাহাতে তাহারাও তাকওয়া অবলম্বন করে" (আন'আম ঃ ৬৯)।

এই নৈতিক বিধানের আলোকে বিশ্ব-অর্থব্যবস্থাকে মানবীয় কল্যাণাদর্শের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা ইসলামী ব্যাংকের দায়িত্ব। প্রচলিত সুদনির্ভর ব্যাংক ব্যবস্থা এই নৈতিক বাধ্যবাধকতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

ফলে উহার পক্ষে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে শৃংখলা বিধান করা সম্ভব নয়। সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলি এই ক্ষেত্রে বিশৃংখলা বাড়াইয়া তুলিতেছে এবং আর্থ-সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধিতেই সহায়তা করিতেছে।

**২. সামাজিক উন্নয়নের সহিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্বয় ঃ** ইসলামী ব্যাংক শুধু একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়, ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার সহায়ক একটি সামাজিক আন্দোলনও। ইসলামী ব্যাংক উন্নয়ন বলিতে শুধু মুষ্টিমেয় মানুষের উন্নয়ন মনে করে না। শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও এই ব্যাংক মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন বালিয়া গণ্য করে না। মূল্যবোধ সমন্বিত বহুমুখী ও গতিশীল সার্বিক উন্নয়ন এই ব্যাংকের আদর্শ। ইসলামী ব্যাংকের বিবেচনায় সামাজিক উন্নয়নই হইল অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি। ইসলামী ব্যাংক তাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের দুই ধারাকে সমন্বিত করিতে চায়। ইসলামী ব্যাংক এইভাবেই সামাজিক স্বার্থ ও ন্যায়বিচারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। অন্যদিকে সুদ-নির্ভর ব্যাংক ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিগত মানুফার প্রশ্নটিই শুধু বিবেচনা করে।

**৩. ব্যক্তিস্বার্থ নয়, সামাজিক কল্যাণের আদর্শ ঃ**

ব্যক্তিস্বার্থ নয়, সামাজিক কল্যাণ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল কথা। শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা ইসলামী ব্যাংকের আদর্শ। শুধু আয়ের সৃষ্টি নয়, সেই আয়ের সুষম বণ্টনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম নীতি। ইসলামী ব্যাংকের এই নীতির মূলে রহিয়াছে পবিত্র কুরআনে নির্দেশ ঃ "...ধন-সম্পদ যাহাতে শুধু বিত্তবানদের মধ্যে পুঞ্জীভূত না থাকে (আবর্তিত না হয়)" (হাশর ঃ ৭)। মুষ্টিমেয় মানুষের মাঝে যাহাতে অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত হইতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে দরিদ্র, স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীনদের জন্যও বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা, সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মেধা ও কর্মক্ষমতা কাজে লাগাইয়া তাহাদেরকে উৎপাদনে জড়িত করা এবং এইভাবে তাহাদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে যে কোন মূল্যে মুনাফা অর্জন ও ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করাই সুদ-ভিত্তিক ব্যবস্থার সারকথা।

**৪. ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকাঃ** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ব্যষ্টিক অর্থনীতির (macro economy) স্থিতিশীলতা, যাহার পূর্বশর্ত হইল মুদ্রাস্ফীতির নিম্নহার, সন্তোষজনক অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ, জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার বাঞ্ছিত পরিমাণ রিজার্ভ। এইসব শর্ত পূরণে সঞ্চালক শক্তিরূপে ব্যাংকিং সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ রহিয়াছে। সুদী ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে সঞ্চয় সংগ্রহ ও তাহা বিনিয়োগে শুধু সুদের পরিমাণকেই বিবেচনা করে। এই কার্যক্রমের আর্থ-সামাজিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তাহাদের বিবেচ্য নয়। উৎপাদন ও তাহার উপকরণের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন সুদভিত্তিক কারবারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে দ্রব্যের উৎপাদন ও সরবারহ বৃদ্ধি ছাড়াই ঋণগ্রহীতাদের ঋণের সুদ এবং জমাকারী ও ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি পায়। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে বাজারে টাকার সরবরাহ বৃদ্ধি ছাড়াই ঋণগ্রহীতাদের ঋণের সুদ এবং জমাকারী ও ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি পায়। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে বাজারে টাকার সরবরাহ বাড়িয়া যায় এবং উৎপাদন কম হইলে তাহার উপর সুদের বাড়তি মূল্যও যোগ হয়। এই দুষ্ট চক্রের ফলে অবাঞ্ছিত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়। এইভাবে নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের ক্রয়-ক্ষমতা এবং শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী কমিয়া যায়। এই প্রক্রিয়ায় আর্থিকভাবে দুর্বল বিপুল মানুষের সম্পদ অধিক আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হয়। সুদী কারবারের মধ্য দিয়া এই নীরব সম্পদ হস্তান্তর (Silent resource transfer) ঘটিবার ফলে অর্থের বণ্টন প্রবাহ ও সম্পদের মালিকানার ভারসাম্য নষ্ট হয়। কার্লমার্ক্স এই প্রক্রিয়াকেই 'সিঁদেল চুরি' বলিয়াছেন (কার্লমার্কস ঃ ক্যাপিটাল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৫২)। সুদী ব্যাংকের মুনাফা বাড়ার সহিত পাল্লা দিয়া দেশে মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও ধনী-গরীবের পার্থক্য বৃদ্ধি পায়। সুদের এমনি অসংখ্য কুফল হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই ইসলাম সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করিয়াছে। সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতাও এখানেই নিহিত।

ড. মুহাম্মদ বদিউল আলম ও মুহাম্মদ আবু মিসির বাংলাদেশের প্রচলিত ধারার ব্যাংকের সহিত সুদমুক্ত ব্যাংকের লাভ, উৎপাদন ক্ষমতা ও জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান মূল্যায়ন করিয়া তাহাদের একটি গবেষণাপত্রে উপসংহার টানিয়াছেন এইভাবে ঃ "Therefore it is clear that the interest-free banking system provides better service to the customer and contribute to the economy as a whole with high esteem of moral values than that of traditional banking system operating in our country (Dr. Muhammad Badiul Alam & Mohammad Abu Misir, Analysis of Comparative Financial Performance in Banking Sector of Bangladesh : A Study of Interest-free and Traditional Banks ; Thoughts on Economics, IERB, vol. 7, No. 3 & 4, 1997)।

**৫. সম্পদ সৃষ্টি ও বণ্টনে জনকল্যাণের আদর্শ ঃ** ইসলাম অর্থের মজুদ বৃদ্ধি নিরুৎসাহিত করিয়াছে, কিন্তু সঞ্চয় সৃষ্টি কয়িয়া তাহা উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত করিতে উৎসাহ দিয়াছে। ইসলামী ব্যাংক তাই জনগণের ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য বিবেচনা করে। সমাজ-সংগঠন-প্রকিয়ার সক্রিয় অংশীদাররূপে ইসলামী ব্যাংক জাতির প্রতিটি সদস্যকে সঞ্চয়ের কাজে অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে কাজ করিবে। সমাজে সঞ্চয়ের অভ্যাস বেশী হইলে তাহা সম্পদ তৈরি ও সমৃদ্ধির সহায়ক হইবে। সমাজে ইসলামের দাবি পূরণে সমর্থ লোকদের উৎপাদনক্ষম জনশক্তির সহিত বিনিয়োগের সম্মিলন ঘটাইয়া সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করার এই নীতি সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দেশের প্রকৃত উন্নতি ও সমৃদ্ধির সহায়ক। ইসলামী ব্যাংক অল্প টাকা বেশী লোকের কল্যাণে নিয়োজিত করে। অন্যদিকে সুদভিত্তিক ব্যাংকের নযর বড় বড় সঞ্চয়ের প্রতি নিবদ্ধ। কম সংখ্যক লোকের নিকট হইতে বেশী সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া তাহা লগ্নি করা হয় অধিকতর সম্পদশালী মুষ্টিমেয় লোকদের মাঝে। সমাজের অর্থ-সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত করিবার এই প্রক্রিয়ায় সমাজে ধন-বৈষম্য বাড়িয়া যায়, ভারসাম্য ভাঙিয়া পড়ে।

ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন সঞ্চয় স্কীমের দিকে তাকাইলেও এই ক্ষেত্রে ব্যাংকের সামাজিক লক্ষ্য ও ইহার অবদান স্পষ্ট হইবে। যৌতুকের মত অপরাধ নির্মূলে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং বিবাহিত পুরুষদের দেনমোহর আদায়ে উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে ব্যাংকিং জগতে প্রথমবারের মত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ **মুদারাবা মোহর সঞ্চয় হিসাব** চালু করিয়াছে। নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নে ইহা একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ। ওয়াকফ সম্পত্তি এক সময় এই দেশের সামগ্রিক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিত। বর্তমানে নিরুৎসাহিত এই ধারাটিকে বেগবান করিবার উদ্যোগ নিয়াছে ইসলামী ব্যাংক ও সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক। কর্মব্যস্ত বিত্তশালী ব্যক্তিগণকে সামাজিক দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ ও আগ্রহী করা এবং এই কাজে তাহাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দেওয়ার জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ '**মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট স্কীম**' চালু করিয়াছে। গ্রাহক সেই উদ্যোগে অংশ নিতে পারেন কিংবা এই হিসাবের লাভের অর্থ গ্রহাকরে নির্দেশিত স্থানে পৌছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব ব্যাংক পালন করে। এই ব্যাংকের ১ হইতে ২৫ বৎসর মেয়াদী হজ্জ সেভিংস স্কীম এমনভাবে সাজানো হইয়াছে যাহাতে একজন সাধারণ আয়ের মানুষও জীবনে একবার হজ্জের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে পারেন। অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকও বিভিন্ন মেয়াদী হজ্জ স্কীম চালু করিয়াছে।

**৬. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ** ইসলামী ব্যাংক মুশারাকা (লাভ-লোকসান অংশীদারিত্ব) নীতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে। এই ধরনের ব্যবসায়ে লাভ হইলে ব্যাংক তাহার অংশ পায়। লোকসান হইলে তাহার অংশও ব্যাংক বহন করে। বর্তমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ইহা একটি বৈপ্লবিক চিন্তা। ইহার ফলে ব্যাংক গ্রাহকের সহিত একাত্ম হইয়া ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালায়। এই ধরনের কারবারে ব্যাংক গ্রাহকের সাফল্যকে তাহার নিজের সাফল্য মনে করে। গ্রাহকের ব্যর্থতাও ব্যাংকের ব্যার্থতা হিসাবে গণ্য হয়। গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যকার এই একাত্মতা ইসলামী ব্যাংকিং-এর একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। অংশীদারী ভিত্তিক ও উন্নয়নমুখী এই কল্যাণধর্মী ব্যবস্থা প্রচলিত সুদ-নির্ভর পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

মুশারাকা পদ্ধতি ছাড়াও বায়' মুরাবাহা, বায়' মুয়াজ্জাল, বায়' সালাম, ইজারা, 'ভাড়ায় ক্রয়' প্রভৃতি পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ করে। সুদমুক্ত এই সকল পদ্ধতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ব্যাংক কাহারও নিকট সরাসরি টাকা লগ্নি করে না। পণ্যের মাধ্যমে ব্যাংক এইসব বিনিয়োগ পরিচালনা করে। টাকা লগ্নি করিয়া বিনিময়ে বাড়তি টাকা গ্রহণ সুদের মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করিয়া যে অর্থ অর্জিত হয় তাহা লাভ। টাকার নিজস্ব কোন উৎপাদন ক্ষমতা নাই এবং মানুষের কোন প্রয়োজনেই টাকা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করিতে পারে না। ইহা একটি মাধ্যম, একটি পরিমাপ ও একটি মানদণ্ড হিসাবে ভূমিকা পালন করে মাত্র। তাই ইসলাম অর্থকে পণ্য হিসাবে গণ্য করে না। টাকার বিনিময়ে টাকা বেশী বা কম গ্রহণ বা প্রদর্শনকেও ইসলাম অনুমোদন করে না।

ইসলামী ব্যাংক উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি কৌশলগত ও ব্যবস্থাপনাগত প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয় এবং নিয়মিত তত্ত্বাবধান করে। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ টাকার পরিবর্তে সরাসরি পণ্যের সহিত যুক্ত। অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক টাকার বেচাকেনা করে না; পণ্যের ব্যবসায়ে অংশ নেয়। ফলে তাহা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত (Diversion of Fund) হওয়ার সুযোগ থাকে না। ইহাতে বিনিয়োগ মন্দ হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পায়। ইসলামী পদ্ধতির বিনিয়োগের ইহাও একটি ইতিবাচক দিক।

**৭. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমের অর্থনৈতিক বিবেচনা ঃ** ইসলামের দৃষ্টিতে জনগণই হইল সকল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। উন্নয়ন সমাজের সকল মানুষের জন্য। সুদী লেনদেনের নীতি ও কৌশল ইহার বিপরীত। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ পদ্ধতি সুদমুক্ত হওয়ার কারণে তাহা সুদের বহুমাত্রিক ও জটিল উপসর্গ হইতে মুক্ত। পূর্ব নির্ধারিত সুদের হার এবং জমার সুদ ও ঋণের সুদের মধ্যকার পূর্ব নির্ধারিত ব্যবধানের কারণে সুদী ব্যাংকের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ নানভাবে নিরুৎসাহিত হয়। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত অর্থের কোন পূর্ব নির্ধারিত তহবিল-মূল্য (Prefixed cost of fund) না থাকায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার চাহিদা না মেটা পর্যন্ত বিনিয়োগ অব্যাহত রাখিয়া কাম্য মানের বিনিয়োগ (investment equilibrium) নিশ্চিত করা সম্ভব। ইহার ফলে উদ্যোক্তাগণ সমাজের জন্য কল্যাণকর কোন কম লাভজনক প্রকল্প গ্রহণেও নিরুৎসাহিত হন না। ইহা ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে।

**৮. বিনিয়োগের উদ্দেশ্য অর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঃ** অর্থনৈতিক উন্নতির সহিত সামাজিক উন্নয়নের সমন্বয় ছাড়া সুষম উন্নয়ন (balanced development) সম্ভব নয়। ইসলামী ব্যাংক প্রকল্প বাস্তবায়নে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়। ইসলামী ব্যাংক কোন প্রকল্প নির্বাচনে ইহার সম্ভাব্য আর্থ-সামাজিক অবদান বিশেষভাবে মূল্যায়ন করে। ব্যক্তির অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে সমষ্টির অর্থাৎ সর্বসাধারণের উন্নয়নকে আগাইয়া নেওয়ার লক্ষ্যকেও ইসলামী ব্যাংক নিশ্চিত করিতে চায়। ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য হইল ব্যক্তির কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাহার ও তাহার পরিবারের ভরণ-পোষণের সুযোগ সৃষ্টি করা। ফলে সমাজে সুস্থ ও কল্যাণধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি সহজ হয়। ইসলামী ব্যাংক একই সাথে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূপে সমাজের ব্যাপক ও বহুমুখী প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে কাজ করে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ উমর চাপরার মতে, ইসলামী ব্যাংক একটি Multipurpose ব্যাংক।

**৯. মুদ্রাস্ফীতির কারণ দূর করা ঃ** মুদ্রাস্ফীতি আধুনিক অর্থনীতির একটি প্রধান সমস্যা। প্রধান তিনটি কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে ঃ (ক) অর্থের ক্রমবৃদ্ধির সহিত উৎপাদন প্রবৃদ্ধির অসামঞ্জস্য; (খ) অনুৎপাদনশীল ও অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয়বৃদ্ধি এবং (গ) সরকারী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি। সুদ-ভিত্তিক ব্যবস্থায় পণ্যের সহিত টাকার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায় অর্থনৈতিক কার্যক্রম ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট হারে মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। ফলে মুদ্রার সামগ্রিক সোপান বাড়িয়া গিয়া দ্রব্যমূল বৃদ্ধি পায়। সুদ-নির্ভর অর্থলগ্নির ফলে বাজারে অর্থের সরবরাহ বাড়িয়া যায়। সেই অর্থ উৎপাদনে নিয়োজিত না হইলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে বাধ্য।

ইহার বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকের সুদমুক্ত আর্থিক লেনদেন নানা উপায়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। প্রথমত, ইসলামী ব্যাংক অর্থের লগ্নি করে না। পণ্যের বেচা-কেনাই ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির মূল ভিত্তি। উৎপাদনের সহিত এই পণ্য প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। পণ্য-ভিত্তিক

এই বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির কারণ দূর হয়। লগ্নিকৃত টাকা অনেক সময় নির্ধারিত খাতের বাহিরে সরাইয়া নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। ইহার ফলে ব্যাংকের ঋণ প্রদানের উৎপাদনমূলক লক্ষ্য ব্যাহত হইতে বাধ্য। পণ্য-ভিত্তিক বিনিয়োগ এই ত্রুটি হইতে মুক্ত। দ্বিতীয়ত, ইসলামী ব্যাংক অত্যাবশ্যকীয়, উৎপাদনমূলক, শ্রমঘন, সামাজিকভাবে লাভজনক বিভিন্ন বৈধ খাতে বিনিয়োগ করে। এই বিনিয়োগ নীতি সমাজের মানুষের চাহিদার সহিত পুরাপুরি সংগতিপূর্ণ এবং মুদ্রাস্ফীতি রোধে সহায়ক। তৃতীয়ত, ইসলামী ব্যাংক মানুষকে শুধু ব্যাংকিং-এর প্রতি আকৃষ্ট করে না, সামাজিক দায়িত্ব পালনেও তাহাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম সমাজে অবৈধ আয়কে নিরুৎসাহিত করে। ইহা সম্পদের সুবিচারমূলক বণ্টন এবং ন্যায়নিষ্ঠ লেনদেনের সুযোগ প্রসারিত করে। ইসলামী ব্যবস্থায় নৈতিক শৃংখলার নীতি প্রাধান্য পায়। ফলে সম্পদের অপরিমিত ব্যবহার ও অপচয় নিরুৎসাহিত হয়। এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইবার ফলে অপ্রয়োজনীয় ও অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হ্রাস পায়। বর্ধিত সরকারী ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনও কমিয়া আসে।

**১০. বেকারত্ব দূরীকরণ ও অধিক কর্মসংস্থান :** ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য, নীতি ও কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের সহিত যুক্ত হওয়ায় তাহা কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত করে। ইসলামী ব্যাংক শুধু সম্পদশালী লোকদের মাঝে তাহার বিনিয়োগ সীমিত রাখে না। সমাজের স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীন লোকদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইহা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের একটি অপরিহার্য কর্মকৌশল। অন্যদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত করিতেই সুদ ভূমিকা পালন করে। সুদের ইতিবাচক হার পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সমতা রাখিতে ব্যর্থ হয়। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা এই দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। বেকারত্ব দূরীকরণে ও অধিক কর্মসংস্থানে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা ইতিবাচক, প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়।

সমাজে বেকারত্ব দূর করিতেও ইহাই একামত্র কার্যকর পদ্ধতি। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জেমস কীনস তাহার 'থিওরী অব ইন্টারেস্ট' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "কোন অর্থনীতিতে পূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য সুদের হার শূন্যের কোঠায় নামাইয়া আনিত হইবে।" এই মন্তব্য ইসলামের সুদমুক্ত নীতিরই প্রতিধ্বনি। অধিক বিনিয়োগ অধিক উৎপাদন ও অধিক কর্মসংস্থানের সাথে সাথে অধিক রফতানীও নিশ্চিত করে। ইহাতে বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার আন্তপ্রবাহ বাড়ে। অধিক রফতানী দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা (exchange rate stablity) বজায় রাখিতে সহায়তা করে। ফলে স্থানীয় মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পায়। আমদানী মূল্য পরিশোধে তাহা অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে এবং অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

**১১. গ্রাহকদের সহিত অংশীদারিত্বের সম্পর্ক :** সুদ-ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থায় সকল পক্ষ পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ গ্রহণ বা প্রদান করিবার কারণে ব্যাংক বা গ্রাহক কোন পক্ষই অপর পক্ষের লাভ-লোকসানের ভাগীদার নয়। তাই তাহাদের মাঝে পারস্পরিক সমস্বার্থবোধ বা একাত্মতা গড়িয়া উঠিবার সুযোগ থাকে না। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সঞ্চয়কারীদের লাভ-লোকসান ব্যাংকের লাভ-লোকসানের সহিত যুক্ত। আবার ব্যাংকের লাভ-লোকসান বিনিয়োগ গ্রহীতাদের ব্যবসায়িক ফলাফলের উপর নির্ভরশীল। ফলে এই ক্ষেত্রে সঞ্চয়কারী, ব্যাংকার ও বিনিয়োগ-গ্রহীতা পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ। এইখানে পারস্পরিক সম্পর্ক অংশীদারিত্বের, দাতা-গ্রহীতার নয়। তাই ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সকল পক্ষ তাহাদের অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে সমন্বিত করিয়া সম্মিলিতভাবে কাজ করিতে উদ্বুদ্ধ হয়। গ্রাহক-সম্পৃক্ততার এই আদর্শ ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে বিবেচিত।

**১২. শারী'আর নীতি অনুসরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যে নীতি-নৈতিকতা ও হালাল-হারামের দৃষ্টিভঙ্গী :** ইসলামী ব্যাংক তাহার বিনিয়োগের আর্থ-সামাজিক প্রভাব বা সামাজিক লাভ-ক্ষতিও বিবেচনা করে। সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী মদ বা মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও বিপণন, চরিত্র বিধ্বংসী উপকরণ, তামাক ও সিগারেটের মত জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন ও বিপণনে ইসলামী ব্যাংক সহায়তা করে না। মজুতদারী ও মুনাফাখোরীর সুযোগ সৃষ্টিকারী কাজে কিংবা সর্বসাধারণের ক্ষতি করিয়া ব্যক্তিবিশেষের সৌভাগ্য গড়িবার কাজে বিনিয়োগও ইসলামী ব্যাংক সমর্থন করে না। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ শুধুমাত্র শারী'আত অনুমোদিত খাতে ও শারী'আ সম্মত পদ্ধতিতে হইতে হইবে। সেই সাথে ইসলামী ব্যাংক তাহার বিনিয়োগ নীতিতে ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ হইতে অগ্রাধিকার খাত নিরূপণ করিবে। ইসলামী ব্যাংক বিলাস সামগ্রীর তুলনায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীতে বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেয়। সম্পদ শুধু স্বল্প সংখ্যক মানুষের মাঝে যাহাতে আবর্তিত না হয় তাহা নিশ্চিত করাও ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। ইসলামী ব্যাংক তাহার জমা গ্রহণ ও বিনিয়োগ কার্যক্রমসহ সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শারী'আর নীতি অনুসরণ করে। ইসলামী শারী'আর আল-ওয়াদি'আ নীতির ভিত্তিতে চলতি হিসাব এবং মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে লাভ-লোকসান অংশীদারী জমা হিসাব (সঞ্চয়ী হিসাবের বিকল্প) ও লাভ-লোকসানে অংশীদারী মেয়াদী জমা হিসাব (স্থায়ী জমা হিসাবের বিকল্প) পরিচালিত হয়। ইসলামী ব্যাংক তাহার বিনিয়োগ কার্যক্রমে মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, বায়' মুআজ্জাল, বায়' সালাম, শিরকাতুল-মিলক প্রভৃতি ইসলামী পদ্ধতি অনুসরণ করে। কেন্দ্রী বাংকসহ সুদভিত্তিক অন্যান্য ব্যাংকের সহিত, এমনকি আন্তর্জাতিক সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহের সহিত লেনদেনেও ইসলামী ব্যাংক সুদ পরিহার করে।

ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম শারী'আর বিধান মুতাবেক পরিচালিত হইতেছে কিনা তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য বিশ্বের প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক শরীয়া কাউন্সিলের তদারকির অধীন। শরীয়া কাউন্সিল ব্যাংকের সকল কার্যক্রমে ইসলামী শারী'আ সংক্রান্ত যথার্থতা তদারক করে এবং এই ব্যাপারে নিয়মিত পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করে।

ইসলামী ব্যাংকের লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, মূলধন বা তহবিল বিনিয়োগ ইত্যাদি বহুমাত্রিক পরিচালনাগত কাজে শারী'আ পরিপালন নিশ্চিত করা এবং সকল ক্ষেত্রে তাহা লংঘন রোধের উদ্দেশ্যে শারী'আহ কাউন্সিল একটি স্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সংস্থারূপে ভূমিকা পালন করে। শারী'আ অনুমোদিত পদ্ধতি উদ্ভাবন, প্রয়োগ, নির্দেশনা, নিরীক্ষণ, পরামর্শ প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যাংকের শরীয়া কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফিক্হ সংক্রান্ত বিষয়ে পারদর্শী বিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ আলিম, ইসলামী অর্থনীতিবিদ, অভিজ্ঞ আইনবিদ ও অভিজ্ঞ ব্যাংকারদের সমন্বয়ে শরীয়া কাউন্সিল গঠিত হয়।

ইসলামী ব্যাকের শারী'আ কাউন্সিল শারী'আত সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাধীনভাবে তাহাদের মতামত প্রদান করে। বাংলাদেশে যেইসব সুদভিত্তিক ব্যাংক পৃথকভাবে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা পরিচালনা করিতেছে তাহাদেরও নিজস্ব শারী'আ কাউন্সিল রহিয়াছে। বাংলাদেশের সকল ইসলামী ব্যাংকের শারী'আ তসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সংস্থারূপে ২০০১ সালের ১৬ আগস্ট হইতে কাজ করিতেছে সেন্ট্রাল শরীয়া বোর্ড ফর ইসলামী ব্যাংকস অব বাংলাদেশ। বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরীয়া স্ট্যাণ্ডার্ড নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠনরূপে ১৯৯১ সালের ২৭ মার্চ হইতে কাজ করিতেছে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের অঙ্গ সংস্থা বাহরায়নভিত্তিক একাউন্টিং এণ্ড অডিটিং অর্গানাজেশন ফর ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস বা AAOIFI।

**১৩. বঞ্চিত ও অভাবী মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন ঃ** ইসলামী ব্যাংক সমাজের সহিত সুদৃঢ় সংযোগ-সম্পর্ক রক্ষা করিয়া জনগণের উন্নতি ও সামাজিক সাম্য অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী পরিকল্পিত জনকল্যাণমূলক কাজ করিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে সাধারণত যাকাত ও সাধারণ দানের অর্থে পৃথক হিসাবের ভিত্তিতে ব্যাংকের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব দেয়। আল-কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ "তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও..." (বাকারা ঃ ৪৩)। "কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যেই যাকাত তোমরা দিয়া থাক তাহাই বৃদ্ধি পায়; তাহারাই সমৃদ্ধিশালী" (রূম ঃ ৩৯)। "আর যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তাহা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাহাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও" (তওবা ঃ ৩৪)। "লোকে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কি তাহারা ব্যয় করিবে? বলুন, যাহা উদ্বৃত্ত" (বাকারা ঃ ২১৯)।

যাকাতের আটটি খাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে ঃ "সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও (সংগ্রহ ও বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট) কর্মচারীদের জন্য, যাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাহাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। ইহা আল্লাহর বিধন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" (তাওবা ঃ ৬০)।

"তাহা ধনী লোকদের নিকট হইতে আদায় ও গ্রহণ করা হইবে এবং তাহা সেই সমাজেরই দরিদ্র লোকদের মধ্যেই বণ্টন করা হইবে" (বুখারী)। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, মহান আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি (আমার অভাগা বান্দাদের জন্য) খরচ কর। আমি তোমার জন্য খরচ করিব" (বুখারী, মুসলিম)।

যে সমাজ শুধু মুনাফা নিয়া ব্যস্ত, তাহার পতন ঘটিবে। অর্থই সাফল্যের একমাত্র নিয়ামক বিবেচিত হইলে সেই সমাজে দুর্নীতি বহু গুণে বাড়িয়া যাইবে। যোশেফ সুমপিটার বলিয়াছেন, প্রতিটি মানুষ যদি তাহার একপেশে স্বল্পমেয়াদী স্বার্থ দ্বারাই পরিচালিত হয়, তবে কোন সমাজই চলিতে পারে না।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রথমে 'সাদাকা ফাণ্ড' ও পরে ব্যাপক ভিত্তিতে 'ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংকও অনুরূপ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে পরিচালিত জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীর মধ্যে বহুমুখী প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত (নিম্নে দ্র.)।

**১৪. ইসলামী ব্যাংকের সামাজিক বিনিয়োগ ঃ** বিভিন্নমুখী ব্যাংকিং লেনদেনের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংক গরীব, দুঃস্থ, অসহায় ও নিঃসম্বল মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যুব কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন, দুঃস্থ পুনর্বাসন, পরিবেশ সংরক্ষণসহ সামাজিক খাতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছে। এইসব কর্মসূচীর মধ্যে রহিয়াছে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প, দুধেল গাভী পালন প্রকল্প, রিকশা ও ভ্যান গাড়ী প্রকল্প, পোল্ট্রি প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রকল্প, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী প্রকল্প, ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্পসহ বিভিন্ন আয়বর্ধক ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী। মডেল ফোরকানীয়া মক্তব, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি ও অনুদান এবং দুঃস্থদের জন্য স্কুল পরিচালনা ও সাহায্য দানসহ শিক্ষা কর্মসূচী। মেডিক্যাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা, দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য অনুদান, নলকূপ স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণসহ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কর্মসূচী। ইয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে কন্যা পাত্রস্থ করিবার জন্য অনুদান, ঋণগ্রস্ত ও ভ্রমণ পথে বিপদগ্রস্ত লোকদের অনুদানসহ মানবিক সাহায্য কর্মসূচী এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী। ইসলামী ব্যাংক মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসাবে ক্ষুদে উদ্যোক্তা উন্নয়নসহ মানবকল্যাণে বিভিন্নমুখী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, যেমন হাসপাতাল ও কম্যুনিটি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং দুঃস্থ মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা করিতেছে।

**১৫. দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন ঃ** সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণা হইতে এখন ইহা স্পষ্ট যে, জ্বালানি, শিল্প কিংবা কৃষিখাতের চাইতেও দরিদ্র জনগণের মাঝে বিনিয়োগ করিয়া বেশী আর্থ-সামাজিক রিটার্ন পাওয়া সম্ভব। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন হইতে দেখা যায়, মানব সম্পদ উন্নয়ন খাতের বিনিয়োগ হইতেই সর্বোচ্চ আয় নিশ্চিত হয়। কার্যকর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ ও অনুপ্রাণিত জনগোষ্ঠী একটি অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। ইহার ফলে আর্থ-সামাজিক কর্মক্ষেত্রে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়, সামাজিক অসাম্য দূর হয় এবং উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ দেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংক হিসাবে তাহার বিনিয়োগ কার্যক্রম এই লক্ষ্যেই পরিচালিত করিতেছে এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন খাতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলিতেছে। এই ব্যাংক দেশের বৃহৎ কর্পোরেট গ্রাহকদেরকে এককভাবে বৃহত্তম বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের সামর্থ্য (Single party exposure) নিয়া দেশের শিল্প বিকাশে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করিয়াছে। অন্যদিকে বিনা জামানতে ৫ হাজার টাকা হইতে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত পল্লীর হত-দরিদ্র, সংকটপ্রবণ জনগোষ্ঠীর লোকরদেরকে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করিয়া তাহাদেরকে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করিতেছে। ইসলামী ব্যাংক এইভাবেই আয়ের (সম্পদ) পুনর্বণ্টন ও সুযোগের পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে সাধার মানুষের প্রকৃত ক্ষমতায়ন, ধনী-গরীব বৈষম্য দূরীকরণ, সামাজিক সম্প্রীতি ও স্থিতিশীলতা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূমিকা পালন করিতেছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনরায় সক্রিয় করিয়া তুলিতে বিনা জামানতে ক্ষুদ্র ও ছোট বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বৃদ্ধির লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন

প্রকল্প চালু করিয়াছে। ১৯৯৫ হইতে ২০০৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক এই প্রকল্পের আওতায় ৫৬২২টি গ্রামে ৩,২৭,৩৫৩ জন গ্রাহকের মাঝে ৬৮১.৩৩ কোটি টাকা বিতরণ করিয়াছে। ২০০৬ সালের ৩০ এপ্রিল এই প্রকল্পের উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ২,৫৫,৭৭০ জন। তাহাদের শতকরা ৯৪ ভাগের বেশী হইতেছেন মহিলা। ইহার ফলে গ্রামীণ জনপদে একটি অত্যন্ত ইতিবাচক গুণগত পরিবর্তন আসিতেছে।

গ্রামের বিত্তহীন সাধারণ মানুষকে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের সাথে সাথে তাহাদেরকে অক্ষরজ্ঞান দেওয়া হইতেছে এবং নৈতিক ও মানবিক বোধে উদ্বুদ্ধ ও সাবলম্বী হইবার প্রক্ষিণ দেওয়া হইতেছে। ফলে এই উপকারভোগীগণ পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যথাযথ মর্যাদা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য অর্জন করিতেছে। গ্রামীণ মহিলাদেরকে আয়ের সুযোগ সৃষ্টিকারী উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করিয়া তাহাদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সামর্থ্যের বিকাশ ঘটাইবার মধ্য দিয়া দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা সামাজিক উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করিয়া ইসলামী ব্যাংক তাহার সামাজিক দায়িত্ব পালন করিতেছে। প্রথমে ৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ নিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাইয়া এই প্রকল্পের সদস্যদের কেহ কেহ এখন ২ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ নেওয়ার সামর্থ্য অর্জন করিয়াছেন। ইহা একটি আর্থ-সামাজিক উত্তরণ প্রক্রিয়া। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর অঙ্গসংস্থা ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য বিনামূল্যে টিউবওয়েল সরবরাহ করিতেছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াইবার লক্ষ্যে সেনিটারী ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছে।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশকে সবুজায়ন করিতে গত তিন বৎসরে মোট ১২,৭৫,০০০টি বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এই জাতীয় সামাজিক কর্মসূচী ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে নবতর সংযোজন।

এই ব্যাংকের বিভিন্ন বাণিজ্যিক অর্থায়নের মুনাফার হার ২০০৫ সালে যেখানে ছিল প্রায় ১৪ ভাগ, সেখানে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ গ্রাহক হইতে মুনাফা নেওয়া হয় ১০ ভাগেরও কম হারে। এখানে উল্লেখ্য যে, সরাসরি পণ্য ক্রয় করিয়া ব্যাংক ক্রয়মূল্যের উপর যে হারে আয় করে তাহাই মুনাফা। শারী'আতে এই জাতীয় কেনা-বেচা বায়' মুরাবাহা নীতির আলোকে পরিচালিত হয়। এই নিম্ন হারে অর্থায়ন দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংকের আন্তরিক ও দৃঢ় প্রতিশ্রুতির বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। এই ধরনের উদ্যোগ সম্পদের বণ্টন উৎসাহিত করিতেছে এবং সমাজ ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখিতেছে।

**এক নজরে ইসলামী ব্যাংক ও সুদভিত্তিক ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য**

১. ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুদভিত্তিক ব্যাংক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বাইপ্রডাক্ট।

২. মাকাসিদ আশ-শারী'আহ অর্থাৎ ইসলামের আর্থ-সামাজিক সুবিচার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্যে। শারী'আহর উদ্দেশ্য অর্জনে সুদী ব্যাংকব্যবস্থার কোন চিন্তা, উদ্যোগ বা কর্মসূচী নাই।

৩. সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দিকে সম্পদের প্রবাহ ধাবিত করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম কর্মকৌশল। সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় সম্পদের প্রবাহ পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থের দিকে ধাবিত হয়।

৪. আয় ও সম্পদের বৈষম্য কমানো এবং সকল স্তরের মানুষের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক অগ্রাধিকার খাতে বিনিয়োগ করে। সুদভিত্তিক ব্যাংক বিত্তবানদের স্বার্থে সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

৫. ইসলামী ব্যাংক হালাল পদ্ধতিতে জমা সংগ্রহ করে এবং হালাল খাতে ও হালাল পদ্ধতিতে সেই তহবিল বিনিয়োগ করে। সুদভিত্তিক ব্যাংক জমা সংগ্রহ ও লগ্নীসহ কোন কার্যক্রমে হালাল-হারামের বিধান অনুসরণ করা হয় না।

৬. ইসলামী ব্যাংকে মুদারাবা পদ্ধতিতে জমাকারীগণ বিনিয়োগের ঝুঁকি বহন করেন। সুদভিত্তিক ব্যাংকে জমাকারী কোন ঝুঁকি বহন করেন না, মূল জমা পূর্ব নির্ধারিত সুদসহ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা ভোগ করেন।

৭. ইসলামী ব্যাংক তাহার সঞ্চয় ও জমা গ্রহণের নীতি এবং বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে পুঁজির স্বাভাবিক বিকাশে সহায়তা করে। সুদী ব্যবস্থায় পূর্ব নির্ধারিত সুদ পুঁজির স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে।

৮. ইসলামী ব্যাংকের সহিত গ্রাহকের সম্পর্ক মুদারিব ও সাহিবুল মাল, মুয়াদ্দ' ইলায়হি ও মুয়াদ্দি', ক্রেতা ও বিক্রেতা, কারবারের অংশীদার কিংবা ভাড়াদাতা ও ভাড়াগ্রহীতা হিসাবে গড়িয়া উঠে। সুদী ব্যবস্থায় ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যকার সম্পর্ক হইল ঋণদাতা ও ঋণ গ্রহীতার।

৯. ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম শারী'আহসম্মতভাবে পরিচালনা হইতেছে কিনা তাহা তদারকির মাধ্যমে নিশ্চিত করিবার জন্য শরীয়াহ বোর্ড থাকে। সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় এই ধরনের শরী'য়াহ বোর্ডের প্রয়োজন হয় না।

১০. ইসলামী ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বমূলক। ফলে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সুদী ব্যবস্থা ব্যাংকার-গ্রাহক বা ক্রেডিটর ও ডেটর-এর মধ্যকার সম্পর্ক পারস্পরিক দায়িত্বশীলতার অনুভূতি সৃষ্টি করে না। ইহাকে অপরের দুঃসময়ে সহযোগিতার হাত বাড়াইতে উদ্বুদ্ধ করে না।

১১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক তাহাদের নিজস্ব অবণ্টনযোগ্য তহবিলের উপর ২.৫% হারে যাকাত দেয়। গ্রাহকদেরকেও ব্যাংক যাকাত প্রদানে উৎসাহিত করে। যাকাত প্রদানের কোন অনুভূতি বা ব্যবস্থা সুদভিত্তিক ব্যাংকিং-এ নাই।

১২. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যবসায়ের নীতি ও কর্ম কৌশলে অনগ্রসর সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রাধান্য পায়। সুদী ব্যবস্থায় ব্যবসায়ের সামগ্রিক আয়োজন কতিপয় পুঁজিদারের মুনাফা বাড়াইবার লক্ষ্যে নিবেদিত।

১৩. ইসলামী ব্যাংক অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে এবং উৎপাদনকে উৎসাহিত করে। ফলে এই ক্ষেত্রে বাজারের স্বাভাবিক চাহিদা ও সরবরাহের আন্তঃপ্রক্রিয়ায় লাভ-লোকসান নির্ধারিত হয়। সুদী ব্যাংক সুদ পাওয়াকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। প্রকল্পের উৎপাদন-সামর্থ্য বা ইহার ফলে সামাজিক চাহিদা পূরণের বিষয় এইখানে কম গুরুত্ব পায়।

১৪. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বহুমুখী বিনিয়োগ পদ্ধতি রহিয়াছে। ইজতিহাদের ফলে ক্রমশ ইহার সংখ্যা বাড়িতেছে। সুদভিত্তিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ পদ্ধতি সীমিত। এই ক্ষেত্রে নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবনের সুযোগ কম।

১৫. কোন প্রকল্প কতটা সফল ও লাভজনক হইবে তাহা মূল্যায়ন করার উপর ইসলামী ব্যাংক বেশী গুরুত্ব দেয়। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। সুদভিত্তিক ব্যবস্থায় প্রকল্প বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নের চাইতে সহায়ক জামানতের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়।

১৬. ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি সরাসরি পণ্যের সহিত যুক্ত এবং এই পদ্ধতিতে ব্যাংকের তদারকী বেশী। তাই এক খাতের মূলধন অন্যত্র সরাইয়া লওয়ার সুযোগ কম। ফলে পাওনা অনাদায়ী হওয়ার আশংকা কম। সুদভিত্তিক ব্যাংকে টাকা বেচা-কেনার পদ্ধতিতে টাকার লেনদেন হয়। এক খাতের লগ্নীর টাকা অন্য খাতে সরাইয়া লওয়ার সুযোগ অবারিত হয়। ফলে অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ বাড়িয়া যায়।

১৭. ইসলামী ব্যাংক সমাজের কল্যাণকে নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে গ্রাহকের ব্যক্তি-চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা এবং তাহার সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের উন্নয়নের উপর জোর দেয়, ভালো মানুষদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা বাড়িলে সমাজ সংহত হইবে বলিয়া মনে করে এবং এই লক্ষ্যে এই ব্যাংক কাজ করে। প্রচলিত ব্যাংক গ্রাহকের নীতি-নৈতিকতা, সামাজিক বা ধর্মীয় মূল্যবোধ বিবেচনা করে না।

১৮. শারী'আ অননুমোদিত খাত হইতে প্রাপ্ত কোন অর্থ ইসলামী ব্যাংকের আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। শরীয়াহ বোর্ডের পরামর্শক্রমে তাহা ব্যয় করা হয়। যে কোনভাবে বা যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ ব্যাংকের আয়ের অংশ হয়। এখানে হালাল-হারামের কোন বাছ-বিচার নাই।

**ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনে ইসলামী ব্যাংক**

একটি উন্নততর ও স্বতন্ত্র ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সৌন্দর্য ও আবেদন বুঝিতে হইলে মূলত ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তা ও ইহার লক্ষ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ আবশ্যক। একটি পূর্ণাঙ্গ ও গতিশীল জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামের ব্যাপ্তি জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে স্পর্শ করে এবং জীবনের একটি ব্যাপক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে। এই অবস্থান হইতে ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাজ করে।

য়ূরোপীয় শিল্প বিপ্লবের পর হইতে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া অর্থনৈতিক বিষয়াদি হইতে দয়া, ভালবাসা, সহমর্মিতা, পরোপকার ইত্যাদি মানবীয় ও নৈতিক বিষয়গুলি বিসর্জন দিয়া যে অর্থব্যবস্থা ক্রমশ গড়িয়া তোলা হইয়াছে সেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নামকরণ করা হইয়াছে তথাকথিত positive economics হিসাবে। এই অর্থব্যবস্থার বিকাশ ও পরিপুষ্টিতে প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা নিরন্তর শক্তি যোগাইয়াছে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বাইপ্রোডাক্ট হইল সুদী ব্যাংক ব্যবস্থা। অন্যদিকে সমাজবাদী অর্থব্যবস্থা সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী শোষণ হইতে মানবতাকে উদ্ধার করিতে যাইয়া নিজেই পরবর্তীতে এক দানবাকৃতির পুঁজিবাদ কায়েম করিয়া এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আবার তথাকথিত নমনীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

এই দুই প্রান্তিক অর্থব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শনের মূল কথা হইল, মানুষ উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্ট কোন প্রাণীবিশেষ নয়, বরং বিশ্বজাহানের মহান মালিকের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এক সম্মানিত প্রতিনিধি বা খলীফা। ইসলামী ব্যাংক-এর সকল প্রচেষ্টা মূলত এই উদ্দেশ্য অর্জনে নিবেদিত। ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্যকে ডঃ ওমর চাপরা সংজ্ঞায়িত করিয়াছেন 'মাকাসিদ আশ-শারী'আহ' হিসাবে। মাকাসিদ আশ-শারী'আহ হইতেছে শরীয়ার সীমার মধ্য হইতে "ফালাহ" (কল্যাণ) আহরণ এবং 'হায়াতে তায়্যিবার' (পবিত্র জীবন) বাস্তবায়নের জন্য যাহা কিছু করা প্রয়োজন তাহার সব কিছুই। ইমাম গাযালীর মতে মাকাসিদ হইতেছে ঈমান, জীবন, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশধর ও সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধনের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার সবই (এম. উমর চাপরা, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, পৃ. ৩৩, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা ২০০০ খৃ.)।

জীবনে মাকাসিদের মধ্যেই মূলত অর্থনৈতিক দর্শনসমূহের ভিত্তি প্রোথিত। পাশ্চাত্যের দর্শন মূলত মানুষের অভাব ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে সচেষ্ট। অন্যদিকে ইসলামী অর্থ-দর্শনের প্রবক্তাদের বক্তব্য হইল, ঈমান হইতেছে মানুষের সর্বপ্রধান মৌলিক প্রয়োজন। ফলে পাশ্চাত্যের ক্রমবিবর্তিত অর্থনৈতিক কর্ম-পরিকল্পনার সহিত ইসলামী অর্থনীতির পার্থক্যটি মৌলিক ও নীতিগত। ইসলামী অর্থনীতির বিশ্ব-দর্শন ও কর্মকৌশলের সহিত সম্পৃক্ত মৌলিক বিষয়গুলি হইল ঃ

**বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ঃ** মানবজাতির প্রত্যেক সদস্যই আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলীফা হিসাবে বিশ্ব মানবমণ্ডলীর অচ্ছেদ্য অংশ। তাহার পরিচয় কোন দেশ, দল বা বিশেষ কোন জাতির সদস্য বা কোন বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর সদস্য হিসাবে নয়। প্রত্যেকেই আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সীমার মধ্যে স্বাধীন। একের উপর অন্যের মর্যাদার মানদণ্ড ধন-সম্পদ বা প্রাচুর্য নয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, 'গোটা সৃষ্টিকুল আল্লাহর পরিবার। অতএব যেই ব্যক্তি আল্লাহর পরিবারের সহিত সদ্ব্যবহার করে সেই আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি' (বায়হাকী)। ভ্রাতৃত্বের এই ধারণাগত কাঠামোর আওতায় অন্যান্য মানবসত্তার সহিত দরদী আচরণ ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ আবর্তনের অন্যতম মাধ্যম ও অনুঘটক হিসাবে কাজ করে।

**সম্পদ একটি আমানত ঃ** সম্পদের মালিকানা সংক্রান্ত ইসলামী আকীদা অনুযায়ী সমস্ত সম্পদরাজির মালিক আল্লাহ আর মানুষ উহার আমানতদার। মানুষ তাহার আওতাধীন সকল উপায়-উপকরণ আল্লাহর বিধিবদ্ধ নিয়মে ব্যয় ও ভোগের কাজে ব্যবহার করিবে। সম্পদ এমনভাবে কাজে লাগাইতে হইবে যেন তাহা মুষ্টিমেয় লোকের নহে, বরং সকলের উপকারে আসে। অন্যদিকে যাবতীয় আয়-উপার্জনও হইতে হইবে বৈধ। বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদও আমানতের শর্তের বাহিরে ব্যয় বা ব্যবহার করা যাইবে না।

**সরল ও বিনীত জীবন যাপন ঃ** সরল ও বিনীত জীবনাচরণ ইসলামী মাকাসিদের একটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য। মানুষকে পৃথিবীতে অবস্থান ও আচরণ করিতে হইবে বিনীতভাবে। কোন প্রকার ঔদ্ধত্য, জাঁকজমক, আড়ম্বর ও অনৈতিক চালচলন ইসলাম অনুমোদন করে না। এমন কোন জীবন-যাপন পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইবে না, যাহা অপচয় ও অপব্যয়কে উৎসাহিত করে।

**মানুষের স্বাধীনতা ঃ** মানুষের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ, একচ্ছত্র বা অবাধ নয়। শারী'আতের বিধিবদ্ধ নিয়মের মধ্যে থাকিয়া মানুষ তাহার অর্থনৈতিক প্রয়োজনে উপায়-উপকরণ সংগ্রহের স্বাধীনতা ভোগ করিবে। এইভাবে জবাবদিহিতার অনুভূতি লইয়া প্রত্যেকেই তাহার যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে অবদান রাখিতে সমর্থ হইবে।

**চাহিদা পূরণ ঃ** সম্পদ যাহাতে প্রত্যেকের চাহিদা পূরণে অবদান রাখিতে পারে সেই লক্ষ্যে সম্পদের বণ্টন ও ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের চাহিদা অসীম নয়, বরং সহজ, সরল ও বিনীত জীবন যাপনে সাহায্যকারী। ইসলামী শারী'আতের মদের ব্যবহার, উৎপাদন ও বিপণন নিষিদ্ধ। এই কারণে একজন বিশ্বাসী ব্যক্তির কাছে মদের কোন চাহিদাই সৃষ্টি হইতে পারে না। অর্থাৎ চাহিদা জাগ্রত হওয়ার আগেই ইসলাম একটি Moral filter বা নৈতিক ছাঁকুনি পদ্ধতি অবলম্বন করে, যাহাতে প্রত্যেকের চাহিদা প্রকৃত চাহিদা হিসাবে অর্থনৈতিক বিবেচনায় আসে (এম. উমর চাপরা, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, পৃ. ৩৩, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা ২০০০ খৃ.)।

**দায়িত্বশীল দরদী সমাজ ঃ** প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার যোগ্যতা অনুযায়ী চাহিদা পূরণে নিজের প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাইবে। এতদসত্ত্বেও সমাজের কিছু লোক শারীরিক অক্ষমতার কারণে নিজস্ব উদ্যোগে আয় করিতে পারে না। এই ধরনের লোক যাহাতে কোন রকম বঞ্চনার শিকার না হন এবং অর্থনৈতিক দীনতায় না ভোগেন, তাহা নিশ্চিত করা সকলের ইসলাম নির্দেশিত সামাজিক দায়িত্ব। মুসলিম সমাজে সম্পদের সুসম বণ্টন অপরিহার্য। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সম্পদ যেন শুধুমাত্র তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়' (সূরা আল-হাশর, আয়াত ঃ ৭)। 'তোমাদের সম্পদে অধিকার রহিয়াছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের' (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত ১৯)। হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে, 'চাষবিহীন অবস্থায় কোন জমি অনধিক তিন বৎসর ফেলিয়া রাখা যাইবে না।' যাকাত ও 'উশর আদায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণসহ অসহায় দরিদ্র লোকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইসলামী অর্থনীতির যেইসব বিধান রহিয়াছে উহার আলোকে সমাজের আর্থিক লেনদেন ঢালিয়া সাজাইতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা রাখিতে সক্ষম। এইজন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের সকল কার্যক্রম ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমন্বিত হইতে হইবে।

**ইসলামী ব্যাংকের কর্মকৌশল**

সুদভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শত শত বৎসরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়াছে। ফলে ইহার সেবার ক্ষেত্র ও পরিসর ক্রমশ বিস্তৃত, সম্প্রসারিত ও ব্যাপকতর হইয়াছে। বহুমাত্রিক কার্যক্রমের কারণে এই ব্যাংক ব্যবস্থা 'ব্যাংকিং সুপার মার্কেট' বা '৩৬০ ডিগ্রী ব্যাংক'রূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। অন্যদিকে ভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও কর্মকৌশল লইয়া গত কয়েক দশকে বাড়িয়া উঠা ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম সুদভিত্তিক ব্যাংকের চাইতেও ব্যাপকতর। সুদভিত্তিক ব্যাংকের কার্যক্রমের মুকাবিলায় ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদের চাহিদা সামনে রাখিয়া ইসলামী শারী'আতের সীমার মধ্যে নূতন নূতন প্রডাক্ট উন্নয়ন করিতেছে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বিকাশের সাথে সাথে এই ক্ষেত্রে ইজতিহাদ তথা গবেষণার মধ্য দিয়া নূতন নূতন প্রডাক্ট উন্নয়ন হইতেছে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার কর্মকৌশল সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

**জমা গ্রহণ ঃ** গ্রাহকের নিকট হইতে জমা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাংকের তহবিল গড়িয়া উঠে। ব্যাংক সেই তহবিল বিনিয়োগ করে। জমা গ্রহণ ও বিনিয়োগ এই উভয় ক্ষেত্রেই সুদভিত্তিক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য মৌলিক। সুদী ব্যাংক চলতি হিসাবে জমা গ্রহণ করিয়া সেই টাকা সুদে খাটায়। ইহা ছাড়া পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ দেওয়ার আগাম অঙ্গীকারের ভিত্তিতে সঞ্চয়ী, স্বল্প মেয়াদী, স্থায়ী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের জমা গ্রহণ করে।

ইসলামী ব্যাংক শারী'আত অনুমোদিত আল-ওয়াদি'আ পদ্ধতিতে চলতি হিসাবে জমা নেয়। ইহা ছাড়া শারী'আভিত্তিক মুদারাবা পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের লাভ-লোকসান অংশীদারী জমা গ্রহণ করে। এই দুই পদ্ধতির সহিত সুদের কোন সম্পর্ক নাই।

ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের জমা আকৃষ্ট করিবার জন্য শারী'আ অনুমোদিত নীতি ও পদ্ধতির ভিত্তিতে জমার ধরন ও প্রকৃতিতে বৈচিত্র আনিয়াছে। ইহা বৈচিত্রপূর্ণ প্রডাক্ট উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করে। ইসলামী ব্যাংকের তহবিল ইসলামী শারী'আ অনুমোদিত পদ্ধতিতে বিভিন্ন শারী'আ অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা হয়। বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত লাভ ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে মুদারাবা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ভাগ হয়।

**ঋণ বনাম বিনিয়োগ ঃ** সনাতন পদ্ধতির ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে (তাহাদের পরিভাষায়) ঋণ ও আগাম (Loans & Advances) প্রদান করে। এইসব লগ্নী কাবারের মধ্যে সবচাইতে চালু পদ্ধতিগুলি হইল নগদ ঋণ-সুবিধা (Credt বা CC), ওভারড্রাফ্ট (Over Draft বা OD), বন্ধকী ঋণ (Pledge), হাইপোথিকেশন (Hypothecation) ইত্যাদি। লগ্নীর ধরন অনুযায়ী এইসব ঋণ ও আগাম বিভিন্ন রকম হইয়া থাকে। যেমন ভোক্তা-ঋণ (Consumer credit), ব্যবসায়িক ঋণ (Commercial Credit), শিল্প ঋণ (Industrial Loan) ইত্যাদি। ঋণের ধরন, মেয়াদ ও প্রকৃতিতে পার্থক্য সত্ত্বেও সুদ আহরণই সুদী ব্যাংকের কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য।

ঋণের বিপরীতে সুদ নেওয়ার সুযোগ ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় নাই। ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদেরকে ইসলামী শারী'আ অনুমোদিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়। ইসলামী ব্যাংকের তহবিল বিনিয়োগের শারী'আ অনুমোদিত অনেক পদ্ধতি রহিয়াছে। এইসবের মধ্যে রহিয়াছে (ক) মুদারাবা ও মুশারাকা ভিত্তিক অংশীদারি পদ্ধতি, (খ) বায়' মুরাবাহা, বায়' মু'আজ্জাল ইত্যাদি বেচা-কেনা পদ্ধতি এবং (গ) ইজারা ও লীজিংসহ শারী'আ অনুমোদিত বিনিয়োগ পদ্ধতি।

ইসলামী ব্যাংক টাকাকে পণ্যের মত বেচা-কেনা করে না; (ক) প্রকৃত দ্রব্যের বেচা-কেনা করে; (খ) গ্রাহকের সহিত অংশীদারি পদ্ধতিতে ব্যবসা করে; (গ) গ্রাহকদের কাছে কল-কারখানা, যানবাহন, বাড়ী ইত্যাদি ভাড়া দিয়া তাহা হইতে ভাড়া বাবদ আয় করে। এই ধরনের বিনিয়োগ কার্যক্রমের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংক সামর্থ্য অনুযায়ী কোন গ্রাহককে সীমিত পর্যায়ে বিনা লাভে ঋণ প্রদান করিতে পারে। সুদমুক্ত এই ঋণ 'করযে হাসানা' নামে পরিচিতি।

**ঋণপত্র (Letter of Credit বা L.C.) খোলা ঃ** আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলা ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

ঋণপত্রের মাধ্যমে আমদানীকৃত পণ্যের বিপরীতে অর্থলগ্নী করিয়া সুদী ব্যাংক সুদ নেয়। ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের ক্ষেত্রে বিলম্বে বিল পরিশোধের জন্যও সুদী ব্যাংক নির্ধারিত হারে সুদ আদায় করিয়া থাকে। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শারী'আতের নীতি মানিয়া ঋণপত্র খুলিয়া আন্তর্জাতিক লেনদেনে অংশ নেয়। ঋণপত্রের বিপরীতে আমদানী করা পণ্য ব্যাংক শারী'আ অনুমোদিত বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতির অধীনে গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করে অথবা ভাড়া দেয় কিংবা গ্রাহকের সহিত অংশীদারী কারবারে নিয়োজিত হয়। বিলম্বে বিল কিংবা রফতানী বিল ডিসকাউন্টিং-এর মত পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে এবং তাহাতে সুদ যুক্ত হইলে ইসলামী ব্যাংক সেই সুদ তাহার আয়ের মধ্যে শামিল করে না। যে কোন ধরনের অবৈধ বা সন্দেহজনক আয় শরী'য়া কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী অন্য কোন জনহিতকর কাজে ব্যয় করা হয়।

**বৈদেশিক মুদ্রা বেচা-কেনা ঃ** বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচা সুদভিত্তিক ব্যাংকের একটি স্বাভাবিক কাজ। নগদ (Spot) ও আগাম ফরমায়েশের (Forward Booking) মাধ্যমে এই জাতীয় লেনদেন হয়। এই ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সামর্থ্য ব্যাংকের ব্যবসায়িক সফলতার নিয়ামক হিসাবে বিবেচিত হয়। ইসলামী ব্যাংক দৈনন্দিন আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্য শারী'আসম্মত নগদ ভিত্তিতে (Spot basis) এক মুদ্রার সহিত অন্য প্রকার মুদ্রার বিনিময় বা কেনা-বেচা করে। বৈদেশিক মুদ্রা-বাজারে ফরওয়ার্ড বুকিং কিংবা ডিরাইভেটিভ প্রডাক্টে ইসলামী ব্যাংক অংশ নেয় না। ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মতে, মুদ্রার বেচা-কেনার মাধ্যমে ফটকা লাভ অর্জনের প্রবণতা মুদ্রা বাজারে অস্থিতিশীলতা ও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে।

**মুদ্রা বাজার দলীল ঃ** অর্থনৈতিক তৎপরতায় অগ্রসর দেশগুলিতে মুদ্রা-বাজারের বিভিন্ন দলীল (Money Mrket Instrument) কেনা-বেচা হয়। 'মুদ্রা বাজার দলীল' লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদের হার প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে। মুদ্রাবাজার দলীলের মধ্যে ট্রেজারী বিল (T-Bill), হস্তান্তরযোগ্য সার্টিফিকেট (Nagotiable Certificate), বাণিজ্যিক পত্র (Commerial Paper), ব্যাংকারের গ্রহণযোগ্যতা-পত্র (Bankers Acceptance) ইত্যাদি বেশী প্রচলিত। সুদভিত্তিক 'মুদ্রাবাজার দলীল'-এর বিকল্প হিসাবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইতোমধ্যে বেশকিছু আকর্ষণীয় ইসলামী দলীল (Instrument) উদ্ভাবন করিয়াছে। তাহার মধ্যে অংশগ্রহণমূলক মেয়াদী সার্টিফিকেট (Participatory Term Certificate), মুদারাবা বণ্ড, মুদারাবা সার্টিফিকেটও মুশারাকা সার্টিফিকেট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব ইসলামী আর্থিক দলীল প্রকৃত সম্পদ (Real Asset)-এর বিপরীতে ইস্যু করা হয়। এই লেনদেনে প্রকৃত সম্পদ তাহার যথাযথ ভূমিকা পালন করে। এই কারণে আর্থিক বাজারে স্থিতিশীলতা অর্জন ও স্বাভাবিকতা রক্ষা করা সহজ হয়।

**মার্চেন্ট ব্যাংকিং ঃ** মার্চেন্ট ব্যাংকিং সেবা ব্যাংকিং জগতে তুলনামূলকভাবে নূতন ধারণা। তবে ইতোমধ্যেই ইহার কার্যপরিধির ব্যাপ্তি ঘটিয়াছে। বর্তমানে মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর উল্লেখযোগ্য কাজ হইল ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা, মূলধন বাজারে পুঁজি বিনিয়োগ, অবলেখন (Under Writing) ইত্যাদি। ব্যাংকের স্বাভাবিক কার্যপরিধির বাহিরে মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ব্যাংকের মুনাফার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও তারল্য বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ডের সহজ ও ব্যাপক প্রচলন হইয়াছে। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের উন্নয়ন ও প্রয়োগ করিতেছে। ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহারে শারী'আ পারিপালন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) শারী'আ স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করিয়াছে। পুঁজি বাজারে মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারেও শারী'আর আপত্তি নাই। তবে বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে এই ক্ষেত্রে ইসলামের নৈতিক মান সংরক্ষণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন জরুরী।

**লকার ভাড়া ঃ** মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদ হেফাযতের জন্য লকার ভাড়া দেওয়া ব্যাংকিং সেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই সুবিধার বিনিময়ে ব্যাংক মাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে নির্ধারিত ফি আদায় করিয়া থাকে। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শারী'আতের আল-আমানাহ নীতির ভিত্তিতে গ্রাহকের দ্রব্যসামগ্রি নিরাপদে হেফাযত করিবার দায়িত্ব পালন করে।

**রেমিট্যান্স কার্যক্রম ঃ** রেমিট্যান্স হইল এক স্থান হইতে অন্যত্র অর্থ বা তহবিলের স্থানান্তর। এইজন্য ব্যাংক গ্রাহকের নিকট হইতে কমিশন বা ফি আদায় করে। ২ ঃ ২৮২ আয়াতের ভিত্তিতে সেবার বিনিময়ে কমিশন বা ফি আদায় করা শরীয়তসম্মত। তবে ইনষ্ট্রুমেন্ট বা ড্রাফট বাট্টাকরণ বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সুদের উদ্ভব হইতে পারে। ইসলামী ব্যাংক বাট্টাকরণের কাজে জড়িত হয় না। কমিশন বা ফি-এর বিনিময়ে অর্থ স্থানান্তরে অংশে নেয়।

**ব্যাংক গ্যারান্টি ঃ** ইহা হইল কোন দায়-দেনা বা প্রতিশ্রুতি পূরণে গ্রাহকের অপারগতার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ব্যাংক কর্তৃক তৃতীয় পক্ষের সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার বা নিশ্চয়তা প্রদান। গ্যারান্টির শর্ত পূরণে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ব্যর্থ হইলে তাহার পক্ষে ব্যাংক তৃতীয় পক্ষকে গ্যারান্টির অর্থ পরিশোধ করে। ব্যাংক এই ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট হইতে নির্ধারিত কমিশন আদায় করে। ।

বিল বাট্টাকরণ ঃ রফতানী বিল বাট্টাকরণ (Discounting) সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার একটি বহুল প্রচলিত অর্থায়ন কার্যক্রম। গ্রাহককে তাহার বিলের বিপরীতে আগাম আর্থিক সুবিধা দানের জন্য ব্যাংক গ্রাহকের রপ্তানী বিল বাট্টাকরণ করে অর্থাৎ কম দামে কিনিয়া নেয়। সুদভিত্তিক ব্যাংকিং লেনদেনে এই ধরনের বিল বাট্টাকরণ ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে বিলম্বিত সময়ের জন্য সুদী ব্যাংক সুদ আদায় করে। ইহার বিকল্প হিসাবে ইসলামী ব্যাংক রফতানী কারকদেরকে বায়' সালাম বা মুশারাকা পদ্ধতিতে প্রাক-জাহাজীকরণ (Pre-shipment) বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে। এই ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের আরও নূতন নূতন প্রডাক্ট উন্নয়নের সুযোগ রহিয়াছে।

**কল-মানি মার্কেটে অংশগ্রহণ ঃ** সুদভিত্তিক ব্যাংক-ব্যবস্থায় আন্ত-ব্যাংক লেনদেনে কল-মানি মার্কেট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন ব্যাংকের তারল্য (নগদ অর্থের) ঘাটতি দেখা দিলে সেই ব্যাংক অধিক তারল্যের অধিকারী বাংকের নিকট হইতে সুদে টাকা ধার নিয়া তাহার ঘাটতি মুকাবিলা করে। এই ক্ষেত্রে তারল্য সংকটে পতিত ব্যাংকের বিপদের সুযোগ লইয়া অধিক তারল্যের অধিকারী ব্যাংক ইচ্ছামত চড়া হারে সুদ আদায় করে। ইসলামী ব্যাংক এই ধরনের সুদী লেনদেনে অংশ নেয় না।

বিকল্প হিসাবে অধিক তারল্যের অধিকারী ইসলামী ব্যাংক তারল্য সংকটে পতিত ইসলামী ব্যাংকের তারল্য ঘাটতি পূরণে সহযোগিতা করিতে তাহাদের মুদারাবা একাউন্টে টাকা জমা রাখে। জমাকারী ইসলামী ব্যাংক জমা গ্রহণকারী ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা কারবারে স্বাভাবিক নিয়মে সাহিব আল-মাল হিসাবে অংশ নেয়। এই ধরনের জমার মাধ্যমে অধিক তারল্যের অধিকারী ব্যাংক তারল্য সংকটে পতিত ব্যাংকের সাময়িক তারল্য-চাপ মুকাবিলায় সহায়তা করে। এই সহযোগিতার মধ্য দিয়া সেই ব্যাংক তাহার বাড়তি মূলধন বিনিয়োগেরও সুযোগ পায়।

**সরকারী ট্রেজারী বিল ক্রয় ঃ** সুদের বিনিময়ে সরকারী ট্রেজারী বিল (T-Bill) ক্রয়-বিক্রয় সুদভিত্তিক ব্যাংকের একটি স্বাভাবিক ব্যবসা। ইসলামী ব্যাংক সুদযুক্ত সরকারী টি-বিল কেনা-বেচা করে না। বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি ইসলামী শারী'আত অনুমোদিত মুদারাবা বন্ড চালু করিয়াছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ এখন এই বন্ডে বিনিয়োগ করিবার সুযোগ পাইতেছে।

**এস. এল. আর. (SLR) ও সি আর আর (CCR) সংরক্ষণ ঃ** আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে তফসিলভুক্ত সকল ব্যাংক নির্ধারিত হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতি (Statutory Liquidity Reserve বা SLR) জমা রাখে। সময়ে সময়ে এই তারল্য সঞ্চিতির হারের পরিবর্তন হয়। এই ধরনের সঞ্চিতিরি উপর সুদভিত্তিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে 'ব্যাংক হার' (Bank Rate) অনুযায়ী সুদ পায়। যে সকল ঝুঁকি বিবেচনা করিয়া এই ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে, পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে ইসলামী ব্যাংকের জন্য তাহা প্রযোজ্য নয় বলিয়া অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন। তবে আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে ইসলামী ব্যাংক এই বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি তহবিল সংরক্ষণ করে। এই খাত হইতে কোন সুদ অর্জিত হইলে তাহা ইসলামী ব্যাংকের স্বাভাবিক আয়ের অংশ হয় না। শরীয়া কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহা অন্য কোন সেবামূলক খাতে ব্যয় করা হয়।

**ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ঃ** ইসলামী ব্যাংক নীতিগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে সরাসরি অংশ নিতে পারে। ইহাতে ব্যবসায়ের যাবতীয় ঝুঁকি ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে ভাগ হইয়া যায়। ইসলামী ব্যাংক তাহা দুইভাবে নিশ্চিত করিয়া থাকে ঃ (ক) প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং (খ) লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের চুক্তিতে অংশগ্রহণ। (ক) প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ঃ ইসলামী ব্যাংক তাহার নিজ তহবিল এবং জমাকারীদের অনুমতিক্রমে তাহাদের তহবিল হইতে মূলধন লইয়া নিজ উদ্যোগে ও মালিকানাধীনে শারী'আ অনুমোদিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিতে পারে। ব্যাংক শুধুমাত্র জমাকারীর তহবিল ব্যবহার করিয়াও বিনিয়োগ কার্যক্রম চালাইতে পারে। দেশের প্রচলিত আইনে এই ব্যাপারে বাধা থাকিলে তাহা আলাদা কথা। (খ) অংশীদারিত্বের চুক্তিতে অংশগ্রহণ ঃ ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প, কল-কারখানা প্রভৃতি স্থাপনে পুঁজি বা তহবিল বিনিয়োগ করিয়া তাহাতে অংশীদার হইতে পারে। ব্যাংক এই ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার সহিত অংশীদারী চুক্তি অনুযায়ী আংশিক বা সম্পূর্ণ পুঁজি সরবরাহ করিতে পারে। ব্যবসায়ে লাভ হইলে তাহা চুক্তির শর্তে উল্লেখিত হারে বণ্টন হয় এবং লোকসান হইলে তাহা মূলধন অনুপাতে ব্যাংক ও গ্রাহক বহন করে।

**করযে হাসানা ঃ** করযে হাসানা অর্থাৎ (উত্তম ঋণ) প্রদান করা হয় ব্যক্তির সাময়িক প্রয়োজন পূরণের জন্য। কখনো কখনো সচ্ছল উপার্জনক্ষম সৎ ব্যক্তিরও এইরূপ ঋণের প্রয়োজন হইতে পারে। করযে হাসানা একটি ইসলামী ধারণা। ইহা ইসলামী সমাজের একটি অনন্য সৌন্দর্য। সমাজে করযে হাসানার প্রচলন থাকিলে বিপদের সময় কাহাকে সহায়-সম্বল বিক্রয় করিতে হয় না বা সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিতে হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক 'করযে হাসানা' (দ্র.) হিসাব পরিচালনা করিয়া থাকে।

### ইসলামী ব্যাংকের জমা গ্রহণের নীতি ও পদ্ধতি

**জমা গ্রহণের নীতি ঃ** (ক) ইসলামী ব্যাংক জনসাধারণকে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে উৎসাহ যোগায়। শুধু বৃহৎ সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী না হইয়া ক্ষুদ্র জমাকারীদের সম্পদও জাতীয় আর্থিক প্রবাহে নিয়োজিত করে। (খ) ইসলামী ব্যাংক সকলের নিকট সঞ্চয়ের এই চিত্র তুলিয়া ধরে যে, সঞ্চয়ের মাধ্যমে তিনি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হইতে পারেন এবং একই সাথে তিনি সামাজিক দায়িত্বও পালন করিতে পারেন। (গ) সঞ্চয়ী গ্রাহক ও ব্যাংকের সম্পর্ক মুদারাবা পদ্ধতির অংশীদারী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ক্ষেত্রে গ্রাহক 'সাহিবুল-মাল' (পুঁজিপতি) এবং ব্যাংক 'মুদারিব' হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। (ঘ) ইসলামী ব্যাংক জনগণের সঞ্চয়কে শারী'আর 'আল-ওয়াদি'আ (الوديعة) নীতির ভিত্তিতে 'আল-ওয়াদি'আ চলতি হিসাব' পরিচালনা করে। এই ক্ষেত্রে গ্রাহক হইলেন মুওয়াদ্দি' (المودع)। আর ব্যাংক 'মুওয়াদ্দা' ইলায়হি' (المودع اليه)। এই হিসাবে জমাকৃত অর্থ ব্যবহারের ব্যাপারে গ্রাহক (মুওয়াদ্দি') ব্যাংক (মুয়াদ্দা' ইলায়হি)-কে অনুমতি দেয়, ব্যাংক গ্রাহককে তাহার অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকার করে।

আল-ওয়াদি'আ চলতি হিসাব ঃ 'আল-ওয়াদি'আ শব্দটির অর্থ (১) সংরক্ষণ করা, (২) জমা করা, (৩) বাদ দেওয়া, (৪) পরিত্যাগ করা ইত্যাদি। আল-ওয়াদি'আ চুক্তিতে দুইটি পক্ষ থাকে। জমাগ্রহণকারী, পক্ষকে বলা হয় 'মুয়াদ্দা ইলাইহি'। জমাকারী পক্ষকে বলা হয় 'মুয়াদ্দি'। যে বস্তু জমা রাখা হয়, তাহা হইল 'মুওয়াদ্দা''। ইসলামী ব্যাংক সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাবের বিকল্প 'আল-ওয়াদি'আ পদ্ধতি অনুসরণ করে। এই পদ্ধতিতে ব্যাংক (মুওয়াদ্দা' ইলায়হি) জমাকারীর (মুওয়াদ্দি') অর্থ (মুওয়াদ্দা') জমা নেয়। জমাকারী (মুওয়াদ্দি') ব্যাংককে এই অর্থ ব্যবহারের অনুমতি দেয়। ব্যাংক জমাকারীর সম্মতির ভিত্তিতে সেই অর্থ ব্যবহার করে। ব্যাংক জমাকারীকে তাহার অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। 'আল-ওয়াদি'আ' হইল অর্থের নিরাপত্তা বিধানের চুক্তি। এই চুক্তির মাধ্যমে জমাকারী ব্যাংকের নিকট হইতে কোন মুনাফা পান না। তিনি তাহার জমা টাকা যে কোন সময় ফেরত লওয়ার অধিকার রাখেন। জমাকৃত অর্থের নিরাপদ হেফাযত করা ও অন্যান্য সেবা প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক জমাকারীর নিকট হইতে সার্ভিস চার্জ নিতে পারে (যদিও নেয় না)।

**আল-ওয়াদি'আ চলতি হিসাব ও সুদী ব্যাংকের চলতি হিসাবের মধ্যে পার্থক্য ঃ** (১) ইসলামী ব্যাংকের চলতি হিসাব শারী'আতের আল-ওয়াদি'আ নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাব পরিচালনায় শারী'আর কোন নীতি বা পদ্ধতি বা বিধান অনুসরণের তাকীদ বা প্রয়োজন অনুভব করা হয় না। এই দিক হইতে দুই ব্যাংকের চলতি হিসাবের মাঝে পার্থক্য নীতি ও নিয়তের। (২)

আল-ওয়াদি'আ চলতি হিসাবে জমাকারীর নিকট হইতে তাহার অর্থ ব্যবহারের পূর্বানুমতি লওয়া হয়। সুদ ভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাবে জমাকারীর কাছ হইতে তাহার অর্থ ব্যবহারের অনুমতি লওয়ার বাধ্যবাধকতা অনুভব করা হয় না (বিনা অনুমতিতে অন্যের গচ্ছিত সম্পদ ভোগ বা ব্যবহার শারী'আতের দৃষ্টিতে আমানতের খেয়ানতের শামিল)। (৩) আল-ওয়াদি'আ চলতি হিসাবে জমা অর্থ শারী'আত পরিপন্থী কোন পদ্ধতিতে বা কোন হারাম খাতে ব্যবহার করা হয় না। ব্যাংক এই ব্যাপারে জমাকারীকে নিশ্চিত করে। অন্যদিকে সুদভিত্তিক ব্যাংক চলতি হিসাবে জমা অর্থ সুদের ভিত্তিতে হালাল-হারাম নির্বিশেষে যে কোন খাতে ব্যবহার করে।

**'আল-ওয়াদি'আ' ও 'আল-আমানাহ'র মধ্যে পার্থক্য ঃ** শারী'আতের নীতি অনুসারে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কিছু গচ্ছিত রাখিবার একটি প্রচলিত পদ্ধতি হইল আমানত বা আল-আমানাহ (الامانة)। 'আল-ওয়াদি'আ' ও 'আল-আমানাহ'র মধ্যে পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। আল-আমানাহ পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণকারী তাহার নিকট গচ্ছিত আমানতকারীর অর্থ বা বস্তু ব্যবহার করিতে পারেন না, ঐ সম্পদে কোনরূপ পরিবর্তন বা যোগ-বিয়োগ করিতে পারেন না। কিন্তু আল-ওয়াদি'আ চুক্তি অনুযায়ী জমা গ্রহণকারী (মুওয়াদ্দা' ইলায়হি) জমাকারীর (মুওয়াদ্দি') অনুমতি নিয়া জমা অর্থ বা বস্তু (মুওয়াদ্দা') ব্যবহার করিতে পারেন।

ব্যাংকিং সেবায় ইসলামী ব্যাংকের চলতি হিসাব 'আল-ওয়াদি'আ' পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংকের লকার সার্ভিস পরিচালিত হয় 'আল-আমানাহ' নীতির ভিত্তিতে। ইসলামী ব্যাংক আল-ওয়াদি'আ চলতি হিসাবের টাকা ওয়াদি'আ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যবহার করে এবং চাহিবামাত্র ফেরত দেয়, কিন্তু লকারে গচ্ছিত সম্পদ যেই অবস্থায় রাখা হয় সেই অবস্থায় হেফাযত করে।

**মুদারাবা হিসাব ঃ** 'মুদারাবা (مضاربة) শব্দটি আরবী 'দারব' (ضرب) হইতে উদ্ভূত। ইহার অর্থ আল্লাহর রহমতের তালাশে সফর করা। "আল্লাহ জানেন, তোমাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িবে, কেহ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করিবে এবং কেহ আল্লাহর পথে সংগ্রামে নিয়োজিত হইবে..." (সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ২০)। 'মুদারাবা' হইল অংশীদারী কারবারের একটি পদ্ধতি। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসা পরিচালনার জন্য দুইটি পক্ষ মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হয়। এক পক্ষ (পুঁজির মালিক) মূলধন সরবরাহ করেন। অন্যপক্ষ তাহার মেধা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সামর্থ্য ও মেহনতের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার উদ্যোগ নেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সাহিবুল মালের মূলধন ব্যবহার করেন। এই উদ্যোক্তা বা ব্যবস্থাপক পক্ষকে বলা হয় 'মুদারিব'। মুদরাবা চুক্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 'সাহিবুল মালের' দায়িত্ব অর্থ যোগানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যবসা পরিচালনায় তিনি অংশ নেন না। 'মুদারিব' (مضارب) ব্যবসায়ের একজন ট্রাস্টি ও প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবসা পরিচালনা করিবেন। ব্যবসা পরিচালনায় মুদারিবকে সততা ও দক্ষতার পাশাপাশি সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। ইচ্ছাকৃত অবহেলা, প্রতারণা বা মিথ্যা বর্ণনার কারণে ব্যবসায়ের ক্ষতি হইলে সেই ক্ষেত্রে মুদারিব দায়ী হইবেন।

**মুদারাবা হিসাবের ব্যাপারে শারী'আর নীতি ঃ** শারী'আতের নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংক মুদারাবা তহবিল সংগ্রহ করে। ব্যাংক তাহার বিভিন্ন মেয়াদী বিনিয়োগের পরিকল্পনা ও চাহিদা বিবেচনায় রাখিয়া নানা ধরনের জমাকারীকে আকৃষ্ট করিবার লক্ষ্যে মুদারাবা পদ্ধতিতে বিভিন্ন মেয়াদের এবং বিভিন্ন ধরনের হিসাব খোলার ব্যবস্থা রাখিতে পারে। সেইসব হিসাব সঞ্চয়ী, স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী, দীর্ঘ মেয়াদী প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে। গ্রাহকদের আগ্রহ ও চাহিদা এবং অন্য কোন কল্যাণমূলক লক্ষ্য সামনে রাখিয়া বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমেও জমা সংগ্রাহ করা যাইতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদে অর্থ জমা করিয়া জমাকারী ব্যাংকের ব্যবসায়ে বেশী ঝুঁকি বহন করেন। আবার দীর্ঘমেয়াদী জমা বিনিয়োগ করা ব্যাংকের জন্য বেশী সুবিধাজনক। এই কারণে সাধারণত জমার মেয়াদের উপর ভিত্তি করিয়া অর্থের গুরুত্ব বা 'ওয়েটেজ' (الوزن) নির্ধারণ করা হয়। অন্য কোন দৃষ্টিকোণ হইতেও ব্যাংক কোন বিশেষ জমা প্রকল্পকে বেশী গুরুত্ব বা ওয়েটেজ দিতে পারে।

মুদারাবা তহবিল হইতে অর্জিত আয় ব্যাংক ও জমাকারীর মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাত অনুযায়ী বণ্টন করা হয়। যেমন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ও তাহার মুদারাবা জমাকারীদের মধ্যে লাভ বণ্টনে বর্তমান ন্যূনতম অনুপাত হইল জমাকারী ৬৫ ঃ ব্যাংক ৩৫। ব্যবসায়ে লোকসান হইলে 'সাহিবুল মাল' আর্থিক ক্ষতি বহন করেন। এই ক্ষেত্রে মুদারিবের সময়, শ্রম ও মেধার লোকসান হয়।

**মুদারাবা নীতিতে ব্যাংকের মুনাফা বণ্টন ঃ** মুদারাবা হিসাবে মুনাফা বণ্টনের সাধারণ নীতিমালা হইল ঃ (১) মুদারাবা তহবিলের আয় মুদারিব ও সাহিবুল মালের মধ্যে চুক্তির শর্ত অনুসারে আনুপাতিক হারে বণ্টিত হয়। (২) মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ ছাড়াও ব্যাংক তাহার বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে কমিশন, এক্সচেঞ্জ, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি আয় করে। এইসব আয়ে জমাকারীদের অংশ থাকে না। (৩) মুদারাবা জমাকারীগণ মুদারাবা তহবিলের বিনিয়োগ আয়ে অগ্রাধিকার পাইয়া থাকেন।

বিনিয়োগ আয়ে মুদারাবা জমার অংশ হিসাব করিবার কৌশল নিচে দেখানো হইল ঃ (১) মুদারাবা জমাকারীগণ মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ আয়ের একটি পূর্ব নির্ধারিত অংশ (যেমন কমপক্ষে ৬৫ ভাগ) পান। (২) ব্যাংক বাকী অংশ (যেমন ৩৫ ভাগ) তাহার আয় হিসাবে পায়। (ক) ব্যাংক তাহার আয়ের একটি অংশ (যেমন ২০ ভাগ) বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যয় করে। (খ) ব্যাংক বিনিয়োগ আয়ের বাকী অংশ (ধরা যাক ১৫ ভাগ) বিনিয়োগ ক্ষতিপূরণ সঞ্চিতি হিসাবে সংরক্ষণ করে।

**হিসাবসমূহে লাভ বণ্টনের 'ওয়েটেজ' পদ্ধতি ঃ** জমাকারীদের সকল হিসাবের অর্থের গুরুত্ব ব্যাংকের কাছে সমান নয়। হিসাবের মেয়াদ যত বেশী হয়, সাধারণত সেই অর্থ ব্যাংক ততই সুবিধাজনকভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য বিনিয়োগ করিবার সুযোগ পায়। অন্যদিকে জমাকারী বেশী মেয়াদে অর্থ জমা করিয়া ব্যাংকের ব্যবসায়ে বেশী ঝুঁকি বহন করেন। এই কারণে ব্যাংক প্রধানত মেয়াদকাল বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন হিসাবের ভিন্ন ভিন্ন ওয়েটেজ বা গুরুত্বের ভিত্তিতে লাভ নির্ধারণ করে। ইহা ছাড়া কোন সামাজিক কল্যাণমূলক জমাকে ব্যাংক বাড়তি ওয়েটেজ দিতে পারে। যেমন নির্ধারিত আয়ের লোকদের পবিত্র হজ্জ পালন উৎসাহিত করিতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড হজ্জ একাউন্টের জমাকে সর্বোচ্চ ওয়েটেজ দেয়। 'ওয়েটেজ'-এর একটি নমুনা ঃ মনে করুন একটি ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা ডিপোজিটে নিম্নরূপ 'ওয়েটেজ' দেয় ঃ

| মুদুরাবা জমা | মেয়াদ | ওয়েটেজ (%) |
|---|---|---|
| ক) মুদারাবা হজ্জ জমা | - | ১১০% |
| খ) মুদারাবা মেয়াদী জমা | ৩৬ মাস | ১০০% |
| মুদারাবা মেয়াদী জমা | ২৪ মাস | ৯৮% |
| মুদারাবা মেয়াদী জমা | ১২ মাস | ৮৬% |
| মুদারাবা মেয়াদী জমা | ৬ মাস | ৯২% |
| মুদারাবা মেয়াদী জমা | ৩ মাস | ৮৮% |
| গ) মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব | - | ৭৫% |
| ঘ) মুদারাবা স্বল্পকালীন নোটিশ জমা | -- | ৫৫% |

এই ক্ষেত্রে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ ১০০০.০০ টাকা মুদারাবা জমা ৮০০.০০ টাকা এবং মোট বিনিয়োগ আয় ১৫০.০০ টাকা এবং সাহিবুল মাল ও মুদারিবের মধ্যে লাভের অনুপাত ৬৫ ঃ ৩৫ হইলে উপরের ছকে দেখানো ওয়েটেজ অনুযায়ী মুনাফা বণ্টনের হিসাব দাঁড়াইবেঃ

১. মুদারাবা হিসাবসমূহের মোট জমা (৮০%) ঃ ৮০০.০০ টাকা
২. ব্যাংকের ইকুয়েটি ও আল-ওয়াদি'আ চলতি হিসাবে জমা (২০%) ঃ ২০০.০০ টাকা
মোট ঃ ১০০০.০০ টাকা

মুদারাবা ডিপোজিটে আয়ের হিস্যা ঃ
বিনিয়োগ আয়ের ৮০% (১৫০×৮০%)= ১২০.০০ টাকা
মুদারাবা জমাকারীদের মাঝে বিতরণযোগ্য আয় (মোট আয়ের ৬৫%) ঃ ৭৮.০০ টাকা
ব্যাংকের আয় (মোট আয়ের ৩৫%) ঃ ৪২.০০ টাকা
মোট ঃ ১২০.০০ টাকা

এই অবস্থায় বিভিন্ন মুদারাবা হিসাবে মুনাফা বণ্টনের হিসাব দাঁড়াইবে ঃ

| ক্রমিক | মুদারাবা জমা হিসাবের প্রকৃতি | বার্ষিক প্রোডাক্ট | ওয়েটেজ % | ওয়েটেড প্রোডাক্ট | বিতরণযোগ্য মুনাফার অংশ | মুনাফার হার |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | মুদারাবা হজ্জ জমা | ১০০ | ১.১০ | ১১০.০০ | ১২.৪৪ | ১২.৪৪% |
| ২ | ৩৬ মাস মেয়াদী জমা | ১৫০ | ১.০০ | ১৫০.০০ | ১৬.৯৭ | ১১.৩১% |
| ৩ | ২৪ মাস মেয়াদী জমা | ৫০ | ০.৯৮ | ৪৯.০০ | ৫.৫৪ | ১১.০৮% |
| ৪ | ১২ মাস মেয়াদী জমা | ১০০ | ০.৯৬ | ৯৬.০০ | ১০.৮৬ | ১০.৮৬% |
| ৫ | ৬ মাস মেয়াদী জমা | ১৫০ | ০.৯২ | ১৩৮.০০ | ১৫.৬১ | ১০.৪০% |
| ৬ | ৩ মাস মেয়াদী জমা | ৫০ | ০.৮৮ | ৪৪.০০ | ৪.৯৮ | ৯.৯৬% |
| ৭ | মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব | ১০০ | ০.৭৫ | ৭৫.০০ | ৮.৪৯ | ৮.৪৯% |
| ৮ | মুদারাবা স্বল্প মেয়াদী জমা | ৫০ | ০.৫৫ | ২৭.৫০ | ৩.১১ | ৬.২২% |
| | মোট ঃ | ৭৫০ | | ৬৮৯.৫০ | ৭৮.০০ | |

## ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতি

**বিনিয়োগ নীতি ঃ** ইসলামী ব্যাংক ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম বিধায় ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক লক্ষ্যসমূহ সামনে রাখিয়া ইহার বিনিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরী। তদনুযায়ী ঃ (১) ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ইসলামী শারী'আতের দৃষ্টিতে হালাল হইতে হইবে। সেই সাথে বিনিয়োগের খাতও হালাল হইতে হইবে। (২) ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সামাজিক কল্যাণের দিকেও নযর রাখিবে। (৩) বিনিয়োগের খাত এমনভাবে নির্ধারিত হইতে হইবে যাহাতে সম্পদ উৎপাদন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সেই সম্পদ বণ্টনের গুরুত্ব তাহার চাইতে কম নহে। সম্পদ বণ্টনের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিবে।

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইল ঃ (১) মূলধনের নিরাপত্তা ও মুনাফার সম্ভাব্যতা বিবেচনায় রাখিয়া ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা। (২) বিনিয়োগের অন্যতম লক্ষ্য হইল অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এইজন্য প্রয়োজনীয় মূলধন ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটানো। বৈজ্ঞানিক, কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও পেশাগত সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়িয়া তোলা। (৩) পুঁজির মালিক যাহাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রকৃত ও বাস্তব ভূমিকা রাখিয়া হালাল মুনাফা পাইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা। উন্নয়ন কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করিয়া সমাজকে কর্মচঞ্চল করিয়া তুলিবার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন করা। (৪) পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশ এবং দেশের সামগ্রিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিনিয়োগ করা। (৫) সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত না করিয়া তাহা সমাজের বেশীরভাগ মানুষের কাজে লাগাইবার ইসলামী নীতিকে অগ্রাধিকার দান। (৬) উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন ও উৎপাদনমুখী শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাহাদের ভিত মজবুত করা। (৭) বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও সামাজিক অবকাঠামো গঠনের উদ্যোগে অংশগ্রহণ। (৮) গ্রাহককে সরাসরি টাকা না দিয়া বায়' মুরাবাহা, বায়' মুআজ্জাল প্রভৃতি বেচা-কেনা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ। এই পদ্ধতির বিনিয়োগ প্রকৃত ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে ও আগাইয়া নেয়। (৯) লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ। (১০) ব্যাংকের সব ধরনের বিনিয়োগ কার্যক্রম ইসলামী শারী'আত অনুযায়ী পরিচালনা। শারী'আতের দৃষ্টিতে অবৈধ ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক খাতে প্রচুর মুনাফা থাকিলেও সেই খাতে বিনিয়োগ না করা। (১১) সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে মুনাফা কম হইলেও সেই সব খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা।

**বিনিয়োগ পদ্ধতি ঃ** ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ইসলামী শারী'আহ ভিত্তিক বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতি রহিয়াছে। বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক তাহাদের নিজ নিজ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও বিনিয়োগের ধরন অনুযায়ী শারী'আতের সীমার মধ্যে নানা পদ্ধতি অনুসরণ করে। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক শারী'আত অনুমোদিত যেইসব পদ্ধতি সাধারণভাবে অনুসরণ করে, সেই পদ্ধতিগুলিকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (ক) বেচা-কেনা পদ্ধতি ঃ (১) বায়' মুরাবাহা, (২) বায়' মুআজ্জাল, (৩) বায়' সালাম ও (৪) বায়' ইসতিসনা। (খ) অংশীদারী পদ্ধতি ঃ (১) মুদারাবা ও (২) মুশারাকা; (গ) মালিকানায় শরীকানা বা শিরকাতুল মিলক-এর ভিত্তিতে হায়ার পারচেজ বা ভাড়ায় ক্রয় ঃ হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (এইচ পি এস এম)।

### (ক) অংশীদারী পদ্ধতি

মুদারাবা ঃ মুদারাবা বলিতে বুঝায় ব্যবসার জন্য সফর। 'মুদারাবা' কারবারে দুইটি পক্ষ থাকেন। এক পক্ষ মূলধন সরবারাহ করেন এবং অন্য পক্ষ তাহার সময়, মেহনত, মেধা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগান। মূলধন সরবরাহকারীকে বলা হয় 'সাহিবুল মাল' এবং সময়, মেহনত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিনিয়োগকারী হলেন 'মুদারিব'। 'মুদারাবা' এক ধরনের অংশীদারি চুক্তি। 'সাহিবুল মাল' এই চুক্তি অনুযায়ী মুদারিবকে তাহার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, মেহনত ও চেষ্টার মাধ্যমে ব্যবসা চালানোর

জন্য পুঁজি সরবরাহ করেন। লাভ হইলে চুক্তিতে উল্লেখিত অনুপাত অনুসারে তাহারা লাভের ভাগীদার হন এবং লোকসান হইলে আর্থিক ক্ষতি তহবিল সরবরাহকারী অর্থাৎ 'সাহিবুল মাল' বহন করেন। মুদারিব এই লোকসানী কারবারে দেওয়া সময়, মেহনত ও দক্ষতার বিনিময় বা ফায়দা হইতে বঞ্চিত হন। বিশ্বাসভঙ্গ, দুর্নীতি, অবহেলা বা চুক্তির শর্ত লংঘনের কারণে ব্যবসায়ে ক্ষতি হইলে মুদারিব সেই আর্থিক লোকসানের জন্য দায়ী হইবে না

'মুদারাবা' চুক্তির শর্ত অনুসারে ব্যাংক মূলধন যোগায়। অন্যপক্ষ স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তা তাহার দক্ষতা, অভিজ্ঞাতা, মেহনত, নিয়োজিত করেন। 'মুদারিব' সেই পুঁজি ব্যবসায়ে খাটান। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যাংক ও উদ্যোক্তার মধ্যে মুনাফা ভাগ হয়। ব্যবসায়ে অনিচ্ছাকৃত লোকসান হইলে আর্থিক লোকসান সাহিবুল মাল হিসাবে ব্যাংক বহন করে (Manual for Investment under Mudara mode, IBBL)।

মুদারাবা কারবারের মুনাফা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কারবারের স্বাভাবিক উৎপাদন ও পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ বিবেচনায় আনিতে হইবে। ইহা ছাড়া ব্যবসায়িক কাজে মুদারিব নিজ শহরের বাহিরে যাতায়াত ও অবস্থান করিলে সফরকালের পানাহার, পোশাক, পরিবহন, যাতায়াত ও খিদমতের জন্য নিযুক্ত পরিচারকের খরচ পাইবেন। তবে নিজ শহরে অবস্থানকালে মুদারিব তাহার নিজের পানাহার, পোশাক-আশাকসহ নিজস্ব কোন খরচ কারবার হইতে নিতে পারিবেন না। মুদারিবকে তাহার কাজের জন্য কোন বেতন-ভাতা দেওয়া বৈধ নয়।

ইসলামী উন্নয় ব্যাংক (IDB) মুদারাবার সংজ্ঞায় বলিয়াছে ঃ "Mudaraba is a form of partnership where one party (Shahib al Maal/Rabbul Maal) provides the fund, while the other provides the expertise and management. The latter is reffered to as the Mudarib (Manager). Any profit accrued is shared between the two parties on a pre-agreed bassis, while capital loss is exclusively borne by the partner providing the capital (shahib al Maal). ["মুদারাবা এক ধরনের অংশীদারিত্ব যেইখানে এক পক্ষ (সাহিবুল মাল/রাব্বুল মাল) তহবিল সরবরাহ করেন এবং অন্য পক্ষ তাহার দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা নিয়োজিত করেন। তাহাকে বলা হয় মুদারিব (ব্যবস্থাপক)। ব্যবসায়ের লাভ দুই পক্ষের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে ভাগ হয়। পুঁজির লোকসান হইলে তাহা মূলধন সরবরাহকারী (সাহিবুল মাল) বহন করেন]।

AAOIFI-এর মতে ঃ Mudaraba is a partnership in profit whereby one party provides capital (rab al mall) and the other party provides labour (mudarib). (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 2004-5, Statement of the Standard, P. 231)। [মুদারাবা হইল মুনাফায় অংশীদারিত্ব, যেইখানে এক পক্ষ (রাব্বুল মাল) মূলধন যোগায় এবং অপর পক্ষ (মুদারিব) মেহনত করেন]।

ব্যাংক কোম্পানী আইন (সংশোধন) ১৯৯১-এ মুদারাবার সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে ঃ "মুদারাবা অর্থ এমন চুক্তি যাহার শর্তানুসারে ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক পরিচালিত কোন ব্যাংক কোন কিছুতে মূলধন যোগান দেয় এবং গ্রাহক উহাতে দক্ষতা, প্রচেষ্টা, শ্রম ও প্রজ্ঞা নিয়োজিত করে।" (Mudaraba means such an agreemnt in terms of which a bank conducted in accordance with the Islami Shariah provides capital for anything and the customer employs his efficiency, efforts, labour and intelligence)।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মুদারাবা ম্যানুয়েলে মুদারাবা চুক্তি সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ Mudaraba is a partnership in profit whereby on party provides capital and the other party provides skill and labour. The provider of capital is called 'Shahib-al-maal' ,while the provider of skill and labour is called 'Mudarib'. (মুদারাবা হইল মুনাফা ভিত্তিক একটি অংশীদারিত্ব যেইখানে এক পক্ষ মূলধন যোগান দেন এবং অন্য পক্ষ তাহার দক্ষতা ও মেহনত কাজে লাগান। পুঁজির যোগানদারকে বলা হয় 'সাহিবুল মাল' এবং দক্ষতা ও মেহনত বিনিয়োগকারীকে বলা হয় 'মুদারিব')।

**ব্যাংকিং বিনিয়োগে মুদারাবার বৈশিষ্ট্য ঃ** (১) ব্যাংক 'সাহিবুল মাল' হিসাবে মূলধন যোগায় এবং স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তা বা গ্রাহক 'মুদারিব' হিসাবে সেই মূলধন ব্যবসায়ে খাটান। (২) ব্যবসা পরিচালনা করেন গ্রাহক বা মুদারিব। (৩) ব্যাংক 'সাহিবুল মাল' হিসাবে ব্যবস্থাপনায় অংশ নেয় না, তবে ব্যবসায়ের তদারকি এবং পরামর্শ ও উপদেশ দিতে পারে। (৪) ব্যবসায়ের লাভ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যাংক ও উদ্যোক্তার মধ্যে ভাগ হয়। (৫) চুক্তির শর্ত পালন নিশ্চিত করিতে ব্যাংক গ্রাহকের নিকট হইতে পারফরমেন্স গ্যারান্টি নিতে পারে। (৬) মূলধনের প্রকৃত লোকসানের দায়িত্ব সাহিবুল মাল হিসাবে ব্যাংক বহন করে। (৭) উদ্যোক্তা (মুদারিব) বা তাঁহার কর্মচারী বা প্রতিনিধির শর্ত লংঘন, অবহেলা, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, অব্যবস্থা বা বিশ্বাসভঙ্গের কারণে ব্যবসায়ে লোকসান হইলে ব্যাংক উদ্যোক্তার নিকট হইতে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে। (৮) ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া উদ্যোক্তা অন্য কোন উৎস হইতে ব্যবসায়ের মূলধন নিতে পারেন না। নিলে তাহা উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে। (৯) মুদারিব কারবার হইতে মুনাফার নির্ধারিত অংশের অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক বা ভাতা কিংবা নিজস্ব কোন খরচ নিতে পারেন না, তবে কারবার পরিচালনার কাজে স্বাভাবিক ও অপরিহার্য খরচ নিতে পারেন। (১০) চুক্তির মেয়াদশেষে লাভ-লোকসান হিসাব চূড়ান্ত করিয়া কারবার সমাপ্ত করিতে হয়। (১১) মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সম্মত সময়সূচী অনুসারে (যেমন তিন মাস, ছয় মাস, এক বৎসর পরপর) প্রাক্কলিত লাভ-লোকসান বন্টন করা যাইতে পারে, তবে তাহা অগ্রিমরূপে গণ্য হয়। মেয়াদশেষে চূড়ান্ত হিসাবের সহিত তাহা সমন্বয় করিতে হয়।

**মুশারাকা ঃ** 'মুশারাকা' (مشاركة) পরিভাষাটি আরবী 'শিরকাত' (شركة) বা 'শারিকাত' (শিরক) শব্দ হইতে উদ্ভূত। আরবীতে শিরকাত বা শারিকাত বলিতে অংশীদারিত্ব বুঝায়। ইসলামী ব্যাংকিং পরিভাষায়

'মুশারাকা' এক বিশেষ অংশীদারী কারবার। 'মুশারাকা' হইল দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা সংস্থার মধ্যে এক ধরনের অংশীদারিত্বের চুক্তি। ইহাতে সকল অংশীদার মূলধন গঠনে অংশ নেন। সকল অংশীদার বা তাহাদের কেহ কেহ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মুনাফা বণ্টিত হয়। লোকসান হইলে অংশীদারগণ মূলধন বা ইকুইটির অনুপাতে তাহা বহন করেন। 'মুশারাকা' চুক্তির অধীনে ব্যাংক মূলধনের একটি অংশ যোগান দেয় বাকী অংশ যোগান দেন গ্রাহক। ব্যবসায়ের মুনাফা বণ্টনের অনুপাত ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। মুশারাকা কারবারে লোকসান হইলে ব্যাংক ও গ্রাহক মূলধনের আনুপাতিক হারে তাহা বহন করেন।

আধুনিক কালে ফকীহদের একটি অংশের মতে, মুশারাকা ব্যবসায়ের ম্যানেজিং পার্টনার হিসাবে কেহ নিযুক্ত হইলে তিনি কারবারের লাভ-লোকসানের ভাগী হইবার পাশাপাশি ম্যানেজার হিসাবে অংশীদারের সম্মতিক্রমে বেতন লইতে পারিবেন। তাহাদের মতে, মুশারাকা কারবারে সকল অংশীদারই পুঁজির যোগানদানের বিনিময়ে লাভ-লোকসানের ভাগী হন এবং অশীদারদের মধ্যে কেহ কারবার পরিচালনায় অংশ নিলে তিনি তাহার কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাওয়ার হকদার। মুশারাকা কারবারে কোন অংশীদার তাহার নিজস্ব কোন খরচ কারবার হইতে বহন করিতে পারেন না। কিন্তু কারবারের উদ্দেশ্যে অংশীদারের যাতায়াত, থাকা-খাওয়া ইত্যাদি খরচ বহন করিবেন।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) মুশারাকার সংজ্ঞায় বলিয়াছে : Musharaka is an Islamic financing technique that adopts 'equity sharing' as a means of financing projects. Thus, embraces different types of profit and loss sharing partnerships. The partners (entrepreneurs, bankes etc.) share both capital and management of project so that profits will be distributed among them acording to agreed ratio and loss is shared as per their equity participation (ratio).

[মুশারাকা হইল মূলধনে অংশিদারিত্ব বা ইকুইটি শেয়ারিং-এর ভিত্তিতে কোন প্রকল্পে বিনিয়োগের একটি ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে লাভ-লোকসান ভিত্তিক বিভিন্ন অংশীদারী কারবার গড়িয়া উঠে। এই প্রকল্পের লাভ বা ক্ষতি অংশীদারগণকে বহন করিতে হয়। অংশীদারগণ (উদ্যোক্তা, ব্যাংক ইত্যাদি) প্রকল্পে মূলধন সরবরাহ করেন ও ব্যবস্থাপনায় অংশ নেন। তাহাদের মধ্যে চুক্তির শর্তানুযায়ী লাভের অংশ এবং মূলধন অনুপাতে লোকসান বণ্টিত হয়]।

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) মুশারাকার সংজ্ঞায় বলিয়াছে : 'A form of partnership between the Islamic Bank and its clients whereby each party contributes to the capital of partnership in equal or verifying degrees to establish a new project or share in an existing one, and whereby each of the parties becomes an owner of the capital on a permanent or declining basis and shall have his due share of profits. (Accounting, Auditing and Governance Standars for Islamic Finanncial Institutions, 2004-5, Musharka Finanancing, Appendix E : Definitions, P. 187)। (মুশারাকা হইল ইসলামী ব্যাংক এবং গ্রাহকের মধ্যে এক ধরনের অংশীদারী কারবার যেখানে প্রত্যেক অংশীদার সমান বা ভিন্ন মাত্রায় কোন নূতন কিংবা প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পে মূলধন গঠনে অংশ নেয় এবং যেখানে প্রত্যেক অংশীদার স্থায়ী কিংবা ক্রমহ্রাসমান ভিত্তিতে মূলধনে মালিকানা লাভ করে এবং মুনাফায় প্রাপ্য অংশ পায়)।

ব্যাংক কোম্পানী আইন (সংশোধন) ১৯৯৫-এ মুশারাকার সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে : "মুশারাকা অর্থ এমন চুক্তি যাহার অধীন কোন কাজে মূলধনের এক অংশ ইসলামী শরীয়ত মুতাবেক পরিচালিত কোন ব্যাংক এবং অপর অংশ গ্রাহক যোগান দেয় এবং যেই কাজের লাভ চুক্তিতে উল্লিখিত অনুপাতে এবং লোকসান মূলধন অনুপাতে বণ্টিত হয়।" (Musharaka means such an agreement under which a portion of capital of anything is provided by a bank conducted in accordance with the Islami Shariah and the other portion is given by the customer and in which profit is distributed in such proportion is mentioned in the agreement and loss is distributed in proportion to the capital.)।

**ব্যাংকিং কারবারে মুশারাকার বৈশিষ্ট্য** : ইহা একটি যৌথ মূলধনী কারবার। (১) কারবারের প্রয়োজনীয় মূলধন যোগায় গ্রাহক ও ব্যাংক। মোট পুঁজির একটি অংশ গ্রাহক যোগান দেন এবং অপর অংশ দেয় ব্যাংক। উভয়ের পুঁজি সমান অথবা কম-বেশী হইতে পারে। (২) কোন প্রকল্প বা ব্যবসায়ে গ্রাহক ও ব্যাংকের মূলধনের হিস্যা বা পরিমাণ চুক্তিতে উল্লেখ থাকে। (৩) চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যবসায়ের লাভ গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে ভাগ হয়। (৪) ব্যবসায়ের প্রকৃত লোকসান ব্যাংক ও গ্রাহক তাহাদের মূলধন অনুপাতে বহন করেন। (৫) মুশারাকা প্রকল্পে কোন অংশীদারকে চূড়ান্ত হিসাবের আগে অনুমানের ভিত্তিতে আগাম লাভ দেওয়া যায়। তবে আগাম দেওয়া লাভ হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রকৃত লাভ-ক্ষতির সহিত সমন্বয় করিতে হয়। (৬) অব্যবস্থাপনা, চুক্তিভংগ, বিশ্বাসভংগ ইত্যাদি কারণে লোকসান হইলে দায়ী পক্ষকে তাহা বহন করিতে হয়। (৭) ব্যাংক মুশারাকা চুক্তিতে যে কোন যুক্তিসংগত শর্ত আরোপ করিতে পারে। যেমন কোন গ্রাহক ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া কোন পণ্য লোকসানে বিক্রয় করিতে পারিবেন না। (৮) গ্রাহক যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিবেন। ব্যাংক নিজে অথবা মনোনীত নিরীক্ষক দ্বারা এই হিসাব পরিদর্শন ও নিরীক্ষণ করাইতে পারে। (৯) এই ধরনের বিনিয়োগ সাধারণত তদারকি ভিত্তিক হয়। নিয়মিত ও সুষ্ঠ তদারকির অভাবে মুশারাকা বিনিয়োগ ব্যর্থ হইতে পারে।

**মুদারাবা ও মুশারাকার মধ্যে পার্থক্য** : (১) মুদারাবার ক্ষেত্রে সাহিবুল মাল মূলধন সরবরাহ করিয়া থাকেন এবং মুদারিব তহবিলের ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করেন। মুশারাকার ক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত সকল পক্ষ

মূলধন গঠনে অংশগ্রহণ করেন। (২) মুদারাবা পদ্ধতিতে 'সাহিবুল মাল' ব্যবসা পরিচালনায় অংশ নেন না। মুশারাকা পদ্ধতিতে অংশীদারগণ সকলেই ব্যবসা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন অথবা সকলের পক্ষে কতক অংশীদার কারবার পরিচালনা করিতে পারেন। (৩) মুদারাবা পদ্ধতিতে পুঁজির লোকসান 'সাহিবুল মাল' বহন করেন। মুশারাকা পদ্ধতিতে পুঁজির ক্ষতি মূলধনের আনুপাতিক হারে সকল অংশীদারকে বহন করিতে হয়।

**হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক** ঃ 'হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক' (شركة الملك) হইল এক বিশেষ সমন্বিত চুক্তি। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া এই পদ্ধতির উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা হইল ঃ (১) মালিকানায় শরীকানা, (২) ইজারা ও (৩) বিক্রয়-এই তিন চুক্তির সমন্বয়। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর শরীয়াহ কাউন্সিলের মতে ঃ "মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হায়ার পারচেজ (হয়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌কা বা اجارة بالبيع تحت شركة الملك) শরীয়াহ্‌সম্মত একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি। ইহার প্রধান শর্তগুলি নিম্নরূপ ঃ (ক) মূলধন অনুপাতে অংশীদারগণের মালিকানার স্বীকৃতি দেওয়া যাহাতে পরবর্তীতে তাহাদের বা তাহাদের ওয়ারিসগণের বঞ্চিত হওয়ার আশংকা না থাকে। (খ) ক্রেতাকে তাহার পরিশোধিত মূল্যের আনুপাতিক মালিকানা ব্যাংক কর্তৃক হস্তান্তর করা।

শিরকাতুল মিলক বা মালিকানায় শরীকানা ঃ 'শিরকাত' (شركة) অর্থ অংশীদারিত্ব। 'শিরকাতুল মিলক' মানে মালিকানায় শরীকানা। এই ধরনের শরীকানা কারবারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি তাহাদের মূলধনে কোন সম্পদ ক্রয় করেন এবং যৌথভাবে তাহার উপর মালিকানা লাভ করেন। ব্যবসায়ের লাভ সকল পক্ষ চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করিয়া নেন। লোকসান হইলে মূলধনের অনুপাতে তাহারা তাহা বহন করেন। এই ধরনের চুক্তিকে বলা হয় 'শিরকাতুল মিলক'।

ইজারা ঃ আরবী 'আজর' (اجر) এবং 'উজরাত' (اجرة) শব্দ হইতে ইজারা পরিভাষাটি উদ্ভূত। 'আজর' (اجر) মানে প্রতিদান, লাভ, মজুরী বা ভাড়া। ইজারা হইল কোন সম্পদ ব্যবহারের বিনিময় মূল্য বা প্রতিদান, লাভ, মুজরী বা সেবার ভাড়া। ভাড়াদাতা ও ভাড়া গ্রহীতার মধ্যে ইজারা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ভাড়াগ্রহীতা ভাড়াদাতার সম্পদের ব্যবহার বা সুবিধা গ্রহণ করেন এবং বিনিময়ে ভাড়াদাতাকে নির্দিষ্ট অর্থ দেন।

**বিক্রয়** ঃ বিক্রয় হইল ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চুক্তি। এই চুক্তির মারফত বিক্রেতার মালিকানাধীন কোন নির্দিষ্ট পণ্য বা সম্পদ নির্ধারিত মূল্য নগদ বা আগাম বা ভবিষ্যতে পরিশোধের শর্তে ক্রেতার মালিকানায় ন্যস্ত হয়।

**তিন চুক্তির সমাহার** ঃ 'হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক' পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয় পক্ষ প্রথমত সম বা অসম পুঁজি বিনিয়োগ করিয়া কোন সম্পদ (ভূমি, দালান, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদি) ক্রয় করিয়া যৌথভাবে সেই সম্পদের উপর মালিকানা লাভ করেন। তাহারা উক্ত সম্পদের আয় পূর্ব নির্ধারিত হারে ভাগ করিয়া নেন। আর্থিক ক্ষতি হইলে উভয় পক্ষ পুঁজির অনুপাতে তাহা বহন করেন। দ্বিতীয়ত, এইরূপ সম্পদে ব্যাংক তাহার অংশ গ্রাহকের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট হারে ভাড়া দেয়। তৃতীয়ত, ব্যাংক তাহার অংশ কিস্তিতে বা এককালীন নির্ধারিত মূল্যে ভাড়া মেয়াদে বা মেয়াদশেষে গ্রাহকের নিকট বিক্রয় ও হস্তান্তর করে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ম্যানুয়েলে 'হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক' সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ "এই পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক চুক্তির ভিত্তিতে যৌথভাবে যানবাহন, মেশিন ও যন্ত্রপাতি, ভবন, এপার্টমেন্ট ইত্যাদি ক্রয় করে। গ্রাহক ভাড়ার ভিত্তিতে তাহা ব্যবহার করেন এবং ব্যাংকের অংশের মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করিয়া পর্যায়ক্রমে তাহার মালিকানা অর্জন করেন। পণ্য বা মালামাল ক্রয়ের আগে ইহার প্রকৃত মূল্য, মাসিক ভাড়া, ব্যাংকের অংশের মূল্য, পরিশোধের সময়সীমা ও কিস্তির পরিমাণ এবং জামানতের প্রকৃতি প্রভৃতি নির্ধারণ করিয়া চুক্তি সম্পাদিত হয়" (Manual for Investment under HPSM mode, IBBL)।

**হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক-এর বৈশিষ্ট্য** ঃ (১) গ্রাহক তাহার চাহিদা অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট সম্পদ কেনার অভিপ্রায় জানাইয়া ব্যাংককে আবেদন করেন। ব্যাংকের মঞ্জুরী লাভের পর গ্রাহক তাহার অংশের পুঁজি বা ইকুইটি ব্যাংকে জমা দেন। ব্যাংক গ্রাহকের এই টাকার সহিত তাহার অংশের টাকা যোগ করিয়া সম্পদের পুরা দাম পরিশোধ করে। (২) এইরূপ সম্পদ ক্রয়ের আগে মোট দাম, মাসিক ভাড়া, ব্যাংকের অংশ, পরিশোধের সময়সীমা ও কিস্তির পরিমাণ, জামানতের ধরন প্রভৃতি নির্ধারণ করিয়া পক্ষগণের মধ্যে চুক্তি হয়। (৩) ব্যাংক যৌথ মালিকানাধীন এই সম্পদে তাহার নিজের অংশটি গ্রাহকের নিকট চুক্তির শর্ত অনুসারে ভাড়া দেয়। (৪) গ্রাহক নির্ধারিত ভাড়া ও ব্যাংকের অংশের মূল টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করেন। (৫) গ্রাহকের কিস্তি পরিশোধের ফলে সম্পদে ব্যাংকের মালিকানার অংশ কমিতে থাকে এবং গ্রাহকের মালিকানা সেই অনুপাতে বাড়িতে থাকে। (৬) গ্রাহকের মালিকানা বাড়িবার সাথে সাথে ব্যাংকের প্রাপ্য ভাড়ার পরিমাণ আনুপাতিক হারে কমিয়া আসে। (৭) সম্পদে ব্যাংকের অংশের মূল্য পুরা শোধ হইলে গ্রাহক তাহাতে পূর্ণ মালিকানা লাভ করেন। (৮) মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ব্যাংকের অংশের মূল্য শোধ হইলে গ্রাহক তাহাতে পূর্ণ মালিকানা পাইতে পারেন। (৯) গ্রাহক নির্ধারিত কিস্তি দিতে ব্যর্থ হইলে ব্যাংকের মালিকানার অনুপাত অনুযায়ী ভাড়া অব্যাহত থাকে। (১০) চুক্তির শর্ত পালনে গ্রাহক ব্যর্থ হইলে ব্যাংক সম্পদ নিজ নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে। (১১) ভাড়া হিসাবে পাওয়া অর্থ ব্যাংকের আয়। ভাড়ার টাকা মালিকানার অংশের সহিত যুক্ত নয়।

**গৃহনির্মাণ বিনিয়োগ (এইচ পি এস এম)** ঃ হায়ার পারচেজ আণ্ডার শিরকাতুল মিলক পদ্ধতিতে গৃহনির্মাণ খাতে বিনিয়োগ করিবার ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর শরীয়া কাউন্সিল নিম্নোক্ত নীতিসমূহ অনুমোদন করিয়াছে ঃ (১) গ্রাহক কর্তৃক প্রস্তাবিত জমির উপর অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাংক নির্মাণ কাজ করিতে পারে এবং হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক অথবা ইজারা চুক্তির অধীনে ক্রমহ্রাসমান মালিকানা পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে ভাড়া ও মূল্য আদায়ের মাধ্যমে গ্রাহকের নিকট মালিকানা হস্তান্তর করিতে পারে অথবা ভাড়ার মেয়াদশেষে একসাথে পূর্ণ দাম আদায়ের মাধ্যমে মালিকানা হস্তান্তর করিতে পারে। (২) ব্যাংক গ্রাহকের অনুরোধক্রমে তাহারই প্রদত্ত জমিতে

অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে এবং নির্মিত ভবনের বিক্রয় মূল্য কিস্তিতে অথবা এককালীন পরিশোধের শর্তে বায়' মুআজ্জাল পদ্ধতিতে গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করিতে পারে। (৩) ব্যাংক সরাসরি জমি ক্রয় করিয়া তাহার উপর পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ করিয়া বায়' মুআজ্জাল পদ্ধতিতে আগ্রহী ক্রেতার নিকট কিস্তিতে বা এককালীন বিক্রয় করিতে পারে। (৪) ব্যাংক অনুমোদিত প্লান অনুযায়ী এককালীন এসটিমেট করিয়া শুধুমাত্র নির্মাণ সামগ্রী ক্রয় করিয়া সংশ্লিষ্ট বাড়ি নির্মাণের পর বায়' মুআজ্জাল পদ্ধতিতে বিক্রয় করিতে পারে।

**(খ) ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি**

**বায়' মুরাবাহা** ঃ আরবী 'বায়' ও 'রিবহুন' (ربح) শব্দ হইতে 'বায়' মুরাবাহা' (بيع مرابحة) পরিভাষাটি উদ্ভূত। 'বায়' অর্থ ক্রয়-বিক্রয়। 'রিবহুন' অর্থ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত মুনাফা। সহজ কথায় 'বায় মুরাবাহা' হইতেছে সম্মত নির্ধারিত মুনাফায় বিক্রয়। ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে 'মুরাবাহা' এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তি, যাহার অধীনে ব্যাংক তাহার গ্রাহকের অনুরোধে নির্ধারিত মাল কিনিয়া ক্রয়মূল্যের সহিত সম্মত লাভ যোগ করিয়া তাহা সেই গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে। গ্রাহক চুক্তির শর্তানুসারে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দাম শোধ করিয়া মাল নিতে বাধ্য থাকেন (Manual for Investment under Murabaha mode, IBBL)।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) 'বায়' মুরাবাহা'র সংজ্ঞায় বলিয়াছে ঃ Muarabaha is a contract between a buyer and a seller at a higher price than the original price at which the seller bought the goods as a financing technique, it involves the purchase by the seller (financier) of certain goods needed by the buyer and their re-sale to the buyer on cost-plus basis, Both the profit (mark-up) and the time of repayment (usually in installments) are specified in the initial contract.

[বায়' মুরাবাহা হইল ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে একটি চুক্তি যেখানে বিক্রেতা (অর্থায়নকারী) ক্রেতার নিকট পণ্য বিক্রয় করে। এই ক্ষেত্রে বিক্রেতা অর্থায়ন কৌশল হিসাবে ক্রেতার প্রয়োজন অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয় করিয়া এবং 'মুনাফা সংযোজন' করিয়া প্রকৃত ক্রয়মূল্যের চাইতে উচ্চতর মূল্যে তাহা ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে। চুক্তিতে লাভ (মার্ক-আপ) এবং মূল্য পরিশোধের সময় (সাধারণত কিস্তিতে) নির্ধারিত থাকে]।

সকল ইসলামী ব্যাংকের কর্মকৌশল অভিন্ন ধারায় পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত বাহরায়ন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) বায়' মুরাবাহা'র সংজ্ঞায় বলিয়াছে ঃ Murabaha is selling a commodity as per the purchasing price with a defined and agreed profit mark-up. This mark-up may be a percentage of the selling price or a lumpsum. This transaction may be conclude either without a prior promise to buy in which case it is called an ordinary Murabaha, or with a proior promise to buy submitted by a person interested in acquiring goods through the institution, in which case it is called a "banking Murabaha" i.e. Murabaha to the purchase orderer. This transaction is one of the trustbased contracts that depends on transparency as to the actual purchasing price or cost price in addition to common expenses." (Sharaia Standards No. 8 Murabaha to the purchase orderer, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2004-5, Appendix D : Basis for the Sharia Rulings, P. 127)।

[মুরাবাহা হইল নির্ধারিত ও সম্মত লাভের ভিত্তিতে পণ্য বিক্রয়। এই লাভ (মার্ক আপ) বিক্রয় মূল্যের হারাহারি হইতে পারে কিংবা তাহা 'থোক' হইতে পারে। ক্রয়ের ওয়াদা ছাড়া এই লেনদেন সম্পন্ন হইলে তাহা হইবে একটি সাধারণ মুরাবাহা চুক্তি। কোন আগ্রহী ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পণ্য ক্রয়ের জন্য আগাম পেশ করা ওয়াদাপত্রের ভিত্তিতে এই লেনদেন হইলে তাহা 'ব্যাংকিং মুরাবাহা' বা ক্রয়-আদেষ্টার নিকট লাভে পণ্য বিক্রয় (মুরাবাহা) হিসাবে গণ্য হইবে। এইরূপ লেনদেনে প্রকৃত ক্রয়মূল্যের সহিত সাধারণ খরচাদি আলাদাভাবে উল্লেখ থাকায় এই চুক্তি স্বচ্ছতানির্ভর আস্থাভিত্তিক চুক্তিসমূহের পর্যায়ভুক্ত]।

**ব্যাংকিং কারবারে মুরাবাহা বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য** ঃ (১) ব্যাংকিং মুরাবাহায় তিনিটি পক্ষ থাকে ঃ (ক) ব্যাংক (অর্থায়নকারী), (খ) বিক্রেতা (যাহার নিকট হইতে ব্যাংক মাল ক্রয় করে) এবং (গ) ক্রেতা বা গ্রাহক (যাহার কাছে ব্যাংক মাল বিক্রয় করে)। (২) বিনিয়োগ প্রস্তাব বিবেচনার সময় ব্যাংক গ্রাহকের ব্যবসয়িক যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিশ্বস্ততা, বাজারে তাহার সুনাম ইত্যাদির ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়। (৩) গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ক্রয়ের আগে বাজারে সেই মালের কাটতি, মূল্য, সম্ভাব্য মুনাফা ইত্যাদি ব্যাপারে সতর্কতার সহিত যাচাই করিয়া দেখা ব্যাংকের দায়িত্ব। (৪) পণ্যের ক্রয়মূল্য ও লাভের অংক ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়েরই জানা থাকা মুরাবাহা পদ্ধতির একটি শর্ত। (৫) পণ্যের প্রকৃত ক্রয়মূল্যের সহিত পরিবহন ও আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করিয়া নীট ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। ব্যাংক এই নীট ক্রয়মূল্যের উপর সম্মত লাভ যোগ করিয়া বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে। (৬) ব্যাংক মাল রাখার জন্য গুদামের ভাড়া, গুদাম কর্মচারীদের বেতন, বীমার প্রিমিয়াম ইত্যাদি খরচ গ্রাহকের নিকট হইতে আদায় করে। (৭) ব্যাংক একই ধরনের অতিরিক্ত মাল গ্রাহকের নিকট হইতে জামানত নিতে পারে। (৮) ব্যাংক প্রয়োজনে গ্রাহকের নিকট হইতে সহায়ক জামানত নিতে পারে। (৯) গ্রাহক সম্পূর্ণ দাম শোধ করিয়া সব মাল একসাথে নিতে পারেন বা কিস্তিতে আনুপাতিক মূল্য পরিশোধ করিয়া আংশিক মাল নিতে পারেন। (১০) বিনিয়োগকৃত পণ্যের মালিকানা গ্রাহকের নিকট ন্যস্ত হয়। (১১) চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্যের সরবরাহ নিতে ও দাম শোধ করিতে বাধ্য

থাকেন। (১২) বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর শর্তের কোন পরিবর্তন করা যায় না।

**বায়‘ মুআজ্জাল** ঃ আরবী ‘বায়‘ (بيع) এবং ‘আজাল’ (اجل) শব্দ হইতে বায়‘ মুআজ্জাল (بيع مؤجل) পরিভাষাটি উদ্ভূত। ‘বায়‘ অর্থ ক্রয়-বিক্রয়। ‘আজাল’ অর্থ নির্ধারিত সময়, মেয়াদ। বায়‘ মুআজ্জাল অর্থ ভবিষ্যতে পরিশোধের শর্তে পণ্য বিক্রয়। ইহা একটি বাকীতে পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি। ‘বায়‘ মুআজ্জাল বলিতে ব্যাংক কর্তৃক মুনাফার উদ্দেশ্যে গ্রাহকের নিকট বাকীতে মাল বিক্রয় বোঝায়। ব্যাংক পণ্য কিনিয়া তাহার উপর মালিকানা নিশ্চিত করিবার পর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গ্রাহককে সম্মত মূল্যে সেই পণ্য সরবরাহ করে। চুক্তিতে পণ্যের ধরন, মান, পরিমাণ, বিক্রয়মূল্য, পণ্য সরবরাহের স্থান ও সময়, দাম পরিশোধের সময়সীমা ও পদ্ধতি ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে (Manual for Investment under Bai Muajjal mode, IBBL)।

বায়‘ মুআজ্জালের বৈশিষ্ট্য ঃ (১) এই পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের অনুরোধে কৃষি ও শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ, ভোগ্যপণ্য ও মাল কিনিয়া তাহা গ্রাহকের নিকট বাকীতে বিক্রয় করে। (২) গ্রাহকগণ চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে মালের নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করেন। (৩) ব্যাংক পণ্য কিনিয়া তাহাতে মালিকানা নিশ্চিত করিয়া চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহককে সম্মত মূল্যে সেই পণ্য সরবরাহ করে। (৪) চুক্তিতে পণ্যের ধরন, মান, পরিমাণ, বিক্রয়মূল্য, সরবরাহের স্থান ও সময়, গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধের সময়সীমা ও পদ্ধতি ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। (৫) বায়‘ মুআজ্জাল বিনিয়োগে ব্যাংক গ্রাহকের নিকট পণ্যের কেনা দাম প্রকাশ করিতে বাধ্য নয়। (৬) ব্যাংক ও গ্রাহক উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত হয়। পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত হওয়ার পর তাহা পরিবর্তন করা যায় না। (৭) ব্যাংক এই বিনিয়োগ নিরাপদ করিতে গ্রাহকের নিকট হইতে সহায়ক জামানত লইয়া থাকে। (৮) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রাহক পণ্যের দাম পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে ব্যাংক অতিরিক্ত কোন অর্থ আদায় করিতে পারে না, তবে গ্রাহকের নিকট হইতে শর্তানুযায়ী ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে। ক্ষতিপূরণের অর্থ ব্যাংকের আয়রূপে গণ্য হয় না। শরীয়া কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত কোন জনহিতকর কাজে তাহা ব্যবহার করা হয়।

**বায়‘ মুআজ্জাল ও বায়‘ মুরাবাহার মধ্যে পার্থক্য** ঃ মুরাবাহা চুক্তিতে পণ্যের কেনা দাম, মুনাফা ও অন্যান্য খরচ আলাদাভাবে উল্লেখ করা অপরিহার্য। বায়‘ মুআজ্জাল চুক্তির বেলায় গ্রাহককে এইসব তথ্য জানানো বাধ্যতামূলক নহে, শুধু বিক্রয় মূল্য ঘোষণা করিলেই চলে। বায়‘ মুআজ্জাল পদ্ধতির অন্যান্য শর্ত মুরাবাহা চুক্তির মতই। বায়‘ মুরাবাহা ও বায়‘ মুআজ্জাল পদ্ধতির কয়েকটি সাধারণ শর্ত হইল ঃ (১) গ্রাহকের নিকট বিক্রয়ের আগেই সংশ্লিষ্ট মাল ব্যাংকের মালিকানায় ও দখলে থাকিতে হইবে। শারী‘আতের বিধান অনুসারে যাহা নিজের মালিকানায় নাই তাহা বিক্রয় করা যায় না। (২) মাল ক্রয়ের পর হইতে ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করিবার আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মাল হারাইয়া গেলে, চুরি বা নষ্ট হইলে যেই কোন ক্ষয়ক্ষতির দায়িত্ব ব্যাংক (বিক্রেতা) বহন করে। শারী‘আতের দৃষ্টিতে ঝুঁকি বহন না করিয়া মুনাফা করা বৈধ নয়। (৩) গ্রাহকের ফরমায়েশ অনুযায়ী মাল কেনার যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের দায়িত্ব ব্যাংক বা তাহার প্রতিনিধির। সেই প্রতিনিধি কোনক্রমেই ফরমায়েশ দানকারীর ক্রেতা হইতে পারিবে না। মালের পরিবহন ও বিক্রয়ের আগ পর্যন্ত সংরক্ষণের দায়িত্ব ব্যাংকের। (৪) বায়‘ মুআজ্জাল ও মুরাবাহা পদ্ধতিতে একবার পণ্যের দাম নির্ধারিত হইলে তাহা আর পরিবর্তন করা যায় না। ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে ক্রেতা দেরী করিলে অতিরিক্ত সময়ের লাভের হার বা দাম বাড়ানো যাইবে না।

**বায়‘ সালাম** ঃ আরবী ‘বায়‘ অর্থ কেনা-বেচা। ‘সালাম’ অর্থ আগাম। ‘বায়‘ সালাম’ (بيع سلم) হইল আগাম ‘কেনা-বেচা’। ‘বায়‘ সালাম’ এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তি যাহার আওতায় আগামী কোন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য সরবরাহের শর্তে ব্যাংক মালের দাম আগাম পরিশোধ করে। নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাংক গ্রাহকের নিকট হইতে পণ্য সরবরাহ লইয়া তাহা যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বেচিতে পারে (Manual for Investment under Bai Sakam mode, IBBL)

AAOIFI বায়‘ সালাম’-এর সংজ্ঞায় বলিয়াছে ঃ

A Salam transaction is the purchase of a commodity for deffered delivery in exchange for immediate payment. It is a type of sale in which the price, known as the Salam capital, is paid at the time of contracting while the delivery of the item to be sold, known as al-Muslam fihi (the subject matter of a Salam contract), is deffered. The seller and the buyer are known as al-Muslam ilaihi and al-Muslam of Rabb al-Salam respectively. Salam is also known as salaf (lit. borrowing)" (Sharia Standards No. 10 Salam and Parallel Salam, Accounting & Audititng Organization for Islamic Financial Institutions, 2004-5, Appendix C : Definitions, P. 174।

সালাম লেনদেন হইল আগাম মূল্য পরিশোধের বিপরীতে ভবিষ্যতে সরবরাহের শর্তে পণ্য ক্রয়। এই ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সরবরাহ করা হইবে এমন পণ্যের (মুসলাম ফীহি مسلم فيه বা সালাম চুক্তির বিষয়বস্তু) বিপরীতে পণ্যের দাম বা সালাম মূলধন চুক্তির সময় আগাম পরিশোধ করা হয়। বিক্রেতাকে বলা মুসলাম ইলায়হি (مسلم اليه) এবং ক্রেতাকে বলা হয় আল-মুসলাম (مسلم) বা ‘রাব্বুস-সালাম’ (رب السلم)। সালাম চুক্তি সালাফ (سلف) নামেও পরিচিত (আভিধানিক অর্থ ধার করা)]।"

**বায়‘ সালামের বৈশিষ্ট্য** ঃ (১) এই পদ্ধতিতে ব্যাংক সাধারণত কৃষি ও শিল্প পণ্য আগাম কিনে। (২) এই পদ্ধতিতে ব্যাংক হইতেছে ক্রেতা এবং গ্রাহক এই ক্ষেত্রে বিক্রেতা। (৩) ব্যাংক এই ধরনের চুক্তি সম্পাদনের পর গ্রাহককে মালের আগাম মূল্য বাবদ অর্থ (সালাম মূলধন) যোগান দেয়। (৪) চুক্তির সময় ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্মতির ভিত্তিতে পণ্যের দাম নির্ধারণ করা হয়। (৫) চুক্তির সময় পণ্যের মান, পরিমাণ, সরবরাহের সময়, স্থান ও ধরন স্থির করা হয়। (৬) চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য সরবরাহ করেন। (৭) পণ্য সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে বিক্রেতা আগাম লওয়া দাম ফেরত দিবেন। (৮) ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ে গ্রাহকের নিকট হইতে পণ্য সরবরাহ তাহা যেই কোন

ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করিতে পারে। (৯) ব্যাংক সময়মত যথাযথ পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করিবার জন্য গ্রাহকের কাছ হইতে সহায়ক জামানত নিতে পারে।

**বায়' ইসতিসনা'** ঃ ইসতিসনা' (استصناع) হইল ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটি চুক্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী ক্রেতার নির্দেশে বিক্রেতা কোন বস্তু তৈরি করিয়া দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাহার চাহিদামত কোন দ্রব্য নির্ধারিত দামের বিনিময়ে তৈরি করিয়া দিতে কোন কারিগর বা কারখানা মালিকের নিকট প্রস্তাব করিলে এবং কারিগর বা মালিক ঐ প্রস্তাবে রাযী হইলে 'ইসতিসনা' চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই ক্ষেত্রে আদেশদাতাকে বলা হয় 'মুসতাসনি' (مستصنع) এবং আদেশ গ্রহীতা হইলেন 'সানে' (صانع)। আদেশের মাধ্যমে তৈরী করা পণ্যকে বলা হয় মাসনূ' (مصنوع)। অর্ডারের বিপরীতে নির্মাণ বা তৈরী করা হয় এমন জিনিস নির্মাণ বা তৈরী করিয়া দিতে আদেষ্টা আদেশ দিলে এবং আদিষ্ট তাহাতে সম্মত হইলে তাহা 'ইসতিসনা' চুক্তি হইবে। আজল বা মেয়াদ নির্ধারণ করা 'ইসতিসনা' চুক্তিতে জরুরী নয়। তবে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে বিরোধ এড়াইতে মেয়াদ নির্ধারণ করা ভালো।

AAOIFI ইসতিসনার সংজ্ঞায় বলিয়াছে ঃ "Istisna'a is a contract of sale of specified items to be manufactured or constructed, with an obligation on the part of the manufacturer or builder (contractor) to deliver them to the customer upon completion." (Sharia Standards No. 11, Istisna'a and Parallel Istisna'a Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Instituions, 2004-5, Appendix C : Definitions, P. 195)।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) ইসতিসনার সংজ্ঞায় বলিয়াছে ঃ "Istisna is a contrct for manufacturing (or construction) whereby the manufacturer (seller) agrees to provide the buyer with goods identified by description after they have been manufactured/constructed in conformity with that descripton within a certain time and for an agreed price."

[ইসতিসনা হইল উৎপাদনের (বা নির্মাণের) এমন এক চুক্তি যেইখানে উৎপাদনকারী (বিক্রেতা) নির্দিষ্ট বিবরণ অনুযায়ী কোন পণ্য তৈরি করিয়া তাহা নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত দামে ক্রেতাকে সরবরাহ করিতে সম্মত হয়।]

**ইসতিসনা'র বৈশিষ্ট্য** ঃ (১) 'ইসিতসনা' চুক্তিতে পণ্যের স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ থাকিতে হইবে। পণ্যের ধরন, শ্রেণী, পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য চুক্তিতে উল্লেখ করা জরুরী। ইহার ফলে পরবর্তীতে কোন ভুল বুঝাবুঝি বা বিবাদ এড়ানো যাইবে। (২) চুক্তিতে সম্মত দাম উল্লেখ করিত হইবে। দাম কখন ও কিভাবে পরিশোধিত হইবে তাহাও চুক্তিতে উল্লেখ থাকিবে। (৩) পণ্য কখন, কোথায়, কাহার খরচে সরবরাহ করা হইবে তাহার উল্লেখ চুক্তিতে থাকিতে হইবে। (৪) পক্ষগণ রাযী হইলে বিক্রেতাকে পণ্যের আংশিক বা পুরা দাম আগাম দেওয়া যাইতে পারে অথবা বাকি রাখা যাইতে পারে। (৫) 'ইসতিসনা' চুক্তিতে মাল সরবরাহের সময়সীমা নির্ধারণ জরুরী নয়। মেয়াদ নির্ধারণ না করিয়াও ইসতিসনা' চুক্তি করা যায়। তবে বিরোধ এড়াইবার জন্য ব্যাংকের ক্ষেত্রে মেয়াদ নির্ধারিত করা ভালো। (৬) চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর পণ্যের পূর্ণ বা আংশিক দাম শোধ হওয়ার পর কোন পক্ষ এককভাবে চুক্তি বাতিল বা প্রত্যাহার করিতে পারেন না। (৭) কোন পক্ষ ইচ্ছাকৃত চুক্তি ভঙ্গ করিলে দায়ী পক্ষের উপর নির্দিষ্ট জরিমানা আরোপ করা যাইবে। এরূপ শর্ত ইসতিসনা' চুক্তিতে রাখা যাইবে। (৮) সমকালীন ফকীহগণের মতে ইসতিসনা' ক্ষেত্রে আরোপিত ক্ষতিপূরণ ব্যাংকের বৈধ আয়রূপে বিবেচিত হইবে।

**বায়' সালাম ও ইসতিসনা'র মধ্যে পার্থক্য** ঃ (১) বায়' সালাম বা আগাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে পণ্য সরবরাহ করা হয়। পণ্যের দাম চুক্তির সময় পরিশোধ করিতে হয়। ইসতিসনার ক্ষেত্রে পণ্যের আংশিক বা পুরা দাম আগাম কিংবা পণ্য সরবরাহের সময় পরিশোধ করা যায়। (২) বায়' সালাম সাধারণত কৃষিপণ্য আগাম কেনার চুক্তি। কিন্তু ইসতিসনার সম্পর্ক শিল্প পণ্যের উৎপাদন বা নির্মাণের সহিত। কোন কোন ইসলামী ব্যাংক পোশাক শিল্পের প্রাক-রফতানী কাজে অর্থায়নের বেলায় ইসতিসনার পদ্ধতি অনুসরণ করে। এমন কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও কোন কোন ফকীহ বায়' ইসতিসনা'কে বায়' সালাম চুক্তির সম্প্রসারিত রূপ বলিয়া মনে করেন।

**বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল্যায়ন**

বিশ শতকের ষাটের দশকে মিসরের মিটগামার হইতে যাত্রা শুরু করিয়া ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা মাত্র অর্ধ শতাব্দীর কম সময়ের মধ্যেই তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে বিশ্বব্যাপী সুস্পষ্ট করিতে এবং সাড়া জাগাইতে সমর্থ হইয়াছে। বাংলাদেশেও এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হইয়াছে। বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র কাঠামো ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও বেসরকারী পর্যায়ে ইসলামী ধাঁচে আর্থিক পুনর্গঠনের একটি প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এখন আর শুধু তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় নয়। মুদারাবা, মুশারাকা, বায়' মুরাবাহা, বায়' মুআজ্জাল, বায়' সালাম প্রভৃতি পরিভাষা এখন এই দেশের লাখো মানুষের দৈনন্দিন বাস্তব আর্থিক লেনদেনের ভাষা হিসাবে চালু হইয়াছে। দুই যুগের কম সময়ের মধ্যে দেশের ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রায় এক-অষ্টমাংশ এখন ইসলামী শারী'আভিত্তিক পদ্ধতির আওতায় আসিয়াছে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিস্তৃতির সাথে সাথে উহাকে কেন্দ্র করিয়া আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণা বিস্তৃত হইতেছে। মুসলিম বিশ্বে ইজতিহাদ বা গবেষণার যে ধারাটি স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছিল, ইসলামী ব্যাংকিং সেখানে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার এই পরিচালনাগত সফলতা সকলের সামনে এই বিষয়টি আবার স্পষ্ট করিয়াছে যে, আধুনিক বিশ্বের মানুষ সুদের মত ক্ষতিকর উপাদানসমূহ বর্জন করিয়া তাহাদের সকল কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদন করিতে পারেন। এই দিক হইতে ইসলামী ব্যাংকিং নূতন আস্থা ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালনাগত সফলতা এই দেশে নূতন ৬টি ইসলামী

ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করিয়াছে। এইগুলি হইল আল-বারাকা ব্যাংক আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, অক্সিম ব্যাংক লিঃ, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, ঢাকা ব্যাংক লিঃ, দি-সিটি ব্যাংক লিঃ, প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিঃ যমুনা ব্যাংক ও সাউথইস্ট ব্যাংকসহ কয়েকটি প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খুলিতে আগাইয়া আসিয়াছে। একটি সুদভিত্তিক ব্যাংক ইতোমধ্যে ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক হিসাবে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং আরও কয়েকটি ব্যাংক এই লক্ষ্যে কাজ শুরু করিয়াছে।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে ৩১.১২.২০০৫ তারিখে মোট জমার পরিমাণ ছিল ১৫,৪৩,৯৫৮.০০ মিলিয়ন টাকা। তাহার মধ্যে সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং শাখাসহ ইসলামী ব্যাংকসমূহের মোট জমা ছিল ২,১১,৫৭১.০০ মিলিয়ন টাকা। ইহা দেশের মোট জমার শতকরা ১৩.৭০ ভাগ। দেশীয় অর্থনীতিতে এই সময় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১১,৯২,৫০১.০০ মিলিয়ন টাকা। তাহার মধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ছিল ১,৯৪,৩৬৪.০০ মিলিয়ন টাকা, যাহা মোট বিনিয়োগের শতকরা ১৬.৩০ ভাগ (ইকোনোমি ট্রেন্ডস, বাংলাদেশ ব্যাংক, মার্চ ২০০৬ খৃ.)।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় অর্ধশত ব্যাংকের প্রায় ছয় হাজার শাখা কাজ করিতেছে। তাহার মধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখার সংখ্যা সোয়া তিন শতের বেশী। ইসলামী ব্যাংকিং শাখাগুলি গ্রাহক আকর্ষণের দিক দিয়া বিপুল সাফল্যের পরিচয় দিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২০০৫ সাল নাগাদ তাহার ১৬৯টি শাখার মাধ্যমে প্রায় তিন মিলিয়ন গ্রাহককে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক-এর বিশেষ জনপ্রিয়তার একটি প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে।

গত দশ বৎসরে জাতীয়ভাবে ব্যাংকিং খাতে সঞ্চয় আহরণের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১৩.৯১%। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এই সময় বৎসর গড় প্রবৃদ্ধি অর্জন করিয়াছে ২৪%। এই চিত্র হইতে ইহা স্পষ্ট যে, জাতীয় সঞ্চয় আহরণে এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে ইসলামী ব্যাংকের সামর্থ্য ও নীট অবদান সুদী ব্যাংকের তুলনায় অনেক বেশী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ইসলামী ব্যাংকের জমার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিয়াছে। ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক বেশী হারে সঞ্চয় আহরণের ফলে জাতীয় আর্থ-সামাজিক খাতে সুদের নেতিবাচক প্রভাব কমিতেছে এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এর ইতিবাচক অংশীদারিত্ব ক্রমশ বাড়িতেছে।

এই আলোকে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিনিয়োগ কার্যক্রম বিচার্য। ২০০৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ ছিল ১০,২১৪.০০ কোটি টাকা। ২০০৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত উহার আরও ৯৯৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ১১,২১১.০০ কোটি টাকা। ১৯৯৬ হইতে ২০০৪ সাল পর্যন্ত জাতীয়ভাবে দেশের গোটা ব্যাংকিং সেক্টরের বিনিয়োগের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১৪.২৫%। সেই ক্ষেত্রে গত দশ বৎসরে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ঘটিয়াছে প্রায় ২৫.৫০%।

**ইসলামী ব্যাংকিং-এর আর্থিক দক্ষতা ও সামর্থ্য মূল্যায়ন**

ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন এণ্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (CEISL) নামক আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থার ২০০২ সাল হইতে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী রেটিংয়ে ইসলামী ব্যাংকের অবস্থান ছিল $A^+$ যাহা ব্যাংকের সার্বিক আর্থিক সামর্থ্য ও মজবুত ভিত্তি নির্দেশ করে। ২০০৫ সালে CEISL ইসলামী ব্যাংকের অবস্থান আরও উন্নত করিয়া 'ডাবল এ মাইনাস' নির্ধারণ করিয়াছে যাহা ব্যাংকের উচ্চতর আর্থিক সামর্থ্য, অধিক নিরাপত্তা, অধিক ক্রেডিট মান ও সুদৃঢ় ক্রেডিট প্রোফাইলসম্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সত্তার নির্দেশক। সম্প্রতি আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংককে CEISL রেজিঃ করিয়াছে।

নিউইয়র্ক ভিত্তিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্লোবাল ফিন্যান্স 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাংক পুরস্কার' (World's Best Bank Awards)-এর আওতায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-কে তাহার কার্যক্রম ও কৃতিত্বের জন্য ১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০৪ সালে তিন-তিনবার 'বেস্ট ব্যাংক ইন বাংলাদেশ' পুরস্কারে ভূষিত করিয়াছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সদস্যরূপে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেছে। এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রহিয়াছে বাহরায়ন ভিত্তিক একাউন্টিং এণ্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশনস (AAOFI), জেনারেল কাউন্সিল ফর ইসলামিক ব্যাংকস এণ্ড ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশনস, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল মার্কেট (IIFM), সংযুক্ত আরব আমিরাত ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল কনসিলিয়েশন এন্ড কমার্শিয়াল আরবিট্রেশন সেন্টার, মালয়েশিয়া ভিত্তিক ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড (IFSB) ও ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডস্ট্রিজ (বাংলাদেশ চ্যাপ্টার) ইত্যাদি। জাতীয় পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম), দি ইন্সটিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (আইবিবি), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (BAB), বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স এসোসিয়েশন (BAFEDA), ইসলামী ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় শরীয়াহ বোর্ড, ইসলামী ব্যাংকস কনসালটেটিভ ফোরাম (IBCF), ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সদস্য।

দেশের বেসরকারী খাতের ব্যাংকগুলির মধ্যে জমা, বিনিয়োগ, পরিচালনাগত মুনাফা, আমদানী-রফতানী বাণিজ্য, রেমিট্যান্স সংগ্রহ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় অবস্থান অর্জনের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দুই হাজার এবং এশিয়ার শীর্ষস্থানীয় পাঁচ শত ব্যাংকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উন্নত মানের ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি মূলধনের পর্যাপ্ততা, পরিসম্পদের গুণাবলী, মুনাফা অর্জন ও যথার্থ তারল্য পরিস্থিতি প্রভৃতি মিলাইয়া ইসলামী ব্যাংক একটি সফল ব্যাংকের দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেচিত হইতেছে।

**একবিংশ শতকে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং**

ইসলামী ব্যাংক সকল বিচারে একটি গণ-ব্যাংক ও সার্বজনীন ব্যাংক হিসাবে ইসলামী অর্থনীতির আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া দেশের ভারসাম্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করিতেছে। ইসলামী আদর্শের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য, ব্যাংকের সকল স্তরের জনশক্তির সৎ, আন্তরিক ও আত্মনিবেদিত সেবা, প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে দুর্নীতিমুক্ত কার্যক্রম, ব্যাংকার ও গ্রাহকের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব ও অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক এই ব্যাংকের সার্বিক পরিবেশকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তকরূপে ইসলামী ব্যাংকসমূহ দেশের আর্থ-সামাজিক খাতে গত প্রায় দুই যুগের মধ্যে যে অবদান রাখিয়াছে তাহার আলোকে বলা যায়, দেশের সার্বিক ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য নিয়া কাজ করিলে দেশের ছয় সহস্রাধিক শাখার এই বিরাট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক এই দেশের অভাবী মানুষের হতাশা মুছিয়া ফেলিতে এবং সামগ্রিকভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করিতে অসামান্য অবদান রাখিতে পারে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়া দেশের নেতৃস্থানীয় তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদ হইতে শুরু করিয়া ব্যাংকিং খাতের অনেক শীর্ষ ব্যক্তি মনে করেন, একবিংশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদদেশের গোটা ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হইবে। ইহার ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নূতন গতি ও উদ্যম সৃষ্টি হইবে।

সবশেষে বিখ্যাত পশ্চিমা সাময়িকী 'ইকনোমিস্ট'-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। ইহার ১৯৯৪ সালের ৬ আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত 'সার্ভে অব ইসলাম' শিরোনামের একটি দীর্ঘ প্রতিবেদনে বলা হয়, অতীতে বিশ্ববাসী মুসলিম স্পেন হইতে আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে জানিয়াছিল এবং ইসলামের নিকট হইতে ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে ধারণা পাইয়াছিল। আর এখনকার বিশ্ব ইসলামের নিকট হইতে ইসলামী ব্যাংকিং-এর আইডিয়া গ্রহণ করিতে পারে।

ইকনোমিস্ট-এর দৃষ্টিতে মুসলমানদের অতীত গৌরব তাহার শিক্ষা পদ্ধতি। আর দীর্ঘকাল পর মানব জাতির প্রতি ইসলামের বর্তমান উপহার ইসলামী ব্যাংকিং। ইকনোমিস্ট-এর এই বক্তব্যের সারকথা হইল, ইসলামী ব্যাংকিং সিস্টেম ইজ সুপিরিয়র টু কনভেনশনাল ওয়েস্টার্ন মডার্ন ব্যাংকিং সিস্টেম। পশ্চিমা আধুনিক ব্যাংকিং-এর সীমাবদ্ধতা অনেক আগেই অর্থনীতিবিদদের সামনে স্পষ্ট হইয়াছে। তাহার মুকাবিলায় ইসলামী ব্যাংকিং একটি বিশেষ ধর্মীয় পদ্ধতি হিসাবে নয়, বরং সার্বজনীন আর্থিক ব্যবস্থা হিসাবে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের সামনে মুক্তির এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করিয়াছে। ইসলামী ব্যাংকিং হইল আর্থিক দুনিয়ায় এক অনন্য বিপ্লব।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) Ausaf, Ahmad, Development and Problems of Islamic Banks, Islamic Researchs and Training Institute, Islamic Development Bank, Jaddah, Saudi Arabia, 1407/1987; (২) Dr. Mahmood Ahmad, "Scope for Micro Enterprise Developmnet in Bangladesh under Islamic Finance", Journal of Islamic Banking & Finance, vol. 15, No. 1, The Association of International Islamic Banks, Karachi (Asian Region), Jan-Mar. 1998; (৩) Ariff Mohammad, Islamic Banking (1988); (৪) Abdur Raquib, Islamic Banking in Bangladesh: Prospects & Problems (2004); (৫) Ahmad, Abu Umar Faruq, Problems of Islamic Banking in Bangladesh (Unpublished article 2003); (৬) M. Umar Chapra, Islam and the Economic Challenge, The [illegible] Foundation, Nairobi, Kenya and the Intenational Institute of Islami Thought, London and USA 1416H (1995); (৭) Shah Abdul Hannan, History, Methodology, Problem and Prospects of Islamic Banking in Bangladesh (2004); (৮) Hamud, Sami Hasan, Progress of Islamic Banking : The Aspirations and the Realities, Islamic Economic Studies, vol. 2, No. 1, Rajab 1415H (December 1994), Islamic Research and Traning Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, KSA; (৯) M. Azizul Huq, Islamic Banking in Bangladesh with a brief overview of Operational Problem, A paper Presented at the seminar held at BIBM on June 24, 1996; (১০) Md. Muzahidul Islam, Islamic Banking in Bangladesh : Success, Problems and Potentialities (in Bangla), (2004); (১১) Khan, A.R., Towards Identification of the Problems of the Shariah-based Commercial Banking, Dhaka University Journal of Business Studies, vol. 12, No. 2, December 1991; (১২) Dr. Md. Ataur Rahman, Islamic Banking : A Challenge to Interest-based Banking (in Bangla), unpublished; (১৩) Fariduddin Ahmad, An Empirical Study of Performance of Islamic Banks in Bangladesh, (2004); (১৪) M. Azizu Huq (Editor, Readings in Islamic Banking, Bagladesh Islamic Bankers Association (BIBA), 1983 & 1984; (১৫) M. Kabir Hasan Ph.D (Chief Editor), Text Book on Islamic Banking, Islamic Economics Resarch Bureau (IERB), June 2003; (১৬) Meezan Bank's Guide to Islamic Banking, Karachi, Pakistan; (১৭) Bangladesh Bank Annual Report 2002-2003; (১৮) Scheduled Banks Statistics: Bangladesh Bank, Jan.-March, 2003; (১৯) Bangladesh Bank Economic Trands, April 2003; (২০) Annual Reports of Islamic Banks operating in Bangladesh; (২১) Islamic Bank 18 year of progress, published by IBBL; (২২) The Bank Companies Act-1991; (২৩) Bank Parikrama-A Journal of the Bangladesh Instituite of Bank Management, Sept.-December, 1989; (২৪) IBBL Memorandum & Aricales of Association; (২৫) BANK WATCH, New York, Jan. 30, 1998; (২৬) Bankers' Almanac, UK, Jan. 1999; (২৭) শাহ আবদুল হান্নান, ইসলামী অর্থনীতি ঃ দর্শন ও কর্মকৌশল, আল-আমীন প্রকাশন, ঢাকা ২০০২ খৃ.; (২৮) মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা, সেন্ট্রাল শরীয়া বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ; (২৯) Sudin Haron & Bala Shanmugam, Islamic Banking System, Concepts & Applications, pelanduk Publications Malaysia.

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

**ইসলামী সম্মেলন সংস্থা** (Organisation of Islamic Conference) ঃ সংক্ষেপে OIC। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে জেদ্দায় ইসলামী সম্মেলন সংস্থা একটি প্রাতিষ্ঠানিক নাম ও রূপ লইয়া জন্ম নেয়। গঠিত হয় একটি স্থায়ী সেক্রেটারিয়েট। মরক্কোর রাজধানী রাবাতে ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে এই সংস্থার মূল কাঠামো তৈরি হয়, যদিও সেই সম্মেলনটি মাসজিদু'ল-আকসায় য়াহূদীদের অগ্নি সংযোগের কারণে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মাসজিদু'ল-আকসায় অগ্নি সংযোগের ঘটনাই যে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার জন্ম দেয়, এই ধারণা সর্বাংশে সঠিক নয়। তবে এই কথা ঠিক যে, ঐ ঘটনাই বিশ্ব মুসলিমকে আবার একই মঞ্চে দ্রুত একত্র হইতে সাহায্য করে। ১৯৬৭ সালের 'আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের দুঃখজনক পরিণতি মুসলিম নেতৃবৃন্দকে বিশ্বমুসলিম ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নূতনভাবে চিন্তাভাবনা করিতে বাধ্য করে। এই দুইটি ঘটনা ছাড়াও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। সেই পটভূমির উল্লেখ না করিলে এই সংস্থার আবশ্যকতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সেই পটভূমি এই ঃ খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে মুসলিম রাষ্ট্র তদানীন্তন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে উন্নীত হয়। চার খলীফার শাসনামল পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ব এক ও অখণ্ড ছিল। তাঁহাদের ত্রিশ বৎসরের শাসনামলের পর শুরু হয় মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য। উমায়্যাদের অভ্যুত্থান সেই মতবিরোধকে স্পষ্ট করিয়া তোলে। উমায়্যাদের ৯০ বৎসরের শাসনামল (৬৬১-৭৫০ খৃ.) এবং 'আব্বাসীদের ৫০৮ বৎসরের শাসনামল (৭৫০-১২৫৮ খৃ.), এই দুই শাসনামলের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল সোনালী অধ্যায়ের সংযোজন ঘটিয়াছে, কিন্তু বিশ্বমুসলিমকে এক মঞ্চে এক আদর্শের পতাকাতলে এক আদর্শের ভিত্তিতে জমায়েত করা সম্ভব হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে তেমন কার্যকর উদ্যোগও ছিল না। খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলের সেই ঐক্য আর ফিরিয়া আসে নাই। খলীফা উপাধি ধারণ করিয়া ৬৬১ খৃ. হইতে ১৯২৪ খৃ. পর্যন্ত শত শত লোক দেশ শাসন করিয়াছেন, কিন্তু খুলাফায়ে রাশিদীনের সেই মহান আদর্শকে অনুসরণ করিয়া মুসলিম উম্মাহকে অনুসরণ করিয়া মুসলিম উম্মাহকে পরিচালনা করিয়াছেন বা পরিচালনার চেষ্টা করিয়াছেন এমন খলীফার সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। ফলে তাওহীদী ঐক্যে মুসলিম উম্মাহ সংঘবদ্ধ হইতে পারে নাই। কোন কোন মুসলিম শাসক এই উদ্দেশ্যে নিজ নিজ সীমানায় তৎপরতা দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বংশগত শাসনামল শেষ হইবার পরপরই 'একতার বন্ধন'গত সমস্যাদি প্রকটিত হইয়া পড়ে। সেই তৎপরতার প্রভাবও এমন ছিল না যে, বিশ্ব মুসলিমকে এক কেন্দ্রমুখী করিতে পারে। সুতরাং অনৈক্যই অনিবার্য হইয়া উঠে। এক সময় মুসলিম জাহান তিনটি খিলাফাতের অধীনে বিভক্ত হইয়া পড়ে ঃ বাগদাদের 'আব্বাসী (৭৫০-১২৫৮ খৃ.), স্পেনের উমায়্যা (৭৫৬-১৪৯২ খৃ.) ও মিসরের ফাতিমী নামে পরিচিত উবায়দী খিলাফাত (৯০১-১১৭১ খৃ.)। 'উছমানী খিলাফাতকালে (অবসান, ১৯২৪ খৃ.) কালেও মুসলিম বিজয়াভিযান অব্যাহত থাকিলেও দেশের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলিতে থাকে। ইসলাম হইতে মুসলিম শাসকরা যতই দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন, ঐক্যের বদলে তত বেশী অনৈক্য শক্তিশালী হইতে লাগিল এবং অনৈক্য যতই বাড়িতে লাগিল, মুসলিম শক্তি ততই দুর্বল হইতে লাগিল। এই সুযোগে ইসলামের শত্রুরা ঐক্যবদ্ধ হইতে লাগিল। এক এক করিয়া ধীরে ধীরে মুসলিম ভূখণ্ড অমুসলিমদের করতলগত হইয়া পড়ে। য়ূরোপীয় শক্তির উত্থান ঘটিল, আর ঐ একই সময়ে মুসলিমদের পতন শুরু হইল। 'উছমানী খিলাফাতের উচ্ছেদের পর মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক কেন্দ্র বলিতে আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

সায়্যিদ জামালু'দ-দীন আফগানী বিশ্ব মুসলিমকে এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য প্যান-ইসলামিজমের আন্দোলন করেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি সফল হইতে পারেন নাই। তবে তিনি মুসলিম বিশ্বকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 'আব্বাসী শাসনের শেষদিকে মুসলিম দেশগুলি য়ূরোপীয় আধিপত্যের শিকারে পরিণত হয়। মুসলিম এলাকাগুলির পতন ঘটিতে থাকে। মুসলিম জাতিকে য়ূরোপীয়দের হামলা হইতে রক্ষার জন্য তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় 'আবদু'ল-হামীদ ঐক্যের ডাক দেন। সেই ডাক মুসলিম বিশ্বে ঝড়ো হাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল সত্য; কিন্তু সেই হাওয়া অনৈক্যের ভিত উপড়াইয়া ফেলিয়া ঐক্যকে সুসংহত করিতে পারে নাই। যুগে যুগে কত মর্দে মুজাহিদ ঐক্যের আহ্বান জানাইয়াছেন, ঐক্যের জন্য কাজ করিয়াছেন, কেহ কলম দিয়া, কেহ আন্দোলন করিয়া, কেহ সংগঠন কায়েম করিয়া, কেহ বক্তৃতা দিয়া, নাকীব হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া অর্থাৎ যিনি যে পথকে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সঠিক মনে করিয়াছেন তিনি সেই পথই অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ ভূমিকা পালন করিয়াছেন। খিলাফাতের যে ক্ষীণ আশাটুকু মুসলমানদের মনে ১৯২৪ খৃ. পর্যন্ত ছিল তাহাও কামাল পাশার এক ঘোষণায় শেষ হইয়া গেল। খিলাফাতের নামটি পর্যন্ত মুছিয়া গেল।

সা'উদী বাদশাহ 'আবদু'ল-'আযীয ইব্ন সা'উদ উপলব্ধি করিলেন যে, বিশ্ব মুসলিমের একটি রাজনৈতিক কেন্দ্র থাকা একান্ত দরকার। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯২৬ খৃ. মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন ডাকেন। বাদশাহ 'আবদু'ল-'আযীয সেই সম্মেলনে এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য নেতৃবৃন্দের কাছে আবেদন রাখেন। এই সম্মেলনের পাঁচ বৎসর পর ১৯৩১ খৃ. ফিলিস্তীনের মুফতী আ'জাম আমীন আল-হুসায়নী (দ্র.) বিশ্বের মুসলিম নেতৃবৃন্দকে জেরুসালেমে আসিয়া নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা করিয়া বিশ্ব মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবনের আহ্বান জানান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হইতে মুসলিম নেতাগণ ১৯৩১ খৃ. জেরুসালেমে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগ দিয়া নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। এই উপমহাদেশ হইতে যে কতিপয় নেতা যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন 'আল্লামা ইকবাল। ইহার পর ১৯৬২ খৃ. অনুষ্ঠিত হয় এক আন্তর্জাতিক মুসলিম সম্মেলন। সেই সম্মেলনে জন্ম নেয় রাবিতা আল-'আলাম আল-ইসলামী। ১৯৬৪ খৃ. মুগাদিসুতে ইসলামী দেশগুলিকে একত্র করিয়া একটি ফোরাম গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে রাবিতা আল-'আলাম আল-ইসলামীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন। সেই সম্মেলনে বাদশাহ ফায়সাল ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান। ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে মু'তামার আল-'আলাম আল-ইসলামীর এক সম্মেলন লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, ১৯২৬ খৃ. হইতে ১৯৬৬ খৃ. পর্যন্ত এতগুলি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরও ঐক্যের একটা মজবুত ভিত রচিত হয় নাই। সব কয়টি সম্মেলনেই ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল মাত্র। ১৯৬৭ খৃ. 'আরব-ইসরাঈল যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে যে দুঃখজনক পরিণতি

ঘটিল তাহা মুসলিম জাহানের ঘুমন্ত সত্তাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল। মুসলিম নেতৃবৃন্দ বুঝিতে পারিলেন যে, মুসলমানগণ যাহারা সংখ্যায় বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ হওয়া সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ না থাকিবার কারণে কত অসহায়! ১৯৬৮ খৃ. মালয়েশিয়ার প্রধান মন্ত্রী টেঙ্কু 'আবদু'র-রাহমান ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সালের ২১ এপ্রিল কুয়ালালামপুরে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন ২৯ এপ্রিলে শেষ হয়। কিন্তু এই সম্মেলনে তাঁহারা ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারেন নাই। ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট পবিত্র মাসজিদু'ল-আকসা'য় য়াহূদীরা অগ্নিসংযোগ করে। ফলে মুসলিম জাহান বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। এইবার মুসলিম নেতৃবর্গ আরও ভালভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, সম্মানের সঙ্গে বাঁচিতে হইলে মযবুত ঐক্যের প্রয়োজন। তবে এই উপলব্ধি সত্ত্বেও সেই ঐক্য শুধু 'আরব দেশগুলিকে লইয়া গড়িয়া তোলার উদ্যোগ লওয়া হয়। ২৫ আগস্ট (১৯৬৯) 'আরব লীগভুক্ত ১৪টি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ মিসরের রাজধানী কায়রোতে এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হইয়া য়াহূদীদের এই ধৃষ্টতা এবং অব্যাহত হুমকি ও সম্প্রসারণের মুকাবিলা করার উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা-ভাবনা করেন। শুধু 'আরব দেশগুলির পক্ষে য়াহূদী হামলা মুকাবিলা সম্ভব নয় এবং সম্ভব হইলেও সেই উদ্যোগ 'আরব লীগের গ্রহণ করা উচিতও নয়। এই আগুনের তাপ শুধু 'আরবদের দেহেই লাগে নাই, সকল মুসলমানের দেহে এই আগুনের তাপ লাগিয়াছে। সুতরাং বিশ্বের সকল মুসলিম দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের একটি শীর্ষ সম্মেলন অনতিবিলম্বে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। সা'উদী সরকার এই আলোকে একটি প্রস্তাব পেশ করেন যাহা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত আকারে গৃহীত হয়। সেই বৈঠকেই মরক্কো, সা'উদী 'আরব, ইরাক, পাকিস্তান, সোমালিয়া, মালয়েশিয়া ও নাইজেরিয়াকে লইয়া একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। মরক্কোর রাজধানী রাবাতে ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর প্রস্তুতি কমিটি বৈঠকে বসে। সেখানে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রস্তুতি কমিটির বৈঠকের ঠিক বারদিন পর রাবাতেই ২২ সেপ্টেম্বর বিশ্বের ২৫টি মুসলিম দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ অভিন্ন লক্ষ্যে মিলিত হন। এই বৈঠকই প্রথম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন। ২৫ সেপ্টেম্বর সম্মেলন শেষ হয়। শুরু হয় নজীরবিহীন এক ঐতিহাসিক যাত্রা। এই ভিত্তিতেই গড়িয়া ওঠে "ইসলামী সম্মেলন সংস্থা"র সৌধ, ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ইহাই ঐতিহাসিক পটভূমি (দৈনিক সংগ্রামের ওআইসি বিশেষ সংখ্যা, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৩)।

**সনদ, লক্ষ্য ও নীতি ঃ** ওআইসি সনদ ঃ ১৯৭২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী হইতে ৪ মার্চ পর্যন্ত জেদ্দায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে ওআইসি চার্টার বা সনদ অনুমোদিত হয়। এই সনদ ১৪টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। জাতিসংঘ সনদের ১০২ নং অনুচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া ১৯৭৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারী এই সনদ জাতিসংঘে রেজিস্ট্রিভুক্ত করা হয়। ওআইসি সনদে ইহার সাংগঠনিক বিন্যাসের ব্যাপক রূপরেখা বিধৃত। সনদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ওআইসির ৭টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের পাঁচটি আচরণ বিধি তথা নীতিমালা লিপিবদ্ধ করা হয়।

**সাতটি লক্ষ্য ঃ** (১) সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামী ঐক্য, সংহতি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন সাধন। (২) সদস্য দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাকরণ, দেশগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা শক্তিশালীকরণ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত সদস্য দেশসমূহের সঙ্গে পরামর্শ ও মত বিনিময়। (৩) মুসলিম দেশগুলির বর্ণবৈষম্য, বর্ণবিদ্বেষ নির্মূল করা এবং সকল ধরনের ঔপনিবেশিকতার মূলোৎপাটন করা। (৪) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি ও সমৃদ্ধি স্থাপনের লক্ষ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থার সকল রকমের প্রচেষ্টায় প্রয়োজনীয় সমর্থন দান করা। (৫) মুসলিমদের পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধানের প্রয়াসে সমন্বয় সাধন, ফিলিস্তিনীদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের প্রতি অব্যাহত সমর্থন দান এবং তাহাদের দখলকৃত স্থানসমূহ ফেরত পাইবার প্রচেষ্টায় যথোপযুক্ত সহযোগিতা প্রদান। (৬) মর্যাদা, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা এবং জাতীয় অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে পরিচালিত মুসলমানদের সমস্ত সংগ্রামকে জোরদার করা। (৭) সদস্য রাষ্ট্র এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে বৃহত্তর সহযোগিতা ও সমঝোতার ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা।

**নীতি ঃ** ওআইসি যেসব মূলনীতি দ্বারা পরিচালিত হইবে তাহা নিম্নরূপ ঃ (১) সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পূর্ণ সাম্য। (২) আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সদস্য দেশগুলির মধ্যকার কাহারও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা। (৩) প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন। (৪) সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন রকম কলহ এবং জটিলতা দেখা দিলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলাপ-আলোচনা, মধ্যস্থতা, সম্পর্ক স্থাপন এবং সালিসীর মাধ্যমে এই সকল সমস্যার নিষ্পত্তি সাধন। (৫) কোন সদস্য দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা, জাতীয় ঐক্য কিংবা রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি হুমকি সৃষ্টি হইতে পারে এমন কোন হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকা।

**সাংগঠনিক কাঠামো ঃ** ইসলামী সম্মেলন সংস্থা প্রধানত চারিটি অংগ সংস্থায় বিভিক্ত। (১) মুসলিম দেশসমূহের বাদশাহ, রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধানদের সম্মেলন। (২) পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন। (৩) সাধারণ সচিবালয়। (৪) আন্তর্জাকি ইসলামী আদালত।

(১) মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন হইতেছে ওআইসির সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। প্রতি তিন বৎসরে এই সম্মেলন একবার অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের নাম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন।

(২) ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন বৎসরে একবার বৈঠকে মিলিত হয়। ওআইসির সাধারণ বিষয়াদি বাস্তবায়িত করার নীতি ও পদ্ধতি লইয়া এই সম্মেলনে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববর্তী বৈঠকের কার্যবিবরণী এবং মুসলিম দেশগুলির সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা হয়। ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনেই সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল নিয়োগ করা হয়। সেক্রেটারী জেনারেলের অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁহার চারিজন সহকারীও সম্মেলনে ঠিক করা হয়। ওআইসির বাজেট অনুমোদনও এই বৈঠকের অন্যতম দায়িত্ব।

(৩) সাধারণ সচিবালয় ওআইসির প্রধান কার্যনির্বাহী সংস্থা। সচিবালয়ের এগারটি বিভাগ রহিয়াছে। এই সকল বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত আছে সেক্রেটারী জেনারেলের চারিজন সহকারীর উপর।

(৪) ইসলামী আন্তর্জাতিক আদালত ঃ সদস্য দেশগুলির মধ্যে যে কোন ধরনের অপরাধমূলক কাজ পর্যবেক্ষণ এবং ওআইসি সনদের লংঘনমূলক তৎপরতা পরীক্ষা করিয়া দেখা এই আদালতের কাজ।

ওআইসি-র ৬টি বিশেষজ্ঞ কমিটি রহিয়াছে। এইগুলি হইতেছে (১) আল-কুদ্স কমিটি ; (২) স্থায়ী অর্থ কমিটি ; (৩) অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজ বিষয়ক ইসলামী কমিশন ; (৪) বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতা স্ট্যান্ডিং কমিটি ; (৫) অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার স্টাডিং কমিটি এবং (৬) তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি। বিশেষ কমিটিগুলি ছাড়াও জাতিসংঘের মতই ওআইসির তেরটি সহায়ক সংগঠন রহিয়াছে। যথা ঃ (ক) ইসলামী ঐক্য তহবিল ; (খ) আল-কুদ্স তহবিল; (গ) ইসলামী দেশসমূহের জন্য পরিসংখ্যান বিষয়ক অর্থনৈতিক ও সামাজিক গবেষণা ও শিক্ষা কেন্দ্র ; (ঘ) ইসলামী ইতিহাস, শিল্প সাহিত্য এবং সংস্কৃতির জন্য গবেষণা কেন্দ্র; (ঙ) কারিগরি, বৃত্তিগত শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ইসলামী কেন্দ্র ; (চ) বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়নের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন ; (ছ) ইসলামী শিক্ষার জন্য কেন্দ্র ; (জ) বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য ইসলামী কেন্দ্র ; (ঝ) আন্তর্জাতিক ইসলামী কমিশন ; (ঞ) ইসলামী ঐতিহ্যের জন্য ইসলামী কমিশন ; (ট) ইসলামী আইনশাস্ত্র (ফিক্হ) একাডেমী ; (ঠ) ইসলামী বেসামরিক বিমান পরিবহন কাউন্সিল ও (ড) আন্তর্জাতিক ইসলামী আইন কমিশন।

ওআইসি-র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের বাস্তব কর্ম পরিচালনার জন্য সংস্থার ৭টি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এইগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাঙ্ক।
২। আন্তর্জাতিক ইসলামী সংবাদ সংস্থা।
৩। বাণিজ্য, শিল্প ও পণ্য বিনিময়ের জন্য ইসলামী চেম্বার।
৪। ইসলামী পুঁজি সংস্থা।
৫। ইসলামী জাহাজ মালিক এসোসিয়েশন।
৬। ইসলামী শিক্ষা সংক্রান্ত, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা।

(১) ওআইসির কর্মকাণ্ডে সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয় 'আরবী, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা।

(২) ওআইসি সচিবালয় জেদ্দায় অবস্থিত। জেদ্দায় মক্কা রোডে অবস্থিত এই সচিবালয়টি সা'উদী সুলতানের পূর্বতন প্রাসাদ। সা'উদী 'আরবের বাদশাহ এই রাজপ্রাসাদ ওআইসিকে দান করিয়াছেন।

ওআইসি-র প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন মালয়েশিয়ার টেংকু 'আবদু'র-রাহমান। ১৯৭০ খৃ. তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ খৃ. এই পদে নিয়োগ লাভ করেন মিসরের হাসান তুহামী, ১৯৭৫ খৃ. সেনেগালের ডঃ 'আবদু'ল-কারীম গায়ে এবং ১৯৭৯ খৃ. তিউনিসিয়ার হাবীবশাত্তী। ও.আই.সি.-র বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেল হইলেন মালয়েশিয়ার প্রধান মন্ত্রী দাতো সেরি আবদুল্লাহ বাদাবী।

ওআইসি-র বৈঠকসমূহ

| ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন | স্থান | তারিখ/সাল |
|---|---|---|
| প্রথম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন | রাবাত | ২২-২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ |
| দ্বিতীয় ” ” ” | লাহোর | ২২-২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ |
| তৃতীয় ” ” ” | মক্কা | ২৫-২৮ জানুয়ারী ১৯৮১ |
| চতুর্থ” ” ” | কাসাব্লাংকা | ১৬-২০ জানুয়ারী ১৯৮৪ |
| পঞ্চম ” ” ” | কুয়েত | ২৬-২৯ জানুয়ারী ১৯৮৭ |

ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ম ” | ” | ” | জেদ্দা | ২৩-২৫ মার্চ ১৯৭০ |
| ২য় ” | ” | ” | করাচী | ২৫-২৮ ডিসেম্বর ১৯৭০ |
| ৩য় ” | ” | ” | জেদ্দা | ২৯ মে -৪ মার্চ ১৯৭২ |
| ৪র্থ ” | ” | ” | বেনগাজী | ২৪-২৬ মার্চ ১৯৭৩ |
| ৫ম ” | ” | ” | কুয়ালালামপুর | ২১-২৫ জুন ১৯৭৪ |
| ৬ষ্ঠ ” | ” | ” | জেদ্দা | ১২-১৫ জুলাই ১৯৭৫ |
| ৭ম ” | ” | ” | ইস্তাম্বুল | ১২-১৫ মে ১৯৭৬ |
| ৮ম ” | ” | ” | ত্রিপোলী | ১১-১৪ মে ১৯৭৭ |
| ৯ম ” | ” | ” | ডাকার | ২৪-২৮ এপ্রিল ১৯৭৮ |
| ১০ম” | ” | ” | ফেজ (ফাস) | ৮-১২ মে ১৯৭৯ |
| ১১শ” | ” | ” | ইসলামাবাদ | ১৭-২২ মে ১৯৮০ |
| ১২শ” | ” | ” | বাগদাদ | ১-৫ জুন ১৯৮১ |
| ১৩শ” | ” | ” | নিয়ামী | ২২-২৬ আগস্ট ১৯৮২ |
| ১৪শ” | ” | ” | ঢাকা | ৬-১০ ডিসেম্বর ১৯৮৩ |
| ১৫শ” | ” | ” | সানা | ১৮-২২ ডিসেম্বর ১৯৮৪ |
| ১৬শ” | ” | ” | ফেজ (ফাস) | ৬-৯ জানুয়ারী ১৯৮৬ |

ইহা ছাড়াও মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের ৪টি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশন ইসলামাবাদে ২৭-২৮ জানুয়ারী, ১৯৮০, দ্বিতীয় অধিবেশন আম্মানে ১১-১২ জুলাই, ১৯৮০, তৃতীয় অধিবেশন ফেজ (ফাস) নগরীতে ১৮-২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ অধিবেশন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে ওআইসি অনেকগুলি সেমিনারের আয়োজন করে। ১৯৮০ খৃ. জেনেভায়, ১৯৮১ খৃ. প্যারিসে, ১৯৮১ খৃ. রোমে ১৯৮২ খৃ. কলম্বোতে এই ধরনের সেমিনারের আয়োজন করা হয়। তাওহ্ীদবাদী ধর্মের সঙ্গে সংলাপের পক্ষে ১৯৮২ খৃ. ওআইসি কলম্বোর সেমিনারে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মুসলমান ও খৃস্টান এই দুই ধর্মাবলম্বীদের একযোগে কাজ করিবার বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয়। ওআইসি ইতোমধ্যেই বিশ্বগির্জা পরিষদ ও ভ্যাটিকানের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বিশ্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ উদ্বাস্তু হইতেছে মুসলিম। ওআইসি সেই লক্ষ্যে জাতিসংঘ উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাই কমিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া চলিয়াছে (সাপ্তাহিক অগ্রপথিক, ২২ জানুয়ারী, ১৯৮৭)।

**প্রথম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন** ঃ ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে জেদ্দায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লইয়া ইসলামী সম্মেলন সংস্থা জন্ম নিলেও রাবাতে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনকেই ইসলামী সম্মেলন সংস্থার প্রথম শীর্ষ সম্মেলন হিসাবে গণ্য করা যায়। ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ সালে রাবাতের হিলটন হোটেলে সম্মেলন শুরু হয় এবং ২৫ সেপ্টেম্বর শেষ হয়। সম্মেলন কক্ষের প্রবেশ দ্বারে ইসলামী ঐক্যের সেই চিরন্তন বাণী শোভা পাইতেছিল। সকল প্রতিনিধির দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। আল-কুরআনের আয়াত "তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জুকে শক্তভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না" (৩ ঃ ১০৩)।

এই প্রথম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বের ২৫ টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানগণ যোগদান করেন। যোগদানকারী দেশসমূহের নাম ঃ আফগানিস্তান, আলজিরীয়া, সা'উদী 'আরব, গিনি, ইন্দোনেশিয়া,

ইরান, জর্দান, কুয়েত, লেবানন, মালয়েশিয়া, মালি, মরক্কো, মৌরিতানিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, লিবিয়া, সংযুক্ত 'আরব আমীরাত, সেনেগাল, সূদান, সোমালিয়া, তুরস্ক, দক্ষিণ য়ামান, য়ামান প্রজাতন্ত্র, শাদ এবং তিউনিসিয়া। পর্যবেক্ষক হিসাবে পিএলও (ফিলিস্তীনি মুক্তি সংস্থা) যোগদান করে। এই সম্মেলনে যে সকল দেশের প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন সা'ঊদী 'আরবের বাদশাহ ফায়সাল, ইরানের শাহ মুহাম্মাদ রিদা পাহ্‌লাবী, জর্দানের বাহশাহ হুসায়ন, কুয়েতের আমীর সাবাহ সালিম, আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাওয়ারী আবূ মুহয়িদ্দীন, মরক্কোর বাদশাহ হাসান, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট য়াহ্‌য়া খান এবং মৌরিতানিয়ার প্রেসিডেন্ট মুখতার আদ-দাদাহ। মরক্কোর বাদশাহ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। পবিত্র মাসজিদু'ল-আকসায় য়াহূদীদের অগ্নিসংযোগের ঘটনার প্রতি উপস্থিত মুসলিম নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন। বেশ কিছু মুসলিম দেশ এই সম্মেলন হইতে দূরে থাকে। সিরিয়া ও ইরাকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিরিয়া যোগ না দেওয়ার কারণ মরক্কোর সঙ্গে সিরিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। ইরাক সম্মেলনের ব্যাপারে কতকগুলি শর্ত আরোপ করে, সেই শর্তসমূহ পূরণ হয় নাই। এই কারণে ইরাক সম্মেলনে যোগদানে বিরত থাকে।

**রাবাত ঘোষণা** ঃ রাবাত ঘোষণা ছিল এই ঃ মুসলমানদের অভিন্ন বিশ্বাসই তাহাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও সমঝোতা সৃষ্টির ভিত্তি। এই সম্মেলন এই প্রত্যয় প্রকাশ করিয়া এবং ইসলাম নির্দেশিত আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা ও আর্থ-সামাজিক মূল্যবোধ, যাহা গোটা মানব জাতির সমৃদ্ধির অপরিহার্য চাবিকাঠি, তাহা সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত লইয়া এবং জাতিসংঘ সনদ, মৌল মানবাধিকার, মানুষে মানুষে সুসম্পর্কের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত নীতি ও লক্ষ্যের প্রতি দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করিয়া এবং মুসলিম জনগণের ভ্রাতৃসুলভ ও আধ্যাত্মিক বন্ধন শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে সুবিচার, সহনশীলতা, বৈষম্যহীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করত গোটা জগত ব্যাপী স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি ও উন্নতির বিস্তার ঘটাইবার আগ্রহ লইয়া বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার প্রচেষ্টাকে সুসংহত করিবার দৃঢ় মত ঘোষণা করিতেছে এবং ইসলামের চিরন্তন শিক্ষার উপর ভিত্তিশীল অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্য ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারসমূহ পরস্পর আলোচনা করিবেন।

তাঁহাদের মধ্য কোন বিরোধ দেখা দিলে জাতিসংঘ্য সনদের নীতি ও উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা শক্তিশালী হয়, এমন উপায়ে তাঁহারা এই বিরোধগুলি শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করিবেন।

মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি এবং মাসজিদু'ল-আকসার উপর সংঘটিত জঘন্য অপরাধ মূল্যায়নক্রমে এই সম্মেলন ঘোষণা করিতেছে ঃ "১৯৬৯ সালের ২১ আগস্টের অগ্নিসংযোগের ঘটনার মাধ্যমে পবিত্র মাসজিদু'ল-আকসার যে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করা হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বের ৭৫ কোটি মুসলমানকে গভীর শোকে নিমজ্জিত করে এবং ইসলাম ধর্ম, খৃস্ট ধর্ম, য়াহূদী ধর্মের অনুসারীদের পবিত্র জেরুসালেম নগরীর আল-কুদস দখল করিয়া ইসরাঈলী সৈন্যরা পবিত্র স্থানসমূহের যে ক্ষতিসাধন করিয়াছে এবং মানব সমাজের একটি অতি পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে যে অপরাধ করিয়াছে তাহা মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং বিশ্বের মুসলিম জনগণের মধ্যে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছে।

"সম্মেলনে উপস্থিত রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান এবং প্রতিনিধিগণ ঘোষণা করেন যে, ইসরাঈলী সৈন্যের দখলই জেরুসালেমের মুসলিম পবিত্র স্থানগুলির উপর হুমকি সৃষ্টির কারণে পবিত্র স্থানসমূহের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা এবং সেই স্থানে অবৈধ প্রবেশ বন্ধ করিবার জন্য পবিত্র নগরীর ১৯৬৭ খৃ. পূর্ব অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইবে যাহা বিগত ১৩ শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল।

"সুতরাং তাঁহারা ঘোষণা করেন, তাঁহাদের সরকার ও জনগণ জেরুসালেম নগরীর ১৯৬৭ খৃ. পূর্ব অবস্থার বিপরীত যে কোন সমাধান প্রত্যাখ্যান করিতে দৃঢ়সংকল্প।

"তাহারা বিশ্বের সকল সরকার, বিশেষ করিয়া ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জেরুসালেম নগরীর সহিত ইসলামের অনুসারীদের গভীর সম্পর্কের কথা বিবেচনা করিতে এবং এই নগরীর মুক্তির লক্ষ্যে প্রয়াস প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

"১৯৬৭ খৃ. হইতে অধিকৃত আরব এলাকা দখল করিয়া রাখা এবং জেরুসালেমকে কুক্ষিগত করিবার ষড়যন্ত্র হইতে বিরত থাকিবার জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আহ্বানের প্রতি ইসরাঈল কর্ণপাত না করায় তাঁহাদের জনগণ ও সরকার গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

"পরিস্থিতির ভয়াবহতার প্রতি বিবেচনা করায় রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান ও প্রতিনিধিগণ জরুরীভাবে ও আন্তরিকভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সকল সদস্যের প্রতি, বিশেষ করিয়া বিশ্বশান্তি রক্ষার ব্যাপারে অধিকতর দায়িত্বশীল বৃহৎ শক্তিসমূহের প্রতি, সামরিক শক্তিবলে জবর দখলের অবৈধতার নীতি সামনে রাখিয়া অধিকৃত এলাকা হইতে সৈন্য প্রত্যাহারে ইসরাঈলকে বাধ্য করিবার ঐক্যবদ্ধ চেষ্টাকে জোরদার করিতে আহ্বান জানাইতেছেন।

"ফিলিস্তীনের ঘটনায় অত্যন্ত ব্যথিত এই সম্মেলন ফিলিস্তীনী জনগণের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করিতেছে এবং তাহাদের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধার ও তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিতেছে।" এই সম্মেলনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল P. L. O. -এর নেতৃত্বে যে মুক্তি সংগ্রাম চলিতেছে সেই সংগ্রামকে ফিলিস্তীনিদের একমাত্র জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম হিসাবে সর্বসম্মত সমর্থন প্রদান। এই সম্মেলনের আর একটি সুফল ছিল এই যে, এই সম্মেলনেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন সম্পর্কে সলাপরামর্শের জন্য মাঝে মাঝে পররাষ্ট্র পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। এই সম্মেলন শেষে ২৭ সেপ্টম্বর এক যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন লিবিয়া, পাকিস্তান, জর্দান, 'আরব আমীরাত, ইরিত্রিয়া, শাদ, সিরিয়ার মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ, আলফাতাহ এবং মরক্কোর ইসতিকলাল পার্টির প্রতিনিধিগণ। যৌথ ঘোষণায় ফিলিস্তীনীদের মাতৃভূমি উদ্ধারের সংগ্রামকে সমর্থন করা হয়। ইরিত্রিয়ায় মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিও একাত্মতা প্রকাশ করা হয়।

এই ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের একটি দুঃখজনক দিক এই ছিল যে, ইরান এবং তুরস্ক সম্মেলনে যোগদান করা সত্ত্বেও আফ্রিকার অনারব মুসলিম দেশসমূহের মত এই দুইটি দেশও ইসরাঈলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করিতে রাযী হয় নাই। [দৈনিক সংগ্রাম (ম্যাগাজিন) ওআইসি বিশেষ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৩ সাল]।

**দ্বিতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন ঃ** ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে (২২ হইতে ২৪) লাহোরে দ্বিতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৩৪টি মুসলিম দেশ এই শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করে। ইরাক যোগদান করে পর্যবেক্ষক হিসাবে। বাংলাদেশ এই সম্মেলনে ওআইসির সদস্য পদ লাভ করে। প্রথমে বাংলাদেশ সম্মেলনে যোগদান করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। কারণ তখনও পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নাই। বাংলাদেশ সুস্পষ্ট ভাষায় এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, পাকিস্তান বাংলাদেশের বাস্তবতা স্বীকার না করিলে বাংলাদেশ পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করিতে পারে না। বাংলাদেশ ৩ ফেব্রুয়ারী এই ঘোষণা করে। এই ঘোষণার ৪৮ ঘন্টা পর অর্থাৎ ৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার ইসলামী সম্মেলনের সেক্রেটারী জেনারেল আত-তুহামী এক ঝটিকা সফরে কায়রো হইতে ঢাকায় আগমন করেন এবং বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানান। জনাব তুহামী ৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকা ত্যাগ করেন। বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি ঢাকায় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জওয়াবে বলেন, "আমরা এই ব্যাপারে পথ উন্মুক্ত করিয়াছি। আমরা চাই বাংলাদেশ এই সম্মেলনে যোগদান করুক। এই যুগসন্ধিক্ষণে বাংলাদেশকেও সকল বাধা অতিক্রম করিয়া অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সহিত হাতে হাত মিলাইয়া কাজ করিবার সময় আসিয়াছে।" জনাব তুহামীর এই আমন্ত্রণ এবং সম্মেলনে বাংলাদেশের যোগদানের আশাবাদ পাকিস্তানের স্বীকৃতি ব্যতিরেকে ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই। যখন স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, বাংলাদেশ যাহা বলিয়াছে তাহা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সম্মেলনে যোগদান করিবে না, তখন ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের পক্ষ হইতে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি শুভেচ্ছা মিশন ২২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রাত্রে লাহোর হইতে ঢাকা আগমন করেন। এই মিশনের নেতা ছিলেন কুয়েতের (তৎকালীন) পররাষ্ট্র মন্ত্রী শায়খ সাবাহ আল-আহমাদ আল-জাবির। সদস্যরা ছিলেন লেবাননের পররাষ্ট্র মন্ত্রী, সোমালিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী, আলজিরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা, সেনেগাল ও পি.এল. ও.-এর দুইজন প্রতিনিধি এবং ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব হাসান আত-তুহামী। রাত্র ১২-১৫ মিনিটে গণভবনে বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁহাদের আলোচনা শুরু হয়। এই মিশনের নেতা ও সদস্যরা একটানা ১৫০ মিনিট এই সমস্যা লইয়া আলাপ-আলোচনা করেন। পর শুক্রবার অতি প্রত্যুষে ৩-১৫ মিনিটে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন এবং শুভেচ্ছা মিশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। এই বৈঠক সকাল ৬-১৫ পর্যন্ত চলে। এই বৈঠক শেষ হওয়ার সংগে সংগে এই গ্রুপের ৪ জন সদস্য লাহোরে চলিয়া যান। দল নেতাসহ তিনজন ঢাকায় রহিয়া গেলেন। জনাব তুহামীসহ চারজন সদস্য লাহোর অবতরণের পর বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে মিশনের তের ঘন্টাব্যাপী বৈঠকে এক সরকারী সিদ্ধান্তের কথা পেশ করা হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রাদেশিক গভর্নরগণ, পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং লাহোর পিপলস পার্টির নেতৃবৃন্দের এক সমাবেশে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করেন। পাকিস্তানের স্বীকৃতির পরই ইরাক এবং তুরস্ক স্বীকৃতি ঘোষণা করে। পাকিস্তানের স্বীকৃতি ঘোষণার সংগে সংগে বাংলাদেশ সরকার দ্বিতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। শনিবার সকালে প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২২ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাওয়ারী বুমিদীনের (হাওয়ারী আবূ মুহয়ি'দ-দীন) প্রেরিত বিমানে লাহোরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানকারী দেশসমূহ ছাড়াও উগাণ্ডা, আপার ভোল্টা, গ্যাবন, ক্যামেরুন, গাম্বিয়া ও গিনি বিসাউ যোগদান করে। এই সম্মেলনের ঘোষণায় ছিল দশ দফা। সব কয়টি দফাই ছিল ফিলিস্তীন ও আল-কুদ্স সম্পর্কিত। মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কেও সম্মেলনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ছিল। স্বল্পোন্নত মুসলিম দেশগুলির রোগ, দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতা দূর করিবার চিন্তা-ভাবনা ও পথ-পদ্ধতি বাহির করিবার জন্য আলজিরিয়া, মিসর, কুয়েত, লিবিয়া, পাকিস্তান, সাউদী 'আরব, সেনেগাল ও 'আরব আমীরাতকে লইয়া একটি কমিটিও গঠন করা হয়। পরবর্তী কালের ইসলামী সলিডারিটি ফাণ্ড ও ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ড এই চিন্তারই ফল।

**লাহোর ঘোষণা ঃ** লাহোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে পি. এল. ও.সহ ওআইসির ৩৪টি সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান ও প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। পর্যবেক্ষক হিসাবে যোগদান করেন 'আরব লীগ, রাবিতা 'আলাম আল-ইসলামী, মু'তামার 'আলাম আল-ইসলামী এবং আন্টিওকের পেত্রার্ক।

**লাহোর ঘোষণার পূর্ণ বিবরণ ঃ** ইসলামী দেশ ও সংস্থাসমূহের বাদশাহ, রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান ও প্রতিনিধিগণ এই ঘোষণা করিতেছেনঃ

(১) আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মুসলিম জনগণ তাহাদের সাধারণ বিশ্বাসের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ এবং ইসলামী জনতার সংহতি, প্রকৃত মানুষের মর্যাদা, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য প্রতিষ্ঠা, বিভেদ ও বঞ্চনা হইতে মুক্তি এবং জুলুম ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিবাচক ও চিরন্তন নীতির উপর ভিত্তিশীল।

(২) এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি এবং পৃথিবীর জাতিসমূহের সমৃদ্ধি অর্জনের সংগ্রামের সহিত আমরা একাত্মতা ঘোষণা করিতেছি।

(৩) স্বাধীনতা ও সামাজিক সুবিচারের ভিত্তিতে বিশ্বশান্তি নিশ্চিতকরণে তাঁহাদের প্রচেষ্টা, ইসলামের নীতি অনুসারে অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের সহযোগিতা ও সমঝোতার মধ্য দিয়া সফল করিয়া তোলা তাঁহাদের একান্ত কামনা।

(৪) মুসলিম দেশগুলির মধ্যকার সংহতি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ, অন্যের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, একে অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব লইয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের মধ্যকার বিরোধ মিটানো এবং যেখানে যতটা সম্ভব, মুসলিম দেশগুলির বিরোধে শুভেচ্ছা ও মধ্যস্থতাকারী শক্তির ব্যবহারই তাঁহাদের কাম্য।

(৫) অক্টোবর যুদ্ধে ইসরাঈল সীমান্তবর্তী 'আরব দেশসমূহের তথা ফিলিস্তীনীদের প্রতিরোধ আন্দোলন তথা 'আরব প্রচেষ্টার বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং সেই সন্ধিক্ষণে মুসলিম সংহতির প্রতি তাঁহাদের দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি জানাইতেছে।

(৬) মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে এবং অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সহিত ঘনিষ্ঠ ও ভ্রাতৃসুলভ সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে ইসলামিক কনফারেন্সের নিষ্ঠাপূর্ণ কাজের প্রতি স্বীকৃতি।

মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া তাঁহারা ঘোষণা করিতেছেন ঃ (ক) 'আরব স্বার্থ, যাহা আগ্রাসনের বিরোধী এবং যাহা চায় না যে, শক্তির অন্যায় ব্যবহারে ভূখণ্ড বা অন্য লাভ দ্বারা পুরস্কৃত হউক তাহা সব দেশেরই সাধারণ স্বার্থ।

(খ) 'আরব দেশকে তাঁহাদের হৃত ভূমি উদ্ধারের জন্য সর্ব উপায়ে পূর্ণ ও ফলপ্রসূ সাহায্য করা উচিত।

(গ) ফিলিস্তীনী জনগণের স্বার্থ প্রকৃতপক্ষে তাহাদেরই স্বার্থ যাহারা মনে করে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার তাহাদের নিজেদেরই।

(ঘ) ফিলিস্তীনী জনগণকে তাহাদের পূর্ণ জাতীয় অধিকার ফিরাইয়া দেওয়াই মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধান এবং সুবিচার ভিত্তিক স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল শর্ত।

(ঙ) আন্তর্জাতিক সমাজ, বিশেষ করিয়া যাহারা ১৯৪৭ খৃ. ফিলিস্তীনী বিভাগের প্রশ্নে অভিভাবকত্ব করিয়াছিল, ফিলিস্তীনী জনগণের উপর চাপাইয়া দেওয়া এই অবিচার দূর করার দায়িত্ব তাহাদেরই।

(চ) দীন ইসলামের একটি পবিত্র প্রতীক 'আল-কুদ্স'। গত ১৩০০ বৎসর ধরিয়া মুসলমানগণ পবিত্রতাসহ এই নগরীর সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছে। তাহারাই একমাত্র এই পবিত্র স্থান সংরক্ষণের অধিকারী। কারণ একমাত্র তাহারাই জেরুসালেমের ইতিহাসের সহিত সংযুক্ত তিনটি আসমানী ধর্মের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে। জেরুসালেমে য়াহূদী অধিকার সংরক্ষণের কোন চুক্তিই এবং এই নগরীকে অনারব কাহাকেও নিয়ন্ত্রণে দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই ইসলামী দেশসমূহের কাছে গ্রহণযোগ্য হইবে না। মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য ও অপরিবর্তনীয় পূর্ব-শর্ত হইল জেরুসালেম হইতে ইসরাঈলী সৈন্য প্রত্যাহার।

(৭) 'আরব দুনিয়া এবং গোটা বিশ্বের-যেমন লেবানন, মিসর, জর্দান এবং সিরিয়ার খৃস্টান গির্জা কর্তৃক আন্তর্জাতিক জনমতের কাছে এবং বিশ্বের ধর্মীয় সম্মেলনগুলিতে ফিলিস্তীন প্রশ্ন লইয়া আলোচনা এবং জেরুসালেম ও ফিলিস্তীনের অন্যান্য পবিত্র স্থানের উপর আরব সার্বভৌমত্বের প্রতি সমর্থন প্রশংসার যোগ্য।

(৮) অধিকৃত 'আরব এলাকা, বিশেষ করিয়া পবিত্র নগরী জেরুসালেমের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিনাশের চেষ্টা আন্তর্জাতিক বিধির সুস্পষ্ট লংঘন এবং ইসলামী সম্মেলনের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ও সাধারণভাবে ইসলামী বিশ্বের আবেগ-অনুভূতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

(৯) 'আরবদের সমর্থনে আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশের সম্মানজনক ও দৃঢ় ভূমিকা খুবই প্রশংসাযোগ্য।

(১০) সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠার ধারাকে মূল প্রশ্নের গভীরে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে এবং যুদ্ধ বিরতিকে অন্য কিছু নয়, অধিকৃত এলাকা হইতে ইসরাঈলী সৈন্যের প্রত্যাহার এবং ফিলিস্তীনী জনগণের জাতীয় অধিকার প্রত্যর্পণের পদক্ষেপ হিসাবে ধরিতে হইবে।

বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত লক্ষ্যসমূহ গ্রহণ করা হয় ঃ (১) ইসলামী দেশসমূহ হইতে দারিদ্র্য, রোগ ও অজ্ঞানতা দূর করা।

(২) শিল্পোন্নত দেশসমূহ কর্তৃক অনুন্নত দেশের উপর শোষণ চালাইবার প্রক্রিয়া বন্ধ করা।

(৩) কাঁচা মালের রফতানী এবং শিল্প পণ্য ও কলাকৌশল আমদানীর ক্ষেত্রে সুষম বাণিজ্য বিনিময় নীতির প্রবর্তন করা।

(৪) উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তাহাদের সার্বভৌম অধিকার নিশ্চিতকরণ।

(৫) উন্নয়নশীল দেশসমূহ হইতে বর্তমান মূল্য বৃদ্ধিজনিত অবাঞ্ছিত সুবিধা দূর করা।

(৬) মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সংহতি বৃদ্ধি করা।

উপরিউক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আলজিরিয়া, মিসর, কুয়েত, লিবিয়া, পাকিস্তান, সা'উদী 'আরব, সেনেগাল ও 'আরব আমীরাতকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি আলোচনা-পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করিবে এবং তাহা পরবর্তী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে পেশ করিবে। শীর্ষ সম্মেলন শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যেই সেক্রেটারী জেনারেলের আমন্ত্রণে এই কমিটির অধিবেশন জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

সম্মেলনে উপস্থিত বাদশাহ, রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রতিনিধিগণ জেরুসালেম, মধ্যপ্রাচ্য, ফিলিস্তীন, ইসলামী সলিডারিটি ফাণ্ড, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাব পাস করেন এবং ঐগুলিকে এই ঘোষণার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করেন।

এইগুলি ছাড়াও অন্যান্য সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে কাজ করিয়া যাইবার জন্য তাহাদের নিজ নিজ প্রতিনিধিদের নির্দেশ দানের প্রস্তাবও গৃহীত হয় (ওআইসি বিশেষ সংখ্যা, দৈনিক সংগ্রাম, ডিসেম্বর ১৯৮৬)।

**তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন** ঃ তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮১ সালের ২৫ জানুয়ারী হইতে ২৮ জানুয়ারী পর্যন্ত পবিত্র মক্কা মুকার্‌রামা এবং তাইফে। এই শীর্ষ সম্মেলনে ৩৮টি মুসলিম দেশ যোগদান করে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্যের উপস্থিতি ও ইসরাঈলের সংগে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরের কারণে ১৯৭৮ সালের ৮ ডিসেম্বর মিসরকে এবং ১৯৮০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী আফগানিস্তানকে সম্মেলন হইতে বহিষ্কার করা হয়। ইরাক ও লিবিয়া যোগদান করে নাই। তখনকার ৪২টি মুসলিম দেশের মধ্যে বাকি ৩৮টি দেশ যোগদান করে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা ছাড়াও জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ওয়াল্ড হেইম এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের আল্লাহ্‌র ঘর কা'বাকে সামনে রাখিয়া শপথ গ্রহণের সুবিধার জন্য এবং আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত লাভের ব্যবস্থা হিসাবেই আল্লাহ্‌র ঘরে সম্মেলনের স্থান নির্ধারণ করা হইয়াছিল। কা'বার দিকে মুখ করিয়া আসন পাতিয়া উপবিষ্ট রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। রাষ্ট্র প্রধানদের সারিতে উপবিষ্ট কা'বামুখী বাদশাহ খালিদ তাঁহার আবেগ জড়ানো কণ্ঠের ভাষণে ইসলামী বিশ্বের শান্তি, সংহতি ও বিজয়ের প্রার্থনা আল্লাহ্‌র কাছে জানাইয়াছিলেন। ভাষণের পর কা'বার ইমামের নেতৃত্বে রাষ্ট্রপ্রধানগণ সালাত আদায় করেন। অতঃপর রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রতিনিধিগণ সম্মিলিতভাবে কা'বাঘর তাওয়াফ করেন, হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করেন। শীর্ষ সম্মেলনের বিদায়ী বৈঠকে সম্মেলনের কাজ সমাপ্ত করিয়া রাষ্ট্রপ্রধানগণ পরস্পর বিদায় গ্রহণের পূর্ব মুহূর্তে সকলে একসংগে দাঁড়াইয়া সম্মিলিত কণ্ঠে সূরা ফাতিহা পাঠ করিয়া আল্লাহ্‌র নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব মানিয়া নেন এবং সিরাতু'ল-মুসতাকীমে চলিবার অঙ্গীকার করেন। সেই সম্মেলনের ঘোষণা বিখ্যাত মক্কা ঘোষণা নামে পরিচিত।

**মক্কা ঘোষণা ঃ** আমরা অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্সের সদস্য, রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানগণ ১৪০১ হিজরীর ১৯ হইতে ২২ রাবী'উ'ল- আওওয়াল/১৯৮১ সালের ২৫ হইতে ২৮ জানুয়ারী পবিত্র মক্কা মুকার্‌রামায় তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হইয়াছি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রাব্বু'ল-'আলামীনের কাছে আমাদের লাখো সিজদা নিবেদন করি। তিনি তাঁহার অপার রহমতে আমাদেরকে বিশ্ব মুসলিমের পবিত্র কা'বার সান্নিধ্যে এই পবিত্র নগরীতে নূতন এক হিজরী শতাব্দীর (১৫শ হি. শতক) সুবহে সাদিকে সমবেত হওয়ার সুযোগ দিয়াছেন। আমরা এই সুযাগকে মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং সার্বিক ইসলামী পুনর্জাগরণের এক শুভারম্ভ বলিয়া মনে করিতেছি। মানব সভ্যতা এবং বিশ্ব সমাজে পুনরায় সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী আসন লাভ, মুসলিম বিশ্বের ঐক্য, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং ইসলামের সংহতি ও শিক্ষার দৃষ্টিকোণ হইতে অতীতের স্মৃতিচারণ, বর্তমানের মূল্যায়ন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত রচনার জন্য আস্থার সহিত সামনে আগাইয়া যাইবার ক্ষেত্রে ইহা এক অমূল্য সুযোগ।

পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসাবে ইসলাম, ইসলামী আদর্শ ও ইসলামের মূল্যবোধের প্রতি অনড় ও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণই বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের নিরাপত্তার সর্বাপেক্ষা বড় গ্যারান্টি। ইসলামের পথই একমাত্র পথ, যে পথ শক্তি, সম্মান, সমৃদ্ধি ও সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে আমাদেরকে পরিচালিত করিবে। ইসলামই শুধু মুসলিম উম্মাহকে বস্তুবাদের যন্ত্রণাদায়ক সয়লাব হইতে রক্ষা করিয়া মুসলিম উম্মাহ্‌র স্বকীয়তাকে সমুন্নত এবং ইহার নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে পারে। ইসলামই মুসলিম জনতা ও তাহাদের নেতৃবৃন্দের এক অতুল শক্তির সঞ্জীবনী সুধা। শুধু ইহার দ্বারাই তাহারা পারে পবিত্র স্থানগুলি মুক্তকরণসহ এই বিশ্বে তাহাদের হারানো আসন পুনরুদ্ধার করিতে এবং অন্যান্য জাতির পাশে যোগ্য আসনে দাঁড়াইয়া বিশ্ব মানব জীবনে সাম্য, শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখিতে।

স্বাধীনতা, সুবিচার, মানবীয় মর্যাদা, ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা, বিবেকবোধ এবং অবিচার ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের চিরন্তন নীতির প্রতি মুসলমানদের ঈমান, মানব জীবনে শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান এবং মানবিক নীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপর ভিত্তিশীল এক আন্তঃজাতি সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনুসৃত তাহাদের প্রয়াসকে নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত করে। এইভাবে মুসলমানদের এই প্রয়াস নূতন এক যুগের উত্থান ঘটায়। বিশ্বের জাতিসমূহ এইখানে শক্তি নয়, যুক্তি ও নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়, এইখানে বিশ্ব হইতে সকল প্রকার নির্যাতন, বঞ্চনা, আধিপত্য, অবিচার, ঔপনিবেশিকতা এবং নব্য ঔপনিবেশিকতা— এক কথায় বংশ, বর্ণ, জাতিভিত্তিক সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান যেন ঘটে।

আমরা ঘোষণা করিতেছি, আমাদের আদর্শের দৃঢ় অনুসরণের মাধ্যমেই শুধু আমরা আমাদের শক্তি কাঠামোকে ধরিয়া রাখিতে পারি এবং যে অনৈক্য ও অধঃগতির ফলে অনেক মুসলিম এলাকা বিশেষভাবে কি'বলায়ে আওওয়াল আল-কুদ্‌স বিদেশী আধিপত্যের খপ্পরে নিপতিত হইয়াছে, সেই খপ্পর হইতে মুক্ত করিতে পারি। ইতিহাস সাক্ষী, যখনই মুসলমানগণ কোন অবিচার ও আগ্রাসনের শিকার হইয়াছে তখনই তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিক কৃতিত্ব লোপ পাইয়াছে এবং তাহাদের বৈষয়িক সহায়-সম্পদের বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। উল্লেখ না করিলেও চলে যে, আজ নূতন শতাব্দীর সুপ্রভাতও অবলোকন করিতেছে যে, মুসলিম বিশ্ব তাহার স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, মান-মর্যাদা লইয়া সংঘাতের সম্মুখীন। আমরা দুঃখের সহিত বলিতেছি, সকল প্রকার বৈষয়িক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবিষ্কার-অবদান সত্ত্বেও মানবতা আজ আত্মিক দারিদ্র্যে ভুগিতেছে, নিদারুণভাবে নৈতিক অধঃগতির শিকার হইতেছে এবং সমাজ সমানভাবেই আজ অসাম্যপীড়িত। অনুরূপভাবে আমাদের অর্থনীতি ভয়ানক সংকটে ভুগিতেছে এবং রাজনীতিও নিরন্তর অস্থিতিশীলতার বিপদ দ্বারা তাড়িত। বিপুল বেগে বিচরণশীল অমঙ্গলের শক্তি যুদ্ধের তপ্ত আবহাওয়াকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে, বিভেদের বীজ বপন করিতেছে, মানুষের শান্তি ও বিশ্বশান্তির প্রতি চোখ রাঙ্গানী দিতেছে এবং মানব সভ্যতাকে বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

আমরা মনে করি, মুসলিম উম্মাহ্-র অন্তর্নিহিত গুণ এই ঃ উম্মাহ্ ঐক্য ও সংহতির দিশারী হইবে, অগ্রগতি ও অগ্রযাত্রার পথ নির্দেশ করিবে এবং শক্তি ও সমৃদ্ধির নিয়ামক হইয়া দাঁড়াইবে। আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহর অধিকারী এই জাতি; মানুষকে মঙ্গল ও মুক্তির পথে পরিচালিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান তাহাদের কাছে রহিয়াছে। ইহাই আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের শক্তি আমাদের পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গায় সহায়তা ও সাহায্য করে এবং আমাদের অন্তর্নিহিত সকল শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করিবার লক্ষ্যে আধ্যাত্মিক শক্তিকে সংগঠিত করে। মূলত আমাদের সত্য পথকামী জীবনের আসল নোঙ্গর ইহাই।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিভিন্ন বংশ-গোত্র লইয়া গঠিত ভূমণ্ডলের বিশাল এলাকা জুড়িয়া পরিব্যপ্ত অতুল সম্পদ সামর্থ্যের অধিকারী ১৫০ কোটিরও অধিক মানুষের এই জাতি যদি নিজেদের আধ্যাত্মিক শক্তিতে সজ্জিত হইয়া স্বত্ব ও জনসম্পদকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগায় তাহা হইলে বিশ্বে তাহারা একটি বিশিষ্ট আসন লাভ করিতে পারে এবং বিশ্বমানবতাকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন উপহার দিবার জন্য তাহাদের নিজেদের সমৃদ্ধি অর্জনের পথকে নিশ্চিত করিয়া তুলিতে পারে।

ইসলামের ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে পবিত্র মক্কা নগরীর মহৎ এই সম্মেলনে সমবেত হইয়া অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত আমরা আমাদের সংহতি জোরদার এবং আমাদের পুনর্জাগরণের পদ্ধতিকে গতিশীল করিবার সংকল্প ঘোষণা করিতেছি। এই সংকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে নিম্নলিখিত ঘোষণা করিতেছি ঃ

ভাষা, বর্ণ, দেশ এবং এই ধরনের সকল পার্থক্য সত্ত্বেও বিশ্বের সকল মুসলমান একটি অখণ্ড জাতির অন্তর্ভুক্ত। একই বিশ্বাসের বন্ধনে আমরা আবদ্ধ। একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে তাহারা সঞ্জীবিত হইয়া একই দিকে ধাবিত হইতেছে এবং একটিমাত্র লক্ষ্যই তাহাদের সামনে। সকল প্রকারের ভিন্ন শক্তি-জোট ও মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এবং অনৈক্যের ষড়যন্ত্র ও স্বার্থ-দ্বন্দ্বের কাজে আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করিয়া মুসলমানগণ এক মহান জাতি হিসাবে বিশ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

সুতরাং আমাদের সংহতি জোরদার করা, বিভেদ-বিরোধের অবসান ঘটানো এবং ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং আমাদের জন্য চিরন্তন সুবিচারের মাপকাঠি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল নীতি ও বিধানের মাধ্যমে আমাদের মধ্যকার যাবতীয় বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবার লক্ষ্যে সামনে অগ্রসর হইবার জন্য আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আমাদের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য আমরা আমাদের পারস্পরিক আলোচনা জোরদার করিব এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ স্বার্থ সমুন্নত রাখিবার জন্য আমাদের যাবতীয় মান-মর্যাদার বৃদ্ধি ঘটাইব। একইভাবে আমাদের হারানো ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার, স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা সংরক্ষণে একে অপরকে সমর্থন করা, আমাদের অধিকারকে তুলিয়া ধরা ও আমাদের জাতির উপর আপতিত অবিচারসমূহের অবসান ঘটাইবার জন্য নিজেদের শক্তি ও সংহতির উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের সব উপায়-উপকরণকে কাজে লাগাইয়া জিহাদে অবতীর্ণ হইতে আমরা আমাদের দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করিতেছি।

আমরা জানি যে, মুসলমানগণ আজ অসংখ্য অবিচারের শিকার এবং আন্তর্জাতিক চরিত্রে শক্তিমত্তার অবাধ প্রদর্শনী, আগ্রাসন ও সন্ত্রাসের রাজনীতি তাহাদের জন্য আজ অনেক বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে।

আমরা আরও জানি যে, ইসলাম তাহার অনুসারী ও অন্যদের জন্য সুবিচার ও সাম্যের আদর্শ তুলিয়া ধরে। যাহারা আমাদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে আসে না, আমাদেরকে ঘর-বাড়ি ছাড়া হইতে বাধ্য করে না এবং অত্যাচার-অন্যায়ের সহিত আপোসহীন আমাদের পবিত্র মূল্যবোধকে যাহারা আহত করে না, তাহাদের জন্য সৌহার্দ্য ও সহনশীলতার বাণীও ইসলাম বহন করে।

আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত য়াহূদী কর্তৃক ফিলিস্তীন ও অন্যান্য 'আরব এলাকা কুক্ষিগত করিয়া লইবার মুকাবিলা এবং সেই সঙ্গে সকল প্রকার য়াহূদী ষড়যন্ত্র ও তৎপরতাকে নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার অনড় শপথ ঘোষণা করিতেছি। ইহাদের এই ঘৃণ্য আগ্রাসনকে যাহারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও জনশক্তি সরবরাহ করিয়া সমর্থন দিয়া যাইতেছে তাহাদের এই নীতির আমরা তীব্র নিন্দা করি এবং ইহা প্রত্যাখ্যান করি। একই সঙ্গে আমরা ফিলিস্তীন সংক্রান্ত যে সকল উদ্যোগে ফিলিস্তীনীদের স্বীয় মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনসহ তাহাদের অপরিবর্তনীয় জাতীয় অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি নাই এবং ফিলিস্তীনী জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি ফিলিস্তীন মুক্তি সংস্থার নেতৃত্বে স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারসহ তাহাদের পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবির প্রতিফলন নাই সেই ধরনের সকল উদ্যোগ প্রত্যাখ্যান করিতেছি। আমাদেরকে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে অন্যায় অসমীচীন সমাধানের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য করিবার জন্য চাপ প্রয়োগের সকল চেষ্টাও আমরা প্রত্যাখ্যান করি। আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ প্রস্তাব কর্তৃক স্বীকৃত ফিলিস্তীনী জনগণের ন্যায্য অধিকার পুনরুদ্ধার এবং পবিত্র স্থানসমূহসহ ফিলিস্তীন ও 'আরব ভূখণ্ড মুক্ত করিবার জিহাদে সর্বশক্তি দিয়া অংশগ্রহণ করিতে এবং আগ্রাসন ও চাপের মুকাবিলা করিতে আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

'আল-কুদ্স লইয়া কৃত জঘন্য অপরাধ, ফিলিস্তীনী জনগণের জাতীয় ও ধর্মীয় অধিকার নস্যাৎ করিবার জন্য পরিচালিত সুপরিকল্পিত হামলা ও আল-কুদ্স শরীফকে চিরতরে কুক্ষিগত করিয়া লইবার জঘন্য চেষ্টা অব্যাহত থাকায় ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার এবং এই সকল কাজের সমর্থকদের নিন্দা করিবার কোন বিকল্প আমাদের নাই।

সুতরাং আমরা আল-কুদ্স-এর মুক্তি এবং হারানো ভূখণ্ডসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদের যাহা আছে সব কিছু দিয়া জিহাদে শরীক হইবার শপথ গ্রহণ করিতেছি। আল-কুদ্সসহ সকল হারানো এলাকা ও অধিকার, এই সবের ন্যায্য দাবিদার ফিলিস্তীনী ও 'আরব জনগণের হাতে ফিরাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত এই জিহাদকে আমরা বর্তমান কালের সর্বাপেক্ষা বড় ইসলামী দায়িত্ব বলিয়া মনে করিব।

**আফগানিস্তান ঃ** নগ্ন আগ্রাসনের শিকার স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তানকে এবং স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও ইসলামী পরিচয় হইতে বঞ্চিত হওয়ার মুখোমুখী আফগান জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে আমরা দৃঢ় সমর্থন দিয়া যাইব। বিদেশী সৈন্যের হস্তক্ষেপ আজ আফগানিস্তানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছি। বাহিরের সকল হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত বীর আফগান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রতিষ্ঠা, আফগানিস্তানের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনসহ উহার জোট নিরপেক্ষ চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখা এবং আফগানিস্তান হইতে অবিলম্বে ও সম্পূর্ণভাবে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের ভিত্তিতে আফগান সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছার প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করিতেছি। আমরা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জিহাদে লিপ্ত আফগান জনগণের সহিত আমাদের পরিপূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করিতেছি।

**পরাশক্তির দ্বন্দ্ব ঃ** পরাশক্তিগুলির ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব, স্ব স্ব প্রভাব-বলয় বিস্তারে তাহাদের প্রতিযোগিতা এবং ইসলামী রাষ্ট্র অধ্যুষিত ভারত মহাসাগর, 'আরব সাগর, লোহিত সাগর এবং উপসাগরীয় এলাকায় তাহাদের সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছি। আমরা আমাদের এই সাধারণ বিশ্বাসের কথা পুনর্ব্যক্ত করিতেছি যে, উপসাগরীয় এলাকার শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং ইহার সমুদ্র পথগুলির নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলির নিজেদের এবং যে কোন ধরনের বাহিরের হস্তক্ষেপই এখানে অবাঞ্ছিত।

**মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রশ্ন ঃ** পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিম সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন এবং মানব মর্যাদার স্পষ্টই পরিপন্থী। পৃথিবীর যে সকল দেশে মুসলিম সংখ্যালঘু রহিয়াছে তাহাদের প্রতি আমাদের আবেদন, পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত মুসলমানগণকে তাহাদের ধর্মকর্ম পালনের সুযোগ দিবেন এবং নাগরিক হিসাবে তাহাদেরকে আইনানুগ সমান অধিকার দান করুন।

**নূতন বিশ্ব গড়ার ডাক ঃ** গোঁড়ামি এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব, শক্তির দাপট ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার তাড়না, লোভ ও অবিচারের পীড়ন এবং দুর্বল জাতিগুলির উপর উদ্যত ঔপনিবেশিকতা ও বঞ্চনার থাবা বিস্তার আমাদের সভ্যতা এবং আমাদের সামাজিক ও বৈষয়িক ভারসাম্য বিনষ্ট করিতেছে। এই অবস্থায় আজ সময়ের দাবি হইল, বিশ্বের মঙ্গল ও শান্তি, ভ্রাতৃত্ব, মানবতা ও সুবিচারের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় আগাইয়া আসা। এই বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটকে সামনে রাখিয়া আন্তরিক ও সম্মিলিত চেষ্টার মাধ্যমে সংঘাত ও যুদ্ধের আশংকা বিমুক্ত শান্তিসিক্ত এক নূতন বিশ্ব গড়ার দিকে আমরা পৃথিবীর সকল দেশ এবং সকল মানুষের প্রতি আহবান জানাইতেছি। সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্যও আমরা সকলের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা উদাত্ত আহবান করিতেছি, মানুষের যোগ্যতা ও সামর্থ্যকে অস্ত্র সংগ্রহ প্রতিযোগিতা এবং ধ্বংস ও মৃত্যুর অস্ত্র সন্ধানে বিনষ্ট হইতে না দিয়া ইহাকে মানবতার সেবায় সমন্বিত করিবার উপযোগী পারস্পরিক সম্পর্ক নির্মাণে আগাইয়া আসুন। যদি আমরা ইহা পারি, জগতে সুবিচার সব কিছুর উপর স্থান পাইবে

এবং আমাদের মানবীয় সম্পর্কসমূহ অবিচার ও বৈষম্যমূলক মানসিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মঙ্গলকামিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। একমাত্র তখনই বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের সত্যিকার মুক্তি আসিবে, উজ্জ্বল সুবহে সাদিকের আগমনে যুদ্ধবাজদের কাল হাতগুলি অন্ধকারে লুকাইবে, মানবতা সত্যিকার শান্তির পরশ পাইয়া ধন্য হইবে এবং মৌল মানবাধিকারগুলি পুনরায় বিজয়ীর বেশে মাথা তুলিবে।

**আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির প্রশ্ন ঃ** আমরা সহযোগিতার সুন্দর কাঠামো, আলোচনা ও সমঝোতার গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফরম, বিরোধ নিষ্পত্তি ও সংকট নিরসনের মাধ্যম হিসাবে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তঃসরকার প্রতিষ্ঠানকে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন জানাই এবং অন্যান্যকেও আমরা এইভাবে সমর্থন জানাইতে আহবান করিতেছি। জাতিসংঘে কতিপয় ক্রীড়নক চরিত্র চাপাইয়া দেওয়া কিংবা ইহার কোন কাজে বাধা সৃষ্টি করাকে আমরা দৃঢ়তার সহিত নিন্দা জ্ঞাপন করি। নিন্দা জ্ঞাপন করি ইসরাঈল এবং ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের যাহারা সুপরিকল্পিতভাবে জাতিসংঘ সনদ লংঘন করিতেছে। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, আরব লীগ এবং অর্গানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটির লক্ষ্য ও নীতির প্রতি পুনরায় আমরা আমাদের আস্থা ও আনুগত্য জ্ঞাপন করিতেছি এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সহিত আমাদের পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করিতেছি।

**জাতীয় নিরাপত্তা ও জনগণের অধিকার ঃ** আমাদের জনগণ তাহাদের বিশ্বাসের প্রতি অনুগত এবং সুবিচার ও নৈতিকতার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। সমাজ গঠনের ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতি তাহাদের আনুগত্যের কথা অনুধাবনের পর আমরা আমাদের জীবন ও সমাজ গঠনে এবং বিশ্বের মানুষ ও দেশসমূহের সহিত আমাদের সম্পর্ক উন্নয়নে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত হইবার জন্য আমাদের দৃঢ় সংকল্পের নিশ্চয়তা দান করিতেছি। আমরা এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ যে, সত্য ও মহত্ত্বের বিজয় এবং সুবিচার ও শান্তির ইহাই সর্বোত্তম গ্যারান্টি। আর ইহাই ইসলামী উম্মাহ্-র সম্মান, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার নিশ্চিততম পথ।

আমরা আমাদের এই আকাঙ্ক্ষার ঘোষণা দিতেছি যে, জাতীয় জীবনে সুকৃতির প্রসার এবং মন্দের বিলুপ্তির লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা মুসলমানদের মধ্যে শূরায়ী (পরামর্শ) পদ্ধতির সার্থক অনুশীলনের প্রতিষ্ঠা করিব এবং জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে এই নীতির প্রকাশ স্বাভাবিক করিয়া তুলিব। ইহার ফলে সম্মিলিত ধারণার মধ্যে সংহতি দৃঢ়মূল হইয়া উঠিবে এবং জনগণ অনৈক্য ও বিভেদ হইতে মুক্ত হইয়া তাহাদের নিজেদের কাজ পরিচালনায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে। অব্যাহত আলাপ-আলোচনা এবং মত বিনিময়ের সুযোগ দানের জন্য মুসলিম জনগণ এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের সংযোগ সম্পর্ক উন্নয়নের যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করিব। আমরা হিদায়াতের দিশারী আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের আদর্শ দ্বারা পরিচালিত মানবাধিকার এবং মানব মর্যাদা সংরক্ষণ করায় আমাদের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করিতেছি। এইভাবে আমরা মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা এবং অপরিহার্য প্রয়োজনসমূহ পরিপূরণে আমাদের দৃঢ় ইচ্ছা ঘোষণা করিতেছি। ফিলিস্তীন কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকা যেখানেই সুবিচার ও মানবীয় মর্যাদার লংঘন ঘটিয়া থাকুক, তাহা সমুন্নত করিয়া তুলিয়া ধরিবার জন্য মুক্তি, স্বাধীনতা ও সুবিচার কামনায় সংগ্রামরত জনগণের বিজয়ের জন্য, অন্যায়ের অবসান ঘটাইবার জন্য এবং অধিকার ও পবিত্র মূল্যবোধ সংরক্ষণের পথ রচনায় আমরা সচেষ্ট থাকিব।

**অর্থনৈতিক সহায়তার প্রশ্নে ঃ** আমাদের সম্মিলিত স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়া, আমাদের সকল সম্পদ সমন্বিত করিয়া এবং পরিপূরক প্রয়াসের দ্বারা আমাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে সংহত করিবার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে যাহারা দারিদ্র্য কবলিত তাহাদের দারিদ্র্য বিমোচন করা ও তাহাদের সমন্বিত উন্নয়নে উদ্যোগী হইবার জন্য আমরা আমাদের দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করিতেছি। ইসলামী সংহতিবোধের দাবি অনুসারে আমরা আমাদের মধ্যকার স্বল্প উন্নতদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলাম। আমরা আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি, আমাদের শিক্ষাকে ভারসাম্যপূর্ণ করার জন্য অধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক দিকের প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপ করিব।

পারস্পরিক সহযোগিতা, নির্ভরশীলতা ও সুবিচারের উপর ভিত্তিশীল অর্থনৈতিক সম্পর্ক নির্মাণের চেষ্টা-সাধনার জন্য আমরা সকলকে আহবান জানাইতেছি যাহাতে শিল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যকার বিরাট বৈষম্যের আমরা অবসান ঘটাইতে পারি এবং যাহাতে বিকাশ ঘটাইতে পারি নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার, যাহা সাম্য ও সংহতির উপর ভিত্তিশীল হইবে এবং যাহা দুর্ভিক্ষ তথা পশ্চাদপদতা ও ঔপনিবেশিক শোষণক্লিষ্ট মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও বঞ্চনার চিরতরে অবসান ঘটাইবে এবং ঐ সকল পশ্চাদপদ দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার জন্য আমরা আমাদের সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশলকে লাগসই প্রযুক্তিনির্ভর ও ভারসাম্যপূর্ণ করিয়া তুলিব। প্রতিটি দেশই নিজের প্রাকৃতিক সম্পদের সার্বভৌম অধিকারী এবং ইহার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার সেই দেশ রাখে— এই নীতির প্রতি আমরা জানাই আমাদের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন।

**শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ** জ্ঞানের অনুসন্ধান প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত কর্তব্য। ইসলামের এই নীতির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমরা ঘোষণা করিতেছি, অজ্ঞানতা ও নিরক্ষরতার মূলোচ্ছেদ না ঘটা পর্যন্ত আমরা শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের জন্য পরস্পরের সহযোগী হইব এবং শিক্ষা কারিকুলামকে ইসলামীকরণের পদক্ষেপ শক্তিশালী করিব এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও কলাকৌশল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম চিন্তাবিদ ও 'আলিমদের ইজতিহাদ ও গবেষণাকে উৎসাহিত করিব।

শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করিবার জন্য আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিতেছি। আরও ঘোষণা করিতেছি, মুসলিম উম্মাহ-কে ঐক্যবদ্ধ করা, তাহাদের সংস্কৃতিকে সংহত করা, নৈতিক গুণের বিকাশ ঘটাইয়া নৈতিক অবক্ষয় রোধ করিবার জন্য এবং আমাদের যুবসমাজকে অজ্ঞানতা হইতে এবং তাহাদের অর্থনৈতিক অসুবিধার সুযোগ লইয়া তাহাদেরকে ধর্মচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষার জন্য আমরা আমাদের ধর্ম ও ঐতিহ্যের শক্তিকে কাজে লাগাইব। ইসলামের নীতি ও আদর্শকে, ইহার গৌরব ও সংস্কৃতিকে ইসলামী সমাজ ও গোটা দুনিয়ায় প্রচার করা এবং ইসলামের বিরাট ঐতিহ্য, ইহার আধ্যাত্মিক শক্তি, নৈতিক মূল্যবোধ ও অগ্রগতি, সুবিচার ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইসলামের অমূল্য আবেদন তুলিয়া ধরিবার প্রয়োজনীয়াতার প্রতি গভীর আস্থা স্থাপন করিয়া এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বৈষয়িক ও জনসম্পদের

সংগ্রহ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে আমরা পারস্পরিক সহযোগিতা দানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের চলমান ইসলামী চিন্তার অঙ্গন হইতে যাবতীয় বিজাতীয় ও বিভেদমূলক চিন্তার উচ্ছেদের মাধ্যমে ইহাকে পবিত্রকরণ এবং সংস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের চিন্তাধারার পুনর্বিন্যাসকরণের জন্য সবরকম চেষ্টা-সাধনারও আমরা প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিতেছি। আমরা আরও প্রতিশ্রুতি দিতেছি, ইসলামের শিক্ষা সামনে রাখিয়া আমাদের সমাজ সংস্কারে কার্যকর ভূমিকা পালনের উপযুক্ত এবং গোটা দুনিয়ার সম্মুখে আমাদের সঠিক রূপ প্রদর্শন ও পশ্চিমী প্রচার মাধ্যমের বিভ্রান্তিকর প্রচারণা নস্যাৎ করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও যুক্ত কর্মসূচীর একক এক কাঠামোর অধীনে পক্ষপাতহীন, নীতিনিষ্ঠ ও সুবিচারমূলক গণমাধ্যম ও তথ্য সরবরাহ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে আমরা সচেষ্ট হইব।

**ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ঃ** ইসলামী সম্মেলন সংস্থা প্রতিষ্ঠার মহৎ সিদ্ধান্তের কথা আমরা সন্তুষ্টির সঙ্গে স্মরণ করি। সংস্থার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি, আন্তর্জাতিক চত্বরে মুসলিম ঐক্যের প্রতীক ও তাহাদের সাহায্য-সমঝোতার কাঠামো হিসাবে ইহার দ্রুত বিকাশমান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং এই সংস্থা হইতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি এবং এই গঠনমূলক কাজের লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপন্থার আরও বিস্তারের আনন্দকর বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদের এই সংস্থা যাহাতে তাহার উপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব পালন করিতে পারে, এইজন্য ইহাকে উপযুক্ত প্রতিভা এবং পর্যাপ্ত অর্থ ও উপকরণ দ্বারা সমৃদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের সার্বিক সহযোগিতা দানের ওয়াদা করিতেছি। ইসলামিক সলিডারিটি ফাণ্ড, আল-কুদস ফাণ্ড তথা এই সংস্থার অন্যান্য শাখা ও প্রকল্প এবং তাহাদের সাফল্য বিধানের প্রতিও আমরা আমাদের সার্বিক সমর্থন ঘোষণা করিতেছি। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জোরদার, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার পরিসর বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্মিলিত ভূমিকা বলিষ্ঠতর করার লক্ষ্যে সংস্থার উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ যাবতীয় আন্তর্জাতিক ও আন্তঃসরকার ইসলামী সংস্থা সংগঠনের প্রতি সমর্থন দানের যৌথ প্রতিশ্রুতি আমরা ঘোষণা করিতেছি। আমরা যুক্তভাবে আমাদের সংস্থার নীতি ও আদর্শের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সদস্য রাষ্ট্রের আইন-বিধির সহিত সাংঘর্ষিক নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এমন বেসরকারী ইসলামিক সংস্থা ও সংগঠনের প্রতিও সমর্থনের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিতেছি।

**জনগণের প্রতি ঃ** আমরা আমাদের জনগণের প্রতি আবেদন জানাইতেছি, আমাদের বিরুদ্ধ শক্তির মুকাবিলার লক্ষ্যে নিজেদের শক্তিকে সংহত করিবার জন্য আমাদের ধর্ম ইসলামের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন এবং নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন ও বিশ্বে শক্তি, সমৃদ্ধি ও মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠার জন্য পারস্পরিক সমর্থন ও সহায়তা দান করুন।

**বিশ্বের প্রতি ঃ** বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও জনগণের প্রতি আমাদের আবেদন, মানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধের আন্তরিক অনুভূতি লইয়া ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্যদের আবেগ অনুধাবনে আগাইয়া আসুন। আসুন, আমরা সকল ঘৃণা, অবিচার ও নিপীড়নের অবসান ঘটাই, যাহাতে আমরা মানবতার উপযোগী এক বিশ্ব গড়িবার জন্য সম্মিলিতভাবে আগাইয়া যাইতে পারি এবং আমাদের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবনের মান উন্নয়নে একই সঙ্গে কাজ করিতে পারি।

আমরা করুণাময় রাব্বু'ল-'আলামীন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি আমাদেরকে সিরাতুল-মুসতাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন, আমাদের চেষ্টাকে সাফল্যের স্বর্ণমুকুটে শোভিত করুন এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণ বান্দার জীবন যাপনের তৌফিক দান করুন।

ইহাই বিখ্যাত মক্কা ঘোষণা। মিসর, আফগানিস্তান, ইরাক ও লিবিয়া ছাড়া বাকি ৩৮টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান ও প্রতিনিধিগণ এই ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন (মক্কা ঘোষণা, অনুবাদ, আবুল আসাদ; ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের সা'উদী দূতাবাস কর্তৃক প্রকাশিত)।

**চতুর্থ ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন ঃ** চতুর্থ ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মরক্কোর বন্দর নগরী কাসাব্লাংকায় (দারু'ল-বায়দা'); ১৯৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি শুরু হয় এবং শেষ হয় ২০ জানুয়ারী। ইরান এই সম্মেলনে যোগদান করে নাই। আফগানিস্তানের সদস্য পদ বাতিল থাকায় আফগানিস্তানও যোগদান করিতে পারে নাই। ৪২টি দেশ এই সম্মেলনে যোগদান করে। সম্মেলন কাসাব্লাংকার শাহী প্রাসাদে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন সা'উদী 'আরবের বাদশাহ ফাহ্দ। জাতিসংঘ মহাসচিব পেরেজ দ্য কুইয়ার, ওআইসি মহাসচিব হাবীব শাত্তি, 'আরব লীগের মহাসচিব শাযলী কুলায়বী, উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (জেসিসি) মহাসচিব 'আবদুল্লাহ বিকারা এবং পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মিসরের পুনঃঅন্তর্ভুক্তি লইয়া সম্মেলনে তুমুল বিতর্ক হয়। প্রায় ৫ বৎসর কালব্যাপী মিসরের সদস্য পদ স্থগিত থাকিবার পর ১৯ জানুয়ারি, ১৯৮৪ মিসর আবার সদস্য পদ লাভ করে। গিনির প্রেসিডেন্ট আহমাদ সেকুতুরে মিসরকে ওআইসিতে পুনরায় গ্রহণের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিলে সম্মেলনে তীব্র বিতণ্ডা শুরু হয়। উহাতে মরক্কো একটি আপোস ফর্মূলা পেশ করে ঃ ১৯৮১ খৃ. ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে এবং ১৯৮২ খৃ. ফেয শহরের আরব শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রকাশ্যে মিসর সমর্থন করিলে ওআইসিতে লওয়া হইবে। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। তবে মিসর শর্তাধীন সদস্য হইতে রাযী হয় নাই।

বাদশাহ ফাহ্দের উদ্বোধনী ভাষণের পর মরক্কোর বাদশাহ হাসান ওআইসির নূতন চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সম্মেলনে ৬টি রিপোর্ট মূল্যায়ন করা হয়। রিপোর্টগুলি ছিল ঃ ওআইসির সাফল্য সম্পর্কে বাদশাহ ফাহদের রিপোর্ট; বাদশাহ হাসানের দেয়া আল-কুদ্স কমিটির রিপোর্ট; গিনির প্রেসিডেন্ট সেকুতুরের দেয়া উপসাগরীয় লড়াই বন্ধে ৯ সদস্যের ইসলামী শান্তি কমিটির রিপোর্ট; পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল যিয়াউ'ল-হাক্ক-এর দেয়া বিজ্ঞান ও কারিগরী সহযোগিতা সংক্রান্ত রিপোর্ট, সেনেগালের প্রেসিডেন্ট দিউফের দেয়া তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক রিপোর্ট এবং আফ্রিকার সাহিল অঞ্চল সম্পর্কে ইসলামী সংহতি কমিটির চেয়ারম্যানের দেয়া রিপোর্ট।

এই সম্মেলনে ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণা 'ঢাকা ঘোষণা' হিসাবে চতুর্থ ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে অনুমোদন লাভ করে। মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ১১ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। এই ১১ দফা প্রস্তাবের মধ্যে ফিলিস্তীন প্রশ্নে একটি ব্যাপকভিত্তিক জরুরী কর্মসূচি গ্রহণ, ইসলামী দেশগুলির মধ্যে বিরোধ ও সংঘাতের মীমাংসার জন্য কমিশন গঠন এবং ইসলামী বিশ্বের কোন মুসলিম দেশ

হুমকির সম্মুখীন হইলে স্বল্প সময়ের নোটিশে জরুরী বৈঠক ডাকার সুবিধার্থে ওআইসির একটি স্থায়ী কমিটি গঠনের প্রস্তাব রহিয়াছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মুকাবিলায় স্বল্পোন্নত মুসলিম দেশসমূহকে সহায়তা করিবার জন্য একটি বিশেষ প্রত্যক্ষ কর্মসূচি গ্রহণ, একটি ইসলামী সাধারণ বাজার স্থাপন, মুসলিম বিশ্বে সরকারী ও বেসরকারী খাতে অধিকতর বিনিয়োগ এবং মুসলিম দেশসমূহের পরিচিতি তুলিয়া ধরিবার জন্য প্রকাশনার ব্যবস্থা করা ১১ দফা প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের প্রস্তাবে মুসলিম দেশ ও কেন্দ্রসমূহের মধ্যে কারিগরী সহযোগিতা কর্মসূচী জোরদার, সম্পর্ক সুদৃঢ় করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে পারস্পরিক কূটনৈতিক মিশন স্থাপন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্র ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং মুসলিম দেশসমূহ হইতে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের পরামর্শ রহিয়াছে। লেবানন সমস্যা, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, আফগান পরিস্থিতি এবং তুর্কী সাইপ্রিয়টদের সমস্যার উপর বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি ও সমর্থন এইসব প্রস্তাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

**চতুর্থ ইসলামী সম্মেলনের ইশতেহার** ঃ সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে ১৩ পৃষ্ঠার একটি ইশতেহার প্রকাশ করা হয়। ইশতেহারে ফিলিস্তীন ও মধ্যপ্রাচ্য প্রশ্নে ফেয শান্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের আহ্বান জানান হয়। ইরান-ইরাক যুদ্ধ প্রসঙ্গে নেতৃবৃন্দ ভ্রাতৃঘাতী এই যুদ্ধ বন্ধে ৯ সদস্যের ইসলামী শান্তি মিশনকে তাঁহাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিবার আহ্বান জানায়। সম্মেলন উভয় দেশকে তাহাদের নিজ নিজ সীমান্তে সৈন্য সরাইয়া লইবার ডাক দেয়। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে অধিকৃত সকল 'আরব এলাকা হইতে ইসরাঈলী সৈন্য প্রত্যাহারই মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানের মৌলিক শর্ত বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং পশ্চিম তীর ও গাজায় ইসরাঈলী আইনসমূহ প্রত্যাখ্যান করা হয়।

**আল-কুদ্স** ঃ ইসলামী উম্মাহ এই পবিত্র নগরীর 'আরব ও ইসলামী চরিত্র বজায় রাখিবার এবং আল-কুদ্সকে 'আরবদের অধিকারে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতি সম্মেলনে ঘোষণা করে।

**মার্কিন হামলা** ঃ সম্মেলন গত মাসে (ডিসেম্বর) সিরীয় অবস্থানগুলির বিরুদ্ধে মার্কিন বিমান হামলার নিন্দা করিতেছে। সম্মেলন ইসরাঈল অধিকৃত সিরিয়ার গোলান মালভূমিতে ইসরাঈলী আইন কার্যকর করিবার সিদ্ধান্তকে বাতিল ঘোষণা করে।

মুসলিম নেতৃবৃন্দ লেবাননের পূর্ণ স্বাধীনতা, ঐক্য, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে। সম্মেলনে লেবাননে শান্তি অর্জনের সকল উদ্যোগের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করা হয় এবং লেবাননের একটি বড় অংশ ইসরাঈলী দখলে থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবে লেবানন ভূখণ্ড হইতে অবিলম্বে ইসরাঈলী সৈন্য প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়। ইহা ছাড়া লেবানন সরকার যেসব বাহিনীর প্রত্যাহার দাবী করিয়াছে, তাহাদেরও প্রত্যাহারের দাবি জানান হয়। আফগানিস্তান হইতে অবিলম্বে বিনা শর্তে সকল বিদেশী বাহিনীর প্রত্যাহার দাবি করা হয় এবং আফগানিস্তানে অব্যাহত সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। সম্মেলন সাইপ্রাস প্রশ্নে পূর্ববর্তী ইসলামী সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ঘোষণা করে এবং সমমর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার অর্জনে তুর্কী সাইপ্রিয়টদের প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন ব্যক্ত করে। নামিবিয়ার জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ঘোষণা করে। ইসলামী নেতৃবৃন্দ দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী প্রশাসন এবং ইসরাঈল ও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্যবাদী চক্রের মধ্যে সহযোগিতার কঠোর নিন্দা করেন। সম্মেলন ফ্রান্স অধিকৃত দ্বীপটির উপর কমরোর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে। একটি আন্তর্জাতি ইসলামী আদালত প্রতিষ্ঠার ব্যাপার আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। ডিসেম্বর মাসে (১৯৮৩ খৃ.) ঢাকায় ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে এই বিচারালয়ের জন্য গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। তবে নেতৃবৃন্দ ইসলামে মানবাধিকার বিষয়ে ঢাকা ঘোষণা অনুমোদন করেন। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট কেনান এভরেন ওআইসি মন্ত্রী পর্যায়ের স্থায়ী অর্থনৈতিক কমিটির প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হন।

ঐক্য, সহযোগিতা, ইসলামী ঈমান-'আকীদা রক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং মুসলিম স্বার্থের প্রতি ইসলামী দেশসমূহের অঙ্গীকার সম্বলিত কাসাব্লাংকা সনদ প্রকাশ করা হয়। সম্মেলনে সমাপ্তি অধিবেশনে ভাষণ দানকালে মরক্কোর বাদশাহ হাসান বলেন, ভাষা, বর্ণ ও আঞ্চলিক ভিন্নতা সত্ত্বেও সারা বিশ্বের মুসলমানগণ পরস্পর অভিন্ন ঈমানের বন্ধনে আবদ্ধ।

চতুর্থ সম্মেলনে ব্রুনেই সালতানাত ওআইসিতে নূতন সদস্য হিসাবে যোগদান করে (১৬ হইতে ২০ জানুয়ারি, ১৯৮৪ সালের দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক অবজার্ভার, দৈনিক বাংলা)।

**পঞ্চম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন** ঃ পঞ্চম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন ১৯৮৭ সনের ২৬ জানুয়ারী হইতে ২৯ জানুয়ারী পর্যন্ত কুওয়ায়ত-এ অনুষ্ঠিত হয়। এই শীর্ষ সম্মেলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যেসব দেশের প্রতিনিধিত্ব ছিল তাহাদের নাম ঃ জর্দান, 'আরব আমীরাত, ইন্দোনেশিয়া, উগাণ্ডা, পাকিস্তান, বাহরায়ন, ব্রুনেই, বাংলাদেশ, বেনিন, তুরস্ক, শাদ, তিউনিসিয়া, গ্যাবন, গাম্বিয়া, আলজিরিয়া, কমোরো, জিবুতি, সা'উদী 'আরব, সেনেগাল, সুদান, সিরিয়া, সিয়েরালিওন, সোমালিয়া, ইরাক, উমান, গিনি, গিনিবিসাউ, পিএলও, কাতার, ক্যামেরুন, কুওয়ায়ত, লেবানন, লিবিয়া, মালদ্বীপ, মালি, মালয়েশিয়া, মিসর, মরক্কো, মৌরিতানিয়া, নাইজার, নাইজিরিয়া, উত্তর য়ামান ও দক্ষিণ য়ামান।

**যোগদানকারী সংস্থাসমূহের নাম** ঃ দি সাইপ্রিয়ট-টার্কিশ ফেডারেটেড স্টেট, মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট, UNO, OAU, আরব লীগ, FAO, ইউনেসকো, জাতিসংঘ উদ্বাস্তু কমিশন, ফিলিস্তিনী জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জাতিসংঘে স্থায়ী কমিশন, 'আরব শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, আফ্রিকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত 'আরব ব্যাংক, ইসলামিক ওয়ার্লড লীগ, ইসলামী দা'ওয়া সোসাইটি, কনফারেন্স অব ইসলামিক ওয়ার্লড, ইন্টারন্যাশন্যাল ক্লাব অব মুসলিম ইয়ূথ; দি ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইসলামিক ব্যাংকস, দি ইসলামিক কাউন্সিল অব য়ুরোপ, দি ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রিসেন্ট কমিশন। আফগান মুজাহিদ আল-ইসলামী ঐক্য জোটের প্রতিনিধি এবং গাল্ফ কোঅপারেশন কাউন্সিলের সেক্রেটারী জেনারেল সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ইরাক যোগদান করে নাই। আফগানিস্তানের সদস্য পদ বাতিল করা হইয়াছে, এইজন্য দেশ হিসাবে যোগদান করে নাই। নাইজিরিয়াও প্রত্যক্ষভাবে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে নাই। কারণ নাইজিরিয়ার খৃষ্টানরা ওআইসির সদস্যভুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনমুখর।

**পঞ্চম শীর্ষ সম্মেলনের ইশতেহার ঃ** শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসে (২৯/১/৮৭) গৃহীত ইশতেহারে ইরাক ও ইরানের প্রতি অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানানো হয়। ইশতেহারে বলা হয়, এই যুদ্ধে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে হুমকির সম্মুখীন। যুদ্ধরত দুই দেশের প্রতি তাহাদের সৈন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমান্তে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার অনুরোধ করা হয়। ইহা ছাড়া দুই দেশের মধ্যে বন্দী বিনিময় এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংঘর্ষ অবসানের জন্য আলাপ-আলোচনা শুরু করিবার এবং আফগানিস্তান হইতে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হইয়াছে। ইসরাঈলের সহিত যেসব ওআইসি দেশের সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাদেরকে এই সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য ইশতেহারে অনুরোধ করা হয়। সম্মেলনে লেবাননে শরণার্থী শিবিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ, লিবিয়া-শাদ বিরোধ নিষ্পত্তি, ইসরাঈলী পরমাণু নীতি ও অন্যান্য বিষয়ে মোট ৩০টি রাজনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাসে লিবিয়ার ত্রিপলী ও বেনগাজী শহরে মার্কিন বিমান হামলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা করা হয় এবং লিবিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যবরদস্তিমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিন্দা করা হয়। সম্মেলনের ৩০টি রাজনৈতিক প্রস্তাবের মধ্যে একটি ইরানী নেতাদের শীর্ষ বৈঠকের ফলাফল অবহিত করিতে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল তেহরানে প্রেরণের কথা বলা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, ১৯৯০ খৃ. সেনেগালের রাজধানী ডাকারে ষষ্ঠ ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) Tufail Muhammad Dogar, Standard General Knowledge, 28th Edition 1970; (২) Arabia (monthly), volume b, no. 67, March 1987; (৩) The Bangladesh Observer, 6 December, 1983, ICFM Conference Supplement; (৪) দৈনিক সংগ্রাম (ম্যাগাজিন সাইজ), ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন সংখ্যা, প্রকাশিত ৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ সাল; (৫) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা 'অগ্রপথিক', ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ২২ জানুয়ারি, ১৯৮৭ সাল।

সালেহ উদ্দিন আহমদ

**ইসলামুল হক** (اسـلام الحق) **ঃ ডঃ শিবশক্তি,** একজন নওমুসলিম। তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল মোহান্ত স্বামী শিবশক্তি স্বরূপজী মহারাজ উদাসেন ধর্মাচারিয়া আদ্যশক্তি পীঠ। মননশীল প্রাবন্ধিক, অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্পন্ন গ্রন্থকার, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত দার্শনিক বহুভাষাবিদ, ক্ষুরধার সমালোচক, প্রাজ্ঞ সমাজনেতা এবং মনো-দৈহিক রোগের প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক ডক্টর শিবশক্তি ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারী ভারতের উত্তর প্রদেশের মথুরা জিলার বৃন্দাবন শহরে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ধর্মগুরু মোহান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা প্রীতমদাস উদাসেন ছিলেন এক বিশাল হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—আশ্রমের অধিপতি। তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় তাঁহার পিতার আশ্রমেই সম্পন্ন হয়। ভারতের এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি প্রাচ্য বিদ্যায় এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর দীর্ঘ আট বৎসরকাল লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবীর দশটি প্রধান ধর্মমত সম্পর্কে তুলনামূলক গবেষণা করেন। সেইখানে প্রথমে ডক্টর অব ডিভাইনিটির উপর ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

ডক্টর শিবশক্তির অতুলনীয় প্রতিভা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তি লক্ষ্য করিয়া খৃষ্টান ধর্মগুরু পোপ ষষ্ঠ পল তাঁহাকে বৃত্তি দান করিয়া খৃষ্টান ধর্মের প্রধান কেন্দ্রস্থল ইতালীর ভ্যাটিকান সিটিতে লইয়া যান। সেইখানে পৃথক পৃথক সাতটি ধর্মীয় প্রশ্নে তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে বলা হয়। তাঁহার যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁহাকে সম্মানসূচক ও.এফ.এম. ক্যাপটেন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণের জন্য তাঁহাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হইলে তিনি তাঁহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, "এক নিরাকার স্রষ্টার ধারাবিচ্যুত খৃষ্ট দর্শনের প্রতি পৌত্তলিক হিন্দুদিগের পক্ষেও আকৃষ্ট হওয়ার মত কিছু আছে সেকথা আমি মনে করি না। কারণ খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদ হিন্দুদের বহু দেববাদের তুলনায় আদৌ কোন উন্নততর মতাদর্শ নয়।" তারপর তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতের সর্বোচ্চ হিন্দু ধর্মীয় বিদ্যাপীঠ গুরুকুল কাংড়ি হইতে সংস্কৃত ভাষায় পরীক্ষা দিয়া ধর্মাচারিয়া খেতাবে ভূষিত হন। অতঃপর তিনি যথারীতি মুকুট ধারণ করিয়া বিশাল বৃন্দাবন আশ্রমের গদীতে প্রধান পরিচালক পদে সমাসীন হন।

এতদ্ভিন্ন মুম্বাই ও দেওয়ালনে অবস্থিত আরও দুইটি আন্তর্জাতিক মানের আশ্রমের প্রধান পরিচালক অর্থাৎ আচার্যরূপে দায়িত্ব পালন করিতে শুরু করেন। অন্তত বারোটি ভাষায় সুপণ্ডিত মনীষী ডক্টর শিবশক্তি যেমন ছিলেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতৃপুরুষ, তেমনই তাঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সমকালীন উচ্চ মর্যাদার অন্যান্য হিন্দু ধর্মগুরু—জগৎগুরু শঙ্করাচার্য, রামগোপাল শালওয়ালে, পুরীর শঙ্করাচার্য, মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী অখণ্ডানন্দজী, গুরুগোলওয়ালকার বাবা সাহেব, দেশমুখ বালঠাকুরে, অটল বিহারী বাজপেয়ী, নানা সাহেব দেশমুখ, আচার্য বিনোবাভাবে প্রমুখের সঙ্গে।

সমকালীন হিন্দু ধর্মীয় পণ্ডিতবর্গ ও ধর্মগুরুগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিদ্বান ও মেধাবী হওয়াতে তিনি ছিলেন সকলের বিশেষ স্নেহপ্রীতিভাজন। তাঁহার অপূর্ব মেধা ও কর্মশক্তি দেশের উচ্চশিক্ষিত সমাজেও পাশ্চাত্যে হিন্দুধর্মের প্রচারে বিশেষ অবদান রাখিবে— এই রকম আশা তাহারা সকলেই ঐকান্তিকভাবে পোষণ করিতেন।

ইসলামের প্রতি কিভাবে আকৃষ্ট হইলেন সেই প্রশ্নের জবাবে ডক্টর শিবশক্তি বলেন, সে এক বিস্ময়কর ঘটনা। আত্মার জগৎ সম্পর্কে এই যুগের বস্তুবাদী মন-মানসের অধিকারী মানুষের কোন ধারণাই তো নাই। তাই তাহাদের পক্ষে সেই ঘটনা হয়ত বিশ্বাস করাও সম্ভব নয়। অথচ এমন একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা যে বাস্তবে ঘটিয়াছে তাহার জীবন্ত সাক্ষী তো আমি নিজেই। আমি ছিলাম এই দেশের অর্ধশত কোটি হিন্দু জনতার পরম ভক্তিভাজন এক শীর্ষস্থানীয় ধর্মগুরু। তাহারা আমাকে ধর্মাচার্য ভগবান বলিয়া শ্রদ্ধা জানাইত। অপরপক্ষে ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মুসলমানদের অবস্থান তো কাহারও অজানা নয়। অবস্থানগত আকাশ ও পাতালের পার্থক্যটা বুঝিবার মত মেধা কি আমার ছিল না? কিন্তু তারপরও যে আমি কেন এবং কেমন করিয়া ভগবানের সোনার সিংহাসন স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া এই কণ্টকাকীর্ণ মাটির পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের কাতারে সামিল হইয়াছি সে রহস্যের পর্দা উন্মোচন করিতে যাইয়া আমি আবেগে উদ্বেলিত হইয়া পড়ি। অক্সফোর্ডে পাঠ্যাবস্থায় তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে পড়াশুনা করার সময় আমি পবিত্র কুরআন পাঠ করার সুযোগ লাভ করি। ইসলাম ধর্মকে উহার মূল উৎস হইতে

শিখিবার আকাঙ্ক্ষায় আমি ইহার আগে 'আরবী ভাষা বেশ ভালভাবেই শিক্ষা করি, যেমন শিক্ষা করিয়াছিলাম হিন্দুধর্মের আদি গ্রন্থাদি পাঠ করার জন্য সংস্কৃত, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার জন্য পালি এবং খৃস্টধর্মের গ্রন্থাদি পাঠের জন্য প্রাচীন গ্রীক ভাষা।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে আল-কু'রআন পাঠের সময় হইতেই আমার মনোরাজ্যে প্রায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটিয়া যায়। যে বিদ্বেষবহ্নি অন্তরে লইয়া পাঠ শুরু করি তাহা যে ধীরে ধীরে কেবল নির্বাপিত হইয়া গেল তাহাই নয়, বরং তদস্থলে আমার অলক্ষ্যে ভক্তি শ্রদ্ধার এক স্রোত আমার মনের গোপন কোণে যেন বহিতে শুরু করিয়া দিল। কিন্তু নিজের ধর্মমত সম্পর্কে আমার ভক্তি ও বিশ্বাসে তখনও পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য ফাটল সৃষ্টি হয় নাই, বরং পূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুভূতি লইয়াই আমি আমার করণীয় কাজ করিয়া যাইতেছিলাম। ভারতে আমি সর্বক্ষণ প্রভূত বিত্তসম্পদ ও ভক্তদল পরিবৃত হইয়া থাকিতাম। বিশাল ভারত ভূমিকে অখণ্ড রামরাজত্বে রূপান্তরিত করার স্বপ্নে বিভোর হিন্দু নেতৃত্বের সঙ্গে আমার ভূমিকাও পশ্চাৎপদ ছিল না।

১৯৮৪ সনের জানুয়ারী মাস। এক রাত্রে আমি ও আমার বিদুষী স্ত্রী শ্রীমতী শ্রদ্ধাদেবী ও আমার গ্রাজুয়েট কন্যা শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী পাশাপাশি কামরায় শায়িত। গভীর রাত্রে স্বপ্নে দেখি, বিরাট এক জনতা আক্রমণাত্মকভাবে আমার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া আমি ছুটিতে লাগিলাম। ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে এক জায়গায় অতর্কিতভাবে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলাম। ভয়ে তখন আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছে। আশেপাশে এমন কাহাকেও দেখিলাম না যিনি আমাকে একটু সাহায্য করিতে পারেন। এমন সময় অদৃশ্য দুইটি হাত যেন আমাকে তুলিয়া দাঁড় করাইল। চাহিয়া দেখিলাম এক দিব্যকান্তি মহাপুরুষ আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমি অবাক বিস্ময়ে সেই আলো ঝলমল চেহারার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলাম। মন হইতে সমস্ত ভয়-ত্রাস মুহূর্তে অন্তর্হিত হইল। আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বিহ্বল দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান অপর ব্যক্তি বলিলেন, তুমি ইঁহাকে কি চিনিতে পার নাই ? ইনিই ইসলামের নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। এই সময় তিনি তাঁহার পবিত্র হাতে আমার ডান হাত ধরিয়া বলিলেন ঃ "কলেমা পাঠ কর।" এই কথা বলিয়া তিনি নিজেই কলেমা পাঠ করিতে লাগিলেন। আর আমিও তাঁহার পবিত্র কণ্ঠ অনুসরণ করিয়া কলেমা পাঠ করিতে থাকিলাম। কলেমা পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মু'আনাকা (আলিঙ্গন) করিলেন। আর স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন ঃ "যাও, এইবার এই দেশের লোকজনকে কলেমা পড়াও"।

আমার এই পবিত্র স্বপ্ন কতক্ষণ স্থায়ী ছিল তাহা বলিতে পারিব না। তবে যখন চোখ খুলিলাম তখন রাত্রি তিনটা বাজিয়াছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অনুরূপ স্বপ্ন আমার স্ত্রীও একই সময়ে দেখিয়াছেন। আমরা এই সময় যখন দুইজনে দুইজনের কাছে আপন আপন স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছিলাম, তখন আমাদের দুইজনের মনের বীণায় এক অদ্ভুত ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিল। আমরা উভয়ে নিজেদেরকে প্রথম যুগের মুসলিমরূপে কল্পনা করিতে লাগিলাম। মনে হইল, এই দেশে সাহাবীদের সেই সোনালী যুগ ফিরাইয়া আনিবার সাধনাতেই আমাদেরকে ব্রতী হইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত আমাদের মনে এমন এক প্রত্যয় জন্মলাভ করিল যে, অতি শীঘ্রই দুনিয়ার এক নবীন বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে। আর সেই বিপ্লবের একজন নগণ্য কর্মীরূপে কাজ করার জন্য মহান আল্লাহ আমাকেও কবুল করিয়াছেন।

ইহার পরদিন হইতেই ধর্মগুরু ভগবানের সুউচ্চ আসনচূড়া হইতে নামিয়া আসিয়া মাটির মানুষের কাতারভুক্ত হইবার জন্য সচেষ্ট হইলাম। যদিও সেই মুহূর্তে আমি, আমার স্ত্রী ও কন্যা পরিপূর্ণ মুসলিম, তথাপি আমার উপর যে তিনটি আশ্রম ও সংগঠনের দায়িত্ব অর্পিত ছিল, অন্য কোন ব্যবস্থাপনায় সেইগুলি ন্যস্ত না করা পর্যন্ত আমরা মুসলিম হিসাবে আমাদের ধর্মীয় পরিচিতি প্রকাশ করিলাম না।

অবশেষে সেই প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি আসিয়া গেল। ১৯৮৬ সনে সেইদিন সন্ধ্যাকাশে রমযানের সোনালী হেলাল পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করার কথা। সেইদিন দিবাভাগে ডক্টর শিবশক্তি আপন ঘনিষ্ঠ লোকজনের পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ করিয়া ভারতের অন্যতম মুসলিম প্রধান শহর ভূপালে সপরিবারে হিজরত করেন। সেইখানে ১৫ নং নীলম কলোনীর একটি দোতলা ভাড়াটে বাড়ির নিচের তলায় সপরিবারে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি ১৯৮৬ সনের ১০ মে তারিখে ভূপালের রাণী সাহেবার মসজিদের মাওলানা আবদুল লতীফের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সপরিবারে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এইভাবে তিনি তাঁহার আগেকার অঢেল বিত্তবৈভব, ধর্মগুরুর উচ্চ মর্যাদা, ভক্তকুলের সকল সেবাযত্নকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া আগ্রাসী হিন্দু সমাজের মর্যাদাপূর্ণ ধর্মগুরুর মুকুট হেলায় ত্যাগ করিয়া মজলুম মুসলমানগণের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, ছিলাম ভগবান, আল্লাহ্র অপার মহিমায় এখন হইতে পারিয়াছি ইনসান। আর ইনসান চরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ ইনসানিয়াত (মানবতা) হইল ইসলামের অনবদ্য অবদান। ইনসানিয়াতের অপর নামই ইসলাম। তিনি বলিলেন, তরবারি নয়, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত মানবতাবোধ ইসলামের দ্রুত বিস্তারে সহায়তা করিতেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। সেইদিন বেশী দূরে নয় যেইদিন সারা বিশ্বের মানুষ ইসলাম স্বীকৃত মানবতাবাদের অমলিন সরোবরে অবগাহন করিবার জন্য দলে দলে অগ্রসর হইবেন। মুসলমানরা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মত ও পথ হইতে অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছেন। যতদিন পর্যন্ত মুসলমানগণ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনাদর্শকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়িত না করিবেন ততদিন তাহারা নিগৃহীত, উৎপীড়িত, বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হইতে থাকিবেন।

তিনি বলিয়াছেন, আমি আমার সৃষ্টিকর্তাকে চিনিতাম না, জানিতাম না। মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার পিয়ারা হাবীব (স)-এর মারফত আমাকে হিদায়াত লাভের সৌভাগ্য দান করিয়াছেন। আমি এখন হইতে সারাজীবন শোকরগুজার থাকিলেও এই অসীম অনুগ্রহের তুলনায় তাহা মোটেই যথেষ্ট হইবে না। শুধু ঈমানের দৌলত লাভ করিয়াই আমি যে আত্মতৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিয়াছি সাত আসমানের বাদশাহী পাইলেও বোধ হয় এত সুখ এত তৃপ্তি লাভ করা সম্ভব হইত না। তাঁহার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভীর মন্তব্য ছিল ঃ "ডক্টর ইসলামুল হক এই যুগের ভারতীয় মুসলমানদের জন্য রাসূলে মকবূল (স)-এর একটি তোহফাবিশেষ।" দারুল উলুম হইতে মন্তব্য করা হয় ঃ "দেবালয় হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন পবিত্র কা'বার প্রহরী।"

মুসলমানদের প্রাথমিক যুগের সেই সোনালী দিনগুলি ফিরাইয়া আনিবার যে বাসনা আপনি মনে মনে পোষণ করেন তাহা অর্জনের জন্য আপনার ধারণায় কি কোন কার্যকর কর্মসূচী আছে ? এই প্রশ্নের জবাবে

ডক্টর ইসলামুল হক বলেন, মুসলমানদের সেই আদর্শ প্রথম শতকটি আবার দেখার আকাঙ্ক্ষা সকল যুগের মুসলিম সাধকরাই অন্তরের মনিকোঠায় পোষণ করিয়া আসিতেছেন। এই যুগের মুসলমানগণও অতীতের সেই উত্তরাধিকার পরম যত্নে বহন করিয়া চলিতেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিটি মুমিনের অন্তরেই সেই পবিত্র আকাঙ্ক্ষাটির বীজ সুপ্ত রহিয়াছে। কেবল কিছু কায়েমী স্বার্থ তাহা বাস্তবায়িত হইতে দিতেছে না।

এই যুগে যদি আমরা সেই আকাঙ্ক্ষিত দিন ফিরাইয়া আনিতে চাই তবে ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ কর্মীদিগকে নবীন সংকল্প ও কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে তাহাদেরকে বিলাল (রা)-র হিম্মত ও অধ্যবসায় লইয়া ময়দানে আসিতে হইবে। এই যুগের মুসলমানগণও যদি সাহাবীগণের অনুভূতি লইয়া জীবন যাপন করিতে শুরু করেন, তবে তাহার সুফল অতিশীঘ্র চতুর্দিকে লক্ষণীয় হইবে।

মুসলিম সমাজের জন্য এখন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হইল প্রকৃত মু'মিন সুলভ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করা। এইজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হইল মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা। তিনদফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে এই কাজের সূচনা করা যায় বলিয়া আমি মনে করি। প্রথমত, ইসলাম বিরোধী সকল শক্তি ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে পূর্ণ সতর্কতার ভাব সৃষ্টি করা।

দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের ইহজাগতিক সকল ক্রিয়াকর্মের মধ্যে দীনের প্রাধান্য এবং দীনী অনুশাসনের ভিত্তিতে জীবন যাপন করার প্রেরণা সৃষ্টি করা।

তৃতীয়ত, দেশ, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানব সমাজকে তাহাদের মাতৃভাষায় ও বোধগম্য পন্থায় আল্লাহ্‌র দীনের দাওয়াত দিতে থাকা।

ভারতে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ১৯৮৬ সনের ১০ মে তারিখে ভূপালের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে হাজির হইয়া এক হলফনামার মাধ্যমে তিনি সপরিবারে ইসলাম গ্রহণ করেন। ভারতের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু মানসে ভগবানের আসনে সমাসীন ডক্টর শিবশক্তির এই ধর্মান্তরের ঘটনা ভারতীয় গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের গাত্রদাহের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

উত্তর প্রদেশের নাজিমাবাদের স্বামী দেবমুনি পরিব্রাজক লাক্ষৌ হইতে প্রকাশিত আর্যমিত্র সাময়িকীতে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি আল-কুরআনের অনুসারিগণকে এই মর্মে চ্যালেঞ্জও করেন যে, যদি তাহাদের হিম্মত থাকে তবে তাহারা যেন আল-কুরআনকে ঐশী গ্রন্থ প্রমাণ করিতে অগ্রসর হন। ডক্টর ইসলামুল হক এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া 'লিজিয়ে আপত্তি গৌচিয়ে' শীর্ষক একখানা খোলা চিঠি প্রকাশ করেন। উহাতে তিনি বলেন, আল-কুরআন আসলে কোন সাধারণ গ্রন্থ নয়। ইহা হইতেছে সমগ্র মানব জাতির জন্য আসমানী দাওয়াত, আর ইহাতে দাওয়াতের পূর্ণতা বিধান করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত আল-কুরআন মানবজাতির জন্য এক ঐতিহাসিক দলীল। আর শুধু অতীতের নয়, ইহাতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের রূপরেখাও তুলিয়া ধরা হইয়াছে। আল-কুরআনের অন্তর্নিহিত সত্য এবং মানবতা মানুষের জ্ঞানের সীমারেখায় প্রতিফলিত হইতে চায়। আল-কুরআন একটি সুস্পষ্ট পয়গাম। এই গ্রন্থ অনাগত প্রতিটি মুহূর্তের জন্য এক বাস্তব বিষয়। আল-কুরআন পৃথিবীতে কোন ধর্মগ্রন্থ, কোন নবী, রাসূল, মুনি-ঋষি কিংবা বুযুর্গানের প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে নাই। কাজেই বিশ্বের সকল ধর্মগ্রন্থ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গেরও আল-কুরআনকে শ্রদ্ধা করা কর্তব্য। কেননা আল-কুরআন যে এক অতুলনীয় পথনির্দেশ দিতেছে—সেই কথা তাহারা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

সত্যকে পাওয়া মানবজীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। সত্যের মুখামুখী হইলে মানুষের সমগ্র জীবনের ভিত্তি আন্দোলিত হয়, আর আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়ার অনুভূতি জাগ্রত হইলেই মানুষ সত্যের আলোতে আলোকিত হইয়া উঠে। অবশ্য কোন সত্য কিংবা কোন বাস্তবতা স্বীকার করার জন্য মন-মানসিকতা কলুষমুক্ত হওয়া দরকার। সংকীর্ণ মনের ও আচ্ছন্ন চিন্তার কোন লোকের পক্ষেই সত্য এবং বাস্তবতা স্বীকার করা সম্ভব নয়।

মন যদি কলুষমুক্ত না হয় তাহা হইলে মানুষ দূরে থাকিয়া সত্যের দিকে উঁকি দিতে পারে, তাহার কাছে যাইতে সাহস করে না। তাহা ছাড়া সে সর্বদা সন্দেহ বাতিকে ভোগে। সময় নিজস্ব গতিতে বহিয়া যায়, তৎসঙ্গে দিন অতিবাহিত করে সেই মানুষটিও। কিন্তু সত্য পড়িয়া থাকে পিছনে। সন্দেহের বাতিক তাহার জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, আর এইভাবে সেই মানুষটি ধ্বংস হইয়া যায়।

পবিত্র কুরআন যে মহান আল্লাহ্‌র বাণী সেই কথা প্রমাণের জন্য কিছু যুক্তি এখানে তুলিয়া ধরিতেছি।

মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া যে, তিনি এক অপরিবর্তনীয় দলীল হিসাবে আল-কুরআনকে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মারফত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর নাযিল করেন। আল-কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী করীম (স) তাহা উপস্থিত সকলকে তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতেন, সাহাবীগণ উহা সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করিয়া লইতেন, আর ওহী লেখকগণ তাহা অবিলম্বে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। জগতে এ যাবত ধর্ম বিষয়ক যত গ্রন্থ নাযিল হইয়াছে, সেসবের মধ্যে প্রথমবারের মত ইহা ঘোষণা করিয়াছে ঃ

ইহা সেই আল্লাহ্‌র বাণী; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার পরহেজগারদের জন্য সুপথ প্রদর্শক।

পবিত্র সূরা বাকারার তেইশ ও চব্বিশতম আয়াতে রব্বুল আলামীন আরও বলেন ঃ আমি আমার বান্দার প্রতি যাহা নাযিল করিয়াছি তাহাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিলে তোমরা ইহার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর। আর তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর।

যদি তোমরা আনয়ন না কর এবং কখনও করিতে পারিবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় কর, মানুষ ও পাথর হইবে যাহার ইন্ধন; কাফিরদের জন্য যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে।

(এক) এই একটিমাত্র দাবিই নয়, বরং আল-কুরআনের প্রতিটি দাবিই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে স্বস্থানে অটল আর বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাইকৃত।

(দুই) আল-কুরআন এমন এক সময়ে এই পৃথিবীতে নাযিল হইয়াছে যখন মানুষের জন্য ইতিহাসের বিবর্তন ধারায় সকল দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে। এ যাবত নাযিলকৃত ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে আল-কুরআন সকল গ্রন্থের শিরোমনি, সকল ধর্মগ্রন্থের উন্নত মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক পথনির্দেশের একমাত্র মাধ্যম।

(তিন) মানবজাতির জন্য আল-কুরআন ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, ভাষা এবং চিন্তা-চেতনার উৎসধারা। ইহাতে সকল মানুষের জন্য ইহকাল ও পরকালের সকল মৌলিক সমস্যার অনুসরণযোগ্য সমাধান বিদ্যমান।

(চার) আল-কুরআন মানবজাতির জন্য দর্শন, বিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্রের এক পূর্ণাঙ্গ তাফসীর। ইহার মাধ্যমে মানবজাতির সকল সুপ্ত যোগ্যতা ও সম্ভাবনাকে জাগ্রত করা হইয়াছে এবং মানুষকে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে টানিয়া আনা হইয়াছে।

(পাঁচ) আল-কুরআন আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনের সকল অপূর্ণতা বিদূরিত করিয়াছে এবং আখিরাতের অবিনশ্বর জীবনধারার সঙ্গে পার্থিব জীবন ধারার সংযোগ ঘটাইয়া দিয়াছে।

(ছয়) আল-কুরআন ঈমান ও আমলের সুস্পষ্ট ও সুমহান আধ্যাত্মিক দলীল। এই গ্রন্থ সকল বিতর্কের উর্ধ্বে। এই গ্রন্থ যে কোন লোকের মন-মগজকে সহজেই প্রভাবিত করিতে পারে।

(সাত) মানুষের বিবেক-বুদ্ধির জন্য আল-কুরআন শুধু এক জ্ঞানের আধারই নয়, বরং ইহাতে রহিয়াছে অভাবনীয় স্বাদ—যেমন সুখপাঠ্য তেমনি শ্রুতিমধুর। এ গ্রন্থ মানুষকে শুধু মানসিক খোরাক দেয় না, বরং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাহার চেতনাকেও জাগ্রত করে।

(আট) আল-কুরআন কেবল একখানি ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং তাহা ওহীর মাধ্যমে নাযিলকৃত এক বিস্ময়কর নিয়ামত।

(নয়) সভ্যজগতের কোন দেশে এমন কোন কল্যাণকর আইন নাই যাহা আল-কুরআনের আদর্শে প্রভাবিত হয় নাই। এইজন্য পবিত্র কুরআনের কাছে মানবজাতির কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

(দশ) পবিত্র কুরআনের ৩০ পারায়, ১১৪টি সূরায় ৬ হাজার ২৩১টি মতান্তরে ৬ হাজার ৬ শত ৬৬টি আয়াতের ১ লাখ ৭৭ হাজার ১৩৪ টি শব্দের ও ৩ লাখ ২৩ হাজার ৬২১ টি বর্ণের জের জবর পেশ-এর প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগ রাখিয়া কণ্ঠস্থ করেন এবং মনে প্রাণে ভালবাসেন এমন মানুষ আজও অগণিত। ইহা পবিত্র কুরআনের এক ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য। এই বাণীর হেফাযতের সকল দায়িত্ব আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন নিজের উপরে রাখিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় মুসলমানদের জীবন চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে।

(এগার) আল-কুরআনই পৃথিবীতে একমাত্র গ্রন্থ যাহা বিশ্বে সর্বাধিক পঠিত, সর্বাধিক শ্রুত ও সর্বাধিক মুখস্থ হইয়া আসিতেছে এবং এই ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে। মানবমনের পিপাসা নিবৃত্তির জন্য পবিত্র কুরআন বিশ্বের অসংখ্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

(বার) পবিত্র কুরআন আল্লাহ্র বাণী আর তাঁহার সত্তার চতুর্দিকে আবর্তিত। ইহার প্রধান প্রধান শিক্ষা নিম্নরূপ ঃ

(ক) এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণের প্রেরণায় 'ইবাদত করা।

(খ) আল্লাহ্র প্রেরিত নবী-রাসূল, কিতাব ফেরেশতা ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

(গ) আল্লাহ্র প্রেরিত সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (স)-এর কর্মজীবনের রীতি-নীতির সঙ্গে পূর্ণ একাত্মতা প্রকাশ আর তাঁহার জীবনকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া জীবন যাপন।

(ঘ) পিতা মাতা ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন ও অন্যদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা।

(ঙ) অশালীনতা ও বেহায়াপনা প্রকাশ পায় এমন সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অভ্যাস পরিত্যাগ করা।

(চ) য়াতীম ও অসহায় লোকজনের সেবা ও সাহায্য করা।

(ছ) ঈমানদারী ও ইনসাফের সাথে ওজন করা। সকল অবস্থায় সত্য ও সুবিচারের উপর অটল থাকা। আর সকল অবস্থায় অঙ্গীকার পালন করা।

(তের) পবিত্র কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যাহা জায়েয নাজায়েযের মধ্যে, ইনসাফ ও বেইনসাফীর মধ্যে, হালাল-হারামের মধ্যে, ঈমান ও কুফরির মধ্যে, হক ও বাতিলের মধ্যে, আলো-আঁধারের মধ্যে, নেকী-বদী তথা পাপ-পুণ্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছে।

(চৌদ্দ) এই বিশ্বজাহান নিসর্গ প্রকৃতি মানুষের জন্য এক নীরব নির্বাক পথপ্রদর্শক, আর আল-কুরআন এক সবাক পথপ্রদর্শক।

(পনের) জান্নাত ও জাহান্নামের চিরস্থায়ী জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা যেখানে রহিয়াছে সেই সকল বিবরণ আল-কুরআনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এই গ্রন্থ মানুষের প্রতি সর্বশেষ হুঁশিয়ারী।

(ষোল) মানুষের দৈহিক, আত্মিক, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষেত্রসমূহ পূর্ণতা বিধানের জন্য পবিত্র কুরআন মানুষের ইতিহাসে প্রথম আলোর পরশ।

(সতের) কুরআনুল করীম মানুষকে ঈমানের সেই বাস্তবতার দাওয়াত দেয়–যাহা মানুষের মনের মাধ্যমে মরমে পৌঁছে আর তাহার কর্মতৎপরতা ও প্রাণস্পন্দনে পরিণত হয়।

(আঠারো) পবিত্র কুরআন কুদরতের এক বিস্ময়কর মু'জিযা। ইহাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথনির্দেশ রহিয়াছে। হযরত মুহাম্মাদ (স) পৃথিবীতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পরিপূর্ণ রূপায়ন।

(উনিশ) আল-কুরআন মানুষকে অবাস্তব ও কাল্পনিক কোন দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করে না, বরং এমন একটি সহজলভ্য কর্মজীবনের পথনির্দেশ দেয় যাহা ছোট-বড়, ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলে সহজে বুঝিতে পারে। এই কারণেই অসংখ্য লোক আল-কুরআনের এই জীবন্ত পয়গামকে প্রবল আগ্রহে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করিয়া যাইতেছেন। এই গ্রন্থের দুর্বার শক্তি, অজেয় প্রভাব, অন্তর্নিহিত ও প্রচ্ছন্ন প্রেরণাও অতুলনীয় শব্দসম্ভার এখনও মুসলমান আবাল-বৃদ্ধা-বণিতার জীবনে দেদীপ্যমান।

(কুড়ি) পবিত্র কুরআন বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় আলো ও হিদায়াত দিয়া মানবজাতিকে বিশৃঙ্খল হওয়া হইতে রক্ষা করিয়াছে। মানব সমাজকে এই মহান গ্রন্থ দান করিয়াছে সাম্যের মহিমা, আর তাহাদের কর্মজীবনকে দিয়াছে এক অতুলনীয় দিকনির্দেশনা। মানব সমাজকে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, গোত্র, ভাষা ও জাতীয়তা ইত্যাদির উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া মানুষকে ঐক্য ও সংহতির আলোয় উদ্ভাসিত করিয়াছে। মানুষের ব্যবহৃত কোন ভাষা দিয়া আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাহার মহিমার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলিয়া ধরা সম্ভব নয়। এই কারণেই দেখা যায়, পৃথিবীর প্রতি চারজন মানুষের একজন আল-কুরআনের অনুসারী। তিনি আর্য হইতে পারেন, রুশ হইতে পারেন, পারেন এংগলো স্যাক্সন হইতে। বিশ্বের ইতিহাসে এই রকম অন্য কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না।

(একুশ) সিয়েরালিওন হইতে ক্যান্টন এবং তুবালেস্ক হইতে কেপটাউন পর্যন্ত দিনরাত ২৪ ঘন্টায় অগণিত মসজিদ হইতে আল্লাহু আকবার আওয়াজ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (স)-এর প্রতি মহব্বতে কোটি কোটি মানুষ নামাযে দাঁড়ায়। আল-কুরআন যে ঐশি গ্রন্থ ইহা তাহারই অন্যতম প্রমাণ।

(বাইশ) এই বিশ্বে অসংখ্য সভ্যতা বিকাশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু আল-কুরআন মানুষের জীবনের গভীরে যে সভ্যতার বীজ বপণ করিয়াছে তাহার বুনিয়াদ নির্লোভ ঈমান ও আমলের মজবুত মাটিতে প্রোথিত। মুসলমানদের বিজয়ের শক্তি তাহাদের সামাজিক ঐক্য। অস্ত্রের শক্তিতে নয় বরং আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হইয়াই মুসলমানরা অনেক অসাধ্য সাধন করিয়াছে। ইহার উৎস ও প্রেরণা হইল কুরআন মজীদ ও হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পবিত্র জীবন।

(তেইশ) গদ্য হওয়া সত্ত্বেও আল-কুরআন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাব্যের চাইতে উন্নত ও সুন্দর। এই গ্রন্থের ভাষামাধুর্য, ভাব-সম্পদ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা মানব মনকে মুহূর্তে মোহিত করে, বর্ণনাভঙ্গি ও ভাবচেতনা তাহাকে করে অভিভূত। এই ধরনের অতুলনীয় বাণী মানুষ তো দূরের কথা, ফেরেশতাদের সম্মিলিত চেষ্টায়ও রচনা করা সম্ভব নয়। এই বাণী স্বয়ং রব্বুল আলামীনের। এবং আজ পর্যন্ত কোন ধর্মগ্রন্থ ইহার সমতুল্য হইতে পারে নাই।

(চব্বিশ) যাহাদের জ্ঞানচক্ষু খোলা রহিয়াছে তাহারা এই গ্রন্থের আস্বাদ লাভ করিয়া নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন না। পক্ষান্তরে সন্দেহের কুয়াশায় নিমজ্জিত অন্ধব্যক্তি এই পবিত্র গ্রন্থের আলো পাইয়াও সম্মুখে অগ্রসর হইতে অক্ষম।

(পঁচিশ) হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাব ও আল-কুরআন নাযিলের আগে ইবাদতের কয়েকটি রীতি (দীনে হানীফ ইত্যাদি)। প্রচলিত থাকিলেও মানুষ আল্লাহ্র রহমতের ধারা হইতে বঞ্চিত ছিল। আল্লাহ রব্বুল আলামীন রহমাতুল-লিল-'আলামীনের মাধ্যমে সেই অভাব পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

(ছাব্বিশ) মানব মনে প্রভাব বিস্তার করিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বিজয় হিসাবে চিহ্নিত। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সেই বিজয় আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন ও পবিত্র কুরআনের বিজয়। সকল ধর্মের মধ্যে ইসলাম শ্রেষ্ঠ, সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আল-কুরআন শ্রেষ্ঠ। সকল নবী-রসূলের মধ্যে সকল মুণি-ঋষির মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (স) শ্রেষ্ঠ। সকল উম্মতের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদী শ্রেষ্ঠ এবং সকল কালের মধ্যে ইসলামের নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা (স)-এর জীবনকাল শ্রেষ্ঠ। আল-কুরআনের অতুলনীয় গভীরতা অনুধাবন করিবার জন্য হাদীছে রসূল (স) বুঝা প্রয়োজন। আল-কুরআন যাহা বলিয়াছে তাহার বাস্তব রূপায়ন আছে হাদীছেই।

ডক্টর ইসলামুল হক তাঁহার বিভিন্ন বক্তৃতায় বলিয়াছেন, মানুষ মূলত দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে একটি হইল কাফির (অবিশ্বাসী), আর অন্যটি মুসলিম বা বিশ্বাসী। এই মুসলিমকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। তাহার একভাগ মুনাফিক, অন্য ভাগ মুসলমান এবং অপর ভাগ মু'মিন। তাঁহার মতে এই মু'মিনরাই হইল মুসলমানদের পূর্ণরূপ। তিনি বলেন, ভারতের মুসলমানরা প্রকৃত মুমিন হিসাবে জীবন নির্বাহ করিতে বিশেষভাবে আগ্রহী। কিন্তু সেই দেশে নানা কারণে তাহারা তাহাদের লক্ষ্য অর্জন করিতে অপারগ থাকিয়া যান। কিন্তু মুসলিম প্রধান বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হওয়া সত্ত্বেও এবং পূর্ণ ইসলামী জীবন যাপনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এখানকার মুসলমানদের মধ্যে তিনি প্রকৃত ইসলামী তমদ্দুন ও তাহযীব দেখিতে পান নাই। ইহা তাঁহার মনকে দারুণভাবে পীড়া দিয়াছে।

ডক্টর ইসলামুল হক ১৯৮৯ সনের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশ ইসলামিক সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষ হইতে খুলনা মহানগরীতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক সেমিনারে যোগ দিতে সপরিবারে বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি সেই বৎসর (১৯৮৯ খৃ.) সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করেন, অতঃপর মালায়েশিয়ায় যান। তিনি সপরিবারে ইরান, পাকিস্তান ও আন্দামান নিকোবর ভ্রমণ করেন। তাঁহারা আন্দামান নিকোবর দ্বীপে দুই মাস ছিলেন। তারপর তাঁহারা মাদ্রাজে আসেন। সেইখানে আসিয়াই ডক্টর ইসলামুল হক গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়েন। তখন তাঁহাকে মুম্বাইতে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ১৯৯৪ সনের ২৬ জুন শনিবার সকাল সাতটায় ইনতিকাল করেন। নিকটবর্তী মুসলিম গোরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

পৃথিবীর সব দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনেক সৎ, বিশ্বস্ত ও জ্ঞানী ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়া ইসলাম সম্পর্কে অনেক জ্ঞান দান করিয়াছেন। ডক্টর ইসলামুল হকের ভূমিকাও অনুরূপ। তিনি দুনিয়ার আরাম-আয়েশ, শান-শওকত, অর্থ-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ-কষ্টের সাধারণ জীবনকেই বাছিয়া লইয়াছিলেন। বহু বৎসরের ধর্ম বিষয়ক গবেষণার ফলে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামই সত্য ধর্ম, মুক্তির ধর্ম ও মানবতার ধর্ম। এই ধর্মে আল্লাহ্ এক, রাসূল এক, পবিত্র কুরআন এক, কলেমা এক এবং মুসলমানরা সবাই এক ও অবিচ্ছেদ্য।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ডক্টর ইসলামুল হক, অনু. এ বি এম কামালুদ্দিন শামীম ও অন্যান্য, সত্য মুক্তি মানবতা, প্রকাশক ঃ রিজওয়ানুল আলম, আই বি আই, ৭৭ মতিঝিল বা/এ ঢাকা, ২য় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ২২-২৮ ও অন্যান্য। (২) দিল্লী হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "নয়া দুনিয়া" ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ খৃ. সংখ্যার বঙ্গানুবাদ, প্রকাশক ঃ ইসলাম প্রচার সমিতি, বাংলাদেশ সিংড়া উপজেলা শাখা, নাটোর, পৃ. ১-১২; (৩) দৈনিক ইনকিলাব, ১ জুন, ২০০০, পৃ. ১০।

মুহাম্মদ ইলাহি বখ্শ

**ইসলাহ** ( اصلاح ) (আ), সংস্কার।

(১) 'আরব বিশ্ব ঃ আধুনিক আরবীতে সাধারণতভাবে ইসলাহ শব্দটি ব্যবহৃত হয় 'সংস্কার' অর্থে [তু. RALA ২১ ঃ (১৩৮৬/১৯৬৬), ৩৫১, নং ১৫]। সাম্প্রতিক ইসলামী সাহিত্যে ইহা বিশেষভাবে সংস্কারবাদ নির্দেশ করে, এই বিশেষ দিকটি উদ্ভূত হইয়াছে মুহাম্মাদ 'আবদুহ-এর মতবাদ সংক্রান্ত শিক্ষা, রাশীদ রিদা-র লেখাসমূহ এবং কতিপয় মুসলিম গ্রন্থকারের রচনাবলী হইতে। শেষোক্ত গ্রন্থকারগণ এই জ্ঞানীদ্বয় দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং তাঁহাদের ন্যায় নিজেদের সালাফিয়্যা (নিম্নে দ্র.) মতবাদের অনুসারী হিসাবে বিবেচনা করিতেন। ইসলাহ-কে নিম্নোক্ত সামগ্রিক শিরোনামের অধীনে আলোচনা করা হইবে ঃ (ক) ঐতিহাসিক ; (খ) মৌলিক নীতিসমূহ ; (গ) প্রধান মতবাদ সম্পর্কিত দৃষ্টিভংগিসমূহ ; (ঘ) ইসলাহ—সমসাময়িক 'আরব বিশ্বে।

(ক) ঐতিহাসিক ঃ (১) পটভূমি। আধুনিক ইসলামী সংস্কৃতিতে অত্যন্ত সুবিস্তৃত ইসলাহ-এর ধারণাটি আল-কুরআন-এর শব্দসমূহের

অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে ص-ل-ح শব্দমূল একটি বিস্তৃত শব্দার্থবিদ্যা বিষয়ক ক্ষেত্র অধিকার করিয়া আছে। কুরআনে ব্যবহৃত এই মূল হইতে উদ্ভূত শব্দাবলীর মধ্যে রহিয়াছে ঃ (ক) ক্রিয়া পদবাচ্য আসলাহা এবং ইহার ক্রিয়ামূল ইসলাহ, সময় সময় ইহা "শান্তির (সুল্‌হ) পথে কর্মতৎপর হওয়া" "সম্প্রীতি আনয়ন করা", "একে অপরের সহিত সহিষ্ণু ও আপোসকামী হইতে জনগণকে আহ্বান করা" এবং "সম্মত হওয়া" অর্থে ব্যবহৃত হয় (তু. ২ ঃ ২২৮, ৪ ঃ ৩৫, ১১৪, ৪৯ ঃ ৯, ১০) এবং অন্য ক্ষেত্রে ইহা 'কোন নেক কাজ করা ('আমাল সালিহ), 'কোন সৎ কাজ সম্পন্ন করা (সালাহ)", "পবিত্র ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করা (সালিহ বহুবচনে সালিহূন/সালিহাত)" অর্থে ব্যবহৃত হয় (তু. ২ ঃ ২২০, ৪ ঃ ১২৮, ৭ ঃ ৫৬, ৮৫, ১৪২ ; ১১ ঃ ৪৬, ৯০) ; কর্তৃবাচক বিশেষ্য মুসলিহ, বহুবচনে মুসলিহূন সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা পুণ্য কাজ সম্পাদন করেন, যাহারা মহৎ প্রাণের অধিকারী, যাহারা শান্তি ও সম্প্রীতি প্রচার করেন, যাহারা তাহাদের প্রতিবেশিগণের নৈতিক উৎকর্ষের ব্যাপারে আগ্রহী এবং মানুষের উন্নতি সাধনে তৎপর। ঠিক এই ধারণার প্রেক্ষাপটে আধুনিক মুসলিম সংস্কারকগণকে মুসলিহ আখ্যায়িত করা যায়। সংস্কারকগণ (মুসলিহূন) সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ পাওয়া যায় (তু. কুরআন, ৭ ঃ ১৭০, ১১ ঃ ১১৭, ২৮ ঃ ১৯)। ইসলাহ-এর অনুসারিগণ নিজেদেরকে ঐ সকল সংস্কারক নবীগণের সরাসরি অনুবর্তীরূপে বিবেচনা করেন যাহাদের জীবনী কুরআনে উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে । তবে তাঁহারা দাবি করেন যে, মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন ও কার্যাবলী তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত করিয়াছে এবং তাঁহাদের মতে তিনি সংস্কারকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম (তু. আশ-শিহাব, মে ১৯৩৯, পৃ. ১৮৩ ঃ মুহাম্মাদ আল-মুসলিহু'ল-আ'জাম)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইসলাহ ইসলামের মূল ভূমিতে সুগভীরভাবে প্রোথিত এবং সেইজন্য ইহা কেবল আধুনিক যুগের প্রারম্ভে মুসলিম বিশ্বে আবির্ভূত একটি বুদ্ধিগত প্রবণতারূপে বিবেচনা করা যায় না।

(২) ইসলাহ-এর ঐতিহাসিক অবিচ্ছিন্ন ধারা ঃ ইসলাহ একদিকে যেমন ইসলামকে ইহার মূল উৎসসমূহ, যথা কুরআন এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সুন্নাহ (দ্র.)-র প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করার একটি ব্যক্তিগত অথবা যৌথ উদ্যোগ, অপরদিকে ইহা এমন একটি পরিস্থিতির লক্ষ্যে সযত্ন প্রচেষ্টা যাহাতে মুসলিম জনগণের জীবন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে, যথার্থভাবে তাহাদের ধর্মনির্ধারিত মূল্যবোধ ও মানের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হয়। ইসলামের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ইসলাহ একটি চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য। বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইসলাহ-এর বিশ্লেষণে এই দ্বিবিধ পদক্ষেপ কুরআনী দৃষ্টিকোণ হইতে সম্পূর্ণভাবে বৈধ। কেননা (ক) ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ হইল হযরত মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক প্রাপ্ত এবং ব্যাখ্যাকৃত আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রত্যাদেশের বিষয় (নিম্নে দ্র. প্রথম সূত্রে প্রত্যাবর্তন)। (খ) সর্বাধিক কল্যাণ ও উন্নতির (আসলাহ) জন্য যত্নবান হওয়া হইতেছে আধুনিক মুসলিম সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার একটি প্রচেষ্টা। এই দৃষ্টিকোণ হইতে ইসলাহ-এর ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, "শুভ কার্যের আদেশ এবং মন্দ কার্যের নিষেধ"—আল-কুরআনের এই অনুজ্ঞার প্রতি বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রায়শ ব্যবহারিক সাড়া প্রদানরূপে (এই বিষয়ের জন্য দুইটি মৌলিক নির্দেশনা দ্রষ্টব্য, কুরআন, ৩ ঃ ১০৪, ১১০)। সংস্কারকগণ সর্ব সময়েই এই ধর্মীয় দায়িত্বের (ফারদ, ফারীদা) প্রতি আহবান জানাইতেছেন। সমাজ প্রধানগণের (ইমাম) জন্য ইহা একটি প্রধান দায়িত্ব। সমাজ সংস্কারকগণ তাঁহাদের কর্মতৎপরতার সমর্থনে এবং ঈমানদারগণের প্রতি আহবানের ক্ষেত্রে বহু ধর্মীয় অনুশাসনের উল্লেখ করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামাজিক অবস্থান ও সামর্থ্য অনুযায়ী সৎ কার্যের আদেশ প্রদান সম্পর্কে নিজ দায়িত্ব পালনে বাধ্য। [মুসলিম শাস্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত প্রমাণ গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য, আল-গাযালী, ইহ্‌য়া' 'উলূমি'দ-দীন, অনুচ্ছেদ ঃ কিতাবু'ল-আম্‌র বি'ল-মা'রূফ ওয়া'ন-নাহ্‌য়ু 'আনি'ল-মুনকার, অনু. L. Bercher, De L'bligation d'ordonner le Bien et d'interdire dle Mal selon al-Ghazali, in IBLA, প্রথম এবং তৃতীয় trim. ১৯৫৫ খৃ. ; H. Laoust-এ নব্য হাম্বালী নীতি (যাহা সংস্কারবাদী শিক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান), Essai sur les doctrines...d'Ibn Taymiya, ৬০৫-৫ ; রিসালাতু'ত্‌-তাওহীদ, পৃ. ১১৩ (ফরাসী অনু. পৃ. ১২১) এবং তাফসীরু'ল-মানার, ৯খ, ৩৬-এ মুহাম্মাদ 'আবদুহ-এর অবস্থান ; প্রশ্নটির সম্পূর্ণ বিবরণ সম্পর্কে রাশীদ রিদা ; ibid, ৪ ঃ ২৫-৪৭, সূরা ৩ ঃ ১০৪ এবং ৫৭-৬৪, সূরা ৩ ঃ ১১০ ; L. Gardet, Dieu et la destinee de l'homme, প্যারিস ১১৬৭ খৃ., পৃ. ৪৪৫ প.]।

সকল মুসলিমই সৎকার্য ও পুণ্য জীবনের (সালাহ) এক আদর্শ মনে পোষণ করেন। তাহাদের সংস্কারকগণও কুরআনের যে সমস্ত আয়াতে "যাহারা ইস্‌লাহ-এর কাজ করে" তাহাদের প্রশংসামূলক বক্তব্য রহিয়াছে সেইগুলির উদ্ধৃতি দান করেন (৬ ঃ ৪২, ৭ ঃ ১৭০, ২৮ ঃ ১৯), বিশেষত ১১ ঃ ৮৮ আয়াতটিকে তাহারা মুসলিম সংস্কারবাদের পূর্ণাঙ্গ নীতিবাক্যরূপে বিবেচনা করেন ঃ إِنْ أُرِيْدُ اِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ "আমি আমার সাধ্যমত ইস্‌লাহ'ই (সংস্কার) করিতে চাহি।" আল-কুরআনের বক্তব্যকে আরও সুস্পষ্ট করিয়া তোলে একটি হাদীছ, যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত মুহাম্মাদ (স) বলিয়াছেন ঃ "ইসলামকে কালক্রমিভাবে সজীব করিতে হইবে এবং প্রতি শতাব্দীতে ধর্মীয় ও নৈতিক পুনর্জাগরণের এই অতি প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের জন্য আল্লাহ উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে প্রেরণ করিবেন" (আবূ দাঊদ, মালাহিম, বাব ১, নং ৪২৯১;" সায়্যিদ আবু'ল-'আলা আল-মাওদূদী, তাজদীদ ওয়া ইহ্‌য়ায়ে দীন, বাংলা অনু. ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ২২-৪, ৩৫-৬)।

ইসলামী মিশনের এই বিশেষ দায়িত্ব পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির অভাব সমাজে কখনও ঘটে নাই। প্রারম্ভিক পর্যায়ে এবং পরবর্তী বিকাশের কালেও ইস্‌লাহ-কে চিহ্নিত করা হইয়াছে। সুন্নাহ-এর অনুসরণের সহিত ইহাকে ইসলামী জীবনধারার উত্তম আদর্শরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল (তু. কুরআন, ৩৩ ঃ ২১ )। একই সঙ্গে ইহা ইসলামের প্রারম্ভিক নিষ্ঠার ভিত্তিমূলের প্রয়োজনীয় মৌলিক তত্ত্বসমূহ সরবরাহ করিতে সক্ষম। নিঃসন্দেহে আধুনিক ইসলাহ-এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হইতেছে পবিত্র কুরআন। তথাপি ইহার সর্বপ্রাথমিক আবির্ভাবে আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহার সম্পূর্ণ আনুগত্য ছিল রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হাদীছে'র উপর। এই সক্রিয় এবং সময় সময় আনুগত্য প্রকাশ পায় সুন্নাহ-এর সমর্থনে এক বিদ'আত (দ্র.)-এর প্রতিরোধে যাহা কুরআনের বাস্তব তথ্য, রাসূলের সন্দেহাতীত শিক্ষা এবং "পুণ্যবান পূর্বপুরুষগণের" (আস-সালাফু'স-সালিহীন) বক্তব্যের সহিত অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত। আহলু'স-সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আতের অনুসারিগণ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে

বিদ্'আ (নিন্দনীয় নব্যধারা)-এর ক্রমবর্ধমান আবির্ভাবের প্রতি সতর্ক ছিলেন ঃ (ক) ধর্মমত সংক্রান্ত ক্ষেত্রে উদীয়মান যুক্তিবাদী ধর্মতত্ত্বের লালিত ধারণাসমূহ [কালাম (দ্র.)], বাতিনী প্রবণতার কু'রআনীয় ব্যাখ্যা; চরম শী'ঈপন্থিগণের মতবাদ এবং (খ) ইবাদতের ক্ষেত্রে, সংসারে অনাসক্তি, অতিমাত্রায় ভক্তি, সূফীবাদ অনুপ্রাণিত কঠোর সাধনা [তাসাওউফ (দ্র.)]। তাহাদের বিশ্বাসমতে এই সকলই একটি অতিমাত্রিক ভাব প্রকাশ করে (গুলূ), যাহা ইসলামী আধ্যাত্মিকতার মূল উপাদানসম্মত নয়। এই সকল নবপরিবর্তন নিন্দনীয়রূপে বিবেচিত হইত। কারণ এইগুলি ভ্রান্তির উৎস এবং প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতার বীজরূপে গণ্য হইত। এইজন্যই বিদ্'আতসমূহকে উম্মাহ-এর নৈতিক এবং রাজনৈতিক সংহতি এবং 'আকাইদ ও বিশ্বাসের ঐক্যের জন্য গুরুতর হুমকিরূপে বিবেচনা করা হইত।

ইসলাহ-এর ঐতিহাসিক বিবর্তনকে আপাত দৃষ্টিতে একটি নূতন চেতনার সহিত সম্পর্কিত করা উচিত যাহা সমাজের সাংস্কৃতিক ক্রমবিবর্তনের সর্বক্ষেত্রে বিদ্'আত-র উৎপত্তিতে সহায়তা করিয়াছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশিকা হইল ঃ (১) সিফ্ফীন (দ্র.) (৩৭/৬৫৭) এবং নাহ্রাওয়ান (দ্র.) (৩৮/৬৫৮) যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক ও নৈতিক সংকট একদিকে খাওয়ারিজ (দ্র.) ও শী'আ (দ্র.) এবং অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের সমর্থকগণের মধ্যে রাজনীতি ও ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে বিতর্কমূলক আলোচনার সূত্রপাত করে। এই বিভেদের আবহাওয়ায় সুন্নীপন্থিগণ সেই মতবাদগুলিকে প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী হিসাবে নিন্দিত করিয়াছেন যেইগুলির প্রবণতা বিভিন্ন মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে (তু. আশ-শাহ্রাসতানী, মিলাল, ১খ, ২৭)। রাসূলুল্লাহ (স)-র সাহাবাগণের কাল অতিক্রান্ত হইতে না হইতে যেই সমস্ত অস্বস্তিকর ধর্মতাত্ত্বিক ভাবধারা পরবর্তীতে বহু শতাব্দী ব্যাপী মুসলিম বিবেককে অশান্ত করিয়াছে তাহার আবির্ভাব ঘটে। (২) প্রথম/সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে মুসলিম সমাজের বিবর্তন যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করে যাহাতে প্রথম দশকসমূহের বিশ্বাসের ঐক্য এবং একত্বের বিরাট প্রত্যয় ক্রমশ প্রতিস্থাপিত হইতে থাকে কু'রআনী ওহী এবং ইহা হইতে উদ্ভূত প্রশ্নসমূহের (তাকদীর এবং স্বাধীন ইচ্ছা, অশুভ সংক্রান্ত সমস্যা, আল্লাহ্‌র গুণাবলী, কু'রআনের প্রকৃতি ইত্যাদি) প্রতি এক বৈচিত্র্যময় বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা দ্বারা। কর্তৃত্বপূর্ণ (অন্ততপক্ষে তত্ত্বগতভাবে) অবস্থান সত্ত্বেও স্বীকৃত সুন্নীবাদ কার্যকরভাবে নব্য বংশধরগণের নৈতিক ও ধর্মীয় আচরণ প্রভাবিত করার মত যথেষ্ট সুসংহত ছিল না। বহুবিধ কারণের (বিশেষত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে) সুন্নী মতবাদ ক্রমশ ইহার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব হারাইতেছিল এবং বিশাল সাম্রাজ্যের বহু বিচিত্র জনরাশির মধ্যে ইহার সামাজিক ভিত্তিমূল ক্রমশ দুর্বল হইয়া আসিতেছিল। সাহাবীগণ এই প্রসঙ্গে ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের প্রধান যাঁহারা "পূণ্যবান পূর্বপুরুষ"রূপে বর্ণিত, তাঁহাদের ভৌগোলিকভাবে দূর-দূরান্তে অবস্থান এবং ক্রমলোপ অত্যন্ত লক্ষণীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ। ইঁহারা ছিলেন প্রধানত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সঙ্গী (সাহাবা) এবং তাঁহাদের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে সর্ববিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ (তাবি'উন)। (৩) আল-হাসান আল-বাস্রী (দ্র.) (মৃ. ১১০/৭২৮) মুসলিম বিশ্বকে বিভক্তকারী বিতর্কসমূহের প্রচারের পূর্বেই সুন্নাহ-এর প্রথম যুগের সমাপ্তি নির্দেশ করিয়াছেন (এই সকল বিতর্ক কু'রআনী ব্যাখ্যা এবং আসমানী কিতাবের স্বাধীন দার্শনিক চর্চা হইতে উদ্ভূত)। আল-হাসান আল-বাস্রী এবং ওয়াসিল ইব্ন 'আতা' (দ্র.) (মৃ. ১৩১/৭৪৮)-এর মধ্যকার বিখ্যাত বিচ্ছেদ নীতিগত বিরোধ ও পরবর্তী সংঘাতের পূর্বাভাস বহন করে। ইহার ফলে অন্যতমরূপে সৃষ্টি হয় "পুণ্যবান পূর্বপুরুষ (তা'ইফাতু'স-সালাফ)" সুন্নাহ্‌র অনুসারী দল (আহ্‌লু'স-সুন্না)। ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল কমবেশী প্রচলিত মতবিরোধী বলিয়া বিবেচিত, বিভিন্ন নব্য সম্প্রদায় ও প্রবণতার (শী'আ, খাওয়ারিজ, জাহ্‌মিয়্যা, মু'তাযিলা ইত্যাদি) বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে (তু. H. Laoust, Schismes, ৮৪ প.)। (৪) আহ্‌মাদ ইব্ন হাম্বাল (র) [মৃ. ২৪১/৮৫৫ (দ্র.)] একটি শক্তিশালী দৃঢ় ভিত্তিক সুন্নীবাদের প্রতিনিধি। ইহারা আদি নিষ্ঠাবাদে সন্দেহ পোষণকারী যে কোন নব্য চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত ছিল (তু. তাঁহার রাদ্দ 'আলা'য-যানাদিকা ওয়া'ল-জাহ্‌মিয়্যা)।

তাহাদের শতাব্দীর ভ্রান্তিসমূহ খণ্ডন করা, ইসলামে "নিন্দনীয় নূতন প্রবর্তন" আনয়নকারী সম্প্রদায়সমূহকে প্রতিহত করা, ঈমানদারগণকে মৌলিক বিশ্বাস ও 'ইবাদতে আবার ফিরাইয়া আনা এবং রাসূলের হাদীছ গঠন ও অনুসরণের মাধ্যমে সুন্না-এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা—এই ছিল সুন্নীবাদের অতি প্রারম্ভিক কাল হইতেই ইসলামের ধর্মীয় ইতিহাসে পর্যায়ক্রমে আবির্ভূত সংস্কারকগণের অধিকাংশের ব্যাকুল বাসনা। রাশীদ রিদা মনে করেন, বংশপরম্পরায় এমন ব্যক্তিগণের আবির্ভাব হইবে যাহারা সুন্নাহ্‌র প্রতিরক্ষায় এবং বিদ্'আত-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ হইবেন (তাফসীর, ৭ ঃ ১৪৩)। প্রতি শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছেন বিশ্বাস ও সুন্নাহ-এর "পুনরুজ্জীবক"গণ (মুজাদ্দিদ দ্র.), তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন 'পঞ্চম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ... ইমাম ইব্ন হায্ম (দ্র), ইসলামের সুপণ্ডিত সপ্তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আহ্‌মাদ ইব্ন তায়মিয়্যা (দ্র.), নবম শতাব্দীর মহান হাদীছ বিশেষজ্ঞ (হাফিজ) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (দ্র.) ... এবং দ্বাদশ শতাব্দীর য়ামানী মুজাদ্দিদ ও প্রখ্যাত ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী আশ-শাওকানীর (১১৭৩-১২৬০/ ১৭৬০-১৮৩৪) ন্যায় ব্যক্তিবর্গ (তাফসীর, ৭ ঃ ১৪৪-৫)। তাঁহাদের প্রত্যেকেই স্বকীয় ধারায় ইসলাহ-এর অবিসংবাদী স্থপতি। এই গৌরবের অধিকারী অপরাপর বহু ব্যক্তির মধ্যে প্রথমেই স্মরণে আসে আল্-গাযালী (র)-কে। তবে রাশীদ রিদা দুঃখের সহিত মন্তব্য করিয়াছেন, এই সকল অতি অসাধারণ ব্যক্তিগণ সাধারণত এই পৃথিবীতে ছিলেন একাকী (গুরাবা')। সমসাময়িক কালের জীবন যাত্রার প্রতি বিরোধিতা করার ফলে একাকী হওয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছাচারী শাসকবর্গের ঔদ্ধত্যের লক্ষ্যে পরিণত হওয়া ও জাগতিক সন্দেহবাদিতা এবং শাসক সমর্থক 'উলামা' এবং তাহাদের সমর্থকগণের শত্রুতার শিকার হইয়াও সংস্কারকগণ সুন্নাহ-র প্রতিরক্ষায় এবং ইহার মাধ্যমে ইসলামের মূল মূল্যবোধকে সংরক্ষণ ও ধারাবাহিকতা রক্ষার কাজে নিজেদের নিবেদিত করিয়াছেন। সুন্নাহ এবং সামাজিক সম্প্রীতির প্রতিরক্ষকগণের সহিত এক স্তরে আবদ্ধ এবং উম্মাহ-র ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সঞ্জীবক সংস্কারক ও সকল মতাদর্শ প্রবণতা ও দলীয় ভাবধারার উর্ধ্বে পুনর্গঠকগণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আধুনিক মুসলিম সংস্কারকগণ তাঁহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের প্রচেষ্টায় রত রহিয়াছেন। [সালাফ-এর যুগ হইতে আধুনিক কালের উদভাস পর্যন্ত ইসলাহ-এর ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য আবু'ল-হাসান 'আলী আল-হাসানী আন-নাদাবী, রিজালু'ল-ফিক্‌র ওয়া'দ-দা'ওয়া ফি'ল-ইসলাম, দামিশ্‌ক ১৩৭৯/১৯৬০ (জালালু'দ-দীন

রুমী ৬৭২/১২৭৩-তে সমাপ্ত ; বাংলা অনু. ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক); 'আব্দু'ল-মুতা'আল আস্-সা'ঈদী, আল-মুজাদ্দিদু ফি'ল-ইসলাম . . . (১০০-১৩৭০ হি.), কায়রো ১৩৮২/১৯৬২; A Merad, Le Reformisme musulman . . . . ২৯ প.; H. Laoust, Schismes]।

(৩) আধুনিক যুগে ইসলাহ ঃ উপরে বর্ণিত ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার অংশরূপে বিবেচনা করিলে ইহা সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, সালাফিয়্যাগণের আধুনিক সংস্কারবাদ ছিল একটি অত্যন্ত অসাধারণ ফলপ্রসূ সময়কাল। ইহার প্রথম আবির্ভাবের বিস্তীর্ণতা, ইহার নিয়োজিত মেধার বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি ইহার প্রচারকগণের কর্ম-উদ্দীপনা এবং 'আরব বিশ্ব, এমনকি ইহার বহু দূর-দূরান্ত ব্যাপী এলাকায় ইহার বিস্তারের তুলনামূলক দ্রুতগতি ইসলাহকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিকাল হইতে ইসলামের বিবর্তনে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনারূপে চিহ্নিত করে। ইহা ছিল পশ্চিমা ভাবধারা ও সভ্যতার প্রভাবের বিরোধিতার ফলে জন্মলাভকারী রেনেসাঁ উদ্ভূত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফল। ইহা হইতে 'আরব প্রাচ্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের পুনর্জাগরণের সূচনা হয়। এই পুনর্জাগরণকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে সক্রিয় কতিপয় শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ ফলরূপে। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রায়শ উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ হইতেছেন ঃ জামালু'দ-দীন আল-আফগানী (দ্র.) (১৮৩৯-৯৭), মুহাম্মাদ 'আবদুহু [দ্র.] (১৮৪৯-১৯০৫) এবং 'আবদু'র-রাহমান আল-কাওয়াকিবী (দ্র.) (১৮৫৪-১৯০২)। অবশ্য এই 'আরব মুসলিম সচেতনতা উন্মেষের পূর্বে কিছু সময় সুপ্ত অবস্থায় ছিল যাহা অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ উপাদানসমূহের সমন্বয়ে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রধান কারণসমূহ হইল (ক) ওয়াহ্হাবী(দ্র.) আন্দোলনের চাপ, যাহার লক্ষ্য ছিল (প্রাথমিকভাবে 'আরবে), ইসলামী নীতিমালা ও ধার্মিকতাকে তাহার পূর্ব পবিত্রতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং "পুণ্যবান পূর্বপুরুষ" (আস-সালাফু'স-সালিহ) (তাহা হইতে সালাফিয়্যা নামকরণ)-এর আদি ইসলামী সামাজিক সংগঠনকে আদর্শরূপে রূপায়ণের এক প্রচেষ্টা। সুন্নাহর ব্যাপারে তাঁহাদের ধারণার সপক্ষে তাঁহাদের উদ্দীপনা (যাহা অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত বিবেচিত হইত), তাহাদের মনোভাবের অনমনীয়তা এবং সময় সময় তাঁহাদের অসহিষ্ণু কঠোরতা সত্ত্বেও ওয়াহ্হাবীগণ কখনও ইসলামের নৈতিক ও রাজনৈতিক নবায়নের প্রয়োজনীয়তা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের স্বধর্মাবলম্বিগণকে ধর্মের (দীন) ব্যাপারে কেবল কুরআন ও সুন্নাহ-র কর্তৃত্ব স্বীকার করার জন্য আবেদন জানান। একই সঙ্গে তাঁহারা মধ্যযুগ হইতে আহরিত কুসংস্কারসমূহ বর্জন করা এবং সেই সময়ে (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ) অত্যন্ত প্রভাবশালী তাকলীদ (দ্র.)-এর চেতনা এবং সামগ্রিকভাবে অদৃষ্টবাদী আত্মসমর্পণের প্রবণতার বিরুদ্ধে তৎপর হওয়ার আহবান জানান। এই সকল প্রচেষ্টার মাধ্যমে এবং ইসলামের বিভিন্ন মূল্যবোধ, বিশেষত জিহাদ (দ্র.)-এর আধুনিকায়নের মাধ্যমে মুসলিমগণকে তাহাদের অতীত গৌরবের সমসাময়িক রাজনৈতিক গতিশীলতায় উদ্বুদ্ধ করিয়া ওয়াহ্হাবীগণ আধুনিক ইসলামের বিবর্তনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই কারণে তাঁহারা "আরব রেনেসাঁ-এর লক্ষ্যে কর্মরত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা অগ্রণী ছিলেন" তাঁহাদের শ্রেণীভুক্ত হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী (L. Massignon, in RMM, ৩৬ খ., ১৯১৮-১৯ খৃ., পৃ. ৩২৫)।

(খ) প্রধানত ছাপাখানা ও প্রকাশনার মাধ্যমে 'আরবী ভাষার ছাপা হরফ-এর বিকাশ। এই প্রসঙ্গে বূলাক (দ্র. মাত'বা'আ)-এ অবস্থিত মিসরীয় মুদ্রণালয়টির অতি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গুরুত্ব সহকারে বিবেচ্য। ১৮২২ সাল হইতে পরবর্তী কাল পর্যন্ত ইহা 'আরব বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হইয়া দাঁড়ায়। মিসরীয় এবং সিরীয়-লেবাননীগণ একটি দায়িত্বসম্পন্ন ও তথ্যবহুল প্রকাশনার উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে এবং ইহা জনগণের সংস্কারপন্থী ও জাতীয়তাবাদী দলের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কামনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাইতে সক্ষম হয় (তু. 'আবদু'ল-লাতীফ আত-তীবাওয়ী, American interest in Syria, ১৮০০-১৯০১, খৃ., অক্সফোর্ড ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ২৪৭-৫৩; Ph. K. Hitti, Lebanon in History[3],নিউইয়র্ক ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ৪৫২-৬৪)।

(গ) পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে 'আরব বিশ্বে য়ুরোপীয় অনুপ্রবেশের প্রভাব খুব শীঘ্রই দেখা দেয়, বিশেষভাবে বুদ্ধিজীবী মহলে [তু. H. Peres, Les premieres manifestations de la renaissance litteraire arabe en Orient au 19e siecle, in AIEO, আলজিয়ার্স (১৯৩৪-৫ খৃ.), ২৩৩-৫৬ ; A. Hourani, Arabic thought (Bibl) ; সমস্যা সম্পর্কে হুসায়ন মু'নিস-এর চোস্ত বক্তব্য La renaissance culturelle arabe, in Orient, নং ৪১-৪২ (১৯৬৭ খৃ.), ১৬-২৭; J. Heyworth-Dunne, An introd. to the hist. of education in modern Egypt[1], লণ্ডন ১৯৩৯ খৃ., পুনঃপ্রকাশ ১৯৬৮ খৃ. ৯৬-২৮৭]।

(ঘ) 'উছমানী শাসনে উদারনৈতিক বিবর্তন ঃ ইহার প্রথম প্রকাশ ঘটে সুলতান প্রথম 'আবদু'ল-মাজীদ (দ্র.)-এর আমলে। তিনি ১৮৩৯ সালের ৩ নভেম্বর এক খাত্তে শেরীফ-এর মারফৎ সংস্কারের (তানজীমাত)-এর এক নূতন নীতির উদ্বোধন করেন। ইহার মাধ্যমেই তাঁহার প্রজাগণ প্রথমবারের মত খলীফা প্রদত্ত নিশ্চয়তার অধীনে নাগরিক স্বাধীনতার অধিকার লাভ করে। প্রাচীনপন্থিগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই সকল পাশ্চাত্য প্রভাবিত সংস্কার গতিশীলভাবে কার্যকর হইতে থাকে, বিশেষত ১৮৫৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারীর খাত্তে হুমায়ূন-এর দ্বারা শেষ পর্যন্ত নিকট প্রাচ্য আধুনিক ভাবধারা ও প্রভাবের জন্য উন্মুক্ত হয় (তানজীমাত ; F. M. Pareja Islamologie, ৩৩৯ প., ৫৮৩)।

(ঙ) প্রাচ্য গির্জাসমূহের গঠনমূলক নবায়ন এবং ইহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিকতা ও ভাবধারার উন্মেষ। (তু. ইউনিয়েট গির্জা বিষয়ক দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাটি সম্পর্কে Joseph Hajjar-এর সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ Les Chretiens uniates du Proche-Orient, প্যারিস ১৯৬২ খৃ.)। ইহার সহিত একই সঙ্গে স্থানীয় খৃষ্ট ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন, ধর্মীয় ও কূটনৈতিক ঘটনাসমূহের সুবিধাজনক সমাবেশকে ধন্যবাদ দেওয়া যাইতে পারে এবং ক্যাথলিক ও সর্বোপরি প্রটেস্ট্যান্ট মিশনসমূহের উদ্দীপনা ইত্যাদি বিষয়েও লক্ষ্য করিতে হইবে। ইসলামী ভূমিতে এই সকল মিশনারী কার্যকলাপ সম্পর্কে RMM ১৬ ঃ (১৯১১ খৃ.)-তে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহ দ্রষ্টব্য ঃ A. la conquete du monde musulman (১ খণ্ড) ; Kenneth Scott Latourette, A

history of the expansion of Christanity, ৬ ঃ The great century (১৮০০-১৯১৪ খৃ.), লণ্ডন ১৯৪৪ খৃ., অধ্যায় ২ (উত্তর আফ্রিকা ও নিকট প্রাচ্য), পৃ. ৬-৬৪ ; A. al-Tibawi, American interests in Syria, পৃ. ৩১৬-২৪)।

এই মিশনারী কর্মতৎপরতা মুসলিম বিশ্বে শুধু একটি প্রতিরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করে নাই, বহু 'আলিম'-এর দৃষ্টিতে ইহা দুইটি দৃষ্টিকোণ হইতে দৃষ্টান্তমূলক ঃ বিশ্বাসের পক্ষে কার্যউদ্দীপনার ইহা একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ এবং ইহার প্রচারিত বক্তব্যের বিষয়বস্তু প্রকৃতভাবেই মূল্যবান। সুতরাং প্রটেস্ট্যান্টগণের অনুকরণে সংস্কারবাদিগণ ধর্মগ্রন্থের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেন, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁহারা কখনই ইসলামের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নবায়নের পথে প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হন নাই। ইহার পাশাপাশি তাঁহারা মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মুক্তির জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং এই লক্ষ্যে তাঁহারা নিরবচ্ছিন্নভাবে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকে জনপ্রিয় করার জন্য প্রচেষ্টা বজায় রাখেন।

এই সকল বিভিন্ন কারণে (ইহাদের অবশ্যই 'প্রাচ্য প্রশ্নে"র সাধারণ আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে) এক বুদ্ধিবৃত্তিক আলোড়ন ক্রমশ উন্মেষ লাভ করে যাহার ফল হইতেছে নাহদা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী সাংস্কৃতিক স্থবিরতার পর 'আরব পুনর্জাগরণ প্রাচ্য সম্পর্কে এক নূতন প্রাণবন্ত বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতুহল জাগাইয়া তোলে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই সেরা 'আরববাসিগণ আধুনিক জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করেন—ইঁহাদের কিছু সংখ্যক অনুবাদের মাধ্যমে, অপরাপরগণ য়ুরোপীয় বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে। এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে য়ুরোপে অবস্থিত 'আরব ছাত্র মিশনসমূহ, নিকট প্রাচ্যে অবস্থিত পাশ্চাত্য বিদ্যালয়সমূহ (ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ) এবং য়ুরোপীয় ধারায় সৃষ্ট বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ। এই বিষয়ে তু. C. Brockelmann, SII, ৭৩০ ; জুরজী যায়দান, তা'রীখ আদাবি'ল-লুগাতি'ল-'আরাবিয়্যা[২], কায়রো ১৯১৪ খৃ., ৪ খ., ১৮৬-২১৭ ; যাকতাজির, হারাকাতু'ত-তারজামা ফী মিস'র খিলালি'ল-কারনি'ত-তাসি' 'আশার, কায়রো ১৯৪৪ খৃ.; J. Heyworth-Dunne-এর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা An introd. to the hist. of education in Modern Egypt; Ph. K. Hitti, Lebanon in History, অধ্যায় ৩১।

'আরব গ্রন্থকারগণের জন্য এই বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপের সহিত একটি ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা যুক্ত হয়। ইহার লক্ষ্য ছিল তাহাদের সঠিক কারণসমূহ নির্ণয় করা এবং স্বাভাবিকভাবেই এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা। আল-'উরওয়াতু'ল-উছকা (১৮৮৪ খৃ.) এবং পরবর্তীতে মানার (১৮৯৮ খৃ. হইতে ক্রমশ) প্রকাশিত গ্রন্থাবলী, বিশেষত রাশীদ রিদা ও মুহাম্মাদ 'আবদুহু-এর প্রবন্ধসমূহের (তু. উদাহরণস্বরূপ পঞ্চম খণ্ডটিতে, ১৯০২ খৃ.), আল-ইসলাম ওয়া'ন-নাস্‌রানিয়্যা মা'আ'ল-'ইল্‌ম ওয়া'ল-মাদানিয়্যা (১৩৬ প.)। এই সামগ্রিক শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধসমূহের (সংকলন) মূল সুর ও বক্তব্য হইতেছে ইহাই। ইহা উম্মু'ল-কু'রা-এরও মূল বক্তব্য যাহাতে আল-কাওয়াকিবী ১৯শ শতকের শেষাংশে মুসলিম সমাজে প্রকটভাবে বিদ্যমান সকল অশুভ বৈশিষ্ট্য এবং ঐ প্রকার শ্রমবিমুখতার (ফুতূর) একটি অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করিয়াছেন (তু. সপ্তম বৈঠক, ১০৯ ff., Passim)। মুসলিম জনগণের "পিছইয়া থাকা" প্রসঙ্গে অপর দুইটি বিবরণী বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য ঃ মুহাম্মাদ 'উমার (মৃ. ১৩৩৭/১৯১৮), হাদিরু'ল-মিসরিয়ীন ওয়া-সির্‌র তা'আখখুরিহিম, কায়রো ১৩২০/১৯০২ ; শাকীব আরসলান, লিমাযা তা'আখ্‌খারা'ল-মুসলিমুন ওয়া লিমাযা তাকমা'দ্দামা গায়রুহুম (কায়রো সং, ১৯৩৯ খৃ.)।

এইভাবে আধুনিক বিশ্বে ইসলামের অবস্থান সংস্কারবাদী লেখনীসমূহে অন্যতম প্রধান বক্তব্য বিষয়ে পরিণত হয়। Ernest Renen-এর L'Islamisme et la Science বিষয়ক বিখ্যাত বক্তৃতা (সোরবোন, ২৯ মার্চ, ১৮৮৩) এবং পরবর্তী সময়ে রিনান ও জামালু'দ-দীন আল-আফগানীর মধ্যে এই সম্পর্কে সৃষ্ট বিতর্কের ফলে (তু. এই বিষয় সম্পর্কে Homa Pakdaman, Djamal-Ed-Din, ৮১ ff.) "ইসলাম বৈজ্ঞানিক চেতনার পরিপন্থী এবং ইহাই মুসলিম জনগণের সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতার মূল হেতু" এই মতবাদ খণ্ডন করা সংস্কারবাদী গ্রন্থকারগণের একটি প্রধান দায়িত্ব হইয়া পড়ে। রাশীদ রিদা'র ভাষায়, "একথা বারবার লিখিতে ও বলিতে বলিতে আমাদের লেখনী ও কণ্ঠ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে যে, মুসলিম জনগণের দুর্ভাগ্যের জন্য তাহাদের ধর্ম দায়ী নয়, বরং দায়ী হইতেছে তাহাদের প্রবর্তিত অবাঞ্ছিত বিদ'আতসমূহ এবং প্রকৃত অবস্থা এইরূপ যে, তাহারা ইসলামকে 'পরিধান' করে একটি পশমী কোটের ন্যায় যাহার অভ্যন্তরভাগ বাহিরে উল্টানো হইয়াছে" (মানার, ৩খ. ১৯০০ খৃ., ২৪৪ )। আরও দ্র. মুহাম্মাদ 'আবদুহু, আল-ইসলাম ওয়া'ন-নাস'রানিয়্যা এবং মুহাম্মাদ ফারীদ ওয়াজদী, তাত্‌বীকু'দ-দিয়ানা আল-ইসলামিয়্যা 'আলা'ন-নাওয়ামিসি'ল-মাদানিয়্যা, কায়রো ১৩১৬/১৮৯৮।

পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহাদের অভিমত প্রতিষ্ঠার পর সংস্কারকগণ তাঁহাদের স্বধর্মীয়গণের মধ্যে এক নূতন চেতনা সঞ্চার এবং জনগণকে ইহার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্থবিরতা হইতে মুক্তি লাভের স্পৃহা জাগাইবার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা সর্বদাই আল-কু'রআনের এই আয়াতটি উল্লেখ করেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা নিজেরাই নিজ অবস্থা পরিতন করে" (১৩ ঃ ১১; তু. আল-'উর্‌ওয়াতু'ল-উছকা, নং ১৭ (সেপ্টে, ১৮৮৪), রাশীদ রিদা কর্তৃক তাঁহার তাফসীরে উদ্ধৃত সম্পাদকীয়, ১০ খ, ৪৬-৫২ ; মুহাম্মাদ 'আবদুহু, রিসালাতু'ত-তাওহীদ, পৃ., ১৭৮ ফরাসী অনু., পৃ. ১২১; রাশীদ রিদা, তাফসীর ১০খ., ৪১-৫, সূরা ৮ ঃ ৫৪ সম্পর্কে)। এই দৃষ্টিকোণ হইতে মনে হয় সংস্কারের চিন্তা কেবল বর্তমান পরিস্থিতি উন্নয়নের (ইসলাহ) লক্ষ্যেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলাহ-এর অনুসারিগণ তাঁহাদের দৃষ্টিতে সংস্কার প্রচেষ্টার বিরোধী সকল গোঁড়া শক্তি (বিশেষভাবে ভ্রাতৃসংঘসমূহ এবং সমাজ গোষ্ঠীর (প্রাচীনপন্থী এবং রক্ষণশীল শক্তি) বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পক্ষপাতী। তাঁহারা একই সঙ্গে প্রাচীনপন্থী শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষামালার সংস্কার এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনকে জনপ্রিয় ও আধুনিক প্রযুক্তি করায়ত্ত করার পক্ষে সমর্থন দান করেন। যেহেতু শেষোক্ত দুইটি ক্ষেত্রে তাঁহাদের নিজস্ব কোন প্রশিক্ষণ ছিল না, সংস্কারকগণের পক্ষে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপকারিতা এবং মুসলিম

জনগণের বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির পক্ষে ইহাদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করা ব্যতীত অপর কিছু করার ছিল না। তবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রচেষ্টার প্রধান ও সক্রিয় অংশ নিয়োজিত করেন নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এবং এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের দখলে ছিল উপযোগী ভাষাজ্ঞান।

সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিবর্তনের (তাকাদ্দুম, তারাক্কী) জন্য সংস্কারকগণের আবেদন কেন্দ্রীভূত ছিল উন্নতি সাধন, সংশোধন, পুনর্গঠন, নবায়ন এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের উপর। এই ক্রিয়াপদগুলি সাধারণভাবে ইসলাহ এই মাসদার-এর বিভিন্ন অর্থ বহন করে (তু. Lane ১/৪ ১৭১৪, ঃ ص-ل-ح)। ইহার পর হইতে ইসলাহ সংস্কারবাদী সাহিত্যের এক প্রকার অনুভূতি আশ্রিত ভাবপ্রবণতায় পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, মুহাম্মাদ 'আবদুহু তাঁহার প্রাথমিক রচনাবলীতেও এই শব্দটিকে বারংবার একটি অনুপ্রেরণা প্রদায়ী ভাবধারার নির্দেশকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন [তু. আল-আহরামে (প্রথম বর্ষ, ১৮৭৬ খৃ. ) প্রকাশিত এবং রাশীদ রিদা কর্তৃক তাঁহার তা'রীখু'ল-উসতাযি'ল-ইমাম-এ উদ্ধৃত তাঁহার প্রথম প্রবন্ধসমূহ, ২খ., ২০, ২২, ৩৪ ; সরকারী পত্রিকা আল-ওয়াকা'ই'উ'ল-মিস্রিয়্যা, ১৮৮০-১ খৃ. (ঐ, পৃ. ১৭৫-৮১)-তে তাঁহার প্রবন্ধসমূহ পর্যালোচনামূলক আল-মানার পত্রিকাতেও (যাহারা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২২ শাওওয়াল, ১৩১৫/১৬ মার্চ, ১৮৯৮ সালে) ইসলাহ শব্দটি সকল ক্ষেত্রে ইহার সকল বৈচিত্র্যমূলক অর্থে বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, আমরা নিম্নোক্ত ব্যবহারসমূহের সন্ধান পাই ঃ আল-ইসলাহু'দ-দীনী ওয়া'ল-ইজতিমা'ঈ ("ধর্মীয় এবং সামাজিক সংস্কার", ১খ., ১৮৯৮, ২) ; ইসলাহ কুতুবি'ল-'ইল্‌ম ওয়া তারীকাতি'ত-তা'লীম (পাঠ্যপুস্তকসমূহের এবং শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সাধন", ঐ, পৃ. ১১) ; ইসলাহ দাখিলিয়্যাতি'ল-মাম্‌লাকা ("সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাবলীর সংস্কার অথবা পুনর্গঠন", ঐ, পৃ. ৭৩৬) ; ইসলাহু'ন-নুফূস ('আত্মশুদ্ধি', ঐ, পৃ. ৭৩৭) ; ইসলাহু'ল-কাদা আসাসু'ল-ইস্‌লাহ ("সার্বিক সংস্কারের ভিত্তিরূপে আইনসমূহের সংস্কার, ঐ) ; ৪০তম সংখ্যার (১৮৯৮ খৃ.) সম্পাদকীয়তে রাশীদ রিদা "খুতবাসমূহের সংস্কারেরও" (ইসলাহু'ল-খিতাবা) আহবান জানাইয়াছেন; ৪২ নং সংখ্যার ৮২২ পৃষ্ঠায় তিনি মুহাওয়ারা ফী ইসলাহি'ল-আযহার ("আযহার-এর সংস্কার সম্পর্কে মতামতের আদান-প্রদান")-এর প্রস্তাব দান করিয়াছেন।

এই কয়েকটি উদাহরণই ইসলাহ-এর ধারণাটির বহু বিচিত্র ব্যবহার সুস্পষ্ট করে। তবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিই বিশেষভাবে সংস্কারবাদী গ্রন্থকারগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয় ঃ

**(ক) শিক্ষণ ঃ** মুসলিম শিক্ষণ ব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রশ্নটি, বিশেষত আল-আযহার-এর উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইহার তাৎপর্য মুহাম্মাদ 'আবদুহু ও রাশীদ রিদার-গ্রন্থসমূহে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে (তু. তা'রীখু'ল-উস্‌তায আল-ইমাম, ১খ, ৪২৫-৫০৭-এ এই প্রসঙ্গে শায়খ 'আবদুহু-এর কার্যকলাপের বর্ণনা)। এই সমস্যাটিকে মসজিদ ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহের পুনর্গঠনের সহিত সংযুক্ত করা যাইতে পারে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা— শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বর্ধিত আয় এবং নূতন ভবনের ব্যবস্থা করিতে পারে (তু. রাশীদ রিদা, পূর্বোল্লিখিত, ১খ., ৬৩০-৪৫; আল-মানার ওয়া'ল-আযহার, Passim)।

**(খ) আইন ঃ** সংস্কারকগণের মন অপর একটি বিষয়ে সার্বক্ষণিক আচ্ছন্ন ছিল। তাহা হইল মুসলিম আইন ব্যবস্থা সংস্কার সাধন [দ্র. এই বিষয়ে মানার-এ প্রকাশিত কতিপয় প্রবন্ধ এবং মুহাম্মাদ 'আবদুহু (মিসরের মুফতী) কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট তাকরীর মুফতী আদ-দিয়ারি'ল-মিসরিয়্যা ফী ইসলাহি'ল-মাহাকিমি'শ-শার'ইয়্যা, কায়রো ১৩১৮/১৯০০ ; তু. এই বিষয়ে তারীখু'ল-উসতাযি'ল-ইমাম, ১খ., ৬০৫-২৯)।

(গ) ধর্মীয় ভ্রাতৃসংঘসমূহ ঃ সংস্কারগণ ভ্রাতৃসংঘসমূহকে সংস্কার করিতে (সম্পূর্ণ অবলুপ্তি না হইলেও) চাপ প্রদানে কখনও ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহাদের মতে সংঘসমূহ—ধর্মীয় জীবনে নিন্দনীয় নব প্রবর্তনসমূহ বজায় রাখা, জনগণকে কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানে উৎসাহিত করা এবং তাহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত (তু. মানার-এ আল-বিদ্'আ ওয়া'ল-খুরাফাত শিরোনামে বিভিন্ন প্রবন্ধ ; রাশীদ রিদা, আল-মানার ওয়া'ল-আযহার, Passim)। মুসলিম শিক্ষা, আইন ব্যবস্থাও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে সংস্কার আনয়নের প্রচেষ্টায় ইসলাহ-এর সমর্থকগণ পূর্ণভাবেই সজাগ ছিলেন যে, তাঁহারা মুসলিম সমাজের ঐতিহ্যগত কাঠামোর প্রতি আক্রমণ পরিচালনা করিতেছেন, তথাপি তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন যে, সমাজকে তাহার অতি প্রয়োজনীয় নব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিশীলতা দানের জন্য এই সকল কাঠামোগত নবায়ন অপরিহার্য ছিল। কিন্তু তাঁহাদের কর্তব্য এই স্থানেই সমাপ্ত হয় নাই। কারণ মুহাম্মাদ 'আবদুহু এবং তাঁহার নিকটতম সমর্থকগণের সমর্থিত ইসলাহ এমন একটি সুবিশাল নবায়ন আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছিল যাহা মুসলিম জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইবে। এইভাবে আমরা তাই দেখি তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বৈষয়িক ক্ষেত্রসমূহে ইসলাহ সম্পাদনের ওকালতি করিতে (যথা ভাষা ও সাহিত্য, বিদ্যালয়সমূহের সংগঠন, শাসন ব্যবস্থা, সামরিক শাসন ইত্যাদি)। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, প্রকৃত 'উলামা' কেবল ধর্মীয় সংস্কারে নিজকে আবদ্ধ না রাখিয়া মুসলিম সামাজিক সংগঠনের সার্বিক উন্নয়নে ও সংস্কারে নিজেকে উৎসর্গ করিবে।

সার্বিক ইসলাহ সম্পন্ন করার এই আহবানের পক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে 'আরব ও মুসলিম বুদ্ধিজীবী মহল মোটামুটিভাবে ভাল সাড়া প্রদান করেন। আল-'উরওয়াতু'ল-উছ্‌কা (১৮৮৪ খৃ.)-র সময়কাল হইতে আল-আফগানী এবং 'আবদুহু ও আল-কাওয়াকিবীর মত গুণসম্পন্ন প্রচারকারিগণের সমবেত প্রচেষ্টা। সুনির্দিষ্টভাবে আধুনিক মুসলিম মননে ইসলাহ-এর ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। এই সময়কাল হইতে 'আরব বিশ্বের কোন বুদ্ধিজীবী সংস্কারবাদী ঘটনাবলী সম্পর্কে অনীহা প্রকাশ করিতে বা নিরুৎসাহিত থাকিতে পারেন নাই [তু. আল-মানার, ১খ., (১৮৯৯ খৃ.), পৃ. ৯৪৯ ঃ আল-ইসলাহু'ল-ইসলামী ওয়া'স-সিহাফা 'আরব এবং তুর্কী সংবাদপত্রে ইসলাহ অন্যতম প্রধান এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পরিণত হইয়াছে, উম্মু'ল-কুরা, ৩]। সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক গভীরভাবে ধর্মনিরপেক্ষ কবি ও গ্রন্থকার ইসলাহ-এর সমর্থকগণের সহিত নিজ নিজ শক্তি যোগ করেন। তাহাদের সহানুভূতি ধর্মীয় আন্দোলনের প্রতি ছিল না, ছিল মুসলিম সমাজ ও সার্বিকভাবে 'আরবগণের জন্য তখন ইহা যে শক্তিশালী, উজ্জীবনী শক্তি প্রকাশ করিতেছিল তাহার প্রতি। তাহাদের জন্য ইসলাহ-এর তাৎপর্য ছিল প্রগতির প্রতি আহ্বানরূপে, নবায়নের এক নব জীবনরূপে এবং

'আরব জাতির জন্য অপেক্ষাকৃত উন্নততর ভবিষ্যতের অঙ্গীকাররূপে। বহু বুদ্ধিজীবীর চোখেই ইহার ধর্মীয় নবায়ন ও নৈতিক পুনর্জাগরণের মৌলিক আহ্বানটি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল ইহার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আংগিকের দ্বারা। ক্রমশ ইসলাহ এক প্রকারের গূঢ় অর্থপূর্ণ কাহিনীর চেহারা প্রাপ্ত হয় যাহা বিশ্বাসী অথবা অবিশ্বাসী, মুসলিম অথবা অমুসলিম, সকলকেই আকৃষ্ট করে, যাহারা তাহাদের নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য সংগ্রামরত ছিলেন [অমুসলিম জগতে ইসলাহ-এর প্রভাব সালামা মূসা প্রমুখের ন্যায় গ্রন্থকারের রচনাতে প্রত্যক্ষ করা যায় ; তু. তারবিয়াত সালামা মূসা, কায়রো ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ৫২ (ইংরেজী অনু, Schuman, The Education of Salama Musa, লাইডেন ১৯৬১ খৃ., পৃ. ৩৫]। এই কারণেই দেখা যায়, ধর্মীয় সংস্কারকগণের (সালাফিয়্যা) সঙ্গে কতিপয় নিবেদিত ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীও ইসলাহ-এর আহ্বানে সাড়া প্রদান করিয়াছেন, যদিও ইহা ছিল সম্পূর্ণভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগিজাত। ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কারবাদী এই স্রোতের সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হইতেছেন ইরাকী কবি জামীল সিদকী আয-যাহাবী (১৮৬৩-১৯৩৬ খৃ.) (দ্র.)। ইনি ধর্মীয় বক্তব্য বিবর্জিত এক শ্রেণীর ইসলাহ-এর সমর্থক ছিলেন (তাহার বিশ্বাসের বহিপ্রকাশ পাওয়া যায় "নাশারতু ফি'ন-নাস আরা'আন উরীদু বিহা/ইসলাহা দুনয়াহুম লা আল-তা'না ফি'দ-দীন")।

ইসলাহ-এর বিস্তারণে একটি সর্বপ্রধান নির্ধারক ঘটনা ছিল 'আরব বুদ্ধিজীবিগণের কমবেশী পাশ্চাত্য সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত তুলনামূলক গ্রহণ ক্ষমতা। সংস্কারবাদিগণ প্রচারক ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নূতন মিত্রের সন্ধান লাভ করে। ইহারা প্রাচীনপন্থীগণের" রক্ষণশীলতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গোঁড়ামীর সমর্থকগণের ক্রিয়াকলাপ (আল-আযহার, আয-যায়তুনা ইত্যাদি), জনসাধারণের অনীহা এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদ্ধতির ধীর গতিতে অতিশয় উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইভাবে মাগরিবের ন্যায় প্রাচ্যেও তরুণ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিগণ সংস্কারবাদিগণের নিকটতম হইতে থাকে। তাহাদের দৃষ্টিতে সংস্কারবাদিগণ ছিল একটি গতিশীল দলের প্রতিনিধি, যাহারা বিভিন্নরূপী বৈদেশিক কর্তৃত্বের মুখে, শিক্ষা, প্রগতি এবং জাতীয় সম্মানের ক্ষেত্রে জনগণের অধিকারের দাবি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে কখনও দ্বিধা করে নাই।

কিন্তু সঙ্গে একই উদারপন্থী সুন্নী গোষ্ঠীর পক্ষ হইতেও ইসলাহ কিছু পরিমাণ সমর্থন লাভে সমর্থ হয়। কমবেশী দূর ভবিষ্যতে সমাজের ইসলাম হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার আশংকায় ভীত এবং মুসলিম ভূমিতে খৃস্টান মিশনারিদের গতিশীল কর্মতৎপরতার মুখে তাহারা এমন একটি নূতন আন্দোলনের জন্মলাভ দর্শনে উল্লিসিত হন, যাহা সুন্নাহ্র প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত এবং বিশ্বাসের প্রতিরক্ষায় দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতি এবং একই সঙ্গে যাহা 'আরব বিশ্বে একটি সামাজিক বিবর্তন এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছে। তথাপি আলোকপ্রাপ্ত সুন্নী এবং প্রগতিশীল তরুণদের মধ্যে ইহা যে গভীর আগ্রহের সঞ্চার করে, তৎসত্ত্বেও ইসলাহ ইহার প্রারম্ভিক কতিপয় বিঘ্নের সম্মুখীন হয়। ইহার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকদর্শনের কারণে ('আরববাদ ও বিশ্ব ইসলামী ভ্রাতৃত্ববাদ-এর প্রশংসা) সূচনা হইতেই এই আন্দোলনটি তৎকালীন 'আরব বিশ্বের অধিকাংশ অংশের কর্তৃত্বের অধিকারী শাসক শক্তিবর্গের (তুরস্ক, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স) সন্দেহভাজন হইয়া পড়ে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার ঘোষিত নীতির ফলে ইহার উপর বর্ষিত হয় শাসক শ্রেণী ও বিভিন্ন মর্যাদার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের (বিশ্ববিদ্যালয়, ম্যাজিস্ট্রেট, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, ভ্রাতৃসংঘসমূহ) শত্রুতা ও অত্যাচার। সকল প্রকার বিদ'আত ধর্মীয় ও অলৌকিক কার্যকলাপ সংক্রান্ত কুসংস্কার এবং পৌত্তলিকতার সমতুল্য (জাহিলিয়্যা) আচরণসমূহের বিরুদ্ধে ইহা যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার প্রচারিত তাওহীদবাদী ধর্মমতে, ইহা বহু প্রকার স্থানীয় জনপ্রিয় ধর্মীয় আচরণকে শির্ক-এর বহিঃপ্রকাশরূপে গণ্য করে এবং এই কারণে ইসলাহ সরকার সমর্থিত চক্রকে ব্যথিত করে। এই একই কারণে জনসাধারণ—যাহারা চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠানসমূহকে অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গরূপে মনে করিত—তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই।

অবশ্যম্ভাবীরূপেই ইসলাহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আক্রমণের সম্মুখীন হয় (তু. রাশীদ রিদা-এর আল-মানার ওয়া'ল-আযহার-এ প্রদত্ত ইসলাহ-এর সমর্থকগণের বিরুদ্ধে আল-আযহারের শিক্ষা ও নীতিমূলক ঐতিহ্যবাদের প্রতিরক্ষিগণের মধ্যে দীর্ঘ কলহের বিবরণ)। যাহাই হউক না কেন, ইহা ছিল রাজনৈতিক প্রতিরোধ ('উছমানী শাসন বিরোধী না হইলেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী) এবং সামাজিক পরিবর্তনের (ঐতিহ্যবাহী মুসলিম সমাজের কাঠামোতে লক্ষীভূত) উদ্দেশ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ একটি আন্দোলন। ইহার লক্ষ্য ছিল আত্মিক ও নৈতিক সংস্কার এবং ইহার আক্রমণের ক্ষেত্র ছিল পবিত্র বলিয়া বিবেচিত কয়েকটি প্রচারক সংগঠন (ভ্রাতৃসংঘ এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহ) ও জনপ্রিয় লৌকিক রীতিনীতির কিছু বিশেষ দিক।

উম্মাহ্-এর মধ্যে একজন শাসনকর্তারও সমর্থনের অভাবে এবং সংস্কারবাদী দলের নৈতিক সমর্থন লাভে অসমর্থ হওয়ার ফলে সালাফিয়্যাগণ এই অভিযোগের সম্মুখীন হইতে থাকেন যে, তাঁহারা পবিত্র সুন্নী ঐতিহ্য পরিবর্তন ও ধ্বংস সাধনে তৎপর। তাঁহাদের উদ্দেশ্যের আন্তরিকতাকে এবং তাহাদের দৃষ্টিতে তাহাদের সংস্কার কর্মের ব্যাপক ইসলামী চরিত্রকে গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিতে তাহাদের অবিরাম সংগ্রামে নিয়োজিত থাকিতে হয়। যাহা হউক, ঐতিহ্যপন্থী সুন্নী অথবা ভ্রাতৃসংঘসমূহের সদস্যগণ কেহই তাহাদের প্রচেষ্টার বৈধতা স্বীকার করিতে আগ্রহী ছিল না (তু. মানার, ১খ., ৮০৭, ৮২২ ; বিরোধিগণ কর্তৃক আক্রান্ত রাশীদ রিদা ; রাশীদ রিদা, তা'রীখু'ল-উসতাযি'ল-ইমাম, Passim ঃ মিসরের মুফতী থাকাকালীন মুহাম্মাদ 'আবদুহু যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছিলেন; জাফির আল-কাসিমী, জামালুদ-দীন আল-কাসিমী, পৃ. ৫৯৪ ; রাশীদ রিদাকে প্রদত্ত দামিশ্ক-এর 'উলামা' স্বরূপ অভ্যর্থনা, ৬০৩-৪ ; সিরিয়াতে সালাফিয়্যাগণের সাফল্যের অভাব ; A. Merad, Le Reformisme musulman . . . Book I : the resistance of Algerian sunnism and Brotherhoods to reformist Propaganda)।

ওয়াহ্হাবীগণের প্রচলিত মত বিরোধী মতবাদকে "বিভ্রান্তির পথ" (দালালা)-রূপে অথবা মুসলিম সমাজকে ধর্মনিরপেক্ষকরণের পথে কমবেশী অনুকূল প্রগতিশীল ধারার সহিত সমন্বিতকরণরূপে যেভাবেই উপস্থাপন করা হউক না কেন, সালাফিয়্যা আন্দোলন আলজিরিয়া ও তিউনিসিয়ার ন্যায় মিসর ও সিরিয়াতেও প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। ইহার বিরোধিগণ ইহাকে সুন্নাহ্র নামে প্রত্যাখ্যান করে, তাহাদের দৃষ্টিতে যাহা চিরায়ত সুন্নীবাদ ব্যতীত অপর কোন গঠন বা রূপ ধারণ করিতে

পারে না। ইস্‌লাহ -এর প্রকৃত অর্থ আমাদের বোধগম্য হয় যখন আমরা ইহার মৌল নীতিসমূহ এবং ইহার প্রধান মতবাদগত পদ্ধতিসমূহ পর্যালোচনা করি।

(খ) **মৌলিক নীতিসমূহ** ঃ উৎপত্তিগত দিক হইতে ইস্‌লাহ একটি ধর্মীয়ভাবে অনুপ্রাণিত আন্দোলন। তথাপি আন্দোলনটির মূলসমূহ পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, ইহার প্রবক্তাগণের প্রদত্ত যুক্তিসমূহে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সুরের তুলনায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুরই অনেকাংশে শক্তিশালী ও সুগভীরভাবে প্রতিধ্বনিত। সর্বপ্রথম সংস্কারবাদী ঘোষণাপত্রসমূহে মুহাম্মাদ আবদুহু-এর প্রবন্ধসমূহ (এবং আল-আফগানী-এর) যাহা আল-'উরওয়াতু'ল-উছ্‌কা (১৮৮৪ খৃ.) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—ধর্মীয় বিবেচনার তুলনায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক, এমনকি রাজনৈতিক বিবেচনাসমূহ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আল-কাওয়াকিবী তাঁহার উম্মু'ল-কুরা এবং তাবা'ই'উ'ল-ইস্‌তিবদাদ-এ একই প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন। রাশীদ রিদা তাঁহার আল-মানার পর্যালোচনার প্রাথমিক পর্যায়ে (১৮৯৮ খৃ.) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নসমূহের প্রতি গভীরভাবে মনোযোগী হইয়াছিলেন।

তাঁহার শিক্ষকগণের ন্যায় তিনিও মুসলিমগণকে এই মর্মে উদ্বুদ্ধ করিতে সচেষ্ট হন যে, তাহাদের নৈতিক ও বস্তুবাদী অবস্থার উন্নয়ন সম্পূর্ণভাবেই ইসলামের পুনর্জাগরণের উপর নির্ভরশীল। ইহা অর্জন করিতে হইবে "মূলনীতিসমূহে প্রত্যাবর্তনের" দ্বারা। ইহা ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধকে তাহার পূর্ণ সমৃদ্ধি ও প্রামাণিকতায় পূর্ণ আবিষ্কারের জন্য প্রয়োজনীয়। পরবর্তীতে সংস্কারবাদী বিতর্ক সম্পূর্ণভাবেই এই মূল ভাবধারার সহিত সংযুক্ত ছিল।

মূলনীতিসমূহে প্রত্যাবর্তন ঃ মূলনীতিসমূহে প্রত্যাবর্তনের (রুজূ') প্রতিপাদ্যটি সংস্কারবাদী সাহিত্যের সর্বত্র বিরাজমান। ইসলামের প্রারম্ভিক কালের প্রতি এই সার্বক্ষণিক নির্দেশনা ইস্‌লাহ -এর একটি অত্যন্ত লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এবং এই কারণে সালাফিয়্যা সংস্কারকগণকে মাঝে মাঝে "অতীতের প্রতি আসক্তির" অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। ইস্‌লাহ মতবাদে মূলনীতিসমূহে প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন করা হইয়াছে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রকৃতির যুক্তির মাধ্যমে। শেষোক্তটি কুরআন হইতে গৃহীত যাহা নিম্নোক্তভাবে সারসংক্ষেপ করা যায় ঃ ইসলাম সম্পূর্ণভাবেই তাহার ধর্মগ্রন্থের বর্ণিত (কুরআন ৫ ঃ ৩, ৬ ঃ ৩৮) ; আল্লাহ্‌র অনুপ্রেরণায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ হইতেছে (৫৩ ঃ ৩, ৪) প্রত্যাদেশসমূহের স্বাভাবিক পরিপূরক। ধর্ম কেবল আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের নিকট হইতেই গ্রহণ করা সম্ভব (৪ ঃ ৫৯), আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তদীয় রাসূল (স) কর্তৃক বর্ণিত সকল আদেশ এবং নিষেধ সকল মুসলিমের পক্ষে অবশ্য পালনীয় (৫৯ ঃ ৭)। ফলত সংস্কারবাদিগণের জন্য ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ততার পূর্ণ প্রমাণ নির্ধারণ করা হয় ওহী এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ এই দুইটি উৎসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে।

একটি ঐতিহাসিক হাদীছ দ্বারা সমর্থিত ধর্মীয় যুক্তিটি প্রকৃতপক্ষে মালিক ইব্‌ন আনাস (র) (মৃ. ১৭৯/৭৯৫ (দ্র.)-এর প্রতি আরোপিত একটি নীতিবাক্য ঃ "এই সমাজের পরবর্তী সফলতাসমূহ উদ্ভূত হইবে শুধু সেই সকল মৌলের মাধ্যমে যাহা ইহার প্রাথমিক সাফল্যের পশ্চাতে বিদ্যমান ছিল" (لايصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها)। এখন আমরা জ্ঞাত হই যে, 'আরবগণের ঐতিহাসিক সফলতার বাস্তব ভিত্তি ছিল প্রামাণিক সূত্রে প্রাপ্ত এবং সম্পূর্ণভাবে গৃহীত ইসলাম (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ; তু. রাশীদ রিদা, তাফ্‌সীর, ১০খ, ৪৩৭, ১১ খ., ২১০ (গুরুত্বপূর্ণ), (৯খ., ২৯৩ ; শিহাব, মার্চ ১৯৩৯ খৃ., পৃ. ৫৮)। তাঁহাদের পূর্বগামিগণের (সালাফ) ন্যায় বর্তমান কালেও মুসলিমগণ পার্থিব শক্তি (সিয়াদা) অর্জন এবং নৈতিক কল্যাণ-এর সুখ (সা'আদা) উপলব্ধি করিতে পারেন। ইহার জন্য প্রয়োজন নিজেদের সেই সকল নৈতিক বিশ্বাসের দ্বারা শক্তিশালী করা যাহা সালাফ-এর শক্তি ও মহত্ত্বের ভিত্তি ছিল। একই সঙ্গে তাঁহারা সমসাময়িক মুসলিম সমাজকে বিশ্বাসের মূল্য এবং ইসলামের সার্বিক শিক্ষা ইহার প্রামাণিক বিশুদ্ধতায় ব্যাখ্যা করিতে সচেষ্ট হইবে (তু. রাশীদ রিদা, তাফসীর, ২খ., ৩৩৯-৪১, ১০খ, ২১০ ; A. Merad, Le Reformisme Musulman, ২৮৭ ff.)। এই প্রামাণিক সূত্র প্রকৃতপক্ষে কি ? সংস্কারকগণের উত্তরটি অত্যন্ত সাধারণ ও সুস্পষ্ট। কুরআন এবং সুন্নার মধ্যেই নিহিত আছে ইসলামের সম্পূর্ণতা, ইহার সহিত সালাফ-এর ঐতিহ্য সংযুক্ত করা যাইতে পারে শুধু পথ প্রদর্শকরূপে, কোনরূপেই অনুশাসনিক উৎসরূপে নয়। মৌলিকভাবে এই অবস্থানটি ঐতিহ্যগত সুন্নীবাদের অবস্থান হইতে পৃথক নয়। এই প্রসঙ্গে চিরায়ত মতবাদ এবং ইস্‌লাহ -এর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে তিনটি মূল সূত্রের প্রত্যেকটির সংস্কারবাদী ব্যাখ্যার দ্বারা ঃ

(১) কুরআনের সূত্র ঃ এই বিষয়ে নীতিগতভাবে ইস্‌লাহ এবং সালাফ-এর অবস্থান একই। এই কথা কুরআন-এর প্রকৃতি সূত্ররূপে ইহার মর্যাদা এবং ইহা ব্যাখ্যা ধারা পদ্ধতি সম্পর্কে সত্য।

(ক) ইস্‌লাহ কুরআনকে চিহ্নিত করিয়াছে আল্লাহ্‌র চিরন্তন বাণীরূপে, যাহা অসৃষ্ট, পরম পবিত্র এবং অপরিবর্তনীয় (কুরআন, ৪১ ঃ ৪২, ১৫ ঃ ৯) এবং ইহার বাণীর সার্বজনীনতা ও চিরস্থায়িত্ব সুদৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে (৩৪ ঃ ২৮, ৬ ঃ ৯০, মানার, ১খ, ১ ; রাশীদ রিদা, তাফসীর, ২খ, ১৬৩, ৩খ, ২৮৯)। "চিরন্তন ও অসৃষ্ট কুরআন"-এর মতবাদকে অত্যন্ত সুদৃঢ়রূপে স্বীকার করিয়া ইহা আশ'আরীগণের সমন্বয়ী ভাবধারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কারণ ইহা সালাফ-এর অবস্থান সরলভাবে পুনঃসমর্থন করে না (তু. রাশীদ রিদা, তাফসীর, ৯খ, ১৭৮)। এই কারণেই সালাফিয়্যাগণ তাঁহাদের সমসাময়িক যুগের মুসলিমগণকে কুরআনের একটি নিজস্ব ও মৌলিক ব্যাখ্যা সরবরাহ করিতে পারে নাই ; যদিও এই সময়ে ইসলামে যুক্তিবাদের প্রতি আনুকূল্য ফিরিয়া আসিয়াছিল (তু. R. Caspar, Le renouveau du Mo'tazilisme, in MIDEO, ৪খ., (১৯৫৭ খৃ., ১৪১ ff.) এবং যদিও কতিপয় সমসাময়িক মুসলিম গ্রন্থকার এবং য়ুরোপীয় প্রাচ্যবিদগণের সীরাঃ-এর আলোকে প্রদত্ত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে আমরা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞান অর্জন করি। অতীতের প্রতি এবং সালাফের বক্তব্যের প্রতি যাহা সময় সময় নেতিবাচক—বিশ্বস্ত থাকার অদম্য ইচ্ছা ইহাদের মতবাদকে নিশ্চল করিয়া দেয় এবং ইহার ফলে তাহারা ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক আবিষ্কারসমূহ সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞান অর্জনে ব্যর্থ হয়, অন্যথায় এই জ্ঞান তাহাদের জন্য ওহী ও আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রেরণার সহিত সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহ উপলব্ধি করিতে সহায়তা করিত [ওহী (দ্র.)-এর সম্পর্কে তু. রাশীদ রিদা-এর সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য, তাফসীর, ১১খ, ১৪৬-৯৪ ; ইহাতে তিনি পুনরায় দৃঢ়ভাবে প্রত্যাদেশকে "আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রেরিত" বলিয়া ব্যক্ত

করেন। তিনি হাদীছের ব্যাখ্যার বিপরীত কোন ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করেন নাই। ইহার জন্যই তিনি এ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থকার, বিশেষত E. Dermenghem (in La Vie de Mahomet, প্যারিস ১৯২৯ খৃ., অধ্যায় ১৮)-এর প্রকাশিত ধারণাসমূহকে সুদীর্ঘভাবে খণ্ডন করিয়াছেন (ঐ, পৃ. ১৬৯-৭৮)]।

কু'রআন-এর প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ 'আবদুহু তাঁহার রিসালাতু'ত-তাওহীদ-এর মৌলিক সংস্করণে প্রচলিত ধর্মমত ছাড়িয়া আরও দূরে যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন (বূলাক ১৩১৫/১৮৯৮)। এই বিশেষ বিষয়ে রাশীদ রিদা কর্তৃক পরিশুদ্ধিসহ (২য় সং, কায়রো ১৩১৬/১৯০৮) মূল পাঠটি (পৃ. ২৮, ফরাসী অনু., পৃ. ৩৩, ১, ২ হইতে ৩৪, ১.৪) এখন পুনরায় মাহমূদ আবূ রায়্যান-এর প্রস্তুত রিসালাতু'ত-তাওহীদের সংস্করণটিতে পাওয়া যায় (কায়রো ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৫২-২)। রাশীদ রিদা নিজেও সজোরে কুরআন-এর পবিত্রতা ও প্রত্যাদিষ্ট চরিত্র সমর্থন করিয়াছেন (তাফসীর, ১খ., ১৩২-৩, ২২০, ৬খ., ৭১, ৮খ., ১০, ২৮০, ৩০৩, ৯খ., ১৭৮, ১২খ., ৪৯৯) এবং সম্পূর্ণভাবেই ইহার যে কোন যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। শিহাব-এর কুরআনী পর্যালোচনায় এবং ইব্ন বাদীস-এর অন্যান্য রচনাবলীতে তাঁহার এই একই অবস্থান সুস্পষ্ট ঃ "কু'রআন হইতেছে আল্লাহ্‌র বাণী এবং তাঁহার প্রত্যাদেশ" (জানুয়ারী ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ৫৫)।

(খ) কুরআন ধর্মীয় অনুশাসনের প্রাথমিক উৎস ঃ পবিত্র কু'রআন হইতেছে "ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ" (আসাসু'দ-দীন, তাফসীর, ১খ., ৩৬৯, ৭খ., ১৩৯, ১৯৮, ৯খ., ৩২৬ ; ইব্ন বাদীস, শিহাব, ফেব্রু. ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ৯৫) ; ইহার চেয়েও বেশী, প্রকৃতপক্ষে ধর্মের সকল সমৃদ্ধতা ইহার মধ্যে নিহিত— বাল হুওয়া'দ-দীন কুল্লুহু (তাফসীর, ৬খ., ১৫৪-৬৭, ৭খ., ১৩৯, ১৮৯, ৯খ., ৩২৬)। কু'রআন-এর প্রত্যাদেশের মাধ্যমে, আল্লাহর ঘোষণা মুতাবিক ধর্মের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে "আজ আমি তোমাদের দীন (ধর্ম) পূর্ণ করিলাম . . . . (৫ ঃ ৩)। রাশীদ রিদা ব্যাখ্যা করিয়াছেন ("ইব্ন 'আব্বাস এবং সালাফ-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মতামত"-এর প্রেক্ষিতে), এই ক্ষেত্রে দীন বলিতে যাহা বুঝানো হইয়াছে তাহা নিম্নরূপঃ বিশ্বাস ('আকাইদ), আইনানুগ নির্দেশাবলী (আহ'কাম) এবং নৈতিক বিষয়সমূহ" (আদাব) (তাফসীর, ৬খ., ১৬৬ পৃষ্ঠার পাদদেশে দ্র.)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কুরআন হইতেছে ধর্মের সর্বোৎকৃষ্ট উৎস। অধিকন্তু, নমুনারূপে ইহার মধ্যে সমাজের ঐতিহাসিক জীবনকালের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কিছুই রক্ষিত আছে। ১৭ ঃ ১২ আয়াতের সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া ইব্ন বাদীস সমাপ্তিতে বলেন, "দুই জগতে সুখ লাভের জন্য আল্লাহ্‌র বান্দাগণের যাহা কিছু প্রয়োজন হইতে পারে অর্থাৎ পরম সত্য বিশ্বাস, শক্তিশালী নৈতিক সদগুণ, ন্যায় আইন এবং মহৎ মানসিকতা, এ সকলই কুরআনে পরিষ্কারভাবে বিধৃত রহিয়াছে (শিহাব, ডিসেম্বর ১৯২৯-জানুয়ারী ১৯৩০ খৃ., পৃ. ৭)। মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনে এবং ইহার কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে, কু'রআন কেবলমাত্র সামগ্রিক নির্দেশনা প্রদান করিয়াছে এবং সমাজের আইনানুগ কর্তৃপক্ষের (উলু'ল-আম্র) হাতে, মুসলিমগণের স্বার্থের পক্ষে (মাসলাহা) ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়াছে [তু. মানার, ৪খ, (১৯০১ খৃ.), ২১০ ; তাফসীর, ৩খ, ১০-১, ১২ (গুরুত্বপূর্ণ), ৪খ., ১৯৯-২০৫ (গুরুত্বপূর্ণ), ৬খ., ১২৩, ৭খ., ১৪০-১, ১৯১, ১১খ, ২৬৪]। কু'রআন হইতেছে ইসলামের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ এবং তাই ইহার উপলব্ধি (এবং পরিণতিতে ইহার ব্যাখ্যা) সংক্রান্ত সমস্যাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ওহী যেভাবে উপলব্ধি করা হইবে, সেভাবেই ইহার মর্মবাণী বাস্তবে রূপান্তর লাভ করিবে।

(গ) পবিত্র কু'রআন-এর ব্যাখ্যাসমূহ ঃ ভাষাগত দিক হইতে কু'রআন-এর বক্তব্যকে দুই শ্রেণীতে উপস্থিত করা যাইতে পারে (তু. ৩ ঃ ৭)। অধিকাংশ আয়াত অর্থের দিক হইতে স্ব-ব্যাখ্যাকারী (মুহ'কাম) এবং ইহারা ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না। কিন্তু কতিপয় আয়াত কিঞ্চিত অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করিতে পারে (মুতাশাবিহ দ্র.), বিশেষত যদি ইহাদের আপাত ভাবকেই গ্রহণ করা হয়। এই ক্ষেত্রে ঈমানদারগণ আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশসমূহ যেইভাবে উপস্থাপিত (ইমরার) হইয়াছে সেইভাবে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করিবে, ইহাতে নিহিত সত্যের প্রতি তাহাদের আস্থাশীল বিশ্বাস প্রদর্শন করিবে, যে সত্য তাৎক্ষণিকভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আক্ষরিক বাণীকে অতিক্রম করে (তু. তাফসীর, ৮খ., ৪৫৩, ১০খ., ১৪১)। যেহেতু শুধু আল্লাহ তা'আলাই মুতাশাবিহ-এর প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত, মু'মিনগণের তাই এই সম্পর্কে তাঁহার উপর দায়িত্বভার অর্পণের মত এবং বিনয়ের অধিকারী হইতে হইবে (তাফবীদ, তাসলীম)। মুহাম্মাদ 'আবদুহু-এর দৃষ্টিতে এইরূপ বিশ্বাস একটি অনুশাসনিক বাধ্যবাধকতার মূল্য পরিগ্রহণ করে ( তাফসীর, ১খ., ২৫২)। রাশীদ রিদা এবং ইব্ন বাদীস-এর দৃষ্টিভঙ্গিও একই প্রকারের (তু. তাফসীর, ৩খ., ১৬৭, ৪খ., ২৫৬, ৭খ., ৪৭২, ৮খ., ৪৫৩, ৯খ., ৫১৩, ১০খ., ১৪১, ১২খ., ৩৭৮ ; হিসাব, জানুয়ারী ১৯৩৪ খৃ., ৬ জুন ১৯৩৯, পৃ. ২০৬)।

কু'রআনী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সংস্কারবাদী মতবাদকে ইহার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা (তা'বীল দ্র.) এবং বিশদ ব্যাখ্যা (তাফসীর দ্র.)-এর প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইস'লাহ ব্যক্তিগত রুচি বা মত অনুসারে ব্যাখ্যার তীব্র নিন্দা করিয়াছে। কারণ ইহা আক্ষরিক অর্থের পরিবর্তে 'লুক্কায়িত' ভাব এবং দৃশ্যমান প্রতিচ্ছবির অতিরিক্ত কম-বেশী প্রমাণহীন প্রতীকী ভাব বিশ্লেষণের দাবি করে। ৩ ঃ ৭ আয়াতের প্রেক্ষাপটে রাশীদ রিদা সুস্পষ্টভাবে সংস্কারবাদিগণের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করিয়াছেন (তাফসীর, ৩খ., ১৬৬)। তা'বীল হইতেছে বিদ'আ-এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ (প্রাগুক্ত, ১০খ., ১৪১)। ইহাকে সুন্না অথবা সালাফ-এর বর্ণনা-এর কোনটির মাধ্যমেই যথার্থরূপে প্রমাণ করা যায় না। সালাফগণ কুরআনের অনিশ্চিত অর্থবোধক আয়াতসমূহের (মুতাশাবিহ)ব্যাখ্যা পরিহার করিয়া তাঁহাদের নিজস্ব উপলব্ধির উপর নির্ভর করিয়াছেন (দ্র. মুহাম্মাদ 'আবদুহ, রিসালাতু'ত-তাওহীদ, পৃ. ৭, ফরাসী অনু., পৃ. ৪)। তা'বীল সম্পর্কে সালাফিয়্যাগণের অবিশ্বাস ও সন্দেহ ছিল সকল দৃঢ় ও মরমী ব্যাখ্যা এবং যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের প্রবক্তাগণের ব্যাখ্যা সম্পর্কে। তু. তাফসীর, ১খ., ২৫২-৩, ৩খ., ১৭২-৬ ঃ তা'বীল প্রসঙ্গে ইব্ন তায়মিয়া হইতে দীর্ঘ উদ্ধৃতিসহ সংস্কারবাদী মতবাদের ব্যাখ্যা ; "বিদ'আতপন্থী ব্যক্তিবর্গের" (জাহ্‌মিয়্যা, কাদারিয়্যা খাওয়ারিজ, বাতিনিয়্যা বাবিয়্যা, বাহা'ইয়্যা ইত্যাদি) প্রবণতাপূর্ণ ব্যাখ্যাসমূহের সমালোচনা, ৯খ, ১৩১-২, বাতিনিয়্যাদের "প্রচিলিত মত বিরোধী" ব্যাখ্যাসমূহ এবং চরমপন্থী সূফীবাদ ; ৪খ., ১৯১ ; এই সকল ব্যাখ্যা একেকটি এক এক সম্প্রদায়ের প্রতি সমর্থনমূলক ছিল এবং প্রত্যাদিষ্ট বক্তব্যের একটি মনগড়া ব্যাখ্যা

প্রদান করে। ইহাকে বলা হয় তাহ্রীফ (দ্র.) এবং কুরআনে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। 'কিতাব-এর অধিকারীদের (আহ্লু'ল-কিতাব) প্রতি আধুনিক সংস্কারকগণ ইহা ব্যবহার করিয়াছেন দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদানকারিগণকে কলংকিত করিতে (তু. তাফসীর, ১খ, ৪৩০, ৪খ., ৯৭, ২৮৭, ৭খ., ৫০৬; শিহাব, সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ৩৪৪-৫)। তাহ্রীফ-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বিভিন্ন ছদ্ম পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবরণীসমূহ, যাহা মূল পাঠকে ইসরা'ঈলিয়্যাত (দ্র.)-এর রীতিতে "মিথ্যা কিংবদন্তী" (আবাতীল ওয়া খুরাফাত) দ্বারা সজ্জিত করে এবং যাহাকে সংস্কারবাদী গ্রন্থকারগণ বারংবার নিন্দিত করিয়াছেন (তু. তাফসীর, ১খ., ৮, ১৮, ৩৪৭, ২খ, ৪৫৫, ৪৭১, ৪খ., ৪৬৬, ৬খ., ৩৩২, ৩৫৫-৬, ৪৪৯, ৯খ., ১৯০, ৪১৪, ১০খ., ৩৮৪, ১১খ., ৪৭৪ ; শিহাব, জুলাই ১৯৩ খৃ., পৃ. ৩৫৪) অজ্ঞেয় বিষয় (গায়ব দ্র.) সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কুরআনী আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধেও একই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে (তু. তাফসীর, ১খ., ২৫২, ৩খ., ১৬৬ ff., ৪খ., ২৫৪ ff., ৩খ. সম্পর্কে ১৭৩ পৃ., ৯খ., ৫১৩, শিহাব, অক্টোবর ১৯৩০ খৃ., ৫৩৪, জানুয়ারী ১৯৩৪, পৃ. ১-৯)।

সংস্কারবাদী ব্যাখ্যা তা'বীলকে বর্জন করিয়া সরল ব্যাখ্যা তাফসীর-এর দিকে প্রবণতা দেখাইয়াছে। ইহার মতে কিছু রহস্যপূর্ণ কতিপয় আয়াত ব্যতীত বিশেষভাবে আল্লাহ্র গুণাবলী, সিফাত এবং ভবিষ্যত জীবনের অবস্থা [আহ্ওয়ালু'ল-আখিরা] সম্পূর্ণ কুরআন সমসাময়িক মুসলিমগণের জন্য সহজেই অনুধাবনযোগ্য, যেমন ইহা ছিল সালাফ-এর জন্য। এইভাবে তাফসীর প্রণয়নের কাজকে পুরুজ্জীবিত করা হইয়াছে। ঐতিহাসিক কাহিনীমূলক আবরণ এবং প্রধানত ব্যাকরণ ও আলংকারিক প্রকৃতির ভাষ্য হইতে মুক্ত হইয়া তাফসীর কুরআনের পঠন ও অনুধ্যানে সহায়ক একটি ব্যবস্থায় পরিণত হয়। তাঁহাদের ধারণায় যে সমস্ত ভাষ্যকার প্রাথমিকভাবে তাফসীরের নীতি শিক্ষামূলক বিষয়ের দিকে আগ্রহী ছিলেন, তাঁহারা মুসলিম এবং তাঁহাদের পবিত্র গ্রন্থের মধ্যে একটি অন্তরাল (হিজাব) সৃষ্টি করিয়াছেন (তাফসীর, ৩খ., ৩০২)। সংস্কারবাদিগণের মতে, তাফসীর-এর প্রধান লক্ষ্য হইতেছে আধ্যাত্মিক নির্দেশনা (হাদ্য়ি) এবং নৈতিক মূল্যবোধকে পরিস্ফুট ও বর্ণনা করা, যাহা ধর্মীয় আবেগকে সঞ্জীবিত করিবে ও মুসলিমগণের ভক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবে (প্রাগুক্ত, ১খ., ২৫)। ইহাকে এমন একটি প্রতিপাদক বিদ্যা মনে করা উচিত নয় যাহা বৈজ্ঞানিক ও পরীক্ষণীয় সত্য প্রতিষ্ঠা এবং যুক্তিবাদের ও যুক্তিবাদের প্রতি লালায়িত আধুনিক মননকে সন্তুষ্ট করিবে। সংস্কারবাদী ভাষ্যকারগণ (বিশেষভাবে রাশীদ রিদা এবং ইব্ন বাদীস) কোনভাবেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হন নাই এবং একটি মাত্র ক্ষেত্র ব্যতীত কখনওই তাঁহাদের যুগে সুপ্রচলিত আপোসের পথে অগ্রসর হন নাই [ তু. MIDEO, ৫খ. (১৫৮ খৃ.), ১১৫-৭৪-এ তানতাবী জাওহারী (১৮৬২-১৯৪০ খৃ. )-এর বিশেষ ঘটনা ]। পরিণতিস্বরূপ রাশীদ রিদা ফাখরু'দ-দীন আর-রাযী (দ্র.) কর্তৃক তাঁহার সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক সংহতির আবেদনের দ্বারা তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যটি অনাবশ্যকভাবে ভারাক্রান্ত করার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি অনুরূপ প্রবণতার জন্য সমসাময়িক ভাষ্যকারদের মধ্যে যাহারা আপাত দৃষ্টিতে এত বেশী বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তাহারা তাহাদের তাফসীরের পাঠকবর্গকে প্রত্যাদেশ-এর লক্ষ্যবস্তু হইতে দিকভ্রষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহাদেরও নিন্দা করিয়াছেন (তাফসীর, ১খ., ৭৫)। উপরন্তু কুরআনে উল্লিখিত এবং বাইবেলে বর্ণিত কাহিনীসমূহ সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করিতে গিয়া রাশীদ রিদা মুহাম্মাদ 'আবদুহুকে উদ্ধৃত করিয়া, ঈমানদারগণের মধ্যে যাহারা এই রকম ধারণা সৃষ্টি করিতে আগ্রহী যে, এই সব তথ্যসমূহের সত্যতার উপর কুরআনের সত্যতার ভিত্তি স্থাপিত, তাহাদের সমালোচনা করিয়াছেন। "কুরআন যেমন একটি সাহিত্যমূলক (কাসাস) গ্রন্থ নয়, তেমনি ইহা কোন ঐতিহাসিক পুস্তকও (তা'রীখ) নহে। ইহা মূলত একটি নৈতিক পথনির্দেশক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উৎস (তাফসীর, ২খ, ৪৭১)। নৈতিক আচার এবং প্রেরণার উৎসরূপে ইহার মূল্যের তুলনায় কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলীর ঐতিহাসিকতার গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে অনেক কম। সংস্কারবাদী পর্যালোচকের ভূমিকা হইতেছে সর্বোপরি কুরআনের বাণীকে যতটুকু সম্ভব মুসলিম হৃদয়ের নিকটে আনয়ন করা। এই কর্তব্য সম্পাদনে তাহার লক্ষ্য অবশ্যই হইবে কুরআনের আয়াতসমূহের অর্থ মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিতে যতদূর যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। ইহাদের অর্থ, তাফসীরকারকে অবশ্যই 'আরবী শব্দকোষসমূহ ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে। কিছু সংখ্যক আয়াত রহিয়াছে যাহাদের অন্তর্নিহিত মর্ম সহজভাবেই প্রকাশিত, কিছু ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ স্বয়ং কুরআনে প্রাপ্তব্য নির্দেশিকা ও সমান্তর উদাহরণের মাধ্যমে সুস্পষ্টতর করা সম্ভব (তাফসীরু'ল-কুরআন বি'ল-কুরআন) ; অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক প্রত্যাদেশের সময় প্রদত্ত ব্যাখ্যার অনুসরণে মহান সাহাবা এবং তাঁহাদের প্রধান অনুগামী তাবি'উন যেইসব ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন সেইসব প্রারম্ভিক ব্যাখ্যাসমূহ ব্যবহার, বিশ্লেষণ ও অনুসরণ করা প্রয়োজন। সুন্নাহ হইতে গৃহীত (সুস্পষ্ট কুরআনী নির্দেশনার অভাবে) প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় (দালাইল) এমন যে কোন ব্যাখ্যা সন্দেহজনক এবং সেইজন্য গ্রহণযোগ্য নয় (মুহাম্মাদ 'আবদুহু, রিসালাতু'ত-তাওহীদ, পৃ. ১২৯, ফরাসী অনু. পৃ. ১৩৭, তাফসীর, ১খ., ৮, ১৭৪-৫, ৩খ., ৩২৭)। এই কারণেই আল-কুরআন সম্পর্কেই পরিপূরক প্রকৃতির ধারণা।

২। সুন্নাহ্—ইস্লাহ্-এর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দ্বিতীয় অনুশাসনিক উৎসরূপে ইহার অবস্থান আল-কুরআনের পরেই। তবে ইহা কি প্রত্যাদেশের ন্যায় একটি বিধানিক উৎস অথবা শুধু উহার একটি বিশ্লেষণ—এই প্রশ্নে সংস্কারবাদিগণ সম্পূর্ণভাবে একমত নন। প্রধান মতবাদ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীসমূহ নিম্নরূপ ঃ

কুরআন ও সুন্নাহ্র মৌলিক সার একই। এই দৃষ্টিভংগী ইব্ন বাদীসের। তিনি সুন্নাহ এবং আল-কুরআনের মধ্যে সংযোগকারী গভীর ঐক্যের কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। "পরম করুণাময় আল্লাহ্র প্রেরিত প্রত্যাদেশ" (কুরআন, ৩৬ ঃ ৫৮) এই ভাবের আয়াতসমূহ যে অর্থ বহন করে, তাহা হইতেছে ধর্ম ইহার সম্পূর্ণ অবস্থায় আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ .... কারণ ইসলামের উৎস হইতেছে ....পবিত্র কুরআন, যাহা প্রত্যাদেশ এবং সুন্নাহ একটি প্রত্যাদেশ, যেহেতু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র বাণী ইহা প্রমাণ করে (৫৩ ঃ ৪-এর উদ্ধৃতি) (শিহাব, ফেব্রু. ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ৯৫)। এই চরমপন্থী মত জাহিরী ইব্ন হায্ম-এর দৃষ্টিভঙ্গীর অনুরূপ। তিনিও মনে করিতেন, সুন্নাহ ও প্রত্যাদেশ একই সমমান সম্পন্ন (তু. তাঁহার ইহ্কাম ফী উসূলি'ল-আহ্কাম, কায়রো ১৩৪৫/১৯২৭, ১খ., ১২১-২)। এই মতের সমর্থনে হাদীছ রহিয়াছে (তু. Wensink, Handbook, 223 A

ঃ জিবরীল দ্বারা মুহাম্মদ (স) প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন যেমন হইয়াছিলেন পবিত্র কুরআন-এর ক্ষেত্রে)। এই মতটি কেবল আংশিকভাবেই রাশীদ রিদা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও স্বীকার করেন যে, "প্রত্যাদেশ কেবল কুরআনেই সীমাবদ্ধ নয়" (তাফসীর ..., ২খ., ১৩৯, ৫খ., ২৭৯, ৪৭০)। পবিত্র আত্মার (আর-রূহুল-কুদুস) প্রেরণার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কিছু উপদেশ কুরআন-এর ন্যায় সমান গুরুত্বসম্পন্ন, তবে ইহাদের ভাব প্রকাশের মান কুরআনের অনুকরণীয় প্রকৃতি অর্জন করিতে পারে নাই (ibid, ৫খ., ২৭৯, ফাস্‌ল ৩)।

সুন্নাহ্ প্রত্যাদেশকে স্পষ্ট করে। এই বিষয়ে সকল সংস্কারবাদী গ্রন্থকারই একমত। কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, নবী (স)-এর দায়িত্ব ছিল ধর্মগ্রন্থের সঠিক অর্থ মানব জাতির নিকট প্রকাশ করা (লি-তুবায়্যিনা লি'ন-নাস) (তাফসীর ...., ২খ., ৩০, ৬খ., ১৫৯, ৪৭২, ৭খ., ১৩৯, ৮খ., ২৫৫, ৩০৯ ; শিহাব, অক্টোবর ১৯৩০ খৃ., ৫৩২, ফেব্রু. ১৯৩২ খৃ., ৭৩)। যেহেতু সুন্নাহ একটি বিশ্লেষক বা ব্যাখ্যাদানকারী সেইহেতু গুরুত্বের দিক দিয়া সুন্নাহ্ দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী (তাফসীর..., ৪খ, ১৮, ৩খ. সম্পর্কে, পৃ. ১০১)। কুরআন ধর্মের সামগ্রিক দিকের মূল সূত্র এবং সুন্নাহ হইতেছে ইহার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; কারণ ইহা প্রত্যাদেশকে ব্যাখ্যা করে (Ibid, ৯খ., ৩২৬)। এইখানে দ্বিতীয় অনুশাসনিক উৎসরূপে সুন্নাহর মর্যাদার অহবান পাওয়া যায়।

সুন্নাহ বলিতে শুধু সম্পূর্ণভাবে যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হাদীছসমূহের গ্রন্থকেই বুঝানো হয় (তু. মুহাম্মাদ "আবদুহু, রিসালাতু'ত-তাওহীদ, ফরাসী অনু., পৃ. ১৩২)। সীমিত সংখ্যক হাদীছ প্রধানত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ইবাদাত পদ্ধতির (যথা সালাত, হজ্জ ইত্যাদি) সহিত সংশ্লিষ্ট। পবিত্র কর্মপদ্ধতি সম্পর্কিত এই সকল বর্ণনামূলক হাদীছসমূহের অতিরিক্ত যে সমস্ত সন্দেহাতীত হাদীছ রহিয়াছে (যথা নৈতিক উপদেশমূলক বিভিন্ন উদাহরণ) "তাহাদের সংখ্যাও অধিক হইবে না" (রিসালাতু'ত-তাওহীদ, সম্পা. রাশীদ রিদা, পৃ. ২০৩, টীকা ২; তাফসীর.. ৫খ., ৩৬৫)। একটি হাদীছ কেবল নবী (স)-এর নামের সহিত সংযুক্ত থাকার কারণেই বিশ্বাস করতে হইবে—এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই, যদিও ইহার পশ্চাতে কোন বিখ্যাত মুহাদ্দিছের সমর্থন থাকে। রাশীদ রিদা উদাহরণ প্রসঙ্গে গাযালীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এমন সব হাদীছকে প্রামাণিকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যেগুলি হয় "তাৎপর্যবিহীন অথবা সরাসরিভাবে মনগড়া" (তাফসীর, ৭খ., ৩১)। তিনি অপ্রামাণিক (মাওদূ') হাদীছসমূহেরও তীব্র সমালোচনা করিয়া ইহাদের উৎপত্তির পশ্চাতে কতিপয় হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন ঃ যানদাকা (দ্র., সাম্প্রদায়িকতা, শাসকবর্গের প্রতি তোষামোদী, মানবসুলভ ত্রুটি এবং বার্ধক্যজনিত স্মৃতিহীনতা। উপরন্তু গোঁড়ামী ও কঠোরতার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া কতিপয় হাদীছবেত্তা হাদীছে এমন কিছু নৈতিক নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন যেগুলি তাহাদের মতে কতিপয় 'দুর্বল' রূপে কথিত হাদীছের ন্যায় সমান উপদেশমূলক।

সংস্কারবাদিগণের দৃষ্টিকোণ হইতে হাদীছের প্রমাণিকতার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সুন্নাহ-র প্রমাণিকতাই অনুশাসনিক উৎস-এর প্রামাণিক গ্রন্থরূপে ইহার বিবেচিত হওয়ার ভিত্তি। রাসূলুল্লাহ (স) যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহার সকলই আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রাপ্ত এবং তাই এই সকলের উপর বিশ্বাস স্থাপন মু'মিনগণের জন্য অপরিহার্য (কুরআন, ৪ ঃ ৮০ "যাহারা রাসূল-কে মান্য করে তাহারা আল্লাহ্কে মান্য করে")। সুতরাং যে কোন মুসলিমের জন্য (কুরআনের ন্যায়) সন্দেহাতীত নয়, এমন যে কোন হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রহিয়াছে। সুতরাং পবিত্র গ্রন্থের ন্যায় প্রামাণিক সুন্নাহ্ এবং যে সমস্ত হাদীছের প্রমাণিকতা সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই অথচ উহা সালাফের ভাবধারার সহিত সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ—এই দুই প্রকার হাদীছের মধ্যে পার্থক্যকরণের প্রয়োজনীয়তা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতপক্ষে সালাফিয়্যাগণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র সংখ্যক হাদীছ-এর আদর্শগত মূল্য স্বীকার করে যাহাদের প্রমাণিকতা অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠিত (আহাদীছু মুতাওয়াতিরা, ওয়া কালীলুন মা হিয়া; মানার, ৩খ., ৫৭২)। "মুসলিমগণ কেবল কুরআন ও সুন্নাহকেই অনুসরণ করিবে" এই বক্তব্যের মাধ্যমে (আল-কাওয়াকিবী, উম্মু'ল-কুরা, পৃ. ৭৩ ; রাশীদ রিদা, পূর্বোক্ত তাফসীর ; ইব্‌ন বাদীস, শিহাব, ফেব্রু. ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ৯৫) সংস্কারবাদিগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর শিক্ষার উপর তাঁহাদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন (তু. Wensinck, Handook, 130 A ঃ 'কেবল কুরআন ও সুন্নাহ্কে আঁকড়াইয়া ধরা" ; ২২৩ ক ঃ "নিজেকে একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিতর আবদ্ধ করা")। কিন্তু সুন্নাহ্র ধারণা সম্পর্কে তাঁহাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের প্রেক্ষিতে তাঁহারা ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, বস্তুতপক্ষে ধর্ম (দীন) হিসাবে ইসলাম মূলত কুরআনে নিহিত রহিয়াছে।

প্রাচীন ধর্মমতসমূহের সার্বিকভাবে গৃহীত রীতির ন্যায় ইসলাহ-এর মতবাদ ও উৎসরূপে হাদীছের তুলনায় কুরআনের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদানে আগ্রহী। এই ধারার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হইতেছে সাম্প্রতিক গ্রন্থকারগণের রচনাবলীতে হাদীছ-এর কর্তৃত্ব প্রায় লুপ্ত করিয়া তাহা কুরআন ও ইজতিহাদ (দ্র.)-এর প্রতি ন্যস্ত করা (তু. রাশীদ রিদা-এর একজন প্রাক্তন শাগরিদ মাহমূদ আবূ রায়্যা, আদওয়া 'আলা'স-সুন্নাতি'ল-মুহাম্মাদিয়্যা, কায়রো ১৯৫৮ খৃ., এবং হাদীছ-এর বিষয় সম্পর্কে বর্তমান অবস্থান ঃ REI, 1954, Abstracta, 117-23, G.H.A. Joynboll, The authenticity of the tradition Literature, Leiden 1969)।

যুক্তিসম্মতভাবে নিঃসন্দেহে ইসলামকে স্বতন্ত্রভাবে কুরআনের প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা যায়। রাশীদ রিদা-এর অপর একজন শাগরিদ মুহাম্মাদ তাওফীক সিদকী তাঁহার রচনা 'আল-ইসলাম হুওয়াল-কুরআন ওয়াহ্দাহু"-তে এই তত্ত্বটি পেশ করেন এবং এইটি ইহার নিজ দাবিতেই একটি কর্মসূচী (মানার, ১৯০৬ খৃ., ৯খ., ৫১৫-২৫ ৯০৬-২৫)। এই গ্রন্থকারের মতে ইসলামের ভিত্তি হইতেছে আল্লাহ্ প্রদত্ত কিতাব এবং বিচারবুদ্ধি। ইসলামের নামে আরোপিত কোন মতবাদ যদি কুরআন প্রদত্ত তথ্যসমূহের প্রেক্ষিতে সন্তোষজনক না হয় অথবা বিচারবুদ্ধির মৌলিক দাবি মিটাইতে অক্ষম হয় তবে সেইগুলি গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে (হাদীছ প্রত্যাখ্যানকারীদের ইহা একটি ভ্রান্ত মতবাদ)। অপরাপর স্থানে মুহাম্মাদ তাওফীক সিদকী সুন্নাহ্র মূল্যায়নে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করিয়াছেন। পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত বস্তুনিষ্ঠ তথ্যসমূহের সহিত হাদীছের বিরোধের ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতাকে সীমিত থাকিতে হইবে, কিন্তু যে সমস্ত ক্ষেত্রে ইহা জ্ঞানসম্মত নীতিমালার (হিক্মা) প্রস্তাবনা করিয়াছে সে সকল ক্ষেত্রে ঈমামদারগণের জন্য ইহাকে উল্লেখ করার ব্যাপারে কোন বাধা নাই, যেমন বাধা নাই অন্য যে কোন উৎস

সম্পর্কে। সালাফিয়্যাগণ নিশ্চিতভাবেই এতদূর অগ্রসর হন নাই। মুহাম্মাদ তাওফীক সিদকীর এই নূতন তত্ত্ব (রাশীদ রিদা কর্তৃক কিছু আপত্তিসহ পেশকৃত) সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন সুন্নী মতবাদের একজন সমর্থক দ্বারা খণ্ডিত হয় (তু. তাহা আল-বিশরী, উসূলু'ল-ইসলাম ঃ আল-কুরআন, আস-সুন্নাহ, আল-ইজমা', আল-কিয়াস, মানার-এ, ৯খ., ৬৯৯-৭১১)। সালাফিয়্যাগণের দৃষ্টিতে ইসলাম কেবল কতিপয় বাধ্যতামূলক ধর্মকর্ম ('ইবাদাত) ও বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যে সীমিত নয় যাহা কেবল প্রত্যাদেশ এবং সুনির্দিষ্টভাবে প্রামাণিক (মুতাওয়াতির) কতিপয় হাদীছ দ্বারা প্রতিপন্ন। বস্তুতপক্ষে ইসলাম একই সঙ্গে একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক পদ্ধতি এবং নৈতিক মূল্যবোধের সমাহার ও একটি সংস্কৃতি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নির্ধারিত মানসিক সম্পর্ক (মু'আমালাত) এবং ব্যবহার বিধি ('আদাত) প্রসঙ্গে সুন্নাহ এবং সালাফ-এর প্রচলিত বিধি সহায়ক ও শিক্ষণীয়, বিশেষত যে সমস্ত অবস্থান ধর্মগ্রন্থীয় অনুশাসন (নাস্স দ্বারা বিধিবদ্ধ নয়)। ব্যবহারিক ও নৈতিক জীবনযাত্রা পদ্ধতির জন্য ইহার নির্দেশিকারূপে মুসলিমগণের জন্য বাস্তবিকই দৃষ্টান্তমূলক ও মনোযোগ আকর্ষণের উপযুক্ত। এই দুইটি উৎস ছাড়াও ইসলাহ সালাফ-এর ঐতিহ্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। তাঁহাদের মতে ইহা সুগভীরভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সেইজন্য ইসলামের উৎসমূলের প্রামাণিক বাণীসমূহ উপলব্ধি করিতে আগ্রহী যে কোন ব্যক্তির জন্য ইহা অপরিহার্য।

৩। **সালাফ-এর ঐতিহ্য** ঃ বহুলাংশে সালাফ-এর জন্য ইসলাহ-এর আবেদন সুন্নাহ-এর বিশ্লেষণী উৎসরূপে এবং সার্বিকভাবে ইসলামের মর্ম উপলব্ধির নির্দেশনারূপে। সালাফ শব্দটি এমন একটি তথ্য নির্দেশ করে যাহা একই সঙ্গে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক। প্রথমত ইহা পূর্ববর্তিতার ধারণাবোধক (তু. কুরআন ৪৩ ঃ ৫৬), যাহা প্রাচীন প্রয়োগে স্বাভাবিকভাবেই কর্তৃত্ব ও দৃষ্টান্তমূলকতার সহিত সংশ্লিষ্ট। সালাফ হইতেছে যথাযথভাবেই "সদগুণাবলীসম্পন্ন পুরুষগণ" (আল্-সালাফ আস-সালিহ), এই পূর্ব-পুরুষগণের নিখুঁত নিষ্ঠা, ভক্তি, পবিত্রতা এবং ধর্মীয় জ্ঞান তাহাদিগকে মানুষের জন্য আদর্শ ও পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু নিশ্চিত ও পর্যাপ্ত জীবনীমূলক নির্দেশনার অভাবে ইহাদের নির্ণয় কঠিন। যত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিতই হউক না কেন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত গুণাগুণ সালাফ-এর কর্তৃত্ব আনয়নে ততটা সক্রিয় নয় যতটা তাঁহাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় ক্ষেত্রবিশেষে রাসূলের সহিত তাঁহাদের যোগাযোগ এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে তাঁহার সাহাবা ও উত্তরসুরিগণের সাহচর্য উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ইসলামের অসংখ্য অনুসারির মধ্যে সালাফগণ দৃষ্টান্তমূলক। তাঁহারা ইসলামের ইতিহাসের একটি বিশেষ যুগে একটি বিশেষ নিষ্ঠবাদী রূপের প্রতিনিধি। তাই সালাফ-এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কালানুক্রমিক প্রসঙ্গ অবতারণা সঠিক নয় এবং প্রায়শ বিরোধপূর্ণ। সাধারণভাবে সালাফ-এর অন্তর্ভুক্ত হইলেন ঃ (ক) "ঈমানদারগণের মাতা" 'আইশা (রা) এবং খুলাফা-ই রাশিদূন ও সেই সঙ্গে তাল্হাও যুবায়র (রা) (Lane, Book iv, 1408C)।

(খ) প্রধান প্রধান তাবি'উন (ibid); (গ) রাসূলের সাহাবীগণ (আত-তাবারী, তাফসীর, সং, মা'আরিফ, ১খ., ৯৩); (ঘ) সাহাবীগণ এবং তাঁহাদের উত্তরসুরিবৃন্দ [তাবি'উন, একদিকে চার মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতাগণের প্রেক্ষিতে (তু. আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, তাঁহার "আমাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষগণ"–সালাফুনা আস-সালিহ সম্পর্কে বিবরণ, Wensinck, Concordanees, ...i, 505B); অপরপক্ষে পরবর্তী এবং তাহাদের পরবর্তী বংশধরগণের প্রেক্ষিতে নিকটস্থ শাগরিদগণ (আত-তাহানাবী, কাশ্শাফ ইসতিলাহাতিল-ফুনূন, সম্পা. খায়্যাত, ৩খ., ৬৭৬-৭]। আধুনিক সংস্কারবাদী গ্রন্থকারগণের রচনাতেও সালাফ-এর সংজ্ঞাও একই প্রকার অস্পষ্ট। রাশীদ রিদা-এর মতে ইঁহারাই প্রাচীন ইসলামী সমাজের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত প্রতিনিধি, আস-সাদর আল আওওয়াল (তাফসীর, ২খ., ৮১, ৭খ., ১৪৩, ১৯৮), "প্রথম যুগের" প্রতিনিধিবর্গ–আল-'আসরু'ল-আওওয়াল (Ibid, ৫খ., ১৯৬, ৩খ., ৫৭২), ইহা প্রথম তিন পুরুষকে কারন করে (কারন শব্দটি আধুনিক ভাবধারায় 'শতাব্দী' হিসাবে গণ্য করা উচিত হইবে না বরং ইহা সত্তর হইতে আশি বৎসর ব্যাপি এক সময়কালের মধ্যে উপস্থিত এক "মানব বংশধর" (জীল) বুঝায়, (Ibid, ১১খ., ৩১৪, ১২খ., ১৯০)। রাশীদ রিদা ও ইব্ন বাদীস-এর রচনাবলীতেও আমরা তিন পুরুষ-এর একই চিরাচরিত সংজ্ঞার সন্ধান লাভ করি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ও তাঁহার সঙ্গীগণ (সাহাবা), তাঁহাদের অনুগামিগণ (তাবি'উন) এবং শেষোক্ত শ্রেণীর উত্তরসুরিগণ তাব'উ তাবি'ঈন (তাফসীর, ৮খ., ৫০; শিহাব, এপ্রিল ১৯৩৭ খৃ., পৃ. ৪৩৪)। ইঁহারা গুণে ও মানে (খায়রিয়্যা) অন্য সকলকে অতিক্রমকারী এবং স্বয়ং শ্রেষ্ঠ মানব রাসূলুল্লাহ (স) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন (শিহাব, ফেব্রু. ১৯৩২ খৃ., পৃ. ৬৬, এই হাদীছটির প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত ঃ "শ্রেষ্ঠতায় আমার যুগই উত্তম, ইহার পর পরবর্তী যুগ, তাহার পর যাহা পর আসিয়াছে" (দ্র. মুসলিম, ফাদাইলুস-সাহাবা, বাব ৫২; নং ৬৪৭৩/২১৩, ৬৪৬৯/২১০; আবূ দাউদ, সুন্নাহ, বাব ৯, নং ৪৬৫৭); তু. Wensinck, Handbook, 48A. lg. 40 ঃ 'উত্তম' এই শব্দটি আশ-শাফি'ঈ (র) কর্তৃক উদ্ধৃত অপর একটি হাদীছের সহিত তুলনীয়, রিসালা, সম্পা. আ. ম. শাকির, পৃ. ৪৭৪, নং ১৩১৫ ঃ "আমার সাহাবাগণ এবং তাহাদের উত্তরসুরি এবং তাহাদের উত্তরসুরিগণকে সম্মান করিবে। কারণ ইহার পর হইতে অসত্য আবির্ভূত হইবে"। তু. Wensinck, Handbook, 48B "মুহাম্মাদ-এর উপদেশ বাণী. . .)।

কয়েকটি কালানুক্রমিক ঘটনা প্রসঙ্গের প্রতি নির্দেশনা সালাফ-এর এই তিনটি শ্রেণীকে সাধারণভাবে সংজ্ঞায়িত করিতে সহায়তা করিবে ঃ (ক) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারিগণ হইতে (মক্কাতে ৬১০ খৃ. এবং মদীনায় জুন ৬২১ খৃ.) শুরু করিয়া রাসূলের সঙ্গীগণের মধ্যে শেষজন বলিয়া কথিত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর মৃত্যু (৯১/৭১০ অথবা ৯৩/৭১২ সাল) পর্যন্ত সময়কালীন সকল সাহাবা (অথবা আসহাব; তু. ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ইসাবা, ১খ., ১৩৮; ইব্ন হায্ম, ইহকাম, ৪খ., ১৫২)। অন্যমতে সাহাবাদের মধ্যে সর্বশেষে ইনতিকাল করেন আবুত--তুফায়ল 'আমির ইব্ন ওয়াছিলা (মৃ. ১০২/৭২০)। (খ). তাবি'উন ঃ ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন নবী (স)-এর সঙ্গীগণের সমসাময়িক; ইঁহাদের কেহ কেহ হয়ত-বা রাসূলের জীবনকালের মধ্যেও জীবিত ছিলেন, কিন্তু সাহাবাগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবার প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করিতে সমর্থ হন নাই। তাবি'উনের মধ্যে শেষজন আনুমানিক ১৮০/৭৯৬ সালে ইনতিকাল করেন (যেমন হুশায়ম ইব্ন বাশীর আস-সুলামী, মৃ. ১৮৩/৭৯৯)। তিনি অন্যান্যদের মধ্যে মালিক ও সুফ্য়ানুছ-ছাওরীকে হাদীছ বর্ণনা করেন। (গ) তাব'উ তাবি'ঈন। এই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিবর্গকে

সঠিকভাবে সনাক্ত করিবার মত উপযুক্ত গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান নাই। সংস্কারবাদিগণ উল্লিখিত দুইটি শ্রেণীর তুলনায় ইঁহাদেরকে অত্যন্ত কম উল্লেখ করিয়া থাকেন, বিশেষত কুরআনের ব্যাখ্যার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ব্যাপারে (তু. তাফসীর, ৩খ., ১৭৯, ২০৮)। বস্তুতপক্ষে ইহারা প্রধানত মহান তাবি'উন, কিবারু'ত্-তাবি'ঈনের সর্বপ্রধান শাগরিদবৃন্দ ছিলেন (যেমন আল-কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বাক্র, মৃ. ১০১/৭২৯; আশ্-শা'বী, মৃ. ১০৪/৭২৩; আল-হাসানু'ল-বাস্রী, মৃ. ১১০/৭২০; ইব্ন সীরীন, মৃ. ১১০/৭২৯)। সালাফ-এর এই শেষোক্ত শ্রেণীর জন্য ৩য়/৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগকে শেষ প্রান্তরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। সালাফ শব্দটি দ্বারা "দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের বিজ্ঞ 'আলিমগণকেও" চিহ্নিত করা হইয়াছে (তাফসীর, ২খ., ৮২)। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন বিশেষত চার সুন্নী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহাদের কতিপয় সমসাময়িক। ইঁহারা ছিলেন ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ হইতেই অত্যন্ত শক্তিশালী ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন আল-আওযা'ঈ (মৃ. ১৫৭/৭৭৪), সুফ্য়ানুছ-ছাওরী (মৃ. ১৬১/৭৭৮), আল-লায়ছ ইব্ন সা'দ (মৃ. ১৭৫/৭৯১) এবং ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়ায়হ (মৃ. ২৩৮/৮৫৩) (তু. তাফসীর ৭খ., ৫৫২, ৮খ., ৪৫৩)। প্রতীয়মান হয় যে, সালাফ-এর উম্মাহ্-এর দেহকে সঞ্জীবিত করিয়াছে তাহা হইতে নিজেদের সরাইয়া রাখিতে চায়। বস্তুতপক্ষে সালাফিয়্যাগণের অবস্থানটি আরও অস্পষ্ট ঃ উপরে উল্লিখিত সালাফ-এর সময়কালের বাহিরে আধুনিক সংস্কারকগণ 'স্বতন্ত্র' (মুসতাকিল্ল) বিশেষজ্ঞগণের অভিমতসমূহ বিবেচনা করিতে নারাজ নহেন। বিভিন্ন দল ও মতাদর্শী গোষ্ঠীর বহির্ভূত এই সকল স্বাধীন ব্যক্তিত্ব সালাফ-এর পথ অনুসরণ করিয়া সকল প্রকার দলীয় ও সংকীর্ণ মানসিকতা হইতে মুক্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় ছিল সমাজের ঐক্য ও সুন্নাহর সত্যতা রক্ষা করা। এই বিবেচনায় রাশীদ রিদা অত্যন্ত প্রশংসার সহিত আবূ ইসহাক আশ-শাতিবী (মৃ. ৭৯০/১৩৮৮)-কে সম্মান করিতেন (তু. ইহার প্রতি উৎসর্গিত রাশীদ রিদার প্রশংসামূলক প্রবন্ধ, কিতাবু'ল-ই'তিসাম, কায়রো ১৩৩২/১৯১৪, ১খ., ১-৯; তাফসীর, ৬খ., ১৫৬-৬৩, ৭খ., ১৯৩)। উপরন্তু সালাফিয়্যাগণ কতিপয় প্রখ্যাত সুন্নী শিক্ষক ও মরমী ব্যক্তিত্বকে সম্মানের সহিত বিবেচনা করেন। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আল-গাযালী (মৃ. ৫০৫/১১১১), আল-জুওয়ায়নী (মৃ. ৪৩৮/১০৪৭), তাঁহার পুত্র ইমামু'ল-হারামায়ন (মৃ. ৪৭৮/১০৮৫) এবং ইব্ন তায়মিয়া (মৃ. ৭২৮/১৩২৮), যদিও তাঁহারা সালাফ-এর পরবর্তী কালে আসিয়াছেন (তু. তাফসীর, ১১খ., ৩৭৮)।

**সালাফ-এর যুগের আনুমানিক সীমা**

যুগের শেষ প্রতিনিধি হইতেছেন আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল (মৃ. ২৪১/৮৫৫)।

সংস্কারকগণের ব্যবহারবিধিতে 'সালাফ' মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হইয়াছে 'খালাফ' (পরবর্তী পুরুষ)-এর বিপরীত অর্থে। ইহাদের প্রভাবে ইসলামের বাণী নব প্রবর্তন, বিভিন্ন মতবাদগত গোঁড়ামী এবং দলগত বিভক্তি দ্বারা বিকৃত অথবা অন্ততপক্ষে অস্পষ্ট হইয়াছে (তু. তাফসীর, ৮খ., ২৬৯)। এই ধারণাটি দ্বারা সহজেই মনে হইতে পারে যে, সংস্কারবাদিগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী যে সাংস্কৃতিক স্রোত নিরন্তরভাবে

তাঁহাদের মতে ইঁহারা হইতেছেন "সত্যপথের পথপ্রদর্শক" (আইম্মাতু'ল-হুদা) এবং তাঁহাদের দৃষ্টিতে ইঁহারা মশালবাহী। ইঁহারা পর্যায়ক্রমে মুসলিম আধ্যাত্মিকতা পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। এইরূপে যাঁহারা ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন এবং সালাফ-এর ধারণাসমূহ বিশ্বস্তভাবে প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন মুহাম্মাদ 'আবদুহু। আধুনিক সংস্কারবাদের সমর্থকগণের নিকট তিনি হইতেছেন সেই গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি (আল-উসতাযু'ল-ইমাম) যিনি বাস্তবিকপক্ষে বিংশ

শতাব্দীর ঊষালগ্নে ইসলামের পুনর্জাগরণ সূচিত করেন।

ইসলাহ-এর একটি মৌল দাবি হইতেছে সালাফ-এর ধর্মীয় ঐতিহ্য ও নৈতিক বিধির প্রতি বিশ্বস্ততা। দুইটি মূল উৎস ব্যতীত এই ঐতিহ্যটিকেই সংস্কারবাদিগণ তাঁহাদের একমাত্র মৌলিক নির্দেশক বিন্দুরূপে স্বীকার করেন। এই অভিমতের পক্ষে তাঁহাদের প্রদত্ত যুক্তিসমূহ হইতেছে ঃ (ক) সালাফ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে তাঁহার পবিত্র উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন (ধর্মবিশ্বাস, ইবাদাতের রীতি ও পদ্ধতি) এবং উক্তি ও কর্মে বিশ্বস্তভাবে তাহা প্রচার করেন (কাওলান ওয়া 'আমালান, তাফসীর, ৬খ., ২৭৭)। তাঁহারা সুন্নাহ-এর নিশ্চয়তা প্রদায়ক (ঐ ২খ., ৩০, ৮২) এবং তাঁহাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পদ্ধতি অবশ্যই অনুকরণ করিতে হইবে। কারণ ইহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেতনার বাস্তবায়ন এবং ইহার অনুসরণ প্রত্যেক মুসলিমের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত। (খ) সালাফ কুরআনের বাণী সঠিকভাবে উপলব্ধি ও অনুসরণ করিয়াছেন। কারণ ইহা প্রত্যাদেশ হইতে সরাসরি তাঁহাদের নিকট পৌঁছে (গাদ্দান কামা উনযিলা)। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পর ইঁহারাই কুরআন-এর ব্যাখ্যার জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত (তাফসীর, ৩খ., ১৭৮, ১৮২, ৬খ., ১৯৬; তু. R. Blachere, Introd. au Coran, ২২৫ ff)। কুরআনের আধুনিক উপলব্ধির জন্য ইহাদের পঠন ও ধ্যানসমূহ অপরিহার্য যাহা অবশ্যই অতিমাত্রায় আক্ষরিক বা অতিমাত্রায় ব্যক্তিগত রুচি বা মত অনুযায়ী অর্থাৎ মনগড়া হওয়া হইতে বিরত থাকিবে। (গ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবন ও প্রত্যাদেশসমূহ কার্যকরী করার ব্যাপারে তাঁহার ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে সালাফই আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠতম তথ্যউৎস। বহু তথ্যগত বিষয়ে তাঁহাদের ঐকমত্য বিবরণী (ইজমা') সমূহের কোন বিকল্প নাই এবং তাহা দুইটি উৎস হইতে প্রদত্ত তথ্যাবলীকে সম্পূর্ণ করে। এইরূপে সালাফ প্রত্যাদেশ এবং সুন্নাহ-এর উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় একটি কাঠামো সরবরাহ করে।

সুন্নাহ-র পরিপূরক ও ইসলামী জীবনযাত্রার জন্য অনুপ্রেরণার একটি উৎস (আত্মিক বিষয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ কার্যকলাপ উভয় ক্ষেত্রে)-রূপে সালাফ-এর ঐতিহ্য আধুনিক সংস্কারকের জন্য কেবল একটি ভক্তির বিষয়মাত্র নয়। সালাফিয়াগণ সালাফ দ্বারা প্রতিবিম্বিত ইসলামের একটি আদর্শ প্রতিচ্ছবির প্রশংসায় নিমগ্ন একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হইতে চাহে নাই বরং তাহারা আধুনিক সমাজে, সালাফ-এর উদাহরণ অনুসরণে একটি সরল অথচ প্রকৃত পন্থায় ইসলামকে সঞ্জীবিত করিতে সচেষ্ট ছিলেন। উপরন্তু ইসলাহ-এর তাত্ত্বিকগণের জন্য এই আদর্শ, বিদেশী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির অনুকরণে নয়, বরং প্রাথমিক যুগের ইসলামের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হইতে অনুপ্রেরণা গ্রহণের মাধ্যমে তাহাদের মুসলিম ব্যক্তিত্ব পুনর্গঠনের অভিলাষ ব্যক্ত করে। এই আদর্শটিকেই ইব্ন বাদীস তাঁহার শিহাব-এর স্তম্ভ ঃ রিজালু'স-সালাফ ওয়া নিসা'উহ্ ["প্রাথমিক যুগের ইসলামের (বিখ্যাত) পুরুষ ও মহিলা"]-এ সমর্থন দান করিয়াছেন ঃ "আমাদের লক্ষ্য হইতেছে আমাদের পাঠক সমাজকে আমাদের কতিপয় পুণ্যবান পূর্বপুরুষ-'পুরুষ ও মহিলা'-সম্পর্কে সচেতন করা, যাঁহারা ইসলামের মহান গুণাবলীতে গুণান্বিত হইয়াছিলেন এবং ইহার সেবায় প্রশংসনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করেন। কারণ ইঁহাদের দৃষ্টান্ত মুসলিম হৃদয়কে শক্তিশালী করিবে, তাহাদের নৈতিক উন্নতিতে সহায়তা দান করিবে, মহান কার্যাবলী সম্পাদনে তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিবে এবং তাহাদের মধ্যে নূতন জীবন সঞ্চার করিবে। বর্তমান বংশধরদের জন্য সালাফ-এর জীবন ভিন্ন অন্য কোন জীবন নাই যাহা হইতেছে তাহাদের জীবন্ত ইতিহাস ও তাহাদের শাশ্বত স্মৃতি মাত্র" (শিহাব, জানুয়ারী ১৯৩৪, পৃ. ১৪)। একই পদ্ধতি অনুসরণে সংস্কারবাদী গ্রন্থকারগণ সালাফ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক তথ্যসমূহ পদ্ধতিগতভাবে ব্যবহার করিয়া তাহা নৈতিক, সামাজিক এমনকি রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য ব্যবহার করিয়াছেন [তু. তাফসীরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তসমূহঃ ৩খ., ৯২ঃ 'আলী ইব্ন আবী তালিব, ৩৭৪ ঃ আবূ তালহা যায়দ ইব্ন সাহ্ল, ৩৭৫ ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার, ৩১৪ ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফার; ৭খ., ২১-২৩ ঃ 'উছমান ইব্ন মাজ'উন এবং 'আলী ইব্ন আবী তালিব; ৮খ., ২২৫ ঃ যায়দ ইব্ন 'আলী এবং তাঁহার সঙ্গীবৃন্দ যাঁহাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইসলাহ-এর জন্য উৎসর্গিত (ফিদা'ইয়্যুন) রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ১০খ., ৬৫৪-৫ ঃ 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন 'আওফ; A. Merad-এর Le Reformisme musulman, ২৮৭ ff.-এ উদ্ধৃত উদাহরণসমূহ ও এই সঙ্গে দ্রষ্টব্য; 'উবাদা ইব্নু'স-সামিত ও তাঁহার স্ত্রী উম্মু হারাম, আবূ যারর আল-গিফারী, বিলাল ইব্ন রাবাহ, আন-নু'মান ইব্ন 'আদী আল'-আদাবী (রা): ৩২৫-৬ ঃ লায়লাতু'শ-শিফা' বিন্ত 'আম্র]। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের (সীরাত-এর অতিরিক্ত) জীবনীমূলক রচনাবলী সংস্কারকগণের ঐতিহাসিক ও নৈতিক গবেষণার এক অফুরন্ত ভাণ্ডারে পরিণত হয় (তু. মানার-এর একটি কলাম ঃ আছারু'স-সালাফ 'ইবরাতু লি'ল-খালাফ ঃ ইতিমধ্যে নির্দেশিত শিহাব-এর একটি কলাম; রিজালু'স-সালাফ ওয়া নিসা'উহ্ (১৯৩৪ খৃ., হইতে পরবর্তী; আদর্শ স্থানীয় খলীফাগণ সম্পর্কে গীতিময় ও নীতিময় কাব্যসমূহ 'উমারিয়্যা (ফেব্রু. ১৯১৮ খৃ., ১৯০ ছত্র), হাফিজ ইবরাহীম (মৃ. ১৯৩২ খৃ.) এবং (নভেম্বর ১৯১৯ খৃ., ৩০০ ছত্রের অধিক পংক্তি), মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-মুত্তালিব (মৃ. ১৯৩১ খৃ.)-এর 'আলাবিয়্যা; মুহিব্বু'দ-দীন আল-খাতীব, মা'আ'ররা'ঈল আওওয়াল, কায়রো ১৩৭৮/১৯৫৮।

ইসলাহ'-এর পদ্ধতিগত দিক হইতে সালাফ-এর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। যদিও সালাফিয়্যাগণ দুইটি উৎসকে অগ্রাধিকার দিতেন— তথাপি তাঁহারা এই মত ব্যক্ত করেন যে, আল-কুরআন এবং সুন্নাহ মানব ইতিহাসে এক নূতন প্রক্রিয়ার সূচনা করে এবং সেই প্রক্রিয়াটি সালাফ-এর কার্যক্রমে এবং ইহার মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ বাস্তব সত্যতায় পরিণত হয়। এইভাবে সংস্কারবাদিগণের ইসলামী ধারণাকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যায় ঃ ইসলামের মৌলিক সূত্রসমূহ হইতেছে কুরআনী প্রত্যাদেশ, মুহাম্মাদ (স)-এর সুন্নাহ এবং পুণ্যবান পূর্বপুরুষগণের ঐতিহ্য (ওয়ামা কানা 'আলায়হি'স-সালাফু'স-সালিহ) যাহা ঐতিহ্যগতভাবে নৈতিক ও ধর্মমত সম্বন্ধীয় দৃষ্টিকোণ হইতে বিচারের ফলে প্রাপ্ত (তাফসীর, ৭খ., ১৪৩, ১৯৮; ৯খ., ১৩২, ১১খ., ৩৭৮; ইব্ন বাদীস, শিহাব, ফেব্রু. ১৯৩৪, পৃ. ৯৯)। যেহেতু সংস্কারকগণ ইহাকে ইসলামী আদর্শ 'পথের' সুস্পষ্ট ও বাস্তব প্রকাশরূপে বিবেচনা করিতেন, সেই হেতু তাঁহারা সালাফ-এর ঐতিহ্যকে প্রায়শই উল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষত তাঁহাদের ধর্মীয় প্রচারমূলক কার্যক্রম (দা'ওয়াত) এবং কুরআনী ব্যাখ্যা অথবা সামাজিক ও রাজনৈতি নীতিমালা সম্পর্কে তাঁহাদের উপদেশের সমর্থনরূপে। সালাফের প্রতি এই বিশ্বস্ততা ইসলাহ-এর একটি প্রধান মতবাদী অবস্থানের নিয়ন্ত্রক।

গ। প্রধান মতবাদগত অবস্থান ঃ ইসলাহ-এর লক্ষ্য মুসলিম জীবনের পূর্ণ সংস্কার সাধন ঃ

১। পার্থিব বিষয়ের সংস্কার প্রসঙ্গে ইসলাহ্ মসজিদসমূহে মৌখিক শিক্ষা (ওয়াজ-নসীহত, ইরশাদ) এবং সালাফিয়্যা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সাংস্কৃতিক চক্রের সহায়তা গ্রহণ করে। তাহাদের শিক্ষামূলক এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ (আত-তার্বিয়্যাঃ ওয়া'ত-তা'লীম) অথবা সেবামূলক (খায়রিয়া) কার্যক্রমের আড়ালে থাকিয়া এই সকল সংঘ সংস্কারকগণের মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন প্রচুর সংখ্যক সাময়িকী এবং প্রকাশনার মাধ্যমে ইসলাহ্-এর বিস্তৃতি ঘটে। ইহাদের মধ্যে কতিপয়, যথা প্রাচ্যে রাশীদ রিদা-এর পরিচালনায় মানার (১৮৯৮-১৯৩৫ খৃ.) এবং মাগ্‌রিবে 'আবদু'ল-হামীদ ইব্‌ন বাদীসের সম্পাদনায় শিহাব (১৯২৪-৩৯ খৃ.) অত্যন্ত গভীর প্রভাব সঞ্চার করে।

জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত সংস্কারবাদী তত্ত্বসমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নোক্তভাবে করা যায় ঃ 'উছমানী পদ্ধতিকে পূর্বতন রীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, কতিপয় আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন প্রকৃত প্রস্তাবে সামান্য ছিল কিন্তু প্রাচীনপন্থী সুন্নীগণের জন্য ইহা ছিল অত্যন্ত অস্বস্তিকর; এমন কিছু প্রথার বিরুদ্ধে প্রচারণা যাহা ধর্মীয়রূপে গণ্য, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ অথবা সালাফের ঐতিহ্যে যাহার কোনরূপ ভিত্তি নাই [বিভিন্ন প্রকার মৃত্যু-উত্তর অনুষ্ঠান, যেমন কবরের কাছে জনসমক্ষে কুরআন তিলাওয়াত, মাওলিদ (দ্র.) অনুষ্ঠান ইত্যাদি] এমন সব পুণ্যকর্ম এবং বিশ্বাস সম্পর্কে সতর্কবাণী যাহা সালাফিয়্যাগণের মতে পৌত্তলিকতারই নিদর্শন অথবা শির্ক (দ্র.)-এর প্রকাশ (সূফী তারীকা, মৃতের দু'আ' ইত্যাদি)। সংস্কারকগণ বিশ্বাসীদের প্রতি সকল ক্ষুদ্র মতবাদগত পার্থক্যের উর্ধ্বে উঠিয়া ঐক্যবদ্ধ হইবার এবং সমবেতভাবে প্রার্থনা করিবার আহবান জানান। একই সঙ্গে তাঁহারা প্রচলিত শী'ঈবাদ ও সুন্নীবাদের মধ্যে বিরাজমান বিরোধ নিষ্পত্তির আহবান জানান। তাঁহার নৈতিক বিধিনিষেধসমূহ কার্যকরী করিবার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন যাহার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আজ্ঞানুবর্তী এবং অশুভ কার্য নির্মূল সাধন নিশ্চিত করা যায় এবং ইহা ছাড়া মুসলিম সমাজ হইতে সকল পাপাচার, জুয়া খেলা, মদ্যপান, নেশা ইত্যাদি নির্মূল করিতে চেষ্টা করার অনুশাসনিক বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত হয়। প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি (বিশেষত সঞ্চয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান) সম্পর্কে মুসলিম পুরুষগণকে (এবং বিশেষভাবে মহিলা) শিক্ষিত করিয়া তোলা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। একই রকম গুরুত্বপূর্ণ ছিল শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠুভাবে কাজ সমাপ্ত করার প্রতি একটি সহজাত রুচিবোধ সৃষ্টি করা। অন্যান্য শিক্ষামূলক লক্ষ্যের মধ্যে ছিল মুসলিম জনগণের মধ্যে বুদ্ধিভিত্তিক অনুসন্ধিৎসার উন্মেষ ঘটান যাহাতে তাহারা আধুনিক বিজ্ঞানসমূহ এবং বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে সচেষ্ট হয় এবং মুসলিম যুবকের বিভিন্ন সংঘ (নাদী) এবং সংগঠনের মাধ্যমে (জাম'ইয়্যাতু'শ-শুব্বানি'ল-মুসলিমীন) তরুণদের কিছু প্রকল্পে সহায়তাদান, যেমন, স্কাউটিং, শিল্পকলা বিষয়ক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক তৎপরতা— এই সকলই ছিল নব্য মুসলিমের জন্মকে ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত, যাহারা নির্ভীকভাবে এবং কোনরূপ বিচ্ছিন্নতার আশংকা ছাড়া সমসাময়িক জগতের সমস্যাসমূহ মুকাবিলা করিতে সক্ষম হইবে।

২। তাত্ত্বিক সংস্কারের জন্য একটি তথ্য সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজনীয়। তাহা হইতেছে, প্রধান সংস্কারবাদী গ্রন্থকারগণ ছিলেন সর্বোপরি সক্রিয় কর্মী এবং তাঁহাদের উচ্চ মানের বিকশিত মতবাদী বিশদ রচনাবলী সৃষ্টি করার মতো সময় ছিল না। মুহাম্মাদ 'আবদুহু-এর প্রধান প্রধান ধর্মীয় ভাবধারাসমূহ তাঁহার রিসালাতু'ত-তাওহীদ-এর ক্ষুদ্রকায় ১৩৩টি পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশাবলীর অপরাপর অংশ ছড়ানো ছিটানোভাবে বিশৃঙ্খল অবস্থায় রাশীদ রিদার তাফসীরে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এখানে তাঁহার শাগরিদগণের রচনাবলী হইতে তাহা পৃথকীকরণ দুঃসাধ্য। আল- কাওয়াকিবী (১৯০২ খৃ.-এ অকাল মৃত্যুবরণ করেন) কেবল দুইটি প্রবন্ধ রচনা করেন ঃ তাবা'ই'উল-ইস্‌তিবদাদ এবং উম্মু'ল-কুরা। ইহাতে অতি সামান্যই তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। 'আবদুহু-এর ন্যায় আলজেরীয় সংস্কারক ইবন বাদীস তাঁহার জীবন- ব্যাপী বহু প্রকার নূতন ধারণার প্রবর্তন করেন, কিন্তু কেবল শিহাবে প্রকাশিত কুরআনের ভাষা প্রসঙ্গে তাঁহার কতিপয় প্রবন্ধ (সর্বমোট প্রায় ৫০০ ষোল পেজি পৃষ্ঠা) ছাড়া কিছুই রাখিয়া যান নাই (তু. A. Merad, Ibn Badis, commentateur du Coran)। ইহা ভিন্ন রহিয়াছে রাশীদ রিদা'র প্রচুর রচনাবলী, বিশেষত তাঁহার তাফসীর (তাফসীরু'ল-মানার); আধুনিক ইস্‌লাহ-এর ধর্মমত সম্পর্কিত অবস্থান সম্পর্কে গবেষণার জন্য ইহাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। পরবর্তী স্তরের বহু সংস্কারবাদী গ্রন্থকার তাঁহাদের শিক্ষকগণকে হয় সরাসরি শিক্ষায় ও লেখনীতে অনুকরণ করিয়াছেন অথবা তাঁহাদের চিন্তাধারাকে বিকশিত করিয়াছেন।

সালাফিয়্যাগণের প্রচেষ্টা প্রধানত কেন্দ্রীভূত ছিল তাহাদের কালে প্রচলিত ধর্মমতসমূহের সমালোচনায়। তাহাদের মতে, ইহা ছিল হয় প্রাচীন ধর্মমতের কঠোর রূপ (সুন্নী মতবাদী) অথবা ইস্‌লাহ্ প্রবর্তিত নিষ্ঠার মানদণ্ডের সহিত সঙ্গতিবিহীন এবং নীতিগতভাবে সন্দেহজনক এক প্রকার আধুনিকতাবাদ হইতে উদ্ভূত হঠকারী বিশ্লেষণ বা ধর্মীয় আচার। একই সঙ্গে তাঁহারা একটি আদর্শ ইসলামী অবস্থান নির্ধারণের চেষ্টা করেন এবং এই প্রেক্ষিতে দুই সূত্রে প্রাপ্ত বিষয়বস্তুগত তথ্য ও সালাফ-এর ধারণা ব্যবহার করেন। শেষোক্তটির ব্যবহার সম্ভব হয় প্রধানত ইব্‌ন তায়মিয়া (র) ও তাঁহার ছাত্র ইব্‌নু'ল— কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা (মৃ. ৭৫১/১৩৫০)-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে। ইঁহারা সালাফের ঐতিহ্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বসম্পন্ন বিশেষজ্ঞরূপে বিবেচিত ছিলেন (তু. তাফসীর, ১খ., ২৫৩)। এই দুইজনের কল্যাণেই গ্রন্থকার সালাফের মতবাদের প্রতি এত দৃঢ়ভাবে অনুরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন (ইত্‌মাআন্না কাল্‌বী)। সংস্কারকগণের বিবরণী ও সমালোচনামূলক রচনাবলী হইতে (তু. গ্রন্থপঞ্জী) নিম্নোক্ত মতবাদী অবস্থানসমূহ চিহ্নিত করা সম্ভব ঃ

১। পদ্ধতিগত বিন্যাস ঃ প্রধান সুন্নী ধর্মমতটি জ্ঞানকে (ইল্‌ম) চারটি মৌলিক উৎস (উসূল দ্র.)-এর উপর ভিত্তি করিয়াছে ঃ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা' ও ইজতিহাদ (তু. আশ-শাফি'ঈ, রিসালা, পৃ. ৪৭৮-৯, নং ১৩২৯-২; EI[1]-এ J. Schacht-এর USUL, idem, FIKH, EI[2])। এই চারটি উৎস হইতে শুরু করিয়া উসূল-এর সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত নিয়মের মাধ্যমে বিচার সম্বন্ধীয় ও নৈতিক আইনসমূহ (আহ্‌কাম) প্রণয়ন করা হয়। 'ইল্‌মু'ল-উসূলের ইহাই আলোচ্য বিষয়। ইস্‌লাহ্ চারটি উৎস সম্পর্কিত ঐতিহ্যবাহী তত্ত্ব স্বীকার করে (তাফসীর, ৫খ., ১৮৭, ২০১, ১১খ., ২৬৭), কিন্তু ঐতিহ্যবাহী মানদণ্ড সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে না (৫খ., ১৮৭, ২০১, ২০৩, ২০৮, ৪১৭)। সংস্কারবাদী মনোভাবকে নিম্নোক্ত শিরোনামে সংক্ষিপ্ত করা চলে ঃ দুই উৎসের কর্তৃক ; তাক্‌লীদ-এর প্রত্যাখ্যান, ইজতিহাদ ও ইজমা'-এর নূতন ধারণা এবং 'ইবাদাত ও

'আদাত-এর মধ্যে প্রয়োজনীয় পার্থক্য নিরূপণ।

(১) দুইটি উৎস (কুরআন সুন্নাহ) সমগ্র ইসলামী আইন ব্যবস্থার মূল ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত। ইহাদের কর্তৃত্ব মুসলিমগণকে প্রচলিত মতবাদ সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রতি সম্পূর্ণ বশ্যতা হইতে মুক্ত করে এবং ফলে বিভিন্ন মাযহাবী গোষ্ঠীর পার্থক্য (ইখতিলাফ), সুন্নী ও শী'ঈপন্থীদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধ এবং প্রচলিত মতের বিরোধী সম্প্রদায়সমূহের [বিশেষত ইবাদিয়া (দ্র.)-এর বর্তমান রূপে সকল প্রকার খারিজীবাদ] প্রতি সুন্নীদের ঘৃণা হইতে উদ্ভূত সম্ভাব্য সকল সমস্যা দূরীভূত হয়। প্রথম নীতিতে প্রত্যাবর্তনের ফলে মুসলিমগণ বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতাবাদী ফলাফলের উর্ধ্বে উঠিতে সক্ষম হইবে অথচ সকল গোষ্ঠী হইতে শ্রেষ্ঠ অংশগ্রহণ করিতে পারিবে (ইবন বাদীস, শিহাব, মার্চ ১৯৩৬, পৃ. ৬৫৪, নভে. ১৯৩৮, পৃ. ২৩০)। ইহার ফলে উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম আইন ব্যবস্থার একটি চূড়ান্ত ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইতে পারে। প্রথম নীতির প্রত্যাবর্তনের জন্য অবিশ্রান্তভাবে প্রচার চালাইতে যাইয়া সংস্কারবাদিগণ, নিষ্ঠাবান গোষ্ঠীসমূহ এবং ইহাদের শিক্ষক, ফাকীহগণের তীব্র সমালোচনা করিতে থাকেন [ তু. আল-কাওয়াকিবী, উম্মু'ল-কুরা, ৭২ প., মুহ., 'আবদুহু, রিসালাতু'ত-তাওহীদ, পৃ. ১৫, ১০১ (ফরাসী অনু., পৃ. ১৯, ১০৭) ; রাশীদ রিদা, তাফসীর, ২খ., ২৫৮-৯, ৩খ. ৯-১১, ৪খ. ৪৯, ২৮০ ; ৭খ. ১৪৫ এবং তৎপরবর্তী নির্দেশিকা]। তাহাদের দৃষ্টিতে এই সকল গোষ্ঠী সাধারণত বিজ্ঞান ও যুক্তির পরিপন্থী প্রবণতার জন্য চিহ্নিত হইয়াছিল (তাফসীর, ২খ., ৯১-৩)। ইহারা ইজ্‌তিহাদের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের সাংস্কৃতিক প্রগতির পথ রুদ্ধ করিতেছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহারা কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ্র উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের তুলনায় ফিক্হ-এর পঠন ও গবেষণাকে প্রাধান্য দান করিয়াছিল (Ibid, ৫খ., ১০৬, ১২০, ৯খ., ১২৯-৩০, ১০খ., ৪২৯)। ইহারা ইমামগণের কর্তৃত্বকে একমাত্র গুরুত্বসম্পন্ন ও বৈধ মাযহাব অর্থাৎ সালাফ-এর কর্তৃত্বের উপর স্থান দান করিয়াছিল (Ibid ৯খ., ১৩৩)। জনগণকে তাহাদের পণ্ডিতগণের নিঃশর্তভাবে বশ্যতা স্বীকার করিতে উৎসাহিত করিয়া গোষ্ঠীসমূহ কুরআনের শিক্ষা উপেক্ষা করিয়াছিল। আল-কুরআনে বলা হইয়াছে, মুসলিমগণ অবশ্যই মুক্তির একটি এবং একমাত্র রজ্জুকে একসঙ্গে দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরিবে (জামী'আন), আল্লাহ্র রজ্জু (হাবলুল্লাহ) যাহা হইতেছে কুরআন (তু. এই কুরআনী নির্দেশনা প্রসঙ্গে রাশীদ রিদা-এর বিবরণী, ৩খ., ৯৮ ঃ তাফসীর, ৫খ., ২০ ff.)। দুইটি মাত্র উৎস (এবং সেই সঙ্গে সালাফের ঐতিহ্য) প্রত্যাবর্তন তাই মুসলিমগণের জন্য একটি ঐক্য আনয়নকারী এবং পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপনের ব্যবস্থারূপে কাজ করিবে। মাযহাবী গোঁড়ামী ও পারস্পরিক বিরূপতা হইতে মুক্ত হইয়া মুসলিম উম্মাহ তাহাদের মৌলিক ঐক্যে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হইবে। ইহার মাধ্যমে তাহারা তাহাদের আদি ভ্রাতৃত্ব এবং সর্বোপরি তাহাদের জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বন্ধন পুনআবিষ্কার করিবে (প্রথম নীতিতে প্রত্যাবর্তনের তত্ত্বটি ছিল প্যান-ইসলামিক মতবাদের পক্ষে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি এবং এই ধারণাটি ছিল সংস্কারবাদী গ্রন্থকারগণের একটি প্রিয় বিষয়)।

সালাফিয়্যাগণের প্রচারিত প্রথম নীতিতে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি কি প্রতিক্রিয়াশীলরূপে বিবেচনা করা যায় ? সংস্কারবাদিগণ কিছু পুরাতন পরিভাষা (যথা সুন্নাহ, উম্মা, জামা'আত, ইমাম, দারু'ল-ইসলাম, ইজমা', ইজ্‌তিহাদ)-কে সালাফের সময় প্রচলিত ইহাদের সঠিক তাৎপর্যকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট ছিলেন না ; বরং এই প্রত্যাবর্তন দুই উৎসকে তাহাদের চিন্তা-ভাবনার খুবই প্রয়োজনীয় (কিন্তু একমাত্র নয়) ভিত্তিরূপে বিবেচনা করিবার মানসিকতা প্রকাশ করে—যাহাতে আধুনিক বিশ্ব মুসলিমগণের জন্য যে নৈতিক সমস্যাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সহায়ক হয়। ইহাদের ব্যবহারে তাঁহারা কুরআন ও সুন্নাহ-য় প্রাপ্ত কতিপয় পরিভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন যাহা সময় সময় আধুনিক বিশ্বের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা হইতে উদ্ভূত কতিপয় সর্বাগ্রে করণীয় কর্মের সহিত মিলিত হইয়া যায়। আপাত দৃষ্টিতে যাহা ছিল ইসলামের মূল উৎসে প্রত্যাবর্তন, প্রকৃতপক্ষে ইহার পশ্চাতে সালাফিয়্যাগণ একটি নৈতিক ও মতবাদী নবায়নের দিকে সচেষ্ট ছিল। এই লক্ষ্যে তাঁহারা ধর্মগ্রন্থ ও বর্তমান যুগের বাস্তবতার মধ্যে সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য সন্ধান করিতে থাকেন [ উদাহরণরূপে দ্র. সূরা ২ ঃ ২৩৩ ; ৩ ঃ ১৫৯) এবং উলু'ল-আম্‌র (কুরআন ৪ ঃ ৫০)-এর ধারণা এবং রাশীদ রিদা প্রদত্ত ইহাদের ব্যাখ্যা, তাফসীর, ২খ., ৪১৪, খ., ১৯৯-২০৫, ৫খ., ১৮০-১৯০]। উৎসমূলে প্রত্যাবর্তনের নীতির একটি যুক্তিযুক্ত পরিণাম হইতেছে তাকলীদ (দ্র.)-এর প্রত্যাখ্যান ও ইজতিহাদ পরিচালনার নূতন পন্থার সন্ধান করা।

(২) তাকলীদ ঃ সংস্কারকগণ চিরাচরিত সংক্রান্ত ধর্মীয় মতবাদী কর্তৃত্বের বশ্যতা স্বীকারের প্রবণতাকে অত্যন্ত তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। বিশেষত গোঁড়াপন্থী গোষ্ঠীসমূহের স্বাভাবিকভাবেই তাকলীদের ধারণা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর কর্মপন্থার নিষ্ঠাপূর্ণ অনুকরণ যাহা বস্তুতপক্ষে একটি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা (তু. কুরআন, ৪ ঃ ৫৯, ৩৩ ঃ ২১) অথবা সালাফের প্রামাণিকতার প্রতি আস্থা স্থাপন যাহাদের নৈতিক ও মতবাদী কর্তৃত্ব সংস্কারকগণ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন (উপরে দ্রষ্টব্য)। এই সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স) ও সালাফ উভয় ঐতিহ্যের ক্ষেত্রেই তাকলীদের পরিবর্তে ইত্তিবা' (সক্রিয় অনুসরণ) শব্দটি ব্যবহৃত (তু. এই বিষয়ে রাশীদ রিদাকৃত পার্থক্যকরণ, তাফসীর, ৫খ., ২৩৮)। এই প্রকার নিষ্ঠা ইসলাহ-এর সার্বিক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ ও অনুপ্রাণিত করে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুকরণকে "জ্ঞান ও কর্মক্ষমতার" একটি আদর্শরূপে পেশ করে (H. Laoust, Essai, ২২৬)। ইব্‌ন বাদীসের মতে, এই অনুকরণ যত উত্তম হইবে সংস্কারবাদের কর্মতৎপরতাও (দা'ওয়া) ততই উত্তম হইবে (শিহাব, এপ্রিল ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ৮)। ইত্তিবা' হইতেছে যথার্থতায় পৌছাইবার প্রচেষ্টা এবং ইহা হইতেছে নবপ্রবর্তন ও কল্পনামূলক চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত যাহা ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে কর্তৃপক্ষের শিক্ষার নিষ্ক্রিয় সমর্থনের মতই নিন্দনীয়। যে কোন ক্ষেত্রেই পবিত্রতা ও পুণ্যতার জন্য অনুকরণীয় যে কোন ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক জীবনীর অনুকরণে (ইকতিদা') নিজ জীবন গঠনের প্রচেষ্টা হইতে তাকলীদ সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার (তাফসীর, ৬খ, ৪১৫)। বিশেষত শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদগণের সরবরাহকৃত ব্যাখ্যাসমূহের সুচিন্তিত গ্রহণকে তাকলীদ বলা চলে না। কারণ তাঁহারা নিজেদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল হইতে স্বতন্ত্র আইন প্রদায়ক (শারি'উন)-রূপে দাবি করেন না। অন্যদিকে তাঁহারা হইতেছেন আসমানী আইন ও সুন্নাহ উত্তমরূপে উপলব্ধির জন্য উপযুক্ত পথপ্রদর্শক মাত্র (ibid, ৫খ., ২৩৮)। একইভাবে উলু'ল-আম্‌র (কুরআন ৪ ঃ ৫৯)-এর প্রতি বাধ্যতা গ্রহণযোগ্য। কারণ তাঁহারা আইন ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে, ইহার প্রয়োগে এবং মুসলিম

জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে কুরআনী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় তৎপর। তাকলীদের প্রতি সংস্কারবাদিগণের সমালোচনার লক্ষ্য ছিল একদিকে যুক্তিহীন সমর্থন এবং অপরদিকে ধর্ম ও সংস্কৃতির নিশ্চল ধারণার নামে ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা ও প্রগতি বিরোধী সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনসমূহকে সক্রিয় সমর্থন দান। সংস্কারবাদীরা মনে করেন, মুকাল্লিদগণের জন্য ধর্মীয় জীবন হইতেছে অর্জিত অভ্যাসের প্রকাশ এবং বর্তমান অবস্থানকে নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করা; তাহাদের 'ইবাদাত প্রকৃতপক্ষে পরিণত হয় কোনরূপ গভীর অর্থবিহীন মৌখিক প্রক্রিয়ায় এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া কতিপয় ক্রিয়াকলাপের যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হয় যাহার কোন সংশোধনমূলক অথবা পবিত্রকরণমূলক মূল্য থাকে না। এই আলোকে বিচার করিলে তাকলীদ প্রকৃতপক্ষে হইতেছে কুরআনের দাবিকৃত আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার বিপরীত।

পূর্ববর্তিগণের কিংবা পূর্বপুরুষগণের (আবা') প্রতি যুক্তিহীন আত্মসমর্পণ সম্পর্কে কুরআনে প্রচুর সংখ্যক নিন্দাবাচক বক্তব্য রহিয়াছে। সংস্কারবাদী গ্রন্থকারগণও ইহার বহুল ব্যবহার করিয়াছেনঃ তাফসীর, ১খ, ৪২৫, ৪খ, ৬৩ (তাকলীদ-কে ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্যময় নিদর্শনরূপে বিবেচনায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন), ৮খ, ২১ (৯০ নং সূরা-এর প্রতি নির্দেশনা), ৯খ, ৫৭০, ১০খ, ৪২৮ (কুরআনে অন্ধ তাকলীদের নিন্দা জ্ঞাপন), ১খ, ৪২৫, ২খ, ৮৩, ৭খ, ১৪৩ (সালাফ এবং প্রথম মহান চিন্তাবিদগণ কর্তৃক দৃঢ়ভাবে ইহাকে অনুৎসাহিত করা হইয়াছে), ৫খ, ২৯৬, ৮খ, ৩০, ১৪৪ (ইহা একটি ভ্রান্তির উৎস), ১খ, ৪৪৮, ৩খ, ২৩৬, ৫খ, ২৯৬ (ইহা প্রত্যাদেশ সম্পর্কে ব্যক্তিগত চিন্তাধারার প্রতি বাধাস্বরূপ), ২খ, ৭৬, ৮খ, ১৬৯, ৯খ, ১৭৯, ১০খ, ৪৩২ (ইহা একটি নূতন শ্রেণীর ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন ঃ বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষকগণের প্রতি অত্যধিক সম্মান প্রদর্শন); ১খ, ৪২৯, ৩খ, ২০২, ২৫৮, ৪খ, ৪৯, ৭খ, ১৪৫ (ইহা দলীয় মনোভাব ও ধর্মান্ধতা সৃষ্টি করে); ২খ, ৭৬, ১০৮, ৮খ, ৩৯৯ (ইহা সমাজের মধ্যে অনৈক্য ও দুর্বলতা সৃষ্টির হেতু)। যেহেতু ইহারা ব্যক্তিগত চিন্তা ও অভিজ্ঞতার তুলনায় কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিগণের যুক্তিকে অধিকতর মূল্য দান করে, তাকলীদ তাই ইসলামের চেতনার বিরোধী। কারণ ইসলাম সকল বুদ্ধিজীবীর জন্য সকল ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা স্বীকার করে (ঐ, ১২খ, ২২০); অতিরিক্ত দ্রষ্টব্য মুহাম্মাদ ইকবাল, The Reconstruction ..., পৃ. ১২৫-৯; ফরাসী অনু., পৃ. ১৩৬-৪১)। তাকলীদের নিষিদ্ধ (তাহরীম) এবং অবৈধ (বুতলান) প্রকৃতি এবং মুসলিম শিক্ষা ও নীতিজ্ঞানের উপর ইহার নেতিবাচক প্রভাবের নিন্দা করিতে গিয়া সংস্কারবাদিগণ বারংবার এই সকল বিরোধিতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইসলামের সাংস্কৃতিক বদ্ধতা এবং ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় কাঠামোর প্রতি মুসলিম জনগোষ্ঠীর উদাস আনুগত্যের জন্যও তাকলীদকে দায়ী করা হইয়াছে (দ্র. ভ্রাতৃসংঘসমূহের 'উলামা' এবং শায়খগণ; তু. তাফসীর, ৩খ, ৩২৫-৭, ১০খ, ৪২৫-৩৫, ১২খ, ২২১; রাশীদ রিদা, আল-ওয়াহদাতু'ল-ইসলামিয়্যা, স্থা.; ইব্‌ন বাদীস, শিহাব, নভেম্বর ১৯৩২ খৃ., পৃ. ৫৫২-৭; A. Merad, Le Reformisme musulman, পৃ. ২৭৫-৬)। সংস্কারবাদিগণের দৃষ্টিভঙ্গীতে তাকলীদের ধারণা অবশ্যম্ভাবীরূপে ইজতিহাদের ধারণা মনে আনে যাহার সহিত ইহার একটি নীতি বিরোধী জোড় সৃষ্টি করে (তাওহীদ/শিরক, সুন্নাহ/বিদ'আত, ইত্তিবা'/ইবতিদা', সালাফ/খালাফ), ইহাদের চতুর্দিকে ইসলাহ-এর মতবাদ সর্বাপেক্ষা সোচ্চারিত।

(৩) ইজতিহাদ ঃ ইসলাহ দৃঢ়ভাবে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতা ব্যক্ত করিয়াছে। রাশীদ রিদা ইহাকে বর্ণনা করিয়াছেন "ধর্মের মধ্যে একটি জীবনীশক্তি"রূপে (হায়াতু'দ-দীন, তাফসীর, ২খ., ৩৯৯)। এইসঙ্গে সমাপ্ত হয় ইজতিহাদের "তোরণ বন্ধ হওয়ার" কল্পকাহিনী (৪র্থ/১০ম শতাব্দী হইতে), একই সঙ্গে সমাপ্তি ঘটে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নিষেধাজ্ঞা ও রূপকথাসমূহের যাহা এতকাল যাবত মুসলিম মানসের উপর গুরুভাররূপে অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু সংস্কারবাদিগণ ইজতিহাদ-এর প্রতি মানসিকতার উন্মুক্তিকে সমালোচনামূলক চেতনার জন্য সকল কিছুকেই প্রশ্ন করার অবাধ স্বাধীনতারূপে বিবেচনা করেন নাই। ধর্মীয় বিষয়ে চেতনার সর্বাত্মক স্বাধীনতা অন্তহীন মনগড়া অনুমানের সৃষ্টি করিবে (ঐ, ৮খ, ৩১৭), ইহা সালাফিয়্যাগণের কোনক্রমেই অভিপ্রেত ছিল না। তথাপি রক্ষণশীল সুন্নীবাদ ইসলাহ-কে বিদ'আতে উৎসাহ প্রদান ও ধর্মীয় মতবাদে অরাজকতার সমর্থন দানের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন (ঐ, ২খ., ২৭৩, ১১খ, ২৫৩)। তাকলীদের বিষয়বস্তু সব সময়েই সংস্কারবাদিগণ ও তাহাদের ঐতিহ্যপন্থী প্রতিপক্ষের মধ্যে একটি ভুল বোঝাবুঝির উৎসরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কারণ কোন পক্ষই এই নীতিটির সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান অথবা ইহার ব্যবহারিক পরিসীমা নির্ধারণে ঐকমত্যে আসিতে সম্মত হন নাই। প্রাচীনপন্থিগণ যাহারা ধর্মকে (ইহার সার্বিক ভিত্তিতে) আল্লাহপ্রদত্ত বিধান এবং ইহাকে যথাযথরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ (কুরআন ৫ ঃ ৫) হিসাবে বিবেচনা করিতেন তাঁহারা আশংকা করিতেন যে, আধুনিকপন্থীরা ইজতিহাদকে ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় ভিত্তিসমূহকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু সংস্কারবাদী চিন্তাতেও ইজতিহাদ-এর সীমাবদ্ধ শর্ত ছিল।

প্রথমত, ইসলাহ এমন একটি অনুভবনীয় পরিমণ্ডল বলয় সৃষ্টি করিয়াছিল যাহাতে ধর্মীয় বিশ্বাস ('আকাইদ), মৌল 'ইবাদাত এবং ধর্মীয় নিষেধসমূহ (তাহরীম দীনী) অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহাদের প্রতিটির ভিত্তি ধর্মগ্রন্থে আছে এবং ইহাদের সুস্পষ্ট ও আনুষ্ঠানিক প্রকৃতি অথবা ইহাদের ব্যাখ্যার প্রশ্নাতীত যথার্থতার কারণে ইহারা এই শ্রেণীভুক্ত (মা হুয়া কাত'ঈ'র-রিওয়ায়া ওয়া'দ-দালালা, তাফসীর, ১খ., ১১৮ (bis), ১১খ, ২৬৫, ২৬৮; আল-ওয়াহদাতু'ল-ইসলামিয়্যা পৃ. ১৩৬)। এই ক্ষেত্রে ইজতিহাদ-এর কোন সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা নাই (তাফসীর, ৫খ, ২১১, ৮খ., ২১৭, ১০খ., ৪৩২, ১১খ, ২৬৮)। কারণ এই ক্ষেত্রে ইহা হইবে "আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট একটি পবিত্র ব্যবস্থার" অংগ মৌল ধর্মীয় বিধানসমূহের প্রতি একটি অত্যন্ত অসহনীয় দাম্ভিক সন্দেহ প্রকাশের প্রচেষ্টা (ঐ, ২খ., ১৮, ১০খ., ৪৩২)। এই কয়েকটি অতি পবিত্র বিষয় ব্যতীত ইসলাহ ইজতিহাদের ব্যবহার অনুমোদন করে যাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট তাৎপর্যবাহী দুইটি ভিন্ন ক্ষেত্রের উপর অবস্থিত।

(ক) দুইটি উৎসকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টায় প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল-কুরআন ও সুন্নাহর মর্মবাণী অনুধাবনে যত্নবান হইবার কর্তব্য ও অধিকার রহিয়াছে, ইজতিহাদ উহার একটি অংশ (ঐ, ২খ., ৩৯৯)। সংস্কারমূলক প্রচারের একটি মৌল আদর্শ হইতেছে, প্রত্যেক মুসলমানকে আল্লাহর বাণী ও ইহাকে ব্যাখ্যাকারী রাসূলের শিক্ষা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট ও জড়িত হইতে হইবে। ধর্মগ্রন্থের উপর সার্বক্ষণিক ধ্যান, ইহার

প্রদত্ত সকল সম্পদের বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের জন্য ধৈর্যশীল প্রচেষ্টার মাধ্যমে সকল মুসলিমের পক্ষে নিজকে আল্লাহ্র বাণীতে সম্পৃক্ত করিয়া ইহা হইতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আচরণবিধি (হিদায়াত) সম্পর্কে নীতি আহরণ করা সম্ভব হইবে। ইজতিহাদের এই নিছক অভ্যন্তরীণ রূপটি মুসলিম আধ্যাত্মিকতাকে সমৃদ্ধ করিতে এবং নৈতিক বিচার ও ব্যবহারিক পসন্দের ব্যাপারে তাহার বিবেককে পরিচালনা করিতে সহায়তা দান করে। ইহার তাৎপর্যসমূহ প্রধানত ব্যক্তিগত (তু. তাফসীর, ১খ., ১১৮। 'ইবাদাতের বিষয়ে ব্যক্তিগত ইজতিহাদ (ইবাদাত শাখসিয়্যা) ইজতিহাদ সমাজের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের সাধারণ নীতি নির্ধারণে (সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈদেশিক ইত্যাদি) কুরআন ও সুন্নাহ-র মৌল বিধানসমূহের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষ্য করিয়া উৎস দুইটির ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইহার সার্বিক নীতি প্রণয়নে সমাজকে সদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

(খ) ধর্মমতের তুলনায় আইন পদ্ধতি ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর এবং সমাজ ও ব্যবহারিক বিষয়াদি উভয় ক্ষেত্রেই প্রভাবশালী একটি গঠনমূলক প্রচেষ্টার ন্যায় ইজতিহাদ স্বয়ং উলু'ল-আম্র (দ্র.)-এর কর্তৃত্বাধীন ছিল। শেষোক্তগণ ছিলেন কর্তৃত্বের বৈধ অধিকারী (কুরআন ৪ ঃ ৫৯) এবং তাহাদের দায়িত্ব, তাহাদের ধর্মীয় জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ দক্ষতার জন্য ইহারা 'বাধ্যবাধকতা ও বাধ্যবাধকতা নয়" উভয়েরই দায়িত্বে (আহ্লু'ল-হাল্ল ওয়া'ল-'আক্দ) ছিলেন অর্থাৎ সমাজের পক্ষে এবং ইহার বৃহত্তর স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী ছিলেন [উলু'ল-আম্র-এর সংজ্ঞা ও ভূমিকা প্রসঙ্গে তু. H. Laoust, Essai, ৫৯৬ এবং Traite de Droit Public d'Ibn Taymiyya (শেষোক্ত জনের দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে)। আল-কাওয়াকিবী, উম্মু'ল-কুরা, পৃ. ৫৮ রাশীদ রিদা, তাফসীর, ২খ., ৪৯২, ৩খ., ১১-১২, ৪খ., ১৯৯-২০৫ (গুরুত্বপূর্ণ), ৫খ., ১৮০-১ (মুহাম্মাদ 'আবদুহু-এর অবস্থান), ২১১-২, ৭খ., ১৪০, ১৯৮, ৮খ., ১০২, ১১খ., ১৬৪]। উলু'ল-আম্র-এর কার্যাবলী সমাজের জন্য নৈতিক মঙ্গল (ইসলাহ) এবং বাস্তব সমৃদ্ধি (মাসালিহ) আনয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হইবে। তাহাদের আইনগত যোগ্যতা এমন সকল বিষয়াদি পর্যন্ত বিস্তৃত যাহা সাধারণত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব। তবে ইহা 'ইবাদাত সম্পর্কিত বিষয়াদি অথবা ব্যক্তিগত মর্যাদা প্রসঙ্গে প্রযোজ্য নয় (ঐ, ৫খ., ২১১)। এই সকল ক্ষেত্রে, ইজতিহাদের ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত প্রথার বিরোধিতা সৃষ্টি করিবে (ঐ, ১১খ., ২৫৩)। মুসলিমগণ সেই সকল উলু'ল-আম্র (ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা)-কে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিতে পারিত যাহারা তাহাদের ইজতিহাদ পবিত্র ক্ষেত্রসমূহে (ঐ, ৩০৮) প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করেন যাহা একমাত্র "আল্লাহ্র অধিকার" (হাক্কুল্লাহ)-ভুক্ত (ঐ, ৮খ, ২৮৮)। সুতরাং কতিপয় 'আরব রাষ্ট্র নেতার প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তিগত মর্যাদার কতিপয় দিকে সংস্কার, যাহা তাহাদের মতে সমসাময়িক সভ্যতার চেতনার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, এই লক্ষ্যে পরিচালিত ইজতিহাদ ছিল সম্পূর্ণ অসঙ্গত। অনুশাসনিক ব্যবস্থামতে সংশ্লিষ্ট সকল কিছুই যাহা নিঃসন্দেহে উৎস দুইটির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাদের প্রসঙ্গে "উলু'ল-আম্র"-এর ভূমিকা প্রধানত ছিল নিষ্ঠাশীলতার সংরক্ষণ যাহাতে সালাফ-এর বিঘোষিত সুন্নাহ সম্পূর্ণভাবে সম্মানের সহিত পালিত হয় তাহা নিশ্চিত করা (ঐ, ৩খ, ১১-১২)। সংস্কারবাদী ধর্মনীতির বিঘোষিত মতের ইহা ছিল স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত যাহাতে বলা হইয়াছে, ধর্ম গ্রন্থের পরম প্রমাণিত তথ্য হইতে উৎসারিত নিশ্চয়তার (য়াকীন) প্রসঙ্গে ইজতিহাদ অসঙ্গতিপূর্ণ (ঐ, ২খ, ১৮, ১০৯)। সালাফিয়্যাগণ শুধু কোন বিশেষ সমস্যার সমাধানকল্পে সুস্পষ্ট ধর্মগ্রন্থীয় নির্দেশনা (নাস্স) অথবা রাসূলের হাদীছ (সুন্নাহ) অথবা সার্বিক মতৈক্য (ইজমা')-এই ক্ষেত্রে রাসূলের সহাবাগণের সর্বসম্মত মত, ইহাদের অনুপস্থিতিতেই ইজতিহাদ-এর ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন (ঐ, ৮খ., ২১৯)।

গুরুত্বপূর্ণ এই সকল বিধিনিষেধের আলোকে আমরা দুই শ্রেণীর সমস্যাকে চিহ্নিত করিতে পারি যাহাদের ব্যাপারে উলু'ল-আম্র-এর ইজতিহাদ সাধারণত প্রযোজ্য ঃ (১) সম্পূর্ণ বৈষয়িক কার্যাবলী (প্রশাসনিক সংগঠন, বিজ্ঞান ও কারিগরি প্রশ্নাবলী, সামরিক ও কূটনৈতিক বিষয় ইত্যাদি)। এই সকল ক্ষেত্রে 'উলু'ল-আম্র' তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী পসন্দ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী। তবে এই পসন্দ সর্বোপরি ইসলামের সুস্পষ্ট লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে সমাজের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে হইতে হইবে। (২) অপরপক্ষে যেইসব বিষয় অনুশাসনিক ধর্মমতের সহিত সম্পর্কযুক্ত, সেইসব ক্ষেত্রে উলু'ল-আম্র-এর ইজতিহাদ আল-কুরআনের সেই সকল আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় হইতে পারে যেইগুলির আপাত ভাবটি সুনিশ্চিত নয়, জান্নি'দ্-দিলালা (তাফসীর, ২খ., ১০৯)। এই সকল ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য ব্যাখ্যাসমূহ এমন সিদ্ধান্ত দান করিবে যাহা চেতনা ও আক্ষরিকভাবে দুই উৎসের সহিত ঐকমত্য পোষণ করিবে। কারণ ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে যে, ইজতিহাদ কেবল উৎসদ্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করা চলে এবং শুধুমাত্র ইহাদের বিভিন্ন ইঙ্গিত (দালা'ইল, কারা'ইন)-সমূহ ও পাঠগত সূত্রসমূহের প্রতি নির্দেশনা দান করিতে পারে। ইসলাহ-এর একটি মৌলনীতি হইতেছে, উম্মাহ-এর স্বার্থ বিবেচনা কখনো এমন কোন সমাধান প্রদান করিবে না যাহা কুরআন ও সুন্নাহ-এর বাস্তব তথ্য এবং চেতনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এই আলোকে ইজতিহাদ আশ-শাফি'ঈর রিসালা-তে বর্ণিত কিয়াস (দ্র.) হইতে ভিন্ন নয় (তু. J. Schacht, Origins, পৃ. ১২২ প.)। ইসলাহ তীব্রভাবে "মিথ্যা ইজতিহাদ এবং খারাপ কিয়াস"-এর সমালোচনা করিয়াছে (তাফসীর, ৩খ., ২৩৮, ৫খ. ২০৩)। ইহাদের মাধ্যমে ধর্মীয় আইনে (শার') এমন কিছু বিষয়বস্তু প্রবেশ করিবে যাহা কেবল ব্যক্তিগত মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত (রা'য় দ্র.) অথবা কমবেশী মূল বিধি-বহির্ভূত অগ্রাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত [ইসতিহসান (দ্র. ইসতিহসান এবং ইসতিসলাহ)]। ধর্মীয় ব্যাপারে রা'য়-কে এক প্রকার 'বিপদ' (বালিয়্যা)-রূপে বিবেচনা করা হয়। কারণ ইহার একমাত্র কাজ বিপদজনক নব প্রবর্তনসমূহকে আড়াল করিয়া রাখা (ঐ, ৮খ., ৩৯৮)। সংস্কারকগণ যদিও ফুকাহা'-এর প্রযুক্তিক ব্যবহারের অনুসারে কিয়াস, রা'য় ও ইসতিহসান সম্পর্কে সন্দিহান, তথাপি কিছু সুস্পষ্ট শর্তাধীনে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তাঁহারা এই সকল যুক্তি ও সমাধানের পদ্ধতি ব্যবহার করেন [যথা সাহাবাগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের রায় ('উলামাউ'স্-সাহাবা), কুরআনী ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক রায়; শূরা-এর সদস্যগণের (জামা'আতু'শ-শূরা) রায়, যাহারা সমাজের পার্থিব বিষয়রসমূহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন (ঐ, ৭খ., ১৬৪)। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর জন্য তু. তাফসীর, ৭খ., ১৬৪ (অনুমোদিত রায়, মাহমূদ সম্পর্কে); ৭খ., ১৯০ (গ্রহণযোগ্য কিয়াস, সাহীহ প্রসঙ্গে);

৭খ., ১৬৭ প. (সম্পূর্ণভাবে কিয়াস-এর প্রত্যাখ্যানের অপকারিতা (তু. ইব্‌ন হায্‌ম, ইহ্‌কাম, ৭খ., ৫৩ প., ৮খ., ২ প.) প্রসঙ্গে অথবা ইহা বাধ্যবাধকতা বুদ্ধিহীনভাবে ইহার ব্যবহার প্রসঙ্গ]। এই বিতর্কের মধ্যে রাশীদ রিদা ইব্‌নু'ল-কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা-এর অনুসৃত নব্য হাম্বালী দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করিয়াছেন (ই'লামু'ল-মুওয়াক্কি'ঈন)। সংক্ষেপে বলা চলে, রায় ও কিয়াস হইতেছে ইজতিহাদ-এর বিশেষ দিক মাত্র এবং শেষোক্ত-এর ন্যায় শুধু 'ইবাদাত-এর বাহিরের বিষয় সম্পর্কেই ইহা গ্রহণযোগ্য। আইন অথবা বিধি প্রণয়নের (আহ্‌কাম) ক্ষেত্রে ইজতিহাদ-এর সকল রূপে ব্যবহার কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য যখন এই প্রসঙ্গে কুরআন, সুন্নাহ অথবা খুলাফা-ই রাশিদূন-এর অবিসংবাদিত কার্যাবলীতে ইহার কোন নজীর নাই (তাফসীর, ৭খ, ১৬৪)। পবিত্র বাণীর ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা বা ইহা হইতে প্রবাহিত করুণাধারা (হুদা) পাওয়া যায়-এমন অবস্থায় থাকিবার আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও সংস্কারকগণ কেবল ইজতিহাদ-এর সেই সকল ব্যবহারে সীমাবদ্ধ ছিলেন যাহা উলু'ল-আম্‌রগণ বৈষয়িক শ্রেণীর সরকারী কার্যাবলীতে প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু যাহাতে উলু'ল-আমর-এর ইজতিহাদ সংঘাত ও বিবাদের উৎসে পরিণত না হয় সেইজন্য ইহাদের আহরণ করিতে হইবে কুরআন-এর নীতির (৪২ ঃ ২৬) আলোকে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার (শূরা) মাধ্যমে। স্বতন্ত্র মুজতাহিদগণের ব্যক্তিগত এমনকি সমগ্র সময় পরস্পর বিরোধী মতামত দ্বারা সমাজ সীমাবদ্ধ নয়। ইজতিহাদ-এর বৈধতা উলু'ল-আম্‌রগণের দ্বারা তাহা গৃহীত হওয়ার একটি পূর্বশর্ত। উপরন্তু সংস্কারকগণের দৃষ্টিতে ইহা হইতেছে ইজমা' (দ্র.)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। ইহার মাধ্যমে উম্মাঃ আধুনিক বিশ্বের বাস্তবতায় ইহার বাস্তবায়নজনিত অসংখ্যা সমস্যার সমাধান লাভ করিবে।

(৪) **ইজমা'** ঃ উসূল-এর প্রাচীন তাত্ত্বিকগণের মতবাদের তুলনায় এই ক্ষেত্রেও (ইজতিহাদ-এর ন্যায়) সংস্কারকগণের অবস্থান ছিল অত্যন্ত পৃথক [তু. আশ-শাফি'ঈ, রিসালা, পৃ. ৪৭১ প. ; ইব্‌ন হায্‌ম, ইহ্‌কাম, ৪খ., ১৩২-২৩৫ এই বিষয়ে হানাফী, মালিকী ও শাফি'ঈ ধারণাসমূহের সমালোচনা; I. Laoust, Contribution a une etude de la methodologie canonique d'Ibn Taimiya, কায়রো ১৯৩৯ খৃ.; ঐ লেখক, Essai, পৃ. ১৩৯ প.; J. Sehacht, Origins, পৃ. ৮২-৯৪; মুহাম্মাদ ইকবাল, Reconstruction ..., পৃ. ১৬৪ প.; Gardet, Introduction.. .,পৃ. ৪০৩ প.; ঐ লেখক, La Cite Musulmane, ১১৯-২৯; আরো দ্র. ইজমা']। ইজমা'-কে ইসলামের তৃতীয় মৌল উৎসরূপে গণ্য করা হয় (কেবল 'আইন'-এর উৎস নয়। তু. আল-কাওয়াকিবী, উম্মু'ল-কুরা, পৃ. ১০৪; তাফসীর, ৫খ, ১৮৭, ১১খ., ২৬৭)। কিন্তু সংস্কারকগণ ইহা হইতে উদ্ভূত প্রচলিত শ্রেণীকরণ ও পদ্ধতিসমূহ গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন না (তাফসীর, ৫খ., ২০৩-৯)। তাঁহাদের মতে বিষয়টির প্রাচীন ভাবধারা উৎসদ্বয়ের দ্বারা যথার্থরূপে প্রতিপাদিত নহে (ঐ, ৫খ., ২১৩), যদিও ইজমা'-এর ধারণাটি কুরআন (৪ ঃ ১১৫) এবং সুন্নাহ্য় অন্তর্নিহিতরূপে বর্তমান আছে (তু. Wensinck, Handbook, ৪৮A; ইব্‌ন হায্‌ম, ইহ্‌কাম, ৪খ, ১৩২ প.)। এই পদ্ধতিগত নীতিটি 'সর্বসম্মত' (ইজমা') এই ধারণায় সংজ্ঞায়িত না করিয়া বরং 'গোষ্ঠী' (জামা'আত)-এর অর্থে বিবেচনা করিতে হইবে এবং শেষোক্ত বলিতে এই স্থলে স্বাভাবিকভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠী না বুঝাইয়া কেবল 'কর্তৃত্বের বৈধ রক্ষক' (উলু'ল-আমর) বুঝিতে হইবে (তাফসীর, ৫খ. ২১৩-৪)। সুতরাং সংস্কারকগণ ইজমা'-কে সমাজের সার্বিক মতৈক্য (তু. আশ-শাফি'ঈ, রিসালা, পৃ. ৪০৩, নং ১১০৫, এবং ৪৭১ প.) অথবা কোন একটি বিশেষ সময়কালের মুজতাহিদগণের কোন একটি বিশেষ প্রশ্নে সর্বজনস্বীকৃত মতৈক্যে উপনীত হওয়ার অবস্থা কোনটিরই দ্বারা ভূষিত করেন নাই (ঐ, ৫খ, ৪১৭)। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র) এবং নব্য হাম্বালী গোষ্ঠীর ধর্মমত সংক্রান্ত নীতির ন্যায় সালাফিয়্যাগণও ইজমা-কে অনুশাসনিক স্তরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের সমস্থানে সীমাবদ্ধ (হাসারা) রাখিয়াছেন (আল-কাওয়াকিবী, উম্মু'ল-কুরা, পৃ. ৬৭, ১০৩; তাফসীর, ২খ., ১০৮, ৪৫৪, ৫খ, ১৮৭, ২০৬, ৭খ., ১১৮, ৮খ., ২৫৪, ৪২৮)। সাহাবাগণের যুগের পরবর্তী যে কোন ইজ্‌মা' মূল্যহীন, বিশেষত যে সমস্ত ইজমা' এমন কোন ধর্মমত অনুমোদন করে যাহা শেষোক্ত কোন ঐতিহ্যের সহিত বিরোধপূর্ণ ইজ্‌মা'উ'ল-মুখালিফীন (তাফসীর, ৫খ., ২০৬, ৭খ, ১৯৮)।

'ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়সমূহ যেমন সাহাবাগণের মতৈক্যের প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করা হয় (প্রয়োজনবোধে এসবকি তাবি'ঊন)। কারণ নিষ্ঠাশীলতার একমাত্র নির্ধারক তাঁহারই, তেমনি ধর্ম সংশ্লিষ্ট নয় এমন সব বিষয় সম্পর্কে বৈধতার নির্ধারক মাত্রা হইতেছে উলু'ল-আম্‌র-এর মতৈক্য কারণ ইহারাই সমাজের বৈধতার রক্ষক (ঐ, ৩খ, ১২, উলু'ল-আম্‌র হইতেছেন তাহারা, উম্মা-এর দৃষ্টিতে যাহাদের নেতৃবর্গ এবং তাহাদের সরকারী কর্মকাণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ শক্তি আছে, তাজ'আলুহুম মুসায়তিরীন 'আলা হুক্কামিহা ওয়া আহ্‌কামিহা)। উলু'ল-আম্‌র-এর প্রতি আনুগত্যের (সূরা ৪ ঃ ৫৯-এর মাধ্যমে সংস্কারকগণ কর্তৃক সর্বদা উদ্ধৃত) মূল কারণ ইহার অভ্রান্ততার যুক্তি নয় ['ইস্‌মা দ্র.], ইহার কারণ হইতেছে সংশ্লিষ্ট জনস্বার্থ (মাস'লাহা, ঐ, ৫খ., ২০৮)। এই বিষয়ে সংস্কারকগণের মনোভাব সংক্ষেপে বর্ণনা প্রসঙ্গে রাশীদ রিদা উলু'ল-আম্‌র-এর মতৈক্যকে বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের আইন (শারী'আত)-এর ভিত্তিসমূহের অন্যতমরূপে বিবেচিত খাঁটি ইজমা'রূপে (ঐ, ৫খ, ১৯০)।

সামাজিক স্তরে শূরা-এর কার্য প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, কোনরূপ উপদেষ্টা পদ্ধতির অবর্তমানে, ইসলামে ইজমা'র ব্যবহারকে সংস্কারকগণ দেখিয়াছেন একটি শূন্যস্থান পূরক হিসাবে। তবে তাঁহারা ইহার রূপ ও বিষয়বস্তুকে আধুনিকায়নের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে সালাফিয়্যা চিন্তাধারা কখনই আমাদের নিকট বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। ফলে সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বে ইজমা'-এর ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে কোন সুসংহত সংস্কারবাদী মতবাদ প্রদান করা কষ্টকর। মুহাম্মাদ ইক্‌বাল (১৯৩৪ খৃ.) এই মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে, ইজমা'-কে একটি স্থায়ী আইন প্রণয়ক প্রতিষ্ঠানরূপে সংগঠিত করা উচিত (Reconstruction..., পৃ. ১৬৪)। রাশীদ রিদা (১৯২২ খৃ.) সমাজ না উম্মাহ্‌র সর্বোচ্চ প্রধান (আল-ইমামু'ল-আ'জাম)-কে সহায়তা প্রদানের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ ব্যবহারের ধারণাটি বিবেচনা করিয়াছেন (তু. H. Laoust, Le Califat dans la doctrine de Rashid Rida, ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ২১ প.), কিন্তু এই ধারণাটি কেবল খিলাফাত পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটেই অর্থবহ। বর্তমান বাস্তবতার আলোকে ইব্‌ন বাদীস খিলাফাতের সমস্যাটিকে বর্জন করিয়াছেন ("একটি ব্যর্থ কল্পনা")। তিনি একটি জামা'আতু'ল-মুসলিমীন গঠনের প্রস্তাব করেন। এই সংগঠনটি হইবে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী

পরিষদ যাহা ইসলামী সমাধান সন্ধানের লক্ষ্যে বিশেষত মুসলিম সমস্যাসমূহ লইয়া গবেষণা করিবে। এই গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র সমাজের স্বার্থে সক্রিয় থাকিবে। ইহা কোন বিশেষ সরকারকে সহায়তা প্রদান করিবে না। ইহা হইবে সম্পূর্ণভাবে অরাজনৈতিক প্রকৃতির যাহাতে ইহার প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা পায় (তু. A. Merad, Reformisme, পৃ. ৩৭৬ প.; ঐ, Ibn Badis, Commentat., ৪র্থ অধ্যায়)।

যদিও তাহারা ইহা প্রতিষ্ঠার ব্যবহারিকতার প্রসঙ্গে কখনও ঐকমত্যে পৌঁছাইতে সক্ষম হন নাই, তথাপি সংস্কারকগণ ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, ইজমা'-এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপের মাধ্যমেই সালাফিয়াগণের আদর্শ ও ইসলামী নীতির অনুসরণে উম্মাহ-এর উত্তরণের একটি দৃঢ় পদক্ষেপ সম্ভব। এই প্রসঙ্গে সকল লেখকই একমত হইয়াছেন যে, গোষ্ঠীর ইজমা'-এর জন্য জামা'আত-ই হইবে অধিকারপ্রাপ্ত দল। ইহার দুইটি ভূমিকা থাকিবে ঃ ধর্মীয় ব্যাপারে, ইহা যেই সমস্ত বিষয়ে বিতর্কের (ইখ্‌তিলাফ) সৃষ্টি হইবে, সেই সকল ক্ষেত্রে প্রচলিত অবস্থান নির্ধারণের মাধ্যমে একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কায়েম করিবে; বৈষয়িক ব্যাপারসমূহে ইহা ইহার আওতাধীন বিশাল এলাকায় ইজতিহাদের নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সক্রিয় উৎসরূপে কাজ করিবে। এইভাবে ইহা 'ইবাদাত ও 'আদাত-এর মধ্যে উদ্ভুত যে কোন বিভ্রান্তি নিরসনে সক্রিয় থাকিবে এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও আধিভৌতিক প্রগতির ক্ষেত্রে সমাজের প্রয়োজনীয় মুক্ত অনুসন্ধানকে উৎসাহ প্রদানে সহায়তা দান করিবে।

(৫) **'ইবাদাত এবং 'আদাত-এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যসমূহঃ** নব্য হাম্বালী গোষ্ঠীর অনুসরণে (তু. আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, H. Laoust, Essai, ২৪৭-৮, ৪৪৪) আধুনিক ইসলাহ 'ইবাদাত (দ্র.)-এর নিজ নিজ বিষয়বস্তুর মধ্যে সুস্পষ্ট পৃথকীকরণের পক্ষপাতী। এই ক্ষেত্রেও তাহাদের নিজস্ব অবস্থানের স্বপক্ষে তাহারা যে যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহা হইতেছে, 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে সকল কিছুই সম্পূর্ণভাবে ও সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্ (কুরআন) ও তাঁহার রাসূল (সুন্নাহ) কর্তৃক নির্ধারিত করা হইয়াছে। অপরাপর ক্ষেত্রে অর্থাৎ বস্তুগত জীবনের সংগঠনের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল কিছুর ক্ষেত্রে উলু'ল-আম্‌র তাহাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতার অধিকারী (উপরে দ্র. ইজতিহাদ)।

(ক) 'ইবাদাত আল-কুরআন হইবে উদ্ধৃত অথবা রাসূলের প্রদত্ত বিধিবদ্ধ আনুষ্ঠানিক আদেশ-নিষেধ-এর কর্তৃত্বাধীন। ইহাতে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত (তা'আব্বুদ) সংক্রান্ত সকল কার্য ও অনুষ্ঠান, হালাল ও হারাম (দ্র.) ইত্যাদিসহ রীতিনীতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে কাহারও দ্বারা ইজতিহাদের মাধ্যমে অথবা সহজ সাধারণ ধর্মীয় উদ্দীপনার কারণে কোন প্রকার অতি সামান্য নব প্রবর্তন আনয়নের কোন প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে প্রশ্নাতীত ও অসম্ভব। 'ইবাদাত-এর অপরিবর্তনীয় কাঠামো স্বীকার করা বস্তুতপক্ষে বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু। ইহাই হইতেছে আনুগত্যের কাজ যাহাতে ঈমানদারগণ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নিকট হইতে নিশ্চিতভাবে প্রাপ্ত নির্দেশাবলী আঁকড়াইয়া ধরে, রাসূলের সুন্নাহর প্রতি সম্পূর্ণ ও আন্তরিক বিশ্বাসের ইহাই চিহ্ন।

(খ) 'আদাত (অভ্যাস, সংস্কার, ব্যবহার) বলিতে সাধারণত "পার্থিব ঘটনাবলীর" (উমূর দুনয়াবিয়্যা) বিশাল ক্ষেত্র বুঝায় ; "যাহা ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠীভিত্তিক নির্দিষ্ট অথবা সাধারণ হইতে পারে" (রাশীদ রিদা, তাফসীর, ৭খ., ১৪০)। সর্বোপরি ইহা সাধারণত রাজনৈতিক অথবা আইনগত বিষয়ক (ঐ. ৩খ. ৩২৭, ৭খ., ১৪০,২০০) যাহা স্থান ও কালভেদে বিভিন্ন রকম হয়। সেইজন্য ইহা কেবল স্বাভাবিক ফিক্‌হ-এর প্রচলিত ভাবধারায় 'আদাত (দ্র.)-এর প্রচলিত আইনগত ব্যবহারিক বিধি (মু'আমালাত) অথবা "প্রচলিত অধিকার"-এর বিষয়মাত্র নহে। 'আদাত-এর ক্ষেত্রে সংস্কারকগণ সহনশীলতার (عفو) উপদেশ দিয়াছেন এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে না হইলেও উলু'ল-আম্‌র-এর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা এবং ইজতিহাদের যুক্ত ব্যবহারের দাবি করেন (আল-কাওয়াকিবী, উম্মু'ল-কুরা, ৬৭; মানার, ৪খ., ২১০, ৭খ., ১৫৯; তাফসীর, ৩খ, ৩২৭, ৭খ., ১৪০-৪১, ১৯১)।

এই পার্থক্যকরণের মাধ্যমে সংস্কারকগণ যেই সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্ প্রদত্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ বা রাসূলের ব্যবস্থাপত্র নাই। সেই সকল ক্ষেত্রে সংযম প্রদর্শন করিয়াছেন। রাশীদ রিদার মতে, আল্লাহ্ যাহা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন নাই মানুষ তাহা নিষিদ্ধ করিতে পারে না। আল্লাহ্ যে সকল বস্তুকে বৈধ করিয়াছেন সেইগুলিকে মানুষ অবৈধ ঘোষণা করিতে পারে না (তাফসীর, ৭খ., ১৬৯)। যেই সকল ব্যাপারে আল্লাহ্ নীরব রহিয়াছেন সেইগুলিকে অবশ্যই সহনীয় (عفو) রূপে গণ্য করিতে হইবে (ঐ, ৩খ. ৩২৮, ৭খ, ১৬৯)। ধর্ম বিষয়ের "জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের" কোন বস্তুকে নিষিদ্ধ বা সিদ্ধ ঘোষণা করার অধিকার নাই। তাহাদের ভূমিকা কেবল প্রত্যাদিষ্ট আইন (শারী'আত)-কে কার্যে পরিণত করা শুধু ইহা কার্য সম্পাদনেই তাহারা আনুগত্য লাভের অধিকারী। কতিপয় বৈষয়িক বিষয় সম্পর্কে (খাদ্য ব্যবহার এবং ঔষধ প্রয়োগ ইত্যাদি) কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নির্দেশনাকে কেবল অগ্রাধিকার সম্পর্কিত উপদেশ, অনুশাসনিক ব্যবস্থাপত্র নয়, ইরশাদ লা তাশরী' (৭খ., ২০১)।

'ইবাদাত এবং 'আদাত-এর মধ্যে পার্থক্যকরণের মাধ্যমে সালাফিয়্যাগণ এমন কিছু ভক্তিমূলক আচরণ ও নিষেধাজ্ঞার নিন্দা করিতে সমর্থ হন যাহা সূফীবাদের নামে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত প্রসার লাভ করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত জনপ্রিয়ভাবে ধর্মীয় অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছে, যদিও এইসব কুরআন বা সুন্নাহ্‌র উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। উপরন্তু ইহার মাধ্যমে তাহারা প্রচলিত আইন ও নৈতিক বিধিসমূহের সংখ্যা হ্রাস (ফাতওয়ার মাধ্যমে) এবং প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের হ্রাসের দ্বারা একটি সুশৃঙ্খল ও সুস্পষ্ট ধর্মের অনুসারী হওয়ার দাবি সুদৃঢ় করেন। তাহাদের মতে ইহা ছিল মধ্যম ধারার চেতনার নিকটবর্তী যাহা যথার্থ ইসলামের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত (কোমল ধর্ম, আল-হানীফিয়্যা আস-সাম্‌হা) এবং আধুনিক বিশ্বের সহিত অধিকতর সুসংবদ্ধ। এই পার্থক্যকরণের মাধ্যমে স্থানীয় আইন বিষয়ক ও সামাজিক ব্যবস্থাসমূহকে 'আদাতরূপে শ্রেণীভুক্ত করিয়া একটি অধিকতর সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করা যাইবে এবং ইসলামী বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদী ধারার মধ্যে বর্তমান পার্থক্যসমূহের (ইখ্‌তিলাফ) তীক্ষ্ণতা হ্রাস করিবে। সম্ভবত ইহা প্রাচীন মতপার্থক্যসমূহ হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন ধর্মীয় বিবাদকেও দুর্বল করিবে। যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে, এই মনোভাব এমন একটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দৃশ্য অবলোকনের সুযোগ দান করে যাহাতে উম্মাহ-র হৃদয়ে সকল রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক এবং আদর্শগত মতপার্থক্য একই সঙ্গে বিরাজ করিবে। ইহার পূর্বশর্ত হইল, বিশ্বাস ও 'ইবাদাত সম্পর্কে মুসলিমগণের মৌল ঐক্য নিশ্চিত করিতে হইবে এবং ইসলামী আইনের (শারী'আত) প্রতি তাহাদের সামগ্রিক বন্ধন নিবিড় হইতে হইবে।

তবে 'ইবাদাত ও 'আদাত-এর মধ্যে এইরূপ পার্থক্যকরণের মূল্য প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক পরিণতির তুলনায় কৈফিয়তমূলক মূল্যই বেশী। এই বিষয়ে রাশীদ রিদা ও আল-কাওয়াকিবীর প্রস্তাবিত খণ্ড খণ্ড এবং প্রায়শ অস্পষ্ট ধারণাসমূহ হইতে আমরা এই মর্মে কোন যথার্থ বিশ্লেষণে উপনীত হইতে পারি না যে, চিরায়ত মুসলিম আইন ব্যবস্থার কোন কোন দিক মৌলরূপে বিবেচনা করিতে হইবে এবং সেইজন্য উহা অপরিবর্তনীয় থাকিবে এবং কোন কোনগুলি 'আদাত-এর তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা চলিবে। 'আদাত সম্পর্কে পরিকল্পিত সহনশীলতার ব্যাপারটিও অস্পষ্ট। ইহার কারণ সালাফিয়্যাগণের আরোপিত এবং কুরআন হইতে আহরিত সীমাবদ্ধতার শর্তাবলী। সালাফিয়্যাগণ প্রতিবারই তাহাদের রাজনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক স্থিতি-অবস্থান বর্ণনা করিতে গিয়া উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, যদিও তত্ত্বগতভাবে এই সকল ক্ষেত্রেই 'আদাত ব্যবহৃত হইতে পারে। বস্তুতপক্ষে সংস্কারবাদিগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যাদেশ ও সুন্নাহ্র মধ্যে প্রাপ্ত নীতিসমূহের এবং নৈতিক আদেশসমূহের বাহিরে খুব অল্প সংখ্যক বিষয়কেই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কল্পনা করা যায়। যদি বা কোন প্রকার সৃষ্টিধর্মী কর্মতৎপরতা আশা করা যায়, তাহার লক্ষ্যকেও উৎসদ্বয়ের নৈতিক ও ধর্মীয় মানদণ্ডের আলোকে পরীক্ষিত হইতে হইবে। মুসলিম জীবনাদর্শ ও প্রচলিত ব্যবস্থাকে আধুনিক বিশ্বের বাস্তবতার আলোকে পরিবর্তন করার সম্ভাবনা সম্পর্কে ইসলাহ একমত, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ইহা নিশ্চিত করিতে হইবে যে, এই সকল পরিবর্তন উৎসদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত মৌলিক মূল্যবোধকে কোন প্রকারে ধ্বংস সাধন করিবে না। এই প্রসঙ্গে বলা চলে, নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে সালাফিয়্যাগণ মুসলিম নারীর মুক্তির পক্ষে সমর্থন দানের ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মতে এই শিথিলতা এমন পর্যায়ে যাইবে না, যাহাতে তাহাদের আইনগত অবস্থান— কুরআনে প্রতিষ্ঠিত তাহাদের আইনগত অবস্থান অথবা ইসলামী পারিবারিক অথবা যৌন নীতিমালার পরিপন্থী হইতে পারে (তু. এই বিষয় প্রসঙ্গে তাফসীর, ১১খ, ২৮৩-৮৭, "ইসলাম সকল নারীকে সর্বপ্রকার মানবিক, ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার প্রদান করিয়াছে"; রাশীদ রিদা, নিদা' লি'ল-জিনসি'ল-লাতীফ, কায়রো ১৩৫১/১৯৩২; A. Merad, Le Reformisme Musulman, ৩১৫-৩১, Le Reformistes et le Feminisme)।

যদিও তাহারা পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে এক আল্লাহ্র সহিত মানুষের সম্পর্ক ও একান্তভাবে মানবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পার্থক্য-করণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন (বিশেষত যেই সমস্ত কার্যকলাপ ধর্মগ্রন্থীয় আদেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে), সালাফিয়্যাগণ ধর্মতত্ত্ব ও আইনকে পৃথক করার ব্যাপারে কোনরূপ চূড়ান্ত অবদান রাখিতে পারেন নাই। তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে দীন ও শারী'আতের সম্পর্কের অস্পষ্টতা (যাহা তাহারা প্রকৃতপক্ষে কখনও ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন নাই) অবিমিশ্রভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়সমূহের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানিবার প্রচেষ্টায় চিরায়ত আইন ও নৈতিক মতবাদের কোন প্রকার পদ্ধতিগত সমালোচনাকে অত্যন্ত কঠিন করিয়াছে এবং ইহা যুক্তিযুক্তভাবে সন্দেহজনকও [এই প্রসঙ্গে 'আলী 'আবদু'র-রাযিক (১৮৮৮-১৯৬৮ খৃ.) তাঁহার আল-ইসলাম ওয়া উসূলু'ল-হুকম, কায়রো ১৩৪৩-৪৪/১৯২৫-এর রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যাসমূহকে নৈতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক সমস্যা হইতে সংশ্রবমুক্ত করার যে প্রয়াস করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে সংস্কারবাদিগণের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়; তু. Kerr, Islamic Reform, ১৭৯ প.]। রাশীদ রিদা প্রসঙ্গত দীন ও শারী'আত-এর ধারণার মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ইহাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকে অযৌক্তিকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন (তাফসীর, ৬খ, ১৪৭)। কিন্তু তিনি এই পার্থক্য হইতে কোন যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন নাই। দীন/শারী'আতের মধ্যে পার্থক্য (যাহা 'ইবাদাত ও 'আদাত-এর মধ্যে পার্থক্যের ন্যায় সমান গুরুত্বপূর্ণ) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি সৃষ্টি করিতে পারিত। ইহাকে অপ্রাসঙ্গিকরূপে বিবেচনা করিয়া, ধর্মীয় আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্র কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ করার সম্ভাবনা সম্পর্কে গবেষণার মাধ্যমে 'পবিত্র' ক্ষেত্র হইতে সকল কিছু অপসারণের মাধ্যমে যাহা বিশ্বাস ও 'ইবাদাতের সহিত মৌলিক সম্পর্কযুক্ত নয় তাহাদের ইজতিহাদ-এর নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হইত। এই গবেষণার ভার শেষ পর্যন্ত অর্পিত হয় আধুনিকতাপন্থীদের উপর (তাজদীদ দ্র. তু. মুহাম্মাদ খালাফুল্লাহ-এর প্রবন্ধসমূহ, বিশেষত তাঁহার আল-কুরআন ওয়া মুশকিলাত হায়াতিনা'ল-মু'আসিরা, কায়রো ১৯৬৭ খৃ.। ইহাতে তিনি "আধুনিক অভিজ্ঞতার আলোকে শারী'আতে-র মৌল নীতিসমূহের একটি নূতন ব্যাখ্যা"-র বৈধতা ঘোষণা করিয়াছেন (পৃ. ৩১; এই অভিমতের জন্য তিনি যথেষ্ট তিরস্কৃতও হইয়াছেন)। অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও 'ইবাদাত ও 'আদাত-এর মধ্যে পার্থক্য যুক্তিসম্মততার প্রয়োজনীয়তা এবং বাস্তববাদী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। সালাফিয়্যাগণ ইহাদের নিজ অবস্থানের পক্ষে যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করিয়া ঐতিহ্যপন্থীগণের (জুমূদ) কট্টর রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আধুনিক বিশ্ব ও অগ্রগতির বিষয়ে ইসলাহ-এর উদারনৈতিক মনোভাবের সপক্ষে বক্তব্য রাখিয়াছেন। একই সঙ্গে ইহা অতি আধুনিকতা প্রচারকারিগণের প্রতিও একটি প্রত্যুত্তর যাহারা যথার্থ ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ততার পরিপন্থী এইরূপ আধুনিকতার প্রয়াসী (সালাফ-এর ঐতিহ্য দ্বারা প্রকাশিত বিশ্বস্ততা)। সংস্কারবাদিগণ এই শ্রেণীর আধুনিকতাকে তাহাদের কৈফিয়তরূপে প্রদর্শিত ইসলামের আদর্শ প্রবণতা পরিচায়ক "আপোসের মনোভাব"-এর অস্বীকাররূপে গণ্য করেন।

২। আত্মপক্ষ সমর্থন : ইসলামের প্রচলিত দিকসমূহের বিভিন্ন রূপ যাহা রক্ষণশীল, সুন্নীবাদ, জনপ্রিয় ধর্মের কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস ও বিভিন্ন অলৌকিক কার্যকলাপ এবং ভ্রাতৃসংঘসমূহের ধর্মপদ্ধতিরূপে প্রকাশমান ছিল, তাহার সমালোচনা ভিন্ন, আত্মপক্ষ সমর্থন সংস্কারবাদী কার্যাবলীর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে পরিগণিত। যদিও ইহা প্রধানত মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ সমস্যার প্রতি কেন্দ্রীভূত এবং প্রায়শ সেবামূলক মনোভাবের সহিত প্রচারিত হইয়াছে, সংস্কারবাদী ব্যাখ্যাসমূহ ইসলামের শত্রুদের প্রতিও নির্দেশিত। এই নির্দেশনা কখনও সরাসরিভাবে (তু. মুহাম্মাদ 'আবদুহু, আল-ইসলাম ওয়া'র-রাদ্দ 'আলা মুনতাকিদিহি, ১৯০০ খৃ.-এর art., কায়রো ১৩২৭/১৯০৯; ফরাসী অনু. তাল'আত হারব, Le Europe l'Islam, কায়রো ১৯০৫ খৃ.; ঐ, আল-ইসলাম ওয়া'ন-নাস্‌রানিয়্যা, ১৯০১ খৃ.-এর art., মানার), আবার কখনও বা পরোক্ষভাবে পশ্চিমা সভ্যতা ও মতার্দশের প্রলোভন সম্পর্কে মুসলিমগণকে সাবধান হওয়ার আহবানের মাধ্যমে উচ্চারিত। উভয় ক্ষেত্রেই সংস্কারবাদিগণ একটি ধর্ম হিসাবে, একটি নৈতিক নীতিমালারূপে এবং একটি আইনগত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থারূপে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রকার কৈফিয়ত নিম্নোক্ত পরিসরে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

(১) ইসলামের মুক্তির বাণী : (ক) আধ্যাত্মিক বাণীরূপে। এই

ক্ষেত্রে যুক্তিসমূহ প্রধানত মানব মুক্তির নীতিরূপে তাওহীদ (দ্র.)-এর উচ্চ প্রশংসার মধ্যে সীমাবদ্ধ। নৈতিক মুক্তি আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি সমর্থন দান (একমাত্র আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়)-এর উদ্দেশ্য ব্যতীত সকল প্রকার 'ইবাদত এবং সকল প্রকার অভ্রান্ততার ছলনার অবসান ঘটায়। কারণ শুধু প্রত্যাদেশ ও আল্লাহ্‌র দ্বারা অনুপ্রাণিত (ইলহাম) রাসূলই একমাত্র অভ্রান্ত উৎস [এই যুক্তিটি অন্যত্র তাকলীদ (দ্র.)-এর খণ্ডনে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই ক্ষেত্রেও তাকলীদ এমন একটি কর্তৃত্বের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে যাহাকে অভ্রান্তরূপে বিশ্বাস করা হয়]। অপরদিকে আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপী অবস্থান বিশ্বাস মধ্যস্থতার (শাফা'আত দ্র.) নীতিতে প্রতিষ্ঠিত যে কোন প্রাধান্যের নিন্দা করে। ইহার ফলে তাওহীদ মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে কোনরূপ মধ্যস্থতাকারীর (প্রতিষ্ঠানিক গির্জাসমূহের ন্যায়) বৈধতা স্বীকার করে না এবং কতিপয় শ্রেণীর মানুষের (দরবেশ, মরমী ইত্যাদি) মধ্যস্থতাকারী কার্যাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে।

সামাজিক মুক্তি আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, এই বিশ্বাস সকল মানুষের সাম্যের ভিত্তি। কারণ প্রত্যেক মানুষ সমানভাবে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন। প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে অনন্য মর্যাদার অধিকারী (তু. মুহাম্মাদ 'আবদুহু, রিসালাতু'ত-তাওহীদ, পৃ. ১৫৫-৬, ফরাসী অনু., পৃ. ১০৬, ইংরেজী অনু., পৃ. ১২৫)। ইহা মানব মনকে কর্তৃত্বভিত্তিক যুক্তি (তাকলীদ) অথবা তথাকথিত 'মহান' কর্তৃক অর্পিত দাসত্ব অথবা হীনতর অবস্থার প্রতি নিষ্ক্রিয় অথবা হতোদ্যম বশ্যতা হইতে মুক্ত করে (তু. কু'রআন ৩৩ ঃ ৬৭, ৩৪ ঃ ৩১-৪; আল্লাযীনাসতুদ'ইফূ)। 'ইবাদাতের রীতিসমূহ (জামা'আতে সালাত, হজ্জ ইত্যাদি) ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতাবাদী চরিত্র নির্দেশ করে।

(খ) ইসলামের মুক্তিবাণী কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নীতির মাধ্যমেও চিত্রিত হইয়াছে, যাহাতে মানব জাতির মৌলিক ঐক্য গৃহীত হইয়াছে এবং জাতি বা সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে সকল প্রকার ভেদ- বৈষম্যকে বর্জন করা হইয়াছে (তু. মুহাম্মাদ 'আবদুহু, রিসালাতু'ত-তাওহীদ, ১৭২, ফরাসী অনু. ১১৬-৭; ইংরেজী অনু. ১৩৫; তাফসীর, ৪৪৮ প.; মুহাম্মাদ ইক'বাল, Reconstruction, ৮৯, ফরাসী অনু. ১০৩)।

(২) ইসলামের সার্বজনীন গুণাবলী ঃ (ক) একটি ধর্ম (দীন) হিসাবে। সংস্কারবাদিগণের ব্যাখ্যা এই ক্ষেত্রে কেবল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাতের সার্বজনীনতার চিরায়ত মতবাদই অনুসরণ করিয়াছে ('উমূমু'ল-বা'ছা)। কারণ রাসূলুল্লাহ (স)-কে মনোনীত করা হইয়াছিল সকল জাতিকে মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিতে (. . .) এবং সকল মানুষকে এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানাইতে" (মুহাম্মাদ 'আবদুহু, রিসালাতু'ত-তাওহীদ, ১৩৯; ফরাসী অনু., ৯৫; ইংরেজী অনু. ১১৪; আরও দ্র. তাফসীর, ৭খ., ৬১০, ৬ নং সূরা প্রসঙ্গে, পৃ. ৯০)। আমাদের নিজ সময়কালীন বহু মুসলিম চিন্তাবিদের ন্যায় সংস্কারবাদী গ্রন্থকারগণও বিশ্বাস করিতেন, ইসলামই একমাত্র পূর্ণ সার্বজনীন ধর্ম। কারণ ইহাতে প্রাক্তন প্রত্যাদেশসমূহের (এবং য়াহূদী ও খৃষ্ট ধর্মের) অবশ্য প্রয়োজনীয় সকল কিছু অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং তাহাদের বাণীকে পূর্ণতা দান করিয়াছে (তু. মুহাম্মাদ 'আবদুহু, রিসালাতু'ত-তাওহীদ, ১৬৬ প., ফরাসী অনু., ১১২ প.; নিম্ন অংশ; ইংরেজী অনু. ১৩২ প.; তাফসীর . . . ১০খ, ৪৪৮-৫৬)। (খ) একটি সামাজিক আইন ও রাজনৈতিক পদ্ধতি (শারী'আত)-রূপে। সংস্কারবাদিগণ ইসলামী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব, চিরস্থায়িত্ব ও সার্বজনীন চরিত্র সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার বিপরীতে মানবিক আইন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক সংশোধন ও পরিবর্তন সত্ত্বেও সর্বদাই অসম্পূর্ণ। শারী'আত ইহার সারাংশ লাভ করে আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা হইতে অন্ততপক্ষে ইহার যে অংশ প্রত্যাদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা সেইজন্য সকল স্থানে সকল সময়ে মানুষের (বাশার) প্রয়োজনের (মাসালিহ') সহিত সর্বাপেক্ষা উত্তম আইন ব্যবস্থা (ইব্‌ন বাদীস, শিহাব, জানু. ১৯৩৪, পৃ. ৫৭; তাফসীর, ৬খ., ১৪৬)। কারণ ইহা মানুষের মঙ্গলের দিকনির্দেশনা দান করে দুইটি দৃষ্টিকোণ হইতে, তাহাদের পার্থিব সুখ ও আখিরাতের মুক্তি [এই ধারণাটি সংস্কারকগণের অত্যন্ত প্রিয়, রাশীদ রিদা অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে ইহার বিকাশ সাধন করিয়াছেন, মানার, ১খ. (১৮৯৮ খৃ.), ১, ৫, (১৯০২ খৃ.), ৪৫৯-৬৫; তাফসীর, ১খ, ১১, ২খ., ৩৩০-৪১, ১০খ., ২১০, ৪৩৭। আরো তু. মুহাম্মাদ 'আবদুহু, রিসালাতু'ত-তাওহীদ, ১২৪, ১৬৯; ফারাসী অনু., ৮৪, ১১৫; ইংরেজী অনু., ১০৪, ১৩৪]। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে, সালাফিয়াগণ মুসলিম আইন ব্যবস্থাকে একটি বন্ধ বিষয়রূপে বিবেচনা করেন, যাহা পূর্ণতায় ও বর্ণনাত্মক সত্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নিখুঁত। তাহারা বিশ্বাস করেন যে, শারী'আতের কতিপয় বিধি (যথা নারীদের ব্যক্তিগত মর্যাদা) আদর্শ মানসম্পন্ন এবং ইহাদের তুলনায় প্রাচীন আইন ব্যবস্থা (উদাহরণস্বরূপ বাইবেলীয় প্রকৃতির) অথবা আধুনিক আইন ব্যবস্থার (পাশ্চাত্য ধারণা উদ্ভূত) কোনটিই তুলনীয় নয়। তথাপি তাঁহারা এই ধারণাটি কখনও বিসর্জন দেন নাই যে, মুসলিমগণ উন্নত দেশসমূহে প্রচলিত কতিপয় মতবাদ অনুকরণ করিতে পারিবে। তবে সালাফিয়্যাগণ ইহা স্বীকার করেন না যে, পাশ্চাত্য অগ্রগতির সকল দিকই মঙ্গলজনক এবং প্রতিক্রিয়াশীলরূপে বিবেচিত হইবার ভয়ে য়ূরোপ ও আমেরিকার বর্তমান সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে (ইব্‌ন বাদীস, শিহাব, জানু. ১৯৩২ খৃ., ১১)। উপরন্তু উলুল-আমর-এর উচিত মুসলিম আইন ব্যবস্থার অভিযোজনের সহায়তা করা [পারস্পরিক আলোচনা (শূরা) এবং ইজতিহাদের মাধ্যমে] এবং এই লক্ষ্যে নূতন বাস্তবতাসমূহকে বিবেচনা করা, কিন্তু একই সঙ্গে ইসলামের আইনের মূল দিকসমূহের প্রতি শর্তহীন সম্মান প্রদর্শন করা এবং ইসলামের সাধারণ নীতিসমূহ পালন করা। সালাফিয়াগণ সর্বদাই ইহার পুনরুক্তি করিয়াছেন যে, প্রাত্যহিক জীবনের বৈষয়িক ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষকে এই বিশ্বে তাহার জন্য মঙ্গলজনক ক্রিয়া-কলাপের স্বাধীনতা (ফাওওয়াদা) দিয়াছে (তাফসীর, ২খ, ২০৫। নির্দেশনা ঃ নিম্নোক্ত হাদীছ ঃ 'পার্থিব ঘটনাবলী বিচার করিবার জন্য তোমরাই শ্রেষ্ঠ অবস্থানে অবস্থিত', ৬খ, ১৪০; ইব্‌ন বাদীস, শিহাব, অক্টোবর ১৯৩০ খৃ., ৭০)। পূর্বোক্ত বিষয়সমূহ হইতে সংস্কারবাদিগণ যুক্তি আহরণ করেন যে, ইহা হইতে ইসলামের উদার চরিত্র প্রতীয়মান এবং যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন সময়ে যে কোন মানবিক পরিস্থিতিতে ইহাকে ব্যবহার করা সম্ভব।

**(৩) ইসলামের উদার নীতি** ঃ বিশ্বাস সম্বন্ধীয় বিষয় ও শারী'আতের অপরিবর্তনীয় অংশসমূহ ব্যতিরেকে (উভয়ই সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে নির্ধারিত) ইসলাম বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনরূপ সীমাবদ্ধতা আরোপ করে না। সংস্কারবাদিগণের অভিমতের এই দিকটি এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে না। বিষয়টি সম্পর্কে মুহাম্মাদ 'আবদুহু (রিসালাতু'ত-তাওহীদ, স্থা.), রাশীদ রিদা (তু. J. Homier,

Le Comment. coran. du manar, তৃতীয় অধ্যায়) এবং ইব্ন বাদীস (তু. A. Merad, Ibn Badis, Commentat, du Coran, ২য় অধ্যায় ৫ম) যথোপযুক্তভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বিশ্বাস ও যুক্তি ('আক্ল) সংক্রান্ত সমস্যাবলী প্রসঙ্গে সংস্কারকগণের বক্তব্য হইতেছে ঃ কু'রআনের বাণী বিবেক (ওয়াজ্দান) ও মনন (ফিক্র) উভয়ের প্রতিই নির্দেশিত হইয়াছে এবং ইহা কেবল বিশ্বাসের দ্বারা গৃহীত হইলে চলিবে না। তাহা যুক্তির মাধ্যমে উপলব্ধিও করিতে হইবে। কু'রআন যদি বা কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তি প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করিয়াছে, তাহা কেবল সেই সকল ক্ষেত্রে যেগুলি অজ্ঞেয় [গায়ব দ্র.] এবং মানুষকে অবশ্যম্ভাবী ভ্রান্তি এবং আল্লাহ্র সাথে শিরক হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে।

সংস্কারকগণ প্রায়শ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের যুক্তিটি ব্যবহার করেন। ইহার মাধ্যমে তাঁহারা ইহাই দাবি করেন যে, ইসলাম কোনভাবেই বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা ও 'আক্ল-এর প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে না, বরং প্রকৃতপক্ষে ইহা উভয় ক্ষেত্রেই উৎসাহ প্রদান করে এবং মানুষকে তাহার আল্লাহ প্রদত্ত উপহার অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তার সুযোগ্য ব্যবহার ও উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহিত করে (ইব্ন বাদীস, শিহাব, মার্চ ১৯৩১, ৭৮ প., সূরা ১৭ ঃ ৭০-এর প্রতি নির্দেশনা)। সংস্কারকগণের ব্যবহারে 'আক্ল প্রকৃতপক্ষে যথার্থ সজ্ঞান বিবেক অথবা যুক্তির সন্ধানে যুক্তি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় না—যাহা বিশ্বাস ও প্রত্যাদেশের গণ্ডীর বাহিরে থাকিয়া স্বতন্ত্রভাবে সত্য সন্ধানে ব্রতী হয়। গোঁড়া সংস্কারক গ্রন্থকারগণের মতে 'আক্ল হইতেছে এমন অন্ধ অনুরাগের (হাওয়া) বিপরীত যাহা "সুস্থ প্রকৃতি"র [ফিত্রাত দ্র.] কণ্ঠকে রুদ্ধ করে এবং নিঃসন্দেহে ইহা অতি সমালোচনাকারী মানসিকতার বিরোধী। 'আকিল বলিতে এমন মানুষকে বুঝায় না, যে অতি সহজে কল্পণাপ্রবণ অনুশীলনী চর্চা করিতে পারে এবং শুধু যুক্তিবাদের প্রতিই একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত। ইহাতে এমন মানুষকে বুঝানো হয়, যে বিচক্ষণ ও ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তার অধিকারী, যাহা দ্বারা তাহার সহনশীল চেতনা, একক বিচারশক্তির উপর কোন বিষয়ের নির্ভরতার এবং সকল কিছুই স্বীয় বুদ্ধিমত্তার আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতার প্রতি অনেকটা নিরুৎসাহী।

বিশ্বাস ও যুক্তি সম্পর্কিত বিতর্ক সংস্কারকগণের চিন্তাধারার একটি বৈপরীত্য নির্দেশ করে। ইহাদের এমন একটি ভাষা, এমনকি কখনও অধিকতর বুদ্ধিগত পদ্ধতি গ্রহণের ইচ্ছা যাহা আধুনিক মননের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, একই সঙ্গে তাহারা সেই সকল নীতি ও অবস্থান আঁকড়াইয়া থাকে যাহা তাহাদের মতে সালাফের মতবাদের সহিত সম্পূর্ণভাবে ঐকমত্যসম্পন্ন। এই ক্ষেত্রে ইহা লক্ষ্য করা তাৎপর্যপূর্ণ যে, কতিপয় সংস্কারবাদী গ্রন্থকারের উদারনৈতিক প্রবণতাকে সুপ্রকাশিত হইতে দেওয়া হয় নাই। কারণ ইহা হইতে এইরূপ একটি আশংকা ছিল যে, বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি কেবল বিশ্বাসের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় অবৈধ প্রবেশ করিবে এবং মানবিক প্রবৃত্তির (হাওয়া) প্রলোভন ক্রমশ প্রত্যাদেশের মৌলিক নীতিসমূহকে (হুদা) গ্রাস করিবে (তু. তাফসীর, ৫খ, ৪১৬ ঃ বিরোধিতা হুদা/হাওয়া)। অবশ্য সংস্কারবাদিগণ ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার ব্যাপারে আদৌ উৎসাহী ছিলেন না। মুহাম্মাদ 'আবদুহুর রিসালাতু'ত্-তাওহীদ (যাহাতে সম্পূর্ণভাবে ধর্মতত্ত্বের বদলে একটি মৌলিক পরিকল্পনা বর্ণনা করা হইয়াছে) এবং মুবারাক আল-মীলীর রিসালাতু'শ-শির্ক (যাহা প্রকৃতপক্ষে মুরাবিতীয় বিশ্বাসসমূহের খণ্ডন) ব্যতীত সালাফিয়্যাগণের মতবাদী ব্যবস্থায় কোন বিস্তৃত ধর্মমত সম্বন্ধীয় আলোচনা পাওয়া যায় না। তাঁহারা কুরআনের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যাপক বিধানের সমর্থনেই সন্তুষ্ট ছিলেন যাহা তাঁহাদের মতে উপযুক্ত ও যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা কু'রআনের যে কোন উল্লেখ যাহাতে আপাতভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণাকে উৎসাহিত করা হইয়াছে এবং প্রকৃতির অনুসন্ধান ও মানুষের সেবায় ইহার ব্যবহারের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে কখনওই ব্যর্থ হন নাই। তাহারা প্রত্যাদেশের সেই সকল অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যাহাতে মানুষকে চিন্তা করিতে, বিভিন্ন বিষয় উপলব্ধি করিতে, সুস্পষ্ট প্রমাণের (বুরহান) মাধ্যমে অন্যকে সম্মত করিতে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। জ্ঞান ও মনন সংক্রান্ত কার্যাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট কু'রআনী শব্দ সম্পদের সকল সম্পদকে তাহারা সর্বাত্মকভাবে ব্যবহার করিয়াছেন (তু. G. Flugel-এর Concordantiac, ইহাতে আমরা ح، ع ل م، ع ق ل، ع ب ر ف ق ه، ف ك ر، ك م শব্দমূলসমূহের দ্বারা গঠিত ভাবসমূহের সমৃদ্ধি দেখিতে পাই)। সংক্ষেপে তাঁহারা ইহা প্রদর্শনের প্রচেষ্টা করিয়াছেন যে, ইসলাম মানব বুদ্ধিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সহায়তা করে এবং ইহা (ব্যবহারিক ও তত্ত্বগতভাবে) জ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে মানব প্রগতিকে উৎসাহিত করে (তু. তাফসীর, ২৪৪ প.-এ নিম্নোক্ত আলংকারিক শিরোনামে রাশীদ রিদার বিশিষ্ট ও জোরালো মতবাদী বক্তব্য ঃ আল-ইসলাম দীনু'ল-ফিত্রা আস্-সালীমা ওয়া'ল-'আক্ল ওয়া'ল-ফিক্র ওয়া'ল-'ইল্ম ওয়া'ল-হিক্মা ওয়া'ল-বুরহান ওয়া'ল-হুজ্জাহ্)।

জ্ঞান ও সভ্যতার ভাবধারাটি সংস্কারবাদী প্রচারণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (তু. J. Jomier, Le Comment. coran. du Manar, ৪র্থ অধ্যায়; A. Merad, ইব্ন বাদীস, Commentat, du Coran, ৪র্থ অধ্যায়, তৃতীয়)। আল্লাহ্ প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় মানুষ ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কারের উর্ধ্বে উঠিতে সক্ষম হয়, বিজ্ঞানের চর্চা করিতে পারে এবং সুস্থ বিশ্বাসসমূহ অবলম্বন করিতে পারে। ইহার ব্যবহারের মাধ্যমে সে প্রকৃতির উপর তাহার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে এবং সৃষ্টির বিভিন্ন সম্পদের মাধ্যমে লাভবান হইয়া পার্থিব শক্তি ('ইয়্যা, কু'ওওয়া) অর্জন এবং সুখী, নৈতিক ও মানসিক অবস্থা অর্জনে সক্ষম হইবে। সংস্কারকগণের পেশকৃত এই বিশেষ দৃষ্টিকোণে ইসলাম এমন একটি ধর্মরূপে পরিচিতি লাভ করে, যাহার প্রধান লক্ষ্য মানব সমাজের নৈতিক ও জাগতিক হিতসাধন। সুতরাং এই মর্মে ইহা Renan-এর উপস্থাপিত যুক্তিসমূহের (ইসলাম বৈজ্ঞানিক চেতনার পরিপন্থী) সফল খণ্ডনরূপে কার্যকর। একই সঙ্গে ইহা মার্কসবাদ প্রভাবিত সমালোচনার (ইসলাম একটি প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ) দুর্বলতা প্রকাশেও বিশেষ সহায়ক। কিছু সংখ্যক অনুসারীর মাত্রাহীনতার ও ব্যবহার মাধ্যমে যাহারা নিজ নিজ নব-প্রবর্তনের দ্বারা ইসলামের আদর্শ বিকৃত করিয়াছে অথবা অজ্ঞতাজনিত সৃষ্ট কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস দ্বারা অথবা ভণ্ড পণ্ডিতগণের মিথ্যা ব্যাখ্যা দ্বারা এবং কিছু মুসলিম রাজনীতিকের অনৈতিকতা দ্বারা ইসলামের আদর্শ বিকৃত করিয়াছে তাহাদের আচরণ ইসলামকে বিচার করার প্রবণতাকে সংস্কারকগণ তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছেন (তু. মুহাম্মাদ 'আবদুহুর বিস্তারিত প্রতিবাদ ও বিরোধিতা, রিসালাতু'ত-তাওহীদ, ১৯৫-৯; ফরাসী অনু., ১৩২-৫; ইংরেজী অনু., ১৫১-৩)। ইসলামের যথার্থ শিক্ষা, প্রত্যাদেশ ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে প্রকাশিত, সেইদিকে প্রত্যাবর্তন করিলে প্রমাণিত হইবে ইসলাম সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান ও সভ্যতার

সহিত সঙ্গতিপূর্ণ একটি ধর্ম (তাফসীর..., ৯খ., ২৩)। ইহা প্রগতি ও বিজ্ঞানকে উৎসাহিত করে (ঐ, ৩খ, ২৬, ৩৪, ১০৬); এবং গবেষণার স্বাধীনতা ও বিজ্ঞানের উচ্চ প্রশংসা করে যাহা মানুষের মহত্ত্বের শর্ত (ঐ ৫খ., ২৫৮)। ইসলাম প্রাচ্যের সভ্যতার পুনর্জাগরণ এবং প্রাশ্চাত্যের সভ্যতার কল্যাণের দিক সংরক্ষণে সক্ষম (ঐ, ৯খ., ২২)। ইহা ছাড়াও–

(৪) ইসলাম হইতেছে মানব জাতির সংস্কারক নীতি (ইস্‌লাহ নাওউ'ল-ইন্‌সান, তাফসীর, ১১খ., ২০৬)। দীন ও শারী'আত হিসাবে ইসলাম হইতেছে পূর্বতন সকল ধর্মের পরবর্তী একটি গতিশীল ধারা (ঐ, ২০৮-৮৮ ঃ মানব জাতির জন্য উপকারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের বিস্তৃত বর্ণনা)। কাজেই ইসলামের মূল সত্য প্রকাশ করা মুসলমানের কর্তব্য ঃ "তাহাদের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার অংশ" মঙ্গলের পথে আমন্ত্রণ (মুহাম্মাদ 'আবদুহ, রিসালাতু'ত্-তাওহীদ, ১৭১; ফরাসী অনু., ১১৬; ইংরেজী অনু., ১৩৫; তাফসীর, ৪খ., ২৬-৪৬, সূরা ৩ প্রসঙ্গে, ১০৪) এবং ইহা আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান" (ইব্‌ন বাদীস্, শিহাব, এপ্রিল ১৯৩৫, পৃ. ৬, সূরা ১৬ ঃ ১২৫ এবং ১২ ঃ ১০৮-এর প্রতি নির্দেশনা)। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান বলিতে ইসলামের মূল্যবোধসমূহ ঘোষণা করা, প্রমাণসমূহের মাধ্যমে ইহার নামে প্রচলিত মিথ্যা ধারণাসমূহ খণ্ডন করা এবং ইহার সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন করা বুঝায়। এই সকলই করিতে হইবে মুসলিমগণের বিশ্বাস সুদৃঢ় ও অমুসলিমগণকে আলোক প্রদর্শন করিবার জন্য এবং ইহা শুধু তাহাদের ধর্মান্তরিত করার জন্য নয়, বরং তাহাদের ধর্মান্ধতা ও পক্ষপাতিত্ব দূরীভূত করিবার জন্য। তবে ধর্ম প্রচারের ধারণাটিও সংস্কারকগণের নিকট অজানা ছিল না (তু. J. Jomier, Le Comentat. Cora., du Manar, দশম অধ্যায়)। যাহাই হউক, মুহাম্মাদ 'আবদুহু ধর্মান্তরকরণের তুলনায় ইসলামী সহনশীলতাকে অগ্রাধিকার দিয়াছেনঃ "ইসলাম তাহার নিজ আলোকেই মানুষের হৃদয়ে প্রবেশের ক্ষমতার অধিকারী" (রিসালাতু'ত্-তাওহীদ, ১৭২)। বাস্তবপক্ষে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের কর্মতৎপরতা মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের মধ্যে কতিপয় ধর্মীয়, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মনোভাবের সৃষ্টি করে।

(ক) আল্লাহ্‌র পথে আহবানের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে এমন একটি জীবন প্রণালী পালন করা যাহা ইসলামের সার্বিক আদেশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। কু'রআনের আদর্শসমূহের প্রভাব বৃদ্ধি নিশ্চিত করিবার জন্য ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক স্তরে রাসূলুল্লাহ (স) ও "পূণ্যবান পূর্বপুরুষ"গণের উদাহরণ ঈমানদারগণকে অবশ্যই উদ্দীপিত করিবে "এই অনুকরণে তাহারা যত নিখুঁত হইবে, আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানের দায়িত্ব পালনে তাহারা ততই পূর্ণতার সহিত কৃতকার্য হইবে" (ইব্‌ন বাদীস)।

(খ) আল-কু'রআনের অন্তর্ভুক্ত সত্যসমূহ প্রচার এবং এইভাবে প্রত্যাদিষ্ট বাণী প্রচারে সহায়তা (তাবলীগু'র-রিসালা) প্রদান করাও "আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানে"র ন্যায় সমমর্যাদা-সম্পন্ন। যেহেতু এই বাণীর সর্বজনীন আবেদন রহিয়াছে, তাই ইহার প্রতিটি অংশ সকল মানুষের নিকট সহজবোধ্য হইতে হইবে। এই ভাবটি কু'রআনের মাধ্যমে জিহাদের ভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট করা যায় (তু. শিহাব, এপ্রিল ১৯৩২ খৃ., ২০৪ প.)। ইব্‌ন বাদীস-এর মতে, এই কু'রআনই অভিব্যক্তিটি একটি কঠোর ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় প্রচারণায় উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী ধারণার পক্ষে যুক্তিসঙ্গতি দান করে। ইহার দ্বারা জনতাকে তাহাদের স্থবিরতা ও আগ্রহহীনতা হইতে জাগাইয়া তুলিতে হইবে এবং প্রত্যাদেশের সমৃদ্ধির (আত্মিক) প্রেক্ষাপটে "ধর্মীয় মন্দ শিক্ষকগণে"র ('উলামাউ'স-সূ) অন্ধত্ব ও এই সকল আত্মিক সম্পদ মানব সমাজের নিকট প্রকাশ করিতে তাহাদের অনীহার বিরুদ্ধে সজাগ হইতে হইবে।

(গ) আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানের মধ্যে ইহাও অন্তর্ভুক্ত যে, প্রচেষ্টার দ্বারা সেই সকল মুসলিমকে ইসলামের আশ্রয়ে ফিরাইয়া আনিতে হইবে যাহারা ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শের দ্বারা পথ হারাইয়া অথবা তথাকথিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদ দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া ইসলামকে "একটি ছিন্ন পরিধানের বস্ত্র"রূপে গণ্য করে এবং ইসলামের ধর্মমত ও আদেশসমূহকে উপহাস করে (মুহাম্মাদ 'আবদুহু, রিসালাতু'ত্-তাওহীদ, ১৯৮; ফরাসী অনু., ১৩৪-৫; ইংরেজী অনু. ১৫৩)।

(ঘ) আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানের অপর একটি অর্থ "তথাকথিত আধুনিকতা"র নামে মুসলিম সমাজে সম্প্রসারিত দুর্নীতির (ফাসাদ) বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা (তাফসীর, ১০খ., ৪৫) এবং কামাল পাশার ন্যায় ব্যক্তিদের (ঐ, ১খ., ৩২২-৩) নাস্তিকতার বিরুদ্ধে সক্রিয় হওয়া, অত্যধিক ব্যক্তিস্বাধীনতা যাহা সকল প্রকার অপব্যবহার সৃষ্টি করে (ঐ, ৮খ., ৪৩০-১) এবং যাহা-কমবেশী প্রত্যক্ষভাবে "পাশ্চাত্যের নৈতিক সংকটে"র জন্য দায়ী–তাহাদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী দান, ধর্ম ও বিজ্ঞানের পৃথকীকরণের নিহিত বিপদ সম্পর্কে জনতাকে জ্ঞাত করা, বিজ্ঞানকে একটি ধর্মের ন্যায় ব্যবহার এবং নৈতিক লক্ষ্য ব্যতিরেকে বস্তুবাদী সুবিধা লাভের জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাহাদের উদ্বুদ্ধ করা (ঐ, ১১খ, ২৪৩)।

(ঙ) ইহা ব্যতীত পেশাদার রাজনীতিবিদগণের মুখোশ উম্মোচন করিতে হইবে যাঁহারা আন্তরিক ও কর্মশীল মুসলিম না হইতে পারেন, কিন্তু হয় সরকারের প্রতি আনুগত্যবশত অথবা তাহাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিলাষ পূরণের বিপজ্জনক উদ্দেশ্যের জন্য ঠিকই মৌখিক প্রচারণার জন্য ইসলামকে ব্যবহার করেন (ঐ, ২খ, ৪৪০)। একইভাবে প্রতিকূল সমালোচনা, রাজনৈতিক মতবাদ [তু. উদাহরণ খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ, La Religion au service du peuple, in Orient, ২০খ., (১৯৬১ খৃ., ১৫৫-৬১)] অথবা কতিপয় আর্থ-সামাজিক মতাদর্শের (তু. "মুসলিম সমাজতন্ত্র", যাহার প্রতি কতিপয় 'আরব সমাজবাদী নির্দেশ করেন) সমর্থনে ধর্মীয় যুক্তি ব্যবহারের সাম্প্রতিক প্রবণতার প্রতিও সমভাবে প্রযোজ্য।

(চ) সংগ্রামপ্রিয় আধুনিকতাপন্থিগণের প্রচারিত জাতীয়তাবাদের বিপরীতে এবং নির্দিষ্ট কোন পিতৃভূমির বাহিরে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান, রাজনৈতিক অথবা জাতিগত সম্পর্কের তুলনায় ধর্মীয় সম্পর্ককেও গৌরবময় স্থান দান করে (ঐ, ২খ., ৩০৪)। ইহার অর্থ ইসলামের সৌভ্রাতৃত্বকে জোরদার করা (ঐ ৪খ, ২১) এবং মুসলিম জনগণকে এই মর্মে উপলব্ধি দান করা যে, যুগ প্রাচীন গোষ্ঠীভিত্তিক চেতনার নূতন রূপ ('আসাবিয়্যাতু'ল-জাহিলিয়্যা) বিশেষ কোন বর্ণ অথবা জাতীয়তার উপর জিদ করিবার মধ্যে গৌরব ও মহত্ত্ব নিহিত নাই, বরং তাহা "ইসলামী মানব সমাজ"-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মধ্যে রহিয়াছে (ঐ, ১১খ., ২৫৬)। সার্বজনীন ইসলামীবাদ (pan Islamism)-এর মতাদর্শের এই একটি বিশেষ দিক সালাফিয়্যাগণের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মতবাদের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ (আল-জামি'আতু'ল্-ইসলামিয়্যা) জামালু'দ-

দীন আল-আফগানী ও 'আবদু'র-রাহ্‌মান আল-কাওয়াকিবীর পর হইতে সংস্কারবাদী গ্রন্থকারগণ অভ্রান্তভাবে কেবল গোঁড়া মতবাদী গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে মতপার্থক্য নিরসন (বিশেষত ধর্মীয় আইনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে) এবং সুন্নী ও শী'ঈ বিশ্বের মধ্যকার ব্যবধান অবলোপের চেষ্টাই করেন নাই, বরং একই সঙ্গে তাঁহারা মুসলিমগণকে তাহাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সংহতির প্রতি দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া আন্তঃইসলামী সহযোগিতা ও সুদৃঢ়তর রাজনৈতিক বন্ধনের নীতির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন। এইভাবে কেবল প্রতীকী হইলেও উম্মাহ্‌র ঐক্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা কার্যকর হইবে সকল মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সর্বোচ্চ নৈতিক সংগঠনের মধ্যস্থতার মাধ্যমে যাহার সম্ভাব্য রূপ হইতে পারে ইব্‌ন বাদীস-এর প্রস্তাবিত স্থায়ী পরিষদ (তু. A. Merad Le Reformesme musulman, ৩৭৬ প.)। এমনকি ইহাও হইতেছে শুধু দ্বিতীয় সর্বোত্তম ব্যবস্থা, শ্রেষ্ঠটি হইবে রাশীদ রিদার স্বপ্ন যাহাতে সমগ্র জাতি এক পূর্ণাঙ্গ ঐক্যে আবদ্ধ হইয়া একজনমাত্র পরম নেতার (ইমাম) পতাকাতলে সমবেত হইবে (তু. তাঁহার খিলাফা; অনু. H. Laoust, Le Califat dans la doctrine de R. R.)।

(ছ) পাশ্চাত্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধসমূহের মহিমা ঘোষণাকারিগণের জওয়াবে সংস্কারবাদিগণ বিশেষভাবে ইসলামী নৈতিক মূল্যবোধসমূহের মহিমার প্রশংসা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে তাঁহারা পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদগণের "বিবরণীসমূহে"র (শাহাদাত) প্রতি নির্দেশ করিয়াছেন যাঁহারা ইসলামের গুণাবলীর প্রতি সংবেদনশীল ছিলেন এবং পাশ্চাত্য বিশ্বের বস্তুবাদী সভ্যতায় নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য চিন্তিত ছিলেন (তাফসীর, ১০খ., ৪১২, ৪২০; ১১খ., ২৪৩)।

সংস্কারবাদী চিন্তাধারা দুইটি বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সালাফিয়্যাগণের মনোভাব প্রকাশ করে ঃ একদিকে পাশ্চাত্য কর্তৃক মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও শাসক শ্রেণীকে বস্তুবাদী ও সাংস্কৃতিক প্রলোভন প্রদান, অপরদিকে মুসলিম সমাজের পদ্ধতিগত নবায়নের পথে আধুনিকপন্থিগণের প্রচেষ্টা যাহা দ্বারা মুসলিম সমাজ কার্যকরীভাবে শীঘ্র আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয়তাসমূহের সম্মুখীন হইতে পারে। সুতরাং ইহা শুধু পাশ্চাত্য সভ্যতার কতিপয় বিশেষ দিকের প্রত্যাখ্যানকারী অথবা ইহার বিরুদ্ধে একটি সংরক্ষণবাদী প্রতিক্রিয়া নয়, বরং ইহা হইতেছে প্রগতি ও আধুনিকায়নে (তাজদীদ) বিশ্বাসী মুসলিমগণের প্রতি একটি উত্তর যাহারা মুসলিম জীবন যাত্রায় আধুনিক বিশ্বের বাস্তবতার প্রয়োজনীয় অভিযোজন এবং ইসলামের মৌলিক দাবিসমূহের মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য মধ্যপথের সন্ধানে উৎসুক ছিলেন।

সালাফিয়্যাগণের ব্যাখ্যামূলক রচনাবলী কেবল প্রাসঙ্গিক ঘটনা সম্বলিত ছিল না, বরং ইহাতে তাহাদের বিরোধিগণের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করার প্রচেষ্টাও সুস্পষ্ট। ইহার ফলে তাঁহারা কিছু পরিমাণে সাংস্কৃতিক মুক্ত মননশীলতা (ইহা সত্য যে, প্রায়শ ইহা ছিল অতি দুর্বল) অর্জন করেন এবং কোন কোন সময় তাহাদের ধর্মতত্ত্ব ও নৈতিক মতবাদের যে সকল দিক অতিমাত্রায় মৌলবাদীরূপে পরিগণিত হইতে পারে তাহা তুলনামূলকভাবে মধ্যপথে আনয়নে সহায়তা করে। কিন্তু একই সংগে ইহা ব্যবহারিক সমস্যার সম্মুখে তাঁহাদের মনোভাব ও মানসিকতার বৈচিত্র্য উন্মোচন করে, বিশেষত যে সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয় ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এবং ইসলামের সার্বিক নীতিমালায় সালাফের ঐতিহ্যে উৎসদ্বয়ের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস ও আনুগত্যের স্থান সম্পর্কে বিষয়সমূহের বহির্ভূত বিষয়ে তাঁহাদের আলোচনা ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে। মোটের উপর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সন্ধিক্ষণের অনুকূল মুহূর্ত ছাড়াও 'আরব বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ইসলাহ-এর সাফল্যের সহিত কিছু পরিমাণে সংযুক্ত করা হইয়াছে আধুনিক বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক মানে মুসলিম সমাজের প্রগতিশীল প্রবেশের ফলে সৃষ্ট বিশেষ বিশেষ সমস্যা সমাধানে সালাফিয়্যাগণের প্রচেষ্টাকে।

(জ) সমসাময়িক 'আরব বিশ্বে ইসলাহ ঃ প্রায় এক শতাব্দী ব্যাপী বিকাশ লাভের শেষে আমরা আল-'উরওয়াতু'ল-উছকা (১৮৮৪ খৃ.)-এর সময় হইতে আজ পর্যন্ত সালাফিয়্যা সংস্কারবাদী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত ক্ষেত্রসমূহের মূল্যায়ন করিতে পারি। এই মুহূর্তে 'আরব বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক পরিদৃষ্ট হয়। একদিকে রহিয়াছে হাদীছের যথার্থতা এবং কুরআনের ব্যাখ্যার পদ্ধতিসমূহ, অপরপক্ষে বর্তমানে ধর্মের স্বাধিকার ও কার্যাবলী। এই অবস্থাটি বিশেষভাবে কতিপয় রাষ্ট্রের জন্য সত্য যেখানে গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ গতিশীল করা না হইলেও পরিচালিত করা হইয়াছে এমন সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যের দিকে যাহা পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। একই সঙ্গে এই সকল দেশে জাতীয় শক্তি নিবিষ্ট করা হইয়াছে অনুগত অবস্থা হইতে মুক্তি লাভের প্রচেষ্টায়—প্রধানত অর্থনৈতিক গঠন ও সামাজিক পুনর্গঠনের প্রতি। পরিবর্তনশীল 'আরব বিশ্বে ইসলাহ-এর উন্নয়ন ও বিকাশকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরে বিভক্ত করা যায় ঃ

১। বীরত্বপূর্ণ স্তরঃ এই সময়ে জামালু'দ-দীন আল-আফগানী, মুহাম্মাদ 'আবদুহু এবং 'আবদু'র-রাহ্‌মান আল-কাওয়াকিবী প্রচলিত ইসলামের প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি স্থাপন করেন (তু. উম্মুল-কুরা-তে বর্ণিত পরিকল্পনা)। এই পর্যায়ে সংস্কারমূলক কার্যাবলীর প্রধান লক্ষ্য ছিল মধ্যযুগ হইতে সদ্য আত্মপ্রকাশ করা সমাজের বৈষয়িক ও নৈতিক উন্নতি সাধন। আধুনিক ইসলাহ-এর এই তিন নেতা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দাবির প্রতিক্রিয়া তাঁহাদের মতবাদ সংক্রান্ত হস্তক্ষেপের তুলনায় অনেক বেশী ছিল (মুহাম্মাদ 'আবদুহুর রিসালাতু'ত্-তাওহীদ এই ব্যাপারে ব্যতিক্রম, ইহাকে ব্যবহার করা হইয়াছে ধর্মতত্ত্বের প্রাথমিক ভিত্তিরূপে)। এইভাবে সংস্কারবাদিগণের রচনা ও মৌলিক প্রচারণা আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিবর্তন, প্রগতি ও সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টার (ইজতিহাদ) ধারণায় সমাজের ক্রমবর্ধমান সচেতনতা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। ইহাও সত্য যে, এই সময়ের (উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরু) সাংস্কৃতিক পরিবেশে মুসলিম চিন্তাধারা এই সকল ধারণাসমূহ গ্রহণের অনুকূলে ছিল। কারণ ইহা ছিল বিজ্ঞানের যুগ, কারিগরি উৎকর্ষের ফলে সৃষ্ট আশাবাদ এবং এই ধারণার উৎপত্তি যে সামাজিক সফলতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য দক্ষতা একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। ইহা সত্ত্বেও সালাফিয়্যাগণের একটি কাজ ছিল এই সকল ধারণার উপর এবং প্রথম ইজতিহাদ-এর ধারণাকে এমনভাবে বৈধতা দান করা যাহাতে ইসলামের যথার্থ নীতিসমূহকে (নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ হইতে দৃষ্ট) ইহাদের সহিত সংমিশ্রণের মাধ্যমে উম্মাহর সন্তোষ অর্জন করা যায়। ইহার প্রারম্ভিকরূপে সাম্প্রতিক ইসলামের সংস্কারের স্রোত 'আরব মুসলিম মানসে আধুনিক বিশ্বের প্রতি সচেতনতার জন্ম দেয়। একই সঙ্গে ইহা সেই সকল প্রশ্ন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা (সামাজিক সাংস্কৃতিক

প্রকৃতির) সৃষ্টি করে যাহা পরবর্তী মুসলিম বংশধরগণকে মুকাবিলা করিতে হয়।

২। দ্বিতীয় পর্যায় (আনু. ১৯০৫ হইতে ১৯৫০ খৃ. পর্যন্ত) ঃ এই যুগে উন্মেষ ঘটে একটি মতবাদী পদ্ধতির, যাহাতে রাশীদ রিদা ও শায়খ ইব্ন বাদীস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই দুই শক্তিমান ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্তসমূহ লেখকগণকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে যাঁহাদের প্রবন্ধাবলী (আল-মানার, আশ-শিহাব, মাজাল্লাতু'শ-শুব্বানি'ল-মুসলিমীন, আর-রিসালা, আল-মাজাল্লাতু'য্-যায়তুনিয়্যা প্রভৃতি সাময়িকীতে) ইস্লাহ-এর ধারণাকে সমৃদ্ধ ও ইহার মতবাদ সংক্রান্ত অবস্থান সুদৃঢ় করিয়াছে। এখন বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রধান প্রধান লেখককে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা হইবে।

(ক) সিরিয়াতে জামালু'দ-দীন আল-কাসিমী (১৮৬৩/৭-১৯১৪) ছিলেন নব্য হাম্বালী ঐতিহ্যের একজন বিশ্বস্ত শাগরিদ। তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহির 'আল-জাযাইরী (১৮৫১-১৯১৯ খৃ.) তাঁহার ব্যাপক পাণ্ডিত্য উৎসর্গ করেন ইস্লাহ-এর সেবায় (বিশেষত প্রকাশনার ক্ষেত্রসমূহে)। তরুণ বয়সে জামালু'দ-দীন আল-আফগানীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শপ্রাপ্ত ও তাঁহার দ্বারা 'আবদু'ল-কাদীর আল-মাগরিবী (১৮৬৭-১৯৫৬ খৃ.) সিরিয়াতে ইস্লাহ-এর প্রতি অত্যন্ত ফলপ্রসূ অবদান রাখিতে সমর্থ হন। শাকীব আরসালান (১৮৬৯-১৯৪৬ খৃ.) ছিলেন একজন মেধাবী লেখক (তাঁহাকে বলা হইত আমীরু'ল-বায়ান, "বাগ্মীরাজ") ও রাজনীতিবিদ। তিনি ছিলেন আরববাদের একজন দৃঢ় প্রবক্তা (তু. তাঁহার মাসিক গীতিনাট্য, La Nation Arabe, জেনেভা ১৯৩০-৯ খৃ.); আল-মানার-এর সম্পাদকের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল এবং উক্ত সাময়িকীতে তিনি প্রশংসনীয় কতিপয় রচনা প্রকাশ করেন। মুহাম্মাদ কুর্দ 'আলী (১৮৭৬-১৯৫৩ খৃ.) দামিশ্কের 'আরব একাডেমীর প্রাক্তন সভাপতি (১৯২০-৫৩), যদিও সঠিকভাবে বলিতে গেলে ইনি সংস্কারবাদী লেখক ছিলেন না। তিনি 'মুহাম্মাদ 'আবদুহু-এর ধারণাসমূহের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন এবং তাঁহাকে 'আরব বিশ্বের সেই সকল সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত করা চলে যাঁহারা ইস্লাহ-এর প্রতি মূল্যবান নৈতিক সমর্থন দান করেন।

(খ) মিসরে মুহাম্মাদ 'আবদুহু-এর প্রচুর সংখ্যক আধ্যাত্মিক সন্তান ছিল যাঁহারা মোটামুটিভাবে তাঁহাদের শিক্ষকের মূল ধারণাসমূহের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। মুহাম্মাদ ফারীদ ওয়াজদী (১৮৭৫-১৯৫৪) ছিলেন আর-রিসালা সাময়িকীর (১৯৩০ খৃ. প্রতিষ্ঠিত) কর্মতৎপর সম্পাদক। তিনি ইসলামের উদ্যমী প্রচারক ছিলেন এবং সংহতিশীল প্রবণতাপূর্ণ একটি কুরআনের তাফসীর রচনা করেন। মুহাম্মাদ মুসতাফা আল-মারাগী (১৮৮১-১৯৪৫ খৃ.) দুইবার (১৯২৮, ১৯৩৫ খৃ.) আল-আযহারের রেকটরের পদ অলংকৃত করেন। সেখানে তিনি সংস্কারবাদী ধারণাসমূহ সম্প্রসারণে অবদান রাখেন এবং গোঁড়া মতাবলম্বী গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে সংযোগ শক্তিশালী করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। মুহাম্মাদ 'আবদুহু-এর তিনি যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার আদর্শে তিনি সংস্কারের চেষ্টা করেন। মাহ্মূদ শালতূত (১৮৯৩-১৯৬৩ খৃ.) ঃ আযহার-এর অপর একজন মহাপণ্ডিত (তু. জামা'আতু'ত-তাক্রীব বায়না'ল-মাযাহিব এবং তাঁহার Trimestrial রচনা রিসালাতু'ল-ইসলাম, কায়রো ১৯৪৯ খৃ.)। আহ্মাদ আমীন (১৮৮৬-১৯৫৪) ছিলেন ইসলামী সংস্কৃতি ও ইতিহাসের একটি বিশাল চিত্রের শিল্পী (ফাজ্র, দুহা ও জুহ্রু'ল-ইসলাম)। তিনি ছিলেন আধুনিক ইস্লাহ-এর উদ্যোক্তাগণের আকাঙ্ক্ষিত 'আরব ইসলামী সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের একজন প্রধান প্রবক্তা। তাঁহার লেখনী ও শিক্ষার মাধ্যমে (তু. তাঁহার রচিত আছ-ছাকাফা, কায়রো ১৯৩৯ খৃ.) তিনি মুহাম্মাদ 'আবদুহু-এর ন্যায় মুসলিম চিন্তাধারাকে এমন একটি মতবাদের প্রতি নির্দেশিত করার চেষ্টা করেন যাহা ছিল কিছুটা নব্য মু'তাযিলাপন্থী।

(ঘ) তিউনিসিয়াতে প্রচলিত সংস্কারবাদী চিন্তাধারার প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন ইব্ন বাদীস-এর অত্যন্ত সম্মানিত শিক্ষক বাশীর সাফার (মৃ. ১৯৩৭ খৃ.) এবং দুইজন শায়খ মুহাম্মাদ আত-তাহির ইব্ন আশূর (জন্ম ১৮৭৯ খৃ.)। ইনি কুরআনের একটি তাফসীর রচনা করেন (প্রকাশিত ১-৩খ, তিউনিস ১৯৫৬-৭১ খৃ.) এবং তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ আল-ফাদিল ইব্ন 'আশূর (১৯০০-১৯৭০ খৃ.; তু. মুহাম্মাদ আল-ফাদিল ইব্ন 'আশূর, আল-হারাকাতু'ল-আদাবিয়্যা ওয়া'ল-ফিক্রিয়্যা ফী তুনিস, কায়রো ১৯৫৬ খৃ.)।

(ঘ) আলজিরিয়াতে ইব্ন বাদীস ব্যতীত প্রধান সংস্কারবাদিগণের মধ্যে ছিলেন আলজিরীয় সংস্কারবাদী গোষ্ঠীর ধর্মতত্ত্ববিদ মুবারাক আল-মীলী (১৮৯০-১৯৪৫ খৃ.); তায়্যিব আল-'উকবী (১৮৮৮-১৯৬২ খৃ.)। ইনি ছিলেন ইস্লাহ সমর্থক এবং ওয়াহ্হাবী প্রবণতা দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত (তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল হিজাযে)। ইনি ইস্লাহ (বিসকরা ১৯২৭ খৃ.) নামক অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত একটি সংবাদপত্রের মালিক ছিলেন; মুহাম্মাদ আল-বাশীর আল-ইবরাহীমী (১৮৮৯-১৯৬৫ খৃ.) (দ্র. আল-ইবরাহীমী); আহ্মাদ তাওফীক আল-মাদানী (জ. ১৮৯৯ খৃ.)। ইনি ছিলেন ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ এবং সংস্কারবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আলজিরীয় জাতীয় সংস্কৃতির পক্ষে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন।

(ঙ) মরক্কোতে সালাফিয়্যাপন্থী প্রচলিত সংস্কারবাদ তুলনামূলকভাবে অনেক বিলম্বে প্রসার লাভ করে। ফলে এই পরিপ্রেক্ষিতে অতি নগণ্য সংখ্যক নাম ও রচনাবলী খ্যাতি লাভ করিয়াছে (তু. J. Berque, Ca et la dans les debuts du reformisme religieux au Maroc, in Etudes... dediees a la memoire d'E. Levi-Provencal, প্যারিস ১৯৬২ খৃ., ২খ, ৪৭১-৯৪)।

শেরিফীয় সাম্রাজ্যে ইস্লাহ সম্পর্কিত প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রহিয়াছেন আবূ শু'আয়ব আদ-দুক্কালী (মৃ. ১৯৩৭ খৃ.), ইব্নু'ল-মুওয়াক্কিত (১৮৯৪-১৯৪৯)। ইনি প্রকৃত অর্থে ইসলামের পুনর্জাগরণের তুলনায় জনগণের নৈতিক আচরণের আলোচনাতে বেশী আগ্রহী ছিলেন (তু. Hesperis, ১৯৫২ খৃ., ১৬৫-৯৫-এ ইবনু'ল-মুওয়াক্কিত সম্পর্কে A. Faure-কৃত একটি প্রবন্ধ)। 'আল্লাল আল-ফাসী (জ. ১৯১০ খৃ.)ঃ ইনি ছিলেন একজন গ্রন্থকার ও রাজনৈতিক নেতা (স্বাধীনতাপন্থী দল হিযবু'ল-ইসতিকলাল) এবং তিনি নিজেকে একজন সালাফীরূপে দাবি করিতেন (তু. তাঁহার Autocritique, আন-নাকদু'য্-যাতী, কায়রো ১৯৫২ খৃ.)।

এই সকল গ্রন্থকার প্রকৃতপক্ষে ইস্লাহ-এর প্রারম্ভিক শিক্ষকগণের মতবাদ ও শিক্ষামূলক রচনাবলীকেই পরবর্তী কালে প্রচলিত রাখিয়াছেন। ইহা ছাড়াও লক্ষণীয় যে, অপরাপর কতিপয় কবি ও সাহিত্যিক তাঁহাদের রচনাবলীতে ইস্লাহ-এর নৈতিক ও সামাজিক ভাবসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ইস্লাহ-এর প্রচারে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের

মধ্যে রহিয়াছেন হাফিজ ইবরাহীম (১৮৭২-১৯৩২), মুস্তাফা লুত্ফী আল-মানফালূতী (১৮৭৬-১৯২৪), 'আব্বাস মাহ্মূদ আল-'আক্কাদ (১৮৮৯-১৯৬৪), মুহাম্মাদ আল-'ঈদ (১৯০৪ খৃ. জন্ম) প্রমুখ।

ইহার অনস্বীকার্য ফলপ্রসূতা সত্ত্বেও (Brockelmann কেবল আংশিকভাবে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, in S iii, ৩১০-৩৫, ৪৩৫-৬) সংস্কারকগণের পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী কার্যাবলী সমাজের অন্তর্গত সকল সামাজিক শ্রেণীর সমস্যাসমূহ সন্তোষজনকভাবে সমাধান করিতে পারে নাই। তাহাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক এবং এমনকি নৈতিক ও ধর্মমত সংক্রান্ত মতবাদসমূহ আপাতভাবে শহরের নব্য উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটাইতেছিল। দলগতভাবে ইহা তুলনামূলকভাবে আলোকপ্রাপ্ত ছিল এবং মাঝে মাঝে কোন একটি য়ুরোপীয় ভাষায় আধুনিক সংস্কৃতির চাকচিক্যের সহিত ন্যূনতম 'আরব-ইসলামী সংস্কৃতি সংযোজন করিয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল কোন একটি বিশেষ ঐতিহ্যের— এই ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে বর্ণিত সালাফ-এর ঐতিহ্য— প্রতি ইহার আনুগত্য প্রদর্শন করা এবং একই সঙ্গে আধুনিকতার প্রতি কিঞ্চিৎ আগ্রহ প্রকাশ করা। এই শ্রেণীর আদর্শ প্রতিভাত হইয়াছে মধ্যপন্থা ও আপোসকামী মনোভাবের মাধ্যমে। ধর্মীয় গণ্ডিতে তাহারা যেই প্রকার সঙ্গত ব্যবস্থার সন্ধান করিয়াছেন যাহা জনপ্রিয় ঐতিহ্যসমূহ (যাহা ছিল তাহাদের দৃষ্টিতে মূর্খতা অথবা প্রতিক্রিয়াশীল চেতনা) এবং অনমনীয় মৌলিকতাপন্থী মনোভাব। কতিপয় মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বকারী [আল-ইখওয়ানু'ল-মুসলিমূন দ্র.] ইহা বর্জন করিয়াছে। ইহারা অতিমাত্রায় আধুনিকতাকেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে (যথা সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে সুপারিশ)। সুতরাং সালাফিয়্যাগণের গোড়া সংস্কারবাদের পক্ষে তুলনামূলকভাবে ব্যাপক জনসমর্থন ছিল, যাহারা বিচক্ষণতাসূচক সুশৃঙ্খল বিবর্তনে বিশ্বাসী, যাহারা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের নৈতিক কর্তৃত্বকে শ্রদ্ধা করিত এবং এই মর্মে নিশ্চিত ছিল যে, সংস্কারবাদী বিশ্বাসের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ একটি উন্নতির পথে সমাজকে পরিচালিত করিবার জন্য সমাজের পথপ্রদর্শক প্রয়োজন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ইসলাহ্-এর ঐক্যপূর্ণ সুসংহত বিকাশ পরবর্তী কালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্তন রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(৩) **সাম্প্রতিক ঘটনাবলী** (পঞ্চাশ দশক হইতে) : যুদ্ধ-পরবর্তী কালটি 'আরব বিশ্বের ধর্মীয় অবয়বের একটি সম্পূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা নির্দেশ করে। সংস্কারবাদী গোষ্ঠীর অবয়বে দেখা দেয় গভীর মানগত ও পরিমাণগত পরিবর্তনের সূচনা। ইসলাহ্-এর মুখপাত্রগণের মধ্যে এই সময় রাশীদ রিদা (মৃ. ১৯৩৫ খৃ.) এবং 'আবদু'ল-হামীদ ইব্ন বাদীস (মৃ. ১৯৪০ খৃ.)-এর ন্যায় গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন না এবং একই সঙ্গে মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ আন্দোলন পুরোভাগে অবতীর্ণ হয়। রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মতবাদ সংক্রান্ত রচনাবলীর মাধ্যমে এই আন্দোলনটি দ্রুত দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন শহীদ হাসান আল-বান্না (দ্র.)-র উত্তরসুরি এবং একজন প্রখ্যাত নেতা হাসান ইসমা'ঈল আল-হুদায়বী; সিরীয় বংশোদ্ভূত প্রচার বিশেষজ্ঞ ও আল-মাতবা'উস'-সালাফিয়্যা (কায়রোতে অবস্থিত)-এর প্রাক্তন পরিচালক মুহিব্বু'দ-দীন আল খাতীব, সিরিয়ার মুস্তাফা আস-সিবা'ঈ (মৃ. ১৯৬৫ খৃ.); কুরআনের একটি তাফসীর ফী জিলালি'ল-কুরআন-এর প্রণেতা সায়্যিদ কুতুব শহীদ (১৯৬৬ খৃ.-তে মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত); মুহাম্মাদ আল-গাযালী, ইঁহার প্রণীত সমর্থনমূলক ও মতবাদী রচনাবলীর পরিমাণ ৭০০০ পৃষ্ঠার অধিক (তু. REI, Abstracta ১৯৬১ খৃ., পৃ. ১০৫-৬); এবং আল-মুসলিমূন (কায়রো-দামিশ্ক, ১৯৫১ খৃ.; জেনেভা ১৯৬১ খৃ.) নামক সাময়িকীর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক সা'ঈদ রামাদান।

(খ) সংস্কারবাদী আন্দোলন সমাজে ইহার সেই বিশেষ স্থানটি হারায় যাহা দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ছিল ইহার শক্তিস্বরূপ। ইসলাহ্-এর প্রধান ধারার সমর্থকগণ (উদাহরণস্বরূপ রাশীদ রিদার প্রত্যক্ষ অনুসারিগণ) শীঘ্রই এমন একটি সামাজিক ও নৈতিক পদ্ধতির সমর্থকরূপে চিহ্নিত হন যাহা ইতিপূর্বে ঐতিহ্যবাহীরূপে বিবেচিত হইত।

(গ) আপাত বিরোধী হইলেও আলজিরিয়ায় এবং কিছু পরিমাণ মিসরে— সংস্কারবাদী আন্দোলনের ঐতিহাসিক সাফল্যই ইহার বিচ্ছিন্নতা ও পতনের জন্য দায়ী। ক্ষমতার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ইসলাহ্-এর বহু প্রচারক (যাহাদের কতিপয়কে কার্যক্ষেত্রে সরকারী পদে স্থান দেওয়া হয়) ইসলামী মূল্যবোধের বিজয়ের পথে তাঁহাদের সাবেক উদ্দীপনাময় তৎপরতা পরিত্যাগ করিয়া সুবিধাবাদী অবস্থান গ্রহণ করেন। ঘটনাচক্রে 'সরকারী' প্রভাবে ধর্মের জন্য গঠন পদ্ধতি ও মতবাদ সরবরাহ করিতে বাধ্য হইয়া তাঁহারা অবিলম্বে আপোসকামী শক্তিতে পরিণত হন। বিরোধী পক্ষে থাকাকালীন ইসলাহ্-এর যে লক্ষ্য ছিল— পবিত্র ইসলামের প্রতিরক্ষা করা ইহার দায়িত্ব— এমন কতিপয় ব্যক্তি তুলিয়া লইয়াছিল যাহারা তাহাদের বিবেচনায় বেআইনী অথবা অন্যায়কারী যে কোন রাষ্ট্রশক্তির সহিত কোন প্রকার আপোষ করার বিরোধী ছিলেন, ঐ একই ব্যক্তিবর্গকে তাহাদের বিরোধিগণ উল্লসিতভাবে ফ্যাসিবাদী অথবা প্রতিক্রিয়াশীলরূপে অভিহিত করিত।

(ঘ) শুধু 'আরবী বলিতে সক্ষম— এই সীমাবদ্ধতার দ্রুত অবলুপ্তির মাধ্যমে তরুণ সম্প্রদায় বিশ্বের চতুর্দিকে সামাজিক ও নৈতিক বাস্তবতার এক নূতন দিগন্তের সন্ধান লাভে সমর্থ হয় (বিদেশী সাহিত্য, সচিত্র সংবাদ, সাময়িকী ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে); নূতন দর্শনসমূহ (তু. যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে 'অস্তিত্ববাদে'র সফলতা এবং 'আরবদেশসমূহে কমিউনিজমের অনুপ্রবেশের প্রতিক্রিয়ারূপে ক্রমবর্ধমান হারে মার্কসবাদের প্রসার); নূতন নূতন কমবেশী বিপ্লবী আদর্শবাদ (সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও উপনিবেশবাদ বিরোধী, 'আরব সমাজবাদ ও ঐক্য); এবং "বানদুং-এর চেতনা" (১৯৫৫ খৃ.) দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি নূতন রাজনৈতিক নীতিমালা। এই সকল কারণে তরুণ সম্প্রদায়কে ইসলাহ্-এর গুণাগুণ সম্পর্কে সন্দিহান ও ইহার মৌল নীতি সম্পর্কে সন্দেহবাদী করিয়া তোলে, যে সমস্ত নীতি পূর্ববর্তী বংশের জন্য ছিল মানসিক দিক হইতে সন্তোষজনক এবং বিশ্বাসের জন্য আস্থাসূচক।

(ঙ) নব্য স্বাধীন দেশসমূহে নূতন সামাজিক শক্তিসমূহের ক্ষমতায় আরোহণ (সিরিয়া-লেবানন ১৯৪৬ খৃ., লিবিয়া ১৯৫২ খৃ., সুদান ১৯৫৫ খৃ., মরক্কো ও তিউনিসিয়া ১৯৫৬ খৃ., আলজিরিয়া ১৯৬২ খৃ.) অথবা যে সমস্ত দেশে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় (মিসর ১৯৫২ খৃ., ইরাক ১৯৫৮ খৃ., তিউনিসিয়া ১৯৫৭ খৃ., লিবিয়া ১৯৬৯ খৃ.) সেই সমস্ত দেশে জাতীয় বুর্জোয়া ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ যাঁহারা এতদিন পর্যন্ত প্রাক্তন শাসকগণের ছত্রছায়ায় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তাঁহাদিগকে পশ্চাদপটে নির্বাসিত করা হয়। রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকারের ফলে স্বাভাবিকভাবেই

তরুণ সম্প্রদায় "জাতীয় দিকদর্শনের" নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে জনমতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রসারিত করিতে সচেষ্ট হয়। ফলে রাজনীতির সহিত ক্রমবর্ধমানভাবে যুক্ত হইয়া ধর্ম নিজকে এমন একটি সংগ্রামে (বিপ্লব না হইলেও) জড়াইয়া পড়িতে দেখে, যাহার লক্ষ্য ছিল ইহার এলাকা বহির্ভূত। অতীতের ন্যায় এই সময় ধর্মীয় নেতৃবর্গ (মুফতী, 'উলামা') একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী গঠন করিতে সমর্থ ছিলেন না, বিশেষত যাঁহারা আদর্শ ইসলামের নামে এবং ক্ষমতাসীন মতাদর্শের নির্দেশের পরোয়া না করিয়া স্বাধীনভাবে মতবাদ (বিশেষত রাজনৈতিক নীতি) প্রণয়ন করিতেন।

(চ) রাজনৈতিক মুক্তি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরে নিয়োজিত 'আরব সমাজসমূহে ইসলাহ আর সংস্কারবাদী ও প্রগতিশীল মতাদর্শরূপে বিবেচিত হইতে থাকে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার মতবাদ সংক্রান্ত অবস্থানসমূহ সেকেলে হিসেবে বিবেচিত হইতে থাকে। মুসলিমগণের সকল ব্যক্তিগত ও সরকারী কর্মতৎপরতায় অনুপ্রেরণার উৎসরূপে কুরআন-এর সার্বক্ষণিক ধ্যানের প্রতি ইহার আহবান তরুণদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়। ইহার পরিবর্তে আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ তাহাদের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা পদ্ধতি, যথা কার্যক্রম, সনদ ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে তাহাদের উপর চাপাইয়া দেয়। সালাফ-এর ঐতিহ্য, যাহা ইসলাহ মহিমান্বিত আলোকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করিয়াছে তাহা তরুণ সম্প্রদায়ের নিকট নিরুৎসাহব্যঞ্জক অভ্যর্থনা লাভ করে। তাহাদের জন্য সুস্পষ্ট বাস্তবতা, ইহার সামাজিক, পেশাগত ও বস্তুবাদী সমস্যাসমূহ, ইহার আরোপিত যৌথ দায়িত্বসমূহ, ইহার সৃষ্ট চাহিদাসমূহ (ভোগ্য পণ্য, বিনোদন ইত্যাদির জন্য), ইহার প্রস্তাবিত ভোগবিলাস (আপ্যায়ন, খেলাধুলা পর্যন্ত) অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাহাদের যুগের নৈতিক ও সৌন্দর্যবোধ ভিত্তিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাইয়া তরুণ সম্প্রদায় এই জগতের সুখ সন্ধানকেই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া ইহলোক ও পরলোকে সুখ লাভের সংস্কারবাদী লক্ষ্য পরিত্যাগ করে। ইহার সৃষ্ট ও উপস্থাপিত সমস্যাসমূহ এবং ইহার মূল্যায়নে ইসলাহ উদীয়মান তরুণ সম্প্রদায়ের নিকট অসংহত একটি চেহারা ধারণ করে। এই উদীয়মান সম্প্রদায়ের নিকট অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী ছিল নৈতিক-আধ্যাত্মিক সমস্যাসমূহ হইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তরুণ সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও উদারতাবাদের নীতির সহিত নিজেদের চিহ্নিত করে এবং তাহারা ইহার মধ্যেই বর্তমান যুগের মুসলিম সমাজের জন্য মানবিক সম্পর্ক ও জীবনের আদর্শের পরিচালিকা শক্তির সন্ধান করে। তরুণ সম্প্রদায় আদৌ যদি ধর্মকে বিবেচনা করে, তবে তাহা ছিল ক্ষমতাসীন চক্রের রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমরূপে, বিশেষত ইহার ব্যবহার ছিল জনগণের রাজনৈতিক ও নাগরিক শিক্ষার প্রশ্নের সহিত জড়িত এবং জাতীয় ঐক্যকে পবিত্রতা দানের উপায়মাত্র। এই সময় প্রায়শই সরকারী মতাদর্শের সমর্থনে ইসলাহ-কে ব্যবহার করা হইয়াছে, ইহার উপস্থাপিত ধর্মীয় মূল্যবোধ অথবা ইসলামের প্রামাণিকতার প্রতি ইহার নির্দেশনাসমূহের জন্য নয়।

'আরব বিশ্বের সর্বত্র গত কয়েক দশকে এই যে জটিল ঘটনাটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহা সুস্পষ্টভাবে দুইটি বিষয় প্রকাশ করে : মুসলিম সমাজে "পরিচালিকা শক্তি"রূপে ইসলাহ-এর লক্ষণীয়ভাবে শক্তি হ্রাস এবং ইহার পরিবর্তে রাজনীতির আবির্ভাব যাহা আজ জাতীয় জীবনের সকল পর্যায়ে সঞ্জীবনী চেতনায় পরিণত হইতেছে। বর্তমান কালে রাজনীতিই জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ; জনসংযোগ মাধ্যমে ও প্রচারণা ব্যবস্থাসমূহের ব্যাপক সহায়তায় ইহা জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং সমাজের শাসকবর্গের ক্রিয়াকলাপের উপর তাহা কেন্দ্রীভূত করে। এইভাবে একটি সমগ্র জাতির জীবন নির্ভর করে ইহার জাতীয় নেতৃবৃন্দের 'ঐতিহাসিক' ভাষণ ও বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তব্যের উপর। তাহারাই আধুনিক কালের জননায়ক 'উপদেবতা' (এইভাবে বর্তমানে ইহাও সম্ভবপর হইয়াছে যে, জনগণ দ্বারা পুজনীয় কোন কোন 'আরব রাষ্ট্রপ্রধানের অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়)। রাজনীতির ভাষা পর্যন্ত এত প্রবল-প্রতিপত্তি অর্জন করে যে, অন্যান্য প্রকাশ মাধ্যমসমূহ (সাহিত্য, ধর্ম ইত্যাদি) ইহার ধারণা ও দ্বন্দ্ববাদ দ্বারা উর্বর হইতে থাকে। বহু ক্ষেত্রেই ধর্মীয় শব্দমালা পরিণত হয় রাজনৈতিক শব্দ সম্পদের সাধারণভাবে পুনঃসজ্জিত রূপ মাত্রে। নব্য শক্তিসমূহ রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলসমূহ উম্মাহ্‌র জীবনের প্রাথমিক ভূমিকা গ্রহণ করে এবং ইহার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকনির্দেশনা করিতে থাকে। সময়ে সময়ে এই সকল শক্তি একচ্ছত্র আধিপত্যের ক্ষমতায় নাগরিকগণের উপর নাগরিক দায়িত্ব ও বিশ্বাস চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করে। এই মুহূর্ত হইতে ধর্ম মুসলিম জীবন যাত্রার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মর্যাদা হারায় এবং সমাজের বিবেকের দলীল ও প্রতীকের ব্যাখ্যাকাররূপে ইহার ঐতিহ্যবাহী কর্মতৎপরতা হইতে বিযুক্ত হয়।

এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ইসলাহ ইহার কণ্ঠের শক্তি ও কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে হারাইয়া ফেলে। স্বয়ং সংস্কারবাদী জনতা নাস্তিক ও আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হয় অথবা এইরূপ সংস্কারবাদী দলে পরিণত হয় যাহাদের আধুনিক বিশ্বে ইসলাহ-এর ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণা ছিল সালাফিয়্যাগণের অনুসৃত ধারণা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই প্রকার প্রবণতা ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই সংস্কারবাদী চিন্তাধারার দুইটি প্রধান স্রোতের প্রচ্ছন্ন ধারণাবলীর যুক্তিযুক্ত পরিণতি। একটি ধারা হইতেছে আধুনিক বিশ্বের সহিত মুসলিম জীবনযাত্রার পুনঃবিন্যস্তকরণের সমর্থক উদারপন্থী প্রবণতা এবং অন্যটি কঠোরভাবে গোঁড়াপন্থী ভাবধারা যাহা সকল বাধা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও সমসাময়িক সভ্যতায় সম্পূর্ণভাবে ইসলামের প্রারম্ভিক মর্মবাণী সংরক্ষণ করিতে ইচ্ছুক।

১। উদারনৈতিক প্রবণতাটি আন্তঃযুদ্ধকালীন সময়কালের কতিপয় লেখকের মধ্যে সুপ্তভাবে বিরাজমান ছিল। ইহারা মুহাম্মাদ 'আবদুহুর ধর্মীয় চিন্তাধারার না হইলেও তাঁহার চেতনার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারীরূপে প্রকাশ্যভাবে নিজেদের দাবি ঘোষণা করে। যুদ্ধ পরবর্তী কিছু সময়কালে ইহারা কিছু পরিমাণ সাফল্য লাভ করে। এই সময় সংস্কারবাদ ও আধুনিকায়নবাদের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে অনুভূত হয়। কতিপয় উদারনৈতিক চেতনার দ্বারা প্রভাবিত পরিস্থিতির ফলে বহু 'আরব (এবং মুসলিম) দেশে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়সমূহের কার্যত পৃথকীকরণ সংঘটিত হয়। এই পরিস্থিতিই কতিপয় ব্যক্তিকে ইসলামী সমস্যা ও বিষয়সমূহের পরীক্ষণে উৎসাহিত করে যাহা তখন পর্যন্ত ছিল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এই ধরনের স্বাধীন তদন্ত এখন আর তাহাদেরকে প্রশাসনের প্রতিহিংসার নগ্ন শিকারে পরিণত করিত না অথবা 'আলী 'আবদু'র-রাযিক ১৯২৫ খৃ.-এ এবং ১৯৩০ খৃ.-এ তাহির আল হাদ্দাদ-এর ন্যায় রক্ষণশীল ধর্মীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়

চক্রের হাতে নির্যাতিত হইবার আশংকা ছিল না [কু'রআন শারীফের ব্যাখ্যার প্রকৃতি ও শ্রেণী অথবা হাদীছসমূহের যথার্থতার ন্যায় কতিপয় স্পর্শকাতর সমস্যা অবশ্য পূর্বের ন্যায় প্রাচীনপন্থী 'উলামা' এবং নব্য মুসলিম চিন্তাধারার অগ্রণী সদস্যগণের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি করিতে থাকে [তু. উদাহরণস্বরূপ J. Jomier, Quelques positions actuelles de l'exegese coranique en Egypte.... (১৯৪৭-৫১ খৃ.), in MIDEO (১৯৫৪), ৩৯-৭৩; মুহাম্মাদ আহ'মাদ খালাফুল্লাহ-এর একটি গ্রন্থ ঃ আল-ফান্নু'ল-ক'াসাসী ফি'ল-কু'রআনি'ল-কারীম, কায়রো ১৯৫১ খৃ.-এ]। ব্যক্তিগত বিশ্বাসসমূহকে সম্মান করে এইরূপ একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধুনিকায়নের ধারণা ক্রমে ক্রমে গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠে। এই উদারনীতি রাজনৈতিক সংগঠনের বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিল, কিন্তু ইহা ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়াস পায় যাহাতে মুসলিম সমাজের বিবর্তনে পশ্চাদমুখী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী ধর্মীয় দিকসমূহকে অবলুপ্ত করা সম্ভব হয়। ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে এই প্রবণতাটি ধর্মগ্রন্থের তুলনামূলকভাবে অধিকতর নমনীয় ব্যাখ্যার সমর্থক যাহা বৈজ্ঞানিক চেতনা এবং বুদ্ধি-বিচেনার প্রতি সন্তোষজনক হইবে এবং একই সঙ্গে শারী'আত এবং ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ নিরসনে সমর্থ হইবে। এই শারী'আ প্রবর্তন করেন ঐতিহ্যবাহী পণ্ডিতগণ এবং সালাফিয়্যাগণ পরবর্তীতে তাহা গ্রহণ করেন। আধুনিকপন্থীদের এই প্রবণতাটির স্বাভাবিক পরিণতি হইতেছে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকতার অনুরূপ; রাশীদ রিদা, ইব্ন বাদীস এবং তাঁহাদের অনুসারিগণ তীব্রভাবে ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন।

২। একই সময়ে উৎসাহী সংস্কারবাদীদের অনুগামিগণ মুসলিম সমাজে নৈতিক শিথিলতা বৃদ্ধি এবং ধর্মনিরপেক্ষ প্রবণতার সাফল্যে উদ্বিগ্ন হইয়া রাষ্ট্রে ও জনগণের মধ্যে ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য সক্রিয় হন। মধ্যপন্থী ইসলাহ'-এর মতবাদগত অবস্থানসমূহকে পুনঃসজীবকরণের মাধ্যমে ইহা মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের জন্য অনুসারী ও সহানুভূতিশীল সমর্থক লাভ করে। মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের মৌলিক নীতিসমূহ ছিল (তাঁহাদের কতিপয়ের রাজনৈতিক তৎপরতা বাদ দিলে) সালাফিয়্যাগণের প্রচারিত কঠোর নিষ্ঠাবাদ-এর অতি নিকট রূপ [তু. পুস্তিকাকারে ইখওয়ানু'ল-মুসলিমূনের প্রথম সর্বোচ্চ পথনির্দেশিকা হাসানু'ল-বান্না (১৯০৬-১৯৪৯ খৃ.) (দ্র.) প্রদত্ত তাহাদের চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ইলা আয়্যি শা'ইন নাদ'উনৃ-নাস ? কায়রো ১৯৩৯ (?)]। যেহেতু ইহা ইসলামী মূল্যবোধের পূর্বতন প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিল এবং এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, ইহা স্বেচ্ছায় আধুনিক সংস্কৃতির নূতন মূল্যবোধসমূহকে অবহেলা করে। ফলস্বরূপ এই প্রবণতাটি আধুনিকতাবাদিগণের, যাহারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদারতা এবং বিবেকের স্বাধীনতার উগ্র সমর্থক ছিলেন তাহাদের সহানুভূতি অর্জনে ব্যর্থ হয়। একই সঙ্গে তরুণ সমাজ, যাহারা তখনও ইসলামের প্রতি অনুরক্ত ছিল এবং তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে সংঘটিত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতি সজাগ ছিল, তাহারাও সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। ইহারা "ইতিহাসের যুক্তি"র প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত ছিলেন এবং তাহাদের নিকট যথেষ্ট প্রগতিশীল নয় এমন সংস্কারবাদের অস্পষ্ট মতবাদসমূহ এবং তাহাদের ধারণায় প্রতিক্রিয়াশীলরূপে বিবেচিত ধর্মীয় আন্দোলনের অনমনীয় মৌলবাদ— উভয়কেই এড়ানোর আশায় তাহারা একটি জনকেন্দ্রিক ইসলাহ'-এর পক্ষে মত দান করে। পূর্ববর্তী শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা এতদিন পর্যন্ত অবহেলিত জনসাধারণের একটি বিশেষ অংশের পক্ষ লইয়া তাহারা সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য সংগ্রাম করিতে থাকে (যুদ্ধ পরবর্তী যুগের ধর্মীয় রাজনৈতিক সাহিত্যের একটি অন্যতম প্রধান ভাবধারা, তু. সায়্যিদ কু'তু'ব, আল-'আদালাতু'ল্-ইজতিমা'ইয়্যা ফি'ল-ইসলাম, কায়রো ১৯৫২ খৃ.; ইংরেজি অনু. J. H. hardie, Social Justice in Islam, ওয়াশিংটন ১৯৫৩ খৃ.)। ইহারা সংস্কৃতির সামাজিকীকরণের পক্ষে ওকালতি করেন (তু. বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়করণ এবং সাধারণ মানুষের নিকট ইহাকে সহজলভ্য করিবার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত মিসরীয় "সাংস্কৃতিক পাঠাগার")।

অন্যদিকে সমাজতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত একটি গ্রুপ একটি নূতন 'আরব ইসলামী মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন যাহার ভিত্তি হইবে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপর এবং যাহা স্বয়ং সন্ত্রাস প্রয়োগ ব্যতিরেকেই অত্যাচার ও শোষণের অবসান ঘটাইবে [তু. এই প্রসঙ্গে 'আরব সমাজবাদ (বা'ছ)-এর একজন তাত্ত্বিক স'ালাহু'দ-দীন আল-বায়ত'ার-এর প্রদত্ত নীতিমালাসমূহ আস-সিয়াসাতু'ল-'আরাবিয়্যা বায়না'ল-মাবদা' ওয়া'ল-তাত্'বীক', বৈরূত ১৯৬০ খৃ.; ফরাসী অনু. Marcel Colombe-কৃত in Orient, ৪০খ. (১৯৬৬ খৃ.), ১৭৩ ff.]। পরিশেষে এই অগ্রণী সংস্কারবাদী লেখকবর্গ তাঁহাদের বিবেচনায় ইতিহাস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নিন্দিত সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদসমূহের সহিতই সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করেন, একই সঙ্গে তাঁহারা তাঁহাদের মতে মধ্যযুগীয় মানসিকতার ফসল যৌথ প্রতিনিধিত্ব ও ধারণাসমূহকেও পরিত্যাগ করেন। অপরপক্ষে আমাদের সাম্প্রতিক ভাষায়, যতদূর প্রকাশ করা সম্ভব কু'রআনী বাণীর জন্য যাহা কিছু অত্যাবশ্যকীয় রহিয়াছে, তাঁহার মুসলিম চিন্তাধারার সহিত সমসাময়িক সংস্কৃতির প্রধান ধারণাসমূহকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করেন (বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের প্রসঙ্গে), এমনকি যে সমস্ত ধারণা প্রধানত নাস্তিকতা ভিত্তিক মতাদর্শপ্রসূত, যথা সমাজতন্ত্র (ইশতিরাকিয়্যা দ্র.) এবং বিপ্লব (ছাওরা দ্র.) তাহাও।

উপসংহারে বলা যায়, যদিও ইসলাহ' ইহার আন্তঃযুদ্ধকালীন সময়ের পূর্ণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্রোতধারায় শক্তি, সমপ্রকৃতি ও ঐক্যের সুর হারাইয়া ফেলে, তথাপি ইহা বিভিন্ন রূপের—কখনও মধ্যপন্থী, কখনও উগ্রপন্থী ভাবধারার সৃষ্টি করিয়া চলে। যেভাবেই বিবেচনা করা হউক না কেন, মধ্যপন্থী বুদ্ধিজীবিগণের প্রচারিত উদারপন্থী ইসলাহ', যাহা ইসলামের জন্য সহনশীলতা ও গবেষণার স্বাধীনতা দাবি করিত এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণের মুক্তি আনয়নের বাণী প্রচার করিত এবং যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিজয়ের মাধ্যমে মানবিক বিকাশের আশাপূর্ণ ভবিষ্যতের ভিত্তি কল্পনা করিত অথবা মুসলিম ইখওয়ানু'ল-মুসলিমূনের আপোষহীন ইসলাহ' যাহা রাসূলুল্লাহ (স')-এর মিশনের প্রতি অনুরক্ততার মাধ্যমে বিশ্বে ইসলামের একটি কার্যকর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত ছিল অথবা আদর্শবাদী তরুণগণের প্রচারিত ইসলাহ' যাহা রাজনৈতিক নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে এবং 'বামপন্থী' ভাবধারায় প্রকাশ পাইয়াছে, এই সকল ধারাসমূহের প্রত্যেকটিই জামালু'দ-দীন আল-আফগানী, মুহ'াম্মাদ 'আবদুহু এবং 'আবদু'র-রাহ'মান আল-কাওয়াকিবীর প্রচারিত মৌল ভাবধারার কোন না কোনটিতে প্রতিনিধিত্ব করে এবং পরবর্তীতে তাঁহাদের বিশ্বস্ত অনুগামিগণ প্রাচ্যে ও মাগ'রিবে ইহা পৌঁছাইয়া দিয়াছিল।

এমন একটি সময়কালে যখন সংস্কৃতিসমূহের পারস্পরিক সংযোগ পূর্বের তুলনায় অধিকতর দ্রুততার সহিত সংগঠিত হইতেছে, যখন বিশ্বজনীনতার চেতনা শুধু খৃস্টীয় প্রেক্ষিতেই বিকাশ লাভ করিতেছে না, তখন মুসলিম সংস্কারবাদ আর কোনভাবেই সালাফিয়্যার স্থবির জগতের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহার বর্তমান স্রোতধারার বৈচিত্রের মাধ্যমেই ইসলাহ এককেন্দ্রিক আন্দোলনসমূহের অনুসরণীয় কঠোর ধর্মীয় গোঁড়ামী হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। এইভাবে ইসলাহ পরিণত হয় এমন মিলনক্ষেত্রে যেখানে আধুনিক বিশ্বে ইসলামের ভবিষ্যত সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে উদ্বিগ্নতা অনুভবকারী প্রচুর সংখ্যক চিন্তাবিদ ও শিক্ষক একত্র হন এবং ইসলামী সংস্কৃতিকে একটি 'নূতন সূচনা' দানের প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। ইহার ফলে সৃষ্টি হইয়াছে প্রবন্ধ ও সমালোচনামূলক রচনার এক নূতন জোয়ার —যাহা ইসলাহ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবার দাবিদার এবং যাহার বিস্তৃতি 'আরব বিশ্বের সর্বত্র পরিলক্ষিত (মিসর, লেবানন, তিউনিসিয়া ইত্যাদি) এবং এমন কি পাকিস্তানে, যেখানে এখনও 'আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবালের ধারণাসমূহ অনুপ্রেরণায় সমৃদ্ধ উৎসরূপে পরিগণিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ১। পটভূমি ঃ (১) Brockelmann, S III, ৩১০-৫৫, (২) F. M. Pareja et al. Islamologic, বৈরূত ১৯৫৭-৬৩ খৃ., ৭২৪-৪৩; (৩) H. Laoust, Le Reformisme orthodoxe des "Salafiya" et les caracters generaux de son orientation actuelle, in REI, ১৯৩২ খৃ., ১৭৫-২২৪; (৪) Ch. C. Adam, Islam and modernism in Egypt, লণ্ডন ১৯৩৩ খৃ. (পুনর্মুদ্রণ, আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, কায়রো ১৯৬৮ খৃ.); (৫) H. A. R. Gibb, Modern Trend in Islam, শিকাগো ১৯৪৭ খৃ. (সংস্কারবাদী ও আধুনিকতাবাদী প্রবণতা প্রসঙ্গে); (৬) A. Hourani, Arabic thought in the Liberal Age, ১৭৯৮-১৯৩৯, অক্সফোর্ড ১৯৬২ খৃ.; (৭) L. Gardet, La Cite-musulmane, প্যারিস[4] ১৯৫৪ খৃ., ১৯৬৯ খৃ. (বিশেষভাবে পরিশিষ্ট ৩); (৮) মুহাম্মাদ ইকবাল, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, অক্সফোর্ড[2] ১৯৩৪ খৃ.।

২। আধুনিক ইসলাহ-এর ঐতিহাসিক বিবরণী ঃ (ক) নব্য হাম্বালী প্রভাব ঃ মূল নির্দেশনা (৯) H. Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-D-Din Ahmad b. Taymiya, কায়রো ১৯৩৯ খৃ., ৫৪১-৭৫।

(খ) ওয়াহ্হাবী উত্তরসূরিগণ ঃ (১০) H. Laoust, Essai ..., ৫০৬-৪০; ৬১৫-৩০; গ্রন্থপঞ্জী ৬৪৮-৫১; (১১) L. Massignon, Les vraies, origines dogmatiques du Wahhabisme..., in RMM, ৩৬ খ. (১৯১৮-১৯ খৃ.) ৩২০ প.; (১২) EI1-এ Wahhabiya; (১৩) EI[2]-তে, Ibn Abd Al-Wahhab.

(৩) আধুনিক সংস্কারবাদী ধারার প্রতিনিধিগণ ঃ বিশাল পরিমাণ সাহিত্য এই বিষয়টিকে সাধারণ দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা করিয়াছে। তু. (১৪) আহমাদ আমীন, যু'আমা'উ'ল-ইসলাহ ফি'ল-'আসরি'ল-হাদীছ, কায়রো ১৩৬৮/১৯৪৯ (আরব বিশ্ব এবং ভারতীয় উপমহাদেশের দশজন বিশিষ্ট সংস্কারক ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে। বিশেষ পাঠ ঃ (ক) (১৫) জামালু'দ-দীন আল-আফগানী (১৮৩৮-১৮৯৭ খৃ.) ঃ EI[2], sv; (১৬) Brockelmann, S III, ৩১১-৫; (১৭) আহমাদ আমীন, যু'আমা'উল-ইসলাহ..., ৫৯-১২০; (১৮) Nikki R. Kedie, Sayyid Jamal al-Din "al Afghani" : A. Political Biography, লসএঞ্জেলস্ ১৯৭২ খৃ.; (১৯) d. Kedourie, Afghani and 'Abduh, লণ্ডন ১৯৬৬ খৃ.; (২০) Homa Pakdaman, Djamal de-Din Assad Abadi dit Afghani, প্যারিস ১০৬০ খৃ., গ্রন্থপঞ্জী... ৩৬৯-৮২ (মানবিক দুর্বলতাসমূহকে চিহ্নিত করিয়া ইহাতে চরিত্রের রহস্য অপনোদনের প্রবণতা লক্ষণীয়)। পরিপূরক পাঠ ঃ (২১) A. Albert Kudsi-Zadeh, Sayyid Jamal al-Din al-Afghani, An Annotated Biography, লাইডেন ১৯৭০ খৃ.। (খ) 'আবদু'র-রাহমান আল-কাওয়াকিবী (১৮৫৪-১৯০২) ঃ (২২) Brockelmann, S III, ৩৮০; (২৩) রাশীদ রিদা, মুস'আব 'আযীম, ... (স্মরণে), in Al-Mannar, ৫খ. (১৯০২ খৃ.), ২৩৭-৪০; ২৭৬-৮০; (২৪) আহমাদ আমীন, যুআমা'উ'ল্-ইসলাহ ..., ২৪৯-৭৯; (২৫) মুহ. আহ. খালাফুল্লাহ, আল-ক, হায়াতুহ ওয়া আছারুহ, কায়রো ১৯৬২ খৃ.; (২৬) খালদূন স আল-হুস রী, Three Reformers, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ., ৫৫-১১২; (গ) মুহাম্মাদ 'আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫)। (২৭) EI[1], sv; (২৮) Brockelmann, S III, 315-21; অবশিষ্ট মৌলিক নির্দেশনাসমূহ ঃ (২৯) রাশীদ রিদা, তা'রীখু'ল-উসতায আল-ইমামু'শ-শায়খ মুহ. 'আ., ৩ খণ্ড, কায়রো, ১খ, ১৩৫০/১৯৩১ (মূলত জীবনীমূলক, মুহাম্মাদ 'আবদুহু-এর আত্মজীবনীমূলক টিকাসম্বলিত, ২০-৫), ২খ, ১৩৪৪/১৯২৫ (রচনাবলী ও বিচিত্র প্রবন্ধসমূহের তালিকা), ৩খ, ১৩২৪/১৯০৬ (দাফনকালীন বক্তৃতা, মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন); (৩০) H. Laoust, Essai, ২৮১-৩৩৮, ৫৪২ প.; (৩১) আহ. আমীন, যু'আমা'উ'ল-ইসলাহ. ...; (৩২) J. Jomier, Le Comment : coran. du Mannar, প্রথম অধ্যায়। মুহ. 'আবদুহু-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন মাত্রায় আকর্ষণীয় প্রচুর রচনা ও গবেষণা বর্তমান, প্রায়শ ইহা কৈফিয়তমূলক [তু. (৩৩) 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ, 'আবকারিয়ুল-ইসলাহ ওয়া'ত-তা'লীমি'ল্-উসতাযি'ল-ইমাম মুহ. 'আবদুহু, কায়রো nd.]। মুহ. 'আবদুহু-এর জীবন, রচনাবলী ও চিন্তাধারা সম্পর্কে গ্রন্থাবলীর সার্বিক গ্রন্থপঞ্জী এখনো সংকলিত হয় নাই।

(ঘ) মুহাম্মাদ রাশীদ রিদা (১৮৬৫-১৯৩৫ খৃ.) ঃ (৩৪) Brockelmann, S III, ৩২১-৩; (৩৫) তাঁহার আল-মানার ওয়া'ল-আযহার-এ আত্মজীবনীমূলক টীকাসমূহ, ১২৯-২০০; (৩৬) শাকীব আরসলান, আস-সায়্যিদ আর. আর. আওইখা, আরবা'ঈনা সানাতানা, দামিশ্ক ১৩৫৬/১৯৩৭; (৩৭) H. Laoust, Essai. ..., ৫৫৭ প.; (৩৮) J. Jomier, Le comment. coran. du Manar, প্রথম অধ্যায়।

(ঙ) 'আবদু'ল-হামীদ ইবন বাদীস (১৮৮৯-১৯৪০ খৃ.) ঃ (৩৯) EI[2], s. v.; (৪০) A. Merad, Le Reformisme musulman en Algerie de 1925 a 1940, ৭৯-৮৬ এবং নির্ঘণ্ট; (৪১) ঐ লেখক, 'Ibn Badis, Commentateur du Coran, প্যারিস ১৯৭১ খৃ.। (চ) সাম্প্রতিক ইতিহাসে সংস্কারবাদী প্রবণতার ইতিহাসের সহিত যে সমস্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের চরিত্রের নাম এখনও পর্যন্ত সংযুক্ত আছে তাহাদের জন্য উপরে উল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ দ্রষ্টব্য।

(৪) মতবাদ সম্পর্কিত রচনাবলী ঃ এখানে শুধু প্রধান রচনাসমূহ তালিকাভুক্ত হইয়াছে। অবশিষ্টের জন্য মূল পাঠে অন্তর্ভুক্ত নির্দেশনাসমূহ দ্রষ্টব্য। (ক) (৪২) আফগানী এবং মুহ. 'আবদুহু, আল-'উরওয়াতু'ল-উছকা, বৈরূত ১৩২৮/১৯১০ (নব সংস্করণ, কায়রো ১৯৫৮ খৃ.); ফরাসী অনু. Marcel Colembe, Pages choisies de Dj. al-D. al-A. in Orient, ২১-২৪খ, (১৯৬২ খৃ.) এবং ২৫খ. (১৯৬৩)। (খ) (৪৩) আফগানী, হাকীকাত মাযহাব-ই নায়শারী ওয়া বায়ান-ই হাল-ই নায়মারিয়ান [সায়্যিদ আহমাদ খান (দ্র.)-এর বিরুদ্ধে নির্দেশিত, হায়দরাবাদ ১২৯৮/১৮৮০, লেখক কর্তৃক আরবী অনুবাদ, একই স্থান ও কাল]; (৪৪) মূল ফারসী পাঠের ভিত্তিতে মুহাম্মাদ 'আবদুহু-কৃত অপর একটি 'আরবী অনুবাদ ঃ রিসালাতু'র্-রাদ্দ 'আলা'দ-দাহরিয়্যীন, বৈরূত ১৩০৩/১৮৮৬), পরে কায়রো ১৩২১/১৯০৩ (ফরাসী অনু. 'আরবী অনুসরণ); (৪৫) A. M. Goichon, Refutation des Materialistes, প্যারিস ১৯৪৪ খৃ.; (৪৬) মূল ফারসী পাঠ অনুসরণে ইংরেজী অনুবাদ ঃ Nikki R. Keddie, An Islamic Reponse to Imperialism—Polit, & Relig. Writings of Sayyid J. al-D. 'al Afghani,' বার্কলে-লস এঞ্জেলস ১৯৬৮ খৃ.। (গ) (৪৭) 'আবদু'র-রাহমান আল-কাওয়াকিবী, উম্মু'ল-কুরা, কায়রো ১৮৯৯ খৃ., খণ্ডাকারে আল-মানার-এর ৫খ. (১৯০২ খৃ.), কায়রো ১৩৫০/১৯৩১, আলেপ্পো ১৯৫৯ খৃ. ঃ এই ক্ষুদ্র রচনাটিতে সংক্ষিপ্ত আকারে রাশীদ রিদা ও ইব্ন বাদীস-এর প্রদত্ত সকল প্রধান সংস্করণমূলক ভাবধারা সংকলিত হইয়াছে। (ঘ) (৪৮) ঐ, তাবা'ই'উ'ল-ইস্তিব্দাদ, কায়রো ১৩১৮/১৯০০, বর্ধিত পুনঃসংস্করণ, আলেপ্পো ১৯৫৭ খৃ.। সংস্কারবাদী চক্রে এই রচনাটির প্রভাব পূর্ব উল্লিখিতটির তুলনায় অনেক কম। (ঙ) (৪৯) মুহাম্মাদ 'আবদুহু, রিসালাতু'ত-তাওহীদ, কায়রো ১৩১৫/১৮৯৭, নূতন সংস্করণের রিদা্র টীকাসহ ("সৃষ্ট কুরআন" সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর পরিশুদ্ধি সহকারে), কায়রো ১৩২৬/১৯০৮। এই সংস্করণটিকে অর্ধশতাধিক বৎসর ব্যাপী চূড়ান্তরূপে বিবেচনা করা হইয়াছে (১৭মত পুনঃমুদ্রণ ১৩৭৯/১৯৬০); (৫০) মাহমূদ আবূ রায়্যান-কৃত একটি নূতন সংস্করণে গ্রন্থকার কর্তৃক পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিতরূপে মূল সংস্করণের গ্রন্থটি ব্যবহার করা হইয়াছে, মা'আরিফ, কায়রো, ১৯৬৬ খৃ.; (৫১) প্রথম সংস্করণের উপর ভিত্তি করিয়া ফরাসী অনুবাদ ঃ B. Michel and Moustapha Abdel Razik, Resalat al-Tawhid-Expose de la religion musulmane, প্যারিস ১৯২৫ খৃ.; (৫২) ইংরেজী অনু. (Ishak) Musa'ad এবং K. Cragg. The Theology of Unity, লণ্ডন ১৯৬৬ খৃ.। (চ) (৫৩) ঐ, হাশিয়া 'আলা শারহি দাওয়ানী লি'ল-'আকা'ইদি'ল-'আদুদিয়্যা, কায়রো ১২৯২/১৮৫৭; পুনঃসংস্করণ; (৫৪) In sulayman Dunya, আশ-শায়খ, ম. 'আ. বায়না'ল-ফালাসিফা ওয়া'ল-কালামিয়্যীন, কায়রো ১৩৭৭/১৯৫৮, ২ খণ্ড। ইহার ভূমিকায় (পৃ. ৬৪) সম্পাদক মুহ. 'আবদুহু-এর চিন্তাধারাকে বিশ্বাস ও যুক্তির সমস্যার প্রেক্ষাপটে স্থাপন করিয়া 'আবদুহুর 'অত্যধিক' যুক্তিবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। একই প্রকার অনুসৃত নীতি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য তাঁহার রিসালাতু'ল-ওয়ারিদাত (১২৯৪/১৮৭৭ সালে লিখিত), প্রথম সং., কায়রো ১২৯৯/১৮৮২। রাশীদ রিদা্র মতে গ্রন্থকার তাঁহার জীবনের শেষভাগে তাঁহার যৌবনকালে লিখিত রচনাবলীর একটি প্রধান অংশ পুনর্বিবেচনা করিয়াছিলেন (যাহা প্রধানত কালাম, সূফীবাদ ও ফালসাফা সম্পর্কিত)। (ছ) (৫৫) ঐ, আল-ইসলাম ওয়া'ন-নাস্রানিয়্যা মা'আ'ল-'ইল্ম ওয়া'ল-মাদানিয়্যা, কায়রো ১৩২০/১৯০২ (প্রত্যুত্তর ও আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক)। (জ) (৫৬) রাশীদ রিদা, তাফসীরু'ল-কুরআনি'ল-হাকীম, ১২ খণ্ড, কায়রো ১৩৪৬-৫৩/১৯২৭-৩৪ (এই বিবরণীটি সূরা ১২, আয়াত ৫২-তে সমাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং ইহা কুরআন-এর মাত্র দুই-পঞ্চমাংশ পাঠ সম্পূর্ণ করিয়াছে। (ঝ) (৫৭) ঐ, তা'রীখু'ল-উসতাযি'ল-ইমাম আশ-শায়খ মুহাম্মাদ 'আবদুহু (উপরে দ্রষ্টব্য, ৩গ)। (ঞ) (৫৮) ঐ, আল-খিলাফা আও আল-ইমামাতু'ল্-'উজমা, কায়রো ১৩৪১/১৯২২-৩ (ফরাসী অনু. H. Laoust, Le califat dans la doctrine de R. R., বৈরূত ১৯৩৮ খৃ.)। (ট) (৫৯) ঐ, আল-মানার ওয়া'ল-আয্হার, কায়রো ১৩৫৩/১৯৩৪ (আল-আযহার-এর রক্ষণশীল চক্রের সহিত বিতর্ক)। প্রচুর সংখ্যক পুস্তিকায় মানার হইতে সংগৃহীত প্রবন্ধসমূহকে একযোগে পেশ করা হইয়াছে। (ঠ) (৬০) আল-ওয়াহ্দাতু'ল-ইসলামিয়্যা ওয়া'ল-খুওয়াতু'দ-দীনিয়্যা, কায়রো ১৩৪৬/১৯২৮ (তাকলীদ ও ইজ্তিহাদ-এর ভাবধারা সম্পর্কে)। (দ) (৬১) 'আবদু'ল-হামীদ ইব্ন বাদীস, মাজালিসু'ত-তাযকীর মিন কালামি'ল্-খাবীর, M. B. Ibrahimi-এর ভূমিকাসহ অংশবিশেষ প্রকাশনা, Ahmed Bouchemal, কনস্ট্যানটিনোপল ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ৯৬; (৬২) সম্পূর্ণ কিন্তু সমালোচনাহীন সম্পাদিত সংস্করণ, মুহ. সালিহ্ রামাদান ও 'আবদুল্লাহ শাহীন-কৃত, কায়রো ১৩৮৪/১৯৬৪, পৃ. ৪৯৬। (ধ) (৬৩) মুবারাক আল-মীলী, রিসালাতু'শ-শিরক ওয়া মাজাহিরিহ, কনস্টানটাইন ১৩৫৬/১৯৩৭ (ওয়াহহাবী চিন্তাধারায় প্রবলভাবে প্রভাবিত একটি নীতিবাদী ধর্মতাত্ত্বিক রচনা)। (ন) (৬৪) ম. আল-বাশীর আল-ইবরাহীমী, 'উয়ুনু'ল-বাসাইর, কায়রো ১৯৬৩ খৃ. (আল-বাসা'ইর পত্রিকার সম্পাদকীয়সমূহ, আলজিয়ার্স ১৯৪৭-৫৬ খৃ., পূর্ণ সংস্কারবাদী ঐতিহ্যে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নাবলী। (ত) (৬৫) মাহমূদ শালতূত, আল-ইসলাম 'আকীদা ওয়া'শ্-শারী'আ, কায়রো n.d. (১৯৫৯ খৃ.)। (থ) (৬৬) প্রধান প্রধান সংস্কারমূলক পত্রিকা ও নাট্য ঃ আল-মানার (মাসিক, কায়রো ১৮৯৮-১৯৩৫ খৃ., সম্পা. রাশীদ রিদা); আল-ফাত্হ (সাপ্তাহিকী, কায়রো, ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত, সম্পা. মুহিব্বু'দ-দীন আল-খাতীব); মাজাল্লাতু'শ-শুব্বানি'ল-মুসলিমীন (মাসিক, কায়রো ১৯২৮ খৃ. প্রতিষ্ঠিত, Society of Young Muslim-এর মুখপত্র); আশ-শিহাব (কনস্টানটাইন ১৯২৫-৩৯ খৃ.; ১৯২৭ খৃ. হইতে মাসিক, সম্পা. ইব্ন বাদীস); আল-বাসা'ইর (সাপ্তাহিক, আলজিয়ার্স ১৯৩৬-৯ খৃ., সম্পা. তায়্যিব আল-'উকবী, নূতন সিরিজ, ১৯৪৭-৫৬ খৃ., সম্পা. বাশীর ইব্রাহীম)।

৫। বিশ্লেষণার্থক ও সমালোচনামূলক গ্রন্থসমূহ ঃ উপরে বর্ণিত মুহ ইকবাল, H. Laoust, H. A. R. Gibb, L. Gardet, J. Jomier1-এর নাম ছাড়া অন্যান্য নামের জন্য তু. (৬৭) I. Goldziher, Dic Richtungen der islamischen Kora-nauslegung, লাইডেন ১৯২০ খৃ., পুনঃপ্রকাশ ১৯৭০ খৃ.; (৬৮) আরবী অনু. 'আবদু'ল-হালীম আন-নাজ্জার মাযাহিবু'ত-তাফসীরি'ল-ইসলামী, কায়রো ১৩৭৪/১৯৫৫; (৬৯) রিসালাতু'ত-তাওহীদ-এর ফরাসী অনুবাদের ভূমিকা (পৃ. ৯-৮৫); (৭০) ওস্মান আমীন, মুহ. 'আবদুহ,

Essai sur ses idees philos. et relig., কায়রো ১৯৪৪ খৃ. (ইংরেজী অনু. Ch. Wendell, Muhammad 'Abduh, ওয়াশিংটন ১৯৫৩ খৃ.। তু. Fr. Rosenthal-এর দ্বারা এই অনুবাদটির পরিশুদ্ধিকৃত সংস্করণ, in JAOS, ৭৪খ., ১৯৫৪ খৃ., ১০১-২); (৭১) ঐ, রা'ইদু'ল-ফিকরি'ল-মিসরী, ম. 'আ., কায়রো ১৯৫৫ খৃ. (পূর্ববর্তী শিরোনামের পরিবর্ধিত সংস্করণ); (৭২) R. Caspar, Le Renouveau du Motazilisme, in MIDEO, ৪খ, (১৯৫৭ খৃ.), ১৪১-২০২ (অত্যন্ত বিস্তারিত গবেষণা, এই প্রশ্নে অত্যাবশ্যকীয় নির্দেশনা); (৭৩) P. Ronodot, L'Islam et les Musulmans d'aujourd'h'ui, প্যারিস, ১খ. (১৯৬৮ খৃ.), ২খ. (১৯৬০ খৃ.) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জনপ্রিয়করণের জন্য রচিত; (৭৪) J. Berque, J.-P. Charnay and others, Normes et valeurs de L'Islam contemporain, প্যারিস ১৯৬৬ খৃ. (২০) শতকের মুসলিম চিন্তাধারার সংস্কারবাদী স্রোত সম্পর্কে কতিপয় আকর্ষণীয় মন্তব্য)। (৭৫) M. Kerr, Islamic Reform (The Polit. & Legal Theories of M. 'Abduh and R. Rida), বার্কলে-লসএঞ্জেলস্ ১৯৬৬ খৃ. (সংস্কারবাদী চিন্তাধারার কতিপয় বৈপরীত্য চিহ্নিত করিয়াছে); (৭৬) A. Merad, Le Reformisme Musulman en Algerie de 1925 a 1940 (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২১১-৪৩২, মতবাদের পরীক্ষা); (৭৭) ঐ, Ibn Badis, Commentateur du Coran (শিহাব-এর কুরআনী পর্যালোচনার ভাবগত বিশ্লেষণ)।

৬। 'আরবীয় প্রেক্ষাপটে সংস্কারবাদের সমস্যা সম্পর্কে প্রায়শ ব্যবস্থা গ্রহণকারী সাময়িকীসমূহ ঃ L'Afrique et L'Asie; Cahiers de L'Orient Contemporain; IBLA; Islamic Culcute; JAOS; MIDEO : Orient, OM; the old Revue du Monde Musulman; the Revue des Etudes Islamicques and its Abstracta, ইত্যাদি।

A. Merad (E.I.[2])/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

২। ইরান

'আরব ভূমি অথবা উপমহাদেশের তুলনায় ইরান সুস্পষ্ট আধুনিকতার ছাপবাহী ইসলামী চিন্তাধারা ও প্রকাশনার পরিমাণ ও গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে অনেক কম। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, প্রভাব ও সাহিত্যিক সৃষ্টিকর্মে সায়্যিদ কুত্ব অথবা ড. মুহাম্মাদ ইকবাল (উভয় দ্র.)-এর সমকক্ষ কোন ব্যক্তির আবির্ভাব সেখানে ঘটে নাই। ইহার কারণরূপে দুইটি ব্যাখ্যা সম্ভব। প্রথমত, শী'ঈবাদের অনুসারী হিসাবে ইরান মুসলিম বিশ্বের অপরাপর অংশে সক্রিয় বুদ্ধিজীবী স্রোত হইতে তুলনামূলকভাবে সংযোগবিহীন অবস্থায় ছিল। দ্বিতীয়ত, শী'ঈবাদের নিজস্ব প্রকৃতিও ইহার জন্য দায়ী। ইহার মৌলিক গূঢ় রহস্যবাদী প্রকৃতির কারণে অন্যত্র সংস্কারবাদী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ঝড়-ঝাপটা হইতেও ইহা তুলনামূলকভাবে কম প্রভাবিত হইয়াছে। উপরন্তু ইরানে ঐতিহ্যবাদী শিক্ষা ও আচার-আচরণসমূহ অসাধারণভাবে সুসংরক্ষিত হইয়াছে। একই সঙ্গে, যখন অন্যত্র ইসলামী আধুনিকতার উত্থান হইয়াছে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 'উলামা'র যে দৃষ্টিভঙ্গী—উহার প্রতি অবিশেষজ্ঞসুলভ অধৈর্য এবং তাঁহাদের ব্যতিরেকেই ইহার নির্দেশ ও প্রচারণা কার্যকরী করার আকাঙ্ক্ষা হইত, তখনও ইরানী 'উলামা' ইহার বৈপরীত্যে উচ্চ সম্মান ও প্রভাব অর্জনে সমর্থ ছিলেন। তৎসত্ত্বেও ইরানে সংস্কারবাদী ধারার কতিপয় স্রোত পৌঁছায়। ইহার জন্য দায়ী প্রধানত পাশ্চাত্য প্রভাব এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও যৌক্তিকতার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে ইসলামের উপস্থাপনের প্রবণতা।

এই ধারার উৎপত্তির সন্ধান পাওয়া যায় ফাত্হ 'আলী শাহ (১৭৯৭-১৮৩৪ খৃ.)-এর রাজত্বকালে যখন যুবরাজ 'আব্বাস মীরযা পাশ্চাত্য উৎসের কতিপয় সামরিক সংস্কার প্রবর্তনের প্রচেষ্টায় কুরআনী অনুমোদন আহ্বান করেন। ইহার পর হইতেই সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারকে ধর্মীয় বিধান ও কর্তব্য হইতে উদ্ভূতরূপে বর্ণনা করা সংস্কারবাদী চিন্তাধারার জন্য অতি সাধারণ হইয়া দাঁড়ায়। তথাপি ইহা অতি সামান্য নিয়মানুগ ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং প্রায়শ এমন ব্যক্তিবর্গ দ্বারা প্রচারিত হয় যাহারা স্বয়ং যথেষ্ট পরিমাণে ধর্মীয় বিশ্বাসের অধিকারী ছিল না এবং সর্বোপরি ইহা ছিল পাশ্চাত্যকরণ ও সংস্কারের পক্ষে জনসমর্থন ও 'আলিমগণের আশীর্বাদ লাভের লক্ষ্যে কৌশলগত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পরিকল্পিত। এই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী ছিলেন পারস্য আরমেনীয় বংশোদ্ভূত মীরযা মালকুম খান (১৮৩৪-১৯০৮ খৃ.)। তাঁহার ব্যক্তিগত বক্তব্যের ভিত্তিতে (বিশেষত তাঁহার বন্ধু ও বিশ্বাসভাজন আখুন্দযাদার নিকট প্রদত্ত) মন্তব্য করা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন মুক্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি, তথাপি তিনি ইরানে ইসলামী সংস্কারবাদের ইতিহাসে অন্যতম ব্যক্তিত্বরূপে চিহ্নিত। কারণ তিনি তাঁহার বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলামের জন্য সংস্কারের গ্রহণযোগ্যতা এমনকি প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত প্রভাবশালী ও কার্যকররূপে বর্ণনা করেন। এই ভাবটি প্রকাশিত হয় কতিপয় প্রবন্ধের মাধ্যমে, বিশেষত কিতাবচা-য়ি গায়বী এবং সর্বোপরি লণ্ডন হইতে প্রকাশিত ১৮৯০ হইতে ১৮৯৮ খৃ. পর্যন্ত প্রখ্যাত সাময়িকী কানূন-এ।

সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার সহিত ধর্মীয় কর্তব্যকে চিহ্নিত করিতে আইনের প্রশ্নটি একটি সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা পালন করে। পুনর্জাগরিত রাষ্ট্রটির আইন কি হইবে ? শারী'আত ভিত্তিক না পাশ্চাত্য প্রভাবিত আইন ব্যবস্থা ? প্রশ্নটির সমাধান লাভ ঘটে—যদিও কেবল তাৎক্ষণিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তথাকথিত মৌলনীতিসমূহের ভাগাভাগির ভিত্তিতে উভয়ের মধ্যে সমতা আনয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধি বৃদ্ধির স্বার্থে সুশৃঙ্খল ও যথার্থভাবে সমাজের কাজ করিয়া যাওয়া। এই সমীকরণ যাহা মালকুম-এর সাময়িকীর শিরোনামের মধ্যেই অন্তর্নিহিত ছিল, তাহা পরবর্তী কালে আরও সুস্পষ্টভাবে (এবং সম্ভবত অধিকতর স্বীয় আস্থাপূর্ণ অবস্থান প্রকাশ করিয়া) মীরযা য়ূসুফ খান মুসতাশারু'দ-দাওলা কর্তৃক তাঁহার "য়াক কালিমা" (১৮৭০ খৃ.) (একটি শব্দ) নামক প্রবন্ধে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়। শিরোনামের উল্লিখিত "একটি শব্দ" হইতেছে আইন যাহা ইরানের সকল সমস্যার প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত সমাধান দিতে সমর্থ এবং এই আইন হইতেছে ফরাসী আইন ব্যবস্থার অনুরূপ যাহাকে মীরযা য়ূসুফ খান কুরআন ও হাদীছ হইতে উদ্ধৃত বক্তব্যের সাহায্যে ইসলামের সহিত সংগতিপূর্ণরূপে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি একই ভাবধারায় অপর একটি রচনা প্রণয়ন করেন। রূহ-ই-ইসলাম নামক এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, "আমি মহান কুরআন ও বিশ্বস্ত হাদীছ হইতে প্রগতি ও সভ্যতার জন্য সকল পদ্ধতির পক্ষে সাক্ষ্য— প্রমাণের সন্ধান লাভ করিয়াছি।

ইহার ফলে এখন হইতে কেহ আর বলিতে পারিবে না, 'অমুক অমুক বিষয় ইসলামের নীতি বহির্ভূত' অথবা 'ইসলামের নীতিসমূহ প্রগতি ও সভ্যতার জন্য বাধাস্বরূপ'।"

ইরানে সায়্যিদ জামালু'দ-দীন আসাদাবাদীর (আফগানী) (দ্র.) প্রভাবও একইভাবে পাশ্চাত্য সংস্কারের দিকে নির্দেশিত ছিল, যদিও তাঁহার চিন্তাধারার ধর্মীয় বিষয়বস্তু ও সুর মালকুম বা মীরযা য়ূসুফ খানের তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখন ইহা সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, তিনি ছিলেন জন্মগতভাবে ইরানী, অথচ তাঁহার নিজ জন্মভূমিতে তাঁহার প্রভাব ছিল নিশ্চিতভাবেই মুসলিম বিশ্বের অন্যত্র তাঁহার ভূমিকার তুলনায় অনেকাংশে কম। ধর্মের 'প্রতিরক্ষা'য় রচিত তাঁহার প্রধান রচনা 'হাকীকাত-ই মাযহাব-ই নায়চিরী' লিখিত এবং প্রথম প্রকাশিত হয় হায়দরাবাদে (১৮৮১ খৃ.), প্রধানত কতিপয় স্থানীয় ভারতীয় পরিস্থিতির প্রত্যুত্তরে এবং রচনাটির 'আরবী সংস্করণ 'আর-রাদ্দ 'আলা'দ-দাহরিয়্যীন' সম্ভবত ইহার ফারসী মূল হইতে অনেক বেশী পরিমাণে পঠিত হয়। তথাপি ১৮৮৬-৮৭ ও ১৮৮৯-৯১ সালে ইরানে তাঁহার দুইবার ভ্রমণকালে জামালু'দ-দীন প্রচুর সংখ্যক ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। তাঁহাদের উপর তিনি অত্যন্ত গভীর রেখাপাত করিতে সমর্থ হন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন শাসনতান্ত্রিক বিপ্লবের সক্রিয় সমর্থক অন্যতম প্রধান মুজতাহিদ সায়্যিদ মুহাম্মাদ তাবাতাবা'ঈ-এর পিতা সায়্যিদ সাদিক তাবাতাবাঈ এবং প্রখ্যাত শাসনতান্ত্রিক প্রচারক মীরযা নাসরুল্লাহ ইসফাহানী মালিকুল-মুতাকাল্লিমীন। তেহ্রানের দক্ষিণে ১৮৯০ খৃ. শাহ 'আবদু'ল-'আজীম-এর সমাধি সৌধে আত্মগোপন করা অবস্থায় তিনি বহু সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসেন এবং সামগ্রিকভাবে ইহা ধারণা করা যায় যে, তিনি ইরানে সংস্কারবাদী স্রোতধারাকে শক্তিশালী করিয়াছেন, যদিও তাহা তাঁহার মরণোত্তরকালে সৃষ্ট কিংবদন্তীর দাবির তুলনায় কিছু পরিমাণে ক্ষীণতর ছিল।

সায়্যিদ জামালু'দ-দীনের প্রভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট ভাবধারাসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল প্যান-ইসলামীবাদ (দ্র.), যাহা শী'ঈবাদ সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও ইরানে ইসলামী আধুনিকতাবাদের আন্দোলনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ইহা অনুভূত হইয়াছিল যে, ইরান এবং 'উছমানী সাম্রাজ উভয়ই পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের হস্তে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার বিপদের প্রতি উন্মুক্ত এবং তাই খলীফা না হইলেও 'উছমানী সুলতানের অধীনে একটি ইউনিয়ন সংযুক্ত রাষ্ট্র গঠন প্রত্যাশিত পরিমাণ প্রতিরক্ষা প্রদান করিতে পারে। ১৮৯২ খৃ. ইস্তাম্বুলে অবস্থানকালে সায়্যিদ জামালু'দ-দীন এই ভাবধারাটি শক্তিশালী করার মানসে প্রচার করিবার জন্য নির্বাসিত ইরানীগণকে লইয়া একটি চক্র গঠন করেন—আশ্চর্যজনক হইতেছে যে, ইহাদের অধিকাংশ ছিল আযারীয়। ইরান এবং 'ইরাকের পবিত্র শহরসমূহের শী'ঈ 'উলামা'র নিকট পত্র প্রেরণ করা হয় যাহার প্রতি ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়। ইস্তাম্বুল ও শী'ঈ 'উলামা'র মধ্যে সংযোগ জামালু'দ-দীনের মৃত্যুর পরও টিকিয়া থাকে এবং কতিপয় বৎসর বিশেষত ১৯০০-১৯০৩ খৃ. পর্যন্ত ইরানের ঘটনাবলীতে ইহা কতক পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পারস্যে প্যান-ইসলামীবাদের একমাত্র উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হইতেছে কাজার-এর শাহযাদা মীরযা আবু'ল-কাসিম শায়খু'র-রাঈস-এর রচিত "ইত্তিহাদ-ই ইসলাম" নামক একটি পুস্তিকা (বোম্বাইতে প্রকাশিত, ১৮৯৪ খৃ.)।

সাম্প্রতিক বৎসরসমূহে ইসলামী সংহতির প্রতি অভিলাষ ইরানের নূতন অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য ইহার লক্ষ্য রাজনৈতিক সংযুক্তি বা ফেডারেশন গঠন নয়, বরং সুন্নী-শী'ঈ সৌহার্দের প্রতিষ্ঠা।

লক্ষ্য ও ভাবধারার প্রধানত ধর্মীয় নয় এমন কতিপয় গ্রন্থে অস্পষ্টভাবে কতিপয় আধুনিক ভাবধারা, বিশেষত সামাজিক ও শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের ধর্মীয় কাম্যতা এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা গ্রহণের কর্তব্য সম্পর্কে আভাস দান করা হইয়াছে ঃ আযারবায়জানী তা'লিবভ-এর কিতাব-ই আহমাদ (১৮৯৬ খৃ.) এবং মাসালিক-ই মুহসিনীন (১৯০৫ খৃ.) এবং তাঁহার সমসাময়িক যায়নু'ল-'আবিদীন মারাগা'ই-এর সিয়াহাতনামা-য়ি ইব্রাহীম বেগ (৩ খণ্ড, ১৯০৩-১৯০৯ খৃ.)।

এই পর্যন্ত বর্ণিত কোন রচনা বা প্রবণতাই 'উলামা'র নিকট হইতে উদ্ভূত হয় নাই, যদিও ইহারা তাহাদের কোন কোন ব্যক্তিত্ব দ্বারা বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত হইতে পারেন। শাসনতান্ত্রিক বিপ্লবকালীন (১৯০৫-১৯১১ খৃ.) বৎসরগুলির আগে পর্যন্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের প্রশ্নে আমরা এমন কোন সুসংহত ও জোরালো বক্তব্য দেখিতে পাই না যাহা যথার্থ উদ্বিগ্নতার দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় প্রকাশিত হইয়া 'উলামা' শ্রেণী দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। আলোচ্য রচনাটি শী'ঈ ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে শাসনতান্ত্রিক সরকার সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ। ইহার শিরোনাম 'তানবীহু'ল-উম্মাহ ওয়া তানবীহু'ল-মিল্লাত দার আসাস ওয়া উসূল-ই মাশ্রূতিয়্যাত' (প্রথম প্রকাশ ১৯০৯ খৃ., সায়্যিদ মাহমূদ তালাকানী-এর ভূমিকাসহ ১৯৫৫ খৃ. পুনর্মুদ্রিত)। ইহার প্রণেতা ছিলেন নাজাফ-এর বাসিন্দা ও একজন মুজতাহিদ শায়খ মুহাম্মাদ হুসায়ন না'ঈনী (১৮৬০-১৯৩৬ খৃ.)। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত মীরযা হাসান শীরাযীর ছাত্র, যাঁহার ফাতওয়া অত্যন্ত কার্যকরভাবে ১৯৯১-৯২ সালের তামাক বর্জন আন্দোলন সফল করিয়াছিল, তাঁহার সহিত সুবিখ্যাত নিয়মতন্ত্রবাদী মনীষী মুল্লা কাজিম খুরাসানী ও মুল্লা 'আবদুল্লাহ মাযানদারানীর গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। শাসনতান্ত্রিক বিপ্লবে ইরানী 'উলামা' গোষ্ঠীর প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশের ব্যাপক অংশগ্রহণকে প্রায়শ পরিস্থিতি চাপ ও বিভ্রান্তির ফলরূপে গণ্য করা হয়। রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রতি 'উলামা'র ঐতিহ্যগত বিরোধিতার ফলেই তাঁহারা সমর্থন দান করেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ নূতন দিগন্ত তাঁহারা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন নাই। না'ঈনীর পুস্তকটিতে কুরআন ও সুন্নাহর উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের প্রতি তাঁহাদের সমর্থনের ইতিবাচক মতবাদ সংক্রান্ত কারণসমূহ বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি রাষ্ট্রের কার্যক্রমকে বর্ণনা করিয়াছেন সমাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষক একটি প্রতিষ্ঠান ও বহির্দেশীয় আক্রমণ হইতে ইহার প্রতিরক্ষকরূপে। রাষ্ট্রের উপভোগ্য ক্ষমতা কেবল এই কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে; ইহার অতিরিক্ত ক্ষমতা অবশ্যম্ভাবীরূপে স্বেচ্ছাচারিতা সৃষ্টি করে যাহা আবার শাসকবর্গকে সার্বভৌমত্বের পবিত্র দিকসমূহ লংঘন করিতে প্রলুব্ধ করে এবং এইরূপে সংঘটিত হয় শিরক-এর ন্যায় মহাপাপ। এই প্রকার বিকৃতি সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ সম্ভব কেবল শাসকের 'ইসমার মাধ্যমে (ভ্রান্তি ও পাপ হইতে তাঁহার মুক্ত থাকা) এবং এই কারণে ইমামগণের জীবদ্দশায় বৈধ ক্ষমতার অধিকার ছিল তাঁহাদের। দ্বাদশ ইমাম-এর অন্তর্ধানের পর বৈধতা পার্থিব জগত হইতে অপসারিত হইয়াছে এবং বর্তমান শাসকবর্গের মধ্যে কতক পরিমাণে বল প্রয়োগকারী মনোভাব পরিলক্ষিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

তথাপি এই পরিমাণকে সর্বনিম্ন অবস্থানে আনয়নের প্রচেষ্টা সম্ভব এবং কাম্য। ইহা সম্ভব শাসক ব্যক্তির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার ও কুরআনে প্রকাশিত উপদেশমূলক নীতিসমূহের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি প্রতিনিধি পরিষদ (মাজলিস্) গঠনের মাধ্যমে। এই প্রকার একটি পরিষদ, ইতিমধ্যে শারী'আ দ্বারা পূর্ণ ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই কেবল সেই সকল বিষয়ের ব্যাপারে আইন পরিষদরূপে কাজ করিতে পারে অথবা সার্বিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা আইনসিদ্ধরূপে বিবেচিত বিষয়সমূহকে বাস্তবায়িত করিতে পারে। এই পরিষদের কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে একটি সংবিধানের মাধ্যমে এবং এই সংবিধান একটি সম্পূর্ণ নূতন শাসনতন্ত্ররূপে কোন না কোনভাবে শারী'আতের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে এইরূপ কোন আপত্তি হইতেছে অজ্ঞতাপ্রসূত ও স্বার্থপ্রণোদিত। পরিষদের নিকট সীমাবদ্ধ আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণের ফলে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ আইনের একটি দ্বৈততা সৃষ্টি হয়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ আইনের নির্দোষিতা নিশ্চিত করার জন্য মাজলিসে কতিপয় সংখ্যক মুজতাহিদ উপস্থিত থাকিবেন এবং সর্বোপরি মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার সকল বিধিবদ্ধতা অনুযায়ী জীবনের সকল দিকে ইহার নিখুঁত ও সফল বাস্তবায়ন সম্ভবপর হইবে শুধু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইমামগণের উপস্থিতির মাধ্যমে। শী'ঈ মতে শাসনতান্ত্রিক শাসনের কাম্যতা প্রসঙ্গে না'ঈনীর বক্তব্য, কয়েক দশক পরে রাজনৈতিক জীবনে কর্তৃত্বের উৎসরূপে 'উলামা' কিভাবে কুরআন ও শাসনতন্ত্র উভয়কে নির্দেশকরূপে ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন শুধু তাহাই বর্ণনা করে না, একই সঙ্গে সাধারণ রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে তাঁহারা কিভাবে ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সহিত মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহারও বর্ণনা করিয়াছে।

ইসলামী মতে আধুনিকতাপন্থী চিন্তাধারা ও প্রকাশনা রিদা শাহ (১৯২৬-১৯৪১ খৃ.)-এর সম্পূর্ণ শাসনামলে পরিপূর্ণভাবে সুপ্ত থাকে। তাঁহার উদ্যোগে ধর্মনিরপেক্ষতাপন্থী ও ইসলাম বিরোধী প্রবণতাপূর্ণ একটি জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ লালিত হইতে থাকে। অবশ্য ইহার তীব্রতা প্রতিবেশী তুরস্কের ন্যায় ততটা শক্তিশালী ছিল না। তাঁহার উৎখাতের পর এবং মুহাম্মাদ রিদা শাহ-এর সিংহাসনে আরোহণের পর কিছু পরিমাণে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হয় যাহার সুযোগ গ্রহণ করে বিভিন্ন ধর্মীয় চক্র এবং যদিও তাহার পর হইতে সংযমহীন মত প্রকাশের সম্ভাবনা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। যুদ্ধ পরবর্তী যুগে ইরানে ইসলামী আধুনিকতাবাদ ক্রমাগতই উন্নতি লাভ করিয়াছে, বিশেষত গত দশকের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ধর্মীয় সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যাহার চিন্তাধারার সুর অত্যন্ত আধুনিক এবং যাহা আর্থ-সামাজিক সমস্যা, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষিত যুবকগণের জন্য ইসলামকে একটি সহজবোধ্যরূপে পুনঃপ্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

মুহাম্মাদ রিদা শাহ-এর সিংহাসনে আরোহণ এবং জুলাই ১৯৫৩ খৃ. প্রধান মন্ত্রী মুহাম্মাদ মুসাদ্দিক-এর উৎখাতের মধ্যবর্তী সময়কালে সরকারী ঘটনাবলীতে একটি প্রকাশ্য মাত্রারূপে ইসলামের পুনঃঅভ্যুদয় একটি অত্যন্ত চরমপন্থী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছিল। যাহার পশ্চাতে সার্বিকভাবে তেমন কোন বুদ্ধিজীবী অথবা সাহিত্যিক কার্যকলাপ জড়িত ছিল না। এই মন্তব্যটি নাওয়াব সাফাবীর নেতৃত্বের অধীনে ফিদাইয়্যান-ই ইসলাম (দ্র.)-এর সংগঠন এবং আয়াতুল্লাহ আবুল কাসিম কাশানীর ব্যক্তিত্ব উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য। ফিদা'ইয়্যানগণ কখনওই ইসলামী ধারামতে সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনকে পুনঃসজ্জিত করার লক্ষ্যে কোন ঐকান্তিক কার্যক্রম অথবা সঙ্গতিপূর্ণ একটি মতাদর্শ বিকশিত করিতে পারে নাই। তাহাদের মুখপত্র যিলযিলা-তে প্রধানত তাৎক্ষণিক গুরুত্বের সাম্প্রতিক প্রশ্নাবলী সম্পর্কে পর্যালোচনা প্রকাশিত হইত, অথচ অধিকতর স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী সমস্যাসমূহকে কেবল খণ্ডকালীন গুরুত্ব দেওয়া হইত। কাশানী যদিও অস্থায়ীভাবে ফিদা'ইয়্যান-এর সহিত সহযোগিতা করেন, বস্তুতপক্ষে তিনি ছিলেন উক্ত শতাব্দীর প্রথম অংশের নিয়মতান্ত্রিক মুজতাহিদগণের ঐতিহ্যবাহী প্রতিনিধি। তিনি ছিলেন প্রকৃতই নাজাফ-এ মুল্লা কাজিম খুরাসানীর একজন অগ্রণী শিষ্য। তাঁহার বক্তৃতা ও পত্রসমূহের মাধ্যমে কাশানী এই পূর্বসূরী 'উলামা'র চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটাইয়াছেন। না'ঈনী-এর ন্যায় তাঁহারাও কুরআন ও শাসনতন্ত্রকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দ্বৈত উৎসরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য অত্যন্ত কর্কশ তার্কিক শ্লেষযুক্ত যাহা তাঁহাদের যুগের চরম উত্তেজনার প্রতিফলন ঘটায়।

এই সময়কালে ইরানের ধর্মীয় জীবনে সর্বপ্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন আয়াতুল্লাহ হুসায়ন বুরূজিরদী (১৮৭৫-১৯৬২ খৃ.), কাশানী নন। প্রথমোক্ত জন যদিও তাঁহার রাজনৈতিক মনোভাবের দিক হইতে ছিলেন শান্ত প্রকৃতির, সময় সময় এমনকি আনুগত্যপন্থী, তথাপি ইহা সর্বজন স্বীকৃত ছিল যে, ধার্মিকতা ও বিদ্যায় তিনি কাশানীকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভাবধারা অনুযায়ী বুরূজিরদীকে আধুনিকতাপন্থীরূপে গণ্য করা চলে না। কারণ তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যায় নিজেকে উল্লেখযোগ্যরূপে কখনওই সংশ্লিষ্ট করেন নাই। তথাপি ইছনা 'আশারী শী'ঈ সম্প্রদায়ের একমাত্র মারজা'-ই তাকলীদ (দ্র.)-রূপে তাঁহার দেড় দশকব্যাপী কার্যকালে তিনি ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে নবায়ন ও আত্মসমালোচনার একটি প্রক্রিয়া প্রবর্তন করেন। ইহা তাঁহার মৃত্যুর পর গতি সঞ্চার করে এবং ইরানে ধর্মীয় চিন্তাধারা ও উদ্বিগ্নতার সমসাময়িক প্লাবনে বিস্তারিতভাবে অবদান রাখিতে সক্ষম হয়। বুরূজিরদী একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন যাহা কুম্ম হইতে প্রসারিত হইয়া দেশের সকল এলাকায় পৌঁছাইতে সক্ষম হয়। ইহার লক্ষ্য ছিল 'সাহ্‌ম-ই ইমাম'-এর সংগ্রহ নিয়মিত করা। পরবর্তীতে ব্যবস্থাটি ধর্মীয় নির্দেশ ও উপদেশ প্রচার ও প্রসারকার্যে অত্যন্ত সহায়করূপে প্রমাণিত হয়। অবিমিশ্র পাণ্ডিত্যপূর্ণ কার্যাবলীর ক্ষেত্রে তিনি হাদীছের স্বতন্ত্র পাঠ ও গবেষণার পুনঃপ্রচলন করেন এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসান আল-হুর্‌র আল-'আমুলীর মৌলবাদী শী'ঈ সারগ্রন্থ 'ওয়াসা'ইলু'শ-শী'আ ইলা তাহকীক মাসা'ইলি'শ-শারী'আ'-এর সমালোচনামূলক সংশোধনের প্রেরণা দান করেন। তিনি সুন্নী-শী'ঈ পুনর্মিলনের ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেন এবং এই লক্ষ্যে তিনি আল-আযহার-এর কতিপয় রেকটরের সহিত পত্রালাপ শুরু করেন। তাঁহাদের সহযোগিতায় কুম্ম-এ একটি শাখাসহ কায়রোতে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। দারু'ত-তাকরীব বায়না'ল মাযাহিবি'ল-ইসলামিয়্যা নামক এই প্রতিষ্ঠানটি রিসালাতু'ল-ইসলাম নামক একটি মুখপত্র প্রকাশ করিত। বুরূজিরদীর এই উদ্যোগ তাঁহার মৃত্যুর পরও টিকিয়াছিল এবং যদিও তেহরান ও কায়রোর মধ্যে কতিপয় বৎসরব্যাপী কূটনৈতিক সম্পর্কের অনুপস্থিতিতে আযহার-এর সহিত সংযোগ রক্ষা করা অসুবিধাজনক হইয়া দাঁড়ায়। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে এই বাধা অপসারিত হয় এবং আযহার-এর রেকটর মুহাম্মাদ

আল-ফাহ্হাম ১৯৭১-এর গ্রীষ্মকালে ইরানে এক বিস্তৃত সফরে আগমন করেন। এই সফরকালে তিনি কতিপয় প্রখ্যাত মুজতাহিদ, তন্মধ্যে মাশহাদে আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ হাদী মীলানীর সহিত সাক্ষাত করেন। বুরূজিরদীর অপর একটি প্রবর্তন যাহা ক্রমাগত ফল প্রদান করিয়া আসিয়াছে তাহা হইতেছে, বিদেশে বসবাসকারী ইরানীগণের প্রয়োজন মিটাইতে এবং আগ্রহী য়ুরোপীয়গণের মধ্যে শী'ঈ ইসলামের প্রসার ঘটানোর জন্য পশ্চিম য়ুরোপে শী'ঈ দূত প্রেরণ।

বুরূজিরদীর মৃত্যুতে শী'ঈ সমাজ তাহাদের একমাত্র মারজা'কে হারায় এবং নেতৃত্ব ও নির্দেশনার সমস্যাটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ইহা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে অনুভূত হইতে থাকে যে, ঐতিহ্যগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞানে প্রাধান্য ও উৎকর্ষের দ্বারা যোগ্যতা অর্জনকারী এক বা একাধিক মুজতাহিদ পথ প্রদর্শনের উৎসরূপে আত্মপ্রকাশ করেন তাহা ত্রুটিপূর্ণ এবং সমাজের প্রকৃত প্রয়োজনসমূহের সমাধান দানে অসমর্থ। গভীর সম্মান উপভোগ করা সত্ত্বেও বুরূজিরদী মুসাদ্দিক-এর আমলে ইরানকে প্রকম্পিতকারী ঘটনাপ্রবাহের সময় কর্তৃত্বপূর্ণ নেতৃত্ব প্রদানে তাঁহার ব্যর্থতাকে একটি ত্রুটিরূপে অনুভব করা হয় যাহা হইতে তাঁহার উত্তরসুরিগণকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত হইতে হইবে। উপরন্তু ইহা অনুভূত হয় যে, কেবল ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় বিষয়সমূহের উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ দখল এখন আর সমাজের কার্যকরী দিকনির্দেশনা দানে এবং সমসাময়িক সমস্যাসমূহের প্রতি ইসলামী সমাধান প্রয়োগের জন্য যথেষ্ট ও কার্যকর প্রশিক্ষণ নয়। অপরদিকে এই কার্যের জন্য আপাতদৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শাখায় বিশেষ জ্ঞান অর্জন স্পষ্টতই কোন বিশেষ একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ইহা হইতে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, একটি যৌথ মারজা' কাম্য। এই ধরনের বহু বিবেচনা প্রস্তাবিত সমাধানের অস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদর্শনসহ বাহ্ছী দার বারায়ি মারজাইয়্যাত ওয়া রূহানিয়াত নামক একটি সংগ্রহ পুস্তক ১৯৬৩ খৃ. প্রথমে প্রকাশিত হয়, যাহা সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুসহ পরবর্তী কালে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। সাতজন গ্রন্থকারের রচনাবলী সংকলিত এই পুস্তকটি সম্ভবত শাসনতান্ত্রিক সরকারসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে না'ঈনীর রচনার পর পারস্যে প্রকাশিত সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী একক ধর্মীয় রচনা সংগ্রহ। ইহার সাতজন গ্রন্থকারের মধ্যে ছিলেন 'উলামা' এবং সাধারণ গ্রন্থকার। উপসংহারে ইহা কতিপয় মৌল ধারণা, যথা তাকলীদ, ইজ্তিহাদ ও বিলায়াত (সায়্যিদ মুহাম্মাদ হুসায়ন তাবাতাবা'ঈ ও মুরতাদা মুতাহ্হারী দ্বারা আলোচিত) সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করিয়াছে এবং সার্বিকভাবে ধর্মীয় শ্রেণীসমূহও নির্দিষ্টভাবে মারজা'-এর প্রকৃত সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছে (মাহ্দী বাযারগান ও সায়্যিদ মুহাম্মাদ বেহেশতী কর্তৃক আলোচিত)। সম্ভবত ইহার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ হইতেছে সেইগুলি যেইগুলিতে মুতাহ্হারী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে একটি স্বতন্ত্র আর্থিক ব্যবস্থা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করিয়াছেন, যদ্দারা ইহা জনগণ অথবা রাষ্ট্র উভয়ের প্রতি বশ্যতার অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে পারে এবং যে স্থানে বাযারগান ও সায়্যিদ মুরতাদা জাযা'ইরী ব্যক্তিবিশেষের পরিবর্তে একটি যৌথ মারজা' (শেষোক্ত জন দ্বারা শাওরা-য়ি ফাত্ওয়া নামে অভিহিত) গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন।

বর্তমান কালে শী'ঈবাদ-এর জন্য বৈশিষ্ট্যমূলক সমস্যাসমূহের এইরূপ আলোচনা ছাড়াও যুদ্ধ পরবর্তী ইরানের ধর্মীয় দৃশ্যপটে ইসলামী বিশ্বের অন্যত্র প্রকাশিত আধুনিকতাপন্থী রচনাবলীকে ফারসীতে অনুবাদ করার প্রবণতা দৃষ্টিগোচর হয়। যেই সমস্ত গ্রন্থকারের রচনাবলী প্রায়শ অনূদিত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম হইতেছেন সায়্যিদ কুতব, মুহাম্মাদ কুতব, য়ূসুফ আল-কারদাবী এবং ইখওয়ানু'ল-মুসলিমূন (দ্র.)-এর সহিত জড়িত ব্যক্তিবর্গ এবং জামা'আতে ইসলামীর নেতা মাওলানা সায়্যিদ আবু'ল-আ'লা মাওদূদী। অনূদিত রচনাবলীর মধ্যে তুলনামূলকভাবে অধিকতর প্রভাবশালীরূপে সায়্যিদ কুতবের আল-'আদালাতু'ল-ইজমিতা'ঈয়্যা ফি'ল-ইসলাম গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে অনুবাদসমূহে সময় সময় পাদটীকার মাধ্যমে শী'ঈ মতামতের বিভিন্নতা নির্দেশ করা হইয়াছে।

বর্তমান ইরানে মৌলিক আধুনিক সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও সৃজনশীল লেখক হইতেছেন মাহ্দী বাযারগান। ইতিমধ্যে উল্লিখিত যৌথ রচনাকর্মটির ইনিও অন্যতম প্রণেতা। তাঁহার রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য হইতেছে, কতিপয় সুন্নী আধুনিকতাপন্থী দ্বারা তাহার উপর সুস্পষ্ট প্রভাব, বৈজ্ঞানিক ঘটনা ও ধর্মীয় তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদর্শনের প্রতি উদ্বিগ্নতা এবং একটি সাবলীল ও প্রত্যয় উৎপাদনকারী রচনাশৈলী। তাঁহার রচিত প্রথম গ্রন্থ 'মুতাহ্হিরাত দার ইসলাম' (১৯৪৩ খৃ.; পরবর্তী কালে পুনর্মুদ্রিত); ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পবিত্রতার প্রতি ইসলামী বিধানের মধ্যে অন্তর্নিহিত জৈবিক ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারিকতার বিস্তারিত বিবরণী। আজ পর্যন্ত লিখিত তাঁহার পরবর্তী কালের প্রায় বিশটি রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ঃ "মানুষের তাপ-গতিবিদ্যা" নামক উপ-শিরোনামের রচনা 'ইশ্ক ওয়া পারাসতিশ (১৯৬৩ খৃ.); 'ইবাদাতের মনস্তাত্ত্বিক উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনামূলক দু'আ' (১৯৬৪ খৃ.) এবং আধুনিক বিশ্বে সমাজ ও মানুষের জন্য ধর্মের সার্বক্ষণিক ও সর্বকালীন প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপকারী 'দার্স-ই দীনদারী' (১৯৬৫ খৃ.)। বাযারগান একই সঙ্গে রাজনীতির সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন নিষিদ্ধ ঘোষিত বিরোধী ন্যাশনাল ফ্রন্টের ধর্মীয় ভাবানুসারী অঙ্গ প্রতিষ্ঠান নিদহাত-ই আযাদী-এর পশ্চাতে সক্রিয় অনুপ্রেরণা দানকারিগণের অন্যতম। এই উদ্যোগে তাঁহার সহযোগিগণের একজন হইতেছেন সায়্যিদ মাহমূদ তালিকানী। ইনি কতিপয় রচনার প্রণেতা, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হইতেছে জিহাদ ওয়া শাহাদাত (১৯৬৫ খৃ.)।

বাযারগান ও তালাকানীর প্রায় সকল রচনা শিরকাত-ই ইনতিশার নামে পরিচিত তেহ্রান-এর একটি প্রকাশনালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটি এখনও ক্রমবর্ধমান হারে আধুনিকতাবাদী ধর্মীয় সাহিত্য প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ইহাদের কতিপয় গ্রন্থের উল্লেখ করা যায় ঃ 'আলী গাফফারীর ইসলাম ও ইসলামীয়া-য়ি জাহানী-য়ি হুকূক-ই বাশার (১৯৬৪ খৃ.), যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে কিভাবে ইসলামই সর্বপ্রথম সার্বজনীন মানবাধিকারের ধারণার জন্ম দেয়। মুহাম্মাদ তাকী শারী'আতীর তাফ্সীর-ই নুভীন (১৯৬৭ খৃ.) অত্যন্ত যুক্তিশীল মানসিকতার সহিত লিখিত কুরআন-এর শেষ 'জুয' সম্পর্কে একটি ভাষ্য এবং ইসলামের বিশ্বজনীন ও ভ্রাতৃপ্রতিম রূপের উপস্থাপনমূলক রচনা, মুহাম্মাদ মুজ্তাহিদ শাবিস্তারীর জামি'আ-য়ি ইনসানী-য়ি ইসলাম (১৯৬৯ খৃ.)।

ইহা ভিন্ন উল্লেখযোগ্য অপর কতিপয় শ্রেণীর ধর্মীয় সাহিত্য বর্তমান। ইহার একটি হইতেছে জনপ্রিয় ধর্মীয় জীবনীসমূহ; ইহার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন যায়নু'ল-'আবিদীন রাহনুমা। তাঁহার অত্যন্ত সফল রাসূলের জীবনী

'পায়ামবার' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খৃ.। তখন হইতে ইহা এই পর্যন্ত বহু সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত এবং ফরাসী ভাষায় (প্যারিস ১৯৫৭ খৃ.) অনূদিত হইয়াছে। রাহনুমা-র রচনার বৈশিষ্ট্য হইতেছে সুদক্ষ বর্ণনামূলক কৌশল ও উদ্ভাবিত বাক্যালাপের অবাধ ব্যবহার। দুই খণ্ডে প্রকাশিত যিনদাগানী-য়ি ইমাম হুসায়ন-ও (নূতন সংস্করণ ১৯৬৬ খৃ.) একই প্রকার জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই শ্রেণীতে অপর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হইতেছে C. V. Gheorghiu-এর ফরাসী ভাষায় লিখিত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনীর, মুহাম্মাদ ঃ পায়গামবারী কি আয নাও বায়াদ শিনাখ্ত (১৯৬৪ খৃ.) শিরোনামবিশিষ্ট ফারসী অনুবাদ।

সমসাময়িক ধর্মীয় রচনাবলীর অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ হইতেছে তর্কমূলক রচনাসমূহ। শী'ঈ-সুন্নী পুনর্মিলনের জন্য নির্দেশিত আন্দোলনের প্রতি অংশত বিরোধিতামূলক এবং অংশত আনুষঙ্গিকরূপে, শী'আ-এর অনুপম সত্তার গুরুত্ববাহী কতিপয় রচনা লিখিত হইয়াছে। সম্ভবত এই শ্রেণীতে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাটি হইতেছে সায়্যিদ মুহাম্মাদ হুসায়ন তাবাতাবা'ঈ-এর 'শী'আ দার ইসলাম' (১৯৬৯ খৃ.)। খুম্ম সাধারণ তাহবিল হইতে প্রকাশিত মহানবী (সা)-এর উত্তরাধিকারীরূপে 'আলী (রা)-এর তথাকথিত নিয়োগ সম্পর্কে 'আরবীতে লিখিত সুবিশাল রচনা, শায়খ 'আবদু'ল-হুসায়ন আমীনী-র আল-গাদীর অংশবিশেষ ফারসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। একই বিষয়ে একটি অধিকতর জনপ্রিয় সংস্করণ হইতেছে যৌথভাবে কিন্তু অজ্ঞাত পরিচয় লেখকগণের প্রণীত রচনাকর্ম হাস্‌সাসতারীন ফারায-ই তারীখ য়া দাসতান-ই গাদীর (১৯৯৬ খৃ.)। অপরাপর রচনার লক্ষ্য হইতেছে, চরমপন্থী মোল্লা বিরোধী আহমাদ কাসরাভী-র বহুলভাবে পুনর্মুদ্রিত শী'আগারী নামক রচনায় শী'ঈ ইসলামের প্রতি বর্ষিত আক্রমণ খণ্ডন করা। এই শ্রেণীতে উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহের অন্যতম হইতেছে হাজ সিরাজ আনসারী-র শী'আ চেমীগূয়াদ (তৃতীয় সং. ১৯৬৬ খৃ.) এবং মুহাম্মাদ তাকী শারী'আতীর ফা'ইদা ওয়া লুযূম-ই দীন (১৯৬৫ খৃ.)। শেষত, প্রধানত পুস্তিকা আকারে বাহাঈপন্থীগণের বিরুদ্ধে লিখিত একটি বিস্তৃত প্রকাশনা বর্তমান।

মুদ্রিত পাঠের অতিরিক্তরূপে, বিশেষভাবে মসজিদে উপস্থিতির ক্রমহ্রাসমান অবস্থার বর্তমান যুগে ধর্মীয় বিষয়ের উপর বক্তৃতাসমূহের প্রচার সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাধারা বিস্তারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে। অত্যন্ত বিখ্যাত এই শ্রেণীর প্রচারকগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুহাম্মাদ তাকী ফালসাফী এবং হুসায়ন রাশিদ। ইঁহাদের বক্তৃতার বিষয়বস্তুসমূহ সংগৃহীত করিয়া পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হইয়াছে।

যুদ্ধ-পরবর্তী কালের অপর একটি প্রবর্তন হইতেছে সমিতি ও সংস্থা গঠন যাহা তাবলীগে নিবেদিত অর্থাৎ মুদ্রিত ও বক্তৃতার মাধ্যমে বিশ্বাসের প্রসার ঘটান। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে ১৯৪৩ সালে ডঃ 'আতা'উল্লাহ শিবাহ্পুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আনজুমান-ই তাবলীগাত-ই ইসলামী। বিভিন্ন প্রাদেশিক শহরে শাখাসহ এই প্রতিষ্ঠানের সদর দফতর ছিল তেহরানে। ধর্মের মৌল বিষয়সমূহ সম্পর্কে ইহা কতিপয় পুস্তিকা প্রকাশ করে। ইহা ব্যতীত নূর-ই দানিশ নামে একটি পত্রিকা ও একই নামে একটি বর্ষপঞ্জীও ইহারা প্রকাশ করিত। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ১৯৫০ খৃ.-এর শেষদিকে স্তিমিত হইয়া আসে বলিয়া মনে হয়।

১৯৬৫ খৃ. দারু'ত-তাবলীগি'ল-ইসলামী নামে পরিচিত একটি প্রতিষ্ঠান কুম্ম শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় একজন মুজতাহিদ 'আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ কাজিম শারী'আত মাদারী-এর উদ্যোগে এবং ইহা ছিল মরহুম বুরূজিরদীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সফল বাস্তবায়ন। এই প্রতিষ্ঠানটি ছাত্রবৃন্দকে ধর্মীয় বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ দান করিত, তাহা একমাত্র জ্ঞান অর্জনের জন্য, তবে প্রচলিত মাদরাসাসমূহের প্রশিক্ষণের ন্যায় ছিল না। ইহার লক্ষ্য ছিল জনগণের মধ্যে ফলপ্রসূভাবে ধর্মীয় প্রচারণা পরিচালনা করা। ইহার প্রদত্ত প্রশিক্ষণের মধ্যে ছিল ইংরেজী ভাষা এবং বিদেশে মিশনারী কার্যক্রম চালু করার পরিকল্পনা। প্রতিষ্ঠানটির চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে সীমা-ই ইসলাম নামক একটি বিস্তৃত ও বর্ণোজ্জ্বল রচনা প্রকাশ করে; ইহাতে সংকলিত হইয়াছিল তৎকালীন প্রধান ধর্মীয় লেখকগণের রচনাবলী। দারু'ত-তাবলীগ-এর কার্যক্রমের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত একজন লেখক হইতেছেন সায়্যিদ হাদী খুসরাও শাহী। ইনি আন্তর্জাতিক ইসলামী চক্রে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব এবং জনপ্রিয় ধর্মীয় পত্রিকা মাকতাব-ই ইসলাম (১৯৫৮ খৃ. হইতে প্রকাশিত)-এর সম্পাদক।

আরও সাম্প্রতিক কালে তেহরানে হুসায়নিয়া-ই ইরশাদ নামে অপর একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রে 'উলামা' এবং অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে প্রচুর সংখ্যক শ্রোতার উপস্থিতিতে বক্তৃতা প্রদান করেন। এই প্রতিষ্ঠানটির কতিপয় প্রকাশনা রহিয়াছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে ঃ মুহাম্মাদ, খাতাম-ই পায়গামবারান (১৯৬৯ খৃ.) নামক দুই খণ্ডে প্রকাশিত একটি রচনা সংকলন। হাজ্জ-এর সময় হুসায়নিয়া মিনা-তে একটি অস্থায়ী শাখা স্থাপন করে এবং ইরানী তীর্থযাত্রিগণ এই হাজ্জযাত্রার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তৃতা শ্রবণ করিত ও পথনির্দেশনা লাভের জন্য তথায় গমন করিত।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ফিরীদূন আদামীয়াত, ফিক্‌র-ই আযাদী ওয়া মুকাদ্দিমা-য়ি নিহদাত-ই মাশরূতিয়াত-ই ঈরান, তেহরান ১৩৩৪ সৌর বর্ষ/১৯৬১; (২) হামিদ আলগার, Religion and State in Iran, 1785-1906 : The Role of the Ulama in the Qajar period, বার্কলে-লসএঞ্জেলস্ ১৯৬৯ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, মীরযা মালকুন খান, A Biographical study in the history of Qajar Iran (হয়ত প্রকাশিত হইয়াছে); (৪) ঐ লেখক, The Oppositional role of the Ulama in twentieth century Iran, in Sufis, saints and scholars, xŒJ. Nikki R. Keddie (প্রকাশিতব্য); (৫) য়াহ্‌য়া আরমাজানী, Islamic Literature in post-war Iran, in The World of Islam, লণ্ডন ১৯৬০ খৃ., ২৭১-৮২; (৬) R. Cottam, Nationalism in Iran, পিটার্সবার্গ ১৯৬৪ খৃ.; (৭) Nikki. R. Keddie, An Islamic Response to imperialism : political and religious writings of Sayyid Jamal al-din "al Afghani", বার্কলে-লসএঞ্জেলস্ ১৯৬৮ খৃ.; (৮) ঐ লেখক, Religion and irreligion in early Iranian Nationalism, in Comparative studies in society and history, ৪/৩খ. (এপ্রিল ১৯৬২ খৃ.), ২৬৫-৯৫; (৯) 'আয়াতুল্লাহ রূহুল্লাহ খুমেনী, হুকূমাতই ইসলামিয়্যা বিলায়াত-ই ফাক'ীহ, নাজাফ ১৩৮৯/১৯৬৯; (১০) A. K. S. Lambton, A Reconsideration of the position ot the Marja'

Al-Taqlid and the Religious Institutions, in Studia Islamica, ২০খ. (১৯৬৪ খৃ.), ১১৫-৩৫।

Hamid Alger (E.I.[2]) মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

৩। **তুরস্ক ঃ** 'উছমানী-তুর্কী প্রেক্ষাপটে ইস্‌লাহ্‌ কখনও ধর্মকে আধুনিকীকরণের অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইহা রাজনৈতিক সংস্কারের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহা আবার ক্রমান্বয়ে, প্রথম দিকে (১১শ/১৭শ এবং ১২শ/১৮শ শতাব্দীর মধ্যে) পুরাতন রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পরবর্তীতে (আনু. ১৮০০ খৃ.-এর পরে) এমন সকল নীতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনঃ-সংগঠন যাহা ক্রমবর্ধমান হারে সালতানাত ও খিলাফাত হইতে যথেষ্ট ব্যবধানবিশিষ্ট। ধর্মীয় আধুনিকায়নের ধারণাকে চিহ্নিত করিতে সঙ্গতিপূর্ণভাবে কোন শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই এবং মাদরাসার ন্যায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আধুনিকায়ন প্রসঙ্গেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোন পৃথক শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। উভয় ক্ষেত্রেই ইসলাহ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইসলামী বিশ্বের অন্যত্র সংঘটিত ধর্মীয় আধুনিকায়ন আন্দোলনের সহিত তুল্য কোন উল্লেখযোগ্য আন্দোলন এখানে ঘটে নাই।

ধর্মীয় আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কোন আন্দোলন অথবা ধারণার অনুপস্থিতির সম্ভাব্য একটি হেতু হইতেছে, 'উছমানী লেখকগণ প্রায়শই ইহাকে পেশ করিয়াছেন 'দীন-উ-দেভলেত' শব্দটি দ্বারা। প্রাতিষ্ঠানিক বা ধর্মতাত্ত্বিক অর্থে রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলন হইতে স্বতন্ত্র কোন ধর্মীয় আধুনিকায়ন প্রচেষ্টা উদ্ভবের সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত সামান্য। অন্য যে কোন ব্যবস্থার তুলনায় 'উছমানী রাজনৈতিক পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের কাঠামোর মধ্যে ইসলাম এবং ইহার প্রতিনিধিবৃন্দ 'উলামা'কে সংরক্ষণ এবং ব্যবহার করিতে অধিকতর সফলকাম হইয়াছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন আধ্যাত্মিক অথবা ঐশী কর্তৃত্বের প্রতিনিধি ছিল না, ইহা ছিল কেবল শাসন ব্যবস্থার একটি অংশমাত্র এবং ইহাতে একটি সংঘবদ্ধ আকারে অথবা ওজাক (দ্র.)-এর সংগঠিত করা হয়। ইহার প্রথম ভূমিকা ছিল আইনশাস্ত্র (ফিক্‌হ)-এ অনুশীলন বৃদ্ধি, আইন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে মতামত প্রদান (ইফতা') এবং শারী'আ আইন-কানূন-এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে। মাদ্রাসাসমূহ মূলত ধর্মতাত্ত্বিক বিষয় শিক্ষার বিদ্যালয় ছিল না, বরং প্রধানত ইহা ছিল আইনশাস্ত্র সম্পর্কে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের একটি কেন্দ্র। ইহার বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রটি সুন্নী মতবাদ গ্রহণ করে এবং মাতুরীদী ধর্মতত্ত্ব ও হানাফী আইনশাস্ত্র বিষয়ক মতামতের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এইভাবে ধর্মতাত্ত্বিক বিভ্রান্তির আশংকা সীমাবদ্ধ করিয়া আনে।

তথাপি ইহার শিক্ষামূলক ও আইন বিষয়ক শৃংখলা ও কর্তৃত্বের অবস্থানসম্পন্ন নিষ্ঠাপূর্ণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিক অপর একটি ধারাকে সুযোগ প্রদান করা হয়, যাহাকে একটি স্বায়ত্তশাসিত আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের নিকটতমরূপে বিবেচনা করা চলে। ইহারা হইতেছে বিভিন্ন সূফী সম্প্রদায় বা তারীকাসমূহ। ইহাদের দল ভাংগনজনিত সংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতার কারণে ইহাদের প্রচুর সংখ্যক বিভিন্ন পৃথক অস্তিত্ব ছিল। ইহাদের অধিকাংশ অবশ্য বিশ্ব ও রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের মনোভাবে অন্তত বাহ্যিকভাবে, প্রধান প্রধান রক্ষণশীল, মধ্যপন্থী অথবা চরমপন্থী ধারার কোন না কোনটির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। 'উলামা' ও সূফী সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রহণযোগ্য পার্থক্যের সীমায় কোন সংঘাত অনুষ্ঠিত হইলেই কেবল কোন প্রকার ধর্মীয় বিভ্রান্তি সৃষ্টির আশংকা উপস্থিত হইত। যখন এইরূপ কোন সংঘাত প্রচলিত কোন মৌল মতাবাদকে গ্রাস করিত, 'আলিম'গণ তখন ইহাকে ধর্মীয় অর্থে না দেখিয়া রাজনৈতিক অর্থে বিবেচনা করিতেন এবং এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর পৃষ্ঠপোষকগণকে প্রচলিত মত বিরোধীরূপে চিহ্নিত করিতেন। এইরূপ সকল ক্ষেত্রে 'উলামা' সহজেই রাজনীতিবিদগণের সমর্থন পাইতেন। তারীকাসমূহের অধিকাংশ অবশ্য প্রকাশ্যভাবে সাধারণ আইনসমূহের বিরোধিতা পরিহার করিয়া 'উছমানী নীতির মূল কাঠামোর মধ্যে নিজস্ব অবস্থান বজায় রাখিত। তাহারা ধর্মতাত্ত্বিক রাজনৈতিক বিষয়ে উদাসীনতা অথবা নীরবতার নীতি গ্রহণ করে এবং ক্রমশ ক্রমবর্ধমানভাবে অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি এবং কাব্য-ও শিল্পের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে। এই প্রবণতাটি তাহাদের অস্তিত্বকেই কেবল নিরাপদ করে নাই, বরং একই সঙ্গে ইহা তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি করে এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, বিশেষত শিল্পী, সামরিক পেশাদার এবং আমলাগণের মধ্যে তাহাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে। সুতরাং তারীকা হইতেছে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য প্রকাশক অপর একটি উদাহরণ যাহা কেবল 'উলামা'র অংশগ্রহণই আকৃষ্ট করে নাই, একই সঙ্গে উচ্চ পদস্থ শাসকশ্রেণী এমনকি সময় সময় স্বয়ং শাসকবর্গের অংশ গ্রহণও নিশ্চিত করিয়াছিল। উপরন্তু পরবর্তী কালে 'উছমানিয়া রাষ্ট্র তারীকাসমূহকে রাষ্ট্রের আধা-সরকারী স্তম্ভরূপে পরিণত করিতে সমর্থ হয় এবং বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় 'উলামা' পাশাপাশি 'মাশায়িখ'কে স্বীকৃতি দান করে।

রাষ্ট্র, 'উলামা' ও তারীকাসমূহের মধ্যে দীর্ঘকালীন অংশীদারিত্বের পর ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে আধুনিক বিশ্বের সর্বপ্রথম চ্যালেঞ্জের মুখে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানই আক্রান্ত হয় এবং ফলস্বরূপ দেখায় ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিরোধ। তাহাদের মধ্যকার বিরোধের বিষয়সমূহ, যেমন কফি পান করা, ধূমপান করা, মাতাল হওয়া, অলংকারাদি অথবা রেশমী বস্ত্র ব্যবহার, প্রাত্যহিক জীবন বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আবেগের বাড়াবাড়ি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উর্ধ্বে অথবা ইহা ছাড়াইয়া অন্য কোন ক্ষমতায় বিশ্বাস। কিন্তু এই সকল প্রবর্তনের পশ্চাতে ছিল অংশত শাসক শ্রেণীর বিষয়-সম্পদের প্রাচুর্য এবং একটি স্ফীতিমান অর্থনীতির অভ্যুদয়ে সৃষ্ট অর্থনৈতিক জটিলতা এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট 'উছমানী নীতিমালার ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থাসমূহের বিপর্যয় যাহার সহগামীরূপে দেখা দেয় জনগণের সার্বিক দারিদ্র্য। এই সকল হেতুর সমন্বয় নবায়নের (বিদ'আ) সমস্যাটিকে ধর্মীয় বিরোধের কেন্দ্রে পরিণত করে। 'উলামা' এবং মাশায়িখ পরস্পরকে এই নব প্রবর্তনসমূহ উপস্থাপনার জন্য দোষারোপ করিতে থাকে। এই সুযোগে রাষ্ট্রযন্ত্র, যাহা মূলত এইজন্য দায়ী, উভয়ের উপর তাহার নিয়ন্ত্রণ কঠোরতর করে।

অবশ্য আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে 'উলামা' এবং সূফী গোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত মনোভাবের কোন মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয় নাই, যদিও ইহা সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত হইবে না যে, 'আলিমগণ সর্বসময়ই নবায়নের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করিতেন। 'উছমানী ব্যবস্থা চালু রাখার মধ্যে তাহাদের কায়েমী স্বার্থ থাকায়, পরিবর্তনের প্রতি তাহাদের মনোভাব নিয়ন্ত্রিত হইত তাহাদের মাস্‌লাহা রাজনৈতিক সুযোগের নীতি দ্বারা। অতি নগণ্য ক্ষেত্রেই 'আলিমগণ সংস্কারের প্রচেষ্টা ও সরকারী নীতির প্রকাশ্য সমালোচনা করেন। উত্তেজনার সময় 'আলিমগণ

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হইয়া সূফীগণের বিরুদ্ধে সক্রিয় হইয়া উঠেন এবং তাহাদের আক্রমণের মুখে তারীকাসমূহ আরও নমনীয় হইয়া পড়ে। ইহা ছিল পরবর্তী কালে তাহাদের অবক্ষয় ও দুর্নামের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ সোপান। সামগ্রিকভাবে 'আলিমগণ ছিলেন সুদৃঢ়ভাবে রাষ্ট্রের পক্ষে এবং যদিও তাহাদের অবস্থানে কিছু পরিমাণে নমনীয়তা ছিল, তাহারা সংকটের প্রাথমিক কালটি কেবল ধর্মীয় প্রাণোচ্ছলতা ও অগ্রণী ভূমিকা হারানোর মাধ্যমেই কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হন। সুতরাং ১৮০০ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব হইতেই এই দুইটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অবক্ষয়ের পথে ছিল। ১১শ/১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই কোচিবেগ (দ্র.) তাঁহার রিসালা-তে 'আলিম সম্প্রদায়ের দুর্নীতির ও অবক্ষয়ের বর্ণনা দান করিয়াছেন এবং পরবর্তী কালে হাজ্জী খালীফা [কাতিব চেলেবি দ্র.] তাঁহার মীযানু'ল-হাক্ক ফী ইখতিয়ারি'ল-আহাক্ক (ইংরেজী অনু. G. L. Lewis, The Balance of Truth, লণ্ডন ১৯৫৭ খৃ.) গ্রন্থে 'উলামা' ও শায়খগণের মধ্যে তীব্রভাবে প্রচলিত অর্থহীন বিবাদ-বিসংবাদের প্রচণ্ড ভর্ৎসনা করেন এবং মাদ্রাসাসমূহে যুক্তিবাদী ও ধর্মীয় বিজ্ঞানসমূহের অজ্ঞতার গভীরতার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন। 'আলিমগণ যখন সম্পূর্ণভাবে পার্থিব বিষয়ে আসক্ত, তারীকাসমূহ তখন ক্রমাগত বাস্তবতা হইতে দূরে সরিয়া যাইতে থাকে।

ব্যাপকভাবে সংস্কার সাধনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার প্রথমকালে ৩য় সালীম (১৭৮৯-১৮০৭ খৃ.)-এর রাজত্বকালে দেখা যায় যে, 'উলামা' ধর্মীয় সংস্কারের প্রতি আগ্রহের তুলনায় পার্থিব বিষয় সম্পর্কে অধিকতর সক্রিয়। এই শাসকের নিকট যে সমস্ত সংস্কারমূলক প্রকল্প পেশ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠটি প্রণয়ন করেন 'আলিম সম্প্রদায়ের একজন উচ্চপদস্থ সদস্য 'আবদুল্লাহ মুল্লা। অবশ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে তাঁহার প্রদত্ত সুপারিশের কোনটিই 'উলামা' প্রধান শায়খু'ল-ইসলাম অথবা তাঁহার কোন সহকর্মীর উপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে নাই এবং বাস্তব এমন কিছু প্রণয়নে সক্ষম হয় নাই যাহাকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে আধুনিকায়নরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে। তারীকাসমূহ অধিকতর দুর্নামের অবস্থানে পতিত হয় এবং ইহাদের অন্তত একজন বেকতাশিয়্যা ১৮২৬ খৃ. ২য় মাহমূদের অধীনে 'উলামা' সমর্থিত জানিসারিগণের ধ্বংসসাধন অভিযানে তিনি ইহাদের সহিত জড়িত ছিলেন এই অভিযোগে চরম আঘাতপ্রাপ্ত হন। তখন হইতে স্বল্পকালীন দুইটি সময়কাল ব্যতীত, তারীকাসমূহ আর কখনও পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারে নাই; প্রথমটি ছিল ২য় 'আবদু'ল-হামীদ (১৮৭৬-১৯০৯ খৃ.)-এর রাজত্বকালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৪০ খৃ. হইতে পরবর্তী কালে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থার মৌল পরিবর্তনের প্রথম আভাস পাওয়া যায় শুধু যখন তানজীমাত সনদের কতিপয় শর্ত বাস্তবায়ন করা হয়। প্রথমদিকে 'উলামা' ধর্মীয় সংস্কারের লক্ষ্যে তানজ়ীমাত সংস্কারের অন্তর্নিহিত ভাবার্থকে অবজ্ঞা করিতে সমর্থ হয়। যদিও তানজীমাত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে রাজনীতিতে আরও বিস্তৃতভাবে জড়িত করার পথে একটি নূতন পদক্ষেপরূপে প্রমাণিত হয়, তথাপি একই সঙ্গে ইহা রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে প্রথমবারের মত বিভেদ সূচিত করে। উদাহরণস্বরূপ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে যদিও শায়খু'ল-ইসলামকে মন্ত্রীসভার একটি স্থায়ী ও বিশিষ্ট স্থান প্রদান করা হয়, বিচার বিভাগের অর্ধেক পদ নব প্রতিষ্ঠিত বিচার বিভাগীয় মন্ত্রণালয়ের জন্য সংরক্ষিত করা হয়, সকল জনকল্যাণমূলক সংস্থার সকল প্রকার বিধি ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্বাধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং সকল নূতন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থাপন করা হয় (দ্র. বাব-ই মাশীখাত)।

ঐতিহ্যগতভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্মুক্তকরণের এই প্রবণতা সত্ত্বেও শায়খুল-ইসলাম, 'উলামা' এবং মাদ্রাসাসমূহ পার্থিব বিষয়ে তাহাদের লক্ষণীয় ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখে। এই প্রকার কার্যক্রম বিভিন্ন রূপ ছিল ঃ উন্মুক্তকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিরোধ করা, মেজেলীর রীতিভুক্তিকরণে অন্তর্ঘাতমূলক প্রচেষ্টা, সংস্কারসমূহকে আরও ধর্মনিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে য়ূরোপীয় শক্তিসমূহের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে সমর্থন দান করা এবং শাসকগণের উৎখাত প্রচেষ্টায় গুপ্ত ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করা। তাহাদের কার্যাবলীর এই বিভিন্নতা প্রমাণ করে যে, 'উলামা' তাহাদের অভ্যন্তরীণ ঐক্য রক্ষায় সমর্থ হন নাই এবং রাষ্ট্রের সহিত তাহাদের সংস্রব অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল।

তান্‌জীমাত-এর সময়কালে এবং নব্য 'উছমানী শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের সময়, 'উলামা' কোন প্রখ্যাত ধর্মীয় চিন্তাবিদ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। 'উলামা' শ্রেণীর মধ্যে একমাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন আহ্‌মাদ জেওদেত পাশা (১৮২২-১৮৯৫ খৃ.) (দ্র.)। কিন্তু তিনি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন শুধু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একজন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনায়করূপে আবির্ভূত হওয়ার পর। জেওদেত সম্ভবত এই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন আইনের সংস্কারক, ধর্মীয় চিন্তাবিদ ছিলেন না। একদিকে তিনি তান্‌জ়ীমাত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ফ্রান্সের নয়া আইনবিধি পুরাপুরি প্রবর্তনের প্রবণতা দমনে সক্ষম হন এবং অন্যদিকে শারী'আর মুখপাত্ররূপে আধুনিক একটি আইন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করিতে 'উলামা'র অপারগতাও উপলব্ধি করেন।

ইসলামী আইন সংকলনকরণ এবং আধুনিকায়নের লক্ষ্যে তাঁহার প্রচেষ্টার প্রধান ফলসমূহের মধ্যে ছিল কানূন-ই ইরাদী এবং মেজেল্লী (দ্র.) (১৮৭০-৭৭ খৃ.)। অবশ্য তাঁহার প্রগতিশীল আধুনিকতাবাদ শাসনতান্ত্রিকতা পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল না। যদিও তিনি ফিক্‌হ-এর বিষয়ে আধুনিকতাপন্থীরূপে নব্য 'উছমানীর প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, শাসনতান্ত্রিকতাপন্থিগণের বিরুদ্ধে তিনি ২য় 'আবদু'ল-হামীদের পথও অবলম্বন করেন। অথচ 'আবদু'ল-হামীদ সেই শাসনকর্তা যিনি প্রখ্যাত প্রতিক্রিয়াশীল শায়খু'ল-ইসলাম হাসান ফেহমী (দ্র.)-এর প্রভাবে জেওদেতকে তাঁহার কার্যে মধ্যপথে বাধা প্রদান করেন।

২য় 'আবদু'ল-হামীদের রাজত্বকাল [১৮৭৬-১৯০৯ খৃ. (দ্র.)] ছিল সকল প্রকার ধর্মীয় সংস্কারের জন্য এক গভীর অমানিশার কাল। অপর দিকে ইহা পরিণত হয় তারীকাসমূহের পুনঃঅভ্যুদয়ের কাল হিসাবে বিশেষত 'উছমানী সাম্রাজ্যে যেগুলির কোন প্রকার ঐতিহাসিক স্থান ছিল না, যেগুলি প্রধানত উত্তর আফ্রিকা হইতে আমদানী করা হইয়াছিল এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, 'আবদু'ল-হামীদ ইহাদের উৎসাহিত করিয়াছেন যাহাতে 'আরব রাষ্ট্রসমূহে 'উছমানিয়া প্রভাব পুনপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই সকল তারীকাসমূহ পরিণত হয় জ্ঞান ও সংস্কার প্রসারে বাধা প্রদানকারী কেন্দ্ররূপে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইহাদের ব্যবহারের প্রচেষ্টা একদা প্রাণচঞ্চল ও জনগণের ধার্মিকতার কেন্দ্রবিন্দু এই সকল প্রতিষ্ঠানের ভাগ্য রুদ্ধ করিয়া দেয়। ইহা লক্ষণীয় যে, প্যান-ইসলামীবাদের প্রবক্তা 'আবদু'ল-হামীদের রাজত্বকালে মুহাম্মাদ 'আবদুহ

(দ্র.)-এর ন্যায় ব্যক্তিবর্গের আধুনিকতাবাদী ভাবধারার কোনরূপ চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, যদিও জামালু'দ-দীন আল-আফগানী (দ্র.)-এর অনুপ্রেরণায় "বস্তুবাদিগণের মতামত খণ্ডন"-এর মত সাহিত্যের প্রাচুর্যের অভাব ছিল না।

অন্যদিকে মুহাম্মাদ 'আবদুহুর আধুনিকতাপন্থী রচনার কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, 'আবদু'ল-হামীদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত, ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী মহলের, ১৯০৮ খৃস্টাব্দের পূর্বের রচনাসমূহে। নব্য তুর্কীগণের মধ্যে অন্যতম চরমপন্থী নাস্তিকতাবাদী ডঃ 'আবদুল্লাহ জেওদেত সর্বপ্রথম তাহার নির্বাসনে থাকাকালে প্রকাশিত পর্যালোচনা সাময়িকী ইজতিহাদ-এ 'মুহাম্মাদ 'আবদুহুর মতবাদ প্রকাশ করেন। ১৯০৮ খৃ. শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর সর্বপ্রথম আধুনিকতাপন্থী পর্যালোচনা, সিরাত-ই মুসতাকীম (পরবর্তী কালে সেবীলু'র-রেশাদ) আবির্ভূত হয় তরুণ 'উলামা'র মুখপত্ররূপে। ইহারা পুরাতন তুর্কী ধারায় আর একটি মোল্লা শ্রেণী গঠন করিতে পারে নাই। এই আধুনিকতাপন্থী সাময়িকীটির প্রধান ব্যক্তিত্বগণ অবশ্য আসন্ন মিসরীয় আধুনিকতাপন্থীগণের ইসলামী-আরবী জাতীয়তাবাদ ও নব্য তুর্কীগণের প্যান-উছমানী-এর মধ্যে সংঘাতের ফলে সৃষ্ট জটিলতাজনিত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। সাময়িকীটি মুহাম্মাদ 'আবদুহু-এর তুলনায় রাশীদ রিদার অধিকতর অনুগামী। বাস্তবিক পক্ষে, সিরাত-ই মুসতাকী মে 'আবদুহু-কে অতি সামান্যই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার সম্পর্কে মাত্র দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং দুইটিই ছিল অনুবাদ কর্ম। দেখা যাইতেছে, আরব দেশসমূহে যাহার ছিল আধুনিকতাবাদ, তুরস্কে তাহা বিবেচিত হয় 'উছমানী খিলাফাতের বিরুদ্ধে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়ারূপে। ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্যবাদিগণও এই সকল আধুনিকতাপন্থীকে প্রতিক্রিয়াশীলরূপে গণ্য করেন। দুই পক্ষের দুইজন কবি তেওফীক ফিকরেত এবং মেহমেত 'আবকিফ (Frsoy)-এর মধ্যে সংঘটিত একটি বিবাদ, তখন হইতে এ পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতাপন্থী ও আধুনিকতাপন্থিগণের পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির নমুনারূপে রহিয়া গিয়াছে।

সিরাত-ই মুসতাকীম-এর আধুনিকতাপন্থিগণ যখন জাতীয়তাবাদি-গণের চ্যালেঞ্জের মুখে সেবীলু'র-রেশাদ-এর ক্রমশ স্থিরভাবে রক্ষণশীলতার পথে অগ্রসরমান, তখন ধর্মীয় আধুনিকায়নের আবেদন ক্রমশ শক্তিশালীভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাপন্থী বুদ্ধিজীবিগণ নিজ হাতে গ্রহণ করেন। 'আবদুল্লাহ জেওদেত (দ্র. জেওদেত) এবং কীলীচয়াদে হাক্কী উভয়ই ইজতিহাদ-এর লেখার মাধ্যমে ঐতিহ্যপন্থী 'উলামা' এবং যুগপৎ আধুনিকতাপন্থিগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন। অবশ্য সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে তুর্কী জাতীয়তাবাদিগণের শিবির হইতে। তিনি হইলেন যিয়া গোকাল্প (১৮৭৬-১৯২৪ খৃ.) (দ্র. গোকাল্প)। তাঁহার সমসাময়িক রুশ সাম্রাজ্যে অবস্থিত তুর্কী মুসলিমগণের সংস্কারক ও ধর্মতত্ত্ববিদ মূসা জারুল্লাহ বা বিগিয়েফ (১৮৭৫-১৯৪৯ খৃ.)-এর মত গোকাল্প ধর্মতাত্ত্বিক বা ধর্মীয় চিন্তাবিদ ছিলেন না। একজন রোমান্টিক পপুলিস্ট এবং একজন জাতীয়তাবাদী সমাজতত্ত্ববিদরূপেই তিনি একটি ত্রিনীতিবিশিষ্ট এক মতাদর্শ উদ্ভাবন করেন—যাহাতে ইসলামের গুরুত্ব কেবল পাশ্চাত্যপন্থী আধুনিকায়নের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং তুর্কী জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। গোকাল্পের বিক্ষিপ্ত রচনাসমূহে (N. Berkes কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত) আমরা দেখিতে পাই, ইসলামী আধুনিকায়নের ব্যাপারে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁহার ধারণাসমূহ হইতে অবিচ্ছেদ্য।

গোকাল্প-এর ধর্মীয় আধুনিকায়ন কামালপন্থী যুগের অধিকতর চরমপন্থী (১৯২৩-১৯৩৮ খৃ.) ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির পথ প্রশস্ত করে। কামাল পাশা (১৮৮১-১৯৩৮ খৃ.) এমনকি "ইসলামী বিজ্ঞান"সমূহের ঐতিহ্য হইতে আরও দূরে অবস্থান করিতেন। 'উলামা', মাদ্রাসাসমূহ, তারীকাসমূহ এই সকলই তিনি সব সময়ে পশ্চাদপদতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং ষড়যন্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট মনে করিতেন এবং ক্রমবর্ধমানভাবে উন্মুক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে তিনি ইহাদের কোন স্থান বা প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার প্রবর্তিত সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ বিপ্লবী পরিবর্তনসমূহের মধ্যে ছিল সালতানাত, খিলাফাত ও ইসলামী আইনের বিলোপ সাধন। 'উলামা' প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা এবং তারীকাসমূহের যাবিয়াসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং ইহাদের সম্পত্তি ওয়াক্ফ প্রশাসনের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়, যাহা ইতিমধ্যেই একটি সরকারী বিভাগে পরিণত হইয়াছিল।

কামালপন্থী সংস্কারকে তুরস্কে ইসলামের সম্পূর্ণ নির্মূলকরণরূপে বিবেচনা করা অসঙ্গত নয়। 'উছমানী নকশায় ধর্ম ও রাষ্ট্রের সহিত ইসলামের সংমিশ্রণ, এই ঐতিহাসিক রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থার অভ্যন্তরে যে পর্যায় পর্যন্ত ইসলাম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে, যাহার অভ্যন্তরে ইহা সর্বদা আনুষ্ঠানিকতা ও স্থবিরতা রোগের পীড়িত হইয়াছে—এখন সেই রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের ফলে ইহা অবশ্যম্ভাবীরূপেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে [কামাল পাশা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর যে অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেন, ইসলামের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল (দ্র. আতাতুর্ক)]। ইসলামকে এখন হইতে মুসলিমগণের স্বতঃস্ফূর্ত পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুগমনের উপর নির্ভর করিতে হয়, 'ইবাদাত স্থানসমূহকে উন্মুক্ত রাখা হয় এবং তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় অর্থে পরিচালিত ধর্মীয় বিষয়ক বিভাগের প্রশাসনে আনা হয়, কিন্তু ইহারা তাহাদের ধর্মতাত্ত্বিক ও ধর্মমত সংক্রান্ত কর্তৃত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। স্বীকৃত ধর্মসমূহকে (ইসলাম, খৃস্ট ও য়াহূদী) আইনের সুরক্ষার অধীনে আনয়ন করা হয়। কিন্তু একই সঙ্গে এই সকল ধর্মের যে কোনটির সহযোগিতায় যে কোন প্রকার রাজনৈতিক সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয় এবং কোন প্রকার নূতন সম্প্রদায় অথবা তারীকা প্রতিষ্ঠাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পুরাতন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবনতি, স্থবিরতা এবং অবিশুদ্ধতা যাহা 'উছমানী সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতনের বিশেষ দৃশ্য ছাড়া আর কিছুই নয়—তাহার কামালপন্থী সংস্কারসমূহের বাস্তবায়ন আমাদের প্রণোদিত বিশ্বাস অপেক্ষা সহজতর ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য করিয়া তোলে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে কেবল জাতীয় উদ্দীপনা প্রশমিত হওয়ার পরই (যাহার ফলে কামালপন্থী ধর্মীয় সংস্কারের বাস্তবায়ন ও গ্রহণযোগ্যতা অত্যন্ত সাবলীলভাবে সহজতর হয়) ইসলামের প্রতি এক নয়া আকর্ষণ পুনরায় আবির্ভূত হয়। এখানেও তুর্কী ঐতিহ্যের সর্বক্ষেত্রের ন্যায়, আমরা আধুনিকায়নের অর্থে ইসলাহ-এর কোন চিহ্ন দেখিতে পাই না। উন্নয়নের চারিটি পৃথক ধারা পৃথকভাবে লক্ষ্য করা যায়ঃ (১) ইসলামের প্রতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আকর্ষণ। ঐতিহাসিক প্রকৃতির রচনাবলী, মূল রচনাসমূহের অনুবাদ অথবা সংস্করণসমূহ এবং কিছু সমাজতাত্ত্বিক পাঠ। (২) ধর্ম

সম্পর্কে উঠতি বুর্জোয়াগণের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ; ইহার প্রকাশ ঘটে প্রধানত নূতন মসজিদসমূহের নির্মাণকার্যে অথবা পুরাতন ধর্মীয় অট্টালিকাসমূহের সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহে ধার্মিকতার বিভিন্ন প্রকাশ, যথা ধর্মীয় ছুটির দিনসমূহ পালন, কুরআনের আবৃত্তি অথবা মাওলিদ কবিতা পাঠ, ভিক্ষা প্রদান, হজ্জ ও সাওম পালনের অভ্যাসের মাধ্যমে। (৩) নূতন বেআইনী তারীকাসমূহের উত্থান, প্রধানত অ-ঐতিহ্যগত ধরনের ধর্ম-সাম্প্রদায়িক প্রতিবাদী গোষ্ঠীসমূহ, যাহা সামগ্রিকভাবে কারিগর, ক্ষুদ্র দোকানদার এবং ব্যবসায়িগণের সমর্থন লাভ করে। (৪) ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী মতাদর্শগত প্রবণতাসমূহ, যাহা শারী'আতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এমন কি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সোচ্চার দাবি ঘোষণা করে। সুস্পষ্টভাবেই কামালের নীতি বিরোধী এই প্রবণতাটি প্রধানত পাশ্চাত্যপন্থী বুদ্ধিজীবিগণের একটি অসন্তুষ্ট গোষ্ঠী এবং জাতীয়তাবাদী তরুণগণের একটি অংশের সমর্থন লাভ করে। অংশত একদলীয় শাসনের বিরুদ্ধে বহুদলীয় পদ্ধতির উন্মেষের কারণে এবং অংশত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার তুলনামূলক সুদৃঢ়তা হেতু এই সকল কিছুকেই যে মুক্ত ও অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহা যাহারা ইহাদিগকে ধর্মীয় আধুনিকায়নের আভাসরূপে মনে করেন এবং এবং যাহারা ইহাদিগকে অতীতের প্রতিক্রিয়াশীলতায় প্রত্যাবর্তনের চিহ্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, উভয় দলকেই ইহার প্রতি অতিরঞ্জিত গুরুত্ব প্রদান করিতে সাহায্য করে এবং ইহাকে কামালপন্থী ধর্মীয় সংস্কারের ধারণা অতিক্রমকারী একটি স্তররূপে চিহ্নিত করে। প্রত্যেকেরই যে একটি শ্রেণী, পেশা, অঞ্চল এবং দলীয় প্রেরণা ও শ্রেণীকরণ ছিল সেইজন্য মনে হয় 'উছমানী প্রশাসনিক ব্যবস্থা কামালপন্থী সংস্কারের ফলে পরিবর্তিত হইয়া এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যাহাতে ধর্ম সকল আধুনিক গণতন্ত্রের ন্যায় একটি রাজনৈতিক সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুরূপে পরিণত হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) Z. Gokalp, Turkish Nationalism and Western Civilization, সম্পা. ও অনু. N. Berkes, ১৯৫৯ খৃ.; (২) G. Jaschke, Nationalismus und Religion im turkischen Befreiungskriege, in WI, ১৮ খ. (১৯৩৬ খৃ.), ৫৪-৬৯; (৩) ঐ লেখক, Zur Krisis des Islams in der Turkei, in Beitrage zur Arabistik, Semitistik und Islam wissenschaft, (১৯৪৪ খৃ.), ৫১৪-৩০; (৪) Der Islam in der neuen Turkei, in WI, n. s., ১ খ. (১৯৫১ খৃ.); (৫) J. K. Birge, Bektashi order of dervishes, ১৯৩৭ খৃ.; (৬) S. Yaltkaya, Tanzimattan Evvel ve Sonra Medreseler, in Tanzimat, ১খ, ইস্তাম্বুল ১৯৪০ খৃ., ৪৬৩-৭; (৭) H. A. R. Gibb, Modern Trends in Islam, লণ্ডন ১৯৪৫ খৃ.; (৮) ঐ লেখক এবং H. Bowen, Islamic Society and the West, ১খ. ২, লণ্ডন ১৯৫৭ খৃ.; (৯) এবুল'উলা মারদিনী, আহমেত জেভদেত পাশা, ইস্তাম্বুল ১৯৪৬ খৃ.; (১০) U. Heyd, The Ottomann 'Ulema and westernization in the time of Selim III and Mahmud II, in Scripta Hierosolymitana, ৯খ. (১৯৬১ খৃ.), ৬৩-৯৬; (১১) ঐ লেখক, Islam in Modern Turkey, R. C. AS. J., (১৯৪৭ খৃ.), ২৯৯-৩০৮; (১২) ঐ লেখক, Foundations of Turkish nationalism, ১৯৯০ খৃ.; (১৩) E. Erisirgil, Bir Fikr Adamnin Romiani, Ziya Gokalp, Istanbul ১৯৫১ খৃ.; (১৪) ঐ লেখক, Mehmet Akif : Islam'i bir sairn romani, আনকারা ১৯৫৬ খৃ.; (১৫) A. Adnan-Adivar, Interaction of Islamic and Western thoughts in Turkey, in Near Eastern Culture and Society, সম্পা. T. Cuyler Young, ১৯৫১ খৃ.; (১৬) B. Lewis, Islamic Revival in Turkey, in International Affairs, ২৮খ. (১৯৫২ খৃ.), ৩৮-৪৮; (১৭) ঐ লেখক, The Emergence of modern Turkey[2], লণ্ডন ১৯৬৮ খৃ.; (১৮) L. V. Thomas, Recent developments in Turkish Islam, in MFJ, ৬খ. (১৯৫২ খৃ.), ২২-৪০; (১৯) E. Marmorstein, Religious opposition to nationalism in the Middle East, in International Affairs, ২৮খ. (১৯৫২ খৃ.), ৩৪৪-৫৯; (২০) H. J. Kissling, The Social and educational role of the dervish orders in the Ottoman Empire, in Studies in Islamic cultural history, সম্পা. G. E. von Grunebaum, ১৯৫৪ খৃ.; (২১) H. Reed, Revival of Islam in secular Turkey, in MEJ, ৬খ. (১৯৫৪ খৃ.), ২৬৭-৮২; (২২) A. D. Rustow, Politics and Islam in Turkey, in Islam and the west, সম্পা. R. Frye, ১৯৫৭ খৃ.; (২৩) W. C. Smith, Islam in Modern History, প্রিন্সটন ১৯৫৭ খৃ.; (২৪) T. Z. Tunaya, Islamilik Cereyani, ইস্তাম্বুল ১৯৬২ খৃ.; (২৫) I. H. Uzuncarsili, Osmanli Devletinin Ilmiye Teskilati, আনকারা ১৯৬৫ খৃ.; (২৬) A. H. Lybyer, The govt. of the Ottoman Empire, ১৯৬৬ খৃ. ঃ S. Mardin, Din ve Ideoloji, আনকারা ১১৬৯ খৃ.; (২৭) N. Berkes, The development of secularism in Turkey, মন্ট্রিয়ল ১৯৬৪ খৃ.।

N. Berkes (E.I.[2])/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

৪। ভারত-পাকিস্তান ঃ মুসলিম জনগণের মধ্যে ভারতীয় মুসলমানগণই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। কিন্তু শুধু পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭ খৃ.) পরিণতি হিসাবে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাহাদের জীবনযাত্রা ও মানসিকতাকে প্রভাবিত করিতে শুরু করে। শার'আ ব্যক্তিগত আইনসমূহ ব্যতীত, ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিধিসমূহের সংস্কার সাধনের দ্বারাই মুসলিম আইন প্রণয়ন ছিল ভারতীয় মুসলিমগণের সামাজিক ও আইন সংশ্লিষ্ট জীবনযাত্রার উপর প্রভাব বিস্তারকারী প্রথম প্রধান সংস্কারমূলক প্রয়াস। শারী'আ আইনের এই বিবর্তন সূচিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকসমূহে (দ্র. শারী'আ)। কিন্তু এই সংস্কার কর্মের প্রণয়নে বা উন্নয়নে মুসলমানগণ কোন ভূমিকা পালন করে নাই।

য়ুরোপের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম ভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কালে কতিপয় ভারতীয় মুসলিম পরিব্রাজক। ইহাদের মধ্যে ছিলেন ই'তিসামু'দ-দীন, য়ুসুফ খান কাম্মালপুশ এবং মীরযা আবূ তালিব খান (দ্র.)। ইহাদের শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন

সর্বাপেক্ষা অনুভূতিপ্রবণ ও বিশ্লেষণধর্মী। ভারতীয় মুসলিম মেধার মধ্যে মতামত সৃষ্টি করিতে এই সকল পর্যটকের কোন প্রভাব থাকিলেও তাহা ছিল অতি অকিঞ্চিৎকর।

আধুনিকতাবাদের আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক সূত্রবদ্ধ বিস্তৃতি সাধারণত সায়্যিদ আহমাদ খান (দ্র.) হইতে উদ্ভূত বলিয়া ধরা হয়। তাঁহার রচনাবলী নিঃসন্দেহে ইহার পরবর্তী উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু এই কৈফিয়তমূলক রচনার প্রকৃত নকশা প্রণয়ন করেন প্রায় এক দশক পূর্বে কারামাত 'আলী জৌনপুরীর (মৃ. ১৮৭৩ খৃ.) তাঁহার মা'আখিযু'ল-'উলূম গ্রন্থে (ইংরেজি অনু. 'উবায়দী এবং আমীর 'আলী, কলিকাতা ১৯৬৭ খৃ.)। পরে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক গবেষণায় তিনি উপস্থাপন করেন যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ কেবল কু'রআনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণই নয়, প্রকৃতপক্ষে ইহারা স্পেনের মাধ্যমে য়ুরোপে প্রচারিত কু'রআনের অনুপ্রেরণা হইতে উদ্ভূত এবং সেইজন্য আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহকে আত্মীকরণের মাধ্যমে মুসলিমগণ প্রকৃতপক্ষে তাহাদের নিজ ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকেই পুন প্রতিষ্ঠা করিবে।

সায়্যিদ আহমাদ খানের বিশাল ব্যক্তিত্ব ভারতীয় মুসলিমগণের আধুনিকতাবাদের সম্পূর্ণ অট্টালিকার উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আছে। তিনি কুরআনের প্রত্যাদেশের অন্তর্নিহিত ও ব্যাখ্যাকৃত সত্যকে উনবিংশ শতাব্দীর মূল্যায়নের দুইটি তৌলদণ্ড 'হেতু' এবং 'প্রকৃতি' সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞানের সহিত সমীকরণ করিয়াছেন। প্রত্যাদেশ হইতেছে আল্লাহর বাণী এবং 'প্রকৃতি' হইতেছে তাঁহার সৃষ্টি। ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার পরস্পর বিরোধিতা বা বিভ্রান্তি থাকিতে পারে না। ইসলামী আইনের চারিটি ঐতিহ্যবাহী উৎসের মধ্যে তিনি 'ইজমা' (পারস্পরিক সম্মতি) (দ্র.)-কে প্রত্যাখ্যান করেন। কিয়াস (উপমা) (দ্র.)-কে ইজতিহাদ (দ্র.) (ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ) দ্বারা প্রতিস্থাপন করেন এবং মনে করেন, ইহা সকল শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মুসলিমের জন্য একটি অধিকার; যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের মাধ্যমে তিনি হাদীছ (দ্র.)-এর সংগ্রহের বিরাট অংশের বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং প্রায় সম্পূর্ণভাবে কু'রআনের পুনঃ ব্যাখ্যার ব্যাপারে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার কু'রআনী ব্যাখ্যা তিনি নাসখ (বাতিলকরণ) (দ্র.)-এর বৈধতা অস্বীকার করেন এবং মনে করেন যে, ইহা শুধু য়াহুদী, খৃস্টান ও মুসলিম ধর্মগ্রন্থের ঐতিহাসিক ধারার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, পরবর্তী গ্রন্থসমূহকে বাতিল করে। তাঁহার পরলোকতত্ত্ব (মৃত্যু, শেষ বিচার, দোযখ ও বেহেশ্ত সম্পর্কিত মতবাদ), ফেরেশতাতত্ত্ব এবং শয়তানতত্ত্ব ছিল অ-বস্তু ভিত্তিক এবং যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের সামাজিক গঠনে তাঁহার প্রদত্ত ব্যাখ্যায় তিনি দাসপ্রথা ও বহুবিবাহ উভয়েরই অনুমতির বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদান করেন। অপরপক্ষে তিনি মূলধন অথবা সম্পত্তি হইতে লাভ প্রাপ্তিকে যথার্থরূপে বিচার করিয়া নিষিদ্ধ রিবা (অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ)-কে চক্রসুদের সহিত সমীকরণ করিয়াছেন।

সায়্যিদ আহমাদ খানের রচনাবলী, তাঁহার সহযোগিগণের সৃষ্টিকর্ম দ্বারা সম্পূরিত হয়। ইহাদের মধ্যে চিরাগ 'আলী ছিলেন অধিকতর চরমপন্থী এবং তিনি বিস্তৃতভাবে একটি আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রে সংস্কারের সম্ভাবনাসমূহ এবং জিহাদ (দ্র.) সম্পর্কে রচনা প্রণয়ন করেন। সায়্যিদ আহমাদ খানের শিক্ষামূলক ও রাজনৈতিক নীতিসমূহকে উত্তরসুরিরূপে বাস্তবায়নকারী হিসাবে মাহ্দী 'আলী খান মুহ'সিনু'ল-মুল্ক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়া তুলনামূলকভাবে অধিকতর মধ্যপন্থী ছিলেন। সায়্যিদ আহমাদ খান এবং তাঁহার সহকর্মিগণের কৈফিয়তমূলক রচনাবলীর কেবল অংশবিশেষ ভারতীয় মুসলিমগণের উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। বিভিন্ন খুঁটিনাটিতে ইহা প্রত্যাখ্যাত হয়, কিন্তু সার্বিকভাবে ইহা ধর্মীয় বিশ্বাসের ধারণাকে উদার করিতে এবং ইহার বিস্তৃতিকে প্রশস্ততর করিতে সমর্থ হয়। 'উলামা' সম্পূর্ণ ইহা পরিত্যাগ করেন।

সায়্যিদ আমীর 'আলী (দ্র.) কেবল ইংরেজি ভাষাতেই লিখিয়াছেন এবং ইহার পশ্চাতে ছিল একটি মুসলিম ও পাশ্চাত্য পাঠকের মিশ্র পরিকল্পনা। তিনি সায়্যিদ আহমাদ খানের 'আলীগড় আন্দোলনের সদস্য ছিলেন না, কিন্তু ইহা দ্বারা তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং ইহার সংস্কারবাদী পরিকল্পনা ও আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রচার করেন।

যেখানে সায়্যিদ আহমাদ খান পুনর্জাগরণবাদকে পশ্চাদমুখী বিবেচনা করিয়া বিরোধিতা করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার সহযোগী হালী (দ্র.)-এর মুসাদ্দাস এবং অন্যান্য কবিতা আধুনিকায়নের নাটকে পুনরুদিত বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। এই বিশেষ দিকটি তাহার সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে ইক'বাল (দ্র.)-এর প্যান-ইসলামী কবিতাসমূহে।

বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় মুসলিম আধুনিকতাবাদের সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব হইতেছেন 'আল্লামা মুহাম্মাদ ইক'বাল (১৮৭৫?-১৯৩৮)। কিন্তু সায়্যিদ আহমাদ খানের তুলনায় তাঁহার আধুনিকতাবাদী অবস্থান ও বিশ্লেষণসমূহ অধিকতর সূক্ষ্ম, অস্পষ্ট, সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করিতে কম সহজতর এবং এমনকি সময় সময় পরস্পর বিরোধী। তাঁহার আবেদন প্রধানত কাব্যিক, গভীর মাত্রায় বুদ্ধিজীবিক, কিন্তু ইহা কার্যকররূপে ধর্মতাত্ত্বিক নয়।

যেই সকল মূল্যবোধকে ইক'বাল মোটের উপর একতরফাভাবে সমাজ ও ব্যক্তিবিশেষের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয়রূপে নির্বাচন করিয়াছেন তাহারা প্রত্যক্ষভাবে কু'রআন হইতে উদ্ভূত নয়, বরং ইহারা আত্মপক্ষ সমর্থনের মাধ্যমে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট। এই সকল মূল্যবোধ হইতেছে, তৎপরতা, ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা— এইগুলি তাঁহার কাব্যিক সৃষ্টির মূল কেন্দ্রীয় ভাবধারার প্রধান ধারা এবং তাঁহার পরবর্তী রচনাবলীর ভিত্তি। তাঁহার ধর্মীয় চিন্তাধারার স্বতঃলব্ধ জ্ঞান হইতেছে একটি মৌল ধারণা এবং ইহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে বুদ্ধিমত্তার একটি উচ্চতর রূপ হিসাবে। কোন কোন স্তরে ইহাকে তুলনা করা হইয়াছে নবুওয়াতের সহিত এবং ইহা ইক'বালের বের্গসোনীয় বিবর্তনধারার ধারণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মূলত নৈতিক, যদিও ইহাতে শক্তির মূল্যের উপর নির্ভরশীলতা ব্যক্ত করা হইয়াছে। আইনের ক্ষেত্রেও ইক'বাল ইজতিহাদ-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু সায়্যিদ আহমাদ খানের সহিত অ-সদৃশ হইল যে, তিনি ইজমা'-এর ধারণার বৈধতা স্বীকার করেন এবং ইহার বিস্তৃতি সাধন করেন। তিনি ইহাকে গণতন্ত্র অথবা সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের সহিত সমীকরণ করিয়াছেন। একই সঙ্গে তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিও কিছুটা স্বীকৃতি দিয়াছেন যে, সেই আন্দোলনে 'উলামা'র-ও একটি ভূমিকা রহিয়াছে যাহার ফলে সংস্কারপন্থী আন্দোলন গতি অতিক্রম না করে। এই দৃষ্টিভঙ্গীটি পাকিস্তানে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নকশায় গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতীয় ইসলামের জন্য তিনি রক্ষণশীল ভূমিকার প্রস্তাব করেন যাহাতে তুরস্কের নিরপেক্ষতাবাদ-এর কার্যকর প্রতিবিধান করা সম্ভব হয়।

তাঁহার সমসাময়িক আবু'ল-কালাম আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮ খৃ.)-কে প্রকৃত অর্থে আধুনিকতাবাদী বলা চলে না, কিন্তু তিনি তাঁহার কু'রআনের ব্যাখ্যায় ইসলামী বিশ্বাসসমূহকে আরও উদার ও মানবিক রূপ দান করিয়াছেন এবং আল্লাহর বিভিন্ন রূপ, যথা প্রতিপালক, দাতা, দয়ালু এবং সুন্দর এইগুলির প্রতি সম্যক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ইক'বাল যেখানে মানুষকে আল্লাহর আদেশ ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরূপে সৃষ্টির কেন্দ্র গণ্য করিয়াছেন সেখানেই আযাদ পুনরায় আল্লাহর চরম কর্তৃত্বশালী অবস্থান পুন প্রতিষ্ঠা করেন। যাহাতে মানুষের জন্য একমাত্র কর্তব্য-কর্ম হইতেছে ভক্তি, আদেশ পালন, 'ইবাদত ও তাঁহাকে অনুসরণ করা।

ইক'বাল এবং আযাদ উভয়েই গু'লাম আহমাদ পারবেয-এর চিন্তাধারার উপর প্রভাব বিস্তার করেন। ইহার আধুনিকতাবাদ, মোটের উপর ইহলোক সংশ্লিষ্ট ও বাস্তব, কিন্তু কু'রআনের শব্দাবলীর এক অ-গ্রহণযোগ্য অসংযততা ও দূরাগত সম্ভাবনাময় ব্যাখ্যার উপর ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যার কারণে আধুনিকতাবাদী নেতৃবৃন্দের উপর তাঁহার প্রভাব অতি নগণ্য।

ভারত আধুনিক ইসলামের বুদ্ধিজীবী ইতিহাসের এই বৈশিষ্ট্যগুলি মুসলিম উচ্চ শ্রেণীর সামাজিক আধুনিকায়নের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে, বিশেষত ১৯৪৭ খৃ. পর্যন্ত। শুধু উক্ত সময়ের পরই পাকিস্তানে পাশ্চাত্যকরণ ও প্রাচীনপন্থীগণের মধ্যে মহাবিতর্ক শুরু হয় এবং তাহা এখনও পর্যন্ত বর্তমান। সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে পাকিস্তানে আধুনিকায়ন যে অগ্রগতি লাভে সমর্থ হইয়াছে তাহা যথেষ্ট বিস্তৃত নয়। ইহার ব্যাপ্তি একমাত্র মুসলিম পারিবারিক আইনের পর্যালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ যাহার দ্বারা বহু বিবাহকে সামান্য পরিমাণে অধিকতর কঠিন এবং বিবাহ-বিচ্ছেদকে সামান্য পরিমাণে কম সহজতর করিয়া তুলিয়াছে। যে বিশেষ শ্রেণীটি পাকিস্তান সৃষ্টিতে নেতৃত্ব দেয় এবং তাহার পর হইতে ইহা শাসন করিতেছে, তাহারা সার্বিকভাবে আধুনিকতাপন্থী ও পাশ্চাত্যপন্থী। ইহাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার দিক হইতেও ইহারা পাশ্চাত্যপন্থী, কিন্তু রাজনীতিতে এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নে আধুনিকতাবাদ অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রাচীনপন্থীগণের চাপের সম্মুখীন। প্রধানত এই চাপের মূল উৎস হইতেছে আবু'ল-আ'লা মাওদূদীর ইসলামী আন্দোলন।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) আবু ত'ালিব খান-এর জন্য, Storey, ১/২ খ. ৮৭৮-৯; (২) সায়্যিদ আহমাদ খান, খুত'বাত-ই আহমাদিয়্যা, আগ্রা ১৮৭০ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, তাফসীরু'ল-কু'রআন, লাহোর ১৮৮০-১৮৯৫ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, ইয়ালাতু'ল-গায়ন 'আন যু'ল-কারনায়ন, আগ্রা ১৮৯০ খৃ.; (৫) ঐ লেখক, তারকীম ফী কিসসা আসহাবি'ল-কাহ্ফ ওয়ার-রাকীম, আগ্রা ১৮৯০ খৃ.; (৬) ঐ লেখক, লেকচার (বক্তৃতাবলী), সাধোরা ১৮৯২ খৃ.; (৭) ঐ লেখক, আত-তাহ'রীর ফী উসূলি'ত-তাফসীর, আগ্রা ১৮৯২ খৃ.; (৮) ঐ লেখক, ইবতাল-ই গু'লামী, আগ্রা ১৮৯৩ খৃ.; (৯) এ লেখক, তাসানীফ-ই আহ'মাদিয়্যা, আগ্রা ১৯০৩ খৃ.; (১০) ঐ লেখক, মাকালাত (রচনা সমগ্র), লাহোর ১৯৬২ খৃ.; (১১) ঐ লেখক (সম্পা.), তাহযীবু'ল-আখলাক (সংগৃহীত পুনমুদ্রণ), লাহোর n. d.; (১২) চিরাগ 'আলী, রাসা'ইল, হায়দরাবাদ ১৯১৮-১৯ খৃ.; (১৩) ঐ লেখক (চিরাগ 'আলী), The Proposed political, legal and social reforms in the Ottoman Empire and other Mohammedan states, বোম্বাই ১৮২৩ খৃ.; (১৪) ঐ লেখক, A critical exposition of popular Jehad, কলিকাতা ১৮৮৫ খৃ.; (১৫) আমীর 'আলী, The ethics of Islam, কলিকাতা ১৮৯৩ খৃ.; (১৬) ঐ লেখক, The Spirit of Islam, লণ্ডন ১৯২২ খৃ.; (১৭) আলতাফ হু'সায়ন হা'লী, মুসাদ্দাস মাদ্দ ওয়া জাযর-ই ইসলাম, দিল্লী ১৮৭৯ খৃ.; (১৮) মুহাম্মাদ ইক'বাল (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী, s. v. ইক'বাল); (১৯) আবু'ল-কালাম আযাদ, তারজুমানুল-কু'রআন, লাহোর ১৯৬১ খৃ.; (২০) ঐ লেখক, বাকিয়াত-ই তারজুমানু'ল-কু'রআন, লাহোর ১৯৬১ খৃ.; (২১) ঐ লেখক, 'উরূজ ওয়া যাওয়াল কা কুরআনী দাসতূর, লাহোর ১৯৬৪ খৃ.; (২২) গু'লাম আহ'মাদ পারওয়িয (পারবেয, মি'রাজ-ই ইনসানিয়াত, করাচী ১৯৪৯ খৃ.; (২৩) ঐ লেখক, ইসলামী নিজ'াম, করাচী ১৯৪২ খৃ.; (২৪) ঐ লেখক, সালীম কে নাম, করাচী ১৯৫৩ খৃ.; (২৫) ঐ লেখক, নিজ'াম-ই রুবূবিয়্যাত, করাচী ১৯৫৪ খৃ.; (২৬) ঐ লেখক, তাকদীর-উমাম, করাচী ১৯৫৭ খৃ.; (২৭) ঐ লেখক, লুগাতু'ল-কু'রআন, লাহোর ১৯৬০-৬১ খৃ.; (২৮) ঐ লেখক, Islam : a challenge to religion, লাহোর ১৯৬৮ খৃ.; (২৯) ঐ লেখক, A.A.A. Fyzee, A modern approach to Islam, বোম্বাই ১৯৬৩ খৃ.; (৩০) Wilfred Cantwell Smith, Modern Islam in India, লণ্ডন ১৯৬৪ খৃ.; (৩১) Aziz Ahmad, Islamic Modernism in India and Pakistan, ১৮৫৭-১৯৬৪ খৃ., লণ্ডন ১৯৬৭ খৃ.; (৩২) Freeland Abbott, Islam in Pakistan, ইথাকা ১৯৬৮ খৃ.; (৩৩) Aziz Ahamd and G. E. von Grunebaum, Muslim self-statement in India and Pakistan, ১৮৫৭-১৯৬৮ খৃ., wiesbaden ১৯৭০ খৃ.; (৩৪) L. Binder, Religion and politics in Pakistan, বার্কলে ১৯৬১ খৃ.; (৩৫) S. M. Ikram, Modern Muslim India and the birth of Pakistan, লাহোর ১৯৬৫ খৃ.; (৩৬) J. M. S. Baljon, Modern Muslim Koran interpretation, ১৮৮০-১৯৬০ খৃ., লাইডেন ১৯৬১ খৃ.; (৩৭) ঐ লেখক, The Reforms and religious ideas of Sir Sayyid Ahmad Khan, লাইডেন ১৯৪৯ খৃ.; (৩৮) Bashir Ahmad Dar, Religious thought of Sayyid Ahmad Khan, লাহোর ১৯৫৭ খৃ.; (৩৯) Shahid Husayn Razzaki, Sir Syyid awr Islah-i muashara, লাহোর ১৯৬৩ খৃ.; (৪০) হালী, হায়াত-ই জাবীদ, কানপুর ১৯০১ খৃ.; (৪১) K. K. Aziz, Ameer Ali " his life & work, লাহোর ১৯৬৮ খৃ.; (৪২) S. M. Ikram, Mawdj-i Kawthar, লাহোর ১৯৫৮ খৃ.; (৪৩) J.N. Farquhar, Modern religious movements in India, লণ্ডন ১৯২৪ খৃ.।

Aziz Ahmad (E.I.[2])/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

**আল-ইসলাহ** (الإصلاح) ঃ বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন সাহিত্য পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ/ ১৯৩২ খৃ.। প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ নূরুল হক। কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট কর্তৃক প্রকাশিত। আল-ইসলাহ্-এর এক দশক উপলক্ষে ১৯৪২ সালের ১১ জুলাই প্রীতি সম্মেলনীর আয়োজন করা হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আল-ইসলাহ্-এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। (১৯৮২ খৃ.)। ১৯৮৪ সালের

এপ্রিল মাসে এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। এই পঞ্চাশ বৎসর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিয়া মুহম্মদ নূরুল হক ২-৯-১৯৮৭ খৃ. তারিখে ইন্তিকাল করেন। কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের ৬০তম বার্ষিকী পালন উপলক্ষেও আল-ইসলাহ-এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় (১৯৯৬ খৃ.)। মুহম্মদ নূরুল হকের মৃত্যুর পর রাগিব হোসেন চৌধুরী আল-ইসলাহ সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। এখনও তিনি ইহার প্রধান সম্পাদক। হযরত শাহ জালাল (র)-এর সিলেট আগমনের সাত শত বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট আল-ইসলাহ শাহ জালাল (র) সংখ্যা প্রকাশ করে। ইহার প্রচ্ছদ ছিল নিম্নরূপ ঃ

১৩৬৪ বাংলা সনে আল-ইসলাহ শাহ জালাল (র) সংখ্যা প্রথম প্রকাশিত হয়। আল-ইসলাহ পত্রিকায় মুসলিম চিন্তা-চেতনা (সিলেট ২০০০ খৃ.) ও আল-ইসলাহ পত্রিকার লেখক ও রচনাসূচি (সিলেট ২০০০ খৃ.) লিখিয়াছেন অধ্যাপক নন্দলাল শর্মা। গবেষণা জগতে আল-ইসলাহ পত্রিকার অবদান। বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) রব্বানী চৌধুরী সাম্পা., সিলেট বিভাগের গবেষক ও গবেষণা-২, ঢাকা ২০০৫ খৃ. ; (২) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, জালালাবাদের কথা সম্পা. ঢাকা ১৯৯৭ খৃ.; (৩) সৈয়দ মোস্তাফা কামাল, সিলেট বিভাগের পরিচিতি, সিলেট ২০০০, ২০০২, ২০০৪; (৪) ডাঃ রাগিব হোসেন চৌধুরী, সিলেটের শতবর্ষের ঐতিহ্য, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, লণ্ডন ২০০৪ খৃ.।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

**ইস্‌লি (Isly)** ঃ আলজিরিয়া ও মরক্কোর মধ্যবর্তী সীমান্তের একটি নদী। তাফনা নদীর বাম উপকূলের উপর দিয়া প্রবাহিত ইহা একটি উপনদী। ইহার নিজস্ব তেমন কোন গুরুত্ব নাই। তবে আলজিরিয়া ও মরক্কোর মধ্যবর্তী পূর্ব-পশ্চিম পথের প্রতিবন্ধক হওয়ার ফলে নদীটি অসংখ্য যুদ্ধের রণক্ষেত্র হিসাবে বিখ্যাত। এখানে ৬৪৮/১২৫০ ও ৬৭০/১২৭১ সালে মারীনী ও 'আবদুল-ওয়াদ বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহা ছাড়া Marshal Bugeaud-এর নেতৃত্বে ফরাসী বাহিনীর এবং সুলতান মাওলায় 'আবদুর-রাহ্‌মানের পুত্র মাওলায় মুহাম্মাদের নেতৃত্বে মরক্কো বাহিনীর মধ্যকার যুদ্ধটি এখানেই সংঘটিত হয়। বুগেদের বাহিনীতে ছিল দশ হাজার সৈন্য এবং মরক্কো বাহিনীতে ছিল ত্রিশ হাজার সৈন্য। মরক্কো বাহিনীর দুই-তৃতীয়াংশের বেশী সৈন্য ছিল উপজাতীয় অশ্বারোহী। এই যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশটি সংঘটিত হয় নদীটির দক্ষিণ তীরে ১৮৪৪ সালের ১৪ আগস্টের ভোর বেলায়। কিন্তু দক্ষ রণকৌশল ও সামরিক সুশৃঙ্খলার কারণে ফরাসী বাহিনী অল্প সময়ের মধ্যে মরক্কোর সাহসী অথচ বিশৃঙ্খল ও অসংগঠিত অশ্বারোহী বাহিনীকে পরাভূত করিয়া ফেলে। ইহার ফলে প্রায় সমগ্র মরক্কো শিবির ফরাসীদের হাতে আসিয়া পড়ে। এই বিজয়ের জন্য বুগেদকে ডিউক অব ইস্‌লি উপাধি প্রদান করা হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) আন-নাসিরী আস-সালাবী, ইসতিকসা, সং. কায়রো, ৪খ., ১৯৬-৮ (অনু. In Am, X, 167-171); প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ঃ (২) Leon Rochc, Trentedeux ans travers L'Islam, Paris 1885, ii, 396-407; (৩) General du Barail, Mes souvenirs, Paris 1894, i, 236-55; (৪) Marshal de Castellaue, Campagnes d'Afrique, Paris 1898, 371-5; (৫) Ph. de Cosse-Brissac, Les rapports de la France et du Maroc pendant la conquete de P Algerie, Paris 1931; (৬) Ch. A. Julien, Histoire de l'Algerie Contemporaine, Paris 1964, i, 198-9.

R. Le. Turneau (E.I.[2])/আ. খ. ম. আবদুর রব

**ইস্‌হাক 'আলায়হিস-সালাম** (اسحاق عليه السلام) ঃ একজন বিশিষ্ট নবী, হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-এর পুত্র [তিনি হযরত ইসমা'ঈল ('আ) হইতে বয়সে ১৩/১৪ বৎসরের ছোট ছিলেন], যাঁহার জন্মের সুসংবাদ ইবরাহীম (আ) ও তাঁহার স্ত্রীকে বৃদ্ধ বয়সে দেওয়া হইয়াছিল। হিবরূন (অপর নাম আল-খালীল)-এ তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া অনুমান করা হয়, যেখানে হযরত ইবরাহীম ('আ) মিসর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বসবাস শুরু করেন (ইব্‌ন খাল্‌দূন, ১খ, ৫২)। ইস্‌হাক শব্দটির 'ইবরানী (হিব্রু) উচ্চারণ হইল য়াসহাক (يصحك)। আর য়াসহাক শব্দটির 'আরবী সমার্থক শব্দ হইল য়াদহাক (يضحق)। হিব্রু ভাষায় ض অক্ষরের ব্যবহার নাই। সেইজন্য উহাতে ض-এর পরিবর্তে ص-এর ব্যবহার করা হইয়াছে; আর ق ك উচ্চারণের দিক হইতে খুবই কাছাকাছি। এই ভিত্তিতে 'ইসহাক' তাঁহার মাতার রাখা নাম। হযরত সারা বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ তা'আলা আমাকে হাসাইলেন (তাসহাক) এবং আমার সহিত যাহারা ইহা শ্রবণ করিবে তাহারাও হাসিবে" (বাইবেল, আদি পুস্তক, ২১ ঃ ৭)। কুরআন কারীমে উল্লিখিত হইয়াছে "وَامْرَاَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ "তখন তাহার স্ত্রী দাঁড়াইয়াছিল এবং সে হাসিল" (১১ ঃ ৭১)। অর্থাৎ হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-কে যখন হযরত ইসহাক-এর জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তাঁহার স্ত্রী হযরত সারা যিনি নিকটেই দণ্ডায়মান ছিলেন, খুশীতে হাসিতে লাগিলেন।

ইংরেজী ভাষায় ইসহাক-কে Issac (আইজাক) নামে অভিহিত করা হইলেও প্রাচ্যবিদদের এই ধারণা সঠিক নহে যে, তাওরাতেও ইসহাক ('আ)-এর এই নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইসরাঈলী রিওয়ায়াত (কাহিনী)-এ উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি "ঈদু'ল-ফাসহ"-এর দিন জন্মগ্রহণ করেন। আর ইসলামী রিওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি 'আশূরা'-র রাত্রে জন্মগ্রহণ করেন (দ্র. আছ-ছা'লাবী, পৃ. ৬০; আল-কিসা'ঈ, পৃ. ১০০)। প্রকৃতপক্ষে ইহার কোনটিই ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত হয় না। অবশ্য বাইবেলের আদিপুস্তক ৪৫ অনুচ্ছেদে এতটুকু উল্লেখ আছে যে, হযরত ইসহাক ('আ)-এর জন্মের এক বৎসর পূর্বে হযরত সারাকে তাঁহার জন্মের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ইসরাঈলী রিওয়ায়াতে উল্লিখিত আছে যে, হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) ক্ষুধার্ত ও অসহায় মানুষকে আহার না করাইয়া নিজে খাদ্য গ্রহণ করিতেন না। একবার পনের দিন পর্যন্ত কোনও মেহমান আসিল না। অতঃপর একদিন তিনজন অপরিচিত লোক আসিয়া হাযির হইলেন। হযরত ইবরাহীম ('আ) তাঁহাদের জন্য একটি ভুনা গো-বৎস লইয়া আসিলেন। তাহারা বলিলেন, আমরা মূল্য পরিশোধ না করিয়া কোন কিছু খাইব না। আর সে মূল্য হইল, প্রথমে আমরা আল্লাহ্‌র নি'মাতের শোকর আদায় করিব এবং শেষে তাঁহার প্রশংসা করিব। অবশেষে তাঁহারা তাঁহাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন। কুরআন কারীমেও এই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। তবে কিছুটা ভিন্নভাবে ঃ

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ. فَلَمَّا رَاٰ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ . وَامْرَاَتُهٗ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ. (১১ঃ৬৯-৭১)

আরো বলা হইয়াছে ঃ

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ . اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ . فَرَاغَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ . فَقَرَّبَهٗ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ . فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ (৫১ ঃ ২৪-২৮).

এইসব আয়াতের সারমর্ম হইল ঃ হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-এর নিকট কিছু সম্মানিত মেহমান আসিলেন। তিনি তাঁহাদের জন্য একটি ভুনা গো-বৎস লইয়া আসিলেন এবং তাহাদিগকে খাইতে বলিলেন, কিন্তু তাহারা হাত গুটাইয়া রাখিলেন। ইহাতে ইবরাহীম ('আ) কিছুটা ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বলিলেন, ভয় করিবেন না। আমাদিগকে লূত ('আ)-এর মহল্লায় প্রেরণ করা হইয়াছে।" ইহার পর তাঁহারা হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-কে একটি পূত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন অর্থাৎ হযরত ইসহাক ('আ)-এর, যাঁহার নামও সূরা হূদ-এ স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং রিওয়ায়াতের কথা বাদ দিলে (সেই রিওয়ায়াত ইসরাঈলী হউক অথবা কিছু সংখ্যক জীবন-চরিত রচয়িতা মুসলমানদের হউক, যেমন আছ-ছা'লাবী ও আল-কিসা'ঈ ভুলক্রমে উহা গ্রহণ করিয়াছেন) হযরত ইসহাক ('আ)-এর জন্ম সম্পর্কে কুরআন কারীমের বিবরণই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে সঠিক। প্রাচ্যবিদগণ মাদরাশ (R. Gen., ৫৫; Tanchuma Gen., ৪০)-এর কোন কোন বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, সেই মেহমানগণ হযরত ইবরাহীম ('আ)-কে ইহাও বলিলেন যে, ইহাকে আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করিবার নিমিত্ত যাব্‌হ করিতে হইবে—এই বর্ণনা সঠিক নহে। অনুরূপভাবে এই বর্ণনা যে, ইসহাক ('আ)-এর বয়স সাত বৎসর হইলে ইবরাহীম ('আ) তাঁহাকে বায়তু'ল-মাকদিস লইয়া যান। সেখানে তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল যে, উহাকে আল্লাহ্‌র রাহে কুরবানী কর। সকালে তিনি একটি ষাঁড় আল্লাহ্‌র নামে যাব্‌হ' করিলেন; কিন্তু রাত্রে পুনরায় গায়েব হইতে আওয়ায আসিল, "আল্লাহ্ ইহার চাইতে অধিক মূল্যবান বস্তুর কুরবানী চাহেন।" সুতরাং তিনি এইবার একটি উট যাব্‌হ' করিলেন। পরের রাত্রে তিনি এই আওয়ায শুনিলেন যে, আল্লাহ তোমার পুত্রের কুরবানী চাহেন। প্রাচ্যবিদগণ উপরিউক্ত ঘটনাকে ইসহাক' ('আ)-এর সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া ধারণা করত তাঁহাকে যাবীহুল্লাহ (আল্লাহর নামে কুরবানীকৃত) বলিয়া আখ্যায়িত করেন। অথচ তাওরাত ও কুরআন কারীম-এর বর্ণনা দ্বারা এই উভয় রিওয়ায়াতই খণ্ডিত হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে যাবীহুল্লাহ কে এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. ইসমাঈল ('আ) শিরো.।

হযরত ইসহাক ('আ)-এর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। ইসরাঈলী রিওয়ায়াতও বেশীর ভাগই যাব্‌হ-এর ঘটনায় পরিপূর্ণ। অনুমান করা হয় যে, চল্লিশ বৎসর বয়সে রিফাকা (Rebecca)-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় (আল-য়া'কূ'বী, তা'রীখ, ১খ, ২৮)। কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত কোন সন্তান হয় নাই। অবশেষে বিশ বৎসর পর 'ঈস্‌) (বা 'ঈস) এবং য়া'কূব নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে (প্রাগুক্ত বরাত, পৃ. ২৯ এবং ইব্‌ন খালদূন, ১খ, ৫৮)। উভয়েই ছিলেন যমজ। বলা হইয়া থাকে যে, প্রথমত 'ঈসু'র জন্ম হয় এবং পরে য়া'কূব-এর। রিওয়ায়াতে উল্লিখিত আছে যে, আজীবন উভয়ের মধ্যে কিছুটা মন কষাকষি ছিল। পিতা অনেকটা হযরত য়াকূবের দিকে আকৃষ্ট ছিলেন। আর মাতা ছিলেন 'ঈসু (বা 'ঈস')-এর দিকে। এইসব কাহিনীর উপর গুরুত্ব দেওয়া সঙ্গত নহে। কারণ ইস্‌রাঈলী কাহিনী বানূ ইসরাঈল-এর নবীগণকে তাহাদের নিজেদেরই জীবনধারার আলোকে মূল্যায়ন করিয়াছে। কিছু সংখ্যক মুসলিম ঐতিহাসিক ও জীবন-চরিত রচয়িতাও নির্বিচারে সব ধরনের রিওয়ায়াতই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান আদৌ করেন নাই, করিলেও খুবই অল্প। য়াহূদী বিশ্বকোষ Jawish Eneyclopaedia-তে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইসহাক ('আ)-এর বাসস্থান লাহায়রো Lahai-roi) নামক 'বি'র' (কূপ) অঞ্চলে। যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে মিসর না যাইতে ইঙ্গিত করিলেন এবং ফিলিস্তীনের সীমানায়ই অবস্থান করিতে বলিলেন। আরও বলিলেন যে, সেখানে তিনি এবং তাঁহার সন্তান-সন্তুতি খুবই সুখে-শান্তিতে বসবাস করিবে। তাই হযরত ইসহাক ('আ) জিওয়ার (Gera)-এর সন্নিকটে ফিলিস্তীনীদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন এবং সেইখানেই চাষাবাদ করিতে থাকেন। সেখানে ধীরে ধীরে তিনি এতই উন্নতি লাভ করেন যে, ফিলিস্তীনবাসী তাঁহার প্রতি হিংসা করিতে লাগিল। কিন্তু হযরত ইসহাক ('আ) তাহাদের এই দুর্ব্যবহার প্রফুল্ল চিত্তে বরদাশত করিতেন। অবশেষে তিনি "বির'স-সাব'আ (Beer Shcba)" চলিয়া যান। সেইখানে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁহাকে বরকত দেন। এইখানেই হযরত ইসহাক ('আ) একটি ইবাদতখানা (বায়ত ঈল-আল্লাহ্‌র ঘর) নির্মাণ করেন। ইহার পর তিনি এতই প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করেন যে, ফিলিস্তীনের বাদশাহ্‌ও তাঁহার সহিত সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হন। ইসরাঈলী কাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, হযরত ইসহাক ('আ)-এর বৃদ্ধ জীবন বেশী সুখে অতিবাহিত হয় নাই। তাঁহার চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং পুত্রগণ অর্থাৎ 'ঈসু' (বা 'ঈস) এবং হযরত য়া'কূবের বিরূপ সম্পর্ক লইয়াও চিন্তিত ও মনক্ষুণ্ন থাকিতেন। তিনি হিবরূন ('আল-খালীল)-এ ইনতিকাল করেন। তিনি খুবই দীর্ঘ জীবন লাভ করেন এবং হিবরূনেই হযরত ইবরাহীম ('আ) ও হযরত সারা (রা)-র পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) আয-যামাখশারী, ১খ, ২২৪; (২) আল-বায়দা'বী, ১খ., ২৩৩; (৩) আছ-ছা'লাবী, কিসা'সু'ল-আম্বিয়া', কায়রো ১৩১২ হি., ৪৮-৬০; (৪) আল-কিসাঈ, কিসাসু'ল-আম্বিয়া', পৃ. ১৩৬-১৪০; (৫) আত-তা'বারী, লাইডেন সং, ১খ, ২৭২-২৯২; (৬) ইব্‌নু'ল-আছীর, ১খ, ৮৭-৮৯; (৭) Grunbaum, Beitrage, পৃ. ১১০-১২০; (৮) Eisenberg, Abraham in der Legende, arab., ১৯১২ খৃ., পৃ. ৩০-৩১; (৯) Encyclop. Hebrew, নিউইয়র্ক, ৫খ, ১৮, Isace শিরো.; (১০) Jewish Encyclop., শিরো; (১১) আল-য়া'কূবী, তা'রীখ, বৈরূত; (১২) ইব্‌ন খালদূন, তা'রীখ, ১ম খণ্ড., মিসর ১৯৩০ খৃ.; (১৩) 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব আন-নাজ্জার,

কিসাসু'ল-আম্বিয়া', কায়রো, ৩য় সং, ১৯৫৩ খৃ.; (১৪) E.I.[2] ৪খ., ১০৯-১০।

সায়্যিদ নাযীর নিয়াযী (দা. মা. ই.)/ ড. আবদুল জলীল

**ইস্‌হাক ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ** (اسحاق بن عبد الله) ঃ আল-আনসারী আন-নাজ্জারী জনৈক আনসারী মুহাদ্দিছ ও তাবি'ঈ। বানূ নাজ্জার গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। বংশতালিকা এইরূপ ঃ ইস্‌হাক ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন আবী তালহা যায়দ ইব্‌ন সাহল ইবনু'ল-আসওয়াদ ইব্‌ন হিযাম ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মানাত ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌ন মালিক ইব্‌নু'ন-নাজ্জার। বিশ্বস্ত সূত্রে তাঁহার জন্মতারিখ পাওয়া যায় না। পিতা 'আবদুল্লাহও একজন প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ ছিলেন। মাতার নাম সালামা বিন্‌ত রিফা'আ। পিতামহ আবূ তালহা (রা) একজন খ্যাতনামা সাহাবী। প্রসিদ্ধ মহিলা সাহাবী উম্ম সুলায়ম (রা) তাঁহার পিতামহী। তাঁহারা দশ ভাই ছিলেন। প্রত্যেকেই 'আলিম হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। সম্ভবত ইহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দু'আর ফল। বর্ণিত আছে যে, তাঁহার পিতা 'আবদুল্লাহ মাতৃদুগ্ধ পরিত্যাগ করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার শিশুর তাহ্‌নীক (শিশুকে প্রথম আহার প্রদান) করিয়াছিলেন এবং বরকতের দু'আ করিয়াছিলেন। ইসহাক মদীনায় তাঁহার দাদার বাড়ীতে বসবাস করিতেন। তাঁহার পারিবারিক নাম ছিল য়াহ্‌য়া, কাহারও মতে আবূ নুজায়হ। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তিনি আত-তুফায়ল ইব্‌ন উবায়্যি ইব্‌ন কা'ব, আবূ সালিহ, 'আবদু'র রাহমান ইব্‌ন আবী 'আমরা, 'আলী ইব্‌ন য়াহ্‌য়া ইব্‌ন খাল্লাদ আল-আনসারী, আবূ মুর্‌রা ও স্বীয় পিতার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। দশ ভাইয়ের মধ্যে তিনিই ছিলেন অন্যতম প্রধান মুহাদ্দিছ। হাদীছ সমালোচকগণ একবাক্যে তাঁহার নির্ভরযোগ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। ওয়াকিদী বর্ণনা করেন যে, ইমাম মালিক (র) তাঁহার উপর অন্য কাহাকেও প্রাধান্য দিতেন না। ইব্‌ন মু'ঈন, আবূ যুর'আ, আবূ হাতিম ও ইমাম নাসাঈ তাঁহাকে একজন শক্তিশালী রাবী হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। য়াহ্‌য়া ইব্‌ন সা'ঈদ আল-আনসারী, য়াহ্‌য়া ইব্‌ন আবী কাছীর, আল-আওযা'ঈ, মালিক ইব্‌ন আনাস, 'আবদু'ল-'আযীয, সুফ্‌য়ান ইব্‌ন 'উয়ায়না, হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা প্রমুখ মুহাদ্দিছ তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। সাহীহ বুখারী ও মুসলিম-এ তাঁহার বর্ণিত হাদীছ স্থান পাইয়াছে। তিনি ১৩২ বা ১৩৪ হি. সালে ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্‌ন হিব্বান, কিতাবুছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ., ২৩; (২) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, আত-তারীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ১খ, ৩৯৩; (৩) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৫ হি., ১খ., ২৩৯, ২৪০; (৪) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ১খ, ৫৯; (৫) মুহয়ি'দ-দীন শায়খ আন-নাওয়াবী, তাহযীবু'ল-আসমা' ওয়া'ল-লুগাত, মিসর তা. বি., ১ম ভাগ, ১খ, ১১৬, ২৭৩; (৬) ওয়ালিয়্যু'দ-দীন মুহাম্মাদ আল-খাতীব, আল-ইক্‌মাল ফী আসমাইর-রিজাল (মিশ্‌কাতু'ল-মাসাবীহ-এর সহিত সংযোজিত), দিল্লী তা. বি., পৃ. ৫৮৬; (৭) 'আবদু'র-রাহমান আল-মুবারাকপুরী, মুকাদ্দিমা তুহফাতি'ল-আহওয়াযী, বৈরূত তা. বি., ২৫৪।

আবুল বাশার মু. সাইফুল ইসলাম

**ইসহাক ইব্‌ন আবী ইসহাক আল-মালাবী** (اسحاق بن ابی إسحاق المالوی) ঃ আশ-শায়খ আল-কাদী, একজন ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ, সুবিজ্ঞ 'আলিম এবং চিশ্‌তিয়া সূফী তারীকার খ্যাতনামা শায়খ। সম্ভবত তিনি মালবের কাদীও ছিলেন। মালবের তদানীন্তন শাসক 'আলাউদ-দীন মাহমূদ শাহ আল-মালাবী ইসহাক-এর একজন ভক্ত মুরীদ ছিলেন এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে বিজয় লাভের জন্য তাঁহার দু'আ ও শুভেচ্ছা কামনা করিতেন। কাদী ইসহাক-এর জন্ম ও মৃত্যুতারিখ অজ্ঞাত, তবে গুলযার-ই আব্‌রার-এর বর্ণনামতে তিনি 'আলাউদ-দীন মাহমূদ-এর শাসনামলে ইনতিকাল করেন।

'আলাউদ-দীন মাহমূদ শাহ হি. ১৪৩৬ হইতে ১৪৬৯ সাল পর্যন্ত মালবের শাসক ছিলেন। এই হিসাবে কাদী ইসহাক সম্ভবত পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) শারীফ 'আবদুল-হায়্যি আল-হাসানী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ৩খ, ২৮-২৯, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ আল-'উছমানিয়্যা, হায়দরাবাদ, ভারত, ১ম সং. ১৯৫১ খৃ.; (৩) গুলযার-ই আব্‌রার।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

**(শায়খ) ইসহাক ইব্‌ন 'আলী** (الشيخ اسحاق بن علی) ঃ ইব্‌ন ইসহাক আদ্-দিহ্‌লাবী আল-বুখারী (মৃ. ৬৯০/১২৯১), একজন বিজ্ঞ ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ, সূফী সাধক ও বহু গ্রন্থ রচয়িতা। তাঁহার বংশতালিকা 'আলী (রা)-র সহিত সংযুক্ত এবং সম্ভবত তাঁহার পিতামহ বুখারা হইতে দিল্লীতে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁহার পিতাও একজন সুখ্যাত 'আলিম ছিলেন এবং তাঁহার উপাধি ছিল মিন্‌হাজু'দ-দীন। শায়খ ইস্‌হাক দিল্লীতেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মতারিখ অজ্ঞাত। দিল্লীতে পিতার নিকট তিনি ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। দিল্লীর মু'ইয্‌যিয়া মাদ্‌রাসায় বহুদিন অধ্যয়ন করিয়া তিনি ইসলামী বিষয়সমূহে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। শিক্ষা সমাপন করিয়া সম্ভবত পূর্বপুরুষদের আবাসভূমি দর্শনের উদ্দেশ্যে বুখারা যাত্রা করেন। পথিমধ্যে আজুধান (اجودهن)-এর তাপসপ্রবর শায়খ ফারীদু'দ-দীন মাস্‌'উদ-এর আধ্যাত্মিক গুণ-গরিমার খ্যাতির কথা শুনিয়া তিনি তথায় গমন করেন এবং শায়খ-এর গুণমুগ্ধ ভক্তে পরিণত হন। মুর্শিদের নির্দেশে তিনি দীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করিয়া 'ইলমে মা'রিফাতে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। শায়খ ইস্‌হাকের অসাধারণ ধর্মীয় নিষ্ঠা ও চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া শায়খ ফারীদ স্বীয় কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন এবং তাঁহাকে স্বীয় খিরকা দান করিয়া তাসাওউফের উচ্চ মর্যাদায় সম্মানিত করেন। শায়খ ফারীদ তাঁহার বিভিন্ন মুরীদকে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করিতেন, এই রীতি অনুযায়ী তিনি শায়খ ইসহাককেও কোন অঞ্চলে পাঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি স্বীয় মুরশিদের এত অনুরক্ত ছিলেন যে, তাঁহার সঙ্গবিচ্ছেদে তিনি রাযী হইতে পারেন নাই এবং আজীবন তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। তাঁহার এই ঐকান্তিক মনোবাসনা পূর্ণ করা হয় এবং ৬৯০/১২৯১ সালে ইনতিকালের পর আজুধান শহরে তাঁহার মুরশিদের কবরের পার্শ্বেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য যে, আজুধান শহরের বর্তমান নাম পাক-পাটান। ইহা পাঞ্জাবের শাহীওয়াল জিলা (সাবেক মন্টেগোমারী) হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতাসহ শায়খ ইস্‌হাক ছিলেন একজন বিজ্ঞ ফাকীহ, কবি এবং অতি সরল প্রকৃতির সূফী

সাধক। তিনি এত আল্লাহ্‌ভক্ত ছিলেন এবং এত ক্রন্দন করিতেন যে, অত্যধিক অশ্রুস্রোতে তাঁহার চক্ষে ক্ষত হইয়াছিল। দানশীলতার জন্য তাঁহার খ্যাতি ছিল। জ্ঞানবত্তা, ধর্মনিষ্ঠা ও চারিত্রিক মাধুর্যের জন্য তিনি বাদ্‌রু'দ-দীন (ধর্মের পূর্ণচন্দ্র) উপাধিতে ভূষিত হন।

তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আস্‌রারু'ল-আওলিয়া' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে তিনি স্বীয় মুর্‌শিদের উপদেশাবলী সংকলন করিয়াছেন। 'আরবী ব্যাকরণের (صـــرف) সূত্র সম্বলিত তাঁহার একটি 'আরবী কবিতার পুস্তকও রহিয়াছে। ৬ জুমাদা'ল-উখ্‌রা, ৬৯০/১২৯১ সালে শায়খ্‌ ইস্‌হাক ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** : (১) 'আবদু'ল-হায়্যি আল-হাসানী, নুয্‌হাতু'ল-খাওয়াতির, ১ম সং, ১খ, পৃ. ১২৪-২৫, দাইরাতু'ল-মা'আরিফি'ল-'উছমানিয়্যা, হায়দরাবাদ ১৯৪৭ খৃ.।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

## ইস্‌হাক ইব্‌ন ইবরাহীম আল-মাওসিলী (اسحـــاق بن ابراهيم الموصلى)

: ইবরাহীম আল-মাওসিলী (দ্র.)-এর পুত্র এবং পিতার মতই তাঁহার সময়ের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ, ১৫০/৭৬৭ সনে রায় নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং রামাদান ২৩৫/আগস্ট ৮৫০ সনে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। তিনি হুশায়ম ইব্‌ন 'বুশায়র, আল-কিসাঈ, আল-ফার্‌রা', আল-আস্‌মা'ঈ এবং আবূ 'উবায়দা প্রমুখ মনীষীর অধীনে কুরআন, হাদীছ এবং আদাব অধ্যয়নের মাধ্যমে অত্যুৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন তাঁহার পিতা, তাঁহার বিবাহ সম্পর্কিত ভাই (মতান্তরে পিতৃব্য) যালযাল এবং 'আতিকা বিন্‌ত শু'বা (মতান্তরে সুহৃদা)। তাঁহার কণ্ঠস্বর চমৎকার ছিল এবং তিনি উচ্চ স্বরলহরী ও কণ্ঠস্বরের (তাখ্‌নীছ) ব্যবহার করিতেন; তিনি শ্রেষ্ঠ গীতিকারও ছিলেন। তিনি খলীফা হারূন হইতে আরম্ভ করিয়া আল-মুতাওয়াক্কিল পর্যন্ত সকল খলীফা, বিশেষভাবে আল-ওয়াছিক কর্তৃক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেন। আল-মা'মূন তাঁহাকে ফাকীহ-এর পোশাক পরিধান করার অনুমতি দান করেন এবং তাঁহাকে 'উলামা'র সমমর্যাদা দেন (দ্র. আল-কালী, আমালী[১], ৩খ., ৯০)। ইবরাহীম ইবনু'ল-মাহদী (দ্র.)-এর মতবাদের অনুসারী আধুনিকতাবাদীদের সহিত হিজাযের সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্তদের বিরোধের ক্ষেত্রে ইসহাক পুরাতন ধারার একজন ঘোর সমর্থনকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং ইহার সঙ্গীত রীতিকে নিয়মানুবর্তী করেন। প্রাচীন কবিতার প্রতিও তিনি অনুরূপ অনুরাগ প্রদর্শন করেন যাহার ভাষারীতি ও বিষয় তিনি তাঁহার নিজের কবিতায় অনুসরণ করেন। অন্যদিকে আবূ তাম্মাম এবং আবূ নুওয়াসের মত আধুনিক কবিদের তিনি সমালোচনা করেন। তিনি একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন এবং যখন ভ্রমণ করিতেন তখন অনেক বইপুস্তক সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তিনি ভাষাতত্ত্ববিদ ইবনু'ল-'আরাবীকে বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান করেন। তাঁহার অনেক গ্রন্থই সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদের সম্বন্ধে লিখিত। ইতিপূর্বেই তাঁহার পিতা ইব্‌ন জামি' এবং ফুলায়হ ইব্‌ন আবি'ল-'আওরা'র সহিত একত্রে মিলিয়া হারূনু'র-রাশীদের জন্য ১০০টি সঙ্গীত চয়ন করিয়াছিলেন (তু. Agh[২]., i, 4-5)। পরবর্তীতে আল-ওয়াছিকের আদেশক্রমে ইসহাক এক শতটি সঙ্গীতের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন, যাহাতে পূর্ব সংকলনের উত্তমগুলি বহাল রাখেন এবং নিম্নমানের সঙ্গীতসমূহ সরাইয়া তদস্থলে অধিকতর উন্নত মানের সঙ্গীত সন্নিবেশিত করন (Aghani[২], i. 8 ff.)। ইহাই হইতেছে ইখ্‌তিয়ার মিনা'ল-আগানী লি'ল-ওয়াছিক (ফিহ্‌রিস্ত, ১৪১, ৪: য়াকূত, উদাবা', ২খ, ২২৩,৯)। ইহা ছাড়াও তিনি কখনও পৃথকভাবে কোন একজন সঙ্গীতবিদ অথবা কখনও একত্রে তাঁহাদের একদলের জীবনী সম্পর্কে এবং তাঁহাদের সঙ্গীত রচনার উপর গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন আখবার 'আয্‌যা (ফিহ্‌রিস্ত, ১৪১), আখ্‌বারু'ল-হুযালিয়্যীন (Aghani[১], ৪খ. ১৫২ প.), আল-মাক্কিয়্যীন (দ্র. য়াকূত, I.c. ii, 223, 7), আল-কিয়ান। এই পুস্তিকাসমূহ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে আগানীর গ্রন্থটির সংশ্লিষ্ট অধ্যায়সমূহের তথ্য-উৎস ইস্‌হাকের স্বরচিত সঙ্গীতের একটি পুস্তকও বর্তমান ছিল। কিন্তু ইহা ইস্‌হাকের অনুমতি ছাড়াই তাঁহার একজন অনুলিপি প্রস্তুতকারী কর্তৃক সংকলিত হইয়াছিল। ইসহাক সম্পর্কে আমাদের প্রাপ্ত তথ্যসমূহের অধিকাংশই তাঁহার পুত্র হাম্মাদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে যিনি নিজেও ইসহাকের সঙ্গীতসমূহের একটি খাঁটি সংকলন প্রকাশ করেন। ইসহাক সম্পর্কে তাঁহার ছাত্র 'আলী ইব্‌ন য়াহ্‌য়া ইব্‌নি'ল-মুনাজ্জিম একখানি গ্রন্থ রচনা করেন (ফিহ্‌রিস্ত, ১৪৩, ২২), অন্যদিকে উক্ত ছাত্রের পুত্র য়াহ্‌য়া ইব্‌ন 'আলী তাঁহার সংকলন-গ্রন্থ আল-বাহির-এর একটি অধ্যায় ইস্‌হাক সম্পর্কেই লিখেন (ফিহ্‌রিস্ত, ১৪৩, ২৭)। তাঁহার মৃত্যুর উপর অনেক শোকগাথা রচিত হইয়াছে (আগানী[৩], ৫খ, ২৫৬ এবং ৪৩১-৩৪)। ইসহাকের অনেক ছাত্র ছিল এবং তাঁহার সুখ্যাতি বর্তমান সময় পর্যন্তও স্থায়ী রহিয়াছে। আল-হারীরীর মাকামাত গ্রন্থে এবং আল্‌ফ লায়লা উপন্যাসে তাঁহার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

**গ্রন্থপঞ্জী** : (১) নিবন্ধে উল্লিখিত সূত্রসমূহ; (২) আমাদের প্রধান উৎস, আগানী, ৫খ., ২৬৮-৪৩৫; (৩) তা'রীখ বাগদাদ, নং ৩৩৮০; (৪) ইব্‌নু'ল আনবারী, নুযহা, ২২৭-৩২; (৫) য়াকূত, উদাবা', ২খ., ১৯৭-২২৫; (৬) ইব্‌ন খাল্লিকান, নং ৮৬; (৭) ইব্‌ন হাজার, লিসানু'ল-মীযান, ১খ, ৩৫০-৫২; (৮) ফিহ্‌রিস্ত এবং আগানী-র সূচীপত্র; (৯) মারযুবানী, আল-মুওয়াশ্‌শাহ'; (১০) আল-কালী, আমালী; (১১) ইব্‌ন কুতায়বা, মা'আরিফ এবং 'উয়ুন; (১২) আল-কামিল; (১৩) য়াতীমাতু'দ-দাহ্‌র; (১৪) G. H. Farmer-এর রচনাবলী; (১৫) E. Neubauer, Musiker am Hof der fruhen EAbbasiden, Frankfurt am Maia 1965, 187-89, একটি পূর্ণ গ্রন্থ তালিকাসহ; (১৬) Brockelmann, S. I. 273; (১৭) Sezgin. GAS. I, 371.

J. W. Fook (E.I.[২])/মোঃ মনিরুল ইসলাম

## ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আশ-শাশী (اسحـــاق بن ابراهيم الشاشى)

: আস-সামারকান্দী আল-খাতীবী ৩য়/৯ম শতকের একজন ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ এবং হানাফী মাযহাবের নেতৃস্থানীয় শায়খ। কুন্‌য়া (উপনাম) আবূ য়া'কূব, মতান্তরে আবূ ইব্‌রাহীম। তুর্কিস্তানের প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর শাশ, বর্তমানে সোভিয়েত শাসিত মধ্য এশিয়ায় উযবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রের রাজধানী তাশকান্দ শহরে আনু. ২৪৪/৮৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবত উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি মিসর গমন করেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ফিক্‌হশাস্ত্রে তাঁহার অন্যতম শিক্ষক ছিলেন শায়খ যায়দ ইব্‌ন উসামা। ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌নু'ল-হাসান আশ-শায়বানীর ফিক্‌হশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ আল-জামি'উ'ল-কাবীর গ্রন্থটি তিনি শায়খ যায়দ-এর নিকট অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহার

সূত্রেই তিনি এই গ্রন্থটি রিওয়ায়াত করিতেন। শায়খ যায়দ-এর নিকট শায়খ আবূ সুলায়মান আল-জুজ্জানী এবং তাঁহার উস্তাদ ইমাম মুহাম্মাদ শায়খ ইসহাক মিসরের একটি অঞ্চলের কাদীর দায়িত্বও পালন করিতেন। তিনি সমসাময়িক কালে হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফাকীহ্ এবং উসূলু'ল-ফিক্হ (দ্র.) শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ 'আলিম হিসাবে সমাদৃত হইয়াছিলেন। উসূলু'ল-ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁহার অমূল্য অবদান হইল উসূলু'শ-শাশী নামক গ্রন্থটি। এই গ্রন্থটি বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের বহু মাদ্রাসার মাধ্যমিক স্তরে অদ্যাবধি পাঠ্য তালিকাভুক্ত রহিয়াছে। ৩২৫/৯৩৭ সালে তিনি মিসরে ইন্তিকাল করেন এবং এইখানেই তাঁহার কবর বিদ্যমান।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) শায়খ 'আবদু'ল-কাদির, আজ-জাওয়াহিরু'ল-মুদিয়্যা ফী তাবাকাতিল-হানাফিয়্যা, হায়দরাবাদ ১৩৩৬ হি., নির্ঘণ্ট; (২) 'আল্লামা 'আবদু'ল-হায়্যি লাখনাবী, আল-ফাওয়াইদু'ল-বাহিয়্যা, কায়রো ১৩২৪ হি., ৪৩-৪৪; (৩) শায়খ 'আবদুল্লাহ মুস্তাফা আল-মারাগী, আল-ফাতহু'ল-মুবীন ফী তাবাকাতি'ল-উসূলিয়্যীন, কায়রো ১৯৪৭ খৃ., ১খ, ১৭৭।

ডঃ এ. কে. এম., আইয়ুব আলী

**ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-হানজালী** (اسحاق بن ابراهيم الحنظلى) ঃ আত-তামীমী, উপনাম আবূ য়া'কূব, ইব্ন রাহ্ওয়ায়হ্ (দ্র.) নামে সমধিক পরিচিত একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও ফাকীহ্। হিজরী ১৬১ মতান্তরে ১৬৬ সালে তিনি বানূ হানজালা-র শাখাগোত্র বানূ তামীম-এ জন্মগ্রহণ করেন। বংশতালিকা এইরূপ ঃ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মাখলাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন বাক্র ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ ইব্ন গালিব ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়ারিছ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'আতিয়্যা ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন হুমাম ইব্ন তামীম ইব্ন মুররা ইব্ন 'আম্র ইব্ন হানজালা। তাঁহার পিতা ইব্রাহীম-এর উপাধি ছিল রাহ্ওয়ায়হ্। এই হিসাবে তাঁহাকে ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়ায়হ বলা হয়। আমীর 'আবদুল্লাহ ইব্ন তাহির একদা তাঁহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনাকে ইব্ন রাহ্ওয়ায়হ বলা হয় কেন ? ইহার অর্থই বা কি ? আর এই ডাকনাম আপনি পসন্দ করেন কি ? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, শোন আমীর ! আমার পিতা মাতৃগর্ভে থাকাকালে আমার পিতামহী মক্কায় সফর করিয়াছিলেন। পথে আমার পিতা জন্মগ্রহণ করেন। এই কারণে রসিক শ্রেণীর লোক তাঁহার নাম দিয়াছিল রাহ্ওয়ায়হ রাস্তায় জন্মগ্রহণকারী। আমার পিতা ইহা ভালবাসিতেন না, তবে আমি অপসন্দ করি না। শৈশবকাল হইতেই ইস্হাক জ্ঞানের অন্বেষায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি ইরাক, খুরাসান, সিরিয়া, হিজায ও য়ামান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। যুগের প্রধান মুহাদ্দিছগণের নিকট হইতে তিনি হাদীছ সংগ্রহ করিয়াছেন। সুফ্য়ান ইব্ন 'উয়ায়না, ইসমা'ঈল ইব্ন 'উলায়্যা, জারীর, বিশ্র ইবনু'ল-মুফাদ্দাল, হাফ্স ইব্ন গিয়াছ, সুলায়মান ইব্ন নাফি' আল-'আব্দী, মু'তামার ইব্ন সুলায়মান, ইব্ন ইদ্রীস, 'আবদুল্লাহ ইবনু'ল-মুবারাক, 'আবদু'র-রায্যাক, আদ-দারাওয়ার্দী, 'ইতাব ইব্ন বাশীর, 'ঈসা ইব্ন য়ূনুস, আবূ মু'আবিয়া, ওয়াকী' ইবনু'ল-জার্রাহ, গুনদার ও বাকিয়্যা তাঁহার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য উস্তাদ। তাঁহার ছাত্রসংখ্যা অগণিত। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ, ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম তিরমিযী (র) তাঁহার প্রখ্যাত শাগরিদগণের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার উস্তাদবৃন্দের মধ্য হইতে বাকিয়্যা ইবনু'ল-ওয়ালীদ, মুহাম্মাদ ইব্ন য়াহ্য়া আয যুহ্লী ও য়াহয়া ইব্ন আদাম এবং সমসাময়িকদের মধ্যে আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, ইসহাক ইব্ন মানসূর, মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' ও য়াহ্য়া ইব্ন মু'ঈন তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও ফাকীহ্। সমকালীন 'আলিমগণ উচ্চকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (র) বলেন, খুরাসান ও ইরাকে তাঁহার সমতুল্য কোন ব্যক্তি নাই। ইসহাক-এর পুত্র মুহাম্মাদ তাঁহার দরবারে জ্ঞানার্জনের জন্য গমন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, তোমার জন্য স্বীয় পিতার সাহচর্য আক্ড়াইয়া ধরাই অধিক লাভজনক। তাঁহার মত জ্ঞানী ব্যক্তি তুমি দেখিতে পাইবে না। ইমাম ইব্ন হাম্বাল (র) তাঁহার মর্যাদা রক্ষার প্রতি এত সচেতন ছিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে কেহ ইব্ন রাহওয়ায়হ বলিলে তিনি বলিতেন, এইরূপ বলিও না, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-হানজালী বল। মুহাম্মাদ ইব্ন আসলাম বলেন, যদি সুফ্য়ান ছাওরী আজ জীবিত থাকিতেন তবে 'ইল্মের জন্য তাঁহাকে অবশ্যই ইস্হাকের শরণাপন্ন হইতে হইত। আহমাদ ইব্ন সা'ঈদ ইহার সহিত যোগ করেন, ইব্ন 'উয়ায়না ও হাম্মাদকেও তাঁহার মুহতাজ থাকিতে হইত। ইহা শুনিয়া মুহাম্মাদ ইব্ন য়াহ্য়া বলিলেন, কেবল তাহা নহে, হাসান বাসরী জীবিত থাকিলেও অধিকাংশ মাস'আলার সমাধানের জন্য তিনিও ইস্হাকের সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হইতেন। ইব্ন খুযায়মা মন্তব্য করেন, যদি ইস্হাক তাবি'ঈদের যুগের 'আলিম হইতেন তাহা হইলে তাবি'ঈগণও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইতেন। নু'আয়ম ইব্ন হাম্মাদ বলেন ঃ যদি খুরাসানের কোন লোক ইস্হাকের বিরূপ সমালোচনা করে তবে তাহাকে ধর্মীয় ব্যাপারে সন্দেহযুক্ত (متهم فى الدين) মনে করিও। সা'ঈদ ইব্ন যু'ওয়ায়ব বলেন, আমি ভূপৃষ্ঠে ইস্হাকের সমতুল্য কোন 'আলিম দেখি নাই। য়াহ্য়া বলেন, খুরাসানে 'ইল্মের দুইটি খনি ছিল—একটি ছিল মুহাম্মাদ ইব্ন সালাম বায়কান্দীর নিকট, আর অন্যটি ইস্হাক-এর নিকট। ইস্হাক ইব্ন রাহওয়ায়হ যুগপৎ মুহাদ্দিছ, ফাকীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (র)-এর নিকট তাঁহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, তিনি মুসলমানদের ইমাম। আমার কাছে শাফি'ঈ, হুমায়দী ও ইস্হাক তিনজনই ইমাম। তিনি আরও বলেন, ইস্হাক (র)-এর সমতুল্য কে হইতে পারে ? তাঁহার নিকটই মাস্'আলা জিজ্ঞাসা করা উচিত। আমরাও মাস'আলার ক্ষেত্রে তাঁহার শরণাপন্ন হই। অনেক গবেষক তাঁহার নাম মুহাদ্দিছের পরিবর্তে ফাকীহ ও মুজতাহিদদের তালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। ফিক্হ্-এর গ্রন্থসমূহে ইখ্তিলাফ (বিরোধপূর্ণ) মাসআলায় স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার মতামতেরও উল্লেখ রহিয়াছে। সাধারণত তাঁহার ও ইমাম আহমাদের রায় ও মতামতে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মূলত হাদীছ ছিল উভয়ের ইজতিহাদের উৎস। ইমাম শাফি'ঈ (র)-র সহিত তিনি দুইবার মুনাজারায় (বিতর্কে) লিপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথম বিতর্কের বিষয় ছিল ঃ মক্কার ঘরবাড়ী ভাড়া দেওয়া বৈধ কি না ? ইস্হাক ইহাকে অবৈধ এবং ইমাম শাফি'ঈ (র) বৈধ মনে করিতেন। ইমাম আহমাদ (র) এই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় বিতর্ক সংঘটিত হইয়াছিল মৃত প্রাণীর চর্ম সম্পর্কে। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে ইহা দাবাগাত (tanning অর্থাৎ পাকাকরণ) দ্বারা পবিত্র হয়, পক্ষান্তরে ইস্হাকের মতে পবিত্র হয় না। উভয়ের দলীল ফিক্হ্-এর কিতাবে

উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয় বিতর্ক সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন, শাফি'ঈর তুলনায় ইস্হাকে'র রায় ও দলীল অধিকতর শক্তিশালী ছিল, যাহার ফলে এই বির্তকে তিনি বিজয়ী হইয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমাদও এই ক্ষেত্রে ইস্হাকে'র সহিত ঐকমত্য পোষণ করিয়াছিলেন।

হাদীছ ছিল ইমাম ইস্হাকে'র গবেষণা ও অনুশীলনের বিষয়। এই কারণে ইতিহাসে তাঁহার নাম জগৎবিখ্যাত মুহাদ্দিছদের সঙ্গে স্থান পাইয়াছে। খালীল তাঁহাকে হাদীছের রাজাধিরাজ হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাঁহার স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ ও বিস্ময়কর। ইব্ন হিব্বান, খাত্বীব আল-বাগ'দাদী ও ইব্ন 'আসাকির তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। কুতায়রা ইব্ন সা'ঈদ খুরাসানের হুফ্ফাজ (হাদীছের হাফিজগণ) হিসাবে ইস্হাক ইব্ন রাহওয়ায়হ, ইমাম দারিমী ও বুখারীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আবূ য়াহ্য়া আশ-শা'রানী বলেন, আমি ইস্হাকে'র হাতে কখনও কিতাব দেখি নাই। তিনি স্বীয় স্মৃতি হইতে হাদীছ বর্ণনা করিতেন। তিনি ছিলেন একজন যথার্থ শ্রুতিধর। তিনি স্বয়ং বলেন, আমি কোনদিন কোন হাদীছ লিপিবদ্ধ করিতাম না; যখনই কোন হাদীছ শ্রবণ করিয়াছি তৎক্ষণাৎ তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছি। কোন মুহাদ্দিছে'র নিকট একটি হাদীছ দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করি নাই, এই বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে কি তোমরা আশ্চর্য বোধ কর ? সকলেই উত্তর দিল, হাঁ। তিনি বলিলেন, কোন হাদীছ শুনিবামাত্র আমার মুখস্থ হইয়া যায়। সর্বক্ষণ সত্তর হাজার হাদীছ আমার চোখের সামনে ভাসিতে থাকে। যে কোন সময় আমি বলিয়া দিতে পারি যে, উহা কিতাবের কোন্ জায়গায় আছে ? আবূ দাউদ ও খুফাফের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি এক লক্ষ হাদীছ সম্পর্কে বলেন ঃ এইগুলি আমার চোখের সম্মুখে, এখনই শুনাইতে পারি। একবার তিনি দশ সহস্র হাদীছ এক নাগাড়ে মুখস্থ বলিয়া গিয়াছেন আর এইগুলি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ লিখিয়া লইয়াছেন। অতঃপর তিনি কিতাব হইতে উহা পাঠ করিয়া শুনাইলেন। দেখা গেল একটি বর্ণও এদিক ঐদিক হয় নাই। একদিন আবূ হাতিম তাঁহার স্মরণশক্তি সম্পর্কে আবূ যুর'আর নিকট আলোকপাত করিলে তিনি মন্তব্য করেন, তাঁহার মত হাদীছের কোন হাফিজ দৃষ্টিগোচর হয় না। আহমাদ ইব্ন সালামা, আবূ হাতিমের নিকট বলিয়াছিলেন, ইস্হাক তাঁহার স্মৃতি হইতে তাফসীর লেখাইয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া আবূ হাতিম বলিলেন, ইহা তো আরও বিস্ময়কর ব্যাপার। কেননা হাদীছের মূল পাঠ ও সনদ-এর তুলনায় তাফসীরের ভাষা ও সনদ অধিকতর কঠিন। খুরাসানের আমীর 'আবদুল্লাহ ইব্ন তাহির একদিন তাঁহার নিকট একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ইহার উত্তর দিয়া বলিলেন, ইহাই আহলু'স-সুন্নাহ ওয়া'ল-জামা'আতের অভিমত। তবে আবূ হানাফী (র) ও তাঁহার শাগরিদগণ এই ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইব্রাহীম ইব্ন আবূ সালিহ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমীরু'ল-মু'মিনীন! ইস্হাক ভুল তথ্য দিয়াছেন। আবূ হানীফা (র)-এর রায় ইহার বিপরীত নহে। ইহা শুনিয়া ইস্হাক বলিলেন, তাঁহার রায় আমার যথাযথভাবে স্মরণ আছে। অমুক কিতাবটি লউন। সাথে সাথে কিতাব আনা হইল এবং ইব্ন তাহির ইহার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। ইস্হাক বলিলেন, আমীরু'ল-মু'মিনীন! একাদশ পৃষ্ঠার নবম ছত্র দেখুন। দেখা গেল যে, আবূ হানীফা (র)-এর রায় হুবহু উহাই যাহা ইস্হাক বর্ণনা করিয়াছেন। আমীর বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, আমরা পূর্ব হইতেই আপনার ফিক্হী যোগ্যতা সম্পর্কে অবগত ছিলাম। কিন্তু আপনার স্মরণশক্তির যেই পরিচয় পাইলাম তাহা সত্যিই বিস্ময়কর! একদা ইমাম আহমাদ (র) তাঁহার নিকট একটি হাদীছ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ইহার উত্তর দিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল ! জনাব ওয়াকী' ইব্নু'ল-জার্‌রাহ ত আপনার বিপরীত বলিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ইমাম আহমাদ (র) অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, চুপ থাক। আবূ য়া'কূব ত 'আমীরু'ল-মু'মিনীন ফি'ল-হাদীছ'। তিনি যদি কোন হাদীছ বর্ণনা করেন তবে নিশ্চিন্তে তাহা গ্রহণ করা উচিত। এইরূপভাবে ইমাম আয-যাহাবী, আবূ হাতিম, নাসা'ঈ, খাতীব আল-বাগ'দাদী, ইব্ন হিব্বান ও দারিমীসহ সকল ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিছ তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। হাদীছ ও ফিক্হ-এর বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তবে ইহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ফিক্হ বিষয়ে তাঁহার লিখিত গ্রন্থ কিতাবু'স-সুনান ফি'ল-ফিক্হ-এর নাম পাওয়া যায়। তাফসীর বিষয়ে তিনি কিতাবু'ত-তাফসীর রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইল আল-মুসনাদ। হাদীছশাস্ত্রের উপর লিখিত এই গ্রন্থখানি বৃহৎ ছয় খণ্ডে সমাপ্ত। 'আল্লামা সুয়ূতীর হস্তাক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপি জার্মানীর লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। তাঁহার সন্তান-সন্ততির মধ্যে তিনজনের নাম পাওয়া যায়। তাঁহার হইলেন ঃ আবু'ল-হাসান 'আলী, মুহাম্মাদ ও য়া'কূব। প্রথম জীবনে তিনি খুরাসানের প্রসিদ্ধ শহর মার্ব-এ বসবাস করিতেন। পরবর্তী কালে তিনি নীশাপুরে স্থায়ী নিবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ বর্ণনানুসারে তিনি হিজরী ২৩৮ সালে ১৪ বা ১৫ শা'বান রোজ রবিবার ইন্তিকাল করেন। অনেকে হিজরী ২৩৭ সালও উল্লেখ করিয়াছেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্নু'ল-জাওযী, সিফাতু'স-সাফওয়া, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮৮/১৯৬৮, ৪খ, ৯৫-৬; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৫ হি., ১খ, ২১৬-২১৯; (৩) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ১খ, ৫৪; (৪) ওয়ালিয়্যুদ-দ্বীন মুহাম্মাদ আল-খাতীব, আল-ইক্মাল ফী আসমা'ই'র-রিজাল (মিশ্কাতু'ল-মাসাবীহ-এর সহিত সংযোজিত), দিল্লী, তা. বি., ৫৮৬; (৫) ইব্নু'ন-নাজ্জার আল-বাগ'দাদী, তা'রীখ বাগ'দাদ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৮/১৯৭৮, ৬খ, ৩৪৭-৮; (৬) ইব্ন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশক, বৈরূত ১৩৯৯/ ১৯৭৯, ২খ, ৪০৯-১০; (৭) ইব্নু'ল-'ইমাদ আদ-দিমাশ্কী, শাযারাতু'য-যাহাব, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ২খ, ৮৯; (৮) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, বৈরূত, তা. বি., ১০খ, ৩১৭; (৯) ইব্ন শুহ্বা আদ-দিমাশ্কী, তাবাকাতু'শ-শাফি'ইয়্যা, বৈরূত তা.বি., ১খ, ২৩৩; (১০) আয-যাহাবী, মীযানু'ল-ই'তিদাল, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), তা. বি., ১খ, ৮৬; (১১) জালালু'দ-দীন আস-সুয়ূতী, আল-ইত্কান, মিসর ১৩৭০/১৯৫১, ২খ, ১৯০; (১২) 'আবদু'র-রাহমান আল-মুবারাকপুরী, মুকাদ্দিমাঃ তুহফাতি'ল-আহওয়াযী, বৈরূত তা. বি., পৃ. ১৬৫; (১৩) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, ১খ, ১১৩।

আবুল বাশার মু. সাইফুল ইসলাম

**ইসহাক ইব্ন বাহরাম** (اسحاق بن بهرام) ঃ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-হুসায়নী আল-বুখারী আশ-শায়খ আস-সায়্যিদ আশ-শারীফ, ৯ম/১৫শ শতকের উপমহাদেশের একজন সুশিক্ষিত সাধক পুরুষ। তিনি

বুখারার খ্যাতনামা আপন শায়খ জালালু'দ-দীন হুসায়ন ইব্‌ন 'আলী আল-হুসায়নীর তৃতীয় অধস্তন বংশধর। তিনি উচ (اچ) নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এইখানেই লালিত-পালিত হন। স্বীয় মাতুল আশ-শায়খ সাদরু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল-হুসায়নী আল-বুখারীর নিকট শারী'আত ও তারীকাতের শিক্ষা লাভ করেন এবং দীর্ঘকাল তাঁহার সংসর্গে অতিবাহিত করেন। ৮১২/১৪০৯ সালে তাঁহার মাতুল ও মুরশিদের নির্দেশক্রমে তিনি সাহারানপুর গমন করেন এবং শিক্ষাদান কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বহু লোক তাঁহার নিকট ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার খ্যাতনামা শাগরিদ ও মুরিদগণের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ আশ-শায়খ 'আবদু'ল-কারীম, আশ-শায়খ 'আবদু'র-রায্‌যাক, আশ-শায়খ 'আবদু'ল-'আযীয, আশ-শায়খ 'আবদু'ল-বাকী প্রমুখ। তাঁহারই উদ্যোগে ও প্রেরণায় সাহারানপুর একটি খ্যাতনামা শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।

শায়খ ইস্‌হাক সাহারানপুরে শিক্ষাদীক্ষার মহান ব্রতে সারা জীবন অতিবাহিত করেন। ৮৬০/১৪৫৫ সালে ইনতিকাল করিলে তাঁহাকে সাহারানপুরেই দাফন করা হয়। তাঁহার জন্ম সম্ভবত ৮ম হিজরীর শেষ দশকে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) শারীফ 'আবদু'ল-হায়্যি আল-হাসানী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ৩খ, পৃ. ২৮, মাত্‌বা'আতু মাজলিস, দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফি'ল-'উছমানিয়া, হায়দরাবাদ, হিন্দ ১৯৫১ খৃ.।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

**ইসহাক ইব্‌ন মিরার** (দ্র. আবূ 'আম্‌র আশ-শায়বানী)

**ইস্‌হাক ইব্‌ন মুরাদ** (اسحاق بن مراد) ঃ একজন তুর্কী চিকিৎসক যিনি সুলতান প্রথম বায়াযীদের রাজত্বকালে আনাতোলিয়ার জেরেদে বসবাস করিতেন। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায়। তিনি চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন এবং এই বিষয়ের উপর গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান গ্রন্থের নাম কিতাব এদবীয়ে-ই মুফরিদে "সরল চিকিৎসা পুস্তক", যাহা তিনি ৭৯২/১৩৯০ সনে সমাপ্ত করেন। ইহার প্রথম অংশে তিনি তাঁহার নিজ দেশের বিভিন্ন ভেষজ গুল্ম সম্পর্কে আলোচনা করেন (ইহাদের প্রতিটির তুর্কী নাম ছাড়াও 'আরবী এবং ফারসী নামও দিয়াছেন) এবং শেষে বিভিন্ন রোগের জন্য ব্যবস্থাপত্র লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে রোগসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দান করেন। গ্রন্থটি তুরস্কের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। গ্রন্থটি ভাষা বিজ্ঞানের দিক দিয়াও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইহাতে বর্ণ, ব্যাকরণ এবং শব্দ- সম্ভারের অনেক প্রাচীন বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) Bursali Mehmed Tahir, 'othmanli mu'ellifleri, iii, 203; (২) A. Adnan-Adivar, Osmanli Turklerinde ilim, Istanbul 1943 67; (৩) O. Spies, Das Turkische Drogen-und Medizinbuch des Ishaq b. Murad, in Studia orientalia in memoriam Caroli Brockelmann, Halie 1968, 185-92.

O. Spies (E.I.[2])/মোঃ মনিরুল ইসলাম

**ইস্‌হাক ইব্‌ন মুহাম্মাদ** (اسحاق بن محمد) ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন যায়দ আল-হাকীমু'স-সামারকান্দী, ৪র্থ/১০ম শতকের মুসলিম জগতের একজন হানাফী ফাকীহ ও কালামশাস্ত্রবিদ। কুন্‌য়া (উপনাম) আবু'ল-কাসিম। বর্তমান সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার উযবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্রাচীন শহর সামারকান্দ-এর অধিবাসী। সামারকান্দ-এর প্রখ্যাত তাফসীরকার, ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ এবং 'ইলমু'ল-কালামের ইমাম শায়খ আবূ মানসূর মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মাতুরীদী (মৃ. ৩৩৩/৯৪৪)-র নিকট তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্র ও 'ইলমু'ল-কালাম (কালামশাস্ত্র) অধ্যয়ন করেন। বাল্‌খ-এর সমসাময়িক শায়খদের নিকট তাসাওউফ (সূফীতত্ত্ব) শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এইভাবে দীর্ঘ দিনের অধ্যয়ন ও সাধনার ফলে শায়খ কাদী ইসহাক হাদীছ, তাফসীর, ফিক্‌হ, কালাম ও তাসাওউফ শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হন এবং বিদ্যাবত্তা ও তত্ত্বজ্ঞানের গভীরতার জন্য তিনি জনগণের ও সূফী সমাজের নিকট "আল-হাকীমু'স-সামারকান্দী" (সামারকান্দের প্রজ্ঞাবান) এই উপাধিতেই সমধিক পরিচিত ছিলেন।

শায়খ ইসহাক দীর্ঘকাল সামারকান্দের কাদী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শেষ বয়সে স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি কাদী পদে ইস্তিফা দেন। সাম'আনী তাঁহার প্রজ্ঞা, ন্যায়নিষ্ঠা, মহৎ চরিত্র ও অমায়িক ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কাশফু'জ-জুনূন ও অন্যান্য জীবনী গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শায়খ ইসহাক 'আকা'ইদ ও কালামশাস্ত্রে দুইখানা গ্রন্থ রচনা করেন। একটি গ্রন্থ হইল শারহু'ল-ফিকহি'ল-আকবার। এই গ্রন্থটিকে ইমাম আবূ হানীফা (র) রচিত আল-ফিক্‌হু'ল-আকবার গ্রন্থের সর্বপ্রথম ভাষ্যগ্রন্থ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম 'আকীদাতু'ল-ঈমাম, এই গ্রন্থে সম্ভবত ইমাম আ'জাম (র)-এর মাযহাবী দৃষ্টিভংগীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। আস-সাওয়াদু'ল-আ'জাম নামক তাঁহার অন্য একটি গ্রন্থ মিসরের বূলাক হইতে ১২৫৩ হি. সনে প্রকাশিত হয়।

ইমাম আল-মাতুরীদীর খ্যাতনামা শাগরিদদের মধ্যে শায়খ কাদী ইসহাক ছিলেন অন্যতম। মধ্য এশিয়ায় আহলু'স-সুন্নাহ ওয়া'ল-জমা'আত, বিশেষভাবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ফিক্‌হ ও 'আকা'ইদ সম্পর্কিত মতবাদসমূহ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠায় ইমাম আল-মাতুরীদী, তাঁহার শাগরিদবৃন্দ ও অনুসারীরা যে ব্যাপক কার্যকর পন্থা অবলম্বন করেন তাহার ফলে এতদঞ্চলে সুন্নাহ বিরোধী কোন মতাদর্শ কখনও প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। কাদী ইসহাক ১০ মুহাররাম, ৩৪০/৯৫১ মতান্তরে ৩৪২/৯৫৩ সালে ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) 'আবদু'ল-কারীম আস-সাম'আনী, কিতাবু'ল-আনসাব, আল-হাকীম শিরোনাম; (২) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনূন, সং. ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ., ২/১১৫৭, ২/১২৮৭; (৩) 'আল্লামা আবুল-হাসানাত মুহাম্মাদ 'আবদুল-হায়্যি আল-লাখনাবী, আল-ফাওয়াইদু'ল-বাহিয়্যা, আস-সা'আদা প্রেস, ১ম সং, ১৩২৪ হি., পৃ. ৪৪; (৪) ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী, 'আকীদাতু'ল-ইসলাম ওয়া'ল-ইমাম আল-মাতুরীদী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১ম সং, ১৯৮৩ খৃ., ঢাকা পৃ. ১০৬, ৪৮৩, ৪৮৫।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

**ইসহাক ইব্‌ন সুলায়মান** (اسحاق بن سليمان) ঃ আল-ইসরা'ঈলী আবূ য়া'কূব, (আনু. ২৪৩/৮৫৫–আনু. ৩৪৩/৯৫৫) চিকিৎসক, চিকিৎসা বিষয়ক লেখক এবং দার্শনিক, জন্ম মিসরে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কায়রাওয়ান গমনের পর 'উবায়দুল্লাহ আল-মাহ্‌দী কর্তৃক রাজ-দরবারে চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তাঁহার সমগোত্রীয় য়াহূদীদের মধ্যে তাঁহার

যে সুখ্যাতি ছিল তাহার সত্যতার সাক্ষ্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাপারসমূহে তাঁহার পরামর্শের জন্য সা'ঈদ (Se'adya সে'আদিয়া) আল-ফায়্যূমীর লিখিত পত্রাবলীতে পাওয়া যায়। তাঁহার চিকিৎসা বিষয়ক রচনাবলী কন্স্টানটাইন দি আফ্রিকান (Constantine the African) কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় (১০৮৭) এবং মধ্যযুগে তাহা উচ্চ সমাদর লাভ করে (Omnia opera ysaac, lyons 1575-এ মুদ্রিত)। তাঁহার দর্শনমূলক রচনাসমূহের মধ্যে কিতাবু'ল-হুদূদ ওয়া'র-রুসূম ল্যাটিনভাষী বিদ্বজ্জনদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল, যাঁহারা এই গ্রন্থকে দুইটি অনুবাদের দ্বারা জানিতে পারেন (সম্পা. J. T. Muckle in Archives dÈhistoire doctrinale et litteraire du moyen age, xii-xiii, Paris 1937-38)। মধ্যযুগীয় য়াহুদী লেখকগণ এই গ্রন্থের সহিত সমানভাবে পরিচিত ছিলেন। ইহার হিব্রু ভাষায় দুইবার অনূদিত হয় (দ্র. A. Altmann, in JSS, ii, 1957, 232 ff.)। তাঁহার কিতাবু'ল-জাওয়াহির গ্রন্থের কেবলমাত্র ভিন্ন ভিন্ন অংশ বর্তমানে পাওয়া যায়, যাহা A. Borisov উদ্ধার করেন এবং S. M. Stern সম্পাদনা করেন (Journal of Jewish Studies, vii, 1956, 13-29)। তাঁহার সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও বৃহৎ গ্রন্থ কিতাবু'ল-উসতুকুস্সাত, যাহার একটি ল্যাটিন অনুবাদ (contained in Omnia opera Ysaac) এবং দুইটি হিব্রু অনুবাদ বর্তমান আছে ঃ একটি Abraham Ibn Hasday কর্তৃক, সম্পা. S. Fried 1900 এবং অন্যটি মোজেস ইব্ন তিব্বন (?) কর্তৃক অনূদিত। একটিও হিব্রু পাণ্ডুলিপিতে সংরক্ষিত একটি অধ্যায় (Sha'yar hayesodoth) 'মূল সূত্র ঃ তত্ত্ব সংক্রান্ত অধ্যায়' (Chapter on the Elements)-কে A. Altmann, Gershom G. Scholem-এর পরামর্শ অনুসারে আল-ইসরা'ঈলীর আরেকটি গ্রন্থ হিসাবে দেখাইয়াছেন (Journal of Jewish Studies, vii, 1956, 31-57)।

য়াহুদী নব্য প্লেটোবাদের জনক আল-ইসরা'ঈলী, আল-কিন্দীর দ্বারা এবং একটি জাল অ্যারিস্টোটলীয় নব্য প্লেটোবাদী উৎস দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, যাহা Altmann "মূল সূত্র ও তত্ত্ব সংক্রান্ত অধ্যায়" (Chapter on the Elements)-এ আবিষ্কার করেন এবং Stern যাহা এইরূপ গ্রন্থ যেমন Theology of Aristotle (রবিসোভ কর্তৃক আবিষ্কৃত)-এর এক বৃহৎ অনুবাদের এবং ইব্ন হাসদের" Prince and Ascetic-এ অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া সনাক্ত করেন (দ্র. Oriens, xiii-xiv, 1961, 58-120)।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) উপরে মূল নিবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও, (২) J. Guttmann, Die philosophischen Lehren des Isaak b. Salomon Israeli, Munster 1911, (৩) A. Altmann and S. M. Stern, Isaac Israeli, a Neoplatonic philosopher of the early tenth century, Oxford 1958, (৪) reviewed by M. Plessner, in Kiryat Sefer, xxxv (1960), 457 ff., (৫) J. D. Latham, Isaac Israili's Kitab al-Hummayat and the Latin and Castilan Texts, in JSS, xiv (1969), 80-95.

A. Altmann (E .I.²)/মোঃ মনিরুল ইসলাম

**ইসহাক ইব্ন হুনায়ন** (اسحاق بن حنين) ঃ ইব্ন ইসহাক আল-'ইবাদী, তাঁহার পিতা আবূ য়া'কূব হুনায়ন ইব্ন ইসহাক (দ্র.)-এর ন্যায় প্রাচীন বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রখ্যাত অনুবাদক এবং গ্রীক, সিরীয়, 'আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কিছু সংখ্যক গ্রন্থকার যেমন ইব্নু'ন-নাদীম এবং ইব্নু'ল-মাতরান দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, তাঁহার 'আরবী রচনাশৈলী তাঁহার পিতার অপেক্ষা উন্নততর ছিল। সমসাময়িক অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তির ন্যায় তিনি কবিতা রচনায়ও ঝুঁকিয়া পড়েন। তিনি তাঁহার পিতার চিকিৎসা পেশা গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা তাঁহার কৃত গ্যালেনের কিছু সংখ্যক পুস্তকের অনুবাদ তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এই অনুবাদসমূহ ছিল সিরীয় ভাষায়, 'আরবীতে নয়। হুনায়ন ও ইসহাকের মধ্যে প্রাক-সক্রেটিস দর্শন সম্পর্কীয় একটি কথোপকথন আবূ সুলায়মানের সিওয়ানু'ল-হিক্মা গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে [দ্র. এফ. রোজেনথাল-এর Orientalia. n. S. X. (১৯৪১ খৃ.) ৩৯৫]। ইসহাক খলীফাদের দরবারে চিকিৎসক হিসাবে চাকুরি করিয়াছেন; আল-বায়হাকী তাঁহাকে আল-মুক্তাফী (দ্র.)-এর অন্তরঙ্গ সহচর ও জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক উপদেষ্টা এবং ভাল মুসলিমরূপেও উল্লেখ করিয়াছেন। মন্ত্রী আল-কাসিম ইব্ন 'উবায়দি'ল্লাহ্-এর সহিত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রাখিতেন এবং তাঁহার সহিত শ্লেষাত্মক ক্ষুদ্র কবিতার বিনিময় করিতেন (তু. C. Elgood, A medical History of parsia, কেমব্রিজ ১৯৫১ খৃ., ১১৫)। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া বাগদাদ রাবী' ১ অথবা ২. ২৮৯/নভেম্বর ৯১০ কিংবা জানুয়ারী ৯১১ সালে ইনতিকাল করেন। ইব্ন খাল্লিকান ২৯৯ হি. সাল উল্লেখ করিয়াছেন।

অনুবাদক হিসাবে ইসহাক চিকিৎসাবিদ্যার সহিত কম সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তিনি গ্যালেনের (দ্র. জালীনূস) বিস্তর রচনা তাঁহার পিতার সমধর্মী গোত্রের সদস্যদের নিকট ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং নিজে তাহাদের মধ্যে মাত্র দুইটি সিরীয় ও নয়টি 'আরবীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, যেমন ঃ (De. Patibus artis medicativae) যে অনুবাদটি হুনায়ন তাঁহার মৃত্যুর জন্য অসমাপ্ত রাখিয়া যান, উহাই তিনি সমাপ্ত করেন (তু. M. Lyons Corpus Medicorum, Graccorm Suppl, Orient. II, বার্লিন ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ৮ প.)। তিনি এরিস্টোটলের বহু রচনার অনুবাদ করিয়া খ্যাতি লাভ করেন (তু. এফ. ই. পেটার্স, Aristoteles arabus, Leiden 1968)। অন্যান্য দার্শনিকের মধ্যে তিনি প্লেটো (দ্র. আফলাতুন), নকল প্লেটো (দ্র. মাশরিকা', ix, ১৯০৬ খৃ., ৬৭৭),দামিশ্ক-এর নিকোলাস (De Plantis, cf. B. Hemmerdinger, in philolgus cxi, 1967, 58), এফ্রোদিসিয়াস-এর অধিবাসী আলেকজাণ্ডার (দ্র. আল-ইসকান্দার আল-আফরূদীসী), porphyry (দ্র. ফারফূরিয়ূস), থেমিসতিয়াস, এমিসাবাসী নেমেসিয়াস (দ্র. p. Sbath, Bibliotheque de manuscrits Paul Sbath, কায়রো ১৯২৮ খৃ., নং ১০১০) এবং proclus (দ্র. বুরুকলুস)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তদুপরি তিনি অংকশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রের বহু প্রামাণিক পুস্তক অনুবাদ করেন, যেমন ইউক্লিডের পুস্তকাদি (তু. G. P. Matvievskaya, U enie o cisle na srednevekovom bliznem i srednem vostoke, তাসখন্দ ১৯৬৭ খৃ.; পৃ. ১০০ প.)। Autolycus of pitanec. Arehimedes, Theodosius of Bithyania, Menelaus

of Alexandia (তু. Max Krause, in Abh. G. W. Gott., Phil, hist, Kl., Dritte Folge, no. 17, 1936, 21,23) এবং টলেমি (দ্র. বাতলামিয়ূস)। ছাবিত ইবন কুররাঃ (দ্র.) এই সমস্ত অনুবাদের মধ্যে কতগুলির পুনঃপরীক্ষা ও সংশোধন করেন (তু. M. Bouyges, in Melanges deL universite Saint-Joseph, ix, 1923-4, 77-81)। ছাবিত কর্তৃক তাঁহার নিকট প্রেরিত জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক একটা লিপির অংশও বিদ্যমান আছে (দ্র. F. J. Carmody, The astronomical works of Thabit b. Qurra, Berkeley, Los Angeles 1960, 20, 45f. 229)।

ইসহাকের নিজস্ব রচনা প্রধানত চিকিৎসাবিদ্যা ও ঔষধবিজ্ঞান বিষয়ের উপরে ছিল। ২৯০/৯০৩ সনে তিনি আল-কাসিম-এর অনুরোধে তাঁহার তা'রীখু'ল-আতিব্বা' রচনা করেন (এফ. রোজেনথাল সম্পাদিত, in Oriens, vii. 1954, 55-80; তু. JAOS. lxxxi, 1961, 10f.)। আমাদের জানামতে এই বইটি দর্শন ও ধর্মের ইতিহাসের সহিত সম্পর্কযুক্ত চিকিৎসাশাস্ত্রের সূত্রপাত সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনার প্রথম প্রয়াস।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) Hunain Ibn Ishaq uber die syrischen und arabischen Galen-Ubersetzungen. সম্পা. G. Bergstra.Ber, Leipzig ১৯২৫ খৃ.; (২) Abh. K. M. xvii/2. তু. Abh. K. M. xix/2; (৩) Fihrist (নির্ঘন্ট); (৪) Ibn Djuldjul, Tabakat al-Atibba wal-Hukama, সম্পা. F. Sayyi, Cairo ১৯৫৫ খৃ., ৬৯; (৫) Ali b. Zayd al-Bayhaki, Tatimma siwan al-hikma, সম্পা. M. Shafi, Lahore 1935, i. 4 f. ; (৬) Ibn al-Matran, Bustan al-atibba wa rawdat al-atibbea, Ms. Bethesda, Md A8, fol, 117r f.; (৭) Ibn al-Kifti, Tarikh' al-hukama, সম্পা. J. Lippert, Leipazig ১৯০৩ খৃ. নির্ঘন্ট; (৮) Ibn Abi usaybia, ÈUyun al-anba' fi tabakat al-atibba, সম্পা. A. Muller Cairo ১৮৮২ খৃ., ১খ., ২০০ প., ২০৩, ২১৮; (৯) Ibn Khallikan, নং ৮৭, অনুবাদ by da Slane, ১খ., ১৮৭; (১০) M. Steinschaeider, Die hebraischen Ubersetzungen des Mittelaters Berlin ১৮৯৩ খৃ., (repr. Graz ১৯৫৬ খৃ.), ১০৫৬ (নির্ঘন্ট); (১১) ঐ লেখক, Die arabischea Ubersetzungen aus dem Griechisohen, repr. Graz ১৯৬০ খৃ., ২৬৯ প. (নির্ঘন্ট); (১২) Suter, ৩৯; (১৩) I. Pollak, Die Hermeneutik des Aristoteles in der arabischen Ubersetzung des Ishaq Ibn Honain, Leipzig ১৯১৩ খৃ., Abh. K. M. xiii/1; (১৪) L. Cheikho, Catalogue des manuscrits des auteurs arabes ehretiens depuis l'Islam, Beirut ১৯২৪ খৃ., ৩১; (১৫) G. Sarton, Introduction to the history of science, i, Baltimore ১৯২৭ খৃ.; (১৬) J. Tkatsch, Die arabischen Ubersetzung dre Poetik des Aristoteles, 2 vols., Vienna and Leipzig ১৯২৮ খৃ., ১৯৩২ খৃ.; (১৭) Brockelmann., 1. 277, S. I. ৩৬৯, ৯৫৬, S III, ১২০৩ প.; (১৮) G. Graf. Geschichte der christlichen arabischen Literatur, ii. Vatican City 1947 (Studi e testi 133), 129 প. (১৯) Khalil Georr, Les categories d' Aristole dans leurs versions syroarabes, Beirut ১৯৪৮ খৃ.; (২০) Roger Paret. Notes bibliographiques sur quelques travaux recents consacres aux premieres traductions arabes d'oeuvres grecques, in Byzantion, xxix-xxx (1959-60), 387-446; (২১) R. walzer, Greek into Arabic Oxford 1962;(২২) W. Kutsch, khalil al-Djurr (Georr), Al-Makala Al-Èula min Kitab al-samaÈ al-TabiÈili Aristutalis, in Melanges de l'Universite Saint-Joseph. xxxix (1964), 266-312.

G. Strohmaier (E.I.[2])/মোহাম্মদ নওয়াব আলী

**ইসহাক এফেন্দি** (خواجه اسحاق افندى) ঃ খাজা, সুলতান ২য় মাহমূদের রাজত্বকালের একজন 'উছমানী গণিতবিদ ও প্রকৌশলী। তিনি ১৭৭৪ সনে জানিনা (Yanya) প্রদেশের অন্তর্গত আর্তায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন য়াহূদী ছিলেন যিনি পরে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন। Faik Resit Unat তাঁহার গবেষণা প্রবন্ধ Bashoca Ishak Efiendi (Bell., xxviii, 1964, 89-115)-এ দেখাইয়াছেন যে, খাজা ইসহাক এফেন্দি এবং ৩য় সেলীমের প্রিয় পুত্র সুলতান যাদাহ্ ইসহাক যে একই ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি ইস্তাম্বুলে আসেন এবং সেখানে ব্যক্তিগতভাবে গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও বিভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮১৬ সালে তিনি সামরিক প্রকৌশল বিদ্যালয়ে (মুহেনদিসখানে-ই বেররী-ই হুমায়ূন) গণিতের শিক্ষক (খাজা) নিযুক্ত হন এবং যু'ল কা'দা ১২৩৯/জুলাই ১৮২৪ সনে, মুহেনদিসখানায় (ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে) তাঁহার দায়িত্বের অতিরিক্ত তিনি দীওয়ান-ই হুমায়ূন (দ্র.)-এর দোভাষী নিযুক্ত হন। ১২৪৫/১৮২৮-২৯ সনে তিনি দীওয়ানে তাঁহার পদ হইতে বরখাস্ত হন এবং বলকানে দুর্গসমূহ নির্মাণকার্য তদারকীর জন্য সেখানে প্রেরিত হন। মনে হয়, তাঁহার বরখাস্ত হওয়ার পিছনে ছিলেন তৎকালীন রা'ঈসুল-কুত্তাব পার্তেভ এফেন্দি (পরবর্তীতে পাশা) (দ্র.) যিনি ইসহাক এফেন্দিকে তাঁহার শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিতেন। ইসহাক এফেন্দি মুহেনদিসখানায় তাঁহার শিক্ষকতার কাজ চালাইয়া যান এবং রাজাব ১২৪৬/ডিসেম্বর ১৮৩০-জানুয়ারী ১৮৩১ সনে তিনি সেখানে প্রধান প্রশিক্ষক (বাশ-খোজা) নিযুক্ত হন। তিনি মুহেনদিসখানায় পাঠ্যসূচীর সংস্কার করিতে এবং শিক্ষকবৃন্দের মান উন্নয়ন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু অফিসে তাঁহার পূর্বসূরী সায়্যিদ 'আলী এফেন্দি (পরে পাশা) নিজের প্রভাব খাটাইয়া তাঁহাকে বরখাস্ত করান এবং মদীনার পবিত্র ভবনসমূহের সংস্কারের কাজ তদারকী করিবার জন্যে সেখানে পাঠান। সেখান হইতে ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া আসিবার পথে সুয়েযে তিনি ১২৫১/১৮৩৫ সনে ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

ইসহাক এফেন্দির প্রধান রচনা মাজমূ'আ-ই 'উলুম-ই রিয়াদিয়্যা (৪খ., ইস্তাম্বুল ১২৪৭-৫০/১৮৩১-৩৪)-এর বৃহৎ অংশ গণিতবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ভূতত্ত্ব এবং ইহাদের প্রয়োগ সম্পর্কিত বিভিন্ন ফরাসী পুস্তকের অনুবাদ লইয়া গঠিত। যদিও ইহা একখানি সংক্ষিপ্ত স্কুল-পুস্তক, যাহার খুব বেশী একটা বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই, কিন্তু আধুনিক পদার্থ ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর তুর্কী ভাষায় ইহাই প্রথম গ্রন্থ (দেখুন তানজীমাত ১, ইস্তাম্বুল ১৯৪০ খৃ., ৪৭৯ প. ৪৯২ প.; ৫৫৪ প.)। অধিকন্তু 'আরবী ভাষাভিত্তিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষাসমূহ, যাহা তুরস্কে ১৯৩০ খৃ. পর্যন্ত এবং কোন কোন আরব রাষ্ট্রের ইহার পরবর্তী সময় পর্যন্তও ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা প্রধানত ইসহাক এফেন্দিরই সৃষ্টি। তাঁহার শিক্ষা দান এবং প্রকাশনার মাধ্যমে তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে তুরস্ক ও 'আরব রাষ্ট্রসমূহে পরিচিত করিয়া তুলিবার ক্ষেত্রে প্রচুর অবদান রাখেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) সামী, কা'মূসু'ল-আ'লাম, ইস্তাম্বুল ১৩০৬-১৬ খৃ. ২খ. ৮৯৯। (২) সিজিল্ল-ই 'উছমানী, ১খ. ৩২৮। (৩) মেহমেদ এস'আদ, মির'আত-ই মুহেনদিস খানা-ই বেররী-ই হুমায়ূন, ইস্তাম্বুল ১৩১২ খৃ., ৩৪-৪২, ৪৯, ৫৮-৬১। (৪) ওসমান এরজিন, Turkiye maarif tarhil, Istanbul 1939-43, ii. 277f.; (৫) A. Adnan-Adivar, Osmanli Turklerinde ilim, Istanbul 1943, 196f.; (৬) B. Lewis, The emergence of modern Turkey[2], London 1968, 86-8; (৭) N. Berkes, The development of Secularism in Turkey, Montreal 1964, সূচীপত্র; (৮) সমসাময়িক বিবরণের জন্য দেখুন, J. de key, Sketches of Turkey in 1831 and 1832, New York 1833, 138-44; (৯) তাঁহার প্রকাশনার তালিকার জন্য দেখুন, Othmanli Muellifleri, iii. 255; (১০) দেখুন, Ibrahim Alaettin Govsa, Turk meshurlari, Istanbul 1946, 191; (১১) Cagatay Ulucay and Enver Kartekin, Yuksek Muhendis Okulu, Istanbul 1958, index.

E. Kuran (E.I.[2])/মোঃ মনিরুল ইসলাম

**ইসহাক আল-গানাবী** (اسحاق الغنوى) ঃ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী। ঐতিহাসিকগণ সাহাবীদের তালিকায় তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। হিজরতের উদ্দেশ্যে মদীনা যাত্রার প্রাক্কালে তিনি স্বীয় ভগ্নিপতির হাতে শাহাদাত বরণ করেন। বাশ্শার ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক স্বীয় পিতামহী উম্মু হাকীম বিন্ত দীনার আল-মুযানিয়্যা হইতে এবং তিনি নিজ মনিব উম্মু ইসহাক আল-গানাবিয়্যাঃ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি স্বীয় ভ্রাতা ইসহাক সহকারে হিজরতের উদ্দেশ্যে মদীনাভিমুখে যাত্রা করেন। কিয়দ্দুর অগ্রসর হওয়ার পর তাঁহার ভ্রাতা ইসহাক বলিলেন ঃ ভগিনি! তুমি এইখানে অপেক্ষা কর। আমি পুনরায় মক্কায় যাইব। কেননা আমি আমার কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইতে ভুলিয়া গিয়াছি। সেইগুলি লইয়া আসিব। উম্মু ইসহাক (রা) বলিলেন ঃ ভাই! আমার যে ভয় হয়। হয়ত দুরাচার লোকটি (অর্থাৎ তাঁহার স্বামী) তোমার কোন অনিষ্ট সাধন করিবে এবং তোমাকে হত্যা করিবে। কিন্তু ইসহাক তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ভগিনীকে সেইখানে রাখিয়া তিনি মক্কায় চলিয়া গেলেন। উম্মু ইসহাক তিনদিন যাবত অপেক্ষা করিলেন। তবুও ইসহাক ফিরিয়া আসিলেন না। তিনদিন পর এক আরোহী সেই পথ অতিক্রম করিতেছিল। উম্মু ইসহাক-কে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল ঃ হে উম্মু ইসহাক ! তুমি এইখানে বসিয়া কেন ? তিনি বলিলেন ঃ আমি আমার ভ্রাতা ইসহাক-এর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি। সে বলিল ঃ আর প্রতীক্ষা করিও না। তোমার ভ্রাতা ইসহাক আর ইহলোকে নাই। মক্কা ত্যাগের প্রাক্কালে তোমার স্বামী তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। উম্মু ইসহাক ক্রন্দন করিতে করিতে মদীনায় চলিয়া গেলেন এবং রাসূল (স.)-এর নিকট তাঁহার ভ্রাতৃ- হত্যার ঘটনা সবিস্তারে বিবৃত করিলেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্নু'ল-আছীর আল-জাযারী, উসদু'ল-গাবা, বৈরূত ১৩৭৭ হি., ১খ., ৬৮; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ৩২, নং ৯৪; (৩) যাহাবী, তাজরীদু আসমাই'স.-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ১৪।

আবুল বাশার মু. সাইফুল ইসলাম

**ইস্হাক** (اسحاق) ঃ (র) মুহাম্মাদ, মাওলানা, প্রসিদ্ধ 'আলিম ও সমাজ-সেবক, পিতা মুহব্বাত 'আলী, ফেনী জিলার দুদ্মুখা এলাকার ইয়াকুবপুর গ্রামে জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর কাযীর হাট (সোনাগাজী)-র বিশিষ্ট 'আলিম মাওলাবী সুলায়মানের নিকট আরও কিছু দীনী কিতাব অধ্যয়ন করেন। তৎপর উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি বোম্বাই গমন করেন এবং তথা হইতে বহু কষ্টে মক্কা শরীফে পৌছেন। সেখানে তিনি প্রসিদ্ধ সাওলাতিয়া মাদ্রাসায় এগার বৎসর অধ্যয়ন করত হাদীছ, তাফসীর, ফিক্হ ইত্যাদিতে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি তাসাওউফ বিষয়ে শিক্ষা লাভের জন্য সেখানকার বিশিষ্ট ওয়ালী-বুযুর্গদের খিদমতে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করেন। মক্কা শরীফেই শায়খ 'আবদু'ল-হাক্ক' মুহাজির মাক্কী (র)-এর সাহচর্য লাভ করিবার সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া 'ইল্ম মা'রিফাতে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন এবং তাঁহার মুরীদ হন। অতঃপর মুরশিদের নিকট হইতে খিলাফাত লাভ করিয়া হিদায়াতের কাজে আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্যে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

কথিত আছে যে, তিনি প্রায় এক যুগ লোকালয় হইতে দূরে নির্জন স্থানে 'ইবাদাত ও রিয়াদাতে (আধ্যাত্মিক অনুশীলনে) মশগুল ছিলেন। এই সময় তিনি বৃক্ষের ফল ও পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন (বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগণ, ১খ., ১৭২)। তাঁহার সাহচর্যে আসিয়া বহু লোক মুত্তাকী পরহেযগার হইয়াছেন। বৃহত্তর নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলে তাঁহার বহু সংখ্যক মুরীদ রহিয়াছে। তাঁহার ওয়া'জ মাহ্ফিলে বহু লোকের সমাগম হইত। তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন। তাঁহার নাসীহাতমূলক কথা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করিত। মৃত্যু ও আখিরাতের বর্ণনায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে শ্রোতাদের কেহ কেহ কাঁদিতে থাকিত। তাঁহার চেহারায় বিশেষত চক্ষুতে এক বিশেষ আকর্ষণীয় শক্তি ছিল যাহা একবার দেখিলে মানুষ পুনরায় দেখিতে আগ্রহান্বিত হইত।

ফলে যেখানেই তিনি যাইতেন, সেখানেই দর্শনার্থীদের ভীষণ ভিড় লাগিয়া থাকিত। হয়ত বা এই কারণেই তিনি সাধারণের সমক্ষে বিশেষ বাহির হইতেন না। তিনি খাঁটি শারী'আতপন্থী ছিলেন, বিদ্'আত ও শারী'আত বিরোধী কাজকর্ম হইতে বিরত থাকিতে লোকদের উপদেশ দিতেন। মানুষের সহিত তাঁহার ব্যবহার ছিল নম্র ও হৃদ্যতাপূর্ণ। দু'আ'প্রার্থীদের কখনও তিনি বিমুখ করিতেন না। তাঁহার দু'আ'য় অনেকের

বিপদ-আপদ ও অসুখ-বিসুখ দূর হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। তাঁহার অনেক কারামাতের কথাও লোকমুখে শোনা যায়।

তিনি ইংরেজ আমলে দুধমুখায় অত্র এলাকার প্রাচীনতম য়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা করেন (১৯৩৬ খৃ.)। তিনি তাঁহার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করিয়া দেন। প্রতিষ্ঠানটি তাঁহারই নামানুসারে ইস্হাকিয়া এতীমখানা নামে আখ্যায়িত হয়। তাঁহার মুরীদান ও ভক্তদের [তাঁহাদের মধ্যে ফেনীর চাড়িপুর নিবাসী দানবীর মরহুম মুমতাযু'দ্দীন আহমদ (মৃ. ১৯৪২ খৃ.)-এর নাম উল্লেখযোগ্য] সাহায্য ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে উহা সরকারী অনুদানে ও জনসাধারণের সাহায্যে সুন্দরভাবে পরিচালিত হইতেছে। য়াতীমখানার ছাত্রসংখ্যা প্রায় পাঁচ শত (১৯৭৮ খৃ.)।

মাওলানা তাসাওউফ বিষয়ে উর্দূতে 'তা'লীমে হাক্কা'নী ওয়া ফুয়ূদে. ইসহাকী' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল হক উহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন (২য় সংস্করণ, ফেনী ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ)। গ্রন্থটিতে তাসাওউফের নানা জটিল বিষয় সহজ পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হইয়াছে এবং যিক্র-আয্‌কারের নিয়মাবলীও বিবৃত হইয়াছে। ইহার সংক্ষিপ্ত সারও 'আমল ও নছিহত' নামে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্তৃক রচিত হইয়াছে (প্রকাশ ফেনী, তা. বি.)।

মাওলানা তৎকালীন রাজনীতি সম্পর্কেও সজাগ ছিলেন। জাম'ইয়াতে 'উলামায়ে হিন্দের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তাঁহার সমর্থন ছিল। অবশ্য সক্রিয় রাজনীতিতে তিনি অংশ গ্রহণ করেন নাই। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দের বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে ফেনী এলাকায় জাম'ইয়াত মনোনীত পার্থী মৌলভী আবদুর রাজ্জাককে তিনি সমর্থন দান করেন। ফলে মুসলিম লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া আবদুর রাজ্জাক বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন।

মাওলানা দুই বিবাহ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা আবদুল হক (মৃ. জানুয়ারী ১৯৮৬) তাঁহার গদ্দিনিশীন হন।

তিনি ১৯ নভেম্বর, ১৯৩৮ তারিখে ইনতিকাল করেন এবং নিজ বাড়ীর অঙ্গনে তাঁহাকে দাফন করা হয়। এখনও দূর-দূরান্ত হইতে লোকজন তাঁহার কবর যিয়ারাতের জন্য সেখানে আগমন করে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) এম. ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, ২য় সংস্করণ, ফেনী ১৪০১/১৯৮১, পৃ. ১৭২; (২) মোহাম্মদ আবদুল হক, তায়ালীমে হাক্কানী, ২য় সংস্করণ, ফেনী ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৯-৬১; (৩) ঐ লেখক, আমল ও নছিহত, ফেনী তা. বি., পৃ. ২; (৪) ইছহাকিয়া য়াতীমখানার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রকাশক আবদুছ ছাত্তার, ফেনী ১৯৭৮ খৃ.)।

এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন

**ইসহাক ফরিদী** (اسحاق فريدى) ঃ মাওলানা ইসহাক ফরিদী ১৯৫৭ সনের ৫ জুন (মুতাবিক ১৭ অগ্রহায়ণ) বুধবার সকল আট ঘটিকায় মুনশীগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার হোগলাকান্দী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আবদুস সালাম শিকদার, মাতার নাম সকীনা বেগম; দাদা নেকবর শিকদার ও দাদী মোসাম্মৎ নেসা বেগম। নেকবর শিকদার অত্যন্ত ধর্মভীরু লোক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র সন্তান আবদুস সালাম শিকদার অতিশয় নম্র, ভদ্র ও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজ গ্রামের বেপারী পরিবারে বিবাহ করেন। আবদুস সালাম ও সকীনা বেগমের বিবাহের আঠারো বছর পর তাহাদের একমাত্র সন্তান মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী জন্মগ্রহণ করেন।

মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ছিলেন পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তাই তিনি ছিলেন পিতা-মাতার গর্বের ধন ও নয়নের মনিস্বরূপ। অত্যধিক আদরে প্রতিপালিত হইলেও মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ছিলেন নম্র, বিনয়ী ও পড়াশুনার প্রতি আগ্রহী।

তাঁহার শিক্ষাজীবনের সূচনা হয় হোগলাকান্দী জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আকবর আলী সাহেবের নিকট। পরবর্তী ইমাম হাফিয আবদুল হামীদ সাহেবের নিকট ইসহাক ফরিদী পবিত্র কুরআন মজীদ হিফয করিতে শুরু করেন। ইহার পাশাপাশি ইসহাক ফরিদীকে হোগলাকান্দী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। তিনি অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হন।

হাফিয আবদুল হামীদ মসজিদের দায়িত্ব ছাড়িয়া দুই মাইল দূরবর্তী নিজ বাড়ি চলিয়া যান। ইসহাক ফরিদী প্রত্যহ উস্তাদজীর বাড়ি গিয়া কুরআন মজীদ হিফয করিতে থাকেন। অল্প দিনেই তিনি সুনামের সঙ্গে পবিত্র কুরআনের হিফ্য সমাপন করেন।

ইহার পর তিনি নারায়ণগঞ্জের দেওভোগ মাদ্রাসার কিতাব বিভাগে ভর্তি হন। পরবর্তী বৎসর তিনি মাওলানা কাযী মু'তাসিম বিল্লাহ প্রতিষ্ঠিত যাত্রাবাড়ি মাদরাসায় ভর্তি হন। এক বৎসর পর তিনি ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তিনি এই মাদ্রাসায়ই মাওলানা নূর হোসাইন কাসিমী ও মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদকে শিক্ষক হিসাবে পান। তিনি মালীবাগের জামিয়া শারইয়্যাহতে চলিয়া আসেন। ঐ বৎসরই মালীবাগ মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীছের ক্লাস খোলা হয়। তাই, মাওলানা ইসহাক ফরিদী ও তাঁহার সতীর্থরাই মালীবাগ জামিয়ার দাওরায়ে হাদীছের প্রথম বর্ষের ছাত্র। তখন এই মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ। মাওলানা ইসহাক তাঁহার নিকট বুখারী শরীফ পড়িয়া হাদীছের সনদ লাভ করেন। ইহা ছাড়া তিনি শায়খুল হাদীছ মাওলানা আবদুল হক আযমী ও শায়খুল হাদীছ মাওলানা আশরাফ উদ্দীন আহমদের নিকট হইতেও হাদীছের সনদ লাভ করেন। এই তিন উস্তাদই ছিলেন মাওলানা হুসায়ন আহমদ মাদানীর সনদপ্রাপ্ত।

মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৮৪ সনে কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী কাসিমুল 'উলুম মাদরাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। পরের বৎসর এই মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদীছের ক্লাস চালু করা হইলে মাওলানা ইসহাক ফরিদী তিরমিযী শরীফের দরস প্রদান করেন। তাঁহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদ্রাসাটির প্রভূত উন্নতি হয়। ১৯৮৮ সনে নিজ থানা গজারিয়ায় কাউনিয়াকান্দী গ্রামে মদীনাতু'ল 'উলুম সিরাজিয়া মাদ্রাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর ঢাকার পীরজঙ্গী মাযার সংলগ্ন জামিয়া দীনিয়ায় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ইহার পাশাপাশি শাহজাহানপুরের ঝিল মসজিদে ইমাম ও খতীব হিসাবেও দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন।

তিনি ১৯৮৯ সনে জামিয়া মাদানিয়া বারিধারায় মুহাদ্দিছ পদে যোগদান করেন। এখানে দুই বৎসর শিক্ষকতার পর ১৯৯১ সনে তিনি ঢাকার চৌধুরী পাড়ায় শেখ জনুরুদ্দীন দারুল কুরআন শামসুল 'উলুম মাদরাসার মুহতামিম পদে এবং মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদ-ই নূর-এর খতীবের দায়িত্বে

নিযুক্ত হন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে এই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য অর্জিত হয়। তিনি এই দায়িত্বে তাঁহার ইনতিকাল পর্যন্ত প্রায় চৌদ্দ বৎসর বহাল ছিলেন।

মাওলানা ইসহাক ফরিদী মাওলানা সায়্যিদ আস'আদ মাদানীর হাতে বায়আত হন। তাঁহার উদ্যোগেই ১৯৯৭ সনে আস'আদ মাদানী বহু ভক্তসহ চৌধুরীপাড়া মাদরাসা সংলগ্ন নূর মসজিদে পূর্ণ রমযান মাস ই'তিকাফ করেন।

১৯৯৪ সনে চট্টগ্রামের জামিয়া ইসলামিয়া উবাইদিয়ার মুহতামিম মাওলানা শাহ জমির উদ্দীন নানূপুরী মাওলানা ইসহাককে খিলাফত ও ইজাযত দান করেন। মাওলানা ইসহাক ফরিদী মোট চারবার হজ্জ করেন।

মাওলানা ইসহাক ফরিদী ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাধর অধিকারী। তিনি বহু সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার পাশাপাশি লেখালেখিতেও নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার সাকুল্য জীবন মাত্র আটচল্লিশ বৎসর। তিনি এই অল্প সময়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে হাজার হাজার পৃষ্ঠা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক লেখা এখনো অগ্রন্থিত রহিয়াছে। এখন পর্যন্ত তাঁহার যেসব মৌলিক ও অনূদিত লেখা মুদ্রিত হইয়াছে তাহার একটি তালিকা প্রকাশক ও প্রকাশকালসহ পেশ করা হইল। (ক) মৌলিক গ্রন্থাবলী ঃ ১. কুরবানী ঃ ইতিহাস ও মাসাইল, প্রকাশকাল ১৯৮৬; ২. বাতিল ঃ যুগে যুগে, আলআমীন একাডেমী, ১৯৯০; ৩. নবী প্রেমের অমর কাহিনী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫; ৪. উজ্জ্বল একটি নক্ষত্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, ৫. ইসলামে বিবাহ-শাদী, আগস্ট ১৯৯২; ৬. জিহাদের মর্মকথা, ১৪১২ হি.; ৭. কুরআন সুন্নাহ ও যুক্তির আলোকে ইসলামী আকীদা, আল আকাবা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮; ৮. সূদ একটি অর্থনৈতিক অভিশাপ, মাদানী পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫; ৯. আযাদী আন্দোলনের বীর সেনানী মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, ১৯৯২; ১০. ইসমতে আম্বিয়া (উর্দু), আনজুমানে হুফফাজে কুরআন, ১৯৯৩; ১১. সিনেমার কুফল, মাদানী পাবলিকেশন্স, ১৯৯৩; ১২. দাওয়াত ঃ পদ্ধতি ও দা'ঈর গুণাবলী, ১৯৯৬; ১৩. খিলাফত ও ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন, মাদানী পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬; ১৪. কওমী মাদরাসা কি ও কেন, মাদানী পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭; ১৫. নামায ও জরুরী মাসাইল, নয়া জামানা প্রকাশনী, ৬২ হাজীপাড়া, ঢাকা; ১৬. খতমে নবুওয়ত ও কাদিয়ানী সম্প্রদায়, ইসলাহুল মুসলিমীন পরিষদ; ১৭. কুসংস্কারের বেড়াজালে মুসলিম উম্মাহ, হেরার কাফেলা; ১৮. মাসনূন দু'আ, ১৯. কুরআন সুন্নাহ ও যুক্তির আলোকে জন্মনিয়ন্ত্রণ, ২০. ইসলাম ঃ রাষ্ট্র ও রাজনীতি, ১৯৯৯; ২১. ইসলাম ঃ অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা, ২০০০; ২২. আল-কুরআনের আলোকে ত্রিত্ববাদ, ২৩. বাইবেল কি আসমানী কিতাব ? ২৪. শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী ঃ জীবন ও সংগ্রাম, ১৯৯৮; ২৫. হাদীস ও ফিকহে হানাফী (আংশিক), ইফাবা, ২০০৪।

(গ) অনূদিত গ্রন্থাবলী ঃ ৩৭. ইসলামী জীবন, মাদানী পাবলিকেশন্স, ১৯৯৪; ৩৮. বুখারী শরীফ দ্বিতীয়, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম খণ্ড (আংশিক), ইফাবা, ১৯৯১-৯২; ৩৯. তাফসীরে তাবারী শরীফ প্রথম, ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৮ম খণ্ড (আংশিক), ইফাবা, ১৯৯৩-২০০০; ৪০. আল-হিদায়া চতুর্থ খণ্ড (আংশিক), ইফাবা, ২০০১; ৪১. ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, প্রথম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, ইফাবা, ১৯৯৯-২০০৩; ৪২. আশরাফুল হিদায়া (আংশিক), ইসলামিয়া কুতুবখানা, ২০০৪; ৪৩. মুসলিম শরীফ, তৃতীয়, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড, ইফাবা, ১৯৯১-২০০৪; ৪৪. নাদরাতুন নাঈম, প্রথম, দ্বিতীয় ও ৬ষ্ঠ খণ্ড (আংশিক), ইফাবা, ২০০৫; ৪৫. ইলাউস সুনান, প্রথম খণ্ড, ইফাবা, ২০০৫; ৪৬. জীবন গঠনে আল কুরআনের শিক্ষা, ইফাবা, ২০০৫; ৪৭. তাফসীরে ইবন আব্বাস (রা), ২খ (আংশিক), নভেম্বর ২০০৪।

ইহা ছাড়া দিশারী স্মারক, মাসিক পাথেয়, মুজাহিদ বার্তা, রাহমানী পয়গাম, মহিলা দর্পণ, পয়গামে হক, মঈনুল ইসলাম, আর-রশীদ ও আল কাউসার এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন হইতে প্রকাশিত সীরাত স্মরণিকা ও মাসিক অগ্রপথিকে তাঁহার বহু নিবন্ধ ছড়াইয়া রহিয়াছে।

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদীর চরিত্রে অনেক মানবিক গুণ পরিলক্ষিত হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল। জীবনের নানা চড়াই উতরাই, দুর্যোগ দুর্বিপাক ও সংগ্রাম সংকট তিনি সবরের মাধ্যমে মুকাবিলা করেন। তাঁহার ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং কর্মক্ষেত্রের সমস্যা মুকাবিলায় তিনি অবিচল থাকিতেন। অর্থসম্পদের মোহ তাঁহাকে কখনও স্পর্শ করে নাই। তিনি জমি বিক্রয় করিয়া সেই টাকা দিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থও দীনী কাজে অকাতরে বিলাইয়া দিতেন। তিনি দরিদ্র, অসুস্থ ও বিপদগ্রস্ত মানুষের উপকারের জন্য ছুটিয়া যাইতেন।

মাওলানা ইসহাক ফরিদী ২০০৫ সনের ৬ জুন রবিবার রাত্রে কুমিল্লার বুড়িচং থানার কোরপাই নামক স্থানে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। পরদিন সোমবার বাদ যুহর চৌধুরী পাড়া মাদরাসায় তাঁহার জানাযার সালাত অনুষ্ঠিত হয়। সালাতে ইমামতি করেন মাওলানা কাযী মু'তাসিম বিল্লাহ। মুনশীগঞ্জের কাউনিয়াকান্দী সিরাজিয়া মাদরাসার পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক পুত্র, ছয় কন্যা এবং অসংখ্য ছাত্র, ভক্ত ও গুণগ্রাহী রাখিয়া গিয়াছেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) আল্লামা ইসহাক ফরিদী স্মারকগ্রন্থ, মাওলানা মুহাম্মদ আবূ মূসা ও জাফর আহমদ আশরাফী সম্পাদিত, চৌধুরী পাড়া মাদরাসা, ঢাকা, নভেম্বর ২০০৫; (২) মাওলানা আশরাফউদ্দীন আহমদ স্মারকগ্রন্থ, জুবাইর আহমদ আশরাফ সম্পাদিত, চৌধুরী পাড়া মাদরাসা, ডিসেম্বর ২০০৩; (৩) উলূমুল হাদীস স্মারক গ্রন্থ, মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী সম্পাদিত, চৌধুরী পাড়া মাদরাসা, ২০০২; (৪) দৈনিক ইনকিলাব, ৭-৬-২০০৫; (৫) দৈনিক যুগান্তর, ৭-৬-২০০৫; (৬) দৈনিক আমার দেশ, ৭-৬-২০০৫; (৭) দৈনিক খবর, ১৪-৬-২০০৫।

**ইসহাক আল-মাগরিবী** (اسحاق المغربی) ঃ ভারতবর্ষের একজন প্রসিদ্ধ সূফী, ফাকীহ্। তিনি ৬৬০/১২৬১ সনে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। শায়খ মুহাম্মাদ আল-মাগ্‌রিবীর নিকট তিনি তরীকাতের শিক্ষা লাভ করেন। তিনি নিজ শায়খের জীবিতকাল পর্যন্ত তাঁহার সাহচর্যে কাটান এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কবরের নিকট সাধনা করিতে থাকেন। অতঃপর ফীরূয শাহের রাজত্বকালে তিনি আজমীর আগমন করেন। তখন এইখানে কিছুকাল অবস্থান করার পর নাগূরের খাটু গ্রামে চলিয়া আসেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। ১৭ শা'বান ৭৭৬/১৩৭৪ সনের ১২০ বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। মাজমা'উ'ল-আবরার (مجمع الابرار) গ্রন্থে অনুরূপ উল্লেখ আছে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) 'আবদু'ল-হায়্যি লাখনাবী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতি'র, ২য় সং, হায়দরাবাদ (ভারত) ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ. ১০, ১১; (২) prof. Muhammad Enamul Haq, Sufism in Bengal, Ist Ed. Bangladesh 1975, p. 14-5, 41।

মুহাম্মদ মূসা

**ইসহাক সূকুতী** (اسحاق سوكتى) ঃ একজন তরুণ তুর্কী নেতা ছিলেন। সম্ভবত কুর্দী বংশোদ্ভব এই ব্যক্তি ১৮৬৮ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। ইস্তাম্বুলের সামরিক মেডিক্যাল স্কুলের একজন ছাত্র হিসাবে তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গুপ্ত সঙ্ঘের (Secret Committee) প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম প্রারম্ভিক সদস্য হিসাবে যোগদান করেন। গুপ্ত সঙ্ঘ পরবর্তীতে 'সংহতি ও উন্নতি সঙ্গে' (Committee of Union and Progress), (ইত্তিহাদ ভি তারাক্কী জেম'ইয়েতি দ্র.) উন্নীত হয়। পরবর্তীকালে ১৮৯৫ খৃ., তাঁহাকে রোড্স (Rhodes)-এ নির্বাসন দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি পলায়ন করিতে সক্ষম হন এবং প্যারিসে গমন করেন। সেইখানে তিনি রাজনৈতিক কারণে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত তরুণ তুর্কীদের সহিত মিলিত হন। ১৮৯৭ খৃ. অন্যদের সহিত তিনি সরকার বিরোধী সাময়িকী 'ওসমানলি' ('উছমানলী) প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা জেনেভা হইতে প্রকাশিত হইত। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে সুলতানের পক্ষ হইতে সম্মিলিত চাপ ও প্রলোভনের মুখে সাময়িকীটির প্রকাশনায় সমাপ্তি ঘটে এবং ইহার কতিপয় পোষককে সরকারী চাকুরী প্রদান করা হয়।

ইসহাক সূকুতী রোমের (Rome) 'উছমানী দূতাবাসে মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত হন। যাহা হউক তিনি যুব তুর্কীদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করেন নাই এবং 'ওসমানলী'-র প্রকাশনা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে তাহাদের একটি দল লণ্ডনে গমন করিলে প্রকাশনার ব্যয় বহন করিতে সম্মতি প্রদান করেন এবং ১৯০৩ খৃ. San Remio-তে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত ইহা অব্যাহত রাখেন। ১৯০৯ খৃ. তুরস্কের বিপ্লবের পরে তাঁহার বন্ধু ডঃ রিদা নূর (দ্র.) তাঁহার মৃতদেহ ইস্তাম্বুলে আনয়ন করেন এবং সুলতান মাহমুদের সমাধি সন্নিহিত বাগানে দাফন করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) E.E. Ramsaur, The Young Turks's prelude to the revolution of 1908, princeton N. J. ১৯৫৭ খৃ.; (২) Serif Mardin, Jon Turklerin siyasi fikirleri, আংকারা ১৯৬৪ খৃ.; (৩) Ahmed Bedevi Kuran, Osmanli Imparatorlugunda inkilap hareketleri ve milli mucadele, ইস্তাম্বুল ১৯৫৬ খৃ., বিশেষ করিয়া পৃ. ২১২ পৃ.।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/মুহঃ আবু তাহের

**ইসহাকিয়্যাঃ** (দ্র. কাযারুনী)

**ইসাক্চা** (Isakca) ঃ বর্তমান রুমানিয়ার একটি স্থানের নাম, ইহার আদি-উৎপত্তি প্রাচীন কালে। মধ্যযুগে ইহা অবলুচিকা (Oblucica) নামে পরিচিত ছিল। মোল্দাভিয়া (Moldavia) আক্রমণ এবং পরবর্তীকালে পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য তুর্কী শাসনআমলে ইহা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি ছিল। ৮৮৯/১৪৮৪ সালে প্রথম ভাগে ২য় বায়াযীদ তাঁহার বাহিনীসহ ইসাকচা-র নিকটবর্তী সেতুর উপর দিয়া দানিয়ুব নদী অতিক্রম করিয়া কিলিয়া (Kilia বা Kili) এবং সিটাটি আল্বা (Cetatea Alba) বা আক কেরমান (Ak Kerman)জয় করেন। 'উছমানী সরকার দুর্গ রক্ষা এবং দুর্গ রক্ষায় নিয়োজিত সৈন্যদল (Garrison)-এর রসদ সরবরাহের ব্যাপারে বিশেষ নজর দিতেন। ওয়াল্লাচিয়া (Wallachia) এবং মোল্দাভিয়া হইতে শস্যাদি ও গবাদি পশু ইস্তাম্বুলে আনয়ন এবং মালামাল বিপরীতমুখী পথে প্রেরণের জন্য ইসাক্চা একটি গুরুত্বপূর্ণ যাতায়াত কেন্দ্রে পরিণত হয়।

১১শ/১৭শ শতকের একটি কাযা (قضاء)-র কেন্দ্র হিসাবে ইসাক্চা একটি বেশী বড় শহর ছিল না। আওলিয়া' চেলেবির মতে জনসংখ্যা ওয়াল্লাচীয়, মোল্দাভীয়, গ্রীক, আর্মেনীয় ও বুলগেরীয় জনগণ লইয়া গঠিত। নদী বন্দরটি ছিল অত্যন্ত কর্মচঞ্চল নৌ-বাণিজ্য কেন্দ্র। স্থানীয় শাসকগণ এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার খাজনা ও বন্দর-শুল্ক বাবদ উল্লেখযোগ্য রাজস্ব পাইতেন। ইসাকচাতে কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য চালু ছিল; যথেষ্ট সংখ্যক দোকানপাটও ছিল, কিন্তু কোন বেযাযিস্তান (بزاز ستان, market-place,সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত বাজার) ছিল না। সমগ্র বাজার এলাকা, দুর্গ, সরাইখানা, মসজিদ, ইমারত ও গোসলখানাসমূহ সমেত কা'পুদান হাসান পাশার ওয়াক্ফ ছিল। ১১শ/১৭শ শতকে তাঁহারই বংশধরগণ রাজস্ব গ্রহণ করিতেন।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে রুশ ও তুর্কীদের মধ্যে যুদ্ধ চলাকালে 'উছমানী সাম্রাজ্যের বলকান-এর দিকে দব্রুজা (Dobruja) হইয়া অগ্রসর হওয়ার পথে রুশ বাহিনী কয়েকবার ইসাক্চা দখল করে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) নেশ্রী জিহান্নুমা, সম্পা. T. Menzel এবং Fr. Taeschner, লাইপযিগ ১৯৫১ খৃ., ১খ., ২২৪; (২) Cronici turcesti privind Tarile Romane, বুখারেষ্ট ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৫৪৪; (৩) আওলিয়া চেলেবী, ৫ম খণ্ড, ৩৫৯-৬১; (৪) J. v. Hammer, Rumeli un Bosna, ভিয়েনা ১৮১২ খৃ.; (৫) Istoria Romintei, সম্পা. Ac. Rupubl, popul. Romine, ২খ, ৮০৬, ৮১১, ৮১৪, ৩খ., ৬০২, ৯২৬; (৬) N. Beldiceanu, La campagne ottomane de 1484; ses preparatifs militaires et sa chronologie, in Fevue des etudes roumaines ৫-৬খ., প্যারিস ১৯৬০ খৃ., ৭৫-৭; (৭) A. Kuzev, Prinosi kam istoriyata na srednovekovnite kreposti po Dolnija Dunav, V. izvestiya na Narodniya muzei Varna. ৭খ. (১৯৭১ খৃ.), ৭৭-৮৭; (৮) M. Guboglu, Turetskiy istocnik 1740 o vlachii, Molavii i Ukraine, Vostocnie istoeniki po istor narodov yugo-vostocnoy i tsentral noy Evropi, মস্কো ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ১৪৭; (৯) Bibl, Nat., সোফিয়া, Oriental dept. fonds ১৭৬।

B. Cvetkova (E.I.[2])/নুরুল আমিন

**ইসাফ ওয়া না'ইলা** (اساف ونائلة) ঃ 'আরবের জাহিলী যুগে মক্কায় যে সমস্ত মূর্তি পূজিত হইত ইহারা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ইহা একটি যুগল মূর্তি। ইসাফ একটি পুরুষ মূর্তি এবং না'ইলা নারী মূর্তি। তদানীন্তন আরবদেশে এই যুগল মূর্তি লইয়া নানারূপ কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়। একটি কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, য়ামান বংশজাত জুরহুম গোত্রে প্রাচীন কালে ইসাফ ইব্ন য়া'লা' নামক এক যুবক এবং না'ইলা বিন্ত যায়দ নামক এক যুবতী ছিল। এই যুবক-যুবতী গভীর প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

হিশাম আল-কাল্বী (মৃ. ২০৪/৮১৯ অথবা ২০৬/৮২১) তাঁহার কিতাবু'ল-আসনাম গ্রন্থে জাহিলী 'আরবে প্রচলিত এই যুগল মূর্তি সম্বন্ধে বহু কল্পকাহিনী উল্লেখ করেন (দ্র. কিতাবু'ল-আসনাম, সম্পা. ও অনু. W. Atallah, প্যারিস ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ৬; তু. Klinke-

Rosenberger. Das Gotzenbuch, লাইপযিগ ১৯৪১ খৃ.; পৃ. ৬ ও ১৮)।

জানা যায় যে, খুযা'আ, কুরায়শ ও অন্যান্য গোত্রের তীর্থযাত্রীরা এই যুগল মূর্তিকে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন দেবদেবী জ্ঞানে পূজা করিত। আরও জানা যায় যে, প্রাথমিক অবস্থায় এই যুগল মূর্তি পৃথক পৃথক দুইটি মূর্তি ছিল; একটি স্থাপিত ছিল কা'বা শারীফের সংলগ্নে এবং অন্যটি ছিল যামযাম কূপের সন্নিকটে। পরে কুরায়শ গোত্র মূর্তি দুইটিকে একত্র করিয়া যাম্যামের নিকট স্থাপন করে। সেকালে ইহার পার্শ্বে তাহারা পশু বলি দিত। কিন্তু আল-আযরাকী (দ্র. আখবার মাক্কা, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৪৯) প্রদত্ত তথ্যে জানা যায় যে, এই মূর্তিদ্বয় সাফা ও মারওয়াঃ পাহাড়ে স্থাপিত ছিল।

অন্য একটি কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, কা'বাঃ শারীফ অপবিত্র করিলে কি দশা হয় তাহার নিদর্শনস্বরূপ এই দুইটি মূর্তিকে সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে রাখা হইয়াছিল। পরবর্তী কালে 'আমর ইব্ন লুহায়্যি নামক দলপতির নির্দেশে এই মূর্তিদ্বয় দেব-দেবীর মর্যাদা লাভ করে এবং তখন হইতেই উহা পূজিত হইতে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, উপরিক্ত 'আমর ইব্ন লুহায়্যি 'আরবে মূর্তি পূজার অন্যতম পুরোধা।

ইসাফকে মনে করা হইত বায়ু ও বৃষ্টির দেবতা এবং নাইলাকে উর্বরতার দেবী (দ্র. Pantheon, পৃ. ১০৭)। ৬৩০ খৃস্টাব্দে মক্কা বিজয়ের পর 'আরবে মূর্তিপূজা সমূলে উৎপাটিত হয়। তৎসংগে এই যুগল মূর্তিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) R. Dozy. De Israelieten te Mekka. পৃ. ১৯৭; (২) Wellhausen, Reste Arab. Heidenthums, ২য় সং., পৃ. ৭৭; (৩) T. Fahd, Le Pantheon de lÈArabie centrale a la veille de lÈhegire, প্যারিস ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ১০৩-৭।

T. Fahd (E.I.[2])/হাসান আবদুল কাইয়ূম

**'ইসাম ইব্ন 'আমির** (عصام بن عامر) ঃ (রা), একজন সাহাবী। তিনি বানূ কাল্ব গোত্রের লোক ছিলেন। 'আম্র ইব্ন জাবালাঃ আল-কাল্বী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আম্রা নামে আমাদের একটি মূর্তি ছিল। উহার অর্ঘাদি অর্পণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল 'ইসাম ইব্ন 'আমির নামে বানূ 'আম্র ইব্ন 'আওফ শাখা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি। একদিন 'ইসাম বলিল, "আমি এই মূর্তি হইতে এই শব্দ গুঞ্জরিত হইতে শুনিয়াছি, 'হে 'ইসাম! ইসলাম সমাগত, মূর্তিসমূহ তিরোহিত এবং আত্মীয়তার বন্ধন সংস্থাপিত।' ইহাতে আমরা উভয়ে ভীত হইয়া পড়িলাম। অতঃপর আমরা মহানবী (স)-এর নিকট আগমন করিয়া এই ঘটনা বিবৃত করিলাম। তিনি আমাদিগকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলেন। আমরা ইসলাম গ্রহণ করিলাম।" আবূ সা'ঈদ নায়সবুরী তাঁহার "শারাফু'ল-মুস্তাফা" নামক গ্রন্থে এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্ন হাজার 'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৪৮১, ক্রমিক নং ৫৫৪৫।

লিয়াকত আলী

**'ইসাম ইব্ন য়ূসুফ** (عصام بن يوسف) ঃ ইব্ন মায়মূন ইব্ন কুদামা আল-বাল্খী, একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ও ফাকীহ এবং খুরাসান অঞ্চলে সমসাময়িক কালে হানাফী মাযহাবের নেতৃস্থানীয় 'আলিম। তাঁহার ভ্রাতা শায়খ ইবরাহীম ইব্ন য়ূসুফ (দ্র.)-ও একজন প্রখ্যাত হাদীছ শাস্ত্রবিদ ফাকীহ ছিলেন। এতদঞ্চলে হানাফী মাযহাবের প্রসারে এই দুই ভ্রাতার যে বিরাট অবদান রহিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার কুন্য়া ছিল আবূ 'ইসমাত।

শায়খ 'ইসাম বর্তমান আফগানিস্তানের খুরাসান অঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহাসিক রাজধানী বাল্খ-এর অধিবাসী ছিলেন। হাদীছ শাস্ত্রে তাঁহার শায়খদের অন্যতম হইলেন ঃ ইমাম 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারাক, সুফ্য়ান আছ-ছাওরী ও শু'বা (র)। ইঁহাদের সকলের নিকট হইতেই তিনি হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। আবূ হাতিম ও ইব্ন হিব্বান তাঁহাকে হাদীছের একজন বিশ্বস্ত রাবী হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার বর্ণিত দুই একটি হাদীছে কিছু ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয় বলিয়া কোন কোন সমালোচক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। স্থানীয় বহু মুহাদ্দিছ তাঁহার নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করেন।

শায়খ 'ইসাম সালাতের রুকূ' করিবার সময় এবং রুকূ' হইতে দাঁড়াইবার সময় রাফ'উ'ল-য়াদায়ন (হস্তদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন) করিতেন। অথচ হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের অভিমত হইল এইরূপ করিলে সলাত ফাসিদ হয়। ইমাম আবূ হানীফাঃ (র)-এর এই অভিমত শুধুমাত্র শায়খ মাকহূলের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শায়খ 'ইসাম-এর কার্য দ্বারা অনেক বিচক্ষণ ফকীহ মাকহূলের রিওয়ায়াতটি নির্ভুল নয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কেননা শায়খ 'ইসাম কিছুকাল ইমাম আবূ য়ূসুফের সাহচর্যে ছিলেন। কাজেই সালাত ফাসিদ হইবার বর্ণনাটি সঠিক হইলে নিশ্চয়ই ইমাম আবূ য়ূসুফ তাঁহাকে এইরূপ কার্য হইতে বিরত থাকিতে বলিতেন। শায়খ 'ইসাম ২১০/৮২৫ সালে ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) মোল্লা 'আলী আল-কারী, তাবাকাতু'ল-হানাফিয়্যা; নির্ঘন্ট; (২) 'আবদু'ল-কারীম আস-সাম'আনী, কিতাবু'ল-আনসাব, আল-বালখী শিরোনাম; (৩) 'আল্লামা 'আবদু'ল-হায়্যি আল-লাকনাবী, ফাওয়া'ইদু'ল-বাহিয়্যা, মিসর ১৩২৪ হি., পৃ. ১১৬।

ডঃ এ. কে.এম. আইয়ুব আলী

**'ইসাম আল-মুযানী** (عصام المزني) ঃ (রা), একজন সাহাবী। তিনি মহানবী (স.) হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছটি নিম্নরূপঃ মহানবী (স.) কোন অভিযানে সৈন্য প্রেরণ করার সময় বলিয়া দিতেন ঃ "তোমরা যদি কোথাও মসজিদ দেখিতে পাও বা মুআয্'যিনকে আযান দিতে শুনিতে পাও তাহা হইলে তথাকার কাহাকেও হত্যা করিও না।" ইহা তাঁহার পুত্র তাঁহার নিকট হইতে বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী, আবূ দাউদ সিজিস্তানী, নাসা'ঈ, তাবারানী প্রমুখ তাঁহাদের সংকলিত হাদীছ গ্রন্থে এই হাদীছটির উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য ইমাম তাবারানীর গ্রন্থে হাদীছের উপরিউক্ত বর্ণনার অব্যবহিত পরেই এমন একটি অভিযানের ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে যাহাতে 'ইসাম (রা) শরীক ছিলেন। ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র্, ইব্ন মানদা ও আবূ নু'আয়ম তাঁহাদের গ্রন্থে তাঁহার সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) তাঁহাকে সাহাবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন সা'দ তাঁহাকে খন্দক যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন।

**গ্রন্থীপঞ্জী** ঃ (১) ইব্ন হাজার 'আসকালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৪৮০, ক্রমিক নং ৫৫৪৪; (২) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত্-তাহযীব, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ., ২খ, ২১, ক্রমিক নং ১৮২ ঃ (৩) যাহাবী, তাজরীদু

আসমাই'স-সাহাবা; বৈরূত তা. বি., ১খ, ৩৮০, ক্রমিক নং ৪০৯২; (৪) ইবনুল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবাঃ, বৈরূত ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৪০৮; (৫) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র্‌, ইস্‌তী'আব (ইসাবাঃ হাশিয়াঃ, ৩খ, ১৬৩)।

লিয়াকত আলী

**'ইসামী** (عصامی) ঃ পারস্যদেশীয় জনৈক কবির কবিনাম ও পারিবারিক উপনাম, যিনি ভারতে ৮ম/১৪শ শতকে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং ৭৫০-১/১৩৪৯-৫০ সালে গাযনাবীগণের শাসনকাল হইতে শুরু করিয়া রচনাকাল পর্যন্ত বিজয়ী শাসকগণের এবং তাঁহাদের সেনাপতিগণের কৃতিত্বসমূহ সম্পর্কে একটি মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বস্তুত তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় নাই। কারণ ভারতীয় কবিদের জীবনী সংক্রান্ত কোন রচনায় তাঁহার উল্লেখ নাই। বর্তমান প্রবন্ধটি প্রধানত উক্ত মহাকাব্যের মূল বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে নিজের সম্পর্কে তিনি যে বিক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। তাঁহার পূর্বপুরুষ ফাখরু'ল-মুলক 'ইসামী, যিনি 'আব্বাসী খলীফাগণের একজন উযীর ছিলেন, ইলতুতমিশ (দ্র.)-এর রাজত্বকালে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আগমন করেন এবং মুলতানে বসবাস আরম্ভ করেন। পরে তিনি রাজধানী দিল্লীতে চলিয়া যান। তাঁহার পরিবার রাজকীয় আনুকূল্য লাভ করে এবং এই পরিবারের কতিপয় সদস্য উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। 'ইসামী প্রায় ৭১১/১৩১০-১ সালে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার পিতামহ 'ইয্‌যু'দ-দীন 'ইসামী, যিনি বালবান (৬৬৪/১২৬৬–৬৮৪/১২৮৫)-এর অধীনে একজন সিপাহসালার (সেনাপতি) ছিলেন, তাঁহা কর্তৃক লালিত-পালিত হন। তিনি তাঁহার পিতা সম্পর্কে কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে মনে হয় যে, তিনি শৈশবেই পিতৃহারা হইয়াছিলেন। ৭২৬/১৩২৬ সালে যখন মুহাম্মাদ ইব্‌ন তুগলুক [দ্র.] দিল্লীর সমস্ত জনগোষ্ঠীকে দেবগীর (দাওলাতাবাদ)-এ স্থানান্তরের আদেশ দান করেন, তখন 'ইসামীও তাঁহার নব্বই বৎসর বয়স্ক পিতামহের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে যান। তাঁহার পিতামহ ভ্রমণজনিত পরিশ্রম সহ্য করিতে না পারিয়া পথিমধ্যে ইনতিকাল করেন। কিন্তু তরুণ 'ইসামী নিরাপদে দেবগীর পৌঁছেন। পরবর্তী ২৪ বৎসর যাবত তিনি তথায় বসবাস করিয়া একজন সামান্য পরিচিত ও অবহেলিত পণ্ডিত হিসাবে তিক্ত ও নৈরাশ্যময় জীবন যাপন করেন। তখনও অবিবাহিত অবস্থায় তাঁহার সমকালীন ব্যক্তিগণের নৈতিকতাবর্জিত আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি হিজায-এ হিজরত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তদনুযায়ী কাব্য সম্পন্ন করিবার অব্যবহিত পরেই ৭৫১/১৩৫০ সালে 'আরবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ও তথায় বসবাস আরম্ভ করেন এবং খুব সম্ভবত মদীনায় ইনতিকাল করেন। তাঁহার মৃত্যুর সাল অজ্ঞাত।

তাঁহার খ্যাতি প্রধানত তদরচিত একমাত্র বিদ্যমান গ্রন্থ ফুতূহু'স-সালাতীন-এর জন্য টিকিয়া আছে (সং, আগ্রা ১৯৩৮ খৃ., মাদ্রাজ ১৯৪৮ খৃ., ইংরেজী অনু. ও ভাষ্য আগা মাহ্‌দী হুসায়ন, ১খ, বোম্বাই ১৯৬৭ খৃ.,)। তিনি ইহা বাহ্‌মানী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 'আলাউ'দ-দীন হাসান বাহমান শাহ-এর পৃষ্ঠপোষকতায় রচনা করেন। প্রায় পাঁচ মাসে রচিত কবিতাটিতে ১১,৬৯৩ টি শ্লোক রহিয়াছে এবং ইহা ফিরদাওসীর শাহনামার ছন্দে লিখিত। কবি এই ছন্দে তাঁহার সমকক্ষতা অর্জনে অভিলাষী হইয়াছিলেন এবং প্রাপ্ত সকল উৎস হইতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী স্পষ্ট ও সরল শৈলীতে বর্ণনা করিয়াছেন। বিধৃত যুগের তথ্যাদির উৎস হিসাবে ইহা উচ্চমানের বিবেচিত হয় না, তথাপি ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। ইহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম হইতেছে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের প্রতি অনুরাগ এবং কবিসুলভ অমিতাচার বা স্বাধীনতা বর্জন। তাবাকাত-ই আকবারী-র লেখক নিজামু'দ-দীন' আহমাদ, ফিরিশ্‌তা, দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস গ্রন্থ বুরহান-ই মা'আছির-এর রচয়িতা তাবাতাবা'ঈ এবং বাদা'উনী [দ্র] ও তাঁহাদের উৎসসমূহের অন্যতম হিসাবে 'ইসামীর কাব্যগ্রন্থ ব্যবহার করেন। কল্পনা ও প্রকাশ ক্ষমতায় অসাধারণ একজন প্রতিভাবান কবি হিসাবে 'ইসামী সহজ ও সরল ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা ছিল আলংকারিক আতিশয্য, বাগাড়ম্বর ও বাকচাতুরী হইতে মুক্ত। তিনি নিজামী (দ্র.)-র নিকট তাঁহার ঋণ স্বীকার করেন এবং তাঁহাকে তিনি আদর্শ হিসাবে অনুসরণ করিতেন। কিন্তু নিজামী যেই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে পৌঁছিতে তিনি ব্যর্থ হন, বাহমান শাহের প্রতি উৎসর্গিত তাঁহার রচনা . . . সমালোচনামূলক ইতিহাস নয়, বরং ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-তথ্যাদির পরিবেশন উপস্থাপন করে।" ইহার সহজ কারণ এই যে, ইতিহাস রচনা অপেক্ষা মহাকাব্য রচনারই ছিল তাঁহার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ফুতূহু'স-সালাতীন, সম্পা, A. S. Usha, মাদ্রাজ ১৯৪৮ খৃ., সম্পাদকের মুখবন্ধ এবং M. H. Nainar-এর ভূমিকা। (২) Ethe, ১খ. ৫৫৯ (নং ৮৯৫); (৩) Oriental College Magazine, লাহোর ১৪/১খ., (নভে. ১৯৩৭ খৃ.), ৮৯-৯০; (৪) এম. য়ূশা' প্রণীত 'ইসামী-নামাহ, মাদ্রাজ ১৯৩৭ খৃ.; (৫) সাবাহ'দ-দীন 'আবদু'র-রাহমান, মা'আরিফ (উর্দু মাসিক)-এ আজমগড়, আগস্ট ১৯৩৯ খৃ. ১০৯ প., সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ খৃ., ২০১ প.; (৬) P. Hardy, historians of Medieval India, লণ্ডন ১৯৬০ খৃ., পৃ. ৯৪-১১০ ('ইসামী এবং তাহার রচনা সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় লিখিত সমালোচনামূলক গ্রন্থ)। (৭) ফুতূহু'স-সালাতীন, বা 'ইসামীর শাহ নামাহ-ই হিন্দ (আগা মাহদী হুসায়ন কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত)। ১খ., বোম্বাই ১৯৬৭ খৃ., মুখবন্ধ এবং ১৩-১৮ খ. ৭৪-৫; (৮) এস. মু'ঈনু'ল-হাক্ক, Baranis History of the Tughluqs, করাচি ১৯৫৯ কৃ., পৃ. ১১৪-৬; আগা মাহদী হুসায়ন, Tughluk Dynasty, কলিকাতা ১৯৬৩ খৃ., ৫০, ৭২-৭৩, ১১৩, ১২২-৩, ১৬১, ১৬৮, ১৮৩-৪, ১৯৯, ২০২-৩, ২১৪, ২১৮-৯, ২২১, ২২৪, ২৪১, ২৫২, ২৯৯, ৩০২-৩, ৩০৭, ৩৫৮, ৫০২, ৫৭০, ৫৭২-৩, ৫৯৫-৬, ৬৪২।

A. S. Bazmee Ansari (E.I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল বাসেত

**ইহতিশামুদ্দীন মুন্‌শী** (احتشام الدين منشى) ঃ শেখ মির্যা ১৭৩০ ?-১৮০১ খৃ., প্রথম শিক্ষিত বাঙ্গালী য়ুরোপ পর্যটক, সুপণ্ডিত ও লেখক, সৈনিক ও রাজসভাসদ, কূটনীতিক ও নিষ্ঠাবান মুসলিম। জন্মস্থান কস্‌বা পাঁচনূর। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের রেভিনিউ সার্ভের সময় হইতে পরিবর্তিত নাম কাজীপাড়া, বর্তমান নদীয়া জিলার (ভারত) রানাঘাট মহকুমায় চাকদহ পৌরসভার অন্তর্গত, রানাঘাট হইতে ১৫ মাইল এবং কলিকাতা হইতে ৩৮ মাইল দূরে অবস্থিত চাকদহ রেল স্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে 'দারগাহায়ন' নামে পরিচিত হযরত জাহীরু'দ-দীন বাকী হযরত আদাম শাহীদ-এর দুইটি মাযারকে কেন্দ্র করিয়া পাঁচনূর গড়িয়া উঠে (আনু. ১৩শ শতক)। ইহ্‌তিশামের পিতা শায়খ তাজু'দ-দীন, মাতা যুহরা বীবী, পিতামহ শায়খ শিহাবুদ্দীন (মীর জুম্‌লা-র ইতিহাসকার ফাতহিয়্যা 'ইব্‌রিয়া-র লেখক শিহাবু'দ-দীন তালিশ নহেন)। তাঁহার

প্রপিতামহ সুবাদার শাহ শুজা'-র দরবারে "শায়খু'ল-ইসলাম" ছিলেন; তাঁহার ব্যক্তিত্বের কারণে লোকে তাঁহার নাম না লইয়া কেবল উপাধি উল্লেখ করিত। এইভাবে তাঁহার উপাধির অন্তরালে হারাইয়া যাওয়া আসল নাম তাঁহার বংশধরেরা উদ্ধার করিতে পারেন নাই। শায়খু'ল ইসলাম-এর পিতা হযরত শায়খ 'আবদু'শ-শাকূর অতিশয় বুযুর্গ লোক ছিলেন। ইহ্তিশামের অষ্টম উর্ধ্বতন পুরুষ শায়খ মুহাম্মাদ জামাল ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ তালিবু'দ-দীন 'আরব হইতে আগত ভাগ্যান্বেষীদের বংশধর ছিলেন। তাঁহারা বঙ্গদেশের তৎকালীন সমৃদ্ধ বন্দরনগরী আনুলিয়ায় বসবাস স্থাপন করেন। শায়খ জামালের পৌত্র শায়খ ফুল মুহাম্মাদ আনুলিয়া ত্যাগ করিয়া কয়েক মাইল দূরবর্তী পাঁচনূরে বসবাস স্থাপন করেন। এই পরিবারের লোকেরা তাঁহাদের সমসাময়িক রাজদরবারে পুলিশ, সামরিক ও বেসামরিক পদে চাকুরী করিতেন, আইন ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতেন এবং কাদী, মুন্শী ও মুফতীর সম্মানিত পদে কাজ করিতেন। কাদী হিসাবে অনেকেই চাকুরী করিতেন বলিয়া পরিবারটি পরে কাদী (কাযী) উপাধি ধারণ করে। বৃহত্তর পরগণাটির নাম পরে পাঁচনূর হওয়ায় গ্রামটির নাম হয় কাযী পাড়া। (অন্য অভিজাত পরিবারগুলির পদবী অনুসারেও এক একটি পাড়ার নাম হইয়াছিল, যেমন ঃ দেওয়ান পাড়া, মুফতী পাড়া, খোন্দকার পাড়া, মুন্শী পাড়া ইত্যাদি। এই অভিজাত পরিবারগুলির কর্মস্থল ছিল প্রধানত দিল্লী ও মুর্শিদাবাদ। ইঁহাদের অন্যতম মুন্শী সালীমুল্লাহ মুর্শিদাবাদের নিজামাত-এ চাকুরী করিতেন এবং পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আটজন প্রখ্যাত মুন্শীর অন্যতমরূপে গণ্য হইয়াছিলেন)। ইহ্তিশামের বড় ভাই মুফতী গুলাম মুহয়ি'দ-দীন 'আলীবর্দী খাঁর দরবারে মুফতী ছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। ইহ্তিশামের জীবনও প্রায় মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রিক। তিনি নওয়াব মীর কাসিমের আমলে পূর্বোক্ত মুন্শী সালীমুল্লাহ্ এবং নওয়াবের হেড মুন্শী মীর্যা মুহাম্মাদ কাসিমের সহিত ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেন এবং তাঁহাদের সৌজন্যে ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার জীবন সম্পর্কে ইহার বেশী কিছু জানা যায় না। তবে তাঁহার পরবর্তী জীবন ও রচনাবলী হইতে বুঝা যায়, তিনি ফারসী ভাষা ছাড়াও 'আরবী, ইসলামী সাহিত্য ও ইংরেজী ভাষায় অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে তিনি হিন্দী, ব্রজবুলি ও বাংলা কাব্যে প্রেম ও বিরহের কবিতার আধিক্য এবং ইংরেজীতে উহার বিরলতার কারণ সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, হিন্দী ও বাংলা সাহিত্যেও তাঁহার প্রচুর জ্ঞান ছিল। তাঁহার রচনাশৈলীও যে অপূর্ব সুন্দর ছিল তাহা তাঁহার ফারসীর অনুবাদ হইতেও টের পাওয়া যায়। বিলাত যাত্রা নিষ্ফল হইবে এবং মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া আসা অসম্ভব মনে করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "হাতের তীর জ্যা-মুক্ত হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে, ইহাকে আর ফিরাইবার পথ নাই। পাড়ি যখন জমান হইয়াছে তখন শেষ মনযিল পৌঁছিতেই হইবে।" যাত্রাকালে সমুদ্রের দৃশ্য সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "সমুদ্রের ঢেউয়ের খেলায় রাত্রিকালে যেন প্রদীপের মেলা বসে।" লণ্ডন ও অক্সফোর্ড সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "লণ্ডন আমাকে এমন মায়া করিয়াছ যে, তাহা ছাড়িয়া যাইতে আমার হৃদয় দুঃখে ও বেদনায় ভরিয়া উঠে। কিন্তু অক্সফোর্ড শহরটি দেখিয়া আমার হৃদয়ে পুলকের শিহরণ জাগে। ইহার সৌন্দর্য ও রুচিকর পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া সুখের বিহঙ্গ আমার হৃদয়শাখায় নীড় রচনা করে।" মোটকথা তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা নিঃসন্দেহে উচ্চদরের ছিল।

নওয়াব মীর জা'ফারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া সম্ভবত ইহ্তিশামের কর্মজীবনের শুরু। পরে নওয়াব মীর কাসিমের আমলে তিনি মেজর পার্ক (বাকল্যাণ্ডের মতে মেজর ইয়র্ক) নামক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামরিক অফিসারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সহিত বীরভূমের রাজা আসাদ যামান খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেন। পরে তিনি যশোহরে ক্যাপ্টেন নিক্সন-এর অধীনে পে-মাস্টার বা বাখ্শী নিযুক্ত হন। ইংরেজদের সহিত মীর কাসিমের বিরোধ উপস্থিত হইলে তিনি গেরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষেই ছিলেন। পরে ইংরেজরা তাঁহাকে মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব আলোচনার জন্য দূত নিযুক্ত করে। ইহার পর তিনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত কুতুবপুরের তহসীলদার নিযুক্ত হন। অনতিকাল পরে তিনি প্রধান সেনাপতি মেজর কর্মক-এর অধীনে নিযুক্তি লাভ করেন। ইতিপূর্বে সম্রাট শাহ 'আলামের সঙ্গে ইহ্তিশামের একবার সাক্ষাত হইয়াছিল; আবার সাক্ষাত হয় এলাহাবাদে ইংরেজদের হাতে মল্লাররাও ও শুজা'উ'দ-দাওলার পরাজয়ের পরে। এইবার তিনি সম্রাটের দরবারে মুন্শী (সেক্রেটারী) নিযুক্ত হন ও মীর্যা উপাধি লাভ করেন। এইভাবে তিনি শাহী দরবারের আমীরদের অন্তর্ভুক্ত হন এবং প্রায় চার বৎসর এই সম্মানিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকেন। দ্রুত রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে তাঁহার উচ্চতর আকাঙ্খার পথ ব্যাহত হয়।

১৭৬৫ খৃ. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বহু সুবিধাসহ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দীওয়ানী লাভ করে। এই সম্পর্কে যেসব সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, তাহার মুসাবিদা করেন বাদশাহের পক্ষে মীর্যা ইহ্তিশাম ও কোম্পানীর পক্ষে মুন্শী মু'ইয়্য। দীওয়ানী লাভের পরক্ষণেই গভর্নর ক্লাইভ বাদশাহর সঙ্গে তাঁহার নিরাপত্তার জন্য একটি ইংরেজ ব্যাটেলিয়ান রাখার অলিখিত চুক্তি ভঙ্গ করেন এবং ইংলণ্ডের রাজার হুকুম ছাড়া উহা তিনি পারেন না বলিয়া অজুহাত দেন। এইজন্য বাদশাহ শাহ 'আলাম একখানি পত্র ও এক লক্ষ টাকা মূল্যের খিল'আতসহ রাজা তৃতীয় জর্জের কাছে একটি মিশন প্রেরণ করেন। আশ্চর্যের বিষয়, ক্লাইভের চক্রান্তে বাদশাহর প্রতিনিধি নিযুক্ত হন স্কটল্যাণ্ড হইতে ফৌজদারীর ভয়ে পলাতক ক্যাপ্টেন আর্চিবল্ড সুইন্টন নামে একজন অখ্যাতনামা সৈনিক। তাঁহার সঙ্গে শাহী দরবারের আমীর হিসাবে নিযুক্ত হন ইহ্তিশামু'দ্দীন। জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছে আর ফিরিবার উপায় নাই এমন অবস্থায় ইহ্তিশাম জানিতে পারেন যে, ক্লাইভ বাদশাহের পত্র ও খিল'আতের টাকা রাখিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ক্লাইভ এই কাজ করিয়াছিলেন বাদশাহকে না জানাইয়া কোম্পানীর স্বার্থে মিশনকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে। ভারতে কোম্পানীর বিজিত ভূখণ্ডের অধিকার লইয়া বৃটিশ সরকার ও কোম্পানী কর্তৃপক্ষের মধ্যে তখন বাদানুবাদ শুরু হইয়াছিল। এই অবস্থায় বাদশাহের পত্র বিলাতে প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাহা কোম্পানীর পক্ষে যুদ্ধ জয় করিয়া বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার দখল হাসিল করার দাবী দুর্বল হইয়া যাইবে বলিয়া ক্লাইভ এই আচরণ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ১৭৬৫-এর নভেম্বর মুতাবিক ৯ শা'বান, ১১৮০ হি. এবং ১৩ অগ্রহায়ণ, ১১৭২ কলিকাতার দক্ষিণে হিজলী বন্দর হইতে প্রায় ছয় মাস সমুদ্র-যাত্রার পর তিনি লণ্ডন পৌঁছেন। যাত্রাপথে তিনি মালদ্বীপ, মরিশাস, মাদাগাস্কার (বর্তমান মালাগাসী), পেগু, উত্তমাশা অন্তরীপ, অ্যাসেনসন দ্বীপপুঞ্জ, ফ্রান্সের নান্টিজ ও ক্যালে হইয়া ডোভার পৌঁছেন;

ফ্রান্সে তিনি ১৬ দিন ভ্রমণ করেন। লণ্ডনে তিনি তৎকালীন দর্শনযোগ্য সবকিছু ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখেন। তিন মাস পর তিনি অক্সফোর্ড গমন করেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকিছু মনোযোগ সহকারে পরিদর্শন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক মি. জোনস (যিনি পরে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হইয়া আসেন), ডা. হান্ট তাঁহাকে সম্মানিত অতিথি হিসাবে গ্রহণ করেন এবং লাইব্রেরীর বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক তাঁহাকে দেখান। তিনি কিছু ফারসী ও তুর্কী ভাষায় লেখা পুস্তক ও পত্র তাঁহাদিগকে পড়িয়া, বুঝাইয়া অনুবাদ করিয়া দেন এবং ফারসী ভাষায় বিশেষজ্ঞ মি. জোনসকে 'ফারহাঙ-ই জাহাঙ্গীরী-'র অংশ বিশেষের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া দেন। জাহাজে সময় কাটাইবার জন্য তিনি সুইন্টনকে 'কালীলাঃ ওয়া দিমনাঃ' গ্রন্থটি পড়াইয়াছিলেন। লাইব্রেরীতে গ্রন্থখানির একখানি ফারসী ভাষা পাইয়া উহার পরিশিষ্ট নকল করিয়া লইলেন সুইন্টনকে পড়াইবার জন্য।

দৌত্যকার্য যখন ব্যর্থই হইল, তখন তিনি সুইন্টনের পৈত্রিক বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থানের জন্য তাঁহার সঙ্গে এডিনবরা গমন করেন। এই সময়ে লণ্ডনে কলিকাতার কয়েকজন প্রাক্তন কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে নওয়াব মুজাফ্ফার জাঙ্গ, মহারাজ নন্দকুমার ও মহারাজা দুলহর রামের নিকট হইতে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগের বিচার চলিতেছিল। এই প্রসঙ্গে প্রমাণ হিসাবে কিছু কাগজপত্র পড়িয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য আদালতে হাযির হইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সপ্তাহখানেকের জন্য লণ্ডনে আসিতে হইয়াছিল।

বিলাতে অবস্থানের শেষ দিকে তাঁহাকে বহু পীড়াপীড়ি করা হয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে বা অন্তত কিছুকালের জন্য ফারসী অধ্যাপকরূপে কাজ করিতে। তাঁহাকে বহু অর্থ ও এক বা একাধিক বিলাতি স্ত্রী বিবাহেরও প্রলোভন দেখান হয়। তিনি জবাবে বলিয়াছিলেন, "আমার নিজের দেশে দারিদ্র্য এই দেশের ঐশ্বর্যের তুলনায় ভাল, আর ইংলণ্ডের পরীর মত যুবতীদের তুলনায় আমার দেশের গমের মত রঙের মহিলাদিগকে আমি বেশী পসন্দ করি।" অবশেষে তাঁহাকে য়ুরোপের মূল ভূখণ্ড ভ্রমণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। ইহা তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিলেও তাঁহার মুসলিম বাবুর্চি মুকীমকে সঙ্গে লওয়া চলিবে না বলিয়া তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার আদর্শ ছিল, তাঁহার নিজের ভাষায় সুলায়মানের সিংহাসনের তুলনায় আপন জন্মভূমির মমতা মহত্তর। জন্মভূমির কাঁটা (বিদেশী) সুগন্ধ ফুলের তুলনায় মধুরতর। যে য়ূসুফ মিসরে বাদশাহী করিয়াছিলেন তিনিও বলিতেন, "কান'আন-এর ভিখারী হওয়াও ইহার তুলনায় প্রিয়তর।" কাজেই স্বদেশ ত্যাগের দুই বৎসর সাত মাস পর ১৭৬৮-এর জুন (মুতাবিক রাবী'উ'ছ-ছানী ১১৮৩ হি. এবং আষাঢ় ১১৭৫) মাসে তিনি স্বদেশে পদার্পণ করেন। মিশনের ব্যর্থতার কারণে তিনি তখন ভগ্নহৃদয় ও বাদশাহের সামনে মুখ দেখাইতে অসমর্থ।

**'শিগারফ্ নামাহ্ বিলায়াত'** (شگرف نامۀ ولايت)ঃ এই গ্রন্থে মীর্যা সাহেব তাঁহার য়ুরোপ, বিশেষ করিয়া বিলাত ভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থখানি "বিলায়েতনামাহ্" নামেও কিছুটা পরিচিত। ফারসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থখানি মূল ফারসীতে কখনও মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। পাণ্ডুলিপিও দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছিল। বর্তমানে বৃটিশ মিউজিয়াম, বডলিয়েন লাইব্রেরী, হায়দরাবাদের আসাফিয়া লাইব্রেরী, কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, বাঁকীপুরের খোদা বাখ্শ লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী এবং ঢাকার বাংলা একাডেমীতে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। জেমস এডওয়ার্ড আলেকজাণ্ডার কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়া গ্রন্থখানির ইংরেজী অনুবাদ করেন ১৮২৭ খৃ., লণ্ডন হইতে তাহা প্রকাশিত হয়। ভারত হইতে একখানি উর্দূ অনুবাদের কথাও শোনা গিয়াছে। সম্প্রতি (১৯৮১ খৃ.) ঢাকা হইতে অধ্যাপক আবূ মহামেদ হাবিবুল্লাহকৃত একখানি "আক্ষরিক না হইলেও মূলানুগ" অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

যাহা হউক, এইসব অনুবাদ ও কিছু প্রবন্ধ সত্ত্বেও নির্বাচিত সুধীমহলের বাহিরে ইহ্তিশাম উদ্দীন এখনও পরিচিত নহেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের ৯ বৎসর পূর্বে বিলাত ভ্রমণে যান এবং তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের তিন বৎসর পূর্বে। তবু সাধারণভাবে রামমোহনই প্রথম বাঙ্গালী বিলাত পর্যটক বলিয়া পরিচিত। ইহ্তিশাম "নাসাবনামাহ" নামে আরেকখানি পুস্তিকা ফারসীতে লেখেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ কাযী সাদরু'ল-'উলা 'নাসাব নামাহ' ইংরেজীতে অনুবাদ ও সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেন।

স্বদেশে ফিরিয়া কিছুকাল পরে তিনি আবার ইংরেজদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন, আর কর্নেল ইটনের সঙ্গে পুনা ও সাতারায় উপস্থিত থাকিয়া বিভিন্ন সন্ধির প্রস্তাব লইয়া পেশওয়া পণ্ডিত রাও, সুখরাম বাবু ও নানা ফারনাবিসের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি অনেক সন্ধি প্রস্তাবের মুসাবিদাও করেন। সম্ভবত তিনি লর্ড ওয়েলেসলীর আমল পর্যন্ত বৃটিশের অধীনে চাকুরী করিয়া গিয়াছেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের দিকে তিনি ইনতিকাল করেন। 'শিগারফনামাহ' ও 'নাসাবনামাহ' ছাড়া ইহ্তিশামের মত সুদক্ষ লেখক আর কিছু লেখেন নাই বলিয়া মনে করা কঠিন; হয়ত তাঁহার অন্যান্য রচনা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। তবুও শিগারফ নামার আলেকজাণ্ডারকৃত ইংরেজী অনুবাদ ১৮২৭ খৃ., হইতে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও রাজা রামমোহন রায় প্রথম বাঙ্গালী বিলাত যাত্রীরূপে পরিচিত হইলেন। তাহার কারণ সম্ভবত এই দেশের সমকালীন সাম্প্রদায়িক মনোভাব। তিনি এতই বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার অধঃস্তন বংশধরদের মধ্যে তিনি কেবল "বিলাতী মুনশী"রূপে গল্পের নায়কের মত পরিচিত ছিলেন।

রাজনৈতিক ব্যাপারে বৃটিশের পক্ষে হইলেও ইহতিশাম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে স্বকীয়তা বিন্দুমাত্র বিসর্জন দেন নাই। বিদেশে বিধর্মীর হাতে পান-ভোজন করিবেন না বলিয়া তিনি তাঁহার কারুকার্যখচিত হুক্কাটি ও বিশ্বস্ত খাদেম মুহাম্মাদ মুকীমকে সঙ্গে লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন। কতেক মুসলিম আমীর-উমারা-র দৃষ্টান্ত অনুসারে তাঁহাকে অন্তত সামান্য মদ্যাদি, নিষিদ্ধ দ্রব্য পানভোজন করাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও সুইন্টন ব্যর্থ হন। রাগান্বিত সুইন্টন তখন তাঁহাকে বলেন, "আসলে তোমরা অত্যন্ত নির্বোধ, আর বাঙ্গালীরা নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতায় হিন্দুস্থানের মধ্যে সর্বাধিক বেশী খ্যাত।" শান্ত অথচ দৃঢ় জবাব দিয়াছিলেন ইহতিশাম, "মুসলমানদের আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ধনদৌলত বা ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বিদ্যা ও জ্ঞান, সৎকর্ম ও ধর্মনিষ্ঠার উপর। পার্থিব দৌলতের অহংকারে বা শয়তানের প্ররোচনায় যেসব উচ্চ শ্রেণীর লোক নিজেদের ধর্মবিধান লঙ্ঘন করে তাহারা অবশ্যই দোষী। কিন্তু সাধারণ দরিদ্র মুসলিমগণ এমন ধনীদের কথা কেন শুনিবে, যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (স)-এর আদেশ অমান্য করিতে পরামর্শ দেয়? পার্থিব

সম্পদের কী মূল্য ? আমাদের ধর্মীয় নেতাদের চোখে একজন অধার্মিক নবীপুত্রের তুলনায় একজন ঈমানদার ও সৎ ভিক্ষুক বেশী সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র।" ইহাই ইহতিশামের জীবনাদর্শ ছিল বলিয়া মনে করা যায়।

ইহ্তিশাম উদ্দীনের বংশধরেরা পাকিস্তান হইবার পর হইতে ক্রমান্বয়ে স্বদেশ ত্যাগ করেন। কথিত মতে এখন তাঁহাদের কেহই কাযী পাড়ায় নাই, তবে কিছু স্থাবর সম্পত্তি এখনও পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। তাঁহার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুফতী গু'লাম মুহয়ি'দ-দীন এর সপ্তম-অষ্টম-নবম অধঃস্তন পুরুষের অনেকেই এখন ঢাকায় বসবাস করিতেছেন এবং তাঁহারা সুপরিচিত মহলের লোক।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) Alexander, J. E., Shigurf Namah-i velayet (London, 1827), অনুবাদ; (২) Buekland C. E., A Dictionary of Indian Biography (London, Swan Sonn, & Co. Ltd., 1906); (৩) খান মোহাম্মদ দরবেশ আলী, মুনশী শেখ ইহ্তিশাম উদ্দীন মীর্জা (বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৭১ বা., ঢাকা)। (৪) Mohammed Sudrul Ola. History of the Family of Mirza I'teamuddin of Qusba panchumoor (S. C. Sarkar & Sons Ltd., Calcutta 1945 ?)। (৫) হাবিবুল্লাহ আবু হামেদ, বিলায়েতনামা (অনু. মুক্ত ধারা, ঢাকা ১৯৮১ খৃ.)।

মোহাম্মদ দরবেশ আলী খান

**ইহতিসাব** (দ্র. হিসবা)

**ইহ'দাছ** (إحداث) ঃ আহ'দাছা শব্দের ক্রিয়ামূল (মাসদার)। (ح-د-ث) মূল হইতে উদ্ভূত, এই শব্দটি কালভিত্তিক কোনরূপ নব বিশ্বকোষ রূপায়ণের ভাব প্রকাশ করে। হাদীছ হইতেছে কাদীম (প্রাচীন)-এর বিপরীতার্থক, যাহা হইতে 'শাশ্বত' (eternal) হুদূছ হইতেছে কুদমাঃ-র বিপরীতার্থক।

কু'রআন-এ চতুর্থ রূপটি (মুহ'দিছ মুহদাছ) ব্যবহার করা হইয়াছে প্রত্যক্ষ কর্মপদ যিক্'র-এর সহিত। ২০ ঃ ১১৩ আয়াতের ভাষ্য প্রসঙ্গে ফাখরু'দ-দীন আর-রাযী আল্লাহ্‌র বাণী তাক'ওয়া সৃষ্টি না করিয়া কেন যিক্'র সৃষ্টি করে তাহা বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহার সম্ভাব্য কারণ হইতেছে "তাক'ওয়া বলিতে কোন প্রকার মন্দ কর্ম না করার অবস্থা নির্দেশ করে এবং মৌলিকভাবে নেতিবাচক অবস্থা বজায় রাখা ইহার অন্তর্গত" (ওয়া যালিকা' ইস্তিম্‌রার 'আলা'ল-'আদামি'ল-আস'লী)। "যিক্'র সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলা যায়–ইহা হইতেছে এমন কিছুর অস্তিত্ব লাভ যাহার পূর্বে অস্তিত্ব ছিল না" (আম্মা হুদূছু'য-যিক্'র ফাআমরু হাদাছ বাদা আন্ লাম্ য়াকুন)। এই ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবেই হাদাছ'-এর সহিত ইসতিমরার-এর বৈসাদৃশ্য বিরাজমান। শেষোক্তটি একটি অপরিবর্তনীয় স্থায়িত্ব প্রকাশ করে। স্মরণ করার প্রক্রিয়াটি বস্তুতপক্ষে একটি অবস্থান পরিবর্তন সূচিত করে, যাহাতে বিস্মৃতি হইতে স্মৃতিতে উত্তরণ ঘটে। তাঁহার ২১ ঃ ২ আয়াতের ভাষ্যে যেখানে যিক্‌রুন মুহ'দাছু'ন রহিয়াছে, তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, আল্লাহ মানুষের স্মৃতি নবায়ন করেন (য়ুজাদ্দিদু লাহুমু'য-যিক্'র), প্রতি মুহূর্তে (ওয়াক'তান ফা-ওয়াক'তান), প্রতি আয়াতের পর আয়াতে এবং প্রতি সূরার পর সূরায়। ইহাকে ধারাবাহিক একটি প্রত্যাদেশ বলা চলে, যাহা সর্বদাই নবায়িত হইতেছে এবং যাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে বিরতিহীন সৃষ্টির অনুরূপ। অবশ্য এই প্রসঙ্গে মু'তাযিলাদের অনুসরণ করা চলে না; এই আয়াতটির ভিত্তিতে তাঁহাদের যুক্তি হইতেছে ঃ কুরআন হইতেছে যিক্'র, যিক্'র হইতেছে মুহ'দাছ (সৃষ্ট) এবং তাই কুরআন হইতেছে সৃষ্ট। কু'রআনে সৃষ্টিবোধক বহু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু আহ'দাছা ব্যবহৃত হয় নাই।

লিসানু'ল-'আরাব-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী মদীনা সম্পর্কিত হাদীছ-এ আহ'দাছা হাদাছু'ন শব্দ রূপটি কোন প্রকার নব প্রবর্তনের সূচনা অথবা তাহা উৎসাহিতকরণ বুঝায়। এই প্রসঙ্গে তাহা বিদ'আঃ অর্থাৎ প্রচলিত মতবিরোধী নবপ্রবর্তন প্রকাশ করে। একটি বিষয়ে ইহা কৌতূহলোদ্দীপক এই কারণে যে, ইহা দুইটি মূল (ح-د-ث) এবং (ب-د-ع) এবং প্রাসঙ্গিকভাবে ইহদাছ এবং ইবদা'-কে একত্র করে (তু. নীচের বর্ণনা)।

আল-জুরজানী তাঁহার তা'রীফাত গ্রন্থে শব্দটির আভিধানিক অর্থের অতি কাছাকাছি পৌঁছিয়াছেন। ইহ'দাছ এমন কোন বস্তুকে অস্তিত্বে আনয়নের প্রক্রিয়া যাহার অস্তিত্বে আগমন একটি সময় কাল দ্বারা পূর্বগামী (ঈজাদ শায়' মাসবূক বি'য-যামান)। মুহদাছ তাই 'সাবিক'-এর সহিত বৈসাদৃশ্যময়, সাবিক হইতেছে পূর্বগামী এবং তাহা হইতেছে একটি সময়। কালভিত্তিক সৃষ্টির এই ধারণাটি এই বিশ্বে আবির্ভূত সকল বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে, কোন বিশেষ মুহূর্তে তাৎক্ষণিক সৃষ্টি অথবা মহাবিশ্বের সৃষ্টিকালীন উভয় ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য (এই মতবাদটি দার্শনিকগণ প্রত্যাখান করেন)। ইব্‌ন মানজূর-এর মতে (লিসানু'ল-'আরাব) "হুদূছ হইতেছে এমন কোন বস্তুর সৃষ্টি '(কাওন) যাহার পূর্বে কোন অস্তিত্ব ছিল না" এই শব্দমূলটি তাই আল্লাহ্ কর্তৃক বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। নিম্নোক্ত বাক্যটিতে ইহা স্পষ্টতর হইয়াছে ঃ লাম য়াকুন, ছুম্মা কানা, "ইহা ছিল না, তৎপরে ইহা অস্তিত্বপ্রাপ্ত হইল।"এই সকল বাক্যাবলী এমনিতে (ex nihilo) শূন্য হইতে সৃষ্টি নির্দেশ করে না। কারণস্বরূপ বলা যায়, দার্শনিক (ফালাসিফা)-দের মতে কাওন (genesis)-এর আরিস্টোটলীয় অর্থে বস্তুগত সম্ভাবনার বাস্তবায়ন নির্দেশ করে। ইহাতে কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে পূর্বেই স্বীকৃতি দান করা হয়। ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর মতে "যদি কোন প্রকার পরিবর্তন ব্যতিরেকে কোন কিছু সৃষ্টি করা হয় তবে অবশ্যই তাহা নির্বস্তু হইতে সৃষ্ট (লাও কানা য়াহ'দুছ' শায়'উন মিন গায়রি তাগায়্যুরিন লা হাদাছা মিন লাশায়'ইন)"। তিনি তাকাওউন (কোন বস্তুর অস্তিত্ব) বলিতে বুঝাইয়াছেন পরিবর্তনের অনুসারী প্রতিক্রিয়া (হুদূছ লি-তাগায়্যর)-রূপী কোন সৃষ্টি রূপ। তাৎক্ষণিক ও স্বয়ম্ভু হুদূছ অথবা ইহ'দাছ তাঁহার নিকট অকল্পনীয় বা ধারণাতীত।

ইব্‌দা', সুন' এবং তাকবীন-এর তুলনায় ইব্‌ন সীনা ইহ'দাছ যেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন সেই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য A.-M. Goichon, Lexique de la langue philosophiqce d'Ibn Sina, একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ঐ গ্রন্থকারের La distinction de l'essence et de l'existence d'apres Ibn Sina (দ্র. H. d. t.,-এর নির্ঘন্ট) এবং Livre des Directives et Remarques (ইশারাত-এর অনুবাদ, ৩৭৩, ৩৭৭, ৩৮৬ পৃষ্ঠার টীকা)। সার্বিকভাবে "উৎপাদন বা সৃষ্টি" সূচক ধারণা ছাড়াও ইব্‌ন সীনা বহু সূক্ষ্ম দার্শনিক যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি পূর্ব সময় কালে (ফী যামান সাবিক) অস্তিত্ব ছিল না এমন কোন বস্তুকে অস্তিত্বে আনয়নের প্রক্রিয়া আল-ইহ'দাছু'য-যামানী-কে আল-ইহ্‌দাছু'ল-গা'য়র যামানীর সহিত তুলনা করিয়াছেন, শেষোক্তটি হইতেছে এমন একটি প্রক্রিয়া যাহাতে এমন বস্তুকে অস্তিত্বে

আনয়ন করা হয় যাহাতে এই অস্তিত্ব মূলত বিদ্যমান ছিল না; কোন সময়ের পরিবর্তে অপর সময়কালে নয়। ইহা কোন কালেই অস্তিত্বময় ছিল না। যেহেতু কালের সঞ্চালনের দ্বারা কাল সঞ্চালিত হয় না, বরঞ্চ হয় তাৎক্ষণিক সৃষ্টিশীল উৎপাদনের (ইবদা') মাধ্যমে, স্রষ্টা (মুহ্দিছ) কালের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, বরঞ্চ মূল সূত্রে পূর্ববর্তী। আবার সকল ফলাফল (মা'লূল) হইতেছে মুহ্দাছ'। কারণ ইহা তাহার অস্তিত্ব আহরণ করে অপর কোন বস্তু হইতে। এই অর্থে ইহ্দাছ হইতেছে এমন কোন সত্তাকে অস্তিত্বে আনয়ন যাহা স্বকীয়ভাবে কেবল সম্ভব এবং এইভাবে মুহ্দাছ হইতেছে আনুষঙ্গিক। এই আনুষঙ্গিকতা এই অর্থে নয় যে, ইহা সমভাবে অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীন হইতে পারে। ইহার অর্থ হইতেছে, যখন ইহা অস্তিত্ব ধারণ করে তখন তাহা স্বকীয়তার জন্য অস্তিত্বময় হয় না। ভাবধারার এই সম্পর্কায়নটি ফাখরু'দ-দীন আর-রাযী সূরাতু'ল-বাকারাঃ-এর বিখ্যাত ১১৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অত্যন্ত সাবলীলভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন "বেহেশ্ত ও পৃথিবীর প্রত্যক্ষ স্রষ্টা (বাদী') এবং যখন তিনি কোন কিছু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করেন তখন তাঁহাকে কেবল বলিতে হয় 'হও' এবং তাহা অস্তিত্ব লাভ করে।" প্রায় ইব্ন সীনার রচনা রীতির মতই আর-রাযী লিখিয়াছেন, "যাহা কিছু প্রয়োজনীয় সত্তা নয় তাহার সত্তার অস্তিত্ব সম্ভব (মুমকিন) মাত্র। যাহার সত্তার অস্তিত্ব সম্ভব তাহা অস্তিত্বে আনীত হয়। (মুহ্দাছ এই ক্ষেত্রে সময়ে নয়)। এবং সকল মুহ্দাছ-ই হয় সৃষ্টি (মাখলূক) প্রয়োজনীয় সত্তার সৃষ্টরূপে"। ইহার পর এই আয়াতটি যে শব্দগতভাবে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব তাহা প্রদর্শন করিয়া তিনি ইহাকে একটি তা'বীল দ্বারা ব্যাখ্যা করেন এবং উল্লেখ করেন যে, ইহা "যে গতিতে পরম শক্তি বিভিন্ন সত্তার রূপদান করে ঃ আল্লাহ্ তাহাদের সৃষ্টি (য়াখলুকু) করেন, তবে তিনি তাহার জন্য পূর্ব চিন্তা, সাবধানতা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন না" তাহারই ইঙ্গিত দান করে। সুতরাং 'কুন' ইব্ন সীনার ইব্দা'-র মর্মার্থের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং তাহা আয়াতটির প্রথম শব্দ বাদী'-এর সহিত প্রসঙ্গিক। বস্তুতপক্ষে এই দুই প্রকার কর্মতৎপরতার মধ্যে পার্থক্যকরণের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, আল্লাহ্ কর্তৃক বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বলা যায় যে, স্রষ্টার প্রসঙ্গে যে ইহ্দাছ তাহা হইতেছে ইবদা', বিশেষত ইহা প্রথম হেতুর প্রত্যক্ষ কার্য নির্দেশ করে। অবশ্য তখন প্রথম হেতু কোন মাধ্যমের দ্বারা মাধ্যমিক হেতু সৃষ্টি করে তখন যে শব্দটি প্রাসঙ্গিক তাহা হইতেছে ইহ্দাছ এবং ইহাকে অবশ্যই ইবদা' হইতে পৃথক করিতে হইবে।

বস্তু এবং আকার-এর অধিবিদ্যার উত্তরাধিকারী ফালসাফা (দর্শন) পরিত্যাগ করিয়া বস্তুর বাস্তবতা ও সময়ের সবিরামতার উপর প্রতিষ্ঠিত আশ'আরী ধর্মতত্ত্বের ধারণার দিকে দৃষ্টি দিলে অনস্তিত্ব (ex nihilo) সৃষ্টিকে সহজেই সৃষ্ট বস্তুর একমাত্র যুক্তিযুক্ত ও প্রাসঙ্গিক সমাধানরূপে স্বীকার করা সম্ভব হয়। আল-বাকিল্লানী কাদীম ও মুহ্দাছ জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে সুচারু পার্থক্যায়ন করিয়াছেন। প্রথমোক্তটির বিষয়বস্তু হইতেছে আল্লাহ্, শেষোক্তটির বিচার্য বিষয় হইতেছে বিশ্ব ('আলাম)। বিশ্বের সকল বস্তু সত্তাকে বিভক্ত করা হইয়াছে গোত্রে যাহারা যৌগিক ও জটিল, ইহাদের প্রতিটির সারবস্তু হইতেছে অনু (জাওহার মুনফারিদ) এবং আকস্মিকতা (আ'রাদ), যাহা সকল বস্তু ও সারে অস্তিত্বময়। আল্লাহ্ ব্যতীত অপর সব কিছুই মুহ্দাছ। দেহসমূহ যেহেতু যৌগিক (মুআল্লাফ) বলিয়া সঙ্গতভাবেই সত্তায় উদ্ভুত হয়, একইভাবে ইহা সত্তা ও আকস্মিকতা-উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আল-বাকিল্লানী দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ প্রদর্শন করিতে গিয়া উল্লেখ করেন [তাঁহার প্রদত্ত যুক্তিতে তিনি অতঃপর আর সত্তার উল্লেখ করেন নাই, ইহার পরিবর্তে তিনি দেহসমূহের উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে যৌগিক পর্যায়ে যে যুক্তি সহজবোধ্য তাহা অযৌগিক ক্ষেত্রেও একইরূপ প্রযোজ্য হইবে] যে, আকস্মিকতা হইতেছে বাস্তবতামাত্র যাহা ঘটিয়াছে (হাওয়াদিছ)। যখন কিছু উৎপাদিত হয়, উদাহরণস্বরূপ গতি, তখন অপর কিছু, এই ক্ষেত্রে স্থিতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। দেহসমূহ কিন্তু ইহাদের আকস্মিকতার অস্তিত্বের পূর্বে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহার কারণ, তাহাদের গঠনের উপাদানের অংশের মধ্যে দূরত্বের নৈকট্যের একটি আকস্মিক সম্পর্ক রহিয়াছে। সুতরাং যদি কোন বস্তু আকস্মিকতার পূর্ববর্তী না হয় যাহা হয় মুহাদাছাত তাহা অবশ্যই সৃষ্ট। ইহা সুস্পষ্ট যে, এমন কি অনু ও কোন নির্দিষ্ট স্থানে হয় গতিশীল অথবা স্থিতিশীল অবস্থা ব্যতীত অস্তিত্বময় হইতে পারে না। অধিকন্তু তাহাদের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক অপরিহার্য এবং এই সকল নির্ধারণই আপতিক কারণ ইহারা সকলই অধ্রুবক। সুতরাং এই সকল একক বস্তু কোন আকস্মিকতা পূর্ববর্তী নহে এবং তাহারা সৃষ্ট। আল-বাকিল্লানীর সংজ্ঞায় মুহ্দাছ' হইতেছে এমন সত্তা যাহার উৎপত্তি অনস্তিত্বতায় (আল-মাওজূদ 'আনি'ল-'আদাম), যেহেতু কোন আকস্মিকতা স্বকীয়ভাবে পরপর দুই মুহূর্তের সময় কালে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে না। সামগ্রিকভাবে তাই ইহ্দাছ হইতেছে একটি বিরামহীন সৃষ্টি এবং তাহা আ'রাদ' ও জাওয়াহির উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সার পদার্থ এমন কোন সত্তা নয় যাহা একবার অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইলে কেবল ইহার প্রকৃতির আইনের মাধ্যমে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে। একমাত্র আল্লাহ্ ইহার অস্তিত্ব প্রদান (ঈজাদ) এবং তাহা বজায় রাখা (ইবকা') সম্ভব করেন। এই অবস্থানটি আর-রাযী তাঁহার মাফাতীহু'ল-গায়ব গ্রন্থের বহু অধ্যায়ে, বিশেষত সূরাঃ সাবা'-এর ভাষ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং ইহা বলা যায় যে, ধর্মতাত্ত্বিকগণের মানসে সৃষ্টির আপেক্ষিকতায় ইহ্দাছ হইতেছে ঈজাদ এবং ইবকা' উভয়ই। আল-বাকিল্লানী যে মতবাদ কিতাবু উসুলি'দ্-দীন-এ প্রকাশ করিয়াছেন 'আবদু'ল-কাহির আল-বাগদাদী তাহাই উপস্থাপন করিয়াছেন।

কাদীম এবং মুহ্দাছ-এর চরম বিরোধটি মু'তাযিলী উৎস হইতে উদ্ভুত। ইঁহাদের মতে ঈজাদ হইতেছে কঠোরভাবেই অস্তিত্ব সৃষ্টির অর্থের সহিত সংশ্লিষ্ট-ইহা হইতে সত্তাসার সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। মু'তাযিলাগণের অভিপ্রায় হইতেছে সৃষ্টি হইতে সকল প্রকার দৃষ্টান্তমূলকতাবাদ সম্পূর্ণভাবে নির্বাসিত করা। তাহাদের এই সমস্যাটি কিভাবে সমাধানের চেষ্টা করা হয় তাহা অবশ্য ইহ্দাছ'-এর অধ্যয়নের রূপরেখার মধ্যে পড়ে না।

ইহা লক্ষ্য করা বাঞ্ছনীয় যে, ইহ্দাছ-এর ধারণাটি খালুক হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা যাইতে পারে। প্রথমোক্তটি সৃষ্ট বস্তুর নূতনত্বের নির্দেশক, অন্য দিকে খালুক হইতেছে স্রষ্টার বাস্তব কর্মের ইঙ্গিতবাহী। সহজভাবে বলা যায় যে, এমন কোন মুহ্দাছ-এর ধারণা সম্ভব যাহার মুহ্দিছ অস্তিত্বহীন। কিন্তু ইব্ন হাযম-এর মতে যদি স্রষ্টা (খালিক)-ই সকল সত্তার (মূজিদ) প্রদায়ক হন, তবে আল্লাহ্-ই সকল অস্তিত্বশীল বস্তুকে তাহাদের অস্তিত্বকালের প্রতিক্ষণে অস্তিত্বময় করেন। আশ'আরী অণু মতবাদ অনুসারে ক্রমাগত সৃষ্টি, পারম্পর্যময় ইহ্দাছ নয়, যাহাতে প্রতি মুহূর্তে যে কোন সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব প্রথমে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও পরে পুনর্জীবিত

হয়। ইহার বিরোধিতায় ইব্ন হায্‌ম ও আন-নাজ্জাম একমত হইয়া বলেন যে, ইহা হইতেছে এমন একটি ব্যবস্থা যাহা কোন বস্তুর অস্তিত্ব কালে সর্বক্ষণ অবিরামভাবে চলিতে থাকে ঃ "ওয়াল্লাহ মূজিদু লি-কুল্লি মা যুজিদু ফী কুল্লি ওয়াক্ত আবাদান ওয়া-ইন লাম য়ুফ্‌নিহি কাবলা য'লিক' (ফিসাল, ৫খ., ৫৫)।

R. Arnaldez. (E.I.[2])/আবদুল বাসেত

**ইহ্য়া'** (احياء) ঃ শাব্দিক অর্থ জীবিতকরণ, ফিক্‌হশাস্ত্রের পরিভাষায় ইহার অর্থ কোন পতিত বা অনাবাদী ভূমিকে আবাদ করা। ফিক্‌হ-এর গ্রন্থসমূহে "বাবু ইহ্য়া'ই'ল-মাওয়াত (باب احياء الموات) নামে একটি অধ্যায় আছে, যাহার শাব্দিক অর্থঃ মৃত যমীনকে জীবিত করা। 'আরবী ভাষায় মাওয়াত (দ্র.) (موات) শব্দ দ্বারা ঐ সমস্ত ভূমি বুঝায় যাহা অনাবাদী বা পতিত রহিয়াছে,যাহা কাহারো অধিকারে নাই এবং যাহা সাধারণত জনপদ হইতে বহু দূরে অবস্থিত। যে বা যাহারা উক্ত ভূমিকে প্রথম ব্যবহার করে সাধারণভাবে ইহাতে তাহার বা তাহাদের অধিকারই বর্তায়। লেখকগণ খলীফা হযরত 'উমার (রা)-এর উক্তি এবং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হাদীছ সমূহকে এইভাবে ভূমি ব্যবহারে আনিয়া ভূমি মালিকানা লাভ করিবার পদ্ধতির ভিত্তি হিসাবে গণ্য করেন। একটি হাদীছে বলা হইয়াছে ঃ "মাওয়াত ভূমি তাহাদের মালিকানাভুক্ত যাহারা উহাকে জীবিত করে (তু. আল-বুখারী, সাহীহ, ২খ., বাব মান আহ্য়া আরদান মাওয়াতান)। ঐ সমস্ত ভূমির আইনগত মালিকানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি অবগত হইবার পূর্বে ব্যবহারে আনয়ন বিষয়টির ব্যাখ্যা (যে পদ্ধতিই কার্যকর করা হউক) জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত হিসাবে গণ্য করিতে হইবে কিনা তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। হানাফী আইনেই শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক অনুমতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এই অভিমত তাঁহার শাগরিদবর্গের নিকট এবং ইমামী শী'ঈ আইনে প্রাধান্য লাভ করে। অন্যান্য মাযহাব ইহাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে, তবে তাহারাও শাফি'ঈদের মত সরকারী অনুমতি শুধু অনুমোদন করে। মালিকী আইনেও ইহা অনাবশ্যক, কিন্তু বসতি এলাকার নিকটবর্তী ভূমির ক্ষেত্রে ইমামের পূর্ব অনুমোদনের উপর গুরুত্ব দান করে। এই মতবাদের স্বীকৃত প্রমাণ হিসাবে মূল পুস্তকাদি যত্ন সহকারে নিরীক্ষা করিলে ইহা দৃষ্ট হয় যে, এই ক্ষেত্রে যাহা আবশ্যক উহা প্রকৃত অনুমোদন লাভ নহে, বরং ইমাম কর্তৃক আরোপিত একটি নিয়ন্ত্রণ-যদ্দারা ইহা সঠিকভাবে স্থির করা যায় যে, উক্ত ভূমি যাহা ব্যবহারে আনয়ন করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা "জনসাধারণের ভূমি নহে"—অর্থাৎ উহা সরকারী সম্পত্তি। এইরূপ ক্ষেত্রে যেহেতু উহা কোন ব্যক্তির দ্বারা অর্জিত হইতে পারে না, অতএব সরকারের অনুমতি ছাড়া ইহার ব্যবহার অসিদ্ধ হইবে। যাহা হউক, যদি উক্ত ভূমি বসতি এলাকা হইতে অনেক দূরবর্তী এলাকায় অবস্থিত হয় সেক্ষেত্রে ইহা বিপজ্জনক হইবে না। অতএব উক্ত ক্ষেত্রে পূর্ব অনুমোদনের কোন প্রয়োজন হইবে না।

অনুমোদন প্রয়োজনীয় কি না, যেমন হানাফী ও ইমামী আইনে ব্যক্ত অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত, যেমন অন্যান্য মাযহাবের অভিমত, প্রশ্ন আসে যে, একজন মুসলিমের মত যিম্মীর ক্ষেত্রেও ইহা নিস্প্রয়োজনীয় কি না বা পতিত ভূমির মালিক হওয়ার জন্য উহাকে ব্যবহারে আনিবার সমান অধিকার তাহার আছে কি না? এই বিষয়ে হানাফী আইনে কোন অনিশ্চয়তা নাই। হানাফীগণ ব্যক্ত করেন যে, একজন যিম্মীকে ইহ্য়া' ব্যবহার করিয়া সম্পদ আহরণে বঞ্চিত করিবার কোন হেতু নাই, যেহেতু মুসলিম আইন মতে সিদ্ধ অন্য সকল প্রকার পন্থায় সম্পদ আহরণ করিতে পারে। ইহা হইতে পারে যে, হানাফী আইনের এই উদারতা এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে, যেহেতু এই মাযহাবের দৃঢ়মত হইল যে, ইহ্য়া' ইমাম কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। অতএব একজন যিম্মীকে ভূমি মঞ্জুর করা হইবে কিনা উহার সিদ্ধান্তের ভার তাহারই ইখতিয়ারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অন্যান্য মতবাদের বিষয়টি অত্যন্ত বিতর্কমূলক। যদিও মালিকীগণ সমতুল্য একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (যে, একজন যিম্মীর এই বিষয়ে একজন মুসলিমের সমান অধিকার আছে)। শাফি'ঈ, হাম্বালী এবং ইমামীগণ তাঁহাদের মাযহাবী মতবাদ অনুসরণে উদার মনোভাবের পক্ষাবলম্বন এবং মুসলিম দেশগুলিতে অনাবাদী ভূমি মুসলিমদের জন্যই সংরক্ষিত থাকিবে এই নীতি গ্রহণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন।

ইহ্য়া'র আইনগত ভিত্তি কি ? এই যাবতকাল পর্যন্ত পতিত বা অনাবাদী বিবেচিত ভূমির ভাবী মালিককে ভূমি ব্যবহারে আনয়ন করিয়াছে—এই দাবীর স্বীকৃতির জন্য কি করিতে হইবে যদ্দারা সে উহার মালিকানা অর্জন করিতে পারিবে ? এখানেই তাহজীর বা সীমা নির্দেশকরণ এবং ব্যবহারে আনয়ন, তথাকথিত ইহ্য়া'-এর মধ্যে পার্থক্য উদ্ভূত হয়। যেই ব্যক্তি এক খণ্ড ভূমি ব্যবহারে আনয়নের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত (হানাফী অথবা ইমামী আইনে) অথবা যে ব্যক্তি নিজ বিবেচনায় (অন্যান্য মাযহাব অনুসারে) ব্যবহারে আনয়নের উদ্দেশ্যে এক খণ্ড পতিত ভূমি বাছিয়া লয় তাহাকে অবশ্য উহার সীমানা নির্ধারণ করিয়া লইতে হইবে যাহা সে উৎপাদন কাজে লাগাইবার মানসে হাতে লইয়াছে, ইহাকে তাহজীর বলে। এইরূপ বলা হয় এইজন্য যে, ব্যবহারে আনয়নের জন্য বাছাইকৃত এলাকাটির পরিধি নির্ধারণের জন্য প্রতি দিকে সীমানা বরাবর প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করিতে হইবে। সীমানা নির্ধারণের জন্য অন্য পদ্ধতি হইল একটি বেড়া অথবা একটি গর্ত—উভয়ই সমভাবে সিদ্ধ। তাহ'জীর বলিতে ব্যবহারে আনয়ন বুঝায় না এবং ইহা মালিকানা প্রদান করে না। এই প্রসঙ্গে সব মতবাদের ফুকাহা' সম্পূর্ণ ঐক্যমত পোষণ করেন। কিন্তু এই সীমানা নির্ধারণ ন্যূনতমভাবে অনাবাদী ভূমির প্রকৃতভাবে ব্যবহারে আনয়নের প্রাথমিক স্তর বা ধাপ সংগঠন করে। যাহা হউক, গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হইল যে, এই প্রাথমিক স্তরের প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে কমবেশী হইতে পারে হানাফী বা অন্যান্য মাযহাবের মতবাদ অনুসারে।

(ক) হানাফী আইনে যেহেতু প্রকৃত ইহ্য়া'র জন্য ইমামের পূর্ব অনুমোদন সর্বদাই আবশ্যক বলিয়া গুরুত্ব দেওয়া হয়, কাজেই সীমানা চিহ্নিত করার স্বাভাবিক পদ্ধতিই যদিও ইহা অনুমোদন ব্যতিরেকে করা হইয়া থাকে, সীমানা নির্ধারণকারী ব্যক্তিকে প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে যে পর্যন্ত না ইমামের অনুমোদনপ্রাপ্ত কোন প্রকৃত ব্যবহারকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিয়া দখল লয়। এই একচেটিয়া অধিকার অন্যূন তিন বৎসরের জন্য বলবৎ থাকে। সত্যিকারভাবে এই সময়কালটা, 'উমার (রা)-এর উক্তি অনুযায়ী, ব্যবহারকারীকে অনুমোদন দান করা হইত যাহাতে সে উক্ত ভূমি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারে আনিতে পারে যাহার সীমানা সে ইতিপূর্বেই চিহ্নিত করিয়া লইয়াছে। একবার এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে ইমাম তাহাকে এই ব্যাপারে পুনঃঅনুমোদন প্রদান

না করিলে উহা তাহা অপেক্ষা অধিকতর পরিশ্রমী উৎপাদনক্ষম ব্যবহারকারীকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লওয়া হইত। কিন্তু ব্যবহারে আনয়ন কর্মটি যদি তিন বৎসরকালের মধ্যে সমাপ্ত হইত, তাহা হইলে ভূমির দখলকার উহার সর্বস্বত্বাধিকারীতে পরিণত হইত। ইহা ছাড়া হানাফী আইন "ব্যবহারে আনয়ন"-এর শর্তাবলী সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নহে। হানাফী লেখকগণ (শুধুমাত্র পরবর্তী কালের লেখকগণের ক্ষেত্রে ইহা সত্য) বিবেচনা করেন যে, এই শর্তাবলী পতিত ভূমির ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ব্যবহারকারীর স্থির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। যদি ভূমিটি মরুভূমি হয় এবং সে উহা আবাদ করিতে আগ্রহশীল হয় তাহা হইলে সে উহা লাভ করিবে প্রথমেই সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে, যেমন একটা কূপ খনন করা। যদি সে বসবাস করিতে ইচ্ছা পোষণ করে তাহা হইলে উহার চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টনী দেওয়াল নির্মাণই যথেষ্ট হইবে (হানাফী আইনে উহার উপরে ছাদ বা বেষ্টনী দেওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না)। যেহেতু যৌক্তিক সিদ্ধান্ত যাহার উপর ব্যবহারে আনয়নের শর্তাবলী নির্ভর করে উহা হইল ভূমিটি অবশেষে কি প্রকারে ব্যবহৃত হইবে, অতএব শুধুমাত্র বেষ্টনী দেওয়া ভূমিটির ব্যবহারে আনয়ন হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইত যখন দখলকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিত যে, ভূমিটি সে পতিত জমি হিসাবে গণ্য করিত, যাহা শুধু ভেড়া চরাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

(খ) অন্যান্য মাযহাবে তাহজীর হানাফী আইন অপেক্ষা কম গুরুত্ব বহন করে। উহার কারণে ইহ্য়া' স্বয়ং কোন অনুমোদনের আওতাধীন নহে। যে ব্যক্তি কার্য করিয়াছে তাহার দাবী অগ্রগণ্য এবং ইহা শুধামাত্র একটি নৈতিক বিবেচনা, যাহার কোন আইনগত অনুমোদন নাই এবং কাহাকেও ইহা পালন করিতে বাধ্য করা হয় না, যদি না কেহ উহা বিবেকপ্রসূত সিদ্ধান্তে (দিয়ানা) মান্য করে। ইহার ফলশ্রুতিতে যে ব্যক্তি ঐ ভূমির সীমানা চিহ্নিত করিয়াছে তাহার পূর্বেই যদি অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত ভূমি প্রকৃত ব্যবহারে আনয়ন করে তাহা হইলে শেষোক্ত ব্যক্তিই ঐ ভূমির প্রকৃত মালিক বা স্বত্বাধিকারী বিবেচিত হইবে এবং ঐ প্রথম ব্যক্তির প্রাধ্যান্য (যে শুধুমাত্র সীমানা চিহ্নিতকরণ কাজটি সমাধা করিয়াছে) তামাদি হইয়া যাইবে। কোন সময় এই নৈতিক স্বত্ব যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল এই কারণে যে, হাম্বালী ইব্ন কুদামা (মুগনী, ৫খ, পৃ. ৫১৯) এক খণ্ড ভূমি যাহা কোন ব্যক্তির দ্বারা চিহ্নিত সীমানার অন্তর্ভুক্ত ছিল অথচ সে তাহার জীবদ্দশায় ইহার প্রকৃত মালিকানা অর্জন করে নাই ভূমিখণ্ডকে উক্ত মৃত ব্যক্তির বংশধরদের সম্পত্তিভুক্ত হিসাবে গণ্য করিতে কোন দ্বিধাবোধ করেন নাই। হানাফী নহেন এমন লেখকগণ তাহজীর-এর অনিশ্চিত ধারণাকে সুস্পষ্ট করিবার জন্য ভূমিকে ব্যবহারে আনয়নের শর্তাবলী হানাফীগণের অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া দাবী করেন। তাঁহারা স্বীকার করেন, ইহা সত্য যে, উক্ত বিষয়ে (ইহ্য়া') কোন সুসম্পূর্ণ নিয়ম-কানুন নাই এবং "ব্যবহারে আনয়ন" বলিতে যাহা বুঝায় তাহা হইল ইহার প্রকৃত ব্যবহার যাহা দেশ-বিশেষের রীতিনীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়, যাহা ঐ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রকৃতি এবং ব্যবহারে আনয়নযোগ্য ভূমির গুণাগুণকে বিবেচনা করে। এতদসত্ত্বেও একটা সাধারণ নিয়ম সকলের জন্য প্রযোজ্য, যাহা ইহ্য়া' শব্দটির আক্ষরিক অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। মৃত জমিকে 'নব জীবন' দানের জন্য যে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড প্রয়োজন তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত, সঠিকভাবে বলিতে গেলে ব্যবহারে আনয়ন শুধুমাত্র উক্ত ভূমিকে দখল করা বুঝায় না। অতএব খালীল (মুখতাসার, ইহ্য়া'উল-মাওয়াত-এর বিষয়ে লিখিত গ্রন্থ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহ্য়া' ভূমির সীমানা বেষ্টনী দেওয়া, পশুর চারণক্ষেত্র অথবা ইহাতে সেচের উদ্দেশ্যে কূপ খনন বুঝায় না, বরং সেচ প্রদানের জন্য কূপ খনন করিলে ইহ্য়া' সম্বন্ধীয় কর্ম হিসাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে। এই বিষয়ে শাফি'ঈ, হাম্বালী এবং ইমামী মাযহাবের সহিত মালিকী আইনের সামান্য পার্থক্য সত্ত্বেও ইহা একই সূত্রের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সময়ের বিবর্তনে ইহ্য়া'-এর ধারণা বা ভূমিকে ব্যবহারে আনিয়া সম্পত্তি আহরণ করা আনুপাতিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ হইয়া পড়ে। কেননা মাওয়াত ভূমি নিঃশেষিত হইয়া যায় এবং যাহা প্রায় সর্বত্রই ইহার রেস নুল্লিয়াস (res nullius) চরিত্র হারাইয়া রাষ্ট্রীয় খাস জমিতে পরিণত হয়। এই ব্যাপারটি বিশেষভাবে 'উছমানী সাম্রাজ্যে স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়। 'উছমানী ভূমি আইনের ১৮৫৮ সালের সংকলন গ্রন্থে মাত্র দুইটি অনুচ্ছেদ ধারায় পতিত ভূমি পুনরুদ্ধারের বিষয়টি সংযোজিত হয় (অনুচ্ছেদ ধারা ১০৩ এবং ১০৪)। পক্ষান্তরে একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় মীরিয়্যাঃ (اميرية—ميرية) বা রাষ্ট্রীয় ভূমি বিষয়ে সংরক্ষিত রাখা হইয়াছিল। ইহা সত্য যে, পরবর্তীতে ১৮৭৭ খৃ., হানাফী আইনসমূহের ভিত্তিতে বিষয়টির উপর বিস্তারিত নিয়মাবলী মাজিল্লা (মেজেল্লী) (দ্র.)-তে (অনুচ্ছেদ ১২৭০) লিপিবদ্ধ করা হয়। অতএব প্রকৃত ইহ্য়া'-এর জন্য পূর্ণ অনুমোদন তখনও প্রয়োজনীয় ছিল (ভূমি আইনের ১০৩ ও ১০৪ অনুচ্ছেদ ধারায় যেমনটি আছে), কিন্তু তাহজীর-এর জন্য মেজেল্লীতে অনুমোদন প্রকাশ্যভাবে দাবীকৃত হয় নাই। ইহা হইতে সাধারণভাবে সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছিল যে, অনুমোদন লওয়া অত্যাবশ্যকীয় ছিল না (আদি ও অসম্পূর্ণ হানাফী মতবাদের সমাধান অনুযায়ী) এবং সেইজন্য বাস্তবপক্ষে ভূমি ব্যবহারে আনয়নের জন্য অবশ্যই ইমামের অনুমোদন সাপেক্ষে হইতে হইবে—এই নীতিটি সহজে এড়াইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ ফিক্হ-এর সমস্ত গ্রন্থে ঃ "ইহ্য়া'উ'ল-মাওয়াত"-এর উপর একটি অধ্যায় সন্নিবেশিত রহিয়াছে, (১) ইব্ন কুদামা, আল-মুগনী, কায়রো ১৩৬৭ হি., প্রশ্নটি ৫১৩-৫ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে এবং পরে ৫ম খণ্ডে ৫৩৮-৪৪ পৃষ্ঠায়। ফিক্হ-এর সাধারণ গ্রন্থাবলী ছাড়া নিম্নোক্ত প্রাচীন গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য ঃ (২) আবূ য়ূসুফ য়া'কূব (মৃ. ১৮২/৭৯৮), কিতাবু'ল-খারাজ, বূলাক সম্পা., ১৩০২ হি. (Fr. tr. by Fagnan. Le Livre de l'Impot foncier, প্যারিস১৯২১ খৃ.,) ; (৩) য়াহ্য়া ইব্ন আদাম (মৃ. ২০২/৮১৭-৮), কিতাবু'ল-খারাজ কায়রো ১৩৪৭ হি., পৃ. ৮৪ প. (Eng. tr. by A. Ben Shemesh, Texation in Islam, i, Leiden 1958); (৪) ইব্ন সালাম (মৃ. ২২৪/৮৩৯), কিতাবু'ল-আমওয়াল, কায়রো ১৩৫৩ হি. ; (৫) আল -মাওয়ারদী আল-আহকামু'স-সুলতানিয়্যা কায়রো ১৯০৯ খৃ., (Fr. Tr. by Fagnan, Les Statuts Gouvernementaux, Algiers 1916) ; (৬) 'উছমানী বিধানাবলীর জন্য দ্র. N. Chiha, Traite de la Propriete immobiliere en droit ottoman, Cairo 1906; (৭) D. Santillana, Istituzioni di diritto musulmano. i, no. 69.

Y. Linant de Bellefonds (E.I.[2])/হেদায়েতুল ইসলাম খান

**ইহ্‌রাম** (احرام) ঃ ح-ر-م এই শব্দমূল হইতে গঠিত باب افعال-এর মাসাদার বা ক্রিয়ামূল। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিষেধ করা; কোন বস্তু বা বিষয়কে হারাম বলিয়া নির্দেশ করা ; কোন বস্তু বা বিষয়কে হারাম করা। যেমন লিসানু'ল্-'আরাব অভিধান গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—احرم الشئ। অর্থাৎ সে ব্যক্তি বস্তুটিকে হারাম করিয়াছে।" ইহ্‌রাম শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ ইহ্‌লাল (احلال)। উহার অর্থ কোন বস্তু বা বিষয়কে হালাল করা। ইহ্‌রাম শব্দের ইসলামী পারিভাষিক অর্থ শারী'আত কর্তৃক হারাম বা সম্মানিত বলিয়া নির্দেশিত পবিত্র মক্কা ও তৎসন্নিহিত ভূ-খণ্ডের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করা ; যে বেশভূষায় ও যে অবস্থায় হাজ্জের রুক্‌নসমূহ পালন করা হয়, সেই বেশভূষা ও অবস্থা ধারণ করা। ইহ্‌রাম একটি শারী'আতী পরিভাষা আর এই কারণে ইহ্‌রাম অবস্থা ধারণকারী ব্যক্তিকে মুহ্‌রিম (محرم) বলা হয়। মানুষ যে অবস্থায় 'উম্‌রা ও হাজ্জ পালন করে, ইহ্‌রাম সেই অবস্থার-ই নাম। এই কারণে ইহ্‌রাম শুধু সেই সময়েই বাঁধা হয়, যখন হাজ্জী ব্যক্তি পবিত্র মক্কা অর্থাৎ হারাম শারীফের (হারাম নিবন্ধ দ্র.) সীমানায় প্রবেশ করেন। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাজ্জীগণ জেদ্দায় পৌঁছিয়াই ইহ্‌রাম বাঁধিয়া থাকেন। হারাম শারীফের সীমানার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শারী'আতের পক্ষ হইতে ইহ্‌রামের জন্য কতগুলি মীকাত (দ্র.) (বহু বচন মাওয়াকীত) নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল মীকাতের যে কোনও একটিকে অতিক্রম করিবার পূর্বে অর্থাৎ মীকাতে অথবা উহার বাহিরে—ইহ্‌রাম বাঁধিতে হয়। মীকাতগুলি এই ঃ (ক) যু'ল-হুলায়ফা উহা মদীনার দিক হইতে আগত হাজ্জযাত্রীদিগের জন্য নির্ধারিত মীকাত যাহা বর্তমানে বি'র 'আলী নামেই পরিচিত। (খ) আল-জুহ্‌ফাঃ; উহা মিসর ও সিরিয়ার দিক হইতে আগত হাজ্জ যাত্রীদিগের জন্য নির্ধারিত মীকাত। (গ) কারনু'ল্-মানাযিল ; উহা নাজ্‌দ তথা রিয়াদ, মানফূহ অঞ্চলের দিক হইতে আগত হাজ্জ-যাত্রীদিগের জন্য নির্ধারিত মীকাত। (ঘ) য়ালাম্‌লাম। উহা য়ামান অঞ্চলের দিক হইতে আগত হাজ্জযাত্রীদিগের জন্য নির্ধারিত মীকাত। (ঙ) যাতু 'ইর্‌ক'। উহা ইরাকের দিক হইতে আগত হাজ্জযাত্রীদের জন্য নির্ধারিত মীকাত। মীকাতের আরেক নাম মুহাল্ল (مهل) অর্থাৎ ইহ্‌লাল আরম্ভ করিবার স্থান। ইহ্‌লাল শব্দের অর্থ কণ্ঠস্বরকে উচ্চ করা। উচ্চৈঃস্বরে লাব্বায়েক (লাব্বায়্‌ক নিবন্ধ দ্র.) বলা। এইরূপে ইহ্‌লাল ও ইহ্‌রাম—এই উভয় শব্দের অর্থ একইরূপ দাঁড়ায়। احرم بالحج এবং اهل بالحج এই উভয় বাক্যের অর্থ হইতেছে 'সে ব্যক্তি হাজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধিয়াছে'। যাহারা উক্ত মীকাতসমূহের সীমানার মধ্যে বাস করেন, তাঁহারা তাঁহাদের গৃহেই ইহ্‌রাম বাঁধিয়া হাজ্জ পালন করেন (তান্‌বীহ্‌, সম্পা. A. W. T. Juynboll, পৃ. ৭২)। অবশ্য 'উম্‌রাঃ পালন করিতে হইলে তাঁহাদিগকে হিল্ল (হিল্ল নিবন্ধ দ্র.)-এর যে কোনও সীমান্তে গিয়া ইহ্‌রাম বাঁধিতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত তান্'ঈম নামক স্থানকেই ইহ্‌রামের স্থান বলিয়া নির্বাচিত করা হয়।

গোসল অথবা উযূর মাধ্যমে ইহ্‌রাম আরম্ভ করা হয়। অতঃপর ইহ্‌রামের পোশাক পরিধান করা হয়, সুগন্ধি ব্যবহার করা হয় এবং দুই রাক'আত নফল সালাত আদায় করা হয়। ইহ্‌রাম বিষয়ে সারকথা এই যে, হাজ্জযাত্রী যে মহান ফরয কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পবিত্র কা'বাঃ-য় উপস্থিত হইতে যাইতেছেন, ইহ্‌রামের মাধ্যমে বাহ্যিক ও আন্তরিক-উভয়বিধ যাবতীয় অপবিত্রতা হইতে নিজেকে পবিত্র করত উহার জন্য প্রস্তুত হইয়া যান। ইহ্‌রামের পোশাকের মধ্যে কোন সেলাই করা কাপড় থাকে না। উহাতে দুইখানা বস্ত্রখণ্ড থাকে ঃ (১) ইযার। উহা নাভি হইতে হাঁটুর নিম্ন পর্যন্ত দেহের নিম্নার্ধে পরিধান করা হয়। (২) রিদা'। উহা দেহের উপরার্ধে এইরূপে জড়ান হয়-যাহাতে মোটামুটিভাবে বাম কাঁধ, পিঠ এবং বুক ঢাকিয়া যায়। কখনও কখনও উহার ডান দিক ডান কাঁধের উপর গিরা দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। এই কারণে উহাকে বিশাহ্‌' (وشاح = শরীরে বাঁধা দীর্ঘ বস্ত্রখণ্ড) নামেও অভিহিত করা হয়। মহিলাদের জন্য ইহ্‌রামের পৃথক কোনও পোশাক নির্ধারিত নাই। তবে তাঁহারা সাধারণত একটি দীর্ঘ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আপাদমস্তক সমস্ত শরীরকে আবৃত করিয়া রাখেন। এইজন্য শর্ত এই যে, উক্ত বস্ত্রখণ্ড রঙ্গীনও হইতে পারিবে না এবং উহা শরীরের সহিত লাগিয়া থাকিতেও পারিবে না।

'আরবগণ হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) প্রবর্তিত দীনের অনুসারী বলিয়া ইহ্‌রাম বাঁধিবার প্রথা প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। অবশ্য ইসলাম উহাকে জাহিলিয়্যাতের যাবতীয় অপবিত্রতা হইতে মুক্ত ও পবিত্র করিয়া দিয়াছে।

যাহা হউক, হাজ্জযাত্রী বা 'উম্‌রা পালনকারী ব্যক্তি দুই রাক'আত সালাত আদায় করিবার পর স্বীয় নিয়্যাত ও উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করেন। উক্ত নিয়্যাত শুধু হাজ্জের জন্য, শুধু 'উম্‌রা-র জন্য অথবা হাজ্জ ও 'উম্‌রা-উভয়ের জন্য হইতে পারে। এইরূপে উহা তিন প্রকারের নিয়্যাতে বিভক্ত হইয়া যায় ঃ (১) ইফ্‌রাদ (افراد-পৃথক পৃথকরূপে সম্পাদন করা) অর্থাৎ শুধু হাজ্জ বা শুধু 'উম্‌রা পালন করিবার নিয়্যাত করা হইবে। (২) তামাত্তু' (تمتع-'উম্‌রা-র সহিত হাজ্জকে যুক্ত করিবার সন্তোষ লাভ করা) অর্থাৎ নিয়্যাত করা হইবে 'উম্‌রা পালন করিবার; কিন্তু উহার সহিত হাজ্জও পালন করা হইবে। তামাত্তু'-তে 'উম্‌রা পালন করিবার পর হাজ্জ পালন করা হয়; (৩) কিরান (قران-দুইটি বিষয়ক একত্র করা)। অর্থ 'উম্‌রা ও হাজ্জ-উভয়ের জন্য একই সময়ে নিয়্যাত করা।

ইহ্‌রাম বাঁধিবার পর তাল্‌বিয়াঃ অর্থাৎ 'লাব্বায়্‌কা....'-এই দু'আ' পাঠ করা আরম্ভ করিতে হয়। উহা যথাসম্ভব বেশী করিয়া পাঠ করিতে হয়। যু'ল্-হিজ্জা মাসের দশ তারীখে মাথা কামাইয়া বা চুল ছাঁটিয়া ফেলিবার পর উক্ত দু'আ' (লাব্বায়্‌কা...) পাঠ করিবার ধারা সমাপ্ত হয়।

ইহ্‌রামের অবস্থায় কতগুলি কার্য হইতে বিরত থাকা শারী'আতী বিধানে অবশ্য কর্তব্য। যেমন স্ত্রী-সংগম, প্রসাধনী ব্যবহার ও সৌন্দর্য চর্চা, প্রাণী-হত্যা, প্রাণী শিকার করা (তু. ২ ঃ ১৯৭....হাজ্জ পালন করিবার অবস্থায় কোনরূপ অশ্লীল কথা, অন্যায় কার্য ও ঝগড়া-বিবাদ নাই), তৃণ-গুল্ম ইত্যাদি উদ্ভিদ উপড়ান বা ভাঙ্গা (তু. ৫ ঃ ১-ইহ্‌রামের অবস্থায় তোমরা প্রাণী শিকার করিও না (. . . .)। হাজ্জযাত্রী পবিত্র মক্কায় পৌঁছিয়া তাওয়াফ ও সা'ঈ (তাওয়াফ ও সা'ঈ নিবন্ধদ্বয়' দ্র.) সম্পন্ন করেন। তিনি ইচ্ছা করিলে যাম্‌যাম কূপের পানি পান করিতে পারেন। যিনি শুধু 'উম্‌রা পালনের উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধেন, তিনি অতঃপর মাথার চুল কামাইয়া ফেলেন বা ছাঁটিয়া ছোট করেন। কিন্তু যিনি হাজ্জের উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধেন, তিনি হাজ্জের যাবতীয় মান্‌সাক বা করণীয় কার্য সম্পন্ন করিবার পর যু'ল্-হিজ্জা মাসের দশ তারিখে মাথা মুড়ান বা

মাথার চুল ছাঁটিয়া ছোট্ট করেন। অতঃপর হাজ্জী ইহ্‌রামের পোশাক ত্যাগ করিয়া নিত্য দিনের পরিধেয় পোশাক পরিধান করিতে পারেন। তৎপর যদি তিনি পবিত্র মক্কা ত্যাগ করিবার কালে 'উম্‌রাতু'ল-বিদা'-ও পালন করিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে এতদুদ্দেশ্যে তান্‌'ঈম নামক স্থানে গমন করত তথায় দুই রাক'আত সালাত আদায় করিবার পর তা'ওয়াফ ও সা'ঈ সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে পুনরায় পবিত্র মক্কায় আগমন করিতে হয় (তু. বুখারী, সাহীহ্, ১খ, ২১১-২১২)।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) Wellhausen, Reste arabischen Heidentums, দ্বিতীয় সং., পৃ. ১২২ প.; (২) Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest, পৃ. ৬৮ প.; (৩) Juynboll, Handb. des Islam. Gesetzes, পৃ. ৭৯-৮০, ১৪৩ প.; (৪) W. R.obertson Smith, Lectures on the religion of the Semites, দ্বিতীয় সং., পৃ. ৪১৮ প; (৫) ফিক্‌হ্ ও হাদীছ বিষয়ক গ্রন্থাবলীর হাজ্জ অধ্যায়; (৬) Burckhardt, Burton, v. Maltzan এবং Keane কর্তৃক রচিত 'ভ্রমণকাহিনী'-সমূহ; (৭) এইচ. কাজিমযাদাহ্, Revue de Monde musulman সাময়িকীতে প্রকাশিত নিবন্ধ, ১৯খ., পৃ. ১৯৮ প; (৮) A. J. Wensinck, Some Semitic Rites of mourning and Religion নিবন্ধ, Verhandl. der kon. Akad. van Wetensch. সাময়িকীতে প্রকাশিত, Nieuwe Reeks, Dl. ১৮, ১ম. সংখ্যা, স্থা.; (৯) ফিক্‌হ্ বিষয়ক গ্রন্থাবলী, ইহ্‌রাম পর্ব ও সালাত অধ্যায় দ্র.; (১০) Juynboll, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৭৯ প.; (১১) A. J. Wensinck, Der Islam, C. H. Becker কর্তৃক মুদ্রিত, ৪খ., ২২৯-২৩২।

A. J. Wensinck (দা.মা.ই/ মু. মাজ্‌হারুল্ হক (সংযোজন)

**ইহরাম (احــــرام)** ঃ শব্দটি আরবী, ধাতু م-ر-ح হইতে গঠিত হইয়াছে احـــرام। শব্দটি, অর্থ বাধা দেওয়া, নিষেধ করা, বঞ্চিত করা, নিষিদ্ধ, অবৈধ, পবিত্র, সম্মাননা। اَحْــرَمَ ক্রিয়ার ক্রিয়ামূল احـــرام। অর্থ এমন একটি কার্য যদ্দ্বারা হালাল ক্রিয়া হারাম হইয়া যায় (ইবন মানযূর, লিসানুল 'আরাব)।

পারিভাষিক সংজ্ঞা — হানাফী ইমামগণের অভিমতে কোন ব্যক্তি যখন হজ্জ ও 'উমরা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিজের জন্য কিছু হালাল ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ করিয়া লয় তখনই উহা ইহ্‌রাম বলিয়া কথিত হয়। ফাতহুল কাদীর প্রণেতা বলেন, ইহরামের প্রকৃত অর্থ উচ্চারিত নিয়াত যোগে নিজের প্রতি কতিপয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করা (ইবনুল হুমাম, ফাত্‌হুল কাদীর, ২খ, পৃ. ১৩৪)।

মালিকী মাযহাবের ইমামগণ বলেন, নিয়াত উচ্চারণের প্রয়োজন নাই, বরং ইচ্ছা ও সংকল্প দ্বারা ইহ্‌রাম কার্যকরী হইবে। আবার নিয়াত করিবার পর কোন আমল পরিত্যাগ করিলেও ব্যক্তি ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকিবে (শারহুস সাগীর, ১খ, পৃ. ২৫০)। শাফি'ঈ ইমামগণের মতে— হজ্জ বা 'উমরা অথবা দুইটিই কার্যকরী করার লক্ষ্যে প্রবৃত্ত হওয়াই ইহ্‌রাম, তবে নিয়াত থাকিতে হইবে (ইবন শিহাব আর-রামালী, নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, ৩খ, পৃ. ২৫৬)। হাম্বালীগণের মতে প্রবৃত্ত হইলেই ইহরাম হইয়া যাইবে নিয়াত থাকুব বা না থাকুক, যেহেতু ইহরাম গ্রহণ করিলে সিদ্ধ কিছু কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হইয়া যায় (কাশশাফুল কাশফ, ১খ, পৃ. ৫৬৪)।

হজ্জ অথবা উমরা আদায়ের জন্য ইহরাম একটি প্রারম্ভিক বিধান। ইহাই হানাফী, মালিকী ও শাফি'ঈগণের অভিমত। কেহ যদি হজ্জের মাস আগমনের পূর্বেই ইহরাম গ্রহণ করে তবে ইমাম আবূ হানীফার মতে তাহা সিদ্ধ হইবে কিন্তু উহা মাকরূহ। ইহা হজ্জের একটি মৌল বিধান। কাহারও হজ্জ ফাসিদ হইলে তাহার উচিত হইবে না যে, ফাসিদ হজ্জ আদায়ের লক্ষ্যে ইহরাম অব্যাহত রাখিবে। বরং 'উমরা করিয়া ইহরামমুক্ত হইবে, অতঃপর যথানিয়মে কাযা আদায় করিবে।

হাম্বালী মাযহাবের এক অংশের মতে ইহরাম হজ্জের একটি বিধান যেহেতু নিয়াতযোগে হজ্জে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রতীক হইল ইহরাম। অন্যান্য ইবাদতের মত নিয়াত ব্যতীত হজ্জ সম্পন্ন হয় না। অপর দলের অভিমত, ইহরাম হজ্জের কোন বিধান নহে। ইমাম ছাওরী (র) বর্ণিত হাদীছে আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন— الحج عـرفـة। - 'আরাফাই হজ্জ'। অর্থাৎ আরাফা প্রান্তরে অবস্থানের নামই হজ্জ। সুতরাং যে কেহ 'আরাফা দিবসে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে 'আরাফা প্রান্তরে উপস্থিত হইলেই তাহার হজ্জ সমাধা হইবে। অবশ্য প্রথম অভিমতটি সুপ্রসিদ্ধ (ইব্‌ন কুদামা, আশ-শারহুল কাবীর, ২খ, পৃ. ৫০৩-৪)।

ইহরাম গ্রহণকারীর জন্য উত্তম হইল সে গোসল অথবা উযু করিবে, তবে গোসলই উত্তম। যেমন বর্ণিত হইয়াছে, 'রাসূলুল্লাহ (স) ইহরামের জন্য গোসল করিয়াছেন' (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, ১খ, পৃ. ২৪৮)। রজঃস্বলা রমণীও গোসল করিতে পারে, যদিও উহা তাহার জন্য ফরয গোসল বলিয়া গণ্য হইবে না, তবে উযূ করিবে। পুরুষগণ পরিধান করিবে দুইটি সাদা নূতন অথবা ধোয়া বস্ত্র, একটি সেলাইবিহীন লুঙ্গি ও একটি চাদর।

ইহরাম গ্রহণকালীন গোসলের পূর্বে নখ কর্তন করা, গোঁফ ছাঁটিয়া ফেলা, বগল পরিষ্কার করা, গুপ্ত স্থানের চুল বিলোপ করা, মস্তক মুণ্ডন করা মুস্তাহাব। দুই রাক'আত সালাত আদায় করিতে হইবে। রাসূলুল্লাহ (স) ইহরাম গ্রহণকালে যুলহুলায়ফাতে সালাত আদায় করিয়াছেন (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, ১খ, ২০৭)। হজ্জের বা উমরার অথবা উভয়ের উদ্দেশ্যে ইহরাম গ্রহণ করিলে সালাত আদায়ের পর বলিবে, "আয় আল্লাহ্ ! আমি উক্ত ইবাদতের সংকল্প করিয়াছি, তুমি উহা আমার জন্য সহজ করিয়া দাও এবং উহা আমার পক্ষ হইতে কবূল কর"। এইরূপে মনের বাসনা উল্লেখ করিয়া দু'আ করিবে। যেহেতু হজ্জ অনুরাগ ও কষ্ট মিশ্রিত একটি মহান 'ইবাদত, সুতরাং সহজসাধ্যতা ও কবূলের জন্য দু'আ করা মুস্তাহাব। অতঃপর তাল্‌বিয়া পাঠ করিবে। যেমন বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (স) সালাত আদায়ের পর তাল্‌বিয়া পাঠ করিয়াছেন (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, ১খ, ২০৮)। বাহনে সমাসীন হওয়ার পর তাল্‌বিয়া পাঠ করিলেও সিদ্ধ হইবে। তবে প্রথম পদ্ধতিই উত্তম। যখনই কেহ তাল্‌বিয়া পাঠ করিবে ইহরাম হইয়া যাইবে। আর তালবিয়া ব্যতিরেকে শুধু নিয়াত দ্বারা সূচনা করা যাইবে না। ইমাম আবূ য়ূসুফের মতে তালবিয়া ব্যতীত শুধু নিয়াত দ্বারা সূচনা করা যাইবে। যাহারা তাল্‌বিয়াকে হজ্জের জন্য শর্ত মনে করেন তাহাদের দলীল হইল ঃ

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ
فِى الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ

خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يَا أُوْلِى الْأَلْبَابِ .

"যে কেহ এই মাসগুলিতে হজ্জ করা স্থির করে তাহার জন্য হজ্জের সময় স্ত্রীসম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নহে। তোমরা উত্তম কাজের যাহা কিছু কর, আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করিও, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ! তোমরা আমাকে ভয় কর" (২ ঃ ১৯৭)।

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, উল্লেখিত আয়াত দ্বারা হজ্জ করা স্থির হওয়ার অর্থ তাল্বিয়া পাঠ করা। হযরত 'আইশা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি তাল্বিয়া পাঠ করিল না তাহার ইহ্রাম হইল না। উচ্চরবে তাল্বিয়া পাঠ করার নাম اهلال। (ইমাম যায়লাঈ, তাবয়ীনুল হাকাইক, ২খ, পৃ. ৮)।

এমন কতকগুলি চিহ্নিত স্থান মীকাত বলিয়া পরিচিত— হজ্জ বা 'উমরাকারী ইহ্রামের পোশাক পরিধান ব্যতীত যাহা সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। এই অর্থে মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণ ঐকমত্য পোষণ করেন। হানাফী ইমামগণ বলেন, আঞ্চলিক বিভিন্নতার কারণে মীকাতগুলিও বিভিন্ন হইয়াছে। হজ্জব্রত পালন করার উদ্দেশ্যে আগমনকারীগণ তিন ধরনের হয়— (১) নির্ধারিত মীকাতের বাহিরে অবস্থানকারী। তাহাদিগকে বলা হয় 'আফাকী। (২) মীকাতের অভ্যন্তরে হেরেমের বাহিরে অবস্থানকারী। তাহাদিগকে বলা হয় 'হিল্লী'। (৩) আর যাহারা হেরেমে বসবাস করে, তাহারা হেরেমী।

কা'বা কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্ব হইতে আগমনকারী অভিযাত্রীদের জন্য মীকাত পাঁচটি, (১) মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলায়ফা। (২) ইরাকীদের জন্য যাতু ইরক। (৩) সিরীয়দের জন্য জুহ্ফা। (৪) নজদের অধিবাসীদের জন্য 'কারন'। (৫) ইয়ামানীদের জন্য য়ালামলাম। এই সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য এই সকল মীকাতই নির্ধারিত। তবে এক অঞ্চলের অধিবাসী যদি অপর অঞ্চলের মীকাত পথে যাত্রা করে তাহা হইলে সেই অঞ্চলবাসীদের মীকাতই হইবে তাহার মীকাত। প্রথম শ্রেণীর হজ্জযাত্রী অর্থাৎ 'আফাকীদের জন্য এই সকল মীকাত। দ্বিতীয় শ্রেণীর হজ্জযাত্রী যাহারা মীকাতের অভ্যন্তরে হেরেমের বাহিরে অবস্থান করে তাহাদের মীকাত স্ব স্ব বাসস্থান অথবা হেরেমের বাহিরে যে কোন স্থান। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ .

"তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও 'উমরা পূর্ণ কর" (২ঃ১৯৬)।

উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে হযরত 'আলী ও হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) জিজ্ঞাসিত হইয়া বলেন, "হজ্জ ও 'উমরা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তোমরা তোমাদের বাসস্থান হইতে ইহ্রাম গ্রহণ কর।" ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের বাসস্থান হইতে হেরেমের সূচনা পর্যন্ত তাহাদের মীকাত (আল-মুগনী, ৩খ, পৃ. ২৫৭)।

তৃতীয় শ্রেণীর হজ্জযাত্রীগণ হেরেম শরীফের অধিবাসী। তাহারা হেরেমের যে কোন স্থান হইতে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধিবে। আর যে ব্যক্তি হেরেমের অধিবাসী নহে অথচ কোন কারণে তথায় অবস্থানের সুযোগ লাভ করিয়াছে তাহার জন্যও এই বিধান (প্রাগুক্ত)।

যদি কোন একটি মীকাতের অধিবাসীকে কার্য ব্যাপদেশে দুইটি মীকাত অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে হেরেম হইতে দূরবর্তী মীকাত হইতে ইহ্রাম গ্রহণ করা উত্তম হইবে। অবশ্য পরবর্তী মীকাত পর্যন্ত বিলম্ব করিলে দূষণীয় হইবে না। আর যদি কেহ স্থলপথ অথবা নৌপথে দুইটি মীকাতের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়া যাত্রা করে, তবে সে চেষ্টা করিবে যে কোন মীকাতের বরাবর হইলে ইহ্রাম বাঁধিতে (প্রাগুক্ত)।

মীকাতের বাহিরের অধিবাসী হজ্জ অথবা 'উমরার উদ্দেশ্য ব্যতীত মক্কায় প্রবেশের মনস্থ করিলে তাহাকেও ইহ্রাম বাঁধিতে হইবে। যেমন হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ

لا يدخل احد مكة الا باحرام .

"ইহ্রাম ব্যতীত কেহই মক্কাতে প্রবেশ করিবে না" (হাশিয়া ইব্ন আবিদীন আলা দুররিল মুখতার, ২খ, পৃ. ২০৮)।

মহাসম্মানিত মর্যাদাশীল ভূখণ্ড বলিয়াই এইরূপ বিধান। হজ্জ, উমরাকারী এবং হজ্জ ও উমরাকারী নহে সেখানে সকলেই সমান। তবে হজ্জ অথবা উমরার সংকল্প নাই এমন কেহ যদি মীকাতে প্রবেশ করে, প্রয়োজনবোধে মক্কাতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে সে বিনা ইহ্রামে প্রবেশ করিতে পারিবে। যেহেতু উহা তাহার সংকল্প বহির্ভূত কর্ম। কোন কার্য ব্যাপদেশে বারংবার মক্কাতে প্রবেশ করিতে হইলে সে মক্কাবাসীদের পর্যায়ভুক্ত হইবে। যেমন মক্কাবাসীগণ প্রয়োজনানুযায়ী মক্কার বাহিরে যায় আবার প্রবেশও করে। বারংবার তাহাদের ইহ্রাম গ্রহণ জরুরী নয় (হাশিয়া ইব্ন 'আবিদীন, ২খ, পৃ. ২০৮; আল-বাদাই' ওয়াস-সানাঈ', ২খ, পৃ. ১৬৪)।

যদি কেহ হেরেম শরীফে প্রবেশ করার ইচ্ছা করে জরুরী যুদ্ধের নিমিত্ত অথবা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া অথবা প্রয়োজনের পুনরাবৃত্তিতে, যেমন খড়-কুটা, জ্বালানী সংগ্রহ কিংবা ফসলের জমিতে যাতায়াত, তাহাকে ইহ্রাম গ্রহণ করিতে হইবে না। আর যাহার উপর হজ্জ ফরয নহে, যেমন ক্রীতদাস, বালক, তাহাদের প্রবেশে কোন অসুবিধা নাই। মীকাত অতিক্রম করিয়া কোন কাফির মুসলমান হইলে, ক্রীতদাস মুক্ত হইলে অথবা কোন বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যদি ইহ্রাম গ্রহণের সংকল্প করে তবে তাহার অবস্থান স্থল হইতে সে ইহ্রাম গ্রহণ করিবে। তাহার অনুষ্ঠানাদি মক্কাবাসীদের অনুরূপ হইবে (ইব্ন কুদামা, আল-মুগনী, ৩খ, পৃ. ২০৬-২১৫)।

ইহ্রাম গ্রহণের সময়— হজ্জের ইহ্রাম গ্রহণের সময় হইল হজ্জের মাসসমূহ শাওয়াল, যুল-কা'দা ও যুল-হিজ্জা মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত। ইহা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত। হযরত ইব্ন মাস'ঊদ, ইব্ন 'উমার, ইবন 'আব্বাস ও 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা) হইতে এইরূপ উক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

'উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম গ্রহণের কোন নির্দিষ্ট মাস নাই। যে কেহ হজ্জের মাসসমূহের আগমনের পূর্বে ইহ্রাম গ্রহণ করে সে যেন উহাকে 'উমরার ইহরাম বলিয়া নির্ধারণ করে (তাবয়ীনুল হাকাইক, ২খ, পৃ. ৪৯)। তবে রমযান মাসে 'উমরার ইহ্রাম গ্রহণ করা মুস্তাহাব। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রমযান মাসে একটি 'উমরা পালন করা একটি হজ্জের সমতুল্য (হাশিয়া ইব্ন 'আবিদীন 'আলা দুররিল মুখতার, ২খ, পৃ. ৬০৭)।

আরাফাত দিবসে দ্বিপ্রহরের পূর্বে উমরার ইহ্রাম গ্রহণ করা মাকরূহ। ইহাই হানাফী মাযহাব সিদ্ধ। তবে ইমাম আবূ য়ূসুফের মতে দ্বিপ্রহরের পূর্বে ইহ্রাম গ্রহণ করা মাকরূহ হইবে না। এইরূপে আরাফাত দিবসের পর চতুর্থ দিবসে ইহরাম গ্রহণ করা মাকরূহ। অনেকেই পঞ্চম দিবসকেও

মাকরূহ বলিয়াছেন। মক্কাবাসী, তথায় অবস্থানকারী ও মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের জন্য হজ্জের মাসসমূহে 'উমরার কর্মসূচী পালন করা মাকরূহ। কারণ ঐ সময় তাহাদের প্রধান কর্তব্য থাকে সেই বৎসর হজ্জ পালন করা। তাহারা 'উমরা পালন করিলে উমরা মিশ্রিত হজ্জ 'তামাত্তু' হজ্জে পরিণত হয় যাহা তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ। মক্কাবাসীগণ যদি হজ্জ পালনের ইচ্ছা না করে তাহা হইলে শুধু 'উমরা পালনে কোন বিপত্তি নাই (হাশিয়া ইবন 'আবিদীন আলা দুররিল মুখতার, ২খ, পৃ. ৬০৭-৮)।

ইহ্‌রামে যাহা নিষিদ্ধ এবং যাহা নিষিদ্ধ নহে ঃ বাদাই' গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে যে, নিষিদ্ধ বস্তুগুলি দুই ধরনের, একটি হজ্জ বিনষ্ট করে এবং অপরটি হজ্জ বিনষ্ট করে না। যাহা হজ্জ বিনষ্ট করে না তাহা কয়েক প্রকারের, কতকগুলি পরিধেয় সংক্রান্ত, কতগুলি সুগন্ধি সংক্রান্ত, কতকগুলি রতিক্রিয়ার আনুষঙ্গিক, আর কতক শিকার সম্বন্ধীয়।

হজ্জ বিনষ্টকারী বিষয়গুলি— ইহ্‌রামকারী সম্পূর্ণত সেলাইকৃত পোশাক- জুব্বা, জামা, পাজামা, পাগড়ী ও টুপী পরিধান করিবে না। তবে জুতা বা মোজার পায়ের গোছার নিম্নাংশ পর্যন্ত কাটিয়া বাদ দিয়া ব্যবহার করিলে কোন বিপত্তি নাই। যাফরান বা ওয়ারস সিক্ত বস্ত্র পরিধান করিবে না। মস্তক আবৃত করিবে না। এমন পোশাক পরিধান করা যাইবে না যদ্দ্বারা দেহ আবৃত থাকে। পুরুষদের জন্য মুখমণ্ডল আবৃত করা যাইবে না। মহিলাদের জন্য এই শর্তে মুখমণ্ডল আবৃত করা যাইবে যে, বস্ত্র যেন মুখমণ্ডলে আলগাভাবে থাকে। ইহ্‌রাম গ্রহণকারীর দেহে সুগন্ধি ব্যবহার করা যাইবে না।

তাঁবু বা সামিয়ানার নীচে ছায়া গ্রহণে কোন বাধা নাই। হযরত 'উমার (রা) বৃক্ষে কাপড় লটকাইতেন এবং উহার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। আরও বর্ণিত হইয়াছে, হযরত 'উছমান (রা)-এর জন্য সামিয়ানা লটকান হইত, তিনি উহার ছায়ায় আশ্রয় লইতেন (প্রাগুক্ত)।

ইহ্‌রাম পরিহিতা মহিলা যদি তাহার সমস্ত দেহ সেলাইকৃত বস্ত্র বা অন্যকিছু দ্বারা আবৃত করে তাহাতে কোন দোষ নাই। মহিলাগণের স্বর্ণখচিত বস্ত্র বা রেশমের পোশাকেও কোন বিপত্তি নাই। স্বর্ণ বা অন্য ধাতুর অলংকারে সজ্জিত হইতে পারে। অবশ্য কোন কোন মতে উহা মাক্‌রূহ। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতে উহা সিদ্ধ। বর্ণিত হইয়াছে, হযরত ইবন 'উমার (রা) ইহ্‌রাম গ্রহণকালে তাঁহার পুরবাসিনীগণকে স্বর্ণ ও রেশমী বস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করিতেন। সুগন্ধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারীগণ পুরুষগণের সমতুল্য। হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) স্বীয় ইহ্‌রাম পরিহিতা কণ্যাগণকে দস্তানা পরিধান করাইতেন (প্রাগুক্ত)।

ইহ্‌রামকারীর জন্য রক্তমোক্ষন করা, আহত স্থান ফাঁড়িয়া ফেলা, ন্যাকড়া জড়ান, ভগ্নস্থানে পট্টি বাঁধা, দংশিত স্থান হইতে দাঁত বাহির করাতে কোন দোষ নাই। কারণ এইগুলি চিকিৎসার ক্ষেত্র, কষ্ট নিবারণের উপায়। যে সুরমাতে সুগন্ধি নাই, উহা ব্যবহারেও কোন দোষ নাই (প্রাগুক্ত)।

যাহা পরিচ্ছন্নতার পর্যায়ে পড়ে ইহ্‌রাম অবস্থায় তাহা করা যাইবে না। ইহ্‌রামকারীর পরিচয় হইবে— ধূলিময় বেশ, এলোমেলো কেশ। মস্তক মুণ্ডন করা, নখ কর্তন করা, পরিচ্ছন্নতার পর্যায়ভুক্ত। হানাফী মতে কুরবানীর পূর্বে মস্তক মুণ্ডন করা সিদ্ধ হইবে না। আল্লাহ পাক বলেন,

وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ـ

"যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু উহার স্থানে না পৌঁছে তোমরা মস্তক মুণ্ডন করিও না। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা কুরবানীর দ্বারা ফিদয়া দিবে" (২ ঃ ১৯৬)।

মস্তক পুষ্প মঞ্জুরিত করা যাইবে না। উহা মস্তক মুণ্ডন সদৃশ। মস্তকের কিছু অংশের চুল নিবারণ করা যাইবে না। ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি অপর ইহ্‌রামধারী অথবা ইহ্‌রামবিহীন লোকের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিতে পারিবে না।

ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির জন্য অবশ্য কর্তব্য যে, চুম্বন, লালসাপূর্ণ স্পর্শ, পরস্পর আদর-সোহাগ, অঙ্গবিহীন রতিক্রিয়া পরিহার করিবে। যেমন আল্লাহ পাক নির্দেশ করেন ঃ

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ.

"যে কেহ এই মাসগুলিতে হজ্জ করা স্থির করে তাহার জন্য হজ্জের সময় স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নহে। তোমরা উত্তম কাজের যাহা কিছু কর আল্লাহ তাহা জানেন" (২ ঃ ১৯৭)।

এমনও বলা হইয়াছে, মহিলার নিকট পুরুষের কিছু চাহিদার নামই رفث। হযরত 'আইশা (রা) একবার জিজ্ঞাসিত হইলেন, ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির নিকট তাহার ভার্যায় কোন বস্তু সিদ্ধ ? তিনি বলেন, শুধু কথাবার্তা ব্যতীত আর কিছুই সিদ্ধ নহে।

**শিকার সম্পর্কিত মাসআলা**

ফিক্‌হবিদগণের ব্যাখ্যায় আসিয়াছে, যে সকল বন্য পশু শিকারযোগ্য ঐ সকল প্রাণী সৃষ্টিগতভাবে বন্য, আকৃতিগতভাবে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিক হইতেও পৃথক, মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে অবস্থান করে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে একজন ইহ্‌রামধারীর জন্য গৃহপালিত পশু উট, গরু, ছাগল, মহিষ, হাঁস-মুরগী যবেহ করা নিষিদ্ধ নহে। এই সকল প্রাণীর নিকটবর্তী হইলে এইগুলি মানুষকে কোন বাধা দেয় না, বনেও বাস করে না। আর যে সকল হাঁস মানুষের মধ্যে বাস করে অথচ উড়িয়া চলে উহা শিকারযোগ্য প্রাণী, মানুষের সহিত ঘনিষ্ঠ আবার বন্যও। তবে কুকুর এই জাতীয় প্রাণী নহে। তেমনই বরগুচ্ছ (পাখাবিহীন এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট), মাছি, আঁঠালী, বাঁদর, বোলতা বাধা প্রদানকারী নহে, আবার বন্যও নহে। সচরাচর ইহরা মানুষের সহিত না মিশিলেও ইহারা মানুষকে চায়। অতঃপর ইহ্‌রামধারীর জন্য স্থলভাগের ভক্ষণযোগ্য প্রাণী শিকার করা নিষিদ্ধ। যেমন আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ـ

"তোমরা যতক্ষণ ইহ্‌রামে থাকিবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম" (৫ ঃ ৯৬)।

তাহার জন্য বন্য পশু বধ করাও নিষিদ্ধ। তেমনই বধ করার উদ্দেশ্যে কাহাকেও উহার প্রতি ইঙ্গিত করাও নিষিদ্ধ, বধ করার জন্য সাহায্য করাও নিষিদ্ধ। উহা হত্যা করা হারাম, হত্যাকর্মে সাহায্য করাও হারাম। কেহ এমনটি করিলে তাহার উপর কাফ্‌ফারা (ক্ষতিপূরণ) অবধারিত। স্বহস্তে শিকারকৃত পশুর গোশ্‌ত ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। যেমন হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন,

ان النبى ﷺ قال الصيد حلال لكم ما لم تصيدوا او يصيد لكم.

"নবী (স) ইরশাদ করেন, শিকারকৃত পশুর গোশত তোমাদের জন্য হালাল, যদি তোমরা উহা শিকার না করিয়া থাক অথবা তোমাদের উদ্দেশ্যে শিকার করা না হয়।"

শিকার কার্যে সাহায্য করার অর্থ, উহা নিধনে ইঙ্গিত করা। উহার গোশতও ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। যেমন হযরত আবূ কাতাদা (রা)-এর পুত্র বর্ণনা করেন, আবূ কাতাদা ছিলেন ইহ্‌রামধারীদের দলে। আর কাতাদা ইহ্‌রামধারী ছিলেন না। তিনি একটি বন্য গাধা দেখিতে পান। অমনি কাহারও নিকট হইতে একটি বর্শা সংগ্রহ করিয়া গাধাটির উপর হামলা করেন, উপর্যুপরি আঘাত করিয়া ধরাশায়ী করেন। অতঃপর উহা যবেহ করিয়া সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করেন। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট বিবৃত করিলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেহ কি উহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছিলে ? সকলে সমস্বরে বলিলেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তিনি বলেন, উহা ভক্ষণে কোন দোষ নাই, যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা ভক্ষণ কর" (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, ১খ, পৃ. ২৪৭)।

স্থলভাগের সেই সমস্ত পশু-পাখী শিকার করা হারাম যেইগুলির গোশ্‌ত ভক্ষণ করা হালাল। আর যে সমস্ত পশুপ্রাণীর গোশত আহার করা হারাম সেইগুলির মধ্যে যেগুলি অনিষ্টকর, অলাভজনক, যেমন বাঘ, ভালুক, সিংহ, শৃগাল, সাপ, বিছা, চিল, শকুন, বোলতা, ভীমরুল ইত্যাদির অনিষ্টতা হইতে নিজের ও অপরের নিরাপত্তার জন্য হত্যা করা মুস্‌তাহাব। আর যেইগুলি দ্বারা কিছুটা হইলেও উপকার পাওয়া যায়, আবার আঘাত পাওয়ারও প্রবল আশংকা থাকে সেইগুলি বধ করা মুস্তাহাবও নয় মাকরূহও নয় (শীরাযী, আল-মুহায্‌যাব, ১খ, পৃ. ২০৭-২১০)।

আরাফাত প্রান্তরে অবস্থানের পর মস্তক মুণ্ডনের পূর্বে স্ত্রী-সম্ভোগ করিলে একটি উট কুরবানী করা তাহার উপর ওয়াজিব হইবে। আর আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে সহবাস করিলে হজ্জ বাতিল হইবে।

যদি কেহ তাওয়াফে যিয়ারাত করার পর মস্তক মুণ্ডনের পূর্বে সহবাস করে তাহা হইলে তাহার উপর একটি ছাগল কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব হইবে। মুণ্ডন ব্যতীত ইহ্‌রামমুক্ত হওয়া যায় না। ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি যদি একসঙ্গে হজ্জ এবং উমরা একত্রে আদায়কারী হয়, তবে দুইটি ছাগল কুরবানী করা ওয়াজিব হইবে, সহবাস ইচ্ছাকৃত হউক বা ভুলক্রমে।

'কিরান' হজ্জ সম্পাদনকারী (যে ব্যক্তি একই ইহ্‌রামে হজ্জ ও 'উমরা আদায় করে) যদি 'উমরার তাওয়াফ করার পূর্বে সহবাস করে তাহা হইলে হজ্জ ও উমরা উভয়টিই বাতিল হইবে। তাহার উপর দুইটি ছাগল কুরবানী করার খেসারত বর্তিবে। উপরন্তু হজ্জ ও উমরার কাযা আদায় করিতে হইবে। কেহ যদি 'দাড়ি ও মস্তক তরল জাতীয় হেনা দ্বারা খেজাব করে, তাহা হইলে একটি ছাগল কুরবানী ওয়াজিব হইবে। আর চুল যদি বিশুদ্ধ যয়তুন তৈল দ্বারা সিক্ত হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে একটি ছাগল কুরবানী করিতে হইবে। আর সাহিবায়নের মতে সাদাকা বিধিবদ্ধ হইবে।

ইহ্‌রামধারী যদি স্বভাবসিদ্ধভাবে সেলাইকৃত বস্ত্র পরিধান করে অথবা পূর্ণ এক দিবস মস্তক আবৃত রাখে, তাহা হইলে একটি ছাগল কুরবানী ওয়াজিব হইবে। ইমাম আবূ য়ূসুফ (র)-এর মতে একাধিক দিবস এইরূপ পরিধান করিলে কুরবানী ওয়াজিব হইবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে দিবসের কিয়দংশ পরিধান করিয়া থাকিলে একটি ছাগলের মূল্যের সমপরিমাণ সাদাকা ওয়াজিব হইবে। আর যদি জামা, পাজামা, জুব্বা, মোজা পূর্ণ দিবস পরিধানে রাখে, তবে কাফ্‌ফারা হইবে একটি ছাগল। যেহেতু অপরাধটি এক জাতীয়। আর যদি রাত্রিতে পোশাক খুলিয়া রাখে, পরদিন পুনরায় পরিধান করে তবে দুইটি ছাগল কুরবানী ওয়াজিব হইবে।

সুগন্ধি ব্যবহার, সেলাইকৃত বস্ত্র পরিধান অথবা মস্তক মুণ্ডন যদি ওযরবশত হয়, তবে ইহ্‌রামধারীর জন্য এখতিয়ার থাকিবে, ইচ্ছা করিলে একটি ছাগল কুরবানী দিবে অথবা ছয়জন মিসকীনের মধ্যে তিন 'সা খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করিবে অথবা তিন দিবস রোযা রাখিবে। যেমন আল-কুরআনে নির্দেশ রহিয়াছে ঃ

"فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ .

"তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয়, কিম্বা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা কুরবানী দ্বারা উহার ফিদ্‌য়া দিবে" (২ ঃ ১৯৬)।

এখানে রোযা বলিতে তিন দিনের রোযা এবং ফিদ্‌য়া বলিতে অর্ধ সা' হিসাবে ছয়জন মিসকীনকে দেয় তিন সা' খাদ্য দ্রব্য (তাবয়ীনুল হাকাইক, ২খ, পৃ. ৫০৬)।

যদি ইহ্‌রামধারী নিজে শিকার করে কিংবা শিকার দেখাইয়া দেয় তবে তাহাকে কাফ্‌ফারা আদায় করিতে হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ .

"তোমাদের মধ্যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে উহা হত্যা করিলে তাহার বিনিময় হইতেছে অনুরূপ গৃহপালিত পশু" (৫ ঃ ৯৫)।

শিকারের কাফ্‌ফারা হইবে উহার মূল্য। আর মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি হইল, শিকার স্থল অথবা সন্নিকট স্থলের দুইজন বিবেকবান লোক উহার মূল্য নির্ধারণ করিবে। আর নির্ধারিত মূল্য ইহ্‌রামধারীর ইচ্ছামত বণ্টিত হইবে (প্রাগুক্ত)।

কখন এবং কিরূপে ইহ্‌রাম মুক্ত হইবে ? আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক কুরবানী সম্পন্ন করার পর ইহরাম মুক্ত হওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ .

"অতঃপর তাহারা যেন তাহাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, তাহাদের মানত পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের" (২২ ঃ ২৯)।

ইহাই ধারাবাহিক বিধান। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে ঃ

عن انس رضى الله عنه ان رسول الله # اتى منى فأتى الجمرة فرمها ثم اتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس.

"হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) মিনাতে আগমন করিলেন, তারপর জামরায় পৌঁছিয়া কংকর নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর স্বীয় অবস্থান স্থল মিনাতে ফিরিলেন, কুরবানী করিলেন। অনন্তর তিনি নরসুন্দরকে বলিলেন, এখন তোমার কর্ম তুমি সমাধা কর ঃ প্রথমে ডানের, অতঃপর বামের কেশ। তিনি কেশগুচ্ছ জনগণকে দিলেন" (মুসলিম, নং ৩১৫২/৩২৩; আবূ দাউদ ও আহমাদ)।

ইহরামমুক্ত হওয়া যায় মস্তক মুণ্ডন করিয়া অথবা চুল ছাটিয়া, তবে মস্তক মুণ্ডন উত্তম। যেমন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "হে আল্লাহ্ ! তুমি মস্তক মুণ্ডনকারীদেরকে মার্জনা কর। সাহাবীগণ বলেন, আর চুল কর্তনকারীদের ? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্ ! তুমি মস্তক মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা কর। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর চুল কর্তনকারীদের ? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি মস্তক মুণ্ডনকারীদিগকে মাফ করিয়া দাও। সকলে আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! চুল কর্তনাকারীদের ? অবশেষে তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্ ! চুল কর্তনকারীদিগকেও তুমি মার্জনা কর" (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, ১খ, পৃ. ২৩৩; শারহু কানযিক দাকাইক, ২খ, পৃ. ৩২)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ২০০৩; (২) ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, দেওবন্দ, ভারত, তাবি; (৩) ইবনুল-হুমাম, ফাতহুল কাদীর, আল-মাতবাআ আল-কুবরা, বূলাক ১৩১৫ হি; (৪) দারদীর, আল-বালাগাতুস-সালিক লি-আকরাবি'ল মাসালিক আলা শারহিস সাগীর, মিসর ১৩২৩ হি; (৫) ইবন শিহাব আর-রামলী, নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, মিসর ১৩৫৭ হি; (৬) ইবন আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, মিসর ১৩২৪ হি; (৭) ইব্ন কুদামা, আশ-শারহুল কাবীর, মিসর ১৩৪১ হি; (৮) ইমাম যায়লাঈ, তাবয়ীনুল হাকাইক, বূলাক, মিসর, তাবি; (৯) আবূ মুহাম্মাদ আবীদ, আল-মুগনী, মিসর ১৩১৩ হি; (১০) শীরাযী, আল-মুহাযযাব, মিসর, তাবি; (১১) আল-কাসানী, কিতাবু বাদাইস' সানাই' ফী তারতীবিশ শারাই', মিসর ১৩২৭ হি; (১২) ইবন মানজূর, লিসানুল 'আরাব, বৈরূত ১৩৭৫ হি.।

মুহাঃ তালেব আলী

**ইহসান** (দ্র. মুহসান)

**ইহসান আহমাদ** (দ্র. আহমাদ ইহসান)

## ঈ

**ঈওয়ান** (ايوان) ঃ বা Eyvan (ঈভান) এবং মাঝে মাঝে কথ্য 'আরবীতে লীওয়ান, তুর্কী ও 'আরবী ভাষায় গৃহীত একটি ফারসী শব্দ। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য পরিব্রাজক, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও শিল্পকলার ঐতিহাসিকগণ এই শব্দ দ্বারা নিকট প্রাচ্য এবং বিশেষভাবে ইসলামী স্থাপত্য শিল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়াছেন। যেহেতু মধ্যযুগীয় মূল গ্রন্থসমূহে এবং আধুনিক পণ্ডিতগণ কর্তৃক এই শব্দটির প্রদত্ত অর্থে লক্ষণীয় প্রভেদ রহিয়াছে, সেইহেতু দুইটি অর্থকে স্পষ্টভাবে পৃথক করিতে হইবে।

শব্দটি স্বয়ং প্রাচীন পারস্য আপাদানা হইতে উৎপন্ন বলিয়া ধারণা করা হয় (E. Herzfeld, Mythos und Geschichte, 88, in Archaologische Mitteilungen aus Iran, vi (1936), n. I ; W B. Henning in Handbuch der Orientalistik : Iranistik, Lieden 1958, 71, n, 6)। এই ব্যুৎপত্তিকে প্রায়শই নিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইলেও যেভাবে বিশ্বাস করা হয় সে রকম নিশ্চিত নাও হইতে পারে। কিন্তু ইহার ব্যুৎপত্তিগত অনুসন্ধান ইসলামী যুগের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে।

মধ্যযুগীয় মূল গ্রন্থসমূহে ব্যবহারের নিরিখে এই শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। সম্ভবত এই অর্থসমূহ ঐতিহাসিক ও মুদ্রণ তাত্ত্বিকভাবে এমন কিছু সূত্রের সহিত জড়িত যাহা এখনও গবেষণার অপেক্ষা রাখে। প্রথম অর্থ ঃ কোন কক্ষ বা হলঘর যাহার এক প্রান্ত বাহির দিকে সরাসরিভাবে বা বারান্দার মাধ্যমে উন্মুক্ত এই ক্ষেত্রে ইহা সুফ্ফাঃ শব্দের একটি অর্থের অনুরূপ। কৌতূহলোদ্দীপকভাবে লক্ষণীয় যে, শিল্পকলার ঐতিহাসিকগণের নিকট যে স্থাপত্য শিল্পাংশগুলি ঈওয়ান নামে পরিচিত উহাদিগকে মূল পাঠে কখনও কখনও সুফ্ফা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন L. Hunarfar-এর গানজীনা-ই আছার তা'রীখ-ই ইসফাহান, ইসফাহান ১৩৪৪ হি., পৃ. ৮৬ প. এবং Lane-এর Lexicon, দ্র. (ايوان) দ্বিতীয় অর্থ ঃ মঞ্চ বা মেঝের উচুঁ স্থান। কোন স্থাপত্য গঠনে সম্মানিত স্থান হিসাবে রীতিসিদ্ধ গুরুত্বের কারণে অথবা একান্তই ব্যবহারিক প্রয়োজনে একটি উচ্চতর স্থান নির্বাচিত হইত। যেমন স্নানাগারের অংশ যেখানে মানুষ বিবসন হয় (E. W. Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians, Everyman edition লণ্ডন ১৫৪ খৃ., পৃ. ৩৪৪-৫) (লীওয়ানজী বলিয়া কথিত সেবকের উপস্থিতি লক্ষ্য করুন এবং দ্বাদশ পৃষ্ঠায় শব্দটির অন্যান্য অর্থ দেখুন) তৃতীয় অর্থ হইল কোন রাজকীয় প্রাসাদ অথবা ন্যূনপক্ষে কোন প্রকারের অতি আনুষ্ঠানিক সরকারী ভবন। এই অর্থে ইহা মনে হয় যে, ঈওয়ান বলিতে প্রথমোক্ত দুইটি অর্থের ন্যায় কোন বিশালকায় ভবনের অংশবিশেষকে বুঝাইবার পরিবর্তে একটি সামগ্রিক স্থাপত্য কর্মকেই বুঝায়। এইভাবে জনৈক মুজাফ্ফার শাহী রাজকুমার য়াযদ-এ একটি জলাশয়বিশিষ্ট উদ্যান এবং চারতলা ঈওয়ান (প্রাসাদ) নির্মাণ করিয়াছিলেন (আহমাদ ইব্ন 'আলীর তারী'খ জাদীদ-ই য়াযদ, সম্পা. আই. আফসার, তেহরান ১৩৪৫ হি. পৃ. ৮৬ প.)। টেসিফোনে অবস্থিত বিখ্যাত সাসানী প্রাসাদসমূহ বুঝাইবার জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় শব্দটিকে এই অর্থেই ধরিয়া লওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ দ্র. তাবারী, ২খ, ১০৫৬, ঈওয়ান কিসরাবীর উপর মন্তব্য (E. Herzfeld, Materiaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum : Alep কায়রো ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৩৯১)। টেসিফোনের স্মৃতিস্তম্ভ বিষয়ক অনেকগুলি রচনায় ঈওয়ান ও তাক শব্দ দুইটি সমার্থবোধক অথবা প্রায় কাছাকাছি বলিয়া মনে হইতে পারে (তু. Max van Berchem, Notes d'archeologie arabe, in JA, 8th ser., xix, 1892 খৃ., 399 প.) কিন্তু বাস্তবে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক। কেননা একটি আকারের প্রতি ইঙ্গিত করে আর অন্যটি ব্যবহারের প্রতি। এই অর্থে ঈওয়ান কাস্র (প্রাসাদ)-এর সমার্থক। উদাহরণস্বরূপ কায়রোতে অবস্থিত ফাতিমীদের প্রাসাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহাকে আল-কাসরু'ল-কাবীর অথবা আল-ঈওয়ানু'ল-কাবীর নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। শাহনামাহ গ্রন্থেও এই শব্দটি ব্যবহারের অনেক নজীর পাওয়া যায় যাহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঈওয়ান বলিতে কোন ক্ষুদ্র স্থাপত্য নয় বরং বৃহদাকার রাজপ্রাসাদ বুঝান হইয়াছে (N. V. Diakonova and O. I. Smirnova, K. voprosu ob istolkovaniy pendjikentskoy rospisi, in Sbornik v. cesti I. A. Orbeli, Leningrad 1960)। অবশেষে শব্দটির চতুর্থ অর্থ প্রদান করা হইয়াছে কায়রো অথবা দামিশ্কের মামলূকদের বর্ণনার সমসাময়িক কালের ব্যাখ্যায় (Max van Berchem, Matiriaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicaum : Le Caire, কায়রো ১৯০৩

খৃ.,পৃ. ৯৫, টীকা-২)। কোন ধর্মীয় ইমারত, যেমন মাদরাসা অথবা মসজিদের যে হলঘরটি প্রাংগণের দিকে উন্মুক্ত উহাকে ঈওয়ান বলা যাইতে পারে। আমাদের প্রথম সংজ্ঞা দ্বারা যে রকম বুঝান হইয়াছে সে রকম বৃহদাকারের ভবন বুঝাইবার জন্য ঈওয়ান শব্দটি সাধারণত ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহাকে বর্ধিত অর্থে অপরাপর স্থাপত্য আকার, যেমন স্তম্ভ ও ছাদবিশিষ্ট বিশালাকারের ভবনের জন্যও ব্যবহার করা যাইতে পারে। পবিত্র মক্কামুখী হলঘরকে ঈওয়ান কিব্‌লা বলা হয়, যদিও এই বিশেষ অর্থ চলিত ভাষায় নিশ্চিতভাবে পরিলক্ষিত হয় (বা হইয়াছিল)। কিন্তু এই শব্দটি কখনও মসজিদের স্তম্ভাকারে নির্মিত অংশ বুঝাইবার জন্য সঠিকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল কিনা সেই বিষয়ে কিঞ্চিত অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। মূল গ্রন্থসমূহে ঈওয়ান শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলেও ইহার কোনটিই থামবিশিষ্ট ইমারত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। (যেমন, H. Sauvaire কর্তৃক অনূদিত দামিশ্‌কের বর্ণনা, Description de Damas, in JA, 9th ser., iii-vii, ১৮৯৪-৬ খৃ., index by e. Ouechek, Damascus ১৯৫৪ খৃ., esp. vol. vi., 260 as opposed to vol. v, ৩০১ অথবা ৩৯২)। সব কিছু মিলাইয়া একথা বলা যায় যে, শব্দটির দুইটি স্পষ্ট আনুষ্ঠানিক অর্থ এবং একটি ব্যবহারিক অর্থ আছে। এতদ্ব্যতীত আরও একটি ব্যবহারিক অর্থ আছে যাহা কিঞ্চিত অস্পষ্টভাবে নিরূপিত। এমন হইতে পারে যে, প্রাসাদের ব্যবহারিক অর্থটাই ছিল আদি ও অকৃত্রিম। টেসিফোনের ধ্বংসাবশেষগুলি মধ্যযুগীয় স্থাপত্য ধারণা ও পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে। টেসিফোনের ধ্বংসাবশেষের মাধ্যমে আকারগত সূত্রসমূহ ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই প্রশ্নটি মূল গ্রন্থসমূহের শ্রেণীভিত্তিক ও সময়ানুক্রমিক বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী, যাহা কখনও করা হয় নাই।

শিল্পকলার ঐতিহাসিক ও স্থাপত্যবিশারদগণ ঈওয়ান শব্দটির একটি কৌশলগত যথাযথ অর্থ প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ ঈওয়ানে এমন একটি বৃহদাকার খিলানযুক্ত ছাদ যাহার তিনদিক প্রাকারবেষ্টিত এবং চতুর্থ দিক সরাসরি বাহিরের দিকে উন্মুক্ত। এই আংগিকের সৃষ্টি অনেক তত্ত্ব ও আলোচনার বিষয় ছিল, তু. F. Oelmann, Hilaniund Liwanhaus, in Bonner, Jahrbucher, Heft vcxxii, ১৯২২ খৃ., G. Gullini, Architettura Iranica, তুরীন ১৯৬৪ খৃ.,পৃ., ৩২৬ প. ; J. Sauvaget, La Mosquee Omeyyade de Medine, প্যারিস ১৯৪৭ খৃ., পৃ., ১৬৩ প.)। এই আলোচনা ও তত্ত্বসমূহ ইসলামী যুগের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়। কেননা একথা সহজেই প্রতিষ্ঠিত করা যায় যে, ইরাক ও পশ্চিম ইরানে সাসানী স্থাপত্য রীতিতে প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে এই ধরনের গঠন প্রণালী ও নির্মাণ পরিকল্পনা নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে যদিও পরবর্তী খননকার্য ও বিশ্লেষণাত্মক গবেষণার পর উক্ত বক্তব্যের সহিত আরও সামান্য কিছু তথ্য সংযুক্ত করা যাইতে পারে। এই বিশেষ ধরনের হলঘর সাসানী রাজাদের আমলে প্রধান অভ্যর্থনা কক্ষ ও অডিটরিয়াম হিসাবে ব্যবহৃত হইত (যেমনভাবে টেসিফোনে হইত)। প্রকৃতপক্ষে ইহাকে ঈওয়ান বলা হইত এমন কোন প্রমাণ নাই অথবা এই আকারের প্রাসাদ শুধুমাত্র সরকারী কার্যকলাপ নির্বাহের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল ইহারও কোন প্রমাণ নাই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, ঈওয়ানের পশ্চাতে একটি গম্বুজবিশিষ্ট কক্ষ ছিল। অপর এক ক্ষেত্রে (ফীরূযাবাদের নিকট নির্মিত কাল'আ-ই দুখ্‌তার) দেখা যায় যে, ঈওয়ান এবং গম্বুজের সহযোগে একটি রাজকীয় প্রাসাদের একাংশ মাত্র তৈরি হইয়াছে।

ঈওয়ানের এই লৌকিক বা ধর্মনিরপেক্ষ আচার-অনুষ্ঠানেও ইহার আকারগত দিক ইসলামের প্রাথমিক লৌকিক স্থাপত্য যুগ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কূফায় উমায়্যা প্রাসাদে ইহার সূচনা হয় যাহা মুশাত্তা-এর Fertile crescent-এর পশ্চিমাংশে নীত হইয়াছিল। ইহা উখায়দি'র ও সামাররাঃ-র মহান 'আব্বাসী প্রসাদসমূহের প্রধান সরকারী দফতর বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে। শেষোক্ত স্থানে সাধারণ গৃহ নির্মাণ শৈলীতেও ইহার প্রতিফলন ঘটিয়াছে। দেখুন K. A. C. Creswell, Early Muslim Architecture, 2vols., অক্সফোর্ট ১৯৩২ খৃ., ও ১৯৪০ খৃ., O. Gradar, আলি-মুশাত্তা, বাগদাদ এবং ওয়াসিত, The world of Islam গ্রন্থে, সম্পা. J. Kritzek এবং R. B. Winder লণ্ডন ১৯৫৯ খৃ.,; B Fransis এবং মুহাম্মাদ 'আলী, জামি' আবী দুলাফ, in Sumer, iii (১৯৪৭ খৃ.,)। এমনকি যে সকল ক্ষুদ্র সংস্কারকে পাশ্চাত্য সৃষ্টি বলিয়া মনে হইতে পারে উহাদের সূচনাও সাসানী ইরানের স্থাপত্য পরিভাষায় দেখা যায়। যেমন ঈওয়ানকে সমান্তরাল থামবিশিষ্ট তিন অংশে সম্বলিত হলঘরে রূপান্তর করা। বাগদাদ ও ওয়াসিতের সৌধরাজির বর্ণনাসম্বলিত প্রায়শই উদ্ধৃত ও আলোচিত মূল গ্রন্থসমূহে এই শব্দের ব্যবহার এই কথা আবশ্যিকভাবে বুঝায় না যে, এই নির্দিষ্ট আংগিকটিই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমনভাবে উপরোল্লিখিত রচনাসমূহে Creswell এবং Grabar স্বতঃসিদ্ধভাবে অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু এই বহিরাকৃতির ব্যবহার হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কেননা আফগানিস্তান হইতে মিসর পর্যন্ত প্রাসাদ ও গৃহ স্থাপত্যের প্রধান আকৃতি হিসাবে ঈওয়ান বহু পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অবশ্য ব্যাপক বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মুসলিম বিশ্বে দেশে দেশে কালে কালে ঈওয়ানের মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। সব সময় সরকারী কার্যে এই আকৃতিকে হলঘর হিসাবে ব্যবহার করা হইত একথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। দুর্ভাগ্যক্রমে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বা লৌকিক স্থাপত্যসমূহ সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত হয় নাই এবং এইগুলি সম্বন্ধে সুষ্ঠু গবেষণাও হয় নাই—যেই কারণে এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট বা সুনিশ্চিত পরিসমাপ্তি টানা যায় না। যেহেতু এই বিষয়ের অধিকাংশ সূত্রই সাহিত্য বা লোককথা নির্ভর, সেইহেতু মধ্যযুগীয় স্থাপত্য পরিভাষার সঠিক বিশ্লেষণ সর্বকালেই বাধাসংকুল।

ধর্মীয় স্থাপত্যে ঈওয়ানের সূচনাও সমভাবে সমস্যাসংকুল, যদিও ঈওয়ানের প্রখ্যাত নমুনা ধর্মীয় স্থাপত্যেই দেখা যায়। এই অবস্থাটিকে নিম্নবর্ণিতরূপে সংক্ষেপিত করা যায়। নারীয-এর বিশেষ ধরনের মসজিদটি ব্যতীত ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পূর্বে ঈওয়ানের অস্তিত্ব দেখা যায় না। উক্ত শতাব্দীর প্রথম দিকে পশ্চিম ইরানে প্রায় বারটি মসজিদে আদর্শ আকারের আঙ্গিনা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে চারিটি ঈওয়ান খোলা হইয়াছিল। এই ধরনের ঈওয়ানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, উদাহরণের তালিকা ও গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্র. (O. Grabar, in Cambridge History of Iran, iv এবং v, কেমব্রিজ ১৯৬৮ খৃ.,)। সেই চার ঈওয়ানবিশিষ্ট মসজিদ অদ্যাবধি ইরানে ধর্মীয় উদ্দীপনায় স্থাপিত প্রায় সকল ইমারতের আদর্শ আঙ্গিক হিসাবে স্বীকৃত এবং যে পরিবর্তনগুলি সাধিত হইয়াছে তাহা নির্মাণশৈলী সম্মত । কেননা উহাতে শুধু রুচিগত পরিবর্তনের

অবয়বের প্রতিফলন সংঘটিত হইয়াছে শতাব্দীকাল পূর্বে, তবে বিব্রতকর প্রশ্ন হইতেছে ইহার নক্শার উৎপত্তি ও গঠনের কারণসমূহে। প্রথমত ৬ষ্ঠ/১২ শতাব্দীর পূর্বে ইরাক ও মধ্য এশিয়ায় গৃহের আঙ্গিনার চার ঈওয়ানের ব্যবহার সম্ভবত স্মৃতিস্তম্ভের স্থাপত্যও পরিদৃষ্ট হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় [দ্র. Sumer, iii (প্রাগুক্ত), অন্যদের মধ্যে G. A. Pugacenkova, Iskusstvo Turkcmenistana, মস্কো '৬৭ খৃ. পৃ. ১০২; A. Godard, in Ars Islamica, xvi (১৯৫১ খৃ.)]। যেহেতু ৫ম/১১শ ও ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে পূর্ব-পশ্চিম দিকের সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক প্রভাব বিদ্যমান ছিল, সেহেতু উত্তর-পূর্ব ইরান অথবা মধ্য এশিয়ার পটভূমি ঈওয়ানের আকৃতিগত দিকের উপর প্রভাবশীল ছিল বলিয়া মনে হয়। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর পশ্চিম ইরানের মসজিদসমূহের সৃষ্টিশৈলীর উদাহরণ সমগ্র ইরানে বিস্তার লাভ করে।

ঈওয়ানের স্থাপত্য নক্শা গ্রহণ সম্পর্কিত প্রধান প্রচলিত তত্ত্ব এই যে, ইহা সরকারী ইমারত হিসাবে ইরানের উত্তর-পূর্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তারিত মাদ্রাসাসমূহের সহিত সম্পৃক্ত (Godard, Max van Berchem সংশোধনী, কিন্তু দ্র, K. A. C. Creswell-এর সমালোচনা Muslim Architecture of Egypt, ii, অক্সফোর্ড ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১৩২-৩)। এই তত্ত্বটি প্রত্যয়পত্র নহে। নানা কারণে ইহা স্বীকার করাই সহজ যে, হয় এই প্রশ্নটি অমীমাংসিত অথবা সেই অঞ্চলে প্রাথমিকভাবে ধর্ম-নিরপেক্ষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত আঙ্গিককে সমগ্র ইরান সালজূকীদের নূতন রুচি চাপাইয়া দেওয়ার অংশ হিসাবে মসজিদসমূহের গঠনশৈলীতে অনুপ্রবেশ লাভ করে বসে।

এককভাবে অথবা পূর্বজনিত চারিটি নমুনার ঈওয়ানের পশ্চিম ইরানের মসজিদসমূহে কদাচ ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু মাদ্রাসা, রিবাত ও হাসপাতালসমূহে ইহা আদর্শ স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জাঙ্গী ও আয়্যূবী আমলে প্রবর্তিত অসংখ্য অনুষ্ঠানাদির অধিকাংশগুলিতে ইহার ব্যবহার করা হইত অথবা ঈওয়ান তখন স্মৃতিরক্ষক বস্তু হিসাবে এক নব গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। মাদ্রাসা ভবনে ঈওয়ানের সর্বপ্রথম ব্যবহার হইয়াছিল মনে হয় বুস্রার মাদ্রাসায় ৫৩০/১১৩৬ সালে (Creswell, Egypt, ii ১০৭)। কিন্তু মাদ্রাসাটির প্রাচীন গঠন ও নক্শা ইহাকে সন্দেহজনক উদাহরণে পরিণত করিয়াছে। যাহা হউক, ঘটনাচক্রে কোন উদারহণ না খুঁজিয়া এই কথা বলিয়া পরিসমাপ্তি টানা যায় যে, সে সময় গৃহে স্থাপত্য ঈওয়ানের ব্যবহার ছিল অতি সাধারণ (উদাহরণস্বরূপ ফুসতাতের বেসরকারী বাসগৃহসমূহে ইহার ব্যবহার), সালজূকীদের পুনঃবিজয়ের পরবর্তীকালে ইরানের উপর একটি সাধারণ প্রভাব। ইরানের ন্যায় 'আরবদেশের নিকটপ্রাচ্যে কখনও একক স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিগণিত হয় নাই, যদিও দামিশ্কে অবস্থিত নূরু'দ-দীনের স্মৃতিসৌধে (N. Elisseeff, Les Monuments de Nur al-Din, in Bulletin d' Etudes Orientales, xiii, ১৯৪৯-৫১ খৃ.) অথবা অনেক পরে সুলতান হাসান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কায়রোর চমৎকার মাদ্রাসায় (অন্যদের মধ্যে L. Hautecoeur and G. Wiet, Les Mosquees du Caire, প্যারিস ১৯৩২ খৃ., পৃ. ১০৩ প.) এই স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। ইটের স্থাপত্যদেশে উৎপন্ন আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য কিভাবে প্রস্তরের স্থাপত্যে রূপান্তরিত হইয়াছে উহার স্পষ্ট প্রমাণ আমাদের হস্তে রহিয়াছে।

অতীতে বহুবার, বিশেষভাবে Max van Berchem ও E. Herzfeld কর্তৃক এই ইঙ্গিত প্রদানের প্রয়াস চালান হইয়াছে যে, ঈওয়ান-ভিত্তিক নক্শার বিস্তার ও উন্নয়ন, বিশেষভাবে মাদ্রাসাসমূহে, ব্যবহারিক প্রয়োজন (যেমন শিক্ষা দান)-এর সহিত জড়িত। এমন কি ইহা প্রতীকী রূপের সহিতও জড়িত, যেমনভাবে বাগ্দাদের মুস্তানসিরিয়্যাঃ মাদ্রাসার একটি ইমারতে ব্যাপকভাবে সুন্নী প্রকৃতি ব্যবহৃত হইয়াছিল। যুক্তিগুলি বেশ ইঙ্গিতবহ ও চিত্তাকর্ষক, তবে এইগুলি সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। ঈওয়ানকে এই বলিয়া বিবেচনা করা অধিকতর বাঞ্ছনীয় হইতে পারে যে, ইহা মধ্যযুগীয় মুসলিম বিশ্বের গৃহীত অনেক উপায়ের অন্যতম যাহার মাধ্যমে তাঁহারা বস্তুনিষ্ঠ কিছু আরোপ না করিয়া স্থাপত্যে শূন্যতাজনিত সমস্যার সমাধান খুঁজিয়াছেন অথবা শুধুমাত্র আঙ্গিকের সহিত প্রতীকী অর্থসমূহ স্থায়ীভাবে সংশ্লিষ্ট করিয়াছে। গম্বুজবিশিষ্ট হলঘর অথবা দুর্গের মত ঈওয়ান ছিল একটি নির্দিষ্ট আঙ্গিক বা কাঠামো যাহা যে কোন সময় সমাজের রুচি ও প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইত। পরিচিত আঙ্গিকের চমৎকার ব্যবহারের উদাহরণের জন্য দ্র. L. Golombek, the Timurid Shrine at Gazur Gah, Toronto, 1969।

শিল্পকলা ঐতিহাসিকদের মতে ঈওয়ানের শেষ একটি দিক মনোযোগ আকর্ষণের দাবী রাখে। উহা এই, ঈওয়ানের যে সকল ক্রিয়াকর্মের কথা বলা হইয়াছে সেইগুলি ছাড়াও ইহার একটি সৌন্দর্যবোধক মূল্য রহিয়াছে। ইহা একটি শক্তিশালী প্রধান বৈশিষ্ট্য যাহার স্থাপত্য গঠনের উচ্চতা ও নক্শা উভয়ের জন্য প্রধান অক্ষ হিসাবে কাজ করে। ফলে ঈওয়ানের আকার ও সুবিন্যাসই প্রধানত ইহার ছন্দ নির্ধারণ করে এবং যাহা অতি পরবর্তীকালে ইরানের বহির্মুখী ইমারতের অংশসমূহের পরস্পরের সংযোগ এবং ইরানী স্থাপত্যের অতি অভ্যন্তরীণ গঠন কৌশলে পরিদৃষ্ট হয়। অত্যাধিক আবিষ্কারক্ষম না হইলেও অথবা অর্ধবৃত্তাকার ইসলামী গম্বুজের মত অধিক সংখ্যক না হইলেও ঈওয়ান পৃথিবীর সেরা চিত্তাকর্ষক খিলান-ঐতিহ্যের বিকাশ ও উন্নয়নের বাহন হিসাবে কাজ করিয়াছে। মুসলিম বিশ্বে পরিচিত সকল প্রকারের সাজ-কৌশল এবং আলঙ্কারিক নক্শা দ্বারা ঈওয়ানের প্রাচীর সজ্জিত করিয়া রাখা হইত।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** তাৎক্ষণিকভাবে যথার্থ গ্রন্থপঞ্জীর প্রায় সবগুলি মূল পাঠে যাওয়া যাইবে। ব্যক্তিগত স্মৃতিফলকসমূহের অতিরিক্ত উদাহরণ ও আলোচনা ইসলামী, বিশেষভাবে ইরান ও মধ্য এশিয়ার স্থাপত্য বিষয়ক উন্নতমানের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যাইতে পারে। ঈওয়ানের ব্যবহার সম্পর্কিত মৌলিক গ্রন্থে তথ্যের জন্য দ্র. (১) D. Sourdel, Questions de Ceremonial Abbaside, in REI, ১৬০ খৃ., ইরানের চার ঈওয়ানবিশিষ্ট ধর্মীয় ইমারতের উন্নয়ন বিষয়ক সাম্প্রতিককালের অনুসন্ধান ও আবিষ্কারসমূহ প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহকে অনিশ্চিত করিয়া দিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ দ্র. (২) O. Grabar, Notes on the Great Mosque of Isfahan, in Bulletin of the Aisa Institute in memory of A. U. Pope (Shiraz, 1972)।

O. Grabar (E.I.[2])/মোঃ সিরাজুল ইসলাম হুসাইনী

**ঈকা'** (ايقاع) ঃ (و-ق-ع) মূল হইতে باب افعال-এর (مصدر) শাব্দিক অর্থ দণ্ড (قضيب)-এর 'পতন ঘটান' বা পতিত হইতে দেওয়া, গানের ছন্দের সহিত তাল মিলাইবার উদ্দেশ্যে দণ্ডের এই

ব্যবহার। প্রয়োগিক অর্থ গানের ছন্দ (rhythm)-এর পরিমাণ নির্ধারণ করা। ইসলামী যুগের প্রাথমিক পর্যায়ের ঈকাকে মধ্যযুগীয় য়ুরোপের Mensura-এর অগ্রদূতরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে। উত্তরাধিকারসূত্রে ‘আরবগণের প্রাপ্ত প্রাচ্য রীতির উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত ইহার অবয়বে গ্রীক rhythmos-এর কিছু উপকরণ দৃষ্ট হয় এবং ভারতীয় ‘তাল’-এর সহিত ইহার সাদৃশ্য রহিয়াছে। সাফীউ’দ-দীন আল-উরমাবী-র মতে ঈকা‘-এর মূল সাসানী ইরান পর্যন্ত প্রসারিত এবং তথায় ভারতীয় সঙ্গীতের উপস্থিতি স্বীকৃত।

ঈকা‘-এর অভ্যন্তরীণ গঠন স্পষ্টতই ‘আরব উৎস হইতে উদ্ভূত ‘আরবী কাব্য সাহিত্যের ছন্দ প্রকরণের সাদৃশ্যে গঠিত। একটি ঈকা‘তে থাকে দুইটি আবর্তন (Cycles-আদওয়ার), প্রতিটি কতিপয় মৌলিক সুর (উসূল) সংযোগে গঠিত এবং ইহাতে থাকে একটি বিরতি (ফাসি‘লা), মৌলিক সুরের ধরন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সঙ্গীত শিল্পী ঈকা‘র নির্বাচিত ‘রূপ’ (জিন্‌স)-এর ছন্দ প্রকৃতিতে উপনীত হয়। প্রাথমিক কালের সঙ্গীতমণ্ডলী জানিতেন সাত অথবা আটটি পৃথক রূপ (form) যথাঃ আছ-ছাকীলু’ল-আওওয়াল, আছ-ছাকীলু’ছ-ছানী, আর-রামাল, আল-হাযাজ এবং ইহাদের ‘দ্রুত’ (খাফীফ) রূপসমূহ।

বর্তমানে অবলুপ্ত কিতাবু’ল-ঈকা‘ গ্রন্থের প্রণেতা আল-খালীল ইব্‌ন আহ্‌মাদ (মৃ. ১৭৬/৭৯১)-কে এই বিজ্ঞানের ‘উদ্ভাবক’ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। পরবর্তী সূত্র অথবা মৌলিক পাঠ প্রদত্ত উদ্ধৃতি হইতে ৫ম/১১শ শতক পর্যন্ত অন্তত দশজন গ্রন্থকারের ঈকা‘ লিখিত তথ্যের খবর পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন আল-ফারাবী। তিনি তাঁহার কিতাবু’ল-মূসীকি’ল-কাবীর-এ দুইটি অধ্যায় এবং অপর দুইটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ এই বিষয় সম্পর্কেই রচনা করিয়াছেন।

আবু’ল-ফারাজ আল-ইস্‌ফাহানী প্রণীত কিতাবু’ল-আগানী-তে সংরক্ষিত মাওসিলী ঈকা‘-র ঐতিহ্য দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্পেনে প্রচলিত থাকে, অন্যপক্ষে প্রাচ্য খিলাফাতের আওতায় বিশদতর নূতন ধারার বিকাশ ইতিমধ্যেই লক্ষিত হয়। সাফীউ’দ-দীন আল-উর্‌মাবী (মৃ. ৬৯৩/১২৯৪) বর্ণিত ছন্দসমূহ ‘আবদু’ল-কাদির আল-মারাগী (মৃ. ৮৩৮/১৪৩৫)-র শেষ ‘আন্তর্জাতিক’ গোষ্ঠীর মৌলিক সঙ্গীত রীতির উদ্ভব ঘটায়, অনুরূপভাবে সেই ছন্দগুলি পরবর্তীতে উসূল, আওযান, দু’রূব অথবা আদ্‌ওয়ার (ঈকা‘)-এর তথা আঞ্চলিক ঐতিহ্যের জন্ম দেয়, ইরানে (যথায় ইহা ১২শ/১৮শ শতকে অবলুপ্ত হয়) তুরস্কে (যথায় ইহার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ব্যবহার অদ্যাবধি অব্যাহত রহিয়াছে) এবং ‘আরব দেশসমূহে (১৯শ শতকের শেষভাগে ও ২০শ শতকের প্রারম্ভে যেইখানে স্থানীয় ছন্দরূপসমূহের পুনর্জাগরণ ঘটে)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ প্রায় সকল ‘আরবী, ফারসী ও তুর্কী সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ এবং অধিকাংশ সঙ্গীত বিষয়ক বিশ্বকোষে ঈকা‘ সংক্রান্ত একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত আছে। ইহার প্রাচীন ‘আরবী তত্ত্বের জন্য দ্র. (১) F. Dicterici, Die Propaedeutik der Araber im 10. Jahrhundert, Berlin 1865, 112-17; (২) H. G. Farmer, Sa`adyah Gaon on the influence of music, London 1943, 78-89; (৩) A. Shiloah, L'epitre sur la musique des Ikhwan al-Safa' ; in REI, xxxiv (1966), 176-8; (৪) E. Neubauer, Die Theorie Vom iqaÈ, I : Ubersetzung des Kitab al-Iqa`at von Abu Nasr al-Farabi, in Oriens, xxi-xxii ( 1968-9), 196-232; (৫) H. Avenary, The Hebrew version of Abu l-Salt's treatise on music, in Yuval (Jerusalem), iii (1974), 68-71. পরবর্তী ‘আরবী তত্ত্ব ও আধুনিক রীতি প্রসঙ্গে দ্র. ঃ (৬) R. d'Erlanger, La musique arabe, Paris 1930-59, তুর্কী রূপের জন্য দ্র. ঃ (৭) Suphi (Ezgi), Nazari ve ameli Turk musikisi, Istanbul 1933-53; (৮) H. P. Seidel, Studien zum usul Ídevri kebir" in den pesrev der Mevlevi, in Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft fur Musik des Orients, xi (1972-3), 7-69; (৯) S. Heper, Turk musikisinde usuller, in Musiki mecmuasi, Istanbul, no 344-7 (June-September 1978)।

E. Neubauer (E.I.[2], Suppl.)/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

**ঈগার** (ايغار) ঃ ‘আরবী শব্দ, মূল ওয়াও, (و) গায়ন (غ) ও রা (ر), বাব ইফ্‌‘আল (افعال)-এর ক্রিয়ামূল (مصدر)। এখানে ইহার অর্থ ঃ অব্যাহতি, রেয়াত বা সুযোগ-সুবিধা যাহা কর প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থাৎ কর রেয়াত বা অব্যাহতি। সুবিখ্যাত ‘আব্বাসী সরকার কর রেয়াত বা অব্যাহতিমূলক সুবিধা ও যে জমির ক্ষেত্রে এই সুবিধা প্রযোজ্য হইত সেই জমির ক্ষেত্রেও এই পরিভাষাটি ব্যবহার করিতেন। এই সুবিধার আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কর সংগ্রাহকের মাধ্যমে নয় বরং সরাসরি রাজকোষে কেবল একটি মাত্র কর প্রদান করিতে হইত। পশ্চিম ইরানের মারজ ও কারাজ জিলা দুইটিকে বরাবর আল-ঈগারায়ন (দুইটি ঈগার) নামে উল্লেখ করা হইত। এমন কি যে সরকারী মর্যাদা প্রাপ্তির কারণে জিলা দুইটি এই সুবিধা ভোগ করিত তাহার অবসানের পরেও ঐ পরিচিতি বহাল থাকে। পরের শতাব্দীগুলিতে ঈগার পরিভাষাটির বিলুপ্তি ঘটে। কেননা উহা ইক্‌তা‘ (দ্র.) শব্দের মধ্যে মিশিয়া যায় এবং অধিকতর বিস্তৃত তাৎপর্য লাভ করে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) F. Lokkegaard, Islamic Taxation, Copenhagen 1950-এ কুদামা, মিস্‌কাওয়াহ্, সাবী, তা’রীখ-ই কুম্ম ইত্যাদির উল্লেখ দ্র.; (২) A. K.S. Lambton, Landlord and peasant, নির্ঘন্ট; (৩) Cl. Cahen L'evolution de l'Iqta, in Annales ESC, 1953, 23-30.

Cl. Cahen (E.I.[2].)/আফতাব হোসেন

**ঈজাব** (ايجاب) ঃ আ. আক্ষরিক অর্থে “সুনির্দিষ্ট করা, অবশ্য পালনীয় করা, ওয়াজিব করা”, ইসলামী আইনে প্রস্তাবের পেশাগত প্রতিশব্দ; কোন দ্বি-পক্ষীয় চুক্তি আইনগ্রাহ্য হইতে হইলে যেই দুইটি আনুষ্ঠানিক উপাদান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়, ঈজাব (প্রস্তাব প্রদান) হইতেছে উহার একটি [অপরটি কাবূল (দ্র. বায়‘) অর্থাৎ প্রস্তাব গ্রহণ]। প্রস্তাব উত্থাপন ও প্রস্তাব গ্রহণ মৌখিকভাবে করা যাইতে পারে (কোন আদেশ পালনের মাধ্যমেও করা যায়। যথা ঃ এইরূপ বলিয়া “আমার নিকট বিক্রয় করুন” এবং “আমি এতদ্দারা আপনার নিকট বিক্রয় করিলাম”), অথবা সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয় কর্তৃক চুক্তির উদ্দেশ্য সাধনের দ্বারা, যেমন, নীরবে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি বিনিময় করা, যদি উহাই স্থানীয় রীতি হয়, অন্তত যদি বিনিময়ের

দ্রব্যাদি স্বল্পমূল্যের হয়। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (সুনির্দিষ্ট করা, অবশ্য পালনীয় করা ইত্যাদি) এবং বাস্তবে উহা যাহা নির্দেশ করে এই দুইয়ের মধ্যে দৃশ্যত একটি পার্থক্য রহিয়াছে। কারণ গ্রহণ করিবার পূর্বে কোন প্রস্তাব অবাধে প্রত্যাহার করা যাইতে পারে (অধিকন্তু একটি মাক্কী মতবাদ অনুযায়ী গ্রহণের পরও কোন প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যায় যতক্ষণ না সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয় স্থান ত্যাগ করিয়া পৃথক হইয়া যায়। আশ-শাফি'ঈ পরে এই তথাকথিত "খিয়ারু'ল-মাজলিস" মতবাদটি গ্রহণ করেন)। ইহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, প্রাচীনকালীন আইনসমূহের মধ্যে বিরল এই দ্বিপক্ষীয় চুক্তি ব্যবস্থা চালু হওয়ার পূর্বে একপক্ষীয় চুক্তিই ছিল, অন্যান্য আইন ব্যবস্থায় ইহা সুবিদিত। যদি তাহাই বাস্তব সত্য হইয়া থাকে তবে একপক্ষীয় হইতে দ্বিপক্ষীয় স্তরে পরিবর্তনটি নিশ্চিতরূপে ইসলামী আইনের সাংগঠনিক আমলের গোড়ার দিকেই সম্পন্ন হইয়া থাকিবে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) আত-তাহানাবী, কাশ্শাফ ইস্তিলাহাতি'ল-ফুনূন, 'ঈজাব' নিবন্ধ দ্র.; (২) C. Snouck Hurgronje, The Achehnese, ii, 320; (৩) I. Goldziher, in RSO, i (1907), 209; (৪) J. Schacht, Introduction, 22, 145 ; (৫) ঐ লেখক, Origins, 159-6।

J. Schacht (E.I.[2])/শায়খ ফজলুর রহমান

**ঈজার, ইজারা** (ايجار، اجارة) ঃ আজ্র (পারিশ্রমিক বা পুরস্কার) শব্দ হইতে উদ্ভূত ভাড়ার জন্য চুক্তি ইহার সমার্থক। ইস্তি'জার এবং কিরা' শব্দ দুইটিও একই মর্মে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু কদাচিৎ। ভাড়াদার কোন বস্তু ভাড়া দিলে তাহাকে বলা হয় মু'জির (مؤجر), আজির (آجر) বা মুকারী (مكارى) ; শ্রম ভাড়া করিলে বলা হয় আজীর, (اجير) ; ভাড়াদারকে সকল ক্ষেত্রেই বলা হয় মুসতা'জির (مستاجر) ; ভাড়ায় গৃহীত বস্তু বা শ্রমকে বলা হয় মা'জূর (ماجور) বা কচিৎ মু'জার (مؤجر) বা মুসতা'জার (مستاجر)। পুরস্কার বা ভাড়ার অর্থকে সকল ক্ষেত্রে একই রূপ বলা হয় উজরা (اجرة) বা আজর (اجر) চুক্তিতে যদি উহার পরিমাণ স্থির করা থাকে তবে উহা আজর মুসাম্মা (اجر مسمى), আর যদি কোন বিচারক বা মধ্যস্থ ব্যক্তি উহা স্থির করিয়া দেয় সে ক্ষেত্রে উহা আজরু'ল-মিছ্ল (اجر المثل)।

ঈজার বা ইজারা হইল একটি চুক্তি যাহা দ্বারা কোন ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিগত অধিকার বলে অর্থের বিনিময়ে অন্য ব্যক্তিকে কোন বস্তু বা শ্রম ভোগ করিতে দিয়া থাকে। ইজারাঃ দুইটি প্রধান ধরণের হইয়া থাকে ঃ বস্তুসমূহ ভাড়া করা (ইজারাতু'ল-আ'য়ান) এবং কার্যাদি ভাড়া করা (ইজারাতু'ল-আ'মাল)। শেষোক্ত ধরণের ভাড়ার দুইটি প্রশাখা রহিয়াছে ঃ একটি হইল সাধারণ শ্রম ভাড়া করা অর্থাৎ কাজ করিয়া দিতে হইবে এই চুক্তি, আর একটি হইল দক্ষতাপূর্ণ শ্রম ভাড়া করা যাহাকে বিশেষভাবে বলা হয় ইসতিস্না' (استصناع) (যেমন, কোন কারুশিল্পীর ক্ষেত্রে হইয়া থাকে)। একই শ্রেণীতে দুইটি পৃথক অবস্থা রহিয়াছে—একটিতে ভাড়াদার (Lessee) ভাড়াদাতা (Lessor)-এর কার্যাদির সম্পূর্ণ অধিকারী হইবে, সেই ক্ষেত্রে ভাড়াদাতাকে বলা হইবে আজীর খাসস (اجير خاص) ; আর অন্যটিতে আজীর মুশতারাক (اجير مشترك), তাঁহার কার্যাদি বিভিন্ন ব্যক্তিকে ভাড়ায় প্রদান করিতে পারিবে।

ভাড়া দেওয়া (ইজারা) উভয় পক্ষের সম্মতিসূচক চুক্তিবিক্রয়ের মত (দ্র. বায়') হয়। তবে প্রথমত লক্ষণীয় যে, চুক্তিবদ্ধ কোন পক্ষেরই প্রাপ্ত বয়স (بالغ) হওয়া প্রয়োজনীয় নহে ; তাহারা উভয়ে আযাদ (حر = স্বাধীন), জ্ঞান এবং বোধ ক্ষমতাসম্পন্ন (عاقل مميز) হওয়া যথেষ্ট ; দ্বিতীয়ত নীতিগতভাবে ভাড়ার অর্থ তখনই প্রদেয় হয় যখন কার্য ভোগ করা হইয়াছে অথবা কার্য ভোগ করার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কোন বস্তুর ভাড়াদাতা সেই বস্তুর প্রকৃত মালিক হইতেই হইবে তাহা জরুরী নহে ঃ বস্তুটি তাহার হস্তান্তর করার অধিকার (تصرف) থাকিলেই যথেষ্ট।

যেই বস্তু ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যম হওয়ার যোগ্য (অর্থাৎ যে বস্তুর মালিকানা স্বত্ব ভিন্ন ব্যক্তিতে স্থানান্তরিত হইতে পারে, যেমন টাকা-পয়সা যে কোন শরীরী বস্তু) ইহা ভাড়া স্বরূপ প্রদানের জন্যও বৈধ। কিন্তু কোন জিনিস ভোগ করিলে সেই ভোগ করাটাও [illegible]দেয় ভাড়াস্বরূপ গণ্য হইতে পারে, সেই ক্ষেত্রে চুক্তিটিকে সাধারণ দুইটি পারস্পরিক ইজারা বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে।

ইজারার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের অবশ্যই উল্লেখ থাকিতে হইবে, কিন্তু এই সময়ের জন্য কোন নির্ধারিত সীমা নাই। এই রীতির ফলে ইজারা পদ্ধতির ব্যবহার দ্বারা ওয়াক্ফ আইনের যে অপরিবর্তনীয়তা তাহা এড়ান সম্ভব হইয়াছে। বিভিন্ন আকারেই 'ইজারা দেওয়া হয়, যথাঃ ইজারা তাবীলা, ইজারাতায়ন, হিক্র। এইগুলি কাদী কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত মুতাওয়াল্লী দ্বারা সম্পাদনা করা হয়, যিনি ইজারাদারকে বস্তুত অনির্দিষ্ট কালের জন্যই সম্পদের ভোগস্বত্ব প্রদান করিয়া থাকেন। ইজারাদার তখন ইজারার জমিতে চাষাবাদ করিতে ও গাছপালা লাগাইতে পারে অথবা সেইখানে পাকা বাড়ীও নির্মাণ করিতে পারে এবং সেগুলির মালিকানা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সবই ভোগ করিতে পারে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ ফিক্হ বিষয়ক গ্রন্থসমূহ ব্যতীত শায়বানী ও সারাখ্সী হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী যুগ পর্যন্ত ইজারা অধ্যায়। আরও দ্র. (১) মাজাল্লা ('উছমানী দীওয়ানী আইন), ধারা ৪০৪ প.; (২) গাযালী, ওয়াজীয, কায়রো ১৩১৮/১৯০০, ১খ, ১৩৮ প., (৩) ইব্ন 'আবিদীন রাদ্দু'ল-মুহতার, ৫খ, ২প. ; (৪) ইব্ন 'আসিম, তুহফা, মূল পাঠ এবং Houdas and Martal-এর ফরাসী অনু. আলজিয়ার্স ১৮৮২ খৃ., পৃ. ৫৫১ প. ; (৫) ইব্ন কাদী সামাওনা, জামি'উল-ফুসূলায়ন, কায়রো ১৩০১/১৮৮৩, ২খ, ১৭৯ প. ; (৬) ইব্ন কুদামা; মুগনী কায়রো ১৩৬৭/১৯৪৭, ৫খ, ৩৯৭ প. ;(৭) ইব্ন নুজায়ম, আল-বাহ্রু'র-রা'ইক, কায়রো ১৩৩৩/১৯১৪, ৭খ, ২৯৭ প. ; (৮) তাব্বাহ, Propriete privee et registre foncier, বৈরূত ১৯৪৭ খৃ., ১খ, ২৫৯ প.।

(E. Tyan, E.I.[2])/হুমায়ুন খান

**আল-ঈজী** (الايجى) ঃ 'আদুদু'দ-দীন 'আবদু'র-রাহ্মান ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন 'আব্দি'ল-গাফ্ফার আল-ঈজী আশ-শাফি'ঈ (৬৮০/১২৮১-৭৫৬/১৩৫৫)-একজন বিখ্যাত কালামশাস্ত্রবিদ। ৬৮০/১২৮১ সালের কিছুদিন পর পারস্যের ঈগ্ (আরবায়িত উচ্চারণ ঈজ) নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন, (জন্ম তারিখ ৭০০ হইতে ৭০৮ হিজরীর মধ্যে, যে সকল সূত্রে এই তথ্য পাওয়া যায় তাহা গ্রহণ যোগ্য নহে)। তাঁহার বংশ তালিকা আবূ বাক্র (রা)- পর্যন্ত পৌছে। বিখ্যাত শিক্ষকগণের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি শিক্ষা দান ও কাদীর

দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঐ যুগের (৭২৮/১৩২৮ সালে) মন্ত্রী ও ঐতিহাসিক রাশীদু'দ-দীন ফাদ্‌লুল্লাহ (দ্র.)-এর পুত্র গিয়াছু'দ-দীন মুহাম্মাদ যখন সুলতান আবূ সা'ঈদ ইল্‌খানীর মন্ত্রী হন, তখন আল-ঈজী সুলতানিয়্যা শহরে সুলতান আবূ সা'ঈদের গৃহশিক্ষক ও অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতেছিলেন। ঐ যুগের জন-সাধারণ তাঁহাকে (আল-ঈজীকে) প্রাচ্যের ইসলামী দেশসমূহের মধ্যে শাফি'ঈ মায্‌হাবের নেতা মনে করিত। তিনি একবার গিয়াছু'দ-দীন সুলতান আবূ সা'ঈদের নিকট আগমন করিয়া উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থই হইলেন না, বরং তাঁহাকে নজরবন্দী করা হইল। তিনি তখন অত্যন্ত প্রভাবশালী আল-ঈজীরই সাহায্য কামনা করেন এবং তাঁহার মাধ্যমেই স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি লাভ করেন। আল-ঈজী সুলতানিয়্যা শহরে কতদিন অবস্থান করেন, তাহা স্পষ্ট জানা যায় নাই। তবে এই শহরে অবস্থানকালে তিনি ইব্‌নু'ল-হাজিব-এর "কিতাবু'ল-মুখ্‌তাসারি'ল-মুন্‌তাহা (كتاب المختصر المنتهى)-র ব্যাখ্যা লিখেন এবং 'ইলমু'ল-মা'আনী ও বায়ান বিষয়ক গ্রন্থ 'আল-ফাওয়া'ইদু'ল-গিয়াছিয়াঃ (الفوائد الغياثية) রচনা করিয়া গিয়াছু'দ-দীনকে তাহা উৎসর্গ করেন।

অতঃপর আল-ঈজীর জীবনের পনের বৎসর ব্যাপী এক অন্ধকার অধ্যায় শুরু হয়। সম্ভবত গিয়াছু'দ-দীন মুহাম্মাদ নিহত (২১ রামাদান, ৭৩৬/৩ মে, ১৩৩৬) হইবার পর পরই তিনি সুলতানিয়্যা ত্যাগ করিয়া শীরায-এ আগমন করেন এবং অধ্যয়ন, শিক্ষকতা ও কাদীর দায়িত্বে ব্যাপৃত হন। এইখানেই তিনি তাঁহার বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ আল-মাওয়াকিফ" রচনা করেন এবং শীরায-এর শাসনকর্তা শাহ শায়খ আবূ ইসহাক ঈজু (=ইঞ্জু)-এর খিদমতে উপহারস্বরূপ তাহা পেশ করেন। ৭৫৪/১৩৫৩ সালে মুজাফ্‌ফারিয়্যাঃ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুবারিযু'দ-দীন মুহাম্মাদ যখন শীরায অধিকারের ইচ্ছা করেন, তখন শাহ শায়খ আবূ ইসহাক আল-ঈজীকে তাঁহার দরবারে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন যাহাতে যুদ্ধ সংঘটিত না হয়। মুবারিযু'দ-দীন আল-ঈজীকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন এবং যথেষ্ট মর্যাদা দান করেন। তাঁহাকে পঞ্চাশ হাজার এবং অনুচরগণের জন্য দশ হাজার দীনার প্রদান করেন। তাঁহার পুত্র শাহ শুজা' এই সুযোগে আল-ঈজীর নিকট "আল-মুখতাসার"-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ অধ্যয়ন শুরু করিয়া দেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুবারিযু'দ-দীন সন্ধি করিতে সম্মত হন নাই। আল-ঈজী শীরায প্রত্যাবর্তন করিয়া শাহ্ আবূ ইসহাকের নিকট অবস্থার পূর্ণ বর্ণনা প্রদান করেন এবং দ্বিতীয়বার দূত হিসাবে মুবারিযু'দ-দীনের দরবারে উপনীত হন। কিন্তু ইহাতেও কোন ফলোদয় হয় নাই। ইত্যবসরে শীরায অবরোধ দীর্ঘায়িত হইতেছিল যাহাতে শহরবাসিগণ সীমাহীন দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়। 'আদু'দ-দীন আল-ঈজী কোন প্রকারে শহর হইতে বাহির হইয়া আসেন। মুবারিযু'দ-দীনের দরবারে তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হয় (খাওয়ান্দ আমীর, হাবীবু'স-সিয়ার, ৩/২খ, ২১ নিম্নে)। কিন্তু ইহার কিছুদিন পর আল-ইজী শুবান্ কারা (شبانكاره) চলিয়া যান। কিন্তু তথাকার শাসনকর্তা আরদেশীর (اردشير) তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া আরদায়মিয়ান (ارديميان) দুর্গে বন্দী করেন। 'আরবী উৎসসমূহ এই সম্পর্কে একমত যে, আল-ঈজী ঐ আরদায়মিয়ান দুর্গেই ইনতিকাল করেন (৭৫৬/১৩৫৫)। কিন্তু ইরানী ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, আল-ঈজীর মৃত্যুর বৎসরে তিনি শীরায হইতে প্রত্যাবর্তনকারী বিজয়ী শাহ শুজা'কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য শুবানকারাঃ পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন এবং শাহ শুজা'র সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত হয়। ইহাতে মনে হয় তিনি শেষ জীবনে বন্দীত্ব হইতে মুক্তি পাইয়া থাকিবেন।

আল-ঈজী অত্যন্ত ধনী ছিলেন। তাঁহার এই ধন-সম্পদ গোত্রীয় শাসনকর্তাগণ ও তাঁহাদের মন্ত্রীদের প্রদত্ত উপহার হইতে সঞ্চিত হয়। তিনি ছিলেন সৎ ও দানশীল ব্যক্তি, শিক্ষার্থীদিগের সাহায্য এবং সাক্ষাত প্রার্থিগণের সহিত সৌজন্যমূলক আচরণে অভ্যস্ত। তাঁহার নির্ভরযোগ্যতার খ্যাতি তাঁহার জীবদ্দশায়ই চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। 'আলিম ও কবিগণ তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। কবি হাফিজ শারাযী, যিনি তাঁহার সাক্ষাত লাভ করেন এবং তাঁহার অধ্যাপনা শ্রবণ করেন, তাঁহার প্রশংসামূলক চরণ রচনা করিয়া বলেন ঃ আল-ঈজী তাঁহার মাতৃভূমির জন্য গৌরবের কারণ ছিলেন। আল-ঈজীর ভাষ্যকার আত-তাফ্‌তাযানী, যিনি ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের 'আলিম ও সাহিত্যিক, তাঁহার প্রশংসায় বলেন, "আমাদের পক্ষে আল-ঈজীর পদাঙ্ক অনুসরণ এবং তাঁহার অনাবিষ্কৃত জ্ঞানের ভাণ্ডারকে প্রকাশ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ইহাতে আমরা তাঁহার ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান আহরণ করিতে পারিব।"

আল-ঈজী বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি নিজেই একাধিকবার ঐ সব গ্রন্থের ব্যাখ্যা, পার্শ্বটীকা ও পরিশিষ্ট রচনা করেন। তাঁহার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী ঃ (১) তাহকীকু'ত-তাফ্‌সীর ফী তাক্‌ছীরি'ত-তান্‌বীর (تحقيق التفسير فى تكثير التنوير) (GAL, নং ১)। এই গ্রন্থ তিনি বায়দাবী রচিত "আন-ওয়ারু'ত-তানযীল ওয়া আসরারু'ত-তাবীল (انوار التنزيل واسرار التاويل)-এর ব্যাখ্যা ও পরিপূরক হিসাবে রচনা করেন। (২) আর-রিসালাতু'ল-'আদুদিয়্যা ফী 'ইলমি'ল-ওয়াদা' (الرسالة العضدية فى علم الوضع), এই পুস্তিকার ব্যাখ্যা পার্শ্বটীকা ও বিন্যাসের জন্য দ্র. GAL, নং ৩। বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে এই পুস্তিকা স্বল্প সংখ্যক দুর্লভ গ্রন্থের অন্যতম। (৩) আল-মাওয়াকিফ ফী 'ইল্‌মি'ল-কালাম (المواقف فى علم الكلام) GAL, নং ৪। 'ইল্‌মু'ল-কালাম সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের অন্যতম, পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য। (৪) আল-'আকা'ইদু'ল-'আদুদিয়্যাঃ (العقائد العضدية) GAL, নং ৮। এই পুস্তিকা আস-সাক্কাকী'র মিফতাহু'ল-'উলূম (مفتاح العلوم)-এর 'ইল্‌মু'ল-মা'আনী ও 'ইল্‌মু'ল-বায়ান-এর আলোচনাসম্বলিত পরিচ্ছেদগুলির সার সংকলন। মিফ্‌তাহু'স-সা'আদাঃ (مفتاح السعادة)-এর গ্রন্থকার তাশকোপরূ যাদে এই পুস্তিকার অত্যন্ত উত্তম ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। (৫) শারহু মুখ্‌তাসার ইব্‌নি'ল-হাজিব (شرح مختصر ابن الحاجب) ( GAL, নং ৯)। ইব্‌নু'ল-হাজিব-এর مختصر المنتهى-এর ভাষ্য গ্রন্থসমূহের অন্যতম হিসাবে পরিগণিত। এই ব্যাখ্যাকে মূল রচনা হইতে পৃথক রাখা হয় নাই ; বরং উভয়কে একই সূত্রে গ্রথিত করা হইয়াছে। তিনি দুর্বোধ্য বাক্যগুলির বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তবে সমালোচনামূলক অভিযোগের উত্তর প্রদান করেন নাই। সংক্ষিপ্ত হইলেও অধিকতর ব্যাখ্যা ও বিবরণের প্রয়োজন নাই (আশ-শাওকানী)। (৬) ইশ্‌রাকু'ত-তাওয়ারীখ (اشراق التواريخ) (GAL, নং ১০)। যতদূর জানা যায়, এই গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (নং ২/২৪৬৭, AY)। এই গ্রন্থটি ভূমিকা, তিনটি অধ্যায় এবং পরিশিষ্টসম্বলিত। ভূমিকা

আদাম ('আ) হইতে 'ঈসা (আ) পর্যন্ত আম্বিয়া'-ই কিরাম-এর বিবরণ, প্রথম অধ্যায়ে মুহাম্মাদ (স)-এর বর্ণনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'আশারা মুবাশ্শারা (রা), তৃতীয় অধ্যায়ে অন্যান্য সাহাবী (রা) এবং পরিশিষ্টে ইমাম গাযালী (র) পর্যন্ত বিভিন্ন মাযহাবের ইমাম ও মুহাদ্দিছগণের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর স্মারক গ্রন্থ, যাহা একজন 'কালাম'বিদের জন্য প্রয়োজনীয়, এই গ্রন্থটি সেই জাতীয় গ্রন্থের সমতুল্য।

'আলী নামক একজন তুর্কী ঐতিহাসিক কিছু কিছু সংযোজন এবং সংশোধন সহ তুর্কী ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন এবং ইহার নাম রাখেন যুবদাতু'ত-তাওয়ারীখ (زبدة التواريخ) (Istanbul Kitapliklari Tarih Cografya yazmalari Kataloglari, ইস্তাম্বুল ১৯২৫ খৃ., ৪খ., ৩৩৭ প.)।

(৭) রিসালাতু'ল-আখলাক (رسالة الاخلاق), (GAL, নং ৫)। একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা, ইহাতে আখলাক-এর তিনটি স্তর অর্থাৎ 'ইল্ম-ই আখলাক, ইল্ম-ই তাদ্বীর-ই মান্যিল, 'ইল্ম-ই সিয়াসাত সম্পর্কে বিবরণ রহিয়াছে। মুহাম্মাদ আমীন ইব্ন মুহাম্মাদ আস'আদ কর্তৃক এই গ্রন্থের তুর্কী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে (ইস্তাম্বুল ১২৮১ হি.)। ইতিপূর্বে তা'শকোপরূযাদে এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন।

নিঃসন্দেহে আল-ঈজীর শ্রেষ্ঠতম রচনা "কিতাবু'ল-মাওয়াকিফ ফী 'ইল্মি'ল-কালাম"। এই গ্রন্থ 'উছমানী আমলের মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং আল-আয্হার বিশ্ববিদ্যালয়ে ও তিউনিসের মাদ্রাসাসমূহে অদ্যাবধি বিশেষ পাঠ্য হিসাবে পড়ান হয়। সুতরাং এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করা সমীচীন। আল-ঈজীর অন্যান্য গ্রন্থের মত "আল-মাওয়াকিফ"-ও দলীল-প্রমাণাদিসহ বিস্তারিত বর্ণনাসম্বলিত এবং উত্তমরূপে বিন্যস্ত। ইহাতে একটি ভূমিকা ও ছয়টি 'মাওয়াকিফ' (অধ্যায়) রহিয়াছে। ভূমিকায় আল-ঈজীর 'ইল্মুল-কালাম-কে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও পরিচ্ছন্ন বিদ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। কেননা তাঁহার মতে ইসলামের মূল ভিত্তি মহান আল্লাহ্র সত্তা, তাঁহার একত্ব এবং নুবুওয়াত, সব কিছুই 'ইল্মু'ল-কালামের মাধ্যমে সপ্রমাণ করা সম্ভব। জ্ঞান, এই জ্ঞানের দ্বারা 'আকীদা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নে অন্ধ অনুকরণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় এবং ঈমানের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। তাঁহার মতে 'ইল্মু'ল-কালাম সম্পর্কে পূর্বে রচিত গ্রন্থগুলির কোনটিই ভুল-ত্রুটিমুক্ত নহে। কোন কোনটি এত সংক্ষিপ্ত যে, তাহাতে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না বা এত বিস্তারিত যে, তাহার পঠন কষ্টসাধ্য। সুতরাং জ্ঞান আহরণ প্রত্যাশী এবং সত্যের সন্ধানীদিগের জন্য এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজন যাহা ত্রুটিমুক্ত হইবে এবং যাহাতে 'ইল্মু'ল-কালামের সমুদয় প্রশ্নের সূক্ষ্ম গবেষণাপ্রসূত এবং সহজবোধ্য আলোচনা থাকিবে। ইহাতে আল-ঈজীর নিজের কোন নূতন মতবাদ প্রবর্তন করার ইচ্ছা দৃষ্ট হয় না। আল-ঈজী তাঁহার এই গ্রন্থ প্রণয়নে আল-আমিদীর "আব্কারু'ল-আফ্কার (ابكار الافكار) এবং ফাখরু'দ-দীন আর-রাযীর আল-মুহাস্সাল (المحصل) নিহায়াতু'ল-'উকূল (نهاية العقول) এবং আল-মুলাখ্খাস (الملخص)-কে সহায়ক গ্রন্থরূপে ব্যবহার করেন।

এই সংক্ষিপ্ত অবতরণিকার পর আল-ঈজী আলোচনার বিষয়বস্তুকে ছয়টি مواقف (অধ্যায়ে)-এ বিভক্ত করেন [সায়্যিদ শারীফ আল-জুরজানী এই মাওকিফ (موقف)-সমূহের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন] প্রথম অধ্যায় প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের (مقدمات) সহিত সম্পৃক্ত ; দ্বিতীয় অধ্যায় সার্বিক নীতি (كلية)-র সহিত তৃতীয় অধ্যায় গুণ (عرض=attribute)-এর সহিত, চতুর্থ অধ্যায় (جوهر=essence) সারবস্তু এর সহিত, পঞ্চম অধ্যায় সামা'ইয়্যাত- سمعيات (শ্রুত বিষয়াবলী) এবং ষষ্ঠ অধ্যায় ইলাহিয়্যাত-এর সহিত সম্পৃক্ত। অতি সুবিন্যস্ত অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের শিরোনামগুলি দেখিয়া মনে হয় যে, গ্রন্থের অধিকাংশে রহিয়াছে দার্শনিক আলোচনা।

প্রতিটি موقف-এর বিষয়বস্তু কোন না কোন مرصد পরিচ্ছেদ এবং প্রত্যেক مرصد কতিপয় مقاصد (অনুচ্ছেদ) এ বিভক্ত। প্রথম موقف-এ আল-ঈজী 'ইল্মু'ল-কালামের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, ইব্ন খালদূন তাহা সমর্থন করিয়াছেন (আল-মুকাদ্দিমা)।

"কালাম এমন জ্ঞান-এর এমন শাখা যাহার দ্বারা দলীল-প্রমাণ সহকারে মানুষের সন্দেহাদির নিরসন এবং দীনী 'আকাইদকে প্রতিপন্ন করা সম্ভব হয়। 'ইল্মু'ল-কালামের বিষয়বস্তু এই বর্ণনা দ্বারা আল-ঈজী প্রাচীন ব্যাখ্যা (তথা 'ইল্মু'ল-কালামের বিষয়বস্তু আল্লাহ্র সত্তা)-কে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, কালাম শাস্ত্রের বিষয়বস্তু এমন তথ্য সমষ্টি যাহার সঙ্গে 'আকা'ইদের দূর বা নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে। আল-ঈজীর এই গ্রন্থে যুক্তিবিদ্যার সমুদয় নীতির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী দর্শনশাস্ত্রের মতবাদগুলিকে তিনি খণ্ডন করিয়াছেন। এই বিবেচনায় পরবর্তী যুগের তারীকাঃ (طريقة متاخرين)-এর জন্য 'ইল্ম-কালামের সর্বাপেক্ষা সুবিন্যস্ত এবং উৎকৃষ্ট এই গ্রন্থ। সমকালীন দুইজন গ্রন্থকারের মতে এই গ্রন্থ কালামশাস্ত্রে বুদ্ধির বিজয়স্বরূপ।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, আদ-দুরারু'ল-কামিনা হায়দরাবাদ, (দক্ষিণাত্য) ১৩৪৯ হি., ৩খ, পৃ. ৩২২ প. ; (২) আস-সুব্কী, তাবাকাতু'শ-শাফি'ইয়্যাতি'ল-কুব্রা, কায়রো ১৩৩৪ হি., ৬খ, পৃ. ১০৮ প, ; (৩) আস্-সুয়ূতী, বুগ্য়াতু'ল-উ'আত (بغية الوعاة), কায়রো ৪২৬, পৃ. ২৯৬ ; (৪) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শাযারাতু'য-যাহব, কায়রো ১৩১৫ হি., ৬খ, ১৭৪ প. ; (৫) তা'শকোপরূ যাদে, মিফতাহু'স-সা'আদা, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৮ হি., ১খ, ১৬৯ প., এবং কামালু'দ-দীন কৃত তুর্কী অনুবাদ موضوعات العلوم ইস্তাম্বুল ১৩১৩ হি., ১খ, পৃ., ৩৪৯ প. ৪৩৭, ৬৩২ ; (৬) আশ-শাওকানী, আল-বাদরু'ত'-তালি', কায়রো ১৩২৮ হি., ১খ, ৩২৬ প. ; (৭) হামদুল্লাহ্ আল-মুস্তাওফী, তারীখ-ই গুযীদাঃ সম্পা. E. G. Brown, লণ্ডন ১৯১০ খৃ., ৬৫২ প., ৬৬৩ ; (৮) খাওয়ান্দ আমীর, হাবীবু'স-সিয়ার, বোম্বাই ১৮৫৭ খৃ., ৩খ, ১খ, ভাগ, পৃ. ১৭৫ প. ; ২খ, পৃ. ২১ ; (৯) কাসিম গানী, بحث در اثار وافكار واحوال حافظ তেহরান ১৩২১ সৌ., ১খ, ২৯, ৩১, ৭৫, ৯৯ প, ; আরও দ্র. (১০) M.M. Andati and L. Gardet, Introduction La theologie musulmane, প্যারিস ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ১৬৫-৬৮, ৩৭০ প. ; (১১) E.I.[2], ৩খ, ১০২২।

আহ্মাদ আতিশ (দা. মা. ই.)/সিরাজ উদ্দীন আহ্মদ

**আল-ঈতা'** (الايطاء) ঃ ('আ) ঈতা' (وطئ - يطاء -) এবং وطأ الشيء برجله (وطأ)-এর অর্থ داسه ইহাকে পদদলিত

করিয়াছে ايطاء ও موطئا – ইত্যাদি এই একই শব্দমূল হইতে গঠিত। وطئا الشعر পরিভাষাটির উৎপত্তি ইহা হইতেই। ইহার অর্থ শাব্দিক ও অর্থগতভাবে ছন্দের পুনরাবৃত্তি (লিসান, ইত্যাদি দ্র.)। ফারসী ভাষায় ইহার জন্য শায়েগী শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পরিভাষায় ঈতা' ছন্দের একটি ত্রুটি বিশেষ। ইহার অর্থ, পূর্বের চরণে ছন্দার্থে ব্যবহৃত কোন শব্দকে পুনর্বার এমনভাবে ছন্দোবদ্ধ করা যাহাতে উভয়ের মধ্যে শাব্দিক ও অর্থগত কোনও পার্থক্য না থাকে। উদাহরণত বলা যাইতে পারে যে, চরণে অন্ত্যমিল হিসাবে দারদ (درد) শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। অতঃপর পরবর্তী চরণেও অন্ত্যমিলের জন্য হুবহু এই শব্দটি ব্যবহার করা। কখনও এই পুনরাবৃত্তি অতি স্পষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে "ঈতা-ই-জালী" বলা হয়। যেমন, چاره کر ও ستم کر এবং درد مند ও حاجت مند আর অনেক সময় ইহা অস্পষ্ট হইয়া থাকে, যেমন دانا , بينا ও حيران ও سر گردان آب ও گلاب। উভয় ক্ষেত্রেই যদি মাছনাবী, মুসাম্মাত এবং রুবা'ঈ-তে অথবা কাসীদাঃ (গীতিকাব্য)-এর এবং গাযাল-এর বা এতদুভয়ের অন্যান্য কবিতায় এই পুনরাবৃত্তি কাছাকাছি প্রযুক্ত হয় তবে তাহা ছন্দের ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইবে। আর যদি কয়েক ছত্র পরে (কাহারও মতে সাত শ্লোক পর পর) এই পুনরাবৃত্তি সংঘটিত হয় তবে তাহা দুষণীয় নহে (কিন্তু খালীলের মতে তথাপি ইহা কাব্যরীতি বিরুদ্ধ)। পুনরাবৃত্ত শব্দটি একাধিক অর্থবোধক হইলে (যেমন, جنگ-এর অর্থ এক জায়গায় শব্দ এবং অন্য স্থানে ইচ্ছা) ঈতা' বলিয়া গণ্য হইবে না (অবশ্য খালীলের মতে ইহাও ঈতা'-রই একরূপ)। সমার্থবোধক শব্দের ব্যবহারও ঈতা' নহে। যেমন, الفت ও محبت অর্থ ভালবাসা এবং فرصت ও مهلت অর্থ অবসর।

য়াস 'আজীম আবাদী 'আরূদ ওয়া কাওয়াফী' পুস্তকে লিখিয়াছেন, ছন্দের শেষ শব্দের (একার্থবোধক একই শব্দের) পুনরাবর্তনকে ঈতা' বলা হয় অর্থাৎ একার্থবোধক শব্দটিকে ছন্দ হইতে পৃথক করা হইলে অবশিষ্ট অংশের অর্থ থাকে তবে অন্ত্যমিল বজায় থাকে না। যেমন درد مند (দরদী) ও حاجت مند (অভাবী) শব্দদ্বয়ে مند-এর অর্থ উভয় স্থলে এক ও অভিন্ন। যদি ইহাকে পৃথক করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে حاجت ও درد-এর অর্থ বিলোপ ঘটে না ; কিন্তু অন্ত্যমিল বিনষ্ট হইয়া যায়। এমনিভাবে كهنا ও سننا।

শাদা বিলগিরামী বলেন, অন্তাক্ষর লোপ করার পর শব্দের অর্থ বহাল থাকিলেই তবে ঈতা' হয়, অন্যথায় নহে। যেমন, گلستان ও بوستان ইত্যাদি।

**গ্রন্থপঞ্জী** : (১) লিসানু'ল-'আরাব, শব্দমূল দ্র. (২) আক্রাবু'ল-মাওয়ারিদ, শব্দমূল দ্র. : আল-মুনজিদ, শব্দমূল দ্র. : (৪) রিদাকুলী খান হিদায়াত, ফারহাংগ-ই আনজুমান আরা-ই নাসিরী, তেহরান ১২৮৮ হি.; (৫) আস-সাক্কাকী, মিফতাহু'ল-'উলূম, ১ম সংস্করণ, মিসর তা. বি. ; (৬) শায়খ্, 'ইলমু'ল-ইন্শা' ওয়া'ল-আরূদ ৭ম সংস্করণ, বৈরূত তা. বি.; (৭) মুহীতু'দ-দা'ইরা, কাওমী প্রেস লাহোর ১৯৩৯ খৃ. (৮) শামসু'দ-দীন ফাকীর, হাদা'ইকু'ল-বালাগাত, লখনৌ ১৮৮৭ খৃ. ; (৯) নাসীরু'দ-দীন তূসী, মি'য়ারু'ল-আশ'আর, লখনৌ ১৮৭২ খৃ. ; (১০) মুজাফ্ফার 'আলী আমীর, রাওদাতু'ল-কাওয়াফী, লখনৌ ১৯১৫ খৃ. ; (১১) ঐ লেখক, যারূখ কামিলি'ল-'ইয়ার, লখনৌ ১৮৭২ খৃ. ; (১২) মুহাম্মাদ জা'ফার উজ (ফারযান্দ-ই দাবীর), মিকয়াসু'ল- আশ'আর, লখনৌ ১৩০৫ হি.; (১৩) ইমাম বাখ্শ সাহ্বা'ঈ, হাদা'ইকু'ল-বালাগাত-এর উর্দু অনুবাদ, লখনৌ ১৮৮৭ খৃ. ; (১৪) নাজমু'ল-গানী, বাহরু'ল-ফাসাহাত, লখনৌ ১৯১৭ খৃ. ; (১৫) য়াস 'আজীম আবাদী, রিসালা-ই 'আরূদ ওয়া কাওয়াফী, ২য় সং, লখনৌ ১৯২১ খৃ., (১৬) Wright, Arabic Grammar, কেমব্রিজ ইউনির্ভাসিটি ১৫১ খৃ.।

সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

**'ঈদ** (عيد আ. ব. ব. আ'য়াদ اعياد) ; মুসলমানদিগের দুইটি উৎসবের নাম ; ধাতু ع-و-د ,عيادا ,عودا ,عاد يعود (অর্থ ঘুরিয়া আসা, ফিরিয়া আসা) হইতে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (اسم مصدر) ; আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার অর্থ হইল : (১) সেই সকল দিন যাহাতে সমবেত হয় ; (২) খুশী ও আনন্দ ফিরিয়া আসার মওসুম ; (৩) সেই দিন যাহা প্রতি বৎসর আনন্দ ও খুশী লইয়া আসে (ইব্ন মানজূর, লিসানু'ল-'আরাব ; আয যুবায়দী, তাজু'ল-'আরূস, শিরো.)।

ইসলামের দুইটি উৎসব রহিয়াছে : একটি শাওওয়াল মাসের প্রথম তারিখে 'ঈদু'ল-ফিত্র (দ্র.) এবং অপরটি ১০ যু'ল-হিজ্জাঃ 'ঈদু'ল-আদহা (দ্র.)-রূপে পালন করা হয়। এই উভয় 'ঈদের বিশেষ ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রূহানী ঐতিহাসিক পটভূমিকা রহিয়াছে। 'ঈদু'ল-ফিত্র রামাদানের সাওম (দ্র.)-এর গুরুত্বপূর্ণ ফরয আদায় করিয়া খুশিতে পালন করা হয়। আর 'ঈদু'ল-আদহা হযরত ইবরাহীম ('আ) (দ্র.)-এর কুরবানীর আদর্শ স্মরণে পালন করা হয়। উভয় 'ঈদে আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে শুক্র-এর সিজদা ('ঈদের নামায) আদায় করা হয় এবং তাঁহার নিকট গুনাহ ক্ষমার জন্য দু'আ করা হয়।

এই উভয় উৎসবেরই একটি সমন্বিত বৈশিষ্ট্য হইল সমষ্টিগত-ভাবেই ইহাদের সালাত আদায় করা যাহা বহু ফযীলাতের অধিকারী। এই সালাত দুই রাক'আতবিশিষ্ট, যাহার প্রতিটি রাক'আতেই হাত উত্তোলনসহ কিছু অতিরিক্ত তাকবীর বলা হয়। হানাফী মাযহাবে প্রতি রাক'আতে তিনটি করিয়া মোট ছয়টি অতিরিক্ত তাকবীর বলিতে হয়। ইহা ওয়াজিব। প্রথম রাক'আতে ছানা' (দ্র.)-এর পরে এবং তা'আওউয ও তাসমিয়ার পূর্বে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে কিরা'আতের পরে (রুকূ'-এর পূর্বে) ইহা আদায় করিতে হয়। শাফি'ঈ, হাম্বালী ও মালিকী, আহল-ই হাদীছ-এর মাযহাব মতে মোট বারটি তাকবীর আদায় করা সুন্নাত। সাতটি প্রথম রাক'আতে তাকবীর তাহরীমাঃ-র পর তা'আওউয এবং কিরা'আতের পূর্বে, আর পাঁচটি দ্বিতীয় রাক'আতে কিরা'আতের পূর্বে (আল-জাযীরী, ১খ, ৫৪৯-৫৫৪)। সালাত শেষে ইমাম খুত্বাঃ পাঠ করেন, যাহা জুমু'আঃ (দ্র.)-এর খুত্বার ন্যায় দুইটি অংশে বিভক্ত। এই সালাতের জন্য আযান নাই, ইকামাতও নাই। 'ঈদ-এর সালাত সূর্যোদয়ের পর সকাল সকাল আদায় করা সুন্নাত। 'ঈদের দিনে 'ঈদের সালাতের পূর্বে গৃহে, মসজিদে অথবা 'ঈদগাহে কোন প্রকার নফল সালাত আদায় করা সুন্নাত বহির্ভূত।

'ঈদের দিনে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা সুন্নাত : (১) গোসল করা, (২) মিসওয়াক করা, (৩) খোশবু লাগান, (৪) নূতন কাপড় (থাকিলে) অথবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করা, (৫) 'ঈদু'ল-ফিত্র-এর দিন কিছু বিশেষত মিষ্টি দ্রব্য) খাইয়া এবং 'ঈদু'ল-আদহার দিন খালি

পেটে 'ঈদের সালাত আদায় করিতে যাওয়া, (৬) 'ঈদু'ল-ফিত্'র-এর সালাতের পূর্বে সাদাকাতু'ল-ফিত্'র আদায় করিয়া দেওয়া ও (৭) তাকবীরই তাশরীক اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ পড়িতে পড়িতে 'ঈদগাহে যাওয়া এবং প্রত্যাবর্তন করা (আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া, ১খ, ১৫৩ প. ; আল-জাযীরী, ১খ, ৫৫৫-৫৫৮)।

'ঈদ-এ বিশেষভাবে আনন্দ প্রকাশের উপর খুবই জোর দেওয়া হইয়াছে। এই কারণেই সর্বসম্মতিক্রমে ঐদিন রোযা রাখা হারাম। যদি কেহ রোযা রাখে তবে তাহা ভঙ্গ করা জরুরী। 'ঈদের দিনগুলি (ايام عيد) হইল শাওওয়াল-এর প্রথম তারিখ এবং যু'ল-হিজ্জাঃ-এর ১০ তারিখ হইতে ১২ তারিখ পর্যন্ত (হিদায়া, ১খ, ২০৮)। উভয় 'ঈদে আনন্দ প্রকাশের জন্য কোলাকুলি করা এবং সদা হাসিমুখে আলাপ করা মুসতাহাব।

এই দিনের খায়ের ও বরকত অগণিত। আল্লাহ্ তা'আলা এই দিন বিশেষভাবে তাঁহার বান্দাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং ফেরেশতাদের সামনে গর্ব প্রকাশ করেন। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে বান্দাদের ভুলত্রুটি মার্জনা করিয়া দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়।

সামাজিক দিক হইতে উভয় 'ঈদে দূর-দূরান্তের মুসলমানদের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাত এবং একে অপরের দুঃখ-দুর্দশায় শরীক হওয়ার সুযোগ মিলিয়া থাকে। যাহার ফলে বহু কল্যাণকর সামাজিক সুফল লাভের আশা করা যায়। উপরন্তু উভয় 'ঈদে গরীব-মিসকীনদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয় এবং তাহাদিগকে বিশেষভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) কুরআন কারীম, ২ ঃ ১৮৪ ; (২) আল-বুখারী, আস-সাহীহ, ২খ, ২৪১-২৫১ ; (৩) মুসলিম, আস-সাহীহ, কায়রো ১৯৬৫ খৃ., ২খ, ৬০২-৬০৮ ; (৪) আবূ দাউদ, আস-সুনান, হিম্স ১৯৬৯ খৃ., ১খ, ৬৭৫-৬৮৫ ; (৫) আত-তিরমিযী আস-সুনান, কায়রো ১৯২৭ খৃ., ২খ, ৪১০-৪২৮ ; (৬) খাতীব তাব্রীযী, মিশকাত, কায়রো ১৯৬১ খৃ., ১খ, ২৫০-২৫৬ ; (৭) আল-মারগীনানী, হিদায়া, ১খ, ১৫১-১৫৪ ; (৮) আল-জাযীরী, ১খ, ৫৪৭-৫৬৫ লাহোর ; (৯) আশ-শাফি'ঈ, কিতাবু'ল-উম্ম (সম্পাদনা পরিষদের সদস্য মাহ্মূদু'ল-হাসান 'আরিফ কর্তৃক লিখিত)।

সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/ ড. আবদুল জলীল

**ঈদার** (ايدار) ঃ আহমাদাবাদ হইতে ১০০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত উত্তর গুজরাটের দুর্গ পরিবেষ্টিত একটি শহরের নাম, ইহার চারিদিকের সীমান্ত অত্যধিক পর্বতময়। ৮ম/১৪শ শতকে ঈদারের রাজাগণ দিল্লী সালতানাতের অধীন গুজরাটের প্রথমদিকের শাসকগণের কাছে সদা-সর্বদা বিরক্তির কারণ ছিলেন এবং প্রায়শই কর আদায়ের জন্য সামরিক অভিযানের প্রয়োজন হইত। ১ম আহমাদ শাহের আমলে গুজরাট স্বাধীন সালতানাতে পরিণত হওয়ার পর তাঁহাকেও একইভাবে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। আহমাদাবাদের নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর এত নিকটবর্তী ঈদারের শক্তি প্রতিপত্তি তাঁহার জন্য মাথা ব্যাথার কারণ ছিল। ফলত তিনি ইহার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার কেন্দ্র হিসাবে ঈদার হইতে প্রায় ২০ কিলোমিটার নিম্নে আহমাদ নগরে (বর্তমানে হিমাত নগর নামে অভিহিত) আরেকটি নূতন গ্যারিসন শহর নির্মাণ করেন এবং ৮২৯/১৪২৫ সন হইতে ৮৩১/১৪২৮ সন পর্যন্ত ঈদারের রাজার বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতে থাকে। অবশেষে রাজা সন্ধি প্রার্থনা করেন ও কর প্রদানের অঙ্গীকার করেন। সাধারণভাবে এই চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইলেও পরবর্তী বৎসরগুলিতে বেশ কয়েকবার কর প্রদান বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে নূতন করিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হয়। আহমাদের পুত্র ১ম মুহাম্মাদ ৮৫০-১৪৪৬ সনে নূতন করিয়া আক্রমণ করিলে ঈদারের শাসক মুহাম্মাদের কাছে স্বীয় কন্যাকে বিবাহ দিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

২য় মুজাফ্ফারের আমলে চিতোরের শক্তিশালী মহারানা সাংগরাম জোরপূর্বক ঈদারের সিংহাসন দখল করেন। অধীনস্থ করদ রাজ্যের উপর এই ধরনের হস্তক্ষেপ নিরীহ স্বভাবের শাসক মুজাফ্ফারও সহ্য করিতে পারেন নাই, তাই গুজরাট বাহিনী সমুচিত জবাব দিয়া তাহা পুনরুদ্ধার করে। যাহা হউক, 'সাংগরাম' ঈদারে গুজরাটী ফৌজদের হাতে এহেন কলঙ্কজনক পরাজয়ের গ্লানিতে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং ৯২৫/১৫১৯ সনে বিরাট গুজরাটী বাহিনী কর্তৃক পরাজিত ও ক্ষতিপূরণে বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত ঈদার ও তৎসীমান্তবর্তী শহরগুলির উপর আক্রমণ পরিচালনা করিতে থাকেন।

মুগল যুগে ঈদারের শাসক ও মুগল সেনানায়কগণের সহিত প্রায়ই অনুরূপ সংঘর্ষ হইত এবং মুগল সেনানায়কগণ হিন্দু শাসকদিগকে বারবার সরাইয়া দিতেন। ৯৮৪/১৫৭৬ সনে একটি পূর্বঘোষিত যুদ্ধে মুগল বাহিনী কর্তৃক পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত রাজা নতি স্বীকার করেন নাই । ইহার পর পরিস্থিতি শান্ত থাকে, যদিও শোনা যায় যে, ১০১৮-৯/১৬০৯-১০ সনে মালিক 'আনবারের অধীনস্থ নিজাম শাহী বাহিনীর লুটতরাজ হইতে গুজরাটকে রক্ষার জন্য করদ রাজ্যের চুক্তির শর্ত মুতাবিক ঈদারের রাজাকে ২০০০ অশ্বারোহীর একটি বাহিনী প্রদানের জন্য আহ্বান জানান হয়। পরবর্তীকালে মুগল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হইলে গুজরাট প্রদেশ মহারাজা অভয় সিংয়ের সুবাদারীর অধীনে আসে। অভয় সিং তাঁহার ভ্রাতাকে ঈদারের জায়গীর প্রদান করেন এবং সেখানে নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঈদারের পরবর্তী ইতিহাস ভারতে ইসলামের ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ দ্র. গুজরাট। মারাঠাদের অধীনে ঈদার রাজ্যের ইতিহাসের জন্য দ্র. Imperial Gazetieer of India, ১৩খ, (১৯০৮ খৃ.), ৩২৫-৮।

J. Burton Page (E.I.[2])/নুরুল আমিন

**'ঈদু'ল আযহা** (عيد الاضحى) ঃ অর্থ কুরবানীর উৎসব। ইহা 'ঈদু'ল-কুরবা বা 'ঈদু'ন-নাহ্'র নামেও অভিহিত। এই উপমহাদেশে ইহাকে বাক্'র 'ঈদ বা বাক্'রা-'ঈদ বলা হয় ; তুরস্কে ইহা বূয়ুক-বায়রাম বা কুরবান বায়রাম নামে পরিচিত। ضحية বা اضحية অর্থ উৎসর্গিত পশু—যাহা এক আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যাব্হ করা হয়। আত্মীয়-বন্ধু, বিশেষত দুঃস্থ দরিদ্র (البائس الفقير ,২২ ঃ ২৮) জনের মধ্যে গোশত বিতরণ করিয়া আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক তাঁহার সান্নিধ্য (قربان বা قرب) লাভ করার চেষ্টা চালান হয়, এইরূপ সার্থক প্রচেষ্টার যে আত্মিক আনন্দ (عيد) তাহাই 'ঈদু'ল-আযহা নামে আখ্যায়িত হয়। কুরবানী উপলক্ষে সমর্থ বান্দাদের ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁহার সমর্থ-অসমর্থ সকল মেহমানের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন বলিয়া ইহাকে দিয়াফাতুল্লাহ্ (ضيافة الله) বলা হয়। ইহা ১০ যু'ল-হিজ্জাঃ, যেই দিন মিনা

উপত্যকায় হাজ্জীগণ কুরবানী করেন ও তৎপরবর্তী দুই দিনে, মতান্তরে তিন দিনে (আয়্যামু'ত-তাশ্রীকে) অনুষ্ঠিত হয় (হাজ্জ ও তাশ্রীক দ্র.)। এই দিনে মিনায় হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর অপূর্ব ও অনুপম কুরবানীর (৩৭ ঃ ১০২-১০৭) অনুসরণে কেবল হাজ্জীদের জন্য নহে ; বরং মুসলিম জগতের সর্বত্র সকল সক্ষম মুসলিমের জন্যও এই কুরবানী করা সুন্নাত মু'আক্কাদাঃ (মতান্তরে ওয়াজিব)-রূপে গণ্য। 'ঈদু'ল-আযহা কুরবানী এবং আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি হাজ্জ সমাপনরত মুসলিমদের সহিত ইসলামী দুনিয়ার সমস্ত মুসলিমের মনে এ একাত্মতার অনুভূতি জাগ্রত করে। কুরবানী মানত করিলে ইহা অসমর্থ ব্যক্তির জন্য অবশ্য কর্তব্য (ওয়াজিব) হয়। প্রত্যেক স্বাধীন মুসলিমের পক্ষে একটি দুম্বা, মেষ বা ছাগল অথবা এক হইতে সাতজনের পক্ষে একটি গরু বা উট কুরবানী করা যায়।

কুরবানীর পশু নির্ধারিত বয়সের হইতে হইবে ও কতগুলি দৈহিক ত্রুটি (কানা, খোঁড়া, কান-কাটা, শিংভাঙ্গা ইত্যাদি) হইতে মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সালাতু'ল-'ঈদের পর হইতে কুরবানীর সময় আরম্ভ হয়, পরবর্তী দুই দিন (মতান্তরে তিন দিন) স্থায়ী থাকে এবং শেষ দিনের সূর্যাস্তের সঙ্গে শেষ হয়। যিনি কুরবানী করেন তিনি নিজেই যাব্হ করা সুন্নাত, তাঁহার পক্ষে অন্য কেহ যাব্হ করিলেও চলে। কুরবানীর পশু যাব্হ করিবার সময় সাধারণত কুরআনের দুইটি আয়াত পড়া হয় ঃ

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

"আমি আমার মুখ ফিরাইলাম যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তৎপ্রতি একনিষ্ঠভাবে এবং আমি মুশ্রিক নহি" (৬ ঃ ৮০)।

اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ – لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ –

"অবশ্যই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ—সবই আল্লাহ্র জন্য, যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক, যাঁহার কোন শরীক নাই . . . " (৬ ঃ ১৬২-৬৩)। তারপর সাধারণত বলা হয় "হে আল্লাহ ! এই পশু তুমিই দিয়াছ এবং তোমারই জন্য কুরবানী করিতেছি, সুতরাং তুমি ইহা কবুল কর" ইত্যাদি। তারপর "বিস্মিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলিয়া যাব্হ করা হয়। এই "কুরবানীর রক্ত আল্লাহ্র কাছে পৌঁছায় না, ইহার গোশ্তও না, বরং তাঁহার কাছে পৌঁছায় কেবলমাত্র আমাদের তাক্ওয়া" (২২ ঃ ৩৭)। জাহিলিয়্যাঃ যুগে প্রতিমার গায়ে বলির রক্ত মাখান এবং গোশ্ত প্রতিমার প্রসাদরূপে বিতরিত হইত। কুরবানী এই প্রথার মূলোচ্ছেদ করিল। আর এই তাকওয়ার চূড়ান্ত অর্থ হইল মু'মিনের এই সংকল্প যে, প্রয়োজন হইলে সে তাহার সব কিছু এমন কি নিজের জীবনটিও আল্লাহ্র নামে কুরবানী করিতে সদা প্রস্তুত। কারণ "আল্লাহ্ মু'মিনের জান-মাল ক্রয় করিয়াছেন জান্নাতের বদলে" (৯ ঃ ১১১)। এইজন্য কুরআনের এই নির্দেশ ঃ "অনন্তর তোমার প্রতিপালক প্রভুর জন্য সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর" (১০৮ ঃ ২)। হাদীছে ইহার স্পষ্ট বিধান আছে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ দ্র. 'ঈদ প্রবন্ধ, ইহাতে উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী ছাড়া হাদীছ ও ফিক্হ গ্রন্থে উদ্হিয়্যা অধ্যায় দ্র.।

E. Mittwoch (S. E. I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

**ঈদু'ল-ফিত্র (عيد الفطر)** ঃ অর্থ রামাদান-এর সিয়াম (রোযা) ভঙ্গের উৎসব। এই উৎসব ১ শাওওয়াল তারিখে উদ্যাপিত হয়। 'ঈদের দিনের পূর্বে সাদাকাতু'ল-ফিত্র না দেওয়া হইলে এই দিন 'ঈদের সালাতের জন্য 'ঈদগাহে যাইবার পূর্বেই তাহা প্রদান করিতে হয়। এই সাদাকা দুঃস্থগণকে এই 'ঈদ উৎসবে যোগদানের সুযোগ দেয়, ইহা সিয়ামকে ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে পবিত্র করে। ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকের পক্ষ হইতে এই সাদাকা আদায় করা ওয়াজিব। প্রধান খাদ্য গম, যব, আটা, খেজুর প্রভৃতি এক এক সা' (صاع) পরিমাণ (বুখারী ও মুসলিম) বা উহার মূল্য, মতান্তরে গমের অর্ধ সা দেওয়া ফরয মতান্তরে ওয়াজিব। সা-এর পরিমাণ সাধারণত ২ সের ৯ ছটাক, মতান্তরে ২সের ১২ ছটাক ধরা হয়। 'ঈদু'ল-ফিত্রের সালাত-এর জন্য 'ঈদ' দ্র.।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ 'ঈদ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ও ফিক্হ গ্রন্থসমূহের সাদাকাতু'ল-ফিত্র অধ্যায় দ্র.।

E. Mittwoh (S. E. I.) /ডঃ এম. আবদুল কাদের

**ঈনজু (তুর্কী)** ঃ সঠিক অর্থে মোঙ্গলদের অধীনস্থ রাজকীয় জায়গীরের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যে রাজবংশটি আনুমানিক ৭০৩/১৩০৩ হইতে ৭৫৮/১৩৫৭ সাল পর্যন্ত ফারস (শীরায)-এ রাজত্ব করিয়াছিল সেই বংশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা শারাফু'দ-দীন মাহমূদ শাহ তথায় রাজকীয় ভূসম্পত্তির শাসন কার্য পরিচালনার জন্য ওলজেইতু (oldjeytu) কর্তৃক প্রেরিত হন। তারীখ-ই গুযীদাঃ-র বিবরণ মতে তিনি 'আবদুল্লাহ আন্সারী (দ্র.)-এর বংশধর ছিলেন। ওলজেইতুর উত্তরাধিকারী আবূ সা'ঈদ-এর অধীনে তিনি শুধু তাঁহার পদে বহালই ছিলেন না, উপরন্তু মাহমূদ শাহ তাঁহার ক্ষমতা এতদূর প্রসারিত করিয়াছিলেন যে, আনু. ৭২৫/১৩২৫ সালে প্রকৃতপক্ষে তিনি শীরায এবং প্রায় সমগ্র ফারস-এর স্বাধীন শাসনকর্তারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। আবূ সা'ঈদ-এর মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী আরপা কে'উন (Arpa Ke'un)-এর আদেশে মাহমূদ শাহ ৭৩৬/১৩৩৬ সালে নিহত হন। শীরায-নামাহ্ অনুসারে তাঁহার চারি পুত্র ছিল ঃ জালালু'দ-দীন মাস্'উদ শাহ, গিয়াছু'দ-দীন কায়খুসরাও, শামসু'দ-দীন মুহাম্মাদ এবং আবূ ইস্হাক জামালু'দ-দীন। প্রথম পুত্র পূর্ব হইতেই তাঁহার পিতার জীবদ্দশাতেই শীরায-এর শাসনকার্য আনু. ৭৩৫/১৩৩৫ সাল পর্যন্ত পরিচালনা করেন। এই সময়ে জালালু'দ-দীনের অনুপস্থিতিতে তাঁহার ভ্রাতা কায়খুসরাও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পর কায়খুসরাও তাঁহার ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। ফলে ভ্রাতৃযুদ্ধ আরম্ভ হয়, যাহার অবসান ঘটে কেবল ৭৩৯/১৩৩৮-৯ সালে কায়খুসরাও-এর মৃত্যুতে। মাস্'উদ শাহ তৃতীয় ভ্রাতা মুহাম্মাদকে কা'ল্'আ-ই সাফীদ-এ কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি পালায়ন করিতে এবং চোবানী (Cobanid) পীর হুসায়ন-এর সমর্থন লাভ করিতে সক্ষম হন। শেষোক্ত ব্যক্তি একদল মঙ্গোল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মুহাম্মাদের সহিত শীরায আক্রমণ করিলেন। মাস'উদ শাহ পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং পীর হুসায়ন শহরে প্রবেশ করেন। অল্পকাল পরেই ৭৪০/১৩৪০ সালে পীর হুসায়ন যখন মুহাম্মাদকে হত্যা করেন তখন অধিবাসিগণ এমনই মারমুখো মনোভাব প্রদর্শন করে যে, তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করাই সমীচীন মনে করেন : কিন্তু পরবর্তী বৎসরই নূতন সৈন্যদল লইয়া ফিরিয়া আসেন। এই বারও ভাগ্য তাঁহার প্রতিকূল ছিল; তিনি চোবানী

আশরাফের সহিত কলহে লিপ্ত হন এবং যখন দুই পক্ষ সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন মাস্‌'উদ শাহ-এর লোকজন তাঁহাকে বিপদে ফেলিয়া দল ত্যাগ করিল এবং তিনি হাসান-ই কূচাক (দ্র.)-এর আশ্রয় প্রার্থনা করেন, কিন্তু তদ্দারা নিহত হন। ইতিমধ্যে মাস্‌'উদ-শাহ লুরিস্তান-এর দিকে অগ্রসর হন এবং সেখানে তিনি আশরাফের এক ভ্রাতা Yaghi-basti-র সহিত মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হন। অপরদিকে আশরাফ স্বয়ং মাস্‌'উদ-শাহের একমাত্র অবশিষ্ট ভ্রাতা আবূ ইস্‌হাকের পক্ষ অবলম্বন করেন। Yaghi-basti-র সহায়তায় মাস্‌'উদ শাহ শীরাযে পৌঁছিতে সফল হন এবং সেইখানে তিনি ৭৪৩/১৩৪৩ সালে বিশ্বাসঘাতক Yaghi-basti-র হস্তে নিহত হন। অতঃপর শেষোক্ত ব্যক্তি আশরাফের সহিত কলহ করিলেন এবং পরে আপোস করিলেন। তাঁহারা ফারস্‌কে পদানত করিবার জন্য যুক্তভাবে অভিযান চালাইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহাদের ভ্রাতা হাসান-ই কূচাকের মৃত্যু সংবাদে তাঁহাদের সৈন্যগণ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। আবূ ইস্‌হাক যিনি পূর্বেই পীর হুসায়নের নিকট হইতে ইস্‌ফাহান শহরটি লাভ করিয়াছিলেন, এখন শীরায এবং সমগ্র ফারস-এর শাসনকর্তা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শাসন ক্ষমতা য়ায্‌দ ও কিরমানের উপর বিস্তার করিতে প্রয়াসী হইলে মুজাফফার পন্থীগণ (দ্র.)-এর সহিত সংঘর্ষ বাধে যাহাতে কখনও তিনি বিজয়ী হন, কখনও বিজিত। সংঘর্ষের পরিণতিতে আবূ ইস্‌হাক শুধু য়ায্‌দ এবং কিরমান হইতেই বিতাড়িত হন নাই, উপরন্তু শীরায শহরেই অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং শহরটি ৭৫৪/১৩৫৩ সালে মুজাফ্‌ফারীগণের নিকট আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু ইহার পূর্বেই তিনি কাল'আ-ই সাফীদ-এ পলায়ন করেন এবং হাসান-ই বুযুর্গ-এর কিছু সমর্থন লাভ করিয়া ইস্‌ফাহানের দিকে অগ্রসর হন। পুনরায় অবরুদ্ধ হইয়া তিনি বন্দী হইলেন এবং তাঁহারই আদেশে নিহত এক শায়খের আত্মীয়গণের হস্তে মৃত্যুদণ্ডের জন্য সমর্পিত হন (৭৫৮/১৩৫৭)। পারস্য কবি 'উবায়দ-ই যাকানী একটি শোকগাথায় তাঁহার পৃষ্ঠপোষক আবূ ইসহাকের স্মৃতিচারণ করিয়াছেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) আবূ বাক্‌র আল-কুত্‌বী আল-আহারী, তা'রীখ-ই শায়খ উওয়ায়স, অনু. J. B. van Loon, 157 প. ; (২) হামদুল্লাহ কাযবীনী, তা'রীখ-ই গুযীদাঃ, সম্পা. Browne, 622 প. ; (৩) যারকূব শীরাযী, শীরায-নামাহ্‌, সম্পা. কারীমী ; (৪) ইব্‌ন বাত্তূতাঃ, ২খ, ৬৮-৭৭, অনু. Gibb, ২খ, ৩০৮-১৩ ; (৫) দাওলাত শাহ, ২৯৩।

J. A. Boyle (E. I[2].)/আ. র. মামূন

**ঈনাক** (اينق) ঃ (উচ্চারণ ঈনাক, ইনাগ এবং ইনাক), বিভিন্ন তুর্কী ও মঙ্গোল দেশসমূহে প্রচলিত একটি উপাধি।

স্পষ্টতই এই শব্দটি তুর্কী ক্রিয়াপদ ঈনান (অর্থ "বিশ্বাস করা, নির্ভর করা" ইত্যাদি) হইতে উদ্ভূত একটি বিশেষ্য পদবাচ্য শব্দ যাহা মৌলিকভাবে "ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি" অর্থ প্রকাশ করে। [খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের বিভিন্ন মধ্য এশীয় সূত্রসমূহে প্রায়শ একটি প্রাথমিক 'আয়নযুক্ত যে 'ইনাক বানান দেখিতে পাওয়া যায় তাহা খুব সম্ভবত ইহার প্রাথমিক অবস্থার বর্ণের প্রতি নির্দেশ করে মাত্র ; A. A. Semenov কর্তৃক এই বানান রীতির যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে শব্দটিকে 'আরবী 'ইনাক, (আলিঙ্গন) হইতে উদ্ভূত বলিয়া বলা হইলেও তাহা কেবলমাত্র একটি পরবর্তীকালীন সাহিত্যিক উদ্ভাবন হইতে পারে]। একই ক্রিয়াপদ হইতে গৃহীত অনুরূপ একটি শব্দ ঈনানচ্‌ (নির্ভরতা, বিশ্বাস) ; খৃষ্টীয় ১০ম শতকের তুর্কী গ্রন্থসমূহে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় যাহা পরবর্তীকালে শাসনকর্তার ঘনিষ্ঠ সহচরগণের 'উপাধি' বা 'পদবী'রূপে ব্যবহৃত হয় (তু. বিশেষভাবে, মাহমূদ কাশগারী, ১খ, ১১৯-এ ইনানচ্‌ বেগ এবং কুতাদগু বিলিগ, ফারগানা MS, 293)। এই উপাধি সালজূক যুগের সমগ্রকালব্যাপী প্রচলিত ছিল (তু. অন্যান্য উপাধি ও পদবী, যথাঃ ঈনানচ্‌ পায়গু, ঈনানচ্‌ বিল্‌গে ইত্যাদি ; দ্র. Sir G. Clauson, An etymological dictionary of pre-thirteenth century Turkish, অক্সফোর্ড ১৯৭২ খৃ., ১৮৭)। সম্ভবত এই একই অর্থ ঈনাল নামক পদবীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল (একই মূল হইতে উদ্ভূত অপর একটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য), এই উপাধিটি ইতোমধ্যে য়েনিসেয় অঞ্চলের রূনিক শিলালিপিসমূহে দেখা যায় (দ্র. Drevnel-yurkskiy, লেলিনগ্রাড ১৯৬৯ খৃ., ২১৮ ; S. E. Malov, Yeniseyskaya Pismennost Tyurkov, মস্কো-লেনিনগ্রাড ১৯৫২ খৃ., ৩৮, ৪৫, ৪৯)। কারাখানী ও সালজূক যুগে ইনাল, ইনাল-তেগিন, ইনালচুক (ইনালচিক) উপাধিসমূহ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত (দ্র. G. Clauson পূ. গ্র., ১৮৪-৫)। একই সময়ে চীনা উৎস এবং ওরখোন শিলালিপিসমূহ হইতে ইনাল "সহকারী" (?) হইতে প্রাপ্ত এই উপাধির অপর একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় (দ্র. Drevnetyurks Kiy slovar. ২০৯, ২১৮; G. Doerfer, Turkische und Mongolische Elemente im Neuperschen, ৪খ, ১৯৬-৯, নং ১৯০০; তু. P. Pelliot, Notes sur l'histoire de la Horde d'or., প্যারিস, ১৯৪৯ খৃ., ১৮২-৩ ; টীকা-২), ইনাক যাহা রূনিক শিলালিপিতে দৃষ্ট হয় না—উইগুর বর্ণে লিখিত ভাষ্যসমূহেই ইহা প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের সামাপ্তির পূর্বেই তাহা তুর্কী হইতে মঙ্গোলীয় ভাষায় প্রবেশ লাভ করে ; চিনগিয খানের আমলে ইহা খান-এর একজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী (nukers)-র উপাধিরূপে প্রচলিত ছিল।

মঙ্গোল বিজয় অভিযানের পর এই উপাধিটি, সম্ভবত মঙ্গোল প্রভাবের কারণে, তুর্কীদের মধ্যে প্রচলিত ইনান-এর অন্যান্য পরিবর্তিত রূপের উপর প্রাধান্য লাভ করে। মঙ্গোল এবং তীমূরীয় যুগের ফারসী ঐতিহাসিক সূত্রসমূহে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে ; সঠিক অর্থে ইহার কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, তবে সুস্পষ্টত ইহা দ্বারা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিশেষত শাসনকর্তার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে নির্দেশ করা হয় (উদাহরণের জন্য দ্রষ্টব্য Quatremere, Histoire des mongos de la Perse, ১খ, পৃ. L-LI, টীকা ৮৪, অতিরিক্ত দ্র. নিজামু'দ-দীন শামী প্রণীত জাফার-নামাহ, সম্পা. F. Tauer, ১খ, ৯৬, ১৪২, ২খ, ১০৯, ১১৮, ১৪৮)। সময়ে সময়ে এই সকল সূত্রে ইনাকগণকে (ঈনাকান, ঈনাকিয়ান) শাসনকর্তার একটি বিশেষ শ্রেণীর নিজস্ব কর্মচারীরূপে উল্লেখ করা হয় [তু. উমারা' ওয়া ঈনাকিয়ান, মুকাররিবান ওয়া ঈনাকান, খাওয়াস্‌স্‌ ওয়া ঈনাকান, ফারযানদান ওয়া নূকারান ওয়া ঈনাকিয়ান (একজন আমীরের) ইত্যাদির ন্যায় শব্দাবলী]। আককোয়ুনলু রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেও শব্দটি একই অর্থে প্রচলিত ছিল ; এই স্থানে একটি সূত্রমতে জনৈক আমীর ইনাকগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহার পদমর্যাদা মুহরদার-এর সমকক্ষ ছিল (দ্র. V. Minorsky, in BSOAS, ১০/১খ, ১৯৪০-৪ খৃ., ১৭০-১)।

এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, তীমূরীয় যুগের পরবর্তীকালে এই উপাধিটি কেবলমাত্র মধ্য এশিয়ার উযবেক খানেত সমূহেই প্রচলিত থাকে। বাহ্‌রু'ল-আসরার-এর গ্রন্থকার মাহ্‌মূদ ইব্‌ন ওয়ালী কর্তৃক প্রদত্ত বালখ্-এর আশতারখানী শাসনকর্তার রাজসভার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিবরণে ইহার কোন উল্লেখ নাই (তু. V. V. Bartold, Socinenya, ২/২খ, ৩৯০-৩)। তবে ইহা নিশ্চিত যে এই কালে ইহা প্রচলিত ছিল। মুহাম্মাদ আমীন বুখারী প্রণীত 'উবায়দুল্লাহ্-নামাহ্-এর বিবরণ অনুযায়ী (১৮শ শতকের প্রথম ভাগ, দ্র. রুশ অনু. A. A. Semenov, তাশকেন্ত ১৯৫৭ খৃ., ৩৩), সুবহান কুলী খান (মৃ. ১১১৪/১৭০২)-এর রাজত্বকালে ইনাক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা রাজকীয় সীলমোহরের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিতেন। 'উবায়দুল্লাহ খান (১১১৪-২৯/১৭০২-১১)-এর জনৈক কর্মচারী, একজন কালমুক (অর্থাৎ দাস বংশোদ্ভূত ব্যক্তি)-কে একই সঙ্গে পদোন্নতি প্রদান করিয়া ইনাক পদ এবং প্রথম মন্ত্রীর পদ-কোশ-বে গি-য়ি কুল্ল [ দ্র. কোশ-বেগি ], [দ্র. ঐ, ৪৫, ১৯১) প্রদান করা হয়। এই ব্যক্তি একই সঙ্গে রাজকীয় সীলমোহরের রক্ষক ছিলেন (ঐ, ২০৪)। তাঁহার পরবর্তী অপর দুইজন উত্তরসুরি যাঁহারা দাস বংশোদ্ভূত ছিলেন, একই সঙ্গে ঈনাক উপাধি এবং বড় কো'শ বেশী পদমর্যাদা প্রাপ্ত হন (ঐ, ২৩০, ২৭৬)। ১২১২/১৭৯৮ সালে বুখারায় সংকলিত প্রশাসনিক বিধি গ্রন্থ মাজমা'উ'ল-আরকাম দুই প্রকার ইনাক উল্লেখ করে ঃ প্রথম ('ইনাক-ই কালান), যিনি শাসনকর্তার বিশেষ ঘনিষ্ঠ ৪ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার মধ্যে তৃতীয় স্থানীয় ( কোশ-বেগীর পর) ছিলেন এবং যাঁহার দায়িত্ব ছিল আমীর হইতে নিম্নতর পদস্থ কর্মকর্তাগণের প্রতি রাজকীয় আদেশ সরবরাহ করা। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল ইনাক-ই খুরদ, তাহার দায়িত্ব ছিল রাজকীয় সীলমোহর রক্ষা করা এবং প্রদেশ হইতে আগত প্রতিবেদন ও বিদেশী দূতগণের আনীত বার্তা গ্রহণ করা, উন্মুক্ত করা এবং পঠনের জন্য তাহা মুনশীকে সরবরাহ করা (দ্র, Pis'menniye pamyatniki Vostoka 1968, মস্কো ১৯৭০ খৃ., ৫৬, ৫৭)। N. Khanikpv (O. Pisaniye Bukharskogo khamstva, সেন্ট পিটার্সবুর্গ ১৮৪৩ খৃ., ১৮৩-৫, ১৮৭)। কেবলমাত্র একটি ইনাক উল্লেখ করিয়াছেন, ইঁহার দায়িত্ব ছিল মীর-ই আখুর, ইশিক-আগামী এবং চাগাতায়-বেগী উপাধিসমূহ প্রদানকারী সনদের পশ্চাদভাগে তাঁহার সীলমোহর সংযুক্ত করা ; বাহ্যতঃ ইহা হইতেছে প্রাক্তন ইনাক-ই খুর্দ-এর দফতর। অবশ্য শেষ মানগীতগণ [দ্র.]-এর সময়ে ইনাক অন্যান্য কতিপয় উপাধি কেবলমাত্র সম্মানসূচক পদে পরিণত হয় ; বুখারায় ইহার অবস্থান ছিল উর্ধ্ব হইতে পঞ্চম স্থানে, দাদখাহ্ এবং পারওয়ানীচি-র মধ্যে।

খীওয়া খানেতে ইনাক উপাধিটি উযবেক গোত্রীয় নেতৃবৃন্দকে প্রদান করা হইত এবং প্রাথমিকভাবে ইহা আতালীক [উপরে দ্র.] উপাধির পরেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব সম্পন্ন ছিল। খীওয়া-এর ঐতিহাসিক মু'নিস [দ্র.] আবু'ল-গাযী [দ্র.] (১০৫৩-৭৯/১৬৪৩-৬৩)-এর কৃত প্রশাসনিক সংস্কারের প্রসঙ্গে তাহার বর্ণনায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, আবু'ল-গাযী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৩৪ জন 'আমালদার সমন্বয়ে গঠিত খান-এর পরিষদে ৪ জন ইনাক এবং চারজন 'চাগাতায় ইনাক" অন্তর্ভুক্ত ছিল (ফিরদাওস আল-ইক বাল, পাণ্ডু., ইনস্‌টিটিউট অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ, লেনিনগ্রাড শাখা, C-571, f 65 b)। চারিটি তুপা-এর প্রতিটি হইতে একজন ইনাক থাকিতেন, খাওয়ারায্‌ম-এর উযবেক গোত্রসমূহ খৃস্টীয় ১৬শ শতকের মধ্যেই এই চারি অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল ঃ উইগুর এবং নায়মাল, কুনগ্রাত এবং কিয়াত, মানগীত এবং নূকুয, কান্‌গলী এবং কি'পচাক; চাগাতায় ইনাক 'উপাধিটির অর্থ স্পষ্ট নয়। মুনি'স [ঐ, flola]-এর মতে কুনগ্রাত বংশের পূর্বপুরুষ উমবার ইনাক ইতোমধ্যে আবু'ল-গাযীর শাসনামলে শক্তিশালী প্রথম মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ইহা ছিল ইতঃপূর্বে তাঁহার কৃত বিভিন্ন সাহায্যমূলক কর্তব্যের স্বীকৃতিস্বরূপ। আবু'ল-গাযীর পুত্র আনূশা-এর পক্ষে লিখিত শাজারা-য়ি তুর্ক-এর শেষ অংশে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, (সম্পা. Desmaisons. মূল পাঠ, ৩২৭, অনু., ৩৫১) আবু'ল-গাযী কর্তৃক হাযারাস্‌প হইতে খীওয়া আনীত জনৈক য়াদিগার ইনাককে ইনাকলিক উপাধি প্রদান করা হয়, যদিও ইতঃপূর্বে নিশ্চিতভাবে উক্ত ব্যক্তি ইনাক উপাধির অধিকারী ছিল (তু. ঐ, মূল পাঠ, ৩২৬, অনু. ৩৪৯)। ইহাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, উযবেক ইনাকগণের একজনকে উচ্চতর পদে উন্নীত করা হয় যাহার অনুরূপ পদ পরবর্তীকালে উমবায় ইনাক ভোগ করেন। আনূশা খান-এর শাসনামলে খীওয়াতে যে সকল রুশ দূত অবস্থান করিতেন তাহাদের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ইনাকগণ তখনও পর্যন্ত আতালীকগণের নিম্নে দ্বিতীয় অবস্থানে অবস্থিত ছিল (দ্র. Nakaz Borisu-i Semenu Payukhinim, সেন্ট পিটারর্সবুর্গ ১৮৯৪ খৃ., ৪৩-৪)। নাদির শাহ খীওয়া অধিকার করিবার পর (১৭৪০ খৃ.) কানগিত গোত্রভুক্ত আরতুক ইনাক খীওয়া খানেত-এর প্রকৃত শাসকে পরিণত হন।

খৃস্টীয় ১৮শ শতকের তৃতীয়-চতুর্থাংশে কুনগ্রাত গোত্রের প্রধান মুহাম্মাদ আমীন ইনাক খানেত-এর শাসনকর্তায় পরিণত হন এবং তিনি যে বংশ প্রতিষ্ঠা করেন তাহা ১৯২০ খৃ. পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে এবং সাহিত্যে মাঝে মাঝে ইহাদিগকে "ইনাকীয়"-রূপে বর্ণনা করা হয়। এই বংশের তৃতীয় শাসক এলতুযার ইনাক ১২১৯/১৮০৪ সালে নিজেকে খানরূপে ঘোষণা করেন। ইহার পর হইতে খীওয়া-এর উযবেক সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর জন্য ইনাক সর্বোচ্চ উপাধিতে পরিণত হয় (খীওয়া-এর ঐতিহাসিকবৃন্দ এই রূপ কতিপয় ক্ষেত্রের উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে আতালীক পদ হইতে ইনাক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয় (দ্র. ফিরদাওস আল-ইকবাল, পাণ্ডু. 3176. 578 a)। মুহাম্মদ রাহীম খান (১২২০-৪০/১৮০৬-২৫)-এর রাজত্বকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাতলুগমুরাদ ইনাক-বেক উপাধির অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহাকে বলা হইত আমীরু'ল-উমারা' (ঐ, f. 316 a ; কিন্তু তথাপি তখন পর্যন্ত আতালীক দ্বারা বয়স্ক উযবেক আমীর নির্দেশ করা হইত)। ইহা ভিন্ন তাহাকে বিয়-ইনাক এবং ইনাক-আকা নামে অভিহিত করা হইত। খৃস্টীয় ১৯শ শতকের মধ্য ভাগে ইনাক-বেগ উপাধিটি খান-এর উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হয়, এই ব্যক্তি সাধারণত হাযারাস্‌প শহরের গভর্নর হইতেন। রুশ বিজয় অভিযানের পূর্বে (১৮৭৩ খৃ.) অবশ্য এই উপাধি উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হইয়া খানের কোন একজন ঘনিষ্ঠ ও বয়স্ক আত্মীয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় (তু. A. L. Kuhn, ইনস্‌টিটিউট অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ, লেনিনগ্রাড শাখার মহাফেজখানায় রক্ষিত দলীলপত্র, ফাইল ১/১৩, f. পত্রক ৩৬ a-৩৮ b)। তাঁহাকে এবং উযবেক গোত্রসমূহের চার ইনাক ব্যতীত এই উপাধিটি মাঝে মাঝে তুর্কমান অন্যান্য গোত্রপ্রধানকে প্রদান করা হইত।

খোকান্দ [দ্র.] খানেতেও ইনাক উপাধিটি সুপ্রচলিত ছিল ; এ স্থলে এই উপাধিটি যে সভাসদকে প্রদান করা হইত তাঁহার (বা তাঁহাদের) দায়িত্ব ছিল রাজসভার যাবতীয় সামগ্রী সরবরাহ করা এবং খানের দেহরক্ষী বাহিনীর তত্ত্বাবধান করা। ইহা ব্যতীত তাঁহারা খানের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কিছু কার্য তত্ত্বাবধান করিতেন। একই সঙ্গে অবশ্য বুখারা-র ন্যায় এখানেও উপাধিটি বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যথা ঃ প্রাদেশিক গভর্নরগণকে সম্মানসূচক পদবীরূপে প্রদান করা হইত (তু. V. P. Nalivkin, Histoire du khanat de Khokand, প্যারিস ১৮৮৯ খৃ., ১০৪)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) মূল প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলীর অতিরিক্ত, (১) B. Ya. Vladimirtsov, Obshces-tvenniy stroy mongolov. লেনিনগ্রাড ১৯৩৪ খৃ., ৩ ; (২) P. Pelliot, Notes sur l'histoire de la Horde d' Or, প্যারিস ১৯৪৯ খৃ., ১৮২-৩, টীকা ২ ; (৩) A. A. Semenov, in Sovetskoye-vostoko-vedeniye, ৫খ., (১৯৪৮ খৃ.). ১৪৮-৯ ; (৪) ঐ লেখক, in Materiali po istorii tadzikov i uzbekov Sreney Azii, ২খ, স্ট্যালিনাবাদ ১৯৫৪ খৃ., ৬১; (৫) A. L. Troitskaya, Katalog arkhiva Kokandskikh khanov, XIX veka, মস্কো ১৯৬৮ খৃ., ৫৪৫; (৬) ঐ লেখক, Materiali po istorii Kokandskogo khanstva XIX v, মস্কো ১৯৬৯ খৃ., ৫, ২১ ; (৭) Radloff, Worterbuch, ১খ, ১৩৬১-৩ ; (৮) G. Doerfer, Turkische und mongolisehe Elemente in Neupersischen, ২খ., ২১৭-২০, নং ৬৬৮-৯ ; (৯) E. V. sevortyan, Etimolôgiceskiy slovar tyurkskikh yazikov, মস্কো ১৯৭৪খৃ., ৬৫৪-৬।

Yu. Bregel (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

**'ঈনাত** (عينات) ঃ হাদরামাওত-এর একটি শহর ; 'ঈনাত এবং হাদরামাওত উপত্যাকাদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে এবং তারীম হইতে প্রায় সোজা ১০ মাইল ১৫ কিঃ মিঃ পূর্ব দিকে অবস্থিত। 'ঈনাত-এর পুণ্যবান পরিবারটি আল বূ বাকর ইব্ন শায়খ এবং মাওলা 'ঈনাত নামে পরিচিত সুবিখ্যাত মানসাব শায়খ বূ বাক্র ইব্ন সালিম এই শহরে সমাহিত। অস্ত্র বহন করার কারণে এই পরিবারটি অন্যান্য সায়্যিদ উপদলের নিকট হইতে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে। 'ঈনাত বর্তমানে হাদরামাওত-এর অন্যতম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হাওতাঃ (দ্র.)-য় পরিণত হইয়াছে। শহরটি ইহার নিজস্ব প্রজাতির এক প্রকার শিকারী কুকুরের জন্য বিখ্যাত, আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ রাস্তার কুকুর হইতে যাহার পার্থক্য অলক্ষণীয়। এই সকল কুকুর দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ তাহাদের মানসাব-এর নির্দেশে বন্য ছাগ শিকারে লিপ্ত হয়। ওয়াদী হাদরামাওত অঞ্চলে যুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষের পর শহরের জনসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পায় এবং এক সাম্প্রতিক জরিপ মতে বর্তমান জনসংখ্যা আনুমানিক ১৩০০। পুরাতনকালে বিভিন্ন মহল্লা থাকিলেও বর্তমানে কার্যত ইহা অবলুপ্ত। Landberg এ ক্ষেত্রে 'এয়নাত ('আয়নাত') বানান ব্যবহার করেন, যদিও মনে হয় যে, প্রস্তাবিত অপরাপর য়ুরোপীয় সকল বানানরীতি ত্রুটিপূর্ণ।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) H. von Wissmann, Map of Southern Arabia, Royal Geographical Society, লণ্ডন ১৯৫৮ খৃ.; (২) Le Comte de Landberg, Arabica, ৫খ. লাইডেন ১৮৯৮ খৃ., ২০৬ ; (৩) R. B. Serjeant, Saiyids of Hadramawt, লণ্ডন ১৯৫৭ খৃ., ১৭-১৮ ; (৪) ঐ লেখক, South Arabian hunt, লণ্ডন ১৯৭৬ খৃ., ৩২-৩।

G. R. Smith (E. I.[2]) / মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

**ঈনাল, ঈনালী** (اينالى، اينال) ঃ একজন তুর্কোমান সরদারের এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শাসক বংশের নাম (প্রাচীন মধ্য এশীয় উপাধি 'য়ীনাল' হইতে উদ্ভূত)। ঈনাল ৫ম/১১শ শতাব্দীর শেষভাগে সুলতান মালিক শাহের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে লড়াইয়ের সুযোগে নিজে আমিদ [দিয়ার বাক্র (দ্র.)]-এ একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই বংশ ক্ষমতাসীন ছিল। কতিপয় শিলালিপিতে ঈনালীদের নাম পাওয়া যায়, তবে ঐতিহাসিকগণ তাহাদের সম্পর্কে অতি সামান্যই বর্ণনা করিয়াছেন।

ঈনালীরা দিয়ার বাক্র-এর ন্যায় বাণিজ্যিক ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকার কর্তৃত্ব লাভ করিলেও সেইখানে তাহাদের স্থান ছিল যাঙ্গীদের সমর্থনপুষ্ট হইলেও আরতুকীদের তুলনায় দ্বিতীয় পর্যায়ের এবং রাজ্যের অভ্যন্তরভাগে নীসানী (দ্র.) নামের একটি স্থানীয় রু'আসা' পরিবারের নিকট তাহাদেরকে প্রকৃত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে হয়। কার্যোদ্ধারের জন্য এই নীসানীরা কখনও কখনও ঘাতক নিয়োগ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিত না। ৫৭৯/১১৮৩ সালে তুর্কী সুলতান সালাহু'দ-দীন এই দুই পবিারের সম্মিলিত শক্তিকে ধ্বংস করিয়া দিয়া আমিদ-এর কর্তৃত্ব হিস্ন কায়ফা-তে তাহার আর-তুর্কী মিত্রকে প্রদান করেন। এই সময় হইতে বংশের এই শাখার অধীনে এলাকা দুইটি একত্র থাকে। যাহা হউক, ঈনালী ও নীসানীদের অধীনে, বিশেষত নীসানীদের আমলে আমিদ শহর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। ঐ আমলে ইহা খৃষ্ট ধর্মের একটি সক্রিয় স্বার্থক কেন্দ্রেও পরিণত হয়। ঈনালী শাসকদের কোন মুদ্রার কথা জানা যায় নাই।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ ঈনালীদের সম্পর্কে সমস্ত সাহিত্যিক তথ্যনির্দেশ (ইব্ন হাওকালের রচনা সম্পূরক উত্তরসুরি ইবনু'ল-আযরাক, সিরীয় মাইকেল ও অন্যরা) পাওয়া যাইবে ঃ (১) Cl. Cahen, Le Diyar Bakr au temps des premiers Urtukides, in JA, 1935 এবং (২) ঐ লেখক, Mouvements populaires...., in Arabica, 1958, 244। প্রত্নতত্ত্ব ও শিলালিপি সম্পর্কে দ্র. (৩) A. Gabriel, Voyage archeologique dans les provinces orientales de la Turquie এবং (৪) J. Sauvaget প্রণীত শিলালিপি ক্রোড়পত্র, শিলালিপি নং ৬২-৫; (৫) আরও দ্র. আরতুকী এবং যামবাউর নিবন্ধ।

Cl. Cahen (E.I.[2])/ শায়খ ফজলুর রহমান

**ঈনাল (বা আয়নাল) আল-আজরূদ** (اينال الاجرود) ঃ আল-মালিকু'ল-আশরাফ সায়ফু'দ-দীন আবু'ন-নাস্র আল-'আলাঈ আজ-জাহিরী আন-নাসিরী, মিসর ও সিরিয়ার মামলূক সুলতান (৮৫৭/১৪৫৩-৮৬৫/১৪৬১)। ইনি জন্মসূত্রে সারকাসিয়ান ছিলেন, বণিক 'আলা'উ'দ-দীন ৭৯৯/১৩৭৯ সনে তাঁহাকে খরিদ করিয়া কায়রোতে লইয়া আসেন (এইজন্য তাঁহার উপাধি হইয়াছে আল-'আলা'ঈ) এবং বারকূক (দ্র.) (আল-মালিক আজ-জাহির)-এর নিকট বিক্রয় করিয়া

দেন (এইজন্য ঈনালের উপাধি হইয়াছে আজ-জাহিরী)। ঈনালকে বারকূকে'র 'আল-মুশ্‌তারাওয়াত' বাহিনীতে ভর্তি করিয়া লওয়া হয়। সুলতান (আন-নাসির) কারাজ (দ্র.)-এর রাজত্বকাল শুরু হইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি 'কিতাবিয়্যা' বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতঃপর ৮২৪/১৪২১ সনে সুলতান আন-নাসিরের আমলে তিনি সুলতানের দেহরক্ষী ও বাছাইকৃত সহচর বাহিনী 'খাস্‌সাকিয়্যা'-য় বদলী হন (তখন হইতে তাঁহার উপাধি হয় আন-নাসিরী)। এই বাহিনীতে আল-মু'আয়্যাদ শায়খ-এর পুত্র আল-মুজাফ্‌ফার আহমাদের অধীনে তিনি "দশজনের অধিনায়ক" পদে উন্নীত হন। বারস্‌বায় (দ্র.)-এর অধীনে তিনি 'আমীরু'ত-তাব্‌ল খানা' ও পরবর্তী কালে 'রা'স নাওবা' পদে এবং ৮৩০/১৪২৭ সনে 'আমীর আরবা'ঈন, রা'স নাওবা আছ'ছানী' পদে উন্নীত হন। ৮৩১/১৪২৮ সনে তিনি গায্‌যা'র না'ইব নিযুক্ত হন, আমিদ (দিয়ার বাক্‌র দ্র.) আক্রান্ত হইলে তিনি আক-কোয়ুনলু সর্দার কারা' য়ূলুক 'উছমান বেগের বিরুদ্ধে ৮৩৬/১৪৩৩ সনে পরিচালিত বারস্‌বায়-এর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। 'উছমানের জন্য মুরাদ আমিদ দুর্গ রক্ষায় বিপুল শক্তি নিয়োগ করিয়া আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেন। তখন ঈনালকে আমীর মি'আ তাকদিমা আল্‌ফ বি'দ-দিয়ারি'ল-মিস্‌রিয়্যা পদমর্যাদাসহ রুহা (এডেসা)-এর না'ইব নিয়োগ করা হয়। ৮৩৯/১৪৩৬ সন পর্যন্ত ঈনাল আক-কোয়ুনলুদের সহিত বহু যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। পরবর্তী বৎসর তিনি সাফাদ-এর না'ইব নিযুক্ত হন। ৮৪৩/১৪৩৯ সনে সুলতান চাক্‌মাক (ঈনালের ন্যায় তিনিও ছিলেন একজন 'আলা'ঈ) তাঁহাকে কায়রো ডাকিয়া পাঠান এবং প্রথমে মুকাদ্দাম ৮৪৬/১৪৪২ সনে প্রধান দাওয়াদার পদে নিয়োগ করেন। ৮৪৬/১৪৪২ সনে এবং ৮৪৮/১৪৪৪ সনে তিনি রোড্‌স দ্বীপের উপর ব্যর্থ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

৮৫০/১৪৪৬ সনে য়াশবাক্ আস্‌-সূদূনীর মৃত্যু হইলে ঈনাল প্রধান সেনাপতি আতাবাক্ আল-'আসাকির (-আল-আমীর আল-কাবীর) হিসাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ৮৫৭/১৪৫৩ সনে সুলতান চাকমাকের ইনতিকালের পর বিভিন্ন মামলূক গোষ্ঠীগুলিকে দেয় অনুদান লইয়া সুলতানের পুত্র ও উত্তরাধিকারী 'উছমানের সহিত ঈনালের মতবিরোধ দেখা দেয়। পরবর্তী কালে দুই পক্ষের মধ্যে রাস্তায় রাস্তায় লড়াই শুরু হয়, ইহার ফলে ঈনাল কাল'আতু'ল-জাবাল দখল করিয়া লন এবং ('আব্বাসী) ছায়া খলীফা ও ৪ জন প্রধান বিচারপতি (কাদি'ল-কুদাত)-সহ গঠিত একটি পরিষদ কর্তৃক 'আল-মালিকু'ল-আশরাফ সায়ফু'দ-দীন' উপাধিতে ভূষিত হইয়া সুলতান নিযুক্ত হন। ঈনালের বয়স তখন ৭৩ বৎসর। সুলতান নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁহার প্রথম কাজ হইল তাঁহার ন্যায় 'আলা'ঈদিগকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ করা, তাঁহার পূর্বসূরী যে রাজকীয় মামলূক গোষ্ঠীটি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং বিভিন্ন মাযালিম (নির্যাতন) আদালতের বিলোপ সাধন করা।

ঈনালের স্বল্পকালীন রাজত্ব ছিল ঘটনাবহুল। 'উছমানী দূতাবাস হইতে তাঁহাদের কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের এক ঘোষণা প্রচারের জওয়াবে ৮৫৭/১৪৫৩ সনে ঈনাল দ্বিতীয় 'আমীর আল-আখূর (রাজকীয় আস্তাবলের প্রধান) বার্‌সবায়কে 'উছমানী সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদের দরবারে দূতরূপে প্রেরণ করেন। পরবর্তী বৎসর তিনি যু'ল-কাদি'র ওগ্‌লু ফায়্যাদ বেগের আলবিস্তানের আমীর হইয়া বসিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া তদীয় ভ্রাতা সুলয়ামান বেগকে আলবিস্তানের আমীর পদে সমাসীন করেন। ৮৫৯/১৪৫৫ সনে তিনি তাঁহার নিজস্ব মামলূক গোষ্ঠী ও প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির মধ্যকার মতবিরোধের ফলে সাংঘাতিক একটি বিদ্রোহ দমন করেন। এই গোলযোগে জড়িত থাকার দায়ে ঈনাল খলীফা আল-কা'ইমকে পদচ্যুত করিয়া তদীয় ভ্রাতা আল-মুস্‌তানজিদকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন। কারামানওগ্‌লু দ্বিতীয় ইবরাহীম সুলতান ঈনালের নিকট এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, উছমানী সুলতান মুহাম্মাদ গ্রীকদের 'রক্ষক' সাজিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই অভিযোগে কর্ণপাত না করিয়া সুলতান মুহাম্মাদের সহিত সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করিবার মানসে তাঁহার দরবারে একটি দূতদল পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সিলিসিয়ায় কারমানীদের রাজ্য বিস্তার প্রচেষ্টা বন্ধ করিবার জন্য খোশ্‌কাদামের নেতৃত্বে একটি প্রতিরোধ বাহিনীও প্রেরণ করেন। এই সেনাবাহিনী কারামানে ৪টি দুর্গ অধিকার করে এবং লারিন্দা অগ্নিদগ্ধ করে। ইহার ফলে ঈনালের নীতি তীব্র নিন্দার সম্মুখীন হয়। এই সময় পুনরায় খোশ্‌কাদামকে মালাতিয়া অবরোধকারী আক্‌কোয়ুন্‌লু শাসক উযুন হাসান (দ্র.)-এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়।

পরবর্তী সঙ্কট দেখা দেয় সাইপ্রাসকে কেন্দ্র করিয়া। সুলতান বারস্‌বায়-এর রাজত্বকালে সাইপ্রায় ৮৩০/১৪২৭ সন হইতে মাম্‌লূক সুলতানকে কর প্রদান করিয়া আসিতেছিল। ঈনালের সিংহাসনারোহণের সময় লুসিগ্‌নীয় রাজা দ্বিতীয় জন (Lusiginan King John II, ১৪৩২-৫৮ খৃ.) স্বয়ং কায়রোয় আসিয়া তাঁহার অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজকুমারী শারলট (Charlotte, ১৪৫৮-৬০ খৃ.) স্যাভয়ের লুই (Louis of Savoy)-এর সহিত যৌথভাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতে যাইতেছিলেন। ঐ সময় মৃত রাজা জনের জারজ ভ্রাতা নিকোশিয়ার আর্চবিশপ জেম্‌স (James) [মামলূক সূত্রগুলির বর্ণনায় জাকাম] স্বীয় জীবনাশঙ্কায় কায়রোয় পলায়ন করেন। সাইপ্রাসের গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ এবং রোড্‌স-এর নাইটরা শাসকরূপে রাজকুমারী শারলটকে বেশী পছন্দ করিতেছিলেন, কিন্তু সাইপ্রাসের জনসাধারণ জেম্‌সকেই পছন্দ করে। মাম্‌লূক আমীরদের মধ্যেও অনেকে তাঁহাকে সমর্থন দেন, বিভিন্ন পক্ষের দূতগণ এই ব্যাপারে দেনদরবার করিবার উদ্দেশ্যে কায়রোয় সমবেত হইলে সুলতান ঈনাল জেম্‌স-এর দাবি মানিয়া লন এবং তাঁহাকে সাইপ্রাসের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। অতঃপর একটি মিসরীয় নৌবহরের সমর্থনসহ জেম্‌সকে সাইপ্রাস পাঠাইয়া দেওয়া হয়। জেম্‌স নিকোশিয়া দখল করেন, কিন্তু শারলট অধিকৃত চেরিনেস (কাল'আত) শারীন দখল করিতে ব্যর্থ হন। যুদ্ধে মাম্‌লূক সেনাদলের বিপুল ক্ষতিসাধিত হয়, মামলূক বাহিনীর বৃহত্তর অংশ মিসরে ফিরিয়া আসে।

বিভিন্ন তথ্যসূত্র হইতে জানা যায়, সুলতান ঈনাল একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন এবং তাঁহার শাসনকালে দেশ মুখ্যত তাঁহার মুদ্রা সংস্কারের ফলে সমৃদ্ধি লাভ করে। নির্দিষ্ট মান অপেক্ষা কম ওজনের রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রা বাজার হইতে প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয় এবং নূতন মানের (৮ ফাল্‌স - ১ দিরহাম) একটি ফাল্‌স মুদ্রা চালু করা হয়। আট বৎসর রাজত্বের পর ৮০/৮১ বৎসর বয়সে ১৫ জুমাদা'ল-উলা, ৮৫৬/২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৪৬১ সনে ঈনাল ইনতিকাল করেন। তাঁহার গায়ের রং ছিল কালো, গড়ন হাল্‌কা, শরীর দীর্ঘকায়; বিরল শ্মশ্রুমণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার ডাকনাম হয় 'আজরূদ'। তিনি দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া যান।

সুলতান ঈনালের ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার পুত্র আহমাদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন, তাঁহার উপাধি ছিল আল-মালিকু'ল-মু'আয়্যাদ। কিন্তু খোশকাদাম (দ্র.)-কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিবার জন্য মাত্র ৪ মাস পরে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন হাজার, ইনবা'উল-গুমার, পাণ্ডু. আয়াসোফিয়া ২৯৭৪, পত্রক ৩৩৪a, ৩৭৬a, ৩৯৩a, ৩৯৬a; (২) মাকরীযী, সুলূক, পাণ্ডু. আয়াসোফিয়া ৩৩৭২, ৪র্থ. পত্রক ১৫১ f.; (৩) ইব্‌ন তাগরীবিরদী, নুজূম, সূচীপত্র; (৪) ঐ লেখক, হাওয়াদিছ, সম্পা. Popper, ii, iii, index; (৫) ঐ লেখক, মানহাল, পাণ্ডু. তৃতীয় আহমাদ ৩০১৮, পত্রক ১৭১b; (৬) ঐ লেখক, মাওরিদু'ল-লাতাফা, সম্পা. Carlyle, 129-32 (text); (৭) কিতাব তা'রীখ আল-মালিকি'ল-আশরাফ কাইতবায়, Paris, Bibl. Nat., MS. ar. 5916, fals. 68b-70 a; (৮) আস-সাখাবী, ওয়াজীযু'ল-কালাম, পাণ্ডু. কোপরুলু ১১৮৯, পত্রক ৯৭ b, ৯৯a, ১০৬a, ১১৩b, ১২৭b, ১২৯a, ১৩২b, ১৪০a; (৯) ঐ লেখক, আত্-তিবরু'ল-মাসবূক, বূলাক ১৮৯৬ খৃ., পৃ. ৪৩০ প্র.; (১০) ঐ লেখক, দাও', কায়রো ১৩৫৪ হি., ২খ., ৩২৮ প.; (১১) ইব্‌ন ইয়াস, বাদা'ইউ'য-যুহূর, কায়রো ১৩১১ হি., ২খ, ৪৪, ৪৮, ৫০-২, ৫৯, ৬৩-৫; (১২) ঐ লেখক, জাওয়াহিরু'স-সুলূক..., পাণ্ডু. তৃতীয় আহমাদ ৩০২৬, পত্রক ১২০a-১২১b; (১৩) ফারীদুন, মুনশা'আত, ১খ ২৩৫-৯; (১৪) L. de Mas-Latrie, Histoire de l'ile de chypre, iii, Paris 1855 (doc. et mem.), 73-5, 86, 96, 98, 99f., 103f., 108f.; (১৫) Abbe de vertot, Hist. des Chevalers Hospitaliers..., iii, Paris 1778, 10f., 13, 16; (১৬) P. Balog, The Coinage of the Mamluk Sultans of Egypt and Syria, New York (Am. Num. Soc.) 1964, 330-7 (অন্যান্য মুদ্রা Istanbul Arkeoloji Muzesi সংগ্রহে রক্ষিত আছে, নং. ৮৫৫-৬)।

M.C. Sehabeddin Tekindag (E.I.[2])/ শায়খ ফজলুর রহমান

**ঈফরান, বানূ** (يفرن) : (অথবা ইফ্‌রান, ইফ্‌রান, উফ্‌রান, উফ্‌রান ইত্যাদি) বানূ ঈফরান বিশাল বারবার গোত্র যেনাতা (যেনাতা দ্র.)-র সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সাবিক ইব্‌ন সুলায়মান আল-মাতমাতী, হানী ইব্‌ন মাসদূর আল-কূমী এবং কাহলান ইব্‌ন আবী লুওয়া এই তিনজন বারবার কুলজীবিদের লেখা (বর্তমানে বিলুপ্ত) অনুসারে, ইব্‌ন খালদূনও যাঁহাদের রচনাকে উৎস হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন বানূ ঈফরান গোত্র আদীদাত-এর পুত্র ওয়ারদীরান (অথবা ওয়ারশীক), তৎপুত্র যাকিয়া, তৎপুত্র মিসরা, তৎপুত্র ঈসলিতান (অথবা যাস্‌লিতান-এর অধস্তন বংশধর)। একই বর্ণনা অনুসারে যাকিয়া ছিলেন দাম্মার (দেমমের) নামে পরিচিত একটি বারবার গোত্রের পূর্বপুরুষ। দাম্মার ছিলেন দেমমের-এর সহোদর ভ্রাতা এই দাম্মারের নাম অনুসারেই উক্ত গোত্রের নামকরণ হয়। পক্ষান্তরে ঈসলিতানের অধস্তন বানূ ঈফরানের অন্যান্য জ্ঞাতি গোত্রের নাম হইতেছে মাগরাওয়া, বানূ ঈরনিয়ান ও বানূ ওয়াসীন। এই বর্ণনা মধ্যযুগে বারবারদের নিকট সাধারণভাবে গৃহীত হইলেও ইহার পাশাপাশি ইব্‌ন খালদূনের অন্য একটি বর্ণনাও রহিয়াছে যাহা এই বর্ণনা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রামাণিক বলিয়া মনে হয়। কারণ উহা ঈফরান গোত্রেরই একজন তথ্য প্রদানকারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত। ইব্‌ন খালদূন এই বর্ণনা গ্রহণ করেন ইব্‌ন হাযম (দ্র.)-এর জামহারা হইতে, যাহা ইব্‌ন হাযম গ্রহণ করিয়াছিলেন স্পেনীয় ঐতিহাসিক য়ূসুফ আল-ওয়াররাক (মৃ. ৩৬৩/৯৭৩)-এর বর্ণনা হইতে। এই শেষোক্ত পণ্ডিত অর্থাৎ য়ূসুফ আল-ওয়াররাক ঈফরান গোত্র সম্পর্কীয় তাঁহার এই বর্ণনা পাইয়াছিলেন আবূ যায়ীদ মাখলাদ ইব্‌ন কায়দাদ (দ্র.)-এর পুত্র আয়্যূবের নিকট হইতে। তিনি কর্ডোভায় এই আয়্যূবের সাক্ষাত পান, যখন আয়্যূব কর্ডোভায় তাঁহার পিতা কর্তৃক উমায়্যা খলীফা তৃতীয় 'আবদু'র-রাহমানের দরবারে এক মিশনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বানূ ঈফরান-এর ব্যুৎপত্তি সম্পর্কিত এই দ্বিতীয় বর্ণনা, যাহাকে 'গোত্রীয়' বর্ণনা হিসাবেও আখ্যায়িত করা যায় উহা আল-মাতমাতী, আল-কূমী এবং কাহলান ইব্‌ন আবী লুওয়া এই তিন বারবার কুলজীবিদের লিখন হইতে প্রাপ্ত প্রথম বর্ণনা হইতে খুব ভিন্ন নয়। আয়্যূবের বর্ণনা অনুসারে বানূ ঈফরান গোত্র ঈসলিতানের পুত্র 'ঈফরী'-র অধস্তন বংশধর এবং তাঁহার নাম অনুসারেই এই গোত্রের নাম। 'ঈফরী'-র ঊর্ধ্বমুখী বংশতালিকা এইরূপ : ঈফরী, তাঁহার পিতা ঈসলিতান, তাঁহার পিতা মিসরা, তাঁহার পিতা ওয়ারসীক (অথবা ওয়ারশীক), তাঁহার পিতা যাকিয়া, তাঁহার পিতা আদীদাত, তাঁহার পিতা জানা। এই জানা-এর নাম অনুসারেই যানাতা গোত্রসমূহের নামকরণ হইয়াছে। আমরা আরও জানিতে পারি যে, ঈফরান গোত্র সম্পর্কীয় আয়্যূবের বর্ণনাতেও বানূ মাগরাও (বানূ মাগরাওয়া), বানূ ঈরনিয়ান ও বানূ ওয়াসীন গোত্রসমূহকে বানূ ঈফরানের জ্ঞাতি-গোত্র হিসাবে এবং দাম্মারকে যাকিয়ার ভাই হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্বশেষে বলা যায়, ইবাদী ঐতিহাসিক আবূ যাকারিয়া আল-ওয়ারজলানীর (৫৪৪/১১৩০-৯১-এর পরবর্তী সময়ের) মতানুসারে বানূ ঈফরান এবং বানূ ওয়াসীন জ্ঞাতি-গোত্র ছিল এবং উভয় গোত্র একত্রে মিলিত হইয়া যে গোত্র গঠন করে সেই মিশ্র গোত্রের নাম বানূ তীজাত। ইব্‌ন খালদূনের মতে যে নামের অনুসরণে ঈফরান গোত্রের নামকরণ হইয়াছে সেই নাম অর্থাৎ ঈফরী মূলত বারবার শব্দ 'ইফরি' হইতে আসিয়াছে যাহার অর্থ "বিরাট গভীর ও অন্ধকার গুহা" (আধুনিক বারবার আঞ্চলিক ভাষাসমূহে ইহার বিভিন্ন রূপ যেমন ইফরি, আফরা, উফরা এবং ইহার ক্ষুদ্রত্ববাচক রূপ তিফরিত ইত্যাদি প্রচলিত আছে যাহার অর্থ গুহা, গুহার মত ঘর, লুকাইবার স্থান ইত্যাদি)।

বানূ ঈফরান সম্পর্কে প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় উত্তর আফ্রিকায় মুসলমানদের বিজয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ে অর্থাৎ বলিতে গেলে ১ম/৭ম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে। প্রাচীন কালের গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের নিকট ঈফরান গোত্রের নাম অজানা ছিল, এমনকি ৬ষ্ঠ শতকের গ্রীক ও ল্যাটিনভাষী বায়যান্টীয় লেখকদের কাছেও বানূ ঈফরানের সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না। উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম বিজয়ের সময়ে বানূ ঈফরান বিশাল যানাতা বংশের সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তিশালী গোত্র ছিল। ইব্‌ন খালদূনের মতে ইফরীকিয়া, আউরেস এবং কেন্দ্রীয় মাগরিব অঞ্চলে তাহাদের শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া ছিল। পরবর্তী কালে ১ম/৭ম শতাব্দীর শেষের দিকে বানূ ঈফরান সমগ্র পূর্ব বারবার অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গোত্র হিসাবে বিকাশ লাভ করে। বানূ ঈফরান গোত্র মাগরাওয়া, যানাতা ও বুত্‌র-এর অন্যান্য কয়েকটি গোত্রের সহিত একত্রে জারাওয়া

গোত্রের নেতৃত্বাধীন বৃহৎ বারবার গোত্র সংঘে যোগদান করে, যাহার প্রধান ছিলেন রাণী ও ধর্মনেত্রী 'কাহিনা' (দ্র.)। মনে হয় এই সময়ে জারাওয়া গোত্র আউরেস অঞ্চলে বসবাস করিত এবং বানূ ঈফরানের প্রধান অংশ বর্তমান তিউনিসিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করিয়াছিল। বানূ ঈফরান গোত্র রাণী কাহিনার সহিত এত বেশী ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল যে, ইব্ন ইযারী কর্তৃক উল্লেখিত এক বারবার বিবরণীতে এই গোত্রের পূর্বপুরুষ ঈফরানকে কাহিনার পিতা হিসাবে বর্ণনা করা হয়। অধিকন্তু ইহা খুবই সম্ভব যে, সূচনায় বানূ ঈফরান পূর্বাঞ্চলীয় কতকগুলি বারবার গোত্রের বিভিন্ন শাখার কেবল একটি সংঘ ছিল এবং মনে হয়, তাহা খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অথবা ৭ম শতকের প্রথমার্ধে গড়িয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে ৬ষ্ঠ শতকের করিপাশের (Corippus) Iohannis নামক গ্রন্থে পূর্বাঞ্চলীয় বারবার গোত্রসমূহের পূর্ণ বিবরণ রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে বানূ ঈফরান নামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ করিপাশের Iohannis একখানি সুপরিচিত ল্যাটিন উৎস গ্রন্থ, যাহাতে বায়যান্টীয় সাম্রাজ্য কর্তৃক বারবারদের দেশ পুনর্দখলের সময় পূর্ব বারবার এলাকায় বসবাসকারী সকল জনগোষ্ঠীর প্রায় পূর্ণ তালিকা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

সত্য কথা বলিতে কি, বানূ ঈফরান নামে পরবর্তী সময়ে যে গোত্র সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার কেন্দ্রস্থলে ছিল এই বানূ ঈফরান গোত্র; যদিও সূচনাপর্বে ইহা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বা উল্লেখযোগ্য গোত্র ছিল না। কালক্রমে বায়যান্টীয় আধিপত্যের সময়ে অথবা ত্রিপোলিতানিয়া ও মূল ঈফরীকিয়্যা (উত্তর আফ্রিকা) অঞ্চলে 'আরবদের প্রথম আক্রমণের সময়ে এই ঈফরান গোত্র নিজদিগকে বারবার গোত্রসমূহের অনেক শাখার নেতৃপদে আসীন করিতে সমর্থ হয়। এই জনগোষ্ঠী প্রথম যে এলাকায় বসবাস করিত তাহা পশ্চিম ত্রিপোলিতানিয়ার অন্তর্গত, এই স্থানটিকে সকল যানাতা গোত্রের আবাসভূমি বলিয়া অনুমান করা হয়। ২য়/৮ম শতাব্দী এবং ৩য়/৯ম শতাব্দীর আরব বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় এই এলাকাকে 'আরদ যানাতা বা যানাতাদের ভূমিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইব্ন 'আবদি'ল-হাকাম তাঁহার মাগ রিব বিজয়ের বর্ণনায়ও এই অঞ্চলের জন্য এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই সময় যানাতা বংশ কেবল পশ্চিম ত্রিপোলিতানিয়ার ভিতরের এলাকাতেই বসবাস করিত না, উপকূলবর্তী শহর সাবরা (প্রাচীন নাম সাবরাথ) এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বের অঞ্চল জুড়িয়াও তাহাদের বসতি ছিল, যেখানে ১২৩/৭৪১ সালে তাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যানাতা অধ্যুষিত এই এলাকার পূর্ব সীমান্ত ঘিরিয়া ছিল আরদ হাওওয়ারা বা হাওয়ারাদের বাসভূমি, ত্রিপোলিতানিয়ার সমগ্র মধ্যভাগ যাহার অন্তর্গত ছিল। এই দুই ভূমির মধ্যবর্তী সংযোগস্থলেই যাহা বর্তমান য়েফ্রেন (য়েফ্‌রেন) জিলার অন্তর্ভুক্ত, এই বারবার গোত্র বানূ ঈফরান (অথবা য়াফরান) বসবাস করিত। কেহ কেহ তাহাদেরকে যানাতাদের অংশ বলিয়া মনে করে, আবার কাহারও মতে তাহারা হাওওয়ারাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বানূ ঈফরানের আদি ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে প্রায় ৩য়/৯ম শতকের মধ্যভাগে 'আরবদের বর্ণনায় প্রথম তাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায় নাফূসাদের পূর্বদেশীয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। খুবই সম্ভব যে, পশ্চিম ত্রিপোলিতানিয়ার এই বানূ ঈফ্‌রানরা বৃহৎ যানাতা গোত্রসংঘের বিক্ষিপ্ত কিছু অংশ ছিল, উক্ত যানাতা গোত্রসংঘের মূল অংশ যখন 'আরবদের ত্রিপোলিতানিয়া দখলের সময়ে আরও পশ্চিমদিকে পাড়ি জমাইয়া বর্তমান তিউনিসিয়া অঞ্চলে চলিয়া যায়, তখন য়েফ্‌রেন এলাকাতেই এই বানূ ঈফ্‌রান বসবাস করিতে থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইব্ন খালদূন, বানূ ঈফ্‌রান গোত্রের পূর্বপুরুষ এবং যাঁহার নাম অনুসারে উক্ত গোত্রের নামকরণ হইয়াছে সেই ঈফ্‌রীর সহিত বারবার শব্দ ইফরি (যাহার অর্থ 'গভীর গুহা')-র সম্পর্ক দেখাইয়াছেন। শব্দের এই ব্যুৎপত্তি যদি সঠিক হয় তবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বানূ ঈফ্‌রান গোত্র সংঘের (অথবা বলা যাইতে পারে ইহার কেন্দ্রস্থলে অবস্থানকারী বানূ ঈফ্‌রান গোত্রের) এই নাম হওয়ার কারণ ছিল এই যে, প্রথমদিকে যানাতা বংশের অন্তর্ভুক্ত লোকেরা গুহাবাসী ছিল। এখন জানা গিয়াছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব তিউনিসিয়া ও পশ্চিম ত্রিপোলিতানিয়ার ভিতরের অঞ্চলে অবস্থিত জাবাল-দেমমের (দাম্মার), জাবাল নাফূসা ও গারিয়ান প্রভৃতি পার্বত্য জিলায় নূতন ও পুরাতন প্রচুর গুহা রহিয়াছে (J. Despois, Djebel Nefousa, 202-206) এবং বানূ ঈফ্‌রান গোত্র যে আরদ যানাতা বা যানাতা ভূমির এই অঞ্চল হইতে আগত এই ধারণার বিরুদ্ধে কিছু পাওয়া যায় না। বারবারদের বিশেষভাবে ঈফ্‌রানদের বর্ণনাসমূহকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের আদি বাসভূমি সম্পর্কে বর্ণনার এই মিল আরও সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এইভাবে ঈসলিতান (য়াসলিতান- ইফ্‌রানের এক জ্ঞাতিগোত্র) নামের সহিত ইয্‌লিতেন (যলিতেন) শহরের যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব। এই শহর Leptis Magna-এর ধ্বংসাবশেষের পূর্বদিকে ত্রিপোলিতানিয়ার উপকূলে অবস্থিত, যাহা মধ্যযুগে হাওওয়ারা অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। ঈফরী-র পিতামহ মিসরা-র নামের সহিত মিসরাতা গোত্রের নামকে নিশ্চিতভাবেই যুক্ত করা যায়। মধ্যযুগীয় বারবার কুলজীবীদের মতে, এই গোত্র হাওওয়ারাদের একটি শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং মধ্য ত্রিপোলিতানিয়ায় 'আর্‌দ হাওওয়ারা' উপকূলীয় অঞ্চলের পূর্বতম অংশ জুড়িয়া বসবাস করিত। মধ্যযুগে এই গোত্রের প্রধান কেন্দ্র ছিল সুওয়ায়কাত ইব্ন মাছ্‌কূদ-এর শহর, যাহার বর্তমান নাম মিসুরাতা। ত্রিপোলিতানিয়ার এই দুই স্থান হইতে ঈফ্‌রান/য়াফ্‌রানদের ৩য়/৯ম শতকের বাসভূমি য়েফ্‌রেন (য়াফ্‌রেন) জিলার অবস্থান খুব বেশী দূরে নয়।

বানূ ঈফ্‌রানের প্রপিতামহ যাকিয়ার নাম হইতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সম্ভবত বানূ ঈফ্‌রান সংঘের অন্তর্ভুক্ত বারবার গোত্রসমূহে লুওয়াতা (দ্র.) গোত্রেরও কিছু অংশ ছিল। এই লুওয়াতা গোত্র 'আরবদের উত্তর আফ্রিকা বিজয়ের সময় প্রাচীন মারমারিকা এবং সাইরেনাইকা অঞ্চল জুড়িয়া বসবাস করিত। মনে হয়, যাকিয়া নাম হইতেই প্রকৃতপক্ষে 'আর্‌যাকিয়া' স্থানের নামকরণ হইয়াছে। আল-বাক্‌রীর মতে এই স্থানটিই লুওয়াতাদের দেশের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত আওজিলা/জালো মরূদ্যানের প্রধান বসতি এলাকা। খুব সম্ভব এই 'আর্‌যাকিয়্য' নাম দুইটি শব্দ-উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছে—একটি যাকিয়া, যাহা বারবার কুলজীবিদদের বর্ণিত বানূ ঈফ্‌রানদের পূর্বপুরুষ 'যাকিয়া' নামের রূপ, আর অন্য উপাদানটি হইতেছে 'আর'। এই দ্বিতীয় উপাদান অর্থাৎ 'আর' শব্দাংশটি প্রাচীন লিবীয় গোত্র 'আরযুগিতানি' (আর-যুগ-ইতানি) নামের ভিতরও পাওয়া যায়। এই আরযুগিতানি গোত্রের নাম ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের বর্ণনায় 'যাউকেস' (Zaukes) এবং 'আরব ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় 'যাওয়াগা' হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এই শব্দ-উপাদান 'আর্' সম্ভবত 'ওয়ার' শব্দাংশের সহিত সম্পর্কিত, যাহা কিছু সংখ্যক বারবার গোত্র ও ব্যক্তির নামের পূর্বে যুক্ত হইয়াছে (উদাহরণস্বরূপ

তুলনীয় ঃ ব্যক্তিবাচক 'আরবী নাম 'যায়দান' হইতে ওয়ার্‌যায়দান) কিন্তু ইহার অর্থ ও তাৎপর্য এখনও পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হয় নাই (দেখুন T. Lewicki, Etudes ibadites nord-africaines, 45-46)।

**ত্রিপোলিতানিয়া** ঃ বানূ ঈফ্‌রান নামের বৃহৎ গোত্র সংঘের মূল অংশ ৩য়/৯ম শতকে যখন দেশত্যাগ করিয়া পশ্চিম ত্রিপোলিতানিয়া হইতে বর্তমান তিউনিসিয়া এবং আউর্‌স অঞ্চলে চলিয়া যায়, তখন বানূ ঈফ্‌রান নামে এক অংশ মূল এলাকাতেই থাকিয়া যায়। পশ্চিম ত্রিপোলিতানিয়ার এই বানূ ঈফরান গোত্র সেই সময়ের সর্বাপেক্ষা বেশি শক্তিশালী পশ্চিম ত্রিপোলিতানিয়ার বারবার জনগোষ্ঠী নফ্‌সা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। তাহের্‌ত-এর রুস্তামপন্থী ইমামদের সমর্থক না হইয়াও তাহারা ইবাদী ফিরক'ভুক্ত ছিল। তাহারা ত্রিপোলিতানিয়ার ইবাদী নেতা খালাফ্‌ ইবনু'স-সাম্‌হে'র পক্ষ সমর্থন করিত যিনি বানূ রুস্তামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে ৫ম/১১শ শতকেও নুক্কারী গোষ্ঠীর সহিত খালাফী 'ফিরকা য়েফ্‌রেনের জনসংখ্যার একটি অংশ ছিল (দেখা যায় যে, ৪র্থ/১০ম শতকের প্রথমার্ধে নুক্কারী মতবাদ সকল ঈফ্‌রানী গোত্রের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল)। ৬ষ্ঠ/১২শ শতকে য়েফ্‌রেন দল রুস্তামী ইমামদের পূর্বতন সমর্থক ইবাদী ওয়াহ্‌বীদের উদার মতবাদে দীক্ষিত হয়। বিভিন্ন শাসক বংশ পালাক্রমে পূর্ব বারবার রাজ্য শাসন করিলেও "ওয়াতান য়াফ্‌রান" বা য়াফ্‌রান ভূমির জনগণ 'আওন ইব্‌ন হারীয্‌ পরিবারভুক্ত এবং মুকাদ্দাম উপাধি দ্বারা পরিচিত তাহাদের অধীনে থাকিয়া দীর্ঘকাল যাবত সাফল্যের সহিত স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য প্রচেষ্টা চালাইয়া যায়।

**ইফ্‌রীকিয়্যা** ঃ ইফ্‌রান গোত্রসমূহ যখন দেশ ত্যাগ করিয়া ইফ্‌রীকিয়্যা গমন করে, তখন বারবার গোত্র উদ্ভূত মাগীলা' (দ্র.) (হেরোডোটাসের বর্ণনায় ম্যাকলাইস-Machlyes)-র কয়েকটি দলও তাহাদের সহিত যোগদান করে। এক সময় এই দলগুলি বানূ ঈফ্‌রান গোত্র-সংঘে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু পরে তাহারা সংঘ হইতে বাহির হইয়া আসে এবং আলাদা একটি গোত্র গঠন করে। বানূ ঈফ্‌রানের সহিত এই 'মাগীলা'দের মিলিত গোত্র হইতে ঈফ্‌রীকিয়্যা ও মধ্য-মাগ্‌রিব রাজ্যের বানূ ঈফ্‌রানের নেতা আবূ কু'র্‌রা আল-ঈফ্‌রানী' (কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী আল-মাগীলী)-র অভ্যুদয় ঘটে। তিনি ২য়/৮ম শতকের প্রথম ও মধ্যভাগে উত্তর আফ্রিকার 'সুফ্‌রী'দেরও প্রধান নেতা হন। প্রকাশ্যত ১১১/৭২৯-৩০ সাল হইতেই তিনি ঈফ্‌রানী গোত্রসমূহের নেতৃত্বে ছিলেন। ১৫১/৭৬৮-৬৯ সন পর্যন্ত সাফল্যের সহিত তিনি বানূ ঈফ্‌রানের উপর তাঁহার দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের নেতৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখেন। যে বারবার গোত্র সংঘ রাণী কাহিনার নেতৃত্বাধীন ছিল তাহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল জারাওয়া ও মাগ'রাওয়াসহ বানূ ঈফ্‌রান গোত্র। কাহিনার মৃত্যুর পর এবং এই গোত্র সংঘের পতনের মাত্র সিকি শতাব্দী পর ইতিহাসে আবূ কু'র্‌রা আল-ঈফরানীর অভ্যুদয় ঘটে। ইব্‌ন 'আবদি'ল-হাকামের মতানুসারে ১২৪/৭৪১-৪২ সালে সুফ্‌রী নেতা 'আবদু'ল-ওয়াহিদ যখন কায়রাওয়ানে অভিযান পরিচালনা করেন, তখন আবূ কুর্‌রা (আল-মাগীলী) তাঁহার সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দলের অধিনায়ক ছিলেন। বানূ ঈফ্‌রানের মূল অংশ এই সময় পর্যন্ত সম্ভবত আউরেসের নিকটবর্তী ঈফ্‌রীকিয়্যা অঞ্চলে ছিল, যাহা ছিল রাণী কাহিনার শাসিত রাজ্যের কেন্দ্রস্থল। ধারণা করা যাইতে পারে যে, এই গোত্র ওয়ারফাজজূমা'র সুফ্‌রী অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করিয়াছিল—যাহারা ১৩৯/৭৫৭ সালে কায়রাওয়ান শহর দখল করে। ত্রিপোলিতানিয়ার ইবাদী ইমাম আবু'ল-খাত্তাব 'আবদু'ল-আ'লা ইব্‌নু'স-সাম্‌হ্‌ আল-মা'আফিরী ১৪১/৭৫৮-৫৯ সালে যখন ওয়ারফাজ্‌জূমাকে কায়রাওয়ান হইতে বহিষ্কার করেন এবং ঈফ্‌রীকিয়্যাকে তাঁহার রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করেন, তখন সেই দেশের সুফ্‌রী বারবার গোত্রসমূহ তাহাদের ইবাদী শত্রুদের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া কেন্দ্রীয় মাগ্‌রিব রাজ্যের দিকে যাইতে আরম্ভ করে। তাহাদের এই দেশত্যাগ ১৪৪/৭৬১-৬২ সালের পরে অর্থাৎ 'আরব সেনাপতি ইব্‌নু'ল-আশ'আছ কর্তৃক পূর্ব বারবার রাজ্য পুনর্দখলের পরে, যে কারণে তিনি খারিজী, ইবাদী ও সুফ্‌রী প্রভৃতি বারবার উপজাতির সাধারণ শত্রুতে পরিণত হইয়াছিলেন, নিঃসন্দেহে ব্যাপক আকার ধারণ করে। প্রকাশ্যত এই সময়েই ১৪০/৭৫৭-৫৮ এবং ১৪৪/৭৬১-৬২ সালের মধ্যে আবূ কু'র্‌রা আল-ঈফ্‌রানী আল-মাগীলীর নেতৃত্বে ঈফ্‌রান গোত্রসমূহের প্রধান অংশ দেশ ত্যাগ করিয়া কেন্দ্রীয় মাগ্‌রিব রাজ্যে গমন করে।

আবূ কুর্‌রার নেতৃত্বে ঈফ্‌রান গোত্রদের দেশ ত্যাগের পর তাহাদের যেসব শাখা ঈফ্‌রীকিয়্যাতেই বসবাস করিতে থাকে তাহাদের ইতিহাস সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। ইব্‌ন খালদূন দাবি করেন যে, এই প্রদেশে 'মারানজীসা' এবং 'বানূ ওয়ারকূ (ওয়ারকো) এই দুই ঈফ্‌রান গোত্র ছিল। এই গোত্রগুলি কায়রাওয়ান এবং তিউনিসের মধ্যবর্তী দেশে বিলাদু'ল-জারীদ এবং আউরেস স্তেপ-পর্বত অঞ্চলে বসবাস করিত। মনে হয় তাহারা ইবাদী ধর্মমতে দীক্ষিত হয় এবং নুক্কারী দলের মতবাদ গ্রহণ করে। উত্তর আফ্রিকায় ফাতিমী শাসন ধ্বংসকারী নুক্কারী বিদ্রোহের নেতা আবূ য়াযীদ মাখ্‌লাদ ইব্‌ন কায়দাদ তাঁহার বংশ তালিকায় বানূ ওয়ারকূ গোত্রে তাঁহার জন্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই গোত্রের নাম অর্থাৎ ওয়ারকূ এবং আল-ইদরীসীর বর্ণিত লোরবিয়াস (Lorbeus) হইতে আল-মাসীলাগামী রাস্তায় অবস্থিত স্থান 'আরকূ' নামের সূত্র একই। ওয়ারকূ গোত্রের একটি শাখা বিলাদু'ল-জারীদের অন্তর্গত সাদাদায় (বর্তমানে সদাদা), বানূ ওয়াসীন (অন্য রূপ বিসয়ান Wisyan) গোত্রের খুব কাছাকাছি বসবাস করিত। বারবার কুলজীবিদদের মতে বানূ ঈফ্‌রানের একটি জ্ঞাতি-গোত্র বানূ ওয়াসীন। ইহারা ঘটনাক্রমে সকলেই ইবাদী ওয়াহ্‌বী মতবাদে বিশ্বাসী। বানূ ওয়ারকূ গোত্র আবূ য়াযীদ ইব্‌ন কায়দাদকে সাহায্য করে। ফলে তাঁহার মৃত্যুর পর এবং নুক্কারী বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর ফাতিমী সরকার যখন প্রতিশোধ গ্রহণ করে তখন বানূ ওয়ারকূকে তাহা সহ্য করিতে হয়। তখন হইতেই উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস হইতে তাহাদের নাম সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া যায়। ইবাদী ইতিহাসে বানূ ওয়াসীন এবং বানূ ঈফরানের মধ্যে সংঘটিত একটি যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই যুদ্ধ বিলাদু'ল জারীদ এবং 'যাব' এলাকায় ৩৬২/৯৭২-৭৩ সালে সংঘটিত হইয়াছিল। সম্ভবত বানূ ওয়ারকূর সহিত ইহার কোন যোগ আছে। আবূ য়াযীদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হইবার পর বানূ ওয়ারকূর গোত্র মারানজীসা তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকখানি হারাইয়া ফেলে। তবে তাহারা সমূলে উৎপাটিত হয় নাই। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন 'আরবী বর্ণনায় তাহাদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই সময় পর্যন্তও তাহারা যাযাবর হিসাবেই জীবন যাপন করিয়াছে এবং কায়রাওয়ান

ও তিউনিস শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল তাহাদের বিচরণ ক্ষেত্র। কৃষিকাজেও তাহারা নিয়োজিত ছিল। ইহা খুবই সম্ভব যে, ৩য়/৯ম শতকে আস-সিবখা (সেব্খা সিদি হানি)-র নিকটে বসবাসকারী যানাতা বংশ এবং ইবাদী ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক উল্লেখিত যানাতা বংশ মারানজীসার একটি শাখা ছিল। অনুরূপভাবে ঈফরানদের যে অংশের নাম অনুসরণে ঈফরান অন্তরীপ নাম হইয়াছে (ঈফ্‌রান অন্তরীপ কার্থেজের পূর্ব দিকে অবস্থিত, আল-ইদরীসী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন) তাহারাও মারানজীসা শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। আল-মুওয়াহহিদ (১১৫৯-৬০ খৃ.) কর্তৃক ঈফ্রীকিয়্যা দখলের পর মারানজীসাদের অবস্থার পতন শুরু হয়। কারণ তিনি এই গোত্রের উপর কর ধার্য করেন এবং যুদ্ধ করিবার জন্য এক নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক সুলতানের নিকট সরবরাহ করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করেন। পরবর্তী কালে তাহারা 'আরব গোত্রদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। ৮ম/১৪শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আসিয়া হাফ্সী সুলতানদের অধীনে মারানজীসাদের অবস্থার উন্নতি ঘটে।

**ওয়ারগলাঃ** মনে হয় আবূ য়াযীদের বিদ্রোহ যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত, তখন বানূ ঈফরানের একটা অংশ, যাহা সম্ভবত বিলাদু'ল-জারীদ হইতে আগত বানূ ওয়ারকূর অন্তর্ভুক্ত ছিল, ওয়ারজলান (ওয়ারগলা) মরূদ্যানের দিকে চলিয়া যায়। স্থানটির সহিত বিলাদু'ল-জারীদের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায় সম্পর্ক ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইবাদী ঘটনাপঞ্জীর বর্ণনায় ওয়ারগলা মরূদ্যানে ঈফ্রান নামের একটি গ্রামের উল্লেখ আছে (অন্যরূপ ঈফরান, ঈফরান অথবা ফারান)। সম্ভবত বানূ ঈফরান গোত্রের নাম হইতেই এই গ্রামের নাম হইয়াছে। এই গ্রামটির অবস্থান খেফীফ এবং 'আরীফজীর মধ্যে— বর্তমান ওয়ারগলা শহর হইতে ২০ কিলোমিটার উত্তরে। বর্তমানে এখানে কোন জনবসতি নাই। বিভিন্ন সূত্রে ইহার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ৪০৯/১০১৮-১৯ সালের অল্প পরে।

**কেন্দ্রীয় মাগরিব ঃ** যে সকল ঈফ্রানী গোত্র ২য়/৮ম শতকের মধ্যভাগে কেন্দ্রীয় মাগরিব এলাকায় গমন করিয়া আবূ কুররা আল-ঈফ্রানী আল-মাগীলীর নেতৃত্বে বসবাস করিতে থাকে, তাহারা সম্ভবত ১৪০/৭৫৭-৫৮ এবং ১৪৮/৭৬৫-৬৬ সালের মধ্যে একটি সুফরী রাজ্য স্থাপন করে, যাহার রাজধানী ছিল তেলেমসেন (Tlemcen) শহর। নবাগতরাই একটি প্রাচীন রোমান শহরের পাশে এই শহরটি গড়িয়া তোলে। ১৪৮/৭৬৫ সালে আবূ কুররাকে সুফরীদের খলীফা বা ইমাম বলিয়া ঘোষণা করা হয়। মজার কথা এই যে, আল-বাক্রীর (১০৬৭-৬৮ খৃ.) সময়েও তেলেমসেন শহরের পাঁচটি দরজার মধ্যে একটির নাম ছিল বাবূ আবী কুররা' বা আবী কুররার দরজা, যাহা সম্ভবত শহরের প্রতিষ্ঠাতার নাম হইতেই আসিয়াছে। আবূ কুররার আধিপত্য তেলেমসেন হইতে বানূ রাশিদ পর্বত, এমনকি সুদূর তাহেরত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্যে বসবাসকারী বারবার গোত্রসমূহের মধ্যে বানূ ঈফ্রান গোত্রের পাশাপাশি ছিল আবূ কুর্‌রা'র গোত্র মাগীলা-ও, যাহাদের বসতি গড়িয়া উঠে তেলেমসেন শহরের উপকণ্ঠে। ইহা বানূ ঈফরানের তুলনায় ক্ষুদ্র একটি সুফরী গোত্র ছিল এবং ১৪৮/৭৬৫ সালে ইবনু'ল আশ'আছের বিরুদ্ধে তাহাদের যুদ্ধের সময় বানূ ঈফরান গোত্রকে সহযোগিতা প্রদান করে। যে জারাওয়া গোত্র একদা বানূ ঈফ্রান এবং মাগরাওয়া গোত্রের সহিত একত্রে রাণী কাহিনার রাজ্যের মূল শক্তি ছিল, তাহারই একটি অংশ আবূ কুর্‌রার অনুগত ঈফ্রানী গোত্রগুলির অনুসরণ করিয়া কেন্দ্রীয় মাগরিব রাজ্যে গমন করে। এই গোত্রের নাম হইতেই মধ্যযুগীয় শহর জারাওয়া তাহার নাম ধারণ করে। এই শহর মুলুয়া-মোহনা হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবিস্থত ছিল এবং ইহার চারিপাশে যে সমস্ত গ্রাম ছিল, তাহাদের জনগোষ্ঠীর ভিতর অন্যান্য গোত্রের সহিত বেশীর ভাগই বানূ ঈফ্রান গোত্রভুক্ত ছিল। মনে হয় এই সময়েই মাগরাওয়া গোত্র তেলেম্‌সেন শহর এবং তাহার উপকণ্ঠে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। এই মাগরাওয়া বানূ ঈফ্রানের জ্ঞাতি গোত্র এবং রাণী কাহিনার অনুগত গোত্র-সংঘের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আবূ কুর্‌রার রাজ্য তাহার প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরই ইবনু'ল-আশ'আছ (দ্র.) কর্তৃক প্রেরিত 'আরব বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই বাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল আল-আগলাব আত-তামীমী-র নেতৃত্বে। তিনি যাব দেশের অন্তর্ভুক্ত তুবনায় তাঁহার সদর দফতর স্থাপন করিয়া প্রথমে তেলেমসেন এবং তাহার পর তানজিয়ার আক্রমণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বারবারগণ তাঁহাকে এই আক্রমণ বাতিল করিতে বাধ্য করে। শীঘ্রই সুফরী এবং ইবাদী বারবার গোত্রসমূহ একটি জোট গঠন করে, যাহাতে আবূ কুর্‌রার নেতৃত্বে বানূ ঈফ্রান গোত্র এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৫০/৭৬৭ সালে আবূ কুর্‌রার বাহিনী কায়রাওয়ান শহরের প্রাচীরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ১৫১/৭৬৮ সালে তিনি নিজেই ৪০,০০০ ঈফ্রানী অশ্বারোহীসহ তুবনা শহর অবরোধ করেন।

তুবনা অবরোধের পরে ঈফ্রানী রাজ্য তেলেমসেন সম্পর্কে খুব বেশী জানা যায় না। তবে ইহা খুবই সম্ভব যে, সীমান্তবর্তী দেশ তাহেরত-এর বানূ রুস্তামের ইবাদী রাজ্যের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। তাহেরত-এর প্রথম শাসক 'আবদু'র রাহমান ইব্ন রুস্তাম, যিনি ১৬০/৭৭৬-৭৭ অথবা ১৬২/৭৭৮-৭৯ সাল হইতে এই শহরটি শাসন করেন, তিনি তেলেম্‌সেন শহরের শাসক পরিবারের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া বানূ ঈফ্রানের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিবাহ হইতে তাহের্‌ত-এর দ্বিতীয় ইবাদী ইমাম 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব জন্মগ্রহণ করেন। এই বিবাহ অবশ্য ১৪৮/৭৬৫-৬৬ সাল অথবা তাহার পূর্বে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। কেননা ১৬৭/৭৮৪-৮৫ সালে যখন 'আবদু'র-রাহ্‌মান ইব্ন রুস্তাম ইনতিকাল করেন, তখন 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব ইতোমধ্যেই একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিতে উপনীত হইয়াছেন এবং তখনই তিনি তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে একজন ইমাম নির্বাচনের জন্য কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ছয় সদস্যবিশিষ্ট পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইহা বেশ কৌতূহলজনক ব্যাপার যে, উক্ত পরিষদের আর একজন সদস্য ছিলেন 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাবের জ্ঞাতিভ্রাতা এবং সমর্থক আবূ কুদামা য়াযীদ ইব্ন ফান্‌দীন আল-ইফ্রানী, যিনি পরে 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাবের ঘোরতর শত্রুতে পরিণত হন। তিনি ভিন্ন মতের নুক্কারী ফির্‌কার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। তিনি প্রধানত বানূ ঈফ্রান গোত্রের উপর নির্ভর করিয়া দীর্ঘদিন যাবত 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাবের সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করেন। অবশেষে ১৮৮/৮০৩-৪ সালের দিকে অথবা তাহার অল্প পরে তিনি 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাবের পুত্র আফ্‌লাহ কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। এই সময়ে আবূ কুর্‌রা-ইফ্রানী রাজ্য কয়েক বৎসর পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আবূ কুর্‌রার মৃত্যুর পর বানূ ঈফ্রান এবং মাগরাওয়া দল যখন শহরের প্রধান অধিবাসী ছিল তখন তেলেমসেন শহরের কর্তৃত্ব মাগ্‌রাওয়া নেতাদের হাতে চলিয়া যায়, যাহারা ছিলেন বানূ খাযার শাসক বংশের অন্তর্ভুক্ত।

এই বংশ মাগরিবের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করিয়া আছে। ১৭৩/৭৮৯-৯০ সালে কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে (১৭৪/৭৯০-৯১ সালে) ইদরীসী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম ইদরীস (দ্র.) কর্তৃক সেই দেশ বিজয়ের সময়ে তেলেমসেন শহরের শাসক মুহাম্মাদ ইবন খাযার ইবন সুলাত বিজয়ের সম্মুখে হাযির হন এবং প্রশংসনীয় দ্রুত আনুগত্যের দ্বারা তাঁহার নিজের জন্য এবং কেন্দ্রীয় মাগরিবের সকল যানাতা গোত্রের জন্য নিরাপত্তা অর্জন করেন। প্রথম ইদরীসের ভাই সুলায়মান তেলেমসেন শহরের ইদরীসী গভর্নর হন। যাহা হউক, এই ঘটনা ছাড়া কেন্দ্রীয় মাগরিবের অন্যান্য অবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। দেশের যানাতা গোত্রসমূহ বানূ ঈফরানের প্রাধান্য খর্ব করিয়া স্থাপিত মাগ্‌রাওয়াদের প্রাধান্য মানিয়া চলিতে থাকেন। এইভাবে বানী কাহিনার শাসনাধীন বারবার গোত্র সংঘভুক্ত জারাওয়া গোত্রের পরে এক সময়ের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাগরাওয়া গোত্র তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় মাগরিবের আকসায় ঈফরানী এবং মাগ্‌রাওয়া নেতাদের বিরোধ দীর্ঘদিন পর্যন্ত চালু ছিল। কেবলমাত্র আল-মুরাবিত বাহিনী কর্তৃক সমগ্র মাগরিব দখলের পরে যখন বানূ ঈফরান এবং মাগ্‌রাওয়াদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রহিল না, তখনই এই বিরোধের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু কেন্দ্রীয় মাগরিবের ঈফরানী গোত্রসমূহ, সুলায়মান এবং মাগ্‌রাওয়া নেতাদের শাসনাধীনে থাকিলেও ১৭৩/৭৮৯-৯০ সালের পর অনেকখানি স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। মাগরিবে ইদরীসী আমলে বানূ ঈফরান গোত্র সুন্নী আকীদায় বিশ্বাসী ছিল। কেননা ঠিক কোন সময়ে সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন হইলেও পূর্বেই তাহারা সুফ্রী বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিল। যাহাই হউক, ইবাদী বারবার কুলজীবিদ আল-বিররাযালী, যিনি মাগরিবের যানাতা গোত্রের সম্পর্কে অনেক তথ্য ইবন হায়ম (৫ম/১১শ শতাব্দী)-কে সরবরাহ করেন, বিশ্বাস করিতেন যে, বানূ ঈফরান সব সময়ই সুন্নী ছিল এবং তিনি অতীতে তাহাদের সুফ্রী থাকা সম্পর্কে কিছুই জানিতেন না।

কেন্দ্রীয় মাগরিবের ঈফরানী রাজ্য ইতিহাসে স্থান পায় ফাতিমীগণ কর্তৃক তেলেমসেন শহর হইতে ইদরীসী শাসকদের বিতাড়নের পর। এই বিতাড়ন ঘটে ৩১৯/৯৩১ সালে। দেশের সুন্নী গোত্রসমূহ আবূ যাযীদ মাখলাদ ইবন কায়দাদ আল-ঈফরানীর নুক্কারী বিদ্রোহে কোন অংশগ্রহণ করে নাই। অবশ্য ইহা অসম্ভব নয় যে, তাহাদের নেতৃবৃন্দ হয়ত কর্ডোভার উমায়্যা শাসকদের সহিত সম্পর্ক স্থাপনে তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকিতে পারেন এবং আবূ যাযীদের পুত্র আয়্যূব যখন তাঁহার পিতা কর্তৃক এক রাজনৈতিক মিশনে তৃতীয় 'আবদু'র-রাহমানের দরবারে প্রেরিত হন, তখন তিনি তাঁহাদের ভূখণ্ড হইতেই স্পেনের পথে যাত্রা করেন। সে যাহাই হউক, আবূ যাযীদ এবং ফাতিমীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের সময়ে কেন্দ্রীয় মাগরিবের বানূ ঈফরানের সংখ্যা এবং শক্তি অপরিবর্তিত ছিল। এই সময়ে তাহাদের নেতা ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-ঈফরানী যাঁহার ক্ষমতা শুধুমাত্র তেলেমসেন শহরের নিকটবর্তী ঈফরানী গোত্রদের মধ্যেই সীমিত ছিল। অন্যদিকে স্থানীয় ইদরীসী শাসকদের পতনের পর এই শহর পুনরায় মাগরাওয়াদের রাজধানীতে পরিণত হয় এবং মুহাম্মাদ ইবন খাযার ইহা শাসন করিতে থাকেন। মুহাম্মাদ ইবন খাযার মাগরাওয়া নেতাদের সেই রাজবংশের সদস্য ছিলেন যাঁহারা ১৭৩/৭৮৯-৯০ সালে তেলেমসেন শাসন করিতেন। ফাতিমী খলীফা আল-মানসূর (৩৩৪-৪১/৯৪৬-৫৩) যখন মুহাম্মাদ ইবন খাযারকে মাগরিবের এই অঞ্চলের শাসনক্ষমতা প্রদান করেন, তখন বানূ ঈফরান এবং মাগ্‌রাওয়াদের ভিতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে ফাতিমী সরকারের অধীনে চাকুরীরত এবং এই মাগ্‌রাওয়া শাখার অন্তর্ভুক্ত একজন ঈফরানী নেতা কর্তৃক মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-ঈফরানী বানূ ঈফরানের শাসক হিসাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। মাগ্‌রাওয়াদের বিরুদ্ধে সমর্থন লাভের জন্য ইবন মুহাম্মাদ খোলাখুলিভাবে নিজেকে স্পেনের উমায়্যা খলীফা তৃতীয় 'আবদু'র-রাহমানের সেবায় নিয়োজিত করেন। খলীফাও কেন্দ্রীয় মাগ্‌রিবের যানাতা নেতাদের বন্ধুত্ব অর্জনের জন্য নিজের পক্ষে তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি ফাক্কান শহরে (অন্যরূপ আফাকান অথবা ইফকান) তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। এই শহর তিনি যানাতা গোত্রসমূহের বাজার স্থানে ৩৩৮/৯৪৯-৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বর্তমানে ইহা মাসকারা শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ১৫ মাইল দূরে ওয়াদী ফেক্কান ও ওয়াদী হাম্মামের মিলনস্থলে অবস্থিত। অতঃপর ফাতিমী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তিনি তাহেরত শহর অধিকার করেন। এই বিদ্রোহে তিনি তাঁহার জ্ঞাতি আল-খায়র ইবন মুহাম্মাদ কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইবন 'ইযারী ইহাকে আল-খায়র ইবন মুহাম্মাদ ইবন খাযার আয-যানাতী নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং সম্ভবত তিনি মাগ্‌রাওয়া নেতা মুহাম্মাদ ইবন খাযারের পুত্র ছিলেন (ইবন হাওকালের মতানুসারে আল-খায়র "যানাতাদের রাজা", বানূ ওয়ারমামার বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন)। আল-খায়র তাঁহার পিতা কর্তৃক অনুসৃত ঈফরানী রাজবংশের সহিত বিরোধিতার নীতি পরিত্যাগ করেন এবং য়া'লা ইবন মুহাম্মাদ এবং স্পেনের উমায়্যা শাসকদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। অল্পকাল পরে ৩৪৩/৯৫৪-৫৫ সালে য়া'লা ইবন মুহাম্মাদ ফাতিমীদের নিকট হইতে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় ওরান শহর দখল করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাহেরত হইতে তানজিয়ার পর্যন্ত সমগ্র দেশ ঈফরানী নেতার শাসনাধীনে আসে। এইভাবে তিনি মাগ্‌রাওয়া গোত্রসহ কেন্দ্রীয় মাগ্‌রিবে বসবাসরত যেনাতা বংশের সকল শাখার উপর তাঁহার নিজ গোত্রের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দেশের সকল মসজিদে খলীফা তৃতীয় 'আবদু'র-রাহমানের নামে খুতবা পাঠের ব্যবস্থা করেন। সেই বৎসরেই অথবা সম্ভবত ৩৪৪/৯৫৫-৫৬ সালে য়া'লা ইবন মুহাম্মাদ খলীফার সনদ লাভ করেন, যাহার দ্বারা তৃতীয় 'আবদু'র-রাহমান তাঁহাকে যানাতাদের দেশ কেন্দ্রীয় মাগ্‌রিব এবং তেলেমসেন শহরের প্রশাসক নিয়োগ করেন। তাঁহার নিজের অনুরোধে উমায়্যা খলীফা ফেয (ফাস) নগরীর প্রশাসনের দায়িত্ব তাঁহার মাগ্‌রাওয়া মিত্র আল-খায়র ইবন মুহাম্মাদ ইবন খাযার আয-যানাতীর পুত্র ও তাঁহার জ্ঞাতি মুহাম্মাদ ইবনু'ল-খায়র ইবন মুহাম্মাদের জন্য তাঁহার উপর অর্পণ করেন। কিন্তু ইহা ছিল য়া'লা ইবন মুহাম্মাদের শেষ সাফল্য। ৩৪৭/৯৫৮-৫৯ সালে খলীফা আল-মু'ইয্য-এর সচিব জাওহারের নেতৃত্বে ফাতিমী বাহিনী কেন্দ্রীয় মাগ্‌রিব জয় করে এবং য়া'লা ইবন মুহাম্মাদের রাজধানী ফাক্কান শহর দখল করে। য়া'লা ইবন মুহাম্মাদ নিহত হন এবং কিছু দিনের জন্য উত্তর আফ্রিকার এই অংশে বানূ ঈফরানের আধিপত্যের অবসান ঘটে। ফাতিমীদের হাতে নির্মমভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মাগরিবের যানাতা গোত্রদের শাসন পুনরায় একবার মাগরাওয়াদের হাতে অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনু'ল-খায়র ইবন মুহাম্মাদ ইবন খাযারের হাতে ফিরিয়া আসিলে তিনি

স্পেনের উমায়্যা খলীফাদের নামে ফেয (ফাস) শাসন করিতে থাকেন। এই নেতা ৩৬০/৯৭০-৭১ এবং ৩৭০/৯৮০-৮১ সালের মধ্যে ফাতিমী রাজ্যের নিকট হইতে তেলেমসেন শহর পুনর্দখল করিতেও সমর্থ হন। যাহা হউক, মনে হয় য়া'লা ইব্‌ন মুহাম্মাদের বংশধর ও উত্তরসুরি শাসকগণ শেষ পর্যন্ত ৩৪৭/৯৫৮-৫৯ সালের পরাজয়ের আঘাত কাটাইয়া উঠে এবং কেন্দ্রীয় মাগ্‌রিবের ঈফ্‌রান গোত্রসমূহের উপর তাহাদের শাসন অব্যাহত রাখে। এই বংশের শাসকরা ৫ম/১১শ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্তও তেলেমসেন শহরকে রাজধানী করিয়া তাঁহাদের শাসন বজায় রাখেন। বানূ হিলাল গোত্রের আক্রমণের সময়ে তেলেমসেন শহরের নেতা ছিলেন রাজপুত্র বাখ্‌তীত। ইব্‌ন খালদূন ইঁহাকে তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে ঈফ্‌রান বংশীয় এবং অন্য এক জায়গায় মুহাম্মাদ ইব্‌ন খাযারের বংশধর অর্থাৎ মাগ্‌রাওয়া হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, তাঁহার উযীর ছিলেন একজন ঈফ্‌রানী সেনাপতি, যিনি ৪৫০/১০৫৮ সালে বানূ হিলালের বিরুদ্ধে সংঘটিত এক যুদ্ধে মারা যান। এই সময়ে বানূ ঈফ্‌রান ছাড়াও মাগ্‌রাওয়া এবং অন্য আরও দুইটি বৃহৎ বারবার গোত্র ওয়ামানূ এবং বানূ ঈলুমান কেন্দ্রীয় মাগরিবে যানাতাদের উপর শাসন করিতেন। বাখ্‌তীতের পর ক্ষমতা লাভ করেন তাঁহার পুত্র আল-আব্বাস, যিনি আল-মুরাবিত বাহিনী কর্তৃক কেন্দ্রীয় মাগ্‌রিব দখলের সময়ে তেলেমসেন শাসন করিতেছিলেন।

আল-মাগ্‌রিব আল-আকসা: ৩৪৮/৯৫৮-৫৯ সালে য়া'লা ইব্‌ন মুহাম্মাদের মৃত্যুর পরে তাঁহার এক পুত্র য়াদ্দূ ফাতিমী সেনাবাহিনীর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য সাহারায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে তিনি কেন্দ্রীয় মাগ্‌রিবে ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে কিছুকাল বসবাস করেন। এই সময়ে তিনি অন্যান্য যানাতা নেতার সহিত স্পেনীয় উমায়্যা খলীফাদের নিয়োজিত মাগ্‌রিবের গভর্নর (৩৬৫/৯৭৫-৭৬ সাল হইতে) জা'ফার ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাম্‌দূনের পারিষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। য়াদ্দূ তখন যানাতা নেতৃবৃন্দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবশালী নেতারূপে গণ্য হইতেন। ৩৬৯/৯৭৯-৮০ সালে য়া'লা ইব্‌ন মুহাম্মাদের পরিবারকে (তখনও কর্ডোভার উমায়্যাদের প্রতি অনুগত) ইফরীকিয়ার প্রশাসক বুলুক্কীন ইব্‌ন যীরী-র বাহিনীর আক্রমণের মুখে পলাইয়া যাইতে হয়, তখন বুলুক্কীন ইব্‌ন যীরী শুধু কেন্দ্রীয় মাগ্‌রিব-ই অধিকার করেন নাই, বরং সুদূর ফেয এবং এমনকি সিজিলমাসা পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু বুলুক্কীন যেই মাত্র ইফরীকিয়্যার পথে পা বাড়াইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গেই য়াদ্দূ ইব্‌ন য়া'লা তাঁহার পলাতক অবস্থা হইতে কেন্দ্রীয় মাগ্‌রিবে ফিরিয়া আসেন। য়া'লা বংশীয় অন্য কয়েকজন শাসকও এইরূপ করেন এবং তেলেমসেন রাজ্য পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন। য়াদ্দূ ইব্‌ন য়া'লা আল-মাগ্‌রিব আল-আকসায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন এবং ৩৭৬/৯৮৬-৮৭ সালে উমায়্যা শাসনের পক্ষ হইতে এই প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি তাঁহার সদর দফতর স্থাপন করেন ফেয শহরে, যাহা পূর্বে অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনুল-খায়রের শাসনকাল হইতে মাগ্‌রাওয়াদের ভূখণ্ড ছিল। সম্ভবত এই সময়েই বানূ ঈফ্‌রানের কিছু সংখ্যক পরিবার ফেয শহরে বসতি স্থাপন করেন যাহাদের বংশধরেরা যানাতা গোত্রদের অন্য কয়েকটি শাখার সহিত ৪৬২/১০৬৯-৭০ সালেও সেখানে বসবাস করিত। এই সময় মুরাবিতী য়ূসুফ ইব্‌ন তাশফীনের বাহিনী আল-মাগ্‌রিব আল-আকসার রাজধানী দখল করে। যাহা হউক, য়াদ্দূ ইব্‌ন য়া'লা অনেক বেশী ক্ষমতা অর্জন করিতে পারেন। এই অঞ্চলে উমায়্যা শাসন একই সঙ্গে মাগ্‌রাওয়াদের একজন আমীর যীরী ইব্‌ন 'আতিয়্যাকে সমর্থন দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলস্বরূপ বানূ ঈফ্‌রান এবং মাগ্‌রাওয়াদের মধ্যকার পুরাতন বিরোধ যাহা য়া'লা ইব্‌ন মুহাম্মাদের সহিত আল্-খায়র ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন খাযার ও তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদের মিত্রতা স্থাপনের ফলে মিটিয়া গিয়াছিল, তাহা ৪০ বৎসরের মৈত্রীর পর পুনরায় মাথাচাড়া দিয়া উঠে। ৩৭৯/৯৮৯-৯০ সালে অথবা ৩৮১/৯৯১-৯২ সালে য়াদ্দূ ইব্‌ন য়া'লা প্রকাশ্যে উমায়্যা শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই সময় উমায়্যাদের নিয়োজিত ফেযের গভর্নর ছিলেন যীরী ইব্‌ন 'আতিয়্যা। এই বিরোধের ফলে উমায়্যা এবং মাগ্‌রাওয়াদের সম্মিলিত শক্তির সহিত য়াদ্দূর যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধে সম্মিলিত শক্তির বিজয় ঘটে এবং য়াদ্দূ সাহারায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সেখানেই তিনি ৩৮৩/৯৯৩-৯৪ সালে ইনতিকাল করেন। গোত্রের শাসক হিসাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন তাঁহার ভাই যীরী ইব্‌ন য়া'লার পুত্র হাব্বুস। কিন্তু হাব্বুস তাঁহার নিজের জ্ঞাতি-ভ্রাতা ইফ্‌রানী আমীর আবূ য়াদ্দাস ইব্‌ন দুনাসের হাতে প্রাণ হারান। অবশ্য ঘাতকও পরে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হয়। তাহার পর হাব্বুসের ভাই হাম্মামা বানূ ঈফ্‌রানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার গোত্রকে তাদ্‌লা প্রদেশের অন্তর্গত শালা (সালে) শহরের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিয়া যীরী ইব্‌ন 'আতিয়্যার নিকট হইতে এই শহর এবং ইহার উপর নির্ভরশীল তাদ্‌লার অংশবিশেষ দখল করেন। তিনি সেখানে একটি নূতন ঈফ্‌রানী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বানূ য়া'লা বংশীয় শাসনের পরিচালনাধীনে এই রাজ্য আল-মুরাবিতগণ কর্তৃক মরক্কো বিজয়ের সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়। হাম্মামা ৪০৬/১০১৫-১৬ সালে ইনতিকাল করিলে তাঁহার ভাই আবুল-কামিল তামীম তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি মুসলিম বিরোধী বারগাওয়াতা রাজ্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ থাকার কারণে ফেযের মাগ্‌রাওয়াদের সহিত শান্তি স্থাপন করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক, ৪২৪/১০৩৩ সালে আবার একবার যুদ্ধ বাধে এবং আবুল-কামিল ফেয শহর দখল করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ৪২৯/১০৩৭-৩৮ সালেই তিনি মাগ্‌রাওয়াদের দ্বারা বিতাড়িত হন। মাগ্‌রাওয়া আমীর কর্তৃক পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইয়া তিনি তাঁহার তাদ্‌লা রাজ্যে ফিরিয়া যান এবং ৪৪৬/১০৫৪-৫৫ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই বসবাস করেন। সম্ভবত আবুল-কামিলের রাজত্বকালেই সালের ঈফ্‌রানী রাজবংশ বৃহৎ বাণিজ্যিক শহর আগমাত দখল করে—যাহার শাসক ছিলেন মাগ্‌রাওয়া বংশোদ্ভূত। কিন্তু শীঘ্রই আল-মুরাবিত বাহিনী কর্তৃক মাগরিবের এই অংশ বিজয় এবং ৪৪৯/১০৫৭-৫৮ সালে আগ্‌মাত দখল ও পরবর্তী বৎসর তাদ্‌লা রাজ্য আক্রমণের ফলে সালে রাজবংশের অস্তিত্ব লোপ পায়। এইভাবে দেশের ঈফ্‌রানী শাসকদের অবসান ঘটে এবং তাঁহাদের রাজ্য আল-মুরাবিতগণের রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। তাদ্‌লার বানূ ঈফ্‌রান গোত্র (বর্তমান মরক্কোর পশ্চিমাংশে প্রতিষ্ঠা লাভকারী) ঈফ্‌রানদের একমাত্র শাখা ছিল বলিয়া মনে হয় না। আরো কিছু ঈফ্‌রানী পরিবারও সালে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার অনেক পূর্বেই এই অঞ্চলে আসিতে আরম্ভ করে। যোষুরের প্রতি ধন্যবাদ, যিম্মুর বারগাওয়াতার (তামাসনা প্রদেশে)-র অধিপতির পক্ষ হইতে রাষ্ট্রদূত হিসাবে ৩৫২/৯৬৩ সালে উমায়্যা খলীফা আল-হাকাম আল-মুস্‌তানসির-এর দরবারে গমন করেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বারগাওয়াতা রাজাদের কর্তৃত্বাধীন ছোট ছোট মুসলিম বারবার গোত্রের মধ্যে একটি

ঈফ্রানী গোত্রও ছিল। উল্লিখিত এই গোত্রটি ৩৪৭/৯৫৮-৫৯ সালে য়া'লা ইব্ন মুহাম্মাদের ঈফ্রানী রাষ্ট্রের পতনের পর কেন্দ্রীয় মাগ'রিব হইতে দেশত্যাগী বানূ ঈফ্রানেরই একটি অংশ ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

স্পেন ঃ য়া'লা ইব্ন মুহাম্মাদের মৃত্যু এবং তাঁহার রাজ্যের পতনের পর ঈফ্রানী দেশত্যাগীদের প্রথম স্রোত আসে স্পেনে, ৩৪৭/৯৫৮-৫৯ সালে। য়া'লা ইব্ন মুহাম্মাদের চাচার পুত্র ইব্ন কুর্রা'র নেতৃত্বে আগত এই দল কর্ডোভায় আন্তরিক সম্বর্ধনা লাভ করে। বানূ ঈফ্রানের অন্য একটি শাখা ৪র্থ/১০ম শতকের শেষের দিকে স্পেনে বসতি স্থাপন করে। এই শাখা ঈফ্রানী নেতা আবূ য়াদ্দাস ইব্ন দুনাসের নেতৃত্বাধীন একটি অংশ লইয়া গঠিত ছিল। আর য়াদ্দাস তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা য়াদ্দু ইব্ন য়া'লাকে হত্যা করেন এবং আল-মাগ্'রিব আল-আকসা'র সকল ঈফ্রানী গোত্রের উপর আধিপত্য লাভের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া তাঁহার তিন ভাই এবং বহু সংখ্যক সমর্থক লইয়া স্পেনে পলাইয়া আসেন। ইব্ন খালদূনের মতে এই দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে ৩৮৩/৯৯৩-৯৪ অথবা ৩৮২/৯৯২-৯৩ সালে। আবূ য়াদ্দাস কর্ডোভার উমায়্যা সরকারের সহিত একযোগে কাজ করিতেন। উমায়্যা সরকারও আল-মাগ'রিব আল-আকসা'র সকল ঈফ্রানী গোত্রের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব হইতে য়াদ্দু ইব্ন য়া'লার পরিবারকে অপসারণ করিয়া তদস্থলে উমায়্যা প্রশাসনের স্বার্থের প্রতি ঘনিষ্ঠতর অন্য কোন শাসক পরিবারকে বসাইতে আগ্রহী ছিলেন। কাজেই উমায়্যা সরকার এই দেশত্যাগীদের সাদরে গ্রহণ করিয়া লয়। আবূ য়াদ্দাসের সকল যোদ্ধা ব্যক্তিকে স্পেনের বারবার বাহিনীতে তালিকাভুক্ত করা হয় এবং তাহাদের নেতাকে এক উল্লেখযোগ্য অংকের টাকা ও কয়েকটি জায়গীর (ইক্তা') প্রদান করা হয়। পরবর্তী কালে দেখা যায়, ৪০০/১০০৯-১০ সালে খলীফা আল-মুস্তা'ঈন তাঁহার পূর্ববর্তী আল-মাহদীর সহিত যে যুদ্ধ করেন, তাহাতে আবূ য়াদ্দাস সকল বারবার বাহিনীসহ খলীফা আল-মুস্তা'ঈনের পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি গুয়াদিয়ারোর তীরে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে ইনতিকাল করেন। তাঁহার বংশধরগণ স্পেনের যানাতা বাহিনীতে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। মুলূকু'ত-তাওয়া'ইফের যামানায় আবূ য়াদ্দাসের ভাই আল-'আত্তাফের পুত্র য়াহ্য়া ইব্ন 'আবদি'র-রাহ'মান হাম্মূদী শাসকদের অধীনে চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং তাঁহাকে কর্ডোভার অধিনায়কত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু ৫ম/১১শ শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম স্পেনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন আবূ য়াদ্দাসের অন্য এক ভাই আবূ কুররা'র পুত্র আবূ নূর। ৪০৫/১০১৪-১৫ সালে তিনি রোণ্ডা শহর হইতে ইহার গভর্নর 'আমির ইব্ন ফুতূহ-কে বিতাড়ন করিতে সক্ষম হন। আমির সেখানে উমায়্যা শাসকদের নামে শাসন করিতেছিলেন। এইরূপে আবূ নূর নিজেকে একজন স্বাধীন শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। রোণ্ডা ছাড়াও তাকুরুন্না (তাকোরোন্না) শহরের উপরও তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। ইব্নু'ল-খাতীবের উপর নির্ভর করিয়া বলা যায়, আবূ নূর এই ভূখণ্ড লাভ করেন সুলায়মান ইব্নু'ল-হাকাম ইব্ন সুলায়মান ইব্নি'ন-নাসিরের নিকট হইতে যিনি স্পেনে বসতি স্থাপনকারী ছয়টি বারবার গোত্রের নেতাদের মধ্যে আল-আন্দালুসের কয়েকটি প্রদেশ ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। ৪৪৩/১০৫১-৫২ সালে অন্যান্য বারবার নেতার সহিত আবূ নূর ও সেভিলের 'আব্বাদীদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হন। অল্পকাল পরেই ৪৫০/১০৫৮-৫৯-এ তিনি ইনতিকাল করিলে তাঁহার পুত্র আবূ নাস্র তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি ৪৫৭/১০৬৫ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অতঃপর একজন বিশ্বাসঘাতক 'আব্বাদী সরকারের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে।

খুব সম্ভব মুরসিয়া (Murcia) প্রদেশে মাযাররোনের নিকটবর্তী এলাকায় বানূ ঈফ্রানের একটি প্রশাখা বসতি স্থাপন করে। সেখানে 'ইফ্রে' নামের একটি Diputacion আছে, যাহার নামের সহিত C.E. Dubler বানূ ঈফ্রান (অথবা এই পণ্ডিত কর্তৃক গৃহীত উচ্চারণ 'ইফ্রীন') নামের যোগাযোগ দেখাইয়াছেন। যাহা হউক, মধ্যযুগের বারবার কুলজীবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী আধুনিক 'ইফ্রে' নামের উৎস 'ঈফ্রান' নয়, বরং 'ঈফ্রী' যাহা হইতে এই গোত্রেরও নামকরণ হইয়াছে। অধিকন্তু ইহা অসম্ভব নয় যে, আধুনিক স্পেনীয় স্থানের নামের উৎস বানূ ঈফ্রান গোত্রের নাম বা তদনুসারে নামকৃত অন্যান্য নাম নয়, বরং সরাসরি বারবার শব্দ 'ঈফ্রি' (যাহার অর্থ গর্ত, গুহা) হইতে এই নামকরণ হইয়াছে।

সিসিলি ঃ ঈফ্রানী উৎসের কিছু পরিবার সম্ভবত সিসিলিতে বসবাস করিত। সিসিলি ৩য়/৯ম শতাব্দী হইতে ইফ্রীকিয়্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। বানূ ঈফ্রানের অন্তর্ভুক্ত এবং মারান্জীসা ও বানূ ওয়ারকূ শাখা হইতে উৎসারিত কিছু যোদ্ধা সম্ভবত আগলাবী অথবা ফাতিমী বাহিনীর সহিত সেখানে গিয়া থাকিবে। একটি মধ্যযুগীয় সূত্র কর্লিয়নে (Corleone) শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহার অধিবাসীদের মধ্যে ইব্ন আবী য়াফ্রান নামক এক ব্যক্তির বর্ণনা আছে; সম্ভবত ইনি ঈফ্রানী গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) বাক্রী, Description (বিবরণী), ১২, ৭০-৭১, ৭৬, ৭৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২ (অনু. de Slane, আলজিয়ার্স ১৯১৩ খৃ., ৩১, ১৪৫, ১৫৫, ১৬০-৬১, ২৭০, ২৭১, ২৭৩); (২) দারজীনী, কিতাব তাবাকাতি'ল-মাশায়িখ, Ms 275 of the Cracow collection, fols. 113r. and 134r; (৩) ইব্ন 'আবদি'ল-হাকাম, Conquete de l'Afrique du Nord et de l'Espagne, ed. A. Gateau, আলজিয়ার্স ১৯৪৭ খৃ., ৩৬-৩৭, এবং ১৭৩; (৪) ইব্ন হাওকাল, কিতাব সূরাতি'ল-আরদ, সম্পা. Kramers, লাইডেন ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ৮৯, ছত্র ১৪-১৬, এবং ১০৭, ছত্র ৫-৮; (৫) ইব্ন 'ইযারী, কিতাব আল-বায়ানি'ল-মাগরিব[২], ১খ, ৭৫-৭৬, ১৯৮, ২১৬, এবং ২খ, ২১৯, ২২২; (৬) ইব্ন খালদূন; Berberes[২], ১খ, ৩৬-৩৭, ২খ, ১১, ৭১, ১৩০, ১৪৮; ৩খ, ৯২, ১৮৫-৭, ১৯০, ১৯৩, ১৯৭-২০১, ২১২-২৩, ২২৫-২৬, ২২৯, ২৩২, ২৩৭-৪১, ২৪৯, ২৫১-৫২, ২৫৪, ২৭০-৭১, ৩৩৬; ৪খ, ২, ৫৬০; (৭) ইদ্রীসী, Description de l'Afrique et de l'Espagne, অনু. Dozy এবং De Goeje, লাইডেন ১৮৬৬ খৃ., 'আরবী মূল ঃ ১২০, ১২৪, অনু. ১৪০, ১৪৬; (৮) ইব্নু'ল-খাতীব, Histoire de l'Espgane, সম্পা. Levi-Provencal, রাবাত' ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ১৩৯, ২৭৩; (৯) Masqueray, Chronique d'Abou Zakaria, আলজিয়ার্স ১৮৭৮ খৃ., পৃ. ৫৩-৭৬, ২২৬, ২৪৯; (১০) নুওয়ায়রী, Apud Ibn Khaldun, Histoire des Berberes, ১খ, পৃ. ৩৮০-৮১; (১১) শাম্মাখী, কিতাবু'স সিয়ার, কায়রো ১৩০১/১৮৮৩-৮৪, পৃ. ২৬০, ৩৫৫-৫৬, ৪২৪; (১২) M. Canard,

Une famille de partisans, puis d'adversaires des Fatimides en Afrique du Nord, in Melanges d'histoire et d'archeologie. Hommage a G. Marcais, আলজিয়ার্স ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ৪৩, ৪৪, ৪৮; (১৩) C. Dubler, Uber die Berbersiedlungen auf der Iberischen Hablinsel, in Sache und Wort. Festschrift Jakob Jud, Romanica Helvetica, xx (1943), 191; (১৪) Ferrand, in R. Afr., ১৮৮৬ খৃ., পৃ. ২৬৮; (১৫) H. Fournel, Les Berbers, প্যারিস ১৮৭৫-৮১ খৃ., ১খ, ৬, ১২, ৩৬৪, ৩৭১-৭৩; ২খ, ৫-৬, ২২৩, ২৮৮, ৩০৩, ৩১৭-৮, ৩২০; (১৬) T. Lewicki, Etudes ibadites nord-africaines, ওয়ারশো ১৯৫৫ খৃ., ৪৫-৪৬ এবং স্থা.; (১৭) ঐ লেখক, Ibaditica I, in RO, xxv/2 (1961), 107; (১৮) ঐ লেখক, La repartition geographique des groupements ibadites dans l'Afrique du Nord au moyen age, in RO, xxi (1957), 330-1, স্থা.; (১৯) ঐ লেখক, Les Ibadites en Tunisie au moyen age, রোম ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১৩।

T. Lewicki (E. I.[2])/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

**ঈমান** (ايمان) ঃ 'আরবী, শব্দমূল আলিফ, মীম, নূন। 'আম্ন' ও 'আমানা' শব্দদ্বয় একই ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস (আল্লাহ্র উপর)। 'আম্ন' হইল 'খাওফ' বা ভীতির বিপরীত এবং 'আমানা' বা বিশ্বস্ততা, 'খিয়ানত' বা অসাধুতার বিপরীত। 'আম্ন' শব্দমূলের চতুর্থ গঠনরূপ (বাব ইফ'আল)-এর মাস্দার (ক্রিয়ামূল) হিসাবে ঈমান শব্দ দ্বারা নিরাপত্তা বিধান করা কিংবা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা, এই দ্বৈত অর্থ বুঝায়। আবার 'ঈমান' অর্থ তা'মানীনাতু'ন-নাফ্স (বা অন্তরের প্রশান্তি) এবং যাওয়ালু'ল-খাওফ (ভীতির অবসান)-ও হয় [ লিসান ]।

'আম্ন' শব্দমূলটি পবিত্র কুরআনে বহুল ব্যবহৃত শব্দাবলীর অন্যতম। সেখানে 'ঈমান' অর্থ কখনও 'আমাল (বা কার্য সম্পাদন), কখনও বিশ্বাসের সারমর্ম বা সারবস্তু, কখনও একত্রে উভয় অর্থই প্রকাশ করে। ইহাও বলা হয় যে, পবিত্র কু'রআন বারবার ঈমানের অপরিহার্যতা শিক্ষা দেয় এবং উহার চাহিদার ব্যাপকতা ঘোষণা করে।

ইমাম রাগি'ব উল্লেখ করেন যে, 'ঈমান'-এর অর্থ ইয'আনু'ন-নাফ্স লি'ল-হা'ক্ক 'আলা সাবীলি'ত-তাসদীক (মুফ্রাদাত, দ্র. আম্ন) অর্থাৎ "আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত কোন ব্যক্তির সত্যের (আল্লাহ্র অস্তিত্ব) স্বীকৃতি প্রদান এবং উহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশকে 'ঈমান' বলে"। তিনটি প্রধান বিষয়ের সমন্বয়ে ইহা সম্ভব, যথা ঃ (১) আন্তরিক দৃঢ়বিশ্বাস (তাসদীক বি'ল-কা'ল্ব); (২) মৌখিক স্বীকারোক্তি (ইক'রার বি'ল-লিসান); (৩) এবং অঙ্গ/প্রত্যঙ্গ দ্বারা বিধিবদ্ধ কার্যাদি সম্পাদন ('আমাল বি'ল-আরকান)।

(১) **ঈমানের উপাদান ও শর্তাবলী ঃ** কি বিশ্বাস করিতে হইবে ? 'ইল্মু'ল-কালাম এবং ফিক্হশাস্ত্রবিগণ এই প্রশ্নটি সমাধানকল্পে বারংবার ইহার নানাদিক উত্থাপন করিয়াছেন। ঈমানের মৌলিক উপাদান তিনটি (উপরে বর্ণিত)। পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে ইহার প্রধান প্রধান ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ইহাতে আরও সংযোজন করা যাইতে পারে যে, ঈমান সম্পর্কিত প্রদত্ত সংজ্ঞার প্রতিটি শব্দই যাঁহারা উহা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের মতাদর্শ এবং মাযহাব-এর প্রবণতার আলোকে বিবেচনা করিতে হইবে।

(ক) আশ'আরী মতবাদ অনুসরণকারিগণ দৃঢ় প্রত্যয় বা আন্তরিক বিশ্বাসের উপর জোর দিয়াছেন। আশ'আরীগণের মধ্যে আমরা ঈমান সম্পর্কে দুই ধরনের মতবাদ দেখিতে পাই ঃ (১) ইবানা (কায়রো সং ১৩৪৮ হি., পৃ. ১১) এবং মাকালাত (সম্পা. 'আবদু'ল-হা'মীদ, কায়রো তা.বি., ১খ, ৩২৭)-এ বর্ণিত ধর্মবিশ্বাস, যেখানে (হাম্বালী মাযহাবমতে) কথায় উচ্চারণ এবং কার্য সম্পাদন করাকে ঈমান বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে; (২) লুমা' গ্রন্থে (সম্পা. ইংরেজি অনুবাদসহ, R. J. Mc Carthy, The Theology of al-AshEari, বৈরূত ১৯৫৩ খৃ., ৭৫/১০৪) বর্ণিত ঃ "আল্লাহ্কে বিশ্বাস করাই ঈমান", সত্যবাদিতার আন্তরিক বিচারকেই তাসদীক বলে, যাহা দ্বারা আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য বুঝায়। ভিন্ন শব্দে ইহার বর্ণনা দিয়াছেন ইমাম গাযালী (র)। তিনি বলেন, 'আক্'দ হইল এক ধরনের চুক্তি, আন্তরিক সম্মতি এবং আল-জুরজানী (তা'রীফাত, সম্পা. Flugel, Leipzig ১৮৪৫ খৃ., ৪১) ই'তিকাদ (বিশ্বাস)-কে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আশ'আরী মতবাদে আন্তরিক (বা বুদ্ধিবৃত্তি, 'আক্ল)-এর দৃঢ় প্রত্যয়কে ঈমানের সাংগঠনিক উপাদান বা স্তম্ভ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কার্যে পরিণত করা (নির্ধারিত পালনীয় কার্য সম্পাদন) ইহার পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত, ইহা ব্যতীত (ঈমানের) পরিপূর্ণতা অর্জন সম্ভব নয়। সুতরাং আল-গাযালী (র)-র (ইহ্য়া' উলূমি'দ-দীন, কায়রো সং. ১৩২৫/১৯৩৩, ১খ, ১০৩) রচিত গ্রন্থে ঈমান-এর সংজ্ঞায় তিনটি উপাদানকে যে একত্র করা হইয়াছে, যেমন তাসদীক (বা 'আক্'দ) বা আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক উচ্চারণ (কাওল), কার্যে পরিণতকরণ ('আমাল), তাহাতে এই কথা বলা যায় না যে, তিনি আশ'আরী মতাদর্শ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন।

(খ) হানাফী মাতুরীদীগণ ই'তিকা'দ বা আন্তরিক বিশ্বাসের তুলনায় কা'ওল বা মৌখিক স্বীকারোক্তির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞান (মা'রিফাত) সম্বলিত আন্তরিক বিশ্বাসকে বাদ দেন নাই।

'ওয়াসিয়্যাতু আবী হা'নীফা' গ্রন্থের ১ম নিবন্ধে বর্ণিত, ঈমান হইল "মৌখিক স্বীকারোক্তি (ইক'রার), আন্তরিক বিশ্বাস (তাসদীক বি'ল-জানান) এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান (ওয়া মা'রিফাত বি'ল-কা'লব)"-এর নাম। ফিক্'হ আক্বার, ২য় খণ্ডে (অধ্যায় ১৮) আরও সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখিত আছে, "ঈমান হইল মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং আন্তরিক বিশ্বাস।" ঈমান-এর প্রকাশ্য ঘোষণা করা হয় শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে (যেমন, কলেমার দুইটি অংশের সাক্ষ্য [শাহাদাত] প্রদান এই ক্ষেত্রে অপরিহার্য)। ইহাতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, মৌখিক স্বীকারোক্তি ঈমানের মৌলিক উপাদান এবং আন্তরিক বিশ্বাস হইল ইহার শর্ত। ওয়াসিয়্যা-র কতিপয় পাণ্ডুলিপিতে কখনও কখনও তাসদীক (আন্তরিক বিশ্বাস), কখনও মা'রিফাত (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আধ্যাত্মিক জ্ঞানই হানাফী-মাতুরীদী মতবাদের বৈশিষ্ট্য বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অনুসরণে আল-আশ'আরী স্বীয় গ্রন্থ

মাকালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন-এ 'ঈমান'-এর প্রাথমিক উপাদান হিসাবে ইহাকে প্রদর্শন করেন। যেমন Wensinck উল্লেখ করেন (The Muslim Creed, ক্যাম্ব্রীজ ১৯৩২ খৃ., পৃ. ১৩২), খুব সম্ভব এখানে মুরজি'ইগণ প্রদত্ত ঈমান-এর সংজ্ঞার সহিত কতক সাদৃশ্য রহিয়াছে, যেমন ইহা (ঈমান) আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল সম্পর্কিত জ্ঞান এবং তাঁহার (রাসূলের) শিক্ষার জ্ঞানকেও অন্তর্ভুক্ত করে বলিয়া ধারণ করা হয়। এতদপ্রসঙ্গে মাকালাত (১খ, ১৯৭-৮)-এ জাহ্ম ইব্ন সাফওয়ান এবং জাহ্মিয়্যার উল্লেখ করা হইয়াছে। আল-আশ'আরী হানাফিয়্যাগণকে মুরজি'আ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করেন (ঐ, ২০২)। তাঁহারা স্বীকৃতি প্রদান করেন যে, (জাহ্মিয়্যাদের মত নয়) তাঁহারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান (মা'রিফাত) (ঐ, ২০৩)-কে মৌখিক স্বীকারোক্তি (ইক্রার)-এর সহিত বা পরে ঈমান-এর অন্তর্ভুক্ত করেন। যাহা হউক, ফিক্হ আকবার ২য় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে উল্লিখিত কেবল "মৌখিক স্বীকারোক্তি" এবং "আন্তরিক বিশ্বাসই" হইল মাতুরীদী চিন্তাধারার প্রধান বিষয়বস্তু (যথা 'আবদু'র-রাহীম ইব্ন 'আলী, কিতাব নাজ মি'ল-ফারা'ইদ, কায়রো তা.বি., ৪৯ পৃ.)। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, আল-জুরজানী তাঁহার তা'রীফাত গ্রন্থে (পৃ. স্থা.) এই মতবাদের সহিত ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন।

(গ) আশ'আরীগণের বিভিন্ন গ্রন্থে "অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যাবলী"র উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই (মুরজি'আদের বিপরীত, যাঁহাদের মতে 'আমাল হইল 'পন্থা/পথ', শারা'ঈ')। তাঁহারা 'আমালকে তাঁহাদের মতবাদ হইতে বাদ দেন নাই, কিন্তু ইহাদিগকে তাঁহারা আনুষ্ঠানিক উপাদান, এমনকি বাধ্যতামূলক শর্ত বলিয়াও বিবেচনা করেন নাই। প্রথম দিকে মনে করা হইত যে, 'আমাল হইল ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এমনকি উহাই ঈমান। পরবর্তী কালে সুন্নীগণ কর্তৃক ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত হয় এবং 'খারিজী', 'শী'আ', 'কাদারী' এবং মু'তাযিলীগণও এই বিতর্কে যোগদান করেন। 'আমাল দ্বারা (বহুবচন, আ'মাল) ইসলামের ভিত্তি বা স্তম্ভকে (ঈমান-এর প্রকাশ্য স্বীকৃতিসহ) এবং পবিত্র কুরআন দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলীকে বুঝিতে হইবে। কোন অননুতাপী (অর্থাৎ যে তাওবা না করে) পাপী ব্যক্তি জাহান্নামের দণ্ডপ্রাপ্ত হয় এই কারণে যে, সে তাহার নাফরমানীমূলক কাজের মাধ্যমে ঈমান পরিত্যাগ করিয়াছ। এইখানে খারিজী বা মু'তাযিলীগণ কর্তৃক সমর্থিত ঈমানদার পাপীদের জন্য অন্য কোন "মধ্যবর্তী অবস্থা"র পর্যালোচনার প্রয়োজন নাই (দ্র. ফাসিক)। সংক্ষেপে আমরা বলিতে পারি, এই উভয়েরই (খারিজী ও মু'তাযিলী) মতে 'আমালই ঈমানের শুধু প্রতীকই নয় বা 'ঈমান'-এর পূর্ণাঙ্গতা কেবল 'আমাল দ্বারাই হয় নাই, বরং 'আমালই ঈমান এবং ঈমান-এর কাজ। কিন্তু খারিজীগণের মতে 'ঈমান' এবং 'আমাল' পরস্পর বিনিময়যোগ্য, পক্ষান্তরে মু'তাযিলীদের মতে 'আমালই' হইল 'ঈমান'-এর সাক্ষ্য, ইহাই আল্লাহ্র উপর আত্মসমর্পণের স্বাক্ষর। অতঃপর কাদী 'আবদু'ল-জাব্বার (শারহু'ল-উসূলি'ল-খামসা, সম্পা. 'আবদু'ল-কারীম 'উছমান, কায়রো ১৩৮৪/১৯৬৫, পৃ. ৮০৪)-এর ভাষ্যানুসারে "ঈমান এবং দীন হইল এক এবং অভিন্ন বস্তু"। আল-জুব্বা'ঈ এবং তাঁহার পুত্র আবূ হাশিম বর্ণনা করেন, কেবল 'বাধ্যতামূলক' (ফরয) কর্তব্য পালন (তা'আত) করাকেই 'ঈমান' বলে। কিন্তু আবু'ল-হুযায়ল আল-'আল্লাফ-এর ভাষ্যানুযায়ী (এতদসম্পর্কে 'আবদু'ল-জাব্বারও তাঁহার মতামতের অনুসরণ করেন) অতিরিক্ত (নাওয়াফিল) কার্যাবলী ('ইবাদাত) সম্পাদনেও ঈমান-এর অংশ সংগঠিত হয় (পূ. গ্র., ৭০৭-৮)। স্বেচ্ছায় বাধ্যতামূলক কর্তব্য (ফরয) পালন না করার অর্থ হইল ঈমান-এর সাক্ষ্য বহন না করা। পক্ষান্তরে স্বেচ্ছায় আনুষঙ্গিক ধর্মীয় নির্দেশ পালনে ব্যর্থতা (কেবল) আন্তরিক সাক্ষ্য প্রদানকে মলিন করিয়া দেয়।

(ঘ) হাম্বালী মতাদর্শে ঈমান-এর উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ইহা মুরজি'আদের কঠোর বিরোধী এবং 'আমাল করা ব্যতীত কেবল বিশ্বাস স্থাপন করাই 'ঈমান'-এর স্তম্ভ হিসাবে ইহাদের সংজ্ঞায় স্থান পাইয়াছে। ইব্ন হাম্বাল (র)-এর ভাষ্যানুযায়ী ('আকীদা, ১খ, ২৪), "মৌখিক স্বীকারোক্তি, 'আমাল, খাঁটি নিয়াত (নিয়্যা) এবং সুন্নাহর প্রতি আসক্তি' দ্বারাই ঈমান গঠিত"। ইব্ন বাত্তার ভাষ্যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি প্রেরিত বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, উহার মৌখিক উচ্চারণ, আন্তরিক দৃঢ় প্রত্যয় (তাসদীক বি'ল-জানান) এবং ইসলামের মৌলিক বিধিবিধানসমূহ বাস্তবায়ন করাই ঈমান (তু. H. Laoust, La profession de foi d'Ibn Batta, মূল পাঠ ও ফরাসী অনু., দামিশ্ক ১৯৫৮ খৃ., ৪৮/৭৮)। অনুরূপভাবে এখানে 'তাসদীক' (আন্তরিক বিশ্বাস), সত্যপরায়ণতার তুলনায় ইহার সমার্থবোধক শব্দ 'নিয়্যাত' (খাঁটি নিয়াত)-এর নিকটতর। আল-কালাবাযী এই হাম্বালী চিন্তাধারাকে "সূফী মতবাদে" রূপান্তরিত করেন। যেমন ঈমান হইল মৌখিক স্বীকারোক্তি (কাওল), কার্যে পরিণতকরণ ('আমাল) এবং খাঁটি নিয়াত (নিয়্যাত) (কিতাবু'ত-তা'আররুফ, সম্পা. Arberry, কায়রো ১৩৫২/১৯৩৩, পৃ. ৫১; ইং. অনু. ক্যাম্ব্রীজ ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ৬৭)। যাহা হউক, বহু হাম্বালী গ্রন্থ (যাহাদের মধ্যে 'আকীদা, ২খ এবং 'আকীদা, ৩খ) কেবল মৌখিক উচ্চারণ এবং কার্যে পরিণতকরণকেই (কাওল এবং 'আমাল) অধিকতর গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করিয়াছে। আমরা আশ'আরীগণের ধর্মীয় বিশ্বাসের আলোচনায় ব্যবহৃত অনুরূপ পরিভাষা পুনঃপ্রত্যক্ষ করি (ইবানা এবং মাকালাত) এবং ওয়াহ্হাবীগণের ধর্মীয় বিশ্বাসমতেও ঈমানের অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে (তু. ফরাসী অনু. H. Laoust, apud Doctrines sociales et politiques de Taki-d-Din Ahmad b. Taimiya, কায়রো ১৯৩৯ খৃ., পৃ. ৬২৩)। অনুরূপভাবে দৃশ্যমান ও শ্রুত (স্পষ্ট) সাক্ষীর উপর গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু অন্তরের বদ্ধমূল সাক্ষ্যই কেবল মহান আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য। ইহা ইব্ন তায়মিয়া (র)-র কিতাবু'ল-ঈমান-এ প্রকাশিত (কায়রো সং. ১৩২৫ হি.)। কিতাবু'ল-ফুরকান-এ ইহার প্রধান প্রধান যুক্তি পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে (apud মাজমু'আতু'র-রাসা'ই'লি'ল-কুবরা, কায়রো ১৩২৮ হি., ১খ, ২৮)। শুধু মৌখিক উচ্চারণ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে ঈমানের বহিঃপ্রকাশ সংঘটিত হয় না, বরং আল্লাহ্ ভীতির মত (খাওফ) প্রধানত নৈতিক সদগুণাবলী, যথা আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ (তাওয়াক্কুল), বিনয় বা নম্রতা প্রকাশ করা (যিল্লু), ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন (সাব্র) করা ইত্যাদি ঈমানদার ব্যক্তির হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে উদ্ভূত হওয়া উচিত। H. Laoust তাঁহার গবেষণাপ্রসূত সংক্ষিপ্ত থিসিসে এই বিষয়ে যথার্থ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন (La foi, dans la doctrine dÈIbn Taymiyya, est totalitaire, পূ. গ্র., ৪৭০)।

(ঙ) ইহা অস্বাভাবিক নয় যে, ইব্ন তায়মিয়া শী'আ মতবাদের কতিপয় প্রভাব, প্রকৃতপক্ষে তিনি যেইগুলির বিরোধিতা করিয়াছিলেন,

গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উহাদিগকে তাহাদের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা হইতে পৃথক করিয়াছিলেন এবং উহাদিগকে সুন্নী মতাদর্শের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা ইখওয়ানু'স-সাফা'র মধ্যপন্থী ইসমা'ঈলী মতবাদের (রাসা'ইল ইখওয়ানি'স-সাফা', কায়রো ১৩৪৭/১৯২৮, ৪খ, ১২৮-১২৯) প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে আমরা বাহ্যিক (জাহির) ঈমান এবং অভ্যন্তরীণ (বাতিন) ঈমান-এর মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাই। প্রথমত, মৌখিক স্বীকারোক্তি বা প্রতিজ্ঞা; দ্বিতীয়ত, অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে উদ্ভূত প্রকৃত ঈমান বা বিশ্বাস যাহা মৌখিকভাবে উচ্চারিত হয়। অনুরূপভাবে ইহা ই'তিকাদ, দৃঢ় প্রত্যয় বা আন্তরিক বিশ্বাস (তাসদীক) বা সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার বিষয়বস্তু নয়, কিন্তু উহা বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত ধারণা (ঈদমার) যদ্দারা নিশ্চিতভাবে ঈমান-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান (য়াকীন) লাভ করা যায় [তু. আল-গাযালী (র) কর্তৃক প্রচারিত য়াকীন]। তিনি এতদূর বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, ঈমান-এর বাস্তবতাকে অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের অভিজ্ঞতালব্ধ আস্বাদ বলিয়া আখ্যায়িত করা যায়। ইখওয়ানু'-সসাফা'র পরবর্তী অধ্যায়সমূহে এই "নিশ্চিত বিশ্বাস" বা 'য়াকীন'-এর সহিত 'তাওয়াক্কুল', 'ইখলাস', সাব্র ইত্যাদি (পূ. গ্র., ৪খ, ১২৯ প.) ধর্মীয় অনুভূতিগুলিকে একটি নিয়ম অনুসারে সংযুক্ত করা হইয়াছে। বিভিন্ন মৌলিক ধারণা হইতে ইহার সূচনা হইলেও উহা ইব্ন তায়মিয়া (র)-এর কাঙ্ক্ষিত অভ্যন্তরীণীকরণের (interiorization) সহিত সাদৃশ্যবিহীন নয়।

(২) **ঈমান-এর বিষয়বস্তু (বা সারমর্ম)** ঃ মুরজি'আ এবং জাহমীয়াদের বিরোধিতা করিয়া হাম্বালী মাযহাব বিশ্বাসের উপর জোর দিয়াছে যাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয় ঃ ঈমান কেবল (আধ্যাত্মিক) জ্ঞানকেই (মা'রিফাত) বলে না, বরং ঈমানকে জীবন্ত করিতে হইবে বিশুদ্ধ নিয়াত (নিয়্যাত) বা আন্তরিক বিশ্বাস (তাসদীক) দ্বারা এবং মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া এবং বিধিবদ্ধ কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে ইহাতে পরিপূর্ণতা প্রদান করিয়া। নিশ্চয় (আধ্যাত্মিক) জ্ঞানকে 'ঈমানের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে উপলব্ধি করিবার বিষয়টি উপেক্ষা করা হয় নাই, কিন্তু ইহাই (জ্ঞান) যথেষ্ট নয়। একমাত্র জ্ঞানই, যদি ইহা বহুদর্শীও হয়, ঈমান গঠন করে না, কিন্তু 'ঈমান' বলিতে কতিপয় অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে বুঝায় ঃ 'ঈমান' এবং উহার বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ইব্ন বাত্তা বলেন (তু. H. Laoust, পূ. গ্র., ৪৭/৭৭-৭৮), "মহান আল্লাহ্র উপর বিশ্বাসের অর্থ হইল, আল্লাহ্ যাহা ইরশাদ করিয়াছেন, উহার সব কিছুর উপর, তাঁহার সকল আদেশ, তাঁহার আরোপিত সকল নির্ধারিত (বিধিবদ্ধ) কর্তব্য ও দায়িত্ব, তাঁহার সকল প্রকার নিষেধাজ্ঞা, তাঁহার রাসূল (স)-এর উপর প্রচারার্থ প্রেরিত নির্দেশাবলী এবং তাঁহার মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে নাযিলকৃত সকল বাণীর প্রতি কাহারও পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ।" আরও সংক্ষেপে ইহা বলা যাইতে পারে, "স্বয়ং পবিত্র কুরআনই ঈমান-এর বিষয়বস্তু।" কলেমা শাহাদাত-এর দুই অংশে, সংক্ষিপ্তাকারে "আল্লাহ্র একত্ববাদ" এবং তাঁহার প্রেরিত পুরুষ "হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে" প্রেরণের উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে অপরিহার্য বিশ্বাস এবং যাহা উপেক্ষা করিলে কেহ ইসলাম হইতে খারিজ হয় না, এই দুয়ের মধ্যে প্রায়শই পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। ইহা স্পষ্টত বর্ণিত যে, "অপরিহার্য বিশ্বাস" সম্পর্কে আল-কুরআনের সুপ্রসিদ্ধ আয়াতে বিবরণ রহিয়াছে (২ ঃ ২৮৫) ঃ রাসূল, তাঁহার প্রতি তাঁহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে সে ঈমান আনিয়াছে এবং মু'মিনগণও। তাহাদের সকলে আল্লাহ্তে, তাঁহার ফেরেশতাগণে, তাঁহার কিতাবসমূহে এবং তাঁহার রাসূলগণে ঈমান আনিয়াছে (এবং শেষ দিবসেও, ৬০ ঃ ৬)। একটি প্রসিদ্ধ হাদীছে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহে, তাঁহার ফেরেশতাকুলে, পরকালে, তাঁহার প্রেরিত নবী ও রাসূলগণে এবং শেষ বিচারের দিন পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান (তু. হাদীছটি "হাদীছে জিব্রীল নামে খ্যাত", আল-বুখারী, কিতাবু'ল-ঈমান, ৩৭)। পুনঃপুনঃ উদ্ধৃত অন্য একটি হাদীছে আরও বর্ণিত আছে, "আল্লাহ্ প্রদত্ত তাকদীরের মঙ্গল ও অমঙ্গল এবং ভাল ও মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত।" এবং তৃতীয় অন্য একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, "চারটি বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত মানুষ 'ঈমানদার' হইতে পারে না ঃ (১) যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই; এবং (২) আমি (মুহাম্মাদ) তাঁহার রাসূল সত্য ও ন্যায়শিক্ষা প্রদানকল্পে প্রেরিত হইয়াছি; যতক্ষণ পর্যন্ত না (৩) সে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং (৪) "তাকদীরের ভাল-মন্দ ও মঙ্গল-অমঙ্গল" সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত— ইহার উপর পূর্ণ আস্থাবান হয়।"

আবশ্যকীয় ধর্মবিশ্বাসের নিয়মনিষ্ঠ তালিকায়, বিভিন্ন মাযহাব এবং লেখকগণের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পার্থক্য হইতে পারে। যাহা হউক, সর্বদা মূলত কুরআনের আয়াতের প্রতি এবং উপরোল্লিখিত ৩টি হাদীছের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করা হয়।

ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, ঈমান সম্পর্কিত শী'আগণের মূল ধারণা সুন্নীগণের ধারণার অতি নিকটবর্তী। শী'আ মতবাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, বিশেষত ইসমা'ঈলী মতবাদের কতিপয় অতিরিক্ত বিষয়ও ইহার সহিত সংযোজন করা হইয়াছে, ফেরেশতাকুলের প্রকৃতির ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত ব্যাখ্যা যাহা বিশ্বচরাচরের স্বাভাবিক নিয়মের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ সকল সৃষ্টির উদ্ভাবক—এই মত এবং অদ্বৈতবাদী অভিমতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ (তু. রাসা'ইল ইখওয়ানি'স-সাফা', ৪খ, ১২৯)।

(৩) **বিশ্বাস (ঈমান)-এর তাৎপর্য** ঃ এখানে তিনটি সমস্যার উল্লেখ বাঞ্ছনীয়।

(ক) **বিশ্বাস এবং স্বাধীনতা** ঃ "যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যাহার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক" (আল-কুরআন, ১৮ ঃ ২৯)। এই আয়াতটি কিভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে? মনুষ্যোচিত কাজের স্বাধীনতার সমস্যার সহিত বিজড়িত বিশ্বাসের মধ্যে স্বাধীনতার মান উপলব্ধি করা যায়। বিভিন্ন মাযহাব অনুযায়ী ইহার মান নির্ধারণ বিভিন্নরূপ হয়। মু'তাযিলাগণের ধারণা, আল্লাহ্ কর্তৃক মানুষের মধ্যে সৃষ্ট ক্ষমতাবলেই বিশ্বাসের (ঈমান) সৃষ্টি হইতে পারে। আশ'আরীগণ মনে করেন, আল্লাহ্ সরাসরি মনুষ্য হৃদয়ে ঈমান সৃষ্টি করেন, আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা (তাওফীক)-কে ধন্যবাদ যাহা নিজেই মানুষের হৃদয়ে আনুগত্যের এইরূপ শক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন (আত-তাফতাযানী, মাকাসিদ, ইস্তাম্বুল, তা. বি., পৃ. ১১৮)। তাফতাযানী কর্তৃক প্রদত্ত এই সংজ্ঞা মাতুরীদী মতবাদের তুলনায় অধিকতর আশ'আরী মতবাদের অনুরূপ। প্রকৃতপক্ষে সাধারণত মাতুরীদী হানাফীগণ মনে করেন, মনুষ্যোচিত প্রতিটি কার্যের মূল উৎস (আসল) আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট, পক্ষান্তরে মানুষের বিচারবুদ্ধি দ্বারা ইহা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই সামঞ্জস্য বিধান প্রচেষ্টার লক্ষ্য হইল,

আল্লাহ্র সৃষ্ট কার্যাবলী এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা সংক্রান্ত ধারণাগুলির মধ্যে পুনঃসামঞ্জস্য বিধান যেইরূপটি পবিত্র কুরআন দ্বারা স্বীকৃত (১৮ ঃ ২৯)।

(খ) **বিশ্বাস (ঈমান) এবং পরিত্রাণ** ঃ প্রতিটি মাযহাবেই বর্ণিত আছে যে, ঈমান দ্বারা পরিত্রাণ নিশ্চিত হয়। মৌলিক ঈমানের কার্যাবলী হইতে অপসারণ ঘটিলে তাহাদের পরিত্রাণ প্রাপ্তিতে বিচ্যুতি ঘটিবে। আশ'আরীগণের মতে ইহা আন্তরিক বিশ্বাসের (তাসদীক) উপর কেন্দ্রীভূত, মাতুরীদী হানাফীদের মতে ঈমান স্পষ্টত প্রকাশ্য ঘোষণা এবং আন্তরিক অনুরক্তি। মু'তাযিলীগণের মতানুসারে, "নির্ধারিত দায়িত্ব পালন" এবং হাম্বালী ও ওয়াহ্হাবীগণের নিকট প্রকাশ্য উচ্চারণ এবং মৌলিক (ফরয) দায়িত্ব পালন। যদি এই সকল বিভিন্নমুখী মতবাদের জন্য একটি সাধারণ নাম দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঈমান হইল কলেমা শাহাদাতে সংক্ষিপ্তভাবে যাহা বলা হইয়াছে ঃ আল্লাহ্র নিকট সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ই সর্বশক্তিমান প্রভু, আদি অনন্ত কালের অঙ্গীকার (মীছাক)-এর শর্তানুসারে, "আমি কি তোমাদের প্রভু নই ? ... হাঁ, নিশ্চয়ই আমরা সকলেই সাক্ষ্য প্রদান করিলাম" (৭ ঃ ১৭২)।

এইভাবে একটি বিখ্যাত হাদীছেও ঐকমত্য প্রকাশিত হইয়াছে ঃ "যে ব্যক্তির অন্তকরণে কণা (যাররা) পরিমাণ ঈমান আছে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না" (সাহীহ মুসলিম) এবং পুনঃ "যাহার অন্তরে এক 'কণা' পরিমাণ ঈমান রহিয়াছে, জাহান্নাম তাহাকে কখনও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিবে না" (হাদীছের দ্বিতীয় অংশ সাহীহ আল-বুখারী, ৮১, ৫১ হইতে গৃহীত)। কিন্তু এই সমস্ত হাদীছের ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম দেওয়া হইয়াছে। (১) যে ব্যক্তি নির্ধারিত বিধিবদ্ধ কর্তব্য পালনকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করে, তাহার মতে একজন চরম অবাধ্য পাপিষ্ঠ ব্যক্তি কখনও প্রকৃত বিশ্বাসী (ঈমানদার) হইতে পারে না। (২) যে ব্যক্তি কেবল 'আমল দ্বারা 'ঈমান'-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে বলিয়া মনে করেন, এইরূপ একজন বিশ্বাসী (ঈমানদার) পাপী ব্যক্তি, বিশ্বাসী বা ঈমানদার থাকিয়া যায়, সাময়িকভাবে তাহাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতে হইতে পারে, কিন্তু পরিশেষে সে "জান্নাতবাসী" হইবে। প্রথম অভিমতটি হইল খারিজীদের। 'মু'তাযিলীগণ বিশ্বাস (ঈমান) ও অবিশ্বাস (কুফর)-এর মধ্যবর্তী এক তৃতীয় অবস্থার স্বীকৃতি দেন। খারিজীদের অভিমতের সহিত ইহার অতি সূক্ষ্ম তারতম্য রহিয়াছে। সাধারণত বলিতে গেলে, দ্বিতীয় অভিমতটি সুন্নীগণ কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে। একটি অতিরিক্ত বিষয় ঃ মাতুরীদীগণ মনে করেন যে, বিশ্বাসী (ঈমানদার) পাপীকে সাময়িকভাবে অবশ্যই শাস্তি প্রদান করা হইবে, অপরপক্ষে আশ'আরীগণ মনে করেন যে, তাহাকে সরাসরি এবং সম্পূর্ণ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইতে পারে।

(গ) **অসৃষ্ট বিশ্বাস (ঈমান)** ঃ "এক কণা (যাররা) পরিমাণ বিশ্বাস (ঈমান)" সম্পর্কে হাদীছের দৃঢ় উক্তি আমাদিগকে "অসৃষ্ট বিশ্বাস বা ঈমান"-এর সমস্যার দিকে লইয়া যায়। যে মাযহাবগুলি সাধারণভাবে 'ই'তিকাদ' বা তাসদীকের উপর গুরুত্ব প্রদান করে তাহাদের মতে এই আন্তরিক অনুরক্তি এক অপরিবর্তনীয় প্রাণকেন্দ্র—"আল্লাহ্র অসৃষ্ট বিশ্বাস (ঈমান)"-এর সৃষ্ট প্রত্যুত্তর। আপাতদৃষ্টিতে ইহা এক আশ্চর্যজনক ধারণা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। যাহা হউক, আশ'আরী লেখকগণ ইহার জোর সমর্থন করেন। তাঁহারা—"আল্লাহ্র অসৃষ্ট বিশ্বাস (ঈমান)"-কে তিনি (আল্লাহ্) কর্তৃক তাঁহাকে প্রদত্ত ঈমানের সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য করেনঃ "নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্; আমা ব্যতীত কোন ইলাহ নাই" (২০ ঃ ১৪)। ইহা এইরূপ যে, আল-ঈজী এবং আল-জুরজানী (অন্যদের মধ্যে), "৯৯টি পরম সুন্দর নামের" তালিকায় (দ্র. আল-আসমাউ'ল-হুসনা), আল-মু'মিন (৫৯ ঃ ২৩) আল্লাহ্র নামের প্রথম ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আল-ঈজী (মাওয়াকিফ, apud আল-জুরজানী, শারহি'ল-মাওয়াকিফ, কায়রো ১৩২৭/১৯০৭, ৮খ, ২১২) বলেন, আল্লাহ্ স্বয়ং মু'মিন। যতদূর সম্ভব, "তিনি তাঁহার এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি অনুরক্ত" এবং আল-জুরজানী ইহার উপর মন্তব্য করিয়া পবিত্র কুরআনের ২০ ঃ ১৪-এর উল্লেখ করেন। এই প্রথম অর্থ, যাহা "অসৃষ্ট বিশ্বাস" (আল্লাহ প্রদত্ত ঈমান) সম্পর্কে ধারণার উৎস, কোনক্রমেই 'মু'মিন' সম্পর্কে উল্লেখিত দ্বিতীয় অর্থকে বাদ দেয় না ঃ যিনি নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা প্রদান করেন। সুতরাং আল্লাহ্ মু'মিন ঃ ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্ নিরাপত্তার উৎস (এবং অনুরূপভাবে বিশ্বাসের উৎস) ও 'রক্ষাকারী'। পরন্তু ফাখরু'দ-দীন আর-রাযী (লাওয়ামি', কায়রো ১৩২৩ হি., পৃ. ১৪৩-৫) প্রথম অর্থের উল্লেখপূর্বক, দ্বিতীয় অর্থকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেন বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়।

তৎসত্ত্বেও অধিকাংশ আশ'আরীর মতে এক কণা (যাররা) পরিমাণ বিশ্বাস (ঈমান), যাহা মানুষকে পরিত্রাণ (নাজাত) দেয়, তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ্র "অসৃষ্ট বিশ্বাসে"র (আল্লাহ প্রদত্ত ঈমান) সৃষ্ট অংশ, যাহা মহান আল্লাহ অঙ্গীকার (মীছাক) গ্রহণকালে মানব হৃদয়ে স্থাপন করেন।

(৪) **ঈমান (বিশ্বাস) সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী** ঃ ঈমান সম্পর্কে চিন্তা করিলে বহু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আমরা এখানে একটি অসম্পূর্ণ তালিকা প্রদান করিব। (ক) ইহ ও পরকালে মু'মিনের মর্যাদা (হুকম); (খ) বিশ্বাস (ঈমান) এবং অবিশ্বাস (কুফর)-এর মধ্যে সম্পর্ক; (গ) ঈমান এবং ইসলামের মধ্যে সম্পর্ক; (ঘ) কেহ কি তাহার বিশ্বাস (ঈমান) গোপন করিতে পারে ? [আন্তরিক মনোভাবকে প্রকাশ না করা অর্থাৎ মনে একরকম এবং বাহিরে অন্যরকম জনিত সমস্যা (তাকিয়্যা)]; (ঙ) যদি কেহ বলে, আমি একজন বিশ্বাসী বা ঈমানদার, তাহার এই বক্তব্যের সহিত "আল্লাহ চাহেতো" (ইনশা'আল্লাহ) বাক্যটি যুক্ত করিতে হইবে কি? (চ) ঈমান কি বৃদ্ধি ও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ? (ছ) ঈমান-এর পরিমাণসমূহ (তু. L' Gardet, Les grauds Problemes de la theologie musulmane ঃ Dieu et la destinee de I' homme, Paris 1967, 308-90)। নিম্নে ইহাদের কয়েকটি আলোচনা করা হইলঃ

(খ) পারিভাষিক অর্থে 'ঈমান' হইল 'কুফরের' বিপরীত। এই ক্ষেত্রে ঈমানের অর্থ 'বিশ্বাস' (মিথ্যা প্রতিপন্ন করার বিপরীত)। কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে ঃ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا অর্থাৎ "তুমি তো আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে না" (১২ ঃ ১৭) (মু'মিন সত্যবাদী)। আয-যাযজাজ-এর মতে ঈমান-এর অর্থ শারী'আ এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহকে বিনয়াবনত অন্তরে স্বীকৃতি প্রদান করা, তদনুরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অন্তরের সহিত উহাকে সত্য জ্ঞান করা। ইমাম গাযালী (র) ইহা হইতে এই অর্থ প্রকাশ করেন যে, (গ) ঈমান এবং ইসলাম (দ্র.) সমার্থবোধকও হয় এবং বিভিন্ন অর্থবোধকও হইতে পারে এবং মিশ্র অর্থও প্রকাশ করিতে পারে (অর্থাৎ একটির বিষয়বস্তুর আংশিক অন্যটির মধ্যে বিদ্যমান)। যেমন

কু'রআন মাজীদে আছে ঃ "সেইখানে যেসব মু'মিন ছিল আমি তাহাদেরকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং সেইখানে একটি পরিবার ব্যতীত কোন মুসলিম (মু'মিন) আমি পাই নাই," (৫১ ঃ ৩৫, ৩৬)। অনুরূপভাবে ইরশাদ হইয়াছে ঃ "হে আমার সম্প্রদায় ! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়া থাক, যদি তোমরা মুসলিম হও তবে তোমরা তাঁহারই উপর নির্ভর কর" (১০ ঃ ৮৪)।

সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে 'ঈমান' এবং 'ইসলাম'—উভয়ই এক অর্থবোধক হয় এই প্রসঙ্গে সাহীহ্ বুখারীতে হযরত 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীযের এই বর্ণনার উল্লেখ করা হইয়াছে, "ঈমান-এর কিছু অবশ্য পালনীয় বিধিবিধান ও রীতিনীতি এবং কতকগুলি সীমা-পরিসীমা এবং কিছু পদ্ধতি আছে। যে ব্যক্তি এই সমস্ত পালন করে, সে তাহার ঈমানকে পূর্ণাঙ্গ করে এবং যে ব্যক্তি ইহা সম্পূর্ণ পালন করে না, তাহার ঈমানও পরিপূর্ণ হয় না।" কু'রআন মাজীদের কতিপয় আয়াত হইতে ইসলাম এবং ঈমান-এর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন "আরববাসিগণ বলে, আমরা ঈমান আনিলাম। বল, তোমরা ঈমান আন নাই; বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি" (৪৯ ঃ ১৪)। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, 'ইসলাম' শব্দটি যেখানে 'ঈমান'-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেখানে ইসলাম অর্থ কেবল বাহ্যিক ও মৌখিক স্বীকারোক্তি অথবা বাহ্যত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করা, কিন্তু বিপরীতক্রমে 'ঈমান' আন্তরিক বিশ্বাস ও পূর্ণাঙ্গ দৃঢ় প্রত্যয় (নিঃসন্দেহ ও নির্দ্বিধা)-এর নাম। এমতাবস্থায় ঈমান ব্যতীত ইসলাম পূর্ণাঙ্গ হয় না। এইভাবে মিশ্র অর্থও প্রকাশ পায় যে, একটির সারমর্মের একাংশ অন্যটির মধ্যে বর্তমান থাকা। অতএব ইসলাম শব্দের এক ভাবার্থ লওয়া হইয়াছে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং 'আমাল বি'ল-জাওয়ারিহ্ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কার্যে পরিণত করা। কিন্তু অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসকেই শুধু ঈমান বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে, যাহা ইসলামের সংজ্ঞার অঙ্গীভূত উহার আরেকটি অংশ। এইভাবে ইহাতে 'আম ও খাসস্'-এর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ইসলাম হইল 'আম এবং ঈমান হইল খাসস্'।

ইমাম গাযালী (র) তাঁহার গ্রন্থ ইহ্'য়া'-তে উল্লেখ করেন (হাদীছ জিব্রীল অনুযায়ী), রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, 'ঈমান' কাহাকে বলে ? উত্তরে তিনি ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্, ফেরেশতাকুল, প্রেরিত গ্রন্থসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাতের উপর, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভের উপর, হিসাব-নিকাশ প্রদানের উপর এবং তাক্দীরের মঙ্গল ও অমঙ্গলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই ঈমান। পুনঃ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, 'ইসলাম' কাহাকে বলে ? জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন ঃ পাঁচটি ভিত্তির উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত, এই বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ (স) তাঁহার রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠিত করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ পালন করা এবং রামাদানের সিয়াম সাধনা করা। ইমাম বুখারী (র) কিতাবু'ল-ঈমানে, ঈমানের শর্তাবলী, উহার শাখা-প্রশাখাসমূহ, উহার প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে বহু হাদীছের উল্লেখ করেন। যেমন এক রিওয়ায়তে উল্লেখ আছে যে, 'ঈমান'-এর কতকগুলি শাখা আছে, লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা। অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, জিহাদ ঈমানের অঙ্গ। আরেকটি বর্ণনায় রামাদানের সিয়াম পালন এবং সালাতকে ঈমান-এর অঙ্গ বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। অন্য এক বর্ণনায় 'আনসারদিগকে' ভালবাসা ঈমান বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং অন্য এক স্থানে আছে, মানুষ নিজের জন্য যাহা পসন্দ করে, তাহা তাহার অপর ভাইয়ের জন্য পসন্দ করাও ঈমান। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-কে ভালবাসাও ঈমান (আল-বুখারী, কিতাবু'ল-ঈমান)।

মোটকথা, সাধারণত ঈমান ও ইসলাম সমার্থবোধক শব্দ, কিন্তু যেখানে এই দুইটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেখানে 'ইসলাম' বাহ্যিক স্বীকারোক্তি ও 'আমল করা এবং ঈমান অন্তরের দৃঢ় প্রত্যয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই দৃষ্টিকোণ হইতে ঈমান ব্যতীত ইসলাম পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। 'আম এবং খাসস্-এর মধ্যে যেমন পার্থক্য, ঐ দুইটি শব্দের মধ্যে ঠিক তেমনি পার্থক্য। মুতাকাল্লিমূন 'ঈমান' ও 'ইসলাম'-এর খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু আলোচনা করিয়াছেন এবং উহাদিগকে আখিরাতে পরিত্রাণ বা মুক্তির উপায় বিবেচনা করিয়া উহাদের সীমা নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। এই সার্বিক বিতর্কের উৎস এই যে, কতিপয় মুতাকাল্লিম 'আমলকে ঈমান-এর অংশ হিসাবে আখ্যায়িত করেন, কিন্তু কতিপয় 'ঈমানকে' অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেন।

এই প্রসঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে যে, নাজাত লাভের জন্য শুধু কি অন্তরের দৃঢ় প্রত্যয়ই যথেষ্ট বা ইহার সহিত মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং 'আমাল সালিহ' বা সৎ কর্মও আবশ্যক ? উদাহরণস্বরূপ শেষদিককার মুরজী'ইগণের এই ধারণা ছিল যে, অন্তরের দৃঢ় প্রত্যয়ই শুধু নাজাতের জন্য যথেষ্ট এবং ইহার মধ্যে অসৎ কর্ম দ্বারা বিঘ্ন সৃষ্টির কোন অবকাশ নাই। যেরূপ শুধু সৎ কর্মের দ্বারা কোন অবিশ্বাসী বা কাফির ব্যক্তি নাজাত পাইতে পারে না। পক্ষান্তরে খারিজীদের ধারণা ছিল যে, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত 'আমাল সালিহ' বা সৎকর্ম সম্পাদন করাও অত্যাবশ্যক। যদি কোন ব্যক্তি 'কবীরা' গুনাহ করে (মুশাদ্দিদুন বা গোঁড়াপন্থিগণের নিকট প্রতিটি গুনাহ্ই কবীরা) তবে সেই ব্যক্তি কাফির হইয়া যাইবে এবং অনন্তকাল জাহান্নামে বাস করিবে। মু'তাযিলাগণের নিকট এইরূপ ব্যক্তি কাফিরও নহে, মু'মিনও নহে বরং সে ফাসিক। আহ্‌ল সুন্নাতগণও এইরূপ ব্যক্তিকে ফাসিক বলিয়াই অভিহিত করেন। কিন্তু তাহাদের বিশ্বাস এই যে, পরিশেষে এইরূপ ব্যক্তি জান্নাতে গমন করিবে। ফাকীহ্গণের অভিমত এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজেকে মুসলিম বলিয়া দাবি করে, তাহাকে মুসলিম হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে। ইহার আলোকে সকল আহ্‌লে কিব্‌লা (দ্র.)-কেই মুসলিম হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করিতে হইবে, তাহাদের আন্তরিক বিশ্বাসের ব্যাপারটিকে আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করিতে হইবে, যতদিন না সমস্ত গোপন কথা আল্লাহ প্রকাশ করিয়া দেন। 'আমাল সালিহ' বা সৎকর্মের ব্যাপারটিও অনুরূপ, যদিও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এইরূপ অবস্থায় সৎকর্মে শিথিলতা সুনিশ্চিত এবং "আমালহীন" ও 'আমালদার' মুসলিমের মধ্যে কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে না। ইসলামী চিন্তাবিদগণের মধ্যে যাঁহারা 'আমালের উপর জোর দেন এবং নাজাত পাওয়ার জন্য ইহাকে মৌলিক শর্ত হিসাবে অভিহিত করেন, তাঁহাদেরও এই অভিমত, যদিও এই ব্যাপারে কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন হইয়া গিয়াছে। মোটকথা মৌলিক বিশ্বাস অপরিহার্য।

(চ) **ঈমান কি হ্রাস ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ?** বিভিন্ন মাযহাবে এই প্রশ্নটি বহু পূর্বেই উত্থিত হইয়াছে। ইহা ঈমানের গৃহীত সংজ্ঞার সহিত সম্পর্কিত। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ঈমানের বৃদ্ধি সম্পর্কে উল্লেখ রহিয়াছে

(যথা, ৩ ঃ ১৭৩; ৪৮ ঃ ৪; ৭৪ ঃ ৩১)। যাহা হউক কতিপয় বিশেষজ্ঞের মতে ইহা অপরিবর্তনীয়। এতদসম্পর্কে দুইটি উদাহরণ হইল ঃ (ক) খারিজী ও কাররামিয়্যাগণ ধারণা করেন যে, ঈমান সামগ্রিকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে এবং ইহা অখণ্ডভাবেই বজায় থাকে এবং খোয়ান যায়, যাহার ভিত্তিতে ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি আনুগত্য বজায় থাকে অথবা বিনষ্ট হয়। ইহা বিভিন্ন রকম হইতে পারে না। (খ) মুরজি'আ এবং মাতুরীদী-হানাফীগণ 'ঈমান' অপরিবর্তনীয় বলিয়া মনে করেন, কিন্তু খারিজীগণ ইহা যেইভাবে বুঝিয়াছেন সেইভাবে নয়। ওয়াসিয়্যাত আবূ হানীফার দ্বিতীয় নিবন্ধে বর্ণিত আছে, 'ঈমান' বৃদ্ধি কিংবা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। অবিশ্বাস (কুফ্র) বৃদ্ধি পাইলে প্রকৃতপক্ষে ঈমান দুর্বল হয় এবং অবিশ্বাস (কুফ্র) দুর্বল হইলে ইহার উন্নতি সাধিত হয়। ইহাতে একই সময় বিশ্বাসী (ঈমানদার) এবং অবিশ্বাসী (কাফির)—উভয়ই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ইহা কিরূপে সম্ভব (তু. Wensinck, পৃ. গ্র., ১২৫, ১৩৮)? মাতুরীদীগণের পরবর্তী গ্রন্থসমূহে ইহার সমর্থন পাওয়া প্রয়োজন ছিল [তু. 'আবদু'র-রাহীম ইব্ন 'আলী, পৃ. গ্র., ৫২-৪, যাহা আবূ হানীফা (র) এবং মাতুরীদীর হৃদয়ে সাড়া জাগাইয়াছিল] আশ'আরীদের মতবাদের বিরুদ্ধে। ইহা বিশ্বাস (ঈমান) এবং সৎকর্ম ('আমাল)-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নির্দেশ করে। বাধ্যতামূলক কার্যাদি বর্জন করা একটি অবাধ্যতামূলক আচরণ কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ঈমানকে বা উহার পরিপূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না।

কিন্তু কুরআনের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ একটি অতি প্রাচীন হাদীছে ঈমানের সম্ভাব্য পরিবর্তনের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। আল-বুখারী এবং ইব্ন মাজা, সাহাবীগণের উদ্ধৃতি প্রদান পূর্বক ঈমান অধ্যায় (কিতাবু'ল-ঈমান)-এর ভূমিকায় এই সন্দর্ভের উল্লেখ করেন। এই মতবাদই অধিকাংশ মাযহাব কর্তৃক অনুসরণ করা হয়। অনুরূপভাবে (ক) মু'তাযিলাগণ মনে করেন যে, বিশ্বাস (ঈমান) হইল কর্মের ('আমাল) সাক্ষী ঃ অতঃপর ইহা আপনা আপনি পরিবর্তিত হইতে পারে; ইহা বিধিবদ্ধ কার্যাবলী পালনের মাধ্যমে বর্ধিত এবং উহা বর্জনের মাধ্যমে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। (খ) আহমাদ ইব্ন হাম্বাল ('আকীদা, ১খ, ২৪) বর্ণনা করেন, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং কার্যে পরিণত করার নাম ঈমান, ইহা সহজে বৃদ্ধি এবং হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে পারে। এই বিষয়ে হাম্বালী চিন্তাধারা সর্বসম্মত। ইব্ন বাত্তা বলেন, অন্তরের দৃঢ় প্রত্যয় (তাসদীক) সৎকর্ম ('আমাল) এবং নিষ্ঠাবান হওয়া (ইহ্সান) দ্বারা বৃদ্ধি পায়, আদেশ অমান্যকরণ (পাপকর্ম) (মা'সিয়্যা) দ্বারা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহার শেষ এবং শুরু আছে বিধায় ইহার অসীম উন্নতি ও বৃদ্ধি সম্ভব (পৃ. গ্র., ৪৮/৭৮)। ইব্ন তায়মিয়া এবং ওয়াহ্হাবীগণও একই ধারণা পোষণ করেন। এই মতবাদটি অবশ্য আশ'আরীগণের মাকালাত ও ইবানা-তেও দৃষ্ট হয়। (গ) আশ'আরী মতবাদ সামগ্রিকভাবে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির এই তত্ত্বগত দিক সমর্থন করে এবং একই সঙ্গে গুরুত্ব আরোপ করে যে, কার্যাদি সম্পাদন (এবং না) করার মাধ্যমে ইহার পরিপূর্ণতার পরিমাণ নির্ধারিত হইবে। অতঃপর (তু. আল-বাজূরী, হাশিয়া... 'আলা জাওহারাতি'ত-তাওহীদ, কায়রো ১৩৫২/১৯৩৪, পৃ. ৩০)। আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার ফেরেশতাকুলের উপর 'অসৃষ্ট বিশ্বাস' (Uncreated faith)-এর কোন বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে না; রাসূলগণের ঈমান, তাঁহাদের প্রেরণের উদ্দেশ্যসমূহ নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করা অনুযায়ী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের রাসূলসুলভ নিশ্চিত ভ্রান্তিহীন ও নিষ্পাপ ('ইসমা) হওয়ার কারণে তাঁহাদের ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। কেবল সাধারণ মানুষের ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু আল-আশ'আরীর লুমা'র বর্ণনা অনুসারে ঈমানের প্রচলিত উপাদানকে সংজ্ঞায়িত করা হইয়াছে আন্তরিক বিশ্বাস (তাস্দীক) দ্বারা, এই মতবাদ প্রথাগতভাবে ঈমানের মূলে মানব হৃদয়ে আল্লাহ্ সৃষ্ট এক অপরিবর্তনীয় প্রাণকেন্দ্রকে (হাদীছে বর্ণিত ঈমানের কথা) চিহ্নিত করিয়াছে। ইহা অবিশ্বাস বা কুফ্রী কর্ম দ্বারা সম্পূর্ণ খোয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহা পরিবর্তন হইতে পারে না। অনুরূপভাবে আশ'আরীগণ, ইহার প্রধান প্রধান কেন্দ্র (তু. মাতুরীদী হানাফী) বিশ্বাসের অপরিবর্তনীয়তা এবং ইহার পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তির স্তরের পরিবর্তনশীলতা, এই উভয়েরই স্বীকৃতি দান করেন (তু. হাম্বালী)।

(২) **ঈমানের স্তর ঃ** এই প্রশ্নটি শেষোক্তটির সহিত কিছুটা সম্পর্কযুক্ত, তৎসত্ত্বেও ইহা হইতে পৃথক। আনুগত্য বা অনানুগত্য অনুসারে, একই বিষয়ে এখন আর নিম্ন বা উচ্চতর বিশ্বাসের (ঈমান) ব্যাপার নয়, বিভিন্ন বিষয়ে ইহার স্বকীয় প্রকৃতি অনুযায়ী বিশ্বাস বা ঈমানের স্তরের ব্যাপার মাত্র। আশ'আরী ও শাফি'ঈগণের চিন্তাধারা (যাহাতে তাক্লীদকে অযৌক্তিক অনুকরণ এবং নিষ্ক্রিয় সমর্থন বলিয়া বিবেচনা করে) এই ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিল যে, অনুকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশ্বাস কেবল তাহার ক্ষেত্রে সিদ্ধ যে উহার ঊর্ধ্বে উঠিতে সক্ষম নয়। পক্ষান্তরে হাম্বালীগণ স্বেচ্ছাকৃত এবং সচেতনভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর, সাহাবীগণের এবং তাঁহাদের পরম্পরাগত আগত ব্যক্তি (তাবি'উন)-গণের অনুকরণ তাক্লীদ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন এবং ইহাকে (ঈমানদারগণের) মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি বলিয়া মনে করেন (তু. H. Laoust, Ibn Batta, পৃ. ৭, নোট ২, এবং পৃ. ৯, নোট ১)। যাহা হউক, ইব্ন 'আকীল ইহা সম্পর্কে সন্দেহভাজন ছিলেন এই ভয়ে যে, তাক্লীদের আশ্রয় গ্রহণের ফলে প্রমাণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া অনুকরণকে উহার বিকল্পরূপে ধরিয়া লইবে (তু. G. Makdisi, Ibn Aqil et la resurgence de l'Islam traditionaliste au XIe siecle, Damascus 1963, 524-5)।

'ইলমে কালামের অধিকাংশ প্রাচীন পুস্তক তাক্লীদ-এর মাধ্যমে ঈমান-এর তুলনায় জ্ঞান (বা বিজ্ঞান)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত (ঈমান 'আন 'ইল্ম) বিশ্বাসকে শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করে। আলোচিত 'প্রমাণ' (Proof) মুতাকাল্লিমদের যুক্তিতর্ক ও বিচার-বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত বলিয়া পরিজ্ঞাত। এইভাবে প্রশংসিত বৈজ্ঞানিক বিষয় হাম্বলী ও ফালাসিফা, উভয় প্রতিপক্ষীয় দ্বারা বিরূপভাবে সমালোচিত হইয়াছে। আল-গাযালী (র) (ইহ্য়া', ১খ, ১০৭-৮) পূর্ববর্তীটির তুলনায় উন্নততর একটি তৃতীয় স্তরের উল্লেখ করিয়াছেন, 'দৃঢ় বিশ্বাস' (faith of certitude) (য়াকীন)। সম্ভবত এই ক্ষেত্রে শী'আ ও সূফী, উভয় মতবাদের প্রভাবই পরিদৃষ্ট হয়। "ইখ্ওয়ানু'স-সাফা'র" আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসের ন্যায় ইমাম গাযালী (র)-এর মতে "দৃঢ় বিশ্বাসের" এই উচ্চতর স্তর কেবল য়াকীন বা একমাত্র সত্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সম্ভবত ইব্ন তায়মিয়া (র)-এর মধ্যেও একই প্রভাব বিদ্যমান। ইসলামের মাধ্যমে ঈমানের সংজ্ঞা প্রদান করিয়া অর্থাৎ শাহাদাত-এর ঘোষণার দ্বারা এবং বিধিবদ্ধ (ফারদ্) দায়িত্ব সম্পাদন (কিতাবু'ল-ঈমান, ৩২) করিয়া এবং অভিজ্ঞতার অনুভূতির ব্যাখ্যা প্রদানের পর, ঈমানদারের অন্তঃকরণে যাহার উৎপত্তি হয় (তু. উপর উল্লিখিত), তিনি ঈমানকে ঊর্ধ্ব স্তরে পার্থক্য করেন ঃ

(আল্লাহর ওয়ালীর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি), সিদ্দীক (অত্যন্ত সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ) এবং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ঈমান। ইব্‌ন তায়মিয়ার ভাষ্যে ধর্মীয় যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি, আদেশ-নিষেধ ও রীতি-নীতি পালনে অভ্যস্ত ব্যক্তি হইতে শুরু করিয়া (H. Laoust), বিশ্বাস (ঈমান), ইহ্‌সান (সদাচরণ), ইখলাস (সততা, নিষ্ঠা এবং অবিমিশ্র বিশুদ্ধতা) এবং ফানা' ফিল্লাহ (পার্থিব সকল কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ)-তে শেষ হয়।

(৬) ইহা জানা যায় যে, প্রথম হইতেই ইনশা'আল্লাহ (যদি আল্লাহর ইচ্ছায় হয়) বলা ব্যতীত, আমি একজন মু'মিন (আনা মু'মিন) একথা বলা অপসন্দ করা হইয়াছে। আবার ভিন্নমতে ইহা হইতে আরও অধিক, 'হাক্কান' (প্রকৃতপক্ষে), "ইনদাল্লাহ" (আল্লাহর নিকট) ইত্যাদি বাড়াইয়া বলার (দ্র. শারহ 'আকাইদ নাসাফী) উল্লেখও রহিয়াছে। আল-গাযালী (র) বিরচিত ইহ্‌য়া', ২খ, ৪র্থ অধ্যায়, ৩ নং মাস'আলা-তে ইহার কয়েকটি উদাহরণ প্রদান করা হইয়াছে (তু. সায়্যিদ আল-মুরতাদা, শার্‌হ)। সুতরাং আশা'ইরা এবং সকল শাফি'ঈ, মালিকী, হাম্বলী মতাবলম্বী ইনশা'আল্লাহ বলার উপর অনমনীয় ছিলেন। পক্ষান্তরে মুরজি'আ ও হানাফী মতাদর্শ অবলম্বিগণ ইনশা'আল্লাহ বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং হাক্কান বলাকে জা'ইয মনে করিতেন। তাঁহাদের অভিমত হইল (কেহ নিজেকে মু'মিন বলিয়া দাবি করার সময় ইনশাআল্লাহ বলা সন্দেহ প্রকাশের শামিল এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে সন্দেহ প্রকাশ করা কুফ্‌রীর শামিল। উত্তরে আশা'ইরা বলেন, ইন্‌শাআল্লাহ-এর সংযোজন আন্তরিক বিশ্বাসের উপর কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশের উদ্দেশ্যে নয়, বরং (১) ইহা নিজেকে পবিত্র বলিয়া দাবি করা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বলা হয়। যেমন আল-কুরআনের আয়াত—

فَلاَ تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى (৫৩ : ৩২)

"অতএব তোমরা নিজেদের পবিত্রতা প্রচার করিও না; তিনিই সম্যক্ জানেন মুত্তাকী কে")। (২) ইহার উদ্দেশ্য বিনয় প্রকাশ এবং প্রতিটি কাজ ও কথায় আল্লাহর ইচ্ছার উপর তাওয়াক্কুল-এর মাধ্যমে বরকত লাভ; (৩) আলোচ্য ঈমান পূর্ণতাপ্রাপ্ত হওয়া কিংবা উহার সত্যতা সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ ইহার উদ্দেশ্য নয়। আবার যদি 'আমালকে ঈমানের অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হয়, তবে এই সন্দেহ প্রকাশ করা 'আমাল-এর অন্তর্ভুক্ত হইবে কি না? (৪) এই সন্দেহ প্রকাশ করা, আলোচ্য মু'মিন ঈমানদার অবস্থায় থাকিতে পারিবে কি না? কেননা প্রতিটি ব্যাপারে উহার পরিণাম (খাওয়াতিম) দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া উচিত। এতদব্যতীত ব্যাপারটি নিয়াতের সহিতও সম্পর্কিত (আল-আ'মালু বিন-নিয়্যাত)। আশ'আরীদের দৃষ্টিভঙ্গী জানার জন্য দ্রষ্টব্য ইহ্‌য়া,' ২খ, ৪র্থ অধ্যায় এবং মাতুরীদী মতবাদের জন্য আত-তাফতাযানী বিরচিত শারহ 'আকাইদি'ন-নাসাফী, কায়রো ১৩২১ হি., পৃ. ১২৭ প.।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ নিবন্ধে উল্লেখিত বরাত ব্যতীত ঃ (১) আল-ঈজী, মাওয়াকিফ, সং. Soerensen, পৃ. ২৪৭-২৯০, বূলাক ১২৬৬ হি., পৃ. ৫৯৩-৬০০; (২) তাহানাবী, কাশ্‌শাফ, পৃ. ৯৪-৯৮; (৩) আল-বুখারী, কিতাবু'ল-ঈমান; (৪) Krehl, Zur Lehre Vom Glauben in Islam; (৫) সায়্যিদ সুলায়মান নাদাবী, সীরাতু'ন-নাবী, ৪খ.; (৬) আস্‌গার 'আলী রূহী, মা ফি'ল-ইসলাম; (৭) শার্‌হ 'আকা'ইদি'ন-নাসাফী।

L. Gardet/ D. B. Macdonald (E.I.², দা. মা. ই.)/
মুহাম্মদ সাইয়েদুল ইসলাম

**ঈরাজ মীরযা** (ايرج ميرزا) ঃ জালালু'ল-মামালিক (১২৯১/১৩৪৩ হি.) গুলাম হুসায়ন মীরযার পুত্র, যিনি মালিক ঈরাছ-এর পুত্র, যিনি ফাত্‌হ 'আলী শাহ কাচার-এর পুত্র। হি. ১২৯১ সনের রামাদান মাসের প্রথমদিকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ঈরাজ রাখা হয়। কিন্তু পিতামহের খাতিরে কিছুকাল যাবত তাঁহাকে আমীর খান বলিয়া ডাকা হইত। বাল্যকালে তিনি আকা মুহাম্মাদ তাকী 'আরিফ ইসফাহানী ও মীরযা নাসরুল্লাহ বাহার শিরওয়ানীর নিকট শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করেন (উভয় শিক্ষক 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ জ্ঞান থাকা ছাড়াও ফারসী ভাষারও সুপণ্ডিত ছিলেন)। যৌবনে পদার্পণ করিয়া ঈরাজ ভাষা ও সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তাবরীযের দারু'ল-ফুনূন-এ ভর্তি হন। অবসর সময়ে তর্কশাস্ত্র ও অলংকারশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য আশতিয়ানীর পাঠচক্রে যোগদান করিতেন।

হাসান 'আলী খান আমীর নিজাম গাররূসী ঈরাজের প্রতিভা ও জ্ঞানপিপাসা দেখিয়া তাঁহাকে কবিতা চর্চার প্রতি উৎসাহিত করেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহাকে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করিতেন। [আমীর নিজাম যখন তাবরীয শহরে মাদ্‌রাসা-ই মুজাফ্‌ফারী নির্মাণ করেন তখন ঈরাজকে ঐ মাদ্‌রাসার প্রধান হিসাবে নিয়োগ করেন]।

ষোল বৎসর বয়সে ঈরাজের বিবাহ হয়। তিন বৎসর পর তাঁহার মাতা ও স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। হি. ১৩০৯-১০ সনে যখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৯ বৎসর তখন কাচার-এর শাহ্ মুজাফ্‌ফারু'দ-দীন তাঁহাকে সাদ্‌রু'শ-শু'আরা (প্রধান কবি) খেতাব দান করেন [এই কারণে রাজকীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবে স্তুতিমূলক কবিতা (قصائد) ও খণ্ড কবিতা (قطعات) লিখিয়া পেশ করা তাঁহার কর্তব্য হইয়া পড়ে]। এই কার্য ঈরাজের পসন্দ হইল না। আমীর নিজামের প্রশংসায় লিখিত এক কাসীদায় তিনি "সাদ্‌রু'শ-শু'আরা" ও "ফাখরু'শ-শু'আরা" জাতীয় খেতাবের প্রতি স্বীয় অনীহা প্রকাশ করেন। মুজাফ্‌ফারু'দ-দীন শাহের রাজত্বের প্রথমদিকে মীরযা 'আলী খান আমীনু'দ-দাওলা যখন আযারবায়জান-এর 'পেশকার' নিযুক্ত হন তখন তিনি ঈরাজকে তাঁহার মুন্‌শী খাস্‌স্' (ব্যক্তিগত সচিব) নিয়োগ করেন। ১৩১৪ হি. সনে যখন তিনি সাম্রাজ্যের উচ্চ রাজপদ 'উহ্‌দা-ই সাদারাত-এর দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য তেহরান গমন করেন তখন ঈরাজকেও সঙ্গে লইয়া যান। কিছু দিন পর ঈরাজ "কাওয়ামু'স-সালতানাত"-এর সহিত য়ুরোপও গমন করেন। (তথা হইতে) প্রত্যাবর্তনকালে তিনি তাবরীযে আসেন। সেখানে সুলতানের গভর্নর (নিজামু'স-সালতানাত) হুসায়ন কুলী খান তাঁহার যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেন এবং তাঁহাকে "উতাক তিজারাত' (বণিক সংঘ)-এর প্রধান পদে নিয়োগ করেন [ইহা ছাড়া দারু'ল-ইনশা'(পত্র আদান-প্রদান) বিভাগেও উচ্চ পদ প্রদান করেন]। ১৩১৮ হি. তিনি গভর্নরের সফরসঙ্গী হিসাবে তেহরান এবং ১৩১৯ হি. খামসাহ্ ও যানজান গমন করেন।

[ঈরাজ দরবারী চাকুরী হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাহিতেছিলেন এই জন্য] তিনি বেলজিয়ামের উপদেষ্টাদের মাধ্যমে ডাক ও শুল্ক বিভাগের চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছু দিন তিনি কিরমান শাহ এবং কিছুকাল কুর্দিস্তানে অবস্থান করেন। পরে এই দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইয়া ১৩২৩ হি. তেহরান উপস্থিত হন [১৩২৪ ও ১৩২৫ হি.-এর মধ্যে তিনি সানী'উদ-

দাওলার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন এবং মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করেন]। ১৩২৬ হি. তিনি আযারবায়জান-এর গভর্নর মাহ্দী কুলী মুখবিরু'স-সালতানাত-এর সঙ্গে তাবরীয যান এবং তথায় প্রদেশের ব্যবস্থাপনা দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর ককেশাস হইয়া তেহরানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ স্থাপন করেন। দুই বৎসর পর সরকারী উপদেষ্টা পদ লইয়া ইসফাহান যান। অতঃপর আবাদা-তে নিযুক্তি লাভ করেন। ইহার পর দ্বিতীয় বারের জন্য কর আদায় বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এনযিলী (বন্দর পাহ্লাবী)-তে নিযুক্ত হন। তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া অর্থ মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ বিভাগের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জা'ফার কুলী মীরযা আত্মহত্যা করায় তাঁহার জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠে। ইহার পর তিনি তেহরান ত্যাগ করিয়া অর্থ উপদেষ্টা পদে খুরাসান গমন করেন (আমেরিকার বিশেষজ্ঞগণ আগমন করিলে অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত কাজে নিয়োজিত হন)। অবশেষে এই কাজে অতিষ্ঠ হইয়া তেহরান চলিয়া আসেন এবং ভিন্নতর পদের প্রতীক্ষায় থাকেন। দেড় বৎসর পর তিনি ২৭ শা'বান, ১৩৪৩ হি./২২ ইসফান্দ, ১৩০৪ হি. সৌর তারিখে হৃদক্রিয়া বন্ধ হইয়া ইনতিকাল করেন।

ঈরাজ মীরযা ফরাসী ভাষায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার রচনাসমূহেও ইহার প্রভাব বিদ্যমান। তিনি 'আরবী, রুশীয় এবং তুর্কী ভাষাও যত্নসহকারে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি একজন নিপুণ লিপিকারও ছিলেন।

তাঁহার কবিতা এতই প্রাঞ্জল ও সাবলীল যে, যদি উহার ওযন এবং কাফিয়া (মাত্রা ও অন্ত্যমিল) বাদ দেওয়া হয় তবে তাঁহার গদ্য ও পদ্যের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য হইবে না। এই দৃষ্টিতে ঈরাজ ফারসী কবিদের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। তাঁহার বর্ণনার মধ্যে কোন দুর্বোধ্যতা ও কৃত্রিমতা নাই। তাঁহার ভাষা তাঁহার অভ্যন্তরীণ প্রেরণারই মুখপত্র। তিনি সর্বদা সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে লিখিতেন। তাঁহার কিছু কিছু রম্য রচনাও রহিয়াছে।

তিনি কবিতার সব শাখাতেই অবদান রাখিয়াছেন, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কথা সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি সাধারণত মেযাজ পরীক্ষা করিতেন। তিনি মাছনাবী (দ্বিপদী কবিতা) ও কিত'আ (খণ্ড কবিতা) লেখার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

তাঁহার রচনাবলী ঃ (১) মাজমু'আ আশ'আর—প্রধানত কাসীদা; গাযাল, কিত'আ, মাছনাবী এবং মুখাম্মাসও ইহার অন্তর্ভুক্ত; (২) 'আরিফ নামাহ (মাছনাবী), 'আরিফ কাযবীনী সম্বন্ধে ব্যঙ্গ কবিতা, সাত শত শ্লোকসম্বলিত; (৩) যুহ্রাঃ ও মিনূচিহ্র (মাছনাবী), অসমাপ্ত, চারি শত উনিশটি শ্লোক।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) দীওয়ান ঈরাজ, সং, খুস্রাও ঈরাজ, সাত খণ্ড, তেহরান (দীমাহ ১৩০৯, ফারওয়ারদীন ১৩২০ ইরানী সন দীবাচাহ, ১খ., (। হইতে ل), তা. বি.; (২) রাশীদ য়াসিমী, আদাবিয়্যাত-ই মু'আসির, তেহরান ১৩১৬ হি. সৌর, পৃ. ২৩-২৭; (৩) মুহাম্মাদ ইসহাক, সুখান ওয়ারান-ই ঈরান দার 'আসর-ই হাযি-র, ১খ., ১ম সং, দিল্লী ১৩৫১ হি., পৃ. ১৩, ৩১; (৪) দীনশাহ ঈরানী, সুখানওয়ারান-ই দাওরান-ই পাহ্লাবী, বোম্বাই ১৩১৩ হি. সৌর; (৫) সায়্যিদ 'আলী আযারী, কিয়াম কিলনিল, ২য় সং.,১৩২৯ হি. সৌর; (৬) নুসরাতুল্লাহ ফাতহী, 'আরিফ ও ঈরাজ, ২য় সং. তেহরান ১৩৩৩ হি. সৌর; (৭) সায়্যিদ মুহাম্মাদ বাকির বুরকা'ঈ, সুখানওয়াবান-ই নামী-ই মু'আসির, ১খ., তেহরান ১৩২৯ হি. সৌর; (৮) নাদির, নাদিরপুরঃ চিশ্মিহা ওয়া দাস্তিহা, তেহরান ১৩৩৩ হি. সৌর; (৯) মুহাম্মাদ হুসায়ন মীরযা নাদিরী, আদাবিয়্যাত নাদিরী, আদাবিয়্যাত নাদিরী বা-রাদ্দ বা-'আরিফ নামা-ই ঈরাজ মীরযা, মাশহাদ ১৩০৬ হি. সৌর; (১০) আসাদুল্লাহ তালা'আত তাবরীযী, দীওয়ান-ই তালা'আত তাবরীযী, তেহরান ১৩২৪ হি. সৌর; (১১) হুসায়ন পাঝমান বাখ্তিয়ারী, বেহতারীন আশ'আর, তেহরান ১৩১৩ হি. সৌর; (১২) সিদ্দীকাঃ মাস'উদ ওয়া জা'ফার নাওয়া'ঈ, গুরচীন-ই গুলচীনহা, ইসফাহান ১৩৩৩ হি. সৌর; (১৩) মুজাহির-ই মুসাফ্ফা, পাসদারান-ই সুখুন, ১খ. তেহরান ১৩৩৪ হি. সৌর; (১৪) 'আবদু'ল-হামীদ 'ইরফানী, শারহ্-ই আহওয়াল ওয়া আছার-ই মালিকু'শ-শু'আরা মুহাম্মাদ তাকী বাহার, ১৩৩৪ হি. সৌর; (১৫) আরবেরী, শে'র-ই জাদীদ ফারসী, অনু. ফাত্হুল্লাহ মুজতাবা'ঈ, তেহরান ১৩৩৪ হি. সৌর; (১৬) আসাদুল্লাহ ঈয়াযদ গুশ্ব, কিতাব নামা-ই সুখানওয়ারান, তেহরান ১৩১৬ হি. সৌর; (১৭) মাহ্দী হামীদী, দারয়া-ই গাওহার, ৩খ. তেহরান ১৩৩৪ হি. সৌর; (১৮) জা'ফার শেদবান, শু'আরা-ই মা'রূফ-ই মু'আসির, তেহরান ১৩৩২ হি. সৌর; (১৯) হুসায়ন ফারেওয়ার, তারীখ-ই আদাবিয়াত-ই ঈরান, তেহরান, চতুর্থ অধ্যায়। (২০) নুখুস্তীন কুঙ্গুরা-ই নাবীসান্দাগান-ই ঈরান, তেহরান ১২২২ হি. সৌর; (২১) হাদী হা'ইরী (কুরাশ), আফ্কার ওয়া আছার-ই ঈরাজ, দ্বিতীয় অধ্যায়, তেহরান ১৩৩৪ হি. সৌর। (২২) মুহাম্মাদ যি-য়া, মুন্তাখাবাত-ই আছার, তেহরান ১৩৪২ হি. সৌর। (২৩) হুসায়ন পাঝমান বাখ্তিয়ারী, খাশাক, তেহরান ১৩৩৫ হি. সৌর। (২৪) রিয-া যাদাহ শাফাক ও অন্যান্য, ফারসী ওয়া দাস্তুর-ই যাবান (স্কুলসমূহের ২য় শ্রেণীর জন্য), দ্বিতীয় অধ্যায়;(২৫) য়াওয়ার আসাদুল্লাহ তালা'আত, ইনতিকাল-ই তালা'আত বা'আরিয়া নাম-ই ঈরাজ মীরযা, তাবরীয ১৩০৪ হি. সৌর; (২৬) আমীর মাস্'উদ, আশ'আর জাবীদাস-ই পারসী, তেহরান ১৩৩৯ হি. সৌর; (২৭) মাহ্মূদ ফাররুখ, সাফীনা-ই ফাররুখ, মাশহাদ ১৩৩৩ হি. সৌর। (২৮) যাবীহুল্লাহ সাফা, গানজ-ই সুখুন, ৩খ, তেহরান ১৩৪০ হি. সৌর। (২৯) জুহুরু'দ-দীন আহমাদ, নায়া ঈরানী আদাব, ২য় সং, লাহোর ১৯৬৭ খৃ.; (৩০) মুহাম্মাদ ইসহাক, Modern Persian Poetry. কলিকাতা ১৯৪৩ খৃ.; (৩১) মুনীরু'র-রাহমান, Post-Revolution. Persian Verse, আলীগড় ১৯৫৫ খৃ.। সাময়িকী ও দৈনিক পত্রিকাসমূহ ঃ (৩২) সাপেদাহ দাম, সাপ্তাহিক পত্রিকা, তেহরান, সংখ্যা ২৩, ১২ ইস্ফান্দ ১৩২৬ হি. সৌর; (৩৩) জাহান-ই নাও, মাসিক পত্রিকা, তেহরান, ১ম ও ২য় সংখ্যা, খুর্দাদ এবং তীর ১৩২৫ হি. সৌর; (৩৪) ঈরান শার, মাসিক পত্রিকা, বার্লিন, ২খ; (৩৫) সুখুন, মাসিক সাহিত্য পত্রিকা, তেহরান, ৬খ. সংখ্যা, আবান ১৩৩৪ হি., সৌর; সংখ্যা ৫, ৫ম সিরিজ; (৩৬) সাপেদ ওয়া সিরাহ, সাপ্তাহিক পত্রিকা, তেহরান, সংখ্যা ১৮, ৩য় বর্ষ, ১২ আযার মাহ ১৩৩৪ হি. সৌর, সা'ঈদ নাফীসীর প্রবন্ধ। (৩৭) গায়হান ফারহাঙ্গী, সাপ্তাহিক পত্রিকা, তেহরান, ২য় সংখ্যা, ১৫ ইস্ফান্দ, ১৩৩৪ হি., সৌর, সংখ্যা ১৩৩১৫ খুরদাদ ১৩৩৫ খুরদাদ ১৩৩৫ হি., সৌর। (৩৮) ঈরান-ই মা, সাপ্তাহিক পত্রিকা, তেহরান, সংখ্যা ২৯৬, ১১ আবান

মাহ ১৩৩৫ হি. সৌর। (৩৯) উমীদ-ই ঈরান, সাপ্তাহিক পত্রিকা, তেহরান, সংখ্যা ৩৭, ১৩৩৬ হি., সৌর; (৪০) খোশাহ, সাপ্তাহিক পত্রিকা, তেহরান, সংখ্যা ৮, ৯, ১ম বর্ষ, ১৩৩৫ হি. সৌর। (৪১) মাহ্ নামা-ই তেহরান, সচিত্র, সংখ্যা ৬. খুর্‌দাদ ১৩৩৫ হি., সৌর; (৪২) ইন্‌তিকাদ-ই কিতাব, তেহরান, সংখ্যা ৭, তীরমাহ ১৩৩৫ হি., সৌর। (৪৩) পায়াম-ই নাও, মাসিক সাহিত্য পত্রিকা, তেহরান, ২য় সিরিজ। (৪৪) আরমাগান, মাসিক পত্রিকা, তেহরান, ১ম সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ।

মুহাম্মাদ মু'ঈন [এবং জু'হূরু'দ-দীন আহ'মাদ]/ (দা.মা.ই.)/
বোরহান উদ্দীন

**ঈল** (ایل) ঃ তুর্কী হল শব্দের 'আরবী বর্ণশুদ্ধি, সঠিক মূল উচ্চারণ এল (el), শব্দটির ব্যাপক অর্থগত পরিবর্তন ঘটিয়াছে (দ্র. Radloff, Versuch....i, 803-5, 1471)।

(১) V. Thomsen প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুয়ায়ী এখন লিপিতে শব্দটির অসংখ্য ব্যবহার হইতে un peuple ou une reunion de peuples consires comme formant un tout independant et organise ayant et a sa tete un kagan (Inscriptions de 1'Orkhon dehiffrees, Helsingfors 1896, 135) ইহার মোটামুটি অর্থ দাঁড়ায় 'সাম্রাজ্য' (empire)। এই অর্থে শব্দটি প্রায়শই বুদুন (read bodun) "গোত্রসমূহের সংঘ" শব্দের সহযোগ বা Toru "আইন, রীতিনীতি" শব্দের সহযোগে ব্যবহৃত হয় (ব্যবহার সম্পর্কে দৃষ্টান্ত ও আলোচনা, R. Giraud, I'Empire des Turcs Calestes, Paris 1960, 67/72)। ধরিয়া নেওয়া হয় যে, এই অর্থেই শব্দটি এল তেরিশ (elterish), এল ইতিমধ্যে (el-etmish), এল তুতমিশ (el-tutmish.), A. Caferoglu. Tukyu ve Uygurlarda han unvanlari, in THITM, i (1931, 105-19) ইত্যাদি তুর্কী রাজকীয় উপাধিসমূহে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং "ঈলেক খান" (দ্র.)-এর প্রথমাংশ (সম্ভবত) এল লিগ "সাম্রাজ্যাধিপতি" (শাসক)-রূপেই ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত (O. Turan, Ilig unvani hakkinda, in TM. vii-viii/i (1942), 192-9).

(২) প্রাথমিক সময়ে শব্দটি দ্বারা "যে জিলার উপরে কর্তৃত্ব খাটান হয়" এই ধারণা প্রকাশ করা হইত, যে কারণে মাহমূদ কাশগারী সংজ্ঞা দিয়াছেন (সম্পা. কিলিসলি রিফা'আত, ১খ, ৪৯; তু. দ্র. B. Atalay, i. 48) ঃ আল-বিলায়া য়ুক'াল মিনহু "বেগ এলি" (beg eli) আয় বিলায়াতু'ল-আমীর। তাই "জিলা, অঞ্চল" অর্থে শব্দটি তুর্কী নামের প্রথমাংশরূপে ব্যবহৃত হইত, যথা ঈল-আলদী, (El-aldi), ঈল-বিগি (el-bigi), ঈল-গাযী (el-ghazi) ইত্যাদি এবং 'উছ'মানী আমলে স্থানের নামের (দ্বিতীয়াংশরূপেও ইহা খুব ঘন ঘন ব্যবহৃত হইত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবহার ছিল রূম-এলি ("রুমেলিয়া") রুমানিয়া-এর একটি প্রতিরূপ (calque), "(য়ুরোপে) বায়যানটীয় অঞ্চল" (দ্র. P. wittek, Le Sultan de Rum, in Ann-de l'Inst. de phil. et d'Hist. Or. et Slaves vi, (1938), 361-90, esp. 377 পৃ.) এবং তাহা ছাড়া সাধারণভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকার জন্যও ব্যবহৃত হইত, যথা ইক ইল (Ic-el)। এই ধরনের ক্ষেত্রে প্রথমাংশ সাধারণত হইত নাম যাহাতে স্থান নাম দ্বারা কখনও বুঝান হইত "অমুক অমুক কর্তৃক বিজিত অঞ্চল" (যেমন কোজা-এলি হইতেছে গাযী বীর আকচে কোজা কর্তৃক বিজিত অঞ্চল ; (F. Giese, de. Die altosmanischen nonymen Chroniken. i (Text), Breslau 1922, p. 13, lines 24-5) এবং ৮ম/১৪শ শতকে আনাতোলিয়ার আমীরাতে প্রচলিত নাম আয়দীন, মেনতেশে, মূলে ছিল আয়দীন-ইলি মেনতেশে ইলি (ইত্যাদি স্থানীয় রাজবংশসমূহের স্থান-নামের প্রতিষ্ঠাতাগণের "রাজ্যাংশসমূহ")। কখনও কখনও ইহা দ্বারা (সাবেক) শাসনাধীন এলাকা বুঝাইত (যথা কারলী-ইলি (দ্র.), এই নামকরণ হইয়াছে স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তা কার্লো টককো (Carlo Tocco)-এর নাম হইতে, হারসেক-ইলি (হারযেগোভিনা) নামকরণ হইয়াছে সেন্ট সাভার হারসেগ (herceg) হইতে। অন্যান্য আরও উদাহরণের জন্য দ্র. H. Inalcik, Fatih devri. . . i, 1954, 159 n.)। আয়দীন জিলার প্রাচীন নাম ছিল লেশকারী-ইলি, "লাসকারীগণের ভূমি"। এই একটি 'জিলা' সংজ্ঞাবোধক অর্থে শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায় আলবানিয়াতে 'উছ'মানী কিল্লা-নগরী এলবাসান-এ এবং তাহা ছাড়াও এরূপ প্রকাশভঙ্গীতে, যেমন ইল-ইয়াযীজীসী (el-yazidjisi) অর্থাৎ আমীন (emin)-এর জন্য যিনি তাহ'রীর পালন করেন [বিলায়েত তাহ'রীরি (el-yaz ইল-ইয়ায'); ইল-দিলি, "স্থানীয় ভাষা" (দ্র. যথাঃ কামাল পাশা যাদে, ৭খ. (অনুলিপি), আনকারা ১৯৫৪ খৃ., ৪৩৮, ৫১৯ ইত্যাদি]। ইচ-ইল (অভ্যন্তর) ইহা বহির্ভাগ অঞ্চল উজ-এর বিপরীতার্থকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্র. কামাল পাশা যাদে, প্রা. গু. ১৪১, ১৬২, ২০৪, ২০৫ ইত্যাদি; তু. এভরিয়া চেলেবি, সিয়াহাত-নামাহ, ৮খ, ৭১৩) (কিন্তু ইচ ইল মুদাররিসলেরী এই কথা দ্বারা তিনটি রাজধানী শহর, বুরসা, এদীরনে ও ইস্তাম্বুলে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণকে বুঝায়, দ্র. I. H. Uzuncarsili, Osmanli devletinin ilmiye teskilati, Ankara 1965, 57)। ইল এরি, "স্থানীয় অধিবাসী (জরুরী অবস্থায় যাহাদের উপরে কর বসানো হইয়াছে") (দ্র. যথা; TM, iii (1926-33), p. 290. no 47, ৯৭৮/১৫৭১ সালের একটি ফরমান)। দিগ্বিজয়ী সুলত'ান ২য় মুহাম্মাদ-এর একটি ক'ানূননামে-তে [MOG. i (1921-2), pp. 24 and 38, 5) ফাস্'ল ইল শব্দ দ্বারা উন্মুক্ত অঞ্চল (শহর অঞ্চলের বিপরীত অর্থে) বুঝানো হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

তুরস্কর প্রজাতন্ত্রী আমলে "ভাষা সংস্কার" আন্দোলনের প্রভাবে ইল শব্দটিকে সাবেক বিলায়েত, 'প্রদেশ' শব্দের স্থলে প্রচলন করা হয়। আরকয-া বা ক্ষুদ্র প্রদেশ বুঝাইতে ইলচে উদ্ভাবন করা হয় (তাই সাবেক বালি-র স্থলে হয় ইলবে এবং কায়মাকাম-এর স্থলে ইলচেবে)।

(৩) ইল শব্দটি দ্বারা 'জনগণ' অর্থও বুঝাইত, প্রথমদিকে (আপাতদৃষ্টিতে) সমার্থক (?) শব্দ কুন-জনগণ-এর সঙ্গে 'এবং' শব্দ দ্বারা যুক্ত হইয়া একযোগে ব্যবহৃত হইত। পুরাতন 'উছ'মানী তুর্কী ভাষায় এই "এবং" দ্বারা যুক্ত শব্দের ব্যবহার সচরাচরই হইত, যেমন, এলগুন। ইহাকে এল উগুনও লিখিত হইত (দ্র. TTS. i. ii. iv, প্রবন্ধ ইলগুন) এবং কোন কোন নির্দিষ্ট বাগ্‌ধারাতে ইহা এখনও ব্যবহৃত হয় (দ্র. F. Rundgren)-এর আলোচনা Orientalia Suecana, ivi (1967, 100-2-এ)। আধুনিক তুর্কী ভাষায় এল শব্দটি এককভাবে ব্যবহৃত হইলে উহা দ্বারা "ভিন্ন লোক" বা 'আগন্তক' বুঝায় (তুর্কচে সয্‌লুক, প্রবন্ধ এল (২),উদাহরণ সমেতঃ তুল এল আলেম, এই শব্দটির প্রথমাংশ 'আরবী নির্দিষ্টবাচক আল্ নহে, বরং তুর্কী এল 'আরবী 'আলাম)।

পারস্য বা ইরানে শব্দটি 'গোত্রের লোক' এই অর্থে ব্যবহৃত হইত [সমার্থক শব্দ ঃ উলুস (দ্র.) বহুবচনে ইহার রূপ ছিল অর্ধ-'আরবী ঈলাত (দ্র.)]।

(৪) আদতে শব্দটি দ্বারা 'শান্তি' অর্থও বুঝাইত (G. Doerfer মনে করেন যে, উহাই ছিল আদি অর্থ), তু. মাহমূদ কাশগারী, ১খ, ৫০-অনু. B. Atalay, i, 49 (আস্'-সু'লহ বায়না'ল-মালিকায়ন)। ইহা হইতে সম্ভবত এলীচ (দ্র.), 'রাষ্ট্রদূত' (অর্থাৎ "শান্তির প্রচেষ্টাকারী") রূপটি আসিয়াছে; দ্র. O. Turan, in TM. vii-viii (1942),197; তু. আবূ হায়্যান, কিতাবু'ল-ইদ্‌রাক, সম্পা. এ. কালেরোগ্‌লু, ইস্তাম্বুল ১৯৩১ খৃ. ২০ ঃ আর্‌-রাসুলুল্লাহী য়াত্'লুবু'স-সু'লহ') এবং 'উছমানী শব্দ এল্লিক, যাহা সম্ভবত বিশেষণ ও বিশেষ্য দুই রূপেই ব্যবহৃত ঃ "যিনি শান্তি গ্রহণ করিয়াছেন", অর্থাৎ (?) দারু'স-সুলহ (দ্র.) গ্রহণকারী (তু. E. Zachariadou, in Summikhta, i, Athens 1966)। পৃ. ২১১-২, যেখানে ৮৭০/১৪৬৫ সালের একখানি দলীলে এল্লিক কাফিরলার কথাটি দ্বারা Patmos-এর অধিবাসিগণকে বুঝানো হইয়াছে) এবং অর্ধ (বিশেষরূপে) ('উছমানী) তুর্কী সাম্রাজ্যের আনুগত্য স্বীকারকারী অঞ্চলকেও বুঝানো হইয়াছে (তু. মেহমেদ 'আরিফ-এর ভূমিকা, পৃষ্ঠা দাল (১), তথাকথিত "১ম সুলায়মান-এর কানূন নামে", ইলাবে হইতে TOEM. ইস্তাম্বুল ১৩২৯ হি.। উহার বিপরীত হইতেছে য়াগিলিক', দ্র. মূল পাঠ, পৃ. ২৪)।

(৫) ৭ম/১৩শ শতাকের মধ্যে শব্দটি ফারসী ভাষায় প্রচলিত হয়। (রাশীদু'দ-দীন ইল 'কারদান' বাধ্য করা এবং ইল শুদান, 'আত্মসমর্পণ', 'বিনীত হওয়া' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন)। এই ব্যবহার হইতে পারস্যের মঙ্গোল শাসকগণের ঈল খান উপাধি হয়। কেননা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ খান (দ্র. হুলাগূ)-এর অধীনস্থ ছিলেন এবং ইল বিশেষণ হইতে ফার্সী বিশেষ্য (Abstract noun) হয় ইলি, 'আনুগত্য'। 'উছমানী তুর্কী ভাষার ব্যবহারে ইল বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, তারা ফার্সী হইতে ধার করা শব্দরূপে (যতা, তুরসুন, পৃ. ১৮৭, ছত্র ৩, ইলউ মুনকাদ) এবং 'শান্তি অবস্থায়', 'বন্ধুত্বপূর্ণ' অর্থে শব্দরূপে (ইয়াগী-এর বিপরীত অর্থ) দ্র. TTS. i. ii, দ্র. প্রবন্ধ ইল, ৩য় সংজ্ঞা এবং iv, দ্র. il olmak) যাহা হইতে এল্লিক 'শান্তি' 'সমপর্ণ' (TTS. i, iii, দ্র. ইল্লিক) এবং illesh "শান্তি প্রতিষ্ঠা করা" TTS. ii, iii, দ্র. illesmek রূপ আসিয়াছে। el-djan-যাহার আপাত অর্থ আমান, শান্তি, দ্র. V. L., Menage in S. M. stern (ed.) documents from Islamic chanoelleries, Oxford 1965, 96-8।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ ব্যতীত দ্র. (১) G. Doerfer, Turkische und Mongolische Elemente im Neupersischen, ii, Wiesbaden 1956, nos, 653 (el), 656, 657, 661, অনূদিত বরাতসহ এবং (২) H. H. Zarinezade, Fars dilinde Azerbayjan sozleri, Baku 1962, 169 ff.।

সম্পাদনা পরিষদ (E.i.[2])/হুমায়ুন খান

**ঈলখান বংশ** ঃ ৭ম/১৩শ শতাব্দী এবং ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে পারস্য-শাসনকারী মোঙ্গল বংশ।

মধ্যপ্রাচ্যের দিকে পরিচালিত প্রথম মোঙ্গল অভিযানের (১২১৮-২১ খৃ.) ফলে কেবল ইরানী অঞ্চল অধিকৃত হয় এবং কেবল খুরাসান (দ্র.) কিয়ৎ পরিমাণে মোঙ্গল নিয়ন্ত্রণের অধীনে আসে। সুতরাং মহান খান মংগকে (১২৫১-৯)-এর অধীনে যখন রাজ্যসমূহ বণ্টন করা হইতেছিল তখন পারস্য, মেসোপটেমিয়া এবং সম্ভব হইলে সিরিয়া ও মিসরের উপর অধিকার বিস্তার করিবার কাজের ভার তদীয় ভ্রাতা হুলেগূ (দ্র.)-এর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। খান মংগকে এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা কুবিলায়সহ চীনদেশে যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন। Barthold-Fr মতে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ১,২৯,০০০ লোককে এই কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং ১২৫৩-৫ খৃস্টাব্দের দিকে হুলেগু' অভিযানে পরিচালনা
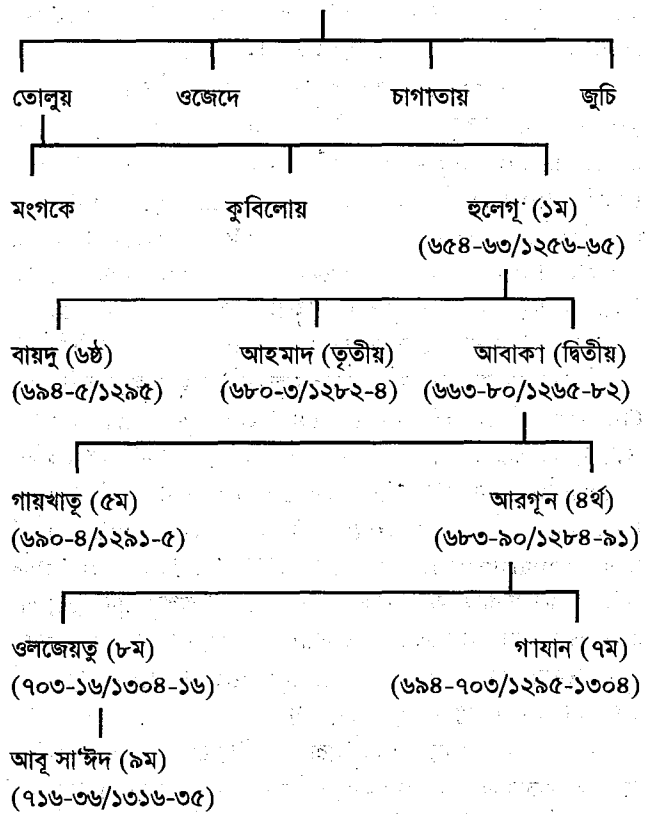
করেন। তিনি আলামূত (দ্র.)-এর আসাসিন দুর্গ দখল করেন, কিন্তু পূর্ব ও দক্ষিণ ইরানের প্রধান অঞ্চলসমূহে (হিরাত, ফারস ইত্যাদি) কিছু সময়ের জন্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল খলীফার সহিত মধ্যস্থতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর বাগদাদে তাঁহার অভিযান আগাইয়া নেওয়া। ১২৫৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী বাগদাদের পতন হয়। হুলেগূ তখন দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া দখল করেন এবং পরবর্তী বৎসর দেশের উত্তরাঞ্চল তাঁহার অধিকারে আসে। কেবল মায়্যাফারিকীন (দ্র.) তাঁহার বিরুদ্ধে টিকিয়া থাকেন।

মংগকের মৃত্যু (১২৫৯ খৃ.)-র পর যখন হুলেগু সেনাবাহিনী হইতে অনুপস্থিত ছিলেন, তখন সিরিয়ার মধ্য দিয়া মামলূকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া যাওয়া হইতেছিল। দামিশক এবং অন্যান্য শহর বিজয় সফল হইয়াছিল, কিন্তু 'আয়ন জালূত (দ্র.), কোটুম (দ্র.)-এ বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মামলূক অশ্বারোহী বাহিনী মঙ্গোলদিগকে তাহাদের অগ্রসর

থামাইতে বাধ্য করিয়াছিল (৩ সেপ্টেম্বর, ১২৬০) এবং নূতন সুলতান প্রথম বায়বারস (দ্র.) যিনি বিজয়ের অব্যবহিত পরেই সালতানাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, নিজেকে মংগোলদের সমকক্ষ বিরোধী হিসাবে প্রমাণিত করেন।

এই চূড়ান্ত সামরিক অভিযান পারস্যে মংগোল সাম্রাজ্যের সর্বশেষ সীমা নির্ধারণ করিয়া দেয়। সিরিয়া ও ফিলিস্তীন মামলূকদের হাতে রহিয়া যায়; ফুরাত নদীর উপত্যকার পশ্চিম প্রান্ত এই রাজ্যের সীমান্ত হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই অঞ্চলের উত্তর দিকে ক্ষুদ্রতর আরমেনিয়া এবং সালজূক এশিয়া মাইনর অধীনস্থ রাজ্য হিসাবে ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহা গোল্ডেন হোর্ডের আধিপত্যের অবসান ঘটে; ককেশাস অঞ্চলও ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই পর্যন্ত এই অঞ্চল শিথিলভাবে হইলেও মংগোল আধিপত্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তরাঞ্চল হইতে বিভিন্ন প্রকার আক্রমণ পরবর্তী দশকগুলিতে ককেশাস এবং ঈলখানদের মধ্যকার মৈত্রীর বন্ধন শিথিল করিতে পারে নাই। এমন কি জর্জিয়ানগণ যখন পৌনঃপুনিক বিদ্রোহে লিপ্ত ছিল, তখনও মধ্য এশিয়ার চাগতায় রাজ্যের সীমান্ত দিয়া অক্সাস (Oxus) নদী প্রবাহিত ছিল। পূর্বদিকে হিরাতের কারট বংশ শাসিত রাজ্য অল্পবিস্তর মংগোল শক্তির আওতা-বহির্ভূত ছিল। মাকরান (দ্র.)-এরও কিছু সময়ের জন্য বেলুচিস্তান এবং পাঞ্জাব রাজ্যের শাসকদের বিরুদ্ধে অনির্দিষ্ট মালিকানাভুক্ত একটি সীমান্ত এলাকা বিরাজমান ছিল, একইভাবে হুরমুযের দ্বীপরাজ্য ইহার দখলিস্বত্বসহ লুরিস্তান, জীলান এবং মাযানদারান (দ্র.)-এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রভৃতভাবে স্বাধীন ছিল। এক মংগোল যুবরাজের বিবাহের মাধ্যমে মাত্র ১২৮৪ খৃ., ফারস (দ্র.) রাজ্য ঈলখানদের অধিকারে আসে।

পিকিং-এ মহান খানদের উপর তাঁহাদের নির্ভরশীলতা দেখাইবার জন্য পারস্যের শাসকগণ এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২৯৪ খৃ. কুবিলায়ের মৃত্যু পর্যন্ত এই রকমই ছিল। ১২৯৫ খৃ. পারস্যের শাসনকর্তাগণ চূড়ান্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তখন মহান খানদের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। এই সময় হইতে পারস্যের মুদ্রা হইতে মহান খানদের নাম বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং 'ঈলখান' উপাধির পরিবর্তে 'খান' খেতাব দৃষ্টিগোচর হয়। ৭৫৬/১৩৫৫ সালে পারস্যে মংগোল শাসনের অবসান ঘটে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই শাসনামলকে 'ঈলখানি' শাসনামল নামে অভিহিত করিবার প্রচলন রহিয়াছে।

সুতরাং ঈলখানদের সাম্রাজ্য ছিল মূলত মেসোপটেমিয়াসহ পারস্য রাজ্য এবং সেই হেতু ইহার বিস্তৃতি সাসানী সাম্রাজ্যের ন্যায় ছিল।

মধ্য এশিয়া, গোল্ডেন হোর্ড এবং মিসরের প্রতি এই কারণে তাঁদের নীতি ছিল পারস্য সরকারের ন্যায়। অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পারস্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দ্রুততার সহিত গৃহীত হয় যেমনভাবে এই প্রক্রিয়া চীনদেশে ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি মংগোল রাজা যাযাবর রাজ্যের (চাগতায় এবং গোল্ডেন হোর্ড) বিরুদ্ধে একটি সাধারণ স্বার্থ সমন্বিত গোষ্ঠী গঠন করিয়াছিল। এই যাযাবর রাজ্যদ্বয় এক অর্থে উপরে উল্লিখিত ১২৯৫ খৃস্টাব্দের পরেও টিকিয়া ছিল। পারস্যের সহিত সাংস্কৃতিক একীভূত হওয়া এবং তুর্কী ভাষা গ্রহণ নিশ্চিতভাবেই ততদিন পর্যন্ত বিলম্বিত হইয়াছিল যতদিন পর্যন্ত ধর্মীয় বৈষম্য বিরাজমান ছিল। পারস্য আক্রমণকারী মংগোলদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছিল নেস্তোরিয়ান খৃস্টান; কিন্তু অধিকাংশই ছিল শামানীয়। রাজগৃহে এবং শাসক শ্রেণীর শীঘ্রই (এমন কি হুলেগুর অধীনেও) বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের প্রতি একটি প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ইহা সম্ভবত চীন দেশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফল। বৌদ্ধধর্ম ভিক্ষুদের ধর্ম প্রচারমূলক ক্রিয়াকলাপও ইহার একটি সম্ভাব্য কারণ (ভিক্ষুদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের মূল উৎস সন্দেহজনক, কেননা এই সম্পর্কীয় আমাদের সকল উৎস অ-বৌদ্ধ এবং এই উৎসসমূহ বুদ্ধের শিক্ষা সম্পর্কে আমাদিগকে সঠিক তথ্য খুব কদাচিতই সরবরাহ করিয়াছে)। যে প্রভাবেই হউক না কেন, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি এই প্রবণতা শাসকদের মধ্যে সমাদৃত হইয়াছিল এবং ইহা সুন্নী ইসলামের প্রতি তাহাদের শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবকে শক্তিশালী করিয়াছিল। এই মনোভাবে আপাত প্রেরণা যোগাইয়াছিল ঐ দশকগুলিতে মিসরের সহিত বিরাজমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবস্থা (বিপরীতক্রমে ইসলামের বদৌলতে মিসর এবং গোল্ডেন হোর্ডের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক একটি সুসম্পর্ক কায়েম হইয়াছিল। এই সম্পর্কের ফলে ঈলখানদের বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী যৌথ শক্তি গঠিত হয়)। সুন্নী ইসলাম-এর বিরুদ্ধে শত্রুতার ফলে শী'আ মতবাদের প্রতি সহিষ্ণুতা সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, যখন গণিতবিদ এবং জ্যোতির্বিদ নাসীরু'দ-দীন তূসী (দ্র.)-র নেতৃত্বে বাগদাদ অধিকৃত হয় তখন শী'আ মতবাদের প্রতি এই সহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হয়। ইহার ফলে শী'আদের সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে এবং প্রশাসনে তাহাদের প্রবেশের ক্ষেত্রে একটি অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। খৃস্টানদিগকেও বিশেষ করিয়া নেস্টোরিয়ান খৃস্টানদিগকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়। হুলেগূর প্রিয় পত্নী দোকূয খাতুন (মৃ. ১২৬৫ খৃ.) নেস্টোরিয়ান খৃস্টান গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি জেকোবাইটদিগকেও সাহায্য করিয়াছিলেন এবং সিরিয়াতে খৃস্টানদিগকে ঈলখানীদের পক্ষাবলম্বন করিতেও উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

একই সময়ে খৃস্টানদের প্রতি অনুকূল নীতি পাশ্চাত্য খৃস্টানদের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করিয়াছিল। এই বিষয়সমূহ হুলেগূর আমলের পূর্বেই উপস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী আবাকা (৬৬৩/১২৬৫-৬৮০/১২৮২)-র সময় বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। আবাকা নিজে ছিলেন একজন বৌদ্ধ। ফলে বিশেষ করিয়া রোমান পোপ এবং ফরাসী দেশের চতুর্দশ লুই (সেন্ট লুই)-এর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত কতিপয় রাজ্যের সহিতও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। এই রাজ্যসমূহ মামলূকদের দুর্দান্ত শত্রু ছিল। কোন সময়ে অভিযান পরিচালনা করা হইবে এই ব্যাপারে মতানৈক্যের ফলে মিসর রাজ্যের বিরুদ্ধে (১২৬৯ খৃ.) একটি যুগ্ম অভিযান ব্যর্থ হইয়া যায়। অপরদিকে ককেশাসে এবং অক্সাস নদী এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলসমূহ এক সংগে একটি আক্রমণ পরিচালনার পরিকল্পনা করে। কিন্তু উহা ব্যর্থ হইয়া যায় (১২৬৮-৬৯ খৃ.)।

এইভাবে আবাকা তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত উপরে বর্ণিত সীমান্ত সমন্বিত রাজ্য শক্তিশালী করিবার মাধ্যমে ইহার প্রকৃত সংগঠকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। একই সময়ে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের কাজ প্রসারিত করেন এবং প্রকাশ্যভাবে অনেক বৌদ্ধ মঠ নির্মাণ করিয়া এই কাজ সম্পন্ন করেন। খৃস্টানদের প্রতি তাঁহার সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার এই কার্যে সমতা আনয়ন করে। নেস্টোরিয়ানগণ একজন খৃস্টান উইগুরকে ক্যাথলিকোস [y (h) আবাল্লাহা তৃতীয়, ১৩১৭ পর্যন্ত] নির্বাচিত করিয়া তাঁহার (আবাকার) এই কাজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ; বংশগত কৌলিন্যের দরুন এই ক্যাথলিকোসের রাজসভায় যাতায়াতের অধিকার

ছিল যদিও তিনি 'আরবী বা সিরীয় ভাষা কোনটিই জানিতেন না। ১২৮২ খৃ. জ্বরে আবাকার মৃত্যুর ফলে এক গণ্ডগোলের আমলের সূত্রপাত হয়। তাঁহার ভ্রাতা আহমাদ অনতিকাল পরই ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহার ফলে মিসরের সহিত বিরাজিত উত্তেজনা প্রশমিত হয়। অবশ্য ১২৮৪ খৃ. আবাকার পুত্র এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আরগূন (দ্র.)-এর নিকট তাঁহার পরাজয়ের ফলে এই অবস্থা বজায় থাকে নাই। আরগূন বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা না থাকায় মন্ত্রী সা'দু'দ-দাওলাকে অবাধ অধিকার দেন। এই মন্ত্রী য়াহূদী ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং অনেক জিলার প্রশাসন ভার নিজের আত্মীয়-স্বজনের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত অর্থ দাবী করিয়া তিনি জনগণের মধ্যে পৌনঃপুণিক অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ১২৯১ খৃ. আরগূনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরই তিনি নিহত হন। নূতন শাসনকর্তা গায়খাতূ (দ্র.), যিনি ছিলেন আরগূনের ভ্রাতা, অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখী হইয়া চীনা মডেলের অনুকরণে ১৩৯৪ খৃ. কাগজী মুদ্রার প্রচলনের প্রচেষ্টা চালান (চীনা ভাষায় এই কাগজী মুদ্রাকে চাও বলা হয়) (দ্র. K. Jahn, Das Iranische Papiergeld, in ArO, X (১৯৩৫ খৃ.), ৩০৮-৪০)। মধ্যপ্রাচ্যে এই ধরনের মুদ্রার প্রচলন সম্পূর্ণ নূতন ছিল বিধায় শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ভাংগন ধরে। যদিও অল্প কয়েক মাস পরেই তিনি এই ব্যবস্থাসমূহ প্রত্যাহার করেন, তথাপি গায়খাতুকে রাজ্যচ্যুত করা হয় (মার্চ, ১২৯৫ সাল) এবং একই পরিবারের অপর শাখার নূতন খান বারদু (দ্র.)-ও এই পদ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং য়াসা (দ্র.)-এর প্রতি বিশ্বস্তদিগকে নিজের চারদিকে সমাবেশ করিবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার এই পদ রক্ষা করিতে পারেন নাই।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে রাহাজানি বাড়িয়া যায়। একই সঙ্গে মঙ্গোলদের কর্তৃক প্রবর্তিত ডাক ব্যবস্থায় (দ্র. য়াম) বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ইহার ফলে প্রকারান্তরে কৃষিক্ষেত্রে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিরান হইয়া যায়, মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণ দেখা দেয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংকট দেখা দেয়। দেশে সাধারণভাবে অরাজকতা দেখা দেয় এবং ইহা অধিকতর ভয়াবহ রূপ ধারণ করে যখন মামলূকগণ এবং গোল্ডেন হোর্ড রাজ্য ঈলখানদের রাজ্যের উপর নূতনভাবে আক্রমণ করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এই কারণে আরগূনের পুত্র গাযান (দ্র.) যখন ২৪ বৎসর বয়সে ১২৯৫ সালের ৯ নভেম্বর নূতন শাসনকর্তা হিসাবে উত্তরাধিকার লাভ করেন তখন শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য কাজ করাই তাঁহার জন্য সর্বাপেক্ষা জরুরী হইয়া পড়ে। মন্ত্রী রাশীদু'দ-দীন ফাদ্‌লুল্লাহ (দ্র.) 'আলী শাহের মন্ত্রণায় তিনি এক বৃহৎ সংস্কার কাজ শুরু করেন। ইহা লোক প্রশাসন, কৃষি, বাণিজ্য এবং জনকল্যাণ বিভাগকে প্রভাবিত করে যদিও তাহার অধিকাংশ ব্যবস্থা তাঁহার সংক্ষিপ্ত আমলে ফলপ্রসূ হয় নাই। ইহা ছিল মৌলিক গুরুত্বের ব্যাপার যে, তিনি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছিলেন এবং সুন্নী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পদক্ষেপ প্রাচীন মংগোল ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে নাই যেমন নারীর সম্মানিত জনমর্যাদার বিষয়টি। কিন্তু ইহা পারস্য মংগোল এবং তুর্কীদের মিলনের দুয়ার বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার বর্তমান কাল পর্যন্ত ইরানী মালভূমিতে বসবাসের নমুনাকে প্রভাবিত করিয়াছে, বিশেষ করিয়া আযারবায়জানে যেখানে তাবরীয মারাগা এবং (১৩০৭ খৃ. হইতে) সুলতানিয়্যা (দ্র.) (কাযবীনের নিকটবর্তী)-র রাজধানীসমূহ অবস্থিত ছিল।

গাযান শী'আদের প্রতি একটি বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী প্রদর্শন করিবার মত বিবেচকের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের পবিত্র স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন এবং তাহাদের কাজের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। এইভাবে তিনি নিজের জন্য এমন একটি দৃঢ় অবস্থা বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন যাহার দরুন গোল্ডেন হোর্ডের দাবী মুতাবিক ককেশাস হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যাওয়া এবং সিরিয়া জয়ের (ব্যর্থ) প্রচেষ্টা চালাইবার প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছিলেন।

৭০৩/১৩০৪ সালে গাযানের মৃত্যুর পর ঈলখানদের রাজ্য উন্নতির চরম সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। গাযানের ভ্রাতা ওলজেয়তূ সংস্কার কার্য অব্যাহত রাখেন নাই ; কিন্তু অভ্যন্তরীণ প্রশাসন এবং সামরিক ক্ষেত্রে যোগ্যতার সহিত কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে ১৩১০ খৃ., তাঁহার শী'আ মত অবলম্বনের ফলে দেশে অত্যন্ত দুরবস্থার সৃষ্টি হয়। কেননা তিনি তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীরাও গাযানের আমলের তুলনায় তাঁহার অধীনে বেশী দুর্ভোগের শিকার হয় (গাযান অবশ্য ১২৯৫-৯৬ খৃ. তাহাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি সন্ত্রাসমূলক অভিযান দ্রুত নস্যাৎ করিয়াছিলেন)। ৭১৬/১৩১৬ সালে যখন ওলজেয়তূ ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার যুবক পুত্র আবূ সা'ঈদ খাঁটি ইসলামী নাম বিশিষ্ট প্রথম মংগোল শাসক সুন্নী মত অবলম্বন করেন তখন দেশে গৃহযুদ্ধের আশংকা দেখা দেয়। তাঁহার তারুণ্য তাঁহার চতুর্দিকে বিভিন্ন দলকে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র করিতে সুযোগ দিয়াছিল। ১৩১৮ খৃ. ঐতিহাসিক হিসাবে খ্যাত মন্ত্রী রাশীদু'দ-দীনের প্রাণ বধ করা হইয়াছিল। জেনারেল চুবান (চোবান) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি 'আলী শাহ নামে একজন মন্ত্রীর সহিত তাঁহার (শেষোক্ত জনের) মৃত্যু (৭২৪/১৩২৫) পর্যন্ত যৌথভাবে কাজ করেন। জেনারেল চুবান নিজস্ব কোন রাজনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। বিভিন্ন দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির ফলে তিনি তিন বৎসর পর এক ষড়যন্ত্রের শিকার হন। সেই সময় ইহাকে চুবানের পুত্র হাসান কুচুক এবং তাঁহার ভূতপূর্ব জামাতা হাসান বুযুর্গ (দ্র.)-এর দুই দল অবিরাম পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে। ইহাতে আবূ সা'ঈদ আর কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন নাই। ৭৩৬/১৩৩৫ সালে ককেশাসের এক অভিযানে তিনি ইনতিকাল করেন।

আবূ সা'ঈদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে মংগোল বংশের অবসান ঘটে, যদিও ৭৫৬/১৩৫৫ সালে ঐ বংশের কয়েকজন যুবরাজের এবং ১৩৩৯-৪০ খৃ. একজন রাজকুমারীর খান হিসাবে অভিষেক হয় এবং তাঁহারা সিংহাসনচ্যুত হন। প্রকৃত ক্ষমতা দুই হাসানের হাতে নিবদ্ধ থাকে। তাঁহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ জনকে ১৩৪৪ খৃ. হত্যা করা হয়। জ্যেষ্ঠ জন ক্রমশ বাগদাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং সেইখানে জালায়িরী (দ্র.) বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের ক্ষমতা মেসোপটেমিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইতিমধ্যে এশিয়া মাইনর, জর্জিয়া, ক্ষুদ্র আর্মেনিয়ার বাহিরে অবস্থিত রাজ্যসমূহ এবং কুর্দীরা সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ফারস-এ মুজাফ্‌ফারীগণ (দ্র.) ক্ষমতা লাভ করে। মাযানদারান এবং দূরপ্রাচ্য সারবেদারীগণ (দ্র.) ক্ষমতা লাভ করে এবং মধ্য পারস্যে স্থানীয়

শাসকদের বিরামহীন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৩৫৭-৫৮ খৃ. আযারবায়জান স্বল্প সময়ের জন্য গোল্ডেন হোর্ড কর্তৃক অধিকৃত হয়। কেবল তায়মূর (দ্র.)-এর অভিযানসমূহ এই অভ্যন্তরীণ পতনের অবসান ঘটায় এবং পরবর্তীকালে তাঁহার স্থাপিত সাম্রাজ্যের ভিত্তিও দুর্বল বলিয়া প্রমাণিত হয়। ঈলখানের অধীনে প্রথমবারের মত পারস্য কয়েক শতাব্দীর জন্য একীভূত হইয়া রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে বিকাশ লাভ করে (ইহা অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের সহিষ্ণুতার বদৌলতেই সম্ভব হইয়াছিল)। সুতরাং এই আমলকে এই দেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আমল হিসাবে চিহ্নিত করা উচিত। এই সময় শিল্পকলার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়, লক্ষ্য সীমিত হওয়া সত্ত্বেও (চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইতিহাস, জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে জ্যোতির্বিদ্যার উদ্ভব) বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্নতি সাধিত হয় এবং অবশেষে ইহার ফলে সমগ্র জাতির মান বৃদ্ধি পায়।

ঈলখানদের আমল সম্পর্কে আমাদের নিকট প্রচুর তথ্য রহিয়াছেঃ বিপুল পরিমাণ পারস্য-ইতিহাস, বিশেষ করিয়া জুওয়ায়নী, রাশীদু'দ-দীন এবং ওয়াস্সাফ-এর রচিত গ্রন্থসমূহ ; অতঃপর সিরীয় ভাষায় (Barhebraeus Chronography) স্বতন্ত্র ইতিহাস, যাহা ঘটনাবলীকে খৃষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিয়া বিশেষভাবে সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে। এই উৎসসমূহ ছাড়াও আমাদের নিকট 'আরবী ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ রহিয়াছে। প্রথমত ইব্নু'ল-ফুওয়াতী (দ্র.)-র গ্রন্থসমূহে মেসোপটেমিয়ার ঘটনাবলীর এমন বর্ণনা রহিয়াছে যাহা প্রশাসনিক ইতিহাসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইহার পর রহিয়াছে প্রথম মামলূক মিসরীয় ইতিহাস, ইহাতে মামলূক দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহা বাহ্যিক ঘটনার প্রতি আলোকপাত করিয়াছে এবং এইভাবে ইহাতে পারস্য গ্রন্থসমূহের সহিত পার্থক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। জর্জীয়, আর্মেনীয়, বায়যান্টীয় ও পাশ্চাত্য গ্রন্থসমূহে আরও বেশ কিছু তথ্য রহিয়াছে এবং এইগুলিকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। এই সংক্রান্ত কোন মূল দলীল-পত্রের অস্তিত্ব নাই ; কিন্তু বিপুল সংখ্যক বিদ্যমান মুদ্রা দলীলপত্রের এই অভাবের একটি নির্ভরযোগ্য বিকল্প হিসাবে কাজ করিতেছে।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) B. Spuler-Fr Die Mongolen in Iran. Politik, Verwaltung und Kultur der Ilchanzeit 1220-1350, লাইপযিগ ১৯৩৯ খৃ.-এ বিস্তৃত বিবরণ (-Iranische Forschungen, সম্পা. H. H. Schaeder, i), তৃতীয় সংস্করণ, বার্লিন ১৯৬৮ খৃ. (তুর্কী ভাষায় একটি অনুবাদ, কিন্তু সংযোজনসহ, ১৯৫১ খৃ., তুর্কী তারিহ কুরুমু কর্তৃক আংকারায় প্রকাশিত) ; (২) B. Spuler, Die Mongolenzeit, লাইডেন ১৯৫৩ খৃ. (=Handbuch der Orientalistik, সম্পা. B. Spuler, vi/2, Geschichte der Islamichen Lander im Uberblick)-এ বিশদ বিশ্লেষণ ; (৩) ইংরেজী অনু., The Mongol period, লাইডেন ১৯৬০ খৃ. ; (৪) পুরাতন গ্রন্থসমূহঃ বিশেষ করিয়া Mouradgea d'Ohsson, Histoire des Mongols depuis Tchinguiz-khan jusqu'a Timour Bey ou Tamererlan, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৪ খণ্ডে, আমস্টারডাম ১৮৫২ খৃ., (৫) H. Howorth, History of the Mongols from the 9th to the 19th century, ৪ খন্ডে, লন্ডন ১৮৭৬-৮৮, খৃ., সূচী ও পরিশিষ্টসহ, লন্ডন ১৯২৭ খৃ., (কেবল দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রসমূহ) ; (৬) R. Groussct, L 'Empire des Steppes. Attila, Genges-Khan, Tamerlan, প্যারিস ১৯৩৯ খৃ. ; (৭) ঐ লেখক, Histoire de l'Asie Centrale, প্যারিস ১৯৪৮ খৃ. (শুধু সরকারী উৎসসমূহ) ; এবং (৮) বিশেষ করিয়া ঈলখান সাম্রাজ্যের জন্য) J. von Hammer-Purgstall, Geschichte der Ilchane, দুই খন্ডে, Darmstadt 1841-3।

সাধারণ ঃ (১) 'আব্বাস ইক্বাল, তারীখ-ই মুফাস্সাল-ই ঈরান আয ইস্তীলা-ই মোগুল তা ই'লান-ই মাশ্রূতিয়্যাত, ১খ, আয হামলা-ই-চিংগীয তা তাশ্কীল-ই দাওলাত-ই তীমূরী, ১৩৪১ সৌর ; (২) J. J. Saunders, Le nomade comme batisseur d'Empire : concquete arab et conquete mongole, in Diogene, নং ৫২ (১৯৬৫ খৃ.), ৮৫-১০৯ ; (৩) B. Lewis, The Mongols, the Turks and the Muslim polity, in Trans. Royal Hist. Soc. ৫ম সিরিজ, ১৯৬৮ খৃ., ৪৯-৬৮ ; (৪) C. Cahen, The Mongols and the East, in K. M. Setton, প্রধান সম্পাদনা, A History of the Crusades, ২খ, সম্পা. R. L. Wolff and H. W. Hazard, The later Crusades 1189-1311, পৃ. ৭১৫-৩৪।

**অর্থনৈতিক ইতিহাস** ঃ (১) I. P. Petrushevskiy, Zemledeliye i agrarniye otnosheniya v Irane xiii-xiv vekov, মস্কো-লেনিনগ্রাড ১৯৬০ খৃ. (ফার্সী অনু. কারীম কিশাভারয, কিশাভারযী ভা মুনাসাবাত-ই আরদী দার ঈরান 'আহ্দ-ই মোগূল ; (২) জা'ফার এইচ, খেশবাক, আহ্ওয়ালু'ল-'ইরাক আল-ইক্তিসা'দিয়্যা ফী 'আহ্দ আল-ঈলখানিয়্যীন আল-মুগূল, মাজাল্লাত কুল্লিয়্যাত আল-আদাব-এ, বাগদাদ ১৯৬১ খৃ., পৃ. ১-৫৬ ; (৩) ঐ লেখক, আল-'ইরাক' ফী 'আহ্দি'ল-মুগূল আল-ঈলখানিয়্যাত, বাগদাদ ১৯৬৮ খৃ., (৪) Ann K. S. Lambtom, Landlord and peasant in Persia, লণ্ডন ১৯৫৩ খৃ. পৃ. ৭৭-১০৪।

**পাশ্চাত্যের সহিত সম্পর্কের জন্য** ঃ বিশেষ করিয়া দ্র. (১) P. Pelliot, Les Mongols et la Papaute, in ROC, ser. 3, xxiii (১৯২২-২৩ খৃ.), পৃ. ১-৩০, xxiv (১৯২৪ খৃ.) পৃ. ২২৫-৩৫ এবং xxviii (১৯৩১-২ খৃ.), ৩-৮৪ ; (২) G. Soranzo, Il Papato, l' Europa cristiana e i Tartari, মিলান ১৯৩০ খৃ, (Publicazioni dell' Universita Cattolica del Sacro Cuore, ser. 5, দ্বাদশ খণ্ড) ; (৩) D. Sinor, Les relations entre les Mongols et l'Europe jusqu'a la mort de Bela IV, in J. World Hist., তৃতীয় খণ্ড (১৯৫৬খৃ.,), ৩৯-৬২।

মুদ্রা প্রস্তুতকরণের তথ্যাবলীর জন্য Lane-Poole এবং Markov-এর পুস্তকাবলী, ইস্তাম্বুলের যাদুঘরে রক্ষিত তালিকা এবং অন্যান্য তালিকা ছাড়াও বিশেষভাবে দ্র., C. M. Frahn. De ll-Chanorum sive Chulaguidarum numis Commentationes duae, in mem. de l'Acad. Imp.

des Sciences de Saint-Petersbourg, ser. 6. ২য় খণ্ড (১৮৩৩ খৃ.), ৪৬৯-৫৬২।

(১) Spuler-এর উপরিউক্ত গ্রন্থসমূহে ; (২) Verlag Georg Westermann-Braunschweig (1956 Ja.)-এর ঐতিহাসিক এ্যাটলাসে ; (৩) A. Hermann, Historical and commercial atlas of China, Cambridge, Mass, ১৯৩৫ খৃ., (Havard-Yenching Institute, Monograph Series, vol. i)-এ মানচিত্রসমূহ রহিয়াছে। (৪) Spuler, Howorth এবং E. von Zambaur-Fr Manuel de genealogie, Hanover ১৯২৭ খৃ., (৫) Bad Pyrmont ১৯৫৫ খৃ., পৃ., ২৪৪-৫-এ আছে পূর্ণ বংশতালিকা।

B. Spuler (E. I.[2])/পারসা বেগম

স্থাপত্য শিল্প এবং শিল্পকলা ঃ ঈলখানী শিল্পকলা ইরানের মংগোল আমলের শিল্পকলার প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। এই আমল হুলেগূর ঈলখান উপাধি গ্রহণের সময় হইতে আবূ সা'ঈদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিস্তৃত (সপ্তম/ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ৭৩৬/১৩৩৫ সাল পর্যন্ত)। ইহা ছিল এই দেশের উপর দূরপ্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রভাবের আমল। এই প্রভাব বস্ত্রশিল্পে, মৃৎশিল্পে এবং ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রে বহুলভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহার ফলে মুসলিম সংস্কৃতিতে চীন দেশে উদ্ভূত কতগুলি নূতন পাটশিল্পের বিষয়বস্তু সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন পদ্ম, ফিনিক্স (ফেং হুয়াং) এবং চতুষ্কোণ কূফী লেখন পদ্ধতি। এইগুলি সম্ভবত চীনা সীলমোহরের বৈশিষ্ট্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। অন্য অনেক দিক দিয়া, বিশেষ করিয়া ইহার প্রথমার্ধে ঈলখানী শিল্পকলা ছিল সালজূক শিল্পকলার রচনাশৈলীগত ধারাবাহিকতা এবং ইহার বিশোধিত রূপ। অপরদিকে মংগোল সালতানাতের শীরাযে ইন্‌জূ ও মুজাফ্‌ফারী, তাব্‌রীয ও বাগদাদে জালায়িরী এবং হিরাতে কার্ট। ধ্বংসাবশেষের উপর গড়িয়া উঠা কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র বংশের শিল্পকলায় মংগোল ঐতিহ্য বজায় থাকে এবং এইভাবে এই ঐতিহ্য ও তায়মূরীয় শিল্পকলার মধ্যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠে।

**স্থাপত্যশিল্প** ঃ D. N. Wilber ইরানের বর্তমান রাজনৈতিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত ধর্মীয় ভবন এবং অন্যান্য ইমারতের তালিকা প্রণয়ন এবং বর্ণনা করিয়াছেন (Architecture of Islamic Iran. The Ilkhanid period. প্রিন্সটন ১৯৫৫ খৃ. ; 'আবদুল্লাহ্ ফারয়ার কর্তৃক ফারসী ভাষায় অনূদিত ঃ মি'মারী-য়ি ইসলাম-য়ি ঈরান দার দাওর-য়ি ঈলখান, তেহরান ১৩৪৬/১৯৬৭ ; কিছু ভুল সংশোধন এবং সংযোজনের জন্য JAOS, ৭৬ খ, ১৯৫৬ খৃ., ২৪৩-৭ পৃষ্ঠাতে Myron Bement Smith-এর পর্যালোচনা দ্রষ্টব্য)। এই সকল ইমারতের বর্ণনার সহিত আযারবায়জান এবং Turkmen S. S. R.-এর স্মৃতিস্তম্ভের উপর রুশ প্রকাশনা যোগ করা উচিত (সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত L. S. Bretanitskii, Zodcestvo Azerbaidzana XII-XV, vv. i ego mesto v arkhitekture peredeniego মস্কো ১৯৬৬ খৃ. ; G. A. Pugacenkova Iskusstvo Turkvostoka, menistana, মস্কো ১৯৬৭ খৃ.)। সাধারণভাবে সালজূক আমলের নকশাসমূহ, কৌশল এবং অঙ্গসজ্জার স্কীমই অনুসৃত হয়, বিশেষত যখন প্রায় পাঁচ দশকের অকর্মণ্যতার পর স্থাপত্য শিল্পের এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। গতির এই পরিবর্তনের মূলে গাযান খান (৬৯৪-৭০৩/১২৯৫-১৩০৪)-এর শাসনাধীনে এই বংশের ইসলামীকরণ, ইরানীকরণ এবং নগরায়ণ। প্রধান অট্টালিকাসমূহের মধ্যে ছিল মসজিদ, মাদ্‌রাসা, সমাধি স্তম্ভ, তীর্থস্থান ও খানকাহ। এই নূতন নির্মাণ পদ্ধতির প্রবণতা ছিল উল্লম্ব অবস্থানের দ্বারা চাপ সৃষ্টি করা—এই চাপ উচ্চতর গম্বুজ, উচ্চতর ও সংকীর্ণতর সুবৃহৎ কক্ষ, মীনারের পার্শ্ববর্তী প্রবেশ পথ ইত্যাদির দ্বারা সৃষ্টি হইত। এই পদ্ধতিগত নূতনত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছে গবাক্ষ, কুলঙ্গী ও সিঁড়ির মাধ্যমে প্রাচীর বিভাজন ও উন্মুক্ত পথে ; রং-এর অধিকতর শক্তিশালী ব্যবহার কেবল কারুশিল্পে (relief) ব্যবহৃত পলস্তারা অঙ্গসজ্জার রূপে নহে বরং বিশেষ করিয়া প্রায় ৭১০/১৩১০ সালের পরে সমগ্র প্রাচীর আবরণের জন্য মোজাইকের ব্যবহারের মাধ্যমে [D. N. Wilber, The development of mosaic faience in Islamic architecture, in Ars Islamica, vi, (১৯৩৯ খৃ.), ৪০-৭]। সালজূক আমলে গড়িয়া উঠা ক্লাসিক ইরানী মসজিদে চারটি সুবৃহৎ কক্ষ ছিল। এই কক্ষগুলি একটি আঙ্গিনার চারপাশে অবস্থিত ছিল। একমাত্র জামি' মসজিদে মিহ্‌রাবের সম্মুখে বৃহৎ গম্বুজবিশিষ্ট কক্ষ ছিল। এই মসজিদটি ভারামিনের আমলে (৭২২-৬/১৩২২-৬) এবং কিরমানে মুজাফ্‌ফারী শাসনামলে (৭৫০/১৩৪৯) বিরাজমান ছিল। যাহা হউক পূর্ববর্তী দুই প্রকার মসজিদের নির্মাণ শৈলী পাওয়া যায় নাঈনের (৭০০/১৩০০) মসজিদ-ই-বাবা 'আবদুল্লাহ্-তে এবং দাশ্‌তী, কাজ ও এযীরানে অবস্থিত ইস্‌ফাহানের নিকটবর্তী এলাকার তিনটি মসজিদে, ৮ম/১৪শ শতকে আরদাবীলে পুনঃনির্মিত মসজিদ-ই জামি'-তে এবং তাব্‌রীযে (৭১০-২০/১৩১০-২০) 'আলী শাহের স্মরণীয় মসজিদ-ই জামি'-তে। এই মসজিদগুলির বৃহৎ গম্বুজ ছিল। এই গম্বুজ চাহার-তাক নামক অগ্নি মন্দিরের গম্বুজের অনুরূপ ছিল। এই মসজিদগুলি একটি মাত্র বৃহৎ কক্ষসম্বলিত ছিল। ইরান সফরের সময় (৭২৭/১৩২৭) ইব্‌ন বাত্তূতা পৌনঃপুনিকভাবে মাদরাসার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই মাদ্‌রাসাগুলি কেবল ধর্মীয় বিদ্যালয় হিসাবেই কাজ করে নাই, এইগুলি ছিল যাবিয়াঃ (ছাত্রাবাস, আশ্রম বা মঠ)। এইরূপ ইমারতের মধ্যে কেবল চারটি সংরক্ষিত আছে। প্রকৃত অর্থে এইগুলি ঈলখানী আমলের পরে নির্মিত। এইগুলির মধ্যে অধিকতর উল্লেখযোগ্য হইতেছে মাদরাসা ইমামী (৭৫৫/১৩৫৪) এবং মসজিদ-ই জামি'-এর মাদরাসা। এই মাদরাসা দুইটি ৭৬৮/১৩৬৬ ও ৭৭৮/১৩৭৬ সালের মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। এইগুলি ইস্‌ফাহানে অবস্থিত। এইগুলি বৃহৎ চার কক্ষবিশিষ্ট ছিল। সেই কক্ষগুলির মাঝখানে ছাত্রদের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ছিল। কবরের উপর নির্মিত সৌধগুলিকে বিশেষ করিয়া ইমামযাদাদের কবর (শী'আঃ ইমামদের বংশধরদের কবরস্থান)-সমূহকে যে গুরুত্ব দেওয়া হইত তাহা ইহাদের সংখ্যাধিক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়। উইলবার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকায় যে ১১৯টি সৌধের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে ৩৯টি ইমামযাদাদিগের কবর। এই সৌধসমূহ প্রধান দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত। উভয় প্রকার সৌধের মধ্যে অভ্যন্তরীণ গম্বুজ রহিয়াছে ; এই গম্বুজটি সমাধিকক্ষের উপর অবস্থিত। সমাধি ক্ষেত্রের কেন্দ্রে রহিয়াছে প্রস্তর নির্মিত শবাধার। খিলান করা অর্ধগোলাকৃতি গৃহে শবাধার না থাকিলে কক্ষের কেন্দ্রেই ছিল ইহার স্থান। এইগুলি ছিল চতুষ্কোণ কক্ষের আকৃতিসম্পন্ন। বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া এইগুলি ছিল আনুভূমিক। বর্ণোজ্জ্বল চুনকাম-বালির কারুকার্যখচিত গুনবাদ-ই 'আলাভিয়ান মাদরাসা ছিল ইহার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ

(৭১৫/১৩১৫) E. Herzfeld এবং উইলবারের মতে অথবা আনু. ১২০০-১২৫০ খৃ. Minorsky-এর মতে) অথবা এইগুলি উচ্চতর, উল্লম্ব অবস্থানিক সমাধি বুরূজ যেগুলি গোলাকৃতি, চতুষ্কোণ বা বহুতলবিশিষ্ট হইতে পারে। এই সমাধি বুরুজগুলি বৃহত্তর গ্রুপের পর্যায়ভুক্ত। এইগুলি উন্মুক্ত বুরূজ অথবা বহুতলবিশিষ্ট তাঁবু বুরূজ অথবা কোণাকৃতি ছাদ দ্বারা আবৃত। এইগুলির মধ্যে প্রাচীনতমটি হইতেছে শীরাযে অবস্থিত ৬২৮-৫৮/১২৩০-৩৯ সালের ইমামযাদা শাহ চিরাগ। এইগুলি এই সময়কাল ব্যাপিয়া এবং এই সময়ের পরে নির্মিত হয়। এইগুলির মধ্যে সর্বশেষটি হইতেছে ইমামযাদা খাজা 'ইমাদু'দ-দীন। ইহা ৭৯২/১৩৯০ সালে কুম্ম শহরে নির্মিত হইয়াছিল। কুম্ম শহরটি সমাধি গৃহ দ্বারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। সমাধি গৃহের সংখ্যা দশ। প্রাচীনতমটি ৬৭৭/১২৭৮ সালে নির্মিত। অন্য যে শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই রকম বহু অট্টালিকা সংরক্ষিত আছে তাহা হইতেছে ইস্ফাহান। সেখানকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমাধি হইতেছে শায়খ মুহাম্মাদ ইব্ন বাকরানের। ইনি লিনজানে পীর-ই বাকরান নামে পরিচিত। এই সমাধির প্রকোষ্ঠ গভীর ; বৃহৎ কক্ষ এবং প্রবেশপথ ৬৯৮/১২৯৯ ও ৭১২/১৩১২ সালে নির্মিত হইয়াছিল। ইহা খোদাইকৃত চুনকাম বালির কারুকার্য প্রদর্শনীর জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। তাব্রীযের শহরতলী গাযানিয়্যাতে ১২৯৭ ও ১৩০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত গাযানে উচ্চ সমাধি বুরূজ প্রথম শাহ 'আব্বাস কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে অধিকতর উল্লেখযোগ্য হইতেছে সুলতান মুহাম্মাদ ওলজেয়তূ খুদাবান্দার সমাধিগৃহ। ইহা ৭০৫-১৩/১৩০৫-১৩ সালে সুলতানিয়্যাতে নির্মিত হয় এবং তথায় ইহা সুরক্ষিত অবস্থায় আছে, যদিও বিভিন্ন আনুষঙ্গিক অট্টালিকা এবং চূড়াবিশিষ্ট একটি প্রাচীর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ৯৪৪/১৫৩৭ সালে বাসূহ আস-সিলাহী আল-মাত্রাকীর পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় এই অট্টালিকাসহ একটি শহরের ছবি E. Akurgal, C. Mango and R. Ettinghausen, Treasures of Turkey-তে বর্ণাঢ্যভাবে চিত্রিত হইয়াছে (জেনেভা ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ২০১)। A. Godard-এর মতে ইহা মঙ্গোল স্থাপত্য শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, পারস্যের ইসলামী অট্টালিকার যোগ্যতম প্রতিরূপ এবং কৌশলগত দিক হইতে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ("The Mausoleum of Oljeitu at Sultaniya", in Survey of Persian Art, ২খ, ১১০৩-১৮ ; Wilber, পৃ. গ্র.পৃ. ১৩৯-৪১)। ওলজেয়তূ যখন শী'আঃ ধর্মমত অবলম্বন করিলেন (৭০৯/১৩০০ সালের পরে) তখন তিনি তাঁহার সমাধি সৌধ খলীফা হযরত 'আলী (রা) এবং তদীয় পুত্র হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর দেহাবশেষ স্থানান্তরিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় নাই। সমাধি সৌধটি একটি বৃহদাকার অষ্টভুজবিশিষ্ট কক্ষ, প্রস্থে ইহা প্রায় ১২৬ ফিট (৩৯ মিটার)। ইহার শবাধারে সুলতানের স্মৃতিস্তম্ভ ছিল। এই শবাধার প্রবেশ পথের বিপরীত দিকে অবস্থিত ছিল। ইহা ছিল আয়তাকার। এই বাহিরের প্রাচীরের উভয় পার্শে ছিল বিশাল আলোকিত গ্যালারী। এই গ্যালারীসমূহের তিনটি দরজা ছিল। প্রাচীরের অভ্যন্তরে ছিল আলোকিত দ্বিতল খিলানশ্রেণী। গম্বুজের তলদেশে ছিল একটি সমতল ছাদ যাহার প্রতি কোণায় একটি করিয়া মীনার ছিল। সুষ্ঠুভাবে নির্মিত গম্বুজটি প্রস্থে ছিল ৮০ ফিট (২৪.৫ মিটার)। ইহা ইটের তৈরী ছিল। ইহার কোন চূড়া বা অবলম্বন ছিল না। ইমারতটি চুনকামবালির রাঞ্জিত কারুকার্য দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। ইহার অধিকাংশই ইটের কাজ, টালির কাজ, মোজাইক এবং ভিতরের দিকে পুস্তকের চিত্রের ন্যায় রং দ্বারা সজ্জিত ছিল। এই আমলে অবশ্য শ্রদ্ধেয় ওয়ালীগণের কবরের চারিদিকে নামায পড়িবার স্থান নির্মিত হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হযরত বায়াযীদ বিস্তামী (র)-র মাযারের কথা। ইহার সহিত ছিল মসজিদ-ই জামি' এবং একটি সমাধির চূড়া। এইগুলি ৭০০/১৩০০ এবং ৭১৩/১৩১৩ সালের মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল (A. U. Pope, in Survey of Persian Art, ২খ, ১০৮০-৬ ; Wilber, পৃ. গ্র., পৃ. ১২৭-৮)। নাতানযে অবস্থিতা শায়খ 'আবদু'স-সামাদ আল-ইস্ফাহানীর মাযার ৭০৪/১৩০৪-৭২৫/১৩২৫ সালের মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। সমাধি ছাড়াও এইখানে ছিল মসজিদ-ই জামি' একটি মীনার এবং একটি খানকাহ্ (PS.C.pe, পৃ. গ্র., পৃ. ১০৮৬-৯ A. Godard, Natanz, in আছার-ই ঈরান, ১খ, ১৯৩৬ খৃ., ৮৩-১০২, Wibler, পৃ. গ্র., পৃ. ১৩৩-৩৪)। আহমাদ ইব্ন আবি'ল-হাসানের মাযারও এইখানে ছিল যাহা শায়খ জাম নামে পরিচিতি, তুরবাত-ই শায়খ জাম-এ। এইখানে বিভিন্ন ইমারতের সুসংহত সমাহার রহিয়াছে (Wilper, পৃ. গ্র., পৃ. ১৭৪)। সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ধর্মীয় স্মৃতিসৌধ হইতেছে মিহরাব। ইহা ৭১০/১৩১০ সালে নির্মিত এবং সূক্ষ্ম খোদাই কার্যসম্বলিত প্লাস্টার সজ্জিত। ইহা ইসফাহানের মসজিদ-ই জামি'র পার্শ্ববর্তী প্রার্থনা কক্ষে অবস্থিত এবং ওলজেতূর শী'আঃ আমল হইতে বিরাজমান। কতিপয় অন্যান্য ইমারত যে সংরক্ষিত আছে ইহার আংশিক কারণ হইতেছে এই যে, ঈলখানী শাসকেরা তাহাদের শাসনকালের শেষ পর্যন্ত বিলাসবহুল তাঁবুতে বাস করিতে পসন্দ করিতেন এবং এই সমাপ্ত স্মৃতিসৌধ কাঠ ও অন্যান্য নশ্বর পদার্থ দ্বারা তৈরী হইত। মংগোল পার্বত্য শহর সাতুরিক-এ অবস্থিত তাখত-ই সুলায়মান নামক স্থানে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি বিশাল কক্ষ রহিয়াছে। ইহা পেরেকসম্বলিত কুলঙ্গী দ্বারা সজ্জিত ছিল। ইহা ছিল প্রাসাদের একটি অংশ। হামদুল্লাহ্ মুসতাওফীর মতানুসারে ইহা আবাকা খান কর্তৃক পুনঃনির্মিত হইয়াছিল। উইলবার (পৃ. গ্র., পৃ. ১১২)-এর মতে ইহার সময়কাল ছিল ১২৭৫ খৃ.। ১৯৬০-৬৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পরিচালিত জার্মান খনন কার্যের ফলে জানা যায় যে, জটিল প্রাসাদ প্রকল্পটি বিভিন্ন এককের সমন্বয়ে গঠিত ছিল; যথাঃ বিচ্ছিন্ন বিশাল কক্ষ, মধ্যবর্তী আঙ্গিনা অথবা মধ্যবর্তী গম্বুজসম্বলিত ক্রস আকৃতির ইমারত, আয়তাকার হলঘর ১২ পার্শ্ববিশিষ্ট ইমারত ইত্যাদি। এই সমস্ত একটি বৃহদাকার প্রায় চতুষ্কোণ নকশার চারিপার্শ্বে নির্মিত হইয়াছিল। এই নকশার থামগুলি দ্বারা আংগিনার চারিধারে একটি খিলান শ্রেণী তৈরী করা হইয়াছিল। ইহার কেন্দ্র ছিল ডিম্বাকৃতির ছাদ। জ্যামিতিকে নকশাবিশিষ্ট এবং আংশিকভাবে নীল ও সবুজ রং-এ চাকচিক্যময় প্রাচীরের টালি, চীনা ড্রাগন দ্বারা সজ্জিত দুইটি স্তম্ভশীর্ষ এইখানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় প্রস্তুতকৃত বিপুল পরিমাণ মৃৎ শিল্প, বিশেষ করিয়া তথাকথিত গাব্‌রুস শ্রেণীর (যাহা পূর্বে ৫ম/১১শ হইতে ৭ম/১৩শ শতকে বিরাজমান বলিয়া কথিত) ; মিহরাবের কাঠামো এবং পশুভাস্কর্য এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। অধিকন্তু একটি খোদাইকৃত দ্বারপথবিশিষ্ট একটি চতুষ্কোণ ইমারত, যাহা কেন্দ্রীয় গুম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, মংগোল স্থাপত্যের নিদর্শনস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে (যদিও পূর্বে ইহাকে পার্থিয়ান বলিয়া ধরা হইত) এবং অনুমান করা হয় যে, ইহা ছিল একটি সমাধিগৃহ। সর্বশেষে পাওয়া গিয়াছে একটি

মংগোল তোরণ। এই সব আবিষ্কারই ছিল ব্যতিক্রমধর্মী এবং ধর্মীয় নয় এইরূপ ইরানী স্থাপত্য শিল্প বুঝিবার জন্য ইহা আমাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন (R. Naumann, W. Kleiss, et. al., Takht-i Suleiman and Zendan-i Suleiman, in Archaologicher Anzeiger, lxxvi (১৯৬১ খৃ.,) কলাম ৫১-৯ ; ঐ লেখক, et. al., ঐ, ১৯৬২ খৃ., কলাম ৬৬০-৭০ ; ঐ লেখক, et. al., ঐ, ১৯৬৪ খৃ., কলাম ২৭-৬৫ ; ঐ লেখক, et.al., ঐ ১৯৬৫ খৃ., কলাম ৬৯৭-৭১৩)। ইহা ছাড়া অযত্নে সংরক্ষিত তিনটি প্রচলিত দরবার আকারের সরাইখানা পাওয়া গিয়াছে মারান্দ (অনু. ১৩৩০-৫ খৃ.), সীন (৭৩০-১/১৩৩০-১) ও সারচামে (৭৩৩/১৩৩২)। এইগুলির প্রতিটির সর্বোত্তমভাবে সংরক্ষিত অংশটির ছিল একটি মাত্র প্রবেশপথ। সীনে এই সরাইখানার বাহিরে ছিল ষড়ভুজবিশিষ্ট বারান্দা, সারকামে প্রস্তর খোদিত প্রবেশ পথ এবং ইহার উপরে খোদাইকৃত শিলালিপি স্পষ্টতই সিরীয় প্রভাবের প্রমাণ বহন করে। সর্বাপেক্ষা অসাধারণ অন্যতম ইমারতটি ছিল সম্ভবত একটি মানমন্দির। ইহা ৬৫৬/১২৫৮ সালে হুলাগূর আদেশানুসারে মারাগায় নির্মিত হইয়াছিল। হুলাগূ নাসীরু'দ-দীন তূসীর প্রস্তুতকৃত পরিকল্পনা অনুসারে এই আদেশ দিয়াছিলেন। ইমারতটির ভিতরে ছিল একটি গম্বুজ ও পাঠাগার। গাযান খান ইহাতে আর একটি গম্বুজ সংযোজিত করিয়াছিলেন। এইগুলি ১৩৪০ খৃ., যখন হামদুল্লাহ্ মুসতাওফী তাঁহার নুযহাতু'ল-কুলূব গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন তখন প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

মোঙ্গল আমলের একটি অভিনব বৈশিষ্ট ছিল নূতনভাবে নির্মিত স্থানে জনসাধারণের ইমারতগুলি কেন্দ্রীভূত করা, যেমন গাযান খানের গাযানিয়া এবং রাশীদু'দ-দীন কর্তৃক তাবরীযের নিকট নির্মিত রাব'-ই রাশীদী। গাযানিয়্যাতে সুলতানের সমাধি সৌধ এবং তাঁহার প্রাসাদসমূহ ব্যতীত একটি মসজিদ, দুইটি মাদরাসা, একটি খানকাহ, সায়্যিদগণের জন্য যাবিয়া, একটি মানমন্দির, একটি হাসপাতাল, একটি গ্রন্থাগার, মুহাফিজ খানা এবং প্রশাসনিক ভবন, হাম্মামসমূহ ও একটি ঝর্ণা ছিল। অপরপক্ষে শেষোক্তটিতে ছিল দুইটি মসজিদ, মাদরাসাসমূহ, একটি খানকাহ, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, দুইটি গ্রন্থাগার, হাসপাতালসমূহ, হাম্মামসমূহ, সরাইখানা, কাপড় বুননের কারাখানা, কাগজের কারখানা, রঞ্জন গৃহ, একটি টাকশাল এবং উদ্যানসমূহ (K. Jahn, Tabris, ein mittelalterliches kultuurzentrum zwischen Ost und West, in Osterrei-chische Akademie der Wissenschaften. Anzeiger der phil-hist. Klasse, Jahrg. ১৯৬৮ খৃ., নং ১১, পৃ. ২০৭, ২১০)। এই ইমারতসমূহ সমন্বিতভাবে নির্মিত হইয়াছিল না অধিকতর বিশৃঙ্খলভাবে নির্মিত হইয়াছিল তাহা নির্দিষ্টভাবে জানা যায় নাই। প্রথমোক্ত অনুমানটি যদি ঠিক হয় (এবং অধিকাংশ বক্তব্যই ইহার পক্ষে) তাহা হইলে এই মংগোল কর্মতৎপরতা ইযনিক, বুরসা ও ইস্তাম্বুলে 'উছমানী সুলতানদের 'কুল্লিয়্যে' প্রতিষ্ঠানগুলির অগ্রদূত হিসাবে পরিগণিত হইবে।

**চীনামাটির শিল্প** ঃ প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র ছিল কাশান। কেননা আনু. ১২২০ খৃ. মোঙ্গলদের দ্বারা রায়-এর ধ্বংসলীলার পর তাহার কার্যকলাপ পুনরায় আরম্ভ হয় নাই। এই আমল ব্যাপিয়া কাশানে বৃহদায়তন মিহ্‌রাব এবং ক্ষুদ্রায়তন টালি নির্মিত আবরণ (উভয়টিই শহরের নামানুসারে কাশী নামে অভিহিত হইত) এবং মৃৎশিল্প উৎপাদিত হইত। এইগুলির মধ্যে মিহ্‌রাব নির্মাণ ছিল অধিকতর সংরক্ষণশীল। কুলংগীর প্রতীক হিসাবে এইগুলি সাধারণভাবে এক সারি খিলানের সমাহার ; অভ্যন্তরভাগে প্রায়ই একটি বাতি থাকিত (সূরাঃ নং ২৪, আয়াত নং ৩৫-এর প্রসঙ্গ অনুসারে) এবং ইহার প্রধান অঙ্গসজ্জা ছিল কুরআনের অনূচ্ছেদ অথবা শী'আঃ ইমামদের বাণীসমূহ। এইগুলি উজ্জ্বল পটভূমির উপর গাঢ় নীল রিলিফে উৎকীর্ণ ছিল। এইগুলির উৎপাদন ৬২৩/১২২৬ সালে শুরু এবং ৭৩৪/১৩৩৩ সাল পর্যন্ত উৎপাদিত হইতে থাকে। স্বাক্ষরিত মিহ্‌রাবসমূহ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সময় সময় এইগুলি পারিবারিক কারখানায় ঘরোয়াভাবে তৈরী হইত। প্রায়শ তারিখ সম্বলিত টালিগুলি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এইগুলি এই আমল ব্যাপিয়া এমন কি ৭৩৯/১৩৩৮ সাল পর্যন্ত তৈরী হয়। এইগুলি প্রায়শই উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত হইত এবং প্রাচীরের নিম্নাংশে যুক্ত হইত। যেইগুলিতে আট বিন্দুবিশিষ্ট তারকা এবং ক্রসচিহ্নিত একক পর্যায়ক্রমে অংকিত ছিল। ১৩০০ খৃ. হইতে শেষোক্ত কারুকার্যগুলিতে বৈপরীত্য প্রদর্শনের জন্য এইগুলিকে কোবাল্টের ন্যায় নীল অথবা নীলকান্ত মণির ন্যায় সবুজ রঙে রঞ্জিত করা হইত। যেখানে ধর্মীয় ইমারতের টালিসমূহ ফুলের অথবা আরাবিস্ক নকশায় আকীর্ণ ছিল, অন্য ইমারতসমূহে তখন প্রকৃত পশুর চিত্র এবং কখনও কখনও সালজূক ঐতিহ্যের অংকনযোগ্য বিষয়বস্তু প্রদর্শিত হইত। কেবল ৮ম/১৪শ শতকে প্রদর্শিত বিখ্যাত ব্যক্তিগণ মোঙ্গল পোশাক পরিধান করিতে শুরু করে। ৭ম/১৩শ শতকের শেষ দিকে কেন্দ্রভাগে দূরপ্রাচ্যের প্রধান প্রসঙ্গসহ অপেক্ষাকৃত মোটা উঁচু নকশা এবং নীল পটভূমির উপর বৃহদাকার নাস্খ লিখন কাঠামোগত কৌশলরূপে ব্যবহৃত হয়। ৮ম/১৪শ শতকে শৈল্পিক গুণের একটি সুনির্দিষ্ট ক্রম অবনতি দেখা দেয়।

৭ম/১৩শ শতাব্দী জুড়িয়া মৃৎশিল্পও সালজূক ঐতিহ্য অনুসরণ করে। কিন্তু ইহা ক্রমশ পূর্ববর্তী পাত্রসমূহের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি নকশা এবং সাধারণ সুচারু সংস্কৃতি হারাইয়া ফেলে। একটি নূতন এবং প্রায় অর্ধগোলাকৃতি পাত্র আবির্ভূত হয় এবং ভারী আকৃতির গামলা যাহার উপরের দেওয়ালগুলি খাড়া এবং শীর্ষদেশে চতুষ্পার্শ্বে প্রলম্বিত কানা যাহা বাহির এবং ভিতর উভয় দিকে প্রক্ষিপ্ত, প্রচলিত হয়। ব্যাসার্ধ বরাবর খণ্ডাংশের একটি সুসজ্জিত অভ্যন্তরীণ স্কীমও ইহাতে রহিয়াছে (যাহা বিভিন্ন প্রকার শিল্পকলা দ্বারা পরিপূর্ণ)। একদিকে অতিরিক্ত চকচকে জেল্লা রঞ্জিতকরণের (মীনা'ঈ বলিয়া অভিহিত) প্রচলন বন্ধ হইয়া যায়, অপরদিকে অন্যান্য কৌশল আবিষ্কৃত হয় যাহা এই আমলের সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। এইগুলি ছিল সাদা যমিনের উপর সবুজ, নীল এবং বেগুনী রংয়ের কম উজ্জ্বল আস্তরণ যাহা ৬৭২/১২৭৪ সাল এবং ৭২৯/১৩২৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রচলিত ছিল। বৈশিষ্ট্যমূলক গভীর কোবাল্ট নীলে রঞ্জিত পাত্র যাহা সাদা লাল এবং সোনালী উজ্জ্বল নকশায় আকীর্ণ ছিল। এইগুলি মৃৎপাত্র এবং টালি—এই উভয় শিল্পেই ব্যবহৃত হইত (৭১৫/১৩১৫ সালের মাত্র একটি তারিখ অংকিত টালি এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে)। অবশেষে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত তিনটি পাত্র রহিয়াছে যেগুলি ৮ম/১৪শ শতকের প্রথম চার দশকে বিরাজমান ছিল এবং যাহা ভুলক্রমে সুলতানাবাদের আধুনিক শহরের (যেখানে প্রাচীনতম পাত্রগুলি পাওয়া গিয়াছে) সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেও পূর্ববর্তী কাশান আমলের উৎপাদিত পাত্রসমূহের সহিত রচনাশৈলীগত দিক হইতে সংযুক্ত। এইগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে

খসখসে মাটি দ্বারা ভারী পাত্রের ছাঁচে তৈরী। ইহাতে আছে খুব ঘন কর্ম উজ্জ্বলভাবে রঞ্জিত নক্‌শা যাহাতে পত্রকুঞ্জের নীচে যমিন প্রায় অদৃশ্য এবং ধূসর, খয়েরী ও সাদা রংয়ের উপর খুব সুচারুরূপে ব্যবহৃত গাঢ় নীল ও নীলকান্তমণির ন্যায় সবুজ রংয়ের প্রচ্ছন্ন বর্ণগত বিন্যাস এবং এই শেষোক্তটির প্রতি প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। পুষ্প এবং পশু প্রতিকৃতি প্রায়শ দূরপ্রাচ্যে উদ্ভূত এবং প্রতিকৃতিসমূহ মংগোল পোশাক পরিহিত। এই শ্রেণীর মৃৎশিল্প অন্যান্য মুসলিম দেশের উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এমন কি যে সকল দেশের সহিত রাজনৈতিকভাবে মংগোলদের সদ্ভাব ছিল না, সেই সকল দেশের উপরেও। সেইহেতু ইহার রচনাশৈলী কেবল সারায় বার্কের গোল্ডেন হোর্ডের মৃৎশিল্পেই অনুসৃত হইত না, বরং দামিশ্‌ক ও কায়রোতেও অনুসৃত হইত (A. Lane, Later Islamic pottery. Persia, Syria, Egypt, Turkey, London ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ৬-২০)। উক্ত মৃৎশিল্পের বস্তুগত উপাদান সম্পর্কিত সঠিক বিবরণ ৭০০/১৩০০ সালের একটি ফারসী পাণ্ডুলিপির এক অধ্যায়ে সংযোজিত হইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপিতে আবু'ল-কাসিম 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী তাহির সমসাময়িক উজ্জ্বল কাশান মৃৎপাত্রে ব্যবহৃত উপাদান এবং উহা তৈরীর কৌশলগত প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন। তিনি দুইজন বিখ্যাত কাশান মৃৎশিল্পীর পুত্র এবং ভ্রাতা (H. Ritter, J. Ruska, F. Sarre and R. Winderlich, Orientalische Steinbucher und persische Fayencetechnik, ইস্তাম্বুল ১৯৩৫ খৃ.)।

**ধাতব শিল্পকর্ম ঃ** পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে, বিশেষ করিয়া জাযীরায় তৈরী দ্রব্যসমূহ হইতে ইরানী দ্রব্যসমূহ পৃথকীকরণ বেশ কঠিন। রৌপ্য এবং কখনও স্বর্ণ ও কদাচিৎ তাম্রখচিত পিতলের নক্‌শা দ্রুত গতিতে সালজূক আমলের তুলনায় নীরস, কঠিনতর এবং কল্পনাবিহীন হইয়া পড়ে। যাহা হউক এইগুলিতে অংগ সজ্জা পূর্ববর্তী নিয়মই অনুসৃত হয়, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন নক্‌শার শ্রেণীবদ্ধ বিস্তারেও বিভিন্ন প্রকারের বৃত্তাকৃতি আধারে যেগুলি রীতিসিদ্ধ পটভূমির নক্‌শায় সন্নিবেশিত হইত এবং যেগুলিতে দরবারের দৃশ্যে মানব মূর্তি ব্যবহৃত হইত। এই ক্ষেত্রে এইগুলিতে মেসোপটেমিয়ার প্রভাব প্রতিফলিত হয়, বিশেষ করিয়া মাওসিল শিল্পকর্মের প্রভাব। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ অঞ্চলের ধাতব শিল্পসমূহ মূলগতভাবে ইরানী ধাতব শিল্পের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। (৭০৫/১৩০৫ সালে আরম্ভকৃত বিশেষ গ্রুপের শীরাযী শিল্প নির্মিত পাত্র সম্বন্ধে গবেষণার জন্য দ্র. Eva Baer, Fish-pond ornaments on Persian and Mamluk metal vessels, in BSOAS, xxxi, ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ১৪-২৭)। চীনা প্রভাব মাঝে মধ্যে দেখা যায় (R. H. Pinder-Wilson, A Persian bronze mortar of the Mongol period, in Proc. xxvth Int. Congress of Orientalists, ৯-১৬ আগস্ট, ১৯৬০, মস্কো ১৯৬৩ খৃ., ২খ, ২০৪-৬)। এই যুগ যে সৃষ্টিশীল শিল্পদক্ষতাবর্জিত নহে তাহা প্রমাণিত হয় বেশ কিছু সংখ্যক নূতন আকৃতির গহনার বাক্স, বিশেষ করিয়া গম্বুজাকৃতি ঢাকনা সহকারে বহুভুজবিশিষ্ট বাক্স হইতে। ৮ম/১৪শ শতকের তারিখ অংকিত ধাতব দ্রব্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মংগোল আমলের দ্বিতীয়ার্ধে উৎকীর্ণ লিপি, ফুলের নক্‌শা এবং জ্যামিতিক প্যাটার্ন ব্যবহারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল যদিও মূল বিন্যাসে ৭৫২/১৩৫১ সালের একটি পেয়ালায় মানব-মূর্তি অংকিত আছে। L. Giuzalian ইনজূ সুলতান আবূ ইসহাকের জন্য শীরাযে তৈরী একটি ধাতব পাত্র চিহ্নিত করিয়াছে (দ্র. Proc.xxvth Int. Congress of Orrientalists, ২খ, ১৭৪-৮)। মুজাফ্‌ফারীদের অধীনে শীরাযের কাজ চলিতে থাকে। কায়রো যাদুঘরে সংরক্ষিত ৭৬১/১৩৬০ সালের একটি তারিখ অংকিত পাত্র হইতে এই পরিচয় পাওয়া যায়। একটি ভিন্নধর্মী ধাতবকর্ম একজন ইসফাহানী শিল্পী কর্তৃক তৈরী একটি বিশাল ব্রোঞ্জ বেসিন, যাহাতে কার্ট বংশের সুলতান গিয়াছু'দ-দীন আবূ বাক্‌রের নাম উৎকীর্ণ ছিল। ইহা ৭৭৬/১৩৭৫ সালে হিরাতে মসজিদ-ই জামি'-র জন্য তৈরী করা হইয়াছিল (A. S. Melikian Chirvani, Un basin iranien de l'an 1375, in Gazette des Beaux-Arts, n. s. lxxiii, ১৯৬৯ খৃ., ৫-১৮)। তৃতীয় এবং আর একটি মঙ্গোল আমল-উত্তর ভিন্ন ধাতব শিল্পের গ্রুপে রহিয়াছে রৌপ্য দ্বারা তৈরী পেয়ালা যেগুলিতে বৃত্তের ভিতরে বা মধ্যে বিস্তৃত ক্ষুদে দরবার-দৃশ্য অঙ্কিত ছিল। এইগুলি তৈমূরীয় পেইন্টিং স্টাইলের অগ্রদূত (D. Barret, Islamic metalwork in the British Museum, লণ্ডন ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ১৭-১৯, একটি সাধারণ জরীপ)।

**বস্ত্রশিল্প ঃ** এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, মঙ্গোল আমলে ইরানে তন্তুবয়ন হইত। কিন্তু আধুনিক গবেষণা এতদূর অগ্রসর হয় নাই যে, এই উৎপাদনকে অন্যান্য মুসলিম দেশের উৎপাদন হইতে এমন কি চীন দেশের উৎপাদন হইতে স্পষ্টভাবে পৃথকীকরণ করিতে সমর্থ হয়। Panni tartarici নামক এই বস্ত্রশিল্প পাশ্চাত্য দেশসমূহে একটি আন্তর্জাতিক বিলাসী স্টাইলের প্রতীক। ইহা স্পষ্ট যে, এই রীতিটি দুই একটি পশুর প্রতিকৃতি চিহ্নিত বৃত্তের এবং মধ্যবর্তী ফাঁকসম্বলিত প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত সামগ্রিক সংগঠন যাহা সাসানী আমলে গড়িয়া উঠে এবং সালজূক আমলেও অব্যাহত থাকে, তাহা তখন আর মূল ব্যবস্থাপনার মধ্যে ছিল না। চীন দেশীয় চিন্তাধারা বহু শতাব্দীর সেই প্রথা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত করিয়াছিল এবং নূতন স্কীমের ও দূরপ্রাচ্যের বিষয়বস্তু প্রবর্তন করিয়াছিল। যে ব্যবস্থাপনা পুরাতন পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ছিল তাহা সূঁচালো উপবৃত্ত প্যাটার্নের অনুবর্তী ছিল ; ইহা বৃত্তাকার অবস্থানে পশুর প্রতিকৃতি বেষ্টিত করিয়া রাখিত। অন্যথায় সেখানে ঘন সমাচ্ছন্ন বৃক্ষরাজির মধ্যে একান্তর অবস্থায় স্থাপিত পশু প্রতিকৃতির উন্মুক্ত রচনা পরিলক্ষিত হইত। সর্বাপেক্ষা প্রচলিত সাংগঠনিক স্কীম ছিল বিভিন্ন প্রস্থের 'আরবী লিপিসমূহে, ফুল, জ্যামিতিক ও অন্যান্য নক্‌শা এবং অল্প সংখ্যক পশু ও পাখীর ছবি। সর্বশ্রেষ্ঠ বস্ত্রটি হইতেছে অস্ট্রিয়ার ডিউক চতুর্থ রুডল্‌ফের (১৩৬৫ খৃ.) কাফন ; ইহা ভিয়েনাতে যাজকীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ইহাতে ঈলখান সুলতান আবূ সা'ঈদের নাম বুনন করা আছে। ইহা আবার ভেরোনায় প্রথম ক্যানগ্রেণ্ডের (১৩২৯ খৃ.) সমাধিতে পাওয়া বস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ (G. Sangiorgi, Le stoffe e le vesti tombali di Cangrande I della Scala, in Bollettino d'Arte n. s. i., ১৯২১ খৃ., পৃ. ৪৪১-৫৭ ; আরও দ্র. Otto von Falke, Kunstgeschichte der Seidenweberei, বার্লিন ১৯১৩ খৃ., ২খ, ৫০-৬৩, ইদানিং পুরাতন হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু এইগুলি সুন্দর চিত্রাঙ্কিত দ্রব্য ; W. Mannowski, Kirchliche Gewander und

Stickereien aus dem Schatz der Marienkirche, Danzig ১৯২৯ খৃ., ৩খ, ২খ, নং ৩০-৩৩ ; Phyllis Ackerman, Textiles of the Islamic periods, in Survey of Persian Art, ৩খ, ২০৪২-৬১ ; Lane, Later Islamic pottery, পৃ. ৩-৫)।

**পুস্তক শিল্প** ঃ এই সময়কার প্রাচীন পুস্তক বাঁধাই যাহা ৬৭৬/১২৭৭ সালে এবং ৬৯৭ বা ৬৯৯/১২৯৭ বা ১২৯৯ সালে মারাগা-য় শুরু হয়, তাহাতে সাধারণ ফ্রেমের কেন্দ্রে রং করা ছাড়া বাদাম আকৃতির বড় গোলাকার নক্শা এবং ত্রিভুজাকৃতি কোণসমূহ থাকিত। ছিদ্র গুলির সংখ্যা ছিল সীমিত এবং সবগুলিই জ্যামিতিক প্রকৃতির ছিল। ব্যতিক্রম ছিল দুইটি 'আরবীয় নক্শার দ্বিতীয়টির পেটির উপরকার ক্ষেত্রে। গঠনশৈলী এবং গাঁথিয়া রাখার কৌশলগত দিকে এই বাঁধায় তখন পর্যন্ত সালজূক ঐতিহ্যের অনুসারী ছিল। পরবর্তী শতাব্দীতে এই কৌশল অগ্রগতি লাভ করে। এইভাবে সুলতান ওলজেতূর জন্য ৭১৩/১৩১৩ সালে হামাদানে বাঁধাইকৃত ত্রিশ পারার কুরআনে বিন্দুর আকৃতিতে সোনালী বর্ণের বাঁধাই দেখা যায় এবং জ্যামিতিক প্যাটার্নে পূর্ণ বৃহৎ বৃত্তাকার নক্শায়ও ইহা ব্যবহৃত হইত। বাঁধাইয়ের কিনারায় অঙ্কিত নক্শা প্রথম পাওয়া যায় ৭০৪/১৩০৪ সালে এবং প্রথম স্বাক্ষর-সীলমোহর পাওয়া যায় ৭০৬/১৩০৬ সালে। ৭৩৫/১৩৩৪ সালে কেন্দ্রীয় পদক চিহ্নটি এবং কোণার আকৃতি ক্রমশ বৃহদাকার ধারণ করে এবং ইহাদের পরিলেখও অনেক বড় হয়। অপরদিকে ৭৮১/১৩৭৯ সালে পূর্বেকার জ্যামিতিক স্ট্যাপওয়ার্কের অলংকরণ রীতির পরিবর্তে 'আরবীয় নক্শা এবং প্রাকৃতিক পুষ্পশাখা ব্যবহার করা হয়। মামলূক আমলে মিসরে পাওয়া বৃহদায়তন জ্যামিতিক নক্শা অজানা থাকিয়া যায় এবং ৮ম/১৪শ শতকে সোনালী বর্ণের ব্যবহার সীমিত থাকিয়া যায় (R. Ettiinghausen, The covers of the Morgan Manafi' manuscript and other early Persian bookbindings, in Studies in art and literature for Belle da Costa Greene, সম্পা. D. Miner, Princeton ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৪৫৯-৭৩ ; K. B. Gardner, Three early Islamic bookbindings, in the British Museum Quarterly, ২৬ খ, ১৯৬২ খৃ., ২৯-৩০)।

বই বাঁধাই অপেক্ষা অধিকতর জাঁকজমকপূর্ণ হইতেছে রঙীন চিত্রসমূহ, বিশেষ করিয়া কুরআন এবং অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত মখমলের পৃষ্ঠাসমূহ। এই ক্ষেত্রে ওলজেয়তূ ছিলেন মহান পৃষ্ঠপোষক। ৭১৩/১৩১৩ সালে হামাদানে তৈরী ৩০ পারার কুরআন শারীফ কায়রো জাতীয় গ্রন্থাগারে রহিয়াছে। ইহাতে বর্ণাঢ্য 'আরবীয় নকশা এবং গ্রন্থির নক্শা সদা পরিবর্তনশীল জ্যামিতিক নকশার সহিত স্থাপন করা হইয়াছে। কুরআনের আরও বৃহৎ পাণ্ডুলিপি ৭০৬/১৩০৬ সালে বাগদাদে এবং ৭১০/১৩১০ সালে মাওসিলে একই সুলতানের জন্য লিখিত হইয়াছিল। ৭১০/১৩১০ সালে রাশীদু'দ-দীনের তৈরী পাণ্ডুলিপিটি ছিল সুসজ্জিত কাঠামোর মধ্যে মখমলের কারুকার্যখচিত। এই পাণ্ডুলিপি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, অপরাপর পাণ্ডুলিপিও অনুপমরূপে সুসজ্জিত ছিল। ইহার নকশা অপেক্ষাকৃত কম জাঁকজমকপূর্ণ এবং ইহার পদ্ধতি ছিল সূক্ষ্মতর এবং ৭২৮/১৩২৭ সাল ও ৭৩৮/১৩৩৮ সালে রচিত কুরআনের পাণ্ডুলিপিতে এই একই সাধারণ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই সকল পুস্তক সজ্জার একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহার ফলে ইহাকে সালজূক এবং তায়মূরী ঐতিহ্য হইতে পৃথক করা যাইত (R. Ettinghausen, Manuscript illumination in Survey of Persian Art, iii, 1954-9)।

কিছু সংখ্যক প্রাথমিক পাণ্ডুলিপিতে এবং এমন কি ইনজূ সুলতানের অধীনে ৭৩১/১৩৩০ সালে এবং ৭৪১/১৩৪১ সালে শীরাযে চিত্রিত পরবর্তী কালের পাণ্ডুলিপিতে রক্ষণশীল প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও ঈলখানী আমলের ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রসমূহ 'আরব অথবা সালজূক ইরানী চিত্রাগারের ঐতিহ্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। সাফাবী হস্তলিপিকার এবং চিত্রকর দোস্ত মুহাম্মাদ ৯৫১/১৫৪৪ সালে যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা হইতে প্রমাণিত হয়, "ইহার প্রথম বিখ্যাত শিক্ষক আহ্মাদ মূসা চিত্রশিল্পের মুখাবয়ব হইতে আবরণ উন্মোচন করেন এবং সেই চিত্রাঙ্কন রীতি আবিষ্কার করেন যাহা আজও প্রচলিত।" এক পাণ্ডুলিপি হইতে আর এক পাণ্ডুলিপিতে এই বিবর্তন দ্রুত সাধিত হয়। প্যারিসে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে রক্ষিত ৬৮৯/১২৯০ সালে জুওয়ায়নীর রচিত তারীখ-ই জাহান গুশা-র প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই বিবর্তন শক্তিশালী চীনা দেশীয় প্রভাবের ফলে প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিতে ৮ম/১৪শ শতকের প্রথম দিকে রচিত ক্ষুদ্রাকৃতি তারিখবিহীন শাহনামার পাণ্ডুলিপির একটি সমষ্টি এবং ১৩০০ ও ১২৪১ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে শীরাযে রচিত পাণ্ডুলিপিসমূহও কেবল চীনা উপাদান এবং দূর প্রাচ্যের নূতন ধারার প্রবর্তন করে। কিন্তু পরবর্তী পাণ্ডুলিপি, ৬৯৭-৯৯/১২৯৭ অথবা ১২৯৯ সালে Morgan লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত ইব্ন বাখ্তী শূর মানাফি'উ'ল-হায়াওয়ান গ্রন্থে স্থানিক গভীরতার একটি নূতন নির্দেশনা ছাড়াও প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতরণা এবং ছোট ছোট গাছপালার খুঁটিনাটি চিত্র-প্রদর্শনের প্রবণতা দেখা যায়। ৭০৬/ ১৩০৬, ৭১৪/১৩১৪ এবং ৭১৭/১৩১৮ সালে রাশীদু'দ-দীন রচিত জামি'উ'ত-তাওয়ারীখ-এর পাণ্ডুলিপিতে সালজূকীয় বহুবিধ রীতির পরিবর্তে আচ্ছন্ন আংশিক রঙের রৈখিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপস্থাপনা এবং মানবীয় আবেগ-অনুভূতির চিত্রায়নে এক নূতন উৎসাহ দেখা যায়। পরবর্তী ২/৩ দশকের কার্যধারা সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। কেননা এই সময়ের কোন তারিখযুক্ত পাণ্ডুলিপি নাই। যাহা হউক সুলতান আবূ সা'ঈদের শাসনামলের শেষ দিকে এবং পরবর্তী বৎসরগুলিতে (১৩৩০-৪০ খৃ.) যে পাণ্ডুলিপিকে প্রধান রচনা বলিয়া মনে করা হয় তন্মধ্যে একটি বৃহদাকার শাহনামাহ খণ্ডে নূতন ধারাসম্বলিত বিভিন্ন পরীক্ষামূলক স্তরের সমাবেশ দেখা যায় (এই শাহনামাহ ইহার প্রাচীন মালিকের নামানুসারে প্রায়শ ডিমোত্তি শাহনামাহ নামে পরিচিত)। কোন কোন সময় এই নব্য ধারাসমূহে বিশৃঙ্খল সংযুক্তি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বহু ক্ষুদ্র চিত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে, একটি নূতন পদ্ধতির জন্ম হইয়াছে। সুতরাং পাণ্ডুলিপিটি ইহার বিষয়বস্তুর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিশাল স্মরণীয় আকারে প্রতিভাত হয়। চিত্র এবং স্থাপত্য শিল্পের রীতি পদ্ধতিতে ইহা প্রাক-মংগোল পদ্ধতির অনুসারী, কিন্তু ইহার সহিত ত্রিমাত্রার একরঙা নক্শার উপাদান সংযোজিত হইয়াছিল। এই উপাদান গাছপালা, পাহাড়-পর্বত এবং বিলীয়মান পর্বতশ্রেণীর ন্যায় দৃশ্যের জন্য ব্যবহৃত হইত। একদিকে কিছু সংখ্যক চিত্রে নূতন ধারার ত্রিমাত্রিকতার পূর্ণ প্রকাশ বিরাজমান, অপরদিকে কিছু চিত্রে সম্মুখবর্তী একটি সংকীর্ণ বলয়ে দৃশ্য স্থাপন করিয়া পরিসরকে সীমিত করা হয়। সম্মুখবর্তী এই বলয়কে পশ্চাদভূমির সুসজ্জিত উপাদান,

যেমন পাহাড় অথবা স্থাপত্য শিল্পের পর্দা দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা হইত। অন্য যে কোন পাণ্ডুলিপির বর্ণনায় বীরসুলভ দৃশ্যের অবতারণা করা হইত। এই দৃশ্য সময় সময় এক একটি ভাগের সৃষ্টি করিত। ইহা প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ প্রতিফলিত করিত এবং এইভাবে এই দৃশ্যসমূহ চিত্র রচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হইয়াছিল। ইস্তাম্বুলের তোপকাপি সারায়ি মুযেসিতে এবং Peussische Statsbibliothek (এখন তুবিংজেন)-এর আটটি এ্যালবামে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক কিংবদন্তীমূলক লোকগাথা সম্বন্ধীয় বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র চিত্রে একই পদ্ধতিগত স্তর এবং পরবর্তী দশকসমূহের পদ্ধতি প্রতিফলিত হয়। এইগুলির মধ্যে মি'রাজনামায় অংকিত ক্ষুদ্র চিত্রও রহিয়াছে। এই চিত্রগুলি আহ্‌মাদ মূসা কর্তৃক রচিত বলিয়া কথিত। দোস্ত মুহাম্মাদ আহ্‌মাদ মূসাকে এই গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে এই আমলের সারথি হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন। এই একই তথ্য সম্ভবত কালীলাঃ ওয়া দিমনা পাণ্ডুলিপির বৃহদায়তন খোদাই চিত্রসমূহের বেলায়ও প্রযোজ্য। এই পাণ্ডুলিপিটি ইস্তাম্বুলের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ইহার চিত্রসমূহে সাধারণ ছবি এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সফলতার সংযোজনার পরীক্ষামূলক ডেমোত্তি শাহ্‌নামার তুলনায় কিছু পরবর্তী কালের ছাপ রহিয়াছে। এই আমলের ও এই পদ্ধতির তারিখযুক্ত একমাত্র পাণ্ডুলিপি হইতেছে ৭৫৪/১৩৫৪ সালের গারশাস্‌প-নামাহ। ইহা তোপকাপি সারায়িতেও আছে। তোপকাপি সারায়ি ডেমোক্তি শাহনামার পরবর্তীকালের পদ্ধতিগত স্তর নির্দেশ করে, কিন্তু এই দুইটির ধরন একই। চিত্র এবং পাণ্ডুলিপি যদি দুই ভিন্ন সময়ে না হইয়া থাকে তাহা হইলে আরও একটি কালীলা ওয়া দিমনাতে সম্ভবত অন্য এলাকার একটি অধিকতর প্রগতিশীল পদ্ধতি পাওয়া যায়। কালীলাঃ ওয়া দিম্‌নাঃ-র মূল গ্রন্থাংশ ৭৪৪/১৩৪৩ সালের (কায়রোতে) তারিখযুক্ত। এই পুস্তকে সাধারণ চিত্রসমূহ ক্ষুদ্রতর, অপরদিকে প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে সুসজ্জিত এবং খালি জায়গা একেবারেই নাই। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বিভিন্ন তারিখযুক্ত পাণ্ডুলিপিতে ইহা ছিল স্পষ্টভাবে লক্ষণীয় একটি সাধারণ প্রবণতা [L. Binyon, J. V. S. Wilkinson, Basil Gray persian miniature painting, লণ্ডন ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ২৯-৪৮, ১৮৪; D. Barrett, Persian painting in the fourteenth century, লণ্ডন তা. বি.; E. Kuhnel, History of miniature painting and drawing, in Survey of persian Art, ৩খ. ১৮৩৩-৪১; R. Ettinghausen, On some Mongol miniatures, in Kunst des Orients, ৩খ., (১৯৫৯ খৃ.,), ৪৪-৬৫; B. Gray persian painting, জেনেভা ১৯৬১ খৃ., পৃ. ১৯-৫৫ (bibliography: p 173); B. W. Robinson, persian painting, লণ্ডন ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ৩৫-৪২, ৮৭-৫। এ্যালবাম সম্পর্কে ঃR. Ettinghausen, Persian Ascension miniatures, in XII Convegno Volta (Aceademia dei Lincei, Roma), রোম ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ৩৬০-৮৩; M. S. Ipairoglu, Saray-Alben, Diez'sche Klebebande aus Berliner Sammlungen, Wilsbaden ১৯৬৪ খৃ.; ঐ লেখক, Malereider Mongolen মিউনিখ ১৯৬৫ খৃ.]।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ সম্পূর্ণ বিষয়বস্তুর বিস্তৃত বিবরণসম্বলিত (১) "Iikhan Art", in Encyclopedia of World Art, vii, নিউইয়র্ক ১৯৬৩ খৃ., কলাম ৭৮৮-৯৮, বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জী সহ; (২) ইসলামী শিল্পকলার সাধারণ ইতিহাসসম্বলিত অধ্যায়, উদাহরণস্বরূপ Georges Marcais, Ernst Kuhnel এবং Katharina Otto-Dorn-এর রচনাসম্ভার; (৩) সুসজ্জিত চিত্র এবং পেইন্টিং-এর জন্য দ্র. Oleg Grabar, Persian art before and after the Mongol conquest, University of Michigan Museum of Art, Ann Arbor 1959; (৪) ঐ লেখক, ~The visual arts, 1050-1350, in Cambridge History of Iran, ৫ম খণ্ড, সম্পা, J. A, Boyle, কেমব্রীজ ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৬২৬-৫৮।

R. Ettingnausen (E.I.²) পারসা বেগম

**ঈলগাযী** (ايلغازى) ঃ "জনগণের সমর্থক", বন্ধু আরতুকী বংশের দুইজন সালজূক শাসনকর্তার নাম ; ইঁহারা উত্তর ইরাকে শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন।

১। প্রথম ঈলগাযী নাজমু'দ-দীন ইব্‌ন উরতুক (ارتق) ঃ শুরুতে তিনি পারস্যের সালজূক সাম্রাজ্য অধিকার করিবার জন্য আপন শ্যালক তুতুশ (تتش)-এর ঘটনাবহুল সংগ্রামে তাঁহার সমর্থক ও সাহায্যকারী ছিলেন। তুতুশের পরাজয় ও মৃত্যুর (৪৮৮/১০৯৫) পর তিনি জেরুসালেমে চলিয়া যান। তুতুশ তাঁহাকে ও তাঁহার ভাইসুক মান (سقمان)-কে সম্মিলিতভাবে এই এলাকা জায়গীর হিসাবে প্রদান করেন। ভ্রাতৃদ্বয় চল্লিশ দিন অবরুদ্ধ থাকিবার পর জেরুসালেম মিসরীয়দের অধিকারে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন (শা'বান ৪৮৯/জুলাই-আগস্ট ১০৯৬)। কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর (৪৯৩/১১০০) ঈলগাযী সাম্রাজ্যের নূতন দাবিদার সুলতান মুহাম্মাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। ইনি ঈলগাযীকে ৪৯৪/১১০০-১১০১ সালে বাগদাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। চারি বৎসর কাল তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ের শেষ পর্যায়ে তনি সুলতান বারকিয়ারূক (بركيارورق) এবং তাঁহার পুত্র সুলতান দ্বিতীয় মালিক শাহ-এর অধীনে ছিলেন। ৪৯৮/১১০৫ সনে সুলতান মুহাম্মাদ ঈলগাযীকে বাগদাদের শাসনকর্তার পদ হইতে অপসারণ করিলে তিনি সুলতানের উপর চটিয়া যান। ৪৯৮/১১০৫ এবং ৫০১/১১০৭ সনের মধ্যবর্তী সময়ে ঈলগাযী মারদীনের দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করেন, ইহা ছিল নিকটপ্রাচ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দুর্গসমূহের অন্যতম। তাঁহাকে ৫০১ হি. নিসীবীন (نصيبين)-এর শাসক হিসাবেও দেখা যায়। ৫০৪/১১১১ ৫০৫/১১১২, ৫০৬-৫০৭/১১১৩-১১১৪ এবং ৫০৮/১১১৫ সনে তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানান। ঐ সময়ে পশ্চিমাঞ্চলের আমীরগণ সুলতান মুহাম্মাদের নির্দেশে ইরাক ও সিরিয়াতে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এই অভিযানসমূহের শেষ অভিযান পরিচালনার সময় ঈলগাযী তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত মিলিয়া মুসলিম বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ আকসুনকুর আল-বুরসুকী (اق سنقر البرسقى)-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করত তাঁহাকে পরাজিত করেন (মে ১১১৫ খৃ.)।

ঈলগাযীর নিকট সুলতান একখানা পত্র প্রেরণ করিলে তিনি পলাইয়া সিরিয়া চলিয়া যান। মাওদূদ হত্যাকাণ্ডে সহায়তার অভিযোগে সুলতানের সহিত তুগতাকীন (طغتكين)-এর সম্পর্ক খারাপ ছিল বিধায় তিনি ঈলগাযীকে স্বাগত জানান। তাঁহারা দুইজনই সুলতানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কাদাস হ্রদে (Lake Kadas) য়ুরোপীয়দের সহিত এমনভাবে সন্ধি স্থাপন করেন যাহা মুসলিমদের জন্য

ক্ষতিকর ছিল। এমন কি য়ুরোপীয়দের সহিত সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করিতেও সম্মত হন। তুর্কমানদের একটি সেনাদল গঠন করিবার জন্য ঈলগাযী দিয়ার বাক্‌র গমন করেন। দুই হাজার য়ুরোপীয় বাহিনীর সাহায্যের জন্য তুগতাকীন ও ঈলগাযী দশ হাজারের একটি মুসলিম বাহিনী গঠন করেন। য়ুরোপীয় ও মুসলমানদের এই সম্মিলিত বাহিনী আফামিয়া (افامية) ও শায়যার (شيزر)-এ আগস্ট মাস পর্যন্ত নবনিযুক্ত প্রধান সেনাপতি বুরসুক ইব্‌ন বুরসুকের সম্মুখীন হইয়া অবস্থান করিতে থাকে, ইহাকে সুলতান মুহাম্মাদ ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু বুরসুক ও নব্য মিত্রবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর (আগস্ট বা সেপ্টেম্বর ১১১৫) ইরাকে প্রত্যাবর্তনের পথে রাসতান (হিম্‌স ও হামাত-এর মধ্যবর্তী স্থান) নামক স্থানে হিম্‌স-এর শাসনকর্তা ও সুলতান মুহাম্মাদের সেনাপতি খীর খানের হাতে বন্দী হন। তুগতাপখানের আক্রমণ হইতে হিমসকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত খীর খান সুলতানের নিকট সেনাবাহিনী পাঠাইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। ঈলগাযীকে হত্যা করিবার হুমকির মাধ্যমে তিনি ইতোমধ্যে ইহার গতিরোধ করিয়াছিলেন। বাহিনী প্রেরণে বিলম্ব হইলে তিনি ঈলগাযীকে মুক্তি প্রদান করেন। ইহার প্রতিদানস্বরূপ একজন প্রতিভূ তুগতাকীন-এর বিরুদ্ধে ঈলগাযীর প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। মুক্তি পাওয়ার পর ঈলগাযী আলেপ্পোতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁহার তুর্কোমান বাহিনীকে সংঘবদ্ধ করত অবরোধ করিবার উদ্দেশ্যে হিম্‌সএ প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু বুরসুক ইব্‌ন বুরসুকের সেনাপতিত্বে পরিচালিত সুলতানের বাহিনী কর্তৃক তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন। ওয়ালটারের বর্ণনামতে তুগতাকীন ও ঈলগাযী এই নেতৃদ্বয় মাওদূদ হত্যার ক্ষতিপূরণ হিসাবে সুলতানকে প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে আলোপ্পো অধিকার করেন। তাঁহাদের য়ুরোপীয় মিত্র আন্তিওক (Antioc)-এর রাজকুমার রজার (Roger) তাড়াহুড়া করিয়া তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করেন। চূড়ান্ত বিজয়হীন কয়েকটি অভিযান এবং য়ুরোপীয়দের হাতে একবার পরাজিত হইবার পর বুরসুক প্রাচ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। নূতন অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণকালে তিনি সেইখানে ইনতিকাল করেন। মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর মাহমূদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর ঈলগাযী সালজূক সরকারের সহিত সুসম্পর্ক স্থাপন করেন।

আলেপ্পোর শাসনকর্তা লু'লু' ৫১০/১১১৭ সনের শেষের দিকে নিহত হন। অভ্যন্তরীণ কলহের দরুন আলেপ্পো নগরী তথা সমগ্র জিলা য়ুরোপীয়দের আক্রমণ ও লুটতরাজের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ৫১১/১১১৭ সনের দিকে ঈলগাযী অস্থায়ীভাবে আলেপ্পো অধিকার করিলেও বিভিন্ন ধরনের বাধার সম্মুখীন হইবার পর সরিয়া পড়েন। পরবর্তী বৎসর আলেপ্পোর অধিবাসিগণ তাঁহাকে শেষ সম্বল মনে করিয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং তাঁহাকে আলেপ্পোর শাসক হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। ৫১২/১১১৮-এর দ্বিতীয়ার্ধে ঈলগাযী সুনিশ্চিতভাবে আলেপ্পোর উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন। এইভাবে তিনি য়ুরোপীয়দের প্রতিবেশী হইয়া যান। সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি জোর প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ১৭ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ৫১৩/২৮ জুন, ১১১৯ সালে তেল আফরীন উপত্যকায় ঈলগাযীর বিশ হাজার সৈন্যের শক্তিশালী বাহিনী অল্প সংখ্যক য়ুরোপীয়দের দুর্বল বাহিনীকে পরাভূত করে। এই আকস্মিক হামলায় অধিকাংশ য়ুরোপীয় নিহত অথবা বন্দী হয়। বন্দীদের মধ্যে আনতিওকের শাসনকর্তা রজারও ছিলেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ যে যুদ্ধসমূহে বিজয় লাভ করিয়াছেন, উহাদের মধ্যে এইটিই ছিল সর্ববৃহৎ যুদ্ধ (ইবনু'ল-'আদীম বালাত নামক গ্রামটিকে—যাহার নামে প্রায়ই এই যুদ্ধের নামকরণ করা হইয়া থাকে ; ২০, জুন ১১১৯ খৃ.-এর রজনীতেও অর্থাৎ চূড়ান্ত যুদ্ধের আট দিন পূর্ব পর্যন্ত রজার-এর শিবির ছিল বলিয়া উল্লেখ করেন)। তখন আনতিওক প্রতিরক্ষাহীন অবস্থায় বিদ্যমান থাকিলেও ঈলগাযী শহর অধিকারে অবহেলা প্রদর্শন করেন।

ঈলগাযীর সামরিক দক্ষতার খ্যাতি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। এমন কি যেই যুদ্ধে সুলতান মাহমূদ নিজে গুর্জিস্তানী খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন, সেই সময় যুদ্ধে তাঁহাকে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই যুদ্ধে ঈলগাযী অত্যন্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন (কামালু'দ-দীন, তারীখ-হালাব, ৫১২/১১১৮, ইবনু'ল-আছীর, আল-কামিল, ওয়াকাই', ৫১৪/১২২০)। ফলে তিফলিসও গুর্জিস্তানীদের অধিকারে চলিয়া যায়। ৫১৬/১১২২ সনে তাঁহার অধিকৃত অন্যান্য ভূখণ্ডের সহিত সুলতানের পক্ষ হইতে মায়্যাফারিকীন (ميافارقين)- ও তাঁহাকে প্রদান করা হয়।

ইহার কিছু দিন পর রামাদান ৫১৬/নভেম্বর ১২২২ (ইবনু'ল-কালানিসীঃ ৬ রামাদান, আল-ফারিকী, ১৭ রামাদান) প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে ঈলগাযী মায়্যাফারিকীনে ইনতিকাল করেন (ইবনু'ল-আছীর ও আবু'ল-ফারাজ ; ইবনু'ল-'আদীমের বর্ণনামতে 'আজূলায়ন'-এ, যাহা মারদীন হইতে মায়্যাফারিকীন যাওয়ার পথে অবস্থিত, Recueil des Historiens Croisades, 3 : 634, ইবনু'ল-কালানিসী-র মতে 'ফুতুল'-এ এবং মীখা'ঈল শামী-এর মতে আলেপ্পো হইতে মায়্যাফারিকীন যাওয়ার সময় পথিমধ্যে)। মৃত্যুকালে তিনি মায়্যাফারিকীন, মারদীন, আলেপ্পো এবং দৃশ্যত নিসীবীন-এরও শাসক ছিলেন। তাঁহাকে মায়্যাফারিকীনে দাফন করা হয় (বিস্তারিত জানার জন্য সেই শহরের ঐতিহাসিকের রচনাবলী (দ্র.) Amedroz আল-কালানিসী-র পাদটীকায় ইহার বরাত দিয়াছেন)। সেই সময়ে ইরাকের তুর্কোমানদের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের দিক দিয়া ঈলগাযীর সমকক্ষ কেহ ছিলেন না।

ঈলগাযী একজন সাহসী ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যেখানেই গমন করিয়াছেন সেখানেই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। তবে তিনি দক্ষ ও প্রতিভাবান সেনাপতি ছিলেন না। মদ্যপানের অভ্যাস তাঁহার সামরিক সিদ্ধান্তসমূহে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিত। যতদূর জানা যায়, নিজের নামে তিনি কোনও মুদ্রা প্রচলন করেন নাই (I. Ghalib Edhem, Catalogue des monnaies turcomanes Istanbul 1894, p. 82)। প্রথমে তিনি তুগতাকীন তনয়া ঈলখাতূনের (ايل خاتون) সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর আলেপ্পোর শাসনকর্তা থাকাকালীন তথাকার পূর্ববর্তী সালজূক শাসনকর্তা রিদওয়ানের কন্যা ফারখান্দা (فرخنده) খাতূনকে বিবাহ করেন। তাঁহার নিম্নোক্ত সন্তান-সন্ততি রহিয়াছে বলিয়া জানা যায়। কন্যা (১) গাওহার খাতূন (আল-ফারিকী কুমার খাতূন), যিনি ৫১৩/১১১৯-২০ সনে আরব সরদার দুবায়স ইব্‌ন সাদাকা-র সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন ; (২) য়ুমনা (يمنى) খাতূন, আমিদের শাসকর্তা ঈনালীদ ঈ'ল-আলদী-এর স্ত্রী, যিনি ৫৩৬/১১৪১-৪২ সালে মারা যান। পুত্র ঃ (১) আয়ায (اياز) মৃ. ৫০৮/১১১৪-১৫ সনে ; (২) সুলায়মান ; (৩) তীমূরতাশ (হুসামু'দ-দীন তিমূরতাশ) ; (৪) শিহাবু'দ-দীন মাহমূদ (?)। ঈলগাযীর অপর এককন্যা ছিলেন, যাঁহার

নাম জানা যায় নাই। সুলতান মালিক শাহ 'আজামের ভাই তাকিশ-এর অজ্ঞাতনামা কোন পুত্রের সহিত ৪৯৫/১১০১-০২ সনে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। সেই আমীরগণের মধ্যে ঈলগাযীই প্রথম, যাঁহারা সুলতান নূরু'দ-দীন যাঙ্গী এবং সালাহু'দ-দীনের পূর্বে উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে ক্রুসেডারদের অগ্রভিযান রোধ করিয়াছিলেন ; ১ম ঈলগাযী মারদীনের আরতুকী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ; এই বংশ ৮১১/১৪০৮ সন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইবনু'ল-আছীর, আল-কামিল, মুদ্রণ Tornberg, ১০খ. ; (২) উসামা ইব্ন মুনকিয, মুদ্রণ Derenbourg, পৃ. ২৯, ৩১, ৬৭, ৮৮ ; (৩) ইবনু'ল-কালানিসী, যায়লু তারীখ দামিশক, মুদ্রণ H. F. Amedroz, লাইডেন ১৯০৮ খৃ. ; (৪) Recueil des Historiens des Croisades, History Orientaux-এ, ২খ, ১, ২, ৩ ও (৫) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান (কায়রো ১২৭৫/১৮৫৮-৫৯), ১খ, ৮৫ প. ; (৬) Michel le Syrien, Chronique, J. B. Chabot সং., ৩খ, প্যারিস ১৯০৫ খৃ. ; (৭) সিবত ইবনু'ল-জাওযী, মির'আতু'য-যামান, মুদ্রণ J. R. Jewett, শিকাগো ১৯০৭ খৃ. ; (৮) Gregorii Abulfaragii, Chronicon syriacum, মুদ্রণ Bruns ও Kirsch Cioiocclxxxviil Lipsiae ; (৯) Brosset, Histoirea la Georgie, ১/১খ, ৩৬৫-৭, ১/২খ., ২২৮ প. ; (১০) Max van Berchem, Arab Inscher. aus Syrien, Mesopotamien und Kleinasine, Beit zur assyriol. und semit. sprachwiss (=৭/১খ, লাইপযিগ, ১৯১৩ খৃ.), পৃ. ৯৪ প. ; (১১) ঐ লেখক, ও Strzygowski, Aminda, Hidelberg ১৯১০ খৃ., পৃ. ৫৪-৬০ ; (১২) Reinhold Rohricht, 'Gechichte des. Konigreichs Jerusalem, Insbruck ১৮৯৮ খৃ. (এই পুস্তকে বিভিন্ন প্রশ্ন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে)। (১৩) W. B. Stevenson, The Crusaders in the East, ক্যামব্রিজ ১৯০৭ খৃ. ; (১৪) Gustav Weil, Geschichte der Chalifen, ৩খ.।

২। দ্বিতীয় ঈলগাযী কুতবু'দ-দীন ইব্ন নাজমি'দ-দীন আলপি (البى) (সম্ভবত আলপ বে-এর ভিন্নরূপ) আর্মেনিয়ার তুর্কী শাসক দ্বিতীয় সুকমান (سقمان)-এর ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি ৫৭২/১১৭৬-৭৭-এ (Michael)† শামী ঃ ২০ জুলাই, ১১৭৬ খৃস্টাব্দ) মারদীন, মায়্যাফারিকীন, রা'সু'ল-'আয়ন (رأس العين)-এর শাসনকর্তা হিসাবে তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন (ইবনু'ল-আছীর, ১১খ, ২৬৮-এর বর্ণনামতে তিনি ৫৬৯ হিজরী হইতে রা'সু'ল-'আয়ন অধিকার করিয়াছিলেন)। সর্বপ্রথম তিনি 'হানী' (هانى) [হানা'ও (هنه) লিখা হয়, বর্তমান (Hene)] যাহা আমিদ' (آمد)-এর উত্তরে অবস্থিত) এবং 'দারা' (دارا)-র শাসনকর্তা তাঁহার পিতৃদ্বয়ের (অপর এক বর্ণনা অনুসারে মাতুলদ্বয়ের) উপর নির্যাতন শুরু করেন, যতক্ষণ না তাঁহারা ঈলগাযীর বশ্যতা স্বীকার করিয়া লন যেমনভাবে তাঁহারা তাঁহার পিতার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃব্যদ্বয় মারীনে উপস্থিত হইয়া দ্বিতীয় ঈলগাযীকে সম্মান প্রদর্শন করেন। কিছুদিন পর ঈলগাযী অসুস্থ হইয়া পড়েন। আরোগ্য লাভ করিবার পর অবাধ্য 'আরবদিগকে বশীভূত করেন এবং এক অতিরঞ্জিত বর্ণনা অনুসারে তাহাদের কয়েক হাজারকে হত্যা করেন এবং তাহাদের নিকট হইতে বার হাজার উষ্ট্র ছিনাইয়া লন। অতঃপর তিনি ইউফ্রেটিস (ফুরাত) নদী পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত করিবার নিমিত্তে বীরা (بيره) (বর্তমান 'বিরেচিক', (بيرجك) জিলার দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন।

সম্ভবত তাঁহার উপর তাঁহার মামা দ্বিতীয় সুকমানের খুবই প্রভাব ছিল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ঈলগাযী সেই জোটভুক্ত হইয়া যানযাহা ৫৭৮ শেষার্ধে/১১৮৩-এর বসন্তকালের প্রারম্ভে দ্বিতীয় সুকমান ও মাওসিলের প্রথম 'ইযযু'দ-দীন মাস'উদ (কুতবু'দ-দীন ঈলগাযীর চাচাতো ভাই)—এর মাঝে ইরাকের দিকে সুলতান সালাহু'দ-দীনের অগ্রাভিযান প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে সংগঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সালাহু'দ-দীনের সাফল্যের মুকাবিলায় মিত্রশক্তি নিজেকে অসহায় বলিয়া মনে করে। সুতরাং আমরা দ্বিতীয় সুকমানের মৃত্যুর পর দেখিতে পাই যে, ঈলগাযীর বাহিনী সিরিয়াতে সুলতান সালাহুদ-দীনের সেনাবহিনীর অন্তর্ভুক্ত (সাফার ৫৮০/মে-জুন ১১৮৪)। কিছু দিন পর দ্বিতীয় ঈলগাযী জুমাদা'ল-উখরা ৫৮০ প্রারম্ভে/৯ সেপ্টম্বর ১১৮৪ সালে ইনতিকাল করেন। উপরোল্লিখিত এলাকাসমূহ ছাড়াও 'দুনাইসির' (دنيسر)-ও তাঁহার শাসনাধীন ছিল। মারদীনের একটি মাসজিদের মীনারে যে লিপি রহিয়াছে উহাতে তাঁহার সিংহাসনারোহণের তারিখসহ তাঁহার নামের উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু ইহা নির্মাণের গৌরব তাঁহার পিতা আলপী-র। ঈলগাযী কর্তৃক প্রচলিত মুদ্রায় তিনি নিজেকে 'মালিকু'ল-উমারা' (আমীরগণের সম্রাট) বলিয়া আখ্যায়িত করেন (শুধু ব্রোঞ্জের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেগুলিকে 'দিরহাম' বলা হয়) এবং তাঁহার পূর্বসূরী উত্তরসূরি মারদীনের অন্যান্য আরতুকী শাসকবৃন্দের ন্যায় "শাহ-ই দিয়ার বাক্র"। যদিও তিনি এই জিলার মহানগরী আমিদের শাসক ছিলেন না। ঈলগাযী দুই পুত্র রাখিয়া যান ঃ হুসামু'দ-দীন য়ালূক আরসলান (يلوق ارسلان) এবং আল-মালিকু'ল-মানসূর নাসিরু'দ-দীন আরতুক আরসলান। তাঁহারা দুইজনেই ক্রমপরম্পরায় পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ঈলগাযীর একজন ক্রীতদাস নিজামু'দ-দীন আলাপ কুশ (الب قش) তাঁহার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করে। তাঁহার এক কন্যা জুমাদা'ল-উলা ৫৭৮/সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১১৮২-এর শেষের দিকে অথবা কিছুদিন পরে সুলতান সালাহু'দ-দীনের পুত্র আল-মালিকু'ল-মু'ইয্য (الملك المعز)-এর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্ন জুবায়র, আর-রিহ্‌লা (ভ্রমণ কাহিনী), দ্বিতীয় মুদ্রণ W. Wright, Gibb-এর স্মরণে প্রকাশিত (Gib Memorial series-এর অন্তর্গত পুস্তক), পৃ. ২৪১, পৃ. ২৪১ ; (২) ইবনু'ল-আছীর, ১১খ, ২৬৮, ৩২২ প., ৩৩৫, ৩৩৯ প. ; (৩) Michel Le Syrien, Chronique, J. B. Chabot সং., ৩খ, ৩৬৮, ৩৮৯ ; (৪) Gregorri Abulpheragii, Chronicon Syriacum, মুদ্রণ Bruns ও Kirsch, ২খ, ৩৮৬, ৩৯৫, ৪০০ ; (৫) আবূ শামা, কিতাবু'র-রাওদাতায়ন ফী আখ্‌বারি'দ-দাওলাতায়ন, Recueil des Historiens des Croisodes, in Historiens Orientaux, ৪খ, ২৪৯, ২৫৬ ; (৬) ঐ লেখক, কিতাবু তারীখি'ল-জাযীরা (মুদ্রণ Ahlwardt, in Verz. der arab. Handschr. in Berlin, ৯খ, নং ৯৮০০), ইবনু'ল-আছীরের

বর্ণনা অনুসারে; (৭) আবুল-ফারাজ, (Gregorius Abulphargius), তারীখু মুখতাসারি'দ-দুওয়াল, মুদ্রণ 'Eduardus pocokius, Oxoniae, ১৬৬৩ খৃ., পৃ. ৪১২, অনু. পৃ. ২৭১ প. ; (৮) Max van Berchem, Arab Inschriften (Beitr. zur Assyriol, ৭খ, ১), পৃ. ৬৫-৭ ; (৯) গালিব আদহাম, Catalogue des Monaaiestur-comanes, কন্স্টান্টিনোপল ১৮৯৪ খৃ., পৃ. ৭১-৭৬, ৮১-৮৪ ; (১০) Stanley Lane-Poole, The Coins of the Turkoman Houses of Seljuk, Urtuk Zengee, etc., in the British Museum, লণ্ডন ১৮৭৭ খৃ., পৃ. ১৪৫-৪৭; (১১) মাসকূকাত-ই কাদীমা ইসলামিয়া ('ইয্যাত পাশার সংকলন), কন্স্টান্টিনোপল ১৯০১ খৃ., পৃ. ৫৬ প. ; (১২) E.I.[2], ৩খ, ১১১৮-৯।

K. Sussheim (দা. মা.ই.)/মুহম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী

**ঈলবীরা** (ايلبيرة) ঃ স্পেনীয় Elvira। গ্রানাডার সঙ্গে অভিন্ন বা উহার নিকটবর্তী শহর ও সংশ্লিষ্ট প্রদেশ। ঈলবারী/ঈলবীরা/গ্রানাডা প্রশ্ন লইয়া দীর্ঘ আলোচনা ইতোমধ্যে হইয়াছে। সংক্ষেপে ইহা এই ঃ রোমীয় শহর ঈলিবারী বর্তমান গ্রানাডার অংশবিশেষ জুড়িয়া ছিল। এই অঞ্চলের 'আরব শাসকগণ (গভর্নর) প্রথম দিকে এখানে বাস করিতেন, সে সময়েই স্থানটির নাম 'আরবীকৃত করা হয় ঈলবীরা ; কিন্তু আনুমানিক ১৩০/৭৪৭ সালে আধুনিক গ্রানাডার ১২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে তাঁহারা নূতন রাজধানী শহর স্থাপন করেন, উহার নাম হয় কাসতাল্লা (قسطلة), কাসাতীলা বা কাসতিলিয়া। আর ইহা পুনরায় ইহার পূর্বনাম Elvira নামেই পরিচিত হইয়া উঠে। আদি Elvira-তে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে (প্রধানত য়াহূদী ও খৃস্টান)। কিন্তু কালক্রমে ইহা গ্রানাডা/গারনাতা (غرناطة) নামে পরিচিত হয়। ৪০১/১০১০ সালে বার্বার সম্প্রদায়ের আক্রমণের সময় নূতন Elvira যাবী ইব্ন যীরী-এর সানহাজা বাহিনী কর্তৃক লুণ্ঠিত হয় এবং অধিবাসিগণ গ্রানাডাতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি ৪০৩/১০১২ খৃস্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং গ্রানাডায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। তাহার পর হইতে Elvira-র পতন শুরু হয় যদিও এখানে একটি দুর্গ একেবারে ৮৯১/১৪৮৬ সাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল। দুর্গটির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি দেখা যায়, নামটিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় Sierra le Elvira এবং Puerta de Elvira at Granada এই নাম দুইটির মধ্যে।

যে ঈলবীরা অঞ্চলের রাজধানী ছিল গ্রানাডা সেই নামটি Elvira শহরের অবনতির পরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। আরো দ্র. গারনাতা (غرناطة)/গ্রানাডা।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ অধিকাংশ ইতিহাস ও ভূগোল গ্রন্থের সর্বত্র ব্যবহৃত নাম, তবে বিশেষ করিয়া দ্র. (১) য়াকূত, ১খ, ৩৪৮, ৪খ, ৯৭ ; (২) Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., i, 343 ; (৩) Dozy, Recherches[2], i, 328-33.

J.F. P. Hopkins (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

**ঈলাক** (ايلاق) ঃ Jaxarta নদীর মধ্য অববাহিকার উত্তরমুখী বিশাল বাঁক এবং আহানগারান (রুশ উচ্চারণ ঃ আংগ্রেন) উপনদীর ডান তীরের দক্ষিণে ট্রান্স-অক্সিয়ানা (মা ওয়ারাউ'ন-নাহ্র) অঞ্চল। ফলত ইহা উত্তর-পশ্চিমে শাশ (দ্র. তাসখন্দ) ও পূর্বে ফারগানা প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত। ৩য়-৫ম হি./৯ম-১১শ শতাব্দীর 'আরব ও পারস্য দেশীয় ভৌগোলিকগণ ঈলাককে এক সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পাহাড়-পর্বতগুলি তৎকালে রৌপ্য ও লবণসমৃদ্ধ ছিল। ঐ ভৌগোলিকগণ ট্রান্সঅক্সিয়ানার এই অঞ্চলটির বহু শহরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে প্রধান শহরটির নাম তূনকাছ। সোভিয়েট স্থাপত্যবিদরা আধুনিক তাসখন্দের ৫০ মাইল (৯০ কি. মি.) দূরে এই শহরটির ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত করিয়াছেন।

ইসলামের ইতিহাসের প্রথমদিকে মূল ইসলামী দেশ ও বিধর্মী তুর্কী স্তেপ তৃণভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল এই ঈলাক । সামানী শাসনামল ও উহার পরবর্তী কালে স্থানীয় শাসকগণ (দিহকান পদবীতে অভিহিত) প্রভূত মর্যাদা ভোগ করিতেন। সামানী শাসকদের পতনের যুগে এই শাসকেরা টাকশালে নিজেদের মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন (৩৮৮/৯৯৮ ও ৩৯৯/১০০৮-৯)। হুদূদু'ল-'আলাম গ্রন্থের লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী ঈলাকের জনসাধারণ ছিলেন "শ্বেতবস্ত্রধারীদের" অনুগামী সম্ভবত ছদ্ম নবী (ভণ্ড নবী) আল্-মুকান্না (দ্র.)-এর সমর্থক। ২য়/৮ম শতাব্দীর শেষভাগে আল-মুকান্নার উত্থান ঘটে। আল-মুকান্নার উত্থানের সময়কালের বিবেচনায় এই তথ্য ভুল প্রমাণিত হইতেও পারে, তবে লিখিত বিবরণে ইহাও আমরা জানি যে, সামানী আমীর নাস্র ইব্ন আহমাদ-এর শাসনামলে (৩০১-৩১/৯১৪-৪৩) স্থানীয় দিহকান তৎকালের ইসমা'ঈলী মতবাদের প্রচারকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) Le Strange, The Lands of the eastern Caliphate, 482-3 ; (২) Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion[3], 162, 169-৭৫ ২৩৩, ২৪৩, ৩০৭ ; (৩) হুদূদু'ল-'আলাম, অনু. Minorsky, 117, 356-7.

C. E. Bosworth (E.I.[2]., Suppl.)/আফতাব হোসেন

**ঈলাত** (ايلات) ঃ (ঈল-এর বব.), প্রথমে পারস্যে ঈলখানী শাসনামলে ব্যবহৃত হয়, ইহা দ্বারা যাযাবর বা অর্ধ-যাযাবর গোত্রসমূহ বুঝায়। 'আশাইর, কাবা'ইল এবং তাওয়া'ইফ শব্দগুলিও এই একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং সেগুলি দ্বারাও সাধারণভাবে গোত্রই বুঝায়, একেবারে কড়াকড়ি অর্থে যাযাবর হউক বা না হউক। ঈলাত ওয়া 'আশা'ইর শব্দগুচ্ছের ব্যবহার মধ্যযুগের লেখায় এবং বর্তমান কালেও প্রায়শ দেখা যায়, এবং মনে হয় মোটামুটিভাবে শব্দ দুইটি সমার্থক। মধ্যযুগে ঈলাত শব্দ উলূস অর্থাৎ গোত্র অনুসারী এবং ওয়মাক শব্দের সঙ্গে একত্রেও ব্যবহৃত হইয়াছে।

আদিকাল হইতেই পারস্যের বহু এলাকার জনসাধারণ পশু পালন ভিত্তিক কৃষিকাজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত এবং গ্রীষ্মকালে তাহারা নিকটবর্তী চারণভূমিতে পশুপাল লইয়া যাইতে অভ্যস্ত ছিল। এই ধরনের দল গ্রীষ্মে তাঁবুতে বাস করিলেও সঠিক অর্থে যাযাবরের পর্যায়ে পড়ে না, যদিও বা কখনও কখনও তাহারা ছিল গোত্রীয় লোক। পশু পালন এবং সমাজের গোত্রীয় গঠন—এই দুই ছিল যাযাবর জাতীয় জনসাধারণের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্যের কোনটিই শুধু তাহাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। যে বৈশিষ্ট্যের কারণে উহারা স্থায়ী অধিবাসিগণ হইতে পৃথক এবং ভিন্নরূপ ছিল তাহা ছিল স্থায়ী গ্রামের অভাব এবং বিশেষ বিশেষ

ঋতুতে কাছের বা দূরের এলাকায় স্থানান্তর। অবশ্য অর্ধ-যাযাবর গোত্রও ছিল, এইগুলির সর্দারগণ বৎসরের কিছু সময় গ্রামে বা শহরে বাস করিত এবং গোত্রের কিছু সংখ্যক লোককে তাহারা গ্রীষ্ম বা শীতের আবাসে বা উভয় স্থানেই রাখিত। দেশের কোন কোন অঞ্চলে যাযাবর পশুপালকের জীবিকা গ্রহণ হেতু জনসাধারণের একটা বড় অংশ আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া নিতে সক্ষম হইত, অন্যভাবে যাহা সম্ভব ছিল না। কিন্তু পারস্যের মালভূমিতে, ট্রান্সঅক্সিয়ানা ও মধ্য এশিয়ার অনুরূপ এই জীবন যাপন পদ্ধতি কত পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। সালজূক আমল হইতে শুরু করিয়া এবং আরও বিশেষভাবে মোঙ্গল অভিযানের পর হইতে স্থায়ী বসতি স্থাপনকারী ও অর্ধ-যাযাবর অধিবাসিগণের মধ্যকার ভারসাম্য ছিল অতি ক্ষীণ। যাযাবর এলাকা হইতে স্থায়ী বসতি এলাকায় ক্রমাগত চুয়াইয়া আসা জনগণ ছাড়াও অল্প বৃষ্টিজনিত শুষ্কতা এবং পারস্যের ভিতরে ও সীমান্তের বাহিরে মধ্য এশিয়াতে স্থানীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে স্থায়ী বসতি এলাকাসমূহে যাযাবরদের অল্পবেশী স্থানান্তর ঘটিতেই থাকে। স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা অনাবৃষ্টি যে কারণেই হউক না কেন, যখনই যাযাবর জনসংখ্যা ও তাহাদের পালিত পশুর সংখ্যা চারণভূমির খাদ্য সরবরাহ সমতাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তখনই স্থায়ী জনবসতি অঞ্চলে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্যভাবে মানুষের স্থানান্তর ঘটিয়াছে।

পারস্যের ইসলাম-পূর্ব যুগের যাযাবর গোত্রগুলির বিষয়ে আমরা খুব কমই জানি, কিন্তু চারণ জীবন প্রায় নিশ্চিতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর্কমেনীয়, পার্থীয়, আরসাসীয় এবং সাসানীগণের রাজধানী একেক ঋতুতে একেক স্থানে স্থানান্তরিত হইত এবং ইহা খুব সম্ভব যে, যখনই তাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বাস করিতে যাইত তখন নিজেদের পশুর পালও সঙ্গে লইয়া যাইত এবং তাহাদের রাজধানীর চতুর্দিকে তাঁবুর বড় বড় শিবির স্থাপিত হইত। মনে হয়, তাহাদের সেনাবাহিনীতে কিছু সংখ্যক যাযাবর গোত্রীয় সৈন্যও থাকিত। তবে সালজূকগণ এবং আরও পরবর্তী কালে তুর্কী রাজবংশীয়গণ এই সকল যাযাবর গোত্রীয়দের সমর্থনের উপরে যতটা নির্ভর করিতেন, আর্কমেনীয়, পার্থীয় প্রভৃতি শাসকগণও ঠিক সেই পরিমাণ নির্ভর করিতেন বলিয়া মনে হয় না। আনুমানিক ৩০০ খৃ. হইতে সাসানীগণ আল-হীরা (দ্র. বাদও, ৩, প্রাক-ইসলামী 'আরব)-এর অর্ধ-যাযাবর লাখমী শাসকগণের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাহাদের সহায়তায় 'আরবের স্তেপ অঞ্চলের বেদুঈন লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়।

ইসলামী আমলে পারস্যের যাযাবর ও অর্ধ-যাযাবর গোত্রগুলি সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট তথ্য অবগত হইতে পারিলেও উহাদের ইতিহাস এবং স্থানান্তরে যাতায়াত সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা প্রায়ই দুষ্কর। ক্রমাগতই উহাদের জনসংখ্যা পরিবর্তিত হইত। কোন কোন গোত্র সমৃদ্ধি লাভ করে, কোন কোন গোত্রের লোকসংখ্যা লোপ পাইতে থাকে বা তাহারা কোনখানে স্থায়ী হইয়া যায়। অনেক গোত্রেরই নাম তাহাদের পূর্বপুরুষ হইতে আহৃত ছিল, কিন্তু তাহাদের গোত্র প্রধানগণের মিত্রতা ও আন্ত-বিবাহ তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে জটিল করিয়া তুলিত। আর এই ধরনের সম্পর্ক অনেক সময়ে পুরুষানুক্রমিক রক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসার প্রয়োজনে গড়িয়া উঠিত। শক্তিশালী গোত্রসমূহ অন্যান্য গোত্রকে তাহাদের প্রতি আকর্ষণ করিত ; সেই গোত্রকে হয় তাহারা নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিয়া লইত বা তাহাদের সঙ্গে এক সংহত গোত্র গঠন করিত ; সেই একীভূত বিভিন্ন গোত্র হয়ত পরে আবার বিভক্ত হইয়া যাইত এবং পুনরায় অপর কোন সংহত গোত্র গঠন করিত। বিভিন্ন শাসক তাহাদের সাম্রাজ্যের প্রান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী গোত্রসমূহকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে বিভক্ত করিতেন এবং বসত করাইতেন। আর সামরিক বা অন্যবিধ সমর্থনের বিনিময়ে নেতাদিগকে জমি বরাদ্দ দিবার ফলেও গোত্রীয় লোকেরা দেশের নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত।

জনগোষ্ঠীগত, নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিবেচনার দিক ছাড়িয়া দিলেও ইসলামী আমলের যাযাবর ও অর্ধ-যাযাবর গোত্রসমূহকে মোটামুটিভাবে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করিয়া লওয়া 'সুবিধাজনক হইবে ঃ 'আরব, তুর্কোমান ও তুর্কী এবং যাহারা 'আরবও ছিল না, তুর্কীও ছিল না অথচ বিজয়ের কালে ইতিমধ্যেই পারস্যে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এই তিন দলের মধ্যে শেষোক্ত দুইটি ছিল সংখ্যা ও ক্রমাগত প্রভাব সৃষ্টির দিক হইতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। শেষোক্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কুর্দ (দ্র.), লূর (দ্র.), বালূচ (দ্র. জীল, যাহারা ঠিক যাযাবর ছিল না, বরং কৃষক ও পশুপালক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল ; তু. ইব্ন হাওকাল, ২খ, ৩৭৬) এবং অন্যগণ। সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল কুর্দরা। উহারা ছিল উপজাতীয়, কিছু সংখ্যক বাস করিত গ্রামাঞ্চলে আর কিছু সংখ্যক অর্ধ-যাযাবর অবস্থায়। লূরগণ তৈমূরের সময়কাল পর্যন্ত প্রধানত স্থায়ী বসতি স্থাপনকারী ছিল বলিয়া মনে হয়। এই দুইয়ের কাহারও বসতি পারস্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কুর্দগণ উত্তর-পশ্চিম দিকে সিরিয়াতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, আধুনিক কালে তাহাদিগকে পারস্য, তুরস্ক, ইরাক ও সিরিয়াতে দেখা যায়। শিহাবু'দ-দীন 'উমারী উল্লেখ করিয়াছেন যে, ৮ম/১৪শ শতকে লূরগণ সিরিয়াতে বাস করিত।

প্রাথমিক যুগের মুসলিম ভূগোলবিদগণ পারস্যের যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে সামগ্রিকভাবে একটি স্থায়ী বসতিপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী কৃষিজীবী সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা বেশ উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষবাস ও পশুপালন করিত। ভৌগোলিকগণ বিস্তীর্ণ চারণ ভূমির উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন ইব্ন হাওকাল বলিয়াছেন যে, জিবালে সর্বপ্রধান জীবিকা ছিল মেষ পালন (আল-আগনাম, ২খ, ৩৭২-৩)। এক মধ্য এশিয়ার যাযাবরদের বিষয় ছাড়া তাঁহাদের বিবরণীতে বিশেষভাবে যাযাবরদের সম্বন্ধে খুব সামান্য বর্ণনাই পাওয়া যায়। তাহা হয়ত এইজন্যই যে, যাযাবরদের বিষয়ে তাঁহাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না অথবা হয়ত এই কারণে এবং ইহাই বরং বেশী সম্ভব যে, পরবর্তী কালে ইহারা সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক হইতে যত বড় হইয়া উঠিয়াছিল সেই সময়ে ততটা ছিল না। বাস্তবিক ইহা বেশ পরিষ্কার মনে হয় যে, পারস্যে যে জনসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল তাহার জন্য 'আরবরা বা সালজূকরা দায়ী ছিল না, দায়ী ছিল মোঙ্গলরা। প্রাথমিক যুগের ভূগোলবিদ ও ঐতিহাসিকগণ যাযাবর ও অর্ধ-যাযাবর দলকে শ্রেণীগত পরিভাষায় আল-আক্রাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উহা দ্বারা তাঁহারা শুধু যে কুর্দ জাতিকে বুঝাইয়াছেন তাহা নহে, আনারব এবং অ-তুর্কী শ্রেণীর তাঁবুতে বসবাসকারী ও পশুপালনকারী লোকদিগকেও বুঝাইয়াছেন। তাবারীও, তাঁহার বয়স তখন ২৩ হইতে ২৯ বৎসরের মধ্যে, যাগরোসের অধিবাসীদিগকে বলিয়াছেন আকরাদ। ইব্ন হাওকাল বলেন যে, কূহিস্তান (পূর্ব পারস্যে অবস্থিত)-এর শহর এবং গ্রামগুলি মরুভূমি দ্বারা বিচ্ছিন্ন, সেইসব মরুভূমিতে কুর্দরা এবং

উট-ভেড়ার পালের মালিকেরা বাস করে (২খ, ৪৪৬) ; আর হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ আল-কুম্মী তাবারিস্তানের আক্‌রাদদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ইহারা দায়লামীদের দল (গুরূহ)" (তা'রীখ-ই কুম্ম, সম্পা. সায়্যিদ জালালু'দ-দীন তেহ্‌রানী, তেহ্‌রান ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ২৬১)।

অনুমিত হয় যে, প্রাথমিক শতাব্দীগুলিতে পারস্যে যাযাবর ও অর্ধ-যাযাবর লোকদের প্রধান ভীড় ছিল খুযিস্তান এবং ইসফাহান ও ফারস-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। ইসতাখরী (এবং তাঁহার পরে ইব্ন হাওকাল ও অন্যরা) ফার্‌স-এর পাঁচটি গোত্রীয় জিলার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি ইহাকে বলিয়াছেন রুমূম (একবচনে রাম্ম)। য়াকূত এইগুলিকে বর্ণনা করিয়াছেন কুর্দীদের মহল্লা ও জিলা বলিয়া (মাহালু'ল-আকরাদ ওয়া মানাযিলুহুম, দ্র. Barbier de Meynard, Geographie de la Perse, pp. 263)। এইগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ ছিল জিলূয়া (কূহগিলূয়া), যাহা রাম্মু'র-রামীজান নামেও পরিচিত ছিল। ইহা খূযিস্তান হইতে ইসফাহান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ইহার সীমান্ত ছিল ইসতাখর, শাপূর, আররাজান ও বায়দা। ইহার অন্তর্গত সকল শহর ও গ্রাম ইসফাহানের কর-প্রশাসনের অধীন ছিল। অন্য জিলাগুলি ছিল আহমাদ ইব্নু'ল-লায়ছ-এর রাম্ম (অপর নাম রাম্মু'ল-লাওয়ালিজান), ইহা অবস্থিত ছিল আরদাশীর খুরার কুরাতে, হুসায়ন ইব্নু'স্-সালিহ-এর রাম্ম (অপর নাম রাম্মু'দ-দীওয়ান), ইহা অবস্থিত ছিল শাপূর কূরাতে, শাহরিয়ারের রাম্ম (অপর নাম রাম্মু'ল-বাযিন্‌জান), উহা ফার্‌স-এর কর প্রশাসন এলাকার বহির্ভূত ছিল এবং সর্বশেষে আহমাদ ইব্নু'ল-হাসান-এর রাম্ম (অপর নাম রাম্মু'ল-কারিয়ান), উহার চারি সীমান্তে ছিল বানূ'স-সাফ্‌ফার-এর সিফ, রাম্মু'ল-বাযিন্‌জাম, কিরমান ও আরদাশির খুরা। ইসতাখীর মতে এই জিলাগুলির অধিবাসিগণ শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে "আরবদের ন্যায়" চারণভূমির সন্ধানে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত ; শুধু তাহাদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক লোক সার্‌দাসীর (সুরূদ) এবং গর্‌মসীর (জুরূম)-এ থাকিত। তাহাদের তাঁবুর সংখ্যা ছিল ৫০০,০০০ সেইগুলির প্রতিটিতে রাখাল শ্রেণীর লোক, ভাড়া করা লোক বা অনুসারী লোক এক হইতে দশজন পর্যন্ত বাস করিতে পারিত। ইসতাখরী এই লোকদের সঙ্গে একজন অশ্বারোহীও যোগ করেন, যাহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহাদের সর্বমোট সঠিক সংখ্যা সাদাকা রেজিস্টার হইতেই পাওয়া সম্ভব ছিল। বলা হইত যে, তাহাদের মধ্যে এক শতেরও বেশী গোত্র ছিল, কিন্তু ইসতাখরী স্বয়ং মাত্র ৩০ টি গোত্রের লোককে চিনিতেন। মানুষ, পশু ও ঘোড়ার দিক হইতে তাহারা ছিল অনেক। তাহারা আরও ছিল সাহসী এবং শক্তিশালী স্থানীয় সরকার তাহাদের সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা করিতে গেলে বা তাহাদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করিতে গেলে অসুবিধার সম্মুখীন হইতেন। তাহাদের ভেড়া ও মাদী ঘোড়া যথেষ্ট ছিল, কিন্তু উটের সংখ্যা কম ছিল। তাহাদের গরুগুলি খুবই চমৎকার ছিল, কিন্তু ভাল জাতের ঘোড়া ছিল শুধু বাযিনজান হইতে আগত লোকদের নিকট। উহাদের পশুচারণ পদ্ধতি ছিল 'আরব ও তুর্কী গোত্রীয়দের ন্যায়। আদিতে উহারা 'আরব বংশীয় ছিল বলিয়া দাবি করিত। এইসব রুমূমের প্রতিটির মধ্যে শহর এবং গ্রাম ছিল। খারাজ জমি চাষ করিতেন প্রত্যেক রাম্ম-এর সর্দার নিজে। তিনি কাফেলার নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকিতেন, পাহারার ব্যবস্থা করিতেন এবং তিনিই স্থানীয় সরকারের অন্যান্য কার্য নির্বাহ করিতেন (পৃ. ৯৭-৯, ১১৩)। ইদরীসী ৬ষ্ঠ/১২শ শতকে তাহাদের সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া মোটামুটি প্রায় একই রকম, কিন্তু আরও সংক্ষিপ্ত, বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি মাত্র চারিটি রুমূমের উল্লেখ করিয়াছেন, আল-কারিয়ানের কথা বাদ দিয়াছেন। তিনি যোগ করিয়াছেন যে, খুওয়া (?) এবং য়াযীদ নামক যে কুর্দী গোত্রের লোকেরা প্রায়শই সেই দেশে আসিত, তাহাদের সংখ্যা ছিল ৫০০ পরিবার এবং প্রতিটি গোত্র মাঠে ১,০০০ ঘোড়া নামাইতে পারিত। ইব্ন দুরায়দ-এর উদ্ধৃতি দিয়া তিনি বলেন যে, তাহারা বানূ মুররা, বানূ 'উমার ও বানূ 'আমির গোত্রের বংশধর (১খ, ৪০৬-৭)।

গোত্রসমূহের সর্দার এবং সম্ভবত গোত্রের লোকেরাও মনে হয় ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। ইসতাখরী বলেন যে, গোত্রীয় লোকেরা (আহ্‌লু'র-রুমূম) তাহাদের জায়গা জমির (আদ-দি য়া') জন্য মুকাসামা প্রথায় খাজনা দিত। তাহারা 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা), 'উমার ইব্নুল'-খাত্তাব (রা) এবং অন্যান্য খলীফার নিকট হইতে প্রাপ্ত ফরমান ('উহূদ) অনুসারে উৎপাদনের এক-দশমাংশ, এক-তৃতীয়াংশ, এক -তুর্থাংশ এইরূপ পরিমাণে খাজনা দিত (পৃ. ১৫৮)। ইব্ন হাওকাল ইহার সামান্য ভিন্নতর বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, উপজাতীয় জিলাসমূহে (রুমূম) খাজনা নির্ধারণ করা হইত চুক্তি অনুসারে (মুকাতা'আ), আনুমানিক হিসাবে ('ইবরা) বা ফসল ভাগ করিয়া (মুকাসামা)। শেষোক্ত ক্ষেত্রে খাজনা ঠিক করা হইত দুই পদ্ধতির একটিতে ঃ জমি যদি এইরূপ কোন উপজাতির (কাওম মিন আহলি'র-রুমূম) বা এমন অন্য কাহারও অধিকারে থাকে, যিনি 'আলী (রা), 'উমার (রা) বা খলীফার নিযুক্ত কোন প্রাদেশিক শাসকের নিকট হইতে ফরমানবলে উহা লাভ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহারা এক-দশমাংশ হইতে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত খাজনা দিতেন। মালিকরা হাঙ্গামা করায় বা অন্য কোন কারণে গ্রাম যদি রাষ্ট্রের খাস দখলে লওয়া হইত তাহা হইলে কৃষকেরা তাহাদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে এক-পঞ্চমাংশ শস্য দিত (পৃ. ২, ৩০২-৩)।

ফারস নামার রচয়িতা ইব্নুল বালখী অভিযোগ করিয়াছেন, ফারস-এর যাযাবররা (কুরদান) যাহারা সাসানীয় সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ অংশ বলিয়া গণ্য হইত, তাহারা সকলেই ইসলামের বিজয় অভিযানের সময় নিহত হয়। তাঁহার আমলে সকল যাযাবর ফারস-এ বসবাস করিত। তাহারা সকলেই বুওয়ায়হী বংশের 'আদুদু'দ-দাওলা (মৃ. ৩৭২/৯৮২) কর্তৃক ইসফাহান হইতে ফারস-এ আনীত একদল লোকের বংশধর ছিল। কিন্তু ইব্নুল বাল্‌খী এই যাযাবর দলকে শাবানকারা বলিয়া জানিতেন। তাহারা সম্ভবত পূর্বেকার রুমূমকে বদলাইয়া একীভূত করিয়া লইয়াছিল। ইব্নুল বাল্‌খীর সময়ে [তিনি তাঁহার রচিত ফারস-নামা মুহাম্মাদ ইব্ন মালিক শাহ (মৃ. ৫১১/১১১৭)-কে উৎসর্গ করিয়াছিলেন] ফারস বিশৃঙ্খলায় এবং যাযাবর গোত্রীয়দের বারবার আক্রমণে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যতদিন না আতাবেগ চাওলী, যাঁহাকে মুহাম্মাদ ইব্ন মালিক শাহ ফারস-এর শাসক নিযুক্ত করিয়াছলেন, বিদ্রোহীদের সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধ করিয়া সেই প্রদেশে শান্তি স্থাপন করেন। ইব্নুল বালখীর বর্ণনানুসারে শাবানকারাগণ, যাহারা পাঁচটি গোত্র বা দলে বিভক্ত ছিল, ফারসে পশু চরাইয়া ও কাঠুরিয়ার কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। বুওয়ায়হী শাসন বিভক্ত হইয়া পড়িলে তাহাদের ক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত পাঁচ গোত্রের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষমতাবান রামানীদের সর্দার ফাদলূয়া ফারস-এর অধিকাংশ অঞ্চলের উপরে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং বুওয়ায়হীগণের নিকট হইতে ভাতা লাভ করেন। পরবর্তী কালে আলপ আরসলান ফারস-এ

শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য কাউরদকে প্রেরণ করেন। ফাদলুয়া প্রতিরোধ করিতে ব্যর্থ হইয়া আল্প আরসলান-এর দরবারে ফিরিয়া যান। তাঁহাকে সেই প্রদেশের খাজনা ব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার চুক্তিতে পুনরায় ফারসে প্রেরণ করা হয়। তিনি পুনরায় বিদ্রোহ করেন এবং নিজামু'ল-মুলক-এর অধীনে প্রেরিত সালজূক সেনাবাহিনীর হস্তে বন্দী হন। তিনি বন্দী অবস্থা হইতে পলায়ন করেন এবং পুনরায় বিদ্রোহ সংঘটিত করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধৃত ও বন্দী হন (ফারসনামা, সম্পা. G. Le Strange and R. A. Nicholson, G.M.S., 1962, pp 164, 166; আহমাদ ইব্ন যারকূব, শীরাযনামা, সম্পা. বাহমান কারীমী, তেহরান ১৯৩১-২ খৃ., পৃ. ৩৮-৯)।

ইব্ন বাল্খীর বর্ণনানুসারে পাঁচটি দলের মধ্যে ইসমা'ঈলীগণ, যাহারা ইসলামের বিজয়ের পরে দাশ্ত-ই উরদ-এ বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তাহারাই ছিল মহত্তম। মাস'ঊদ ইব্ন মাহমূদ-এর সেনাপতি তাশ ফাররাশ তাহাদিগকে ইসফাহান অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করেন। তাহারা প্রথমে দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, অতঃপর বুওয়ায়হীগণের চাপে পশ্চিম দিকে গিয়া দারাব্জিরদের নিকটে বসতি স্থাপন করে। অভ্যন্তরীণ কলহের ফলে তাহারা দুর্বল হইয়া পড়িলে ফাদলুয়া তাহাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সক্ষম হন (ফারসনামা, পৃ. ১৬৪-৫ ; শীরাযনামা, পৃ. ৩৭-৮)। কারযূবী গোত্রীয়রাও পশু পালন করিত। বুওয়ায়হী শাসনামলের শেষ ভাগে তাহারা কাযিরূন ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিকার লাভ করে, কিন্তু পরে চাওলী তাহাদিগকে সেখান হইতে বিতাড়িত করেন। মাস'ঊদীরা ছিল এক অজানা গোত্র, ফাদলুয়া তাহাদিগকে গড়িয়া তোলেন। ফারস প্রদেশের সালজূক শাসক রুকনু'দ-দীন খুমারতেগীন তাহাদিগকে ইক্তা' প্রদান করেন। পরবর্তী কালে তাহারা ফীরূযাবাদে এবং শাপূর খুরাব অধিকাংশ অঞ্চলের অধিকার লাভ করে। শেষ পর্যন্ত চাওলী তাহাদিগকে দমন করেন (ফারসনামা, পৃ. ১৬৭)। পঞ্চম দল শাঁকানীগণ পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসী ছিল এবং গারমসীর-এর পর্বতমালায় বসবাস করিত। তাহারা দুষ্ট প্রকৃতির লোক বলিয়া পরিচিত ছিল, প্রকাশ্য রাজপথে ডাকাতি করিত। চাওলী উহাদেরও দমন করেন (ফারসনামা পৃ. ১৬৭)। পরবর্তী সময়ে শাবানকারাদের কথা কমই শোনা যায়। তাহারা হয় স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছিল অথবা চাওলী দমন করিবার পরে সেই পরাজয়ের ক্ষতি আর সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই এবং ক্রমে ক্রমে তাহারা নিজেদের স্বাধীন সত্তা হারাইয়া ফেলে। খুব সম্ভব তাহারা লূরদের সঙ্গে মিশিয়া যায়। ৬ষ্ঠ/১২শ শতকে লূরদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

লূর-ই বুযুর্গ (দ্র.)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও নামদাতা আবু'ল-হাসান ফাদলুয়া ছিলেন একজন কুর্দ, তিনি সিরিয়ার জাবাল সুমাক-এ বাস করিতেন। তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে কিছু কিছু মায়াফারিকীন ও আযারবায়জানের মধ্য দিয়া উশ্তুরান কূহ-এর উত্তরে গিয়া বসতি স্থাপন করে। সেখানে তাহারা যায় ৫০০/১০০৬ সালের দিকে। তাহাদের সর্দার আবূ তাহির ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ, সালগুরীর বংশের সুনকুর (৫৪৩-৫৬ হি.)-এর অধীনে চাকুরীতে থাকাকালে শাবানকারাদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। উহার পুরস্কারস্বরূপ তিনি কূহগীলুয়া লাভ করেন এবং লূরিস্তান বিজয়ের জন্য প্রেরিত হন। পরে তিনি সুনকুর-এর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া স্বাধীন হন। ৭ম/১৩শ শতকের শুরুতে সিরিয়া হইতে আগত আরও অনেক গোত্রীয় লোক তাঁহার পুত্র হাযারাস্প-এর সঙ্গে যোগ দেয়। তাহাদের মধ্যে 'উকায়লী ('আকীলী) এবং হাশিমী নামক দুইটি 'আরব গোত্র এবং অপরাপর আটাশটি গোত্র ছিল, যাহাদের অন্তর্গত ছিল বাখতিয়ারী, জাওয়ানিকী, গোতওয়ান্দ, লীরাবী এবং মামাসাতী (মামাসসানী, দ্র. বিদলীসী, শারাফনামা, কায়রো, তা. বি., পৃ. ৪৪ প. এবং প্রবন্ধ লূর)। এই সকল পরিবর্তনের ফলে শূলরা স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে এবং ফারস-এ চলিয়া যায় (দ্র. তারীখ-ই গুযীদাহ, পৃ. ৫৩৭-৯ এবং প্রবন্ধ লূর-ই বুযুর্গ)।

প্রাথমিক যুগের ভৌগোলিকগণ কিরমানের উপজাতীয় গোত্রেরও নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা অর্ধ-যাযাবর ছিল বলিয়া মনে হয়। তাহাদের নাম কুফ (কূচ) ও বালূস (বালুজ বা বালূচ)। হুদূদু'ল-'আলাম-এ এই শেষোক্তদের সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, এই শ্রেণীর লোকেরা একদিকে জীরুফ্ত ও বাফ্ত এবং অপর দিকে কুফিজ পর্বতের মধ্যবর্তী খোলা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা ছিল পশুপালক, মহাসড়কের পেশাদারী ডাকাত, অতি দুঃসাহসী এবং রক্তপিপাসু। বুওয়ায়হী বংশীয় ফানা খুসরাও নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া তাহাদের সংখ্যা কমাইয়া দেন (পৃ. ১২৪)। মুকাদ্দাসী উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'আদুদু'দ-দাওলা বহু পরিমাণে তাহাদের ধ্বংস সাধন করেন (পৃ. ৪৭১)। ইব্ন হাওকাল বলেন যে, তাহারা মানূজান ও হুরমুযের সীমান্তে বাস করিত এবং তাহারা কুর্দীদেরই (অর্থাৎ তাঁবুতে বসবাসকারী যাযাবর বা অর্ধ-যাযাবর) একটি শাখা (সিনফ)। তাহারা নিজেদেরকে 'আরব বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করিত, সংখ্যায় তাহারা ছিল প্রায় ১০,০০০। স্থানীয় সরকার ভাতা দিয়া তাহাদিগকে শান্ত রাখিতেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা প্রকাশ্য রাজপথে ডাকাতি করিত এবং কিরমান ও সীস্তানের মরুভূমিতে ও ফারসে সীমান্তে যাতায়াতকারীদের জন্য এক স্থায়ী উৎপাতস্বরূপ ছিল। বুওয়ায়হী বংশীয় মালিক উহাদের ক্ষমতা ধ্বংস করেন ও ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন (২খ, ৩০৯-১০)। ইসতাখরীর মতে তাহারা ছিল শী'আঃ (পৃ. ১৬৭)। হুদূদু'ল-'আলামে বর্ণিত আছে যে, কূফিজ পর্বতে বসবাসকারী জনগণ সাতটি গোত্রে বিভক্ত ছিল, প্রতিটি গোত্রের স্বতন্ত্র সর্দার ছিল, সরকারী খাজনা আদায়কারীরা সেইসব এলাকায় যাইত না, গোত্রের সর্দার মুকাতা'আ দ্বারা বার্ষিক খাজনা প্রদান করিতেন (পৃ. ১২৪)। ইসতাখরী এবং ইব্ন হাওকালও অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে যোগ করিয়াছেন যে, কুফ্সদের ছিল পশুর পাল এবং তাহারা বেদুঈনদের মত কালো রঙের তাঁবুতে থাকিত। তাহারা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করিত, পথচারীদের আক্রমণ করিত না (ইসতাখরী, ১৬৪ ; ইব্ন হাওকাল, ২খ, ৩১০) এবং তাহারা ছিল শী'আ মতাবলম্বী (পৃ. ১৬৭; ২খ, ৩১২)। ইব্ন হাওকাল আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, খাওয়াশের আশেপাশে উটের মালিক বা পশু-পালক যাযাবরেরা বাস করে (২খ, ৩১৩)। সালজূক আমলে কাউরদ সাফল্যের সঙ্গে কুফ্স ও বালূচদের উপরে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন। তিনি প্রথমোক্তদেরকে বাম ও জীরুফ্ত-এর মধ্যবর্তী পার্বত্য জিলার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন (দ্র. আফদালু'দ-দীন, 'ইকদু'ল-উলা, সম্পা. 'আলী মুহাম্মাদ 'আমিরী না'ঈনী, তেহরান ১৯৩২-৩ খৃ., পৃ. ৬৬)। সান্জারের মৃত্যুর পরে কিরমানে অধিক সংখ্যক গুযদের অনুপ্রবেশের ফলে বালূচরা সম্ভবত কিছুটা স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে এবং আরও পূর্বদিকে চলিয়া যায়।

খুযিস্তান ও পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বসবাসকারী 'আরব গোত্রীয় অধিবাসীদের অধিকাংশ ইসলামের বিজয়ের সঙ্গেই সেইসব এলাকায় আসে, যদিও ইহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আরও পূর্বেই

আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। 'আরবগণ পারস্যে আসিয়া পৌঁছাইতে পৌঁছাইতে তাহারা নিজেদের যাযাবর পশ্চাদপট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই সেনা শিবিরময় শহরাঞ্চল হইতে আসিয়াছিল এবং তাহারা শহরেই বসতি স্থাপন করিয়াছিল। য়া'কূবী কাযবীন (পৃ. ৭০), নিহাওয়ান্দ (পৃ. ৭৩), দীনাওয়ার (পৃ. ৬৯), সায়মারা (পৃ. ২৬৯-৭০), তুস (পৃ. ৮৩) ও নায়শাপুর (পৃ. ৮৫)-এর মিশ্র জনসংখ্যার বিষয় এবং মারব (পৃ. ৮৭)-এর বানূ 'আয্দ, বানূ তামীম ও অন্যান্য 'আরব গোত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, বুস্ত-এর অধিবাসিগণ য়ামান হইতে আগত হিময়ারী গোত্রের বংশধর বলিয়া দাবি করিত (পৃ. ৮৯)। অনুরূপভাবে অনেক 'আরব হারাতেও বাস করিত (পৃ. ৮৮; হুদূদু'ল-'আলাম, পৃ. ১০৪)। ইব্ন হাওকাল বলেন যে, কুম্ম-এর অধিকাংশ অধিবাসী ছিল জাতিতে 'আরব, যদিও তাহাদের ভাষা ছিল ফার্সী (২খ, ৩৭০; আরও দ্র. তা'রীখ-ই কুম্ম, পৃ. ২৬৪)। বর্তমানে হারাইয়া যাওয়া হাম্যা রচিত ইসফাহানের ইতিহাসের উল্লেখ করিয়া মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ কুম্মী বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইসফাহান ও উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী 'আরবগণ হাজ্জাজ-এর আমলে সেখানে আগমন করে (তা'রীখ-ই কুম্ম, পৃ. ২৬৪)। য়াকূত বানূ 'আয্দ ও বানূ মুহাল্লাব গোত্রের বংশধরগণের জীরুফ্তে বসবাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (Barbier de Meynard, 185)। বানূ তামীম এবং বানূ তাযিয়ান গোত্রীয়গণেরও কিছু সংখ্যক লোক য়াযদে বাস করিত বলিয়া মনে হয় (জামি'-ই মুফীদী, সম্পা. ইরাজ আফশার, তেহরান ১৩৪২/১৯৬৪-৫, ১খ, ৩৬)। এই নানা গোত্র ও দলের জনগণের অধিকাংশ স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে মিশিয়া যায়। কিছু যাযাবর দলও ছিল, যাহারা প্রধানত দক্ষিণ পারস্য, কিরমান, সীস্তান, বিশেষ করিয়া খুরাসানে আগমন করে [দ্র. আল-'আরাব, (৩)]। হুদূদু'ল-'আলামে উল্লেখ আছে যে, গূযগানান-এর স্তেপভূমিতে প্রায় ২০,০০০ 'আরব বাস করিত। তাহাদের বহু ভেড়া ও উট ছিল এবং খুরাসানে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাসকারী সকল আরবদের তুলনায় তাহারা বেশী সম্পদশালী ছিল। গূযগানানের মালিক তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের আমীর মনোনীত করিতেন, যাহারা তাঁহাকে সাদাকা প্রধান করিত (পৃ. ১০৮)।

তৃতীয় যাযাবর শ্রেণীর দল তুর্কোমান ও তুর্কীরা আসে প্রধানত সালজূক ও মোঙ্গলদের সঙ্গে এবং তৈমূরলঙ্গ-এর অভিযানের সময়ে। উহাদের মধ্যে সেইসব গোত্রীয়রা ছিল যাহারা পারস্যের ভিতর দিয়া এশিয়া মাইনর ও সিরিয়াতে গিয়া পুনরায় আককোয়ূন্লু, কারা কোয়ূন্লু ও সাফাবী বংশীয়গণের সঙ্গে প্রাচ্যে প্রত্যাবর্তন করে। অপর দুইটি দল হইতে এই যাযাবর দলটির পার্থক্য এই যে, তুর্কোমান ও তুর্কী গোত্রের স্থানান্তর গমনের ফলে যে সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, অন্তত আদিতে তাহা সম্ভব হইয়াছিল উপজাতীয়দের সমর্থনের ফলে। অন্যান্য উপজাতীয় গোত্র, বিশেষ করিয়া পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম পারস্যের কুর্দীগণ এবং ইরাক ও জাযীরার 'আরবগণ স্বাধীনভাবে রাজ্য স্থাপন করে, কিন্তু তাহারা তুর্কোমান ও তুর্কীদের মত সমগ্র দেশের উপরে কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হয় নাই।

৪র্থ/১০ম শতকের শেষভাগে ওগুযগুয্ গোত্রীয়রা মধ্য এশিয়া হইতে পশ্চিমমুখে স্থানান্তরণ শুরু করে। তাহাদের প্রথম দলটি মানগিশ্লাক -এ গমন করে। দ্বিতীয় দলটি ৫ম/১১শ শতকের চতুর্থ দশকের দিকে পারস্যে গমন করে। ইহাদের প্রধান দলটি রওয়ানা হইবার আগে বেশ কয়েকটি গুয্য (দ্র.) দল বিচ্ছিন্নভাবে স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিল। পরে মূল দলটি সালজূক পরিবারের নেতৃত্বাধীন আসিয়া পারস্যে প্রথম তুর্কোমান বা তুর্কী সাম্রাজ্য স্থাপন করে। তৃতীয় দলটি ৫ম/১১শ শতকে কৃষ্ণসাগর অতিক্রম করিয়া বলকানে গমন করে। আর চতুর্থ ও বড় যে দলটি আংশিকভাবে স্থায়ী ছিল, তাহারা সীর দরিয়া অঞ্চলে থাকিয়া যায় [ফারুক সুমের, ওগুয্লার (তুর্কমেনলার), আনকারা ১৯৬৭ খৃ.]। কিংবদন্তী অনুযায়ী ওগুযরা চব্বিশটি গোত্রে বিভক্ত হয়। মাহমূদ কাশগারী উহাদের বাইশটি গোত্রকে তাহাদের তমগা সমেত জানিতেন, কিন্তু শুধুমাত্র কীনীক (সালজূকরা ইহাদের অন্তর্গত ছিল), ঈভা, ডোগার য়াগমা, সালগুর এবং আভশার (আফশার)-গণই মোঙ্গল অভিযানের পূর্বেকার বলিয়া মনে হয়। রাশীদু'দ-দীনও চব্বিশটি গোত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার তালিকা ও মাহ্মূদ কাশগারীর তালিকা একরূপ নহে (Cl. Cahen, Per-Ottoman Turkey, London 1968, pp. 19 ff.)।

সালজূকরা একটি যাযাবর উপজাতীয় দলের দেশত্যাগের নেতা হওয়া সত্ত্বেও নগর জীবন ও ইসলামী সভ্যতার সংগে পরিচিত ছিল। শুরু হইতেই তাহারা রাজধানী স্থাপন করে এবং মোঙ্গল ঈলখানীদের ন্যায় স্থানীয় অধিবাসীদের হইতে দূরে তাবুঁতে বসবাস করিত বলিয়া মনে হয় না—অন্তত মোঙ্গলদের মত অতটা নহে। পারস্য হইতে আগত স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন গুযয দলের অধিকাংশই ছিল অনিয়ন্ত্রিত এবং তাহাদের কার্যকলাপও ছিল অসংবদ্ধ ও সঙ্গতিহীন। তাহাদের নেতা এবং সালজূক নেতাদের মধ্যে পার্থক্য এই ছিল যে, শেষোক্তরা সামগ্রিকভাবে তাহাদের অনুসারীদের নিয়ন্ত্রণ করিত। তুগরিল বেগ (দ্র.) ও আল্প আরসলান (দ্র.) সুযোগ্য সেনাপতি ও শাসক ছিলেন। প্রাচ্যের খিলাফাত অঞ্চলসমূহে প্রচলিত সরকার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তাহারা সেইসঙ্গে নিজেদের উপজাতীয় পশ্চাদপটের নূতন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আনয়ন করে (এই বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দ্র. A. K. s. Lambton, "The internal structure of the Salijuq empire", The Cambridge History of Iran সিরিজের অন্তর্ভুক্ত, vol. v, Cambridge 1968, pp. 203-82)। সামগ্রিকভাবে সালজূক বিজয় তেমন কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন আনে নাই এবং গাযনাবী শাসনযুগের শেষভাগে সরকারী সেনাবাহিনী স্থানান্তরের ফলে যতটুকু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তদপেক্ষা বেশী কিছু নহে। উহাদের সংখ্যাও খুব বেশী ছিল না, সম্ভবত দশ হাজারের কাছাকাছি ছিল। সালজূকরা তাহাদের পশুপাল সমেত আগমন করিবার ফলে বাস্তবে দেশটির কল্যাণই হয়, পশুর গোশত এবং দুধ ও দুধজাত দ্রব্যাদি শহরের প্রয়োজন মিটায়, পশম ও চামড়া কারখানাসমূহে সরবরাহ করা হয়, উহাদের চারণে শস্যকর্তিত ভূমি উর্বরা হয়। উটের পাল হয়ত ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি বহনের অতিরিক্ত কাজে আসিয়াছিল।

গুয্দ গোত্রীয়রা যে পশ্চিম আযারবায়জান ও উচ্চ মেসোপটেমিয়ার কুর্দী ও বেদুঈন ব্যতীত অন্যান্য উপজাতীয় ও যাযাবর দলগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিল এইরূপ প্রমাণ সামান্যই পাওয়া যায়। সেখানে সর্বপ্রথমে আগত গুযয অভিযানকারীদিগকে বাধা প্রদান করা হইয়াছিল। প্রথম বসতি স্থাপিত হইয়াছিল সম্ভবত শুধু কুর্দ পর্বতসমূহের নিম্ন ঢালু অঞ্চলে। পরবর্তী কালে একদিকে সালজূকদের সঙ্গে এবং অপরদিকে

শাবানকারা ও কুফ্‌সদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে, কিন্তু সেইসব সংঘর্ষের কারণ হইল সালজূকরা। তাহারা তখন একটি সাম্রাজ্যের শাসক হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্য আরোপ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। সেইগুলি চারণভূমির দখল লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী যাযাবর দলের মধ্যকার সংঘর্ষ ছিল না। মোটামুটিভাবে গুয্য গোত্রীয়রা ফারস, লূরিস্তান, কুফ্‌স পর্বত অঞ্চল, তাবারিস্তান বা কুর্দিস্তান, যেখানে ইতোমধ্যে উপজাতীয় এবং অর্ধ-যাযাবর জনগণের বাস ছিল, সেখানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না—অন্তত ব্যাপকভাবে নহে। ইহার ফলে যে সমস্যাটি দেখা দেয় তাহা আমাদের বর্তমানের জ্ঞান দ্বারা সমাধান করা সম্ভব নহে। সমস্যাটি এই যে, অন্যান্য অঞ্চলে তাহাদের অনাহূতভাবে প্রবেশের ফলে আবাদী জমি জনসংখ্যার তুলনায় হ্রাস পাইয়াছিল কিনা বা তাহারা সেই সমস্ত জমিই ব্যবহার করিত যেগুলি স্থানীয় অধিবাসীরা কৃষি বা চারণের জন্য পুরাপুরিভাবে ব্যবহার করিত না।

সাম্রাজ্যের মালিক হইবার পরেই সালজূকরা গুয্য উপজাতিদের সমর্থন অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য কোন ক্ষমতার ভিত্তি সন্ধান করিতে বাধ্য হয়। সামরিক শক্তি এবং প্রাদেশিক শাসক নিয়োগের জন্য ক্রমেই তাহারা বেশী করিয়া তুর্কী ক্রীতদাস ও উপজাতীয় যাযাবর পশ্চাদপট হইতে বিচ্ছিন্ন মুক্তদাসদের উপর নির্ভর করিতে থাকে ; যথেষ্ট সংখ্যক গুয্য (যে সকল মুসলিম গুয্য দারু'ল-ইসলামে প্রবেশ করিয়াছিল, 'আরবী ও ফার্সীতে সাধারণত তাহাদিগকে "তুর্কোমান" বলা হইয়া থাকে) তখনও দেশে দেখা যাইত, যদিও তাহাদের সাধারণ প্রবণতা ছিল পশ্চিমমুখী—সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনরের দিকে। এইগুলি ছাড়া তুর্কোমানদের প্রধান প্রধান বাসভূমি গড়িয়া উঠিয়াছিল মেসোপটেমিয়ার উচ্চ অঞ্চল, গুরগান, মারব ও আযারবায়জানে এবং কিছু কিছু অপ্রধান বসতি ছিল খুজিস্তান, ফারস এবং অন্যত্র। তাহাদের অনেক সর্দার বা নেতাই সুলতানের কর্মকর্তা ছিলেন বিধায় কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হইয়া পড়িলেই স্বল্প সময়ের মধ্যে তাহারা স্থানীয় শাসক হইয়া যাইত। এইরূপ ঘটনার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ছিল আরতুকীগণ (দ্র.)।

সানজার-এর অধীনে গুরগান, দিহিস্তান ও মারব-এর তুর্কোমানরা সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত একজন শিহ্‌না (দ্র.) কর্তৃক শাসিত হইত। তিনি তাঁবুর সংখ্যা অনুপাতে তাহাদের সর্দারকে চারণভূমি ও পানি বরাদ্দ করিতেন। তাহারা তাঁহার মাধ্যমেই সরকারের নিকটে আবেদন-নিবেদন করিত। তাহারা চারণ কর দিত এবং শিহ্‌নার দফতরের জন্যও একটা পরিমাণ খাজনা দিত ('আতাবাতু'ল-কাতাবা, সম্পা. মুহাম্মাদ কাযবীনী ও 'আব্বাস ইক্‌বাল, তেহরান ১৯৫০ খৃ., ৮-১২, ৮৪-৫)। তুর্কোমানদের প্রতি বিশেষ ধরনের বরাদ্দের (নানপারা) উল্লেখ প্রায়শই পাওয়া যায়। নিজামু'ল-মুল্‌ক মনে হয় যেন ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, তাহারা অনুরূপ বরাদ্দ লাভ করিবে এবং এইরূপ সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, তাহাদের মধ্যকার কিছু সংখ্যক লোককে দরবারে রাখা উচিত, কিছু সামরিক চাকুরীর জন্য আর কিছু প্রতিভূরূপে যেন অন্যরা সৎ আচরণ করে। সানজার-এর শাসনামলের শেষদিকে খুরাসানে তুর্কোমানদিগকে যে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হইত তাহা সম্ভবত প্রধানত তাহাদের সৎ আচরণের নিশ্চয়তাস্বরূপ, সামরিক বা অন্যবিধ চাকুরীর পুরস্কারস্বরূপ নহে—যদিও ইহা পরিষ্কার যে, অন্যান্য রাজবংশের মত সালজূকরা তুর্কোমান ও অন্যান্য যাযাবর গোত্রীয়দেরকে ভাড়াটিয়া সৈন্যরূপেই সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করিত।

৬ষ্ঠ/১২শ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে খিতায়গণের ট্রান্সঅক্সিয়ানা বিজয় মধ্য এশিয়াতে যে সকল গুয্য রহিয়া যায় তাহাদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং সালজূক সরকারের পক্ষে তাহাদের রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী লোকদিগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ক্রমেই কঠিনতর হইয়া পড়ে। সানজারদের সঙ্গে তাহাদের যে সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বুঝা যায় যে, স্থায়ী বসতকারী একটি সরকারের পক্ষে যাযাবর অধিবাসীদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন ছিল এবং স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনগণ ও যাযাবর বা অর্ধ-যাযাবর গোত্রীয় লোকদের মধ্যে সমঝোতার অভাব ছিল। গুয্যদের পক্ষ হইতে সুলতানকে বাৎসরিক খাজনারূপে প্রদেয় ভেড়ার সংখ্যা লইয়া এবং সেই ভেড়ার সংগ্রহকালীন দুর্নীতিকে কেন্দ্র করিয়া শেষ পর্যন্ত সানজারের সৈন্যবাহিনী এবং গুয্যদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ৫৪৮/১১৫৩ সনে উভয়ের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে সানজার বন্দী হন এবং খুরাসান লুণ্ঠিত হয় (আরও দ্র. A. K. S. Lambton, Landlord and Peasant in Persia, 58-9)। পরে সানজার বন্দী অবস্থা হইতে যথাসময়ে মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু তিনি পুনরায় অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনিতে আর সক্ষম হন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে (৫৫২/১১৫৬) গুয্যরা আরও অধিক সংখ্যায় খুরাসানে আসে। উহাদের কিছু সংখ্যক মালিক দীনারের অধীনে কিরমান অধিকার করে। এই গুয্যরা সালজূকদের ন্যায় সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হয় নাই, বরং এই বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, তাহারা বহু ধ্বংসসাধন ও বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করে (আরও দ্র. মুহাম্মাদ ইবরাহীম, তা'রীখ-ই সালজূকিয়ান-ই কিরমান, সম্পা. M. T. Houtsma, Leiden 1886, pp. 106 ff.)। সালজূক সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে ফারস-এ যাযাবরত্বের একটা পুনর্জাগরণও দেখা দেয়। তখন সালগুরীরা গুনদামান অঞ্চলে বসবাসকারী অর্ধযাযাবর গোত্রসমূহের উপর তাহাদের ক্ষমতার ভিত্তি করিয়া শাসন বিস্তার করিতে শুরু করে (আহমাদ ইব্‌ন যারকূব, শীরাযনামা, ৪৮-৯)। তবে পরবর্তী সালগুরীরা স্বাভাবিক বসতি স্থাপনকারী শাসকদের পদ্ধতিই অনুসরণ করে।

মোঙ্গল অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক আকারে তুর্কী গোত্রসমূহের নূতন করিয়া আগমন শুরু হয়। সালজূক অভিযান হইতে ইহা ভিন্ন প্রকৃতির ছিল, এবারের গোত্রসমূহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় সংগঠিত ছিল। রাজনৈতিক শাসন উপজাতীয় সর্দারগণের হাতে ছিল, তাহারা এক ধরনের সামরিক আভিজাত্যবাদ গঠন করে। তাহারা স্থায়ী জীবন যাপন পদ্ধতির বিরোধী ছিল এবং কৃষক ও শহরবাসীদের সম্পদ লুণ্ঠন করিত। বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক ধ্বংসলীলা ও নরহত্যা চলিত। অধিবাসীদের প্রাণভয়ে পলায়ন বা মৃত্যুর দরুন বহু জমিনের চাষবাস বন্ধ হইয়া যায়। মোঙ্গলদের উপজাতীয় অনুসারীদের দরুন এবং উহাদের গরু-ঘোড়া-ভেড়ার চারণভূমি করার প্রয়োজনেও বহু স্থানচ্যুতি ঘটে (দ্র. রাশীদু'দ-দীন, তা'রীখ-ই মুবারাক-ই গাযানী, সম্পা. Jahn, GMS, s.s. xiv, London 1940, 349 প.)। উপজাতীয় সর্দারগণকে চারণভূমি বরাদ্দ করা হয় বা তাহারা নিজেরাই দখল করিয়া লয়। তাহাদের অনেককে জমি বরাদ্দ করা হয়। তাহারা অনেক সময় সেগুলিকে আবার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া লয় ; সেই জায়গার অধিবাসীদের

উপরে তাহাদের আধিপত্যও দেওয়া হয়। নানারকম নূতন নূতন কর ধার্য করা হয়, তন্মধ্যে একটি ছিল কুবচুর (দ্র.) যাহা মূলে সম্ভবত ছিল যাযাবরদের প্রদেয় পশুচারণ কর (যদিও পরবর্তী কালে এই কর স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের উপরেও ধার্য করা হইত)। গাযান খান-এর শাসনামলে ৬৯৪/১২৯৫-৭০৩/১৩০৪) ঈলখানীদের নীতির কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়, যাহার উদ্দেশ্য ছিল কৃষির পুনপ্রবর্তন এবং যাযাবরদের সামরিক আভিজাত্যের ক্ষমতা খর্ব করা। ইহা আংশিকভাবে মাত্র সফল হয় (আরও দ্র. I. P. Petrushevsky, "The socio-economic condition of Iran under the IlKhans", in the Cambridge History of Iran, v, 483-537, এবং A. K. S. Lambton, Landlord and peasant in Persia, 77-104)।

ঈলখানী রাজ্যের কেন্দ্র ছিল আযারবায়জান এবং সেখানে, আর্‌রানে এবং কিছু কম সংখ্যায় এশিয়া মাইনরে ঈলখানীদের সঙ্গে আগত উপজাতিসমূহ কেন্দ্রীভূত ছিল। তাহাদের অনেকেরই ইতোপূর্বে পারস্যে আগমনকারী তুর্কী উপজাতিসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। যে সকল উপজাতি হুলাগূ খানের সঙ্গে আসিয়াছিল বা তাঁহার সঙ্গে যোগ দেয় তাহাদের মধ্যে ছিল আফ্‌শারগণ (যাহাদের কিছু কিছু দল সম্ভবত সালজূক'দের সঙ্গে হিজরত করিয়াছিল, দ্র. আফশার)। তাহারা প্রধানত আযারবায়জানে বসতি স্থাপন করে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের সংখ্যা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

হামদুল্লাহ মুসতাওফী সুলতানিয়্যার দক্ষিণেও বিভিন্ন জিলার উল্লেখ করিয়াছেন যেখানে ভাল চারণভূমি সমেত কয়েক শত গ্রাম ছিল। মোঙ্গলরা সেখানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল (নুযহাতু'ল-কুলূব, সম্পা. G. Le Strange, G. M. S., 1919, 64-5) এবং মুগান স্তেপভূমিতে মোঙ্গলদের শীতের বাসস্থান ছিল (পৃ. ৮৩)। তাঁহার মতে, রায়-এর নিকটবর্তী সাওজ বুলাগে প্রধানত যাযাবররা বাস করিত (সাহ্‌রানিশীন, পৃ. ৬৩)। তাহাদের মধ্যে সম্ভবত কারা এভলীরাও ছিল। তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না এবং শেষ পর্যন্ত তাহারা আফশারদের সঙ্গে যোগদান করে, যদিও তাহাদের কিছু সংখ্যক লোক অন্যান্য তুর্কোমান উপজাতির সঙ্গে মিশিয়া যায় (কা'ইম মাকাম, মুনশা'আত, সম্পা. জাহানগীর কা'ইম মাকামী, তেহরান ১৯৫৯-৬০ খৃ., পৃ. ৩৬৩)। হামদুল্লাহ-এর মতে নিহাওয়ান্দ-মালায়ির জিলাতেও অনেক কুর্দী উপজাতি ছিল (খায়ল-ই আকরাদ-ই সাহরানিশীন), যদিও আকরাদ কথাটি দ্বারা তিনি হয়তো এইরূপ গোত্রসমূহকে বুঝাইয়া থাকিবেন যাহারা তুর্কীও ছিল না, 'আরবও ছিল না। তাহারা বাৎসরিক ৭,০০০ ভেড়া খাজনা দিত (গৃসফান্দ, পৃ. ৭৪)। এই সময়ে লূরিস্তানেও যথেষ্ট যাযাবরের আগমন ঘটে বলিয়া মনে হয়। মু'ঈনু'দ-দীন নাতান্‌যী বলেন, আতাবেগ শাম্‌সু'দ-দীন আল্‌প আরগূন, যাঁহাকে হুলাগূ খান লূরিস্তানের শাসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, প্রদেশটিকে বিধ্বস্ত অবস্থায় এবং কৃষকগণকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখিতে পান। তিনি এক বৎসরের খাজনা মওকুফ করিয়া দেন এবং সুশাসন দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হন। "প্রদেশটির সমৃদ্ধির একটি কারণ ছিল এই যে, আতাবেগ মোঙ্গলদের অনুসরণে গ্রীষ্মাবাস হইতে শীতাবাসে গমনাগমনের অভ্যাস করেন। তিনি শীতকাল কাটান ঈদাজ ও শূশ-এ, আর গ্রীষ্মকাল কাটান যারদাক পর্বতে, যেখান হইতে যিন্‌দারূদ-এর উৎপত্তি হইয়াছে। ফলে সৈন্যদের পশুপালের জন্য যবের কোন প্রয়োজন হইত না এবং কৃষকরা (রা'ইয়্যাত) সব রকম লোকের দ্বারা নিপীড়িত হইত না (মুন্‌তাখাব তাওয়ারীখ-ই মু'ঈনী, সম্পা. J. Aubin Tehran 1957, 43-4)। অন্যান্য যে সকল গুয্‌য উপজাতি মোঙ্গলদের সঙ্গে পারস্যে আসিয়া দেশের ভিতর দিয়া পার হইয়া যায় এবং পরে পুনরায় সাফাবীদের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করে, তাহাদের মধ্যে ছিল বেগ্‌দিল্লুগণ। তাহারা আদিতে ছিল নাইমানদের সঙ্গে এবং তাহার পরে জুরমাগূন-এর সঙ্গে পারস্যে আসে। তাহাদেরই একদল সিরিয়াতে যায়, সেখানে তাহারা শামলূ নামে পরিচিত হয়। তাহারা সাফাবীদের সঙ্গে পারস্যে ফিরিয়া আসে এবং তাহাদের অধীনে ও আফশারীদের অধীনে ক্ষমতাবান হইয়া উঠে। কাজার আমলে তাহাদের কেন্দ্র ছিল তেহরানের নিকটবর্তী মায্‌দাকান এবং মারাগাতে (কা'ইম মাকাম, পূ. গ্র., পৃ. ৩৬৮)। ১৯শ শতকেও বেগদিল্লুদের কয়েকটি ছোট ছোট দল তেহরানের নিকটে দেখা যাইত। জনশ্রুতি অনুযায়ী কাজাররাও মোঙ্গলদের সঙ্গেই পারস্যে প্রবেশ করিয়া সিরিয়াতে চলিয়া যায় এবং পরে তৈমূরের সঙ্গে পুনরায় পারস্যে আসে।

মোঙ্গল যুগের শেষদিকে বিভিন্ন উপজাতির জোটগুলি নূতন নূতন নামে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, উহাদের মধ্যে আক-কোয়ুনলুগণ (দ্র.) বিখ্যাত ছিল (দ্র. C. Cahen, পূ. গ্র., পৃ. ৩১৪ পৃ. ; আরও দ্র. J. Aubin, Un soyurghal Qara-Qoyunlu concernantle Baluk de Bawanat-Harat-Marwast, in Documents from Islamic chanceries, সম্পা. S. M. Stern, Oxford 1965)। ৮ম/১৪শ শতকের শেষদিকে ঐ অঞ্চলে তুর্কোমান ও 'আরব গোত্রসমূহের বসবাসের জন্য) আনু. ৭৪৭/১৩৪৬ হইতে খুরাসানেও যাযাবর বৃত্তির পুনরুজ্জীবন দেখা যায় (তু. মু'ঈনু'দ-দীন নাতান্‌যী, পূ. গ্র., পৃ. ১৯৭ প.)।

ইতোমধ্যে পূর্ব তুর্কিস্তানে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের পতনের পর যাযাবররা মুগূলিস্তানের চাতায় খান-এর নেতৃত্বে পশ্চিম তুর্কিস্তানের দিকে চাপ সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহার ফলে প্রতি-আক্রমণ সূচিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তৈমূর পশ্চিম তুর্কিস্তানের যাযাবরদেরকে একত্র করিয়া মধ্য এশিয়ার যাযাবরদের বিরুদ্ধে ইসলামী সীমান্ত অঞ্চলসমূহের রক্ষকরূপে দণ্ডায়মান হন। ফলে স্থায়ী অধিবাসিগণ নিরাপত্তা লাভ করে ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালু হয় এবং ধর্মীয় জীবন যাপন করিতে সক্ষম হয় (আরও দেখুন মু'ঈনু'দ-দীন নাতানযী, পূ. গ্র., এবং H. Hookham, Tamerlane the conqueror, London 1962)। চাগাতায় খেতাবধারী যাযাবর এবং কীপচাক'দের দমন করিবার পরে তৈমূর পারস্য ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশে একের পর এক অভিযান করেন, যাহার ফলে নূতনভাবে উপজাতীয়দের স্থানান্তর ঘটে। তৈমূরের ব্যবসা ছিল মোঙ্গলদের মত। তাঁহার ক্ষমতার ভিত্তি ছিল উপজাতীয় সামরিক আভিজাত্য, যাঁহারা তাঁহাদের অনুসারী দল ও পশু পাল লইয়া এক চারণভূমি হইতে আরেক চারণভূমিতে গমনাগমন করিতেন। Clavijo তৈমূরের সৈন্যবাহিনীর বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "তৈমূর যখন যুদ্ধযাত্রার জন্য তাঁহার লোকদেরকে আহ্বান করিতেন তখন তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া তাহাদের পশুপালের সঙ্গে সমস্ত মালামাল ও পরিবার-পরিজন লইয়া তাঁহার সমরাভিযানে সঙ্গী হইত। মালামাল ও পরিবার-পরিজন থাকিত বাহিনীর পশ্চাতে এবং যে

দেশ তাহারা জয় করিত সেই দেশে তাহাদের পশুপাল, বিশেষ করিয়া ভেড়া, উট ও ঘোড়া সমগ্র বাহিনীর খাদ্য সরবরাহ করিত" (Clavijo's embassy to Tamerlane 1403-1406, অনু. স্পেনিশ হইতে, G. Le Strange, London 1928, 191)। তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, কর দেওয়ার জন্য নির্ধারিত পশুগুলির গায়ে নম্বর দেওয়া হইত (পৃ. ১৮৭)। তবে কোন কোন চাগাতায়কে সামরিক কার্যের বিনিময়ে কর মওকুফ করিয়া দেওয়া হইত (পৃ. ১৯৫-৭)। নিশাপূরের নিকটস্থ খুরাসানে যাযাবর কুর্দীরাও (?) ছিল বলিয়া মনে হয়। তাহাদের বর্ণনা দিতে গিয়া Clavijo বলেন, "তাঁবু ব্যতীত বাসস্থান বলিতে তাহাদের আর কোন কিছু নাই। কারণ তাহারা কোন সময়েই শহর বা গ্রামে বাস করে নাই, শীত, গ্রীষ্ম সব সময়েই খোলা প্রান্তর অঞ্চলে বাস করে আর পশু চরায়। তাহাদের পশুর পালে ছিল ভেড়া, ভেড়ী ও গরু। আর এই বিশেষ শ্রেণীর উপজাতীয়দের বিশ হাজারের মত উট ছিল। তৈমূরের রাজ্যের ভিতরে ইহারা এই প্রদেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইত এবং বাৎসরিক করস্বরূপ তৈমূরকে তিন হাজার উট ও পনের হাজার ভেড়া প্রদান করিত (পৃ. ১৮১)।

তৈমূরের মৃত্যুর পরে কিছুকাল পরস্পর ধ্বংসাত্মক কলহের মধ্যে কাটে। পশ্চিমে কারা কোয়ুনলুর তুর্কোমানগণ, যাহাদের নেতা বাহারলূ গোত্রীয় বায়রাম খাওয়াজাহ্ (মৃ. ৭৮২/১৩৮০) জালাইর বংশীয় সুলতান উওয়ায়স-এর অধীনে চাকুরী করিতেন, ৮১২/১৪০৮ সালে আর্মেনিয়া হইতে আযারবায়জান আক্রমণ করে। ইত:পূর্বে তৈমূর তাহাদিগকে আর্মেনিয়াতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ৮১৪/১৪১০-এর মধ্যে তাহারা জালাইরদিগকে পরাজিত করিয়া বাগদাদ দখল করে। শেষ পর্যন্ত তাহারা আক-কোয়ুনলূদের নিকটে পরাজিত হয়। আক-কায়ুনলূদের প্রধান কেন্দ্র ছিল দিয়ার বাকর-এ এবং তাহাদের নেতা ছিলেন বায়ীনদীর গোত্রের (দ্র.)। পূর্বদিকেও আরও যাযাবর স্থানান্তরণ ঘটে। ৮৭০/১৪৬৫-৬ সালে যাযাবরদের ১৫,০০০ তাঁবু ইরাক হইতে খুরাসানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। "কারণ তুর্কোমানদের অত্যাচার ও নিপীড়নে তাহারা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে।" তৈমূর বংশীয় আবূ সা'ঈদ তাহাদিগকে সেই প্রদেশে য়ুরত (yurt) প্রদান করিয়াছিলেন ('আব্দু'র-রায্যাক, মাতলা'উ'স-সা'দায়ন, সম্পা. মুহাম্মাদ শাফী', লাহোর ১৯৪৯ খৃ. ২খ, ১২৯৬)। প্রায় একই সময়ে হাযারাগণ (জনশ্রুতি মতে উহারা মোঙ্গলদের সঙ্গে পারস্যে গিয়াছিল) হারাতের চুতষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে বলিয়া মনে হয় এবং খাজনা প্রদানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের কারণে তাহাদের সঙ্গে সরকারের বিরোধের কথার উল্লেখ দেখা যায় (ঐ, পৃ. ১২৯৬ প.)।

তুর্কোমান রাজবংশের কারাকোয়ুনলূ এবং আককোয়ুনলূ-এর শাসনামল দ্বারা তুর্কোমান উপজাতীয় যাযাবরদের শাসন আবার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সঙ্গে তুর্কোমানদের পূর্বমুখী পারস্যে স্থানান্তর ঘটিতে থাকে। এই দুই উপজাতীয় দল পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম পারস্যে এবং শেষ পর্যন্ত মধ্য ও দক্ষিণ পারস্যে পরপর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দলরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মোঙ্গল ও তৈমূরীয়দের অপেক্ষা সালজূকদের সঙ্গেই ইহাদের অধিক সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও সালজূকরা যেমন সমগ্র পারস্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল ইহারা কখনও তাহা করিতে সক্ষম হয় নাই। বিভিন্ন তুর্কোমান উপজাতিকে ইহার আংশিকভাবে মাত্র একত্রীভূত করিতে সক্ষম হয়। তুর্কোমানগণ ইতোমধ্যে কয়েক পুরুষ ধরিয়া ইসলামের ধর্মীয় রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং উহাদের কিছু সংখ্যক আবার উগ্র শী'আপন্থীদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সেই মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের নেতাগণের মধ্যে অনেকেই যোগ্যতার জন্য খ্যাত ছিলেন, তন্মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান ছিলেন উযুন হাসান (মৃ. ৮৮২/১৪৭৭-৮)। তাঁহাদের প্রশাসন সুসংগঠিত ছিল ; তাঁহাদের দরবার যাযাবর পশ্চাদপট এবং অভ্যাস সত্ত্বেও পারস্য সংস্কৃতি ও তুর্কোমান কাব্যালোচনার কেন্দ্র ছিল (এই বিষয়ে অধিকতর তথ্যের জন্য দ্র. V. Minorsky, Persia in A. D. 1478-1490, London 1957 এবং Travels to Tana and Persia by Barbaro and Contarini, Hakluyt ed., 1873)। উযুন হাসানের মৃত্যুর পর পুনরায় উপজাতীয় লুণ্ঠন শুরু হইয়া যায়। আক্রমণের লক্ষ্য হয় আযারবায়জান ও শীরাযের আক-কোয়ুনলূ কেন্দ্রগুলি ; শেষ পর্যন্ত সাফাবীগণ তুর্কোমান উপজাতীয়দেরকে একত্রীভূত করিয়া কারা কোয়ুনলূ ও আক কোয়ানলূগণ যে সংহতি ও শক্তি সৃষ্টি করিতে পারে নাই, তাহাদের মধ্যে সেই দৃঢ় সংবদ্ধতা সৃষ্টি করেন এবং নিজেদেরকে পারস্যের শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইসমা'ঈল-এর সমর্থকদের একটা প্রধান অংশ ছিল এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও আর্মেনিয়া হইতে আগত উপজাতীয় লোক। তাহাদের সঙ্গে আরও ছিল কারা কোয়ুনলূ ও আক কোয়ুনলূ হইতে বিচ্ছিন্ন উপজাতিসমূহ। তাঁহার বাহিনীর মূল অংশ ছিল কিযিলবাশ, উহা গঠিত হইয়াছিল উসতাজলূ, শামলূ, তেক্কেল, রূসলূ, বাহারলূ, যুল্কাদ্র, তুর্কোমান, খিনিসলূ, কাজার এবং আফশার গোত্রীয়দের লইয়া (অধিকতর তথ্যের জন্য দ্র. V. Minorsky, তাযকিরাতু'ল-মুলূক, G.M.S., 1943, pp. 189 প.)। শেষোক্ত দুইটি উপজাতীয় গোত্রের লোক হইতে কয়েকটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহারা পরবর্তী কালে পারস্য শাসন করে। ইসমা'ঈল তাঁহার পূর্বপুরুষ সাফিয়্যু'দ-দীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাফাবী তরীকার প্রধান ছিলেন। সাফিয়্যু'দ-দীন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ৬৫০/১২৫২ সালে আরদাবীলে। ৮৫১/১৪৪৭ সালে এই ধর্মীয় গোত্রের নেতা হন জুনায়দ এবং তাঁহার নেতৃত্বাধীনেই ইহারা যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হয় (অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দ্র. W. Hinz, Irans Aufstieg zum Nationalstaat, Berlin 1936)। ইসমা'ঈলকে তাহার উগ্রপন্থী তুর্কোমান উপজাতীয় অনুসারীরা স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক পূর্ব-মনোনীত বংশানুক্রমিক ইমাম বলিয়া জ্ঞান করিত। তাঁহার ক্ষমতারোহণের প্রথম দিকে তাঁহার উপজাতীয় এবং ধর্মীয় অনুসারীদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। প্রতি অনুসারী দলের একজন করিয়া খলীফা ছিল, ইসমা'ঈল মুর্শিদ-ই কামিলরূপে খালীফাতু'ল-খুলাফা'-এর মাধ্যমে তাহাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিতেন (দ্র. তাযকিরাতু'ল-মুলূক, পৃ. ১২৫-৬)।

আক কোয়ুনলূ আমলের শেষদিকে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় সেই সময়ে একাধিক তুর্কোমান নেতা এবং অন্যান্যদের নেতৃত্বে স্বাধীন রাজ্য গঠিত হয়। হাসান রূমলূ ৯০৭/১৫০১-২ সালে ইসমা'ঈল যখন তাবরীযে প্রবেশ করেন সেই সময়কার এইরূপ কয়েকজন স্বাধীন নেতার তালিকা তৈরী করিয়াছেন (আহসানু'ত-তাওয়ারীখ, সম্পা. C. N. Seddon, Baroda 1931-4, i, 62)। ইসমা'ঈল এক এক করিয়া তাহাদেরকে উৎখাত করেন বা অধিকাংশের শক্তি খর্ব করেন। অন্যদেরকে উযবেক শাসক মুহাম্মাদ শায়বানী খান পরাভূত করেন। পরবর্তী কালে ইঁহার সঙ্গে ইসমা'ঈল-এর বিরোধ হয়। খুরাসানের পূর্ব সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী উপজাতীয়দের নিয়ন্ত্রণ করা, পূর্ববর্তী রাজবংশীয়দের ন্যায় এবং কাজারদের ন্যায় সাফাবীদের জন্য এক প্রধান সমস্যা ছিল।

ইসমা'ঈলের মৃত্যুর পূর্বেই (৯৩৯/১৫৩৪) তুর্কোমান উপজাতিসমূহ, যাহাদের সমর্থন দ্বারা তিনি ক্ষমতায় আরোহণ করিয়াছিলেন এবং রাষ্ট্রের পারস্যবাসিগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হইয়াছিল। শাহ তাহমাস্প-এর শাসনামলে অন্যান্য উপজাতীয় দল, যথা চাগাতায়গণ, কুর্দীগণ, লূরগণ, ফায়লীগণ এবং আরও অনেকে তাঁহার সেনাবাহিনীকে সমৃদ্ধ করে। প্রথমোক্তগণ বাস করিত প্রধানত খুরাসানে। তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কারা বায়াতগণ, যাহাদের নেতা নিশাপুরের শাসক মুহাম্মাদ সুলতান তাহমাস্প-এর অধীনে চাকুরীতে যোগদান করেন। উযবেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই গোত্রীয় লোকেরা যে ত্যাগস্বীকার করিয়াছিল তাহার স্বীকৃতিস্বরূপ ইহাদের দিভান কর মওকুফ করিয়া দেওয়া হয় ('আলামআরা, পৃ. ৫৮৫-৬)। কোন কোন লেখক বায়াতগণকে স্বাধীন উপজাতিরূপে বর্ণনা না করিয়া বরং আফশারগণের (নিম্নে দ্র.) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করেন। সাফাবী শাসনামলের প্রথমদিকে শাহ 'আব্বাস কর্তৃক পুনর্গঠন সাধনের পূর্বে উপজাতীয় নেতাগণ নিজেদের অনুসারিগণের সঙ্গে বরাদ্দবলে প্রাপ্ত বা বিজিত নিজেদের 'উলকা'-তে বাস করিত। তাহাদের মধ্যে অনেক নেতাই প্রদেশিক শাসকও নিযুক্ত হন। উজাতীয় সর্দার, সামরিক কর্তা বা সেনাপতি ও প্রাদেশিক শাসকের মধ্যে কোন পরিষ্কার সীমারেখা চিহ্নিত ছিল না। প্রাথমিক আমলে প্রধান সামরিক দফতর ও আমীরু'ল-উমারা'-র দফতর কিযিলবাশদের জন্য একটি বিশেষ অধিকার বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহ্মাস্প-এর আমলে যত প্রাদেশিক সরকার সবই উপজাতীয় সর্দারগণের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। তাঁহারা এক প্রদেশের সরকারের দায়িত্ব হইতে আরেক প্রদেশের সরকারের দায়িত্ব লাভ করিতেন। কেননা কোন গোত্রেরই দেশের কোন বিশেষ এলাকার উপরে বিশেষ অধিকার ছিল না। কিন্তু শাহ 'আব্বাসের অধীনে কয়েকটি ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠান দেখা গিয়াছিল এবং ১০৩৪/১৬২৪ সনের মধ্যে ইহা একটি সাধারণ বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল (এই বিষয়ে অধিক তথ্যের জন্য দ্র. কাদী আহমাদ কুম্মী, খুলাসাতু'ত-তাওয়ারীখ, সম্পা. H. Muller, Wiesbaden 1964)। তাহমাস্প উপজাতীয় সর্দারগণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে ব্যর্থ হন। তুর্কী ও অ-তুর্কীদের মধ্যকার ঈর্ষাকাতরতা এবং বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে, বিশেষ করিয়া উসতাজল্ ও রূমলূদের মধ্যে আন্ত-কলহ রাষ্ট্রের অস্তিত্বই বিপন্ন করিয়া তোলে। সমস্যাটি সালজূকদের ক্ষেত্রে যাহা হইয়াছিল তাঁহার ক্ষেত্রে সেই একই হয় যে, উপজাতীয়দেরকে কি করিয়া সংহত করা যায়, যে উপজাতীয়দের সমর্থনে শাসক বংশ ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল, কিভাবে পুনরায় তাহাদিগকে একতাবদ্ধ করিয়া সাম্রাজ্যের জীবনীশক্তিতে পরিণত করা যায়। তবে সেই সময়কার পরিস্থিতি ভিন্নতর ছিল, বিশেষ করিয়া পশ্চিমে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বা রাজ্যের সীমান্তের পরপ্রান্তে আর বিবাদ মীমাংসার কোন উপায় ছিল না।

শাহ তাহমাস্প-এর মৃত্যুর পরে উপজাতীয় নেতাগণের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ দেখা দেয়। শাহ 'আব্বাস (৯৯৫-১০৩৭/১৫৮৭-১৬২৯) শেষ পর্যন্ত কিযিলবাশদের উপর পুনরায় নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন এবং জর্জীয় ও আর্মেনীয় ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত বন্দীদের সমবায়ে একটি বিশেষ অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করিয়া সরাসরি রাষ্ট্রীয় কোষাগার হইতে তাহাদের বেতন প্রদান করত তাহাদের সাহায্যে উপজাতীয় বাহিনীসমূহের গুরুত্ব খর্ব করেন। উহার ফলে উপজাতীয় ও সামরিক নেতাগণ এবং উপজাতীয় ও নিয়মিত সেনাবাহিনীর মধ্যে কিছুটা প্রভেদ হয়, যদিও অবস্থানুসারে উপজাতীয়দের মধ্য হইতে আহ্বান করিয়া সামরিক বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা তখনও ছিল। উদাহরণস্বরূপ ১০১৩/১৬০৪ সনে শাহ 'আব্বাস আযারবায়জান এবং ইরাকের উপজাতীয়দের রীশ্সাফীদানকে তাহাদের মোট জনসংখ্যা তালিকাভুক্ত করিবার আদেশ প্রদান করেন, যাহাতে প্রতিটি উপজাতিকে তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যক সৈনিকের পদ প্রদান করা যায় ('আলামআরা-য়ি 'আব্বাসী, পৃ. ৪৬৬, Minorsky কর্তৃক উপরে উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৪-৫)। তাযকিরাতু'ল-মুলূক গ্রন্থে সীমান্ত অঞ্চলের আমীরগণের তালিকা এবং প্রতিটি প্রদেশের জন্য নির্ধারিত সৈন্যসংখ্যা উল্লিখিত আছে, সেই সংখ্যার মধ্যে অনেককেই উপজাতীয়দের মধ্য হইতে পূরণ করিতে হইত (পৃ. ১০০ প.)। নিয়মিত সেনাবাহিনীর আকার বৃদ্ধি এবং সরকারের খাস (খাস্সা) জমি দ্বারা উহাদের পরিপোষণের ফলে উপজাতীয় নেতাদের বরাদ্দযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমেই কমিতে থাকে, যাহার ফলে তাহাদের ক্ষমতা ও প্রভাব আরও খর্ব হইয়া যায় (দ্র. তাযকিরাতু'ল-মুলূক, উহাতে পৃ. ১৪ প. সাফাবী সাম্রাজ্যের নেতৃস্থানীয় আমীরগণের উপজাতীয় পরিচিতির বিশ্লেষণ রহিয়াছে)। তদুপরি তুর্কী সীমান্ত এলাকায় বারবার যুদ্ধের ফলে এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই জনশূন্যপ্রায় করিয়া রাখিবার ফলে যে সকল গোত্র পূর্ব হইতে সেসব স্থানে বসবাস করিয়া আসিতেছিল তাহাদের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। শাহ 'আব্বাস উপজাতীয় নেতাদের পরিবর্তে দাস-স্বাধীন নির্বিশেষে দরবারের আমীরগণকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া উপজাতীয় নেতাদের ক্ষমতা আরও খর্ব করেন। শাহ 'আব্বাস কয়েকটি গোত্রের জনগণকে স্থানান্তরিতও করেন, তন্মধ্যে কিছু সংখ্যককে রাজ্যের প্রতিরক্ষার কার্যে নিযুক্ত করেন। এইভাবে কাজার গোত্র তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়া যায় ঃ প্রথম শাখা গান্জাতে নিযুক্ত থাকিয়া লেস্গিসদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে, দ্বিতীয় শাখা নিযুক্ত থাকে মার্বে, সেখান হইতে উযবেকদের আক্রমণ হইতে খুরাসান রক্ষা করে এবং তৃতীয় শাখা কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বে অবস্থিত তুর্কমান দেশের সীমান্তে অবস্থিত আসতারাবাদে নিযুক্ত থাকে। ইত:পূর্বে উপজাতীয় লোকেরা দুইটি ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ য়ুক্কারী-বাশ এবং আশাকী-বাশ। বিভক্ত উভয় গোত্রের পরিবারগণ আসতারাবাদে গমন করে। শাহ 'আব্বাস সীমান্তবর্তী জিলাসমূহ হইতেও কিছু সংখ্যক উপজাতিকে স্থানান্তরিত করেন, কারণ উহাদের আনুগত্য সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল। উদাহরণস্বরূপ কাযুকলার উপজাতীয়দেরকে তিনি কারাজাদাগ হইতে ফারস-এর দারাবজিরদ-এ আনুমানিক ১০২৪/১৬১৫ সনে স্থানান্তরিত করেন ('আলামআরা, পৃ. ৬২৩)। আরও কিছু পূর্বে (আনু. ১০০০/১৫৯১-২) একদল আফশার কাযিরূনে আগমন করে এবং তখন তাহাদের সর্দার খাওয়াজা পীর বুদাককে শাহ 'আব্বাস সেই জিলার শাসক নিযুক্ত করেন। এই পরিবার পরবর্তী কালে প্রায় ২৫০ বৎসর যাবত সেই সরকারী পদ ভোগ করে (ফাসা'ঈ, ফার্সনামা-ই নাসিরী, তেহরান, লিথো. ১৮৯৪-৬ খৃ., ২খ, ২৫০-২)। শাহ 'আব্বাস তাঁহার সমর্থক কিছু সংখ্যক লোককে লইয়া একটি নূতন উপজাতিও গঠন করেন, উহাদের নাম হয় শাহসিভান। এই উপজাতিটি পরবর্তী কালে আযারবায়জানে খ্যাতি লাভ করে।

দাস্তূরু'ল-মুলূক অনুসারে (শাহ সুলতান হুসায়ন-এর জন্য রচিত) পাঁচটি প্রধান প্রাদেশিক সরকার ছিল ঃ জর্জিয়া, 'আরাবিস্তান, লূরিস্তান

কুর্দিস্তান ও বাখতিয়ারী। শেষোক্ত চারিটির প্রতিটিতে যথেষ্ট সংখ্যক অ-তুর্কী যাযাবর ও অর্ধ-যাযাবর অধিবাসী ছিল। শাহ 'আব্বাস তুর্কমান উপজাতীয়দের প্রভাব কিছুটা খর্ব করিলেও অ-তুর্কী উপজাতীয়দের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কোন কোন ছোট সরকারেও, যেমন কারাবাগ এবং কূহ্‌গিলূয়া-তে প্রধানত উপজাতীয় বসতি ছিল এবং অন্যগুলিতেও, যেমন হামাদানে যথেষ্ট উপজাতীয় জনবসতি ছিল। পাঁচজন প্রাদেশিক শাসকের মধ্যে 'আরাবিস্তানের ওয়ালী ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। কারণ তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে সর্বাধিক সংখ্যক উপজাতি (ঈল ওয়া 'আশা'ইর) ছিল। গুরুত্বের দিক হইতে ইহার পরেই ছিল লূরিস্তান (মুহাম্মাদ তাকী দানিশপামুহ, দাস্তূরু'ল-মূলূক, in Review of the Faculty of Letters, University of Tehran, July 1968, pp. 473-508 and November 1968, pp. 62-93)। এই প্রদেশ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া Chardin মন্তব্য করেন, 'এখানে বসবাসকারী লোকেরা কখনও শহর নির্মাণের কথা চিন্তা করে না, তাহাদের কোন স্থায়ী বাসস্থানও নাই। তাহারা তাঁবুতে থাকে, অধিকাংশই পশুপাল মাঠে চরায় ও ঘাসপানি খাওয়ায়, তাহাদের পশুর সংখ্যা অগণিত। একজন খান তাহাদের শাসক, পারস্যের বাদশাহ সেই খানকে তাহাদের শাসন করিবার জন্য নিযুক্ত করেন, তবে তিনি তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতেই নির্বাচিত ছিলেন এবং সাধারণত সকলেই ছিলেন একই গোত্রের। পিতার পরে পুত্র শাসক হন · · তাহারা খাজনাও দেয়, আবার 'উশরও দেয়। এই প্রদেশে-ই সফাহান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে গবাদি পশু সরবরাহ করে। সেই কারণে এই প্রদেশের শাসককে ঐ সব এলাকায় অতি সম্মানের চোখে দেখা হয়" (The Coronation of Solyman III, pp. 147, app. to the travels of Sir John Chardin, London 1691)। যেই শর্তে এই চারিজন শাসক বা গভর্নর প্রতিটি প্রদেশের দায়িত্বে নিযুক্ত হইতেন এবং নিজ নিজ এলাকার উপজাতীয় অধিবাসী হইতে তাঁহাকে কিছু সংখ্যক সৈন্যও রাষ্ট্রীয় বাহিনীতে প্রেরণ করিতে হইত, তাহা একেক জনের ক্ষেত্রে একেক রকম হইত। অধিকাংশকে নিজ পুত্র বা ভাই অথবা পুত্র ও ভাই—উভয়কেই প্রতিভূস্বরূপ দরবারে প্রেরণ করিতে হইত। রাষ্ট্রের প্রধান চারিজন কর্মকর্তার মধ্যে একজনকে বলা হইত কুরচিবাশী। তিনি রাজ্যের সকল উপজাতীয় (ঈলাত ওয়া আয়মাকাত) প্রধান (রীশ সাফীদ) হইতেন। উপজাতীয়গণের বিষয়ে তাঁহার সঠিক দায়িত্ব যে কি ছিল তাহা পরিষ্কার জানা যায় না। সম্ভবত উপজাতীয়গণের তালিকা বা রেজিস্টার এবং উপজাতীয়গণের প্রদেয় করসমূহ তাঁহার দায়িত্বে থাকিত। তাঁহার তুয়ূল (tuyul) ছিল ফার্স-এর কারযীন। উপজাতীয় এলাকা বলিয়া সম্ভবত ইহার বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল না। তাব্‌রীয, মুগান এবং আযারবায়জানের আরও কয়েকটি স্থান যেগুলি তখন পর্যন্ত তুর্কী উপজাতির অন্যতম প্রধান বসতি এলাকা ছিল, সেইগুলি সিপাহ্‌সালার-এর কর্তৃত্বাধীন ছিল, তিনি কুরচিবাশীর পরেই রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন (দ্র. দাস্তূরু'ল-মুলূক, পৃ. স্থা.)। তাযকিরাতু'ল-মুলূক গ্রন্থে সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী আমীরগণের তালিকা রহিয়াছে এবং প্রতিটি প্রদেশের প্রদেয় সৈন্যের সংখ্যা ও অন্যান্য করেরও তালিকা দেওয়া আছে। সেই সমগ্র প্রদেয় সৈন্য ও করের একটা অংশ উপজাতীয়দিগকে দিতে হইত (পৃ. ১০০ প.)।

শাহ 'আব্বাস-এর মৃত্যুর পরে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হইয়া পড়ে, ২য় শাহ 'আব্বাসের আমলে সাময়িকভাবে মাত্র কিছুটা নিয়ন্ত্রণ পুনপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। তখন উপজাতীয়গণ, বিশেষ করিয়া পূর্ব অঞ্চলে গালযাঈগণ ও আবদালী আফগানগণ, নিজেদের স্বাধিকার পুনপ্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হয়। বালূচরাও বাম এবং কিরমান পর্যন্ত লুণ্ঠন করে। অন্যদিকে কুর্দীরা বিদ্রোহী হইয়া হামাদান দখল করে এবং ১৭১৯ খৃ. ইসফাহান লুণ্ঠন করে (দ্র. L. Lockhart, The fall of the Safavi Dynasty, Cambridge 1958, pp. 110 ff.)। শতাব্দীর মধ্যভাগে লূর ও বখতিয়ারীগণ ক্রমাগত ইসফাহান অঞ্চল লুণ্ঠন করিতে থাকে (দ্র. A chronicle of the Carmelites, in Persia, London 1939, i, 660)।

শাহ সুলতান হুসায়ন-এর রাষ্ট্রীয় দলীল-দস্তাবেজ হইতে গৃহীত তথ্যসমৃদ্ধ বলিয়া কথিত একখানি পাণ্ডুলিপিতে উপজাতিসমূহের অবস্থান এবং সংখ্যার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। উহাতে উল্লিখিত সংখ্যাগুলি খুব বেশী অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইলেও সম্ভবত সেইগুলি হইতে খৃষ্টীয় ১৮শ শতকের গোড়ার দিকে উপজাতীয়গণের সাধারণ অবস্থান ও জনবসতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়। এমনও হইতে পারে যে, সেই সময়ে উপজাতীয় জনসংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধির দিকে ছিল। গ্রন্থের লেখক উপজাতীয়গণকে পারস্য উদ্ভূত এবং অ-পারস্য উদ্ভূত—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। প্রথমোক্ত দল অর্থাৎ পারস্য উদ্ভূত উপজাতীয়দের মধ্যে ছিল ঃ (১) লুরগণ, যাহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল চারটি বড় উপজাতি, ফায়লী (খুর্‌রামাবাদে কেন্দ্রীভূত, শীত-নিবাস ছিল হাওবীযা-তে), লাকগণ ও যান্‌দগণ (যাহারা কারীম খান যান্‌দ-এর অধীনে স্বল্পকালের জন্য দেশ শাসন করিয়াছিল, কায্যায-এ কেন্দ্রীভূত), বাখতিয়ারীগণ এবং মামাস্‌সানীগণ। বাখতিয়ারীগণ কূহ্‌গীলূয়া হইতে ইসফাহান এবং শূসতার হইতে বিহ্‌বাহান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহারা ইসফাহানের বেগলারবেগীকে খাজনা দিত। প্রদেয় খাজনার পরিমাণ লাকগণ এবং যান্‌দগণের প্রদেয় পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হইলেও অল্পই ছিল। তাহাদের সর্দারগণের মধ্যে দুই-তিনজন সব সময়ে বাদশাহের দরবারে উপস্থিত থাকিতেন এবং অনেক সময় বিনা বেতনেই ১০,০০০ পর্যন্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যবাহিনী সরবরাহ করিতেন। মামাস্‌সানীগণ বাখতিয়ারী বা ফায়লীদের অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক কম ছিল। তাহাদের খাজনা ফার্স-এর খাজনার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাহা উক্ত প্রদেশের বেগলারবেগীকে দেওয়া হইত। লুররা শী'আ ছিল। (২) গার্‌রূগণ, কালখুরগণ এবং মুকরীগণ হামাদান ও মারাগার সীমান্ত অঞ্চলের মধ্যবর্তী এলাকায় বাস করিত। তাহাদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ শী'আ ছিল। (৩) খুরাসানে কুর্দী উপজাতীয়রা বাস করিত, তাহাদের মধ্যকার চারটি প্রধান উপজাতি ছিল যা'ফরানলূগণ, আখলামাদে কেন্দ্রীভূত সা'দানলূগণ; খাবুশানে কেন্দ্রীভূত; কাভানলূগণ রাদকানে কেন্দ্রীভূত এবং জাজারম-এর নিকট বসবাসকারী দাভানলূগণ। ইহারা সরকারকে আদৌ কোন খাজনা দিত না। খুরাসানে (৪) জালা'ইরগণও বাস করিত, মার্‌ব-ই শাহজাহান অঞ্চল পর্যন্ত তাহারা বিস্তৃত ছিল। (৫) কারা'ঈগণ, তুরবাত-ই জাম-এ কেন্দ্রীভূত এবং (৬) জালা'ঈগণ।

অ-পারস্যবাসী যাযাবর উপজাতিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল 'আরবগণ ও তুর্কীগণ। উল্লিখিত পাণ্ডুলিপির লেখকের মতানুসারে তুর্কীগণের মধ্যে ছিল আফশারগণ, কাজারগণ, শাক-শাকাকীগণ (যাহারা ছিল আসলে কুর্দী), আযারবায়জান হইতে গীলান পর্যন্ত এলাকায় বাস করিত;

যানগানাগণ (ইহারাও কুর্দী ছিল), কিরমান শাহের চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাস করিত। কারাগুযলূগণ হামাদান, বুরূজিরদ ও নিহাওয়ান্দের চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাস করিত। শাহ্‌সিভানগণ, যাহাদের কিছু লোক ফার্‌সে এবং অন্যান্যরা আযারবায়জান ও গীলানে বাস করিত। আফশারগণ সেই সময়ের মধ্যে নিজেদের মধ্যে ভিন্ন উপজাতীয় লোক গ্রহণ করিয়াছিল এবং কিছু উপজাতি আবার হারাইয়াছিল বলিয়াও মনে হয়। সেইগুলির মধ্যে ছিল শামলূ, কির্‌কলূ এবং শিরভানলূ উপজাতি। খুরাসানের তূস এবং আযারবায়জানের উরূমিয়্যা তাহাদের অধিকারে ছিল। অপরপক্ষে বায়াত ও দুনবুলীগণ যাহারা নিশাপূর, খউয় ও সাল্‌মাস দখল করিয়াছিল, আর আফশারগণের অংশ বলিয়া গণ্য হইত না।

'আরব উপজাতীয়দের অন্তর্ভুক্ত ছিল চা'বগণ (কা'ব), হাবীযার মুল্লা'ই'গণ যাহারা অন্যান্য 'আরব গোত্রের সঙ্গে সেই জিলা হইতে বাগদাদ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বাস করিত। ফারসে ঈল-ই 'আরবগণ তখন অগণিত সংখ্যায় ছিল। তাহারা শীরায, ইসফাহান ও য়ায্‌দ অঞ্চল জুড়িয়া বাস করিত। খুরাসানের মীশমাস্‌তগণ তুরশীয ও কা'ইনের বিভিন্ন গ্রাম এলাকায় বাস করিত। অন্যান্য কতিপয় কেন্দ্রেও আরবগণ বাস করিত। তন্মধ্যে ছিল তাবাস-এর বানূ শায়বানগণ (দ্র. পাণ্ড. Dr. Caro Owen Minasien সংগ্রহ, ইসফাহান OR পাণ্ডু. Provisional No. ১১৩৮ (s & b)। এই পাণ্ডুলিপির একখানি কপি Sir John Malcolm দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় (দ্র. History of Persia, London 1829, ii, 372)। ১৯শ শতকে কাশান, লার ও লাভাসানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে মীশমাস্‌ত 'আরবদের কোন কোন দল উপজাতীয় অস্তিত্ব নিয়া বাস করিত (মির্যা 'আবদু'র-রাহ্‌মান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌রাহীম আল-কাসানী, মির'আতু'ল-কাসান, বৃটিশ মিউজিয়াম, MS Or. 2303, f. 61b)।

সাফাবীদের পরে তিনটি রাজবংশ ক্ষমতায় আরোহণ করে। তাহাদের প্রতিষ্ঠাতাগণ সকলেই উপজাতীয় সর্দার ছিলেন। নাদির শাহ আফশারগণের অন্তর্ভুক্ত কির্‌কলূ উপজাতীয় ছিলেন। কারীম খান ছিলেন যান্‌দ উপজাতীয় আর আকা মুহাম্মাদ খান ছিলেন কাজার। নাদির শাহ সুন্নী মুসলিমদের পসন্দ করিতেন, যেমন আফগান ও তুর্কমানগণ। তিনি বিদ্রোহের আশংকা কমাইবার উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক উপজাতীয়দের পুনর্বাসন করাইয়াছিলেন। ১১৪২-৩/১৭৩০ সালে ৫০-৬০,০০০ যাযাবর পরিবারকে আযারবায়জান, পারসীয় ইরাক ও ফারস হইতে খুরাসানে স্থানান্তরিত করা হয়। দুই বৎসর পরে ৬০,০০০ আবদালীকে হারাত হইতে মাশহাদ, নিশাপূর ও দামগানে স্থানান্তরিত করা হয় এবং বাখ্‌তিয়ারীগণের অন্তর্ভুক্ত ৩,০০০ হাফ্‌ত্ লাঙ পরিবারকে খুরাসানে প্রেরণ করা হয়। দ্বিতীয় একটি বাখতিয়ারী দল, যাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল হাফ্‌ত্ লাঙ ও চাহার লাঙগণ, সংখ্যায় ১০,০০০ পরিবার খুরাসানের জাম-এ প্রেরণ করা হয় এবং উহা করা হয় ১১৪৯/১৭৩৬ সনে একটি বাখ্‌তিয়ারী বিদ্রোহ দমন করিবার পর (L. Lockhart, Nadir Shah, London 1938, 51-2, 54, 65, 110 ; আরও দ্র. M. Otter, voyage en Turquie et en Perse, 1748, ii, 187)। ১৯শ শতকে পারস্যে আফশার উপজাতীয়গণের ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িবার ঘটনা আংশিকভাবে নাদির শাহের রাজত্বকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় (দ্র. Macdonald Kinneir, A geographical memoir of Persia, London 1813, 46)। নাদির শাহ নিহত হইবার পরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মুহাম্মাদ হুসায়ন খান কাজার আস্‌তারাবাদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মাযান্দারানে ক্ষমতা বিস্তৃত করেন। এই আস্‌তারাবাদে উপরিউক্ত কাজার উপজাতীয়দের একটি শাখা শাহ্ 'আব্বাস কর্তৃক আনীত হইয়াছিল। জনৈক বাখ্‌তিয়ারী সর্দার 'আলী মার্‌দান খান ইসফাহান অধিকার করেন এবং কারীম খান যান্‌দও তাঁহার সঙ্গে যোগদান করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের উভয়েরই পতন ঘটে। 'আলী মারদান খান নিহত হন এবং কারীম খান আযারবায়জানের আফগান শাসক আযাদ খান কর্তক প্রথম পরাজিত হইলেও পুনরায় তাঁহার সেনাবাহিনী সংগঠিত করেন এবং খিশ্‌ত-এর নিকটে আযাদ খানকে পরাজিত করিয়া শীরায অধিকার করেন। অতঃপর মুহাম্মাদ হুসায়ন খান কাজার ও কারীম খান-এর মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে, উহাতে কারীম খান বিজয়ী হন। অন্য অনেক উপজাতীয় শাসকের দরবারের ন্যায় কারীম খানের দরবারেও বিদ্বান ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তিগণের সমাবেশ ঘটে (দ্র. Malcolm, পূ. গ্র., ২খ, ৮৬)। তাঁহার শাসন সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল। আযারবায়জানে উপজাতীয়দের বসত করাইবার একটি চেষ্টাও চলিতেছিল বলিয়া মনে হয়। ১১৭৭/১৭৬৪ তারিখযুক্ত একটি ফরমানে তাব্‌রীযের বেগলারবেগীকে নির্দেশ দেওয়া হয়, যেন সেই প্রদেশস্থ শাক্কাকী ও অন্য উপজাতীয়গণের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হয়, তাহাদিগকে যেন তাহাদের আদি বসতবাড়ীতে বসত করান হয় এবং কৃষিজাত ও সরকারী চাকুরীতে যেন তাহাদের নিয়োজিত করা হয় (দ্র. Landlord and peasant, 133)।

কারীম খানের মৃত্যুর পরে অরাজকতা এবং যান্‌দদের মধ্যে অন্তবিরোধ দেখা দেয়, যাহার ফলে উহাদের কিছু অংশ নির্মূল হইয়া যায় বলিয়া মনে হয়। অবশেষে আকা মুহাম্মাদ খান কাজার, যাঁহাকে কারীম খান বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, শীরায হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়া কাজার উপজাতীয়দেরকে একতাবদ্ধ করিয়া নিজেকে পারস্যের অধিকাংশ এলাকার শাসক বলিয়া ঘোষণা করেন এবং অন্য যে সকল উপজাতীয় সর্দার বিভিন্ন অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ক্ষমতা খর্ব করেন। আকা মুহাম্মাদ খান তাঁহার প্রধান শাসনকেন্দ্র বা রাজধানী তেহ্‌রানে স্থানান্তরিত করেন। মাযানদারান ও গুরগান কাজার উপজাতীয়দের কেন্দ্র থাকিয়া যায়, তাহাদের সঙ্গে নূতন শাসক বংশের যোগাযোগ অক্ষুণ্ন থাকে। Abbott ১৮৪৪ খৃ. আসতারাবাদে অবস্থানরত কাজারদের সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া জানান যে, তাহাদের সংখ্যা ছিল ৪-৫০০ পরিবার। তাহাদের খাজনা মওকুফ ছিল (London, P. R. O., F.O. 60 : 108)। কাস্পিয়ান সাগর ধরিয়া Abbott-এর ভ্রমণ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, Abbott to Aberdeen-এ, No. 8. Encapmt. near Tehran, 29 June, 1844)। আরও কিছুকাল পরে Sir Justin Sheil লিখিতে গিয়া মাযানদারানের কাজারদের সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন ২,০০০ ঘর বলিয়া (দ্র. Lady Sheil, Glimpses of life and manners in Persia, London 1856, 396)। শাসক বংশ কোন সময়েই তাহাদের উপজাতীয় পশ্চাদপট সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারে নাই। William Ousely লিখিয়াছেন যে, ফাত্‌হ 'আলী শাহ অধিকাংশ কাজার পরিবারের সদস্যদের ন্যায়ই "স্থায়ী জীবন অপেক্ষা যাযাবর জীবন, শহর জীবন অপেক্ষা গ্রামের জীবন এবং রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা তাঁবুতে থাকিতেই" বেশী পসন্দ করিতেন (দ্র. Travels, London

1819, iii, 151)। Lady Sheil-ও তাহাদের "সমস্ত জাতির মধ্যে যাযাবর স্বভাব খুব বেশী এবং ব্যাপকভাবে প্রচলিত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (পূ. গ্র., ২১৪)। এমন কি স্বয়ং নাসি রু'দ-দীন শাহ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তাঁহার ফরাসী দেশীয় চিকিৎসক Dr. Feuvrier বলিয়াছেন যে, অন্তর হইতে তিনি এখনও একজন যাযাবর (দ্র. Troisans a la cour de Perse, Paris 1906, 189)। অনেক প্রাদেশিক শাসক বা গভর্নরও শাসক পরিবারেরই সদস্য হইতেন, সেই পরিবার অবশ্য ক্রমেই মূল যাযাবর উপজাতীয়দের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল।

কাজারদের সৈন্যবাহিনী পূর্বতন রাজবংশসমূহের মতই গঠিত হয়-নিয়মিত সৈন্যদল, প্রাদেশিক শাসকগণের বাহিনী এবং উপজাতীয়দের প্রদেয় সৈন্যদের সমবায়ে (দ্র. Landlord and peasant, pp. 137 প.)। Morier লিখিয়াছেন যে, ফাতহ 'আলীর নিয়মিত বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ১২,০০০। উহাদের মধ্যে যাযাবর ও শহরবাসী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকই ছিল; কিন্তু প্রধানত ছিল মাযানদারানের কাজার গোত্রের লোকেরা। সৈন্যরা তাহাদের পরিবার রাখিত তেহরান ও উহার চতুষ্পার্শ্বরর্তী গ্রামে, ডাক দেওয়া মাত্রই তাহারা আসিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইত (দ্র. A journey through Persia, Armenia and Asia Minor to Constantinople in the years 1808 and 1809, London 1812, pp. 243-5)। উপজাতীয়দের প্রদেয় সৈন্যসংখ্যার একটি রেজিস্টার রাখা হইত। সেনাবাহিনীর এক একটি বিভাগ (Division) গঠন করিত এক একটি গোত্রের লোকেরা। নওরোযের সময়ে বাদশাহের তাঁবুতে তাহারা হাযির থাকিত। কোন বিশেষ বৎসরে উহাদের চাকুরীর প্রয়োজন না হইলে বাহিনীর সেই অংশের সৈন্যদের বিদায় দিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু শাহী তাঁবুতে রাখাই হউক বা বিদায়ই দেওয়া হউক, তাহারা একটা নির্ধারিত বেতন পাইত। Jaubert বর্ণনা করিয়াছেন যে, শাহী তাঁবুতে বা শিবিরে মিশ্র জনসংখ্যার সৈন্য দেখা যাইত (Voyage en Armenie et en Perse, fait dans les annees 1805 et 1806, Paris 1821, pp. 258-9)। 'আব্বাস মীর্যা আযাররায়জানের বিভিন্ন উপজাতীয় যাযাবর গোত্র হইতে ৫০,০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, আর খুরাসানের শাসক (গভর্নর) সেই প্রদেশের উপজাতীয়দের মধ্য হইতে ২০,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। আরবরা এবং ফায়লীরা সেনাবাহিনীতে লোক প্রেরণ হইতে অব্যাহতি পায় (Morier, পূ. গ্র., 240-1)।

Morier উপজাতীয়দের সামরিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি লিখেন, "সৈন্য তৈয়ারীর কাঁচা সম্পদ (Raw Material) হিসাবে Eleaut-দের অপেক্ষা যোগ্যতর আর কেহ নাই। শিশুকাল হইতেই তাহারা তাঁবুর জীবনে অভ্যস্ত, আবহাওয়ার তারতম্য আর যত রকমের কষ্টসহিষ্ণুতা সব কিছু তাহারা অভ্যাস করে। প্রকৃতিগতভাবেই তাহারা সৈনিক, যৎসামান্য খাদ্য খাইয়া বিন্দুমাত্র অভিযোগ না করিয়া তাহারা অবিশ্বাস্য দূরত্ব অতিক্রম করিয়া যায়" (A Second journey through Persia, Armenia, and Asia Minor to consatantinople, 1810-16, London 1818, 215)। Sheil ইরানী সৈন্যদেরও উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, যদিও তিনি একথা স্বীকার করেন নাই যে, ঈলাতরাই সচরাচর শ্রেষ্ঠ সৈনিক হয় (Lady Sheil, পূ. গ্র., পূ. ৩৮২)। শতাব্দীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন এবং গোলন্দাজ বাহিনীর উপরে ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার কারণে উপজাতীয় বাহিনীর গুরুত্ব হ্রাস পায়—যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইবার পরেই তাহারা রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী হইতে চিরতরে অদৃশ্য হইয়া যায়।

সাধারণভাবে কাজারদিগকে তাহাদের সর্দারের মাধ্যমে উপজাতীয় এলাকা শাসন করিতে বাধ্য করা হইত। দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে সরকারের লিখিত নির্দেশাবলী কদাচিৎ কার্যকর হইত। বড় উপজাতীয়দের শাসনের জন্য একজন ঈলখানী এবং একজন ঈলবেগী নিযুক্ত করা হইত। এইসব পদ সব সময়েই নেতৃস্থানীয় উপজাতীয় পরিবার হইতে পূরণ করা হইত। শাহ হয়ত বা উত্তরাধিকারের রীতি পরিবর্তন করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের স্থলে চাচাকে বা বড় ভাইয়ের স্থলে ছোট ভাইকে নিয়োগ করিতে পারিতেন, কিন্তু সর্দারেরই পরিবারের কোন একজনকে উপজাতীয় নেতা নিযুক্ত করা ছাড়া তাঁহার কোন গত্যন্তর থাকিত না। ঈলখানীগণ ও ঈলবেগীগণ সরকারের খাজনা আদায় করিতেন এবং সাধারণভাবে উপজাতীয় বিষয়সমূহের দায়িত্বে থাকিতেন এবং গতানুগতিক আইন প্রয়োগ করিতেন (অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দ্র. Landlord and Peasant, pp. 158 প.)। কাজার উপজাতির ঈলখানী (যিনি শাসক শাহ না হইলে) উপজাতীয় মুরুব্বীগণের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতেন এবং তিনি যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন (দ্র. Malcolm, পূ. গ্র., ২খ, ৩২৭)। ঈলখানী 'আদুদু'ল-মুলক ১৯০৯ খৃ. মুহাম্মাদ 'আলী শাহ-এর সিংহাসনচ্যুতির পরে রাজ-প্রতিনিধি হন।

আকা মুহাম্মাদ খান পূর্ববর্তী বহু শাসকের ন্যায় নানা উপজাতিকে পুনর্বাসিত করিয়াছিলেন। 'আবদু'ল-মালিকী গোত্রীয়গণকে বা উহাদের একটা অংশকে ফারস হইতে আনাইয়া কালারিসতাক-এ ও কুজুর-এ বসত করান, হাজ্জীবান্দগণকেও অনুরূপভাবে আবাসিত করা হয়। ১৮৪৪ খৃ. প্রথমোক্তগণের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩,০০০ পরিবার এবং শেষোক্তগণের সংখ্যা ৪-৫,০০০ পরিবার। উভয় উপজাতীয় গোত্রই স্থায়ীভাবে বসবাস করে, তবে প্রথমোক্তদের গ্রীষ্ম ও শীত—উভয় আবাসই ছিল। প্রয়োজনের সময়ে তাহারা সরকারকে ১,৫০০ অশ্বারোহী বাহিনী দিয়া সমর্থন প্রদান করিত (Account of Abbott's journey, পূ. গ্র.)। তিনি 'আমালাকেও লুরিস্তান-ই কূচিক হইতে ফারস-এ স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহাদের অনেকেই নিজেদের মূল বাসস্থানে ফিরিয়া আসে (C. A. de Bode, Travels in Luristan and Arabistan, London 1845, 118-19)। পরবর্তী শাসকগণও বিভিন্ন উপজাতীয়দের স্থানান্তরিত করেন (দ্র. Landlord and Peasant, pp. 158 প.)।

ফাতহ 'আলী খান যখন উপলব্ধি করেন যে, স্থায়ী বসতকারী জনগণ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানকারী বিপুল সংখ্যক উপজাতি তাহাদের নেতাদের আদেশে প্রতিবেশিগণের প্রতি যে জুলুম করে, যে রাহাজানি করে বা আইন বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয় তাহা অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলার অনুকূল নহে, তখন তিনি উহাদের উচ্ছেদ করিবার জন্য সচেষ্ট হন। বহু উপজাতীয় সর্দারকে হত্যা করা হয়, অন্যদিকে দরবারে হাযির করা হয়। কোন কোন উপজাতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়, কোন কোন উপজাতিকে ভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সকল ব্যবস্থার ফলে শতাব্দীর মাঝামাঝি কালের মধ্যে ফারসের কাশকাই-এর ঈলখানীগণ

এবং খুরাসানের যা'ফারানলুগণ ব্যতীত আর কোন উপজাতিরই দেশের বিষয়ে কোন প্রভাব সৃষ্টি ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে নাই (Lady Sheil, পূ. গ্র., ৩৯৫)। Macdonald Kinneir উপজাতীয় সর্দারগণের সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া বলেন, "জন্মসূত্রে এবং প্রভাব সৃষ্টির দিক হইতে উপজাতীয় সর্দারগণ রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি। তাহারা সব সময়েই পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাকাতর ও শত্রুভাবাপন্ন। আর বাদশাহ্ তাহাদের বিবাদকে উস্কানী দিয়া, তাহাদের একের ক্ষমতার সঙ্গে অপরের ক্ষমতার যুৎসই ভারসাম্য বজায় রাখিয়া স্বীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন, রাজ্যের শান্তি-শৃংখলাও রক্ষা করেন। উপজাতীয়দের আনুগত্য বিধানের জন্য তাহাদের সর্দারকে বা তাঁহার পরিবারের কিছু সংখ্যক সদস্যকে বাদশাহের দরবারে প্রতিভূস্বরূপ রাখিয়া দেওয়াই সাধারণ রীতি" (পূ. গ্র., পৃ. ৪৫)।

এই সময় হইতে উপজাতীয়দের বিষয়ে সরকারের নীতি ছিল 'বিভেদ ও শাসন' এক উপজাতিকে আরেক উপজাতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া পারিবারিক ঝগড়া ও ঈর্ষা সৃষ্টি করা, উপজাতি বা উহার অন্তর্গত গোত্রের সর্দার পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে উপহার বা ঘুষ দিয়া অথবা সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দ্বারা একের বিরুদ্ধে অপরকে নিয়োজিত রাখা [তু. (১) Layard, Early adventures in Persia, Susiana and Babylonia, London 1887, i. 453-4; (২) Report of a journey from Tehran to the Karun and Mohamerah.... by Maj. Gen. T. E. Gordon, 9 January 1891, Conf. 9233, Printed for the use of the Cabinet, 30 May 1892 ; (৩) Mrs. Bishop, Journeys in Persia and Kurdistan, London 1891, i, 328, ii, 56; (৪) Curzon, Persia, London 1891, ii, 272]। উপজাতীয় লোকদের মধ্য হইতে প্রতিভূ রাখার যে পুরাতন রীতি তাহা চলিতেই থাকে (দ্র. Malcolm, পূ. গ্র., ২খ, ৩৩২)। এই নীতির দুর্বলতা সত্ত্বেও সরকারের ক্ষমতা সুরক্ষায় হয়ত সহায়ক ছিল, কিন্তু সরকারের প্রতি বিশ্বাসের ব্যাপারে উপজাতিসমূহের মধ্যে আস্থা বিনষ্ট হয়, যাহার ফলে উপজাতীয় জিলাসমূহে প্রায়শ অরাজক অবস্থা বিরাজ করিতে থাকে। সরকার সন্ধির পতাকাতলে উপজাতীয় সর্দারগণের সঙ্গে ঘন ঘন আলোচনায় বসিতেন এবং যে কুরআন স্পর্শ করিয়া পূর্বে তাঁহারা আনুগত্য স্বীকার করিত, নিশ্চয়তার চিহ্নস্বরূপ আগে সেই কুরআন পাঠাইয়া পরে সুযোগ পাওয়া মাত্র তাহাদিগকে গ্রেফতার করিতেন অথবা আলোচনার শেষে বিদায়ের কালে "দুর্ঘটনাক্রমে গুলী" করিয়া হত্যা করিতেন। উপজাতীয় সর্দারগণ প্রায়ই দরবারে তাহাদের নিজেদের তথ্য সরবরাহকারী লোক রাখিত। সেই ব্যক্তি তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় সংবাদ দিত, বিশেষ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত হইতেছে কিনা সেই বিষয়ে পূর্ব-সতর্কতা জ্ঞাপন করিত। বৈবাহিক বন্ধন স্থাপন করিয়াও কোন কোন শাসক উপজাতীয় সর্দারগণের সঙ্গে মিত্রতা করিতেন এবং তখন তাহাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হইত।

মুহাম্মাদ শাহ্-এর শাসনামলে, বিশেষ করিয়া নাসিরুদ্দ-দীন শাহ্-এর আমলে উপজাতীয়দের ক্ষমতা অধিকতর খর্ব করা হয় এবং সরকারের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৮৯৬ খৃ. উপজাতীয় বিষয়ক একটি বিশেষ মন্ত্রণালয় বা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু তাহা খুব বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।

খাজনা আদায় করা হইত পশুর পাল হিসাব করিয়া এবং কখনও কখনও পরিবার পিছু বা মাথাপিছু খাজনাও ধরা হইত। অনেক উপজাতীয় সর্দার উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বা উহার বাহিরে অবস্থিত জমির মালিকানা ভোগ করিতেন এবং তিনি বা তাহার গোত্রবাসিগণ, যাঁহারা জমির মালিক হইতেন, তাহাকেই জমির খাজনা দিতে হইত। উপজাতীয় এলাকায় জমির রায়তী ব্যবস্থা অনেক সময়ে জটিল ধরনের হইত। নওরোযের সময়ে উপজাতীয় সর্দারগণকে শাসক বা স্থানীয় প্রশাসক (গভর্নর)-কে পেশকাশ বা বিশেষ 'নযরানা'ও দিতে হইত। এইগুলি সর্দার তাহার অনুসারী উপজাতীয়দের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতেন এবং প্রায়ই দেখা যাইত যে, সেই পেশকাশের পরিমাণ বোঝাস্বরূপ হইয়াছে (দ্র. Landlord pand easant, 142-3,158)। Jaubert অভিযোগের ভাষায় বলেন, ফাত্হ 'আলী দাবি করিতেন, উপজাতীয় সর্দারগণের নিকট হইতে প্রাপ্য খাজনার অন্তত এক-পঞ্চমাংশ নগদ অর্থে পরিশোধ করিতে হইবে (পূ. গ্র., পৃ. ২৭০)। কোন কোন উপজাতীয় সর্দার, বিশেষ করিয়া সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহের সর্দারগণ সরকারের সামরিক বাহিনীতে সৈন্য সরবরাহের বিনিময়ে নিষ্কর জমি ভোগ করিতেন। ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বুজনুর্দ, দারা গায ও আশরাফ-এ এই রীতি প্রচলিত ছিল (দ্র. Landlord and Peasant, 163-4)। কোন উপজাতিকে তাহাদের কোন বিশেষ কাজের পুরস্কারস্বরূপ খাজনা মওকুফ করিয়া দেওয়া হয়, সেরূপ উদাহরণও ছিল। কারা পাপাখগণকে 'আব্বাস মীর্যা তুর্কমানঞ্চায়-এর সন্ধির পরে সুলদূয-এ বসত করাইয়াছিলেন, তাহাদিগকে আর কোনরূপ সৈন্য সরবরাহ বা খাজনা দিতে হইত না ( E. Aubin, La Perse d'aujourd'hui. Paris 1908, 78-9)। খাজনা আদায়ের এলাকা লইয়া সরকারের সঙ্গে উপজাতীয় সর্দারগণের বিবাদ লাগিয়াই থাকিত। সরকার শক্তিশালী হইলে সামরিক অভিযান চালাইয়া বিরোধ এলাকার খাজনা আদায় করিতেন নতুবা অনাদায়ী খাজনার জন্য নিলাম (বারাত) করা হইত এবং মোটা মুনাফায় তাহা বিক্রয় করা হইত। বারাতদারকে অনেক সময়ে দেখা যাইত যে, অনিচ্ছুক খাজনাদাতার বাড়ীতেই গিয়া বাস করিতেছে এবং ষোল আনা খাজনা বা অন্তত একটা অংশবিশেষ আদায় না হওয়া পর্যন্ত হয়ত বা সে মাসের পর মাস, এমন কি বৎসরকাল পর্যন্ত তাহার বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছে (দ্র. Layard, পূ. গ্র. ১খ, ৪৯৯ প.)।

উপজাতীয়দের সংখ্যা ও অবস্থা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম হইত। সামগ্রিকভাবে তাহাদের জীবন ছিল অত্যন্ত সংগ্রামী ও অনিশ্চিত। কুর্দী তুর্কমানদের মধ্যে কাহারও কাহারও অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতীয় লোকেরা প্রায়ই অত্যন্ত দরিদ্র ছিল (দ্র. Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ১০৭-৮)। Jaubert বলেন যে, উপজাতীয়রা যাযাবর জীবনের প্রতি আসক্ত ছিল। কারণ সেই জীবনে অবাধ স্বাধীনতা ছিল, যাহা ছিল তাহাদিগের নিকট সর্বাপেক্ষা কাম্য, (পূ. গ্র., ২৫২)। Malcolm কুর্দদের সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া বলেন যে, বন্ধুর পর্বতে তাহারা যে স্বাধীনতা পায় তাহাই তাহাদের সর্বাপেক্ষা বেশী কাম্য এবং সেখানে তাহারা যে আরাম-আয়েশহীন অত্যন্ত সংগ্রামী জীবন যাপন করে সেই জীবন লইয়াই তাহারা গর্ব করে। কেননা সেই জীবনে মুক্ত স্বাধীনতার স্পর্শ বিদ্যমান (পূ. গ্র., ২খ, ৩৩৩)। এই মন্তব্যসমূহে নিঃসন্দেহে সত্য নিহিত আছে এবং সামগ্রিকভাবে একেবারে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যাযাবরেরা স্থায়ীভাবে

বসতি গড়িবার বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে এই আশংকায় যে, তাহারা মুক্ত স্বাধীন জীবন হইতে বঞ্চিত হইবে।

Baron de Bode ১৮৪১ খৃ. দক্ষিণ পারস্য অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। যাযাবর উপজাতীয়দের স্বভাব বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি লিখেন, তাহারা অতি দিলখোলা প্রকৃতির, সেই সঙ্গে যথেষ্ট চাতুর্যও মিশ্রিত রহিয়াছে। তাহাদের চরিত্রের সেই আপাত বিরোধের ব্যাখ্যাস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে, সর্দারগণ পুরুষ-প্রধান সামজ ব্যবস্থায় সহজ সরল জীবন যাপন করিতেন, অপর দিকে আবার সর্বসময়ে তাহাদিগকে সচেতন-সতর্ক থাকিতে হইত, কখনও তাহাদের বিরুদ্ধ শক্তির মুকাবিলা করিবার জন্য, কখনও আবার প্রতিবেশীদের সম্পদ লুণ্ঠন করিবার প্রবণতার জন্য (পূ. গ্র., ১খ, ২৫৩)। সাধারণভাবে স্থায়ী অধিবাসিগণ হইতে উপজাতীয়দের বৈশিষ্ট্য ছিল এখানে যে, তাহাদের মধ্যে নারী স্বাধীনতা অনেক বেশী ছিল। কখনও কখনও তাহাদের সর্দার যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক হইত তবে সে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তাহার পক্ষে তাহার মাতা সমগ্র উপজাতীয় গোত্রটিকে শাসন করিতেন (দ্র. de Bode, পূ. গ্র., ২খ, ১৩৪)।

কাজার রাজ্যের বিস্তৃত এলাকায় ছিল বহু উপজাতীয় অঞ্চল। কোন কোনটিতে উপজাতীয়রা বহু দূরে স্থানান্তরে গমন করিত, যেমন বাখতিয়ারীগণ এবং কাশকা'ঈগণ। অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থানান্তর সীমাবদ্ধ ছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা আবার শুধু গ্রামের বহির্ভাগে গিয়া তাঁবু গাড়িত। উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় জমির মধ্যে কোন পরিষ্কার সীমারেখা থাকিত না, অন্তত পূর্বে যেরূপ ছিল সে অপেক্ষা বেশী কোন চিহ্ন থাকিত না। স্থানান্তরে গমনের কালে উপজাতীয়রা স্থায়ী অধিবাসীদের জমির উপর দিয়া বা জমির সীমানা দিয়া পার হইয়া যাইত। অনেক সময়ে তাহারা একরোখা গোঁয়ারের মত উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করিত এবং কখনও বা ফসল ও বাগ-বাগিচার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করিত (দ্র. Landlord and Peasant, 157-8)।

Macdonald Kinneir-এর মতে ঈলাত বা যাযাবর উপজাতীয়দের সংখ্যা সম্ভবত শহরের জনসংখ্যা অপেক্ষা বেশী ছিল (পূ. গ্র., ৪৪)। Sheil, যিনি ফাত্হ 'আলী শাহ্-এর এবং মুহাম্মাদ শাহ-এর আমলে দীর্ঘকাল পারস্যে কাটাইয়াছিলেন, অর্ধ-যাযাবর ও বসতকারী উপজাতীয় জনগণের সর্বমোট সংখ্যা সমগ্র দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন (Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ৩৯৩)। ১৮৯১ খৃ. Mrs. Bishop লিপিবদ্ধ করেন যে, ঈলাতরা "গ্রামাঞ্চলের অধিবাসিগণের এক-পঞ্চমাংশ হইবে" (পূ. গ্র., পৃ. ৮৪)। Bishop কর্তৃক প্রদত্ত সংখ্যা কম হইবার কারণ আংশিকভাবে এইরূপে ব্যাখ্যা করা যায় যে, যেসব উপজাতি সারা বৎসর ধরিয়া বা বৎসরের কোন একটা অংশ কাল ধরিয়া গ্রামে বাস করে তাহাদের জনসংখ্যা হয়ত Mrs. Bishop-কে দেওয়া হয় নাই। Sir A. Houtum-Schindler ১৯০০ খৃ. পারস্যের মোট জনসংখ্যা ৯০,০০০০০-এর মধ্যে উপজাতীয় জনসংখ্যা ২২,০০,০০০ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সংখ্যা ভাঙ্গিয়া তিনি এইভাবে দেখাইয়াছেনঃ তুর্কী ৮,৫০,০০০, কুর্দী ও লাক, ৮,০০,০০০, 'আরব ৩,০০,০০০, লূর ২,৩০,০০০ এবং বালূচ ও বেদে ২০,০০০ (পারস্যের সেনাবাহিনী বিষয়ে বিবরণী, Lt. Col. H. P. Plcot-কৃত, জানুয়ারী ১৯০০ ; আরও তথ্যের জন্য দ্র. Curzon, পূ. গ্র., ২খ, ৪৯৩, যিনি Houtum-Schindler কর্তৃক ১৮৮৪ খৃ. সংগৃহীত ও প্রদত্ত সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহা উপরে উদ্ধৃত সংখ্যা হইতে সামান্য পৃথক)। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, সেই সময়ের মধ্যে খুব কম সংখ্যক উসতাজলু এবং যু 'ল-ক 'াদ্‌র-ই অবশিষ্ট ছিল। তাহারা আয 'রবায়জানে বাস করিত। তেক্কেলূদের অস্তিত্ব তখন আর ছিলই না (Eastern Persian Irak, London 1898, 48-50)।

১৯শ শতকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপজাতীয় অধিবাসিগণের অন্যতম ছিলেন বাখতিয়ারীগণ। ইহাদের সঙ্গে সরকারের প্রায়শ বিবাদ বাধিত এবং ২০শ শতকে ১৯০৯ খৃ. ইহারা দেশে শাসনতান্ত্রিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করে (দ্র. A. K. S. Lambton, Persian political societies, in ST. Antony's Papers No. 16 Middle East Affairs, No. 3, London 1963)। তাহারা প্রধান দুইটি উপদলে বিভক্ত ছিল, হাফ্‌ত লাঙ্ ও চাহার লাঙ্ ; প্রথমোক্তদের গ্রীষ্মকালীন চারণভূমি ছিল চাহার মাহাল্ল-এ এবং শেষোক্তদের ছিল ফিরায়দান-এ। উভয় উপদলেরই শীতকালীন চারণভূমি ছিল খুযিস্তানে। Morier ১৮০৯ খৃ. ইহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন ১,০০,০০০ পরিবার (Journey, 242)। Malcolm বলেন যে, তখনও তাহারা নিজেদের গতানুগতিক রীতিনীতি অনুসারেই চলিত এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সরকারী কর্মকর্তাগণের কোনরূপ হস্তক্ষেপ আদৌ পসন্দ করিত না। তাহারা সেনাবাহিনীতে লোক যোগান দিত এবং নামমাত্র খাজনা দিত। দেশের আইন-শৃঙ্খলার অধিকতর আওতাধীন করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সমভূমি অঞ্চলে বসবাস করাইবার জন্য উৎসাহিত করা হয় এবং দেশের সাধারণ শান্তি-শৃঙ্খলা ভোগ করিবার সুযোগ দিয়া এই আশা করা হয় যে, তাহারা আর প্রতিবেশীদের ধন-সম্পদের উপরে এতকালকার অভ্যাসজাত আকস্মিক আক্রমণ করিবে না (পূ. গ্র., ২খ, ৩৩১)। De Bode, বলেন যে, হাফ্‌ত লাঙগণের অনেকেই বসতি স্থাপন করিয়াছিল (পূ. গ্র., ২খ, ৮৬)। ফাত্হ 'আলী শাহ তেহরানে বাখতিয়ারীগণের মধ্যে হইতে প্রতিভূ রাখিতেন, তাহাদের জন্য আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল (দ্র. de Bode, পূ. গ্র., ২খ, ৭৫)। পরবর্তী শাসকগণও এই প্রতিভূ রাখিবার রেওয়াজ প্রচলিত রাখিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অবশ্য উপজাতীয়দের বিদ্রোহ বন্ধ হয় নাই বা রাস্তাঘাটের নিরাপত্তারও বিধান হয় নাই। Morier ১৮১১ খৃ. ইস্‌ফাহানের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছিলেন। তখন তিনি লক্ষ্য করেন যে, শহরে সদাসর্বদা এই আতংকজনক অবস্থা বিরাজমান রহিয়াছে যে, হাফ্‌ত লাঙ গোত্রীয় আসাদ খান কখন আসিয়া শহরটি দখল করিয়া লয় (দ্র. Second Journey, 156)।

Rawlinson আনুমানিক ১৮৩৬ খৃ. বাখতিয়ারীদের সংখ্যা (চাহার লাঙ ও হাফ্‌ত লাঙ এবং তৎসহ দিনারূনীগণ একত্রে) নির্ণয় করেন ২৮,০০০ পরিবার। উহাদের প্রদেয় খাজনা নির্ধারণ করা হইয়াছিল ১০০ কাতির, যাহা দ্বারা তাহার মতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বুঝাইত। এই পরিমাণ উপজাতির সমৃদ্ধি বা অবস্থার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িত কমিত, আবার তাহাদের উপরে সরকারের ক্ষমতা কতটুকু কার্যকর আছে তাহার উপরও নির্ভর করিত। আতাবেগদের আমলে এক কাতির ১০০০ তূমানের সমান ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু Rawlinson যখন লিখেন তখন মূল্যমান ছিল ১০০ তূমান, সরকার এই পরিমাণও আদায় করিতে

পারিত না। এই সময়ে ঈলখানী ছিলেন চাহার লাঙদের জানিকী গোত্রের মুহাম্মাদ তাকী খান। Rawlinson বলেন যে, তাকী খান ১০-১২,০০০ সুসজ্জিত সৈন্য মাঠে নামাইতে পারিতেন। তিনি তাকী খানের ন্যায়বিচারের প্রশংসা করিয়া বলেন যে, তিনি উপজাতীয়দের যাযাবর অভ্যাস পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কিছুটা সফলও হইয়াছিলেন। তিনি ফিরায়দানে জমি ক্রয় করিয়া সেখানে গ্রাম পত্তন করিয়াছিলেন এবং রাম হুরমুয সমভূমিতে উপজাতি বসত করাইয়াছিলেন। এই সমভূমি তিনি সরকারকে বার্ষিক ৩,০০০ তূমান কর দিয়া চাষাবাদ করিতেন। বাখতিয়ারীগণ খূযিস্তানে তামাক সরবরাহ করিত, সামান্য পরিমাণে খাদ্যশস্য রফতানী করিত এবং ইসফাহানের বাজারে বকরীর গোশত সরবরাহ করিত। বাখতিয়ারীদের প্রতিটি গোত্রেরই একজন স্বীকৃত পুরুষানুক্রমিক নেতা বা খান থাকিতেন। তিনি স্বীয় প্রজাদিগকে স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে শাসন করিতেন (Notes on a march from Zohab, at the foot of the Zagros Along the mountain roads to Khuzistan (Susiana) and from thence through the Province of Luristan to Kirmanshah, in the year 1836, in JRGS, 1839, ix, 26-116)। Layard-ও মুহাম্মাদ তাকী খানের উচ্চ প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, তিনি বাখতিয়ারীগণকে ব্যবসায় বাণিজ্যে নিয়োগ করিতে চাহিতেছিলেন। ১৮৪১ খৃ. ইসফাহানের গভর্নর মু'তামিদু'দ-দাওলা সসৈন্যে ইসফাহান হইতে মালামীরে আসিয়া মুহাম্মাদ তাকী খানের নিকট বকেয়া খাজনা দাবি করেন এবং তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করেন। সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য তাকী খান পরিস্থিতি মানিয়া লন; কিন্তু কোনরূপ মীমাংসায় পৌছিতে ব্যর্থ হন। অতঃপর তিনি ফাল্লাহিয়্যা-তে চা'বদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন; কিন্তু সেখানেও তাঁহাকে অনুসরণ করা হইলে তিনি শূশতারে মু'তামিদু'দ-দাওলার নিকট আসিতে বাধ্য হন। তিনি তাঁহাকে বন্দী করিয়া ইসফাহানে লইয়া আসেন, সেখানে বন্দী অবস্থায় ১৮৫১ খৃ. তাঁহার মৃত্যু হয় (পূ. গ্র., ১খ, ৩৭৩ প.)।

De Bode বলেন যে, চাহার লাঙদের খাজনা ছিল ১৫,০০০ তূমান, কিন্তু এই খাজনা নিয়মিত সংগৃহীত হইত না। কেননা জোরপূর্বক ছাড়া খাজনা আদায়ের কোন উপায় ছিল না (পূ. গ্র., ২খ, ৮২)। হাফত লাঙ অধ্যুষিত প্রায় ১৯৫টি গ্রামের অধিবাসিগণ খাজনা দিত নগদ ৭,৮৭৩ তূমান এবং ৫৩০ খারভার খাদ্যশস্য। আর এই উপজাতীয় গোত্রের অধিবাসী, যাহারা তখনও স্থানান্তর করিতেছিল এবং সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল, তাহারা খাজনা দিত মাত্র ৩,০০০ তূমান। কোন কোন হাফত লাঙ সর্দার জিলার পুরা এলাকাব্যাপীই চাষাবাদ করিতেন (পূ. গ্র., ২খ, ৮৬)। Mrs. Bishop বর্ণনা করেন যে, ঈলখানীরা চাহার মাহাল্ল চাষ করিত প্রায় ২০,০০০ তূমান বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে (৬,০০০ পাউণ্ড) (পূ. গ্র., ১খ, ৩০৯)। তিনি বাখতিয়ারীদের সংখ্যা নির্ণয় করেন ২৯১০০ পরিবার এবং বলেন যে, বিগত অর্ধ শতাব্দীতে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাজনা ইসফাহানের গভর্নরের নিকট পরিশোধ করিতে হইত, শুধু তিনটি উপজাতির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল, তাহারা বুরূজিরদের অধীনে ছিল (পূ. গ্র., ১খ, ২৯৫-৬)। Layard এবং de Bode উপজাতীয়গণের মধ্যে যে ধন-সম্পদ দেখিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা তিনি বাখতিয়ারীদের মধ্যে যে দারিদ্র্যের চিহ্ন দেখেন সেই সবের বৈপরীত্যেরই পরিচায়ক (পূ. গ্র., ২খ, ৫৪)। তিনি বাখতিয়ারীদের মধ্যে যে নিরাপত্তাবোধের অভাব দেখেন তাহারও বর্ণনা প্রদান করেন এবং বলেন যে, সুদূর এলাকাসমূহে ঈলখানীদের কর্তৃত্ব ছিল অতি ক্ষীণ (পূ. গ্র., ২খ, ৯২-৯৩)। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বাখতিয়ারীগণ খচ্চর ও ঘোড়া রফতানী করিত (পূ. গ্র., ২খ, ১১৭)। Curzon যখন তাঁহার Persia গ্রন্থখানি লিখেন সেই সময়ে এই অবস্থা আর ছিল না (পূ. গ্র., ২খ, ২৯৯)। Curzon লিখিয়াছেন যে, শাহ কর্তৃক দানরূপে প্রদত্ত বেতনভুক্ত দুইটি পদ ঈলখানী এবং ঈলবেগী ছাড়াও আরও একটি পদ চাহার মাহাল্লের হাকিম (গভর্নর) ও উপজাতীয় রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কারণ উপজাতীয় সর্দারগণ চাহার মাহাল্লে জমির মালিক ছিলেন (পূ. গ্র., ২খ, ২৯৫)।

লূরিস্তান-ই কূচিক, পীশকূহ এবং পুশ্ত-ই কূহ এই দুই অংশে বিভক্ত ছিল। প্রথমোক্তটির প্রধান প্রধান উপজাতি ছিল সিলাসিলীগণ এবং দিলফুনগণ (De Bode-এর মতে উহাদের সংখ্যা ছিল ৩০,০০০ পরিবার, পূ. গ্র., ২খ, ২৮৬)। পুশ্ত-ই-কূহ উপজাতীয়গণ ও ফায়লীগণ সংখ্যায় খুব বেশী ছিল না। Rawlinson পীশকূহ এবং পুশ্ত-ই কূহ উপজাতিসমূহের একটি বিস্তারিত তালিকা দিয়াছেন এবং প্রথমোক্তদের সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন ৩৮,০০০ আর শেষোক্তদের ১২,০০০ (পূ. গ্র.)। লূরগণ বুরূজিরদ, নিহাওয়ানদ, হামাদান ও কিরমান শাহের বাজারে বকরীর গোশ্ত ও দুধজাত খাবার এবং কাঠকয়লা সরবরাহ করিত। তাহারা ছাগলের লোম বুনিয়া গালিচা এবং মোটা তাঁবুর পশমী কাপড় তৈয়ার করিত। উহা দ্বারা খচ্চর আরোহীদের জিনের কম্বল হইত (দ্র. de Bode, পূ. গ্র., ২খ, ২৯২)। লূর-ই কূচিকের উপজাতীয় সংগঠন বাখতিয়ারীদের (লূর-ই বুযুর্গ) সংগঠন হইতে ভিন্ন ধরনের ছিল। প্রতিটি বিভাগ বা মহকুমার স্ব স্ব নেতা বা তূশমাল ছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে নিজেদের সাধারণ স্বার্থের প্রশ্নে তাঁহারা প্রত্যেকে সমান অধিকার লইয়া আলাপ-আলোচনা করিতেন। পীশকূহের উপজাতিদের খাজনার পরিমাণ নির্ধারিত ছিল ১২০ কাতির (এই শব্দটির অর্থের জন্য উপরে দ্র.)। সর্বসাধারণের এক সম্মেলনে এই সমগ্র প্রদেয় খাজনা বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে ও তাহাদের উপদলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। প্রতিটি উপদল বা মহকুমা এলাকা স্থির করিত যে, উহার অন্তর্ভুক্ত কোন তাঁবু সমষ্টি কত পরিমাণ করিয়া খাজনা দিবে। তখন প্রতি তাঁবু সমষ্টির রীশ সাফীদ তাঁহার অধীনস্থ পরিবারসমূহ হইতে উহা সংগ্রহ করিতেন। উযীর মীর্যা বুযুর্গ-এর আমলে কাতিরের মূল্য বাড়াইয়া ২০০ পুরাতন তূমান বা ৪০,০০০ প্রচলিত তূমান করা হয়, কিন্তু আদায়কৃত পরিমাণ উহা অপেক্ষা কম হয় (Rawlinson, পূ. গ্র., ; আরও দ্র. Curzon, পূ. গ্র., ২খ, ২৭৪ ; এবং আলী মুহাম্মাদ সাকী, জুগ্‌রাফিয়্যা ওয়া তা'রীখ-ই লূরিস্তান, তেহরান ১৯৬৪ খৃ.)।

১৯শ শতকে ফারসে দুইটি প্রধান উপজাতীয় দল ছিল খামসাগণ এবং তুর্কীভাষী কাশকা'ঈগণ। প্রথমোক্তগণ তাহাদের নাম হইতে যেরূপ বুঝা যায়, পাঁচটি উপজাতির সংমিশ্রণে গঠিত ছিল, তিনটি তুর্কী (আয়নালূগণ, বাহারলূগণ ও নাফারগণ), একটি পারস্য দেশীয় (বাসিরীগণ) এবং একটি আরব (ঈল-ই আরাবগণ) (দ্র. ফাসা'ঈ, পূ. গ্র, ২খ, ৩০৯ এবং Landlord and Peasant, 159)। আদিতে তাহাদিগকে ১২৭৮/১৮৬১-৬২ সালে হাজ্জী ইব্‌রাহীম-এর নাতি মুহাম্মাদ আলী খান

কাওয়ামু'ল-মুল্ক-এর নিয়ন্ত্রণাধীন করা হইয়াছিল যাহাতে তাহারা কাশকাঈদের প্রতিরোধ করিতে পারে। কাওআমু'ল-মুলক দারাব ও ঈলাত-ই খামসার খাজনা আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া দশ বৎসরের জন্য একটি মুকাতা'আ চুক্তি করেন (ফাসা'ঈ, পূ. গ্র., ২খ, ৫১)। কাশকা'ঈগণ ও হাজ্জী ইবরাহীম-এর পরিবারের মধ্যকার যে বিবাদ তাহা আরও কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে শুরু হয়। De Bode যিনি ১৮৪১ খৃ. শীরাযে ছিলেন, বলেন যে, তিনি শহরটিকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলীয়গণের মধ্যে বিভক্ত দেখিতে পান। এক দলের নেতৃত্ব করিতেছিলেন ঈলবেগী এবং আরেকটির নেতৃত্ব করিতেছিলেন কালানতার যিনি ছিলেন হাজ্জী ইবরাহীম-এর পুত্র হাজ্জী মীর্যা 'আলী আকবার (পূ. গ্র., ১খ, ১৮০-১)। ১৯৮৫ খৃ. গঠিত খামসা উপজাতি সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত বাসিরীদের বিষয়ের জন্য দ্র. F. Barth, Nomads of South Persia, Oslo 1961।

কাশকা'ঈগণ ১৯শ শতকে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। উপজাতির বিভিন্ন গোত্রের (তীরা) প্রতিটি একজন কালানতারের অধীনে ছিল, সেগুলির প্রতিটি আবার কয়েকভাগে বিভক্ত ছিল, যার প্রতিটির দায়িত্বে ছিলেন একজন করিয়া কাদখুদা। সামগ্রিকভাবে উপজাতীয় শাসন ন্যস্ত ছিল একজন ঈলখানীর এবং তাঁহার প্রতিনিধি ঈল্বেগীর হাতে। ইহাদের উভয়কেই নিযুক্ত করিতেন দেশের সরকার, কিন্তু সে নির্বাচন অবশ্যই স্থানীয় উপজাতীয়দের মধ্য হইতে করিতে হইত (ফাসা'ঈ, পূ. গ্র., ২খ, ৩১৩)। Sheil উহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন ৩০-৪০,০০০ তাঁবু। প্রধান শাখা ছিল 'আমালাগণ, তাঁহাদের তাঁবুর সংখ্যা ছিল ৩,৩০০, নেতা ছিলেন ঈলখানী। এই উপজাতির গ্রীষ্মকালীন বসতস্থান ছিল ইসফাহানের নিকটবর্তী গান্দুমানে আর শীতের বসতস্থল ছিল উপকূলের নিকটে। বাখতিয়ারীদের মধ্যে কয়েকটি দল জানিকী পর্বত এবং দিনা পর্বতশৃঙ্গের নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস করিত। পশুর পালের দিক হইতে তাহারা সম্পদশালী ছিল; সেজন্যই স্থানান্তরের সময়ে বিস্তর ক্ষতি সাধন করিত (Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ৩৯৮-৯)। হুসায়ন 'আলী মীর্যা ফারসের গভর্নর থাকাকালে ঈলখানী মুহাম্মাদ 'আলী খানকে ১২৪৯/১৮৩৩-৪ সালে গ্রেফতার করেন, কিন্তু তথাপি অল্পকালের মধ্যেই আবার তাঁহাকে মুক্তি প্রদান পূর্বক পুনরায় সেই একই উপজাতির গভর্নর নিয়োগ করিতে বাধ্য হন (ফাসা'ঈ, পূ. গ্র., ২খ, ২৮৫)। পরবর্তী কালে উপজাতীয়দের সৎ আচরণের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে তাঁহাকে তেহরানে প্রায় দশ বৎসরকাল প্রতিভূস্বরূপ রাখা হয়। পরে ১৮৪৮ খৃ. তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় (F. O. 60 ঃ 137. Farrant to Palmerston, No. 103, Tehran, 24 November 1848)। Curzon বলেন যে, ঈলখানী ছিলেন ফীরূযাবাদ ও ফারাশবান্দের গভর্নর; কিন্তু তৎকালীন ঈলখানী সুলতান মুহাম্মাদ খান সরকার কর্তৃক উপজাতীয় বিষয়ে ক্ষমতাবিহীন ছিলেন ; এবং উপজাতির প্রধানের দায়িত্ব প্রধান করা হয় ঈলবেগী দারাব খানকে। তিনি প্রাদেশিক গভর্নরকে জনপ্রতি হিসাবে পালের পশু দ্বারা খাজনা প্রদান করিতেন। সেই খাজনা তিনি তাঁহার উপজাতির জনগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতেন। কাশকা'ঈদের জনসংখ্যা ১৮৭১-৭২ খৃ. দুর্ভিক্ষে অনেক কমিয়া যায় এবং স্থায়ীভাবে বসত হেতুও কিছু লোপ পায়। কার্জনের মতে এই উপজাতীয়দের সংখ্যা ১০-১২,০০০ তাঁবুর বেশী ছিল না (দ্র. ঐ, ২খ, ১১২-১৪)। (কাশকা'ঈ উপজাতীয়দের আধুনিক রীতিনীতি বিষয়ক বর্ণনার জন্য দ্র. মুহাম্মাদ বাহমান বেগী, 'উরফ ওয়া 'আদাত-ই 'আশা'ইর-ই ফার্স, তেহরান ১৯৪৫ খৃ.)।

কাশকা'ঈগণ এবং খামসার অন্তর্ভুক্ত তুর্কী উপজাতিগণ ছাড়াও ফার্সে অন্যান্য আরও তুর্কী উপজাতি ছিল। যেমন কুনকারীর খালাজগণ, যাহাদের নেতা মীর্যা কাসিম খান ১৯শ শতকের প্রথম দিকে কা শকা'ঈদের ঈলখানী জানী খান-এর কন্যাকে বিবাহ করেন (ফাসা'ঈ, ২খ, ২৪৪)। কিরমান এবং আযার-বায়জানেও খালাজ গোত্রীয় ছোট ছোট দল বাস করিত (Houtum Schindlar, Eastern Persian Irak, 50)।

মামাস্সানীগণ ফার্স ও খূযিস্তানের সীমান্তে বাস করিত। তাহাদের চারিটি প্রধান বিভাগ ছিল ঃ রুস্তামীগণ, বাকিশগণ, জোঈগণ এবং দুশমানযিয়ারীগণ। প্রথমোক্ত দুই দলই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল এবং তাহাদের মধ্যে ঈর্ষার ভাব লাগিয়াই থাকিত। দুশমানযিয়ারীগণের নেতা মুহাম্মাদ রিদা খানের প্রাণদণ্ড হয় ১৯৪০ খৃ. ফার্সের গভর্নর ফিরায়দূন মীর্যার আদেশে। ফলে উপজাতিটি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। সেই সময়ে মামাস্সানীগণের সর্বমোট সংখ্যা ৪০০০ পরিবারের বেশী ছিল বলিয়া মনে করা হয়। ফার্সের গভর্নর তাহাদের উপরে ৭,০০০ তূমান (প্রায় ২,৮০০ পাউণ্ড) কর ধার্য করেন। ফাতহ্ 'আলী শাহ-এর শাসনামলের শেষ দিকে ফার্স যখন হুসায়ন 'আলী মীর্যার অধীন ছিল তখন ইহারা বিস্তর ডাকাতি করিত। বাকিশ নেতা ওয়ালী খান ছিলেন প্রধান দলনেতা। তিনি এবং তাঁহার পুত্র বাকির খান শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েন এবং তাবরীযে বন্দী হন। ফলে মামাস্সানীগণের ক্ষমতা কিছুটা দমিত হয় (de Bode, পূ. গ্র., ১খ, ২৭০)। De Bode বাশ্ত-এ বসবাসকারী বাভীদের জনসংখ্যা ৪,০০০ পরিবারের উপরে বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। তাহাদের সর্দার শারীফ খানকে হুসায়ন 'আলী মীর্যার আদেশে অন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বাভীরা আদিতে চা'ব দেশ হইতে বাশ্ত-এ আসে। নাদির শাহ উহাদিগকে খুরাসানে স্থানান্তরিত করেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে উহারা পুনরায় ফার্সে ফিরিয়া আসে। বুওয়ায়র আহমাদীগণ সংখ্যায় ছিল ৩,০০০ পরিবার; উহারা আরু এবং দূ গুনবাদানের উত্তরে অবস্থিত এলাকায় বাস করিত। নূঈগণ সংখ্যায় ছিল প্রায় ২,৫০০ পরিবার। তাহারা বিহ্বাহান-এর উত্তর-পূর্বে বাস করিত। তায়্যিবীগণ সংখ্যায় ছিল ৩,০০০ পরিবার আর বাহ্মা'ঈগণ বাস করিত বিহ্বাহানের উত্তর-পশ্চিমের পাহাড়-পর্বতে। উহারা ছিল ফার্সের পার্বত্য উপজাতিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বর্বর ও দুর্দান্ত ধরনের গোত্র। De Bode-এর মতে উহাদের সংখ্যা অবমূল্যায়ন করিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছিল ২,০০০ পরিবার। তাঁহার গ্রন্থ রচনাকালে তাহারা বাখতিয়ারী নেতা মুহাম্মাদ তাকী খান-এর নিকটে চলিয়া গিয়াছিল। রক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের ফলে তাহারা বহু দল উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কতিপয় ছোট ছোট 'আরব এবং তুর্কী গোত্রও ছিল। তাহারা বিহ্বাহানের সমতল এলাকা দখল করিয়াছিল, কিছু গ্রামে স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছিল এবং অন্যরা তাঁবুতে বাস করিত (de Bode, পূ. গ্র., ১খ, ২৭৫)। Sheil কর্তৃক প্রদত্ত উপজাতীয়দের সংখ্যাসমূহ সামগ্রিকভাবে de Bode কর্তৃক প্রদত্ত সংখ্যা অপেক্ষা কম। মামাস্সানীদের ক্ষমতা শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কালের মধ্যে হ্রাস পায়। Sheil তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন ৮,০০০ তাঁবু ও ঘর (Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ৩৯৯ ; আরও দ্র. Curzon, পূ. গ্র. ২খ, ৩১৮)। Sheil-এর অনুমান অনুসারে বিহ্বাহান ও কূহ্গীলূয়া উপজাতীয়গণের মধ্যে সর্ববৃহৎ ছিল বাহ্মা'ঈগণ (২,৫০০ তাঁবু)। অতঃপর বুওয়ায়র আহমাদীগণ (২,০০০

তাঁবু), বাভীগণ (১২,০০০ তাঁবু), চিরামীগণ (১,০০০ তাঁবু), তায়্যিবীগণ (১,০০০ তাঁবু) এবং ছোট ছোট অসংখ্য গোত্র। দরিদ্রের সংখ্যা ছিল বহু, যদিও তায়্যিবীরা ধনী বলিয়াই পরিচিত ছিল (Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ৩৯৯)। ফারহাদ মীর্যা ১৮৮২ খৃ. কূহ্গীলূয়াদেরকে দমন করেন (Curzon, পূ.গ্র., ২খ, ৩১৮)। (আরও দ্র. মাহ্মূদ বাওয়ার, কূহ্গীলূওয়া ওয়া ঈলাত-ই আন, তেহরান (?) ১৯৪৫ খৃ., এবং মানুচিহ্‌র যাররাবী, তাওয়া'ইফ-ই কূহ্গীলূয়া, ফারহাঙ্গ-ই ঈরান যামীন-এ, ৯খ, fas. ১-৪, ২৭৮-৩৫২। আরও দ্র. F. O. 371 : 1728 ; উহাতে বুওয়ায়র আহমাদী গোত্রীয়গণের বংশতালিকা ও ১৯১৩ খৃ. তাহাদের জনসংখ্যা দেওয়া আছে)।

শায়খ ছামির-এর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ১৯শ শতকে 'আরাবিস্তানে চা'বদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, অতঃপর হ্রাস পায়। ১৭৪০ ও ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সম্ভবত তাহারা জার্‌রাহী ও উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ হইতে আফশারগণকে স্থানচ্যুত করে। তৎপূর্বে ইহারা চারণভূমি ব্যবহারের জন্যে আফশার সর্দারকে একটা বার্ষিক কর প্রদান করিত। আকা মুহাম্মাদ খান-এর আমলে ইহারা ফার্‌সের গভর্নরকে অনিয়মিতভাবে পেশকাশ দিয়া আসিতেছিল। Macdonald Kinneir লিখিয়াছেন যে, চা'বের শায়খ ৫,০০০ অশ্বারোহী ও ২০,০০০ পদাতিক সৈন্য ময়দানে নামাইতে পারিতেন। এইসব সৈন্য তাঁহার অধস্তন শায়খগণ সরবরাহ করিতেন (পূ. গ্র., পৃ. ৯১)। মুহাম্মাদ 'আলী মীর্যা বকেয়া খাজনার দাবীতে শায়খ ছামির-এর বিরুদ্ধে ফাল্লাহিয়্যাতে সৈন্য সমাবেশ করেন (১৮১৮ খৃ.)। মুহাম্মাদ শাহ-এর অধীনে চা'বদের মধ্য হইতে প্রতিভূ গ্রহণ করা হয় এবং খাজনার পরিমাণ ৪,০০০ তুমান হইতে ২০,০০০ তুমানে বৃদ্ধি করা হয় (F. O. 60 : 103. Memo. by Rawlinson on Cha'ab, incl. in Sheil to Aberdeen, No. 15, Tehran, 3 February 1844, আরও দ্র. de Bode, op. cit., ii. 110 ff., এবং F. O. 60 : 222, Report on the Cha'b for Outram compiled by George Percy Badger, Arabic interpreter, Camp before Bushire, 21 February 1857)। Pelly ১৮৬৩ খৃ. প্রধান চা'ব উপজাতীয়গণের সংখ্যা নির্ণয় করেন ৬৮,০০০ যোদ্ধা। পরে সংযোজনীতে তিনি বলেন যে, উক্ত সংখ্যাতে অতিরঞ্জন থাকিতে পারে (Report on the Tribes etc., and the shores of the Persian Gulf, Calcutta 1874)। Curzon চা'বদের সংখ্যা নির্ণয় করেন ৬২,০০০ জন (পূ. গ্র., ২খ, ৩২১ প.)।

চা'বদের পতনের পরে মুহাম্মারার মুহাসায়নগণের প্রভাব বৃদ্ধি পায় (Curzon, পূ. গ্র., পৃ. ৩২৫)। দক্ষিণাঞ্চলের অন্য 'আরব উপজাতিসমূহের মধ্যে ছিল হাবীযার মুনতাফিকগণ, ইহারা ১৮১২ খৃ. তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে এই জিলাতে আসে (Curzon, পূ. গ্র., ২খ, ৩২৫ প.) ; বানী তুরুফগণ, ইহারা দাশত-ই মীশানে বাস করিত এবং বানী লামগণ, ইহারা প্রধানত তুরস্কের এলাকায় বাস করিত (দ্র. মানুচিহ্‌র যার্‌রাবী, তাওয়া'ইফ-ই মিয়ান আব, ফারহাঙ্গ-ই ঈরান যামীন-এ, ১০খ, fas. ১-৪, ৩৯৪-৪০৭)।

পূর্ব পারস্যে উপজাতীয়রা সংখ্যায় যেমন অনেক তেমনি প্রকৃতিতেও বিভিন্ন রকমের ছিল। কিরমানে ছিল আফশারগণ ও 'আতা ইলাহীগণ, শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উহারা সংখ্যায় ছিল ১৫,০০০ তাঁবু ও ৩,৩০০ ঘর (Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ৩৯৮)। দক্ষিণ-পূর্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপজাতীয় দল ছিল বালূচরা, উহারা প্রধানত বালূচিস্তানে ও সীমান্তে বাস করিত (দ্র. J. P. Ferrier, Caravan Journeys and wanderings in Persia, Afghanistan, Turkistan and Beloochistan, অনু. Capt. W. Jesse, লণ্ডন ১৮৫৬ খৃ.)। কিন্তু কা'ইনাত এবং খুরাসানেও কিছু বসতি ছিল। কাজার শাসনের প্রথম দিকে সীস্তান ও বালূচিস্তানের বালূচগণ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল না। তাহারা নিয়মিত কোন খাজনাও দিত না, মাঝেমধ্যে শুধু কিরমানের গভর্নরকে নামমাত্র পেশকাশ দিত ('আবদু'র-রায্যাক ইব্‌ন নাজাফ কুলী, Dyansty of he Kajars, অনু., লণ্ডন ১৮৩৩ খৃ., পৃ. ৪৪৭)। Morier ১৮০৮ খৃ. লিখেন যে, বালূচরা পারস্যের প্রজা হইলেও নিজেরা স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল (Journey, 49-50)। নাসিরু'দ-দীন শাহ-এর শাসনামলে বালুচদিগকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনিবার বিষয়ে কিছু অগ্রগতি হইয়াছিল (দ্র. ফীরূয মীর্যা ফারমান ফারমা, সাফারনামা-ই কিরমান ওয়া বালূচিস্তান, সম্পা. মানসূরা নিজাম মাফী, তেহরান ১৯৬৩ খৃ.)। Ferrier ১৮৪৫ খৃ. পারস্য সফরকালে লিখেন যে, তুরশীযে প্রায় ৮,০০০ বালূচ তাঁবু ছিল, তাহাদের পশুর পালের সংখ্যাও ছিল বহু (পূ. গ্র., পৃ. ১৩৭)। Sheil তাহাদের সংখ্যা কম করিয়া ২,০০০ তাঁবু ও অনেক অশ্ব বলিয়া নির্ণয় করেন (Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ৪০০)। কা'ইনেও বালূচরা ছিল (Ferrier, পূ. গ্র., পৃ. ৪৪১) এবং তুর্‌বাত-ই হায়দারীতেও আনুমানিক ২,০০০ তাঁবু ও ঘর ছিল (Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ৪০০)। তুরবাত-ই হায়দারীতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দল ছিল কারা'ঈরা, তাহাদের সংখ্যা ছিল ৫,০০০ তাঁবু ও ঘর। আরও কতিপয় দলের লোক মিলিয়া আনুমানিক ৩,০০০ তাঁবু ও ঘর ছিল (Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ৪০০)। ফাত্হ 'আলী শাহ-এর আমলে কারা'ঈ নেতা ইসহাক খান অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তির মর্যাদায় আসীন হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুরাসানের গভর্নর মুহাম্মাদ ওয়ালী মীর্যা তাঁহাকে এবং তাঁহার পুত্রকে বন্দী করিয়া হত্যা করেন (Watson, A History of Persia, London 1866, 175 ff.)। Colonel Yate ১৮৯৩ খৃ. খুরাসান সফর করেন। তিনি কারা'ঈদের সংখ্যা নির্ণয় করেন ৩,০০০ পরিবার। তাহারা এক রেজিমেন্ট পদাতিক সৈন্য সরবরাহ করিত (দ্র. Khurasan and Sistan, London 1900, 53)। তুরশীযে ৪,০০০ 'আরব তাঁবু ও ঘর ছিল, তুন ও তাবাসে ছিল ৭,০০০ আর কাঈনে ছিল ১২,০০০ (Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ৪০০)।

পূর্ব খুরাসানে হাযারা, তায়মূরী, মায়মানী, ফীরূয-কূহী, জামশীদী এবং যাংগীগণ সকলেই ছিল তুর্কী উপজাতি। কাজার আমলের প্রথম দিকে তাহারা নামমাত্র সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং ফাত্হ 'আলী শাহ ও মুহাম্মাদ শাহ-এর মৃত্যুর পর তাহারা গোলযোগ শুরু করে। Ferrier উল্লেখ করেন যে, তিনি যখন খুরাসান সফর করেন ইহার কিছু কাল আগেই হাযারা উপজাতির মাত্র ২,০০০ পরিবার হেরাত হইতে আসিয়া মাহমূদাবাদ-এর নিকটবর্তী শাহর-ই নাও-এ বসতি স্থাপন করে। তাহারা প্রচুর সংখ্যক ঘোড়া পালন করিত, সেই ঘোড়া দিয়াই সরকারের খাজনা দিত। তাহা ছাড়াও প্রয়োজনবোধে তাহারা সরকারকে ১,০০০

অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া সাহায্য করিত (পূ. গ্র., পৃ. ১৩৭)। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পারস্যে হাযারাদের সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। Yate আন্দাজ করেন যে, তাহাদের সংখ্যা মাত্র ১২০০ পরিবার ছিল (পূ. গ্র., পৃ. ১৩২)। Sheil খাওয়াফে বসবাসরত তায়মূরীদের সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন ৪,০০০ তাঁবু ও ঘর। ২,০০০ অধিবাসীর দ্বিতীয় একটি দল মাশহাদের নিকটে বাস করিত। মাশহাদের চতুর্দিকে নানা গোত্রীয় তুর্কী ও পারস্য উপজাতির আরও কিছু লোক বাস করিত। তাহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১১,০০০ তাঁবু ও ঘর। নিশাপূরে ১০,০০০ বায়াত এবং কুরশাহী বাস করিত ; তাহাদের স্থায়ী বসতি ছিল। কাজার উপজাতীয়দের সঙ্গে মিশিয়া যাহারা শামবায়াত্লূ উপদল নামে পরিচিত হইয়াছিল তাহারা ছাড়াও বুরূজির্দ, খুররামাবাদ ও ফারসে বায়াতরা বাস করিত (Houtum-Schindler, Eastern Persian Irak, 48-50)। খুরাসানের কুর্দী উপজাতির সংখ্যা ছিল কূ চানের যা'ফরানলূদের ১৪,০০০ ঘর ও তাঁবু, রাদকানের ২,০০০ কায়ভানলূ গোত্র এবং বুজনূর্দে ৩,০০০ শাদিল্লু গোত্র। তাহা ছাড়াও ছিল সাব্যাওয়ার, জূওয়ায়ন এবং অন্যত্র বসবাসকারী অন্যান্য দল (Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ৪০০)। যা'ফরানলূদেরকে আদিতে আখাল-এ বসত করাইয়াছিলেন শাহ 'আব্বাস। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের দ্বারা উযবেকদের প্রতিহত করিবেন। কিন্তু শাহ সুলতান হুসায়নের আমলে ইহারা বিতাড়িত হইয়া কূচান, শিরওয়ান ও বুজনুরদে প্রত্যাবাসিত হয় (Yate, পূ.গ্র., পৃ. ১৮০ প. ; Curzon, পূ.গ্র., ১খ, ৯৭ প., ১৯১-২)।

পারস্যের মধ্যে এশীয় সীমান্তে এবং তুর্কোমান স্তেপভূমিতে বসবাসরত উপজাতীয়দের নিয়ন্ত্রণ করা পূর্ববর্তী রাজবংশসমূহের ন্যায় কাজারদের জন্যও এক সমস্যা ছিল। উযবেকরা আর তুর্কোমানরা শতাব্দীর শুরুর দিকে যে ব্যাপক লুটতরাজ করিত আর পারস্যের প্রজাদেরকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া ক্রীতদাসে পরিণত করিত, কাজাররা ইহা দমন করিতে ব্যর্থ হয়। সীমান্তের পারস্য এলাকার দিকে দুইটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপজাতি ছিল গুকলানগণ ও য়ামূতগণ উভয়েই সুন্নী। তাহাদের মধ্যে প্রথমোক্তগণ যাযাবর ছিল না। শেষোক্তগণ ভালভাবে চিহ্নিত নয় সেই সীমান্তের উভয় পার্শ্বে বাস করিত। তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; চুমরগণ, ইহারা কৃষিকাজ করিত আর চারওয়াগণ, ইহারা যাযাবর ছিল। য়ামূত ও আটক গ্রামবাসীদের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক ছিল, আর প্রথমোক্তরা প্রায়শই ডাকাতি করিত। তবে শেষোক্তগণ প্রায়ই বিদ্রোহের উস্কানি দিত এবং সরকার তাহাদেরকে যথেষ্ট নির্যাতনও করিত। গুকলানগণ কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বাস করিত, তাহারা য়ামূতদের ভয়ে সর্বদা অতিষ্ঠ থাকিত। বুজনুর্দের কুর্দীদের সঙ্গে আর কাবূদজামার হাজ্জিলাদের সঙ্গেও উহাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। উভয় পক্ষে লুণ্ঠন ও প্রতিলুণ্ঠন প্রতিনিয়তই হইত (দ্র. Yate, পূ. গ্র., পৃ. ২৪৫-৭, লুণ্ঠনের কাহিনীর জন্য)। গুকলান ও য়ামূতগণের প্রতিটি শাখা কয়েকটি আওবা মিলিয়া গঠিত হইত, উহাদের প্রতিটির নিজস্ব নেতা (আক সাকাল) থাকিত। তিনি বংশানুক্রমিক 'যূরত' ধারী হইতেন। সমগ্র উপজাতির কোন একজন নেতা থাকিতেন না। প্রয়োজনের সময়ে আওবার মুরুব্বীগণ এবং শায়খগণ একত্র হইয়া যথাকর্তব্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বিবাদ-সংঘর্ষ সাধারণ বিষয় ছিল। সরকারকে খাজনা দেওয়া হইত প্রতিনিধির (সারকারদাস) মাধ্যমে। তিনি সরকার কর্তৃকই নিযুক্ত হইতেন। প্রয়োজনের সময়ে সরকারকে উপজাতীয়দের মধ্য হইতে নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য যোগান দেওয়ার দায়িত্বও তাঁহার ছিল (দ্র. Landlord and Peasant, 160-2)।

Morier ১৮১০ হইতে ১৮১৬ খৃ.-এর মধ্যে পারস্য সফর করেন। তিনি য়ামূত ও গুকলানদের জনসংখ্যা একত্রে প্রায় ৮-১০,০০০ পরিবার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সরকারের প্রতি তাহাদের আনুগত্য নামমাত্র ছিল, শাহকে তাহারা বাৎসরিক কয়েকটি ঘোড়া মাত্র উপহার দিত। "শাহও তাহাদিগকে উত্যক্ত না করিবার বিষয়ে এতটা সতর্ক থাকেন যে, তিনি সাধারণত তাহাদের নিকট হইতে যৎপরিমাণ পান তাহা অপেক্ষা বেশী আবার ফেরত প্রদান করেন"। তাহাদের সীমান্ত ছিল আস্তারাবাদ হইতে ৮ ফারসাখ দূরে। তাহাদের এলাকার পরে বাস করিত তেক্কেগণ, যাহারা সাধারণত য়ামূত ও গুকলানগণ হইতে ভিন্নতর ছিল এবং তাহাদের সঙ্গে সম্পর্কও খুব ভাল ছিল না (দ্র. Second Journey, 377-8)। J.B. Fraser ১৮৮৩ খৃ. একদল গুক্লান-এর সঙ্গে ভ্রমণের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন (A winter's journey, ii, 331 ff.)। তিনি লিখিয়াছেন যে, য়ামূতরা সেই সময়ে বিদ্রোহ করিবার পর্যায়ে ছিল (ঐ, ৩৮২)। Abbott য়ামূতদের সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন ৫৯,৫০০ তাঁবু বা পরিবার। এই তথ্য পারস্যের জনৈক কর্মকর্তা ১৮৩৮ খৃ. সংগ্রহ করিয়াছিলেন (F.O. 60 : 92. Abbott to Aberdeen, Tabriz, 10 May. 1842)। এই সংখ্যা সম্ভবত অতিরঞ্জিত ছিল। Taylor Thomson ১৮৪৬ খৃ. এই অঞ্চল ভ্রমণ করেন। তিনি গুক্লানদের সংখ্যা ৫-৬,০০০ পরিবারের কাছাকাছি এবং য়ামূতদের সংখ্যা ২০,০০০ বলিয়া উল্লেখ করেন (F. O. 60 : 122. Taylou Thomson to Sheil, Tehran, 15 April, 1846, incl. in Sheil to Aberdeen, No. 50, Tehran, 4 May, 1846)। Abbott পুনরায় ১৮৪৪ খৃ. লিখিতে গিয়া বলেন যে, গুক্লানগণ গুনবাদ-ই কাবূস ও আটরেক এবং বুজনুর্দ অঞ্চলে বাস করে, তাহাদের সংখ্যা ৩-৪,০০০ পরিবার। পূর্বে তাহাদের সংখ্যা আরও অনেক বেশী ছিল, প্রায় ১২,০০০ পরিবার, কিন্তু ফাত্হ 'আলী শাহ ডাকাতি ও লুণ্ঠনের দায়ে শাস্তি প্রদানের ভয় দেখাইলে বৎসর কয়েক আগে তাহাদের অর্ধেক লোক খীভাতে চলিয়া যায়। মহামারী আকারে কলেরা দেখা দিবার ফলেও তাহাদের বহু লোক মারা যায়। তদুপরি মুহাম্মাদ শাহ-এর সেনাদল ১৮৩৬ খৃ. য়ামূতদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনাকালে ব্যাপকভাবে তাহাদের উপর উৎপীড়ন চালায়। এই সময়ে য়ামূতগণ প্রধানত পারস্যের বাহিরে বাস করিত। সংখ্যায় তাহারা অনেক ছিল এবং পারস্য হইতে খীভাতে স্থানান্তরের সময়ে তাহারা খামখেয়ালী ও বিশৃঙ্খলভাবে গমন করে। চারওয়াগণ বিশেষ মৌসুমে বালখান পর্বত অঞ্চলে স্থানান্তরে গমন করিত। আসতারাবাদের গভর্নরকে তাহারা আনুগত্য কর বলিতে কিছুই দিত না, কিন্তু চুমূরেরা ছিল অপেক্ষাকৃত কম ভাগ্যবান। চারওয়াগণ স্থানান্তরে গমন করিলে চুমূরেরা যখন আশ্রয়হীন হইয়া পড়িত, তখন আস্তারাবাদের গভর্নর তাহাদের নিকট হইতে মাথাপিছু একটা সামান্য কর এবং পেশকাশ আদায় করিতেন। পারস্য সরকার তুর্কোমানদের উপরে জোর প্রয়োগ করিতে না পারিয়া যতদূর সম্ভব সদ্ভাব রক্ষা করিত (Account of Abbott's Journey, পূ. গ্র.)। নাসিরু'দ-দীন শাহ-এর আমলে গুক্লানদেরকে বাধ্য করা হয় যে, তাহারা চল্লিশ হইতে

পঞ্চাশটি পরিবার প্রতিভূস্বরূপ রাখিবে, কিন্তু তাহা দ্বারাও উহাদের পারস্যের নানা স্থানে লুণ্ঠন বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই (Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ২০৭ প.)। Yate ১৮৯৩ খৃ. লিখেন যে, গুকলানদের মধ্যে কেহ কেহ ধনসম্পদশালী ছিল। পারস্য সরকার গুরগান জিলায় গুকলান অধিবাসীর সংখ্যা স্থির করেন ৯০০-১,০০০ পরিবার ; কিন্তু অন্যেরা তাহাদের সংখ্যা বলিয়াছেন ১,৭০০-২,০০০। তাহারা সদাসর্বদা য়ামূতদের ভয়ে দিন কাটাইত (পূ. গ্র., পৃ. ২০৭)। য়ামূতদের জনসংখ্যা বিভিন্ন জনে ৭,০০০ হইতে ১৫,০০০ তাঁবুর মধ্যে নির্ধারণ করিয়াছেন। Yate সর্বনিম্ন সংখ্যা ৭,০০০ প্রায়ই সঠিক বলিয়া মনে করেন। তন্মধ্যে ৪,৬০০ জনকে চুমূর বলিয়া ধরা হয় এবং ২,৪০০ জন চারওয়া (পূ. গ্র., পৃ. ২৭৯-৮০)। (আরও দ্র. Curzon, পূ. গ্র., ১খ, ১৮৯ ; Karelin কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন রিপোর্টে, তিনি ১৮৩৬ খৃ. একটি অভিযানকারী দলের নেতৃত্বে কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব উপকূলে গমন করিয়াছিলেন, সেখান হইতে রাশিয়ার অর্থমন্ত্রীর নিকট তিনি যেই রিপোর্ট প্রদান করেন, ইহার অনুবাদ রক্ষিত আছে F. O. 65 : 226-এ, Durham to Palmerston-এর অন্তর্ভুক্ত, সেন্ট পিটার্সবাগ, ১৯ ডিসেম্বর, ১৮৩৬; F. O. 65: 233, Durhm to Palmerston-এর অন্তর্ভুক্ত, নং ২৮, secret and confidential চিহ্নিত, সেন্ট পিটার্সবার্গ, ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৭ এবং F. O. 65 : 234. Durham to Palmerston-এর অন্তর্ভুক্ত, নং ৬৩, সেন্ট পিটার্সবার্গ, ৮ এপ্রিল, ১৮৩৭)।

তেহরান অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর উপজাতি বাস করিত, তাহাদের মধ্যে শাহ সিভানগণই ছিল সংখ্যায় সর্বাধিক। খৃষ্টীয় ১৯শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে উহারা ছিল ৯,০০০ তাঁবু। বিভিন্ন মওসুমে তাহারা কুম্ম, তেহরান, কাযবীন ও যানজান-এর মধ্যে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিত। অন্যান্য উপজাতীয়গণ নানা ছোট ছোট দলে বিভক্ত ছিল। অধিকাংশই ছিল অতি দরিদ্র (Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ৩৯৭)। কুম্ম এবং সাভা-এর নিকটে খালাজদেরও বসতি ছিল (de Bode, পূ. গ্র., ৩১৮)। Houtum-Schindler উল্লেখ করেন যে, ১৯শ শতকের শেষভাগে ভারামীন ও খওআরে প্রায় ১০০০ পরিবার পাযুকী উপজাতীয়দের ছিল। তাহাদের কেহ কেহ কুর্দী, আর কেহ কেহ তুর্কী ভাষা বলিত। তিনি পূর্ব পারস্যীয় ইরাকে আরও অনেক ছোট ছোট উপজাতি ছিল বলিয়া উল্লেখ করেন (পূ. গ্র., পৃ. ৫০)।

যানজানের খামসা জিলায় কয়েকটি তুর্কী উপজাতি বাস করিত। গ্রীষ্মকালে তাহারা তাঁবুতে বাস করিত, কিন্তু খুব বেশী দূরে যাইত না। শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়িত বলিয়া তাহারা ঘরে বাস করিত। সর্বাপেক্ষা বড় দুইটি উপজাতি ছিল গারুগণ, সংখ্যায় ৪-৫০০ ঘর এবং শাহসিভান-ই আফশারগণ, সংখ্যায় ২,৫০০ তাঁবু (Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ৩৯৭)। বিশ শতকের শুরুর দিকে তাহারা সকলেই স্থায়ী বসবাসকারী হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ব্যতিক্রম ছিল স্বল্প সংখ্যক শাহসিভান এবং একটি তালিশ গোত্র, যাহারা আদিতে গীলান হইতে আসিয়াছিল (E. Aubin, La Perse d'aujourd'hui, Paris 1908, 14)।

হামাদান-মালায়ির-তূয়সিরকান-ফারাহান অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপজাতি ছিল তুর্কী কারাগুযলূগণ। Macdonald Kinneir লিখেন যে, তাহারা ৭,০০০ সৈন্য ময়দানে নামাইতে পারিত (পূ. গ্র., পৃ. ১২৭)। কানগাভার ও হামাদানের মধ্যকার জিলা আফশার উপজাতির দখলে ছিল, তাহাদের কেন্দ্র ছিল আসাদাবাদ (পূ. গ্র., পৃ. ১২৯)। Sheil কারাগুযলূদের সংখ্যা নির্ণয় করেন ৪,০০০ ঘর। সেই সময়ের মধ্যে উহারা সকলেই স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া গিয়াছিল। ইহা ছাড়া বিভিন্ন লোক উপজাতিও ছিল, সংখ্যায় ১,৫০০ তাঁবু ও ঘর, উহারা হামাদান-মালায়ির-তূয়সিরকান-ফারাহান অঞ্চলে বাস করিত (Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ৩৯৮)।

খুরাসান এবং উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন স্থান ব্যতীত, কুর্দ উপজাতীয়রা বাস করিত কিরমানশাহ, আরদালান ও পশ্চিম আযারবায়জানে। উহারা পারস্য এবং তুরস্কের 'উছমানী সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকাতে বাস করিত, কখনও কখনও সীমান্ত অতিক্রম করিয়াও যাইত। ফলে তাহাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত দুষ্কর হইত। Sheil কিরমানশাহের কুর্দী উপজাতীয়দের একটি তালিকা দিয়াছেন, কিন্তু বলিয়াছেন যে, সংখ্যাগুলি একেবারে পুরাপুরি সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা উচিত হইবে না। তাঁহার সেই তালিকা অনুযায়ী সর্বাধিক জনসংখ্যার উপজাতি ছিল কালখূরগণ, সংখ্যা ১১,৫০০ তাঁবু, ও ঘর, যানগানাগণ (সানজাবীগণ সমেত), সংখ্যা ১০,০০০ ঘর ও তাঁবু এবং গুরানগণ, ৩,৩০০ তাঁবু ও ঘর (Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ৪০১)। শতাব্দীর শেষ ভাগে Curzon কিরমানশাহের কুর্দীদের সংখ্যা উল্লেখ করেন প্রায় ২৪,৩০০ তাঁবু ও পরিবার বলিয়া। তন্মধ্যে কালহুর ও গূরানদের সংখ্যা ছিল প্রত্যেকে ৫,০০০ করিয়া, আর সানজাবীরা ছিল ১,৫০০ (পূ. গ্র., ১খ, ৫৫৭)। Curzon-এর প্রদত্ত সংখ্যার মধ্যে শহরে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অনেক কুর্দীও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আরদালানের কুর্দীরা প্রধানত স্থায়ী ছিল এবং নাসিরু'দ-দীন শাহ-এর আমলের শেষভাগ পর্যন্ত বস্তুত স্বাধীনই ছিল, তখন তাহাদের নেতা ছিলেন আরদালানের ওয়ালী। আযারবায়জানের কুর্দী অঞ্চলসমূহেও জনসাধারণ মৌখিকভাবে শাহের আনুগত্য স্বীকার করিলেও কার্যত কেন্দ্রীয় শাসন হইতে স্বাধীনই ছিল। কারণ সেই অঞ্চলে যাতায়াত দুর্গম ছিল। তাহাদের মধ্যে ছিল হাক্কারীগণ। তাহারা উরুমিয়্যার পশ্চিমে সালমাসের নিকটে এবং 'উছমানী তুরস্ক ও পারস্যের সীমান্ত এলাকায় বাস করিত (দ্র. Malcolm, পূ. গ্র., ২খ, ৩৩৪-৫)। Gaspard Drouville ১৮১২-১৩ খৃ. পারস্যে ছিলেন। তিনি লিখেন যে, তাহারা 'আব্বাস মীর্যার আশ্রয়াধীন ছিল এবং প্রতি বৎসরই তাহারা বিপুল সংখ্যক পশুর পাল লইয়া চারণভূমির সন্ধানে পারস্যে আসিত। যুদ্ধের সময়ে তাহাদের বেগগণ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা 'আব্বাস মীর্যাকে সাহায্য করিত। পারস্যে প্রবেশ করিলেই শাহ তাহাদিগকে সকল প্রকার খাদ্য ও আশ্রয় প্রদান করিতেন। Drouville আরও বলেন যে, আযারবায়জানের কুর্দরা 'আব্বাস মীর্যাকে সামরিক বাহিনী দিয়া সাহায্য করিত বলিয়া তাহাদের খাজনা মওকূফ ছিল (Voyage en Perse, Paris 1825, ii 7)। সাদিক খানের অধীনে শাকাকীগণ মিয়ানা ও পার্শ্ববর্তী জিলাসমূহ অধিকার করিয়াছিল। কথিত আছে যে, তাহারা ময়দানে ১০,০০০ ঘোড়া নামাইতে পারিত। আকা মুহাম্মাদ খানের মৃত্যুর পরে সাদিক খান নিজেকে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হন, কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে তিনি পুনরায় বিদ্রোহ করিয়া প্রাণ হারান। উপজাতিটিকে শেষ পর্যন্ত ছত্রভঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয় (Macdonald Kinneir, পূ. গ্র., পৃ. ১৫২)। Sheil-এর মতে শাকাকীগণ ও মুকরীগণ প্রত্যেকেরই সংখ্যা ছিল ১৫,০০০ তাঁবু ও

ঘর। শেষোক্তরা সাওজ বুলাগের চতুষ্পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাস করিত (Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ৩৯৬)। Curzon তাঁহার Persia গ্রন্থে যে সংখ্যা দিয়াছেন সেগুলি প্রকৃত সংখ্যা অপেক্ষা কম (পূ. গ্র., ১খ, ৫৫৫)। Sheil-এর মতে সুলদূযের বাবানগণের সংখ্যা ছিল ১,৫০০ ঘর (Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ৪০১; আরও দ্র. শায়খ মুহাম্মাদ মারদূখ, তা'রীখ-ই মারদূখ, তা. বি., ২ খণ্ডে, এবং মুহাম্মাদ মুকরী, 'আশা'ইর-ই কুর্দ ঈল-ই সান্‌জাবী, ১খ., অংশ ১, তেহরান ১৯৫৪ খৃ.)।

আযারবায়জানের তুর্কী উপজাতিসমূহের মধ্যে শাহসিভানগণ সংখ্যায় সর্বাধিক ছিল। Abbott ১৮৪৪ খৃ. লিখিতে গিয়া বলেন যে, সাধারণত তাহাদের সংখ্যা ১১-১২,০০০ পরিবার বলিয়া ধরা হইত, তন্মধ্যে ৬-৭,০০০ বাস করিত মিশকীন-এ আর প্রায় ৫,০০০ আরদাবীলে। উভয় স্থানের লোকেরাই শীতকালে মুগানে চলিয়া যাইত। আরদাবীল জিলায় উহারা কয়েকটি গ্রাম দখল করিয়া থাকিত। গ্রামগুলির অধিবাসীদের কিছু অংশ ছিল কৃষক আর কিছু অংশ যাযাবর। এই গ্রামগুলিতে উপজাতীয়দের উপরে সরকারের কর-দাবি ছিল বার্ষিক ১,০০০ তুমান। অপর দিকে তাঁবুতে বসবাসকারী অধিবাসিগণ দিত ৫৫০০ তুমান, তন্মধ্যে মিশকীন গোত্র দিত ৪০০০ তুমান। এই অর্থ দলের সর্দার তাঁহার অনুসারিগণের নিকট হইতে আদায় করিয়া দিতেন ("Account of Abbott's Journey", পূ. গ্র.)। Sheil-এর মতে, শাহসিভানগণ সংখ্যায় ছিল ১০,০০০ তাঁবু (Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ৩৯৬)। Houtum-Schindler বলেন যে, শাহসিভানগণের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাখা ছিল ইনানলূগণ। এই সময়ের মধ্যে শামলূগণ বিদ্যমান ছিল অংশত শাহ্‌সিভানগণের শাখা হিসাবে এবং অংশত বাহারলূ নামক একটি আলাদা গোত্র হিসাবে। সংখ্যায় তাহারা ছিল প্রায় ২৫০০ পরিবার, তন্মধ্যে অর্ধেক বাস করিত ফারসে। সেখানে তাহারা খামসা বা পঞ্চগোত্রের অংশ ছিল, আর অর্ধেক বাস করিত আযারবায়জানে (Eastern Persian Irak, 48-50)। বিশ শতকের মধ্যে শাহসিভানগণের অনেকেই স্থায়ী হইয়া যায়। Aubin উহাদের সংখ্যা নির্ধারণ করিয়াছেন ১৯,৭০০ পরিবার বলিয়া। উহারা ষাটটি উপদল বা উজাকে বিভক্ত ছিল, প্রতিটির নেতা ছিলেন একজন কাদখুদা (পূ. গ্র., পৃ. ১০৬-৭)। শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মুকাদ্দামদের সংখ্যা ছিল ৫,০০০ ঘর আর মাহ্‌মূদলূরা ছিল ২,৫০০ ; উভয় উরূমিয়াতে বাস করিত, তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা হয় যথাক্রমে ২,০০০ ও ৭,০০০ ঘর ; দুনবুলীগণ ২,০০০ ঘর, আর ক'ারা পাপাখগণ ১,৫০০ ঘর। ইহা ছাড়া আরও কিছু ছোট ছোট গোত্রও ছিল (Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ৩৯৬)। বিশ শতকের শুরুতে তাহাদের সংখ্যা ছিল ৫,০০০ পরিবার (Aubin, পূ. গ্র., পৃ. ৭৮-৯)। Houtum-Schindler উনিশ শতকের শেষে আযারবায়জানের আফশারদের সংখ্যা নির্ণয় করেন ১২,০০০ পরিবার (Eastern Persian Irak, 48-50)।

কারাজদাগ, কারাদাগ এবং তালিশের উপজাতিসমূহকে অন্যান্য অধিকাংশ সীমান্তবর্তী উপজাতীয়দের ন্যায়ই নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। উহারা ক্রমাগত একদিক হইতে আরেক দিকে যাতায়াত করিত। প্রাথমিক কাজার আমলে রুশ-পারস্য যুদ্ধকালে ইহারা নিরলসভাবে তাহাতে অংশগ্রহণ করে, তখন উহারা এককেবারে একেক দিকে আনুগত্য প্রকাশ করে। Sheil-এর মতে আরাসবারানে বসবাসকারী চিলিবিয়ানলূদের সংখ্যা ছিল ১,৫০০ তাঁবু ও ঘর, কারাচুরলূরা ২,৫০০, হাজ্জী 'আলীলুগণ ৮০০, বেগদিল্লুগণ ২০০ এবং অন্যান্য ছোট দলের সমষ্টি ৫৫০ তাঁবু ও ঘর (Lady Sheil, পূ. গ্র., পৃ. ৩৯৬; আরও তথ্যের জন্য দ্র. বায়বুরদী, তা'রীখ-ই আরাস্‌বারান, তেহরান ১৯৬২ খৃ., পৃ. ১২১ প., এবং Aubin পূ. গ্র., পৃ. ২৫৫)। আরাসবারানের উপজাতীয়গণের মধ্যে ক'ারাচুললূরাই প্রথম স্থায়ী বসতি স্থাপনকারিগণের অন্যতম (বায়বুরদী, পূ. গ্র., পৃ. ১১০)।

খৃষ্টীয় বিশ শতকের শুরুতে উপজাতিসমূহের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়। অনেক উপজাতীয় সর্দার শহর জীবনের সঙ্গে পরিচিত হইয়া উঠেন, সরকারী চাকুরী গ্রহণের ফলেও এই পরিচয় ঘটে, আবার প্রতিভূ স্বরূপ রাজধানীতে আটক থাকার কারণেও। কয়েকজন সর্দার বিদেশেও সফর করেন। নেতাগণের এবং উপজাতীয়গণেরও স্থায়ী আবাস নির্মাণ ক্রমেই বাড়িতে থাকে আর দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ বাদে অন্যান্য সকল এলাকার উপজাতীয়গণ দেশের অন্যান্য জনসাধারণের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে থাকে (Aubin, পূ. গ্র., পৃ. ১৭৭-৮)।

শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে পারস্যে এক নবযুগের সূচনা হয়, যাহার ফলে উপজাতীয়গণের উপর এবং জনসাধারণের অন্যান্য অংশেও উহার প্রভাব পড়ে। শাসনতান্ত্রিক সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী উভয় পক্ষেই উপজাতীয়দের অংশগ্রহণ করিতে দেখা যায়। ১৯০৬ খৃ., ৯ সেপ্টেম্বরের নির্বাচনী আইন দ্বারা নির্বাচনকারী ও নির্বাচিতগণকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। তখন একমাত্র কাজারগণ ব্যতীত অন্যান্য উপজাতীয়গণকে কোন কোন বিশেষ শ্রেণীরূপে গণ্য করা হয় নাই বরং প্রতিটি প্রদেশে তাহাদিগকে স্থানীয় অধিবাসীরূপেই গণ্য করা হয় এবং কাহারও ভোটদাতার শর্ত পূর্ণ হইলেই তাহাকে ভোট প্রদানের অধিকার দেওয়া হয় (ধারা ১, নোট ১)। তবে ১৯০৯ খৃ. ১ জুলাইয়ের নির্বাচনী আইন অনুযায়ী শাহ্‌সিভান, কাশকা'ঈ, খাম্‌সা (ফারস-এর), তুর্কোমান ও বাখতিয়ারী গোত্রসমূহের প্রত্যেকের নিজেদের একজন করিয়া প্রতিনিধি সংসদে পাঠাইবার ব্যবস্থা রাখা হয় (ধারা ৬৩)। পরবর্তী কোন নির্বাচনী আইনে আর উপজাতীয় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। শাসনতান্ত্রিক সরকারের আমলের প্রথমদিকে এবং ১৯১১ খৃ. শাসনতন্ত্র সাময়িকভাবে বাতিল রাখিবার কালে দেশে যে অরাজক অবস্থা বিরাজমান ছিল সে সময়ে সরকার উপজাতীয় অঞ্চলসমূহ নিয়ন্ত্রণে রাখিতে ব্যর্থ হন। এই কারণে দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্যে যখন তৈল আবিষ্কৃত হয় তখন একদিকে ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানী এবং অপরদিকে শায়খ মুহাম্মাদ ও বাখতিয়ারীগণের মধ্যে বিশেষ চুক্তি প্রণয়ন করিতে হইয়াছিল। শেষোক্তগণ ইঞ্জিনিয়ারগণকে শ্রমিক সরবরাহ করেন এবং তৈল খনিসমূহের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পাহারদার সরবরাহ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে উপজাতীয় এলাকাসমূহে অত্যধিক অশান্তি, বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতে থাকে (অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দ্র. Sir Percy Sykes, A History of Persia, ii)। যুদ্ধের পরে রিদা (রিযা) খান (পরবর্তী নাম রিদা শাহ পাহ্‌লাবী) সমগ্র দেশব্যাপী কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। আযারবায়জানের কুর্দীদেরকে দমন করা হয় এবং নিরস্ত্র করা হয়। ১৯২৫ খৃ. বাখতিয়ারীগণ এবং কাশকা'ঈগণকে আংশিকভাবে নিরস্ত্র করা হয় আর তুর্কোমানদেরকেও কতকাংশে দমন করা হয়। পরবর্তী কালে উপজাতীয়গণকে স্থায়ীভাবে বসত করাইবার চেষ্টা করা হয় (দ্র. হাস্‌সান

আর্‌ফা, Under five Shahs, London 1964, এবং Landlord and Peasant, 181, 283 ff.)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে এবং যুদ্ধের পরেও উপজাতীয় অঞ্চলসমূহে গোলযোগ দেখা দেয়, বিশেষ করিয়া কুর্দী অধ্যুষিত আযারবায়জানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দেখা দেয় এবং ১৯৪৬ খৃ. দক্ষিণ অঞ্চলে মারাত্মক উপজাতীয় বিদ্রোহ হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ দ্র.। উপজাতি ও উহাদের স্থানান্তর গমন বিষয়ক অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যাইবে ইতিহাস-পঞ্জী (Chronicle), বংশানুক্রমিক ও স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাসে। আরও দ্র. (১) H. Field, Contributions to the Anthropology of Iran, Anthropological Series Field Museum of Natural History, xxix/1-2, 15 December, 1939; (২) X. de planhol, "Geography of Settlement", in Cambridge History of Iran, i, 1409-67 ; এবং (৩) E. Sunderland, "Pastoralism and the social Anthropology of Iran", ঐ, পৃ. ৬১১-৮৩।

A.K.S. Lambton (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

**ঈলাফ** (ايلاف) ঃ কুরআনী শব্দ (১০৬ ঃ ১-২) যাহা সম্ভবত ইসলামের আবির্ভাবের বেশ কিছু পূর্বে কুরায়শীদের সম্পাদিত চুক্তিকে বুঝায়, কিন্তু উহার পাঠে এবং ব্যাখ্যায় কতক সমস্যার উদ্ভব হয়। ইহা আল-কুরআনের ১০৬তম সূরা যাহা সাধারণত কুরায়শ (দ্র.) নামে অভিহিত। এই সূরায় কুরায়শদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যে ধন-সম্পদ ও নিরাপত্তা লাভ করিয়াছে তাহা নিছক আল্লাহ্‌র করুণা ও কা'বা গৃহের বারাকাত (বরকত)।

প্রথমত এই সূরা খুব সংক্ষিপ্ত এবং নিশ্চিতভাবেই অনেক পূর্বে নাযিল হইয়াছে। বিসমিল্লাহ-এর পর ঃ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ . اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ . فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ . الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ .

"যেহেতু কুরায়শের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে তাহাদের শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণের ; তাহারা এই কা'বা গৃহের প্রভুর 'ইবাদত করুক যিনি তাহাদিগকে ক্ষুধায় আহার দিয়াছেন এবং ভীতি হইতে নিরাপদ রাখিয়াছেন।"

কিন্তু 'উবায়্যি ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর সংকলনে পূর্বের সূরা হইতে ইহাকে পৃথক করা হয় নাই যাহাতে আসহাবু'ল-ফীল-এর উপর আল্লাহ্‌ প্রদত্ত শাস্তির বর্ণনা রহিয়াছে এবং ইহার যথার্থ সম্প্রসারণ হিসাবে সূরাটি উল্লিখিত হইয়াছে ঃ "তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রভু হস্তীর লোকদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিয়াছেন। " কুরায়শদের আসক্তি (ঈলাফ)-এর কারণে . . . (তাহাদিগকে "ইবাদত করিতে দাও. . .)"। কিন্তু পদান্বয়ী অব্যয় লি (لِ) সংযোজক অব্যয়ের অর্থবোধকও হইতে পারে অর্থাৎ "যাহাতে ঈলাফ" (সম্ভব হইতে পারে)। কুরআনের আয়াত বিশেষজ্ঞগণ ঈলাফ এবং ইল্‌ফ প্রভৃতি শব্দের পার্থক্য নিরূপণে সচেষ্ট হন এবং এই আয়াতগুলির অর্থ স্পষ্ট করিতে প্রয়াস পান।

ইহা নিশ্চিত নয় যে, দুইটি আয়াতের প্রতিটিতে ঈলাফ-এর অর্থ একই, বস্তুত প্রথমটিতে প্রকৃতপক্ষে ইহার বিশেষ্য রূপের প্রাধান্য আছে বলিয়া মনে হয় এবং দ্বিতীয়টিতে ক্রিয়ার যেন 'ঈলাফ কুরায়শ'-কে ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ বলিয়া পরিগণিত করা যায় এবং ঈলাফিহিম রিহ্‌লাতা-তাজহীর-এর সমার্থক "তাহাদের বণিকদের সংগঠন ...."।

তথাপি ঈলাফ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অর্থের দ্যোতনা লাভ করিয়াছে এবং অভিধান লেখকগণ এই শব্দের 'আহ্‌দ, যিমাম, আমান প্রভৃতি অর্থ করিয়াছেন অর্থাৎ চুক্তি, নিরাপত্তা বিধানকারী, অভয় দান, রক্ষা করার অঙ্গীকার, প্রচলিত শব্দ আখাযা'ল-ঈলাফ সম্পাদন করা। ঐতিহাসিক বর্ণনানুসারে কুরায়শগণ বিদেশী জাতির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল যাহা তাহাদের বাণিজ্যিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।

সকল বর্ণনার সর্ববাদিসম্মত রায় হইল যে, আলোচ্য চুক্তিটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রপিতামহ হাশিম ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাফের আমলে সম্পন্ন হইয়াছিল। আমরা অবগত আছি যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর আট বৎসর বয়সকালে তাঁহার পিতামহ 'আবদু'ল-মুত্তালিব ৫৭৮ খৃ. ইনতিকাল করেন। এক বর্ণনামতে তখন তিনি এক শত দশ বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন। আমরা আরও জানি যে, হাশিম ঐ চুক্তির জন্য বা চুক্তির এক বৎসর পর বণিক দলের সহিত সিরিয়া যাওয়ার পথে মদীনায় অবস্থান করেন এবং তথায় জনৈক বণিকের (উহায়হা) বিধবা স্ত্রী সুল্‌মা বিন্‌ত 'আম্‌র ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন লাবীদের সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অতঃপর সিরিয়ায় পৌঁছার পর আকস্মিকভাবে রোগাক্রান্ত হন এবং তথায় ইনতিকাল করেন। তাঁহার এই পত্নীর গর্ভেই মদীনায় 'আবদু'ল-মুত্তালিবের জন্ম হয়।

ইব্‌ন সা'দ (১/১খ, ৪৩-৪৬) এই ঘটনার বিবরণে লিখিয়াছেন, আল-কাল্‌বীর বর্ণনা হিসাবে আল-মুত্তালিব নাজাশীর নিকট হইতে (য়ামানের জন্য 'আব্‌দ শাম্‌স) হাব্‌শ রাজ্যসমূহের জন্য, হাশিম ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাফ হিরাক্লের নিকট হইতে সিরিয়ার জন্য এবং নাওফাল ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাফ কিস্‌রার নিকট হইতে ইরাক ও ইরানের জন্য এই অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করিবেন। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, শীত মৌসুমে তাঁহারা য়ামান ও হাবশায় এবং গ্রীষ্মকালে গাযযা তথা আঙ্কারা পর্যন্ত বাণিজ্য সফর করিতেন। ইব্‌ন সা'দ লিখিয়াছেন, হাশিম ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাফ কায়সার-ই রূমের সহিত চুক্তি করিয়াছিলেন যে, কুরায়শ বণিকগণ বায়যানটীয় এলাকায় ব্যবসার জন্য গমনাগমন করিবে। উপরন্তু কায়সার হাব্‌শ সম্রাট নাজাশীর নিকট এই মর্মে একখানি সুপারিশপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, অনুগ্রহপূর্বক তিনি যেন কুরায়শদিগকে হাব্‌শায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রদান করেন। হাশিম বাণিজ্য পথের 'আরব গোত্রসমূহের সহিত চুক্তি সম্পন্ন করেন। তাহা এই ছিল যে, কুরায়শ কাফেলাকে যদি তাহারা নিরাপদে সফর করিতে দেয় তাহা হইলে কুরায়শরা কোনও পারিশ্রমিক ব্যতিরেকে তাহাদের বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাইবে। আত-তাবারীর (তা'রীখ, ১খ., পৃ. ১০৮৯ প.) বর্ণনানুসারে হাশিম সিরিয়ায় রোম ও গাস্‌সানী বাদশাহদের সংগে এবং তাঁহার ভাই 'আব্‌দ শাম্‌স হাবশায় সফর করত নাজাশীর সংগে অনুরূপ চুক্তি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। হাশিমের তৃতীয় ভ্রাতা নাওফাল কিস্‌রার দরবারে উপস্থিত হইয়া ইরাক-ইরানে বাণিজ্য সফরের অনুমতি লাভ করেন। সর্বকনিষ্ঠ আল-মুত্তালিব য়ামান গমন করেন এবং তথাকার হিম্‌য়ারী শাসকদের সঙ্গে মিলিত হইয়া অনুরূপ ব্যবস্থা করেন। ৪৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম পাদে ইরানে ছিল ফীরোয-এর শাসনকাল (ইব্‌ন হাবীব-এর বর্ণনামতে তিনি ৪৫৫-৪৮২ খৃ. পর্যন্ত এবং Noldeke-এর বর্ণনা অনুযায়ী ৪৫৮-৪৮৪ খৃ. পর্যন্ত ইরান শাসন করেন)।

আল-য়া'কূবী বলেন যে, কু'রায়শগণ অত্যন্ত দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন যাপন করিতেছিল। মক্কার চৌহদ্দীতেই তাহাদের কারবার সীমিত ছিল। এই অস্বচ্ছন্দ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য হাশিম সিরিয়ায় সফর করেন। সেখানে তাঁহার দূরদৃষ্টি ও গুণাবলীর কথা কায়সারের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহাকে বাণিজ্যের সুযোগ প্রদান করেন এবং তথায় হিজাযের চামড়া ও বস্ত্র বিক্রয়ের অনুমতি দেন। প্রত্যাবর্তন কালে হাশিম পথের গোত্রসমূহের সঙ্গে বাণিজ্যিক কাফেলার নিরাপত্তা বিধানের চুক্তি সম্পন্ন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কুরায়শগণ আবিসিনিয়ায় ব্যবসা সম্পর্কে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়। সুতরাং 'আবদ শাম্স তথায় গমন করত নাজাশীর সংগে চুক্তি নবায়ন করিয়া লন।

ইব্ন হাবীব (আল-মুনাম্মাক', বাব হাদীছি'ল-ঈলাফ, পৃ. ২২-২৭) আল-কালবীর বরাতে ইহার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন। তিনি বলেন, হাশিম কায়সারকে এই আশ্বাস দিলেন, আমরা সরাসরি হিজাযী দ্রব্য আমদানী করিব। ফলে আপনারা অতি সুলভে উহা সংগ্রহ করিতে পারিবেন (فهو ارخص لكم)। কায়সারের অনুমতি লাভ করিয়া হাশিম মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একটি বিরাট দলসহ সিরিয়ায় রওয়ানা হইলেন। এই সফরেই ফিলিস্তীনের গাযযায় তাঁহার ইনতিকাল হয়। এইরূপ বাণিজ্য ভ্রমণেই 'আল-মুত্ত'ালিব য়ামানে আরাদামান নামক স্থানে এবং নাওফাল ইরাকের সালমান নামক এক জায়গায় ইনতিকাল করেন। একমাত্র 'আব্দ শাম্সই মক্কায় ইনিতকাল করেন। কবি মাত্‌রূদ আল-খুযা'ঈ এই ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের চার দেশে ইনতিকাল সম্পর্কে নিম্নের কবিতাটি রচনা করেন।

قبر بسلمان وقبر باردمان * وقبر عند غزات

وميت مات قريبا لدى اله * يحجون من رقى الثنيات

"একটি সমাধি সালমানে, একটি আরদামানে, আর একটি গাযযায়। অন্যজন ইনতিকাল করিয়াছেন ইলাহ-এর নিকটে যেখানে হজ্জ পালন করা হয় পর্বত চূড়ায়"।

ইব্নু'ল-কাল্বী আরবের বার্ষিক বৃহৎ মেলাসমূহের (اسواق العرب) যে বিবরণ দিয়াছেন (ইব্ন হাবীব, আল-মুহাব্বার, পৃ. ২৬৩-২৬৮; আল-মারযুকী, আল-আযমিনা ওয়া'ল-আমকিনা, ৩খ, ১৬৩-১৭০; আল-য়া'কূবী, আত-তারীখ; ১খ., ৩১৩-৩১৫) তাহা হইতে জানা যায় যে, কুরায়শরা 'আরবের অভ্যন্তরেও একটি বাণিজ্য-নীতি গঠন করিয়াছিল। উত্তরে দূমাতু'ল-জান্দালে (دومة الجندل), পূর্বে বাহরায়ন ও 'উমানে এবং দক্ষিণে হাদরামাওত ও য়ামানের মেলাগুলিতে তাহারা সর্বদা উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করিত। 'উকাজ' মেলা তো তাহাদেরই আয়ত্তে ছিল। ইব্ন হ'াম্বালের আল-মুসনাদে (৪খ., ২০৬) বর্ণিত হইয়াছে যে, নবূওয়াত লাভের পূর্বে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) 'আব্দু'ল-কায়স গোত্র এলাকায় বাহরায়ন ও আল-কাতীফে দীর্ঘ বাণিজ্য-সফর করিয়াছেন। সিরিয়া ও য়ামানেও তাঁহার বিভিন্ন সফরের কথা বর্ণিত আছে। উক্ত মেলাসমূহে পবিত্র মাসসমূহের (اشهر الحرام) বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইত। কোনও কোনও কু'রায়শ গোত্র বাস্ল রীতি অনুসারে (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৬৬, امر البسل) প্রতি বৎসর আট মাস নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারিত। এই আট মাস যদি আল-আশহুরু'ল-হুরুম (পবিত্র মাসসমূহ)-এর অতিরিক্ত হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, গোটা বৎসরই তাহারা সারা 'আরবে নিরাপত্তার সহিত চলাফেরা করিত।

এইভাবে আল-কুরআনের ঈলাফ সূরায় কুরায়শদিগকে অনাহার ও বিপদাশংকা হইতে মুক্তিলাভের যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। ইব্ন হাবীব (আল-মুনাম্মাক, বাব হাদীছি'র-রিহ্লাতায়ন, পৃ. ১৬৯, ১৭০) ইব্নু'ল-কাল্বীর বরাতে বর্ণনা করেন যে, কুরায়শগণ প্রথমত প্রতি বৎসর শীতকালে য়ামানে এবং গ্রীষ্মের মৌসুমে সিরিয়ায় সফর করিতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে (সম্ভবত ধনাঢ্যতার কারণে) ইহা তাহাদের নিকট বোঝাবহ মনে হইতে লাগিল। ফলে তাবালা, হ'াব্শ ও য়ামানের উপকূলীয় অধিবাসীরা মক্কায় দ্রব্যসহ আগমন শুরু করিল। স্থলপথের ব্যবসায়িগণ আল-মুহস্সাবে (মক্কার অন্তর্গত) এবং সমুদ্রপথে আগত বণিকগণ জিদ্দাতে তাহাদের মালামাল পৌঁছাইত। এইভাবে মক্কাবাসীরা প্রতি বৎসর দুইটি দীর্ঘ সফর হইতে রেহাই পাইল। কিন্তু কয়েক বৎসর অনবরত দুর্ভিক্ষের ফলে তাহাদের সঞ্চিত ধন নিঃশেষ হইয়া যায়। বাধ্য হইয়া হাশিম সিরিয়ায় সফর করেন এবং তথা হইতে বহু রুটি তৈরি করিয়া আনেন। তিনি ইহা চূর্ণ করিয়া (هشم) শুরুয়াসহ (ছারীদ) রান্না করিলেন এবং মক্কাবাসীদিগকে আহার করাইলেন। অতএব তাঁহার উপাধি হইল হাশিম (বিচূর্ণকারী)। এই প্রসঙ্গে কবি 'আব্দুল্লাহ্ ইবনুয-যিবা'রা-র 'আরীর একটি পঙক্তি উল্লেখ করা যায়ঃ عمرو العلى هشم الثريد لقوم অর্থাৎ 'আমরু'ল-'উলা তাহার কাওমের জন্য আটা দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য চূর্ণ করিয়াছে'। উল্লিখিত ঘটনা ইব্ন সা'দ ১/১খ, ৪৩-এর ভাষ্য অনুসারে পেশ করা হইল। কিন্তু আত-তাবারীর বর্ণনানুসারে হাশিম ফিলিস্তীন হইতে আটা ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন এবং মক্কায় উহা দ্বারা রুটি তৈরি করা হইয়াছিল (১/৩খ, ১০৮৯)। নিজামু'দ-দীন আল-কুম্মী-কৃত তাফসীর গারাইবি'ল-কু'রআনের (আত-তাবারীর টীকা, ৩০খ. ১৭০) বর্ণনা অনুযায়ী হাব্শীগণ জিদ্দায় দ্রব্যাদি লইয়া আসিত এবং মক্কাবাসীরা তথা হইতে উহা ক্রয় করিয়া উট ও গাধার পৃষ্ঠে বহন করিয়া আনিত)। আল-বালাযুরী (আনসাবুল-আশ্রাফ, ২খ., ৪২৫ ও ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহ, আল-'ইক্দু'ল-ফারীদ, ২খ., ৪৭)-রবিবৃত ঘটনা সম্ভবত ঐ দুর্ভিক্ষ কালেই সংঘটিত হইয়া থাকিবে। তাঁহারা বর্ণনা করেন যে, একবার দুর্ভিক্ষের সময় কয়েকজন হাবশী বণিক ব্যবসার মাল লইয়া মক্কায় আগমন করিলে মক্কার কয়েকজন যুবক দুর্বৃত্ত তাহাদের মাল লুণ্ঠন করে। ফলে কুরায়শগণ হাব্শ হইতে রসদ আমদানী বন্ধ হওয়ার আশংকা বোধ করিল এবং নাজাশীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। বন্ধকস্বরূপ তাহারা নাজাশী আবূ য়াকসূম (অর্থাৎ আকসূমের রাজা)-এর নিকট কুরায়শের কয়েক ব্যক্তিকে বন্ধক রাখিয়াছিল।

'ইহা মনে করাটা অযৌক্তিক নয় যে, এই সূরা কোন এক দুর্ভিক্ষের পরোক্ষ উল্লেখ যাহা এইসব সম্পাদিত চুক্তির বদৌলতে বিভিন্ন দেশের নিকট হইতে প্রাপ্ত সরবরাহের ফলে নিবারণ করা হইয়াছিল।

এইসব চুক্তি কখন সম্পাদিত হইয়াছে ম. হ'ামীদুল্লাহ (দেখুন গ্রন্থপঞ্জী) সেগুলির তারিখ নির্ধারণের চেষ্টা করেন এবং ৪৬৭ খৃ. স্থির করেন এই যুক্তিতে যে, 'আবদু'ল-মুত্ত'ালিব বায়যানটীয়দের সঙ্গে তাঁহার পিতার প্রথম চুক্তি সম্পাদনের এক বৎসর পর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৫৭৮ খৃ. ১১০ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। কিন্তু এই বর্ণনাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও প্রস্তাবিত তারিখ সম্ভবত কয়েক দশক আগাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ 'আবদু'ল-মুত্তালিবের বয়স বোধ হয় অত্যন্ত অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) ইব্‌ন হাবীব, আল-মুহাব্বার, ১৬২-৬৪; (২) ঐ লেখক, আল-মুনাম্মাক (পাণ্ডু. নাসিরিয়া গ্রন্থাগার, লখনৌ), ২২-২৭, ১৬৯-৭০; (৩) আত-তাবারী, আত-তা'রীখ, ১খ., ১০৮৯, ১০৯০; (৪) ইব্‌ন সাদ, আত-তাবাকাত, ১/১খ, ৪২-৪৩; ৪৫-৪৬; (৫) ইব্‌ন হিশাম, সীরাতু রাসূলিল্লাহ্, (সং, য়ুরোপ) ৩৬-৩৮, ৮৭-৮৯, ১১৩-১৪; (৬) আল-মাস'ঊদী, মুরূজু'য-যাহাব (সং, য়ুরোপ), ৩খ, ১২১, ১২২; (৭) আস-সুহায়লী, আর-রাওদু'ল-উনুফ, ১খ. ৪৮, ৯৪-৯৭, ১১৭; (৮) নিজামু'দ-দীন হাসান ইব্‌ন হুসায়ন আল-কুম্মী আন-নীশাবুরী, তাফ্‌সীর গারাইবি'ল-কুরআন ওয়া রাগাইবি'ল-ফুরকান (আত-তাবারীর টীকা), ৩০খ. ১৭০; (৯) আল-য়া'কূবী, আত-তারীখ, ১খ., ২৮০-৮৭, ২খ., ৫৪; (১০) মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ্, 'আহ্‌দ-ই নাবাবী কে নিজাম-ই হুকুমরানী (২য় সং, হায়দরাবাদ [দাক্ষিণাত্য]), পৃ. ২৪৯, ২৫৩; (১১) ঐ লেখক, আল-ঈলাফ, On les rapports economico-diplomatiques de la Mecque Pre, islamique in Melanque Massignon, ii, 293-391 (with unpublished text of the Munammaq of Ibn Habib)।

মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ (দা.মা.ই., E.I.[2], সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পরিমার্জিত)/আবুল বাশার মু. সাইফুল ইসলাম ও আ.খা.মু. আবদুল মান্নান

**ঈলিয়া (দ্র. আল-কুদ্‌স)**

**ঈলিয়া আবূ মাদী** (ايليا ابو ماضى) ঃ (১৮৮৯-১৯৫৭ খৃ.) প্রখ্যাত 'আরব কবি ও সাংবাদিক। লেবাননের অন্তর্গত আল-মুহায়দিছায় জন্মগ্রহণ করেন। অনেকের মতে তাঁহার জন্মতারিখ ১৮৯১ খৃ.; কেহ কেহ ১৮৯৪ খৃ.ও বলিয়াছেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের পর ১৯০১ খৃ. মতান্তরে ১৯০২ খৃ. এগার বৎসর বয়সে ইসকান্দারিয়া (মিসর) গমন করেন। সেইখানে দিনের বেলা সিগারেট বিক্রয় করিতেন এবং রাত্রিকালে সারফ ও নাহ্‌ব ('আরবী ব্যাকরণ) পড়িতেন। অবসর সময়ে কাব্যচর্চা করিতেন। মিসরে এগার বৎসর অবস্থানের পর ১৯১১ খৃ. মতান্তরে ১৯১২ খৃ. আমেরিকা গমন করেন এবং তাঁহার ভ্রাতা মুরাদের সঙ্গে একত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন, কিন্তু ব্যবসায় তাঁহার মন বসে নাই। ফলে ১৯১৬ খৃ. নিউইয়র্কে সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন। প্রথমে "আর-রাবিতাতু'ল-কালামিয়্যা"-র সহিত জড়িত হন। অতঃপর "আল-মাজাল্লাতু'ল-'আরাবিয়্যা"-র সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ইহার পর আল-ফাতা-র এবং পরবর্তীতে ১৯১৮ হইতে ১৯২৮ খৃ. পর্যন্ত মিরআতু'ল-গার্‌ব" পত্রিকার সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯২৯ খৃ. পাক্ষিক "আস-সামীর" প্রকাশ করেন এবং ১৯৩৬ খৃ. ইহাকে দৈনিক সংবাদপত্রে উন্নীত করেন। আমৃত্যু (১৯৫৭ খৃ.) তিনি উক্ত দৈনিকে বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। মিসরে অবস্থাকালে তিনি "তাযকারু'ল-মাদী" (تذكر الماضى) নামে তাঁহার সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। রাজনৈতিক বিধি-নিষেধের কারণে তিনি দেশাত্মবোধক কবিতাগুলি উক্ত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হন নাই। ১৯১৮ খৃ. গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড "দীওয়ান ঈলিয়া আবী মাদী" (ديوان ايليا ابو ماضى) নামে প্রকাশিত হয়। জিব্রান ইহার ভূমিকা লিখেন। ইহার তৃতীয় খণ্ড ১৯২৭ খৃ. মীখাঈল নু'আয়মা-র ভূমিকাসহ "আল-জাদাবিল" (الجداول) নামে প্রকাশিত হয়। "আল-মাখা'ইল" (الخمائل) নামে ১৯৪০ খৃ. ইহার চতুর্থ খণ্ড মুদ্রিত হয়। এই চারিটি খণ্ডই নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত হয়। আত-তিব্‌র ওয়া'ত-তুরাব" (التبر والتراب) নামে ইহার পঞ্চম খণ্ড তাঁহার মৃত্যুর পর হস্তগত হয়। তিনি যতদিন মিসরে অবস্থান করিয়াছিলেন, ততদিন আল-বাওয়ারদী, সাবরী, শাওকী ও হাফিজ-এর কাব্যরীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমেরিকায় গমনের পর তাঁহার কাব্যরীতিতে পরিবর্তন সূচিত হয়। তখন তিনি নূতন কাব্যরীতি "মাহ্‌জারী"-র প্রবর্তন করেন। ইহা স্বকীয় সাবলীলতা, সহজ ব্যঞ্জনা ও বাস্তবমুখিতার জন্য প্রসিদ্ধ। "আর-রাবিতাতু'ল-কালামিয়্যা"-র মাধ্যমেই তাঁহার কাব্য প্রতিভার বিকাশ ও খ্যাতি ঘটে। তিনি "মাহজারী" কাব্যরীতিতে চিন্তা ও মত্ততা এবং কলা ও সৌষ্ঠবে নব জীবন সঞ্চার করেন। তিনি সর্বদা আমেরিকার কোলাহলপূর্ণ জীবনের উপর লেবাননী পল্লীগ্রামের শান্ত-স্নিগ্ধ জীবনকে প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু কোলাহলপূর্ণ সেই আমেরিকান জীবনধারাকে বর্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যে আদর্শ সমাজজীবনের প্রতি উদাত্ত আহ্বান রহিয়াছে। জীবন-প্রেম হইল তাঁহার কাব্যের পয়গাম। তিনি দুর্বল ও দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ন্যায় ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার মূল্যবোধ জাগ্রতকরণের ক্ষেত্রে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। তাঁহার দৃষ্টিতে পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যেই সফলতার বীজ নিহিত। "ফালসাফাতু'ল-হায়া নামক তাঁহার কবিতাটি তাঁহার কাব্যপ্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। ১৯৪৯ খৃ. তিনি ইউনেস্কোর একটি সভায় যোগদান করার জন্য বৈরূত আগমন করিলে লেবানন ও সিরীয় সরকার সাহিত্যে তাঁহার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁহাকে সম্মানজনক পদ ও উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৫৭ খৃ. তাঁহার ইন্তিকাল হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) মুহ্‌য়ি'দ-দীন রিদা, বালাগাতু'ল-'আরাব ফি'ল-কারনিল-'ইশরীন, কায়রো ১৯২৪ খৃ.; (২) তাহির খামীর এবং Kampffmeyer, Leaders in Contemporary Arabic Literature (১৯৩০ খৃ.), ১খ, ১১-১২; (৩) জর্জ সায়দাহ, আদাবুনা ওয়া উদাবাউনা'ল-মুহাজির আল-আমরিকিয়্যা, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ.; (৪) 'ঈসা আন-না'উরী, আদাবু'ল-মাহজার, কায়রো ১৯৫৮ খৃ., ৩৭৪-৩৮৭; (৫) ঐ লেখক, ঈলিয়া আবূ মাদী, রাসূলু'শ-শি'র আল-'আরাবী আল-হাদীছ, লেবানন ১৯৫৮ খৃ.; (৬) নাজদাত ফাতহী সাফওয়াত, ঈলিয়া আবূ মাদী; (৭) 'আবদু'ল-মাজীদ 'আবিদীন, বায়না শা'ইরায়ন আবূ মাদী ওয়া 'আলী মাহ্‌মূদ তাহা; (৮) 'আবদু'ল-লাতীফ, ঈলিয়া আবূ মাদী, দারুস-সাদির ১৯৬১ খৃ.; (৯) সারকীস, মু'জামু'ল-মাতবূ'আত আল-'আরাবিয়্যা, ৪৪৩-৪; (১০) আল-মুক্‌তাতাফ, নং ৭১ (নভেম্বর ১৯২৭), পৃ. ৩৪৫; নং ৭৫ (জুন ১৯২৯), পৃ. ১১০; (১১) আল-হিলাল, নং ৩৬ (নভেম্বর ১৯২৭), পৃ. ১১১; (১২) আল-মাওসূ'আতু'য-যাহাবিয়্যা, নিউইয়র্ক ১৯৬৩-৬৪ খ., ২খ., ১৫২-৩।

'আবদুল-কায়্যূম (দা.মা.ই.)/আবুল বাশার মু. সাইফুল ইসলাম

**ঈশান** (ايشان) ঃ ফারসী ভাষায় ব্যক্তিবাচক সর্বনামের নাম পুরুষের বহুবচন। শব্দটি সম্মান ও মর্যাদা নির্দেশকরূপে বরাবর ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। পূর্বে ইহা মধ্য এশিয়ার [অর্থাৎ বর্তমান সোভিয়েত মধ্য এশিয়া ও চীনের স্ব-শাসিত অঞ্চল সিনকিয়াং উইগুর (Uygor)]-এর মুরীদ (শিষ্য বা ছাত্র)-এর বিপরীত শায়খ বা মুরশিদ (শিক্ষক বা পথপ্রদর্শক)

অর্থে ব্যবহৃত হইত। কখন শব্দটি এই অর্থে প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা নিরূপিত হয় নাই। মধ্যযুগে নিশ্চিতভাবে ইহা বিদ্যমান ছিল। প্রসিদ্ধ খাজা আহরার (মৃ. ৮৯৫/১৪৯০ সনে সামারকান্দে) তাঁহার জীবনী গ্রন্থে বরাবর 'ঈশান' আখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছেন। 'ঈশান' পদমর্যাদা প্রায়ই বংশগত ছিল। একজন ঈশান তাঁহার অনুসারীদের সহিত খানকাহ্-তে এবং কখনও এক সাধকের মাযারস্থলে বাস করিতেন। অধিকাংশ ঈশান মাঝে মাঝে কাযাখ (Kazakh) শুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেন, যেখানে স্থায়ী অঞ্চল অপেক্ষা তাঁহাদের ভক্ত সংখ্যা ছিল অধিকতর এবং তাঁহারা উৎকৃষ্টতর উপহার সামগ্রী লাভ করিতেন। ১৮৯৮ খৃ. আন্দিযান (Andizhan)-এ একজন দুক্‌চি ঈশান-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ শুরু হইলে ঈশানগণের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ঈশানদের সম্বন্ধে খুব সামান্যই লিখিত হইয়াছে। যেহেতু সোভিয়েত ও চীন কর্তৃপক্ষ ঈশানদের অস্তিত্বেরই প্রবলভাবে উপেক্ষা করিত, সুতরাং শব্দটি এখন প্রায় অপ্রচলিত হইয়া যাইতেছে, যদিও অচল হয় নাই। বাংলা ভাষায় উত্তর-পূর্ব কোণকে ঈশান কোণ বলা হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) J. Geijer, Materiali k izuceniyu bitovikh cert musul'manskogo nascleniya Turkestanskogo kraya. I. Ishani (Sbornik materialov dlya statistiki Sir-Darinskoy oblastyi, vol. i); (২) Sbornik materialov po musul'manstvu, St. Petersburg 1899; (৩) Sattar-Chan, Musul'manskie ishani (pravoslavniy Sobesednik, Sept. 1895, and later N. P. Ostfoumov, Sarti, izd. 3e, Tashkent 1908, 206 f.); (8) Prince V. Masal'skiy, Turkestanskiy kray, St. Petersburg 1913, 355 f.; (৫) Er. v. Schwarz, Turkestan, Freiburg im Breisgau 1900, 198.

W. Barthold [G. E. Wheeler] (E. I.[2])/মোহাম্মাদ ওয়াহিদুল ইসলাম

**ঈশীক আকাসী** (ایشیك اقاسی) ঃ সাফাবী প্রশাসনিক পরিভাষা (দ্বারে দণ্ডায়মান অভ্যর্থনাকারী, দ্বাররক্ষী)। ঈশীক আকাসীগণ ছিল যথাক্রমে উচ্চ ও নিম্নপদস্থ রাজ-কর্মচারী। ইহারা প্রশাসনের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন শাখায় অর্থাৎ দীওয়ান (দ্র.) এবং হারেম (দ্র.)-এর অধীনে কাজ করিত। দুইটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পদবী ছিল যথাক্রমে ঈশীক-আকাসী বাশী-য়ি দীওয়ান-ই আ'লা এবং ঈশীক-আকাসী বাশী-য়ি হারাম। উভয় কর্মকর্তারই অধীনে ঈশীক আকাসী শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য কর্মচারীও নিয়োজিত থাকিত। এই দুই কর্মকর্তার মর্যাদা ও ক্ষমতার মধ্যে ছিল অনেক পার্থক্য।

(১) ঈশীক আকাসী-বাশী-য়ি দীওয়ান-ই আলা ঃ Kaenpfer কর্তৃক Supremus aulae Mareschallus নামে অভিহিত এই কর্মকর্তার পদটি প্রাথমিক যুগের সাফাবী রাষ্ট্রের কর্মকর্তাগণের তালিকাভুক্ত ছিল না। এই পদটির সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় (৯৮৫/১৫৭৭-৮) দ্বিতীয় ইসমা'ঈল-এর রাজত্বকালে (ইসকান্দার বেগ মুন্‌শী, তা'রীখ-ই 'আলাম-আরা-য়ি 'আব্বাসী, ১খ, ১৬৩) এবং তখন হইতে বিভিন্ন সূত্রে বারবার ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। সাধারণত এই পদটির ধারক ব্যক্তি হইলেন একজন কিযিলবাশ আমীর। প্রথম 'আব্বাস (৯৯৬/১৫৮৮-১০৩৮/১৬২৯)-এর আমলে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার গঠনে পরিবর্তন করা হইলে ঈশীক আকাসী-বাশী-য়ি দীওয়ান-ই আ'লা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ছয়জন প্রধান কর্মকর্তার একজনের মর্যাদায় উন্নীত হন। ফলে তিনি আমীরগণের সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্যরূপে পরিগণিত হন (দীওয়ান, জানকী)। দ্বিতীয় 'আব্বাস (১০৫২/১৬৪২-১০৭৭/১৬৬৬)-এর আমলে তিনি বাস্তবিকই একজন অতি শক্তিশালী কর্মকর্তা ছিলেন এবং যদিও ইহার পর হইতে তাঁহার মর্যাদার অবনতি ঘটিতে থাকে এবং তাঁহার কর্তব্যকর্ম প্রধানত আনুষ্ঠানিকতায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। তথাপি আনুমানিক ১১৩৮/১৭২৮-এ লিখিত তাযকিরাতু'ল-মুলূক (পৃ. ৪৭)-এ তাঁহাকে উচ্চপদস্থ 'আলী জাহ্ আমীরগণের মধ্যে তালিকাভুক্ত করা হয়।

(২) ঈশীক আকাসী-বাশী-য়ি হারাম ঃ তুলনামূলকতভাবে নিম্নপদস্থ একজন কর্মকর্তা। ইনি মুকাররাবু'ল-হাদরাত নামক কর্মচারী শ্রেণীর ঊর্ধ্বতনরূপে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। এই সকল কর্মচারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল হারাম-এর প্রবেশদ্বারে অথবা বহির্দেশে।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) তাযকিরাতু'ল-মুলূক, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা v. Minorskey, লণ্ডন ১৯৪৩ খৃ., নির্ঘণ্ট দ্র. এবং স্থা.।

R. M. Savory (E.I.[2])/আবদুল বাসেত

**ঈশ্বরগঞ্জ** ঃ উপজেলা, ময়মনসিংহ জেলা, আয়তন ২৮৬.১৯ বর্গকিমি। উত্তরে গৌরীপুর উপজেলা, দক্ষিণে নান্দাইল উপজেলা, পূর্বে কেন্দুয়া উপজেলা ও পশ্চিমে ত্রিশাল উপজেলা (বাংলাপিডিয়া, ১খ, ৪৫৮; ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা, ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা, পৃ. ১)। ঈশ্বরগঞ্জ থানা সৃষ্টি ১৯৩৬ খৃ.। বর্তমানে ইহা উপজেলা। পৌরসভা ১, ইউনিয়ন ১১, মৌজা ২৯৩, গ্রাম ২৯৬। উপজেলা শহর ৭টি মৌজা লইয়া গঠিত। আয়তন ১৩.০২ বর্গকিমি। পৌরসভা সৃষ্টি ১৯৯৭ খৃ.। জনসংখ্যা ২১,৩৬৫ জন, পুরুষ ৫১.৯৩%, মহিলা ৪৮.০৭%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমি ১৬৪১ জন। শিক্ষার হার ৪১.২%, পুরুষ ২৯.০৯%, মহিলা ১৬.০৪% (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ১৯৯১ খৃ.; বাংলাপিডিয়া, ১খ, ৪৫৮-৫৯)।

ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলায় কখন কিভাবে ইসলাম প্রচার শুরু হইয়াছিল সেই সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। তবে ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে কিছু সংখ্যক পীর-আওলিয়া ময়মনসিংহ অঞ্চলে আগমন করিয়া ইসলামের সার্বজনীন ন্যায়নীতি, ইনসাফ ও সাম্যের বাণী প্রচার ও ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজদিগকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শাহ সুলতান কামরুদ্দীন রূমী (র) অন্যতম (নূরুল হোসেন খন্দকার, শাহ সুলতান রূমী (র), ইফাবা, জুন ১৯৮৭ খৃ., পৃ. ১)।

জনসংখ্যা ৩০৬৯৭৭ জন, পুরুষ ৫০.৮০%, মহিলা ৪৯.২০%, মুসলমান ৯৫.০৮%, হিন্দু ৪.১৫%, খৃস্টান ০.১৯%, বৌদ্ধ ০.১৯%, অন্যান্য ০.৪৮% (বাংলাপিডিয়া, ১খ, পৃ. ৪৫৮)। শিক্ষার হার, পুরুষ ২৭.৯%, মহিলা ১৬.৪%। কলেজ ৬টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২১টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯টি, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৪টি (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ১৯৯১ খৃ. ও বাংলাপিডিয়া, ১খ, পৃ. ৪৫৮)।

পেশাসমূহ ঃ কৃষি ৫৭.৬৬%, বন ও মৎস্য ১.৪৯%, কৃষি শ্রমিক ১৯.৩%, অকৃষি শ্রমিক ২.৫৬%, ব্যবসা ৬.৫৬%, চাকরি ২.৮১%,

অন্যান্য ৯.৬২%। চাষযোগ্য জমি ২৭,৯৮১.৭৯ হেক্টর। এক ফসলি জমি ৮.২৮%, দোফসলি ৮১.৫৩%, তিন ফসলি ১০.১৯% ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা, ঈশ্বরগঞ্জ; উপজেলা, পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ১৯৯১ খৃ; বাংলাপিডিয়া, ১খ, পৃ. ৪৫৯)। প্রধান ফল-ফলাদি আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, কলা, নারিকেল, তাল, জামরুল (প্রাগুক্ত)।

**যোগাযোগঃ** পাকা রাস্তা ২৪ কি.মি, আধাপাকা রাস্তা ১০ কি.মি, কাঁচা রাস্তা ৫৫৫ কি.মি।

**কুটির শিল্পঃ** তাঁত ৬৪, বাঁশের কাজ ১৫১, স্বর্ণকার ৪৮, কামার ৬২, কুমার ৬০, কাঠের কাজ ২২৫, সেলাই কাজ ২৩২, ওয়েল্ডিং ৫৩ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ১৯৯১ খৃ; ভূমি ও মৃত্তিকাসম্পদ নির্দেশিকা ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা, বাংলাপিডিয়া, ১খ, ৪৫৯)। প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ধান, পাট, গম, আলু, কলা।

স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১টি, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ৬টি, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৯ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ১৯৯১ খৃ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯)। নদনদী ঃ প্রধান নদী পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, মঘা, সোয়াই ও কাঁচামাটিয়া। কাইলা, সিন্নি, দীঘা, কাটলা ও দলিয়ার বিল উল্লেখযোগ্য।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ ১৯৯১ খৃ; (২) ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ নির্দেশিকা, ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা, ময়নসিংহ জেলা; (৩) জুরিসডিকশন লিষ্ট, ঈশ্বরগঞ্জ থানা, ময়মনসিংহ জেলা ১৯৬২খৃ; (৪) বাংলাপিডিয়া ২০০৩, পৃ. ৪৫৮-৫৯, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খৃ.।

**মুহাম্মদ আবদুল মালেক**

**ঈশ্বর দাস** (ایشور داس) ঃ আওরাঙ্গযীবের রাজত্বকালে দুইজন হিন্দু ঐতিহাসিকের অন্যতম। তিনি পাতান (মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণিত নাহরাওয়াল অথবা আনহাল ওয়া বাই পাতান)-বাসী নাগারা ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১০৬৬/১৬৫৫ সালে তাঁহার জন্ম। তিনি তাঁহার নিজ শহরে ফারসী ভাষা ও রসাত্মক সাহিত্যে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ১০৯৬/১৬৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি কাযী 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব-এর পুত্র কাযী শায়খু'ল-ইসলাম-এর পত্র লেখক ও লিপিকার ছিলেন। শায়খু'ল-ইসলাম ১০৮৬/১৬৭৫ হইতে ১০৯৬/১৬৮৩ সাল পর্যন্ত কাযী বা পেশকার ছিলেন। বাদশাহ আওরাঙ্গযীবের সঙ্গে কোন কারণে মতান্তর হওয়ায় কাযী শায়খু'ল-ইসলাম তাঁহার চাকুরীতে ইস্তফা দেন এবং ১০৯৫ মুহাররাম মাসে/১৬৮৪ ডিসেম্বর মাসে তিনি মক্কায় হজ্জ করিতে যান। ইহাতে ঈশ্বর দাসও চাকুরীচ্যুত হইয়া পড়েন। তখন তিনি গুজরাটের শাসনকর্তা সাজ্জাদ খান-এর অধীনে ১০৯৮/১৬৮৬-৮৭ সাল হইতে ১১১৩/১৭০১ সাল পর্যন্ত চাকুরীতে ছিলেন। সাজ্জাদ খান তাহাকে জোধপুর পরগণার কতগুলি মহল্লার আমীন (খাজনা আদায়কারী) নিযুক্ত করেন। এইখানে তিনি রাঠোরদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন যাঁহারা বাদশাহ্-র কোন কোন ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নীতির প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করিতেন। অবশেষে জোধপুরের বিদ্রোহী সর্দার দুর্গা দাস রাঠোরের সম্রাটের পক্ষে আনুগত্য আদায়ে সমর্থ হন।

আওরাঙ্গযীবের পুত্র মুহাম্মাদ আকবারের কন্যা শাহযাদী শাফিয়াতু'ন-নিসাকে রাঠোরদের হাত হইতে উদ্ধার করিবার কূটনৈতিক দায়িত্ব সাজ্জাদ খান ঈশ্বর দাসের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। মুহাম্মাদ আকবার ১০৯২/১৬৮১ সালে তাঁহার ব্যর্থ বিদ্রোহের পর পারস্যে পলায়নকালে (১০৯৯/১৬৮৭) তাঁহার কন্যাকে রাঠোরদের কাছে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। ঈশ্বর দাস উক্ত কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনে সফলকাম হইয়াছিলেন। শাহী পরিবারের প্রতি তাঁহার এই খেদমতের স্বীকৃতিস্বরূপ বাদশাহ তাঁহার পদমর্যাদা ২০০ হইতে ২৫০ অশ্বারোহীর অধিনায়কের পদে উন্নীত করেন এবং তাঁহাকে সম্মানসূচক পোশাক বা খিল'আত দেন। তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রভু সাজ্জাদ খানও তাঁহাকে আজমীরের পশ্চিমে মার্থা অঞ্চলে একটি জায়গীর প্রদান করেন (Storey, ১/১খ., ৫৮৭ বর্ণিত দিল্লীর নিকটবর্তী মীরাট নহে)। তাহার পর হইতে তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। কেবল ইহাই জানা যায় যে, তিনি ৭৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার ফারসী। (فارسی) ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ফুতূহ-ই 'আলামগীরী-র জন্যই তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন (এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান, Rieu, CPM. Additional ২৩৮৮৪, ইডেনবার্গ ২১৮)। এই পুস্তক রচনা ২১ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ১১৪৩ বা ৪ অক্টোবর, ১৭৩০ সমাপ্ত হয়। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৫ বৎসর। ইহা আওরাঙ্গযীবের রাজত্বকালের সমসাময়িক বিবরণ। সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতা হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গাদাস রাঠোরের বাদশাহী দরবারে আত্মসমর্পণ (১১১০/১৬৯৮) পর্যন্ত আওরাঙ্গযীবের রাজত্বকালীন ঘটনাবলীর বিবরণ ইহাতে রহিয়াছে। আরও রহিয়াছে খিল'আত প্রদান উপলক্ষে বাদশাহের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাতকারের বিবরণ। এই গ্রন্থখানির বিশেষ মূল্য হইতেছে এইজন্য যে, ইহা একজন অমুসলিম ব্যক্তি দ্বারা রচিত যিনি সরকারী দায়িত্ব পালনের সময় তথ্যের প্রত্যক্ষ সূত্রাদি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং নিজেও বহু ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। যদিও লেখক পুস্তকটি ১৭৩০ খৃ. সমাপ্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী কোন ঘটনা তিনি লিপিবদ্ধ করেন নাই। খুব সম্ভব সেই সময় রাজ-দরবারের চাকুরী পরিত্যাগ করার ফলে ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না এবং তখন স্বীয় জায়গীরে প্রত্যাবর্তন করত বসবাস করিতেছিলেন। তিনি ইহা স্বীয় স্মরণিকা হিসাবে এবং তাঁহার পৌত্র (পুত্র ব্রজরাইর সন্তান) খুশহাল রাই-এর জন্য রচনা করিয়াছিলেন। (ইহা দ্বারা বুঝা যায়, আওরাঙ্গযীব তাঁহার সমসাময়িক ইতিহাস রচনা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া যে অভিযোগ করা হয় তাহা সত্য নহে)।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) যদুনাথ সরকার, Studies in Mughal India, কলিকাতা ও ক্যামব্রিজ ১৯১৯ খৃ., ২৪২-৯ ; (২) ঐ লেখক, History of Awrangzib, ২খ, ৩০৫; (৩) ঐ লেখক, Short History of Awrangzib, Calcutta ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৩৭৩ খৃ., পৃ. ৩৭৩; (৪) Storey, ১/১খ., ৫৮৭-৮; (৫) Rieu, CPM, ১খ., ২৬৯ a।

A.S. Bazmee Ansari (E.I.²)/মোঃ আশরাফ আলী খান

**ঈশ্বরদী** ঃ উপজেলা, পাবনা জেলা, আয়তন ২৫৬.৯০ বর্গকিমি। উত্তরে লালপুর ও বরাইগ্রাম উপজেলা, দক্ষিণে গঙ্গা নদী, কুষ্টিয়া সদর ও মীরপুর (কুষ্টিয়া) উপজেলা, পূর্বে পাবনা সদর ও আটঘড়িয়া উপজেলা, পশ্চিমে গঙ্গানদী ও ভেড়ামারা উপজেলা। ঈশ্বরদী থানা সৃষ্টি ১৯০৬ খৃ.। বর্তমানে ইহা উপজেলা। পৌরসভা ১, ওয়ার্ড ৩, ইউনিয়ন ৭, মৌজা ১৫০, গ্রাম ১১৩টি (Bangladesh population Census 2001, ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা, ঈশ্বরদী উপজেলা, পৃ. ১)।

উপজেলা শহর ৪টি মৌজা লইয়া গঠিত। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রেলওয়ে জংশন। আয়তন ২৩.৭৩ বর্গকিমি। জনসংখ্যা ৫১৬৩৩; পুরুষ ৫৪.৮৯%, মহিলা ৪৫.১১%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমি ২১৭৬ জন। শিক্ষার হার ৫১.৮%। দেশের একমাত্র ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র (এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম), আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ডাল গবেষণা কেন্দ্র, রেশম বীজাগারসহ অনেক কলকারখানা এই শহরে অবস্থিত (বাংলাপিডিয়া, ১খ, পৃ. ৪৬১)।

প্রধান নদী গঙ্গা, প্রধান বিল পাতিবিল (প্রাগুক্ত, ১খ, ৪৬১ পৃ.)। এই উপজেলায় ১৯১২ খৃ. মাইকেল লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর নামানুসারে পদ্মা (গঙ্গা) নদীর উপর বাংলাদেশের বৃহত্তম রেলসেতু (তৎকালীন) নির্মাণ করা হয়। এই সেতুর দৈর্ঘ্য ৫৯৪০ ফুট (প্রাগুক্ত, ৪৬১ পৃ.)।

পাবনা জিলার ঈশ্বরদী অঞ্চলে ইসলামের বাণী প্রচার ও প্রসারে হযরত মাওলানা শাহ কারামাত 'আলী জৌনপুরী (র) (দ্র.), ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা আবু বাকর সিদ্দিকী (র) এবং মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (র) (দ্র.)-এর অবদান অনস্বীকার্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তর ভারতের জৌনপুর শহরে জন্মগ্রহণকারী তাপস হযরত মাওলানা শাহ কারামাত 'আলী জৌনপুরী (র) স্বীয় মুরশিদ সায়্যিদ আহমাদ বেরেলাবী (র)-এর আদেশক্রমে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন জেলায় ও পাবনার বিভিন্ন অঞ্চলে শারী'আতের বিধান কার্যকর করিতে সফলতার সহিত চেষ্টা করেন। জনগণ তাঁহার প্রচারের ফলে দীনের প্রতি আকৃষ্ট হয় (মোঃ আবদুল করিম, ময়মনসিংহ জেলায় ইসলাম, পৃ. ৫৬, ৬২)।

জনসংখ্যা মোট ২৩৬৮২৫ জন, পুরুষ ৫১.৮৮%, মহিলা ৪৮.১২%, মুসলমান ৯৪.৯৯%, হিন্দু ৩.৮৫%, অন্যান্য ১.১৬%, আদিবাসী 'মাড়মী' জনগোষ্ঠীর ১৮৭ পরিবার রহিয়াছে (Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of planning 1991)।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলেজ ৭টি, কৃষি কলেজ ১টি, ভকেশনাল টেক্সটাইল কলেজ ১টি, বেসরকারী ক্যাডেট কলেজ ১টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩৩টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৮টি, ভকেশনাল ইনস্টিটিউট ১টি, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ১টি, মাদ্রাসা ২১টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৬টি, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৮টি (প্রাগুক্ত ও বাংলাপিডিয়া, ১খ, ৪৬১-৪৬২)।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ কৃষি ১৯.৮৫%, কৃষি শ্রমিক ১৭.১১%, অকৃষি শ্রমিক ৭.৪৩%, ব্যবসা ১৯.১৭%, চাকরি ১৭.৭৯%, হকার ২.১৩%, পরিবহন ২.৬৪%, অন্যান্য ১৩.৮৮% (প্রাগুক্ত ও বাংলাপিডিয়া, ১খ, ৪৬২)।

চাষযোগ্য জমি ২০২৫৪.৯৬ হেক্টর, এক ফসলী জমি ৭০.৭৫%, দো ফসলী ২৩.৮৬%, তিন ফসলী ৫.৩৯%, সেচের আওতায় আবাদী জমি ৯০% (ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা, ঈশ্বরদী উপজেলা, পৃ. ৬)। ভূমিহীন ৩৮.৪৫%, ক্ষুদ্র চাষী ৫৪.৭৭%, মধ্যম চাষী ৫.৩৫%, বড় চাষী ১.৪৩% (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২)। প্রধান কৃষি ফসল ধান, গম, ইক্ষু, আলু, পিয়াজ, বেগুন। প্রধান ফল-ফলাদি আম, কাঁঠাল, লিচু, পেঁপে, লেবু, বরই, বেল ও তাল।

যোগাযোগ, পাকা রাস্তা ১৫০ কিমি, কাঁচা রাস্তা ৮৫০ কিমি, রেলপথ ৪০ কিমি, নৌপথ ১৭ নটিকেল মাইল, বিমান বন্দর ১টি। চিনিকল ২টি, পেপার মিল ১টি, সুতাকল ১টি, সিমেন্ট কারখানা ৪টি (নির্মাণাধীন ২টি), ধানকল ৪০০, ময়দা কল ২, বরফ কল ৫, করাত কল ২৮টি, ষ্টীল মিল ১টি, হিমাগার ২টি। কুটির শিল্প ঃ তাঁত ৩৫টি, পাট ও পাটজাত দ্রব্য ১০টি, বাঁশের কাজ ৫০টি, স্বর্ণকার ৪৫টি, কামার ৭০টি, কুমার ৫৫টি, কাঠের কাজ ৮১০টি, সেলাইকাজ ৫০০টি।

প্রধান রপ্তানী দ্রব্য ঃ পান, পিয়াজ, পেঁপে, বেগুন, চাল, আখের গুড়, চিনি, সিমেন্ট, বরফ, ময়দা। স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ হাসপাতাল ৪টি, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১টি, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৭টি, দাতব্য চিকিৎসালয় ৩টি (Population Census 2001, National Report (Provisional), July 2003; ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা, ঈশ্বরদী উপজেলা, পৃ. ৬-৭ ও বাংলাপিডিয়া, ১খ, ৪৬২)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) Bangladesh Population Census-2001, National Report (provisional), July 2003; (২) Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Dhaka, Pabna District Census Report 2001; (৩) Bangladesh District Gazetteers, Pabna, 1991; (৪) ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা, ঈশ্বরদী উপজেলা, (পাবনা জেলা); (৫) বাংলাপিডিয়া, ১খ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ২০০৩ খৃ.।

**মুহাম্মদ আবদুল মালেক**

**'ঈসা ('আ)** (عيسى عليه السلام) ঃ ইব্ন মারয়াম ('আ), বানূ ইসরাঈলের শেষ নবী এবং হযরত মারয়াম ('আ) [দ্র.]-এর পুত্র। ইব্ন কাছীর (আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ২খ., ৫৬)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁহার বংশলতিকা নিম্নরূপ ঃ 'ঈসা ইব্ন মারয়াম বিন্ত 'ইমরান ইব্ন পাশাম ইব্ন উমূন ইব্ন মীশা ইব্ন হায়কিয়্যা ইব্ন আহ্রীক ইব্ন মূছিম ইব্ন 'আযাযিয়া ইব্ন আমসিয়া ইব্ন য়াউশ ইব্ন আহ্রীহ্ ইব্ন য়াসিম ইব্ন য়াহফাশাত ইব্ন ঈশা ইব্ন ইয়ান ইব্ন রুহুব'আম ইব্ন সুলায়মান ('আ) ইব্ন দাঊদ ('আ)। আছ-ছা'লাবী ('আরাইসু'ল-মাজালিস, ২৮৪)-র বর্ণনায় ইহা হইতে সামান্য পার্থক্য রহিয়াছে যাহার কারণ সম্ভবত সংক্ষিপ্ত বিবরণ [ইব্ন হায্ম (জামহারাতু আনসাবি'ল-'আরাব, পৃ. ৫০৬)-এর বর্ণনায় নামের উচ্চারণে কিছুটা পার্থক্য রহিয়াছে]। খৃষ্টানগণ তাঁহাকে য়ূসুফ নাজ্জার-এর পুত্র বলিয়া মনে না করিলেও বংশলতিকায় তাঁহাকে অন্তর্ভুক্ত করে (দ্র. মথি, ১-১৬; লূক ৩/২৪-২৮)। এই কারণেই তাহাদের বর্ণনাকৃত বংশতালিকা মুসলিম কুলজিবিশারদগণের বর্ণিত বংশতালিকা হইতে পৃথক। কুরআন কারীমের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মারয়াম ('আ)-এর পিতা এবং হযরত 'ঈসা ('আ)-এর নানা 'ইমরান (দ্র.) সম্পর্কে যেহেতু বাইবেলে কিছুই উল্লেখ নাই, সেইহেতু বাইবেল (নূতন নিয়ম)-সমূহে হযরত 'ঈসা ('আ)-এর আসল বংশতালিকা অর্থাৎ মাতার দিক হইতে একেবারেই উপেক্ষা করা হইয়াছে।

হযরত 'ঈসা ('আ)-এর জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে খুবই মতভেদ পাওয়া যায় (দ্র. C.A.C. : Jesus Christ, in Encyclopaedia Brittannica; Jesus Christ, in Encyclopaedia of Religoin and Ethics. New York 1959)।

কুরআন কারীমে তাঁহার নিম্নলিখিত নাম ও বিশেষণগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ (১) 'ঈসা (প্রায় ২৬ বার), ইহা মূলত হিব্রু শব্দ, মূলে

ছিল যেসু (Jesu)। গ্রীক ভাষায় আসিয়া ইহা Jesies হইল যাহা Jeshua-এর পরিবর্তিত রূপ। 'আরবীতে আসিয়া ইহা 'ঈসা হইয়া গিয়াছে; (২) মাসীহ (প্রায় ১১ বার)। এই শব্দটিও মূলত হিব্রু (মাহমূদ আল-আলূসী, রূহুল-মা'আনী, ২খ, ১৬১, মূলতান সং.)। মাসীহ হিব্রু শব্দ Mashiah অর্থাৎ তেল লাগানো) হইতে ব্যুৎপন্ন এবং ইংরাজী christ-এর সমার্থক। ইহার কয়েকটি অর্থ রহিয়াছে। (১) মুবারাক; (২) রোগগ্রস্তদিগকে হাতের স্পর্শে নিরাময়কারী; (৩) জন্মের সময় হযরত রূহু'ল-আমীন (জিবরীল)-এর হাত লাগানো (পূর্বোক্ত বরাত; ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৩৬৪); (৪) 'আবদুল্লাহ্ (২ বার), আল্লাহ্র বান্দা; (৫) ইব্ন মারয়াম (উপনাম)-এর বরাতে (২৩ বার); (৬) ওয়াজীহান ফি'দ-দুন্য়া ওয়া'ল-আখিরা (১বার) দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানী; (৭) কালিমাতুহ্ (১ বার) আল্লাহ্র কালেমা 'কুন' হইতে, বাহ্যিক কোন উপকরণ ছাড়াই জন্মগ্রহণকারী (নিম্নে দ্র.); (৮) রূহুল্লাহ (একবার) বাহ্যিক উপকরণ ছাড়া রূহদানকৃত (আরও দ্র. মুহাম্মাদ ফুআদ 'আবদু'ল-বাকী, মু'জামু'ল-মুফাহরিস লি-আলফাজি'ল-কুরআনি'ল-কারীম; আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, মুফরাদাতু'ল-কুরআন, শিরো; হিফজু'র-রাহ্মান সীওহারুবী, কিসাসু'ল-কুরআন, ৩খ, ১৪, সং. করাচী ১৯৭২ খৃ.)।

কুরআন কারীমে হযরত 'ঈসা ('আ), তাঁহার মাতা হযরত মারয়াম ('আ), তাঁহার নানা হযরত 'ইমরান ('আ) (দ্র.), তাঁহার নানী (হান্না বিন্ত ফাকূয, যাঁহাকে 'ইমরান-এর স্ত্রী বলা হইয়াছে) এবং তাঁহার গোটা বংশকে অতি উত্তম বিশেষণে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার খানদানকে সেইসব খানদানের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে যাহাদের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে কল্যাণ ও বরকত সম্প্রসারিত করিয়াছেন (দ্র. ৩ ঃ ৩৩-৩৭)।

জন্ম ঃ হযরত 'ঈসা ('আ)-এর মাতা হযরত মারয়াম ('আ) তাঁহার পিতা 'ইমরান (দ্র.)-এর একমাত্র কন্যা ছিলেন। কুরআন কারীমের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত 'ঈসা ('আ)-এর জন্ম আদাম ('আ)-এর জন্মের ন্যায় সাধারণ প্রচলিত নিয়ম বহির্ভূতভাবে হয় (৩ ঃ ৫৯)। আদাম ('আ)-এর জন্ম হয় মা-বাপ ছাড়া আর হযরত 'ঈসা ('আ) পিতার মাধ্যম ছাড়াই জন্মলাভ করেন।

কুরআন কারীমে বলা হইয়াছে যে, হযরত মারয়াম ('আ) খুবই 'ইবাদতকারিণী, পরহেযগার ও সৎকর্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। তাই তাঁহার সৎকর্ম এবং পরহেযগারীর কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সমসাময়িক বিশ্বের সকল মহিলার মধ্য হইতে বিশেষভাবে মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন (৩ ঃ ৩৭-৪৬ প.)। তিনি সমগ্র জীবন আল্লাহ্র 'ইবাদতে অতিবাহিত করেন। এই কারণেই তাঁহাকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বমহিমা ও নিদর্শন প্রকাশের জন্য মনোনীত করেন। তাই প্রথমত তাঁহাকে অ-মৌসুমী ফল দান করা হয় (৩ ঃ ৪২)। ইহার পর কোনরূপ বাহ্যিক উপকরণ ছাড়া শুধু তাঁহার করুণা ও মেহেরবাণীতে তাঁহাকে একজন নবীর মা হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন (৩ ঃ ৪৫ প.)। অতঃপর একদিন যখন তিনি মাসজিদু'ল-আকসার পূর্ব দিকে 'ইবাদাত অথবা পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে লোকজন হইতে পৃথক হইয়া নির্জনে অবস্থানরত ছিলেন, তখন হযরত জিবরীল ('আ) মানুষের আকৃতিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। (অবশ্য মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আল-কিসা'ঈ, কাসাসু'ল-আম্বিয়া, ২খ, ৩০২ পৃ., লাইডেন সং, কিছুটা ভিন্ন বিবরণ দিয়াছেন)। হযরত মারয়াম ('আ) জিবরীল ('আ)-কে একজন মানুষ মনে করিয়া বিচলিত হইলেন। কিন্তু হযরত জিবরীল ('আ) বলিলেন, আমি তোমার রবের প্রেরিত দূত! তোমাকে এক পবিত্র পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিতে আগমন করিয়াছি (১৯ ঃ ১৭-১৯)। মারয়াম ('আ) বলিলেন, তাহা কি করিয়া সম্ভব ? আমাকে তো কোন মানুষে স্পর্শও করে নাই। জিবরীল ('আ) বলিলেন, আল্লাহ্র জন্য ইহা আদৌ অসম্ভব নহে। আল্লাহ্ তা'আলা যেমনিভাবে কোন মাধ্যম ও উপকরণ ছাড়াই এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনিভাবে এক ব্যক্তিকে মাধ্যম ছাড়া সৃষ্টি করা তাঁহার জন্য মুশকিল নহে (৩ ঃ ৪৭ ; আরও দ্র. ১৯ ঃ ২০)। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে হযরত 'ঈসা ('আ) কোনরূপ পিতৃ-মাধ্যম ছাড়াই মায়ের উদরে জন্মলাভ করেন (১৯ ঃ ২১)। মুফাসসিরগণ বলেন যে, এই কারণেই কুরআন কারীমে 'ঈসা ('আ) সম্পর্কে খাল্ক (خلق) শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে যাহার মর্ম হইল কোন জিনিসকে বাহ্যিক কোন মাধ্যম ও উপকরণ ছাড়া সৃষ্টি করা (আল-মারাগী, তাফসীর, ৩খ, ১৫২)। 'ঈসা('আ)-এর জন্ম যেহেতু সাধারণ প্রচলিত নিয়ম বহির্ভূতভাবে হইয়াছে সেই কারণে কুরআন কারীমে তাঁহার সম্পর্কে রূহুল্লাহ্ (৬৬ ঃ ১২) এবং কালিমাতুল্লাহ (৪ ঃ ১৭১) এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, যেইগুলির সমার্থ কুরআন কারীমের কয়েক স্থানে বিবৃত করা হইয়াছে। হযরত আদাম ('আ) সম্পর্কে কুরআন কারীমে বলা হইয়াছে (১৫ ঃ ২৯) فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ অর্থাৎ "যখন আমি ইহাকে সুঠাম করিব এবং উহাতে আমার রূহ ফুঁকি।" এই ভিত্তিতে হযরত 'ঈসা ('আ) সম্পর্কেও এই শব্দটির এই একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বাহ্যিক কোন উপকরণ ছাড়াই হযরত 'ঈসা ('আ)-এর মধ্যে রূহ যাহা আল্লাহ্র একটি আম্র (১৭ ঃ ৮৫) ফুঁকিয়া দিয়াছেন। اِنَّمَا اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ অর্থাৎ "আল্লাহ্র আম্র (কাজ) হইল, যখন তিনি কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন তখন বলেন ঃ 'হও', অমনি তাহা হইয়া যায়'। এই কারণে সকল ফাকীহ ও মুফাসসির-এর মতে "রূহ" (৩৬ ঃ ৮২) এবং 'কালিমা' শব্দটি দ্বারা সাবাব (سبب=কারণ) বলিয়া মুসাব্বাব (مسبب=কর্ম)-এর অর্থ বুঝানো হইয়াছে 'আরবী ভাষায় যাহার ব্যবহার সচরাচর প্রচলিত আছে।

হযরত 'ঈসা ('আ) যখন মাতৃগর্ভে তখন হযরত মারয়াম ('আ)-এর আশংকা হইল যে, এই ঘটনা মসজিদের মধ্যে থাকাকালীন ঘটিলেও লোকজন তাঁহার প্রকৃত ঘটনা জানিবার পূর্বেই তাঁহার সন্তানের জন্মকে অবৈধ বলিয়া ধারণা করিবে। তাই তিনি বায়তু'ল-মাকদিস ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত লইলেন। কিন্তু ইহাতে কিছুটা মতভেদ রহিয়াছে যে, 'ঈসা ('আ)-এর জন্মের কত পূর্বে তিনি এই এলাকা ত্যাগ করিয়াছিলেন (আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ২খ, ৬৫ প্রভৃতি)। এই ক্ষেত্রে য়ূসুফ ইব্ন য়া'কূব আন-নাজ্জার-এর উল্লেখও করা হয় যাহাকে খৃস্টানগণ (দ্র. মথি ১ ঃ ১-১৬) মারয়াম ('আ)-এর স্বামী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে এবং কোন কোন মুসলিম মুফাসসির ইসরাঈলী রিওয়ায়াত-এর ভিত্তিতে য়ূসুফকে হযরত মারয়াম-এর খালাতো ভাই এবং মসজিদে তাঁহার 'ইবাদত ও খিদমত-সঙ্গী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন (দ্র. ইব্ন কাছীর, উল্লিখিত গ্রন্থ ; আল-কিসাঈ, কিসাসু'ল-আম্বিয়া', ২খ, ৩০৩ ; আত-তাবারী, তা'রীখু'র-রুসুল ওয়া'ল-মুলূক, ১খ, ৭২৫, লাইডেন সং.)। কিন্তু কুরআন কারীম এবং বিশ্বস্ত হাদীছে ইহার কোন উল্লেখ নাই। এই কারণেই

আমাদের মতে উক্ত রিওয়ায়াত য়াহূদীদের সেই ষড়যন্ত্রেরই অংশ যাহা তাহারা সতী-সাধ্বী মারয়াম ('আ) ও তাঁহার পুত্রের কুৎসা রটনা করিবার জন্য উদ্ভাবন করিয়াছিল। আর ইন্জীল যেহেতু এই ঘটনার বহু পরে লেখা হইয়াছিল সেইজন্য কোনরূপ তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ ও সত্যতা যাচাই ব্যতিরেকে এই ধরনের রিওয়ায়াত উহাতে স্থান দেওয়া হয়।

হযরত 'ঈসা ('আ)-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হইলে হযরত মারয়াম ('আ) বায়তু'ল-মাকদিস হইতে কয়েক মাইল দূরে সা'ঈর পাহাড়ের কাছে ছিলেন (মুহাম্মদ হি'ফজু'র-রাহ'মান সিউহারবী, কাসাসু'ল-কু'রআন, ৪খ, ৪২, করাচী ১৯৭২ খৃ.)। এই জায়গাটি 'বায়ত লাহ'ম' (বেথেলহাম) নামে প্রসিদ্ধ। কোন কোন 'আলিম (মাওলানা আবু'ল-কালাম আযাদ, তারজুমানু'ল-কুরআন, ২খ, ৪৩৩) 'নাসিরা'-কে তাঁহার ভূমিষ্ঠস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (আরও দ্র. 'আবদু'ল-মাজিদ দারয়াবাদী, তাফসীর, পৃ. ৬২৬)। যখন প্রসব বেদনা শুরু হয় তখন তিনি একটি খেজুর গাছের নীচে তাহার আড়ালে আশ্রয় লইয়া বসিয়া পড়িলেন। তীব্র বেদনা, ভবিষ্যতের পেরেশানী এবং একাকীত্বের কারণে বলিতে লাগিলেন, "হায়, আমি যদি ইহার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করিতাম এবং বিস্মৃত হইয়া যাইতাম!" তখন ফেরেশতা অদৃশ্য হইতে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি দুঃখ করিও না, তোমার সন্নিকটে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি তোমার দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও। উহা তোমাকে সুপক্ব তাজা খেজুর দান করিবে। তুমি আহার কর, পান কর এবং তোমার সন্তান দেখিয়া চক্ষু জুড়াও" (আল-কু'রআন, ১৯ঃ২৩-২৬)।

নহর-এর অর্থ পানির নি'মাতও হইতে পারে এবং স্বয়ং 'ঈসা ('আ)-ও হইতে পারেন যাঁহার নিকট হইতে একটি স্বতন্ত্র রূহানী ধারা জারি হইয়াছে (আল-বিদায়া, ২খ, ৬৬)। এই ঘটনা প্রায় খৃষ্টপূর্ব ১৪ সালে ঘটিয়াছিল ('আবদু'ল-হায়্যি আনওয়ার, মায'াহিব-ই 'আলাম, পৃ. ৪০৮)। বাইবেলে তাঁহার জন্মের সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনাও উল্লিখিত হইয়াছে। কোন কোন লেখক উহা হইতে কিছু কিছু ঘটনা তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদিতে উদ্ধৃত করিয়াছেন (দ্র. আত-তাবারী, ১খ, ৭২৮, ৭২৯ প.)। এই সময়ে হযরত মারয়াম ('আ)-এর এই চিন্তাও ছিল যে, জনগণ কি বলিবে? তাই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে ফেরেশতা তাঁহাকে বলিলেন, যখন তুমি কোন লোক দেখিবে এবং সে তোমাকে এই সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে তখন তাহাকে বলিয়া দিবে, আমি আজ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে চুপ থাকিবার মানত করিয়াছি। তাই কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে এই বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা কর। সুতরাং তাহাই হইল। লোকজন তাঁহার কোলে সন্তান দেখিয়া তাঁহাকে অপবাদ দিতে শুরু করিল। হযরত মারয়াম ('আ) হযরত 'ঈসা ('আ)-এর দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, এই বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা কর। লোকজন বলিল ঃ আমরা দুগ্ধপোষ্য শিশুর সহিত কি কথা বলিব (১৯ ঃ ২৬-২৯)? তখন হযরত 'ঈসা ('আ) বলিলেন ঃ

قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا. وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا. وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا.

"সে বলিল, আমি তো আল্লাহ্র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন, আমাকে নবী করিয়াছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেন আমাকে বরকতময় করিয়াছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করিতে। আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নাই। আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি, যেদিন আমার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুনরুত্থিত হইব" (১৯ ঃ ৩০-৩৩)।

হযরত 'ঈসা ('আ)-এর শৈশবের এই বাক্যসমূহ ছিল অস্বাভাবিক, তাই ইহাকে তাঁহার প্রথম মু'জিযা বলা হইয়াছে। বাইবেলে (নূতন নিয়ম) এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই। যাহা হউক তাঁহার বয়স যখন আট দিন হইল তখন তাঁহার খতনা করা হইল ('আবদু'ল-ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার, কি'সাসু'ল-আম্বিয়া', পৃ. ৩৮৫)।

জন্মকাল হইতে নবূওয়াত লাভ পর্যন্ত হযরত 'ঈসা ('আ) কোথায় ছিলেন? এই সম্পর্কে যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে। কু'রআন ও হা'দীছ এই ব্যাপারে নীরব। ইব্ন কাছীর (আল-বিদায়া, ২খ, ৭৫) ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ প্রমুখ হইতে যাঁহারা ইস্রাঈলী রিওয়ায়াত সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন—বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত মারয়াম ('আ) তখনকার বাদশাহ হিরোদোভীস (Herediae)-এর ভয়ে মিসরের কোন এক অঞ্চলে চলিয়া যান এবং হযরত 'ঈসা ('আ)-এর বয়সের প্রথম বারো বৎসর প্রায় সেইখানে কাটান। আত-তাবারী (তা'রীখ, ১খ, ৭২৯-৭৩৩) এবং আল-কিসা'ঈ (কিসাস, ২খ, ২৫, ৩০৫-৩০৬) এই ক্ষেত্রে হযরত 'ঈসা ('আ)-এর কিছু মু'জিযাও বর্ণনা করিয়াছেন যাহা বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হয় নাই। তাঁহারা এইসব ঘটনার অধিকাংশই বাইবেল ও খৃস্টীয় কিংবদন্তী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন (দ্র. মথি ২/১-২২ প্রভৃতি)।

ইব্ন কাছীর (আল-বিদায়া, ২খ ৭৫) প্রমুখ ঐতিহাসিক হযরত 'ঈসা ('আ) হইতে তাঁহার বার বৎসর বয়সে যে বিভিন্ন অলৌকিক ব্যাপার প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা কৃষকের গৃহে অবস্থানকালে এক চোরকে আশ্চর্যজনকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা। হাফিজ ইব্ন 'আসাকির প্রমুখ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা)-এর সূত্রে হযরত 'ঈসা ('আ)-এর শৈশবের কিছু কিছু ঘটনাও বর্ণনা করিয়াছেন। কু'রআন কারীমের দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সেই শৈশব কালেই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার মাতাকে একটি জায়গার সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন যেইখানে ঠাণ্ডা পানি, উত্তম ও বিশুদ্ধ আবহাওয়াসম্পন্ন বসবাসের উপযুক্ত কিছুটা উঁচু ভূমি ছিল। মুফাসসিরগণের মধ্যে এই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও মতে ইহা দ্বারা হযরত 'ঈসা ('আ)-এর ভূমিষ্ঠস্থান অর্থাৎ বায়তু'ল-মাকদিসের নিকটবর্তী খেজুর বাগানের কথা বুঝানো হইয়াছে। কেহ ইহাকে দামিশকের নিকটবর্তী কোন এলাকা, কাহারও মতে মিসর, আবার কেহ রামলা (রামাল্লা) বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন (আল-বিদায়া, ২খ, ৭৭ ; তাফসীর কাবীর ; ইব্ন কাছীর, তাফসীর, সংশ্লিষ্ট আয়াত ; 'আবদু'ল-মাজিদ দারয়াবাদী, তাফসীর, পৃ. ৭০২)।

এইখানে তিনি প্রায় বার বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহার পর বায়তু'ল-মাকদিসের শাসকের মৃত্যু হইলে হযরত যাকারিয়্যা ('আ) হযরত মারয়াম ('আ)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন হযরত মারয়াম ('আ)

তাঁহার সন্তানসহ বায়তু'ল-মাকদিসে ফিরিয়া আসিলেন (আল-বিদায়া, ২খ, ৭৭)। আল-কিসাঈ (কিসাস, ২খ, ৩০৭)-এর বর্ণনামতে ফিরিয়া আসিয়া হযরত 'ঈসা ('আ) বায়তু'ল-মাকদিসের নিকটবর্তী গ্যালীলী (Galilee- الجليل) প্রদেশস্থ আন-নাসিরা (Nazareth) নামক স্থানে বসবাস করিতে থাকেন—যে কারণে তাঁহার অনুসারিগণকে নাসারা (দ্র.) বলা হয়। তাঁহার শৈশব কাল হইতে নবুওয়াত প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত সময়ের অবস্থা ও জীবন পদ্ধতি খুব অল্পই জানা যায়।

**নবুওয়াত ও ওহী ঃ** হযরত 'ঈসা ('আ)-এর বয়স যখন ৩০ বৎসর হইল (আল-বিদায়া, ২খ, ৭৮ ; আছ-ছা'লাবী, 'আরা'ইসু'ল-মাজালিস, ১খ, ২৮) তখন তাঁহার কাছে ওহী নাযিল হওয়া শুরু হইল। ইব্‌ন কাছীর (আল-বিদায়া, ২খ, ৭৮)-এর বর্ণনা মতে ইহা ছিল ১৮ রামাদানু'ল-মুবারাক। মথি (৩খ, ১৩-১৭)-র বর্ণনামতে 'ঈসা ('আ) হযরত য়াহয়া (আ) হইতে ব্যাপটিজম গ্রহণ করেন। ইহার পর কিছুদিন পর্যন্ত তিনি একাকী য়াহূদিয়া-র অরণ্যাঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া কাটান। এখানে প্রকৃতির বহু রহস্য তাঁহার কাছে উদঘাটিত হয়। এইখানে শয়তানের সহিত তাঁহার কথাবার্তা হয় (আল-বিদায়া)। এই পরিভ্রমণ কালেই তাঁহার কাছে সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়।

মথি (৩ ঃ ১৬-১৭)-এর বর্ণনা অনুযায়ী রূহু'ল-কুদুস (জিবরীল 'আ) হযরত 'ঈসা ('আ)-কে একটি কবুতরের আকৃতিতে দেখা দেন যাহা আকাশ হইতে অবতরণ করিতেছিল। হযরত 'ঈসা ('আ)-এর এই অবস্থা রাসূলুল্লাহ (স)-এর অবস্থার সহিত কিছুটা সাদৃশ্য রাখে। কারণ রাসূলুল্লাহ (স)-কেও রূহু'ল-কুদুস (জিবরীল) প্রথমবার যমীন ও আসমানের মধ্যবর্তী স্থানে থাকিয়া দেখা দিয়াছিলেন (দ্র. সূরা আন-নাজ্‌ম)। ইহার পর হযরত 'ঈসা ('আ) পূর্ণোদ্যমে দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করেন। তাঁহার প্রচারকার্যে বুদ্ধিমত্তা ও আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম দৃঢ়ভাবে পালন করা ও করাইবার তীব্র প্রেরণা ও উদ্দীপনার পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় সেইসব লোককে বিশেষভাবে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানাইলেন যাহারা ধর্মের নামে ব্যবসা করিত। তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির কয়েক দিন পর একটি পাহাড়ের উপর হইতে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন, যাহা "পর্বতের উপর হইতে প্রদত্ত ভাষণ" (Sermon on the mount) নামে খ্যাত। এই ভাষণে তাঁহার সকল শিক্ষার সারসংক্ষেপ রহিয়াছে। ইহার পর সাধারণ জনগণ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকিলে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রচলিত ধর্মীয় সম্প্রদায়, গণক শ্রেণী এবং য়াহূদী সম্প্রদায়ের ভণ্ড ভক্তদল (Pharisees) তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিল। কারণ তাহাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব টলটলায়মান হইয়া উঠিয়াছিল (নিম্নে দ্র.)।

অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হইল। ফলে তিনি যেখানেই যাইতেন সেইখান হইতেই তাঁহাকে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হইত। এই কারণে তাঁহার অধিকাংশ সময় মাঠে-ময়দানে ও বনে-জঙ্গলে অতিবাহিত হয়। তিনি বলিতেন, শৃগালেরও থাকিবার গর্ত থাকে এবং পাখীর থাকে বাসা। কিন্তু আদম সন্তানের মাথা গুঁজিবারও একটু ঠাঁই হয় না (মথি, ৮ ঃ ২০)। এই সময় তিনি নিজের কয়েকজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং তাহাদিগকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার কার্যের জন্য প্রেরণ করেন (মথি ৩৬ ঃ ১৩-৩১)। মথি (১৯ ঃ ৫-২৩)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ইহাদের সংখ্যা ছিল বারজন—যাহারা পরবর্তীতে বার শিষ্যের (হাওয়ারী) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন (দ্র. হাওয়ারী)। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও শত্রুর পক্ষ হইতে বরাবর তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া হইতে থাকে। হযরত 'ঈসা ('আ) যখন দেখিলেন, লোকজন দিন দিন তাঁহার বিরোধী হইয়া যাইতেছে তখন তিনি ঘোষণা করিলেন ঃ مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র রাস্তায় কে আমার সাহায্যকারী হইবে?" হাওয়ারীগণ বলিল, "আমরা এক আল্লাহ্‌র রাস্তায় আপনার সাহায্যকারী" (আল-কুরআন ৩ ঃ ৫২; ৬১ ঃ ১৪)। হযরত 'ঈসা ('আ)-এর এই প্রাথমিক শাগরিদগণ খুবই ন্যায়নিষ্ঠ এবং পবিত্র লোক ছিলেন। ইব্‌ন হাযম (আল-ফিসাল ফি'ল-মিলালি ওয়া'ল-আহওয়া' ওয়া'ন-নিহাল, ২খ., ৩৮)-এর বর্ণনামতে ইঁহাদের কর্মকাণ্ড বর্ণিত বাইবেলে শিষ্যদের কর্মতৎপরতা হইতে ভিন্নতর। এই হাওয়ারীগণ স্বদেশে-প্রবাসে হযরত 'ঈসা ('আ)-এর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহার বক্তব্য শ্রবণ করিতেন এবং তাহা অন্যের নিকট পৌঁছাইয়া দিতেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত লোক; কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে নির্ভরযোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে তাঁহাদের মর্যাদা ছিল অতি উচ্চে।

**গ্রেফতারের ব্যর্থ চেষ্টা এবং আসমানে উত্তোলন ঃ** হযরত 'ঈসা ('আ)-এর বিরুদ্ধে তাঁহার শত্রুরা যখন ষড়যন্ত্র জোরদার করিল তখন তিনি আশংকা করিলেন যে, শত্রুগণ তাঁহাকে হযরত য়াহয়া ('আ)-এর ন্যায় গ্রেফতার করিয়া অপমান এবং হত্যা করিতে পারে। তাই তিনি আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করিলেন। ইহার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে এই সান্ত্বনা দিলেন ঃ

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .

"স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বলিলেন, 'হে ঈসা! আমি তোমার (দুনিয়ায় থাকার) কাল পূর্ণ করিতেছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলিয়া লইতেছি এবং কাফিরদের মধ্য হইতে তোমাকে মুক্ত করিতেছি" (৩ ঃ ৫৫)।

এই আয়াতের তাফসীরে নিম্নলিখিত মতামত পাওয়া যায় ঃ (১) হযরত কাতাদা (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে رافعك متوفيك ছিল। অর্থাৎ 'এখন আমি তোমাকে আমার কাছে উঠাইয়া লইব এবং পরে দুনিয়াতে তোমার বয়স পূর্ণ করিবার পর তোমাকে মৃত্যু দান করিব'। এই মতের সমর্থন সেই হাদীছেও পাওয়া যায় যাহাতে বলা হইয়াছে, হযরত 'ঈসা ('আ) এখনও ইনতিকাল করেন নাই এবং তিনি কিয়ামতের পূর্বে পুনরায় দুনিয়ায় অবতরণ করিবেন (নিম্নে দ্র.; রূহু'ল-মা'আনী, ১খ, ১৭৯ প.)। (২) ইহার অর্থ হইল, انى عاصمك من (ان يقتلك الكفار ومؤخرك الى اجل كتبته ل) (আয-যামাখশারী, আল-কাশ্‌শাফ) অর্থাৎ 'আমি তোমাকে দুশমনদিগের হাতে নিহত হওয়া হইতে রক্ষা করিব এবং তোমার মৃত্যু তোমার জন্য সুনির্দিষ্ট সময় আসা পর্যন্ত পিছাইয়া রাখিব'। (৩) আয়াতের অর্থ হইল—(মাদারিকু'ত-তানযীল) مميتك حتف انفك لا قتلا بايديهم অর্থাৎ 'আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দান করিব। তাহাদের হাতে নিহত হইতে দিব না'; (৪) আমি তোমাকে স্বাভাবিক বয়স পূর্ণ করিতে দিব, তাহাদের হাতে পড়িতে দিব না; বরং তোমাকে আমার কাছে উঠাইয়া লইব (আর-রাযী, তাফসীর কাবীর, আয়াত শিরো.)। توفى শব্দের মূল হইল وفى। ইহার আসল অর্থ হইল পরিপূর্ণভাবে

লওয়া। 'আল্লামা ইব্ন তায়মিয়া (আল-জাওয়াবুস-সাহীহ) تـوفـى-এর কুরআনী ব্যবহার পদ্ধতির তিনটি অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ (১) নিদ্রা, (২) মৃত্যু, (৩) শরীর ও আত্মাসহ উঠাইয়া লওয়া। এইখানে শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (মুফতী মুহাম্মাদ শাফী', মা'আরিফু'ল-কুরআন, ২খ., ৬৯)।

কুরআন কারীম এই কথার উপর খুবই জোর দিয়াছে যে, শত্রুগণ হযরত 'ঈসা ('আ)-কে শূলে দিতে অথবা হত্যা করিতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। তাই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ. مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ. وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا. بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ. وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا.

"তাহারা (য়াহূদীগণ) তাহাকে হত্যা করে নাই, ক্রুশবিদ্ধও করে নাই ; কিন্তু তাহাদের এইরূপ বিভ্রম হইয়াছিল। যাহারা তাহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিল তাহারা নিশ্চয় এই সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল ; এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত কোন জ্ঞানই তাহাদের ছিল না। ইহা নিশ্চিত যে, তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই; বরং আল্লাহ্ তাহাকে তাঁহার নিকট তুলিয়া লইয়াছেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৪ ঃ ১৫৭-৫৮)।

এই আয়াতের আলোকে বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন কারীমের মতবাদের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা যায় ঃ (১) খৃস্টান ও য়াহূদীগণ এই ব্যাপারে একমত ছিল যে, হযরত 'ঈসা ('আ)-কে শূলবিদ্ধ করা হইয়াছে। অবশ্য অন্য ব্যাপারে কিছু মতভেদ ছিল। য়াহূদীরা বলিত, হযরত 'ঈসা ('আ) নিহত হইয়াছেন। আর খৃস্টানগণ বলিত, তিনি তিন দিন মৃত থাকিবার পর জীবিত হইয়া আসমানে চলিয়া গিয়াছেন। এই উভয় দল সম্পর্কে বলা হয় যে, ইহারা সন্দেহে নিপতিত। প্রকৃতপক্ষে ইহারা 'ঈসা ('আ)-কে গ্রেফতারই করিতে পারে নাই (২) وما قتلوه এবং وما صلبوه ও بل رفعه الله এই তিনটি শব্দের সবগুলি সর্বনাম (ضمير) একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। আর সেই ব্যক্তি হইলেন হযরত 'ঈসা ('আ), তাঁহার সার্বিক সত্তা—আত্মা ও শরীর। কারণ হত্যা ও শূলী আত্মা ও দেহ উভয়টিরই হইয়া থাকে, শুধু শরীরের নহে অথবা শুধু আত্মারও নহে। সুতরাং শুধু আত্মাকে উঠাইয়া লওয়া কিভাবে হইতে পারে ? (৩) আয়াতের শেষে عزيز (পরাক্রমশালী) ও حكيم (প্রজ্ঞাময়) এই গুণবাচক নাম দুইটি ব্যবহার করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিপাদ্য বিষয়টি অধিক বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি ইহা করিতে সামর্থ্যবান এবং তাঁহার প্রতিটি কাজে প্রজ্ঞা ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। (৪) খৃস্টান ও য়াহূদীদের দাবি প্রত্যাখ্যান করিতে গিয়া মৃত্যুর জন্য ব্যবহৃত ماته অথবা توفاه শব্দ ব্যবহার না করিয়া স্পষ্ট অর্থবোধক শব্দ رفع ব্যবহার করিয়াছেন। এইজন্য সকল মুফাস্সির, ফাকীহ ও 'আলিমের সর্বসম্মত মত হইল, হযরত 'ঈসা ('আ)-কে আত্মা ও শরীরসহ উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে (দ্র. মুফতী মুহাম্মাদ শাফী', মা'আরিফু'ল-কুরআন, ২খ, ৬০১ প. ; ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ২খ, ৫৭৪ প. ; ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ফাতহু'ল-বারী, শারহ সাহীহ আল-বুখারী, ৬খ, ৩০৪ ; সীওহারবী, কাসাসু'ল-কুরআন, ৪খ, ১১৪-১৩৫ ; আবদু'ল-মাজিদ দারয়াবাদী, তাফসীর, পৃ. ২২৭-২২৮ প.)।

মোটকথা শত্রুরা রোমের গভর্নর Potnsmpilate-কে হযরত 'ঈসা ('আ)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তোলে এবং তাঁহার সৈনিকদের সহিত মিলিত হইয়া হযরত 'ঈসা ('আ)-কে গ্রেফতারের ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। বাইবেলের বর্ণনামতে "ঈস্করিয়োতী যিহূদা" নামক হযরত 'ঈসা ('আ)-এর এক শিষ্যকে ৩০ দীনার দিয়া গুপ্তচর নিযুক্ত করে। হযরত 'ঈসা ('আ) ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে বায়তু'ল-মাকদিসে আসিয়াছিলেন। এইখানে তিনি মথি (২৬ ঃ ২৭-২৯, 'আরবী সংস্করণ)-এর বর্ণনামতে নিস্তার পর্বের খাবার খাইয়াছিলেন। ইহার পর হযরত 'ঈসা ('আ) তাঁহার এগারোজন শাগরিদসহ শহরের বাহিরে গেৎসিমেন (Gethsemane) নামক স্থানে রাত্রি যাপন করার জন্য গমন করেন। অতঃপর তিনি শাগরিদদিগের নিকট হইতে পৃথক হইয়া সিজদায় পড়িয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট এই দু'আ' করিলেন, "হে আমার প্রভু (পিতা) ! সম্ভব হইলে এই পিয়ালা (মৃত্যু) আমার নিকট ইহতে সরাইয়া দাও" (প্রায় তিনবার এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন ; মথি, ২৬ ঃ ৩৬-৪৩)। এই দু'আ'র উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে সান্ত্বনার বাণী আসে (উপরে দ্রষ্টব্য)। মুসলিম মনীষী ও 'আলিমগণ এই ব্যাপারে একমত যে, শত্রুরা যখন হযরত 'ঈসা (আ)-এর এক শিষ্য ঈস্করিয়োতায় যিহূদা-এর পথনির্দেশক্রমে উল্লিখিত স্থানে পৌছিল এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল তখন ঠিক সেই মুহূর্তেই হযরত 'ঈসা ('আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা আসমানে উঠাইয়া লইলেন এবং স্বয়ং যে গ্রেফতার করাইয়া দিতে আসিয়াছিল তাহাকে হযরত 'ঈসা (আ) বানাইয়া দিলেন। তাই সরকার পক্ষের লোকজন এবং য়াহূদী এমনকি খোদ হাওয়ারীগণও তাহাকে 'ঈসা ('আ) বলিয়া মনে করিল এবং তাহাকেই ধরিয়া লইয়া শূলবিদ্ধ করিল (আল-বিদায়া, ২খ, ৯২ প.; রূহু'ল-মা'আনী, ২খ, ১৭৭-১৭৮)। বিভিন্ন কারণে যেহেতু তাহাদের এই কাজে খুবই ব্যস্ততা ছিল সেইহেতু বিষয়টি বেশী একটা যাচাই-বাছাই করা হয় নাই ('আবদু'ল-মাজিদ দারয়াবাদী, তাফসীর, পৃ. ২২৮-২২৯)। আল-আলূসী (উপরোক্ত বরাত) অপর একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা হইল, হযরত 'ঈসা ('আ)-এর যখন গ্রেফতার হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গেল তখন তিনি তাঁহার শাগরিদগণকে বলিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছ কি—যে আমার পরিবর্তে তাহার নিজের জীবন বিসর্জন দিয়া জান্নাতের অংশীদার হইবে ? তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি এই কাজের জন্য নিজের নাম পেশ করিলেন। হযরত 'ঈসা ('আ) তাহাকে নিজের পাগড়ী ও বেশভূষা পরিধান করাইলেন। আল্লাহ তা'আলা তাহাকেই হযরত 'ঈসা ('আ)-এর সদৃশ বানাইয়া দিলেন। অতঃপর সে-ই য়াহূদীদের সম্মুখে বাহির হইল এবং তাহাকেই গ্রেফতার করিয়া শূলে চড়ানো হয়। বারনাবাস-এর বাইবেলের বর্ণনাকে যদি প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা হয় [দ্র. খালীল সা'আদা, মুকাদ্দামা, ইনজীল বারনাবাস ('আরবী), কায়রো সং. তাকী 'উছমানী, বাইবেল সে কুরআন তক, ৩খ, ৩৬১-৩৮৪ টীকা] তবে উহা দ্বারা পরিপূর্ণভাবে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বারনাবাস লিখিয়াছেন, আর সৈনিকগণ যিহূদাহ-এর সহিত য়াসূ' ('ঈসা) যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন সেখানে যখন পৌছিল এবং য়াসূ' একটি বিরাট দলের নিকটবর্তী হওয়ার শব্দ শুনিলেন তখন তিনি গৃহে চলিয়া গেলেন। তাঁহার এগারজন শাগরিদ তখন নিদ্রিত

ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁহার প্রিয় বান্দার বিপদ দেখিলেন তখন তাঁহার দূত জিব্রীল, মীখাঈল, বিফা'ঈল এবং আওরীলকে হুকুম দিলেন য়াসূ'কে দুনিয়া হইতে তুলিয়া লওয়ার জন্য। তখন পবিত্র ফেরেশ্‌তাগণ আগমন করিলেন এবং য়াসূ'কে দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন। অতঃপর তাঁহাকে তৃতীয় আসমানে ফেরেশতাদিগের সাহচর্যে রাখিয়া দিলেন (২১৫ ঃ ১-৫)।

মোটকথা, মুসলমান এবং কিছু সংখ্যক খৃস্টান পণ্ডিতের দৃষ্টিতে হযরত 'ঈসা ('আ)-কে দুশমনদের হাত হইতে রক্ষা করা হয় এবং তাঁহার স্থলে ঈস্করিয়োতয় যিহূদা অথবা অন্য কোন লোককে 'ঈসা ('আ) মনে করিয়া ফাঁসি দেওয়া হয়। ইব্ন কাছীর (আল-বিদায়া, ২খ, ৯৩) হযরত 'ঈসা (আ)-এর স্থলে শূলীপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম সারজিস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরিউক্ত বর্ণনার সত্যতা ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, যিহূদা ঈস্করিয়োতয় যিহূদার শেষ পরিণতি সম্পর্কে বাইবেলে বিভিন্ন রকম এবং পরস্পর বিরোধী বর্ণনা পাওয়া যায়। মথি (২৭ ঃ ৩-১০)-তে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া সে আত্মহত্যা করে। লূক, মার্ক (মার্কস) ও যুহান্না (যোহন) এই ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করিয়াছেন। প্রেরিতদের কর্মকাণ্ডে (আ'মাল) (১৮১ প. 'আরবী)-এ উল্লিখিত হইয়াছে, সে অপকর্মের দ্বারা শস্যক্ষেত অর্জন করে এবং উপুড় হইয়া পড়িয়া যায়। ইহাতে তাহার পেট কাটিয়া সমস্ত নাড়ীভুঁড়ি বাহির হইয়া যায়। এইসব বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য সত্ত্বেও এতটুকু অন্তত নিশ্চিত যে, হযরত 'ঈসা ('আ) আকাশে উঠাইয়া লওয়ার পর তাঁহাকে আর কোথাও দেখা যায় নাই। তাঁহার আকাশে উঠানোর ঘটনা প্রায় ২৯ খৃ,/৫৯৩ হি.—পূর্ব সালে সংঘটিত হইয়াছিল (মাযাহিব-ই 'আলাম, পৃ. ৪০৮)। তখন হযরত 'ঈসা ('আ)-এর বয়স প্রায় ৩৩ বৎসর।

"ঈসা ('আ)-এর অবতরণ (نزول عيسى) ঃ ইসলামী 'আকীদা মতে যেহেতু হযরত 'ঈসা ('আ) নিহতও হন নাই আর স্বাভাবিক মৃত্যুও বরণ করেন নাই বরং জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে আকাশে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, তাই শেষ যমানায় পুনরায় তাঁহাকে দুনিয়াতে অবতরণ করানো হইবে। প্রায় সকল হাদীছের গ্রন্থেই রাসূলুল্লাহ্ (স) হইতে মারফূ' (দ্র.) সনদে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। আল-বুখারী (২খ, ৩৭০, কিতাবু'ল-আম্বিয়া বাব ৪৯) ও মুসলিম (১খ., ১৩৫, নং ২৪২, কায়রো সং. ১৩৭৪ হি., নুযূলু 'ঈসা ইব্ন মারয়াম)-এ বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب يفيض المال حتى لا يقبله احد "সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় এমন একটি সময় আসিবে যখন তোমাদের মধ্যে মারয়ামের পুত্র ('ঈসা 'আ) নায়বিচারকরূপে অবতরণ করিবেন। অতঃপর তিনি ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, শূকর হত্যা করিবেন এবং যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিবেন। তখন সম্পদ এত অধিক পরিমাণে হইবে যে, তাহা কেহ গ্রহণ করিতে চাহিবে না।"

অপর এক রিওয়ায়াতে রহিয়াছে ঃ 'তোমাদের তখন কি অবস্থা হইবে যখন 'ঈসা ('আ) তোমাদের মধ্যে অবতরণ করিবেন (পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি)। ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল (মুসনাদ) একটি দীর্ঘ এবং বিস্তারিত রিওয়ায়াত উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে কেবল হযরত 'ঈসা ('আ)-এর অবতরণ সংবাদই দেওয়া হয় নাই; বরং তাঁহার 'আলামাতও বর্ণনা করা হইয়াছে যাহা দ্বারা তাঁহাকে চিনিতে সহজ হইবে। বলা হইয়াছে ঃ তিনি মধ্যমাকৃতির, গৌর বর্ণের হইবেন। তাঁহার শরীরে লালচে দুইটি চাদর থাকিবে। তিনি এমন অবস্থায় অবতরণ করিবেন যে, মনে হইবে এইমাত্র গোসল করিয়া আসিতেছেন। ইমাম মুসলিম (আস-সাহীহ) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'ঈসা ('আ) সিরিয়াতে (শাম) সেই সময় অবতরণ করিবেন যখন মুসলমানগণ বিধর্মীদের সহিত বিরাট এক যুদ্ধ চলাকালে সালাত আদায় করিতে থাকিবে। ইমাম মুসলিম (৮খ, ১৯৮) হযরত নাওওয়াস ইব্ন সাম'আন (রা) হইতে আর একটি বিস্তারিত রিওয়ায়াত উল্লেখ করিয়াছেন। নাওওয়াস ইব্ন সাম'আন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ 'কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সময়ে দাজ্জাল (দ্র.) বাহির হইবে। তাহাকে ধ্বংস করিতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত 'ঈসা ('আ)-কে নাযিল করিবেন। তিনি দামিশ্ক-এর পূর্বদিকে সাদা মীনারার উপর অবতরণ করিবেন। তাঁহার শরীরে দুইটি চাদর থাকিবে'।

এই ব্যাপারে যেসব সাহাবায়ে কিরাম হইতে রিওয়ায়াত রহিয়াছে তাঁহারা হইলেন ঃ (১) 'ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা); (২) নাফি' (রা) ইব্ন 'উয়ায়না; (৩) আবূ বারযা আসলামী (রা); (৪) হুযায়ফা (রা) ইব্ন উসায়দ; (৫) আবূ হুরায়রা (রা); (৬) কায়সান (রা); (৭) 'উছমান ইব্ন আবি'ল-'আস (রা); (৮) জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (রা) (৯) আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা); (১০) 'আবদুল্লাহ (রা) ইব্ন মাস'উদ; (১১) 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্নি'ল-'আস; (১২) সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা); (১৩) নাওওয়াস ইব্ন সাম'আন (রা); (১৪) 'আমর ইব্ন 'আওফ (রা); (১৫) হুযায়ফা ইবনু'ল-য়ামান (রা) (দ্র. আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল, মুসনাদ ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ১খ. ৫৮৩, ৫৮৮)।

এইসব রিওয়ায়াত বর্ণনাকারী অধস্তন রাবীগণও অত্যন্ত সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ছিলেন যাঁহাদের নিকট হইতে মিথ্যা বর্ণনার কোন সন্দেহই করা যায় না। এত সাহাবী যে হাদীছ বর্ণনা করেন হাদীছের পরিভাষায় তাহাকে মুতাওয়াতির বলে। ইহা মুহকাম (যাহা নিশ্চিত এবং যাহাতে বিশ্বাস করিতেই হইবে)-এর পর্যায়ভুক্ত। তাই ইহার 'আকীদাকে সেইসব 'আকীদার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয় যাহার উপর ঈমান আনা মুসলিমদিগের জন্য অবশ্যই কর্তব্য। আরও বিস্তারিত জানিবার জন্য দ্র. ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ২খ, ৯৮-১০০ ; ঐ লেখক, তাফসীর, ১খ, ৫৮৩-৫৮৮, ইব্ন হাজার, ফাতহু'ল-বারী, ৬খ, ৩০৪ ; আনওয়ার শাহ, 'আকীদাতু'ল-ইসলাম ফী হায়াতি 'ঈসা 'আলায়হি'স-সালাম ; সীওহারুবী, কাসাসু'ল-কুরআন, ৪খ, ১৩৫-১৪৫ ; সা'দু'দ-দীন তাফতাযানী, শারহ 'আকাই'দি'ন-নাসাফিয়্যা।

**অবয়ব ও আকৃতি** (হুলয়া) ঃ রাসূলুল্লাহ (স) মি'রাজ (দ্র.)-এর সময় অন্যান্য নবীদের সহিত হযরত 'ঈসা ('আ)-এর সঙ্গেও সাক্ষাত করিয়াছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন বর্ণনায় হযরত 'ঈসা ('আ)-এর অবয়ব ও আকৃতির বিবরণ দিয়াছেন যাহা এইরূপ ঃ তাঁহার রং লাল এবং এত পরিষ্কার ছিল যে, তিনি যেন এইমাত্র গোসলখানা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন ; তাঁহার চুল ছিল কোঁকড়ানো যাহা কাঁধের মাঝখানে আসিয়া পড়িত। তাঁহার বুক ছিল প্রশস্ত। তিনি অত্যন্ত সুন্দর আকৃতি ও সুদর্শন চেহারার অধিকারী ছিলেন (আল-বুখারী, ২খ, ৩৬৮-৩৭০, কিতাবু'ল-আম্বিয়া', বাব ৪৮)।

**স্বভাব-প্রকৃতি** ঃ হযরত 'ঈসা ('আ) খুবই ধৈর্যশীল, প্রশস্ত হৃদয় এবং হাস্যময় ও প্রফুল্ল চিত্তের অধিকারী ছিলেন। তিনি দরিদ্র এবং বিপদাপন্ন ব্যক্তিদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনকারী ও কল্যাণকামী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নম্র প্রকৃতির ছিলেন যাহার ফলে তাঁহার অন্তরে কখনও কাহারো বিরুদ্ধে শত্রুতা বা কঠোরতা এবং প্রতিশোধের স্পৃহা জাগিত না। তাঁহার শান্তিপ্রিয়তার এমনই অবস্থা ছিল যে, একবার তিনি এক ব্যক্তিকে স্বচক্ষে চুরি করিতে দেখিয়া বলিলেন ঃ তুমি কি চুরি করিয়াছ ? সে বলিল, আল্লাহ্র কসম! কখনও না। হযরত 'ঈসা ('আ) সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন ঃ আমি আল্লাহর কসমের উপর বিশ্বাস করিতেছি এবং আমার চোখকে মিথ্যা বলিয়া মনে করিতেছি (আল-বুখারী, ৪খ., ৩৬৯, কিতাবু'ল-আম্বিয়া' বাব ৪৮)।

তিনি কাহারও খারাপ কাজের প্রতিশোধ গ্রহণেরও বিরোধী ছিলেন। তাঁহার কথা ছিল ঃ দুর্বৃত্তের মুকাবিলা করিও না, বরং যদি কেহ তোমার ডাইন গালে চপেটাঘাত করে তবে তাহার জন্য বামটিও পাতিয়া দাও। আর যদি কেহ তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া তোমার জামা লইতে চায় তবে তাহাকে চোগাও লইয়া যাইতে দাও। যদি কেহ বিনা পারিশ্রমিকে তোমাকে এক ক্রোশ দূরে লইয়া যায় তবে তাহার সহিত তুমি দুই ক্রোশ চলিয়া যাও (মথি, ৫ ঃ ৩৯-৪২)। এই ধৈর্যপূর্ণ প্রকৃতির ফলেই কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সেইসব উম্মাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন যাহারা তাঁহাকে আল্লাহ্র পুত্র বলিত—তখন তিনি নিজের নির্দোষিতা বর্ণনা করার পর বলিবেন ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

"তুমি যদি তাহাদিগকে 'শাস্তি দাও তবে তাহারা তো তোমারই বান্দা (তাহাদের কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই), আর যদি তাহাদিগকে মা'ফ করিয়া দাও (তবে তাহা তোমার মেহেরবানী), নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়" (৫ ঃ ১১৮)। কোন বিপদগ্রস্ত লোককে দেখিলে তাঁহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিত এবং তাঁহার দ্বারা যতটুকু সহায়তা করা সম্ভব তাহা করিতেন। তাঁহার মতবাদ এই ছিল যে, নিজে নিজের সংশোধন করিয়া লও, তাহা হইলে অন্যরাও সংশোধিত হইয়া যাইবে।

ধর্মীয় দিক হইতে তিনি বেশী কঠোর ছিলেন না। তাঁহার মুখে সর্বদা স্মিত হাসি লাগিয়া থাকিত। "আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই বিরাগ"–এই নীতির তিনি একজন প্রবক্তা ছিলেন। তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনকালে লোকজনকে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন। এমনিভাবেই তিনি বানূ ইসরাঈলী নবীগণের মতাদর্শই প্রচার করিয়াছেন। কোন কোন ব্যাপারে তাঁহার নীতি বেশ কঠোর ছিল যাহা সমাজ জীবন সংশোধনের জন্য প্রয়োজন ছিল। তিনি দুনিয়াদারীর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার নিকট আপন-পর, ধনী-দরিদ্র সবাই সমান ছিল।

তিনি অবিবাহিত থাকিয়া তাক্ওয়া, সংযম ও পবিত্রতার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। এই কারণেই তাঁহার জীবন-পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনাদর্শের ন্যায় স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। হযরত য়াহ্ইয়া ('আ)-এর ন্যায় তাঁহাকে শুধু একটি বিশেষ শ্রেণীর পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে। ইসলামী 'আকীদামতে ইহা ছিল তাঁহার পবিত্র জীবনের একটি দিকমাত্র।

**শিক্ষা** ঃ হযরত 'ঈসা ('আ)-এর নবূওয়াতের সময়কাল ছিল যদিও খুবই স্বল্প (আড়াই বা তিন বৎসর; আল-বিদায়া, ২খ. ৭৮), কিন্তু তবুও তিনি এই স্বল্প সময়ে যে শিক্ষা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরস্মরণীয়। কুরআন কারীম একদিকে হযরত 'ঈসা ('আ)-এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য তুলিয়া ধরিয়াছে যাহাতে তাঁহার সম্পর্কে য়াহূদীদের প্রচারিত ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয়। অপরদিকে সেইসব খৃস্টানেরও তিরস্কার করিয়াছে যাহারা তাঁহাকে আল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্র পুত্র বলিয়া আখ্যায়িত করে। ইহার বিপরীতে কুরআন কারীম হযরত 'ঈসা ('আ)-এর প্রকৃত শিক্ষা বারবার উল্লেখ করিয়াছে যাহাতে তাওহীদ, রিসালাত ও কিয়ামতের 'আকীদা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। কুরআন কারীমে হযরত 'ঈসা ('আ)-এর শিক্ষার যে দিকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ ঃ

১. **মু'জিযাসমূহ** ঃ কুরআন কারীমে প্রাচীন নবীদের মধ্যে যাঁহাদের মু'জিযা (দ্র.) বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে হযরত 'ঈসা ('আ)-ও রহিয়াছেন। কুরআন কারীমে বর্ণিত সেইসব মু'জিযা হইল ঃ (১) কোন পিতার মাধ্যম ছাড়াই তাঁহার জন্মগ্রহণ (৩ ঃ ৪৫-৪৬)। (২) তাঁহার জন্মগ্রহণের পরপরই দোলনায় থাকিয়া কথা বলা (৩ ঃ ৪৬; ১৯ ঃ ২৯ প.)। (৩) জন্মগতভাবেই তাঁহার অন্য নবীদের কিতাব সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া ( ৩ ঃ ৪৮; ৫ ঃ ১১০)। (৪) মাটি দ্বারা পাখী তৈরি করিয়া ফুৎকার দিয়া উড়াইয়া দেওয়া (৩ ঃ ৪৯; ৫ ঃ ১১০)। তবে ফার্রা' আল-বাগাবী (মা'আলিমু'ত-তানযীল, ১৫৯-১৬০)-এর মতে তাঁহার তৈরীকৃত পাখী চোখের আড়ালে গিয়া ভূপাতিত হইয়া মারা যাইত; (৫) জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে (ইব্ন জারীর, আত-তাবারী, তাফসীর, ৬খ, ৪২৬) কেবল হাত বুলাইয়া ভাল করিয়া দেওয়া (৩ ঃ ৪৯; ৫ ঃ ১১০); (৬) কোন কোন মৃতকে জীবিত করিয়া দেওয়া (প্রাগুক্ত উদ্ধৃতি)। (৭) তাঁহার কাছে আসমানী দস্তরখান (খাবার) নাযিল হইত অর্থাৎ খাবারে বরকত হইত (৫ ঃ ১১১-১১৫); (৮) তাঁহাকে আত্মা ও শরীরসহ জীবিতাবস্থায় আকাশে উঠাইয়া লওয়া (৪ ঃ ১৫৮)। (৯) লোকের গৃহে কি কি জিনিস সাধিত রহিয়াছে তাহার সংবাদ দেওয়া (৩ ঃ ৪৯); আরও দ্র. আল-কুরতুবী, তাফসীর, ৪খ, ৯৪-৯৫; ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ১খ., ৩৬৫ প.; শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দিহ্লাবী, তা'বীলু'ল-আহাদীছ ফী রুমূযি কিসাসি'ল-আম্বিয়া', উর্দু অনু., পৃ. ১৪২ প.; রূহু'ল-মা'আনী, ২খ. ৫৮৯; আল-কাশ্শাফ, ১খ., ৩৬৪-৩৬৫; আল-বায়দাবী, আনওয়ারু'ত-তানযীল, ১খ., ১৩৮; দুররু'ল-মানছুর, ২খ., ৩২। ইহার মধ্যে কিছু মু'জিযা (যথা মাটি দ্বারা তৈরীকৃত পাখীকে ফুৎকার দিয়া উড়াইয়া দেওয়া) বাইবেলেও বর্ণিত নাই। যেহেতু এইসব মু'জিযার কারণে কিছু কিছু লোকের 'ঈসা ('আ)-এর খোদা হওয়া সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল, সেইহেতু এইসব বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় বারবার বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এইসব ঘটনার প্রকাশ কখনও হযরত 'ঈসা ('আ)-এর স্বীয় শক্তিতে হয় নাই, বরং ইহা আল্লাহ্ তা'আলার কুদ্রতেই হইয়াছে (দ্র. আয-যামাখশারী, আল-কাশ্শাফ, ১খ, ৩৬৪ প.; আবূ হায়্যান, আল-বাহ্'রু'ল-মুহীত, ২খ., ২৬৭; আল-কুরতুবী, ৪খ., ৯৪-৯৫)।

২. **তাওহীদ** ঃ হযরত 'ঈসা ('আ)-এর শিক্ষায় যে বিষয়ের উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হইয়াছিল তাহা হইল আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ (একত্ব)। কুরআন কারীম বারবার এই বিষয়টি তুলিয়া ধরিয়াছে যে,

হযরত 'ঈসা ('আ) মানুষকে সর্বদা তাওহীদের শিক্ষা দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে শিরক ও বিদ'আত লিপ্ত হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ .

"আল্লাহ্ যখন বলিবেন, হে মারয়াম-তনয় 'ঈসা ! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ কর ? সে বলিবে, তুমিই মহিমান্বিত। যাহা বলার অধিকার আমার নাই তাহা বলা আমার পক্ষে শোভনীয় নহে" (৫ ঃ ১১৬)। তিনি বলিতেন (৩ ঃ ৫১) ঃ

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ .

"আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা তাঁহার 'ইবাদত করিবে। ইহাই সরল পথ।" তিনি আরও বলিতেন ঃ

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ .

"কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কিতাব, হিকমাত ও নবূওয়াত দান করিবার পর সে মানুষকে বলিবে, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে আমার দাস হইয়া যাও, ইহা তাহার জন্য শোভনীয় নহে; বরং সে বলিবে, তোমরা রাব্বানী (ইলাহের সাধক) হইয়া যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষাদান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর" (৩ ঃ ৭৯)। সূরা আল-মাইদা (৫ ঃ ৭২)-তে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে ঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْ اِسْرَاۤئِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ .

"যাহারা বলে, আল্লাহ্ই মারয়াম-তনয় মাসীহ, তাহারা অবশ্যই কুফরী করিয়াছে। অথচ মাসীহ বলিয়াছিল, 'হে বানী ইসরাঈল ! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর। কেহ আল্লাহ্‌র শরীক করিলে আল্লাহ্ তাহার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করিবেন এবং তাহার আবাস জাহান্নাম। জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই" (৫ ঃ ৭২)।

এই কারণেই বর্তমান বাইবেলে (দ্র. শিরো., ইনজীল) রদবদল হইয়াছে (দ্র. রাহমাতুল্লাহ্ কীরানাবী, ইজহারু'লহাক্ক)। তবুও উহাতে 'ঈসা ('আ)-এর শিক্ষার কিছুটা আভাষ পরিলক্ষিত হয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে এক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে ঃ তুমি তোমার আল্লাহ্‌র সহিত তোমার সমস্ত অন্তর, তোমার সমগ্র জীবন, তোমার পূর্ণ জ্ঞান এবং তোমার সর্বশক্তি দিয়া ভালবাসা রাখ। সবচাইতে বড় এবং প্রথম হুকুম এইটাই (মথি, ২২ ঃ ৩৬ প.; মারকাস (মার্ক) ১২ ঃ ২৯ প.; লুকা (লুক) ১০ ঃ ২৬-৭, 'আরবী সংস্করণ)। এক স্থানে হযরত 'ঈসা ('আ)-এর সকল শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হইয়াছে, আর চিরস্থায়ী জীবন তো ইহাই যে, তুমি (বান্দা) পরম সত্য এক বারহাক্ক আল্লাহ্‌কে এবং তোমার প্রেরিত য়াসু মাসীহকে চিনিবে, (যোহন ১৭ ঃ ৩)

**মাসীহ-এর খোদার পুত্র হওয়ার দাবী খণ্ডন ঃ** কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে ঈসা ('আ) স্বয়ং আল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্‌র পুত্র" (নাঊযু বিল্লাহ্) এই মিথ্যা দাবিকে খণ্ডন করা হইয়াছে ঃ

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ . مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهٗ .

"এই-ই 'ঈসা মারয়াম-তনয়, ইহাই সত্য কথা, যেই বিষয়ে উহারা বিতর্ক করে। সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্‌র জন্য শোভনীয় নহে, তিনি পবিত্র মহিমাময়" (১৯ ঃ ৩৪-৩৫)'।

খৃস্টানগণ হযরত 'ঈসা ('আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়া দাবি করে। ইহার বিবরণ দিয়া বলা হইয়াছে ঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا . لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا . تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا . اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا . وَمَا يَنْبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا .

"তাহারা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করিয়াছ, ইহাতে যেন আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হইবে ও পর্বতশ্রেণী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া আপতিত হইবে। যেহেতু তাহারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নহে" (১৯ ঃ ৮৮-৯২)।

হযরত 'ঈসা ('আ)-এর মানুষ হওয়া সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ .

"মারয়াম-তনয় তো কেবল একজন রাসূল ; তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছে এবং তাহার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল। তাহারা উভয়ে (মানুষ ছিল এবং) আহার করিত" (৫ ঃ ৭৫; আরও দ্র. ৪ ঃ ১৭১-১৭২ ; ৫ ঃ ১৪, ১৭, ৭৩, ৭৭)।

এই কারণেই কুরআন কারীমে যেখানেই 'ঈসা ('আ)-এর উল্লেখ আসিয়াছে সেখানেই "ইব্ন মারয়াম" (মারয়াম-তনয়) শব্দটি অবশ্যই বলা হইয়াছে। কুরআন কারীমের এই শিক্ষা খোদ হযরত 'ঈসা ('আ)-এর শিক্ষারই অনুরূপ। বাইবেলসমূহে যেখানেই হযরত 'ঈসা ('আ) নিজের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেখানেই তিনি নিজেকে ইব্ন আদাম ('আরবী ইব্নু'ল-ইনসান ; ইংরেজীতে The son of man) অর্থাৎ মানবসন্তান বলিয়াছেন। তিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ' করিতে এবং তাঁহার সামনে অনুনয়-বিনয় ও কাকুতি-মিনতি করিবার শিক্ষা দিতেন (মথি, ৬ ঃ ৫-১৩, 'আরবী সংস্করণ)। আর যেইসব বর্ণনায় তিনি আল্লাহ্‌কে পিতা এবং নিজেকে পুত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে আসল শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত নহে, বরং তাঁহার বর্ণনার বিশেষ একটি রীতি। কারণ তিনি নিজেই যেই অর্থে আল্লাহর পুত্র বলিয়াছেন সেই অর্থে অন্যকেও আল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়াছেন (যথা দ্র. মথি, ৫ ঃ ৯ ; ৬ ঃ ৬-১০ প্রভৃতি, 'আরবী সংস্করণ)। একবার তিনি বলিলেন, তোমরা পৃথিবীতে

কাহাকেও নিজের পিতা বলিও না। কারণ তোমাদের পিতা একজনই, যিনি আসমানে রহিয়াছেন। আর তোমরা নিজেদেরকে "পথ প্রদর্শনকারী" বলিও না, কারণ তোমাদের পদপ্রদর্শক একজনই অর্থাৎ মাসীহ ('আ) (মথি, ২৩ ঃ ৯, ১০)। বর্ণনার এই বিশেষ রীতি কেবলমাত্র হযরত 'ঈসা ('আ)-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, বানী ইসরাঈলের সাবেক নবীগণও এই রূপক শব্দ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়াছেন। যথা আদিপুস্তক , (৬ ঃ ১, ২, ৩,)-এ আল্লাহ্‌র পুত্রগণের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহার কিছু পরে (৬ ঃ ৪-৫) বীরদিগকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলা হইয়াছে ; যাত্রাপুস্তক (৪ ঃ ২২-২৩)-এ ইসরা'ঈল (দ্র.)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। আর ইহা সর্বজনবিদিত যে, ইহা দ্বারা প্রকৃত পুত্র কখনও বুঝানো হয় নাই, বরং রূপক অর্থ বুঝানো হইয়াছে। আর এই রূপক অর্থই হযরত 'ঈসা ('আ) একটু বেশী মাত্রায় ব্যবহার করিয়াছেন।

হযরত 'ঈসা ('আ) নিজেকে সর্বদাই একজন পথপ্রদর্শক, রাসূল এবং আদম সন্তানই মনে করিতেন। তাই তিনি একবার বলিলেন ঃ যে আমার উপর ঈমান আনে, সে প্রকৃতপক্ষে আমার উপর নহে, বরং আমাকে প্রেরণকারীর উপর ঈমান আনয়ন করে [য়ূহান্না (যোহন) ১২/৪৪, 'আরবী সংস্করণ]। ইহার পরবর্তী অনুচ্ছেদে রহিয়াছে, আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়াই বলিতেছি যে, চাকর কখনও তাহার প্রভু হইতে বড় হইতে পারে না এবং রাসূল কখনও তাহার প্রেরণকারী হইতে বড় হইতে পারে না (১৩ ঃ ১৬)। শুধুমাত্র যোহন (য়ূহান্না=John)-এর বাইবেল ব্যতীত বাইবেলের অন্য কোন গ্রন্থে "পিতাই পুত্র, পুত্রই পিতা" এই অভিনব মতবাদের অবতারণা করা হয় নাই। যোহন-এর বাইবেল সম্পর্কে বিশেষভাবে অভিমত হইল, নব্য খৃস্টবাদ প্রতিষ্ঠিত পল (Paul)-এর আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা লিখিত হইয়াছে (দ্র. বারাকাতুল্লাহ, কাদামাত ওয়া আসলিয়াত-ই আনাজীল-ই আরবা'আ, ২খ, ১৩১-১৪০ প., সং লাহোর, ১৯৬০ খৃ.; রাশীদ রিদা, মুকাদ্দামা ইনজীল বারনাবাস; কায়রো; তাকী 'উছমানী, মুকাদ্দামা, বাইবেল সে কুরআন তক, ১খ, ১১৬-১২৭)। আল-বুস্তানী (দ্র. দা'ইরাতু'ল-মা'আরিফ, ৬খ, ৩০৫ প., ছালূছ শিরো)-এর বর্ণনামতে ত্রিত্ববাদ (ছালূছ=Trinity)-এর মতবাদ পল-এর নেতৃত্বে প্রথম সৃষ্ট হয় এবং "প্রেরিতদের" যুগে ইহার প্রথম প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এতদসত্ত্বেও বেশ কিছুকাল পর্যন্ত এমন একটি দল বিদ্যমান ছিল (যথা এবীয়নিয়্যী=Ebionitus ; আরও দ্র. নাসারা) যাহারা হযরত 'ঈসা ('আ)-কে কেবল আল্লাহ্‌র রাসূল বলিয়া আখ্যায়িত করিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যামানায় হাবশার খৃস্টান রাজা আসহামা নাজ্জাশী (দ্র. নাজাশী) এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন (ইব্‌ন হিশাম, সীরা, ১খ, ৩৬১ প., কায়রো সং. ১৩৫৫ হি.; তাকী 'উছমানী, মুকাদ্দামা বাইবেল সে কুরআন তক, ১খ, ৪৩-৬৬, ১০৬-১১৩, করাচী সং. ১৩৯১ হি., হিফজু'র-রাহমান সীওহারুবী, কাসাসু'ল-কুরআন, ৪খ, ১৮৯-২০১, ৩৬৫, করাচী সং. ১৯৭২ খৃ., Encyclopaedia Britannica, নিবন্ধ Jesus Christ এবং Pauls Interpretation; এবং নিবন্ধ Paul শিরো., H. Maurice Retton, Studies in Christian Doctrine)।

**(৪) কেবল বানূ ইসরাঈলের জন্য প্রেরিত** ঃ কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত 'ঈসা ('আ) কেবল বানূ ইসরাঈলদের জন্য নবীরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন—সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য নহে। তাঁহার শারী'আতও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল, উহা সার্বজনীন ছিল না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَرَسُوْلاً اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ

অর্থাৎ হযরত 'ঈসা ('আ)-কে বানূ ইসরাঈলের জন্য রাসূল করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছিল (৩ ঃ ৪৯)। অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ .

"স্মরণ কর, যখন মারয়াম-তনয় 'ঈসা বলিয়াছিল, হে বানূ ইসরাঈল! আমি তোমাদের জন্য রাসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছি" (৬১ ঃ ৬)। বাইবেলেও (নূতন নিয়ম) বর্ণিত আছে যে, হযরত 'ঈসা ('আ) যখন নিজের আগমন সংবাদ ঘোষণা করিবার জন্য তাঁহার শাগরিদগণকে বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 'অন্য কোন জাতির নিকট যাইও না এবং সামিরীদের কোন শহরে প্রবেশ করিও না, বরং ইসরাঈল পরিবারের হারানো দরিদ্র ও মিসকীন লোক (ভেড়া)-এর নিকট যাইবে' (মথি, ১৯ ঃ ৫-৬, 'আরবী সংস্করণ)। ইসলামী শিক্ষামতে হযরত 'ঈসা ('আ)-এর খোদা এবং খোদার পুত্র হওয়ার দাবির ন্যায় তাঁহার সার্বজনীন ও বিশ্বনবী হওয়ার মতবাদটিও তাঁহার বহু পরে উদ্ভাবিত হইয়াছে।

**(৫) মূসা ('আ)-এর শারী'আতের শিক্ষা** ঃ হযরত 'ঈসা ('আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা একখানি পৃথক কিতাব ইনজীল (দ্র.) দান করিলেও তিনি ছিলেন মূসা ('আ)-এর শারী'আতের বিধি-বিধানের অনুসারী। এই কারণেই তাঁহার সারা জীবন মূসা ('আ)-এর শারী'আতের অনুসরণে অতিবাহিত হয়। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ.

"তিনি (আল্লাহ্) তাহাকে কিতাব ও হিকমাত এবং তাওরাত ও ইন্‌জীল শিক্ষা দেন" (৩ ঃ ৪৮)। অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ.

হযরত 'ঈসা বলিলেন "আর আমার পূর্বে যে তাওরাত আসিয়াছে তাহার সমর্থন করি" (৩ ঃ ৫০; আরও দ্র. ৬১ ঃ ৬)। এই বিষয়টিকে বাইবেলে এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ তোমরা ইহা মনে করিও না যে, আমি তাওরাত অথবা অন্য নবীদের কিতাব রহিত (মানসূখ) করিতে আসিয়াছি, রহিত করিতে নহে; বরং আমি পূর্ণ করিতে আসিয়াছি (মথি, ৫ ঃ ১৭, 'আরবী সংস্করণ)।

**(৬) মুহাম্মাদ (স)-এর সুসংবাদ** ঃ ইহা ছাড়াও হযরত 'ঈসা ('আ)-এর বিভিন্ন ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর আগমনের সুসংবাদ পাওয়া যায়। আল-কুরআনে এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ .

"আমি সুসংবাদ দিতেছি আমার পরে আগমনকারী এক রাসূলের, যাহার নাম হইবে আহমাদ" (৬১ ঃ ৬)।

রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে হযরত 'ঈসা ('আ)-এর এই সুসংবাদ ইনজীল-য়ূহান্নার (যোহনের লিখিত সুসমাচার) এইভাবে পাওয়া যায়—"আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আমার চলিয়া যাওয়া তোমাদের জন্য উপকারী। কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আসিবে না। আর আমি গেলে তাঁহাকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়া দিব। তিনি আসিয়া পাপ, ধর্মপরায়ণতা ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে জগতকে দোষী প্রমাণ করিবেন" (১৬ ঃ ৭-৮, 'আরবী সংস্করণ)।

তিনি আরও বলেন, "যখন তিনি অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ আত্মা আসিবেন তখন তিনি তোমাদিগকে সকল প্রকার সত্য পথ প্রদর্শন করিবেন। কারণ

তিনি নিজের পক্ষ হইতে কিছু বলিবেন না। যাহা কিছু (আল্লাহ্র নিকট হইতে) শুনিতে পাইবেন তাহাই বলিবেন এবং তোমাদিগকে ভবিষ্যতের সংবাদও দিবেন" (১৩-১৪, 'আরবী সংস্করণ)। এই ভবিষ্যৎবাণীতে যাহার সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহাকে একটি বিশেষ গুণের অধিকারীরূপে পরিচিত করানো হইয়াছে। এই গুণসম্পন্ন মহান ব্যক্তিকে বাইবেলের নূতন সংস্করণসমূহে যদিও সাহায্যকারী, সহায়, ওয়াকীল (উকীল), সান্ত্বনা দানকারী, সুপারিশকারী বা পক্ষ সমর্থক নামে তরজমা করা হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন গ্রীক, ফরাসী ও ল্যাটিন অনুবাদগুলিতে প্রাক্লীটাস (পারাক্লিটস) এবং হিব্রু ও 'আরবী অনুবাদ 'ফারাকলীত' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে [দ্র. ইনজীল, 'আরবী, যূহান্না (যোহন), ১৪ ঃ ১৬, লণ্ডন ১৮৪৪ খৃ.] যাহা 'আরবী শব্দ আহমাদ-এর সমার্থক (দ্র. স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান, খুতবাত-ই আহমাদিয়্যা ; রাহমাতুল্লাহ কীরানাবী, ইজহারু'ল-হাক্ক, উর্দু অনু., ৩খ, ৩২১-৩৪০)। এই শব্দ দ্বারা যে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বুঝানো হইয়াছে—তেরটি দলীলের দ্বারা তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে (সীউহারুবী, কাসাসু'ল-কুরআন, ৪খ, ২৪৪-২৫০)। ইনজীল বারনাবাস (Barnabas)-এ তো 'মুহাম্মাদ' শব্দ দ্বারাই কয়েক স্থানে এই সুসংবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৭) **আসমানী কিতাব** ঃ হযরত 'ঈসা ('আ) সেই চারজন নবীর অন্তর্ভুক্ত যাঁহাদিগকে একখানি পৃথক পবিত্র কিতাব দান করা হইয়াছে। হযরত 'ঈসা ('আ)-কে ইনজীল প্রদান করা হইয়াছিল যাহাতে ছিল আল্লাহ্র নির্দেশাবলী। কিন্তু খৃস্টান পাদ্রীরা তাহাদের নিজস্ব মতবাদ অনুযায়ী উহাতে বহু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করিয়া উহার স্বরূপই বিকৃত করিয়া ফেলে (বিস্তারিত জানার জন্য দ্র. ইনজীল প্রবন্ধ)।

**'ঈসা ('আ)-এর কর্মকাণ্ড** ঃ হযরত 'ঈসা ('আ)-এর আবির্ভাবের সময় সমগ্র বিশ্বে অত্যাচার, উৎপীড়ন ও মূর্খতার তাণ্ডবলীলা চলিতেছিল। য়াহূদী সম্প্রদায় বিভিন্ন পাপাচার ও অপরাধজনক কর্মে লিপ্ত ছিল। শত শত বৎসরের চিন্তাধারার বন্ধ্যাত্ব এবং শিক্ষা বিমুখতা তাহাদিগকে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখিয়াছিল। তাহারা ধর্মের প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন ও আল্লাহ্র বিধি-বিধানের অনুসরণের পরিবর্তে লোকাচার ও বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করিত। হযরত 'ঈসা ('আ)-এর আগমনের সময় য়াহূদীরা নিম্নলিখিত কয়েকটি দলে বিভক্ত ছিল ঃ (১) সাদূকী (صدوقى Sadducee), (Sadaki) ঃ তাহারা বলিত, মানুষের ভাল-মন্দ কাজের ফল এই দুনিয়াতেই সে পাইবে, আখিরাতে নহে। অন্য কথায় তাহারা পরকালে অবিশ্বাসী ছিল। (২) ফারীসী (فريسى Pharisea) ঃ ইহারা সর্বপ্রকার ভোগবিলাস হইতে বিমুখ থাকাকেই মুক্তির উপায় বলিয়া মনে করিত, অথচ নানাবিধ অসাধু কর্মে লিপ্ত থাকিত। (৩) কাহিন (كاهن) ভবিষ্যৎ বক্তা ঃ ইহারা ধর্মীয় উপাসনা ও কর্মকাণ্ডে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিবর্তে সম্পদ আহরণকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছিল। (৪) আহবার (احبار) বা ধর্মযাজক ঃ ইহারা য়াহূদী ধর্মের হর্তাকর্তা হইয়া বসিয়াছিল, যাহা ইচ্ছা হালাল করিত এবং যাহা ইচ্ছা হারাম করিত। তাওরাতের বিকৃতিতে ইহাদের প্রধান ভূমিকা ছিল। এতদ্ব্যতীত তাহাদের ধর্মীয় জ্ঞান ও নৈতিক বোধের এত অবক্ষয় হইয়াছিল যে, সুলায়মান ('আ)-এর মসজিদকে তাহারা ব্যবসায়ের কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছিল। হযরত 'ঈসা ('আ) য়াহূদী ধর্মযাজকদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ তোমরা এই উপাসনালয়কে দস্যুদের আখড়া করিয়াছ (মথি, ২১ ঃ ১২-১৩)। বস্তুত তাহারা ধর্মকে একটি ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছিল। তাহারা ছিল নির্দয় ও কঠোর হৃদয়। দরিদ্র ও অসহায়দিগের জন্য তাহাদের মনে কোন সমবেদনার উদ্রেক হইত না। হযরত 'ঈসা ('আ) এইসব দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এবং জনগণের মনে ধর্মের নূতন প্রেরণা সৃষ্টির প্রয়াস পান। তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনে স্বীয় বাণী জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি দরিদ্র এবং মানবেতর জীবন যাপনকারী লোকদের সাহায্যের জন্য আহবান জানান। তাঁহার প্রচারের ফলে সেখানকার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব টলটলায়মান হইয়া উঠে। ফলে তাহারা ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠে। আল্লাহ্ তা'আলা এইসব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া তাঁহাকে আসমানে উঠাইয়া নেন।

সাধকসুলভ আচরণ, ধৈর্য ও স্থৈর্য, নম্রতা, সহনশীলতা এবং উদারতার জন্য ইসলামের ইতিহাসে তিনি একজন মহান নবীরূপে খ্যাত (দ্র. ইনজীল; নাসারা, হাওয়ারী, মারয়াম, 'ইমরান প্রভৃতি নিবন্ধ)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত বরাত ব্যতীত আরও দ্র. (১) E.I.2, ৪খ, ৮১-৬। (২) আবু'ল-আ'লা আল-মাওদূদী, তাফহীমু'ল-কু.রআন, ২২তম সং., দিল্লী ১৯৮২ খৃ., ১খ, স্থা., ৪খ, ১১শ সং, লাহোর ১৯৮১ খৃ., পৃ. ১৮৩-৬৯ (বাংলা অনু., ১২খ., ১৩৬-৮১)। (৩) ঐ লেখক, ক.াদিয়ানী মাস'আলা (বাংলা অনু., কাদিয়ানী সমস্যা); (৪) ঐ লেখক, খতমে নবুওয়াত; (৫) ঐ লেখক, সীরাতে সারওয়ারে 'আলাম, ১খ, ১ম সং. দিল্লী ১৯৭৯ খৃ., পৃ. ২১৩-৩০, ৩৯৪-৭, ৪৬০-৭২; ৬৪১-৭০৯; (৬) মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী, মেশকাত শরীফ, ৪র্থ সং., ঢাকা ১৯৭৮ খৃ., ১খ., ৬৬-৭২; (৭) বিস্তারিত দ্র. সীরাত বিশ্বকোষ, ইফাবা, ৩য় খণ্ড, শিরো. ঈসা (আ)।

(মাহ্মূদু'ল-হাসান 'আরিফ, সদস্য সম্পাদনা পরিষদ এবং বাশীর আহ্মাদ সি'দ্দীকী কর্তৃক লিখিত)।

সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/ডঃ আবদুল জলীল

**'ঈসা ইব্ন আবান** (عيسى ابن ابان) ঃ ইব্ন সাদাকা ইব্ন 'আদা ইব্ন মুরাদ, 'আব্বাসী খলীফা আল-মা'মূনের শাসনামলের একজন খ্যাতনামা কাদী, মুহাদ্দিছ, ফাকীহ এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁহার উপনাম আবূ মূসা। তিনি পারস্যের ফাসা অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। হাদীছশাস্ত্রে তাঁহার শায়খদের মধ্যে অন্যতম হইলেন শায়খ ইসমা'ঈল ইব্ন জা'ফার, হাশিম ইব্ন বিশ্র এবং য়াহ্য়া ইব্ন যাকারিয়া। হাদীছশাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান সম্বন্ধে কাদী আবূ হাযিম বলেন, বাগদাদবাসীদের মধ্যে 'ঈসার সমকক্ষ কোন হাদীছবিশারদ আমি দেখি নাই। তিনি ইমাম আবূ হানীফার বিশিষ্ট সহচর আল-হাসান ইব্ন যিয়াদ আল-লুলুঈ এবং মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান আশ-শায়বানীর নিকট ফিক্হশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মুহাম্মাদ ইব্ন সিমা'আ বর্ণনা করেন যে, কাদী 'ঈসা প্রথমদিকে ইমাম মুহাম্মাদ-এর শিক্ষা মজলিসে আসিতেন না। একদা আমরা একসঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করি। সালাতান্তে ইমাম মুহাম্মাদ-এর শিক্ষাদান আসর শুরু হইলে আমি 'ঈসাকে সঙ্গে লইয়া মজলিসে আসি এবং ইমাম সাহেবকে বলি, আপনার এই ভ্রাতুষ্পুত্র ইব্ন আবান ধারণা করেন যে, আপনি হাদীছবিরোধী কিছু অভিমত পোষণ করেন এবং এই কারণে তিনি আপনার শিক্ষা মজলিসে উপস্থিত হইতেছেন না। ইমাম মুহাম্মাদ (র) তখন 'ঈসাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, প্রিয় বৎস! কোন্ কোন্ বিষয়ে আমরা হাদীছের বিরোধিতা করি বলিয়া তুমি ধারণা কর ? 'ঈসা তখন ২৫টি হাদীছের উল্লেখ করিলে ইমাম মুহাম্মাদ (র) তখন নির্দিষ্ট বিষয়গুলির প্রতিটি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছসমূহের পটভূমি, তাৎপর্য, কোন্ হাদীছের দ্বারা কোন্ হাদীছটি মানসূখ হইয়াছে ইত্যাদি বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দ্বারা তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করিলে 'ঈসা স্বীয় ভুল উপলব্ধি করেন এবং ইমাম মুহাম্মাদ-এর জ্ঞানের প্রসারতা ও সত্যনিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সাহচর্য গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল তিনি ইমাম মুহাম্মাদ-এর নিকট হাদীছ ও ফিক্হ অধ্যয়ন করেন।

শায়খ 'ঈসা সুদর্শন চেহারা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। বাগদাদের কাদী য়াহ্‌য়া ইব্ন আকছাম যখন খলীফা আল-মা'মূনের সফর-সঙ্গীরূপে পারস্যের কুম্ম শহরে গমন করেন তখন শায়খ 'ঈসাকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান। কাদী য়াহ্‌য়া সফর হইতে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত শায়খ 'ঈসা বাগদাদের কাদী-র দায়িত্ব পালন করেন। ইহার পর তাঁহাকে বসরার কাদী পদে নিয়োগ করা হয়। তিনি আমরণ দীর্ঘ দশ বৎসর কাল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দক্ষতার সহিত নিরপেক্ষভাবে দ্রুত বিচারকার্য নির্বাহে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁহার বিশিষ্ট শাগরিদ এবং ইমাম তাহাবীর উস্তাদ কাদী আবূ হাযিম 'আবদু'ল-হামীদ বলেন, বাগদাদে শায়খ 'ঈসা অপেক্ষা অধিক হাদীছ জানেন এমন কাহাকেও আমি দেখি নাই। ইব্ন কুতায়বা বলেন, হিলাল ইব্ন য়াহয়া বলিতেন, ইসলামের ইতিহাসে শায়খ 'ঈসার ন্যায় ফিক্‌হ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন কাদী খুব অল্পই পরিদৃষ্ট হয়।

শায়খ 'ঈসার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ঃ কিতাব খাবারি'ল-ওয়াহিদ (كتاب خبر الواحد); কিতাবুল-জামি' (كتاب الجامع); কিতাব ইছ্‌বাতি'ল-কিয়াস (كتاب اثبات القياس), কিতাবুল-ইজ্‌তিহাদি'র-রা'য় (كتاب اجتهاد الرأى)। এবং কিতাবু'ল-হুজাজ (كتاب الحجج)। কোন কোন সূত্রে শেষোক্ত গ্রন্থটির নাম কিতাবু'ল-হাজ্জ (كتاب الحج) উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদ।

কিতাবু'ল-হুজাজ প্রণয়নের কারণ সম্পর্কে কথিত আছে যে, 'আব্বাসী শাসনামলে হানাফী ফিক্‌হশাস্ত্রের প্রসার এবং খলীফার নিকট হানাফী মতানুসারী 'আলিমদের বিশেষ সম্মান লাভে ঈর্ষান্বিত কয়েকজন 'আলিম কয়েকটি হাদীছ লিপিবদ্ধ করিয়া খলীফা আল-মা'মূনের নিকট পেশ করেন এবং অভিযোগ করেন যে, হানাফী মতাবলম্বীরা এইসব হাদীছের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, অথচ রাষ্ট্রের মধ্যে তাঁহারা প্রাধান্য পাইতেছে। শায়খ 'ঈসা তখন এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থে তিনি বিতর্কিত বিষয় কয়টি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছসমূহের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিয়া উহাদের মূল্যায়ন করেন। অতঃপর কোন্‌টি অগ্রাধিকারযোগ্য, কোন্‌টি ব্যাখ্যাযোগ্য এবং কোন্‌টি গ্রহণীয় তাহা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ইমাম আবূ হানীফা (র)-র অভিমতসমূহ যে কুরআন ও সাহীহ্‌ হাদীছের উপর প্রতিষ্ঠিত ও সর্বাপেক্ষা যুক্তিগ্রাহ্য তাহা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত করেন। খলীফা গ্রন্থটি পাঠ করিয়া অতিশয় মুগ্ধ হন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আবূ হানীফা (র)-র উপর করুণা বর্ষণ করুন।

ইবনু'ন-নাদীমের বর্ণনামতে কাদী 'ঈসা যে হাদীছ গ্রন্থটি ইমাম শাফি'ঈ (র)-র অভিমতসমূহ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে সংকলন করেন তাহা সুফয়ান ইব্ন সাহবান-এর বর্ণিত গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত।

বদান্যতা ও ন্যায়নিষ্ঠায় তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি মুহাররাম মাসে ২২০/৮৩৫ সালে বসরায় ইনতিকাল করেন এবং শায়খ কুছাম ইব্ন জা'ফার ইব্ন সুলায়মান তাঁহার জানাযা পড়ান। কোন কোন সূত্রে তাঁহার মৃত্যু সন ২২১ হি. উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইবনু'ন-নাদীম কর্তৃক উল্লিখিত প্রথমোক্ত সনটিই সঠিক প্রতীয়মান হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইবনু'ন-নাদীম, আল-ফিহ্‌রিস্‌ত, কায়রো ১৩৪৮ হি., পৃ. ২৮৯; (২) 'আবদু'ল-কারীম আস-সাম'আনী, কিতাবু'ল-আনসাব, শিরো., আল-কাদী; (৩) আবু'ল-হাসনাত মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-হায়্যি আল-লাকনাবী, আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যা, কায়রো ১৩২৪ হি., পৃ. ১৫১; (৪) 'আবদুল্লাহ্ মুসতাফা আল-মারাগী, আল-ফাতহু'ল-মুবীন ফী তাবাকাতি'ল-উসূলিয়ীন, কায়রো ১৯৪৭ খৃ., ১খ, পৃ. ১৩৯-৪০।

ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

**'ঈসা ইব্ন আবী 'ঈসা** (عيسى بن ابى عيسى) ঃ মুহাদ্দিছ ও তাবি'ঈ, উপনাম আবূ মূসা বা আবূ মুহাম্মাদ। তিনি বানু'ল-গিফার গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। বিশুদ্ধ সূত্রে তাঁহার জন্মতারিখ পাওয়া যায় না। প্রথমে তিনি কূফায় বসবাস করিতেন, পরে মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি কুরায়শদের মাওলা ছিলেন। তাঁহার পিতা আবূ 'ঈসার নাম ছিল মায়সারা। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ মূসা তাঁহার ভাই ছিলেন। 'ঈসা যথাক্রমে আল-খায়্যাত (দর্জী), আল-হান্নাত (গম ব্যবসায়ী) ও আল-খাব্বাত (বৃক্ষপল্লব বিক্রেতা) উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। তিনি এই সকল পেশায় নিয়োজিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার এই সকল উপাধি। তিনি অনেকের নিকট হইতে হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আশ-শা'বী, আবু্‌য-যিনাদ, নাফি', হিশাম ইব্ন 'উরওয়া ও 'আমর ইব্ন শু'আয়ব (র)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। পিতার নিকট হইতেও তিনি বহু হাদীছ আহরণ করিয়াছেন। তিনি হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সূত্রে তিনি হাদীছও বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মারওয়ান ইব্ন মু'আবিয়া, ওয়াকী' ইবনুল-জাররাহ, ইব্ন আবী ফুদায়ক, আবূ খাল্লাদ আল-আহ্‌মার, সাফওয়ান ইব্ন 'ঈসা, 'আমর ইব্ন হারূন আল-বালাখী ও 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা এবং আরও অনেকে। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু'ল-হাসান আশ-শায়বানী তাঁহার নিকট হাদীছশাস্ত্র শিক্ষালাভ করিয়াছেন। হাদীছ সমালোচকগণ তাঁহাকে নির্ভরযোগ্য রাবী হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। কেননা তাঁহার স্মরণশক্তি অনেকটা দুর্বল ছিল। 'আম্‌র ইব্ন 'আলী বলেন যে, য়াহয়া ইব্ন সা'ঈদ আল-কাত্তান-এর সম্মুখে 'ঈসা সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপিত হইলে তিনি তাঁহাকে পসন্দ করেন নাই। উপরন্তু তিনি তাঁহাকে স্মরণশক্তি দুর্বল সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র)-ও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। আহ্‌মাদ ইব্ন হাম্বাল (র), 'ঈসা ইব্ন আবী 'ঈসার তুলনায় আস-সাররী ইব্ন ইসমা'ঈল-কে প্রাধান্য দিতেন। আদ-দাওরী বলেন, য়াহ্‌য়া ইব্ন মা'ঈন-এর তাঁহার উপর আস্থা ছিল না। তিনি তাঁহার বর্ণিত হাদীছ লিখিতেন না। ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম দারা কুতনী তাঁহাকে মাতরূকু'ল-হাদীছ বলিয়াছেন। আবু'শ-শায়খ, য়া'কূব ইব্ন সুফয়ান, আবু'ল-কাসিম আল-বাগাবী, ইব্ন হিব্বান, হাকিম, আস-সাজী, আল-'ইজলী ও আল-'উকায়লী প্রমুখ মুহাদ্দিছ, ঐতিহাসিক ও হাদীছ সমালোচকগণ তাঁহাকে দা'ঈফ (দুর্বল) রাবী হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন। 'আব্বাসী খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূর-এর শাসনকালে ১৫১ হিজরী সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী তাহ্‌যীবু'ত-তাহ্‌যীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৫ হি., ৮খ. ২২৫; (২) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ., ১০০; (৩) ঐ লেখক, লিসানু'ল-মীযান, বৈরূত ১৩৩১ হি., ৭খ., ৩৩২; (৪) ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, করাচী ১৩৯৬/১৯৭৬, পৃ. ২১২।

আবুল বাশার মু. সাইফুল ইসলাম

**'ঈসা ইব্ন 'আলী** (দ্র. 'আলী ইব্ন 'ঈসা)

**'ঈসা ইব্ন 'উমার** (عيسى بن عمر) ঃ আছ-ছাকাফী আল-বাস্‌রী, তৎকালীন একজন 'আরব ব্যাকরণবিদ এবং কারী, মৃ. ১৪৯/৭৬৬। তিনি ছিলেন খালিদ (রা) ইব্নুল-ওয়ালীদ আল-মাখ্‌যূমী আল-কুরাশী (দ্র.)-র আশ্রিত (মাওলা)। কিন্তু তাঁহাকে আছ্-ছাকাফী বলা হইত এই কারণে যে, বস্‌রাতে তিনি ছাকীফ গোত্রীয়দের মধ্যে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। হাজিব নামে তাঁহার এক ভাই ছিলেন, মৃ. ১৫৮/৭৭৪-৫ (ইব্ন হাজার, তাহ্‌যীবুত-তাহ্‌যীব, ২খ, ১৩৩)। তাঁহাদের মাতা ছিলেন যিয়াদ-এর কন্যা। যিয়াদ বস্‌রায় যিয়াদান নামক জমিদারীর মালিক ছিলেন (বালাযুরী, ৩৬২)। তাঁহার ভগিনী ছিলেন মুনিস ইব্ন 'ইম্‌রান-এর মাতা। মুনিস জা'ফার ইব্ন য়াহ্‌য়া আল-বারমাকীর দলভুক্ত ছিলেন। 'ঈসা কুরআন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী ইস্‌হাক (দ্র.), ইব্ন কাছীর (দ্র.), আল-জাহ্‌দারী (দ্র. ইব্ন জাযারী, ১খ, ৩৪৯) এবং ইব্ন মুহায়সিন (ঐ, ২খ. ১৬৭, ১০)-এর নিকট। তাঁহার 'ইখতিয়ার' গ্রন্থে তিনি বেদুঈনদের ভাষা অন্ধভাবে অনুসরণ করেন নাই, বরং তাহাদের কবিগণের সমালোচনা করিয়াছেন এবং ইব্ন আবী ইস্‌হাকের মত যুক্তি (কিয়াস) প্রয়োগ করিয়াছেন। এমনকি সাধারণ কথোপকথনেও তিনি সর্বদা ই'রাব (শব্দান্তে স্বরচিহ্ন)-মূলক উচ্চারণ করিতেন। তাঁহার জীবনীকারগণও তাঁহার কৃত্রিমতাপূর্ণ বাকপদ্ধতির কিছু কিছু নমুনা তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার শাগরিদদের মধ্যে ছিলেন আল-আস্‌মা'ঈ, খালীল ইব্ন আহ্‌মাদ এবং সীবাওয়ায়হ্ (তিনি তাঁহার আল-কিতাব গ্রন্থে 'ঈসা ইব্ন 'উমারের নাম কয়েকবার উল্লেখ করিয়াছেন)। বলা হয় যে, তিনি দুইটি ব্যাকরণ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনটিই আমাদের হস্তগত হয় নাই। তাঁহার কিরাআত রীতি সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল এবং উহা ব্যতিক্রমধর্মী বা শাওয়ায্ (شواذ) বলিয়া গণ্য হইত।

একই নামের কূফাবাসী আল-হাম্‌দানী এবং এই 'ঈসা ইব্ন 'উমার-এর নামের যেন বিভ্রান্তি না হয়; আল-হাম্‌দানীর মৃত্যু ১৫৬/৭৭৩ সনে (দ্র. ফিহ্‌রিস্ত, ১খ, ৩১; তাহযীবুত-তাহ্‌যীব, ৮খ., ২২২; ইব্ন জাযারী, গায়া)।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইব্ন কুতায়বা, মা'আরিফ, ২৬৪, ২৬৮; (২) ফিহ্‌রিস্ত, ৪১ প., ৫১, ২২; (৩) ইব্ন আন্‌বারী, নুযহা, ২৫-৯; (৪) য়াকূত, উদাবা', ৮খ., ১০০-৩; (৫) ইব্ন খাল্লিকান, নং ৫২৩; (৬) ইব্ন জাযারী, গায়া, ১খ, ৬১৩; (৭) ইব্ন হাজার, তাহ্‌যীব, ৮খ, ২২৩; (৮) সুয়ূতী, বুগ্‌য়া, ৩৭০; (৯) আরও দ্র. জুমাহী, তাবাকাত-এর নির্ঘণ্টগুলি; (১০) ইব্ন কুতায়্‌বা, 'উয়ূন; (১১) মুবার্‌রাদ, কামিল; (১২) আল-কালী, আমালী; (১৩) মার্‌যুবানী, মুওয়াশ্‌শাহ এবং মুক্‌তাবাস; (১৪) Noldeke, Geschichte des Qorans, iii, 120; (১৫) Brockelmann, I, 99; SI. 158; (১৬) Sezgin, I. 29.

J. W. Fuck (E.I.[2])/ছালেমা খাতুন

**'ঈসা ইব্ন দীনার** (عيسى بن دينار) ঃ ইব্ন ওয়াফিদ আল-গাফিকী, স্পেনের ইসলামী আইনশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বের তিন স্থপতির অন্যতম। অপর দুইজন হইলেন ঃ য়াহ্‌য়া ইব্ন য়াহ্‌য়া (মৃ. ২৩৪/৮৪৮) ও 'আবদু'ল মালিক ইব্ন হাবীব (মৃ. ২৩৮/৮৫২)। 'ঈসা তাঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বলিয়া বিবেচিত এবং তাঁহাকে 'আলিমু'ল-আন্দালুস' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি টলেডোতে খুব সম্ভব ১৫৫/৭৭১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন মালিক ইব্ন আনাসের নিকট অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে মদীনায় গমন করেন তখন দেখিতে পাইলেন যে, মালিক ইব্ন আনাস (র) সম্প্রতি (১৭৯/৭৯৫) ইনতিকাল করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ফুসতাতে ফিরিয়া যান এবং মালিক ইব্ন আনাসের যোগ্যতম সহচর 'আবদু'র-রাহমান ইব্নু'ল-কাসিম (মৃ. ১৯১/৮০৬)-এর তত্ত্বাবধানে বিদ্যা অর্জন করেন। ইহা ছাড়াও তিনি ফুসতাতের প্রসিদ্ধ দুইজন মালিকী মায্‌হাবের আলিমের বক্তৃতা মজলিসে যোগদান করিতেন। তাঁহারা হইলেন—'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহ্‌ব (মৃ. ১৯৭/৮১২) ও আশহাব ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয (মৃ. ২০৪/৮১৯)। য়াহ্‌য়া ইব্ন য়াহ্‌য়া গর্ব করিতেন যে, তিনি ইমাম মালিক (র)-এর অধীনে কিছুকাল লেখাপড়া করিয়াছেন, আর সেইগুলি তিনি পরবর্তী কালে ফুসতাতে সম্পূর্ণ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন হাবীব সর্বদা দেখাইতে চেষ্টা করিতেন যে, তিনি মালিক ইব্ন আনাসের মদীনাবাসী চারজন শাগরিদের নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়াছেন। তাঁহারা হইলেন মুগীরা ইব্ন 'আবদি'র-রাহমান আল-মাখযূমী (মৃ. ১৮৮/৮০৪), আবু'ল-মুস্'আব আয-যুহরী (মৃ. ২৪২/৮৫৬), আবদু'ল-মালিক ইব্ন আল-মাজিশূন (মৃ. ২১২/৮২৭) ও আল-মুতাররিফ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (মৃ. ২২০/৮৩৫)। 'ঈসা ইব্ন দীনার এই কথা প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, একজন ভাল অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়নে অনেক ভাল ফল লাভ করা যায়—যদি ছাত্রটি অধিক মেধাবী ও চরিত্রবান হয়। 'ঈসা ইব্ন দীনার মিসর হইতে ফেরার কিছুদিন পরই কর্ডোভার মুফ্‌তী (দ্র.) নিযুক্ত হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত (২১২/৮২৭) সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। য়াহ্‌য়া' ছাড়া এই পদে এত দীর্ঘকাল কেহই অধিষ্ঠিত থাকেন নাই। 'ঈসা মালিকী ফিক্‌হ-এর উপর 'আল-হিদায়া' নামে একটি বিশাল গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তাহাতে তিনি ইব্নু'ল-কাসিম হইতে আহরিত জ্ঞানের সমন্বয় ঘটান এবং তাহাতে নিজস্ব মতামতও লিপিবদ্ধ করেন। তিনি এই বিশাল গ্রন্থটি ফিক্‌হ-এর অধ্যায়ের অনুসরণে বিন্যাস করেন এবং প্রতিটি অধ্যায়ের প্রশ্নসম্বলিত একটি খণ্ডও রচনা করেন। তাঁহার একজন ছাত্র 'ব্যবসা-বাণিজ্য/ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়টি (মাসা'ইলু'ল-বুয়ূ') ইব্নু'ল-মাজিশূনকে পড়িয়া শুনাইলে তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে পুনঃপুনঃ বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আপনাদের 'ঈসা বস্তুতপক্ষে একটি অপূর্ব জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন (احسن والله عيسى هذا)। হিদায়া গ্রন্থখানি য়াহয়া ইব্ন য়াহ্‌য়ার দশখানি গ্রন্থ (عشرات يحيى) এবং ইব্ন হাবীবের আল-ওয়াদিহা (الواضحة)-এর তুলনায় মানের দিক দিয়া অনেক উন্নত। এই দুইখানি গ্রন্থে মালিকী মায্‌হাবের আইন খুব সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু স্পেনীয় মালিকী মায্‌হাব-এর বিকাশে 'আল-হিদায়া'-র অবদান ছিল প্রচুর।

আইন ও ধর্মতত্ত্বে অগাধ পাণ্ডিত্য ছাড়াও কোন কোন বিষয়ে 'ঈসার নিজস্ব মতামত ছিল যাহা বিভিন্ন সময়ে সরকার ও অপরাপর ফাকীহদের সহিত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছিল। কর্ডোভার উপকণ্ঠের বিদ্রোহে অংশগ্রহণের কারণে তিনি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন (২০৩/৮১৮) এবং বিদ্রোহ দমনের পর তিনি মুক্তি পাইয়া নিরাপদ হইয়াছিলেন। ১ম আল-হাকাম তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহাকে তাঁহার পদে সম্মানের সহিত পুনর্বহাল করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষদিকে তিনি মালিকী মায্‌হাবের কঠোরতায় ও ফাকীহগণ অন্ধ বশ্যতাসুলভ মনোভাব লইয়া যেইভাবে আল-মুওয়াত্তা'-কে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তিনি উভয়টিকে ত্যাগ করিয়া ইসলামের মৌলসূত্র কুরআন ও সুন্নাহ-এর দিকে ফিরিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বহুদিন পূর্বেই ফুসতাতে অধ্যয়নকালে তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহ্‌ব-এর নিকট হইতে এই ধারণা পাইয়াছিলেন। ইব্ন ওয়াহ্‌ব তাঁহাকে মুওয়াত্তার বিষয়ে হুঁশিয়ার করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, 'ঈসা তাঁহার আশা পূরণের সময় পান নাই। পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসরকাল পর্যন্ত মুওয়াত্তা' স্পেনের

মুসলমানদের আইনের অদ্বিতীয় উৎস হিসাবে চলিয়া আসিতেছিল যতদিন না তাহা বাকী ইব্‌ন মাখ্‌লাদ (২০১-২৭৬/৮১৬-৮৮৯) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওয়াদ্দাহ্ (১৯৯-২৮৭/৮১৪-৯০০) কর্তৃক পূর্ণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইয়াছিল। 'ঈসা ইব্‌ন দীনার তাঁহার বিচারকার্যে সংশোধন আনিয়াছিলেন, বিশেষত যখন তাহারা শাস্তির বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 'আবদু'ল-মালিক ইব্‌ন হাবীব যখন খারিজী ও মু'তাযিলাগণকে নির্দয়ভাবে হত্যার আদেশ দেন, তখন তিনি চাপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে স্বীয় মতবাদ হইতে তাওবা করিয়া সুন্নাহ-এর দিকে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ দিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে 'ঈসা ইমাম মালিক অপেক্ষাও একই নীতিতে অধিকতর অবিচল ছিলেন—ইমাম মালিক (র) তাঁহার সর্বশেষ পুস্তিকা "বাবু'ন-নাহ্‌য়ি 'আনি'ল-কাদ্‌র (باب النهى عن القدر)-এ বলিয়াছিলেন যে, মু'তাযিলাগণকে কোনরূপ শাস্তি দিবার পূর্বে তাহাদিগকে তাওবা করিবার সুযোগ অবশ্যই দিতে হইবে। কিন্তু যখন তাঁহাকে মসজিদে তাহাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তখন তিনি উচ্চস্বরে বলিয়াছিলেন ইহারা ধর্মদ্রোহী নাস্তিক। ইহাদিগকে হত্যা করা হউক।

**গ্রন্থপঞ্জী :** (১) ইবনু'ল-ফারাদী, 'উলামা', মাদ্রিদ ১৮৯০-৯২ খৃ., ৯৭৩ ; (২) আল-হুমায়দী, আল-জাফওয়া, কায়রো ১৯৫২ খৃ., ৬৭৮ ; (৩) ইবনু'ল-কূতিয়্যা, ইফ্‌তিতাহ্, মাদ্রিদ ১৯২৬ খৃ., ৩৫ ; (৪) দাব্বী, বুগ্‌য়া, ৩৮৯ ; (৫) আস-সাফাদী, আল-ওয়াফী, ফটোকপি, কায়রো লাইব্রেরী, ৫/৩খ, ৬১৫ ; (৬) ইব্‌ন সা'ঈদ, আল-মুগরিব, কায়রো ১৯৫৬ খৃ., ২খ, ২৪ ; (৭) ইব্‌ন ফারহুন, দীবাজ, কায়রো ১৯৩২ খৃ., ১৭৭ ; (৮) আল-মাক্কারী, নাফ্‌হু'ত-তীব্ব, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., ২খ, ২১৫, ৪খ, ১৮১-২; (৯) 'ইয়াদ, আশ-শিফা', কায়রো তা. বি., ২খ, ২৭৩ ; (১০) ঐ লেখক, আল-মাদারিক, সম্পা. এ. বাকীর, বৈরূত ১৯৬৭ খৃ., নির্ঘন্ট ; (১১) Jose Lopez Ortiz, la recepcion de la Escuela Maleki en Espana, in Anuario de historia del derecho espanol, vii (1930), 1-169 ; (১২) Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., i. 148, ii, 473 ; (১৩) M. A. Makki, Ensayo sobre las aportaciones orentales en la Espana Musulmana, Madrid 1968, Index.

H. Mones (E.I.[2])/এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম

**'ঈসা ইব্‌ন মুহান্না** (عيسى ابن مهنى) : মৃ. ৬৮৩/১২৮৪, মামলূক সুলতান কর্তৃক আমীরু'ল-'আরাব পদে নিযুক্ত বাদিয়াতু'শ-শাম-এর একটি বেদুঈন গোত্র আল-ফাদ্‌ল-এর প্রধান ছিলেন।

সাধারণত তাঁহার বংশ তালিকা এইরূপ বলিয়া উল্লিখিত হয় : 'ঈসা ইবনু'ল-মুহান্না ইব্‌ন মামী' ইব্‌ন হাদীছা ইব্‌ন আসাবা (বা 'উক্‌বা) ইব্‌ন ফাদ্‌ল ইব্‌ন রাবী'আ। তাঁহার উপাধি ছিল শারাফু'দ-দীন আত-তাঈ। এই আল-ফাদ্‌ল গোত্রটি বাবী'আর সহিত এবং তৎমাধ্যমে তাঈ গোত্রের সহিত সম্পৃক্ত ছিল (তাঁহাদের প্রাথমিক ইতিহাসের জন্য দ্র. ইব্‌ন খালদূন, আল-'ইবার, কায়রো ১২৮৪ হি., ৫খ, ৪৩৬ প. ; আল-কালকাশান্দী, সুব্‌হ, কায়রো ১৯১৪ খৃ., ৪খ, ২০৩ প., ২০৬)। তাহারা খুবই সম্পদশালী ছিল (দ্র. আল-উমারী, আত-তা'রীফ, কায়রো ১৩১২ হি., ৭৯) এবং হিম্‌স হইতে কাল'আত জা'বার এবং রাহ্‌বা' পর্যন্ত অবাধে বিচরণ করিত (সুব্‌হ, ৪খ, ২০৪, ২৩১ ; আল-খালিদী, আল-মুক্‌সিদু'র-রাফী', Paris, Bibl. Nat., পাণ্ডু. 4439, 155)। 'ঈসা তাঁহার ঘনিষ্ঠ অনুগামিগণসহ বাদিয়াতু'শ-শামে বাস করিতেন। তিনি কখনও কখনও রাহ্‌বা-র নিকট ফুরাত নদী পার হইয়া ইরাকে যাইতেন।

৭ম/১৩শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মামলূক ও মোঙ্গলদের যুদ্ধের সময় 'ঈসা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অন্যান্য বেদুঈন সঙ্গে করিয়া ৬৫৮/১২৬০ সনে 'আয়ন জালূত (দ্র.)-এর যুদ্ধে কুতুয (দ্র.)-এ লড়াই করিবার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে (অথবা তাঁহার পিতাকে) সালামিয়্যা (দ্র.)-র ইক্‌তা' (দ্র.) দান করা হইয়াছিল, যদিও তিনি প্রতিবেশী আমীরগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, বিশেষত ইর্‌বিলের জালালু'দ-দীন আল-কালালী-র সঙ্গে (দ্র. কাদী মুহয়ি'দ-দীন ইব্‌ন 'আবদি'জ-জাহির, আর-রাওদু'জ -জাহির, সম্পা. এস. এফ. সাদিক, ১৯৫৬ খৃ., ১১২)। তথাপি বায়বারসদের (দ্র.) সঙ্গে তাঁহার সুসম্পর্ক না থাকায় তাঁহার চাচাত ভাই 'আলী ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন মানি-এর রক্তপিপাসু নিষ্ঠুর শাসন দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে (আর-রাওদ, ১২৩)। তাঁহার স্থলে সুলতান ৬৬৩/১২৬৪ সনে তাঁহাকে সমস্ত বেদুঈনদের উপর 'আমীরু'ল-'আরাব নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সমসাময়িক উৎস হইতে জানা যায় যে, তিনি সুশাসন ও ন্যায়বিচার দ্বারা দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনেক কিছু করিয়াছিলেন (যথা ইবনু'ল-ফুরাত, তা'রীখ, বৈরূত ১৯৩৯ হি., ৭খ, ১২ প.)। 'ঈসা এশিয়া মাইনর-এ ৬৭৫/১২৭৭ সনে বায়বারসদের আক্রমণ প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন এবং আলেপ্পোর না'ইব নূরু'দ-দীন-'আলীর সহিত একত্রে সিরিয়াতে মোঙ্গলদের অনুপ্রবেশে বাধা দিয়াছিলেন (দ্র. বায়বারস তারিহি, T. tr. S. Yaltkays, Istanbul 1941, 85)। তবে কালাউন-এর অধীনে তিনি স্বয়ং সুনকুর আল-আশকার, যিনি আল-মালিকু'ল-কামিল উপাধি ধারণ করিয়া দামিশ্‌ককে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন এবং ঈলখানী শাসকদের পক্ষে বাগদাদ শাসক 'আলা'উ'দ-দীন 'আতা' মালিক জুওয়ায়নীর সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। ৬৭৯/১২৮০ সনে তিনি এবং সুনকুর আবাকার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। জুওয়ায়নীর মাধ্যমে তিনি তাঁহার পুত্রকে আবাকার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আবাকা এই পুত্রকে একটি খিল্‌'আত (সম্মানী পোশাক) উপহার দিয়াছিলেন এবং বাগদাদের রাজস্বের কিছু অংশ তাঁহার জন্য মঞ্জুর করিয়াছিলেন (D'Ohsson, Histoire des Mongoles, iii, 522)। তবে এই প্রীতির সম্পর্ক বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। ৬৮০/১২৮১ সনে 'ঈসা কায়রো পরিদর্শন করেন। কালাউন তাঁহাকে ক্ষমা করেন এবং হিম্‌স (দ্র.)-এর যুদ্ধে মামলূক বাহিনীর দক্ষিণস্থ সমস্ত বেদুঈন অগ্রণী দলের নেতৃত্ব দেন (দ্র. আবু'ল-ফিদা', আল্-মুখ্‌তাসার ফী আখ্‌বারি'ল-বাশার, ইস্তাম্বুল ১২৮৬ হি., ৪খ, ১৫ ; D'Ohsson, iii, ৫২৬)। রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৬৮৩/মে ১২৮৪ সনে 'ঈসা ইনতিকাল করেন। এই মাসেরই ৯ তারিখে/২৬ মে, দামিশকের বিখ্যাত মসজিদে তাঁহার গায়বী জানাযার সালাত অনুষ্ঠিত হয় (দ্র. ইবনু'ল-ফুরাত, ৮খ, ১৩)। তাঁহার বিশ বৎসর শাসন আমলে 'ঈসা ঈলখানীদের মৈত্রী কামনা করা সত্ত্বেও একটি সুবিন্যস্ত শাসন প্রণালী অনুসরণ করিয়াছিলেন যাহার ফলে তাঁহার রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত ছিল এবং বিভিন্ন সূত্রে তিনি একজন সৎ ও ধার্মিক লোক বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছিলেন (ইবনুল ফুরাত, ৮খ, ১৩ ; আল-য়াফি'ঈ, মিরআতু'ল-জিনান, হায়দরাবাদ ১৩৩৮ হি., ৪খ, ১৯৯)।

আলু 'ঈসার নেতা হিসাবে তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী এবং তাদমুর-এর শাসনকর্তা হুসামু'দ-দীন মুহান্না তাঁহার পিতার শাসননীতি অনুসরণ করেন। কিন্তু ৬৯২/১২৯৩ সনে মামলূক সুলতান খতীব, হিম্স-এ তাঁহাকে তাঁহার ভাই মুহাম্মাদ ও ফাদল এবং তাঁহার পুত্র মূসাসহ গ্রেফতার করিয়া কায়রো লইয়া আসেন এবং কাল'আতু'ল-জাবাল-এ বন্দী করিয়া রাখেন (আবু'ল-ফিদা', ৪খ, ২৯ ; ইব্ন খালদূন, ৫খ, ৪৩৮; সুবূহু, ৪খ, ২০৬)। যাহা হউক, দুই বৎসর পর তিনি 'আমীরু'ল-'আরাব' পদ ফিরিয়া পান। ৬৯৭/১২৯৮ সনে তিনি খুব জাঁকজমক সহকারে পবিত্র হজ্জ পালন করেন (Wustenfeld, Chron. der Stadt Mecca, ii, 275)। শীঘ্রই তাঁহার আল-মালিক আন-নাসির মুহাম্মাদ-এর সহিত বিবাদ বাধে এবং তিনি নিজে ৭১২/১৩১২ সনে, বিশেষ করিয়া ৭২০/১৩২০ সনে ঈলখানীদের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হন (ইব্ন খালদূন, ৫খ, ৪৩৯)। ফলে আলু 'ঈসা দামিশ্কের না'ইব এবং বেদুঈনদের একটি দল কর্তৃক ভীষণভাবে নির্যাতিত হন এবং তাঁহার "ইক্তাসমূহ প্রত্যাহার করা হয় (আবু'ল-ফিদা', ৪খ, ৯১-৩; আল্-'উমারী, ৭৯)।

তথাপি যখন ৭২৩/১৩২৩ সনে মামলূক এবং ঈলখানীগণ শান্তি স্থাপন করেন, মুহান্না তখন সিরিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার শাসন আমলে গোত্রটি দুই শাখায় বিভক্ত হয় ঃ (১) বায়তু মুহান্না ইব্ন 'ঈসা এবং (২) বায়তু ফাদ্ল ইব্ন 'ঈসা (আল-'উমারী, ৭৯ ; সুবহ, ৪খ, ২০৫, ২০৮ ; মুক্সিদ, ১৫৫)। আলু মুহান্না নামে আর একটি তৃতীয় শাখা মুহান্নার দৌহিত্র নু'আয়র-এর অধীনে আবির্ভূত হয় (মুহাম্মাদ ইব্ন জাব্বার ইব্ন মুহান্না) (নু'আয়র-এর জন্য দ্র. M. C. Sehabeddin Tekindag, Barkuk devrinde Mamluk Sultanigi, ইস্তাম্বুল ১৯৬১ খৃ. পৃ. ৫৯, ৬৫, ৭২-৩, ৭৫, ৮১-২, ৯৫-৬)। মনে হয় এই পরিবারগুলি "আমীরুল-'আরাব" পদটি ৮৭৯.১৪৭৪ সন পর্যন্ত রক্ষা করিয়াছিল।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত সূত্রের অতিরিক্ত (১) মাক্রীযী, কিতাবু'স-সুলূক, কায়রো ১৩৩৯ খৃ., ১/৩খ, ৭২৫-৬ ; (২) Well, Chalifen, iv, 12f. ; (৩) Gaudefroy-Demomoyncs, La Syre al'epoque des Mamelouks, Paris 1923, 186f. ; (৪) যিরিক্লী, আল-আ'লাম, ৫খ, ২৯৬।

M. C. Sehabeddin Tekindag (E.I.[2])/ মোঃ লোকমান হোসেন

**'ঈসা ইব্ন মূসা** (عيسى بن موسى) ঃ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্নি'ল-'আব্বাস, 'আব্বাসী যুবরাজ, 'আব্বাসী বংশের প্রথম দুইজন খলীফার ভ্রাতুষ্পুত্র। আস-সাফ্ফাহ্ (দ্র.)-এর শাসনামলে তিনি কূফার গভর্নর ছিলেন এবং সেই সময় আবূ জা'ফারের পরে খিলাফাতের দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত হন। আস-সাফ্ফাহ্র মৃত্যু হইলে তিনিই তখন মক্কায় অবস্থানরত আল-মানসূরের পক্ষে আল-আনবারে আনুগত্যের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

'ঈসা ইব্ন মূসা আল-মানসূরের রাজত্বকালে গভর্নর পদে বহাল ছিলেন এবং 'আলী বংশীয় বিদ্রোহী মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ এবং ইব্রাহীম-এর বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতা পরিচালনা করেন। যু'ল-কা'দা ১৪৫/ফেব্রুয়ারী ৭৬৩ সালে তিনি বাখামরা (দ্র.) যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। কিন্তু ১৪৭/৭৬৪-৬৫ সালে আল-মাহ্দীর অনুকূলে তাঁহাকে উত্তরাধিকার দাবি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মুহার্‌রাম ১৬০/অক্টোবর-নভেম্বর ৭৭৬ সালে আল-মাহ্দী, যিনি খলীফা হইয়াছিলেন, তিনিও 'ঈসার উপর চাপ প্রয়োগ করেন যাহাতে তিনি পুনরায় তাঁহার নিজ পুত্র মূসা' (পরবর্তী কালে আল-হাদী)-র অনুকূলে তাঁহার উক্ত উত্তরাধিকার দাবি পুনর্বার পরিত্যাগ করেন। 'ঈসা ইব্ন মূসা ১৬৭/৭৮৩-৪ সালে ৮৫ বৎসর বয়সে কূফায় ইনতিকাল করেন।

বাগদাদ নির্মাণ পরিকল্পনায় তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মন হয়। কতিপয় উৎস অনুসারে এই কারণেই নাহ্র 'ঈসা (দ্র.) নামকরণ করা হইয়াছিল এবং ঐতিহাসিকগণ তাঁহার একটি প্রাসাদের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা পরবর্তী কালে খলীফা আল-মা'মূনের বংশধরদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। অধিকন্তু আল-উখায়দির দুর্গ প্রাসাদের নির্মাণ-কৃতিত্ব সাধারণভাবে তাঁহার প্রতি আরোপিত হইয়া থাকে। দুর্গ প্রাসাদটি কূফার অনতিদূরে তৃণভূমি অঞ্চলে অবস্থিত এবং ইহার সামরিক গুরুত্বের কথা আধুনা উল্লিখিত দেখা যায়। ইহার নির্মাণ এতদঞ্চলে 'আলী বংশীয়দের আন্দোলন দমনের সহিত সম্পর্কিত ছিল বলিয়া মনে করা হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) তাবারী, ৩খ, নির্ঘণ্ট ; (২) ইবনু'ল-আছীর, নির্ঘণ্ট ; (৩) য়া'কূবী, নির্ঘণ্ট ; (৪) মাস'ঊদী, মুরূজ, নির্ঘণ্ট ; (৫) আগানী, বিন্যস্ত তথ্য তালিকা ; (৬) বালাযূরী, আনসাব, পাণ্ডু, ইস্তাম্বুল-আসির Ef. ৫৯৭, পত্র ৫৬৯ ; (৭) L. Caetani, Cronografia, রোম ১৯২৩ খৃ., fasc. ১খ, স্থা. ; (৮) Le Strange, পৃ. ৬৬ এবং নির্ঘণ্ট ; (৯) K. A. C. Creswell, Early Muslim Architecture, ২খ, অক্সফোর্ড ১৯৪০ খৃ. ; (১০) W. Caskel, al-Ukaidir, Isl.-এ, ৩৯খ. (১৯৬৪ খৃ.), ২৮-৩৭।

D. Sourdel (E.I.[2])/মুহ. আবু তাহের

**'ঈসা ইব্ন য়ূনুস আস-সাবী'ঈ** (عيسى بن يونس السبيعي) ঃ আল-হামাদানী, জনৈক খ্যাতনামা হাদীছ বিশারদ, ইমাম আবূ ইসহাক-এর পৌত্র। উপনাম আবূ 'আম্র, আবূ মুহাম্মাদও বলা হইত। তাঁহার পিতা য়ূনুস এবং পিতৃব্য ইস্হাক উভয়ই প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ছিলেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইসরাঈল তাঁহার ভাই। 'ঈসা কূফার বাসিন্দা ছিলেন। 'আব্বাসী শাসনকালে তিনি একজন সীমান্তরক্ষী হিসাবে সিরিয়ার সীমান্ত অঞ্চল আছ-ছাগ্র-এ গমন করেন এবং তথাকার আল-হাদাছ নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। পিতা ও পিতৃব্য ছাড়াও তিনি সুলায়মান আত-তায়মী, হিশাম ইব্ন 'উরওয়া, য়াহ্য়া ইব্ন সা'ঈদ আল-আনসারী, 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'উমার, ইব্ন 'আওন, 'ঈসা ইব্ন সুলায়মান আর-রাসৃতানী, আলা-ওয়ালীদ ইব্ন কাছীর, ইসমা'ঈল ইব্ন আবী খালিদ, আল-আ'মাশ, যাকারিয়্যা ইব্ন আবী যা'ইদা, ইব্ন আবী 'আরূবা, 'আল-আওযা'ঈ, সুফ্য়ান আছ-ছাওরী ও শু'বা প্রমুখ মুহাদ্দিছ হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি স্বীয় পিতামহ আবূ ইস্হাকেরও নৈকট্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে কোনও হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহার ছাত্রসংখ্যা অগণিত। তাঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ঃ হাম্মাদ ইব্ন সালামা, ইস্মা'ঈল ইব্ন 'আয়্যাশ, ইস্মা'ঈল ইব্ন আবান, মুসাদ্দাদ ইব্নু'ল-মাদীনী, বাকিয়্যা ইব্নু'ল-ওয়ালীদ, ইস্হাক ইব্ন রাহ্ওয়ায়হ, আবূ বাক্র ইব্ন আবী শায়বা, মূসা ইব্ন আ'য়ূন ও 'আলী ইব্ন খুশ্রুম। আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, আবূ হাতিম, য়াকূব ইব্ন

শায়বা ও ইব্‌ন খাররাশ তাঁহাকে একজন নির্ভরযোগ্য রাবী হিসাবে প্রত্যায়ন করিয়াছেন। একদা 'আলী ইব্‌ন 'উছমান ইব্‌ন নুফায়ল ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র)-এর নিকট বলিলেন, আবূ কাতাদা আল-হাররানী, 'ঈসা ইব্‌ন য়ূনুস, ওয়াকী' ইব্‌নু'ল-জাররাহ ও 'আব্দুল্লাহ ইব্‌নু'ল-মুবারাকের সমালোচনা করিয়া থাকেন। তদুত্তরে ইমাম আহমাদ (র) বলেন, যেই ব্যক্তি কোনও হকপন্থীদিগের (اهل الحق) সমালোচনা করেন সে-ই মিথ্যাচারী। আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম বলেন আল-আওযা'ঈ-র হাদীছ যেই ব্যক্তিই আমার বর্ণনা হইতে ভিন্নতররূপে বর্ণনা করুক আমি তাহার পরোয়া করি না, তবে 'ঈসা ইব্‌ন য়ূনুস-এর কথা স্বতন্ত্র। কারণ আমি তাঁহাকে আল-আওযা'ঈর হাদীছ "শক্তভাবে" গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। 'ঈসা আল-আ'মাশের একজন অধ্যবসায়ী ছাত্র ছিলেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উবায়দ বলেন 'ঈসা ইব্‌ন য়ূনুস যখন আল-আওযা'ঈর সমক্ষে আসিতেন তখন তাঁহার চরিত্র ও আদর্শ লক্ষ্য করিতেন। বিশ্‌র ইব্‌নু'ল-হারিছ, ইস্‌মা'ঈল ইব্‌নু'ল-'আয়্যাশ, সুফ্‌য়ান ইব্‌ন 'উয়ায়না প্রমুখ সমসাময়িক মুহাদ্দিছ তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন। সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ বলেন, আমরা ইব্‌ন 'উয়ায়নার মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় 'ঈসা ইব্‌ন য়ূনুস সেইখানে উপস্থিত হইলে তিনি এই বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান, "স্বাগতম হে ফাকীহ-পুত্র ! হে ফাকীহ-পৌত্র !! 'ঈসা পালাক্রমে এক বৎসর হজ্জ পালন করিতেন এবং পরবর্তী বৎসর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতেন। এইভাবে তিনি সর্বমোট পঁয়তাল্লিশবার হজ্জ করিয়াছেন এবং পঁয়তাল্লিশটি যুদ্ধাভিযানে শরীক হইয়াছেন। ইব্‌ন মু'ঈন বলেন, আমি 'ঈসার পরিধানে মোটা জুব্বা এবং দুইটি লাল বর্ণের মোজা দেখিয়াছি। ইহা পরিধান করিয়া তিনি যুদ্ধে যাইতেন। তিনি হাদীছ বর্ণনার জন্য কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন না। জা'ফার ইব্‌ন য়াহয়া আল-বারমাকী বলেন, আমি 'ঈসার ন্যায় মুহাদ্দিছ দেখি নাই। একবার আমি তাঁহার সম্মুখে এক শত দীনার পেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। মুহাম্মাদ ইব্‌নু'ল-মুন্‌কাদির বলেন, হারূনু'র-রাশীদ যেই বৎসর হজ্জ করেন, সেই বৎসর তিনি কূফায় গমন করিয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁহার দুই পুত্র আল-আমীন ও আল-মা'মূনও ছিলেন। পুত্রদ্বয় উভয়ে 'ঈসার দরবারে উপস্থিত হন। তিনি তাঁহাদের সম্মুখে কিছু হাদীছ বর্ণনাকালে আল-মা'মূন ইহাতে মুগ্ধ হইয়া দশ সহস্র দিরহাম উপঢৌকন প্রদান করেন। কিন্তু 'ঈসা সেইদিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র করিলেন না। আল-মা'মূন ধারণা করিলেন উপঢৌকনের পরিমাণ হয়ত কম হইয়াছে। ফলে তিনি বিশ সহস্র প্রদানের নির্দেশ দিলেন তখন 'ঈসা বলিলেন, কখনও নহে। আল্লাহ্‌র শপথ, কখনও নহে এক ফোঁটা পানি হইলেও না, এমন কি এই মসজিদকে যদি ছাদ পর্যন্ত স্বর্ণ দ্বারা বোঝাই করিয়া দাও তবুও না। 'ঈসা নাহ্‌ও ('আরবী ব্যাকরণ) শাস্ত্রেও অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি বলেন, আমার সমবয়সীদের মধ্যে এই বিষয়ে কেহ আমা অপেক্ষা অধিক পারদর্শী ছিল না। ইহাতে আমার মনে কিছুটা অহংকারের সৃষ্টি হয়। ফলে আমি এই জ্ঞানচর্চা বর্জন করি। 'ঈসা ইব্‌ন য়ূনুস হিজরী ১৮৭ মতান্তরে ১৮৮ অথবা ১৯১ সালে হারূনু'র-রাশীদের শাসনকালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আন-নাওয়াবী, তাহ্‌যীবু'ল-আসমা' ওয়া'ল-লুগাত, মিসর তা. বি., ২খ, ১ম ভাগ, ৪৭ ; (২) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহযীবু'ত-তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৮খ, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫ ; (৩) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২খ, ২য় ভাগ, ৪০৬ ; (৪) ইব্‌নু'ল-জাওযী, সিফাতু'স-স'ফ্‌ওয়া, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ৪খ, ২৩৩, ২৩৪ ; (৫) আয-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফ্‌ফাজ, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৭৬/১৯৫৬, ১খ, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২; (৬) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৭খ, ৪৮৮ ; (৭) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ আল-হাম্বালী, শাযারাতু'য-যাহাব, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ১খ, ৩২০ ; (৮) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাকরীবু'ত-তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ, ১০৩ ; (৯) ইব্‌ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, করাচী ১৩৯৬/১৯৭৬, পৃ. ১৯৯।

আবুল বাশার মুঃ সাইফুল ইসলাম

**'ঈসা ইব্‌ন সায়ফি'দ-দীন** (عيسى بن سيف الدين)ঃ আল-মালিকু'ল-'আদিল আবী বাক্‌র আহমাদ ইব্‌ন আয়্যূব, আয়্যূবী বংশীয় দামিশকের অধিপতি এবং ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ফিক্‌হশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত মনীষী। তাঁহার উপাধি ছিল আল-মালিকু'ল-মু'আজজাম শারাফু'দ-দীন। সুলতান সালাহু'দ-দীনের (১১৯৩ খৃ.) পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বানূ আয়্যূব-এর শাসকবর্গ স্বাধীনভাবে মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করেন। মালিক 'ঈসার পিতা ছিলেন দামিশকে স্বাধীন নৃপতি। পিতার মৃত্যুর পর ১২১৮ খৃ. তিনি দামিশকের শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করেন।

মালিক 'ঈসা হি. ৫৭৬ সালে মতান্তরে ৫৭৮ সালে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সিরিয়ায় লালিত-পালিত হন। তিনি হাদীছ, ফিক্‌হ, 'আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করিয়া এইসব বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। শায়খ জামালু'দ-দীন মাহ্‌মূদ আল-হুসায়রীর নিকট তিনি ফিক্‌হশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হানাফী ফিক্‌হশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল প্রবল এবং তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন নিষ্ঠাবান অনুসারী। তিনি ব্যতীত আয়্যূবী বংশীয় সকলেই ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। তাঁহার সন্তানগণও হানাফী মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার পিতা একদা এই সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, তোমার আত্মীয়গণ সকলেই শাফি'ঈ, তুমি কেন হানাফী মাযহাব গ্রহণ করিলে ? উত্তরে তিনি বলেন, আপনি কি ইহা কামনা করেন না যে, আপনার বংশধরদের মধ্যে অন্তত একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হউক ?

আল-মালিক 'ঈসা একজন বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী নৃপতি ছিলেন। বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে তিনি বিশেষ সমাদর করিতেন, তাঁহাদিগকে বিপুল অর্থ সাহায্য প্রদান করিতেন। শিক্ষার্থীরা যাহাতে 'আরবী ব্যাকরণে পারদর্শিতা অর্জন করিতে পারে এইজন্য তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, যাহারা 'আল্লামা যামাখশারীর বিখ্যাত ব্যাকরণ গ্রন্থ আল-মুফাসসাল মুখস্থ করিবে তাহাদিগকে এক শত দীনার ও মূল্যবান উপহার প্রদান করা হইবে। ঘোষণা অনুযায়ী বহু শিক্ষার্থী এই পুরস্কার লাভ করে।

আল-মালিক 'ঈসা, ইমাম মুহাম্মাদ-এর আল-জামি'উ'ল-কাবীর গ্রন্থের ভাষ্য কয়েক খণ্ডে রচনা করেন। 'আরবী 'ইলমু'ল-'আরূদ (ছন্দশাস্ত্র) সম্পর্কেও তাঁহার একটি পুস্তক আছে। আল-খাতীব আল-বাগদাদী তাঁহার তা'রীখ বাগদাদ গ্রন্থে ইমাম আ'জাম সম্পর্কে বিদ্বেষপ্রসূত যেই সব অলীক মন্তব্য করেন তাহার প্রতিবাদে তিনি আস-সাহমু'ল-মুসীব

ফি'র-রাদ্দ 'আলা'ল-খাতীব (السهل المصيب فى الرد على الخطيب) নামক একটি গ্রন্থও রচনা করেন। তিনি সাহিত্য চর্চা ও কাব্য চর্চারও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি কিছু কবিতাও রচনা করিয়াছেন বলিয়া জীবনীকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন।

নিম্নোক্ত কয়েকটি গ্রন্থ রচনার জন্যও তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ঃ (১) ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র)-এর সুপ্রসিদ্ধ হাদীছ সংকলন আল-মুসনাদ গ্রন্থটি বিষয়ানুক্রম অধ্যায়ে সুবিনাস্ত করিয়া পুনঃসংকলন ; (২) পূর্ববর্তী অসম্পূর্ণ 'আরবী অভিধান গ্রন্থসমূহ অবলম্বনে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশদ অভিধান প্রণয়ন ; (৩) তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ইমাম আবূ হানীফা (র)-র ব্যক্তিগত অভিমত সম্বলিত ফিক্‌হশাস্ত্রের একটি গ্রন্থ প্রণয়ন।

তিনি বহু সঙ্গী সমভিব্যাহারে হি. ৬১১ সালে হজ্জ পালন করেন। পূর্বদিকের গোর প্রদেশ হইতে পশ্চিমে ফিলিস্তীন পর্যন্ত বিশাল অঞ্চল তাঁহার শাসনাধিকারে ছিল। তিনি যু'ল-হি'জ্জা, মতান্তরে যু'লকা'দা ৬২৪ সালে ইনতিকাল করা পর্যন্ত বিশেষ কৃতিত্ব ও সুনামের সহিত শান্তিপূর্ণভাবে এই বিশাল রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কবি ও জীবনীকারগণ তাঁহার ধর্মানুরাগ, সুশাসন, প্রজাবাৎসল্য, বদান্যতা ও মহান ব্যক্তিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। দামিশকের আল-মু'আজজামিয়্যা এলাকার মাদরাসা প্রাঙ্গণে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

**গ্রন্থপঞ্জী** ঃ (১) ইবনু'ল-আছীর, আল-কামিল, ৬২৪ হি. ঘটনা, নির্ঘণ্ট ; (২) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, সম্পা. মুহাম্মদ মুহ্‌য়ি'দ-দীন 'আবদু'ল-হামীদ, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ৩খ, ১৬২ প. ; (৩) ইবনু'ল-জাওযী, মির'আতু'য-যামান, নির্ঘণ্ট ; (৪) আল-য়াফি'ঈ, মির'আতু'ল-জিনান, নির্ঘণ্ট ; (৫) আস-সুয়ূতী, হুসনু'ল-মুহাদারা, নির্ঘণ্ট; (৬) মোল্লা 'আলী আল-কারী, তাবাকাতু'ল-হানাফিয়্যা, নির্ঘণ্ট; (৭) আল্লামা 'আবদু'ল-হায়্যি আল-লাকনাবী, আল-ফাওয়া'ইদু'ল-বাহিয়্যা, কায়রো ১৩২৪ হি., পৃ. ১৫১-৫২।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

**'ঈসা ইবনুশ-শায়খ** (عيسى بن الشيخ) ঃ ইবনি'স-সালীল, আবূ মূসা আশ-শায়বানী নিঃসন্দেহে জামীরার বানূ শায়বান গোত্রের রাবী'আ শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার পিতার প্রকৃত নাম জানা যায় না, তবে তিনি শায়খ বা আশ-শায়খ নামে পরিচিত ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে আহমাদ বা 'আবদু'র-রায্‌যাকও বলিয়া থাকেন। মূলত 'ঈসার প্রাথমিক জীবনের ইতিহাস অজ্ঞাত।

সম্ভবত তিনি ২৩৪/৮৪৮ সালে খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বকালে নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতিতে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। আযার-বায়জানস্থ (বা বু'আয়ছ) রাবী'আ গোত্রের একজন সদস্য ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনু'ল-বা'ঈছ। তাঁহার পিতা এবং পিতামহ মারান্দ এবং উসিয়া হ্রদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় এক জায়গীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইবনু'ল-বা'ঈছ এক সময়ে বাবাক-এর বন্ধু আবার অন্য সময়ে তাঁহার শত্রু ছিলেন। তিনি উক্ত সময়ে সামাররার কারাগারে বন্দী হইয়াছিলেন। কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া তিনি মারান্দে ফিরিয়া আসিয়া নিজেকে সুরক্ষিত করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে বুগা আশ-শারাবীর সেনাপতিত্বে এক সেনাবাহিনী প্রেরিত হয়। 'ঈসা ইবনু'শ-শায়খ উক্ত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেনাপতি বুগা অবরুদ্ধ মারান্দবাসীদের সহিত যোগাযোগ করার জন্য 'ঈসা ইবনু'শ-শায়খকে ব্যবহার করেন। যেহেতু মারান্দাবাসীদের অধিকাংশই তাঁহার মত রাবী'আ গোত্রভুক্ত ছিল, তাই তিনি মুহাম্মাদের আত্মীয় এবং অনুচরদের অনেককে আত্মসমর্পণ করাইতে সমর্থ হন। পলায়মান মুহাম্মাদ ইবনু'ল-বা'ঈছ ধৃত হইয়া সামাররায় প্রেরিত হন।

Zambaur-এর বর্ণনানুসারে 'ঈসা ২৪৭/৮৬১ সালে দামিশকের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু ইহা সঠিক বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবত যাম্বাউর ভুলবশত তাঁহাকে 'ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মাদ আন-নাওশারী মনে করিয়াছেন। তাবারীতে ২৫১/৮৩৫ সালে 'ঈসা ইব্‌নু'শ-শায়খ সম্পর্কে দুইটি উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমত, তিনি মুওয়াফ্‌ফাক নামক এক খারিজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি খলীফা আল-মুস্তা'ঈনকে দেশে তাঁহার ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার লক্ষ্যে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিবার জন্য এবং বায়যান্টাইনদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিবার অনুমতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি খলীফাকে আরো অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন 'টায়ার' দুর্গের অধিনায়ককে ৪টি অস্ত্র সজ্জিত জাহাজ তাঁহার তত্ত্বাবধানে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। সুতরাং উপরিউক্ত বর্ণনায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, 'ঈসা ইব্‌নু'শ-শায়খ উক্ত সময়ে সিরীয় সীমান্ত বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন।

য়া'কূবীর বর্ণণানুসারে আল-মু'তায্য মুহাররাম ২৫২/২৯ জানুয়ারী ৮৬৬ সালে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অবিলম্বে সকল শাসনকর্তাকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবার জন্য নির্দেশ দেন। কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ আনুগত্য স্বীকার করিলেন, আবার কেহ কেহ বিলম্ব করিতে লাগিলেন। বিলম্বকারীদের মধ্যে ফিলিস্তীনের শাসনকর্তা 'ঈসা ইব্‌নু'শ-শায়খ ছিলেন অন্যতম। যদি য়া'কূবীর উপরিউক্ত বর্ণনা সঠিক হয়, তবে 'ঈসা ইব্‌নু'শ-শায়খ হি. ২৫১ সালের প্রথমদিকে ফিলিস্তীনের শাসনকর্তা ছিলেন। সম্ভবত উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই দামিশকের শাসনকর্তা আন-নাওশারী 'ঈসা ইব্‌নু'শ-শায়খের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হন। জর্দান নদীর তীরে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে 'ঈসা পরাজিত হইয়া প্রথমে ফিলিস্তীনে এবং পরে মিসরে পলায়ন করেন। আন-নাওশারী রামাল্লায় প্রবেশ করেন। এই সময় খলীফা মু'তায্য-এর দূত মিসরে উপস্থিত হইয়া খলীফার প্রতি শাসনকর্তা আন-নাওশারী, তাঁহার পরিষদ এবং 'ঈসা ইব্‌নু'শ-শায়খের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, খলীফা আল-মু'তায্য-এর পক্ষ হইতে আন-নাওশারীর জন্য রামলা অধিকার করিবার অনুমতি ছিল না। সুতরাং খলীফা ফিলিস্তীনে তাঁহার বিরুদ্ধে মুহাম্মাদ ইবনু'ল-মুওয়াল্লাদ তুর্কীকে প্রেরণ করেন। ইবনু'ল-মুওয়াল্লাদ তুর্কী তাঁহাকে ফিলিস্তীন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। 'ঈসা ইবনু'শ-শায়খ মিসর ত্যাগ করেন এবং পরে রামাল্লা ও লুদের মধ্যবর্তী একটি কাসরে (দুর্গে) নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইবনু'ল-মুওয়াল্লাদ তাঁহার বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারেন নাই। অবশেষে য়া'কূবীর মতে উভয়েই ইরাকে ফিরিয়া আসেন।

ঐতিহাসিক তাবারীর মতে হি. ২৫২ সালের শেষের দিকে ৮৬৬ ডিসেম্বর মাসে 'ঈসা ইবনু'শ-শায়খ খলীফা আল-মু'তায্য কর্তৃক ফিলিস্তীনে রামাল্লার গভর্নর মনোনীত হন। কথিত আছে যে, তিনি হি. ২৫২ সালে তৎকালীন বিশেষ প্রভাবশালী বুগা আশ-শারাবীকে ৪০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া অথবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়া উক্ত নিয়োগপত্র লাভ করেন। সুতরাং ২৫৪/৮৬৮-এর পূর্বে তিনি কারাবন্দী এবং নিহত হন নাই।

ঐতিহাসিক মাস'উদীর মতে, 'ঈসা ইব্‌নু'শ-শায়খ খলীফা আলমু'তায্য কর্তৃক ফিলিস্তীনের গভর্নর নিযুক্ত হন। কারণ তিনি মিসর হইতে রাজধানী সামাররায় আসেন প্রচুর অর্থ লইয়া। সঙ্গে আনিয়াছিলেন ৭০ জন সমর্থককে যাঁহারা হিজায হইতে গোলযোগের কারণে পলায়ন করিয়াছিলেন।

উক্ত মনোনয়নের ঘটনার প্রেক্ষাপটে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হন, যাঁহাকে পরবর্তী কালে 'ঈসার পার্শ্বে দেখা যায়। তিনি হইলেন আবু'ল-মাগরা' ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন যুরারা। তিনি এমন এক পরিবারের সদস্য ছিলেন যাঁহারা দক্ষিণ আর্মেনিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গীরের অধিকারী ছিলেন। তিনিই সেই ব্যক্তি যাঁহাকে 'ঈসা তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য রামাল্লায় পাঠাইয়াছিলেন।

এই সময় হইতে 'ঈসার জীবনী বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইরাকের তৎকালীন অরাজকতা তাঁহাকে দামিশ্ক অবরোধ করিয়া স্বীয় আধিপত্যের সীমারেখা বর্দ্ধিত করিবার সুযোগ দেয়। হি. ২৫৫ সালের রাজাব মাসের শেষদিকে/৮৬৯ সালের জুলাই মাসে আল-মুহ্‌তাদী খলীফা হইয়া, যাহারা গোলযোগে অংশগ্রহণ করিয়াছিল অথবা জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করিয়াছিল, তাহাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিলেন। তিন 'ঈসাকে মিসর এবং অন্যান্য দেশ হইতে যে সমস্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ফেরত দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। 'ঈসা অর্থ ফেরত দিতে অস্বীকার করিলেন। ফলে তাঁহার অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় হইল (The Governors and Judges of Egypt, ed. Guest, 214)। আল-কিন্দীর মতে তিনি ৭,৫০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। উক্ত প্রসঙ্গের দিকে ইঙ্গিত করিয়া ইব্‌নু'ল-মু'তায্য খলীফা আল-মু'তামিদের প্রশংসায় রচিত কাসীদায় (উরজূযা) বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, 'ঈসা এবং তাঁহার পুত্র আহমাদ ছিল দস্যু। তাহারা এক কপর্দকও খলীফাকে দেয় নাই। তাঁহার প্রজাদের নিকট হইতে অবৈধভাবে যে অর্থ সংগ্রহ করে খলীফা আল-মু'তামিদ উপরিউক্ত অর্থ চাহিয়া তাঁহার নিকট বিশেষ দূত প্রেরণ করিলেন। 'ঈসা উত্তরে বলিলো যে, তিনি সমুদয় অর্থ তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদের জন্য ব্যয় করিয়াছেন। অতঃপর তিনি খলীফার আনুগত্য স্বীকার করিবেন, এই শর্তে তাঁহাকে গভর্নরের পদ প্রদান করা হইল। 'ঈসা এই ভাবিয়া সম্মত হইলেন যে, তিনি আর্মেনিয়ার গভর্নর তো হইবেনই, উপরন্তু সিরিয়াও দখলে রাখিতে পারিবেন। খলীফা কিন্তু তাহা ভাবেন নাই। তাই খলীফা মিসরের নবনিযুক্ত গভর্নর আহমাদ ইব্‌ন তুলূনকে আর্মেনিয়ার শাসনভার দিয়া সিরিয়া হইতে 'ঈসাকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিলেন এবং তিনি স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে দামিশকের শাসনকর্তা আমাজুর তুর্কীর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। দামিশকের বাহিরে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হইল যুদ্ধে 'ঈসা স্বীয় পুত্র মানসূরকে হারাইলেন এবং পরাজিত হইয়া উপকূল পথে আর্মেনিয়া পলায়ন করিলেন (২৫৬/৮৭০ অথবা য়া'কূবীর মতে ২৫৭/৮৭১ সন)।

তৎকালে আর্মেনিয়ার শাসনকর্তার অধীনে ছিল জাযীরার দিয়ার বাক্‌র এবং আযারবায়জান ভ্যান লেকে প্রতিষ্ঠিত 'আরব উপনিবেশ, 'উছমানী এবং কায়সীদের আহ্বানে 'ঈসা আর্মেনিয়া হইতে সাড়া দিলেন। তাহারা ভ্যাসপুরাকানের রাজা আশোট আর্টস্রুনীর (Ashot Artsruni) হুমকীর সম্মুখীন হইয়াছিল। আশোট 'উছমানীদের লেকের পূর্ব তীরে অবস্থিত 'অ্যামিওক' (Amiwk) দুর্গ প্রায় অবরোধ করিয়া লইয়াছিল। 'ঈসার হস্তক্ষেপে আশোট অবরোধ উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইল। উভয়ের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। 'ঈসা আয়ারবায়জানে গিয়া তথায় তাঁহার একজন কর্মকর্তা মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ'ীদ আত্-তামীমী আল-য়ামীনীকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহাকে আর্মেনীয় ঐতিহাসিকগণ য়ামামিক বা ইমেমিক নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আর্মেনিয়ায়, যাহা ছিল মূলত স্বাধীন এবং বাগরাতুনী ও আশোতের মধ্যে বিভক্ত—'ঈসার কর্তৃত্ব অব্যাহতভাবে হ্রাস পাইতে লাগিল, বিশেষ করিয়া যখন তাঁহার প্রতিনিধি আযারবায়জানে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। এমনিভাবে পূর্ণ এক বৎসর সম্ভবত ৮৭৭-৭৮ খৃ. নিজেকে নিষ্ফল যুদ্ধে নিয়োজিত রাখিয়া অবশেষে তিনি সিরিয়ায় (আর্মেনীয় ঐতিহাসিকদের মতে) অর্থাৎ দিয়ার বাক্‌রের 'আমিদে' ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। প্রকৃতপক্ষে ২৬৬/৮৭৯-৮০ সনে উক্ত এলাকা ব্যতীত অন্য কোন এলাকায় তাঁহার উপস্থিতির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যদিও আর্মেনীয় ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন যে, তিনি ২৬৯/৮৮২-৮৩ সাল পর্যন্ত আর্মেনিয়ার শাসনকর্তা হিসাবে বহাল থাকিয়া ইনতিকাল করেন।

হি. ২৬৬ সালে তিনি ইস্‌হাক ইব্‌ন কুন্দাজীক-এর সহিত শত্রুতায় জড়াইয়া পড়িলেন। ইস্‌হাক ইব্‌ন কুন্দাজীক জাযীরা এবং ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকার কিয়দংশে শাসনকর্তা হওয়ার দাবি করিয়াছিলেন এবং মাওসিল-এ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লাইয়াছিলেন। ইব্‌ন কুন্দাজীক শক্তিশালী খারিজী আন্দোলনের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। খারিজী নেতাদের মধ্যে তাগ লিব বংশীয় হামদান ইব্‌ন হামদূন কর্তৃক সমর্থিত নাসবীনের ইসহাক ইব্‌ন আয়্যুব ছিলেন অন্যতম। ইব্‌ন কুন্দাজীক তাহাদের উপর বিজয় লাভ করিলেন। ইসহাক ইব্‌ন আয়্যুব আমীদের 'ঈসা এবং আরমানের আবু'ল-মাগরা ইব্‌ন মূসার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সম্মিলিত শক্তির কাছে পরাজয় বরণ করিয়া ইব্‌ন কুন্দাজীক মাওসিল-এ ফিরিয়া আসিলেন এবং তথায় মাওসিল, দিয়ার রাবী'আ এবং আর্মেনীয়ার শাসনভার লাভ করিলেন। 'ঈসা এবং আবু'ল-মাগরা' শত্রুপক্ষের শক্তি বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন হইয়া ইব্‌ন কুন্দাজীককে ২০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া সন্ধির প্রস্তাব দিতে মনস্থ করিলেন এই শর্তে যে, তাহারা নিজ নিজ দখল অব্যাহত রাখিতে পারিবে। ইব্‌ন কুন্দাজীক প্রথমত উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং পরে গ্রহণ করিলেন যখন তাঁহাকে নূতন করিয়া শত্রুতা করিবার ভয় দেখান হইল। তবুও পরবর্তী বৎসর হি. ২৬৭ সালে খারিজীগণ এবং তাঁহার অন্যান্য শত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধে পুনরায় ঐক্যজোট গঠন করিল। রামাদান ২৬৭/এপ্রিল-মে ৮৮১ সালে দুই দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে ইব্‌ন কুন্দাজীক জয়লাভ করিয়া শত্রুপক্ষকে আমিদ পর্যন্ত ধাওয়া করিলেন এবং অবশেষে 'ঈসাকে অবরোধ করিয়া রাখিবার জন্য আমিদের বাহিরে একদল সৈন্য রাখিয়া আসিলেন। তথায় আরো অনেকগুলি অমীমাংসিত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

'ঈসা ২৬৯/৮৮২-৮৩ সালে ইনতিকাল করেন। ঐতিহাসিক ইব্‌নু'ল-আছীর উক্ত মৃত্যুতারিখ সম্বন্ধে একমত পোষণ করেন, কিন্তু তাঁহার মতে উক্ত সময়ে তিনি আর্মেনীয় এবং দিয়ার বাক্‌রের গভর্নর ছিলেন। তবে হি. ২৬৭ হইতে ২৬৯ পর্যন্ত আমরা আর্মেনিয়ায় তাঁহার ভূমিকা সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত নহি। সম্ভবত তিনি সেখানে কিছুটা প্রভাব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কারণ সেখানে ইব্‌ন কুন্দাজীকের কর্তৃত্ব ছিল বলিয়া মনে হয় না। ঐতিহাসিক তাবারীর মতে

ইব্ন কুন্দাজীক হি. ২৬৯ সালে মাওসিল এবং জাযীরার গভর্নর ছিলেন ; অধিকন্তু ঐ বছরই খলীফা আল-মু'তামিদের পলায়নের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া তিনি রাজপ্রতিনিধি আল-মুওয়াফ্ফাকের নিকট হইতে মিসর এবং তূলূনী ভূমির কর্তৃত্ব লাভের জন্য গিয়াছিলেন এবং তখন হইতে তূলূনীদের উপর সিরীয় আধিপত্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন।

'ঈসার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আহ্‌মাদ দিয়ার বাক্‌র-এ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। আহ্‌মাদও পিতার ন্যায় প্রায় স্বাধীন ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, তিনিও তৎকালীন রাজপুত্রদের অনেকের মতই জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন। তিনি ন্যায়ত কোনদিনই আর্মেনিয়ার গভর্নর ছিলেন না, তবুও তিনি দেশের বিভিন্ন কার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেন। ক্ষমতালিপ্সু আহ্‌মাদ হঠাৎ করিয়া সমগ্র আর্মেনিয়ায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি মাওসিল ও দিয়ার রাবী'আর শাসনকর্তা ইসহাক ইব্ন কুন্দাজীকে র উত্তরাধিকারী মুহাম্মাদের নিকট হইতে জাযীরার সমতল ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষাকারী 'মারদীন' দুর্গ অধিকার করিলেন। ৮৯০ খৃ. আবু'ল-মাগ'রা'কে বন্দী করিবার পর তিনি দক্ষিণ আর্মেনিয়ার আরযানিন দখল করিয়া সুদূর সীম পর্বত পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। সীম পর্বতটি আরমানিনকে 'তারোন' হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। ৮৯৫ অথবা ৮৯৬ খৃ.-এর প্রথম দিকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক 'তারোনের' যুবরাজ' গারজেন' (Gurgen)-কে হত্যা করিয়া আহমাদ ইব্ন 'ঈসা সমগ্র 'তারোন অধিকার করিলেন। আর্মেনীয়ার রাজা সেমবাত বাগরাতুনী (৮৯০-৯১৪) তারোনের ন্যায্য মালিককে উহা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য আহমাদকে অনুরোধ করিলেন এবং এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি তাঁহার জন্য খলীফার নিকট হইতে আর্মেনিয়ার শাসনকর্তা হিসাবে মনোনয়নের ব্যবস্থা করিবেন। আহ্‌মাদ যখন তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে তখন তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য একদল সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। উভয়ের মধ্যে লেক–ভ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিমে যুদ্ধ সংঘটিত হইল। যুদ্ধে আহ্‌মাদের বন্ধু ব্যাসপুরাকানের রাজা গ্যার্গিক আটস্রুনী সেমবাতের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবার ফলে সেমবাত পরাজয় বরণ করিল। এইভাবে আহ্‌মাদ আরযানিন ও 'তারোনে' অধিকার বহাল রাখিয়া দিয়ার বাক্‌রেও আধিপত্য বিস্তার করিলেন।

অধিকন্তু তিনি খলীফার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ২৮০/৮৯৩-৪ সালে বানূ শায়বানের বিরুদ্ধে এবং মাওসিল-এ অভিযান প্রেরণ করিয়া যখন আল-মু'তামিদ সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া খারিজী ও রাষ্ট্রবিদ্রোহীদের দমন করায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন আহ্‌মাদ ইব্ন 'ঈসা খলীফার নির্দেশক্রমে ইব্ন কুন্দাজীকের নিকট সংগৃহীত সমুদয় অর্থসহ আরো অনেক উপঢৌকন অবিলম্বে খলীফার দরবারে প্রেরণ করিলেন। সেই সঙ্গে একজন খারিজীকে বন্দী করিয়া খলীফার নিকট বাগ্‌দাদে পাঠাইয়া দিলেন। উক্ত খারিজী বাগ্‌দাদ হইতে পলায়ন করিয়া 'আমিদে' আসিয়াছিল। খলীফা আল-মু'তাদিদ-এর প্রশংসায় আল-মু'তায্য কর্তৃক রচিত কাস'ীদায় আহ্‌মাদের এই আনুগত্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে ইহা সন্দেহজনক যে, তিনি প্রাণরক্ষার জন্য বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যে প্রবেশের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং খৃষ্টান হইয়া গিয়াছিলেন। যেমন আল-মু'তায্য তাঁহার কাসীদায় বর্ণনা করিয়াছেন।

যদিও আহ্‌মাদ ইব্ন 'ঈসা আর্মেনিয়ার গভর্নর ছিলেন না, তবুও আল-মু'তাদিদের রাজত্বকালে ৮৮৭ খৃ. আর্মেনিয়ার নবনিযুক্ত রাজা আশোট (১)-কে রাজমুকুট পৌঁছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব তাঁহার উপরই অর্পণ করা হইয়াছিল। এই দায়িত্ব পালনকারী অবশ্যই তাঁহার পিতা ছিলেন না, যেমন আর্মেনীয় ঐতিহাসিক জন ক্যাথলিকুসের বর্ণনা হইতে ধারণা করা হয়। সম্ভবত তিনি ভুলবশত পুত্রকে পিতা ধারণা করিয়াছেন।

আহ্‌মাদ ইব্ন 'ঈসা ২৮৫/৮৯৮ সালে ইনতিকাল করেন। আল-মা'সঊদীর অধুনালুপ্ত 'আখবারু'য-যামান'-এ তাঁহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

তিনি তখনও জোরপূর্বক 'আমিদ' এবং অন্যান্য যেসব অঞ্চল দখলে রাখিয়াছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ সেইগুলির শাসনকর্তা হইলেন। তাঁহার সহিত জাযীরার এই ক্ষুদ্র শায়বানী বংশের যবনিকাপাত হইল। ২৮৬/৮৯৯ সালে খলীফা আল-মু'তামিদ আমিদে নিজ কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি বিরাট বাহিনী লইয়া যাত্রা করিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁহার পুত্র যিনি পরবর্তী কালে আল-মুখতাফী নাম ধারণ করিয়া খলীফা হইয়াছিলেন। মুহাম্মাদ শহরের প্রবেশদ্বার বন্ধ করিয়া শহরের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৮৯৯ সালের এপ্রিল-মে-জুন পর্যন্ত উভয় দিক থেকে শহরটি অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। অবশেষে মুহাম্মাদ আমিদের সকল অধিবাসীসহ নিজের ও পরিবারের জন্য খলীফার অনুকম্পা প্রর্থনা করিয়া আত্মসমর্পণ করিলে খলীফা তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। তাঁহাকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করিলেন এবং মূল্যবান পোশাক উপঢৌকন দিলেন। এই সম্পর্কে আল-মাস্'ঊদীতে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। আলমাস'ঊদীর বিবরণ অনুসারে বিদ্রোহী মুহাম্মাদের ফুফু, যিনি ছিলেন একজন প্রতিভাবান মহিলা কবি, তাঁহাকে খলীফার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে উপদেশ দেন। তিনি স্বয়ং খলীফাকে কাব্যাকারে একখানা পত্র দেন। খলীফা তাঁহার প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এই পত্রের প্রভাবেই বন্দীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাগ্‌দাদের তাহিরিয়া প্রাসাদে মুহাম্মাদের থাকার ব্যবস্থা করা হইল। মুহাররাম ২৮৭/জানুয়ারী ৯০০ সালে মন্ত্রী 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সুলায়মান মুহাম্মাদের পলায়নের পরিকল্পনা উদ্‌ঘাটন করিয়া খলীফাকে অবহিত করিলে খলীফা তাঁহাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। ইহার পর ঐতিহাসিকগণ তাঁহার সম্পর্কে আর কিছুই লিখেন নাই।

৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে আহ্‌মাদ ইবনু'ল-'আব্বাস ইব্ন 'ঈসা ইব্ন শায়খ নামক এক ব্যক্তির কথা জানা যায়। তিনি কিছুটা স্থূলবুদ্ধি হইলেও সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তবে ইবনু'ল-ফুরাতের মন্ত্রিত্বকালে কতিপয় পদস্থ কর্মচারী কার্যকরী কৌতুকের শিকার হইয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে আমিদের রাজস্ব সংগ্রহের এবং 'ঈসা কর্তৃক দখলীকৃত জমি ব্যবহারের ক্ষমতা প্রদান করিল। মন্ত্রীর পুত্র আল-মুহাস্‌সিন ঘটনা সম্পর্কে গুজব শুনিতে পাইয়া মন্ত্রীকে ঘটনা অবহিত করিলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। মন্ত্রী প্রদর্শিত অনুকম্পা যথাযথ হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন। মন্ত্রী এইখানে ঘটনার ইতি ঘটাইলেন, আর বেশী দূর অগ্রসর হন নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচিত ব্যক্তিটি ছিলেন 'ঈসা ইব্ন শায়খের বংশধর।

খলীফা আল-মু'তাদিদ-এর সমর্থক ও স্তুতিপাঠক হিসাবে ইবনু'ল-মু'তায্য 'ঈসা এবং আহমাদ সম্পর্কে কঠোরভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। মূলত আচার-ব্যবহারের দিক দিয়া গোলযোগের মধ্যে জীবনযাপনকারী এই মেসোপটেমীয় 'আরবগণ 'আব্বাসী যুগের অন্যান্য ভাগ্যবান সৈন্যের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না। ইবনু'ল-জাওযী কর্তৃক বর্ণিত উপাখ্যান এবং ডিফ্রেমারী (Defremery) বর্ণিত 'ঈসা ইব্ন আশ্-শায়খের কার্যাবলী হইতে জানা যায় যে, মহানুভবতা ও দানশীলতার জন্য 'ঈসার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল।

**গ্রন্থপঞ্জী** : (১) আল-কালকাশান্দী, নিহায়াতু'ল-'আরাব ফী মা'রিফাতি আন-সাবি'ল-'আরাব, ২৫৯, বাগদাদ ১৩৩২ হি. ; (২) ঐ লেখক, সুবহু'ল-আ'শা, ১খ, ৩৩৮ ; (৩) আন-নুওয়ায়রী, নিহায়া, ২খ, ৩৩৫-৬ ; (৪) ইব্ন কুতায়বা, কিতাবু'ল-মা'আরিফ, ৩২-৩, কায়রো ১৩০০ হি. ; (৫) মাস'উদী, মুরূজু'য্-যাহাব, ৮খ, ১৩৪, ৩খ, ১৩৪, ৭খ, ৩৯৫-৬ ; (৬) তাবারী, ৩খ, ১৩৮২, ১৫৮৫, ১৬৮৫, ১৮৪১, ১৯৯১-২, ২০৪৮, ২১৩৪, ২১৩৭, ২১৮৫-৭, ২১৯১ ; (৭) য়া'কূবী, ২খ, ৫০০, ৫০১, ৫০৬, ৫০৮, বৈরূত ১৩৭৯/১৯৬০ ; (৮) ইবনু'ল-আছীর, কামিল ফি'ত-তা'রীখ, ৭খ, ১৪, ৫৩, ৫৭, ৭৪-৯, ১১০, ১২০, ১৩২, ১৫২-৩, ১৬২-৩ ; (৯) ইব্ন তাগরীবি র্দী, নুজূম, ৩খ, ৭, ৪৬, ১১৬, মর্ডান ওয়ার্কস ; (১০) Defremery, Recherches sur un personnage appele Ica fils du Cheikh et sur sa famille, in Memoires d'Histoire Orientale (1854), ১খ, ১-১৪ ; (১১) Wustenfeld, Die Statthalter von Agypten..., in Abh. der konig. Ges. d. Wiss. Gottingen, xx/3 (1876), 10 ; (১২) Thopdschian, Die inneren Zustande von Armenien unter Aschot I, in MSOS vii/2 (1904), 118ff., 124 ff. ; (১৩) ঐ লেখক, Politische und Kirchengeschichte Armeniens unter Aschot I und Sembat I, in MSOS, viii/2 (1905) 172 ff., 188 ff. ; (১৪) J. Laurent, L'Armenie entre Byzance e l'Isam...., Paris 1919, 223, 233, 273, 329, 347, and passim; (১৫) J. Markwart, Sudarmenien und die Tigrisquellen, ৩০৬, ৩০৯, ৩১৫ প., ৩২৫, ৩৩১ প. ; ভিয়েনা ১৯৩০ খৃ. ; (১৬) Vasmer, Chronologie der arabischen Statthalter unter den Abbasiden ... bis zur Kronung Aschots I, 750-887. Vienna 1931, 98-101, 104 ; (১৭) যাকী মুহাম্মাদ হাসান, Les Tulunides, 46-50, Paris 1933 ; (18) R. Grousset, Hist. de l'Armenie, 381 ff., 385, 394, 397, Paris 1947 ; (১৯) C. Lang, Mu'tadid als Prinz und Regent. Ein historisches Heldengedicht von Ibn al-Mu'tazz, xl (text), 563 ff., xli (trans.), 232 ff., ZDMG. এতদ্ব্যতীত দীওয়ানের বিভিন্ন সংস্করণ অথবা রাসা'ইল (Cairo 1946, 80 ff.)-সহ উক্ত গ্রন্থের পৃথক সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

M. Canard (E.I.$^2$)/এম. এ. আজিজ খান

**'ঈসাওয়া** (عيساوى) ঃ বা 'ঈসাবিয়া (عيساوية) যৌথ নাম (একবচনে 'ঈসাবী) সাধনার একটি 'পথ' বা যূফী তারীকা। ১০ম/১৬শ শতকের শুরুতে ইহার প্রবর্তন করেন শায়খ মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আস-সুফয়ানী আল-মুখ্তারী (অন্যান্য উপনাম আল-মিক্নাসী, আল-ফাহ্রী বা আল-ফাহ্দী)। তিনি আশ-শায়খু'ল-কামিল নামেও অভিহিত ছিলেন।

**প্রতিষ্ঠাতা** ঃ দরবেশ-জীবনীমূলক অসংখ্য কিংবদন্তী হইতে বিচ্ছিন্ন সীদী ইব্ন 'ঈসা-এর জীবনী কিছু সংখ্যক সুপ্রতিষ্ঠিত ঘটনার উপরে ভিত্তি করিয়া রচিত। তিনি ৮৪২/১৪৬৭-৮ সালে সূস অথবা গারব-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পরিবার ছিল সম্ভবত ঈদরীসী শারীফ (কোন কোন ঐতিহাসিক, যথা আস-সালাবী, তাঁহার এই পারিবারিক যোগাযোগ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করিয়া থাকেন)। অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি কুরআন বিষয়ক বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং পিতার সঙ্গেই (যিনি একজন সাধারণ পরিবেশের মানুষ এবং সততার জন্য বিখ্যাত ছিলেন) উত্তর মরক্কোর বানূ সুফয়ান, বানূ মুখতার (এই গোত্রে তিনি বিবাহ করেন) ও বানূ হাসান গোত্রে সফর করেন। প্রথমে তিনি ফাসে অবস্থান করেন, অতঃপর মিকনাসে গমন করেন। সেখানে তিনি জনৈক বিখ্যাত সূফী দরবেশ শায়খ আহমাদ আল-হারিছী আস-সুফয়ানীর সংস্পর্শে আসেন। তিনি ছিলেন শাযিলিয়্যা (شاذلية) (দ্র.) জাযূলিয়া (جزولية)-পন্থী দরবেশ। পীরের মৃত্যুর পর তিনি ধর্মশিক্ষা সমাপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে আল-আযূলী (দ্র.)-এর অপর দুই সূফী দরবেশ, মারাকুশের সীদী 'আবদু'ল-'আযীয তাব্বা' (طباع) এবং খান্দাকু'য-যায়তুন (ফাসের শহরতলী)-এর মুহাম্মাদ আস-সাগীর আশ-শি'লী (الشعلى)-র নিকটে গমন করেন। তাঁহারা তাঁহাকে দালা'ইলু'ল-খায়রাত বিস্তারিতভাবে শিক্ষা দান করেন। অবশেষে মিক্নাসে বসতি স্থাপন করিয়া তিনি শহরের জামি' মসজিদে শিক্ষাদান করিতেন। সেখানে তাঁহার পূতপবিত্র জীবন যাপন রীতিতে মুগ্ধ হইয়া অগণিত ছাত্র ও অনুগামীর আগমন ঘটিতে শুরু করিলে তখন তিনি কিছু সম্পত্তি ক্রয় করিয়া তাহা গোরস্তান হিসাবে ব্যবহারের জন্য ওয়াক্ফ করিয়া দেন। সেখানেই তিনি যাবিয়া (খানকাহ) নির্মাণ করেন। উহা অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছে। তিনি ৯৩০, ৯৩২ বা ৯৩৩/১৫২৩-৭ সালে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর পরে তাঁহাকে সেখানেই দাফন করা হয়।

সীদী ইব্ন 'ঈসা একজন কামিল সূফী ছিলেন, 'তাঁহার দরবেশ জীবন ও সাধনা সাফল্যের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হইয়াছিল (R. Brunel)। আল্লাহ্র প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রেমের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছিল তাঁহার সৎ গুণাবলী এবং নিঃশেষ দান। এগুলি সকল মানুষকে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ করিত। আশ্চর্য প্রতিভাবলে তিনি মানুষের চিন্তাশক্তিকে প্রভাবিত করিতে পারিতেন। লোকের রোগমুক্তির ক্ষমতাও তাঁহার ছিল এবং কথিত আছে যে, তিনি অগণিত কারামাত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যদিও তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন মারীনী বংশের পতনের পরবর্তী (৮৬৯/১৪৬৫) উত্থান-পতন, ওয়াত্তাসী বংশীয় সুলতানের সিংহাসনে আরোহণ এবং সা'দী (سعدى) বংশের উত্থানের সময়, তথাপি তিনি স্থানীয় শাসকগণের সেই সকল দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না অথবা খৃস্টানগণ যখন যে অঞ্চল বিজয় করিতে আসে তখন উহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও তিনি যোগদান করেন নাই। কিন্তু জনপ্রিয়তার কারণে কর্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতি

সন্দিহান হইয়া পড়ে এবং এক পর্যায়ে তিনি কিছু সংখ্যক অনুসারী সমেত মিক্নাস ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। জনশ্রুতি মতে এই সময়েই তিনি এই অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করেন যে, তিনি এবং তাঁহার সঙ্গিগণ সাপ ও বিচ্ছুর দংশন এবং ফণীমনসা জাতীয় গাছের কাঁটা হইতে নিরাপদ থাকিবেন। অতঃপর তাঁহাকে সসম্মানে পুনরায় মিক্নাসে আহ্বান করিয়া পাঠানো হয় এবং তিনি সেখানকার শহর কুতুবের সম্মানে আসীন হন।

ইব্ন 'ঈসা-র সাহিত্য সৃষ্টি বিক্ষিপ্ত ধরনের, রচনার মধ্যে রহিয়াছে কিছু সংখ্যক দু'আ' সম্বলিত ওয়াজীফা (আওরাদ), কিছু ছন্দোবদ্ধ প্রার্থনা (আহযাব), তন্মধ্যে রহিয়াছে জনপ্রিয় হিয্ব সুবহানি'দ-দা'ইম (حـزب سبحان الدائم) যাহা আল-জাযূলী, আল-হারিছী এবং আস-সুহায়লীর মুনাজাতের সংকলন, কিছু সংখ্যক কাসীদা যেগুলি 'ঈসাবীগণ তাহাদের ধর্মীয় সভায় বা সম্মেলন স্থানে গাহিয়া থাকে। আর একখানি আধ্যাত্মিক গ্রন্থ (ওয়াসিয়্যা) যেখানিতে শাযিলী লেখকগণের উপদেশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

**তারীকার প্রসার ও সংস্থাপন** ঃ ইব্ন 'ঈসার বিপুল সংখ্যক অনুসারী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছয় শতজন আধ্যাত্মিক সাধনায় কামিয়াব হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিলেন তাঁহার খলীফা আবু'র-রাওয়া'ঈন (ابـو الـروائـيـن), তিনি মালামাতিয়্যা (مـلامـتـيـة) (দ্র.) শ্রেণীর সূফী ছিলেন। সেই শ্রেণীয়গণের সকলেই বাহ্যিক আচার-আড়ম্বরের অন্তরালে নিজেদের সকল জ্ঞান ও বিদ্যা লুকাইয়া রাখেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন এবং এমনকি এখনও বহু স্ত্রীলোক অভিশাপের ভয়ে তাঁহার মাযারের নিকট যায় না (তাঁহার মাযার দরবেশ ইব্ন 'ঈসা-র মাযারের পার্শ্বেই অবস্থিত)। তাঁহার কতকটা অসঙ্গত ধরনের ব্যবহারের জন্য তাঁহার পরিচিতি হয় আল-মুকাযিব (প্রতিদ্বন্দ্বী) বলিয়া। তিনি ধন-সম্পদশালী বা ক্ষমতাবান ব্যক্তিগণের নিকটে কোন বিশেষ শহর এমনকি এলাকা বিক্রয় করিবার প্রস্তাব দিতেন—যদিও সেই শহর বা স্থানের উপর তাঁহার কোন মালিকানাই ছিল না। কোন ব্যক্তি সেই অবিশ্বাস্য ক্রয়মূল্য দিতে অস্বীকার করিলে নির্ঘাত মহাবিপদের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িত; আর প্রার্থিত অর্থ দিয়া সেই শহর বা অঞ্চল ক্রয় করিলে দরবেশের দু'আ' অনুযায়ী আল্লাহ্ তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতেন। দরবেশ তখন সেই অর্থ গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন। আবু'র-রাওয়া'ঈন পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে প্রথম দিককার সা'দীগণকে সমর্থন প্রদানের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৯৫১/১৫৪৪ সালে তাঁহারা যে নিজেদেরকে মাররাকুশের সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন তিনিই সেই পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালেও তিনি ওয়াত্তাসীদের (وطـاسـى) বিরুদ্ধে ফাস-এর জনগণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার ইনতিকালের (৯৬৩/১৫৫৬) পরে তারীকার খিলাফাত ইব্ন 'ঈসার বংশধরগণের নিকটে চলিয়া যায় এবং বংশানুক্রমে তাহাই চলিতে থাকে। অতঃপর 'ঈসাবীগণ কদাচিৎ আর রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হইয়াছেন।

প্রতিষ্ঠাতার জীবনকালে মিক্নাসের বাহিরে কয়েকটি যাবিয়া (খানকাহ) স্থাপিত হয়, তন্মধ্যে একটি ছিল ফিগুইগে (Figuig- فـجـوج, দক্ষিণ-পূর্ব মরক্কো)। সেখান হইতে এই সূফী ভ্রাতৃসমাজ আলজিরিয়া এবং তিউনিসে বিস্তার লাভ করে। বিভিন্ন শুমারী এবং অনুমান অনুসারে 'ঈসাবিয়্যা তারীকা বর্তমান ৫০ হাজার কার্যকর সদস্য-সদস্যার অবস্থা নিম্নরূপ ।

মরক্কো ঃ Drague-এর বর্ণনা অনুসারে (১৯৩৯ খৃ.) ২১,৫৯১ সংশ্লিষ্ট সদস্য, তন্মধ্যে মিক্নাস অঞ্চলে ৩,১৮১ ; কিন্তু Brunel-এর মতে (১৯২৬ খৃ.) শুধু মিক্নাসেই নারী-পুরুষ মিলিয়া দশ হাজারের বেশী সদস্য-সদস্যা ছিল সমগ্র দেশে, বিশেষ করিয়া ফাস, তিতুওয়ান, তাঞ্জিয়ার (طـنـجـة), আটলান্টিক উপকূলবর্তী সকল শহরে, তাযা, রিফ, তাফিলালত ইত্যাদি স্থানে অগণিত যাবিয়া রহিয়াছে। আলজিরিয়া সদস্য-সদস্যা আনুমানিক ৪,০০০ এবং যাবিয়ার সংখ্যা প্রায় বারো, তন্মধ্যে বিলদা, উযারা (আলজিয়ার্স প্রদেশ), রেমশী ও তেমসন (ওরান প্রদেশ), বুগী ও কন্সট্যানটাইনের যাবিয়া বিখ্যাত। তিউনিসিয়ায় এইচ. আর. ইদরীস-এর মতে (Initiation a la Tunisie. Paris 1950), ২২,২৯০ জন সদস্য-সদস্যা এবং যাবিয়ার সংখ্যা ৮৭; ইহা ছাড়া লিবিয়া, সিরিয়া, কায়রো এবং মক্কা শারীফেও যাবিয়া রহিয়াছে।

'ঈসাবিয়্যা তরীকার যে গঠন তাহা বিকেন্দ্রিক ধরনের হইলেও বেশ ঐক্যবদ্ধ। প্রতিষ্ঠাতা বংশধরগণের মধ্য হইতে একজনকে তত্ত্বাবধায়ক (মিযওয়ার— مـزوار) নির্বাচিত করা হয়, মাখ্যেনগণ (مـخـزن) সেই নির্বাচনকে অনুমোদন করেন। তিনিই মিক্নাসের মূল যাবিয়া পরিচালনা করেন, ইহার আর্থিক আয় মিক্নাস এবং ফাসে বসবাসকারী শায়খ-এর বংশধরগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রকৃতপক্ষে ন্যস্ত থাকে মূল যাবিয়ার মুকাদ্দাম (مقدم)-এর হাতে, তিনিই মিক্নাসের প্রধান ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পাদন করিয়া থাকেন, আর শায়খ-এর বংশধরগণ নিজ নিজ এলাকায় সেই দায়িত্বে নিযুক্ত থাকেন। ফলে কর্তৃত্বের বিভাগ রহিয়াছে এবং তরীকার আচার-আচরণের মধ্যেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রভাব রহিয়াছে। তবে প্রতি বৎসর মিক্নাসে একটি ধর্মীয় মহাসম্মেলন হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মাওলিদ বা জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সকল স্থানের 'ঈসাবীগণ প্রতিষ্ঠাতা শায়খ-এর মাযারে সম্মিলিত হন। সেই সময়ে দেখা যায় ইহাদের মিছিল, ভাবোন্মাদনা, রক্তমাখানো অনুষ্ঠান (ফ্রীসা —فـريـسـة), আর চমকপ্রদ, কখনো বা অতি ভীতিজনক ফকীরী তেলেসমাতের কার্যাবলী। (মাওলিদ উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন Brunel ; ইহার সাহিত্যিক কিন্তু যথাযথ বর্ণনা পাওয়া যায় H. Ardel-এর উপন্যাস Colette Bryce au Maroc, paris 1937, pp.91-101-এর মধ্যে)।

**তরীকা ও পদ্ধতি** ঃ আল্লাহ্র সঙ্গে মিলন এবং আধ্যাত্মিক কামালিয়াত লাভের মৌলিক পদ্ধতির দিক হইতে তরীকা 'ঈসাবিয়্যা সরাসরি চিরাচরিত গোঁড়াপন্থী সূফীবাদ অনুসারী, উহার ভিত্তি সাধারণ ধর্মীয় আইন বা শারীআ। এখানে মুরীদ যে হয় সে মুরশিদের প্রত্যক্ষ এবং যথার্থ শিক্ষাধীনে তারীকা বা পথের সন্ধান লাভ করে। কড়াকড়িভাবে বলিতে গেলে সেই পথের সন্ধান আধ্যাত্মিক সত্তার সরাসরি সাহচর্যে (হাকীকাত) পৌঁছাইয়া দেয়। ইব্ন 'ঈসার আত্মিক সাধনার যে সিলসিলা তাহা আল-জাযূলী এবং আবু'ল-হাসান আশ-শাযিলীকে অতিক্রম করিয়া 'আবদু'স-সালাম ইব্ন মাশীশ (দ্র.), আবূ মাদয়ান (দ্র.), 'আবদুল কাদির আল-জিলানী (র) (দ্র. কাদিরিয়্যা) আল-জুনায়দ (দ্র.) এবং অতঃপর 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) এবং রাসূলুল্লাহ্ (স) পর্যন্ত পৌঁছায়। তাঁহার পূর্ববর্তিগণের ন্যায় ইব্ন 'ঈসাও তাঁহার অনুসারিগণকে দুনিয়াবী কামনা-বাসনা ও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে একমাত্র আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হইবার অর্থাৎ আল্লাহ্র সম্মুখে নিঃস্ব ফকীর হইয়া

আধ্যাত্মিক পথ অবলম্বনের উপদেশ দিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) সমগ্র মুসলিমগণকে যেরূপ বলিতেন সেই অনুকরণে ইব্ন 'ঈসাও তাঁহার মুরীদগণকে বলিতেন, "এই দুনিয়াতে যে আমার সঙ্গী হইবে বা আমাকে পর্যবেক্ষণ করিবে, এমনকি স্বপ্নেও আমাকে দেখিবে সে আমার সুপারিশে জান্নাতবাসী হইবে।" তিনি আরও বলিতেন, "জীবিত বা মৃত আমার অনুসারিগণের উপর আমার হাত রহিয়াছে, যেমন যমীনের উপরে আসমান রহিয়াছে।" এখানেই আদবের গুরুত্ব, যাহা মুরশিদ এবং মুরীদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণকারী রীতি। এই আদব মুরীদগণের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কও নিয়ন্ত্রণ করে। ইব্ন 'ঈসা আল্লাহ্ প্রেমের (মাহাব্বাত) উপরে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন, এই প্রেমের মধ্যেই তিনি কামালিয়াতের পূর্ণ সাফল্য বলিয়া উল্লেখ করেন। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন, "প্রেম বা ভালবাসা চার প্রকারেরঃ বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা হইতে সৃষ্ট ভালবাসা, হৃদয় হইতে উৎসারিত ভালবাসা, আত্মা হইতে উদ্ভূত ভালবাসা এবং রহস্যময় ভালবাসা। . . . বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা হইতে উৎসারিত যে প্রেম উহা আধ্যাত্মিক ভালবাসা, ইহাই মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র প্রতি চিরপ্রবহমান প্রেম ; ইহা হইতে প্রেমের মূল বস্তু বা উৎস যে আল্লাহ্ তাঁহার সঙ্গে একাত্ম হইয়া যাইবার বাসনা জাগ্রত হয়, তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার জন্য 'ইবাদতের ইচ্ছা হয়। . . . হৃদয় হইতে উৎসারিত যে ভালবাসা তাহাকে বলা হয় কামনা . . . ইহার প্রকাশ ঘটে মনের স্থবিরতায়, অনুশোচনায়, শোকে, দুনিয়াদারীর প্রতি অবহেলায় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কামনায়। . . . আত্মা হইতে উৎসারিত যে ভালবাসা তাহার প্রকাশ ঘটে বিভ্রান্তিতে, বিস্ময়ে, অনুতাপে, কান্নায়, তৃষ্ণায়, উন্মাদনায়, আল্লাহ্‌র সম্মুখে সিজদাতে পতিত হওয়াতে · · ফকীরী হালের মধ্যে। রহস্যময় প্রেম বা গোপন প্রেমে মত্ত হইয়া গেলে তখন মানুষ আল্লাহ্‌র মধ্যে সম্পূর্ণ ফানা হইয়া যায়, আল্লাহ্‌র প্রশস্তি গাহিতে গাহিতে নিজেকে সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলে, মানুষ তাঁহার আপন সত্তাকে জানিতে চেষ্টা করে, তখন সে স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর সাধনায় সম্পূর্ণ মগ্ন হইয়া যায় এবং তাহা করিতে গিয়া পরম প্রিয় আল্লাহ্‌র পাক সত্তার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে হারাইয়া ফেলে (Rinn হইতে উদ্ধৃত)। হাতে হাত ধরিয়া মুরশিদ মুরীদকে তরীকাতে গ্রহণ করেন ('আহ্‌দ), নারীদেরকেও পুরুষগণের ন্যায় একই পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হয়।

আল্লাহ্‌র দীদার বা নৈকট্য লাভের মূল উপায় হইল যিক্‌র (দ্র.)। এই যিক্‌রের বিভিন্ন পদ্ধতি থাকিতে পারে ঃ (ক) মুখে সুর করিয়া আবৃত্তি করা, একা একা বা সকলে মিলিতভাবে, তরীকার বিশেষ রীতি (বিরদ ; বহুবচনে আওরাদ) অনুযায়ী যিক্‌র করিতে হইবে। ইহা তিন প্রকারের—ছোট যিক্‌র, মাঝারি যিক্‌র ও দীর্ঘ যিক্‌র। প্রথমে ছোট যিকর দিয়া শুরু করিতে হয়। ক্রমে মাঝারি করিতে হয় এবং শেষে ভাবোন্মাদনা সৃষ্টি হইলে তখন যিক্‌র দীর্ঘ করিতে হয় ; (খ) তরীকার বিশেষ কতকগুলি মুনাজাত বারবার বলা, যেমন হিয্‌ব সুব্‌হানি'দ্-দা'ইম এবং উত্তর আফ্রিকার প্রায় সকল ধর্মীয় ভ্রাতৃসমাজের মধ্যে প্রচলিত আল-জাযারীর, আন-নাওয়াব ীর (النواوى), আশ-শাযিলীর এবং যার্‌রুক (زروق)-এর আহ্ যাব এবং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর না'তিয়া; যেমন মাশীশিয়্যা (مشيشية) এবং সূফী কবিগণের রচিত কবিতা আবৃত্তি ; (গ) কলেমা শাহাদাত; আল্লাহ্‌র পাক সিফাতসমূহ এবং ইসমু'ল-মুফ্‌রাদ বা সর্বশক্তিমানের নাম ছন্দোময়ভাবে বারবার পড়া ; (ঘ) ভাবোন্মাদ অবস্থায় নৃত্য করা, 'ঈসাবীগণ এই নাচকে বলেন তাহায়্যুর (تحير), হায়রা (حيرة), ওয়াজদ (وجد) ("পরম আনন্দের উল্লাস")। এই নাচের সময়ে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, যথা তবলা, বন্দির (بندير) দফ্, বাঁশী (গেস বা কাসাবা (قصبه) শরের তৈরী] বা গায়তা (غيطة) (ক্লারিওনেট জাতীয়) বাজানো হয় এবং গান গাওয়া হয়। নাচ প্রথমে ধীরগতিতে শুরু হয়, ইহা রব্বানী বা প্রস্তুতি ; এই সময়ে নাচে অংশগ্রহণকারী সূফীগণ পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়ান, একবার সামনে ও একবার পার্শ্বের দিকে দুলিয়া দুলিয়া ছন্দোময়ভাবে নাচিতে থাকেন ; দ্বিতীয় পর্যায়ে গতি দ্রুততর হয়। এই পর্যায়ে নাচের গতি মিশ্র ধরনের হয়, এই স্তরকে বলা হয় মুজাররাদ (مجرد) বা আবরণহীণ হওয়া। নাচের এই স্তরে সূফীগণ তাঁহাদের জাল্লাবা খুলিয়া ফেলেন এবং তাঁহাদের মুকাদ্দামের চতুর্দিকে গোলাকার হইয়া ঘুরিতে থাকেন। নাচের চূড়ান্ত স্তরে শাগরিদগণ কখনো কখনো ফকীরী তিলিস্‌মাত প্রদর্শন করেন, যেমন সম্মোহিত বা জ্ঞানহারা অবস্থায় তাঁহারা জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়া খালি পায়ে হাঁটিয়া যান, জ্বলন্ত অঙ্গার হাতের তালুতে ধরিয়া রাখেন—অনেক সময়ে দুই ঠোঁটের মাঝখানে ও ধরিয়া রাখেন ভাঙ্গা বোতলের কাঁচের টুকরা গিলিয়া ফেলেন বা নিজেই নিজের দেহে তলোয়ার দিয়া আঘাত করেন।

**বিচিত্র রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানাদি ঃ** ইব্ন 'ঈসার শিক্ষার একান্তভাবে ভক্তি তন্ময়গত বৈশিষ্ট্য এবং হাদরা 'ঈসাওয়ার তীব্র আকর্ষণহেতু (প্রশংসা-গানের মাধ্যমে প্রস্তুতি ও পরে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় নাচা) এই তরীকা সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্রুত বিস্তার লাভ করে—যেমন শহর অঞ্চলের শ্রমিক-মজুর ও কারিগর শ্রেণী, গ্রাম অঞ্চলের বারবার অধিবাসিগণ, সুলতান আহমদ আয-যাহাবী কর্তৃক তিমবুকতু অভিযানকালে (১৫৯১ খৃ.) সুদান হইতে প্রত্যাবাসিত নিগ্রো ক্রীতদাসগণ যাহাদিগকে মাওলায় ইসমা'ঈল ১৬৭২ খৃ. পরে একত্রে দলবদ্ধ করিয়াছিলেন। তারীকার এই বিস্তৃতির কালে এই ধর্মীয় ভ্রাতৃসমাজে কিছু কিছু স্থানীয় আচার-আচরণ প্রবেশলাভ করে (বিশেষ করিয়া বারবারগণের বাৎসরিক মেলা চলাকালীন কিছু রীতিনীতি) এবং সুপ্রাচীন, অর্ধবর্বর প্যাগান বা প্রকৃতি পূজারীদের কিছু আচরণ। সেগুলি এই তারীকাকে বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্যময় রূপ দান করে। এই যাদুমন্ত্র মিশ্রিত ধর্মীয় সমাজের সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখযোগ্য কতগুলি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ (ক) কালো রঙের ভয়াবহতা, এই ভয়াবহ রূপ দেখা যায় উৎসব অনুষ্ঠানাদির সময়ে। তখন পথিপার্শ্বস্থ কোন লোক কালো কাপড় পরিহিত থাকিলে এই তরীকার লোক গিয়া অকস্মাৎ তাহার উপরে নিপতিত হয় এবং উক্ত ব্যক্তির পরনের কাপড়-চোপড় ইত্যাদি যাহা কিছু থাকে সব ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে ; (খ) ইহারা গাত্তায়া (كطايه) বা এক ধরনের জটাযুক্ত চুল রাখে, সারা মাথা চাঁছিয়া ফেলিয়া শুধু তালুতে কয়েক গোছা চুল রাখে এবং উহা অনেক লম্বা করে ; (গ) রোগীদেরকে ইহারা মন্ত্রতন্ত্র পড়িয়া রোগমুক্ত করে, কখনো বা রোগীকে পা দিয়া মাড়ায়, কখনো আবার রোগীকে একটি পা দিয়া মাড়ায়, কখনো আবার রোগীকে একটি সাপের সঙ্গ একত্রে রাখে ; (ঘ) ইহারা মনে করে যে, পূর্বে এই তরীকার যত কামিল শায়খ ছিলেন তাঁহারা সকলেই সাপের সঙ্গে অহিংস চুক্তি করিয়াছিলেন, তাই ইহারাও সাপের সঙ্গে দোস্তি সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সাপ সঙ্গে রাখে। এই অদ্ভুত রীতি হইতে আবার হুয়ায়শিয়্যা নামক আরেক বিশেষ উপগোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, উহারা সাপের ওঝা, মন্ত্র দ্বারা সাপকে বশীভূত করে, সাপের কামড়ের রোগীকে ভালো করে, এমনকি মানুষকে এমন নিশ্চয়তা প্রদান করে যে,

সাপের বিষ তাহাদের দেহে ক্রিয়া করিবে না ; (ঙ) ভেল্কিবাজী, হাতসাফাই ও যাদুটোনা ইত্যাদি প্রদর্শন করা, এইজন্য তাল্লা' একটি চ্যাপ্টা ঝুড়ি ব্যবহার করে, উহা হইল মাজমা'উ'ল-আসয়াদ বা "বড় কুতুবগণের সম্মিলনী", উহার মধ্যে ছোট ছোট পাথরের টুকরা বা নুড়ি, শামুক, ঝিনুক আর নানান জিনিস রাখা হয়, সেগুলির প্রতিটি এক একজন রক্ষাকর্তা দরবেশের এবং পরিচিত জিনের প্রতিনিধি, ঝুড়িটি নাড়া দিবার পরে সেই পাথরের টুকরা ও শামুক ঝিনুকের কোন্‌টি কোন্‌মুখী হইয়া আছে তাহা দেখিয়া উহার ভবিষ্যদ্বাণী করে বা রোগ নির্ণয় করে ঃ জিনে ধরিয়াছে বা বেদিশা হইয়া পড়িয়াছে এরূপ কোন রোগীকে হয়তো উহারা সদ্য য াবহ' করা একটি পশুর রক্ত পান করিতে বলে ; (চ) জীবজন্তুর প্রতিনিধিত্ব। প্রতিটি তা'ইফা-তে কিছু সংখ্যক ফুকারা' বিভিন্ন জীবন্তুর প্রতিনিধি হয় এবং অত্যন্ত বাস্তবভাবে সেই প্রাণীর ডাক ও ব্যবহার নকল করে। কোন বড় উৎসব বা সম্মেলনের সময়েই বিশেষভাবে তাহারা ইহা করিয়া থাকে। যে সকল জীবজন্তুর প্রতিনিধিত্ব করে সেইগুলি হইল ঃ সিংহ ও সিংহী, শৃগাল ও চিতাবাঘের সমবায়ে এক আনুষ্ঠানিক ভোজে (ফ্রীসা) অংশগ্রহণ করে, সেখানে উহারা পূর্বেই যাবহ' করা কোন প্রাণী, ভেড়া বা বকরীকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিড়িয়া ফেলে, উহার রক্ত সারাদেহে মাখে এবং সেই কাঁচা গোশত ভক্ষণ করে। সেই অনুষ্ঠানে বন্য শূকর (হ'াল্লুফ) আর কুকুর ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত হয় ; বিড়াল গিয়া চুরি করে এবং নানা রকম কৌশলের খেলা দেখায় ; উট যে হয় সে বিশাল বড় এক বোঝা বহন করে, আর ফণীমনসা, কাটাগুল্ম ও যবক্ষেত খাইয়া ফেলে ; সবশেষে অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়া মাংসাসী হায়েনা কৃদাচিৎ আসিয়া দেখা দিয়া যায়। এই জীবজন্তুর রূপ গ্রহণের রীতি যদিও বা নিগ্রো টোটেমবাদ হইতে আসিয়া থাকে (Van Gennep, Religion Moeurs et Legendes, paris 1908), তথাপি এই পশু হত্যার গণ-অনুষ্ঠান, বিশেষ করিয়া পরিমিত অর্থে বলিতে গেলে, ...লামের প্রভাবে গভীরভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করা গিয়াছে (Brunel) যে, সুদূর অতীতের কোন পশু পূর্বপুরুষের প্রতি সন্তানসুলভ ভালবাসাবোধের স্থলে একটি 'আহ্‌দ-এর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করিয়াছে এবং তাহা সীদী ইব্‌ন 'ঈসার বারাকাতের কারণে। তরীকাপন্থিগণ মনে করেন যে, সকল সৃষ্ট জীবের উপরে তাঁহার আধিপত্য (তাসাররুফ) ছিল, আর তরীকার মধ্যে মানুষ, জীবজন্তু ও জিনদের মধ্যে এক ধরনের ভ্রাতৃত্ব বা মমত্ববোধ সৃষ্টি করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন; (ছ) সবশেষে 'ঈসাবিয়াদের অনেক সম্মেলনেই এক ধরনের ভাঁড় প্রকৃতির লোক থাকে, তাহাকে বলা হয় 'আত্তার (عطار) বা মিছা হাকীম, সে নানা রকমের হাস্যকর কাহিনী বলিয়া লোকদিগকে আনন্দ দিয়া থাকে।

তরীকা 'ঈসাবিয়্যার অস্বাভাবিক বিষয়সমূহ সূফীতত্ত্ব বিরোধী 'আলিমগণের মধ্যে বিতৃষ্ণার ভাব সৃষ্টি করে। ফলে যথেষ্ট প্রাণবন্ত সমালোচনা শুরু হয়। সেরূপ বিরুদ্ধ মতের একটি প্রকাশ দেখা যায়, উদাহরণস্বরূপ, 'আলাবী সুলতান মাওলায় সুলায়মানের একটি আদেশ জারীর মধ্যে। ১৮১৫ খৃ. জারীকৃত সেই আদেশ মরক্কোর সকল মসজিদে পাঠ করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। সেই শাহী ফরমানের বিশেষ করিয়া এই অংশগুলি অনুধাবনযোগ্য ঃ "মওসুসেমদের (Moussem)-কে আপনাদের হইতে দূরে নিক্ষেপ করুন . . . এইসব অদ্ভুত, নূতন পথ অবলম্বনকারী লোকদের হইতে দূরে থাকুন। . . . এই সকল অস্বাভাবিক আচার-আচরণের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, শয়তানকে ভালবাসিবার জন্য ইহারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছে। যে সকল লোক এই সকল অদ্ভুত আচরণকারীদের প্রতি, 'ঈসাবিয়্যাদের প্রতি, জিলালা (جلالة) ও অন্যান্য ভ্রাতৃসমাজের প্রতি আসক্ত হয় তাহারা শুধু অভিনবত্ব আর ভ্রান্তির প্রতিই আসক্ত হয়, মিথ্যা আর অজ্ঞতা দ্রুত তাহাদের প্রতি ধাবিত হয় . . ." (Drague কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ৮৯-৯১)।

সূফীগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনোভাবের বিষয়ে আলজিরিয়ার শায়খ ইব্‌ন আলীওয়া (ابن عليــــوه) (দ্র.)-এর উদাহরণ প্রদান করা যায়। দারকাওয়া (درقاوه)-পন্থী (দ্র.) হইবার পূর্বে তিনি স্বয়ং একজন 'ঈসাব'ী ছিলেন। 'ঈসাবী সূফী তরীকার শিক্ষার যথার্থতা স্বীকার করিয়া তিনি বলেন যে, এই তরীকার কামিল ব্যক্তিগণ যথেষ্ট আত্মিক উন্নতিও সাধন করেন, কিন্তু তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন যে, ইহারা অলৌকিকতা ও অস্বাভাবিকতার সন্ধানের প্রতি খুব বেশী গুরুত্ব দিয়া থাকে, আর ফকীরীর প্রতি অত্যন্ত বেশী আসক্ত হয় (দ্র. M. Lings, A Moslem saint of the twentieth century, London 1961, p.p. 50-1)। বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যাঁহারা 'ঈসাওয়াকে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে উপরিউক্ত এই মতামত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই তরীকার বিচিত্র রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানাদি শরী'আত সম্মত নহে। (সম্পাদনা পরিষদ)।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) মৌলিক গ্রন্থ এখন পর্যন্ত R. Brunel-এর গবেষণা প্রবন্ধ Essai sur la Confrerie religieuse des Aissaoua au Maroc, Pais 1926, ইহাতে পূর্বেকার সকল গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া Cat. Delphin. de Neveu, Depont and Coppolani, Doutte এবং সর্বোপরি L. Rinn (ইহার Marabouts et khouans, Algiers 1884, Chapter xxi-এ এমন সব পাঠ রহিয়াছে যেগুলি Brunel-এ নাই) ইত্যাদি, তদুপরি কিছু সংখ্যক মুদ্রিত 'আরবী তথ্য সূত্রও রহিয়াছে [সালাবী (الســــلاوى)-এর ইস্‌তিকসা', জা'ফার আল-কিত্তানীর সালওয়াতুল-আনফাস (سلـوة الانفـــاس) ও অন্যান্য এবং সেগুলি ব্যতীত কিছু সংখ্যক অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি। এখানে শুধু সেই গ্রন্থের সঙ্গে প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জীর (পৃ. ৭-১০) প্রতি পাঠক-পাঠিকাগণকে নির্দেশ প্রদান করা যাইতে পারে]।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের পঠন-পাঠনের মধ্যে (২) E. Dermenghem, Le Culte des Saints dans l'Islam maghrebin-এ প্রকাশিত গ্রন্থখানি (Paris 1954, pp. 303-18) বিশেষ চিত্তাকর্ষক। ইহাতে Brunel কর্তৃক আলজিরিয়ার 'ঈসাওয়াগণের সম্বন্ধে অতি কঠোর সমালোচনার সংশোধন করা হইয়াছে, ইহাতে বিভিন্ন সম্মিলনীতে ব্যবহৃত তরীকার বিধিমতো কথার প্রচুর উদ্ধৃতি রহিয়াছে এবং চমৎকার সঙ্গীতের স্বরলিপিসমূহ দেওয়া আছে (Leo-Louis Barbes in R. Afr. 1951 হইতে)। নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীও দেখা যাইতে পারে ঃ (৩) P. J. Andre, Contribution a l'etude des Cnfreries Religieuses musulmanes, আলজিরিয়া ১৯৫৬ খৃ. ; (৪) A. Barnard, La religion Musulmane en Berberie, Paris 1938 ; (৫) G. Drague, Esquisse d'histoire religieuse du Maroc, Paris 1951, সেইখানির সর্বত্র জুড়িয়া বিবরণ রহিয়াছে।

J. L. Michon (E.I.[2])/হুমায়ুন খান